নূতন দিগন্ত
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

বিষয় লেখক

তুষার-শয্যায় শিলা
(পূর্ব কামেট হিমবাহ ১৮০০০ ফুট)

বিশ্বদেব বিশ্বাস

সরস্বতীর সন্ধানে
বীথি সরকার

আচ্ছাবল-কাশ্মীর — মুকুলকান্তি ঘোষ

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

প্রবন্ধ

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

মহাত্মা শিশিরকুমারের
— কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ —
অমিয় নিমাই-চরিত (৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি খণ্ড ... ৩৲
কালাচাঁদ গীতা
৬ষ্ঠ সংস্করণ ... ৩৲
নিমাই সন্ন্যাস (নাটক)
২য় সংস্করণ ... ২৲
নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ... ২৲
লর্ড গৌরাঙ্গ (২টি খণ্ড)
(ইংরেজী) প্রতি খণ্ড ... ৩৲
প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট
১৷৷০
নয়শো রুপিয়া ও বাজারের
লড়াই (নাটক) ... ১৷৷০
সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৮ম সংস্করণ ... ১৷৷০
LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
De-luxe Ed. ... Rs. 6.50
LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Popular Ed. ... Rs. 3.50
প্রাপ্তিস্থান
পত্রিকা ভবন—
বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে

সূচীপত্র

কবিতা

সুচীপত্র

কবিতা

খেলার দুনিয়া

অভিনয় জগৎ

চিত্রাঙ্কনাদি : কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার, শৈল চক্রবর্তী, সুধীর মৈত্র, অহিভূষণ মালিক, শুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, নৃপেন ভট্টাচার্য, শ্যামদুলাল কুণ্ডু, অশোক দেব, রঞ্জন দাস, শ্যামল সেন।

সূচীপত্র

পূজা পাত্তাড়ি

নতুন ইতিহাস

আমাদের ইতিহাস বোবা ছিল
মানচিত্রে ছিল শুধু নখরের দাগ,
আমাদের পাণ্ডুলিপি ? ছিল শুধু
ললাটলিখন,
সাত সমুদ্রের জলে ছিল নিত্য
লবণাক্ত জীবনের স্বাদ।

আমাদের বসন্তের ফুলের বাগানে
কটুগন্ধ বারুদের ধোঁয়া,
আমাদের স্বপনের নীলপাখী যত
বুলেটে নিহত।
আমাদের শ্যামশোভা নদী তীরে তীরে—
সারি সারি এলো গানবোট্।
মানুষমারার গানে
রাতগুলি যন্ত্রণা বধির,
দিনগুলি ঝরে যেত বরফের কুচির মতন
মরা মানুষের পায়ে
যেন শেষ প্রণয়বেদন।

সেদিন বিগত আজ।
ইতিহাস বোবা নয় আর,
ইতিহাস কথা বলে—
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের
বাঁচিবার কথা,
মানচিত্রে নয় আর নখরের দাগ
রঙে তার নয়া অনুরাগ।
মহা পৃথিবীর মেলা
মানবের মহামিলনের মেলা ঃ
সে মেলায় আমেরিকা নিয়ে এলো
মানবিক নীতি—
হিরোসিমা নয় আর, নয় আর
সীমাহীন বোমারুর ভীতি !
ইউরোপ এলো বুঝি অপরূপ
প্রাণের জাগরণে
'অস্ত্রহীন জগতের' নব রূপায়ণে।

অন্ধকার আফ্রিকা হাতে নিয়ে এলো
দীপমালা,
মুখে তার অরণ্যের নবোদিত সূর্যের
মহিমা,
মানব-মৈত্রীর বাণী নিয়ে এলো
প্রাচীন এশিয়া
পুষ্পগুচ্ছ হাতে নিয়ে দাঁড়াইলো
নয়া অস্ট্রেলিয়া।
মহত্তর সভ্যতার উত্তর সাধক
এলো সোভিয়েট ;
কণ্ঠে তার শান্তির নির্ঘোষ
বক্ষে তার পৃথিবীর মুক্তির কামনা।

উত্তরের মেরু হতে দক্ষিণের সমুদ্রসুদূর
পশ্চিমের অতলান্ত, পূর্বের
প্রশান্ত জলধি—
এই যে বিপুল পৃথ্বী আশ্চর্য সুন্দর
নানা বর্ণ, নানা ধর্ম, ভাষায় সজ্জায়—
বিচিত্র বিরাট,
বহুর মাঝারে সেই দেখিনু একেরে
একের মাঝারে যেন দেখি বহুরূপ !
এক বিশ্বনীড়ে যেন লক্ষ কোটি
বিহঙ্গের বাসা
যেন এক পরিবার
অজস্র নদীর স্রোতে হলো এক
মহাপারাবার !

মহামিলনের সেই জয়দীপ্ত
দুর্বার মিছিল
আমি তার সহযাত্রী
আমি এক বিশ্বনাগরিক
লিখে যাই নয়া ইতিহাস ঃ
পৃথিবী সুন্দর হবে, জীবনের মিলিবে
আশ্বাস ! *

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

* পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক মস্কোর বিশ্ব-কংগ্রেসের স্মরণে

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে শরৎকালে যে বার্ষিক মহাপূজো বিহিত, তাতে দেবীর মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করলে মানুষ দেবীর কৃপায় সকল বাধা থেকে মুক্তিলাভ করবেন এবং (পার্থিব দিক থেকেও) ধন, ধান্য, পুত্র লাভ করবেন—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্য সুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

এই উপরের উদ্ধৃতি থেকে অনেকগুলি প্রশ্নই মনে জাগে, যার সমাধান প্রয়োজন।

পুরাণাদিতে শরৎকালে দেবীর পূজোর বিধান যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি বসন্তকালেও দেবীর পূজোর বিধান আছে। আবার প্রত্যেক তিন মাস পরে পরেও দেবীর পূজো বিধান আছে সেজন্য শরৎকালের মহাপূজোর দ্বারা ঐ সকল পূজোও সূচিত হয় কিনা, দেখা প্রয়োজন।

উত্তরায়ণের মধ্যভাগে যে বাসন্তী দুর্গা পূজো, সে সময়ে দেবীর বোধনের প্রয়োজন নেই। অথচ দক্ষিণায়নের মধ্যভাগে শরৎকালে করণীয় দুর্গাপূজোয় শ্রীশ্রীদেবীকে অকালে বোধন করে, জাগিয়ে পূজো করতে হয়। অকালের এই পূজোর প্রাশস্ত্যও বা কেন?

দেবীর এই পূজোকে 'মহাপূজো' বলা হয় কেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী', এই শ্লোকাংশের 'চ' পদের বিশেষ অর্থ আছে। এতে বোঝা যায় বার্ষিক যে মহা-উৎসব, অর্থাৎ যাতে অকাল বোধনের প্রয়োজন হয় না, সেই যে বাসন্তী দুর্গাপূজো, তাতেও দেবীর মাহাত্ম্যমূলক চণ্ডী পাঠ একান্ত করণীয়। এবং এই দুই উৎসব—পূজো মহাপূজো ধরে নিয়ে লক্ষণার দ্বারা ত্রৈমাসিক অন্য দুই দুর্গাপূজোতেও চণ্ডী পাঠ সমর্থিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর গুপ্তবতী-টীকাকার বলছেন,—"চকারাদ্ আষাঢ়, পৌষ—নবরাত্রয়োগ্রহণম্। তয়োরপি দেবী ভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ' এই প্রসঙ্গে দেবী ভাগবতের মূল শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করি—

"শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্যা মম সর্বদা।
নবরাত্র-বিধানেন ভক্তিভাব-যুতেন চ॥
চৈত্রেহশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্যো মহোৎসবঃ।
নবরাত্রে মহারাজ পূজা কার্যা বিশেষতঃ॥"
(দেবীভাগবত, ৩,২৪,২০-২১)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই দেখা দরকার যে শরৎকালের এই যে মহাপূজো, এই মহাপূজো পুরাণাদিতেও শরৎ-কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দেবী-ভাগবতের ৩।২৬তম "নবরাত্র-বিধান" অধ্যায়ে বিশেষ করে বলা আছে শরৎকালেই বিশেষভাবে বিধিপূর্বক শুভ নবরাত্রব্রত অনুষ্ঠেয়।

"শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্র-ব্রতং শুভম্।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম"।

নবরাত্র অনুষ্ঠান শরৎকালে প্রশস্ততম, চণ্ডীর শ্লোক থেকেও তা' প্রমাণিত হয়। এর কারণ অনুসন্ধেয়।

কারণ এই—"স্বয়ং দুর্গাষ্টমী তিথির্দেব্যাঃ প্রীতিকরী পরা"। শরৎকালে দুর্গাষ্টমীর যে তিথি—সেই তিথি দেবীর বারংবার আবির্ভাবের তিথি, দেবীর বড়ই প্রিয়। ঐ দিনে আবির্ভূতা হয়ে তিনি মহিষাসুর বধ করেছিলেন; পরের দিনে দেবতারা তাঁর মহাপূজো করেছিলেন (কালিকাপুরাণ, ৬০, ৭৯-৮১)। দেবী-পুরাণ বলছেন (২২।৩) ঐ দিনে আবির্ভূতা হয়ে পরের দিন দেবী "ঘোর-অসুর"কে বধ করেছিলেন। দেবী-ভাগবত বলছেন—এই আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী তিথিতে আবির্ভূতা হয়ে দেবী দক্ষযজ্ঞও বিনাশ করেছিলেন—

"পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।
অতোহষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা।।"
(দেবীভাগবত, ৩,২৭,৯-১০)

যদিও বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গা-পূজোর উল্লেখ করেন নি, তথাপি দেবীভাগবত (৩।৩০তম অধ্যায়), কালিকাপুরাণ (৬০তম অধ্যায়) বৃহদ্ধর্মপুরাণ (পূর্বখণ্ড ২১-২২ অধ্যায়) এবং মহাভাগবত (৩৬-৩৮তম অধ্যায়) অতি সুন্দরভাবে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজোর ফলে রাবণবধ সম্ভবপর হয়েছিল, এই তথ্য প্রচার করছেন বলে সমাজে "শারদীয়া পূজো"র প্রসিদ্ধি ঘটেছে অবিসংবাদিভাবে।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন—এই পূজো "মহা-পূজো" কেন? তার শাস্ত্রীয় উত্তর এই—যে পূজোয় মহাস্নান, পূজো, হোম ও বলিদান আছে, সেটি মহাপূজো। লিঙ্গপুরাণে আছে—"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কর্মময়ী শুভা"। এই মহাপূজো মহাভারতের সময় থেকেই সার্বজনীন মহোৎসবও বটে—মহাভারত বলছেন, দেবী "শবরৈর্বর্বরৈ-শ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা"। মহাস্নানের মধ্যেই মহামিলনেরও সার্বজনীনতা মূলসূত্রটি নিহিত আছে। দ্বাদশ মৃত্তিকা সংগৃহীত না হলে মায়ের স্নান হয় না; তন্মধ্যে পতিতালয়ের মৃত্তিকা অন্যতম। মায়ের পূজোর দিনে পতিতাও বাদ যাবেন না। বাদ যাবেন না চণ্ডালও। এজন্যই "শাবরোৎসব" বা চণ্ডালোৎসবের বিধান—"বিসর্জনং দশম্যান্তু কুর্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ" (কালিকাপুরাণ, ৬০-১৯)। শাবরোৎসবে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের কোলাকুলি না হলে, "তস্য ক্রুদ্ধা ভগবতী"—দেবী ক্রুদ্ধা হন, শাস্ত্রের উক্তি। এমনি মহামাহাত্ম্যপূর্ণ শারদীয়া পূজোয় দেবীকে প্রণাম জানাই—

'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।।"

———

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক লিখিত ও তৎকর্তৃক প্রাপ্ত পত্রগুচ্ছ

রাজনারায়ণের দৌহিত্রী ও সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

পত্রলেখকগণ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে

জগদীশ্বর

প্রিয়তমেষু,

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং

আপনার জীবন সম্পর্কীয় শুভ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইলাম। কখন কোথায় কোন দিকের বাতাস বহিতে থাকে কিছুই বলা যায় না। যখন এক মকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আরও বা কি হয়! আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টায় আছি। দুই তিন মাস হইতে মৎস্য, মাংস গ্রহণ করি নাই, কিন্তু অদ্যাপি পরীক্ষার অবস্থা যাইতেছে। সুরাপান করা ও অভ্যাস নাই, কিন্তু সে বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই নাই। আর শুনিয়াছেন এ তরঙ্গ অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে।

বর্ধমানের মহারাজা প্রায় তিন দিন পর্যন্ত মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন নাই লিখিয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, যদি তাহা আহার না করিলে কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয় তবে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। বিধবাদিগেরই জন্য, কেবল আতপ তণ্ডুল অর্পিত হইত। কিন্তু আমাদের বড়বাবু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, সে ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব মৎস্য মাংস বর্জিত না হইলে [illegible] ব্যক্তি সর্বতোভাবে চরিতার্থ হয় না।

আপনার ছাত্রদের পরীক্ষার কাল উপস্থিত অতএব আর গল্প করিয়া কাল হরণ করিব না।

ইতি ২১ ভাদ্র (১৮৫১—সেপ্টেম্বর)
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পত্র
রাজনারায়ণ বসুকে—

জগদীশ

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং

আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্রাসুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে রজনীযোগে অপর্যাপ্ত বারি বর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুস্থ শীতল হইয়াছে। বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল নরকে সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুর এখানে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্বক দক্ষিণ দিকে গিয়া বা উদয় হয় এই আমার আশঙ্কা হইতেছে আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর সুস্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।

আপনি যে সকল গ্রন্থের নিমিত্ত লিখিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ দত্তের নিকট christian Advocate ছিল এ প্রযুক্ত তাহা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে। বুঝি আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

আপনাকে মহারাণীর ছবিখানি অমূল্য মু[illegible] পরিত্যাগ করিতে হইবেক। বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন তাহা শুনিয়াছেন। তিনি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেছেন। যেমন ভাই, তেমনি ভগিনী, যেমন দেব তেমনি দেবী, যেমন উড়ে তেমনি তাহাদের দেবতার গড়ন। তিনটিরই সমান শ্রী—সমান ভঙ্গী।

শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ তর্কভূষণের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি তথাকার পণ্ডিত পদের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, তাহার কি হইয়াছে?

আমরা সকলে শারীরিক সুস্থই আছি। আপনি কিরূপ আছেন লিখিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি ৯ই বৈশাখ (১৮৫১)
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে—

জগদীশ

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং

আপনার তপোবন প্রবেশ এবং ছোট্ট ব্রাহ্ম সমাজটি বড় হইবার উপক্রম সংবাদ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম।

আমরা সকলে এক প্রকার সুস্থ শরীরে আছি। আপনি এক্ষণে সপরিবারে কিরূপ আছেন লিখিয়া বাধিত করিবেন।

আপনি কবে [illegible] অধিকারী হইবেন? আপনার স্নেহবৃত্তি আর কতদিন পরে সর্বতোভাবে চরিতার্থ হইবেক? কতদিনে আপনারা উভয়ে বসিয়া পরস্পরের মুখশ্রীর সহিত প্রণয় বৃক্ষের ফলস্বরূপ শিশু সন্তানের মুখশ্রীর ঐক্য করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন!

এক্ষণে এই শুভ সমাচার শ্রবণের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

এখানে সভা ও সমাজের কার্য পূর্ববৎ চলিতেছে। গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সকলেই স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীবাবু একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সমাজে বিলক্ষণ লোক সমাগম হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মধর্মের বাঙ্গলা ভাষ্য প্রস্তুত। বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাহার কিঞ্চিৎ আপনার দৃষ্টার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। এ ভাষ্য শিক্ষকরূপে উপকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বারাসতের পূর্ব অংশে নিবোধই গ্রামের পাঠশালার বালকেরা বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম অধ্যয়ন করিতেছে। বড়বাবু গত দিবস তথায় গমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

[illegible] সাহেব 'বাহ্যবস্তু' পুস্তক গ্রহণের বিষয় কি বলিলেন শুনিতে প্রার্থনা করি।

ইতি ১৭ জ্যৈষ্ঠ
অক্ষয়কুমার দত্ত

পুনশ্চঃ বাণেশ্বর শর্মা ও বৈকুণ্ঠনাথ সেনের শত নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে

জগদীশ্বর

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং

বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের) তিনখানি পত্র প্রেরণ করিতেছি, পাঠ করিয়া অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার কটক পৌঁছিবার সংবাদ অদ্য প্রাপ্ত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পত্র লিখিলাম।

এখানে সূর্যদেব প্রচণ্ডরূপে প্রকাশ করিয়াছেন মধ্যাহ্নকালে বৈশাখ বৈশাখ মাসের ন্যায় দুঃসহ বোধ হয়। পরিশ্রম করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। একালে নিদ্রার ন্যায় আর বন্ধু নাই। আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম ওখানে মাথা খোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিছু মন্ত্রতন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর সীমানায় না আসিতে পারে। ভয় কি! বিষস্য বিষমৌষধং। বোধ করি এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড়বাবু আপনাকে অভয় দান দিয়া গিয়াছেন।

আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, কলের জল পান করিবেন, উষা ও সায়ংকালে পদব্রজে ভ্রমণ করিবেন আর ঘাড়টি একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।

প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদপত্রাদি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধ্য থাকিবেন। ঝগড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া দিবেন, বাস্তবিক দেখিবেন লিখিতে হইলে, মানুষের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য। ইহাই সভ্যতার স্বরূপ। এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা।

ইতি ৮ই চৈত্র (১৮৫১)
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে

শ্রীশ্রীহরি

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্

বহু দিবস হইল মহাশয়কে পত্র লিখিতে পারি নাই তাহার কারণ এই যে, চৈত্র মাসের শেষ অবধি ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়িয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। আপনি জানেন আমাদের দেশে কতকগুলি গ্রামে বিধবা বিবাহ হইয়াছে তন্মধ্যে কোমরগঞ্জ নামে গ্রামে জাড়া নিবাসী শিবনারায়ণ রায়ের তালুক। রায় মহাশয় রামমোহন রায়ের চেলা। এই মহাপুরুষ বিধবা বিবাহের বিষম বিদ্বেষী। কোমরগঞ্জের বিধবা বিবাহের দলস্থদিগের উপর যারপরনাই অত্যাচার করেন এবং যাহাতে ঐ অঞ্চলে বিধবা বিবাহ বন্ধ হইয়া যায় তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া এরূপ দুষ্টতা আরম্ভ করিয়াছেন যে, দল রক্ষা করা ভার হইয়াছে। তাঁহার কৃত অত্যাচার নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিতে হইয়াছে, নালিশ করা অবধি সেই বিষয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত

হইতে হইয়াছে। মধ্যে বাটী যাইতে হইতেছে। প্রায় সর্ব্বদা হুগলী যাইতে হইতেছে এবং প্রায় প্রতিদিন ভবানীপুর গিয়া উকিলদিগের সংগে পরামর্শ করিতে হইতেছে। ফলতঃ এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আর সকল কর্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মোকদ্দমা এ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। মাঝে আবার ম্যাজিস্ট্রেট বদল হইয়াছেন। পূর্বে যিনি ছিলেন তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন শিবনারায়ণ বাবা অত্যন্ত কুচক্রী এবং বিধবা বিবাহ দম্পতিদিগের উপর—করিতেছেন। ১০।১২ দিন হইল নূতন সাহেব আসিয়াছেন। তিনি কিরূপ করেন বলা যায় না। আমার অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইবার তাৎপর্য এই যে, যদি দুরাত্মারা সমুচিত দণ্ড না পায় তাহা হইলে বিধবা বিবাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইবেক। পরে যেরূপ হয় সংবাদ লিখিব।

কিছুদিন হইল আপনকার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে যে আপনাকে কি পর্যন্ত অসুখী হইতে হইয়াছে এবং আমিও তজ্জন্য কি পর্যন্ত অসুখী হইয়াছি তাহা আপনি ও আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। ফলতঃ এই ব্যাপার যৎপরোনাস্তি দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি যেরূপ অসাধারণ সাহস প্রদর্শনপূর্বক বিধবা বিবাহের মঙ্গলার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ যাত্রা ক্ষমা করিয়া তদপেক্ষায় অনেক অংশে অধিক ঔদার্য্য ও মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া অবধি আমি আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আপনি মহাত্মার কর্ম করিয়াছেন। এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনকার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে বোধ হয় আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না। আমি এ বিষয়ে যে এতদিন আপনাকে কোন পত্র লিখিতে পারি নাই তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এতদিন যেরূপ বিব্রত ছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি।

পরশ্বঃ প্রাতঃকালে মদন মেদিনীপুরে যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম। এখানে কায়িক সকলে ভাল আছেন। মহাশয়দিগের মংগল সংবাদ পাইলে পরম আহ্লাদিত হইব। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পত্র লিখিলাম সংগতাসংগত দোষ গ্রহণ করিবেন না।।

ইতি ২৫ জুলাই
ভবদীয়
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মনঃ

The letter of Rajnarain Bose to
Pandit Iswar Chandra Vidyasagar.

Midnapore
10th March.

My dear Vidyasagar Mahasaya,

I think I did not sufficiently explain to you of our plan in my last letter. We should not think highly of Beechar. A Beechar has great influence on the people of the mofussil. Besides Ananda Babu has formed connections with the boys of Isacpore Ghoses, at whose house, the Beechar is proposed to be held. They are not now unfavourably disposed towards the movement and if by a Beechar at their house, we succeed in making an impression upon them that could have much influence on Ananda Babu. If Tarakabachaspati with the Beechar forces us and if we induce the boys to countenance the marriage, by speaking to them, somewhat after this fashion—you, yourselves are not required so do it, why then set obstacles in the way of one who is inclined to do it (words which we have found to take effect on many people)—especially those, who are somewhat favourably, inclined to the causes if you send down Mukherjee Kulins whom the Boys themselves would respect and your letter to the effect that as soon as Ananda Babu sets the first example, it will be followed immediately after by our friends at K. & elsewhere be shown to him, there is great probability of his coming forward. If you think the above plan feasible and that the beginnings would be made in Midnapore, as it is your wish, it should be. We should wait for sometimes there for taking the first blow.

Though Ananda Babu is not inclined to set the first example, he has shown evident marks of an extremely agitated mind ever since the commencement of the movement: Wherever is the collectorate, he sees people talking on the subject, he draws close to hear. Some of our opponents remark, we have put him under a sort of spell.

We are all anxiously expecting the publication of your reply. Jagabandhu Babu is drawing up a statement of the objection usually put forth by people of this place about Pinda—Samanaya and so forth and will send it to you within a few days to be embodied in your reply. Kashi Babu writes that Raja Bahadur has written to the Pandits of Benares texts actually prohibitory of Widow marriage which I have great doubts of his ever obtaining.

Jagabandhu Babu and Shib Chandra Babu give their namaskar to you.

I remain
Yours very very sincerely,
Sd/ — Rajnarain Bose

P.S. My best compliments to Prasanna Babu and my pronam to Tarka Bachaspati Mahasaya.

ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য
মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে

৭৮, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৩ কার্তিক ১৩০৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন পর আপনার একখানা পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অন্য কিছু লিখিবার পূর্বে দেশীয় প্রথানুসারে বিজয়ার আলিংগন মহাশয়কে দিতেছি।

এবার বৈদ্যনাথ বোধহয় আমার যাওয়া হইবে না। প্রথম কারণ বাড়ী এখন প্রাপ্ত হই নাই; দ্বিতীয় কারণ সাগরদ্বীপ দেখার ইচ্ছা। আমি আগামী বুধ কিম্বা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাগর যাইতেছি। "হলো" সাহেব (Mr. Hollow) কালতক এখানে পেঁছিবেন।

বয়ঃক্রমের স্বধর্মেই আপনার ক্ষীণতা জন্মিবে; তাহা বলিয়া স্বাস্থ্যের ত্রুটি করিবেন না। যাহাতে বল থাকে ও হিম (Chill) না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ও সতর্ক থাকিবেন।

এবারকার দুর্ভিক্ষ সর্বদেশব্যাপী—অন্নের হা হা শব্দ সকল কোণ হইতেই শুনাইতেছে কেবল অন্নকষ্ট হইলে লোকে গাছের গলিত পত্র, শাকসবজী খাইয়া কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু এ যে দেখি উভয় কষ্ট—অন্নকষ্টের উপর আবার জলকষ্ট—স্থানে ২ ক্ষুধায় ও পিপাসায় লোক ত্রাহি ২ চিৎকার করিতেছে। আমাদের দেশে যদিও ততদূর কিছু না হইয়াছে, কিন্তু স্থানে ২ চাউলের দুর্মূল্যতা বিশেষরূপ অনুভব হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রজার সাহায্যার্থ ও কষ্ট উপশমনিমিত্ত কোন ২ গ্রামে ও মহালে চাউল কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রজাদের জীবন রক্ষা করা যাইতেছে।

শ্রীমান কুমারসহ আমি ভাল আছি। নিবেদন
নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীসূর্যকান্ত আচার্য

পুঃ আপনার একটা বহি আমার নিকট আছে আগামীকল্য পর্যন্ত পাঠাইব।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এখানে ১১ই মাঘ হইতে আমরা সংগীতসুধা পাকে এবং বিতরণে মত্ত আছি; সংগীত রচনার নেশা এখনো ছুটে নাই, কিন্তু এবারকার মত Session close হইয়াছে, নূতন সংগীত গান করা স্থগিত হইয়াছে।

আপনি পত্রের মধ্যে ধর্মবিষয়ক উপদেশ যখন যেরূপ উদয় হয় তাহা দিবেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব। আপনার উপদেশাদি আমার Spiritual hunger & thirst-এর পক্ষে অমৃত বারি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনার মধুময় সংসর্গ সেবন করিবার আমার যে কত ইচ্ছা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কঠোর কর্তব্যভাব এবং আবির্ভাবের মধ্যে একটি অলংঘনীয় প্রাচীর উত্থাপিত করিয়াছে। Give me strong wine যাহা আমার Strength হইতে পারে। অর্থাৎ আপনি যাহাতে বলী হইয়াছেন তাহার Secret আমাকে বলিয়া দিউন। সংসারের সকল অবস্থার মধ্যে কিরূপে বশী হওয়া যায় বলিয়া দিউন।

সংসারের বিভীষিকা কাহাকে বলে? কেই বা তাহা অতিক্রম করিতে পারে! অথবা অন্য যেমন বিষয় যাহা আপনার মনে উদয় হয়, আমার নিকট ব্যক্ত করুন। কেন না আপনার সহিত আমার সহিত বহুত Sympathy হইবে, যেহেতু উভয়েই আমরা সরস্বতীর সেবক হইয়া লক্ষ্মীর সহিত কখন কখন বিবাদ করিয়া থাকি।

আপনি পশ্চিমপ্রদেশে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের ন্যায় শিষ্যগণ বেষ্টিত হইয়া নিরুদ্বেগে এবং আত্মপ্রসাদ সুলভ আনন্দে কালযাপন করুন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

রাজর্ষি উপাধি আপনার নামের সহিত বোধহয় ঐক্য হইতে পারে and with revrence, be it said দেবর্ষি উপাধি পরম পূজনীয় পিতাঠাকুরের নামের সহিত ঐক্য হইতে পারে। এখন আমার মনে এইটি হঠাৎ উদয় হইল, ঈশ্বরপ্রসাদে।

এখানকার সকলই মংগল। ৭ই চৈত্র
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের চিঠি—
রাজনারায়ণ বসুকে

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

Star Theatre,
Cornwallis Street, Calcutta.
3rd June, 1895.

পরমভক্তিভাজন পূজ্যপাদ
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাত্মা
শ্রীচরণকমলেষু

দেব,

দেব দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না কিন্তু অতি পাপীয়ও দেবপূজায় অধিকার আছে। তাই যিনি বংগভাষার অমৃত সরসীতে শুভ্র শতদল সৃজন করিয়া তাহার হার গাঁথিয়া নিজ কণ্ঠ শোভিত ও সৌরভে দিক আমোদিত করিয়াছেন উহাতে আজ সেই সরসী কূল হইতে একটি ক্ষুদ্র ঘেটু ফুলে পূজা করিতে এই দীনহীনের বড় সাধ হইয়াছে। এই ইচ্ছার আকস্মিক হেতু আর একটি—এইমাত্র "দাসী" নামক একটি পত্রিকা খুলিয়াই দেখিলাম

(শেষাংশ ২৬৬ পৃষ্ঠায়)

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলী

অবন্তী দেবীর সৌজন্যে

(১)

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ শুক্রবার।
31, Hilldrop Road, London.

মা লক্ষ্মী হেম,

তোমাকে গতবার পত্র লেখার পর সেইদিনই আমি দুর্গামোহনবাবুকে(১) দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় তিনি আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পীড়া বড় বাড়িয়াছিল, এমন কি, আমাদের মনে ভয় হইয়াছিল জ্বর কাসি, প্লুরিসি প্রভৃতি সমুদায় সারিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে উপর হইতে নীচে আহার করিতে আসিলেন দেখিয়া আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। তিনি এত কাহিল হইয়াছেন যে, উপর হইতে নীচে আসাতে আমাদের আনন্দ হইল। সে দুর্গামোহন দাস যেন আর নাই। যাহা যাহা হউক তিনি আবার স্বরায় পূর্বের বল লাভ করিবেন। এখন শীত পড়িবার পূর্বে তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া তুলিতে পারিলে হয়। আমার নিজের স্বাস্থ্যের ভাবনা আর হয় না। এখন দুর্গামোহন-বাবুর ভাবনা আমার মনে প্রবল হইয়াছে। তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিতেছি আপনি একটু সারিলেই আপনাকে জাহাজে তুলিয়া দিই, তিনি তাহাতে অস্বীকার; তিনি বলেন—তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করিব।

আমি এক মহাব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড বই লিখিতেছি। আগে ছোট একখানি লিখিতেছিলাম, মনে ভাবিয়াছিলাম, আপনাদিগকে খরচ দিয়া ছাপিতে হইবে। এখন এখানকার দুইটি বড় বড় ছাপাওয়ালা নিজের ব্যয়ে ছাপিতে চাহিতেছেন, সুতরাং আমাকে আবার বদলাইয়া বড় করিয়া লিখিতে হইতেছে। অনেক পড়িতে হইতেছে, আমি আর কোন কাজে মন দিতে সময় পাই না। দেখাশুনা, বাহির হওয়া একেবারে বন্ধ করিয়াছি। চিঠিপত্র বড় বেশি লিখিবার সময় পাই না। এই একটি কাজ যদি ভাল করিয়া করিতে পারি, আমার বিলাত আসা সার্থক হইবে।

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর আমরা ব্রিষ্টল নগরে যাইব, এবং সেখানে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশে এক সভা করিব। তাঁহার কবর ততদিনে মেরামত সাঙ্গ হইয়া যাইবে। আমাদের বিলাত আগমনের এই একটি শুভ ফল।

আদিনাথবাবুকে(২) আমার নমস্কার জানাইবে এবং বলিবে যে, স্বতন্ত্র পত্র লিখিবার সময় নাই। বৌঠাকুরাণীকে(৩) বলিবে যে, তাঁহার দুই পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। সময়াভাববশতঃ এবার উত্তর দিতে পারিলাম না।

বাড়ীর ছোটবড় সকলকে আমার ঢের ঢের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে।

আদিনাথবাবুর ছোট স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। যে মেয়েরা অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের জন্য কিছু করা যায় এদিকে বন্ধুদের মনোযোগ নাই। এই আশ্চর্য! যাহা হউক আবার স্কুল করা যাইবে। ইতি

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

---

(১) **দুর্গামোহন দাস**—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আইনসেবী ও সমাজ-সংস্কারক; ইনি ব্যারিস্টার এস আর দাস ও জাস্টিস জে আর দাসের পিতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

(২) **আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়**—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকগণের অন্যতম।

(৩) **বৌ-ঠাকুরাণী**—পরলোকগত ডাঃ লোকনাথ মৈত্রের সহধর্মিণী; প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মাতা।

(২)

31, Hilldrop Road, London—N.
14th September, 88.

মা লক্ষ্মী,

তোমার দুইখানা পত্র এক সপ্তাহে পাইয়াছি। প্রথম পত্রে লিখিয়াছ, কেহ কেহ গোপনে আমার নিন্দা করে, তাহাতে তোমার গা জ্বলিয়া যায়। বোকা মেয়ে, তুমি তাহাতে বিরক্ত হও কেন? তোমার বাবা আপনাকে এত তীব্রভাবে নিন্দা করেন, এমন কোন বন্ধু আজও তাহা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ আমি আমার হীনতা সর্বদা যেমন অনুভব করি, আমার বন্ধুরা আমাকে এত হীন মনে করেন না। দেখ মা। মানুষের কত দোষ দুর্বলতা, অন্য লোক জানে না। আমাদের ক্ষমা-শক্তি এত কম, যদি আমরা সকলের সকল প্রকার দুর্বলতা জানিতাম, আরও কত নিন্দা করিতাম। পরম মহিমান্বিত ঈশ্বরই কেবল আমাদের দুর্বলতা অপরাধ পাপ জানেন, অথচ পাপীর চক্ষে অনুতাপের অশ্রু আসিতে না আসিতেই ক্রোড় পাতিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। দেখ আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষের কথা স্মরণ করিয়া আপনাকে কতই ঘৃণা করি। কিন্তু আবার নিজের প্রতি এমনি আন্তরিক ভালবাসা আছে যে, ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা মন বলে, আহা এ লোকটি যেন একেবারে যায় না, ঈশ্বরকৃপায় এক সময় ভাল হইবে। অন্যে যখন নিন্দা করেন, যেন এই প্রেম ও আশার অভাব অনেক সময় হয়, সেই জন্য আমাদের প্রাণে লাগে। আমার নিন্দা যদি কেহ করে, তুমি যেন তাহাকে শত্রু ভাবিয়ো না এবং তাঁহাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিয়ো না। কারণ আমাদের সাধুতা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। আমাদের প্রতি কেহ সৎ ব্যবহার করিলে তবে আমরা সৎ হইব তাহাও নহে। লোকে সৎ ব্যবহার করুক আর নাই করুক আমরা যেন সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পারি। তোমাদিগকে ভাল কথা লিখিতে আমার এই ভয় হয়, পাছে বড় বড় কথা ব্যবহার করা আমার ও তোমাদের অভ্যাস হইয়া যায়। আমি যে উচ্চ ভাবের কথা উপরে লিখিলাম, জানি না ইহা আমাতে কতদূর আছে। আমি কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই ভাবটি মনে রাখিয়া কার্য করিবার চেষ্টা করি।

তবে আমার এই একটা ক্ষোভ হইতেছে যে, ...আমাদের মধ্যে সে-ভাব এখনও জাগিতেছে না—যাহা পাইলে পরস্পরের দোষের প্রতি অধিক দৃষ্টি না পড়িয়া গুণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, অনুসন্ধান করিলে যাঁহার কোন না কোন দোষ বাহির না করা যায়! যখন দেখা যায় মন অপরের দোষানুসন্ধানেই প্রবৃত্ত তখন বোঝা যায়, নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি নাই এবং প্রেমের ভাব হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাহা আর বলিলে কি হইবে? জগদীশ্বর আমাদের অবস্থা এরূপ কখনই রাখিবেন না, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে মহৎ কার্যের জন্য অভ্যুদিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহার আশ্রয় নিশ্চয়ই পাইব। যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কি কি দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা যদি লিখিতে পার, ভাল হয়। হয়ত এমন হইতে পারে তাঁহারা আমার যে দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। শুনিলে আমার উপকার হইতে পারে।

কাদম্বিনী(১) বেচারি কোথায় যাইবে? আমি যাওয়া পর্যন্ত যো-যো করিয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকুক।

একটি দুঃখের সংবাদ আছে। দুর্গামোহন-বাবুকে ভাল দেখিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি পত্র লিখিয়াছেন যে ডাক্তার তাঁহাকে বলিয়াছেন, তাঁহার আর ইংলণ্ডে থাকা কর্তব্য নয়। যত শীঘ্র তিনি এ-দেশ পরিত্যাগ করেন ভাল। তাঁহার শরীর অতি দুর্বল। তিনি অক্টোবরের প্রথমেই যাত্রা করিবেন। আমি 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' সম্বন্ধে যে বই লিখিতেছি তাহা যদি তখন শেষ করিতে পারি তবে তাঁহার সহিত যাইব, নতুবা অক্টোবরের শেষে আমি যাত্রা করিব। আমি সঙ্গে যাইতে না পারিলে পার্বতীবাবু(২) সঙ্গে যাইবেন।

আমার বইখানা বড় হইবে, অনেক পরিশ্রম করিতে হইতেছে। এদেশের লোকের ধারণা যে, ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গিয়াছে। এই বইখানা প্রকাশ হইলে সে-ধারণা দূর হইতে পারে। এখানকার Trubner Co. (ট্রবনার কম্পানি) তাঁহাদের ব্যয়ে প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন—এমন সুবিধা ছাড়া উচিত নয়। বইএর জন্য আমাকে বাঁধা থাকিতে হইবে। এই বইএর জন্যই আমার কোথাও যাওয়া হইল না। কি করি, ব্রাহ্মসমাজের দাসখতে যখন নাম লিখিয়াছি, যেখানেই থাকি ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে হইবে।

তোমার মা, ছোটমা(৩), কাদম্বিনী, সরলা, সরোজিনী, রাজু(৪) প্রভৃতি বাড়ীর সকলকে এবং বাড়ীতে অন্যান্য যাঁরা আছেন সকলকে আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা স্নেহ জানাইবে। প্রিয়কে(৫) বলিবে তাহার পত্র পড়িয়া সুখী হইয়াছি। আজ এই পর্যন্ত। তোমার পিতা, শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

---

(১) **কাদম্বিনী**—কাদম্বিনী মণ্ডল; বালবিধবা, নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আজীবন ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে থাকিয়া বহু ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত প্রীতিযোগে যুক্ত ছিলেন। বেথুন কলেজের বোর্ডিংয়ে পূর্বে মেট্রনের কাজ করিয়াছিলেন।

(২) **পার্বতীবাবু**—পার্বতীনাথ দত্ত, জনৈক ব্রাহ্মবন্ধু। বিলাত গমনকালে ইনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও দুর্গামোহন দাসের সহযাত্রী ছিলেন।

(৩) **ছোট মা**—শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী। এই সাধ্বী পতিপ্রাণা আত্মত্যাগিনী মহিলা ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃকনিষ্ঠ, প্রায় সকলেরই ছোট মা বলিয়া অভিহিত হইতেন।

(৪) **সরলা, সরোজিনী, রাজু**—শাস্ত্রী মহাশয়ের তিনটি **পালিতা** কন্যা।

(৫) **প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য**—শিবনাথ শাস্ত্রীর একমাত্র পুত্র।

(২)

31, Hilldrop Road, London—N.
21st September, 1888

মা লক্ষ্মী,

আমি শারীরিক সুস্থ আছি। পরে শুনিয়াছ দুর্গামোহন বাবুর শরীর খারাপ, এইজন্য তিনি দেশে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি আর এক সপ্তাহ মধ্যে এ-দেশ পরিত্যাগ করিবেন। এবং আর এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিবেন......

এই মাত্র দেশের পত্র পাইলাম। তাহাতে দেখিতেছি আমার দেশে ফিরিয়া যাওয়া লইয়া বন্ধুদের মধ্যে গোল বাধিয়াছে, কেহ কেহ বলেন থাকি, কেহ কেহ বলেন যাই, গড়াইতে গড়াইতে বোধ হয় গিয়াই পড়িব। কারণ এখানে থাকা অনেক ব্যয়সাধ্য, আমি আমার ব্যয়ের জন্য কাহারও উপরে আর বোঝা হইতে চাহি না।

তোমার পত্রের সঙ্গে প্রিয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছে।........তাহার চিঠিপত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে উন্নতির ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়াছে। ঈশ্বর করুন এই ইচ্ছা বর্ধিত হউক। আমি এই দেখিতে চাই, একজন লোক যথাসাধ্য আপনার উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। তাহা হইলেই সন্তুষ্ট।

প্রিয় লিখিয়াছে মথুরের(১) ভাইয়েরা বলে পাড় তুমি ওত পড় না। Frist Art পরীক্ষা বড় কঠিন। বোর্ডিংএ থাকিলে ভাল হয় কিনা ভাবিয়া দেখিবে। যদি বাড়ীতে পড়ার ক্ষতি হইতেছে বুঝে, তবে সেখানে যাইবে।

তোমার মা ও ছোট মাকে আমার অন্তরের ভালবাসা জানাইতে বলিবে; আমাকে অনেক পত্রাদি লিখিতে হয় বলিয়া স্বতন্ত্র পত্র লিখি না। রাজুর খোকাটি হইয়া তোমার মায়ের কোলে একটি খোকা হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু রাজু যখন কাড়িয়া লইয়া যাইবে তখন কি করিবেন? "পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নিবে হেঁচকা টানে।"

সরলা আপনা হইতে উমাপদের(২) বাড়ীতে যাইতে চাহিতেছে ভালই। কাদম্বিনী থাকিবে লিখিয়াছ ভালই।

আমি এখানে মিঃ নাইটের(৩) এর নিকট হইতে হিমাদ্রিকুসুম লইয়া একজন বাঙ্গালীকে একটু পড়িয়া শুনাইয়াছি। তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আমার বিশ্বাস লোকে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া পড়ে না। আমার আশা, ভাবী বংশীয়েরা ইহার রসাস্বাদন করিবে। আমি ইহাকে আমার সকল কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি।

দেখাশুনো একরকম বন্ধ, সুতরাং নূতন কথা অধিক লিখিবার কিছু নাই। এখন কেবল দিনরাত্রি আলোচনার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। ইহাই ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র, সাধনা।

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন। সেই দিন ব্রিস্টল নগরে যাইব এবং তাঁহার জীবন-চরিত বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিব। সেজন্য সভা হইবে, বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর কিছু করিয়া থাকে, এবারে আমি একাই করিতেছি।

এখানকার ব্রাহ্মসমাজের ভগিনীগণ আমাকে ক্ষণ্ঠে প্রায় ১৫০ দেড় শত টাকা পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের ভালবাসার উপহার মাথায় করিয়া লইয়াছি। আমাকে আমার পরম মাতা খাওয়াইতেছেন পরাইতেছেন; আমি তাঁহার প্রসাদে বেশ আছি। কেবল এই দুঃখ যেমন করিয়া তাঁহার সেবাতে প্রাণ মন সমর্পণ করা উচিত, তাহা করিতে পারিতেছি না।

সরোজিনীকে বলিবে তাহার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে পারিলাম না কারণ সময় নাই। বাড়ীর ছোট-বড় সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও শ্রদ্ধা জানাইবে। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমি তাঁহাদেরই। আমার মন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ২১১ নম্বরের পাড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে। আজ এই পর্যন্ত। ইতি

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

(১) **মথুর**—মথুরামোহন গাঙ্গুলী, তৎকালীন একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। ইনি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজদাস দত্ত; সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ব্রাহ্ম যুবকগণ ঐ সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ১৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে সপরিবারে একত্রে বাস করিতেন।

(২) **উমাপদ রায়**—জনৈক ব্রাহ্ম যুবক, তখন ইনি সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

(৩) **মিঃ জে, বি, নাইট**—একজন ইউনিটেরিয়ান ব্রাহ্ম বন্ধু, ইংরেজ। ইনি ইতঃপূর্বে সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন।

(৩)

২১শে সেপ্টেম্বর
বৈকাল।

মা লক্ষ্মী,

আমি তোমাকে আজ যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা লেখার পর Mrs. Taweil(১) আমার হাতে এই পত্রখানি দিয়াছেন। আগামী শুক্রবার আমি ব্রিস্টলে থাকিব, সুতরাং পত্র লিখিতে পারিব না। যদি পত্র না পাও চিন্তিত হইও না। পত্রখানি পড়িয়া পাছে ভুলিয়া যাইতে পারি বলিয়া স্বতন্ত্র খামে পাঠাইলাম। যদি পার ইঁহাকে পত্র লিখিবে। তোমাদের পড়াশোনার বিষয় লিখিতে পার। আমার পত্রের ভিতর দিবে।

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

(১) **মিসেস টওয়েল**—বিলাতে শাস্ত্রী মহাশয় যে পরিবারের সহিত বাস করিতেন, সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রী।

(৪)

Bristol
28th September
1888.

মা লক্ষ্মী,

আমি কয়েক দিনের জন্য লণ্ডনের কার্যের বন্ধনের ভিতর হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি। গতকল্য ২৭শে সেপ্টেম্বর আমি সমস্ত দিন রামমোহন রায়ের বিষয় চিন্তা, পাঠ ও আলোচনায় কাটাইয়াছি। প্রাতে তাঁহার গোরে গিয়া প্রার্থনা করি। গোরটি এখন মেরামত হইয়া, অতি সুন্দর দেখাইতেছে। দেখিয়া আমার কি আনন্দই হইল।

রাত্রে এখানকার এক স্কুল 'হলে' রামমোহন রায়ের বিষয়ে এক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আমার খুব মনের মত হয় নাই। যাহা হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি।

আমি এখানে মিস মেরী কার্পেণ্টার-এর(১) ভাইঝির বাড়ীতে দুইদিন অতিথি হইয়াছি।

তাঁর নাম মিঃ হার্বার্ট টমাস(২) ইনি এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সম্পন্ন ব্যক্তি। মিঃ টমাসের এখনকার গৃহিণী যিনি তিনি মিস কার্পেণ্টারের ভাইঝি নন। ইনি দ্বিতীয়া স্ত্রী। মিঃ টমাসের বয়ঃক্রম সত্তর হইবে। গৃহিণীর বোধ হয় ত্রিশ। ইংরাজের বাড়ীতে যেখানেই যাওয়া যায়, সেইখানেই শান্তি, নিস্তব্ধতা, সৌজন্য। ইঁহাদের পারিবারিক জীবন অতি সুন্দর। আমাদিগকে ক্রমে এইরূপ পারিবারিক জীবন গঠন করিতে হইবে; ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি এই ভার।

মা, তোমাদের আমি আর কি লিখিব! আমি ভারতবর্ষের কথা যতই ভাবিতেছি, ততই আমার ক্ষোভ বাড়িতেছে যে, আমার একা শরীরে দশটা মত্ত হস্তীর বল হইল না কেন? আমার একটা মনে দশটা রামমোহন রায়ের শক্তি আসিল না কেন? আমি তাহা হইলে প্রাণ জুড়াইয়া দেশের জন্য খাটিতে পারিতাম।

চারিদিক হইতে দেশের বিষয়ে খারাপ সংবাদ আসিতেছে, ক্ষেত-মাঠ জলে ভরিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। এই সকল সংবাদ শুনিয়া দেশে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। ঝড় উঠিলে মুরগী যেমন তাড়াতাড়ি বাসাতে গিয়া ছানাগুলিকে ডানা চাপা দিয়া বসে, তেমনি আগতপ্রায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া ছানাগুলির পাশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু আমি যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহার একটা কিছু না করিয়া যাইতে পারিতেছি না। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে বই লিখিতেছি, তাহা শেষ না করিয়া এ দেশ ছাড়িতে পারিতেছি না। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কি দ্বিতীয় সপ্তাহে যাত্রা করিতে পারিব এরূপ আশা করিতেছি।

এখন হইতে এক্সটার বা ওয়েস্টন সুপারমেয়ার(৩) নামক স্থানে যাইব। সেখানে সুবিখ্যাত প্রফেসর নিউম্যান-এর(৪) বাড়ীতে দুইদিন থাকিব। নিমন্ত্রণ আছে। ইনি এক সাধুপুরুষ, মহাত্মা ব্যক্তি, ব্রাহ্মধর্মের জন্য অনেক করিয়াছেন, ইঁহারই লিখিত 'Soul' নামক গ্রন্থ প্রভৃতি আমার নিকট পড়িতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সম্প্রতি পরকালে অবিশ্বাসী হইয়াছেন। সে যাহা হউক, সত্যপরায়ণ, জনহিতৈষী জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তি। ইংলণ্ডের বড়লোকদের মধ্যে একজন। আমার সৌভাগ্য যে, আমি ইঁহার বাড়ীতে দুই দিন যাপন করিব।

আচার্য নিউম্যানের বাড়ী হইতে আমি স্ট্রীট(৫) নামক একটি পাড়াগাঁয়ে গিয়া তিন দিন থাকিব। সেখানে তিনটি স্ত্রীলোক বাস করেন। একটি মা ও তাঁর দুই মেয়ে। ইঁহারা আমাকে কাছে পাইবার জন্য প্রাণসমর্পণ করিয়াছেন। কি ব্যাকুলতা তোমাকে লিখিয়া জানাইতে পারি না। ইঁহারা নিরামিষাশী ও সুরা পান বিরোধী, পাড়াগাঁয়ে কুঁড়ে ঘরে থাকেন, সেখানে এক স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহাদের সাধুতা গুণে সকলে ইঁহাদের প্রশংসা করে। আমার মনে এখন হইতে আনন্দ হইতেছে যে, আমি ইঁহাদের সঙ্গে তিনদিন বাস করিব। এখনই

(শেষাংশ ২৭১ পৃষ্ঠায়)

একবার

(স্মৃতি)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

একবার গ্রীষ্মের এক দারুণ দিনে আমরা কয়েকটি বন্ধু লাহোরে বাসা বেঁধেছিলুম। চোত মাসের শেষাশেষি। এই সময়ে লাহোর শহরে কেউ বেড়াতে যায় না—এটা অতি জানা কথা। আমরা এই অসময়ে সেখানে গিয়ে জুটেছিলুম কর্মদোষে। সেখানকার এক বড়লোকের ছেলের ফিল্ম তৈরি করার সখ হয়েছিল। বাপকে পটিয়ে সে টাকার বিষয়ে রাজীও করিয়েছিল। এই সূত্রেই আমাদের সেখানে যাওয়া।

লাহোর আমার অজানা জায়গা নয়। ইতিপূর্বে বার দুয়েক সেখানে গেছি এবং সেই শহরকে ভালোও বেসেছি। কিন্তু এমন পরম উপভোগ্য সময়ে সেখানকার রূপ এই প্রথম দেখলুম।

আমাদের জন্য বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল পুরাতন শহরের এক কোণে চুন্নি-মন্ডীতে—সেখানে শেখুপুরা হাভেলির পরিত্যক্ত একটি অংশতে। এই বাসস্থানের একটু বিবরণ দেওয়া দরকার।

প্রকান্ড গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। গেট এত বড় এত উঁচু আর এত প্রশস্ত যে দুটো হাতী সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। গেটের সেই খিলানের ওপরেই মস্ত বাড়ী। সেই বাড়ীতে শেখুপুরার রাজাদের কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজন বাস করে। গেটে ঢুকেই ডানদিকে হচ্ছে সর্দখানা—মাটির নিচের ঘর। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমেই বৈঠকখানা-ঘর দুটি, হলঘর একটি, দুটি-তিনটি শোবার ঘর চানের ঘর, কল পায়খানা ইত্যাদি। মাথার ওপরে একদিকের রাস্তার দিকে দুটো-তিনটে জানলা আছে—সেইখান দিয়ে আলো আসে। অন্যদিকের জানলার ভেতর দিয়ে হাভেলির বাগান দেখা যায়।

ফটকের খিলেন পেরিয়েই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারিদিকেই বাড়ী ঘেঁষাঘেঁষি করা। উত্তরদিকে বিশাল ভগ্নস্তূপ। পশ্চিমে প্রকান্ড কেল্লার মতো প্রাসাদ—তারও খানিকটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রাঙ্গণের চারদিকে যে বাড়ী তাতে রাজাদেরই আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীর দল বাস করেন। মধ্যিখানে খানিকটা ঘাসজমি—ঘাসজমিটাকে ঘিরে আছে চওড়া একটা রাস্তা। আমাদের বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল এই ভাঙা কেল্লার খানিকটা জায়গায়। প্রাঙ্গণের একদিকে একটি বড় বৈঠকখানা-ঘর; প্রায় সেইখান থেকেই পাঁচতলা উঁচু সিঁড়ি বয়ে আমাদের বাসস্থানে পৌঁছতে হয়। বাহ্যত এই জায়গাটা দোতলা বলে মনে হয় কিন্তু এত উঁচু দোতলা হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আরো দুটো তলা ছিল।

আমরা ছিলুম চারজন বাঙালী। তাদের মধ্যে দুজন স্ত্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন কৌতূহলপরবশ হয়ে। আমি এবং অবিবাহিত বিষ্টুচরণ—আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা করে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। ঘরের দরজাগুলো গরমে ফেটে চৌচির—সার্সি একটিও নেই। মাছির ভয়ে সব দরজাতেই চিক ঝুলছে। ঘরের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য কিছু আসবাবপত্র কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। একটি নেয়ারের খাট, একটি টেবিল—টেবিলটি টকটক করছে, আর একটি চেয়ার—তার চারটি পায়াই অসমান—মানে চেয়ারে বসলে নাগরদোলায় বসবার কাজ হয়। টেবিলের ওপরে খানকয়েক বই—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী তর্জমা, একখানি শেলির কবিতার বই—বইগুলি রোদের আঁচ লেগে লেগে শুকিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সেগুলিকে আর বন্ধ করা যায় না। একটা আলনাও ছিল—সেটিও ঘরের অন্যান্য আসবাবের সামিল।

অসংখ্য ঘর! তারি মধ্যে কয়েকটিকে কোনো-রকমে থাকবার মত অবস্থা করে আমাদের খাতির করা হয়েছে। কমোড-দেওয়া বাথরুমও আছে—কিন্তু কমোডে ব'সে একটু অসাবধান হলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এ ছাড়া রান্নাঘর খাওয়ার ঘরতো আছেই। আমাদের ঘরের লাগোয়া আর একখানি ঘরে একটি মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল—তার বাড়ী মালাবারে, বোম্বাই শহরে নয়।

বাংলা সে মেয়েটি মোটেই জানত না—মাতৃভাষা ছাড়া জানত এক ইংরেজী ভাষা। তার নাম দিয়েছিলুম আমরা শকুন্তলা। অবশ্য সে খৃষ্টান ছিল ব'লে তার একটা ইংরেজী নামও ছিল—মেবেল।

আমাদের অন্যদিকে একটি মারাঠী পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের একটি মেয়ে ফিল্মে কাজ করবার জন্য এসেছিল। মেয়েটি যুবতী—তাকে একলা পাঠানো যায় না। কাজেই তার সঙ্গে বাড়ীর আরো দুটো তিনটে যুবতী ও শিশু এসেছিল। এদের অভিভাবকরূপে এসেছিলেন দেশপান্ডে যাকে আমরা পন্ডিতজী বলে ডাকতুম।

আমাদের ঘর দিয়ে তাদের ঘরে যাওয়া যেত না বা তাদের ঘর দিয়ে আমাদের ঘরে আসা যেত না। উভয় পক্ষের দরজাগুলিতে বিরাট সব ফাঁক থাকায় উভয় পক্ষেরই কার্যকলাপ ইচ্ছে করলেই দেখা যেতো।

আমাদের ছবির গল্প ছিল আনারকলির

জীবন। লাহোর শহরে আনারকলির নাম ঘরে ঘরে ফেরে। এই শহরেরই রাবী নদীর ধারে থামের সঙ্গে হাত-পা শেকলে বেঁধে তার চারিদিকে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছিল। আনারকলির করুণ জীবন-কথা সর্বজনবিদিত। সিংহাসন পাওয়ার পরে সেলিম রাবী নদীর তীর থেকে তার দেহ শহরের মধ্যে নিয়ে এসে কবর দেয় এবং সুন্দর একটি সমাধি মন্দিরও করে দেয়। তাকে ঠিক যেখানে পোঁতা হয়েছিল তার ওপরেই শ্বেতমর্মরের কারুকার্যখচিত বেদী রেখে দেওয়া হয়। এই বেদীর গায়ে ফার্সী ভাষায় একটি কবিতা লেখা আছে যার মর্মার্থ—"এ আনারকলি! যদি আমি স্বপ্নেও একবার তোমার দেখা পাই তা হলে এই রাজ্য-সিংহাসন সব ত্যাগ করতে পারি। ইতি পাগল সেখু"।

সকলেই জানেন সেলিমের ডাকনাম ছিল সেখু-বাবা। সেবারে আমরা গিয়ে দেখলুম সমাধি মন্দিরের ভেতরে সরকারের কি একটা দপ্তর বসেছে এবং বেদীটা ঘরের এক কোণে রেখে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের কাজ সুরু হলো ভোরবেলা। ভোর পাঁচটায় আমরা উঠতুম—তখনি বেশ খটখটে আলো হয়ে যেতো এবং ছ'টার মধ্যে চড়চড়ে রোদ উঠে যেতো। যতক্ষণ রোদ থাকবে ততক্ষণ কাজ করা যাবে এইজন্যে সেই ভোর-বেলা চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তুম শহর থেকে দূরে আগে থাকতে ঠিক করা কোনো জায়গায়। লোকালয় থেকে দূরে গেলেও সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছে এই সন্ধান পেয়ে দলে দলে লোক সেইখানে এসে জুটত।

আমাদের শেঠ ছিল ধনীর সন্তান—বন্ধু-বান্ধব হিন্দু-মুসলমান তার অনেক ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কাজ মনে করে আমাদের সাহায্যে লেগে যেত। এই ছবি তোলার কথা সবিস্তারে বলতে গেলে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে—তবে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

লাহোরের বাইরে রাবী নদীর পুল পেরিয়ে এপারে সরকারের তৈরি তালকুঞ্জ আছে। এক এক জায়গায় কয়েকটি করে তালগাছ আর তার পাশ দিয়ে চমৎকার রাস্তা। জায়গাটার নামই ছিল পামগ্রোভ। এইখানে আমাদের প্রায়ই কাজ হতো। একদিন—সেদিন অনেক লোক নিয়ে কাজ—গুটিকতক মেয়েকেও নিয়ে আসা হয়েছে। বলা বাহুল্য সে সময় ভদ্রঘরের মেয়েরা সিনেমার দিকে ঘেঁষতও না—এই সব লোক এবং মেয়েদের আনবার জন্যে আলাদা একটি বাস ভাড়া করা হয়েছিল এবং বাসটিকে রাস্তা থেকে ঘাসজমিতে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল। সিনেমার ছবি তোলা হবে শুনে আমাদের আগে থাকতেই দলে দলে দর্শক সেখানে উপস্থিত হতে লাগলেন। ঐ গরম ও রোদ উপেক্ষা করে তারা কয়েক মাইল পথ হেঁটে আসত। আমাদের পান করবার জন্যে আগে থাকতেই সেখানে জলের ব্যবস্থা করে রাখা হতো; কিন্তু বাইরের এই রবাহূতেরা এসে আগেই সেই জলটুকু শেষ করে ফেলত।

সেদিনেও এই রকম চলেছে—কাজ তখনো আরম্ভ হয়নি—আরম্ভের আগেকার ব্যবস্থা চলেছে—এমন সময় দর্শকদের মধ্যে দুটি-তিনটি ছেলে ফাঁকা বাসে চড়ে, ড্রাইভারের সিটে বসে কি সব খটাখট নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করলে।

সরে যাও, সরে যাও, একেক দল লোক একেক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঐরকম নিরুদ্দেশ গাড়ী চলতে দেখে যে যার ছুটকে পড়তে লাগল। মেয়েরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছিল, গাড়ীটা তাদের সামনে এসে পড়ায় তারা দৌড়ে দু'পাশে সরে গেল; কিন্তু একটি পালাতে পারলে না। আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম—হায়! হায়! কি হলো—

মেয়েটি কিন্তু অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে টপ করে বাম্পারে বসে পড়ল। গাড়ীও চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন—সিধে একটা তালকুঞ্জের দিকে; সেখানে গিয়ে ধাক্কা লাগলে মেয়েটিতো পিষে যাবে এমনই অবস্থা। ইতিমধ্যে ড্রাইভার কোথা থেকে দৌড়ে এসে টপ করে উঠে গাড়ীটা থামিয়ে ফেললে। অন্য সব মেয়েরা ছুটে গিয়ে সেই মেয়েটিকে ধরে নিয়ে এলো।

দেখলুম সে হো হো করে হাসছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে বললে—ফুল।

ফুলেরই মতন সুন্দর দেখতে সে। টকটকে রাঙা মুখ, উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড মেখে মাথার খানিকটা জায়গা রুপোলি করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বললুম—ফুল, আজকে তোমার ফাঁড়া গেল। আর একটু হলেই মারা যেতে।

ফুল বললে—সে যে অনেক ভালো হতো বাবুজি—

সেদিনে ফুলের কথাটা আমার মনে লাগল। সেদিনে এবং তার পরেও আরো কয়েকদিন তার কথাটা আমার মনের মধ্যে গুণগুণ করতে লাগল। তারপরে তাকে ভুলে গেলুম।

তার পনেরো বছর পরে একদিন বোম্বাই-য়ের রাস্তায় ফুলের সঙ্গে দেখা। সেই এগিয়ে এসে নমস্কার করে আমায় বললে, বাবুজি, আমায় চিনতে পারছ? আমি ফুল।

দেখলুম সে দেহে একটুখানি মোটা হয়েছে, রঙটাও আরো ফর্সা হয়েছে। প্রথমে তাকে যা দেখেছিলুম তার থেকে ভালোই মনে হলো।

বললুম—তুমি ফুল, তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলুম তখন তুমি প্রায় কুঁড়ি অবস্থায় ছিলে। তারপর এখন বেশ প্রস্ফুটিত হয়েছ দেখতে পাচ্ছি। তারপর, তুমি এখানে এলে কি করে?

ফুল বললে, আমার বাবু নিয়ে এসেছে, এখানে প্রায় বছরখানেক এসেছি।

বললুম, এখন আশা করি আর মরতে চাও না?

সে বললে, চাই বাবুজি, এখখুনি যদি মরণ আসে আমি বারণ করব না।

বললুম, কেন? তোমাকে দেখে তো বেশ মনে হচ্ছে, তুমি বেশ সুখেই আছ!

সুখে আছি কিন্তু দুঃখ আসতে কতক্ষণ! এই জোয়ানি চলে গেলে কি করব বাবু? তার চেয়ে এখুনি মরা ভালো নয় কি?

আমি বললুম, ভগবানের উপর নির্ভর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে, বাবুজি, আপনাকে আমি অনেক কথা বলতে চাই। আপনার বাড়ীতে একদিন আসব?

আমি বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার যখন ইচ্ছে আসতে পার। সে আমার বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আর আসেনি।

সমস্ত দিন অনাহার ও রৌদ্রদগ্ধ হয়ে আমরা সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে আসতুম। প্রথমেই তো কাপড়-চোপড় ছেড়ে আধঘন্টা শুতুম; তারপরে ক্লান্তি অপনোদনের পানীয় কিঞ্চিৎ সেবন করে স্নান করতে যাওয়া হতো। স্নান সেরে আড্ডায় বসতুম, সেখানে সামান্য জলযোগ চলত। ইতিমধ্যে আমাদের শেঠ যমুনাপ্রসাদ এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধব কয়েকজন এসে উপস্থিত হতেন। কাল কি কি কাজ আছে তার একটা ফিরিস্তি তৈরি হতো। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও চলত, পান-ভোজনও কিছু কিছু চলত। রাত্রি প্রায় ন'টার সময় সুর্যাস্ত হয়ে গেলে তাঁরা যে যার বাড়ী চলে যেতেন।

আগেই বলেছি যমুনাপ্রসাদের অনেক-গুলি বন্ধু আমাদের নানা কাজে সাহায্য করতেন বিনা স্বার্থে। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেখুপুরার রাজা সাহেব। যমুনাপ্রসাদের বন্ধুদের সঙ্গে দুদিনেই আমাদেরও পরম বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

অবাঙালীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশতে আমি ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত। আমার অন্য বন্ধু দুজনও তাই। কিন্তু শিণ্টুচরণ ঠিক আমাদের মতন মিশতে পারত না। সেই জন্যে কাজ থেকে ফিরে এসেই সে চানটান করে ছাদের উপর গিয়ে শুয়ে থাকত।

এই সব নতুন বন্ধুর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান অনেকেই পরে আমাদের পরম বন্ধু-রূপে গণিত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যের পর অনেকদিন কেউ কেউ আমাদের তাদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে রাত্রে আহার ও হৈ-হুল্লোড় করে আমরা বাসস্থানে ফিরে আসতুম। অনেক সময় আমাদের এখানেই খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হতো। আমাদের বন্ধু বন্ধুপত্নীর মধ্যে একজন ছিলেন রন্ধননিপুণা, তাঁর রান্না এরা খুবই ভালোবাসত। মুসলমান বন্ধুরা মাছ পছন্দ করতেন না, কিন্তু এঁর রান্না অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেতেন।

মাঝে মাঝে আমাদের শহর ছেড়ে বার-চোদ্দ মাইল দূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠে কাজ করতে হতো। এক একদিন সব সময়ে রোদ্দুর পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে বড় বড় মেঘের খণ্ড সূর্যকে ঢেকে ফেলত। তাতে আলো হয়ে পড়ত ঘোলা। ছবি ভালো উঠবে না বলে আমাদের ক্যামেরাম্যান যোশী কাজ বন্ধ করে দিত।

যোশী মহারাষ্ট্রীয় দেশস্থ ব্রাহ্মণ। তার রঙ কালো আবলুষ কাঠের চেয়েও কালো। মাথার চুল ধবধবে শাদা, খুব মোটা একজোড়া ভ্রূ গোঁফের মত—তাও শাদা ধবধব করছে, চোখের পাতার লোমগুলো সব শাদা—এমনকি গায়ের রোঁয়াগুলো সব শাদা। সর্বদাই তার

(শেষাংশ ২৬২ পৃষ্ঠায়)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নাটকীয় অর্থাৎ থিয়েটারি সফর। আমি একবার থিয়েটার দলের সঙ্গে সফরে গিয়েছিলুম।

সে কতকালের কথা হবে? ঠিক তারিখ মনে নেই। তবে নাট্যজগতে প্রখ্যাত বন্ধুবর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহের সম্প্রদায় তখন মনোমোহন নাট্যমন্দিরে নিয়মিত অভিনয় করছিল। সেখানকার শেষ নূতন নাটক হচ্ছে "কারাগার।" সেই সময়েই প্রবোধবাবুর নূতন রঙ্গালয় "নাট্য-নিকেতনের" গঠনকার্য আরম্ভ হয়েছে।

প্রবোধবাবুকে আমি "দাদা" বলে ডাকি—তিনি আমার চেয়ে দেড় বৎসরের বয়সে বড়।

একদিন প্রবোধদা বললেন, "হেমেন্দ্র থিয়েটারের দল সফরে যাচ্ছে, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

আমি বললুম, যবনিকার অন্তরালে বসে আমি থিয়েটারের কাজ করি বটে, কিন্তু বাইরের সবাই জানে আমি সাহিত্যিক। নটনটীদের নট-ঘটির মধ্যে আমি মাথা গলাব কেমন করে? আমার যাওয়া চলবে না।"

প্রবোধদা আশ্বাস দিলেন, "ভয় নেই, কোথাও তোমার পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।"

—"কিন্তু আপনার সঙ্গে এত লোক যাচ্ছে তবু আপনি সঙ্গী খুঁজছেন কেন?"

"ওরা হচ্ছে আমার কর্মচারী, আর তুমি হচ্ছ বন্ধু। সঙ্গে বন্ধু না থাকলে মনের কথা বলা চলে না।"

সফরে যাওয়া মানে নতুন নতুন জায়গা দৃশ্য ও নরনারী দেখা। মনে লোভও ছিল যথেষ্ট। তার উপরে থিয়েটারের দলের সঙ্গে গেলে কোন-কিছু নিয়ে নিজেকে মাথা ঘামাতে হয় না, দিব্যি আরামে খালি খাও-দাও, গাল-গল্প কর, বেরিয়ে বেড়াও আর ঘুমিয়ে পড়—এও মস্ত সুবিধা। রাজি হয়ে গেলুম।

এর আগেও আমন্ত্রিত নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন কোন স্থলে এক-আধ রাত্রের জন্য গিয়েছি। কিন্তু নাট্য-সম্প্রদায়ের কর্তারা সফরে যান নিজেরাই—আজ এখানে, কাল ওখানে আমন্ত্রণ না পেয়েই অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং সফর হচ্ছে আর এক ব্যাপার।

এবং সে ব্যাপার যে সময় বিশেষে কত সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, আমি আগে তা জানতুম না। এখন জেনেছি, তাই থিয়েটারি সফরের নাম শুনলেই বুক ধড়াস করে ওঠে!

প্রথমেই গিয়ে নামলুম রংপুরে। সেখানে স্টেশন থেকে বাসার পথে যেতে যেতে ট্যাপার বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরীদের প্রাসাদোপম ভবন চোখে পড়ল। ওঁদের এক ভাই নলিনী-মোহন রায়চৌধুরী ছিলেন সাহিত্য-সেবক এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে প্রধান একজন। ওঁর দুই বড় ভাইয়ের সঙ্গেও আমি পরিচিত। কিন্তু আমি নটনটীদের সঙ্গে এসেছি বলে পাছে ওঁরা কিছু মনে করেন সেই ভয়ে ওঁদের কারুর সঙ্গেই মুলাকাত করলুম না। এদেশী থিয়েটারের লোকজনকে তখনও যে সমাজ বহির্ভূত জীব বলে মনে করা হত, সেটা বেশ উপলব্ধি করতে পারলুম।

তার আগের—অর্থাৎ গিরিশ-যুগের অসুবিধা আন্দাজ করতে পারলুম। এই জন্যই গিরিশচন্দ্র নিজে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইতেন না।

অন্য বাড়ীতে রঙ্গালয়ের অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী রইলেন—আমাদের বাড়ীতে কেবল প্রবোধদা, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুধীর, আমি, নীহারবালা ও নবাগতা অভি-নেত্রী সুহাসিনী।

সন্ধ্যাবেলায় রংপুরের কোন্ সাধারণ ভবনের বাঁধা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কি ধুন্ধুমার কাণ্ড! হুঙ্কার, চীৎকার, লম্ফঝম্প, ইষ্টকবৃষ্টি, গালি-গালাজ, মারামারি, ধাক্কাধাক্কি দ্বিতীয় রিপুর রকমারি প্রদর্শনী! কি ব্যাপার? না, রংপুরের যুবকবৃন্দ টিকিট না কিনেই প্রেক্ষাগারে প্রবেশ করতে চান, কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ অতখানি দাক্ষিণ্য প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন বলে তাঁরা নিজেদের ভদ্রতার যাবতীয় নমুনা প্রদান করছেন।

দুই পক্ষের কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ না করে বিনাবাক্যব্যয়ে নির্জন বাসায় ফিরে এলুম। শুনলুম কর্তৃপক্ষ যথারীতি অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বহুক্ষেত্রে ভুক্তভোগী, এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত।

কিন্তু সাব্যস্ত হল, রংপুরের অরসিক বাসিন্দাদের আর নাট্যরস উপভোগ করবার সুযোগ দেওয়া হবে না। আমরা সেইদিনেই দিনাজপুর অভিমুখে সদলবলে বাহির হলুম।

দিনাজপুর পুরাতন সহর। তার আশে পাশে নাকি হিন্দুযুগের কয়েকটি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়

মন উৎসাহিত হয়ে উঠল—কিন্তু ঐ পর্যন্ত, দিনাজপুরে বসে প্রাচীন কীর্তির কথা ভাববার সময়ও পাইনি।

ওখানে দুটি ছোট ছোট পাকা রঙ্গালয় ভবন আছে। তার দুই মালিকের মধ্যে অহি নকুল সম্পর্ক। সেটা কারুর বোধ করি জানা ছিল না। কয়েকদিনের অভিনয়ের জন্যে এক-খানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল।

থিয়েটার বাড়ীটি ছোট হলেও ভালো লাগল। সবচেয়ে ভালো লাগল তার পিছনদিকে সংলগ্ন সাজানো বাগানটি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে গাছপালা, ফুলের চারা, ঘাস জমি, বেদী। মালিকের সৌন্দর্যবোধ উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম, বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে শিল্পীর প্রাণ যখন হাঁপিয়ে উঠবে, তখন এখানে এসে মুক্ত আকাশের তলায় মুক্তি পেয়ে খানিকটা জিরিয়ে নিতে পারবে। কলকাতার মত নগরেও কোন রঙ্গালয়েই কেবল শিল্পীদের জন্যে এমন ব্যবস্থা নেই।

স্থির করেছিলুম অভিনয় আরম্ভ হলে এইখানে এসেই একান্তে আশ্রয় গ্রহণ করব। আমার ইচ্ছে টের পেয়ে অন্তর্যামী তখন বোধ-করি মুখ টিপে হাস্য করেছিলেন। কারণ গান্ধীজীর অসহযোগ-মন্ত্রের মহিমা তিনি জানতেন।

হ্যাঁ, অসহযোগ এবং ধর্মঘট। কতটা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর কারণে এই অস্ত্র প্রয়োগ করা আধুনিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারই একটা চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

চারিদিকে রটনা করা হল—দেশের এই ঘোর দুর্দিনে থিয়েটার সিনেমার মত বাজে আমোদের জন্যে অর্থব্যয়ের সুযোগ দিলে গরীবদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব সকলে কলকাতার থিয়েটারওয়ালাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন কর—ধর্মঘটে যোগ দাও, প্রভৃতি।

আমাদের জীবিতকালের মধ্যে কবে যে দেশের সুদিন এসে আমাদের সকলকে বেবাক ফাঁকি দিয়ে আবার পলায়ন করেছে, আমরা কেহই তা জানতে পারিনি। কাজেই এই দুর্দিন, অসহযোগ আন্দোলন ও ধর্মঘট প্রভৃতি কথাগুলো আমার কাছে ছেলেমানুষি ঠাট্টা বলে মনে হল—এবং ব্যাপারটা তুচ্ছ ভেবেই উড়িয়ে দিলুম।

এও শুনলুম রটনাকারীদের পিছনে আছে প্রতিযোগী থিয়েটারের মালিক—কারণ তার থিয়েটার ভাড়া নেওয়া হয়নি।

কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভিনয়ের আগে থিয়েটারের সামনে গিয়ে বুঝলুম, ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

থিয়েটারের প্রবেশপথ জুড়ে মস্ত একদল গুণ্ঠনবতী মহিলা মাটির উপরে শিকড় গেড়ে পবিষ্ট—তাঁরা সকলেই মহিলা কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও খোঁজ নেওয়া হয়নি।

কোন কোন নারী ভিতরে মেয়েদের সামনেও গিয়ে ঢুকেছিল—কিন্তু মহিলাদের স্টের বিপুলবপু পরিচারিকা রায়বাঘিনীর মত তাদের পাকড়াও করে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে তাড়িয়ে দিলে।

ধর্মঘটী নারীবৃন্দ নাট্য-সম্প্রদায়ের সকলকেই পথ ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু দর্শকদের ভিতরে ঢুকতে দেবে না বলে তারা

প্রতিজ্ঞ। আমি বিরক্ত হয়ে ভিতরে চলে লুম। তারপর কোন্ অব্যর্থ প্রক্রিয়ায় রা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রীর দলকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন মি তা জানিনা।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অভাব হল না, কিন্তু রম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গালয়ের ছাদে ন্দার করে ইষ্টকবৃষ্টির বিষম শব্দ ক্রমাগত তে লাগল, তবু কিন্তু অভিনয় বন্ধ হ'ল —বোধ করি সফরে বেরিয়ে নটনটীরা প্রায়ই নি সব গোলমালের মধ্যে অভিনয় লিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়েছে।

খানিক পরে সঙ্গীতশিক্ষক স্বর্গীয় ধাচরণ ভট্টাচার্য এসে চুপি চুপি আমার নে কানে বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, গতিক বিধের নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন, আবার হল?",

রাধাচরণ বললেন, "খবর পেলুম, এখান-র বদমাইসের দল লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি য়ে আছে। থিয়েটার ভাঙলেই পথে আমাদের াক্রমণ করবে।'

সচকিত স্বরে বললুম, "প্রবোধদাকে এখনি কথা জানিয়ে এস।"

—"তিনি তো বাগানের বেদীর ওপরে পাদমস্তক চাদর-মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন— ক তাঁকে জাগাবে?"

—"বেশ আমিই যাচ্ছি।"

সেদিনকার আকাশ অন্ধকার মেঘে এক রে ঘুটঘুটে হয়ে আছে। থিয়েটার বাড়ী থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব আধ মাইলের কম নয়। পথের মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, জঙ্গল ও ছোট-বড় মাঠ আছে। এই অপরিচিত মফঃস্বলে পুরুষদের পক্ষেই পথ বিপজ্জনক, তার উপরে সঙ্গে থাকবে বিশ-পঁচিশজন সালঙ্কারা তরুণী—তাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার হ'তে পারে এবং গুণ্ডারা গহনাপত্তরও কেড়ে নিতে পারে। এখানে এত রাতে গাড়ীও ভাড়া পাওয়া যাবে না।

তখন অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছে এবং শিল্পীরা সাজপোষাক ছেড়ে হাত-মুখের রং তুলছে। রাত অনেক।

ছুটে প্রবোধদার কাছে গিয়ে পা-নাড়া দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম।

তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে নিদ্রাজড়িত চক্ষু সংকুচিত ক'রে বললেন, "হয়েছে কি?"

আমি সব কথা ব্যক্ত ক'রে বললুম, "এ অবস্থায় মেয়েদের নিয়ে পথে বেরিয়ে তাদের সামলাতে পারবেন কি?"

—"তুমি যা ভালো বোঝো, ব্যবস্থা কর"—বলতে বলতে আবার নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়ে তিনি মুখে চাদর চাপা দিলেন এবং আমি সে স্থান ত্যাগ করবার আগেই তাঁর নাসিকা গর্জন ক'রে যেন বলতে চাইলে খবরদার, খবরদার, আর আমার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা কোরো না!

চমৎকার? কি আর করি, রঙ্গমঞ্চে ফিরে এসে আমি সকলের কাছে ব্যাপারটা আবার খুলে বললুম।

মেয়েদের মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ হাসিখুসির চিহ্ন মুছে গেল এবং কেউ কেউ অনুচ্চ কণ্ঠে আর্তস্বরে বললে, "ওমা, কি হবে গো!"

আমি বললুম, "তোমাদের ইচ্ছা কি? এইখানেই রাত কাটাবে, না বাসায় ফিরে যাবে?"

সকলে একবাক্যে ব'লে উঠল—"আমরা ভোর না হ'লে বাসায় ফিরব না।"

আমি বললুম, "তাহলে তোমরা স্টেজের ওপরেই শুয়ে পড়ো। আমার আজ আর ঘুম হবে না, আমি এইখানেই জেগে জেগে পাহারা দেব।" এই বলে হার্মোনিয়াম-বাদকের টুলের উপরে আসন গ্রহণ করলাম।

রাধাচরণ ভট্টাচার্য ও ভূমেন রায় এবং আরো অনেকেই সেই আঁধার রাতে পথে বেরুবার কথা মুখেও আনলেন না, কেবল নির্মলেন্দু লাহিড়ী বললেন, "ও-সব বাজে গুজবে আমি ভয় পাই না, আমি বাসায় ফিরে যাব।"

স্বর্গীয় বনবিহারী ছিলেন একাধারে গায়ক, অভিনেতা ও তবলাবাদক—দেহখানিও তাঁর তাগড়া। তিনি মঞ্চে ব্যবহার্য কাঠের বর্শাখানা টেনে নিয়ে সদর্পে বুক ফুলিয়ে বললেন, "আমরা কলকাতার খলিফা ছেলে, পাড়াগেঁয়ে ভূতদের থোড়াই কেয়ার করি।"

কয়েকজন তাঁর কথাতেই সায় দিলেন। আমি শেষবার চেষ্টা ক'রে বললুম, "নির্মলেন্দু, যেও না বন্ধু—আমার কথা শোনো।"

নির্মলেন্দু বললেন, "ধ্যেৎ!"

নির্মলেন্দুর সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোজন লোক প্রস্থান করলেন।

আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। মেয়েরা স্টেজের উপরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কেউ কেউ আবার শয়ন করবার আগে গায়ের গয়নাগুলো খুলে আমার জিম্মায় রেখে গেল।

তখন শেষ রাত। আমি অধীরভাবে প্রভাতের প্রতীক্ষায় আছি।

অবশেষে ভোরের পাখীরা ডেকে উঠল। হঠাৎ একজন ভগ্নদূত ছুটে এসে জানিয়ে দিলে যে, রাত্রে একদল লাঠিয়ালের আক্রমণে নির্মলেন্দু অত্যন্ত আহত হয়েছেন এবং বন-বিহারী প্রমুখ মঞ্চবীরগণ 'যে পালায়, সে বাঁচে' নীতির অনুসরণ ক'রে পৈতৃক প্রাণকে দেহপিঞ্জরেই বন্দী রাখতে পেরেছেন।

আমরা দ্রুতপদে নির্মলেন্দুর বাসার দিকে অগ্রসর হলুম। প্রথমেই গিয়ে দেখলুম, ঘরের এখানে সেখানে যেন রক্তে ডোবানো রাঙা রাঙা কাপড় ছড়ানো—এগুলো দিয়ে রক্তস্রোত বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। এককোণে রক্তে-ভেজা কাপড়ে-বাঁধা হাত নিয়ে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে নির্মলেন্দুর আদুড় দেহ। তিনি আমাদের দেখে ওষ্ঠাধরে জোর ক'রে ক্ষীণ হাসি আনবার চেষ্টা করলেন।

রক্ত দেখে বুক শিউরে উঠল—এত রক্ত আমি আর কোথাও কখনো দেখি নি! যা হোক তিনি যে প্রাণে বেঁচেছেন তাই-ই যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল। শুনলুম তাঁর মাথায় চোট লেগেছে, হাত ভেঙে গিয়েছে। এই ভাঙা হাত নিয়ে তাঁকে বহুদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে হয়েছিল।

তারপর দিনাজপুরে একদিন কি দুইদিন অভিনয় হয়েছিল তা আমার মনে নেই। কারণ আমি আর কোনদিন থিয়েটার-বাড়ীতে পদার্পণ করি নি। বাসায় একলাই ব'সে থাকতুম।

(শেষাংশ ২৭০ পৃষ্ঠায়)

আয় আজি আয় মরিবি কে?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
পিশিতে অস্থি, শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র,
প্রেত ভয়ে, ছি ছি! ডরিবি কে?
মড়ার মতন না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
অসুরে নিধনে কিসের তরাস?
পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস?
না গণি বিজন কানন ভীষণ,
বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিঠুর অরি সংহার করি'
বীরের মতন মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্মি পরশি' বিমান;
সাহসেতে ভর করি' সে সাগর
হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন,
তবু তরী বাহি মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
চরণের তলে দলি' রিপুগণ
লভিতে নির্বাণে অমর জীবন,—
তাদেরি অংশে তাদেরই বংশে
জনম,—সে কথা স্মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণে ত্রিদিব পুণ্য,
আর্যের মত মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
চন্দনমাখা হাতে দেববালা
নন্দন ফুলে গাঁথি' জয়মালা
তোমারে নিরখি' রয়েছে অপেখি';
সে বিজয় মালা পরিবি কে?
মাতি সৌরভে, যশে গৌরবে,
দেশের হইয়া মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?

আষাঢ় মাসে নবমেঘোদয়ে যখন চাতক উন্মুখ হয়ে ওঠে, বহুকাল পূর্বে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদক রামগিরিতে যখন ঐ একই কারণে বেচারা যক্ষ উন্মনা হয়ে উঠেছিল, সেই শুভক্ষণে বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ উতলা হয়ে ওঠেন, না, ঠিক একই কারণে নয় বটে তবে কারণটা একই জাতের নিঃসন্দেহ। পূজা সংখ্যায় লিখবার জন্যে তাঁরা সম্পাদকীয় চিঠি পান। প্রত্যেকখানা চিঠিকে প্রমিসরি নোট বলে গণ্য করতে হবে, তবে মূল্য নির্ভর করে লেখকের মানমর্যাদা সম্মান পুরস্কারপ্রাপ্তি প্রভৃতির ওপরে। লক্ষ্মীর প্রদত্ত এই প্রমিসরিনোট সরস্বতীর কাউণ্টারে ভাঙাইবার অপেক্ষা মাত্র। প্রত্যেক লেখকের একখানি প্রাইভেট ডায়ারী আছে, তাতে আছে আগতগতিকের হিসাব। বারো-চোদ্দ পনেরোখানি পত্রিকার নাম। বছরের মধ্যে কোন নূতন পত্রিকা বের হলে সংখ্যা বাড়ে, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে নাম বাদ পড়ে। কোন নূতন পত্রিকা বার হলে লেখকগণ নিজেদের মধ্যে আশায় আনন্দে বলাবলি করে একটা নূতন ঘর বাড়লো, কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে মুখ ম্লান করে বলে একটা ঘর গেল। এথেকে প্রমাণ হয় লেখক ও পাঠকের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব ভিন্ন নয়। যাই হোক এই সব আপেক্ষিক মনস্তত্ত্ব আলোচনার জন্য বসি নাই, একটি অভিজ্ঞতা বিবৃত করবার ইচ্ছা।

তুম্চুভিশ্চাং নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে আর তার পূজা-সংখ্যায় লিখবার জন্যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েছি। ব্যাপারটা সামান্য নয়। প্রথমে যখন ঐ পত্রিকার হোর্ডিং বিজ্ঞাপিত হয় লোক নূতন কোন ছবির বিজ্ঞাপন বলে ভুল করেছিল—বুঝুন কেমন আড়ম্বর। একদফা মারামারিও হয়ে গেল। একদল বলল বোম্বাই ছবি, একদল বলল মাদ্রাজী ছবি। বাস্, তর্ক থেকে হাতাহাতি মারামারি লাঠালাঠি, মাথা ফাটাফাটি, একেবারে ২৮৮ ধারা। ও রকম কোন ধারা নাই জানি তবে দুই-ধারায় মিলে দাঁড়িয়েছে ওটা। পুলিশ এসে জারী করলো ১৪৪ ধারা আর তার আগেই মাথা ফেটেছে ১৪৪টা। এবারে যোগ করে দেখুন ২৮৮ হয় কিনা। তুম্চুভিশ্চাং রাজ্যময় বেড়াজাল ফেলে প্রবীণ নবীন নরম-গরম সব রকম লেখককে ধরতে সঙ্কল্প করেছেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে শেষের দিকে চার পাঁচখানা ফর্মা থাকবে সেই সব লেখকদের জন্যে যাদের লেখা নিজেরা ছাড়া অন্যে বুঝতে পারে না। সম্পাদক জানেন অগ্নিদেব সব শ্রেণীর লেখাই সমান আগ্রহে গ্রাস করেন। জড়বুদ্ধির দেহ কি চিতার আগুনে পোড়েনা? এহেন পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তর থেকে পত্র পেয়ে পুলকিত হলাম, কিন্তু পত্রখানা পাঠ করে বিস্ময়ের অন্ত রইলো না, একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস চাই। নীচে ফুটনোটে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে কিন্তু লাল কালিতে লিখিত আছে, আমরা বিলাতি কেতামতে লাইনগুণে সম্মান দক্ষিণা দিয়ে থাকি।

হুররে! চীৎকার শুনে গৃহিণী এসে সমস্ত ব্যাপার শুনে 'মন-উচাটন' শাড়ী দাবী করে বসলো। অবশ্যই দেবো। এ যে লাইনগুণে সম্মান দক্ষিণা। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বিষয় স্থির করে ফেললাম 'হিড়িম্বা পরিণয়', ওর মস্ত সুবিধা এই যে, গল্পের মধ্যে হিড়িম্বা হিড়িম্ব, বৃকোদর, ঘটোৎকচ প্রভৃতি যে সব পাত্র পাত্রীকে পাওয়া যাবে তারা সকলেই পূর্ণাঙ্গ। এদের সঙ্গগুণে আমার উপন্যাসখানাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। দেখা যাবে কি পরিমাণ সম্মান দক্ষিণা আছে সম্পাদকের তহবিলে। দিন-তিনেক পরে সশরীরে সম্পাদক এসে উপস্থিত হলেন। হাঁ তিনিও পূর্ণাঙ্গ বটেন। হিড়িম্বা পরিণয় উপন্যাসের অন্যতম পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখেন সন্দেহ নাই।

লাইন প্রতি টাকাপ্রসূ হিড়িম্বা পরিণয় উপন্যাস যখন অনেকটা লিখে ফেলেছি তখন সম্পাদকের একখানা চিঠি এলো। তিনি বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কাগজ সম্বন্ধে নূতন অনুশাসন জারি করেছেন তার ফলে পত্রিকায় কাগজের 'কোটা' কমে গিয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে উপন্যাসের বদলে একটি বড় গল্প পেলেই চলবে। অবশ্য এ রচনার জন্যেও লাইন প্রতি টাকা সম্মান দক্ষিণার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। গৃহিণীর মন উচাটন শাড়ী আকাশে বিলীন হল। কিন্তু তবু আশা মরতে চায় না। জাতে বড় গল্প হলেও আয়তনে উপন্যাস করতে বাধা কি। অনেক সময়েই উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে ব্যবধান কেবল টাইপের। পাইকাতে ছাপলে যা উপন্যাস, স্মল পাইকাতে ছাপলে তাই বড় গল্প। কাজেই হিড়িম্বা পরিণয়ের মধ্যে থেকে ঘটোৎকচকে বাদ দিয়ে বড় গল্প রচনা করতে সুরু করলাম। অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি অশ্বত্থ-বৃক্ষের শক্ত একখানা ডালে বসে হিড়িম্বা ও বৃকোদর প্রেমালাপ করছে এমন সময়ে সম্পাদকের আবার একখানি চিঠি। পোড়াকপাল সরকার কাগজের কোটা আরও কমিয়ে দিয়েছে কাজেই এবারের মতো একটা প্রকৃত ছোট গল্প হলেই চলবে। প্রকৃত ছোট গল্প কেনা ছোট হওয়া অত্যাবশ্যক গল্প না হলেও চলবে।

সম্মান দক্ষিণার ব্যবস্থা পূর্ববৎ। নাঃ হিড়িম্বার কাহিনী নিতান্তই বাদ দিতে হল, ছোট গল্পের নস্যের ডিবের মধ্যে ঐ সব পৌরাণিক বীর ও বীরাঙ্গনাদের স্থান কুলায়

(শেষাংশ ২৫ পৃষ্ঠায়)

রামমোহন রায়ের প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক স্মারকলিপি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব কি বিষয় লইয়া ঘটে এবং কি যুক্তির উপর তিনি দাঁড়াইয়া ার সমর্থন করেন তাহা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত । করিবার সঙ্গত হেতু আছে। এতদিন ন্ত এই ধারণাই চলিয়া আসিয়াছে যে র্ণর অ্যাডাম প্রবর্তিত প্রেস রেগুলেশনের তবাদে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত এবং সুপ্রীম র্টে সেই যুক্তিযুক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেই কাউন্সিল ইংলন্ডেশ্বরের নিকট আপীল এবং হার পর এদেশে নব্য শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যামহার্স্টের নিকট গুরুপূর্ণ আবেদন মারফতেই রামমোহন রাজ- ৈতিক আসরে প্রথম অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু াডামের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা র্তনের পূর্বেই রামমোহন যে অতি যত্ন- কারে তথ্য ও যুক্তি নির্ভর কতকগুলি দাবী- ওয়া মার্কুইস অফ হেস্টিংসের নিকট প্রেরণার্থে স্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহার একটি ুলিপি বন্ধু স্যার জন বাউরিং-এর মন্তব্যের ্য বাউরিংকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা উরিংকে লিখিত ১৮২২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের এক পত্র হইতে জানা যায়। এই রেজি ভাষায় লিখিত পত্রে রামমোহন যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :

আমি রাজসমীপে যে প্রকান্ড স্মারকলিপি দানের সংকল্প করিয়াছিলাম তাহা অন্যান্য ার্যে ব্যস্ত থাকার জন্য এতদিন করিতে পারি ই। আমি খৃষ্টীয় জনসাধারণের নিকট শেষ বেদন রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম সেজনা জনীতিঘটিত এই আবেদনটির প্রতি যথা- যোগ্য নজর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত মোগল আমলের রাজস্ব সম্পর্কিত কতকগুলি লিলের অনুলিপি যাহা উহার জন্য নিতান্ত য়োজন তাহা উত্তর ভারতস্থ আমার বন্ধুগণ খন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি মত সংগ্রহ করিয়া াঠাইতে পারেন নাই। আমার রাজনীতি ক্ষেত্রে থম অবতরণ ইহাই সেজন্য আমি হাকে তদূর সম্ভব তথ্য-নির্ভর করিতে চাই, যাহাতে হা এমনই যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে য উহা সরকারের প্রতি বিরাগবশত অথবা আদালি প্রসূত বলিয়া কেহ ইঙ্গিত না করিতে ারে। এই সব কারণে উহা বিলম্বিত হওয়ার জন্য আপনি এদেশ ত্যাগের পূর্বে উহাকে ূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। লর্ড হেস্টিংসও শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; সেজন্য আমার বদেশবাসী কতিপয় বন্ধু এখনই আশ ংশোধনীয় কতকগুলি অভাব-অভিযোগ পেশ করা জরুরী বিবেচনা করাতে এরূপ কয়েকটি অভাব-অভিযোগের বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিতে সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছেন তদনুসারে রচিত একটি আবেদনলিপি আপনার মতামতের জন্য এতৎসহ প্রেরণ করিলাম। আশা করি আপনি আপনার মূল্যবান মতামত জানাইয়া বাধিত করিবেন। ডিউক অফ ওয়েলিংটন হেস্টিং-এর স্থলে গভর্ণর জেনারেলরূপে আসিতেছেন এরূপ এক সংবাদ গোচরীভূত হওয়াতে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে তিনি সামরিক নিয়ম-কানুনে রক্ষিত করিয়া শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে দক্ষ এবং সকলকে তাঁবে রাখিতেও ওস্তাদ। কিন্তু সাধারণ বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ আছে। এখন ভারতে গভীর শান্তি বিরাজিত এবং সেজন্য একজন খ্যাতিমান সমরবেত্তা অপেক্ষা দক্ষ রাজনীতিকেরই এদেশের অধিক প্রয়োজন। আমার অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা হইতেছে আপনি ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করি- বার পূর্বে আপনার সাক্ষাৎ একবার লাভ করিতে এবং আপনার শুভ অভিরুচি আপনাকে এক-দুই ঘণ্টা আমার সকাশে ক্ষেপণে আকৃষ্ট করিলে সেইমত দিনক্ষণ নির্ধারণ করিয়া জানাইলে অধীন অনুগৃহীত বোধ করিবে।

ইতি

ভবদীয়

একান্ত অনুগত

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮২২; স্বাঃ রামমোহন রায়

পুনশ্চ—এখন পর্যন্ত আবেদনলিপিখানি লর্ড হেস্টিংএর দরবারে বিবেচনার্থ প্রেরিত হয় নাই। সেজন্য আশা করি তৎপূর্বে এখনই কাহারও সমীপে ইহার উল্লেখ করিবেন না।"

রামমোহনের এই পত্র হইতে জানা যায় যে আশু প্রবর্তনযোগ্য কয়েকটি দাবী দাওয়া হেস্টিংসের নিকট পেশ করিবার মানসে কতিপয় বন্ধু সহযোগে প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে বাউরিং-এর অভিমত জানিবার জন্য একটি অনুলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার বিষয়বস্তু কি ছিল তাহা অপরিজ্ঞাত। বাউরিং পরিবারে রক্ষিত কাগজপত্র ও ভারতের দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিলেই উহা বাহির হইলেও হইতে পারে। এই পত্রে আরও জানা যাইতেছে আরও পূর্ণতর দাবী অত্যন্ত যত্নসহকারে অকাট্য যুক্তি ও সহায়ক তথ্যাদি দিয়া রামমোহন রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই চিঠিখানি অ্যাডামের রেগুলেশনের পূর্বে লিখিত, কাজে কাজেই এই রাষ্ট্রীয় আবেদনখানি সুপ্রীম কোর্টে আবেদনের পূর্বের এবং রামমোহন নিজেই স্বীকার পাইয়াছেন যে ইহাই তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। এই দুইটি আবেদন আবিষ্কৃত না হইলে রামমোহনের এক প্রধান কীর্তি অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তবে পত্র হইতে এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে যে উহাতে রাজস্ববিধি সংস্কারে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে প্রদত্ত হইয়া আবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়রূপে স্থান পাইয়াছিল, নতুবা "উত্তর ভারতের বন্ধুগণ কর্তৃক মোগল আমলে রাজস্ব সম্পর্কিত কতকগুলি দলিল তখন পর্যন্ত হস্তগত না হওয়াতে" লিপিটি সম্পূর্ণ হওয়ার অন্তরায় বিবেচিত হইবে কেন?

পরে নূতন চার্টার রচিত হওয়ার পূর্বে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের নিকট রামমোহন রাজস্ব- বিধি সংস্কারের জন্য যে স্মারকলিপি দাখিল করেন তাহা হইতে এই অনাবিষ্কৃত লিপিটির এতৎসম্পর্কে তথ্য ও যুক্তির কিছুটা হদিস অনুমান করিতে পারি। পরে এই স্মারক- লিপিখানি লন্ডনের পুস্তক প্রকাশক স্মিথ এলডার কোম্পানী কর্তৃক "এক্সপোজিশন অফ প্র্যাকটিক্যাল অপারেশন অফ দি জুডিশিয়াল অ্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অফ দি জেনারেল ক্যারাকটার অ্যান্ড কনডিশন অফ ইট্স নেটিভ ইনহ্যাবিট্যান্টস অ্যাজ সাব- মিটেড ইন এভিডেন্স টু দি অথারিটিস ইন ইংল্যান্ড" নামে পুস্তকাকারে ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয়। এগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে অতিরিক্ত রাজস্ব ভারে প্রপীড়িত রায়তগণের অবস্থা সম্যকরূপে অনুধাবন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে রামমোহন কতদূর আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি তথ্যাদি সমাবেশে প্রমাণ দিয়াছিলেন যে ১৭৯৩ সালের স্থায়ী রাজস্ব নির্ধারণের ফলে জমিদার শ্রেণী লাভবান হইলেও দরিদ্র চাষীদের কোনই লাভ হয় নাই। তিনি স্পষ্টই স্মারক- লিপিতে উহাদের দুর্দশা লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন যে—"কৃষিজীবীদের এইরূপ দুঃখ- কর অবস্থার উল্লেখ করাও আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।" প্রতিবিধানস্বরূপ তিনি বলি- য়াছেন যে "প্রথমতঃ দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি বন্ধ করা প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ বর্তমান দেয় এত অত্যধিক যে রায়তগণকে অত্যন্ত কষ্টে দিন যাপন করিতে হয় সেজন্য জমিদারদের নির্ধারিত খাজনার হার কমাইয়া রায়তের দেয় কম করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত। এজন্য সরকারি তহবিলের যে ঘাটতি দেখা দিবে তাহার জন্য বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে এবং উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় কর্মচারীর পরিবর্তে অল্প বেতনে এদেশীয় উপযুক্ত কর্মী নিয়োগেও খরচ কমাইয়া ঘাটতি পূরণ করা যায়।" তিনি বলেন রায়তগণের প্রতি এই সুব্যবস্থার দ্বারা সরকার লাভবান হইবেন, কেননা অসন্তোষের কারণ দূরীভূত হওয়াতে প্রজার আনুগত্য বৃদ্ধি পাইবে এবং অনুগত প্রজার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত করিয়া বেতন- ভুক সমরবাহিনী হ্রাস করিয়া মিলিশিয়া দ্বারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া সামরিক ব্যয় প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব। সমরবাহিনী সম্পর্কে এই মত যে রামমোহনের ১৮১৯ সালের পূর্বেই ছিল তাহা ফিজক্লয়েন্সের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। রাজস্ব সম্পর্কে এই মত যে ১৮২২ সালেই রামমোহনের ছিল তাহা ...ন করিবার সঙ্গত হেতু এই যে তাহা না হইলে ...লনার্থে তিনি মোগল রাজস্ব নীতি সম্পর্কিত ...লিল দস্তাবেজের সন্ধান করিবেন কেন? ...জন্য এরূপ আঁচ করা অযৌক্তিক নহে যে রাম-

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

মালকোষ

গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরদা বলিল,—'ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনেছ?'

ক্লাবের পাঠাগারে আমরা কয়েকজন নীরবে বসিয়া সাময়িক পত্রিকার পাতা উলটাইতেছিলাম। অমূল্য পত্রিকা হইতে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'তোমার মতলবটা কি? নতুন আষাঢ়ে গল্প তৈরি করেছ, তাই শোনাতে চাও?'

বরদা কর্ণপাত করিল না, গল্প আরম্ভ করিয়া দিল—পুজোর ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। আমার ছোট শালা শুভেন্দুর ভারি গান-বাজনার শখ, একদিন আমাকে বলল, —'জামাইবাবু, ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনতে যাবেন? ওস্তাদজি আমাকে খুব ভালবাসেন; কয়েকদিনের জন্য সহরে এসেছেন, ডাকবাংলোতে আছেন। আমি খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলাম; তিনি বললেন, আজ রাত্রে যখন আর কেউ থাকবে না তখন বাজনা শোনাবেন। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে?'

নেই কাজ তো খই ভাজ। উচ্চাঙ্গ গানবাজনার প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই; ধ্রুপদ চৌতাল ধামার দশকুশি বুঝি না; রবীন্দ্রসঙ্গীতেই আমার আত্মা পরিতুষ্ট। কিন্তু বিনা মাশুলে যখন এতবড় একজন ওস্তাদের বাজনা শোনার সুযোগ হয়েছে তখন ছাড়ি কেন। বললাম—'আচ্ছা যাব।'

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ডাকবাংলোতে উপস্থিত হলাম। জায়গাটি বেশ নিরিবিলি, পাঁচিল-ঘেরা উঁচু ভিতের বাড়ি, বাড়ির সামনে চার ফুট উঁচু চাতাল। এই চাতালের ওপর আলোয়ান গায়ে দিয়ে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন, তাঁর পাশে একটি সেতার শোয়ানো রয়েছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ওস্তাদজিকে দেখলাম। লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় পাকা বাবরি চুল, চিবুকে ত্রিকোণ দাড়ি। বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে সত্তরের কাছাকাছি। শালক ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। ওস্তাদজি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—'এস বাবা। সঙ্গে ওটি কে?'

শালা পরিচয় করিয়ে দিল, আমিও হেঁট হয়ে প্রণাম করলাম। ওস্তাদজিকে দেখে তিনি হিন্দু কি মুসলমান এ কথা মনে আসে না। মনে হয় তিনি একটি প্রশান্তচিত্ত সাধক। সাধকের জাত নেই।

শালা জিগ্যেস করল,—'আজ কেউ আসেনি?'

ওস্তাদজি একটু ম্লান হেসে বললেন,—'এসেছিল কয়েকজন রঈস্ লোক, আধঘণ্টা বাজনা শুনে বাহবা দিতে দিতে চলে গেল।—কেউ কিছু বোঝে না।'

গুণিজনের পক্ষে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ কতখানি পীড়াদায়ক তা জানি বলেই নিজের কথা ভেবে মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি যাতে আমার অজ্ঞতা ধরতে না পারেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ওস্তাদজি সেতারের ওপর হাত রেখে শালাকে বললেন,—'কী শুনতে চাও বল।'

শালা হাত জোড় করে বলল,—'অনেকদিন আপনার মালকোষ শুনিনি।'

ওস্তাদজি আস্তে আস্তে সেতারটি কোলে তুলে নিলেন, আঙুলে মেরজাপ্ পরে তারের ওপর মৃদু স্পর্শ করলেন; তারগুলি রণরণ করে উঠল। তারপর তিনি সেতারের কান মোচড় দিয়ে তারগুলি বেঁধে নিতে নিতে বললেন,—'এখন হেমন্ত কাল, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরও আরম্ভ হয়ে গেছে। মালকোষ বাজাবার উপযুক্ত সময় বটে।'

চারিদিকে জ্যোৎস্না ঝিমঝিম করছে; দূর থেকে সহরের যেটুকু শব্দ আসছে তাও যেন দূরত্বের দ্বারা মোলায়েম হয়ে আসছে। ওস্তাদজি যন্ত্র বেঁধে নিয়ে বললেন,—'মালকোষ বাজাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, যদি কিছু দেখতে পাও ভয় পেয়োনা।'

ওস্তাদজি নিতান্ত সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি আমার পানে চেয়ে বললেন,—'মালকোষ যদি শুদ্ধভাবে বাজানো যায় তাহলে জিন্ আসে। ওরা মালকোষ রাগ শুনতে বড় ভালবাসে।'

জিন্! আরব দেশের দৈত্য বিশেষ। আমি ভূতপ্রেত নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছি কিন্তু জিন্ জাতীয় জীবের সঙ্গে কখনো মুলাকাৎ হয়নি। ওরা আরব্য রজনীর কাল্পনিক প্রাণী এই ধারণাই ছিল। এখন মালকোষ শোনবার জন্যে তারা আসতে পারে এই কথা ভেবে মনটা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল।

ওস্তাদজি বাজাতে সুরু করলেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁর হাতের আঙুলগুলো লোহার তারের মতন বাঁকা-বাঁকা, কঠিন; কিন্তু সেতারের তারের ওপর তাদের স্পর্শ কি নরম! যেন ফুলের বাগানে মৌমাছি গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। তিনি প্রথমে খুব ঠায়ে বাজাতে সুরু করলেন, তারপর আস্তে তালের গতি দ্রুত হতে লাগল। আমি উচ্চসঙ্গীতের সমজদার নই কিন্তু

(শেষাংশ ২৭০ পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মোহনের বহু যত্নে অকাট্য তথ্য ও যুক্তি সম্বলিত প্রথম রাজনৈতিক স্মারকলিপিতে অন্যান্য দাবীর সহিত বৃটেনের বোর্ড অফ কন্ট্রোলকে প্রদত্ত রাজস্ব সম্পর্কিত স্মারকলিপিতে কথিত বিষয়বস্তুর অনেকটাই ছিল। এ অনুমান অসঙ্গত না হইলেও মূল লিপিটির সন্ধান করা উচিত, তাহা হইলে এই জ্ঞান ও কর্মবীরের চিন্তা ধারার ক্রমিক বিকাশের ধারা জানা যাইবে।

ছ ধরার নানারকম গল্প জমে উঠেছে। সেকালে এত পলিটিকস ছিল না, আড্ডা জমাতে মাছ ধরার গল্পই ছিল সবচেয়ে।

বকমারি গল্প। সন্দীপের মামা ছিলেন ন এ্যারিস্টোক্র্যাট্ মাছ ধরিয়ে। "মেছো"— াই চলে গিয়েছিল তখন গল্প-গল্পে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে। এখন মাছ ধরার শখ নেই, হয়তো সুযোগও নেই, কাজেই ও নেই ; আঁটসাঁট এ কথাটা আর আছে লোপ পেল জানি না।

সন্দীপের মামার কথা হচ্ছিল। এদিকে ন যেমন এ্যারিস্টোক্র্যাট্ জমিদারই তো, ধরাতেও ঠিক সেইরকম মেজাজ নিয়ে ছলেন। দেশী ছিপ, সুতো, বঁড়শি কিছুই না তাঁর—না, ফাৎনা পর্যন্ত নয়। নও (Thompson & Co,) না। সব সাপ্লাই আসত জারমাণি থেকে। । নূতন ইমপ্রুভমেণ্ট হোল, কি সেখান পার্সেল এসে হাজির হোল, সঙ্গে সঙ্গে না সব বাতিল।

মাছ ধরার সরঞ্জাম করতেই লোক-লস্কর দশজন। মাচা বাঁধা থেকে চার-টোপ করা পর্যন্ত। যার হাতে চার-টোপ তার ন ছিল পঞ্চাশ টাকা। সে যুগে হাই-স্কুলের ন সেকেণ্ড মাণ্টারের মাইনে। এক্সপার্ট। বড়ই ঘাঘি আর ত্যাঁদোর মাছই হোক ধাড়ার চার এড়িয়ে যাবে সে উপায় না। আর কোন শখ ছিল না সন্দীপের । অঢেল পয়সা, অঢেল ফুরসৎ; লোক- র নিয়ে মহাল ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে ছেন।

শুধু তোড়জোড় আর সরঞ্জামের দিক ই নয়, মাছের জাত-বিচারের দিক দিয়েও স্টোক্র্যাট্ ছিলেন সন্দীপের মামা। কেবল আর কাৎলা। বলতেন রাজায় রাজায় খেলা মিরগেল কালবোস—এরা সব এর মধ্যে । কি করতে? যদি দৈবাৎ উঠে পড়লতো । সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হোত। রুই-কাৎলাও যদি আধ মোনের কম হোল তো তাদের খাতির নেই। গেঁথেই বুঝে ফেতেন কত ওজন। অবশ্য তুলতেন খেলিয়ে—আসল নেশাটা তো ঐখানেই ; তারপর দিতেন ছেড়ে—"যাঃ, গতর বাড়াগে আগে, তদ্দিন পর্যন্ত আর ডেঁপোমি করতে আসিস নি।"

জমিদারিটা তো গেল মাছ ধরার পেছনেই। দৌলতপুরের কাজল দীঘিতে তিনটে কাৎলায় সারে তিন মোন মাছ, খুশী হয়ে মাতব্বরদের ভোজ দিচ্ছেন, এদিকে গ্রামখানা যে নিলামে উঠতে যাচ্ছে সে খবর নেই। মাছ ধরার ব্যাপারের মধ্যে বাজে কথা এনে ফেলে বাগড়া দেওয়ার হুকুম ছিল না তো।

রাজেনের পিসেমশাইয়ের ছিল অন্যরকম ব্যাপার। জমিদারিই ছিল না পিসেমশাইয়ের তো মাছ ধরার পেছনে বিকোবে কি ক'রে? (রাজেন একটু আড়ে চেয়ে নেয় সন্দীপের পানে)—তবে হ্যাঁ, ঝোঁক বলো, নেশা বলো, তপস্যা বলো, পিসেমশাই একেবারে চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিলেন তো। পিসিমা ধুঁকছেন, পুরনো ম্যালেরিয়া তার ওপর অম্বল, ডাক্তার বদ্যিতে জবাব দিয়েছে একরকম, পিসেমশাই দাঁয়েদের বড় পুকুরে ছিপ হাতে ক'রে ফাৎনার দিকে চেয়ে ধ্যানে বসে আছেন। বলবে এলে দিয়েছেন আর উপায় নেই দেখ? মোটেই নয়। পিসেমশাইয়ের সাড়াই নেই তো এলে দেবেন কি? রাত্তিরে খবর পেয়েছেন নদী উপচে পুকুরে জল ঢুকেছে, ভোর থেকে গিয়ে যে বসেছেন রাত্তিরেই চার-টোপের ব্যবস্থা করে, আর তো হুঁস নেই কিছু। পুরনো রুগী সে তার রোগ নিয়ে আছে, ওষুধ-পত্র চলছে, উনি ও'র মাছ ধরা নিয়ে রয়েছেন—গতানুগতিক এই ব্যবস্থা ক'বছর ধ'রে চলে আসছে, সকালে উঠে মুখহাত ধুয়ে চলে গেছেন উনি, বেলা দশটার সময় ডাক্তার এসে দেখে শুনে জবাব দিয়ে গেল।

ছেলে ডেলি-প্যাসেঞ্জার বেরিয়ে গেছে, নাতি এসে খবরটা দিল। ঘোলা জল ঢুকেছে মাছ কিন্তু টোপ ধরে না তো, নাতি এসে যখন খবরটা দিল, ঠিক সেই তালের মাথায় এদিকে টক্-টক্-টক্ করে তিনটে গোত্তা মেরেই ফাৎনা খাড়া হয়ে উঠেছে, পিসেমশাই বাঁ হাতটা পেছনে করে চুপ করতে ইসারা করলেন। মেছোর বংশ, শুধু ঠাকুরদাদাই নয়তো, ফাৎনার অবস্থা দেখে নাতিও কি করতে এসেছে গেছে ভুলে। "ঠাকুর্দা, আর দেরি নয়, দাও খ্যাঁচ বেঁকিয়ে।"

নাত্নি যখন খবর দিতে এল—দিতেই বলো বা নিতেই বলো—তখন পিসেমশাই মাছটাকে খেলিয়ে প্রায় কায়দা করে ফেলেছেন; শেষ চেষ্টা, একটা লাফ দিয়ে উঠেছে—মাছ দেখেই নাত্নিও কি করতে এসেছিল গেল ভুলে।

শেষে রাখোমণি এসে উপস্থিত। বাল-বিধবা মানুষ, তার বাঁচলেও ঠাট্টা, মলেও ঠাট্টা, বললে—"ঠাকুর্দা, ঠানদির যে উদিকে পালকি-বেয়ারা এসে গেছে।"

মাছ তখন ভেসে উঠেছে, খানিকটা সাড় ফিরে এসেছে পিসেমশাইয়ের; কিন্তু পুরো নয়; সুতো গুটোতে গুটোতে বললেন— "একটু আটকাবি নি? এয়োস্ত্রী মানুষ, একটু আঁশ-মুখ না করে বেরুবে বাড়ি থেকে?"

এইরকম আরও সব। অমর্ত পালের কাকা, হাঁদুর দাদার বড় সম্বন্ধী, বিলাসের খুড়শ্বশুর, রাধানাথের ছোট দাদা-শ্বশুর—তা-বড়ো, তা-বড়ো "মেছো"-দের গল্প।

চুপ ক'রে বসে শুনে যাচ্ছি। জিভ চুলকাচ্ছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। এমন এক খোলা নামাতে পারি, এ-আসরেও বাজিমাৎ ক'রে দিতে পারা যায়। এরা মাছের গল্প করে ভূতের গল্পের নিয়মে—সব মামা, কাকা বা শ্বশুরগুষ্টি, ধরবার জো নেই। আমার একেবারে নিজের অভিজ্ঞতা, যোগেন দাদাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে একটা ছোটখাট ভোজ দিতে হোল সেই মাছ দিয়ে, এখনও জিভে স্বাদ লেগে রয়েছে তার।

কিন্তু সাহস হোল না, অমন আসরেও কেউ বিশ্বাস করত কি? অনেক দিনের কথা,

আজ মনে হোল লিখেই রাখা যাক না হয়। পাঠক—সে দুয়ের শ্রোতা, বিশ্বাস করল কি না করল, খোঁজ নিতে যাচ্ছি না তো।

যোগেন দাদা নিজে ভালো করে দেখেশুনে ছোট ভাই গোপেনের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে। মেয়েরা স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছে; নূতন চাল, নূতন ফ্যাশন নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ছে গৃহস্থ বাড়ির সদর—খিড়কি জানলা ঘুলঘুলি দিয়ে, পুরানো বুনিয়াদে বেশ আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে বুনিয়াদ আলগা করে দিচ্ছে। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে সমাজ। দুদিক মিলিয়ে বেশ সামঞ্জস্য—ক'রে চলতে পার তো টিকে রইলে, নয়তো গেলে,—ভাবটা এই রকম।

গোপেন ছেলেটি পড়াশুনায় বেশ ভালো। ক্লাসের ফার্স্ট বয়, পনেরো টাকা জলপানি বা বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করল। ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে কলকাতার একটা বড় কলেজে ঢুকল। এ ব্যবস্থাটা যোগেনদাদা ইচ্ছে করেই করলেন। হোস্টেলেই দিলে ভালো হোত, কিন্তু দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, ভাই কি পথ ধ'রে চলেছে লক্ষ্য রাখবার জন্যই বাড়ীর সঙ্গে যোগ-সূত্রটা রেখে দিলেন। তারপর একদিন সন্ধান পেলেন, যা ভয় করেছিলেন তাই হ'তে চলেছে; আধুনিকতার ছোঁয়াচ লেগেছে ভাইয়ের। ভাজ—অর্থাৎ যোগেনদাদার স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী আরও সেকেলে, তাঁকে ভালো ক'রে পড়তে শিখিয়েছে, এখন কলেজ থেকে নভেল-নাটক এনে জোগায় লুকিয়ে লুকিয়ে।

এই সূত্র ধরে তলে তলে খবর নিয়ে আরও জানতে পারলেন, উদার স্ত্রী শিক্ষার ভয়ানক পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে, নাকি ব্রাহ্ম সমাজে মেলামেশাও করে।

একমাত্র ওষুধ আচিরাৎ বিয়ে দিয়ে দেওয়া। সেকালের হিসাবে বয়সও হয়েছে, শুধু ভালো ছেলে বলেই চুপ করে ছিলেন যোগেনদাদা, আর কিন্তু বসে থাকা চলল না।

সেকালের ছোট ভাইরা আপত্তি করবে কি, বড় ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে চাইতেই সাহস করত না। ও'দের দুজনের মধ্যে আবার বয়সের অনেক প্রভেদ, প্রায় কুড়ি বৎসর, তবু গোপেন বিবাহে আপত্তি না করুক, মেয়েটি অন্ততঃ হাই-স্কুলের দুটো ধাপও ওপারে উঠেছে এমন হয়—এ উচ্চাশাটুকু জানিয়েছিল পাকে-প্রকারে; আমল দেননি যোগেনদাদা।

তবে মা ঠাকুরমাদের মতো একেবারে প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীনও নয়। ঐ সামঞ্জস্য; যুগটা যে বদলাচ্ছে সেটা মানতে হবে তো। মেয়ে ঠিক করলেন মিডিল স্কুলের প্রায় শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়েছে। যথেষ্ট হোল, এই সামলানো যাক আপাততঃ। ঠাকুরমা-মায়েদের পর বিন্ধ্যবাসিনী ধোবার হিসেবটা নিজেই লিখে রাখতে পারতেন।

আর, মেয়ে নিয়ে এলেন একেবারে পাড়াগাঁ থেকে। এটা আরও বিশেষ করে এই জন্য করলেন যে, ভাইয়ের মনটা অন্য দিকে ঝুঁকেছে। ব্যালেন্স বা ভারসাম্যটা রক্ষা হবে।

এদিকে মেয়ে যতদূর বাঞ্ছনীয় হতে হয়। দেখতে যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি, তেমনি স্বাস্থ্য, বয়স ঠিকমত হবে ষোল বছর পাঁচ মাস, কিন্তু মনে হবে যেন সতের—আঠার বছরের মেয়ে একটা। কাজে-কর্মে, সেবায়-শুশ্রূষায় সাড়া তল্লাটে অমন একটা বৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি স্বভাবে, চাল-চলনে, পায়ের নখের দিকে চেয়ে ভিন্ন চলতে জানে না; আর কেউ বলুক তো রায়েদের বাড়ির নূতন বৌয়ের গলার আওয়াজ শুনে এলাম! অজ পাড়াগাঁ, তার ওপর বাড়িতে একেবারে সেকেলে চাল, বৌ দেখে চারিদিকে বাহবা পড়ে গেল।

যোগেনদাদাদের বসত বাড়িটা সাবেকি আমলের। চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ বড় চৌহদ্দি, খিড়কির দিকে একটা বড় পুকুর, বাঁধানো ঘাট, দুদিকে দুটো বকুল গাছ, চারিদিকে ফলের বাগান, কলা থেকে গিয়ে জাম-জামরুল পর্যন্ত কোনটা বাদ নেই। তারপর ফুল, বিশেষ করে পুজোয় সেগুলো কাজে লাগে। তারপর তরি-তরকারি।

নূতন বধূ নব-নলিনীর বাপের বাড়িও অনেকটা এই ধরণের।

তবুও মায়া হয় বৈকি একটু, একেবারে অজ পাড়াগাঁ থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। আর, সেখানে বাপের বাড়ির ঝিউড়ি মেয়ে, এখানে শ্বশুরবাড়ির নূতন বৌ। যোগেনদাদা সামঞ্জস্যের দিকে হাত আর একটু ঢিলে করলেন, বললেন,—মাকে আমার বলে দাও—অত ঘোমটা টেনে মেপে মেপে চলা-ফেরা করতে হবে না, উনি তো এখন খানিকটা নূতন হাওয়ার মধ্যেই এসে পড়লেন। তারপর বাপের বাড়ির মতন পুকুর রয়েছে, বাগান রয়েছে, বাড়ির মধ্যেই তো, কাউকে সঙ্গে নিয়ে ইচ্ছে হোল একটু ঘুরে বেড়ালেন, বসলেন ঘাটের বকুলতলায়। উনি যদি অষ্টপ্রহর বাড়ির মধ্যে হাঁপিয়ে সারা হলেন তো কার জন্যে আমার এ সব?'

দেরি হোল পায়ের জড়তাটুকু ভাঙতে। যদি বা বেরুল কোন দিন তো সেখানেও ঐ রকম পা মেপে মেপে চলা। সঙ্গে থাকে ননদ রেবা, কিম্বা ভাসুরঝি রেণু। রেবা হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী, দড়ি ঘুরিয়ে স্কিপিং খেলায় তার জুড়ি নেই স্কুলে, অনুযোগই করে বলে—'না বাপু, রেণুকেই দিও সঙ্গে। জড়-ভরত, ও'র সঙ্গে বাগানে বেড়াতে গেলে খেলাই ভুলে যাব আমি। একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন তো দেখছেনই, দেখছেনই। বিশেষ করে যদি কুল গাছ বা বিলিতি আমড়ার গাছটা হোল—বলি, হাঁ বৌদি, এই শুনি তোমাদের সেখানে গাছে গাছে জঙ্গল হ'য়ে রয়েছে, তা দ্যাখোনি কখনও কুল গাছ, কি বিলিতি আমড়ার গাছ?'

রাগের অনুযোগ তো নয়, ঠাট্টারই। মা রয়েছেন, বড়ভাজ বিন্ধ্যবাসিনী, হয়তো পাড়ারও দু'একজন বৈকালিক আসরে জড়ো হয়েছেন। নব-নলিনী সেবা করছে শাশুড়ীর, তারই হাতে দুটো একটু একত্র করে নিয়ে মিনতির দৃষ্টিতে চায় ননদের পানে—অর্থাৎ হাত জোড় করছে, থামুক।

শাশুড়ি প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, বলেন, 'আহা, দেখবেন না কেন গা? অনেক দেখেছেন বলেই তো আরও মনে পড়ে যায়......'

রেবা নূতন ভাজের দিকে চেয়ে চোখ নাচায়—'আর অমনি [illegible]।'

রেণুর নালিস নয়। তার হোল একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। চোখ বড় বড় করে, গলা একেবারে চেপে শুধু মাকে বলে,—'জানো মা, কাকিমার 'গঙ্গাজল'—পাতায় নাকো 'সই', গঙ্গাজল'? —সেই 'গঙ্গাজল' গাছে চড়তে পারে!......হ্যাঁগো, সত্যি বলছি, কাকিমা নিজে আমায় বললেন, আজ কুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে—ঐ যে দেখছ রেণু একসঙ্গে অনেকগুলো কুল পেকে রয়েছে, হোক না মগ ডালের কাছে, আমার 'গঙ্গাজল' হলে ঠিক পেড়ে আনত।...... আমায় দেখিয়েও দিলেন কাকিমা—গাছ কোমর বেঁধে নিত আগে? কাঠ পিঁপড়ে তাড়াবার একটা মন্ত্র আছে—আমায় শিখিয়ে দেবেন বলেছেন কাকিমা—সেইটে পড়ে নিয়ে এ ডালে পা দিয়ে ওডাল, তারপর মাথার ওপরেরটা ধরে টকটক করে উঠে গিয়ে পেড়ে কোঁচড়ে পুরে নেমে আসত......হ্যাঁ, কাকিমার নিজের 'গঙ্গা-জল! ......তুমি কিন্তু বোল না কাকিমাকে মা, আমায় দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন বলতে......'

—তা সত্ত্বেও পারে না চেপে রাখতে, কুল-গাছ দেখে যেমন নব-নলিনীও চাপতে পারেনি গঙ্গাজলের পৌরুষের কথাটা। শেষ ক'রে রেণু কুণ্ঠিতভাবে চোখের কোণ তুলে চায় মায়ের মুখের দিকে, আরও গলা নামিয়ে বলে,—'হ্যাঁমা, তাহলে নিশ্চয়......'

'তা হ'লে নিশ্চয়টা কি?' চোখ পাকিয়ে ওঠেন বিন্ধ্যবাসিনী, বলেন,—'মানা করেছেন তো তুমি বলতে গেলে কেন? গুরুজন তো আর কাউকে বলবে না'।

নিজেও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আনমনা হয়ে থাকেন।

নূতন বধূ এও যে যায় বাগানে, অনেক বলা-কওয়ার পর। কাজের মেয়ে, পা দুটি যতই মন্থর হোক, বিরাম নেই তাদের, অষ্টপ্রহরই একটা না একটা কিছু কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঘর, রক, উঠান। ভাসুর যদি সামনে পড়ে গেলেন তো এক গলা ঘোমটা নামিয়ে দিলে; কিম্বা গোপেন, কিম্বা পাড়ার বর্ষীয়সী কোন মেয়েছেলেই।

শুধু দুপুরটিতে এক একদিন দেখা যায়, বকুলতলাটিতে গিয়ে চুপ করে আছে ব'সে। বেটা ছেলেরা যখন বাইরে তাদের নিজের নিজের কাজে, শাশুড়ি ঘুমুচ্ছেন, বড় জা বিন্ধ্যবাসিনী কোলের ছেলেটিকে পাশে শুইয়ে একটা বই হাতে করে বিছানায়।

গোপেন একদিন অসময়ে কলেজ থেকে ফিরে (আজকাল মাঝে মাঝে হচ্ছে এটা) দেখে ফেলে ভাজকে বলেছিল,—'কোথা থেকে একটা বুনো ধরে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরেছ, ডুবে মরবার মতলব আঁটছে না তো? পুকুরের দিকে ঠায় চেয়ে কী অমন করে রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করে বলতো? দেখো না একদিন লুকিয়ে।' দেখল একদিন সকলেই। লুকিয়েও নয়। ছোট-খাট বেশ একটি ভিড়ই জমে গিয়েছিল।

যোগেনদাদার মাছ ধরার ভীষণ বাতিক। আরও কয়েকজন আছে পাড়ায়। কোন ছুটিছাটা থাকলে গোটা চার-পাঁচ ছিপ নিয়ে বেশ একটি দল দূর গ্রামের কোথাও চলে যান, সমস্ত দিনটা

কাটিয়ে, 'ঐ মিলন নিয়ে ফেরেন। সমস্ত দিনটা বাইরে যায় কেটে, সুতরাং অন্ততঃ দুটো দিনের ছুটি না হলে হয় না।

ঐ রকম দিন দুই নিয়ে একটা কি ছুটি রয়েছে। বেশ খানিকটা দূরে একটা ভালো পুকুর ঠিক হয়েছে, একটা দিন থেকেও যেতে পারেন সবাই, শরীরটা খারাপ বলে যোগেনদাদা যেতে পারলেন না।

মনটা খুঁৎখুঁৎ করছে, একেবারে অমনি যাবে এমন দিনটা? দলটা বেরিয়ে গেলে বাড়িতে ঢুকে চাকরটাকে বললেন, নিজেদের পুকুরেই বসবেন, চার তোয়ের ক'রে ফেলুক ঘাটে।

নব-নলিনী পূজার বাসনগুলো মেজে সিঁড়ি দিয়ে রকে উঠছিল, ভাসুর উঠোনে। একগলা ঘোমটা। কথাগুলো শুনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আর ওপরে না গিয়ে পূজার বাসনশুদ্ধ শাশুড়ির কাছে গিয়ে চাপা গলায় হলেও বেশ দ্রুতগতিতে একরাশ কি বলে গেল। গেলও হঠাৎ বেশ একটু দ্রুত গতিতেই। যোগেনদাদা বেশ একটু বিস্মিত হয়ে গেছেন, কান খাড়া হয়ে উঠেছে।

মা বললেন,—'ওরে যোগেন, মেছোর বেটি কি বলেন শোনো, আমায় চার তোয়ের করে দিতে বলুন মা বড়ঠাকুরকে। এমন চার তোয়ের করে দোব, যদি একটাও কোথাও মাছ থাকে পুকুরে তো না এসে পারবে না।'

যোগেনদাদা বললেন,—'তা দিন না ক'রে মা, দেখি। মাছ তো আছে পুকুরে তবে কেমন ঘাঁটচড়া হয়ে গেছে ঘেঁষতে চায় না চারের দিকে।'

! নব-নলিনী যেন একেবারে বদলে গেল। পূজার বাসনগুলো সেখানেই নামিয়ে চাকরটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ফর্দ করে তখনই বাজারে পাঠিয়ে দিল, মশলা এসে গেলে নিজেই ভাজল, হামানদিস্তায় গুঁড়ো করলে, নিজে নিজেই মেশাল। ময়দার সঙ্গে তুলো আর কি একটা মশলা মিশিয়ে নিজেই মেখে টোপ তোয়ের করলো। এমন কি খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চার কিভাবে আর কোথায় ফেলতে হবে চাপা গলায় এবং আঙুলের ইসারায় সেটাও দেখিয়ে দিল চাকরটাকে। সমস্ত ব্যাপারটুকুর মধ্যে রয়েছে নব-নলিনী একাই।

চাকরটা হুকুম তামিল ক'রে যাচ্ছে: আর সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।... কান্ডখানা কি!

ওরই নির্দেশে যোগেনদাদা তাড়াতাড়ি খেয়েও নিলেন; চার যা হয়েছে, মাছ আসতে দেরী হবে না। উনি চারে বসার পর একটু যেন সাড় ফিরে এল নব-নলিনীর। ননদকে প্রশ্ন করল—'হ্যাঁগা ঠাকুরঝি, বড়ঠাকুর কিছু বলছিলেন নাকি?'

রেবা বলল—'তবু ভালো। তা কোন্ জগতে ছিলে বলো দিকিন এতক্ষণ? মনে ছিল বড়ঠাকুর কি আর একজনকে?'

'তাই নাকি গো! দ্যাখো মরণ!' —জিভ কেটে গাল পাড়ল নিজেকে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঝোঁকের মাথায়—একটানা খেটে গিয়ে যখন হুঁস ফিরে এল, তখন লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই ওর প্রথম প্রশ্ন—'পেলেন কিছু বড়ঠাকুর, রেণু।

রেণু পুতুলের সংসার নিয়ে প'ড়েছিল, ঠোঁট উলটে বলল,—'জানিনে কে কি পেল মা পেল বাপু! নিজের জ্বালাতেই মরছি, একটু থেমে জুড়ে দিল—'কবে পেয়েছেন বাবা যে আজ অমনি পেয়ে যাবেন?'

সে কথাটা ঠিক, যোগেনদাদার ঐ শখ পর্যন্তই, হাত নেই একেবারে মাছ ধরায়।

ওপরের জানলা থেকে ঘাটটা দেখা যায়, নব-নলিনী গিয়ে বসল সামনে। ভেতরের উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে, কিন্তু নীচে গিয়ে দাঁড়াবে সে বিশ্বাসটুকু আর নেই নিজের ওপর। রেবা ক্লান্তভাবে উঠে এল; বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল,—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর ধরে গেল, একটু গড়াই। কী মাছটাই খাচ্ছে! কিন্তু দাদাই তো?'

'তাই নাকি?......'

—কী একটা বলতে গিয়ে 'উঃ! আবার ঐ!' ব'লে শিউরে উঠল নব-নলিনী, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই 'ও-টান নয়!! ও-টান নয়!!' বলে, এক রকম চেঁচিয়ে উঠেই জানলা থেকে নেমে পড়ে ছুটল নীচের দিকে।

রেবা তার কোমরের ব্যথা ভুলে গেছে, রেণু তার পুতুলের-সংসারের ঝামেলা, বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখল রক থেকে নেমে উঠোনের মাঝখান দিয়ে ছুটছে নব-নলিনী, ঘোমটা খসে গিয়ে এলো খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। মুখে—'ও রকম নয়!! —বলছি, ও-মাছের ও-টান নয়!!—থামুন!!—আসতে দিন আমায়!!......'

খিড়কিতে যারা জড়ো হয়েছে তাদের ঠেলে, বিন্ধ্যবাসিনীর কোল থেকে খোকাকে প্রায় ছিটকে ফেলে, গোপেনকেও বেশ একটা টাল খাইয়ে তরতর ক'রে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই হতভম্ব যোগেনদাদার হাত থেকে ছিপটা ছিনিয়ে নিয়ে সুতোটা আঙুলে টিপে, হাত একটু যেন নূতনভাবেই খেলিয়ে এক টান।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই—'গেঁথে গেছে। গাঁথতেই হবে! যদি কাৎলা না হয়, আর আধ মোনের কম হয় তো.....'

উল্লাসের চোটে ঘুরে চাইতেই রাঙা মুখটা একেবারে টকটকে হয়ে উঠল। একটানে যতটা পারল ঘোমটা নামিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল নূতন বধূ।

সেকালের ব্যাপার। ভাদ্রবৌ ছুঁয়ে ফেলেছেন, রীতিমতো প্রায়শ্চিত্ত করে একটা ছোটখাট ভোজ দিতে হোল যোগেনদাদাকে। অন্যেকে বলল, ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সংস্পর্শ, এ মাছও বাতিল। নব বধূর মনের দিকটা ভেবে এখানটা যুগের সঙ্গে একটু সামঞ্জস্য করে নিলেন যোগেনদাদা। মাছ এসে অবতার প্রায় অগ্নিসংস্পর্শে আরও শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আঠারো সেরের কাৎলাটাও রইল ভোজে।

মুড়োটা পুরুত-গঙ্গাধর ভট্টচার্জির পাতে দিয়ে ভালো করে মুখ বন্ধ ক'রে দিলেন।

কোটা

(২০ পৃষ্ঠার পর)

হবে না। অগত্যা একটি আধুনিক কাহিনী নিয়ে ছোট গল্প সুরু করলাম। কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলাম যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বড় গল্প ছোট গল্প সবই টাইপের খেলা। ছোট গল্পকেই ওস্তাদ কম্পোজিটার মাঝখানে ডবল লেড দিয়ে, এম কমিয়ে দিয়ে, টাইপ বড় করে বড় গল্প বা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস করতে পারে। লেখক Necessary Evil মাত্র। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ছোট গল্পটি যখন ছোটত্বের সীমা লঙ্ঘন করবার মুখে তখন আর একখানি সম্পাদকীয় পত্র। কাগজের কোটা অসম্ভব রকম কমে গিয়েছে কাজেই এবারের মতো একটি রম্য-রচনা হলেই চলবে। পাছে সপ্তকান্ড রামায়ণ লিখে ফেলি তাই তিনি একটি বচন উদ্ধার করে দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। Brevity is the Soul of Wit।

পূজা-সংখ্যার লেখক না পারে এমন কার্য নাই। তাই সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থেকে কেমন অনায়াসে রম্য রচনায় নেমে এলাম। অপরং কি ভবিষ্যতি? জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটি রম্য রচনা ফেঁদে বসেছি এমন সময়ে সম্পাদকের "গোপনীয়" পত্র। ওয়াকিবহাল মহলের খবর এই যে কাগজের কোটা শীঘ্রই আরও কমে যাবে তাই আর কালব্যাজ না করে যা হয়েছে যতটুকু হয়েছে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অসম্পূর্ণ রচনারও একটি নিজস্ব মাধুর্য আছে, লেখা যদি সম্পূর্ণ না হয় চিন্তিত হবেন না। বাধ্য হয়ে ওমনি রচনাটি পাঠিয়ে দিলাম, কোটা নিয়ন্ত্রণবিধায় লেখাটি অবশ্যই ছোট কিন্তু অসম্পূর্ণ নয়। এরূপ সম্পূর্ণ রচনা আমি আর লিখি নাই, অপরেও লেখে নাই, কারণ এর চেয়ে পূর্ণতর আর কিছুই হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

"মানুষে জন্মগ্রহণ করে, কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হয়।"

সম্পাদক খুশী, পাঠক খুশী, কেবল গৃহিণীর অসন্তোষের অন্ত নাই। এক-লাইনের রচনার সম্মান দক্ষিণা একটিমাত্র টাকা। তবু তিনি আর দখল ছাড়েননি, কোটার কৃপায় প্রাপ্ত টাকাটি সযত্নে কৌটায় তুলে রেখে দিয়েছেন।

নীতি-কথা ঃ—পূজা সংখ্যার লেখকের স্থিতি-স্থাপনতা বিস্ময়কর। এক-মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থেকে এক-ছত্রের শুভাষিতে নেমে আসতে তিনি সক্ষম।

এপার ওপার

পরিমল গোস্বামী
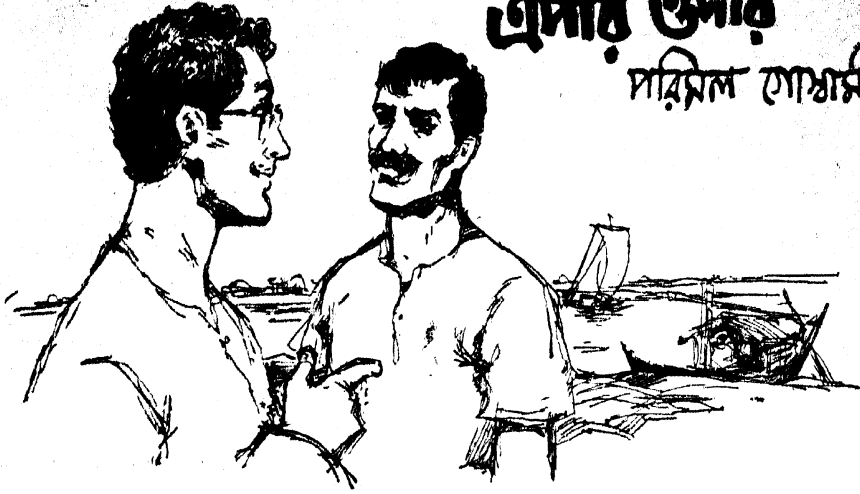
একটি মাত্র দমকা হাওয়া, আয়ু তার কতটুকুই বা। কিন্তু তাইতেই দুখানা নৌকার গতি সামান্য বদলে গিয়ে দুটি লোকের দুটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বছর ত্রিশ আগের কথা। তখন বাংলাদেশ দুটো হয়নি, নিজের দেশে চলতে ফিরতে পাসপোর্ট লাগত না। সেইদিনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকের ঘটনা। এ সময় প্রচণ্ড ঝড়ের কাল গত, এখন কেবল মাঝে মাঝে দমকা বাতাস পদ্মা নদীতে।

সবে জল বাড়তে শুরু করেছে। বৃদ্ধির গতি অতি মন্থর। নদীর মাঝখানকার এক চরে মরশুমের চাষবাস শেষ হয়ে গেছে, চাষীরা ঘর ভেঙে দেশে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে ফরিদপুর জেলার সীমানায়।

শহরের জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল আদিত্য দত্তগুপ্ত। টাকা থাকলে সুখও থাকে একথা আর যেই মানুক, আদিত্য মানে না। টাকা থাকলে শহরের বুকে মলয় হাওয়া বওয়ানো যায় না, বসন্তকাল নামানো যায় না, শত শত কোকিল ডাকানো যায় না।

আদিত্যর টাকা ছিল, কিন্তু শহরে কাব্যের পরিবেশ ছিল না। আদিত্য কবি। শুধু ছন্দ মিল সামলে কবিতা রচনা নয়, কবি ছিল সে মনে। একটা জোলি-জোলি ভাব। নরম নরম। ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। ফুল লতা পাতা দেখলে কাবু হয়ে পড়ে, এবং যত হয় তত আরও হতে চায়। মেয়েদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে, অথচ তার কাব্যের প্রেরণা তারা। একটা অর্থহীন কবিতা কাগজে বেরোলে অন্তত পঞ্চাশজন মেয়ের প্রত্যেকে মনে করে তাকে উদ্দেশ ক'রেই লেখা। কোনো অর্থ থাকে না ব'লেই তার নানা অর্থ হয়। অর্থ হয়, কারণ তারা জানে কবির আসল অর্থ আছে ব্যাঙ্কে।

আদিত্য আদর্শবাদী। উদার চরিত্র। শহর-জীবনকে তার যত কৃত্রিম বোধ হয়, তত তার পল্লীর প্রতি টান বাড়ে। আসল বাংলা দেশ রয়েছে পল্লীর বুকে। আকাশে রঙীন মেঘ দেখলে আদিত্যর মন খারাপ হয়, দূরে কোকিলের ডাক শুনলে মনে হয় শহরের ভাঙা নোংরা পাত্রে যেন অমৃত পরিবেশন করা হচ্ছে। সহ্য করতে পারে না সে এই বিষম ব্যবস্থা। বাস্তব কোনো কিছুই তার কাছে খুব ভাল লাগে না। রস-সমুদ্রে ডুবে থাকাই তার জীবনের লক্ষ্য। সকল দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়াতে চায় সে। কবিয়ানা তার ধর্ম।

এবং সে বিশ্বাস করে একমাত্র পল্লীগ্রামই হচ্ছে তার উপযুক্ত স্থান। সে যা চায় তা সেখানে আছে। সেখানে আকাশ ভরা নীল, মাঠভরা সবুজ, বনভরা পাখীর গান। শহরে শুধু স্বার্থপরতা, আর কাব্যহীনতার নোংরামি। বহুদিন সহ্য করেছে সে এসব, আর পারছে না। এবারে সে পাড়াগাঁয়ে যাবেই।

জমি কিনে বাড়ি করা যায় কিনা দেখতে সে একটি বিশেষ গ্রামে একটি লোককে পাঠিয়েছিল পাবনা জেলার কোনো একটি স্থানে, যেখানে আধুনিকতা নেই, শুধু নদী আছে, বন আছে, আর মাঠ আছে। যে লোকটি গিয়েছিল সে পরিচিত লোকের জানা লোক। সেই লোকটাই এ গ্রামের সন্ধান দিয়েছিল। গ্রামের নাম নিশ্চিন্তপুর। নাম শুনেই আদিত্যর পছন্দ হয়েছিল। তারপর শুনেছিল সে যা চায় এখানে সে সবই আছে।

এই গ্রামের উদ্দেশেই আদিত্যর অভিযান। পথনির্দেশ সে আগেই পেয়েছিল। রেল স্টেশনে নেমে কিছুদূর গিয়ে পদ্মা নদী পার হতে হবে। সেখানে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া করা নৌকাতেই সে যাচ্ছিল। দূরবীণ দিয়ে দূরের গ্রাম দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে মাঝনদীতে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস উঠে নৌকাখানা কিছুক্ষণের জন্য মাঝির আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেল, এবং ছুটে এসে আটকে গেল এই চড়ায়। চরের চারদিকের জল অনেকদূর পর্যন্ত অগভীর, বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

দমকা বাতাস তার কাজ শেষ ক'রে থেমে গেল, কিন্তু রেখে গেল এক অপ্রত্যাশিত পরিণাম, এবং সে যে কি ভয়ঙ্কর তা বাতাসের সাধ্য কি বোঝে।

এ ঘটনা ঘটল চরের দক্ষিণ দিকে। ঠিক তার উলটো দিকে, অর্থাৎ উত্তর দিকে ঐ একই বাতাসে আরও একখানি নৌকা এসে ঠেলে উঠেছে প্রায় চড়ার জমির উপর। এখানা নিতান্তই শস্তা ভাড়ার ছোট নৌকা।

অদৃষ্টের দোহাই পাড়ছে রাজু দাস। জমি-জমা যা সামান্য কিছু তার অবশিষ্ট ছিল তা বেচে সে শহরে চলেছে। ওপার থেকে এপারে। পরিচিত ভিটে ছেড়ে নির্বান্ধব দেশে।

আদিত্য কিন্তু এই চরের উপর তাকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ জুড়ে দিল। রাজুর চেহারায়, কথায়, ব্যবহারে আদিত্য প্রথম গ্রামের স্বাদ পেল। পেল প্রথম এক মিনিটের মধ্যেই অথচ রাজু কখনও শহরের কোনো বাবুর সঙ্গে আলাপ করেনি। সে কোনো কথা গুছিয়ে বলতে পারে না, সেটাই হল আদিত্যের একটা বড় আকর্ষণ। রাজুকে অবশ্য সে বেশি কথা বলতেই দেয়নি, কেবল নিজের কথাই বলেছে।

রাজু জানতে পারল আদিত্যবাবু শহর ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছেন বাস করতে। কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। শহুরে বাবুর খেয়াল, দুদিনেই মিটে যাবে।

রাজু শুধু একটু একটু হাসল আদিত্যর কথায়। আদিত্যর কাছে তা আরও মনোহর বোধ হল। কি সরল কি সুন্দর এই মানুষটি। রাজু, তুমি কত বড় তা তুমি জান না। আমরা শহুরে মানুষ তোমার কাছে কত ছোট।

রাজুর মনে হয় শহুরে বাবুর মাথায় ছিট আছে। বাবু, অমন কথা বলবেন না, শুনলে আমার পাপ হবে। কিন্তু আপনি বাবু, কেন যাচ্ছেন পাড়া গাঁয়ে মরতে?

রাজু, তুমি জান না শহর অতি খারাপ।

না বাবু, তা কি কখনও হতে পারে?

শোন রাজু, আমি যা বলছি তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। শহরে প্রাণ নেই, হৃদয় নেই, কিছু নেই। যারা আছে সেখানে তাদের হৃদয় ইস্পাতে গড়া, তারা সব কলের মানুষ।

আদিত্য শুনে খুশি হয়। ভাবে কলে কাজ ক'রে সবাই। সেও তো সেই উদ্দেশ্যেই যাচ্ছে সেখানে।

আদিত্যর কথা শেষ হয় না, সে আবার বলতে থাকে, শহুরে মানুষদের কথা বলতে বড় কষ্ট হয় রাজু, তারা সব অমানুষ, স্বার্থ ছাড়া এক পা এগোয় না। চোর সব। যাকেই বিশ্বাস করবে, সেই ঠকাবে। গুণ্ডারা ভাল-মানুষ সেজে এসে বাড়িতে চাকর হবে, তারপর

মনিবকে খুন ক'রে পালাবে। কথায় কথায় বুকে ছোরা, কথায় কথায় গাড়ি চাপা।

রাজুর মনে একটু একটু সন্দেহ ঢোকে।

আবার জিজ্ঞাসা করে, সত্যি এ সব?

প্রত্যেকটি সত্যি।

রাজু আবার ভাবে।

আবার জিজ্ঞাসা করে, ভাল মানুষ সেখানে কেউ নেই।

আছে—দু-চারজন; তারা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়।

রাজু আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবে।

সবাই মিলে এক হ'লে তো বাবু মন্দ মানুষদের জব্দ করা যায়।

তুমি বুঝতে পারছ না রাজু। ভীষণ জটিল সব ব্যাপার। শহরকে এখন বাঁচায় কার সাধ্য?

রাজু চুপ করে। আদিত্যর বলার ভঙ্গিতে এখন তার এসব কথা বিশ্বাস হ'তে থাকে।

রাজুর মাথা ঘুরে ওঠে।

সে এখন কি করবে?

ভবিষ্যতের যে ছবিখানা তার মনের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছিল তার উপর কে যেন কালো কালি ঢেলে দিল। আদিত্য জানল না সে রাজুর কি ক্ষতি করল।

আদিত্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজু হঠাৎ উঠে প'ড়ে বলল, আর শুনতে চাই না বাবু, আর শুনতে চাই না। আমার কি হবে এখন। ব'লে সে অস্থিরভাবে বলল আমি একটুখানি আসি বাবু, আমার মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিম-ঝিম করছে।

কিন্তু আদিত্যর তখন আবেগ এসে গেছে, তাকে এখন থামাবে কে। সে বলল, না না মাথা ঝিমঝিম করার ব্যাপারটা কিছু না, তোমার বোধহয় ব্লাডপ্রেসার কম। বোধহয় সিস্টোলিক ১০০ কিংবা কাছাকাছি নেমে পড়েছে। তা হোক, তোমার রক্তে আছে গ্রামের হাওয়া, গ্রামের সবুজ ছায়া, পাখীর গান, মাথা ঘোরায় তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। গ্রামের হাওয়া যে কি মধুর, কি তেজস্কর—

রাজু বলল, বাবু আমি চললাম একটু ওদিকে, মাথাটা একটু ভিজিয়ে আসি।

রাজু চলতে আরম্ভ করল জলের দিকে। তার মনের মধ্যে একটা প্রবল ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আদিত্যকে সে সেকথা বলে কি করে। সে চলতে থাকে জলের দিকে।

কিন্তু আদিত্য তাকে ছাড়ে না। সে তাকে অনুসরণ করে আর বলতে থাকে, আচ্ছা রাজু, তোমাদের গাঁয়ে ফুলে ফুলে অলিরা গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়?

রাজু—এখন থাক, আমি এখন বড় কষ্ট পাচ্ছি। গান গায় না কেউ, অলি কাকে বলে তাও জানি না।

অলি হচ্ছে ভ্রমর, মধুকর, মৌমাছি। তুমি কাজের মানুষ তাই হয়তো ওসব লক্ষ করনি। কিন্তু প্রত্যেকটি অলি ফুলের মধু খেতে খেতে প্রথমে গান গায়, কিন্তু খাওয়া শেষ হ'লে গান গাইতে পারে না, ফুলের উপর লুটিয়ে পড়ে; আর কি জান। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এ জিনিস নেই। স্বয়ং ডি, এল, রায় বলে গেছেন একথা। বলেছেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি।

কি জানি বাবু, জানি না—ব'লে আরও একটু জোরে পা চালায় রাজু।

আদিত্যও এগিয়ে চলে। বলে, তোমাদের পাড়াগাঁ রাজু স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

রাজু বেঁকে দাঁড়ায়। তার মনে এখন গভীর বিরক্তি। তার ভয় কেটে গেছে। সে এখন ক্রমেই মরীয়া হয়ে উঠছে। সে এখন আদিত্যকে প্রাণপণে এড়াতে চাইছে। আদিত্য তার জীবনে বয়ে আনল এ কি অভিশাপ! সে বলল, না বাবু সে কথা ঠিক নয়, পাড়া-গাঁ ম্যালেরিয়া দিয়ে ঘেরা, পচানো পাটের গন্ধ দিয়ে ঘেরা। —তার কণ্ঠে তিক্ততা।

কিন্তু আদিত্যর কানে যায় না তার কথা। সে ছুটতে থাকে রাজুর পিছনে, ভাবে রাজু বোধহয় তার গাঁয়ের শান্তির মধ্যে শহরের অশান্তি ঢোকাতে চায় না, তাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? সে তো শান্তিতে থাকবে বলেই গ্রামে যেতে চাইছে। শোনো রাজু, আমি তোমাদের কারো কোনো অনিষ্ট করব না। আহা, গাঁয়ের কথা কল্পনা করতেও সুখ! ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ। আহা! এমন ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব আর কোনো দেশে আছে?

রাজু এবারে রুখে দাঁড়ায়। বাবু, ভাইই আমাকে ভিটেছাড়া করেছে। দু'ভাইয়ের নামে এজমালিতে যত জমি ছিল, ভাই সব গেরাস করেছে, ভাই আমাকে পথে বসিয়েছে।

রাজুর কথার সুরের বদল ঘটল। ভয়ের সুর নয়, মন রাখার সুর নয়। তেজের সুর, তিক্ততার সুর। আদিত্য থমকে দাঁড়াল। কি যেন ভাবল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। বলল, আমার মনে হয় রাজু তোমার হয়তো ভুল হয়েছে বুঝতে। ভাই এসব করতে পারে? ডি-এল রায় বলেছেন—

রাজু এবারে প্রায় ক্ষেপে যায় আদিত্যের কথায়। সে ফিরে দাঁড়ায়। বলে, বাবু সে তো অনেকদিনের কথা—তারপর আমরা আলাদা হই। বাড়ি ভাগ করি। কিন্তু তাতেই বা বাঁচলাম কোথায়? দু'ভাইয়ের বাড়ির সীমানার এক হাত জমি নিয়ে আমার সঙ্গে একটি বছর মামলা চালিয়েছে। তাই তো গাঁ ছেড়ে চলেছিলাম। বাড়ি বেচেছি, বৌকে বাপের বাড়ি রেখেছি। সামান্য সম্বল নিয়ে চলেছি ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

আদিত্য আরও একটু দমে যায়। তবু জিজ্ঞাসা করে তুমি যা বলছ তা কি ঠিক?

প্রত্যেকটি কথা বাবু খাঁটি কথা।

আদিত্য আত্মগত হয়। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। চুপসে যায়। এতক্ষণ রাজুর কথা তার কানে ঠিকমত যায়নি। এতক্ষণ সে নিজের কথাতেই মেতে ছিল। এইবারে মর্মে প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে। তার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মাটিতে পদক্ষেপ। প্রথম বাস্তবের রূঢ়তায় দৃষ্টিক্ষেপ। কবিয়ানা-ধর্মীর পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক।

আদিত্য কথা বলতে গেল, কিন্তু একুশদিন অনশনের পর কণ্ঠ যেমন ক্ষীণ এবং দুর্বল হয়, ঠিক তেমনি দুর্বল কণ্ঠে বলল, রাজু, গাঁয়ে যদি সম্পত্তি হারিয়ে থাক তবে শহরে কি পাবে? সেখানে পথে মরতে হবে না খেয়ে, কেউ ফিরেও চাইবে না।

আদিত্য কেমন যেন বিভ্রান্ত। দুজনেই চুপ। কিছুক্ষণ পরে তবে আদিত্য আবার কথা বলতে পারল। তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। আচ্ছা রাজু, গাঁয়ের মাটিতে হাঁটতে পায়ে কি কোনো সুখেরই ছোঁয়া লাগে না?

রাজু গম্ভীরকণ্ঠে আত্মগতভাবে বলল, না বাবু শুধু জোঁক লাগে।

আমি ঘর থেকে বেরোব না। আমি কারো সঙ্গে শত্রুতা করব না। নিজের মতো থাকব। শুধু কবিতা লিখব, গান গাইব। গ্রাম্য সরলতা নিয়ে গল্প লিখব।

রাজুর স্বর এবারে আরও তিক্ত। না বাবু, তা পারবেন না। ওরা সব মামলাবাজ। আপনাকে সাক্ষী মানবে। আদালতে ছুটতে হবে। এমন জড়িয়ে ফেলবে যে, ছাড়াতে সমস্ত জীবন কেটে যাবে।

কি সর্বনাশ! মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে হবে? কিছুর মধ্যে না থাকলেও?

রাজু উত্তেজিতভাবে বলে, ওটাই তো গাঁয়ের মজা। মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে হবে। ওরা শিখিয়ে দেবে। না দিলে আপনাকে গাঁ ছাড়া করবে। আপনার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা খাড়া করবে। আমারই মতো আপনাকেও পথে বসাবে। রাত-বিরাতে ঢিল ছুঁড়বে বাড়িতে। ভূতের ভয় দেখাবে। উচ্ছেদ ক'রে তবে ছাড়বে। তারপর আপনাকে তাড়াবার পর তখন কেউ কেউ বলবে, আহা, লোকটা মন্দ ছিল না।

ঝড়ের মতো কথাগুলো ব'লে রাজু জলে নেমে মাথা ভেজাতে লাগল। কিন্তু সে দৃশ্য আর আদিত্যর চোখে পড়ল না। সে হঠাৎ উল্টো দিকে ঘুরে প্রায় ছুটে চলে গেল তার নৌকার মধ্যে।

কিছু বলল না।

পিছনে একবার ফিরে তাকাল না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে জল কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গিয়ে নৌকা জলে ভেসেছে আপনা থেকেই।

আদিত্য মাঝিকে বলল ওপারে যাবার দরকার নেই, ফিরে চল।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আদিত্যের মনে হ'ল রাজুকে সঙ্গে নিয়ে এলে হ'ত। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে সেই। তার মতো একটি ভাল মানুষকে নিজেই সে কাজ দিয়ে পালন করতে পারত। এ কথাটা তার যথাসময়ে মনে হয়নি। হঠাৎ দূরবীণটি তুলে নিয়ে চোখে লাগাল। দূরে দেখা যাচ্ছিল রাজুর নৌকা। অনিচ্ছার ভারে গতি মন্থর—রাত্রির মৃদু চিক্‌চিক্ করা জলের উপর অস্পষ্ট কালো একটি বিন্দু।

ও বিন্দু মিলিয়ে যাবে এখুনি। আদিত্যর মনে ওর ছাপ পড়ল। একটি কলঙ্ক-বিন্দু।

সেটিও মিলিয়ে যাবে যথাসময়ে।

ফ্লু

বনফুল

প্রথমে মাথাব্যথা থেকে শুরু হল। তারপর পর পর কয়েকটা হাঁচি। হেঁচে মাথাটা পরিষ্কার হল না। রগের কাছে আর দুই ভুরুর মাঝখানে ব্যথা আরও জমে বসল যেন। অসহায় বোধ করতে লাগলাম। জানি কোনও উপকার হবে না তবু নস্যি নিলাম। আবার হাঁচি। এবার তপতী এল। মনে হল যেন আরাম পেলাম একটু। রোদও ঢুকল একটু জানলা দিয়ে। পড়ল তপতীর শাড়ির লাল পাড়ে আর গালের উপর। মনে হল আমার মনের আকাশও একটু রঙীন হয়ে উঠল যেন।

"আপনি হাঁচছেন কেন বারবার। কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটা বড় ব্যথা করছে।"

নিজের হাত দিয়েই রগ দুটো টিপে ধরলাম।

"আমি টিপে দেব?"

"না থাক, তোমাকে আর কষ্ট দেব না।"

একটু হেসে তপতী বললে—"এতে আর কষ্টের কি আছে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব ভাল মাথা টিপতে পারি। দাদারও মাথা ধরে মাঝে মাঝে। আমি মাথা টিপে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। নিন, শুয়ে পড়ুন। চোখ বুজে থাকতে হবে। অমন করে' চেয়ে আছেন কেন?"

শুয়ে চোখ বুজলাম।

তপতী মাথা টিপতে লাগল।

বিকেলবেলা বেশ জ্বর হল।

তপতীই টেম্পারেচার নিয়ে বলল—বেশ, জ্বর হয়েছে আপনার। প্রায় ১০৩-এর কাছাকাছি। ডাক্তার ডাকবেন? কে আপনার ডাক্তার?

ডাক্তারের নাম আর ফোন নম্বর বলে' দিলাম।

তপতী পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করতে লাগল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। তপতীর গলার স্বর যেন কাকাতুয়ার স্বরের মতো। মানসচক্ষে তার মাথার উপর একটা ঝুঁটিও যেন দেখতে পেলাম, ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছে উত্তেজনাভরে আর তার ভিতর দেখা যাচ্ছে গোলাপী রঙের আভা। অত কি কথা কইছে ডাক্তারের সঙ্গে? আলাপ আছে নাকি। হাসছে মাঝে মাঝে।

"না, না, আমি এমনিই বেড়াতে এসেছি। উনি আমার দাদার বন্ধু তো। ওঁর মা? ভালই আছেন। তবে উনি তো চোখে দেখতে পান না, কানেও শুনতে পান না। হ্যাঁ, মায়ের দাই আমি আসবার আগেই ফিরে এসেছে। তা না হলে তো আমি মহামুস্কিলে পড়ে যেতুম। ছটুকু চাকরটা অবশ্য খুব কাজের।" অকারণে আবার একটা কথা মনে হল। বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বর কেমন?

তপতী ফিরে এসে বলল—"ডাক্তারবাবু একটু পরেই আসছেন। লোকটিকে বেশ ভালই মনে হল। মায়ের খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, এই শীতেই ওঁর ছানি কেটে দেবেন। আচ্ছা, ওঁর কি বিয়ে হয়েছে? আমার বন্ধু রুণুর একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাঁর নামও অমৃত সেন।"

"না, এঁর বিয়ে হয়নি।"

পাশ ফিরে শুলাম। রগের শির দুটো দপ দপ করতে লাগল। মনে হ'ল সর্বাঙ্গ যেন কে চিবুচ্ছে।

ডাক্তার সেন একটু পরে এলেন।

বললেন, "ফ্লু হয়েছে। একটা মিক্শ্চার দিয়ে যাচ্ছি। চার ঘণ্টা অন্তর খাবেন। আর তিনদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। কম্‌প্লিট্‌ রেস্‌ট্‌!" তারপর তপতীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আপনিও আপনার রুমালে ইউক্যালিপ্‌টাস ছড়িয়ে নিন। শুঁকবেন মাঝে মাঝে রোগটা ভারি ছোঁয়াচে।"

মনে হল ডাক্তার সেন একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে চাইলেন তপতীর দিকে।

ভাই সমর,

তপতী দার্জিলিং থেকে তোমাদের ওখানে গেছে। ওকে তোমার কেমন লাগছে? বুঝতেই পারছ কেন একথা লিখছি। বোনটিকে সৎপাত্রে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু সৎপাত্র কোথায়? কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখ ভাই। ইতি—

নরেন

চিঠি নয়, স্বপ্ন। এ রকম স্বপ্ন দেখার মানে?

মাথাটা আবার টিপ টিপ করছে।

"ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু।"

মাথা দুলিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল তপতী।

নিপুণভাবে ওষুধটি শিশি থেকে ঢেলে নিপুণভাবে খাইয়ে রঙীন তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিলে।

বড় দুর্বল বোধ করছি।

সন্ধ্যার পর গলার ভিতরটা যেন কুটকুট করতে লাগল।

"তপতী—"

"কি?"

"না, থাক—"

"কি বললেন না?"

"গলার ভিতরে টর্চ দিয়ে দেখবে? বড্ড কুটকুট করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে থাক, তোমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে।"

"না, না, তাতে কি। আমার কিছু হবে না। কিন্তু দেখে আমি কিছু বুঝব কি। আচ্ছা দেখছি,—" টর্চ নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ দেখল তপতী।

"লাল দেখছি কেবল—"

"লাল?"

হঠাৎ কেমন যেন একটা প্রেরণা পেলাম।

"মেণ্ডেলস্‌ পিগমেণ্ট গলায় লাগিয়ে দাও তো। ও-ঘরের তাকে আছে শিশিটা। ছোট্ট শিশি।"

একটি চমৎকার তুলি বানিয়ে নিয়ে এল তপতী।

"হাঁ করুন। পিছন দিকের লাল জায়গাটায় লাগিয়ে দেব তো?"

"হ্যাঁ, ভিতরের দিকে! যেখানে খুশী লাগাও—"

নিজেরই মনে হল কথাগুলো অসংলগ্ন হচ্ছে।

সত্যিই বেশ ভাল করে' লাগিয়ে দিলে পিগমেণ্টটা। ...বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

তার পরদিন সত্যিই নরেনের চিঠি এল।

ভাই সমর,

তপতীকে চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দিও। তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। জামা কাপড় গয়না কেনার সময় তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কোনমতেই যেন ওখানে আর দেরি না করে। ভালবাসা জেন। মাকে প্রণাম দিও।

—নরেন

পরদিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাথা, গলা, বুক সব পরিষ্কার।

কোথাও ব্যথার লেশ নেই।

যাবার সময় তপতী যখন প্রণাম করতে এল—বললাম, "আশীর্বাদ করি সুখী হও"।

হারানো ঠিকানা

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী

মেয়ের বিয়ে দিতে কলকাতায় এসেছে অবন্তী। এ কথা যে শুনছে সেই আকাশ থেকে পড়ছে। না, কলকাতায় আসার জন্যে নয়, বিয়ে দেওয়ার জন্যে। অবন্তীর বিয়ের ঘটাটাই যে এখনো ভোলেনি অনেকে। অবন্তীর দিদিরা বসে আছে বড় বড় মেয়ে নিয়ে।

সবাই বলছে, 'ওমা সে কি!'

যদিও অবন্তীর ছেলেমানুষের মত মাথা দুলিয়ে চোখ মুখে আলোর ঝিলিক ফুটিয়ে বলছে, 'বাঃ বিদেশে পড়ে থাকি, আমার বুঝি ইচ্ছে করে না একটা কিছু ঘটা করি?' কিন্তু কাজের বেলায় ছেলেমানুষের মত কিছু করছে না। বেশ পাকা গিন্নীর মতই বিয়ের সুব্যবস্থা করতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এক করে বেড়াচ্ছে।

সেই বেড়ানোর মাঝখানেই মর্ত্যের এক কোণে দেখা হয়ে গেল, তার জীবনের 'প্রথম প্রেমের' সঙ্গে।

বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্যি, শেষ দেখা সেই অবন্তীর বিয়ের দিন। অনেক দিন আগে একদিন বলেছিল গৌতম 'পৃথিবীটা গোল।'

কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার কথাটা প্রমাণিত হতে এতগুলো দিন লাগল।

শাড়ীর দোকান থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হয়ে গেল। গৌতম অনেকক্ষণ থেকে দেখছিল, গৌতম নিঃসংশয় ছিল, অবন্তীর নিঃসংশয় হতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। তারপর অবন্তী স্থান কাল লোক ভীড় সব বিস্মৃত হয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরে বিহ্বল উচ্ছলতায় বলে উঠল, 'গৌতম!'

গৌতম এই প্রচণ্ডতা আশা করেনি বরং দ্বিধাগ্রস্ত ছিল—চিনতে যদি না পারে পরিচয় দিয়ে দেখা করবে, না ভীড়ের স্রোতে হারিয়ে যেতে দেবে!

হারিয়ে যাওয়াই তো জিনিস, না হয় আর একবার হারাল। তবু—চলে যেতে ও পারছিল না, পারছিল না এতবড় সুযোগটা বৃথা অহমিকায় হারাতে। তাই দোকানের দরজা থেকে বেরিয়েই অবন্তী ঠিক যেখানে ঘুরে দাঁড়াবে সেইখানে দাঁড়িয়েছিল, বেশ আলোর দিকে মুখটা করে।

অবন্তী যে কোন্ দিকে ঘুরবে, তা অবশ্য জানাই হয়ে গিয়েছিল তার, দেখেছিল গাড়ীটা কোন্ দিকে রেখেছে।

কিন্তু খুব একটা আশা ছিল না।

সেই ক্ষীণ প্রত্যাশার খাতে হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকল বন্যার স্রোত।

অবন্তী সেই ধরা হাতটায় প্রবল একটা আবেগের চাপ দিয়ে আবার বলে উঠল, 'গৌতম! সত্যি তুমি?'

গৌতম অবশ্য এতটা জ্ঞান হারায়নি, সে হাতটা আস্তে আলগা করে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কেন, দেখে কি অশরীরী আত্মা বলে মনে হচ্ছে?'

'বিশ্বাস করতে পারছি না। কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আমি আজ। গৌতম এস গাড়ীতে উঠে এস। কথা বলবো। হাজার হাজার কথা।'

গৌতমের মনে হল রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ উচ্ছ্বাসের চেয়ে বরং গাড়ীই শ্রেয়। কিন্তু—বলল, 'তা যেন উঠলাম। কিন্তু মিস্টার তেড়ে উঠবেন না তো, 'এ ভ্যাগাবণ্ডটাকে আবার কোথা থেকে জোটালে' বলে?'

'আহা আমার মিস্টার তা' বলে ও রকম নয়।' অবন্তী এবার একটু ধাতস্থ হয়ে হেসে বলে, 'তা ছাড়া মাভৈঃ, তিনি আপাততঃ পাঁচশো মাইল দূরে।'

'তাই না কি?'

'আর বল কেন!' অবন্তী কপট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, 'তিনি নেমন্তন্ন খেতে আসবেন। মেয়ের বিয়ের ঝঞ্ঝাট একা করে বেড়াচ্ছি—'

'মেয়ের বিয়ে! কার মেয়ের বিয়ে!'

গাড়ীতে উঠতে গিয়ে চমকে প্রশ্ন করে গৌতম।

অবন্তী প্রায় ওকে ঠেলে তুলে দিয়ে নিজে উঠে পড়ে বলে, 'কার আবার? আমারই!'

গৌতম ওর ওই তরুণীর লালিত্যভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বলে, 'তাহলে ধরে নিতে পারি এখনো পুতুল খেলা ছাড়নি তুমি। পুতুল মেয়ের বিয়ে—'

'কী যে বল, মোটেই তা নয়—' অবন্তী বেশ গুছিয়ে বসে বলে, 'কেন, 'সত্যি' মেয়ের বিয়ে দেবার বয়েস হয়নি আমার?'

'ভাবছি। ভাবতে হচ্ছে।'

'অত ভাবাভাবির কি আছে? সতেরো বচ্ছর থেকে বছর খানেক বাদ দাও।'

'বাদ দিলে দাঁড়ায় মাত্র ষোলো।'

গৌতম হতাশের অভিনয় করে কথাটা বলে। অবন্তী মুখটা একটু পাশ ফিরিয়ে উঁচু করে ধরে একটু রহস্যাচ্ছন্ন হাসি হেসে বলে, 'তাই। ষোলোই।' তবু এই বেলা দিয়ে দিচ্ছি বিয়ে। ঠিকে দিয়ে দিচ্ছি। আর বড় হতে দিলে কোনদিন আবার কোনখানে হৃদয় হারিয়ে বসে থাকবে। আর সারাজীবন কষ্ট পাবে।'

(শেষাংশ ২৬৭ পৃষ্ঠায়)

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের যুদ্ধকৌশল

শ্রীরেজাউল করীম

মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যুদ্ধ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে দেখা যাবে যে মানুষ চক্ষু-রাঙা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র হাতে লইয়া অপরের প্রতি মারমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সমাজ-বদ্ধ হইবার পূর্বে মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়াছে। আর তারা যখন সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বসবাস আরম্ভ করিয়াছে, তখনও তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করিয়াছে। মানুষ যুদ্ধ করে নাই এমন কোন যুগ ইতিহাসে দেখা যায় না। যুদ্ধের কারণ বহুবিধ। অধিকার প্রসারের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, অপর দেশ আক্রমণ করিবার জন্য এবংবিধ কারণে পৃথিবীতে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাঝে মাঝে বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্যের মত মহামানব আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁরা মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য বহু সদুপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তাঁদের শিক্ষার আনুষ্ঠানিক দিকটা গ্রহণ করিলেও মৌলিক নীতি গ্রহণ করে নাই। তাই পৃথিবী হইতে যুদ্ধটা একেবারে বন্ধ হয়নি। সমাজে যুদ্ধের ভীতি চিরকালই ছিল, এবং থাকিবে। আজ মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তবুও যুদ্ধের দ্বারা পশুর মত রক্তপাত করিতে ক্ষান্ত থাকে নাই।

বিশাল এই পৃথিবী। তার অঞ্চলে অঞ্চলে সংগঠিত রাষ্ট্রও গঠিত হইয়াছে। সমাজ হইতে নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়নি। যুদ্ধ আজিও যে কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনের একটি প্রধান ও অপরিহার্য অংশরূপেই পরিগণিত। অতীতকালে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজা ও রাজচক্রবর্তীগণ বহু যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁরা যুদ্ধ করিতে করিতে কতকগুলি রণকৌশল ও রণনীতিও রচনা করিয়াছিলেন। আজ ভারতবর্ষের অতীত যুগের যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যে কোন দেশের রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসক-শ্রেণীর সুষ্ঠু যুদ্ধনীতি। যুদ্ধনীতি যদি ঠিকভাবে গঠিত না হয়, অথবা এ বিষয়ে যদি শাসকগণ কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তবে বিদেশী আক্রমণের কবল হইতে দেশ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। শুধু তাই নয়। শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা দেখিয়া দেশের অভ্যন্তরে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন পাঠানগণ ভারত আক্রমণ করিল, তখন সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার এই ছিল যে তৎকালীন ভারতীয় শাসক-গণ যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নীতি ও কৌশল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আবার মোগলদের শাসনকালের শেষের দিকে বৃটিশশক্তি যখন ভারতবর্ষের দ্বারদেশে আসিয়া আঘাত দিতে লাগিল, তখনও এদেশের তৎকালীন শাসকবর্গ কোন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধনীতি ও দেশ-রক্ষার কৌশল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এদেশের শাসকবর্গের যুদ্ধনীতি ও কৌশলের দুর্বল দিক লক্ষ্য করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল ও অনায়াসে এদেশের শাসকবর্গকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল। আজ এই স্বাধীন ভারতে যদি আমাদের যুদ্ধনীতি ও দেশরক্ষা নীতি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত না হয়, তবে তার পরিণতি মারাত্মক হইতে পারে—অতীতের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে।

অতীতকালের ভারতের শাসকগণের রণ-নীতি, রণচাতুর্য ও দেশরক্ষা নীতি সম্বন্ধে এবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। অতি প্রাচীনকালে সেই স্মরণাতীত বৈদিক যুগেও ভারতের বক্ষে বহু রক্তক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন নূতন অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য অথবা নিজের অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোন-কালে যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কৌরবগণ বলিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবদেরকে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিব না—তাহা মানবমনের সেই আদিম প্রবৃত্তির আবেদন মাত্র। অতীতকালে ভারতবর্ষে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাতে প্রবলতর দলই জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অনেক সময় উন্নত ধরণের রণচাতুর্যের ফলে প্রবল পক্ষও পরাজিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

বৈদিক যুগেও যে ভারতবর্ষে যুদ্ধ হইয়া-ছিল তাহার প্রমাণ আছে। পবিত্র ঋগ্বেদে দশ-রাজার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আর্যগণ যাহাতে দস্যুদের উপর জয়লাভ করিতে পারেন সেই মর্মে বহু প্রার্থনা আছে। রামায়ণ ও মহা-ভারতের যুগে যে বহু যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের বিপুল অংশ জুড়িয়া আছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত বহু রণনীতি ও কৌশলের কথা উল্লেখ আছে। রাবণ যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে হতচৈতন্য করিয়াছিল তাহার নাম শক্তিশেল। মহাভারতে বর্ণিত কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ এমন এক বিরাট ঘটনা যাহা সে যুগের সমস্ত রাজন্যবর্গকে জড়াইয়াছিল। এই যুদ্ধের ঘটনা লইয়া এক বিরাট মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ হইতে বহু প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিযুক্ত হইয়াছিল। বহু রকমের যুদ্ধ কৌশলের কথাও এই মহাকাব্যে বিবৃত আছে। অষ্টাদশ দিবসব্যাপী এই মহাযুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ভারতের আর্য জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই মহাযুদ্ধকে একদিক দিয়া চূড়ান্ত বলা যাইতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে আধুনিক যুগের যুদ্ধ হইতে সে যুগের যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। আধুনিক যুগে দুটি যুযুধান জাতির মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সুশিক্ষিত বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য-দলই প্রধান ও মুখ্য অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু অতীতকালের যুদ্ধে তেমন কোন স্থায়ী বিধি-নির্দিষ্ট সৈন্যদল থাকিত না। কেবল যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। যুদ্ধ ঘোষিত হইলে বাহির হইতে যে কোন লোক যে কোন যুদ্ধরত দলে যোগদান করিতে পারিত। এক দল ত্যাগ করিয়া অপর এক দলে যোগদান করা চলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব যুদ্ধ ছিল একটা দলের নেতার অধীনে দলীয় যুদ্ধ। মাঝে মাঝে দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ হইত। প্রতি-নিধির পরাজয় ঘটিলে সমস্ত দলেরই পরাজয় বলিয়া গণ্য হইত। যোদ্ধারা নানাপ্রকার লাঠি-সোটা, তীর বল্লম ও অপরবিধ যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইতেন। তাঁহারা এক একটা ইউনিটের অধীনে যুদ্ধ করিতেন। প্রয়োজন হইলে একটি ইউনিট অপর ইউনিটকে সাহায্য করিত। বহু-ক্ষেত্রে এই সব যুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কেবল কৌশল দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অনায়াসে পরাস্ত করিত। এই প্রকার ইউনিট গঠনের পদ্ধতি আধুনিক যুগেও পরিত্যক্ত হয়নি।

আলেকজান্ডারের পাঞ্জাব অভিযানের পর হইতে মুসলিম অভিযানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় যুদ্ধরীতির মধ্যে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে গ্রীক প্রভৃতি আরও বহু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। ফলে বহির্দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহু বিষয়ে আদান প্রদান হইয়াছিল। ভারতীয় যুদ্ধরীতির উপর কিছুটা বিদেশী প্রভাব পড়িয়াছিল। মৌর্য যুগে, গুপ্ত যুগে এবং তারপর অন্যান্য রাজাদের সময়েও যে সব যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা প্রাচীন যুগের যুদ্ধ হইতে আরও উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষ আর কূপমণ্ডূক হইয়া থাকে নাই।

মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হইত তাহাতে এমন কতকগুলি উপাদান ছিল যাহা সর্বত্র সমান। যুদ্ধরত উভয় দলে, কখন কখন একটি দলেই সুশিক্ষিত হস্তী থাকিত। যুদ্ধে হস্তীর সাহায্য এক অভিনব আবিষ্কার। সে যুগে যুদ্ধের জন্য হস্তী অত্যন্ত শক্তিশালী ও অজেয় অস্ত্র ছিল। তাছাড়া কোথাও কোথাও অশ্বের ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছিল। তবে অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করার রীতি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অশ্ব ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত হইত। অশ্বচালিত রথে অস্ত্র ও রসদাদি লইয়া সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রা করিত। সেই রথ হইতেও যুদ্ধ করা হইত। হস্তী ও অশ্ব ব্যতীত প্রচুর সংখ্যক পদাতিক সৈন্য থাকিত। তাহারা বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদাতিক দল যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল না। তাদের কোন শৃঙ্খলাবোধও ছিল না। শান্তির সময় সৈন্যদেরকে যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্র প্রয়োগবিধি শিক্ষা দেওয়া হইত। পদাতিক সৈন্যদলের

অধিকাংশ সৈন্য সংগ্রহ করা হইত কৃষক সম্প্রদায় হইতে। তাহাদেরকে সমষ্টিগতভাবে সৈন্যদলে ভর্তি করা হইত। এবং যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিত, ততদিনই তাদের হাতে অস্ত্র থাকিত। যুদ্ধ শেষ হইলে অস্ত্র রাখিয়া তাহারা নিজ নিজ কাজে চলিয়া যাইত। এছাড়া রাজাদের একটা স্থায়ী সৈন্য বিভাগ থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁরা এইসব কৃষকদেরকে উপযুক্তভাবে সামরিক রীতিতে শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেননি। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মাইবার দিকে মনোযোগ দেন নাই। ইহাদেরকে রীতিমত-ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিলে সৈন্য বিভাগ আরও শক্তিশালী ও কার্যকরী হইত।

গৃহবিবাদের সময়, অথবা পার্শ্ববর্তী কোন দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সময় যুদ্ধের উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কারণ যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সৈন্যদল প্রায় একই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিত। বস্তুতঃ প্রাক-মুসলিম যুগে এদেশের বহু রাজার নিকট যুদ্ধযাত্রাটা বিশেষ কোন গুরুতর বিষয় ছিল না। যুদ্ধে জিতিলে ভাল, না জিতিলে বিশেষ কিছু যায় আসে না— মনোভাব ছিল কতকটা এই ধরণের। প্রতি বৎসর দশহরার পর প্রত্যেক রাজা বা স্বাধীন শাসক কোন অঞ্চল অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধা-ভিযানে যাইতেন। এই প্রকার অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল করদ মিত্র শাসকদেরকে ভয়ত্রস্ত করিয়া তোলা। অথবা কোন বিদ্রোহভাবাপন্ন আশ্রিত রাজা বা জমিদারদের নিকট নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া। আর যদি অবস্থা অনুকূল হইত তবে পার্শ্ববর্তী কোন প্রতিবেশী স্বাধীন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁর রাজ্যকে অধিকার করিবার জন্যও মাঝে মাঝে যুদ্ধ করা হইত। এইভাবে বহু প্রবল রাজা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতেন। তবে এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধের চিরাচরিত নীতিগুলি কঠোরভাবে পালিত হইত। এ যুগের মত "টোটাল্ ওয়ারের" নীতিটা ঘৃণাজনক বলিয়া মনে হইত। সুতরাং কোন যুদ্ধে ক্ষেত-খামার নষ্ট করা হইত না। বেসামরিক লোক, নারী, শিশু, গরু, বাছুর, গৃহপালিত পশু এসবের কোন ক্ষতি করা হইত না। বিনা কারণে শত্রুপক্ষের বণিকদের উন্মূলিত করা হইত না। তবে তাদেরকে অনুগত হইয়া থাকিতে হইত। শত্রুপক্ষের যে সব লোক কর দিতে সম্মত হইত, তাদেরকে সমস্ত প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া হইত।

সে যুগের যুদ্ধে হস্তী অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। যুদ্ধরত যে দলের সহিত হস্তী থাকিত, তাহারা শত্রুপক্ষের বহু ক্ষতি করিতে পারিত। বিরোধী দলের নিকট যেসব অস্ত্র থাকিত, তাহা হস্তীর বিরুদ্ধে কার্যকরী হইত না। সুশিক্ষিত হস্তী যখন তার বিরাট বপু লইয়া হেলিয়া দুলিয়া বীরবিক্রমে অগ্রসর হইত, তখন বিপক্ষ দল তার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। অবশ্য হস্তীকেও বিপক্ষ দলের তীর বল্লম ও বর্শার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত। ভারতের যুদ্ধ-হস্তীর সুনাম এত বেশী ছিল যে, গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস এদেশ হইতে প্রায় তিনশত সুশিক্ষিত হস্তী নিজের দেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি এই হস্তীর সাহায্যে আলেকজাণ্ডারের এশিয়া মহাদেশস্থ রাজ্যগুলি জয়ের জন্য ফিলেডেলফাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যুদ্ধে বহুদিন পর্যন্ত হস্তীর প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে অশ্বের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। অবশ্য প্রথম প্রথম কেবল রথ পরিচালনা অথবা মালবাহী শকট বহনের জন্যই অশ্ব ব্যবহৃত হইত। বিভিন্ন স্থানে দ্রুত গমনের সুবিধার জন্য অশ্ব অধিকতর কার্যকরী ছিল। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে হস্তীই যথেষ্ট ছিল। সামরিক পদ্ধতির মধ্যে অন্য কোন পরিবর্তন প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া ভারতীয় সৈনিকগণ হস্তী-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে হস্তীর প্রাধান্যের যুগে কোন বিদেশী আক্রমণকারী গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে নাই।

কিছু সময়ের জন্য পার্শিয়ানগণ সিন্ধু-নদের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু সুবিশাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অধিকৃত অংশটিকেই তারা ভারত বলিয়া মনে করিত। মহাবীর আলেক-জাণ্ডার পার্শিয়ানদের অধিকৃত অঞ্চলটুকুই অধিকার করেন। ঐ অঞ্চলের যে সব রাজাকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন তাঁরা পারসিক সম্রাটের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাই ছিলেন। পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করার পর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পারস্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তার বহুদিন পরে শক হূণ প্রভৃতি জাতিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অধিক দিন স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ পর্যন্ত অন্য কোন বিজেতা স্থায়ীভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেননি। শক হূণ ও অপরাপর জাতিরা গাঙ্গেয় উপত্যকা ভেদ করিয়া আরও পূর্বের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাদের সে সব উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ তখন পর্যন্ত ভারতের আত্মরক্ষার পদ্ধতি যথেষ্ট উপযোগী ছিল। ভারতীয় রাজাদের তৎকালীন দেশরক্ষার নীতি তাঁদেরকে বিদেশী আক্রমণকারীর হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু তারপর অবস্থা একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতে লাগিল। বিদেশীরা উন্নত ধরণের অস্ত্র ও যুদ্ধ-কৌশল লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিল এবং এই পরিবর্তিত অবস্থা ভারতের পক্ষে বহু অসুবিধা সৃষ্টি করিল।

যুদ্ধ কৌশলের সামান্য একটু পরিবর্তন সূচিত হইলে কিরূপ বিপ্লব সাধিত হইতে পারে তাহা একটি ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে— সামান্য একটা রেকাবের উদ্ভাবন হওয়ার ফলে প্রাচীন পদ্ধতির যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া গেল। মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিরা ঘোড়ায় চড়িতে চড়িতে হঠাৎ রেকাব উদ্ভাবন করিয়া বসিল। এই অভিনব উদ্ভাবন সমগ্র রণ-কৌশলের মধ্যে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করিল। আমাদের যুগে নানা প্রকার মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে যেমন যুদ্ধের মধ্যে বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, সে যুগে রেকাবের উদ্ভাবনের ফলে সমরনীতিতে কতকটা সেইরূপ বিপ্লব ঘটিয়া গেল।

রেকাব উদ্ভাবনের পূর্বে যুদ্ধের সময় অশ্ব প্রধানতঃ শকটাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত হইত। অশ্ব তার আরোহীকে দিত গতির ক্ষিপ্রতা ও যদৃচ্ছা গতিশীলতা। কিন্তু অশ্ব যুদ্ধকালে হস্তীর মত বিশেষ কার্যকরী ছিল না। হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহী সৈন্য তার আসনে উপবেশন করিয়া সেখান হইতে তীর-বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারিত। পূর্বে অশ্বারোহণ অবস্থায় সেরূপ ভাবে অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। রেকাব-সহ অশ্বে আরোহণ করিলে অবস্থাটা সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এখন আরোহী রেকাবের মধ্যে তার পা দুটি স্থাপন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এবং সেই অবস্থাতেই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই তীর-বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারে। এই অভিনব উদ্ভাবন যুদ্ধ জয়ের কাজকে বহুগুণ ত্বরান্বিত

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায়)

অভিনায়িকা
অজিত দত্ত

নায়িকার ভূমিকায় তোমাকে
মানায় ভারি ভালো,
হাজার পাওয়ার পাদপ্রদীপেতে
তুমি জ্যোতির্ময়ী।
সত্য-মিথ্যা দুই রূপে মিলে
একাধারে তুমি স্বয়ী,
তোমার হাসি ও কান্না জোর ক'রে
আনাতে জোরালো,
কত যে মধুর কথা মুগ্ধ দর্শকের
কানে ঢালো,
কত যে নিরীহ হয়ে অনায়াসে
হও দিগ্বিজয়ী,
যারা নিত্য দেখে তারা হাড়ে-হাড়ে
জানে সেটা অয়ি,
শুধু চোখে শাদা-সিধে,
মনশ্চক্ষে তুমি জম্ কালো।
আমি আছি দর্শকের ভূমিকায়
অন্ধকার কোণে,
যদিও এদিকে তুমি চোখ ফেল,
দেখনা আমাকে,
তুমি দেখ তোমাকেই, আর দেখ
সাম্রাজ্য তোমার।
অভিনয় শেষ হলে প্রেক্ষাঘর
হবে অন্ধকার,
আমি হেসে পথে নেমে চলে যাব
সংসারের ডাকে,
তোমার সাম্রাজ্য হতে বহু দূরে
চির-নির্বাসনে॥

সারা বছর জুড়েই উৎসব দিনের আনন্দ দেয়···একটি

ন্যাশনাল একো রেডিও

বছরের যে কোন সময়—বাড়ীর সকলের জন্যেই সুর ও সঙ্গীতের সমারোহ—উৎসবের দিন ফুরোয় কিন্তু এ সমারোহ অফুরন্ত! ন্যাশনাল-একো রেডিও সেই আনন্দের সমারোহে ঘর ভরে তুলবে।

পছন্দমত গড়ন ; দামও নাগালের ভেতর। নয় রকম সুদৃশ্য মডেল। দাম টা. ১২৫৲ থেকে টা. ৭২৫৲ । আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বললেই বিনা খরচায় বাজিয়ে শোনাবেন।

মডেল ইউ ৭৫৩ঃ
৩ নোভাল ভালব, ২ ব্যাণ্ড, অল্প খরচে বড় সেটের কাজ দেয়। মেরুন প্লাষ্টিক ক্যাবিনেট
দাম ১২৫৲ টাকা

মডেল ইউ ৭৬৪ঃ ৫ ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, চমৎকার প্লাষ্টিক ক্যাবিনেট **দাম ২৬৫৲ টাকা**
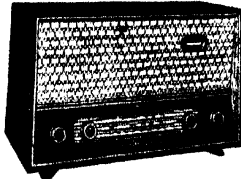
মডেল ইউ ৭৫৫ঃ ৬ নোভাল ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, ডিলীয়র ক্যাবিনেট **দাম ৩৫৫৲ টাকা**
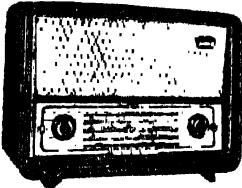
মডেল এ ৭৪৪ঃ ৬ ব্যাণ্ড, ৬ নোভাল ভালব যাতে ৮ ভালবের কাজ হয়। ছাঁচে তৈরী ক্যাবিনেট **দাম ৪০৫৲ টাকা**
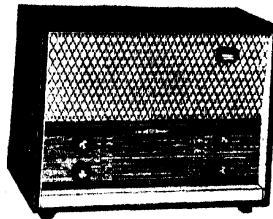
মডেল ৭৬৮ঃ
৬ নোভাল ভালব যাতে ৯ ভালবের কাজ হয়।
৮ ব্যাণ্ড, কাঠের ক্যাবিনেট **দাম ৫৭০৲ টাকা**

মডেল এ ৭৬৭ঃ ৭ ভালব, ৮ ব্যাণ্ড, সুদৃশ্য বড় ক্যাবিনেট **দাম ৭২৫৲ টাকা**
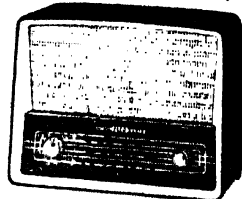
মডেল বি ৭৬৪ঃ ৪ ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, প্লাষ্টিক ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারীতে চলে
দাম ২৬৫৲ টাকা
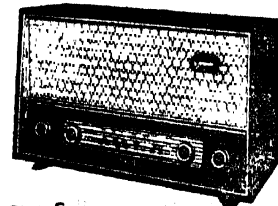
মডেল বি ৭৫৫ঃ ৫ নোভাল ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, ডিলীয়র ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারী সেট
দাম ৩৫৫৲ টাকা

সমস্ত দামই আবকারী শুল্ক সমেত ; অন্যান্য ট্যাক্স আলাদা
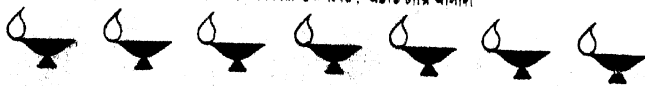
JWT/GRA-4226

পথের প্রিয়া

** গল্প **

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের নাম কাঁঠালগাছি।
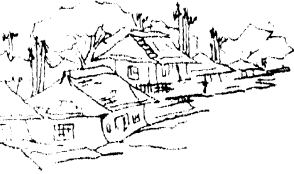
এই গ্রামে পিতৃহীন পুত্র শরৎকে নিয়ে জননী কাদম্বিনী দেবী তাঁর বৈধব্য জীবনের মধ্যেও একটা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাস করেন। শরৎ-এর বয়স বছর ষোল। সে ক্লাস-এইটে পড়ে। এ-গ্রামে হাই-স্কুল না থাকায় শরৎ পাশের শাঁড়ো গ্রামে পড়তে যায়। দূর বেশী নয়; মাইল-দেড়েকের মধ্যেই। বোষ্টুম পাড়া ছেড়ে, নন্দীদের আউস ক্ষেতের পাশ কাটিয়ে, লাহিড়ি সেখের পাট-ভুঁইকে বাঁয় রেখে, সাঁওতালদের কুঁড়েগুলো পেরিয়ে গেলেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। রাস্তাটা পার হোলে ওপারে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে খানিকটা গেলেই চাটুয্যেদের বাড়ী আর বাগান। ওটাই শাঁড়ো। চাটুয্যে বাড়ীর কিছুটা পরেই শাঁড়োর হাটতলা। হাটতলারই অদূরে শাঁড়োর হাইস্কুল। এই পথেই দুবেলা শরৎ স্কুলে যাতায়াত করে।

শাঁড়োর জমিদারবাবুরা গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় গিয়ে বাস করেন নি; তাই শাঁড়োর শ্রী-ও আছে, লক্ষ্মীশ্রী-ও আছে। সব গেরস্থই বেশ সম্পন্ন অর্থাৎ পেট ভরে মাছ-ভাত, ঘি-দুধ, ফল-পাকুড় খেতে পায় ও অভ্যাগতদের খাওয়ায়। স্কুলটি শাঁড়োর বাবুদেরই অর্থানুকূল্যে চলে।

শরৎ ছেলেটি—পড়া-শুনোয় ভালো থাকলেও স্বভাবটি বেশ শান্ত ছিল না। সারা গ্রীষ্মের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে তার বাইরের কাজ এত বেড়ে যেত যে, পাড়ার যাবতীয় পুষ্করিণী আর ফলের বাগানের মালিকদের সে সময় সন্ত্রস্ত ও সতর্ক হোয়ে দিন কাটাতে হোত। অন্য সময়ও সে যে তার অশান্ত স্বভাবটির অপমান করতো তা নয়, সুযোগ হোলেই ও-জিনিসটার সে মর্যাদা দান করতে দ্বিধা বোধ করতো না।

চাটুয্যেদের আমবাগানের পাশ দিয়েই শরৎকে স্কুল যেতে হোত। এজন্য চৈত্র মাসে গাছে-গাছে কাঁচা আমের সময় শরৎকে বই-পেন্সিল-এর সঙ্গে কিছুটা লবণ ও একখানা চাকু ছুরিও নিতে হোত। আষাঢ়ের মাঝা-মাঝি কোন গাছেই আর আম থাকতো না; শুধু "আষাঢ়ে" নামক একটা গাছের আম বিলম্বে-এসে-পড়ার লজ্জায় লাল হোয়ে ঝুলে থাকতো। এই রকম একদিন নিত্যকার মত বই-পত্তর হাতে সরস্বতীর মন্দিরে যেতে যেতে দুটো সরস্বতী শরৎ এর ঘাড়ে এসে চাপলো। সে সেই 'আষাঢ়ে' গাছের তলায় এসে একবার ওপর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে, একবার আশে-পাশে চেয়ে দেখল, তারপর বইগুলো কাপড়ের ভাঁজে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে 'আষাঢ়ে' গাছটায় উঠে পড়লো এবং সুপক্ক দেখে দু'চারটে পকেটস্থ করে নেমে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দশম-বর্ষীয়া নারী-প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সে এড়াতে পারলো না। দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে বললে—"আম পেড়েচ কেন?"

"বেশ করেছি"।

"দাঁড়াও, কাকুকে গিয়ে বলে দিচ্ছি।"

"দিগে যা।"

মেয়েটি বিকৃত মুখে ভেংচি কেটে ও তার কোমল হাতের একটা কিল দেখিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দু'একদিন পরে, শরৎ স্কুলের পথে চাটুয্যে-বাড়ীর সামনে আসতেই হঠাৎ তার গায়ের ওপর একটা ভুক্ত আমের আঁটি পড়লো। জামায়, কাপড়ে আমের বিশ্রী দাগ লেগে গেল। চাটুয্যে বাড়ীর সদর দরজার অন্তরাল থেকে একটা মধুর এবং মৃদু খিল-খিল হাসাধ্বনি তার কর্ণকুহরে এসে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। এদিক-ওদিক চেয়ে, কাউকে না দেখতে পেয়ে, সে একখন্ড কাগজের দ্বারা জামা-কাপড়ের দাগ মুছতে মুছতে স্কুলের দিক অগ্রসর হোল।

মেয়েটির অত্যাচার কিন্তু বন্ধ রইলো না। দুটো দিন না যেতে-যেতে; সেই একই ঘটনা-স্থানে তার পেছন থেকে তার মাথার চুলে, জামায় কাপড়ে তার অজ্ঞাতসারে এবং নিঃসাড়ে বে-মালুম অনেকগুলি বুলেট এসে পড়তে লাগলো। এগুলি এক রকমের উদ্ভিদ-বুলেট, নাম—'ওকড়া ফল', কাঁচা সবুজ রংয়ের করমচার গায়ে সুতীক্ষ্ম কাঁটা থাকলে যেমন দেখায়, ফলগুলো দেখতে সেইরকম। বর্ষায় নীচু জমিতে অজস্র জন্মায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এই 'ওকড়া-ফল' গোপনে পরস্পরের মাথায়, চুলে, কাপড়ে, জামায় ছুঁড়ে দেয়। সেগুলো সেখানে বিঁধে থাকে। শরৎ এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারল না। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে একটা আনন্দ-ভরা মোলায়েম হাততালির শব্দে সে চকিত হোয়ে পেছন ফিরে চাইতেই গুপ্ত অপরাধিনী দ্রুতে তাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করলে। তখন তার এই অপকর্মের বিষয় জানতে পেরে সে সামনেকার শিব-মন্দিরের পৈঠার ওপর বোসে একটা-একটা কোরে তার মাথা ও জামা-কাপড় থেকে 'ওকড়া ফল'গুলো তুলে ফেলতে লাগলো। ছুটির পর স্কুল থেকে ফেরবার সময় শরৎ দেখল যে চাটুয্যে-বাড়ীর সদর দরজায় এক ভদ্রলোক চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। এঁকে গৃহকর্তা মনে করে শরৎ তাঁর কাছে তাঁর কন্যাটির সমস্ত অপকর্মের কথা জানালো। ভদ্রলোক বললেন—"কে, চাঁপা? বয়স তার কত বলো ত?"

'বছর দশেক হবে।"

তা হোলে আমার ভাই-ঝি রাণী। তা বাবা, তুমি পিঠে দুটো থাপ্পোড় কষিয়ে দিতে পারলে না?"

তখন থেকে শরৎ এখান দিয়ে যাবার সময় খুব সতর্ক ও সাবধান হোয়েই যাতায়াত করতে লাগলো। এই সময় একদিন শরৎ একটু দূর থেকে দেখলে যে,—পথ পার্শ্ববর্তী মোড়ল-দীঘিতে স্নান কোরে, রাণী অদূরবর্তী তাদের বাড়ী অভিমুখে যাচ্ছে। শরৎ একটু দ্রুতপদে চলে নিঃশব্দে তার পেছনে এল এবং তার কোমল পিঠে দুম্-দুম্ কোরে দুটো কিল মেরে বললে—"হোমিওপ্যাথিক 'ডোজ'-য়ে আজ

কিছু পুরস্কার দিলুম, দরকার হোলে 'ডোজ' বাড়িয়ে দেবো।" বলেই হন্-হন্ কোরে শরৎ স্কুল অভিমুখে চলে গেল।

এদিন থেকে শরৎ তার প্রতি একটা ভাবী বৃহত্তর উৎপাতের সম্ভাবনা নিয়ে চাটুয্যে বাড়ীর কাছা-কাছি পথ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলো। এবং সে অবস্থায় নিজেও মনে মনে অনেক-কিছু পাল্টা আক্রমণের কথা ভেবে রাখতে কসুর করলে না। দিন দুচ্চার পরে একটু দূরে থেকে দেখলে যে, দরজার সামনে রাস্তার ওপর একটি ছ-সাত বছরের মেয়ে তাকে দেখতে পেয়েই, "দিদি। আসচেরে!" বলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কেউ একজন দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। যে অদৃশ্য হাতে দরজায় খিল লাগিয়ে দেওয়া হোল, মনে হয় তা কোন দশ-বছুরি হাতে।

অতঃপর আর কিছু অঘটন ঘটলো না। আসামী পক্ষ যখন বুঝতে সক্ষম হোল যে, ফরিয়াদী পক্ষের হাতেও য়্যাটম-বোমা আছে, তখন আর জল ঘোলা করতে সাহস পেল না।

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

পূর্ব ঘটনার পর কিঞ্চিদধিক পাঁচ বছর কেটে গেছে। এ সময়ের মধ্যে শাঁড়ো—কাঁঠাল-গাছিতে অনেক কিছু পরিবর্তন এবং ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটেচে, যথা—শাঁড়োর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস কোরে, শরৎ কোলকাতার এক মেস থেকে ফোর্থ-ইয়ারে পড়চে; তাদের বাড়ীর সামনেকার জিয়োল গাছটা শুকিয়ে মরে গেছে; নোদো বাগ্‌দীর একটা ছাগল-ছানাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে। শাঁড়ো স্কুলের পন্ডিত মশায়ের ভায়রা-ভাই মারা গিয়েচে......ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো কিছু ঘটেচে—ও পাড়ার সিদুর মা ত্রিবেণীতে গঙ্গা স্নানে গিয়ে আড়াই টাকা দিয়ে একটা টিনের তোরং কিনে এনেচে; সরকার বুড়ীর পোড়ো ভিটেটা ধুতোরা আর ভাঁট গাছের জঙ্গলে ছেয়ে গেছে; শঙ্কর চাটুয্যের ভাই-ঝি রাণীবালার বয়স দশ থেকে পনেরোয় উঠেচে এবং তার পূর্বের সেই চঞ্চল আর দুষ্টামী স্বভাব পরিবর্তিত হোয়ে, এখন সে আশ্চর্য রকম ধীর-স্থির, নম্র ও লজ্জাশীলা হোয়েচে, তার চারু দেহখানা ঘিরে সর্বাঙ্গে যৌবনের প্রথম শ্রী-সৌন্দর্য ফুটে উঠছে।

উক্ত কয়েকটি পরিবর্তন এবং ঘটনা ছাড়া, আরও একটা ঘটনা আসন্নপ্রায়। তবে সেটা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ সেরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক সংসারে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঘটে থাকে। তা হোলেও এস্থলে সেটির উল্লেখের প্রয়োজন, নচেৎ বর্তমান কাহিনীর পরিণতির সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ রাখতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। ঘটনাটা এই যে, কাঁঠালগাছির শরৎ ও শাঁড়োর স্বর্গত শিবদাস চাটুয্যের কন্যা ও শঙ্করদাস চাটুয্যের ভাইঝি রাণীবালা—উভয়েরই বিয়ের ফুল ফুটতে আরম্ভ হোয়েচে। কাঁঠালগাছির বর ও শাঁড়োর কন্যা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়, উভয় পক্ষেরই সেইরূপ ইচ্ছা। ভেতর-ভেতর উভয় পক্ষের মধ্যে কথা বার্তা অনেকদূরে এগিয়েচে।

সুতরাং কাদম্বিনী দেবী একদা কোলকাতায় পুত্রকে পত্র-লিখলেন, 'তুমি শীঘ্রই অতি অবশ্য একবার আসবে।' চিঠি পেয়ে শরৎ কাঁঠালগাছি এল। মা বললেন—"তোমার বিয়ে।"

"বিয়ে! সে কি?" শরৎ লাফিয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ। আমি আর কদ্দিন বাঁচবো, ক্রমেই আমার শরীর ভেঙ্গে পড়চে, সুতরাং..........."—ইত্যাদি। অতঃপর পাত্রীটির পরিচয় এবং নাম শুনে, শরৎ ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে সোজা ঘরের বাইরে এবং সেখান থেকে বাড়ীর বাইরে চলে গেল।

রাত্রে খেতে বোসে শরৎ বললে—"সেই দুষ্টু, যাচ্ছেতাই, অসভ্য মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে!" মা বল্লেন—"সে আর সেরকম নেই রে, আশ্চর্য ভালো মেয়ে হোয়েচে। রূপেও যেমন, গুণেও তেমন। এরকম মেয়ে আমাদের তল্লাটে খুঁজে পাবি নে। শরৎ গোঁজ হোয়ে খেয়ে যেতে লাগলো। জননী বললেন——"আরো একটা কথা আছে।"

"কি?"

চাটুয্যেদের বিষয়-সম্পত্তিটা ত কম নয়। বড়র ত ঐ একটিমাত্র মেয়ে। ওই ত অর্ধেকের মালিক। কাকারও ছেলে নেই, দুটি মেয়ে। এদিক দিয়েও.................

"তা বোলে পয়সার লোভে বিয়ে কোরতে হবে?" আহার শেষ কোরে শরৎ আঁচাবার জন্য বাইরে গেল। তার মুখের ভাব বিরক্তিতে পূর্ণ।

তথাপি শেষ পর্যন্ত, প্রজাপতির নির্বন্ধে বিয়েটা হোয়েই গেল। এবং শরৎ সেবার বি-এটা ফেল করলে।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ—

ছেলের ফেলের খবর পেয়ে, কাদম্বিনী লিখলে—ফের পড়ো। ছেলে লিখলে—পড়চি।

শরৎ অবশ্য পড়তে লাগলো, কিন্তু বি-এ নয়,—হোমিওপ্যাথি। সে একটা হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হোয়ে, মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা বিদ্যাতে আত্মনিয়োগ করলে। বছর দুই ভালোভাবে পড়বার পর সে ভালোভাবে পাশ কোরে, ডিপ্লোমা নিয়ে, দেশে চলে এল এবং বাইরের ঘরখানাকে আবশ্যকমত মেরামত করিয়ে, তার ডাক্তারখানা খুলে বসলো। দেওয়ালের গায়ে একখানা ছোট-খাটো সাইন-বোর্ডও ঝুলিয়ে দিলে।

শাঁড়োর হাটতলায় কালিমিত্তিরের নাম করা ডাক্তারখানা। য়্যালোপ্যাথ। দশ-বিশখানা গাঁয়ের মধ্যে তার অবাধ পসার। সন্ধ্যার পর সমাগত দুচারজনের সমক্ষে তিনি বললেন—এইবার একজন ভাঙ্গা ডাক্তার তোমাদের কাছাকাছি এসে বসলো হে!

শশী গাঙ্গুলী হেঁ-হেঁ কোরে হেসে বললেন—"তাই বটে?"

কানু রায় বললেন—"হোমোপ্যাথির ওই পুকুরের সাদা জলে যদি রোগ সারতো, তা হোলে—আর ভাবনা ছিল না গো!"

দীনু ঘোষ বললেন—"পুকুরের নয়, টিউব-কলের।"

হারু অচার্যি উক্তি করলেন—"জবরদস্ত খুড়ো-শ্বশুর আছেন, ঠেলে তুলে দেবেন।"

কানু রায় বললেন—"হরিদ্বারের গঙ্গায় এক ফোঁটা ওষুধ ফেলে এসে, গঙ্গা-সাগরে গিয়ে তার জল খেলে, রোগ-রুগী—একেবারেই সারবে!"

গাঙ্গুলী একটু নড়ে বসে বললেন——"তাই বটে!"

*   *   *   *

দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে আসতে চললো, শরৎ গ্রামে এসে ডাক্তারখানা খুলেচে। কিন্তু এই বারো মাসের মধ্যে বারোটা রোগীও তার কাছে আসেনি। ও-পাড়ার জিতু সমাদ্দার টাকা ধার করতে তার কাছে কয়েকদিন যাতায়াত কারেছিল; সেই সময় ছেলের অসুখের জন্যে কয়েক শিশি ওষুধ তাকে নিয়ে যেতে দেখা গেছলো। প্রথমদিকে পাড়ার নন্দ ঘোষাল ও তার সাত বছরের মেয়ে হাবলীর ক্রিমির জন্য তিন মোড়া ওষুধ চার আনা দাম দিয়ে নিয়ে গিয়ে-ছিলো; শরৎ বলেছিল, যত ক্রিমি আছে সবই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কি হোয়েছিল, নন্দ তা কোনদিন এসে বলে যায়নি। তবে তার দু-চারদিন পরে, বেনের দোকান থেকে নন্দকে চার পয়সার বিড়ঙ্গ কিনে নিয়ে যেতে দেখা গেছে। মাস দুই আগে অন্নদা মুখুজ্জের কোমরে একটা ব্যথা হয়। শরৎ তাঁকে আট দাগ ওষুধ দিয়ে বলেছিল—ব্যথাকে জেলা ছেড়ে পালাতে হবে। হয়ত তা হোয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে সময় পরে তাঁর ঘরের কুলুঙ্গীতে—মালিসের শিশিটা ছিল, তার লেবেলের ওপর লেখা ছিল—মিত্র ডিস্‌পেন্সারী।

তবুও শরৎয়ের মনে তিলমাত্র নৈরাশ্য বা নিরুৎসাহের ভাব নেই। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যে সে তার ডিস্‌পেন্সারীর দরজা খুলে সামনেকার টেবিলের ওপর মারক্কো লেদার মোড়া ওষুধের চেস্টটা রেখে, হয় খবরের কাগজ, নয় তো বা কোন মোটা ডাক্তারী বই—চোখের সামনে ধরে বসে থাকে।

*   *   *   *

"অ কেষ্টা! যাও কোথা?"

শরৎয়ের ডাকে কেষ্ট দাঁড়িয়ে গেল, বললে——"গোষ্ঠ পালের দোকানে একবার যাচ্ছি, দা'ঠাকুর।"

"শরীরটা ভালো যাচ্ছে ত?"

"ভালো আর কই যাচ্ছে! দিনেও ঘুম হয় না, আঁত্তিরেও ঘুম হয় না। কি যে............."

"উঠে এস দিকি একবার!"

অতঃপর কেষ্টকে অনেক-কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কোরে শরৎ অত্যন্ত সযত্নে তাকে আট মোড়া ওষুধ দিলে। কেষ্ট বললে—"ওষুধের দাম, দাদাবাবু?"

"তোমাকে আর ওষুধের দাম দিতে হবে না, ভালো কোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় গে যাও এখন। ওষুধ-বিসুদের দরকার হোলে—আসবে; বুঝলে? আমি যখন গাঁয়ে এসে বসলুম তখন............."

—দিন আষ্টেক পরে কেষ্ট পালেদের দোকানে গেলে গোষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলে—"তোমাদের পাড়ায় নাকি চোরের উপদ্রব হচ্চে, তোমার বাড়ী কোনদিন ঢুকেছিল নাকি?

"রূপদ্রব অধিবসায়ক হোচ্চে বটে, কিন্তু আমার বাড়ীও সুবিধে করতে পারবে না। একটু খুট্‌-কোরে রাওয়াজ হোলেই আমি উঠে বাস, সারা আত্ চোখে ও-কম্মটি ত আর হয় না, গো!"

—চতুর্থ পরিচ্ছেদ—

আরও দু'এক মাস কেটে গেল। অবস্থা কিন্তু একই রকম। গাঁয়ে রোগও আছে, রুগীও আছে, কিন্তু শরৎয়ের কাছে কেউ আসে না; সব যায় শাঁড়োর কালি মিত্তিরের কাছে। গাঁয়ের লোকগুলো অতি জঘন্য।..............দাঁড়াও; ব্যবস্থা করচি। এখান থেকে ডাক্তারখানা উঠিয়ে

(শেষাংশ ২২৪ পৃষ্ঠায়)

ছুটির আগের দিন নয়—তবু ভিড় হয়েছিল প্রচণ্ড। প্ল্যাটফরমটাকে মনে হচ্ছিল বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। ট্রেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে ওয়ার্নিং বেলটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমুদ্র আরও উত্তাল হয়ে উঠলো। তার থেকে একটা বড় ঢেউ আছড়ে পড়লো কামরাটার গায়ে।

একই গাড়ীর অঙ্গীভূত হলেও কামরাটার গোত্র ছিল আলাদা। এক দেশের জলপ্লাবনের সংবাদ আর এক দেশের মানুষ যেমন উদগ্রীব হয়ে পাঠ করে—এই কামরার ভিতরকার সুখী যাত্রীরাও তেমনি আগ্রহভরে দেখছিল অপর কামরার যাত্রীদলের উদ্বেল তরঙ্গ। অকস্মাৎ একটি দুরন্ত ঢেউ যে আছড়ে পড়বে কামরাটার গায়ে—ভাবতেই পারেনি।

এই কামরাটার জগৎই আলাদা। এখানে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি বসার নিয়ম নাই। মাথা গুনতি বসবার আসন, শোবার ব্যবস্থাও রয়েছে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে—প্রতি জনের জন্য একখানি করে বরাদ্দ। প্রতিটি সীটের ধারে ছাইদান, শুয়ে শুয়ে বই পড়বার জন্য মাথার শিয়রে আলোর ব্যবস্থা। ইচ্ছামত আলো নিবিয়ে জ্বালিয়ে, পাখার গতি কমিয়ে-বাড়িয়ে সীটে হেলান দেওয়ার গদিটাকে বিছানার মত বিছিয়ে নিয়ে আরাম করে যাওয়া চলে। রাতের গাড়ীটা যেন নিজেরই শোবার ঘর—খেয়াল-খুসি মত ভোগ দখল কর। পয়সা বেশী দিলেই এই জগৎ কেনা যায়। অথচ সে ক্ষেত্রে এমন উৎপাত, হোক না সামান্য ক্ষণের জন্য, কেউ সহ্য করতে পারে!

নরেনও পারল না।

কামরায় চারজনের মত জায়গা; স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চারটি আসনই দখল করেছিল সে। রাতের মত কামরাটা তার নিজস্ব সম্পত্তি, একটি নিভৃত নিরালা ঘর। চলন্ত গাড়ীতে এভাবে নিভৃতি রচনা করে যাওয়ার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে ঘটে নি। সুতরাং এই সঙ্গে একটু কল্পনাও ছিল। চলন্ত গাড়ীর চাকায় চাকায় শব্দ উঠে যে ছন্দটি সৃষ্টি করবে— তারই সঙ্গে দু পাশের দ্রুত ধাবমান দৃশ্যাবলী আর উপরের নক্ষত্রখচিত আকাশকে মিলিয়ে চমৎকার একটি ছবি আঁকবে আর আরাম শয্যায় নিশ্চিন্ত আলস্যে দেহ এলিয়ে দিয়ে সস্ত্রীক সেই স্পন্দমান ছবি উপভোগ করবে বলে পুলক অনুভব করছিল নরেন। তার বহুক্ষণের আশ্রিত কল্পনা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়াতে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

এতক্ষণ আধশোওয়া অবস্থায় বাইরের জন-তরঙ্গ দেখছিল আর একটি সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে টানছিল—দলটি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তেই নরেন তীরবেগে উঠে বসলো।

এই উতারো উতারো, জলদি উতারো—ফার্স্ট কিলাস হ্যায়। চীৎকার করে উঠলো নরেন।

জনা আষ্টেক মানুষের একটি মাঝারি দল। অসহায় এবং বিপন্নের মত ফ্যাল ফ্যাল করে ওর পানে চাইল।

নরেন সগর্জনে বলল, সমঝতা নেহি?

কামরার মধ্যে ঢুকেই ওরা টের পেয়েছিল অনধিকার প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন উপায়ই ছিল না। ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ ওদের এইদিকেই ঠেলে দিয়েছিল— চেয়ে দেখবার মত অবস্থা কারও ছিল না।

দলের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণ লোকটি হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, মেরে রাজা সাব গরীব আদমিকো পর জেরা মেহেরবানি রাখিয়ে। হাম এইসাই খড়া রহেঙ্গে —আপকো তকলিফ ন পড়েগা। এক টিসন বাদ যব গাড়ী ঠহরেগা—হাম উতর যায়েঙ্গে।

এক স্টেশন বাদ অর্থাৎ ঘণ্টা দুই অন্তত। ততক্ষণে চলন্ত গাড়ীর চাকার সুর আর দু পাশের মনোরম দৃশ্য—উপভোগের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখতে পারবে তো? নির্জনতা যদি না রইলো, কল্পনায় রং ধরবে কিসে!

চড়ে উঠলো নরেন, নহি নহি আবভি উতর যাও। নেহি তো টিকিসবাবুকো ম্যয় বোলায়েঙ্গে।

বুড়ো লোকটির সঙ্গে আর দু-তিনজন কাকুতি জুড়ে দিল, নারাজ না হও বাবুজি।

হৈচৈ কোলাহলে নরেনের গলার স্বর ডুবে গেল। বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা দুলে উঠলো।

দলটি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, বম্ বাবা—বৈদনাথকি জয়।

ও পাশের বেঞ্চে ছেলে দুটিকে নিয়ে নরেনের স্ত্রী চামেলি বসেছিল। ওর মনেতেও সম্ভবত একটি কল্পনা ছিল, কিন্তু সেটিকে লালন করার মোহ আপাতত ছিল না। দলটির অনধিকার প্রবেশে খানিকটা বিব্রত হয়েছিল, বিপর্যস্ত বোধ করেনি। ওদের দুর্দশা-মলিন বেশবাস আর কাকুতি মিনতিতে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল—করুণা বোধ করছিল। গাড়ী ছাড়লে স্বামীকে সম্বোধন করে বলল, আহা—থাকলই বা। একটা স্টেশন বইতো না।

নরেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, থাকলই বা। জাননা তো এদের কীর্তি! এইভাবে কামরায় ঢুকে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে—নামবার নামটিও করে না। তারপর যাত্রী অসতর্ক হলেই—মাল নিয়ে সরে পড়ে। এরা চোর।

বলাবাহুল্য, কথাগুলি ইংরেজিতেই বলছিল নরেন—এরা যাতে বুঝতে না পারে।

চামেলি বলল, না না। দেখছ না ওদের নির্দোষ গোবেচারা চাউনি। ওরা কখনই অমন কাজ করতে পারে না। তোমার ভুল ধারণা।

ভুল! কখনই নয়। নরেন প্রতিবাদ করল। একটু বাদেই দেখবে—স্টেশনে গাড়ী থামলেও ওরা নাবে কি না? তারপর যেই ঘুমোবে—

বল কি—দলশুদ্ধ চোর? ওই বুড়ী মেয়ে-লোকটি, বাচ্ছা দুটি, ঘোমটা পরা বউটি? চামেলি আশ্চর্য হল।

সব সব। দেখছ না ওদের কাপড়চোপড়—অভাবী মানুষ। অভাবী মানুষ কখনো সৎ হয়?

চামেলি হেসে বলল, হয় বই কি। যারা চুরি করে সবাই কি অভাবী লোক? স্বভাবেও এই কর্ম করায়।

তাহলে তর্কই কর। রাগ করে মুখ ফেরালে নরেন।

চামেলি দেখল, লোকগুলি মেঝের উপর এক জায়গায় গাদাগাদি করে বসেছে। যেন কত অপরাধী। নিষিদ্ধ কামরায় উঠে গদিতে বসার স্পর্ধা তো করছেই না, উল্টে বেশী জায়গা দখল করে অন্যের অসুবিধা ঘটানোর ভয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। আহা—বেচারারা!

চামেলি মৃদুস্বরে নরেনকে বলল, তুমি রাগ করছ কেন? দেখছ না ওরা ভয় পেয়ে গেছে।

নরেন বলল, ভয়ই বটে। ভয় নয়—ওটা গেঁয়ো গোঁয়ো ভয়ের অভিনয়।

তাহোক, ওদের ভাল করে বসতে বলবে?

তোমার খুশি।

চামেলি ছেলেদের ওদিকের বেঞ্চিতে পাঠিয়ে দিয়ে এক পাশে সরে বসলো। বুড়ীকে সম্বোধন করে বলল, ইধার আও—বইঠ যাও।

বুড়ী ঘোমটা টেনে আরও জড়োসড়ো হয়ে বসল। বুড়ো হাত জোড় করে বলল, রহনে দেও মাইজী—বহুৎ আরামসে মায় বৈঠা হ্যায়।

কিছুতেই ওরা এধারে এলো না।

চামেলি জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে তোমরা?

লাখ্‌নাউ।

ওখানে ঘর বুঝি? কাজ কর ওখানে?

জী হাঁ।

কি কাজ?

কাজের বৃত্তান্ত জেনে চামেলি নরেনের পানে চাইল। বলল, ওগো শুনেচ? সুবিধেই হলো তোমার। এদের সংগে ভাল করে আলাপ কর। সত্যিকারের হরিজন এরা।

নরেন বলল, ছি চামেলি, ঠাট্টা ভাল নয়।

ঠাট্টা হল? তুমি মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌-শ্যানে নামছ কিনা?

নামছি—তাই কি?

যে ওয়ার্ড থেকে নামছ—সেখানে হরিজন পল্লী আছে কি না? তাদের ভোট পাওয়ার জন্য তোড়জোড় করাতে হবে কি না!

কি বলছ আজেবাজে। নরেন বিরক্ত হল। সে যেখানকার কাজ সেইখানে ব্যবস্থা হবে। এরা যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ—এদের সংগে আলাপ জমিয়ে কলকাতায় ভোট সংগ্রহ করা যাবে?

চামেলি বলল, হায়রে দূরদৃষ্টি! তাদের কাছে যখন ভোটের জন্য যাবেই—তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার খবরটি জেনে রাখবে না? আশা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো তাদের দলে টানতে হবে। তাছাড়া এরা তাদের আত্মীয়ও হতে পারে।

নরেন বলল, তোমার দূরদৃষ্টি আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশংসা করতে পারলাম না।

অপরাধ?

বললাম তো—ক্ষেত্র বিপরীত। এরা যখন তারা নয় তখন এদের সঙ্গে আপ্যায়িত করার মানে হয়। তাছাড়া আপ্যায়িত করলে এরা গাড়ী থেকে নামবে মনে করেছ? সারারাত জ্বালাবে।

চামেলি গম্ভীর হল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। গাড়ী চলতে লাগল। চাকায় চাকায় শব্দ উঠছে, পাশে পাশে ছবি ভেসে যাচ্ছে। মাঠে অন্ধকার নামলেও—আকাশের ছবিটা স্পষ্ট। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। এক সময়ে চামেলি বলল, দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে—কিন্তু কাউকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

হঠাৎ ওকথা কেন! নরেন শুধালো।

হঠাৎ মনে হলো, রাষ্ট্র আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ কিন্তু ধর্মের খোলসটা ছেড়েও ছাড়ছে না।

ধর্মের খোলস!

নয়তো কি! ভগবান মান বা না—বি

একটি ধর্মমতকে মানবো না, বললেই কি ত

মানা সম্ভব? এটা তো মনে রয়েই যায়, অ

ধর্মটা ভাল—অতএব আমি উঁচু। এসব

করবার জন্য আইন হয়েছে। অথচ দেখ বি

অর্থে কর্মে জ্ঞানে এক একটি আলাদা থাক

তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এ বড় ও ছোট এই ধ

—আমরা সবাই এক নয়—এই ধারণা ে

সময়েই ভুলতে পারছি?

নরেন হেসে উঠল, চামেলি—কথাগ

কিন্তু বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে।

চামেলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, শোন

তুমি তো বাইরেই চেয়ে আছ, দেখছ এইদি

বুড়ীটা কি কষ্ট করে বসে আছে— ছেলে দ

মেঝের ধুলোয় লুটোচ্ছে—বুড়োটা জিনিসপ

মধ্যে পুঁতে গেছে, দেখেছ? এরা বে

ভাড়া দেয়নি বলে এইভাবে জন্তু-জানোয়া

মত কষ্ট পাবে—এইটাই বুঝি ভাল?

নরেন হেসে উঠলো। বড্ড সেন্টিমেন্

হয়েছ চামেলি। বেশী ভাড়া দেয় যারা ত

নিশ্চয় আশা করে বেশী আরাম পাবার। ে

ন্যায্য পাওনা। কাউকে বঞ্চিত করে দেওয়

হিসাব নয়। যাক ও নিয়ে মন খারাপ ক

বোকামি। এইবার গাড়ী থামবে—ওরা নে

যাবে। মালপত্রের উপর ভাল করে নজ

রাখবে।

তুমি রাখগে। চামেলি জানালার দি

মুখ ঘুরিয়ে বসল।

(শেষাংশ ২২১ পৃষ্ঠায়)

✱ গল্প ✱

বৃষ্টি

মনোজ বসু

সেঁশনে নেমেই মুষলধারে বৃষ্টি। বেরুতে পারে না প্রদীপ, অধীর হয়ে ওঠে। জিনিষপত্র কিনতে হবে ঘুরে ঘুরে, অনেকের বাড়ি যেতে হবে। একগাদা কাজ।

খানিকক্ষণ পরে বৃষ্টির জোরটা কমল, কিন্তু একেবারে থামে না। টিপ-টিপ করে চলছে। ছুটতে ছুটতে সে ছাতার দোকানে চলে যায়। বাজে খরচটা এড়ানো যাবে না। কাজ-কর্ম পন্ড হবে তা হলে।

সস্তার জিনিষ একটা দিন।

দোকানদার টাকা ছয়েকের মতো একটা বের করে দিল: এইটে নিন, হাসতে খেলতে পাঁচ-ছ'টা বছর।

আর সস্তা নেই?

আছে। কিন্তু জোচ্চোরি কারবার নয় আমাদের, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেব। সে জিনিষ দুটো দিনও টিকবে না।

শুধু আজকের দিনটা চলবে কিনা, বলুন। তা হলে অনেক হল।

বিকালের দিকে বৃষ্টি ধরল। কাজ-কর্ম তখন সারা হয়ে গেছে। এক চেনা দোকানে জিনিষপত্র মজুত রেখেছে। বিশ্রাম এতক্ষণে। ট্রামে উঠে পড়ল।

কলকাতার ট্রামের যা নিয়ম—লোকে-লোকারণ্য। তার উপরে বিপদ, এক দঙ্গল মেয়ে উঠে পড়ল এই জায়গা থেকে। কণ্টেসৃষ্টে ঠাঁই করে নিয়ে কি-হয় কি-হয় ভেবে মনে মনে অনেকে গুরু নাম জপছিল—সেই কাণ্ডই ঘটে গেল এবার। থুনথুনে বুড়ো মানুষটাও দশ বছুরে লেডির জন্য জায়গা ছেড়ে মাথার উপরের রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলল। প্রদীপও ঝুলছে। এবং সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে মেয়েদের দিকে।

নিরিখ করে দেখে দেখে দৃষ্টি স্থির করে ফেলেছে। ঝকঝকে মেয়েটা, আমাদের শম্পা—প্রভঞ্জন-গতিতে তার মুখো এগোয়। রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি। এসে পড়েছে সামনের উপর, এক দৃষ্টে শম্পার দিকে তাকিয়ে আছে।

সমস্ত সংসার এবং দুনিয়ার উপর বিতৃষ্ণা নিয়ে শম্পা বেরিয়ে পড়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ অনেকখানি এগিয়ে আজকেই ভেঙ্গে যাবার খবর এলো। কথাবার্তা চলছিল পাত্রের বাবা আর শম্পার মামার মধ্যে। শম্পারই সহপাঠিনী রেবা সরকারকে পাত্র পছন্দ করেছে, এমন কি বিয়ে, দিন-ক্ষণ অবধি ঠিকঠাক। মামা এ সবের কিছু জানতেন না। খবর পেয়ে আজ চিঠি লিখেছেন।

প্রদীপ হাঁ করে তাকিয়ে। ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নেয় শম্পা। বিরক্তি বুঝেও প্রদীপ নিরস্ত হয় না। ডাকছে: শুনুন, একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

শম্পা কানেই শুনছে না যেন। জানলা দিয়ে পথের দিকে দেখে। একটু জোর দিয়ে প্রদীপ বলে, জরুরী কথা।

অবহেলার ভঙ্গীতে শম্পা বলল, আপনাকে চিনিনে তো আমি।

হাসল প্রদীপ: না-ই বা চিনলেন। অচেনা লোকের সঙ্গে কি কথা বলেন না? ঘোমটা দেওয়া সেকেলে মেয়েরা বলতেন না অবিশ্যি। আপনারা তো তেমন নন।

তবু শম্পা ক্ষণকাল চুপ করে থাকে। রেবা সরকারের কথা মনে আসছে—হতে পারে তারই সম্পর্কের কিছু। এমন কোন গুপ্ত তথ্য নিজয়িনীর দম্ভ যাতে চুরমার হয়ে যায়।

ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, কি কথা?

প্রদীপ বলে, অনুমতি দেন তো বসে পড়ি পাশের খালি জায়গাটায়। এমনি ঝুলে ঝুলে বলা কি ভাল হবে?

সেটা শম্পাও চায় না। রেবার সম্বন্ধে যদি কিছু হয়, নিচু গলায় হওয়াই ঠিক। তবু সহসা হাঁ-না কিছু বলতে পারে না। শুধু রেবা কেন, পুরুষ জাতটার উপরেও নিদারুণ ঘৃণা। রি-রি করে জলছে মনের মধ্যে।

প্রদীপ সকাতরে বলে, খুব আলগোছে বসছি আমি। আপনার অসুবিধা হবে না।

শম্পা কঠিনভাবে বলে, যেমন ইচ্ছা বলতে পারেন। শোনাবার দরকার নেই। মানুষ কি পাথর কি গাছ আমি তাকিয়েও দেখব না।

বসে পড়ল প্রদীপ। সঙ্কুচিত হয়েই বসল। চুপচাপ আছে।

থাকতে না পেরে শম্পা বলে, কি বলতে চান বলুন এবারে।

এগারোটায় এসে নেমেছি, সেই থেকে ঘোরাঘুরি। পা টনটন করছে, না বসলে উপায় ছিল না।

পিছনে ঠেসান দিয়ে প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঁজল। কত ক্লান্ত হয়েছে বোঝা যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখার সুবিধা পেল শম্পা। সুশ্রী তরুণ, চেহারায় অপরূপ উজ্জ্বলতা। এত উদাসীন ভাব না দেখালেও হত। কিন্তু মনটা আজ বড় গুমড়ে আছে, ক্ষিপ্ত হয়ে আছে মনে মনে।

শম্পা বলে, বসা তো হয়েই গেছে। কথাটা বলুন।

চোখ মেলে প্রদীপ ফিক করে একটু হাসল: কথাও আমার এই। আপনার এই পাশে একটুখানি বসবার দরকার।

শম্পা বলে, বসতে চাওয়া তো অন্যায়। লেখা রয়েছে 'মহিলাদের জন্যে'।

মেয়ে হয়ে আপনাদের বড্ড সুবিধা। যথা ইচ্ছা বসে পড়বেন, কোন রকম বাধা নেই। তার উপরে আলাদা নিজস্ব সিট তো রিজার্ভ করাই আছে। এখন যেটা দরকার হয়ে পড়ছে—

কৌতুক লাগছে প্রদীপের কথায়। যে ব্যথা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, অনেকখানি স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। শম্পা বলে, হ্যাঁ, দরকারটা কি শুনি?

জায়গা রিজার্ভ থাকবে পুরুষের জন্য—বেঞ্চির গায়ে তাই লেখা থাকবে। হচ্ছে না চক্ষুলজ্জায়, পুরুষেরা কর্তা বলে। জাত ধরে তাই আমাদের নিগ্রহ।

কথা ভাল করে শেষ হতে পারল না। আবার প্রদীপ চোখ বুজল। এবং কিঞ্চিৎ যেন নাসাধ্বনি।

ট্রাম চলেছে। মড়াং করে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে থেমে আছে। ঘন্ত মেরে হুড়মুড় করে নেমে যায়। নিমেষে

চাউস সামনে। অপরাহ্ণের এইগুলো সিনেমার ট্রাম, মোড়ে মোড়ে সাজগোজ করা মেয়েরা ওঠে। আরও কিছু পরে অফিসের ট্রাম—বিজীর্ণ মলিন কেরানী মশায়রা ঘরে ফিরবেন। প্রদীপ ঘুম ভেঙে এক লাফে নেমে পড়ে টিকিটের লাইন দিল।

টিকিট কেটে বেরিয়েও এল। এসে দেখে শম্পা হাসি মুখে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

আপনিও এসেছেন?

শম্পা বলে, সিনেমা দেখতে বেরুইনি। এদিক-সেদিক বেড়াতাম, কিম্বা কোন বান্ধবীর কাছে গিয়ে বসতাম খানিক। আপনার জন্যে নেমে পড়তে হল।

কথাটা বেয়াড়াভাবে বেরিয়ে গেল। সদ্য পরিচিত মানুষটা কোন্ অর্থ ধরে বসে—তাড়াতাড়ি শম্পা বিশদ করে বলে, আপনার এই ছাতার জন্য। ট্রামে ছাতা ফেলে এসেছিলেন। এমন ভুলো মন নিয়ে কাজ-কর্ম করেন কি করে?

প্রদীপ একটুও অপ্রতিভ নয়। বলে, অন্য কিছু ভুলি না কখনো। শুধুমাত্র ছাতা। বৃষ্টি যদি না থাকল, ছাতা ঠিক ফেলে আসব। বছরে কতগুলো ছাতা যায়, তার লেখাজোখা নেই। নতুন ছাতা, আজকেই কিনেছি। আপনি এই দিয়ে দিচ্ছেন—হল থেকে বেরুনোর সময় খুব সম্ভব আবার ফেলে আসব।

শম্পা হেসে বলে, তবে দেবো না। আমার কাছে থাকল এখন। আমিও ঢুকছি, বেরিয়ে এসে দিয়ে দেব। কিন্তু সামনের টিকিট কিনলেন কেন? চোখ কর-কর করবে, ভাল দেখতেও পাবেন না ঐ সিট থেকে।

দেখব না তো। অকারণে বেশি খরচা করলাম না সেজন্যে।

সবিস্ময়ে শম্পা প্রশ্ন করে, তবে?

ঘুমোব। এয়ার কণ্ডিশন করা ঘরে এত সস্তার মধ্যে বের করুন দিকি এমন একটা ঘুমোবার জায়গা।

দেখি টিকিটখানা—

বাধাপার বুঝবার আগেই শম্পা ছোঁ মেরে টিকিট নিয়ে অদৃশ্য। ক্ষণপরে ফিরে এসে বলে, বদলে নিয়ে এলাম। আমার আপনার পাশাপাশি সিট। একা-একা ছবি দেখতে পারিনে, একজন কেউ থাকবে আমার সঙ্গে।

প্রদীপ বিরক্তভাবে বলে, আমি তো দেখবই না ছবি। ঘুমাব। বেশি দামের টিকিট কিনে খামোকা কতকগুলো পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন।

শম্পা বলে, আলো নেভানোর পর পাশের মানুষ ছবি দেখছে, না ঘুমোচ্ছে না অন্য কিছু করছে, সে তো আমি দেখতে যাব না। পাশে থাকলেই খুশি—আমি ভাবব, ছবিই দেখছেন।

একটুখানি হেসে বলল, সস্তা সিটে ছারপোকার কামড়ে ছটফট করতেন। পয়সা জলাঞ্জলি যায়নি—গদী-আঁটা ভাল চেয়ারে আরামেই ঘুম হবে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা দিল। হল অন্ধকার। তর্কাতর্কির সময় নেই। ঢুকে পড়ল শম্পা আর প্রদীপ।

ছবির শেষে লবীতে বেরিয়ে এসে প্রদীপ বলল, ছাতা দিন।

শম্পা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলে, অনেক উন্নতি। ভুলবেন না তো এবার।

বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলে, বৃষ্টির সময়টা আমি ভুলিনে। দেখুন না অবস্থা।

বিষম বৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এখনো চলছে। আকাশে মেঘ উঠলেই তো কলকাতার রাস্তায় জল জমে। এখন সমুদ্রের ঢেউ। ট্রাম এবং যানবাহন বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র যা চলতে পারে সে হল নৌকা। এবং ছোটখাট স্টিমারও বোধ হয়।

ছাতাটা টেনে নিয়ে প্রদীপ এগিয়ে যায়। শম্পা বলে, বাঃ রে, আমি যাব না?

যাবেন বই কি! আমার তাড়া আছে। নটার গাড়িতে ফিরতে হবে আমায়।

শম্পা বলে, কেমন করে যাব? বৃষ্টি তো ধরবার লক্ষণ নেই।

প্রদীপ নির্বিকারভাবে বলে, না ধরে তো পরের শো-এ বসে পড়বেন। ধরবেই এক সময় না এক সময়। কলেজ স্কোয়ারে বন্ধুর দোকানে জিনিষপত্র রেখে এসেছি, দোকান বন্ধ করে চলে যাবে। চললাম, কিছু মনে করবেন না।

শম্পা এবারে জোর দিয়ে বলে, সে হবে না। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবেন আপনি। নয় তো কলেজ স্কোয়ার অবধি এক ছাতায় যাই দুজনে। মাঝে কোন রিক্সা-টিক্সা পেয়ে যেতে পারি।

হেসে বলে, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। যা ছুৎমার্গী আপনি।

আছে বই কি—আপত্তি, সত্যিই আছে। শম্পার আপাদ মস্তক প্রদীপ নিরীক্ষণ করে নেয় একবার। বলে, ছোঁওয়াছুঁয়ির কথা হচ্ছে না। আপনার বপুখানা দেখে থাকেন তো। আপনি ছাতার নীচে এলে ছাতার বাইরে আমায় ভিজতে ভিজতে যেতে হবে। নিউমোনিয়ায় ধরবে। আচ্ছা, নমস্কার!

ফুটপাথে নেমে পড়েছে। কি মনে পড়ে আবার ফিরে আসে।

আপনার নাম-ঠিকানা দিন তো। চিঠি দেব।

কঠোর স্বরে শম্পা বলে, দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও সায় দিয়ে বলে, তা বটে! এখান থেকেই তো কাজ চুকিয়ে যেতে পারি। রয়েছে একটা পড়ে।

ফোলিও-ব্যাগ খুলে খামের চিঠি বের করল। বলে, নাম লেখা আছে, তাকে পাওয়া গেল না। কেটে নিজের নাম বসিয়ে নেবেন। গেলে বড্ড খুশি হব। এই কলকাতার উপরেই, বাইরে যেতে হবে না।

শুভবিবাহ-ছাপা নিমন্ত্রণের চিঠি। প্রদীপ চলে গেছে। বাইরে ধারা বর্ষণ। চিঠি খুলে নেড়ে-চেড়ে দেখে। কনে রেবা সরকার।

পাত্রের নাম—শম্পার মনে পড়ল, মামার চিঠিতে অনেকবার নাম পড়েছে—প্রদীপকুমার দত্ত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমারে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ
যুগাবতার!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু
জানে নি আর।
দু'হাতে কেবল বিলালে অমল, জগন্মাতার
মহাপ্রসাদ—
ভুলিয়া মায়ার ভুলিয়া ধরায় ছিলাম
আমরা যাহার স্বাদ।
ধন জন মান কামনার মোহে দেখি'
আমাদের অন্ধ, ম্লান,
ঝলকিয়া নিশা, উজলিয়া দিশা,
উছলিয়া উষা এলে মহান!
গাহিলে মধুরে: "যে শিশুর সুরে কেঁদে ডাকে:
'মাগো, কোথা তুমি?'
'আয় আয়' ব'লে টেনে নেয় কোলে মা তারে—
কপোলে স্নেহে চুমি'!
সে-প্রেমময়ীর প্রেমই বুকে বুকে
ঝরে যুগে যুগে মধুরিমায়,
সে-আলোময়ীর নয়নমণির আলো জ্বলে
রবি শশি তারায়!"
ধন জন মান......এলে মহান!
"মা তারেই পায় দেন ঠাঁই—
চায় গহন হিয়ায় যে তাঁহারে,
চরণে তাঁর যে শরণ না চায়—
ঘুরে মরে হায়, সে আঁধারে।
মানবজীবন সফলসাধন হয় শুধু
সুধাপরশে তাঁর,
সে-সুধায় যার মিটে ক্ষুধা—
তার থাকে কি অভাব ভুবনে আর?"
ধন জন মান......এলে মহান!
"জ্ঞানের গরব, বিভূতিবিভব কত ছলে
জনে জনে ভুলায়—
সোনার হরিণ-মৃগয়ায় তবে উধাও রঙিন
সুখ-আশায়!
জানিতে সে চায়—বনবীথিকায় আছে
কত শাখা, পাতা ও ফুল,
শুধু যায় ভুলে—ফলই প্রাণদাতা,
বিদ্যাভিমান মিথ্যাজাল!"
ধন জন মান......এলে মহান!
চাওনি কিছুই আপনার তরে,
করোনি চিন্তা—কী হবে কাল
ঝরালে মোহন অমৃতবচন
পতিতপাবন-রূপে দয়াল!
তাই যোগী মুনি কবি জ্ঞানী গুণী
গায় নাম তব আঁখিজলে,
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ লুটায় তোমার পদতলে।
ধন জন মান......এলে মহান!

(বিবেকানন্দ শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে)
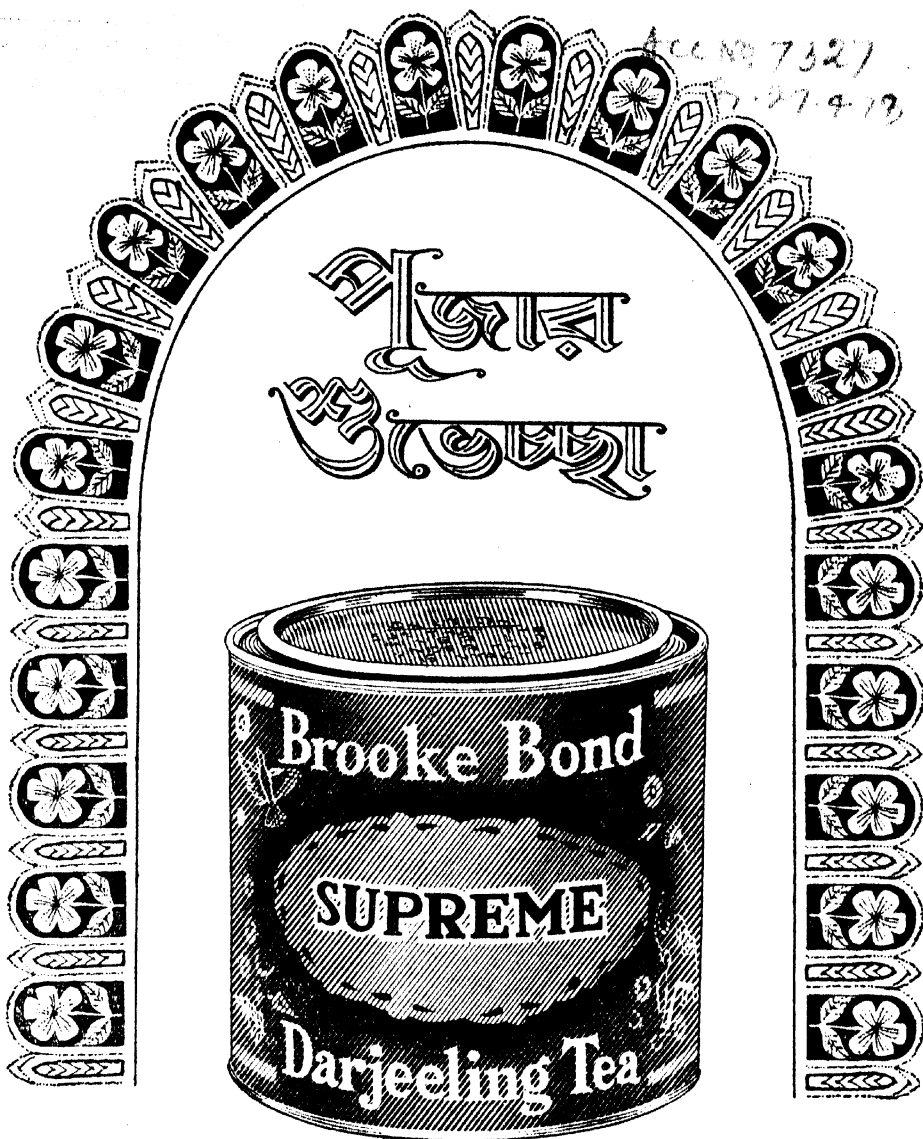
'সে শুধু গেল চলে'

মণীশ ঘটক

শুনেছি নাকি ঝোঁকের মাথায় জগাই-মাধাই
বামায়-শ্যামায়
বলেছিস রায়বাড়ির কর্তা রাতবিরেতে
গিন্নী ঠ্যাঙায়?
বাবু তোকে ক্যাবলা জেনে
ঘুসতে দিলেন অন্দরেতে
তোর কি বাবা লেহ্য হোলো
বাইরে বাবুর মন্দ গেতে?
সে শুধু গেল চলে,
কথাটি নাহি বলে।
গুন্ডা গণেশ ডাকাত বিশে
লড়ছিল কাল মানের লড়াই,
ফোড়ন কেটে সেথায় নাকি
জাহির করতে গেছিস বড়াই?
গণ্‌শাটাকে চিনিস্‌ না তো,
ভুঁড়ি পেলেই দেয় ফাঁসিয়ে,
বিশের স্টাইল কথা রাখা,
লুঠ করতেও যায় শাসিয়ে।
সে শুধু গেল চলে
কথাটি নাহি বলে।
ক্যাবলা শুনি তোর বাড়ীতেই জ্যাঠায়
খুড়োয় ভাগ্নে শালায়,
পান থেকে চুণ খস্‌লে পড়েই
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চালায়?
তুই তখুনি অন্য বাড়ীর ঝগড়াঝাটি
যাস্‌ মেটাতে,
স্যায়না আছিস্‌, সরেও পড়িস্‌,
আসলে তেড়ে কেউ পেটাতে!
সে শুধু গেল চলে
কথাটি নাহি বলে।
জাল ফেলে রোজ থাকিস বসে,
মাছও ওঠে দু'চার খালুই,
পাচ্ছিল ভাগ খুশ মেজাজে
শ্বশুরে জামাই বেয়াই তালুই।
নসীবের খেল্‌, করবি কি বাপ,
চিরটা কাল যায় কি সমান?
তাঁত বুনে খাচ্ছিল তাঁতি—
হাতে হাতে দ্যাখ্‌না প্রমাণ!
সে শুধু গেল চলে,
কথাটি নাহি বলে।
মাছ না উঠে উঠলো ঘড়া
খুলতে তাহার পেলি ডালা,
ধোঁয়ার আকার যা বেরুলে,
সামলা এখন তাহার ঠ্যালা।
ম্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা,
বচনে তোর নেইক জুড়ি
তাতেই ভুয়ে ঠুকিস্‌ মাথা, আর কি
ছাড়ে জুজুবুড়ি!
সে শুধু গেল চলে,
কথাটি নাহি বলে।
ভূতের কাছে রোজা কহিল—এমন
ভূতও আছে জানিস,
টিঁকবে নাকো তার সকাশে
চরম কালে কোনো সালিশ।
মামদো, না সে কন্দকাটা,
শাকচুন্নি কি নাকেশ্বরী,
তাক্কে তক্কে পেছন থেকে
ঘাড় মট্‌কাতে ঘুরছে তোরি।
সে শুধু গেল চলে
কথাটি নাহি বলে।
ক্যাবলা শুধু রাখিস মনে,
পড়লে ওদের খপ্পরেতে,
রায়বাবু কি গণশা বিশে,
ছাড়বে না স্রেফ থাপ্পড়েতে।
আর যারা, নাম করব নাকো,
ডাণ্ডস্‌ মেরে ভাঙবে মাথা,
আপন জনাও সুযোগ পেলেই
ছাড়বে নাকো করতে যা তা।
সে শুধু গেল চলে,
কথাটি নাহি বলে।

মহিমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ছিল যেথা তুঙ্গ-শৃঙ্গ ঐশ্বর্যের অনুপ মহিমা
নিবন্ধ দৃষ্টির 'পরে গভীর বিস্ময়
পরিকীর্ণ জমাট তুষারে
আদিগন্ত ফেনশুভ্র নিঃসীম বিস্তারে;
নিমগ্ন চৈতন্য হতে মেলিয়া নয়ন
দেখিলাম সেথা যেন অন্তিম শয়ন
রচিয়াছে মহাকাল পর্বতের অনন্ত আরোহে।
শুনিলাম সেথা ওঠে অধীর আগ্রহে
রণক্লান্ত পৃথিবীর নীরব প্রার্থনা
পরাভূত দেবতার সিংহাসন পানে।
ভূমিগর্ভে পুঞ্জীভূত জীবনের যত আবর্জনা
স্খলিত গলিত পত্র, চরণে দলিত পুষ্পদল,
ব্যথিত হৃদয় হতে উদ্বেলিত যত আর্তনাদ,
দুঃখশোক বঞ্চনার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
অবরুদ্ধ অশ্রুর পাথার
গুহায় আশ্রয় খোঁজে তবু সেই নিরন্ধ্র আঁধারে।
তবু সেই মহিমার অবশিষ্ট স্তিমিত শিখারে
জ্বালাইতে চাই মোরা আরণ্য ইন্ধনে
মুক্তি পেতে চাই মোরা সংশয়ের যন্ত্রণা হইতে।
সূর্যের উত্তাপ লাগে জমাট তুষারে
গলে গলে নেমে আসে
পার্বত্য পথের ধাপে ধাপে
নৃত্যপরা নির্ঝরিণী শুভ্রতার তরল মহিমা।
দেবতা-পূজার ফুলদল
ভেসে আসে স্রোতমুখে অম্লান সুন্দর।
তীর্থযাত্রী দুর্গম পথের
পথক্লেশ ভুলে যায়,
ভুলে যায় অবসিত মহিমার গ্লানি,
প্রশান্তি নামিয়া আসে
নির্মাল্যের পরম প্রসাদে।

শান্তিতত্ত্ব

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সকলেই শান্তি চায়। কেউ কারো পাকাধানে মই
যদি দেয়, ফৌজদারির মামলা বাধে
স্বত্বের সংসারে।

আদালত তপ্তখোলা। উকিল মোক্তার ফোটে খই
রায় দেন বিচারক! বিধি জানে, কে জেতে,
কে হারে।

শান্তিতত্ত্ব বুকে নিয়ে পাঠাগারে মোটা মোটা বই
আলমারীতে সমাধিস্থ। ধ্যান তা'র কে
ভাঙাতে পারে?

শান্তিবাদী সাধুকণ্ঠে সান্ত্বনার মাভৈঃ, মাভৈঃ,
অযথাই উচ্চারিত! কেউ মরে, কেউ তাকে মারে।
সভ্যতা-সুন্দরবনে ডাঙায় বাঘেরা ডাক ছাড়ে,
আকাশে শকুন ওড়ে, জলে ক্রুর হাঙর কুমীর;
জ্ঞানীগুণী হতভম্ব ঐতিহ্যের হাড়ের পাহাড়ে,
দার্শনিক অর্থ খোঁজে তর্কশাস্ত্রে ভূমার ভূমির।
সংশয়িত কবিকণ্ঠে তবু ডাকে কালের কোকিল
অহিংস কুহর-কাঁপা ব্যঞ্জনা কি শান্তির দলিল?

সংলাপ

মণীন্দ্র রায়

আলোটা নিবিয়ে দাও,
এস অন্ধকারে।
সারাদিন মুখ চোখ রেখার বাঁধনে
ভয়ানক উচ্চকিত তুমি।
ওই সব ঘনতার রঙ
স্নায়ুর স্বাধীন কোলাহলে
লুপ্ত করে দেয় পটভূমি।

আলোটা নেভানো থাক।
গল্প যদি চাও, গল্প করি।
ইচ্ছে হলে হাত ধরো, যদিও সে হাত
হাত নয়, ঘরে-ফেরা পাখি—
আকাশের সব গান শেষ হলে যার
নিঃসঙ্গের রাত্রি থাকে বাকী।

অথবা ধরো না হাত।
পাশে বসো। রোদ্দুরে যেমন
গাছের পাতার শত শ্যামকায়ে তৃষ্ণার আধারে
নিঃশব্দে ক্ষরিত,
তেমনি এ অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু
ছেয়ে যেয়ো তুমি।

চাই না তোমার নাম, ওই দেহ, নারী!
হতাহত শুশ্রূষার শিয়রে এখন
মমতাই আমার জীবন।
পারো যদি ঢেলে দাও সে অমৃত-ঝারি॥

১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যকার কথা-- রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসামান্যতা তখন দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা তখন রবীন্দ্র শিষ্য বলে গণ্য—কোন কোন স্থলে অবশ্য ঘৃণ্য। ভারতী, প্রবাসী ও মানসী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আমরা সংঘবদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতায় আমাদের নামহীন সংঘের নাম দিয়েছিলেন---'গন্ধরাজের পরিমল মন্ডল।' আমরা জ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতাম না, কারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম—'রবীন্দ্রনাথের রচনা অননুকরণীয়। তবে অজ্ঞাতসারে তাঁর দুর্নিবার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল আমাদের রচনায়। এ প্রভাবও বহিরঙ্গীয়, অন্তরঙ্গীয় নয়। এতে আমরা লজ্জা পাইনি, গৌরবই অনুভব করতাম। আমাদের কবিতার ছন্দ, ভাষা, মিল, স্তবকবন্ধন, পঠন ও শ্রী ভাষার পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টির প্রয়াসেই তাঁর প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁর রস-সৃষ্টির ধারা, ভাবাদর্শ, কল্পনার প্রসার, দৃষ্টিভঙ্গী, আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রভাব আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি ছিলেন সেকালে গোবিন্দ দাস, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বভাবতই এড়িয়ে চলতেন। আমাদের কবিজীবন যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভূমিতে ভূমিষ্ঠ, এঁদের কবিজীবন তা নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেই প্রথম যৌবনেই এঁদের কবিধর্ম বদ্ধমূল হয়েছিল। পরবর্তীকালে কারো কারো রচনায় যে তাঁর প্রভাব সম্পাত একেবারেই হয়নি তা নয়। এঁরা প্রধানত স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান ছিলেন। রবির প্রখর আলোকে এঁরা ম্লান হয়ে পড়েননি। এই কবিদের সেকালে যথেষ্টই খ্যাতি ছিল। এখনও রবীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় প্রতিভার কবি বলে যাঁরা স্বীকার করে লন নি, তাঁরা ঐ কবিদের রচনার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা রবীন্দ্রভক্তের দলও এঁদের কবি প্রতিভা অকপটেই স্বীকার করতাম। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এঁদের নগণ্য কবি বলে মনে করতেন না। আমরা তখন অপ্রবীণ কবি। আমরা যতই রবীন্দ্রভক্ত হই না কেন, অগ্রজ কবিদের সঙ্গে অনুগত অনুজের মতই আচরণ করতাম।

আমাদের যুক্তি ছিল, রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। কিন্তু ঐ অগ্রজ কবিগণ আপন আপন সাধনাক্ষেত্রে যে এক-একজন দিকপাল, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। এঁরা যে রবীন্দ্রযুগে আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন—এটা কম কথা নয়। এঁদের রচনা-রীতি স্বতন্ত্র, ভাবাদর্শ স্বতন্ত্র। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এঁদের আপন আপন ধারায় এঁরা কতটা সার্থকতালাভ করেছেন— তাই ছিল আমাদের বিচার্য। এঁদের রচনায় যা-কিছু উৎকৃষ্ট তাই দিয়ে এঁদের প্রতিভার বিচার করতাম। এঁদের রচনায় কি কি নেই তার সন্ধান আমরা করিনি। যা কিছু উৎকৃষ্ট তাই ছিল আমাদের আস্বাদ্য। মোহিতলাল বলতেন—যাঁর একটা রচনাও রসোত্তীর্ণ হয়েছে তিনিই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়। কারো অপকৃষ্ট রচনা খুঁজে খুঁজে বার করে তার দ্বারা তাঁকে খর্ব করে দেখানোর প্রথা তখন ছিল না।

অগ্রজ কবিদের খ্যাতি ম্লান বা বিলুপ্ত হলেই আমদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হবে—তাঁদের স্থানাবরোধকতার জন্য আমরা যথাযোগ্য স্থান পাচ্ছি না—এরূপ কথা কোনদিন আমরা মনে করিনি। জানতাম— আশেপাশে স্থান প্রচুর আছে,—বিপুলা চ পৃথ্বী। কোনদিন তাঁদের রচনা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিনি—কি রসনায়, কি রচনায়। মাসিকপত্রে প্রকাশিত ছাড়া ছাড়া কবিতা পড়ে বা একখানা কোন বই ভাসা ভাসা পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গঠিত হত না। তাঁদের প্রত্যেক বইখানা আমরা পড়েছিলাম একাধিকবার, তাঁদের রচনাও এত বেশী ছিল না যে পড়ে উঠা যায় না। তাঁদের রচনার যা কিছু চমৎকার সে সমস্তই আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেটা ছিল শ্রদ্ধার যুগ,—একনিষ্ঠ সারস্বত সাধক মাত্রকেই আমরা ভক্তি করতাম। করুণানিধান বলতেন—আমাদের এই অগ্রজ কবিরা আপন আপন ধারায় দেশের সাহিত্যকে আগিয়ে দিচ্ছেন। এঁদের সব লেখা হয়ত টিকবে না কালের বিচারে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ধারায় সে সব অঙ্গীভূত হয়ে রয়ে গেল। একটা কোকিলে বসন্ত আসে না।

গোবিন্দ দাস দূর পল্লীতে চিরজীবন কাটিয়ে দিলেন—শহরের সঙ্গে বা তথাকথিত সভ্য-সমাজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর লেখা বেরুত নব্যভারতে এবং পূর্ববঙ্গের সৌরভ প্রতিভা ইত্যাদি পত্রিকায়। আমরা অনেকেই তাঁকে চোখেও দেখিনি। তাঁর কবিতার বই ছিল দুর্লভ। তবু তাঁর বইগুলি সংগ্রহ করে আমরা আগ্রহভরে পড়েছিলাম। তাঁর লেখায় সম্পূর্ণ দেশীসুরের সন্ধান পেয়েছিলাম—এ সুর ক্ল্যারিয়োনেটের নয় এ সুর শানাইএর।

তিনি ইংরাজিবিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ভাষায় ছিল অসামান্য বলিষ্ঠতা ও ওজস্বিতা তা আমাদের অবধান এড়ায় নি। সভ্যতার সর্বসংস্কারমুক্ত, অকৃত্রিম, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, অপরিশীলিত হৃদয়ের অবলুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস, আলংকারিকতার মৌলিকতা ও বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

আপনারা বলবেন রবীন্দ্র-কাব্য-রসিক কেউ কি করে গোবিন্দদাসের অমার্জিত রুচির কবিতায় রস পান। আমরা বলব—আপনাদের যাঁরা ঠাকুরবাড়ীর ঘিয়ে ভাজা মালপোয়া ভোজনে অভ্যস্ত—তাঁরা মাঠের খেজুর গাছের কলসীতে আহৃত রসের তাতারসির স্বাদ কি করে উপভোগ করেন? সেকালে আমাদের বিচারে কবিতায় গভীর আন্তরিকতার মূল্য ছিল খুব বেশি। আমাদের মধ্যে গোবিন্দ দাসের সবচেয়ে বড় ভক্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি কবির উদ্দেশে চমৎকার একটি কবিতায় তাঁর ভক্তি-নিবেদন করেছিলেন, আমরা অনেকেই তাঁর তিরোধানে কবিতায় ভক্তিঅর্ঘ্য দান করেছিলাম।

গোবিন্দ দাসের কবিতায় ছিল অতিভাষণ, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আছে উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতা। অক্ষয়কুমার ছিলেন এঁদের বিপরীত। ভাষণে তাঁর শাসন ছিল অসামান্য। তাঁর রোমান্টিক মনোভাব গাঢ়বন্ধ রীতির মিতভাষণে উপলব্ধি। এজন্য প্রধানতঃ অক্ষয়কুমার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তারপর এষা প্রকাশিত হলে প্রদীপের কবির পূর্ণ পরিণত রূপ আমরা পেলাম। শোক এমন করে কারো কবিতায় শ্লোকত্বলাভ করেনি এযুগে। অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি সনেট রচনা করেন— সনেটে যা আছে তার বেশি তাঁর বলবার কিছু ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত আলাপ-আলোচনায় জানতে পারতাম। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না বলে তাঁর কবিতাবলীকে আমরা কখনও উপেক্ষা করিনি। তাঁর সঙ্গে একবার আমার বিদ্যাপতির পদাবলী নিয়ে বাদানুবাদ হয়, দেশবন্ধুর বৈঠকে। বিদ্যাপতির আলংকারিতার আতিশয্যকে তিনি গুণ বলে স্বীকার করতেন না, দোষই বলতেন। বিদ্যাপতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও রবীন্দ্রানুবর্তিতার জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করেছিলেন দেশবন্ধুর বৈঠকে। দেশবন্ধু স্বয়ং আমাদের মতভেদের একটা মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর ভবন থেকে এক গাড়ীতে আসবার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—আমি রবীন্দ্র-বিরোধী নই হে নই, রবীন্দ্রনাথের ২৫টা কবিতার তুলনা নেই, সেগুলি আমার প্রায় মুখস্থ। একদিন যেও —তালিকাটা দেব। উত্তর কলিকাতার সাহিত্যিকরা তাঁর রচনার খুবই ভক্ত ছিলেন। তাঁদের অবিরত প্রশস্তি-বাচনে অক্ষয়কুমারের নিজের শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ও একটা অভিমান জন্মে। তাঁর কথাবার্তায় এ অভিমানটা প্রকট হত। আমরা তাঁর কবিতা নিয়ে কোনরূপ আতিশয্য প্রকাশ করিনি —তাতে তিনি মনে করতেন আমরা বুঝি রবীন্দ্র সাহিত্যে এমনি বিভোর যে অন্য কবিদের সৃষ্টির প্রতি উদাসীন।

আমরা যে তাঁর কবিতারও অনুরাগী ছিলাম, সেকথা আমরা প্রবন্ধাদি লিখে বা তাঁর

কাছে যাতায়াত করে জানাইনি, তিনি তা জানতেই পারেননি। বলা বাহুল্য, তার কারণ আমরা তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী বলেই জানতাম। সে জন্য তাঁকে এড়িয়েই চলতাম।

দেবেন্দ্রনাথ থাকতেন সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে। তিনি আমাদের দলের সকলেরই ভক্তিভাজন ছিলেন এবং সকলের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি মোহিতলালের নিকট-জ্ঞাতি, আত্মীয়। তিনি কলকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামে একটি ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কবি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। এখানে এলেই কবি ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত। একরূপ সারাদিনই সাহিত্যিক বৈঠক চলত। আমি আমার বন্ধু অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে যেতাম। সেকালের সকল কবিই দেবেন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরী দেবেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন—উৎসর্গ পত্রটি এই—"কবি ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে তদীয় ভক্তের প্রীতি উপহার সাদরে সমর্পিত হইল।" দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনের কবি—তিনি ঘনিষ্ঠ নরনারী বালক-বালিকাদের মধ্যে কবিতার প্রচুর উপাদান খুঁজে পেতেন। ভাবভোলা কবির মনে যে কোন ভাব উদিত হলেই তাকে ছন্দে রূপ দিতেন—ভাবটিকে পরিপুষ্টি লাভের অবসর দিতেন না। যা লিখতেন তার পরিবর্তন বা পরিমার্জনের প্রয়োজনবোধ করতেন না। অধিকাংশ রচনা অবলীলাক্রমে হৃদয়োচ্ছ্বাস। ভাবাবেগের সংযম একমাত্র তাঁর রচিত সনেটগুলিতেই দেখা যায়। সনেটের নির্দিষ্ট চতুঃসীমার মধ্যে লেখনীকে বাধ্য হয়ে সংযত হতে হত। মালা গাঁথার ধৈর্য তাঁর ছিল না, ডালাভরা ফুল তিনি অনুরাগীর আঁচলে ঢেলে দিতেন।

একবার কলকাতায় এসে তিনি ১৫ দিনের মধ্যে বারোখানা কবিতার বই বার করে ভক্তদের ও অনুরক্ত পাঠকদের দু-হাতে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। সেই বারোখানি বই নতুন করে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি। এই বইগুলির মধ্যে একটি আসল কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায় যা বিচার বিবেচনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ধার ধারে না—কোন শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা মানে না।

সত্যেন্দ্রনাথের মতো অত বড় শৃঙ্খলানিষ্ঠ কবিও দেবেন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন—দেবেন্দ্রনাথ একজন আসল কবি, যত বড় কবি তিনি, তত বড় আর্টিস্ট নন।

দেবেন্দ্রনাথ আমাদের সকলের উদ্দেশে পৃথক পৃথক কবিতা লিখে গেছেন। আমরা তাঁর কাছে উৎসাহ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। সেসব কবিতা কবির অপূর্ব নৈবেদ্য নামক কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

এই ঋষিতুল্য কবি শেষ বয়সে অন্ধ হন। ভাগ্যগুণে কবির লক্ষ্মণপ্রতিম অনুজ সুরেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তিনিও একজন কবি ছিলেন। ফলে, কবির দৃষ্টিহীন দশা হেমচন্দ্রের মতো হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি ছিলেন দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অসাধারণ মানুষ। তাঁর একটি ব্যক্তিত্বে ছিল রঙ্গ-রসিকতার লঘুত্ব, আর একটি ব্যক্তিত্বে ছিল গাম্ভীর্যের গুরুত্ব। আমরা তাঁকে রাশভারী মানুষ বলে জানতাম, তাই কাছে যেতে ততটা উৎসাহিত হতাম না। আমাদের যতীন দাদা (কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি) তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন এবং দাদা বলেও ডাকতেন। রবীন্দ্রভক্ত কবিদের মধ্যে দেবকুমার রায় চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। তাই তিনি তাঁর জীবন-চরিত লিখতে পেরেছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের খুবই ভক্ত ছিলাম। আমরা বলতাম বাংলার কাব্যাকাশে এক সঙ্গে রবি ও চন্দ্রের (দ্বিজেন্দ্র দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্র) উদয় আমরা দেখলাম। বাংলার সাহিত্যের তখন স্বর্ণযুগ চলছিল। এক চন্দ্র অস্তমিত হলেন—আর এক চন্দ্র বর্মা থেকে এসে উদিত হলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান তখন দেশের ঘরে ঘরে পথে পথে, হাসির গান বৈঠকে মজলিসে এবং প্রেমের গান ও অন্যান্য নানা-শ্রেণীর গান রঙ্গমঞ্চে উদ্‌গীত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার তখন এত বেশি হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরই রজনীকান্তের গান তখন জনবল্লভ।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি তখন অভিনীত হচ্ছে—পেশাদারী অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চগুলিতে। গিরিশবাবুর নাটকগুলি অভিনীত না হলে উপভোগ্য হ'ত না। কবিত্বরসে পরিসিক্ত বলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক কেবলমাত্র পাঠেও আনন্দ দিত আমাদের।

১৯১১-১২-১৩ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে যে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় হয়—তাতেই এ দেশের অভিনয় বিদ্যার নব-যুগের সূত্রপাত হয়। শিশিরই এ-যুগের যুগ-প্রবর্তক।

অভিনয় উপলক্ষে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের "ঘন সঘন গগন-গরজে বরিষে করকা ধারা"—চন্দ্রগুপ্তের এই গানের অনুকরণে—'দ্যুলোক-ভূলোক পুলকি আলোকি জনমী আমার রাজে', এই গানটি লিখে দিয়েছিলাম। এ-গান অভিনয়ের প্রারম্ভে গাওয়া হ'ত। এই গানই চন্দ্রগুপ্তের অভিনেতারা ১৯১৩ সালে নিখিলবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে কোরাসে গেয়েছিল।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের রচনার অস্পষ্টতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন—সাহিত্য সমাজে তাতে একটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের রচনাকে ব্যঙ্গ করবার জন্য আনন্দ বিদায় নামে একটি নাটিকা লেখেন—রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় ভেঙে যায়—আমাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি কবিগণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে প্রত্যভিযান করেন। এই ঘটনাটি বড় বেদনাদায়ক হয়েছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলছি—সে সময়ে রজনীকান্ত জীবিত ছিলেন না।

এই সময়ে গীতি-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পরই রজনীকান্তের স্থান ছিল। রজনীকান্তের হাসির গানও বৈঠক মজলিসে গাওয়া হত। নলিনীকান্ত সরকার রজনীকান্তের হাসির গান গাইতেন। রজনীকান্তের স্বদেশী গানও পথে পথে গীত হত। ১৯১০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি করতেন—সেজন্য সেকালের অধিকাংশ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। অনেকে তাঁকে চোখে দেখেনি। তিনি যখন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিলেন—তখন অনেকেই তাঁকে প্রথম ও শেষ দেখতে গিয়েছিল।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৯০৮ সালে। সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে আমি রাজসাহী গেলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন—এক বৎসর তাঁর সঙ্গে পত্রালাপও চলেছিল। কেবল গান রচনা করেই তিনি সে যুগের একজন বরেণ্য কবি ব'লে গণ্য হয়েছিলেন। তবু অর্থাভাবে তাঁকে সামান্য মূল্যে বাণী কল্যাণীর স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল।

আর একজন বরেণ্য কবির কথা এ-যুগের পাঠকরা ভুলে গেছেন—তিনি বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। একই বৎসরে দুইজনের জন্ম—প্রায় একই বৎসরে দুইজনের মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এঁর রচনায় যথেষ্ট, সমবয়স্কের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পাতের এটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন নানা ভাষায় নিষ্ণাত এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত। তাঁর প্রগাঢ় ও অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ছন্দের কারুকার্যে, ভাবের গভীরতায়, রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনায়, অনুবাদকুশলতায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে, রচনার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যে বিজয়চন্দ্র উচ্চশ্রেণীর কবি। তাঁর কবিতার যথাযোগ্য প্রচার বা আলোচনা হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ ও আমার সঙ্গে বিশেষ তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ লাভ করে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম, তখন তিনি বঙ্গবাণী পত্রিকার সম্পাদক। বীরবলের মতো তিনিও আমাকে গদ্য রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন।

বিজয়চন্দ্র শেষ বয়সে অন্ধ হয়েছিলেন। অন্ধদশাতেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন ও গ্রন্থাদি রচনা করতেন।

পঞ্চভূত

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কোথা কবি তোমার সে প্রাণরসে পূর্ণ পঞ্চভূত
সভ্যতার সংকট-শেষে বিশ্ব বুঝি মানুষেরই নয়।
অতিমানবিক সৃষ্টি, অক্ষপথে বিন্দু গুটিকয়—
ক্ষিতি অপ উবে গেল, রইল শুধু
ব্যোম ও মরুৎ!
সেথা ঊর্ধ্ব অধঃ নেই, আছে শূন্য বাহির বিদিক,
যদি বা মানুষ থাকে, আঁটা রয় বর্ম ও মুখোস
সাগাত্রের সুনিপুণ নিশ্চিহ্নের মহা পরিতোষ
নির্মম ক্লান্তির তালে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি
টিক্ টিক্।
শান্তি নেই জীবলোকে বিশ্বাসিত সম্পর্ক-বিধৃত
শুধু গতি শুধু তেজ প্রতিস্পর্ধী ভস্মে
অসংবৃত!

ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা

* গল্প *

শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী

প্রেমতোষ দত্ত বাংলাদেশে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গে) একটা নাম। তাদের দলের একজন প্রতিষ্ঠাবান নেতা। তাঁর কর্ম-পরিচয় প্রকান্ড বড়। বিক্রমের দিক দিয়ে, ত্যাগ স্বীকারের দিক দিয়ে, দেশপ্রেমের দিক দিয়ে, সব দিক দিয়েই।

কিন্তু ব্যাধি কাউকে খাতির করে না। পঞ্চাশের কাছে এসে প্রেমতোষ কঠিন ব্যাধিতে পড়লেন।

ডাক্তার একটা প্রকান্ড বড় ল্যাটিন নাম করে বললেন, হাসপাতালে যেতে হবে। অপারেশন ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই।

প্রেমতোষ হেসে বললেন, ল্যাটিন নামে আমার কোনো দরকার নেই। রোগের নাম জানার কোনো আগ্রহও নেই। হাসপাতালে যদি যেতেই হয় তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন।

ব্যবস্থা ডাক্তারকে করতে হল না। প্রেমতোষকেও না। তাঁকে খুশি করবার জন্যে হাজারো লোক তৈরি। খবরটা পাওয়া মাত্র তারা ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে ভালো একটা কেবিনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর প্রকান্ড একখানা মোটরগাড়ি তাঁর দরজায় এসে দাঁড়াল তাঁকে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে।

কার গাড়ি, কে দিলে হাসপাতালের ফি কেউ জানে না। প্রেমতোষেরও তা নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। আগ্রহ নিরর্থক। কারণ টাকাটা যেই দিক, হাসপাতাল হাসপাতাল, তার কেবিন কেবিন।

প্রেমতোষ অকৃতদার।

সুতরাং কারও কাছে বিদায় নেবার নেই। চোখ মুছতে মুছতে কেউ তাঁর সঙ্গে মোটরে এসে উঠবে না। শুষ্কমুখে ছেলে-মেয়েরা সামনে এসে দাঁড়াবেও না।

ঝাড়া-হাত-পা প্রেমতোষ গাড়িতে এসে উঠলেন। আর যারা উঠল তারা প্রেমতোষের সাঙ্গোপাঙ্গ। এদেরও তিনি খুব ভালো করে চেনেন না।

চিরকালই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়েই তাঁর সংসার। কিন্তু যাঁদের নিয়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে তিনি সংসার পেতেছিলেন, তাদের প্রায় কেউই আর নেই। একে একে কি করে যেন তারা কোথায় কোথায় চলে গেল। যারা এখন রয়েছে তারা সবাই নতুন লোক। তারা মোটরের সামনে-পিছনে উঠে পড়ল।

আস্তে আস্তে চলেছে মোটর। তার মধ্যে গভীর আলস্য ও ঔদাসীন্যে চোখ বন্ধ করে চলেছেন প্রেমতোষ।

গাড়ি হাসপাতালের ফটক পার হয়ে একটুখানি যেতেই টের পাওয়া গেল, এই মহামান্য রোগীর অভ্যর্থনার জন্যে হাসপাতাল বেশ সচকিত হয়ে উঠেছে।

সংশিলষ্ট ডাক্তারেরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাজের অছিলায় নার্সরা বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি আসলে মস্ত বড় গাড়িখানার দিকে, যার মধ্যে এলিয়ে রয়েছে প্রেমতোষ দত্তের অসুস্থ দেহ।

ডাইনে-বাঁয়ে প্রচুর ভিড়। শুধু ডাক্তার-নার্স-জমাদারের নয়, অনেক বাইরের লোকেরও। তাদের কিছু প্রেমতোষের বিশেষ পরিচিত, কিছু অল্প-পরিচিত, কিছু বা নিতান্ত মুখচেনা।

এই যে স্যার, এই যে স্যার!

সবাই প্রেমতোষের আরাম সুবিধার জন্যে ব্যস্ত। প্রেমতোষ ইচ্ছা করলে তাঁদের সকলেরই সঙ্গে দুটো হেসে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু নিজের অসুখ সম্বন্ধে সকল সময়েই তিনি সচেতন। সচেতন যে, অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিক ভদ্রতার নিয়ম-কানুন মেনে না চললেও কেউ দোষ ধরবে না।

ডাক্তারের পিছু পিছু একখানা ইনভ্যালিড চেয়ারে প্রেমতোষ চললেন লিফটের কাছে। সেখান থেকে কেবিনে।

প্রেমতোষ, আলসাভরেই অবশ্য, ছোট্ট কেবিনের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। ঝকঝক করছে মেঝে। বিছানায় সদ্য-পাট-ভাঙা দুগ্ধফেননিভ আস্তরণ। টুকিটাকি যা দু' একটা আসবাব আছে তাও পরিমার্জিত।

পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ল।

তখন হাসপাতাল কি নোংরাভাবেই না থাকত! স্বাধীনতা-লাভের পরে সব দিকেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বিকেলে প্রেমতোষের কেবিনে বহু বিশিষ্ট লোকের ভিড়। আরও বহু বিশিষ্ট এবং অ-বিশিষ্ট লোক ভিতরে ঢুকতে না পেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। উদ্দেশ্য ভিতরের লোকেরা বেরিয়ে এলে তারা ঢুকবে। হলও তাই। একদল বেরিয়ে এলো আর একদল ভিতরে ঢোকে।

ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে বলেন, রোগীর ঘরের সামনে এত লোকের ভিড় ঠিক নয়।

সে কি আর ভিড়ের লোকেরা বোঝে না?

কিন্তু উপায় কি?

দেখা তো দিতেই হবে। প্রেমতোষকে বোঝাতে হবে, তারা সবাই প্রেমতোষের জন্যে কাতর। অন্তত একবার চোখের দেখাও দিতে হবে। তারপরে স্লিপ-বাঁধা ফলের টুকরি তো রইলই। নাম-লেখা স্লিপ চোখে পড়তেও পারে, না পড়তেও পারে।

সুতরাং যারা এসেছে, একবার চোখের দেখা না দিয়ে তারা যেতে পারে না। তা সে যতক্ষণই অপেক্ষা করতে হোক।

ফলের টুকরিতে ছোট কেবিনটায় তিল ধরবার জায়গা নেই। কি ফল খাওয়া চলে, কি চলে না, কেউ জানে না। সুতরাং এই সময় যত

রকমের ফল পাওয়া যায় সবই এসে জুটেছে। কেবিনটা দেখলে মনে হচ্ছে যেন ফলের দোকান।

ভিড় কমলে প্রেমতোষ সোজা হয়ে বললেন। ডাক্তার, নার্স, জমাদার, জমাদারণী যে কেউ ঘরে আসে, তারই হাতে গোটা কয়েক করে ফল দেন নিয়ে যাবার জন্যে। তারা ভয় পায়, ইতস্তত করে। কিন্তু প্রেমতোষ ছাড়বার পাত্র নয়।

বলেন, না নিলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছেন? রোজ এমনি ধারা ফলের পাহাড় জমবে। সেগুলো পচবে। দুর্গন্ধে গোটা হাসপাতালের রোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। নিন। নিয়ে যান। যতগুলো পারেন। আমাকে রক্ষা করুন।

কথা মিথ্যা নয়।

বড় ডাক্তাররা প্রেমতোষের মর্যাদা রক্ষার জন্যে একটি আপেল কি নাসপাতি তুলে নেন। জমাদাররা গোটা কয়েক করে। ছোটরা ঝুড়ি-কে-ঝুড়ি পাচার করতে লাগল। প্রেমতোষের অনুচররাও কয়েকটা ঝুড়ি নিয়ে গেল।

সমস্ত সন্ধ্যা ফল বিতরণ চলল। রাত্রি ন'টায় ঘর অনেকটা পরিষ্কার হল। কিন্তু ফলের গন্ধ আরও কিছুক্ষণ রইল।

প্রেমতোষ হেসে বললেন, এর নাম স্মৃতি।

—কি রকম?

প্রেমতোষ বললেন, মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার স্মৃতি থাকে। ফল গেছে, তার গন্ধ রয়েছে। ফলের স্মৃতি।

—আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না তো?

হেসে প্রেমতোষ বললেন, একটু হবে হয় তো। কিন্তু তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

—কেন?

—কারণ বহুদিন থেকেই ঘুম আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সারারাত্রি বিছানায় ছটফট করে ভোরের দিকে, ঠিক ঘুম নয়, একটুখানি তন্দ্রার মতো আসে। সূর্যের আলোয় শিশিরের সঙ্গেই তা উবে যায়।

—দিনে ঘুমোন না?

—না। তখনও একটুখানি তন্দ্রার মতো আসে। তারপরে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ি। পঁচিশ বৎসর এমনি চলছে।

প্রেমতোষ হাসলেন।

শ্রোতারা অবাক। এর নাম দেশসেবা। যোদ্ধার জীবন। আরাম, বিলাস এবং বিশ্রাম ভুলে যেতে হয়।

সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে প্রেমতোষের দিকে চেয়ে রইল।

একজন ডাক্তারকে প্রেমতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন আমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে মনে করেন।

সিনিয়র ডাক্তার কি যেন ভাবছিলেন। বললেন, মাসখানেক রাখব ভাবছি। কি আরও বেশি।

—মাসখানেক?—প্রেমতোষ চমকে উঠলেন, —অসুখটা কি খুব কঠিন মনে হচ্ছে?

—মোটেই না।

—তবে অকারণ একটা কেবিন আট রাখব কেন?

—কারণ যে জিনিসটা আপনার সব চে বেশি প্রয়োজন তা ওষুধ নয়, পথ্যও নয়।

—তবে?

—বিশ্রাম। যা শুনলাম তাতে মনে হ নাইরে আপনার বিশ্রাম হবে না।

—মোটেই না।

—সুতরাং আমাদের জিম্মায় কিছুদি এখানে থাকুন।

প্রেমতোষ উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন ভিতরে ভিতরে তাঁর মন যে বিশ্রামের জন্যে এত খানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, এ তিনি একদিন টের পাননি। প্রবল কর্মতরঙ্গে কাজ ছাড়া আ কিছু ভাববারই সময় পাননি।

বললেন, খুব ভালো হয়। পারবেন রাখতে

ডাক্তার বললেন, তাই তো মনে করছি।

—কিন্তু লোকের ভিড়?

—বন্ধ করে দোব। খবরের কাগজে নোটি দোব, কেউ যেন দেখা করে আপনাকে বিরব না করে।

—ফল? ফলের গন্ধ?

—ওর কোনো উপায় নেই। ওটুকু সহ করতে হবে।

—খুব ভালো হয়।

প্রেমতোষ হাসলেন।

(শেষাংশ ২২৩ পৃষ্ঠায়)
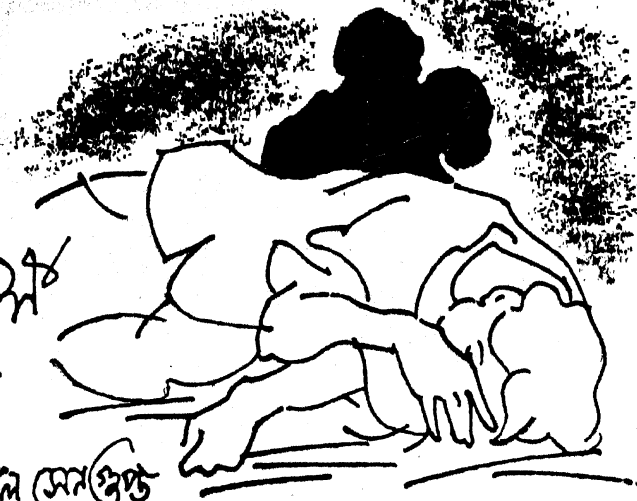
অসুখটা সন্দেহজনক। বুকে পিঠে ব্যথা, খুক খুক করে কাসি। বিকেলের দিকে রোজই একটু করে জ্বর হয়।

সঞ্জীবন চৌধুরী আগাগোড়া পরীক্ষা করে বললেন, যা ভয় করছ, তাই। তবু একটা প্লেট করিয়ে নাও।

শমী একটু ইতস্তত করে বলল, আজই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি যক্ষ্মা হয়, তাহলে ত বাড়ীতে রাখা ঠিক হবে না।

নিশ্চয় না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দুর্মিনিট পরে বললেন ডাক্তার, সে জন্যে চিন্তার কিছু নেই। সীট জোগাড় করে দোব আমিই। তুমি শুধু প্লেটটা করিয়ে ফেলো।

শমী বলল, আচ্ছা এত বয়সে যক্ষ্মা হয়?

ডাক্তার বললেন, হয় বৈকি। তবে অল্প বয়সের তুলনায় কম হয়।

ডাক্তার চলে যেতে ভুবনেশ্বরী বললেন, শেষ কালটা আর ওকে হাসপাতালে দিসনে রে। আমি ওকে নিয়ে বরং শান্তিপুরে চলে যাই। সেখানে বিপিন কবরেজ চিকিচ্ছা করলেই...

শমী বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে তুমি বলো মা, তার ঠিক নেই। অসুখটা হল যক্ষ্মা। গেঁয়ো বিপিন কবরেজ কি করবে তার?

ভুবনেশ্বরী বললেন, দেখিস ঠিক খাড়া করে তুলবে সে ওকে। তোর দাদু বলতেন, বিপিন হল ধন্বন্তরী।

কিন্তু তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকেই কে দেখে তার ঠিক নেই। তুমি পারবে এই রোগীর সেবা করতে, আবার রান্না-বাড়া, কাজ-কর্ম, সব করতে?

না পারলে আর উপায় কি বাবা?

মনীষা পাশেই ছিল। সে ফোঁস করে মন্তব্য করল, একটা চাকরের জন্যে এত হয়রানিতে লাভ কি? অসুখ হয়েছে, হাসপাতালে পাঠানো হক। সারল ভালো, না সারলে কি আর করা যাবে?

ভুবনেশ্বরী বললেন, চাকর বলতে তোমরা যা বোঝ, কাঙালী তা নয়। আমার শ্বশুর ওকে নিয়ে এসেছিলেন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে। এক রকম জামা-কাপড়, এক রকম খাওয়া-পরা দিয়ে মানুষ করেছিলেন ওকে নিজের ছেলের সঙ্গে। পড়িয়েছিলেন এন্ট্রান্স পর্যন্ত।

মনীষা ঠোঁট উল্টে বলল, আমার ও-সব সেকেলে গল্প শুনলে গা জ্বালা করে।

তা বললে ত চলবে না বাছা। সেকাল থেকেই একালটা এসেছে। বনিয়াদটা আছে বলেই দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ও-সব থাক। কাঙালী এই সংসারের কি, সে আমি জানি। পাঁচটি বছর একটানা বিছানায় পড়ে থেকে জোয়ান বয়সে কর্তা চলে গেছেন। যাবার সময় তিনি বলে গেছেন, সংসার রইল, আর তার মাথার ওপর রইল কাঙালী। খোকার তখনো জন্ম হয়নি।

মনীষা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে শমী বলল, আহা-হা মণি, উচিত কথা সব সময় না হয় না-ই বললে!

দুফোঁটা চোখের জল মুছে ভুবনেশ্বরী বললেন, অদিনে আজ ওকে হাসপাতালে ঠেলে দোব, সে হতে পারে না। আমার যতক্ষণ জ্ঞান আছে...

ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল সকালেই আমাদের রেখে আসবি তুই। অফিস থেকে আসার সময় বরং দুখানা টিকেট কেটে আনিস। যা বাঁধা-ছাঁদা করার, সব আমি করে রাখব দুপুর বেলার মধ্যেই।

* * *

দুজনকে শান্তিপুরে রেখে শমী যখন চলে আসছে, কাঙালী তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, বাপ আমার, রাজা হও। দুঃখী লোক যেন তোমার কাছে এসে সোয়াস্তি পায়, হতভাগা যেন পায় একটু ভালোবাসা।

বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এল তার। চোখদুটো উঠল চক চক করে।

বলল, আর দেখা হবে না আমার সঙ্গে। না হক, আমার আশীর্বাদ রইল তোমার ওপর চিরদিনের জন্যে।

ভুবনেশ্বরী প্রায় কিছুই বললেন না। চাপা একটা অভিমান নিয়ে চলে এসেছেন তিনি কলকাতা থেকে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কাঙালীকে মনীষা নিছক একটা আপদ মনে করে। তার জন্যে ওষুধ-পথ্য, খরচ, কোনটাই তার অভিপ্রেত নয়।

শমী যাবার আগে একশোটা টাকা দিল ভুবনেশ্বরীর হাতে।

তিনি বললেন, আমার সামান্য গয়না-গাটি যা ছিল, তা নিয়ে এসেছি। দরকার হলে, তা বেচেই আমি মানুষটার চিকিচ্ছা করাব বাবা। আমি ত আর ওকে তোমাদের মতো চাকর বলে মনে করি না!

শমী বলল, মনীষার ওপর তুমি রাগ করে থেক না মা। ও এ-সংসারে নতুন এসেছে। আমি ত কোনদিন অবিবেচনা করিনি। যাই হক, তেমন-তেমন বুঝলে, তুমি টেলিগ্রাম করো আমাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।

* * *

সত্যি সত্যি টেলিগ্রাম যখন এল, শমী তখন বিছানায় পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

গজ গজ করতে করতে মনীষা বলল, বাড়া-বাড়ি দেখে আর বাঁচি না। চাকরের অসুখ করেছে ত ত্রিভুবন রসাতলে গেছে! হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! বাপের জন্মে এমন দেখিনি।

অসহিষ্ণু সুরে শমী বলল, আহা-হা, ওর কথা নয়। অনন্ত টেলিগ্রামে জানিয়েছে, মার খুব অসুখ।

হবেই ত। দিনরাত্রি ঐ নফরের অত সেবা করলে বুড়ো বয়সে দেহ কদিন মজবুত থাকবে? কি দরকারটা ছিল ওকে নিয়ে দেশান্তরী হবার?

* * *

একটু সাব্যস্ত হয়ে শমী এল শান্তিপুরে।

সে-ও উঠানে ঢুকল, আর হরিবোল দিয়ে শব-যাত্রীরাও এসে দাঁড়াল সদর দুয়ারে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল শমীর। তাহলে কি মা আর নেই?

না, দেখল রোয়াকে নিঃশব্দে বসে আছেন ভুবনেশ্বরী। বুঝল মা নয়, কাঙালী চলে গেছে।

ভুবনেশ্বরী বললেন, ওর নামে তার করলে ত বৌমা তোমায় আসতে দেবে না। তাই নিজের অসুখ বলে জানিয়েছিলাম বাবা। শেষ কালটা

(শেষাংশ ২২২ পৃষ্ঠায়)

·· গল্প ··

রোগ ও তাহার প্রতিকার

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ঘটনাটা যে ঠিক কি ঘটল তা কেউই ভাল জানে না। কারণ কেউই ঠিক বুঝতে পারেনি। বোঝবার অবকাশও পায়নি তেমন। অমন সুস্থ সবল কর্মঠ মানুষটা—ওঁর প্রতিবেশী তেঁতুল পালের ভাষায় 'গাট্টাগোট্টা' আর বিলেতের ভাষায় 'খাটোগাড়েন' (মোটে?—কালোটা বলতে পারব না—কারণ অভিধানে শব্দটা নেই)—হঠাৎ আঁ-আঁ শব্দ করতে করতে চেয়ার থেকে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন একেবারে—কেউ কিছু বোঝবার কি কোন প্রতিকার করবার আগেই, এক্ষেত্রে কে কি বুঝবে বলুন?

কেউ কিছু বুঝল না বলেই কেউ কিছু করবে না—শাস্ত্রের এমন কোন অনুশাসন নেই। রোগ নির্ণয় শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

প্রহ্লাদ ঘোষ আর্তনাদ করে উঠলেন যেন, 'থ্রম্বোসিস! তোমরা হাঁ করে দেখছ কি! একজন ছুটে ডাক্তার নিয়ে এসো!'

সুমন্ত প্রামাণিক সংক্ষেপে বললেন, 'সেরিব্রাল। ইস—ব্রেনেতেই চোট লেগে গেছে!'

আশু মুখুজ্যে বললেন, 'উঁহু, করোনারী। সেরিব্রাল হলে নাক দিয়ে রক্ত গড়াত এতক্ষণে।'

সুকান্ত জবাব দিলেন, 'সে সময় যায়নি এখনও। এই তো সবে শুরু।'

ভুষণদা বললেন, 'ও সব কিছু না—স্ট্রোক হয়েছে একটা সিম্পল স্ট্রোক। ব্লাড প্রেসার ছিল নিশ্চয়ই যা খাওয়া খেতেন—না থাকাই তো আশ্চর্য!'

নির্মলদা বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—স্ট্রোক ঠিকই। তবে ওর মধ্যে সিম্পল কিছু নেই দাদা, সবই কমপ্লেক্স। আসলে ওর সবটাই থ্রম্বোসিস।'

এঁরা বাদানুবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনবার লোকও ছিল সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাড়িতেই ছিলেন, খবর পাওয়া মাত্র চলে এলেন। পাড়ার ডাক্তার কিন্তু তার নাম-যশ আছে, একবার ডাকলে বড় একটা কোথাও যান না, দস্তুর মতো বার কতক হাঁটাহাঁটি করে তবে আনতে হয়। কিন্তু এখানে আলাদা ব্যাপার। বংশীবাবুর অসুখ শুনলে আসবেন না কে? বংশীবাবু এ পাড়ার মাথা, পাড়ার গৌরব। তিনি শুধু ধনীই নন—গণ্যমান্যও বটে। সম্প্রতি আবার এম-এল-এ হয়েছেন। তাও কোন দলে নাম লিখিয়ে নয়—ইন্ডিপেন্ডেন্ট এম-এল-এ, একদিকে কংগ্রেসী অপর দিকে বামপন্থী সমর্থিত—দুই প্রার্থীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সগৌরবে ঢুকেছেন তিনি। মন্দ লোকে বলে ভোট কিনেছেন প্রত্যেকটি টাকা গুনে দিয়ে—কিন্তু মন্দ লোকের বলাকে কোনদিনই গ্রাহ্য করেননি বংশীবদনবাবু, আজই বা করবেন কেন?

ডাক্তার যাঁকে ডাকা হল—সুশীল অর্ণব বহুদিনের বিচক্ষণ ডাক্তার, তাই বলে বুড়ো-হাবড়াও নন। বড় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, পড়াশুনোও ভাল। বিলেতে না গেলেও বিলাত-ফেরতের ধাঁচ ধরনটা আয়ত্ত করেছেন পুরোপুরি। সুতরাং সেই মতো একটা অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক ভাব নিয়েই তিনি এসেছিলেন কিন্তু রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর আর সে শান্ত গাম্ভীর্য রাখতে পারলেন না। তাঁর মুখে-চোখে ইতর লোকের মতোই বিস্ময় ফুটে উঠল একটা। বরং তাকে বিহ্বলতা বলাই উচিত।

'এ তো থ্রম্বোসিস নয়!'

'থ্রম্বোসিস নয়?' উপস্থিত সকলের মুখ দিয়ে হিস-হিস শব্দ বেরোল একটা; 'বলেন কি? তাহলে কি এটা?'

যেন থ্রম্বোসিস মনে করেই সকলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—এইবার বিচলিত বোধ করছেন একটু—

'আজ্ঞে—কি তবে এটা দেখলেন?'

তেঁতুল পাল এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন।

কি দেখলেন তা ডাক্তারও জানেন না। তাঁর শাস্ত্রে যাকে স্ট্রোক বলে তা নয়, বুকের অবস্থা খুবই ভাল, নাড়ি একটু উত্তেজিত হলেও ভয়াবহ নয়, ব্লাড প্রেসার কম—তবে?

কিন্তু কিছু বুঝতে পারছেন না—এ কথা বলা সম্ভব নয়। ডাঃ অর্ণবকে সবাই বিচক্ষণ ডাক্তার বলে জানেন—তাঁর মুখ থেকে বিচক্ষণ মতামত শুনতেই অভ্যস্ত সবাই। তিনি মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, 'এটা একটা ফীট মতো হয়েছে। আপনারা সবাই চারদিকের হাওয়া ছাড়ুন, মুখে মাথায় জল দিন। বাড়িতে স্মেলিং সল্ট আছে? না থাকে তো কেউ ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন একটা!'

থ্রম্বোসিস নয় শুনে সকলে কিছুটা নিরুৎসাহ হলেও ডাক্তারের নির্দেশ পালন করার লোকের একেবারে অভাব হল না। জল এল পাখা খোলা হল—কে একজন হাত পাখাও আনলে একখানা,—স্মেলিং সল্ট মায় বুটিং পোড়ার গন্ধ পর্যন্ত শোঁকানো হল কিন্তু বংশীবদনবাবুর 'ফিট' ভাঙল না। যেমন পড়ে ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন তিনি; দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ এবং দুই চক্ষু নিমীলিত হয়েই রইল। দাঁতে-দাঁত লেগে গিয়েছিল সেটাও খুলল না—উল্টে কান পেতে শুনলে একটা মৃদু গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা যেতে লাগল এখন।

ডাক্তার প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলেন—এইবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রশান্ত ললাটে ঘাম দেখা দিল—চির-অবিচলিত ঠোঁটের ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী নষ্ট হয়ে মুখটা তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই হাঁ হয়ে রইল খানিকটা। এক কথায় তিনি এ রোগের আগা এবং গোড়া—মাথা এবং মুণ্ড কিছুই ধরতে পারলেন না।

এই—যাকে বলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে নির্মলদা বলে উঠলেন, 'অত সহজে এর হদিস করতে পারবে না ডাক্তার, বংশীবদন অত সহজে উঠে বসবে না। চিরদিন

সবাইকে ঘোল খাইয়েছে—আজ তোমাকেই কি এমনি ছাড়বে? যাকে বলে বংশীবদন ভড়, মানুষটি অত সহজ নয় সেটা মনে রেখো।'

বংশীবদনবাবু সম্বন্ধে এই তিনটি শব্দই যথেষ্ট। এই-ই ওঁর যথার্থ পরিচয়।

মানুষটি বড় সহজ নয়।

কখনও কোনদিনই সহজ ছিলেন না তিনি।

প্রথম বয়সে কিভাবে টাকা জমিয়েছিলেন তা কেউ জানে না—তবে কিম্বদন্তী এই যে, মামা ওঁকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছিলেন, তাঁকে শেষ অবধি আত্মহত্যা করতে হয়েছিল, মামাতো ভাই-বোনেরা চেয়ে-চিন্তে পরের দয়ায় মানুষ হয়েছে। মামা মরবার পর চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকেই নাকি চাকরী করছেন তিনি—সাধারণ বাঙ্গালী ফার্মের কাজ, সামান্যই বেতন, কিন্তু তারই কপাল গুণে কোনটা টেঁকেনি। পর পর যে তিনটি ফার্মে কাজ করেছেন, সে তিনটিরই মালিককে দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে। শেষেরটির নাকি মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে—বিশেষত বংশী শব্দ কানে গেলেই নেচে-কুঁদে লাফিয়ে-চেঁচিয়ে—পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা করতেন। অথচ সত্যিই কিছু বংশীবাবুর জন্য তাঁদের কারবার যেতে পারে না—কারণ তাঁরা যখন দেউলে হয়েছেন তখন বংশীবাবুর আর কতই বা বয়স, বড়জোর একুশ হবে! ঐ বয়সে আর কিইবা করতে পারেন তিনি!

না, সে সব কিছু নয়। তবে ঐতেই বংশীবদনবাবুর ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল একটা চাকরীর ওপর—মনিবদের বেইমানী দেখে দেখে আর ওদিকে যেতে ইচ্ছে করেনি। এরপর—সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি ব্যবসাতেই নেমেছিলেন।

কিন্তু ঐ যে বলে না (বংশীবদনবাবু নিজেই বলতেন কথাটা) 'তুমি যাবে বঙ্গে তোমার কপাল যাবে সঙ্গে'—তাই যেন হল ওঁর। সোজাসুজি কারবারে নামার মতো পুঁজি বা মূলধন ওঁর ছিল না, তাই প্রথম প্রথম ভাগেই করতে হয়েছে, অপরের সঙ্গে। কেউ ছোটখাটো কোন কারবার করেছে কিন্তু টাকার অভাবে জুৎ করতে পারছে না, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে দেখলেই বংশীবদনবাবু তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। কিছু টাকা ঢেলে অংশীদার হতেন। যার মোটে তিন হাজার টাকা পুঁজি তার পক্ষে আরও দুই কি তিন হাজার টাকা পেলে সুবিধেই হবার কথা কিন্তু এমনই ভাগ্য বংশীবাবুর যে প্রত্যেকবারই তাঁর প্রচেষ্টায় হিতে বিপরীত হয়েছে। যাদের যাদের সঙ্গে ভাগে কারবার করতে গেছেন—তাদেরই কারবার উঠে গেছে কিছুদিন পরে। নিজেদের চালের ভুলে, অভিজ্ঞতার অভাবে বা গোঁয়ার্তুমির জন্য বিপুল দেনায় জড়িয়ে পড়েছে তারা। সেক্ষেত্রে নিজের আসলটা উদ্ধারের জন্য যদি বংশীবাবু তাদের কারবার বেচে-কিনে ক্রোক করে নিজের হক্কের টাকা আদায় করে নেন তো খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

ক্রমশ এতেও অরুচি ধরে গেল তাঁর। স্থির করলেন পুঁটি মাছের ঝাঁকে আর যাবেন না, মরতে যদি হয় তো রুই মাছের ঝাঁকে গিয়ে মরাই ভাল। ছোটখাটো কারবারে আর না—এবার যদি ব্যবসায় জড়াতে হয় তো যা আছে গরীবের ক্ষুদ-কুঁড়ো সব দিয়ে একটা বড় করে কোম্পানী ফাঁদবেন নিজেই। লিমিটেড কোম্পানী।

ফাঁদলেনও নিজেই উদ্যোগী হয়ে, একটা নয় কয়েকটাই পর পর। কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং—সব কটা কোম্পানীই পর পর লিকুইডেশ্যানে গেল। অবশ্য তাতে বংশীবাবুর কোন ক্ষতি হয়নি—তখন নাকি তা হত না। লিমিটেড কোম্পানী যতই ডুবুক—ম্যানেজিং এজেণ্ট বা ডিরেক্টারদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগত না। পাঁকাল মাছের মতোই বেরিয়ে আসতে পারতেন তাঁরা—পিছলে।

যাই হোক—এইভাবে গোটা এগারো কোম্পানীর সুব্যবস্থা করতে করতেই যুদ্ধ এসে গেল, তার সঙ্গে মন্বন্তর। লিমিটেড কোম্পানীর কাজটা বড়ই তুচ্ছ মনে হল তখন। নেমে পড়লেন কালো বাজারে—চাল থেকে সিগারেট, কামানোর ব্লেড থেকে চিনি—কোনটাই বাদ গেল না। তার সঙ্গে মিলিটারী কনট্র্যাক্ট তো আছেই। সেও নানাবিধ ও বিচিত্র। কখনও নিজে কাজ করতেন না, তার কাজ ছিল শুধু ঠিকা বার করা, তারপর সে ঠিকা ভাগ করে নেবার জন্য তো কত লোকই প্রস্তুত। তারা লাভ করুক বা লোকসান করুক—ওঁর লাভ বাঁধা, তাও আগাম এসে যেত। মন্দ লোকে বলে যে, সে সময় তিনি সরবরাহ করেননি এমন বস্তু নেই বা এমন প্রাণী নেই। চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদ—যে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। এবং ঠিকা বার করার জন্যেও দেননি এমন ঘুষ নেই, পদার্থ থেকে প্রাণী সবই যুগিয়েছেন নির্বিচারে। তবে মন্দ লোকে কি না বলে! আর তাদের কথাতে কান দেবার মতো মানুষও বংশীবদন ভড় নন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে সময় ওঁকে রায়-বাহাদুর খেতাব দিতে চেয়েছিলেন—যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর সর্ববিধ সাহায্যের জন্য। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বংশীবাব তা নেননি। এদেশে তাদের রাজত্ব যে বেশীদিন নয় তা যেন তিনি তখনই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা আসার পর বংশীবাবু দিন কতক কংগ্রেসী মহলে ঘেঁষেছিলেন—তারপর দিন কতক বিরোধী দলে কিন্তু কোথাও ভাল লাগেনি তাঁর। ওরা সবাই টাকা চায়, তাঁর টাকার জন্যেই নাকি তাঁকে দলে নেবার আগ্রহ। এত বোকা বংশীবাবু নন যে তাঁর রক্ত জলকরা টাকা ঢেলে ওদের দল বজায় রাখবেন।

এখন আর তিনি কোন দলেই নেই। সখ হয়েছিল কিছু টাকা খরচ ক'রে এম এল এ হয়েছেন। টাকার শক্তি তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন—যত দিন ও বস্তুটি তাঁর পর্যাপ্ত আছে, ততদিন কোন দলই কিছু করতে পারবে না। যদি সখ হয় তো আসছে বারে দিল্লীর লোকসভাতে গিয়েও বসতে পারবেন।

টাকার শক্তি জানেন বলেই তার সাধনাও ছাড়েন নি। তবে এখন আর বেশী পরিশ্রম করতে পারেন না। দৌড়-ঝাঁপ পেরে ওঠেন না তত। এখন শুধু খুঁজে খুঁজে নাবালক আর বিধবার সম্পত্তি কিনে বেড়ান, মামলা-মকদ্দমা ক'রে নিজের অধিকার কায়েম ক'রে অনেক চড়া দামে বেচেন অথবা মামলা-মকদ্দমা শুরু হবার আগেই কিঞ্চিৎ লাভে বেচে দিয়ে স'রে পড়েন। এ ছাড়াও কিছু করেন তিনি—সমব্যবসায়ীদের সাহায্য করেন পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে। না, তার মধ্যে কোন ভেজাল কি ভেল নেই। কারণ যা করেন তার জন্য ফী নেন—মোটা টাকাই নেন—নিঃস্বার্থ পরোপকারে তিনি বিশ্বাস করেন না কোন দিনই। আর যারা শুধু খাতাপত্রে কিছু হের-ফের ক'রে, দু-একটা শেয়ার এ-হাত থেকে ও-হাতে সরিয়ে সামান্য কয়েকটা কালির আঁচড় টেনে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করবে—তারই বুদ্ধিতে ও নির্দেশে—তাদের কাছ থেকে হাজার-কয়েক টাকা তিনি নেবেন নাই বা কেন? এটা তো ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তাঁর পাওনা। তাঁর পরামর্শ না পেলে কি আর হরিদয়াল কুণ্ডু অতগুলো বড় বড় বিলিতী কোম্পানী কব্জা করতে পারত, না ওসিয়ানিয়া বীমা কোম্পানীর লাখ লাখ টাকা গিয়ে উঠত হরিহর চৌরাশিয়ার সিন্দুকে। তবু তো হরিহর তাঁর সঙ্গে বেইমানী করলে। এক পারসেণ্ট দেবে বলে দেবার সময় দিলে আধ পারসেণ্ট। এক ক্রোরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র। তা তার শোধও উঠেছে হাতে হাতে—বংশীবদনবাবু হাতে থাকলে কি আর ধরা পড়ত, না শ্রীঘর বাস করতে হত? শেষে এসে তো কেঁদে পড়েছিল। 'বাবুজী বাঁচাও। শলা দাও কী করব!' তা বংশীবাবুও একরোখা এক কথার মানুষ। যে বেইমানী করবে তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না, লাখ টাকার লোভ দেখালেও না। শেষ হয়ে গেল সব সম্পর্ক, ঐ পর্যন্তই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাই দেখলেন বংশীবদন ভড়, কেমন ক'রে লোকটা চারদিক থেকে ডুবল!

এহেন বংশীবদন মানুষটি যে সহজ হবেন তা সম্ভব নয়। সহজ মানুষ ননও তিনি। তাই কাঁৎ হয়ে পড়ে থেকেও মানুষকে বেগ দিতে থাকলেন। সব চেয়ে বেগ দিলেন ডাক্তার অর্ণবকেই বেশী ক'রে। ডাক্তার ঘেমে নেয়ে উঠলেন, মাথার চুলগুলো টানাটানিতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠল, উদভ্রান্তের মতো কেবল নিজের টাইটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। অর্থাৎ এতদিনের অভ্যস্ত আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটি মোড়ক খোলা কর্পূরের মতোই উবে গেল—অতি সাধারণ গোলা লোকের মতোই বিচলিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

এই যখন অবস্থা তখন বংশীবদনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সেক্রেটারী—এবং অধুনা তাঁর জামাইও বটে—বাঘা দে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। বাঘা আগে এই বাড়িতেই থাকত এককালে বলতে গেলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন বংশীবদন, বাড়িতে থাকা-খাওয়া ও মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরী দিয়েছিলেন। তা বাঘাও বেইমানী করেনি। দীর্ঘদিন শুধু ঐ পেটভাতাতেই দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা ভূতের মতো খেটেছে সে। সেই বাপ-মরা মা-খেদানো ছেলেটিই ক্রমে তাঁর সব চেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং কোন কোন বিশেষ কারবারে অংশীদারও হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে যতটা চুরি করা স্বাভাবিক বা সম্ভব, অন্য কোন লোক—বংশীবদনবাবু নিজেও এ অবস্থায় বিবেক বাঁচিয়ে যতটা চুরি করতেন—তার থেকে অনেক কম করত বাঘা। তার এই বিশ্বস্ততার চরম পুরস্কার দিয়েছেন বংশীবদনবাবু, তাকে জামাই ক'রে তার জন্য বাহবাও দিয়েছেন নিজেকে। পুরস্কার দেওয়া তো হ'লই, সেই সঙ্গে অমন বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত লোকটিকে বেঁধে ফেলাও হ'ল চিরকালের মতো। জামাই হবার পর অবশ্য বাঘা আর এ বাড়িতে থাকে না, ভালও দেখায়

না সেটা। এই পাড়াতেই কাছাকাছি একটা বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন বংশীবাবু মেয়ে জামাইকে (অবশ্য বাঘারই টাকায়)—ওরা এখন সেখানেই থাকে।

বাঘাকে দেখে সবাই আশ্বস্ত হ'ল। এমন কি ডাক্তারও। তাকে দেখে আশ্বস্ত না হয়ে থাকা যায় না—এমনই একটা দক্ষতার ছাপ আছে তার চেহারায়, তার চলনে বলনে। সে এসেই—'সরুন, সরুন, সরে যান তো—দেখতে দিন আমাকে কী হয়েছে' বলে সবাইকে ঠেলে গুঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে মুহূর্তের মধ্যে সামনে এসে পড়ল।

'এবার বলুন তো—ব্যাপারটা কি?'

সবাই একসঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, একটি মাত্র আঙ্গুল তুলে সবাইকে নিরস্ত ক'রে বাঘা বলল, "মামা তুমিই বল শুনি, কেমন ক'রে কী ঘটল।"

তেঁতুল পালও সাড়ম্বরে বেশ রঙ দিয়েই বলতে যাচ্ছিলেন, দু'টো চারটে কথার পর তাঁকেও থামিয়ে দিলে বাঘা। বললে, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ডাক্তারের কম্ম নয় এ রোগ সারানো। আচ্ছা, উনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে কী কথা হচ্ছিল জানেন? কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কে কী বলছিল?'

নিমেষে একটা স্তব্ধতা নেমে এল সেই গুঞ্জনরত আসরে। অস্বাভাবিক নীরবতা একটা।

সত্যিই তো—এটা তো কেউ লক্ষ্য করেনি—কী কথা হ'তে হ'তে ফাঁট হ'ল ও'র—কার সঙ্গে কথা কইতে কইতে!

কিছুক্ষণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাবার পর—সকলেই যেন এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই!'

—এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে এক কোণে-দাঁড়িয়ে-থাকা পাড়ার ইস্কুলের হেড মাস্টার—পঞ্চানন্দ মাইতিকে। বংশীবাবু সেক্রেটারী, সেইহেতু প্রতি রবিবারেই পঞ্চুবাবুকে একবার ক'রে আসতে হয়—সেদিনও এসেছিলেন। ঠিক তাঁর সঙ্গেই যে কথা কইতে কইতে ফাঁট্‌টা হয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। পঞ্চুবাবুকেই কেউ লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্য করবার মতো ননও তিনি।

এখন সকলের মিলিত অগ্নিদৃষ্টির সামনে এতটুকু মানুষ পঞ্চানন্দ মাইতি সঙ্কুচিত হয়ে আরও এতটুকু হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি তো তেমন কোন কথা—মানে আমি তো ভাল কথাই বলছিলুম। মানে—'

প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে উঠল বাঘা, 'আচ্ছা আচ্ছা সে ভল-মন্দ আমরা বুঝব। কী বলছিলেন তাই বলুন দিকি—চট পট। ঠিক ঠিক বলবেন, একটা কথারও না হেরফের হয়।'

ঠিক ঠিকই বললেন পঞ্চানন মাইতি, না বলবার কোন কারণও নেই কিছু। সত্যিই খারাপ কথা কিছু বলেননি। ও'র এক ভগ্নীপতি এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে হাজার খানেক টাকা ঠকেছিলেন, গরীব মানুষ খুবই কষ্ট হয়েছিল সেজন্য, লোভে পড়েই যথাসর্বস্ব বার ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। তা তখন কোন প্রতিকারই হয়নি। কিন্তু সেই লোকটা এতদিন পরে অন্য একটা ব্যাপারে দারুণ ফেঁসে গেছে—যথাসর্বস্ব তো গেছেই—পুরো তিনটি বছর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। আপীল করেছিল তাতেও কোন ফল হয়নি। আরও একটা মজার ব্যাপার—সম্প্রতি একটা কি চার-আনা টিকিটের লটারীতে ও'র সেই ভগ্নীপতিটি প্রায় উনিশ শো টাকার মতো পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ যা গিয়েছিল তার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিয়েছেন ভগবান।

এইকথাটা শুনতে শুনতেই বংশীবদনবাবুর প্রথম একটু ভাবান্তর হয়। তাঁর মুখখানা কেমন বিকৃত হয়ে উঠতে থাকে, দু একবার তাঁর চেয়ারে বসেই কী রকম এপাশ ওপাশ করেন, তাঁর যে অস্বস্তি হচ্ছে একটা তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তার ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেননি পঞ্চুবাবু। গত রাত্রির গুরু ভোজনের ফলে বায়ুর আধিক্য হয়েছে, এই মনে করেছিলেন। বলার উৎসাহে বলেই যাচ্ছিলেন তিনি। এমনি আরও দুচারটি যা ঘটনা ঘটেছে তাঁর জানাশুনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—তাঁর প্রত্যক্ষ চোখে দেখা—তারই ইতিহাস বিবৃত ক'রে উপসংহার টেনেছিলেন তিনি, 'যে যথার্থ ধর্মভীরু হয়, যে সৎপথে থাকে— তার কথা স্বয়ং ভগবান চিন্তা করেন আর শেষ পর্যন্ত তার ভালই হয়। ধর্মই প্রধান, ধর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই দেখুন না—'

এই পর্যন্ত বলেছিলেন পঞ্চুবাবু, হ্যাঁ, তাঁর বেশ মনে আছে। এই কথাগুলি ঠিক এইভাবে বলেছিলেন। তবে শেষ করতে পারেন নি, তার আগেই—বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে অতর্কিতে দুম্ ক'রে পড়ে গিছলেন বংশীবাবু। ও'র ঘাড়েই কতকটা পড়েছিলেন তাই রক্ষা, নইলে আরও খুবই লাগত। হাজার হোক ও'দের আরামের শরীর তো!

'হু, লাগাচ্ছি!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল বাঘা। বাঘের মতোই যেন গর্জন ক'রে উঠল সে। অসুস্থ শ্বশুরকে উপলক্ষ্য ক'রেই যে তার এখানে আসা, সে কথাটা সে বেমালুম ভুলেই গেছে মনে হ'ল। সেদিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরেই আগে সে পড়ল পঞ্চানন্দবাবুকে নিয়ে।

'বলি কে, কে বলেছে আপনাকে কথাটা, য়্যাঁ? কে বলেছে শুনি? যে সৎ পথে থাকে তার ভাল হয় আর যে পাপী তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়—এমন গাঁজাখুরী গালগপ্প কোথায় পেলেন আপনি? এই সব মিথ্যে কথাগুলো শেখান নাকি ছেলেদের ইস্কুলে? তা হ'লে তো খুব শিক্ষা দিচ্ছেন! হুঁ!'

একটু দম নেবার জন্যেই বোধহয় থামল বাঘা দে, আড়ে একবার শ্বশুর-কাম-মনিব-কাম-অংশীদারের চেহারাটাও দেখে নিলে যেন, তারপর আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বলি কী জানেন আপনি, য়্যাঁ? এতবড় দুনিয়াটায় কোথায় কি হচ্ছে তার কী খোঁজ রাখেন?' ঐ যে সব সেন্ট্রাল এভিনিউ আর রাসবিহারী এভিনিউ আর সাদার্ণ এভিনিউর ওপর বড় বড় বাড়ি আর ঐ যে দেখেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুমুখো গাড়ি—যার একটার দামে আপনার মতো ইস্কুলবাড়ি তিন-চারখানা কেনা যায়—কিসের পয়সা ওগুলো জানেন? সবগুলোই বুঝি নিছক সৎপথের পয়সা?......পাপের সাজা হয় বলছেন, বছরে কতগুলো ক'রে খুন জখম রাহাজানির কিনারা হয় না, ক্রিমিন্যালরা মোটে ধরাই পড়ে না, তার খবর রাখেন? যারা ওকাজ করেছে তারা কত লোক দেখুনগে আপনার আশেপাশেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি হেডমাস্টারী করেন—খবরের কাগজ একখানা তো পড়লে পারেন, এ সব হিসেব তো মধ্যে মধ্যে বেরোয়; তা নিয়ে য়্যাসেম্ব্লীতে কোশ্চেনও ওঠে। খাস দারোগা পুলিশকেই খুন ক'রে গুম্ ক'রে দিচ্ছে তার কিনারা হচ্ছে না—তা সাধারণ মানুষতো কোন ছার। বিশ্বাস না হয় লালবাজারে গিয়ে খতেনটা দেখে আসুন গে যান।'

পঞ্চানন্দবাবু স্তম্ভিত। স্তম্ভিত উপস্থিত সকলেই। আর সকলের সেই প্রস্তরীভূত নিস্তব্ধ অবস্থার মধ্যে নিদারুণ নিঃশব্দ চাঞ্চল্য জাগিয়ে একটি মাত্র ধ্বনি প্রকাশ করলেন—এতক্ষণ যিনি পাথরের মতো পড়েছিলেন—সে বংশীবাবু। একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অতি ক্ষীণ একটা শব্দ উঠল, 'য়্যাঁ———।'

আনন্দিত হবার কথা, এমনকি আনন্দে লাফিয়ে ওঠাই হয়ত উচিত, অন্তত সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাপারটা কতদূর কী হচ্ছে দেখা দরকার—যাই হোক এতক্ষণ পরে একটু হুঁশের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না বাঘা। বরং আগের চেয়েও বেশী ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'অকারণে যারা সাথে সাথে মানুষ মারে তারা বীর যোদ্ধা, যারা সেই মানুষ মারায় হুকুম দেয় তারা বড় বড় রাজনীতিক নেতা আর তাদের মারবার জন্যে সাংঘাতিক সাংঘাতিক হাতিয়ার সন্ধান দেয় তারা বড় বৈজ্ঞানিক—তা আপনি জানেন না? এদের কী হয়, আপনারাই মহাপুরুষ বলে পুজো করেন, বড় বড় পুরস্কার দেওয়া হয়। সৎপথে কারা থাকে?—গরীব গুরেবো বা চাষী মজুর—তাদের কখনও ভাল হয় আপনি দেখেছেন? যেখানে যত অধর্ম যত পাপ—সেখানে তত পয়সা, তত সম্মান, তত প্রতিপত্তি। এসব কি আপনাদের চোখে পড়ে না? কোথায় কোন্ জগতে থাকেন আপনি য়্যাঁ?

আরও হয়ত খানিকটা বক্তৃতা করার ইচ্ছা ছিল বাঘার, উৎসাহের বাষ্পটা অনেকখানি তৈরী করে ছিল নিজের ভেতরে কিন্তু তাতে বাধা দিলেন স্বয়ং বংশীবদনবাবু। আর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'য়্যাঁ—? ও কে কথা কইছে? বাঘা? আমার কী হয়েছে? আমি শুয়ে কেন?'

ডাক্তার হেঁট হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কনুয়ের এক গুঁতো দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করে বাঘাই এবার এগিয়ে এসে বললে, 'কিছু হয়নি বাবু, ঐ একটু তন্দ্রামতো এসেছিল আপনার। উঠুন, উঠে বসুন এবার আপনি—ঘুমতো ভেঙেগেছে, আর কেন!'

ডাক্তারের দৃষ্টির আতঙ্ক এবং হাতের বাধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বাঘা তাঁকে ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বংশীবদনবাবু তাঁর আসনে নিরাপদে ও আরামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর দুর্বল ও ক্লান্ত দৃষ্টিটা একবার উপস্থিত সকলের ওপর বুলিয়ে নিলেন, তারপর ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাববার চেষ্টাও করলেন। তারপর কতকটা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'তা তুই—তুই এ সময় এখানে কেন—কাজ কর্ম ফেলে?'

'আজ্ঞে, আমি আপনাকে সেই খবরটা দিতে এসেছিলুম।'

'কী খবর?' ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন—সেই পূর্ববৎ।

'ঐ যে কাগজে সেদিন পড়েছিলেন

(শেষাংশ ২২২ পৃষ্ঠায়)

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

দোলগোবিন্দরায়ের জীবনদর্শন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মামজোয়ানের নামকরা লোক
দোলগোবিন্দ রায়—
গৌরবর্ণ, বুদ্ধির ছাপ মুখের চেহারায়।
নম্রস্বভাব দোলগোবিন্দের হৃদয়টি সুন্দর!

পরের জন্যে চিন্তা তিনি করেন নিরন্তর।
উদারচেতা, মিষ্টভাষী, কথা বলেন কম;
নরম হলেও অসম্মানকে করেন না হজম।
দোলগোবিন্দ পুরুষসিংহ, সংকল্পে অটল;

কালবোশেখীর ঝড়ে যখন শুকনো পাতার দল
ছত্রভঙ্গ দিকে দিকে,—দোলগোবিন্দ ঠিক
ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন পর্বত নির্ভীক।
কর্মবীরের বসুন্ধরা, বাক্যবীরের নয়;
বলো একবার প্রেমানন্দে, দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দ জ্ঞানতপস্বী; আলমারিতে তাঁর
বাছাই-করা দেশবিদেশের যত গ্রন্থকার।
প্রাচীন নবীন আছেন সবাই দিব্যালোকের দূত।
কাজকর্মের মাঝে মেলে যখনই ফুরসুত,
দোলগোবিন্দ পড়েন পুঁথি। এত অধ্যয়ন
সত্যে হবে প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন—
তারই লাগি। পুঁথির পাতায় কী যাদু যে রয়!

সেই যাদুতে কত যে মন হোলো জ্যোতির্ময়!
মুক্তি পেলো মিথ্যা হোতে! 'ফিলজফি'র ভুল
কত জীবন মাঝ দরিয়ায় ডোবালো বিলকুল।
বিশ্বাস যার যেমন সে ঠিক তেমনি ধারাই হয়।
বলো একবার প্রেমানন্দে, দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দের দৃষ্টিকোণটা একটু
'প্র্যাগম্যাটিক্'—
অর্থাৎ কোন dogma নয়,
Common Senseই ঠিক।

'Ism'গুলোর পিঞ্জরে জ্ঞান আটকা পড়ে যায়;
পুঁথির যতো ছেঁদো বুলি কুহেলিকার প্রায়
ঝাপসা করে দৃষ্টি শুধু; সৃষ্টি করে ভ্রম।
পরিমিত আহার-নিদ্রা, পরিমিত শ্রম;
অহিংসারও নয় গোঁড়ামি; দুষ্ট লোককে ফোঁস;
ফোঁস যদি না করো তোমায় করবে সে
পাপোস।

যার যা মূল্য তার বেশী নয়। দরকার নেই কার?
একচক্ষু হরিণ হলে খাবে ব্যাধের মার।
দোলগোবিন্দ পন্ডিত ঠিক—গোঁড়া কিন্তু নয়।
বলো একবার প্রেমানন্দে,
দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দের মূল কথাটা হচ্ছে সমন্বয়।
অখন্ড এই জীবন হবে জ্ঞানে জ্যোতির্ময়।
এবং কর্মযোগে ধন্য। ক্ষুধায় আতুর জন
নারায়ণের পাদপদ্মে মন দেবে কখন?
ফসল ফলার স্লোগানে নয়, হাতের মেহনত;
কর্মবিমুখ পরাশ্রয়ী—চোট্টা সে আলবত।
হাতের মেহনতের সঙ্গে যুক্ত হ'লে জ্ঞান
ফলবে তখন প্রচুর ফসল, আসবে দেশে প্রাণ।
শ্রেষ্ঠ মানুষ কৃষ্ণ—কারণ দু'দিকে তাঁর চোখ;
হাতে রথের ঘোড়ার লাগাম,
মুখে গীতার শ্লোক।
কর্মজ্ঞানের মিলনকেই তো নয়াতালিম কয়।
বলো একবার প্রেমানন্দে,
দোলগোবিন্দের জয়।

বিরোধী সব সুরগুলিরে মেলানো মুস্কিল।
দেহ এবং আত্মা—দুয়ে আছেই আছে মিল।
দেহের দাবী ঠেলতে গেলে বিপদ আছে ঢের;
তবু মানুষ নয়কো কেবল রক্তের ও মাংসের।
সে যে আত্মা আর আত্মা চিরন্তনকেই চায়।
কে বলে সুখ অল্পে আছে? আনন্দ ভূমায়।
বাঁচার জন্যে বাঁচা—সে তো নেহাতই জান্তব;
তার মধ্যে তৃপ্তি কোথায়? কোথায় বা গৌরব?
ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে চিরন্তন।
আর অর্ধেক সত্যঃ দেহ আত্মার বাহন।
সুঠাম দেহ, উদার প্রেমে আত্মা জ্যোতির্ময়!
বলো একবার প্রেমানন্দে,
দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দ বলেন, তোমার যুক্তিই কি সব?
বিশ্বাস কি ফেলনা? তার নাই কোন বৈভব?
প্রমাণ বিনা চলবে নাকো, ঠকবো না একচুল—
সতর্কতার এই আধিক্য এতই কি নির্ভুল?
বিশ্বাসে ভর ক'রে যারা ভাসলো অজানায়—
ডুবতে পারে তরী তাদের, তবু তারাই পায়
পথিকৃতের জয়মাল্য। যুক্তি ও বিশ্বাস
--দুয়ের মিলেই পরিপূর্ণ সত্যের প্রকাশ।
বিশ্বাস চাই; বিচারেরও নেই কি প্রয়োজন?
দোলগোবিন্দ বাড়াবাড়ির পক্ষে আদৌ নন্।
আবার বলি দোলগোবিন্দের নীতি সমন্বয়;
বলো একবার প্রেমানন্দে,
দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দ বলেন, খোদার বিচিত্র সংসার।
মিল আছে কি মুখের সঙ্গে মুখের চেহারার?
একই ক্ষুরে তিনি সবার কামান্ না তো শির!
কাউকে করেন মহাকবি, কাউকে কর্মবীর।
নানারকম উপাসনার এই যে আয়োজন—
সাকারবাদী কেহ, কারও নিরাকারে মন,
—এ রুচিভেদ তাঁরই সৃষ্টি। সব ধর্মই ঠিক
—যুগের সিংহদ্বারে লেখা। ধর্মান্ধকে ধিক্।

ঐক্য যেমন পরম সত্য বৈচিত্র্যও তাই।
পরের অন্ধ অনুকরণ আত্মহত্যা ভাই।
দোলগোবিন্দের কথায় সবার হউক জ্ঞানোদয়;
বলো তোমরা প্রেমানন্দে, দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দ বলেন, মুক্তি অমূল্য রতন।
স্বাধীনতার তুল্য আছে এমন পরম ধন?
সকল ভালোর উৎস সে যে। স্রষ্টা দুনিয়ার
একই ছাঁচে দুটো মানুষ করেন না তৈয়ার।
শুধু কি তাই? কোন জীবন নহে নিরর্থক।
সবাই যদি হোতেন বুদ্ধ, খৃষ্ট বা নানক,
মানুষগুলির কারও মধ্যে থাকতোনাকো খাদ,
তবে কি এই বসুন্ধরায় রইতো কোন স্বাদ?
যে যার সুরে বাজুক,—কোরাস্ জমবে
চমৎকার।

দোহাই, জ্ঞানের দম্ভে কারও ভেঙো না সংস্কার।
অধিকারী ভেদ মস্ত কথা; 'যার যা পেটে সয়।'
বলো একবার প্রেমানন্দেঃ দোলগোবিন্দের জয়।

দোলগোবিন্দ বলেন, জীবন সংগ্রাম অপার।
বাধার পরে বাধার শুধু দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার।
পালঙ্কে লোভ করো যদি দুর্গতি বিস্তর!
ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যারা নিরন্তর
বাইতে পারে তরী তারাই, বরণমালা পায়
ভাগ্যদেবীর; কবির বাঁশি তাদেরই জয় গায়।
বীরভোগ্যা বসুধা নয় স্বপ্নবিলাসীর;
দুঃখজয়ী বীরের পায়ে জগৎ নোয়ায় শির।
ক্লৈব্য আনে মৃত্যু শুধু; বীর্য আনে প্রাণ;
বিঘ্ন এবং বিপদ করে মানুষকে মহান।
দুঃসাহসী যুগে যুগে করলো দিগ্বিজয়;
বলো একবার প্রেমানন্দেঃ দোলগোবিন্দের জয়।

নীড়ের প্রার্থনা

জগদীশ ভট্টাচার্য

ওগো সুদূরের নভচারিণী,
কখন আসবে তুমি আমার বুকে?
কখন??

তোমার পাখায়
আকাশের হাসি ইন্দ্রধনু হয়ে ওড়ে।
তোমার হীরের চোখে
লক্ষ-আলোক-বর্ষ-পারের নক্ষত্রের আলো।
আর তোমার কন্ঠে
সূর্য থেকে ঝরে-পড়া প্রথম ধারাবর্ষণের গান॥

আমি যে তোমার প্রতীক্ষায়
আকাশে চোখ তুলে বসে আছি।
কখন আসবে তুমি আমার বুকে?
কখন??

আমার তুচ্ছ খড়কুটোর আশ্রয়ে
ঘিরে রেখেছি তোমার শ্বেতপাথরের
নরম ডিমগুলিকে।
তোমার বুকের রক্তাভ উত্তাপে
প্রোটোপ্লাসমের ঘনীভূত তরলতায়
জীবনের স্পন্দন জাগাব ধীরে ধীরে।
পাথরের দেয়াল ভেঙে
বেরিয়ে আসবে তুলতুলে মিষ্টি শাবকগুলি॥
তোমার মাতৃ-হৃদয়ের কবোষ্ণ স্নেহে
লালিত হবে তারা।
তোমার পাখার কোমল পালকের ফাঁকে ফাঁকে
ভীরু ভীরু চোখ মেলে দেখবে
শ্যামল পৃথিবী
আর সুনীল আকাশকে।
আদুরে ঠোঁটদুটো তুলে ধরে
তোমার চঞ্চুতে পাবে
বেঁচে থাকার পরম প্রাশন॥

ধীরে ধীরে
তাদের কণ্ঠে জাগবে ভোর-বেলাকার
মধুর কাকলি।
রাতের আঁধার তারা পেরোবে গান গেয়ে।
আকাশে সাঁতার দেবে
সবল সতেজ দুখানি ডানা মেলে।
সার্থক হবে আমার তুচ্ছ খড়কুটোর আয়োজন।
ধন্য হব,
পূর্ণ হব আমি॥
ওগো সুদূরের নভচারিণী,
কখন আসবে তুমি আমার বুকে?
কখন??

মানুষ কেন পাখির মতো উড়বে না?

শ্রী সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

মানুষের আকাশে উড়ে বেড়াবার বাসনা বোধহয় মানব জাতির সমকালীন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের পুরাণেই আকাশ-বিহার এবং আকাশযানের কথা আছে। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দাইদালাস ও তৎপুত্র ইকারাসের কাহিনী অনেকেই জানেন। দাইদালাস ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিল্পী। ক্রীট দ্বীপে নির্বাসিত হলে সেখানকার পুরাণ-প্রখ্যাত গোলক-ধাঁধা নির্মাণ করেন। এই গোলকধাঁধায় দৈত্য মিনোটরকে বন্দী করে রাখা হয়। পরে দাইদালাস এবং তাঁর পুত্র ইকারাসকে এখানে আটক করে রাখা হয়। দাইদালাস তখন নিজের এবং ছেলের জন্য দুজোড়া ডানা তৈরি করে সেখান থেকে পাখির মতো উড়ে বেরিয়ে পড়লেন। পুরাণের বর্ণনা অনুসারে দাইদালাস নিরাপদে দেশে ফিরে গেলেন আর বেচারা ইকারাস সূর্যের বেশি কাছে যাওয়ার ফলে মোম দিয়ে আটকান ডানার জোড় খুলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে মারা গেল।

মানুষের পক্ষে পাখির মতো ওড়ার চেষ্টার ব্যাপারে ইকারাসের সলিল-সমাধি বিপরীত প্রচারের কাজ করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু অনেকেই মনে রাখেননি যে দাইদালাস নিরাপদে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

পুরাণের কথা যাই হ'ক, পাখির মতো মানুষের ওড়বার বিষয়টি বিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয় হতে অনেক সময় লেগেছে। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম যাঁকে স্মরণ করতে হয় তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর লেওনার্দো দা ভিন্চি। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পাখির উড্ডয়ন সম্পর্কে একটি বই লেখেন। মানুষের পেশীশক্তি দিয়ে চালান যায় এমন এক উড্ডয়নযন্ত্রের নকশাও তিনি এঁকে রেখে যান। প্যারাশুট ও হেলিকপ্টার আবিষ্কারের কৃতিত্বও দা ভিন্চির।

দা ভিন্চির আগে যে ওড়বার চেষ্টা হয়নি তা নয়, যদিও তাকে ওড়া না বলে ডানার সাহায্যে উঁচু থেকে নিরাপদে নিচে নামার প্রচেষ্টা বললেই ভাল হয়। এর মধ্যে কতখানি কাহিনী আর কতটা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বলা কঠিন। ভেরানৎসিও, ফ্রান্সিস বেকন, চেস্টারের বিশপ জন উইলকিনস অনেকেই এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উইলকিনস ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাথম্যাটিক্যাল ম্যাজিক' নামে একটি পুস্তকে এই বিষয়ক পুরাকাহিনী, কিংবদন্তী ও জল্পনা-কল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁর অনেকগুলি সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত হয়নি। উইলকিনসের বন্ধু তদানীন্তন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, রবার্ট হুক দাবী করেন যে, তিনি এমন একটি যন্ত্রের আদর্শ তৈরি করেছেন যা স্প্রিং ও ডানার সাহায্যে মাটি থেকে উঠতে পারে। ফরাসী মিস্ত্রি বেস্‌নিএ অনুরূপ দাবী করেন।

এই সম্পর্কে সবচেয়ে সার্থক আলোচনা করেন ইতালীয় শারীরবিজ্ঞানী বোরেল্লি। নিউটনের মতো তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাতাস যে উড়ন্ত পাখিকে পড়তে দেয় না তার কারণ তির্যকভাবে স্থিত ডানা দ্বারা প্রতিহত বায়ুর প্রতিক্রিয়া ভারটিকে ধরে রাখে। দুঃখের বিষয় বোরেল্লির সিদ্ধান্তে ভুল না থাকলেও হিসেবে ভুল ছিল। তাঁর মতে উত্তোলন-বলের যা পরিমাণ হওয়া উচিত কার্যত বল তার অন্তত দশগুণ। গণনার এই ভুলের জন্য বিজ্ঞান প্রায় দু'শ বছর পেছিয়ে গেছে।

তত্ত্ব অনুসারে মানুষ উড়তে না পারলেও পাখিরা যে নিয়তই উড়ে বেড়াচ্ছে সেকথা অস্বীকার করবার উপায় অবশ্যই ছিল না। কতদূর পর্যন্ত ওজন হলে পাখিরা উড়তে পারে বোরেল্লি তার বিশ্লেষণ করেন। তাঁর বিশ্লেষণ অগ্রাহ্য হবার কোন কারণ এখনও মেলেনি। ওড়বার একটি উচ্চতর সীমা নিশ্চয়ই বর্তমান, কারণ দেখা গেছে যে কোন উড্ডয়নক্ষম জীবের ভার মোটামুটি ৩০ পাউন্ডের বেশি হয় না। গ্যালিলেও আগেই দেখিয়েছিলেন যে, যেহেতু সব প্রাণীর ঘনত্ব প্রায় একই রকম সেহেতু ভার ও ক্ষেত্রফলের অনুপাত প্রাণীর আকারের উপর নির্ভর করবে। ভার দৈর্ঘ্যের ঘনফলের সমানুপাতী, আর সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্যের বর্গের সমানুপাতী। সুতরাং আকার বাড়লে ডানার প্রত্যেক একক বর্গক্ষেত্রকে আরও বেশি ভার বহন করতে হবে। বোরেল্লি সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানুষের নিজের ভার বইবার মতো ক্ষমতা তার কাঁধের পেশীর নেই। বোরেল্লির সিদ্ধান্ত নির্ভুল কিন্তু এই অসুবিধা এড়াবার উপায় আছে।

ঊনবিংশ শতকে অনেক কিম্ভূত-কিমাকার মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল। কয়েক জন বিজ্ঞানী এমন মত প্রকাশ করেন যে, কোন বস্তু বাতাসের মধ্য দিয়ে গেলে কোনরকম বাধার সম্মুখীন হবে না। এই মতবাদ অবশ্যই অসম্ভব, ফলে কেলি-প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী উড্ডয়ন সম্পর্কে নতুন করে তথ্যানুসন্ধান এবং পরীক্ষা শুরু করে দেন।

এই শতকের আর একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী অটো লিলিএনটাল। ইঁনি ডানা লাগিয়ে উপর থেকে নীচে নামবার প্রচেষ্টায় পা ভেঙেছিলেন এইটুকু সংবাদ হয়তো অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু তিনি যে পাখিদের ওড়ার কৌশল সুদক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তিনি দেখান যে যে-কৌশল দ্বারা বক ডানার সাহায্যে উত্তোলন-বল পায় তা নিউটন ও বোরেল্লি কথিত মতবাদের অনুরূপ নয়। তার পর্যবেক্ষণ এবং হিসাব থেকে তিনি দেখান যে, উল্লিখিত দুই বিজ্ঞানীর মত অনুসারে বকের প্রতি গ্রাম পেশী থেকে তাহলে আরও দশগুণ

হাওয়াই সাইকেলে আরূঢ় ভারতীয় উদ্ভাবক শ্রীযুক্ত শিবরাও।

শক্তি উৎপাদন করা প্রয়োজন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, পক্ষ-বিধূননের কালে নিচে নামবার এবং উপরে উঠবার সময় পাখির ডানা নৌকার দাঁড়ের মতো পাশ থেকে বাতাসকে

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিমান-প্রদর্শনীতে এই অর্নিথপটার প্রদর্শিত হয়েছিল, এটিও উড়তে পারে নি।

আঘাত করে না। বরং ধার দিয়ে আঘাত করে। কৃত্রিম ডানা নিয়ে পরীক্ষার কালে তিনি দেখান যে উপযুক্ত ছেদক্ষেত্রবিশিষ্ট ডানার বেলায় সামান্য কোণবিশিষ্ট বায়ুস্রোত অনেক বেশি উত্তোলন-বল এবং কম পিছটান বা 'ড্র্যাগ' সৃষ্টি করে। গত অর্ধ শতাব্দীতে এই সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বহু গবেষণা হয়েছে। তার ফলে কেবলমাত্র মানুষের পেশীশক্তির সাহায্যে ওড়ার সম্ভাবনার আলোচনা অনেক সুগম হয়েছে।

সবচেয়ে সহজে এবং অল্প শক্তি ব্যয়ে ওড়বার জন্য এরোপ্লেনের আকার কেমন হওয়া প্রয়োজন আমরা তা এখন ভালভাবেই জানি। বাতাসের বাধা কমাবার জন্য এরোপ্লেনের দেহ যে ভালভাবে স্ট্রীমলাইন করা প্রয়োজন তা সুবিদিত। কিন্তু প্রধান বিষয় হচ্ছে ডানার আকার। প্রস্থের তুলনায় তার দৈর্ঘ্য যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ডানার এই স্বরূপ বহু দ্রুতগামী প্লেনে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন মাস অ্যালবেট্রস প্রভৃতি পাখির বেলায়।

আসলে বিংশ শতাব্দীর অনেক পূর্বেই এরোপ্লেন সম্পর্কিত সকল তথ্যের মীমাংসা প্রায় হয়ে গিয়েছিল, অভাব ছিল সেটিকে বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে চালাবার উপযোগী হাল্কা এনজিন। অন্তর্দহন পেট্রল এনজিন একদিন এই সমস্যার সমাধান করে দিল। পেট্রল এনজিন এখন নানা আকারে পাওয়া যায়—কয়েক গ্রাম থেকে কয়েক টন পর্যন্ত। মোটামুটি হিসেবে বলা যায় পেট্রল এনজিন কিলোগ্রাম পিছু ১·৪ অশ্ব-ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য আধুনিকতম এনজিন এর চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণেও শক্তি উৎপাদন করতে সমর্থ।

কার্যক্ষমতা ও ভারের এই অনুপাত পেট্রল এনজিন সম্পর্কে দেখা গেল। প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ এই অনুপাতের কতটা নিকট তা এখন আলোচনা করা আবশ্যক। প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকে জানা আছে যে ক্ষুদ্র প্রাণীরা বৃহত্তর প্রাণীর তুলনায় কিলোগ্রাম পিছু বেশি কার্যক্ষমতা উৎপাদন করে। এর হেতু সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয়নি। ওজন বেড়ে দ্বিগুণ হলে কোন প্রাণীর শারীর ক্রিয়ার হার দ্বিগুণ হবে না, হবে আন্দাজ ১·৭ গুণ। সামান্য ইতরবিশেষ সত্ত্বেও এই নিয়ম ক্ষুদ্রতম জীবাণু থেকে হাতির মতো বৃহৎ জীব পর্যন্ত প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নিয়ম কেবলমাত্র ভিত্তিক শারীর ক্রিয়া বা 'বেসাল মেটাবলিজম' অর্থাৎ জীবন-ধারণের জন্য নিম্নতম ক্রিয়ার পক্ষেই প্রযোজ্য। কোন প্রাণী স্বল্পকালব্যাপী প্রবল প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ কতখানি কার্যক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে তা এই হিসেবে পড়ে না, বস্তুত কোন হিসেবেই পড়ে না। মানুষ সাধারণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে ০·০০৬ অশ্বক্ষমতা উৎপাদন করে।

ভারের অনুপাতে ওড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার আলোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ পাখি—মোটামুটি প্রায় ৩০ পাউন্ড ওজনের নিচে—এই ক্ষমতা রাখে। ২০০ পাউণ্ডের কিছু বেশি ওজন হলে কোন প্রাণীর ওড়া সম্ভব নয়।

১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী কারিগর বেসনিএ ওড়ার এই ব্যর্থ পরিকল্পনা করেন।

সুতরাং মানুষের ওড়ার জন্য পাখির মতো ডানাওয়ালা যন্ত্রসজ্জা খুব সুবিধের হবে না বলে বোধ হয়। এমন কি এনজিন দিয়ে চালিত কোনও 'অর্নিথপটার' অর্থাৎ পাখির মতো পক্ষ-সঞ্চালনকারী প্লেন এপর্যন্ত সন্তোষজনক কাজ দেয়নি। সুতরাং দাইদালস বা ইকারসের অনুরূপে চেষ্টা না করাই সঙ্গত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন খুব হালকা এরোপ্লেন তৈরি করাই উপযুক্ত সমাধান; এর ডানা হবে অনড় এবং চালান হবে সাধারণ প্লেনের মতো ঘূর্ণায়মান স্ক্রু দিয়ে। এক কথায় এটি হবে এনজিনবিহীন প্লেন বিশেষ। মনে রাখা প্রয়োজন এটি গ্লাইডার নয়, কারণ গ্লাইডার চলে অনুকূল বায়ুস্রোতের সহায়তায়, তার চালকের কাজ সুযোগ গ্রহণ করা, দৈহিক পরিশ্রম নয়। সে ক্ষেত্রে এই প্লেনের চালককে শারীরিক শক্তি ব্যয় করে প্লেনটিকে চালু রাখতে হয়। যেসব প্লেন তৈরি হয়েছে তাদের চালাতে ০·৩৫ থেকে ০·৭ অশ্বক্ষমতার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের কার্যক্ষমতা এর নিম্নসীমার কাছ ঘেঁষে যায়। পরীক্ষার দেখা গেছে

(শেষাংশ ২২১ পৃষ্ঠায়)

পেশীশক্তি-চালিত প্লেন 'পাফিন' ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে আধ মাইলের কিছু বেশি উড়তে সমর্থ হয়েছিল।

জহর ছিল আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলে, বয়েসে মাস ছয়েকের ছোট হবে আমার চাইতে। কিন্তু এমন ধড়ীবাজ আর শয়তান ছেলে জীবনে আর আমি দুটি দেখিনি।

বিড়ি খেতে শিখেছিল তেরো বছর বয়েসে এবং সেই সময়েই বাপের পকেট থেকে পয়সাও চুরি করতে শিখে গিয়েছিল। হাটে-বাজারে দোকানে যেতে উৎসাহের অন্ত ছিল না তার। সেজদা—অর্থাৎ জহরের বাবা যে খুব বোহিসেবী লোক ছিলেন তা নয়। দেওয়ানী আদালতে চাকরী করতেন, টেবিলের তলায় বাঁ হাতখানা তাঁর খোলাই থাকত। পয়সা যেমন কামাতে জানতেন রাখতেও জানতেন সেই রকম। এ হেন সেজদার চোখে ধুলো দিয়েও নিশ্চিন্তে কাজ গুছিয়ে নিত জহর।

মাঝে মাঝে ধরা পড়ত না, এমন নয়। তখন পাগলের মতো ঠ্যাঙাতেন সেজদা—নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে তবে ছাড়তেন। কিন্তু ঠ্যাঙানো ছাড়া ছেলের সম্পর্কে আর যে কোনো কর্তব্য থাকতে পারে, একথা কোনোদিন ভাবেননি তিনি। ফলে চোদ্দ বছর বয়েসেই চুয়াল্লিশ বছরের সমস্ত কাজ জহরের আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এ-সব থাক। মূল কথায় ফিরে আসি।

দিনাজপুর শহর, ছেলেবেলায় যেখানে আমরা থাকতুম—সেখান থেকে মহকুমা শহর ঠাকুরগাঁর দিকে একটা নতুন রেল লাইন খোলা হয়েছে তখন। বলা বাহুল্য, আমাদের উত্তেজনার সীমা ছিল না। সামনে দিয়ে মীটার গেজের ট্রেণ ঝক ঝক করে বেরিয়ে যেত আর ভাগ্যবান যাত্রীদের দিকে আমরা ঈর্ষ্যাভরা চোখে তাকিয়ে থাকতুম।

শেষ পর্যন্ত একদিন সেই ট্রেণে চাপবার সুযোগ এসে গেল।

বাবা তখন কতগুলো কাজকর্মের ব্যাপারে ঠাকুরগাঁ রোডে চলে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। সেই সময় এক পরম সুপ্রভাতে ঠাকুরমা ডেকে বললেন, 'এই অন্তু, খোকা তোকে যেতে লিখেছে একবার। সামনে অম্বুবাচী, অনেক-গুলো আম কিনেছে, কিন্তু পাঠাবার লোক পাচ্ছে না। তুই গিয়ে আমগুলো নিয়ে আয়। আসবার সময় সের পাঁচেক ভালো কাটারীভোগ চালও আনবি।'

হাতে স্বর্গ পাওয়া একেই বলে!

কয়েক বছর আগে মা মারা গেছেন, ঠাকুরমা আমাদের চোখে হারান। ক'টা স্টেশন পরেই তো পার্বতীপুরের মস্ত জংশন—সেখানে পর্যন্ত এক আধদিন বেড়াতে যাবার হুকুম নেই। কাজেই আমি আনন্দে লাফাতে লাগলুম। বললুম, 'শিগগীর পয়সা দাও—এখুনি যাচ্ছি।'

ঠাকুরমা ধমক দিয়ে বললেন, 'গাড়ী তো সেই ন'টায় ছাড়ে—এত তাড়াহুড়ো কিসের! আর বাড়ী থেকে দু পা বাড়ালেই তো ইস্টিশন।'

ঠিক সেই সময় শহরের আর এক প্রান্ত বালুবাড়ি থেকে জহর এসে হাজির।

'কী হয়েছে কাকু? কোথায় যাচ্ছিস?'

পরমানন্দে বললুম, 'ঠাকুরগাঁ।'

'এক্ষুণি যাবি?'

'হুঁ। ন'টার ট্রেণে।'

'একলা যেতে পারবি কাকু? তুই তো এক নম্বরের গোবেচারা।'

আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল। বললুম, 'পারি কিনা আমি বুঝব। তোকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

জহরকে দেখেই ঠাকুরমার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। (বলা দরকার, সেজদার ঠাকুরদা ছিলেন আমার ঠাকুরদার বড় ভাই।) এই ছেলেটিকে দেখলেই তাঁর মনে হত এবং বেশ সঙ্গত কারণেই মনে হত, জহর আমাকে বখাতে আসছে। কাজেই যে ঠাকুরমা একটু আগেই আমাকে বলছিলেন ট্রেণ ন'টায় ছাড়ে, এত তাড়া কিসের, সেই ঠাকুর-মা-ই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এখন আর গল্প করতে হবে না—জহর তো রইলই। তুই চান করে খেয়ে নে—খোকার ওখানে পেঁছুতে তো দুপুর হয়ে যাবে।'

জহর বললে, 'ভালোই হল, চল্—আমিও সঙ্গে যাই। বেরিয়ে আসি ঠাকুর্দার ওখান থেকে।'

ঠাকুরমার টুকটুকে ফর্সা মুখখানা কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'তুই যাবি কি করে? বাড়ীতে বলে আসিসনি, কিছু না—'

'এক্ষুণি বলে আসছি—দশ মিনিটের ভেতর। সাইকেল আছে আমার সঙ্গে।'

বলেই তীরবেগে বেরিয়ে গেল জহর।

তখন ঠাকুরমা আমাকে নিয়ে পড়লেন।

'লক্ষ্মীছাড়া হাবা কোথাকার! কেন তুই ওকে বলতে গেলি?'

প্রবল প্রতিবাদ করে আমি বললুম, 'আমি বলেছি নাকি? ওই তো নিজে এসে শুনল।'

ঠাকুরমা গজগজ করতে লাগলেন: 'আপদ জোটেও এসে সময় বুঝে! হতভাগাকে ঝাঁটিয়ে পুঁতে দিলে গাছ গজায়। এই অনামুখোর সঙ্গে তোকে আমি কিছুতেই যেতে দিতুম না, কিন্তু খোকা লিখেছে আমগুলো পচে যাবে। কী যে করি—'

আমি বললুম, 'বাবার কাছে যাচ্ছি তো। সেখানে ও কোনোরকম দুষ্টুমি করতে পারবে না।'

'কিন্তু রাস্তায়? যত রাজ্যের ইয়ার্কি আর অসভ্যতা করবে, সেগুলো শিখবি তুই।'

'কক্ষণো না। আমি খারাপ ছেলে নই।'

ঠাকুরমা বললেন—'মনে থাকে যেন। বাঁদরটাকে ওর বাপ আসতে যদি না দেয় তো বেশ হয়। ধরে ধরে যে ঠ্যাঙায়—বেশ করে। এমন উন-পাঁজুরে উনুনমুখো ছেলে তোদের বংশে কেমন করে জন্মালো তাই ভাবি।'

জহর কিন্তু ঠিক এসে গেল। আমি তখন খেতে বসেছি। বড়ো বড়ো পা ফেলে বাড়ীতে ঢুকেই বললে, 'কিরে কাকু এখনো খাওয়া হয়নি? এক ইস্কুল ছাড়া তুই সব সময় লেট লতিফ। দ্যাখ্‌তো—আমি কেমন রেডি হয়ে এসেছি।'

ঠাকুরমা ভ্রুকুটি করে বললেন—'বসে থা অন্তত ছটফট করিসনি। মাছের কাঁটা বিঁধবে গলায়।'—তারপর ছোড়দিকে ডেকে বললেন, 'ওর মাছটা বেছে দিয়ে যা।'

অর্থাৎ, যতক্ষণ পারেন, জহরের সংসর্গদোষ থেকে রক্ষা করবেন আমাকে।

মফঃস্বল শহরের রেল স্টেশন—আমাদের পাড়া ষষ্ঠীতলার লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে দু-পা হাঁটলেই প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুনো যায়। ঠাকুরগাঁ লাইনের ট্রেণটা আমাদের বাড়ীর দিকে আরো এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্টেশনের হাতায় ঢুকেই আমরা গাড়ী পেলুম। ছাড়তে প্রায় কুড়ি মিনিট দেরী তখনো।'

আমি বললুম—'চল টিকিট কেটে আনি।'

জহর বললো,—'তোকে যেতে হবে না—আমিই যাচ্ছি। তুই ততক্ষণ এই কামরাটায় বসে থাক।'

আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে জহর টিকিট আনতে গেল। আমি সামনের সেই থার্ড ক্লাসটায় উঠে পড়লুম। এ গাড়ীটায় ভিড় হয় না। বেশির ভাগ লোকই শহরে আসে আদালতের কাজে—সকালে সাড়ে আটটার ট্রেণে তারা শহরে পৌঁছায় আবার সন্ধ্যে ছটার ট্রেণে মামলা মোকদ্দমা মিটিয়ে জিনিষপত্র কিনে ফিরে যায়।

প্রায় ফাঁকা কামরায় বসে বসে আমি রেল কোম্পানীর বাণীগুলো পড়তে লাগলুম। 'নিজে টিকিট কেন—মালের উপর নজর রাখো।' সংস্কৃত হরফ চেনার বিদ্যে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলুম : 'আপনা টিকট আপসে খরিদো'। বিনা কারণে চেন টেনে গাড়ী থামালে যে পঞ্চাশ টাকা ফাইন হয় সেটাও আর একবার নতুন করে জানা হল। এইসব বিবিধ কাজ আয়ত্ত করে যখন ভাবছি, 'টিকিটজন বসিবেক' না লিখে 'বসিবে' লেখলে কী ক্ষতি হত, তখন জহর এসে হাজির।

ডাকল : 'কাকু—কুইক, কুইক। নেমে আয়।'

'নামব কেন?'

'অন্য কম্পার্টমেন্টে যাব। ফাঁকায় ফাঁকায়।'

'এই বা মন্দ কী? বেশ তো আছি।'

'না—না!'—জহর অধৈর্য হয়ে উঠল : 'তুই নেমে আয় না শিগগীর। এই তো প্রথম ঘণ্টি দিচ্ছে।'

বিরক্ত হয়ে আমি নেমে এলুম। কয়েক পা এগোতে একটা খালি ইন্টার ক্লাস। জহর বললো, 'ওঠ।'

'ইন্টার ক্লাস যে!'

'তুই আয় না—' জহর উঠে পড়ল।

অগত্যা আমাকেও উঠতে হল। বললুম, 'ইন্টার ক্লাসের টিকিট করলি বুঝি? এক টাকায় তো হবার কথা নয়।'

জহর বললে,—'তোকে ভাবতে হবে না। তুই বোস চুপ করে।'

গাড়ী ছাড়ল। দুদিক চলো আমাদের ষষ্ঠীতলার লেভেল-ক্রসিং পার হল, আমাদের বাড়ীর বাতাবি লেবুর গাছটাকে দেখতে পেলুম, তারপর বন-বাগান ছাড়িয়ে গমগমে করে পেরিয়ে গেল ছোট্ট কাঞ্চন নদীর মস্ত ব্রীজটা। ব্রীজের ওপারে ফ্ল্যাগ পয়েন্ট পার হয়ে ঠাকুরগাঁ লাইন বাঁক নিলো।

আমি খুশি মনে বাইরে তাকিয়েছিলুম। শরতের ছুটির মেজাজ—বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জল জমেছে নতুন কাটা রেলের নয়ানজুলিতে, গাছপালার রং ঘন সবুজ। এদিকে ওদিকে ফজলী আম ঝুলতে দেখা যাচ্ছে, কাঁঠাল দুলছে গাছের মাথা থেকে একেবারে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘ—মাঠ আর নয়ানজুলির জলের ওপর ছায়া ফেলে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা।

জহর বললে, 'বেশ লাগছে—না কাকু?'

বললুম, 'হুঁ'।

জহর পকেট থেকে এক বাক্স রেড ল্যাম্প সিগারেট বের করল।

'কাকু, খেয়ে দেখবি একটা সিগারেট?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'না—তুই খা।'

'একেবারে গুড বয়!' —জহর অনুকম্পার হাসি হাসল : 'ওই জন্যেই তোর কিছু হয় না।' পা দুলিয়ে দুলিয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট শেষ করল, তারপর গ্রামোফোন রেকর্ডের

(শেষাংশ ২১৮ পৃষ্ঠায়)

জীবনের স্বাদ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সূর্য ওঠে :
তুষার দিগন্ত শিরে সোনালি ইসারা
লাজাঞ্জলি কণক হিঙ্গুলে,
নতুনের নেশা—
কিশোরীর ওষ্ঠপ্রান্তে
মুখোমুখি যৌবনের প্রথম বিস্ময়!
জাগরণ-শ্রান্ত চোখে স্তিমিত চেতনা,
মিটমিট করে তারা পশ্চিম আকাশে
বিচ্ছেদ-বেদনা-ভরা মন
একাকিনী ফিরে যায়

দিনের সাগর পারে।

গৃহকোণে
শিথিল শিথানে
ঝরে' পড়া শুভ্র শেফালির স্তূপ,
কনক-বর্ণিনী প্রিয়া আসঙ্গ-কুণ্ঠিতা
পদ্ম-আঁখি মোছে করতলে।
রাত্রি শেষ!
মিলন মন্দিরে—বিদায়ের উদাস ভৈরবী।
নগ্ন দুটি বাহু : উদ্বেল কৃশানু শিখা,
অতলান্ত অতল সাগরে
ক্ষুধাতুর অক্টোপাস যেন।
মৃত্যুরে শুধায়—
পেয়েছ কি কোনদিন জীবনের স্বাদ?
শুনেছ কি!
জীবনে জীবনে কানাকানি,
মুখে মুখে বুকে বুকে—
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
আনন্দের নূপুর নিক্কণ;
সীমাহারা তনুসীমা
শ্রাবণ-প্লাবনে লীন অতনু সাগরে
ব্রহ্মপুত্র যেন মত্ত জলোচ্ছ্বাসে
ছুটে চলে কলহাস্যে—
হিমাদ্রি শিখর ছাড়ি,
মাতৃবক্ষে।
শিরায়, শিরায়
চঞ্চল জীবন-স্রোত,
চোখে চোখে স্ফুরিত বিদ্যুৎ
আনন্দের আবাহনে, মধু মহোৎসবে।
রক্তে ফোটে শতদল!
পয়োধর অমৃত ধারায়
হিম প্রস্রবণ! —কৈলাস শিখর হতে
নামে মন্দাকিনী।

জননীর বক্ষ আঁকড়িয়া,
সদ্যফোটা কুন্দফুল, চাহে মুখপানে;
আবেশ-বিভোর-আঁখি
সূর্যমুখী
ভীরু চোখে চায় সূর্যপানে
বিস্মিত মানুষ
রক্তের মুকুরে দেখে মুখ :
আপনারে খুঁজে পায় আপন সৃষ্টিতে।
আনন্দ বিহ্বল বুকে
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু দ্রুত হয়

অশান্ত আবেগে।

জননীর কম্প্রবক্ষে
পলে পলে ভয়,
অশ্রুস্পন্দিত ভীরু চোখে মৃত্যুরে শুধায়—
পেয়েছ কি কোনদিন জীবনের স্বাদ?
শুনেছ কি কানে
আনন্দের নূপুর নিক্কণ?
দেখেছ কি
চোখে চোখে জীবনের আলো?
মৃত্যুহীন অমৃত উৎসবে
প্রণয়ের স্পর্শ সুমধুর
পেয়েছ কি কোনদিন
বক্ষ পরে!
আসঙ্গ উল্লাসে
হিল্লোলিত রক্তধারা,
ফেনিল উচ্ছ্বাসে
ধাবমান স্রোত,
কন্দরে কন্দরে

জীবনের গাহে জয়গান!

শুনেছ কি ভাষা তার?
পেয়েছ কি স্বাদ?
মৃত্যু রহে অধোমুখে,
বক্ষে দাবানল—
সর্বক্ষয়ী দুরন্ত পিপাসা।
ভ্রুকুটি ভয়াল মুখ!
তবু প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী
তাহারে শুধায়—
পেয়েছ কি কোনদিন প্রণয়ের স্বাদ?
মৃত্যুহীন ভালবাসা,
মৃত্যুহীন প্রেম
তোমারে করেছে ম্লান।
তাই মহাকাল,
ভিক্ষাপাত্র হাতে
দাঁড়ায়েছে উমার দুয়ারে
কণ্ঠে লয়ে বিষ;
গৌরীশৃঙ্গে নব সূর্যালোকে
বিগলিত ধারা
বয়ে আনে
জীবনের কল্যাণ আশীষ।

জেলে গেছেন কখনো? আমি সত্যিকার জেলে যাওয়ার কথা বলছি, আপনাদের ঐ খবরের কাগজে সোনার অক্ষরে নাম ওঠা, রাজার হালে দুবেলা পোলাও-কালিয়া খেয়ে সারা দিনমান খোসগল্প করা সেকালের সেই সম্মানিত জেলে যাওয়ার কথা বলছি না। সে তো সেকালে সবাই যেত। আমি বলছিলাম খেরোর জামা গায়ে দিয়ে দড়ি-পাকানো কারাবাসের কথা। আমি তাও গেছি।

বনে বাস করেছেন কখনো? যেই না সূর্য ডোবে অমনি অন্ধকার এসে সমস্ত বিশ্বটাকে গ্রাস করে ফেলে, সে যে কি দারুণ অন্ধকার সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গাছের ঘন ডাল-পালার নিচে আকাশের তারার আলো দেখা যায় না, চারিদিকের ঘন বন একেবারে লোপপেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু ক্যাম্পের উনুনের চারপাশটাতে একটু আলো থাকে; যুদ্ধের সময় ধুনি জ্বালানোর উপায় ছিল না। ক্যাম্পে যারা বাস করে রাতে গলার আওয়াজ তাদের আপনা থেকেই নেমে আসে, যে যার ঢাকা লণ্ঠন নিয়ে বন্দুক পরিষ্কার করতে বসে যায়, তার এতটুকু খট্ শব্দ হয়েছে তো কি সমস্ত অদেখা বন জুড়ে তারি প্রতিধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

তবে সে কথা এখন থাক, কি বলতে কি এসে পড়ল। আমি বলছিলাম জেলখানাতেও রাতগুলো তেমনি। এখন কি হয় জানি না, যুদ্ধের সময় জেলের কয়েদীদের আলো জ্বালার নিয়ম ছিল না। কোনো রকম আলোর ব্যবস্থাই ছিল না। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতে এই মোটা মোটা হাত রুটি আর ডাল খেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। অথচ রাত বারোটার আগে ঘুমও আসত না। শুয়ে শুয়ে মনে হত বোধ হয় সেই ক্যাম্পেই রাত কাটাচ্ছি, জেলে আমি নেই।

পাঁচ ঘণ্টা অন্ধকারে না ঘুমিয়ে শুয়ে থেকেছেন কখনো? জীবনে যেখানে যত অক্ষমতা বিফলতা ব্যর্থতা জমা হয়ে থাকে সব তখন বেরিয়ে এসে সারি সারি সামনে দাঁড়ায়। সে দুঃখও বড় কম নয়। কিন্তু তার চেয়েও হাজার গুণ বড় নৈরাশ্যের কথা হল অন্ধকারে জেল-খানার শক্ত বিছানায় একলা শুয়ে যখন স্পষ্ট বোঝা যায় কি সামান্য আকারের কোথায় ভুলটা হয়েছিল, কি করলে এই অকৃতকার্যতার গ্লানির বদলে মাথায় সাফল্যের বিজয়মুকুট পরা যেত। কি করলে মুনিয়া এসে বুকের মধ্যে আপনা থেকে ধরা দিত।

আসলে নাম তার মুনিয়া নয়, কিন্তু অমন একটা হাল্কা ছোট্ট রঙ্গীন এক মুঠো পালকের মতো নরম দেখতে মেয়েকে আর কোন্ নামে ডাকা যায় বলুন? শত্রুদের এক শো হাত আগে আগে ছুটে পালাবার সময় সেই যে তাকে দেখেছিলাম গা-ময় পেট্রোম্যাক্সের আলো ঝরে পড়ছে, যেন সর্বাঙ্গে সোনা মেখে আছে। ওরা যে আমাকে ধরে ফেলবে সে তো জানা কথা; আমার নাগাল পাবার আগেই ঐ একবারটি চেয়ে দেখা মাত্রই আমার পায়ে বেড়ি পড়ে গেছিল; তা হলে গোড়া থেকেই বলতে হয়।

আগেই তো বলেছি এটা যুদ্ধের সময়কার ঘটনা, তখন সব কিছুর বিচার হত অন্য এক মানদণ্ডে। প্রথম সাইরেন বাজবার বহু আগেই মাল অফিসের কেরানীগিরি ছেড়ে দিয়ে মিলিটারী খাতায় নাম লিখিয়েছি, আর অমনি—সম্ভবতঃ আমার লম্বা-চওড়া চেহারা দেখেই হবে,—দিয়েছে আমাকে পাঠিয়ে সুন্দরবনের এক রাডার ঘাঁটিতে। কোথায় কার কোন্ প্লেন আসছে যাচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে তাই ধরাই ছিল ঐ ঘাঁটির একমাত্র কাজ, তাও আমাকে নিজের হাতে কিছু করতে হত না, জানতামও না কিছু, যে করব। আমার কাজ ছিল ঘাঁটি পাহারা দেওয়া। হাতে এন্তার সময় থাকত।

তবু সেও কিছু কম কাজ নয়। ঘন বনের মধ্যে গভীর রাতে একা জেগে কাটানোই প্রথমতঃ খুব সহজ নয়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। তার ওপরে ছিলেন আমাদের মার্কিনী কর্তাটি। সকাল সন্ধ্যে যখন তখন কোথাকার কোন জঙ্গলে কে কি বীভৎসভাবে মরেছিল, কোন নির্জন আস্তানায় কার কি সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এ সব ছাড়া তাঁর মুখে আর কথা ছিল না। শুনে শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে যেতাম, রাত নামবার বহু আগে থেকেই চোখে অন্ধকার দেখতাম। আমাদের ভয় দেখে সাহেব আমাদের যা নয় তাই বলে বকাবকি করত বটে, কিন্তু তারপরেই আবার বলে বসত, আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা, ভয়ের যে যথেষ্ট কারণ নেই একথা আমি আদৌ বলছি না, কারণ এই বনেই আমি নিজের চোখে যা দেখেছি সে জর্মানও নয় জাপানীও নয়, তাদের চেয়ে হাজার গুণে সাংঘাতিক। কিন্তু তার সামনে দাঁড়াতে পারাই তো পৌরুষের প্রমাণ। সে যাই হক গে আজ থেকে রাতে দুজন করে পাহারা দেবে। গেলে একটির জায়গায় আমার দুটি দুটি যাবে; কিন্তু যা সব বীরপুরুষ, কি আর করা।

সেই হল আমার কাল। তারপরে জেলে বসে বহুবার মনে হয়েছিল আমার ঐ একাই ছিল ভালো। আমার সঙ্গে দিল মোহনকে। আমার চেয়ে এক মাথা বেঁটে, এক ঝাঁক কালো কোঁকড়া চুল সব সময় দুলছে উড়ছে, পাৎলা ফর্সা নরম চেহারা, দূরবীনের মতো চোখ, বিদ্যুতের মতো চলাফেরা, এই আছে এই নেই। ও কোথায় গেল এই ভেবেই আমার অর্ধেক রাত কেটে যেত, ভয় পাবার বিশেষ অবকাশও থাকত না। আবার কবিতাও লিখত।

আট ঘণ্টা এক নাগাড়ে এক সঙ্গে কাটাই, ওর সঙ্গে কেমন একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল, অবিশ্যি নিজের কথা খুব বেশি বলত না, কেমন যেন চাপা স্বভাব। মাঝে মাঝে মনে হত

কিছু একটা গোপন করতে চায়। আমি আবার ঠিক তার উলটো; তিন রাত না পেরুতেই বাবা, পিসিমা, ছোটকাকা আর ওদের জন্য আমার বিয়ে না হওয়ার কথাটথা বলে একাকার করে দিলাম। তাই বলে ওকে যে আমার ভালো লাগত তা যেন কেউ না মনে করে, বরং বেশ খারাপই লাগত। কি রকম কাটা কাটা দুই মানের কথা বলত, হাসির কারণ নেই তবু হাসত, দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যেত। মেলা পড়াশুনো করেছিল বোধ হয়, ইংরিজি বলত ভালো। তা হলে হবে কি, হাতটা একটু চেপে ধরলেই কালসিটে পড়ে যেত। জোরে শব্দ হলেই চমকে উঠত। কত রকমে যে ওকে জব্দ করতাম, ক্যাম্প সুদ্ধ লোকের সামনে বোকা বানাতাম তার ঠিক নেই। ওর পেণ্টলুন গাছের মগ্ ডালে তুলে রেখে, বিছানায় জল ঢেলে, খাবারে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে, যখন তখন সায়েব ডেকেছে বলে শুধু কাঁদাতে বাকি রাখতাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ও যে বিশেষ রাগ করত তা মনে হয় না। আসলে কিছুতেই ওর মনের নাগাল পেতাম না, এ সব জিনিষ ওর কিছু এসে যেত না। ওর সত্যিকার দুর্বলতাটা কোথায় তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারি নি। এ রকম লোককে ক্ষমা করা বড় শক্ত।

এক দিন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে কাছা-কাছি দুজনে দাঁড়িয়ে আছি, চারদিকে অদৃশ্য বনভূমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, ক্যাম্পের লোকরা ঘুমে অচেতন, ও হঠাৎ আমাকে বললে :

কাউকে ভালোবেসেছ কখনো?

অবাক হয়ে গেলাম। আমি আবার ভালো-বাসার লোক কোথায় পাব? ফাগুদার বৌ অবিশ্যি মন্দ দেখতে নয়, তবে ফাগুদা তার সঙ্গে মিশতেই দিত না। মোহন কাষ্ঠ হেসে বললে ও রকম ভালোবাসার কথা বলছি না, মুনিয়াকে—'মুনিয়াই' বলছি তাকে যদিও তার অন্য নাম—যে দেখেছে তার আর ও সব সরবতি ভালোবাসায় মন ওঠে না; প্রাণে তার আগুন লেগে যায়। বাকি সব জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যায়।

বলে খানিক চুপ করে থাকল। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় বাড়ি তাদের?

কলকাতায়। মানে ঠিক কলকাতায় নয়, বেলেঘাটায়। সেখানে ওর বাবার নিজের বাড়ি-ঘর, লোহার কারবার, ও-ই একমাত্র সন্তান আর কি যে রূপ সে আর কি বলব।

এর পর থেকে রোজ রাত্রে মোহন শুধু মনুয়ার কথাই বলত। শুনে শুনে হিংসায় বুকটা আমার জ্বলে যেতে লাগল। আমার চেয়ে মোহন কিসে ভালো হল? ঐ তো টিকটিকির মতো চেহারা খরগোসের মতো সাহস, এক চড় মারলে জিভ বেরিয়ে যায়, ও ভালোবাসবে ঐ রকম একটা মেয়েকে, আর আমি যুদ্ধের শেষে বাড়ি ফেরবামাত্র পিসিমার দেওরঝি মতির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে। ভগবানের এ কি অবিচার চোখ বুজে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, এ যুদ্ধ যেন আরো দশ বছর চলে, মতির বিয়ের বয়েস পার করে তবে যেন থামে! চোখ খুলে মোহনকে বললাম ওকে বিয়ে করলে না কেন?

মোহন বে-আইনীভাবে একটা পুরোনো উই ঢিপির উপর বসে পড়ে বলল, কপালে লেখা না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। অত সুখ আমার লেখা ছিল না বোধ হয়। জানো, ওর ডান চোখের কোণায় একটা কালো তিল, মাঝে মাঝে কোঁকড়া চুলে ঢাকা থাকে আবার মাঝে মাঝে দেখা যায়।

মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মোহন বলে যেতে লাগল, বিয়েতে কোনো বাধা ছিল না। ওকে ওর সই-এর বাড়িতে দেখেছি, তারা আমার আত্মীয়, ও কিন্তু আমাকে দেখেনি। ওর বাড়ির লোকেরাও আমার নামটুকুই জানে, আমাকে চোখেও দেখে নি কখনো। বলে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, একটু লিখিটিখি তো, তাই পড়েছিল ওরা, ওদের পড়াশুনোর বাই আছে কিনা; ভালোই লেগেছিল হয় তো, তাই অনাথদাদা বিয়ের কথা পাড়লে অমত করে নি। তারপরে যুদ্ধ বাধল, বিয়ে আর হল না। যুদ্ধ থামলে কি হয় কে জানে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মোহন উঠে পড়ল। পর দিন দুপুরে ক্যাম্পে শুয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম যাঁরা ওকে চেনে না জানে না তাদের কাছে মোহনই বা কি আর অন্য লোকই বা কি, ধরুন আমি জগন্নাথই বা কি? কেউ যদি ওদের কাছে গিয়ে বলে আমি সেই মোহন, মনুয়াকে বিয়ে করতে এসেছি, তাহলে কি হয়? নাম-ঠিকানা সবই তো বলে দিয়েছে মোহন। যে রাখতে জানে না, তার হারানোই উচিত।

চোখ থেকে আমার ঘুম বিদায় নিল। বুকের মধ্যে ওটা মনুয়াকে ভালোবাসার জ্বলুনি, না মোহনকে হিংসা করার জ্বলুনি ভেবে পেলাম না। ভালোবাসা যে চোখে দেখানোর অপেক্ষায় থাকে না, এ আমি শিরায় শিরায় বুঝলাম।

পরদিন ভগবান নিজে আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন, আমাকে কিছু করতেও হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর মোহন বললে মাংস খেয়ে খেয়ে আর পারা যায় না জগন্নাথ, সাগর মাছের ঝাঁক এসেছে। চল, জালটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

বুকের ভিতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই কি তবে সেই সুযোগ যা জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না? মুখে বললাম, তুমি যাও, জল তো পুকুরের মতো স্থির, দ্বিতীয় লোকের দরকারই নেই। আমার মাথা ধরেছে।

বলে এক দৌড়ে ক্যাম্পে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকলাম, সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল। নৌকো নিয়ে সেই যে গেল মোহন আর ফিরল না। ফিরবে না অবিশ্যি জানতাম; নৌকোর তলা একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, মোহন সাঁতার জানত না।

যুদ্ধ শেষ হবার কিছু দিন আগেই আমাদের ঘাঁটি তুলে নেওয়া হল। ততদিনে আমি ছাড়া মোহনের কথা সবাই ভুলে গেছে। আমার জাগার চিন্তা ঘুমের স্বপ্ন জুড়ে মনুয়া রয়েছে। মোহনকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ঘাঁটি উঠে যাওয়ার পরে কিছু দিন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য মিলিটারী হাস-পাতালে ছিলাম। সেখান থেকে যখন বেরুলাম, নিজের মুখে বলতে বাধছে, কিন্তু সত্যি সত্যি স্রেফ সাহেবের মতো চেহারা হয়ে গেছে। হাসপাতালের আয়নায় নিজে দেখে নিজেই অবাক!

একেবারে সটান্ চলে গেলাম বেলেঘাটাতে। ঠিকানা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধা হল না। ওখানকার নামকরা লোক মুনিয়ার বাবা, ভারি খাতির দেখলাম, মেলা পয়সাও করেছেন, বাড়ি বাগান, খেতখামার, লোহার কারবারটাও জমজমাট। গিয়ে সোজা বললাম বুড়োকে যেমন স্বপ্নে হাজার বার বলেছি।

আমি সেই মোহন, মনুয়াকে বিয়ে করতে এসেছি। আর যাব কোথায়! এক মুহূর্তে বুড়ো রেগে অগ্নিশর্মা, পলক না ফেলতে পড়শীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে উপস্থিত, সবার মুখে এক কথা, নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গায়ে হলুদ মাখানো কনে ফেলে যুদ্ধ করতে যাওয়া বের কচ্ছি!

টেনে দৌড় মেরেছিলাম, কিন্তু কি যে দুর্বুদ্ধি হল, একবারটি ফিরে চাইলাম। গোল-মাল শুনে বেরিয়ে এসে বারান্দার পেট্রোম্যাক্সের নিচে সবুজ কাপড়ের আঁচল গায়ে জড়িয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছে সে যে মনুয়া ছাড়া আর কেউ নয় এ আর আমাকে বলে দিতে হল না। অমনি পায়ে বেড়ি পড়ে গেল।

সবাই মিলে ধরে দিলে আমাকে থানায় জিম্মা করে। সাক্ষী-সাবুদ সব তৈরী, বিয়ের নাম করে পাঁচ হাজার টাকা ঠকিয়ে নেবার দরুণ আমার তিন মাস জেল হয়ে গেল। খেরোর জামা গায়ে দাঁড় পাকানো জেল খাটা। আমি যে মোহন নই, সে আর কাকে বলি? বাড়ির লোকেরা কিছুই জানতে পারল না, তাদের ধারণা আমি তখনো সুন্দরবনে। জানাইও নি ইচ্ছে করেই, পাছে গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে পিসিমা আমাকে খালাস করিয়ে মতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন।

কিন্তু ঐ খানেই আমার দুর্ভোগের শেষ হয় নি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেই না ফটকের বাইরে পা দিয়েছি, মনুয়ার বাবার দুই যমদূতের মতো অনুচর আমার ঘাড় ধরে লরিতে তুলে সোজা বেলেঘাটায় নিয়ে গিয়ে সেই রাত্রেই গোধূলি লগ্নে মনুয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। আমার গায়ে-হলুদ-হওয়া কনের আবার কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

আজ পর্যন্ত মনুয়া বিশ্বাস করে না যে, সে মোহন আমি নই, বলে টাকা হাতাবার লোভেই সেবার নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। মোহনের সে আত্মীয়রাও বর্মা চলে গেছে। এখনো আমি আমার সাজার কড়ি গুণছি। নিজের বলতে আমার কানা কড়িও নেই, স্ত্রীর কথায় উঠি বসি, শ্বশুরের ব্যবসায়ে খাটি।

কি বললেন? মোহনের মৃত্যুর জন্য এই হল উচিত সাজা? কি আর বলব আপনাদের, জেলে থাকতে মোহন এক ঠোঙ্গা সস্তা কমলা লেবু হাতে নিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে গেছিল। সে নাকি জল উঠছে দেখে তীরে নৌকো লাগিয়ে ওখান-কার ঐ জঘন্য জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। বেহারে কোথায় মাষ্টারি করে, হেড মাষ্টারের লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে বিয়ে করেছে। এই পুজোর সময় ওর প্রথম কবিতার বই বেরুল। কৃতজ্ঞচিত্তে আমার নামে উৎসর্গ করেছে।

দুটি ফরাসী কবিতা

অনুবাদ • অরুণ মিত্র

স্যুপেরভিয়েল এবং র‍্যাভের্দি আধুনিক ফরাসী কাব্যের দুই স্মরণীয় নাম। কিন্তু দুই-জনের কবিধর্ম বিপরীত। স্যুপেরভিয়েল সর্বপ্রকার সাহিত্য-আন্দোলন থেকে দূরে থেকে পৃথিবী ও জীবনের প্রতি তাঁর প্রেম ও সবকিছু সম্বন্ধে তাঁর অনুভবের কথা সহজ সুরে বলে গেছেন। র‍্যাভের্দি এককালে ফরাসী নব্য-কবিতায় একজন পুরোধা ছিলেন। তাঁর প্রকাশ জটিল, কিন্তু শব্দ-ভারাক্রান্ত নয়। তাঁর মনের ওঠাপড়াকে তিনি পরি-বর্তমান চিত্রকল্পে জড়িত করে রূপ দেন এবং তা যেন এক উদ্বেগের অনুভূতিকে বিকীর্ণ করে। এ-উদ্বেগ হয়তো আমাদের কালেরই এক নিগূঢ় চিহ্ন।

বৃষ্টি

চোখ মেলে দেখি বৃষ্টি পড়ে
জলে জলে কেবল ঝলকায়
আমাদের গম্ভীর ধরণী,
বৃষ্টি পড়ে সহজে তেমনি
যেমন সে পড়ত হোমারের
এবং ভিয়ঁর দূর কালে
শিশু আর শিশুর মায়ের
পরে, পড়ত ভেড়াদের পিঠে;
বৃষ্টি ফের নামে পৃথিবীতে
কিন্তু সে পারে না কোনোমতে
কাঠিন্য ঘোচাতে স্বৈরাচারী
মাথাদের, হৃদয়েরও নয়,
পারে না তাদের উপহার
দিতে এক সংগত বিস্ময়;
তুচ্ছ এক বৃষ্টি পড়ে আজ
অবিশ্রাম ইউরোপের পরে
একই আচ্ছাদনে ঘিরে নেয়
সকলকেই যে যেখানে আছে
পদাতিক সৈন্যেরা সত্ত্বেও
বন্দুক উঁচিয়ে তৈরী যারা,
সংবাদপত্রেরা যারা পাকা
খবর ছড়ায় ছাঁকা ছাঁকা
তাদের সে-সংকেত সত্ত্বেও;
তুচ্ছ বৃষ্টি ভেজায় পতাকা।

—ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল
(১৮৮৪—১৯৬০)

দোরগোড়ায়

যে মাটির উপর বসেছিল যে-কোণায়
সেখানে বিষাদ বা শূন্যতা
হাওয়া ঘোরে
একটা চীৎকার শোনা যায়
অভিযোগ করতে কেউ চায়নি
কিন্তু প্রদীপ নিবে গেল এক্ষুণি
নিঃশব্দে স্পর্শ ছড়ায়
একটি তপ্ত করতল
তোমার চোখের পাতায়
যেখানে ভারী হ'য়ে আছে সারাদিনের
যত প্রহর
সব কিছু দাঁড়ায় সিধে
এবং ব্যস্ত পৃথিবীতে
বস্তুরা মিশে যায় রাত্রির ছায়ায়
আমার নির্বাচিত মূর্তিটিও হারায়
যদি আলোর লহর
আবার জাগত ঘুম ভাঙার মতো

তাহলে আমার কানে র'য়ে যেত
সেই উৎফুল্ল কণ্ঠ যা আমাকে অবিরত
অনুসরণ করেছে ফেরার পথে গত সন্ধ্যায়।

—পিয়ের র‍্যাভের্দি
(১৮৮৯—১৯৬০)

একটি মা-বিড়ালের মৃত্যুতে

উমা দেবী

আরেকটি মৃত্যু এলো।
নীল-পর্দা ঢাকা কোনো গৃহের নিভৃতে নয়
সন্তর্পণ পদপাত তার।
চারিদিকে অশ্রুমুখী উচ্ছ্বাসের তরঙ্গিত
বিলাসের
আবর্তে আবর্তে ঘন হ'য়ে
মৃত্যুপাশ হয়নি প্রগাঢ়।
ক্ষোভ আর হতাশার কপাটকে দীর্ণ করে
অকস্মাৎ শূন্য কোনো পুঞ্জির হিসাবে
মর্মরিত বক্ষের পঞ্জরে
কণ্টক করেনি বিদ্ধ।
অথবা গভীর কোনো বেদনার তমিস্রা নিবিড়
ডুবিয়ে দেয়নি কোনো আত্মার ক্লান্তিকে।
অথচ এ মৃত্যু কত সহজ ও প্রত্যাশিত
শান্ত আর সমস্ত অশান্তি থেকে ঊর্ধ্বে স্থিত।
অশ্রুজল এসেছিল—হয়তো বা দৃষ্টিকেও
ঘোলা করেছিল—
হয়তো বা একটি কি দুটি বিন্দু
ঝরেছিল পথের ধূলোয়,
ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো
এ আমার মানুষিক দম্ভ আর আত্মম্ভরিতার
প্রমাণ দাখিল করা শুধু।
কি দিয়েছি আমি ওকে?
আজ কত উজ্জ্বল প্রভাত!
বৃষ্টিশেষে শ্রাবণের মেঘগুলি
শীষের পাতের মতো
সরানো রয়েছে একদিকে—হয়তো বা
পশ্চিমের দিকে—
না হ'লে আলোক এত উজ্জ্বল সহাস কেন?
পাশেই ললিত এক মহানিম গাছে
বৃষ্টিধোয়া শাখাগুলি প্রগাঢ় সবুজ
কম্পিত পাতার পুঞ্জ বুকে তুলে নিয়ে।
কার যেন পালিত পায়রার দল
হঠাৎ উত্থিত হয়ে আনন্দে—
আনন্দে মত্ত হয়ে
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলে যায়
শূন্য থেকে মহাশূন্যে—
বিয়োগের যন্ত্রণা কোথায়—প্রকৃতির গাঢ় প্রেমে?
সুপ্তোত্থিত নগরী-সভ্যতা
এখন ছড়ায় তার কর্মসূচী জটিল গ্রন্থির
দ্বিচক্রে ও চতুশ্চক্রে ঊর্ধ্বশ্বাস গতি
কাগজ-হাঁকার শোনা যায়—
ঘুমভাঙা শিশুদের কল-কল ক্রন্দন-কাকলি
গৃহিণীর ব্যস্ততা ও ছাত্রদের তপস্যা পাঠের
সর্বোপরি—গ্রাম থেকে বয়ে আনা
কাঁচা সবজীর রাশ
গন্ধ তার প্রভাত-সমীরে—মাছ দুধ
মাংস ও ডিমের
নানাস্বাদ প্রত্যাশা দিনের।
—ওর কোনো সাধ নাই—নাই কোনো
বিকৃতি মুখের
শান্তভাবে প্রকৃতির নির্দেশকে মেনে
সন্তান ধরেছে গর্ভে—পালন করেছে যত্নে
নিপুণা ধাত্রীর মত—
নিজের দেহের সুখ তুচ্ছ করে রিক্তাহার হয়ে।
ওর ক্ষুদ্র জীবনের নগণ্য নগ্নতা
বিশ্ব-বিধানের মধ্যে পেয়ে গেছে সহজ স্বাক্ষর।
মৃত্যু কত সহজ ও নির্ধারিত।
আমাদের মতো—অশ্রুতে কলুষ নয়।
বেদনার বিদ্রোহ সে নয়—
শোকের স্মৃতির মধ্যে ঔদ্ধত্যের অঙ্গীকারে
নয় মর্মান্তিক।
হয়তো বা আকস্মিক—তবু প্রত্যাশিত।
দেহ থেকে অন্য দেহ-সৃষ্টির প্রক্রিয়া
রূঢ় ও নিষ্ঠুর যত হোক—
তবু তার সহজ গ্রহণ
জীবনকে করেছে জীবন।
—তারপর মৃত্যু যদি আসে
যখন প্রসন্ন রৌদ্র প্রভাত বাতাসে—
আসুক সে—নামহীন বিস্মৃতির শুচিতা প্রতীক
সব মুছে দিক।

নির্মাতার জন্য

আনন্দ বাগচী

সব মূর্তি প্রতিমূর্তি ডুবে আছে বুকের
কোরকে,
আশ্চর্য ভ্রূণের মত, সৌন্দর্যের নিখিল-বারতা
রক্তে মিশে আছে, বক্ষে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে
খেলা করে
জন্মের-মৃত্যুর ঋণ, সব চিত্র রেখার গণিতে
অব্যয় অন্বয়ে বাঁধা; জীবনে যৌবনে
গল্পের লহরীমালা ছুঁয়ে যায় মৌন বেলাভূমি।

পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকে, অতি তীক্ষ্ণ নিকষ অক্ষর
শুধু নির্জনতা আনে, নিঃসঙ্গতা;
দিন রাত্রি জুড়ে॥

হাইকু

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

এক:
কুঞ্জপথে সখি কত যে পাতা মৃত
রয়েছে শুয়ে, দ্যাখো, সবুজ পাতা ছিল
এত যে বৃক্ষে তা লক্ষ্য করিনি তো!

দুই:
বিকেল চলে মৃদু সাঁঝের মন্দিরে,
ছায়ার পিছু ছায়া, দিনের জেলে যেন
আলোর জাল তার গুটায় ধীরে ধীরে।

তিন:
বৃষ্টিজলকণা আটকে আছে তারে,
আলোকরেখা কাকে গোপনে ভালবাসে—
বৃষ্টিবিন্দু না মুক্তাকণিকারে?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অর্জুন সেন তার এক কিস্তি বাঘ শিকারের গল্প শেষ করেই হাঁক ছাড়ে :

এই চা সে আও—গলা যে শুকিয়ে কাঠ। আর বকতে পারি না।

—বক বক করে বকে যাওয়াটাও যেমন পরিশ্রম—মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাটাও ঠিক তেমনি মেহনত। তোমার ওই সব খোঁড়া অজুহাত চলবে না।

হাতজোড় করে বন্ধুপ্রবর রেহাই চাইলেও আমি ঠিক জানি, উস্কানি দিয়ে আর একটি শিকারের ঘটনা ওর কাছে কেমন করে আদায় করা যায়। সেই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া যেই না সঞ্চালন করেছি, সে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল।

—আচ্ছা, তবে আমার ডায়েরীখানা খুলে তোমার খোরাক যোগাড় করে নাও—না, না, রোসো, একদিনে আড়াইটে বাঘ কেমন করে কায়দায় এনেছিলাম, তার জলজ্যান্ত ইতিহাসটাই তোমায় শোনাবো।

মেজর সেন ভল্টুকে আদেশ করতেই সে ইয়া মোটা একখানা কেতাব এনে হাজির করে।

চমকে উঠলাম বই নয়, যেন এক ভল্যুম ‍এনসাইক্লোপিডিয়া!

—সর্বনাশ! ওর মধ্যেই বাঘ লুকিয়ে আছে না কি?

অর্জুন সেনের উচ্চহাস্যে ঘরের কড়িবরগাগুলো যেন কেঁপে ওঠে—দেয়ালে ফাটল রে আর কি!

বিরাটাকৃতি ডায়েরীখানা খুলে কয়েক পাতা উল্টেই অর্জুন সেন থেমে গেল। দেখলাম তার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত, মুখের পেশীগুলি ফুলে উঠেছে 'ডোন্ট-কেয়ার' গোঁফজোড়া ন কোন চুম্বকের আকর্ষণে ঊর্ধমুখী। মিনিটখানেক কী ভেবে নেয়, তারপরই বলতে কে :

মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে, কোন্-চুলোয় ব, সেই কথাই চিন্তা করি। জানোইতো চলের মানুষ ঘরের টান বলতে কিছু নেই, জকর্মের ফাঁকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হৈ-হুল্লোড় করেই জীবনটা কেটে যায়।

এমনি সময় একটি পত্রাঘাত আমার সমস্ত ানকে উল্টে দিলে। সেই যে নেপাল বর্ডারে সীমানা জরীপের কাজে গিয়েছিলাম, সেখানকার ফ্যাক্টরীর সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ করে অন্ততঃ দিন-দশেকের ছুটি নিয়েও যেন আমি তাঁর কাছে হাজির হই—খুব বড় রকম শিকারের সম্ভাবনা। তাছাড়া আরও খবর—তাঁর নিজের দেশ থেকেও একজন নামজাদা শিকারী এসেছেন, নাম হান্টার। আমি গেলে পার্টি জমবে ভাল।

আর চাই কী? ভল্টুকে বলি—

তল্পিতল্পা তোল—আজই বেরিয়ে পড়া যাক। তোর আর বাড়ী যাওয়া হল না।

উৎসাহ তারও কম নয়। কিন্তু এবার সে যেন একটু খুঁত খুঁত করে। মর্মার্থ উপলব্ধি করি। তখনই তার হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা গুঁজে দিয়ে বলি :

এই টাকাটা আমার নাম করে তোর পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দে আর সেই সঙ্গে তার কাছে দিন পনেরোর ছুটি চেয়ে নিস। বোধগম্য হয়েছে কী?

দু'পাটির বত্রিশখানা দাঁত বের করে ভল্টু উত্তর দিলে :

এটা তাহলে আমার উপরি পাওনা? আগাম পেয়ে গেলাম? এবার খুব বড় শিকার না হয়ে যায় না!

—যা এখন চটপট বাজারে গিয়ে যা যা দরকার সব কিনে-কেটে ঝটপট গুছিয়ে নে—

ভল্টু আমার কারিৎকর্মা অনুচর। সব যোগাড়-যন্তর করে নিতেই আদেশ দিলাম—এবার চলো মুসাফির।

নেপালের প্রান্ত দেশে যেখানে সাহেবের ফ্যাক্টরী, সেখানে একবার শিকারে গিয়েছিলাম সে কথা তোমাদের বলেছি।

এবার পেঁছে দেখি, এলাহি কারবার। সাহেব যেন শিকারের নেশায় মেতে উঠেছেন। 'হোম' থেকে বন্ধু এসেছেন তাঁকে একবার দেখিয়ে দিতে চান—কী রাজসিক চালে তাঁরা ভারতবর্ষে বসবাস করেন।

হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর, কিছুর অভাব নেই। সারি সারি কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। লোকজন কারণে অকারণে ব্যস্ত। আমরা যখন পেঁছলাম—তখন বেলা প্রায় ১১টা। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর বন্ধু মিঃ হান্টারকে নিয়ে তখন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আর্দালী, বাবুর্চি, মশালচী যারা ক্যাম্পে হাজির ছিল, তারা আমাদের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেনি। চা-পান পর্ব সেরে আমি ও ভল্টু একটু এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা আমবাগান সেটা পার হতেই ডানদিকে বেশ বড় একটা দীঘি তার পাড়ে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তার পরেই এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমিটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে—মাঝে মাঝেই ঘন জঙ্গল।

শিকারের উপযুক্ত স্থান বটে। পথের ধারে একজোড়া বটপাকুড়ের নীচে আমি আর ভল্টু দুজনে একখানা বড় পাথরের ওপর বসে আছি—দেখা গেল দুটি ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। কাছে আসতেই দেখি তারা দুজনেই ইউরোপীয়ান, একজন আমার পূর্ব পরিচিত সেই ফ্যাকটর সাহেব, দ্বিতীয়জন নিশ্চয়ই নবাগত মিস্টার হান্টার।

আমাদের দেখেই ফ্যাক্টর সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে প্রথমেই আমার হাত ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি—তারপরই পরিচয় বিনিময়ের পালা। মিস্টার হান্টার লোকটি বেশ অমায়িক ও ভদ্র—কিন্তু চাল-চলনে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখার দিকেই ঝোঁকটা বেশী।

ভল্টুর চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না; বিশেষতঃ আমার ওপর কেউ টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে এটা তার অসহ্য। প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে সে আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। এবারও যদি তেমনি কিছু একটা করে বসে, তাই গোড়াতেই গা-টিপুনি দিলাম। সেও আমার ইসারা বুঝে নিয়েই সাহেব দুটির সামনে গিয়ে হাবিলদার মেজরের কায়দায় দু-পায়ের বুট ঠুকে একটা জবরদস্ত সেলাম দিয়ে বসল।

আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। লাঞ্চ খেতে বেশী সময় লাগেনি। তারপরই তিনজনের গোল-টেবিল বৈঠক। সাক্ষী-সাবুদ উপস্থিত।

গিরিধারীলাল নামে স্থানীয় এক মাতব্বর ব্যক্তির ডাক পড়তেই তার প্রবেশ ও লম্বা কুর্ণিশ। তৎপর উক্তি।

একটা নয়, দু-দুটো বাঘের অত্যাচারে তাদের গাঁয়ে বাস করা অসম্ভব। বাঘ দেখা যায় না—কিন্তু প্রায় রোজই দু-একটা গরু, মোষ ঘায়েল হয়—তাছাড়া মাস তিনেকের মধ্যে

জন-দশেক মানুষও বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

বাঘকে তারা দেখেছে কিনা এবং কোন-দিকটায় তাদের আনা-গোনা এটা তার কাছে ভাল করে জেনে নিয়ে ঠিক করা হল পরদিন খুব ভোরেই কিছু সংখ্যক বিটার পাঠিয়ে জঙ্গল বিট করা হবে। বাঘ যদি বের হয় ভালই নইলে সামনে যে বিস্তীর্ণ ঘাসের জঙ্গল আছে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলেই বাছাধনকে আমাদের সামনে পড়তেই হবে। এছাড়া গত্যন্তর নেই।

ভল্টুকে বলি : এবার খুব হুঁসিয়ার—দেখো বিদেশী বন্ধু যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যান।

ভল্টু লক্ষ্মী ছেলের মত আত্মসমর্পণ করে।

আপনার যা আদেশ, সেই মতই কাজ হবে। কিন্তু যদি সামনেই বাঘ এসে যায়, তাহলে কিন্তু আপনি ছেড়ে দেবেন না—আমিও ছাড়বো না।

আমার পরমভক্ত শ্রীমান অনুচরকে সতর্ক করে দিই :

খবরদার, পাগলামি করিসনি—অতিথিকে সর্বপ্রথম সুযোগ দিতে হয়। একটা কাজ কর বরং তুই কাল বিটারদের দলপতি হয়ে যা—যেমন করেই হোক বাঘকে আমাদের সামনে ফেলে দে।

ভল্টু প্রস্তাবটি সরাসরি ডিসমিস করে দিল।

সেদিনের দিনপঞ্জী এখানেই শেষ। সন্ধ্যার আগেই যে যার ক্যাম্পে আশ্রয় নিলাম। ভল্টু আমার পাশেই একটা নেওয়ারের খাটিয়ায় অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল। কেবলমাত্র আমার 'নিদ নাহি আঁখিপাতে।'

রাত্রির যে বিশেষ একটা পরিচয় আছে সেটা যেন এর আগে এমন করে অনুভব করিনি। কী যেন একটা রহস্যের হাতছানি একটা বিপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতির পূর্বাভাস বারে বারেই আমাকে পীড়া দেয়, এক-সঙ্গে পনেরো মিনিটের বেশী ঘুম হয় না। হঠাৎ সেই অন্ধকার ভেদ করে বহু দূর থেকে ভেসে আসা বাঘের গর্জন শুনতে পেলাম। রাইফেলটি বিছানায় আমার পাশেই। লাফিয়ে উঠে গুলী ভরে নিয়ে প্রস্তুত হই।

ভল্টুরও হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—আমাকে তখনো রাইফেল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে সেও উঠে বসে—তারপরই তন্দ্রাজড়িত প্রশ্ন।

—বাঘের ডাক শোনা গেল না?

—হাঁ, তাইতো মনে হয়।

কথাটা তবে মিথ্যে নয়—দিন দশেক এখানে থাকলে গণ্ডাখানেক কুড়িয়ে নিতে দেরী হবে না—কিন্তু স্যার আমি আর আপনি একই হাতীর সওয়ার হব।

পরদিন সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব—আমাদের তৈরী হয়ে নিতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নি। পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী বিটাররা আগেই রওনা দিয়েছে। তাদের দল-পতি পালোয়ান সর্দার। গোটা তিনেক হাতী, বিস্তর লোকজন আর টপার তার সঙ্গে

দুটো হাতী পিঠের ওপর হাওদা নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর বাইরে আসতেই আমি ও ভল্টু তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। ঠিক হ'ল, তাঁরা দুই বন্ধু একটি হাতীর ওপর উঠবেন—বাকীটায় আমি আর ভল্টু।

অতঃপর আমাদের যুদ্ধযাত্রা। পথে কয়েক-জন গ্রামবাসী উৎসুক নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে—হাত ইসারায় কী যেন বলতে চাইলো।

অর্ধেক পথ গিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে কয়েকটি লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকেই ছুটে আসে। মুখে নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া। একজনের কম্পিত উচ্চারণ।

—শের, হুজুর, শের, একঠো আদমিকো পাকড় লিয়া!

—সে কী? কোথায়?

সে নিরুত্তর—তার ভ্রূ-যুগল তখন দোতলা ছেড়ে তেতলায় উঠেছে।

সাহেব দুজন অনেকটা দূরে। আমার হাতীটাকে ফিরিয়ে নেবার হুকুম দিলাম।

কিছুটা পিছিয়ে আসতেই দেখা গেল একটি লোক খুঁড়িয়ে আসছে। গায়ের এখানে সেখানে রক্তের ধারা—নেহাৎ পাহাড়ী বলেই একেবারে কাবু হয়নি। তার কাছেই শুনলাম বাঘ তার পিঠে একটা থাবা মেরেছিল বটে, তারপর কী খেয়াল হতেই, তাকে আরো বেশী ঘায়েল না করেই চম্পট। হয়তো সে বুঝেছিল, তার রাজত্বে কোথায় যেন কী একটা গোলমাল চলেছে—তারই প্রতিবাদের নমুনা-স্বরূপ সে মানুষটার পিঠে চাঁটি দিয়েই উধাও।

আমাদের হাতীকে পেছনে দেখতে না পেয়ে ফ্যাক্টর সাহেব ভাবলেন, আমরা হয়তো পথ হারিয়েছি, তাই আমাদের খোঁজে আবার পিছু হটে এলেন। আহত লোকটিকে তখুনি ক্যাম্পের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে আমরা সবাই এবার একসঙ্গে পাশাপাশি চলতে থাকি।

বাঘ যখন একবার বেরিয়েছে—আর একটা মানুষকে ঘায়েল করেও তার রক্তের আস্বাদ পেলো না, তখন শোণিত তৃষ্ণায় সে যে পাগল হয়ে উঠবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই—কাজেই সময় বুঝে সাবধান হওয়া উচিত।

পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বাতাস বইতে সুরু করেছে। আমাদের সম্মুখেই একটা বিরাট ঘাসের জঙ্গল—তারও পেছনে অরণ্য-ছাওয়া পাহাড়গুলো ক্রমেই উঁচুতে উঠেছে। বিটাররা এখানেই জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করছে—চূড়ান্ত নির্দেশ পেলেই তারা আপন কাজে লেগে যাবে।

প্রথমেই চিন্তায় পড়া গেল—এই ঘাসের জঙ্গলে বাঘটা যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাকে 'বিট্' করে বের করা কঠিন। তার ওপরেও সমূহ বিপদ—যে কোনও মুহূর্তে সে আমাদের ওপর হামলা করবে। বন্দুক তোলার সময়টুকুও দেবে না।

ফ্যাক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—

এ অবস্থায় ঘাসের জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

উত্তর দিলেন হান্টার সাহেব—

সেইটিই একমাত্র করণীয়, মেজর। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পালোয়ান সর্দারকে

ডেকে আগুন লাগানোর কথা বলতেই তারও চোখে আগুন জ্বলে উঠল। ভীষণ উৎসাহ—সে তখুনি তার অনুচরবর্গের কাছে ছুটে গেল। ঘাসের জঙ্গল প্রায় শুকনো—কাজেই, অগ্নি-সংযোগ হওয়ামাত্রই বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলা সুরু হয়ে গেল—তার সঙ্গে বাতাসের মাতামাতি।

দেখতে দেখতে সমস্ত জঙ্গলটা পুড়ে গেল—কিন্তু বাঘ কৈ? দু-চারটে জন্তু-জানোয়ার প্রাণের ভয়ে সেই ধ্বংসের জঙ্গল থেকে ছুটে পালালো বটে, কিন্তু ব্যাঘ্র মহারাজ যে কোন্ অজানা আশ্রয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছেন, তার উদ্দেশ নেই।

আমরা আরও এগিয়ে যাই—বিটাররাও এগোতে থাকে। সামনেই আর একটি বিরাট জঙ্গল—মাঝে মাঝেই এক-একটি প্রকান্ড গাছ তাদের ডালপালা বিছিয়ে সেই গভীর অরণ্যকে পাহারা দেয়।

জঙ্গলের অপরদিক হতে 'বিট' সুরু হতেই ভীষণ হৈ-হল্লার আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয় কোন জানোয়ারের দেখা মিলেছে—আমাদের মধ্যে এইসব গবেষণা চল্‌তে থাকে এমন সময় একটা ফার্ণ গাছের ঝোপ থেকে সুন্দর একটি মাঝবয়সী ডোরাকাটা বাঘ বেরিয়েই দে ছুট্—যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ—বন্দুক তুলবার ফুরসুৎ পাওয়া গেল না।

কিন্তু হান্টার সাহেব ছাড়বার পাত্র নন—জঙ্গল নড়া দেখেই ধাঁ করে এক রাউন্ড গুলী ছুড়লেন। সেটা চাঁদের দেশে পৌঁছে গেল কিনা কে জানে!

ভল্টুর মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য :

সাহেবের নিশানার বহর দেখলেন, স্যার?

তাকে ধমক দিয়ে বলি :

চুপ করে বসে থাক—ও তো তবু গুলী করেছে, তুই তো বাঘটাকে দেখতেই পাস্‌নি।

ভল্টু দমে যাওয়ার পাত্র নয়—বুক ঠুকে বলে :

সাহেবও দেখতে পায়নি—আমি বাজি রাখতে পারি।

জানোয়ার দেখা না গেলেও তার পশ্চাৎধাবন করাই উচিত, আমরা হস্তীপৃষ্ঠে এই সিদ্ধান্তই করে নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি উল্টো দিক থেকে আক্রমণ চালাই। যদিই দৈবাৎ সোজা বেরিয়ে আসে, আমাদের সামনে পড়তেই হবে।

কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল, আমাদের হিসেবে ভুল হয়নি। জঙ্গলের একধার দিয়ে চুপি চুপি সে পালিয়ে যাচ্ছে—আমার নজরে আসতেই ধাঁ করে একটি গুলী। সেটা লাগলো তার সামনের পায়ে। মাটির ওপর একবার গড়িয়ে পড়েই সে হাঁ করে ছুটে আসে—সঙ্গে সঙ্গে কী ভীষণ গর্জন। কিন্তু তার আস্ফালন তখনই ঠান্ডা হয়ে গেল। আমাদের তিনজনের বন্দুকই একসঙ্গে গর্জে ওঠে—আর চোখের সামনে তালগোল পাকানো বাঘের দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই একদম গতাসু।

ভল্টু সচীৎকারে জয়ধ্বনি দেয় :

বাঘটা আমাদের—মেজর সাহেবের গুলীতেই প্রথম ঘায়েল হয়েছে।

ভাগ্যে বাংলা ভাষায় সাহেব দুটির ব্যুৎপত্তি নেই, নইলে আমিই লজ্জায় মরে যেতাম।

ফ্যাক্টর সাহেবও উত্তেজনায় চেঁচামেচি সুরু করলেন। শুধু তাঁর বন্ধু সদ্যসমাগত হান্টার সাহেবের আত্মসমাহিত ভাব।

চীৎকার শুনেই বিটার ও স্টপাররা ছুটে আসে; পালোয়ান সর্দার সামনে এসেই তাল ঠুকে দাঁড়ায়—যেন সব কৃতিত্ব তারই।

এদিকে ভল্টু হাতীর ওপর থেকে নেমে একটা পাথরের চাঁই বাঘের গায়ে ছুঁড়ে দেখলো—জানোয়ারটা সত্যিই অক্কা পেয়েছে কিনা।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিটারদের সাহায্যে বাঘটাকে অপর একটি হাতীর ওপর তুলে বেঁধে দেওয়া হ'ল। বীর-বিক্রমে আমরা দু'চার পা এগিয়ে যেতেই আবার একটা ক্রুদ্ধ গর্জন।

তবে কী জঙ্গলটা বাঘের ডিপো? আরো বাঘ—অনেক বাঘ? সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে আনন্দ ও বিপদ আশঙ্কা আর উত্তেজনা যেন আমাদের সবাইকে নাচিয়ে তোলে। শিকারের নেশা যাকে একবার পেয়ে বসে তার কাছে কিন্তু পৃথিবীর অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যায়।

তবু ফ্যাক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি—

এবার কি ক্যাম্পে ফেরা হবে?—না—নতুন শিকারের পেছনে?

হান্টার সাহেব মুখ খুললেন—

বেলা তেমন বেশী হয়নি—একবার চেষ্টা নিতে দোষ কী?

ভল্টু চোখ উল্টে ভেংচি কাটে—

ভারী আমার শিকারী—তার আবার কথা!

মেজর সেন একটি সিগারেট ধরিয়ে, একরাশ ধূম উদ্গীরণের সঙ্গে বলতে সুরু করে—

এবার সংক্ষেপেই বলছি—বেশী সময় নেব না।

বাঘের গর্জনটা যেদিকে শোনা গিয়েছিল, আমরা সেই দিকেই অভিযান চালাই। বিটার

(শেষাংশ ২০৫ পৃষ্ঠায়)

কলকাতার উত্তর প্রান্ত থেকে অনেকগুলো বাস ছাড়ে। ওদেরই একটায় উঠে পড়তে হবে আমাদের।

তা প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। রাস্তার বাঁকে বাঁকে অনেক যাত্রী উঠিয়ে নামিয়ে অনেক ধোঁয়া অনেক ধুলো উড়িয়ে অবশেষে বাস যখন তার যাত্রাপথের শেষে এসে থামবে তখন শহর কলকাতার পোষাকী পরিবেশের চিহ্নমাত্রও কোনদিকে দেখতে পাব না আমরা। এপাশে বুড়ো বটগাছের ছায়ায় টালিঢাকা ছোট্ট খুপ্রিতে চায়ের দোকানের ধুনি জ্বলছে, তার চারিপাশে জন পাঁচছয় হবু খরিদ্দারের জটলা। ওপাশে নির্জন হাটখোলায় খালি চালাগুলো বিষণ্ণ বৈরাগ্যের ছবির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

যাত্রীরা পোটলাপুঁটলি নিয়ে নামবে, কিছুক্ষণ কল্‌বল্‌ করবে, তারপর যে-যার পথে চলে যাবে। ড্রাইভার কন্‌ডাক্‌টর গাড়ী ছেড়ে আস্তে আস্তে চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে যাবে—আমরাও নেমে পড়ব।

ঐ দেখুন, হাটখোলার পাশ দিয়ে একটা সরু অপরিচ্ছন্ন সুরকি-ফেলা রাস্তা একটু বেঁকে গাঁয়ের বাইরের দিকে চলে গেছে। বেশি দূর নয়, মাত্র মিনিট দশেক হাঁটতে হবে আমাদের।......

এই যে পাঁচিল সুরু হয়েছে। পলেস্তারা খসে পড়ছে, সবুজ শ্যাওলায় সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছে, এখানে ওখানে দুই একটা বট-অশ্বত্থের চারাও গজিয়েছে। কিন্তু একখানা ইট খসে পড়ে নি কোথা থেকেও। দারুণ মজবুত গাঁথুনি। আর ওপর দিকে চেয়ে দেখুন—প্রায় তিন মানুষ সমান উঁচু। এ পাঁচিল আজ মরে গেছে। এখন যা দেখছেন তা শুধু মরা ইটের পাঁজরা-বের-করা কঙ্কাল মাত্র। কিন্তু একদিন এ পাঁচিল জীবন্ত ছিল, কড়া পাহারার তর্জনী তুলে ভিতরের জীবনকে বাইরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। তখন এ পাঁচিলের প্রচণ্ড দাপটে—

দেউড়িতে এসে পড়েছি আমরা। এখন অবশ্য শুধু নামেই দেউড়ি। লোহার গুল-বসানো সুপারি কাঠের প্রকাণ্ড একখানা ধুলি-মলিন পাল্লা বাদুড়ের ডানার মত এখনও থাম থেকে অসহায় একপেশে ভঙ্গীতে কায়ক্লেশে ঝুলে আছে। বড় রকমের আর একটা ঝড়-ঝাপটা উঠলেই বোধ হয় ঝুপ করে খসে পড়বে। আর একখানা পাল্লার কোন পাত্তা নেই, বোধ হয় গাঁয়ের লোকেরা চেলা করে পুড়িয়ে ফেলেছে।

একদিন এখানে পাগড়ি-আঁটা তক্‌মা-পরা ভোজপুরী দারোয়ানের দল হাতে সঙিগন-বাঁধা গাদা-বন্দুক নিয়ে টুলের ওপর বসে বসে পালা করে দিনরাত পাহারা দিত। আগে এত্তেলা না পাঠিয়ে কাকপক্ষীরও ভিতরে ঢুকবার হুকুম ছিল না।

এটা ছিল রাজাবাবুর খাসমহল। কাছারি-বাড়ী ছিল কলকাতার গা ঘেঁসে খালধারে। আস্তাবল ভর্তি ঘোড়া ছিল—বাছা বাছা ওয়েলার আর আরবী ঘোড়া। ব্রুহাম ছিল, ল্যাণ্ডো ছিল, টমটম ছিল, ভেলভেট-মোড়া গদিওয়ালা সাটিনের ঝালর-ঝোলানো বড় বড় পাল্কি-গাড়ী ছিল। দিনের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে দশবার এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত করত কেউ না কেউ।

ঐশ্বর্য ছিল, ঐশ্বর্যের আস্ফালনেরও অভাব ছিল না।

আজ সব ভোঁ-ভাঁ। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। নিস্তব্ধ নির্জনতা থমথম করছে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। দেউড়ির ভিতরকার পথ আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে—ভিতরেও নিবিড় জঙ্গল। একদিন যা ছিল ফলের বাগিচা, ফুলের কেয়ারি, বাহারী লতাপাতার-সাজানো বাগান, মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আজ তাই ভয়াবহ আরণ্য মূর্তি ধারণ করেছে।

তবু পথ আছে। ঝোপ-জঙ্গলের জটিলতার মধ্য দিয়ে একটা অত্যন্ত অস্পষ্ট পায়ে-চলা পথের চিহ্ন দেখা যায়—বুড়ো জনকধারীর পায়ের দাগ।

ঐ পথ দিয়েই আমরা ভিতরে ঢুকব।

ঐ দেখুন, একটু দূরে ডানদিকে ভাঙ্গা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। বিকেলের পড়ন্ত লালচে রোদ্দুরের মধ্যে যেন একটা নিরেট অন্ধকারের স্তূপ। দোতলায় প্রায় সবটারই ছাদ ভেঙেগ পড়েছে, একতলার ঘরগুলোর মেঝের জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। ঠিক যেন একটা ভূতের বাড়ীর মত দেখাচ্ছে।

কিন্তু ওখানে ভূত নেই। বাদুড় আছে চামচিকে আছে, শেয়াল আছে, সাপখোপও বোধ হয় আছে—আর আছে পাগ্‌লা জনকধারী। কোথায় কোন্‌ অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে কিংবা বসে বসে ঝিমুচ্ছে—আর স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ভূত নেই ও বাড়ীতে।

আমরা যাব সোজা সামনের দিকে। বাড়ীটাকে ডাইনে রেখে আর একটুখানি এগিয়ে গেলেই দীঘির ধারে গিয়ে পৌঁছব। এই দীঘিটাই আজ আপনাকে দেখাতে নিয়ে এসেছি।

বেশ বড় দীঘি—না? বিঘে তিন চার তো হবেই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, চারিদিকে এত ঘাস আগাছা আর ঝোপঝাড়ের জড়াজড়ি—শান-বাঁধানো ঘাট্‌লাটা পর্যন্ত আধা-জঙ্গল হয়ে গেছে, কিন্তু দীঘির জলের ওপর কোথাও এক কুচো শ্যাওলা নেই, কল্‌মির দাম নেই, জলো ঘাসের চাব্‌ড়া নেই। কালো কাকচক্ষুর মত নির্মল জল কানায় কানায় টলটল করছে—পূর্ণযৌবনা শাম্‌লা মেয়ের দেহলাবণ্যের মত। গ্রীষ্মকালের এই প্রচণ্ড খরা চলছে, কিন্তু দেখুন—এ দীঘির জলে এক ইঞ্চিও টান পড়েনি; কখনও পড়ে না। এ দীঘি সব সময়েই ভরা দীঘি।

যেমন কালো জল তেমনি ঠাণ্ডা।

গ্রীষ্মকালের বিকেলে এই এতখানি পথ এসেছেন বাসের ভ্যাপ্‌সা গুমোটে সিদ্ধ হতে হতে। গায়ের গেঞ্জি বোধ হয় এতক্ষণে ঘামে ভিজে জপজপে হয়ে গেছে—কেমন? চোখ মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, হাত-পা জ্বালা করছে নিশ্চয়?

তাহলে এইবার এক কাজ করুন। পায়ের জুতোজোড়াটা খুলে ফেলুন। এক সিঁড়ি জলে নেমে বেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন, মাথায় ঘাড়ে একটু জল থাবড়ে দিন। তারপর দুই পা জলের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে

দিয়ে ঘাটের এই রাণাটার ওপর আরাম করে বসে পড়ুন।—সব জ্বালা সব দাহ এক্ষুণি জুড়িয়ে যাবে।......

কেমন লাগছে বলুন তো?

চমৎকার ঠান্ডা—না? একটা স্নিগ্ধ শীতল তন্দ্রার আমেজ কুয়াশার মত কুন্ডলি পাকিয়ে ধীরে ধীরে দুই পা থেকে মগজের দিকে উঠছে বলে মনে হচ্ছে—কেমন? ঠিক যেন পায়ের দিক থেকে ঘুম আসছে। কিন্তু এ-তন্দ্রা ঘুমের তন্দ্রা নয়, এ শুধু স্বপ্নের তন্দ্রা।

আর কোন জ্বালা নেই, উত্তাপ নেই, শ্রান্তি বা ক্লান্তি কিছুই নেই আপনার দেহে মনে। সুশীতল শান্তির প্রলেপে আপনার সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে আসছে, মস্তিষ্ক মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছে। তন্দ্রার কুয়াশা এইবার আপনার চিন্তাকেন্দ্রকে স্পর্শ করেছে।

এইবার আপনি একটা স্বপ্ন দেখবেন। হ্যাঁ, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখবেন—এই বাড়ীর স্বপ্ন, এই দীঘির স্বপ্ন।

দীঘির কালো জল......দীঘির এই জল... শীতল কালো...শীতল কালো...শীতল...... কালো...

*　　*　　*　　*

ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত—শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশের আধখানা পার হয়ে পশ্চিমদিকে বেশ একটু হেলে পড়েছে। ঘন্টাঘরের পেটা ঘড়িতে একটু আগেই একটা বেজে গেছে।

বাঁ দিকে দীঘির কালো জলের ওপর চাঁদের আলো রুপালী আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। ডানদিকে চওড়া মোরামের রাস্তা, তারপর প্রকান্ড ফুলের বাগান—তার মাঝখানে পঙ্খের কাজ করা শাদা দোতলা বাড়ীটা জ্যোৎস্নার আলোয় কেমন যেন হালকা শাদা মেঘের স্তুপের মত দেখাচ্ছে।

এর মধ্যেই সব নিশুতি হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ অন্ধকার। শুধু দোতলার ঐ কোণের ঘরের জানালা দিয়ে ফিকে সবুজ আলোর অস্পষ্ট একটু আভা দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্রে রাজাবাবু নাচঘরে নামতে পারেন নি। আজ তিন রাত তিনি নামেন নি।

অভ্যস্ত রাজকীয় ব্যসনের কোলাহলের অভাবে বাড়ীটাকে বড় নির্জন মনে হচ্ছে। আসলে কিন্তু লোকের অভাব নেই বাড়ীতে। সদাসী বেয়ারা খানসামা সবাই আছে। তা ছাড়া কাছারি বাড়ী থেকে খোদ ম্যানেজারবাবু এসেছেন সঙ্গে দুজন সাহেব ডাক্তার আর চারজন নার্স নিয়ে—তাঁরাও আছেন। আর দীঘির দিকে বড় বড় তিনটে জানালাওয়ালা ঐ যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে পাশে, ওর মধ্যে প্রকান্ড পালঙ্কের মাঝখানে অন্ধকারে চুপ করে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন বুড়ী রাণীমা। নিষ্পলক চক্ষু মেলে জানালার ভিতর দিয়ে দীঘির ঘাটের দিকেই চেয়ে আছেন বটে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। সম্প্রতি দৃষ্টিহীন হয়ে গেছেন তিনি। রাত্রে ঘুম হয় না, তাই চোখ মেলে চেয়ে থাকেন—কিন্তু দিনরাতের পার্থক্য বুঝবার শক্তিও তাঁর চোখ এখন হারিয়ে ফেলেছে।

তিনি ছাড়া আর সবাই ঘুমুচ্ছে। অশান্তি আছে, উদ্বেগ আছে, উৎকন্ঠা আছে—তবু ঘুমের প্রয়োজনও আছে। রাত্রে ঘুমুতে হয়। বিশেষ করে অশান্ত উদ্বিগ্ন উৎকন্ঠাপীড়িত স্নায়ুমন্ডলীরই বিশ্রামের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।—তাই সবাই ঘুমুচ্ছে।

সবুজ আলো জ্বালা ঘরের মধ্যে—জানালার ধারে পাতা হাতির দাঁতের কাজ-করা মেহগিনির পালঙ্কে রাজোচিত রোগশয্যায় শুয়ে রাজাবাবুও ঘুমুচ্ছেন। তবে তাঁর নিদ্রায় শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই—মাঝে মাঝে পাশ ফিরছেন, উসখুস করছেন, বিড়বিড় করে কি বকছেন, হঠাৎ এক একবার ছটফট করে উঠছেন। ব্যাধির যন্ত্রণা অবসাদ-নিদ্রার পাতলা চাদরে সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে আছে—এইমাত্র।

ওদিকের দেয়ালের ধারে ছোট টেবিলের ওপর অষুধ-পথ্য ঘড়ি থার্মোমিটার স্পিরিট-ল্যাম্প অডিকলোনের শিশি প্রভৃতি রোগী-পরিচর্যার যাবতীয় সরঞ্জাম পরিপাটিভাবে সাজানো রয়েছে। দেয়ালের গায়ে টেম্পারেচার চার্ট ঝুলছে। টেবিলের ওপাশে ছোট টিপয়ের ওপর মোরাদাবাদী ফুলদানিতে রাখা মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া ঘরের ব্যাধিগন্ধ দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর এপাশে শক্ত কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে মেমসাহেব নার্স অঘোরে ঘুমুচ্ছে—নরম সুরের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে সবুজ আলোর চাপা উদ্ভাস, বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। দুই-এর মাঝখানে জানালার বাইরে প্রশস্ত বারান্দায় ছায়াময় রহস্যের রাজত্ব।

'উঃ! মাগো! জ্বালা—বড় জ্বালা!'

অস্ফুট কাতরোক্তি করে রাজাবাবু আবার একবার পাশ ফিরে শুলেন, তারপর অতি-কষ্টে চোখ মেলে চাইলেন।

জানালার ঠিক বাইরে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে—একেবারে গরাদের ওপর বুক চেপে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

'কে?—কে ওখানে?'

চওড়া লালপেড়ে শান্তিপুরী খড়কে-ডুরে শাড়ীর আধ-ঘোমটার নীচে অত্যন্ত মিষ্টি অত্যন্ত নরম একখানা মুখের আদল। ছায়ার মধ্যে আবছায়ার মত দুই চোখে গভীর শান্ত দৃষ্টি। কপালের ওপর আর দুপাশে দুই একটা অসংবৃত উড়ে-পড়া চূর্ণ-কুন্তলের গুচ্ছ।—কিন্তু বারান্দার অন্ধকার আর ঘরের মৃদু সবুজ আলো দুই-এ মিলে কেমন একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে ওখানে—কিছুই ভাল করে দেখা যায় না।

রাজাবাবুর দু'চোখের পাতা ক্লান্তিতে ভারী হয়ে আসছে; চোখ বুজে অত্যন্ত ক্ষীণ কন্ঠে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?'

আরও ক্ষীণ সুরে উত্তর ভেসে এল, 'আমি।'—উচ্চারিত মুখের ভাষা না বোবা দীর্ঘনিশ্বাসের প্রতিধ্বনি, বোঝা খুব সহজ নয়।

'কে?—ও, মণিবৌ। ভেতরে এস মণিবৌ, আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।—উঃ! বড় জ্বালা! সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল!'

'আমার তো ভেতরে যাবার উপায় নেই। আমি যে এখন বাইরের লোক'—ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিল মণিবৌ।

'ও—তুমি রাগ করেছ। আমাদের দোষ দিচ্ছ তুমি। কিন্তু—'

রাজাবাবুর কন্ঠে ক্ষুব্ধ অসন্তোষের আভাস।

'—কিন্তু ভেবে দেখ, দোষ তোমারই। তোমাকে সুখে রাখবার জন্যে সব চেষ্টাই আমরা করেছি, কিন্তু তুমি নিতান্তই অবুঝ। তুমি যা চাও সব কিছু পেতে পারতে—একটিমাত্র জিনিস বাদে। অথচ আর সব কিছু ছেড়ে তাইই তুমি চাইতে গেলে। আমাদের কি দোষ বল?'

রাজাবাবুর কণ্ঠস্বর ক্লান্তিতে নীরব হয়ে গেল। জানালার বাইরে ছায়ামূর্তির মুখেও কোন কথা নেই।

অনেকক্ষণ এমনি নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

আবার সেই মৃদু আর্তনাদ : 'জ্বলে গেলাম! জ্বলে গেলাম! সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে! মাগো—'

'রাণীবৌ কোথায়?'

রাজাবাবু আবার চোখ মেলে চাইলেন।

'কে?—ও! এখনও দাঁড়িয়ে আছ, মণিবৌ?—রাণীবৌ কাছারিবাড়ীতে চলে গেছে। তারও শরীর ভাল নয়। দু-দুটো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে রোগীর বাড়ীতে ডাক্তার-নার্সের হাঙ্গামার মধ্যে রাত কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

একটুখানি চুপ করে থেকে রাজাবাবু আবার বিড়বিড় করে বকতে শুরু করলেন,—'না, আমাদেরও অন্যায় হয়েছিল একটুখানি। শুধু রূপ দেখে ভুলে গিয়ে বামুন-পন্ডিতের ঘরের মেয়ে আমাদের সংসারে আনা উচিত হয় নি।—কিন্তু তুমি কেন মানিয়ে নিতে পারলে না, মণিবৌ? দোষ তোমারই।'

'তা হবে।'

'জান আমরা কে?'—রাজাবাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় ঝকমক করে উঠল।—'আমাদের বংশ রাজার বংশ। ইংরেজের খেতাব পাওয়া হঠাৎ-বড়লোক ভুঁইফোঁড় রাজা নই আমরা। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলেও আমরা রাজা ছিলাম, তার আগেও বোধ হয় ছিলাম। আমাদের রাজগী বনেদী রাজগী, আমাদের দেহের রক্ত বনেদী রাজরক্ত। আর সবাই যা আমরা তা নই।'

'তা জানি।'

'জান? কি জান? কতটুকু জান? জান যদি তবে এমন কাজ করতে গেলে কেন?—আমাদের বংশের পুরুষেরা গানবাজনা করে, শিকার করে, মদ খায়, বাইজী নিয়ে হুল্লোড় করে, বাছা বাছা মেয়েমানুষ পোষে। এই আমাদের বংশের ধারা, এই চিরকাল হয়ে আসছে। আর তুমি কিনা চাইলে—'

'এখন বুঝতে পারছি, ভুল করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, ভুল করেছিলে তুমি। আর সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলে সেইদিন যেদিন আমার মায়ের পা ধরে কেঁদে তুমি তাঁর কাছে তোমার দুঃখের কথা নিবেদন করতে গিয়েছিলে।—

(শেষাংশ ২০৬ পৃষ্ঠায়)

সিন্ধি পোখরী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গাঁ ছাড়িয়ে শহরেও খবরটা রটে গেল। ধর্ম মানে না, সংস্কার মানে না, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না যে বিক্রম সাহেব—এটা তার মুখেরই ঘোষণা। একটা মাস এক মস্ত অশান্তি নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে কাটিয়েছে সকলে। কি অভিশাপ জানি লাগে। শাসনকর্তা তাদের মত মানুষকে শায়েস্তা করতে পারে, মানুষের সঙ্গে যুঝতে পারে—কিন্তু দেবতার রোষ ঠেকাবে কি করে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সকলে। বিশেষ করে হনুমন্ত্খোলার ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সক্কলে। বিক্রম সাহেব এই গাঁয়েরই ছেলে। হনুমন্ত্খোলার খালের ওধারে তাদের মস্ত পাথরের বাড়িটাতে এখনো তার আত্মীয়-পরিজনেরা বাস করে। ওই বাড়ির ছেলে হোমরাচোমরা শাসনকর্তা হয়ে বসলেও বাড়ির লোকেরা গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে এখনো আগের মতই ব্যবহার করে। তাছাড়া শাসক হোক আর যাই হোক, গাঁয়ের অনেক বৃদ্ধ অনেক প্রৌঢ়র চোখে সে-দিনের ছেলেটা বই তো নয়। বয়েস বোধ হয় চল্লিশও ছোঁয়নি এখনো। তার কত কীর্তি-কলাপ তো তাদের চোখের ওপর ভাসছে। গত এক মাস ধরে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত তারা, শঙ্কিত। আজও তাদের উত্তেজনা কম নয়। কিন্তু এ উত্তেজনায় শঙ্কা নেই। আনন্দ আছে। নিশ্চিন্ততা আছে। কিছুটা বিস্ময়ও আছে। সকলের মুখেই এক কথা। সিন্ধি পোখরীর কথা। বিক্রম সাহেবের ঘোষণার কথা।

বিক্রম সাহেব বলেছে, সিন্ধি পোখরীতে যেও না কেউ, সিন্ধি পোখরীর জলে নেমো না কেউ। সিন্ধি পোখরীর জলে বিষ আছে। মুখে না বললেও বিক্রম সাহেব প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে, সিন্ধি পোখরীর জলে পশুপতি-নাথের গায়ের জ্বালা মিশে আছে, নীলকণ্ঠের বিষাক্ত নিঃশ্বাস পড়েছে।

হনুমন্ত্খোলার অনেক বৃদ্ধ এর পরেও পশুপতিনাথের চরণে বিক্রম সাহেবের কল্যাণ কামনা করেছে। গত মাসে সিন্ধি পোখরীর জলে যে তোলপাড় হয়েছে, তার জন্য ছেলেটার যেন কিছু অশুভ না হয়। শেষ পর্যন্ত তো সুমতি হয়েছে তার। তাই পশুপতিনাথ খামখেয়ালী ছেলেটার ওপর যেন কোনো রাগ না রাখেন। শাসকদের সম্পর্কে এ-যাবৎ দেবতার চরণে বিপরীত প্রার্থনাই করে এসেছে তারা। অত্যাচার অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছে। এ-পর্যন্ত শাসকদের নির্মম শোষক হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত তারা, নির্যাতনের যন্ত্রস্বরূপ ভেবে অভ্যস্ত। রাজ্যছাড়া ব্যতিক্রম হয়েছে এই একজনের বেলায়। ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ একদিন যখন একেবারে খোদ হর্তা-কর্তা হয়ে বসল সে, সকলে সচকিত, সন্ত্রস্ত। কি না জানি কান্ড শুরু হয় এবার। শাস্ত্র মানে না আচার মানে না যে, তার হাতে কিনা শাসনের ভার!

কিন্তু কিছুদিন না যেতে ভিতরে ভিতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে সকলেরই। তার শাসনকালে পাহাড়ী পথঘাটের চেহারা পর্যন্ত বদলে গেছে, হনুমন্ত্খোলার খালের নড়বড়ে পুল গিয়ে স্থায়ী পাকাপোক্ত পুল হয়েছে, খেত-খামারের কত উন্নতি হয়েছে ঠিক নেই। বাইরে থেকে চাষের কত জিনিস তারা পেয়েছে, গ্রাম শহরের অসুখ-বিশুখ পর্যন্ত কমে গেছে। খাজনা দিতে না পারলে পেয়াদা এসে গলায় পাথর ঝুলিয়ে ধরে নিয়ে যায় না, বরং অতি সহজে খাজনা দেবার মিয়াদ বেড়ে যায়। কোনো শাসকের আমলে এমনও যে হয়, নেপাল খণ্ডের এই ক্ষুদ্র অংশের লোকেরা অন্তত জানত না।

সংস্কারান্ধ এই মানুষেরা ধর্মগত আচার অনুষ্ঠানের গাফিলতি কখনো ক্ষমার চোখে দেখে না। কিন্তু বিক্রম সাহেব বা কমল বিক্রমের আচার-আচরণের ত্রুটি ধরা দূরে থাক, তার ঘরের কাশ্মীরী বউকে নিয়েও এখন আর তারা নিজেদের মধ্যে জটলা করে না। সেই ভিনদিশি মেয়ের নাক, মুখ, চোখ কিছুই তাদের মেয়েদের মত না হলেও এ-পর্যন্ত কোনো অকল্যাণের ছায়া তো গ্রাম-দেশে পড়েনি। উল্টে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু হচ্ছে না। এমনি করেই লোকটি সকলের বুক জুড়ে বসেছিল। তারা শুধু খামখেয়ালী মানুষ বলেই জানত তাকে। আর মঙ্গল কামনা করত।

কিন্তু হঠাৎ এই লোক সব ছেড়ে সিন্ধি পোখরী নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে একটা চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে উঠল, একটা শিহরণ দেখা দিল। অনেকের সন্দেহ হল, আসলে লোকটা পাগল কিনা। নইলে কোথায় লোকালয় বর্জিত জঙ্গলের ধারে সিন্ধি পোখরী পড়ে আছে—তার ওপর হামলা করার ঝোঁক চাপল কেন!

কিন্তু যারা আর একটু ভালো করে জানে তাদের শাসক বিক্রম সাহেবকে, তারা এই পাগলামি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু গোপন কথা বলাবলি করতে লাগল। এই গোপন কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

ছেলেবেলা থেকে বলতে গেলে কলকাতাতেই মানুষ হয়েছে কমল বিক্রম। এখানেই লেখাপড়া শিখেছে—স্কুলে পড়েছে, কলেজে পড়েছে। তবু দেশের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মানসিক যোগ ছিল তার। বছরে দু'বার দেশে যেত। গরমের সময় আর পুজোর সময়। পুজো গেলে প্রতীক্ষা করত কবে গরম আসবে, গরম গেলে ভাবত কবে পুজো আসবে। তাদের পাহাড়ী হনুমন্ত্-খোলা গ্রামটা যেন সর্বদা টানত তাকে।

বাবাকে মনে পড়ে না, তার জ্ঞান বয়সের আগে থেকেই বাবা পরলোকে। মা আছে। কিন্তু মায়ের শিথিল শাসন বড় মানেনি কখনো। আট দশ বছর বয়েস পর্যন্ত পাহাড়ে-জঙ্গলে নেচে-কুঁদে বেড়াত। গাঁয়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন তারা, অঢেল জায়গা জমি, মস্ত পাথরের বাড়ি। দিব্বি মনের আনন্দে ছিল।

কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন টিকল না। তার কাকা থাকত কলকাতায়। শিক্ষিত লেখাপড়া জানা মানুষ। তাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা তখন হাতে গোনা যায়। কাকা কলকাতায় ভালো চাকরি করত। একবার দেশে গিয়ে কাকা তাকে কলকাতায় নিয়ে এলো, তারপর ইস্কুল নামে একটা কয়েদখানায় পুরে দিল।

কমল বিক্রমের সর্বদা মন ছটফট করত, মন কাঁদত। বেশি খারাপ লাগত সংগী সাথীদের কথা মনে হলে। ঘড়ি দেখত আর ভাবত সুবর্ণবীর এখন কি করছে, শ্যামকলি কি করছে। ছুটিতে সেই অনুপস্থিতির খেদ পুষিয়ে নিত। মায়ের কাছে যেত বটে, কিন্তু ঘরে বড় থাকত না। মা বলত, তোর ছুটি ফুরোলে বাঁচি।

সুবর্ণবীর আর শ্যামকলি দুজনেই থাকত হনুমন্তখোলার পুলের এধারে। ওরা কেউ তাদের মত অবস্থাপন্ন নয়। তাদের বাপ-দাদারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে। শ্যামকলির আবার বাপ নেই, দাদাই কর্তা। কিন্তু অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা অবস্থা-টবস্থার ধার ধারত না। যার যত বেশি গায়ের জোর আর মনের জোর, সে তত বেশি মাতব্বর। এদিকে থেকে সুবর্ণবীরের জুড়ি ছিল না। যেমন গোঁয়ার, তেমনি দুরন্ত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমল বিক্রম পেরে উঠত না। হনুমন্তখোলার খালের জলে তাকে অনেক নাকানি-চোবানি খাইয়েছে সে। সাঁতারে তার সঙ্গে বড় বড় যোয়ানেরাও পারত না। বছর কতক কলকাতায় থাকার পর কমল বিক্রমের কত অধঃপতন হয়েছে, সে শুধু সেই জানে। সুবর্ণবীরের সঙ্গে দূরে থাক, সাঁতারে বা পাহাড়ী ক্ষেতে দৌড়ে ওই মেয়েটার সঙ্গেও সে পেরে উঠত না। অবলীলাক্রমে তাকে হারিয়ে দিত।

মনে মনে কমল বিক্রম কোনদিনই সুবর্ণবীরের ওপর খুশি ছিল না। সে থাকতে কারো কোন রকম সর্দারি করার উপায় নেই। কমল বিক্রমের সঙ্গে তার প্রকাশ্যে রেষারেষি হত, অপ্রকাশ্যেও। ছুটিতে দেশে গিয়ে গায়ের জোর আর বেপরোয়া সাহসের বদলে সে তার ওপর শিক্ষা আর বুদ্ধির টেক্কা দিয়ে চলতে চেষ্টা করত। দলবলের সঙ্গে সুবর্ণবীরও এক একসময় আজব শহর কলকাতার গল্প শুনত, ইস্কুলের লেখাপড়ার গল্প শুনত। মনে মনে কমল বিক্রম আশা করত সেও এবার তাকে একটু-আধটু সমীহ করবে, মান্যগণ্য করবে। কিন্তু শেষে দেখা যেত শহুরে বুদ্ধিসুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষার কোন দামই নেই তার কাছে। আর সকলে যখন মান্যগণ্য করতে শুরু করেছে তাকে, তখনো সে-যে কতভাবে তাকে অপদস্থ করেছে, হেলাফেলা করেছে ঠিক নেই। মোট কথা, তার বন্য দুরন্ত স্বভাবটাই সর্বদা সব-কিছুর ওপরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমল বিক্রমের বছর আঠের বয়স তখন। সুবর্ণবীরেরও তাই হবে। পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে কমল বিক্রম দেশে গেছে। চলা-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে কথা-বার্তায় আরো ভদ্র হয়েছে সে। শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে শিখেছে। পরীক্ষা ছিল বলে এবারে অনেক দিন পরে দেশে এলো। সুবর্ণবীরের সঙ্গে এবারে আর ছেলেমানুষি রেষারেষি করবে না ঠিক করেছিল। সে-যে উঁচু স্তরের মানুষ সেটা সুবর্ণবীর এবারে টের পাবে।

কিন্তু এসেই মায়ের মুখে শুনল শিগগীরই শ্যামকলির স্বয়ম্বর হবে। আর হবে সুবর্ণবীরের সঙ্গেই। শ্যামকলির বারো বছর বয়স পেরিয়ে গেছে, স্বয়ম্বরা হবার বয়স হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় থাকে বলে এ সম্ভাবনার কথা একবার মনেও হয়নি তার। শুনল, স্বয়ম্বর করাচ্ছে পাড়া-পড়শী মাতব্বরেরা। কারণ, শ্যামকলির দাদা ফৌজী দলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। গত বছরই স্বয়ম্বর হবার কথা ছিল, কিন্তু তার দাদা আসবে আসবে করে হয়নি। এ-বছর সেই দাদা আরো দূরে কোথায় চলে গেছে। তাই শ্যাম-কলির মায়ের অনুরোধে পড়শীরা এগিয়ে এসেছে।

শোনামাত্র শিক্ষার গর্ব গিয়ে কমল বিক্রমের বুকের ভিতরটা চিন্ চিন্ করে উঠল। আগে খেয়াল থাকলে এই স্বয়ম্বরটা তার সঙ্গেই হতে পারত। তারাও ছত্রী। পাত্র হিসেবে শ্যামকলির মা তাকে আকাশের চাঁদ ভাবত। কিন্তু মনেই ছিল না তার আর কি করবে। তবু যোগাযোগটা হয়েছে ভালো, কমল বিক্রম তা মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না। দুটিই সমান দস্যু। যেমন সুবর্ণবীর তেমনি শ্যামকলি। কেউ কারো থেকে কম যায় না।

কমল বিক্রম স্বয়ম্বরে এলো। ছেলেমেয়ে দুই তরফ থেকেই নেমন্তন্ন তার। নেপালের ছত্রীদের পাকা দেখাকে স্বয়ম্বর বলে। বিয়ের থেকেও এটা বড় ছাড়া ছোট অনুষ্ঠান নয়। বিয়ে সুযোগ-সুবিধে মত পরে যে-কোন সময়ে হতে পারে। অনেক বছর পরেও হতে পারে। এই স্বয়ম্বরটুকু হয়ে গেলেই সব হয়ে গেল। মেয়ে সম্প্রদান হয়ে গেল এই বিধানের আর নড়চড় নেই।

কমল বিক্রম স্বয়ম্বর দেখল। ভারী ভালো লাগল তার। এমনকি আজ সুবর্ণবীরকেও ভালো লাগল। সুন্দর সেজেছে। কোমরে তলোয়ার গুঁজেছে, মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে। এমনিতেই তরতাজা সুন্দর চেহারা, দৃপ্ত চাউনি। এখন আরো সুন্দর লাগছে। ঝকঝকে রাজপুত্রের মত লাগছে। আর শ্যাম-কলির তো তুলনাই নেই। ডানপিটে মেয়েটাকে এমন রূপসী কোনদিনও মনে হয়নি। গায়ের রঙ ফরসা নয় তেমন, কিন্তু এখন ফরসা লাগছে। ঝকঝকে বসনের ওপর দিয়ে ফিনফিনে চাপা রঙের ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। কিন্তু মুখ পরিষ্কারই দেখা যায়। তার পায়ে পাওজে, গলায় হাঁসুলি, কানে পাকা সোনার দুল। এ ছাড়া গলায় বাহুতে ফুলের গয়না। প্রথমে সুবর্ণবীর নিজের গলার মালা তুলে নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিল। মালা পরিয়ে শ্যামকলির আঙুলে ঝক-ঝকে আঙটি পরালো একটা। তারপর শ্যাম-কলি মালা পরালো, আঙটি পরালো। উৎফুল্ল মুখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কমল বিক্রম। মালা আঙটি পরানোর সময় শ্যামকলির ঠোঁটের ফাঁকে সে দুষ্টু দুষ্টু হাসি লক্ষ্য করেছে।

স্বয়ম্বর হয়ে গেল।

এবারের দীর্ঘ অবকাশে সুবর্ণবীরের আর একটা নেশা ধরেছে দেখল কমল বিক্রম। শিকারের নেশা। গেল বছর বন্দুক কিনেছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে শিকার করে বেড়ায়। এই শৌখের ব্যাপারটাও যেন তাকেই শুধু মানায়। দৃপ্ত পায়ে শিকারের সন্ধানে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ভয় ডর বলতে কিছু নেই। দেখে দেখে কমল বিক্রমের এখনো এক-এক সময় ঈর্ষা হয়। কিন্তু সেটা আর প্রকাশ পায় না এখন। শিকার জিনিসটা তারও ভালো লাগে। তার সঙ্গে সেও ঘোরে।

একদিন সুবর্ণবীর প্রস্তাব করল, সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গলে যাবে পাখি শিকার করতে। সেখানে অনেক পাখি।

কমল বিক্রমের ভিতরে অনেকদিনের একটা সংস্কার নাড়া খেল। সিদ্ধি পোখরীতে সে অনেকবার গেছে বটে, দূরে থেকে জঙ্গল দেখেছে, দূরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধি পোখরীর কালো জল দেখেছে। কিন্তু জঙ্গলেও ঢোকেনি কোনদিন, জলেও পা ছোঁয়ায়নি। সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গল সম্বন্ধে অবশ্য কোনদিন কোন নিষেধ বচন শোনেনি। পুকুরই নামা নিষেধ শুধু। নিষেধ অমান্য করে ওই পুকুরে নেমে প্রাণ দেওয়ার এত গল্প ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে, দলবেঁধে ছাড়া কেউ ওদিক মাড়ায় না। গোটা এলাকাটাই উঁচু প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের ওধারে পুকুর আর জঙ্গল। পুকুরটা নাকি মায়া-পুকুর, মানুষ খায়। জলে নামলেই টেনে নেয়। ওদের পন্ডিতেরা বলে, হর হর মহাদেও সমুদ্রমন্থনের বিষ খেয়ে জ্বালা জুড়োবার জন্যে ওই পুকুরে নেমেছিল, ওই জল তার বিষ-নিঃশ্বাস মিশেছে। সেই বিষই মানুষ টেনে নেয়।

সুবর্ণবীর ফিসফিস করে বলেছিল, শ্যাম-কলিকে বলেছে আজ সে পাঁচটা পাখি এনে দেবেই। একটা পশুপতিনাথের নামে, একটা তার নিজের নামে, একটা শ্যামকলির নামে, একটা শ্যামকলির মায়ের নামে, আর একটা কমল বিক্রমের নামে। ভারী ধুমধাম হবে। সিদ্ধি পোখরীতে গেলে নিশ্চিত পাখি মিলবে।

কমল বিক্রম জানে শ্যামকলির সঙ্গে গোপনে দেখা করে এই রকমই এক একটা বীরত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে সে। কিন্তু সিদ্ধি পোখরী নিয়ে এই ছেলেমানুষি তার ভালো লাগল না। বলল, সিদ্ধি পোখরীতে যাবে?

সুবর্ণবীর হাসল। বলল, তোমার ভয় করে তো তুমি যেও না, আমি একাই যাব। একা আরো গেছি।

শ্যামকলি জানে তুমি সিদ্ধি পোখরীতে যাচ্ছ?

সুবর্ণবীর তেমনি হেসে বলল, ফিরে এলে জানবে।

কমল বিক্রম ভাবল একটু। ভাবল, শ্যাম-কলি আরো জানবে যে সে ভয় পেয়ে সুবর্ণ-বীরের সঙ্গে যায়নি। জানবে সিদ্ধি পোখরীর জঙ্গলে সুবর্ণবীর একা গিয়েছিল পাখি শিকার করতে। কমল বিক্রম গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেও ভীরু নয়।

আকাশে বাতাসে সেদিন সংকট লেখা ছিল তারা কেউ জানত না। নিয়তি জাল ফেলে টেনে নিয়ে গেল তাদের, জানত না। যা ঘটবার তা বড় আকস্মিক ঘটে গেল। পঞ্চম পাখিটাই ঘুরতে ঘুরতে জলে পড়ল। ওটাই একজনের নিয়তি। আর ওই নিয়তির দূত কমল বিক্রম নিজে। অতগুলি গুলীর শব্দে জঙ্গলের পাখি উড়ে গিয়েছিল। অনেক ধৈর্যের পর সুবর্ণবীর এই শেষেরটা পেয়েছিল। কিন্তু ওটা জলে পড়তে সে হতভম্বের মত কমল বিক্রমের দিকে তাকিয়ে-ছিল। আর তক্ষুনি কমল বিক্রমের মুখ দিয়ে

(শেষাংশ ২০৭ পৃষ্ঠায়)
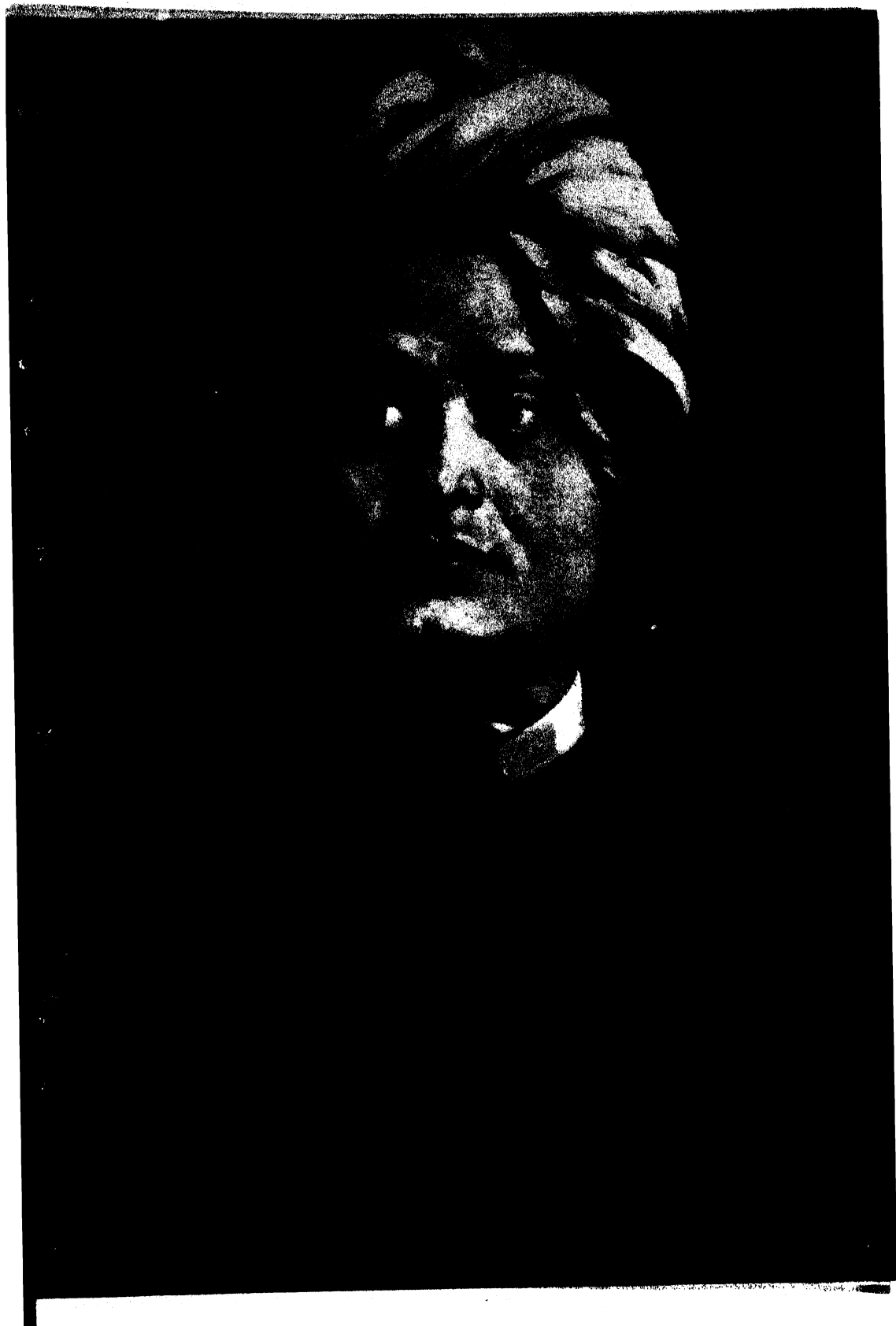
পুজোর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। ভবেন্দ্র ভাবিতেছে, সবাই কেমন পুজোর ছুটিতে এখানে ওখানে বেড়াইতে গিয়াছে। সে-ই শুধু একা পড়িয়া আছে। তাহার ইচ্ছা হইল, যাই, দিন কয়েক একটু দেশ-ভ্রমণ করিয়া আসি। ভবেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, একটু দক্ষিণ দিকে কলম্বো, কান্ডি (Kandi), অনুরাধাপুর—এই সব দিকে গেলে হয়। বেশ হয়, কিন্তু অন্তত হাজারখানেক টাকা পকেটে না লইয়া সে চেষ্টা না করাই ভাল। তাহাতে তাহার সামান্য প্রভিডেণ্ট ফান্ড হইতে তাহার প্রাপ্য প্রায় সব টাকাই তুলিয়া লইতে হইবে। অতদূর না গিয়া এদিকে মাদুরা, তাঞ্জোর, ব্যাঙ্গালোর, ত্রিচনোপল্লী এই সব দিকে গেলে হয়। কিংবা বম্বের দিকে, বম্বে, নাসিক, পুণা—ঐ সঙ্গে অজন্তা, ইলোরা—মন্দ হয় না। কিন্তু বাধা সেই একই বাধা, খরচে কুলাইবে না। শিমলা, শ্রীনগর, এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাণপুর, হরিদ্বার, দেরাদুন ঘুরিয়া আসিলে হয়। পথেই পড়িবে কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ ইত্যাদি—কিন্তু সেও তো বিষম খরচের ব্যাপার। তবে এদিকে গেলে ভ্রমণ ও পুণ্যার্জন দুইই হইতে পারে—হয়তো একটা ফ্যাসাদ বাড়িবে, গিন্নী সঙ্গে যাইতে চাইবেন। তাঁহাকে একটু বুঝাইয়া দিলেই হইবে, আমাদের কবির কথা—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নইলে খরচ বাড়ে! তাছাড়া, ভবেন্দ্র ভাবিয়া দেখিল, তিনিও আমারই মত আধুনিকা। আমার অনুপস্থিতি তাঁর মন্দ লাগিবে না। আমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো, পাড়াতো ভাইরা আসিয়া হাসি-ঠাট্টায়, গানে কলরবে তাঁর শূন্য মন ভরিয়া তুলিবে। আমার বিরহ-ব্যথা ডুবিয়া গিয়া পরমানন্দে ঘর ভরিয়া উঠিবে। সুতরাং সেদিক দিয়া ভাবিবার কিছু নাই। আসল বাধা—সেই মৌলিক বাধা—খরচ। ভবেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, বেশি দূরে না গিয়া বরঞ্চ নিকটে—এই যেমন, কাশী বা আরো কাছে ঘাটশিলা, রাঁচী, জামসেদপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, দার্জিলিং—এই সব জায়গায় দু'-চারদিন কাটাইয়া আসিতে পারিলেও শরীর ও মনের জড়তা ভাঙিয়া আসা যায়। কিংবা আরো কাছে, বর্ধমান, চন্দননগর, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি যায়গাও মন্দ কি? ভ্রমণ করিতে যে দূরেই যাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের কবিই বলিয়াছেন—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু।

ভবেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, তাই তো। কি কাজ বর্ধমান, চন্দননগরে? এই আমাদের বোট্যানিক গার্ডেন, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরেশনাথের মন্দির—এই তো কত কিছু রহিয়াছে নয়ন মেলিয়া দেখিবার! জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক শিশিরবিন্দু চক চক করিতেছে না, একটা দেওয়ালের গায়ে হাজারখানেক ঘুঁটে লেপটাইয়া আছে! তা থাক। ক্ষুধার অন্নের জন্য যখন উনান ধরাইতে হইবে, তখন ঐ কদাকার ঘুঁটেই সোনার থালার মত মূল্যবান হইয়া উঠিবে। জগতে কেউই ছোট নয়!

ভবেন্দ্রের মনের সমস্যা ক্রমশ সরল হইতে সরলতর হইয়া গেল। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিল, বড্ড একঘেয়ে লাগছে, একটু ঘুরে আসি। পুজোর পরেই যে সব আপিসের ঝামেলা আছে, তা মনে করলে নাড়ী বসে যায়। যাই, একটু মনটা যদি হালকা করে আসতে পারি।

কোন্‌দিকে যাচ্ছ?

কাছেই কোথাও যাই। ভাবছি একবার জু-তে ঘুরে আসি।

গৃহিণী ভামিনী বলিয়া উঠিল, এখনো তোমার জু-এর সখ আছে? ওখানে তো অন্তত পঞ্চাশবার গেছ ছেলেবেলা থেকে।

ছেলেবেলার যাওয়া আর এখন যাওয়ার অনেক তফাৎ।

বেশ, যাও, ঘুরে এস। কখন ফিরবে? বাড়ী এসে খাবে তো?

না, ওখানেই কিছু খেয়ে নেব। ভবেন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল।

২

চিড়িয়াখানার প্রবেশপথে ঘোরান কাঠের দরজা পার হইতেই ভবেন্দ্র দেখিল, একটি ছোট পরিবার সেই সময়েই ভিতরে ঢুকিয়াছে। এক বৃদ্ধ, দুইটি তরুণী, একটি বালক এবং একটি বধূ। বধূটিকে দেখিয়াই ভবেন্দ্রের মনে হইল, যেন কতকালের চেনা, যদিও ভবেন্দ্র তাহাকে জীবনে কখনো দেখে নাই। ভবেন্দ্র ইহাতে পুলকিত, অভিভূত হইলেও বিস্মিত হইল না। আধুনিক জীবনে ও সমাজে নাকি এরূপ সর্বদাই হয়। ভবেন্দ্র ও ভামিনীর জীবনেও হইয়াছে।

ভবেন্দ্র বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি খোকা?

আমার নাম ভবেশ।

তোমরা কোথা থেকে এসেছ?

ঐ যে কলকাতার দক্ষিণে ভৈরবপাড়া থেকে।

সঙ্গে ও'রা?

উনি আমাদের কাকা ভোলানাথবাবু, আর দুজন আমার দিদি আর বোন—ও'দের নাম ভবানী আর ভগবতী, আর উনি আমার বৌদি ভারতী।

তোমার বৌদির নামটা বেশ, না?

হ্যাঁ, কিন্তু ও'রা একটু সেকেলে। এ বিয়েতে আমাদের বাড়ীর কারো তেমন মত ছিল না, কিন্তু আমার এক পিসিমার বাড়ীতে বউদিকে দেখে দাদা পছন্দ করে ফেললেন। কাল রাত্রে ও'দের ফুলশয্যা হয়ে গেছে।

ভবেন্দ্র ভাবিল, কি আশ্চর্য, এমন বৌকে অপছন্দ! মুখ তো নয়, ঠিক যেন একটা ফোটা গোলাপফুল। কি চমৎকার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে! দেখলেই মনে হয় যেন কত অসুখী।

ভবেশ বোধ হয় একটু বেশি কথা বলে। বলিল, জানেন, আমাদের নিজেদের বাড়ী ছাড়া কলকাতাতেই চৌদ্দখানা বাড়ী আছে। দু'খানা দোতলা, চারখানা তেতলা আর চারখানা চারতলা। বউদিদের বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। উনি ত হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। আমার আর ভাই নেই। কাজেই বুঝলেন, আমাদের দু' ভাইয়েরই সব।

ভবেন্দ্র ভাবিল, তবে ভারতী অসুখী কেন?

ভবেশ ভারতীর আলস্যজড়িত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কাল রাত্রে ও'রা মোটেই ঘুমোন নি। দেখছেন না, চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আছে। দাদা বোধ হয় এখনো বিছানা থেকেই ওঠেননি।

ভবেন্দ্র বলিল, চল, আমিও তোমাদের সংগে যাই। আমার বেশ ভাল লাগছে তোমাদের সংগে যেতে।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া উহারা ময়ূরের খাঁচার নিকট গিয়া দেখিল, কি চমৎকার একটি ময়ূর তার প্রকাণ্ড পাখা মেলিয়া যেন টুক টুক করিয়া নাচিতেছে। ভারতী এমন পাখা-মেলা ময়ূর কখনো দেখে নাই। সে আনন্দে ও বিস্ময়ে ময়ূরটির দিকে চাহিয়া আছে। ভবেন্দ্র বলিল, দেখবেন, সাবধান। আপনার অমন চোখ কাছে পেলে এক্ষুণি ঠোঁট দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে। ভারতী শুধু বলিল, যান, কি যে বলেন! আহা! কি সুন্দর ওই পাখাগুলো আর ওই উপরের দিকের নীলরংএর নক্সাগুলো—ঠিক যেন কেউ তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। ভগবতী বলিল, নাও হয়েছে, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। চল, অনেক কিছু দেখবার আছে।

উহারা দেখিতে দেখিতে চলিল, ভবেন্দ্র বুঝাইতে বুঝাইতে চলিল। ভবানী ও ভগবতী সব দেখিয়াছে, কাজেই শুধু টিপ্পনী কাটিয়াই চলিল। কাকাবাবু দলে একটি অচেনা অথচ বেশ চটপটে সংগী পাইয়া বেশ হাল্কা মনেই চলিলেন। ভবেশ বৌদির কাছে কাছে থাকিলেও, মোটের উপর ভবেন্দ্রই যেন ভারতীর ঘনিষ্ঠ আপন জন হইয়া উঠিল।

ভবেন্দ্র ভারতীকে বুঝাইতে লাগিল, ওই যে বানর, হনুমান—ওরাই আমাদের বহু পূর্বের পূর্বপুরুষ। ওদের বড়গুলোর মুখ কালো, আর ছোটগুলোর মুখ লাল—মোটের উপর একই জাত। যেমন আফ্রিকার নিগ্রো আর বিলেতের ইংরেজ। আমরাও ঠিক ওই রকম ছিলাম। ডারউইন সাহেব বলে গেছেন, ওদেরই লেজ খসে গিয়ে, গায়ের লোম পড়ে গিয়ে আর মুখটা একটু এদিক-ওদিক বদলে গিয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। আমরাও সেটা মেনে নিয়েছি—আমাদের বাঁদরামি কথাটার মানেই হচ্ছে বানরের মত ব্যবহার।

ভারতী বলিল, আমরা রাস্তায় মাঝে মাঝে যে বানর নাচ দেখি, সেটা ওই লালমুখো বানরের নাচ।

হ্যাঁ। আর বড় বড় কালমুখো বানরগুলো—যাকে আমরা হনুমান বলি, সেগুলো—

ভারতী বলিল, থাকগে, আর বানরের বাঁদরামি দেখতে চাইনে। ওখানেই একটি ফেরিওয়ালার নিকট হইতে গোটাকয়েক চাঁপাকলা কিনিয়া তাহার দু' একটা লোহার গরাদের ফাঁক দিয়া ভিতরে ছুঁড়িয়া দিল এবং বাকিগুলি তাহার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিল—প্রয়োজনবোধে অন্যান্য জন্তুদের দিয়া দিবে।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া উহারা হাতীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবেন বলিল, চলুন, সবাই হাতীতে ওঠা যাক।

ভবানী বলিলেন, আমরা আর হাতীতে উঠব না, অনেকবার উঠেছি। বরঞ্চ আপনিই বৌদিকে নিয়ে একবার উঠুন। উনি নিশ্চয়ই আগে কখনও ওঠেননি। আমরা বরঞ্চ ততক্ষণ ওদিকে আর একটু ঘুরেটুরে দেখি। আপনারা কাছে কাছেই থাকবেন। আমরা এদিক দিয়েই ফিরে আসব।

ভারতী এর আগে কখনও হাতীই দেখেনি। ছবিতে অবশ্য দেখিয়াছে। কিন্তু এই বিরাট জন্তুটা সত্যই কেমন, তাহা জানিত না। সে অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল এবং অন্য অনেক লোককে হাতীতে চড়িতে দেখিয়া তাহারও ইচ্ছা হইল, একবার হাতীতে চড়ে। তাহার মনোভাব বুঝিয়া ননদিনী ভবানী বলিলেন, হ্যাঁ, যাও বৌদি, দেখে এস, কেমন মজা লাগবে।

হাতীতে ওঠার সিঁড়ির কাছে বেশ ভীড় হইয়াছিল। সেখানকার কর্তা সদ্য বিবাহিতা, সালংকারা, পদ্মাননা ভারতীকে দেখিয়া একটু উদ্যোগ করিয়াই উহাকে এবং উহার সংগী ভবেন্দ্রকে একেবারে সম্মুখের সারিতে স্থান করিয়া দিল। একটি ফাজিল ছোকরা নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিল, বঙ্কিমবাবু কি আর শুধু শুধু লিখে গেছেন, চাঁদমুখের জয় সর্বত্র।

ভবেন্দ্র ও ভারতী একেবারে সামনে, মাহুতের পশ্চাতে কাছাকাছি গিয়া বসিল। ভারতীর মনে একটু ভয়, একটু সংকোচ থাকিলেও, মোটের উপর বেশ ভালই লাগিতেছে। হাতী ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ভারতীও হেলিয়া-দুলিয়া চলিতে লাগিল। ভবেন্দ্র তন্ময় হইয়া পরস্ত্রীর অর্থাৎ ভারতীর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ভবেন্দ্র বলিল, বেশ মজা, না?

ভারতী ধীরে ধীরে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে ভারতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, হাতীর শুঁড়টা উল্টাইয়া ভারতীর বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ছবির শুঁড় এবং নিজের বুকের উপরে আসিয়া পড়া শুঁড়, ঠিক এক ব্যাপার নয়। ভারতী বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। ভবেন বলিল, এক কাজ করুন তো। আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে যে কলা আছে, তার একটা কলা ওর নাকের ডগায় পুরে দিন।

ভারতী তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে রাখা কলাগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া একটু বড় দেখিয়া একটি চাঁপা-কলা হাতীটির শুঁড়ের ডগায় নাকের ফাঁকের মধ্যে পুরিয়া দিল। হাতীটা ভোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভারতীর আঙুলশুদ্ধ একটা কলা চাপিয়া ধরিল।

ভারতী আঙুলে ব্যথা পাইয়া বলিয়া উঠিল, ওরে পোড়ারনাকী, ওটা কলা নয়, ওটা আমার শরীর, ছেড়ে দে। গদি হইতে মাহুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া তাহার অংকুশ দিয়া শুঁড়ের গায়ে একটা খোঁচা দিতেই হাতীটা আঙুল ছাড়িয়া দিয়া কলাটি লইয়া শুঁড়টাকে প্রথমে য-ফলার মত করিয়া এবং পরক্ষণে প্রকাণ্ড একটা ও-র মত করিয়া কলাটাকে তাহার বিরাট মুখগহ্বরে ছুঁড়িয়া দিল।

ভারতী তাহার আঙুলটি টানিয়া আনিতেই, ভবেন তাহার রুমাল দিয়া আঙুলটি মুছিয়া সেটি মুখে পুরিয়া একটু চুষিয়া ছাড়িয়া দিল। বলিল, বেশি লাগেনি। এখুনি সেরে যাবে।

ভারতী বলিতে লাগিল, কি অদ্ভুত এই জীবটি। কি না করে বাবা!

ভবেন বলিল, ওই নাক দিয়েই ওরা সব কাজ করে, যা আমরা হাত দিয়ে করি। সেই জন্যই তো ওদের বলে হস্তী, করী, এই সব। ওই শুঁড় দিয়ে ওরা বড় বড় গাছ ভেঙে ফেলে—

ভারতী বলিল, আমার বুকটাও যেন ভেঙে গেল।

ভবেন বলিল, তার মানে?

ভারতী বলিল, আহা, ন্যাকা, কিছুই বোঝেন না যেন।

হাতী ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পিঠের উপরের যাত্রীরাও ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসিল। হাতীর উল্টানো শুঁড়ের ডগায় আরো একটি কলা সাবধানে গুঁজিয়া দিয়া ভারতী ভবেন্দ্রের সংগে মাটিতে নামিয়া পড়িল। ভবেন্দ্র বলিল, এবার চলুন আর একটা অদ্ভুত জীব দেখে আসি। ওই লম্বা গলা কালো কালো ফুলকাটা হলদে-গলা, ছোট্টমাথা জিরাফ। দূরে হইতে দেখিয়াই ভারতী বলিল, থাক, ওসব না হয় আর একবার এসে দেখে যাব। আমি আর হাঁটতে পারছি নে। চলুন ওদিকে একটু ছায়ায় কোথাও গিয়ে একটু শুয়ে পড়ি। ততক্ষণে ঠাকুরঝিরা ঘুরেটুরে আসুন।

ভবেন্দ্রও তাহাই চায়। উহারা দুইজনে একটি গাছের ছায়ায় গিয়া বসিল। ভারতী বলিল, কাল রাত্রে এক ফোঁটাও ঘুমুতে পারিনি। ভবেশটা গিয়ে আমাকে জোর করেই তুলে দিল। উনি তো আমাদের অসবার আগ পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিলেন।

ভারতী কাত হইয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িতেছিল। ভবেন্দ্র তাহার মাথাটা ধরিয়া আস্তে তাহার ডান হাঁটুর উপর রাখিয়া বলিতে লাগিল, আপনার এই তো মাত্র শুরু। শ্বশুর-বাড়ীতে অনেক জ্বালা, অনেক ঝামেলা। সেই জন্যই তো উপপতিদের এত আদর। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। সময় মত স্নো-পাউডার-রুজ-লিপস্টিক মেখে সেজেগুজে দেখাশোনা, যতক্ষণ ইচ্ছে যা ইচ্ছে করা। এইটেই হল আসল প্রেম। ঘরে ঘরে যে সব প্রেম দেখা যায়—মানে—খাওয়া দাওয়া—কাজকর্ম — অসুখ — বিসুখ—ঝগড়াঝাঁটি — কান্নাকাটি — সেক — পুল্টিস —সালফাবড়ি — ইনজেকশন — ট্যাঁ-ট্যাঁ এর মধ্যে কি খাঁটি প্রেম গজাতে পারে? আমাদের সেকালের কেষ্টে দা—

ভারতী বলিল, কেষ্টোদা কে?

আহা, তোমরা যাকে বলো শ্রীকৃষ্ণ। ষোড়শ' গোপিনীদের সংগে লীলা করেছিলেন বলেই তো তাঁর এত নাম-ডাক। সে না হয় পুরোনো কথা। এই ধর আমাদের চণ্ডীদাস—একটা ধোপানীর সংগে—মানে, সেইজন্যই তো ওদের কথা মনে করলে আমাদের মনে কত পুলক-শিহরণ জাগে—আসল প্রেমের পরিপূর্ণ আস্বাদ পাই।

ভারতী নিদ্রা-জড়িতকণ্ঠে বলিল, আপনি কত ভালো ভালো কথা বলছেন। শুনে আমার খালি মনে হচ্ছে আমাদের কবিবরের কথা—

আমি যাবো না যাবো না যাবো না ঘরে,
বাহির পাগল করেছে মোরে—

তারপর বলিল, আপনি আমাকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চলুন—আমি আর শ্বশুর-ঘরের খাঁচায় যাব না। ভারতী ঘুমাইয়া পড়িল।

(শেষাংশ ৮৮ পৃষ্ঠায়)

আড়বার (আলোয়ার)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আড়বার শব্দটী তামিল শব্দ। অর্থ ভগবদ্ প্রেমোন্মাদ। আড় অর্থে নিমজ্জিত, বার অর্থে ব্যক্তি। যিনি ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া থাকেন। প্রেমোন্মত্ত ভক্ত। আল অর্থে বিজয়, যিনি ভগবানকে জয় করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন আল্বার, অর্থ বিজেতা—অর্থ সংসার বিজয়ী, ভগবদ বিজয়ী। শব্দ-তাত্ত্বিক বলেন তামিল বর্ণমালায়—দুইটী "ল" এবং দুইটী "ড়" আছে। একটী মৃদুভাবে আর একটী সমান কঠোরভাবে উচ্চারিত হয়। বাঙলা বর্ণমালায় অথবা দেবনাগরী বর্ণমালায় এই দুইটী অক্ষর নাই।

আড়বারগণ দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের সর্বজনমান্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবতে দ্রাবিড় দেশের বহুল প্রশংসা দেখিতে পাই।

শ্লোক আছে—

"তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী"—
সেই দেশ মহা পবিত্র।

শ্লোক আছে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজদ্রাবিড়েষু চ ভূরিসঃ।

দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুকাঞ্চী একটী বিখ্যাত তীর্থ, এই তীর্থে বিষ্ণুর নাম বরদরাজ। শ্রীমদ্ভাগবতে বরদরাজের উল্লেখ লক্ষণীয়। দশমে কয়েকবারই বরদরাজের নাম আছে। আধুনিক কোন কোন পন্ডিতের মতে শ্রীমদ্ভাগবত দাক্ষিণাত্যে প্রণীত হইয়াছিল, এবং গ্রন্থের রচনাকাল নাকি অষ্টম শতাব্দী। এই মত একান্ত অশ্রদ্ধেয়। কয়েকখানি পুরাণ উপপুরাণে শ্রীমদ্ ভাগবতের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে পশ্চিম ভারতের শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরার কথা বহু বিস্তৃত। তাহা হইলে বলিতে হয় গ্রন্থ পশ্চিমেই প্রণীত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের কথাও গ্রন্থ মধ্যে অবহেলিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আরো একটী কথা স্মরণীয়। অন্ধ্র ভৃত্য বংশীয় নরপতি হাল দাক্ষিণাত্যেরই রাজা। তিনি সাতশত প্রাকৃত ভাষায় রচিত গাথা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। একটী গাথায় ভাবার্থ—শ্রীমতী যশোদা বলিতেছিলেন, "আমার দামোদর এখনো বালক, এই কথা শুনিয়া গোপ বধূরা নিভৃতে হাসিয়াছিলেন।" আর একটী গাথায় আছে একজন গোপী কৃষ্ণকে (কানুকে) বলিতেছেন—গোধূলি বেলায় শ্রীরাধার (রাই-এর) বদনমণ্ডল গোক্ষুরোত্থিত ধূলিতে মলিন হইয়াছিল, তুমি মুখ মারুতের দ্বারা (ফুৎকারে) সেই ধূলি অপনোদন করিয়াছিলে, অর্থাৎ ধূলি ঘুচাইতে গিয়া শ্রীরাধার মুখ চুম্বন করিয়াছিলে, ইহাতে অন্যান্য গোপীদের গৌরব গিয়াছে। বর্তমান পদাবলী সাহিত্যে আজিও আমরা এই গোপীদিগকে এবং এই শ্রীরাধাকেই দেখিতে পাই। হাল-সপ্তশতীর সঙ্কলন কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। শ্রীমদ্-ভাগবত যদি পরে সঙ্কলিত হইত, এবং দাক্ষিণাত্যে সঙ্কলিত হইত, নিশ্চয়ই শ্রীরাধা তাহার মধ্যে স্থান পাইতেন। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে কিম্বা তাহারও পূর্বে গোপীদিগকে গ্রহণ পূর্বক শ্রীরাধাকে পরিত্যাগের কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অষ্টম শতকের কিছু পরেই আচার্য নিম্বার্ক শ্রীরাধাকে আপন অভীষ্টরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্-ভাগবতের মত একখানি রহস্য গ্রন্থের রচনা একক কোন পন্ডিতের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয় শ্রীমদ্ ভাগবতে বরদ-রাজের নাম পাইয়া পরবর্তী কালে কোন সাধক "বরদরাজ" আখ্যা দিয়া বিষ্ণু মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্রাবিড় যে ভক্তির বিকাশ ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অন্য একটী শ্লোকে উল্লিখিত আছে—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি বৃদ্ধিং কর্ণাটকেগতা"

আড়বারগণের মধ্যেই এই ভক্তির পরম প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথজীর মন্দিরের একজন আচার্যের নিকট শুনিয়াছিলাম—কোন কোন আড়বারের বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক হইবে। কিন্তু আধুনিক পন্ডিতগণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আড়বারগণের আবির্ভাবকাল গণনা করেন। অষ্টম শতকের পরে আর কোন আড়বার আবির্ভূত হন নাই। আড়বারগণের মধ্যে দ্বাদশ জন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই দ্বাদশজনের নাম পোয়গৈ, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশৈ নম্বাড়, মধুর কবি, কুলশেখর, পেরিয়, অন্ডাল, তোন্ডারিপ্পড়ি, তিরুপ্পান ও তিরুমঙ্গই। ইহাদের মধ্যে নম্বাড় বা শঠকোপই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জাতিতে ইনি শূদ্র। আড়বার-গণের রচনা তামিল বেদ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম দিব্য প্রবন্ধ। শঠকোপ রচিত তিরুবিরুত্তমকে বলা হয় ঋকবেদ। তিরুবাশিরিয়ম যজুর্বেদ। তিরুবন্দাদি অথর্ববেদ, আর তিরুবায়-মোড়ি বা সহস্র গীতি সামবেদ নামে অভিহিত হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "বেদানাং সামবেদোঽস্মি", বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। সামবেদ যেমন শ্রেষ্ঠ, শঠকোপ স্বামীর তিরুবায়মোড়িও তেমনই তামিলবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শঠকোপ আচার্য রামানুজের সমসাময়িক। এক সময়—রামানুজ এই শূদ্রের নিকটেই মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রামানুজ অদ্বৈতবাদ খন্ডনপূর্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে গিয়া তিরুবায়মোড়ি হইতে বহু সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামানুজের শ্রীভাষ্যের মূল ভিত্তি হইল তিরুবায়মোড়ি। বেদান্ত ভাষ্যের মত তিরুবায়-মোড়িরও বহু ভাষ্য প্রচলিত আছে। মধুর কবি ব্রাহ্মণ; অণ্ডাল বা গোদাম্বাজী একজন প্রেমোন্মত্তা রমণী, ইনিও ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিরুপ্পান জাতিতে পারিয়া, এই অন্ত্যজ আড়বার আপন প্রেম-ভক্তিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলেরও বন্দনীয় হইয়া আছেন। কুলশেখর ছিলেন ক্ষত্রিয়, রাজবংশে জন্মিয়া নিজেও রাজ্যেশ্বর ছিলেন। ইঁহার মুকুন্দমালা স্তোত্র বহুবিখ্যাত এবং বাঙ্গালাতেও সুপরিচিত। ইঁহার মুকুন্দমালা স্তোত্রের একটি অংশ—"মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো মা কুদেশেসু জন্ম"। আমি যেন স্ত্রীলোক হইয়া না জন্মাই। আমার মনে যেন মন্দভাব কখনো না আসে, কুদেশে যেন আমার জন্ম না হয়। কথা-গুলি শুনিতে অদ্ভুত লাগে। যদিও অন্ডাল বা গোদাম্বাজী ইঁহার পর আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তথাপি ইনি কি কোন ভক্তিমতী রমণীকে দেখেন নাই? শ্রীদেবী বা গোপীগণের কথা শোনেন নাই? রমণীর প্রতি ইঁহার এই বিরাগের কারণ খুঁজিয়া পাই না। বাংলায় মধুসূদন স্তোত্র বহু ভক্ত বৈষ্ণব নিত্য পাঠ করেন। ব্রাহ্মণগণ ইহা স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ মনে করেন। স্তোত্রটি শ্রীশুকদেব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। গবেষকগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত হউক ক্ষতি নাই। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়।

যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীসু বা পুরুষেসু চ।
তত্র তত্রাচলা ভক্তি স্ত্বয়ি মাং মধুসূদন।

অবশ্য কুলশেখর একথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই ...

নরকে বা নরকান্তক প্রকামম অবধীরিত শারদার
বিন্দৌ চরনৌতে মরণেঽপি বিচিন্তয়ামি।

আড়বারগণ সাধারণতঃ বিধিমার্গেই শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে রাগমার্গে উপাসকেরও সংখ্যা ছিল প্রচুর। অন্ডাল দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বকীয়া নায়িকা হইলেও তাঁহার মধ্যে পরকীয়া ভাবের আচরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আড়বারগণের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, রাগমার্গে এই পঞ্চবিধ উপাসকেরাও স্বকীয়া বা পরকীয়া ভাবের উপাসক ছিলেন।

আড়বারগণের মতে শ্রীভগবানের তিন শক্তি—শ্রীদেবী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী, ভূদেবী অর্থাৎ পৃথিবী, এবং লীলাদেবী। এই লীলাদেবীই নারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিষী, শ্রীরাধারাণী লীলা-দেবীরই অবতার।

শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত আছে—সাতটি বৃষকে জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে লীলাদেবীর সম্বন্ধেও এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে সাতটি বৃষকে পরাজয়পূর্বক নারায়ণ লীলাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দিব্য প্রবন্ধেও ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত দাক্ষিণাত্যে রচিত হইলে তাহার মধ্যে লীলাদেবীর নাম কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নিশ্চয়ই থাকিত। আড়বারগণ নারায়ণের স্তব করেন—'শ্রীভূমি লীলা নায়ক।' শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু নারায়ণ নহেন—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। গোপীগণ নন্দগোপ সুতকেই পতি-রূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্রহ্মার স্তবে শ্রীকৃষ্ণ পশুপাঙ্গজরূপে বন্দিত হইয়াছেন। ইহা দাক্ষিণাত্যের প্রভাবের পরিচায়ক নহে। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী—সকল সম্প্রদায়েই, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানির বিপুল সমাদর। অষ্টম শতকে দাক্ষিণাত্যে গ্রন্থখানি রচিত হইলে কোন—

(শেষাংশ ৭৬ পৃষ্ঠায়)

আমি প্রায়ই তাই দেখি যে, ফুলের মধ্যে যারা মিষ্টগন্ধী তারা অন্য ফুলের চেয়ে স্বল্পায়ু হয়, তাদের ভিতরকার সৌরভ-টুকু তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়ে তারা হঠাৎ শুকিয়ে যায়। ওর মধ্যে কতক ফুল তবু কিছুকাল টিকে থাকে, যেমন গোলাপ, চাঁপা। আর কতক ফুল খুবই তাড়াতাড়ি শুকোয়, যেমন বেল, যুঁই, হেনা।

দুই ভাই-এর দুই মেয়ে ছিল বিবাহযোগ্যা। তাদের বয়স বাড়ন্ত, আগেকার দিনে বলতো অরক্ষণীয়া। দুইজনেই দেখতে ভালো, তবে ওর মধ্যে যার নাম অনিলা সে একটু ফর্শা, আর যার নাম সুনীলা সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। আমাদের ছোটদার জন্যে জ্যাঠাইমা খুড়ীমার দল ফর্শা মেয়েটিকেই পছন্দ করেছিলেন। ছোটদার বাপ-মা বেঁচে না থাকায় তাঁরাই হলেন অভিভাবক। কিন্তু ছোটদা তখন বি-এ পড়ছে, কাজেই তারও নিজের কি মত সেটা জানা দরকার। সবাই বললে, তুমি নিজে দেখে এসো কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ। ছোটদা একে নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকে, তাতে ভারিক্কি মানুষ, নিজের জন্যে কনে দেখতে যাওয়া সে পছন্দই করলে না। সে আমাদের নাম করে বললে, এরা আমার হয়ে দেখে আসুক, এরা যা বলবে তাই হবে। কাজেই আমি কনে দেখতে গেলাম পাড়ার আরো তিনজনের সঙ্গে। তারা গেল বন্ধু হিসাবে, আমি গেলাম দূর সম্পর্কের ছোটো ভাই হিসাবে। আত্মীয় আর প্রতিবেশী।

মেয়ে দুটিকে এক-সঙ্গেই আমাদের সামনে এনে হাজির করা হলো। অনিলা অর্থাৎ যে মেয়েটি ফর্শা, সে মাথা হেঁট করে বসে রইল। মুখ তুলে চাইতে বলায় সে যখন আমাদের দিকে চাইলে তখন দেখলাম তার চোখে-মুখে একটু গর্বিত ভাব। অর্থাৎ যেন বলতে চায়,—সবাই জানে আমি সুন্দরী, তা স্বীকার করতেই হবে। আর শ্যামলা মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে-মুখে যেন একটা প্রাণবন্ত আগ্রহ ফুটে বেরোচ্ছে। যেন সে স্পষ্টই বলছে "আমাকে নাও, আমাকে নাও।" তার গায়ের রং যেমনই হোক, চোখের দৃষ্টি জীবন্ত আর মুখখানি ভারী মিষ্টি। দেখলেই মনে হয়, এর মধ্যে যথেষ্ট প্রাণসম্পদ আছে। দেখবামাত্র আমার একেই পছন্দ হলো।

আমি ছাড়া আরো তিনজন যারা ছিল তাদের মধ্যে দুজন আমার কথাতেই সায় দিলে, কেবল একজন পছন্দ করলে ফর্শা মেয়েটিকে। ছোটদা সকলের মত শুনে বললে, মেজারিটি মাস্ট বি গ্র্যাণ্টেড্। সুতরাং ছোটদার সঙ্গে ঐ শ্যামল মেয়েটিরই বিয়ে হয়ে গেল, যার নাম সুনীলা।

তার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার একটা হৃদ্যতা জন্মে গেল। সে জানাল যে, আমিই তাকে পছন্দ করে এনেছি, নইলে ফর্শা অনিলা থাকতে এমন বিদ্বান বরের সঙ্গে তার বিয়ে হতো না। তা ছাড়া এমনিতেই সে মিশুক প্রকৃতির। আমি যদিও তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, তবু সে আমার সঙ্গে ঠিক সমবয়সীর মতোই আচরণ করতো। আমাকে ডাকতো ঠাকুরপো বলে।

আমি প্রায়ই গিয়ে হাজির হতাম ছোটো বৌদির কাছে। গেলেই বেশ গল্প জমে উঠতো— সে তো বটেই, তাছাড়া ছোটো বৌদি দুটি জিনিস চমৎকার বানাতে পারতো। একটি হলো কড়া চা, আর একটি হলে মিঠে পানের খিলি। গেলেই তা পেতাম সেই লোভে লোভে প্রায়ই গিয়ে পড়তাম। দেখতাম যে সে ভারী বুদ্ধিমতী, খানিকটা লেখাপড়াও জানে, সকল বিষয়েই বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে।

সব-কিছু মিলিয়ে তার দিকে আমার এমন একটা আকর্ষণ এসে গেল যে, দু-চার দিন সেখানে যাওয়া বাদ পড়ে গেলেই আমার মন খুঁতখুঁত করতো, তাই অবসর থাকলেই যাতায়াতের পথে ওদের বাড়িতে ঢুকে পড়তাম।

বেশ চলছিল। ইতিমধ্যে ছোটদা অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে একসঙ্গে এম-এ আর ল পড়তে শুরু করলেন। সর্বক্ষণ তাই নিয়েই থাকতেন। তার উপরে আবার সকালে সন্ধ্যায় দু-জায়গাতে টিউশনি করতে শুরু করলেন। তার কারণ কাকা জ্যাঠারা পরস্পরে পার্টিশন হয়ে বাড়ি ভাগ ক'রে নিলে, ছোটদার অংশটা দেয়াল গেঁথে আলাদা করে দিলে। পৃথক হয়ে ছোটদাকে আলাদা রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হলো। অথচ তাঁর নিজের তেমন কোনো আয় নেই, যা কিছু পৈতৃক পুঁজি তা আছে কোম্পানির কাগজে। কাজেই নগদ আয়ের একটা উপায় তাঁকে করতেই হয়।

কিন্তু তাঁর যা পরিশ্রম হতে লাগল অমানুষিক। সময়ে নাওয়া-খাওয়া নেই, সব উঠেই টিউশনি, তারপর ফিরে এসেই না মুখে কিছু গুঁজে কলেজে ছোটা। বি ফিরে একটু চা খেয়েই আবার টিউশনি। এ করতে করতে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হলো। কি কাল পরে দেখা গেল তাঁকে টি বি রে ধরেছে।

ছোটো বৌদি যথেষ্টই সেবাশুশ্রূষা কর কোম্পানির কাগজগুলি ভাঙিয়ে ভা চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কিছু কিছু হলো না। প্রায় বছর-খানেক ভুগে স স্বান্ত হয়ে ছোটদা মারা গেল। বৌদি বেচ নিতান্তই নিঃসহায় আর নিঃসম্বল হয়ে পার্টিশান করা বাড়িতে একা একা বাস কর লাগল।

অবস্থাটা যা দাঁড়ালো তা শোচনী আত্মীয়েরা কিছু সাহায্য কর দূরে থ দিনান্তে কেউ একবারও উঁকি মারে না। বৌ যদি তাদের কাছে যায় তাতে তারা বিরক্ত হ ভাবে যে সে বুঝি কিছু চাইতে এসেছে, ত রোগের ছোঁয়াচ তাদের মধ্যে ছড়াতে এসে কিন্তু সে হলো বাঙালীর ঘরের অসহ বিধবা বৌ, কিছু সাহায্য না পেলে তার চলে কেমন করে! এমনকি দোকানে গি নিজের খাবার জন্যে চাল, ডাল পর্যন্ত সং করতে পারে না। লজ্জা সরম খুইয়ে যা সামনে পায় তার কাছেই কেঁদে-কেটে অন করে। পাড়ার ছেলেদের ডেকে কাকু মিনতি করে, তাদের দয়া হয়, তারা কখনো ধারে কখনো বা নিজেদের গাঁটের পয়স নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এনে দেয়।

আমি অবশ্য সবই দেখতে পাচ্ছি, কি আমারও তখন ছাত্রাবস্থা, ইচ্ছা থাকলে কতটুকুই বা করতে পারি। নিজেকে যথে অপরাধী বলে মনে করতে থাকি কারণ আমিই তাকে পছন্দ করে তার এ বাড়ি আসার হেতু হয়েছিলাম. নইলে অন্য কোথা বিয়ে হতো, এমন অবস্থায় ওকে পড়তে হতে

না। তাই যথাসাধ্য চেষ্টা করি ওর কিছু উপকার করে দিতে। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে চওড়া ধুতিপাড় কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে বলি—"বৌদি, এই চওড়াপাড়ের ধুতি পরে কলেজে গেলে ছেলেরা বড়ো ঠাট্টা করবে, এখানা তুমিই নাও।" বৌদি একটু হেসে বলে, "নেবো বৈকি, তোমার যখন মানে লাগছে তখন আমাকেই তোমার মান বাঁচাতে হবে তো।" বাড়ির দৈনিক বাজারের ভিতর থেকে উচ্ছে, পটোল, আলু, বেগুন যা দেখতে পাই চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে বলি, "মা পাঠিয়ে দিলে।" বৌদি সবই বুঝতে পারে, বলে "তাঁর দয়ার শরীর, আমার কথাটা ভুলতে পারেন না।" পয়সাকড়িও কিছু কিছু দিই, যখন যা পারি। আমতা আমতা করে বলি, "এমাসে আমার এই ক'টা টাকা বেঁচেছে বৌদি, তোমার তো এখন দরকার"—।বৌদি টাকা ক'টা হাতে নিয়ে একটু কান্নাভেজা হাসি হেসে বলে. "হাঁ দরকার বৈকি। তোমার কাছে এখন ঋণ নিচ্ছি, ভিক্ষে নয়। এ ঋণ আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো, আসছে জন্মে। খুব বেশী দেরী হবে না।"

কিন্তু এমনভাবে কি চিরদিন চলতে পারে? আমি তাই ভাবতাম, হঠাৎ মাস-কতক পরে সে সমস্যার একটা কিছু কিনারা হয়ে গেল! বৌদির ভগ্নীপতি হলেন সতীশবাবু, যার সঙ্গে সেই ফর্শা মেয়ে অনিলার বিয়ে হয়েছে। তিনি এসে বললেন যে, তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা আর আসন্নপ্রসবা। সে একেবারে অক্ষম হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, হাত-পা ফুলছে। সতীশবাবু অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন, নিজেকে তাঁকে দুবেলা রাঁধতে হচ্ছে, অফিসে যেতে রোজ দেরী হয়ে যাচ্ছে, এমন করলে তাঁর চাকরি থাকবে না, ইত্যাদি। তিনি একজন ভালো লোক খুঁজছেন, যত টাকা মাইনে চায় দিতে রাজী আছেন।

বৌদি এ কথার কিছু জবাব দিলে না, নিঃশব্দে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি কিন্তু দেখলাম বৌদির চোখে সেই উন্মুখ আগ্রহপূর্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি, ঠিক যেমন দেখেছিলাম কনে দেখার সময়। সে দৃষ্টি স্পষ্টই বলছে "আমাকে নাও, আমাকে নাও।"

সতীশবাবুও বোধ করি তা বুঝলেন। তিনি বললেন, "তোমাকে এ অবস্থায় নিজের বাড়ি ছেড়ে আমার ওখানে যেতে বলতে পারি না. কিন্তু তুমি যদি যেতে পারতে তাহলে সব দিক দিয়েই খুব ভালো হতো। এ বাড়িতে চাবি দিয়ে যাবে, আমি না হয় মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো।"

বৌদি বললে, "তা কেন, যদি বলো তো আমার বোনের কাছেই বরাবর থাকতে পারি। এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিতে পারি, যে ভাড়াটা উঠবে তা তুমিই নেবে, আমার খাওয়া-পরার খরচটা তাতেই—"

সতীশবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"না না, সেকি কথা! তুমি গিয়ে থাকবে আমার বাড়িতে, সেই তো যথেষ্ট সৌভাগ্য! তোমার টাকা তোমারই থাকবে।"

বাড়ির নিজের অংশটা ভাড়া দিয়ে বৌদি সতীশবাবুর ওখানে চলে গেল।

সতীশবাবুদের বাড়ি ভবানীপুরের দিকে. আমাদের উত্তরপ্রান্ত থেকে অনেকখানি দূরে। কলেজের ছুটির পরে আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম, বৌদির সঙ্গে দেখা করে তার হাতের কড়া চা খেয়ে আসতাম।

কিছুদিন পরে শুনলাম, অনিলা প্রসব হতে গিয়ে মারা গেছে। এক্লামসিয়া হয়েছিল। তাকে প্রসূতি হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে সে মারা গেছে।

সতীশবাবু শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ত্যাগই করলেন, কিছু না খেয়েই অফিস চলে যান। বৌদি অনেক কষ্টে তাঁকে কিছু খাওয়ায়।

সে অবস্থা কেটে যেতে কিন্তু বেশীদিন বিলম্ব হলো না। বৌদি তাঁকে সেবা-যত্ন দিয়ে আর ভুলিয়ে-ভালিয়ে অল্পদিনেই সুস্থ প্রকৃতিস্থ করে তুললে।

এর পর কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করতে লাগলাম, বৌদির মুখটা যেন ভার ভার অন্যমনস্ক। কথাও বলে, সবই করে, কিন্তু কি একটা যেন ভাবে।

একদিন ওখানে যেতেই বৌদি হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "ঠাকুরপো, আমাদের মতো বিধবা জগতে আর কোনো দেশে হয় কি?"

আমি স্বীকার করলাম যে তা হয় না, কেবল আমাদের দেশেই বিধবাদের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষার এমন কড়াকড়ি ব্যবস্থা দেখা যায়।

বৌদি বললে, "পবিত্রতার কথা চুলোয় যাক, আমি বলছি বিপদে পড়ার কথা। এমন বিপদে বোধ হয় হতভাগা বাঙালী বিধবাগুলো ছাড়া আর কেউ পড়ে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আসল কথাটা কি, বৌদির এখানে আবার কি বিপদ হলো!

বৌদি বললে, "ঐ সতীশবাবু। অনিলা নেই, এখন ওর আমাকে দরকার। মুখে এমনি বেশ ভদ্র ব্যবহারই করে, কিন্তু আমি ওর চোখ দেখলে ওর রকম-সকম দেখলে সবই বুঝতে পারি। আমি তাই একদিন স্পষ্টই ওকে বললুম, এখানে এভাবে তোমার সঙ্গে আর থাকা চলে না। হয় আমাকে ছেড়ে দাও, নয় আমাকে বিয়ে করো। সে জিভ কেটে বললো, তাই কি হয়, ছেড়ে দিলে তুমি যাবে কোথায়। আমি বললাম, যেখানে হোক একটা জায়গা খুঁজে নেবো, কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করব। সে বললে, তা কিছুতেই হয় না, ছেড়ে আমি দিতে পারি না। তখন আমি বললাম, তাহলে বিয়ে করো, বিধবার বিয়ে আজকাল কতই হচ্ছে। সে বললে, তাহলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারব না, আত্মীয়রা সবাই ছি ছি করবে। তার মানে সেটুকু মনের জোর কিংবা সাহস ওর নেই। বললে, কিছুই করতে হবে না, তুমি এমনিই থাকো যেমন আছো তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি যতক্ষণ আছি। কিন্তু এইভাবে কি থাকা যায়, তুমি বলো? বাড়িতে রয়েছে একজন লুব্ধ পুরুষ, আর আমার দেহও দুর্বল, মনও দুর্বল, কোনদিন কি একটা হয়ে যাবে তার ঠিক কি। রাত্রে সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না, দরজায় খিল-এঁটে দিয়েও। এখন কি করি ঠাকুরপো, তুমি এর একটা উপায় বাতলে দিতে পারো?"

আমি বললাম, "তাহলে তোমার এখানে একদিনও থাকা উচিত নয়। তুমি আমাদের বাড়িতে চলে এসো, আমি মাকে বলে-কয়ে তোমার সেখানেই থাকার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারব।"

বৌদি বললে, "না ভাই, ওতে কাজ নেই। আমার এই বয়সটাকে আমি নিজেই বিশ্বাস করি না, কাউকে বিশ্বাস করতেও বলতে পারি না। তা ছাড়া কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে আমি আর রাজী নই। দেখলাম তো বেঁধে-চেয়ে। তার চেয়ে এমন কোনো উপায় বলো যাতে আমি নিজে উপার্জন করে নিজের অধিকারে থাকতে পারি, যাতে কারো অনুগ্রহের উপর আমাকে নির্ভর করতে না হয়। আমি খেটে খাবো, তার কি কোনো রাস্তাই নেই এ পোড়া দেশে?"

আমি বললাম, "আছে বৈকি, অনেক রাস্তাই আছে। কিন্তু তোমার যে কোনো কিছু পাস করা নেই, সার্টিফিকেট নেই। মেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারো, কিন্তু তোমাকে নেবে না। সেলাই মেশিনের কাজ নিতে পারে, কিন্তু তাও তোমাকে শিখতে হবে। টাইপিস্ট হতে পারো, কিন্তু তাও আগে শেখা দরকার। নার্সের কাজ করতে পারো, কিন্তু তাও তোমাকে শিখতে হবে।"

"তারই ব্যবস্থা করে দাও ঠাকুরপো, আমি নার্সিং শিখবো। দোষ কি?"

সে ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে কঠিন হলো না। হাসপাতালের সিস্টার আর মেট্রনদের বলে-কয়ে বৌদিকে ভর্তি করে দিলাম ট্রেনিংএ। বৌদি এক বছরের মধ্যেই নার্সিং পাস করে বেরিয়ে এলো।

বৌদি তখন এক প্রাইভেট নার্সদের ব্যুরোতে নাম লিখিয়ে সেখানে যাতায়াত করতে লাগল, আর বেছে বেছে নাইট ডিউটির কাজ করতে আরম্ভ করল। দিনেরবেলা সে রান্না বান্না করে, আর সতীশবাবু অফিসে চলে গেলে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কিছুকাল এইভাবে চলল, তারপর এতেও অসুবিধা হওয়াতে ঐ নার্সদেরই হস্টেলের মতো একটা বাড়িতে ঘর-ভাড়া নিয়ে বাস করতে শুরু করলে।

এই সময়টাতে আমি প্রত্যহই সেখানে যেতাম, একবেলা করে খেতাম তার কাছে। তখন আমি ডাক্তারি পাস করে পি জি হাসপাতালে জুনিয়র হাউস সার্জন হয়েছি। সেখানে সকালে বিকেলে দুবেলা আমার ডিউটি। সকালের কাজ সারতে বেলা একটা বেজে যায়, তারপরে কলকাতার অপর প্রান্তে বাড়ি ফিরে গিয়ে খেয়ে আবার বিকেলের ডিউটিতে হাজির হওয়া প্রায় অসাধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই আমি দুপুরে ওখানকার ক্যানটিনে খাবার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু বৌদি সে কথা শুনে বললে—তা হতেই পারে না, ক্যানটিনের অখাদ্য খেয়ে শরীর খারাপ হবে। আমি তো কাছেই রয়েছি, এখানে এসে খেয়ে যাবে, না হয় কিছু টাকা দিও।

সেই থেকে প্রত্যহ দুপুরে বৌদির কাছে খেতে যেতাম। কোনোদিন বা রান্না প্রস্তুতই থাকতো, কোনোদিন বা রান্না শেষ হতে একটু দেরী হতো। বৌদি বলতো—"তুমি ঐ চেয়ারটা নিয়ে আমার কাছে ব'স গল্প করো, আমি তাড়াতাড়ি রেঁধে ফেলি।"

বসতাম বৌদির কাছে। কখনো কথা বলতাম, কখনো দেখতাম তাকে চেয়ে চেয়ে। বৌদির স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে আরো ভালো হয়েছে, মুখ-চোখের সৌন্দর্য আরো বেড়েছে। বোধ করি বাইরের বাতাস লেগে আর নিয়মিত পরিশ্রম করায় দেহের তন্তুগুলি স্বাভাবিক নিয়মেই পুষ্টিলাভ করেছে। সদ্য স্নান করে এসে বৌদি রাঁধতে বসেছে, মাথার কোঁকড়ানো চুলের রাশি সারা পিঠ ছেয়ে লুটিয়ে পড়েছে মেঝের উপর, উনুনের আঁচ লেগে মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, সরু সরু সোনার চুড়িপরা নিটোল বাহু দুটিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, সুঠাম গ্রীবার প্রান্তে লিকলিকে একটি সরু হার, তার নীচে মোটা রক্তশিরা ধকধক করছে—আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখতাম। সে লাবণ্য দেখবার মতো আরো এই জন্য যে তাতে মাখানো রয়েছে এক দুর্লভ অন্তরসৌরভ, এক স্বতঃস্নিগ্ধ মমতা, যা দেখাই যায়, বলা যায় না।

দেখতাম বটে—কিন্তু যেভাবে তোমরা ভাবছো সেই ভাবে নয়। ফ্রয়েডের থিওরি আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমারও একটা থিওরি আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা বর্ডার লাইন থাকে, সকল ক্ষেত্রে সে লাইন পেরোয় না। যেখানে ডাক্তার তার রোগিণীকে দেখছে সেখানে নয়, যেখানে নার্স রোগীর সেবা করছে সেখানে নয়, যেখানে ভাই-বোন বা দেওর-বৌদির অন্তরঙ্গতা সেখানে নয়। তবে ব্যতিক্রমও হয় বৈকি! কিন্তু আমার তা কখনো হয়নি, এই পর্যন্ত বলতে পারি, আমি তাকে বোনের মতোই দেখতাম।

বৌদি আমাকে নীরব দেখে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখতো যে আমি তার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছি। সে হেসে বলতো—"কি ঠাকুরপো, মাকাল ফল দেখছো?"

আমি বলতাম—"দেখছি যে তুমি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছ। কিন্তু তাই বলে নজর দিচ্ছি না, আমার দেখায় তোমার উপর কোনো খারাপ নজর লাগবে না।"

বৌদি হেসে বলতো—"তা কি বলা যায়, পাঁচ দিন দেখতে দেখতে হঠাৎ কোনো রকম নজর লেগে যেতে পারে বৈকি। তার সাক্ষী আমাদের ডাক্তার বোস।"

"কে ডাক্তার বোস? কি হলো তার?"

"আর বলো কেন। ভদ্রলোক প্রায়ই আমার দিকে চেয়ে থাকতো। তারপর একদিন হঠাৎ মুখ ফুটে বলেই ফেললে। ভাবলে যে মাকাল ফল হাত বাড়ালেই মিলবে।"

"ভালোবেসে ফেলেছে নিশ্চয়, তাই না বলে থাকতে পারলে না।"

"অমন ভালোবাসার মুখে আগুন। ঘরে এক জাঁদরেল বৌ রয়েছে, দু-একটা ছেলে-পুলেও হয়েছে। হঠাৎ এমন ভালবাসার মানে কি হয়? এই মাকাল ফলের দিকে লোভ, তা-ছাড়া আর কি! কিন্তু ভদ্রলোক এদিকে লোক ভালোই, আমাকে অনেক কেস দেয়।"

"সুন্দর মুখের জয় সর্বত্রই এতো জানা কথা!"

"বুঝেছি। তোমার কিন্তু এবার বয়স হয়েছে, আর না, এবার একটা বিয়ে করে ফেল। আর আইবুড়ো থাকা উচিত নয়। একটা হিল্লে হওয়া দরকার।"

"আমার না হয় হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার কি হবে?"

"আমার? সে জন্যে কোনো ভাবনা নেই। "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।" আমাকে পার করবার মাঝি ঠিক করাই আছে, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

"মানুষ মাঝি তো কাউকে দেখিনা, ঠাকুর-দেবতা ধরেছ বুঝি?"

"মানুষও নয়, ঠাকুরও নয়, একেবারে খোদ মালিক।"

"তুমি আজকাল ভগবান বিশ্বাস করছ বুঝি?"

"সবাই করে। আমিও করি, তুমিও করো। মুখে যে যাই বলুক।"

"সে তো ঠুঁটো জগন্নাথ, তার কোনো বিচার-বিবেচনা নেই। তেমন মালিকের ওপর নির্ভর করে কারো কাজ চলে না। তুমি নিজের অবস্থাই ভেবে দেখ, এই কি বিচার হচ্ছে?'

"ওমা, বিচার নেই! সব রকম খেলার মধ্যেই বিচার আছে। তুমি ফুটবল খেলা দেখেছ? আজকাল গড়ের-মাঠে চারিদিকেই খেলা হচ্ছে, একটু দাঁড়ালেই দেখতে পাওয়া যায়। যে পাচ্ছে সে বলটাকে নিয়ে লাথি মেরে মেরে ছোটাচ্ছে। তার অবস্থা দেখলে মায়া হয়, মনে হয় বেচারার প্রাণটা বুঝি এবার ফেঁসে গেল। কিন্তু তা হয় না, এক সময়ে সে গোলে গিয়ে পৌঁছয়। একজন রেফারি সর্বক্ষণ ওর দিকে নজর রাখছে, গোলে পৌঁছেছে দেখেই সে অমনি খুশি হয়ে শিটি দেয়। তখন আবার নতুন খেলা শুরু হয়, আবার তাকে লাথি খেয়ে খেয়ে গোলে পৌঁছতে হবে, আর রেফারি অমনি খুশি হয়ে আবার শিটি দেবে। এই তো হলো এক খেলা। এর মধ্যেও নিখুঁত বিচার আছে।"

"এখনও তোমার কি ফুটবলের মতো ঐ-রকম অবস্থা চলছে, তাই ওকথা বলছ? আমি তোমার ভিতরের কথা কিছুই আজকাল জানি না, তুমি তো কিছুই বলোনা। বাইরের থেকে দেখি তুমি বেশ আছো, নিজের আনন্দে আছো। তা বুঝি মিথ্যে?"

"না না ঠাকুরপো, সত্যি বলছি আমি এখন বেশ আছি। মাঝে মাঝে সতীশবাবু কিংবা ডাক্তার বোস আমাকে জ্বালায় বটে, কিন্তু সে কিছু না। আমি আজকাল খুব ভালো একটা কাজ পেয়ে গেছি। বড়লোকের বাড়ির গিন্নি, তাঁর প্যারালিসিস হয়েছে। দিনের বেলা বাড়ির লোকেরাই দেখাশুনা করে, রাত্রে আমি তাঁর কাছে থাকি। গায়ে হাত বুলিয়ে আর গান গেয়ে আমি তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। আমি শ্যামা-সংগীত গাইতে জানি, তিনি আমার গান শুনতে খুব ভালোবাসেন। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেই আমি তাঁর বিছানার এক-পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ি আর ঘুমিয়েও পড়ি। একটু উসখুস করলেই আবার জেগে উঠি। এই কাজটি পেয়ে অবধি আমার বেশ কেটে যাচ্ছে, অন্য কাজ আর খুঁজতে হয় না। সারা দিন আমার ছুটি, যা খুসি তাই করতে পারি।"

"সারা দিন কী করো?"

"কী করি? কত কাজ। ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, রান্নার জোগাড় করা, সব কিছু সেরে স্নান করা। ছাদে গিয়ে চুল শুকোনো, আর আমসত্ত কুলের আচার রোদ্দুরে দেওয়া, যা খেতে তুমি ভালোবাস। তার পর শুরু হয় রান্নার কাজ। পাঁচ রকম যাহোক রাঁধি। তুমি এসে পড়লে তোমাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে খানিক ঘুম লাগাই। বিকেলে উঠে ট্রামে চড়ে যাই ইডেন গার্ডেনের দিকে। সেখানে একটু বেড়িয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত সেখানেই চুপচাপ বসে থাকি।"

"শুধুই একা একা বসে থাকো?"

"তা কেন, আমি কেবল দেখি। দেখবার জন্যেই তো যাই।"

"গঙ্গার ধারে কি এমন দেখবার আছে?"

"আছে বৈকি, চোখ খুলে রাখলেই দেখা যায়। সেই আকাশ, একই গঙ্গা, তবু রোজ দেখি রকম রকম। আকাশে দেখি রোজই মেঘের নতুন নতুন কত আঁকাজোকা, কোনোদিন সূর্যকে আড়াল করছে, কোনোদিন মেঘের কিনারা দিয়ে তার ছটা বেরোচ্ছে। গঙ্গার জলের রোজই দেখি রং আলাদা, ঢেউ আলাদা, স্রোত চলাচলের ভঙ্গী আলাদা। সমস্ত মিলিয়ে রোজই নতুন রকমের একটা ছবি ফোটে। গাছেতে যেমন ফুল ফোটে, তেমনি করে রোজ সারা দুনিয়ার মধ্যে এমনি কত নতুন নতুন আশ্চর্য ফোটে। কখনো তার নতুনত্ব ফুরোয় না, কখনো তা একঘেয়ে হয় না। এমন আশ্চর্য রকমারি কাণ্ড-কারখানাগুলো যে নিত্যই করে চলেছে অনন্তকাল ধরে, না জানি সেই কারিগর কেমন, আমি তাই বসে বসে ভাবি।"

"ভেবে তার কোনো কিনারা করতে পারো?"

"কিছু না। সে তো আছে আড়ালে, তার কাজগুলোই কেবল দেখছি। কাজগুলোকেই সে দেখাচ্ছে, নিজেকে দেখাচ্ছে না। আমরা যদি সামান্য একটা কিছু তৈরি করি, তার মধ্যে নিজেকেই পুরোপুরি জাহির করতে চাই। একটু কুলের আচার তৈরি করলে পঞ্চাশ বার জিজ্ঞাসা করি কেমন হয়েছে, তার মানে কেমন আমি বানিয়েছি বলো, কিন্তু তার কথা আলাদা। এমন দেখায় যেন সবই আপনি হচ্ছে, কেউ কিছু করছে না, কিন্তু তাই কখনো সম্ভব? একজন করছেন বৈকি। বাইরের জগতের মধ্যেও তিনি কাজ করছেন আর আমাদের মনের মধ্যেও কাজ করছেন, কিন্তু ধরা কোথাও দিচ্ছেন না। কিন্তু নাই বা ধরা দিলেন, বুদ্ধিতে তাঁকে নাই বা ধরলাম, অনুভবে জানি যে, তিনি সবের মধ্যেই রয়েছেন, আমার মধ্যেও রয়েছেন। তাতেই যথেষ্ট। আমার এই সামান্য বুকে জায়গা কত-টুকু যে তাঁকে ধরবো।"

"আজকাল তুমি এই সব ভাবো বুঝি? একে বলে টেনে মানে করা। তুমি অন্ধবিশ্বাসী হয়ে পড়ছ, পার্থিবের দিক থেকে অপার্থিবের দিকে চলে যাচ্ছ। ভালো কথা নয়।"

"কি করি বলো, ঐদিকেই যে আমাকে টানছে। পার্থিবের সুখ তো খুবই দেখালে ভাই। ওর জন্যে অনেক কিছু জিনিসের দরকার, পয়সা চাই, মানুষ চাই, নীরোগ থাকা চাই, ভাগ্য থাকা চাই, আরো কত কি! কিন্তু অপার্থিবের জন্যে কোনো কিছুই চাই না, কেবল ভগবানের দয়া। হয়তো তিনি ইচ্ছে করেই তাই করেন, যাকে তিনি অপার্থিবের দিকে নিতে চান তাকে পার্থিব সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেন। এও রকমারি।"

(শেষাংশ ৭৬ পৃষ্ঠায়)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

॥ গল্প ॥

প্রতীক্ষা

আকাশে অনাবিল জ্যোৎস্না। দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে দেবীপ্রসাদ চুপচাপ বসে রইল। অল্প অল্প বাতাস বইছে। বেলীফুলের গন্ধে সে বাতাস মদির। কিন্তু দেবীপ্রসাদের এ সৌন্দর্য, এ সুরভি উপভোগ করার মন নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে অনেক দূরের হালকা মেঘের দিকে চেয়ে সে নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে।

সকাল থেকে হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই কথাটাই মনে এসেছে। অফিসে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভেবেছে কখন রাত্রি আসবে। দিনের সমস্ত কলরব সব চঞ্চলতা মুছে যাবে। নিজের মনের মুখোমুখি বসবে দেবীপ্রসাদ।

অফিস যাবার মুখে তরুণী স্ত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আমার কথাটা মনে আছে তো? কথাটা বলেই কটাক্ষ বিলোল করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু দেবীপ্রসাদ খেয়াল করে নি। বলেছিল, কিছু বললে?

হা ভগবান, স্ত্রী কপাল চাপড়েছে, তোমার কিছু বলা আর রেফ্রিজারেটরের সামনে প্রেম নিবেদন একই কথা। দুইই সমান নিরুত্তাপ, সমান শীতল।

দেবীপ্রসাদ লজ্জা পেয়েছে। বিয়ে করেছে এখনও বছর ঘোরে নি। এত তাড়াতাড়ি রেফ্রিজারেটরের সামিল হয়ে যাওয়াটা রীতিমত অপরাধ। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কিছু মনে কর না। একটু অন্যমনস্ক রয়েছি। কোন্ কথাটা বলছ বল তো?

স্ত্রী চোখে আঁচল চাপা দিতে গিয়েও থেমে গেল। এখন অভিমান করে লাভ নেই, চোখে জল এনেও সুবিধা হবে না। নীচে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা এখনই নেমে যাবে! তার চেয়ে কাজের কথাটা বলে ফেলাই ভাল।

আমার সেই নেকলেশের কথাটা মনে নেই? বলেছিলে, সাত দিনের মধ্যে এনে দেবে। আজ তো দশ দিন হয়ে গেল। কাল দুপুর বেলা সবাই সিনেমা যাবে বলছে। কিন্তু খালি গলায় আমি যাই কি করে?

নেকলেশ! খুব আবছা দেবীপ্রসাদের মনে পড়ল। নেকলেশ দেবার একটা প্রতিশ্রুতি বোধ হয় দিয়েছিল। পড়শীদের কার গলায় একটা জড়োয়ার নেকলেশ দেখে আবদার ধরেছিল, ঠিক ওই ধরণের একটা চাই। দেবীপ্রসাদ একটা ক্যাটালগ এনে দিয়েছিল। সারা দুপুর ধরে বাছাবাছির পালা চলেছিল, তারপর একটা পছন্দ করা হয়েছিল।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ, এখন শুধু দোকানে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চেক দিয়ে নেকলেশটা নিয়ে আসবে। বাস, এইটুকু। কিন্তু এইটুকু করতেই দেবীপ্রসাদের দশদিন কেটে গেল।

একটু একটু করে দেবীপ্রসাদের সব মনে পড়ল। সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। আজ যদি মনে থাকে অফিস থেকে দুপুর বেলা বেরিয়ে নেকলেশের একটা ব্যবস্থা করবে।

যদি মনে থাকে? তরুণী ঠোঁট ফোলাতে গিয়েই থেমে গেল। দেবীপ্রসাদ ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে গেছে।

আশ্চর্য, হ'ল কি মানুষটার! মনটা গেল কোথায়!

সিঁড়িতে নামতে নামতে দেবীপ্রসাদও ঠিক এই কথাই ভাবছিল।

মনটা তার এখানে নেই। বারো শো মাইল দূরে চলে গেছে কল্পনার পাখায় ভর করে। জানকীর কাছে।

নামটা মনে হতেই দেবীপ্রসাদের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আজ রাতে এতদিনের প্রতীক্ষার অবসান হবে। পৃথিবীর সব কোলাহল থেমে গেলে, সব মানুষের চোখে ঘুমের পর্দা নেমে এলে, জানকী সাড়া দেবে। নিভৃতে চলবে অন্তরের কথা। এতদিন ধরে যে কথা শোনার জন্য দেবীপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, আজ রাত্রে সেই উদ্বেগের ইতি।

মোটরে উঠে দেবীপ্রসাদ চিঠিটা খুলল। এ কদিনে কতবার যে এই কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে মেলে ধরেছে, জানকীর হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলো পড়েছে তার ঠিক নেই। এ সাদা কাগজ যেন শ্বেতপদ্ম। কালো কালো অক্ষরের সার, ভ্রমরের দল। তাই বুঝি চিঠিটা খুললেই দেবীপ্রসাদের নাকে পুষ্পের সুরভি ভেসে আসে। কানে মধুপের অশান্ত গুঞ্জন।

এই কদিন দেবীপ্রসাদ সংসার ভুলেছে, পরিজন ভুলেছে, নিজের স্ত্রীর কথাও বিস্মৃত হয়েছে। দিনের বেলা তবু একরকম। নিটোল, ভরাট কাজের ফাঁকে জানকীর মুখ, জানকীর প্রতিশ্রুতি একটু অস্পষ্ট, কিন্তু সব আলো নিভে গেলেই, দেবীপ্রসাদের মনের আলো জ্বলে উঠেছে।

বিছানায় ছটফট করেছে। স্ত্রী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে বল তো তোমার? শরীর খারাপ?

না, না, দেবীপ্রসাদ মাথা নেড়েছে, শরীর ঠিক আছে। শরীরের কিছু হয় নি।

কি হয়েছে তাও বলতে পারে নি। এমন কথা স্ত্রীকে বলা যায় না। কাউকেই বুঝি বলা সম্ভব নয়। এ মর্মদাহ শুধু দেবীপ্রসাদের একান্তের।

তবে এমন করছ কেন? শুয়ে পর্যন্ত কেবল এপাশ ওপাশ করছ?

দেবীপ্রসাদ চুপ। মাত্র দুটো লাইন। কিন্তু দুটো লাইন কত অর্থবহ, কত ব্যঞ্জনাময়। বেশী লেখার বোধ হয় সময় পায় নি জানকী। এর বেশী দেবীপ্রসাদ প্রত্যাশাও করে নি। একটা জীবন ওলোট পালোট করে দেবার পক্ষে ওই রকম দুটি লাইনই যথেষ্ট।

আলোটা নিভিয়ে দেব? স্ত্রী আর একবার চেষ্টা করল যাতে মানুষটার কষ্ট একটু প্রশমিত হয়।

আলো? না, আলো থাক। দেবীপ্রসাদ অন্য-মনস্কভাবে উত্তর দিল।

সে রাত্রে আর কথা হ'ল না। পাশে শোয়া মানুষটা যদি এমন উদাসীন হয়, ঠিকভাবে কথা-বার্তার উত্তর না দেয়, তাহ'লে কথা বলে আর সুখ কোথায়!

আলো নিভিয়ে দিতেই মনের পটে পুরোনো ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানকীর সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ তখন দেবীপ্রসাদের বয়স বোধ হয় বারোর বেশী নয়। জানকীর দশ। দেখা তীর্থস্থানে। আজমীঢ়। পুষ্করতীর্থে কচ্ছপের কামড় বাঁচিয়ে স্নান করে উঠতেই দেবীপ্রসাদের দৃষ্টি পড়ল জানকীর ওপর। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, সুগৌর বর্ণ, আয়ত দুটি চোখ। পাশাপাশি কামরায় দুটি পরিবার উঠেছিল। একই ধর্মশালায়।

তখন দেবীপ্রসাদ আর জানকীর ধর্মের মাহাত্ম্য বোঝার বয়স হয় নি। শুধু মা-বাপের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াত এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে। মূর্তি দেখার চেয়েও বানরের পাল দেখতে খুব ভাল লাগত। হাত-তালি দিয়ে ময়ূরের পিছনে। পেখম-তোলা ময়ূরীর নাচ দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হয়ে দেখত।

জানকীকে দেবীপ্রসাদের খুবই ভাল লেগেছিল। আচারে আচরণে সেটা প্রকাশ করতেও দেবীপ্রসাদ দ্বিধা করে নি। তাকে লাড্ডুর ভাগ দিয়েছে। কুমড়োর মেঠাই দিয়েছে। দুটি পরিবারেও অন্তরঙ্গতা বাড়ল। এক সঙ্গে ঘুরল জয়পুর, উদয়পুর, মথুরা, বৃন্দাবন।

ছাড়াছাড়ি হ'ল হরিদ্বারে এসে।

দেবীপ্রসাদের পরিবার নেমে এল কলকাতায় আর জানকীরা ফিরে গেল রেওয়া। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে একপশলা কান্নাকাটি চলল। দেবীপ্রসাদ আর জানকী কাঁদল সব চেয়ে বেশী। হাতে হাত রেখে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে প্রথমে, পরে উচ্ছ্বসিত আবেগে।

তারপর অনেক দিন আর দেখা হয় নি। চিঠিপত্রে দুটি পরিবারে যোগ ছিল। তাদের কাছ থেকে দেবীপ্রসাদ জানকীর খবর পেয়েছে।

মধ্যে একবার বুঝি দেখা হয়েছিল। কি একটা কাজে জানকীরা কলকাতায় এসেছিল। তখন দেবীপ্রসাদ বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বাপের কারবারে যাওয়া আসা করছে। বিয়ে করে নি। তবে মেয়ে দেখার পালা চলছে।

একদিন বাড়ী ফিরেই অবাক হয়ে গেল। বারান্দায় জানকী। জানলার দুটি গরাদ ধরে পথের দিকে চেয়ে রয়েছে। কে জানে দেবী-প্রসাদের আসার অপেক্ষা করছে কি না!

প্রথম কয়েক মিনিট দুজনের কেউ কথা বলতে পারে নি। লজ্জায়, সংকোচে, আনন্দে দুজনেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আড়চোখে দেবীপ্রসাদ জানকীকে দেখল। কত বড় হয়ে গেছে জানকী, কত সুন্দর। আগের চেয়েও যেন অনেক ফর্সা হয়েছে। আগের মতনই কথা বলতে বলতে দুটি চোখে লজ্জার ছায়া ঘনিয়ে আসে। কথার মাঝখানেই চোখ নামিয়ে নেয়।

একটু একটু করে বাধা কেটে গেছে। জানকী আর দেবীপ্রসাদ দুজনে কোণের ঘরে গিয়ে বসেছে। একেবারে পাশাপাশি। অনর্গল কথা বলে চলেছে। পুরনো কথা, কিছু কিছু নতুন কথাও।

জানকীকে ছাড়তে চায় নি দেবীপ্রসাদ। কেবল মনে হয়েছে, এমন যদি হ'ত চিরদিন জানকী তার পাশে থাকত। সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা ভাগ করে নিতে পারত দুজনে। এক-জনের মনের কথা আর একজনকে বলে মনের ভার লাঘব করতে পারত।

জানকীরা যে বম্বে চলে গেছে সে খবরও দেবীপ্রসাদের কানে এসেছে। এক সময়ে জানকীর বাপের হীরা জহরতের কারবার ছিল। খদ্দের ছিল রাজপুতানার রাজবংশ। ফলাও কারবার। ব্যবসার কল্যাণে কত কাঁচের টুকরো পদ্মরাগমণি হয়ে গেছে, কত সাদামাটা পাথর বৈদূর্যমণি, তার ইয়ত্তা নেই। আলোয়ারের রাণী-সাহেবা তো আঙুলে অন্য কারো রত্ন কোনদিন ধারণই করেন নি। [illegible]বার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যেভাবে প্রাণে বেঁচে গেলেন এ শুধু গোমেদের জন্য, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। বুন্দির রাজাসাহেবেরও অগাধ বিশ্বাস। বিলেত যাবার আগে জ্যোতিষীর কথায় ইন্দ্রনীলকান্ত-মণি হাতে পরলেন। তিন দিনের মধ্যে সেই দুষ্প্রাপ্য পাথর জানকীর বাবাই জোগাড় করে দিলেন। জানকীর হাতেও ছোট্ট একটা নীলার আংটি দেবীপ্রসাদ দেখেছিল।

হেসে বলেছিল, খুব দামী পাথর বুঝি?

জানকী সলজ্জ উত্তর দিয়েছিল, কি জানি, দামের কথা পিতাজী জানেন। আমাকে হাতে পরতে বলেছেন, পরেছি।

কি হয় এতে?

সামনের বছর আমার একটা ফাঁড়া আছে, সেইজন্য পরেছি।

পাথরটা দেবীপ্রসাদের খুব ভাল লেগেছিল। জানকীর আঙুলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে দেবীপ্রসাদ বলেছিল, এ পাথরটা আমার ভারি পছন্দ।

সঙ্গে সঙ্গে জানকী বলেছে, নেবে তুমি এটা?

কিন্তু তোমার ফাঁড়া?

সারা মুখে জানকীর রক্ত এসে জমেছে। খুব মৃদু কণ্ঠে বলেছে, তুমি পরলেই আমার ফাঁড়া কেটে যাবে।

এই জানকী! এর বুঝি তুলনা নেই। পারলে সবই দেবীপ্রসাদকে দিয়ে দিতে পারে। একটা পাথর তো তুচ্ছ, সারা জীবনটাই উৎসর্গ করতে পারে।

জানকীকে চিঠি লেখার সময় দেবীপ্রসাদ অনেক ভেবেছে। অনেক দিন কেটে গেছে মাঝখানে। রাজপুতানার মরুতে অনেক বালির ঝড় উঠেছে।

জানকীর বাবা পাথরের ব্যবসা তুলে দিয়েছেন। অবশ্য না দিয়েও উপায় ছিল না।

রাজপুতানা রাজস্থান হ'ল দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে। জাঁদরেল রাজারাণীরা এক মুহূর্তে সাধারণ নাগরিকে পরিণত হল। রাজ্য গেল, অর্থ গেল, সঙ্গে সঙ্গে মানও। ভাগ্য ফেরাবার জন্য হাতে আর রত্ন ধারণের প্রশ্ন উঠল না, তাদের ভাগ্য একেবারে খোদ ভারত-ভাগ্যবিধাতার হাতে গিয়ে পড়ল।

জানকীর বাবা কারবার তুলে দিয়ে কিছুদিন আমেদাবাদে রইলেন সুতোর দালাল হয়ে। বয়স হয়েছে, তেমন ছুটোছুটিও করতে পারেন না। ওরই মধ্যে যেটুকু হয়। তারপর অবস্থা একটু গুছিয়ে নিয়ে বম্বে গেলেন। শেয়ার মার্কেটের তেজী-মন্দার তন্তুতে জীবন বাঁধলেন। তারপর আর অনেক দিন দেবীপ্রসাদ জানকীর কোন খবর নিতে পারে নি।

প্রথমে ভয় হয়েছিল যদি জানকী চিঠির উত্তর না দেয়। যদি ভুলে গিয়ে থাকে তাকে। যদি মনে করে শুধু প্রয়োজনে জানকীর খোঁজ করছে, এই বুঝি দেবীপ্রসাদের ভালবাসা! কিন্তু তবু দেবীপ্রসাদ চিঠি না লিখে পারল না।

অফিসে সবাই বেরিয়ে যেতে ড্রয়ার থেকে প্যাড টেনে নিয়ে দেবীপ্রসাদ লিখেছে। আশ্চর্য মানুষের মন। কেবলই যেন আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে যায়। মনের দ্বিধা আর সংকোচে হাতের অক্ষরগুলোও বাঁকা বাঁকা হয়ে ওঠে। তবু লিখতে দেবীপ্রসাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে। অনেকদিনের হাজার কাজের ভীড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আবোল তাবোল কথাগুলো মালা হয়ে ফুটে ওঠে মনের সামনে।

এত তাড়াতাড়ি জানকীর চিঠির উত্তর আসবে দেবীপ্রসাদ ধারণাও করতে পারে নি। স্তূপাকার চিঠির সঙ্গে জানকীর চিঠি এল। সব চিঠি সরিয়ে দেবীপ্রসাদ চিঠিটা তুলে নিল। কতবার যে পড়ল তার বুঝি হিসাব নেই।

দেবীপ্রসাদের বাপ আর নেই জেনে জানকী দুঃখ প্রকাশ করেছে। এখন তো দেবীপ্রসাদ মালিক। সব কিছু তাকেই দেখাশোনা করতে হয়। কাজের ভীড়ের মধ্যেও যে সে জানকীকে মনে রেখেছে তার জন্য জানকীর আনন্দের সীমা নেই। ছোট্ট একটু অভিমানের খোঁচাও ছিল চিঠিতে। বিয়ে করেছে দেবীপ্রসাদ? যদি করে থাকে তাহ'লে সে খবরটুকুও কি জানকীকে দিতে পারত না!

সব শেষে আসল কথা লিখেছে। সামনের বুধবার রাত সাড়ে বারোটার পর জানকী টেলিফোনে কথা বলবে। এই লাইনটা বারবার দেবীপ্রসাদ পড়ল। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়লে জানকী মুখর হবে। যে কথা দেবীপ্রসাদ জানতে চায়, সেই কথা জানাবে। দেবীপ্রসাদ যেন জেগে থাকে।

শুধু সেই রাত! প্রয়োজন হলে দেবীপ্রসাদ রাতের পর রাত জেগে থাকতে পারে এমন একটা খবর শোনার জন্য। বিশেষ করে জানকীর কণ্ঠে।

আজ সেই বুধবার।

সকাল থেকেই দেবীপ্রসাদ একটু অন্যমনস্ক রইল। স্ত্রীর কথার কিছু উত্তর দিল, অনেকটাই শুনল না। এক জিনিস তুলতে আর এক জিনিস তুলল। খবরের কাগজ নিজের হাতে, অথচ সেই খবরের কাগজ সারাটা বাড়ী খুঁজল।

কি বলবে জানকী। মধ্য রাত্রে কোন্ রাগিণী শোনাবে!

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর স্ত্রীকে বলল, তুমি ঘুমোও, আমার অফিসের কতকগুলো দরকারী কাজ বাকি আছে, আমি বসবার ঘরে যাচ্ছি।

স্ত্রী আয়নার সামনে বসে মুখে ক্রীম মাখছিল। খোঁপায় বেলকুঁড়ির মালাটা আগেই জড়িয়েছিল। বিনীত কণ্ঠে বলল, এত রাতে আবার অফিসের কাজ নিয়ে বসবে? শরীরটা যাবে যে?

দেবীপ্রসাদ কিছু বলল না। শুধু হাসল।

তুমি বরং এ ঘরে বসেই কাজ কর। তবু জানব তুমি কাছাকাছি আছ। দেবীপ্রসাদের স্ত্রী একবার শেষ চেষ্টা করল।

পাগল নাকি, দেবীপ্রসাদ বাইরে যেতে যেতে উত্তর দিল, আলো জ্বালা থাকলে তোমার ঘুম আসবে কেন?

স্ত্রী আর কোন আপত্তি তোলবার আগেই দেবীপ্রসাদ বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্য একটু দ্বিধা মনটাকে নাড়া দিল। দেবীপ্রসাদ কি অন্যায় করছে? যুবতী স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে, তার প্রণয়কাকলী এড়িয়ে, বহুদূরের আর এক-জনের কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হওয়াটা কি উচিত!

নিজের ওপর যেন আর জোর নেই দেবী-প্রসাদের। হরিণ যেমন অজগরের দিকে এক পা

(শেষাংশ ৭৬ পৃষ্ঠায়)

।। গল্প ।।

তানাকার চোখের তারায়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আরেক বার সে ফিরে এসেছে। দেখতে এসেছে তানাকা ঠিক মতো বাড়ি ফিরে যেতে পারলো কিনা।

পারেনি। তার পা চলছে না। টলতে টলতে অনেকটা পথ এগিয়ে এলেও সে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে চৌমাথার মোড়ে। যেখান থেকে একটু বাঁ-দিকে হাঁটলেই হোটেল ইম্পিরিয়াল।

এই ইম্পিরিয়াল হোটেলেই এসে উঠেছে এণ্টনি। এক মাসের ছুটিতে সে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে জাপানে বেড়াতে এসেছে দিন ছয় সাত আগে।

প্রাচ্য দেশে এন্টনি নিডহ্যামের এই প্রথম সফর। প্রথম দর্শনেই জাপানের রাজধানীর সঙ্গে তার গভীর প্রেম। কে বলে এশিয়া এখনো অনেক পিছিয়ে? জাপান তো মনে হয় আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। অনেকেরই তাই মত। তানাকা তাকে সে কথাই বলছিল খুব জোরের সঙ্গে।

আহা, বেচারা তানাকা! বড্ড বেশি ড্রিংক করে ফেলেছে সে। —শ্রীমতী তানাকার অবস্থার জন্যে মনে মনে দুঃখ করে এণ্টনি। এছাড়া কী-ই বা আর করার থাকতে পারে তার।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা লাইটপোস্টে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল তানাকা।

পথের এধারে এবং ওধারে জন দুই-তিন ছোকরা গোছের টাউট বিদেশী পথচারীদের জালে ফেলবার চেষ্টা করছে আশপাশের নাইট ক্লাবগুলোর নানারকম রঙ্গীন বর্ণনা দিয়ে। কেউ কেউ সহজেই সে জালে গিয়ে পড়ছে। জালে জড়িয়ে পড়ার জন্যেই হয়তো তারা বেরিয়েছে। অনেকে টাউটদের এড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাদের কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে।

ঠিক তেমনি একটি দলই সেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখে। শুধু মেয়ে বললে ঠিক হবে না, মেয়েটি বিবাহিতা। তার কেশ-সজ্জাই তার পরিচয়। দলের সঙ্গে যে জাপানী বন্ধুটি রয়েছে সে-ই তাদের বলছিল সে কথা। বলছিল, জাপানী মেয়েরা কিমোনো ছেড়ে মোটামুটি প্রায় সবাই পশ্চিমী পোষাক গ্রহণ করলেও কেশ-সজ্জার ব্যাপারে অনেকেই এখনো জাপানী ঐতিহ্যকে মেনে চলে। যারা নিছক বালিকা তাদের কেশ-চর্চা চলে 'মোমোবাড়ে' রীতি ধরে, যারা বিবাহযোগ্যা তাদের চুলের বিন্যাস চলে 'শিমাডা' স্টাইলে, আর যারা বিবাহিতা তারা সাধারণতঃ 'মারুমাগে' প্রথায় তাদের খোঁপা বানিয়ে থাকে। এ ছাড়া কাউকে 'ইচো গেইসি' খোঁপায় দেখতে পেলেই তাকে ধরে নেওয়া যায় যে সে একজন পরিচারিকা।

'মারুমাগে' ধরণে চুলবাঁধা দেখেই ওহিরো বলছিল তার বন্ধুদের যে মেয়েটি বিবাহিতা।

কিন্তু একজন বিবাহিতা মহিলা এমনি-ভাবে রাস্তায় মাতলামি করতে পারে, এ ভারি আশ্চর্য।—একজন মন্তব্য করে দলের মধ্য থেকে।

নিজের দেশের প্রেস্টিজের কথা ভেবে ওহিরো বলে, তা' এমনি একসেপ্‌শন বোধহয় সব দেশেই আছে। তা'ছাড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঢাকনি দিয়ে যতই চেপে রাখবার চেষ্টা করা হোক না কেন মানুষের আদিম ইচ্ছে সময় সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে, স্থান কালের বিচার পর্যন্ত করে না, সে কথা তো কখনো অস্বীকার করা যায় না।

একেবারে ফ্রয়েডকে এনে হাজির করলেন দেখছি।—দলের নায়ক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একথা বলতেই দেখা গেল মহিলার পাশে একটি তরুণ এসে হাজির। সেই দিকেই তখন সবার দৃষ্টি।

এই তরুণই মিঃ এণ্টনি নিডহ্যাম। শ্রীমতী তানাকার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছে মাত্র এক দিন আগে কাবুকি থিয়েটার দেখতে গিয়ে। এণ্টনির পাশের আসনেই বসেছিল তানাকা। কাবুকির কথা এণ্টনি শুনেছে তার দেশে থাকতেই। এও সে জানে, কাবুকিতে পুরুষরাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে থাকে এবং তা দেখার মতো। বাস্তবিকই তা দেখার জন্যেই আর কাবুকি থিয়েটারের পরিবেশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়া নেবার জন্যে এণ্টনি সেদিন কাবুকির টিকিট কেটেছিল। সে জানতো অভিনয়ের বিন্দুবিসর্গও সে বুঝতে পারবে না এবং দু'একটা দৃশ্য দেখেই তাকে চলে আসতে হবে। সত্যি তাই, কিছু কিছু অনুমান করে নেওয়া ছাড়া জাপানী ভাষা থেকে গল্পাংশের কিছুই উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু যে এণ্টনি সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত স্থিরভাবে একঘণ্টাকাল অভিনয় দেখেছে সে শুধু তার ধৈর্যেরই পরিচয় নয়, থিয়েটারের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা এবং অতুলনীয় দৃশ্যাবলীর আকর্ষণও তার জন্যে অনেকখানি দায়ী। কিন্তু আর নয়। আরেক অঙ্ক শেষ হলেই সে উঠবে ঠিক করে ফেলেছে। হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি ডিনারটা সেরে নিয়ে কোনো একটা নাইট ক্লাবে যাবে এই তার মতলব। কিন্তু তা' শেষ হতে বড্ড দেরি হচ্ছে তো! ঘড়ির দিকে একবার তাকায় এণ্টনি। সাতটা বাজে যে! আঁতকে উঠতেই দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত ঘটে তুমুল করতালির মধ্যে।

হঠাৎ একটা স্বপ্ন ঘুচে গেল যেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এণ্টনি ভাবছিল সে যেন সত্যি সত্যি উন্মুক্ত আকাশের নিচে ক্যালিফোর্ণিয়ারই সমুদ্রকূলে কোথাও দূরে থেকে দু'টি হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া দেখছে। তার চমক ভাঙে যবনিকা পড়লে। কোথায় আকাশ, কোথায় সমুদ্র আর কোথায় সেই মন দেওয়া-নেওয়ার ছবি! সবটাই অভিনয়।

সাতটা বেজে গেছে! আরেকবার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে যেতেই

পথ করে দিতে গিয়ে পাশের মহিলা প্রশ্ন করেন, আর ইউ গোয়িং?

ইয়েস মাদাম, কারণ আমি তো অভিনয়ের একবর্ণও বুঝতে পারছি না। কাজেই মিছি-মিছি এখানে বসে থাকা বৃথা।

আপনি যদি চান আপনাকে আমিই সমস্তটা বুঝিয়ে দিতে পারি। ভেরি ইণ্টারেস্টিং স্টোরি।

আরি গাত্তো!—সাহায্যের আশ্বাসের জন্যে এই বলে মহিলাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ফের তার আসন গ্রহণ করে এণ্টনি নিডহ্যাম। এ কয়দিনের মধ্যে একটি মাত্র জাপানী কথা সে শিখতে পেরেছে, সেটি এই 'আরি গাত্তো' অর্থাৎ ধন্যবাদ।

এণ্টনি চলে যাবে বলে দাঁড়িয়ে উঠেও আবার বসে পড়ে শ্রীমতী তানাকার আশ্বাস পেয়ে। বিরতির সুযোগে তাদের দু'জনের মধ্যে শুধুমাত্র পরিচয় বিনিময়ই হয় না, ঐ সময়টুকুতেই তানাকা 'কাইদান কাসানেগাফুচি' অর্থাৎ কাসানেগাফুচির ভৌতিক কাহিনীর প্রথম অংশটুকু এণ্টনিকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় কাট-কাটা ইংরেজীতে।

ভূতের গল্প আপনার ভালো লাগে?—প্রথমেই জিজ্ঞেস করে নেয় শ্রীমতী তানাকা।

নিশ্চয়ই ভালো লাগে। কার না লাগে বলুন?—তানাকা খুবই খুশি এণ্টনির এ উত্তরে। কাহিনীর অভিনীত অংশটুকু সে তখন বলে চলে।

জানেন তো এই টোকিওর পুরনো নাম ইডো। সেই পুরনো কালেরই একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে আজকের এই অভিনয়।

সেই কাহিনীরই সারাংশটুকু বলুন।—জানবার জন্যে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে এণ্টনি।

হ্যাঁ বলছি। উর্মেকিচি আর ওসিনো দুই বোন। ছোট বোন ওসিনো ছিল ইডো শহরের বিখ্যাত নাচিয়ে আর ওখানকারই এক দোকানের কর্মচারী। ঐ দোকানেরই আরেক কর্মচারী ভালোবাসতো ওকে, কিন্তু ওসিনোর মোটেই ভালো লাগতো না তাকে। তাই যতবারই সে বিয়ের প্রস্তাব করে ততবারই ওসিনো তাকে ফিরিয়ে দেয়। অমনিভাবেই সে একদিন চেষ্টা করছিল ওসিনোর মন পাবার জন্যে যখন হঠাৎ এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে পিছুতে গিয়ে ঘাস কাটার শাণিত অস্ত্র ওসিগিরির ওপর পড়ে নিতান্তই আকস্মিকভাবে প্রাণ হারাল ওসিনো। আর সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তার প্রেমিকও দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করল।

এ অবধি বলতে বলতেই আবার অভিনয় শুরু। ভাষা না বুঝতে পারলেও কাহিনীর প্রথমাংশ জানা থাকায় এবার মোটামুটিভাবে ধরে নিতে খুব অসুবিধে হয় না এণ্টনির। তা' ছাড়া মাঝে মাঝে শ্রীমতী তানাকা তো তাকে বুঝিয়েই চলে।

মৃত কর্মচারীটির ছোট ভাই শিনাকিচি দাদার দেহাবশেষ স্বগ্রামে নিয়ে যাবার জন্যে দোকানে এলো। ওসিনোর দিদি উর্মেকিচিও এলো সেই দোকানে মৃতের জন্যে সমবেদনা জানাতে, যদিও সে জানত তার জন্যেই তার ছোটবোনের মৃত্যু হয়েছে। শিনাকিচি ও শ্রীমতী উর্মেকিচির মধ্যে সে সময় দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে এক মাস বাদে ইডোরই উপকণ্ঠে শিনা-গাওয়া উপকূলে। সেখানে ঝিনুক কুড়ুতে গিয়ে শিনাকিচির সঙ্গে উর্মেকিচির দেখা। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। অবশ্য এ কথা তার জানা ছিল না যে, তার ছোটবোনের প্রেমিক সেই দোকান কর্মচারীরই ছোটভাই এই শিনাকিচি।

তারপর তাদের বিয়ে হল এবং বেশ কিছু-দিন সুখেই কাটল তাদের। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল নাচের শিক্ষিকা শ্রীমতী উর্মেকিচি আর সেদিনই সে জানতে পারল যে তার এক ছাত্রী তার স্বামীর প্রণয়াসক্তা। ছাত্রীটি খুবই সুন্দরী এবং নাম তার ওহিসা। এই ওহিসাকে নিয়েই উর্মেকিচির সংসারে ভীষণ অশান্তি দেখা দিল এবং একদিন স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল যে, শিনাকিচির এক তীব্র আঘাতে উর্মেকিচির মুখ বিকৃত হয়ে গেল। অসুখ তার আরো বেড়ে গেল এবং সেই অসুখেই উর্মেকিচি প্রাণ হারাল। তারপরেই শিনাকিচি আর ওহিসা দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তারা চলেছিল ওহিসার বোনের বাড়ির দিকে, কিন্তু পথেই ওহিসা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পাথরের ওপর পড়ে গিয়ে খুবই আহত হলো। একটা কাস্তে পড়েছিল সেখানটায়, তাতে তার পা-ও কেটে গেল। আর তার মুখখানিও দেখতে দেখতেই কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেল উর্মেকিচির মুখের মতো। অকস্মাৎ ভীত হয়ে উঠল শিনাকিচি, তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল উর্মেকিচির প্রেতাত্মার অভিশাপের আশঙ্কায়। আর সহ্য করতে পারল না সে। সেই অভিশাপের আশঙ্কায় ওহিসাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করল শিনাকিচি।

অভিনয় শেষ। মুক্তি পেল যেন এণ্টনি। কাবুকি থিয়েটারের চারঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ অভি-নয়ের শেষের দিকে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল একেবারে। নাটক শেষ হতেই শ্রীমতী তানাকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে এণ্টনি নিডহ্যাম এবং সে উঠতেই তানাকাও।

এক নাটকের শেষ, আরেক নাটকের শুরু।

বাইরে এসে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো ওদের দু'জনের মধ্যে। একটা ট্যাক্সি ধরে শ্রীমতী তানাকাকে জিজ্ঞেস করল এণ্টনি, সে কোন্ দিকে যাবে।

আমার হোটেল ছাড়িয়ে? বেশতো, ভালোই হলো। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে এসে আমি হোটেলে ফিরব। আরো খানিকক্ষণ গল্প করার সুযোগ পাওয়া গেল। কী বলেন?—এণ্টনির চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে এই প্রশ্ন করতে গিয়ে।

চোখের ইঙ্গিতে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসে শ্রীমতী তানাকা। এণ্টনি এসে তার পাশে বসে।

'ইট ইজ ওয়াণ্ডারফুল!'—গাড়িতে স্টার্ট দিতেই ভাবাবেগে যেন অধীর হয়ে ওঠে এণ্টনি। রূপসী টোকিও নগরীর রাত্রির ঔজ্জ্বল্য দেখে এই ভাবাবেগ না অন্য কোনো কারণে?

এ দেশে একটা চলতি কথা আছে জানেন?—তানাকা জিজ্ঞেস করে।

কী, বলুন তো।

ডোণ্ট সে এক্কো টিল ইউ সি নিক্কো।

তার মানে?—ইংরেজীতে বলা সত্ত্বেও কথাটির ঠিক অর্থ ধরে উঠতে পারে না এণ্টনি। তাই পরিষ্কারভাবে সে বুঝিয়ে দিতে বলে তানাকাকে।

মানে খুব সহজ। এক্কো মানে ওয়াণ্ডার-ফুল। নিক্কো না দেখা পর্যন্ত ঐ ওয়াণ্ডারফুল কথাটি বলা চলে না এদেশে। নিক্কো দেখতে গিয়েছিলেন আপনি?

না তো! —এণ্টনি জবাব দেয়।

যাবেন? কালই চলুন তা'হলে। কাল রোববার, আমার ছুটির দিন, যদি আপনার অমত না থাকে আমিও আপনার সঙ্গী হতে পারি। আমারও অনেকদিন যাওয়া হয়নি নিক্কোতে।

দি আইডিয়া! —বলেই উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে এণ্টনি একেবারে জড়িয়ে ধরে শ্রীমতী তানাকাকে। অন্য দিক থেকে কোনো বাধা বা প্রতিবাদ না আসায় আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে এণ্টনি। সে ব্যবস্থাই করে ফেলতে বলে তানাকাকে।

তা'হলে চলুন, কোথাও বসে নিক্কো সফরের প্ল্যানটা করে ফেলা যাক। —তানাকা প্রস্তাব করে।

আমার হোটেলেই চলুন, এক সঙ্গে বসে ডিনার খেতে খেতে প্রোগ্রামটা করে ফেলা যাবে।

এণ্টনি নিডহ্যামের কথা মতোই ইম্পিরিয়াল হোটেলে এসে নামে ওরা। সরাসরি হোটেলের কাফেটেরেসের ভোজসভায় গিয়ে বসে। নকল আকাশের নিচে বাজনার তালে তালে নাচ চলেছে জোড়ায় জোড়ায়। তারই সামনে বসে টেবিলে টেবিলে চলেছে পানে-আহারে আর সবার তৃপ্তি সাধন।

এণ্টনির ইচ্ছে করে তানাকার পার্টনার হয়ে এক রাউণ্ড নেচে আসবার। না থাক, একেবারে প্রথম দিনের আলাপেই অতোদূরে এগুনো বোধ-হয় ঠিক হবে না। এই মনে করে ইচ্ছেটা আর প্রকাশ করে না এণ্টনি। পান-ভোজনে আর গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কেটে যায়। আর তারই মধ্যে এণ্টনি আর তানাকা ঠিক করে ফেলে তাদের নিক্কো ভ্রমণের পরিকল্পনা।

নৈশাহার শেষে এণ্টনি নিজে গিয়ে তানাকাকে পৌঁছে দিয়ে আসে তাদের বাড়িতে। ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে কতটুকুই বা আর দূর গিঞ্জা এলাকা! ট্যাক্সিতে সেটুকু পথ যেতেই তানাকার দেহের উত্তাপ যথেষ্ট অনুভব করেছে এণ্টনি। তাকে ছেড়ে দিতে খুবই যেন কষ্ট হচ্ছিল তার।

উড ইউ মাইণ্ড এ কিস?—বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে তানাকা নামবার উদ্যোগ করতেই এণ্টনির মুখ থেকে এই ইচ্ছেটি বেরিয়ে আসে। তানাকা হেসে ফেলে, এণ্টনিকে খুশি করেই সে গাড়ি থেকে নেমে এসে হাত তুলে বলে, সোয়েনারো অর্থাৎ বিদায়, বাই বাই!

হোটেলে ফিরে এসে শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গেলেও তানাকার সান্নিধ্যের মধু-স্মৃতি এণ্টনির ঘুমকে যেন আরো মধুময় করে তুলছিল। নিবিড় ঘুমে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিল সে।

সকালবেলা ফোনটা বেজে উঠতেই চমক ভাঙে এণ্টনির। সাড়ে ছয়টা বেজে গেল! আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে তাকে। তানাকা সাতটায় এসে হাজির হবে হোটেলে, তার সঙ্গে সেই কথা। তাই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

এরই মধ্যে আবার ফোন আসে, লাউঞ্জ

থেকে শ্রীমতী তানাকা এবার তাগিদ দেয় এন্টনিকে তাড়াতাড়ি নেমে আসার জন্যে।

ট্যুরিস্ট বাস আটটায় ছাড়বে। হোটেল থেকে বাস স্টেশনও কম দূরে নয়। তারপর টিকিট কাটার ঝামেলা আছে। এসবের জন্যেই তানাকার এত তাড়া।

যাক, খুব বেশি দেরী করেনি এন্টনি। সময় মতোই তারা গিয়ে বাস ধরেছে। অনেক কল্পনা অনেক পরিকল্পনা এন্টনির মনকে আন্দোলিত করেছে ট্যাক্সিতে আসতে আসতে। তার কিছুটা কথায় কথায় সে বলেও ফেলেছে তানাকাকে। মৃদু হাসিতে সে সব প্রস্তাব সমর্থন পেয়েছে তানাকার তরফ থেকে।

ফটো তুলবেন বৈকি, আমার এবং আমাদের ফটোগুলো তুলবেন তা আবার বলতেই বা হবে কেন? নানা ধরণের ফটো তোলবার জন্যেইতো আপনাকে অবশ্যি করে ক্যামেরা নিয়ে আসতে বলেছিলাম।—ট্যাক্সিতে বসে এন্টনির শেষ প্রস্তাবের এই উত্তর দিয়েছিল শ্রীমতী তানাকা। তারপরে বাসে পাশাপাশি বসে এন্টনি কেবল তানাকার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই নানা রকমের ভাবনা ভেবে চলেছে। কোন্ কোন্ পোজে সে তানাকার ছবি তুলবে, দু'জনের ছবি একসঙ্গে কীভাবে নেবে, আরো কত কি।

বাসের পর ট্রেনে কেটেছে তিন ঘণ্টা। তারপরে পুরনো শহর নিক্কোয় এসে যখন তারা পৌঁছল এন্টনি তখন আনন্দে আত্মহারা। আবার তারা বাসে উঠেছে হোটেলে যাবার জন্যে। ঘোষণা হলো নিক্কো কানাইয়া হোটেলে আধ ঘন্টা বিশ্রামের পর মধ্যাহ্নভোজ, তারপরেই শহর পর্যটন আরম্ভ। সে ঘোষণায় এন্টনি ভারি খুশি।

হোটেলের পরিবেশটি চমৎকার। বনানী বেষ্টিত একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপর হোটেল প্রাঙ্গণে পৌঁছেই এন্টনির আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে প্রাণ চায় না। শ্রীমতী তানাকাকে নিয়ে সে তখন তখনি পাশের বাগানে চলে যায়, সেখানে গিয়ে অনেকগুলো ফটো তোলে, আনন্দ করে এবং ঠিক সময়মতোই আবার হোটেলে ফিরে আসে।

খেতে বসে বড় বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছে তানাকা। ওর দাবী মেটাতে মোটেই আপত্তি নেই এন্টনির, কিন্তু ভয় অতিমাত্রায় পানের পরিণতি সম্পর্কে। তবে নিক্কোয় এ নিয়ে কোনো বেগ পেতে হয়নি সেই রক্ষে। আর সবার সঙ্গে তানাকাও দিব্যি ঘুরে ফিরে সাড়ে তিনশ' বছর পূর্বেকার তোসোগু মন্দিরের নানা অংশ দেখেছে। শুধু তাই নয়, এন্টনিকেও সে সমস্ত বিষয় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। এ থেকে এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, টু মাচ ড্রিঙ্ক বলে কিছুই নেই শ্রীমতী তানাকার কাছে।

মন্দির দেখা শেষ করে আবার বিশ্রামের ব্যবস্থা। কাতারে কাতারে দর্শনার্থী। বাসের পর বাস চলেছে সব সার বেঁধে। গড়ে প্রায় দশ হাজার লোক নাকি প্রতিদিন দেখতে আসে এই নিক্কো শহর। এবার এন্টনি তাই বুঝতে পারে, কেন এই ছোট্ট পুরনো শহরটি দেখার আগে এদেশে কেউ 'এক্কো' কথাটি উচ্চারণও করে না।

দিয়া নদীর তীর ধরে ট্যুরিস্ট বাস এসে আরেকটি হোটেলে থামে। পনের মিনিটের বিশ্রাম। জাপানী বীয়ারের খুব সুনাম, তানাকার এই সুপারিশে বীয়ারেরই অর্ডার দেয় এন্টনি। দু' বোতল বীয়ার শেষ করে এবার তাদের যাত্রা নিক্কোর কেগন ওয়াটার ফল দেখতে।

আমেরিকার মানুষ এন্টনি নিডহ্যাম। নায়গারা জলপ্রপাত সে দেখেছে। তার তুলনায় কেগন ওয়াটার ফল তুচ্ছ। কিন্তু এখানকার পরিবেশটি যেন আরো বেশি নয়নাভিরাম বলে মনে হয়েছে এন্টনির কাছে। এই জলপ্রপাতকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে সে তাই আরেকখানা ছবি তুলে নেয় তানাকার এবং সেই সঙ্গে নিজেরও একখানা।

রিয়ালি ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল!—নিক্কো দেখা শেষ হলে এই মন্তব্য করে এন্টনি। তারপর যখন ট্রেনে টোকিওয় ফিরে আসে সূর্য তখন অস্তগামী। সবে সন্ধ্যা, ঘড়িতে মাত্র সাড়ে সাতটা।

এখনই কী বাড়ি ফিরবেন, চলুন আমার হোটেলে। একটু বিশ্রাম করে হাতমুখ ধুয়ে নতুন কোথাও না হয় খেতে যাওয়া যাবে আজ। কালই তো টোকিও ছেড়ে চলে যাব, আবার দেখা হবে কিনা কে জানে!—সরাসরি এই প্রস্তাব করে বসে এন্টনি। শ্রীমতী তানাকাও এক কথাতেই রাজী হয়ে যায় তাতে। কিন্তু কেমন যেন সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে।

বেশ, আপনার হোটেলেই চলুন। কিন্তু সত্যি সত্যি কি আপনি কালই টোকিও ছেড়ে চলে যাচ্ছেন মিঃ নিডহ্যাম?—তানাকার এই প্রশ্নের সুর যে অকস্মাৎ খুব ভারি হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারে এন্টনি। তাই ট্যাক্সিতে উঠেই বেশ সহজভাবে তানাকাকে সে জানায়, কাল টোকিও ছেড়ে গেলেও দেশে ফেরবার পথে সে হয়তো টোকিও হয়েই ফিরবে; তখন নিশ্চয়ই তানাকার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে।

হোটেলে এসে সরাসরি এন্টনি তার ঘরে চলে যায় শ্রীমতী তানাকাকে নিয়ে। ফোনের রিসিভারটা তুলে রুম সার্ভিসকে অর্ডার দেয় দুটো হুইস্কি অন-রকস আনবার জন্যে। প্রচণ্ড গরমে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিল এন্টনি। হুইস্কি আসতে আসতে সে একবার ওয়াস-রুম থেকে ঘুরে আসে। শ্রীমতী তানাকাও এক ফাঁকে হাত-মুখটা ধুয়ে মুছে একটু ফিটফাট হয়ে নেয়। তাতে অনেক শান্তি।

কথা ছিল নতুন কোথাও যাব আমরা, ভুলে গেলেন নাকি?—মুখ থেকে মদের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল তানাকা। একই কুশনে বসে তার ঘাড়ে মাথা রেখে শ্রান্তি অপনোদন করছিল এন্টনি। তানাকার আকস্মিক প্রশ্নে তার চমক ভাঙে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব, কথা দিয়েছি, যাব বৈকি!—বলেই মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে এন্টনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে আধ ঘন্টারও বেশি সময় কেটে গেছে। আনন্দের মুহূর্তগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। মনে মনে আপশোষ করে এন্টনি।

জাপানী খানা খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে এন্টনি। শ্রীমতী তানাকা তাই তাকে নিয়ে একটি জাপানী ইনে গিয়ে ওঠে। ইনের মেয়েদের বিনয়-নম্র ব্যবহারে, তাদের কিমোনো সাজের পারিপাট্যে এবং ব্যবস্থাপনার সর্বাঙ্গীণ শুভ্র পরিচ্ছন্নতায় এন্টনির মুগ্ধ-বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এমন একটি ইনে নিয়ে আসার অজস্র ধন্যবাদ জানায় সে তানাকাকে।

তারপর পান-ভোজনের পালা। সাকে আর হুইস্কির সঙ্গে সুকিয়াকি আর টেম্পোরার মিলিত স্বাদে এন্টনি পরিতৃপ্ত হলেও শ্রীমতী তানাকার তৃষ্ণার যেন আর শেষ নেই—তার পিপাসা বুঝি আর মিটবে না! কয়েক রকমের স্কচ এবং আমেরিকান হুইস্কি গলাধঃকরণ করেও সে উঠতে চাইছে না দেখে এন্টনিকেই বাধ্য হয়ে বলতে হয়, আপনার যদি আর কিছুর প্রয়োজন না থাকে তাহলে এখন যাওয়া যেতে পারে। রাত এগারটা বেজে গেছে।

হ্যাঁ, চলুন। কাল সত্যি সত্যি তাহলে চলে যাচ্ছেন আপনি? কখন যাবেন?—আসন ছেড়ে উঠে পড়ে আরেকবার সেই পুরনো প্রশ্ন করে তানাকা। কথা বলতে গিয়ে জিভ তার জড়িয়ে জড়িয়ে আসে।

সকাল আটটায় কিয়োটোর ট্রেন ধরবো। কাজেই সাড়ে সাতটার মধ্যে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।—ইনের পাওনা মিটিয়ে এই ছোট্ট উত্তর দিয়ে বাইরের দিকে এগোয় এন্টনি নিডহ্যাম এবং তার পাশাপাশি শ্রীমতী তানাকা। তানাকার মুখে আর একটিও কথা নেই। পথ চলতে চলতে দু'একবার সে শুধু তাকায় এন্টনির মুখের দিকে।

শ্রীমতী তানাকাকেই প্রথমে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল এন্টনি। কিন্তু সে রাজী হয়নি তাতে, বরং বলেছে তারই আগে হোটেলে ফিরে যাওয়া দরকার—মালপত্র সব প্যাক-ট্যাক করে সাত-সকালে রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে হবে তো।

এন্টনিকে তাই করতে হয়েছে। সামান্য পথ, পায়ে হেঁটেই সে রওনা হয়েছে তার হোটেলের দিকে। তানাকাও তার সঙ্গ নিয়েছে। চৌমাথার মোড় পর্যন্ত তানাকা চলে এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। কোনো কথাই আর বলেনি। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কেঁদেছে আর সেই কান্নার শব্দ এন্টনিকে অস্থির করে তুলেছে।

টলতে টলতে চৌমাথার মোড় পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ায় শ্রীমতী তানাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েই এন্টনিকে বলে হোটেলে চলে যেতে। আরো বলে, সে একাই সেখান থেকে বাড়ি চলে যেতে পারবে—কোনো ভাবনার কারণ নেই তার জন্যে।

তবুও না ভেবে পারেনি এন্টনি। হোটেলের গেট অবধি গিয়েও সে ফিরে আসে তানাকা সত্যি সত্যি ঠিকমতো ফিরে যেতে পারলো কিনা দেখবার জন্যে।

না, যায়নি তানাকা। ঠিক একইভাবে সে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সামনেই একজন জাপানীর সঙ্গে একদল বিদেশী বোধ হয় তা' নিয়েই কী সব বলাবলি করছে।

এন্টনি তার নিজের রুমালে চোখ-মুখ মুছিয়ে দিলে তানাকার। তারপর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চায়, কিন্তু কিছুতেই রাজী করাতে পারে না তাকে। একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেবার কথা বলতে গিয়েও বাধা পায়—দু'হাত তুলে কেবলি বারণ, কেবলি নিষেধ করে তানাকা, আর বড়ো বড়ো চোখে শুধু কটমট করে তাকায় তার দিকে। সেই চোখের তারায় যেন আরো অনেক বিদেশীকে আপ্যায়নের ছায়া!

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

প্রতীক্ষা

(৭২ পৃষ্ঠার পর)

এক পা করে এগিয়ে যায়, প্রাণ হারাবে জেনেও, ঠিক তেমনি ভাবে দেবীপ্রসাদ এগিয়ে চলেছে কালো যন্ত্রের দুর্বার আকর্ষণে। দেবীপ্রসাদ বাইরের ঘরে চেয়ারের ওপর গিয়ে বসল। কি মনে করে একবার উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল। মেয়েদের মনের কথা কিছু বলা যায় না। স্ত্রী হয়তো আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়াবে দরজার পাশে। উঁকি দিয়ে দেখবে। কান পেতে শুনবে টেলিফোনের কথা।

না, জানকীর কথা দেবীপ্রসাদ ছাড়া আর কেউ শুনবে না। শুনতে দেবে না দেবীপ্রসাদ।

কিছু বলা যায় না, জানকীর আজকের কথায় হয়তো দেবীপ্রসাদ নতুন জীবনের সাড়া পাবে। নতুন চেতনা। তার জীবনকে তোলপাড় করে দেবে। হয় তাকে আমীর করবে, নয় ফকির।

দেবীপ্রসাদ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল। আর মিনিট পাঁচেক। ঘড়ির টিক টিক শব্দের সঙ্গে দেবীপ্রসাদের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন তাল রেখে চলল। বারোটা বেজে গেল। টেলিফোন নীরব।

মনে মনে দেবীপ্রসাদ নিজেকে বোঝাল। তার মত জানকীকেও সব দিক বজায় রেখে তবে টেলিফোন তুলতে হবে। এই গোপনবার্তা আর কেউ শুনুক, এটা জানকীও চাইবে না। দেবীপ্রসাদের মতনই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকোচ তাকেও বিচলিত করছে।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল দেবীপ্রসাদের, হঠাৎ ফোনের শব্দে চমকে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে হাতলটা তুলে নিল, অনেকটা যেন আলিঙ্গন করার ভঙ্গীতে। কান পেতে শুনল।

হ্যাঁ, জানকী কথা বলছে। জানকীর শান্ত কোমল কণ্ঠস্বর। বম্বে থেকে বলছে জানকীরাম ঝুনঝুনওয়ালা। বুলিয়ন বাজারের গোপন খবর।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রবণের মূলে এনে কাগজ পেন্সিল নিয়ে দেবীপ্রসাদ স্থির হয়ে বসল।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হঠাৎ কেমন যেন বিকৃত বলে মনে হয় শ্রীমতী ভানাকার মুখশ্রী। সঙ্গে সঙ্গে কাল্কের কার্নুকি থিয়েটারের কথা মনে পড়ে যায় এন্টনির এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর কথাও। কিন্তু কার্নুকি অভিনয়ে উমিকাচির প্রেতাত্মার স্মৃতি তার দেহ-মনকে এমন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিচ্ছে কেন? প্রেমিকাকে হত্যা করে উমিকাচির মতো কিছুতেই সে আত্মহত্যা করতে পারবে না—কিছুতেই না!

আর বিন্দুমাত্র না ভেবে এন্টনি নিউহ্যাম দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ইম্পিরিয়াল হোটেলে যেয়ে আশ্রয় নেয়।

ছোট বৌদিদি

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

এমনি সব কথাবার্তা হতো আমাদের। তুচ্ছ থেকে বৃহৎ, দেহ থেকে দেহাতীত, ভাগ্য থেকে ভগবান, কোনো কিছুই বাদ যেতো না। বৌদির কোনো সংকোচ ছিল না।

কিন্তু তা বেশী দিনের জন্যে নয়। এর পরে আবার নানারকম অবস্থান্তর ঘটল, তাতেই কিছু কালের মতো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। প্রথমত আমার হাউস সার্জনী করার মেয়াদ ফুরোলো, ওদিকে যাবার দরকারই রইল না। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল। তার পরে আমাদের পাড়াতেই নতুন এক ডাক্তারখানা খুলে প্র্যাকটিসের জন্যে সেখানে গুছিয়ে বসতে হলো। এই সব নিয়ে খুবেই ব্যস্ত থাকায় বৌদির সঙ্গে আর মোটে দেখাই হয়নি, তা প্রায় ছয় মাস হবে কিংবা তার চেয়েও বেশী।

হঠাৎ বৌদির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম—"ঠাকুরপো, একবারটি তুমি এসো। তোমাকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে।"

সেই দিনই গিয়ে হাজির হলাম। স্তম্ভিত হয়ে দেখি বৌদি একেবারে শয্যাগত। খুবেই রোগা হয়ে গেছে, মুখের সে লাবণ্য নেই, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর। কিন্তু চোখ দুটি খুব জ্বলজ্বল করছে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "বৌদি, এ কি কাণ্ড হয়েছে?"

সে হেসে বললে, "পেয়ালা এবার ভরে গিয়েছে।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে সেই রবীন্দ্রসংগীত—বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।"

"হেঁয়ালি রাখো, তোমার কি হয়েছে বলো। কে দেখছে তোমাকে?"

"বুঝতে পারছ না, টি-বি-তে ধরেছে। কে আর দেখবে, সেই ডাক্তার বোস।"

আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। ঠিক কথা, বুকে যথেষ্টই দোষ রয়েছে। রোগের বীজ অনেক আগেই ঢুকেছিল, স্বাস্থ্য ভালো থাকায় তখন কিছু করতে পারেনি, এখন সুযোগ পেয়ে তার ক্রিয়া শুরু করেছে।

বৌদি বললে, "দেখছ কি, গোলে পৌঁছে যাচ্ছি। এবার আর হলো না, পরের বারে এসে তোমার দেনা শোধ করব।"

"আর যদি সারিয়ে তুলতে পারি?"

"পারবে না ঠাকুরপো, আরো কেন মিথ্যে দেনা বাড়াবে। দুঃখ কোরো না, আবার আসব আমি, এই বাঙালী মেয়ে হয়েই জন্মাবো। তখন কি ভাবছ যে পৃথিবীর এমন অবস্থা থাকবে? দেখছ না, কত তাড়াতাড়ি সব বদলে যাচ্ছে। তখন এ সব রোগ-বালাই কিছু থাকবে না, পয়সার লোভ আর মেয়ে পুরুষের পাশবিক লোভ এগুলো কিছু থাকবে না, মানুষ জ্ঞানী হয়েও এমন অন্ধ প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকবে না তখন সে পুরোপুরি জ্ঞানী হবে। তখন এসে দেখিয়ে দেবো যে কেমন করে জীবন সার্থক করতে হয়।"

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে হাসপাতালে একটা বেড জোগাড় করে বৌদিকে সেখানে ভর্তি করে দিলাম। তখনকার পক্ষে যতটা সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, বৌদির জ্বর কমানো গেল না।

কিন্তু আমি দেখতাম, বৌদির দেহের যতই ক্ষয় হচ্ছে, মুখে ততই একটা নির্মল আনন্দ ভেসে উঠছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, "তুমি এমন হাসিখুশি রয়েছ কেমন করে? তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না?" বৌদি বলতো, "কিছু না। আমি যে তাঁকেই এখন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বারে বারে এসে দেখা দিচ্ছেন, কখনো বা মূর্তিময়ী মা হয়ে, কখনো বা সূর্যোদয়ের মতো আলো হয়ে, কখনো বা বুকে উপচে ওঠা হঠাৎ আনন্দ হয়ে। তিনি বলছেন, ভয় পেওনা, আমি রইলাম তোমার কাছে।"

শেষ মুহূর্তে আমি ছিলাম তাঁর কাছে। তখন সে হাঁপাচ্ছে, খুবেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নার্স এসে একটা ইনজেকশন দিতে যাচ্ছিল। বৌদি তার হাতখানা ঠেলে ফেলে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। সেই জ্বলজ্বলে চোখে একটা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল। এ ঠিক সেই তেমনি দৃষ্টি, যেমন দেখেছিলাম কনে দেখার সময়। কার দিকে চেয়ে সে যেন তেমনি উন্মুখ আগ্রহে বলছে "আমাকে নাও, আমাকে নাও।"

আড়বার (আলোয়ার)

(৬৭ পৃষ্ঠার পর)

রূপ জনশ্রুতি থাকিত এবং আচার্যগণের তাহা অজ্ঞাত থাকিত না।

শ্রীরঙ্গমে একটি পারিভাষিক শব্দ শুনিয়াছিলাম—'মঙ্গলাশাসন'। চিরকাল শ্রীভগবানই জীবদের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছেন। আড়বারগণ শ্রীভগবানেরই মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। আমার প্রিয় দেবতার লাবণ্যাদির যেন কখনো কোন অপহৃব না ঘটে, এই প্রার্থনারই নাম মঙ্গলাশাসন।

দিব্য প্রবন্ধে অভিমানিনী অথবা অভিমানী ভক্তের যে আক্ষেপ, অভীষ্টের প্রতি যে তিরস্কার তাহার নাম—'মড়ল গ্রহণ'। শুনিলাম দাক্ষিণাত্যে পতি পরিত্যক্তা কোন কোন রমণী দৃষ্ট বুদ্ধিবশে পূর্বে এক সময়—মাথা মুড়াইয়া, হাতে তালপাতার পাখা লইয়া, নানা বিচিত্র বেশ ধারণ পূর্বক চতুষ্পথে দাঁড়াইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কোন কোন পতিদেবতা লোকলজ্জা ভয়ে উত্যক্ত হইয়া পত্নীকে ঘরে আনিয়া ঢাকের বাদ্যি থামাইয়া দিত। এই আচরণ 'মড়ল গ্রহণ' নামে পরিচিত। দিব্য প্রবন্ধে কোন কোন সাধকের উক্তি ও আচরণের নাম 'মড়ল গ্রহণ'।

সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্যগণ সকলেই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। বৈষ্ণব দর্শন দাক্ষিণাত্যেরই অবদান—বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ হইতেই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রহ্ম সংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থখানি দাক্ষিণাত্যেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সংহিতা ও কর্ণামৃতের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। আড়বারগণের দিব্যাবদান ভারতের বৈষ্ণব ধর্মকে মধুরতর করিয়াছে। তাহাকে মধুরতর করিয়াছেন বাঙ্গলার প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু!

শ্যাম নটরাজ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শান্ত সমাধি-শয়নে, হে বিরাট ! একান্ত একাকী
কত কল্প নির্বিকল্প নিরন্তর একা একা থাকি
অবশেষে নিরঞ্জন, রসাঞ্জনে নয়ন রঞ্জিয়া,
উন্মীলিলে আঁখি পদ্ম,
মহাশূন্যে দেখিলে চাহিয়া,
প্রথম উড্ডীন-পক্ষী, শূন্যে লক্ষি' উড়ে যেই মত,
সেই মত বোধ করি, বিশ্ব সৃষ্টি করিতে উদ্যত,—
করিলে ঈক্ষণ-ক্ষেপ।
সেই ক্ষণে, সেই সে ঈক্ষণে,—
তারকার দীপাবলী, উঠে জ্বলি আঁধার গগনে,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে পুষ্প কুঞ্জবনে যথা,—নিরাধার
নিষ্প্রাকার শূন্যে পূর্ণ করি।
খুলি সপ্তনরী হার,—
নিজ কণ্ঠ হতে তুলি, করাইলে নীলকণ্ঠে তার,
সূর্য শশী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
উঠে জ্বলি আর বার
সে-গভীর তিমির-গহ্বরে, পুনঃ হারাইয়া যায়,
স্বর্ণ বর্ণ বালু কণা স্বল্পালোকে যেমন হারায়
বেলাভূমে বেলা শেষে।
তালে তালে পুনরাবর্তন,—
করি চলে জ্যোতিষ্কেরা,—করে যথা হল্লীষ-নর্তন
রাস চক্রে গোপীগণ ঘিরি রাসেশ্বরে।
ঘটে যদি
অতি তুচ্ছ তাল ভঙ্গ সূক্ষ্ম ছন্দ-চ্যুতি,—তদবধি,
নিরবধি নিষ্ঠুর নিয়তি, ছন্দ-ভাঙ্গা—গ্রহটারে
উল্কা-পিণ্ডে পরিণত করি কত লাঞ্ছিত ধিক্কারে
দেয় দূরে করে।
মালার কুসুমে, শুধু ম্লান হতে,—
শুষ্ক হতে নাহি হতে,
হেলাভরে ফেলে দেয় পথে।
জীবনের ঘরট্ট ঘর্ঘরে,—নিষ্পেষিত নারী-নর
কাঁদে 'হা-হা'—ক'রে।
সে-বিচার, শাস্ত্রে বলে সূক্ষ্মতর,—
চণ্ড নহে—মৃদু দণ্ড; বিবেকের প্রশাসন লভি'
সাবধানে শিক্ষা করি লাভ করি পূর্বের পদবী
পুনরায় স্থান পায় সাধনায় হয় অবহিত
চিরানুচরিত মতে গতি পথে করে নিয়ন্ত্রিত
যথাযথ ছন্দ লয়।
নাহি হয় অন্ধ অভিমানে,—
নাহি করে ছন্দোভঙ্গ,—বিধিবদ্ধ বিহিত বিধানে
ভুক্ত হলে আপনার স্বৈরাচার—কৃত কর্ম-ফল
বিস্মৃত হইতে চাহে অনুশোচনার অশ্রু জল,—
পরিশেষে শেষ দৃশ্যে অন্তিমের অমৃত-সিঞ্চনে
চির শান্তি পায়।
কেন দুঃখ ? কেন তাপ ? সযতনে
কেন পুনঃ আনন্দ-প্রলেপ তাহে ? ক্রীড়নক সনে
শাশ্বত এ-চক্রব্যূহে অনুক্ষণ প্রাণের স্পন্দনে
ক্রীড়া, কিম্বা যুদ্ধ,
কিম্বা রঙ্গ-ভঙ্গ কর নিরন্তর ?
অল্প দৃষ্টি, বহু অনুমান, অন্ধে অন্ধে পরস্পর
পথ প্রদর্শন, কী নিষ্ঠুর পরিহাস অদৃষ্টের
সৃষ্টি চক্র-সুদর্শনধারী, এই মহা মানবের
সমষ্টির দুঃখ-সুখ বিজড়িত অবিদ্যা-বিদ্যায়
কুয়াসার আঁধারে আলোকে।
নিজ মহা মহিমায়,—
গতানুগতিকতার জগতের আনুগত্য তাজি,—
ত্যজি রাজ সিংহাসন, পরিপূর্ণ লীলানন্দে মজি,
যন্ত্রবৎ নিয়ন্ত্রিত আবর্তিত সৃষ্টি চক্র হ'তে
কর না প্রয়াণ প্রভু,—কভু কোনো অপূর্ব-জগতে
কোনো চিত্রকল্প লোকে, কামচারী মনোরথে চড়ি,
কোনো বরবর্ণিনীরে, হে বরেণ্য! বরমাল্য গাড়ি
কর না বরণ ?
যেথা মনোহর সুরে বাঁশরীর,
আনন্দে কালিন্দী জল, চলে প্লাবি তটভূমি তীর,
একাকার করি হর্ষে—তুলিয়া কল্লোল কলতান,—
ধন্য করি, পূর্ণ করি, হ্রদ-নদী-সরসী-নিপান
যেথায় গুঞ্জন তুলি, পরিমল লুব্ধ অলি দলে,—
সঞ্চিত সারস্য মধু ভুঞ্জিবারে ইন্দীবর দলে
ছুটে চলে পুলক-চঞ্চল।
বৈজয়ন্ত-সভা ত্যজি,—
স্বর্গ ত্যজি এসেছিলে নেমে,—
যেথা তুমি ছিলে মজি
মঞ্জু কুঞ্জে মানবীর প্রেমে, ব্রজ রেণু অঙ্গে মাখি
ধন্য হয়েছিলে শ্যামরূপে।
বাঁশীখানি পদে রাখি
অশ্রুজলে গলিত কজ্জলে,
লিখেছিলে নিজ করে—
দয়িতারে দাস্য-লিপি আত্মনিবেদনে। তারপরে
সর্ব-ধর্ম ত্যাগ মন্ত্র প্রচারি কহিলে ভালবেসে
তুমিও তাহারে চাহ তোমারেও যেমনি চাহে সে।
সর্ববেদ সংবিধান সে-মহামন্ত্রের দেশনায়—
* 'যাবানর্থ উদপানে' 'বিধি' তার সংপ্লুত বন্যায়
ভেসে যায় 'ব্যতিরেকে'। ডুবে যায় সব যায় ভেসে,
তোমার মুরলী যবে জানায় আহ্বান মর্মে এসে
মিলিতে তোমার সনে।
ঊর্ধ্বে হেরি নীলকান্ত-নীল
ক্রন্দসীরে কাঁদাইয়া নটরাজ ভরিছ নিখিল
আকুল বাঁশীর গানে। তুলি তাই আনন্দ জোয়ার
কালিন্দী ছুটিয়া চলে,—অটবী সে পল্লবে আবার,
পৃথ্বী শ্যাম হয় শস্যে।
সিন্ধুনীরে দিতে আলিঙ্গন
তটিনীর দুরাকাঙ্ক্ষা, দূরে হতে তোলে শিহরণ,—
তোলে বক্ষে ঊর্মিমালা।
হাসে শশী উভয়ের মাঝে
নীলে নীলে এ-নিখিলে অচঞ্চল আনন্দ বিরাজে
আকাশ মৃত্তিকা-মাঝে।
অপরূপ শ্যাম নটরাজ!
ঊর্ধ্বে নিম্নে নীল নীলিমায় করিছ বিরাজ
কভু অশ্রু ভারাতুর শ্রাবণের শ্যামল-জলদে
কভু বা কৌমুদী-ধৌত-শরতের লাবণ্য-সম্পদে
উশীরে শিশির নীরে নিষিক্ত শ্যামল শস্য তৃণে
দূর্বাদল বিছাইয়া বাঁধিয়াছো আতিথ্যের ঋণে
পৃথিবীর প্রজাগণে। করিতেছ কত না আরতি,—
ঈশ্বর, ঐশ্বর্য ত্যজি,—মানবের প্রেমে হল মতি
দেব ত্যজি মৃত্তিকায়!
কভু হেরি মেঘালক-স্তরে
রাজো রাজ রাজেশ্বর,—
সাজো ইন্দ্র বজ্র ধরি করে,—
পাঞ্চজন্য বাজাইয়া কুরুক্ষেত্রে জ্বালো অগ্নিশিখা
কভু বা প্রলয়ান্তরে পুনর্বার আঁকো সৃষ্টি লিখা।
আপনারে বহু করি বহুরূপে সাজো বহুরূপী
শূন্যে পূর্ণ করি কভু পরিপূর্ণতায় শূন্যরূপী
নানা দৃশ্যে এই বিশ্বে বরবর্ণ ইন্দ্রজাল-সম
দেখাইয়া, হে সুন্দর! মরীচিকা-দগ্ধ-চক্ষে মম
কেন যাও মিলাইয়া ?
নিত্য বিশ্ব কর লুকোচুরি,—
মন্মথের মনোমথি, কন্দর্পের দর্প ভাঙ্গি চুরি,—
অলক্ষিতে কর চুরি অন্তরের মথিত নবনী
কোন রজ্জু বাঁধি পায়ে, কহ তস্করের শিরোমণি!
কোন দণ্ডনীতি দিয়া, কোন রাজ সভাতলে গিয়া,—
কাহার চরণতলে নিবেদিব সাধিয়া কাঁদিয়া,
বিশ্বনাথ করে বিশ্বে নিরন্তর নিগ্রহ লাঞ্ছনা
ডাকিলে শোনে না কানে মানবের মরম-বেদনা।

(* 'যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে'—
গীতা ২য় অধ্যায়)
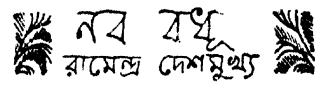
কাল পরেছিলে ফুলকাটা জামা শ্বেত
রাত্রির দেহে
পর্বতে ছিল মরূদ্যানের বায়ু
কাল যে তোমার ধূসর জ্যাকেটে বন
জ্যোৎস্নার স্নেহে
অক্ষয় হ'ল প্রেমিকের পরমায়ু।

দূর-দূরান্ত পাড়ি দিয়ে কাল মৃত বসন্ত এলে
পাতায় মুকুলে ফুলের জলসা গান,
প্রাচীন দেহের তলায় তলায় রসের
শেকড় মেলে
আমি যে শুনেছি তিলোত্তমার তান।

উষ্ণ জলের আধারে কেঁপেছে আমার
প্রাণের মাছ
পাগলের মতো খুঁজেছি শীতল ঢাল,
তুমি জীবন্ত, আমি যে কালের মরা
কটালের গাছ,
তুমি গন্ধকে সুগন্ধভরা ডাল।

কাল পরেছিলে চাঁদের হাঁসুলি, বেণী
উজ্জ্বল তারা,
মহাশূন্যের উল্কার মণিহার,
শৈলশিরায় নাচল নূপুরে ঝর্ণার জলধারা
শিলায় রাখলে আর্দ্র পাতার ভার।

হিন্দোলে তুমি কূজন করেছ, হেসেছি
কেঁদেছি মনে,
হে কোমলায়ন, ধূমকেতু যৌবন,
প্রাণের আবহ রাগিণীতে কাল
মিলেছিল দুইজনে
মৌ-ঝরা আলো, মালভূমি নির্জন।

কাল পরেছিল রোহিণীর রুলি,
ক্যাসিওপিয়ার বালা
গ্রহাণুপুঞ্জ ঝমকার ছিল সাজ
ঈশান কোণেতে রেখেছিলে বুঝি নীরদ
মেঘের মালা
ফুৎকারে শেষে নিজেকে নেবালে আজ।

"না, মোটেই না। যাবনা যাও।"

আধ এলায়িত মধুর ভঙ্গিমায় কুরুবকী সোফার সবুজ গায়ে নিজের সবুজ সম্বলপুরী শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে হাতের একগোছা সবুজ কাঁচের চুড়ির জলতরংগ বাজাল জেডবসানো আংটির ঝিলিক তুলে।

একটু বিস্মিত, একটু ক্রুদ্ধ অংশুমালী সেটির ওপর বসে আছে। তার দৃষ্টিকে আনন্দ দিল কুরুবকীর হাত নাড়ার লীলায়িত মুদ্রা; কানেরও তৃপ্তি হল কণ্ঠের সংগীতধ্বনির সংগে তাল রেখে অলঙ্কার শিঞ্জন।

কিন্তু বলে কি কুরুবকী?

তাদের বিবাহ আসন্ন, তারপরে তারা যথারীতি মধুচন্দ্রে যাবে স্থির আছে। কুরুবকী ভালবাসে উড়িষ্যার সূর্যমন্দির। অংশুমালী সেখানেই যেতে চায়। কিন্তু কুরুবকী যাবে না সেখানে। সে যাবেনা স্বামীর সংগে কোনার্কে। অথচ যেতেই হবে তাকে—সে যাবে ছোট ভাইয়ের সংগে।

"কি আশ্চর্য! আমরা তো একমাস পরে—বিয়ের পরে ওখানেই যেতে পারি। তুমি এত ভালবাস, আমারও দেখা-দেখা করে দেখা হয়ে ওঠেনি।"

"তুমি দেখলে বুঝতে কি তুমি দেখনি। সেই নির্জন সমুদ্রতীরে নির্জন মন্দির। যেন একখণ্ড রঙ্গ আকাশের নীচে। মন্দিরে সূর্য-দেবতার মূর্তি নেই। মন্দির ভাঙা। আমার খালি মনে হয় এবার যেয়ে দেখব সেই ভাঙা মন্দিরে দেবতা বসে আছেন। বারবার তাই ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়।"

"কিন্তু কোনারকের সূর্যদেবতা দিয়ে তোমার কি দরকার?" বিমূঢ় অংশুমালী প্রশ্ন পাঠাল।

"জানি না। মনে হয় আমার বড় চেনা মন্দিরটা। কি একটা আকর্ষণ যেন আছে। যদি কখনও মন খারাপ হয় কোনারকের সূর্যমন্দিরের কথা ভাবি। অমনি মনটা ভালো হয়ে যায়। সাতটি ঘোড়া টানছে সূর্যের রথ, বারোজোড়া চাকার ওপর বারোজোড়া—চব্বিশখানা চাকা। কি আশ্চর্য যে সেই শিল্প!"

অংশুমালী যন্ত্রতান্ত্রিক এঞ্জেনীয়ার। এক কলেজের উৎসবে ছাত্রী কুরুবকীর নৃত্য দেখে অংশুমালীর পিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। ততোধিক মুগ্ধ হয়েছিলেন কুরুবকীর রূপ ও কুরুবকীর পিতার রৌপ্য দেখে। ছেলে বিদেশে স্থপতি-বিদ্যা শিখতে গিয়েছিল। পুত্রের ছবি দেখিয়ে অচিরাৎ বি-এ ক্লাশের ছাত্রী কুরুবকীকে তিনি পুত্রের বাকদত্তা করে রেখে দিলেন।

অংশুমালী ফিরে এল। বিবাহের দিন স্থির হল। ইতিমধ্যে সহসা ভাবী শ্বশুর, কুরুবকীর পিতার হৃৎরোগে মৃত্যু হল। এক বছর বিয়ে স্থগিত রইল। ইতিমধ্যে বি-এর ছাত্রী কুরুবকী বি-এ পাশ করে ফেলল।

কিন্তু লেখাপড়া তার ছিল জোর করে করা। পড়াশোনায় ভাল ছিল না সে। কোনক্রমে গেজেটে নাম রাখার মধ্যেই সমাপ্ত বিদ্যার ঐতিহ্য। সমস্ত প্রতিভা তার কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল নৃত্যশিল্পে। গানের গলা, বাজনার হাতও উত্তম ছিল।

নৃত্যপরা যে কিশোরীকে ভাবী শ্বশুর প্রবাসী পুত্রের উদ্দেশে মনোনয়ন করেছিলেন তিনিই আবার প্রকাশ্য নৃত্য নিষেধ করে দিলেন; ঘরে নাচে নাচুক, এতবড় নাচিয়ে মেয়ের ঘরে নাচ চলবে এক-আধটু। কিন্তু দশজনের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ পায়ে ঘুঙুর বেঁধে লীলায়িত দেহবল্লরী হেলিয়ে নাচবে না পেশাদার বাজিয়ে তবলার ধপাধপে। কুরুবকী আধুনিক ঘরের কন্যা। পিতার একমাত্র কন্যা। অতএব আব্দার ও স্বেচ্ছাচার তার নিত্য অভ্যস্ত। বিদ্রোহ করে উঠল সে। নৃত্যশিল্প তার প্রাণ, বহু সময় ব্যয় করে শিখেছিল সে। যে বিবাহে নৃত্য বিসর্জন দিতে হয়, সে তা চায় না।

পিতা তখন অংশুমালীর কান্তরূপের নানা প্রতিচ্ছবি আনিয়ে একখানি এ্যালবাম সযত্নে প্রস্তুত করেছেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে সগর্বে দেখাচ্ছেন ভাবী জামাতার গুণের তালিকাসহ। গয়না গড়ানো, শাড়ী কেনা সুরু হয়েছে মাতৃহারা কন্যার। অবস্থাপন্ন ঘরের এও উপযুক্ত ছেলে। শ্বশুর সেধে নিচ্ছেন। এমন সম্বন্ধ পাওয়া যাবে না আর। ছেলেটিকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি।

সুতরাং বিয়ে ভাঙল না। কুরুবকীকে বোঝানো হল, প্রথম কয়েকদিন নূতন বউ-এর নাচ চলবে না। আধুনিক, বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামী অবশ্যই কয়েকদিন পরে সুবিধা একটা কিছু করে দেবে। বাবা চিরকাল কুরুবকীর ভাল দেখে এসেছেন, তাঁর উপরে ভার থাক। এবারও তিনি যাতে তার ভাল হয় ব্যবস্থা করে দেবেন।

মনমরা হয়ে কুরুবকী বাড়ীতে নৃত্যচর্চা বজায় রাখল। মন লাগে না। দলে দলে লোক কুরুবকী সান্যালের নৃত্য বুক্‌ করতে এসে ফিরে যায়। যন্ত্রের তার কাটে, তবলার চামড়া ফাটে। উদাস দিনগুলো পাখীর মত শূন্যে উড়ে যায়।

মাদ্রাজী নৃত্যশিক্ষক সবিনয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। নিজেই কোনমতে ঘষে পুরনো নৃত্যগুলো ঝালিয়ে তুলবার আশায় কুরুবকী বেতালা পা ফেলতে লাগল।

নৃত্যপরা অপ্সরা মর্ত্যে নেমে এল।

প্রথম দেখায় অংশুমালীর তাকে বড় পছন্দ হল। ভয়ে ভয়ে দেশে ফিরছিল সে। ছবি দেখিয়ে পাত্রী পছন্দ করানো হলেও বাবার পছন্দে আস্থা ছিল না। হয়তো বুনো-গেঁয়ো মেয়ে একটা। ফটো মন্দ নয় দেখা যাচ্ছে, আসল বস্তুটি কেমন কে জানে?

একখানি অজন্তার ছবি দেখল, সে ফিরে এসে। সাগ্রহ সম্মতি দিতে তার বাধা রইল না। উভয় পক্ষে বিবাহ উদ্যোগ সুরু হল। যাতায়াত চলতে লাগল। অকস্মাৎ কুরুবকীর পিতৃবিয়োগ হল। এক কাকা ছাড়া তার অভিভাবক রইল না। ভাইটি বছর দুইয়ের ছোট।

অংশুমালীর বাবা ভাবী বেয়াইয়ের জন্য হা-হুতাশ করলেও গোপন হর্ষ দমন করতে

পারলেন না। কুরুবকী সান্যাল বিরাট টাকার অঙ্কের মালিক হয়ে গেল।

শোকজ্ঞাপিতা কিশোরীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে অংশুমালীও তার যথেষ্ট নিকটস্থ হল। কিন্তু ভরসা পেল না সে। এ যেন অন্য কোন লোকের জীব। একে বোঝা কোন স্থাপত্য-বিশারদের কর্ম নয়।

কার্যব্যপদেশে ব্যস্ত অংশুমালীর মনে আপশোষ হতে লাগল কেন সে গানবাজনার কোন অনুশীলন করেনি, তাহলে তো কুরুবকীকে বুঝতে পারত সে।

আজও অংশুমালী বিমূঢ় হয়ে কুরুবকীর কথা শুনতে লাগল। "সেই মন্দিরের উপরতলা থেকে দূরে সমুদ্রের ছায়া দেখা যায়। নির্জন! অত নির্জনে কোন মন্দির গড়ার কারণ আছে কি? আমার মনে হয় তখন মন্দিরের চারপাশে বসতি ছিল। ক্রমেই সমুদ্রের আক্রমণে গেছে সরে—অথবা লুপ্ত হয়ে গেছে। বালি উড়ে এসেছে, বালিতে ডুবে গেছে সিংহের মূর্তি, হাতীর মূর্তি।"

অংশুমালী ধীরে ধীরে বলল, "ভারতবর্ষে আরও অনেক সুন্দর ভাস্কর্য আছে। সব ফেলে একটা ধরে আছ কেন?"

"কি জানি!" কুরুবকী সবুজ জরির ডুরি-টানা দাক্ষিণদেশীয় জামার উপর নূতন ভঙ্গিতে শাড়ীর আঁচল জড়াল—"জানি তাজমহল আছে, অজন্তা-ইলোরা আছে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দির আছে। সবগুলোই তো দেখেছি আমি। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি পাগল হয়ে কি যেন খুঁজে খুঁজে। শেষে কোনারকে এসে শান্তি পেয়েছি। মনে হয়েছে এতদিনে যা খুঁজছিলাম পেয়েছি।"

"তুমি সত্যি পাগল, কুরুবকী!"

"হবে।" নির্লিপ্ত উত্তর দিয়ে ভঙ্গি বদল করে অন্য ভঙ্গিতে বসল কুরুবকী।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল অংশুমালী। প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন যেন এর কোন নাচের দুর্লভ মুদ্রা। দেহের সামান্যতম ভঙ্গি দ্বারা এমন লাবণ্য সৃষ্টি সম্ভব পূর্বে দেখেনি অংশুমালী।

কিন্তু চোখের, কানের যেমন তৃপ্তি, মনের তেমন তৃপ্তি কোথায়? শীতল, অতি শীতল কুরুবকী। ভাবী স্বামীকে একটি চুম্বন দিতেও তার আপত্তি। অথচ ভাল সে বাসতে জানে—নৈর্ব্যক্তিক বস্তুকে।

"একটু হাত ধরলেও সহ্য করতে পারেনা। অথচ ওইসব অকথা-কুকথা—আমি চোখে না দেখলেও ফোটো দেখেছি প্রচুর। মৈথুন ছাড়া আর কিছু নেই।"

"তুমি বুঝছ না, ওগুলো আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাই ওদের দেখে মনে কুভাব জাগে না। রক্তমাংসের বস্তু নয়, শিল্পীর শিল্প। তাই এমন অনাবৃত ভাবে সর্বত্র উৎকীর্ণ।"

অংশুমালী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "কুভাব জাগাবে আর কি করে মনে? ক্রমাগত যদি রসগোল্লা-সন্দেশও জোর করে একজন ক্ষেতী চাষীকে খাওয়ানো যায়, সেও আর খেতে চাইবে না, ঘেন্না হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এগুলো Katharsis।

"সে আবার কি?"

ইনটেলেকট্ কুরুবকীর কম। অতএব তার প্রশ্নে অবাক হল না অংশুমালী।

"ক্যাথারসিস্ হচ্ছে গ্রীক নাট্যকারদের মতে নাটকের পরিস্থিতি দ্বারা মনের অনুরূপ ভাব, যথা দুঃখ বেদনা থেকে মনকে মুক্ত করা। ক্রমাগত যৌনচিত্র দেখিয়ে দেখিয়ে হয়তো উক্ত যৌন-বিশারদেরা চাইছিলেন যে মানুষ কামনাশূন্য হোক। কি বিশ্রী সব মূর্তি!"

ভাস্কর্যের আদর্শে নির্মিত প্রস্তরমূর্তি কুরুবকীর মুখে এতক্ষণে লালের ছায়া পড়ল। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে কোনারকের নিন্দায়। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—

"শিল্পে যা উন্নীত হয়েছে, তাকে বিশ্রী বলে না কেউ। ভীনাসের ছবি দেখনি—সমুদ্র থেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ নগ্নরূপে উঠে আসছে। দেহের প্রত্যেকটি অংশ নিখুঁত পবিত্র। ভীনাসের নগ্ন যোনির মত সুন্দর পবিত্র ওই সূর্যমন্দির।"

অংশুমালী হেসে উঠল। তবু ভাল কুরুবকীর মধ্যে এমন উত্তাপ আছে। গালে লালের ছোপ, চোখ জ্বলছে। আরও সুন্দর হয়ে উঠল সে এক মুহূর্তে। অংশুমালী সেটি ছেড়ে উঠে কুরুবকীর নিকটস্থ হতে হতে বলল, "ভাল, ভাল। তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কোনারকেই যাওয়া যাবে, কি বল—?" কুরুবকীর পিঠে হাত রাখল সে।

আর একরকম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে দেহের এক মোচড়ে অন্য দিকে ফিরে সে দাঁড়াল; কঠিন শীতল গলায় বলে উঠল, "অংশুমালী, আমি তোমার সঙ্গে কোনারকের সূর্যমন্দিরে যাব না। আমি বিয়ের আগে একবার একা যেতে চাই।"

বিমুখী নারীকে স্তোক দেবার স্বরে অংশুমালী বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, মঞ্জুর। তবে এখন বাড়ী যাই, অনেক রাত হয়েছে। দেখ চাঁদ কোথায় চলে এসেছে। কদিন পরেই পূর্ণিমা কিনা। তারাগুলো অন্ধকারে জ্বলছে তোমার চোখের মত।"

কুরুবকীকে প্রসন্ন করবার জন্য মরিয়া অংশুমালী কাব্য করবার চেষ্টা পেল। "এখন তাহলে যাই।" নিরুত্তর কুরুবকীকে কাছে টানবার চেষ্টা করল সে। এতক্ষণ কামতত্ত্ব আলোচনা করে তৃষিত হয়েছিল সে "যাবার আগে একটা—" মুখ নামিয়ে আনল অংশুমালী।

এক ঝাপটায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলার কাছে সরে গেল কুরুবকী। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল সন্তপ্তা কোন চাতকিনীর মত।

বিফল অংশুমালীর মনে কেমন করে যেন অন্তস্তল থেকে এক বিচিত্র অনুভূতি উঠে এল। চেনাকে অচেনার রূপ দিয়ে মণ্ডিত করে তুলবার অনুভূতি। যেন কোথায় কবে এমন আর একটি মূর্তি দেখেছে সে!

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে চাঁদের আলো—তিলফুল নাসা, অর্ধচন্দ্র ললাট, ন্যাশপাতির মত সুডোল মুখ, আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ, পদ্মদলের মত অধরোষ্ঠ, ত্রিকোণ চিবুক—সমস্ত কিছু অন্য কাকে বা মনে করিয়ে দেয়? দীর্ঘ গ্রীবার ওপরে কবরী সজ্জিত, ফুলের মালা তাতে জড়িত। কোথায় দেখেছে সে—কোথায়? এমনি সুগঠিত দেহের বঙ্কিম ভঙ্গি?

রাত্রে সেদিন চোখে ঘুম এল না অংশুমালীর। নিরুদ্ধ কামনায় নয়; বার বার তাকে তো ফিরিয়েই দেয় কুরুবকী। একবছরে সে অভ্যস্ত প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে। যাকে একদিন পাওয়া যাবে, তাকে পাবার জন্য অপেক্ষা অংশুমালী করতে জানে।

কিন্তু পাবার পরেই বা কেমন হবে দাম্পত্যলীলা? প্রস্তর প্রতিমা রক্ত মাংসের মানবী হয়ে ধরা দিতে জানে না কি?

বিচিত্র চরিত্র! বিবাহে কেন, এমন মেয়ে রাজী হল? পিতার প্ররোচনায় নিশ্চয়। বিবাহের কোন মূল্য তার কাছে নেই বলেই হয়তো এত সহজে মত দিতে পেরেছে।

ঘুমন্ত মুখচোখ কুরুবকীর। যেন চলাফেরা—খাওয়া বসা কোনটাই তার আসল সত্তার করণীয় বস্তু নয়। অন্য কোথাও তার অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্তা যেন অন্য কাজ করে চলেছে।

সেটাই মুখ্য, এটাই গৌণ।

নিঃশ্বাস ফেলে উঠে বসল বিছানায় অংশুমালী, এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ-ভাগ্য অবশেষে স্থির হল যাকে সে বুঝতেই পারে না।

বিদেশে মহিলা-প্রেম লাভ করে করে অংশুমালী নিশ্চিন্ত ছিল নিজের মনোহারিতা সম্পর্কে। অল্প বয়সে বিদেশ পাঠানো হয়েছিল তাকে। যাবার পূর্বেও বাঙালী মেয়ের মন পেয়ে গিয়েছে সে। গৌরীর সঙ্গে তো প্রণয় গভীর হয়েছিল। টের পেয়ে বাবা তাড়াতাড়ি তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষার ছুতোয়।

গৌরী কেমন সহজ ছিল! গৌরীকে নিয়ে কোন চিন্তার প্রয়োজন হয়নি। গৌরী নিজের রূপকে প্রেমিকের ভোগ্য করতে চাইত। গৌরী অংশুমালীর জন্য পাগল ছিল।

তবু গৌরীকে নিয়ে মন ভরেনি অংশুমালীর। বিদেশী মেয়েতেও না। কুরুবকী যেমন কোনার্কের মন্দির খুঁজে খুঁজে বার করেছে, তেমনি অংশুমালী যেন কাকে খুঁজে বেড়াত। মনে মনে অবশ্য; কুরুবকীর মত অশান্ত দেশভ্রমণে নয়।

কুরুবকীর মধ্যে অন্বেষণের বস্তুর সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল সে। কিন্তু—হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল অংশুমালী। এ কথা এতদিন মনে হয়নি কেন? কুরুবকী অন্য কাউকে ভালবাসে। হয় প্রেমিক বিবাহিত বা অন্য কোন বাধা আছে, তাই বাবার আদেশে অংশুমালীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। পূর্বপ্রেম থাকা-হেতু তার অংশুমালীকে মনে ধরছে না।

এখন পিতা গত, এমন স্বাধীনা নারী অনায়াসে যা ইচ্ছা করতে পারে। কথা দেওয়ার মূল্য কি কুরুবকীর কাছে এতই?

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল অংশুমালী। অসতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করার চেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ভালো। কোনারকে যায় বোধ হয় সমাজের চোখ এড়িয়ে প্রেমিক সাহচর্যে বিহার করতে। তাই ঘন ঘন কোনারকে যাওয়া।

অথবা—অংশুমালীর মাথা গরম হয়ে উঠল—সেখানেই কোন উদ্ভট প্রেমিক আছে—লেডি চ্যাটারলির প্রেমিকের মত। সমাজে তাকে আনা যায় না, তাই নির্জনে উপভোগ করে অনেক দূরের দেশে। কে জানে কে সেটা! ওই মন্দিরের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত কেউ নিশ্চয়। তাই সূর্য-মন্দিরের নামে পাগল। বোধ হয় ওই মন্দিরের বহু-পূর্ব-বংশের সন্তান কোন কাপালিক।

বাথরুমের বেসিনের নীচে মাথা ধুয়ে এল সে। হায়, তার ভাগ্যে শেষে এই ছিল!

বিছানায় শুয়ে পড়ল সে, কাল অফিস আছে, একটু ঘুমের চেষ্টা করা যাক। কিন্তু মনে যখন সংশয় এসেছে চোখে ঘুম আসবে কি করে তার?

দেওয়ালে আবছা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি মূর্তি আঁকা হয়ে গেল—ভাস্কর-গঠিত দেহসৌষ্ঠব সেই মূর্তির, নাক মুখ চোখ যেন শিল্পীর বাটালি দিয়ে ক্ষোদিত। কালচুলে ফুলের মালা।

সেই মুখ বলল, আমার দিকে চেয়ে দেখ। শিল্পে যে পবিত্রতার কথা বলছিলাম, আমি তেমনি পবিত্র।

অংশুমালীর চোখে ঘুম নেমে এল।

দুইদিন অংশুমালী আর গেল না, সংশয়ে নয়, অভিমানে। যে পবিত্র, সে যদি না চায় তবে ধরে নিতে হবে পছন্দ হয়নি। শিল্পী স্বামী চেয়েছিল শিল্পপ্রিয়া, স্থপতিস্বামী পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে। নাচ-গান-বাজনা ভিন্ন কোন কিছুই ভাল লাগে না ওর।

পিতা বিবাহের ফর্দের অংক নিয়ে ব্যস্ত, কুরুবকীর খবর তিনি রাখেন না। অগত্যা তিনদিনের দিন অংশুমালী আবার উপস্থিত। দুইদিন সে টেলিফোনেও কুরুবকীর কোন খবর পায়নি। কুরুবকী খেয়ালী, তবু সে তো কুরুবকীই। তাকে ভুলে কি করে থাকা যায়? কোনার্কের মূর্তির শিল্প, নৃত্যভঙ্গি হয়তো অনুশীলন করে ও; ওই স্কুলের শিল্পকলার সেবিকা কুরুবকী। তাই অত ভালবাসে। কিছু মুদ্রা তুলে নেবে বলে বোধ হয় বিবাহের আগে ছাত্রীর প্রথায় নিরিবিলি অভ্যাসে যেতে চায়।

অংশুমালীর অধরে প্রেম ও স্নেহের হাসি খেলে গেল।

যত মুদ্রা সংগ্রহ করে কুরুবকী ততই লাভ। এই লাভের মুদ্রায় মাছ আনাজ কেনা যাবে না সত্য, কিন্তু প্রতিটি দিনে এই মুদ্রা ব্যবহারে কুরুবকীশিল্প আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। চলাফেরায় হাত নাড়ার প্রতিটি ভঙ্গি তার এক একটি মুদ্রা। প্রতিদিনে অজস্র এই সব মুদ্রা ঝরে পড়ে তাদের গৃহকে ধনী করে তুলবে। তারা স্বর্ণমুদ্রা।

যাওয়া মাত্র কিন্তু অংশুমালী খবর পেল গতকাল কুরুবকী ছোট ভাইকে নিয়ে উড়িষ্যা চলে গেছে।

পূর্ণিমার দিনে কোনারকের মন্দির দেখার বাসনা নিয়ে কুরুবকী চলে এসেছিল এতদূরে।

হোটেলে বহু টুরিস্ট। তারই মধ্যে ছোট ভাইকে নিয়ে কুরুবকী বাস করল। দেড় বছর—দুই বছর পরে এল সে কোনারকে। বিবাহ ঠিক হবার পরে আসা হয়নি। এখন অনেক টুরিস্ট, অনেক লোক। তবু নির্লিপ্ত ঔদাস্যে গগনবিহারী সূর্যদেবতার সপ্তাশ্বরথ অপরূপ ভঙ্গিমায় সূর্যের রথ টেনে নিয়ে চলেছে বালির ওপারে সমুদ্রসৈকতে। আজ দূরে গেছে সমুদ্র, দূরে গেছে নদী চন্দ্রভাগা। ভগ্ন দেউলের মুখশালা বা জগমোহন চেয়ে আছে বিষাদে। দেউলে ছিল অরুণ সারথি সূর্যদেবের মন্দির. প্রথম প্রভাতী আলো এসে তাঁর মুখে পড়ত।

কৃষ্ণাভ প্রস্তর নির্মিত মন্দির, কৃষ্ণাভ মূর্তি—নানারূপ কারুশিল্প সর্বাঙ্গে উৎকীর্ণ।

জিনিষপত্র রেখে কোনমতে একটু চা খেয়ে কুরুবকী চলে এল মন্দিরে। মন্দিরের অংগনে কত যুগের সঞ্চিত ধুলো। সপ্তাশ্ববাহিত রথে দেবদেউল—পুরাণের এক শ্রেষ্ঠ দেবতা সূর্যদেব, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সমগ্র পৃথিবী যৌবন উৎসবে মত্ত হত।

দূরে নাটমন্দির—ছাদ নেই, দেওয়ালে সংগীত ও নৃত্যের নানা জীবন্ত মূর্তি ক্ষোদিত। এখানে মৈথুন নেই, এখানে শুধু পবিত্র দেবদাসীরা সূর্যদেবতার উদ্দেশে নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে আত্মনিবেদন করত। তাদের মৈথুন নিষিদ্ধ, তাই বোধ হয় এখানে একটিও মৈথুনরত মূর্তি নেই।

চিরকুমারী, চিরপবিত্রা দেবদাসীদের সাধারণ মানুষকে ভালবাসাও নিষিদ্ধ। এখানে নৃত্য যেন যুগলপদকে বন্দনা করে, এখানে এলায়িত দেহবল্লরীতে ওই প্রাচীরে ক্ষোদিত আঙুরলতায় সুষমা দোলে। কোনও অদৃশ্য শক্তি সুন্দরীকে নিপুণা করে তোলে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঞ্চল কুরুবকীর মূর্তিগুলো স্পর্শ করছে। নাটমন্দির ছেড়ে এল সে ভগ্ন দেউলের জগমোহনে। দেউলের পাশ দিয়ে পাহাড়ী সিঁড়ির সুউচ্চ ধাপ। তিনটি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চূড়ার উপরে উঠবার পথ। জীবন্ত পাথরের সুন্দরীকুল সেখানে নৃত্যসংগীতপরায়ণা। রূপে অতুলনীয়া, মানুষপ্রমাণ সেই সব মূর্তি। হঠাৎ চোখ পড়লে প্রাণময়ী বলে ভ্রম হয়।

একটি মন্দিরাবাদিকার কাছে উন্মনা কুরুবকী—আকর্ণ চোখে তার সন্ধানের দৃষ্টি। কি যেন খুঁজছে সে, একটু বিষণ্ণ। সূর্যের আলোয় মেয়েটিকে কত অসহায় লাগছে। সে যেন পরবাসী, তার সব হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তার ঐতিহ্য, তার স্মৃতিপ্রবাহ।

অপ্সরা নর্তকীর কাছে দাঁড়াল সে, চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। অবশেষে ক্ষীণ সুরে বলল, "চাঁদের আলোয় আবার আসবো।"

যেন কোন প্রেমিকার ভীরু প্রতিশ্রুতি প্রেমিকের কাছে।

সেই চাঁদ, সেই আমি, কিন্তু তুমি কোথায়? পাষাণ দেবতা, সপ্তাশ্ববাহী সূর্যদেবতা, তুমি কোথায়?

অনেকদিন আগে, দেবদাসী আমি, ছিলাম তোমার মন্দিরে। তখন এই দেউল ভগ্ন ছিল না। বেদীর উপর অরুণসারথি তোমার মূর্তি-দর্শনে দূর দূরান্ত থেকে আসত ভক্ত। পুষ্পচন্দন সৌরভে, ধূপদীপে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ নিত্য বন্দিত হত। সব মন্দিরের কার্ণিশের অপ্সরারা গভীর রাত্রে জীবন্ত হয়ে তোমার সম্মুখে নৃত্য করত। দিব্য সংগীত বাজত দিব্য যন্ত্রে। সে কোন মানুষের জন্য নয়।

আমিও নাটমন্দিরে নৃত্য করতাম। আমার স্বপ্নে, দেবতা, তুমি আমার নিত্য প্রিয় হতে। তোমার অদেহী ভালবাসা ছিল আমার পাথেয়। সূর্যদেবতা, গ্রীক পুরাণের সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মতো তুমিও সংগীতের দেবতা। তুমি আর অ্যাপোলো অভিন্ন।

মন্দির আলোড়ন করে ধাতব-ভীষণ কণ্ঠ শোনা গেল, দেবদাসী, তুমি জান না দেবতা নিষ্ঠুর। চিরকাল মানুষের প্রতি দেবতা নিষ্ঠুর হয়েই থাকেন। যে নারীকে দেবতা ভালবেসেছেন, তাকে প্রস্তরময়ী করে মানুষের হাত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

এই আকাশস্পর্শী, পৃথিবীর বিস্ময় দেউলের পাদপীঠ শোণিতে সিক্ত। শেষ চূড়ার ওপর চুম্বক পাথরটি বসাতে শিল্পীরা অক্ষম হয়েছিল। অবশেষে এক শিল্পীর কিশোর পুত্র পারল সেই দুরূহ কাজ। সহকর্মিবৃন্দ শিল্পীকে ধিক্কার দিল, পুত্রকে অভিনন্দন জানাল।

ঈর্ষাপরায়ণ শিল্পী গভীর রাত্রে নিজের পুত্রকে হত্যা করল এখানে। না, না!—বিলাপ বেজে উঠল,—এমন সুন্দর মন্দির পুত্রহন্তার স্পর্শে কলঙ্কিত হয়নি। চাঁদের আলোয় ঝকমক করে উঠল প্রস্তর দেবতার অধরে নিষ্ঠুর হাসি।

এক? সহস্র বলির রক্ত লেখা আছে কোনার্কের সূর্যমন্দিরে। ইতিহাসে লেখা নেই। শুধু স্থানীয় লোকেরা জানত। দেবতা নিষ্ঠুর হন, জান না?

কেন, তোমার নিজের গল্পটা কি?

জানি। দেবদাসী আমি, দেবতা আমার স্বামী। কিন্তু মানুষ চাইল আমাকে। পুরোহিত।

এই মন্দিরে নৃত্যের শেষে আলিঙ্গনে চেয়েছিল, তাকে এড়াতে আমি ওই জগমোহনের চূড়ায় উঠেছিলাম। তারপর?

বিদ্যুতের আভায় সমগ্র মন্দির প্লাবিত হল। কুরুবকী নতজানু, হাতে টর্চ, সভ্য জগতের একমাত্র চিহ্ন, অন্যহাতে ক্যামেরা। "পেয়েছি খুঁজে। এই আমার মন্দির, আমিও দেবদাসী ছিলাম। তাই বারে বারে অজানা আকর্ষণে এখানেই ছুটে এসেছি। আমার কৌমার্য জীবনের পবিত্র দিন অবসানপ্রায়। কুমারী, আমি শেষবারের মত তোমাকে বন্দনা করতে এসেছি, দেবতা; জন্মান্তরের টানে আমি এখানে এসেছি।"—এবারও তোমাকে আমিই গ্রহণ করব।—ধাতবকণ্ঠে শোনা গেল ভয়াবহ বাণী।

ছোট শহরটিতে বিপুল লোকসমাগম, পুলিশ তার মধ্যে প্রধান। কলিকাতাবাসিনী বিশিষ্টা মহিলা সখ করে চাঁদের আলোয় সূর্যমন্দিরের ছবি তুলতে গিয়েছিলেন টর্চ আর ক্যামেরা নিয়ে। জগমোহনের চূড়ার কাছে মন্দিরাবাদনরতা অপ্সরার পায়ের কাছে পা পিছলে পড়ে আছেন। অসাধারণ সাহস বলতে হবে। বালিগঞ্জের ডানপিটে মেয়ে। গাইডকে সংগে নেওয়া উচিত ছিল।

জ্ঞান হবে কি না সন্দেহ।

সেদিন রাত্রে অংশুমালী স্বপ্ন দেখল।

অপ্সরা। পাথরে গঠিত অপ্সরা মূর্তি, শ্যামাভ, লীলায়িত ভঙ্গিমায় মন্দিরা বাজাচ্ছে। একে তো দেখেছে সে বহুদিন। কোথায় মনে পড়ছে না।

—

নান্দীমুখ — গল্প — শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

নিমেষের মধ্যে কি যে হয়ে গেল রঞ্জনার। এখনো কানে বাজছে—পিতা প্রশান্তকুমার দেবশর্মা। মন্ত্র পড়ছে উৎপল। শোনামাত্রই চমকে উঠল রঞ্জনা।

আগুন, আগুন। বুকের ভেতর যে আগুনটা এতদিন চাপা ছিল, তা যেন ধুক্ ধুক্ করে আবার জ্বলে উঠল। পঁচিশ বছরের চাপা দেওয়া সেই আগুন।

সিঁড়ি ভেঙে প্রায় ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এল রঞ্জনা। না, এখানেও শান্তি নেই। ঐ যে প্রশান্তর ছবি। তার মুখে প্রশান্ত হাসি। যে হাসিতে এতদিন পরমনির্ভরতার আভাস পেয়ে আসছে রঞ্জনা, আজ মনে হল সে হাসিতেও আছে করুণা মাখানো। দয়া করেছিল প্রশান্ত। দয়া করে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার মহত্ত্ব দিয়ে রঞ্জনাকে ঢেকে রেখেছিল।

ভালবাসা নয়, প্রেম নয়,—দয়া।

মিথ্যাচার, সবই প্রহসন। পিতা—প্রশান্তকুমার দেবশর্মা। উৎপলের পিতা! সবই প্রহসন।

জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। জল খেতে গিয়ে কুঁজোর জলটা পাগলের মত নিজের বুকে ঢেলে দেয় রঞ্জনা। না, তবুও হল না। ঘরের ভেতর পায়চারি করে। তারপর দরজার খিলটা বন্ধ করে দেয়।

ওদিকে সানাই বাজছে। আগমনীর সুর। উৎসবমুখর বাড়ি। নববধূকে নিয়ে আসবে উৎপল। তারই প্রস্তুতি চলছে।

চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতীত। হ্যাঁ, এমন করে সানাইতো বাজেনি সেদিন। শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বউকে বরণ করেছিলেন প্রশান্তর মা। আশীর্বাদ করেছিলেন কৃপানাথ।

কৃপানাথ আজ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জরাজীর্ণ তাঁর দেহ। পুত্রশোকে, প্রশান্তর শোকে মুহ্যমান দেহ টেনে টেনে এতকাল নিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধ। উৎপলকে মানুষ করেছেন।

এমন আনন্দের দিনে আজ এ কি ভাবছে রঞ্জনা? অতীত আজ সুযোগ বুঝে এ মুহূর্তে কেন আঘাত দিতে ফিরে এসেছে?—রঞ্জনার চোখের সামনে স্মৃতির পর্দায় ফুটে উঠে এক তরুণীর ছবি।—তারই প্রতিচ্ছবি। কাঁদছে, সে তরুণী বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে। যে একদিন দম্ভে আত্মহারা ছিল। আজ তার দম্ভ কোথায় গেল? তার যে সর্বনাশ হয়ে গেল। ভুলের মাশুল দিতে কি যে দিতে হবে সে জানে না। আজ বাবা-মা সবাই বিমুখ। আজ নেমে এসেছে তাঁদের কঠোর শাসন। কিন্তু এতদিন তাঁদের কোন শাসনই ছিল না। কলেজে পড়া মেয়েকে দিয়েছিলেন অবাধ অধিকার।

প্রতারণা করে গেছে সমীর। বিশ্বাস করে যার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেই সমীর এখন কোথায়? আর যে কোন উপায়ই নেই। আভিজাত্যের দম্ভের জাল ছড়িয়ে নিজেকে আগলে থাকত রঞ্জনা। প্রশান্ত দূরে থেকেই দেখত। রঞ্জনার প্রতিভার প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল তার। এক সঙ্গেই তারা এম-এ পাশ করেছিল। তবু করুণার চোখে দেখত স্কুলের পণ্ডিত কৃপানাথের ছেলে প্রশান্তকে।

সমীর তার সিভিলিয়ান বাবার আভিজাত্য যোগাই ছিল। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট অরিন্দম চ্যাটার্জি এরকম স্বপ্নও দেখতেন। তাই মেয়েকে প্রশ্রয়ও দিয়েছিলেন। মীরাট আর কলকাতা। মীরাটে থাকতেন সমীরের বাবা। সমীর দিয়েছে প্রত্যাখ্যানের চিঠি। নানা অজুহাত,—এদিকে আর ফিরবে না।

ভেঙে গেছে রঞ্জনার স্বপ্ন। বাড়িতে জানাঘুষা চলছে। ক্ষেপে উঠেছেন অরিন্দম চ্যাটার্জি। মায়ের কণ্ঠেও কঠোর মন্তব্য। দাদা সন্দীপ বলছে কুছপরোয়া নেই। রঞ্জনার বিরুদ্ধে যেন কি এক ষড়যন্ত্র চলছে।

না, না, না। রঞ্জনা তা পারবে না।—যা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই করতে গেল রঞ্জনা। ছুটে গেল প্রশান্তর কাছে। এমনি এক দুপুর। প্রশান্ত অবাক।

আমায় বাঁচাও প্রশান্ত।—আর বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি রঞ্জনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হাঁটু গেড়ে প্রশান্তর পা-দুটি জড়িয়ে ধরেছে রঞ্জনা।

প্রশান্ত কিছুই বুঝতে পারে না। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে সবই শুনল বা বুঝল। তারপর দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল,—ভয় কি রঞ্জনা। আমি তোমার সব ভার নিলাম। কিন্তু বড়লোকের মেয়ে তুমি। তুমি কি আমাদের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমারও মর্যাদা আমি কোনোদিন ক্ষুণ্ণ করব না।

স্তম্ভিত হয় রঞ্জনা। এতখানি আশা সে করেনি। তার মনে দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল। কিন্তু প্রশান্ত বলে কি? রঞ্জনার সকল অহঙ্কার চোখের জলে যেন গলে গলে ঝরতে থাকে।

রঞ্জনা জানত সাধু মানুষ আপনভোলা প্রশান্ত। প্রশান্তকে এতখানি বড় ভাবতে পারেনি রঞ্জনা। আজ পরশকাঠির স্পর্শে নিষ্প্রাণ রাজকন্যা জেগে উঠল।

—হ্যাঁ পারব প্রশান্ত। তুমি যা বলবে, তাই করব।

তারপর দুজনে এসে অরিন্দম চ্যাটার্জির আশীর্বাদ চাইল। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অরিন্দম চ্যাটার্জি—না, না, না। এ হতে পারে না। তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না রঞ্জনা!

সন্দীপ বললে,—বড় ভুল করলি রঞ্জনা।

বাবার সঙ্গে সেই থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। নতুন জীবন সুরু হল রঞ্জনার। প্রশান্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। সে কি তপশ্চর্যা! তা পীড়া দিয়েছিল রঞ্জনাকে। তবু মুগ্ধ হয়েছিল সে। নতুন জীবনে নতুন শিক্ষা পেয়েছিল রঞ্জনা। অধ্যাপক প্রশান্ত তাকে এক অনাস্বাদিত প্রেমের আস্বাদ দিয়েছিল।

দেহসৌখ্যের উপরেও যে এক পরমতৃপ্তি

হয়েছে, তার অনুভূতি রঞ্জনা প্রশান্তর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রশান্ত রঞ্জনার অতীতকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ এক আঘাত। উৎপল বছর তিনেকের হয়েছে। এমন সময় একদিন প্রশান্তর অচেতন দেহকে নিয়ে এল একদল ছাত্র। হঠাৎ ক্লাসে বক্তৃতা দিতে দিতে প্রশান্ত মূর্ছিত হয়ে গেছে।

প্রশান্তর আর জ্ঞান ফেরে নি। কিন্তু মৃত্যুর আগে একবারমাত্র চোখ চেয়ে কি যেন খুঁজেছিল প্রশান্ত। আজ সে চাওয়া, সে দৃষ্টি রঞ্জনা ভুলে যায় নি। সে দৃষ্টিতে ছিল সেই স্নিগ্ধ ভাষা।

তাই ত এতকাল রঞ্জনাকে পথ দেখিয়েছে। উৎপল প্রশান্তরই প্রতীক্। কি আশ্চর্য? উৎপলের চোখেও সেই প্রশান্ত দৃষ্টি। এ কি করে সম্ভব হল?

তপশ্চর্যা রঞ্জনা,—তপশ্চর্যা। উৎপল সত্যই শতদল পদ্ম হয়ে উঠবে।—কানে বাজে তার সুর।

এ কি স্বপ্ন দেখছে রঞ্জনা? কথা বলছে প্রশান্ত। ছবি কথা বলছে, খোকাকে, উৎপলকে আশীর্বাদ করছে প্রশান্ত।

ঝর ঝর করে জল ঝরছে রঞ্জনার চোখে। এতদিন কাঁদেনি। পঁচিশ বছর কাঁদেনি রঞ্জনা। ভুল, একি ভুল করতে বসেছে!

বারান্দায় বেরিয়ে এল। ঐ যে সেই চাঁপা-গাছ। প্রশান্তই চাঁপার চারা লাগিয়েছিল। অজস্র ফুলে সোনার হাসি। বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়েও ঝাঁপ দিতে পারল না।

মাঙ্গলিক মন্ত্রের ঝংকার কানে বাজছে। আর ফুলের মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে প্রশান্তর কণ্ঠ—

ফুলকে ভালবাসি রঞ্জনা। তাই ফুল পাড়তে আমার কষ্ট হয়। যে ফুল এত সুন্দর। না জানি যার কাছ থেকে ফুল তার এত সৌন্দর্য পেয়েছে, সে কত সুন্দর!—

অঝোরে কাঁদছে রঞ্জনা। আগুন নিভে গেছে। সানাই বাজছে। নীচে মাঙ্গলিক ক্রিয়া হচ্ছে। সেখানেই দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ এ কি হল? কেন সে পালিয়ে এল?

নিজের হাতে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। আভ্যুদয়িক হবে। শুভকর্মের প্রারম্ভে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য মাঙ্গলিক—নান্দীমুখ।

যাঁদের পরিকল্পনায় এ অনুষ্ঠানের উদ্ভব, শ্রদ্ধায় তাঁদের উদ্দেশে প্রণতি জানায় রঞ্জনা। মহৎ,—শুধু মহৎ নয়, মহত্তর এ অনুষ্ঠান। শুধু পিতৃপুরুষের জন্য নয়, যাঁদের কেউ নেই, তাঁদের জন্যও বলা হচ্ছে, ওঁ যেষাম্ ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধিন্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েহন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।

আসনে বসে আছে উৎপল। গরদের চেলিতে তাকে সুন্দর মানিয়েছে, মুখে-চোখে প্রশান্ত দীপ্তি। প্রশান্তর হাসি! উদ্বেল আনন্দে ছেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছিল রঞ্জনা। পরম-তৃপ্তিতে তার বুকটা ভরে উঠেছিল। হ্যাঁ, বড় সুন্দর, বড় মহান্ এ মন্ত্র।

কৃপানাথ এক পাশে পিঁড়ির ওপর বসে আছেন। তাঁর শ্বেত শ্মশ্রুলে মুখমণ্ডলে রঞ্জনা দেখতে পায় এক অপূর্ব দ্যুতি। যেন ঋষি-মূর্তি। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় পঁচিশ বছর কাটিয়েছে রঞ্জনা। নিজের বাবা ও মা-কে ভুলে গিয়েছে।

বসুধারার মঙ্গলচিহ্ন দেওয়ালে শান্তিশ্রী ফুটিয়ে তুলেছে। সিঁদুর আর চন্দনের তিলক বেয়ে ঝরছে ঘৃতধারা। কৃপানাথ বলছেন,—হ্যাঁ, পিতামহ আমি তো বেঁচেই রয়েছি। আমার নামটা বোধ হয় বলতে হবে না। মাতামহের দিক্‌টা যতদূর পারি সংগ্রহ করেছি। পিতামহী কামাখ্যা দেবী। পিতা প্রশান্তকুমার দেবশর্মা।

ধুতির কোঁচায় চোখের জল মোছেন কৃপানাথ। তাঁর গলার স্বরও ভারি হয়ে ওঠে। —এই ফর্দটা নিন ঠাকুরমশাই! সবই এতে লেখা আছে।

পুরোহিত মশাই হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিজের হাতে নেন। তারপর ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হয়। পুরোহিতের কথার প্রতিধ্বনি করছে উৎপল,—

শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শ্রীউৎপলকুমার দেবশর্মণঃ শুভ উদ্বাহকর্মাভ্যুদয়ার্থং শাণ্ডিল্যগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ প্রশান্তকুমার দেবশর্মণঃ—

চমকে উঠেছিল রঞ্জনা। এ কি পরিহাস? তার মনে হয়েছিল, এ সবই প্রহসন। তার এতক্ষণের মুগ্ধভাব, উদ্বেল আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। ছুটে পালিয়েছিল রঞ্জনা।

এই যে চাঁপা ফুলগুলি হাসছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে রঞ্জনা। নীচেকার দৃশ্য আবার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কান পেতে শোনে।

—না, না, এ মিথ্যাচার নয়। ফুলকে ভালবাসার প্রতীকের মাঝেই প্রশান্ত তার স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। এযে মিথ্যা হতে পারে না।

আমাদের দুজনের জীবনের তপশ্চর্যায় উৎপলের জীবন শুদ্ধ শান্ত হয়ে উঠবে রঞ্জনা!

বাতাসে ভেসে আসে প্রশান্তের কণ্ঠস্বর। তবু একি ভাবছে রঞ্জনা। সে যা ভেবে বিচলিত হয়ে উঠেছিল, তা যে সেই পঁচিশ বছর আগে ধুয়ে মুছে গেছে। পঁচিশ বছর পরে আজ চাঁপাফুলের হাসির মাঝে প্রশান্তর হাসি দেখতে পায় রঞ্জনা।

সত্যি সংশয় ছিল তার মনের কোণে। আজ হঠাৎ তা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।—"পাগল! সে পাগল হয়ে গেছে রঞ্জনা। বদ্ধ পাগল।"—এছাড়া কোন কিছুই শুনেনি রঞ্জনা।

—ফুল কি তুলতে আছে রঞ্জনা! ফুলকে ভালবাসি বলেই তাকে দলিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করতে পারি না।

প্রশান্তর কথা আজ নতুন করে মনে পড়ে মিথ্যা এ অভিমান। সত্যি উৎপল পাবে তাঁ আশীর্বাদ। প্রশান্তর পিতৃপুরুষ প্রশান্তর মধ দিয়েই উৎপলের অঞ্জলি গ্রহণ করবেন। যেম করেছেন—এই কৃপানাথ।

তৃপ্তির হাসি ফোটে রঞ্জনার মুখে।

ওদিকে ডাস্টবিনে কুকুর আর কাে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। কি বিশ্র ঘেয়ো একটা কুকুর। একটা পাগল কোথা থেে এল ডাস্টবিনটার কাছে। কাক ও কুকুরকে তাড়িে দিয়ে ডাস্টবিন থেকে এঁটোপাতা তুলে নিে চাটতে লাগল পাগলটা। হঠাৎ পাতাটা ছুঁে ফেলে দিল; তুলে নিল এক গোছা ফেলে দেওয়া রজনীগন্ধা। ফুল শুঁকছে পাগল।

পাগলের মুখে হাসি—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

কি বীভৎস দৃশ্য! পাগলটা হাসছে। এ কি কপালের পাশে একটা দাগ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চোখ তুলে বারান্দার দিকে তাকায় পাগলটা।

কি যেন মনে পড়ে যায় রঞ্জনার। পুরনে স্মৃতি আঘাত দেয়। পঁচিশ বছর আগেক স্মৃতি। স্মৃতির আলেয়ায় আর ভুলে না রঞ্জন চাঁপা ফুলের হাসি তাকে পথ দেখায়। মন শ করে রঞ্জনা।

মা, মা, মা!—উৎপল ডাকছে। ছুটে ভেত চলে যায় রঞ্জনা।

—

মনোনীতা

মায়া বসু

একেই বুঝি লোকে পোড়া কপাল বলে? জন্মাবার পর থেকে শৈশবের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান অজ্ঞাত সময়টার কথা একেবারেই মনে পড়ে না ললিতার। কিন্তু তার পর থেকে তার এই ভরা বিশ বছর বয়স পর্যন্ত উঠতে বসতে প্রায়ই যে কথাটা শুনতে হয়েছে সেটা ওর পোড়াকপালের খোঁটা।

সহানুভূতির প্রলেপে শানানো। ললিতাকে ওর প্রকৃত অবস্থার কথা ভাল করে জানিয়ে দেওয়া। শুনিয়ে দেওয়া।

শুনতে হবে নাই বা কেন?

বুড়ো বয়সে, আঁতুড়ের পাট শেষ হয়ে যাবার বহু বছর বাদে হঠাৎ যদি অনাহূতভাবে একটা অবাঞ্ছনীয় সন্তান জন্মায় অভাব-অনটনের ঘরে, তবে বাড়ির লোকের মনের অবস্থাটা কেমন হয়? আবার তাও যদি মেয়ে সন্তান হয়!

অন্য লোকের কথা দূরে থাক। সুখবরটা কর্ণগোচর হওয়া মাত্র পরম স্নেহময়ী গর্ভধারিণী পর্যন্ত নিজের কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। 'পোড়া কপাল আমার! লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে বুড়োবয়সে শেষকালে কিনা একটা মেয়ে হল? পোড়াকপালী কি আর জন্মাবার জায়গা পেলি না ভূভারতে?'

বছর তিনেক বাদে সেই পোড়াকপালীর কপাল আবার ভাল করে পুড়ল।

বড় আদর করে, বড় ভালবেসে যিনি মেয়ের নাম রেখেছিলেন ললিতা। পাঁচজনের বাঙ্গ-বিদ্রূপমিশ্রিত চোখের উপরেই ওকে কোলে পিঠে বুকে করে বেড়াতে বুড়ো বয়সেও যিনি বিন্দুমাত্র লজ্জা সরমের ধার ধারেননি, সেই ললিতার বুড়ো বাবাই মারা গেলেন সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে।

ঘরে-পরে সবাই আবার ললিতার পোড়া-কপালের দুঃখে হা-হুতাশ করল।

তখন অবশ্য ওই বিশেষ কথাটার মানে বোঝার মত জ্ঞান ওর হয়নি।

কিন্তু তার ক'টা বছর বাদে যখন মাও মারা গেলেন তখন আর ঐ বিশেষ কথা 'পোড়া-কপালের' অর্থটার মানে বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয়নি ললিতার।

বড় বড় বোন দুটো আগেই পার হয়ে গেছে। উপস্থিত দাদা বৌদি। গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে। একটা পুকুর। দুটো শাকসব্জীর বাগান। গোটা চারেক গরু-বাছুর নিয়ে শিমুলপুরের সংসারটা নেহাৎ কম নয়। সকাল থেকে উঠে সেই রাত অবধি ললিতাকে ঘুরতে হয় চরকির মত এরই পিছনে।

দাদাকে টাইম ধরা অফিসের ভাতের থালা ধরে দেবার সময় এক একদিন শুনতে হয়: 'কী কপালই করে এসেছিলি ললিতা? খেটে খেটে তোর হাড় মাস কালি হয়ে গেল! একটা ভাল সম্বন্ধও—'

'বক-বকানি থামাও দাদা, আমার ঢের কাজ পড়ে রয়েছে। নাও ভাতটা মাখো দেখি, একহাতা ঝোল দিচ্ছি। পুতুলটার বার্লি জ্বাল দেওয়া হয়নি এখনো—। এক্ষুণি খাই খাই সুরু করবে।'

ললিতার চেয়ে বয়সে অনেক বড় দাদা বোনের ধমক খেয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। আর কথা বলে না।

ভর-দুপুরবেলা সংসারের সহস্র কাজের বোঝা নামিয়ে যখন বৌদির সঙ্গে খেতে বসে, বায়না সুরু করে দেয় কোলের ছেলেটা। খাওয়া শেষ হতে না হতে গলা ফাটিয়ে চিল চিৎকার সুরু করে। দুধ খাবার বায়না মায়ের কোলে শুয়ে।

জোর করে বৌদিকে উঠিয়ে দেয় ললিতা। বাসনের পাঁজা নিয়ে উঠে পড়ে পুকুর ঘাটে যাবার জন্যে।

তখন নিঃশ্বাস পড়ে বৌদিরও।

কী কপাল করেই এসেছিলি ঠাকুরঝি? দশ মাসের একটা ঝি পর্যন্ত রাখতে পারে না তোর দাদা? এত রূপ, এত গুণ, তবু টাকার অভাবে তোর বিয়ে হয়না? খেটে খেটে তোর—

বৌদির শেষ কথাগুলো কানে যায়না ললিতার। ততক্ষণে ও পুকুর ঘাটে পৌঁছে গেছে। পোড়াকপালের উপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে বাসনে ছাই বুলোতে সুরু করেছে।

অনবরত পোড়াকপালের কথা শুনে শুনে একটুকু বিকারও হয়না ওর।

* * * *

সেই ললিতা। শিমুলপুরের বাপ-মা মরা দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকা বিশ বছরের ললিতা, পাড়াগাঁয়ের সতেজ শ্যামল প্রচুর বন্য স্বাস্থ্য আর ভরা বয়সের ঢলনামা রূপ ছাড়া যার আর কিছু সম্বল নেই, সেই শিক্ষাদীক্ষাহীন গেঁয়ো মেয়েটাই কিনা একটা বছর কাটতে না কাটতে, কলকাতার জলহাওয়া আদব-কায়দা ভাল করে রপ্ত করতে না করতেই খুড়িমার সম্পর্কে ভাগ্নে, সহরের চারটে পাশকরা ছেলে সহদেবের মুখের উপর স্পষ্ট বলে বসল, 'পোড়া-কপাল আপনার ভাগ্নে বাবু! জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছি ওটা নাকি একচেটে আমার দখলে। কিন্তু আপনার দশা দেখলে আমার হাসিও পায়। দুঃখও হয়।'

শুধু ছোট মুখে বড় কথা নয়। একটা পরাশ্রিতা, পরান্নপালিতা নিঃসহায় মেয়ের মুখ থেকে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনে প্রত্যুত্তর দিতে ভুলে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক সহদেব শুধু কট-মট করে তাকিয়ে থাকে এই সম্পর্কহীন মেয়েটার দিকে। ক্রোধে অপমানে চোখমুখ আরক্ত হয়ে ওঠে।

কথাটার অন্তর্নিহিত শাণিত সত্যটা তীরের মতই মর্মস্থল ভেদ করে জ্বালাটা আরো বাড়িয়ে দেয়।

ততক্ষণে ললিতা হাতের কাজগুলো গুছিয়ে সেরে নিয়ে আরেকটা কাজে হাত লাগিয়েছে। ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে।

এ-বাড়িতে দাঁড়িয়ে দু'দন্ড গল্প করার মত সময় যে ওর নেই, সে কথা সহদেব খুব ভাল করে জানে। তবু কোনমতে রাগ সামলে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাঁড়াও ললিতা, আমার দুঃখ দেখলে তোমার দুঃখে বুক ফাটার মানেটা না হয় কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু আমার এমন কী দুর্দশাটা তুমি দেখলে যে তাতে তোমার হাসির ফোয়ারা উথলে উঠল?'

একটা তীব্র ঠাট্টার হাসি জ্বলজ্বলে থাকে ললিতার কর্মক্লান্ত মুখের উপর। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে উত্তর দেয়: 'কেন হাসি পায়, একথাও কি বলে দিতে হবে আপনাকে? কিন্তু থাক 'ওসব কথা। অন্তর্যামি

উপরে চলে যান। কাকিমা যদি টের পান আপনি আমার সঙ্গে গল্প করছেন, আপনার কোন ক্ষতি হবেনা, আমার হবে। কাজ ফাঁকি দিয়ে গল্প করা উনি পছন্দ করেন না। জানেন তো, কাজের জন্যেই আমায় এখানে এনেছেন? দুবেলা দুমুঠো খেতে পরতে পাচ্ছি! লেখাপড়া শিখলে না হয় চাকরি করে খেতাম—'

আর দাঁড়ায় না ললিতা। একেবারে রান্না-ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে। ওর ময়লা কালি হলুদ মাখা আঁচলখানার একটা কোণও আর নজরে পড়ে না সহদেবের ক্রোধ-রক্ত দুচোখের কোণে।

নিরুপায় আক্রোশে অগত্যা জুতোর অনা-বশ্যক শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে যায় সহদেব। দোতলায় একটা বিশেষ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, দরজার লতাপাতা আঁকা বিচিত্র পরদাটার একটি কোণ চেপে ধরে, মুখে একটা মধুর হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে অন্তরাল-বর্তিনীকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, 'আসতে পারি?'

ততক্ষণে সুগৌর মুখে, গলায় ঘাড়ে বাহুদুটিতে গোলাপী পাউডার মাখা শেষ হয়ে গেছে। আয়নার সামনে বসে প্রত্যেকদিনের দুঘন্টা ধরে সান্ধ্য প্রসাধনও শেষ। একটা বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির মতই নানা রঙের প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে প্রীতি অতি সুন্দর করে।

"এসো এসো সহদেব। এত দেরী যে?"

প্রীতি নয়। ঘরে ঢোকবার আমন্ত্রণ জানান প্রীতির মা। ভারী দেহটা নিয়ে হাঁসফাঁস করে ওঠার চেষ্টা করতে করতে বলেন, 'কখন থেকে পীতু তোমার জন্যে ছটফট করছে।'

ঘরে ঢোকে সহদেব। আর প্রীতির দিকে তাকায়। ওর দুচোখের মুগ্ধ দৃষ্টির পিপাসা শান্ত হয়।

লক্ষ্য করে—মেয়ে মা দুজনেই খুশী হয়ে ওঠে।

'আজ সকালে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন? কি বললেন মামিমা?'

প্রীতির বিছানার পাশের চেয়ারটায় ঘরের লোকের মত স্বচ্ছন্দে বসে পড়ে সহদেব।

হাসিমুখে ঘাড় নাড়েন প্রীতির মা। 'আজ সকালেই উনি আবার ভাল করে পীতুকে দেখে গেছেন বাবা। এবার থেকে ও ভালভাবেই হাঁটাচলা করতে পারবে। কোন খুঁতই থাকবে না। কি যে হল পায়ে? দুটি বছর সমানে বড় বড় ডাক্তার। জলের মত পয়সা খরচ হচ্ছে। ভোগান্তি আর কাকে বলে! তোমার মামা তো চোখ বুজলেন। আর আমি এই মেয়ে নিয়ে জবুলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেলাম। যাক তবু ঠাকুরের দয়ায় এতদিনে পা-টা ওর সারল।'

প্রীতি হঠাৎ বলে ওঠে, 'যাই বল মা, ললিতাদির জন্যেই আমার ভাঙ্গা পা-টা সারল কিন্তু। ডাক্তারবাবুও ঐ কথাই বললেন। দিনের পর দিন এমনভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যাসাজ করতে আর কেউ পারত না।'

প্রীতির মা মেয়ের কথায় বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সালিশ মানেন সহদেবকে। 'শোন বাবা মেয়ের কথা! ও যদি নাই আসত শিমুলপুর থেকে, মালিশ করবার লোক কি আর জুটতনা?'

তবু প্রীতি ফস্ করে বলে ওঠে, 'যাই বল মা, বছরখানেক ধরে একনাগাড়ে সংসারের কাজকর্ম সেরে আবার আমার এই সেবা যত্ন করা বড় সহজ কথা নয় মা। তাতে শুধু গতোর নয়, টাকাও লাগে।'

প্রীতির মা এবার বেশ রেগেই মেয়েকে ধমক লাগান। 'তুই থামতো পীতু। ও কি এমনি এমনি তোর সেবা করছে? বাপ-মা মরা মেয়ে, বড় ভাইয়ের ঘাড়ে পড়েছিল। এত বয়স অবধি বিয়েতো দিতে পারলনা মেয়েটার, এখানে এনেছি কি অমনি অমনি? তোর সেবা করবার জন্যে? মোটেই না। হাজার হোক কলকাতা সহর। পাঁচ জায়গায় জানা শোনা আছে। মেয়েটা দেখতেও মন্দ নয়। যা হোক দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দেবই। পরের মেয়ে তো নয়। নিজেরই খুড়তুতো দেওরের মেয়ে। তাতে যদি আমার হাজার দু হাজার টাকা খরচই হয়, হোক গে। কী বল সহদেব?'

'তাতো বটেই।' সহদেব ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ভাবী শাশুড়ী ও সম্পর্কে মামিমার কথায়।

প্রীতি কথা বলেনা। মুচকে হাসে। অতি কৃপণ অতি হিসেবী মাকে প্রীতি ভাল করেই চেনে। একটি পয়সা মায়ের বুকের একবিন্দু রক্তের মত।

ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাদ দিয়েও বাড়িখানার দাম বড় কম নয়। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে প্রীতিই সমস্ত কিছুর ভাবী উত্তরাধিকারিণী। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

তবু প্রীতির এখনো বিয়ে হয়নি। হঠাৎ কি একটা কঠিন রোগ থেকে ওঠবার পরই ওর ডান পা-টা একেবারে অশক্ত দুর্বল হয়ে গেছে। প্রায় দেড় বছর ধরে বিছানায় শোওয়া-বসা। উন্নতি হয়েছে বটে, তবে অতি ধীরে ধীরে। ললিতাকে আনার মুখ্য উদ্দেশ্য মেয়ের সেবা-যত্ন ও মালিশ, তাতে আর কোন ভুলই নেই। আনবার সময় অবশ্য বলেছিলেন, বিয়ে দিতেই নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেজন্যে বিন্দুমাত্রও মাথা উনি ঘামাননি।

করকরে এক গাদা টাকা খরচ করে ললিতার বিয়ে দেবেন এত বড় বোকা উনি নন। আর বিয়ে দিতেই হবে, এমন কি কথা আছে? সংসারে সব মেয়েরই কি বিয়ে হয়? বেশতো খাচ্ছে পরছে। এ বাজারে তাই বা দেয় কে? তাতে আবার এত বড় সোমত্ত মেয়ে? ওকে আগলে আগলে রেখেছেন। মায়ের মত দেখাশোনা ভরণ-পোষণ করছেন। সেইটেই কি সবচেয়ে বড় কথা নয়?

হিসেবে ভুল করেননি ললিতার খুড়িমা। ওর দরুণ যে খরচটা হচ্ছে, সুদে আসলে তার চতুর্গুণ তিনি উসুল করে নিতে জানেন। নিচ্ছেনও।

হাত দিয়ে জল না গলুক, আর মনে যাই থাক, মুখ তাঁর বেশ মিষ্টি। কথা দিয়ে মানুষ বশ করতে তিনি ওস্তাদ।

"কী কাজের মেয়ে তুই ললিতা! সমস্ত দিন এত কাজ করতেও পারিস বাছা! গরম কাপড়-গুলো রোদে দেওয়া হয়ে গেল? ওমা, সাড়ি-গুলো তুই নিজেই ইস্ত্রী করলি বুঝি?"

"ওমা গো মুখপুড়ি ঝিটা আজ কামাই করল। ঐ এক গাদা বাসন তুই একাই মাজলি ললিতা? ধন্যি মেয়ে বটে!"

"ঠাকুরটার আবার জ্বর হল, কী হবে মা ললিতা? আমার তো এই শরীর। নড়তেই পারিনা, বুক ধড়ফড় করে। তুই একাই চালিয়ে নিতে পারবি বলছিস? আহা কী কাজেরই মেয়ে তুই মা! যে ঘরে যাবি, তাদের আর ভাবতে হবেনা। কোনদিকে চোখ চেয়ে দেখতেও হবেনা। এ মেয়ে একাই একশো। তাই তো এমন গুণের মেয়ে যার তার হাতে তুলে দিতে প্রাণ চায়না। রাজার ঘরে তোর বিয়ে দেব আমি ললিতা, তুই কিচ্ছু ভাবিসনি।"

ললিতা ভাবেও না। উত্তরও দেয় না। এই এক বছরে কাকিমাকে ও হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছে।

এ-বাড়িতে ঢোকার পর থেকে এমন কথা ও প্রায় প্রত্যেক দিনই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে অরেকজনাকে বলা কাকিমার মিষ্টি মিষ্টি কথা-গুলো মনে পড়ে যায়। হাসি সামলানো কঠিন হয়ে ওঠে তখনই।

এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কিছুই নেই। প্রীতির বাবাকে গ্রাম সুবাদে দাদা বলে ডাকতেন সহদেবের মা। সেই সম্পর্ক ধরে সহদেব এখনো মামিমা বলে ডাকে প্রীতির মাকে।

গরীব দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে কোনকালেই পাত্তা দেননি প্রীতির মা। সামাজিক পদমর্যাদা দূরে থাক, কলকাতায় একখানা বাড়িও যদি থাকত! দুর্গাপুরে মোটা মাইনের এঞ্জিনীয়ারের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করার মত উপযুক্ত চাকরিটাও সহদেবের নয়। কোনদিক দিয়েই সহদেবকে নিজের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেন না তিনি। কোন কালেও নয়।

স্বামী বেঁচে থাকতেই আসা যাওয়া ছিল। অন্তরঙ্গতা না থাকলেও মেলামেশা ছিল।

প্রীতির বাবা মারা যাবার পর একেবারেই সম্পর্ক তুলে দিয়েছিলেন প্রীতির মা।

বছর দেড়েক হল প্রীতির কঠিন অসুখ হবার পর আবার আগের মত আসা-যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য এবার প্রীতির মাই নিজে থেকে সহদেবকে নেমন্তন্ন করে এনেছেন। ওর মায়ের সঙ্গে যেচে ভাব করেও এসেছেন আবার।

কারণ একটা ছিল। ছোট-খাট নয়, বেশ জটিল। সহদেব ছেলে হিসেবে ভাল। অবস্থা-টাই মন্দ। চাকরিটাই কম মাইনের। তা ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষায় চেহারায় অপছন্দের নয়।

আর প্রীতির বিয়ের জন্যে যত উঁচু নজর ছিল, ওর একটা পায়ের অবস্থা শোচনীয় হবার পর থেকে, সে দৃষ্টিটাকে বেশ একটু নীচুতেই নামাতে হয়েছে। ভাল ভাল মস্ত বড় বড় সম্বন্ধ-গুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাই এখন সহদেবই আশা-ভরসা।

তুলে দেওয়া সম্বন্ধটা নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন মিষ্টি মুখে। অনবরত শোনাতে লাগলেন তাঁর মস্ত বড়লোক দাদার কথা। বিজয়-লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা যাঁর কথায় ওঠ-বোস করে। বহু টাকার শেয়ার কেনা আছে তাঁর ঐ ব্যাঙ্কেই। হাজার কুড়ি পঁচিশ টাকার মামলা মোটে। ঐ টাকাটা জমা দিয়ে তিনি সহদেবকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাজটা দাদাকে বলে করিয়ে দেবেন। আর সবই তো প্রীতি আর সহদেবের। দুদিন আগে আর পরে।

পা-টা সত্য-সত্যই সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। দুপুরবেলা সংসারের সব কাজ সেরে ললিতা প্রীতির ফর্সা পাখানা কোলের উপর টেনে নিয়ে মালিশের ওষুধ মাখাতে মাখাতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ভাগ্‌নেবাবুর সঙ্গে সত্যি সত্যি তোমার বিয়ে হবে নাকি পীতু?'

উত্তরে পীতু একটু হাসল। 'আঃ। এত কাজ কর সমস্ত দিন রাত, তবু তোমার হাত কী নরম, কী ঠান্ডা ললিতা দিদি। কিন্তু তুমি হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বলতো?'

'কাকিমা প্রায়ই বলেন কিনা একথা তাই। অথচ তোমাকে সুমন্ত্রবাবু, অরবিন্দবাবু ওদের সঙ্গেও—'

'ওদের সঙ্গেও হাসি গল্প করতে দেখ। এই তো? তুমি কলকাতায় নতুন এসেছো দিদি, ও তুমি বুঝবে না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কই মাছ জিয়ানো দেখেছ তো? একটা শেষ হয়ে গেলে পরের দিনের জন্যে আরেকটা জিইয়ে রাখে—'

কথাটা শেষ না করেই প্রীতি হেসে ললিতার গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে।

কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ললিতা হঠাৎ বোকার মত বলে বসে, 'যদি সহদেববাবুর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে জান, তবে ওদের সঙ্গে অমন করে মেশো কেন ভাই? চা খাওয়াও, নেমন্তন্ন কর, গাড়ি করে এখন তো আবার বেড়াতেও যাচ্ছ ডাক্তারবাবু বলার পর থেকে।'

'তুমি বড় ভালমানুষ ললিতা দিদি। ডাক্তারবাবু কি বলেছেন তুমি শুনেছ তো? আমার পা-টা উপস্থিত ভাল হয়ে গেলেও হয়ত ভবিষ্যতে আমাকে ভুগতে হবে। যন্ত্রণা হবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে। সুমন্ত্রবাবু, অরবিন্দবাবু, অনাদিবাবু ওরা মস্ত বড়লোক। মস্ত চাকরি করেন সবাই। প্রত্যেকের গাড়ি আছে। কলকাতায় দু'তিনখানা করে বাড়িও। যদি আমার পা একেবারে ভাল হয়ে যায়, তবে ওদের একজনকে বিয়ে করব। আর যদি একটু খুঁত থেকেই যায়, তবে ঐ ভাগনেবাবুই কপালে নাচছে। অরবিন্দবাবুদের মত হাই ফ্যামিলির হাই সোসাইটির মানুষেরা খোঁড়া মেয়ে বিয়ে করে না। করে সহদেববাবুর মত লোকেরা। তাও আবার টাকার লোভে। তাও জাননা?'

মালিশ করতে করতে কাঠ হয়ে যায় ললিতা। প্রীতির পায়ের উপর ওর হাতখানা অবশ হয়ে আসে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে প্রীতির মুখের দিকে।

আবার হাসে প্রীতি। 'ওকি মালিশ করতে করতে থামলে কেন দিদি? তোমার কি মতলব বল তো? খোঁড়া হয়ে থাকি, আর তোমার ঐ কেরাণী ভাগ্‌নেবাবুকে বিয়ে করি? এমন পোড়া-কপালের দশা হোক, তাই বুঝি চাও তুমি?'

অপ্রস্তুত ললিতা আবার হাত চালায়।

সহদেব দোতলায় ওঠবার আগে নীচের ঘরগুলোয় চোখ বুলোয়। ইচ্ছে করে, না এমনি—কে জানে। ললিতার মুখের সেই ঈষৎ বাঁকা নিঃশব্দ হাসিটা ওর রক্তের মধ্যে অশান্ত ঝড় তোলে। অথচ কোনমতেই ওকে একেবারে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেও পারেনা। সমস্ত প্রতিরোধ আর বিরুদ্ধ শক্তির ভিতর দিয়েই যেন ললিতা ওকে কাছে টানে।

ভাঁড়ার ঘরে একগাদা কুটনো ছড়িয়ে বঁটি নিয়ে বসা ললিতা ওকে দেখেই গম্ভীর হয়ে চোখ নামায়। একটা কথাও বলেনা।

সহদেবের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। স্থির দৃষ্টিতে ওর কর্মব্যস্ত শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। 'তোমার বড় অহঙ্কার ললিতা। মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করনা।'

তবু ললিতা মুখ তোলেনা। আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই জবাব দেয়, 'অহঙ্কার করার মত আমার কী আছে ভাগ্‌নেবাবু? আপনাদের আশ্রয়েই পড়ে আছি। পীতু ভাল হয়ে উঠেছে। এইবার ক'টা দিন পরেই তো চলে যাব—'

'চলে যাবে?' হিংস্র উল্লাস ঝরে পড়ে সহদেবের গলায়। 'কোথায়? শ্বশুর বাড়ি বুঝি? পাত্র ঠিক হয়ে গেছে? মামিমাই তা হলে ঠিক করলেন বিয়েটা শেষ পর্যন্ত?'

সেই হাড় জ্বালানো গা জ্বালানো মুখ টিপে মুচকি হাসিটা হাসে আবার ললিতা। গালে টোল ফেলে। ঝকঝকে দাঁতের আভাস দিয়ে।

'শ্বশুর বাড়ি যাবার কথা আমি বলিনি ভাগ্‌নেবাবু। শিমুলপুরে দাদার ওখানে যাবার কথাই বলছিলাম। আমি কোথায় যাই না যাই, থাকি না থাকি তা নিয়ে আর আপনি মাথা ঘামাবেন না। সোজা উপরে চলে যান। কাকিমা বলেছেন, আপনি এলেই যেন আমি আপনাকে পীতুর কাছে পাঠিয়ে দি। ওকি আবার দাঁড়িয়ে রইলেন যে? যান, চলে যান।'

সহদেব উপরে যাবার আগে ললিতাই বঁটি কাত্ করে চলে যায় ভাঁড়ার ঘর থেকে।

সহদেবের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই।

তিক্ত বিস্বাদে গলাটা কটু হয়ে ওঠে। নিষ্ফল ক্রোধে অপ্রত্যাশিত হতাশায় অগত্যা সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় সহদেব।

কিন্তু সংসারে অঘটনও ঘটে বইকি!

সোজা নীচে একবারও না থেমে, না এদিক ওদিক তাকিয়ে গট গট করে উপরে ওঠবার মুখেই ভয়ঙ্কর আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়াতে হল সহদেবকে। ললিতা এখানে আসার পর, এই এক বছরের উপর দেড় বছর হতে চলল, আজ প্রথম ওকে বোধ হয় ডাক দিল।

'দাঁড়ান ভাগ্‌নেবাবু। মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেন না দেখছি। একটু বসুন না ঐ মোড়াটা টেনে নিয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা বললে পৃথিবী অশুদ্ধ হবেনা।'

এতদিন সহদেবের সহস্র অনুরোধে যে মেয়ে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কাজের ভান করে দূরে সরে গেছে, দশটা কথার জবাবে একটা কথারও উত্তর দিয়েছে কিনা সন্দেহ, সেই আজ উৎকন্ঠ ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাক দিচ্ছে বসতে! গল্প করতে!

হাতের সব কাজ কি ফুরিয়ে গেছে ললিতার? না কি এ বাড়িতে আর ওকে প্রয়োজন নেই! নেই আর!

নিঃস্ব রিক্ত বাতিল আবর্জনার মত ওকে এবার সরে যেতে হবে বলে বুঝি ভয় পেয়েছে ললিতা এতদিনে? এতদিনে নিজের দামটা বুঝতে পেরেছে তাহলে? ও যে কত ঠুনকো, এ বাড়িতে ও যে কত মূল্যহীন, প্রীতি ভাল হয়ে ওঠার পর এ আত্মদর্শন হয়েছে তাহ'লে ওর।

এতদিনের অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে ললিতার।

কিন্তু সহদেব তো মূল্যহীন একটা ফাটা ভাঙ্গা কাঁচের পাত্র নয়। ওকে এত সস্তা ভাববার অধিকার কি করে পেল ওই পরাশ্রিতা নিঃসহায় মেয়েটা!

এতদিনকার অপমান, সঞ্চিত অবরুদ্ধ গ্লানির আগুন আজ তার প্রকাশের সুযোগ ছাড়ল না। তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিঃশব্দে

দাঁড়িয়েই সহদেব ললিতার চোখের উপর চোখ রাখল। 'আজ বুঝি আমার দুর্দশা দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে, না ললিতা? এতদিন পর আমার সঙ্গে তোমার দুটো কথা বলবার, গল্প করবার সময় হয়েছে। এ আমার মস্ত সৌভাগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে সময় হবেনা এখন।'

সেই বুকে জ্বালানো মন পোড়ানো গালে টোল ফেলা মধুর হাসিটা নিঃশেষে মুছে যায় ঠোঁটের উপর থেকে। নিরক্ত পান্ডুর হয়ে ওঠে মুখের রং। তবু আস্তে আস্তে অনুনয় করে বলে, 'একটা দিন, মাত্র একটা দিন না হয় আমার কথা রাখলেন! একটুক্ষণের জন্যে নীচে বসে তারপরই না হয় পীতুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন উপরে—'

সত্যি সত্যি যেন সহদেবকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ললিতা কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে আসে। সহদেবের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়।

ললিতার এই অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক ব্যবহারে, ঘন সান্নিধ্যে, ওর গলার ছল ছল আওয়াজে ওর ঘন-কালো গভীর দু'চোখের করুণ মিনতিতে এক মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে যায় সহদেব।

পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ করে কেমন এক অদ্ভুত সন্দেহ ভরা, ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকায় ললিতার মুখের দিকে। বিষাক্ত গলায় বলে, 'তোমার অনুরোধ রাখা সম্ভব হলনা ললিতা, দুঃখিত।'

তারপরই মুখ ফিরিয়ে চোখ ফিরিয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না চরম অবহেলায় ফেলে আসা উপেক্ষিতার দিকে।

ঘরে ঢোকবার জন্যে অনুমতি চাইবার জন্যে পরদার কোণটা ধরতে গিয়ে হাতটা অসাড় হয়ে গেল। তারপর সর্বশরীর।

একটা বিচিত্র রঙা প্রজাপতি যেন পাখনা মেলে নেচে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। তার কথা, খিল খিল হাসির সঙ্গে মিশে গেছে আর একটি পুরুষের গলা।

সহদেব ও গলা চেনে। মানুষটাকেও চেনে। প্রীতিদের বাড়ির দরজায় ওর লক করা ফিয়েট খানাকে দেখেই এসেছে ও। সহদেব আসবার আগে এ-বাড়িতে ওর মত অনেকেরই যাওয়া আসা ছিল, এ কথাও জানে সহদেব।

খোঁড়া মেয়ে বিয়ে করবে না বলেই ওই না একদিন মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল? পার্টিতে 'সোসাইটিতে' মিশতে গেলে শুধু টাকা নয়, রূপসী নিখুঁত বউয়ের প্রয়োজনটা আরো অনেক বেশী। সহদেবের চেয়ে ওদের সে জ্ঞানটা অনেক—অনেক বেশী ছিল না সেদিন?

আজ না হয় প্রীতি ভাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিনের সেই অপমান কি করে ওরা ভুলে গেল? লোভের মাকড়সা এমন করেই কি তার লালার সুতোয় জড়ায় মানুষকে?

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে প্রীতির মা-ই উদ্ধার করলেন সহদেবকে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। 'এই ঘরেই বোসো বাবা, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।'

সহদেবের মুখে ভাবান্তর দেখা দিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল প্রীতির মায়ের মুখের দিকে।

'অরবিন্দ আর দেরী করতে চায়না বাবা; আগে তো ওর সঙ্গেই পীতুর বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল, জান তো সবই। হীরের টুকরো ছেলে। কলকাতায় নিজেদের তিনখানা বাড়ি। দুটো গাড়ি। মস্ত ব্যবসা ওদের নিজেদের—' ভাবী জামাইয়ের ঐশ্বর্য বর্ণনায় মামিমার মুখ আলোকিত হয়ে উঠল।

'এ তো খুব ভাল কথা মামিমা, প্রীতির মত মেয়ের সঙ্গে অরবিন্দবাবুর মত ছেলেকেই ভাল মানাবে।'

'সেই কথাই তো তোমায় বলছি বাবা। ভালয় ভালয় কোনমতে বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি এখন। একটু বেশী চলাফেরা করলেই তো পীতুর পায়ে টান লাগে। ডাক্তারবাবু সাবধানে থাকতে বলেছেন। হয়ত পরে আবার টেনে টেনে হাঁটবে। তাই ভাবছি এ মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলব। একবার বিয়ে হলে কানা হোক চাই খোঁড়া হোক, নিজের বউকে কি আর ফেলতে পারবে? ওকি বাবা? এখুনি উঠে পড়লে? কাজ আছে বুঝি? তা পীতুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছ? নীচে তো ললিতা আছে। ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে চা খেয়ে তবে যেও বাবা। মেয়েটা খুব ভাল। কী কাজের! এমন মেয়ে হাজারে একটা মেলেনা, এ তোমায় বলে দিচ্ছি সহদেব।'

ঠাকুরকে রান্না ঘরে কি রান্না হবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল ললিতা। 'ঠাকুর মাংসে ঝাল দিওনা। অরবিন্দবাবু ঝাল খান না।'

ঠাকুর জবাব দিল। 'কোন্ বাবু কেমন ঝালমিষ্টি খায় আমি জানি দিদিমণি। আমিও নতুন নই। ওরাও নতুন নয়।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখাচোখি হল। ললিতা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল।

'ললিতা শোন।' সহদেবের অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ভীত ললিতা ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। সহদেব ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'এতদিন ধরে তুমি এখানে আছ। আর এতদিন ধরে আমি এখানে আসা যাওয়া করছি। কখনো নিজে থেকে কাছে বসে গল্প করা দূরে থাক, ডেকে দুটো কথাও বলনি। আজ হঠাৎ কেন ডেকেছিলে?'

ললিতা নিরুত্তর। মাথা নীচু করে গায়ের আঁচল টানাটানি করল শুধু।

'আগে মামিমার ভয়ে তুমি কথা কইতে না। কতদিন থেকে এ ভয়টা ঘুচেছে, বলবে?'

তবু চোখ নীচু করে পাষাণ প্রতিমার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ললিতা।

'কোন কথারই কি জবাব দেবে না? বল, আজ কেন তুমি আমাকে উপরে যেতে দিতে চাওনি?'

এবারও ললিতা জবাব দিল না।

'ললিতা, এ বাড়িতে বোধ হয় আমি আর আসব না। আর দেখাও হবে না তোমার সঙ্গে। তবু শুধু একটা কথা শুনে চলে যেতে চাই। আজ প্রথম তুমি নিজে থেকে আমাকে ডেকে বসতে, গল্প করতে বলেছিলে। যদি আমি এখন তাই করি, তোমার প্রবৃত্তি হবে আমার মত মেরুদণ্ডহীন একটা অমানুষের সঙ্গে কথা কইতে? সত্যি করে বল তো? লজ্জা হবে না? ঘেন্না হবে না?'

'না—না—না।' কান্নায় গলা ধরে এলো

ললিতার। 'ভাগ্নেবাবু, যেমন আমি কাউকে করি না পৃথিবীতে, মাত্র নিজের এই পোড়া কপালটাকে ছাড়া।'

চোখের উপর মুখের উপর ময়লা, হলুদ মাখা আঁচলটা চাপা দিয়ে সহদেবের সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল ললিতা।

* * * *

একটা ঋতুকে পিছনে রেখে এগিয়ে এসেছে আর একটা ঋতু। অনেকবার আকাশ রং বদল করেছে। অনেকবার পৃথিবী সেই রংয়ে নিজেকে নতুন করে সাজিয়েছে।

অন্যদিন এমন সময় মুখ তোলার অবকাশটুকুও থাকে না। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত ফাইল আর গন্ধদ্রব্যের মধ্যে ডুবে থাকে চোখ আর মন।

ন্যাশনাল কেমিক্যালের সেলস্ ম্যানেজার সহদেব রায়ের কাজে আজ আর মন বসছে না। হঠাৎ আসা একখানা চিঠি আজ সব কিছু কাজের নেশা ভুলিয়ে দিয়েছে। বার বার চিঠিখানা পড়েছে। বার বার খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়েছে উধাও আকাশের দিকে। আর সেখানকার বিচিত্র বর্ণসমারোহ ওর রক্তে রক্তে দোলা দিয়েছে। দূরান্ত থেকে ভেসে আসা রঙের উচ্ছ্বাস চার দেয়াল ঘেরা এই অফিস রুম থেকে ওকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে কে জানে?

ড্রয়ার বন্ধ হল। ফাইল বন্ধ হল। রাস্তায় নেমে এলো সহদেব।

'ললিতা!'

সেই বাড়ি। সেই ঘর। আর সেই ললিতা! কিন্তু কেমন যেন ক্লান্ত। নির্জীব। সেই সবুজ শ্যামলতা, সেই অকৃত্রিম প্রাণ চাঞ্চল্যের স্রোত কেমন একটা হতাশা আর অবসাদের আবরণে ঢাকা পড়েছে।

ললিতা যেন আজ ওকে দেখে চিনতে পারল না। ভীতত্রস্তভাবে তাকাল চারিদিকে। ফিস ফিস করে বলল, 'মামিমার চিঠি পেয়েছেন তাহলে? যান উপরে চলে যান।'

সহদেব নড়ল না। 'মোড়টা এগিয়ে দেবে ললিতা? তোমার সঙ্গে কটা কথা আছে। একটু বসব এখানে।'

'এখানে বসবেন! এটা কি বসবার মত জায়গা? খুড়িমা বলেছেন আপনি এলেই যেন উপরে পাঠিয়ে দি।' অস্বস্তিতে ভয়ে ললিতা যেন ছট্‌ফট্ করে উঠল। 'নোংরা, ময়লা, গরম, ধোঁয়া—'

'অথচ দিনের পর দিন তুমি এই নোংরা রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই কাটাচ্ছ—'

'সহদেবের গলার শব্দ না?' উপর থেকে মামিমার রাশভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'নীচে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? প্রীতি যে কখন থেকে তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। এসো বাবা, উপরে চলে এসো। আমার চিঠি পেয়েছিলে তো?'

মামিমার গলা শোনামাত্র চোখের পলকে কোথায় উধাও হয়ে গেল ললিতা। অগত্যা সহদেব উপরে উঠে এলো।

সেই ঘর। সেই সব কিছু। সেই আদর অভ্যর্থনা। সেই রঙিন প্রজাপতির মত একই ভাবে সেজে গুজে বসে আছে প্রীতি। মুখে মধুর হাসির অভ্যর্থনা ছড়িয়ে।

'ভাল আছো প্রীতি?'

'ভালই তো ছিল বাবা!' প্রীতি উত্তর দেবার আগে মামিমা উত্তর দিলেন। সেরে ওঠার পর কদিন চলাফেরা করার পর আবার হাঁটুটা ফুলে ব্যথা হয়। একটু খুঁত লেগেই রইল চিরদিনের জন্যে। তুমি তো আর খোঁজ খবর নাও না। হঠাৎ সেদিন তোমার মা এসেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম তোমার নাকি প্রমোশন হয়েছে। এখানকার অফিসের ম্যানেজার হয়েছ। শুনে কী আনন্দই না হল! হবেই তো, এ তো হবেই। তোমার মত হীরের টুকরো ছেলে জীবনে উন্নতি করবে, এ আর বেশী কথা কিসের?'

'অরবিন্দ বাবু তাহলে প্রীতিকে বিয়ে করবেন না? মা যেন এই কথাই বললেন?'

'ওর নাম মুখেও এনো না বাবা!' ক্ষোভে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন মামিমা। তোমার মা বলছিলেন, 'তোমার বিয়ে এ মাসেই দিতে চান। আমি তো এক পায়ে রাজী। আমার টাকা পয়সা, বাড়ি সব আমি তোমাদের দুজনের নামে লেখাপড়া করে দেবো। তুমি তাহলে দিন কতক ছুটি নাও। বিয়ের হাঙ্গামা তো আছে।'

'তাই নিতে হবে মামিমা। মারও তাই ইচ্ছে।'

'ফার্ণিচার, বাসনপত্র, নগদ টাকা, গয়নাগাটি, সব ফর্দ করে রেখেছি। প্রীতু দেখাস তো মা ওকে। আর যা যা চাও সব— ওকি, ললিতা, তুই এলি কেন? ঠাকুরকে দিয়ে চা পাঠালেই হোত।' মামিমার গলাটা বেশ কঠোর শোনাল।

'ঠাকুরকে তুমি মাংস আনতে বাজারে পাঠিয়েছ কাকিমা, রাত্রে ভাগ্নেবাবু খাবেন বলে। ও তো এখনো ফেরেনি।' ললিতা চা খাবারগুলো সহদেবের সামনে গুছিয়ে রাখল। ওর মুখে সেই বুক জ্বালানো মন পোড়ানো গালে টোল ফেলা হাসির আভাস ফুটে উঠল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে সহদেবের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। কৌতুকের। বিচিত্র পুলকের।

খুড়িমার কথার জবাব দিল, 'টাকা পয়সা গয়নাগাটি ওসব কিছুই আমার চাই না মামিমা। আমি গরীব মানুষ। ললিতার দাদার কাছে মা যে চিঠি শিমুলপুরে লিখেছেন, তাতে শুধু ও'র বোনটিকেই তিনি আমার জন্যে চেয়েছেন। সেদিন হঠাৎ এসে ওকে দেখে মায়ের ভারী পছন্দ হয়েছে।'

'পছন্দ হয়েছে! তোমার মায়ের? ললিতাকে! তোমার জন্যে!' খুড়িমার গলার স্বরটা অদ্ভুত শোনাল। অবিশ্বাস্য রকম অদ্ভুত।

"হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর রকম পছন্দ হয়েছে। আর—' চোখ তুলে ললিতার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা উপভোগ করতে করতে মুখ নীচু করে, মাথা চুলকে লজ্জিতভাবে সহদেব আবার বলল, "আর আমারও।"

হাতি-মার্কা প্রেম

(৬৬ পৃষ্ঠার পর)

ভবেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল। এ কি বলে: শ্বশুর-ঘরে ফিরিয়া যাইবে না! আমার কথাগুলো যে খালি কথা, আর কিছু নয়, তা এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটা বোঝে নাই। সহুরে মেয়ে হ'লে কি এমন হ'ত! তাহারা অনেকদিন আগেই শিখিয়া ফেলিয়াছে, কেমন করিয়া এক সঙ্গে টামাকও খাইতে হয়, ডুবুও খাইতে হয়। ভবেন্দ্রের কল্পনা শুধু ইহাই। সে ভাবিতে লাগিল—ইহাকে লইয়া কোথায় যাওয়া যায়। বাড়ীতে গেলে ভামিনীর উদ্যত সম্মার্জনীর প্রতিরোধ তাহার ন্যায় উদ্ভট কাল্পনিকের পক্ষে অসম্ভব। কোন হোটেলে গিয়া দু' এক বেলা হয়তো থাকা যায়, কিন্তু তারপর স্ত্রীচুরির ধাক্কা সামলাইবে কে? তাহার সারাজীবনের আয় একত্রিত হইলেও ওই চারতলা-বাড়ীর মালিক স্বামীর সঙ্গে মামলায় একদিনও টিকিতে পারিবে না। একমাত্র উপায়—যাহা ভবেন্দ্র কল্পনায় আনিতে পারিল, তাহা এই যে এই ঘুমন্ত পদ্মফুলটিকে অতি আস্তে হাঁটুর উপর হইতে মাটিতে রাখিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চম্পট।

ঠিক এমনি সময়ে উহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল একটি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক—চাঁপা-ফুলের মত গায়ের বর্ণ, পরনে জরিপাড় ধুতী, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, আঙুলে তিনটি আংটি, পায়ে সাদা নিউকাট পাম্প-সু।

স্ত্রীকে এইভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়ে ভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চিন্তিত সুরে ভবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ও'র?

ভবেন্দ্র তখনও ঠিক আত্মস্থ হইতে পারে নাই। বলিল, কিছু হয়নি উনি ঘুমুচ্ছেন! অনেক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, ও'র সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায়? আপনি কে?

ভবেন্দ্র অমতা আমতা করিয়া বলিল, মানে তাঁরা অন্যদিকে বেড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমি একটু ও'র সঙ্গে—

ভূষণ বলিয়া ফেলিল, আপনি ভয়ানক লোক দেখছি।

না, না, না। আমি চলে যাচ্ছি। আপনিই বসুন এখানে।

'বসছি। তার আগে একটু কাজ আছে।' এই কথা বলিয়াই ভূষণ ভবেন্দ্রের দুই কান বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া উপরের দিকে টান দিতেই ভবেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে ছেড়ে দিন।

আজকের মত ছেড়েই দিচ্ছি। এই বলিয়া ভবেন্দ্রের কান দুটি শক্ত করিয়া ধরিয়াই গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেটের কাছে গিয়া ভূষণ বলিল, এই কানদুটো নিজের হাতে ধরে ঠিক এমনি করে আস্তে আস্তে গেটের বাইরে চলে যাও। টুঁ-শব্দ করলে কানদুটো ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবো কিন্তু।

ভূষণ ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে আসিতেই দেখিল, ভবানী, ভগবতী, কাকাবাবু, ভবেশ সবাই আসিয়া ভারতীকে ঘিরিয়া বসিয়াছে এবং তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, ভবেন্দ্রবাবু কোথায় গেলেন? তুমি কখন এলে?

ভূষণ বিরক্ত হইয়া বলিল, ভারি অন্যায় করেছ, না? তোমরা চারজনে মিলে একটা পুঁচকে মেয়েকে সামলাতে পারোনি।

কাকাবাবু বলিলেন, ওই হাতীরই কারসাজি। তখনই ভেবেছিলাম, একটা অনর্থ না হয়।

ছাগলে গরুতে মুড়োবে ভয়েই
বেড়া দিতে হয় কচি চারা গাছটাকে।
শক্ত কঠিন গুঁড়ি হলে পরে—
নাড়ানো যায় না হাতী যদি বাঁধা থাকে।

প্রচলিত প্রবন্ধ
অনুবাদ—মায়া বসু।
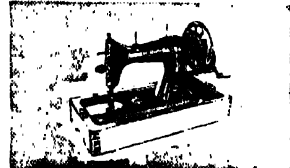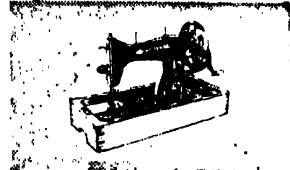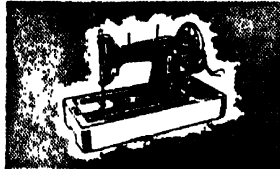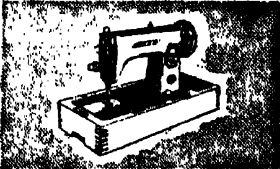
একমুঠো জ্যোৎস্না মাঠে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আহা, দ্যাখো একমুঠো জ্যোৎস্না মাঠে,
বৃক্ষের পল্লবে।

স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে।
মনে হলো বৃক্ষ মাঠ সংলগ্ন ঝর্ণার বুক থেকে
জাগবে হঠাৎ কেউ; কেউ পুরোভাগে
এখনো সজ্জিত কোনো কুন্দশুভ্র নায়িকার মতো
আলতা-পরা শান্ত পায়ে হেঁটে চলে যায়
আশ্বাসের সজীবতা, আঘ্রাণ ছড়িয়ে।

আহা দ্যাখো জ্যোৎস্না মাঠে, বৃক্ষের পল্লবে।

অন্ধকার অতৃপ্তির কুয়াশাকে দ্রবীভূত ক'রে
গাছপালা শরীরিণী; হিতাকাঙ্ক্ষী রাতে
স্তন্যের দুধের মতো টুপটাপ বৃক্ষপত্র ঝরে।
আর্দ্র মমতায় যেন বৃক্ষের শরীর
ঝর্ণার উদ্দাম বেগ প্রাণে নিতে চায়
এবং সমস্ত মাঠ, শান্ত বনস্থলী
বেজে ওঠে স্পর্শ ধন্যতায়।

কে আসবে তাহলে এই প্রতীক্ষার রাতে
নির্মল বিশ্বাসে আর্দ্র প্রণয়ীর মতো
বনস্থলী অন্ধকার পার হয়ে, রাতের সভাতে!
লোহিত হলুদ চাঁদ বারান্দার কোণে
খোলা জানালার ফাঁকে
নিপুণ নটীর মতো নিজেকে সাজায়
এবং ঝর্ণার জলে নিজ মুখ দেখে
বাসর স্বপ্নের জাল বোনে।

আহা দেখ জ্যোৎস্না মাঠে, বৃক্ষের পল্লবে॥

শেষ পরিণতি

শিবদাস চক্রবর্তী

মনে পড়ে মনীষাকে, অরুণার বান্ধবী মনীষা—
স্বভাব-চঞ্চলা মেয়ে, তারুণ্যের বিগ্রহ সদৃশা।
অঙ্গে তার অনঙ্গের আরতির দৃপ্ত অঙ্গীকার,
সে যেন—আনন্দঘন কামনার কায়িক বিস্তার।
কবির জীবনকাব্যে অরুণাই তখন নায়িকা
মনীষা সঙ্গিনী তার,—মূলের যেমন পাদটীকা।
কাহিনী এগিয়ে চলে নিয়ে নিত্য ঘাত প্রতিঘাত,
মনীষা সংকটক্ষণে করে যায় আলোক-সম্পাত।
নবীন কবির মুগ্ধ অগভীর সলাজ কল্পনা
সে-আলোকে ফিরে পায় আবার নতুন উদ্দীপনা।
বহুদিন হয়ে গেল—সব কথা হয়না স্মরণ,
তারপর একদিন—মনে পড়ে, অরুণা কখন
অসতর্ক কল্পনায় অতর্কিতে গেল দূরে সরে;
মনীষা সেখানে এল নব-নায়িকার মূর্তি ধরে।
মনীষা অরুণা নয়—দুমেরুর বাসিন্দা দুজনে;
কবির লেখনী তাই মনীষার চরিত্র চিত্রণে
নতুন উদ্যম নিয়ে ধীরে ধীরে হলো অগ্রসর.
কে জানে কী অহংকারে মনীষা দিল না অবসর।
কবির কল্পনা নিয়ে খেলা করে কিছুদিন ধরে,
বিদ্যুতের বেগে এসে ঝঞ্ঝার আবেগে গেল সরে।
টানা হলো মাঝপথে সে-কাব্যের শেষ পরিণতি,
অসমাপ্ত রয়ে গেল অনঙ্গের অরুদ্ধ আরতি।

ভিন্নধর্মী

গোপাল ভৌমিক

দর্পণে নিজের মুখ
দেখে কার ঘৃণা হয় বল!
পরোপকারের স্পৃহা
হতে পারে সত্য কিংবা ছলও;
সহজ বুদ্ধিতে বুঝি
আছি বলে রয়েছে পৃথিবী
আর যা তা ইতিহাস
পৌরাণিক কাহিনীর শিবি।

যে বলে চায় না কিছু
হয়তো সে প্রয়াস বিহীন
সময় যাপন করে
বাড়ায় এ জীবনের ঋণ।
আমি ভিন্ন ধর্মী বলে
নিজেকেই নিয়ে নাড়ি-চাড়ি,
অপরের অভিধায়
যাই হই, বোকা বা আনাড়ি।

নিজের গভীরে গিয়ে
দেখি নেই প্রত্যয়ের স্পৃহা,
পল্লবচারিতা করে
বড় হব, তাতেও অনীহা।
অতএব ফাঁকা মাঠে
হাতে নিয়ে বাঁকা তলোয়ার
চলি ডন্ কুইক্সট—
প্রতিরোধী হবেই সাবাড়।

নক্সা তোলা কাঁথা

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যদি বা এসেছিলে, দেখালে কই,
স্মৃতির সেলাই-এ কাঁথাখানি।
ভুলে কি এসেছ ফেলে
কিংবা ইচ্ছে করে আনোনি॥

রঙীন সুতোয় তোলা
রঙীন নক্সারা ঃ
যারা তা দেখেছিল বলেছে—
'একালে ইদানীং
অমন খুঁতহীন
দেখিনি নক্সার কাজ'।
আমি তো সেই ভেবে
ছিলাম গর্বিত
কাটলো এতদিন তাই।
এখন বল তুমি
হারালে সেই কাঁথা
কিংবা আনতে সেটা ভুলেছ?

কারণ দেখছি চেয়ে
তুমি তো তুমি নেই
কোথায় গেল সেই চোখ।
এ যেন ছবি নয়
ছবিরই নেগেটিভ,
এ চোখে বিদ্যুৎ কই।

বৃদ্ধ ধীবর বলেছিল

কৃষ্ণ ধর

বয়স ঘাটের পারে বৃদ্ধ ধীবর বলেছিল ঃ
এ সমুদ্র আমার প্রতিমা
তার নীল চালচিত্রে ঝড়-বাদলের ছবি
সান্ত্বনার মন্ত্রগুলি ঢেউয়ের কংকণে বাঁধা আছে।
তারা কোনদিন আমাকে ভোলে না
আমার নৌকোয় খেলা করে, ঢেউ,
ঢেউ আরও কতো অজস্র ফেনার কথাপুঞ্জ
কানে কানে ভালোবাসার আকুতি জানায়।

এ সমুদ্র আমার প্রতিমা
কখনো নতুন বউয়ের মতো মুখ ঢাকে
জাল ফেলে তাকে কাছে টানি,
সোহাগে সে রোমাঞ্চিত হয়
নৌকোর গলুইয়ে ঢেউ ভাঙে, ঢেউ
ঢেউ আরও কতো অজস্র ফেনার কথাপুঞ্জ
কানে কানে মিনতি জানায়
এ সমুদ্র আমার প্রতিমা।

পাকাচুল, ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ ধীবর বলেছিল ঃ
আমরা সব সমুদ্র হয়েছি
বাহুতে ঢেউয়ের বল, বুকের পেশীতে
ফেনার চুম্বন যৌবনের স্মৃতি নিয়ে বাঁচে
জীবনের দিনগুলি, যৌবনের রক্তাক্ত আবেগ,
সমুদ্রেই উপহৃত,
আমরা সব সমুদ্র হয়ে গেছি।

বৃদ্ধ ধীবর বলেছিল ঃ
মেঘগুলো প্রতিমার চুল, আকাশে
ছড়ানো যত তারা
আমাদের ভালবাসার কথা জানে
রৌদ্রে, ঝড়ে, ছড়ানো উপলে
দিনগুলি এখনো রয়েছে
এ সমুদ্র আমার প্রতিমা।

অজন্তা

শতদল গোস্বামী

অন্ধগুহা জেগে ওঠে, কার স্পর্শে এতদিন পর
শতাব্দীর ঘুম ভাঙে, খুলে যায় রহস্যের দ্বার ঃ
লোকালয় হতে দূরে কি নির্জন উদাস প্রান্তর
স্মৃতির প্রদীপ জেবলে ধ্যান করে অজন্তা পাহাড়।

কত যুগ পার হল, এড়ায়েছ কালের ভ্রূকুটি
সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা তব নাম ঃ
সরীসৃপ রুক্ষপথ, সিঁড়ি ভেঙে ধাপে ধাপে উঠি
তোমার পবিত্র তীর্থে হে অজন্তা, জানাতে প্রণাম।

এখানে নিপুণ শিল্পী রেখে গেছে সাধনার ধন
অমর স্বাক্ষর তার চালচিত্রে দেয়ালেতে আঁকা ঃ
ছন্দোবদ্ধ ছবি শুধু, ছবি নয়, প্রাণের স্পন্দন
রঙে রসে ভরপুর কি জীবন্ত, অনুরাগ-মাখা!

শিল্পীরে রাখি না মনে, নাম তার ভুলে গেছি কবে
কীর্তিরে ভুলিনি মোরা,
তাই হেথা আসি বার বার ঃ
স্মৃতি রোমাঞ্চিত তীর্থে,—
ডুবে যাই স্মৃতির সৌরভে
রহস্যের জাল বোনে
আধো-আলো আধো-অন্ধকার।
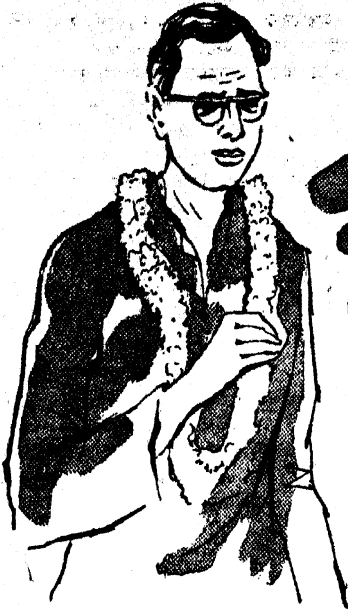
অপরেশচন্দ্রকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন যে, ভদ্রলোকটি বড় রাশভারি। যাঁরা তাঁকে ভালো করে চেনেন না, তাঁদের কাছেও অপরেশবাবুর পরিচয় রাশভারি লোক বলেই।

খ্যাতিমান পুরুষ অপরেশচন্দ্র। তাঁর খ্যাতি যত, খাতিরও সেই অনুপাতে। তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে; তাঁর জন্যে গর্বও বোধ করে অনেকে। গর্ব এই জন্যে যে, একালে অমন একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান পুরুষ পাওয়া কষ্ট, কিন্তু তারা পেয়েছে তেমনি একটি মানুষ। তাঁকে নিয়ে গর্ব অনেকের আছে, সেই সঙ্গে তাঁকে নিয়ে আক্ষেপও আছে। আক্ষেপ এই জন্যে যে, তাঁকে কেউ পায় না, তাঁকে পাওয়া বড় শক্ত।

কোথাও যেতে চান না অপরেশচন্দ্র, কোথাও না, কখনও না। কোথাও যাওয়ার চেয়ে এই তো বেশ, এই তো বেশ আনন্দের—নিজের ঘরের মধ্যে নিজেকে নিয়ে বিভোর থাকা।

বিভোর হয়ে থাকেন অপরেশবাবু নিজেকে নিয়ে। যেতে চান না কোথাও, কতজন এসে কত অনুনয় করেছে, কিছুতে রাজি করাতে পারেনি তাঁকে। তাঁর এক কথা, "আমি তো কোথাও যাই নে, ভাই।"

কিন্তু সেই অপরেশচন্দ্রকে এবার যেতে হল। যেতে হল মেদিনীপুরে। কাজ বিশেষ কিছু না, কাজ হচ্ছে সাহিত্য সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন থেকে আমরা কতটা প্রেরণা পেতে পারি সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করা।

তাঁর মত মানুষকে পেয়ে সকলে ধন্য। এমন সদাচারী মিষ্টভাষী একজন পুরুষকে এবার মেদিনীপুরে আনা যাচ্ছে, এ একটা মস্ত কথা।

রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে কথাটা সারা শহরে। ছাত্র

খানায় এবং ডাক্তারবাবুদের ডিসপেন্সারিতেও এ ব্যাপার নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে।

অপরেশচন্দ্রকে মনে মনে সকলেই মহাপুরুষ বলে জানে, কিন্তু মুখে সে কথা উচ্চারণ করতে পারছে না কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্যে।

যোগীন সামন্তর ডাক্তারখানায় তাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।

পতিতপাবন জানা বাল্যকালে কবিতা লিখতেন, এখন কাঁথিতে লবণের কারখানা খুলে বেশ দু'পয়সা করেছেন। কবিতা-লেখা ছেড়েছেন, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে এখনো কবিত্ব আছে; তিনি বললেন, "অপরেশচন্দ্রের রচনা আপনারা পাঠ করেছেন? চিন্তার গভীরতা যেমন আছে, ভাষার মাধুর্যও তেমনি। আমি তো মুগ্ধ। মহাপুরুষই ও'কে বলতাম, কিন্তু এই মাটিতে বসে ও কথা বলতে বাধছে। কিন্তু সত্যিই উনি মহাপুরুষ।"

"কি দোষ করল হে, এ মাটি?" জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীধর ডাক্তার।

"দোষ না। গুণ। এটা বিদ্যাসাগরের দেশ। তিনি একজন মহাপুরুষ।"

একটু থেমে পতিতপাবন বললেন, "নুন যার খেয়েছি, গুণ তার গাইবই। অপরেশচন্দ্রের রচনা পাঠ করেছি আমি। ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছ। নুনের ব্যবসা করি, সমুদ্রের গুণও গাই। সমুদ্রই আমাকে নুন দেয়। বিদ্যার সাগর যিনি তাঁকেও নমস্কার করি ভাই। অপরেশ-চন্দ্রকেও নমস্কার করি, ইনিও জ্ঞানের সাগর।"

পতিতপাবনের কথার প্রতিবাদ কেউ করে না, প্রতিবাদ করার কিছু নেই। সকলেরই বিশ্বাস ঠিক ওই রকমেরই।

কিন্তু কেবল তাঁর রচনা কেন? তাঁর জীবনটা একবার পরখ করে দেখলে হয় না? অমন চরিত্রবান পুরুষ ক'টা মেলে? আজ দশ বছর হল পত্নী বিয়োগ হয়েছে তাঁর, কিন্তু—

পতিতপাবন চুপ করে বসলেন।

তিনি নিজেও হয়তো জানেন না যে, তাঁর দেশের লোক—এই বাংলা দেশের লোক—তাঁকে এতটা উচ্চ আসন দিয়েছে। তিনি নিজেকে নিয়ে নিজে বিভোর হয়ে আছেন; তাঁকে নিয়েও যে সকলে বিভোর, এ খবর হয়তো তাঁর জানা নেই।

বছর-পঞ্চাশ বয়স হয়েছে তাঁর। তাঁর জীবনে অর্ধ শতাব্দী পার হয়েছে। এই বয়সে এ[illegible] সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া এ যুগের এ[illegible] আশ্চর্য ঘটনাই।

শ্রীধর ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে যে ধরণের আলোচনা চলেছে, প্রায় সেই রকমের আলোচনা চলেছে অন্যত্রও। তার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে এ কাহিনী খুবই লম্বা হয়ে যাবে।

বিদ্যাসাগরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তারা এখানে মাত্র দুটি গানের ব্যবস্থা করেছেন। একটি আবাহন সঙ্গীত, একটি সমাপ্তি সঙ্গীত। মেয়েদের গানের ইস্কুল সুরবীথি। তাঁদের উপর এই গানের ভার দেওয়া হয়েছে।

"আরাধনাদি, রিয়ার্সেল ঠিকমত চলেছে তো? আপনি লীড করছেন তো?"

আরাধনা বসু হচ্ছেন সুরবীথির কর্ত্রী। তিনিই এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিধবা মহিলা। গানের গলা যেমন মিষ্টি, চরিত্রটাও তেমনি মিষ্টি। সকলেই খুব মান্য করে তাঁকে। স্বভাবও যেমন সাদা, গায়ের রংও তেমনি। স্বাস্থ্যটিও বেশ সুন্দর। কিন্তু এত ভালো সহ্য হল না বুঝি ভগবানের, তাই তাঁকে মেরে রেখেছেন। কয়েক বছর হল বিধবা হয়েছেন তিনি। ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে। নিজের জীবিকা চালাচ্ছেন এই গানের ইস্কুলটি দিয়েই।

একটু বুঝি ম্লান হাসি হাসলেন আরাধনা, বললেন, "আমি ভাই নেপথ্যে বকুলকে দিয়ে লীড করিয়ে দেব।"

উদ্যোক্তারা খুব ঝুলোঝুলি করল, কিন্তু

তো গলা। মহাপুরুষের মত অমন একটা মানুষের সামনে এ গলা—”

সকলে যেন হায়-হায় করে উঠল। বলেন কি আরাধনাদি। তাঁর মত গলা এই হোল মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে আছে? নিজের গলা নিজে বুঝি শুনতে পান না উনি?

“নিজের গলা নিজে শুনতে পাই বলেই তো বলছি। এ ডিস্ট্রিক্টে এমন গলা আর না থাক, কিন্তু যিনি আসছেন তাঁর যে সারা ভারতবর্ষ দেখা।” আরাধনাদি বললেন।

এতই যদি তাঁর আপত্তি, তবে থাক। বক্তৃতাই তবে লীড করুক। আর এটা তো গানের আসর নয়, এটা তো একটা বক্তৃতার বৈঠক। নিয়ম রক্ষার জন্যে দুটি গান দেওয়া, এই তো? তবে, তাই হোক। আরাধনাদি যা বলছেন।

শহর সরগরম। অপরেশচন্দ্র এসে পেশীছেছেন। সরকারী উকিল হেরম্ব মাইতির গৃহে তিনি অতিথি। আজ সন্ধ্যার সময় অনুষ্ঠান। চারদিকে কর্মব্যস্ততা।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরটি সাজানো হয়েছে আলো দিয়ে ও ফুল দিয়ে। মাননীয় অতিথির মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই।

যথাসময়ে সভায় এসে উপস্থিত হলেন অপরেশচন্দ্র। সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। তিনি করজোড়ে সকলকে নমস্কার করলেন।

কি প্রশান্ত চেহারা, কি বিনীত আচরণ, কি প্রসন্ন দৃষ্টি! সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল তাঁকে। সত্যি, মহাপুরুষ হবার মত যাবতীয় গুণই এঁর আছে।

আবাহন-সঙ্গীত আরম্ভ হল। মাথা নীচু করে বসে তিনি শুনলেন গান।

একটি ছোট মেয়ে এসে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। মালাটি গলা থেকে নামিয়ে তিনি টেবিলের উপরে রাখলেন।

তার পর তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ভাষণ। কথা বলছেন, আর তাঁর দৃষ্টি হল-ঘরটির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন প্রতিটি শ্রোতাকে একে-একে সম্বোধন করে তিনি তাঁর বক্তব্য বলে চলেছেন। তাঁর বলার এই ভঙ্গি দেখে সকলেই খুশি হয়ে উঠছে। তিনি চরিত্রবল সম্বন্ধে বলছেন, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের কথা বলছেন। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করছেন।

কিছু খুঁজছেন নাকি অপরেশচন্দ্র? বোধ হয় আত্ম-অন্বেষণ করে চলেছেন তিনি। আত্ম-জিজ্ঞাসাই যে জীবনের চরম জিজ্ঞাসা—এ কথাও উল্লেখ করেছেন। বলছেন, “আমাদের জীবন হচ্ছে একটি পরম বস্তু। এ হচ্ছে আরাধনার জিনিস। এ হচ্ছে সাধনার জিনিস। সেই সাধনার ও সেই আরাধনার সংসারে আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র জীব মাত্র।”

এ কথা শুনে সকলে মৃদু হাততালি দিল এবং হল-ঘরের এক কোণে একটু চঞ্চলতা যেন দেখা গেল।

কিন্তু অপরেশচন্দ্রের কথা থামল না। তিনি বলতে লাগলেন, “আমি কোথাও যাই নে। কিন্তু এখানে আসার ডাক যখন শুনলাম তখন আমার মনে পড়ে গেল আমার কিশোর কালের কথা।”

একটু থেমে বললেন, “জীবনের সেইটেই শ্রেষ্ঠ কাল। সে কাল চলে গেছে, পড়ে আছে তার স্মৃতি। যাদের সঙ্গে তখন অন্তরঙ্গতা ছিল তারা আজ কে কোথায়? হয়তো তাদের কেউ কেউ ভাবে তাদের ভুলে গিয়েছি। হয়তো ভুলেছি অনেক কথা, কিন্তু তাদের কথা ভুলিনি। এ কথা আজ এখানে বলতে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। জানি আমাদের সেই অতীত জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ যার ছিল, সে এখানেই আছে। আমি এখানে এসেছি তারই টানে। নইলে বুঝি আসতাম না। ভুলে যাওয়া বড় কঠিন। ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারব না। অনেকে ভাবে আমরা উদাসীন, আমরা কিছু লক্ষ্য করিনে, কিছু মনে রাখিনে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। যাকে হারিয়েছি তাকে ফিরে পাওয়া কঠিন জানি। কিন্তু কঠিন কাজ কি সংসারে হয় না? হয়। ফিরে যদি পাই তাহলে সাগ্রহে তাকে বুকে তুলে নেব।”

সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কথা, একটা চাপা গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছে সারা ঘরময়।

অপরেশচন্দ্র তা লক্ষ্য করলেন, একটু থামলেন, একটু তাকালেন চারদিকে। দৃষ্টিটা একটা জায়গায় একটু আটক হল কিছুক্ষণের জন্যে। স্তব্ধ হয়ে রইলেন অপরেশচন্দ্র।

দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে অপরেশচন্দ্র বললেন, “কিসের কথা বলছি, আশা করি আপনারা তা বুঝতে পেরেছেন। বলছি, কিশোর কালের কথা। সেই কালের সঙ্গে যাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই কিশোরকালে তাঁর জীবনী আমরা প্রথম পড়ি। কাঁচ মনে যে দাগ পড়ে তা মোছে না। তিনি আমাদের জীবনের সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছেন। তাঁর তিরোধান-দিবসে আমরা সমাগত। তাঁর উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করি। তাঁর আকর্ষণে এখানে এসেছি। আবার তাঁকে নমস্কার করি।”

ভাষণ শুনে সকলেই পরিতৃপ্ত হল। এমন বক্তৃতা অনেকদিন শোনা হয়নি। সত্যি, মহাপুরুষ বলতে হবে লোকটাকে। সৌখীন বক্তৃতাই নয় এ, এ যেন মর্মমূল থেকে প্রতিধ্বনির মত বেরিয়ে আসা বাণী।

এমন লোককে নিয়ে আসা সত্যিই সার্থক হয়েছে। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশেও সকলে সমান প্রশংসার কথা বলছে।

সমাপ্তি সঙ্গীতের জন্যে মেয়েরা এসে গোল হয়ে বসল। এমন তো কথা ছিল না—উদ্যোক্তারা দেখল, আরাধনাদি এসে ওদেরই মধ্যে বসে যোগ দিলেন গানে। চোখ বন্ধ করে বসে তিনি গেয়ে চলেছেন একমনে। কি চমৎকার দেখাচ্ছে এখান থেকে! বকের পালকের মত সাদা ধবধবে থান-কাপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে তিনি বসেছেন। বড় সুন্দর লাগছে।

সর্বাঙ্গসুন্দর হল এই অনুষ্ঠান। যেমন সুন্দর বক্তৃতা, তেমনি সুন্দর গান। আর আরাধনাদিও শেষ পর্যন্ত এসে যোগ দিলেন, এতে সকলের মন বিশেষ ভাবে পুলকিত হয়েছে।

হেরম্ব মাইতির গৃহে চলে গেলেন অপরেশচন্দ্র। হল-ঘরটা যেন অন্ধকার হয়ে এল। সত্যিই অন্ধকার হল। একে একে নিভে গেল ইলেক্‌ট্রিকের বাতি।

পরদিন অপরেশচন্দ্র ফিরে গিয়েছেন নিজের আস্তানায়। আবার তিনি বিভোর হয়েছেন বুঝি নিজেকে নিয়ে।

মাসখানেক কেটেছে। সুরবীথি তুলে দিয়ে আরাধনাদি গতকাল কোথায় যে চলে গিয়েছেন, কেউ জানে না। তাঁর ইস্কুলের নোটিশ বোর্ডে একটা কাগজ সাঁটা; তাতে লেখা আছে—

ইস্কুল চালাতে পারলাম না।

তাই এটা বন্ধ করে দিয়ে চললাম।

সকলে দলবেঁধে পড়তে লাগল ঐ নোটিশ। হঠাৎ তাঁর কি হল, কেউ ধরতে পারল না।

—

'হ্যানিমুন কট্!' কুটির নয়। ছোট্ট একটা সাদা রঙের ঘর, কাঁচ ও কাঠ দিয়ে তৈরী করে কোন শিল্পী যেন দার্জিলিং-এর ওই সুন্দর পাহাড়টার গায়ে এঁকে রেখেছে। নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। ফুল, লতা, পাতা ঘরটার গায়ে, মাথায়, সর্বাঙ্গে। কাচের জানলায় যে রেশমী পর্দা তার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে যতটুকু চোখে পড়ে, তার চেয়ে যতটুকু দেখা না যায়, বুঝি আরো বেশী মনকে আকৃষ্ট করে। মনে হয় যেন রূপকথার রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে সেই কক্ষে। তবে অনেক দেউড়ী পেরিয়ে অসংখ্য নিদ্রিত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সঙ্গোপনে যেমন সেখানে ঢুকতে হয়, এখানে তার দরকার হয় না। কিছু বেশী ট্যাক্স দিলে অর্থাৎ যে ফিরিঙ্গী হোটেলের সংলগ্ন হয়েও ওই ঘরটাকে বিচ্ছিন্ন ও একাকিনী বিরহিণীর মত এক পাশে নির্জন বাগানের মধ্যে অপেক্ষমাণা বলে মনে হয়, সেই হোটেলের পুরো দুটো 'সিটের চার্জ'-এর ওপরে অতিরিক্ত আরো কিছু জরিমানা দিলেই প্রবেশাধিকার মেলে অনায়াসে সেই বিলাস কক্ষে! যদিও পৃথিবীতে এমন বিলাসী লোকের সংখ্যা কম নয়। তথাপি অধিকাংশ দিনই চাবি বন্ধ থাকে ওর দোরে। কারণ সেই হোটেলের কক্ষই যুগল নর-নারীর পক্ষে যথেষ্ট নির্জন এবং পর্যাপ্ত বিলাস উপকরণপূর্ণ!

এ দিকটায় অপরেশবাবু আগে আসেননি, চড়াই ভাঙ্গতে হয় বলে। 'ম্যাল' প্রদক্ষিণ করার সময় প্রথমদিন ওই হোটেলটার নীচে এসে দাঁড়িয়ে, ওপরের দিকে তাকিয়ে সেই ঝুলন্ত পাথরের ওপর যাঁরা ওই সুন্দর হোটেলটা বানিয়েছেন মনে মনে তাঁদের রুচির যেমন প্রশংসা করেছিলেন তেমনি স্থান ত্যাগ করার আগে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ওপরে বিরাট রঙীন ছাতার নীচে বসে যে সব শ্বেতাঙ্গ নর-নারী পান ভোজন করছিল, আর স্বপ্নালস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের অনন্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চলতে চলতে পিছন ফিরে, আরো বার দুই সেদিকে তাকিয়ে, আপন মনেই বলে উঠেছিলেন, আসছে জন্মে যেন কালচামড়া নিয়ে আর না জন্মাই হে ভগবান!

যদিও অপরেশবাবু এই প্রথম দার্জিলিং দেখছেন এবং অফিসের কাজে, একটা জরুরী 'ইনস্পেকশন-এ' মাত্র আট দিনের জন্যে এসেছেন, নইলে হয়ত এ জীবনে দার্জিলিং দেখার সাধ অপূর্ণ রয়ে যেতো, তবু তিনি হাঁপাহাঁপি করে কোমর ও হাঁটুতে হাত বুলতে বুলতে দৃশ্য দেখার পক্ষপাতি নন। অকারণ সুস্থ দেহকে ব্যস্ত করে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার চেয়ে সহজ ও সরল পথে ঘুরতে তিনি ভালবাসেন, তাছাড়া দার্জিলিঙের মত জায়গায় যেখানে প্রকৃতি সৌন্দর্যের দ্বার নিজেই উন্মুক্ত করে রেখেছে যেদিকে তাকাও দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়। এই মেঘ, এই রোদ্দুর, এই কুয়াশার অবগুণ্ঠন—প্রতিনিয়ত সেখানে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা, রঙ নিয়ে মেঘে মেঘে, পাহাড়ের গায়ে মাথায় ছোঁড়াছুঁড়ি—সেখানে ছুটোছুটি করার কোন অর্থ হয় কি!

নেহাৎ পুজোর ব্যাপার, নইলে দায় পড়েছিল অপরেশবাবুর চড়াই ভাঙ্গার!

ওই ফিরিঙ্গী হোটেলের ভেতর দিয়ে যে পথটা উঠে গেছে 'অবজারভেটরি হিলস'-এর মাথায়, এই পথটা দিয়ে নাকি সহজে যাওয়া যায় মহাকালের মন্দিরে! সামান্য একটু চড়াই ভাঙ্গতে হয়, লোকেরা বলে দিয়েছিল। তবু ম্যালের একটা সবুজ বেঞ্চিতে বসে, একটু জিরিয়ে নিয়ে অপরেশবাবু উঠছিলেন ধীরে ধীরে। সেই ফিরিঙ্গী হোটেলটাকে বাঁদিকে রেখে যেমন ঘুরতে যাবেন, তাঁর চোখের পাতা দুটো যেন জড়িয়ে গেল মৌমাছির ডানার মত ওই ইংরেজী কাটা অক্ষরে—'হ্যানিমুন কট্।'

একবার নয়, দুবার নয়, বার কতক তিনি আবৃত্তি করলেন, 'হ্যানিমুন্ কট্।' মনে মনে। অস্ফুট স্বরে।

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানের ভেতর দিয়ে, মনের গভীর গহনে প্রবেশ করে কি এক শূন্যতার ব্যথা যেন জাগিয়ে তোলে! তবু বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন সেই ইংরাজী অক্ষর কটার দিকে!

অপরেশবাবুর বয়েস হয়েছে। প্রৌঢ় না হোন, প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে পৌঁছতে আর বেশী বিলম্ব নেই। মহাকালের মন্দিরে পুজো দিতে যাবার কথা বুঝি তখন সম্পূর্ণভাবে তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল, নইলে কেউ অমনভাবে একাগ্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতে পারে না! যেন কিসের স্বপ্নে তন্ময়! বিভোর।

ওদিকে সেই ফিরিঙ্গী হোটেলটার কক্ষে-কক্ষে বেজে চলেছে বিলিতী সঙ্গীতের সুর-লহরী—সেদিকেও অপরেশবাবুর কোন খেয়াল ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে। হঠাৎ তাঁর যেন চমক ভাঙ্গলো। দৃষ্টিটা 'হ্যানিমুন কট্' থেকে তুলে নিয়ে যেমন পিছন ফিরতে যাবেন, একেবারে শিউরে উঠলেন একটা লোককে দেখে। এ্যাঁ, এ যে আমাদের পেঁচো বামনা। ও এলো এখানে কি করে? সেই ফিরিঙ্গী হোটেলটার রঙীন ছাতার নীচে বসে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তার সামনে টেবিলের ওপর কাঁচের নানা রকমের ভোজ্যপাত্র!

নিমেষে অপরেশবাবুর সমস্ত কল্পনার জাল যেন ছিঁড়ে টুটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দার্জিলিঙের ওই সুন্দর পরিবেশ থেকে তাঁর মন চলে এলো চাঁপাতলার এক এঁদোপড়া অন্ধ গলির মধ্যে। কানাই ধর বাই লেনটা যেখানে গিয়ে বেঁকে ছাতাওয়ালা গলির মধ্যে ঢুকে গেছে সেইখানে একটা খোলার ঘরে কয়লার দোকান, ওই পেঁচো বামনার। ওর আসল নাম পাঁচু হালদার কিন্তু ও নাম বললে, কেউ চিনতে পারে না। পেঁচো বামনার কয়লার দোকান বললে, ছেলে বুড়ো আদি সবাই দেখিয়ে দেবে। মুটে না থাকলে, ও নিজেই কয়লার বস্তা ঘাড়ে করে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং কুলি ভাড়াটা চেয়ে নেয়। লোককে ওজন কম দিয়ে ঠকিয়ে সে অতিরিক্ত মুনাফা করে। সারা রাত্রি নাকি কয়লার ওপর জল ছিটিয়ে রেখে দেয়, ওজন বাড়াবার জন্যে। এছাড়া খাবারওলাদের সঙ্গে গোপনে ব্যবসা চলে। রাত্রে চুপি-চুপি 'ব্ল্যাকে' কয়লা বিক্রী করে একথা সবাই জানে। আরো জানে যে ওকে গালাগাল দিয়ে, পুলিশের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। ওপাড়ার যত বদমাইস, গাঁজাখোর, গাঁটকাটা নাকি তার হাত ধরা। সেই জন্যে ভদ্রলোকেরা চুপ করে যায়!

ও বামুনের ছেলে কেবল নয়, একদিন ওই গলিতেই তার যে পৈতৃক বাড়ী ছিল, তা নেশা-ভাঙ করে, রেস খেলে নাকি উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর এই অপরেশবাবুর চোখের সামনেই কত না ব্যবসা করল। একবার খোলার ঘরে চায়ের

দোকান করে, নিজে হাতে বেঁটে কাঁচের গ্লাসের ওপর রক্তবর্ণ চায়ের লিকারের ন্যাকড়াটা টিপে দিয়ে দুধ ও চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে, যত রিক্সাওলা ও ঠেলাগাড়ীওলাকে খাওয়াতো। কিন্তু সে দোকানও 'ফেল' হতে বেশী দিন গেল না। তখন এক পান-বিড়ির দোকান করলে। খালি গায়ে, গলায় ময়লা রঙের পৈতেটা গুটুলি পাকিয়ে ঝুলিয়ে, নিজেই কখনো বিড়ি পাকাতো কখনো পানের ওপর চুণের ও খয়েরের কাঠি বুলিয়ে, খদ্দের বিদায় করতো। এর কিছু-দিন পরে অফিস কোয়ার্টারে এক ভাত-ডালের হোটেলে চাকরী করতেও দেখেছেন অপরেশবাবু তাকে। তারপর কিছুদিন ও কোথায় ডুব মেরেছিল। হঠাৎ একদিন দেখলেন, কয়লার লাইসেন্স নিয়ে এক দোকান করে বসেছে পাড়ায়। লোকেরা বলে, ওর কে মামাতো ভাই নাকি সরকারী অফিসে বড় চাকরী করেন। ও দোকানটা তাঁরই। বেনামীতে করেছেন। পঞ্চাননকে দিয়ে।

পঞ্চানন কিন্তু একথা স্বীকার করে না। বড় মুখ করে বলে, আমার নিজের দোকান।

ওর ইয়ার বন্ধুরা বলে, তুই এত টাকা পেলি কোথায়, তুই ত সব দিয়েছিস শুড়ীর দোকানে আর হাড়কাটা গলিতে!

ব্যটে, উঠে মুখে একটা অশ্লীল গালাগাল দেয় পঞ্চানন। বলে, বেশ করবো যারা পুরুষ বাচ্চা, তারাই মদ খায়। তারাই মেয়ে মানুষ রাখে। বলে দেশের সব নামকরা নেতা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম মুখস্থ আউড়িয়ে যায়!

সেই পেঁচো এসেছে দার্জিলিঙে হাওয়া খেতে! এই ফিরিঙ্গী হোটেলে থাকতে লোককে ঠকিয়ে, ওজন কম দিয়ে, 'ব্ল্যাক মার্কেট' করে এত টাকা জমিয়েছে?

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না অপরেশবাবু। সত্যি, একি সেই পেঁচো বামনা, না তিনি স্বপ্ন দেখছেন!

ভালো করে তিনি নিরীক্ষণ করেন। হাঁ, একেবারে হুবহু সেই। শুধু যা পরিবর্তন পোষাকে! এখন সাহেবী পোষাক পরেছে—প্যান্টের ওপর কোট! সেই মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে নিশ্চয় চেয়ে এনেছে। নইলে ও পাবে কোথায়!

কেমন যেন মনের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। চলতে চলতে নানা কথা অপরেশবাবুর মনে জাগে! তিনি যদি......একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নেন। হাঁ, তিনি যদি ঘুষ নিতেন, তাহলে আজ ওই ফিরিঙ্গী হোটেলে কেন মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলের স্পেশাল সিট-এ তিনি থাকতে পারতেন। একদিন দুদিন নয়—এক-দু মাস। একসঙ্গে।

ওঁর আগে ওইখানে চাকরী করে জ্যোতিষ-বাবু, নরেনবাবু বড়লোক হয়ে গিয়েছেন। জ্যোতিষবাবু শিবপুরে আটখানা ভাড়া বাড়ী তৈরী করে শেষে স্বেচ্ছায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। আর নরেনবাবু দেশে বাগান, বাগিচা, ধান জমি, পুকুর-পুষ্করিণী শুধু করেননি দোল, দুর্গোৎসব করতেন যে রকম ধুমধাম করে বড় বড় জমিদারও তা পারে না। আর নরেনবাবু কত মাইনে পেতেন, তা সকলেই জানতো।

আজ অপরেশবাবু ত নিজে সেই 'পোষ্ট' পেয়েছেন। কিন্তু কি করতে পেরেছেন তিনি। সংসারের অভাব আর ঘোচে না। প্রতি মাসেই টানাটানি!

অবশ্য হাঁ, যদি জ্যোতিষবাবু বা নরেনবাবুর পন্থা অবলম্বন করতেন তা হলে, তাঁর এ জীবনের কাহিনী হতো অন্য রকম। কিন্তু ওপথে তিনি যেতে পারেন না। কিছুতেই না। ঘুষ নেওয়াটাকে তিনি শুধু অপরাধ মনে করেন না, পাপ বলে ঘৃণা করেন। তাছাড়া তাঁদের 'সেকশনে' তিনিই একমাত্র শিক্ষিত এম-এ পাশ। সবাই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। যদি তিনি ঘুষ নিতেন, ত সবাই চোর বলে মনে মনে তাঁকে ঘৃণা করতো।

এই নিয়ে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে কত মনো-মালিন্য হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি অচল অটল। অপরেশবাবুর স্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, ঘুষ নিতে। বলেছেন সবাই যখন নেয়, তুমিই বা কোন্ মহাপুরুষ যে নেবে না। যে পুজোর যে মন্ত্র। করবো চাকরী পরের গোলামী—আবার মহত্ত্বের ডালা মাথায় করে বসে থাকবো।

অপরেশবাবু তার জবাবে স্ত্রীকে বলেন, এখন পরের চাকরী করি না অপর্ণা। ভুলে যেয়ো না—এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। সরকারী অফিসে চাকরী করা মানে নিজের দেশের কাজ করা। ঘুষ নেওয়া মানে এখন নিজের ঘরের লোকের পকেট মারা! ইংরেজ আমলে লোকে যখন ঘুষ নিতো, তখন মনে একটা সান্ত্বনা থাকতো যে, ওই যারা মাথার ওপর বসে উৎপীড়ন করছে, আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে তাদের ঠকাচ্ছি কিন্তু এখন ত ঠিক তার উল্টো!

রেখে দাও তোমার যত সব বুজরুকি? এতই যদি জানতে তাহলে অফিসে চাকরী না করে কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে নাম লেখালেই পারতে! বিয়ে থা করেছিলে কেন? বলতে বলতে অপর্ণার চোখ দুটো নিমেষে জ্বলে ওঠে, আমার ছোট বোন আনু কি ষ্টাইলে থাকে দেখতে পাও না। অথচ অরবিন্দ তোমার মত চারটে পাশ করেনি, এত টাকা মাইনেও পায় না। ওর ছেলেমেয়েরা সব মিশনারী স্কুলে পড়ে, বাড়ীতে গাড়ী এসে নিয়ে যায়। প্রতি হপ্তায় ওরা সিনেমায় যায়। রেস্তোরাঁয় খায়। নিত্য নূতন ডিজাইনের গয়না গড়ায়। ভাল ভাল শাড়ী পরে কোথা থেকে শুনি? তোমার জন্যে আমি বাপের বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

পথে যেতে যেতে এই সব পুরনো কথাই আবার ঘুরে-ফিরে মনে আসে! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আবার মনের মধ্যে কেমন এক রকম ঈর্ষা জাগে!

পেঁচো বামনার এত চাল কোথায় থাকতো, যদি তিনি সত্যি-সত্যি ঘুষ নিতেন। আবার মনটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন! অপর্ণার জন্যেই ত তিনি নিজে এত কষ্ট করেন। নইলে অফিস থেকে ত তাঁকে ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেলে থাকবার চার্জ দেবে, ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রেণের ভাড়াও দেবে।

তবু ত তিনি ফার্ষ্ট ক্লাসে না এসে কষ্ট করে থার্ড ক্লাসে এসেছেন। সেও ত ওই অপর্ণার মুখ চেয়ে। ওই টাকাটা বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে দিয়ে তার প্রসন্ন মুখ দেখবেন বলে!

নইলে আজকের দিনে কি সাড়ে চার টাকার কোন হোটেল মেলে দার্জিলিঙে না থাকতে পারে সেখানে তাঁর মত লোক? তবু তিনি খুঁজে খুঁজে বার করেছেন ওই সস্তার হোটেলটা। ছ টাকা চার্জ ওই হোটেলের। চাঁদমারীর নীচে ওই যেখানে কয়লার গুদামগুলো, স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, নর্দমার গন্ধ, মালগাড়ী আর মালের লরীর আনাগোনা। ভুটিয়াদের বস্তীর পিঁয়াজ-রশুনের গন্ধ ওই যে হোটেলটা তারি একটা সিট-এ তিনি আছেন।

প্রথমদিনই চা আর জলখাবার দুটো বাদ দিয়ে ম্যানেজারকে দিয়ে একটা টাকা কমিয়ে নিয়েছিলেন। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে-ছিলেন। বাড়ীতে ত শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে অফিস যান, এখানে চায়ের সঙ্গে টোষ্ট, কলা খাবার দরকার কি!

ঠিক এমনিভাবেই আবার পরের দিন রাত্রে বলেছিলেন, শরীর খারাপ মাংস খাবেন না। তার দরুণও আট আনা বাদ গিয়েছিল মিল থেকে।

এমনি করে সাড়ে চার টাকায় হোটেলে থাকা খাওয়াটা চালাচ্ছিলেন। রাস্তায় কোন দোকান থেকে দু আনা পয়সা দিয়ে চা খেয়ে নিতেন। অফিস থেকে আট দিনের জন্যে পাঠিয়েছে। এই আট দিনেই যদি হোটেলের খরচা ও গাড়ী ভাড়া থেকে মোটামুটি না বাঁচাতে পারেন, তাহলে ঘর ছেড়ে এই দূর বিদেশে আসবার দরকার কি!

মাঝে মাঝে বছরে একবার কি দুবার অপরেশবাবু বাইরে 'ইনস্পেকশনে' যান বলে রক্ষে। ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেলে থাকা ও ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ী ভাড়া বাবদ যে টাকাটা বাঁচিয়ে নিয়ে যান, তাতেই সংসারের ধার-দেনাগুলো শোধ হয়। কিন্তু বামনাকে দেখার পর থেকে কেমন যেন অপরেশবাবুর মনের ভেতরে একটা আত্মধিক্কার জাগতে থাকে। ছিঃ করলুম কি! এত বয়েস পর্যন্ত! একটা ভালো হোটেলে একটা দিন থাকবারও হিম্মত নেই তাঁর।

এমনি সব আরো কত কি ভাবতে ভাবতে অপরেশবাবু যখন নিজের হোটেলে ফিরে ঘরে ঢুকলেন সহসা তাঁর মনে হলো এ যেন নরক। না-না। এখানে আর কিছুতেই তিনি থাকতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে মালপত্তর নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন, সেই ফিরিঙ্গী হোটেলটায়।

সেই 'হানিমুন কটে'টার চাবি খুলে দিয়ে গেল হোটেলের বেয়ারা। কার্পেট মোড়া সেই রকম সুসজ্জিত ঘরে ইতিপূর্বে আর কোনদিন ঢোকেননি অপরেশবাবু! হয়ত ঢুকেছেন কোন বড়লোকের বাড়ীর ড্রয়িং রুমে কিন্তু তার পরে চলে এসেছেন। এ একেবারে তাঁর নিজস্ব ঘর। চব্বিশ ঘন্টার জন্যে ভাড়া করেছেন! কেষ্ট

সেখানে ঢুকতে পারবে না। তিনিই একমাত্র মালিক সেই ঘরের।

চিন্তা করতেও যেন গর্বে বুক দশ হাত হয়ে ওঠে অপরেশবাবুর। অফিসের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন তাঁর যাত্রা করার কথা কলকাতায়। তাই অন্ততঃ একটা দিনের স্বর্গসুখ থেকে আর নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলেন না।

একেবারে 'হ্যানিমুন কট্' । দেখুক অন্ততঃ ওই পেঁচো বামনা—তিনিও পুরুষ তিনিও জানেন ভোগ করতে জীবনটাকে।

মখমলের চাদর ঢাকা স্প্রিংয়ের গদীওলা খাটের ওপর খানিকক্ষণ শুয়ে গড়িয়ে শেষে তিনি বাজারে গেলেন। বড়বাবুর জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে। ভাল চা আর দু-একটা ফুল কপি।

কপি কিনছেন, এমন সময় পিঠে ঝুড়ি নিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী এসে দাঁড়ালে তাঁর সামনে। এ বাবু কুলি!

আরে দুটো কপি কিনবো, তার জন্যে কুলি! নেহি-নেহি।

অপরেশবাবুর হাতে দুটো চায়ের প্যাকেট ছিল। সেদিকে দৃষ্টি হেনে, সেই কুলি তরুণীটি বললে, এতনা বড়া সাহাব হ্যায়, আওর কুলি নেহি মাঙতা!

বড়া সাহেব তিনি? সত্যি কি? কৈ দার্জিলিঙে কদিন এর মধ্যে ত কেউ বলেনি?

হঠাৎ কি মনে হলো অপরেশবাবুর। আচ্ছা, আও লেও। বলে সেই দু প্যাকেট চা ও চারটে ফুল কপি তার ঝুড়িতে দিয়ে ফিরে এলেন হোটেলে। 'হ্যানিমুন কট্'-এ জিনিষগুলো ঘরের মধ্যে রেখে যেমন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কুলি তরুণীটি, অমনি বৃষ্টি নামলো। দেখতে দেখতে যেন আকাশ ভেঙে এলো। তখনো সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না। সমস্ত পাহাড়টা যেন অন্ধকারে থম-থম করতে লাগল।

এই ভিতর মে খাড়া রও!

অপরেশবাবু বলার সঙ্গে সঙ্গে কুলিটি ভিতরে এসে দাঁড়ালো। কাছে আসতে হঠাৎ দেশী মদের উগ্র গন্ধ নাকে এলো অপরেশবাবুর। তরুণীটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুম সরাব পিতা হ্যায়।

সে একগাল হেসে বললে, হাঁজী!

কাহে?

ভাঙা-ভাঙা বাংলা কথা বলতে পারে ওই ভুটিয়া কুলীরা। বললে, না খেলে আমরা খাটতে পারি না, এই ঠান্ডার দেশে, ওটা আমাদের রোজ চাই-ই-চাই।

তুমি কত রোজগার করো রোজ?

মেয়েটি বললে, কুছ ঠিক নেই। তিন টাকা, চার টাকা সিজিনের টাইমে। অন্য সময় আট আনাও হয় না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে—অঝোর ঝরে। ঝম-ঝম-ঝম। হঠাৎ মেয়েটি সচেতন হয়ে উঠল। বললে কেতনা বাজা সাব।

অপরেশবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, আটটা!

এ্যাঁ, আমাকে তাহলে ত এখনি যেতে হবে! বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ভিজে-ভিজে এই জলে কি করে তুমি যাবে। থামুক, তারপরে যেয়ো। অপরেশবাবু বললেন।

সাড়ে আটটার আগে পৌঁছতে হবে। নইলে সাহেবের গোঁসা হবে। সাহেব রাগ করবে।

কোন্ সাহেব? তুমি কি কোন সাহেবের কাছে কাজ করো!

না। আমি সাহেবের মদ কিনে এনে দিই। সাহেব মদ খায় আর আমায় কিছু পেসাদ দেয়। বলে কোমরের মধ্যে থেকে একটা চ্যাপ্টা সুদৃশ্য বোতল বার করলে! তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বোতলটা দেখতে দেখতে বললে, এতনা আচ্ছা চিজ আর দুনিয়ামে কুছ নেহি বাবুজি! তুম সরব পিতা?

নেহি-নেহি। বলে ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। অপরেশবাবু পান-বিড়ি পর্যন্ত খান না।

অপরেশবাবু বললেন, এর দাম কত?

মেয়েটি বললে, পঁচিশ টাকা! এ রকম আচ্ছা সরাব আমি জীবনে কখনো খাইনি বাবুজি! এ অমৃত! এ স্বর্গের সুধা!

তাই বুঝি তুই ওইটুকু মদের লোভে সাহেবকে কিনে পৌঁছে দিয়ে আসিস!

হ্যাঁ।

সেইজন্যে বুঝি এই জলে ভিজে যেতে চাইছিস!

হাঁ-জী।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অপরেশবাবু বলে উঠলেন, আচ্ছা, তোকে এই বৃষ্টিতে সাহেবের কাছে যেতে হবে না। তুই ওই বোতলটা সব খা। এই নে পঁচিশ টাকা।

হতভম্বের মত সেই কুলি তরুণীটি অপরেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাবু তার সঙ্গে তামাসা করছে না সত্যি বলছে, যেন বিশ্বাস করতে পারে না! তাছাড়া কেন শুধু-শুধু সাহেব, তাকে একটি পুরো বোতল খেতে দেবে! তার সঙ্গে সাহেবের কি সম্পর্ক।

এই লেও। বলে অপরেশবাবু নোটগুলো তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে সে কুড়িয়ে নিলে। তারপর তাড়াতাড়ি বোতলটার ছিপি দাঁত দিয়ে খুলে, ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে।

তারপর! একটু খেয়ে দেখো, বাবু তুমি জীবনে ভুলতে পারবে না। বলে এগিয়ে এলো অপরেশবাবুর দিকে।

না-না। আমি খাবো না। তুই খা। সরে যা সরে যা ওদিকে বলে সভয়ে নিজেই দূরে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নিমিষে সেই ভুটিয়া তরুণীর মূর্তি গেল বদলে। মাতাল হয়ে গেল সে। বিলিতী মদের প্রতিক্রিয়া শুরু হলো, অপরেশবাবুর গায়ের ওপর এসে ঢলে পড়তে চাইলো।

ভয়ে তখন অপরেশবাবুর বুক দুরু-দুরু করছে। যা তুই চলে যা ঘর থেকে, যত তাকে বেরিয়ে যেতে বলেন, তত সে বলে, নেহি! আবকো সাথ আজ মজা করে গা। আব্ বহুত্ ভালা আদমী হ্যায়। আইয়ে! বলে যেমন দু হাত বাড়িয়ে অপরেশবাবুর দিকে ছুটে গেল, অমনি এক ধাক্কা মেরে তিনি তাকে ফেলে দিলেন। বিছানার ওপর মুখটা গুঁজরে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে করতে শুয়ে পড়লো তরুণীটি। তারপর এক সময় নীরব হয়ে গেল।

অপরেশবাবু কাছে এসে পরীক্ষা করে

একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। অপরেশবাবু তখন চেঁচিয়ে তার ঘুম ভাঙাবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু বৃথা। অতখানি বিলিতী মদ যার পেটে পড়েছে তার ঘুম কি সহজে ভাঙে! একেবারে অচৈতন্যের মত সে পড়ে আছে।

এবার অপরেশবাবু পড়লেন আর এক দুশ্চিন্তায়! কি হবে যদি ওর ঘুম না ভাঙে? বিছানার ওপর পড়ে সে ঘুমোচ্ছিল। ওকে কি বিছানা থেকে মেঝেয় নীচে নামিয়ে দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়বেন! কিন্তু ওই তরুণী যুবতীর দেহ স্পর্শ করে তাকে নামানো? না-না অসম্ভব!

রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে! কি করবেন, কিছু যেন ভেবে পান না। ঘরের মধ্যে ওই তরুণী মাতাল আর তিনি! তারপর? যদি তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে যায়, ও কিছু করে বসে?

না-না সেও সম্ভব নয়। তাঁর সাহস হয় না ঘুমোতে।

অবশেষে কি করা উচিত, এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই সারা রাত কেটে গেল।

সকালে 'বেড টি' নিতে এলো বেয়ারা। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। বেয়ারা নিদ্রিতা তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললে আউর এক চা লে আই সাব!

নেহি! বলে অপরেশবাবু মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

ওদিকে 'বেড টি' খেয়ে পেঁচো বামনা বেড়াতে বেরিয়েছিল পাহাড়ের ওপরে থেকে নামবার পথে হঠাৎ অপরেশবাবুকে দেখতে পেয়ে, সে একেবারে বাগানের খোলা ফটকটা দিয়ে ভেতরে চলে এলো। বললে, নমস্কার স্যার। কবে এলেন! আপনি ত আমাদের পাড়ার লোক। আমি আপনাদের বাড়ী কয়লা দিই!

এর জবাবে কি বলবেন বুঝি ইতস্ততঃ কর-ছিলেন অপরেশবাবু। এমন সময় ঘুম ভাঙা লালরঙা চোখে বেরিয়ে এলো সেই ভুটিয়া তরুণীটি দরজার কাছে। বললে, বাবুজি কেতনা বাজা!

অপরেশবাবু হাত ঘড়িটা দেখে বললেন, সাড়ে ছটা।

ভোর গড! বলে ভুটিয়া তরুণীটির মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টিটা আবার অপরেশবাবুর মুখের ওপর নিক্ষেপ করলে পেঁচো বামনা। তারপর মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে অপরেশ-বাবুর তরফ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বললে, আচ্ছা আসি তাহলে, নমস্কার স্যার।

অপরেশবাবু হাঁ, না, কিছুই যেন বলতে পারলেন না। তার মুখ দিয়ে যেন কোন কথা সরছিল না। শুধু একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে কোনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পেঁচো উল্লাসে মুখে এক রকমের শিস দিতে দিতে হোটেলের পথে একে-বেঁকে উঠে গেল।

গল্পের নায়িকা ইঁচড়। রূপক অর্থে ইঁচড় নয়। ইঁচড়ে পাকা মেয়ে নয়। একেবারে সুডোল তাজা তকতকে একটি কাঁচা কাঁঠাল। গায়ে সবুজে হলুদে মেশান কাঁটা। বোঁটায় সাদা সাদা শুকনো কষ। কোমড়ের দিকটা চাপা, যাকে বলা যায় ক্ষীণ-কটি। হাজারে বাছা চেহারার একটি কাঁঠালের ইঁচড়।

দু'চোখে নির্বাক বিস্ময়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা।

ছুটির দিনে রান্নাবান্নার ঝামেলাটা একটু বেশিই হয়েছিল। দুপুরের খাবার পর একটা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল চম্পা। পাশের ঘরে পরিতোষের তাসের আড্ডা বসেছে। কি যেন একটা তর্কের মধ্যে পরিতোষ চেঁচিয়ে উঠল : চম্পার তুলনায় ওরা কিছুই না।

প্রসঙ্গটা চম্পা বুঝতে পারল না। সে যাই হোক, পরিতোষ এমন উচ্ছ্বসিতভাবে চম্পার প্রশংসা করছে কেন? লজ্জা পেল চম্পা। ওমা একি কান্ড। পরিতোষের আজ এ কি হোল? ধীর ঠান্ডা মানুষটা এমন ক্ষেপে উঠল কেন? আর কাদের সঙ্গেই বা ও তুলনা করছে চম্পাকে? ওর ওই বন্ধুদের বৌদের সঙ্গে কি?

একটু পরে পরিতোষ উঠে এল। এক গ্লাস জল চেয়ে খেল চম্পার কাছ থেকে। কি যেন একটা হঠাৎ পাওয়া আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে পরিতোষের। আচমকা চম্পাকে একটু আদরের মত করে এক ঝলক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে চলে গেল। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পেয়েছে পরিতোষ। চম্পা ভাল করে মুখ তুলে চাইবার আগেই সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে চলে গল।

ঘুমের আমেজ এসেছিল চম্পার। ছুটে গেল। চম্পা অবাক বিস্মিত রোমাঞ্চিত। তার শিথিল স্নায়ুগুলো কেমন এক হঠাৎ জাগার আনন্দে নেচে উঠল। চম্পার আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল। যা নেভার নয় তা কখনো নেভে না। চম্পাই তো সংসারের টুকিটাকি বাজে কাজ নিয়ে দিনরাত কাটায়, আর মনে মনে ধরে নিয়েছে যে পরিতোষ নিভে গেছে। মিথ্যেই নারীর প্রেমের অহংকার। চম্পার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি দেখা দিল। মনের অগোচরে গুন্‌গুন্‌ করে উঠল গান। বাইরে চোখ পড়ল। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সত্যিই তো। বৃষ্টি ধোওয়া বাইরেটা কি সুন্দর হয়েছে আজ, আকাশটা যে এত অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে আজকাল তাই কি চম্পার এতদিন চোখে পড়েছে? এতক্ষণে চম্পা বুঝলো প্রকৃতির এই রূপেরই হঠাৎ ছোঁয়া লেগে পরিতোষের মন নেচে উঠেছে। একদিন তো সে কবিতাও লিখত। চম্পাই যেন ভুলে বসে আছে।

নিজের উপর ধিক্কার এল চম্পার। চম্পাই তো সংসারের পাঁচ ঝামেলা নিয়ে নিজেও যেমন অকালে বুড়িয়ে রয়েছে, পরিতোষকেও তেমনি সব সাধ আহ্লাদের কথা ভুলিয়ে রেখেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। বেচারা পরিতোষ তো সেই কবে থেকে বাইরের ঘরে একা একা পড়ে থাকে, চম্পা তো তার দিকে ভাল করে নজরই দেবার সময় পায় না। আর চম্পা এদিকে হয়েছে যেন সাত বুড়ির এক বুড়ি। আহা, পুরুষ মানুষটার কি একটা সাধ আহ্লাদ নেই? একেই বেচারার ছাব্বিশ বছর ধরে আপিসের কলম পিষে পিষে এক হাল, তারপর চম্পাও কি তাকে গৃহকোণের উষ্ণতা-টুকু যত্ন করে দিয়ে থাকে? বেচারা পরিতোষের যে একটা মন বলে জিনিস আছে, সে মন সুখ চায়, ভোগ চায়, চম্পা যেন তা ভুলেই বসে আছে। আসলে দুজনের কেউই আর ওরা এমন কিছু বুড়ো হয়ে যায়নি, বেচারা মুখচোরা পরিতোষ, চম্পারই তো উচিত একটু বুঝে চলা।

হঠাৎ যে আজ নতুন করে পরিতোষকে কি ভালই লাগল চম্পার তার ঠিক নেই। একে একে মনে আসে কত কথা। সেই পঁচিশ বছর আগেকার ফুটে ওঠা দিনগুলো। সেই যখন তখন ছুটে আসা, পালিয়ে যাওয়া আলোছায়ার দোলে দোলে দুলে ওঠা। জীবনটা কেন তেমনিই রইল না? নতুন এক আবেশে গা এলিয়ে দিল চম্পা। বিশ্রী লাগল এই ছকে বাঁধা হিসেব কষা পরিণত সংসারীর গৃহিণীপণা। পরিতোষের একটুকরো লজ্জাহীন উচ্ছ্বাস চম্পার মনে যেন হালকা মেঘের দুটো ডানা লাগিয়ে দিয়ে গেল। চম্পা উড়ে চলেছে দূর দূরান্তরে, সময়ের কালের বয়সের সীমা-রেখা ছাড়িয়ে।

বিকেল থেকে সারাক্ষণ উড়ু উড়ু লাগল চম্পার। কতকালের হারানো কৈশোরের চাপল্য যেন ফিরে এসেছে তার দেহে মনে; পরিতোষের তাসের আড্ডা সন্ধ্যে পর্যন্ত চলল। ছুটির দিনে এই এক নেশা ওর। বার তিনেক চা হয়ে গেল ইতিমধ্যে। তবে আজ কিন্তু চম্পা অন্য দিনের মত রাগারাগি সুরু করল না।

রাত্রে অবশ্য পরিতোষের সঙ্গে ঘর সংসার বাজার দোকান এই সব মামুলি কথা ছাড়া আর কোনো বিশেষ কথা হলো না। আর এর মধ্যে কথার কি আছে? ছকে বাঁধা নিরেট দিনগুলোর জাল ভেদ করে মনে মনে যদি মাঝে মাঝে একটু আধটু দোলাই না লাগে তবে আর স্বামী স্ত্রী কিসের? আর কিসের জোরেইবা সংসারের পথ ঠেলে চলা? মনটা আজ হাল্কা চম্পার। অনেক রাত পর্যন্ত পরিতোষের ভাত নিয়ে বসে থাকতেও বিরক্ত হলো না।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হাতের কাজ সেরে পরিতোষের ঘরে গিয়ে অকারণেই মশারিটা একবার তুলে ঝেড়ে ঝুড়ে ঠিক করে দিতে গেল চম্পা। ওমা, এরই মধ্যে একেবারে ঘুমে কাতর? ইস, ঘেমেও যে জল হয়ে উঠেছে।

ঝি এসে দাঁড়াল পিছনে : মা, দিদিমণি কাঁদতে লেগেছে, তেনার কান ব্যথা করতেছে, সেঁক দেবেন নাকি? চম্পা বিরক্ত হয়ে চলে এল : বুড়োধাড়ি মেয়ের একটু সহ্যগুণ নেই বাপু, চল দেখি কি হলো।

পরদিন সারাক্ষণ চম্পা নিজের তন্ময় ভাবটা নিজেই বেশ উপভোগ করল। [illegible]-

দিন পর আবার নতুন করে নিজের মধ্যে নিজেকে একবার হারিয়ে ফেলা, একবার খুঁজে পাবার আনন্দ বেদনা। বেশ লাগল। মনে যদি লাগে বসন্তের ছোঁয়া, সংসারের শক্ত কাজের বোঝাও কেমন হাল্কা হয়ে যায়।

পরিতোষ আজ সকাল সকাল আপিসে গেছে। কি যেন কাজ পড়েছে অতিরিক্ত। দুপুরটা যেন বড্ড লম্বা লাগছে চম্পার, অন্যদিন দুপুরে কাজে আলস্য আসে, ঘুমিয়ে পড়ে, আজ ওর দু' চক্ষে ঘুম নেই। একরাশ জামা প্যান্ট নিয়ে বোতাম লাগাতে বসল। বোতাম লাগান হয়ে গেলে সেগুলোর ছোটখাট ছেঁড়াছুটোগুলোও সেরে ফেলল। তবুও বেলা পড়ে না। চম্পার তখন মনে পড়ল পরিতোষের টেবিলটা যে কী এলোমেলো করেই রাখে। উঠে গিয়ে তার টেবিল আলমারী শেলফ সব ঝেড়ে-ঝুড়ে নতুন করে সাজাতে আরম্ভ করল। তাকের উপর ফুলদানীটায় ধুলো জমে আছে। ইস্, কত যে শখ করে সেবার ফুলদানীটা কিনেছিল শান্তিনিকেতনের মেলা থেকে। আজই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আনিয়ে সাজাবে ফুলদানীটায়।

ঘরদোর গোছাতে গোছাতে গায়ে মাথায় ধুলোবালি লেগে গেল। কলে জল আসতেই তাড়াতাড়ি গা কাপড় ধুয়ে একটা পাটভাঙ্গা শাড়ি পড়ল চম্পা। শাশুড়ী ঘুম থেকে উঠে পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন বারান্দায়। বল্লেন ঃ অ বৌমা, আজ বুঝি বিষ্যুদবার, লক্ষ্মীপুজো, তাই তাড়াতাড়ি গা ধুলে? ওমা, আমি তো ভুলেই বসে আছি। আমের পল্লব আনান হয় নাই তো। চম্পা বলল ঃ বিষ্যুদবার তো নয়, আজ সোমবার। ঘরদোর পরিষ্কার করে গায়ে মাথায় ধুলো লেগে গেল, তাই গা ধুয়ে ফেললাম। শাশুড়ী বল্লেন ঃ অ।

গা ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল চম্পা। ছেলে এসে দাঁড়াল কলেজ থেকে। বলল ঃ মা, তুমি আজও বুঝি তোমার আদরের মেয়েটিকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছ? এদিকে ছেলেটা যে সিনেমা না দেখে দেখে রোগা হয়ে গেল। তা তোমার চোখে পড়ে না? চম্পা বলল ঃ শোন ছেলের কথা, সিনেমায় না গেলে বুঝি চুল বাঁধতে নেই? কত কাজ পড়ে রয়েছে, এখন নাকি সিনেমায় যাব! চল খেতে দেই গিয়ে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। পরিতোষের আজ এত দেরী হচ্ছে কেন? ঘুরে বারান্দায় এসে এসে দেখছে চম্পা। একবার চোখে পড়ল—ওমা, ঐ তো আসছে। হাতে একটা তো আপিসের ব্যাগ, আর ঐ থলির মধ্যে কি? ঐ রঙচঙে থলিটার মধ্যে? চম্পা উপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল পরিতোষ বাড়ির মধ্যে ঢুকল। একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল চম্পার দিকে। হ্যাঁ, মুখখানা ঠিক কালকের মতই খুসী খুসী। মনে পড়ে গেল চম্পার, সেই কতকাল আগের কথা। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এমনি অপেক্ষা করে থাকত চম্পা—কখন ফিরবে পরিতোষ তার জন্য। চম্পা কেমন আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরিতোষ উপরে উঠে সোজা চম্পার কাছেই এল। তার ছাঁটা গোঁফের মাঝে কালকের সেই হাসির ঝিলিক। চম্পার কেমন আড়ষ্ট-আড়ষ্ট লাগছে। পরিতোষের চোখ মুখের ফুর্তির ছাপ লক্ষণীয়।

পরিতোষ এসেই হাতের থলিটা দেখিয়ে চম্পাকে বলল ঃ বলত কি এনেছি আজ তোমার জন্যে? চম্পা কোন উত্তর দিতে পারল না। পরিতোষ আজ কি উপহার এনেছে তার জন্যে? আনন্দে বিস্ময়ে পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে থাকে চম্পা। পরিতোষ তখন হাতের রঙচঙে থলিটার ভিতর থেকে একটি সুডোল কচি ইঁচড় বের করে বোঁটার দিকটা ধরে চম্পার দিকে এগিয়ে দিল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল ঃ কাল যা চমৎকার ইঁচড়ের চপ তৈরী করেছিলে! আঃ! বহুকাল খাইনি তেমন চপ। কী যে ভাল লেগেছিল, এখনও যেন মুখে স্বাদ লেগে রয়েছে। কালকে তাসের আড্ডায় বসে তাই বলেছিলাম। রথীন বলে কিনা বাজারের কোন্ রেস্টুরেণ্টও নাকি খুব ভাল ইঁচড়ের চপ করে। আমি তাদের জোর করে বলে দিয়েছি যে, চপ তৈরীর কাজে চম্পার তুলনায় ওরা কিছুই না, বুঝলে? অমনি বিনোদ আর রথীন ধরে বসল—খাওয়াতে হবে তাদের তোমার হাতে তৈরী ইঁচড়ের চপ। তাই নিয়ে এলাম। আপিস থেকে আসবার সময় বাজার ঘুরে ঘুরে এই সেরা ইঁচড়টি নিয়ে এলাম। কাল বিকেলে বলব ওদের চা খেতে। বেশ করে বানিও তো খান কয়েক ইঁচড়ের চপ।

সার্টের বোতাম খুলতে খুলতে নিজের মনের আনন্দেই আটখানা হয়ে কথাগুলো বলে গেল পরিতোষ। চম্পাও যে কচি ইঁচড়টি পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়বে এতো স্বাভাবিক। তাই তার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছাড়তে ঘরের ভিতর চলে গেল পরিতোষ।

চম্পা কচি কাঁঠালের ইঁচড়টি হাতে করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—

আশ্চর্য সকালে

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

দৃষ্টির আসনে দেখো ব'সে আছে
তপস্বী আকাশ,
ত্রিদিবের মত্ত লীলা সামনে তার অথচ তবুও
সে তোমারই ছবি আঁকে প্রতিদিন
শমিতা বিশ্বাস!

মনে পড়ে সেদিন তুমিই
পথের উত্তপ্ত দেহ পায়ে-পায়ে
শান্ত ক'রে একা
অনুপম অপেক্ষায় থেমে গেলে
মৌলালীর মোড়ে;
মুহূর্তেই দিগন্তে তখন
আনন্দিত জলসা বসে, উচ্ছৃংখল হাওয়া
তোমার আঁচলে হয় অফুরন্ত ফুলের
সংগীত; তারপর
সে মোড়ের সারা বুকে এবং তোমার
চোখে মুখে, কেশে ও কপোলে
বেথেলহেমের সেই শুভ্রকান্তি মুহূর্তের মতো
নেমে আসে আশ্চর্য সকাল!

অননুমোদিত আমি প্রত্যহের ভিড়ে, অভিলাষ
বসন্তের বোবা পাখি, স্থিতি তার
অলীক, অথচ
আশ্চর্য সকালে সেও সত্য হলো
শমিতা বিশ্বাস!

দূর থেকে সবিস্ময়ে দেখি
তোমার সম্মুখে দোলে সে তোমারই
প্রসন্ন বীক্ষণ
যেন এক নিরুদ্বিগ্ন নদী,
বুকে যার আপনার প্রতিবিম্ব রাখে
উদ্ভাসিত কাশ্যপ নন্দন;
এবং যেখানে ভেসে সুখে দোল খায়
মোড়ের সমস্ত ইচ্ছা পাল তোলা
তরুণীর মতো।

দূরের ঝরোকা যেন একাধিক দিনের ললাট,
সেখানে হঠাৎ ফোটে কৌতূহল নানা নক্ষত্রের।
কিন্তু হায়! তারপর চ'লে গেলে তুমি,
সঙ্গে গেল নদী, ঢেউ, আর
বেথেলহেমের সেই শুভ্রকান্তি মুহূর্তের মতো
আশ্চর্য সকাল!
মোড়ের সমস্ত ইচ্ছা নানা পথে ছত্রভংগ হলো
একদল নিষ্কলুষ তস্করের মতো।

রৌদ্রের কেশরে কাঁপে বালিয়াড়ি
পথের নিঃশ্বাস,
তুমি চ'লে গেলে তাই সূর্য হয় হতাশ দুর্বাসা,
আমারও স্নানার্থী মন কেঁদে ওঠে
শমিতা বিশ্বাস।।

—

মহাকরণে শেষ দিন

তখন ঠাণ্ডা আলো সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম। ভিয়েনার অধ্যাপক হ্যান্স মোলিশ কিছুদিন আগে এখানে এসেছেন। আলো-দেওয়া লতাগুল্ম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে একদিন কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। একটা জংলা জায়গা থেকে কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে আসছি- কিন্তু প্রোফেসর মোলিশের যেন তাড়াতাড়ি ফেরবার তেমন গরজ নেই। তিনি কিছুটা পিছিয়েই পড়েছিলেন। দৃষ্টি তাঁর চতুর্দিকে। একবার এ-গাছটা দেখেন, আবার ও-গাছটা দেখেন—নানান রকম লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে ব্যাগে পোরেন। হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে কি যেন বললেন। ফিরে চেয়ে দেখি—তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন। কাছে যেতেই আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। প্রশস্ত একটা নালার দু-দিকের দুটা গাছের উঁচু ডালের সঙ্গে খুব বড় একটা কালো রঙের মাকড়সা হলদে সুতো দিয়ে প্রকাণ্ড একটা জাল বুনে তার মাঝখানে চুপচাপ বসে রয়েছে। গাছ দুটার মধ্যে ব্যবধান ২০—২৫ হাতের কম নয়। মাকড়সাটাকে ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা করা হলো, কিন্তু পারা গেল না। কারণ, জালটা ছিল অনেক উঁচুতে এবং নালার জলের ঠিক উপরে।

ফেরবার পথে মাকড়সার কথাই হচ্ছিল। সর্বশেষে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—"......But how do they span such a long distance?" এই মাকড়সা এবং আরও কয়েক রকমের মাকড়সা আগেও দেখেছি বটে, কিন্তু এরা মাকড়সা-শুধু এই পরিচয় ছাড়া এদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানতাম না। অধ্যাপকের কথায় মনে একটা কৌতূহল হলো—বনে-জঙ্গলে, আনাচে কানাচে কতই তো মাকড়সার জাল দেখেছি, কিন্তু কখনও তো মনে হয় নি, জাল বোনবার সময় এরা এক গাছ থেকে দূরবর্তী আর এক গাছে সর্বপ্রথম কেমন করে সূত্র-সংযোগ করে? মাঝে মাঝে প্রায়ই প্রোফেসর মোলিশের কথাটা মনে পড়তো বটে, কিন্তু কোন রকম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নি। তার প্রধান কারণ, কেবল ঐ ব্যাপারটা ছাড়া মাকড়সা সম্বন্ধে তখন তেমন কোন উৎসাহ বোধ করতাম না। বেশ কিছুকাল পরে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মাকড়সার সম্বন্ধে কৌতূহল অদম্য হয়ে ওঠে।

বিমান-মহড়া দেখবার জন্যে নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বেই দমদম বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। সময় কাটাবার জন্যে বিমানঘাঁটির অদূরবর্তী জলাভূমির ধারে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে দেখছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো—খানিকটা দূরে জলের ধারে ছোট্ট একটা পানিশালুকের পাতার উপর মাঝারি গোছের একটা মাকড়সা বসে আছে। মাকড়সাটার চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না, গায়ের রং ফিকে কালো বা ধূসর—মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তবে, সেটার উপর নজর পড়েছিল বোধ হয় চকচকে ওই শালুকপাতাটার জন্যেই। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখেই অন্য দিকে চলে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে দেখি—মাকড়সাটা তখনও সেই পাতাটার উপর নিশ্চলভাবে বসে আছে। কৌতূহল হল—এতক্ষণ ধরে একই জায়গায় ওটা চুপচাপ বসে আছে কেন? ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে যতদূর সম্ভব জলের ধারে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন দেখতে পেলাম—ছোট ছোট কতকগুলি তেচোখো মাছ দল বেঁধে জলঝাঁঝি ও শালুক-পাতার আশেপাশে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া আরও অনেক কীটপতঙ্গ জলজ ঘাসপাতার উপর তাদের বিষয়কর্মে ব্যস্ত রয়েছে। এভাবে প্রায় ১৫।২০ মিনিট কেটে গেল, কিন্তু মাকড়সাটার নড়াচড়ার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। উঠবো উঠবো ভাবছি—একটু অন্যমনস্ক হতেই জলের মধ্যে যেন হাল্কা কিছু একটা পড়বার শব্দ হলো। চেয়ে দেখি—মাকড়সাটা ছোট্ট একটা তেচোখো মাছকে জল থেকে শালুকপাতাটার উপর টেনে তুলছে। মাছটা ছটফট করছিল। পাতার উপর তুলেও কিছুক্ষণ সে মাছটার ঘাড় কামড়ে রইলো। অল্প সময়ের মধ্যেই মাছটার দাপাদাপি বন্ধ হয়ে গেল। মাছটাকে ছেড়ে মাকড়সাটা তখন পাতার উপর খানিকটা ঘুরে এসে বিজয় গর্বেই যেন শরীরটাকে একবার উঁচু আবার নীচু করে মৃত শিকারটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করবার পর আহারে প্রবৃত্ত হলো।

মাকড়সা মাছ ধরে খায়—চোখে দেখা দূরে থাক, পূর্বে কখনও এমন কথা শুনি নি। ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত লাগলো যে, তারপর থেকেই এদের বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হলো। কাচের বৃহৎ জলাধারে জলঝাঁঝি, শালুক প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ দিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে কিছু মেছো-মাকড়সা ও তেচোখো মাছ ছেড়ে দিলাম। এখানে তাদের মৎস্য-শিকারের কৌশল এবং দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই সহজে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এদের আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে—অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য। মাকড়সা নৃত্য করে। কথাটাকে অনেকেই হয়তো অতিশয়োক্তি মনে করবেন। কিন্তু তা নয়, সত্যিকারের নাচ—চোখে না দেখলে বর্ণনা দিয়ে ঠিক বোঝানো যায় না। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করতে থাকে। ঘোরবার পথে দু-পা এগিয়ে এক-পা পিছিয়ে শরীরটাকে যতদূর সম্ভব উঁচু করে তোলে। পরক্ষণেই আবার শরীরটাকে নীচু করে মুখের সামনের উপাঙ্গ দুটিকে উঁচুতে তুলে হাত যোড় করবার ভঙ্গীতে নীচে নামিয়ে আনে—ঠিক যেন সেই আগেকার আমলের নবাব-বাদশার দরবারে কুর্ণিশ করবার মত। এভাবে দু-পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে বার বার কুর্ণিশ করে ঘোরবার সময় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃত্তের পরিধি কমিয়ে আনতে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সাটা কিন্তু একই জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন নৃত্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আসলে কিন্তু তা নয়—দৃষ্টি তার সতর্ক। একটু কিছু ব্যতিক্রম হলেই তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে, পুরুষ মাকড়সা তৎক্ষণাৎ ছুটে পালায়। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে আবার নৃত্য সুরু করে দেয়। নাচে খুসী হলে সে চুপচাপ বসেই থাকে। পুরুষ মাকড়সা তখন অতি সন্তর্পণে তার পিছনের পায়ে অতি মৃদুভাবে কয়েকবার সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার সঙ্গে মিলিত হয়। মিলনের পর পুরুষ মাকড়সাটা ছুটে পালাতে থাকে, কিন্তু

ঘরো মাকড়সার চামচিকা শিকার

স্ত্রী-মাকড়সার আক্রমণ থেকে প্রায়ই রেহাই পায় না—তাকে ধরে তৎক্ষণাৎ চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

বেলেঘাটায় একটা এঁদো পুকুরে জলজ ঘাস-পাতার মধ্যে কতকগুলি মাকড়সা দেখে কয়েকটাকে ধরবার চেষ্টা করতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এগুলি মাকড়সা দেখে জলে নেমেছিলাম, কিন্তু সব পরিষ্কার—একটা মাকড়সাও নেই। চক্ষের নিমেষে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি—প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে আমার চোখের সামনেই একটা মাকড়সা জলের নীচ থেকে উপরে ভেসে উঠলো। এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল—ভয় পেলেই ওরা ডুব দিয়ে জলের নীচে ঘাসপাতার মধ্যে আত্মগোপন করে। ভয়ের কারণ দূর হলেই আবার জলের উপরে চলে আসে। এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সারা ডিম সঙ্গে নিয়েই ঘোরা-ফেরা করে। ডিম ফোটবার পর বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠের উপর আঁকড়ে বসে থাকে। ভয় পেলে ডিম অথবা বাচ্চাগুলিকে নিয়েই জলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঘরের দেয়াল বা মেঝেতে অনেক সময়ই ছোট ছোট একরকমের চটপটে মাকড়সাকে মাছি শিকার করতে দেখা যায়। এগুলি নেকড়ে মাকড়সা নামে পরিচিত। মাছিকে বসে থাকতে দেখলেই দূর থেকে অতি সন্তর্পণে গুঁড়ি-পা, দু-পা করে তার পিছনের দিকে উপস্থিত হয় এবং কিছুটা দূর থেকেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা অনেক সময় পিঁপড়ের সারের পাশে ওৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ পেলেই পিঁপড়ের মুখের খাবার বা ডিম ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরা খুবই হিংস্র প্রকৃতির মাকড়সা। দুজনের মুখোমুখি দেখা হলেই লড়াই বেধে যায়। সামনের পা-দুটো উঁচু করে প্রথমে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে পাঁয়তারা কষতে থাকে। তারপর চলে পায়ে পায়ে ঠোকায় ঠেলাঠেলি। দু-একটা ঠ্যাং হারিয়ে উভয়ের কোন একটা পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামে না।

ঘরের দেয়ালে অনেক সময় ধূসর রঙের একজাতের বড় বড় মাকড়সা দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ ঘরো মাকড়সা নামেই পরিচিত। এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সাগুলিকে ডিম বুকে নিয়ে প্রায়ই ঘরের দেয়ালে বসে থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর এরা শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণতঃ আরসোলা, উইচিংড়ি, ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ শিকার করেই এরা জীবিকা-নির্বাহ করে। এই মাকড়সাকে একবার একটা ছোট চামচিকা শিকার করতে দেখেছিলাম। ডিমের প্রতি এদের আকর্ষণ অতি প্রবল। দৈবাৎ সামান্য-সামান্য পড়ে গেলে একে অন্যের ডিম কেড়ে নেবার জন্যে প্রচণ্ড লড়াই সুরু করে দেয়। বিজেতা

ডুবুরি মাকড়সা জলের নীচে ঘাস পাতার মধ্যে লুকিয়ে আছে।
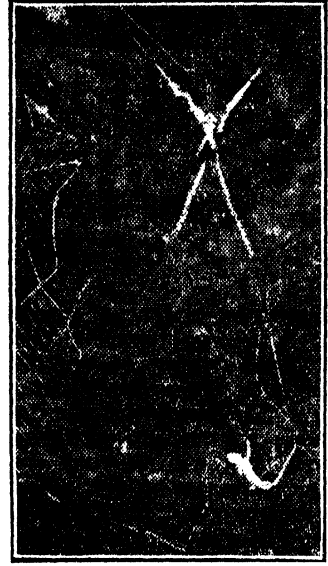
মাকড়সার জালে টিকটিকি ধরা পড়েছে

পরাজিতের ডিম বগলদাবা করে নিয়ে চলে যায়। ছবি থেকে লড়াইয়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

যে সব মাকড়সার কথা বলা হলো, এরা কেউ জাল বোনে না। কিন্তু এদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক রকম জালবোনা মাকড়সার সন্ধান পেয়েছিলাম। সামনে দাঁড়িয়ে অনেকের জাল বোনাও দেখেছি, কিন্তু কেমন করে জালের প্রথম পত্তন করে, সেটা দেখবার সুযোগ হয় নি। প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা, পিঠের উপর হলদে-কালো ডোরাকাটা এক রকম সুদৃশ্য মাকড়সাকে বনে-জঙ্গলে, আনাচে-কানাচে বেশ বড় রকমের জাল বুনে মধ্যস্থলে একটা সাদা ক্রুশের উপর নীচু দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে এরা তাঁতি-বৌ মাকড়সা নামে পরিচিত।

মাকড়সা কেমন করে প্রথমে জালের পত্তন করে, সেটা দেখবার জন্যে এই তাঁতি-বৌ মাকড়সার উপরই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা সুরু করলাম। এজন্যে দিনের পর দিন সহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও কিছু সুবিধা হয় নি, বরং অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কাজেই পরীক্ষাগারে তাদের পোষবার সংকল্প করলাম। কিন্তু পরীক্ষাগারের খালি ঘরের মধ্যে রেখে দেখা গেল—সেখানে তারা জাল তো বোনেই না, অধিকন্তু দু-এক দিন পরেই দেখা যায়, সেখানে একটাও মাকড়সা নেই। হতাশ হয়ে সেই চেষ্টা ছেড়ে দিতে হলো।

কিছু দিন পরের কথা। টেবিলের উপর একটা বড় কাঁচের জারের মধ্যে ঘরো মাকড়সার একটা ডিমের থলি রেখেছিলাম। পরের দিন এসেই দেখি, ডিম ফুটে অনেকগুলি বাচ্চা বেরিয়েছে। টেবিল ফ্যানটা খুলে দিয়ে কিছু দূরে অন্য একটা টেবিলে বসে মাইক্রোস্কোপে কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করবার পর এসে দেখি—

(শেষাংশ ১০১ পৃষ্ঠায়)

আজ ঘরে আলো নেই।

অন্ধকার হবার পর পর কালকের আধ-পোড়া মোম বাতিটা পুড়ে-পুড়ে নিভে গেছে। আর নেভবার আগে-আগে চিড়বৃ চিড়বৃ কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হয়েছিল—মৃত্যুর আগে যন্ত্রণার করুণ স্বরের মতো।

তখন, যেন সেই শব্দে চমকে উঠে এরা দুজন, কেশব আর কমলা, সেই মোম বাতির দিকে তাকায়। না, আর কোন আলো নেই। দূরের কোন আলোর অস্পষ্ট রেখায় দেয়ালে ওদের ছায়া পড়েছে। শুধু ছায়া—ছায়াই। দুলছে, কাঁপছে—এখনও। কিন্তু ঘরে কোন আলো নেই। কথা নেই। আর যদি কিছু আলোর মতো থেকে থাকে, লুকিয়ে থাকে, তা টেনে বের করে পরস্পরের মুখ দেখার কিম্বা ঘরের কি বাইরের কিছু দেখার, যা হোক, জীবন আর ঐশ্বর্য, জীবনের কোন মধুর স্বাদ আর তার ওপারেও যদি কিছু আরও থাকে, যা এরা জানে না, তা পাবার ইচ্ছা এ ঘরে যেন আর নেই। এ ঘরে এখন দূরের অস্পষ্ট আলোর রেখায় দেয়ালে দুলছে, কাঁপছে ছায়া—শুধু ছায়াই।

অন্ধকারে, এই কলকাতায় প্রায় ধ্বসে-পড়া বাড়ির একটা ঘরে তক্তপোষে মোম পোড়ার গন্ধে বসে থাকে বোবার মতো কেশব আর কমলা। একটা কথাও বলে না। মশা কামড়ায়। তবু ওদের হাত চলে না। রক্ত কমুক, অস্বস্তি হোক, ওদের রক্তের আর জীবনের মূল্য, এখন এই মোম-পোড়া অন্ধকারে বোবার মতো বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, শুধু বোধ হয় মশার কাছেই আছে।

এখন দুলু ঘুমুচ্ছে। সারা সন্ধ্যে ছেলেটা কেঁদেছে খাবার জন্য। কেঁদেছে, মাকে আঁচড়েছে, কামড়েছে। একটা কথাও বলেনি কমলা। চুপ করে বসে থেকেছে—এখনকার মতো। দু-একবার শুকনো গলায় ভীষণ জোরে কেশব ধমক দিয়েছে দুলুকে। রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে—মেরে ফেলতে চেয়েছে। কমলা তখন ওকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, আর বোধহয় ওকে আশ্বাস দেবার জন্য বলেছে, কাল,—কাল সকালে তোকে এনে দেব, কত খাবার, দেখিস।

ছেলেটা ভোলেনি। কেশবের ভয়ে জোরে কাঁদতে পারেনি। মার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তারপর কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। কখন—এরা জানে না। কিন্তু কমলা মাঝে মাঝে দুলুর দিকে দেখছিল—অন্ধকারে ওর মুখ না দেখা গেলেও।

কিন্তু দেরি করছে কেন কেশব? কোন আলোর অপেক্ষা করছে? এক-একবার এই অন্ধকারে, স্ত্রী আর ঘুমন্ত ছেলের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে থাকতে মনে হয়, এখুনি, এখুনি, এখুনি—আর দেরি নয়। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না কেশবের। উঠতে যেন কষ্ট হয়। এখানে এমন করে বসে থাকতে থাকতে অন্ধকারেই যদি—কেশব মরবে। কমলা মরবে। আর, ছেলেটাকে ওরা মারবে—পরে, অল্প পরেই, রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওরা তিনজন যদি ফুরিয়ে যায়, শিশিতে লুকিয়ে রাখা কয়েক ফোঁটা কড়া অ্যাসিডের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আধ-পোড়া মোম বাতির মতো নিভে যায়—কে দেখবে ওদের! তবু ওঠে না কেশব। একটাও কথা বলে না কমলার সঙ্গে। ছেলেটার দিকে তাকায় না। নড়ে না। হাসে না। কাঁদে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। মশা মারে না। ও মরে গেছে। মরে গেছে যেন অনেক আগেই। ঘুরে ঘুরে কাজ না পেয়ে, টাকা ধার নিয়ে, অল্প খেয়ে, না খেয়ে—একেবারে উপোস করে অল্পে অল্পে কেশব মরেছে। আর ওর সঙ্গে সঙ্গে কমলাও। তাই সে-ও কথা বলে না। ক্ষিধের কথা না। ছেলের কথা না। স্বামীর কথা না। মরা-বাঁচার কোন কথাই না। মশাও মারে না।

শুধু ছেলেটা, ছ' বছরের দুলুটা বেঁচে আছে—এখনও মরেনি। এখনও হাসে কাঁদে—মশা মারে। তাই ওর ওপরেই কেশবের সবচেয়ে বেশি রাগ। আশ্চর্য, মরার পরেও রাগ থাকে নাকি মানুষের! ছেলেটাকে মারবে কেশব। মারবে, ওকে বাঁচাবার জন্যেই। ছেলেটা ছটফট করে মশার কামড়ে। কমলা দেখে। হাত তোলে না। আর মোটে কয়েক ঘন্টা। মশা মেরে কী লাভ!

প্রত্যেকদিনের ক্লান্তির চেয়ে, ক্ষুধা আর অপমানের চেয়ে, ভূতের মতো, ছায়ার মতো সূর্যের আলোয় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে—চলে যাওয়া ভালো, অনেক ভালো—কেশবের মনে হয়, কমলারও। লাস-কাটা ঘরের টেবিলের ঘুম আরামের—নিশ্চিন্ত আরামের। এখানে, এই তক্তপোষে ঘুম হয়নি, হবেও না, কোনদিনও না। এখন মরে গেলেও, ভূত হয়ে, ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ালেও, ক্ষুধা আছে, অপমান আছে, নিরাশা আছে। লাস-কাটা ঘরে কিছু নেই। কিন্তু সেখানে থাকবে ওদের দেহের দাম। কতগুলো কৌতূহলী চোখ। মানুষের স্বর। ওদের কানে না গেলেও ঝকঝকে মানুষগুলো ব্যস্ত হবে, তৎপর হবে, ওদের দেহ চিরে-চিরে পরীক্ষার জন্যে। তখনও অন্ধকারে বসে বসে কেশবের

মনে হয়, ভূতের দাম হবে মানুষের মতো। তবু আর একবার, শেষবার—

কেশব আলোর রেখা দেখতে চায়। কেন, কে জানে!

মশা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওদের গালে গলায় হাতে পয়ে সেঁটে থাকে। এখন, ওরা বুঝেছে, ওদের এই ভূতগুলোর রক্ত শুষে শুষে নিলেও মরবার ভয় নেই। কেউ মারবে না। প্রাণের আশঙ্কা থাকলে উড়ে যেত। মশারাও মরতে ভয় পায়। আর আজ, এরা জেগে থাকলেও, ইঁদুরগুলো, এ বাড়িতে অনেক বুড়ো বুড়ো ইঁদুর আছে, ঘুরছে ফিরছে। কোন বাধা নেই। এরা কথা বললে, হাত-পায়ের অল্প শব্দ হলে, বুড়ো-বুড়ো ইঁদুর-গুলো লুকিয়ে যেত। ওরা, কেশব ভাবে, আরও বাঁচতে চায়, অনেক—অনেক দিন। মানুষের চেয়ে বেশি—ভূতের চেয়ে বেশি।

হঠাৎ মশা মারে কেশব। চটাস্ চটাস্—এক সঙ্গে অনেক। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু রক্ত লাগে ওর হাতে। নিজেরই রক্ত—মশা যতটুকু শুষে নিয়েছিল ঠিক ততটুকু। আর ওর হাতের শব্দে, এক মুহূর্তে এ ঘরে বুড়ো-বুড়ো ইঁদুরগুলোর নিশ্চিন্ত চলা ফেরা বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। দেখা গেলে, মশার মতোই ইঁদুরগুলোরও বাঁচার সাধ ঘুচিয়ে দিত কেশব। মরুক—মরুক ওরা, ভূতের মতো মরুক!

আর একটা হাতের, কেশবের দেখাদেখি, শব্দ হয়। কমলা উঠেছে তখন। তক্তপোষে বসেছে। চটাস্ চটাস্। মশাও মেরেছে। আর বোধহয়, ওর হাতেও রক্ত লেগেছে। নিজের নয়, দুলুর। ছেলের রক্ত-খাওয়া অনেক মশা হয়তো মেরেছে কমলা। ছেলেটা ঘুমোক। আরামে ঘুমোক। ও ভূত হয়নি। এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু ওর বাঁচার সাধ, কী-ই বা বোঝে ওইটুকু ছেলে, ঘুচিয়ে দেবে কেশব—মশার মতো, মারতে না পারলেও ওর মনে হয় ইঁদুরের মতো।

এই প্রথম, শেষ কথা কখন কমলার সঙ্গে বলেছিল কেশব মনে পড়ে না। অন্ধকারে দূরে কোথায় ঝরুর্ ঝরুর্ করে ঠেলা গাড়ি যায়। পেঁচা ডাকে। ভারী স্বরে, মৃত্যুর ধমকের মতো, কেশব কথা বলে, "কী কর?"

"মশা মারি।"

"কেন, কেন, কেন?"

"ছেলেটা ঘুমোতে পারে না—"

কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ কেশব থেমে যায়। বলতে পারে না। এর পরেও মশা আসে। মশা বসে কেশবের গায়ে। আগেকার মতোই। আবার তার হাত ওঠে-নামে। চটাস্ চটাস্! কেশবের হাতে লাগে ওর নিজেরই রক্ত। কিন্তু ইঁদুরগুলো আর নেই।

চিৎকার করে কেশব, "না ঘুমোক—মশা মার কেন?"

ভাঙা ভাঙা স্বরে কমলা বলে, "তুমি যে মার—"

হাতের বড় জোর শব্দ করে কেশব, "বলি, আমি যা করি, তোমাকেও তা-ই করতে হবে?"

"হবে—হবেই তো," দুলুর গায়ে হাত চালায় কমলা।

হবে—হবেই তো! এতক্ষণ পর, আজ অন্ধকার নামবার পর এই প্রথম, আধ-পোড়া মোম বাতি পুড়ে-পুড়ে নিভে যাবার পর, এই প্রথম, কেশব, আস্তে, সাবধানে—যেন কমলা শুনতে না পায়, বুঝতে না পারে, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। আর, এই প্রথমই ও ভাবে, যে নিঃশ্বাসটা এখন বেরিয়ে এল ওর বুক ঠেলে তা পেঁচার নয়, মশার নয়, ইঁদুরের নয়, ভূতেরও নয়। আর, আর একবার কমলার কথাই ওর মনে হয়, হবে—হবেই তো।

কী হবে? কেশব যা করবে, কমলাও তা-ই করবে। মরবে। আর মরবার অল্পক্ষণ আগে, কেশবের মতো সে-ও মশা মারবে। আশ্চর্য! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপতে পারে না কেশব কিন্তু আর মশাও মারে না। চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে ভোরের জন্যে।

"মশার কামড় খাও কেন?" স্বর অনেক নামিয়ে কমলা বলে, "মার না?"

"না।"

"কেন, কেন?"

"না না, থাক—থাক রক্ত।"

আবার সব চুপ। শব্দ না। কথা না। ইঁদুর-গুলো আসে যায়। মশা গায়ে-পায়ে বসে। কামড়ায়। ওদের দুজনের মনে হয়, দুলু ঘুমিয়ে আছে, ওর মনে হয় না, দুলু বেঁচে আছে—এরা জেগে আছে, কেশব আর কমলা এরা মরে গেছে তাই এদেরই মনে হয়,— মনে হয় মশার কামড়ে ক্ষতি নেই। একটু পরে, আর অল্প পরেই—হবে, হবেই তো। কেশব যা করবে, কমলাও তাই করবে—মরবে। আর তার আগে, সবচেয়ে আগে, দুলু বেঁচে আছে বলে, ওকে মারবে। না মারলে, ও ভূত হয়ে বেঁচে থাকবে কেশবের মতো। শুধু ছায়া হয়েই অন্ধকারে দেয়ালে দুলবে কাঁপবে কমলার মতো। আর তারপর একদিন আবার একটা আধপোড়া মোমবাতি পুড়ে পুড়ে নিভবে। বুড়ো-বুড়ো ইঁদুরগুলো ঘুরবে ফিরবে। প্যাঁচা ডাকবে। মশা কামড়াবে। চটাস-চটাস শব্দ হবে। দুলু নিজেরই রক্ত দেখবে। একা-একা।

'মশা মার না কেন?' কেশব শুকনো কাঠ-কাঠ গলা ফাটায়।

'না—'

'কেন, কেন?'

'থাক—থাক রক্ত।'

'না থাবে না,' হঠাৎ নড়বড়ে একটা শরীর উঠে দাঁড়ায়, 'হবে না, হবে না, হবে না?'

'চেঁচাও কেন? কি হবে না?' দুলুকে গায়ের জোরে চেপে ধরে কমলা ভয়ে ভয়ে ওর চোখের সামনে দেখে একটা কঙ্কালকে। তখন কমলা কাঁদে। আর, কান্না-কান্না গলায় আর একবার, কি এক আশায় খুব আস্তে বলে, 'কি হবে না গো?'

'আমি যা করি, তা করা হবে না—তোমাদের কারুর না। না, আমি দেব না—এক ফোঁটাও না—' আলো না থাকলেও, এবার হঠাৎ দূরের কোন আলোর রেখায়, ভোর হয়ে আসে কি না কে জানে, কমলা স্পষ্ট দেখতে পায় কেশবকে। ও দেখে, এই অন্ধকারেও স্পষ্ট, একটা ভাঙা-চোরা মানুষ টলতে টলতে এগিয়ে আসে। ও দেখে, সেই মানুষটা দেয়ালের কাছে এসে সব-চেয়ে উঁচু তাকে হাত বাড়ায়, এখন বাইরে আলো নেই তবুও। কমলা দেখে, একটা ছোট শিশি আর কাপ। তখন কমলা দুলুকে ছেড়ে ওঠে। সেই মানুষটার নড়বড়ে শরীরের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ভূত, একটা ছায়া। এখন আশ্চর্য, দেয়ালে কোন ছায়া নেই।

'কি কর—কি কর?'

কেশব জোরে, নড়বড়ে শরীরে যত জোর আছে সব ঝেড়ে ফেলে কমলাকে ধাক্কা দেয়,—'সর—সর না। আমি যা করি তা করা হবে না তোমার—না।'

পড়তে পড়তে নিজের ক্ষীণ দেহটাকে সামলে নেয় কমলা। আবার ঝাঁপায়। শক্ত করে ধরে কেশবের দুই হাত, 'ওগো, লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি,' দুলুর তক্তপোষের দিকে ভয়-ভয়ে এক মুহূর্ত সে তাকিয়ে নেয়, 'আমাকে আগেই দাও—'

হঠাৎ গলার স্বর অনেক নীচে নেমে যায় কেশবের, 'কেন? ছেলেটাকে মারতে মন কাঁদে?'

'না—'

'তবে? আগে কেন?'

'হ্যাঁ গো। তোমার আগে—দাও—'

হা-হা করে হেসে কেশব, 'দু মিনিট বিধবা হতে মন চায় না?'

ঠাণ্ডা গলায় কমলা বলে, 'না'।

কেশবের হাসি থামে। প্যাঁচা নেই। ইঁদুর নেই। মশাও নেই। দুলু ছটফট করে না। অন্ধকার। কেশবের হাত দুটো জ্বালা করে। না খেয়ে-খেয়েও এত জোর কোথায় পেল কমলা? অন্ধকারে দেখা যায় কমলার ভিজে চোখ।

কেশবের হাত ধরে ও কাঁদে। বাঁচবার জন্যে নয়, আগে সবচেয়ে আগে মরবার জন্যে।

'ছাড়'।

এক কথায়, বোধহয় কেশবের স্বর আশ্বাসের মতো মনে হয়, কমলা হাত ছেড়ে দেয়। আর তখন, কেশবের হাত দুটো, এতক্ষণ কমলা জোরে ধরে রাখার জন্যেই যেন অবশ হয়ে যায়। একটা টুলের ওপর কেশব শিশি আর কাপ রাখে। আর, শিশিতে যা ছিল—সবটুকুই ঢালে কাপের মধ্যে।

'কি কর?' কেশবকে আবার ধরতে আসে কমলা।

'চুপ চুপ চুপ—' চিৎকার করে নয়, ক্লান্ত ভাঙ্গা স্বরে আস্তে আস্তে কেশব বলে।

হ্যাঁ একটা টুলও আছে এ ঘরে। অনেকদিন আগে, যখন কাজ ছিল কেশবের, যখন কমলারও সময় কাটত রান্নাঘরে, এরা চাল কিনত, কয়লা কিনত, বাড়ি ভাড়া দিত, খাঁটি দুধ খুঁজে বেড়াত দুলুর জন্যে—তখন, একদিন এই টুলটা কিনে এনেছিল কেশব। কিনেছিল কমলার কথা মনে করে। কাজের সময় যখন ও দুলুকে সামলাতে পারত না, দুলু যেত ওর পেছন পেছন রান্নাঘরে, উনুনের কাছে, তখন ওকে ধরে এই টুলের ওপর বসিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারত কমলা।

কমলা দেখে, সেই টুলের ওপর কাপটা। কমলা দেখে, দুলু একটু দূরে তক্তপোষে ঘুমুচ্ছে। কমলার চোখ ভিজে-ভিজে এখনও। এখন ইচ্ছে করেই ও তাকায় না কেশবের মুখের দিকে। ও আর ফিরেও দেখে না ছেলেকে। ও দেখে টুলের ওপর একটা কাপ। একটা খালি শিশি। আর কাপের মধ্যে যা একটু আগে ঢেলেছে কেশব, তা অন্ধকারে দেখা না গেলেও, কমলা জানে, তারই কয়েক ফোঁটা ওকে, একটা মৃতদেহকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাবে হিড়হিড় করে—কমলাকে নিয়ে যাবে দুলুর কাছ থেকে, কেশবের কাছ থেকে। তাই ওর ভিজে ভিজে চোখ ভারী হয়—আরও ভারী। আর ও কাপটার গায়ে হাত বুলোয়।

'কি কর?'

'দাও-'

'না', কেশবের রোগা-রোগা হাত—কাঁপে। কমলার হাতের ওপর এসে পড়ে। ওর চোখ শুকনো খট-খটে। জল নেই, কোথাও যেন এক ফোঁটা জলও নেই। কেশব কথা বলে। কেশব কমলাকে বলে, 'না-না-না, হবে না—'

'হবে—হবেই তো', সেই এক কথা কমলার—একই স্বর।

'কমলা', কেশবের গলাও শুকনো, ওর মনে হয় তাই কমলা বোধহয় বুঝতে পারে না ও কি বলতে চায়। কেশব ওকে বোঝাবার জন্যেই ওর হাত চেপে ধরে বলে, 'তুমি থাক, দুলু থাক—'

'না, কেউ থাকবে না। হয় সব থাকবে, নয় কেউ না।'

চিৎকার করে কেশব ভাঙ্গা গলায়, 'আমি ভূত, একটা ভূত, আমার জন্যে মরে নাকি মানুষ? তোমার দেহ নেই?'

'না', কমলা বলে না, বলতে জানে না, কেশবকে বোঝাতে পারে না যে সেও একটা ছায়া—শুধু ছায়াই। কমলা কাঁদে, শুধু কাঁদে।

কেশব হাসে, 'এখনও কাঁদ। বাঁচার সাধ আছে তোমার। চোখে জল আছে। ছেলে আছে—একটা ভূত যদি না থাকে কমলা, সব থাকবে। হাসি থাকবে জীবনভোর—'

কেশবের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে কমলা। কান্না থামায়। যন্ত্রের মতো ঘড়-ঘড় করে, 'দাও—'

'উঁহু।'

'তবে কাল কি হবে? পাওনাদার আসবে। পুলিশ আসবে। মারবে—ধরবে—তখন?'

'তখন?' কেশব হেসে বলে, 'লাস-কাটা ঘরে যাব আমি। তুমি থাকবে, দুলু থাকবে। টাকা-পয়সার কথা কেউ বলবে না। সকলে তোমাদের দেখবে। সব লোকগুলো মানুষ হয়ে যাবে কমলা। তোমার কোন ভয় থাকবে না—'

'দাও?'

'উঁহু।'

'দাও। ভোর হয় বুঝি।' কমলা বাইরে তাকায়, 'দুলু উঠে পড়বে। কাঁদবে। কি হবে তখন?'

ভোরের কথা শুনে ভয় পায় কেশব। জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। কমলার হাত ছেড়ে একা টুলের কাছে বসিয়ে রাখতে ভরসা পায় না। তাকেও টেনে নিয়ে আসে—তারই ছায়ার মতো। কিন্তু আলোর রেখা আছে কোথাও না কোথাও। ভোরের দেরী নেই। কমলার হাত ধরে কেশব কাঁপে ভয়ে—আলোর ভয়ে, ভোরের ভয়ে। কি হবে তখন?

একটা কথাও নেই কারুর মুখে। দুটো হাত কাঁপে, দুটো হাত স্থির। দুটো চোখ, দুজনেরই জোড়া-জোড়া চোখ, ভিজে আর শুকনো খটখটে, দেখে রাস্তার ওপারে বড় বড় গাছ—যে সব গাছে প্যাঁচা থাকে, অনেক বুড়ো-বুড়ো প্যাঁচা, যারা বাঁচতে চায়, আরও অনেকদিন। আর, এখান থেকেই দেখা যায়, একটা বেড়াল, মেটে রঙের, এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে, যদিও এখনও একটা গাড়ি নেই রাস্তায়, একটা কুকুর নেই তবুও—খুব সাবধানে, ভয়ে-ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে রাস্তা পার হয়। দূর থেকে, এক পোড়ো বাড়ির তেতলার ঘরে-ঘরে অন্ধকার ঘর থেকে রাস্তার আলোয় একটা ভূতের আর একটা ছায়ার মনে হয়, বেড়ালটার ঝোলা পেট। আর ওর পেটে বাচ্চা আছে বলেই রাস্তা পার হওয়ার সতর্কতা বেশী—অনেক বেশী। তখন কমলার ভিজে চোখ শুকিয়ে যায়। তখন কেশবের শুকনো খটখটে চোখ ভিজে ওঠে। হঠাৎ।

আর ঠিক তখনই দুলুর ঘুম ভেঙে যায়। ও দেখে, ঘুম চোখেই দেখে, ওর চোখের সামনে টুলের ওপর একটা কাপ। তেষ্টায় কচি বুক ফাটে দুলুর। মা-বাবা দূরে—জানলার কাছে। দুলুর মনে হয়, এ বাড়িতে জল নেই। এক ফোঁটাও নেই। তেষ্টার কথা বললে মা ওকে ভোলাবে। বাবা মারবে। কি আছে কাপের মধ্যে? জল। জলই তো।

'আঁ-আঁ-আঁ—রা'—' জিব পোড়ে, গলা পোড়ে, বুক পেট সব, 'আঁ—'

'ওগো!'

'দুলু—দুলু—'

ছটফট করে মেঝের ওপর একটা ছোট্ট শরীর। বিকৃত মুখে। ঠোঁট, জিব—সেই। আছে কি না আছে বোঝা যায় না। কেশবের হাত হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়—লোহার মতো। কমলার বুক পুড়ে পুড়ে যায় দুলুর মতো। কাপটা, খালি শিশিটা মাটিতে গড়ায়। কেউ দেখে না।

'দুলু, দুলু, ওগো—'

'কমলা দরজা খোল, কমলা শিগগীর—'

কেশবের হঠাৎ লোহা হয়ে ওঠা হাত দুলুকে তুলে নেয়। বুকে চেপে ধরে। জোরে, খুব জোরে।

'কোথায়, কোথায় ওকে নিয়ে যাও?'

'কমলা শিগগির—হাসপাতালে।'

একটা ভূত ছোটে। পিছনে পিছনে একটা ছায়া। ভূত না। ছায়া না। আধখানা প্রাণের জন্যে দুটো বিভ্রান্ত মানুষই যেন তর-তর করে সিঁড়ি ভাঙ্গে।

মাকড়সার আকর্ষণে

(৯৮ পৃষ্ঠার পর)

বাচ্চাগুলি বেশীর ভাগই জালের মধ্যে নেই, গোটাকয়েক মাত্র জালের কাণাটায় উপরে বসে আছে। কাছে গিয়ে একটু লক্ষ্য করতেই দেখা গেল—সবকটাই দেহের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করে রয়েছে এবং হাওয়ার স্রোতের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম সূতো ছেড়ে বাতাসে ভর করে দূরে চলে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা দেখবার পর একমুখী বায়ু-প্রবাহের মধ্যে অন্যান্য মাকড়সা রেখে দেখা গেল, তারা সবাই বাতাসের মধ্যে ক্রমাগত সূতো ছাড়তে থাকে। সূতোর প্রান্তভাগ কোন কিছুতে আটকে গেলেই সেই সূতো বেয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চ'লে যায়।

এরপর হাওয়ার সাহায্য নিয়ে তাঁতি-বৌ মাকড়সাকে দিয়ে সুবিধামত জায়গায় জাল পত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। এই রকমের একটা জালে আকস্মিকভাবেই একবার একটা টিকটিকি ধরা প'ড়ে। তারপর, টিকটিকি যাতে প্রলোভিত হয়ে মাকড়সার জালে এসে পড়ে, সেরূপ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে আরও কয়েকবার এই মাকড়সাদের টিকটিকি শিকার আনুপূর্বিক প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আজ আর স্রোত নেই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজ আর স্রোত নেই তরঙ্গ ভাঙে না আর
কর্কশ ও বর্ণহীন শুধু অস্থিসার
কঙ্কালের মতো পড়ে আছে।
মৃত্যু ও জীবন রয়েছে
বহু দিন ক্লান্তিকর চেনা
আজ আর স্রোত নেই হিসেব মেলে না।

দুঃস্বপ্নের মতো তন্দ্রা ভাঙা রাত
জেটির অঁাধারে ও জাদুঘরে
সিংহের কান্নার সুরে
জাগে অকস্মাৎ।
তারপর ভাবে
এই সব বাঁচা আর জাগা আর তন্দ্রা ভাঙা ক্ষণ
কবে বিসর্জন?

আজ আর স্রোত নেই।।

সে

চিত্তরঞ্জন পাল

সেদিনও দেখেছি তারে। আজও দেখি।
অনেক বদল
চিহ্নিত সে মুখশ্রীতে। যা ছিল লাবণ্যে ঢল ঢল,
মনোহর সুস্থতায়, আজ তার ভাঁজে ভাঁজে চিড়
বিকারের রুক্ষতায়। বিসর্পিত তমসার ভিড়
গোপন সুড়ঙ্গ-পথে। একদা যে উৎসুক আবেগে
শুকতারা হেসেছিল, আজ তার রিক্ততার মেঘে
কী গভীর ধূসরতা। ফাল্গুনের
সন্ধ্যায় সোনালী
রাসের রাতুল নৃত্যে হাসে না তো উৎসব-দীপালী
স্বপ্নের অঞ্জন মেখে। যন্ত্রণার হোমাগ্নি-শিখায়
সত্তার সমিধ যেন প্রজ্বলনে ছাই হয়ে যায়;
মাথা কোটে সর্বনাশ বিক্ষোভের কঠিন পাথরে—
নীরব করুণ কান্না শূন্যতার বালুচরে ঝরে।
দ্বৈপায়ন একাকিত্বে অনির্বাণ জ্বালার নির্মোহে
সে নয় কোমল স্নিগ্ধ—ভয়ঙ্কর ভীষণ বিদ্রোহে।

মন

লাবণ্য পালিত

মন কই? শুধু মরু বাতাসে বাতাসে
দিনের আলোর কাছে বিষাক্ত নিঃশ্বাসে—
কথা কয় চুপি চুপি, দুরন্ত অধীরা...
বলে যায়; নেই কোন উচ্ছল মদিরা।
মন কই? রংহীন রাতের বিবরে
স্তব্ধমায়া কেঁদে যায় একেলা শিহরে...।
শুষ্ক প্রাণ রিক্তমন সবুজ প্রান্তরে
এঁকে দেয় কাঁটালতা কঠিন মন্তরে...!
মন কই? চারিদিক কে রেখেছে বেঁধে?
কোথা এই গান গাই, কার কাছে কেঁদে?
খুঁজে ফিরি মনান্তরে অন্তরের দ্বার,
শুধুই ছলনা তুমি, সে মন কোথায়?

বহুরূপী

প্রভাকর মাঝি

ঋজু রাস্তায় কে খোঁজে জীবন?
এর গতি তির্যক।
বন্দী করতে পারবে না একে
বীজগণিতের ছক।
চলতে চলতে পূর্বে—
হঠাৎ কখন, কে বলতে পারে
দক্ষিণ দিকে ঘুরবে?

যতো জীবনকে রুখতে চাইবে
আলো আর উত্তাপে,
পথ ছেড়ে ততো খানায়-খোঁদড়ে
ঘুরবে সে বীরদাপে।
বলা যায় কোনো দিন কি?
কখন সে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে, আর
কখন ছড়ায় ফিনকি।

আটঘাটা-বাঁধা পাকা হিসেবের
যোগে ভুল হয়ে যায়,
প্রতি মুহূর্তে খেয়ালী জীবন
গতি-পথ পাল্টায়।
আজ যা প্রতিমা চিত্তে,
কাল তা নিছক কাদামাটি-খড়—
মিথ্যে, মিথ্যে মিথ্যে।

ওকি অস্থির বেদুইন না-কি?
চায় শুধু বাঁক নিতে।
কিছুটা স্বরূপ ধরা পড়ে বুঝি
শিল্পীর দৃষ্টিতে।
প্রতিদিন যেতে আসতে,
তবু বহুরূপী জীবনকে কেন
চাই আরো ভালোবাসতে!

নটরাজ

অনিল ভট্টাচার্য

হে নটরাজ! বাজাও বাজাও বীণার তন্ত্রে
তব সুর ঝঙ্কার
মহাকাশ তলে ধ্বনিয়া উঠুক
তারি মহা ওঙ্কার।

সংগীত তানে তব মহাবাণী
অন্তর ভরি দিক আজ আনি
সাধনা লক্ষ্মী চরণে আনিব
সুরের অলঙ্কার।

যে সুর তোমার স্তবের মন্ত্রে
আজিও রহে যে গাঁথা
আমার নীরব কন্ঠে আজিকে
উঠুক সে মহা গাথা—

মহা সাধনার তীর্থের পথে
তব সুর ধারা জাহ্নবী স্রোতে
নামিয়া আসুক ডুবাক আমার
সকল অহঙ্কার।

যযাতি

॥ সুশীল জানা ॥

সর্বকনিষ্ঠ সে পুরু—বলেছে সে, 'নাও মহাভাগ
এই দেহ সুসক্ষম, এ নবযৌবন মুগ্ধরাগ,
নব নব উন্মাদনা। আমারে ও জরায় জর্জর
দাও দেহ—করো ভোগ যত অভিলাষ।' তারপর
শতাব্দী শতাব্দী গেছে, কেটে গেল হাজারো বছর।
যযাতির তৃপ্তি নেই, কামবহ্নি সুতীব্র প্রখর—
যুগল প্রেয়সী নিয়ে সে বাহুরে করে আলিঙ্গন
উন্মত্ত আবেগে। তবু সর্বগ্রাসী ক্ষুধিত যৌবন
নূতন ক্ষুধায় জাগে।
ছুটেছে সে গন্ধর্বলোক পানে
লুব্ধ দুই বাহু মেলে—স্তূপীকৃত রয়েছে যেখানে
রমণী দেহের ভোগ। চৈত্ররথবাসিনী অপ্সরী
বিশ্বাচীর বরদেহে খুঁজেছে সে দিবস শর্বরী
শান্তি তৃপ্তি পরিণাম। তবু তার অতৃপ্ত কামনা
মেটাতে পারেনি হায় নন্দনের অনন্ত যৌবনা।
কামনা মেলেছে শিখা ঘৃতাহুত বহ্নির মতন,
নারীরে করেছে আরো লোভনীয়; দীপ্ত হুতাশন
হয়েছে দ্বিগুণতর—কোথা তৃপ্তি,
কোথা শেষ তার!
সব সোনা, সব পশুধন, রত্নগর্ভা এ ধরার
যত নারী—সব দিয়ে নেভেনি সে ক্ষুধার দহন।
ভোগে শান্তি মেলে কই?
স্তব্ধকাম হয়েছে উন্মন,
যযাতি বলেছে শেষে, 'পুত্র নাও তোমার যৌবন।'

প্রতীকী

রাণা বসু

তোমার ওই কাজল টানা চোখ দুটোর চেয়ে
তোমার জলভরা দুটো চোখ দেখতে
আমি অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি।
মনে ভেবো না, হৃদয় আমার কঠিন পাষাণ
হয়ে গেছে
ভালোবাসা যে অমরঃ
শেওলাধরা পাথরেও যে ফুল ফোটে।

তোমার জলভরা দুটো চোখ দেখলেই
বুঝতে পারিঃ অনুরাগের প্রতীক—
এই নীরব মুক্তো ঝরা।

গাছের পাতা খসে, ডালগুলো শীর্ণ হয়,
তারপর একদা বসন্ত এসে
আবার মরা গাছকে সজীব করে,
ওই মুক্ত বিন্দুর মতো তোমার চোখের জল
একটু শুষ্ক হলেই
আমি নিশ্চিত জানি—
শরৎ আকাশের মতোই তুমি হাসবে।
লজ্জাবতী, তোমার মুখে সেই মিষ্টি হাসি
দেখতে চাই বলেই
সুন্দর কাজলটানা চোখ দুটোর চেয়ে
তোমার কান্না-ভাঙা চোখ দুটোকে
এতো অধিক ভালোবাসিঃ
তাই তোমাকে আমি অকারণে রাগাই।।

রাজকাহিনী

ডক্টর রমা নিয়োগী

প্রকৃতিরঞ্জন যিনি করেন তিনিই প্রকৃত রাজা—এই হলো শাস্ত্রবাক্য। বর্তমান পৃথিবীতে কিন্তু প্রকৃতি বা প্রজারঞ্জনের দায়-দায়িত্বশুদ্ধ রাজার দল দ্রুত গতিতে বিলুপ্ত হচ্ছে। জীবনের গুরুতর ক্ষেত্রে প্রজারঞ্জন আজ কে বা কারা করে, আদৌ কেউ করে কিনা জানিনা, তবে লঘুতর ক্ষেত্রে রাজার অভাবে রাজকাহিনী অন্ততঃ ক্ষণিক মনোরঞ্জনের ভার নিতে পারে। ভয়ংকর রাক্ষস-খোক্কস আর রোমাঞ্চকর পরী-হুরীরা পৃথিবীতে যাওয়া আসা বন্ধ করলে তাদের নিয়ে গড়ে ওঠা নানা উপকথা আর রূপ-কথাই শিশুজগতে আজও ভয় আর রোমাঞ্চের উৎস হয়ে আছে।

রাজাদের উৎপত্তি অবশ্য রঞ্জনের চেয়েও বেশী রক্ষণের প্রয়োজনে, এ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপাখ্যানটি বহুবিদিত। পুরাকালে সুরাসুরের যুদ্ধে যখন অসুরেরা ক্রমাগত জয়ী হতে লাগল তখন বিপন্ন দেবগণ বহু গবেষণার পর কারণ বুঝতে পারলেন,—অসুরগণ দলপতি নির্বাচন করে তার নির্দেশমত যুদ্ধ করে থাকে সুশৃংখলভাবে, ওদিকে দেবতারা ছিলেন স্বপ্রধান, নিজ নিজ ইচ্ছামত যুদ্ধ করে অসুরদের সম্মিলিত যুদ্ধ কৌশলের কাছে পরাজিত হন। অতএব এইবার দেবতারা দলপতি নির্বাচন করলেন—দেবরাজ। দেখাদেখি পৃথিবীর মানুষ প্রথম যে রাজা নির্বাচন করল তিনি হলেন মনু।

স্বর্গের রাজার মত পৃথিবীর রাজারও প্রথম কর্তব্য ছিল শত্রুনিপাত—এতেই প্রজারা খুসী থাকত। পরবর্তী যুগে সভ্যতা জটিল হওয়ার ফলে রাজার কর্তব্য যেমন বাড়ল, তেমনি বাড়ল তার জটিলতা। রাজার পক্ষে সুখের ব্যাপার এই যে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল তাঁর মহিমাও। নির্বাচনের অধিকার ঘুচল প্রকৃতিপুঞ্জের; রাজপদ হল পুরুষানুক্রমিক। বহু গুণান্বিত বিবিধ বিদ্যাধর রাজাকে সাধারণ প্রজার চেয়ে উপরে তুলতে তুলতে শাস্ত্রকাররা শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেঁছে দিলেন স্বর্গের কাছাকাছি। মনু ঘোষণা করলেন 'মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি;' অতএব জ্ঞান হোক, গুণ হোক, কর্তব্য বা আমোদ-প্রমোদ হোক, রাজসম্পর্কিত সবকিছুর জন্যই মর্যাদায়, গৌরবে, প্রমাণ সাইজের চেয়ে বেশ বড়ো একটা মাপ দাঁড় করান হল, যাকে বলা যায় 'রাজমাত্রিক'। তাই শাস্ত্রের নির্দেশ—রাজা যে শুধু বিনয়-শুশ্রূষা-শ্রবণ-গ্রহণ প্রভৃতি সর্বগুণে ভূষিত হবেন তাই নয়, হবেন শস্ত্রবিশারদ আর বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞও। তাঁকে জানতে হবে সংখ্যালিপি, বেদপুরাণ, দর্শনবার্তা, ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র। বহুবিধ রাজকার্যের মধ্যেও রাজাকে বিদ্যাবুদ্ধি সংযোগ করতে হতো জ্ঞানবৃদ্ধদের সাহচর্যে। শাস্ত্রমতে ধর্ম, জ্ঞান ও কর্মের চাহিদা মিটিয়ে আদর্শ রাজার হাতে থাকত বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ঘন্টা দুই আর ঘুমের জন্য মাত্র ঘন্টা তিনেক; কিন্তু সে রাজমাত্রিক ঘুমও নিশ্চিন্ত ছিল না, ষড়যন্ত্রের ভয়ে রাতে বারে বারে রাজাকে ঘর বদলাতে হত। সময় বাঁচাবার তাগিদেই যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মত রাজারা সভায় কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে অংগ সংবাহন করাতে করাতে বিচারকার্য নির্বাহ করতেন এবং কেশবিন্যাস করতে করতে দূতগণকে আপ্যায়ন করতেন তাতে সন্দেহ নাই।

রাজাদের অবকাশ বিনোদনের শাস্ত্রোক্ত রীতিনীতি ছিল বটে কিন্তু ধর্মকর্মে যেমন বিলাস অবকাশেও তেমন তাঁরা অনেক সময়ই শাস্ত্রের ব্যতিক্রম ও অতিক্রম দুই ঘটাতেন। অবকাশ চর্চায় এঁদের কেউ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের মত কবিরাজ (কবিশ্রেষ্ঠ) অথবা সংগীতজ্ঞ, কেউ বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মত রূপকৃতি-শিল্পী; হর্ষবর্ধন, মহেন্দ্রবর্মণের মত নাট্যকারেরও অভাব নাই রাজকুলে, বিচিত্রচিত্র মহেন্দ্রবর্মণ উপরন্তু ছিলেন চৈত্যকারী এবং চিত্রকারপুলী। কিন্তু সবাইকে হারিয়েছিলেন পরমার রাজা ভোজ। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ছিল সংখ্যায় আর বৈচিত্র্যে সত্যিই রাজমাত্রিক; সবসুদ্ধ তেইশখানি বই তিনি লিখেছিলেন কাব্য, ছন্দ, নীতি, দর্শন, অভিধান, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্থাপত্য বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে।

অবকাশ বিনোদনে রাজাদের রাজসিকতার যে বর্ণনা পাওয়া যায় শাস্ত্রে আর মুগ্ধ বিদেশীর বিবরণে তা রূপকথার মতই মোহন আর চিত্তাকর্ষক। মৃগয়া প্রভৃতি বিহার এবং সমাজানুষ্ঠান ছিল রাজাদের শ্রেষ্ঠ প্রমোদ। মৃগয়া সম্বন্ধে কৌটিল্যের নির্দেশ কৌতূহলোদ্দীপক ত বটেই, কৌতুকাবহও; রাজার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত এক বনে, অভয় বনে, থাকবে বাঘ প্রভৃতি নানা শিকারের জন্তু, কিন্তু তাদের নখ আর দাঁত থাকবে না, অসাবধানে বা অরক্ষিত অবস্থায়ও যাতে রাজার বিপদ না ঘটে। মেগাস্থিনিস প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের বিবরণীকে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলে ধরা হয়। এঁরা বলেন রাজা যখন প্রাসাদ থেকে শিকার করতে বার হতেন তাঁকে ঘিরে থাকত নারী রক্ষীবাহিনী; পথের পাশে দড়ি দিয়ে রাজার পথ চিহ্নিত করা হত, সে বাধা অমান্য করে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে এসে পড়ার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। রাজা সাধারণতঃ শিকার করতেন এক ঘেরা জায়গায় রথের উঁচু মঞ্চের উপর থেকে, আশেপাশে থাকত দু-তিনজন সশস্ত্র নারী শরীররক্ষী। খোলা জায়গায় শিকারের সময় রাজারা চড়তেন হাতীতে, সশস্ত্র নারী রক্ষীরা থাকত হাতী বা ঘোড়ার পিঠে কিম্বা রথে। প্রসংগতঃ বলা হয়েছে প্রজাবৃন্দের সামনে রাজা দর্শন দিতেন মুক্তোর ঝালর দেওয়া সোনার পাল্কীতে বসে, পরিধানে থাকত স্বর্ণখচিত লাল মসলীনের পোষাক। ভৃত্যেরা রূপোর ধূপদানে ধূপ বহন করে সারা পথ আমোদিত করত, চারপাশে রক্ষীবাহিনীর কারও হাতে থাকত অস্ত্রশস্ত্র, কারও হাতে গাছের ডালে থাকত বাকপটু শুকের দল।

মৃগয়া ছাড়া আরও নানাপ্রকার বিহারের উল্লেখ আছে প্রাচীন সাহিত্যে। এসব ক্ষেত্রে রাজা অবকাশ যাপন করতেন নৃত্যগীত উপভোগে, বিচিত্র হস্তকৌশল দর্শনে বা সুখাদ্য ভোজনে। তবে বেশ বোঝা যায় কোন কোন শাস্ত্রকার অপছন্দ করলেও মৃগয়াই ছিল জনপ্রিয় রাজক্রীড়া।

আমোদ-প্রমোদে আত্মকেন্দ্রিক হলে রাজাদের চলত না; শুধু রক্ষণ আর শাসন নয়, বিনোদনের

সাহায্যেও প্রজারঞ্জনের নির্দেশ আছে শাস্ত্রে। সমাজ উৎসব প্রভৃতি হ'ল প্রজার্থে প্রমোদানুষ্ঠান; এ উপলক্ষে কখনো তাদের আমিষাহারে তুষ্ট করা হত, কখনও বা নৃত্যগীত, মল্লযুদ্ধ, হয়ত বা অভিনয়ের ব্যবস্থাও হত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় বিশেষ উপলক্ষে বহু প্রজাকে ভোজন করান ছাড়াও প্রত্যহ বহু ব্যক্তিকে অন্নদান ছিল রাজার নিত্যকর্ম। মহাকাব্য-পুরাণের রাজারা অনেকে দিনে দু'চার হাজার প্রাণিহত্যা করতেন প্রজাভোজনের জন্য। অশোকের রন্ধনশালায় নাকি প্রথমে হাজার হাজার পশু বধ হতে; পরে তিনি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলে মাত্র দুটি হরিণ ও একটি ময়ূর বধ করা হত। তিক্তস্বাদ ময়ূরমাংসের রন্ধন প্রক্রিয়া কেমন ছিল কে জানে—হয়ত শুক্তো হত!

ভারতীয় রাজার আয়োজিত ধাবন প্রতিযোগিতা ও মল্লযুদ্ধের বর্ণনা আছে প্রাচীন
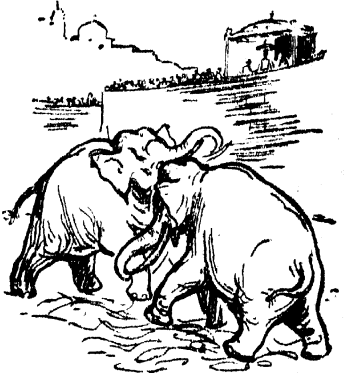
সাহিত্যে আর বিদেশী বিবরণীতে। রাজার নির্দেশমত বছরে একটি দিন মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনী হত, যেমন মানুষে মানুষে

লড়ত, তেমনি লড়ত বুনো ষাঁড় বা হায়েনা কিম্বা পোষা ভেড়া আর একশৃংগী গাধা; মহিষ, ছাগল এবং মোরগ প্রভৃতি পাখীর লড়াইও বেশ জনপ্রিয় ছিল। সবশেষে হত হাতীর লড়াই। যুদ্ধশেষে অনেক সময় উভয় পক্ষই মারা যেত। বাচ্চা কার্টাজোনের লড়াইয়ের কথা আছে এক বিদেশী বিবরণীতে; এ অদ্ভুত জীবটি আকারে বড় ঘোড়ার মত, হাতীর মত পা, পশম-নরম হলদে গায়ের লোম, মাথায় চূড়ো, দুই ভ্রূর মধ্যে তীক্ষ্ম প্যাঁচালো কালো রংগের শিং, গলার স্বর উচ্চ এবং উগ্র। পূর্ণ বয়স্ক কর্টোজোন ধরা অসাধ্য; কয়েকটি বাচ্চা ধরে পাঠান হয়েছিল রাজাকে।

জন্তুদের দৌড় প্রতিযোগিতা—বিশেষতঃ ষাঁড়ের দৌড় খুব জনপ্রিয় ছিল মনে হয়, আর ফলাফলের উপর রাজা প্রজা সবাই বাজি ধরত।

এক একটি রথে দুটি ষাঁড়ের মধ্যে একটি ঘোড়া যুতে দৌড় করান হত। ঘোড়ার চেয়ে জোরে দৌড়ায় এমন ষাঁড়ের উল্লেখ মেলে প্রাচীন সাহিত্যে। রাজার পোষা ষাঁড়ও কখন কখন প্রতিযোগিতায় নামত। সভাসদ, সাধারণ সবাই বাজি ধরত; ওদিকে রাজাও উত্তেজিত হয়ে রথে চড়ে সংগে সংগে থেকে ষাঁড় এবং চালককে উৎসাহ দিতেন। বলাই বাহুল্য যে রাজা অশোকের অবকাশ আর সব রাজার মত হাল্কা আমোদ-প্রমোদে কাটত না; মৃগয়া, বিহারযাত্রা, সমাজ প্রভৃতি গতানুগতিকভাবে না করে তিনি করতেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মযাত্রা, প্রজাদের মনোরঞ্জন করতেন ধর্মের উদাহরণ, ধর্মের কাহিনী, ধার্মিকের পুরস্কারের বিবরণ ইত্যাদি দেখিয়ে ও শুনিয়ে।

ভারতীয় রাজাদের সম্বন্ধে বিদেশী কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক হলো রাজার চুল ধোয়ান উপলক্ষে উৎসবের বর্ণনা। ভারতীয় সাহিত্যে এর কোনও উল্লেখ নেই, অনেকে তাই মনে করেন যে, এটা পারসিক প্রথার অনুকরণ। বিরাট এক উৎসব হত রাজার চুল ধোয়া উপলক্ষে; সভাসদ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের সংগে পাল্লা দিয়ে রাজাকে ভেট দিয়ে সংগে সঙ্গে নিজেদের সম্পদ প্রচার করতেন। যে শোভাযাত্রা বার হত তাতে সৈন্যবাহিনী ছাড়াও থাকত সোনারূপোয় সুসজ্জিত হাতীর দল, সোনার ঘড়া-গামলা প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরখচিত তামার আসবাবপত্র, স্বর্ণখচিত পোষাক, বাইসন, চিতা, সিংহ প্রভৃতি পোষা জন্তু। এর অধিকাংশই যে উৎসব উপলক্ষে রাজার পাওয়া উপহার তাতে সন্দেহ নাই। প্রজাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ ব্যাপারে রাজার উদাসিকতা ছিল না; বন্য কার্টাজোন ও পোষা মুখহীন বনমানুষের মত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত জীব থেকে সুরু করে একশৃঙ্গী গাধা, নানাপ্রকার হরিণ, মাছ এমনকি সামান্য বক, হাঁস মুরগী তিতির পায়রা পর্যন্ত সবই তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। এই মুখহীন বনমানুষদের পক্ষে ঘ্রাণ গ্রহণ-ই ছিল ভোজন; ভোজ্য ছিল সেঁকা মাংসের গন্ধ, ফলফুল প্রভৃতির সুগন্ধ আর দুর্গন্ধ ছিল এদের পক্ষে মর্মান্তিক ক্লেশকর।

রাজপ্রাসাদের বর্ণনা ছাড়া রাজকাহিনী নিতান্ত অসম্পূর্ণ, বিশেষতঃ সে রাজপ্রাসাদ যদি হয় বিদেশীদের মতে পারস্য রাজপ্রাসাদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অপূর্ব কৌশল ও আড়ম্বরে সজ্জিত প্রাসাদের থামে ছিল সোনার লতা-পাতার মাঝে মাঝে রূপোর পাখী বসান। রাজোদ্যানে কাকাতুয়া, শুক, ময়ূর, পায়রা প্রভৃতি বহু প্রকার পোষা পাখী স্বেচ্ছাবিহার করত। বিশেষ যত্ন করে নানা রকম গাছ পালন করা হত এখানে। বিদেশ থেকে নানা দুষ্প্রাপ্য গাছ আনিয়ে তার বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থাও ছিল। কৃত্রিম সরোবরে বড় বড় মাছ ঘুরত; এখানে মাত্র রাজপুত্রেরাই নৌচালনা ও মৎস্য শিকার করতে পারত। অশোকের সময়ও বিদেশ থেকে গাছ আনা হত বলে জানা যায়; মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য বিরাট রাজমাত্রিক ব্যবস্থাই করেছিলেন তিনি বিদেশ থেকে বহু ভেষজ বৃক্ষলতা মূল প্রভৃতি আনিয়ে।

বিংশ শতকের গণতন্ত্র সমস্ত মানমর্যাদাসমেধ রাজাকে বিসর্জন দিলেও গণমানসে যে চিরন্তন শিশুটি লুকিয়ে আছে তার কল্পনার সাধের সিংহাসনে রাজার চাহিদা আজও কমেনি, এরই তাগিদে স্বাধীন গণরাষ্ট্রের মানুষও ছোটে অন্য দেশের রাজদর্শনে মুক্তকচ্ছ ব্যগ্রতায়। এই চাহিদার নিপুণ যোগান দিতেই অনেক গণতন্ত্র শেষ অবধি হয় বহুরাজকতন্ত্র। গণরাষ্ট্রের উৎসব হয় জাঁকজমকে রাজমাত্রিক। এখন আর বছরে দুচারবার রাজা পথে বার হন না; মাসে দুচারবার দুদশজন রাজক বা ভিপ্ কি ভিভিপ্ পথে নামেন; তখন পথের যানবাহন থেমে যায় নয়ত ঘুরে যায়, সাধারণ লোক ওঠে ফুটপাথে। পথের পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে লগুড়াস্ত্র-ধারী রক্তশীর্ষ রক্ষীবাহিনী, আর পথের মধ্য দিয়ে তাঁরা চলে যান,—"পথের দুই ধারে অগণিত নরনারী বিপুল হর্ষধ্বনি করে।"

—

"অথচ প্রেমের একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই।"

অন্তিম-শয্যায় শয়ান নিমীলিত-নেত্র বাঞ্ছারাম। কাছেই একটি চেয়ারে আমি বসিয়া আছি। ওঘরের ঘরে বসিয়া—আমি এঘর হইতেই দেখিতে পাইতেছি—জনার্দন ডাক্তার (হোমিওপ্যাথ) মেটিরিয়া মেডিকা (অর্থাৎ ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ) পড়িতেছেন। তিনিই অন্তিম শয্যাশায়ী বাঞ্ছারামের চিকিৎসার ভার-প্রাপ্ত ডাক্তার এ বাড়ির—অর্থাৎ বাঞ্ছারামের মাসির বাড়ির—ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। বাঞ্ছারামের কথা শুনিয়া জনার্দন ডাক্তার মেটিরিয়া মেডিকা হইতে মুখ তুলিয়া এদিকে তাকাইলেন। আমিও অবাক হইয়া ভাবিলাম "একি? অন্তিম শয্যায় শুইয়া বাঞ্ছারাম প্রেমের পাঠশালার অভাব বোধ করিতেছে কেন? বোধ করিলেও সেজন্য এমন খেদ প্রকাশ করিতেছে কেন? তাহার প্রাথমিক 'অথচ'-টারই বা অর্থ কি? তবে এতক্ষণ ভিতরে ভিতরে প্রেম সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিয়া সে শেষ পর্যন্ত প্রেমের পাঠশালায় আসিয়া ঠেকিয়াছে!"

দেখিলাম জনার্দন ডাক্তারের মুখ পুলকে উদ্ভাসিত। অন্তিম শয়ান রোগীর মুখে প্রেমের পাঠশালা প্রসঙ্গ শুনিয়াও তাঁহার মুখমন্ডলে উদ্বেগের এতটুকু চিহ্ন নাই!

বাঞ্ছারাম নিমীলিত নেত্রেই গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল:

"বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি?"

কথা রবীন্দ্রনাথের, সুর বাঞ্ছারামের। রবীন্দ্রনাথের যে কোনও গান বাঞ্ছারাম গাহিলে শুধু কথাগুলির সাহায্য ছাড়া তাহাকে রবীন্দ্র-সংগীত বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে না, গায়ক বাঞ্ছারামের ইহাই বিশেষত্ব।

গান শেষ করিয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "বিশ্ব-জোড়া কিসের ফাঁদ ......প্রেমের।"

আমি নীরব। ওঘরে জনার্দন ডাক্তারের পুলক বাড়িল। বাঞ্ছারাম বলিতে লাগিল অখ্যাত কবি বলেছেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। ঋষি বঙ্কিম প্রশ্ন করেছেন: যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? অর্থাৎ প্রেমের জোয়ার রুখবে কে? এই ফাঁদ, এই জোয়ার এড়ানো অসম্ভব, অবাস্তব, অবাঞ্ছনীয়, অচিন্তনীয়, অনাবশ্যক। প্রেম জীবনের উৎস, প্রেমই জীবনের সার্থকতা, প্রেম মৃত্যুর মতো অমোঘ। জীবনে প্রেমের আসন সবার ওপরে। সাহিত্য, সঙ্গীত, সাঁতার, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, নাচ, ছবি আঁকা, খেলা-ধুলো, অ্যাকাউন্ট্যান্সী, লড়াই সব তার নীচে; তবু এদেরই ইস্কুল, কলেজ, ইউ-নিভার্সিটি আছে, অথচ প্রেমের একটা পাঠশালা পর্যন্ত নেই।"

কিন্তু তাহাতে বাঞ্ছারামের কি? তাহাকে তো কোনোদিন প্রেমের ছায়াও মাড়াইতে বা প্রেম সম্বন্ধে এতটুকু মাথা ঘামাইতে দেখি নাই। তবে কি প্রেম-তত্ত্ব এতদিন তাহার মনের অবচেতন স্তরে ধামা চাপা ছিল, এখন অব-চেতনার ধামা উল্টাইয়া চেতনার স্তরে উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে?

উদ্বিগ্নচিত্তে জনার্দন ডাক্তারের দিকে তাকাইতেই তিনি দুই হাত ও মাথা নাড়িয়া যেভাবে ইসারা করিতে লাগিলেন তাহাতে মনে হইল তিনি আমাকে শুনো উঠিতে বলিতেছেন। ইসারার অর্থ বুঝিবার জন্য তাঁহার কাছে উঠিয়া যাইতেই তিনি ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, উস্কে দিতে বলছিলাম। সোজা ইসারা বোঝেন না কেন?"

আমি বিস্মিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, "বাঞ্ছারাম যে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে।"

"উস্কে দিয়ে আরো বকান।" বলিলেন, জনার্দন ডাক্তার। "প্রলাপ যতটা পারেন বার করে নিয়ে আসুন। ভেতরে জমতে দেওয়া বিপজ্জনক। যান, যান আর দেরি করবেন না।"

দেরি করিলাম না। তাড়াতাড়ি আমার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া শুধাইলাম "কি বলছিলে, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "বলছিলাম প্রেম শিক্ষার বিরাট এবং ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশ আজো বুঝতে পারেনি, তাই আমাদের দেশে প্রেম শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। আগে সাঁতার-বিদ্যে না শিখে আমরা ডুব-জলে নামিনে, অথচ প্রেম বিদ্যের কোনো রকম হাতে খড়ি ছাড়াই আমাদের হাজার হাজার, লাখ-লাখ সবুজ—ওঃ!"

প্রেম-বিদ্যায় শিক্ষালাভ না করিয়াই আমাদের দেশের অসংখ্য সবুজ প্রাণ প্রেমের মাঠে নামিয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছে, ইহার ফলে আমাদের দেশের যে কি সর্বনাশ হইতেছে এবং সে বিষয়ে আমরা কি ভীষণ এবং শোচনীয়ভাবে অচেতন ও নির্বিকার, তাহা চিন্তা করিয়া বাঞ্ছারাম অসহ্য বেদনায় কিছুক্ষণের জন্য দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া রহিল। তারপর নিজেকে একটু সামলাইয়া নিয়া বলিল, "ভেবে-ছিলাম এই অন্ধ দেশের চোখ খুলে দেবার জন্যে প্রেম-মহাভারতীর পত্তন করে দিয়ে যাব, কিন্তু ভগবানের মার—ঝপাং করে পড়ে গেলাম অন্তিমশয্যায়।"

"প্রেম-মহাভারতী কি জিনিষ, বাঞ্ছারাম?"

"প্রেমের আবাসিক মহাবিদ্যায়তন, মানে রেসিডেনশিয়াল ইউনিভার্সিটি। তিন বছরের কোর্স। মোটামুটি একটা খসড়া শিক্ষাক্রম, অর্থাৎ সিলেবাসও ভেবে রেখেছিলাম। প্রেমের ইতিহাস, প্রেমের ভূগোল, প্রেমমনস্তত্ত্ব, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-জীবন কথা, প্রেম-নিবেদন বিজ্ঞান, প্রেমপত্র-রচনা পদ্ধতি, প্রসাধন বিদ্যা, প্রেম-সঙ্গীত, প্রেমের কবিতা রচনা, নৃত্য, নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ পরিচয়—"

এইখানে বাঞ্ছারামকে থামাইয়া দিয়া শুধাইলাম "এটি কি জিনিষ, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "মনে করো তুমি নর্মদা চাটুজ্যের প্রেমে পড়েছ। এখন, তার হৃদয় জয় করতে হলে তোমাকে জানতে হবে নর্মদা কোন্ জাতের নায়িকা—পদ্মিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, না চিত্রিনী। সেইটে জানতে হলে এই চার জাতের নায়িকার লক্ষণগুলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকা আবশ্যক; ঐ লক্ষণ মিলিয়েই তোমাকে নর্মদা চাটুজ্যের নায়িকা-জাতি নির্ণয় করে তারি ভিত্তিতে প্রেম নিবেদন, প্রেমপত্র-রচনা ইত্যাদি করতে হবে। হোমিওপ্যাথিক লক্ষণ বিচারের মতো আর কি। অ্যাকোনাইটের কেসে বেলেডোনা, কিম্বা বেলেডোনার কেসে অ্যাকোনাইট দিলে চলবে না। নায়িকা-লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েই তো ভোম্বলের প্রেম জীবনটা ম্যাসাকার হয়ে গেল। আর সেই জন্য—"

আবেগে বাঞ্ছারামের কণ্ঠ এইখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রশ্ন করিলাম "সেই জন্যে কি, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "সম্পূর্ণ দায়ী আমি। ভোম্বলের প্রেমপত্রগুলো আমিই খসড়া করে দিয়েছিলাম—চিঠিপিছু নগদ পাঁচ সিকে করে আদায় দক্ষিণাও আদায় করেছিলাম। মোট সওয়া ছ' টাকা।"

"কিন্তু তাতে তোমার অপরাধটা কোথায়?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "ভোম্বলের নায়িকা যদি পদ্মিনী জাতের হতো তাহলে ঐ প্রেমপত্রগুলো মিশ্চিত বাজী মারত; কিন্তু সাগরিকা ভট্টশালী ছিল শঙ্খিনী নায়িকা। পদ্মিনীর হাতে যে চিঠিগুলো ধন্বন্তরীর কাজ দিত, শঙ্খিনীর হাতে পড়ে তাদেরই ফল হল মন্বন্তরী। সাগরিকা মালা পরাল চিদানন্দ চাটুজ্যের গলায়। ভোম্বলের জীবনটা ট্র্যাজেডি হয়ে গেল। সওয়া ছ' টাকা ওকে পুরো ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার ভুলে যে ওর জীবনটা ম্যাসাকার হয়ে গেল তার ক্ষতিপূরণ করব কি দিয়ে?"

বলিলাম, "বাঞ্ছারাম, নায়িকাদের যে এত রকম লক্ষণ আছে তা তো তোমার কাছে আগে কখনো শুনিনি!"

বাঞ্ছারাম বলিল, "আমিই কি আগে জানতাম? দৈবাৎ যখন প্রেমনাথ তর্কবাচস্পতি মশায়ের মুখে শুনলাম, তখন টু লেট, তার আগেই ভোম্বলের সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। মাত্র একটি ভোম্বলই নয়, কত শত ভোম্বলের জীবন আর হৃদয় এমনি ভুলের আগুনে পুড়ে নীরবে গোপনে তিলে-তিলে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তার হিসেব কে রাখে?"

বলিলাম, "প্রেমিকদের যেমন নায়িকা-লক্ষণ জানা দরকার, প্রেমিকাদেরও তেমনি নায়ক-লক্ষণ জানতে হবে তো?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "সেই জন্যেই তো প্রেম-মহাভারতীর সিলেবাস প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ পরিচয়ের কথা বলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম "বাঞ্ছারাম, তোমার প্রেম-মহাভারতীতে কি কো-এডুকেশন, অর্থাৎ সহ-শিক্ষা চালু?"

বাঞ্ছারাম বলিল "নিশ্চয়। সহ না হলে প্রেম হবে কি করে? অবশ্য ছাত্রদের আর ছাত্রীদের আলাদা হোস্টেল থাকবে। অধ্যাপক আর অধ্যাপিকাদেরও তাই। কমন রুম একটাই থাকবে, লাইব্রেরীও একটা। কিছু কিছু ক্লাস মেয়েদের অর্থাৎ ভাবী নায়িকাদের জন্য আলাদা থাকবে—যেমন রান্না, লুচি ভাজা, সোয়েটার বা মাফলার বোনা।"

"প্রেম-মহাভারতীতে এ সবের ক্লাশও থাকবে?"

"বাঃ, নায়িকারা নায়কদের পোলাও রান্না করে, লুচি ভেজে খাওয়াবে না? সোয়েটার, মাফলার বুনে দেবে না? প্রেম জন্মাতে এ সব খুবই দরকারী। বিশেষ করে খাওয়ানোটা যে প্রেমের জগতে ভীষণ দামী।"

শরৎবাবুর উপন্যাসের নায়িকাদের কথা মনে পড়িল। মনশ্চক্ষে দেখিলাম 'পল্লী সমাজ'-এ রমা রমেশকে, 'শেষ প্রশ্ন'-তে কমল শিবনাথকে, 'চন্দ্রনাথ'-এ সরযূ চন্দ্রনাথকে খাওয়াইতেছে।

বাঞ্ছারাম বলিল, "পরীক্ষা থাকবে তিন রকমের—লিখিত, মৌখিক আর হাতে কলমে। থিওরেটিক্যাল, ভাইভা-ভোসি, আর প্র্যাকটিক্যাল।"

"প্রেম-মহাভারতীতে প্রেমের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশও হবে তাহলে?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "নিশ্চয়। এ সব ক্লাসের জন্যে থাকবে বাগান, কুঞ্জ, গাছতলা, পুকুরের পার, অর্থাৎ যথাসম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রেমের তত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি শেখার আসল উদ্দেশ্যই হলো ভালো করে প্রেম করতে শেখা। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ছাড়া হাতে-কলমে প্রেম করা শেখানো হবে কি করে? প্রেম-মহাভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা তা না হলে শেষকালে উপাধি পরীক্ষায় ফেল করবে যে!"

কৌতূহলী হইয়া শুধাইলাম "প্র্যাকটিক্যাল, অর্থাৎ হাতে-কলমে পরীক্ষাটা কি ধরণের হবে, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম একটু ভাবিল। বুঝিলাম এ বিষয়ে মনে মনে একটা মোটামুটি ঝাপসা রকমের খসড়া মাত্র সে করিয়া রাখিয়াছে, খুঁটিনাটিগুলি এখনো ঠিক করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "অনেকটা আগাম প্রস্তুতি ছাড়া নাট্যাভিনয়ের মতো। একটা উদাহরণ দিই। মনে করো তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ। স্থানঃ পুকুরের পাড়। চাঁদ হাসছে আকাশে। তুমি একা বসে আছ সবুজ ঘাসের ওপর। এমন সময় জ্যোছনা মাখানো সবুজ ঘাসে মৃদু পা ফেলে ফেলে এসে হাজির কে ঐ সুন্দরী? কোন্ সুন্দরী বা কি ধরণের সুন্দরী আসবেন তা তোমার আগে জানা ছিল না, কিন্তু তোমায় আগেই বলা ছিল যিনিই আসুন না কেন, তুমি প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়ে যাবে আর তাঁর প্রেম লাভ করবার জন্যে যা করবার করবে, মোট সময় পনেরো মিনিট।"

"আমাকে বলা ছিল? কে বলেছিলেন?"

"পরীক্ষকমণ্ডলী, যাঁরা খাতা পেন্সিল নিয়ে অদূরে বসে আছেন পাশাপাশি।"

"খাতা পেন্সিল নিয়ে কেন?"

"তোমাকে নম্বর দিতে। ও'দের প্রত্যেকের খাতায় আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য ঘর কাটা আছে, কন্ঠস্বর, আবেগ, ভাবভঙ্গি, ভাষা নায়িকা-জাতি-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্যে দশ নম্বর করে মোট একশো নম্বর। সুন্দরীর চেহারা, চলাফেরা, ভাব-ভঙ্গী দেখে আর কণ্ঠস্বর শুনে তুমি পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলবে সুন্দরী পদ্মিনী, না শঙ্খিনী, না হস্তিনী, না চিত্রিনী। এই গেল দশ নম্বর। তারপর শুরু বাকি নব্বুই নম্বরের পরীক্ষা। তুমি ভুলে যাও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর সব কিছু, শুধু মনে রাখো এই সুন্দরীর প্রেম তোমাকে জয় করতে হবে, মোট সময় মাত্র পনেরো মিনিট। অর্থাৎ সুন্দরী কি জাতের নায়িকা, সেইটে ঠিক করতে তোমার যদি দু মিনিট লেগে থাকে, তাহলে আর তেরো মিনিট বাকি।"

আমি ধাঁধাগ্রস্ত হইয়া শুধাইলাম "এই তেরো মিনিট আমি কি করব, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "কি করবে, সেটাই তো

তোমার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা, তারই ওপর নম্বর।"

শুধাইলাম "এই পরীক্ষায় পাশ করলে প্রেম-মহাভারতী থেকে কি উপাধি পাওয়া যাবে, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম একটু ভাবিয়া বলিল, "মেয়েরা হবে প্রেমশ্রী, আর ছেলেরা প্রেম-বিশারদ। প্রেম-বিজ্ঞান আর প্রেম-দর্শন থাকবে এদের নখ-দর্পণে, প্রেম সম্বন্ধে এরা হবে এক একজন বিশেষজ্ঞ, অথরিটি। এরা প্রচার করবে প্রেম-মহাভারতীর মহান আদর্শ। প্রেম-মহাভারতী সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে শাখায় উপশাখায়। ক্রমে এর মতো আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। তারপর চার নম্বর পাঁচসালা পরিকল্পনা দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে এদের সহায়তায়। অন্তিমশয্যায় শুয়ে শুয়ে আমি সেই সোনালী দিনের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি, যেদিন এদেশে আনাড়ি প্রেম, আনাড়ি প্রেমিক আর আনাড়ি প্রেমিকা থাকবে না, যেদিন—"

"এইবার একটু বিশ্রাম করো বাঞ্ছারাম।" জনার্দন ডাক্তারের কণ্ঠস্বর। বুঝিলাম বাঞ্ছারামের আর প্রলাপে তাঁহার ডাক্তারী প্রয়োজন নাই যতটা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

বাঞ্ছারাম বলিল, "তাহলে কথা দিন আমি চলে গেলে আমার প্রেম-মহাভারতীর স্বপ্ন সফল করে তুলবেন।"

"দিলাম।" দৃঢ় এবং নির্ভেজাল সত্য-ভাষণের সুর জনার্দন ডাক্তারের কণ্ঠে। মনে হইল বাঞ্ছারাম নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটু ক্ষণের জন্য চোখ বুজিয়া আনমনা হইল, এই ফাঁকে আমি জনার্দন ডাক্তারকে কানে কানে বলিলাম, "একি করলেন আপনি? কথা যে দিলেন, রাখতে পারবেন?"

জনার্দন ডাক্তার আগেকার চাইতেও দৃঢ়তর কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "জনার্দন ডাক্তারের কথার খেলাপ হয় না মশায়।" তারপর বাঞ্ছারামকে বলিলেন, "সস্তা সিনেমা আর সস্তা উপন্যাসের প্রেম যেভাবে পাইকারী হারে বাজার ছেয়ে ফেলেছে, তাতে শুধু এক জায়গায় একটা প্রেম-মহাভারতী রেসিডেনশিয়াল ইউনিভার্সিটি খুলে বসে থাকাই যথেষ্ট নয় বাঞ্ছারাম, দেশের অলিতে-গলিতে প্রেম-মহাভারতীর ব্রাঞ্চ খোলা দরকার।"

বাঞ্ছারাম বিগলিত কণ্ঠে বলিল, "খুলবেন।"

আমার মনে হইল জনার্দন ডাক্তার বাঞ্ছারামের অন্তিমশয্যার সুযোগ নিয়া তাহাকে বড় বেশি আশা দিতেছেন, ইহা তাঁহার অসাধু ধাপ্পা অথবা ছলনা মাত্র। ইহা উচিত নহে।

বলিলাম, "ব্রাঞ্চ খুলবার আগে সর্বপ্রথম মূলে প্রেম-মহাভারতীর পত্তন করা দরকার।"

জনার্দন ডাক্তার অম্লান বদনে বলিলেন "করব।" ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে দ্বিধা, সংশয়, কুণ্ঠা, উদ্বেগ প্রভৃতির লেশমাত্র নাই। যেন তিনি একটি তুড়ি মারিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-মহাভারতী গজাইয়া উঠিবে। এতটা আমার সহ্য হইল না। বাঞ্ছারামের সামনেই বিষয়টা পরিষ্কার হইয়া যাওয়া দরকার বিবেচনা করিয়া বলিলাম, "জায়গা দরকার। বাড়ি দরকার। টাকা দরকার। যোগাবে কে?"

তেমনি অম্লান বদনে জনার্দন ডাক্তার বলিলেন, "কাঁঠালিয়ার মহারাজা। ওর চার-চারটে এলাহি বাগান বাড়ি—বাংলো, দালান, বাগান, পুকুর, কুঞ্জ সব কমপ্লিট। যে কোনো একটা হলেই আমাদের চলে যাবে। গোড়ায় যা টাকা লাগবে, সে তো মহারাজের হাতের ময়লা। তারপর ডোনেশন, অর্থাৎ কিনা চাঁদা তোলা যাবে।"

আমি বলিলাম "কাঁঠালিয়ার মহারাজ কি আপনার—"

জনার্দন ডাক্তার বলিলেন "আমার এক পেশেন্টের মানিব হচ্ছেন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর মেজো শালা।" সুতরাং মহারাজার বাগানবাড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও ভাবনা নাই জনার্দন ডাক্তারের।

বাঞ্ছারাম চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। আমার মনে এইবার নানা প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল ; প্রেম-মহাভারতীর ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা হইবেন কাহারা? বেতনের হারই বা কিরূপ হইবে? এখান হইতে যাহারা 'প্রেমশ্রী' ও 'প্রেমবিশারদ' হইয়া বাহির হইবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (অর্থাৎ 'ফিউচার প্রস্‌পেক্ট') কিরূপ? প্রেম-মহাভারতীতে প্রেম সম্বন্ধে গবেষণা ও ডক্টরেটের ব্যবস্থা থাকিবে কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব প্রশ্ন তুলিবার উপক্রম করিতেই জনার্দন ডাক্তার ব্রেক কষিয়া দিলেন। বলিলেন "ওসব তুচ্ছ খুঁটিনাটি আমরাই ঠিক করে নেবো'খন। প্রেম-মহাভারতীটা বেশ পোক্ত ভাবে চালু হয়ে গেলে পর কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে কয়ে বুঝিয়ে সাহিত্য-আকাদামির মতো একটা প্রেম-আকাদামির পত্তন করাতে হবে। কি বলো বাঞ্ছারাম?"

"করাবেন।" বলিয়া তারপর বাঞ্ছারাম হঠাৎ বলিয়া উঠিল "একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি। লাভ ইজ স্যাক্রিফাইস, প্রেমের আত্মাই হচ্ছে ত্যাগ। ওটা পয়লা বছরের গোড়াতেই শেখাতে হবে—কম্‌পালসরি কোর্স। ত্যাগে পোক্ত না হলে প্রেম শেখার কিছুই হবে না।"

সুতরাং ঠিক হইল প্রেম শিক্ষার সিলেবাসে 'ত্যাগ' বিষয়ে তাত্ত্বিক (থিয়োরেটিক্যাল—লিখিত ও মৌখিক) এবং হাতে-কলমে (প্র্যাকটিক্যাল) পরীক্ষায় মোট দুই শত নম্বর থাকিবে এবং ত্যাগ পরীক্ষায় শতকরা পঁচাত্তর নম্বর না পাইলে প্রেম-মহাভারতীর ছাত্র বা ছাত্রী থাকা চলিবে না।

মনে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব লইয়া

সায়ন্তনী
শ্রীশান্তি পাল

হের ওই সান্ধ্যলক্ষ্মী ধীরে ধীরে উঠে,
গোধূলির মন্দ্র-মুগ্ধ সায়াহ্ন আকাশে,
শান্তির সম্পুটখানি লয়ে করপুটে,
রাত্রির তপস্যা টুটে কৌমুদী-বিলাসে।
নক্ষত্র সমাজ তারে কুতূহলে ঘিরে
স্নেহে বর্ষে লাজ-দ্যুতি নতশিরে তার;
তরঙ্গিত সমুদ্রের ফেনাইত নীরে
বার বার প্রতিবিম্ব ভাঙে চন্দ্রমার।
ঝিল্লীর আসর বসে বনসভা মাঝে,
পল্লীবধূ জ্বালে দীপ তুলসীর তলে;
দেবালয়ে আরতির শঙ্খ-ঘন্টা বাজে,
কুমুদীরা মেলে চোখ সরসীর জলে।
সন্ধ্যার অম্লান ছবি ধরা দিল প্রাণে,
যাহার পরশ লভি নিশীথের গানে।

শুধাইলাম "ত্যাগের কোর্সটা কি রকম হবে বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বোধহয় অন্তিম শয্যায় অতটা মাথা খাটাইতে চাহিল না, তাই জনার্দন ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইল।

জনার্দন ডাক্তার বলিলেন "সেজন্যে ভাবতে হবে না। আমি ভেবে চিন্তে একটা বেশ কড়া রকমের কোর্স মুসাবিদা করবো'খন। এই ধরুন পুরো এক মাস রোজ একবেলা শুধু নিমপাতা ভাজা দিয়ে নুন ছাড়া আধপেটা ভাত খাওয়া, বালিশ-বিছানা ত্যাগ করে মাটিতে শয়ন, গোঁফ-দাড়ি কামানো ত্যাগ, সিনেমা-রেডিও খবরের কাগজ ত্যাগ ইত্যাদি। এই কোর্স যে পাশ করবে ত্যাগে সে নির্ঘাত পোক্ত হয়ে উঠবে। এবারে তুমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও বাঞ্ছারাম। আমরা আসি। আসুন মশায়।"

বাঞ্ছারাম বাধ্য হইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। আমি বাধ্য হইয়া জনার্দন ডাক্তারের সঙ্গে চলিলাম।

ডাক্তারকে শুধাইলাম "কিন্তু ত্যাগ বিষয়টা অমন কড়াকড়ি রকম বাধ্যতামূলক করলে প্রেম-মহাভারতী ক'জন ছাত্রছাত্রী পাবে?"

জনার্দন ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বলিলেন "সে ভাবনা আমাদের নয় মশায়।"

রাস্তার ওপার থেকেই ওভারকোটের কলারটা তুলে দিল লোকটি। চিবুকটা গলার কাছে ঝুঁকিয়ে চটপট রাস্তা পার হ'য়ে আসে। এপারে পাশের দোকানের সামনে দু'টি লোক। তা'রা ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হয়ে চায়। এত শীতেও একটা ভিখিরী বুড়ো একটি হাত প্রসারিত ক'রে দিয়ে একঘেয়ে গলায় পয়সা চেয়ে যাচ্ছে। সে ঘোলাটে চোখে অবাক হয়ে তাকায়। ঠিক গেটের মুখে একটি রোগা কুকুর নিজের শরীর গুটিয়ে-সুটিয়ে একফোঁটা উত্তাপ আহরণের চেষ্টায় ব্যস্ত। তাকে লাথি মেরে সরিয়ে লোকটা ঢুকে যায়। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে না। বিরক্তিসূচক একটা গর-গর শব্দ করে। তারপর উঠে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। কুকুরটা ভাল জাতের। পাহারাদার কোন বিদেশী কুকুর। অনাহার ও বার্ধক্যে কাঁকলাস হয়ে গেছে।

লোকটি ঢোকে। লম্বা এবং সরু করিডোর। তারপর বারান্দা। সারি সারি ঘর। সবই তালাবন্ধ। সে লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

সিঁড়ির মুখে মিটমিটে বাল্ব। সিঁড়ির এক পাশে ছবি আঁকা কাঁচের প্লেট, বিবর্ণ বাঘছাল এবং ভাল ভাল বিলিতী ছবির নকল, ফ্রেমে বাঁধানো।

ওপরেও কয়েকটি ঘর। তালাবন্ধ। সিলিং থেকে আর একটা মিটমিটে বাতি ঝোলে। লোকটি শেষের ঘরটিতে ঢোকে।

একটি উচ্চশক্তির আলো জ্বলছে।

এ ঘরে পালকের গদী দেওয়া উঁচু পালঙ্ক, সোফা সেটি ও কুশন দেওয়া শক্ত শক্ত পিঠখাড়া চেয়ার। বড় বড় দরজা, বড় বড় জানলা। ঘরটা বেশ বড় তবে অনেক জিনিসপত্তরে বোঝাই ব'লে মনে হয় জায়গা নেই। কার্পেট আছে, পেতলের ফুলদানী আছে, হরিণের শিঙের ওপর জয়পুরী পেতলের থালা বসানো সেণ্টার টেবিল আছে।

সবই আছে, তবে কোন ছিরিছাঁদ নেই। মনে হয় বসবার ঘর, খাবার ঘর, পড়বার ঘর সকল ঘর খালি ক'রে এ ঘরটি বোঝাই করা হয়েছে।

লোকটি অবশ্য এ সব ভ্রূক্ষেপ করে না। সে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখানে এল। এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'চোদ্দ বছর বাদে দেখা হলো, কথাটা বোধহয় খাপছাড়া লাগবে। তবু বলছি মীরা, ঘরটা দেখেই মনে হল যেন বীণাপাণি থিয়েটারের গুদাম ঘর। এখনি সব টেনে নিয়ে যাবে স্টেজে সেট সাজাতে। জানি না, কেন ঐ কথাটাই মনে পড়ল।'

লোকটির গলা ভারী এবং ভাবলেশহীন। সে বসল একটি চেয়ার টেনে। সামনের দিকে চাইল। বলল, 'কেমন আছ?'

ভদ্রমহিলার বয়স প'য়তাল্লিশ থেকে ষাট যে কোন একটা হতে পারে। রংটা হলুদ, চুল কাঁচা-পাকা। একটি উঁচু চেয়ারে বসে আছেন তিনি। গায়ে কালো আলোয়ান জড়ানো। হাঁটু থেকে কেমন যেন দেখায় লক্ষ্য করলে বোঝা যায় হাঁটুর পর পা দু'টি নেই। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় শাড়ী ঝুলছে। তিনি খুব একটা চমকে উঠলেন না। দেখে মনে হওয়া মুস্কিল চোদ্দ বছর বাদে ও'দের দেখা হচ্ছে।

তাঁর গলা ক্ষীণ এবং কেমন যেন ফিসফিস করে কথা বলেন। তিনি বললেন, 'বীণাপাণি থিয়েটারের কথা ত' মনে হবেই তোমার। সেখানেই আলাপ কি না! আর কি যেন জিগ্যেস করলে? ভালই আছি।'

লোকটি হঠাৎ অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসে। তার চোখ ছোট দৃষ্টি ধারালো, ভুরু ঘন।

'তুমি ত ভালই আছ মদন। তা থাকবে না কেন বল, তোমার মতো লোকরা ভালই থাকে।'

'তার মানে?' লোকটি জিগ্যেস করে এবং সাথে সাথেই বেশ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে নিজের চওড়া হাতখানা দেখে।

'সত্যি, তুমি একটুও বদলাওনি।'

এই কথাটি শুনে মদন বক্সী এতক্ষণে যেন সোয়াস্তি পায়। সে একটু হাত-পা মেলে বসে। বলে, 'জান, এমন ক'রে আজকাল কেউ কথা বলে না আমার সঙ্গে। এমন ভাল লাগল!'

'কি মনে হলো? মাঝখানে এতগুলো বছর যেন মিথ্যে? কিছুই যেন ঘটেনি, কিছুই না? আমি আর তুমি ছাতে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর গল্প করছি? দেখছি সীতেশ এল কিনা!'

হেসে উঠলেন মীরা দেবী। তাঁর হাসিতে শুধু অপরিমিত লাবণ্য ঝরল না। সেই সঙ্গে যেন বয়সের ভারও ঝরলো অনেকটা।

মদন বক্সী যেন আরো একটু আলগা হবার প্রশ্রয় পেল। সে বলল, 'সত্যি, মনে হয় সেদিনের কথা!'

'তুমি বদলাওনি মদন! স্বভাবটা তোমার একই রকম আছে।'

'কেন, এ কথা কেন মীরা?'

'বাঃ, আসবার সময়ে তুমি রতনকে লাথি মারলে না?'

'কাকে?'

'রতনকে। আমার কুকুরকে। আমি ওর গরগর শুনলাম। তারপরই তুমি ঢুকলে এ ঘরে। তুমি বোধহয় জান না রতনকে কেউ মারে না এ বাড়ীতে। আসলে তোমাকে দেখলে আমার বেশ লাগে। সীতেশ বলতো তুমি তোমার স্বভাব ছাড়তে পারবে না। কিছুতেই না। সত্যি, তুমি যেন তার থিওরী-ই প্রমাণ করে চলেছ সারা জীবন দিয়ে। তোমার প্রতিটি কাজে আমি সে কথার সমর্থন খুঁজে পাই।'

'এ সব কথার মানে?' লোকটির এ ধরণের কথা শুনে অভ্যেস নেই।

'মানে? এই দেখ না, একটা বিয়ে করেছিলে, বৌটা বেঁচে আছে। কুচবিহারে এক দাতব্য টি বি হাসপাতালে প'ড়ে আছে খোঁজও নাও না। একটা মেয়ে আছে, তাকে তার গরীব মাসীর ঘাড়ে ফেলে রেখেছ। কেন এ সব করেছ ভেবে পাই না। নিশ্চয় স্বভাবের দায়ে। টাকা ত' কম করনি?'

'কে বললে তোমায়?'

'আহা, আমি জানি। আমি জানি না?'

'বাজে কথা বলছ তুমি।'

মদন বক্সী বিশ্রীভাবে ঝুঁকে বসে, হাত দুটো যেন বাড়াতে চায়।

মীরা দেবী বললেন, 'মদন বক্সী, রাস্তার সামনে একটা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। থানার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে আমার। আমার চেয়ারের গায়ে অ্যালার্ম বেল আছে। ও জানে একবার বেল শুনলেই ওপরে আসতে হবে। এ রাস্তায় গাড়ী ঢোকে না দেখেছ! তাই বেল বাজলেই শোনা যাবে।'

লোকটি সোজা হয়ে বসে।

বলে, 'বাজে কথা শুনবার সময় নেই আমার, মীরা! কেন ডেকেছ তা বললেই চলে যেতে পারি।'

'না-না, যাবে কেন! ব'সো ব'সো। আমার ওপর রাগ করো না মদন। ভেবে দেখ হাঁটু থেকে পা দুটো নেই। এক জায়গায় বসে সময় কাটে। মেজাজ হয়ত ঠিক থাকে না।'

'হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, মানে বলতে চাইছিলাম। পুলিশ নয় থাকল। তবু এমন ধারা

খালি বাড়ীতে একটা রোগা কুকুরের ভরসায় দোর খুলে থাক কেন? কলকাতার এ সব জায়গা না হয় এখনো বেশ বনেদী। তবু......!'

'আহা, দুর্ঘটনা কি কেউ এড়াতে পারে? এই সীতেশের কথাই ধর না কেন! কেউ জানল না কেন বেরুল অফিস থেকে। কেন বা মাইনে নিয়েই বেরুল। অথচ......!'

'থাক মীরা, আমার বড় খারাপ লাগে।'

মদন বক্সী একটি বড় এবং ভারী সোনার সিগারেট কেস বের করে এবং সিগারেট ধরায়, অবশ্য একবার জিগ্যেস ক'রে নিয়ে। তার হাত কাঁপে।

মীরা দেবী বলেন, 'জান, এমন কোন দরকারে ডাকিনি তোমায়। এমনিই ডেকেছি। মদন, একটা কথা বলবে?'

'কি?'

'প্রথম যখন এলে নিজের নামটা বলনি কেন? আদিত্য, কেন আদিত্য খাঁ বলেছিলে বল ত?'

'মদন নামটা বড় বিশ্রী মীরা। আর বক্সী পদবী হ'লে খাঁ, চৌধুরী এ সব ব্যবহার করতে আপত্তি নেই।'

'আঃ, নিশ্চিন্ত হলাম যেন। সবাই বলত...'

'কি বলত?'

'নাম তারাই বদলায় যাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। অবশ্য এ সব কথা পরে উঠেছিল। সীতেশ মারা যাবার পর।'

'কথা ওঠে, কথা মিলিয়ে যায়'—

'সাগর লহরী সমান। তাই না? তখন ত' এই কবিতাটাই বলতে। সীতেশ ভাবত তোমার অনেক বিদ্যে......'

'সীতেশের কথা বলার জন্যে আমায় এতদূরে থেকে ডেকে পাঠিয়েছ না কি?'

'তোমার খারাপ লাগছে? কতকগুলো প্রশ্ন আমার মনেই রয়ে গেল। জানতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ, তোমার সব কথার জবাব দিতে চেষ্টা করব। হাজার হলেও,' মদন বক্সী একটু হাসে এবং হেসে কথাটা শেষ করে 'একদিন যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল'।

'অন্তরঙ্গতা তাকে বলে বুঝি? আমি ত' ভেবেছিলাম তোমার মনে কৃতজ্ঞতা থাকবে। বীণাপাণি থিয়েটার ভাড়া নিয়েছিল সীতেশের বন্ধুরা। আমরা মানময়ী গার্লস স্কুল করছিলাম। সাজঘরের এক কোণে পড়েছিলে তুমি। শুনলাম ম্যানেজার তোমায় থাকতে দিয়েছেন। অসুস্থ লোক, ভদ্রঘরের ছেলে, মফঃস্বল থেকে এসে কলকাতায় চোরের হাতে নিঃসম্বল হয়েছ! আমার দয়া হলো, তোমায় এ বাড়ীতে নীচের ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার, সীতেশের কাছেও।' একটু বিরতি দিয়ে মীরা দেবী বলেন, 'সীতেশের কাছে কেন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তা তুমিই জানবে ভাল। তবে ঐ নিঃসম্বল ভদ্র সন্তান, চোরের হাতে পড়ে ভিখিরী হয়েছ, গল্পগুলো সাজিয়েছিলে ভাল। ও কি, তোমার মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? ঐ যে জল আছে, জল খাও।'

মদন বক্সী জল খায়। গলার কাছে হাত রেখে একটু ঘষে। বলে, 'বুকটা কেমন যেন—'

'জানি জানি। হঠাৎ হয়নি। হার্ট যে তোমার দুর্বল।'

'সব খবরই যে রাখ।'

'রাখব না? এই সেদিন তোমার 'হার্ট অ্যাটাক' হয়েছিল দিল্লীতে। কাগজে বেরুল।'

'কাগজে?'

'হ্যাঁ গো। দিল্লীর হিন্দী কাগজে। তোমার খবর রাখবার জন্যে ঐ কাগজগুলোই রাখতে হয়। তুমি দিল্লীতেই যে ব্যবসা খুললে। আমি ত জানি কলকাতায় কারবার খুলবার সাহসই নেই তোমার।'

'মীরা তোমার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আমি অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু আর পারছি না।'

'আর একটু।'

মীরা দেবী দেওয়ালের ঘড়ি দেখেন। তারপর সোজা হয়ে বসেন। চপলতা এবং লঘুভাবটা ছেড়ে দেন। নীচু এবং তীব্র গলায় বলেন, 'খালি বাড়ীতে তোমার সঙ্গে বসে তোমারই কীর্তি-কলাপ নিয়ে কথা কইব তেমন মূর্খ আমি নই। তুমিও আমার প্রলাপ শুনবে বলে আসনি। তুমি কেন এসেছ তা আমি জানি। আমি তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব মদন। সীতেশের কোটের বুক পকেটে ওর নতুন কেনা শেয়ারের কাগজপত্তর ছিল। তুমি জান সেগুলো কোথায় আছে। এত বড় মূর্খ তুমি, যে সেগুলো কোনদিনও তোমার ভোগে আসবে না জেনেও না পারলে সেগুলো ফেরৎ দিতে, না পারলে সেগুলো নষ্ট করতে। আজ সেগুলো আমার দরকার। বাজারে চা-এর দর দেখেছ? আজ আমার টাকার দরকার।'

শুকনো গলাটা ঝেড়ে নেয় মদন বক্সী। দুর্বল ও ক্ষীণভাবে হাসবার চেষ্টা করে। বলে, 'এ সব কথার প্রমাণ কি?'

'আমি বলে যাচ্ছি। সীতেশের অফিসে বসে সীতেশ এমন একটি ফোন পায় যাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে সে উঠে পড়ে ও বেরিয়ে আসে। পকেটে সাড়ে আটশো টাকা। না ও চেক নেয়নি। তুমি, মদন বক্সী, তুমি জেনেছিলে সীতেশ তোমায় চিনে ফেলেছে। সীতেশের দাদা পুলিশে ভাল কাজ করেন। সীতেশ হঠাৎ ধরে ফেলে তুমি আসলে আদিত্য খাঁ নও। পার্টিশান হবার সুযোগে তুমি একটি নিরীহ পরিবারকে নিঃস্ব ক'রে......কি হল?'

'কিছু না!'

'পাকিস্থানে পড়বে তার দেশ সেই ভয়ে রাজীব সা' ব্যস্ত। তোমার পরামর্শে সব টাকা দিয়ে মোহুর কেনা হয়। বিয়েতে সোনার গয়না-টয়না সব গালানো হয়। একদিন রাজীব, তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী এবং মেয়েকে খুন করে তুমি পালাও।

'কি ভাগ্যের পরিহাস, নদীয়ার সে অংশ পাকিস্থানে পড়ল না। পার্টিশানের হাজার ডামাডোলেও রাজীবের ছেলে ভোলে না। সে তোমায় খোঁজে। বীণাপাণি থিয়েটারের সামনে তাকে দেখে তুমি হঠাৎ সট করে ঢুকে পড়লে। ছবি দেখে তুমি তাকে চেন। কিন্তু সে তোমায় চেনে না।

'সীতেশ কেমন করে তোমার সে পরিচয় জানে সে তার দাদাকে খবর দেবার আগে নিজেই বুদ্ধি করে খোঁজ-খবর নিতে চায়। ওটুকু দুঃসাহস ও না দেখালেই পারত। কিন্তু ওর স্বভাবই যে ও রকম। বেশী ভাবে না, ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। নইলে কি আর আমার কথায় তোমায় এখানে তুলে আনে? কেমন লাগছে নিজের জীবনী শুনতে?' মদন বক্সী এখন নিরুত্তর। সে শুধু ঘামছে।

'সীতেশের কেমন যেন একটা ধারণা হয় ঐ বীণাপাণি থিয়েটারে কি যেন একটা ব্যাপার আছে। ঠিকই আঁচ করে ও। সেখানেই পরিত্যক্ত রঙের টিনে আবর্জনার নীচে সেই সোনা বোঝাই ব্যাগ। ও থিয়েটার নিয়ে মামলা চলছিল। কেউ বিশেষ ব্যবহার করে না, অতএব নিরাপদ। ওর দাদা সেদিন আসবেন এখানে। সীতেশ নিঃসংশয় হ'য়ে তোমায় ধরাতে চায়। তুমি আমাদের 'সীতেশ, মীরা' বন্ধ। কৃতজ্ঞতায় গদগদ। এদিকে মনে সন্দেহ ভরপুর। আমি আবার কতকগুলো ছবি তুলেছি বাড়ীর, তার মধ্যে তুমিও আছ। পালাবার ঠিক-ঠাক ক'রে তুমি ঢোক সীতেশের ঘরে। টেবিল-ড্রয়ার খুলতে তুমি জান। সে ছবি এবং নেগেটিভ নষ্ট করে দিতে চাও। এদিকে দিন-রাত মেক-আপের বই পড়। বোধহয় চেহারা বদলাতে চাও। সীতেশের ড্রয়ার খুলতে কেঁচো নয়, সাপ বেরোয়। কেন না লক করা দেরাজে রাজীব সায়ের পরিবারের খুনের ব্যাপার এবং তোমার নিখুঁত বর্ণনা।'

'অঃ!' অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ বেরোয় মদন বক্সীর গলা থেকে।

'তখন তোমার মাথায় নানা বুদ্ধি খেলতে

(শেষাংশ ১২২ পৃষ্ঠায়)
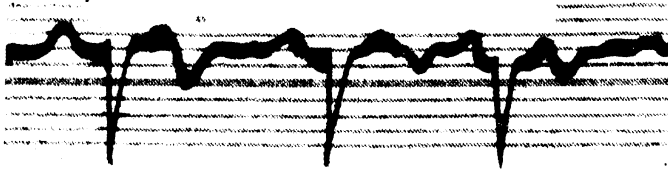
পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুস্থ, সবল কর্মঠ লোকের হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে সকলেরই একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে দেশের নেতৃস্থানীয় ও জনপ্রিয় উচ্চপদস্থ অনেক লোকের এ রকম হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে সাধারণ লোকে এ বিষয়ে অবহিত হয়েছে। এই ধরনের মৃত্যুতে অনেক সময় এমন একটা আকস্মিকতা ও মর্মান্তিক নাটকীয়তা থাকে যে এতে সকলকেই অভিভূত করে। এর কারণ হিসাবে 'করোনারি' বলে সকলেই আজকাল একটা রোগের কথা শুনেছেন। যাঁরা একটু বেশী খবর রাখেন তাঁরা 'করোনারি থ্রম্বোসিস্' কথাটা জানেন। তবে অনেকেরই এ বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন যে, কোনও মধ্যবয়স্ক সুস্থ লোকের হঠাৎ কোন রকম অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে, বিশেষ করে যদি কোনও রকম বুকের কষ্ট থাকে, তবেই তার 'করোনারি' হয়েছে। ভীতুপ্রকৃতির অনেক লোক করোনারির ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত।

'করোনারি' কাকে বলে

'করোনারি' কথাটা এসেছে ল্যাটিন 'করোনোরিয়াস' শব্দ থেকে, যার মানে মুকুট। হার্টের গায়ে সংকোচনশীল যে বলিষ্ঠ পেশী আছে তার কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে অক্সিজেনপুষ্ট রস সরবরাহ করতে হয়। এই কাজের জন্যে হার্টের গায়ের মধ্য দিয়ে দুইটি আর্টারী বা ধমনী আছে যাদের নাম করোনারি আর্টারী। হার্টের উপরিভাগে মুকুটের মত বেষ্টন করে আছে বলেই বোধহয় এই আর্টারীগুলির নাম দেওয়া হয়েছে করোনারি। এই আর্টারী দুটির শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে রক্তধারা অবিরাম চলে। করোনারি আর্টারীগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাস সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। তার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার নানা রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু একটি। করোনারি আর্টারীর নলী ছোট হয়ে যাওয়ার দরুণ যে সব হৃদ্‌রোগের উৎপত্তি হয় তাদের বলে করোনারি আর্টারীজাত হৃদ্‌রোগ। সংক্ষেপে 'করোনারি।'

থ্রম্বোসিস্ ও তার ফলাফল

জীবিতাবস্থায় রক্তবাহী শিরার মধ্যে রক্ত যতক্ষণ গতিশীল থাকে ততক্ষণই তরল থাকে। কোনও কারণে নিশ্চল হলেই জমাট বেঁধে যায়। শিরা থেকে রক্ত বাইরে বেরোলেও জমাট বাঁধে। কিন্তু কোনও কোনও অবস্থায় শিরাগুলির মধ্যেও রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। একে বলে থ্রম্বোসিস এবং শিরার মধ্যেকার এই রকম চাকবাঁধা রক্তকে বলে থ্রম্বাস্। রক্তক্ষরণের ফলে শিরা থেকে বেরিয়ে এসে রক্ত যে চাক বাঁধে তার সঙ্গে থ্রম্বাস্ বা শিরার মধ্যে চলতে চলতে জমাট বাঁধা রক্তের চাকের কিছু তফাৎ আছে। যে কোনও শিরাতেই থ্রম্বোসিস হতে পারে। শিরার মধ্যে রক্তস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্তিমিত হলে অথবা নিশ্চল হ'লে, অথবা শিরার আভ্যন্তরীণ আস্তরণের স্বাভাবিক মসৃণতা নষ্ট হলে

হার্টের গায়ে করোনারি আর্টারীদ্বয় ও তাদের শাখা-প্রশাখা।

থ্রম্বোসিস হয়। থ্রম্বাস যদি যথেষ্ট বড় হয় যাতে শিরাপথ একেবারে বুজে যায় তাহলে সেই শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই দেহের কোনও অংশে তার রক্ত সরবরাহকারী শিরায় থ্রম্বোসিস হয়ে বুজে গেলে সেই অংশের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই অংশে যদি দেহের এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত থাকে, প্রাণধারা অব্যাহত রাখতে যার ক্ষণিক বিরতিও সম্ভব নয়, তাহলে এ রকম অবস্থায় মৃত্যু হয়। হৃদ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্ক এই রকম দুটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। দুর্ভাগ্যবশত থ্রম্বোসিস এই দুই দেহযন্ত্রেই বেশী হয়। তবে রক্ত সরবরাহের জন্যে এই দুটি যন্ত্রেই একাধিক শিরা আছে। এবং তাদের শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ আছে, যাতে একটা রাস্তা বন্ধ হলে অন্য পথে রক্ত এসে যন্ত্রগুলির মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কাজেই থ্রম্বোসিস হয়ে ছোটখাট শিরাপথ রুদ্ধ হয়ে গেলেও সমগ্র যন্ত্রটির ক্রিয়া বন্ধ হয় না। তবুও হঠাৎ কোন পথ বন্ধ হলে যে অংশে সেই পথে রক্ত যায়, সে অংশ সাময়িকভাবে রক্তশূন্য হয়। যদি তাড়াতাড়ি আশেপাশের শিরাপথে পর্যাপ্ত রক্ত এসে না পৌঁছায় তবে সেই অংশের কোষগুলির মৃত্যু হয়। মৃত অংশ সামান্য হলে যন্ত্রটির সামগ্রিক ক্রিয়া সাময়িকভাবে আকস্মিক বিপর্যস্ত হলেও সম্পূর্ণ বিকল হয় না।

রক্ত সরবরাহকারী কোনও শিরার থ্রম্বোসিস-জনিত রক্তশূন্যতায় দেহে বা দেহযন্ত্রের কোন ছোট অংশের মৃত্যু হলে তাকে বলে ইনফার্কশন্ এবং মৃত অংশকে বলে ইনফার্ক্ট।

করোনারি আর্টারীর সংকীর্ণতাজনিত হৃদ্‌রোগ

করোনারি আর্টারীগুলির রোগের জন্যে যখন তাদের নলী সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন প্রধানত তিন রকমের উপদ্রব সৃষ্টি হয়। বিশ্রামের সময় অথবা অল্প পরিশ্রমের সময় হার্টের যেটুকু কাজ করতে হয় তার প্রয়োজনমত অক্সিজেন ও রক্ত হয়ত সংকীর্ণ শিরাগুলি দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বেশী পরিশ্রমে অথবা অন্য কোনও কারণে হার্টের কাজ বৃদ্ধি পেলে তার অধিক অক্সিজেন প্রয়োজন। করোনারি আর্টারীগুলি দিয়ে তখন অধিক পরিমাণে রক্ত চলাচল করা দরকার। কিন্তু আর্টারীগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এ রকম রোগী পরিশ্রম করলে বুকে ভীষণ বেদনা ও চাপ অনুভব করে যার ফলে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। একে বলে অ্যানজাইনা অব্ এফার্ট। পরিশ্রম বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলে অল্পক্ষণেই বেদনার উপশম হয়।

করোনারি আর্টারীর কোনও জায়গায় যদি সংকীর্ণতা এত বেশী হয় যে হার্টের ছোটবড় কোনও অংশবিশেষের জৈবক্রিয়ার ন্যূনতম প্রয়োজনমত অক্সিজেন এবং রক্ত না আসে তবে সেখানে দু-রকম ফল দেখা যেতে পারে। যদি এই রক্তশূন্যতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তবে সেই অংশ অল্প অল্প করে শুকিয়ে যেতে থাকে যাতে হার্টের ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে আসে। কিন্তু যদি এই রক্তশূন্যতা আকস্মিকভাবে হয়, যেমন করোনারি আর্টারীর কোনও শাখায় হঠাৎ থ্রম্বাস জমে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে, তবে ইনফার্কশনের সৃষ্টি হয়। ইনফার্কশন হলে মৃত অংশ ও আশেপাশের সুস্থ অংশের মধ্যে একটা আকস্মিক বৈদ্যুতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে হার্টের পেশীর সুসম্বদ্ধ সংকোচন বিশৃঙ্খল হয়ে যেতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা হার্টকে সম্পূর্ণ বিকল করে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটাতে পারে। যদি বিশৃঙ্খলা সামান্য হয় এবং মুহূর্তের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা যায় তবে মৃত অংশে অক্সিজেনের অভাবে এবং আশেপাশে স্নায়বিক আক্ষেপের ফলে বুকে অসহ্য বেদনা ও আনুষঙ্গিক অপর কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। মৃত অংশ বড় হলে অথবা সেই অংশের অভাবে হার্টের কর্মক্ষমতা অতিরিক্ত হ্রাস হলেও বেশীক্ষণ প্রাণরক্ষা সম্ভব হয় না। থ্রম্বোসিসের এই প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারলে এবং পরবর্তী অপ্রীতিকর কিছু কিছু উপসর্গ দেখা না দিলে ইনফার্ক্ট আস্তে আস্তে জোড়া-

চার্জ দিয়ে সেরে উঠতে পারে এবং হার্টের কর্ম-ক্ষমতা কাজ চালাবার মত ফিরে আসতে পারে।

করোনারি থ্রম্বোসিসে যাবতীয় সব রোগীর একটা মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায় যে, প্রথম ধাক্কায় আকস্মিকভাবে অথবা আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় শতকরা ২৫ জনেরও কম রোগীর। বাকি সকলেই উপযুক্ত চিকিৎসায় প্রথম আক্রমণ কাটিয়ে উঠে সুস্থ হতে পারেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, থ্রম্বোসিস না হয়েও করোনারির কোন শাখার অতিরিক্ত সঙ্কীর্ণতার দরুণ ইনফার্কশন হতে পারে। এই জন্যে অনেক বিশেষজ্ঞ করোনারি থ্রম্বোসিস কথাটা ব্যবহার না করে কার্ডিঅ্যাক ইনফার্কশন নামটি ব্যবহার করেন।

অ্যাথিরোমা ও অ্যাথিরোসক্লেরোসিস

করোনারি থ্রম্বোসিসের প্রাথমিক কারণ হচ্ছে শিরাগুলির ছিদ্রপথ বা নলীর সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা হয় আর্টারীর অভ্যন্তরে এক প্রকার চর্বি জাতীয় জিনিষ জমে। একে বলে অ্যাথিরোমা। ভাতের মণ্ডের মত জিনিষকে গ্রীক ভাষায় বলে অ্যাথিরস। তাই থেকে হয়েছে অ্যাথিরোমা। আর্টারীর আভ্যন্তরীণ আস্তরণের নীচে নরম মণ্ডের মত এক প্রকার জিনিষ জমে ছোট ছোট বাতাসার আকারের ঢিপির সৃষ্টি করে। এই ঢিপি-গুলি আর্টারীর নলী সঙ্কীর্ণ করে দেয়। এর সঙ্গে আর্টারীর গায়ের মধ্যস্তরে পরিবর্তন

করোনারী আর্টারির প্রস্থচ্ছেদ—আভ্যন্তরীণ স্তরে অ্যাথিরোমার দরুন নলীর সংকীর্ণতা।

দেখা যায়। যার ফলে আর্টারীগুলি শক্ত হয়ে যায় ও তাদের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। মধ্যস্তরের এই পরিবর্তন ও অ্যাথিরোমা একসঙ্গে থাকলে তাকে বলে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস। শরীরের বড় বড় ও মাঝারি আর্টারীগুলিতে সাধারণত অ্যাথিরোমা হয়। বড় আর্টারীতে অ্যাথিরোমা হলেও তাদের ব্যাস অনেক বড় থাকায় রক্ত চলাচলের কোনও বিঘ্ন হয় না। কিন্তু মাঝারি আর্টারীগুলিতে অথবা করোনারি আর্টারীর মত অপেক্ষাকৃত সরু আর্টারীতে অ্যাথিরোমা হলে রক্ত চলাচলের অসুবিধা হয়।

অ্যাথিরোমা বা অ্যাথিরোসক্লেরোসিস যদিও করোনারি থ্রম্বোসিসের প্রাথমিক কারণ, অর্থাৎ থ্রম্বোসিস হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টিকারক, কিন্তু আকস্মিকভাবে রক্ত জমে যাওয়ার সাক্ষাৎ কারণ নয়। অ্যাথিরোমার ঢিপিগুলির উপরি-ভাগ সাধারণত মসৃণ থাকে। কোনও কারণে উপরকার মসৃণ আস্তরণ ছিঁড়ে গিয়ে খসখসে হয়ে গেলে তার ওপর থ্রম্বাস জমবার সুযোগ হয়। কখনও বা অ্যাথিরোমার উপরকার আস্তরণ ছিঁড়ে গিয়ে ভিতরকার থলথলে জিনিষগুলি বেরিয়ে এসে আর্টারীর সরু পথ বুজিয়ে দেয়। অনেক সময় অ্যাথিরোমা ঢিপির নীচে রক্তক্ষরণের ফলে হঠাৎ ঢিপি আরও স্ফীত হয়ে আর্টারী বুজিয়ে দেয়। অনেক সময় আবার এসব কোন পরিবর্তন ছাড়াও থ্রম্বাস জমে যায় যার আপাতকারণ বোঝা যায় না।

করোনারি আর্টারীতে অ্যাথিরোমা থাকলেও থ্রম্বোসিস বা অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস নাও হতে পারে। যে সব লোকের জীবিতাবস্থায় এসব রোগের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, এরকম অনেক লোকের দুর্ঘটনায় বা অন্য কোনও রোগে মৃত্যু হলে তাদের শব পরীক্ষা করে করোনারি আর্টারীতে ভাল রকম অ্যাথিরোমা পাওয়া গেছে।

অ্যাথিরামা মানুষ ছাড়াও অন্য জীব-জন্তুদের মধ্যেও দেখা যায়। চিড়িয়াখানার নানা রকম পশুপক্ষীর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর তাদের দেহে অ্যাথিরোমা পাওয়া গেছে। তাদের করোনারি আর্টারীতেও মানুষের অ্যাথিরোস-ক্লেরোসিস রোগের মত রোগ দেখা গেছে। পরীক্ষামূলকভাবেও জীবজন্তুর শরীরে অ্যাথি-রোমা রোগ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু মানুষের মত করোনারি থ্রম্বোসিস বা কার্ডিঅ্যাক ইনফার্কশন পশুপক্ষীদের মধ্যে কখন হয় না।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথিরোমা বেশীর ভাগ লোকেরই হয়। কিন্তু সেই তুলনায় থ্রম্বোসিস হয় অনেক কম। আধুনিক কালে অ্যাথিরোমা ও অ্যাথিরোসক্লেরোসিস রোগ আগের চেয়ে অনেক বেশী ও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হচ্ছে। কোরিয়ার যুদ্ধে মৃত ২০।২২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান সৈনাদের শব পরীক্ষায় শতকরা ৭৭ জনের মধ্যে করোনারি অ্যাথিরোস-ক্লেরোসিস পাওয়া গেছে।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি পাঞ্জাবে একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, দুর্ঘটনায় বা হত্যাকাণ্ডে মৃত লোকদের মধ্যে ২০ বৎসরের বেশী বয়স্ক ১৫১টি শবের মধ্যে ৬৪টিরই করোনারি আর্টা-রীতে অ্যাথিরোসক্লেরোসিসের লক্ষণ আছে। ২০ বৎসরের পরই যদি দশজনের মধ্যে ৬।৭ জনের করোনারি আর্টারীর সঙ্কীর্ণতা হতে থাকে তবে থ্রম্বোসিস যে আরও বেশী কেন হচ্ছে না সেটাই আশ্চর্য। কাজেই মনে হয় অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ছাড়াও আরও কিছু কারণ থ্রম্বোসিসের জন্য প্রয়োজন। করোনারি আর্টারীর সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতার অন্তত সাময়িক বৃদ্ধি থ্রম্বোসিসের অন্যতম কারণ বলে অনেক সন্দেহ করেন।

করোনারি আর্টারী রোগজনিত হৃদ্রোগের সাম্প্রতিক প্রসার—

অ্যাথিরোমা বহু প্রাচীন ব্যাধি। মিশরের ফরোদের 'মামী'তে অ্যাথিরোমার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু করোনারি থ্রম্বোসিস বা অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস অতি আধুনিক রোগ। ১৭৭২ সালে হেবারডেন প্রথম অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস রোগের বিশদ বর্ণনা করেন। কিন্তু তখন এ রোগ এত কম হত যে, বহু চিকিৎসক সারা জীবনেও হয়ত একটিও এই রোগী দেখতেন না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে অভি-জ্ঞতায়, রোগ নির্ণয়ের বিচক্ষণতায় এবং রোগের প্রকাশ লক্ষণসমূহের বিশ্লেষণে যিনি অতুলনীয় এবং যাঁর লেখা মেডিসিনের বই ৩০ বৎসর আগে
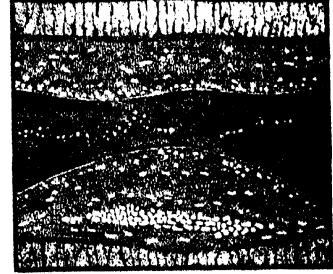
করোনারী আর্টারির দীর্ঘচ্ছেদ অ্যাথিরোমার স্তূপে কোলেস্টেরল জমা হয়েছে। সংকীর্ণ নলীতে রক্ত জমাট বেঁধে থ্রম্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

পর্যন্তও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সবচেয়ে ভাল পাঠ্যপুস্তক বলে গণ্য হত, সেই অসলার সাহেব ১৯১০ সালে লিখে গেছেন যে অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস রোগ তিনি প্রথম দেখলেন চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করবার পর। আমেরিকা ও ক্যানাডায় দুইটি বৃহৎ হাসপাতালে ১০ বৎসরে তিনি মাত্র একটি রোগী দেখেন।

করোনারি থ্রম্বোসিস সম্বন্ধে যদিও ১৮৭৮এ প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায়, তবু ১৯১২ সালেই এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তবুও ১৯২৫ সালের পূর্বে এই রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের মধ্যে আলোচনা খুব দেখা যায় না। কাজেই বহু প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের অ্যাথিরোমা রোগ থাকলেও তার দরুণ করোনারি আর্টারীর সঙ্কীর্ণতাজনিত হৃদ্রোগ আধুনিক যুগেরই রোগ। এর ভয়াবহ বিস্তার আরও সাম্প্রতিক।

ইংলণ্ডের একটি হিসাবে দেখা যায় যে, করোনারি আর্টারীর রোগজনিত মৃত্যু ১৯২৬ সালে ছিল ১৮৮০। মৃত্যু সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ছিল ১৪০৯৫ এবং ১৯৫৬ সালে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৪৭৯০-তে। আমেরিকাতে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা আরো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩০ সালে প্রতি ১ লক্ষ লোকে করোনারি আর্টারীর রোগে মৃত্যু হত ৮ জনের। কিন্তু ১৯৫২ সালে এই মৃত্যুহার দাঁড়ায় লক্ষপ্রতি ২২৬ জনের। আমাদের দেশে অথবা অন্য অন্য দেশেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এই রোগ সব দেশে এবং সব জাতির মধ্যে ঠিক এক রকমভাবে বাড়ে নাই। আবার একই জাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এক রকম নয়। সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন পেশার লোকেদের মধ্যেও এর প্রাদুর্ভাব ভিন্ন রকম। করোনারি থ্রম্বোসিস সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়।

এর কম বয়সেও কিছু কিছু হয়। স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের এই রোগ হয় প্রায় তিনগুণ। সমাজের উচ্চস্তরের এবং পদস্থ ব্যক্তিদেরই এই রোগ সবচেয়ে বেশী হয়। শারীরিক শ্রম দ্বারা যারা জীবিকার্জন করে তাদের মধ্যে এ রোগ খুব কম।

করোনারি রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান

মানুষের করোনারি আর্টারীর সংকীর্ণতা-জনিত হৃদ্‌রোগ, বিশেষ করে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের প্রকৃত কারণ এখনও অজ্ঞাত। নানা সূত্রে এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান হচ্ছে যার ফলে কতকগুলি সম্ভাবনার নির্দেশ পাওয়া গেছে। তবে ঠিক বৈজ্ঞানিকভাবে এই রোগের কোন কারণই প্রমাণিত হয় নাই। এর কারণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রমাণ বলে উপস্থিত করা হয় সেগুলি কোনটাই প্রত্যক্ষ নয়। এইসব প্রমাণকে সারকামস্ট্যানশিয়াল অথবা ঘটনা-চক্রের ইঙ্গিত থেকে অনুমানমূলক বলা চলে। করোনারি রোগের সাম্প্রতিক প্রসার অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত দেশগুলিতে এই রোগ অতি দ্রুত বাড়ছে এবং উচ্চ শ্রেণীর ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় সবচেয়ে বেশী। এর থেকে স্বভাবতই অনুমান হয় যে, আহার ও আরামে প্রাচুর্যের সঙ্গে এই রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

কারণ হিসাবে যে সব বিষয়ের উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাদের সবগুলিরই পক্ষে ও বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি আছে।

আধুনিক সভ্যতা ও করোনারি রোগ

বিভিন্ন দেশের করোনারি রোগের মৃত্যুহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই রোগ সবচেয়ে বেশী উত্তর আমেরিকায়। দক্ষিণ আমেরিকায় তার কিছু কম। ইংলণ্ডে তার প্রায় অর্ধেক। ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় এর মাঝামাঝি। ইউরোপের দেশগুলিতে তার চেয়েও কম। সবচেয়ে কম জাপানে। উত্তর আমেরিকার তুলনায় প্রায় এক দ্বাদশাংশ। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেশী থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ বান্টুদের এই রোগ প্রায় নাই বললেই চলে। চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশেও খুব কম। এই ব্যতিক্রমের কারণ হতে পারে জাতিগত বৈষম্য, উন্নত দেশগুলিতে লোকদের উন্নততর জীবনযাত্রা, অতিরিক্ত আমিষ খাদ্য, অতিরিক্ত আরাম ও বিলাস, শ্রমবিমুখতা, অথবা আধুনিক সভ্যতার কর্মচঞ্চল উত্তেজনা-পূর্ণ জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক মানসিক অশান্তি।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে করোনারি রোগে মৃত্যুর প্রভেদ কেবল জাতিমূলক নয়। তার কারণ জাপানে এই রোগ খুব কম হলেও আমেরিকায় প্রবাসী জাপানীদের এই রোগ আমেরিকানদের মতোই বেশী হয়। আমেরিকান নিগ্রোদেরও এই রোগ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের চেয়ে অনেক বেশী। তাছাড়া একই জাতির স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে রোগের প্রভেদ বড় বেশী।

বৈষয়িক উন্নতি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিও একমাত্র কারণ নয়, কেননা জাপানে এই রোগ খুব কম, যদিও জাপান এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর। আধুনিক সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে এবং লোকের আর্থিক কষ্ট দূর হয়েছে। বাসস্থান অনেক স্বাস্থ্য-সংগত হয়েছে। খাদ্যের প্রাচুর্য, শারীরিক আরামের ও শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা এবং আমোদ-প্রমোদেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছে যা অনুন্নত দেশের লোকেদের ভাগ্যে জোটে না। তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন সভ্য দেশে লোকেদের স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনারি রোগ, ব্লাড প্রেসার ইত্যাদির কারণ হিসেবে আধুনিক সভ্যতার এই মানসিক ও স্নায়বিক উৎকণ্ঠার উপর অনেকে দোষারোপ করেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ জীবনধারণ ও পরিবার প্রতি-পালনের বিড়ম্বনা বেশী হওয়ারই কথা। উৎকণ্ঠাও তাদের কম হওয়ার কারণ নাই। তবুও তাদের করোনারি রোগ কমই হয়। গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ভয়, অশান্তি, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে করোনারি থ্রম্বোসিস মৃত্যু অনেক কমে গিয়েছিল।

নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের লোকেরা একই জাতিগোষ্ঠীর। তাদের আহার বিহার, জীবনযাত্রা প্রায় একই রকম। কিন্তু তবুও ফিনল্যাণ্ডে করোনারি রোগে মৃত্যুসংখ্যা নরওয়ে এবং সুইডেনের প্রায় দ্বিগুণ।

কোলেস্টেরল ও অ্যাথিরোমা

করোনারি থ্রম্বোসিস ও কার্ডিয়্যাক ইনফার্কশনের প্রাথমিক কারণ করোনারি আর্টারীর অ্যাথিরোমা ও অ্যাথিরোসক্লেরোসিস। কাজেই অ্যাথিরোমা বা অ্যাথিরোসক্লেরোসিস রোগের কারণের মধ্যেই করোনারিজনিত হৃদ্‌রোগের কারণ অন্তর্নিহিত আছে বলে মনে করা স্বাভাবিক।

অ্যাথিরোমা রোগে শিরাগুলির মধ্যে চর্বি জাতীয় যে পদার্থ জমে, রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, সেগুলি কোলেস্টেরল। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে কিছু পরিমাণ কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। সংখ্যানুপাতিকভাবে দেখা গেছে যে যাদের মধ্যে অ্যাথিরোমা ও করোনারি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশী থাকে। পরীক্ষামূলকভাবে কোন কোন জন্তুকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল খাওয়ালে তাদের শরীরে অ্যাথিরোমা রোগ সৃষ্টি হয়। এই সব কারণে রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সঙ্গে অ্যাথিরোমা, অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ও করোনারি রোগের যোগাযোগ আছে বলে অনুমিত হয়।

আমিষ খাদ্যে, বিশেষ করে যাতে চর্বি বা তেল আছে তাতে, কোলেস্টেরল থাকে প্রচুর পরিমাণে। যে সব লোকেদের বা জাতির মধ্যে করোনারি রোগ বেশী, তাদের খাদ্যে আমিষের অংশ বেশী এবং তারা ফ্যাট বা চর্বি, মাখন ইত্যাদি জিনিষ বেশী খায়। আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুদের, যাদের করোনারি রোগ নাই তাদের খাদ্যে আমিষ অত্যন্ত কম এবং ফ্যাট বা চর্বি ও মাখন ইত্যাদি তাদের জোটে না। তাদের

এ দুনিয়ার কতটুকুই বা জানি.
শশাঙ্কশেখর দত্ত

নেপাল মুখোপাধ্যায়

নারিকেল কুঞ্জ

রক্তের কোলেস্টেরলও অনেক কম। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, খাদ্যের অতিরিক্ত কোলেস্টেরলই রক্তে এই পদার্থ বৃদ্ধির কারণ নয়। অন্য খাদ্যবস্তু থেকে, বিশেষ করে ফ্যাট বা চর্বি মাখন তেল থেকে শরীরে কোলেস্টেরল তৈরী হতে পারে। কাজেই খাদ্যে সামগ্রিকভাবে ফ্যাট জাতীয় জিনিষের অনুপাত বেশী থাকলেই রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু দেখা গেছে যে, উদ্ভিদজাত তেল বা মাছের তেল বেশী খেলেও রক্তে কোলেস্টেরল বেশী বাড়ে না। এস্‌কিমোদের প্রধান খাদ্য আমিষ। তারা প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট বা চর্বিও খায়। কিন্তু তাদের খাদ্য প্রায় সবই মাছ বা অন্য জলচর প্রাণী থেকে আসে। এস্‌কিমোদের রক্তে কোলেস্টেরল খুব বেশী বাড়ে না। তাদের করোনারি অ্যাথিরোমাও কম হয়। বস্তুত মাছের তেল এবং কতগুলি উদ্ভিদজাত তেল বেশী খেলে রক্তের কোলেস্টেরল বেশী থাকলে কমে যায়। এইসব তেল স্বাভাবিক অবস্থায় তরল থাকে এবং এদের মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি-অ্যাসিড বেশী থাকে। জান্তব চর্বি স্বাভাবিক অবস্থায় জমাট বেঁধে থাকে। গরম না করলে তরল হয় না। এর মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী। উদ্ভিদজাত তেলকে হাইড্রোজেনেটেড করে তার স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ান যায়। তখন সেই তেল জান্তব চর্বির মত স্বাভাবিক উত্তাপে জমাট বেঁধে যায়। এই উপায়ে বাদাম তেল ও অন্য সব উদ্ভিদজাত তেল বাজারে এখন বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনেটেড ভেজিটেবল তেল আমিষজাত তেল, মাখন বা ঘিয়ের মত রক্তের কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে। রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধির ব্যাপারে স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের বিপরীত ক্রিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও জানা নাই।

খাদ্যের দরুণ রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধিই অ্যাথিরোমার কারণ কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ এখনও এ বিষয়ে সব প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। অনেকের মতে কোনও অজ্ঞাত কারণে শরীরে কোলেস্টেরলের উৎপত্তি ও স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার বিপর্যয় ঘটবার ফলেই রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে এবং শিরাগুলির গায়ে কোলেস্টেরল জমে যায়।

রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল থেকেই যদি অ্যাথিরোমার উৎপত্তি হয় তবে আশা করা যায় যে শিরাগুলির মধ্যে কোলেস্টেরল একটা প্রলেপ বা আস্তরণের মত জমবে। এবং শরীরের সব শিরাতেই একরকম জমবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় কোলেস্টেরল জমে শিরার আভ্যন্তরীণ আস্তরণের একটা সূক্ষ্ম স্তরের নীচে এবং সব শিরাতে অ্যাথিরোমা হয় না। অনেকের মতে রক্তে বেশী কোলেস্টেরল থাকার সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার বেশী থাকলে কোলেস্টেরল সেই চাপে শিরার আভ্যন্তরীণ স্তর ভেদ করে ঢুকে যায়। যে সব শিরার রক্ত চলাচলের গুরুত্বের জন্যে অতিরিক্ত চোট পড়ে, তাতেই জমা হয় বেশী। ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক থাকলেও অ্যাথিরোমা হয় বলে এই মত গ্রাহ্য নয়।

এই সমস্যা যে আরও কত জটিল তার পরিচয় পাওয়া যায় আরও একটা ব্যাপারে। রক্তে কোলেস্টেরল স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। প্রোটিনের সঙ্গে যুক্তভাবে থাকে। এই যুগ্ম পদার্থের নাম লাইপোপ্রোটিন। ইলেক্ট্রোফোরেসিস ও আলট্রাসেন্ট্রিফিউগ্যাল ইজেশন দ্বারা এই লাইপোপ্রোটিনের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যাদের অ্যাথিরোমা বেশী হয় তাদের রক্তে বিটা-লাইপোপ্রোটিন থাকে বেশী পরিমাণে। স্ত্রীলোকদের রক্তে আলফালাইপোপ্রোটিনের ভাগ বেশী, তাদের অ্যাথিরোমাও কম। রক্তের সমস্ত কোলেস্টেরলের মোট পরিমাণের চেয়ে আলফা ও বিটা লাইপোপ্রোটিনের অনুপাত অ্যাথিরোমা রোগের সঙ্গে বেশী জড়িত। স্ত্রীলোকদের সন্তানধারণের বয়স পেরিয়ে গেলে দেখা যায় যে তাদের রক্তের আলফা ও বিটা লাইপোপ্রোটিন পুরুষদের মত হয়ে যায়। ৬০ বৎসরের পর স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে করোনারি রোগের পরিমাণ খুব বেশী তফাৎ হয় না।

রক্তের লাইপোপ্রোটিনের প্রকারভেদ ও অনুপাত খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। শরীরের কোলেস্টেরল সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিশেষ কোনও কোনও প্রক্রিয়ায় সংযোজনের বিকৃতির সঙ্গে রক্তে বিটা লাইপোপ্রোটিন বৃদ্ধির ও অ্যাথিরোমা বা অ্যাথিরোসক্লেরোসিসের সম্বন্ধ আছে। এই বিকৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ এখনও অজ্ঞাত। বিটা লাইপোপ্রোটিন বৃদ্ধি অ্যাথিরোমার কারণ না হয়ে এমনও হতে পারে যে উভয়েই শারীরিক একই কোনও বিপর্যয়ের ফল।

অ্যাথিরোমার কারণ সম্বন্ধে অন্য মত

বার্ধক্য—অনেকের মতে অ্যাথিরোমা ও অ্যাথিরোসক্লেরোসিস মানুষের ও জীবজন্তুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরা ও বার্ধক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। উন্নতদেশগুলিতে সংক্রামক ও অন্য অনেক রোগ হ্রাস পাওয়ায় এখন বেশী লোক বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচে। তাইতেই অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ও করোনারি রোগের এত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই মতের সমর্থনে বলা হয় যে, মৃতদেহ পরীক্ষায় বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাথিরোমা ও অ্যাথিরোসক্লেরোসিসও বেশী পাওয়া যায়। জীবজন্তুর মধ্যেও এটা বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বেশী পাওয়া যায়। তৃণভোজী এবং মাংসাশী উভয় প্রকার জানোয়ারের মধ্যেই কম বেশী এই রোগ দেখা যায়। মানুষের দেহেও অ্যাথিরোসক্লেরোসিস রোগ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না, যদিও করোনারি থ্রম্বোসিস্ স্ত্রীলোকের কমই হয়।

কোরিয়ার যুদ্ধে মৃত ২০।২২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান সৈনাদের শরীরে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস বেশী পাওয়া যাওয়াতে এই মত সমর্থিত হয় না।

রক্তচাপ বৃদ্ধি—ব্লাডপ্রেসার যাদের বেশী তাদের মধ্যে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ও করোনারি রোগ বেশী পাওয়া যায়। ব্লাডপ্রেসার বেশী থাকলে শিরাগুলির উপর তার প্রভাব বেশী হওয়ারই কথা। তবে নানা কারণে এখন সাব্যস্ত হয়েছে যে, রক্ত চাপ বৃদ্ধি অ্যাথিরোসক্লেরোসিসের প্রত্যক্ষ কারণ নয়। তবে রক্তচাপ বেশী থাকলে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে এবং শিরাগুলির স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত চাপের জন্যে নানা উপসর্গ আসতে পারে।

বংশগত দোষ—ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি, ডায়াবিটিস ইত্যাদি রোগের মত অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ও করোনারি রোগও কোন কোন পরিবারের মধ্যে অধিক দেখা যায়। বংশগত কোনও দোষ বা ধারা এর জন্যে দায়ী বলে মনে হয়। অবশ্য একই পরিবারে একই ধরণের জীবনযাত্রা, আহার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এর জন্যে দায়ী হতে পারে। দৈহিক আকৃতি ও গঠন এবং মানসিক প্রকৃতি যা অনেক সময় বংশগতভাবে নির্দিষ্ট হয়, তার সঙ্গেও এই সব রোগের সম্বন্ধ দেখা যায়। বলিষ্ঠ স্থূলকায়, রাশভারি বা উগ্র স্বভাব লোকেদের মধ্যে ব্লাডপ্রেসার ও করোনারি রোগ বেশী দেখা যায়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও এত দেখা যায় যে কারণ হিসাবে এগুলির উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তবে এখন অনেকেই মনে করেন যে, বংশগত কতগুলি শারীরিক বিশেষত্ব বা দৌর্বল্যের জন্যে কোনও কোনও লোকের উপর অতিরিক্ত আমিষ ও ঘি, মাখন, চর্বিওয়ালা খাদ্য এবং আধুনিক জীবনযাত্রার অন্যান্য কতগুলি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যার ফলে তাদের অ্যাথিরোসক্লেরোসিস্ বেশী হয় এবং করোনারি থ্রম্বোসিস হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

করোনারি থ্রম্বোসিসের প্রত্যক্ষ কারণ

অ্যাথিরোসক্লেরোসিসের যাই কারণ হউক, করোনারি আর্টারীতে হঠাৎ রক্ত জমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনার মধ্যে এই আকস্মিক আক্রমণের কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায় নাই। হঠাৎ অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম বা মানসিক উত্তেজনা অথবা ভূরিভোজনের পর করোনারি থ্রম্বোসিস আক্রমণ হতে অনেক সময় দেখা গেছে। কিন্তু বিশ্রামের সময়, পথ চলতে অথবা দৈনন্দিন কোন সাধারণ কার্যরত অবস্থায়, এমন কি ঘুমের মধ্যেও এর আক্রমণ হয়। অনেক সময় করোনারি থ্রম্বোসিসের মারাত্মক আক্রমণের পূর্বে কিছু কিছু প্রারম্ভিক লক্ষণ দেখা যায়। এগুলির উপর রোগী বা চিকিৎসক অনেক সময় গুরুত্ব আরোপ করেন না। এই সব লক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য পরীক্ষা করলে করোনারি আর্টারীর সংকীর্ণতা এবং থ্রম্বোসিসের পূর্বাভাষ পাওয়া যেতে পারে। সময়মত সতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনা হয়ত এড়ান যেতে পারে।

করোনারি রোগ আধুনিক সভ্যতার একটা বড় রকম চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে উন্নততর জীবনযাত্রা ও তার আনুষঙ্গিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এই সভ্যতার লক্ষ্য সেই দিকে অগ্রসর হওয়া, না প্রাচীন পন্থায় নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও নিরামিষ আহারের দিকে ফিরে যাওয়াই সমীচীন সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত নির্দেশ দিতে অক্ষম। তবে এ দুয়ের সমন্বয়ে বাহুল্যবর্জিত জীবনযাত্রা এবং স্থিরপ্রজ্ঞ সমাহিত ও তৃপ্ত মনোভাবের অনুশীলন এই চ্যালেঞ্জ হয়ত ব্যর্থ করতে পারে।

নিবেদিতা
চিত্তরঞ্জন মাইতি

দেশ মাটি, দেশ নদী, দেশ আছে অরণ্য সাগরে
দেশে দেশে নীলাকাশ, দেশ আছে প্রতি ঘরে ঘরে
তাই দেখি নির্বিকার, একান্ত প্রসন্ন মনে তুমি
ভূগোলের সীমা ভেঙে বললে, ভারত জন্মভূমি।
পৃথিবীর আশ্চর্যেরা কি আশ্চর্য রেখেছে সঞ্চয়
বেড়া দিয়ে বাঁধা দেশ, সে তোমার যথার্থ বিস্ময়!

মানুষেই পিতা হয়, মানুষেই হয় যে সন্তান
মানুষেরই জনারণ্যে খুঁজে পাই স্বামীর সন্ধান
তাই তুমি কন্যা নও, মাতা নও, নও তুমি জায়া
কোন ব্যক্তি বিশেষের ; আশ্চর্য তোমার অশনায়া,
তুমি সব মানুষের, এই সত্যে চির অবস্থিত
জায়া কন্যা জননীর তিলোত্তমা সত্তায় গঠিত।

দেশ আর মানুষের একাত্ম প্রত্যয়ে অকুণ্ঠিতা
বিশ্বের কামধেনু পীযূষদায়িনী নিবেদিতা।

ত্রিস্রোতা
শ্রীদিলীপকুমার কর

—এক—

জীবন

ঘরের দেওয়ালে ছোট্ট কুলীরের মতো
এক টিকটিকি ;
ওদিকের কোণে একটি বড় মাকড়সার জাল।
টিকটিকি নড়ে, চড়ে ;
মাকড়সা জালের কেন্দ্রস্থলে স্থির।
পথ দিয়ে ঐ চলেছে শ্মশানযাত্রী শব-বাহকের —
'হরিবোল, হরিবোল।'
পাশের বাড়ীতে শাঁখ বাজে
নবজাত শিশুর কান্না শুনি।
টিকটিকিটা একটি পতঙ্গ ধরে মুখে পোরে ;
ওদিকে মাকড়সা ডিম পাড়ে॥

—দুই—

কনট্রাস্ট

তিলোত্তমা, উর্বশী, অপ্সরাদের রূপ-চিত্রে
মগ্ন শিল্পী ছবি আঁকে।
পূর্ণযৌবনছন্দে লীলায়িত নারীদেহে
বিকশিত পুষ্পের মত মাধুর্য নিয়ে
রূপ নেয় তুলির আঁচড় রেখায় রেখায়।
চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে
শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী প্রিয়া স্ত্রী
এসে ঘরে ঢোকে —
অস্থিচর্মসার একটি কংকাল॥

—তিন—

নিঃসঙ্গের বেদনা

একটি নির্জন দ্বীপ।
এদিকে নিঃসঙ্গ মন, আমার,
বেদনা-বিহ্বল।
গাং-চিল উড়ে যায় দ্বীপের উপর দিয়ে ;
জাহাজ নোঙর বাঁধে না উপকূলে
রোদ-বৃষ্টি শুধু এসে দ্বীপকে ছুঁয়ে যায় ;
মানুষের ভালবাসা হতে বঞ্চিত দ্বীপ—
শুধুই সমুদ্রের ঢেউ গোণে।
যেমন আমার মনে রটি
শুধুই নিস্ফল কামনা তোমারে ঘিরে।
তুমি কিন্তু আস না, মানসী প্রিয়া,
না আমার মনে, না জীবনে॥

যন্ত্রণায় কেউ
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বয়স মিনারে দেখি
দূরাগত জীবনের ঢেউ,
দেব নয় দেবী নয়
দস্তুর স্মরণের কেউ!

স্মৃতি অলৌকিক নয়,
স্মৃতি নয় উজ্জ্বল প্রহার,
তবে কেন ছত্রে ছত্রে
কবি হয় স্মৃতির শিকার!

কেন এ-ই স্বপ্ন এক,
নিদ্রা আনে গোপন ছলনা,
শৈশব যৌবন ভঙ্গে
মৃত্যুতেই শেষ এ-খেলনা!

বয়স মিনারে দেখি
দূরাগত অন্ধকার ঢেউ,
নিদ্রা নয় স্বপ্ন নয়,
সে-ই আসে, যন্ত্রণায় কেউ!

ধ্রুবপদী
দিলীপ দাশগুপ্ত

আপাততঃ এ সংসার অনিত্যই নয়।
সে কথা বোঝার আর ভাবনার মত
কাঁচাপাকা মধুময় মন দিয়ে শুধু
পাথরের তনু থেকে তনতীর্থে এসে
কালিদাস শেলী আর রবীন্দ্র ঠাকুর
স্পষ্টসুরে বাঁধা। আহা!
বিচিত্র সে ধ্বনি।
কালজয়ী হবো বলে প্রতিজ্ঞাকে চাই
প্রেমধন্য কোনও তা,
এই বুকে আজ-ও!
কতো ঝড় জানালার বাইরে যে দেখি,
কতো ঝরে পড়া কুঁড়ি,
কতো বিষণ্ণতা,
ভোর-রাতে ঘুমে নম্র চোখের পাতার
রাত জাগা উৎসবের স্মৃতি ভঙ্গ করে।
তবু—
তবু মনে হয়
ভালোবাসা-পাতা এই অস্থির হৃদয়
'ডাকো মধুমিতা নামে'
ডেকে ডেকে যায়
অনিত্য এ সংসারের সীমানায় এসে।
চিরস্থায়ী নিত্য, লব্ধ, ধ্রুব নয় সেকি?

দেউলিয়া
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

বসন্ত জাগিয়ে বলে সে আসেনি নর্মমহোৎসবে
বিজয় গৌরবে,
কোকিলের মত্তকণ্ঠে পলাশের কেতন উড়িয়ে
দর্পভরে মদভরে পদভারে পৃথিবী গুঁড়িয়ে।
সন্ধ্যায় তারার মত মৃদুনীল স্নিগ্ধ আলো জ্বেলে
ভীরু দৃষ্টি মেলে
সে এসেছে নম্রমুখে শান্ত ক্ষেম
কোমলে গান্ধারে
উত্তাপে প্রশান্তি তৃপ্ত শুভ্র যূঁই
স্ফটিক আধারে।
সে এসেছে দাবদাহে—পরাজয়ে—দুঃখে বেদনায়
পল্লব ছায়ায়
ঢেকে নিতে সর্বজ্বালা অবজ্ঞার নির্জনতা আর
পূর্ণ করে দিতে শুধু মুছে নিতে
গ্লানি উপেক্ষার।
নিরলস আঁখি তার নীরবে তো গেছে লক্ষ্য ক'রে
মাস বর্ষ ধ'রে
প্রতিটি দিনের আয়ু ইতিহাস প্রতিটি ক্ষণের—
গৌরবে আনন্দ পেয়ে অগৌরবে যন্ত্রণা অন্তের।
আর ভাষা পড়েছে সে সূক্ষ্মতম মুখের রেখায়
স্নেহে মমতায়
উজ্জ্বল হয়েছে চিত্ত গোধূলির করুণ কিরণে—
নিজেকে হারিয়ে তাই দেউলে সে
সে-কি অকারণে?

সিঁড়ি
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

শব্দের বিচিত্র ভিড় চেতনার যন্ত্রণা অশেষ
ট্রাম-বাস কোলাহল আঁকাবাঁকা গলি,
নগরদেয়াল ঘিরে অবসন্ন মন
মুমূর্ষু মুহূর্তগুলি মরে আর মরে!

দিন নেই, রাত নেই, মানুষের মুখ—
অন্ধকার প্রেত ছায়া ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস,
নেই, নেই, আশা নেই, হতাশের সুর—
এ-নগর ভাঙ্গা ইট প্রাচীর প্রহরে
মুমূর্ষু মুহূর্তগুলি মরে আর মরে।

চন্দ্র তারা টিপ কোথায়, কোথায়?
এ-নগর ছেড়ে এসো অন্য নগরে,
ছায়ারা নিচেতে যাক, অন্ধকার ঘরের দেয়ালে
ভাঙ্গা সিঁড়ি নড়বড়ে তাও পড়ে যাক
উঠে এসো ছাদের উপরে!

মুমূর্ষু মুহূর্তগুলি প্রাণ পায় চেতনা শিহরে
আকাশ অজস্র নীল, নীল পাখি
কোথায়, কোথায়?
এ-নগর ছেড়ে এসো জীবনের আর এক কুলায়।

অভিনয় কী? অভিনয় হল গিয়ে—যা নয় তাই। গুরুদেব খেতুবাবু বলতেন, "এ ত্তি নয়, ও ত্তি নয়, তাকে বলে অভিনয়।

বিখ্যাত অভিনেতা—কী যেন নাম, মনে পড়ছে না—তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, অন্ধকে দিয়ে যদি অন্ধের ভূমিকা অভিনয় করানো হয়, তবে সেটা অভিনয় নয়, সে হয়ে দাঁড়ায় করুণ ব্যাপার।

সেদিক থেকে বলতে হয়, ব্যাটাছেলে যখন মেয়েছেলের ভূমিকা অভিনয় করে, সেটাই সত্যিকার অভিনয়। তা আজকাল তো সে পাট উঠেই যাচ্ছে। উঠে গেছে বললেই চলে। এখন তো' দেখতে পাই, যাত্রার পালাতেও মেয়েরাই নামছে নারী-ভূমিকায়।

হাসছেন? তা বুঝতে পারছি, আমাদের পাড়ায় সোতে নন্দীর মত বলবেন, তা হলে তো মেয়েছেলেকে দিয়ে ব্যাটাছেলের পার্ট করাতে হয়।

হয়ইতো। ভালই হয়। হয় নি কি? আগেকার দিনে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে কত অভিনেত্রী অমর হয়ে গেছেন। মেয়েদের কলেজে কি মহিলা সমিতিতে যে মেয়েরা দাড়ি পরে, গোঁফ লাগিয়ে, পাগড়ি বেঁধে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করছে, তা খারাপ হচ্ছে কিছু? গলা? তা যদি বলেন, তবে বলি, আমাদের এ বঙ্গদেশে আজকাল ব্যাটাছেলে গলারই কী বাহার! আমাদের হিম্বোস বলত, "আপনাদের এ স্টেশনে তো দেখছি সবই 'মেল' হয়ে যায়, দাদা।"

মানে, তখনকার দিনে আমাদের রেল স্টেশনটা ছিল ছোট। অনেক ট্রেনই এখানে থামত না। যে গাড়ি থামত না, সেটা 'প্যাসেঞ্জার ট্রেন' হলেও তাকে বলা হত 'মেল'। "হ্যাঁ ভাই, লালগোলা প্যাসেঞ্জার এখানে ধরবে?" জবাব হল, "না ভাই, মেল্ হয়ে যাবে।" তারই সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলত আর কি হিমু বোস। পুরুষ-পার্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যেত আমাদের থিয়েটার ক্লাবে। ক্যানকেনে খ্যানখেনে গলার লোকও চাইত 'মেল্ রোল'—পুরুষ-ভূমিকা। তাকে 'ফিমেল' পার্টই যে কে দিচ্ছে তার নেই ঠিক।

মেয়েলী গলা হলেই যে মেয়ে ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবে, তার কোন মানে নেই। চেহারায় না মানালে হিজড়ের মত দ্যাখাবে না? মেয়েলী চেহারা? ভুল ধারণা। সেই ধারণা নিয়েই একবার আমাদের 'সরমা' পালায় রঘু সেনকে দিয়েছিলাম সীতার পার্ট। মেয়েলী চেহারা, মেয়েলী হাবভাব, মেয়েলী গলা, কথা বলতে বাঁ হাত চালায় বেশি এবং লীলায়িত ভঙ্গিমায়, দেহটি নিটোল, গায়ের রঙটি পর্যন্ত দুধে-আলতা গোলা। যথাকালে তাকে সীতা সাজিয়ে আমরা তো বেয়াকুব! পুরুষবেশে যে রঘু সেনকে মেয়েছেলের মত দ্যাখায়, কে জানত যে নারীবেশ ধরলে তাকেই দ্যাখাবে ব্যাটাছেলের মত! কিন্তু তখন তো আর উপায় নেই। সেই পুং-সীতা নিয়েই আমাদের 'সরমা' পালা নামাতে হল। শিক্ষা হয়ে গেল জন্মের তরে।

তাক্ লাগিয়ে দিল হিমাংশু বোস। নারী ভূমিকায় অভিনয় করার এমন আদর্শ পুরুষ আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না জীবনে।

আমাদের এখানে স্টেশন মাস্টার ছিলেন বোস মশাই। তাঁর ভাইপো হিমাংশু একদিন এসে উঠল তাঁর বাসায়। চাকরি পেয়েছে কলকাতায়। এখানে জ্যাঠামশাইএর বাসায় থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী ক'রে চাকরি করবে। আমাদেরই সমবয়সী। আমাদের নাট্যসংঘে প্রবীণ থেকে নবীন পর্যন্ত সদস্য ছিল কম নয়; তার মধ্যে আমরা ডজনখানেক প্রায় সমবয়সী বন্ধু ছিলাম সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। সকলেরই নাটুকে বাতিক। সকলেই চাকরি করি। রোজ সন্ধ্যার পরে সংঘের ঘরে আসর জমাই। রতনে রতন চেনে। হিমু বোস এখানে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই ভিড়ে গেল আমাদের দলে। হাসিখুশি মিশুকে ছোকরা। ছেলেবেলা থেকে নাকি নাটের মঞ্চে উঠেছে অনেকবার।

কোন্ কোন্ ভূমিকায়?

নাম বললে সব নারী ভূমিকার। শুনে আমরা হাঁ করে রইলাম। তার তামাম চেহারার মেয়েলী চিহ্নমাত্র নেই। ভাবলাম, ও যেখানে মেয়ে সেজেছে, সেখানে নারী-ভূমিকায় নামতে এর চেয়ে ভাল চেহারা আর নেই নিশ্চয়ই। কাজেই 'এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে'। গায়ের রঙ ময়লা। তাতে কিছু আসে যায় না। ভূমিকা-বিশেষে বেশি মাত্রায় রঙ মাখালেই হল। কিন্তু চেহারা! মোটা নয়, রোগা নয়, চোয়াড়ে ভাব নেই রেখাও, গড়ন নিটোল বটে। কিন্তু মুখ? ওই মুখকে নারীমুখে রূপায়িত করবে কোন্ কারিগর? তারপর, গলার স্বর? পুরুষালী না হলেও, মেয়েলীও তো নয়।

মুখের ওপর তো কিছু বলা যায় না। তায় নতুন এসেছে। কিন্তু চালাক ছেলে। ধ'রে ফেলল আমাদের মনের ভাব। বলল, "আপনারা 'সিন্-ড্রেস্' নেন কোত্থেকে?"

বড় কোম্পানি থেকেই নিতাম। বললাম, "ডি রায় থেকে।"

হিমাংশু বলল, "ডি রায় কোম্পানির মাখনদাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার কথা—হাতি-খুরোর হিম্বোসের কথা।"

হাতিখুরোর মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া করত। বড় মাতুলের নাটুকে নেশা। তাঁরই দীক্ষা-শিক্ষায় সেখানেই হিমুর নাট্যপ্রতিভার বিকাশ। পুরুষ বলতে এক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করেছে—আর সবই নারী ভূমিকা।

কলকাতায় অফিস করতাম আমাদের বন্ধুদের মধ্যে চারজন। রোজই অফিস-ফিরতি সন্ধ্যাবেলা শেয়ালদায় এসে একই ট্রেনে বাড়ি ফিরতাম। সেদিনও একে একে জড় হয়েছি, প্লাটফরমে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেখি হিম্বোস আসছে অফিস-ফেরত। আমাদের দেখতে পেয়ে প্রস্তাবটা সে-ই করল, "চলুন না ডি রায় কোম্পানিতে।"

ভাল কথা! একজন হুঁ বলতেই বাকি সবাই মহা উৎসাহে রাজি।

গেলাম ডি রায় কোম্পানিতে। ওদের 'মেক-আপ-ম্যান' মাখনদা যা একখানা অভ্যর্থনা জানালেন হিমাংশুকে, তাই দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। আমাদের বললেন, "আরে, হিম্বোসকে

য়েছ—তোমাদের ক্লাবের ভাগ্য, গাঁয়ের ভাগ্য, মোটের ভাগ্য। 'জুএল'—একখানা 'জুএল'। মেল্-রোল'-এ......আচ্ছা, কী বই ধরেছ?"

ধরিনি কিছু তখনও। বললাম, "ভাবছি, কদার রায়' ধরলে কেমন হয়?"

"ভাল হয়। খুবই ভাল হয়।" মাখনদা ৎসাহ দিয়ে বললেন, "হিমুকে কর 'সোনা'—াখ কী কাণ্ডখানা হয়।"

সোনা! বলে কী! হিম্বোসের মুখের দিকে ামরা সবাই একসংগে চেয়ে রইলাম নিশ্চল ৃষ্টিতে। ইতিমধ্যে এসে মাখনদাকে পড়িয়ে যায় ন তো হিমাংশু? সে ছাড়া আমরা আর সবাই কলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম অর্থ-ূর্ণ দৃষ্টিতে। মাখনদা সেটা লক্ষ্য করলেন, ঠাৎ মুখ টিপে হেসে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা একটু বোস। হিমু এস দেখি।"

হিম্বোসকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন পেছনের ামরায়।

খানিক পরে ডাকলেন আমাদের।

ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, অমনি একটি গৃহস্থ বধূ ভেতরে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে স্বাগত জানাল, "নমস্কার আসুন।"

থতমত খেয়ে গেলাম। নিখুঁত মেয়েলী গলা, সুমিষ্ট, সুস্পষ্ট। আর রূপ! আমরা কেউ তাকাতে পারছি নে মহিলার চোখে চোখে। অথচ এমন কিছুই করা হয়নি। মুখে, গলায়, হাতে একটু পাউডার, মাথায় লম্বা চুল, পরনে লাল-পাড় আটপউরে শাড়ি, কানে কানপাশা, হাতে তিন-চারগাছা ক'রে চুড়ি—ব্যস্। আমরা একে-বারে বিহ্বল, অচল। মাখনদার মুখে মৃদু বিজয়ের হাসি।

মহিলা বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আপনারা? ভেতরে আসুন, বসুন।"

মাখনদা বললেন, "তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় যে, ইনিই আমাদের হিম্বোস, তাহলে এ মহিলাকে আমি তোমাদের সামনেই বিবসনা করি।"

ব'লে তিনি তার শাড়ির আঁচল ধরে টান মারলেন। আর অমনি হিমু ঊর্ধ্বনেত্রে জোড়হাত করে দ্রৌপদীর পার্ট শুরু ক'রে দিল—সভামধ্যে দুঃশাসন যখন বস্ত্রহরণ করছে তখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর সেই পার্ট। শুনে আমাদের বুকের রক্ত একেবারে রি রি করতে লাগল।

মাখনদা খুলে ফেললেন শাড়ি, তুলে নিলেন পরচুল; আণ্ডারওয়্যারের ওপর হাফশার্ট পরা হিম্বোস দাঁড়িয়ে রইল, কানে কানফুল, হাতে চুড়ি। এটা পর্যন্ত আমাদের কারও খেয়াল হয় নি যে, হাফশার্টের ওপরেই শাড়ি পরেছে সে, একটা ব্লাউজ পর্যন্ত পরে নি, মুখে মেক-আপ নেওয়া তো দূরের কথা। তখনকার দিনে অবশ্য জিভে-কলারওলা ব্লাউজের চল ছিল। যাক্ সে কথা। আমরা একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠ হয়ে। হাতের, কানের গয়না খুলে রেখে, মুখ-হাতের পাউডার মুছতে লাগল হিমু। মাখনদা বললেন, "দাও, খাইয়ে দাও।"

'কেদার রায়'ই করলাম আমরা। আর 'সোনার' ভূমিকায় হিম্বোসের নামে একেবারে জয়জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। শত্রুপক্ষের লোক রটাতে লাগল, আমরা উচ্ছন্নে গেছি—আমরা নাকি মেয়েছেলে নিয়ে থিয়েটার করছি। হায় রে! আজকাল যে ক্লাবগুলো আখছারই বাইরে থেকে অভিনেত্রী ভাড়া এনে থিয়েটার করছে, তাতে কারও মুখে টুঁ-শব্দ নেই! না—না, তার বিরুদ্ধে কিছু বলছি নে আমি, শুধু দুঃখটা নিবেদন করছি আর কি।

তারপরে করলাম 'সাজাহান'। হিম্বোস হল 'জাহানারা'। সে যে কী জাহানারা,—কী রূপ, কী ভঙ্গি, কী উচ্চারণ—বলতে হয়, 'ভাষা না জুয়ায় তারে কেমনে বাখানি'। চারদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল একেবারে। বাড়ি বাড়ি এবেলা-ওবেলা নেমন্তন পেয়ে পেয়ে হিম্বোসের পেট খারাপ হয়ে গেল। আশপাশের ক্লাবগুলো তাকে ধরে টানাটানি করতে লাগল টাকা নিয়ে। সেও তেমনি ছেলে। হাঁকিয়ে দিল সবাইকে, বলল, "আমি মশাই, ভাড়া খাটার ব্যবসা করি নে।"

কথা যখন উঠলই, তখন সেই কাবলিওলার কাহিনীটাও না ব'লে ছাড়তে পারছি নে।

টাকা-ধার দেওয়া কাবলিদের এখন অনেক কম দ্যাখ্যা যায় আগের তুলনায়। তখন সেই ইংরেজ আমলের শেষ দিকে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন সবে বাধি বাধি করছে—সে সময়ও কাবলির উৎপাত ছিল আমাদের শহরতলির যেন জীবন-সাথী। হিমাংশুর জ্যাঠামশাই, আমাদের স্টেশন-মাস্টার সেই বোস মশাইএর সংসারটি ছিল বড়। সামান্য আয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যেতেন ভদ্রলোক। উপরি-শুপরির আমদানিও ছিলই না বলতে গেলে। ধারদেনায় জড়ীভূত হয়ে পড়েছিলেন। এক কাবলিওলার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন একশ' টাকা, তার মাসিক সুদ বারো টাকা। মাসে মাসে কাবলি খাঁ নিয়মিত সময়ে হাজিরা দেয় আর বোস মশাই তার হাতে বারোটি ক'রে টাকা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। খাঁসাহেবও বরাবর বলে চলেছে, "আছল নেহি মাংতা, বাবুজি, ছিরেফ ছুদ দে দো তুম।"

আর, আসলও তো কিস্তিতে শোধ নেবে না। মাসের পর মাস ক'রে ক'রে দু বছরের ওপর শুধু সুদই দিয়ে গেলেন নিরীহ বোস মশাই। খেয়ালই নেই কত টাকা দেওয়া হল। এ অবস্থায় পড়লেন তিনি টায়ফয়েডে। তখন তো এটা মারাত্মক রোগ।

বোস মশাইএর মেয়েরা ছিল বড়, ক'টার বিয়ে হয়ে গেছে, কটার হয়নি, জানিনে. দুটি ছেলে ছিল—বাচ্চা। রোগে যখন পড়েছেন, তখন হিমাংশুই তাঁর সংসার-তরণীর কাণ্ডারী। কাবলি এসে আর সুদের টাকা পায় না, হিমাংশু বলে, "আগে আমার জ্যাঠামশাই সেরে উঠুন তাঁর চিকিৎসায় এখন সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, এক পয়সা দিতে পারব না তোমায়।"

কাবলি ওঠে রেগে। হিমাংশু বলে, "এখানে চ্যাঁচামেচি ক'রে কোন ফয়দা হবে না, বাপু, তুমি বরং আদালতে যাও।"

বোস মশাইএর রোগ আর সারে না দেখে খাঁএর মুখ শুকিয়ে গেল। তখন সে বলে "ছুদ্ নেহি মাংতা, বাবু, আছ্ল দে দো।"

"হ্যাণ্ডোরি ব্যাটা। এক পয়সা এখন ফাদার-মাদার; একশ' টাকা আসল দেব! এ কী খ্যালা-রামের লীলে পেয়েছ বাবা?"

বোস মশাই আর সেরে উঠলেন না। মারা গেলেন। সেই খবর না পেয়ে কাবলি তো হন্ত-দন্ত হয়ে এসে হাজির, হিমুকে বলে, "হাম্‌কা রূপেয়া দো।"

"কিসের রূপেয়া তোর? তোর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি আমি?" হিমাংশুর তখন মেজাজের অবস্থা কী, বুঝতেই পারছেন। তেড়ে এল একেবারে, "ব্যাটা গলাকাটার বাচ্চা! একশ' টাকা ধার দিয়ে তিনশ' টাকার ওপর আদায় করেছিস ভালমানুষ পেয়ে, এখন মারা যাবার পরেও টাকা?"

একদিন তো কাবলিরা একেবারে সদলে এসে হাজির। একেবারে ডজনখানেক খাঁসাহেব। হাতে হাতে ডাণ্ডা। আমরাও হৈহৈ করে গাঁশুদ্ধ ভেঙে পড়লাম। এদিকে খবর দিলাম পুলিসে। তাই না শুনে লাঠিসোটা গুটিয়ে খাঁএর দল মারল উলটো দৌড়।

তখনকার মত মিটল বটে। কিন্তু খাঁ আর গাঁ ছাড়ে না। আমরাও রাতারাতি মাস্টারমশাই-এর সব জিনিসপত্র সমেত তাঁর পরিবারবর্গকে তুললাম এনে আমাদের বাড়িতে। কয়েক দিনের মধ্যেই হিমু কলকাতার একেবারে বিপরীত উপকণ্ঠে বাসা ঠিক ক'রে উঠে গেল সবাইকে নিয়ে। তারপরে তাকে অবশ্য অনেকবারই আসতে হয়েছে মাস্টার মশাইএর পাওনা-টাওনা সংক্রান্ত অফিসী ব্যাপারে; কিন্তু খাঁএর সাধ্য হয় নি তার টিকির দ্যাখা পাবার। খাঁ কিছুকাল পাগলা কুকুরের মত ছোটাছুটি করেছে। এসেই বলে, "কাঁহা ছিপাকে রাখা উ বুস্‌বাবুকো। নিকাল দো উস্‌কো।"

ব্যাটা, তোর বোস বাবুকে আমরা কি হাঁড়ির ভেতর লুকিয়ে রেখেছি যে, বের ক'রে দেব? আমরাও করতাম তাড়া। এই ক'রে ক'রে হয়রাণ হয়ে পড়ল খাঁসাহেব। তবু কি কাবলির ছাড়া দমে? রক্তশোষা টাকার মায়া কাবলির।

কিন্তু তাকে দমিয়ে দিল লড়াই।

তারপরে আর নতুন বইও ধরা হল না আমাদের। বেধে গেল দুনিয়া জুড়ে মহাযুদ্ধ। সিন্, পোশাক, এসবের দর তো বেড়ে গেলই, তার ওপর চলল নিষ্প্রদীপ। নাটুকে শখ মাথায় উঠে গেল আমাদের। দেখতে না দেখতে সংসার, সুখ, শান্তি, আমোদ-আহ্লাদ সব ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে পড়ল। বাস্তবের মঞ্চে যখন জীবন-নাট্য জোলুশ ধরে ওঠে, কাঠের মঞ্চে তখন নকল নাটকের অভিনয় আর চলে না।

এর মধ্যে কোথায় গেল কাবলি খাঁসাহেবরা, কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। এমন কি, হিমাংশু কোথায় গেল, সে-খবরও রাখা গেল না।

তারপর—অনেক কাল পরে, একদিন যুদ্ধ থামল। আলোর শ্মশানে আবার বাতি জ্বলল। আবার একে-দুয়ে খাঁএরা দ্যাখ্যা দিল, কিন্তু দলে আর ভারি নয়। সব দিকে সবই যেন ভাঙা ভাঙা। তাদের দলও ভাঙা। হিম্বোসের সেই খাঁকে আর দেখতে পাই নে।

আমরা ভাঙা হাটে আবার মেলা জমাবার চেষ্টায় লেগে গেলাম। একটা জমাটি বই না ধরলে সুখ হচ্ছে না। পুরানো যাদের পাওয়া গেল, তাদের সংগে নূতন যারা এসেছে যারা এ ক'বছরের মধ্যে কৈশোর কাটিয়ে তরুণ হয়ে উঠেছে তাদের নিয়ে আমরা 'সাজাহান' অভিনয়েরই মহড়া নিয়ে মেতে উঠলাম।

কিন্তু জাহানারার ভূমিকায় যে হিম্বোসকে পাওয়া চাই। কোথায় সে? কলকাতায় যে অফিসে কাজ করত সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সেই অফিসই না পাত্তা। টেলিফোনের বইতেও তার নাম পাওয়া গেল না। টালিগঞ্জের ওদিকে যেখানে থাকত, সেখানে তো আগেই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছি, মিলিটারি ছাউনি

পড়েছে। তার বাড়ির ঠিকানা জানা নেই। হাতি-খদরের নামটা মনে আছে—চলে গেলাম সেখানে তার মামাবাড়ীতে।

সৌভাগ্য যে, সেখানেই পাওয়া গেল তাকে। সামরিক চাকরি নিয়ে চ'লে গিয়েছিল বাইরে, এখন যুদ্ধ থামতে ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও টিকি বাঁধা আছে মিলিটারিতে। এখন ছুটি ভোগ করছে আর ভাবছে, ঐ চাকরিতেই থেকে যাবে, না ছাড়ান নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

আমাকে পেয়ে একেবারে হৈ-চৈ জুড়ে দিল। তার মামাবাড়িতে খুব আদরযত্ন হল আমার। নাটকের ডাক পেয়ে কি আর ঘরে থাকতে পারে হিম্বোস? নাচতে নাচতে চ'লে এল আমার সঙ্গে।

কাবলি খাঁর কথা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল। পূর্বস্মৃতি মনে জেগে উঠল আমাদের স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতে। জিজ্ঞেস করল, "সেই কাবলি শালা আছে এখনও?"

বললাম, "লড়াই শুরু হতেই ভেগেছে। তারপর আর তাকে দেখতে পাইনি।"

"টাকার শোকে অক্কাপ্রাপ্ত করল নাকি!" বলে হাসল। ও সম্বন্ধে আর কিছুই বলল না।

আমাদের 'সাজাহান' অভিনয়ের সব ঠিকঠাক হল প্রায়। হিমাংশুকে পেয়ে আমরা চূড়ান্ত প্রস্তুত হলাম। মঞ্চ বাঁধা হল। পর্দা এল, দৃশ্যপট এল, সাজপোশাক এল—সবই সেই ডি রায় কোম্পানি থেকে। মাখনদাও এলেন।

মঞ্চের পর্দা উঠতে আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরি। অনেক কাল পরে থিয়েটারের আয়োজন হয়েছে—প্রেক্ষা-ময়দান লোকারণ্য। শেষের দিকের কয়েকজনের ছাড়া আর সব অভিনেতারই, বিশেষ ক'রে প্রধানদের সাজ-নেওয়াও সমাপ্ত। প্রথম দৃশ্যেই সাজাহান আর জাহানারা। সাজাহান মঞ্চে উঠেছেন, জাহানারাও উঠতে যাচ্ছে। জাহানারা-রূপী হিমুর দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের আর 'নয়ন না তিরপিত ভেল।' এমন সময়ে সাজঘরের বাইরে কিসের কোলাহল! কোলাহল ভেদ ক'রে ঘন ঘন উঠছে মোটা গলার বিজাতীয় আওয়াজ, "বুস্‌বাবু কাঁহা? বুস্‌বাবুকো নিকালো। হাম বুস্‌বাবু মাংতা।"

হিম্বোস মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে দু'চোখ বড় করে বলল, "অ্যাই মরেছে!"

চটের জোড়ার ফাঁক দিয়ে দেখি, হ্যাঁ, ছায়া নয়, মায়া নয়, ভূত নয়, একেবারে জীবন্ত দেহে সাক্ষাৎ সেই কাবুলি খাঁ। ছিল কোথায় এতদিন! এখন ভুশ ক'রে ভেসেই বা উঠল কোত্থেকে? একা নয়, সঙ্গে আছে আরও দুই খাঁ।

আমরা তো সেজে বসে আছি, বেরোব কী করে? বেরোলেন আমাদের মঞ্চাধ্যক্ষ অমরদা। পালোয়ান মানুষ। সাজঘর থেকেই বেরিয়ে খাঁএর মুখোমুখি হলেন, "কী চাই তোমার এখানে? ক্যা মাংতা?"

"বুস্‌বাবু মাংতা। নিকাল দো বুস্‌বাবুকো। হামলা লুপেয়া মাংতা।"

অমরদা বললেন, "তোমার বোসবাবু এখানে আছে—কে বলল তোমায়?"

সঙ্গের একজনকে দেখিয়ে খাঁ বলল যে, সে নাকি আজ দেখেছে বোসবাবু এখানে আছে আর খোঁজ নিয়ে নাকি জেনেছে যে, বোসবাবু এখানে খেল্ ভি দ্যাখাবে।

মুশকিল! বেশি ভাববারও সময় নেই। অমরদা বললেন, "তোমার ও-লোক বোসবাবুকে চেনে?"

"জরুর পহ্‌ছানতা। বহুত দফে দেখা।" আসল খাঁ নিজেও বলল যে, তার সঙ্গে ও লোকটা অনেকবার এসেছিল আগে, বোসবাবুকে সে ভাল করেই চেনে।

"ওর কথা বাদ দাও।" অমরদা বললেন, "আসল আদমি হলে তুমি। তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে এসে দ্যাখ, বোসবাবু আছে কি না। যদি না থাকে, তা হলে কিন্তু তোমায় দেখে নেব আমি।"

"জরুর্!" আসল পাওনাদার খাঁ ভেতরে যেতে প্রস্তুত।

"এস আমার সঙ্গে।" অমরদা আগে, তাঁর পেছনে মুলো খাঁ। সাজঘরে ঢুকেই খাঁ একেবারে হতভম্ব। কোথায় এল রে বাবা! এদিকে সাজাহান, ওদিকে ঔরংজেব, এখানে দারা, ওখানে সুজা...সামনেই চেয়ারে বসে খোদ জাহানারা তার দিকে চেয়ে আছে।

খাঁ নিশ্চল। প্রায় সবদিকে চটের ঘেরা, নিচে ঘাসের গালচে, এ কোন্ সুলতান-মহলে এসে পড়ল সে? সাজেগোজে সবাইকে যেন অনেকখানি কাছাকাছির লোক বলেই মনে হচ্ছে। জাহানারার দিক থেকে সে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। ফিস্‌ফিস্ ক'রে অমরদার কানে কানে আশঙ্কা জানালাম, "চিনে ফেলল নাকি? কেন মিছিমিছি ভেতরে নিয়ে এসে ঝামেলা বাধালে?"

কিন্তু খাঁসাহেবের দৃষ্টি যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে! লালায়িত হয়ে উঠছে! লালারসে যেন শিথিল হয়ে পড়ছে তার বিপুল দেহ। জয়সিংহ জনান্তিকে চাপা গলায় বললেন, "মরেছে!"

খাঁর দিকে কটমট ক'রে তাকালেন অমরদা, "কোথায় তোর বোসবাবু? আছে এখানে?"

যে অবস্থায় কত কত ফকির-পয়গম্বরের মতিচ্ছন্ন ধরে, সেখানে খাঁ তো কোন্ ছার! সে ক্যাবলার মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, "নেহি।"

"তবে?" মুখভঙ্গি বিকৃত হল অমরদার, উন্নুক বলেছেন, আর অমনি ভল্লুকের বিশ্বাস হয়ে গেল! যা, ভাগ হিঁয়াসে! ঝুটমুট ঝামেলা করনে আয়া।"

নেহাত ঘাড়ে হাত দিলেন না। পিঠে হাত দিয়ে খাঁকে ঘুরিয়ে দাঁড় করালেন। খাঁর সর্বদেহে আর বশ নেই। অমরদা পেছনে ঠেলছেন ব'লে বাইরের দিকে এগোচ্ছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে জাহানারার দিকে। তাই দেখে জাহানারা হেসে ফেলল ফিক্ করে। আর যাবে কোথায়! খাঁ ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখে যা একখানা লাল হাসি ফুটে উঠল, তা দেখে জাহানারার হৃৎকম্প উপস্থিত! ছুটে এসে ধরবে নাকি জড়িয়ে-গড়িয়ে! তা হলেই তো চিত্তির।

কোনমতে খাঁকে ঠেলে বের করলেন অমরদা। ভেতরে এসে হিম্বোসকে বললেন, "মাথা খারাপ তোমার? এ অবস্থায় কখনও আশকারা দিতে হয়?"

হাসির ধুম পড়ে গেল সাজঘরে। কিন্তু হঠাৎ সেই হাসি আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরে কিসের ও বীভৎস গর্জন! মুখ বাড়িয়ে দেখি, দুই খাঁর লড়াই বেধে গেছে। ওদের নিজস্ব ভাষা তো বুঝি নে। তবু সার বোঝা গেল। এ খাঁ বলছে, "মিছে কথা। তুমি বোসবাবুকে দ্যাখ নি। ঝুটমুট আমাকে নাকাল করেছ।" আর ও খাঁ জোর দিয়ে বলছে, খুদা কসম্, সে নিজের চোখে দেখেছে।

এই নিয়ে হাতাহাতি দুই খাঁতে। আজকাল আর লাঠি থাকে না ওদের হাতে। তৃতীয় খাঁ মাঝে প'ড়ে দুজনকে ছাড়াতে গিয়ে দুজনেরই মার খেয়ে মরছে। ওখানে খানিকটা খোলা জায়গাও আছে। আমাদের নাটকের দর্শকেরা সেদিকে ছুটল তিন খাঁর নাটক দেখতে। আর এদিকে আমাদের প্রেক্ষা-মাঠ খাঁ খাঁ করতে লাগল।

আমরা সেজে ব'সে আছি, বেরোতে পারিনে। মহা মুশকিলে পড়া গেল।

অবশেষে অনেকে মিলে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লড়ন্ত দুই খাঁকে ঠেলেঠুলে সদর রাস্তায় তুলে দিয়ে এল।

এর মধ্যে দ্বিতীয় খাঁ বার বার দাবি করছিল যে, তাকে সাজঘরে যেতে দেওয়া হোক—সে বোসকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু প্রথম খাঁর কানে তখন বুঝি ওসব কিছুই ঢুকছে না, অথবা যে বেহেস্তীয় হুরী সে আপন চর্মচক্ষে দেখেছে তা আর কাউকে দেখতে দিতে চায় না। কী তখন তার মানসিক অবস্থা, কে বলতে পারে? বাহ্যত দ্যাখা গেল, সে প্রবল ঘুষিতে দ্বিতীয় খাঁর সব দাবি নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

সে-রাত্রে আমাদের অভিনয় শুরু হতে না হক অন্তত একটি ঘন্টা দেরি হয়ে গেল। তবে জমেছিল খুব।

ওরা কবিতা বোঝেনা

অতসী লাহিড়ী (চৌধুরী)

ওরা কবিতা বোঝেনা,
বোঝবার চেষ্টাও করে না কখনো
আমি প্রায়ই ডেকে বলি, বোসো—
একটি কবিতা পড়ি, শোনো।

ওরা বলে, ও কবিতা থাক্
ওসমস্ত তোমাদেরই সাজে
তার চেয়ে বলো, দেখি কিছু
লাগবে যা' কাজে।

ওরা কবিতা বোঝেনা,
না বোঝারই কথা।
চুপ ক'রে শুনি ব'সে আমি
বলে ওরা জীবন-বার্থতা।

দিন আনে দিন খায় ওরা
সময়ের মূল্য ঢের বেশী
ওদের কাছে,
অর্থাভাবে, অনাহারে যার
উদর ভরে না
কবিতা শুনে কি তার
জীবন বাঁচে?

আমি যদি ডেকে বলি, বোসো,
একটি কবিতা পড়ি, শোনো।
ওরা হাসে, টিট্‌কিরি মারে
বলে শুধু ঘরে ব'সে ব'সে
কল্পনারই মায়াজাল বোনো।

মার্কিনী হযবরল

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

বাংলায় 'গাই' মানে যা, মার্কিনীতে তা নয়। দেশী মতে 'গাই' অর্থে শ্রীভগবতী। মার্কিনী মতে 'গাই' হল শ কেউকেটা ভদ্দরলোক। কোন আমেরিকান ন আপনাকে একটি 'নাইস গাই' বলে খ্যা দেয় তাহলে চটিতং হয়ে তাঁর পরাধ নেবেন না দোহাই। তিনিও যেমন কটি ভদ্দরলোক আপনাকেও তেমনি একটি দরলোক ঠাওরাতে চেয়েছেন মাত্র।

একটি 'চা' অর্থে যা তাতায় কিন্তু মাতায়। চা+চা অর্থে খড়োকে বুঝয় আর তিন চা র্থাৎ 'চাচাচা' হল স্বনামধন্য নাচা।

কলকাতার এসপ্লানেড যা নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারও তাই। সেখানে যদিও আরও রল আলোর বন্যা, আরও পুরুষ, আরও হিলার চলাফেরা, আরও গাড়ি, আরও বাড়ী, আরও সোরগোল। আমাদের এখানে সবেধন নির্মাণ একটা মেট্রো, ওখানে মেট্রোর মত জনখানেক সিনেমা। আরও হৈ হৈ আরও রৈ ই। আমাদের মনুমেণ্ট মাঠে একপায় দাঁড়িয়ে, নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কের মধ্যে ক্লিয়োপেট্রার ছুঁচও আকাশকে ফুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার গড়ের মাঠের মত নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্ক। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মাঠ অন্তরঙ্গতার আস্তরণ বিছিয়ে লোকালয় থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে। সেণ্ট্রাল পার্কের সোনালী সন্ধ্যা মনের বর্ণালী আমেজকে মাতিয়ে তোলে। সেখানে নির্জনতা উপভোগ করতে আসে প্যাণ্ট-কোট, স্কার্ট-ব্লাউজ পরিহিত কপোত-কপোতীরা। বার্ডওয়াচার-এর মত যারা এই অন্ধকারে অন্যের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেড়ায় তাদের এরা বলে বুস ওয়াকার। এদের কাজ অন্যের প্রতি শুধু দৃষ্টি বুলিয়ে যাওয়া। এদের চেয়েও সাংঘাতিক হল তারা যারা অন্ধকার হলেই সেণ্ট্রাল পার্কে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এরা সুযোগ পেলেই পিস্তল তুলে পকেট এবং দরকার হলে পরাণ পর্যন্ত খালি করে দিতেও ওস্তাদ। প্রায়ই খবরের কাগজে বার হয় সেণ্ট্রাল পার্কে এইরকম রাহাজানির সব বিবরণ।

নিউ ইয়র্কে মোটরে মোটরে ছয়লাপ। কিন্তু সেণ্ট্রাল পার্ককে চক্কর দেবার জন্যে আছে অগতির যান ফিটন। কিছুক্ষণের জন্য গতির রাজ্য থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন পাওয়া যায়। সেণ্ট্রাল পার্কের সীমায় স্কাই স্ক্রেপারের আঁকাবাঁকা লাইন দেখতেও নিউ ইয়র্কে দেশবিদেশের দর্শক সমাগম হয়। ভারতবর্ষ থেকে আগন্তুক এলে তাঁর জন্যে যাওয়া বরাদ্দ আছে সকালে সেণ্ট্রাল পার্কে। তুতু করে ডাকলেই আপনার হাতটির কাছে এসে দাঁড়াবে তাদের দেখে মনে হবে এদের সঙ্গে আমাদের কতদিনের সখ্য—সেই সত্যযুগ থেকে চলে আসছে জানাশোনা। রামচন্দ্রের আমলে এরা কত সাহায্যই না করেছে। ভারি মিশুকে হল এই কাঠবিড়ালীরা। ভয়ডর লাজলজ্জার বালাই নেই—সামান্য ইসারা করলেই গাছের ডাল ছেড়ে আপনার কোলের কাছে এসে উপস্থিত—কিছু খাওয়ার প্রত্যাশা করে। সেণ্ট্রাল পার্কের কাঠবেড়ালীদের একবার পরিচয় পেলে আর কখনও তাদের ভোলা যাবে না।

* * *

ক্লার্ক গেবলস্ শুধু একটা নাম মাত্র নয়। নামের উপরও আরও কিছু। আমেরিকার মহিলাদের মনোজগতে তিনি একটা প্রতিষ্ঠানের মত ছিলেন। হঠাৎ ক্লার্ক গেবলস্ মারা গেলেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। তাঁর মৃত্যু সংবাদে আমেরিকা শোকে মুহ্যমান। সবার মুখ ভার, বিশেষ করে মার্কিন মহিলাকুল যেন কী আপনার জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের মনের কথাটা প্রকাশ পেল যখন সাংবাদিকরা পথচারী মহিলাদের কাছ থেকে গেবলসের মৃত্যু সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নিলেন। একবাক্যে মহিলারা জানালেন ক্লার্ক গেবলসের মত এমন সর্বৈব পুরুষ এই আমেরিকায় আর দ্বিতীয়জন ছিল না—তিনি পৌরুষের নির্ভেজাল মুখপাত্র ছিলেন। একজন বৃদ্ধা ক্লার্ক গেবলসের মৃত্যু সম্পর্কে যে কথা জানিয়েছিলেন সেই কথার ভিতর দিয়ে মহিলামহলে ক্লার্ক গেবলসের কতখানি ভাব ছিল তার খানিকটা অনুমান করা যাবে। তিনি বলেন, এ দেশে এমন মহিলা কেউ নেই যিনি ক্লার্ক গেবলসের চেহারার সম্মোহন অনুভব না করতেন। ক্লার্ক গেবলসের চেহারা প্রত্যেক মহিলাকে তাঁর বিগত দিনের সুখস্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। তাকে দেখলে মনে হয় কে যেন কানে কানে ফিসফিস করে আজও বলছে—তুমি সেই রকম চতুর চটুল তরুণীটি হয়ে রয়েছ—তোমার ঔৎসুক্যে আমি উৎসুক। এ স্মৃতিতে ডুব দিলে মনে হয় আকাশের চাঁদ ও তারারা আজও বুঝি তেমনি জ্বলজ্বলে। পৃথিবীতে কিছুই মরে না তবে।

* * *

সহর নিউইয়র্কের তুলনা হয় না। এখানে কত দ্রষ্টব্যের মণিমাণিক্য পথে পথে ছড়ান রয়েছে। সহরের যে অঞ্চল বাওয়ারী বলে খ্যাত সে জায়গাটি না দেখলে চলে না। সহর কলকাতাও তো কম অদ্ভুত নয়। এখানে বাঘের দুধ চাইলে তাও পাওয়া যায়। কিন্তু বাওয়ারী দেখতে চাইলে এখানে কোথা থেকে পাবেন? একবার অনুমান করুন এই সহর কলকাতার যত বৃদ্ধ আছেন তাঁদের বেছে বেছে সহরের কোন একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে এনে ঠাঁই করে দেওয়া হল। ধরুন পাইকপাড়া কিম্বা কসবা শুধু বৃদ্ধ দিয়ে ভর্তি করা হল। নিউইয়র্কের যে জায়গাটির কথা বলছি সে জায়গাটি ভর্তি শুধু বুড় দিয়ে। দেখলে আশ্চর্য হবেন এই স্কাইস্ক্রেপারের সহরে এমন পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ীও থাকে। এইসব বৃদ্ধদের বলে 'বা—'—তাদের অধিকাংশই নেশা ভান করে। সংসার বলতে অধিকাংশের বালাই নেই—কোন রকমে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা প্রকট। হাত পাততে কিন্তু করে না। সাজসজ্জা চালচলন দেখলে মনে হবে হা-ঘোরে। এই অঞ্চলে প্রথম এলে মনে হবে যেন রীপ ভ্যান উইংকলের মতন আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখছেন লোকগুলো কেমন বুড় হয়ে গেছে, সারা দুনিয়া থেকে যেন আপনি এতদিন ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখানে রাস্তা ঘাটে, দোকানে রেস্তরাঁয় টাভার্নে সর্বত্র শুধু বৃদ্ধরা জুড়ে বসে আছে। কিন্তু আপনার ঘোর কাটতে দেরী হয় না যখন আপনি বাওয়ারী ফেলে রেখে একটু চলে এলেই দেখতে পাবেন সেখানে ছোকরাও আছে বুড়ও আছে, সবাই আছে। একলা কেউ নেই।

* * *

বয়সের লাইন পাতা আছে কচি থেকে বুড়িয়ে যাবার জন্যে। এ যেন সময়ের ট্রেণে চেপে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়া—লিলুয়া, বেলুড় বালি করে উত্তর উত্তর বছর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দিল্লি এসে থামা। এখন দিল্লিই তো সবকিছুর মোক্ষ। বর্ধমান যেন ছোল কৈশোরকে মিহিদানা খাওয়ার সময়, তারপর ফতেপুর হল যৌবনের কেল্লা ফতে করার জায়গা। বয়স তো সবারই একটু একটু করে বাড়ছে। কিন্তু মার্কিন মহিলারা বয়সের ট্রেণে চেপে যাত্রার শেষ করার প্রাক্কালে আবার লিলুয়া ফিরে যেতে চান। তখনও হাবভাবে, সাজ সজ্জায়, চাল চলনে, বলনে কয়নে কেমন খুকু খুকু ভাব লাগিয়ে রাখেন। মৌচাক খালি, তবু অভিলাষ পূর্ণ মাত্রায়। দেখা যায় তাঁরা প্রায়ই নিঃসঙ্গ এবং তখন একজন মহিলা আর একজন মহিলার কাছে মরূদ্যানের মত হয়ে উঠেছেন। পার্কে কিম্বা টাভার্নে এখন বৃদ্ধাদের টেবিলের পাশে বসে কান খাড়া করে শোনেন তো শুনবেন একজন আর একজনকে বলছেন—উঃ, তোমাকে আজ কী গর্জাস দেখাচ্ছে। তার উত্তরে তিনি বলছেন—আহা আমি গর্জাস না ছাই, তুমি সত্যি কী ফ্যাবুলাস। এই রকম একজন আর একজনকে কী ওয়াণ্ডফুল কী কিউট বলে আপ্যায়িত করছেন। যখন কেউ বলে না তখন নিজেরা নিজেদের বলে উৎফুল্ল করে রাখেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে ভাগ্যান্বেষী এক যুবক আলফ্রেড মোজার আমেরিকায় এসে এমন বয়স্থা মহিলাদের সমাদর করে হাতে কেমন করে চাঁদ পেয়েছিলেন সে গল্প আর একবার বলব।

* * *

রাত্রির একটা স্বাদ আছে যা দিনের সঙ্গে সর্বৈব তফাৎ। শুধু তাই নয় প্রত্যেক জায়গার রাত্রির স্বাদও আলাদা। এক নিউ ইয়র্কে বসেই বিশ্বের সব রাত্রিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

দূরে কোথাও যেতে হবে না। নিউ ইয়র্কে বসেই যদি হাওয়াইয়ান রাত্রির স্বাদ পেতে চান তাহলে যান হোটেল লেকসিংটনের হাওয়াইয়ান রুমে। পলিনেশিয়ান খাবার মিলবে—তাছাড়া হুলাহুলা নাচ। নাচ দেখতে দেখতে তৃষ্ণার্ত হলে চাইবেন—টিকি লোলা, এন ওকোলেচা স্লিং। ব্যাপারটা শুনতে যত কাজে তত নয়। আসলে এই দলে ভাবের জল ফরমাস করছেন। নিউ ইয়র্কে বসেই যদি 'পারীকে' পেতে চান তাহলে যেতে হবে ল্যাটিন কোয়ার্টার্সএ। যেখানে সবকিছু 'উ লালা' ব্যাপার। ঘরের মধ্যে ফরাসী তপ্ত হাওয়া বইছে। স্পেনকে যদি ছুঁতে চান তাহলে রয়েছে 'এল চিকো'। সেখানে সর্বত্র রয়েছে স্পানিস ডেকোর। গিটার চলছে সঙ্গে ফ্লেমেংকো। রাশিয়ান কিছু পেতে হলে যেতে হবে 'টু গীটারসএ'।

এ সব ছেড়ে দিয়ে যদি আপনার মন চায় পুরোনো ইউরোপকে খুঁজে পেতে, তাহলে নিউ ইয়র্কে বসেও সেরকম জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 'ভিয়েনীজ ল্যান্টার্ন'এ। এখনও

(শেষাংশ ১২২ পৃষ্ঠায়)

একটি মৃত্যু

গল্প

বিশ্বনাথ রায়

এ কী হল?

সারা রাত কেতকী চোখের পাতা এক করতে পারে নি। ভয়ে বিছানার সঙ্গে সিঁটিয়ে আছে একেবারে। কিন্তু কী করে এই পাপ তার দেহে ঢুকল, কেতকী ভেবে পাচ্ছে না, অথচ মা বউদির গঞ্জনাকে ঠেলে ফেলতেও পারছে না। বিধবা মা সকাল সন্ধ্যে মেয়েকে মর মর করছেন। আড়ালে আবডালে কেতকীকে পেলেই দু' পাটির দাঁত এক করে অস্ফুটস্বরে গজরান, সর্বনাশী, মরতে পারিস না?

কেতকী প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারেনি। মা যে অভিযোগ করছেন, তাতো একেবারে খণ্ডন করার শক্তি তার নেই। সে নিজেও কেমন বোবা হয়ে গেছে। প্রথম যখন বউদিকে খবরটা দিয়েছিল, বউদি উঠোনের মাঝখানেই গালে হাত দিয়ে বসেছিল, ওমা, সোমত্থ আইবুড়ো মেয়ে! এ কলঙ্ক লুকোবে কোথায় ঠাকুরঝি?

সমাধানের বদলে সমস্যাটা আরও জটিলতর করে তুলল বউদি। বিধবা শাশুড়ীকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে। বাইরের দিকের জানালাগুলোও বন্ধ হয়ে গেল। কোন দিক দিয়ে ঘরের কথা গলে যাবার উপায় নেই। একে পাড়াগাঁ, তার উপর ঘরের কলঙ্ক-কথা। একবার ছড়ালে আর রক্ষা নেই।

আধঘন্টা পরে দরজা খোলার শব্দ পেল কেতকী। এ ঘরের খাটে চুপচাপ আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। ফাঁসির আসামী যেন। বুকের ভেতরটা দুপদুপ করছে। হাঁটু দুটো অকারণেই কেঁপে উঠছে। গলার ভেতর থেকে ঠোঁট অবধি শুকিয়ে কাঠ। ওপাশে ঘরের কোণে কুঁজোয় ঢাকা জল রয়েছে, কিন্তু গড়িয়ে নেবার সাধ্য নেই। পা দুটো যেন দুটো পাহাড় হয়ে গেছে তার অজান্তে।

মা ঘরে ঢুকেই চাপা কন্ঠস্বরে বললেন, মরতে পারোনি মুখপুড়ি?

মাথা নীচু করে কেতকী বসেছিল। কোন উত্তর দিতে পারেনি, অথচ বুঝতেও পারেনি, কেন তার এই শাস্তি? পৃথিবীতে যত ঠাকুর আছে, সবাইকে সাক্ষী রেখে সে বলতে পারে, সে কোন অপরাধ, কোন পাপ কাজ করেনি। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করবে কে? সে নিজেও যে পারছে না। তাই অবাক হয়েই প্রথমদিন বউদিকে কথাটা বলেছিল।

শৈল বাড়ি না আসা অবধি কোথাও বেরোবি না। মা আদেশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

কেতকী নিজেও ভরসা করে ঘর থেকে বেরোয় নি। পাড়ার কেউ বেড়াতে এলে নানা অছিলায় এড়িয়ে গেছে তাদের। কাউকে বলেছে, শরীর ভাল নয়, কাউকে বলেছে বালিশের ওয়াড় সেলাই করতে হবে।

আসলে সে এই গ্রামকে যমের মত ভয় করে। ছোট গাঁ হলে কী হবে, এর বিষের জ্বালায় অনেক সংসারকে জ্বলে পুড়ে মরতে হয়েছে। কায়েত পাড়ার শিবু ঘোষের ছেলে কলকাতার এক নার্সকে বিয়ে করল বলে বুড়ো বাপ-মাকে এখানে পতিত করলে। সপ্তাহ খানেক কী কষ্ট তাঁদের। কেউ জল দেয় না, নুন দেয় না, কাঠ দেয় না। না খেতে পেয়ে বুড়োবুড়ির মরার অবস্থা। ছেলে দেশে ফিরে মা-বাপের ওই অবস্থা দেখে, নিয়ে চলে গেল সেই দিনই। শিবু ঘোষও চলে গেলেন এ গাঁ ছেড়ে। না খেয়ে মরার চেয়ে, পতিত ছেলের হাতে খেয়ে বাঁচা অনেক ভাল। হাজার হোক ছেলে তো, আর সে নিজে যখন নিতে এসেছে।

রুদ্রপুর! গাঁয়ের নামটা শুনলেই বুকের ভিতর শুকিয়ে যায় কেতকীর। এখানকার লোকেরা যেন সবাই এক একটি রুদ্রদেব। সমাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা সব। পান থেকে চুণ খসলে আর রক্ষা নেই। কেতকী যতই ভাবে মাথাটা গুলিয়ে যায়। গাঁয়ের কর্তারা যখন রক্তচক্ষু হয়ে তার নিরীহ দাদাকে ঘিরে ধরবে, তখন সে বেচারী বোবা চাউনিতে এদিক-ওদিক দেখবে শুধু। না, না, সে সহ্য করতে পারবে না কেতকী। তার চেয়ে—।

আর ভাবতে পারে না কেতকী। কয়েকবার সে ঠিক করেছিল, এ জীবন আর সে রাখবে না। কিন্তু পারেনি। কিছুতেই তার হাত ওঠেনি। কলকে ফুলের ফল জোগাড় করে রেখেছিল দুপুরবেলায়, কিন্তু রাতের বেলায় সে পারেনি। কেমন যেন ভয় ভর করে উঠেছিল। নিরুপায় হয়ে বালিশটা কামড়ে সারারাত শুধু কেঁদেছে আর ভেবেছে এ কী করে সম্ভব হল?

শনিবারের বিকেল বেলা শৈল অফিসের কাজ শেষ করে বর্ধমান-কাটোয়ার ছোট গাড়িতে চেপে বসল। মাইনের পরেই প্রথম শনিবার। ডানহাতে ধরা ক্যাম্বিসের থলিটা বেশ একটু মোটা হয়ে উঠেছে। বর্ধমান বাজার থেকে মাসকাবারির কিছু জিনিষপত্তর পুরে নিয়েছে থলির ভিতর। একজোড়া আটপৌরে শাড়িও নিয়েছে এই শনিবার। অনেক দিন থেকেই কিনবো কিনবো করছিল, পয়সার জন্য পেরে উঠছিল না। মাইনে পেয়েই কিনে ফেলল চোখকান বুজে। বউ-এর একটা, কেতকীর একটা। আসছে মাসের মাইনে পেলে মায়ের থান, আর নিজের ধুতি কিনে নেবে শৈল। কেরাণী শৈল বন্দ্যোপাধ্যায় এক সঙ্গে এর চেয়ে বেশি খরচ করতে ভয় পায়। অত বড় আইবুড়ো বোন রয়েছে মাথার ওপর।

বর্ধমান থেকে নিগম স্টেশন খুব কাছে নয়। সেখান থেকে আরো মাইল দশেক হাঁটাপথে রুদ্রপুর। শৈল বর্ধমানে একটা মেসে থাকে। শনিবার রাত্রিতে দেশে আসে আবার সোমবার ভোরের গাড়িতে চলে যায়।

একটু অবাক হয়ে গেল শৈল বাড়ি ঢুকে। কেতকী অন্যবারের মত পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল না, বউদি, দাদা এসেছে। মা ছুটে এসে থলিটা হাত থেকে বাঁশের খুঁটোয় হেলান দিয়ে রাখলেন না। রেবা গামছা আর সাবান হাতে এসে দাঁড়াল না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে শৈল একটু বিস্মিত হয়ে ডাকল, মা।

মা চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন। শৈল বিমূঢ়। মায়ের চোখের কোলে গাঢ় কালি। কয়েক-রাত নিদ্রাহীনতার সুস্পষ্ট চিহ্ন। মুখ বিবর্ণ, পান্ডুর।

—কি হয়েছে মা? বাজারের থলিটা মাটিতে রাখতে রাখতে শৈল প্রশ্ন করল।

—বউমার কাছে শুনিস্‌। কান্নামেশানো গলায় মা বললেন।

—রেবা কোথায়?

—রান্নাঘরে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। রান্নাঘরের দিকে এগোলেন মা। অনেকটা যেন পালিয়ে যাওয়া।

—কেতুকে দেখছি না।

—সে মরেছে। মা রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

শৈল স্তম্ভিত। সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছিল তার মাথার ভেতর।

নিঃশব্দে রেখা এসে পিছনে দাঁড়াল। এক হাতে গামছা, অন্য হাতে গাড়ু।

—কি ব্যাপার বল তো? গামছা-গাড়ু হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল শৈল।

একটু একটু করে সব ব্যাপারটা ব্যক্ত করল রেবা। শুনে শৈল পাথরের মত স্তব্ধ। সে কী শুনছে বুঝতে পারছে না। যেটুকু বুঝেছে তার অর্থ মস্তিষ্কে ঢুকছে না কিছুতেই।

—কেতু কোথায়?

বন্ধ দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল রেবা, তারপরে নীচু গলায় বলল, হাত-মুখ ধাও, রাতে অনেক কথা আছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে রেবা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগালো, তারপর জানালাগুলোও বন্ধ করে দিল। শৈল একটু অবাক হয়েই বলল, একি! সব বন্ধ করছ কেন?

—কে শুনতে পাবে, তখন কেলেঙ্কারী হবে। তারপর বিছানায় বসে ফিসফিসিয়ে বলল, আমার কী মনে হয় জানো?

অবোধ দৃষ্টিতে শৈল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কী করবে তাও তার বুদ্ধির বাইরে। রেবা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, মনে আছে মাস তিনেক আগে শশাঙ্ক এসেছিল কাটোয়া থেকে।

শশাঙ্ক রেবার মাসতুতো ভাই। রেবার বয়সী। কলকাতার কলেজে পড়ে। ফরসা ধবধবে রঙ। এক মাথা চুল। ছিপছিপে। কালো ফ্রেমের চশমায় আরও সুন্দর দেখায় ছেলেটিকে। মনে পড়ছে মাস তিনেক আগে কাটোয়া গিয়েছিল বেড়াতে, ফেরার পথে এখানে নামে একদিনের জন্য। শৈল তখন বর্ধমানে। পরের শনিবার বাড়িতে এসে শুনেছিল শশাঙ্কের কথা।

—তাহলে বলছ শশাঙ্কই দায়ী? শৈল প্রশ্নটাকে আরও সহজ করে নেবার জন্য বলল।

—আমার তো তাই মনে হয়। রেবা নিজের সন্দেহকে দৃঢ়তর করে তোলে। সে রাতে দুজনে কত গল্প। কত হাসি।

—তোমরা কোথায় ছিলে? একটু রুক্ষ হয়ে উঠল শৈল।

—আমরা কী এসব স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? কান্না মিশিয়ে জবাব দিল রেবা। আমি, মা আর কেতু ওঘরে শুয়েছিলাম, আর এই ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিলাম শশাঙ্ককে। ও খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত অবধি আমাদের ঘরে গল্প করে। গল্পের মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। তারপর যদি কিছু ঘটে থাকে জানি না।

—কেতু কী বলে?

—এসব কথা কী কেউ স্বীকার করে? পরম বিজ্ঞের মত রেবা বলে,—তুমি এক কাজ করো। কাল ভোরেই কলকাতা চলে যাও। মেসোমশাই-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের বিয়ের পাকাপাকি করে এস। যা টাকা লাগে, গয়না বিক্রী করে জোগাড় করতে হবে।

সেই রাতেই বেরিয়ে গেল শৈল কলকাতায়। কারুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না সে। মুখ দেখাবার আর উপায় নেই। কেতকীর সঙ্গেও একটি কথাও বলেনি। নীরবে শেষরাতের অন্ধকারে সে চলে গেল কলকাতায়।

কেতকীর ঘরে সেই যে কেতকী ঢুকেছে, আর বেরোয় নি। দাদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা অনেকবার করেছে কিন্তু একটা দুর্জয় লজ্জা তাকে আটকে রেখেছে। কিছুতেই সে দাদার কাছে যেতে পারল না। বিছানায় কাঠ হয়ে বসে সে দাদার আসার জুতোর শব্দ পেয়েছে আবার চলে যাবার শব্দও শুনেছে। একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

সকাল বেলায় বউদি এসে, একথা ওকথার পর আসল কথা পাড়ল, ঠাকুরঝি, একটা কথার উত্তর দেবে?

কেতকী নীরবে প্রশ্ন মেশানো দৃষ্টি তুলে ধরে বউদির দিকে।

—শশাঙ্ক, আমার ভাই, তাকে তোমার পছন্দ হয়? বউদির প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ। যাচাই করে দেখছে কেতকীকে বার বার। যদি চোখের কোলে কোন আতঙ্ক শিউরে ওঠে।

কেতকীর মনটা থরথরিয়ে উঠল। শশাঙ্কদাকে সন্দেহ করছে দাদা বউদি! ছি ছি এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই যে। দাদা তা হ'লে কলকাতায় গেছে নিশ্চয়ই শশাঙ্কদার কাছে। তাকে হয়ত অপমানিত করবে বিনাদোষে।

শশাঙ্কদা! সুন্দর ফুটফুটে নির্দোষ যুবক। সে রাতে অনেকক্ষণ গল্প করেছিল সত্য। শশাঙ্ক দেশ-বিদেশের গল্প করেছে আর অবাক হয়ে কেতকী শুনেছে। পাশে মা আর বৌদি একসময়ে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কেবল নিঃশ্বাস বন্ধ করে শশাঙ্কদার গল্প শুনেছে আর ভেবেছে, সেও যদি শশাঙ্কের মত দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াত।

শেষ রাতে শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আর নয়। এবার চলি।

এর বেশি তো তাদের আলাপ হয়নি। একজন নিরপরাধ লোক তার জন্যে মিছিমিছি অপমানিত হবেন।

—ঠাকুরঝি, আমায় সবকথা খুলে বলো। বউদি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, যে করে হোক আমি মেসোমশাই-এর মত করাবো।

—আমার কিছু বলার নেই বউদি। কান্নায় ভেঙে পড়ল কেতকী। বউদি আর কোন কথা না বলে উঠে গেল।

পরদিন শৈল ফিরে এল ম্লানমুখে। সবকথা সে খুলে বলেছিল শশাঙ্কের বাবাকে কিন্তু তিনি মারমুখো হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, লজ্জা করে না, আমার ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। তোমার বোনকে সামলাও গে যাও। দরকার থাকে, কিছু টাকা ধার দিতে পারি।

হতাশায় ভেঙে পড়ল দুজনেই।

শৈলর মাথায় আর কোন উপায় আসে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে। এসব ব্যাপারে মেয়েদের বুদ্ধি খোলে বেশি, তাই রেবাই পাকা গিন্নীর মত জবাব দিল, যে করে হোক এই মাসের ভিতরেই পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে হবেই।

পাত্র ঠিক হয়ে গেল। নিগম স্টেশনে চায়ের দোকান করেছিল ছেলেটি। শৈলর পালটি ঘর। স্বরগাঁয়ে বাড়ি। দেনা-পাওনা একটু মোটা রকমের। তা হোক তবু তো মেয়েটার হিল্লে হয়ে যাবে। পাত্র লেখাপড়া কিছুই শেখে নি। গাঁয়ের স্কুলের তিন ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর একে ওকে ধরে স্টেশনে দোকান করার অনুমতি পেয়েছিল।

পাত্রপক্ষ দেখে গেল। পাত্রী পছন্দ হয়েছে, যাবার সময় জানিয়ে গেছেও। তারপর থেকে কেতকীর যাতনা যেন আরও বেড়েছে।

একটি পথই খোলা আছে তার সামনে। প্রশস্ত পিচ্ছিল পথ, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা নেই। কেউ বাধা দেবার নেই। কেউ একবারও মুখ ফুটে সহানুভূতির কথা বলবে না। এ যাত্রার জন্য কেউ দায়ী হবে না।

পরদিন সকাল বেলায় শৈলর বাড়ির উঠোন ভর্তি লোক। সকলেই পাশের লোককে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করছে কী হয়েছিল হে? কি যে হয়েছিল, সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। সবাই ঠোঁট উল্টে বলে, কী জানি? ওসব ব্যাপারে না থাকাই ভাল।

দরজার পাশে মা বসেছিলেন হাঁটু গেড়ে। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছিলেন, আমি একটুও বুঝতে পারিনি, কেতুটা এই কাজ করবে। চৌকাঠের ওপাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল রেবা। একটি কথাও তার মুখে নেই। সে নির্বাক হয়ে ভাবছিল, কালকেও ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলেছে। বিয়ের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করেছে, অথচ আজ সবকিছু শেষ হয়ে গেল। খবর পেয়ে ভিড় ঠেলে দারোগা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে স্বরগাঁয়ের ডাক্তার সামন্ত। ডাক্তারবাবু কেতকীর কাছে গিয়ে, একটু নেড়ে চেড়ে দেখলেন, তারপর গম্ভীরভাবে রায় দিলেন, সন্দেহজনক মৃত্যু।

—আপনি কী বলতে চান ডাক্তারবাবু? দারোগার সন্দেহে আরও খানিকটা উস্কানি বেড়ে গেল।

—হয় হত্যা, না হলে আত্মহত্যা। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশে পড়ে থাকা কলকে গাছের ফলগুলোর দিকে আঙুল দেখালেন, দেখছেন না, ওগুলো।

—তাহলে তো পোস্টমর্টেম না করে বডি ছাড়া যাবে না। গম্ভীরভাবে জানালেন দারোগা সাহেব।

—উচিত হবে না।

দারোগা সাহেব চৌকিদারদের আদেশ দিলেন লাশ নিয়ে যাবার জন্যে। লাশ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। যতটুকু উপভোগ করার গ্রামবাসীরা করেছে, এর পর পুলিশের জেরায় পড়তে হবে। অযথা হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনিতেই লোকে বলে পুলিশে আর বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা।

শৈল উঠোনের কোণে পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা নিজেও বুঝতে পারছে না। শুধু তার মনের মধ্যে একই কথা ক্রিয়া করছে বারে বার, এ কি হল কেতুর? এ কেন হল?

—আপনাকে থানায় যেতে হবে। চমকে উঠল শৈল। সামনে দারোগা। আমাদের সন্দেহ যতক্ষণ না ঘুচছে, ততক্ষণ আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।

—ওকে ছেড়ে দিন। আছড়ে পড়ল রেবা দারোগাবাবুর পায়ের কাছে। ও কিছু জানে না। একটু দম নিয়ে রেবা জানাল, ঠাকুরঝি তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা। সেই লজ্জা ঢাকতে—। কান্নায় বাকিটা আটকে গেল।

—সেটা পোস্টমর্টেমেই প্রমাণিত হবে। দারোগাবাবু শৈলকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দু-দিন পরে বিকেল বেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল থানার দারোগার টেবিলে। অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। মেয়েটির মৃত্যুর কারণ অনেকগুলো কলকে ফলের রস পান। এটা খুন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

শেষ সাক্ষাৎকার

(১০৯ পৃষ্ঠার পর)

থাকে। সীতেশ ক'দিন থেকেই, অর্থাৎ সন্দেহ হওয়া থেকেই বাড়ীতে লোক রাখছিল। আমার ভাই, ওর মাসতুতো ভাই। সবাই ছিল। তার ওপর হঠাৎ ওর ভগ্নীপতি এলেন। তোমাকে পালাতেই হবে।

'ওদিকে থিয়েটারের সাজঘরের সেই সোনা। ওর সেদিন পে-ডে। তুমি বীণাপাণি থিয়েটারে রওনা হলে। পথেই ওকে ফোন করলে। ওকে নয়, ওর অফিসে। তুমি বল যে, বীণাপাণি থিয়েটারের ম্যানেজার ফোন করছেন। ভারী জরুরী দরকার। তুমি আরো বল, বলবেন রাজীববাবু সম্পর্কে খবর আছে। তুমি ওখানে যাও। ম্যানেজার থাকেন না তুমি জান। আমাদের সঙ্গে তোমায় দেখেছে, তাই বেণীবাবু তোমায় ঢুকতে দেয়। ও জানে সীতেশদের ফার্ম-এর মক্কেল হচ্ছেন কমলেন্দু কর। থিয়েটারের মালিক। সীতেশ এবং তারই মতো উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক ক'জন মিলে ক্লাব করেছেন এবং ঐ থিয়েটারের বাগান ও কটেজটি ও'রা ব্যবহার করেন।

'আমাদের কোন আত্মীয়ই হয়তো ভাবে তোমায়। তুমি জান বেণীবাবু অফিস যায়। তুমি ঢোক। তুমি সাজঘরে থেকে তোমার সে মাল-পত্রের চামড়ার ব্যাগ নাও। তারপর সীতেশ ঢোকে। পরিত্যক্ত সাজঘর, যত ছোটই হোক—থিয়েটার বলে কথা, তায় নির্জন। ওকে মিস্ত্রীদের হাতুড়ি দিয়েই মারলে। তারপর পালালে। আমার দুর্ঘটনার খবর কাগজে পড়লে। নিশ্চিন্ত হলে।

'কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হলে তাই ভাবি। হাতে তোমার কাপড় জড়ান ছিল। তবু ঐ হাতুড়ি রগের ওপর মারা, তারপর উপর্যুপরি কপালে মারা—দেখেই পুলিশ বুঝে নিল পাঁচ মাস আগে নদীয়ার গ্রামের ও খুন এবং এ খুন একই লোকের হাতের। ওরা বোঝে।

'আমি শোকে হতবুদ্ধি, আমি পা দুটি হারিয়েছি। ওর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ি, আর পা দুটো আমার গেল। তুমি পালালে। তারপর আদিত্য থাকে কেউ চেনে না, জানে না। দিল্লীতে বছর সাতেক থেকে এক মদন বক্সীকে দেখা যাচ্ছে। তার চেহারায় আদিত্যর সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নেই। আদিত্য ছিল রোগা, কটাশে চুল তার, সে লেংচে হাঁটত।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নয়, কারণ এতগুলো বিস্বাদ তেতো ফল কেউ অন্যাকে খাইয়ে দিতে পারে না।

মেয়েটির দেহ-ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। তার জরায়ুতে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নি। সম্পূর্ণ সুস্থ এবং কুমারীর জরায়ু ছিল। কেবল ওভারিতে এক রকম টিউমার পাওয়া গেছে। এই টিউমার হলে দেহে অন্তঃসত্ত্বার উপসর্গ ফুটে ওঠে। আমার মনে হয় এই টিউমার হওয়ার জন্য মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে আর লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছে।

দারোগাবাবু শৈলকে খালাস করে দিয়ে বসলেন, যদি একবার ডাক্তার দেখাতেন, তাহলে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটত না।

সেদিনকার আদিত্য থেকে আজকের মদন হওয়া কিছুই না। শরীর ভারী হয়েছে। চুলের রঙ পাল্টালে। পায়ের কড়া অপারেশান করিয়েছ, এবং দশ বছর ভারী সোলের জুতো প'রে চলন বদলেছে। সবচেয়ে বাহাদুরীর কথা নীরোগ টনসিল অপারেশান করে গলার স্বর পাল্টেছ। এখানে আসার আগে তিন বছর ধরে খবর নিয়ে জেনেছ এই দিনে, এই সন্ধ্যেয়, আমি সকলকে বের ক'রে দেই। একা থাকি। তুমিও কাগজ পড়। তুমি শুধু ভেবে পাও না মীরা খাসনবীশ এমন কি কেউকেটা ব্যক্তি যে তার খাপছাড়া অভ্যেসের কথা কাগজে দিব্যি রম্য রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল ?'

কিছুক্ষণ কোন শব্দ রইল না।

চেয়ারে বসে মদন বক্সী ছোট হাঁ করে চেয়ে রইল এবং বলল, 'কি চাও তুমি ?'

'তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে ডেকেছি।'

'কি ?'

'সীতেশ আসবে। সময় হয়েছে।'

'কি বলছ ?'

'বলছি সীতেশ আসবে। সীতেশ খাসনবীশ। আটটা বেজে সতেরোতে'।

'আটটা সতেরো !'

'হ্যাঁ। উনিশ শো' সাত চল্লিশ সালের নভেম্বর মাসের বারো তারিখে সন্ধ্যে আটটা সতেরোয় ওকে তুমি খুন কর। তুমি, মদন বক্সী পুলিশকে চুপচাপ দেখে বড় নিশ্চিন্ত ছিলে। জানতে না পুলিশকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া ছিল এবং ওর দাদা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। জানতে না......'

'মীরা !'

মীরা দেবী এতক্ষণে বেশ জোরে হাসেন, গলায় জোর পান। বলেন, 'আহা, অভিনয় করতে পারতাম তাই দেখেই সীতেশ বিয়ে করে, এটা তুমি জানতে না। যেমন জানতে না এ বাড়ীটা বর্তমানে মেয়েদের হস্টেল। যেমন জানতে না প্রতি বছর এ সময়ে আমাকে একা রেখে ওরা চলে যায়। কেন না সীতেশ আসে, সীতেশ তোমায় খোঁজে।'

তাঁর গলা খুব নীচু হয়ে যায়। মদন বক্সী ভীষণ ঘামতে থাকে এবং বিকৃত হাসি হেসে বলে, 'বটে! তুমি আমায় চেন না ?'

'চিনি, চিনব না কেন ? তোমার পকেটে কি আছে, হাতুড়ি, লোহার পাইপ, না আর কিছু ? কিন্তু স্থির হও মদন বক্সী, সীতেশ আসছে।'

হঠাৎ চেয়ার হেলিয়ে কাৎ হ'য়ে আলো নেভান তিনি। হঠাৎ আঁধারটা বড় বেশী ঘন মনে হয়। 'মীরা ?' বলে মদন বক্সী লাফিয়ে উঠতে চায় কিন্তু পারে না। মীরা দেবীর গলাটা শোনা যায় মাত্র 'রতন ডাকছে, সীতেশ আসছে মদন !'

সত্যিই কুকুরটা ডাকে। সত্যিই সিঁড়িতে মচমচ জুতোর শব্দ হয়। মদন উঠতে চায়, পালাতে চায়, পারে না। জুতোর শব্দ কাছে আসে। মীরা দেবী বলেন, 'এই যে! এসেছ ?'

দরজায় একটি মানুষের চেহারা। মীরা দেবীর সামনের চেয়ার থেকে একটা বিকৃত গোঙানির শব্দ আসে।

মীরা দেবী আলো জ্বালেন।

মার্কিনী হযবরল

(১১৯ পৃষ্ঠার পর)

চলছে সঙ্গে ফ্লেমেংকো। রাশিয়ান কিছু পেতে হলে যেতে হবে 'টু গীটারসএ'।

এ সব ছেড়ে দিয়ে যদি আপনার মন চায় পুরোনো ইউরোপকে খুঁজে পেতে, তাহলে নিউ ইয়র্কে বসেও সেরকম জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 'ভিয়েনীজ ল্যান্টার্ন'এ। এখনও পুরোনো দিনের ভিয়েনা বন্দী হয়ে আছে। ভিয়েনা পছন্দ না হলে বুদাপেস্টেও যেতে পারেন। 'চারদাস হাঙ্গেরিকায়' গিয়ে পৌঁছলে আপনার জন্যে বরাদ্দ হবে দেখবেন যাযাবরী-নাচ, গুলাশ ও পাপরিকা সহযোগে ডিনার ও ভোর রাত্রি পর্যন্ত বেহালা শোনা।

যদি নির্ভেজাল ইহুদী ব্যাপার খুঁজতে চান তাহলে রয়েছে 'সাব্রা'—মধ্য প্রাচ্যের বহু জিনিস পাবেন এখানে। নিউ ইয়র্কে একখন্ড আফ্রিকা হল 'আফ্রিকান নুক'। আদিম অকৃত্রিম পৃথিবী মাদলের তালে তালে নাচচে। যদি ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার করতে চান তাহলে আপনার যাওয়ার জন্যে পথ প্রশস্ত রয়েছে তাজমহলে। যেখানে আমসত্ত্ব জলে গুলে ডিনার সুরু হয় আমরস নাম দিয়ে। সেখানে সবরকম কোপ্তা কোর্মা দোর্মা কাবাবএর ফলাও ব্যবস্থা। খাবার সময় পিছনে যে আবহ সঙ্গীত ভেসে আসবে তা মোটেই জ্যাজ জাতীয় মামুলি কিছু নয়। সেতারের মৃদু টুং টাং শুনলেই আর উঠতে ইচ্ছা করবে না। আপনিও এ আঙ্গুলের ঝংকারকে চেনেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকুন টেবিলে—মিউজিক বন্ধ হবে না। আচ্ছন্ন আবেশে সুরের রাজ্যে ভেসে বেড়াবেন।

লোভ সংবরণ করে যদি হোটেলের মালিককে জিজ্ঞাসা করেন কোথ্থেকে এমন সেতার পেলেন ?

উনি এক গাল হেসে বলবেন—সেবার রবিশঙ্কর যখন আমেরিকা এসেছিলেন তখন যাঁর কাছে উঠেছিলেন তিনিই এ সব টেপরেকর্ড করেছিলেন তাঁর রেওয়াজের সময়। আমি সেই থেকে কপি করিয়ে নিয়েছি আপনারা আসেন এখানে সেই ভেবে। আপনারা খানদান লাজবাব শুনুন। আমি ওই ডলারটুকু উপরি পাই মাত্র।

লোকটি ভেতরে আসে। প্রৌঢ় লোক। কঠিন চেহারা। বর্তমানে খুব ভয় পেয়েছেন। বলেন, 'এত ভয় পেয়েছি! তোমার চিঠি যখন গেল তখন আবার আমি বেরিয়েছি। চিঠি পেয়ে তাজ্জব। আটটা কুড়িতে আসবেন। পড়ে ত আমি অবাক। সমানে ভাবছি কি হতে পারে!' তারপর ফিরে তাকান।

সপ্রশ্ন ভুরু তোলেন। মীরা দেবী মাথা নাড়েন।

মদন বক্সী মাথা তুলছে না। তার হাতটা একটু একটু কাঁপছে। মীরা দেবী বলেন, 'আপনার ভাইয়ের মৃত্যু ওরই হাতে হয়। কিন্তু শেষ রাখতে পারলাম না। মনে হচ্ছে ও আইনকে ফাঁকিই দিল।'

জিতেশ খাসনবীশ মদন বক্সীকে তুলতে চেষ্টা করতেই ও একপাশে গড়িয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

'ডাক্তার !' জিতেশ টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলেন।

॥ গল্প ॥

ছবি

জয়ন্তী সেন

শব্দটা এলো দোতলার দক্ষিণের বড় হলঘর থেকে! প্রচন্ড শব্দ! বাড়ীর যে যেখানে ছিলো, হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো উপরে, ঘরের সামনে রীতিমত ভীড় জমে উঠলো।

"কি হয়েছে—কি ভাঙলো?"

"কর্তা বাবুর প্রকান্ড ফটো মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে।"

"ঝড় ঝাপটা নেই—পড়ল কি করে?"

"ইস্—বেছে বেছে ঠিক আজকের দিনে!"

"মায়ের সমস্ত শরীর কেটেকুটে একেবারে রক্তগঙ্গা—।"

"ডাক্তারকে খবর দে—আর ভীড় না জমিয়ে কাচের টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর একজন।" নানারকম মন্তব্যের মাঝখানে সুপ্রভা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। রক্তগঙ্গা না হলেও কপালের কাছে আর হাতের আঙুল বেশ খানিকটা কেটে গেছে। আঁচল চাপা দিয়ে শান্ত গলায় বললেন—"ডাক্তার বদ্যি ডাকতে হবে না—আমার কিছু হয়নি।"

"বাবার ছবি হঠাৎ পড়ে গেল কি করে?" বড় ছেলে বিমলেন্দু কাচ সরাতে সরাতে প্রশ্ন করল।

"জানিনা," বলে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুপ্রভা নীচে নেমে গেলেন। ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখা গেল শুধু কাচই ভাঙেনি, ছবিটাও আড়াআড়িভাবে দু'তিন টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে। জোড়াতালি দিয়েও কাজ চালানো যাবে না। সারা বাড়ীতে মণিশংকরের এইটিই শেষ অবশিষ্ট ছবি। কথা ছিলো আজকের কাজ মিটে গেলে ছোট ছেলে নবেন্দুর কলেজের একটি আর্টিষ্ট ছেলেকে দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নেওয়া হবে—দুই ছেলের ও সুপ্রভার ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য। ছবি অবশ্য আরও অনেক তোলা হয়েছিলো। মণিশঙ্কর নিজের ছবি টাঙাতে ভালো বাসতেন না বলে একটা বড় কালো ট্রাঙ্কে সেগুলো তুলে রাখা ছিলো। তাঁর মৃত্যুর পর কিন্তু দামী দামী ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোর হদিস পাওয়া যায়নি কোনখানে। ফ্রেমগুলো বিক্রী করে দেবে বলে তালা ভেঙে কেউ ছবিগুলো সরিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়। মণিশঙ্করের নিজের অ্যালবামখানাও আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আগুন লাগল কি করে—সে কথা কেউ আজও জানেনা। হয়তো ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন সুপ্রভা নিজেই। বড় রকম অগ্নিকান্ড হয়ে যেতে পারত, কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধির জোরে দামী গরম শালখানা দিয়ে আগুন লাগা বইটা চেপে ধরেছিলেন। দু'খানা হাতই পুড়ে গিয়ে ফোস্কা পড়ে মাস তিনেক ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর আজকের এই এনলার্জ করা বিলিতি দোকানে তোলা মণিশঙ্করের শেষ বয়সের ছবি—। ছেলেরা শখ করে নিজেদের পছন্দসই গিল্টীকরা সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলো। মণিশঙ্করের মৃত্যুর পর, এই ছবিতেই বিমলেন্দুর স্ত্রী মমতা রোজ সন্ধ্যাবেলা মালা পরাত, শ্বেত পাথরের ধূপদানীতে জ্বালিয়ে দিত সুগন্ধী ধূপ।

হাতে কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে সুপ্রভা নিজের ঘরে অবসন্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন; ফ্যাকাশে রক্তহীন বিবর্ণ চেহারা। ডাক্তার দেখে গেছে, ভয়ের কারণ নেই। তবে শক্ পেয়েছেন বলে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা। বিমলেন্দু চিন্তিত হয়ে বলল—

"আজ বিকেলে তাহলে কি হবে মা? আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলেছি, তাছাড়া গান বাজনার আয়োজনও করা হয়েছে। একটা ছবি না হলে লোকে কি বলবে?"

"লোকের কথার মূল্য কি?" নির্জীব অবসন্ন সুপ্রভা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেন—"লোকের কথায় যারা ওঠে বসে, তাদের কাপুরুষ বলা উচিত। নিজেরা যা ভালো বুঝিস তাই কর—।"

"বাবার মত লোকের একখানা ছবি বাড়ীতে নেই শুনলে সকলেই অবাক হয়ে যাবে। সারাটা জীবন পরের জন্য এভাবে আত্মত্যাগ করতে কজন পেরেছে মা—অথচ আমরা তাঁর স্মৃতির কোন চিহ্নই নিজেদের কাছে রাখিনি।"

সুপ্রভাকে আবার নীরব, ক্লান্ত অবসন্ন দেখায়। কথার স্বরে অনুযোগের আভাস নিজেই লক্ষ্য করে বিমলেন্দু লজ্জিত হয়ে বলে—"তুমি আর কি করবে মা? দেখি—যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।"

নবেন্দুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়—তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলে—"বাক্সের ঘরের চাবিটা দাও ত শিগ্গির—। নতুন চামড়ার সুটকেসে দার্জিলিঙে তোলা আমাদের সকলের ছবিগুলো বাবা একটা লম্বা খামে ভরে রেখেছিলেন—মনে পড়েছে? এনলার্জ করা ছবিও কয়েকখানা ছিলো।"

"ও বাক্স ফেলে দিতে হয়েছিলো বর্ষার সময়"—সুপ্রভা মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, "উই ধরে বাইরে ভেতরে সব ঝাঁঝরা হয়ে গেছ্ল।"

হতাশ হয়ে ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরে পরামর্শ সভা ডাকে—একটা ছবির যোগাড় কি করে করা যায় এত অল্প সময়ের মধ্যে। শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবই নয়, মণিশঙ্করের গুণমুগ্ধ বহু বিশিষ্ট লোকজনেরও আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে যোগ দেওয়ার কথা। যারা জানেনা মণিশঙ্করের জীবন কাহিনী, তাদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। প্রথম জীবনে আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরে জনসাধারণের উপকারে অকাতরে তিনি দান করে গেছেন হাসপাতালে, স্কুলে, অনাথ আশ্রমে। আজকে যেসব অনুরাগী বন্ধুজনেরা ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে এখানে আসবেন, একখানা ছবি না থাকলে তাঁদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া কি করে সম্ভব হবে ভেবে বিমলেন্দু অস্বস্তি বোধ করছিল। মমতা ছেঁড়া ছবিটার অংশগুলো সযত্নে মুড়ে নবেন্দুর হাতে দিয়ে বলল—"নিয়ে যাও না তোমার আর্টিস্ট বন্ধুর কাছে—হয়তো এক বেলার মধ্যে নিখুঁত না হোক, মোটামুটি একটা পোর্ট্রেট করে দিতে পারে।"

কথাটা ওদের সকলের মনের মধ্যে আনা-গোনা করলেও মুখে উচ্চারণ করতে বাধছিলো। নবেন্দু আর্টিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে ঘুরে এসে ইতস্ততঃ করে বলল—

"মানস রায় বিকেল পাঁচটার মধ্যে পেন্টিংটা দিয়ে যাবে। ও বলছিলো দেওয়াল থেকে পড়ে গিয়ে কাচ ভাঙলেও ছবি ওভাবে ছিঁড়তে পারে না।"

"তার মানে?" বিমলেন্দু ভীতু ভীতু চোখে তাকায়।

"ছবিটাকে কেউ ইচ্ছে করে ছিঁড়ে ফেলেছে। অত মোটা পিজবোর্ডে বাঁধানো ছবি ছিঁড়তে রীতিমত গায়ের জোর দরকার।"

"ও কথা আমারও একবার মনে হয়েছিলো—" বিমলেন্দু নীচু গলায় বলে—"কিন্তু কে এই কাজ করতে পারে—। এতে কার স্বার্থ রয়েছে?"

"আজকের দিনে অন্ততঃ একথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই—।" বলে নবেন্দু উঠে যায় নিজের ঘরে।

"তুমি ত বাবাকে বেশী দেখনেই না—আমাদের বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন। কি আশ্চর্য স্বার্থহীন পরোপকারী লোক ছিলেন তিনি—সে সব শুনলে গল্প মনে হয়। মার কাছে নিশ্চয় শুনেছ বাবার অল্প বয়সের কথা।" বিমলেন্দু মমতাকে প্রশ্ন করে।

"মা কখনই বাবার কথা বলেন না। আমিই বরং মাঝে মাঝে কথা তুলি—কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেন। বলেন পুরোন কথা বলতে ভালো লাগছে না।"

"আশ্চর্য—বাবার মৃত্যুর পরে মাকে একদিনের জন্যেও বিচলিত হতে দেখলাম না। অথচ সবাই ভেবেছিলো এত বড় শোক কাটিয়ে উঠতে মা কিছুতেই পারবেন না।"

অসুখের সময় অক্লান্ত সেবা করলেও স্বামীর মৃত্যুকে সুপ্রভা খুব সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন। দুঃখ প্রকাশের আধিক্য যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনি শোকের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিও লোকের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে। তবু মণি-শঙ্করের অসামান্য চরিত্রের কথা স্মরণ করে সুপ্রভার নির্বিকার ভাবাবেগহীন গাম্ভীর্যকে একটা মুখোশ বলেই সকলে মেনে নিয়েছিল।

আজকে একটা ভীষণ সন্দেহের ছায়া ওদের মনে বারবার ঘন হয়ে ওঠে বলেই হয়তো সেই নীরব শোকহীনতার ইতিহাস ওদের মনে পড়ে যায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

"আচ্ছা, বাবা মার মধ্যে আসল সম্পর্ক কিরকম ছিলো—তোমার মনে হয়—" নবেন্দুর আচমকা প্রশ্নে বিমলেন্দু চমকে ওঠে—"বাইরে থেকে আমরা হয়তো বুঝতেই পারিনি ওঁদের মনের মধ্যে কোথাও বেসুরো বাজত কিনা!"

"হঠাৎ একথা উঠল কেন?" বিমলেন্দু অস্বস্তি বোধ করে—"তোর কি মনে হয় মা নিজেই ছবিটা—।"

বিমলেন্দুর কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। মুখ নীচু করে নবেন্দু বলে—"জানিনা—। একটা কথা ভাবতে আমার খুব আশ্চর্য লাগে—যে সারা জীবন দুটো মানুষ পাশাপাশি থাকে—ছদ্মবেশ ধরে— তাদের মনের খবর কেউ জানতে পারে না।"

"বাবা ছিলেন অদ্ভুত মানুষ—সুখ-দুঃখের জোয়ার ভাটা তাঁকে কোনদিন বিচলিত করতে পারেনি—কিন্তু মাকেও ত অসুখী বলে মনে হয়নি কোন দিন। তুই ত সাইকোলজীর ছাত্র—তোর কি সন্দেহ হয় মা এইরকম অসম্ভব একটা কিছু করে বসতে পারেন?"

"অনেক সময় অবশ্য খুব বড় রকম শোকের আঘাত পেলে মনের বিবর্তন ঘটতে পারে—যেমন ধরো বাবার মৃত্যু। তবে সেটা আকস্মিক ঘটনা নয়—মা প্রায় তিন বছর নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পেয়েছিলেন—।"

"হয়তো সবটাই আমাদের কল্পনা—" আলোচনা বন্ধ করার তাগিদ অনুভব করে বিমলেন্দু সহজ সুরে বলে ওঠে— "মা-কে আমরা শুধু শুধু সমালোচনা করছি কাল্পনিক সমস্যা খাড়া করে। আমাদের এখন ওধারটা দেখা দরকার—বিলিব্যবস্থা সব ঠিকমত এগোচ্ছে কিনা। বিকেল প্রায় শেষ হতে চলল।"

মণিশঙ্করের পোর্ট্রেট এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য সুন্দর প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, সে কথা কেউ ভাবতে পারেনি। আসলে তাঁর চরিত্রের অভিব্যক্তি এত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত তাঁর মুখে এমন ভাবে যে, প্রকৃত মানুষটির স্বরূপ ধরতে কখনো ভুল হোত না। ছবিটা মমতা যত্ন করে নিজের ঘরে রেখে এধারে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কাজের লোক অনেক, তাই বিশৃঙ্খলারও অবধি নেই। কোথায় দু'তিনটে নিমন্ত্রণ করতে অমার্জনীয় ভুল হয়ে গেছে—বঁটুই ফুলের গোড়ে মালা আনা হয়নি, অতিথি অভ্যাগতরা দু'একজন আসতে শুরু করেছেন—তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানো দরকার—এই সব সমস্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত বিমলেন্দু আর নবেন্দু খেয়াল করেনি হলঘরে মণিশঙ্করের ছবি নামানো হয়নি এখনো। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন কৌতূহল প্রকাশ করাতে নবেন্দু ব্যস্ত হয়ে মমতাকে ডেকে বলল—"বৌদি—ছবি?"

"আমার ঘরে আছে—নিয়ে এসো না ভাই।"

"দাদাকে দেখছি না কেন?"

"ছবিই ত আনতে গেলেন দোতলায়—এত দেরী করছেন কেন জানি না। ওঁকে দিয়ে যদি একটা কাজও হয়—।"

ঘরের বাইরে বিমলেন্দুকে পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নবেন্দু ভয় পেল। আতঙ্কের ছাপ বিমলেন্দুর চোখে মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের পর্দা সামান্য ফাঁক করে কি দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নবেন্দু দেখল দেওয়ালের গায়ে খাড়া করা মণিশঙ্করের অয়েল পেন্টিং-এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছেন সুপ্রভা। বিমলেন্দুর ধারালো কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে অনবরত মণিশঙ্করের মুখে চোখে আঘাত করে চলেছেন। এখানে ওখানে বিশ্রী গর্ত হয়ে যাচ্ছে, দাগ পড়ছে ক্যানভাসের গায়ে। ছবিটা যেন নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান—এমনি এক অমানুষিক পণ নিয়ে তিনি বার বার ছুরির ফলা বিঁধিয়ে দিচ্ছেন প্রাণপণ শক্তিতে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল নবেন্দু নিজের অজান্তে। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন সুপ্রভা। এ-যেন সেই অতি পরিচিত শান্ত, ধীর স্থির মানুষটি নয়—এলোমেলো পোষাক, আলুথালু চুল, চোখের দৃষ্টি উদ্দাম, অস্বাভাবিক, অস্থির। ছেলেদের দেখে নিষ্ঠুরভাবে গলায় অনেকখানি আক্রোশ ঢেলে তিনি বলে উঠলেন—"তোমাকে আমি বাঁচতে দেব না ওদের মনে। বেঁচে থাকার অধিকার তোমার মত কাপুরুষ প্রবঞ্চকের নেই।"

"কি বলছো মা—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?" চিৎকার করে উঠল নবেন্দু।

"পাগল হইনি—কেবল ঠকে গেছি। সারা জীবন ধরে এ' মানুষটা মহত্ত্বের মুখোশ পরে আমাকে ঠকিয়ে গেছে। সেই বাইরের মুখোশকে তোরা কেন পুজো করবি!"

"চুপ করো মা—শান্ত হও—।" বিমলেন্দু সুপ্রভার হাত দুটো চেপে ধরল। অসম্ভব শক্তিতে হাত ছিনিয়ে নিয়ে সুপ্রভা আবার বললেন—

"জীবনে যখন যা চেয়েছি—আদর্শের দোহাই দিয়ে কেড়ে নিয়েছ আমার মুঠো থেকে। বাইরের লোক জেনেছে আমি মহৎ স্বামীর আদর্শ স্ত্রী। চিরকাল লোকে কি বলবে—তাই ছিলো তোমার ভাবনা। তোমার মনে সাধারণ মানুষের মতই অনেক দুর্বলতা ছিল—নানাভাবে চুণকাম করে লোকের চোখ থেকে গোপন করে রাখলেও আমাকে কোনদিন ঠকাতে পারনি। শেষ জীবনে দানের ঘটা দেখিয়েছ—কিন্তু প্রথম জীবনে কিভাবে সে টাকা উপার্জন করেছিলে—সে কথা প্রকাশ করার সাহস তোমার হয় নি। আসল কথা আদর্শ বলতে তোমার কিছুই ছিল না—তাই ভণ্ডামীর মুখোশটা কোনদিন মুখ থেকে নামাওনি। আমি তোমাকে চিরকাল ঘৃণা করেছি—তুমি তা জানতে। কিন্তু লোকে কি বলবে সেই ভয়ে ঘৃণাকেও তুমি সহ্য করে গেছ—এই তোমার চরিত্রের মহান আদর্শ।"

ছবিটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘরের বাইরে এসে নিজেকে আশ্চর্যভাবে শান্ত সংযত করে সুপ্রভা ছেলেদের হাত ধরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন।

—

ব্যথার গোলাপ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

জীবনে হয়েছে শুধু
না পেয়ে পাওয়া,
গ্রাস করে মোহ মায়া
মরুর হাওয়া।

নিখিল ভুবন ছেয়ে
প্রিয় মুখ চেয়ে চেয়ে;
মানসী মনের মাঝে—
করিছে ধাওয়া।

ব্যথার গোলাপ হ'য়ে
ফুটেছে প্রিয়ে,
খেলা ঘরে বসে কাঁদি
খেলনা নিয়ে।

জনমে জনমে আশা,
হবে চির ভালবাসা,
জীবনে-মরণে—ধ্যানে—
বাসনা চাওয়া।

—

চার আনার পারিজাত দেবে?

অমরেন্দ্র ঘোষ

❀ গল্প ❀
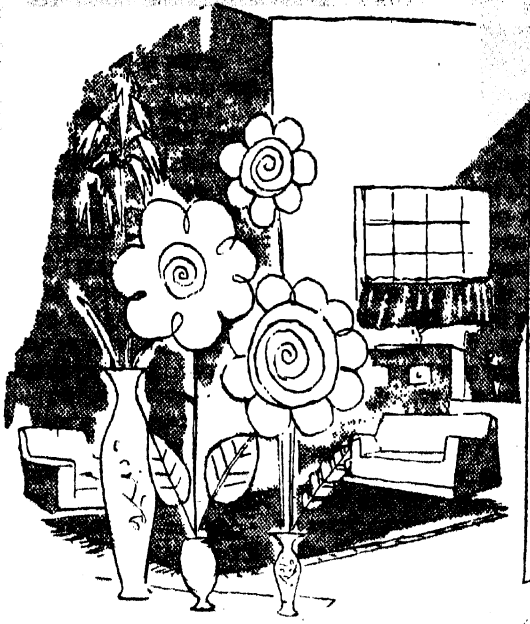
একটা নোনাধরা পাঁচিল। কব্জা ভাঙ্গা ক্যাঁকানো কপাট। মাথার ওপর দাঁত বার করা ইঁট। তাতে সদ্য দেয়া কয়েকখানা ঘুঁটে। সুমুখের ডাস্টবিনটা উপচে চারিদিকে অজস্র নোংরা ছড়িয়ে পড়েছে।

একটি ফুট-ফুটে মেয়ে মুখ বার করল। তার হাতের ঠেলা লাগাতে না লাগতেই একখানা পাল্লা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। অমনি হল্লা হয়ে গেল ভিতরে—দেখে যা, দেখে যা মেন্তির মা......

কি দেখে যাবেলা মেন্তির মা—কচি গলায় বিষ-শানানো ছুরির ঝলকায়। উত্তরে কুরুক্ষেত্র সুরু হল ভিতরে। কিন্তু লাফিয়ে চলল রোগা মেয়েটা, বিড়ালের মত ডিঙিয়ে গেল এই নোংরা সীমানা।

এ অঞ্চলে এমন আর বস্তী নেই। পিচের রাস্তার দুপাশে সারি সারি দালান—দোতলা, তেতলা, চারতলা, পাঁচতলা। কোনোটার দেয়ালে আইভি লতা, কোনোটার গেটে কামিনীর ঝাড়।

কিন্তু একখানা বাড়ি একেবারে ইন্দ্রপুরীর তুল্য। তার কাঁচের জানালাগুলো রঙিন। মেঝের মোজেইককে যেন তেল চুয়ায়। শ্বেত পাথরের গায় শঙ্খ-পদ্ম।

অনেকদিন পাতালপুরীর মত জনশূন্য ছিল। পুটিরাণীর দিদি শ্রীমতী বিষলঙ্কা পান্না উঁকি দিয়ে দেখলে, ভিতরে পরীর আবির্ভাব। বড় হল ঘরখানা কার্পেটে সোফায় সাজানো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বড় বড় টবে, মিনাকরা ফুলদানীতে নানা বর্ণের নানা জাতের ফুল। দুটি ছোট্ট প্রজাপতিও দেখলে যেন পান্না। বিস্ময়ের চূড়ান্তে গিয়ে ভুল দেখলে কিনা বলা যায় না। কিন্তু সে ঠিকই দেখলে উড়ছে যেন পাখা মেলে।

এমনি করে গত পরশুও সে ছুটে এসেছিল উনানের ওপর থেকে চায়ের কেটলিটা ঠিক করে নামিয়ে রেখে। আশ্চর্য ছিল না গরম জল ছিটকে হাত-পা পোড়া। এ বাড়িটাকে পান্না বড় ভালবাসে, বিশেষ করে ওর স্বপ্নময় অস্পষ্টতাকে—অনেক দেখলেও কি যেন বাকি থেকে যায়।

পান্না চুরি করে আবার উঁকি মারল।

ঘাসের মত নরম কার্পেটের ওপর একটি মেয়ে ঘুরছে। প্রজাপতিই কি মেয়ে হল? একবার ডানা মেলে এদিক যাচ্ছে, আবার ওদিকে। এ ফুল থেকে উড়ে যেন ও ফুলের পাঁপড়িতে। কি চায় ও? ওকি গন্ধ নিচ্ছে?

পান্না তো তন্ময়। ওরও ইচ্ছা করে অমনি করে গন্ধ নিতে। পাঁপড়ি ও পরাগরেণুগুলো আলতো হাতে ছুঁয়ে যেতে।

মেয়েটি যেন নাচছে।

পান্না ভাবে প্রজাপতি বুঝি মধু খুঁজছে।

স্বপ্নপুরীর জানালা দিয়ে একটা কেমন যেন সুবাস বেরিয়ে এল। ডাস্টবিনের ধারের বস্তীর মেয়ে বুক ভরে সে গন্ধ টানল। আঃ কি মধুর। এমন গন্ধ সে বুঝি কোনদিন পায়নি। আর এত ফুলও কোনদিন সে দেখেনি।

একটা দুঃখ হল পান্নার। ভিতরের মেয়েটি ওরই প্রায় সমবয়সী। কিন্তু পান্নার তো অধিকার নেই ভিতরে ঢুকে গন্ধ নেয়ার। ওর চোখ দুটো লোভে জ্বল-জ্বল করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ও মনে মনেই গন্ধ শুঁকে সোহাগ করতে থাকল যাবতীয় ফুলগুলোর।

—দিদি, দিদি ও রাক্ষুসী, তোকে খুঁজে মা হয়রাণ, বাবা বেদম রাগ। যাওনা দেখবে মজা।

পান্নার চমক ভাঙ্গল। সে ভয়ও পেল, তবু মুখ খিঁচিয়ে বললে, আমি মার খেলে তোকেও মার খাওয়াব। ডাকাতে বলেছে আমায়, তা না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি খেলা দেখা হচ্ছিল রাস্তায়।

ছোট বোন আশ্চর্য হয়ে গেল ষড়যন্ত্র দেখে।

যাক এবারে দুজনেই সুশীলা হয়ে বাড়ি ঢুকল। কেউ কাউকে আর ঘাটাল না।

গরীবের সংসার। দাওয়ায় পা দিতেই বাপ-মা একযোগে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। ভাঙ্গা কাঁসার মত মা উঠলেন খ্যান-খ্যান করে, ফুটো হারমোনিয়মের মত বাপ করতে লাগলেন ভস-ভস। হাঁপানীর টানের জন্য রাগকে তিনি কিছুতেই বাগে রাখতে পারছিলেন না। এরপর দশ-এগারো বছরের কচি পান্নার ওপর একটা ফরমাসের বাণ্ডিল চাপিয়ে দিলেন দুজনে। প্রথম জল আন, তারপর খুকীকে ধর। অবশেষে মুদী দোকানের অনুকুটি ফর্দ। ফিরে এলে ঘর-সংসারের আর কি কি বোঝা চাপিয়ে দেয়া যায়, তার জন্য পাঁয়তারা কষতে লাগলেন ভাঙ্গা কাঁসা ও ফুটো হারমোনিয়াম।

সেই যে তোমরা শিশু পাঠ্য সাহিত্যে পড়েছ কে যেন এক আনমনা ছেলে বাড়ির নিত্য-নৈমিত্তিক বাজারের ফর্দ গুলিয়ে এক অদ্ভুত তালিকা তৈরী করলে, যা এ ভূ-ভারতে নেই,—দুটি পাকা কৈ, ডিম ভরা দৈ, সরিষার চাল ইত্যাদি। পান্নাও তাই করলে। তার আজ দুটি হতে থাকল পদে পদে। সেইজন্য ধমকানি খেলে ক'বার। শেষ পর্যন্ত মার।

এতটুকু মনের মধ্যে কেবলই সেই স্বপ্ন-পুরীর ছবি। কত ফুল, কত বর্ণ আর কি সুন্দর গন্ধ! এতগুলো মাধুর্যকে স্থান দিলে তো আর চাল-ডালের জায়গা থাকার কথা নয়।

পান্নার কেবলই মনে হয় ঐ মেয়েটি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়। কোন পরীর দেশের যেন বাসিন্দা। ওদের সাজ-সজ্জার যেন স্বপ্ন জড়ানো। ফুলের গন্ধে ওরা জেগে উঠে বুঝি বা ফুলের গন্ধেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ওদের সঙ্গে কি ভাব করা যায় না?

সন্ধ্যার একটু আগেই সন্ধ্যাদীপ ধরাল পান্না। বরাদ্দ কাজগুলো করল এক নিঃশ্বাসে। তারপর রেশমী ফিতা ও চিরুণী নিয়ে পাশের ঘরে এক পাতানো বৌদির কাছে হাজির।

—বৌদি, প্রজাপতির মত করে সাজিয়ে দিতে হবে।

—কেন, বর আসবে নাকি? তাই বুঝি দুপুরবেলা জামায় আর ফিতায় সাবান দেয়া হচ্ছিল?

—ধেৎ, কি যে বলো বৌদি। পান্না লজ্জায় হাসল।

দুপুরবেলা নয়, ঠিক দুটোর পর। পান্নার মা যখন গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। [illegible]

দেখলে বকাবকি করবেন বৌদিসেবী বলে। নয়ত দেবেন খুকী পুঁটির আরো গণ্ডা কতক কাঁথা কাপড় কাচতে চাপিয়ে। ফলে সাবানের স্বল্পতার দরুণ কোনোটাই পরিষ্কার হবে না। এ কত করে মুদী দোকানীর হাতে-পায়ে ধরে, বাপ-মার চোখে ধুলো দিয়ে বাকিতে এই দুই আনার মাল আয়ত্ত করেছে! নিজের বহু কষ্টের আনা পাঁচেক সঞ্চয় ছিল, তাতে হাত দেয়নি।

তেল কটা ফিতা কাচলেও তেমন ফুর-ফুরে ধবধবে হয় না, ময়লা জামাও তেমন চকচক করে না। তবু আনন্দে নেচে-নেচে চলে পান্না ওর রেশমী চুলগুলো উড়িয়ে। এমন প্রকৃতিদত্ত বাহার অনেকেরই থাকে না।

আজ সেই হল ঘরটায় কি যেন কি উৎসব। অনেক লোকের আনাগোনা। মানুষ নয়, সব যেন পরীর দেশেরই বাসিন্দা। ছেলেমেয়ে মধ্য বয়সীরও অভাব নেই। ঝলমলে আলোতে ফুলগুলো যেন আরো উজ্জ্বল হয়েছে। দূর থেকে পান্না উঁকি-ঝুঁকি মারে। আর একটু এগিয়ে যেতে ইচ্ছা থাকলেও তার সাহসে কুলায় না। ও আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে ফুলই দেখে। কিন্তু অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, কেউ ওকে একটু আপ্যায়নও জানায় না। ধুলো-মাটির রেশমী চুল আদর পায় না ভিন দেশী ফুলের রাজ্যে।

পান্না আরো কদিন নিষ্ফল প্রয়াস করে।

কিন্তু হতাশ হলেও একেবারে উদাম ছাড়ে না। ব্যর্থতা তাকে ভিন্ন মুখে গতি যোগায়। ওদের বস্তীতে একটা পোড়ো ঘর ছিল। ব্যাং, মশার আস্তানা। কেউ বড় একটা যেত না সেদিকে।

সকালবেলা কাজের ভিতর একটু ফাঁক খুঁজে ছোট বোন পুঁটির হাতে এক বালতি জল চাপিয়ে দিল পান্না—যা দক্ষিণ দিকে ভাঙ্গা পাঁচিলটার কাছে নিয়ে যা, পোড়ো ঘরটা আমি নিকাবো।

কষ্ট হলেও পুঁটি মহা উৎসাহে বালতি ভরা জল নিয়ে চলল। ভার সামলাতে না পারায় মাঝে মাঝে পড়তে লাগল ছলকে। অনেক ভাড়াটের উঠান, যার ঘরের সামনে পড়ে সেই বকুনি দেয়। পান্নার বোন পুঁটি সেও কম যায় না। বিড়-বিড় করে কি যেন জবাব দেয়। জায়গা মত সে গিয়ে থামে। বাড়ির পিছনে বেওয়ারিশ জায়গায় একখানা এবড়ো-খেবড়ো ঘর। কপাট নেই, আছে একটা ঝাঁপ। কে কবে কি প্রয়োজনে দিয়েছিল তা পুঁটি কেন পান্নাও বোধহয় জানে না। বস্তীর কেউ এদিকে বড় একটা আসে না। একটা আকন্দ গাছ আছে, আর একটা কুলগাছ। শেষেরটার জন্যই পুঁটির এ জায়গার সঙ্গে যা কিছু প্রণয়।

কিন্তু গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতেই একটা নিষ্ঠুর কাক কা-কা করে যেন তেড়ে এলো। পান্না এসে দেখল, পুঁটি কাঁদছে।

হাতের বোঝা নামিয়ে পান্না জিজ্ঞাসা করল,—কিরে কি হয়েছে?

—আমি ভয় পেয়েছি—ঐটা কি পাজি দিদি।

একটা কঞ্চি নিয়ে ধাওয়া করতে শিখিয়ে দিলে পান্না।—ভয়ের কিরে? এখন যাতো দেখি।

এবার পুঁটির কি হাসি।

কত জিনিষ এনেছে পান্না, একখানা ঘর সাজাবার জন্য যা-যা তার পক্ষে সম্ভব তাতে [illegible]।

প্রথমে দু বোনে মিলে ঝাড় পোঁছ করে নিলে। তারপর গোবর মাটি দিয়ে ভাল করে লেপে ফেলল মেজেটা। দেয়ালগুলো চকচক করছে না। কিন্তু রোদ-বাতাস যথেষ্ট। পান্না মিস্ত্রী কাকুর বাড়তি পড়ে থাকা চূণ গোলা টিনটা পুঁটির সাহায্যে নিয়ে এল গোপনে। কর্বিৎ-কর্মা মেয়ে—চূণকাম করল ইচ্ছামত।

কার্পেট কোথায় পাবে? একখানা সবুজ পুরান ত্রিপল এনে বিছাল। সোফার বদলে থাক থাক ইঁট। তা পরিপাটি করে ঢেকে দিলে রঙিন শাড়ীর টুকরো দিয়ে। পুতুল খেলার দৌলতে তার না থাকলেও অনেক কিছু আসবাব সজ্জা সংগ্রহ ছিল। টবের বদলে গামলায় রোয়া গাঁদার ঝাড় নিয়ে এলো। এবার কটা ফুলদানী চাই। কিন্তু তা বুঝি নেই এ বস্তীতে।

পান্না চিন্তিত হল। এখন কি উপায়?

সে ছুটে গিয়ে পাতানো বৌদিকে ধরল,—তোমার বিয়ের ফুলদানী দুটো দিতে হবে।

—অবাক করলি পান্না। আমার বিয়েতে যে ফুলদানী দিয়েছিল তা তুই জানলি কি করে? সে তো তোর জন্মের আগে।

—তুমি যে সৌখিন!

একদিন ছিল,—এখন আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু সন্তুষ্ট হল পাতানো বৌদি। কোনোকালে যে দুটো ফুলদানী ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি, তা বাক্স খুলে বার করে দিল।—ভাঙ্গিস না ভাই, সাবধান।

মাথা নাড়িয়ে নিয়ে গেল পান্না।

সেদিন আর ফুল পাওয়া গেল না।

পরদিন নানা বাগান থেকে, নানা রকম ফুল সংগ্রহ করে আনল দু বোনে মিলে, বেলা হলে রায় বাহাদুরের, নিশিকান্ত সাব জজের এবং বিলাস মিত্র এ্যাডভোকেটের মালীরা চেঁচামেচি করল স্ব স্ব ভাষায়।

কিন্তু পান্না তার হল ঘর সাজাল। নিজেরাও সাজল দু বোনে জরির ফিতা জোগাড় করে।

বেশ বলিষ্ঠ কটা রজনী গন্ধার ঝাড় এনেছে ছুরি চালিয়ে। ফুটন্ত গন্ধরাজ এনেছে ডাল-পালা সমেত। মনে হয় এ ফুল যেন ফুলদানীতে নয়, গাছেই ফুটছে। মালা গাঁথল শিউলী ও রক্ত করবীর। থাকে থাকে ঝুলিয়ে দিল শতনরী হারের মত। সত্যি সত্যি একটা অবুঝ মৌমাছি এসে বড় একটা ফুলের পাঁপড়িতে বসল যেন। পান্না মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে ঘুরতে লাগল। সেই মেয়েটির মত গন্ধ নিতে লাগল এ ফুল থেকে ও ফুলের।

পুঁটি অনুকরণ করতে লাগল দিদিকে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে একটা দুপুর ওরা নেচে কাটাল নিজেদের হাতে গড়া স্বপ্নরাজ্যে। এত মধুর স্বাদ তো ওরা কোনদিন পায়নি। বেলা দেড়টা নাগাদ বৌদি এসে ওদের ধরে নিয়ে গেল, বলি খেলা খেলা করে খাওয়া-দাওয়া নেই! মা তোদের খুঁজছে।

এইবার টনক নড়ল দু বোনের। স্বপ্নের থেকে ফিরে এলো কিল-চড়ের রাজ্যে।

যা হক সেদিন কোনো রকমে রক্ষা করে দিল পাতানো বৌদি।

পরদিন ওরা এসে দেখল, ওদের স্বপ্নরাজ্য শুকিয়ে গেছে। বর্ণ নেই, সে গন্ধ নেই ফুলে। খসে পড়েছে শিউলী, ঝরে পড়েছে গোলাপের পাঁপড়ি।

এ বোন ও বোনের দিকে চাইতে পারে না চোখ মেলে।

কিছুক্ষণ বাদে পান্না সব টেনে-টুনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

—দিদি তোর পায় পড়ি, এই ঝাড়টা শুধু থাক। এখনো পুঁটির মনের স্বপ্ন একেবারে কাটেনি। কোনো প্রকারে সে রজনী গন্ধার ডাঁটাগুলো বাঁচালো রুদ্রাণীর গ্রাস থেকে।

পান্না বস্তী ছেড়ে বেরিয়ে এলো। এসে দেখল স্বপ্নপুরীর জানলা কপাট ভেজান। কিন্তু রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেই মাদক দৃশ্য। সেই ফুল, সেই প্রজাপতির মত মেয়ে।

আবার নিজের সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হল পান্না। কামনা হল প্রখরতম।

ছটফট করে পান্না ঘুরতে লাগল রাস্তায়। কোথায় ফুল, কি করে আবার গড়া যায় স্বপ্ন রাজ্য? আসন্নপ্রসবা মায়ের আকুতি নিয়ে এই কটি মেয়ে যেন সময় কাটাতে লাগল।

আজো তার পথে পথে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো—পেটে পড়ল না একমুঠো অন্ন। মনে হল না মা বাবার তিরস্কার লাঞ্ছনার কথা।

বিকালের দিকে স্বপ্নপুরীর অন্দরের কপাট ঠেলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো।

—কিরে, তুই যে এখানে? সবিস্ময়ে পান্না প্রশ্ন করল।

—আমার মা এখানে কাজ করে।

পান্না ওর গলা জড়িয়ে ধরল। কতদিন যে তোকে ভাই বিন্দা দেখিনি। পান্না পুরান পরিচয় ঝালাল। ভাব জমিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলতে পারিস ওরা অত ফুল কোথায় পায়?

—কেন অভাব কি? চলনা কিনে দেবো দোকান থেকে। মার্কেটে ফুলের ছড়াছড়ি। পয়সা দিলেই পাওয়া যায়।

সে পয়সা তো পান্নার রয়েছে। কিন্তু সে তো আজ পর্যন্ত মার্কেট অবধি গিয়ে দেখেনি। হাজার ডানপিটে হলেও পান্নার একটা সীমানা ছিল।

—পয়সা আনলে তুই কিনে দিবি?

—দেবো, কিন্তু একটা মোয়া খাওয়াতে হবে জয়নগরের।

—খাওয়াব।

পান্না গোপনে বাড়ি ঢুকল। বেরিয়ে এলো গোপনেই সেই সঞ্চিত কআনা ঐশ্বর্য নিয়ে।—চল।

—ওগুলো কি ফুল রে?

—বিন্দা বলে, আমার ওঘরে ঢুকতে বারণ—তবে মা বলে, পারিজাত। কআনার কিনবি?

—তোকে এক আনা খাওয়ালে, চার আনা থাকবে।

বিন্দা বলে, মার মুখে শুনেছি সপ্নের ফুল—দোকানীরা মালী রেখেছে রোজ তুলে তুলে আনে। আমি মার্কেটে মার সাথে গিয়ে দেখে এসেছি একদিন।

একেবারে পথ কম নয়। পান্না হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সারাদিন তো পেটে কিছু পড়েনি। পথের দুপাশে কত নতুন নতুন দৃশ্য কিন্তু তাতে কোনো আকর্ষণ বোধ করে না পান্না। অন্যদিন হলে ভিন্ন কথা ছিল। যা জানে না, দেখেনি, তার জন্য প্রশ্ন করে বৃন্দাকে নিশ্চয় অস্থির করে ছাড়ত। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো।

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায়)

রয়েল কলেজের কয়েকটা দিন

বাসব ঠাকুর

বছরের অর্ধেক তো শেষ হয়ে গেছে, তাই ভেবেছিলুম রয়েল কলেজ অফ আর্টে ভাস্কর্যের বিভাগে ভর্তি হবার জন্য যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলুম নিশ্চয় তা অগ্রাহ্য হয়েছে। কেননা, কোন ওজর দেখিয়ে হয়তো একটা উত্তর আসবে একদিন, তাই আর বৃথা লণ্ডনে সময় নষ্ট না করে একোল দেবোজার-এ যোগ দেবার আশায় প্যারিসে যাবার আয়োজন করছি এমন সময় খবর এলো রয়েল কলেজে আমায় ছাত্র হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম বছরের ছেলেরা তখন নিউড লাইফ স্টাডিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একে আমি যে দেশ থেকে আসছি সেই ভারতবর্ষে তখন নিউড লাইফ স্টাডির চলন প্রায়ই ছিল না। তার উপর এত দেরীতে জয়েন করার জন্য এই সাবজেক্টে একটু পেছিয়েই রইলুম। এখানে পাঁচ দিনে হপ্তা, বাকী দু'দিন ছুটি। হপ্তায় দু'দিন ফুলফিগার স্টাডি। একদিন বাস্ট অথবা হেড, বাকী দু'দিন খুসী মতন ডিজাইনের কাজ। প্রতি সন্ধ্যায় ড্রইং-এর ক্লাস অপ্‌শনাল, এতে প্রতিদিন দুটি করে নতুন মডেল আনা হত ফিগার স্টাডির জন্য। এবং একদিন আরকিটেকচারের ক্লাস অপশনাল, এতে প্রফেসর ছিলেন ন্যাব ফিশার A. R. I. B. A। এগুলো সবই আমি এটেন্ড করতাম। ফলে ফিগার ক্লাসে একটি ভেনাস দ্য মেদিসির মতই নিখুঁত সুন্দরী অষ্ট্রিয়ান মেয়েকে নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথামত ক্যালিপার দিয়ে মাপজোখ নেওয়া দূরে থাক্ তার দিকে ভাল করে চাইতেও আমার সঙ্কোচ হ'ত। তাই প্রথম দু'একটা কাজ আমার সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গেল। ঐ সময় বোধহয় আমার কাজে ভুল দেখে প্রফেসর এসে একদিন জিগ্যেস করলেন "মাপজোখ ঠিক মতন নিয়েছ কি?" বল্লাম "হ্যাঁ"। তাই শুনে সহপাঠীরা একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকাল আর মডেলটিও একটু হাসলো। প্রফেসর বুঝলেন কথাটা আমি সত্য বলিনি, তাই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেদিন আমাকে দিয়ে ঠিকমত মাপটা নেয়ালেন এবং সেই থেকে আমার সঙ্কোচও কেটে গেল এরপর। যে মডেলটা তৈরী করি সেটা দেখে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ভাস্কর স্যার উইলিয়ম রিড্‌ডিক্ বলেছিলেন, ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে নাকি ভালো হয়েছে। ভাস্কর্যে এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তক স্বনামধন্য হেনরি মূর এই কলেজে কয়েক বছরের জন্য শিক্ষক হয়েছিলেন কিন্তু এই সময় আমাদের শিক্ষা দিতেন প্রফেসর রিচার্ড গার্ব আর, এ। সারা কলেজের মধ্যে আমি তখন একমাত্র ভারতীয় ছাত্র। বিদেশীয়দের মধ্যে আমি ছাড়া আরও একজন ছাত্র ছিল, সে এসেছিল মিশর থেকে। আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে ছয়টি মাত্র ছেলে। পাশের ঘরে মেয়েদের ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস সেখানেও মাত্র পাঁচ-ছটি মেয়ে। পেন্‌টিং ও ডিজাইনের ক্লাস ছিল রাস্তার ওপারে ভিক্‌টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামের মেইন বিল্ডিং-এ। কিন্তু কলেজের কমনরুমটা ছিল আমাদের ক্লাসের দিকে আর ক্যান্টিনটাও ছিল তারই মধ্যে। তাই প্রতিদিন লাঞ্চ ও চায়ের সময় সারা কলেজ এসে জমা হত ঐখানেই। প্রতি শুক্রবার সোস্যাল নাইটে ঐ কমনরুমেই হত বল্‌নাচ, ফ্যান্সী ড্রেস, কোন কোনদিন ছোটখাট নাটক, কখনও পুতুল নাচ ইত্যাদি। কলেজে জয়েন করে প্রথম প্রথম কাজের সময় শুধু সহপাঠীদের সঙ্গে যা একটু কথাবার্তা হত, তারপর তাদের সঙ্গে আর আমার কোন যোগ থাকতো না। তাই কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হত নিজেকে। নাচ তখনও শিখিনি, তাই সোস্যাল নাইটে যেতেও সাহস হত না। এমন সময় একদিন চায়ের টেবিলে কমনরুমে আলাপ হল এলিসের সঙ্গে। মেয়েটি ডিজাইন ক্লাসের দ্বিতীয় বছরের ছাত্রী, কাজেই আমার চেয়ে সিনিয়র। সে নিজেই চা নিয়ে আমার পাশে বসে কথা বলতে শুরু করে দিলো।

তার বাবা নাকি মধ্যভারতে এক রাজার গার্জেন টিউটর ছিলেন। তবে তার বাবা দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই যখন ইহলোক ত্যাগ করেন এলিসের বয়স তখন মাত্র ৬।৭ বছর। তবু ভারতকে তার এখনও কিছু কিছু মনে আছে আর সেইজন্যই আমার বিষয়ে তার এত কৌতূহল। সেদিন ছিল শুক্রবার, তাই ও জিগ্যেস করে সোস্যাল নাইটে আমি আসবো কিনা। বলি "না।" কারণ কি জিগ্যেস করলে একটু ইতস্ততঃ করে বলতেই হল "যেহেতু নাচতে শিখিনি।" "কি আশ্চর্য, এইজন্যই তুমি আসনা বুঝি? তা আমি তো আসছি, আমি তোমায় নাচ শিখিয়ে দেবো, আজকে এসো নিশ্চয়।" খানিকক্ষণ গল্প করার পর সে নিজের ক্লাসে চলে গেল। সাহসে নির্ভর করে সেদিন রাত্রে সর্বপ্রথম সোস্যালে গিয়ে হাজির হলাম। কলেজের প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়ে দেখি সেজেগুজে কমনরুমে এসে কেউ নাচছে, কেউ একটা করে বিয়ার নিয়ে বসে গল্প-গুজব করছে। দিনের বেলায় কাজ করতে করতে মেয়েরা ওভারঅল পরে চা অথবা লাঞ্চ খেতে আসতো। তখন বোঝা যেত না সাজপোষাকে তাদেরই কত সুন্দর দেখাতে পারে। আমি এসে দেখি এলিস ফাইনাল ক্লাসের একটা ছেলের সঙ্গে নাচছে। আমাদের ক্লাসের যে দু'একটি ছেলে এসেছে তারাও নিজের নিজের বান্ধবীর সঙ্গে নৃত্যরত, তাই কাউণ্টার থেকে এক বোতল বিয়ার নিয়ে একটা খালি চেয়ারে এসে বসলাম। সিগারেটটা ধরাতে যাচ্ছি, এমন সময় ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ডিক্ এটকিন্‌সন হাতে একটা সিগারেট নিয়ে আমার পাশের চেয়ারে এসে বসলো। বল্লে "অনুগ্রহ করে তোমার দেশলাইটা একবার দেবে?" "নিশ্চয়' বলে দেশলাইটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, সেই থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। দুজনে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে করতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। একজন ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করছি বলে একটু গর্বও হচ্ছিল, এমন সময় এলিস এসে বল্লে, "অনেকক্ষণ তোমায় একলা বসিয়ে রেখেছি না? কিছু মনে করোনি তো?" বল্লাম "না।" সে ওর নাচের সঙ্গী রজারের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময় আবার নাচের বাজনা বেজে উঠলো। এটকিন্‌সন "এটা আমার সঙ্গে?" বলে এলিসের দিকে এগোতেই সে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লে "কিছু মনে কোরনা 'ডিক্', এটা ওকে প্রমিস্ করেছি।" তাই ভদ্রতার খাতিরে আমাকে উঠতেই হল এবং সেই প্রথম ভয়ে ভয়ে কমনরুমের নাচের ফ্লোরে পা দিলাম। মনে হল ডিক্ একটু ক্ষুন্ন হয়েছে। তারপর হয়তো দু'একবার ওর পায়ের আঙুলে মাড়িয়ে দিয়েছি এবং নাচের সময় পাছে ওর গায়ে আমার গা ঠেকে যায় এইজন্য বেশ একটু দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফক্সট্রটের সুরে কয়েক পাক ঘুরতে ঘুরতে একসময় কখন সে আড়ষ্টতা কেটে গেছে। সেদিন সন্ধ্যাটা সত্যি খুব উপভোগ্য হল।

ওরা তিনজনেই থাকে অনেক দূরে, তাই নাচ শেষ হলে আমার অনুরোধে ওরা কলেজের কাছে আমার বাসাতেই বাকী রাতটা কাটাতে এলো। ভোরের ট্রেণটা ছাড়বার আগেই তারা যে যার নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হবে এই ছিল কথা, কিন্তু পরের দিন ঘরে মেজের কার্পেট-এর ওপর শায়িত অবস্থায় চারজনের ঘুম যখন ভাঙলো বেলা তখন ১২টা প্রায় বাজে। তবে সেটা ছিল শনিবার ছুটির দিন, তাই কিছু এসে যায়নি। ওদের সঙ্গে কয়েকটা সোস্যাল নাইটে আসবার পর ক্রমশঃ নাচে আমার কনফিডেন্স বাড়তে লাগলো। শেষের দিকে কমনরুমের সোস্যাল ছাড়াও রয়েল কলেজের বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে পাব্‌লিক ডান্স হল এবং অন্যান্য কলেজের সোস্যাল ফাংসনেও চলে যেতুম। এদেশে আর্টিস্টদের ফ্যান্সী ড্রেস্ বল একটা উল্লেখযোগ্য জিনিষ। বড়দিনের সময় বছরের শেষে লণ্ডনে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাচ হয় সেটা হল 'চেলসি-আর্ট-বল'। টাউন হলে এই ফ্যান্সি ড্রেস অনুষ্ঠানে চ্যারিয়েটের মধ্যে সবার আগে যে চ্যারিয়টটি থাকে সেটা হল রয়েল কলেজ অব আর্টের। প্রত্যেক বছরে রয়েল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নতুন ডিজাইনে এটাকে নির্মাণ করে থাকে এবং তাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতি-বছর এক একটা নূতন ধরণের ট্যাবলো প্রদর্শন করে। এই ফ্যান্সি ড্রেসবল্-এ ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের লোক, লর্ড লেডী ও দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আর্টিস্টদের সঙ্গে সমানে মেলা-মেশা করেন, এতে আর্টিস্টদের প্রাধান্যই বেশী। তবে চ্যারিয়ট নির্মাণ বা ট্যাবলোতে অংশ গ্রহণকারী রয়েল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটা করে কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট দেওয়া হত। এই ফ্যান্সী-ড্রেস-বল-এর টিকিটের এত চাহিদা যে, শেষের দিকে রীতিমত ব্ল্যাকমার্কেট চলত।

ঐ প্রথম সোস্যাল নাইটের পর থেকে আমরা চারজন লাঞ্চে ও চায়ের সময় কমনরুমের এক টেবিলেই বসতাম। ক্রমশঃ অন্যান্য [illegible]

সেই টেবিলে যোগ দিতে লাগলো। আমার টেবিলের আড্ডাটা এতই জমাট বাঁধতে লাগলো যে, শেষে দু'তিনটে টেবিল একসঙ্গে জুড়ে বসতে হত। সোস্যাল নাইটেও ধীরে ধীরে আমার খাতির বাড়তে লাগলো। হয়তো এর একটা কারণ নিজে সব সময় না খেলেও বন্ধুদের মধ্যে ক্যামেল সিগারেট আর বিয়ার যা কমনরুমে খুব অল্প দামেই পাওয়া যেত বিতরণে কখনও আমি কার্পণ্য করিনি। বিয়ার ভিন্ন কলেজের কমনরুমে অন্য কোন মাদক দ্রব্য পাওয়া যেত না। অবশ্য তাও শুধু সোস্যাল নাইটে। ডিক আর রজার এই দুজন ছিল ফাইন্যাল ইয়ারে সবচেয়ে নামকরা ছাত্র, এদের একজন যে ফার্স্ট হবে এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না। রজার ছিল খামখেয়ালী উদাসীন প্রকৃতির লোক, কিন্তু গভীর ছিল তার অনুভূতি। এই ভাবটি তার কাজের মধ্যেও দেখা দিত, তবে অনেকে মনে করত সে একটা স্নব। কিন্তু তার সঙ্গেই হ'ল আমার সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা। ডিক ছিল অনাধরণের ভীষণ খাটতে পারতো সে এবং সেই অধ্যবসায়ের জন্যই তার কাজগুলো ভালো হলেও হত একটু প্রাণহীন মাপজোখের মধ্যে আবদ্ধ। ভারতীয় বলে সে যেন আমায় কৃপার চোখে দেখতো আর আমার সঙ্গে এলিসের মেলামেশাও ভাল চোখে দেখতো না। সে ছিল অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। রজারের আর্থিক অবস্থার বিষয় কেউ কিছু জানতো না। এরা দুজনেই মনে মনে এলিসের জন্য পাগল। ক্লাসের শিক্ষার মত এই নিয়েও যে তাদের মধ্যে রেষারেষি ছিল একথা অনেকেই জানতো। এলিসের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ, অনেক সময় বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তাকে খরচ চালাতে হত। তার পিতার মৃত্যুর পর তার মা তাকে মাসীর কাছে ফেলে রেখে এক বিদেশীর সঙ্গে উধাও হয়ে যায়। মাসী একটা ছোট বোর্ডিং হাউস চালান এবং কোনক্রমে ওর খরচটাও চালিয়ে দেন। রজার লোকটা সবার প্রিয় না হলেও তার কাজগুলো উঁচুদরের একথা সবাই স্বীকার করতো এবং জানতো ডিকের চেয়ে ওরই ফার্স্ট হবার চান্স অনেক বেশী।

সে বছর ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলে সবাই দেখে অবাক হল যে ফার্স্ট হয়েছে ডিক। কলেজের প্রথা অনুযায়ী সেবারের ট্রাভেলিং স্কলারশিপটা ওকেই দেওয়া হবে, কারণ ফার্স্ট হয়েছে ও। জিম হেউডের সঙ্গেও আলাপ হল একদিন। চায়ের টেবিলে বসে এলিসের সঙ্গে কথা বলছিলুম এমন সময় সে অনুমতি নিয়ে আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসলো। এলিসের সঙ্গে কথা বলাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ও আসাতেই পরে দেখা হবে আমাকে এই বলে উঠে গেল এলিস। তাই বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গেই কিছুক্ষণ ওকে কথা বলতে হল। অক্সফোর্ডের ছাত্রদের মতই ওর ইংরেজী উচ্চারণ এবং মার্জিত আদব কায়দা। অদ্ভুত ছেলে এই জিম। ছবি আঁকার পদ্ধতি সম্বন্ধে সব কিছুই সে জানে। কোন্ রংয়ের কি দোষ, কোন্ তুলির কি গুণ এবং কোন্ কাগজ বা ক্যানভাসের কি কি দোষ গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবই তার জানা আছে। এ বিষয়ে সে যে কোন আর্টিস্টের সঙ্গে সমানে আলোচনা করতে পারে—শুধু তাই নয়, তার লাংকাস্টার গেটের ফ্যাসানেবল স্টুডিওতে মূল্যবান রং তুলি এবং ক্যানভাসের ছড়াছড়ি। দেয়ালের গায়ে খ্যাতনামা দেশ-বিদেশের শিল্পীদের ছাপা ছবি ফ্রেমে বাঁধানো কিন্তু ওর নিজের একটাও ছবি কেউ কখন দেখেনি। তাই সহপাঠীরা ওর স্টুডিওকে ঠাট্টা করে বলতো, রঙের দোকান। ও তখন দ্বিতীয় বছরের ছাত্র। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিপ-ছিপে চেহারা। বেশভূষা ঠিক ছাত্রদের মত নয়, প্রফেসরদের মতই দামী। ওর ঠাকুর্দা হলেন এক রিটায়ার্ড জেনারেল আর ওর কাকা তখন একজন কেবিনেট মিনিস্টার। বোধহয় শুধু এই কারণেই ওকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া যায়নি। তাকে তেমন সুনজরে কেউ না দেখলেও উপেক্ষা না করে বরং মেশবারই চেষ্টা করতো সবাই। তবে বড়লোকের ছেলে হলেও তাকে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করতো এলিস। এই কারণেই এলিসের দুই বন্ধুকে সে রীতিমত ঈর্ষা করতো এবং যদিও সে ডিক এটকিনসন-এর সঙ্গে এক রকম বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছিল। সে একদম বরদাস্ত করতে পারতো না রজারকে।

হঠাৎ জিম সবাইকে নেমতন্ন পাঠালে। তার স্টুডিওতে পার্টি ডিক এটকিনসন-এর সম্মানে। রজার ফার্স্ট না হওয়ায় অনেকের মত সে খুসী হয়েছে বলেই যে এই পার্টি নয় তা সবাই বুঝতে পারে। এর আসল উদ্দেশ্য হল এই সুযোগে এলিসকে তার ফ্ল্যাটে আনা। এলিস ডিকের বন্ধু, এ পার্টি ডিকের সম্মানে এবং তার ফেয়ার ওয়েল বল্লেও চলে, তাই এলিস না এসে পারে না। সেদিন জিম হেউডের স্টুডিও কলেজের ছাত্র ছাত্রীতে ভরে গেছিল। কয়েক রাউন্ড ড্রিংকস শেষ হয়ে গেছে। ঘরের আব-হাওয়াও হয়ে উঠেছে গরম। পাছে ডিক ক্ষুন্ন হয় তাই এলিসকে আসতে হয়েছে আর পাছে সবাই মনে করে ডিককে সে ঈর্ষা করে তাই আসতে বাধ্য হয়েছে রজার। জিম তার মার্জিত ভাষায় অনুরোধ করলে ডিককে কিছু বলতে, তাই এর উত্তরে ডিককে উঠে দাঁড়াতে হল এবং বেশ মুরুব্বির চালে সে বলতে লাগলো, 'প্রফেসর একদিন বলেছিলেন আমার কাজের মধ্যে তিনি একটা অধ্যবসায়ের ছাপ দেখতে পান সেইটেই আমার কাজের মধ্যে একমাত্র গলদ। কিন্তু সবাই বোধ হয় স্বীকার করবে যে অধ্যবসায় ভিন্ন সাফল্য লাভ করা যায় না..... আজকের সৌজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। জিম ও সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।' ওর বলা শেষ হ'লে সকলে হাততালি দিয়ে হল্লা করে উঠলো। ওখানকার আবহাওয়াটা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। খেয়াল করিনি সেই হট্টগোলের মধ্যে এলিস আর রজারও নিঃশব্দে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

কয়েকদিন পর ভোরবেলায় একটা খবরের কাগজ নিয়ে রজার আমার বাসায় এসে হাজির, বল্লে, 'দেখ তো কি লেখা'। দেখলাম ওরই নাম বেরিয়েছে সে বছর, সবচেয়ে বড় জাতীয় স্কলারশিপ 'পিটার রোম' প্রাপকদের মধ্যে। ও বল্লে, এই নামে স্লেড স্কুল অফ আর্টে আর একটি ছেলে আছে সেও তো হতে পারে।' অফিসে একলা গিয়ে খবরটা আনতে ওর সাহস হচ্ছিল না, তাই আমায় ওর সঙ্গে যেতে হল এবং গিয়ে জানা গেল নামটা ওরই। বলা বাহুল্য স্লেড স্কুলের সেই ছেলেটিও ওখানে খবর নিতে এসেছিল। সে ওকে কংগ্র্যাচুলেট করলে।

কয়েক দিনের মধ্যে ডিক চলে গেল স্পেনে আর এলিসের মুখেই শুনলাম রোমে যাবার আগে রজার ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে পারেনি।

এর মাস দু'তিন পর সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম যখন শুনলাম কলেজ ছেড়ে জিম বেরিয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে, সঙ্গে গিয়েছে তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী এলিস। ওদের চারজনের সঙ্গে আর আমার কখনও দেখা হয়নি, তবে কিছুদিন পরে এলিসের কাছ থেকে পেয়েছিলাম একখানা চিঠি, ওরা তখন 'সান্তো-বারবারায়'। সে লিখেছিল তার স্বামী ছবি আঁকা ছেড়ে তখন কবিতা লিখতে মন দিয়েছেন এবং গোলাপের উপর কবিতা লিখবেন বলে গোলাপী কাগজ, গোলাপী কলম, গোলাপী কালি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। অবশ্য তখনও একটা কবিতাও তিনি লেখেননি। জিমকে বিয়ে না করলে ওয়ার্ল্ড টুর করা কখনই এলিসের পক্ষে সম্ভব হত না। বহির্বিশ্বের প্রতি এলিসের ছিল অসীম আকর্ষণ। তাই সে নিরুপায়। কলেজের মধ্যে যখন আমি নিঃসঙ্গ বোধ করতাম সেই সময় ওরাই হয়েছিল আমার প্রথম বন্ধু কিন্তু ওরা যখন চলে গেল কলেজের প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গেই তখন আমার বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে গেছে।

চার আনার পারিজাত দেবে?

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

আর কত দূর রে?

বেশি না, ঐ মোড়টা ঘুরেই মার্কেট।

পান্না নতুন করে পায় বল সঞ্চয় করতে লাগল।

মোয়া?

আগে ফুল কিনে দে, তবে তো মোয়া।

সে হয় না, তবে থাক ভাই পান্না।

এ কথার কি যে প্রচণ্ড জবাব তা পান্না জানত। কিন্তু আজ সে নিস্তেজ বিষধরী। তবু বললো, এই নে এক আনা। ছাই খা।

মার্কেটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দোকান পসার আলোয় আলোময় হয়ে উঠল।

গেটে সুমুখেই ফুলের স্টল। এ যেন এক রূপকথার রাজ্য।

—কি চাই মেয়ে?

—চার আনার পারিজাত দেবে?

—দেখোনা কোনটা পছন্দ হয়—কোন্ ফুল?

পান্না বিহ্বল হয়ে এগিয়ে গেল।

মন্মথেরর মত চেয়ে রইল অবাক বিস্ময়ে।

কিরে কোন ফুল তোর মনের মত? ওকি হাঁ করে রইলি যে? বুদ্ধ ওকে ঠেলা দিল। বাসায় যাবিনে?

এবার একটা সতবকে পান্না হাত দিয়েই চমকে সরে এল। এতো স্বর্গের নয়, কাগজের পারিজাত! সে উঁচু গলায় কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে ছুটে চললো। সোনামুঠি যেন ছাই হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ক্ষ্যাপার পরশ পাথর।

সে মা বাবা এমনকি পাতানো বৌদিকেও মুখ দেখাল না। একেবারে পোড়ো ঘরের দুয়ারে হাজির।

ভিতরে একটা আধপোড়া মোমবাতি জ্বলছে। আর শ্রীমতি পুঁটিরাণী বসে।

তখন মরা রজনীগন্ধা সজীব হয়ে আবার গন্ধ ঢালছে।

হাসি ও বাঁশি

হীরেন চৌধুরী

পাশাপাশি চারখানা বাড়ি। প্রায় একই ছন্দে, একই রং-এ আর গড়নেরও ঐক্য নিয়ে এই চওড়া গলিটায় বিশিষ্টভাবে বিরাজমান এই ইমারৎ ক'খানা কোনও উগ্র সমাজ সচেতন ব্যক্তির মনে কথঞ্চিৎ বিরক্তি সৃষ্টি করবে। হঠাৎ সে ধ'রে নেবে এরা একই মালিকের চারখানি সম মাপের দম্ভস্তম্ভ। হীরক গুপ্ত সমাজসচেতন, কিন্তু সে বাড়িগুলি দেখে প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং পরে যখন দ্বিতীয় বাড়িখানার নীচতলার সামনের অংশের ভাড়াটে হিসেবে স্বীকৃত হ'ল তিন মাসের দরুণ তিন শ' টাকা অগ্রিম দিয়ে রসিদ হাতে পেল তখন তারও মনে দম্ভের সঞ্চার হল বইকি। অন্ততঃ তিন মাসের জন্য সে ত মালিকানা কিনে ফেলেছে! আরও খুশি হয়ে উঠল সে, তাদের অংশে এক চিলতে বারান্দা রয়েছে এবং চারখানি বাড়ি একজনের নয়—চারজনের।

ভাড়ার অংকটা আঁতকে-ওঠার মতো। কিন্তু উপায়ই বা কি ছিল এ ছাড়া। এই ফ্ল্যাটখানা পাওয়া না-গেলে আরও কতোদিন সেই ছাত্রকালের অভ্যাসের জের টেনে চলতে হ'ত তার ঠিক কি! এই ফ্ল্যাট না-পেলে ময়না রায়গুপ্ত হ'ত না, হীরকও গুপ্তরায় হ'ত না, হীরক থাকত গুপ্ত হয়ে আর ময়না রায়কে কুমারী পদবী বয়ে বেড়াতে হ'ত। না-পেলে ময়নাকে ঢাকুরিয়া থেকে ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করতেই হ'ত আর হীরকের পৈতৃক বাস্তুর চিলেকুঠুরীর খুপরীতেই মশার দাম্পত্য বরদাস্ত করতে হ'ত। ফ্ল্যাটখানা না-পেলে হীরকের বাবার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'ত না—এমনি আরও কতো-কীই হ'ত কিম্বা হ'ত না, সেই ফিরিস্তির সঙ্গে ময়নার এই মুহূর্তের একজানালা ভাবনার কোন সম্পর্ক স্থাপন করা প্রাসঙ্গিক হবেনা। কেন-না ময়না রায়গুপ্ত এখন আদৌ নিজের কথা ভাবছে না। চওড়া গলিটার ওপারে বস্তীর মাথার ওপর ফাঁকা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুই দেখছিল না ময়না—ময়না শুধুই তাকিয়ে ছিল, ওর চোখে ঘন ঘুমের পরের কুয়াশা জড়ানো। সেই ভোরবেলা ফার্স্ট বাস ধরতে না পারলে স্কুলে ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া যায় না—সবাই মুখটিপে হাসে। বেলা দি'র চোখে একটু প্রশ্রয় আর বিস্তর বিদ্রূপ থাকে, বলেন— 'ময়নাকে তোমরা কেউ ঠাট্টা করতে পাবে না। প্রথম-প্রথম সবারই এরকম হয়।' মুক্তিদি' গম্ভীরভাবে হেড্‌মিস্ট্রেসের অবিবেচনার উপর দোষারোপ করেন—না-না, বড়দির এ ভারি অন্যায়। এখন অন্ততঃ একটা বছর ময়নার ফার্স্ট আওয়ারে কোনো রুটিন থাকা উচিত নয়। বুড়ি হলে কি সব আক্কেল ঘুচিয়ে বসে মানুষ! বড় দি' যেন কী.........কিন্তু আপাততঃ ময়না স্কুলের সহকর্মীদের কথা ভাবছে না—এটা আসলে, ময়নার দুপুর-ঘুমের কারণ, হিসেবে লেখকের সংগৃহীত তথ্যমাত্র। ময়না দেখছে না অথচ তাকিয়ে রয়েছে, ভাবছে না অথচ জেগে রয়েছে। বস্তীর মাথায় আকাশটা মস্ত বড়, কলকাতার আকাশ যেন নয়, ঢাকুরিয়ার আকাশ—যা ছোটবেলা থেকে ময়নার দেখা অভ্যেস।

রোদে ঝল্‌মল দুপুরের আকাশে হঠাৎ কালো ঘেরা-মেঘের দল দেখে ময়নার আলসেমী ঘুচে যায়। খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক দম্‌কা হাওয়া শঙ্কার শিহরণে চম্‌কে দিল ময়নাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গেল, হীরককে বাড়ি ফিরতেই হবে, এখন ত আর বর্ষাবাদলায় ওদের দেখা-হওয়া বন্ধ থাকতেই পারে না। এটা হীরকের বাড়ি, এটা ময়নার বাড়ি—যা ওরা দুজনে অনেক কাল ধ'রে স্বপ্নে দেখে এসেছে।...হাসি পেল। কি অদ্ভুত ভুল ময়নার। মাঝে মাঝে মনেই থাকে না যে, ওর বিয়ে হয়েছে। বিয়ে-হওয়ার পরের দিনগুলি কল্পনায় যে-ভাবে আঁকা হয়েছিল, বাস্তবে তার অনেক অংশই মিলে যাচ্ছে, তবু কোনো কোন জায়গায় একটু অন্যরকম—!

ও, হো! ছাদে উঠতে হবে নইলে শাড়ী-ধুতি সবই ভিজে যাবে যে! আবার সিঁড়ি-ভাঙার অংক ওঠা-নামার মধ্য পথে দোতলায় দু-মিনিট দাঁড়াতে হবে,—সৌজন্য। না, তার চেয়ে একটু কষ্ট ক'রে ভোলার মাকে ডাকা যাক। ওই তো, ভোলার মায়ের ঘরের দরজা খোলাই আছে। রাস্তার ওপারে মাদার আর কুলগাছের ছায়া ঢাকা টিনের চালায় একখানা ঘরে ভোলার মায়ের সংসার। ময়না লক্ষ্য করল, ভোলার মাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাঁ-পাশে বাঁশের সাঁকোর উপর বসে রয়েছে ওই ত ভোলার ছোট ভাইটা। ময়না হাঁক দিল—'এ্যাই, এ্যাই—!' নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, ভোলার মায়ের ষষ্ঠীর কৃপা ত এক-আধটু নয়।

ছেলেটা মুখ তুলল না। আর একটা হাওয়ার দমক্। গাছের ডাল পাতায় আউলি-বাউলি হাওয়ার মাতন শুরু হল যে! ছেলেটার ওপর প্রথমে চটে গেল ময়না। আবার ডাকল, ডেকেই লক্ষ্য করল ছেলেটা ভোলার মায়ের নয়—তাছাড়া ছেলেটা যে ঘুমে ঢুলছে! সর্বনাশ! আঁত্‌কে উঠল ময়না ভয়ে। বাঁশের সাঁকোর একেবারে কিনার ঘেঁষে ছেলেটা বসে ঢুল্‌ছে যে। একটু বেসামাল হ'লে আর দেখতে হবে না, একেবারে নর্দমার ভেতর ঝুপ্ ক'রে পড়বে। ওইটুকু পুঁচ্‌কে বাচ্ছা পাঁকে-ঘন জলের তলায় ডুবে মরবে। আর যা টান ওই পাঁচ ফুট চওড়া নর্দমার জলে!

ময়নার ডাকে এবার ছেলেটা তাকাল। কিন্তু নিদালির আচ্ছন্নতায় ওর চোখের পাতা বুজে গেল, মাথাটা ডান দিকে ঢলে থুৎনীটা বুকে ঠোক্কর খেল। আর তখনই ময়না লক্ষ্য করল ছেলেটার মাথা কাঁচা বেলের মতো চাঁচা-ছোলা। একদম ন্যাড়া। আহা! ময়নার তখন এক ঝলকে সব কথা মনে পড়ে গেল।

ময়নার মগজটা খুব সাফ। ও বুঝল, এই-ভাবে ডাকাডাকি ক'রে কোনো লাভ নেই।

দরজা খুলে রাস্তাটা পেরিয়ে টুক্ করে তেলে-ভাজার দোকানের সাঁকোতে পৌঁছতে ময়নার কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লেগেছে। এই কয় সেকেণ্ডে ওর কান-মাথা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তপ্ত! কেন?

তার জবাব এক কথায় মিলবে না। আর সেই জন্যেই বোধকরি ময়নার দুপুরটা এক অখণ্ড ভাবনাস্রোতের টানে ভেসে চলে গেল।

ময়নার মনে ছায়াছবির মতো সমগ্র পরিবেশটা স্বচ্ছ, পাঠকের মনে তা হবার কথা

নয়, সেই জন্যে পিদিম জ্বালার আগে একটু সলতে পাকানোর গরজ লেখকের থাকা স্বাভাবিক।

এই তেলেভাজার দোকানের বয়স ময়নার বিবাহিত জীবনের চেয়ে কম—মাস তিনেকের বেশি নয়। আর এই ছোট ছেলেটার বয়স যদিও তিন বছর হতে পারে, এই দোকানে হালফিল এর গতায়াত—বড় জোর দিন পনের হবে। ময়নার চোখে পড়েছে বই কি। ভোলার মায়ের এক-পাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলার মতো কোনো সাদৃশ্য নেই। ছেলেটা ফুটফুটে, ছেলেটার মাথায় থোপা-থোপা ঘন চুলের চাল-চিত্র মুখখানাকে বড় মিষ্টি ক'রে তুলেছে। এমন একটা ছেলে ওই তেলে-ভাজার দোকানে যখন-তখন বসে থাকে কেন! অবাক লেগেছিল ময়নার। কেন না এই ক'মাসে এটুকু জানা হয়ে গেছে যে, রাস্তার দু-পারে দুটো পৃথিবী। এ পারে পাড়া। এখানে বাড়ি আছে আর মানুষ আছে, ওপারে বস্তী। সেখানে পাঁচ ফিট নর্দমার পর-পারে, টালি কিম্বা করোগেটের সারি সারি ঘর, সেখানে থাকে লোক। পাড়া'র মানুষে আর বস্তীর লোকে মিলও আছে গর-মিলও রয়েছে—সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে পাড়ার মানুষেরা বস্তীর লোকেদের চেয়ে অনেক দূরে থাকেন। ত্রিশ ফুট রাস্তা আর পাঁচ ফুট নর্দমার ভৌগোলিক দূরত্ব দিয়ে সে অঙ্কের হিসেব কষা চলে না। ওপারে তেলে-ভাজার দোকান রয়েছে, একটা

গরম-চায়ের দোকান আছে, আর ডাইং ক্লি
পান-বিড়ির দোকান, তেমনি আছে ভে
মায়ের মতো স্ত্রীলোক। ওপারের লো
এপারের মানুষদের ভরসায় হা-পিত্যেশ
বসে থাকে। এপারেই সব খরিদ্দার। প্রে
আপনাপন গরজের বালাইতেই ওপারের লো
এপারের মানুষদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায়
সে সদ্ভাবের মধ্যে আনুগত্যের অলিখিত
নামা রয়েছে। কিন্তু এক-একটা দুর্ঘ
এপার আর ওপার এপক্ষ-ওপক্ষে রূপান্ত
হয়ে যায় হঠাৎ। তখন আমদানী হয়
পাগড়ীর। ময়নার ছ-মাস বসবাসের জ
এরকম ঘটনা বার দুয়েক ঘটেছে। সামান্য
অসামান্য, একটা কানমলা থেকে লাঠি-ছ
বোমার শাসানীতে গড়িয়ে গিয়ে ঘো
একটা সাঁজোয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে
দু-বারই। তার মূলে অবশ্য দু-একজন পা
কারচুপি ছিল। ...হীরক বার বার ময়
সতর্ক ক'রে দিয়েছে—তোমার দয়াময়ীগিরি
ওপারের লোকেদের ওপর ফলাতে যেও
ওরা তোমার স্নেহ, মায়ার মর্যাদা বুঝবে
কিন্তু ময়নার মস্ত রোগই হল মানুষে
লোকে ফারাক না-রাখা। এককালে হী
এই একই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, দে
নিপীড়িত জনগণের উপর দরদী হয়ে পুলি
লাঠি আর স্বদেশী সরকারের জেলখানায়
হয়ে ঘুরেও এসেছিল—কিন্তু ইদানীং সে
বাঁধার জন্য এমনই বদ্ধপরিকর যে, সব
থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শামুকের খে
ভেতর লুকিয়ে ফেলেছে। ময়নাও মনে
ও হীরকের মত না-হোক অনেকখানি
কে দ্রক হতে পেরেছে।
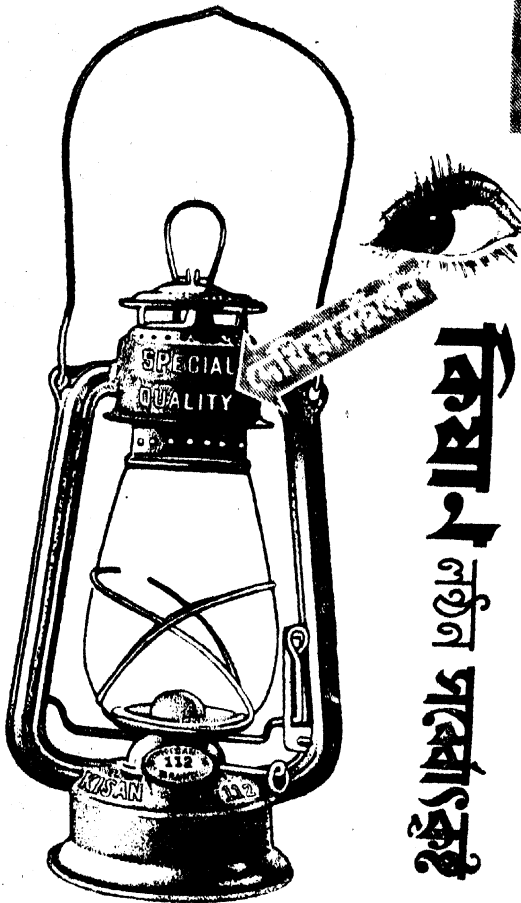
মানুষ সবচেয়ে কম চেনে নিজেকে
ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবেই বা কেন!

রাস্তা পেরিয়ে বাঁশের সাঁকোর উপরে
চট্ ক'রে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল ম
ন্যাড়া মাথার ওপর নজর পড়ল মনে পড়ল
থোপা-থোপা চুলের ছবি।

আচমকা ময়নার মতো গয়না পরা মে
কোলে নিজেকে দেখে ছেলেটা ভড়কে গে
ময়নার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যাঁ ক'রে
জুড়ল। পরিত্রাহি—চিৎকার। ডাগর
দুটো জলে চক্‌চক্ করছে।

ময়না সান্ত্বনা দিল—ভয় কি খো
কেঁদো না লক্ষ্মীসোনা।

আর কি বলবে? বলতে হয়
কিছুতেই মনে পড়ছে না ময়নার। পাঁচ
ধরে স্কুলে মাষ্টারী ক'রে ছেলেমেয়েকে
করার ভাষাটুকু পর্যন্ত ভুলতে বসেছে ম
এর পর যখন ওর নিজের—এই পর্যন্ত ভে
ময়না খুব লজ্জা পেল। কিন্তু ছেলেটা ত
হাল্কা নয়। শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেলে
চোখের জল মোছাতে গিয়ে দেখল কপ
মাঝখানে একটা ফোড়া থর নিয়েছে। ময়
কণ্ঠে সমবেদনার স্নেহ ঝরে, কিছুদিন
হীরকেরও ফোড়া হয়েছিল, যন্ত্রণার কাত
ময়না দেখেছে। হয়তো সেই জন্যেই এত স
সমবেদনার বাছা বাছা ভাষা প্রকাশ হ
ছেলেটার কান্না কমেছে।

এখন কি করবে ময়না?

তেলেভাজার দোকানের ভেতরে কেউ
ফাঁকা। সে-ছোকরা কোথায় গেল? হ

করছে—যদি কেউ এসে কিছু নিয়ে সরে পড়ে?

পিছন থেকে ভোলার মায়ের ফেটে-পড়া শুনখনে 'বাসন্-বাজা' মার্কা কণ্ঠস্বরে 'অ, আমার কপাল—!' শুনে ময়না বিব্রত বোধ করল। মনে হ'ল ভোলার মা ভুল বুঝবে,—ভাববে, ময়নার বুঝি 'মা' হওয়ার সাধ! একটু কিন্তু-কিন্তু সুরে ময়না কৈফিয়ৎ বাতলাল—দ্যাখো না সর্বনেশে কাণ্ড! জান্‌লা দিয়ে দেখি খোকা ঘুমে ঢলে পড়ছে। এক্ষুণি নর্দমায় পড়ে যেত।

ভোলার মা হাত নেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—ভগমান যাকে বাঁচায় তাকে কে মারবে বলো বৌদিদি!

—কিন্তু এ-কি কাণ্ড বলো তো ভোলার মা! এখানে একে একা ফেলে রেখে দিয়ে ওর মা কেমন নিশ্চিন্দি! আর তোমাদের এই দোকানী, সে-ই বা কোথায় উধাও—বলিহারি সব আক্কেল।

মা-কালীর মতো পাকা রং ভোলার মায়ের, বেঁটে-খাটো মানুষটি, দেখলে দজ্জাল বলে ভুল হয় ; আসলে মানুষটা ভালো। ভোলার মা কণ্ঠস্বর নামিয়ে মুচ্‌কী হাসল—এখনই কি দেখছ বউদিদি। সবে ত মালসা-পোড়ানো শেষ হয়েছে, সরস্বতীর এখনই এই। এরপর হরিপদর সঙ্গে গাঁটছড়াটি বাঁধুক তারপর টের পাবে। ভাগ্নি দুকুরবেলা হরিপদ তার সঙ্গে একটু সোহাগ কাড়াচ্ছে।

ময়না নাম জানতো না মেয়েটির, শুধু জানতো এই ছেলেটির মা বলে। আর জানতো তেলেভাজার দোকানীর কাছে ছেলেটাকে রেখে দিয়ে বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যায়। আর কিছুই জানত না ময়না। না, একেবারে আর কিছু জানত না তা নয়, দেখেশুনে মনে হ'ত মেয়েটির চেহারায় যেন উঁচুঘরের ছোঁয়া আছে। প্রথম প্রথম বুঝত না ঐ মেয়েটি (যার নাম সরস্বতী এবং যে এই কচি ছেলেটার মা) ঝি-এর কাজ করে। কেন না বেশ সুশ্রী আর অল্পবয়সী মেয়েটির মধ্যে কিঞ্চিৎ মন-কাড়া মায়া-মেয়া আলগা ছিরি রয়েছে যে! যা থাকলে মেয়েদের পরের বাড়ি বাসনমেজে বেড়ানোর দুর্যোগ ঘটবার কথা নয়।

ভোলার মায়ের কথায় ময়নার কান-গাল রাঙা হয়ে ওঠে। ওদিকে দু-চার ফোঁটা ছিটে-ফিটে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ময়না হাসল—তুমি কি তাদের যেতে দেখেচ! যত্তো সব—

ভোলার মা বল্‌ল—ভালো কথা বললে বউদিদি! শুধু আমি একা দেখলেও নয় কথা ছিল, বলতে পারতে আমার নজর মন্দ। কিন্তু সরির ঢলাঢলির কথা চাপা নি-গো, হ্যাঁ! দাও দাও ওকে কোলথেকে নামিয়ে দাও বউদিদি, অতবড় ছেলেকে কাঁখালে রাখতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আহা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে বউদিদির আমার। নামিয়ে দাও, ওসব পোড়াকপালে ছেলে বউদিদি, ওদের কিচ্ছুটি হবেনি।

ছেলেটা আঁকড়ে ধরেছে ময়নাকে। নামবে না।

কতকটা অসহায় ভাবেই ময়না বল্‌ল—'থাক, আমার কষ্ট হচ্ছে না ভোলার মা। যাই বৃষ্টি পড়ছে।' পাছে ভোলার মা হরিপদ আর সরস্বতীর কথা আরও চীৎকার ক'রে বলে এই ভয় ময়নার।

ময়না ব্যস্তভাবে পা চালালো। চলতে ওর একটু অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু ভোলার মায়ের চোখে ধরা পড়তে নারাজ। ঘুরে দাঁড়িয়ে ও বলল—শোনো—

ভোলার মায়ের মুখখানা একটু ভার-ভার ; ও বলল—কি বউদিদি।

খোকার মা যদি এর মধ্যে খোঁজ করে ত আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ভোলার মা একগাল হেসে আশ্বাস দিল যেন—তুমি কিচ্ছু ভেবোনি বউদিদি! সন্‌ধ্যের আগে সরি-সোহাগিনী এ-মুখো হবেনি। মাঝকে ক-দিন সোয়ামীর মরণ-রোগ ধরেছিল তাতেও ছুঁড়ির কুটকুটনীর খাম্‌তি ছিলনি। দুকুরে হরিপদ আর সন্‌ঝেতে ওই বাবুদের বাড়ির গাড়ি চালায় সেই মোচ্‌ওয়ালা খোট্টা নোকটা। আমি ভাবি কি জানো বৌদিদি—

ভোলার মায়ের ভাবনাটা রীতিমত বিপদ-জনকভাবে সোচ্চার। বস্তীর সীমানা পেরিয়ে পাড়ার চৌহদ্দির হাওয়ায় তার গন্ধ ছড়ালে আর রক্ষে থাকবে না। হয়তো তিন নম্বরের মেম মার্কা মিসেস বোনার্জি 'নুইসেন্স' বলে ব্যালকনিতে নাক-কুঁচকে বেরিয়ে পড়বেন। ভোলার মাকে ধম্‌কে উঠবেন। এবং যদি তিনি ময়নাকেও দেখতে পান তাহলে হীরক অফিস থেকে ফিরলে গোটা সন্ধ্যেটা তাঁর এনামেল করা গাল ঘুরিয়ে ময়নার আদ্যশ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ চুকিয়ে রাত দশটায় অব্যাহতি দেবেন। হীরকের ধৈর্য অপরিসীম।......ময়না সটান ঘরে ঢুকে পড়ল। ভোলার মায়ের কথা পড়ে থাক পাঁচ ফিট নর্দমার ওপারে।

ছেলেটাকে মেঝেতে বসিয়ে দিল প্রথমে। ছেলেটাকে চকোলেট দেবার প্রতিশ্রুতি ময়না মনে রেখেছে। বিস্কুট দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করা যাক। মিটসেফ থেকে কৌটো বার ক'রে দুখানা বিস্কুট এনে ছেলেটার হাতে দিতে গিয়ে ময়না দেখল, ছেলেটা নিবিষ্ট মনে মেঝের লাল সিমেন্টে হাত বুলোচ্ছে : খুব যত্ন ক'রে আলতো ভাবে আস্তে আস্তে। ময়না ডাকল—খোকা! বিস্কুট নাও—

ঢল-ঢলে চোখ দুটোয় ভয়ের আভাস—বকবে না?

বকবো কেন। তুমি খুব লক্ষ্মী ছেলে। বিস্কুট খেয়ে ঘুমোও, কেমন—

—ছত্যি?

—হ্যাঁ।

—ঘুমোলে হলিকাকা না—মানে আমায়, দাদো!

ময়না বুঝতে পারে না। তবু হেসে বলল ধরো, বিস্কুট।

একগাল হাসিতে ছেলেটির গাল দুটো টোপলা হয়ে উঠল, ময়না ভাবল ফুলকো লুচি।

ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি। ভাগ্যে ছেলেটাকে ময়না ঘরে এনে ফেলেছিল, নইলে—! উঃ, ভাবাই যায় না নইলে কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড হ'ত।

বিস্কুট পর্ব শেষ ক'রে ছেলেটি মেঝেতে আবার হাত বুলোচ্ছিল। হঠাৎ গালটা মেঝের উপর রেখে খিল্‌-খিল্‌ হেসে উঠল।

ময়না মনে মনে একটা সমস্যার জট খুলতে চেষ্টা করছিল। ছেলেটাকে নিজেদের বিছানায় শোয়ানো উচিত নয়, কিন্তু একটা কিছু পেতে আর মাথায় দেবার জন্যে বালিশও একটা দিতে হবে ত! পাতবার জিনিষের জন্য ভাবনা নেই, কিন্তু মাথার বালিশ!......এইরকম একটা সঙ্কটের মুখে ছেলেটার খিল্‌-খিল্‌ হাসি ওকে চমকে দিল। ময়নার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ছেলেটা মরমর গড়া-গড়ি দিতে শুরু করল। ভারি মজার খেলা পেয়েছে। হি-হি, হো-হো কতো বিচিত্র শব্দোল্লাসের হাসি! শেষে ময়নাও হাসতে শুরু করে দিল—ময়না টেরও পেল না যে ও নিজে হাসছে।

খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে বিছানা ভিজছে, ময়নার খেয়াল নেই। ক্লাস সেভেনের অঙ্ক পরীক্ষার খাতাগুলো বিছানায় ছড়ানো। ছেলেটা খুব ফূর্তিবাজ ত!

স্কুলের মেয়েগুলি কই এরকম দিলখোলা হাসির জোয়ারে দিনের রং বদলে দিতে পারে না। ময়না অবাক হয়ে যায় ছেলেটার রকম দেখে। এক-একবার হাসি থামিয়ে কিরকম ক'রে যেন তাকাচ্ছে,—তখন শুধু হাসিই নয় গড়াগড়িও বন্ধ রাখছে। ময়নার হাসিটা যেন চোখ দিয়ে, মন দিয়ে চেখে দেখছে। লজ্জা পেয়ে ময়না যখন হাসি থামাচ্ছে, তখন আবার হাসতে শুরু করছে, গড়াগড়িও পুরোদমে—!

ময়না একসময়ে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে শুরু করল।

চট ক'রে খেলা থেকে ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে না। বেশ মজা লাগছে। ময়না বলল—এই খোকা অমন করছিস কেন?

ছেলেটা জবাব দিল—মদা! থান্দা! হি-হি-হি-হি—

—যাঃ!

পাছে ময়না তার কথায় অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেয়, তাই সে ময়নার শাড়ী আর পেটি-কোটের প্রান্তভাগ খামচে ধরে টানতে লাগল।

থত্যি। দ্যাখো—

মজাটা পরখ করবার জন্যে ময়নাকে মেঝেতে গাল ঠেকিয়ে দেখাতেই হয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটা খিল্‌খিলিয়ে হেসে ছড়ার ছন্দে শুরু করল—আমি মানি দামি না, পালক খেলে মানি না।

ময়নার আঁচল ধরে আবার সে গড়াতে লাগল—বলো, বলো! বলো—বলো—!

ময়না গড়াতে চেষ্টা করে, খাটের পায়াতে পা আটকে বেধে গেল, পা গুটিয়ে নিল ময়না।

হঠাৎ সবকিছু থামিয়ে ছেলেটা ময়নার

গলা জড়িয়ে ধরল—মা! তুই আমাল মাছি—মাছি হবি।

ছেলেটার মুখে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ। হয়তো ওর মা ওকে দোকানে একখানা তেলে-ভাজা পেঁয়াজী হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল! ময়নার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—কী সর্বনেশে কান্ড! এখন চারদিকে কলেরার এপিডেমিক আর ওর মা কিনা পেটের ছেলেকে হাতে ক'রে বিষ দিয়ে গেছে!

গলা থেকে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে ময়না বলল—মাসি নয়। না। মাসি নয়। তুই তেলে-ভাজা পেঁয়াজী খেয়েছিস।

—হি-হি! পেঁয়াজী। তোকে দেবো, থত্যি দেবো! তুই আমাল মাথি!

ছেলেটা উৎসাহের চোটে উঠে পড়ল। দরজা ঠেলতে লাগল।

ময়না বলল—এ্যাই বাইরে বিষ্টি পড়ছে। শোন্—খোকা—

কতোকাল পরে একটা খেলার আমেজ এনে দিয়েছে বাচ্ছা ছেলেটা। বৃষ্টির ভিজে হাওয়া আর 'আনি মানি' ছড়ার সুরের রেশের মায়াপথ বেয়ে ময়নার মনে পড়ল 'শিবঠাকুরের বিয়ে' হওয়ার দিনের কথা. জানালায় বসে বসে কাগজের নৌকো তৈরী ক'রে নর্দমার জলে সেই নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে 'সেই নৌকোয় চড়ে দাদা বৌ আনতে' যাওয়ার স্বপ্নময় দিনের কথা। কি সব দিনই ছিল। কি মিষ্টি, কতো সুন্দর আর অঢেল রংদার! অবাক। ছেলেটা চিল্লোচ্ছে—আমি দাবো! খেলে—

ভয় পেল ময়না, শেষে আবার কান্নাকাটি করবে নাকি?

ব্যস্ত হয়ে বলল—ছিঃ খোকা বিষ্টি পড়ছে এখন যায় না। বিষ্টিতে ভিজলে অসুখ করে।

থমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল ছেলেটা। তারপর আস্তে আস্তে বলে—অথুত? বাবা অথুত ভয়েথিল। এ্যা-ঃ, মলে দ্যাকো।

পরম দার্শনিকের মতো সে সিদ্ধান্ত জাহির করল—অথুত তরলে ময়ে দায়, দানো! দানো মাছি!

ময়নার দুচোখ ছাপিয়ে জল উপচে পড়তে চায়, কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলে—ছিঃ বলতে নেই খোকা।

—বলতে নেই! ত্যানো?

ময়না জবাব খুঁজে না পেয়ে অগতির-গতিকে আঁকড়ে ধরল—ভগবান দুঃখ পান।

ভগবানের দোহাই উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ময়নার চোখের সামনে হীরকের বঙ্কিম-ভাষ্যমুখের চেহারাটা ভেসে উঠল। হীরক বলে, 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতোই ভগবানকে মানুষ নিজের গরজে স্মরণ করে। আর দুনিয়াতে সার বস্তুর চেয়ে ছাই-এর পরিমাণই বেশি তাই ভগবান বেচারার খাটুনীর কামাই নেই।' হীরক এখন ফাইলের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে নিশ্চয়।

দরজার ওপার থেকে কড়া নাড়ার খট্-খট্ শব্দ, বৃষ্টির ঝমঝমানী ছাপিয়ে ময়নার কানে পৌঁছালো। নির্ঘাত ভোলার মা। এমন উৎকট-ভাবে আর কেউ কড়া নাড়তেই পারে না। কিন্তু ভোলার মা কি ছেলেটাকে এখুনি নিয়ে যাবে? ছেলেটার মা নিশ্চয় এসে পড়েছে, এসেই ছেলেকে না দেখে খুব ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়। যতোই হোক মায়ের প্রাণ তো!

ময়না নিজের অলক্ষ্যে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল—এই বিষ্টিতে তোমার এখন যাওয়া হবে না, বুঝলে খোকন!

দরজা খুলে দিতেই ভোলার মায়ের আগে এক ঝলক বৃষ্টির কণামাখা ভিজে হাওয়া ঘরে ঢুকে মাতামাতি শুরু ক'রে দিল।

ভোলার মা ছেলেটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল—আ মরণ! সরো না—

ময়নার দিকে তাকিয়ে বল্ল—বলিহারি আপনার হুঁশ বউদিদি,—

—কি হ'ল ভোলার মা?

ময়নার কন্ঠে অপ্রসন্নতার গাম্ভীর্য।

ভোলার মা ততোধিক প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ। বলল—কি আর হবে! ঘরের থে দেকনু আবনার জানলা খোলা, আর ইদিকে পুরে ছাট।

জানালাটা বন্ধ ক'রে খাটের বাজুটা ঝাড়ন দিয়ে মুছতে মুছতে বকতে লাগল—হুঁ! যা ভেবেচি তাই। আমি কেবল মরবো কবে তাই জানি নি, তা বাদে সব টের পাই। স—ব।

ময়না আশ্বস্ত হ'ল—খোকার মা এসেছে নাকি?

ভোলার মা চোখ তুলল—কে? খোকা কে গা! অ, আবনি ভুতোর কথা বলতেছো! হুঁঃ, সে আর এক মহাভারত।

হাতের কাজ ফেলে রেখে ভোলার মা শুর করল—সেই কথাই তখন বনুনু গা। হরিপ দোকানি এই এট্টু আগে এল, মাথায় ফে বাঁধা। কি ব্যাপার? না, সেই মিনষে, সেই গো খোট্টা নাগর আমাদের সরি সোহাগিনীর—সে দেছে একখান নাদনা ঝেড়ে হ'রের মাথায় ভাগ্যি ভালো ছোঁড়াটা যাত্রাদলের অধিকারী মতো একবোঝা বাবুরি বাহার দ্যায়। তা মাথাটা বেল-ফাটা হয়ে দু-ফেন হয়নে।

ময়না বিশ্বাস করতে চায় না, বলে—সতি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

—তা দেবেনি! সরির ভাতার যে একমা ধরে হাসপাতালে শুষলো তার চিকিচ্ছে ওষুধ ফল-মাকড় সব খরচই তো ওই খো মিনষে করলো'! তা সে একে লপ্ত টা জুগিয়ে যাবে আর মাগী এনতার অন্যের সং ছেনালী করবে, হাজার হোক তারও ত মানুষে শরীল, দেছে আজ বাগে পেয়ে!

ময়না মাথা নাড়ল—কি বিশ্রী কান্ড!

—তা আর বলতে! আসলে মেয়েট নষ্ট। সোয়ামী দেবদা শাসতেরে বলছে, সেই সোয়ামী মরল, তুই মালসা পোড়া কিন্তুক চুল ফেলুলি নি? তখনই বো গেছে। আর কিনা ভুতো যার গালে দু গন্ধ সেই ছেলের তুই মাথা কামুমে দি তো বলতে গেনু ত মুখে মুখে উত্ত শেতলাতলার বাউনঠাকুর বিধেন দেছে। দেবে না! সেটা ত গেঁজেল, তার উবুরি সা সঙ্গেও আছে যে!

ময়না বিরক্ত হ'ল।

খোলা দরজা দিয়ে ছেলেটা বাইরে বেরি গেছে। ভিজছে?

ময়না ব্যস্তভাবে ডাকল—খোকা! খোকা—আ—!

সাড়া এল না।

ময়না বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় আশ কোথাও দেখতে পেল না। কোথায় গেল বৃষ্টি মাথায় ক'রে! হরিপদর মতো ওর ম ত বাবরী চুল নেই। আচ্ছা ছেলে ত! ম আবার ডাকল—খোকা-আ—!

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কচি গলায় সাড়া —মা-আ-ছি-ই—

সেই স্বর অনুসরণ করে ময়নার দ ছুটল।

তেলেভাজার দোকানে, ছেলেটা এক পেঁয়াজী হাতে নিয়েছে, আর, আর, হরি তার গালে একটা চড় মারল। এত জে মেরেছে যে, টাল সামলাতে না পেরে ছে উল্টে পড়ল বাঁশের সাঁকোর ওপর।

কিন্তু ময়না শুধু দেখল। ওর কথা চোখের সামনে ছেলেটা পড়ে গিয়ে কাঁ উঠল, তবু ছুটে যাবার উপায় নেই। কেন যেন এই ত্রিশ ফুট চওড়া পথট ওপারে অবস্থিত পাঁচ ফুট নর্দমার ওপ সাঁকোটা দুস্তর দূরত্বলোকে স'রে গেছে। স'রে এল। তবু দরজাটা বন্ধ করল না। জানি যদি ছেলেটা পেঁয়াজী হাতে এপারে এসে দরজা বন্ধ দেখলে চলে যায়!
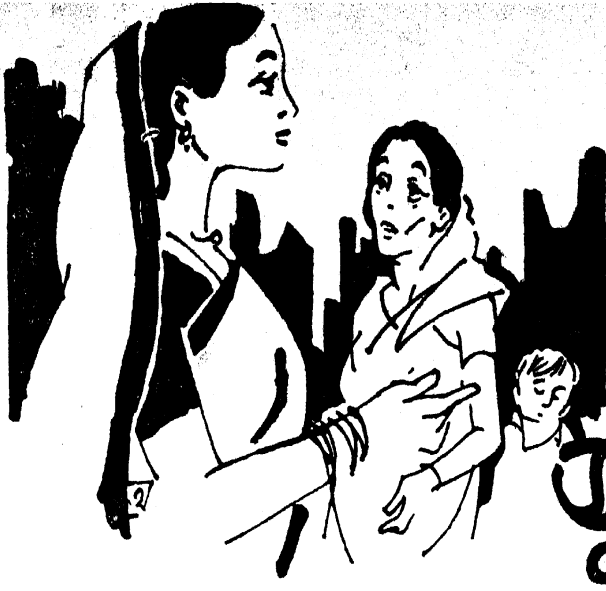
সুধাদি আমাকে বলেছিল: 'তোর কিছু ভাবনা নেই নন্তু, আমি তোকে বই কিনে দেবো, তুই মন দিয়ে পড়। পড়া বুঝি একদিনও ছাড়িস! দরকার হলে আমি প্রতিমাসে তোর স্কুলের মাইনে পাঠিয়ে দেবো। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে যখন তুই চাকরি করবি, তখন আর দুঃখ থাকবে না; সংসারে মাকে নিয়ে তখন তুই রাজা।'

কতই বা তখন আমার বয়স, খুব বেশী হলে দশ। আমি আর মা থাকি তখন জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার এক কাকার বাড়ি। বাবা কবে মারা গিয়েছিলেন মনে নেই। চোখ মেলে আমি যখন বিশ্বপ্রকৃতির অনেক কিছু দেখতে শিখলাম, তখন থেকেই মায়ের সারা গায়ে শুধু একখানি থান জড়ানো দেখেছি। সেই বয়সেই পাশাপাশি নজরে পড়তো কাকিমাকে। সারা গায়ে অলঙ্কার আর ধরে না; জরিপাড় শাড়িতে সেই অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য যেন আরও বেশী ফেটে পড়তো। রাত্রে যখন চুপি চুপি মায়ের কোলের কাছে শুতে আসতাম, জিজ্ঞেস করতাম: তুমি কেন কাকিমার মতো অমনি করে শাড়ি গয়না পরো না মা? সেই মুহূর্তেই ঘরের অন্ধকারে বুঝতে পারতাম—মায়ের চোখ দুটো উৎসারিত অশ্রুভারে ঝাপসা হয়ে উঠছে। কোনো জবাব দিতেন না মা। আমার দুষ্টু চোখ দুটোতে যখন ঘুম আসি-আসি করেও আসতো না, তখন দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলতাম: আমার বাবা নেই, তাই বুঝি আমাদের কিছুই নেই, তাই না মা? জবাব দিতে গিয়ে মা কেঁদে ফেলতেন, তারপর মায়ের সেই অশ্রুজলের মধ্যেই দু'জনকে দু'জনে জড়িয়ে ধরে কখন একসময় মা আর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

সকালে উঠে কাকার ছেলেমেয়েরা যখন বিস্কুট দিয়ে চা খেতো, আমার জন্যে মায়ের হাত দিয়ে আসতো সামান্য কিছু মুড়ি। ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতাম: আমি কবে চা খেতে পাবো মা? মা বলতেন: ও খেতে নেই, ও বিষ। আমি বলতাম: তবে যে ওরা খায়। পিন্টু, ইরা, হাঁদু, ওরা বুঝি তবে বিষ খায়? কোনো জবাব না দিয়ে মা কোথায় একদিকে হেঁটে যেতেন।—কাকার সংসারে অনেক কাজ করতে হতো মাকে; সকাল থেকে রাত অবাধ একটুও যদি বিশ্রাম পেতেন! কিন্তু খেতে বসে নিজের জন্যে উনুন থেকে নামিয়ে নিতেন দুটি সেদ্ধ ভাত, বড় জোর কখনও দুটো কুমড়ো-ডাঁটার চচ্চড়ি। অত খেটে এই খেয়ে কারুর শরীর টেঁকে? কোনোদিন যদি দুদণ্ড শুয়ে থাকতে চেয়েছেন মা, ওঘর থেকে কাকিমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাকা বলেছেন, 'এদিকে ইরা কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তুমি দেখছি হেঁসেল থেকে আর নড়ছো না! বৌদির কি আজ একাদশী নাকি?' অমনি ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছেন মা, গিয়ে হেঁসেলের উনুন আগলে ব'সেছেন।

এদিকে আমার যে পড়া হয় না, তা দেখে কে? পিন্টু, ইরা আর হাঁদু তখন তাদের চকচকে নতুন বইয়ের পাতার মধ্যে ডুবে গেছে; আমার শুধু ছেঁড়া পাতার একখানা বাংলা প্রথম পাঠ আর ইংলিশ ফার্স্ট বুক। তার পাতায় পাতায় হাঁদুর নাম লেখা। তার পরিত্যক্ত বই ভিন্ন আমাকে নতুন বই কিনে দেবে কে? আমার যে বাবা নেই! যেটুকু পারতাম, তাই পড়তাম।

ঠিক এমনি দিনে সুধাদি তার স্বামীকে নিয়ে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এলো তার বাপের বাড়িতে। কোলে তার ফুটফুটে ছেলে, সুধাদির বিবাহিত জীবনের প্রথম ফসল। বছর তিন-চার আগে মাত্র বিয়ে হয়েছিল, সে সব কথা আমার তখন কিছু মনে নেই। দু চোখের দৃষ্টি দিয়ে এই প্রথম সুধাদিকে ভালো করে দেখলাম। তার বাপের বাড়িটা এখানে আমার কাকার বাড়ির ঠিক পাশেই। মাকে সে মাসীমা ব'লে ডাকতো; হয়তো মায়ের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। এবারে এক সময় কাছে এসে নিভৃতে বললো: 'আপনার আর নন্তুর শরীরের এ কি হাল হয়েছে মাসীমা?'

অনুচ্চকণ্ঠে মা বললেন, 'আমার শরীর দিয়ে কি হবে, আমি আর ক'দিন? নন্তুটা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে মানুষ হলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতাম।'

মা যে কাকে কি কথা দিয়ে কি কথা বুঝাতে চান, সবটা তখন ভালো করে বুঝতাম না, তবু একটা জিনিষ আমার কাছে পরিষ্কার ছিল, তা হলো কাকা আর কাকিমার দয়ার উপর আমার আর মায়ের নির্ভরতা। খেতে, চ'লতে, শুতে সেটুকু স্পষ্ট এসে মনে বাজতো।

সুধাদি বললেন, 'এখানে ও'রা তো দিব্যি সুখে আছেন। পিন্টুর বাবা এক্সাইজ থেকে দু'হাতে পয়সা পেটেন, তাই দিয়েই তো এই বাড়ি, জমি সব। আপনি আজ অভাবে পড়েছেন ব'লে এমন তাচ্ছিল্য করছেন কেন ও'রা? শুনেছি, একদিন আপনার স্নেহের ছায়ায় থেকে পিন্টুর বাবা নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন, আজ নাকি এই তার প্রতিদান?'

মা ব'ললেন, 'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। যার কপালে যা আছে, তা কেউ রোধ করতে পারে না।'

হঠাৎ আমাকে নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে সুধাদি বললেন, 'আমি নন্তুকে নিয়ে যাচ্ছি মাসীমা। এবেলা নন্তু আমার সংগে খাবে।'

মা শুধু ছোট্ট ক'রে বললেন: 'এটা ভালো দেখাবে কি?'

সুধাদি আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আমি অত ভালো-মন্দ বুঝি না মাসীমা। চল নন্তু, একটা মজার গল্প শোনাই তোকে।'

সুধাদির হাতের মুঠোয় তখনও আমার হাতখানি ধরা ছিল। জিজ্ঞেস করলাম: 'তোমার ছেলের নাম কি সুধাদি?'

হেসে সুধাদি বললো: 'জানিস না বুঝি, গৌতম। কেমন, তোর মতো নামটা সুন্দর না?

বললাম: 'আমার মতো কেন হবে, আমার চাইতেও সুন্দর।'

সুধাদি জিজ্ঞেস করলো: 'গৌতমের তুই কি হস, জানিস নন্তু?'

নীরবে এবারে [illegible] চোখ দুটো সুধাদির

মুখের দিকে তুলে ধরতেই তেমনি হাসিমুখে সুধাদি বললো: 'তুই যে মামা!'

এবারে তার কোল থেকে গৌতমকে আমার নিজের দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কতক্ষণ যে চুমু খেলাম, বলতে পারি না। মনে মনে ভাবলাম—এ রকম যদি আমার একটা ভাই থাকতো, তবে তাকে কত ভালোবাসতে পারতাম, কত খেলতে পারতাম তাকে নিয়ে! ভাবতে গিয়ে চোখ দুটি বুঝি একবার কান্নায় ছলছল করে উঠেছিল আমার, কোনোভাবে সুধাদির সামনে সেটুকু সম্বরণ করে নিয়ে এক সময় তার সঙ্গে গিয়ে খেতে বসলাম। এ রকম খাওয়া সেই বয়স অবধি আমি একটা দিনও খাইনি। দু'রকম মাছ, মাংস, চাটনি, মিষ্টান্ন, আরও কত কি! আসন ছেড়ে উঠতে গিয়ে পেট যেন ফেটে পড়ে!

মুখ ধুয়ে ঘরে এসে কথায় কথায় সুধাদি বললো: 'তোর কিছু ভাবনা নেই নন্তু, আমি তোকে বই কিনে দেবো, তুই মন দিয়ে পড়। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে যখন তুই চাকরী করবি, মাকে নিয়ে তখন তুই রাজা।'

উত্তরে সুধাদিকে মুখ ফুটে আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে সেই থেকে রাজা হবার স্বপন দেখতাম। রাজা সম্বন্ধে তখন আমার কী-ই বা ধারণা, তবু ভাবতাম—রাজা কারুর অধীন নয়, তাঁর আদেশেই রাজ্য চলে; সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর সবাই তাঁর কথায় ওঠে আর বসে। রাজা হলে সত্যিই আর তখন মাকে নিয়ে কাকা আর কাকিমার সংসারে এমন নিগৃহীত অবস্থায় দিন কাটাতে হবে না।

ক'দিন বাদেই সুধাদি তার স্বামীকে নিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। যাবার আগে মাকে কাছে ডেকে কি যেন একবার বললো সুধাদি, তারপর আমার হাতে দু টাকার একখানি নোট গুঁজে দিয়ে বলে গেল: 'মিষ্টি কিনে খাস নন্তু। আমাকে ভুলে যাবি না তো, চিঠি লিখবি তো আমাকে?'

—'তোমাকে ভুলে যাবো?' বলতে গিয়ে ঝর-ঝর করে দু'চোখ বেয়ে আমার জল নেমে এলো। সেটুকু আর কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলুম না।

সুধাদি চলে গেল।

তার টাকা দিয়ে মিষ্টি কিনে আর খাওয়া হলো না; ছুটে গিয়ে পোষ্ট অফিস থেকে একগাদা পোষ্ট কার্ড কিনে এনে রাখলাম। সুধাদিকে যে চিঠি লিখতে হবে! মিষ্টি কিনে খেলে চিঠি লিখবার পয়সা কোথায় পাবো!

কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে সুধাদিই দেখলাম আগে রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লিখলো। তারপরের সপ্তাহেই মায়ের নামে দশ টাকার একটা মনিঅর্ডার। সেই টাকায় মা যখন আমাকে স্কুলের মাইনে আর নতুন নতুন বই-খাতা কিনে দিলেন, তখন প্রথম ক'দিন কাকার সংসারে দেখলাম কি রকম একটা গুঞ্জন উঠলো; তারপর কাকা একদিন ফেটে পড়লেন মায়ের উপর, বললেন: 'বলি, আমি কি নন্তুকে দেখি না, না তার স্কুলের মাইনে দিই না বৌদি? পরের বাড়ির লোকের কাছ থেকে টাকা ভিক্ষে করে এনে এভাবে আমাকে অপমান করবার মানে কি? ভালো মনে এখানে থাকতে চাও, না আমারই খেয়ে পরে আমারই সর্বনাশ করে তবে যেতে চাও?'

মা শুধু বললেন: 'তোমার একথার জবাব আমি দিতে পারবো না ঠাকুরপো; সময় এলে একদিন এ ভুল তোমার ভাঙবে।' বলে বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে মা কাঁদতে লাগলেন। মায়ের কান্নায় আমারও দু'চোখ ভিজে গেল।

এরপর কি হলো জানি না। সম্ভবতঃ মা-ই সুধাদিকে চিঠিতে সব জানিয়ে থাকবেন। একদিন দেখলাম—সুধাদির চিঠি নিয়ে তার দেওর অমিতবাবু এসেছেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। আমাকে সাজিয়ে দিয়ে মা বললেন: 'এ পোড়া বাড়িতে তোকে আর থাকতে হবে না; যা, তোর সুধাদির কাছে যা, আর আমার নামও করিস না এখানে।'

সুধাদির কাছে যাবো, এ যে আনন্দ! কিন্তু মা? মা যে যাবেন না! মাকে ছেড়ে একা আমি কি করে যাবো? কিন্তু সে কথা মা শুনলেন না, বললেন: 'বড় হয়ে মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবে এসে আমাকে নিয়ে যাস। যা, সুধাদি তোর পথ চেয়ে আছে, যা ওঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়।'

মাকে ছেড়ে এই প্রথম আমি একা বেরোলাম। এই বনগাঁ থেকে সুধাদির কাছে মুর্শিদাবাদ। কান্নায় দু'চোখ আমার ভেসে গেল। সেই চোখ দিয়ে দেখলাম—একমাত্র মায়ের চোখ দুটো ছাড়া এ বাড়ির আর সকলের চোখগুলো রীতিমত পাথরের মতো স্থির। কেউ আমাকে কাছে ডেকে একটা কথা অবধি বললো না। পথে রওনা হয়ে মায়ের অশ্রুসজল মুখখানির সঙ্গে আর যে মুখখানি কেবলই আমার দু'চোখে ভেসে উঠতে লাগলো—তা গৌতমের।

গিয়ে তাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে দাঁড়াতেই ছুটে এসে আমাকে বুকে টেনে নিল সুধাদি। বললো: 'তুই তবে এলি নন্তু!'

এ কথার জবাবে কী বলবো সুধাদিকে? শুধু নির্বাক চোখে যতক্ষণ পারলাম সুধাদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রইলাম। এমন আশ্রয় সংসারে বুঝি একমাত্র মা ভিন্ন আর কোথাও নেই!

সুধাদির এই স্নেহের আশ্রয়েই ধীরে ধীরে আমি বড় হয়ে উঠতে লাগলাম। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বইয়ের পর বই কিনে দিল সুধাদি, বললো: 'প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে উঠে সকলের কাছে আমার মুখ রাখতে পারবি তো নন্তু?'

বললাম: 'তুমি আর জামাইবাবু মিলে আমাকে বুঝিয়ে দিলে কেন পারবো না আমি ফার্স্ট হতে?'

পাশেই গৌতমের বাবা বসে ছিলেন; তাঁর দিকে মুখ তুলে সুধাদি বললো: 'কেমন মাঝে মাঝে একটুকাল বসে পারবে তো নন্তুকে বুঝিয়ে দিতে?'

—'দেখা যাক। এতদিনে যখন একটি শালা জুটেছে, তখন মাঝে মাঝে যে আমার কিছু সময় নষ্ট হবে, তা বুঝেই নিয়েছি।' বলে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন গৌতমের বাবা।

কিন্তু আমাকে নিয়ে বসবার একটা দিনও যদি সময় পেলেন তিনি! এখানকার কোর্টের তিনি মস্ত বড় অফিসার, কত দিকে তাঁকে মাথা দিতে হয়; তার মধ্যে আমাকে নিয়ে বসবার মতো সময় কোথায় তাঁর?

তবু পর পর কয়েক বছরই আমি ফার্স্ট হয়ে উঠলাম। খুসীতে সুধাদির মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ততদিনে গৌতমও কিছু বড় হয়েছে, সেও স্কুলে যায়, পড়াশুনো করে, তার জন্যে বাড়িতে আলাদা মাস্টার রেখে দিল সুধাদি।

মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে মনটা বড় কেঁদে উঠতো। ঠিক তারপরের দিনই মায়ের চিঠি এসে হাজির হতো। লিখতেন: 'আর জন্মে তোর সুধাদি যে কে ছিল জানি না, কিন্তু এ জন্মে তোকে পেলাম সাক্ষাৎ দেবীরূপে। তার কাছে তুই যে কত সুখে আছিস, ভাবতেও আনন্দ পাই। আমার জন্যে দুঃখ করিস না বাবা, আমি এক রকম আছি।'

মাঝে মাঝে সুধাদি যখন বনগাঁয়ে বাপের বাড়ি যেতো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। সেই সাত দশ-দশদিনের জন্যে মাকে আবার কাছে পেতাম! কিন্তু অত অল্প করে পেয়ে তৃপ্তি হতো না। দেখতাম—আগের চাইতে আরও বেশী কষ্টে আছেন মা। আগে আগে কাকা আর কাকিমা যেটুকু বা মাকে করুণা করতেন, ইদানীং সেটুকুও উঠে গেছে। আসার দিন বলে আসতাম: 'দেখ না আর তো মাত্র ক'টা বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিছু একটা চাকরি পেয়েই তোমাকে নিয়ে আমি আলাদা বাসা করবো, তোমাকে একটুও আর আমি কষ্ট পেতে দেব না।'

উত্তরে কিছু একটাও না বলে নীরবে আমার মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতেন মা, তারপর চোখের জল গোপন করে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন!......

এমনি করেই একে একে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। তখন বি-এ দিয়ে আমি অনার্সের জন্যে তৈরী হচ্ছি, কাছে ডেকে হঠাৎ এক সময় সুধাদি বললো: 'বনগাঁ থেকে চিঠি পেলাম, মাসীমার নাকি ভীষণ অসুখ! এ সময় সংসার ফেলে আমি তো আর যেতে পারছি না, তুই যা, ঘুরে আয় নন্তু। সঙ্গে কিছু বেশী টাকা নিয়ে যা, যদি দেখিস ওখানে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে না, তবে মাসীমাকে এখানেই সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। আমি তবু কাছে রেখে মাসীমাকে চিকিৎসা করাতে পারবো।'

অনার্সের বই নিয়ে আর বসা হলো না। মায়ের রোগপাণ্ডুর মুখখানি হঠাৎ দু'চোখে ভেসে উঠে আমাকে অস্থির করে তুললো। একটা বেলাও আর অপেক্ষা না করে সেদিনই রওনা হলাম বনগাঁয়ে। কিন্তু এ কী অভিশাপ বিধাতা
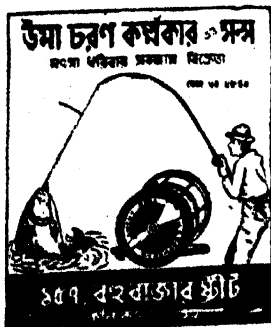
এঁকে দিলেন আমার ললাটে! গিয়ে যখন ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে 'মা' বলে ডাকলাম, একটা মহাশূন্যতায় সারা বুকখানি আমার ভরে গেল। কাকা বাড়িতেই ছিলেন, আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল রে নন্তু, হাজার চেষ্টা করেও বৌদিকে বাঁচাতে পারলুম না। তোকে খবর দিয়ে যখন চিঠি দিলাম, তখন বেলা একটা, আর ঠিক রাত একটাতেই বৌদি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।'

কান্নায় সারা বুক আমার ভেসে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল—পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মা নেই, মাটিও নেই। এই শূন্যতায় কতক্ষণ আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি? কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে একটিবার শুধু বললাম: 'এতদিনে আপনি সমস্ত অপমান আর যন্ত্রণা থেকে বাঁচলেন।' তারপর একদণ্ডও আর অপেক্ষা না করে সোজা ছুটে গিয়ে আবার ট্রেণ ধরলাম। বনগাঁ এতদিন বনরাজিনীলায় আচ্ছন্ন ছিল আমার কাছে, আজ তা চিরকালের শ্মশানে পরিণত হ'য়ে গেল।

এসে সুধাদির সামনে দাঁড়াতেই আমার চোখের জলের সঙ্গে তার চোখের জল মিশে গেল। মনে হলো—শুধু সুধাদি নয়, এ বাড়ির যে চোখ দুটি এতদিন প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতি আনন্দে হাসিতে প্রীতি বর্ষণ করেছে, আজ সেই চোখ দুটি বেদনায় সিক্ত। সুধাদি বললো: 'চোখের জল মুছে ফেল নন্তু, দুঃখ কি, আমি তো আছি!'

বললাম: 'তুমি যে বলেছিলে, মাকে নিয়ে সংসারে আমি রাজা হবো, তা চুকে গেল সুধাদি।'

কিন্তু সে কথার আর জবাব দিতে পারলো না সে, তার কোলের মধ্যে আমার মুখখানিকে গুঁজে নিয়ে নীরবে চুপ করে বসে রইল।

এমনি করেই এক সময় মায়ের পারলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে মনটা ধীরে ধীরে আবার শক্ত হয়ে উঠলো। নতুন করে পড়ার টেবলে গিয়ে বসলাম অনার্সের বই খুলে।

গৌতমের বাবা বললেন: 'এবারে অনার্স দেবার পরেই তোমাকে ভাবছি আমি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবো নন্তু; একটা ভালো পোষ্ট শীগ্‌গিরই খালি হবার কথা আছে। অফিসার-ইন-চার্জকে আমি তোমার কথা বলে রেখেছি।'

গৌতম ততদিনে আরও অনেকটাই বড় হয়েছে, আর শুধু বড় হওয়া নয়, বুদ্ধিমানও হয়েছে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো: 'চাকরিতে ঢুকেছ কি মরেছ মামু, যে কটা দিন পারো, এমনি করে কাটিয়ে দাও। তোমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বাবা এরপর আমাকে নিয়ে পড়বেন।'

হয়তো কথাটা মিথ্যে বললো না গৌতম, কিন্তু আমার মতো আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন বাঙালীর পক্ষে চাকরি ছাড়া উপায় কি! এছাড়া গৌতমের সামনেই বা আর দ্বিতীয় কোন্ পথ খোলা আছে? তার কথাটা উপলব্ধি করেও মন থেকে তাই বড় একটা সাড়া দিতে পারলুম না।

অনার্স শেষ করে তার বাবার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে চাকরির এ্যাকসেপটেন্স-লেটার গ্রহণ করলাম।

হুগলীতে সেদিন সুধাদির মুখে আনন্দ আর ধরে না, বললো: 'এবারে একটা কাজের মতো কাজ হলো।'

অভিমানের মুখে বললাম: 'ছাই হলো। এখানকার এপয়েন্টমেন্ট হলেও কথা ছিল, তোমার কাছে থাকতে পারতাম; তা নয়, সোজা একেবারে কুচবিহার!'

সুধাদি বললো: 'ভালোই তো হলো; নতুন একটা যায়গার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবি। তারপর কত রকমের ছুটিছাটা আছে, সোজা চ'লে আসতে পারবি এখানে। তাছাড়া আমারও একটা বেড়াবার জায়গা হবে; মাঝে মাঝে গিয়ে তোর কাছে আমি থেকে আসতে পারবো।'

বললাম: 'এ তোমার মিথ্যে কথা, তুমি যাবে আমার কাছে বেড়াতে, তবেই হয়েছে!'

—'যাবো বৈকি রে নন্তু, আমাকে যে যেতেই হবে!' সুধাদি বললো: 'তোর মতো ভাই আমি কোথায় পাবো! সুন্দর দেখে টুকটুকে একটা বউ এনে দিয়ে আমি নিজের হাতে তোর সংসার গুছিয়ে দেবো, তবে তো আমার ছুটি!'

বললাম: 'ও—এই তোমার শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে?'

সুধাদি আর কিছু বললো না, শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

আমি ট্রেণ ধরলাম।

কুচবিহারের রাজ পরিবারের ইতিহাস পড়েছিলাম, বাহে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণাও ছিল কিছু, কিন্তু ট্রেনের এই একাকী যাত্রায় যতবার যত কথাই মনে আনতে চেষ্টা করলাম, ঘুরে ফিরে শুধু সুধাদির কথাই মনে পড়তে লাগলো। একদিন গৌতমের বাবার মুখে শুনেছিলাম: সুধাদির একটি যমজ ভাই ছিল, নাম ছিল সুমন; দেখতে নাকি ছিল অবিকল আমারই মতো। সুধাদি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কিন্তু বাঁচলো না সুমন, যখন তার বছর ন-দশ বয়স, হঠাৎ মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। তাকে হারিয়ে সুধাদিও নাকি কিছুদিন মাথার রোগে শয্যা নিয়েছিল।

খেতে বসে একদিন সুধাদিকে আমি নিজেই জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'সুমনদা বুঝি দেখতে অবিকল আমার মতো ছিল?'

শুনে সুধাদির চোখ দুটো অকস্মাৎ যেন কেমন ছলছল করে উঠলো, বললো: 'তোর মতো কি রে নন্তু, সুমনই যে তুই হয়ে এলি!'

একথার পর আর কিছু জিজ্ঞাসার ছিল না, খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি তাই উঠে পড়েছিলাম।

ট্রেণে বসে কেন যেন অনেকদিন বাদে এই কথাগুলিই আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগলো!......

গিয়ে কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম—মোটামুটি খারাপ নয় কাজটা। থাকবার মতো মোটামুটি ঘরও একটা কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক করে নিলাম। জীবনে লেখাপড়া শিখে এভাবে নিজের

পায়ে কখনও স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে পারবো, কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সুধাদি যা করলো, সে ঋণ শুধু এ জীবনে নয়, জন্ম-জন্মান্তর চেষ্টা করেও শোধ দিতে পারবো না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ কাকে বলে জানি না, কিন্তু সুধাদির যে পরম আশীর্বাদ এ জীবনে লাভ করলাম, তাতে তাকে ঈশ্বরের চাইতেও বড় বলে জেনেছি। তাকে ছেড়ে এসে এখানে দিনগুলি যতই অতিক্রান্ত হতে লাগলো, মনটা ততই সুধাদিকে কাছে পাবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। রোজ তাকে একটা করে চিঠি লিখেও মন মানতে চাইল না। সুধাদি লিখলো: 'মনটা কি শুধু তোরই খারাপ, আমার নয়? তোকে ছেড়ে আমারও যে একদন্ড ভালো লাগছে না রে নন্তু! আমি পারি তো শীগ্‌গিরই তোর ওখানে গিয়ে ঘুরে আসবো।'

কিন্তু আসবো আসবো করেও সংসার ফেলে শীগ্‌গিরই কি বেরোতে পারলো সুধাদি, না আমি ছুটি পেলাম যে, ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসবো? এমনি করেই আরও কিছুকাল কেটে গেল।

প্রথম মাসের মাইনে হাতে পেয়ে ভাবলাম—নিজের খরচের টাকা হাতে রেখে বাকীটা সুধাদিকে পাঠিয়ে দিই, কিন্তু হলো না। মনে পড়লো—সুধাদির হাতখানি নিয়ে একদিন খেলতে খেলতে বলেছিলাম 'তুমি বালা পরো না কেন সুধাদি? এমন সুন্দর নিটোল হাতে বালা পরলে তোমাকে ভারী সুন্দর মানায়।' উত্তরে সুধাদি বলেছিল: 'বালা কি আর আমার আছে যে পরবো? তুই চাকরি করে আমাকে গড়িয়ে দিস।'

স্থির করলাম—এবারে মাস দুয়েকের মাইনের টাকা থেকে সুন্দর একজোড়া বালা গড়িয়ে নেব সুধাদির জন্যে, তারপর আমি গিয়ে তাকে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে আসবো।

তাই করলাম।

এরপর খুব বেশীদিন গেল না। একদিন সুধাদি লিখলো: 'মাঝখানে কয়েকদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠলাম। তাই তোকে চিঠি দিতে পারিনি। তুই হয়তো কত কি মনে করেছিস। গৌতমের এখন পড়ার চাপ কম, স্কুলও ছুটি। তাই গৌতমকে নিয়ে পরশুর গাড়ীতে আমি তোর কাছে রওনা হবো ঠিক করেছি। পারিস তো স্টেশনে থাকিস।'

চিঠি হাতে পেয়ে মনে হলো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। তার চাইতেও বেশী, তার চাইতেও মধুর।

যথাসময়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম তাই স্টেশনের গেটে। কিন্তু গাড়ী এসে যখন পৌঁছাবার কথা, তার চাইতে আরও দু ঘন্টা বেশী কেটে গেল। এ রকম লেট সচরাচর হয় না। অধীর প্রতীক্ষায় মনে মনে দারুণ একটা অস্বস্তি নিয়ে জ্বলে মরতে লাগলাম নিজের মধ্যে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নটা বাজলো, তারপর দশটা, তারপর এগারোটা। কিন্তু গাড়ী আর এলো না। শুনলাম—কোথায় নাকি গাড়ী ডিরেইল্ড হয়েছে, তাতেই এই দেরী; হয়তো আজ আর গাড়ী এসে নাও পৌঁছাতে পারে।

বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন একবার কেঁপে উঠলো! মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হতে চাইলাম যে, সুধাদির যে ট্রেনে আসবার কথা, সেই ট্রেনটার হয়তো কিছু নাও হতে পারে! অন্য কোনো গাড়ীর ডিরেইলমেন্টের জন্যে সুধাদির ট্রেনটা হয়তো আটকে পড়েছে!

কোনোভাবে সে রাতটা কেটে গেল।

সকালে উঠে ভাবছি—মুর্শিদাবাদে একটা টেলিগ্রাম করবো, কিন্তু তার আগেই গৌতমের বাবার টেলিগ্রাম এসে হাতে পৌঁছালো। লিখেছেন: 'ভেরি ডেঞ্জার, কাম সার্প।' পড়তে গিয়ে ভুমিকম্পের মতো সমস্তটা দেহ কেঁপে উঠলো! তবে কি সুধাদির কিছু হলো?

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে পরের ট্রেনেই ছুটে পড়লাম মুর্শিদাবাদে। এসে দেখলাম—বাড়ীতে তালা বন্ধ। পাশের বাড়ীর নকুল দত্ত বললেন: 'তোমার সুধাদির অবস্থা ভালো নয়, ওরা সবাই হাসপাতালে। তোমার কাছেই তো গৌতমকে নিয়ে উনি যাচ্ছিলেন! হঠাৎ গোটা তিনেক স্টেশন পেরোতেই গাড়ী ডিরেইল্ড হয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গৌতমের বাবা রওনা হয়ে যান। শুনলাম তোমার সুধাদি মাথায় খুব বেশী আঘাত পেয়েছেন, গৌতমের আঘাতটাও কম নয়। প্রাণে যে বেঁচেছে, এই রক্ষে। এনেই ওদের দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে নিজেও হাসপাতালেই কাটাচ্ছেন ভদ্রলোক।'

আর বেশী শুনবার ধৈর্য ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম হাসপাতালে। গিয়ে লেডিজ ওয়ার্ডে বেড নম্বর খুঁজে বার করতে দেরী হলো না। দেখলাম—সুধাদির পাশে একটা টুলের উপর বসে আছেন গৌতমের বাবা। সুধাদির চোখ দুটি বোজা। ফিস-ফিস করে গৌতমের বাবা বললেন: 'গৌতমের বেড ওপাশের জেন্টস ওয়ার্ডে। তোমার সুধাদির একটুকাল কেবল তন্দ্রার মতো এসেছে; কাল রাত অবধি রেণে ইন্টারনাল হেমারেজ হয়েছে। সেন্স একেবারেই ছিল না, আজ সকালেই বার দুয়েক চোখ মেলে তোমার নাম ধরে ডেকেছে।'

বলতে বলতেই হঠাৎ একবার চোখ মেলে তাকালো সুধাদি। ডাকলো: 'নন্তু? নন্তু কোথায়? নন্তুর যে স্টেশনে থাকবার কথা ছিল?'

চোখ মেলে তাকালেও সে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় সুধাদির, মাথার গন্ডগোলে হয়তো ভুল বকছে! কিন্তু আমি আর একটা মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারলুম না। তার বেডের এক পাশে উঠে বসে সুধাদির মুখের দিকে ঝুঁকে বললাম: 'এই তো আমি, এই তো আমি সুধাদি, তোমার কাছেই আমি বসে আছি! এই দেখ, তোমার জন্যে আমি কি সুন্দর বালা গড়িয়ে এনেছি! দাও, হাত দুখানি এগিয়ে দাও, পরিয়ে দিই।' বলে পকেট থেকে বালার প্যাকেটটা বার করে সুধাদির দুহাতে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলাম।

মনে হলো—সুধাদির মুখখানি খুসীতে একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার মুখের দিকে চোখ দুটো স্থির করে রাখলো সুধাদি।

বললাম: 'দূরের চাকরি দিয়ে আমার আর দরকার নেই, তোমাকে ছেড়ে আমি আর দূরে কোথাও যাবো না সুধাদি।'
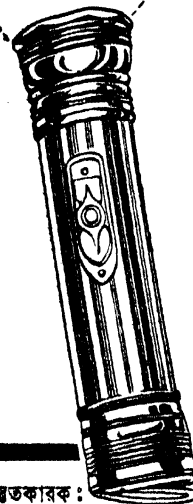
কিন্তু সুধাদির মুখে আর একটিও কথা নেই। মুখের হাসি তেমনি মুখেই লেগে রইল। স্থির চোখ দুটি শুধু ধীরে ধীরে বুজে এলো, যেমন করে বুজে আসে ফুলের পাঁপড়ি।

তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রাণপণ চিৎকার করে ডাকলাম: 'সুধাদি!'
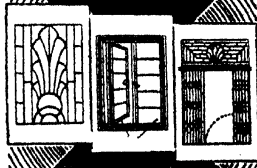
কিন্তু আর সাড়া দিল না সুধাদি।

নিঃসঙ্গ মানুষের খেদ

নারায়ণ চৌধুরী

ভাববেন না মনোবিকলন সম্বন্ধে এক থিসিস লিখতে বসেছি। সে রকম কোন অভিপ্রায় আমার নেই। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। প্রতি মানুষকেই জীবনের কোন না কোন সময়ে কোন না কোন বিশেষ অবস্থায় একাকিত্বের চেতনার মুখোমুখি হতে হয়। সমাজের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও তখন তার মনে হয় সে নিঃসঙ্গ। তার সঙ্গী-সাথী-বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, তার সঙ্গে কেউ সহানুভূতির যোগে যুক্ত নেই সে প্রকৃতপক্ষে সমাজ-পরিত্যক্ত, এক-ঘরে—এই বোধের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে সে নিজেকে বড়ই অসহায় জ্ঞান করতে থাকে। মানুষের এই নিঃসঙ্গতা বোধের একটা ছবি—মোটা রেখার ছবি—ফুটিয়ে তোলাই এই আলোচনার লক্ষ্য।

সমাজের অন্য দশজনার মনের সঠিক সংবাদ রাখা ও তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, সুতরাং নিজেকে নিয়ে লেখাই নিরাপদ। নিজেকে সমাজের অন্যতর প্রতিনিধি মনে করে তাকে সমাজের স্থলে অভিষিক্ত করে কিছু আলোচনা করলে তাতে প্রকারান্তরে দশজনার বিষয়েই আলোচনা করা হয়। আলোচনাটা যাকে বলে প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। সুতরাং নিজ মুখে নিজের কথা বলাই ভালো। আমরা পরের মুখে ঝাল খেলেও খেতে পারি। কিন্তু পরের মুখে নিজের কথা বসাতে পারিনে; বসাতে গেলে নিজের মুখরক্ষা তো হয়ই না, এমন কি কখনও কখনও অপরের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার জো হয়। সুতরাং আপনাকে দিয়েই মুখবন্ধ হওয়া ভালো।

তাছাড়া, আত্মকথার আর একটা সুবিধা এই যে, নিজেকে যত খুশী ব্যঙ্গ করা যায়, কারও কিছু বলার নেই। অপরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে গেলেই মুশকিল। ব্যঙ্গ তো ব্যঙ্গ, অপরকে নিয়ে কৌতুক করাও সব সময় বিপদরহিত নয় এই গোমরামুখো দেশে। তাতে হিতে বিপরীত ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং পরের হিসাবের খাতায় ব্যঙ্গ-কৌতুক জমা করবার চেষ্টা না করে নিজের খরচের খাতায়ই সেটা জমা লেখা ভালো। আপনাকে আপনি মুখ ভ্যাংচালে আর্শিতে মুখটা দেখতে খারাপ লাগবে বটে, কিন্তু অপরের সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতাটা অন্ততঃ রক্ষা করা গেল বলে তো আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাবে। মনোদর্পণে কিছু বিম্বিত করতে হয় তো তা নিজেরই মুখ হোক, পরমুখাপেক্ষী হওয়ার আবশ্যকতা দেখিনে।

*   *   *   *

বাস্তবিকই আমি লোকটা বড় নিঃসঙ্গ। জনসমাজে আমার বড় একটা গতায়াত নেই। নিজের ঘরে একা-একা থাকি, কারও সঙ্গেই বড়-একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এক কালে নির্জনতা ভালবাসতুম, বন্ধু-বান্ধবের ভিড় থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজতুম; কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে উল্টো। বন্ধু-বান্ধবেরা আমার ইচ্ছার সম্মান রেখে আমাকে বাধিত করে দূরে সরে গেছে; আমি একাকিত্বের অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কাবু হবার উপক্রম। এখন বন্ধুজনের সঙ্গ অন্বেষণ করলেও বন্ধুজনেরা সঙ্গী হতে নারাজ। কার হাতে এমন সময় আছে বলুন, আমার মত অসামাজিক লোকের সঙ্গে শুধু বসে গল্প করে সময় নষ্ট করতে যাবে? আমার কোন ক্ষমতাই নেই, আমি একটি নির্ভেজাল নিরীহ লোক, শক্তির প্রসাদবঞ্চিত। লোকে ক্ষমতার কাঙাল, আরও কেন বেশী ক্ষমতা হাতে পায় না বলে আক্ষেপ করে; আমার মনোভাব বিপরীত। অধিক ক্ষমতায় কাজ নেই, আমার যা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তা থেকেও আমি মুক্তি পেতে চাই, এই আশায় যে, তা হলে আর লোকে অনুগ্রহের প্রত্যাশায় আমাকে উত্যক্ত করতে আসবে না, আমি একা একা বসে নির্জনতা ভোগ করতে পারব। নির্জনতা মানেই একাকিত্বের নিভৃতি। সেই আকাঙ্ক্ষিত একাকিত্বের নিভৃতিতে নিজের মনের মুখোমুখি বসে দার্শনিকজনোচিত তত্ত্ব-জ্ঞানের নীরব আলোচনায় কালহরণ করতে পারা কি কম ভাগ্যের কথা! আত্মজিজ্ঞাসার অবসর ক'জনার হয়?

আমার সেই সাধ পূর্ণ হয়েছে। লোকে আর এখন আমার ছায়াও মাড়ায় না। বন্ধু-বান্ধবেরা আমার জীবনে অঢেল অবসরের সুযোগ করে দিয়ে যে যার পথ ধরেছে। আমি নিঃসঙ্গতার দুর্গের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে সুপ্রচুর সময়ের রসদ চারিপাশে স্তূপীকৃত করে তুলেছি। এত সময়ের র‍্যাশন দিয়ে কী করব, এক এক সময় তাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠি। আমি তো মোটে মানুষ একজনা, আমার এত সময়ের কী প্রয়োজন। দু-হাতে সময় ছড়িয়ে ছিটিয়েও যে আমার হাতে প্রচুর সময় উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই উদ্বৃত্ত সময় আর পাঁচজনার জন্যে খরচ করলে এমন কী তা দোষের হত? যেদিন চার পাশ থেকে মনোযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে আপনাকে ঘিরে আত্মকেন্দ্রিকতার বিবর রচনা করেছি, সেদিন থেকে সমাজের সঙ্গেও যে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ আর সামাজিক মানুষ বলে পরিচয় দেবার কোন রাস্তাই আমার সামনে খোলা নেই। জনজীবন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে লাভ কতটা হল, ক্ষতিই বা কতটা হল? আত্মকেন্দ্রিক জীবন-যাত্রার সুপ্রচুর অবসরের সুযোগে আত্মজিজ্ঞাসা হয়তো প্রভূত পরিমাণেই করা যাচ্ছে, কিন্তু পরের কুশল জিজ্ঞাসার অবসর তো কই আর মিলছে না। পরের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে ভাবনার দায় থেকে মুক্ত হয়ে খুব যে সুখে আছি এমন কথা বলতে পারব না।

আর মানুষকেও বলিহারি যাই। আমার না হয় অপরের উপকার সাধনের কোন ক্ষমতা নেই, তাই বলে পরকে সহজ প্রীতি বিলোবার ক্ষমতার তো লোপ হয়নি। সেই প্রীতির আকর্ষণে কেন তারা আসে না? কিন্তু হায় অবোধ, তোমার কি এত দিনে এত মানুষ চরিয়েও এই সামান্য জ্ঞানটি হয়নি যে, তোমার যদি অপরের প্রীতির প্রয়োজন বিনেও জীবন চলে যেতে পারে তো অপরেরই বা তোমার প্রীতিকে বাদ দিয়ে জীবন চলে যাবে না কেন? নিঃখরচায় প্রীতি বিলাতে পারে সবাই, কাজ করবার দায় এলেই যত মুশকিল। প্রীতির প্রসন্নতা পরিবেশন করা এক কথা, আর তা কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য উপকারে রূপান্তরিত করা আর কথা।

তা আমার সেই শেষোক্ত ক্ষমতা নেই, একশো বার কবুল করব। আমি ক্ষমতাহীন মানুষ, পরের উপকার করব কিসের জোরে। কেমন করে অপরের জন্যে চাকরির উমেদারি করতে হয় সে কৌশল আমার জানা নেই, মন্ত্রীদের সঙ্গে কারণে অকারণে দরবার করবার রীতি-নীতি আমি জানি না, যশ-প্রার্থী নতুন লেখকের লেখা ছাপবার বায়না নিয়ে মাসিকপত্রের সম্পাদকের দরজায় ধর্ণা দিতে আমার বাধে, সাহিত্যোৎসাহী হবু গ্রন্থকারের পাঁচ দুয়ার থেকে ফিরে আসা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে ষষ্ঠ কোন প্রকাশকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে আমি মনের জোর খুঁজে পাইনে, যে যুবককে 'bully' জাতীয় ভদ্রজনের পীড়ক ছোকরা বলে জানি, তার অনুকূলে আদর্শ চরিত্রের সার্টিফিকেট লিখে দিতে আমার হাত কাঁপে, তথাকথিত 'কালচারাল' কনফারেন্সের তরফ থেকে যে সকল সভাবিলাসীর দল আমাকে তাদের সভায় নিয়ে যাবার জন্য আমার বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করে আমি তাদের বসতে পর্যন্ত বলি না, লোকান্তরিত মনীষী পরমশ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ধরণে দরজা ঈষৎ ফাঁক করে দু চারটা কথা বলেই তাদের আমি বিদায় করি। কেউ তাঁর নতুন অপাঠ্য বইয়ের সমালোচনা লিখে দেবার জন্যে আবদার ধরলে আমি প্রায়ই সে আবদারের মর্যাদা রাখি না। সুতরাং আমার কাছে লোকে আসবে কেন। আমি যেমন তাদের খাতির করি না, তারাও তেমনি আমার প্রতি খাতির না দেখিয়ে আমার উপর শোধ তোলে। আমার কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকে।

ফলে একা একা গৃহে বসে দার্শনিকোচিত আপাতনির্লিপ্ততায় আত্মজিজ্ঞাসার জাবর কাটাই আমার এখন সার হয়েছে। মানুষকে যেমন এড়াতে চেয়েছিলুম তেমনি তার শাস্তিও হাতে হাতে পেয়ে গেছি—সমাজের চৌহদ্দির মধ্যেই সমাজপরিত্যক্ত হয়ে বাস করবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হচ্ছে।

তবে কিছুদিন থেকে আবার মনের হাওয়া আর এক মুখে বইতে শুরু করেছে। অনেক দিন একা থাকতে থাকতে একা থাকতেই যেন আজকাল ভাল লাগে। নিঃসঙ্গতার শ্বাস-রোধকর আবহাওয়ায় এক এক সময় মনে হাঁফ ধরে গেলেও বাইরে পা বাড়াবার কথা মনে হয় না। মানুষ নামক জীবটি সম্বন্ধে কেমন যেন একটা ভয় ধরে গেছে। যখন থেকে নানা বিরূপ অভিজ্ঞতার ঠেকনা খেয়ে বুঝতে শিখেছি মানুষ স্বার্থে ঘা লাগলে, কখনও বা বিনা স্বার্থহানির আশঙ্কাতেই, জন্তুরও অধম হতে পারে, তখন থেকে এই সংসার-জনারণ্যকে সত্যিই এক

প্রকারের বৃহৎ জঙ্গল বলে বোধ হচ্ছে। এই জঙ্গলে প্রত্যেকেই আমরা মানুষ-খেকো মানুষ। শিকার ধরবার জন্যে সর্বদাই ওৎপেতে আছি। পশুর শিকারের পদ্ধতি থেকে আমাদের শিকারের পদ্ধতি কিছু ভিন্ন। আমরা যাকে ঘায়েল করতে চাই তার সঙ্গে নির্বিবেক প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হই, অযথা তার পায়ের কড়া মাড়াই, অজান্তে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করি, সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে উৎকট গোষ্ঠীবদ্ধতার মত্ততায় তাকে একঘরে করি, তারপর তার ওই নির্বাসনক্লান্ত সঙ্গবর্জিত নির্জীব দেহটার প্রায়-স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে তাথৈ নৃত্য জুড়ে দিই। কাউকে জব্দ করতে হলে এ সমাজে তাকে লেংচি মেরে ফেলে দেওয়াটাই প্রথা।

ভাবছেন বড্ড বেশী সীনিক অর্থাৎ মানববিদ্বেষীর মত কথা বলছি। আজ্ঞে না মহাশয়, এ সকল কথার পিছনে পরীক্ষিত সত্যের জোর আছে। মানুষকে বিদ্বেষ করব এত ঘৃণা আমার হৃদয়ে কই। মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা, অঢেল বিশ্বাস নিয়েই তো জীবন শুরু করেছিলাম, আমার প্রীতি-প্রসন্নতার ঝুলিতে সঞ্চয়ের কোন খাঁকতি ছিল না; আজ এদেশবাসীর গড়পড়তা আয়ুর মাপে জীবনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাটাবার পরেও দেখতে পাচ্ছি আমার সেই সংস্থাত মানবপ্রেমের আধারটি অটুট না থাকলেও একেবারে টুটি-ফাটা হয়ে খান খান হয়ে যায় নি। অনেক গিয়েও মানুষের প্রতি ভালবাসার এখনও যা অবশেষ আছে তা দিয়ে নতুন করে জীবনারম্ভ করা যায়—স্বেচ্ছারচিত আত্মকেন্দ্রিকতার শামুকের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের হাতে আবার হাত রাখা যায়, শেষের আনন্দ-ডাকে আবার পুরাতন দিনের মত অকুণ্ঠে পাত পেতে বসা যায়।

কিন্তু হায়, তা কি আর কখনও সম্ভব হবে? আমার মানবপ্রীতি না হয় অনেক আক্রমণের ধাক্কা আর অনেক গোড় খাবার পরেও আজও একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে জনতা সম্বন্ধে যে আমার মনে এক ধরণের 'অ্যালার্জি' গড়ে উঠেছে তার কী হবে? সে মানস-কূটকে (Complex) আমি কেমন করে কাটিয়ে উঠব? ভিড়ের কথা মনে হলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। ভিড় থেকে দূরে সরে থাকতে পারলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ একদা সদর স্ট্রীটের দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচেকার জনপ্রবাহ লক্ষ্য করে এক অভূতপূর্ব চিত্তের বিস্ফার অনুভব করেছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গিয়েছিল; আমার জনপ্রবাহ দেখলে উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়। ভিড়কে আমার ঠিক জনপ্রবাহের মত বোধ হয় না, মনে হয় কতকগুলি মানুষ-কীট কিলবিল করে চলেছে। কখনও কখনও ভিড় দেখলে আমার আক্ষরিক অর্থে ভিড়মি খাবার যো হয়। হবেই বা না কেন। আমি তো আর কবি নই। নিতান্ত কাটখোট্টা সংসারী জীব। উপর থেকে জনস্রোতকে দেখতে ভালো লাগে, জনতার ভিড় ঠেলে চলতে গেলেই যত ল্যাঠা। কনুইয়ে যার যথেষ্ট জোর নেই, তার পক্ষে জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে নেওয়া কঠিন।

আমার এরকম মনে হওয়ার কারণ, আমি স্বেচ্ছানির্বাসিত অভিশপ্ত একটি মানুষ। নিজে হাতে মানুষের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন করে দিয়েছি, আমার এরকম মনুষ্যবিমুখতা ঘটবে না তো কার ঘটবে? সমাজ-সংসারের কি আমি মান রেখেছি যে সমাজ-সংসার আমার মান রাখবে? আজ চেষ্টা করলেই আমি মানুষের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারি না, তার মানে আমার চিত্তের শোধন দরকার। মানুষের জন্য মনের ভিতর সত্যিকার আকুলতা বোধ করা চাই। তা কি আমার আছে? মেঘদূত কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কবিগুরু লিখেছেন, আমরা সকলেই এই সংসার-সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরহের অশ্রুলবণাক্ত পাথার থৈ থৈ করছে। কুবেরের অভিশাপে নির্বাসিত যক্ষের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে কবি এই কথাগুলি লিখেছিলেন। পরের অভিশাপেই যদি আমাদের সকলের মধ্যে এইরূপ প্রবল বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হয়ে উঠে থাকে তো যে লোক স্বেচ্ছায় নিজেকে জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, আত্ম-আরোপিত নির্বাসনদণ্ড মেনে নিয়ে মানুষের কোলাহলের মধ্যে থেকেও মানুষ থেকে দূরে সরে আছে, তার বিড়ম্বনা আরও কত দুঃসহ তা সহজেই অনুমেয়। বিরহ আমাদের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট নিয়তি স্বরূপ; তার উপর আমি সাধ করে আরও বিরহী সেজেছি। আমার দুর্ভোগ খণ্ডাবে কে?

তবে জনসমাজের প্রতি আমার এক ধরণের অভিমান আছে, সে কথা স্বীকার করব। মানুষের কাছ থেকে অকারণে ঘা খেয়ে, অযথা লাঞ্ছিত হয়ে আমি শামুকের মত আপনার খোলের ভিতর কুঁকড়ে গেছি। প্ররোচনার কারণ ব্যতিরেকেও লোকের ব্যবহার কেন এত অশিষ্ট হয় আমি আজও তার সঙ্গত হেতু খুঁজে পাইনি। ফলে একপ্রকার বিহ্বলতার বশেই আমি বিমূঢ়ের ন্যায় জনসমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। লোকে বলে "আপ ভালা তো জগৎ ভালা।" এ কথা যথার্থ মনে হয় না। এখানে ভালো হওয়ার দায়টা কেবল এক পক্ষের উপরই চাপানো হয়েছে, অন্য পক্ষের যেন কোন দায় থাকতে নেই। এক পক্ষ একক পক্ষ হওয়ায় দায়টা বড্ড বেশী বলে মনে হয়। কেন, জগতের কি ভালো হওয়ার কোনই বাধ্যবাধকতা নেই, যত দোষ এই বেচারা আমি রূপ নন্দ ঘোষের? লোকে আমার উপর অন্যায়ের পর অন্যায় করে যাবে আর আমাকে সে সব সয়েও নির্বিকার থাকতে হবে, উপরন্তু ক্ষমাশীলের ন্যায় আচরণ করতে হবে—মজা মন্দ নয়। জগৎ-সংসারের এ এক আচ্ছা আবদার যা হোক। এমন আবদার শিশুতেও করে না।

তাই আমি ভেবে দেখেছি, হয় আমি এ সংসারে বেমানান, নয়, এ সংসার আমার পক্ষে বেমানান। সুতরাং আমার পক্ষে আত্ম-সম্পূর্ণ Self-sufficient হওয়া ছাড়া বুঝি গত্যন্তর নেই। একে আপনারা আত্ম-কেন্দ্রিকতা বলতে পারেন, অহং-কেন্দ্রিকতা বলতে পারেন—হতাশার মুহূর্তে নিজেও আমি এক এক সময় তা-ই বলি—, কিন্তু আমি নাচার। আমার ধারণা, আমি সংসারের পক্ষে যতটা বেমানান, সংসার আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশী বেমানান। পূর্ব অনুচ্ছেদের বক্তব্যের সূত্র ধরে আমি বেমানান হবার দায় সংসারের উপর চাপাতে চাই, নিজের উপরে নয়। অপরের ত্রুটী-বিচ্যুতি অপূর্ণতার জন্য আমি কেন দায়ী হব? আমি নিজে শিষ্ট আচরণে অভ্যস্ত বলে মনে করি, ফলে সমাজের কাছ থেকেও অনুরূপ শিষ্ট আচরণ প্রত্যাশা করি। লোকে যদি সেই প্রত্যাশার বিপরীত আচরণ করে, লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকে 'নিম্নমানের আদর্শ' অনুসরণ করে, তার দোষ কি আমার? সুতরাং আমি কেন সমাজের পক্ষে বেমানান হতে যাব? বরং এই বলাই কি যথার্থতর হবে না যে, সমাজই আমার পক্ষে বেমানান?

সম্প্রতি প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক রোমাঁ সারীর লোক-ব্যবহার ও অশিষ্টতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়লুম। পড়ে চমকে উঠলুম। আমার ও ওই লেখকের মধ্যে শত যোজনের ব্যবধান, তা হলেও চিন্তাধারায় এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য ঘটে কী করে? তা হলে দেখছি, সমস্ত আধুনিক সমাজেই এই এক সমস্যা—অনুভূতি-পরায়ণ মানুষদের সংবেদনশীলতার সঙ্গে রুচি-সৌকুমার্যের সঙ্গে লোকসমাজের স্থূল আচরণের নিত্য সংঘাত। কী এদেশে, কী ওদেশে। এই রুচির সংঘাতে অনুভূতিপরায়ণ মানুষেরাই কষ্ট পায়; সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজের লোকদের গায়ে বা মনে সামান্যই আঁচড় লাগে। ভোঁতা রুচির লোকদের চেতনা থাকলে তো তারা কষ্ট পাবে! বেদনা সহ্য করা বরাবর সংখ্যালঘুদেরই বিধিলিপি, তাদের মধ্যে যাঁরা মহৎপ্রাণ তাঁদের বেলায় তো এ কথা আরও বেশী মাত্রায় প্রযোজ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ সুকুমার রুচির মানুষ যে নির্জনতাপ্রয়াসী হন, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় হন, তা এই কারণেই হন, তার আর অন্য কোন হেতু নেই।

আলোকিত বাড়ী

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কে ওখানে বেতবনে ঘন হ'য়ে বসে
কাল ধুতি উড়ছে হাওয়ায়—
এদিকে-ওদিকে ছেঁড়া তারা পড়ে খসে
কেন ঐদিকে অত পেঁচা উড়ে যায়।

আহা বাতি নেভাও, নেভাও।
দেখছ না কী ভীষণ তারা পড়ে খ'সে—
কী-ভীষণ, কী-ভীষণ তারা পড়ে খ'সে,
বুঝি আজ হবে আজ অমাবস্যাও।

এই যে পাহাড়, নদী, জংগল গভীর ঃ
যা ভেবেছ শর, বুনোঘাসের মর্মর—
তা নয়, তা নয়—রাত্রি আত কে অস্থির ঃ
মৃত্যু আসে পায়-পায় ছায়ায় ধূসর।

তারপর অতর্কিতে বাগিয়ে বন্দুক—
উঠে যদি তাগ ক'রে দাঁড়ায় শিকারী,
একটুও হটাতে তাকে না-ও যদি পারি,
তথাপি কে চায় প্রিয় বাড়ীটা পুড়ুক।

জীবন সুখের সেই আলোকিত বাড়ীঃ
ভালবাসা—তাকে ঘিরে সুপুরির সারি।

॥ গল্প ॥

"খাঁচা"

হাসিরাশি দেবী

দুম্—দুম্......
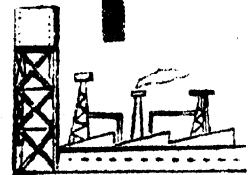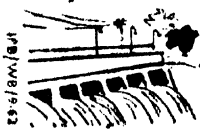
সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে আদিনাথ।

বুট পরা পায়ের আওয়াজ ও। শান্তা চেনে, শোনেও কান পেতে।—

চেনা শব্দ। প্রায় পাঁচটা বছর ধ'রে শুনে আসছে ও আওয়াজ। জানে সিঁড়ির নিচে থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে একটু থামে, তারপর উঠে আসে বাকিটুকু।

বারান্দার সামনেই এই হলঘরটা। ঘরের গৃহিণী ব'লতে তাকেই বোঝায় বটে,—কিন্তু এর প্রত্যেকটি জিনিস সাজানো আর গুছানোর কাজ আদিনাথের। নিজের সৌন্দর্যরুচির কাছে অন্যের রুচিবোধকে সে ছোট মনে করে বরাবরই, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করে না।

এ ঘরের কোন্ জিনিসটা কোথায় রাখলে ভাল মানায়,—কোচের ঢাকা আর জানালা দরজার পর্দা কি রঙের আর কেমন ধরনের হ'লে দেখতে ভাল লাগে, এমন কি মেঝের ঢাকা কার্পেটটা কি ধরণের হবে, এ সমস্ত হিসেবই আদিনাথের। শান্তাও যেন এ ঘরের তেমনি একটা জিনিস—যাকে অনেক বেছে সংগ্রহ করেছে আদিনাথ।

কিন্তু ও নিয়ে ভাববার ইচ্ছাও করে না শান্তার।

আদিনাথ উঠে এসেছে। সিঁড়ির উপর ধাপ শেষ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়।

দেখা যাচ্ছে খাকি হাফপ্যাণ্ট্ আর শার্ট পরা ওর লম্বা-চওড়া দেহটা। মাথায় হ্যাট্‌টা হাতে নেওয়া, তার সঙ্গে চুরোট ধরাবার মুখভঙ্গি।

এ দৃশ্য দেখতে শান্তা অভ্যস্ত। অন্ততঃ পাঁচটা বছর ধ'রে সমানে দেখছে সে।

হাতের সেলাইটা নামিয়ে রাখে,—সূঁচ আর সুতোটা আটকে রাখে রেলে, তারপর উঠে সরিয়ে দেয় দরজার ভারি পর্দাটা।

আদিনাথ ঘরে ঢোকে।—প্রতিদিনের মত নির্দিষ্ট কোচ্‌টায় এলিয়ে দেয় সমস্ত দেহটা: মাথাটা হেলায় পেছনে, তারপর বুজোয় চোখদুটো।

অন্ততঃপক্ষে পাঁচটা মিনিটও চোখ বুজিয়ে কাটাবে ও। এ সব দৈনিক কাজের রুটিন শান্তার নখদর্পণে।—

এগিয়ে আসে এবার পিল্লাই চাকরটা। পা' থেকে খুলে নিয়ে যায় আদিনাথের জুতো আর মোজা। সিলিং ফ্যানটা আরও জোরে ঘুরতে থাকে মাথার উপর,—আদিনাথ থাকে চোখ বুজিয়ে।

—": বাইরে কি প্রচণ্ড গরম! রোদ যেন জ্বলছে!"

—: তাই বুঝি?—

শান্তার কথার জবাবে তাকায় আদিনাথ। চঞ্চল নয়, স্থির দৃষ্টি। যেন বুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এমনি স্থির! শান্তা তাকাতে পারে না। মুখ নিচু ক'রেও স'রে বসে কাছে,—কোচের চওড়া হাতলটায়। তারপর সরু লম্বা আঙুলগুলো কয়টাকে আস্তে আস্তে চালাতে থাকে আদিনাথের চুলের মধ্যে; যে গুলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রুপোলী ছাপ।

চওড়া কপাল ওর; তার উপরেও চুল এসে প'ড়েছে—দুই এক গোছা। চোখের নিচে, হাতলীতে এখনও র'য়েছে ঘামের বিন্দু,— আর গলার ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে সকালের পাউডার।

"নিজেকে ক্লান্ত মনে হ'চ্ছে?—"

শান্তার গলার আওয়াজ মমতায় ভিজে। কিন্তু আদিনাথ যেন ইচ্ছে করেই সেটা এড়িয়ে চলে—

"ক্লান্তি? কৈ, না।"

একটু থেমে আবার বলে—

"লাগবেই বা কেন? বরঞ্চ এ ভালই লাগে আমার; এই রুটিন মাফিক কাজ আর ঘড়ি ধ'রে আসা আর যাওয়া। মনে হয় দিনের আর রাতের সময়টাকে যেন একটা চাকায় বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছি। আমার তো ভালই লাগে; কিন্তু, তোমার কেমন লাগে শান্তা?"

"আমার?—"

হাসে শান্তাও। সীমিত সে হাসি; যেন নেহাৎই ভদ্রতা বাঁচান! সৌজন্যের মাত্রা ছুঁয়ে চলা।

"মন্দ কি? আর আমার এতে মনে করার মতই বা কি আছে? বরঞ্চ তুমি যা ব'লবে—"

"তাই-ই মেনে নেবে নিঃসঙ্কোচে?" একটু থামে আদিনাথ; হাতের মধ্যে টেনে নেয় শান্তার হাতখানা। একটু টিপে, একটু নেড়ে চেড়ে যেন ঐ হাতখানার মতই বুঝতে চায় শান্তার মনটাকেও।—

বোধহয়—একটু লজ্জা পায় শান্তাও, —: কিন্তু, ঠিক ওভাবে কথাটা আমি ব'লতে চাইনি—।"—

: আর চাইলেই বা—"

আদিনাথের হাসিটা যেন করুণা-মাখান।

: তাতেই বা কুন্ঠার কি এমন আছে যে অমন করে চ'ম্‌কে উঠলে!—"

: না—, কিছু নয় ও।—"

: আমিও তো তাই ভাবি।"

আদিনাথের হাতের মুঠোয় শান্তার হাতখানা যেন একটু শিউরে ওঠে, কিন্তু মুক্তি পায় না।—আদিনাথ হাসছে। আরও একটু চাপ দিচ্ছে ওর হাতখানায়—। যেন নিবিড়ভাবে অনুভব করছে ওর এই স্পর্শ,—এই সান্নিধ্য।

সময়টা প্রায় নিস্তব্ধ।

এ বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বোধহয় বিশ্রাম ক'রছে এ সময়ে। নিচের রাস্তাতেও লোক চলাচল কম,—কেবল উঁচু বাড়িগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে দুই একটা গরু। /

—ঃ খাবার দেই ?—"

ঘরজোড়া নিস্তব্ধতাটায় দোলা লাগে যেন,—

ঃ তাড়া কিসের ?—

সার্টটাকে গা থেকে খুলে ফেলে আদিনাথ,—

ঃ ব'লেই এসেছি—এবেলা আর যাবনা কাজে। শান্তার মুখে চোখে বোধহয় একটু খুশীর চঞ্চলতাই লক্ষ্য করতে চায় ও—

ঃ ভাল করিনি ?—"

ঃ খুব ভাল।"

কিন্তু ওর এই মৃদুস্বর যেন পছন্দ হয় না আদিনাথের, তাই জোর দেয় নিজের গলায়—

ঃ আমার তো ম া হয়—ভালই। অন্ততঃ এটুকু সময়ও বাইরে ছুটোছুটি না ক'রে ঘরে থাকতে পাব। তাই না ?—"

ঃ হ্যাঁ—।"

যেন আরও একটু সুন্দর ক'রে হাসতে চায় শান্তা—

ঃ সে-তো বটেই।"

গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে ঝিক-ঝিকিয়ে ওঠে ওর ছোট, সাদা দাঁতগুলো।

কিন্তু—আনুগত্য জানাবার ঐ কথাটাকে আদিনাথ বোধহয় চেনে ভালরকম, তাই সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে যেন চিবোতে থাকে ওটাকে। কিছুক্ষণ কেটেও যায় মনের এই তিক্ততা ঢাকতে। একসময়ে ডাকে—

ঃ শান্তা।

ঃ বল।—

ঃ এক এক সময়ে কি মনে হয় আমার, জানো ?"

—ঃ না।—"

ঃ মনে হয়—"

আদর যেন ঝ'রে পড়তে থাকে আদিনাথের গলার স্বরে—

ঃ হ্যাঁ, মনে হয়—, তুমি যেন ঠিক মন খুলে আমার সঙ্গে কোন কথাই বলনি কোনদিন।" শুধু আমার সম্মতি আর সমর্থনের অপেক্ষাই ক'রে গেছ মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখের দৃষ্টিতেও খুঁজেছ কেবল আমারই ইচ্ছা,—তোমার নয়।"

ঃ এখন বুঝি এইসব জিজ্ঞাসা করার সময় ?—"

সেই হাসিটাকেই আরও কিছুক্ষণ টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে যেন—

"ঃ দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করছে চারিদিক; নিজেও খেটে খুটে ফিরছ' সকাল থেকে। এখন কোথায় খেয়ে দেয়ে একটু জিরোবে, তা নয়, যত সব......!"

"ঃ কি করি বল! দরকারের মধ্যে অ-দরকারেরও যদি একটু ঠাঁই না রাখি, তাহ'লে বাঁচি কি নিয়ে? তাছাড়া বাইরের কাজ নিয়েই যার কাটাতে হয় বেশীর ভাগ সময়, সে ঘরের খবর নেবে কখোন ?"

কেমন একটু নরম রসে ভেজা কথাগুলো। যার স্পর্শ পাওয়া যায় কখনো-সখনো। এখন যেন সেই স্পর্শাতুর হাতখানা মনের দরজায় এগিয়ে এনেছে আদিনাথ, যাকে ফিরাতে মন চায়না।

তবু ব'লে ফেলে—

—ঃ কিন্তু, তার দরকারই বা কি ?

"ঃ ও-তুমি বুঝবে না,—বুঝতে পারবে না।"

"ঃ সত্যি সে কথা।"

নিচের ঠোঁটটা একবার দাঁতে চেপে ছেড়ে দেয় শান্তা—

ঃ কি ক'রে পারবো বল! যে মানুষের সমাজে মিশেছি,—চলাফেরা করেছি এতদিন, তারা যে নিতান্ত সাধারণ,—তাই সাংসারিক সুখ দুঃখ-বোধ ছাড়া আর যে তারা কিছু বোঝেনা; আমিই বা বুঝবো কি ক'রে? তুমি সম্পূর্ণ আলাদা সে দল থেকে,—তাইতো গরীব বাপকে আমার উদ্ধার করেছ কন্যাদায় থেকে।—"

ঃ ঠাট্টা করছো ?—

ঃ মোটেই নয়, বরঞ্চ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আদিনাথের মুখে কোন কথা আসে না। আস্তে ধীরে ধীরে কেবল উচ্চারণ করে—

"ঃ আশ্চর্য।"

আদিনাথের এই আশ্চর্য হওয়ার খবর শুধু আজকে নয়, দীর্ঘদিন ধ'রেই পেয়ে এসেছে শান্তা,—দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে। আদিনাথ ওর মনের বিস্ময়কে জানিয়েছে এমনিভাবে, কথায়—কথায়; কিন্তু শান্তা তার প্রতিবাদ করেনি কোনদিন। এদিনেও হয়তো করতো না; কিন্তু অতর্কিতে যেন মনের কোন একটা পর্দায় আঘাত করে ফেলেছে আদিনাথ, যেটার প্রতিধ্বনি উঠল শান্তার সমস্ত অন্তর ভ'রে। বিস্বাদ হ'য়ে উঠল' বাকি সময়টা,—যেটা মধুময় হ'য়ে ওঠার আশা করেছিল দু'জনেই।

ঘুম আসছে না।

রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে আছে চারিদিকে; রাস্তা আর ঘরের আলো কতটুকুই বা তাকে দূর করতে পেরেছে—তবু চেষ্টার অন্ত নেই।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় শান্তা। তাকায় সামনের দিকে! ছড়ানো আকাশটা সামনের। ওখানে কালো রং ছড়ানো, আর তার মধ্যে অসংখ্য তারার চুমকি!

এদিকের খানিকটা আড়াল করেছে তার নিচে থেকে ওঠা ঝুমকোলতার গাছটা। পাতার পাতায় ওর আলোর ছোঁয়া! সে ছোঁওয়াও কাঁপিয়ে দিচ্ছে রাতের হাওয়া এসে।

শান্তা তাকিয়ে থাকে।

বেশ লাগছে নিরিবিলির এ সময়টা; অন্ততঃপক্ষে আদিনাথ যতক্ষণ না ফেরে।—ওর না ফেরার সময়টা নিচের দরজা আগলে থাকবে পিল্লাই, আর উপর তলার থাকবে শান্তা।

আদিনাথ তা জানে। তবুও প্রশ্ন করবে—

"ঃ ঘুমোওনি ? আশ্চর্য !"

তারপরও কিছুক্ষণ ধ'রে চ'লবে ওর সেই নরম সুরের কথাগুলো,—যেগুলো শান্তা শুনুক আর না-ই শুনুক—আদিনাথ ব'লবেই। বলাটাও ওর একটা বিশেষ কাজ। নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ ও দিয়ে যাবে ঐ সঙ্গে—

" বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়েনা,—কি করি! তাই ওদের সঙ্গেও বকাবকি ক'রতে হয় কিছুক্ষণ, যেতেও হয় ক্লাবে।—"

হাসে ও—

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

অতলান্ত

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"—দরজা-জানালা বন্ধ কর—বন্ধ কর এক্ষুণি। কী আহাম্মুখের মত সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ—সর্বনাশ হয়ে যাবে—ওঃ ভগবান!"

চিৎকার করতে করতে পাশের ঘরের দিকে দৌড়ুলেন ডাঃ সেন, যেখানে সরু তারের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আঁটা পঁচিশ-তিরিশখানা এক্স-রে প্লেট দুলছে। পল্লব ওঁকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে না ধরলে তিনি নিশ্চয় পড়ে যেতেন।

ঝাঁকানি দিয়ে পল্লবকে সরিয়ে দিতে গেলেন ডাঃ সেন।—"ডোন্ট বি ফুলিস—আমাকে ছেড়ে দাও..." ব্যর্থ চেষ্টা করলেন শক্তিমান যুবকের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। দরওয়ান রামভগন, ডেভেলপার সতীশ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে এবং আধ-মিনিটের মধ্যেই দুমদাম করে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

পল্লব সস্নেহে বৃদ্ধ ডাঃ সেনকে তাঁর আরাম কেদারায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। মৃদুকণ্ঠে বলল—"একটু জল দোবো দাদু।" বৃদ্ধের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না—শুধু তাঁর চোখের উপর বাঁ হাতের তেলোটা উল্টো করে দিলেন।

বাইরে প্রলয় চলছে। বন্ধ জানালার উপর ঝড়ের আঘাত যেন কোন অতিকায় প্রাণীর ডানা ঝাপটানোর মত শোনাচ্ছে—বাতাসের শব্দ আহত জন্তুর গোঙানির মত দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হচ্ছে।

পল্লবের সাহস হল না প্রশ্নটা আবার করতে। ফ্রিজের ডালা খুলে ঠাণ্ডা জলের বোতল থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে আরাম-কেদারার পাশে টিপয়ের উপর রেখে দিলে চাপা দিয়ে।

প্রথম প্রথম পল্লবের বিস্ময় লাগত—ভয়ও পেত না এমন নয়। আত্মগত তপস্যার ধ্যান-গম্ভীর ডাঃ সেন, যাঁর মাঝে এতটুকু অসংযম দেখেনি কোনদিন—ঝড় উঠলে যেন একেবারে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন দেখা দেয়—ভীতির সঙ্গে কি যেন একটা জড়ান থাকে—তার কোন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা আজো খুঁজে পায়নি পল্লব। তারপর চেয়ে থাকেন স্থির দৃষ্টি মেলে—এক্স-রে'র চেয়ে সন্ধানী—মনে হয় কাঠ-পাথর দেওয়াল ভেদ করে—এমন কি কালকে অতিক্রম করে অনেক দূরে কি একটা দেখবার চেষ্টা করছেন। পল্লব সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে থেকে বরাবর সরে গেছে। আজ তার আগেই সে বেরিয়ে গেল পা টিপে টিপে—শুধু মনে হল দাদুর চোখের উপর রাখা হাতখানা যেন কাঁপছে—শুধু মনে হল একবারের জন্য যদি নাড়ীটা দেখতে পারত।

সাহস হল না পল্লবের। শুধু যাবার আগে জানালা-দরজাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে হাই-পাওয়ারের বাতিটা নিভিয়ে একটা নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

*　*　*　*

১৯৩০ সনের চৈত্র মাস। তখন এত বড় চেম্বার ছিল না ডাঃ সোমনাথ সেনের। বিখ্যাত ও অভ্রান্ত রেডিওলজিস্ট বলে তাঁর নাম শোনেনি অনেকে। কথায় কথায় এক্স-রে ছবি নেওয়ার রেওয়াজও ছিল না সে যুগে। কোন কোন দিন রোগী আসত, কোনদিন বা আসত না। তিনি একাই ছবি তুলতেন, ধুতেন, পরীক্ষা করে রিপোর্ট লিখতেন। তারপর মুখের দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে চাইতেন—স্পষ্ট করে চাইতে বাধতো। কেউ দিতো, কেউ দিত না, কেউ আংশিক দিত, কেউ পরে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিত। নগদ ও প্রতিশ্রুতিকে কুড়িয়ে এমন হত না, যাতে একজন সাহায্যকারী নিতে পারেন।

মনে আছে তারিখটার কথা। সকলের জীবনেই এমনি এক একটা তারিখ থাকে যা ভোলা যায় না, সহস্র চেষ্টা করেও না। ৯ই এপ্রিল। রোগীপত্রের বিশেষ ভীড় ছিল না। হাতে যে দু-একটা কাজ ছিল সেরে ফেলেছেন। সারা দিনটার অসহ্য গুমোটে বিশ্রী লাগছিল। চেম্বার বন্ধ করে বাড়ী ফিরবেন ভাবছেন, ঘরে ঢুকলেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—সঙ্গে সাতাশ-আটাশ বছরের একটি ছেলে। ডাক্তারের চিঠি দিলেন—স্কায়োগ্রাম করতে হবে। সোমনাথ তার ছবি নিলেন—কেস রেজিস্ট্রীতে নাম ধাম পরিচয় লিখে নিলেন—তারিখ দিলেন প্লেট আর রিপোর্ট নিয়ে যাবার। বললেন—"ভাববার কি আছে—কিছু যে হয়েছে এমন কথা ভাবছেন কেন—মিছে চিন্তা করবেন না—ভালই হবে।" একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক করে তাঁকে প্রায় সবক্ষেত্রেই বলতে হয়।

ভদ্রলোক উঠছেন—ভেতরে এলো আরো একটি ছেলে। ভদ্রলোকের ছেলেরই প্রায় সমবয়সী—সঙ্গে ডাক্তারের চিঠি। একই কথা স্কায়োগ্রাম। সেই একঘেয়ে কাজ। যন্ত্রটা ঠিক করে সেট্ করে ডায়নামো চালিয়ে দেওয়া—"নিন্—খুব জোরে নিঃশ্বাস নিন—দম বন্ধ করুন—বাস্ হয়ে গেছে—ডায়নামো বন্ধ করা। নাম, ঠিকানা লিখলেন তারপর সেই ছেলেকে আশ্বাস, "ভাবছেন কেন মশাই—প্লেট প্রায়ই ভালই হয়। সন্দেহ যখন হয়েছে তখন দেখে নেওয়াই ভাল। পরশু আসতে পারবেন?"

যারা ছবি তুলতে আসে বিষণ্ণ মুখে চলে যায়...কাল, পরশু...অর্থাৎ আরো এক বা দু' রাত্রি মর্মান্তিক যন্ত্রণা। কিন্তু রেডিওলজিস্ট ত তার ফিজিসিয়ান নন—যে নাড়ী দেখলেন, জিভ দেখলেন, চোখ টানলেন, বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে ক'বার জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে বলে—প্যাড টেনে নিয়ে প্রেসক্রিপসন্ লিখলেন। ছবি ডেভেলপ করতে হবে, শুখোতে সময় নেবে—তারপর রিপোর্ট।

দিনের গুমোট দেখে যা ভেবেছিলেন তাই। আকাশে কালবোশেখীর কালো মেঘ জমছে। দোটানায় পড়লেন সোমনাথ। বেরোনো মানেই ঝড়-জলের মধ্যে পড়া—তার চেয়ে!

তার চেয়ে ছবি দুটো ডেভেলপ করে ফেললে কেমন হয়—ইতিমধ্যে ঝড়জলও যদি আসে ত কেটে যাবে। সলিউসনটা এখনো

টাটকা বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা। প্লেট নিয়ে ডার্করুমে ঢুকলেন।

এতক্ষণে বাইরে ঝড় সুরু হয়েছে। সোমনাথ ভিজে প্লেট দু'খানা ক্লিপ দিয়ে তারে আটকে দিলেন, ফিরে গেলেন ডার্করুমে বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করতে। বাইরের প্রলয় তখন ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়েছে। জানালার পাল্লাগুলো সশব্দে চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ছে—ছিটকিনি আঁটা দরজাটা ঝড়ের ঝাপটায় থরথর করে কাঁপছে। সোমনাথ দৌড়ে চেম্বারে এলেন দরজা জানালা বন্ধ করতে। ততক্ষণে উন্মত্ত বাতাস এসে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে—আলমারির মাথার উপর থেকে একরাশ খবরের কাগজ আর মেডিক্যাল বুলেটিন ঘরের মেঝেতে ছত্রাকার—তার উপর উল্টে পড়েছে অ্যাশট্রে—ছড়িয়ে পড়েছে তারে ঝোলান প্লেটগুলো। জানালা দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ করে প্রথমেই প্লেটগুলো তুলে নিলেন—ভগবান বাঁচিয়েছেন, কোনরকম ক্ষতি হয়নি—নইলে পেসেন্টেরও ভোগান্তি আর ডাক্তারেরও লজ্জার একশেষ।

বাইরে কালবোশেখীর ঝড় যেমন অতর্কিতে এসেছিল—তেমনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে। আকাশে ছিন্নভিন্ন মেঘগুলো যেন ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী আবার গুছিয়ে নিচ্ছে—বৃষ্টি দিয়ে ঝড়ের হাতে পরাজয়ের শোধ নেবে। সোমনাথ চেম্বার বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

মাস চারেক পরে সেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আবার ছেলেটিকে নিয়ে হাজির। ডাক্তার আর একবার ছবি তোলবার প্রস্তাব করেছেন—গতানুগতিক ছবি তুললেন। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করছেন। পুরো না হোক যদি আগের ছবিখানা মিলিয়ে আংশিক আভাসও দিতে পারেন। ডেভেলপ করে ভিজে ছবিখানা ভিউবক্সের সামনে ধরে দেখলেন। আগের ছবিখানা পাশাপাশি ধরতেই তাঁর দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বললেন—আমি আর একখানা ছবি নোবো। আবার ছবি নিলেন—সম্মুখ মধ্য থেকে বুকখানা দেখবার চেষ্টা করলেন। চার মাস আগের ছবির সঙ্গে......ডাঃ সেনের হাত কাঁপছে, সেই কাঁপুনি বিস্তৃত হয়েছে তার হাতে ধরা একটা ভিজে সেলুলয়েডে—তার কোণটা ঠক্ ঠক্ করে ভিউবক্সের ঘষা-কাঁচের পাশে লাগছে।

ভদ্রলোক ডাক্তারের মুখের দিকে আশঙ্কাতুর চোখ দুটো তুলে ধরেছেন—কই এখনো পর্যন্ত হেসে বললেন না—'কিছু না প্লেট ভাল আছে।' সোমনাথ মুখ তুলতে পারছেন না—তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু কিছু বলতেই হবে। সঙ্গের ছেলেটি বাইরে বসে আছে—অনেকখানি ভরসা নিয়ে সেও বোধ হয় অপেক্ষা করছে। ভদ্রলোক বললেন—'কিছু খারাপ দেখলেন?'

—'না, মানে, হয়ত কিছুই নয়—আমার মনে হয় কোথায় যেন......দেখুন আপনি কাল এই সময় আসুন আপনাকে ঠিক করে বলতে পারব।'

—ভদ্রলোকের মুখের উপর হতাশা মিশ্রিত বিরক্তি। হয়ত কটু কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিলেন— সামলে নিলেন। কোনরকম সম্ভাষণ না করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এটুকু বোধহয় সোমনাথের পাওনা ছিল। তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না—তিনি কেস রেজিস্টারের পুরানো পাতা তাড়াতাড়ি উল্টোতে লাগলেন—হাত থর থর করে কাঁপছে—হাতের আঙ্গুলে কখন বা পাতাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে—কখন বা দু'তিনখানা পাতা একসঙ্গে উল্টে যাচ্ছেন। তারপর এক জায়গায় এসে থামলেন। হাতের কাছে লেটার-প্যাড থাকতেও দেখতে পেলেন না—ওষুধের বিজ্ঞাপনের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে কি যেন লিখলেন, তারপর চেম্বার বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

'ট্যাক্সি!'—প্রায় চলন্ত অবস্থায় লাফিয়ে উঠলেন। প্রত্যেক মিনিট সেকেণ্ড এর আগে আর কখনও এমন মূল্যবান বলে মনে হয়নি। বুকের উপর হাতুড়ীর ঘা এমন করে আর কখনও পড়েনি। প্রথম যুদ্ধে গিয়েছিলেন ডাঃ সেন, ট্রেঞ্চ থেকে আহত সৈনিককে টেনে এনেছেন ক্যাম্পে, পাশে শেল ফেটেছে—সেদিনও বুকের মধ্যে এমনি শব্দ শুনতে পাননি।

ট্যাক্সি অনেক পথ ঘুরে একটা বাঁধান বটতলায় এসে আর এগুতে চাইলে না। এখান থেকে কয়েকটা সরু সরু গলি চারিদিকে
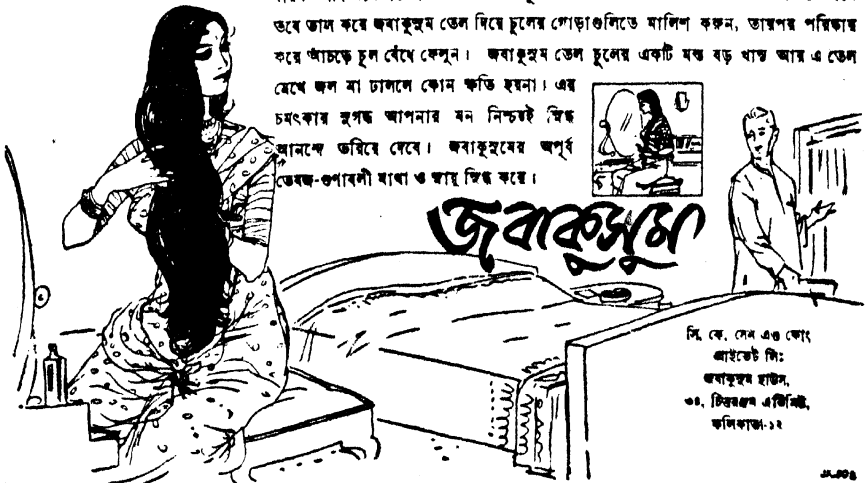
ছড়িয়ে পড়েছে, হয়ত এগুলির নাম আছে হয়ত নেই, দুইই অবান্তর, কারণ এই অন্ধকারে কাউকে প্রশ্ন না করে জানবার উপায় নেই। বটতলার বাঁধান বেদীটায় বসে জটলা করছে পাড়ার ছেলেরা—তাদেরই প্রশ্ন করলেন সোমনাথ—'এখানে রামানন্দ ঘোষ লেনে নিমাই বিশ্বাসের বাড়ীটা কোথায় তোমাদের কারো জানা আছে!'

ছেলেগুলো পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলে। তারপর তাদেরই মুখপাত্র হিসেবে একজন বললে—'একপাড়ায় থাকি মশাই আর এটুকু জানব না। সোজা এই পথ দিয়ে চলে যান—একটা টিউবওয়েল পাবেন তার পাশেই বাঁদিক ঘেঁষে বাড়ী।''

সোমনাথ এগুলেন। পিছনে শুনলেন একটা বারোয়ারী হাসির শব্দ—'দেখ শালা, বলিনি তোকে, কাপ্তেন জুটিয়েছে নইলে শালীর এত দেমাক হয়!'

ভিতটা বোধ হয় পাকা।—তার উপরে ছেঁচা বাঁশের উপর মাটি ধরান, মাথায় খাপরার চাল। সামনের কাঁচা ড্রেনটা টিউবওয়েলের অফুরন্ত জলে বজবজ করছে—একটা বিশ্রী পচা গন্ধ। এই বাড়ীটাই বোধ হয়, তবু একেবারে নিঃসংশয় হলেন আর একজনকে প্রশ্ন করে। লাফিয়ে পার হয়ে গেলেন কাঁচা ড্রেনটা তারপর দরজার কড়া নাড়লেন। প্রথমটা কোন সাড়া পেলেন না—আরো জোরে কড়া নাড়লেন। পাশের একটা জানালা খুলে গেছে—পরক্ষণেই এক বৃদ্ধার অশ্রাব্য কটূক্তি।—'ফের জানালাতে এসেছিস। মুখপোড়া—মুখে নুড়ো জেবলে দোবো—দূর হ—দূর হ—নচ্ছার কোথাকার।'

হতচকিত সোমনাথ দু'পা পেছিয়ে এলেন। তারপর সাহস করে বললেন—'নিমাইবাবু আছেন—নিমাই বিশ্বাস।'

বৃদ্ধার হাতের টেমীর লাল ধুমেল শিখটা উঁচু হয়ে উঠল—তারপর আর্তচিৎকার। 'ওরে নিমাই রে কোথায় গেলি বাপ—তোর এত লোক থাকতে তোকে কেউ বাঁচাতে পারল না।'

বিস্মিত সোমনাথের সামনে তবু দরজা খুলে গেল। হারিকেন হাতে থানপরা সদ্য-বৈধব্যের এক করুণ কিশোরীমূর্তি। বুকের অনেক তলা থেকে একটা অস্পষ্ট জড়িত শব্দ এলো—'তিনি নেই....'

'নেই মানে?' আর বলতে পারেননি সোমনাথ।

—'শোনেন নি, আজ চার মাস হল তিনি মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন—কেন কি হয়েছিল?'—আকুল আগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল—'আত্মহত্যা করেছিলেন।'

'আত্মহত্যা!'—সোমনাথের মাথাটা ঘুরে উঠল। তিনি সামনের দেওয়ালটা ধরে নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে—নিঃস্ব হতভাগা একখানা মুখ বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। অনেক আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন ডঃ সেন।—অনেক আনন্দ। সামনের নিরাভরণা মূর্তি তাকে একেবারে ধুলোয় ছড়িয়ে দিলে—আর দিলে সোমনাথকে একেবারে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে পিষে—আর কোনদিন তিনি মাথা তুলতে পারবেন না।

ওদিকে বৃদ্ধার বিলাপ ঝিমিয়ে এসেছে—এখানে দ্বারপ্রান্তে শোকার্ত কিশোরীর সামনে বিমূঢ় সোমনাথ।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বললে: 'বুঝতে পারছি আপনি কেন এসেছেন—আপনার বোধ হয় কিছু পাওনা আছে—কিন্তু বর্তমানে আমি.....'

নগ্ন পিঠের উপর শঙ্করমাছের ল্যাজের চাবুক মারলেও বোধ হয় ভাল ছিল।

'পাওনা—আমার.....' সামলাতে পারলেন না নিজেকে, ঝর-ঝর করে জল ঝরে পড়ল দুচোখে।—ভেঙে ভেঙে বললেন—'না মা অনেক পাওনা তারই ছিল দিতে পারলুম না।'

এবার মেয়েটির বিস্ময়।

—'কি হয়েছিল আমায় বলবে মা।'

আঙুলে আঁচলটা পাকাতে লাগল মেয়েটি। হয়ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছে—হয়ত একজন অপরিচিত লোকের কাছে বলা যায় কিনা তাও ভাবছে—ইতিমধ্যে পুলিশ-মহল আত্মীয়-মহল থেকে কত রকম জেরাই না হয়ে গেছে।

'মা'—কান্নায় জড়ান বলিষ্ঠ পুরুষের কণ্ঠস্বর।

নিষ্প্রভ লণ্ঠনের আলোয় মেয়েটি সোমনাথের দিকে প্রথম চাইলে। পরিণত যৌবনের মানুষটির শান্ত বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে ভরসা পেল বোধ হয়।

—'কিছুদিন থেকে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল! কিছুতেই ডাক্তার দেখাবেন না। অনেক বলা-কওয়ার পর শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তার দেখান হল তখন তিনি বললেন বুকের ছবি নিতে। বুকের ছবিও তোলা হল—ডাঃ সেনই ছবি তুলেছিলেন। তিনি আভাষ দিয়েছিলেন বুকে দোষ ধরেছে—অবশ্য ভরসাও দিয়েছিলেন, বলেছিলেন চিকিৎসা পথ্য আর নিয়মিত থাকলে সেরে যাবে। ডাক্তার কি করে জানবেন তা সম্ভব নয়। দুদিন খুব মুসড়ে পড়েছিলেন—তারপর একদিন সারাদিন ধরে খাওয়া দাওয়া হাসি গল্প। আর সেই রাত্রেই.....'

ও'রা জানতে পারেননি কখন বৃদ্ধা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। বললে—'চিঠি লিখে রেখেছিল বাছা—দেখাও না বৌমা চিঠিটা ওঁকে।'

—'কি হবে মা, তাছাড়া আসল চিঠিখানা ত পুলিশে নিয়ে গেছে। ওটা একটা কপি করে রেখেছিলুম।'—বললে বটে, তবু ভেতরে গিয়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ এনে ও'র হাতে দিয়ে আলোটা উঁচু করে তুলে ধরলে:

'পুতুল, আমরা সবাই যা সন্দেহ করেছি, অথচ কেউ কাউকে স্পষ্ট করে বলিনি—ব্যাপারটা তাই। ডাঃ সেন অবশ্য অনেক ভরসা দিয়েছেন, চিকিৎসা, পথ্য, আরো কত কি? ডাক্তারী শাস্ত্রে কখন কি করা উচিত—তার নির্ভুল নির্দেশ আছে—কিন্তু কি করে সে নির্দেশ পালন করা যায় তা আজো লেখা হয়নি। তাই বিদায় নিচ্ছি। শুনেছি গর্ভস্থ সন্তানকে নাকি পৃথিবীর পাপ স্পর্শ করে না—বাপের পাপের সংক্রমণ থেকে তাকে বাঁচাতে চাই। চলি—'

উঁচু করে তোলা হারিকেনের আলোতে মেয়েটির মুখ প্রথম ভাল করে দেখলেন সোমনাথ। পুতুল! সত্যিই পুতুল, কত বয়স? উনিশ? কুড়ি? একুশ? খুব বেশী হয়ত তেইশ।.....গর্ভিণী! চোখ নিচু করলেন ডাক্তার, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—'আমিই ডাক্তার সেন।'

পুতুল ফ্যালফ্যাল করে তা'র দিকে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে তার ভেতরটা পড়তে পারলেন না সোমনাথ। প্রয়োজন ছিল না তবু নিজে থেকেই বললেন—'এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখে যাই.....' একটু থেমে বললেন—'এক্স-রে ছবিটা তোমার কাছে আছে মা। যদি থাকে......'

পুতুল ভেতরে চলে গেল। ট্রাঙ্ক খুলে স্কায়োগ্রামখানা এনে ও'র হাতে দিল। লণ্ঠনের আলোয় একবার দেখবার চেষ্টা করলেন—ভাল বোঝা যায় না—তবু......তবু......। ও'র হাতটা আবার কাঁপছে। পুতুলের কাছে ও ছবিখানা অর্থহীন—আসলে ওটা ছবিই নয়। ওতে মানুষটির মুখ নেই, অনেক খুঁজলেও ওর ভেতর একটি তেইশ বছরের বিধবার স্মৃতির সম্বল পাওয়া যাবে না—আকৃষ্ট হবার মত কোথাও কিছু নেই। অপরাধীর মত বললেন সোমনাথ:

—'ছবিখানা আমার কাছে রাখব মা?'

—'কি হবে বলুন, আমার ঐ ছবিতে, আপনার কাজে লাগলে রেখে দিন।'

সোমনাথ লজ্জায় বেদনায় মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত সত্তায় একটা অনুচ্চারিত ধিক্কার—ছিঃ। কি ভাবলেন তিনি। বোধ হয় কিছুই নয়, নিমাই বিশ্বাস, তার বৃদ্ধা মা আর তরুণী স্ত্রী তার জীবনের ভারকেন্দ্রে ভয়ানক ঝাঁকানি দিয়ে গেছে—কোথায় যেন একটা বিশাল বিপুল পরিবর্তন!

স্তব্ধতা ভেঙে বৃদ্ধাই প্রথম বললে: 'হ্যাঁ বাবা বসবে না।'

'এ্যাঁ—' যেন তন্দ্রা ভেঙে জেগে উঠলেন ডাক্তার। 'বসব—হাঁ বসব বইকি। কাল সকালে আবার আসব। কিন্তু একটা কথা, আমি ডাক্তার আমার কাছে লজ্জা করবেন না—আপনার বৌমা কতদিন......

'এই ছ-মাস চলছে বাবা—'

পুতুল মাথা নিচু করেছে। লজ্জা করল, তবু বললেন: 'কোন ডাক্তার...' আবার কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা।—'কোথায় পাব বাবা—নিমাই যে আমায় এমন করে হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে যাবে তা কি কোনোদিন ভেবেছিলুম। তার উপর বৌও হয়েছে তেমনি। খায়না দায়না দিনরাত দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে। আর সব চেয়ে বিপদ হয়েছে বাবা পাড়ার বখাটে ছেলেদের নিয়ে—মাঝ রাতে এসে কড়া নাড়ে, জানালার ফাঁক দিয়ে নোট ফেলে দেয়—কেউ কেউ ঢিল ফেলে—এই সোমত্ত বৌ নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াই বলত বাবা।'

—'ও'র বাপের বাড়ী?'

'হায় ভগবান! বাপের বাড়ী থাকলে ত কথাই ছিল না। সেখানে ফেলে দিয়ে যেদিকে দুচোখ যেত চলে যেতুম। বউ হয়েছে আমার গলায় বাঁধা কলসী।'

দূর থেকে কে একজন শিস দিয়ে উঠল।

'ওই-ওই শোন বাবা'—তারপর অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করে গাল পাড়তে লাগলেন—'সামনে আয়না মুখপোড়া মড়া—ভাতার খেয়েছি, পুত

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

দুঃখের কুড়ি

গৌর দত্ত

প্রাণ হ'তে প্রাণে
রামকিংকর সিংহ

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LLC-6 BEN
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা

মরু-তৃষা
শ্রীকৃষ্ণধন দে

বরষার মেঘ যদি এনে দেয় কেউ,
এ মরুতে খেলে যদি সাগরের ঢেউ,
যদি কভু দেখা দেয় শ্যামল কানন
ফলে-ফুলে ভরা, ছায়া-স্নিগ্ধ মোহন,
—যা' কিছু পাইনি আমি, শুধু তারি তরে
কত আশা কত তৃষা আজো কেঁদে মরে!

আমার এ বুকে যদি বসিত নগরী,
নদীতটে বধূদল ভরিত গাগরী,
কত-সে মিনার থাম প্রাচীর প্রাসাদ
আমার এ বুকে উঠি মিটাইত সাধ,
যা' কিছু পাইনি আমি, শুধু তারি তরে
কত আশা কত তৃষা আজো কেঁদে মরে!

আমার এ বুকে যদি হিমালয় পাই
ধবল শিখর তার সোনায় সাজাই,
তুষার-নদীর বুকে জ্যোছনার আলো
স্বপনে দেখেছি যারে, কোথায় হারালো!
—যা' কিছু পাইনি আমি, শুধু তারি তরে
কত আশা কত তৃষা আজো কেঁদে মরে!

যদি কোনো হ্রদ দোলে এ বুকে আমারি,
সাদা পাল তুলে নাচে তরী সারি সারি,
উড়ন্ত মাছের ডানা ছোঁয় নীলজল,
প্রভাত কিরণ মেঘে করে ঝলমল,
—যা' কিছু পাই নি আমি, শুধু তারি তরে
কত আশা কত তৃষা আজো কেঁদে মরে!

আনো, আনো বুকে মোর নায়েগ্রা প্রপাত,
মেরুর নিশীথ-রবি, ঝঞ্ঝা-আঘাত,
তুন্দ্রার তন্দ্রার স্তিমিত প্রহর,
অগ্নিগিরির স্রাবে গৈরিক সাগর,
যা' কিছু পাইনি আমি, শুধু তারি তরে
কত আশা কত তৃষা আজো কেঁদে মরে!

ফিরে এসো
স্বপ্না সেন

স্বর্ণালী, ওগো স্বর্ণালী, শোনো একটি কথা,
চপল চরণে চঞ্চল চোখে যেয়ো না চলে—
সুনীল আকাশে এখনও ফোটেনি সন্ধ্যা তারা,
দীঘল নয়ন ফিরায়ো না সব কথা না বলে।
সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে ধীরে ধরার বুকে—
গোধূলির রঙে রাঙা হয়ে এলো সাগর বেলা—
স্বর্ণালী, তুমি যেওনা এখনই ধূসর পথে,
এখনও থামেনি আলো ও ছায়ার নীরব খেলা।
তোমার চোখের নীল হ্রদে আজ উঠেছে ঢেউ
লেগেছে জোয়ার আমারও মনের নদীর কূলে,
সীমাহীন শুধু নীল বিস্ময়ে স্তব্ধ সবি
স্বপন ভরানো সব কথা গান গিয়েছি ভুলে!
স্বর্ণালী, শুধু বারেকের তরে ফিরাও আঁখি,
ঐকতানের রেশ আজো বাজে জীবন মাঝে—
নেভেনি প্রদীপ, ফুরায় নি কথা, গান ও হাসি,
স্বর্ণালী, ফিরে এসো সোনাঝরা মদির সাঁঝে।

গল্পের নায়ক
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

এই যে জীবন, প্রেম, সব যেন গল্পের কাহিনী।
তাদের নায়ক যারা প্রতিদিন চিনি বা না চিনি
তবু তারা কতোভাবে,
আমার প্রাঙ্গণে এসে পদচিহ্ন ফেলে ফেলে যাবে।
আর আমি বসে থাকি বিয়োগান্ত নাটকের পারে
যবনিকা নেমে এলে আলো-নেভা ভেজা অন্ধকারে,
দর্শকের কলরব
থেমে গেল, প্রেক্ষাগৃহ অদ্যকার মতন নীরব।
তারপর! তারপর নায়কেরা ফিরে যাবে ঘরে
প্রেমের নিপুণ শিল্প ছুঁড়ে দিয়ে পথের ওপরে
অন্ধকার গলি থেকে,
একটি নিঃসঙ্গ আলো পৃথিবীর কান্না
জেবলে রাখে।
আমিও নায়ক, জানি,—আমি সেই গল্পের
কাহিনী
নিজেকেই নিয়ে লিখি; হতভাগ্য সে
'আমি'কে চিনি।

তোমাকে ভালোবাসার পরে
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে ভালোবাসার আগে ভেবেও
দেখিনি তো—
পৃথিবী-জোড়া ভয়ের হাত,
আকাশ থমথমে;
স্তব্ধ দিনরাত্রি, মেঘে বিষের
ধোঁয়া জমে;
মেরু তুষার চমকে ওঠে,
কাকলি ভোলে পাখি;
বিস্ফোরণে বাতাস ভারী,
আকাশ সচকিত;
প্লাবনমুখী নদী, পাহাড়
আশঙ্কায় কাঁপে;
প্রাণের ভাষা ব্যর্থ হয়
কেবল অপলাপে।
নিজের অপরাধের বোঝা
কোথায় আমি রাখি!
তোমাকে ভালোবাসার আগে
ভেবেও দেখিনি তো—
চোখের জলে ভাসতে হবে,
ব্যাকুলা হবে তুমি;
দিনের বুকে জ্বলবে চিতা,
সুখের পীঠভূমি
লালসাময় মাকড়সার লোভের
হবে বাসা!
সোনালি দিন, স্বচ্ছ হাওয়া
কোথায় অপসৃত!
অপরিসীম অভিলাষের
সাংকেতিক কথা;
করুণ এপিগ্রামে কোথায়
জীবন-সফলতা!
তোমাকে ভালোবাসা আমার,
আহারে ভালোবাসা!

কাছে-দূরে
শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কত কাছে, কত কাছে—
তবু কেন আবেগের দুস্তর দরিয়া
পার হতে সেতু চায়, এই দুটি হিয়া।
দ্বিধা ও শংকার ঢেউ ফণা তুলে
হয়তো করেছে বুঝি একান্ত বিহ্বল,
পূতগন্ধী অবিশ্বাস মলিন গভীর তার জল।
এত কাছে, এত কাছে নরম বুকের তাপ,
ঈষদুষ্ণ হাতের সোহাগ,
ফিস ফিস কানে কানে কথার মহিমা ঃ
তবু যেন দূরে কত,
ভূগোলের পরিধির সীমা
ছাড়িয়ে অনেক দূরে, পৃথিবীর সমস্ত দ্রাঘিমা
পার করে তবুও ঠিকানা
কখনো হবে না বুঝি জানা।
কাছে, জানি অতি কাছে
তবু কিন্তু প্রাণে প্রাণে দুস্তর দরিয়া বয়;
মন চায় মুছে দিতে
হিসেবের খাতা থেকে লাভ ক্ষতি ক্ষয়,—
সরে যেতে চায় ভূগোলের স্নেহের শাসনে
কাছ থেকে দূরে যেতে—
এক মন থেকে অন্য মনে।।

তুমি
মানস রায়চৌধুরী

হাসলেই বাজে কান্নার মত রোল
আর্তশব্দে পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনিত ভ্রান্তি
তবে কি শ্রবনে বিভ্রম আজ স্বপনের মত প্রিয়?
অথচ সকাল তোমার মুখের রহস্যে কেঁপেছিল
দুপুরবেলার রৌদ্র জানালো সময় ভ্রাম্যমাণ
এত তাড়াতাড়ি বেলা সরে যায়, এ কেমন প্রস্থান?
কান্না যদিও মেঘমণ্ডল গ্রাস করে অতিকায়
তবুও পাথর স্নায়ুর কেন্দ্রে বসে আছে কতকাল
অশ্রুতে যার দুঃখ গলে না, তার পরিণাম তুমি!

প্রার্থনা
নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমরা মানুষ চাই। মানুষের বক্তব্যর থেকে
গোটা মানুষের মূল্য আরো ঢের বেশী;
মানুষের প্রয়োজন বহুদিন
বহুদিন থেকে এ পৃথিবী
অনুভব করেছে এক বিবর্ণ বিবেকে।
বহু কথা হয়ে গেছে—দেশী ও বিদেশী
হাজার কথার পরও—
একটি আলোও কৈ হয়নি বিপ্লবী
আমাদের অন্ধকারে। এ যুগের মানুষের মন
অজস্র ব্যথায় তবু কী যে ম্লান!
অনেক কথার বিনিময়ে
কথারা বেড়েছে শুধু; বক্তব্যের স্তূপ
পরিক্রমা করে করে আমাদের হৃদয় এখন
ক্লান্ত হয়ে গেছে। এক বৃষ্টির বিস্ময়ে
পৃথিবী এখন চায়—
সৃষ্টির স্বধর্মে ধৃত স্বপ্ন, শান্তি চুপ।
তারপর রৌদ্রের ঘরে তারা ফের বাঁচবে নির্ভয়ে॥

॥ গল্প ॥

নীলকন্ঠ পাখি

অগ্নিমিত্র

নীলকণ্ঠ পাখিটা খাঁচার ভেতর হঠাৎ ডানা ঝটপট করে উঠলো। চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে রিণি। আমার অন্নদাতা মনিব ডক্টর সুদর্শন ঘোষের পাঁচ বছরের মেয়ে। তাকে দেখে পাখিটা ডানা ঝটপট করতে করতে খাঁচার ভেতর এপাশ ওপাশ করছে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই রিণি বিরক্তভাবে বললে, তোমার পাখিটা ভারী পাজী। আমি কাছে এলেই ওমনি করে। ওকে তুমি ছেড়ে দাও চন্দন মামা।

তার চেয়ে ওকে নর্দমায় ফেলে দিই, কেমন?

আবার ওই কথা? চোখ মুখ কুঁচকে রিণি বললো, তোমাকে কতদিন বলেছি না, নোংরা জিনিসকে মা বলতে নেই? কী ঘেন্না মাগো—

নর্দমাকে কী বলবো তবে?

কেন, নর্দ বলবে। শোনোনি, আমিও তো নর্দ বলি?

হাসি চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কে ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকিয়েছে জানি না। নর্দমাকে ও কিছুতেই নর্দমা বলতে রাজী নয়।

হাসি লুকিয়ে বললাম, আচ্ছা, এখন থেকে তোমার মতোই বলবো।

ছাই বলবে। ঠোঁট উল্টে রিণি বললে, তবে এতদিন বলোনি কেন? তোমাকে কতবার বলি, শুধু তুমি আমার কথা শুনবে না!

হাতে অনেক কাজ। সময় খুবই কম। তবু ওর সঙ্গে একটু মজা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। অথবা ও আসার ফলে এতক্ষণের অস্বস্তি থেকে অন্ততঃ একটু রেহাই পেয়েছি।

রিণিকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, এবার দেখো তোমার কথামতো নর্দমাকে নর্দ বলবো। জামাকে জা বলবো, তামাকে বলবো তা—

যাও, তোমার শুধু ঠাট্টা!—ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল রিণি।

পাখিটা চুপ করে দাঁড়ের ওপর বসেছে।

কাগজপত্র টেনে নিয়ে আবার বসলাম। হাতে খুব কম সময়। আজ রাতে দমদম থেকে বিদেশে পাড়ি দেবেন ডক্টর ঘোষ। আগামীকাল থেকে আমার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না এ বাড়ীতে। দুপুরে বেরিয়েছেন ডক্টর ঘোষ। পাঁচটার মধ্যে ফিরবেন বলে গেছেন। অথচ এখনো কাজগুলো শেষ করে উঠতে পারিনি। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

একটু আগেই স্বামীর খোঁজ নিতে জয়ন্তী নিজে এসেছিল এঘরে। তিনি কোথায় গেছেন তা আমি বলতে পারিনি। যেটুকু জানি সেটুকু অবশ্য বললাম।

একটু মুচকি হাসি হেসে জয়ন্তী বললে, কেমন প্রাইভেট সেক্রেটারী আপনি বলুন তো? কোনো খোঁজই রাখেন না—

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মনে হল, মুচকি হাসিটুকু আমাকে উপলক্ষ্য করে তার নিজের উদ্দেশেই বাণ। জয়ন্তীর দাদা সুশীল ছিল আমার সহপাঠী-বন্ধু। দু'বছর আগে চাকরি যাওয়ার পর যখন অসহায়ভাবে যাহোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় ঘুরছিলাম তখন জয়ন্তীর চেষ্টা আর সুপারিশে ডক্টর ঘোষের প্রাইভেট সেক্রেটারীর চাকরীটা পেলাম আমি। বিখ্যাত সার্জন, তিন-চারটে ভারী শিল্পের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য ডক্টর সুদর্শন ঘোষ। দম ফেলার ফুরসৎ নেই তাঁর।

দু'বছর আগে জয়ন্তী আমাকে চাকরি দিয়েছিল। দু' বছর পরে আজ স্বামীর সম্বন্ধে খোঁজ নিতে তাকেই আসতে হয়েছে আমার ঘরে। মুচকি হাসিটুকু তাই নিজের উদ্দেশে বই কী।

জয়ন্তী বললে, পাঁচটা তো বাজতে চললো, এখনো ফেরবার নাম নেই। এরপর এসে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে সারা বাড়ী মাথায় করবেন তা আমি খুব জানি।

অবাক হয়ে করেক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। তিন চার বছর ধরে অভিনয় হতে হতে যে নাটকের একটা অংক আজ কয়ঘণ্টা পরেই শেষ হতে চলেছে, সে নাটকের নায়িকা কতখানি নির্বিকার। হয়তো এইটেই শেষ অংক। বারো ঘণ্টার পর একজন পাড়ি দেবে ছ' সাত হাজার মাইল দূরের পথে। কাল সকালে আর একজন চলে যাবে বাপের বাড়ীতে। দু' বছর পরে ডক্টর ঘোষ ফিরবেন বলেছেন। ফিরবেন কিনা জানি না। যদিওবা ফিরে আসেন তবু, জয়ন্তী আবার এই বাড়ীতে এসে নতুন করে তার ভূমিকাটুকু ঝালিয়ে নেবে না তা আমি বুঝতে পেরেছি। স্বামীর এই বিদেশ যাত্রা হয়তো চিরবিচ্ছেদের প্রথম পর্ব সে কথা কি জয়ন্তী জানে না? আমার চেয়েও ভালো করে জানে। অথচ তার চোখের চাউনি আর মুখের কথায় তার লেশমাত্র আভাস নেই।

হঠাৎ কী হল জানি না। মনিব-পত্নীকে তো আগে জয়ন্তী বলেই চিনতাম। তার এই প্রচণ্ড নিস্পৃহতা আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠলো। বললাম, যাওয়ার পুরোপুরি ইচ্ছে হয়তো ডক্টর ঘোষের নেই।

আপনাকে কিছু বলেছেন তিনি?

না, তবু আমার মনে হচ্ছে, তুমি ইচ্ছে করলে এ যাওয়া বন্ধ করতে পারো। এমনকি, তিনি যদি ফিরে এসে শোনেন যে, তুমি তাঁর পাশপোর্ট আর প্লেনের টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দুখানা থিয়েটারের টিকিট কেটে অপেক্ষা করছ, তাহলে তিনি আজ বিকেলে হয়তো জীবনে সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তে—

কী পাগলের মতো কথা বলছেন! অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো জয়ন্তী।—তাঁর যাওয়া কেন বন্ধ করতে যাবো আমি?

ইচ্ছে হল, ঠাস করে তার গালে একটা চড় মেরে বলি, গোঁয়ার মেয়ে, অভিমান সে-ই তো করে, যে যত গভীরভাবে ভালোবাসে।

আমার চাউনিতে জয়ন্তী হয়তো কিছু লক্ষ্য করে থাকবে। বড়ো বড়ো দুটো চোখে তখন তার অভিনয়ের চিহ্ন আর নেই। শান্ত গলায় বললে, সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে, এখন কি ওকথা ভাবা যায় চন্দনবাবু?

আমিও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছি। বললাম, এত কথা যদি বোঝো তবে তুমিও গেলে না কেন ওঁর সঙ্গে? এতবার করে বললেন তবু, তো তুমি মত পাল্টালে না!

জয়ন্তীর মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠলো।—চন্দনবাবু, আমার স্বামীকে আমি ডাক্তার বলেই জানি। যদি দেখতাম ভিজিটিং সার্জন হয়ে ডক্টর ঘোষ যাচ্ছেন তাহলে আমি যেতাম। নিশ্চয়ই যেতাম আমার স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু যিনি যাচ্ছেন তিনি সার্জন ডক্টর ঘোষ নন, বিজনেস ম্যাগনেট মিস্টার ঘোষ। আমি যাবো কোন্ পরিচয়ে বলুন?

যা তোমার সত্যি পরিচয়।

জয়ন্তী মুখ নামিয়ে বললে, পরিচয়টা ঠিক এভাবে আমি চাইনি।

এক বছর আগে ইয়োরোপ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল ডক্টর ঘোষের কাছে। ভিজিটিং সার্জেন হিসেবে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে চেয়েছিলেন ওদেশের কয়েকটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যাওয়া হয়নি তাঁর। সিমেন্ট আর চিনি-শিল্প তখন একটা দুর্যোগ যাচ্ছিল। সে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠবার দায়িত্ব অনেকখানি। অবকাশ হল না ডক্টর ঘোষের। অসম্মতি জানিয়ে যে চিঠি তিনি ওদেশে পাঠালেন, সেগুলো আমিই লিখে দিয়েছিলাম। সেই সময় কয়েকটা দিন মরীয়ার মতো চেষ্টা করতে দেখেছিলাম জয়তীকে। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। জয়তিলক পরাবার জন্যে যে উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে কম্পমান হাতের আঙুল কটি সে তুলেছিল তা আর পৌঁছল না ডক্টর ঘোষের ললাট পর্যন্ত। শিল্প-কারখানার ডিরেক্টর তাঁর সজল দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ।

রিণি ছলছল চোখে কয়েকদিন আমাকে বলেছে, মা খালি খালি কাঁদে, আমারও কান্না পেয়ে যায়। তুমি মাকে কাঁদতে মানা করে দাও চন্দন মামা!

জয়তী মুখ তুলে তাকালে। নিষ্প্রভ করুণ একটু হেসে বললে, ছোটবেলায় যখন বার্মায় ছিলাম তখন একটা বুড়ীকে দেখেছিলাম চন্দনবাবু। তার কথা মনে পড়ছে। উত্তর বার্মায় একটা স্টেশনে বাবা তখন কাজ করেন। বুড়ীটাকে মাঝে মাঝে দেখতাম স্টেশনের সাইডিং-এ রাখা মালগাড়ীর গা চাটছে। আমি কৌতূহল সামলাতে না পেরে একদিন বুড়ীকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম, তুমি অমন করে গাড়ীর গা চেটে বেড়াও কেন বলতো? বুড়ী প্রথমটা ভয় পেয়ে গেল। তারপর ভয় কাটিয়ে দিতে একটু করুণ হাসি হেসে বললে, কী করবো বাছা, তেমন পয়সা তো নেই যে নাপ্পি কিনে খাবো! অথচ অমন ভালো জিনিসটা না খেলে জীবনই বৃথা। তাই যখন দেখি গাড়ী ক'রে দক্ষিণের মানুষদের জন্যে নাপ্পি চালান যাচ্ছে তখন এসে গাড়ীর দরজার ফাঁক দিয়ে চেটেপুটে একটু করে খেয়ে যাই। তুমি আবার তোমার বাবাকে বলে দিও না বাছা, তাহলে এই সুখটুকুও আমার বন্ধ হয়ে যাবে।—আমি অবশ্য বাবাকে বলিনি কখনো।

গল্পটা বলে নিজেও একটু হাসলে জয়তী। —চন্দনবাবু, সবচেয়ে প্রিয় জিনিস নিজের সামর্থ্যে জোগাড় করতে না পারলে বরং খাবো না। কিন্তু সেই বেচারা বুড়ীর মতো গাড়ীর গা চেটে নাপ্পির স্বাদ নেবার রুচি আমার নেই।

জয়তী চলে গেল।

নীলকণ্ঠ পাখিটা দাঁড়ের ওপর বসে ঘাড় কাৎ করে কী যেন দেখছে।

ডক্টর ঘোষ রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেননি, পায়চারি করেছেন। জয়তী কী চায় তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু তিনি যে জয়তীর কাছে একটু শ্রদ্ধা, একটু ভালোবাসা পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তা আমি দিনের পর দিন অনুভব করেছি। তিনি তা পান নি।

অসহায় ছেলেমানুষের মতো তিনি আমাকেই একদিন বললেন, আর কী করলে আমি ঘরের শান্তি ফিরে পাবো বলতে পারো চন্দন? জয়তী কাকে ভালোবাসে—আমাকে, না আমার ডাক্তারী খেতাবটাকে?

আমি চুপ করে রইলাম।

ডক্টর ঘোষ ছটফট করতে করতে পায়চারি করছিলেন। আমার কাছ থেকে সত্যিই কোনো জবাব হয়তো তিনি চান না। নিজেই আবার বললেন, সে বলে জীবনের একটা মস্ত বড়ো সাধনাকে খতম করে দিয়ে আমি নাকি চিনি আর সিমেন্টের বস্তা ঘাড়ে করে সমাজের সংগে বেইমানি করেছি। তুমি বলো তো চন্দন, ইন্ডাস্ট্রিকে বড়ো করে তোলার কাজটা কি সমাজের কোনো কাজ নয়? তাঁর মতে নাকি ডাক্তারী পড়ার অপচেষ্টা করে অন্তত আর একজন লোকের ডাক্তার হওয়ার পথ আমি বন্ধ করেছি। আমি না পড়লে আমার সিট্‌টা আর একজন পেতে পারত। সিলি!

হঠাৎ আমার কাছে এসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বললেন, তুমি কি বলতে পারো চন্দন, আর কাউকে জয়তী ভালোবেসেছিল কিনা? আমাকে সে স্পষ্ট করে বলুক, আমি তাকে মুক্তি দেব। তার এই অশ্রদ্ধা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমাকে যে প্রশ্ন তিনি করেছেন তাও তাঁর স্বগতোক্তি। আমি এবারও চুপ করে রইলাম।

কথা বলছ না যে?

চমকে উঠলাম। অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর ঘোষ।

আমি বললাম, আমাকে মাপ করবেন। আপনার স্ত্রীকে আমি চিনতাম বটে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনো।

ডক্টর ঘোষ আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, আমিই বলছি, শোনো। জয়তীর প্রথম যৌবনে আমিই তার জীবনে প্রথম পুরুষ। আর কেউ সেখানে ভাগ বসায়নি। কিন্তু তবু এরকম হ'ল কেন?

এরকম হ'ল কেন, তাতো আমার জানবার কথা নয়।

তিনি নিজের কামরায় চলে গেলেন সেদিন। আমি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। আমার জানবার কথাই বা নয় কেন? উর্মি এখনোতো বেঁচে আছে। বেঁচে আছি আমিও।

রিণির কথাটা কানে বাজছে। নোংরা জিনিসকে মা বলতে নেই। একথা রিণির মুখে সাজে।

আর জয়তীর সেই ম্লান হাসিটুকু। মাত্র পাঁচ ছ' ঘণ্টা পরে যে মেয়ের স্বামী দীর্ঘকালের জন্যে সাত হাজার মাইল দূরের পথে রওনা হবে, তাকে স্বামীর খোঁজ নিতে আসতে হয়েছে বাইরের একটা লোকের কাছে।

বছর তিনেক আগের এক শীতের রাত।

আর একটি পুরুষ, আর একটি নারী। আমি আর উর্মি। ছাড়াছাড়ি হবার পর প্রায় এক বছর বাদে দেখা।

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে সেদিন। চিত্তরঞ্জন এভিনু্য দিয়ে হাঁটছিলাম। ইচ্ছে ছিল একটু মদ খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে নেব। বার-এ ঢুকতে গিয়ে ঢোকা হল না। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে উর্মি। তার পাশাপাশি আমার ভূতপূর্ব মনিব শিবদাস আচার্য।

আমাকে একেবারে মুখোমুখি দেখে হয়তো একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল উর্মি। চোখ দুটো অল্প অল্প লাল। চোখের পাতায় মাদকের অবসাদ। আমাকে হতবাক করে দিয়ে হঠাৎ বিপুল খুশির উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লো উর্মি।—মাস্টার মশাই, আপনি? নিশ্চয়ই কাউকে খুঁজতে এসেছেন এখানে?

ক'কে ও মাস্টারমশাই বলছে!

উর্মি আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই শিবদাসকে বললে, মিস্টার আচার্য, ইনি আমার মাস্টারমশাই শ্যামল দত্ত। অদ্ভুত ভালো পড়াতেন। আর মাস্টারমশাই, ইনি শিবদাস আচার্য—বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন।

আমার চেয়ে অনেক বড়ো দরের অভিনেতা শিবদাস আচার্য। বিগলিতভাবে বললেন, আপনার কথা উর্মির মুখে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। পরিচিত হয়ে ভারী আনন্দ পেলুম।

আমি তাঁর সংগে তাল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে বললাম। আপনার নামও শুনেছি। বিখ্যাত লোকের সংগে পরিচয় তো সৌভাগ্যের কথা।

উর্মি বললে, অনেকদিন পরে মাস্টারমশাইয়ের সংগে দেখা। ওঁর সংগেই আজ চলে যাই মিস্টার আচার্য। উনিও পুরনো ছাত্রীর বাড়ী নিশ্চয়ই ঘুরে যাবেন।

অবশ্যই!—উচ্ছ্বসিত শিবদাস বললেন চলো তোমাদের ট্যাক্‌সিতে তুলে দিই। আসুন শ্যামলবাবু।

শীতের কলকাতায় রাত দশটা। ধোঁয়া আর কুয়াশা ঠেলে ট্যাক্‌সি ছুটছে। গদীর ওপর মাথা এলিয়ে দিয়েছে উর্মি।

প্রথম কথা সে-ই বললে, কেমন আছ?

ভালো।

বিয়ে করেছ আর?

না।

আমি কেমন আছি জানতে চাইলে না তো? তোমায় জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, আমি ভালোই আছি।

বলবার মতো একটা কথাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

আনন্দ রূপ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিকেলে হেলানো রোদ দেবদারু গাছের মাথায়
সুচারু পাতার ফাঁকে আলোরই ঝালর ঝোলায়—
ঘন কাঁচ সবুজের বর্ণালীই ছুঁয়েছে দু'চোখ,
ছায়া ছায়া গাছেদের অস্তিত্বের ঘোষণা চমক।

গোধূলি গোলাপী রঙে পশ্চিমের সীমিত আকাশ
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ যত রঙ্ মেখে অজস্র উচ্ছ্বাস,
বাতাসে গতির বেগ, পুকুরের জলে দেখি কত
চঞ্চল মসৃণ স্রোত,—জীবনের রূপকারে রত।

মেঘ চলে, ঢেউ চলে, দিন চলে রাত্রির গভীরে;
আমরা জলের ধারে দু'চারটি ফড়িঙের ভিড়ে
নিজেদের নাম রাখি,—তাদের ডানার জাফ্‌রানী
গাঢ় রঙ্ আমাদের অবয়বে দু'চোখ ধাঁধানী।

জীবন জটিল তবু অনেকের কুটিল কলাপে!
ফড়িঙের জলসিঁড়ি ধাপে ধাপে ওড়ার বিলাপে
গোধূলির ফিকে রঙ্, বাতাসের সুমসৃণ ঢেউ,
কিছু নয়;—তবু তাতে আনন্দের
সুর পাবে কেউ।

ঊর্মি হঠাৎ খিল-খিল ক'রে খানিকটা হেসে উঠলে।—কেমন জব্দ? মদ খাবে বলে বার-এ ঢুকেছিলে তো?

হ্যাঁ।

খেতে দিলাম না।

বেশ করেছ। কিন্তু শিবদাসবাবুর কাছে আমাকে খামোখা মাস্টারমশাই বলে পরিচয় দিলে কেন?

এমনি!

কিন্তু উনি আমাকে চেনেন। আমার নাম যে শ্যামল দত্ত নয় তা উনি ভালোভাবেই জানেন।

তাই নাকি?

আগের আপিসে উনিই ছিলেন আমার মনিব। ও'র দয়াতেই আমার চাকরিটা গিয়েছিল।

ঊর্মি হঠাৎ আবার আগের মতো হাসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু শব্দটা কেমন যেন বিশ্রী শোনালো। মাথাটা গদীর ওপর আরও এলিয়ে দিয়ে সে বললে, চমৎকার! একজন তোমার ভূতপূর্ব মনিব, আর-একজন তোমার ভূতপূর্ব স্ত্রী। একসঙ্গে মদ খেয়ে বেরুচ্ছে তোমারই সামনে দিয়ে।

তার ফলে একেবারে মাস্টার মশাইয়ের ভূমিকা দিয়ে দিলে?

ঊর্মি চোখ বুজেছিল। আস্তে আস্তে বললে, আমার হঠাৎ কেমন খেয়াল চেপে বসলো, তোমাকে মদ খেতে দেবো না আজ। শুনেছি মা বলে ডাকার কেউ থাকলে মেয়েরা নাকি অনেক লোভ জয় করতে পারে। মাস্টারমশাই বলে ডাকলে তোমরাও বোধ হয় খানিকটা পারো।

এক বছর আগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। আইন আমার পক্ষে ছিল। আমার উকীল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, ঊর্মি দুশ্চরিত্রা। জজ ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কিছুই বলবার নেই মা? তুমি যা বলতে চাও অকপটে বলো, কোর্ট তোমাকে সাহায্য করবে। ঊর্মি কিছুই বলেনি। এমন কি অসম্মতির 'না' শব্দটাও মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিল।

ঊর্মি বললে, তোমাকে এভাবে সঙ্গে আনায় তুমি বিরক্ত হয়েছ?

না।

কী করবো বলো, কতদিন পরে দেখা! কেমন যেন লোভ হ'ল।

কয়েক মুহূর্ত আবার নীরবতা।

চোখ বুজে থেকেই ঊর্মি বললে, ট্যাক্সি কোথায় যাচ্ছে?

কেন, তোমার বাসায়।

তুমি আমাদের সে বাসাটা রেখেছ, না ছেড়ে দিয়েছ?

ছেড়ে দিয়েছি।

ড্রাইভারকে আরও জোরে চালাতে বলো না! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার।

গাড়ী যথেষ্ট বেগেই ছুটছে। বললাম আমি।

ও।

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো সে। তারপর বললে, মা তোমাকে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। ভাববেন, দুটিতে আবার বুঝি মিল হয়েছে।

রুণু কেমন আছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

ভালো। ওর জন্যে একটা ভালো ছেলে জোগাড় করে দাওনা। আমার বোনটা কিন্তু সত্যিই ভালো মেয়ে। তোমার বউয়ের মতো নয়। একটা ভালো ছেলের খোঁজ পেলে দিও, কেমন?

গাড়ী এসে থামলো পাইকপাড়ার ফ্ল্যাট-বাড়ীর সামনে।

ঘরে ঢুকেই ঊর্মি প্রথমে যেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা হ'ল একটা পাখি। বললে, ওটা কী পাখি জানো? ওর নাম নীলকণ্ঠ। আমি পুষেছি।

আমি এর আগে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিনি। ভারী অদ্ভুত লাগলো আমার। পাখিটার সারাদেহ নীল। শুধু গলাটা নীল নয়। অথচ নাম নীলকণ্ঠ।

ঊর্মি বললে, ওইটুকুই তো মজা। কী সুন্দর একটা মেকি নাম বলোতো?

সুন্দর একটা মেকি নামই বটে।

ঊর্মি বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে। কিছু খেয়ে যাও। আপত্তি নেই তো?

না, আপত্তি নেই।

তাহ'লে তুমি একটু ব'সো। আমি এখুনি আসছি।

সে প্রস্থানোদ্যত হ'তেই বললাম, আমার আসার কথা তোমার মাকে বলতে চাও কি?

তুমি কী বলো?

দরকার নেই।

বেশ, তাই হবে। তাছাড়া তিনি এখন ঘুমিয়ে আছেন, জানতে পারবেন না।

ঊর্মি চলে গেল পাশের ঘরে।

প্রচণ্ড শীতের রাত। মদ খাইনি তবু গরম লাগছে। আমার উকীল আদালতে প্রমাণ করেছিলেন, ঊর্মি দুশ্চরিত্রা। আমি সে প্রমাণটা কি সত্যিই চেয়েছিলাম?

ছোটবেলায় খেলার সাথী মেয়েগুলোকে কত সহজে চুলের মুঠি ধরে আমার কথা মানতে বাধ্য করতাম! হায়, সে বয়েসটা আজও যদি থাকত! সেই অপরিণত বুদ্ধি, সেই গোয়ার্তুমি, সেই অধিকারবোধ!

শাড়ী পালটে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এলো ঊর্মি।

স্টোভ জ্বালিয়ে কিছু একটা চাপিয়ে দিয়ে এসেছে হয়তো। সোঁ সোঁ করে স্টোভের শব্দ আসছে।

আবার দেখলাম। হ্যাঁ এই মেয়েটাকেই ভালোবাসতাম আমি। একেই দাঁড় করিয়ে-ছিলাম কাঠগড়ায়। চুলের মুঠি ধরে আমাকে মানতে বাধ্য করিনি।

কী দেখছ? প্রশ্ন করলে ঊর্মি।

চমকে উঠলাম। ম্লান কণ্ঠে বললাম, পাখিটাকে।

আমি ঠিক বলেছি না?

হ্যাঁ।

আর কখনো তুমি ওই বার-এ মদ খেতে যেয়ো না। দেখা হয়ে গেলে ভারী বিচ্ছিরি লাগবে আমার। বললে ঊর্মি।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, সেই মুহূর্তে একটা আর্তনাদ আমার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। অথচ আর্তনাদ না করে আমি অন্য কথা বলতে পারতাম। দু'হাতে তার চুলের মুঠি ধ'রে নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে অঝোরে কাঁদাতে পারতাম তাকে। আমার বুকে মুখ গুঁজে অনেকদিন পরে

আমি বন্দী হবো

শচীন দত্ত

আকাশে জড়িয়ে দাও যন্ত্রণার রঙ
তবু বন্দী হবো।
জাহাজীরা আলো ফেলে কী এক ভীষণতর তৃষ্ণা
বুকে স্বপ্নের আলেখ্য, অতিদূরে জলপথে একা
রহস্যের হাতে হাত রেখে
দিন গুণে রাত গুণে নক্ষত্রকে ভালোবেসে
ঝড়ো হাওয়া বাতিঘর সম্মোহিত সমুদ্রের স্বর
তুচ্ছ করে আলোরেখা হাতছানি জলপরী সব।
তুমি কি জেনেছো এই সব ইচ্ছা-আর্তির পরিধি
এই জলের পৃথিবী
অন্তহীন রহস্যের মায়াবী ভূগোল
পরিক্রমা করে কিছুক্ষণ আবারো ফিরতেই হবে
বিশৃঙ্খল মন যেন টানে
ফেলে-যাওয়া উপকূলে, মাটির মরমী
গন্ধ সে কি যায় ভোলা—
মন তার জানে।
তবে দাও অন্ধকার অস্থির আকাশে
একটি নিষ্ঠুর নাম ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মতন
আশে পাশে উচ্চারিত অস্ফুট আওয়াজে
গুঞ্জরিত হোক তবু বন্দী হবো আমি॥

বিপুল আনন্দে কাঁদতে পারত আমার ঊর্মি।

কিন্তু আমি তা করিনি।

নীলকণ্ঠ পাখি।

সুন্দর একটি নিখুঁত মেকি নাম।

আমিও শেষকালে পুষলাম একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আমার ঘরেই ওকে রেখেছি। আমার চোখে চোখে রাখতে চাই পাখিটাকে।

সেই পাখিটাই ডানা ঝটপট করছিল একটু আগে।

তাকিয়ে দেখি সে আবার চুপ করে বসে ঝিমুচ্ছে। খাঁচাটা তখনও একটু একটু দুলছে।

জয়ন্তীও নির্বোধ। তবে আমার মতো ভীরু নয়। আমি জানি, রিণির মা কখনো ভীরু হবে না, ছোট হবে না। রিণির দেমাকটুকু ঠিকই বজায় থাকবে।

কিন্তু জয়ন্তী অন্য একটা কাজ তো করতে পারতো। ডক্টর ঘোষের পাশপোর্ট ভিসা আর প্লেনের টিকিট ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়ে তো বলতে পারত, যাও দিকি, কেমন করে যাবে? ডক্টর ঘোষের প্রশস্তবুকে মুখ গুঁজে সে বলতে পারত, আমি তোমাকে সার্জন সুদর্শন ঘোষ বলেই দেখতে চাই, তোমাকে সাধক-বিজ্ঞানী বলেই জানতে চাই। আর কিছু নয়, আর কিছু তোমাকে করতে আমি দেবো না।

জয়ন্তী তা পারবে না।

সেই অপরিণত বুদ্ধি, সেই গোয়ার্তুমি, সেই অধিকার-বোধ একটুও যদি তার থাকত!

এরোড্রোমে বিমান ছেড়ে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারবে না, আবার দুটো জীবন নিখুঁতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পাখিটা আবার চোখ মেলে তাকিয়েছে। খাবার খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে।

বিশ্রী লাগছে দেখতে। আজ রাতে এরোড্রোম থেকে ফিরে ওকে আর একবার দেখবো। ওকে ছেড়ে দিতেই হবে। পাখিটাকে আর সহ্য করতে পারছি না।

মরা সোনা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গল্প

শ্যামল রায় এ পাড়ায় অল্প কিছু দিন হয় এসেছে। ছোট সংসার। স্বামী আর স্ত্রী। নির্বিরোধী লোক। কে কোথায় কি করেছে, কে কোন্ কথা ব'লল তা নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা নেই। সকাল দশটায় বাড়ীর সম্মুখে একখানি বড় দামী গাড়ী এসে দাঁড়াবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্যামল নেমে আসে। স্ত্রী বন্দনা সদর পর্যন্ত সঙ্গে আসে। গাড়ী চলে যেতে দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। রাত বারটায় আর একবার বন্দনাকে নামতে হয়—শ্যামল যখন ফিরে আসে। এর ব্যতিক্রম এক-দিনের জন্যও ঘটেনি এ পাড়ায় আসবার পর থেকে।

আর একটি নিয়মিত ঘটনা লক্ষ্য করা যায় শ্যামল রায়ের বাড়ীর রোয়াকে। রাত নটার পর থেকেই এক এক করে জনা পাঁচেক আসে পাশের বাসিন্দা, এসে আসর জমিয়ে বসে। এদের আলোচনার ধারাও বিচিত্র। পাড়ার বহু ঘরের অজ্ঞাত আনাচ কানাচ থেকে সুরু করে গোটা পৃথিবীটা এরা সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রদক্ষিণ করে আসে। তার পর সুরু হয় আলোচনা। রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন আর ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ ক'রতে ক'রতে শেষ পর্যন্ত এ পাড়ার খানকয়েক বিশেষ বাড়ীর বিশেষ কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনাটা জমে ওঠে। ফাঁকে ফাঁকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি ধ্বংস হয়। ওদের আলোচনার মধ্যে শ্যামল রায়ের নামটাও মাঝে মাঝে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে শোনা যায়।

আসরের প্রধান ধীরেশ। কথা বলে কম—মাথা নাড়ে বেশী। আর লোটন বিহারী তার গলার জোরে নিজের মতামতটা প্রতিষ্ঠিত ক'রতে ব্যগ্র। কাঞ্জিলাল ওসব রাজনীতি আর পরের ঘরের হাঁড়ির খবর নিয়ে বড় একটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। তার মতে খুঁজে দেখলে অমন মুখরোচক খবর অনেক ঘরেই পাওয়া যায়। তার চেয়ে সে বরং তার মৎস্য শিকারের কাহিনী শুনিয়ে আনন্দ পায়।

আলোচনাটা আজও প্রতিদিনের মত জমে উঠেছে। কাঞ্জিলাল তার শিকার কাহিনী সুরু ক'রতেই লোটন বিহারী একবার গলা খাঁকারি দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তুমি থাম ত কাঞ্জিলাল...

অনতিদূরে ডাষ্টবিনের কাছে গোটা কয়েক কুকুর শুয়ে ছিল। লোটনের হুঙ্কারে মুখ তুলে একবার বিরক্তি প্রকাশ করে আবার মুখ গুঁজে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। ওরই মধ্যে একটা ডেকে উঠে শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

কি অবস্থাই হ'য়েছে সহর কল্‌কাতার। ডাষ্টবিনের চতুর্দিকে আবর্জনার স্তূপ। পাহাড় প্রমাণ উঁচু হ'য়ে আছে। শুধু এখানেই নয়। সর্বত্র। কারণ দুর্বোধ্য।

লোটন বিহারী ব'লতে থাকে, তোমার ঐ মৎস্য শিকারের বীরত্ব কথা শুনতে আর ভাল লাগে না কাঞ্জিলাল। বড় একঘেয়ে হ'য়ে গেছে। হয় নতুন কিছু বল নয়ত যা বলি তাই শোন।

কাঞ্জিলাল প্রতিবাদ ক'রল, তোমার মত ময়লা ঘাঁটাতেও আমার ভাল লাগে না লোটন। তা সে যতই নতুন নতুন খবর তুমি যোগাড় করনা কেন।

লোটন বিহারী পুনরায় হুঙ্কার দিতে গিয়েও সামলে নিল। তারপর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব খাটো করে বলল, নতুন নয় হে কাঞ্জিলাল, নতুন নয়। তোমার চোখ সবসময় ফাতনার উপর না থাকলে তুমিও দেখতে পেতে। আচ্ছা আপনিই বলুন না প্রেসিডেণ্ট!

ধীরেশ জবাব দিল না বটে কিন্তু তার মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে হেলে আবার স্থির হ'ল।

জবাব না পেয়ে লোটন পুনরায় বলল, অবশ্য ব'লবার এতে আছে কি। জলের মত সোজা কথা। নইলে এত লোক থাকতে বাসব চন্দ্রের দরদ এতটা উথলে উঠলো কেন—

কাঞ্জিলাল বাধা দিল, তাতে হ'য়েছে কি। কুন্তলাদের অভাব আছে আর বাসবের রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত...

লোটন ধমকে কাঞ্জিলালকে বাধা দিল, মৎস্য বিশারদ তুমি বরং মাছের কথা বল কিন্তু মানুষের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না। মাছে মানুষে অনেক ফারাক।

কাঞ্জিলাল বারে বারে বাধা পেয়েও দমল না। বলল, শিকারী বঁড়শিতে গেঁথে শুধু মাছ খেলায় না লোটন বিহারী...

লোটন সহসা চোখ বড় বড় করে কাঞ্জিলালের মুখের পানে তাকাল। বলল, খাসা বলেছ কাঞ্জিলাল! দৃষ্টি তাহলে তোমার ফাতনার উপরই থাকে না আশে পাশেও ঘোরা ফেরা করে!

ধীরেশ মাথাটা আর একবার এ পাশ ও পাশে কাত ক'রল। কাঞ্জিলাল কুণ্ঠ হাসি হাসতে থাকে।

লোটন বিহারী পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে এল। বলল, তুমি ঠিক বলেছ কাঞ্জি বঁড়শিতে গেঁথে শুধু মাছকেই খেলান যায় মানুষকেও যায়। বাসবকেও গেঁথেছে। খেলাচ্ছে কুন্তলার মা তত সুতো ছাড়ছে। বস্তি ঘুচি। শেষ পর্যন্ত কিনা...দুনিয়ার হাল কি হ'চ্ছে দিনকে দিন!

এতক্ষণের গুমোট কেটে হাওয়া দিয়েছে। ডাষ্টবিনের আশে পাশের আ থেকে উগ্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

ধীরেশ নাকে কাপড় চাপা দিল।

কাঞ্জিলাল বলল, পচা চারের কাছেই বেশী ঘোরা ফেরা করে প্রেসিডেণ্ট।

জবাব দিল লোটন বিহারী, সময়টা তোমার বেশ ভাল যাচ্ছে কাঞ্জিলাল। কল আর চার পচাতে হবে না।

ধীরেশের মাথাটা আর একবার নড়ে দমকা হাওয়ায় আবার দুর্গন্ধ গেল।

সামনের বাড়ীর জানালার পাশে দুটি মূর্তি দেখা দিল। কুন্তলার মা আর জানালাটা বন্ধ করে দিল বাসব।

দুর্গন্ধটা ওদের নাকেও পৌঁছে কাঞ্জিলাল—বলল লোটন বিহারী।

ওদেরও নাক আছে তাহ'লে লোটন জবাব দিল কাঞ্জিলাল।

লোটন বিহারীর চোখ থেকে আজও

ঝরে পড়ল। কাঞ্জিলালকে এতদিন ধরে করা তার উচিত হয়নি। ফাতনাটা হয়ত মাত্র।

রেশ আর একবার নড়ে চড়ে স্থির হ'য়ে

াটন বিহারীর কাঁচা ঘরের দেয়াল ভেদ কটা উৎকট অশ্লীল গালাগাল বেরিয়ে লোটনের দাদা ঘোটন জেগেছে। বাক লেছে তার বালবিধবা বোন সুধাকণ্ঠীর

ারে শুধু নাকে কাপড় চাপা দিলে হবে নে আগুন দিতে হবে। ভাই সুরু বোনের অতীত জীবনের ময়লা ঘাটতে ান ভাইয়ের।

য়াকের জমাট আসরের তাল কেটে গেল। ার কুন্তলায় মার কল্পিত কাহিনী এবার ড়ে যাবে। ডাষ্টবিনের আশে পাশের লো ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

াঞ্জিলালের মুখে চাপা হাসি।

ন্তলার মা এতক্ষণে নিজে হাতে বন্ধ াগুলি শব্দ ক'রে খুলে দিয়ে গেল। তার ঝুলে বারান্দায় একখানা ডেকে বসেছিল। স্বামী ফিরে না আসা ওখানেই বেশী সময় কাটায় সে। কিন্তু নেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। দ্রুত উঠে বন্দনা। বারান্দার দিকের দরজা জানালা- া একে একে নিঃশব্দে বন্ধ ক'রে দিল। পর দেয়াল ঘড়ির পানে চোখ তুলে তাকাল। ড় এগারটা বাজল। আরও আধঘণ্টা তাকে ক্ষা ক'রতে হবে। ঠিক বারটায় গলির খ হর্ণ শোনা যাবে। স্বামীর ফিরে আসার কত। ততক্ষণ রোয়াকের আড্ডাও চলবে। পর একে একে যে যার ঘরে ফিরবে। ঝুল ান্দায় বসে বসে এ পাড়ার ভাল মন্দ অনেক রই বন্দনা পায়। শুনতে বিরক্ত লাগে। ও কান পেতে শোনে। অলস সন্ধ্যাটা এক ার কেটে যায়। পাশের ফ্ল্যাট বাড়ীর রঞ্জনার যদি কখনও আলাপ ক'রতে এগিয়ে আসে ফেসার গৃহিণী সংগে সংগে কান পাতে। দু' টের দু' গৃহিণীর মধ্যে সদ্ভাব যতখানি দহও ঠিক ততখানি। কিন্তু কথায় বার্তায় ল চলনে রুচি বোধে ওরা সব উচ্চশ্রেণীর। রে থেকে যতটুকু চোখে পড়ে তা আকর্ষণীয়। লোটন বিহারীর উচ্চ কণ্ঠ বুজে গেছে। রেশের মাথা নাড়াও থেমে গেছে। কাঞ্জিলাল ন বসে পরিস্থিতিটা উপভোগ ক'রছে। কি নি কোন কারণে বাসব জানালায় দাঁড়িয়ে খিক ক ক'রে হাসছে। কুন্তলার অন্ধ বাবা শব্দে কুণ্ঠ হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রে, হাসছো কেন ব? কুন্তলার মা বাসবের পাশে দাঁড়িয়েছিল তার মুখেও নিঃশব্দ হাসি।

বন্দনার বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'ল নিজেকে। ড়র কাঁটা মোটেই এগুচ্ছে না। রঞ্জনাদের টের সব ক'টি আলো নিভে গেছে। প্রফেসার হণীও তাদের খাওয়ার পাট এই মাত্র করেছে।

অনুযোগ দিয়ে স্বামীকে বলছিল, খাতা র ব'সলে তোমার আর সময়ের জ্ঞান থাকে।

উত্তরটাও প্রায় সংগে সংগে শোনা গেল, মার আর কি—লাভ ত তোমারই। খাতা ধার মানেই তোমার একখানা ভারী গহনা।

প্রতিবাদ করল প্রফেসার গৃহিণী, কে চায় তোমার কাছে সোনার গয়না। তার চেয়ে সংসারের দিকে একটু দৃষ্টি দাও। মেয়ে দুটোর দিকে যে আর তাকান যায় না। এইতো চোখের সামনে নীলকণ্ঠর বিয়ে হ'ল আর আজ সে মেয়ের ঘরের নাতির মুখ দেখেছে। আর তোমার......

প্রফেসার গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ভারী ভারী মনে হ'ল।

প্রফেসারের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সময় হ'লে আপনিই সব হবে শ্রীলতা। মিথ্যে মন খারাপ করে নিজেকেই কষ্ট দিচ্ছ।

এই সারগর্ভ উপদেশ বাণীতেও গৃহিণীকে নিবৃত্ত ক'র্তে পারেনি প্রফেসর। বলল, তোমার বই আর পরীক্ষার খাতা কোনদিনই পথের সন্ধান দেবে না। চেষ্টা ক'রতে হয়।

ঘড়ির কাঁটা আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে। বন্দনা চুপ করে বসে আছে। প্রফেসর গৃহিণী থেকে সুরু করে লোটন বিহারী সকলেরই চিন্তা ও কর্মের একটা গতি আছে কিন্তু বন্দনা এদের কারুর স-গোত্রীয় নয়। তার জীবনের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে বটে কিন্তু গতি নেই। গতির উৎস মুখে পাথর চাপা পড়েছে।

ঘড়িতে বারটা বাজল। অভ্যাস বশে বন্দনা উঠে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্র চালিত মানুষের মত সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মোটরের হর্ণ শোনা গেল গলির প্রান্ত থেকে। বন্দনা জানে এর ব্যতিক্রম ঘটবেনা। ঘড়ির কাঁটার সংগে জীবনের চলা বলাকে বেঁধে নিয়েছে শ্যামল রায়। বন্দনা হাঁপিয়ে উঠেছে এই যান্ত্রিক জীবনযাত্রায়। এক এক সময় মন তার বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রতে চায়। পারে না। তার ভদ্র আর শিক্ষিত মন বাধা দেয়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে দর কষাকষি ক'রতে লজ্জিত হয়।

গাড়ী এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল আবার যথানিয়মে চলে গেল। রোজকার মত দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা। শ্যামল প্রতিদিনকার মত দরজা খোলার সংগে সংগেই এসে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রল না।

ঘোটনের গর্জন তখনও অবিশ্রান্তভাবে চলেছে। সুধাকণ্ঠীও পিছিয়ে নেই। সমান তজানে সুধা বর্ষণ ক'রে চলেছে। শ্যামল মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতোর তলায় থেতলে দিল। শব্দ লক্ষ্য ক'রে একবার তাকাল। মুখে-চোখে একটা অসন্তোষ আর ঘৃণা মিশ্রিত অনুকম্পার ভাব।

রোয়াকের অতিথিদের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ওরা একসংগে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

লোটন বিহারীর গলার আওয়াজ অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। এগিয়ে এসে সে বলল, বাড়ীতে দিন রাত এই চলেছে। টিকবার উপায় নেই স্যার।

ধীরেশ তো তো করে হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেলল, সেই জন্যেই আপনার বাড়ীর রোয়াকে এসে আশ্রয় নিতে হয় স্যার।

কাঞ্জিলাল বলল, অন্যসব বাড়ীর রোয়াক গুলো বেদখল হ'য়ে গেছে। পাড়ার উঠতি জওয়ানরা থিতিয়ে বসেছে। সেখানে কারুর নাক গলাবার উপায় নেই। সোজা অপমান ক'রে বসবে। আর...

লোটন ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, এ পাড়ায় জন্মেছি—এখানে এত বড়টি হ'য়েছি। দুরন্ত আমরাও ছিলাম স্যার কিন্তু ওদের কাছে শিশু—একেবারে দুগ্ধপোষ্য।

শ্যামল লোটনের মুখের উপর কটাক্ষ করে নিঃশব্দে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রল। এদের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ ধরে এত কথা কেমন ক'রে শুনল এই ভেবে আশ্চর্য হ'ল।

বন্দনা দরজায় খিল তুলে দিয়ে স্বামীর পিছু পিছু ঘরে ফিরে এল। শ্যামল মুখ হাত পা ধুয়ে প্রস্তুত হ'তে বন্দনা দু'জনার খাবার সাজিয়ে নিলে।

খেতে খেতে শ্যামল বলল, এ বাড়ীও ছাড়তে হবে বন্দনা।

বন্দনা মুখ তুলে বিস্মিত হ'য়ে বলে, কেন এ বাড়ীটা ত বেশ ভালই!

শুধু বাড়ী হ'লেই হ'ল। তুমি কি কানে তুলো গুঁজে থাক! শ্যামল বলে। এমন বাজে-তাই পরিবেশে মানুষ থাকতে পারে না।

তুলো গুঁজে থাকবো কেন—বন্দনা জবাব দেয়, তুমিও যেমন চোখ বেঁধে চলো না আমিও তেমনি কানে তুলো দিয়ে থাকি না।

তবে না বোঝার ভান ক'রছ কেন? শ্যামল প্রশ্ন করে।

বন্দনা হাসি মুখে জবাব দিল, ভান করিনি। তবে তোমার সংগে একমত হ'তেও পারিনি।

বিস্মিত কণ্ঠে শ্যামল বলে, একমত হ'তে পারছ না!

কেমন করে পারব বলো—বন্দনা ব'লতে থাকে, একদিনের একটি ঘটনাকে তোমার মত অত বড় করে আমি ভাবতে চাই না। তোমার কানে আর কতটুকু এসেছে—কতখানি তোমার চোখে পড়েছে। সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। ওদের চতুর্দিকে প্রচুর আবর্জনা জমা হ'য়ে আছে। একদিনে জমা হয়নি। অনেক দিনের অনেক অবহেলায় এতটা জমে উঠেছে—দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দুর্গন্ধের ভয়ে সকলে মিলে যদি নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ঘৃণায় দূরে যাও তাহ'লে একদিন ঐ ময়লার স্তূপের তলায়ই সকলের কবরের ব্যবস্থা হবে।

শ্যামল একটু হেসে বলল, তোমার ঘরের দরজা জানালাগুলি বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন বন্দনা?

এ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটুকু বুঝেই শান্ত কণ্ঠে বন্দনা জবাব দিল, দুর্গন্ধ যে দুর্গন্ধ এইটুকু বোঝাবার জন্যই বন্ধ ক'রেছি। পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার কথাটাই আমি মানতে পারছি না।

শ্যামল মৃদু গলায় ব'লল, তোমার কথার মধ্যে ফাঁক আছে বন্দনা। তুমি ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিচ্ছ নইলে তোমার নিজের যুক্তিই তোমার কাছে হাস্যকর মনে হ'তো।

না হ'তো না, দৃঢ়কণ্ঠে বন্দনা ব'লল।

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে বলল, সত্যি করে বলো দেখি তুমি কি ব'লতে চাইছো?

বন্দনা জবাবে জানাল, বক্তব্যটা আমার মোটেই শক্ত নয়। তুমি বুঝতে না চাইলে আমি আর কি ক'রতে পারি। যাদের জন্য তুমি এ পাড়া ছাড়তে চাইছো তাদের আমিও প্রশংসা করছি না। ওরা সুযোগ পেলেই পরনিন্দা করে, পরচর্চা করে, নিজেদের মধ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে, ওদের শালীনতা বোধের মাপকাঠি আলাদা এ সব কথা তোমার চেয়ে আমি বেশী ক'রে অনুভব করি। তবুও ব'লবো যে, ওরা জীবনটাকে ভাল মন্দ সুখ

মিলিয়ে ভোগ ক'রে যাচ্ছে। তোমার আমার মত একটা উত্তাপহীন যান্ত্রিক জীবনকে আঁকড়ে ধরে আত্মতুষ্টির ভাব দেখায় না।

শ্যামল ডাকল, বন্দনা......

বলো......

তুমি কি চাও?

আমি জীবনের সত্য চেহারাটা দেখতে চাই। সাজ পোষাক পরানো চেহারা নয়। সংসারের আসল রূপ।

শ্যামলের মুখে হাসি দেখা দিল।

বন্দনার তা দৃষ্টি এড়াল না। সে বলতে লাগল, তোমার চোখ নেই বলেই হাসতে পারছো, নইলে দুঃখ পেতে। নিজেকে অপরাধী মনে ক'রতে।

অপরাধী!

হ্যাঁ। তোমার শিক্ষা, তোমার রুচিবোধ, তোমার আভিজাত্যের অহংকার তোমার অপিসের পরে তোমাকে নিয়ে ক্লাবে যায়। সেখানের উগ্র পরিবেশ তোমাকে আনন্দ দেয় কিন্তু আমাকে কি দেয় ব'লতে পার?

শ্যামল বলল, আমার মধ্যে যদি পাঁচটা ত্রুটি থাকেও তাই দেখাবার প্রয়োজনে আর পাঁচটাকে তুমি গুণ বলে চালাতে চাও কোন্ যুক্তিতে আমি বুঝি না বন্দনা।

চালাতে আমি আজ পর্যন্ত কিছুই চাইনি। একথা তোমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। কিন্তু এ সব আলোচনা বৃথা। তার চেয়ে তুমি খাওয়া সুরু করো। এখনও কিছুই খাওনি যে।

তুমিও খাওনি। শ্যামল শান্ত হেসে বলল।

●

বন্দনা তার সংসারের যে নিটোল একটি রূপ কল্পনা করে রেখেছিল বিবাহিত জীবনে তা পায়নি ব'লেই কি তার চিন্তা আজ এইপথে অগ্রসর হ'তে চাইছে—বন্দনা নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে।

বাসব তার সহোদর ভাইয়ের অনটনের সংসারের পানে ফিরে না তাকালেও কুন্তলার মার ডুবে যাওয়া সংসারকে আজও ভাসিয়ে রেখেছে। পাড়ার দশজনা দশ কথা বলে, কুন্তলার মার রূপ আর জোর ক'রে ধরে রাখা যৌবনের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে সব আলোচনা করে তা না শোনাই ভাল। এই ঘটনার মধ্যে কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যে তা বন্দনা জানে না। কিন্তু বাসবের এই বদান্যতাকে সমালোচনার ভোঁতা ছুরি দিয়ে জবাই ক'রতে বন্দনা পারেনি। আর পারেনি তার আশে পাশের আর দশটা সংসারকে।

ওদের জীবনে প্রচুর খাদ আছে। এসিডে ডুবিয়ে সে খাদ দূর করা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু তাদের মত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর জীবনে যে চাকচিক্য চোখে পড়ে তা গিল্টি করা ঔজ্জ্বল্য। সুরা আছে, নারী আছে, ক্লাব আছে ধার করা গাড়ী আছে...পোষাকী কথা বার্তার চটক আছে। এক কথায় প্রায় সবই আছে। নেই শুধু প্রকৃত জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগ। স্বামী সম্মান করে, সমীহ করে চলে। কিন্তু এই সম্মান আর সমীহ করার যথার্থ মূল্য কতটুকু?

স্বামী এই মাত্র চলে গেলেন। ফিরবেন যথাসময়। অপিসের পর তার ক্লাব আছে। লোটন বিহারী সকালে কারখানায় চলে গেছে—প্রফেসার গেছে কলেজে। কাঞ্জিলাল ছিপ নিয়ে কোথায় মাছ ধরতে চলেছে। ধীরেশের সঙ্গে দেখা হ'তে সে আশার বাণী শোনাল। অকর্মা ছেলেগুলি গলির মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা ক'রছে। সিগারেট টানছে। সিনেমার পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে সমালোচনা ক'রছে। সুধাকণ্ঠী ঘোটনের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প ক'রছে। কে বলবে গত রাত্রে ওরা দুজনেই অমন কুশ্রী ভাষায় একে অপরকে আক্রমণ চালিয়েছে। আর ঐ অকর্মা ছেলেগুলিই সেদিন জগন্ময়বাবুর জামাই গলায় দড়ি দিতে কি ছুটোছুটিই না ক'রেছে। ওদের সাহায্য সময়মত না পেলে ছেলেটা মারাই যেত। শক্তির এতবড় অপচয় সত্যিই মর্মান্তিক।

●

দিন গড়িয়ে চলেছে। একই দৃশ্যের পুনরভিনয় রোজই হচ্ছে। সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত। তারপর নিদ্রা।

বন্দনা বলে, একটা চাকরী জুটিয়ে নিলে কেমন হয়?

শ্যামল বলে, তোমার প্রয়োজন নেই। আর একজনের প্রয়োজনের ভাগ নিতে চাইছো কেন?

অর্থের প্রয়োজন তাদের নেই এ কথা সত্য। কিন্তু বন্দনার সময় যে কাটতেই চায় না। দিন রাত্রের একটা বৃহৎ অংশ বাইরে কাটিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত মানুষ।......

আজও ঝুলে বারান্দার একটি বিশেষ কোণে একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে বন্দনা। রাস্তা দিয়ে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ চলেছে। আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে। হয়ত বৃষ্টি আসবে, হয়ত আসবে না। কদিন ধরেই একই অবস্থা চলেছে। মেঘ দেখা দিয়েই সরে যায়। বৃষ্টি হয় না। প্রকৃতি খামখেয়ালী হ'য়ে উঠেছে।

রাস্তার বিজলি আলোগুলি এইমাত্র জ্বলে উঠল। পরমায়ু কতক্ষণ বলা শক্ত। কমাস ধরেই এই খেলা চলেছে। আটঘাট বেঁধে যারা খেলায় নামে তাদের কায়দা করা শক্ত।

ক'দিন ধরেই শ্যামল নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছে। মনে হয় ভিতরে ভিতরে একটা কিছু সে স্থির ক'রে ফেলেছে। কিন্তু বন্দনাকে কিছু ভাঙ্গছে না। বন্দনারও কোন আগ্রহ নেই। ব'লবার প্রয়োজন বোধ ক'রলে আপনিই ব'লবে।

দিন যেমন কাটছিল তেমনিই কেটে যাচ্ছে। কোনদিক দিয়ে এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। শ্যামলের অপিস যাওয়া এবং ফিরে আসা কিংবা রোয়াকের আড্ডা ঠিক একই ধারায় চলেছে। মাঝে মাঝে পাট পরিবর্তন হয়। তারপরেই আবার পুর্ণোদ্যমে চলে। রঞ্জনার মার সঙ্গে চোখা-চোখি হ'লেই সে কথা ব'লবার জন্য এগিয়ে আসে। প্রফেসার গৃহিণীও যথারীতি কান পাতে। অনেকদিন পরে আজ আবার সুধা-কণ্ঠীর গলা পাওয়া গেল। আজ ঘোটনের সঙ্গে নয়। অপর কেউ হবে।

শ্যামল ফিরে এসেছে। আজ আর সে রাস্তায় দাঁড়াল না। গাড়ীর হর্ণ শোনা যেতেই রোয়াক পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

খেতে বসে শ্যামল বলে, আজ মাসের কুড়ি তারিখ।

জানি।

তিরিশ তারিখে এ বাড়ী ছেড়ে দেব। খুব ভাল পাড়ায় চমৎকার একটি ফ্লাট পাওয়া গেছে।

তোমার ভাগ্য।

তোমার আপত্তি আছে নাকি?

থাকলেও তোমার সিদ্ধান্ত পালটাবে না বলেই আমার মনে হয়।

তা ঠিক।

কিন্তু তিরিশ তারিখের পূর্বেই শ্যামলকে তার মত পরিবর্তন ক'রতে হ'ল। মত বদলাতে হল একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে। দুর্ঘটনায় পড়েছিল শ্যামল রায় নিজেই। লরির সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ। গাড়ী থেকে ছিটকে রাস্তার পাশের নালায় গিয়ে পড়েছিল শ্যামল। ড্রাইভারের দেহটা একেবারে চেপটে গেছে। খবর পেয়ে দিশেহারা হ'য়ে বন্দনা প্রফেসার গৃহিণীর শরণাপন্ন হল। কিন্তু খবর পেয়েই তার নাকি ব্লাড প্রেসার অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। রঞ্জনাদের আলো বহুক্ষণ নিভেছে। অনেক ডাকাডাকিতেও আলো জ্বললো না। দীপংকরকে ডাকতে গিয়েও পিছিয়ে এল বন্দনা। ওর স্ত্রীর সন্দেহ রোগ আছে। যুক্তি বিচারের ধার ধারে না। নীলকণ্ঠের স্ত্রীর মুখে শুনেছে বন্দনা। কিন্তু যাদের একবারও ডাকেনি বন্দনা খবর পেয়ে তারাই ছুটে এল পরমাত্মীয়ের মত।

এল বাসব, লোটন বিহারী, কাঞ্জিলাল। আরও এল পাড়ার সব মার্কামারা আড্ডাবাজ ছেলেরা। ডাকতে হল না—বলতে হল না। নিজেরাই ছুটোছুটি করে অত রাত্রে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল এক অনিচ্ছুক ট্যাক্সিওয়ালাকে। বন্দনাকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে।

শুধু সেই রাত্রেই নয়। তারপরে পর পর আরও সাতদিন। যে পর্যন্ত শ্যামলকে ওরা বাড়ী না নিয়ে এল।

বন্দনা বলল, আপনাদের ঋণ আমরা কোন দিন শোধ ক'রতে পারব না।

না না কি যে বলেন আপনি...কি যে বলেন ...ওরা যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ওদের এত-দিনের অসংকোচ চলা বলা হঠাৎ যেন সংকোচে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল।

তারপর আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি। একে একে চলে গেছে।

শ্যামল গত ক'দিন ধরেই ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রেছে, আজও একটা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। একটা বিচিত্র দ্বন্দ্ব ক'দিন ধরেই ওর মধ্যে চলেছে। ওদের চতুর্দিকে প্রচুর জঞ্জাল। একদিনে জমেনি। বহুদিনের অব-হেলায় জমেছে। বহুদিনের চেষ্টায়ই আবার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আশা করা যেতে পারে।

শ্যামল বন্দনাকে কাছে ডাকল। বলল, এ বাড়ী ছাড়া হবে না বন্দনা।

বন্দনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কথা বলল না।

শ্যামল পুনরায় বলল, ভেবে দেখলাম ভয় আর ঘৃণা কোনদিন সমাধানের পথ দেখাতে পারবে না। তাতে ওরাও তলিয়ে যাবে আমরা'ও হারিয়ে যাব। তাছাড়া এই ক'দিন শুয়ে থেকে আমি আমার নিজের চেহারাটাও পরিষ্কার দেখতে পেরেছি। ভাল মন্দর সংজ্ঞা কি তা নিয়ে প্রচুর দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

বন্দনা তাকে জোর করে থামিয়ে দেয়। বেশী কথা ব'লতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন।

শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরের কাব্য

মায়া গুপ্ত

—জলায়া য়ার নে ঐসা কি হম বতন সে চলে
তার শম্মঅ কে রোতে ইন অঞ্জুমন সে চলে
। বাগবাঁ নে ইজাজত দী সৈর করনে কী
। শী সে আয়থে, রোতে হুয়ে চমন সে চলে।"

র্থাৎ

প্রেমিক আমায় এমনই দুঃখ দিলেন য আমায় দেশত্যাগ করে চলে যেতে হল। মামবাতির মত জ্বলে নিঃশেষ হয়ে আমায় মজলিস থেকে বিদায় নিতে হল। মালি আমাকে উপবনে ভ্রমণের অনুমতি দিল না, প্রসন্ন চিত্তে এসেছিলাম, উপবন থেকে কেঁদে বিদায় নিতে লে—

এই কথাগুলি বলেছিলেন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ 'জফর'। রেঙ্গুনে নির্বাসন-কালে তিনি নিজের অন্তরের বেদনা দিয়ে এই কবিতাটি রচনা করে গেছেন।

উর্দু কাব্য সাহিত্যে বাহাদুর শাহ জফর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। দিল্লীর শেষ মোগল বাদশা বাহাদুর শাহ 'জফর'। নাম ছিল আবু জফর তাই থেকে কবিতা রচনার সঙ্গে 'জফর' নামটি যুক্ত করতেন তিনি। জফর ছিলেন এমন বাদশা যাঁর জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা দেখবার ও ভোগ করবার সুবিধা হয়েছিল, অবশ্য সে বৈচিত্র্যের মধ্যে দুঃখের অংশটা বেশী ছিল সন্দেহ নেই। বাদশাহের চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর ঐতিহাসিক বা রাজসিক ব্যক্তিত্বকে বহু গুণে অতিক্রম করেছিল। কবি জফর বাদশাহ জফরের চেয়ে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ও সম্ভ্রান্ত।

জফর ছিলেন এক হতভাগ্য সম্রাট ততোধিক হতভাগ্য সিংহাসনের মালিক। সে মোগল সাম্রাজ্যের আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না জফরের রাজত্বকালে, অস্ত্রবল, অর্থবল এমন কি মনোবলও তাঁর ছিল না, এগুলি না থাকলে মর্যাদাবোধ যতটা আশা করা যায় কেবল ততটা মর্যাদাবোধই অবশিষ্ট ছিল তাঁর। কবিত্ব ছাড়া আর কিছু উল্লেখযোগ্য তিনি করেননি, সুযোগ হয়ত একবার পেয়েছিলেন, যার নাম সিপাহী বিদ্রোহ সেই সময়। কিন্তু সুযোগের যোগ্য ব্যবহার করেননি বাদশা। শান্ত চিত্তে বেশ আভিজাত্যের সঙ্গে সাজাগুলি গ্রহণ করেছিলেন, এ কথাটি সত্য।

বাদশা না হয়ে যদি সাধারণ ব্যক্তি হতেন জফর তা হলে তাঁর দীনতা, দুর্বলতা, অপমানিত দীর্ঘ জীবন এত শোচনীয় বলে মনে করবার কোন কারণ ঘটত না, কবিত্বের গৌরবে সেগুলি বাধা হয়ে দাঁড়াত না।

দিল্লীর সিংহাসনে বসবার অনেক আগে জফর একটি বীভৎস দৃশ্য দেখেছিলেন। শাহ আলম সানী ছিলেন জফরের পিতামহ। সানী ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী চতুর্থ পুরুষ। মোগল সাম্রাজ্যের অতিশয় হীন অবস্থা তখন। মাধবজী সিন্ধিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন 'সানী'। একবার মাধবজী গেছেন রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে গুলাম কাদির কেল্লায় ঢুকে বৃদ্ধ শাহ আলম সানীর দুটি চোখ তরোয়ালের অগ্রভাগ দিয়ে উৎপাটিত করে দিয়েছিলেন। অন্য নানাবিধ অত্যাচার করেছিলেন বাদশাহ ও তাঁর বেগমদের ওপর। যে ধরণের

বাহাদুর শাহ . ১৮৫৭ সালে গৃহীত ফোটোগ্রাফ

অত্যাচার বাদশাহরা হতভাগ্য প্রজাদের ওপর করতেন গুলাম কাদির সেই অত্যাচারই সম্রাটের প্রতি করলেন, ইতিহাসের এমনই মহিমা। একদা নাকি শাহ আলম সানী জাবতা খাঁর পুত্র গুলাম কাদির বেন দরবার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য এই জঘন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়।

বাহাদুর শাহ জফর এ দৃশ্য দেখেছিলেন, তাই লিখেছিলেন—

—ক'র ইস সিতম কা মৈঁ ক্যা বয়াঁ
মেরা গমসে সীনা ফিগার হৈ—

—সে দুঃখের কি বর্ণনা দেব, আমার বুক জ্বলে যায় সে দুঃখের কথা ভাবলে।

বাহাদুর শাহ জফরের মা ছিলেন হিন্দু বেগম, পিতা আকবর শাহ (দ্বিতীয়) অপর এক বেগমের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র জফরকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা না করে অন্য শাহজাদা জাহাঙ্গীরকে মনোনীত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জফরকে নিজের সন্তান বলতে অস্বীকার পর্যন্ত করেছিলেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত মির্জা জাহাঙ্গীরকে সরে যেতে হল এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর আবু জফর দিল্লীর সিংহাসনে বসবার অধিকার পেলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল তা তাঁর নিজের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

—ঐ জফর অব হৈ তুঝী তক ইন্তজামে সল্তনত বাদ তেরে ন বলী-অহদী, না নামে সল্তনত।

অর্থাৎ এ রাজ্যের অস্তিত্ব জফরের সময় পর্যন্ত, তারপর না থাকবে উত্তরাধিকারী আর না থাকবে রাজ্য।

যদিও স্বয়ং জফরের সময় রাজ্য বলতে কিছু বিশেষ বাকি ছিল তা মনে হয় না।

সিপাহী বিদ্রোহ, অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃদ্ধ বাদশা জফর কোন সক্রিয় অংশ নেননি, এ সংগ্রামে তাঁর যে বিশেষ সমর্থন ছিল এমন প্রমাণও কমই পাওয়া যায়। বাদশাহের দুই ছেলে মির্জা মুগল আর মির্জা খিজর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।

বাদশাহের নামে বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন বিদ্রোহী নেতারা। বাদশাহ নিরুপায় ও ইচ্ছা-শক্তিহীনভাবে সব দেখতেন।

কেল্লা যখন ইংরেজের অধিকারভুক্ত হল তখন জফর সপরিবারে কেল্লা ত্যাগ করে হুমায়ুনের সমাধি প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। বিদ্রোহী নেতারা তাঁকে নিরাপদ স্থলে সরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু দুর্বল জফর যেতে রাজি হলেন না। সুতরাং যা হবার তাই হল। মেজর হাডসনের হাতে বন্দী হলেন। মির্জা ইলাহী বক্সের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মির্জা মুগল ও মির্জা খিজর বন্দী হলেন। প্রথমে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে তাঁদের মাথা দুটি কেটে নিয়ে হাডসন বৃদ্ধ বাদশাহকে উপহার দিয়েছিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে জফর বলেছিলেন—

তৈমুর কী ঔলাদ ঐসী হী সুর্খরু হোকর
বাপ কে সামনে আয়া করতী থী—

অর্থাৎ (বীর) তৈমুরের সন্তান এই রকম রক্তাক্ত হয়েই পিতার সামনে উপস্থিত হতেন।

কঠিন হস্তে বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ সরকার বাদশাহ জফরকে রেঙ্গুণে নির্বাসিত করলেন। নির্বাসনকালে বাদশাহের জীবন অতিশয় দুঃখদারিদ্র্যে কেটেছিল এবং সেই-খানেই ৭ই নভেম্বর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জফরের সুপ্রসিদ্ধ দুটি গজল রেঙ্গুণে নির্বাসনকালে রচনা।

ন কিসী কী আঁখ কা নূর হূঁ
ন কিসী কা দিলকা করার হূঁ
জো কিসী কো কাম ন আ সকে
মৈঁ বো এক মুস্তে গুবার হূঁ।
জো চমন খিজা সে উজড় গয়া
মৈঁ উসী কী ফসলে বহার হূঁ।
পত্র-ফাতেহা কোঈ আয়ে ক্যোঁ
কোঈ চার ফুল চঢ়ায়ে ক্যোঁ
কোঈ থাকে শম্মঅ জলায়ে ক্যোঁ
মৈঁ বো বেকসী মজার হূঁ।
মৈঁ নহী হূঁ নগম-এ-জাফিয়া
মুঝে সুনকে কোঈ করে গা ক্যা
মৈঁ বড়ে বিয়োগ কে হূঁ সদা
মৈঁ বড়ে দুখো কী পুকার হূঁ।

অর্থাৎ আমি কারও নয়নের মণি নই, কারও হৃদয়ে আমার আসন নেই। আমি তুচ্ছ ধূলি মুষ্টির মত যা কারও কাজে লাগতে পারে না। আমার রূপ রং নষ্ট হয়ে গেল, প্রিয় হতে বিচ্ছিন্ন হলাম, যে উপবন পাতা ঝরার ঋতুতে শুকিয়ে গেল আমি সেই শুষ্ক উপবনের (ব্যর্থ) বসন্ত। আমি অসহায়তার প্রতীক কবর, আমার জন্য 'ফাতেহা' (আত্মার মঙ্গল কামনার্থে প্রার্থনা) কেনই বা কেউ পাঠ করবে, চারটি ফুলই বা কেন দেবে, প্রদীপই বা জ্বালাবে কেন? আমি আনন্দের সঙ্গীত নই, আমায় শুনে কার কি লাভ? আমি বড়ই বিষাদের স্বর, আমি দুঃখের-ই আর্তনাদ।

দ্বিতীয় গজলটি এই:—

লগতা নহীঁ হৈ জী মেরা উজড়ে দিয়ার মেঁ
কিসকী বনী হৈ আলমে-ন-পায়দার মেঁ
কহ দো ইন হসরতোঁ সে কহীঁ ঔর জা বসেঁ
ইতনী জগহ কহা হৈ, দিল-এ-দাগদার মেঁ
এক শাখে গুল কো বৈঠকে বুলবুল হৈ শাদমা
কাটে বিছা দিয়ে হৈঁ দিলে—লালাজার মেঁ।
উম্রে দরাজ মাঁগ কে লায়ে থে চার দিন
দো আরজু মেঁ কট গয়ে, দো ইন্তজার মেঁ।
হৈ কিতনা বদনসীব 'জফর' দফন কে লিয়ে
দো গজ জমী ভী মিল না সকী কুয়ে সার মেঁ।

এই ভগ্নাবশেষ প্রাসাদে আমার প্রাণ আর টিকছে না, এ ব্যর্থ সংসারে থেকে লাভ কি? আমার মনের আকাঙ্ক্ষাগুলি আর কোথাও আশ্রয় নিক, আমার হৃদয়ে নয়। কারণ আমার হৃদয় দুঃখের দাগে পূর্ণ হয়ে আছে, সেখানে অন্য কিছুর স্থান কোথায়? পুষ্পিত শাখে বুলবুল প্রসন্ন থাকে, সে পুষ্পিত হৃদয়ে কাঁটা বেছান রয়েছে। যে দীর্ঘজীবন আমি চেয়ে এনেছিলাম তা মাত্র চারটে দিন তার দুদিন কেটে গেল আকাঙ্ক্ষায়, বাকি দুটো দিন কেটে গেল প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায়। 'জফর' এতই দুর্ভাগা যে প্রেম পাত্রের হৃদয়ে স্থান পেল না, এমন কি তার কবরের জন্য দু গজ জমিও প্রেমপাত্রের গলিতে মিলল না।'

এবার জফরের সহজ দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে লেখা কিছু সুভাষিত উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করছি।

ন থী হাল কী জব হমে আনে খবর
রহে দেখতে ঔরোঁ কে ঐবো হুনর।
পড়ী অপনী বুরাইয়োঁ পর জো নজর,
তো নিগাহ মে কোঈ বুরা ন রহা।

অর্থাৎ, যখন নিজেকে জানতাম না তখন অপরদের দোষ-গুণ বিচারে ব্যস্ত ছিলাম। যখন নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোর প্রতি দৃষ্টি পড়ল, তখন আমার চোখে মন্দ আর কেউ রইল না।

ন হম কুছ হঁসকে সীখে হৈঁ
ন হম কুছ রোকে সীখে হৈঁ
জো কুছ থোড়াসা সীখে হৈঁ
কি সী কে হোকে সীখে হৈঁ

অর্থাৎ হেসেও কিছু শিক্ষা হয়নি, কেঁদেও নয়, যৎসামান্য যা শিখেছি তা কেবল অপরকে ভালবেসে তবে শিখেছি।

—দিল ফকীরী সে সফা কর, ইসসে ক্যা
হাসিল আগর
তুনে দাঢ়ী কো বঢ়ায়া, যা সফাচট কর দিয়া?

অর্থাৎ সাধুতা দিয়ে হৃদয়কে অম্লান কর, দাড়ি বাড়িয়ে বা মুড়িয়ে আর লাভ কি?

—উসসে থিলায়া কব হো দিলে জার কী সলাহ,
দিল কী বহী সলাহ জো দিলদার কী সলাহ।

অর্থাৎ আমার বেদনার্ত হৃদয় প্রেমিকের বিরুদ্ধে কেমন করে অভিযোগ করবে বা অভিশাপ দেবে? সে যা চায় তাই হোক—। (তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে)

হোশিয়ার রহনা চাহিয়ে য়ারোঁ সে ঐ 'জফর'
হৈ য়ার ইস জমানে কে জো অয়ার বন গয়ে।

অর্থাৎ ঐ সব বন্ধুদের কাছ থেকে সাবধান, এমনই যুগ এখন যে মিত্র শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

মৈঁ করু শিকবা জো কুছ উনকো
মোহব্বত হো জফর
জব মোহব্বত জী নহী হৈ, তো
শিকায়ত ক্যা হৈ?

অর্থাৎ প্রেমের অভিযোগ ওর কাছে কি করি, যেখানে প্রেমই নেই সেখানে অভিযোগ করে কি লাভ?

ক্যা ঔর হোগা জমানে কী ইনকলাব
জো বাত ঐব কীথী, হুনর হো গঈ তো হৈ।

যা দোষ বলে গণ্য করা হত এখন তাই গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যুগ-বিপ্লব অন্য রকম আর কি হবে?

ভড়কী হৈ যেতরহ আজ জফর দিল কী আগ
আগে তো শোলা সা কঈ বার উঠকে রহ গয়া:

অর্থাৎ পূর্বে কেবল কএকটি স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করে শান্ত হয়ে যেতাম কিন্তু এবার যে আগুন জ্বলেছে তা অতি প্রবল।

সম্ভবত এই রচনাটি জফরের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার রচনা।

ফির খোয়াব মে ভী বহ নজর আয়া ন ঐ জফর
আখোঁ কে সামনে সে জো আলম নিকল গয়া।

অর্থাৎ, যে দৃশ্য চোখের সামনে থেকে চলে গেল তা আর স্বপ্নেও কখনও দেখতে পেলাম না।

ঐ 'জফর' মৈ হূ গুলাম তুতিয়ে হিন্দোস্তোঁ
কব মুকাবিল হোবে মেরে অন্দলীবানে চমন।

অর্থাৎ, আমি হিন্দুস্থানের সেই নীরব পরাধীন পক্ষী, আমার উপবনের বুলবুলদের সঙ্গে কবে সম্মুখীন হব সেই প্রতীক্ষায় আছি।

না-জানা কথা

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

"জানাও যতটা না জানাও ততটা। সেই না জানা থেকেই কিছু বলো তুমি।"

উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের। 'এক স্মরণীয় সন্ধ্যার কথা' লিখেছেন সবিতা দেবী ১৪ই শ্রাবণের রবিবারের যুগান্তরে। সেই লেখা থেকে জানতে পারি ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) এবং কররেখা বিজ্ঞান (Palmistry) সম্বন্ধে কবির আগ্রহের কথা। লেখিকাকে হাত দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের কথা। একে কুণ্ঠা বোধ করে সবিতা দেবী যখন বললেন যে, তাঁর সব কথাই তো সকলের জানা তখন প্রত্যুত্তরে উপরের কথাগুলি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে ফলিত জ্যোতিষে অনুরাগী ও আস্থাবান ছিলেন তার সপক্ষে প্রমাণের অভাব নেই, রবীন্দ্র-রচনায় বহুস্থানে গ্রহনক্ষত্রাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি যে কররেখা বিজ্ঞানেও বিশ্বাসী ছিলেন সে কথা সাধারণের জানার সুযোগ হল সবিতা দেবীর প্রবন্ধ থেকে। লেখাটি পড়ে মনে পড়ল যে, আজ থেকে আটাশ-ঊনত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত পণ্ডিত দীপচাঁদ শিহরী জ্যোতিঃশাস্ত্রীর 'হাতের ভাষা' নামক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের কররেখা বিচার করা হয়েছিল এবং তাতে তাঁর করতলের ছবিও ছাপা হয়েছিল। বইখানির প্রথম সংস্করণ বহুদিন আগে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তারপর আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি, ওখানি এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে 'হাতের ভাষার' এই খণ্ডের এক কপি আমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। তার থেকে রবীন্দ্রনাথের করতলের ছাপ এখানে আবার ছাপা হল।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রবীন্দ্রনাথের রেখা বিচার করা সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সম্ভবপর নয়, যাঁরা কররেখা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁরাও যাতে, রবীন্দ্রনাথের হাতের রেখা একটু আধটু বুঝতে পারেন সেজন্যে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলছি। প্রথমে করতলে গ্রহের স্থানগুলি (mount) সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তা হল এই : তর্জনীর নীচে বৃহস্পতির স্থান, মধ্যমার নীচে শনির, অনামিকার নীচে রবির আর কনিষ্ঠার নীচে বুধের স্থান। অঙ্গুষ্ঠের নীচেকার প্রশস্ত স্থানটি হল শুক্রের ক্ষেত্র, আর তার বিপরীত দিকে চন্দ্রের ক্ষেত্র। এখন রবীন্দ্রনাথের করতলের প্রতিচ্ছবি থেকে রেখাগুলি চিনবার চেষ্টা করা যাক।

তর্জনীর নীচে থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত যে রেখাটির অবস্থান সকলের উপরে সেটি হৃদয়-রেখা (Heart line), তার নীচেকার কর পার্শ্ব পর্যন্ত প্রসারিত রেখাটির নাম শিরোরেখা (Head line), আর শিরো-রেখার নীচে যে রেখাটি সমগ্র শুক্র ক্ষেত্রকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে থাকে সেটি হল আয়ু-রেখা (Life line)। করতলের নিম্নভাগ থেকে উঠে যে রেখাটি শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা

রবীন্দ্রনাথের কররেখা

ভেদ করে বরাবর মধ্যমার দিকে চলে গিয়েছে সেটি ভাগ্যরেখা (Fate line), আর আয়ুরেখা থেকে ওঠে যে-রেখাটি রবির ক্ষেত্রে চলে গিয়েছে সেটা রবিরেখা (Sun line)।

রবীন্দ্রনাথের করতলে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তিনটি : (১) নানা শুভচিহ্নযুক্ত বৃহস্পতির ক্ষেত্র, (২) বলবান শিরোরেখা এবং (৩) দীর্ঘ ও সুগঠিত রবিরেখা।

রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি যে কিরূপ বলবান তা কেউ কেউ জানেন। তাঁর রাশিচক্রে চন্দ্র বৃহস্পতির যে যোগ হয়েছে তা বিরল। তাঁর করতলে বৃহস্পতির ক্ষেত্রটিও এমন সব শুভচিহ্নযুক্ত যা অনন্য দুর্লভ। এখানে আছে (Star) একটি চতুষ্কোণচিহ্ন, একটি ক্রশচিহ্ন এবং দ্বিশাখা বিশিষ্ট হৃদয়রেখার সহিত শনি রেখা মিলিত হয়ে বৃহস্পতি ও শনি ক্ষেত্রের মাঝামাঝি একটি ত্রিশূলের সৃষ্টি করেছে, তার উপর বৃহস্পতি ক্ষেত্রে আছে একটি বলবান বৃহস্পতি রেখা।

বৃহস্পতি ক্ষেত্রে তারকাচিহ্ন সম্বন্ধে Comte c. de Saint German তাঁর The Study of Palmistry-তে বলেছেন A Star—Ambition fully satisfied; sudden rise in life. অর্থাৎ করতলে তারকাচিহ্ন থাকলে জাতকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরি-পূর্ণভাবে চরিতার্থ হয়, তাঁর জীবনে হঠাৎ হয় সমুন্নতি। আমাদের সামুদ্রিক শাস্ত্রমতে

(শেষাংশ ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

** গল্প **

বিষ

মানবেন্দ্র পাল

তখন সকাল আটটা।

লর্ড টি.ইপিন্ট মিস চৌধুরী। প্রোপ্রাইটারের খাস কামরায় বসে কফি খাচ্ছিল। সামনেই খোলা রয়েছে সেদিনের কাগজখানা। বাংলা দৈনিক। ইংরেজী কাগজ তো আসেই, কিন্তু মিস চৌধুরী রাখেন বাংলা কাগজ।

আজ একটা নিদারুণ সংবাদ বেরিয়েছে কাগজে। গম্ভীর মনোযোগে সেই ঘটনাই পড়ছিল মিস চৌধুরী। এমনি সময় ভারী একটা কণ্ঠস্বর কানের খুব কাছে গম-গম করে উঠল—Any interesting news in your paper?

মিস চৌধুরী একটু নড়ে-চড়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে সমীহ করে বললে—হ্যাঁ, আছে।

—কি আছে, বোলো।

—A young man's letter—একটি যুবকের চিঠি বেরিয়েছে, চিঠিটা আত্মহত্যা করবার আগে লিখে রেখে গেছে।

—Case of Suicide! very good! এ সব খবর আমি খুব পছন্দ করি। হ্যাঁ, এই সব আত্মহত্যা আর আইন-আদালত! তুমি আমাকে পড়ে শোনাও।

মিস চৌধুরী কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কাগজখানি ভালো ক'রে কাছে টেনে নিয়ে পড়ে শোনাতে আরম্ভ করল। কিন্তু প্রথমেই বাধা।

—What do you want? বিরক্তি ফুটে উঠল প্রোপ্রাইটারের কণ্ঠে।

Sir, একজন পুলিশের লোক—

—পুলিশ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে।

মুহূর্তের জন্যে কর্তার মুখে ভ্রূকুটির একটা ছায়া খেলে গেল। পরক্ষণেই বাঁ-হাত তুলে তাকে চলে যেতে বললে।

—যে যার কাজ করে গেলেই হয়। গম্ভীর-ভাবে এ মন্তব্যটুকু করতেও ছাড়ল না।

মিস চৌধুরীও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর পড়তে শুরু করল—

আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়।

এই যে আমার মৃত্যু বরণ এর পিছনে কি বেদনা আছে, তা না জানিয়ে মরতে পারছি না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে লোকে ভগবানের নাম করে—কিন্তু আমি ভগবানের চেয়ে মানুষকেই বেশী চিনি। সেই মানুষদের মধ্যে আবার যদি কেউ আমার মতো ভাগ্য নিয়ে এসে থাকে তবে বিশেষ করে তাদের কাছেই বলে যাই আমার কথা। আমার এই কর্মের বিচার কেবল তাদের ওপরই যেন ন্যস্ত হয়।

কিন্তু না, আবার ভাবছি ও সব কথা থাক। মৃত্যুর কারণ দেখিয়ে লোকের সহানুভূতি কুড়িয়ে লাভ কি হবে! দুনিয়ার লোককে সাক্ষী মেনে যেতে হবে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা—আমার এই আত্মহত্যার কারণ একান্ত ব্যক্তিগত। যা কেবল-মাত্র ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ—যা দশজনের বিষয় নয় তা দশজনকে জানাতে যাই কেন! বিশেষ করে নন্দিতা—তাকে কেন দণ্ড দেওয়া? তার অপরাধ কি খুবই বেশী?

পড়ায় বাধা পড়ল। আবার সেই কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর—যেন মোটরের হর্ণ বাজল।

—What is the name? Nandita! Very romantic name! Even sweeter than your's.

মিস চৌধুরীর মাথাটা লজ্জায় একটু ঝুঁকে পড়ল। কে জানে হয় তো মনে মনে গাল দিল দুর্ভাগাকে—নামটাও কি একটু সুন্দর রাখা যেতে পারত না?

—কিন্তু নন্দিতার কথা থাক্। তার চেয়ে বলি মৃত্যু পূর্বের এই কয়েক ঘন্টার কথা! রসিক পাঠকের হয়তো তা রুচিকর হবে।

এইমাত্র সব গুছিয়ে ফিরে এসেছি ঘরে। ফুল নিয়ে এসেছি অনেক। সাজিয়েছি—ঘরখানিকে মনের মতো করে। এই ঘরেই—এই বিছানায় আর একটু পরে আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে। দুনিয়ার কোনো শক্তি তা রোধ করতে পারবে না।

আঃ ফুলের গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। দোতলার গিন্নী কলতলায় যাবার সময় বলে গেল—কি ভাই, আবার ফুলশয্যে নাকি?

কথাটায় হুল আছে সত্যি। কিন্তু সত্যিই ফুলশয্যার কথা মনে করিয়ে দিলে! সেদিন নন্দিতাকে কি অপরূপ লাগছিল! বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, সত্যিই ওকে পেয়েছি বলে। কিন্তু সেদিনের সেই আনন্দের মধ্যেও ওর মুখে যেন কিসের ছায়া ছিল। কোথায় যেন একটু মেঘ। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—উত্তর দিতে পারেনি, শুধু আমার বুকে মুখ লুকিয়েছিল।

কিন্তু আমি জানতাম কিসের ছায়া। আজ এত বড় উৎসব—কিন্তু কেউ নেই—কেউ নেই। জনকতক বন্ধু এসেছিল, যারা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছিল, তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গিয়েছে—আর কেউ নেই। অথচ তখন রাত মাত্র দশটা।

আসলে এ বিয়েটা নন্দিতার বাড়ির কেউ চায়নি। তারা কল্পনাও করতে পারেনি, ভেতরে

ভতরে এত বড় ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের। তাঁদের ল্পনা ছিল অনেক উঁচু—আশা ছিল নানা ঙের। অন্যায় কিছু নয়। নন্দিতা যে ঘরের য়ে তার পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু তখানি অস্বাভাবিকতা কি করে তার পক্ষে ম্ভব হল তা মনস্তত্ত্ববিদেরাই বলতে ারবেন। সেদিন সরল বিশ্বাসে মনে করেছিলাম র হেতু ভালোবাসা—আর আজ? আজ মনে রছি, সেটা তার যৌবন-বিলাস! জীবন-নভিজ্ঞ একটি লাস্যময়ী যুবতী কন্যার কৌতূহলী মনের খেলার নেশা। সে নেশা এত-রে রূঢ় হতে পারে নন্দিতা সেদিন তা াঝেনি। যেদিন সে প্রথম বুঝল, সেদিনই ার সোনার মুকুটের নীচে চন্দন মাখা ছোট্ট পালটি ঘিরে ছায়া নামল। সেদিনই আমার প্রশ্নের উত্তরে চমকে উঠে আমার বুকে মুখ ুকালো—সেদিনই প্রথম চুপি-চুপি কাঁদল।

কিন্তু না, নন্দিতার কথা আর নয়। ও প্রসঙ্গ আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য মৃত্যুর পূর্বের মানসিক অবস্থার বর্ণনা করা।

মাত্র গত রাত্রে স্থির করেছি মরতে হবে। ক করে মরব? তাও স্থির করেছি, বিষ খেয়ে কিম্বা দেহের রক্তের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে—হ্যাঁ, ীর বিষ! সাপের বিষ পাওয়া যায় না?

যায়। তাই ছুটেছিলাম সকালেই অসিতের াছে। ওর দাদা অজিত অধিকারী হাসপাতালের াক্তার। কতবার অসিতের সঙ্গে গিয়েছি সাপের াকানে। সেখানে দেখেছি, কেমন করে ডাক্তাররা াপের বিষ কিনে নিয়ে যায়।

হঠাৎ অসময় আমাকে দেখে অসিত চমকে উঠেছিল। আমার উদভ্রান্ত চোখে ও যেন কি ক্ষ্য করেছিল। কিছুতেই কাছ ছাড়তে চায় না। থচ মুস্কিল! ও না সরলে কাজও হাঁসিল হয় া যে। শেষে কোনো রকমে ওকে সরিয়ে ডাঃ ধিকারীর হলদে রঙের আইডেনটিটি কার্ড-ানা চুরি করে নিলাম। জীবনে এই আমার প্রথম চুরি! নিপুণভাবে চুরি করতে পেরেছি। নে হল, সব মানুষেরই ভেতর চুরি করার নপুণ্য আছে—শুধু প্রয়োগ করতে পারে না ভয়ে।

কার্ড তো নিয়ে এলাম। কিন্তু কাজ তো অনেক বাকি। তাড়াতাড়ি কার্ড থেকে ডাঃ অধিকারীর ছবি তুলে ফেলে সেখানে বসালাম নিজের ছবি। ছবিতে ছিল ডাক্তারের Chief যিনি তাঁর সই—সারা দুপুর ধরে সেই সই জাল করলাম নিখুঁতভাবে।

আঃ বাঁচলাম! বোধ হয় শেষ পর্যন্ত successful হব। হে ভগবান, দেখো যেন ব্যর্থ না হই!

এইবার আর একটি কাজ—সেইটেই শেষ কাজ—বিষ কিনে আনা।

জাল ডাক্তার সাজতে হবে। বিপদ যেমন আমার, তেমনি ডাক্তারের, তেমনি দোকানের মালিকের। কাজেই ঘটা করে মোটামুটি ভালো স্যুট পড়লাম—হাতে নিলাম গোল্ড ফ্লেকের টিন—কি হবে পয়সার কথা ভেবে! সবই তো শেষ আজ। ভাড়া করলাম ট্যাক্সি! অর্থাৎ সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে। ঝড়ের মতো গাড়ি উড়ে চলল চৌরঙ্গীর দিকে।

হ্যাঁ, এই স্যুট পরে এমনি ট্যাক্সিতে করে আর একদিন ছুটেছিলাম। পাশে—একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ছিল নন্দিতা। —কলেজ পলাতক মেয়ে! তখনো আমাদের বিয়ে হয়নি। বিয়ে করতে হবে সে কল্পনাও ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য মেয়ে ঐ নন্দিতা! কি পেয়েছিল সে আমার মধ্যে! কেন জড়াতে গেল আমাকে পাকে পাকে! না —না-কখনোই তা ভালোবাসা নয়। সেটা ছিল তার সর্বনেশে নেশা।

বিয়ে হয়ে গেল। গা-ভর্তি গহনা পরে সে এল আমার ঘরে। গহনা ভালোবাসত খুব। বলেছে কতদিন,—বিয়ে হলে বাঁচি। মনের মতো করে গহনা পরে সাজি।

আমি হেসে বলেছিলাম—ও রুচিটা এ যুগে অচল।

ও তার জবাব দেয়নি। ঠোঁট উল্টে বিলাসী মেয়ে বিনুনী দুলিয়ে সরে গিয়েছিল।

আমাদের বিয়েতে নন্দিতার আত্মীয়-স্বজনের মত ছিল না কারো। বিয়েতে তারা কেউ যোগ দেয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁদের যাতায়াত শুরু হল। তাঁরা চুপি চুপি আসেন—চুপি চুপি তাঁদের মেয়েকে নিয়ে চলে যান। কাজ থেকে ফিরে এসে পাই ছোট্ট একটুকরো চিঠি—মামাবাবু নিতে এসেছিলেন, চললাম। দু-চারদিন পরে আসব।

এই যে বিচ্ছেদ এ যে কি নিদারুণ তা আমিই বুঝি। এমনিভাবে চলে যাওয়ার পিছনে কতখানি অপমান তা আমিই বুঝতাম। দুঃখ পেতাম, নন্দিতা তা বোঝে না।

একদিন যখন তিন দিনের নাম করে এক সপ্তাহ কাটিয়ে এল তখন হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল গায়ে তার গহনা নেই।

চমকে উঠলাম। —গয়নাগুলো কোথায়?

ও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—বোনকে দিয়ে দিয়েছি।

সে কি!

ও একটু হেসে বললে,— কেন, তুমি তো গহনা পছন্দ কর না!

অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই কি আমার জন্যে ও এত বড় ত্যাগ করল! মুখ থেকে কথা সরল না। নন্দিতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমার কাছে। আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার কাঁদল নিঃশব্দে।

জিজ্ঞেস করলাম—কাঁদছ কেন?

ও বললে,—কি জানি, বুঝতে পারছি না।

—গয়নার শোক?

—ধ্যেৎ। বলে সরে গেল সামনে থেকে।

আরও মাসখানেক কেটে গেল। লক্ষ্য কর-ছিলাম, দিনে দিনে ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। নেশার ঘোর যেন কাটছে। কি ভাবে চুপচাপ—দিন-রাত!

এমনি সময় আবার ডাক দিলেন মামাবাবু। অনুমতির অপেক্ষাও করল না। চলে গেল।

দু'দিন—চার দিন—এক সপ্তাহ—বিশ দিন—নাঃ, আর থাকা যায় না।

নিজেকে তো জানি, সত্যিই বড় দুর্বল মানুষ আমি। য মুহূর্তে মনে হল, ওকে অনেক দিন দেখিনি, অমনি অনাহূত ছুটলাম নন্দিতার বাড়ি।

তর-তর করে উঠে গেলাম দোতলায়। ওদিকের বারান্দায় হাসির লহর উঠেছে। মেয়ে-দের গলা আমার চেনা। একজন নন্দিতা আর একজন ছন্দা! জানান না দিয়েই হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বারান্দার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। চায়ের আসর বসেছে। অনাত্মীয় পুরুষের কড়া চুরুটের ধোঁওয়ায়—ছন্দার হাসিতে—নন্দিতার রূপ-সজ্জায় চায়ের আসর জমে উঠেছে।

কিন্তু নন্দিতার দিকে তাকাতেই আমি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। সর্বাঙ্গে তার গহনা ঝলমল করছে!

ছন্দা তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দিল বসতে, কিন্তু নন্দিতা যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। একটানে আলনা থেকে শালটা টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গে মুড়ে ছেলেমানুষের মতো পালালো ছুটে।

বসতে পারলাম না, তখনই ফিরে এসেছি। সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গহনার নেশা ছাড়েনি, মামাবাবুর পরামর্শে গহনা আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল। গরীব স্বামী—বিশ্বাস কি? কিন্তু আমি ভাবি—অপমানের ষোলকলা যখন পূর্ণই হয়েছিল, তখন নিরাভরণা হয়ে আমার ঘরে এসে আমার বক্ষলগ্না হয়ে ও মিথ্যাটুকু কি না বললেই হত না!

হ্যাঁ নন্দিতাও বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছিল তার গহনা আমি কেড়ে নেব— বিক্রী করে বাড়ি ভাড়ার টাকা দেব! জীবনে যখন তার প্রত্যুত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই, তখন কি হবে বেঁচে থেকে?

গাড়ি চৌরঙ্গী দিয়ে নিউ মার্কেটের কাছা-কাছি এসে দাঁড়ালো। স্বপ্ন টুটে গেল। সামনে এখন দারুণ পরীক্ষা। ঐ যে দোকানটার সাইন বোর্ড দেখা যাচ্ছে। বুকটা হঠাৎ কেঁপে উ

কেন এমন হচ্ছে? কিসের ভয়? মৃত্যুর অথবা ধরা পড়ার?

একবার মনে হল—ফিরে যাই তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে জীবন দিয়ে কি হবে? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—তুচ্ছ একটা মেয়ে বড় কথা নয়, বড় কথা পৌরুষের অপমৃত্যু। এ পৃথিবীতে কেউ যে তাকে ভালোবাসে না। চারিদিকে শঠতা—বঞ্চনা—মিথ্যা। সেখানে তার মতো তাজা প্রাণ—নিষ্কলঙ্ক হৃদয় ফুলের মতো শুকিয়ে যাবে যে! সুন্দরের—সত্যের সে অপমৃত্যু দেখবার আগে সব শেষ হয়ে যাক।

দোকানের সামনে আসতেই ভেতরটা দেখা গেল। দু' পাশে অনেকগুলো কাঠের খাঁচা রয়েছে। কাঠের ওপর জাল দেওয়া। ঐ খাঁচার মধ্যে কি আছে তা সে জানে। এত দূরে থেকেই হিস-হিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা নয়—শত শত মুখ থেকে চাপা গর্জন হিস্-হিস্-হিস্-হিস্-হিস্-হিস্!

দোকানে ঢুকলাম। আলোর জোর নেই। হাল্কা নীল আলো জ্বলছে কতকগুলো। তাও এমন করে শেড দেওয়া যাতে শুধু কাজই চলে—চারিদিক আলোকিত হয় না।

আলো আঁধারি জায়গা—চারিদিকে সাপের হিস্-হিস্ শব্দ! তারই মধ্যে প্রেতের মতো কতকগুলো লোক নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে তাদের প্লাস্টিকের প্লাবস। এরাই কেস থেকে সাপ বের করে খদ্দেরকে দেখায়।

আরও একটু ভেতরে ঢুকলাম। বাক্সগুলো লক্ষ্য করলাম ভালো করে। কত রকমের সাপ! কতকগুলোর ফণা আছে, কতকগুলোর ফণা নেই, শুধু জিব বের করছে—লম্বা সরু জিব—একটু বেরিয়েই দুভাগ হয়ে লিক্-লিক্ করে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে হিস্-হিস্ শব্দ!

ওদিকে কতকগুলো খাঁচার ওপর গাছপালার ডাল কেটে এমনভাবে বসানো হয়েছে যেন ঠিক জঙ্গল! সেই জঙ্গলের মধ্যে যে কি ভয়ানক সরীসৃপ আত্মগোপন করে আছে এই মুহূর্তে তা দেখবার সাহস হল না। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালাম। এখানেও সাপের বাক্স। এ বাক্সগুলোর ওপর আবার বরফ চাপানো। বোধ হয় মেরু অঞ্চলের সাপ আছে এতে। কিন্তু কিং কব্‌রা? কিং কোব্‌রার বিষ চাই যে!

এবার যেখানে দৃষ্টি পড়ল সেখানেও কি এক ভয়ানক অস্তিত্ব! সাপ নয়—একটা মানুষ। কিন্তু বড় সাধারণ মানুষ বলে মনে হল না। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। ফর্সা রঙ, চওড়া বুক—ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—ব্যাক ব্রাস করা কাঁচা পাকা চুল। বাঙ্গালী নয়—সম্ভবতঃ গুজরাটি! কেন স্মোক করে চলেছে। কিন্তু ও কিসের দৃষ্টি! ছোটো ছোটো কুৎকুতে চোখ—চোখের মণিতে আগুন চিক্-চিক করছে। সে আগুনের তাপে এখানকার সমস্ত বিষধর সাপ যেন ঝিমিয়ে আছে! লোকটি এক দৃষ্টে আমাকে দেখছে—দেখছে তো দেখছেই। উঃ কি অসহ্য দৃষ্টি!

ফিরে এলাম বিষের শিশি নিয়ে—কিন্তু তখনও সেই দুজোড়া চোখ আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছে।

পাঠে বাধা পড়ল। মিস চৌধুরীর কানের কাছে আবার সেই কন্ঠস্বর গম-গম করে উঠল।

—Yes! yes!

কাগজ রেখে মিস্ চৌধুরী অবাক হয়ে তাকালো তার মুখের পানে। প্রোপ্রাইটার তখন মনের আনন্দে তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে।

—Did you notice him day before yesterday?

মেয়েটি তার বড় বড় দুই করুণ চোখ মেলে ধরে বললে—কই না, লক্ষ্য করিনি তো!

—আমি করেছিলাম। ঠিক সন্দেহ করেছিলাম ও লোক তো আমারই কাষ্টমার। ওর চিঠিতে যে ডেস্‌ক্রিপ্‌সন দিয়েছে তাতে এই দোকানটাই বোঝায়। Is it not?

মেয়েটি চমকে উঠে বললে,—সে কি! তুমি লক্ষ্য করেছিলে, সন্দেহ করেছিলে অথচ তাকে কিছু বললে না! মরবার জন্যে বিষ নিয়ে চলে যেতে দিলে!

প্রোপ্রাইটার টেবিলের ওপর তার চওড়া মোটা হাতের ঘুঁষো মেরে হা-হা করে হেসে উঠল।

—আমি তাকে বাধা দেব! হা-হা-হা-হা! নেবে, একটা ইয়ংম্যান কমল দুনিয়া থেকে!

বলেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাকালো মেয়েটির দিকে। মেয়েটির মুখ বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। সেই বেদনার ওপর আর একবার নির্মম কশাঘাত করল প্রোপ্রাইটার—ইয়ংম্যানের কথা শুনলেই তোমাদের মনটা যেন কেমন করে ওঠে, না মিস চৌধুরী?

মিস চৌধুরী সকাতরে মৃদু নালিশের সুরে বললে—again!

প্রোপ্রাইটার তার চওড়া হাত দিয়ে মিস চৌধুরীর কোমর বেষ্টন করে মৃদু হেসে বললে—excuse me darling!—অর্থাৎ আর তোমাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলব না।

বাইরে ঘর থেকে তখন একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে—হিস্-হিস্-হিস!

হাঁ তাজা বিষ আছে! সেই বিষ ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়ায়।

না-জানা কথা

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

বৃহস্পতি রেখা "মহর্ষি বা তত্তুল্য ব্যক্তিগণের করতলে দৃষ্ট হয়।" আর বৃহস্পতি ক্ষেত্রে ত্রিশূল চিহ্নও একটি অতীব শুভচিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এতগুলি শুভরেখা ও চিহ্নযুক্ত বৃহস্পতি ক্ষেত্র 'কোটিকে গুটিক' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কররেখা বিচারে কিরো (Chiero) শিরোরেখা বা মানসিকতার রেখাকে সব চেয়ে উঁচু স্থান দেন। এই রেখাটি নির্দেশ করে শক্তির বিকাশ। রবীন্দ্রনাথের করপার্শ্ব পর্যন্ত প্রসারিত বলবান শিরোরেখা শক্তির বিকাশ হয়েছিল পরিপূর্ণভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের রবি-রেখাটির কথা বলছিলাম। রেখাটি আয়ুরেখা থেকে উঠে সরাসরি চলে গেছে একেবারে অনামিকার নিম্নস্থ রবি-ক্ষেত্র পর্যন্ত। এই রবি রেখায় রবি-ক্ষেত্রে আছে আবার একটি চতুষ্কোণ চিহ্ন। আয়ুরেখা থেকে উদ্গত রবিরেখা সম্বন্ধে Chiero তাঁর 'Language of the Hand' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন:

"Rising from the line of life, with the rest of the hand artistic, it denotes that the life will be devoted to the worship of the beautiful with the other lines good, it promises success in artistic pursuits".

কবির জীবনের সঙ্গে মিলে যায় তাঁর হাতের ভাষার ভাষা। জীবন হয়েছিল তাঁর সুন্দরের উপাসনায় উৎসর্গিত, কাব্য-সাহিত্য শিল্পকলার অনুশীলনে যে সাফল্য তিনি অর্জন করে গেছেন চিরকাল তা পরম বিস্ময়ের উদ্রেক করবে বিশ্বমানবের মনে। তাঁর হাতের রেখায় এবং চিহ্নাদিতেও তো রয়েছে সেই চরম সাফল্যেরই অভ্রান্ত ইঙ্গিত। কবির হাতের লেখার মত হাতের রেখার ছাপও সযত্নে রক্ষণীয়। কররেখা বিজ্ঞানে কিরোর মত ব্যুৎপন্ন যদি কেউ থাকেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের হাতের ভাষার পাঠোদ্ধার করে অন্ততঃ তাঁর অন্তর্লোক সম্বন্ধে এমন সব না-জানা কথা তিনি শোনাতে পারবেন যার সন্ধান মিলবে না তাঁর জীবনচরিতে, কিংবা বহু আয়াসে সংগৃহীত উপচীয়মান তথ্যস্তূপে।

বিবৃতি

মণিমালা দাশগুপ্ত

পাতায় পাতায় মেলে ধরা পাতাবাহারের মন—,
সবুজের বনে বনে—এককোণে। যদিও সম্পূর্ণ নয়
রঙের বাহার, তবুও তো দ্বিধাহীন। আছে তার
ছায়া, আর আছে এ মাটীর কাছে, অকৃপণ
ঐশ্বর্যের খোঁজে একটী জিজ্ঞাসা।—
অনেকে দেখেছে তারে সবুজের বনে—এককোণে।
শুধু একমনে—, একা একা খেলা। দেখেছে
রঙীন চোখে আরও রঙ ঢেলে, কী তার অপরূপ
শোভা। বিস্ময়ে দেখেছে তারা—
হোয়ে গেছে আপনাবিস্মৃত।
একটী পাতার রঙ রঙেদের উত্তাল অস্তিত্ব!
আমিও দেখেছি তারে বহুদিন।
তবু একদিন, আমার
মনের কাছে, হঠাৎ অশান্ত দোলে
দুলে গেলো তারা।
একটী সে বাহারের গাছ আর তার ডালে ডালে
অজস্র পাতারা। মনে হোল—, প্রশ্ন আছে ঢের।
রঙ ঢেলে হোক না মুখর। তবুও সত্তায় তার—
পরম আকূতি, আরও আরও রঙ চেয়ে চেয়ে,
হার মেনে স্থির হোয়ে গেছে। স্মৃতি হোতে মুক্তি
চায়—, পেতে চায় কর্মের বিশ্রান্তি।
যেখানে রঙের শেষ সীমা—, স্তব্ধ—শান্ত—,
স্পন্দন রহিত, অথচ ভাস্বর, সেখানে পৌঁছাতে
চায় সে কি? এই কি এ জীবনের
চরম বিবৃতি।
অথবা বিরূপ সে কি অজানা সে অব্যক্তের
প্রতি? তাই নিরন্তর কোন আকাঙ্ক্ষার ধারা
নিজেরে করিছে আত্মহারা। রূপ হোতে আরও
রূপে ছুটে যেতে চায়—, সবুজের বনে বনে
পাতাবাহারেরা। অশান্ত অতৃপ্ত তার মনে
মনে—, অফুরন্ত রঙের কামনা। জানে না সে
আত্মসংহরণ। নিশ্চয় জেনেছে সে কি—,
এ জীবনই, সত্য শিব সুন্দরের চূড়ান্ত চেতনা
আর বিশ্বাতীতে আছে এক মুক্তির বন্ধন।

"খাঁচা"

(১৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"ঃ আর তাতেও কি ছাড়া পাবার উপায় আছে! হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের খানিকটা দায়িত্ব, বাইরের ফাংশান.........।—"

শান্তা বোধহয় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে।

—"ঃ কেন, তোমাকেও তো কতবার সেধেছি সঙ্গে যেতে।" হাসি আসে, তবু চুপ করে থাকতে হয়।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার রেলিংটায় ঠেস্ দিয়ে। সিঁথির দু'পাশে দুলছে কোঁকড়া কালো চুলের গোছা। মুখে চোখে এসে লাগছে রাতের হাওয়া। সে হাওয়া ঠাণ্ডা।

নিচে এসে থামে মোটর-বাইকটা,—উপরে উঠে আসে আদিনাথ।

বেল ফুলের গ'ড়ে একটা জড়িয়ে দেয় আজও খোঁপায় ; বলে—

"ঃ কাল আমার একজন বন্ধু সস্ত্রীক আসবে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে,—বুঝলে! চা-খাওয়ার নেমন্তন্ন করেই এসেছি একেবারে ; জানি, তুমি খুশীই হবে—।"

"জানো?"

"জানবো না?—"

আদিনাথের চোখে সেই বিস্ময়—

"তুমি হয়তো মনে কর, আমি তোমার এই একা থাকার কথা ভাবি না! কিন্তু তা নয়, ভাবি, বুঝিও—যে একা একা সময় কাটাতে তোমার কত অসুবিধা। তা ছাড়া এতবড় বাড়িতে, কথা বলার মতও তোমার কোন সঙ্গী-সাথী নেই, যে-দু'একটা মনের কথা—

"তাই বুঝি বন্ধু-বান্ধবীকে আমার মনের খবর জানবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছ?

চাপা হাসির একটু বাঁকা রেখা শান্তার ঠোঁটে—

"বাস্তবিক,—কী দরদী মন তোমার।"

"আবার ঠাট্টা!—"

"সত্যি—না।"

এগিয়ে আসে আদিনাথ ; একজোড়া এয়ারিং বার করে পকেট থেকে,—তারপর সেটা পরায় শান্তাকে ;

"ভেবে দেখলাম কানের গহনাগুলো সব সেকেলে হ'য়ে গেছে, তাই এই নতুন ডিজাইনের এয়ারিংটা—"

আয়নার সামনে ওকে সরিয়ে আনে—"দেখতো,—আমার চয়েস আছে কি না! কেমন মানিয়েছে তোমাকে।"

এর পরেও ওর মোলায়েম কথার শেষ হয় না—"নিজের পছন্দের উপরে আমার বিশ্বাস খুব ; প্রমাণ তুমি নিজে। তোমাকেও বেছে নিয়েছি অনেকের মধ্যে থেকে। বুঝেছি—আমার প্রকৃতির সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে তুমি ; অন্ততঃ আমাকে আঘাত করবে না কোন সময়ে,—কিছুর জ'ন্যেও।

'তাই বুঝি?"

লম্বা আয়নাখানার সামনে কেমন যেন আড়ষ্টের মত তাকিয়ে থাকে শান্তা। শোনে—আদিনাথের সেই আদেশ আর অনুরোধ ভরা গলার আওয়াজ—

"কাল সেই নেকলেশটা পরবে, যেটা তোমার জন্মদিনে দিয়েছি। তার সঙ্গে এই এয়ারিং,—চমৎকার মানাবে তোমায়—।"

আদিনাথের মুগ্ধ দৃষ্টি শান্তাকে যেন ঘিরে রাখতে চায়—বাইরের সব কিছু থেকে আলাদা ক'রে,—স্বতন্ত্র ক'রে।—শান্তা বাধা দেয় না।

পরের দিনের সন্ধ্যা—।

সমস্ত হলঘরটা আলোয় আর সাজানোয় ঝকমক্ করছে প্রতিদিনের মতই,—আর নিমন্ত্রিতের অপেক্ষা করছে ওরা দু'জন,—আদিনাথ আর শান্তা।

আজকের হাওয়া—শুধু রজনীগন্ধা নয়, ফোটা গোলাপের গন্ধ ছড়াচ্ছে 'ভাস্' থেকে! আলোর টুক্রো প্রতিফলিত হ'চ্ছে যেন শান্তার সমস্ত দেহে জড়ানো সাজ পোষাকের মধ্যেও ; যেদিকে বারবার তাকাচ্ছে আদিনাথ,—বারবারই বোধহয় উপলব্ধি করছে আত্মতৃপ্তি—! কিন্তু সে তৃপ্তির স্পর্শ নেই শান্তার মুখে—, এমনকি দৃষ্টিতেও।

এখনি হয়তো এসে পৌঁছাবে ওরা,—নিচেয় এসে থেমে যাবে ওদের গাড়ির শব্দ।......

ক্রিং, ক্রিং—

কলিং বেল বেজে ওঠে টেলিফোনের, রিসিভারটা তুলে নেয় আদিনাথই,—একটু পরে নামিয়ে রাখে। এগিয়ে এসে বলে শান্তাকে—

"ওরা আজ আর আসতে পারলে না, কি একটা কাজে আটকে গেছে—বললে। পরে বরঞ্চ আর একদিন—সময় ক'রে—"

"বেশ-তো।"

স্বস্তির একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে শান্তা। দেখে আদিনাথ বাড়ির বার হ'য়ে যাচ্ছে।—

এবার সে একা।

গা থেকে সমস্ত সাজ খুলে রাখে একে একে—; তারপর, এসে দাঁড়ায় সেই খোলা বারান্দাটায়,—যেখান থেকে দেখা যায় ছড়ানো আকাশ আর আকাশ ভরা নক্ষত্র! মুখে চোখে আর সারা দেহে পাওয়া যায় খোলা হাওয়ার স্পর্শ,—দূর-দূরান্ত ছুঁয়ে যা নিয়ে আসছে অবাধ স্বাধীনতা—আর অনন্ত মুক্তির আস্বাদ।

রণক্ষেত্রেই সীমিত থাকে না
বীরের ধর্ম শুধু,
হৃদয় ধর্মে বলবান যিনি প্রত্যেকে মানে তারে।
জীবনে কখনো যায়নি যুদ্ধে
ধরেনিকো তরবার,
এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সেও হতে পারে।

—হোমার—

অনুবাদ—মায়া বসু

অতলান্ত

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

খেয়েছি কিন্তু আঁশবটি এখনো ফেলে দিইনি।"

মোড়ের মাথায় বটতলায় এদেরই বোধ হয় **দেখেছিলেন** সোমনাথ।

—আজকের রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারবে না মা—কাল সকালেই আমি আসছি—তারপর পরামর্শ করে একটা কিছু করা যাবে। দরজা বন্ধ করে দাও—পুতুলকে লক্ষ্য করেই বললেন সোমনাথ।

বাড়া নয়, সরাসরি চেম্বারে ফিরে এলেন ডাক্তার। ভিউবক্সের আলো আবার জ্বলে উঠল। চারখানা ছবি পাশাপাশি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন—তারপর কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

বাসায় ফিরলেন যখন তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা—তাঁর সমস্ত দেহমন থেকে সমস্ত শক্তি কে যেন নিঙড়ে নিয়েছে। স্ত্রীর উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাবে বললেন—'শোন কমল, কাল আমাদের বাড়ীতে অতিথি আসছেন—আমাদের শোবার ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে—ওঃ কারা! আমারই পেসেণ্টের মা ও বৌ—বৌটি সন্তান-সম্ভবা—পেসেন্টটি মারা গেছে।'

কমলা খুশী হয়নি। আশ্চর্য হয়ে বললে—'দুজন বিধবা, তাদের মধ্যে আবার একজন পোয়াতি!—এ সব কি ব্যাপার বলত! মেয়েটির বয়স কত আর, পেসেন্ট কি তোমার এই প্রথম মরল নাকি?' কিন্তু স্বামীর সর্বহারা মুখের দিকে চেয়ে কথা বাড়াতে আর সাহস করলে না—থেমে গেল।

পরের দিন একেবারে ভোরে উঠেই রওনা হয়ে গেলেন সোমনাথ। বেলা দশটার মধ্যে সেখানকার দেনা-পাওনা চুকিয়ে ওদের নিয়ে এলেন। ভুল বড় হলে তার প্রায়শ্চিত্তও অনেক বড়—এখানে দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, না হলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখেও ভয় পাবেন ডাক্তার। কমলাকে বললেন,—'এই নাও তোমার মেয়ে—আমার মা।'

কমলা মুখে হাসবার চেষ্টা করলেও মনে মনে খুশী হল না। বস্তি থেকে সহায়-সম্বলহীন অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে কুড়িয়ে এনে হাতে তুলে দিলেই মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটে না। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে একটি সুধাক্ষরা আশ্রয় চিরকালের মত ভেঙে দিয়েছিলেন সোমনাথ—কিন্তু কি করবেন—এও দণ্ড, একে গ্রহণ না করে উপায়ই বা কৈ!

তারপর সাতাশ বছরের ঘটনা বহুল ইতিহাস। এর ভেতর পল্লব এসেছে, বড় হয়েছে তাঁর সতর্ক স্নেহচ্ছায়ায়—তাকে ইংলণ্ড পাঠিয়েছেন শিক্ষা শেষ করতে—এম, আর, সি, পি; এফ, আর, সি, এস ডাক্তার পল্লব বিশ্বাস তাঁর নিজের হাতের তৈরী। চলে গেছে কমলা সংশয় সন্দেহে অভিমানে পুড়ে পুড়ে—চলে গেছে পল্লবের ঠাকুমা। সন্দেহে কুৎসায় প্রিয় পরিজন মুখর হয়ে উঠেছে—সব ক্ষমা করেছেন সোমনাথ, শুধু পারেননি নিজেকে ক্ষমা করতে। গোপন পাপের লজ্জা তাঁর নিস্তব্ধ প্রহরকে অশ্রুহীন বেদনায় রূপান্তরিত করেছে বারবার।

নিমাই বিশ্বাস—৩৭৲ টাকা মাইনে রেলের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক—ম্যাট্রিক পাশও নয়—বস্তির খোলার ঘরে শুয়োরের মত একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে অসংখ্য মানুষের প্রবাহে একদিন মিলিয়ে যেতে হত—তারই স্ত্রী-পুত্রকে তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—স্নেহ-প্রীতিতে কোনখানে কোন ফাঁক রাখেননি—অথচ এতটুকু গ্রহণ করেন নি তাদের হাত থেকে—জীবনের সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন দিয়েছেন—এতে কি তাঁর পাপ ধুয়ে যায়নি!

বড় সাধ যায় সোমনাথের। পল্লবের হাতে যদি তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হত! তাহলে বোধ হয় শেষ করে দিয়ে যেতে পারতেন তার পিতৃঋণ। মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় কোন একটা ইনজেকসন......

ঠিকই ত! ডাক্তার সোমনাথের মৃত্যু কি তাঁর কাছে কোন সমস্যা নাকি? বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ ডাঃ সেন কিসের আশায় বেঁচে আছেন—বাঁচতে চাইলেই বা আর কতদিন বাঁচবেন। পুতুল পল্লব এদের সম্বন্ধে করবার কিছুত আর অবশিষ্ট নেই।

ডাঃ সেন যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন। বড় আলোটা জেবলে আলমারী খুলে দুটো এমপিউল বার করে আলোর দিকে তুলে ধরলেন। তারপর সিরিঞ্জ ধুয়ে পরিস্কার করে ইনজেকসন তৈরী করলেন। দুখানা চিঠি লি[illegible] টেবিলের উপর রাখলেন—তারপর প্রার্থনা করতে বসলেন। শুধু ক্ষমা—অনন্ত ক্ষমা!!

ঘরে ঢুকল পল্লব মাকে নিয়ে—'এই দেখ মা দাদুর কাণ্ড—যেই ঝড়বৃষ্টি সুরু হয়েছে অমনি পাগলামি সুরু করে দিয়েছেন—তারপর থেকে সেই যে অজ্ঞানের মত পড়েছিলেন—নাও বাবা এখন তোমাকে এনে দিলুম—তোমার জিনিষ তুমি সামলাও—একি! কিসের ইনজেকসন নিচ্ছ দাদু—বাঃ, এ আবার কি? তোমার নামে চিঠি দাদুর হাতের লেখা—পুলিশের নামেও—তুমি কি রহস্য পত্রিকা পড়ছ নাকি... হাত বাড়িয়ে চিঠি দুখানা নিতে গেল পল্লব।

সোমনাথ তার হাত থেকে সে দুখানা টেনে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন। বিস্মিত পল্লব দেখলে তাঁর চোখে জল। ও আরো দেখলে সেই জলের উপর টপটপ করে আরো কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়েছে। মা দাদুর পাকা চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন—যেমন করে পল্লব ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলে তার মাথার চুলের মধ্যে সমস্ত আঙুলগুলো দিয়ে স্নেহ ও শান্তি জড়িয়ে দেন।

না হল না—এবারও বলা হল না সোমনাথের কেমন করে সাতাশ বছর আগে এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় ডাঃ সেন এক মারাত্মক ভুল করেছিলেন দুটি স্কায়োগ্রামের অদলবদল করে

ছোটদের পাততাড়ি
স্বপনবুড়োর চিঠি
শারদীয়ায় মন-বলাকা ভাসাই গগনে—
কাশফুলেরা চামর দোলায় মধুর লগনে!
শিউলী ফুলে আঁচল বিছায়
পাল তোলা নাও সব দিকে ধায়
মঙ্গলেরই শঙ্খ তোদের ডাকছে সঘনে!
গল্পেভরা সপ্তডিঙা চল্‌লো অকূলে—
শিশুরদলে হল্লা করে নদীর দুকূলে!
পাত্‌তাড়ি কে পড়বে আগে—
তাহার লাগি সবাই জাগে,
দেয় ছড়িয়ে স্বপনবুড়ো তল্পি তখনে॥
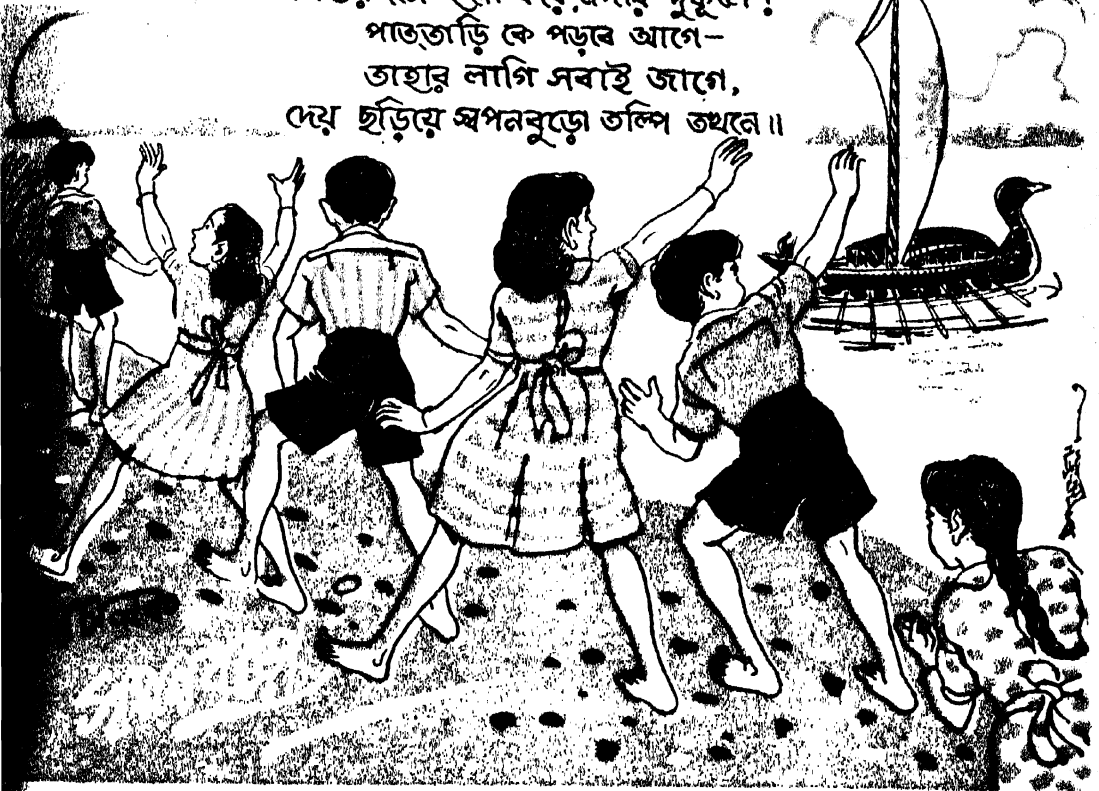
॥ এক ॥

মহারাজা শশাঙ্কের পর অনেকদিন পর্যন্ত গৌড় বা বাঙ্গালার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন কোন বিদেশী রাজা এদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমস্ত বঙ্গদেশকে গৌড়দেশ বলিলেও ইহার উত্তরভাগই বিশেষরূপে ঐ নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ অনেক সময়ে মগধ রাজার অধীনও ছিল। কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মগধনাথ বা গৌড়েশ্বরকে নিহত করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজও পরাজিত হইয়া যশোবর্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্মা আবার কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হন। ললিতাদিত্যের কলিঙ্গ জয়ের সময় গৌড়ের সামন্ত রাজা তাঁহার নিকট অনেক হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর নিজেও কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্যের পরিহাস কেশব নামে নারায়ণ মূর্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। গৌড়েশ্বর তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

॥ দুই ॥

এই সংবাদ পাইয়া গৌড়পতির সৈন্যসামন্ত লোকজন কাশ্মীর ভূপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তীর্থযাত্রীরূপে কাশ্মীরে প্রবেশ করিল এবং বীরদর্পে ছদ্মবেশী তীর্থযাত্রীরা পরিহাস কেশবের মন্দির অবরোধ করিল। পূজকেরা মন্দিরের দ্বার অবরোধ করিয়া দিলে গৌড়ীয় বীরগণ রামস্বামী নামে রজত নির্মিত মূর্তিকে আর এক পরিকেশব মূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। পরিহাস কেশব তাহাদের রাজাকে রক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ জন্মিয়াছিল। দেবতার প্রতি যে ক্রোধ করা উচিত নহে প্রভুভক্ত গৌড়ীয় বীরেরা তখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা রামস্বামীকে পরিহাস কেশব মনে করিয়া ভুল করিয়াছিল। যখন তাহারা রামস্বামীর মূর্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে সেই সময় রাজধানী শ্রীনগর হইতে সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল, অল্প সংখ্যক গৌড়ীয় বীরগণ রামস্বামীর মূর্তি চূর্ণ করিয়া একে একে তাহাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিল। বহু সংখ্যক শ্রীনগরের ও কাশ্মীরের সৈন্যগণের সহিত অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধে গৌড়ের বীরেরা প্রভুভক্তি দেখাইয়া অক্ষয় গৌরব লাভ করিয়াছিল। অনেকদিন পর্যন্ত রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল। এবং কাশ্মীরের লোকেরা গৌড়-বীরগণের যশোগান করিত।

॥ তিন ॥

এই প্রসঙ্গে আর একটি কাহিনী বলিতেছি। ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়াপীড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার শ্যালক জ জ জ কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। জয়াপীড়ের সৈন্যগণ ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। তিনি অবশেষে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হন। পরে ছদ্মবেশে গৌড়ে উপস্থিত হন। সেই সময়ে জয়ন্ত নামে গৌড়দেশে এক রাজা ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্ধন তাঁহার রাজধানী ছিল। জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হইয়া গুপ্তভাবে আসিয়া এক সিংহ হত্যা করেন। তাহাতে লোকে তাঁহার পরিচয় পায় যে ইনি কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়। রাজা জয়ন্ত তাঁহার পরিচয় পাইয়া নিজ কন্যা কল্যাণী দেবীর বিবাহ প্রদান করেন। জয়াপীড় কল্যাণী দেবীকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন যেন কাশ্মীরের হারা লক্ষ্মীকে আবার ফিরিয়া পাইলেন। তিনি পঞ্চ গৌড়ের রাজাদের পরাজিত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কল্যাণী দেবী যে জয়াপীড়ের পক্ষে কাশ্মীরের হারা লক্ষ্মী-স্বরূপ হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায়। জয়াপীড় কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার শ্যালক জ জ জ বারবার পরাজিত হইয়া নিহত হন। জয়াপীড় আবার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। কল্যাণী দেবীর জন্য জয়াপীড়ের এইরূপ কল্যাণ হওয়ায় তাঁহাকে কাশ্মীরের হারা লক্ষ্মী মনে করা অসঙ্গত নহে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়াপীড় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথায় কল্যাণপুর নামে এক নগর স্থাপিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক জয়াপীড়ের গৌড়বিজয়ের কাহিনী ইতিহাসমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে জয়াপীড় রাজচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে গিয়াছিলেন একথা অবিশ্বাস্য নহে।

দাঁড়কাক বলে তার আত্মীয় স্বজনে
"তোমাদের কাজ শুধু চ্যাঁচানো,
কুচকুচে কালো রং, দড় শুধু ভোজনে,
বুদ্ধিও কিদঘুটে প্যাঁচানো।
আমি হব রাজহাঁস, রাজকীয় ধরণে
হেলে দুলে চলে যাব পুকুরে
চারিধারে আলো হবে ধবধবে বরণে
সন্দেহ নাই এতটুকুরে।"
এই বলে দাঁড়কাক গেল চূণ গোলাতে,
সারা গায়ে চূণ তার মাখিয়ে
রাজপথে সং সেজে ঢং করে চলাতে
কৌতুকে দেখে সবে তাকিয়ে।
চূণ মেখে দাঁড়কাক হাঁস হোলো গরবে,
পরোয়া সে নাহি করে কাহারে,
দেখে তারে হেসে ওঠে রাজহাঁসে সরবে
"টেসো হাঁস" নাম দিল তাহারে।

সে যুগের যাগ-যজ্ঞ

যামিনীকান্ত সোম

এটি পুরাণের গল্প। পুরাণের গল্পে যাগ-যজ্ঞের কথা অনেক দেখা পাওয়া যায়। এক যজ্ঞের ঘোরালো এক গল্প আজ বলি। সে যুগের কথা হলেও অসত্য বলে মনে হওয়ার কারণ নয়। তখনকার যুগ ও কাল এই রকমই ছিল।

এক রাজা ছিলেন, নাম সুবর্চা। হঠাৎ তিনি দরিদ্র হয়ে পড়লেন। দরিদ্র হওয়াতে অন্য রাজারা এসে সবাই অত্যাচার চালালো তাঁর উপর। রাজা সুবর্চা তখন হাতে ফুঁ দিয়ে অনেক সৈন্যদল সৃষ্টি করে ফেললেন, আর যুদ্ধে অন্য রাজাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন। এই কারণে এর নাম হল করন্ধম। এঁর এক পৌত্র জন্মাল; নাম তাঁর মরুত্ত। এই মরুত্ত হলেন মহাবীর। ইনি মহা-প্রতাপশালী হয়ে রাজচক্রবর্তী হলেন। মহাবিক্রমে ইনি রাজত্ব করতে থাকেন।

কিছু পরে এঁর ইচ্ছা হল হিমালয়ের প্রান্তে—মেরু প্রদেশে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। এই যজ্ঞের পুরোহিত হবেন কে, সেই হল চিন্তার বিষয়। ভেবে-চিন্তে মনন করলেন বৃহস্পতিকে। বৃহস্পতির আর এক ভাই ছিলেন। নাম তাঁর সংবর্ত। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না আদৌ। বৃহস্পতির উৎপীড়নে সংবর্ত দুটি খালি হাত নিয়ে বনবাসী হলেন।

রাজা মরুত্ত বৃহস্পতিকে পুরোহিতের জন্য মনন করে রেখেছেন। ও-দিকে দেবরাজ ইন্দ্রের হল মহা হিংসা মরুত্তের উপর। তখনকার কালে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যোগাযোগ ছিল। ইন্দ্র ভাবলেন,—মরুত্ত করবে যজ্ঞ? কেন? দেখি কি ক'রে সে যজ্ঞ করে। বৃহস্পতিকে তিনি নিজের যজ্ঞের পুরোহিত করলেন, আর বারণ করলেন তাঁকে, মরুত্তের যজ্ঞে যেন তিনি না যান। বৃহস্পতি এতে সম্মত হলেন। তারপর মরুত্ত তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন,—মানুষের আমি যাজন করি না। মরুত্ত ভাবলেন, তাইতো! তিনি মহা হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন, এমন সময় পথে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে দেখা। নারদ তাঁকে বললেন,—ভাবনা কিসের? যাও তুমি বৃহস্পতির ভাই সংবর্তের কাছে। তাঁকে কর পুরোহিত। তিনি মহা তপস্বী ও শুদ্ধচেতা। যজ্ঞের ফল ভালই হবে।

সংবর্তের কাছে গিয়ে নারদের কথামতো মরুত্ত করলেন প্রার্থনা, করলেন কাতর মিনতি। সংবর্ত শুনে চুপ করে রইলেন প্রথমে। তাঁর মিনতি দেখে বললেন,—আচ্ছা আমি যাজন করবো, কিন্তু ইন্দ্র আর বৃহস্পতি যদি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহলে যেন আমায় ত্যাগ করবেন না। মরুত্ত শপথ করে বললেন যে কোন কারণেই তাঁকে তিনি ত্যাগ করবেন না।

তখন সংবর্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে দিলেন বহু সৎপরামর্শ। তার একটি হোল যে, হিমালয়ের মুঞ্জবান পর্বতে গিয়ে শিবকে কর আরাধনা। তিনি সন্তুষ্ট হলে প্রচুর স্বর্ণ তোমাকে দেবেন। সে স্বর্ণ তোমার যজ্ঞের কাজে লাগবে। মরুত্ত শিবকে করলেন আরাধনা। তাঁকে সন্তুষ্ট করে অফুরন্ত স্বর্ণ সংগ্রহ করলেন।

এই সকল সংবাদ পেলেন বৃহস্পতি। সংবাদ পেয়ে তিনি মহারাগান্বিত। হল তাঁর ভয়ানক হিংসা। ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, মরুত্তকে ও সংবর্তকে দমন করতে। ইন্দ্র তখন হুকুম দিলেন অগ্নিদেবের উপর। বললে,—যাও, বৃহস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে মরুত্তের যজ্ঞশালায়। গিয়ে বল, বৃহস্পতিকেই যেন যাজনের ভার দেওয়া হয়। বৃহস্পতি করবেন যাজন, সংবর্ত নয়। অগ্নি গিয়ে একথা বলাতেই, সংবর্ত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিকে বললেন,—এখুনি তোমায় ভস্ম করবো—তুমি ভেবেছ কি? তখন মহা বিপদ। বেগতিক দেখে ইন্দ্র এবার গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পাঠালেন মরুত্তের কাছে। গন্ধর্বরাজ এসে বললেন,—বৃহস্পতিকে যাজনের ভার দিয়ে পুরোহিত না করলে ইন্দ্র তোমায় বজ্রাঘাত করবেন। রাজা মরুত্ত তেজের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—সংস্তম্ভনী বিদ্যার বলে তিনি এই সব নিবারণ করবেন—করুন তিনি বজ্রাঘাত। এ আর এক বিপদ।

ও-দিকে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ করে মন্ত্রের বলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের আহ্বান করলেন। সংবর্তের মন্ত্রের আহ্বানে আসতেই হল ইন্দ্রকে ও দেবতাদের। এঁরা উপস্থিত হওয়াতে ব্যাপারটা সব উল্টে গেল। সংবর্তের মন্ত্রের বলে প্রীত হয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যজ্ঞের শেষ আহুতি দেবার নির্দেশ দিলেন। আহুতি দেওয়া হল, বহু বৃষ বধ করা হল, বহু স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া হল। যজ্ঞ হল সম্পূর্ণ। কত আনন্দ। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা চলে গেলেন। তারপর?

রাজা মরুত্ত অবশিষ্ট স্বর্ণরাশি কোষ মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে এসে সসাগরা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন।

এরপর আরো আছে। অনেক কাল পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ব্যাসদেবের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন এই সঞ্চিত স্বর্ণরাশি এখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। সে স্বর্ণরাশি ছিল অফুরন্ত।

লঙ্কারচাঁদের আজব খবর

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

লঙ্কারচাঁদের ব্যাটা ফক্করচাঁদ। ঐ যে কথায় আছে-না—যেমন নীলমণি তেমনি তার যাদুমণি,—এরাও তাই,—দুজনেই আস্ত বোকচাঁদ। আর, শুধু ওরাই-বা কেন, যে-রাজ্যের লোক তারা, সে-রাজ্যের প্রত্যেকেই এক-একটি খাঁটি বোকচাঁদ।

ফক্করচাঁদ লঙ্কারচাঁদের ভারী ন্যাওটা, কখখনো বাপের কাছ-ছাড়া হয় না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাপ-ব্যাটা নদীর চর ভেঙে বাড়ীতে ফিরছে। তখন একটা শেয়াল জলের ধারে ব'সে গর্ত থেকে কাঁকড়া ধ'রে খাচ্ছিল। সেই শেয়ালটাকে দেখে ফক্করচাঁদ ব'লে উঠল—হুই দ্যাখো, বাবা, একটা ঘোড়ার বাচ্চা। আনো না তুমি বাচ্চাটাকে ধরে, বাড়ী নিয়ে গিয়ে পুষব।

লঙ্কারচাঁদ বল্‌ল—ও বাব্বাঃ! ওকে কি ধরা যায়! ও যে আসল পক্ষীরাজ-ঘোড়ার ছানা। ধরতে গেলেই ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে জলের ভেতরে গিয়ে লুকোবে। তারপর আবার সেখান থেকে উঠে

হ'য়ে সব ক'রে চ'ড়ে বস্‌বে তাল গাছের মাথায়। সেখানেই ওদের বাসা কিনা।

—সেই বাসায়ই খুঁজে ওদের আন্ডা পাওয়া যায়? ঘোড়ার ডিমের কথা ফক্করচাঁদের শোনা ছিল, কিন্তু কোথায় তা পাওয়া যায় জানা ছিল না। এখন জান্‌তে পেরে আবদার ধর্‌ল—তালগাছের বাসা থেকে একটা ঘোড়ার আন্ডা আমাকে পেড়ে দাও-না।

—আরে বাপ্‌রে! সেখানে কি যাওয়ার জো আছে!—লক্করচাঁদ জবাব দিল—তালগাছ হ'তে তাল পড়ে দেখেছিস্ তো? পড়ে কেন, জানিস্? কেউকে বাসার কাছে যেতে দেখ্‌লেই ঘোড়ার দল দুপ্-দাপ্ ক'রে তাল ছুঁড়ে মারতে থাকে। তার একটা মাথায় পড়লেই চিৎপটাং।

বাপের কথা শুনে ফক্করচাঁদের ঘোড়ার ডিম আনার সাধ আর রইলো না।

*   *   *

বাড়ী ফিরে বাপ-ব্যাটা দ্যাখে সেখানে এক তুমুল কান্ড! তারা যে-রামছাগলটা পোষে একটা ফুটো হাঁড়ির মধ্যে তার মাথাটা ঢুকে আছে, আর ছাগলটা বারবার মাথা ঝেঁকে চারদিকে লাফালাফি কর্‌ছে। তাই দেখে লক্করচাঁদের বৌ দু-হাতে কপাল চাপ্‌ড়াচ্ছে আর বল্‌ছে—নিশ্চয়ই এ ভুতুড়ে কান্ড। নইলে, ঐ ফুটো হাঁড়িটা ছিল আনাজের খোসার সঙ্গে, যেখানে জঞ্জাল ফেলা হয় সেখানে, সেটাকে তুলে নিয়ে ভূত-ছাড়া আর কে ঢুকিয়ে দিল ছাগলটার মাথায়! এখন কি ক'রে হাঁড়িটাকে খুলে ফেলে ছাগলটাকে খালাস করা যায়!

ছাগলটাকে দেখে লক্করচাঁদও ভাব্‌ল—তাজ্জব ব্যাপারই তো! জঞ্জালের উপর থেকে ফুটো হাঁড়ি তুলে রামছাগলের মাথায় পরিয়ে দেওয়া তো যার-তার কম্ম নয়। নিশ্চয়ই ভূতেরই কান্ড এটা। ভূতের রোজা না হ'লে ও-হাঁড়ি ছাড়িয়ে দিতেই-বা পারে কে! লক্করচাঁদ ফক্করচাঁদকে বললে—যা দেখি তুই চট্ ক'রে রোজাদের পাড়ায়। সেখান থেকে একজন রোজাকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়।

রোজা ডাকতে গি'য় ফক্করচাঁদ ভাব্‌ল—ছাগলটা যেরকম মাথা ঝাঁক্‌ছে আর লাফালাফি কর্‌ছে তাতে যে-সে ভূত ওকে ধরেছে মনে হয় না। নিশ্চয়ই এ কোনো জাঁদরেল ভূ'তের কাজ। কাজেই এজন্য চাই-ও একজন জাঁদ্‌রেল রোজা। সেইরকম রোজা খুঁজতে গিয়ে সে লম্বাচওড়া আর মোটাসোটা একজন লোক দেখে তাকেই জাঁদ্‌রেল ভেবে নিয়ে এলো।

*   *   *

কিন্তু লোকটিকে নিয়ে এসে হ'লো মুস্কিল। উটের মত যেমন সে ঢ্যাঙ্গা তেম্‌নি মোটাও হাতীর-মত। ওদের বাড়ীর দরজা-যে ছোটো, তার মধ্য দিয়ে তাকে ঢোকায় কি ক'রে! ফক্করচাঁদ একখানা কুড়োল এনে দরজাটাকে কেটেকুটে ভেঙ্গেচুরে একদম ফাঁকা গড়ের মাঠ ক'রে ফেল্‌ল। তারপর লোকটিকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুক্‌ল।

ছাগলটাকে দেখে লোকটি বল্‌ল—ওকে নিস্কন্ধা-ভূতেই ধরেছে। ঐ ফুটো হাঁড়িটার মধ্যেই রয়েছে সেই ভূত। তার নিজের কাঁধ নেই কিনা, তাই ছাগলের কাঁধেই সে আরাম ক'রে চেপে বসেছে। আচ্ছা, ভূতটাকে আমি এক্ষুনি তাড়িয়ে দিচ্ছি। কেউ একখানা রাম-দা হাতে ক'রে আমার কাছে ব'সে থাকো। আমি মন্তর পড়্‌তে পড়্‌তে যেম্‌নি বল্‌ব নমো ঝ্যাম্বোং ঝ্যাম্বোং, তক্ষুনি যেন ছাগলটার ঘাড়ে রাম-দা দিয়ে এক কোপ দেওয়া হয়। তাতেই হাঁড়িটা আল্‌গা হ'য়ে পড়্‌বে। আর, নিস্কন্ধা-ভূতও বসার ঠাঁই না পেয়ে ছুটে পালাবে।

লোকটির কথামত লক্করচাঁদ নিজেই একখানা রাম-দা হাতে নিয়ে প্রস্তুত রইলেন। তারপর যাই-না মন্তর শুন্‌ল—নমো ঝ্যাম্বোং ঝ্যাম্বোং, অম্‌নি ঘ্যাচাং ক'রে মার্‌ল ছাগলের ঘাড়ে এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে ছাগলের মাথাটা কেটে গিয়ে ফুটো হাঁড়িটা-শুদ্ধ ছিট্‌কে পড়্‌ল একদিকে, ধড়টা পড়্‌ল আর-একদিকে।

লোকটি আর-একবার নমো ঝ্যাম্বোং ঝ্যাম্বোং মন্তর আউড়ে বল্‌ল—যাঃ, আপদ-বালাই কেটে গেল। হাঁড়িশুদ্ধ মুন্ডুটা ঘাড় থেকে খসে পড়ল, নিস্কন্ধা এখন আর বস্‌বে কোথায়?

লক্করচাঁদও ভাব্‌ল—ঠিকই কথা। শক্ত রোজার হাতে প'ড়ে ভূত-বাছাধন এবার কেমন জব্দ!

লক্করচাঁদের বৌ ভাব্‌ল—বাঁচা গেল। ভূতের বসার জায়গাই যখন রইলো না তখন আর ভয় কিসের?

ফক্করচাঁদ ভাব্‌ল—ভাগ্যিস জাঁদরেল রোজাকে নিয়ে এসেছিলাম, নইলে কি আর রক্ষা ছিল!

কারুরই কিন্তু খেয়াল হ'লো না—ভূত তাড়াতে গিয়ে তাদের রামছাগলটাকেই কেটে দু-ভাগ ক'রে ফেলা হয়েছে।

লোকটি রামছাগলের ধড়টা তারই পাওনা ব'লে নিয়ে গেল।

খোদা দেনেওয়ালা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রূপকথা)

বাদশাহী আমলের কথা।

দুজন ভিখিরী। দুজনে ভাব আছে। দুজনে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষে করে সন্ধ্যার আগে এক গাছতলায় এসে বসে— ব'সে কে সারাদিন ঘুরে কি ভিক্ষে পেলো, খবর নেয়, তারপর যে যার নিজের ঘরে চলে যায়।

দুজন ভিখিরীর মধ্যে একজন 'খোদা দেনেওয়ালা' বলে ভিক্ষে চায় আরেকজন চায় 'বাদশাহ দেনেওয়ালা' বলে। বাদশাহ শোনেন দুজনেরই ডাক। একদিন তাঁর খেয়াল হলো, যে ভিখিরী 'বাদশাহ দেনেওয়ালা' ব'লে ভিক্ষে চায় তাকে তিনি কিছু মোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন যাতে তার দুঃখ ঘোচে। তিনি উজীরকে ডেকে বললেন,—একখানা পাঁউরুটির মধ্যে সোনার মোহর গুঁজে ওকে দাও, আর ওকে বলে দাও বাদশাহের দেওয়া এই রুটি নিয়ে ঘরে যাক আর কারো কাছে ভিক্ষে চাইবে না। উজীর তাই করলেন। ভিখিরী রুটি নিয়ে সেই গাছতলায় এসে বসলো তার বন্ধুর অপেক্ষায়। সন্ধ্যার আগে বন্ধু এলো। তারপর কে সেদিন কি পেয়েছে তার হিসেব-নিকেশ।

'খোদা দেনেওয়ালা' বললে,— আমি আজ পেয়েছি কতক গুলো পয়সা-কড়ি, চাল, ডাল, আলু আর বেগুন। 'বাদশাহ দেনেওয়ালা' বললে,—আমি পেয়েছি বাদশাহের দেওয়া একখানি পাঁউরুটি। তা' এতে আমার কি হবে? আমার বাড়ীতে খেতে নজন লোক,—আমি, আমার বৌ আর সাতটা ছেলেমেয়ে। তুমি এক কাজ করো—তুমি চার পয়সা দিয়ে এই রুটিটা কিনে নাও। আমি সেই পয়সা দিয়ে যাহোক কিছু কিনে নেব। 'খোদা দেনেওয়ালা' লোকটি ভালো—সে বন্ধুকে চারটি পয়সা দিলে আর সেই সঙ্গে দিলে কিছু

দিনেমারদের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গত বছরে পূজোর ছুটিতে তোমাদের 'ওলন্দাজ'দের দেশ 'হল্যাণ্ডে' বেড়িয়ে এনেছি। এবার চলো 'দিনেমার'দের দেশে যাই। দিনেমারদের দেশ কোন্‌টা জানো? যে দেশটাকে 'ডেনমার্ক' বলে। ঐ দেশের লোকদের আমরা 'দিনেমার' বলি। এটা ফরাসীদের কাছে শেখা। যেমন 'ওলন্দাজ' নামটা শিখেছিলুম আমরা পর্তুগীজদের কাছে।

হল্যান্ড থেকে ডেনমার্ক আসার সোজা রাস্তা হ'ল পশ্চিম জার্মাণীর ভিতর দিয়ে যাওয়া। চলো এই পথেই রওনা হই।

অনেকটা অংশ ঘুরে যেতে হয়। কাজেই জার্মাণীর দেখাও কিছু কিছু দেখা হয়ে যায়। জার্মাণীর কথা অন্য কোনো বারে বলবো।

'ডেনমার্ক' নামটা শুনলেই মনে পড়ে 'হ্যামলেট—দি প্রিন্স অফ্ ডেনমার্ক'! অমর ক'রে দিয়ে গেছেন এই ছোট্ট দেশটিকে মহাকবি 'সেক্সপীয়র'। তোমরা নিশ্চয় জানো যে ডেনমার্ক হ'ল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার তিনটি দেশের একটি। ডেনমার্কের একদিকে উত্তর সাগর অপরদিকে বল্টিক সমুদ্র। জার্মাণীর মাথার উপর উত্তরদিক ঘেঁষে এই দেশটি। প্রধানতঃ চাষী ও জেলের জাত হ'লেও ডেনসরা একসময়ে দুঃসাহসী জলদস্যু ছিল। প্রায়ই উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ডে হানা দিতো। ইংরেজরা এদের ভয়ে সর্বদা সশংকিত হ'য়ে থাকতো। শুধু যে এরা ইংলণ্ডে এসে লুট পাট করে চলে যেতো তাই নয় ইংলণ্ডের নানা প্রদেশ অধিকার করে রীতিমত বসবাস শুরু করেছিল। ডেনমার্কের অধিবাসীদের বলা হয় 'ডেনস' আর ওদের ভাষা হল 'ড্যানিশ'। সেকালে ডেনসদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইংরেজ ছেলেমেয়ের বিবাহ হ'ত। ইংরেজ ছেলেমেয়েরা নীল চোখ আর সোনালী চুল পেয়েছিল এই ডেনসদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংমিশ্রণের ফলে। এসব কথা তোমরা বড় হ'য়ে জানতে পারবে ব্রিটেন আর ডেনমার্কের ইতিহাস পড়ে।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন। কোপেনহাগেন শহরটি কিন্তু ডেনমার্কের মূল ভূখণ্ডে নয়। পূর্বদিকের একটি বড় দ্বীপের মধ্যে এই শহর। তোমরা যদি ডেনমার্কের মানচিত্র খুলে দেখ, তবে দেখতে পাবে ডেনমার্ক দেশটি একাধিক দ্বীপ ও উপদ্বীপের সমষ্টি। কিন্তু ডেনসরা এমন সুবন্দোবস্ত করে রেখেছে যে ডেনমার্কে যারা বেড়াতে যাবে তাদের সর্বত্র ঘুরে দেখবার একটুও অসুবিধা হবে না। আমরা যে ট্রেণে উঠে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেনে যাচ্ছিলুম সেই লম্বা রেলগাড়ী জার্মাণীর সীমান্ত ষ্টেশন 'ফ্লেন্সবুর্গ' পার হ'য়ে যখন ডেনমার্কের সীমান্ত ষ্টেশন 'পাদবোর্গে' এসে প্রবেশ করলে তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। ড্যানিশ পুলিশ আর শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা এসে আমাদের 'পাসপোর্ট' প্রভৃতি পরীক্ষা করে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে। আমরাও এবার নিশ্চিত হ'য়ে কামরার সব আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল নীলরঙের ঘুমের বাতিটি জেলে রেখে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

কখন যে ট্রেণ দীর্ঘপথ পার হয়ে চলে এসেছে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় কিছুই টের পাইনি। গুড়ু গুড়-গুড়ু গুড় ক'রে একটা মেঘ ডাকার মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রি তখন শেষ হয়ে এসেছে। তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। উঠে পড়ে সবিস্ময়ে দেখি সমস্ত ট্রেণখানাই ঘুমন্ত যাত্রী ও তাদের মালপত্র সমেত সটান গিয়ে উঠছে বিরাট একখানি ফেরী ষ্টীমারের ওপর। ডেনমার্কের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষদের মনে মনে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালুম। তাঁরা যে সেই ভোররাত্রে ঘুমন্ত যাত্রীদের মোটঘাট সমেত। দুরন্ত ঠাণ্ডায় ফেরী ষ্টীমার ধরবার জন্য সমুদ্রের ধারে নামিয়ে না দিয়ে ট্রেণশুদ্ধ সকলকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন এমন আরামে ও সুবিধাজনক উপায়ে-এটা শুধু বিস্ময়কর নয়, যথার্থই প্রশংসনীয়। আমাদের মতো প্রথম ইউরোপ যাত্রীদের পক্ষে এ এক অপ্রত্যাশিত নূতন অভিজ্ঞতা।

সকাল আটটা নাগাদ কোপেনহাগেনের প্রান্তিক ষ্টেশনে ট্রেণ এসে দাঁড়ালো। যাত্রীদের শহরের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য অনেকগুলি বাস অপেক্ষা করছিল। আমরা একখানি বাসে উঠে রওনা দিলাম শহরের দিকে। আমরা ষ্টেশন থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় টাকা-কড়ি 'ড্যানিশ' মুদ্রা—'ক্রোণে' বদল করে নিয়েছিলুম। ড্যানিশ এক ক্রোণের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় বারো আনা।

শহরে পৌঁছে আমরা একটি হোটেলে এসে উঠলুম। নাম 'হোটেল টার্মিনাস'। ম্যানেজারটি খুব ভদ্র। আমাদের বেশ সমাদরে গ্রহণ করলেন। 'ডেনমার্কের অতিথি আপনারা' আপনারা আমাদের

চাল ডাল আর তরকারি। তারপর দুজনে যে যার ঘরে চলে গেল।

পরের দিন থেকে 'বাদশাহ্ দেনেওয়ালা' পায় বাদশাহের দেওয়া একখানি করে রুটি। তার মধ্যে যে মোহর গোঁজা থাকে সেটা জানে না—সে রোজ বন্ধুকে রুটিখানি দেয় আর বন্ধু তাকে দেয় চারটি করে পয়সা, কিছু চাল, ডাল আর তরকারি।

এমনিভাবে ছ মাস কাটলো। এই ছ মাসে 'খোদা দেনেওয়ালার' এতো মোহর জমেছে। কিন্তু 'বাদশাহ দেনেওয়ালা' সেই হাড়ির হাল। সে মোহর গোঁজা রুটি বেচে ওই চারটি করে পয়সা, কিছু চাল, ডাল আর তরকারি নিয়ে বাড়ী ফেরে।

বাদশাহ তার দুর্দশা দেখে আশ্চর্য হ'লেন, উজীরকে বললেন,—ও রোজ একটা করে মোহর পাচ্ছে অথচ সেই ছেঁড়া ট্যানা পরে আছে আর রুক্ষবেশ! এর মানে কি? ওকে ডাকো। তাকে ডাকা হলো। বাদশাহ তাকে বললেন,—তোমাকে রুটি দিচ্ছি রোজ, তবু তোমার দুঃখ ঘোচে না—এর মানে কি? সে বল'ল,—হুজুর আমার বাড়ীতে নটা পেট। একখানি রুটিতে ন'জনের পেট ভরবে না তো, তাই আমার ওই বন্ধু ভিখিরীকে আপনার দেওয়া রুটিটা দিই আর তার কাছ থেকে রোজ চারটে পয়সা আর কিছু চাল, ডাল নিয়ে বাড়ী ফিরি।

বাদশাহ বুঝলেন ব্যাপার, তিনি উজীরকে বললেন, 'এক কাজ করো, এক থলি মোহর একটা গাড়ীতে নিয়ে ওর ঘরে দিয়ে এসো—দেখি ও যা বলে 'বাদশাহ দেনেওয়ালা' সেই বাদশাহ ওর দুঃখ ঘোচাতে পারে কিনা।

উজীর তাই করলেন। এক গাড়ী মোহর নিয়ে ভিখিরীর ঘরের সামনে গিয়ে তাকে ডাকলেন। ভিখিরী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। উজীর তাকে মোহরের বস্তা দিয়ে বললেন,—এ বস্তায় সোনার মোহর আছে—বাদশাহ তোমায় দিয়েছেন, নিয়ে ঘরে রাখোগে। তোমার দুঃখ ঘুচবে।

থলিভরা মোহর দেখে ভিখিরীর এতো আনন্দ হলো যে সে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে বৌকে খবর জানাবে, দরজার কাঠে মাথা ঠুকে, মাথা ফেটে দুম করে পড়ে গেল। রক্তারক্তি ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দোরে পড়ে তার মৃত্যু।

উজীর গিয়ে বাদশাহকে খবর দিলেন। বাদশাহ তাকে দেখতে এলেন। বাদশাহ দেখলেন তার কপাল ছাঁচা আর সেই কপালে লেখা রয়েছে—এর দারিদ্র্য কেউ কোনদিন ঘোচাতে পারবে না! কপালের লিখন......

বাদশাহ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

বন্ধু বলে খুব আপ্যায়িত করলেন। দেখা গেল বিদেশীদের এ'রা যথাসাধ্য যত্ন করেন। কোপেনহাগেন শহরটি খুব বড় নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর। হোটেলের খরচও বেশি নয়। মাথা পিছু দৈনিক ১৫।২০ ক্রোণ। সাজানো ঘরে থাকা, দিনে পাঁচবার প্রচুর খাওয়া! 'বেড টি' সঙ্গে কলা, আপেল বা লেবু। 'ব্রেকফাস্ট' বা প্রাতরাশ। 'লাঞ্চ' বা মধ্যাহ্ন-ভোজন। 'আফটারনুনটি' বা বৈকালিক জলযোগ, রাত্রে 'ডিনার' বা নৈশ ভোজ। লাঞ্চে ও ডিনারে চার-পাঁচ পদ খাদ্য দেয়। এদের রান্না ভালো। যুদ্ধের সময় থেকে এদেশেও 'রেশনিং' বা 'খাদ্য নিয়ন্ত্রণ' প্রচলিত থাকলেও বিদেশী অতিথিদের প্রতি তা প্রয়োগ করা হয় না। এখন আর দুধ প্রচুর।

আমরা হোটেলের ম্যানেজারকে বলে 'এক্সকার্সান্‌ বাস' ঠিক করে ফেললুম। টিকিটের দাম মাথা পিছু পাঁচ ক্রোণ প্রতিদিন। এক একদিন এ'রা এক একদিকে নিয়ে যান এবং সে দিকের দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখিয়ে নিয়ে আসেন। আমরা ডেনমার্কে কি কি দেখে এসেছি একে একে তোমাদের শোনাচ্ছি। প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল 'ওল্ডটাউন' দেখাতে। এ পল্লীটি একটি খালের ধারে। অসংখ্য খাল এদেশে। অনেকগুলি পুরনো বাড়ী ও দুর্গ এরা সযত্নে রক্ষা করছে। কোনো কোনো বাড়ী চার-পাঁচশো বছরের পুরনো। এগুলো দেখে মনে হ'ল এরা ইউরোপ-যাত্রী বিদেশী পর্যটকদের দেখাবার জন্যেই বাড়ীগুলো রেখেছে। ইংলন্ডেও আছে, হল্যান্ডেও আছে, বেলজিয়মেও দেখেছি। এই সব দেখিয়ে এরা প্রমাণ করতে চায় যে তারা একটা বনেদী জাত। হাল আমলের অতি আধুনিক হঠাৎ বড় লোক নয়। 'ওল্ডটাউন' থেকে বাস আমাদের আরও অনেক কিছু দর্শনীয় দেখিয়ে আনলে। রোজই আমরা ঘুরে বেড়াতুম। যা দেখেছি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডেনমার্কের 'মিউজিয়ম' বা জাদুঘরগুলি। কত রকমের মিউজিয়ম যে এরা খাড়া করেছে তার সংখ্যা হয় না। সবগুলো দেখা সম্ভব নয়। আমরা ওর মধ্যে বেছে বেছে কয়েকটি দেখে এলুম। এখানে একটি রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত 'নাট্য-মিউজিয়ম' দেখলুম। যা এর আগে আর কোথাও আমরা দেখিনি। বোঝা গেল 'নাট্যশালা'গুলিকে এরা তাদের জাতীয় সম্পদ বলেই গণ্য করে। তারপর দেখলুম সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যতরকম অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে তার একটি সংগ্রহশালা। এখান থেকে যাওয়া হল ন্যাশনাল মিউজিয়ম দেখতে। ডেনসদের জাতীয় জীবনের গৌরবময় ঐতিহাসিক সম্পদ যা কিছু সমস্তই এখানে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এটি দেখলে সমস্ত ডেনমার্ক দেখা হয়ে যায়। এখানকার চিত্রশালা ও শিল্পভবনও দেখবার মতো। সমগ্র জাতটির রুচি ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এই দুটি সংগ্রহশালা থেকে। এ'দের রয়াল লাইব্রেরী বা রাজকীয় গ্রন্থাগারটি পুস্তক সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। এই লাইব্রেরীতে দেখলুম অনেকগুলি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বইও রয়েছে। ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ শিল্পী 'থরভালসেনের বিরাট স্মৃতি ভবন দেখে বোঝা গেল এরা শিল্পীর মর্যাদা বোঝে। এখানে স্বর্গত শিল্পীর হাতের দুর্লভ কাজ অনেকগুলি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এছাড়া আরও দুটি মজার মিউজিয়াম আছে, সেই আদি-কাল থেকে আজ পর্যন্ত স্থলপথের ও জলপথের যান বাহনের কিভাবে রূপান্তর ঘটেছে। পরের পর সেগুলি সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে।

কোপেনহাগেনের যে দ্রষ্টব্য স্থানটি তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগবে সেটি হ'ল এখানকার 'টিভোলি গার্ডেন'। অবশ্য টিভোলি গার্ডেনে এলে ছেলেবুড়ো দুদলই খুশী হবে। ছেলে ভোলাবার অসংখ্য রকম আয়োজন ছাড়া বয়স্কদের মনোরঞ্জনেরও নানা ব্যবস্থা আছে। রাত্রে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠে টিভোলি গার্ডেনকে যেন রূপকথার একটি স্বপ্নোদ্যান করে তোলে! নাচ, গান, ব্যাণ্ড, অর্কেস্ট্রা, অভিনয়, ম্যাজিক, সার্কাস, পুতুল নাচ, ক্লাউনদের ভাঁড়ামি সব কিছু মিলে এখানে যেন নিত্য উৎসব চলেছে। এক-একটি প্যাভিলিয়ন পৃথিবীর এক এক দেশের প্রসিদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী। যেমন 'চীনভবন', 'বর্মীজ প্যাগোডা', 'জাপানী মন্দির', 'গ্রীসের প্যাভিলিয়ন', 'ভারতের তাজমহল', 'ইস্তাম্বুলের সুলতান মহল' ইত্যাদি। টিভোলি গার্ডেনে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। কতরকম খাবার জিনিষ আর এত রকম মজার জিনিষ ডেনমার্কের আর কোথাও একসঙ্গে দেখা যাবে না।

পরের দিন আমরা একখানি মোটর বোট নিয়ে ডেনমার্কের অসংখ্য খাল-বিল দিয়ে ভেসে ভেসে এদেশের গ্রামাঞ্চল দেখতে গেলুম। ডেনমার্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সহরের বাইরে বেশ একটি শান্ত সুন্দর পল্লী পরিবেশ আছে। এখানকার গ্রাম্য শোভা দেখলে নয়ন মন জুড়িয়ে যায়। দেশটি সম্পূর্ণ কৃষি প্রধান বলে মনে হল। ছেলেমেয়েরাও ঠাণ্ডা প্রকৃতির। চাষীদের সবুজ ক্ষেত খামারের ধারে ধারে সাদা চূণকাম করা রাঙাটালির ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখায় যেন ঠিক ছবির মতো। গ্রামাঞ্চলে একমাত্র 'উইণ্ডমিল' ছাড়া কোনও কল-কারখানা চক্ষে পড়ে না। তবে সাইকেলের ছড়াছড়ি ঠিক হল্যাণ্ডের মতনই। ছেলে-বুড়ো সবাই বাইক চড়ে ঘুরছে। শুনলুম রাজাও নাকি সাইকেল চড়ে বেড়ান।

আমরা গ্রামের একটি ঘাটে এসে নামলুম। পরিচ্ছন্ন গ্রাম। একটা পরিপূর্ণ প্রশান্তি যেন বিরাজ করছে চারিদিকে। গ্রামবাসীদের সকলকেই নিজ নিজ অবস্থায় বেশ পরিতুষ্ট বোধ হল। অভাব ও দারিদ্র্যের কোনো মালিন্য নেই। দুধ, মাখন, পনিরের ফলাও কারবার। হাঁস, মুর্গী ও ডিমের ব্যবসাও বিরাট। বহু লোক শূকর পালন করে। নানা দেশে এরা হ্যাম ও বেকন চালান দেয়। আমাদের দেশের বট, অশ্বত্থের মতো এখানে অসংখ্য বড় বড় বীচ গাছ। যেন বনস্পতির মেলা বসে গেছে। এই বীচের অরণ্যকে এরা বলে 'কুঞ্জবন'! আমাদের তৃষ্ণাবোধ হওয়াতে সঙ্গের 'গাইড' নিয়ে গিয়ে তুললো এক কৃষক পরিবারের বাড়ী। সাধারণ একতলা একখানি বাংলো বাড়ী। চাষীর বাড়ীর বৈঠকখানা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সঙ্গতি সম্পন্ন লোকের বাড়ীর ড্রয়িংরুমের মতোই সোফা দিয়ে সেটি সাজানো। বিজলী বাতি ও পাখা রয়েছে। রেডিয়ো, টেলিফোন, পিয়ানো সবই আছে। একটি বুক শেলফে নানা রকম বইও রয়েছে। আজ রবিবার। ছুটির দিন। ক্ষেতের কাজ-কর্ম বন্ধ। সবাই বাড়ীতেই ছিলেন। আমরা তৃষ্ণার্ত শুনে চা, কফি, সুরা, গরম দুধ, লেমন সিরাপ, অরেঞ্জ কোয়াস যেটা খুশী দিতে পারবেন জানালেন। আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে সবিনয়ে শুধু একটু ঠাণ্ডা জল চেয়ে নিলুম। এল রেফ্রিজারেটরের শীতল পানীয়। আমাদের তো বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই! এদেশের চাষীদের এমন সমৃদ্ধ অবস্থা! মনে পড়লো আমাদের দেশের দরিদ্র চাষীদের কথা। তাদের অবস্থায় এমন উন্নতি কবে হবে?— কথায় কথায় জানা গেল এ'দের ধান, চাল, গম, বার্লির চাষ নয়, শাক-সব্জীর চাষ। শুধু আলু, কড়াইশুঁটি, বরবটি, ওলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, বীট, গাজর, লেটুস এই সব উৎপাদন করেন। এদের উৎপন্ন ফসল শুধু স্থানীয় বাজারেই বিক্রী হয় না অন্যান্য দেশ-বিদেশেও চালান যায়। নিজেদের মোটর গাড়ী আছে। ক্ষেত দেখাতে নিয়ে যাবেন বললেন, কিন্তু সময়াভাবে যাওয়া হল না।

এই সম্পন্ন চাষী পরিবারকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বোটে ফিরে এলুম। এবার আসা হল এলসিনোরের 'ক্রোনবোর্গ দুর্গে'। এই দুর্গ সংক্রান্ত এক মর্মান্তিক ঘটনা অবলম্বন করেই মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁর বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' রচনা করেছিলেন। প্রতি বৎসর গরমের ছুটিতে এই দুর্গে মহাসমারোহে 'হ্যামলেট' অভিনয় হয়। 'হ্যামলেট' নাটকের পশ্চাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে তা সন্দেহজনক এবং প্রমাণ সাপেক্ষ হলেও ডেনমার্কের লোকেরা এর জন্য দস্তুর মতো গর্বিত দেখলুম। এখানে ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের একটি সমাধিও এরা তৈরী করে রেখেছেন।

ডেনমার্কে এসে ছোটদের নিখিল বিশ্রুত গল্প লেখক শিশু

সাহিত্যের সম্রাট হানস ক্রিশ্চিয়ান এ্যান্ডারসনের দেশ না দেখে ফেরা যায় কখনো? এলাম আমরা পরদিন ট্রেনে উঠে 'ওডেন্স' শহরের দিকে। কোপেনহাগেন থেকে ১১৪ মাইল দূরে ফ্যুনেন দ্বীপের 'ওডেন্স' জনপদে হানস এ্যান্ডারসনের জন্ম হয়। এখানে হানস এ্যান্ডারসনের এক বিরাট প্রতিমূর্তি রয়েছে। এ্যান্ডারসন মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসে দেখি সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিচালনায় অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় জমে উঠেছে। কত প্রশ্নই যে তারা করছে শিক্ষকদের। তাঁরা দস্তুর মতো অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিলেন। তবে ছেলে-বুড়োর মুখরোচক খাবার এখানে অনেক রকম আছে। সহজেই তাদের মুখ বন্ধ করা যায়।

কোপেনহাগেনের বন্দরে ঢোকবার মুখে স্থাপিত আছে দেখেছি এই হানস এ্যান্ডারসনেরই পরিকল্পিত এক জলকন্যা 'লিটল মেইড'এর প্রতিমূর্তি। কোপেনহাগেনে এসে ঢোকার দিনই প্রথম দেখেছিলুম এই 'লিটল মারমেইড' আর স্থাপত্য শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন 'গেফিয়ন ফোয়ারা। ডেনমার্কে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গির্জা বা উপাসনার মন্দির আছে যার স্থাপত্যকলা অপূর্ব। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'গ্রুন্ডভিগসক্কার্কেন চার্চ' যা ছোট করে বলা যায় 'গ্রুন্ডভিগ চার্চ'। এর কারুকার্যময় রঙীন চিত্রোৎকীর্ণ দীর্ঘকায় কাঁচের জানলাগুলি অপূর্ব।

এখানকার পার্কগুলিও চমৎকার। প্রত্যেক পার্কেই দর্শনীয় কিছু না কিছু আছে। কোনোটায় 'রাষ্ট্রীয় কলাভবন', কোনোটায় প্রাচীন এক দুর্গ—যেমন 'রোজেনবার্গ', ফ্রেডরিক্সবার্গ' ইত্যাদি। রোজেনবার্গ দুর্গের বিশেষত্ব দেখলুম এখানে যত ড্যানিশ নৃপতির চিত্র ও মূর্তি সংগ্রহ করে কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ডেনমার্ক প্রায় অনেকটা চষে আসা হল। ছোট্ট দেশ হলেও দেখবার অনেক কিছু আছে। এখানকার 'জীল্যান্ড' আর 'জাটল্যান্ড' জায়গা দুটি আর দেখে আসবার সুবিধা হল না। তোমরা যদি কেউ এদেশে বেড়াতে এসো, দেখে যেও। আর ডেনমার্কের বিশ্ব বিখ্যাত 'স্যান্ডউইচ' যা পৃথিবীর লোক খেতে ভালবাসে সেই 'স্মুরেব্রুড' খেয়ে এসো। বিদায়।

দস্যি মেঘের নেই মা দাপট নীল মুলুকের দেশে,
অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যায় না তড়িৎ ভেসে।
বাঁশ ঝাড়ে মা! জোনাক জ্বলে, নদীর পাড়ে ঢেউ,
চতুর্দিকে ডাকছে ঝিঁ-ঝিঁ, নেই কো ঘাটে কেউ।
সাপ খেলানো বাঁশীর সুরে দিন ফুরালো,—মাগো,
সাঁঝেরবেলায় আমায় নিয়ে দাওয়ায় বসে থাকো।

ডিহাং যেতে পীর পাহাড়ে পাথর ডিহির কাছে,
পড়ছে মনে বাঘের ডাক এম্নি নিঝুম সাঁঝে।
বুনো পথের মাঝে তখন ছুটছে মোদের গাড়ী,
তোমায় নিয়ে যাচ্ছি যবে দিদিমণির বাড়ী।
শব্দ শুনে চমকে উঠে ভয় পেলে মা খুব,
মরাত ভালো দেখতে মোরা পাইনি বাঘের রূপ।

[হারাণ ও পরাণ দুই ভাই। দুইটি ছোট ছেলে। রাত্রে ঘুমাইয়া রহিয়াছে হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। হারাণ জাগিয়া উঠিয়া পরাণকে ডাকিয়া তুলিল।]

হারাণ ।। পরাণ! পরাণ!
পরাণ ।। কী দাদা?
হারাণ ।। শুনছিস না, দরজায় কে টোকা দিচ্ছে?
পরাণ ।। হ্যাঁ, তাইতো!
হারাণ ।। যা' না ভাই দরজাটা খুলে দে।
পরাণ ।। ওরে বাবা, সে আমি পারবো না।
হারাণ ।। কেন রে? ভয় করছে?
পরাণ ।। ভয় করবে না? এই নিশুতি রাতে দরজায় অমন আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে-
হারাণ ।। কি বিপদ! হয় বাবা, নয় মা। ভয় কী?
পরাণ ।। তোমার যেমন বুদ্ধি! বাবা কী মা হ'লে টোকা দেবেন কেন, চেঁচিয়ে বলতেন, 'ওরে দরজা খোল'। দরজা না খুললে দরজায় লাথি মারবেন দমাদ্দম! না, দাদা বাবাও না, মাও না। আমার কী মনে হ'চ্ছে জানো দাদা?
হারাণ ।। কী?
পরাণ ।। নিশ্চয়ই কোনো চোর! টোকা দিয়ে দেখছে আমরা জেগে আছি কিনা?
হারাণ ।। দূর বোকা! জেগে যে আছি এতো আমাদের কথা শুনেই বুঝতে পারছে। ঐ শোন্ তবু টোকা দিচ্ছে!
পরাণ ।। তুই ঠিকই ব'লেছিস দাদা! এতো তবে চোরও নয়।

আজ আকাশে অনেক তারা, আলোর ঝিলিমিলি,
ক্লান্ত পাখী কুলায় এসে ঝিমায় নিরিবিলি।
সবুজ মাঠে হাওয়ায় দোলে কচি ধানের চারা,
আলের ধারে, ছায়া-আলোয় বেড়ায় যেন কারা!
আধ ফালি চাঁদ পূব আকাশে, ঝুমকো লতা দোলে,
গল্প বলো,—রাজপুত্তুর কোথায় গেল চলে।

সে কি এখন পাতাল পুরীর পদ্মদীঘির পাশে,
সেথায় কি মা রাজ কন্যা আঙটি নিয়ে আসে?
পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে ফিরবে কি আর ঘরে!
হয়তো রাণী উন্মাদিনী হারাধনের তরে!

দিনের শেষে ভাঙ্গা হাটের নেইকো কলরব,
কত মানুষ হারিয়ে গেছে, হচ্ছে অনুভব।
কত কথাই জাগছে আমার, নেইকো পড়ায় মন,
সন্ধ্যা আসে ধীর বাতাসে, আঁধার ঘরের কোণ।

[illegible] আমি বুঝতে পারলে, চোর আর এখানে থাকতো না, টোকাও দিত না—পালাতো!

[হঠাৎ ভয় পাইয়া] দাদা তবে কী ডাকাত?

হারাণ ।। দূর বোকা ডাকাত হ'লে হারে-রে-রে ব'লে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলে ঘরে ঢুকে পড়তো না-কী এতক্ষণ! না-না ডাকাত নয়।

পরাণ ।। না-না নয়, না নয়, চোর না—ডাকাত নয়— [হঠাৎ ভয়ে এবং আতঙ্কে] দাদা!

হারাণ ।। কীরে? হঠাৎ অমন ভয় পেলি যে?

পরাণ ।। শুনছো, এখনও টোকা দিচ্ছে?

হারাণ ।। হ্যাঁ শব্দটা এখন যেন একটু জোরেই হ'চ্ছে। ঠক্-ঠক্-ঠক্—যেন বড় ঘড়ির পেন্ডুলাম দুলছে।

পরাণ ।। [ভয়ে, আতঙ্কে] দাদা শোন! [হারাণের কানে কানে কী কহিল]

হারাণ ।। [সবিস্ময়ে] ভূত!

পরাণ ।। হ্যাঁ দাদা! ভূত না হ'য়ে যায় না। 'রাম-রাম' বলো দাদা, 'রাম-রাম' বলো।

হারাণ ।। ভূত-টূত আমি মানি না। এই বিজ্ঞানের যুগে আবার ভূত কী রে? এই দেখ্ আমি দরজা খুলছি!

পরাণ ।। না, না দাদা তুমি একলা যাবে না, আমিও যাচ্ছি।

[দুইজনে দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

পরাণ ।। [যাইতে যাইতে] 'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি—রাম, লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কী?' [হারাণ দরজা খুলিল। সবিস্ময়ে দুই ভাই দেখিল রক্তবর্ণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত এক বুড়ো। তাহার বাঁ হাতে একটি লাঠি এবং ডান হাতে একটি পেটিকা। দুই ভাই ভয়ে পিছাইয়া আসিল। বুড়ো সেই অবসরে ঘরে ঢুকিয়া দরজার খিল আঁটিয়া দিল। দেখিতে বুড়ো হইলে হইবে কী, রক্তবর্ণ চাদরে এবং রক্ত চক্ষুতে তাহাকে একটি শয়তানের অবতার বলিয়া মনে হইতে লাগিল]

বুড়ো ।। দেখছি দুটো পুঁচকে ছোঁড়া। দোর খুলতে এত দেরী করছিলি কেন?

হারাণ ।। কে তুমি? না-না কে আপনি?

বুড়ো ।। হাঃ! হাঃ! হাঃ! কে আমি? কী মনে হচ্ছে আমাকে?

হারাণ ।। ভয়ংকর মনে হ'চ্ছে তোমাকে।

পরাণ ।। দাদা ভয় ক'রছে আমার।

বুড়ো ।। না-না ভয় নেই। তোদের কোনো ভয় নেই। যদি আমার কথা মত কাজ করিস, তোদের আমি রাজা ক'রে দেবো।

হারাণ ।। রাজা ক'রে দেওয়া মুখের কথা, না? আমাদের দেশে আজ রাজা আবার কোথায়? জান না কী প্রজাতন্ত্র এই রাজ্য? কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ?

পরাণ ।। দাদা, বাবাকে চেঁচিয়ে ডাক।

['বাবা' বলিয়া চীৎকার করিতে গেল]

বুড়ো ।। [প্রচন্ড ধমকে] য়্যাই চুপ!

[দুই ভাই ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইল।]

বুড়ো ।। শোনো খোকারা। আমার কথা শোনো। আমার কথা শুনলে তোমাদের দুটি ভাইকেই এ দেশের রাজা ক'রে দেব আমি।

হারাণ ।। বেশ তো বলুন না, কী করতে হবে।

বুড়ো ।। বিশেষ কিছু না। আমাকে লুকিয়ে রাখবে তোমরা। এই ঘরে। এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে, কাক-পক্ষীও যেন জানতে না পারে আমার কথা!

হারাণ ।। তারপর?

বুড়ো ।। তোমাদের দুই ভাইয়ের হাতে আমি ছোট্ট দুটো শিশি দেব।

হারাণ ।। বেশ দিলেন, তারপর?

বুড়ো ।। শিশি দুটির ছিপি খুলে শিশি দুটো চুপি-চুপি ফেলে দেবে নদীর জলে।

হারাণ ।। সেতো আপনিও দিতে পারেন।

বুড়ো ।। না, না আমি আর এ ঘর থেকে বেরুবো না। আমি চাই না আর কেউ আমাকে দেখে।

হারাণ ।। শিশি দুটিতে কী আছে?

[বুড়ো পেটিকা হইতে দুটি শিশি বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিল।]

বুড়ো ।। নিজের চোখেই দেখ।

হারাণ ।। [সভয়ে একটি শিশি হাতে লইয়া] শিশির ভেতর কিছু আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

বুড়ো ।। [হাসিয়া] বেশ তো! যদি কিছু না-ই থাকে তবে ছিপি খুলে শিশি দুটো জলে ফেলে দিতে আশা করি তোমাদের কোনো আপত্তি নেই?

হারাণ ।। আপত্তি আছে বৈকি! শিশিতে কিছু দেখছি না বলেই মনে হচ্ছে, না জানি কী রহস্য লুকিয়ে আছে ওর ভেতর! সেটা না জানা পর্যন্ত আপনার কথামত কাজ আমি করতে পারবো না ঠাকুর্দা।

বুড়ো ।। পারতেই হবে। কোটি কোটি মাইল দূরে থেকে আমি যখন এখানে একবার আসতে পেরেছি, ভেবেছ কী আমার কাজ হাসিল না ক'রে আমি মরবো? [সপদ দাপে] নাও! ধর!

পরাণ ।। [ভয়ে বাবাকে ডাকিতে গিয়াছিল] বা-!

বুড়ো ।। [প্রচন্ড ধমক দিয়া] এই চুপ!

পরাণ ।। [থতমত খাইয়া] নিয়ে নে দাদা, কেন ঝামেলা করছিস?

হারাণ ।। তুই বুঝছিস না পরাণ, তুই ছেলেমানুষ, তাই বুঝছিস না। লোকটা একটা ধাপ্পা। তা না হলে বলে কোটি কোটি মাইল দূরে থেকে এসেছে? গ্যাগারিন, না?

বুড়ো ।। [গ্যাগারিন শব্দ শ্রবণে বুড়োর চোখ-মুখ প্রতিহিংসার অনলে জ্বলিয়া উঠিল।]

গ্যাগারিন! টিটভ! ভস্কট! মিকোলেভ পপোভিচ।

হারাণ ।। ওরে বাবা! এ যে সব জানে?

বুড়ো ।। [ক্রোধ-কম্পিত কন্ঠে] জানবো না? আমাদের সুখ-শান্তি সব নষ্ট ক'রেছে ঐ সব নচ্ছার, পাজীগুলো। ভালো চাও তো আমার কথামত কাজ করো। শিশি দুটো নিয়ে এই রাতারাতি বেরিয়ে পড়ে দু'জনে নদীর ধারে গিয়ে তবে খুলবে ছিপি। খবরদার, এমনভাবে খুলবে যাতে ওর ভেতরকার হাওয়া তোমাদের গায়ে না লাগে।

হারাণ ।। ওর ভেতরকার হাওয়া গায়ে না লাগে! কী হবে লাগলে?

বুড়ো ।। কী হবে লাগলে? দেখবে, একটু নমুনা দেখবে?

[একটি শিশির ছিপি সামান্য একটু খুলিয়া ছেলে দুটির দিকে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিপিটি আবার বন্ধ করিল। কিন্তু তাহাতেই এক অভাবনীয় কান্ড ঘটিল। ছেলে দুটির নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের হাত-পায়ে খিচুঁনি সুরু হইল। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধের মনে কিঞ্চিৎ করুণা হইল।]

বুড়ো ।। না-না তোমাদের মারলে তো চলবে না আমার! তোমাদের দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে আমাকে!

[পেটিকা হইতে অন্য একটি শিশি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার আঘ্রাণ দিল ছেলে দুটির নাকে। ছেলে দুটি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। শিশিটির ছিপি বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ আবার উহা পেটিকাতে সযত্নে রাখিয়া দিল।]

বুড়ো ।। এবার বুঝতে পেরেছ আমার কী ক্ষমতা?

হারাণ ।। বুঝেছি, দ্যাখ! কিন্তু মানুষের এত অমঙ্গল করতে এসেছেন কেন আপনি?

বুড়ো ।। অমঙ্গল করতে এসেছি কী সাধে? মঙ্গল গ্রহের নাম শুনেছ? আমি সেই মঙ্গল গ্রহেরই এক অধিবাসী। ঐ গ্যাগারিন, টিটভের দল আমাদের ঐ মঙ্গলগ্রহে কী অমঙ্গল ক'রতে ছুটেছে জানো না কী তোমরা? ওরা না কী মহাকাশের সব গ্রহ জয় করবে! ভেবেছ কী, আমরা তাই বসে বসে দেখবো? উড়ন্ত চাক্কীতে তাই আমি আজ মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছি তোমাদের পৃথিবীতে।

হারাণ ।। য়্যাঁ—?

বুড়ো ।। হ্যাঁ—! ঐ শিশিতে রয়েছে মারাত্মক সব রোগের অদৃশ্য সব জীবাণু। নদীর জলে ঐ সব মারাত্মক জীবাণু তোমাদের দিয়ে ছাড়বো আজ। নদীর জলের স্রোতে ছড়িয়ে পড়বে ঐ সব জীবাণু; গোটা দেশে মহামারী, ব্যারাম সব সৃষ্টি হবে সঙ্গে সঙ্গে—ধ্বংস ক'রবে দেশের যত লোক, দেশের পর দেশ, গোটা পৃথিবী।

হারাণ ।। কিন্তু হিসেবে আপনার একটা ভুল হয়েছে ঠাকুর্দা।

বুড়ো ।। ভুল? কী ভুল হ'য়েছে?

হারাণ ।। গ্যাগারিন আর টিটভ, পোপোলভ—তারা তো এ দেশের লোক নয়?

পরাণ ।। রাশিয়ার লোক!

বুড়ো ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি রাশিয়া। সেখানেই যাবো ব'লে উড়ন্ত চাক্কীতে বেরিয়েছিলাম কিন্তু চাক্কীটা বিকল হয়ে যাওয়াতে নেমে পড়তে হয়েছে তোমাদেরই দুয়ারে। নইলে তো এতক্ষণ ধ্বংস হয়ে যেতো, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভ্লাডিভস্টক!

হারাণ ।। বটেই তো, বটেই তো! কিন্তু একটা নিবেদন আছে ঠাকুর্দা।

বুড়ো ।। কী আবার নিবেদন? আচ্ছা, বলো।

হারাণ ।। এ দেশের ছেলে আমরা; দেশের ছেলে দিয়ে দেশের সর্বনাশ করাবেন আপনি?

পরাণ ।। আমরা তা' পারবো না! বা—!

বুড়ো ।। য়্যাইও, খবর্দার! সর্বনাশটা আমিই করতাম, কিন্তু পারছি না শুধু একটা কারণে।

হারাণ ।। কী—?

বুড়ো ।। আমাকে উড়ন্ত চাক্কীতে এখানে নামতে দেখেছে কয়েকজন লোক; তারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! উড়ন্ত চাক্কীটাকে চটপট্ একটু মেরামত করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছি আকাশে—আমি ধরা পড়ি সেও ভাল; কিন্তু উড়ন্ত চাক্কীকে মানুষের হাতে কিছুতেই তুলে দেওয়া চলে না। উড়ন্ত চাক্কী নিরাপদে ফিরে যাবে মঙ্গলগ্রহে। আমি কী ক'রে ফিরে যাবো তাই ভাবছি। এ দেশে যখন এসেই পড়েছি, তখন এ দেশটা ধ্বংস না করে আমি যেতে পারি না, আমি যাবো না।

হারাণ ।। না-না যাবেন না। কই আপনার শিশি দুটি? আমার হাতে দিন। দুটি শিশি নদীতে আমিই ফেলছি; পরাণ এখানে থাক। লোকজন আপনাকে খুঁজতে এলে পরাণ আপনাকে আরও ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখবে।

বুড়ো ।। নাও খোকা, নাও। তুমি খুব ভালো ছেলে। পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে গেলে তোমাদের দুই ভাইকেই আমি করবো রাজা।

পরাণ ।। আমি রাজা হতে পারবো না।

হারাণ ।। আমি হব রাজা, তুই হবি সেনাপতি।

বুড়ো ।। বেশ! বেশ! তাই হোয়ো, তাই হোয়ো! এই নাও!

[শিশি দুইটি হারাণ হাতে নিল। হারাণ মুহূর্তকাল কী ভাবিল তারপর চারদিকে একবার তাকাইল। তারপর চট করিয়া শিশি দুইটির ছিপি খুলিয়া মুখে ঢালিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিল।]

পরাণ ।। [সভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল] দা-দা; বা-বা।

[হারাণ ভয়ে আতঙ্কে ভূপতিত হইল।]

বুড়ো ।। য়্যা? এ তুই কী করলি? পৃথিবীটাকে বাঁচিয়ে দিলি? মানুষের একটা বাচ্চা তুই; তোরই এত সাহস? পালাই আমি পালাই। ওরে বাপরে। এ যা দেখলাম মানুষকে ধ্বংস করার সাধ্যি কারো নেই, কারো নেই।

[শিশি দুইটি তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের পলায়ন]

পরাণ ।। [দাদার বুকের ওপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল] দাদা! দাদা!

হারাণ ।। [যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল] কে রে—পরাণ তুই? কী হয়েছে? আরে সে বুড়োটা কোথায়?

পরাণ ।। [হাই তুলিয়া, নিজের চোখ মুছিয়া] তাই তো! সে বুড়োটা কোথায় গেল? শিশি দুটোই বা কই?

হারাণ ।। মঙ্গলগ্রহের সেই বুড়োটা! দূর ছাই আমরা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরাণ ।। তাই হবে দাদা কেউ তো নেই এখানে?

হারাণ ।। খবরের কাগজে ঐ গ্যাগারিন, টিটভ ওদের মহাকাশ বিজয়ের কথা পড়ে পড়ে আমাদের মাথাটাই কেমন গরম হ'য়ে গেছে! দুজনেই সারারাত ঐ সব স্বপ্ন দেখেছি। চল ভোর হ'য়ে গেছে। ধর আমাদের ভোরবেলার সেই গানটা! ধর।

[দুজনেই গাহিতে লাগিল]

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।

য ব নি কা

ভোম্বলের কান্না

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলায় মার খেলে সবাই কাঁদে, কিন্তু ভোম্বল কখনও কাঁদে না। এমন কুড়ের সর্দার পেটুকদাস ছেলেও কেউ দেখেনি কখনও। দিন-রাত হয় খাই-খাই করছে, না হয় খেলে বেড়াচ্ছে পাড়ায়-পাড়ায়।

সংসারে বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ ছিল না ভোম্বলের। সে জন্মাবার পরই তার বাপ মারা যায়, কষ্টেসৃষ্টে ভিক্ষেসিক্ষে করে মাই তাকে মানুষ করে। কিন্তু মানুষ আর হল কোথায় ভোম্বল! পাঠশালায় যাওয়া থেকেই আরম্ভ করলে যত গন্ডগোল। কিছুতে পাঠশালায় যাবে না, বই, শ্লেট নিয়ে বসবে না। লেখাপড়া যেন বাঘ।

ক্রমশঃ ভোম্বলের মা তাকে মারধোর আরম্ভ করলে। বাপ-মা যত গরীবই হোক, ছেলেপিলেকে কে আর মুখ্যু করে রাখতে চায় বলো? কিন্তু ভোম্বলের বেলা মারধোরেও কোন কাজ হল না।

মারলে কাঁদে না যে ছেলে তাকে মেরেই বা আর ফল হবে কি? তবু ছাড়ে না ভোম্বলের মা—চড়-চাপড়, কিল-ঘুষি চালিয়ে যায়, কিন্তু মারের ভয়ে কোন ভাল ফলের সম্ভাবনা দেখা দেয় না।

লেখা-পড়া না করুক, না হোক, ঘর-সংসারের কাজ-কর্মও তো করে ছেলেপুলেরা। কিন্তু তাতেও ভোম্বলের কোন আঁঠা নেই, চাড়

নেই। সব সময়েই খাই-খাই আর খেলা। এমন হলে কোন্ সংসারের চলে? এতে কার না রাগ হয়, কে না মারধোর করে পারে?

বাড়ির আশপাশের লোকেরা এসে কত বোঝায় ভোম্বলকে। বলে, তুই তোর মার কাছে এত মারধোর খাস রোজ, তবু কথা শুনিস না কেন? বড় হচ্ছিস, কাজ-কর্ম কিছু না করলে, বুড়ি মা আর কতদিন তোকে মরে-মরে খেটে এনে খাওয়াবে?

সারাদিন টো-টো করে ঘুরে খাবার সময় বাড়ি এসে হাজির হয় ভোম্বল। দু-চার পয়সার কিছু আনতে বললে, পথে পয়সা হারিয়ে আসে; বাড়িতে কিছু করতে বললে, ফেলে ভেঙেচুরে নষ্ট করে বসে। রোজ মারও খায় এর জন্যে প্রচুর।

কিন্তু এইভাবে মার খেলেও কোনদিন সে কাঁদে না বা মারের জন্যে কোন প্রতিবাদ করে না। সবাই বলে মার-খেঁচড়া হয়ে গেছে ভোম্বল। ভোম্বলকে মারতে ওর মারও যে খারাপ না লাগে তা নয়, কিন্তু এ ছাড়া তাকে শোধরাবার আর কোন উপায়ও খুঁজে পায় না তার মা। মধ্যে মধ্যে দুঃখ করে কত কথাই বলে ভোম্বলের মা ভোম্বলকে। বলে, আমি মরে গেলে তখন বুঝবি—তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে!

মায়ের মুখের দিকে ফেল-ফেল করে চেয়ে থাকে ভোম্বল।

সত্যিই দিন-দিন সে যেন আরও কুড়ে হাবাগোবা হয়ে যাচ্ছে। আজকাল আর বাইরেও বেরোয় না বড় একটা। তার মা হতাশ হলেও হাল ছাড়ে না। কোন কিছু বেআদবি দেখলেই মারধোর লাগায়। ভাবে, এমন ছেলে থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি!

দশ-এগারো, বারো করে ক্রমশঃ ভোম্বল ষোল বছরে এসে পড়ে। ছোটবেলায় যদিও সে কিছুটা চালাক-চতুর ছিল, কিন্তু এখন যেন কেমন একটা নির্বোধের মত হয়ে যেতে বসেছে।

পাড়া-পড়শীরা তার মাকে বলে, অতিরিক্ত মারধোর করে করে ছেলের মাথাটা খেয়েছ তুমি।

দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত বুড়ি মার মাথাটা ঠিক রাখা সম্ভব কিনা সে কথা আর ভাবে না কেউ।

এইভাবেই দিন চলে।

মার উপর ছেলের কোন দরদ নেই, এই কথাই বলে অনেকে। আবার অনেকে বলে, কুঁড়ের বাদশা যারা তাদের আবার কি দরদ থাকবে মা-বাপের উপর! কেউ বলে, ওকে বোকার মত দেখতে হলে কি হবে, ও চালাকও কম নয়! পাছে মার কাছে মার খাওয়ার কথা প্রকাশ পায়, সেজন্যে কোনদিনও ও কাঁদে না। অপর জন বলে, তা কেন হবে, ওর মাকে ও ছোট করতে চায় না বলেই কাঁদে না। আবার কেউ বলে, ও ভাল ছেলে হয়ে মার কথা শুনলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। উত্তরে অন্য কেউ বলে, আসলে কথাবার্তা না শোনা, লেখাপড়া করতে না চাওয়াই তো ওর রোগ। মারের ফলে সে রোগ ওর বেড়েই গেছে আর মার খেতেও ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে—ওর শরীর এখন মার খেতেই চায়।

ভোম্বলকে নিয়ে পাড়ায় এমনি যখন সব আলোচনা চলছে, তখন একদিন সবাই চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। কখনও ফুঁপিয়ে কখনও গলা ছেড়ে কাঁদছে ভোম্বল।

আশ-পাশের বাড়ি থেকে অনেকেই ছুটে আসে। অনেকে ভাবে, ভোম্বলের মাই হয়ত মারা গেছে। এমন কান্না কেন, কান্নাই তো কেউ কোনদিন শোনেনি তার মুখে!

তার বুড়ি মাও একেবারে হতবাক। একি কাণ্ড! যে ছেলে কখনও কাঁদে না সে আজ এমন ককিয়ে কেঁদে উঠল কেন? সেদিনও অবশ্য তাকে একটু মেরেছিলেন তিনি, কিন্তু এমন মার তো বহুবারই খেয়েছে সে, কিন্তু একদিনের জন্যেও তো কাঁদেনি!

পড়শীদের মধ্যে একজন তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, একি ভোম্বল তুমি আজ এমন করে কাঁদছ যে?

ভোম্বল ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললে, আমার মা আর বেশীদিন বাঁচবে না, তার মারে আর আগেকার মত জোর নেই; এর জন্যেই মনের দুঃখে আমি কাঁদছি।

তার কান্না শুনে যারা এসেছিল, তারা মুখ-চাওয়াচায়ি করতে থাকে পরস্পরে।

ভোম্বলের মা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে।

* ছোটদের জন্যে লেখা একটি ভিয়েৎনামের গল্পের ছায়াবলম্বনে।

স্বপ্ন নয় শামুক

শ্রীবিমল ঘোষ
(মৌমাছি)

প্রতি বছরের মতই এবছরেও এক চিঠিতে 'স্বপনবুড়ো' দাদার তাগিদ এলো—'জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেখা চাই'। 'স্বপনবুড়ো' দাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই কিন্তু আমার। কারণ, তাঁকে আমি একটু ভয়ই করি। কিন্তু আমি যে একটু স্বপ্ন দেখবো, কল্পনার রঙ চড়িয়ে গল্প শোনাবো তোমাদের, সে সুযোগ আমার নেই।

এবছরও সেই হুকুম তামিল করি কি করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন্ বিষয়টা আনি ধরে—এই ভাবনায় আমি যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই হাজির হলেন তাঁরা। কারা? সেই যে গো তোমাদের চেনা আমার ছোট্ট বন্ধুরা। নিতু, শঙ্কর, মিঠু, মনুয়া, অন্তু, কিন্তুর দল।

দরজা বন্ধ ক'রে, মোটা মোটা বই খুলে বসেছিলুম 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের' লেখা লিখতে। ঠিক তেমন সময়—দরজায় দমাদম্ ধাক্কা! চিৎকার কানে এলো—পেয়েছি, পেয়েছি, ধরে এনেছি, শিগ্গীরী দরজা খোলো মৌমাছি।'

হুড়মুড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার অল্পজ্ঞানী বিজ্ঞানী বন্ধুর দল ঘরে ঢুকে পড়লো। ওরা কেউ কেউ হাঁপাচ্ছে তখনও। অন্তু আর কিন্তু খালি দম বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে শঙ্করের কচুপাতা ঢাকা হাতটার দিকে। আমার চোখ পড়লো সেই দিকেই। আমি কিছু বলবার আগেই শঙ্কর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে বসলো— বাব্বা ঃ এতদিনে 'স্বপনবুড়োকে' পাঠাবার মতো একটা জিনিস জোগাড় হলো।"

আমি জিগ্যেস করলুম—'কীরে কী?'

মনুয়া বললে—'শামুক'। মিঠু বললে—"জানো মৌমাছি দাদা। শামুকটা মানকচু গাছে উঠে—কচুপাতার উপর চলে বেড়াচ্ছিল! শামুকতো জলে থাকে—গাছে উঠল কি করে?"

আমি মনে মনে খুশি হই, এতদিনে ওরা একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে, ধরে এনেছে সেটাই সাহস করে। মিঠুর কৌতূহল মেটাতে ওদের বুঝিয়ে বলি—'শামুক নানা জাতের হয়, ওরা গাছেও থাকে, মাঠেও থাকে, পুকুর ডোবাতেও রয়, সমুদ্রেও পাওয়া যায়।'

মনুয়া বললে—'জলের শামুকগুলোকেই গুগ্‌লি বলে না মৌমাছি? আমার মামার বাড়ির গাঁয়ে গুগলির ঝোল রেঁধে খায়। কিন্তু সেগুলোতো এতবড় নয়! এর চেয়ে ছোট!'

—শামুক যেমন নানা জাতের আছে, তেমনি নানা রঙের ও নানা আকারের হয়। সরষের দানার মতো ছোট্টও শামুক পাওয়া যায়, আর কোন জাতের শামুক আবার দেড় ফুট দু'ফুটও হয়।

অন্তু ফট্ করে বলে "ওদের ভারি মজা কিন্তু মৌমাছি! মার-ধোর খাওয়ার আগেই খোলাটার মধ্যে চট করে শরীরটাকে ঢুকিয়ে নিতে পারে। আমাদের যদি অমনি শামুকের মতো খোল থাকতো রে!"

আমি বলি—"সব শামুকের খোল নেই কিন্তু. কিছু শামুক এমনও আছে, যাদের খোল বলতে কিছুই নেই।"

মিঠু বললে—"ম্যাগোমা! শামুক আবার মানুষে খায় কি করে? দেখলেই তো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।"

মনুয়া বললে—"প্যায়রা খাওয়ার মতো কাঁচা কাঁচা খায়ও না, খোলাসুদ্ধ গেলেও না। খোলা ছাড়িয়ে ধুয়ে লঙ্কা রসুন দিয়ে রেঁধে খায় ঝোল-ঝাল! আমি খেয়েছি মন্দ লাগে না রে!"

মিঠু ঐ কথা শুনেই ওয়াক! ওয়াক করতে করতে ঘর ছেড়ে পালালো!

শঙ্কর এতক্ষণ কথাটি করেনি। সে নজর রেখেছিল, কচুপাতা থেকে নেমে শামুকটা দিব্যি গোলটেবিলের পায়া বেয়ে উঠছে, এগিয়ে চলেছে ফুলদানী থেকে ঝরে পড়া রকমারী ফুলের পাঁপড়িগুলোর দিকে। মিঠুর ওয়াক্ তোলার শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে—'মিঠুটার সবেতেই বাড়াবাড়ি, এটা খাবোনা, সেটা খাবোনা, ওটা খেতে গা গুলোয়! যত্তো ভিরকুটি!'

দিদির পক্ষ নিয়ে অন্তু বললে—"ভিরকুটি"র কী হলো? তুমিও তো দুধের সর মুখে তোলনা? সবাই কি সব খায়? শামুকরা কি সব খায় মৌমাছি?"

আমি আঙুল দিয়ে ওদের দেখাই আমার গোলটেবিলের ওপর শামুকটাকে —সে ঐ ফাঁকে ঝরে-পড়া ফুলের পাঁপ্‌ড়িগুলোকেই সাবাড় করছে।

শামুকের খাওয়ার ধরণ-ধারণ ওরা সবাই চোখ বড় বড় করে দেখে।

মনুয়া বলে—'বুঝেছি শামুকরা ফুল-পাতাই খায়, ওরা 'নিরামিষ্যি খায়।'

আমি চুপ করে থাকতে পারি না। বলি—"না রে, শামুকরা! কেউ কেউ কেবল ফুলপাতা খেয়েই বাঁচে। কেউ কেউ মাছ-মাংস ছাড়া খায়ই না। পোকা মাকড়, মরা পশু পাখীতেই তাদের লোভটা বেশি।"

শঙ্কর জিগ্যেস করে—'আচ্ছা মৌমাছি দাদা! শামুকরা তো পশু, পাখির দলেও পড়ে না, কীট-পতঙ্গের দলেও পড়েনা, আসলে ওরা তাহলে কোন্ দলের জীব?'

জীবজগতে ওদের ধরা হয়—'মোলাস্কস্' জাতের জীব বলেই। আর এক নামেও ওদের ধরা হয়—সেটা হলো গ্যাস্ট্রোপডস—অর্থাৎ পেট-পা বলে। ওদের ঐ দলের জাতভাই হিসাবে ধরা হয়—ঝিনুক, গুগ্‌লি, শঙ্খ, কড়ি ইত্যাদি জীবগুলিকে।'

হঠাৎ অন্তু বলে উঠলো—'পেট-পা ওদের ঠিকই নাম হয়েছে, দেখনা ভাল করে শামুকটার একটাও পা নেই। পেটের ওপর ভর দিয়ে হড়কে হড়কে এগিয়ে চলেছে—হড়হড়ে একটা রসের দাগ রেখে যাচ্ছে—যেখান দিয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তুবাবু বললে—'আচ্ছা মৌমাছি শামুকের ঐ হড়হড়ে রসটা কোত্থেকে আসছে? কেন আসছে?'

খুব ভাল প্রশ্ন করেছে কিন্তুটা। কিন্তু জবাবটা সহজ করে বলাই শক্ত। তবু জানিয়ে দিই যে—শামুকের মাথার কাছে এক জোড়া গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি আছে, সেখান থেকে ঐ হড়হড়ে লালার মতো জিনিসটা বেরিয়ে এসে—শামুকের পেটে হাঁটাকে সহজ করে আর ওর নরম পেটটাকে ছড়ে ছিঁড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। এমনকি ধারালো ক্ষুরের ফলার ওপর দিয়েও যদি শামুক হেঁটে যায়—তাতেও তার গায়ে একটুকু আঁচড় পড়ে না, ঐ লালার জন্যেই। অন্তু বললে—

"শামুকের গায়ে তো আঁচড় পড়ে না বুঝলুম ওরা কি আঁচড়ায় কামড়ায়?"

কিন্তুটা ফট্ করে বলে বসলো—'দাদা'ভাইটার ভারি ভয়, শামুকটাকে দেখেই তো বোঝা যায়, ওরা নিরীহ ভালমানুষ, আঁচড় কামড়ের ধার ধারে না। একটু ভয় পেলেই খোলার ভিতরে গা-ঢাকা দেয়।'

কিন্তুবাবু ঠিকই বলেছে—শামুকদের নিরীহ বলা চলে, তবে সবাই নয়। কোনও কোনও জাতের শামুক কামড়ায়, এবং কারও কারও কামড় রীতিমত বিষাক্ত। সে-সব শামুকের কামড়ে মানুষ মরেও যায়। আমার কথা শুনেই সবাই যেন বেশ একটু ভয় পেয়ে শামুকটার কাছ থেকে সরে সরে দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

শঙ্করও একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করলো—'এ শামুকটা বিষাক্ত নাকি?'

না আমাদের দেশে জলাজঙ্গলে যে সব শামুক ঘুরে বেড়ায়, লতা-পাতা, ফুল খায়, তাদের কামড় ভয়ানক কিছু নয়, তবে কোনও কোনও শামুকের ঐ রস লেগে চামড়া লাল হয়, কুট্‌কুট্ করে, গড়লও হয়। তাই শামুক নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাটি ভাল নয়।

মিঠু জিগ্যেস করলে বিষাক্ত শামুক কোথায় কোন্ দেশে পাওয়া যায়? তার খবরও জানাতে হয় ওদের। বলি,—প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপে—এমন কি নিউগিনি, সামোয়া, অস্ট্রেলিয়ায় 'কোনস' নামে চোঙ আকারের যে বড় বড় সামুদ্রিক শামুক দেখা যায়, সেগুলোই সবচেয়ে বিষাক্ত।

অন্তু বললে,—'শঙ্করদা শুনলে তো সব, শামুক আনতে তাই বারণ করেছিলুম। একে শামুক, তাই কচুপাতা থেকে ধরেছ, এনেছ কচুপাতায় করে। আমার তাই গা কুট্‌কুট্ করতে শুরু করেছে, শামুক ধরে এনে লাভ তো হলো এই।'

'ঠিক বলেছ অন্তুদা,' কিন্তুটা ফোড়ন কাটলে—'শামুক না ধরে 'কাঠবেড়ালী ধরলে লাভ হতো'।

কি আমার বুদ্ধিরে সব? শামুক ধরে এনে লাভ হলো না তো কি লোকসান হলো? শামুক ধরে হাজির না করলে—এত নতুন কথা শুনতিস কি করে! মৌমাছিও তো দরজা বন্ধ করে শামুকের মতোই বসেছিল। দরজা খোলালে, গল্প বলালে এই শামুক বন্ধুই। চল আমরা ওকে সেখানেই রেখে আসি, যেখানে ও ছিল।

সবাই বললে,—'সেই ভালো—তাই চলো, হিপ্‌হিপ্-হুররে!'

ওরা দল বেঁধে চলে গেল—আমিও ঘটনাটা কথায় বেঁধে পাঠিয়ে দিলুম 'স্বপনবুড়ো' দাদার পাততাড়ির আসরে।

(এক)

জমিদার মারা গেলেন।

জমিদারের দুটি ছেলেই তখন নাবালক, এদিকে মস্ত জমিদারী, কে দেখাশুনো করবে? যে সুবিধা পাবে সেই তো নাবালক ছেলেদের ঠকাবে। জমিদারী রক্ষা করা যাবে না, বিষয়-সম্পত্তি সব নষ্ট হবে।

ঝরা শিউলি ফুলে বাগান সব ভরে গেছে—মিষ্টি সুবাস আসছে, মন যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে। শরৎকালের এই সময়টা তাই এত ভাল লাগে। বাতাসে কেমন একটা সুখস্পর্শ, আকাশ নির্মেঘ, আর বকের সারি দল বেঁধে চলেছে। আর ক'দিন পরেই পুজোর বাজনা বেজে উঠবে।

সাজি হাতে করে শিউলি ফুল কুড়োতে এসেছে মুন্নি, রোজই আসে ফুল কুড়োতে, সাজি ছাপিয়ে উঠলে তার জামার কাপড় গুটিয়ে তায় মধ্যে ভরে নিয়ে আসে তারপর ছড়িয়ে দেয় মাদুরের উপর, অনেকক্ষণ বসে থাকে। রোদের তেজ বাড়লে শিউলিগুলো যখন ম্লান হতে সুরু করে তখন সে আস্তে আস্তে বোঁটাগুলো ছিঁড়তে থাকে।

তখনকার দিনে নাবালকের বিষয়-সম্পত্তি দেখার জন্য সরকারী ব্যবস্থা ছিল—কোর্ট অফ ওয়ার্ডস। ছেলেরা যতদিন নাবালক থাকবে ততদিন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস জমিদারী দেখবে তারপর ছেলেরা সাবালক হলে তারা জমিদারী ফিরে পাবে। এই জমিদারীটিও পরিচালনার ভার নিলেন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস।

জমিদারীর ভার নেবার আগেই টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তির একটা হিসাব করার দরকার হয়। গভর্ণমেন্ট জমিদারীর হিসাব নিতে বসলেন। প্রতিটি কর্মচারীর কাছ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাব চাইলেন। প্রত্যেকেই এক একটি হিসাব তৈরী করলেন। সব নিয়ে সমস্ত জমিদারীর হিসাব তৈরী হলো।

সবার শেষে এক কর্মচারী এসে দাঁড়ালো ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বললো, হুজুর, এই নিন পঞ্চাশ হাজার টাকা, কাগজপত্রে এর কোন হিসাব নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কাগজপত্রে হিসাব নেই, সে কি?

—কর্তামশাই বিশ্বাস করে এই টাকাটা আমার কাছে রেখেছিলেন, এর আর রসিদ কোথায় পাবেন?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এ টাকাটা তো আপনি না দিলেও পারতেন?

—তা কি হয়, গচ্ছিত টাকা—এ তো অবশ্য ফেরত দিতে হবে।

—আপনি কি করেন?

—আমি সামান্য একজন গোমস্তামাত্র।

—কত বেতন পান?

—পঞ্চাশ টাকা।

পঞ্চাশ টাকা মাহিনার গোমস্তা পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভ সংবরণ করেছে, এ টাকাটা তো সহজেই সে মেরে দিতে পারতো। ম্যাজিস্ট্রেট বিস্ময়ে গোমস্তার মুখের পানে তাকালেন।

এই মানুষটিকে ম্যাজিস্ট্রেট আর ছাড়তে পারলেন না। নাবালকের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শুনা করার জন্য তিনি একেই সেই জমিদারীর অধ্যক্ষ করে দিলেন। তাঁর পদ-মর্যাদা বাড়লো, মাইনেও বাড়লো, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার তুলনায় সে কিছুই নয়।

এই নির্লোভ মানুষটি কে ছিলেন জান? সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। তখনকার দিনে এই ধরণের বাঙ্গালী ছিল বলেই বাঙ্গালী জাতি ভারতের গৌরব বাড়িয়েছিল। আজকের লোভী স্বার্থপর বাঙ্গালী সেই গৌরবের আসন থেকে নেমে এসেছে, তোমরা কি পারবে আবার সেই গৌরব ফিরিয়ে আনতে?

(দুই)

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সুপণ্ডিত বিদ্যারত্ন মশাই বড়ই ধার্মিক প্রকৃতির লোক। অল্প টাকায় তিনি কিছু জমি কিনেছিলেন নারিকেলডাঙ্গায়। সেই জমি বিক্রী হলো অনেক বেশী টাকায়, বিদ্যারত্ন মশাই লাভ পেলেন দশ হাজার টাকা। কিন্তু এই দশ হাজার টাকা নিয়ে হলো তাঁর সমস্যা,—এই লাভের টাকাটা তিনি কিসে খরচ করবেন? এ টাকা তো তাঁর ন্যায্য উপার্জনের টাকা নয়।

ঠিক সেই সময় এক ছাত্র এলো তাঁর কাছে, বললো—রাজপুরে হরিণাভি গ্রামে এক দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে, আপনি তো রাজপুরের লোক, আপনি আমাদের ওই ভাণ্ডারে কিছু সাহায্য করুন।

বিদ্যারত্ন মশাই জিজ্ঞাসা করলেন,—সেখানে কি কাজ হয়?

—দরিদ্রের সেবা করাই আমাদের কাজ। অনাথা খেতে পাচ্ছে না তাঁদের দুবেলা দু মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা, গরীব রোগী ওষুধ পাচ্ছে না, তাদের ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করা, যার আশ্রয় নেই তার মাথা গুঁজবার মত একটু আশ্রয় দেওয়া—এই সব কাজই আমরা করি।

—এজন্য তো অনেক টাকার দরকার, তা খরচপত্তর চলে কোথা থেকে?

—এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত ও সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মশাই। গোড়ার দিকে অনেক টাকা দিয়েছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী, দুর্গাচরণ লাহা ও সিঁদুরে পটির মতিলালবাবু, এখন অনেকে মাসে মাসে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

বিদ্যারত্ন মশাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—তাহলে তোমরা তো সত্যি একটা বড় কাজ করছ হে, আমি তো এর কিছুই জানি না। ঠিক আছে, আমিও তোমাদের ভাণ্ডারে টাকা দোবো।

—মাসে মাসে দেবেন, না এককালীন?

—এককালীন দোব।

—ছাত্রটি ভাবলো পণ্ডিত মশাইয়ের আয় তো অল্প, এককালীন আর কত টাকাই বা দিতে পারবেন, বললো—আপনি মাসে মাসে দিন, তাতে আমাদের সুবিধা হবে।

—না, মাসে মাসে আমি দিতে পারবো না, আমি তোমাদের একেবারেই দিয়ে দোব, একেবারে দেনা-পাওনা চুকে যাবে।

—কত টাকা দেবেন, আমি তাহলে সবাইকে সেই কথা জানাবো

—আমি তোমাদের একেবারে দশ হাজার টাকা দিয়ে দোব।

ছাত্রটি তো থ', পণ্ডিত মশাই বলেন কি!

—ওই টাকাটা জমি বেচে লাভ করেছি ওইটেই তোমাদের দিয়ে দোব, আমার কাঁধ থেকে বোঝা নেমে যাবে।

ছাত্রটি বলে উঠলো—আমি তাহলে এখনি ওদের খবর দিই, এই টাকা পেলে তো আমরা বিরাট ব্যাপার করে তুলবো!

তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা এখনকার লাখ টাকার সমান।

বিদ্যারত্ন মশাই ব্যস্তভাবে বললেন,—না-না, এখন কাউকে কিছু বল না, আগে লেখাপড়া করে চুপি-চুপি টাকাটা জমা করে নাও, আগেই বেশী জানাজানি হলে ক্ষতি হবে।

—কিন্তু এতো বড় ব্যাপার, আমি না জানিয়ে পারছি না, আমাকে এখনি গিয়ে বলতে হবে।

ছাত্রটি তখনই ছুটলো অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্রের কাছে, বললো,—স্যার বিদ্যারত্ন মশাই আমাদের ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দিচ্ছেন।

সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা মিথ্যা হবার নয়। উমেশবাবু তো আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তখনই ছুটে এলেন বিদ্যারত্ন মশাইয়ের কাছে। বললেন,—বিদ্যারত্ন মশাই আপনি ধন্য!

এই নিঃস্বার্থ পণ্ডিত মশাইটি কে ছিলেন জান? গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই ধরণের অধ্যাপক সে যুগে ছিল বলেই তখনকার ছাত্ররাও ছিল সেই যুগের উপযোগী। এ যুগে সে মন কি আবার ফিরিয়ে আনা যায় না?
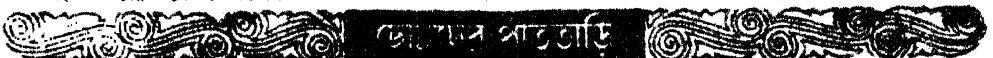
া শুকিয়ে রং করে কাপড় ছোপানো হবে আর সেই কাপড় পুজোর ন পরে সবাইকে অবাক করে দেবে যুঁই। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়, ংকালের সকালে শিউলি ফুল কুড়োনো তার নেশা। ভোর হবার গেই ঘুম ভেঙে যে যায় তার, তারপর মুখ ধুয়ে সাজি হাতে করে ানে যায়—যেদিন একটু দেরী হয়ে যায়—ফুলগুলিও ম্লান হতে ু করে।

মা কতদিন বলেছেন—ফুল কুড়িয়ে, বোঁটা ছিঁড়ে, শুকিয়ে এত ড করে কাপড় রং করার কি দরকার? কত রকমের রং তো বাজারে ওয়া যায়—তাই আনলেই হয়। সকাল বেলা পড়াশুনা নষ্ট করে ানে না গেলেই নয়?

যুঁই-এর দিদি বকুল বলে: তুমিও যেমন কথা বলো মা, ওকি ল কুড়োতে যায়—ওর বাগানে ভাল লাগে আর ওর বন্ধুরাও সব সে যে, তাই খুব মজা হয় ওর।

—মোটেই আমার বন্ধুরা আসে না, আমি যাই আমার—

—যেতে ভালো লাগে তাই তো?

মা বলেন: তা না'হয় গেল, কিন্তু তারপর ঐ সময়ের অপব্যবহার রার কি দরকার? বোঁটা ছেঁড়ো, শুকোয়—

—কাপড় রং হবে না বুঝি?

বকুল বলে: তোমার আদরের মেয়ে হাসালো মা, আজকাল রং রার অভাব আছে নাকি যে অত কষ্ট করতে হবে?

মা হেসে বল্লেন: সত্যি কথাই তো!

যুঁই গাল ফুলিয়ে বল্লে: বেশ যাও।

বকুল বল্লে: আর তো কিছুর জন্য নয়, সময়কে ফাঁকি দেওয়া চ্ছে, পড়া নষ্ট করা হচ্ছে—তাই বারণ করা, না হলে আর কি!

এই রকম তিরস্কার, সাবধানবাণী, সময়ের অপব্যবহার না করার পদেশ প্রায় প্রতিদিনই যুঁইকে শুনতে হয়। কিন্তু তবু সে পারে া। প্রতিদিনই ভোরে উঠে বাগানে গিয়ে শিউলি ফুল কুড়োনোর কটা নেশা তাকে যেন পেয়ে বসেছে—সকালটা তার বাগানেই কেটে য়।

ফুল কুড়িয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে শুকিয়ে বড় টিনের কৌটাতে সে মিয়ে রাখে। রোদে দিয়ে একদিন স্কুলে চলে গেছে ফিরে দেখে কটিও শুকনো বোঁটা নেই। খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল পুরান তো গোবর্ধন ছাদ পরিষ্কার করতে গিয়ে ধুলো ময়লার সঙ্গে সব েলে দিয়েছে। রাগে দুঃখে যুঁই-এর চোখে জল এলো। মা অবিশ্যি ার দুঃখটা বুঝে গোবর্ধনকে মৃদু তিরস্কার করলেন। গোবর্ধন ল্লে: কি করবো চোখে ভাল দেখি না, বুড়ো হয়েছি, ওগুলো যে রকারী তা বুঝতে পারিনি।

বকুল একটু বিদ্রূপ করে বলে উঠলো: ওগুলো ছোটদিমণির শ্বর্য, বুঝলে?

—নাঃ আর সহ্য হয় না, মনে মনে যুঁই ঠিক করলে আর সে াগানে যাবে না, বোঁটা ছিড়ে রং করা কাপড় তার পরার দরকার নেই। কন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ জল হয়ে যায়—আর সাজি হাতে ুটে চলে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই আবার শুকনো শিউলির বোঁটায় কৌটো ভরে ঠলো। মাঝে মাঝে মার তিরস্কার কানে আসে, বকুলের তীব্র কণ্ঠও ুনতে পায়—সকালের পড়া নষ্ট করে এই খেলার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে ারই এই প্রতিবাদ।

পুজোর আগে স্কুলের পরীক্ষা—শেষে জানা গেল যুঁই-এর লাফল অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বাবা খুব বিরক্ত হয়েছেন এবং মা, কুল এবং মাস্টার মশাই-এর উপর রাগ করেছেন। কেন যে তার পরীক্ষার ফল এত খারাপ হলো সে কথা যুঁই নিজেও বুঝতে পারেনি। ভোরবেলা বাগানে গেলে তার মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে এবং ফিরে এসে নিয়ম মত পড়তে বসে—স্কুলে যায় আবার ফিরে এসে খেলাধুলো করে পড়তে বসে। কোনো রকমে অবহেলা করেছে বলে মনে হয় না তার।

তবুও তাকে অনেক কথা শুনতে হয়, মার কাছে লাঞ্ছনা হয়। যে বাবা আদর করে ছাড়া কথা বলেন না তিনিও ক'দিন কেমন গম্ভীর হয়ে রইলেন আর মাস্টারমশাই-এর মুখ দেখলে মনে হয় অগ্ন্যুৎপাতের আর বিলম্ব নেই।

এই রকম অসহ্য অবস্থার মধ্যেও যুঁই ফুল কুড়তে যায় কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে। পুজোর দিন বেশ কাছে এসে পড়েছে, বাড়ীতে নতুন জামা কাপড় কেনার ধুম পড়েছে—কিন্তু যুঁই বেচারী মুখ কালো করে পড়ে যাচ্ছে। তার ছুটি নেই। সকলেই যেন বিরক্ত হয়ে আছেন তার উপর। তার জন্যও কাপড় জামা আসছে তা সে বুঝতে পারে কিন্তু সে নিয়ে ভাবে না।

পুজোর ঠিক দু'দিন আগে যুঁই রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে খানিকটা গরমজল চেয়ে নিয়ে শিউলীর শুকনো বোঁটাগুলি ভিজিয়ে দিলে। তারপর তার জামা কাপড়ের ভিতর খুঁজে খুঁজে একটি কোরা ছোটশাড়ী নিয়ে এসে ভাল করে শিউলি ফুলের রং-এর জলে ডুবিয়ে নেড়ে নেড়ে রং করলো।

ভারী ভাল লাগছে তার—কি সুন্দর হয়েছে দেখতে, কোথায় লাগে দোকানের কেনা রং বা রং—সাবান! আনন্দে সব দুঃখ ভুলে গিয়ে গোবর্ধনকে ডাকে:

—গোবর্ধনদা, কাপড়টা একটু নিংড়ে মেলে দিয়ে দাওনা, আমার হাতে ধরছে না।

এই যে দিদি দিই, তোমার ফুল শুকনো আমি নষ্ট করেছিলাম, আমার মনে খুব কষ্ট ছিল—দাও আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

বিকেলে শুকনো রঙীন শাড়ীখানি ভাঁজ করে গোবর্ধন যুঁই-এর হাতে দিয়ে গেল—ভারী খুসী যুঁই। পরশু সপ্তমী পুজোর সকালে এই শাড়ীটা পরে ও পুজোর আঙিনায় যাবে। মাঝখানে আর একটি দিন আছে। হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাপড়টি দেখতে দেখতে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। শিউলি বিছানো বাগানের কথা মনে হলো তারপর ফুল কুড়োনো, ছাড়ানো, শুকনো কৌটায় তোলা আর সব শেষে পরীক্ষার কথা, তিরস্কারের কথা এবং বাড়ীর পরিবেশের কথা—কিন্তু তবু তার আজ আনন্দ হচ্ছে, আরো আনন্দ হবে যখন পরশু শাড়ীখানি পরে পুজো আঙিনায় যেতে পারবে।

অনেকদিন পরে মা আজ প্রসন্ন কণ্ঠে ডাকলেন: যুঁই তোমার কাপড় জামা জুতো সব দেখেছ? দেখে নও, সব পছন্দ হলো কিনা?

যুঁই এসে দেখে বল্লে: বেশ হয়েছে মা, পরে নেবো রেখে দাও।

বকুল দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—যুঁই-এর হাতে কাপড়খানি দেখে বলে উঠলো! ও এখন সাতরাজার ধন মাণিক পেয়েছে মা, ও-সব ওর চাই না।

মা একটু বিরক্ত হলেন বকুলের উপর—বল্লেন: সব সময় ওরকম করিস কেন বাছা, কত কষ্ট করে কত বকুনী খেয়ে ও কাপড় রং করেছে পুজোর দিন পরবে বলে তা না সব সময়ই বাজে বাজে।

সেদিন সকালে যখন পুজো বাড়ীতে বাজনা বেজে উঠলো—যুঁই জানলা দিয়ে দেখলো দলে দলে ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে চলেছে পুজো বাড়ীর দিকে। স্নান করে যুঁইও ঐ দলে মিশে যাবে, তার আগে সেই শিউলি ফুলে ছোপানো কাপড়টি পরতে হবে। কাপড়টি হাতে নিয়ে নীচে নেমে আসতেই মা বললেন: রাণু তোকে ডাকছিল রে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

—কই, কই রাণু? মুখ বাড়িয়ে যুঁই দেখলো উঠানে তার বন্ধু রাণু দাঁড়িয়ে আছে। আধময়লা একটা ফ্রক পরা।

—কি রে রাণু ঠাকুরতলায় যাবি না?

ম্লান মুখে রাণু বল্লে: চল, বাবো বলেই তো এসেছি।

কাপড় পরিসনি?

ছোটদের পাততাড়ি

ছেলেটার নাম ছিল পল্।

সে একদিন ভাবলো, "যদি একটাও অ্যাডভেঞ্চার করতে পারতাম তাহলে একটা কিছু হোত। বাড়িতে, এমন একঘেয়ে লাগে—বাইসিকলে চড়ো, ইলেকট্রিক ট্রেণ নিয়ে খেলা করো, আর আছে এক সেলফ বই। ব্যস।"

এ সব অবশ্য আদৌ একঘেয়ে নয়, কিন্তু পলের মনে হলো ওগুলো তাই-ই। সে বললে, "আমি চাই সত্যিকারের উত্তেজনার কিছু যাতে আমার হৃৎকম্প হবে। একটা অ্যাডভেঞ্চার!"

তারপর একদিন সে সোজা একটার মুখোমুখি পড়ে গেল। সে রাস্তা দিয়ে চলেছে। আর, উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তার একেবারে সামনে এসে পড়লো গোয়ালাটার ছোট ঘোড়াটা। গোয়ালাটা তার পিছনে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল। গাড়ি থেকে দুধের বোতলগুলো লাফিয়ে উঠে রাস্তার উপরে ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দে আর বোতল ভাঙার ফট্‌ফট্ আওয়াজে পল বাস্তবিকই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে তার দিকে সোজা ছুটে আসছিল। ঘোড়াটাকে একটা ডাঁসে কামড়েছিল। তাতেই সে তড়কে গিয়েছিল। পল সেদিকে একবার তাকিয়েই রাস্তার ধারে ঝোপে ঢাকা বেড়ার দিকে দিলে ছুট্।

সে আতঙ্কে বেড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লো আর ঘোড়াটাও রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা চলে গেল। পল গড়াতে গড়াতে বেড়ার ওধারে গিয়ে পড়লো মাঠে।

সে উঠে দাঁড়ালো। তার বুক কাঁপছে। একচুলের জন্য বেঁচে গেছে! ঘোড়াটা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারতো! হায় কপাল! তারপরই শুনতে পেল কাছেই একটা ষাঁড় হুংকার দিলে। সে ফিরে দেখে, একটা মস্ত শিংওয়ালা জন্তু তার দিকে ছুটে আসছে আর ঠিক তখনই চোখে পড়লো একটা মস্ত বিজ্ঞাপন—"ষাঁড় আছে, সাবধান!"

আর এক মুহূর্তেও না দাঁড়িয়ে পল মাঠ ভেঙে দিল ছুট্। ছুট্ ছুট্। ঐ চোখা শিং দুটোর গুঁতোবার আগেই তাকে সেখান থেকে পালাতে হবে।

হঠাৎ সে টিলার ওপর হাফাতে হাফাতে পড়েই গড়াতে গড়াতে সোজা গিয়ে পড়লো সেখানে দুটো লোক আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছিল সেখানে।

তাদের একজন রাগের সঙ্গে বলে উঠলো, "এই কি করছো? আমাদের জলের পাতিলটা ধাক্কা দিয়ে উল্টে দিলে।"

পল করেওছিল তাই।

পলের চেয়েও মাথায় ঢ্যাঙা একটা ছেলে বললে, "নদী থেকে আমাদের জন্যে খানিকটা জল এনে দাও। যাও—শিগ্‌গির! ঐরকম করে টিলার ওপর দিয়ে এসে একেবারে আমাদের ঘাড়ে পড়েছো!"

পল বললে, "আমায় ষাঁড়ে তাড়া করেছিল।"

অন্য ছেলেটা বললে, "গুলেবাজ!"

পল বিরক্ত হয়ে বললে, "আমাকে যদি ও কথা বল তাহলে তোমাদের একটুও জল এনে দেবো না।"

বড় ছেলেটা বললে, "তোমায় দিতেই হবে।" সে পলকে চেপে ধরলো। পলের মাথায় পাত্রটা উল্টো করে বসিয়ে সে আর অন্য ছেলেটা তাকে নদীতে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

বড় ছেলেটা বললে, "এইবার—পাত্রটাতে জল ভরে দাও।"

পল নারাজ।

ঝপাং! পল দেখলো সে জলে পড়েছে। অন্য ছেলেটা তাকে বেশ জোর ধাক্কা দিয়েছে। ছেলে দুটো হৈ হৈ করে উঠলো। তারা চায় পল ভিজে জাব হয়ে ওপারে গিয়ে উঠুক। আর পল মনে করলো তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তাড়া করবে। তাই উর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটলো যেখানে জলধারাটা গিয়ে বড় নদীতে মিশেছে সেখানে।

সেখানে একখানা নৌকো ছিল। পল তাতে লাফিয়ে উঠলো। তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। সে নৌকোখানা বার-নদীতে ঠেলে দিয়ে দাঁড় টানতে লাগলো। ধন্যবাদ যে সে ঐ সাঙ্ঘাতিক ছেলে দুটোর হাত থেকে পালিয়েছে।

কে যেন বেশ রাগের সঙ্গে তাকে বলে উঠলো, "এই! আমার নৌকোখানা নিয়ে কি করছো? শিগ্‌গির ওটা ফিরিয়ে আনো।"

পল নৌকোখানা ঘোরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কি করে যেন একখানা দাঁড় ঝাঁঝিতে আটকে গেল। পল ঝুঁকে দাঁড়খানা ছাড়াতে যেতেই আবার ঝপাং করে জলে পড়লো।

কিন্তু যে লোকটা তাকে ধমক দিয়েছিল তাকে তার এমন ভয় হলো যে, সামান্য একটু সাঁতরে ওপারে না উঠে সে চওড়া নদীটা সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পারলো না, সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে লাগলো—"বাঁচাও, ডুবে যাবো, বাঁচাও!"

একখানি ছোট ষ্টীমার আসছিল। চীৎকার শুনে সেটা তার কাছে গিয়ে থামলো। ষ্টীমার থেকে একটা হুক বাড়িয়ে দেওয়া হলো। হুকটা তার পোষাকে আটকে গেল। তাকে পাশে টেনে এনে ষ্টীমারে তুলে নেওয়া হলো। তার একটু পরেই সে সকলকে বলতে আরম্ভ করলো কি কি ঘটেছিল—সেই পালানো ঘোড়াটার সামনাসামনি পড়া থেকে আরম্ভ করে তাকে জল থেকে তোলা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা।

রাণু চুপ করে রইল।

—কি হয়েছে তোর? বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো খুশী।

কিছু হয়নি, চল না যাবি যে! যা কাপড় পরে আয়।

—কিন্তু তুই কাপড় পরবি না?

—এই তো ঠিক আছে, আয় তাড়াতাড়ি। কথা বলতে বলতে রাণু মুখ ফিরিয়ে নিলো, যদি তার চোখের জল খুশী দেখতে পায়।

খুশী ফিরে ঘরে ঢুকতেই বকুল বল্লে: কবে বুদ্ধি হবে? বারে বারে ওকে কাপড় পরতে বলা হচ্ছে, বেচারীর কি কাপড় জামা কিছু হয়েছে? কোথায় পাবে রাণু, কি-রকম করে দিন যায়, আর বলবে না ওকে বুঝেছ?

খুশী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—তার চোখেও জল টলটল করছে। তারপর রঙীন শাড়ীখানি হাতে করে রাণুর কাছে এসে বল্লে: তোর জন্য আমি নিজে হাতে শাড়ীটা রং করেছি—তুই পর ভাই!

মা আর বকুল ঘরের ভিতর থেকে সেই দৃশ্য দেখতে পেলেন—তাঁদেরও চোখে জল।

রাণু আপত্তি করলো—কিন্তু খুশী জোর করে তাকে শাড়ীখানি পরিয়ে নিয়ে—হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

মা ঘর থেকে সব দেখলেন—চোখের জল মুছে মনে মনে খুশীকে আশীর্বাদ করলেন—।

বকুল বল্লে: আর কোনোদিন আমি খুশীকে ওসব বলবো না মা।

একটা ছেলে চিৎকার করে বলে উঠলো, "আরে! তুমি কার কি সব এ্যাডভেঞ্চার করেছো। আমি যদি তুমি হতাম!"

পল বললে, 'অ্যাডভেঞ্চার? সেগুলো কি অ্যাডভেঞ্চার? লোর ওপর আমার ঘৃণা হচ্ছিল। আমি বরাবর অ্যাডভেঞ্চার চাই—তবে ও ধরণের নয়।"

ছেলেটি বললে, "অহো! যদি সেগুলোকে বাগে আনতে পারতে লে সেগুলো চমৎকার অ্যাডভেঞ্চার হোত। তুমি সেগুলোর কাছ ক পালিয়েছিলে।"

পল অবাক হয়ে বললে, "এ্যাডভেঞ্চারগুলো বাগে আনো কি র?

সে বললে, "দেখ, গোয়ালাটার টাট্টুটা খুব ছোট। তুমি সহজেই র লাগাম ধরে টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারতে। তখন সকলেই মাকে বাহবা দিত আর বলতো, তুমি কি সাহসী ছেলে। কিন্তু ম পালিয়েছিলে। তারপর তুমি জানো, ঐ মাঠে একটা বিজ্ঞাপন ওয়া থাকলেও ওখানে ষাঁড় নেই। আমি জানি, কারণ ওটা আমার বার, তিনি একজন চাষী।

পল বললে, 'একটা ষাঁড় ছিলই। তার শিং জোড়া দেখতে পেয়েছিলাম।'

ছেলেটি বললে, "সেটা আমাদের বাড়ি গাই বাটারকাপ। গাইটা ব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে, সে অবাক হয়ে গিয়েছিল তুমি কেন ওরকম চিড়-পাচিড় করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিলে তাই দেখে। তুমি যদি কবার হেই করে তাকে তাড়া দিতে তাহলে সে লেজ তুলে পালাতো। ার তুমি মনে করতে একটা ষাঁড় তাড়িয়েছো। তাতে নিজেকে মনে রতে বীর।"

পল বিষম কণ্ঠে বললে, "কিন্তু তার বদলে আমি পালিয়ে গেলাম আর গিয়ে পড়লাম যারা চড়ুইভাতি করছিল তাদের ঘাড়ে। দলাম তাদের জলের পাত্র উল্টে।"

ছেলেটি বললে, "হ্যাঁ। ওরা ওখানে চড়ুইভাতি করছে। ওরা হচ্ছে, বিগ্‌টোনিয়ার রাজকুমার আর তার জ্ঞাতিভাই। তুমি যদি ধরাকুফী না করতে মনে হয় ওরা তোমাকে ওদের সঙ্গে খেলে বলতো, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততো। কেন তুমি বলতে পারলে না, তুমি দুঃখিত আর তৎক্ষণাৎ ওদের জল এনে দিলে না? তাহলে তো ওরা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতো।"

পল বললে, "কিন্তু আমি ধস্তাধস্তি করেছিলাম আর ওরা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল। জানতাম না ওরা কে? একজন রাজকুমারের কথা শুনেছি বটে—সে চমৎকার ক্রিকেটি, তাই নয়? তার সঙ্গে দেখা হলে আমার খুব ভাল লাগতো।"

ছেলেটি বললে, "দেখাও হয়েছিল আর সেই অ্যাডভেঞ্চার থেকেও তুমি পালিয়েছো। তুমি একখানা নৌকো নিয়েছিলে। নৌকোখানা আমার খুড়োর। তিনি তীর থেকে চিৎকার করছিলেন। আমি তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম। তিনি যে কোনদিন নৌকোখানা তোমায় দিতে পারতেন। দুজনে চড়ে মজা করে বেড়াতাম।"

পল বললে, "কিন্তু নৌকোখানা আমি উল্টে দিয়েছিলাম। প্রত্যেকে আমাকে উপহাস করছে।"

ছেলেটি বললে, "আবার পালাও! স্টীমার থেকে লাফিয়ে পড়। আমি বলছি, এ্যাডভেঞ্চারকে কি করে কাজে লাগাতে হয় তুমি জান না। যদি তাদের একেবারে মুখোমুখি হও আর তাদের কাজে লাগাতে পারো তাহলে তা থেকে অনেক কিছু আদায় করতে পারবে।" আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি। তুমি হচ্ছো বাজে ছেলে। আজ তোমার জুটেছে অনেক। তুমি তাদের সম্বন্ধে যা খুশি বলতে পারো, তুমি সেগুলোকে ঘৃণা করেছো। এঃ! কি ছেলেমানুষ তুমি!"

সামনের স্টীমার ঘাটে পল স্টীমার থেকে এক লাফে নেমে ভিজে পোষাকে বাড়ি চললো। তার ভয় হতে লাগলো, পরের অ্যাডভেঞ্চার হবে ভিজে ও ছেঁড়া পোষাকে বাড়ি ফেরবার জন্যে বাবার কাছে মার খাওয়া। স্টীমারের হুকে তার প্যান্টে মস্ত গর্ত হয়ে গেছে।
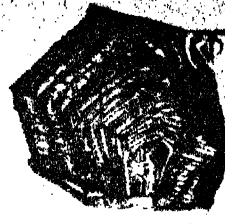
সে মনে মনে বলতে লাগলো, 'অ্যাডভেঞ্চার! যদি না পালাতাম তাহলে সেগুলো ভালই লাগতো। সেই ছেলেটা যেভাবে বললে, সেইভাবে পরে ওগুলো কাজে লাগাবো। কিন্তু—বাবা যদি আমার পরের অ্যাডভেঞ্চার হন, বুঝতে পারছি না তাঁকে কি করে কায়দায় আনবো।'

আমিও জানি না—এ ধরণের অ্যাডভেঞ্চার কেউই পছন্দ করে না, ঠিক তো? *

---

* ইংরেজ লেখিকা এনিড ব্লাইটনের রচনা থেকে।

কোথায় আলো ওরে কোথায় আলো?

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শাস্ত্রে বা পুরাণে একটা ধারণা আছে যে কেউ পাপ করলে, এজীবনে রেহাই পেলেও, মৃত্যুর পর তার ছাড়া নেই—নরকে গিয়ে তাকে নানারকম দুর্ভোগ ভুগতে হবে। আর, নরকের যে বর্ণনা দিয়ে তাতে দেওয়া আছে তার কথা শুনলে চোখে না দেখেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। কবি সুকুমার রায় খুব সংক্ষেপে তার একটু বর্ণনা দিয়েছিলেন :

> "অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড
> তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড।"

একটা নয়, দুটো নয়,—পাশাপাশি চুরাশীটা কুণ্ড, আর তারই ভেতরে মুণ্ডু ঠেসে ধরেছে যমদূতেরা। সঙ্গে হয়তো আরও অকথ্য অত্যাচার চলছে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চার-দিককার ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কিন্তু এত গেল কল্পনা,—ভয় দেখিয়ে মানুষকে পাপের হাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা। সত্যি সত্যি মৃত্যুর পরপারে নরক বলে কিছু আছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়ার উপায় নেই।

তবে পরপারে না থাকলেও এপারের কোন কোন জায়গা যে ঐ বর্ণনার সঙ্গে কিছু কিছু মেলে তাতে ভুল নেই। সত্যিকারের নরক না হলেও সেখানকার হালচাল নরকের চাইতে বেশী সুবিধের নয়। এই রকম একটি জায়গা হচ্ছে কয়লার খনি।

"হচ্ছে" না বলে "ছিল" বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। কারণ, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা-খনির চেহারাও আজ-কাল বদলে গেছে এবং যাচ্ছে। এখনও হয়তো তাকে আদর্শ বলা চলে না। কিন্তু উন্নতি যে যথেষ্ট হয়েছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু আমি যে খনির গল্প বলতে বসেছি তা এ যুগের খনি নয়,—প্রায় শ' দেড়েক বছর আগেকার কয়লা-খনি।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"টু ক্যারি কোল টু নিউ ক্যাস্‌ল্।" অর্থাৎ যেখানে যে জিনিষের অভাব নেই সেইখানে সেই জিনিষ নিয়ে যাওয়া। বাংলায় অনেকটা এর সমার্থক প্রবাদ হচ্ছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া। নিউ ক্যাস্‌ল্ হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটি কয়লা-খনি অঞ্চল, ঠিক আমাদের এদেশে যেমন রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া—অনেকটা সেই রকম আর কি! তবে নিউ ক্যাস্‌ল্-এর নাম বোধ হয় আরও বেশী। ওর আশপাশের সমস্ত জায়গাটাকেই বলা হয় "ব্ল্যাক্ ডিস্টিক্ট।"

এই ব্ল্যাক্ ডিস্ট্রিক্ট বা কালো মাটীর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি কয়লা, আর সভ্য জগতে এই কয়লার প্রয়োজনীয়তার কথা বোধ হয় না বললেও চলে। শুধু ঘরের জ্বালানী হিসেবেই নয়, আরও নানারকম কাজে—বিশেষ করে কল-কারখানা চালাবার কাজে এই কয়লার শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাচ্ছে বহুদিন থেকে। কাজেই সেই কয়লার জন্য এই কালো মাটীর দেশের ওপরই যে আগে নজর পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি? হয়েছিলও তাই। গোটা নিউ ক্যাস্‌ল্ জুড়ে এখানে ওখানে বসানো হয়েছিল খনি। কয়লা তো সাধারণতঃ মাটীর ওপরের দিকে থাকে না—থাকে অনেকটা নীচে, মাটী খুঁড়ে শত শত ফুট নীচে নেমে গেলে তবেই তার দেখা পাওয়া যায়। নিউ ক্যাস্‌ল্-এর এই খনিগুলোতেও, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়লার জন্য অনেকটা নীচে নেমে যেতে হত।

এক কথায়, পাতালপুরী বলতে যা বোঝায় এই খনিগুলোও ছিল তাই। চারদিকে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার—এককণা সূর্যের আলোর সেখানে ঢুকবার উপায় নেই। কবির ভাষায়,—যেদিকে তাকাবে কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে আরও ঘন—আরও তীব্র—আরও ভয়ঙ্কর করে রেখেছে আশপাশের কয়লার চাঁই।—কালো—কুচকুচে কালো—নিকষ কালো কয়লা।

অথচ এক ফোঁটা আলো জ্বালবার উপায় নেই। কয়লার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে জমে থাকে একরকম স্যাঁৎসেঁতে বিস্ফোরক গ্যাস—যা নাকি আগুনের একটু ছোঁয়া পেলেই বিকট শব্দ করে ফেটে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের কয়লার চাঁইকে ফাটিয়ে, ভেঙে চৌচির করে এক ভয়াবহ কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কাছাকাছি কোন লোক থাকলে তার আর রক্ষা নেই। বিজ্ঞানীরা একে বলেন মিথেন। সাধারণতঃ জলা জায়গায় (মার্শ) এই গ্যাস জন্মায় বলে এর আর এক নাম 'মার্শ গ্যাস'। কিন্তু সাধারণ লোকে ওর নাম দিয়েছে 'ফায়ার ড্যাম্প্'—স্যাঁৎসেঁতে আগুন। আগুনের সঙ্গে ওর অতিরিক্ত আঁতাতের জন্যই ঐ নাম।

এই মিথেন বা ফায়ার ড্যাম্প্‌ই ছিল কয়লা-খনির যমদূত আর এরই জন্য অন্ধকার খনি-গর্ভকে তুলনা করা হ'ত নরকের সঙ্গে। অন্ধকারে থাকা যায় না, কাজ করা তো আরও কঠিন, তাই মাঝে মাঝে আলো জ্বালবার চেষ্টা যে হ'ত না তা নয়; কিন্তু যখনই সে চেষ্টা হ'ত তখনই খেসারৎ দিতে হ'ত কিছু লোকের প্রাণ। কত লোক যে এইভাবে প্রতি বছর প্রাণ হারাত তার ঠিক নেই। শেষে, বাধ্য হয়েই, খনির ভিতর আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। উঁই পোকার মত অন্ধকারের জীব হয়েই দিন কাটাতে হবে খনি-মজুরদের।

খনি থেকে এবার খানিকক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টি একটু অন্যদিকে ফেরান যাক্।

আঠারো শতাব্দীর শেষ দিক্। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর পেনজান্স। শহর না বলে গ্রাম বললেই চলে। এখানে প্রায়ই দেখা যেত একটি ছোট্ট ছেলে আপন মনে বনে-জঙ্গলে, সমুদ্রতটে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর এটা-ওটা-সেটা যা নতুন জিনিষ পাচ্ছে বোঝাই করছে পকেটে। সব কিছুর ওপরই তার কৌতূহল, সব কিছুর রহস্যই তার জানা চাই। ছেলেটির নাম হামফ্রী ডেভি। বড়-লোকের ছেলে নয়, বাপ সামান্য একজন কাঠের কারিগর।

তখনকার দিনে, ওদেশেও সাধারণ ঘরের ছেলেদের তেমন বেশী লেখাপড়া শিখবার রেওয়াজ ছিল না। ডেভিকেও তাই অল্প কিছুদিন স্থানীয় স্কুলে পড়িয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল এক ওষুধের দোকানে—অ্যাপ্রেন্টিস্ অর্থাৎ শিক্ষানবীশের কাজে।

এখন, ঐ দোকানের মালিকের ছিল একটি সুন্দর লাইব্রেরী। বালক ডেভি ওষুধের কাজ শিখত বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পছন্দ করত লাইব্রেরীটি। নানান্ ধরণের বই ছিল ওখানে—বিশেষ করে নানান্ ধরণের বিজ্ঞানের বই। ভারী ভাল লাগত সেই বইগুলি।

বইগুলির কোন কোনটায় নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা লেখা ছিল। সুযোগ পেলেই ডেভি হাতেনাতে সেই সব পরীক্ষা করে দেখত। দু'-একবার যে তার ফলে বিপদ আপদ ঘটেনি তা নয়, কিন্তু ঐ থেকেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে গেল ছেলেটির।

এইভাবে, ধরতে গেলে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই, ডেভি একদিন বিজ্ঞানীদের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কত আর বয়স তখন তাঁর?—বড় জোর কুড়ি।

তারপর? তারপর সুরু হ'ল তাঁর আবিষ্কার। একটির পর একটি—অসংখ্য আবিষ্কার।

বিজ্ঞানী ডেভি আবিষ্কার করলেন পর পর ছ'টি নতুন ধাতু—সোডিয়াম, পটাসিয়াম্, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্, স্ট্রন্‌সিয়াম্, ক্যাল্‌সিয়াম্, বেরিয়াম্; ক্লোরিন যে আসলে একটি মৌলিক পদার্থ তাও প্রমাণ করলেন। সেই সঙ্গে উদ্ঘাটিত করলেন রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি নতুন নিয়ম বা সূত্র। বিদ্যুৎ-শক্তিকে নিয়েও অনেক কিছু করলেন। এমনকি বিদ্যুতের সাহায্যে যে আলো জ্বালানো যায় তাও প্রথম দেখালেন আর্ক্‌লাইট আবিষ্কার করে। বিলাতের বিখ্যাত রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট এই "ডিগ্রী-বিহীন" বিজ্ঞানীকে তাদের অধ্যাপকের পদে বসিয়ে দিল এবং কালক্রমে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতির পদও দেওয়া হ'ল তাঁকে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে স্বীকার করে নিলেন তাঁকে পন্ডিতেরা।

এইবার আবার সেই পুরোনো জায়গায় ফিরে আসা যাক্—খনির সেই অন্ধকার কোণে।

রেভারেন্ড হজ্‌সন্ ছিলেন নিউ ক্যাস্‌ল্ অঞ্চলের এক গীর্জার পাদ্রী। খনির মজুরদের সঙ্গে তাঁর খুবই মেলামেশা। মজুরেরা প্রায়ই তাঁকে তাদের অভিশপ্ত জীবনের কথা বলত। হজ্‌সন্ শুনতেন, শুনে কষ্ট পেতেন, কিন্তু কিছুই করবার উপায় ছিল না তাঁর।

কিন্তু সত্যিই কি কিছু করবার ছিল না? নিজের সাধ্যে না হয় নাই কুলোল, অপরের সাহায্যও কি নেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন হজ্‌সনের মনে পড়ল ডেভির কথা। হ্যাঁ, ডেভি। অঘটন ঘটাতে পারেন তিনি। তিনিই হয়তো এর একটা বিহিত করে দিতে পারবেন। হজ্‌সন্ চলে এলেন ডেভির কাছে।

ডেভি কিছুটা জানতেন, বাকিটা শুনলেন। মজুরদের দুঃখে কেঁদে উঠল তাঁর প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। কি করা যায়! যাই হোক, তখনকার মত হজ্‌সন্‌কে আশ্বাস দিয়ে তিনি গিয়ে ঢুকলেন তাঁর পরীক্ষাগারে।

চলল পরীক্ষা। খনির ভিতরকার দুর্ঘটনার কারণ সেই ফায়ার ড্যাম্প খানিকটা সংগ্রহ করে আনলেন তিনি, তার রকম সকম নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে আলো নিয়েও চলল গবেষণা। অন্য সব কাজ ফেলে ঐ হ'ল তাঁর দিনরাতের একমাত্র ভাবনা—ধ্যান-ধারণা।

অবশেষে হঠাৎ একদিন পথ দেখতে পেলেন তিনি। অতি সাধারণ একটা ব্যাপারের সাহায্য নিয়েই এর মীমাংসা হতে পারে। অথচ কত সুদূরপ্রসারী তার ফল!

তারের জাল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন ডেভি। তিনি দেখলেন, তারের একপাশে আগুন রাখলে তার শিখা জাল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি একটা সাধারণ তেলের বাতির চারদিক তারের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া যায় তা হ'লে তার আগুন জালের বাইরে আসতে পারে না, জালটাও এত বেশী গরম হবে না যে তা বাইরের কোন গ্যাসকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। আবার জালের বাইরে যদি কোন

গ্যাস থাকে আর তা যদি কোন রকমে জালের ফুটো দিয়ে ঢুকে বাতির আগুনের সংস্পর্শে এসে পড়ে তাহলেও সে গ্যাস জালের ভিতরেই পুড়বে, বাইরে এসে কোন বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না।

ডেভি তখন ঠিক ঐ ভাবে একটি লণ্ঠন তৈরী করলেন। লণ্ঠনের ভিতরে রইল তেলের প্রদীপ, তার বাইরেটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। লণ্ঠন তৈরী হলে পর তিনি এক বোতল ফায়ার ড্যাম্প এনে তার সামনে ছেড়ে দিলেন। ফায়ার ড্যাম্প জালের ছিদ্র দিয়ে লণ্ঠনের ভিতরে ঢুকল, প্রদীপের শিখায় গিয়ে লাগল, জ্বলে উঠল, কিন্তু কিছুই অঘটন ঘটল না। প্রদীপের শিখাটা ক্ষণেকের জন্য একটু তীব্র হ'ল, এই পর্যন্ত। বার বার পরীক্ষা করলেন ডেভি, প্রতিবারেই সেই এক ব্যাপার। ডেভি এই লণ্ঠনের নাম দিলেন "সেফ্‌টি ল্যাম্প" বা নিরাপদ দীপ। তারপর একদিন রেভারেণ্ড হজসনকে ডেকে তাঁর হাতে জিনিষটি সমর্পণ করলেন।

পাতালপুরীর অন্ধকার খাদের মধ্যে মজুরেরা কাজ করছিল গাঁইতি আর কোদাল নিয়ে। চোখ থেকেও অন্ধ তারা। দেয়ালে হাতবুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করছে কোথায় দেয়াল, কোথায় কয়লা। গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

হঠাৎ সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার চিরে কোত্থেকে একটা আলোর রেখা এসে পড়লো চোখে। এ কি কান্ড! খনির ভেতরে আলো! এক্ষুণি প্রলয় কান্ড ঘটবে যে! কোথায় কোন্ ফাঁকে ঢুকে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ফায়ার ড্যাম্প। এক্ষুণি প্রবল বিস্ফোরণে চৌচির করে দেবে চারদিক। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা মজুরদের দেহও টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছড়িয়ে পড়বে কে জানে!

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—"কে—কে—কে? শীগ্গির আলো নিবিয়ে ফেল। মূর্খ না উন্মাদ! জান না এখনই কি ভয়ঙ্কর কান্ড ঘটে যাবে!"

আলো কিন্তু নিবল না, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

আবার পাগলের মত চীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত শ্রমিকের দল।—"দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি, নিবিয়ে ফেল—নিবিয়ে ফেল ঐ মারাত্মক আলো।"

অন্ধকার পাতালপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল হতাশের প্রলাপের মত সেই করুণ আর্তনাদ।

কিন্তু আলো তবু নিবল না। যেমন আসছিল তেমিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে—আরও কাছে এল সেই আলো। এবারে ভয়ত্রস্ত মজুরেরা চিনতে পারল। —আরে, এ যে হজসন্!—গরীবের বন্ধু—মজুরের বন্ধু রেভারেন্ড হজসন্। মুখে তাঁর মৃদু মৃদু হাসি। তবে—তবে কি এ আলোয় কোন দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা নেই?

সত্যি তাই। বিধাতার আশীর্বাদ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছেন পাদ্রী হজসন। হাম্‌ফ্রী ডেভির ছোট্ট কিন্তু যুগান্তকারী একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সেফ্‌টি ল্যাম্প।

বন্ধুরা ডেভিকে পরামর্শ দিলেন—'এ ল্যাম্প তুমি তাড়াতাড়ি পেটেন্ট করে নাও; এ আবিষ্কারের স্বত্ব ছেড়ো না। এ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী হবে তোমার।'

ডেভি হাসলেন, কিন্তু পরামর্শ কানে তুললেন না। তিনি আবিষ্কার করেছেন গরীবের জন্য, তাদের প্রাণ বাঁচাবার বিনিময়ে অর্থ নিয়ে হাত কলুষিত করতে পারবেন না তিনি।
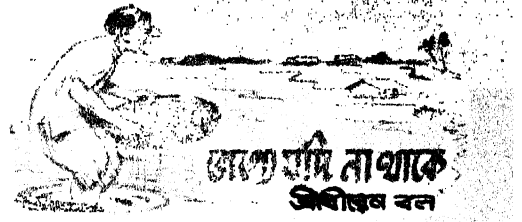
তোমরা ত কেউ চিনলে নাকো আমাকে,
মিথ্যে সবাই নাচছো ঘিরে রামাকে!
বলাও করে বলাও ত খুব কাগজে,
সত্যিকারের কাজে সবাই ভাগো যে!

দানবীর সে বিলায় নাকি কতো কি,
বিদ্যাসাগর, কিম্বা তাঁদের মতো কি!
সব কিছু সে বিলিয়ে দিলে দশেকে,
পাঁচটা ওকে, সাতটা তাকে, দশ একে!

কেউ কি কভু আমার পানে দেখেছো,
যত্ন করে আমায় মনে রেখেছো?
দানের বোঝা বইছি বসে বাড়ীতে,
চাই তো সদাই তুচ্ছ এ ধন ছাড়িতে!
হায়, কপালে একটা সুযোগ জোটে না,
ছড়াতে চাই—কেউ তো এসে লোটে না!
টাকা আমার অমনি পড়ে থাকাতে
ধরলো ছাতা হায়রে সাধের টাকাতে!

আসাম নাকি যাচ্ছে ভেসে বানে গো,
গেলাম ছুটে সেই বন্যার টানে গো!
অথৈ জলে সাধ্যি বা কার ঘেঁসে রে,
বেঁচে গেলাম, নইলে যেতাম ভেসে রে!

বাধ্য হয়েই এলাম ফিরে, যাবো কি!
আর এগোলে হাবু-ডুবুই খাবো কি?
টাকা ওদের ভাগ্যে যদি না থাকে—
বানের জলে ধুয়ে নিলাম ছাতাকে!!

অবশ্য মজুরেরাও তাদের উপকারী বন্ধুরে এ ঋণ ভুলল না। সবাই চাঁদা করে তাঁকে পুরো একসেট রুপার বাসন—ডিনার সেট উপহার দিয়েছিল তারা। কৃতজ্ঞতার এ উপহার ডেভিরও মনে হয়েছিল পরম মূল্যবান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন—ঐসব বাসনপত্র গালিয়ে যে রুপো পাওয়া যাবে তা থেকে যেন প্রতি বছর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

হয়েছেও তাই। আজও শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য রয়্যাল সোসাইটির বিখ্যাত 'ডেভি মেডেল' ঐ থেকেই দিয়ে আসা হচ্ছে প্রতি বছর, আর ওরই ভিতর দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে ডেভির সেই মৃত্যুঞ্জয়ী আবিষ্কার আর খনি-মজুরদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা।
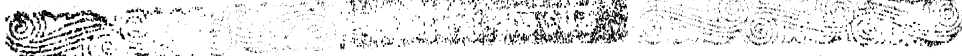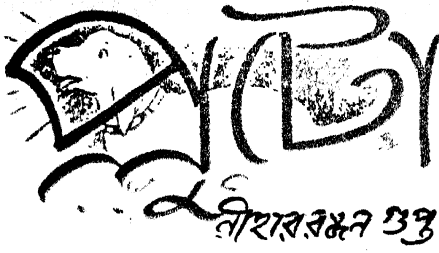
বর্ষার রাত।

অনেকক্ষণ একটানা বৃষ্টি হবার পর বৃষ্টিটা তখন যদিও ধরেছে কিন্তু একেবারে থামে নি। টিপ টিপ করে তখনো ঝরছে।

রোগী দেখে ফিরছিলাম সোদপুর থেকে গাড়িতে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড ধরে। যদিও গাড়ির সামনে উইন্ড স্ক্রীণে ওয়াইপার দুটো কাজ করছিল তবু দেখতে দেখতে আবার জলে উইন্ড স্ক্রীণটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

রাতও হয়েছে।

তাছাড়া বর্ষার রাত।

কেমন যেন দুচোখের পাতায় ঘুমের ছোঁয়া লাগে।

হঠাৎ একটা ঝাকুনী দিয়ে গাড়িটা ব্রেক কষল।

চম্‌কে উঠে শুধালাম্‌ কেয়া হুয়া ডন সিং।

কুত্তা সাব।

কুত্তা।

হ্যাঁ—দেখিয়ে না।

চেয়ে দেখি সত্যিই। গাড়ির সামনে সিলিন্ডারের সুতীব্র আলো ভিজে চক্‌চকে মেটাল বাঁধানো রাস্তার পরে বহুদূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই উজ্জ্বল আলোয় গাড়ির ভিতর থেকেই চোখে পড়ল গাড়ির একেবারে ঠিক সামনেই একটা নাদুস নুদুস ভাল জাতের কালো রংয়ের কুকুরের বাচ্চা, চার পায়ে দাঁড়িয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে উজ্জ্বল তীব্র গাড়ির আলোর দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং পাশেই অল্প দূরে রাস্তার উপরে একটা প্রাইভেট গাড়ি উল্টে আছে। গাড়িটা ডন সিংয়ের নজরে বোধ হয় পড়েনি।

আমি তাড়াতাড়ি বলি, নিশ্চয়ই এ্যাকসিডেন্ট্‌ হয়েছে— বলতে বলতে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

সত্যিই ভয়াবহ এ্যাক্‌সিডেন্ট।

গাড়িটা একেবারে উল্টে রয়েছে আর তার নীচ থেকে দেখা যাচ্ছে একটা মৃতদেহ। মাথাটা চেপ্টে গিয়েছে, রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে।

ডন সিংও গাড়ি থেকে নেমেছিল।

অমন একটা শোচনীয় এ্যাকসিডেন্ট্‌ এখনো হয়ত কারো নজরেই পড়েনি, নিকটবর্তী থানায় একটা সংবাদ দেওয়া কর্তব্য।

তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে উঠে ডন সিংকে বললাম নিকটবর্তী থানায় যেতে। থানায় গিয়ে সেখানকার O. C.কে সংবাদটা দিয়ে ফিরছি, শ্যামবাজারের মোড় পার হয়েছি হঠাৎ পায়ে গাড়ির মধ্যে কি ঠেকতে গাড়ির ভিতরের আলোটা সুইচ টিপে জ্বালালাম।

আরে একি?

সেই কুকুরের বাচ্চাটা।

গুটি-সুটি দিয়ে পায়ের কাছে বসে আছে। এটা আবার কখন গাড়িতে উঠে এলো।

ডন সিং জিজ্ঞাসা করে, কেয়া হুয়া বাবা?

সেই কুকুরের বাচ্চাটা?

কেয়া, গাড়ি মে ঘুস্‌ গিয়া?

হ্যাঁ—তাই তো দেখছি।

ডন সিং গাড়ি থামায়। এবং বাচ্চাটাকে গাড়ি থেকে বের করে দেবার জন্যই বোধ হয় নামে রাস্তায়।

বাচ্চাটা তখন ভিজে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে।

ডন সিং গাড়ির দরজা খুলতে যাবে কিন্তু আমি বাধা দিলাম, থাক—রহনে দো—চল—

ডন সিং আবার গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাড়িতে পোঁছে কুকুরের বাচ্চাটাকে নীচে ড্রয়িং রুমের সামনে প্যাসেজে রেখে দিলাম।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী টুকুনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে কুকুরের বাচ্চাটা।

ভিজে গা শুকিয়ে ঝর ঝরে হয়ে গিয়েছে।

দিব্যি গোলগাল নাদুস নুদুস বাচ্চাটা। গা ভর্তি লোম।

টুকুন বলে, বাবা দেখ কি সুন্দর বাচ্চা! কোথা থেকে এলো বাবা এটা?

কাল রাত্রে রাস্তা থেকে নিয়ে এসেচি কুড়িয়ে।

এটা কিন্তু আমার! পুষবো এটাকে—

হেসে বলি, বেশ।

কিন্তু ওর কি নাম রাখা যায় বাবা?

নাম?

হ্যাঁ।

হঠাৎ কি মনে হলো বললাম—যা কালো ওর নাম প্লুটো থাক।

প্লুটো!

হ্যাঁ।

প্লুটোর মানে কি বাবা!

যমরাজকে বলে প্লুটো।

সারাটা দিন মহানন্দে প্লুটো সারাবাড়ি একতলা দোতলা তিনতলা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সিঁড়ির নীচে যে জায়গাটা সেখানেই প্লুটোর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সরু একটা চেন দিয়ে রাত্রে শোবার আগে সিঁড়ির দরজার লোহার কড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো।

কিন্তু মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল প্লুটোর চেঁচানীতে।

ঠিক চেঁচান নয় যেন কাঁদছে প্লুটো করুণ সুরে কুঁই কুঁই করে।

তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে এলাম। সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেলাম।

কুঁই কুঁই করে কাঁদছে প্লুটো।

সিঁড়ির নীচে অন্ধকার।

সুইচ টিপে সিঁড়ির আলোটা জ্বালাতে যাবো হঠাৎ কানে এলো একটা যেন মৃদু অথচ স্পষ্ট কন্ঠস্বর।

ডোন্ট্‌ ক্রাই রাজা। ডোন্ট ক্রাই—

সুইচের 'পরেই হাতটা রয়ে গেল' আলো আর জ্বালান হলো না। নিজের অজ্ঞাতেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছি।

প্লুটোর কান্না আর তখন শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কতক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই, সম্বিৎ ফিরে আসতে সুইচ টিপে আলো জেবলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

দেখি সামনে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে প্লুটো চুপটি করে বসে আছে। আমার দিকে সে তাকাল একবার তারপর আপন মনে নিজের পা চাটতে লাগল।

প্লুটো, বলে ডাকলাম, কিন্তু ফিরেও তাকাল না।

হঠাৎ কি মনে হলো, ডাকলাম, রাজা।

সঙ্গে সঙ্গে তাকাল কান খাড়া করে আমার মুখের দিকে কুকুরটা।

ছোটদের পাততাড়ি
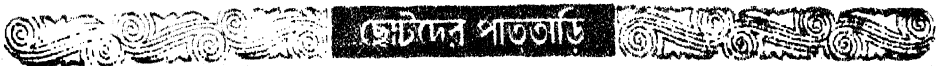
ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে এলাম।

পরের দিন রাত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

প্লুটোর কুঁই কুঁই কান্নায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

স্তব্ধ রাত্রে প্লুটোর কান্না যেন মনে হয় কোন মানুষের অসহায় এক শিশুর কান্না।

ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এসেছিলাম।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামছি শুনতে পেলাম গত রাতের সেই কণ্ঠস্বর, ডোন্ট ক্রাই রাজা, ডোন্ট ক্রাই।

আশ্চর্য

সঙ্গে সঙ্গে প্লুটোর কান্না থেমে গেল।

অন্ধকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মাকে খুঁজে না পেয়ে যেন একটা বাচ্চা কাঁদছিল মার গলার সাড়া পেয়েই চুপ করে গেল।

আলো আর জ্বালালাম না।

পায়ে পায়ে ফিরে এলাম।

তারপরের রাত্রেও ঘটলো ঠিক সেই ঘটনা।

এবং পরের দিন সকালে স্ত্রীকে সব কথা বললাম।

স্ত্রী শুনে বললো, ও কুকুর তুমি বিদায় করো—

কেন বলত ?

না, না—দরকার নেই ও কুকুর বাড়িতে রেখে।

আমি তাকে যত বোঝাবার চেষ্টা করি, তার সেই একই কথা, বিদায় করো—

কি ব্যাপার বলতো, ভূতের ভয় নাকি ?

ভূতের ভয় হবে কেন ?

তবে ?

চেহারা দেখলেই তো বোঝা যায়। একটা ভূতের বাচ্চার মত। একটা অমঙ্গল। বুঝলাম যুক্তি দিয়ে বোঝান যাবে না মহিলাটিকে কিছুতেই। এবং প্লুটোকে বিদায় করতেই হবে। কিন্তু কখন কিভাবে বিদায় করা যায়। সর্বক্ষণ টুকুনের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে প্লুটো। টুকুন কিছুতেই বিদায় করতে দেবে না।

এবং টুকুনকে বলতে ঠিক তাই হলো। কেঁদে কেটে সে একশা করলো।

ফলে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতি রাত্রে চলতে লাগল।

শেষটায় সত্যি বলতে কি আমি যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

দিনের বেলায় দিব্যি খেলে বেড়ায়—মায়া হয় কিন্তু রাত্রে মনে হয় আপদকে বিদায় করতে পারলে যেন বাঁচি।

রাত্রিটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত ক্রমশঃ হয়ে উঠলো।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি, প্লুটোই সমস্ত মীমাংসা করে নিয়েছে। কখন এক ফাঁকে বের হয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, গাড়ির তলায় চাপা পড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। মনটা যে বিষণ্ণ হয়নি তা নয়, কিন্তু রাত্রির কথা ভেবে একটু যেন নিশ্চিন্তই বোধ করি।

যাক—আজ রাত্রে আর সেই বিশ্রী ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

কিন্তু সে রাত্রেও ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

সেই কুঁই কুঁই কান্না।

ভুলেই গিয়েছিলাম যে প্লুটো গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।

রোজকার মত উঠে ঘরের দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে এগুতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। একটা কালো কুকুরের বাচ্চা সামনের বারান্দায় কুঁই কুঁই করে কাঁদছে আর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই দিকে চেয়ে। হঠাৎ কানে এলো সেই কণ্ঠস্বর, রাজা, ডোন্ট ক্রাই। রাজা—

দাঁড়িয়েইছিলাম বোধ হয়—পাশে কখন স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। তার গলা শুনে ফিরে তাকালাম, ঘরে চল।

কোন প্রশ্ন না করে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

ন্যায়-অন্যায়

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

কলকাতার একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। খবরের কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। অনেক আবেদনপত্র আসে। তাদের ভিতর থেকে একজনকে বৃত্তিধারী হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

ঘটনাক্রমে সেই নির্বাচকমণ্ডলীর আমি অন্যতম সদস্য। আর সেই সূত্রেই ঘটনাটি আমার গোচরে আসে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে বসেই প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা করছিলাম। একটা ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আবেদনে চোখ তুলে তাকালাম। সুইং-ডোরের ফাঁকে একখানি বিষণ্ণ কিশোর মুখ।

—ভিতরে আসতে পারি ?

কাজের বিঘ্ন ঘটায় বিরক্ত হলাম। তা ছাড়া আবেদনকারীদের সঙ্গে বিনা আহ্বানে এ ধরণের সাক্ষাৎকার নিয়মবিরুদ্ধ। বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, কি চাই ?

এবার সুইং-ডোরের ফাঁকে দেখা দিল একটি নারী মূর্তি দুঃস্থ বিধবা। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলল, আমার দুটি কথা আপনাকে বলতে চাই বাবা।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, ভিতরে আসুন।

অতি সন্তর্পণে দুজনে ভিতরে ঢুকল। আমার টেবিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না।

ছেলেটিকে ভাল করে দেখলাম। দেখেই কেমন যেন মায়া হল। সূর্যের আলোর স্পর্শ না পাওয়া অংকুরের সারা দেহে করুণ নৈরাশ্যের যে অসহায়তা জড়িয়ে থাকে ছেলেটির আপাদমস্তক ঠিক তেমনি অসহায়তায় যেন জড়ানো। খালি পা। পরনে সস্তা দামের হাফ সার্ট ও প্যান্ট। দুটি বড় বড় চোখ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

বিধবার দিকে চেয়ে বললাম, বলুন।

সব শুনলাম। মায়া বাড়ল। ছেলেটি বিধবার একমাত্র সন্তান। একটি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। বিধবাও সেখানেই রান্নার কাজ করে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়েছে। এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে প্রথম বিভাগে। অতএব অনাথ আশ্রমে আর তার স্থান হবে না।

কথা শেষ করে বিধবা বলল, গোপালের থাকা-খাওয়া ও কলেজে পড়ার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে বাবা।

ছেলেটির নাম গোপাল। এ নামের কোন আবেদনকারীর আবেদনপত্র আমার ফাইলে আছে কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। স্মরণ হল না। ফাইল খুলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী-তালিকা খুঁজলাম। পেলাম না।

সাতদিনের মধ্যেই ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে উঠে গেলাম।

বিজ্ঞানের একজন ছাত্র আমি তাই আজো ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি।
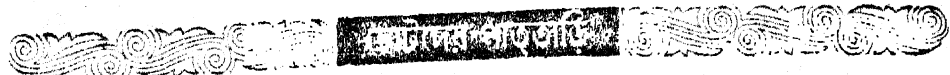
বললাম, কিন্তু আপনার ছেলের আবেদনপত্র তো ফাইলে নেই।

এবার কথা বলল গোপাল। অত্যন্ত আগ্রহের সংগে হাফ শার্টের পকেটে হাত পুরে বলে উঠল, আবেদনপত্র আমি সঙ্গে করেই এনেছি স্যার।

—সে কি? আবেদনপত্র তুমি আগে পাঠাওনি?

—আজ্ঞে না। আমি তো জানতাম না যে—

বাধা দিয়ে বললাম, তবে তো আর আমার কিছুই করবার নেই। এখন তো নতুন আবেদনপত্র আমি নিতে পারব না। সাতদিন হল আবেদন করবার শেষ তারিখ চলে গেছে।

বিধবা এবার এগিয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। ভেজা গলায় বলল, ব্যবস্থা একটা আপনাকে করে দিতেই হবে বাবা।

শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম ছিঃ ছিঃ এ আপনি কি করছেন? অবুঝ হবেন না। উঠে দাঁড়ান।

বিধবা উঠে দাঁড়াল। তার দুই চোখ জলে ভরা।

মনটা নরম হল। নিরমনিষ্ঠায় ফাটল ধরল। ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, কই দেখি তোমার আবেদনপত্র।

আবেদনপত্রখানি এগিয়ে দিল গোপাল। মনে হল, ওর হাতখানা কাঁপছে।

সুন্দর হস্তাক্ষর ছেলেটির। মুক্তাফলসদৃশ। আদ্যোপান্ত পড়ে পাতা ওলটালাম। মার্ক-শিটটা সংগেই রয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র। দুটি বিষয়ে শতকরা আশীর উপরে নম্বর পেয়েছে। কিন্তু এ কি! মার্ক-শিটটা চার টুকরো করে ছিঁড়ে তারপর আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া কেন?

প্রশ্ন করলাম। গোপাল কোন জবাব দিল না। উৎসুক যে দুটি চোখ মেলে এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল সে চোখ দুটি এবার নীরবে নামিয়ে নিল।

জবাব দিল ওর মা। একটি করুণ কাহিনী।

কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠস্থ প্রায় প্রত্যেকটি কলেজের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে মা ও ছেলে গোপালের ভর্তি ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু নিঃসহায় নিঃসম্বল গোপালের কোথাও ঠাঁই হয়নি। কলেজের মাইনে মাপের আশ্বাস যদি বা মেলে, থাকা-খাওয়ার কোন সুরাহাই হয় না। প্রতিদিন প্রভাতের আশা প্রতিদিন সন্ধ্যায় অস্তমিত হয়েছে। সে নীরবে চোখের জল ফেলে পরদিন প্রভাতে আবার নতুন প্রত্যাশায় পা বাড়িয়েছে নতুন কলেজের সন্ধানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারল না এই ব্যর্থ সন্ধান। একদিন রাতের অন্ধকারে মায়ের অজ্ঞাতে ছুটে গেল গঙ্গার ঘাটে। পকেট থেকে বের করল অনেক যত্নে ভাঁজ করা মার্ক-শিটটা। জীবন-সমুদ্র পারাপারের তার একমাত্র কড়ি। মনের অসহায় আবেগে এক সময় চার টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল মার্ক-শিটটা। হু-হু করে কেঁদে উঠল। হয়তো সব আবেগের অবসান করতে গঙ্গার জলেই সে ঝাঁপ দিত। কিন্তু ঠিক সময়ে তাকে বাঁচালেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাটের এক কোণে বসে জপ করছিলেন তিনি। হন-হন্ করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল গোপাল। ব্রাহ্মণের উপস্থিতি খেয়ালই করেনি।

চোখ মুছতে মুছতে বিধবা বলল, সেই বামুন বাবার ছোট ছেলেও কলেজে পড়ে। তার কাছে খবর পেয়েই আপনার কাছে এসেছি। আমার গোপালের একটা ব্যবস্থা আপনি করে দিন বাবা। নইলে গোপাল আমার আত্মঘাতী হবে।

চমকে উঠলাম বিধবার শেষের কথায়। আত্মঘাতী হবে! তাকালাম গোপালের দিকে। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

কিন্তু পাথরের মূর্তি কি কাঁপে!

আমার বুকের ভিতরটাও কি কাঁপছে!

পকেটে টাকা ছিল। বিধবাকে কিছু টাকা দিয়ে বললাম, কালই গোপালকে কলেজে ভর্তি করে দিয়ে অধ্যক্ষ মশায়ের একটা সার্টিফিকেট এনে আমাকে দিয়ে যাবেন। কোন ভয় নেই আপনার। গোপালের পড়া হবে।

গোপালের মুখে হাসি। বিবর্ণ অংকুরের মুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

ওরা চলে গেল।

গোপালের আবেদনপত্রের তারিখটা কেটে 'ব্যাক-ডেট' করে দিলাম। অন্যায় করলাম কি?

দেয়ালের গায়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকের একখানি তৈলচিত্র আছে। সেদিকে চোখ পড়ল।

মনে হল, চিত্রের মুখখানি গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে।

কঙ্কাল-রহস্য

শ্রীমতী পুষ্প বসু

বদলীর চাকরী মোটেই ভাল নয়; আজ এখানে কাল সেখানে—কোন বাড়ীটা হয়ত মনের মত হল, কোন জায়গার বাড়ীটা আবার একদম বিশ্রী। তারপর বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বসা গেল, বাগান করা হ'ল, শাক-সব্জী, ফল-ফুল লাগান হল—বাগান বেশ ফলে-ফুলে ভরে উঠল, এমন সময় আবার এল বদলীর খবর! শুধু কি তাই, সবচেয়ে খারাপ লাগত স্কুল ছাড়তে, কত সব বন্ধু-বান্ধব, সকলকে ছেড়ে আবার এক নতুন জায়গা!

যাইহোক, এবারে বাবা যেখানে বদলী হলেন, জায়গাটাও ভাল, আর বাড়ীটাও চমৎকার। একেবারে নতুন বাড়ী—এর আগে কেউ আসেনি। হলদে রঙের বাড়ী, সবুজ জানলা দরজা, আর বাড়ীর সামনে-পেছনে বাগান। মা বললেন, বাড়ীটার সবচেয়ে গুণ হচ্ছে—চারিদিক খোলা-মেলা আর সাজান-গোছানো। নতুন বাড়ীতে গিয়েই তার পর-দিন থেকেই মালীকে দিয়ে বাগান করান আরম্ভ হল। দু'দিনের মধ্যেই মা যেখানকার যা রেখে-ঢেকে বেশ গুছিয়ে ফেল্লেন।

কিন্তু একটা ভারী মুস্কিল হল, কলঘরে অর্থাৎ যাকে বাথরুম বলে, সেই বাথরুমে যাওয়া নিয়ে। ছোট-বড় যে কেউই যাক্ না কেন, কেউই রেহাই পাচ্ছে না—ব্যাপারটা এবার খুলে বলছি—আসল বাথরুমে যে-কেউই ঢুকছে, সেই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে! প্রথমটা তার গা ছমছম ক'রে গায়ে কাঁটা দেয়, তারপর শরীর ঝিমঝিম্ করে দুর্বল বোধ করে কয়েক মিনিটের জন্যে! কিন্তু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেই আবার সব ঠিক যেমনকার তেমন!

প্রথম দু-একদিন কেউ অত গা করেনি; কিন্তু পরের পর সকলের মুখেই ঐ এক কথা; 'বাবা বাথরুমে যেতে হলেই এক বিশ্রী ভয়!' বাবাও ভুক্তভোগী, একদিন তিনি নিজেই বললেন, "আজ আমি সরাসরি বাড়ীর মালিককে বলেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই এর একটা ব্যবস্থা করবেন।"

কয়েক দিনের মধ্যেই বাথরুমের মেঝেটা সব গভীর করে খুঁড়ে ফেলা হল এবং তার ভেতর থেকে পাওয়া গেল একটা কংকাল। বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে একটা গভীর খড্ডের মধ্যে কংকালটা ফেলে দিয়ে আসা হল। তারপর আবার নূতন করে ভাল মেঝে তৈরী হল।

সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন মেঝে তৈরী হবার পর আর কোনরকম বিপত্তি দেখা গেল না। সকলেই যেন বেশ নিশ্চিন্ত

ভাবছ বসে খেল্না-বুড়ো খেল্না গড়ে
শিশুর দলে পেঁাছে দেবে কেমন ক'রে।
পক্ষীরাজের পিঠে চেপে মোহন বেশে
রাজপুত্তুর হঠাৎ এসে বল্লে হেসে:
'রঙবেরঙের খেল্নোগুলো আমিই নেব
শিশুর দলে দেদার আমি ছড়িয়ে দেব।'

হাওয়া পাগল পক্ষীরাজের চলার বেগে,
কাশের বনে আনন্দ ঢেউ উঠল জেগে।
ভরল আকাশ খেল্না-বিলির মিষ্টি গানে,
খেলনা পেল সব শিশু আজ যে যেখানে।
খেল্না-পাওয়া শিশুদের ঐ হাসির সাথে
খেল্না-বুড়োর হাসি যে চায় রং মেশাতে।

ুল। বাথরুমে সবাই সহজে আসছে-যাচ্ছে—কারও কোনরকম ভয়-ডর
নই। তাহলে ঐ কঙ্কালটাই যত গোলমাল বাধিয়েছিল। কিন্তু
নশ্চিন্ত হয়ে মাত্র একদিন কাটল, ঠিক তারপর দিনই রাত্রিবেলা—এক
মহা গণ্ডগোল সুরু হয়ে গেল। সেই ভয়াবহ ব্যাপারটাই বলি এখন:

পরের দিন রাত বারোটার পর বসবার ঘরে সে কি ভীষণ
ৎপাত! সকলের ঘুম ভেঙে গেল নানারকম আওয়াজের চোটে।
য়িংরুমে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অদ্ভুত সব শব্দ করছে।
কলে ত ভয়ে একেবারে কাঠ; কেউ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না।
ুখে যে যত সাহস দেখাক না কেন, সকলেই বেশ ভয় পেয়ে গেল।
ার সেই ফেলে দিয়ে আসা কঙ্কালটারই যে এইসব কাণ্ড এবং রেগে
ায়ে সেই যে এইসব উৎপাত করছে তাতে আর কারুর সন্দেহ রইল
া। দুদিন উপর্যুপরি ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটল।

তিন দিনের দিন বাবা মা ঠিক করলেন, যে ঘরে ঐ শব্দ উৎপাত
চ্ছে, সেই ঘরে ও'রা আলো না জেবলে টর্চ নিয়ে বসে থাকবেন এবং
চক্ষেই দেখবেন ব্যাপারটা কি। আমরা ত অন্য ঘরের বিছানায়
ীবস্মৃত অবস্থায় জেগে বসে রইলুম কি হয় দেখবার জন্যে।

বেশ খানিকটা রাত হয়েছে, আমরা জেগে বিছানায় মধ্যেই অধীর
তীক্ষায় আছি। এমন সময় রোজকার মত—সেই বিশ্রী শব্দ আর
ুটোপাটি আরম্ভ হ'ল। আমরা ত উত্তেজনায় বিছানা থেকে উঠে
ড়লুম। একটু পরেই শুনতে পেলুম বাবার চীৎকার মার মার,
াঠি নিয়ে আয়, আলোগুলো জেবলে দে!।

কি সর্বনাশ! কঙ্কালটাকে লাঠি পেটা করবে নাকি বাবা!
ারপরেই সব ঘরে আলো জবলে উঠল, দৌড়াদৌড়ি মারধোর, ঠকাঠক
াঠির শব্দ, তারপরেই শোনা গেল, ম্যাঁও করে এক বেড়ালের ডাক!

বাবা হাসতে হাসতে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। তারপর
ামাদের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ দেখি, তোমরা না দেখেই কত কি
বে নিয়ে ভয় পাও। জান কি হয়েছে? বসবার ঘরে কোণের দিকে
প্যাকিং কেসটা আছে দাঁড় করান, তারই মধ্যে বেড়ালে তিনটে বাচ্চা
য়েছে। বাচ্চাগুলো তার মধ্যে ঢুকে হুটোপাটি করছে বলে অমন

সত্যি বলছি দাদা—
বড়ো সাধ হয় বেরুই দিগ্বিজয়ে
অশ্ব না থাক ভাঙ্গা সাইকেল লয়ে
বৃষ্টি এসেই সব মাটি হয়ে
আরে রাম-রাম রাস্তায় কী যে কাদা।

বিশ্বাস করো দাদা—
গরমের দিনে প্রাণ করে আইঢাই—
হিমালয় বুকে তখুনি ছুটতে চাই;
এভারেস্ট চেপে তেন্জিং হয়ে যাই
ঘামাচি ও ঘাম—এ দুটোই হয় বাধা।

মিথ্যে বলিনি দাদা—
শীত এলে ভাবি, এইবার যাওয়া যাক
সাহারা গোবিতে দিয়ে আসি তিন পাক
বিষম ঠাণ্ডা করে দেয় নির্বাক
লেপের তলায় পড়ে থাকি হয়ে হাঁদা।

কথাটাই শোনো দাদা:
বসন্ত এসে সুড়সুড়ি দিলে গায়
রকেটের মত প্রাণটা ছুটতে চায়
ভাবি কী উপায়ে চাঁদটাতে যাওয়া যায়—
ঝঞ্ঝাট বাধে নিয়ে শুধু বাঁধা-ছাঁদা।

কী আর করব দাদা?
মনে আশা ছিল হরেক রকম-
বরাতের দোষে সকলি জখম—
তাই বসে খেয়ে লুচি চমচম—
সুর সাধি: মামা—গাধা।।

বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে,—এই দেখ বাচ্চাগুলো, ওদের মা ভয়ে
পালিয়েছে বলে, বাবা বাচ্চাগুলোকে আমাদের দেখালেন।

যাক বাঁচা গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সে রাত্রে সকলে
ঘুমোলুম।

সকালে উঠে বাবা মাকে বললেন, 'কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য
করেছ? ঐ বাথরুমের তলা খুঁড়ে যে কঙ্কালটা পাওয়া গিয়েছিল,
সেটাও বেড়ালের।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'হয়ত এদেরই পূর্বপুরুষের হবে!'
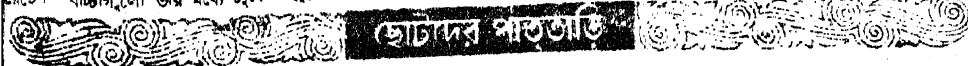
আজ তোমাদের শোনাতে বসেছি সেকালের এক বিচিত্র ভোজের কাহিনী। এ ভোজের যিনি উদ্যোক্তা তিনি বিদায় নিয়েছেন এ পৃথিবী হতে বহু দিন, আর যাঁরা তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ আজও এ পৃথিবীতে বিচরণ করছেন কিনা তা জানা নাই। অনেকদিন আগে এক বৃষ্টির সন্ধ্যায় এ কাহিনী শুনিয়েছিলেন আমার জ্যাঠামশায় ঁক্ষিতীশচন্দ্র চাকী। মেঘে ঢাকা বর্ষার নিকষ কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার শিশু মন সেদিন শুধু এই কথাটাই ভেবেছিল যে লোক এই ভোজের আয়োজন করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আরব্য উপন্যাসের সেই আলাদিন যাঁর হাতে আছে আশ্চর্য প্রদীপ। প্রদীপ জ্বালালেই এসে হাজির হয় এক বিরাট দৈত্য আর হুকুম করবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে রাশি-রাশি খাবার পৃথিবীর নানা স্থান হতে। বড় হয়ে যখন তাঁর জীবনী পড়েছি তখন জেনেছি কি অদ্ভুত কর্মা পুরুষ তিনি ছিলেন।

তখন ইংরাজ আমল। বৃটিশ সিংহ অমিত পরাক্রমে থাবা গেড়ে বসে আছে ভারতের বুকে। সবে আরম্ভ হয়েছে সমবায় আন্দোলন। সমবায়ের মাধ্যমে দেশবাসীর ছিটে-ফোঁটা মঙ্গল সাধন করবার সদিচ্ছা ইংরাজদের হয়েছিল। তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা দেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে উঠেছে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আর বহু গ্রামে গড়ে উঠেছে সমবায় ঋণদান সমিতি।

সমবায় আন্দোলনের সেই প্রারম্ভিক যুগে সেবার কলকাতায় হচ্ছে সমবায় সম্মেলন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সহর আর গ্রাম হতে এসেছেন প্রায় তিনশ প্রতিনিধি। উকিল, ডাক্তার, জমিদার, পণ্ডিত আর শিক্ষিত সঙ্গতিপন্ন জোতদার প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিরা এসেছেন সে সম্মেলনে। দার্জিলিং হতে খুলনা আর চট্টগ্রাম হতে মেদিনীপুর বাংলায় উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব অঞ্চল হতে তাঁরা এসেছেন। সারা বাংলার এক ক্ষুদ্র সংস্করণ সেদিনের সম্মেলনে।

অধিবেশনের শেষদিনে সভাপতিত্ব করছেন সেদিনের স্বনামধন্য শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেও যে সব বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিরাট কর্মশক্তি আর প্রতিভার। তাঁর জীবনী তোমাদের পড়া উচিত। অধিবেশন বিকাল সাড়ে চারটায়। তারপর রাত্রের ট্রেণে প্রতিনিধিরা রওনা হবেন যে যাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে।

যথারীতি সম্বর্ধনার পর সভাপতির আসনে বসলেন স্যার আর এন। সে যুগে এই সংক্ষিপ্ত নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সমবায় বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন তিনি। দশ পনের মিনিট পর আলোচনার এক সংক্ষিপ্ত বিরতি মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন স্যার আর এন। 'আজকের অধিবেশনের শেষে আমার বাড়ীতে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি'। জোড় হাত করে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানান স্যার আর এন এবং সভার অনুমতি নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন, আবার ফিরে এলেন মাত্র পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে, বিস্মিত হয়ে ওঠেন প্রতিনিধিগণ। পূর্বে কোনও ব্যবস্থা করা নাই; হঠাৎ এতগুলো লোককে আমন্ত্রণ করে বসলেন স্যার আর এন? সভার কাজ চলতে থাকে।

বেলা প্রায় একটা। সভার স্বল্পকালীন বিরতি পূর্ব মুহূর্তে দ্বারদেশে দেখা যায় চারজন সুবেশধারী ভদ্রলোক আর তাঁদের পিছনে চারজন বেয়ারা হাতে তাদের ঝকঝকে কার্ড ভর্তি ট্রে। সভাপতির অনুমতি নিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেন। উঠে দাঁড়ালেন স্যার আর এন 'আপনাদের প্রত্যেকের নাম আমি জানি না। এ জন্য আমি দুঃখিত। অনুগ্রহ করে আমার প্রতিনিধিদের নাম বলুন, তাঁরা আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্র দেবেন।' প্রত্যেককে নমস্কার করে নাম জিজ্ঞাসা করে সেই নাম কার্ডে লিখে প্রত্যেকের হাতে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে যান প্রতিনিধিগণ। মাত্র চার-পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ করে চলে যান তাঁরা। আর বিস্ময়ের পর বিস্ময় দানা বাঁধতে থাকে সবার মনে।

বিরতির পর সভার কাজ আরম্ভ হতে সকলের অনুমতি নিয়ে সভাপতির ভাষণটা আগেই দিয়ে দেন স্যার রাজেন। তারপর তিনি বিদায় নেন।

'বিকাল সাড়ে চারটায় আপনাদের গাড়ী প্রস্তুত থাকবে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। আবার ঐ গাড়ী আপনাদের পৌঁছে দেবে আপনাদের গন্তব্য স্থানে। এবার আমায় বিদায় দিন। একটু আগেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। সানন্দে অনুমতি দেন সবাই। গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে বিস্ময়। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে কি বিরাট বিস্ময় সঞ্চিত আছে তাঁদের জন্য।

এরপর সভার কাজ আর বেশী এগোতে পারে না। আসন্ন ভোজের আনন্দে অনেকের রসনা সরস হয়ে উঠেছে। অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষের দ্বারে দেখা দেন সেই চারজন প্রতিভূ কিছুক্ষণ আগে যাঁরা আমন্ত্রণ লিপি দিয়ে গিয়েছেন। এবার তাঁরা এসেছেন নিমন্ত্রিতদের নিয়ে যেতে। রাস্তায় সারবন্দী ষাট-সত্তরখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে, সবাই উঠে পড়েন তাতে। একে-একে গাড়ী এসে দাঁড়ায় স্যার আর এন-এর বিরাট প্রাসাদের প্রশস্ত গাড়ীবারান্দার নীচে। বাড়ীর একজন ছেলে সবাইকে অভ্যর্থনা জানান।

হঠাৎ চমকে উঠে হাঁটুর কাপড় তুলে ধরেন কেউ-কেউ। সাপ নাকি, পুরু পাপোষে পা ফেলতে সেটা বেশ একটু ফেঁপে উঠে জুতোর ধুলো মুছে দেয়। পায়ে সুড়সুড়ি লাগায় চমক জাগে অনেকের মনে। সুরুতেই এই? না জানি এ আজব পুরীর মাঝখানে আরও কত কি আছে। বিচিত্র জুতো পরিষ্কারের পালা শেষ হতেই গৃহদ্বারে স্বয়ং স্যার আর এন অভ্যর্থনা জানান সবাইকে। প্রশস্ত উদ্যান প্রাঙ্গণে অসংখ্য চেয়ার পাতা, সেখানে বসেন সবাইকে নিয়ে। একটু পর সবাইকে নিয়ে রওনা হন ডাইনিং হল অভিমুখে, যাঁরা নিরামিষাশী তাঁদের নিয়ে যান অন্য একটি ঘরে বাড়ীর একজন ছেলে।

বিস্ময়টা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল এই ডাইনিং হলে। প্রশস্ত হল ঘর, প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। বিস্তীর্ণ টেবিলের দুপাশে চেয়ার পাতা আর রাশীকৃত খাবার থরে থরে সাজান টেবিলের উপর। রকমারী চপ, কাটলেট, ফ্রাই, প্যাটিশ, পুডিং হতে আরম্ভ করে নানা প্রকার সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, কচুরীর পাহাড় জমে আছে দৃষ্টি মাত্রেই পেট ভরে যায়, খাওয়ার দরকার আর হয় না, চেয়ারে বসে অনেকের চক্ষুস্থির। সামনে একখানা ঝকঝকে প্লেট তাতে কিছু নাই, একেবারে শূন্য পাত্র। তাহলে ভোজটা কি চোখ দিয়ে সারা হবে মুখ দিয়ে নয়? ব্যাপার যাঁরা বুঝেছেন তাঁরাও হাত বাড়াতে পারেন না খাবারের ছোটখাটো পাহাড়গুলোর দিকে পাশের সঙ্গীদের মুখে চেহারা দেখে। ব্যাপারটা বুঝতে পারেন স্যার আর এন, নিজে হাতে খাবার তুলে দেন কয়েকজনের প্লেটে, 'এবার আরম্ভ করুন, যাঁর যা খুশী তুলে নিন। অনুরোধ জানান তিনি। এরপর সুরু হয় ভোজ ধীরে ধীরে সঙ্কোচ কেটে যায় সকলের, আর প্রত্যেকের পিছনে এসে অনুরোধ জানান স্যার আর এন। দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে খাবারে
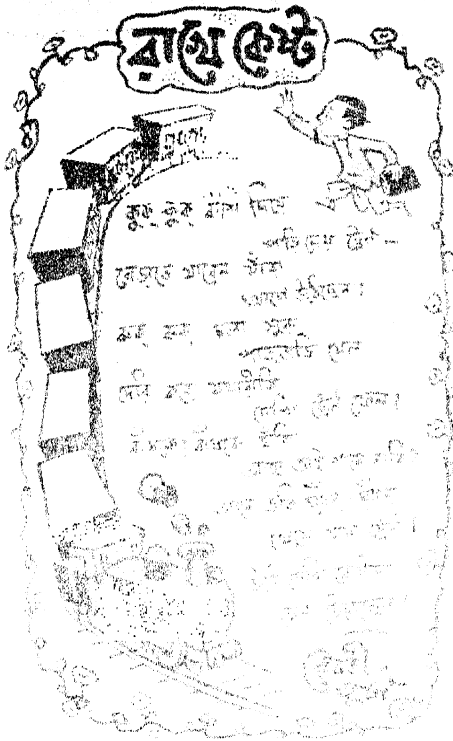
পাহাড়গুলো ! পূর্ববঙ্গের লোকেরা চিরদিন খাওয়ার জন্য বিখ্যাত। এমন সময় কানে ভেসে আসে গাড়ী চলার মৃদু আওয়াজ। সবাই তাকান এদিক-ওদিক। ও হরি! এযে অবাক কান্ড। টেবিলের মাঝখানে সরু লাইন পাতা আর তারি উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে ইঞ্জিন, পিছনে তার খোলা মালগাড়ী। গাড়ী ভর্তি খাবার। এ যেন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে ট্রেণ ভর্তি করে রাশি রাশি খাদ্য পাঠাচ্ছেন খাদ্যমন্ত্রী। দ্রুত ক্ষীয়মাণ সন্দেশের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে যাঁরা একটু দমে গিয়েছিল আবার তাঁরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। খাবার আসবার বিরাম নাই। অতএব ভোজটা যে কেমন হল তা বলার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁরা নিরামিষাশী তাঁদের আয়োজনও বিরাট। ছানা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে নানা রকম সন্দেশ আর লুচি তরকারী। পুরু কার্পেটের আসন পেতে শ্বেত পাথরের থালায় পরিবেশন করা হয়েছে সে সব। ভোজের শেষে সবাইকে নিয়ে আবার বাগানে এসে বসেন স্যার আর এন। সিগার বক্স নিয়ে সবার সামনে এসে দাঁড়ায় সুসজ্জিত বেয়ারার দল। নানা প্রকার সিগারেট সাজান আছে সিগার বাক্সে। যিনি যে ব্রেন্ড পছন্দ করেন তুলে নেবেন। অনেকেই তাঁদের প্রিয় বিড়ির সন্ধান পান না সে বাক্সে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। এবার প্রত্যেককে বিদায় সম্ভাষণ জানান স্যার আর এন, আবার রওনা হয় গাড়ীর বহর প্রত্যেককে আপন আপন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য।

একটা সামান্য ভোজের আয়োজন করতে লেগে যায় এক সপ্তাহ। আর এই বিরাট এবং বিচিত্র আয়োজন করেছিলেন স্যার আর এন মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। অদ্ভুত কর্মা পুরুষের প্রতিটি কর্মে তাঁর বিরাটত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখা ও ছবি — শৈল চক্রবর্তী
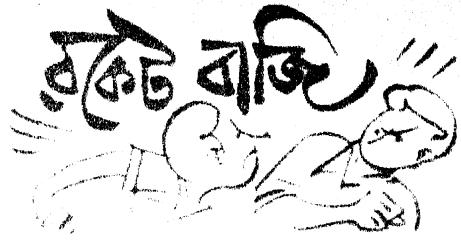
শোন জগা বলে রাখি বসে এই রকেতে
একদিন চলে যাবো চড়ে এক রকেটে
চাঁদেতেও যেতে পারি যেতে পারি শূন্যে
শুনে কেঁপে উঠবে ভয়ে তোর বুক রে।

হা-হা ফ্যালা হাসালি খাসা গুল মারলি
জানি নাকি কত বীর খাস সাগু বার্লি?
হাটিতেই টাল খাস পড়ে যাস খানাতে
সাইকেলে চাপা দিয়ে গিয়েছিলি থানাতে।

সাবধান জগা, তুই হ'তে শেখ সভ্য
তা না হলে থাপ্পড় হবে তোর লভ্য।
শূন্যের কি জানিস কি জানিস রকেটের
ড্যাজ ড্যাজ বকছিস শেখা তোর বাকী ঢের।

কি জানিস তুই, বল গাগারিন কোথাকার?
নাক নেড়ে তর্জ, আয় দেখি জোর কার।
দেব ছুঁড়ে শূন্যে ঝুলিয়ে পড়বি
চাঁদেতে পৌঁছে সেথা হাতাহাতি লড়বি।

এত্ত আস্পর্ধা, দেব এক রামচড়!
থেমে যাবে বক-বক যত বাজে তড়বড়।
জানা আছে একবার ল্যাং মেরে কুপোকাৎ
করেছিনু সাতদিন পড়েছিলি চিৎপাৎ।

[মামার প্রবেশ]

আহা হা-হা একি করো রকে বসে ঝগড়া
খুলেছ ত দেখছি কুস্তীর আখড়া।
কার কত শক্তি সখ যদি দেখবার
গ্লাভস পরে দুজনে নেমে পড় একবার।
এই নাও দুই জোড়া, ঝটপট পরো না
বক্সিং করো দেখি মারামারি করো না।

চল ফ্যালা চলে যাই বক্সিং কাজ নাই
লড়ে বল কিবা ফল গায়ে হবে ব্যথাটাই।
যাক না চুলোয় তোর চড়া সেই রকেটে
চা খাবার পয়সা আছে দ্যাখ পকেটে?

অনেক দিনের পুরোনো এ ঘটনা। ঐ বংশের আজ যিনি স্বনামধন্য সেই লেডী রাণু মুখার্জিও বোধহয় সেদিন পদার্পণ করেন নাই ঐ গৃহে বধূরূপে। এ বিচিত্র ভোজে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বোধহয় একেবারে ভুলে যান নাই সেদিনের কথা। বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে আজও খোঁজলে খুঁজে পাওয়া যায় দু-একটা ঝাপসা রেখা।

ছোটদের পাততাড়ি
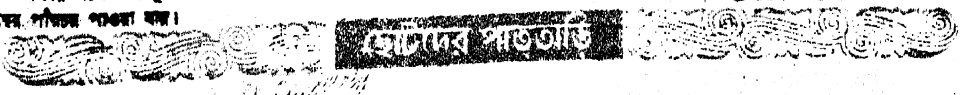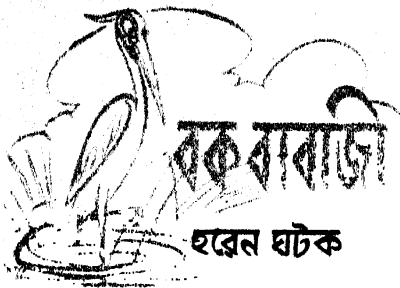
ওরে বক! এই সখ
হ'লো কবে থেকে?
বাবাজী সাজিস কেন
ডোবা নালা দেখে?
ধ্যানে খাসা ব'সে যাস
তুলে এক ঠ্যাং,
বাগে পেলে ধরে খাস
পুঁটি চেলা চ্যাং!
কান তোর খাড়া হয়
টিকি হয় টান,
কুচো-মাছ কাছে গেলে
ভাঙে তোর ভান!
মুনি বটে মনে হয়
দেখে লক্ষণ,
আসলে তো থপ ক'রে
মাছ ভক্ষণ!

মনে করো কাল রাত চারটে যখন,
তখন একলা উঠে চ'লে গেছ ছাদে—
তুমি ছাড়া কেউ আর ধরো জেগে নেই,
আগাগোড়া ভুতে-পাওয়া কলকাতাতে!
তাহলে কেমন মজা হয় ভাবো দেখি—
তুমি আর ছায়া-ছায়া ধূসর সহর,
মনুমেন্ট খাড়া আছে শিং উঁচু করে,
হাওড়ার ব্রীজ যেন বুড়া অজগর!
কুয়াসার ঘোমটায় গঙ্গার জল,
ঘুমোনো মেঘের মতো করে ছলছল।
এই এক কলকাতা তুমি দেখে নিলে,
দেখবে না কেউ যেটা ঢের টাকা দিলে!
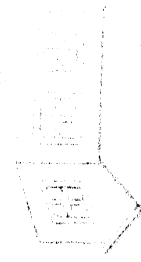
বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 'ডল্‌স্‌ হাউস' (Dolls House) নামে নানা আকারের সুন্দর সুন্দর পুতুলের বাড়ী কিনতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও অনেক বড় বড় খেলনার দোকানে এই ধরণের বাড়ী বিক্রী হয়; কিন্তু সেগুলির দাম এতো বেশী, যার জন্যে আমাদের এই গরীব দেশের অধিকাংশ ছেলে মেয়েরাই তা কিনতে পারে না। যাদের বরাতে এইরকম বাড়ী জোটে না তারা যদি আমার নির্দেশ মতো চলে, তবে তারাও ছোট-খাটো পুতুলের বাড়ীর মালিক হোতে পারবে। খেলনা তৈরীর কারখানায় নানারকম যন্ত্র-পাতির সাহায্যে তৈরী পুতুলের বাড়ীর মতো তোমাদের তৈরী বাড়ী অবশ্য তেমন সুন্দর হবে না, তবে যা হবে তা নেহাতই খারাপ হবে না বরং অনেক দাম দিয়ে কেনা পুতুলের বাড়ীর চেয়ে তোমাদের-টারই দাম হবে বেশী। কেন না সেগুলো হবে তোমাদের নিজের হাতের তৈরী। এই বাড়ী কেমন করে করবে এবার শোনো!

এক ফুট লম্বা ও ছ' ইঞ্চি চওড়া এক টুকরো মোটা দেখে মজবুত কাগজ নিয়ে ১নং ছবিতে দেওয়া মাপের নির্দেশ মতো সেটার ওপরে স্কেল দিয়ে মেপে মেপে বাড়ীর একটা নকশা এঁকে নিয়ে সেটার বাইরে লাইন ধরে গোটা নকশাটা কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। তারপর সমতল কোনো শক্ত কিছুর ওপরে নকশাটা ফেলে ধারালো ছুরি বা দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে খুব সাবধানে দরজা ও জানলাগুলির ভেতরের অংশগুলি কেটে বাদ দিয়ে দরজা জানলার ফোকর বের করো। ইচ্ছে করলে জানলার ফোকরের চেয়ে সামান্য একটু বড় দেশলাই কাঠির মতো সরু কাগজের ফালি নকশার যে কোনো এক পিঠে আঠা দিয়ে জুড়ে জানলার গরাদে বসাতে পারো। সব গরাদেগুলি খাড়া ভাবে যা ৩নং ছবির মতো একটা খাড়া একটা

এড়োভাবেও বসাতে পারো। ৩নং ছবিটা হোলো বাড়ী তৈরী করার শেষ অবস্থা। এই ছবিটাতে দরজা ও জানলার চার ধার দিয়ে যে লাইন টানা আছে সেগুলি দিয়ে দরজা ও জানলার ফ্রেম বোঝানো হয়েছে। ইচ্ছে করলে তোমাদের নকশার দরজা জানলার ধারে ধারে ঐ রকম লাইন টেনে দিতে পারো। আর যদি ইচ্ছে করো তবে দরজা ও জানলাগুলিতে এক জোড়া করে পাল্লা বসাতে পারো। এটা করলে বাড়ীটা দেখতে খুব সুন্দর হবে। পুরনো একটা পোস্টকার্ডের ওপর যে কোনো হালকা রঙের (সবুজ হোলেই ভালো হয়) কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে সেটা থেকে দরজা ও জানলার ফোকরের মাপে টুকরো কেটে সেগুলির ওপরে ২নং ছবির মতো লাইন এঁকে, তারপর প্রত্যেকটির ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি কেটে জোড়ায় জোড়ায় পাল্লা তৈরী করো। এরপর নকশাটার যে পিঠে জানলার গরাদে বসিয়েছ সেই দিকটা ওপরের দিকে রেখে নকশাটা টেবিলের ওপর ফেলে দরজা জানলার ফোকরে পাল্লাগুলি উপুড় করে রেখে,— কাগজের ছোট্ট ছোট্ট টুকরোতে আঠা লাগিয়ে কব্জার মতো করে পাল্লাগুলি নকশার সঙ্গে আটকে দাও। শুকিয়ে গেলে গরাদের দিক থেকে ঠেললে পাল্লাগুলি খুলে যাবে, যেমন সত্যিকারের বাড়ীর দরজা জানলার পাল্লাগুলি খোলে।

এবারে ছ' ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া কাগজের দুটো ফালি কাঁচি দিয়ে কেটে সে দুটো লম্বালম্বি মাঝখানে ভাঁজ করো এবং একটা ভাঁজের অংশে আঠা লাগিয়ে ছ' ইঞ্চি লম্বা দেয়াল দুটোর একেবারে মাথার দিকে ফালি দুটো এমন করে জুড়ে দাও যাতে আঠা না লাগানো অংশ দেয়ালের মাথার বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই অংশেই আঠা লাগিয়ে ছাদের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এটা অবশ্য পরে করতে হবে। এখনই যা করবে শোনো। নকশাতে ফুটকি দিয়ে যে চারটে লাইন আঁকা আছে সেই চারটে লাইন বরাবর নকশাটা ভাঁজ করো এবং নকশাটার ডান দিকের প্রান্তে আধ ইঞ্চি চওড়া যে অতিরিক্ত অংশটা আছে,— নকশার বাঁ দিকের প্রান্তটা সেটার ওপরে এনে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। এইভাবে জোড়বার পর নকশাটা দেখতে হবে চারটে পায়া বিশিষ্ট ছাদ বিহীন একটা ঘর।

এবারে ৭"×৬" মাপের একটা পাতলা পিচবোর্ড কেটে নিয়ে সেটার একপিঠে আঠা দিয়ে লাল কাগজ মারো। শুকিয়ে গেলে স্কেলের সাহায্যে পেন্সিল দিয়ে সেটার ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি একটা দাগ দাও। তারপর স্কেলটা না সরিয়ে পেন্সিলের সেই দাগের ওপর দিয়ে এমন ভাবে ছুরি বা ব্লেড টানো যাতে পিচবোর্ডটা সামান্য একটু চিরে যায়। এইভাবে না কাটলে পিচবোর্ড সমানভাবে ভাঁজ করা যায় না। কিন্তু সাবধান, পিচবোর্ডটা কেটে যেন দু'টুকরো হয়ে না যায়। এটা বোধ হয় বলে দিতে হবে না যে, পিচবোর্ডটা ভাঁজ করবে চেরার দাগের উল্টো দিকে। এই ভাঁজ করা পিচবোর্ড দিয়েই হবে ঘরের ছাদ।

এরপর দেয়ালের মাথায় জুড়ে রাখা কাগজের ফালি দুটোর আঠা না লাগানো অংশে আঠা লাগাও এবং ছাদের পিচবোর্ডটা বেঁকিয়ে দুধার ঢালু করে ঘরের মাথায় বসিয়ে ঘরের নীচের দিক থেকে হাত ঢুকিয়ে আঠা লাগানো ফালি দুটো ছাদের ঢাল অংশের ভেতর দিকে চেপে চেপে জুড়ে দাও।

এবারে ঘরের মাপের চেয়ে কিছুটা বড় আর এক টুকরো পিচবোর্ডের ওপর পায়াওলা বাড়ীটা বসিয়ে, সেটার যেখানে যেখানে পায়া চারটে পড়বে, সেখানে সেখানে পায়ার ধার ঘেঁষে পেন্সিল দিয়ে দাগ দাও। তারপর বাড়ীটা সরিয়ে ফেলে পিচবোর্ডের ওপরকার পেন্সিলের দাগগুলির ওপর দিয়ে ছুরির ডগা ঢুকিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে চিরে দাও এবং সেই চেরা গর্ত দিয়ে ঘরের পায়া চারটে ঢুকিয়ে পিচবোর্ডের নীচের দিকে টেনে এনে বেঁকিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেই পুতুলের বাড়ী তৈরী করা শেষ হবে।

খোকন বসে জারুল তলে বাঁধে খেলার ঘর
দোর, জানালা নেই তবু তা, দেখায় মনোহর।
সেই ঘরেতে ফাঁকা আকাশ চুপিসারে এসে
রাশি-রাশি ছড়ায় হাসি জ্যোছনা রাণীর বেশে!
রাজকন্যা সেজে আসে বাতাস সারা বেলা—
সেই কন্যার নামটি হোলো খেলা ঘরের খেলা।
ছাউনী বিহীন ঘরে বোঝাই মিছামিছির ধন
এ ঘরটিতে বসত করে কেবল খুকুর মন।

টাকা হ'য়েই জন্মেছিলাম। কিন্তু—
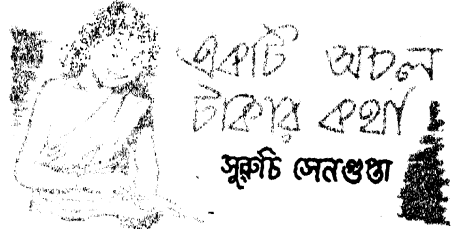
টাকা হাতে পেলে লোকে কত খুসী হয়, হারিয়ে যাবার ভয়ে কত যত্ন ক'রে রাখে, খরচ করে কত হিসেব ক'রে। কিন্তু আমি একটা অখণ্ড টাকা, আমাকে দেখেই লোকে বিরক্ত হয়, হারিয়ে গেলেও আফশোষ করে না, বরং ভাবে আপদ গেল। কেন ভাববে না—? আমি যে অচল টাকা, আমি মেকি, জাল, আমি সকলের সমান নই, তাই আমার আদর নেই কারো কাছে।

একদিন একটা লোক অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে চালিয়ে দেবার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কিন্তু তার সব ফন্দি, সব চালাকি ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। আমার বিবর্ণ দেহ আর বোবাকণ্ঠ দেখে কেউ আমাকে নেয়নি বরং অচল টাকা নিয়ে অন্যকে ঠকাবার চেষ্টা ক'রছে ব'লে তাকে অপমান ক'রেছে, পুলিশে দিতে চেয়েছে। রেগে গিয়ে লোকটা আমাকে পাথর পাশে বটগাছতলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেছে। খোলা জায়গার এলোমেলো বাতাস আমার দেহের উপরে একটা দুটো ক'রে শুকনো বটপাতা উড়িয়ে ফেলে, মুঠো মুঠো ধুলো এনে ঢালে। দু'একদিনের মধ্যেই মাটির নীচে যে আমার সমাধি রচনা হবে, এবিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। সেই ভালো, বার বার লোকের বিরক্তি কুটিল দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে আর ধিকৃত ক'রে তুলতে হবে না, সে-ই ভালো।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছোট মেয়ে সকলের কাছে ভিক্ষে চাইছে। ও নাকি সারাদিন কিছু খায়নি। ওর চেহারা দেখে ও যে মিথ্যে বলেনি, সে কথা বোঝা যায়। ওর শুকনো মুখ আর করুণ কণ্ঠ শুনে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে; আমি অচল নয়তো আমিই আজ ওর মুখে খাবার তুলে দিতে পারতাম।

সহসা আকাশ থেকে এক ঝলক বৃষ্টি পড়ে। মেয়েটি বট-গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টির জলে আমার গায়ের ধুলো ধুয়ে যায়। সহসা আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটির মুখ আনন্দে ঝলমল ক'রে ওঠে। ছুটে গিয়ে ও আমাকে তুলে নেয়, কখনো হাতের মুঠোয়

ভরে রাখে, কখনো আঁচলে বাঁধে। একটা আস্ত টাকা কুড়িয়ে পেয়েছে, এ যেন তার কিম্বদন্তী হয় না। ওর এত আনন্দ দেখে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, আক্ষর বোবা গলায় ভাষা নেই, হয়তো ওকে আমি বল্‌তাম্‌ ওরে অবোধ মেয়ে, তোর এত আনন্দ কিসের? আমি যে মেকি, অচল। তোর কোন কাজেই লাগবে না।

কাছেই একটা মুড়ি-মুড়কির দোকান ছিল; রুক্ষ চুলের গোছা নাচিয়ে মেয়েটি সেই দোকানে গিয়ে বলে, চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি দাও তো দোকানি?

কণ্ঠস্বরে আজ তার কত অহংকার। সারা পৃথিবীকেই যেন সে মুঠোয় ভ'রে ফেলেছে।

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে সে ভারিক্কি চালে আমাকে ফেলে দেয় দোকানীর সম্মুখে। এক মুঠো মুড়ি-মুড়কি মুখে ফেলে বলে, তোমার পয়সা রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দাও,—দেখো যেন মেকি না হয়।

ভালো করে দেখে, আমার কণ্ঠে ভাবার ঝঙ্কার না শুনে দোকানী আমাকে ফিরিয়ে দেয়, এ চ'ল্‌বে না, বদ্‌লে দাও।

চ'ল্‌বে না?—দপ্‌ ক'রে মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ভয়ে সে মুখের মুড়ি-মুড়কি চারটি চিবিয়ে খেতেও সাহস পায় না।

আমার যে আর নেই—

আর নেই তো ফিরিয়ে দাও আমার জিনিষ। খেলে কেন? ন্যাকা সেজে এসেছো অচল টাকা নিয়ে—

রূঢ় হস্তে ঠোঙাটা কেড়ে নেয় দোকানী। লজ্জা-দুঃখে মেয়েটির মুঠোর মধ্যে আমি যেন আর নেই। জগতে কারো কোনো কাজেই যদি না লাগ্‌ব তবে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? আর ঐ ক্ষুধার্ত ছোট্ট মেয়েটির গ্রাস থেকে ঐ দুটি মুড়ি-মুড়কি যে কেড়ে নিতে পারে, এমন নিষ্ঠুরের মাথায় বিধাতা বজ্রাঘাত করেন না কেন?

অকেজো জেনেও মেয়েটি আমার মায়া কাটাতে পারে না আঁচলে বেঁধে রাখে। তারপর ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্ন হ'য়ে সেই শিশু গাছতলাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একটা কুলি গোছের বুড়ো গামছা দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে এসে মেয়েটির কাছেই বসে। নিদ্রিতা বালিকার এলানো আঁচলের খুঁটে কি বাঁধা আছে দেখে লোভে তার চোখ্‌ চক্‌চক্‌ ক'রে ওঠে। সরীসৃপের মত একখানা হাত এগিয়ে দিয়ে আঁচলের গিঁট খুলে আমাকে বের ক'রে নিয়েই সে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁট্‌তে সুরু করে। যদিও আমি অচল, তবু আমাকে নিয়ে মেয়েটির মনে আশার অন্ত ছিল না। জেগে উঠে আমাকে না দেখে সে হয়তো কেঁদেই ফেল্‌বে ভেবে ব্যথায় আমার মন ভিজে ওঠে। ওই গরীব কচি মেয়ের আঁচল খুলে টাকা নিতে যার প্রাণ কাঁদে না, এমন একটা লোকের কর্কশ মুষ্টি আর দুর্গন্ধি ট্যাঁকের মধ্যে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু আমাকে নিয়ে একদিনের মধ্যেই নানা জায়গায় ঠোকর খেয়ে আমার প্রতি তার আর কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। পথের পাশে একজন অন্ধ ব'সে ভিক্ষে কর্‌ছিল, দয়ালু সেজে লোকটা অন্ধের ভিক্ষের ঝুলিতে আমাকে দান করে দে'য়, দৃষ্টিহীন অন্ধ স্পর্শে আমাকে অনুভব ক'রে 'জয় হোক্‌' ব'লে আশীর্বাদ করে। দৃষ্টিহীন অসহায়কে যে প্রতারণা করে, তার যেন পদে পদে পরাজয় ঘটে, জগতের বিচার কর্তার কাছে আমি এই প্রার্থনাই করি। সারাদিন ভিক্ষের পর সন্ধ্যার সময় অন্ধের মেয়ে এসে হাত ধ'রে বাপকে ঘরে নিয়ে যায়। অন্ধ বলে, আলো জেলেছিস মা? দেখ্‌তো কত পেয়েছি। আজ একটা টাকা পেয়েছি। জগতে দাতার অভাব নেই। অন্ধকে যে দয়া করে, বিধাতা তার ভালো ক'রবেন। মেয়েটি বলে, কিন্তু বাবা এ যে অচল টাকা। অচল দেখে দেখে অচল সম্বন্ধে মেয়েটীর বেশ্‌ অভিজ্ঞতা আছে দেখা গেল। অন্ধ বলে, অচল টাকা? তা' হবে, চোখে তো দেখিনে।
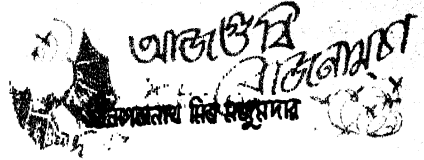
ঘুঘু ডাঙায় নেইকো ঘুঘু—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা,
চক্ষু উঠে চড়ক গাছে দেখ্‌লে মশায় খেল্‌ছে পাশা।
চাম্‌চিকে ও মাছি জুটে
বেড়ায় ঘুরে মজা লুটে
রাত্রে দিনে ঝিঁঝিঁ পোকায়—চলছে সেথায় কাঁদা হাসা,
ঘুঘু ডাঙায় নেইকো ঘুঘু—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা।

কানা-ছেলে পদ্মলোচন—চক্ষে দেখে ডুমুর ফুল
ভিরমি খেয়ে তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে করে হুলস্থূল।
পিঁপড়ে যেমন পেলে পাখা
ধরে তারে যায় না রাখা
কলুর বলদ চিনির কলে—জুড়লে যেমন বকে ভুল,
তেমনি কানা পদ্ম-লোচন—চক্ষে দেখে ডুমুর ফুল।

পটল ডাঙায় পটলবাবু—শুনেছি সে দিন পটল তুলে—
এলেন নাকি ঘুঘু ডাঙায়—নিমের গাছে বাদুড় ঝুলে।
ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানা
কী হল সে যায় না জানা
ঘুঘু ডাঙায় পটলবাবু বলে সবাই—এলেন ভুলে,
পটল ডাঙায় পটলবাবু —শুনেছি গেছেন পটল তুলে।

* * * *

রোজনামচা এমন কত—শুনতে যদি তোমরা চাও—
বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা—ঘুঘু ডাঙায় পা বাড়াও!

মেয়ে বলে, রাত্তিরের অন্ধকারে বাজারে গিয়ে টাকাটা আমি চালিয়ে দেব বাবা!

ব্যস্ত হ'য়ে অন্ধ বলে, না, মা, কাউকে ঠকাতে যাসনে। কি পাপ ক'রেছিলাম তাই এত শাস্তি ভোগ ক'র্‌ছি। পাপের বোঝা আর বাড়াসনে মা!

মেয়েটীর চোখ জ্ব'লে ওঠে, কিন্তু চোখে দেখ্‌তে পাওনা ব'লে ওরা যে ঠকায়; তার বেলা?

মেয়ের পিঠের উপর হাত রেখে শান্ত স্বরে বাপ বলে, পরের কথায় আমাদের কাজ কি মা? যে অন্যায় ক'র্‌বে, তার বিচার ক'র্‌বেন ভগবান।

গন্‌ গন্‌ ক'র্‌তে কর্‌তে মেয়েটী আমাকে ছেঁড়া সাড়ীর আঁচলে বেঁধে রাখে। পরদিন যখন সে পুকুরের জলে সাঁতার কাটে, তখন তার ছিন্ন আঁচল থেকে আমি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম।

কী শীতল স্পর্শ। স্তরে স্তরে জল ভেদ ক'রে চলেছি কোন্‌ পাতালপুরীতে। সেখানে কেউ আমাকে দেখ্‌তে পাবে না, আমাকে নিয়ে কেউ দুঃখ পাবে না এই ভালো,—

গম্ভীর অন্ধকার। কিন্তু কি কোমলতা। কী নীরবতা। কী শান্তি। শান্তি। শান্তি।

কামিনী ডাকছে, ওগো, শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?

গভীর রাত্রি, সুকান্ত নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। সারাদিনের [খাটু]নির পর ঘুম সহজে ভাঙ্গাতে চায় না। কামিনীর ডাকাডাকিতে শেষে ঘুম ভাঙ্গলো। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন সুকান্তবাবু। কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কি হয়েছে?

ঐ শোন, কে যেন গোঙাচ্ছে। আমার বড্ড ভয় করছে।

সত্যি কে যেন গোঙাচ্ছিল। সুকান্তবাবু কান পেতে শোনেন। এই রাতে সেই শব্দ যেন আরো বিশ্রী হয়ে সুকান্তবাবুর কানে বাজলো।

সুকান্তবাবু বললেন, আওয়াজটা যেন মনে হচ্ছে খোকনদের ঘর থেকেই আসছে। ব্যাপার কি। দুজনে লাফ দিয়ে উঠলেন। সুইচ টিপে দিতেই ঘর আলো হয়ে উঠলো। দুজনেই খোকনদের ঘরে এলেন। ছেলেমেয়েরা বিছানার উপর সারি সারি ঘুমাচ্ছে। আওয়াজ সেইখান থেকে উঠছে।

ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিলেন সুকান্তবাবু। বিছানার কাছে এসে চমকিয়ে উঠলেন। তারি ছোট ছেলে খোকন গোঙাচ্ছে। কামিনী ব্যস্ত হয়ে খোকনের কাছে গেলেন।

ডাকলেন, খোকন-খোকন-অ-খোকন!

খোকনের সাড়া শব্দ নেই। চোখ শিবনেত্র। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর খোকন একটু চোখ চাইল। আবার বুজলো।

কামিনী খোকনের মুখের উপর ঝুকে পড়ে ডাকলেন,—অ-খোকন, অমন করছিস কেন? কি হোল তোর? অ-খোকন।

খোকনের মুখে কথা নেই। দুচোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছে।

কামিনী কেঁদে উঠলেন, ওগো, দেখো না গো, খোকন আমার কেমন করছে?

সুকান্তবাবুও দেখে ভয় খেয়ে গেলেন, খোকনের অবস্থা দেখে। কি কান্ড, খেয়ে দেয়ে শুয়েছে, ভাল ছেলে, একি অবস্থা। সুকান্তবাবু ছুটলেন ডাক্তারের বাড়ি।

একটু পরেই ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলেন, সুকান্তবাবু। কামিনী মাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন, ডাক্তারবাবু, খোকন আমায় কথা বলে [...]য় না। কি হোল ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন, বললেন, কাঁদবেন না চুপ করুন। ওকে দেখতে দিন। কামিনী উঠে দাঁড়ালো। ডাক্তারবাবু খোকনকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা শেষ করে বললেন, খোকন কি খেয়েছিল—বলুন তো?

কিছু না! ঝোল ভাত। কাঁদ কাঁদ মুখে কামিনী বললো।

উঃ হু! ঝোল ভাতে পেট ফোলে না?

সত্যি ও কিছু খায়নি ডাক্তারবাবু।

নিশ্চয় খেয়েছে। এই দেখুন! এই বলে ডাক্তারবাবু খোকনকে বমি করিয়ে দিলেন। দেখুন—এই গুলো কি?

কলা! কলা খেলো কি করে?

সুকান্তবাবু বললেন, কেন আজ অফিস থেকে ফির্‌বার পথে এক ডজন মর্তমান কলা এনেছিলাম না,—দেখ তো?

কামিনী ছুটলো রান্না ঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো, বলল, পাঁচটা কলাই নেই? ওই খেয়েছে?

সর্বনাশ ভরা পেটে অত কলা খেয়েছে।

একাকি বসিয়া আছি সমুদ্রের ধারে,
শীতল বাতাস স্পর্শ করে ধীরে ধীরে;
সুন্দর নির্মল জ্যোতি সমুদ্র উপর......
পূর্বদিকে উঠিতেছে দেব দিবাকর।।
মনোহর একি শোভা ঈশ্বরের দান,
হেরিলে হইবে তব বিমোহিত প্রাণ;
আমি শুধু চেয়ে থাকি সমুদ্র উপর,
মধুময় হোয়ে ওঠে আমার অন্তর।।

বমি করে খোকনও এতক্ষণে বাঁচলো। এখন স্বাভাবিক অবস্থা তার ফিরে এসেছে। কামিনী তাকে বলল, ও-রে রাক্ষস কখন খেলি তুই কলা। হতভাগা ছেলে কোথাকার।

ডাক্তারবাবু বললেন, এখন থাক ও কথা। ওকে বিশ্রাম করতে দিন। বলে হজমের একটা ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন।

সকালে ডাক্তারবাবু এলেন, খোকনকে দেখতে, বললেন, কেমন আছ, খোকনবাবু?—

—আর লুকিয়ে কলা খাবে?

কামিনী বলল, জানেন ডাক্তারবাবু, আমি ওকে খাইয়ে দিয়ে যেই খেতে গেছি,—এই ফাঁকে বসে বসে—

বাধা দিয়ে খোকন বলল, বাঃ রে, ডাক্তারকাকা না সেদিন বলেছেন, কলা খাওয়া ভাল। তাই ত খেয়েছি!

শুনে ডাক্তারবাবু হাসলেন, বললেন, সে বলে ভরা পেটে অত গুলো কলা খেতে বলেছি। তুমি তো লোভে পড়ে খেয়েছ খোকন। বেশী লোভ ভাল নয়। যখন যা খাবে ক্ষিধের সময় খাবে। পেট অতিরিক্ত ভর্তি করবে না। খেয়ে উঠে মানে ভরা পেটে কিছু খাবে না। যা যখন খাবে বেশ ধীরে সুস্থে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। তবেই হজম হবে। তাড়াহুড়ো করে খেলে বদ হজম হবার ভয় থাকে। শরীরও খারাপ হয়।

বেশী করে খেলে তো, গায়ে বেশী জোর হবে ডাক্তারকাকা।

না-তা হয় না, সে ধারণা তোমাদের ভুল। নিয়মিতভাবে, সময় ঠিক রেখে খেলে—সেই খাওয়াই হজম হয়। অতিরিক্ত খেলে মানে পাকস্থলী খাদ্য ধারণ করবার ক্ষমতা থেকে বেশী খেলে, (যাকে আমরা বলি ঠেসে খাওয়া) কাল রাত্রে তোমার যা অবস্থা হয়েছিল—তাই হয়।

কেন হয় ডাক্তারকাকা?

ছোট জুতো পরতে পারো?

না পায়ে লাগে। ফোস্কা পড়ে।

কেন পড়ে খোকন?

জুতোর চেয়ে পা বড়।

গুড়। তেমনি পাকস্থলী যা ধারণ করতে পারে তার অতিরিক্ত খাদ্য চাপালে, পাকস্থলী গহ্বর ঠেসে ভরে যায়। তার ফলে পাকস্থলীর পাচক রস, যা খাদ্যকে হজম করায় তা সহজে বার হতে পারে না। যেমন ছোট জুতা পরলে পায়ে ফোস্কা পড়ে। কেন জান! জুতোর চাপে পায়ের রক্ত স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করতে পারে না। সে রকম খাদ্যের চাপে পাকস্থলী তার ক্রিয়া সুস্থভাবে করে উঠতে পারে না। কাজেই বলছি, লোভ সামলাও। দেখবে স্বাস্থ্যও ভাল হবে। হজম শক্তিও বাড়বে। কেমন?

খোকন মাথা নাড়লো।

গোল গোল দেহ মোর
শুঁড় ছাড়া হাতিটা
খালি-খালি খাই শুধু
দুদলের লাথিটা।
এগারোটি খেলোয়াড়
দুই দিকে দাঁড়িয়ে
যেদিকেই ছুটে যাই
দ্যায় তারা তাড়িয়ে।
দুম্ দুম্ ধপ্ ধপ্
বাপ রে কি শব্দ,
বুক করে ধড়-ফড়,
থরো থরো কম্প।
রেফারিটা 'গোল' হলে
বাঁশি দ্যায় বাজিয়ে
লোরগোল পড়ে যায়
দল রাখে সাজিয়ে।
দুরন্ত সে খেলোয়াড়
ছুঁড়ে ফেলে শূন্যে—
সাধ হয় উড়ে যাই
পিসিমার পুণ্যে।
চারদিকে লোকগুলো
হয় তবে জব্দ
ধাঁই ধাঁই ধপ ধপ্
কি বিষম শব্দ।
গ্যালারীতে লোকজন
হাত তালি দিচ্ছে
তাই দেখে—ঘাড়ে পড়ি
হয় মনে ইচ্ছে।
লাফা লাফি করে কেউ,
কেউ মরে চেঁচিয়ে
হাত নেই পারি না—যে
কান দিতে পেঁচিয়ে।
হার-জিৎ নিয়ে করে
হৈ হৈ দ্বন্দ্ব
আমি শুধু লাথি খাই
নিঃশ্বাস বন্ধ।
ওই লাগে হাতাহাতি
গেল দুটো প্রাণ তো
বাঁচা গেল। এইবার—
থাকি আমি শান্ত।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—বাংলায় একটা বহু চলতি এবং নিত্য ব্যবহৃত প্রবাদ বাক্য। এর অর্থ গৌরী সেনের টাকার যেমন শেষ নেই, তাঁর দান-খয়রাতিরও তেমনি শেষ নেই। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে কোনো কাজে হাত দেওয়া চ'লে। তাঁর সে টাকা নষ্ট করলেও জবাবদিহি করার কোনো দায় নেই, কৈফিয়ৎ দেবার জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এই গৌরী সেন লোকটি কে? যিনি প্রবাদ প্রবচনে এত বড় স্থান পেয়েছিলেন তিনি কি সত্যকারের মানুষ না শুধু ফাঁকা কল্পনা? গৌরী সেন সত্যকারের রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ ছি'লন, যেমন ছিলেন ইতিহাসের আর পাঁচজন, যেমন ছিলেন লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন, কিংবা সান-ইয়াৎ সেন। সে ইতিহাস খুব বেশী দিনের পুরোনোও নয়। মাত্র দু'শো-আড়াইশো বছর আগেকার কথা।

কলকাতা থেকে ৬।৭ মাইল দূরে হাওড়া জেলার বালী-তে এক দরিদ্র সুবর্ণ বণিক পরিবারে গৌরী সেনের জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে নিতান্ত গরীবের ছেলে গৌরী সেনের হাতে খড়ি হয় ব্যবসায়। ব্যবসায় নেমে তিনি যে রাতারাতি খুব পয়সা রোজগার করতে পেরেছিলেন তা নয়, কিন্তু সততা, সরলতা এবং সাধুতার জন্য তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তখনকার দিনের বিত্তশালী শ্রেষ্ঠী বৈষ্ণবচরণ শেঠ গৌরীসেনের এই সুনামে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁকে নিজের ব্যবসায়ের অংশীদার করে নিলেন।

বৈষ্ণবচরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতায় বড়বাজারে। কিন্তু এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হওয়াতেই যে গৌরী সেন বিলিয়ে দেবার মত এত টাকা-কড়ির মালিক হতে পেরেছিলেন তা' নয়। তাঁর আশাতীত সৌভাগ্য-উদয়ের একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর এই সৌভাগ্য দেবতারই অনুগ্রহ। ব্যবসাক্ষেত্রে গৌরী সেনের সততাও যেমন ছিল, সাহসিকতাও তেমনি অসাধারণ ছিল। একবার হয়েছে কি, গৌরী সেন এক নৌকো বোঝাই সীসের পাত মেদিনীপুরে তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়েছেন বিক্রীর জন্য। এরকম হামেশাই চলত। সম্ভবতঃ এই সীসের পাত-এর খরিদ্দার ছিল পর্তুগীজ দস্যু-বণিকরা। ঠিক যে রাত্রে সীসের পাত নিয়ে নৌকো ছাড়ল কলকাতা থেকে সেই রাত্রেই গৌরী সেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তিনি যেন তাঁর ইষ্টদেবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর ইষ্টদেবতা তাঁকে বললেন, 'মাল সমেত তোর নৌকো ফেরৎ আসবে, তুই কোনো ভয় করবি না, কিছু চিন্তা করবি না—শুধু আমার কথা মনে রেখে যা ভাল মনে হয় নির্ভয়ে তাই করবি।' ঠিক তার দু'দিন পরে তাজ্জব খবর এলো যে, নৌকো কলকাতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ দেখা গেছে নৌকোয় সীসের পাত একটাও নেই, আছে শুধু তাল তাল রূপো। সীসের পাত যাদের দরকার, রূপোর তাল নিয়ে কি করবে তারা?

কিন্তু তাল তাল রূপো নিয়ে গৌরী সেনই বা কি করবেন? গৌরী সেন বিস্ময়ে হতবাক। তবু স্বপ্নের কথা স্মরণ ক'রে তিনি ইষ্টদেবতাকে দু'হাত তুলে প্রণাম জানালেন। স্বপ্নাদেশ মতই তিনি নির্ভয়ে মতলব ঠিক করে ফেললেন। তখনকার দিনে রূপোর দাম

চাঁদ বুড়ী   থুরথুরী
 ঐ আকাশে থাকে।
আঁধার রাতে   উঁকি মেরে
 হাত দিয়ে সে ডাকে।
আয়রে বুলু   আয়রে টুকু
 বেণু ভাইটি আয়।
মেঘের কোলে   মুখ লুকিয়ে
 চাঁদটি কেমন যায়।।
ফাঁকে ফাঁকে   কালো দাগে
 কলঙ্কতে ভরা।
তবু চাঁদের   গোটা দেহ
 রুপো দিয়ে গড়া।
দুপুর রাতে   তারার সাথে
 টুকু-বুলুকে ডাকে।
হাত বাড়িয়ে   পাইনে তাকে
 এত দূরেই থাকে।।
কাঁদিস কেন   চোখ ফুলিয়ে
 চাঁদের কাছে যাবি?
তবে তোদের   ভাবনা কিসের
 দুঃখ কেন পাবি?
নেইকো দেরী   তৈয়ার হতে
 চাঁদে যাওয়ার পথ।
চলবে তখন   ঘর ঘরিয়ে
 হাতে গড়া রথ।।
টুকু যাবে   বুলু যাবে
 সঙ্গে যাবে বেণু।
গাইবে সেথায়   নাচবে সেথায়
 মাখবে ফুলের রেণু।।

ছিল সোনার দামের আটভাগের এক ভাগ। কাজেই এই বহু পরিমাণ দামী রুপো তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। বালীর গৌরী সেন হঠাৎ রাতারাতি বহু বহু টন রুপোর মালিক হ'য়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুরম্য একটি মন্দির তৈরী করালেন তাঁর ইষ্টদেবতা শিব-এর আরাধনার জন্য, ভজন-পূজনের জন্য। কিন্তু শুধু মন্দির তৈরী করিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, সেই থেকে সুরু হল তাঁর দান-খয়রাতি। নিজে তিনি গরীবের ছেলে ছিলেন, তাই মানুষের প্রতি সহানুভূতি ছিল তাঁর অসীম। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ত তাঁকে দোহন করেছেনই, চেনা-অচেনা, জানা-অজানা যে কেউ তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে কখনো নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হানি। ভারতীয় দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলি, 'ডান হাত দিয়ে যা দান করবে বাঁ হাত যেন তা টের না পায়', এই হোল দাক্ষিণ্যের গোড়ার কথা। এর জীবন্ত উদাহরণ ছিলেম গৌরী সেন। তাঁর কাছে লোকের বাছ-বিচার ছিল না, যারা হাত পেতে নিয়ে গেল তাদের অভাব-অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তা বিচার করার প্রয়োজন বা

খোকন সোনা চাদের আলো,
চাঁদ বেসেছে তোমায় ভালো।
ঘুমের ঘোরে মুচকি হেসে,
যাও চলে কি চাঁদের দেশে?
চাঁদের মা-তো সেই বুড়িমা—
ঘুম পাড়াতে দেয় তুড়ি, না?
কোলের মাঝে যত্ন করে—
দেয় পায়েসের বাটী ধরে।
সেই লোভে কি খোকন সোনা—
চাঁদের দেশে আনাগোনা।

আলপনা   শ্রীমতী রেণুকা গাঙ্গুলী

প্রবৃত্তি ছিল না। দেবতার অনুগ্রহে যা' তিনি পেয়েছেন মানুষের কল্যাণে তা তিনি অকাতরে দিয়ে গেছেন। পাত্র-অপাত্র ভেদ তিনি করেননি। তাঁর দানের এই মূল মন্ত্রের হয়ত বহু অসদ্ব্যবহার হ'য়ে থাকবে, তাঁর এই দাক্ষিণ্য হয়ত কেন নিশ্চয়ই বহু অপাত্রে পড়ে থাকবে। তবু তিনি এই প্রবাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে, বাঙ্গালীর কাছে, বাংলা ভাষা-ভাষীর কাছে অমর হ'য়ে থাকবেন।
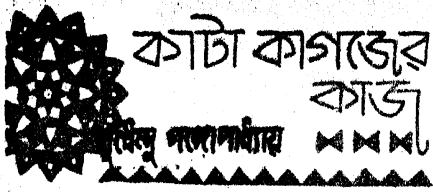
তোমাদের কাছে কাটা কাগজের কাজ সম্বন্ধে বলার আগে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

বহুদিন হইতেই এই কাজটির চিন এবং জাপানে প্রচলন সবচেয়ে বেশী। ওখানকার প্রায় সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে কাটা কাগজের নক্সা তৈয়ারী করিয়া ঘরবাড়ি উৎসব প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সাজান হয়। তাছাড়াও দোকানের শোরুম সাজান, থিয়েটারের সেট সাজান ব্যাপারে এ কাজের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইদানিং বিজ্ঞাপন শিল্পেও এই কাজের কিছু কিছু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার মনে হয় তোমরা বিশেষ করিয়া যাদের একটু ছবি আঁকার হাত আছে তারা একটু ধৈর্য ধরিয়া শিখিলেই কাজটি আয়ত্ব করিতে পারিবে: আমাদের দেশে এই কাজ এখনও বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই।

এইবার কাজের কথায় আসা যাক। এই কাজটির জন্য চাই রঙিন কাগজ, ভাল সরু কাঁচি ও নরুন। লম্বা নক্সা হইলে কাগজটিকে সমান সমানভাবে ভাজ করিয়া লও। তারপর উপরের ভাজে যে রকম নক্সা তোমার করিবার ইচ্ছা, ফুল, পাতা, পাখী, কলকা ইত্যাদি পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া ফেল। এই সময় একটি জিনিষ নজর রাখিও, ডিজাইন যাহাই হউক না কেন তাহা যেন বেশ পরিস্কার সাদাসিদে হয়। নতুবা প্রথম অবস্থায় একটু অসুবিধা হইবে। এইবার ডিজাইন আঁকা হইলে খেয়াল রাখ যে ডিজাইনকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কোথায় কোথায় কাটা দরকার। যেখানে সেখানে কাটিতে আরম্ভ করিলে ডিজাইন মাঝে মাঝে ধসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সরু যায়গাগুলি নরুন দিয়া এবং অপেক্ষাকৃত মোটা যায়গাগুলি কাঁচি দিয়া কাটিবে।

সম্পূর্ণ ডিজাইনটি কাটা হইলে খুব আস্তে আস্তে কাগজের ভাজগুলি খুলিবে এবং দেখিতে পাইবে যে ঐ একটি ডিজাইনই ৬।৭ বার (ভাজ হিসাবে আরও কম বেশী হইতে পারে) একটির পর আর একটি আসিয়া গিয়া সুন্দর একটি একক ডিজাইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই কাজটি তোমরা প্রয়োজন অনুযায়ী গোল, চারকোণা কাগজ অথবা যেকোন আকারের কাগজেই করিতে পার। তবে ডিজাইন করিবার পূর্বে ভাজ করিয়া লইতে ভুলিও না, ভাজ না করিলে একই ডিজাইন একটির পর আর একটি আসিবে না। আশা করি উহা হইতে খানিকটা বুঝিতে পারিবে। এই কাজটি শিখিলে তোমরা প্রয়োজনমত পূজা মন্ডপ সাজান, উৎসব, অনুষ্ঠান এবং অভিনয়ের সেট প্রভৃতিতে এই কাজের ব্যবহার করিতে পারিবে।

'ভো কাটা'—একসুরে ঐকতান তুলে চেঁচিয়ে উঠলো বিশ বাড়ীর ছাদ থেকে—ভোঁ কাটা। সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ি ওদিকে এলোপাথাড়ি পাক খেতে খেতে শূন্য মার্গ ছেড়ে নেমে আসছে মাটির কোলে।। নইলে এতক্ষণ তো সে নানারঙে পাঁয়তারা ভেঁজে উড়ে বেড়াচ্ছিল আকাশে। শুকনো দিনে ঘুড়ি নিয়ে মেতে ওঠে ছেলে-ছোকরার দল। আমাদের দেশে বিশ্বকর্মা পূজোর হুজুগে এই ঘুড়ির বাতিক একেবারে সপ্তমে চড়ে যেন। বুড়ো খোকারাও বাদ যান না বড়। বাতিকটা কিন্তু শুধু আমাদের দেশের গন্ডীতেই সীমায়িত নয়। গোটা দুনিয়াজুড়ে নানা দেশের নানা বয়সের মানুষ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আদ্যি কাল থেকে। বাকসো ঘুড়ি, মাছ ঘুড়ি, সাপ ঘুড়ি, চিলে ঘুড়ি, ডাক ঘুড়ি, ঢাক ঘুড়ি—অষ্টোত্তর শত নামে কতই না ওর রকমফের, আর কত না রঙ-বাহার। তাক লাগিয়ে দেয় এই ঘুড়ির প্রবন্ধ।

ঘুড়ির বাহার যেমন ওর দেহচিত্রে তেমনি আবার ব্যবহারের বৈচিত্র্যেও। পালি-পার্বণে ঘুড়ি উৎসবের অঙ্গ বা অলংকার, যুদ্ধের দিনে আবার সে এক অভাবনীয় হাতিয়ার। ঘুড়ির সেতুবন্ধ বেঁধে শত্রুপক্ষের বিমান বহরকে বেকুব বানিয়ে দেবার নজিরও আছে। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে আকাশপথ পরিক্রমা করে আবহাওয়ার নিশানা এনে দেয় ঘুড়ি। ডুবন্ত জাহাজ থেকে বিপদের সংকেত জানিয়ে উদ্ধারকারী জাহাজকে কাছে ডেকে এনেছে ঘুড়ি। খবরাখবর বহে বেড়ায় সে, আবার হাজার রকমের বিজ্ঞাপনের বোঝাও। টুকিটাকি কত কাজ আর মানুষের কত না ফাই-ফরমাস খাটছে ঘুড়ি। বিজ্ঞানী বলেছেন মর্কটকুল নাকি মানুষের পূর্বপুরুষ। বর্তমান বিমানের পূর্বপুরুষ যে ঘুড়ি একথাও কিন্তু তেমনি এক নিখাদ বৈজ্ঞানিক সত্য।

ঘুড়ি কেন আকাশে ওড়ে—কেইলী সাহেবের মাথায় এসেছিল সে কথাটা। এই ঘুড়ির উড়ে বেড়ানোর পেছনে যে তত্ত্ব কথাটি আছে তাকে ভিত্তি করেই তো পৃথিবীর প্রথম আকাশযান।

বিমানের জন্মকথা আজ সবারই জানা। কিন্তু এহেন যে ঘুড়ি তার জন্মলগ্নের খবর রাখে না কেউ। আঁতিপাতি অনুসন্ধান করে এইটুকু শুধু জানা যায় যে ঘুড়ি বয়সে বহু প্রাচীন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘুড়ির সাথে ধর্মীয় উৎসবের যোগাযোগটা খুব অন্তরঙ্গ রকমের। কোরিয়ানদের তো পুরোদস্তুর বিশ্বাস ছিল যে মন্ত্রবলে অপদেবতাদের চালান করা যায় ঘুড়ির মধ্যে। উড়ন্ত ঘুড়িকে এইভাবে মন্ত্রপূত করে ওরা ছেড়ে দিতো শত্রুশিবিরের দিকে। ঘুড়িকে ভরকরে অপদেবতার দল যেয়ে লণ্ডভন্ড করে দিত নাকি শত্রুব্যূহ। চীনারা তাই বোধ হয় ঘুড়িকে ভাবতো যুদ্ধের এক 'পিলে-চমকানো' হাতিয়ার। সঠিক না হলেও স-তথ্য এমনটি অনুমান করা যায় যে খৃষ্ট জন্মাবার দুহাজার বছর আগেও ঘুড়ির চলন ছিল চীনে। আর ইউরোপে? জন বেট-এর লেখা "প্রকৃতি ও কলা রহস্য" ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে। বইখানিতে ঘুড়ির ছবি আছে। সতেরো শ' কেন, ষোলশ' শতাব্দীতেও ঘুড়ি ওড়াতো রোম আর গ্রীস। অবিশ্যি খৃষ্ট জন্মের চারশ' বছর আগে গ্রীক দেশের গণিত পণ্ডিত আরকিটাস এক উড়ন্ত
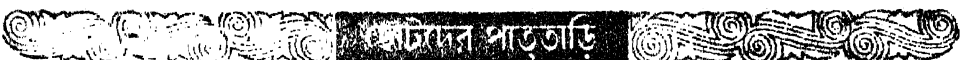
শরতের পল্লী

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সব পেয়েছির ছেলেমেয়ে পল্লী পানে চল্
আকাশ হাতছানি দেয় চলরে দলে দল
বনের কুসুম, রাতের তারা,
জাগছে সবাই আপন হারা,
কমল বনে গন্ধে পাগল উড়ছে অলিদল
সব পেয়েছির ছেলেমেয়ে পল্লী পানে চল্!
সবুজ ধানের ক্ষেতে সেথা হরিৎ গোলা লাগে
বন-বীথির বুকে কত পুষ্প পরী জাগে।
প্রজাপতি রঙিন পাখায়
বন ফুলের রেণু মাথায়;
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু, গোধন চলে আগে—
সবুজ ধানের ক্ষেতে সেথা হরিৎ গোলা লাগে।
সব পেয়েছির ছেলেমেয়ে পল্লী পানে চল্
দেখবি যদি মাকে আজি চলরে চলে চল্
শীষ দিয়ে আজ সজনে শাখে,
বুলবুলি তার চরণ রাখে,
কাঠ বিড়ালী মনের সুখে বাজায় করতল
সব পেয়েছির ছেলেমেয়ে পল্লী পানে চল্।

রাত কানা

জ্যোতিকুমার

রাতকানা গো রাতকানা
কোন দিকেতে হাটিও তুমি
নেই কি তোমার পথ জানা?
বাদুড় ছানা দিন কানা
জোছনা রাতে কোন দেশেতে
ছুটছো খুলে দুই ডানা?
ভূতপরী গো ভূতপরী
মেঘনা থেকে কে এসেছে
চেনো কি কোন্ জলপরী।
ময়নামতীর চর জেগেছে
হায়না হানার বুকে
সেথায় ঘুমায় জলপরী কোন সুখে!
রাত কানা গো দিন কানা
ভূতপরী কি জল পরী তার
নামটি আমার নেই জানা।

ছড়া ও ছবি

কান্তিকুমার

মাছের বাজার দারুণ আগুন
মাছ কেনে কার সাধ্য?
মিছেই চেঁচাস, 'দাম কমাও' আজ—
কেউই কারও নয় বাধ্য।
বলছো কি হে! তোমার মাছের
দুই টাকা সের, সত্য?
ঠিক চিনেছো আমায় তবে—
মাছ নিয়ে যাই নিত্য!
এমন কথা জাগো যার হয়
তার বা কিসের চিন্তা—
টাটকা মাছেই চার টাকা লাভ
তা ধিন্ ধিন্ ধিন্‌তা!
হায়! জব্দ আমায় করবি বলে
করলি এমন কাজটা?
পিছলে পড়েই গুঁড়িয়ে গেল—
মাটির নকল মাছটা!

খুশি

সুনীল চক্রবর্তী

শরতে সোনালী রোদ
ছড়াইছে হাসি,
রঙিন আলোক আনে
জীবনের স্বাদ,
মনে মনে আপনারে
আরও ভালবাসি—
হৃদয় ভরিয়া ওঠে
পরিপূর্ণতায়।।
রঙিন আবির যেন
ছড়ায় ভুবনে
খুশির আবেশ আনে
শিহরণ মনে।।

যন্ত্রের নক্সা করেন। নিছক খেলনা। তবে তার চেহারাটা ছিল পাখনা মেলে ওড়া পায়রার মতোই। অনেকের ধারণা ঘুড়িকে নকল করেই এই নক্সা—তা হবেও বা।

মহাশূন্যে তো আজও ডিগ্‌বাজী খেয়ে উড়ছে ঘুড়ি। বিজ্ঞানীর মাথায় যে দিন সে ডিগ্‌বাজী খেতে সুরু করলে মানুষের সভ্যতায় সেই দিনটি হয়ে আছে চিরস্মরণীয়। কেইলী সাহেব তাঁর যান্ত্রিক ঘুড়ির প্রথম পরীক্ষা করেন আঠারোশ' চার সালে। কেইলী থেকে কোডি সাহেব—একশো তিন বছর পরের কথা। সুশোবার বাক্স ঘুড়ি চেপে শূন্য পথে পাড়ি দেবার পর শেষ পর্যন্ত দুহাজার ফুট উঁচুতে উঠলেন তিনি তাঁর বাক্স ঘুড়ি চেপে। এর পরে উনিশশ' বারো সালে কোডি সাহেব তৈরী করলেন তাঁর লার্ক হিল বাইপ্লেন। এই বাইপ্লেনটিকেই বলা যায় আধুনিক জগতের প্রথম আকাশযান।

আলপনা

মিণ্টু লাহিড়ী

দুধে-জলে

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

গল্প

[illegible]কটা বন্ধ হয়ে গেল। [illegible] ট্যাঁকে গুঁজে অজয়ের [illegible] বিশু ঠাকুর বললেন, 'দ্যাখো, [illegible], দুধ খেয়ে ফুরোতে [illegible] না। আমরা চাকুরিজীবীরা বড় [illegible]। [illegible] দিন পার না হতেই মাসের [illegible] তারপর দরজায় দরজায় [illegible]

[illegible] ভগবান, গাঁয়ের সহায় [illegible] রতনপুরের বাইরে থেকে যারা ঘরে [illegible] আগেই তাদের টাকা [illegible] সঙ্গে মাথা আসে। টানের [illegible] কাছে না এসে উপায় [illegible] ঠাকুর কাউকেই ফেরান না। [illegible] দু-পয়সা, হুঁস থাকে না [illegible]। খুসী হয়েই হ্যান্ড নোট [illegible] আশী নব্বুই একশো টাকা, [illegible]।

[illegible]নের মাসের মাইনে পেলেই [illegible]

[illegible] দেয়, অনেকেই দেয় না। [illegible] ঘুরে বছরে আসে। তাতে [illegible] না। এ বছরের টাকা সামনের [illegible] এতটুকু অপেক্ষা না করলে [illegible] সুদ বাড়বে, আসল মারা [illegible] বারই ত এই।

[illegible] যাদের ফাঁকি দেবার বা [illegible] মনে মনে, তাদের সম্পর্কে। [illegible] করতেই হবে।

[illegible]লেন, 'কাল আসবেন' [illegible] কাল অনেক কাল। কত [illegible] অনুমান করে নিতে হবে। [illegible] হওয়া অবধি বিশু ঠাকুর [illegible] না। সহানুভূতি দেখিয়ে [illegible] দেখো ভাই, আবার যেন [illegible] চতুর্থ বারে মৃদু উক্তি, [illegible]পরে সুদখোর সওদাগরের [illegible] থাকতে তার টাকা

(২)

[illegible] সাইকেল কিনে দাও না।' একমুঠো শুকনো কুল নুন দিয়ে খেতে খেতে অনুরোধ জানায় বীরু, বিশু ঠাকুরের একমাত্র সন্তান, বীরেশ্বর,—'সবে ধন নীলমণি।'

'আঃ, সারাদিন কুল খাওয়া লেগেই আছে! দেখছি, গাছটা কেটে না ফেললে তোমার বদভ্যাস যাবে না।'

কুল নুন ফেলে দিয়ে বীরু আবার বলে, 'দাও না একটা সাইকেল কিনে।'

দাঁড়া, দাঁড়া, একটা সাইকেলের দাম কম-পক্ষে তিনশো টাকা। কোথায় পাবো এখন এত টাকা? আর সাইকেল কিনলেই কি সব হয়ে গেল? দফায় দফায় মেরামত, পার্টস বদলানো, —কত খরচ ফেউএর মতো সারা বছর পিছু লেগে থাকবে বল দেখি? আর তাও না হয় হলো। কিন্তু ওই সাইকেল নিয়ে মেতে থাকলে পড়াশুনো করবি কখন? একদিন কোন খানা খাদে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে সকলকে ডুবোবি! সাইকেল এখন থাক।'

মাকে বলেছিল বীরু সাইকেল কেনার কথা বাবাকে বলতে। মায়ের সাহস হয় নি। কয়েক-দিন খোঁচাখুঁচি করে নিজেই বলতে গিয়ে এই উত্তর!

চট্ করে পিছন ঘুরে বীরু হন্ হন্ করে চলে গেল।

রতনপুরের হাট বসে বুধবার ও রবিবার। সেদিন রবিবার। বিশু ঠাকুরের হাটে অনেক কাজ। দেনা শোধের তাগিদ অন্যতম। নিঃশব্দে দেনদারদের পিছনে বিশু ঠাকুর গিয়ে দাঁড়ায়। চোখাচোখি হলেই মৃদুকণ্ঠে বলেন, হবে নাকি আজ কিছু? না বললেই তিনি আবার নিঃশব্দে সরে যান। হাটবাজারে দেনা শোধের তাগিদ ভালো নয়। তাঁর অস্তিত্বটা জানিয়ে রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য।

রবিবার হাটে যাওয়ার পথে বিশু ঠাকুরের পায়ে ঠেকে গেল রাস্তায় বাঁধা একটা গরুর দড়ি। কোন রকমে সামলে নিলেন তিনি নিজেকে। আর একটু এগিয়ে যেতেই চোখ পড়ল, কে যেন একটা সাইকেল ধরে লাফাচ্ছে।

'কে রে? বীরু নাকি?' চেঁচিয়ে উঠলেন বিশু ঠাকুর। হঠাৎ সাইকেলটা গড়িয়ে পড়ে গেল রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে। ছুটে পালাচ্ছে বীরু, ঊর্ধ্বশ্বাসে। সাইকেলটা গিয়ে ধরল আর একটি ছেলে। বিশু ঠাকুর শুধু আড়চোখে দেখে নিলেন ছেলেটা বীরুর সহপাঠী বিধু।

(৩)

কালের হাওয়া বদলাচ্ছে। সহর এগিয়ে আসছে গ্রামে, গ্রামের গতি সহরের দিকে। সহর ও গ্রামের এই মিলন ব্যাকুলতা ছড়িয়ে যাচ্ছে সবখানে। সহরের রেডিও ছড়ায় পল্লীগীতি, পল্লীমঙ্গলের আসর, গ্রামের যাত্রার আসর চলে আসে সহরে। সহরবাসীর কণ্ঠে পল্লীসংগীত, আর গ্রামবাসীর মুখে আধুনিক গান। কুটির শিল্পের পণ্য সামগ্রী গ্রাম থেকে সহরের শোভা বাড়াচ্ছে, সহরের হাওয়াই শার্ট ছড়িয়ে যায় গ্রামে গ্রামে। গঙ্গা যমুনার মিলনের মতোই এ দৃশ্য উপভোগ্য। ছুটির দিনেও গ্রাম ছুটে আসে সহরে, সহর ছোটে পল্লীর মাধুর্যের খোঁজে।

রতনপুরের রায় বাড়ীর রেডিও শুনতে পল্লীবাসীর ভিড় জমে যায়। বীরু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে যন্ত্রটার দিকে। সহর থেকে বাবুরা এসে সমবায় সমিতির মহিমা শোনায়। গ্রামবাসীরা বলে সমবায়! সমবায়! বিশু ঠাকুরের মনে শঙ্কা জাগে তাঁর কি হবে?

রায় বাড়ীর সমীর রায় সহর থেকে এসেছে রতনপুরে। রেডিওটা তারই আগ্রহে আনা হয়েছে। একলা পেয়ে একদিন বীরু তাকেই ধরলো। 'একটা রেডিওর দাম কত?'

আড়নয়নে তাকিয়ে সমীর রায় বলে, 'আন্দাজ করো দেখি?'

'আমার ত কোন আন্দাজই নেই, আমি ত এই প্রথম দেখি।' সসঙ্কোচে বলে বীরু।

খুসী হ'ল সমীর রায়। 'লোকাল সেট না অল ওয়েভ?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বীরু তার মুখের দিকে।

লোকাল সেটেই তোমাদের বেশ চলে যাবে। তার দাম টাকা আশী কি একশোর মতো। আমাদের ওটা অল ওয়েভ পাঁচশো টাকায় কেনা। তবে কম দামেরও আছে।'

'কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? কলকাতায়?'

॥ গল্প ॥

খাদ

সুভাষ সমাজদার

সোনার কাঁকন
শিল্পশ্রী ছোটন কর্মকার।

গোপালনগরের চৌমাথার মোড়ে দোকানটির এই বিচিত্র নামের সাইন বোর্ড পথচারীদের সহজেই আকর্ষণ করে। নামকরণের ব্যাখ্যা দেয় ছোটন—কবি বলেছেন, সোনার হাতে সোনার কাঁকন। কথাটা শুনলেই শান্ত সুন্দর এক রমণী মূর্তি ফুটে ওঠে চোখের সামনে—দুটি না? ওঁরা আছেন বলেই তো আমরা আছি ভাই—

শুধু নামে নয়। দোকানের মালিক ছোটনও বড় আকর্ষণ। তার এখানে আসে সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, গণৎকার, সাহিত্যিক ও ফুটবল খেলোয়াড় আরও কত বিচিত্র ধরণের মানুষ। সকাল সন্ধ্যা আড্ডা বসে দোকানে। ছোটন অকাতরে ওদের বিড়ি খাওয়ায় আর যে কোন বিষয়ে অনর্গল আলোচনা করে। কোন প্রসঙ্গে কেউ তাকে থেমে যেতে দেখেনি। জ্যোতিষ শাস্ত্র, তন্ত্র, বেদ, উপনিষদকে ছুঁয়ে ফুটবল, সিনেমাকে ডিঙিয়ে ওর কথাবার্তার গতি সুদূর রহস্যময় জন্ম-জন্মান্তরবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যেতে পারে। সহরের একটি বিস্ময় ছোটন কর্মকার!

সেদিন সন্ধ্যার আড্ডায় সহরে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নামে খ্যাত কেশবদাস বলল, গোয়াল ফেলানীর শ্মশানে পিশাচসিদ্ধ এক তান্ত্রিক এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ করে কি বললেন, জানো?

—কি?

তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার নাকি খুব দেরী নেই।

—তোমার তান্ত্রিক ঠিক বলেনি কেশবদাস, একটা চুড়ি পালিশ করতে করতে মুখ না তুলেই বলল ছোটন, সিদ্ধিলাভের গোড়ার কথা হল রিপু জয় করা। তুমি এ পর্যন্ত কয়টা রিপুকে দমন করতে পেরেছো?

—ছোটনদা, একটা প্লট-টুট দাও দেখি, উঠতি সাহিত্যিক বিশু বলল।

—প্লট! দরদ দিয়ে জীবনকে দেখবার চেষ্টা কর—ভালবাসার চেষ্টা কর মানুষকে। তারপর সাহিত্য করিস—

কথা তো খুব ভালই বলো ছোটন। কিন্তু গয়নায় এত খাদ দাও যে তোমার খরিদ্দাররা আমাদের গালাগালি করে, বলল ফুটবল খেলোয়াড় নেপু।

আগুনে ঝরা চোখে নেপুর দিকে তাকালো ছোটন। কোন কথা বলল না। সোনার বালাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ওপরে ঠুক-ঠুক করে হাতুড়ি ঠুকতে লাগল। বাঁশের চোঙা দিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে মালসার আগুনটাকে আরো লাল—আরও গনগনে করে তুলল। ক্রোধতপ্ত কপালে আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়ল।

ছোটনের মুড খারাপ হয়ে গেছে। আর জমবে না আড্ডা। বিশু আর নেপু নিঃশব্দে চলে গেল। কেশবদাস বলল, আমিও উঠি ছোটন। আরেকবার গোয়াল ফেলানীর শ্মশানে যেতে হবে—মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ছোটন।

খাদ! কেন সে খাদ দেবে না! সংসারে খাঁটি বলে কিছু আছে? এই খাদ কি সোনায় পান দেওয়ার কথা শুনলেই গুরুদেবের কথাটা তার কানের কাছে বেজে ওঠে—সংসারে অহরহ দ্বান্দ্বিক সত্যের সংঘর্ষ চলছে ছোটন। যেখানে ভাল আছে, সেখানে মন্দও আছে তার সঙ্গে মিশে। পাপ-পুণ্যে, আলো-অন্ধকারে, সত্যে-মিথ্যায় সর্বদা দ্বন্দ্ব চলছে। শুধু পুণ্য, শুধু আলো, শুধু সত্য যেমন থাকতে পারে না, তেমনি শুধু খাঁটি বলেও কিছু থাকতে পারে না,...আরও অনেক কথা বলেন গুরুদেব মহেশ আচার্য। সব সে ভাল বুঝতে পারে না। কিন্তু বদমায়েস ঐ নেপুটাকে এ সব বলে কি লাভ? ফুটবলে হেড খেয়ে খেয়ে ওর মাথা গেছে [illegible] হয়ে।

—কি হে ছোটন—করছো কি? রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সাইকেল রিক্সা থামিয়ে হেঁকে বলল তার বহুদিনের খরিদ্দার ক্ষেত্রমোহন। নীতপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ছোটনের শাঁসালো মক্কেল।

—আসুন—আসুন—

—তুমি কিছু মনে করো না ছোটন। তোমার তো রেডীমেড মাল নেই। তাই বিশ্বকর্মা জুয়েলারী থেকে মেয়ের বিয়ের সব গয়না নিতে হল। হাতে যে আর মোটে দিন নেই ভাই! ক্ষেত্রমোহন বিয়ের নিমন্ত্রণের কার্ড তার হাতে দিল। যাওয়ার সময় আরার বলল, গয়নার দোকান করেছো—একটা শো কেসটেস কর—এতদিন কি করলে তুমি—

সন্ধ্যার অন্ধকারটাই যেন চেপে নেমে এল ছোটনের মুখে। সত্যিই তো গয়নার দোকান। শো কেস নেই। রেডিমেড মাল নেই। তার খরিদ্দার তো অন্য দোকানে যাবেই।

একটা বহুকালের পুরোনো সিন্দুক, রেড়ীর তেলের প্রদীপ, আগুন রাখার একটা মালসা, ব্লোপাইপ, কয়েকটা হাতুড়ি—মানে—যা না হলে নয় তাই নিয়ে তার এই দোকান! তার হাতের কাজ ভাল, ব্যবহার মিষ্টি—এসবে আজকালকার লোকের মন ভোলে না। বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল তার মন। চীৎকার করে ডাকল—এই নিমু—কোথায় গেলি—এই বাঁদর কোথাকার—

তের-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে ছুটে এসে দাঁড়াল। সোনার কাজ শেখার জন্য ওর সাকরেদী করে। আর টুকটাক ফাই-ফরমায়েস খাটে বিনা পয়সায়।

—তুই পেয়েছিস কি বলতো? নাইট্রিক এ্যাসিডের বোতল খালি। প্রদীপেও তেল নিসনি—

এ্যাসিড নেই। রেড়ীর তেলের বোতলও খালি ছোটনদা—

—খালি তো বলিস নি কেন? সবই খালি হয়ে যাবে— সব শেষ হয়ে যাবে—মনের তীব্র ক্ষোভ যেন ঝরে ঝরে পড়ল তার শেষের কথাগুলোর ভেতরে। নিমু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে নামল। পুনর্ভবার ওপর থেকে হু-হু করে বয়ে আসতে লাগল [illegible] হাওয়া। মরচে পড়া সিন্দুকটা খুলল ছোটন। ওপরের থাক থেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটা বই টেনে নামিয়ে তার প্রথম পাতায় আঁকা বহু রেখাযুক্ত করতলের ছবির সঙ্গে নিজের হাত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তার চোখের দৃষ্টি গভীর হয়ে উঠল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, এই নিমু তুই ভাগ্য মানিস?

—বুঝি না। কেমন তিড়িবিড়ি মনে হয় ছোটনদা—

হো-হো করে হেসে উঠল ছোটন। জোরে তার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, ঠিক

বলেছিস, নিমু—ঠিক বলেছিস। ভাগ্যটা সত্যিই **হিজিবিজি রে।** তা না হলে—হঠাৎ চুপ করে **গেল ছোটন। ছেলেমানুষ ঐ নিমুটাকে** এ সব **বলে কি হবে?**

কয়েকদিন পর।

দোকানে বসে নিমু একা কাজ করছিল। **ছোটন মফঃস্বলে** গিয়েছিল খরিদ্দার সংগ্রহের চেষ্টায়। হঠাৎ নিমুর নজরে পড়ল, ফুল প্যান্ট পরা একটা লোক এক দৃষ্টিতে তাদের দোকানের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে!

—কি চাই আপনার?

—তোমার মালিক কোথায়?

—মফঃস্বলে গেছে—

ও আচ্ছা! বলেই সে পুনর্ভবার ব্রীজের দিকে চলে গেল।

রাত দশটায় মোটরে বুনিয়াদপুর থেকে এল ছোটন।

—ছ আনি সোনার একটা আংটির অর্ডার পেয়েছি রে নিমু। আগুনটা জ্বালিয়ে তোল তো—

একটা অদ্ভুত লোক এসেছিল ছোটনদা,—বলতে বলতে হঠাৎ নিমু চীৎকার করে উঠল—আরে-আরে—ঐ তো আবার এসেছে লোকটা—

সে নিঃশব্দে দোকানে এল। পরনে তালি দেওয়া ফুল প্যান্ট। চুলগুলো উসকোখুসকো। চোখে কেমন ভীত, সংকুচিত দৃষ্টি। চারিদিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে সে বলল, দেখুন তো এই বালা দুটো ভেঙে এক জোড়া কঙ্কন করে দিতে পারেন কিনা। শুনেছি আপনার হাত ভাল। আর বানিটাও একটু কম—

—তা তো হল। মালটা আপনার তো?

—মানে! ও রকম ভাবছেন কেন? তার নিভু নিভু চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। মৃদু গলায় সে বলল, এখানকার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের ক্লার্ক আমি—

—নতুন এসেছেন নিশ্চয়ই। মনে কিছু করবেন না—হে-হে-হে—হেসে তাকে খুসী করার চেষ্টা করে ছোটন।

কষ্টিপাথরে ঘসে দেখল, বালা দুটো খাঁটি সোনার! কিন্তু ওজন করে বলল, এক-একটা চুড়িতে যে মাত্র দশ আনা করে পাওয়া যাচ্ছে স্যার—

—কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে বেশী ছিল—

—বহু দিন আগের জিনিষ—ক্ষয় হয় না! একটু ভেবে বলল ছোটন, মাত্র এক ভরি চার আনা সোনা দুটো মিলে। কিন্তু এত কমে তো কঙ্কন হয় না স্যার—

—কোন উপায় নেই?

—ছোটন ঘাড় নাড়ল।

ব্লক ডেভেলপমেন্টের কেরাণীর মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। যেতে যেতে চাপা অস্ফুট স্বরে বলল, আর কি করলে যে ওর মন পাওয়া যায়......

ছোটন মুচকি হাসল। প্রদীপের শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, নিমু রাত জেগে কাজ করতে হবে কিন্তু। খুব আরজেন্ট—

সোনাটাকে গলিয়ে নিল ছোটন। আংটির ছাঁচে ঢালবার আগে খুব চাপা গলায় **বলল,** নিমু পান দিতে হবে রে— **বের কর** তামা— দাগণীর গলিয়ে নিয়ে আয়—

—কতটা পরিমাণ দেব?

—দে এক আনি—

—সর্ব্বনাশ হবে ছোটনদা—ছ আনির আংটিতে এক আনি খাদ! অত পান দিও না—দিও না—

কঠোর চোখে তাকাল ছোটন। আর একটিও কথা না বলে নিমু তামা গলাতে সুরু করল।

পান তাকে দিতেই হবে। যতটা পারবে—সে দেবে। কেন দেবে না? তার কাঁচের ঝকমকে শো কেস নেই। রেডীমেড মাল নেই—তাই তারই খরিদ্দাররা অন্য দোকানে গিয়ে মাল কিনে চলে যাচ্ছে। নিওন লাইট চাই। বহু মূল্য অলংকার দিয়ে থরে থরে সাজানো শো কেস চাই। চাই চার দেওয়াল জোড়া আয়না। হ্যাঁ। তবে লোক ঠিক আসবে। বাদলার রাতে পুকুরে পোকা যেমন আলোর সামনে ছুটে আসে—এখনকার মানুষের প্রকৃতিও যে ঐ রকম! ইস—তার যদি একটা শো কেস থাকতো, থাকতো হাজার চারেক টাকার মূলধন, তবে সে দেখে নিত কেমন করে পূর্বস্থলী জুয়েলারী তার কাষ্টমার ভাগিয়ে নেয়। অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতায় জ্বলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা। দ্রুত হাতে কাজ করে যায় সে। হু-হু করে হাওয়া আসে। বাতাসে অশ্বারূঢ় ছত্রপতি শিবাজীর ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারটা খড়্‌খড়্ শব্দ করে উড়তে থাকে। সে ভাবল আজ কাজ শেষ করে একবার গুরুদেবের কাছে যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপরে তার এই যে বিশ্বাস, তান্ত্রিক গণৎকারের ওপরে নির্ভরতা তার রিক্ত, আশাহত জীবনের মিথ্যা সান্ত্বনা নয় তো? তার ভয় হল—ভয় হল, সত্যিই সে একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে—ফুরিয়ে যাবে!

কিন্তু যাবো না, যাবো না করেও পুনর্ভবার ওপারে শাল-শিমুলের স্যাঁত-সেঁতে ছায়ায় ঘেরা মহেশবাবুর বাড়ীতে এসে দাঁড়াল।

—কি খবর ছোটন এত রাত্রে?

—আপনি যে বলেছিলেন ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন পড়লে আমার বৃহস্পতি তুঙ্গী হবে। কার্ত্তিক যায় যায়—কোথাও তো উন্নতির কিছু দেখছি না—

অনেকক্ষণ ধরে ছোটনের দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত একটানা শুনে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন মহেশ আচার্য। পুনর্ভবার বুকের ওপর দিয়ে একটা নিশাচর একলা নৌকা ভেসে চলেছে। দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ঝপ-ঝপ।

—ছোটন মরজীবন একটাই। কিন্তু প্রাণের প্রবাহ অনন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে। এই জীবনের পরে যে জীবন আসবে, তার ভেতরে নিশ্চয়ই সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পাবে—

ঘন অন্ধকারে ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে পুনর্ভবার জল। নদীর পাড়ে দাঁড়ালো ছোটন। আকাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে ধূসর ছায়াপথের ভেতরে কোথায়—কোথায় তার এই জীবনের পরের জীবন অপেক্ষা করছে? এই জীবনটা তাহলে এইভাবেই কেটে যাবে!

ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকালে **অজস্র টুকরো টুকরো ঘটনা তার মনে ভীড় করে আসে। সে সব মিলিয়ে তার এই আটত্রিশ বছরের জীবনটাকে একটা বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মত মনে হয়। হ্যাঁ। ঘূর্ণিবাতাসের ঝড়। সেই দুর্য্যোগদিনের**

পথচারী

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যা

চলার নেশায় **চলি পথে পথে** আমি মুস
ঘন তৃণ গালিচায় **পরে কভু বিলাস** শয়ন
কংকর **কন্টক পথে কভু বাস,**—কভু বাল
কভু ঘন পাতা ঢাকা বৃক্ষমূলে শান্তির
কভু নীর ভাসে চোখে, **কভু দীপ্ত** হয়ে ও
কভু নদী কুলুকুলু গাহে গান মোর শ্রা
কভু বা গর্জিয়া ওঠে **ক্ষিপ্ত বায়ু;** সিং
কা

সুকঠিন পাথরের পথে দেয় উত্তুংগের

এরি মাঝে ধীর আর দৃঢ় পদক্ষেপে চলি
কোন্ আশা টেনে লয় সংসারের সুদূর

কভু কেহ কোমল মৃণাল ভুজে দীপ ধ
নিশীথের মায়া মাথা মুখে চোখে,—
আগে

ক্ষণিকের লাগি' মোর দৃঢ় পদ শ্লথ হ
কখন সহসা হেরি সে-আলোক নিভে গে
ফের দেখি সম্মুখে পড়িয়া আছে পথ
এই চলা শেষ হবে কবে কোন মন্দিরের

ভেতরে ভয়, আতংক, কলংক আর মৃত্যু
হয়ে মিশে আছে, আছে উনিশশো
সেই আগ্নেয় দিনের স্মৃতি!

মঞ্জু দেশকে ভালবাসতো। সেও
কিন্তু তার সেই উথাল-পাতাল বয়
নিয়ে মনে কি কোন—

না। নিমু ঠিক বলেছে ভাগ্যটা হি
সত্যিই হিজিবিজি! ভগবানের তৈ
অদৃষ্টের কোন যুক্তি নেই, কোন
তা না হলে পাকশীর বিখ্যাত এ
দালায় নিত্যানন্দ কর্মকারের ছেলের আ
এই সামান্য দোকান খুলে বসার কথা
গঙ্গারামপুরের নিশু ডাক্তারের মত
পয়সায় বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে
ডাক্তার হয়ে বসতে পারতো। আকাশে
উজ্জ্বল ও সুদূর বিস্তৃত জীবন হতে
তার! কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গে
সে সব দুস্বপ্নের মত মনে হয়! কে দ
এই পরিণতির জন্য? দেশ? মঞ্জু! বাব
কেউ না—কেউ না! তার এই ভাগ্যই
নির্জন নদী তীরে দাঁড়িয়ে বন্ধ
মত ছোটন নিজের কপালটা খিমচে ধরল

ছ আনি সোনার আংটির খরিদ্দা
ডেলিভারী নিয়ে গেল। নিমু চাপা গলা
লোকটা যদি খাদ ধরে ফেলে ছোটনদা—

—ছোটনের হাতের মেশানো খাদ
সহজ নয় বুঝলি—তার ছোট ছোট চো
সাপের জিভের মত চিক-চিক করে উঠ

আবার একদিন সেই বিচিত্র লোক
বলল, এই বালা দুটো দিয়ে এককোড়া
হবে তো?

—কেন হবে না স্যার। কি রকম প্যা

—আপনার পছন্দমত করবেন
আরজেন্ট কিন্তু, ভয়ে ভয়ে চারিদিকে

বলল, আমার কথা কাউকে বলবেন না কিন্তু—দ্রুত পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

চাপা গলায় ছোটন বলল, বুঝলি নিমু, সেদিন চুরি দুটোর ওজন কমিয়ে বলেছিলাম। শীগগীর এ দুটো গলিয়ে কিছু সোনা বের করে রাখ—

—ছোটনদা—

যা বলছি কর—

—যদি ধরা পড়ি ছোটনদা—

—আচ্ছা—আচ্ছা ভীতুকে নিয়ে পড়েছি তো। ও'র গবেট এ সব না করলে তুই আমি দুইজনেই যে ডুববো—একটু থেমে কটু তিক্ত গলায় বলল, একটা শো কেস যে করতেই হবে নিমু—

এল কেশবদাস। ছোটন বলল, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের কেরাণীকে চেন না কি হে?

—হ্যাঁ লোকটা অদ্ভুত! নদীর ধারে একা ঘোরে। সব সময় কিসের যেন দুশ্চিন্তা—

—শোন—

কেশবদাসের কানে কানে কি যেন বললে ছোটন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আরো একটা কেস পাওয়া গেল। কাজটা তো কঠিন কিছু নয়। শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার একটু অঙ্গার আর শাগাল দেহের রক্ত—

—তোমাকে পরে খবর দেব

খুব জরুরী অর্ডার। মালসায় আগুন গনগন করছে। দাউ-দাউ করে প্রদীপ জ্বলছে। নিমু নাইট্রিক এ্যাসিড দিয়ে সোনার ময়লা পরিষ্কার করছে। আর ছোটন প্রদীপের শিখার ভেতরে ব্লোপাইপ দিয়ে ফু দিচ্ছে আর নীলাভ আগুনের একটা ঝলক এসে পড়ছে উত্তপ্ত এক টুকরো সোনার ওপরে। দুইজনেই খুব ব্যস্ত।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল এক টুকরো খাবার মুখে নিয়ে একটা পিঁপড়া গর্তের দিকে পালিয়ে চলেছে। সেও কি পাকশীর ষ্টেশন মাস্টারের মেয়ে মঞ্জুকে নিয়ে এ রকম লোভীর মত পালাতে চেয়েছিল? লোভ! না। দূর আকাশের চাঁদ পৃথিবীর বুকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দেয়। ঐ রকম একটা আলো ফেলেছিল মঞ্জু তার সেই আঠারো বছরের কাঁচা মনে। দীর্ঘ ঋজু, ধারালো ঐ মেয়েটার সংগে তার কথা বলতে ভাল লাগতো! আর কিছু নয়।

দেশসেবার কাজে মেতে ছিল তারা দুইজনেই। তখন দেশের বিভিন্ন সহরে বোমা মেরে কালভার্ট উড়িয়ে দিচ্ছে, পোষ্ট অফিস, থানা পুড়িয়ে দিচ্ছে স্বদেশীরা। সেই সময়ে একদিন রাত্রে তাদের স্থানীয় নেতার নির্দেশে পদ্মার পাড়ের গুপ্ত সমিতির পোড়ো বাড়ী থেকে কয়েকটি নিষিদ্ধ জিনিষ তাদের সরকারী কোয়ার্টারের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে যাচ্ছিল মঞ্জু। পই-পই করে বলেছিল মঞ্জু, ছোটনদা। তোমাকে আসতে হবে না। তোমাকে দেখলেই পুলিশ অন্য রকম সন্দেহ করবে—

ঠিক তাই হলো। ষ্টেশন মাষ্টার এস-ডি-ওর পা জড়িয়ে ধরে বলল, ডক্টর কর্মকারের ছেলে আমার মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিল স্যার। আমার মেয়ে দেশের কাজের দ জানে না—অনুগত সরকারী কর্মচারীর মেয়েকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ সেইভাবেই কেস সাজিয়ে ফেলল। শত চেষ্টা করেও পুলিশ মঞ্জুকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে পারেনি। সত্য, নীতি, ধর্ম যেন সতের বছরের মেয়েটির সর্বাঙ্গে জ্যোতিশিখার মত ফুটে থাকতো। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শী মিথ্যা সাক্ষীর জন্য নারীঘটিত কেসের আসামী হয়েই জেলে যেতে হল তাকে! কিন্তু আজও নিখাদ সোনা দেখলেই মনে পড়ে যায় মঞ্জুকে!

সেই ব্রিটিশ আমলের থানা। তার ওপরে আবার স্বদেশীরা তাদের মাথা গরম করে রাখতো। তাই ডাক্তার নিত্যানন্দ কর্মকারকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হল থানা থেকে। ঠাট্টা করেছিলেন অফিসার-ইন-চার্জ—এখুনি আপনার ছেলে মেয়ে ফুসলিয়ে—

কানে আঙ্গুল দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বাবা! জেল থেকে সে আর বাড়ীমুখো হয়নি। দূর সম্বন্ধের এক মাসীর ভরসায় চলে এসেছিল এখানে।

মেসোমশায় এই ব্যবসা করতেন। তিনি

বললেন, আমার সাকরেদী করে কাজ শিখে নাও। হয়ে থেকে জীবন নষ্ট করো না—

জীবনকে গড়বার চেষ্টা করেছে সে। মেসোমশায়ের কাছে থেকে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই দোকান প্রতিষ্ঠা করেছে। এরই ভেতরে বার দুয়েক স্কুল ফাইনাল দিয়েছে। কিন্তু পাশ করতে পারেনি। এদিকে ব্যবসাও জমেনি। যত ঘা খেয়েছে তত বেশী করে গুরুদেব আর খনা-বরাহ-মিহির তাকে আঁকড়ে ধরেছে। সে বুঝতে পারে—বেশ বুঝতে পারে, এগুলো দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু তবু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বই পড়তে ভাল লাগে, ভাল লাগে গুরুদেবের মুখে মরলোকের ওপারে এক সুখী জীবনের কথা শুনতে—

—কিসের [illegible] দেব ছোটনদা, [illegible], মা পেতল?

—পেতলই দে—

বাতাসে ছেঁড়া [illegible] ছবি উড়ছে। ঘরের কোণে কোণে বাঁশের খুঁটির গায়ে মাকড়সার জালগুলো কাঁপছে থর থর করে।

—নিমু যেমন করে হোক টাকা করতে হবে বৈকি। আমি গরীব বলে আমার নিজের লোকেরা পর্যন্ত একবার খোঁজও নেয় না—তাঁর ঘৃণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল ছোটনের। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় তার চোখদুটো যেন চিক চিক করছে—মনে হল নিমুর।

পরদিন কেশবদাস আবার ছুটতে ছুটতে এসে বলল, শোন ছোটন [illegible] ভূতকুমারী ও গোরচনা, এই তিনটি দিয়ে [illegible] করলেও হয়—

—বলছি তো তোমাকে পায় [illegible] দেব।

কানের ঝুমকো তৈরী হয়ে গেল কয়েক-দিনের মধ্যে। সেই রহস্যময় লোকটার পাত্তা নেই। ছোটন বলল নিমুকে, পাবে [illegible] দেখা [illegible] লোকটাকে [illegible] নিয়ে যেতে—

[illegible] দেখতে দেখতে কেটে গেল এক সপ্তাহ। ছোটন ব্যস্ত হয়ে উঠল। একদিন দোকানে [illegible] করে কেশবদাসকে ডেকে এনে বলল, [illegible] কেশবদাস তুমি তৈরী।

—হ্যাঁ সবরকমভাবে। মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্ত করবীর নব আগমনে পরিমাণ শিকড় তুলেছি। তাকে ওং ঐং স্বাহা—এই মন্ত্র সাতবার পড়ে [illegible] করেছি। এখন—

—যাক, চলো তো! দেখি, তোমার কি হয়, আমারই বা কি হয়—

ওরা রাস্তায় নামল। আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আধাকাটা ঘরের সামনে নিমুর সঙ্গে দেখা হল। ছোটন বলল, তুমি তো গল্পের জন্য চরিত্র খুঁজে বেড়াও—রক ডেভেলপমেন্টের কেরাণীকে চেন?

—চিনি না আবার! নোট করা হয়ে গেছে! লোকটা অদ্ভুত ছোটনদা—

—কেন?

—প্রায় দিনই রাতে এই সময় পাওয়ার হাউসের ডায়নামোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, এত জোরে কি করে [illegible] থেকে পায় এত শক্তি তাই দেখি—

[illegible] ছায়া নামল ছোটনের চোখে। কার অর্ডার নিয়েছে? বানির টাকাটা খোয়া না যায়! লোকটার মাথা ঠিক আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

—তোমার সোনার কাকনের মাথায় অনেক ভাল ভাল কেস পেয়েছি।

কিন্তু এবার—

—[illegible] না কেশবদাস।

ওরা থানা ছাড়িয়ে সরকারী ডাক্তারখানা বাঁয়ে রেখে বাগানের জনবিরল নির্জন রাস্তায় পড়ল। কানের কাছে বাতাস গোঁ গোঁ করে গর্জন করছে। ক্যাথলিক মিশনের কাছে একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা একতলা দালানের সামনে দাঁড়ালো ওরা—

—কেউ আছেন না কি বাড়ীতে?

ঝড়ো বাতাসে খোলা দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে আর্তনাদ করে উঠল। কেউ কোন সাড়া দিল না। ওরা স্পষ্ট শুনতে পেল, ঘরের ভেতরে কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে—

—বাড়ীতে কেউ নেই না কি?

কান্নার শব্দ থেমে গেল।

—কে তোমরা বাবা? এক বুড়ী বেরিয়ে এল। সেই দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকারে তার মাথার সাদা চুল, সাদা ভ্রূ দেখে মনে হল যেন [illegible] যুগ থেকে নেমে এসেছে সে।

—[illegible] ছিল। ডেকেছিলাম—

—গয়না! আমার? যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল সেই বুড়ী। চোখমুখ বিকৃত করে বলল, [illegible] ভেঙ্গে বানাতে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ এক জোড়া বালা—

—বালা! সর্বনাশ! নিশ্চয়ই আমার বাক্স থেকে নিয়েছে। তোমরা বালাজোড়া ফিরিয়ে দাও [illegible]। ওর মাথাটা একটু—

—সে বললে কি করে হবে? চুড়ি ভেঙে [illegible] তৈরী করেছি। তার বানি—

—বানি! গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল বুড়ী। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাসের একটানা শব্দে মনে হল যেন মহাপ্রলয় নামছে পৃথিবীর বুকের ওপরে। কান্নায় ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় সে বলল, সব শুনলে বানি চাইতে পারবে না। আমার বৌমার মত সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না। খোকাকে খুব ভালবাসে। খুব যত্নআত্তি করে। কিন্তু ওর [illegible] বৌমা ওকে একটুও পছন্দ করে না— [illegible]। তাই কেমন করে পারে শাড়ি গয়না দিয়ে বৌমার মন পেতে চায়। ঐ এক পাগলামি—সেই যে বৌমা বাপের বাড়ী গিয়ে [illegible] এল, তারপর থেকেই—

—ছিঃ ছিঃ বাইরের লোককে এসব কি বলছেন মা! কৈ দেখি দিন ঝুমকো—

কড়-কড়-কড়াৎ—দূরে কোথায় বাজ পড়ল। কালো পাথরের মত আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। সেই উগ্র সাদা আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল ছোটন। মুহূর্তে তার মাথার ভেতরে অস্থির উন্মত্ত একটা দাপাদাপি সুরু হয়ে গেল। রক ডেভেলপমেন্টের কেরাণীর স্ত্রীর সামনে কেন যেন নিজেকে বড় হীন—বড় ঘৃণ্য মনে হল তার। দুঃখের আঘাতে আঘাতে সে আজ হয়ে গেছে ঠক। কিন্তু শত কষ্টেও তো বিশ বছর

বাংলাদেশে মেঘধ্বনি

পরিমল চক্রবর্তী

বাংলাদেশে মেঘধ্বনি শুনতে শুনতে
দিন কেটে গেল [illegible]
বিবর্ণ আষাঢ়ের ক্লান্ত সন্ধ্যা
মেঘে মেঘে ম্লান হয়ে এলে [illegible]
হৃদয়ের চারিধারে:
কে বা এই বাংলা ছেড়ে দূরে গিয়ে
দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে [illegible]

আমি কিন্তু পারবোনা, স্পষ্ট বলছি,
[illegible] আমার দেশ [illegible]
তোমার মাটিকে ছুঁয়ে:
তোমার হৃদয়ের হাতছানি [illegible]
নিয়ত আমাকে ডাকে।
আমি সেই ডাকে দিশাহারা [illegible]
হয়ে পড়ি, পথে পথে ঘুরে মরি
আত্মভোলা বাউলের মত [illegible]
বাংলাদেশে মেঘধ্বনি শুনতে শুনতে
অতীতের ঘটনার [illegible]
দেহমনে গুমরে মরে:
বিরহের উৎস বলে [illegible]
আমি এই ধ্বনিকেই।
যৌবনের মন্দাকি[illegible]
এই আর্ত ধ্বনি শুনে স্বপন খোঁ[illegible]
খোঁজে [illegible]

যেখানেই চলে যাও,
পৃথিবীর যে-কোনো প্রা[illegible]
এই শব্দ শুনতে পাবে
হৃদয়ের কান পেতে [illegible]
এই মেঘধ্বনি শুনে প্রবাসের ধূধূ মরু[illegible]
অনায়াসে পার হয়ে আসতে পারো
বাংলাদেশে—স্মৃতিদীর্ণ ঘ[illegible]

আগের নিখাদ সোনার সেই অত্যুজ্জ্বল দ[illegible] এতটুকু ম্লান হয়নি—তাহলে কি জীবনে[illegible] ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ দ[illegible] অগ্রাহ্য করেও সত্য ও নীতির পথে চলতে [illegible] সেই ভিত্তিভূমিই সে হারিয়ে ফে[illegible] অন্ধকারে এক পা এক পা করে পিছু [illegible] দাঁতে বিড় বিড় করে ছোটন বলল— ফিরিয়ে দেব—ঝুমকো দিতে পারবো পারবো না—

—করলে কি ছোটন, তোমার কথায় এত ভেবে বশীকরণের কবচ তৈরী কর[illegible] এলাম—দু'পয়সা পাবো বলে—

কেশবদাসের কথা শুনতে পেল না [illegible] সে তখন মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় ক[illegible] পাড়ের রাস্তা ছাড়িয়ে দোকানের দিকে[illegible] দ্রুত না যেয়ে যে উপায় নেই। এখুনি [illegible] করে ডেকে উঠবে মেঘ। বিদ্যুৎ চ[illegible] আর—

সেই আলোয় যদি আজকের এ[illegible] ভেতরে বহুদিন আগের আদর্শবাদী [illegible] দেখতে পায়। সেটা—আরও দুঃখের। লজ্জার।

ভাড়াটের আনাগোনা শুরু হয়। আয়েঙ্গারকে পছন্দ করেন সমরেশবাবু। নির্ঝঞ্ঝাট একেলা মানুষ। বিয়েসাদি করেনি। চল্লিশের ধারে কাছে বয়েস। বড় একটা কোম্পানীর চাকুরিয়া।

গিন্নী খুত্‌খুত্‌ করেন। ঘরে দুটো সোমত্ত মেয়ে। এই বুড়োটাকে ভাড়া না দিলে কি হয় না? সমরেশবাবু ঠাট্টা করে বলেন, ওদের জন্য তো ভাবনা নয়, ভয় তোমাকে নিয়ে, একটু সাবধানে থেকো। ফুঁসে ওঠেন গিন্নী। রেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

কিন্তু একেবারে অন্য ধাতের মানুষ আয়েঙ্গার। কালো ছিপছিপে গড়ন, একমাথা টাক। অফিসের সময়টুকু বাদে বাড়িতে ফাইল-পত্রে মুখ গুঁজে বসে থাকে। সমস্ত দোতলাটা ভাড়া নিয়েছে। তিনটে ঘর খাঁ খাঁ করে। একটা ঘরে নিজের নিরাভরণ সংসার। দ্বিতীয় একটি লোক পর্যন্ত নেই। নিজের হাতেই রান্না করে, ঘর ঝাঁট দেয়। জামাকাপড় ধুয়ে নেয়।

ভাড়াটেকে দেখে আশ্বস্ত হলেন সমরেশ গিন্নী। মেয়েদের দিকে ভাল করে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ।

সমরেশবাবুর বড় দুই মেয়ে নাক সিঁটকে বলে, বাবা একটা ভাড়াটে জুটিয়েছেন বটে, দুনিয়ায় যেন আর মানুষ ছিল না।......

দিদিদের মত কিন্তু নয় অনু। দশ বছরের মেয়ে। সহজ সরল আপনভোলা। যখন তখন সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে যায়। আয়েঙ্গারের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছে। দোতলার একটা ঘর পুতুল দিয়ে সাজিয়েছে। সেদিন একটা দানাদার ভাগ করে নির্ভয়ে আধখানা আয়েঙ্গারকে এনে দেয়। আর অমন গুমরো মুখো আয়েঙ্গারই বা কেমন? অনুর হাত থেকে দানাদারের টুকরোটুকু কোঁৎ করে গিলে নিয়ে হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে। এক সময় হাসি থামিয়ে বলে, হঠাৎ এ খাওয়াবার মানে কি ভাই?

গম্ভীর কন্ঠে অনু বলে, আমার এক মেয়ের বিয়ে হ'ল কিনা তাই।

—আর ক'মেয়ে আছে তোমার?

—দু'মেয়ে।

—আমারও দুই ছেলে আছে। আমার ছেলেদের সঙ্গে তোমার মেয়েদের বিয়ে দেবে।

পাকা গিন্নীর মত অনু উত্তর দেয়। বলে, এখন আর পারবনা। সবে এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠলুম। কত খরচ, কত ঝামেলা।

—মেয়ে দেখে পছন্দ হলে, তোমার কিছুছু খরচ করতে হবে না।

—মেয়েরা আমার খুব সুন্দর।

—সুন্দর না হাতি।

—কি বললে? দু'হাত কোমরে দিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ায় অনু। পিঠের উপর বেণী দুটো লটপট নড়ে ওঠে। মুহূর্তকাল আয়েঙ্গারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দুমদাম পা ফেলে চলে যায়। নিয়ে আসে একটা জুতোর বাক্স। আয়েঙ্গারের ফাইলপত্রের উপর সশব্দে বাক্সটা রেখে বলে, দেখো—

আয়েঙ্গার বাক্সের ভেতর থেকে ঝলমলে পোষাক পরনে দুটি মেয়ে পুতুল তুলে নেয়। ভাল করে দেখে নিয়ে খুশিকন্ঠে বলে, মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, কবে বিয়ের তারিখ বলো—

—তোমার ছেলেরা কোথায়, ওদের আগে দেখাও, আমার ছেলে পছন্দ হলে তবে ত—

—বটে...বটে, বেশ, বিকেলেই নিয়ে আসব ছেলেদের।

সেদিন অফিস ফেরৎ আয়েঙ্গার বহু দোকান ঘুরে দুটো সুন্দর পুরুষ পুতুল নিয়ে আসে। অনু পুতুল দুটি দেখে মহাখুশি। বিয়ের কথা পাকা হতে দেরী হয় না। তার অনুর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে তাজ্জব বনে যায় দুই দিদি আর মা বাবা। প্রচুর খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সমরেশবাবু আয়েঙ্গারকে অনুযোগ করেন, এসব কি করেছেন মিঃ আয়েঙ্গার? ও পাগলীটাকে অত প্রশ্রয় দেবেন না।

—আজ্ঞে প্রশ্রয় আর কোথায়, তবে মেয়ে বিয়ের খরচটা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কিনা।

আয়েঙ্গারের বলবার ধরণে সকলের হাসি পায়। দিদিরা ফিস ফিস করে, মাঝে মাঝে এমন হলে মন্দ হয়না।

সেদিনের সেই পুতুল বিয়ের অন্তরঙ্গতায় দিনে দিনে দানা পড়ে। অমন উৎসাহী নির্বিবাদী শ্রোতা পেয়ে অনুর বকবকানি আর জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। আয়েঙ্গার কাকুকে নইলে অনুর কথা শোনবার লোক কোথায় দুনিয়ায়? পুতুলের সংসার ত আছেই, তাছাড়া অনুর জন্য প্রতি মাসে দেশ বিদেশের একগাদা বই কিনে আনে আয়েঙ্গার। তার উপর এখানে ওখানে বেড়ানো এবং উপহারে অনুর দিন কাটে মহাফূর্তিতে।

সমরেশ গিন্নী খুত্‌খুত্‌ করেন। দিলেই নিতে হবে এর কি মানে? এক সময় ডেকে নিষেধ করে দিও। ঘাড় নাড়েন সমরেশবাবু। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে বলেন, কি করে মানা করি ভদ্রলোককে। বিয়েসাদি করেনি। স্নেহ-ভালবাসার ছোঁয়া পায়নি। এতদিনে অনুকে পেয়ে ওর সুপ্ত স্নেহ জেগে উঠেছে। ওর এ সস্নেহ মনে আঘাত দেওয়া কি উচিত?

যুক্তিটা সমরেশগিন্নী অস্বীকার করতে পারেন না। ধীরে অতি ধীরে একটি একটি করে ছয়টি বছর ঘুরে যায়। এর মধ্যে বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ ছয় বছরের ঘনিষ্ঠতায় আয়েঙ্গার ওদের এখন আপনজন। স্কুল ফাইনালের ছাত্রী অনু কিন্তু এখনও সেই খুকিটি। যদিও পুতুল খেলা বন্ধ হয়েছে, দৌরাত্ম্য কমেনি। নতুন রান্না শিখেছে। ফলে আয়েঙ্গারকে রান্নার পাট বাড়াতে হয়েছে। অনুর ফর্দ নিয়ে যখন তখন তাকে দৌড়াতে হয় বাজারে দোকানে। মহা উৎসাহে অনু রান্না করে নতুন নতুন খাবার। প্লেটে সাজিয়ে কাকুর সামনে এনে ধরে। কখনও প্রশংসার প্রত্যাশায় সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কখনও অতি উৎসাহে কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে খাওয়া দেখে। আবার কখন ঘরময় ঘুরে ঘুরে খেতে খেতে নিজের রান্নার প্রশংসায় নিজেই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

আয়েঙ্গার ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে বিষম খায়। এক হাতে প্লেট অন্য হাতে চামচ। দু'হাত নাচিয়ে পা তুলে তুলে অনু হাঁটছে আর খাচ্ছে। ফ্রক-চাপা উদ্ধত যৌবন বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে। ষোড়শীর দেহে বান ডেকেছে। অতি দ্রুত অনু পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এ উজ্জ্বল যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন নেশা লাগে। চোখ ফিরিয়ে নেয় আয়েঙ্গার। একটু সতর্ক হতে হবে। একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। ওকে আর সন্ধ্যে থেকে রাত্ত দশটা পর্যন্ত পড়ার জন্য আটকে রাখা চলবে না। মেয়ে বড় হয়েছে, এ মানতেই হবে—

হঠাৎ চমকে ওঠে আয়েঙ্গার। এ সব কি ভাবছে সে। এত নীচ মন তার! অনুকে ভয়! এযে পাগলের প্রলাপ। শেষ পর্যন্ত কি মাথা খারাপ হতে চলেছে! ছি.........ছি.........

অনুর কিন্তু এসব দিকে খেয়াল নেই। সামনে স্কুল ফাইন্যাল। ভাল করতে পারলে জব্বর রকম একটা উপহারের প্রতিশ্রুতি মিলেছে কাকুর কাছ থেকে। একটা ইলেকট্রিক গিটার, কম কথা তো নয়। পড়া আর পড়া। নিজেও খাটছে, আয়েঙ্গারকেও খাটিয়ে নিচ্ছে।

পরীক্ষার ডামাডোলে আয়েঙ্গার অনেক সহজ হয়ে যায়। যে ভয় মাথা চাড়া দিয়েছিল নিভৃতে মনের অন্তস্তলে, ঝিমিয়ে যায় সে ভয়।

পরীক্ষা শেষে অনু বোনদের বাড়ী বেড়াতে যায়। একা আয়েঙ্গার। দোতলার ঘরগুলিতে ঝাঁট পড়ে না। জানালা খোলা হয় না। হোটেলেই খাবার ঝামেলা চুকিয়ে আসে। রাত্তিরে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে বিছানায়। ক্লান্তি। নিদারুণ ক্লান্ত জীবন।

একেবারে পরীক্ষা পাশের খবর নিয়ে ফিরে আসে অনু। বেশ ভাল ভাবেই পাশ করেছে। আয়েঙ্গারকে কথা রাখতে হয়। গিটার পেয়েছে অনু। গিটার শেখায় আর কলেজ যাওয়ায় দেখা যায় ওর সমান উৎসাহ। দিন কয়েকের চেষ্টাতেই সে কয়েকটা রবীন্দ্র সংগীত তুলে নেয়। কাকুর বিছানায় গ্যাট্ হয়ে বসে মধুর ঝঙ্কার তোলে তারে। সুরের বন্যায় ভেসে যায় ঘর। গিটার কাঁদে। সুরে সুরে কান্না ঝরে পড়ে। আধো আলো আধো আঁধারে স্বপ্ন দেখে আয়েঙ্গার। অনুকে মনে হয় স্বপ্নকল্প মায়া—

অনেকদিন অনু আর রান্না করে না। সময় কোথায় ওর। কলেজ আর গিটার নিয়েই পাগল। হঠাৎ সেদিনের মেঘ মেঘ রবিবারে ওর মনে পড়ে আজ রান্না করতেই হবে। কাকুকে নতুন কিছু রেঁধে খাওয়াতেই হবে।

দৌড়ঝাঁপ আর হৈ-হল্লার শেষে অনু রান্না শেষ করে। খেতে বসে আয়েঙ্গার। টেবিলে থরে থরে খাবার সাজানো। অনু বকবক করছে, আর আয়েঙ্গারের কাঁধের উপর ঝুঁকে তার খাবার তদারকী করছে। কিন্তু খেতে পারে না আয়েঙ্গার। সর্ব অঙ্গে রক্তে রক্তে কেমন একটা হিমশীতল স্রোত ওঠানামা করে। কেমন একটা সংকোচন। কেমন একটা অনুভূতির অনুরণন।

মেয়েটার বুদ্ধি আর হবেনা। এখনও কি খুকিটিই আছে? ওর সুডৌল কুচযুগল আয়েঙ্গারের কাঁধে চেপে আছে। আয়েঙ্গার ওকে সরিয়ে দিতেও পারে না, নিজেও নড়ে বসতে পারে না। শুধু থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে ওঠে সর্বদেহ।

—খাচ্ছোনা যে, আজ আমার রান্না ভাল হয়নি বুঝি। অনু কাঁধের উপর আরও একটু ঝুঁকে পড়ে।

অনুর প্রশ্নে নিজের মনের মধ্যে চমকে [illegible] আমার মধ্যের দিকে তাকাতেও সাহস হয়না। প্রাণপণে নিজেকে সামলিয়ে নেয়। সরল বালিকা ভাল রাঁধতে পারেনি ভেবে দুঃখ পাচ্ছে। প্লেটের উপর আরও ঝুঁকে পড়ে আয়েঙ্গার। হাসবার চেষ্টা করে বলে, দূর পাগলী, রান্না খুব ভাল হয়েছে। অফিসে বড় কাজের চাপ পড়েছে কিনা, সে সব কথাই ভাবছিলাম—

আশ্বস্ত হয় অনু। সরে যায় আয়েঙ্গারের কাঁধের উপর থেকে। এক প্লেট খাবার নিয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে খেতে থাকে। আজ আর ওর দিকে তাকাতে চায় না আয়েঙ্গার। কিন্তু না তাকিয়েও পারে না। একটা সর্বনাশা আকাঙ্ক্ষা। একটা দুর্নিবার শক্তির কাছে পরাভব মানে আয়েঙ্গার। দৃষ্টির রং বদলায়। পদ্মকলি কন্যা পাপড়ি মেলে হাসে, কিন্তু আয়েঙ্গার ভয়ে চোখ বোজে। শিউরে ওঠে। সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারে না আয়েঙ্গার। একটি অনাথ মিশন স্কুলের ছাত্রের বুভুক্ষু হৃদয়ে এ বাঙ্গালী পরিবারটি নতুন এক দুনিয়ার দ্বার খুলে দিয়েছিল। বালিকা অনু তার হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ আর ভালবাসা নিয়ে কেন বালিকাই থেকে যাক না। কি দরকার ওর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবার?

আয়েঙ্গার বড় চঞ্চল। বড় অস্থির। অফিসের কাজ হঠাৎ বেড়ে যায়। সেই সকালে অফিসে ছোটে, রাত দুপুরে চোরের মত পা টিপে টিপে ফিরে আসে। ছুটির দিনে রবিবারের প্রভাতকে অভিশাপ দেয় আয়েঙ্গার। অফিস নেই, সমস্ত দিনটা কি করে কাটবে। বাইরের ঝলমলে সোনারোদের দিকে তাকিয়ে মন বিমর্ষ হয়ে যায়, মুষড়ে পড়ে। হঠাৎ অনু এসে টিপ করে প্রণাম করে। বিস্ময়ে আয়েঙ্গার তাকায় অনুর দিকে। লাল টকটকে একটা শাড়ি পরে এসেছে অনু।

—কি ব্যাপার! বিস্ময়ে প্রশ্ন করে আয়েঙ্গার। অঞ্চল কোণে গেরো জড়ায় অনু। মুখচোখ ওর লাল হয়ে উঠেছে। মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, মা নতুন শাড়ি এনে দিয়েছেন। আজ থেকে শাড়ি পরতে হবে। মা বললেন, গুরুজনদের প্রণাম করে এসো—

আয়েঙ্গারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অনুর পরিবর্তন নজরে পড়ে। শাড়ি পরা অনুকে কত বড় দেখাচ্ছে। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না, বার বার টেনে দিচ্ছে বুকের কাপড়। নিজের সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে।

আয়েঙ্গারের দৃষ্টির সম্মুখে শুধু একটা কালো পর্দা, দুর্ভেদ্য একটা শাড়ির পর্দা দুলতে থাকে।

—যাচ্ছি......

মনে হয় কতদূর থেকে অনুর গলা ভেসে আসে। আয়েঙ্গার বোবা দৃষ্টি মেলে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। অনু চলে যায়।

হাহাকার করে ওঠে বুকের ভেতরটা। এ শাড়ির পর্দা সরিয়ে অনু আর ছুটে আসবে না। আব্দার তুলবে না। ঝগড়া কোন্দলে, গল্পে আর গানে ব্যতিব্যস্ত করবে না। অনু বড় হয়েছে, অনু যে শাড়ি পরেছে—

সত্যি এরপর থেকে অনু আর যখন তখন উপরে উঠে আসে না। সন্ধ্যের পর ঘন্টাখানেকের জন্য ইংরেজী পাঠটুকু নেবার জন্য আ[illegible] কিন্তু বই উল্টে রেখে আর গল্প করেনা, [illegible] খিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়েনা।

এমন কেন হ'ল! জীবনের চল্লিশটি [illegible] একাকী কাটিয়ে এসে আজ কেন এমন নিঃ[illegible] মনে হয় নিজেকে! অনু তো পরের মেয়ে। চলে যাবেই। এতো জানা কথা। তবু মন [illegible] মানে না! নীচ থেকে অনুর কণ্ঠস্বর [illegible] এলে, ওর একটু হাসি কানে গেলে রক্তের [illegible] কেন অমন করে ওঠে!

মনের গহনে ডুব দিতে গিয়ে আঁতকে আয়েঙ্গার। শিউরে ওঠে। যা ছিল ভয়, আ[illegible] ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বিশ্রী একটা সত্য উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। মরমে মরে যায় আয়েঙ[illegible] লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। অনুর যৌবনটাই [illegible] ছাপিয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে ওঠে একটা সুদৃঢ় সঙ্কল্প। আর নয়, প[illegible] হবে। এ লজ্জা অনুকে জানতে দেওয়া [illegible] কিছুতেই।

হঠাৎ আয়েঙ্গারের বাড়ি ছেড়ে যাবার কারণই কেউ হদিশ করতে পারেনা। আয়েঙ্গার।

এখন

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত হৃদয় আর সমস্ত প্রাণের শক্তি দিয়ে
বারবার করাঘাত করে এই পীত বন্ধ দ্বারে
এখন অনেক শান্ত আমি। যা' জেনেছি
অন্ধকারে
তা' এখন অন্তরালে আলো হয়ে জ্বলে।
তাই নিয়ে
এখন আমার সব দেখা। আমি কুয়াশা তাড়িয়ে
এখন প্রশান্ত মনে চেয়ে চেয়ে দেখি খরধারে
সময়ের নদী বয়ে যায়। দেখি তার দুই পারে
গরু চরে, মেষ চরে, চাষী যায় কাঁধে
হাল নিয়ে।

দেখি আলো আঁধারের সাদা-কালো
বিচিত্র [illegible]
চিহ্নিত অঞ্চল জুড়ে পশু-পাখি কীট[illegible]

নিজের প্রাকৃত বেশে কিংবা ছদ্মবেশে [illegible]
ভেসে থেকে অবশেষে অশেষ প্রবাহে [illegible]বে যায়
এই পুরাতন দৃশ্য নতুন সত্তার আলো-[illegible]
দেখে দেখে আমি যেন আরও শান্ত
হয়েছি এখন।।

চিঠি

গল্প

শ্রীপ্রান্তিক
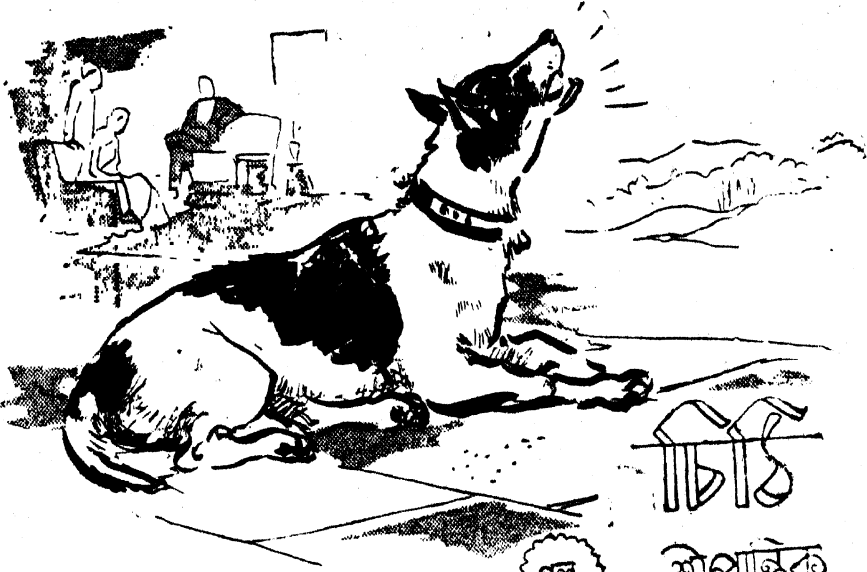
এ চিঠি তোমায় লিখছি, অতীত থেকে নিজেকে আগলে সরিয়ে রাখতে পারছি না—তাই। তুমি আছ বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনের আড়ালে—আর আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রদীপ জ্বালি স্মৃতি মন্দিরের দুয়ারে। সে আলো যেন দীপ্ত করে তোমায়—নিঃশেষ করে আমার অস্তিত্ব।

ভাবছিলাম সেদিনের কথা—কে যেন বলে উঠলো 'পুলিশে চলো'—। সমস্ত গুলিয়ে গেল। প্রতিবাদ করতে গেলুম কঠিনভাবে—পারলাম না। অপরাধী হলাম আমি। কিন্তু তুমি রইলে না নিশ্চুপ, সাপের ফণার মত গর্জে উঠে দাঁড়ালে। মানুষের অবিশ্বাস দূর হলো, সেদিন ভাবলাম তুমি হ'লে আমার।

মনে পড়ছে আর একটা দিনের কথা। সহরের বুকে নেমেছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। নিস্তেজ হয়ে এসেছে মানুষের পথ চলা। চারিধারে শুধু জল আর জল। আমার সঙ্গে তোমার দেখা করতেই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অস্বীকার করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ রাস্তার পাশে—ভেসে যাচ্ছে সারা অঙ্গ। আমি পারলাম না পৌঁছুতে তোমার কাছে—অপেক্ষার সময় পার করে তুমি ফিরে গেলে। অভিযোগ নিয়ে নয়, শুধু ভয়—যদি আমার কোন অমঙ্গল হয়ে থাকে। আমি যখন স্বীকার করলাম আমার অপরাধ, তুমি অভিমানে ভেঙে পড়লে। তাহলে অমঙ্গল নয়—শুধুই অবহেলা! দুর্যোগের অছিলা!

সহরের অগণিত জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে এমনি কত স্মৃতি।

তুমি চলে গেলে আমার দাবীর বাইরে—রইলাম আমি। তুমি পেয়েছ সংসার—পেয়েছ সন্তান। আমি পেয়েছি স্মৃতি—পেয়েছি দুঃস্বপ্ন। নিঃশেষে ক্ষয় হবার ভেতরেও একটা আকর্ষণ আছে—আছে কিছুটা গর্ব। সময় সময় পারি না এই গর্বের ভার বইতে—তাই পালিয়ে যাই যেখানে হোক। আবার ফিরে আসি সহরের মাঝে—যেখানে মাটির সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছ তুমি। আর আমার হারানো অনেকগুলো অনুভূতি......।

এমনি একদিন পালিয়ে গেছলাম একটা ছোট্ট সহরে—একটা জংলীর সঙ্গে দেখলাম সুন্দর একটা কুকুর। চোখ ফেরানো যায় না এত রূপ তার। সাথীরা ছিনিয়ে নিতে চাইলো ঐ সুন্দর জীবটাকে জংলীর কাছ থেকে। জংলী পারলো না তাকে আরও কাছে রাখতে—অর্থের কাছে পরাভূত হলো। সাথীরা পেলো কুকুর—জংলীর হ'লো অর্থ। কুকুরের জংলিত্ব সংস্কার করার জন্য এলো পাউডার—এলো ব্রাশ। মিষ্টি হাতে পরিষ্কার হ'লো তার সারা অঙ্গ, আয়োজন হল ভাল ভাল খাওয়ার—বিছানা এলো নরম। অবলার সারা চোখে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। একই ভাষায় তার সেই করুণ ক্রন্দন, 'ফিরিয়ে দাও আমার আমার আপনজনের কাছে—চাই না প্রাচুর্য—চাই না ঐশ্বর্য।' শুধু একটানা এক ভাষা। রাতের অন্ধকারে সে কাঁদে—দিনের আলোয় সে প্রতিবাদ করে। আমি দূরে থেকে তাকে দেখি আর প্রণাম করি—কোন আকর্ষণই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সেই জংলীকে তার চাই—তার কাছেই তার অনাড়ম্বর শান্তি। দিন যায়, রাত যায়। সেই একই কথা, একই ক্রন্দন।—'মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—দাও শান্তি।' আমি দেখি আর হতবাক হয়ে ভাবি, কি সুন্দর! সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে বলতে চায়—'ওরে তোরা ফিরিয়ে দে—এমনি করে হত্যা করিস না একটা পবিত্র সত্তাকে।'

তার ক্রন্দন পেঁছয় না কারো বুকের তলায়। সময় আরও এগিয়ে যায়। চিৎকার কখন থেমে গেছে। চুপ করে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে সে বসে থাকে মিষ্টি হাতের স্পর্শ পাবার লোভে। চোখভরা তৃপ্তি। সে সহজ হয়ে উঠেছে সুন্দর পরিবেশের মাঝে। ও যেন জন্মেছিল এমনিভাবে বেঁচে থাকার জন্যে। আমি ভাবি সেই জংলীটার কথা—সেও কি এমনিভাবে সহজ হয়ে উঠেছে? চলার পথে ফিরে তাকায় না—ঘুমের মাঝে চমকে ওঠে না, কি যেন তার ছিল—কি যেন তার হারিয়ে গেছে—এই কথা ভেবে?

তুমি কি বলো? ঐ কুকুরটা কি আর কোনদিন জংলীটার কথা ভাববে না, আর সেই জংলীটা—

ক্ষমা করো—অসংযমী হয়ে পড়েছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তারকার নীচে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

চেয়ে থাকো, দেখনা কখনো।
একথা নিশ্চিত জেনো, যার দিকে চেয়ে থাকো
তাকে তুমি দেখনি কখনো।

আলো দেয়, সেই সূর্য ছায়া দেয়,
আলো যা চোখের সামনে
পিছনে তা ছায়া,
মাঝখানে তুমি কিংবা আরো কেউ।

আমরা মৃত্যুর মধ্যে,
মৃত্যু আছে তাই বেঁচে আছি,
শুধু তাই।
আলো হয়ে বেঁচে আছি ছায়ার শরীরে।
আছি তাই নানা ছল না-থাকার।

এই এক বিপরীত রীতি
শব্দ ঢেউ নিঃশব্দের জলে
সমস্ত গভীর ইচ্ছা
অনীপ্সার দেয়ালে চিত্রিত।
তোমার বাইরে তুমি, দূরে তুমি।

ছায়া ছেড়ে, অবয়ব থেকে দূরে
যেখানে কখনো তুমি ছোঁবে না আকাশ
সেইখানে
আকাশ তোমাকে ছোঁবে।
আমরা কোথায় আছি?
সন্ধ্যার নির্জনে
কপালের টীপের মতন
ছোট এক তারকার নীচে
আত্মার ছায়ার নীচে যেন।
এই যে আসন্ন রাত্রি একি দিন?
আমরা কি পথ হেঁটে চলে যাবো
কাল থেকে কালে?
যে পথ তোমার মতো সুন্দর নির্জন
তোমার পথের মতো?
যে পথ তোমার পথ ধ'রে
রাত্রিতে পৌঁছাবে গিয়ে
একেবারে উজ্জ্বল সকালে?
কাল থেকে কাল থেকে কাল থেকে।

সংকেত

করুণাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথা গান কোথা বীণার মীড় ও মূর্ছনা
কোথা ছবি জাগে রূপের মাঝারে ব্যঞ্জনা
কোথা কাব্যের অবারিত স্রোতে গুঞ্জনা
কোথা সাধকের দেবপদে পূজো অর্চনা।
কোথা অবারিত হৃদয়ানন্দ হাসি
দিকে দিকে জাগে মরণের শুধু ধ্বনি
জীবন কুসুম যাহা ছিল নাকো বাসি
হয়ে গেছে সে যে তাই শুধু আজ গণি।
কী চোখে দেখেছি ধরণীর নব রূপ
মোর যৌবনে দীপ্ত আপন রাগে
আজ সুরভির পড়ে ছাই হ'ল ধূপ
মাটি পরে আজ তাহারই মিলন জাগে।
কোথা গেল হায় দখিনা বাতাস খেলা
নিভে যায় বুঝি শেষ প্রহরের বাতি
ভব হাটে বুঝি সাঙ্গ যতেক মেলা
আসিতেছে ধেয়ে ওই মহাকাল রাতি।।

কালো মেয়ে

চিত্রিতা দেবী

দিন কেটে যায় যেমন কারে,
চলেছে আর পাঁচজনের।

মনের কথা মনেই জেগে
মনেই ডুবে যায়।—
তোমার সাথে মিল রয়েছে,
আমার পোড়া মনের,
এমন কথা কেমন করে,
তোমায় বলি হায়।—
শুনতে যদি চাইতে তুমি,
নিজেই শুনে নিতে,
মনের কথা টেনে আনা—
তোমার একটা বাই,
বাজে কথাও মাঝে মাঝে
গভীর সুরে কইতে।

গান গাইতে নিজেই বলে,
ভুলতে না ফের হাই।
ছুতো করে একটু আমার
চোখে-চোখে চাইতে,
ভুলে ছাতা ফেলে গিয়ে
না হয় ফিরে আসতে।

সিনেমাতে বেছে বেছে
আমার পাশেই রইতে।—
আমার খাঁদা নাকই আরো
একটু ভালো বাসতে।
তাইতো তোমায় কোনমতেই
কিছুই বলি না।
শুনলে পাছে মনে মনে
তুমি একটু হাসো।

কুলুপ আঁটা মনটা আমার মোটেই খুলি না।
ডোণ্ট কেয়ার, ভালো আমায় বাসো
কি নাই বাসো।—
তোমার কথায় কাজ কি আমার।
আমি তোমারি।—
তুমি আমায় চেন বা নাই চেন।—
দিনে-রাতে তুমিই আমার—মানস বিহারী।

এমন কথা জানো বা নাই জানো।—
তবু মনে সন্দেহ হয়, একটু একটু যেন।

আমার ছায়া তোমার চোখে পড়েছে,
নইলে তুমি ইচ্ছে করে আমায় এড়াও কেন?
আমারো মন, তোমার মনে, একটু যেন দুলেছে।

কিন্তু আমি কেমন করে,
তোমায় কিছু বলি?
বলতে হলে তোমার বলাই ভালো।

তবু যদি না বোঝ তো
ফিরেই যাব চলি।

কিছু যদি না বল তো—
বুঝব আমি কালো।

অন্যস্মৃতি

* অবিনাশ রায় *

অসংখ্য ছায়ারা সব আমার ঘরের চারপাশে
প্রত্যহ-ই ভীড় করে, দিনান্তের বেলা পড়ে গেলে
অবিস্মরণীয় গন্ধ কোন দূরে চন্দন বনের
নিঃশ্বাসে জাগায় স্মৃতি, আলো কাঁপা
মনের আকাশে
সমস্ত দিনের রাঙা-রঙ মেখে সূর্য যায় হেলে
দ্বৈপায়ন হ্রদে যেন পদ্ম পাতা দুলে
উঠছে ফের।
ওপারে প্রান্তর জুড়ে সঞ্চারিত
আঁধার নিরালা—
ভালবাসা ঐখানে স্থির হয়ে আছে অন্তহীন
এ যেন প্রাচীন পট মনে মনে ঝাপ্সা রেখা তার
কালচক্রে মুছে যাবে সব চিহ্ন,
সূচীমুখ জ্বালা
সাপের বিষের মত অঙ্গাঙ্গী জ্বালাবে
রাত্রিদিন
তখন শূন্যতা শুধু ডুব জলে হারিয়ে যাবার।
জীবন-যৌবন-স্বপ্নে স্বর্গত তৃষ্ণার দাহ, সুখ—
দেখবে দেয়ালে ছবি ঈশ্বরের, তার পাশে
প্রেয়সীর মুখ।
অসংখ্য ছায়ারা সব আমার ঘরের চারপাশে।

ওরা আজো বর্বর

নির্মল দত্ত

আদিম যুগ নেই:
তবু মানুষ আজো বর্বর। ক্ষুধিত লালসা সেই
ব্যঙ্গ করে, সভ্যতা এই বিংশ শতাব্দীর;
শাণিত অস্ত্রের অভিযান
শুধু হিংস্র অভিযাত্রীর।
মানবতা আজো লাঞ্ছিত।
ব্যথিতের কান্নার ধ্বনি—
নিপীড়িতের হাহাকার, আজো কেন শুনি?
অত্যাচারীর অট্টহাস্যে মুখর সে ঘৃণ্যতা।
রক্তলোলুপ নরখাদকের বীভৎস নগ্নতা—
আজো কেন দেখি। প্রতিকার তার,
প্রতিকার কি নেই? বার বার
শুধু মরিবে মানুষ ব্যর্থ বিচার চেয়ে!
কি হবে সে সভ্যতার নিষ্ফল গান গেয়ে?
উদ্ধত সে বিজয়-নিশান বৃথাই আজিকে ওড়ে।
গড়ুক নতুন পৃথিবী যতই নতুন ক'রে,—
যতই করুক না এই মাটিরে উর্বর,
তবু ওরা আজো বর্বর।

উজবেকিস্তানের মেয়ে

আমিয়া সরকার

মধ্য এশিয়ার মধ্য ভাগে উজবেক প্রজাতন্ত্র। এর দক্ষিণ সীমান্ত ছুঁয়েছে আফগানিস্তানকে। সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোনও দেশের সীমানা উজবেকিস্তানের মত এত বিক্ষিপ্ত নয়। বিভিন্ন পাহাড় থেকে নেমে আসা ও নানান্ বয়ে যাওয়া নদীর চার পাশে বহু প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছে মরুদ্যান। আর সেই মরুদ্যানের পাশেই উজবেকেরা বাস করে। বিরাট অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তাসখন্দ, মোরঘানা, জুরাফশান, কশকেদারিয়া, সুরখানদারিয়া, খরেজম্ মরুদ্যান, শুকনো স্তেপা মরুভূমি, আর পাহাড়ের দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের একমাত্র যোগসূত্র হলো রাস্তা, আর রেল লাইন।

সমগ্র উজবেকিস্তানের আয়তন ৪,০৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০০ (আশী লক্ষ)। উজবেকিস্তানের আবহাওয়ায় মধ্য এশিয়ার বৈশিষ্ট্য। এ দেশের প্রধান ফসল হলো তুলো। ও দেশে তুলোকে ওরা "সাদা সোনা" বলে থাকে।

আজকে এই উজবেক মেয়েদের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মেয়েরা জনসংখ্যার অর্ধেক। এই অংশকে বাদ দিয়ে যে কোনও মুক্তি আন্দোলন বা নতুন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না, ও যে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণ মিলবে। নানা কুসংস্কার কাটিয়ে, নানা সামাজিক শাসন অনুশাসন পেরিয়ে এবং বহুকালের কৃত্রিম আবরণের জাল ছিঁড়ে দুঃসাহসের সঙ্গে একদিন জার শাসিত লাঞ্ছিত রাশিয়ার মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল। সেই তখনকার রাশিয়ার সাধারণ মেয়েদের সম্বল ছিল জারের অপ্রতিহত শাসন, সামন্তযুগীয় শাসন ব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, ঘরে ঘরে দারিদ্র্য অশিক্ষা বেকার-সমস্যা ও মৃত্যুর পরোয়ানা। জারের রাজত্বে রাশিয়ার মেয়েদেরকে সমস্ত রকম রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। উজবেক মেয়েরাও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ছিল না।

নানা জাতির মানুষ নিয়ে সোভিয়েত দেশের জনসংখ্যা। একশো নব্বই রকম ছোট বড় জাতি সমান অধিকারের ভিত্তিতে সারা সোভিয়েত গণতন্ত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। এরাই হল সোভিয়েত সমাজের প্রাণ এবং তার সমাজতান্ত্রিক নীতির ধারক এবং বাহক।

সোভিয়েটের নীতি যখন নারী মুক্তির বার্তা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তখন তা কোন বিশেষ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, সমস্ত দেশের ছোট বড় প্রতিটি অঞ্চলে তার আলো পৌঁছেছিল। কোনও জায়গায় স্বাধীনতার বাণী অতি সহজেই সমাদর লাভ করেছিল, আবার কোনও জায়গায় তুমুল বাধা বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতার বাণীকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।

প্রাক্ বিপ্লব যুগে উজবেক মেয়েদের ৮।৯ বছর বয়সেই (আমাদের দেশের গৌরীদানের মত) বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ও দেশে সাধারণতঃ পাত্রপক্ষ পণ দিয়ে বিয়ে করত। পরোক্ষে এই বিবাহ প্রথা অর্থের বিনিময়ে মেয়ে কেনারই রূপান্তর। তাদের স্বামীরা তাদেরকে যে কোনও লোকের কাছে গরু-ভেড়ার মত বিক্রী করতে পারত। অনেক সময় স্বামীরা স্ত্রীদেরকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করত। কিন্তু আজ শুধু উজবেকিস্তানে কেন সারা রাশিয়াতে বারবিলাসিনীর দেখা মিলবে না। তাদের সামাজিক বিধি অনুসারে কোনও স্ত্রী স্বামীর বা বাড়ীর কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া আর কারও সাথে বাইরে বেরুতে পারতো না। পরপুরুষের মুখ দেখা বা কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। বোরখা না পরে রাস্তায় বেরুনো তাদের কাছে স্বপ্নাতীত ছিলো। ৯।১০ বছর বয়স হতেই তারা পারাঞ্জার আড়ালে তাদের দেহকে ঢেকে রাখত। প্রায় আমরণ পারাঞ্জাই ছিল তাদের প্রধান আবরণ। মুখ লুকিয়ে রাখত ঘোড়ার বালামচির সূক্ষ্ম জালে (চাচ্ভান)। কোন উজবেক দূরে দেশে গেলে তার স্ত্রী স্বামীর জন্য নিঃসঙ্গ বোধ করে চিঠি দিতে পারত না। কারণ তাদের যে কোনও অক্ষর পরিচয়ই ছিল না, তাই তারা লিখতে জানত না। তাদের ভর্তাদের কাছে পাঠাত একগাছা খড় আর এক টুকরো কাঠ-কয়লা। এর অর্থ হল "তোমা বিহনে আমি খড়ের মত হলদে শুকনো আর কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছি।"

কিন্তু এখন উজবেকিস্তানের মেয়েদের কাছে সেই সমস্ত দিন রূপকথার গল্প হয়ে

'লাল উজবেকিস্তান' যৌথখামারের গবেষণাগারে।

দাঁড়িয়েছে। এখন বাধ্যতামূলক বিবাহ, গৌরী-দান প্রথা, বলপূর্বক বিবাহ, বহু বিবাহ ও মেয়ে বিক্রী প্রথা আইনতঃ উচ্ছেদ করা হয়েছে। ১৬ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইনসংগত বয়স ঠিক হয়েছে। প্রাচীন কালে এই দেশের মেয়েরা অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিল। তাই আইনের সাহায্যে তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি উচ্ছেদ করে প্রগতির পথ প্রশস্ত করতে হলো। বিপ্লবের ঠিক পরেই মেয়েদের ক্লাব খোলা হলো এবং এই ক্লাবগুলিতে নানা রকম হাতের কাজের শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো এবং এই শেখানো জিনিষের প্রদর্শনী Exhibition চালানো হতে লাগল। আমাদের দেশের মহিলা সমিতি-গুলির মতই তাদেরকে স্বাবলম্বী হবার পথ দেখানো হল। হারেমে বন্দিনী মেয়েরা এই ক্লাব থেকেই নিজেদের পরিশ্রমে একটা কারখানা গড়ে তুলল। নারী আন্দোলনের এক নতুন স্রোত চোখে পড়ল।

রক্ষণশীল মুশ্লিম সামাজিক প্রথা যা এত-দিন সমস্ত নারী সমাজকে তার নাগপাশে বেঁধে রেখেছিল, নতুন যুগের প্রবর্তনে তা ভঙ্গুর হয়ে এলো। মেয়েদের সামনে কর্মজগতের দ্বার খুলে গেল বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিভিন্ন কলকারখানায় যে সব শ্রমজীবীরা কাজ করছে তাদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা একটি বড় অঙ্কেই আছে।

উজবেকিস্তান তুলোর জন্য বিখ্যাত। ও দেশের অপর্যাপ্ত তুলোর ফসলকে সাদা সোনা বলে। আজ সোভিয়েট এশিয়াতেই রেশম ফ্যাক্টরী, কাপড়ের কল, কার্পাস কর্মশালা গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে সাধারণ ভোজনাগার, শিক্ষালয়, ডাক্তারখানা, ফ্যাক্টরী ক্লাব। আজ আর ঘরের কোণে আলাদা হয়ে বসে থাকতে পারে নি উজবেক মেয়েরা। তাই তারা সমাজের কর্ম-মুখর জীবনে এসে নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। আর সেই কাজের মধ্যে তারা এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সেই আস্বাদ তাদের উত্তরোত্তর আরও কর্মনিষ্ঠ আরও সমাজমুখী করে তুলেছে। উজবেক পুরুষ আজ প্রমাণ পাচ্ছে যে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে কোন মেয়েই ভুল পথে যায় নি বরং তাদের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির বিকাশ লাভ হয়েছে।

মধ্যযুগের অশিক্ষিতা নারীর কাছে সংস্কৃতি এক বিস্ময় নিয়ে এলো। ও দেশের ক্লাবগুলি নিছক আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়। ক্লাব হলো সংস্কৃতির বড় বড় পীঠস্থান। আগে ক্লাবে সাধারণ মেয়েদের যাওয়ার অধিকার ছিল না। তবে তখন কারা সে সব ক্লাবে যেত? জারের মোসাহেব, বড় বড় রাজকর্মচারী, বড়-লোক ও জমিদারের পোষাপুত্রেরাই ছিল এই ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক।

শিল্পাঞ্চলে, যৌথ-খামারে, শহরে জন-সংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী হাজার হাজার ক্লাব সমস্ত দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোথাও শ্রমিক সংঘ ক্লাব, আবার কোথাও যৌথ-খামার ক্লাব। এই সব ক্লাবে একটি করে অত্যন্ত সুসজ্জিত পাঠাগার আছে। এখানে এসে লোকে মনো-যোগের সঙ্গে পড়াশুনা করে। নিজেদের দেশের নানা খবর দেশ-বিদেশের খবর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর আহরণ করে, আলোচনা করে—পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া নেওয়া করে। এই ক্লাবগুলি আবার শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলি চক্র পরিচালনা করে যেমন সঙ্গীত চক্র, কবিতা চক্র, চিত্রকলা চক্র, জীববিদ্যা চক্র, প্রত্নতত্ত্ব চক্র, স্থাপত্যবিদ্যা চক্র এমনি আরো অনেক। বোঝা যায় কয়েক বছর আগে যে জাতির বর্ণমালা পরিচয় ছিল না, সে জাতির কাছে এই মর্যাদা কত গভীর কত ব্যাপক।

নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মেয়েরা বর্তমান যুগের বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। সাবান ব্যবহার করতে শিখল, কাপড়ের নীচে অন্তর্বাস ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করল। বিছানাপত্রের প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো, বিজলী বাতি পেল তারা তাদের হাতের নাগালে। সঙ্গে সঙ্গে পেল তারা স্বামী-নির্বাচন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার। যদিও তারা শেষের অধিকার বিবাহিত জীবনে খাটাতে একেবারে নারাজ।

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে এক লাফে তারা চলে এল বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েট সমাজের আওতায়। নয় বছর বয়স হলেই যাদের জীবন পারাঞ্জার আড়ালে ঢাকা পড়ত, পরি-বারের প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের পা ধোয়াই যাদের জীবনের ব্রত ছিল, পরিবারের প্রত্যেকের উচ্ছিষ্ট খেয়ে যাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হতো তারা আজ স্বামীর পাশাপাশি বসে বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। আর একটি মেয়ে (যার মা হয়তো সারা জীবন কাটিয়েছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে কোনও দিন সমাজের ভয়ে স্বামীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে নি) সে আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। জারের রাজত্বে যাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জনই নিরক্ষরা ছিল, আজ তাদের শতকরা ১০০ জনই সাক্ষরা।

যদিও ওরা আজ বিজ্ঞানের সাধনা করছে তবুও মনে মনে ওরা ধর্মমতে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যই বহন করছে। ওদের দেশে আজও পর্যন্ত "কঠোর কৃচ্ছ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয় ধ্যানই" ধর্মজীবনের আদর্শ এবং এই মতই প্রাচ্যবাসীদের বৈশিষ্ট্য। যদিও এই মত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের "অনুমানঘটিত পদ্ধতির" প্রয়োগের অন্তরায়।

উজবেকিস্তানের কলঙ্কময় অতীত বর্তমানের উজ্জ্বলতায় মুছে গেছে—মুছে গেছে জার, আমীর খান, বে ও মোল্লাদের কালো শাসনের কাহিনী। একজন উজবেক মেয়ে আজ তার মার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "পারাঞ্জা কাকে বলতো মা?"

মেয়েদের জীবনে সন্তান পালন করা একটা ভীষণ পীড়াদায়ক কাজ। শুধু পীড়াদায়ক কাজই নয় একটা বড় সমস্যাও বটে। সন্তান-পালন মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তা আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো। দেখতে পাবো তাদের নিজেদের সুখ-সুবিধা এবং ব্যক্তিত্ব সমস্তই সন্তান পালনের সমস্যার কাছে কত নগণ্য কত ছোট হয়ে গিয়েছে। তার সমগ্র জীবনকে ঘিরে আছে কেবল হাজার রকম গেরস্থালির কাজকর্ম, স্বামীর পরিচর্যা, আর

শেষ অঙ্কে কৃতী সোম

আমি কি চেয়েছি এই অন্ধকার রাত্রির অতলে
ডুবে যেতে, অতলান্ত নীল নীল সমুদ্রের মত
চেয়েছি কি অন্তহীন ঊর্মিমালা, অনিঃশেষ জলে
একান্তে মিলিয়ে যেতে নেশাগলা শরীরে নিয়ত
রক্তের আহ্বানে। দুপুরই চেয়েছি আমি। এবং
জ্বলেছি। আজ এই উষ্ণস্রোত আমাকেই পাঁচায়,
রাত্রির ছোঁয়ায় যাদু। আলোভাঙা আঁধার বরং
আসুক, আমি ডুবে যাই এই শিল্পিত শরীরে।
আমি কি চেয়েছি এই অন্ধকার, চাইনি তো তাই
দেখিনি এমন রূপে নীলকান্ত মণির মতন
রাত্রির প্রহরে জ্বলে, চোখ-ধাঁধা, অপরূপ! চাই
আর বিস্ময়ে অবাক হই আরো, ডোবে দেহ-মন।
দুপুর গড়িয়ে যায় জ্বলা থামে রাত্রির শরীরে,
আমি তো হারিয়ে যাই অন্তরালে প্রমূর্ত গভীরে!

সন্তান পালন। কিন্তু আজ উজবেক মেয়েদের এই সব বিষয়ে চিন্তা করতে হয় না। সন্তান পালনের গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রই নিয়েছে।

আজ উজবেকিস্তানের হাজার হাজার সাধারণ ভোজনাগার তৈরী হয়েছে। সেই সব ভোজনাগারে দলে দলে নারী কর্মী আছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মব্যস্ত মানুষের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। মেয়েরাও দলে দলে সেইখানে গিয়ে তাদের নিজেদের আহার্য গ্রহণ করে থাকে। রান্নাঘরের হাজার রকম ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে তারা তাদের রুচিমত কাজের কর্মী হয়ে সেই সময়টা ব্যয় করতে পারে।

কিন্তু তাই ব'লে উজবেক মেয়েরা বাড়ীতে রান্না করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে বা উজবেক পরিবারে "রান্নাঘর" ব'লে কোনও ঘর নেই তা' নয়।

লক্ষ লক্ষ উজবেক পরিবার বাড়ীতে রান্না করে এবং যারা নিয়মিতভাবে বাইরে খায় তারাও কোনো পালা-পার্বণে বা ছুটির দিনে বাড়ীর রান্না খাবার পরিবেশন করে আত্মীয় পরিজনকে আপ্যায়িত করে। উৎসবের দিনে বাড়ীতে নিজে হাতে রান্না করা গৃহিণীদের একটি উৎসব। উজবেক মেয়েরা রান্নার প্রয়োজনীয়তা বা আনন্দকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাই বলে জীবনের বেশীর ভাগ সময়টা রান্নাঘরে নষ্ট করে না।

উজবেকরা প্রাচীন কাল থেকে ফুল ভালো-বাসে। উজবেকদের বাড়ীর উঠানে, মাটির দেয়ালের পাশে পাশে ডেইজি, গোলাপ, শরৎ-কালীন অ্যাস্টের, হলিহক, গাঁদা, মোরগফুল, দেখা যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার শহুরে পথগুলি ছিল পুষ্পহীন। শত শত বছর ধরে রাস্তা ছিল পুরুষের সম্পত্তি আর গৃহপ্রাঙ্গণ ও ফুল মেয়েদের। মেয়েরা যখন বোরখা খুলে রাজপথে বেরিয়ে এল, ফুলেরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো। উজবেকিস্তান শুধু ফুলের দেশ নয়, ফলেরও দেশ—আপেল, খুবানী, চেরী, পিয়ার নেকটারাইন (পীচফল বিশেষ)। এখানে চমৎকার ফুটি ও তরমুজ হয়। উজবেকিস্তান গরম দেশ হলেও এখানে বৈজ্ঞানিক প্রথার সাহায্যে শীতের দেশের নানান ফল অধুনা উৎপন্ন করা হয়।

উজবেক নারীরা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

বাড়ীতে নিশ্চিত থেক

সুনীল বসু

বাড়িতে নিশ্চিত থেক, যাব ওই
প্যাগোডা পাহাড়ে
উপল-খণ্ডের সুরে নদী বাজে
জঙ্গলের-অর্গ্যান
বেসামাল হাওয়া ঘোরে আকাশের
নীল সংসারে
লণ্ঠনের চুমকি রেখ তোমার
গবাক্ষের নিশান।

ভয় মানব না, ধূর্ত নেকড়ের
যদি নামে সাঁঝ
নিশ্চিত কুড়াব আমি স্খলিত
সবুজ জলপাই।
ভালুকেরা রক্ত চেনে, যাব তবু,
কন্যে যাব আজ
টিলার মাথায় ওই আগুন সত্র
পুড়ে হয় ছাই।
পাহাড়ের ওই শীর্ষে ছড়িয়ে
রয়েছে ছোট গ্রাম
চাষ করে ঢ্যাঁড়সের, আমলকি ফলে,
হয় যব।
ওই দূরের শহরে ডাকঘরে
পিওন ছিলাম
বাড়ি যাব, ঝাউ গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে
পাখি কলরব।
আমি জানি দিয়ে রাখবে খন আঁচ
তোমার উনুনে
চাটুতে সেঁকবে রুটি, খাঁটি ঘিয়ে
রাঁধবে অড়হর।
রাঙাবে তোমার ঠোঁট তাম্বুলের
খয়েরে ও চুনে
ঠিক যাব, খাটিয়ায় ঝরে যাবে
তারার প্রহর।
তারপর একঘর তীব্র ঘুমে
জড়ানো শরীর
কাছে টেনে নিয়ে শোবো, চাঁদ হবে
পাহাড়ে টোপর।
কখন দুজনে হব রাঙা স্বপ্নে
আবেশে মদির
অবশেষে মোরগের চিৎকারে
বনরাজি-ভোর।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তাল রেখে এগিয়ে এলেও তাদের পোষাকে তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

উজবেক মেয়েরা সাধরণতঃ হাল্কা হলুদ ও লাল ছোপের বহু-রঙা পোষাক পরে। মাথায় পরে রংদার হাতে কাজকরা তুবেতেইকা (চৌকা চাঁদি টুপি), আর তারই পাশে মালার মত করে জড়ানো থাকে কালো চুলের বেণী। আকৃতিতে ওরা মধ্য এশিয়াবাসী। চুল ছোট করে ছাটার রেওয়াজ ওদের মধ্যে নেই বললেই হয়। মধ্যযুগের থেকে যদিও ওরা এক লাফে আধুনিক যুগে পৌঁছেছে তবুও ওদের মধ্যে অন্য দেশের মেয়েদের মত উগ্র আধুনিক বা তথাকথিত "সোসাইটি গার্ল" বা "গ্ল্যামার গার্লের" সন্ধান পাওয়া যায় না।

একই দিনে আড়াইটে বাঘ

(৬০ পৃষ্ঠার পর)

হাতীগুলোর ওপরে কিছু লোক উঠেছে—স্টপার যারা ছিল তারা সবাই গাছের ডালে।

প্রায় মাইল খানেক যাওয়ার পর একটা জায়গায় 'মরি' পড়ে থাকতে দেখা গেল। তার বুকের খানিকটা মাংস নেই—পেটের নাড়ীভুঁড়িও বেরিয়ে পড়ছে।

তাহলে বাঘ নয়—বাঘিনী? বাঘ হলে, কোমরের মাংসই প্রথমে খায়। পায়ের চিহ্ন দেখেও বাঘ কি বাঘিনী ঠিক করা যায়। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকো ধরণের, বাঘিনীর তা নয়। এখানে সে সুযোগ নেই—জঙ্গলের মাটি তেমন ভিজে নয় যে বাঘের পায়ের ছাপ পড়বে।

অনেকটা দূর দিয়ে ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝর্ণা—আমরা হাতী চালিয়ে সেই দিকেই যাই। মনে আশা ছিল, ব্যাঘ্র মহোদয় অথবা ব্যাঘ্রী যিনিই হোন না কেন, এইমাত্র ভোজন-পর্ব সমাধা করে নির্ঘাৎ ঝরণার জল পান করতে আসবেন।

পাঁচ পাঁচটা হাতী গজেন্দ্র গমনে চলেছে—তার আওয়াজ নেহাৎ কম নয়—মাহুতদের 'ধেৎ' 'মাল' প্রভৃতি বুলি তো আছেই—আমরাও যে মুখ বুজে পথ চলেছি তাও হলফ করে বলতে পারি না।

হঠাৎ সামনের হাতীটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের চারটিও। একটা অস্পষ্ট গুড়ে গুড়ে আওয়াজ করেই তারা শুঁড়গুলি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। এখানেই যে আমাদের বাঞ্ছিত মহাপ্রভু কোথাও সংগোপনে বিরাজ করছেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

বহু সাধনার ধন কদাচিৎ সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু সেদিন আমাদের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন, বলতে হবে। নইলে ভল্টুর দিকেই কেন সেই মহামূল্য জানোয়ারটি তার জ্বলজ্বলে দুটি চোখে এমন অগ্নিবৃষ্টি করবে?

আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ভল্টু যা দেখালে, সেই অপরূপ দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। দুটো বাচ্চাকে আড়াল করে বিরাটকায় এক বাঘিনী দারুণ আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে—তার লেজটা ঠিক অর্ধচন্দ্রাকারে একবার মাটিতে একবার শূন্যে।

অর্জুন সেন তার ডায়েরীর পাতা খুলে বললে,—সেদিনকার সেই ভীষণ অবস্থার কথা আমি ডায়েরীতে টুকে রেখেছি—একটুখানি পড়ে শোনাই—'তার জ্বলন্ত চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, মুখের গহ্বরে মৃত্যুর বিভীষিকা, জিহ্বাগ্রে লেলিহান অগ্নিশিখা, সূচীতীক্ষ্ণ দন্তে দুরন্ত জিঘাংসা, কম্পিত নাসারন্ধ্রে দুর্নিবার ক্রোধ, তার সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন প্রলয়নাচন।

হাঠৎ হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি—সে যেন ল্যাজ তুলে পালাতে পারলে বাঁচে—মাহুত ডাঙ্গশা দিয়ে তার মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে যায়। আমিও এক রাউণ্ড গুলী চালাই। সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণকায়া ব্যাঘ্রী হাতীর ওপর লাফিয়ে উঠেই আমার হাওদা ধরে ফেলে আর কি! তৎক্ষণাৎ তার ললাটে নল বসিয়ে ট্রিগার টিপতেই সেই 'অনন্তবীর্যা ব্যাঘ্রীর ভবলীলা সাঙ্গ।'

ডায়েরী থেকে এইটুকু পাঠ করেই, অর্জুন সেন মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে, তার চোখের তারায় সেদিনের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা যেন আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হঠাৎ ডায়েরীখানা বন্ধ করেই সে আবার বলতে থাকে—

বাঘিনীটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল—এদিকে সামনে তাকিয়ে দেখি, মাহুত নেই।

গেল কোথায়?

ভল্টু সোজা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মাহুতপ্রবর একপাশে ধরাশায়ী, তবে অক্ষত অবস্থায়। তার মাথার বৃহৎ পাগড়িটা ছিটকে পড়েছে।

চোখের সামনে এই রক্তজমাট করা ব্যাপার। ফ্যাক্টর সাহেব তাঁর হাতী ছুটিয়ে কাছে এলেন। তারপর হাওদার ওপর সোজা দাঁড়িয়ে হাত তুলে অভিনন্দন জানান।

মেজর, তোমার সঙ্গে শিকারে এলে অনেক কিছুই শিক্ষা হয়—ধন্য তোমার সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি।

হান্টার সাহেবের মন কিন্তু এদিকে নেই। ভল্টু যে ইতিমধ্যে হাওদা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েছে, আমি লক্ষ্য করি নি; সাহেবের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখি, সে মাহুতের ওই যোলহাত লম্বা পাগড়ির কাপড়টা দুহাতের কনুই পর্যন্ত কপাক জড়িয়ে ঊর্ধবাহু হয়ে ছুটে চলেছে। খুব হুঁসিয়ার কি না—যাতে কোনও কামড় বা আঁচড় হাতে না লাগে, তাই বুঝি এই সাবধানী প্রক্রিয়া।

বাঘের দুটো বাচ্চার মধ্যে একটি জঙ্গলের একদিকে কোথায় উধাও, আর একটি মায়ের পেছনে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু নেহাৎই ব্যাঘ্রশাবক কিনা, ঠিক যেন একটা বড় গোছের বন-বিড়াল, তাই উঁচু-নীচু জমির ওপর টাল খেয়ে পড়ে।

আমরা সবাই হাতীর ওপর থেকে নেমে পড়ি। আমার মাহুতও ইতিপূর্বেই সাব্যস্ত হয়ে স্বস্থানে সমাসীন।

ভল্টুর বাহাদুরি আছে। ছুটে গিয়েই সেই মাতৃহারা ব্যাঘ্রনন্দনকে দুহাতে জাপটে ধরে। তারপর তাকে কোলে তুলে নেওয়ার মত ভাবখানা দেখিয়ে সদর্পে ফিরে আসে।

প্রথমেই একটা সদম্ভ উক্তি : জ্যান্ত বাঘ ধরে এনেছি, স্যার।

হান্টার সাহেব ডবল মার্চ করে এগিয়ে আসেন। ব্যাঘ্রশিশুটির গায়ে হাত দিয়ে অস্পষ্ট কালো দাগগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে থাকেন। তাঁর চোখে একটা লোলুপ দৃষ্টি, ওটি পেলে যেন কৃতার্থ হন। তাঁর মুখের ভাষা পাঠ করে ভেবে নিলাম, এটা তাঁকে দিলে মন্দ হয় না। হাজার হোক, বিদেশী লোক, তার ওপর ফ্যাক্টর সাহেবের বন্ধু, উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে আতিথ্য ধর্মের হানি হয়—তা ছাড়া উপহার দিতে গেলে দেশের সেরা জিনিষটাই দেওয়া উচিত।

ভল্টু হয়ত সহজে রাজী হবে না—তাই কথাটাকে একটু মোচড় দিয়ে বলি :

বাঘের বাচ্চা ঘরে পুষতে নেই, শেষে ওই একদিন তোর ছেলেপুলেদের ঘাড় মটকাবে। তার চাইতে যায় শত্রু পরে পরে—ওটা হান্টার সাহেবকেই দান কর।

ভল্টুর চোখে নৈরাশ্য, মুখে উদারতার বাণী—বেশ, তাই দিয়ে দিন। কিন্তু, আজ প্রথম দিনেই একটা নয়, দুটো নয়, আড়াইটে শিকার—এ কি যে সে কথা। আরো নগদ পঞ্চাশটি টাকা আমার দিতে হবে স্যার।

জ ন ক ধা রী ব লে—

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

দুঃখ! দুঃখ! দুঃখের তুমি কি জান? কতটুকু দুঃখ তুমি পেয়েছ জীবনে?'

একসঙ্গে অনেক কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছেন রাজাবাবু, কিন্তু তাঁর উত্তেজনার তখনও উপশম হয় নি। একটু থেমে একটু জিরিয়ে নিয়েই আবার তিনি বলতে শুরু করলেন :

'আমার মায়ের জীবনের কথা কিছুই জান না তুমি। জানলে তোমার ঐ ছিঁচকাঁদুনে দুঃখের নালিশ তাঁর কানে তুলতে কখনও সাহস করতে না।—বাবা তাঁর মুসলমানী রক্ষিতাকে শোবার ঘরে নিয়ে এসেছেন—মাকে তার জন্যে নিজের হাতে তামাক সেজে দিতে হয়েছে। নেশায় উন্মত্ত চারজন বাঈজীতে মিলে মায়ের পরনের কাপড় কেড়ে নিয়েছে, গ্লাসের পর গ্লাস মদ মাথায় ঢেলে তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছে—বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন আর হেসেছেন। মায়ের পোষা বড় শখের কাবুলী বেড়ালগুলোকে শুধু খেয়ালের ঝোঁকে তাঁর সামনে গুলি করে করে মেরেছেন।—এই আমাদের বংশের দস্তুর, আর এই ছিল আমার মায়ের জীবন। সেই মানুষকে তুমি কি না তোমার দুঃখের কথা শোনাতে গিয়েছিলে। কি সে দুঃখ?—না, আমি কেন সবক্ষণ তোমার আঁচল ধরে বসে থাকিনে, কেন মদ খাই, কেন মেয়েমানুষ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি!—তুমি বড় নির্বোধ, মণিবৌ, তুমি বড় নির্বোধ।'

'তুমি চুপ কর তো এইবার—ঠাণ্ডা হও চেঁচিয়ো না অত। নার্স যদি জেগে ওঠে তখুনি আমাকে চলে যেতে হবে।—তুমি ঠাণ্ডা হও। এখন তো আমার কোন দুঃখ নেই।'

'ঠাণ্ডা হব? ঠাণ্ডা?—উঃ! জ্বলে গেল! সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে, মণিবৌ—জ্বালা! বড় জ্বালা! কি করে একটু ঠাণ্ডা হতে পারি বলে দিতে পার?'

অত্যন্ত সহজ আশ্বাসের সুরে মণিবৌ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ পারি। এক্ষুণি তোমার সব জ্বালা আমি জুড়িয়ে দিতে পারি। জ্বালার খুব ভাল অষুধ আমি জানি। আমি নিজেও কি একদিন কম জ্বালায় জ্বলেছি?...... কিন্তু তোমাকে এ-ঘর থেকে পালিয়ে আসতে হবে আমার সঙ্গে—নীচে নামতে হবে, বাড়ীর বাইরে যেতে হবে। বেশি দূরে নয়, কাছেই। আসবে?—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।'

'সত্যি বলছ? সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে? —তবে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, মণিবৌ। কি অষুধ আছে তোমার কাছে, দাও! আর আমি এ জ্বালা সহ্য করতে পারছি নে।'

'তবে এস। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে ওঠ। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এস। নার্স যেন টের না পায়। চল আমার সঙ্গে—এখুনি সর্বাঙ্গের আগুন নিভে যাবে—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে—জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—এস—'

পরদিন প্রাতঃকালে দীঘির জলে মৃতদেহ ভেসে উঠল।

একটি নাম মুছে গেল—রাজাবাবুর।

দীঘির চারপাশে জনতার মেলা বসে গেছে। দোতলার জানালায় দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলে পাথরের প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ী-রাণীমা। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন—একমাত্র ছেলের মরামুখ তাঁকে দেখতে হল না।

স্বপ্নটা দেখে আপনি খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বলে মনে হচ্ছে। কেমন যেন খাপছাড়া একটা ব্যাপার—না? কিন্তু স্বপ্নে দেখা কাহিনী তো খাপছাড়াই হয়ে থাকে। স্বপ্নের আইনে তো কোন শৃঙ্খলা নেই।

তবু আপনার মন খুঁৎ খুঁৎ করছে—কেমন? আরও অনেক কিছু আপনার জানা দরকার, অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া প্রয়োজন। —কিন্তু দেখুন, আমি নিজে তো কিছুই জানি নে। আমি শুধু আপনাকে শোনা কথাই শোনাতে পারব। আসল জবাব যার কাছ থেকে পেতে পারেন আপনি সে হল জনকধারী।

কিন্তু আজ তো তাকে কোথাও দেখছি নে। একে নব্বুই বছরের দলাবুড়ো, তাতে আবার পাগল। কোথায় পড়ে আছে এই জঙ্গলের মধ্যে গুটিশুটি মেরে, কিংবা হয়তো মরেই গেছে এতদিনে। প্রায় বছর তিনেক পরে এখানে আবার এলাম তো......

না, মণিবৌ সেদিন মরে নি।

তার মৃত্যুর গল্প আমি জনকধারীর মুখেই শুনেছি।

জনকধারী বলে,—বৌ-এর কপালে একটা শুধু অবজ্ঞার লাথি মেরে বুড়ী-রাণীমা কঠিন কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'দূর হ হতভাগী! চালকলা-খেগো ভশ্চাজ্জি বামুনের মেয়ে, তার আর কত বুদ্ধি হবে!—রাজরক্তের মর্যাদার দাম দিতে হয়, তা জানিস? শুধু রূপ দিয়ে সে দাম শোধ করা যায় ... চোখের জল দিয়ে তো নয়ই।'

তারপর খাস-চাকরাণী কদম্বের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'বের করে দে তো ঘর থেকে এই ছোটলোকের বেটীকে। বলে দে, আর কখনও যেন আমার সামনে প্যানপ্যান করে নাকে-কান্না কাঁদতে না আসে। রাজার বাড়ীর বৌ-এর অত প্যান্সে হলে চলে না। তাকে শক্ত হতে শিখতে হয়।'

কদম্ব নিজেই জনকধারীকে সব বলেছিল......

জনকধারী বলে—সেইদিন রাত একটার একটু পরে হঠাৎ দীঘির ধারের ফুলবাগান প্রচণ্ড একটা আলোর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল ঢেলে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে মণিবৌ, তারপর একটা দেশালাই ঠুকে দিয়েছে।

তখনও নাচঘরের হুল্লোড় সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় নি। দেখতে দেখতে অনেক লোক এসে ভিড় করে দাঁড়াল বাগানের ধারে। চাকর-দারোয়ানও ছুটে এল সবাই। ছুটোছুটি চেঁচামেচির অন্ত রইল না, কিন্তু মণিবৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কেউ করল না—করলেও হয়তো বাঁচাতে পারত না। হু-হু করে হাওয়া বইছে তখন, মণিবৌ-এর সমস্ত শরীর একটা বিরাট উর্ধ্বমুখী বহ্নিশিখায় পরিণত হয়েছে। সবাই নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র বহ্ন্যুৎসব দেখতে লাগল।

রাজাবাবু অবশ্য সেখানে ছিলেন না—নাচঘরের মধ্যেই তাকিয়ার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলেন। নেশার স্বর্গে বিদ্যাধরীদের সঙ্গে অলৌকিক আনন্দের স্বপ্ন দেখছিলেন বোধ হয়।

জনকধারী বলে,—অনেকক্ষণ চুপ করে সহ্য করেছিল মণিবৌ। কিন্তু সে তো শক্ত মেয়ে ছিল না। সে ছিল নরম মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। যেমন নরম তুলতুলে শরীর, তেমনি নরম তুলতুলে মন। সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে, ননীর মত নরম শরীর তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, প্রতি রোমকূপের মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত যন্ত্রণার ছুঁচ অস্তিত্বের মর্মকোষে গিয়ে বিঁধছে। আর তো সহ্য হয় না।

'বাঁচাও—বাঁচাও! জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—'

দীর্ণ কণ্ঠের আর্ত চীৎকার জেগে উঠল বহ্নিশিখার ভিতর থেকে। মরতে ভয় পায় নি মণিবৌ, সত্যই সে বাঁচতে চায় নি। জীবন্ত পুড়ে মরার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে শুধু অব্যাহতি চেয়েছিল সে।

কিন্তু একটুও ছটফট করেনি মণিবৌ। পাষাণের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলেছিল, আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠেছিল জ্বলে গেলাম, 'জ্বলে গেলাম—ওঃ মাগো—'

হঠাৎ কঠোর কণ্ঠের কঠিন ধমক শোনা গেল দোতলার জানালা থেকে। বুড়ী-রাণীমা জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দুই চোখে ধারালো ছুরির ফলার মত নির্মম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—তখনও তিনি অন্ধ হন নি।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস সব, উজবুগের দল? মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দে জলের মধ্যে।'

এই জনকধারীই সেদিন লম্বা একটা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে মণিবৌ-এর অর্ধদগ্ধ দেহটাকে দীঘির জলে ফেলে দিয়েছিল। সে তখন আঠারো উনিশ বছরের জোয়ান ছোকরা, সবে দেশ থেকে এসেছে।

এমনি করে মণিবৌ রাজরক্তের মর্যাদার ঋণ শোধ করেছিল।

রাজাবাবুর মৃত্যু হয় এর প্রায় এগারো বছর পরে। সান্নিপাতিক বিকারের ঘোরে দুপুর রাতে ঘর থেকে পালিয়ে এসে দীঘির জলে ডুবে মরেছিলেন।

না, আর নয়। এইবার উঠতে হবে। বাইরে বোধহয় সবে সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু এখানে দেখুন, এর মধ্যেই অন্ধকার বেশ ঘোরালো হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার পর জনকধারী কাউকে এখানে থাকতে দেয় না।

ঐ যে জনকধারী আসছে এইদিকে। নব্বুই বছরের বুড়ো, কোমর ভেঙ্গে গেছে তবু কেমন জোরপায়ে হন হন করে এগিয়ে আসছে দেখছেন? মনে হয় যেন ছুটছে। এখনও অনেকখানি দূরে আছে, কিন্তু চিনতে কোন কষ্ট হয় না। কোমরে একফালি ছেঁড়া নেকড়া জড়ানো, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি, মাথায় একরাশ নোংরা চুলের জঙ্গল —আর ঝাঁকড় দুই ভুরুর নীচে বিচিত্র সেই দুটো চোখ। ঘোলাটে অস্বচ্ছ দৃষ্টির আড়ালে একটা উগ্র রক্তিম দীপ্তির আভাস—মনে হয় যেন বহুদিনকার পুরানো ময়লা-পড়া

আয়নার কাছে জ্বলন্ত বহ্নিশিখার ছায়া পড়েছে। ঐ দেখুন, বিপৎপাতের সংকেতবাতির মত অন্ধকারের মধ্যে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে। শুনেছি নাকি জঙ্গলের নেকড়ে বাঘের চোখ রাত্রিকালে এই রকম দেখায়।

তিন বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম অবিকল তেমনি আছে। একটুও বদলায় নি বুড়ো।

জনকধারী কি বলে জানেন? বলে—যত-দিন মণিবৌ এখানে আছে, এ-বাগান এ-বাড়ী ছেড়ে ও আর কোথাও যেতে পারবে না—যাবার নাকি উপায় নেই ওর।...

ও কি! আপনি অমন ফ্যাল ফ্যাল্‌ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন কেন? আপনার মুখখানা যেন কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে! ভয় পেয়েছেন নাকি জনকধারীকে দেখে?—না না, ওকে দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। পাগল হলেও ও অতি নিরীহ পাগল।—এ কি! তবু তেমনি আড়ষ্ট হয়ে আছেন? কি—হল কি আপনার? কথা বলছেন না যে?

কি? কি বলছেন? কিছু নেই ওখানে? কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না আপনি?—সে কি! ঐ তো—ঐ যে জনকধারী আসছে—আমাদের দিকেই আসছে—আর তিন চার মিনিটের মধ্যেই বোধহয় এসে পড়বে আমাদের কাছে। ঐ যে জঙ্গল হয়ে যাওয়া যূঁইফুলের ঝোপের ঝাড়টার পাশ দিয়ে—

কিছু নেই ওখানে? কেউ নেই? জনক-ধারীকে দেখতে পাচ্ছেন না আপনি? কিন্তু কেন দেখতে পাচ্ছেন না। ভাল করে চেয়ে দেখুন তো আর একবার। ঐ তো—ঐ যে—ঐ—ঐ......

চলুন, আমরা চলে যাই এখান থেকে।... চলুন, আমরা পালাই।...ঐ তো দেউড়ি দেখা যাচ্ছে—বেশি দূরে নয়। যদি জোরে একটা ছুট দিই, দু মিনিটের মধ্যেই বোধ হয় বাইরের পথে গিয়ে পড়তে পারব। কি বলেন? আসুন—পালাই—

●

আমি কিছু জানি নে—আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি পারব না। আমাকে মাপ করুন।...

তবু আপনি ছাড়বেন না?

আরে মশাই, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা কি করে বলব বলুন তো? মাথার মধ্যে যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!—কিন্তু স্বপ্নকে তো লোকে মিথ্যাই বলে থাকে।

আপনি যা দেখলেন দীঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে বসে সেটা একটা স্বপ্ন। আমি যা দেখলাম শেষকালে—সেও নিশ্চয় স্বপ্ন। আর জনকধারীর কাছে শোনা কাহিনী?—জনকধারীও হয়তো স্বপ্নই দেখেছিল কোন-দিন। ঐ তিন মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের ভিতরটা শুধু স্বপ্ন দিয়েই ঠাসা আছে। ওখানে গেলে স্বপ্ন দেখবার জন্যে ঘুমতে হয় না। ওখানে লোকে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু স্বপ্নও তো সত্য হয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

হয়তো হয়।

হয়তো সবই সত্য। হয়তো বা সবই মিথ্যা। কিংবা হয়তো সত্যমিথ্যা কিছুই নয়—দুই-এর মাঝামাঝি অর্ধচেতনার ধূসর গোধূলি রাজ্যের একটা ছায়াছবির মরীচিকা মাত্র।

জনকধারীকে একবার ভাল করে জিজ্ঞাসা-বাদ করে দেখলে হয়।

কিন্তু জনকধারী—!

সিদ্ধি পোখরী

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্রূপ-মেশানো কথা কটা বার হয়ে গিয়েছিল। —শ্যামকলিকে কি বলবে?

সংগে সংগে বন্দুক ফেলে সুবর্ণবীর সিদ্ধি পোখরীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কমল বিক্রম বাধা দেবার অবকাশ পায়নি। মস্ত দীঘির মাঝামাঝি জায়গায় পড়েছে পাখিটা। বড় বড় হাত ফেলে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে সুবর্ণবীর। তার মত সাঁতারু কে আছে?

কিন্তু পাখি নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি। তার আগেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কিছু যেন তার পায়ে জড়িয়ে গেছে। কমল বিক্রম মৃত্যুর সংগে যুঝতে দেখেছে তাকে। চোখে মুখে অব্যক্ত ত্রাস দেখেছে। বাঁচার আকুতি দেখেছে। তার দিকে চেয়ে মরণ যাতনায় প্রাণ ভিক্ষে চেয়েছে, সাহায্য চেয়েছে। কিন্তু কমল বিক্রম অসাড় পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে। তার যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেছে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পারেনি। তার কোনো শক্তি ছিল না। শুধু চেতনা ছিল।

কলকাতায় ফিরেও বহুদিন পর্যন্ত এই বিভীষিকা মন থেকে যায়নি। যখন তখন আঁতকে ওঠে শিউরে ওঠে। শ্যামকলির কথা মনে হলে দুচোখ জলে ভরে যায়। তাদের সমাজ-ব্যবস্থা বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। স্বয়ম্বরার পর ভাবী স্বামী মারা গেলে সেই মেয়ে চির বিধবা।

ভাবতে ভাবতে শেষে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ল কমল বিক্রম। দেশ থেকে তার মাকে নিয়ে আসা হল। তারপর অনেক বছর আর সে দেশে যায়নি। তার মা কলকাতাতেই চোখ বুজেছে।

সময় অনেক ভোলায়। কমল বিক্রমও অনেক ভুলেছে। নিজের অগোচরেই কখন সেই বিভীষিকা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, শ্যামকলির স্মৃতিও আর পীড়া দেয় না।

দেশে এলো প্রায় সাত বছর বাদে। কলেজের লেখাপড়া শেষ করে। তখন আর এক মানুষ সে। সকলে সমীহ করে, সম্ভ্রমের চোখে দেখে। দেশে ফেরার সংগে সংগে সেই পুরনো স্মৃতি খচখচিয়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা আর বোঝা যায়নি। সকলের সংগেই দেখা হয়েছে, দেখা হয়নি শুধু শ্যামকলি আর তার মায়ের সংগে। সেখানে সে যায়নি।

কিন্তু সেখানে না যাক, অন্যত্র গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসে শ্যামকলিকে। শ্যামকলি তার পাহাড়-ঘেরা জমিটুকুতে নিজেই ক্ষেতের কাজ করে। তার মা বুড়ো হয়েছে, সে পারে না। পয়সা দিয়ে লোক রাখারও সঙ্গতি নেই। তাদের দেশে অনেক মেয়েই ক্ষেতে কাজ করে। সেটা বিসদৃশ কিছু নয়! তবু কমল বিক্রমের কষ্ট হত। তাদের ক্ষেতে তো কত মজুর খাটে। ইচ্ছে হত দুটো লোক পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু পারত না।

দূরে থেকে দেখত শ্যামকলিকে। একমনে কাজ করে। কখনো পাহাড় ডিঙিয়ে দূরের আকাশের দিকে তার দুচোখ আটকে থাকে। তার কাছে যাবার দুর্বার আগ্রহ হত কমল বিক্রমের। কিন্তু সে-কথা মনে হলেই পা দুটো যেন মাটির সংগে আটকে থাকত।

পাহাড়ী পথেই একদিন মুখোমুখি দেখা। সেদিন আর নিজেকে আড়াল করতে পারল না কমল বিক্রম। জিজ্ঞাসা করল, শ্যামকলি আমাকে চিনতে পারো?

শ্যামকলি দেখল তাকে। হাসল। বলল, পারি। তুমি রোজ এসে এসে চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকো কেন?

এতবড় বিশ্বান কমল বিক্রমকে এ-রকম কথা বোধহয় এক শ্যামকলিই বলতে পারে। কমল বিক্রম দুচোখ ভরে দেখল তাকে। উনিশ কুড়ি বছরের অস্থির যৌবনা মেয়ের মধ্যে যেন স্থির প্রশান্তি দেখল সে। এই মেহেনতীর কাজ তাকে স্বাস্থ্য প্রাচুর্য দিয়েছে, যৌবন প্রাচুর্য দিয়েছে। কিন্তু সব প্রাচুর্যই যেন এক সহজ শাসনের গন্ডিতে বাঁধা।

আর চোরের মত পালিয়ে থাকল না কমল বিক্রম। ক্ষেতে আসত। ঘেরানো ক্ষেত, সকলের সব-সময় চোখে পড়ত না। পড়লেও তাকে অবিশ্বাস করত না কেউ। তাদের দেশে স্বয়ম্বরা বিধবার সংগে কেউ প্রেম করে না। কিন্তু অবিশ্বাস প্রথমে শ্যামকলিই করল। বলল, তুমি এত ঘন ঘন এসো না।

কমল বিক্রম বলল, আমি সমাজ মানি না, সংস্কার মানি না, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

শ্যামকলির স্থির যৌবনে নাড়া পড়ল। নিজেকে সংযত করে বলল, তোমার যাওয়াই ভালো।

এরপর বার বার শ্যামকলি তাকে ফিরিয়েছে। তবু বার বার সে এসেছে। সেই এক কথা তার। চলো চলে যাই। শ্যামকলির বুকে দোলা লাগে। অবসন্ন অবকাশে যে-যাতনা দেহের কানায় কানায় আকুলি-বিকুলি করে, সেটা যেন এখন ভেঙেই পড়তে চায়। সে রাগ করে, ভ্রূকুটি করে, কটূক্তি করে। তবু কমল বিক্রম আসে। বলে, চলো চলে যাই এখান থেকে।

একদিন। আকাশে থমথমে কালো মেঘ জমেছিল। শ্যামকলি আপন মনে ক্ষেতের কাজ করছিল আর গুনগুনিয়ে গান গাইছিল: বোল্‌ অত ভনে সাইনো মেরো ছুইনো। তুমি আমার কেউ নয়, তোমাকে আমি কি নামে ডাকব।

গান থেমে গেল। পিছনে না তাকিয়েই শ্যামকলি টের পেল পিছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে। আকাশের মেঘের মতই মুখ গম্ভীর হল তার। গাঁয়ে এখন একটু আধটু কথা-বার্তা শুরু হয়ে গেছে। শুধু এই লোক বলেই জোর গলায় কেউ কিছু বলছে না, কা খুব খারাপ কিছু ভাবছে না।

শ্যামকলি একটি কথাও বলল না। হাতের

কাজ সেরে বাড়ির দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলল। পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য, তবু লোকটা অনুসরণ করছে তাকে। শ্যামকলি মন্দিরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করল: পশুপতিনাথ প্রভু লাই, নমস্কার গর ছু ছিন ছিন মা। পশুপতিনাথ তোমার অনুগত আশ্রিত আমি, তোমাকে নমস্কার করি।

তখন সূর্য্য ডুবেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘলা আকাশের আঁধার নেমেছে। ঝড় উঠল। পাহাড়ী ঝড়। ভয়াবহ ঝড়। কিন্তু ঝড়ের থেকে শ্যামকলির বেশি ভয় পিছনে যে আসছে তাকে। না ঠিক তাকেও নয়। ওই লোকের থেকে এ-পথে ঝড়ে জলে অনেক বেশি অভ্যস্ত সে। অনায়াসে ঠেলে ফেলে দিতে পারে তাকে। কিন্তু তা যে পারবে না। ভয় তার নিজেকেই।

কমল বিক্রম বোধহয় এই রকমই একটা দিনের প্রতীক্ষায় ছিল। ঝড় বাড়ছেই। পাথরের গায়ে কোথাও ঠেস দিয়ে আশ্রয় না নিলে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু শ্যামকলি আরো দ্রুত পা ফেলে চলেছে। দৌড়ে এসে দুহাতে জাপটে ধরল তাকে। টেনে নিয়ে একটা বিশাল পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টির মুসলধারা গায়ে মুখে বিঁধছে।

শ্যামকলি হাল ছেড়ে দিল। ওই বুকেই মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল সে। আর সে পারবে না। আর সে যুঝবে না। কমল বিক্রম নিবিড় করে আগলে রইল তাকে। কোমল গলায় বলল, শ্যামকলি চলো এখান থেকে চলে যাই। পশুপতিনাথ আমাদের আশীর্বাদ করবে।

শ্যামকলি আস্তে আস্তে মুখ তুলল। চেয়ে চেয়ে দেখল তাকে। বলল, চলো।

কবে যাবে?

কালই।

পরদিন। মায়ের দিকে মুখ তুলে একবারও তাকাচ্ছে না শ্যামকলি। নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া তার শেষ হয়েছে। মায়ের চলে যাবে এক-রকম করে। কমল বিক্রমের মজুরেরা জমি চষে দেবে। দুপুরে বাক্স খুলে দুই একটা জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। এই রাতেই পালাবে তারা। কমল বিক্রম বলেছে, পশুপতিনাথ তাদের আশীর্বাদ করবে।

সহসা প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেল একটা। তার-পরেই বিবর্ণ পাংশু একেবারে। বাক্স থেকে তার হাতে উঠে এসেছে ঝকঝকে একটা আঙটি। স্বয়ম্বরার আঙটি। সুবর্ণবীরের আঙটি।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হতে চলল। আঙটি হাতে শ্যামকলি ঠায় বসেই আছে মূর্তির মত। বুকের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। সুবর্ণবীর যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে। নির্নিমেষ দেখছে। সেই হাসি-খুশি জ্বলজ্বলে মূর্তি। সে যেন এখনো তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। তেমনি বেপরোয়া, তেমনি নিশ্চিন্ত।

দুদিন বাদে শ্যামকলির দেহের সন্ধান মিলেছে সিন্ধি পোখরীর জলে।

*　　*　　*　　*

সকাল থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক লাগিয়ে সিন্ধি পোখরীর জল থেকে কত মণ — [illegible] এলাকার শাসন-কর্তা বিক্রম সাহেব ঠিক নেই। পুকুরের ধারে ধারে ঝাঁঝের পাহাড় হয়ে গেছে। ওই ঝাঁঝ পায়ে জড়িয়ে মানুষ ডোবে। একটি লোকেরও জীবন সংশয় ঘটতে দেয়নি সাহেব। জলে অনেক বোট নামিয়েছে, আর কোমরে রশি বেঁধে লোক নামিয়েছে। সে নিজেও একটা বোটে বসেছিল সমস্তক্ষণ। কিন্তু বিক্রম সাহেব খবর পেয়েছে, জলে যারা নেমেছিল তাদের প্রতিটি লোক বিষম অসুস্থ। জলেই বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তারা।

শুধু অফিসের জনা-কতক লোকই জানে, সাহেব অনেক ভেবে শেষে সিন্ধি পোখরীর জল পাঠিয়েছিল বাইরের কোন গবেষণাগারে। সেখান থেকে রিপোর্ট এসেছে, জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক রাসায়নিক সংমিশ্রণ আছে।

বিক্রম সাহেব সেইদিনই ঘোষণা করেছে, সিন্ধি পোখরীর জলে কেউ নেমো না। সিন্ধি পোখরীর জলে বিষ আছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে না হতে সিন্ধি পোখরীর রাত্রি গভীর। সেখানে একজন ভিন্ন আর জনমানব নেই। জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। চাঁদ হাসছে। আর, কমল বিক্রমের মনে হচ্ছে, সিন্ধি পোখরীর চকচকে কালো জলে দুটি মুখও হাসছে।

গান

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

নামটি তোমার জানা যেন মুখটি আরো চেনা,
কোথায় যেন দেখেছি তোমায়,
কোন সুদূরে দেখা?
নীল পাহাড়ের ঝর্ণা ধারায়
কোন সে অচিন পথে
কোথায় হল' প্রথম দেখা,—মনের কোণে লেখা!
চাঁদের আলোয় ঝিলিমিলি বকুলঝরা পথে
গন্ধআকুল স্বপনবোনা কোন সে ফুলের রথে,
তোমায় কেন লাগছে এত ভালো
দেখছি তুমি আজো যেন একা!

কোথায় যেন .... দেখা!
কেমন করে জানাজানি সেই কথাটি বলো
মিষ্টি হেসে বনের ছায়ে কেন যে পথ চলো,
আমায় শুধু বলো!

কোথায় দেখা, কবে, কখন, পড়ছে মনে কেন?
সুরে সুরে জাল বোনা যে, প্রথম দেখা যেন,
ভুল করে ফুল কুড়িয়েছিলে স্বপন পরীর দেশে,
পড়ছে মনে খনে, আর কিছু নেই,—
শুধুই স্মৃতির রেখা!

খেলার দুনিয়া

খেলাধুলায় কোন্ দেশ সবার সেরা? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, খেলাধুলার বিভিন্ন মহলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।

এক বিভাগের নেতৃপদে যেমন আমেরিকার নিরঙ্কুশ অধিকার, অন্য বিভাগের শীর্ষাসনে তেমনি রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা। কোনো মহলের নায়ক হয়তো অস্ট্রেলিয়া। আবার ভিন্নতর ক্ষেত্রে সর্ব-প্রধান হলো ব্রেজিল। এক কথায় এক নিঃশ্বাসের স্বস্তিতে কাউকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলার উপায় নেই।

তবু ক্রীড়ানুরাগী মহলে সর্বশ্রেষ্ঠকে বেছে নেওয়ার জন্যে সম্প্রতি চেষ্টা চলেছে। তারই সূত্রে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়ায় শীর্ষ পর্যায়ের তিনটি করে দলের বাস্তবানুগ ভূমিকার কিছুটা হদিশ মিলেছে, তারই প্রমাণ পাশের তালিকাটি।

এই তালিকা রচনার কৃতিত্ব আমেরিকার এক পাক্ষিক পত্রিকার। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং জাতীয় অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণের তথ্য ভিত্তিক মূল তালিকাতে মোট ঊনচল্লিশটি বিভাগীয় ক্রীড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা সেই তালিকা কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করলাম। সংক্ষেপিত তালিকায় দেশ-বিদেশের বহুল প্রচলিত এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে লোকপ্রিয় খেলাধুলার স্থান দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্রমোন্নয়নমুখী এবং অধুনা খেলাধুলার দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান চলেছে বলেই সময় বিশেষে তালিকার অতর্কিত পরিবর্তনও বিচিত্র নয়।

বছর দশেক আগে এই তালিকা রচিত হলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তথ্য হাতে আসতো। কিন্তু ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে সোভিয়েট রাশিয়ার পুনরাবির্ভাবের পর থেকেই মূল তালিকাটি মোটামুটিভাবে একই চেহারা নিয়ে চলেছে। গত দশ বছরে মূল তালিকার আকৃতি বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। অষ্টাদশ অলিম্পিয়াডের মাঝামাঝিও তালিকার মূল কাঠামো অবিকৃত প্রায়।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজয়ী দল বা দেশকে পাঁচ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে তিন এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে এক পয়েন্ট দিয়েই গণনানুসারে এই তালিকা রচিত হয়েছে।

অর্জিত পয়েন্টের খতিয়ানে সবসমেত চৌত্রিশটি দেশ স্বীকৃতিলাভ করেছে। তাদের মধ্যে দুটি কারণে সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দাবী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মূল তালিকাভুক্ত ঊনচল্লিশটি বিভাগীয় ক্রীড়ার প্রায় অর্ধেক অঞ্চলেই সোভিয়েট ক্রীড়াবিদের নৈপুণ্যের কিছু না কিছু স্বাক্ষর রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার বিভাগীয় অনুষ্ঠানে শীর্ষাসন রাখলে আমেরিকার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী।

সাফল্যের নজীরে জার্মাণী ও ইতালীর আসন আমেরিকা ও রাশিয়ার পরই।

অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, জনসংখ্যার অনুপাতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ানুরাগ খুব। গড় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ানরাই আজও বেশী সংখ্যায় খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এবং কমপক্ষে পাঁচটি বিভাগীয় ক্রীড়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠা সবদেশের পুরোভাগে।

ক্রীড়া	বিশ্বশ্রেষ্ঠ		ক্রীড়া
মোটর রেসিং	১ ইতালী ২ বৃটেন ৩ জার্মানী	রাশিয়া ১ জার্মানী ২ ইতালী ৩	নৌ বাইচ
ব্যাডমিন্টন	১ ইন্দোনেশিয়া ২ থাইল্যাণ্ড ৩ ডেনমার্ক	দঃ আফ্রিকা ১ ফ্রান্স ২ নিউজিল্যাণ্ড ৩	রাগবি
বাসকেটবল	১ আমেরিকা ২ রাশিয়া ৩ ব্রাজিল	রাশিয়া ১ জার্মানী ২ আমেরিকা ৩	স্যুটিং
মুষ্টিযুদ্ধ	১ আমেরিকা ২ আর্জেন্টিনা ৩ বৃটেন	ব্রাজিল ১ জার্মানী ২ বৃটেন ৩	ফুটবল
ক্রিকেট	১ অস্ট্রেলিয়া ২ বৃটেন ৩ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	আমেরিকা ১ জাপান ২ অস্ট্রেলিয়া ৩	সাঁতার
সাইক্লিং	১ বেলজিয়াম ২ ইতালী ৩ ফ্রান্স	কম্যু চীন ১ জাপান ২ হাঙ্গারী ৩	টেবল টেনিস
অশ্বারোহন	১ ইতালী ২ জার্মানী ৩ আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া ১ আমেরিকা ২ ইতালী ৩	টেনিস
অসিচালনা	১ রাশিয়া ২ পোল্যাণ্ড ৩ ফ্রান্স	আমেরিকা ১ রাশিয়া ২ নিউজিল্যাণ্ড ৩	অ্যাথলেটিক
হকি	১ পাকিস্থান ২ ভারত ৩ বৃটেন	রাশিয়া ১ পোল্যাণ্ড ২ চেকোশ্লোভাকিয়া ৩	ভলিবল
জিমনাস্টিক	১ রাশিয়া ২ জাপান ৩ চেকোশ্লোভা	হাঙ্গারী ১ ইতালী ২ রাশিয়া ৩	ওয়াটার পোলো
ঘোড়দৌড়	১ আমেরিকা ২ ফ্রান্স ৩ বৃটেন	রাশিয়া ১ পোল্যাণ্ড ২ আমেরিকা ৩	ভারোত্তোলন
মোটর সাইক্লিং	১ বৃটেন ২ দঃ রোডেশিয়া ৩ অস্ট্রেলিয়া	রাশিয়া ১ তুর্কী ২ ইরাণ ৩	মল্লক্রীড়া

মহামল্ল রহিম বখস

সমর বসু

যাদের ধারণা, বৃহৎ ও বলিষ্ঠ পেশীর অধিকারী না হলে প্রকৃত জোয়ান বা পালোয়ান হওয়া যায় না, কুস্তি জগতের বিস্ময় রহিম বখ্‌সের কাহিনী শুনলে তাঁরা বিস্মিত ও হতাশ না হয়ে পারবেন না। একহারা লম্বা দেহ, মুণ্ডিত মস্তক, কুদে কুদে চোখ রহিম যখন লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী পরে রাস্তায় বেরোতেন, তখন অতি পরিচিত ব্যক্তির পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হত যে, কুস্তির আসরে এই লোকটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকেও অতি সহজে ঘোল খাওয়াতে পারেন। কেবল রহিম নন, ফার্মার বার্ণস, ফ্র্যাঙ্ক গচ্, আহমদ বখ্‌স ইত্যাদি মহামল্লদের সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। দৃশ্যতঃ তাঁদের যত সাধারণই মনে হোক, কার্যতঃ তাঁদের দেহের পেশী ও স্নায়ুমণ্ডল ছিল অবিশ্বাস্যভাবে বস্তুর উপাদানে গঠিত। তাই, দুনিয়ার সব চেয়ে বলিষ্ঠ পেশীবান ব্যক্তিদের নিয়েও তাঁরা খেলনা পুতুলের মতো নাড়াচাড়া করতে পারতেন। এমন কি, বিশ্ববিখ্যাত অনেক পেশীবান পালোয়ানও তাঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। আসল কথা, যথার্থ শক্তি বা কুস্তিবিদ্যার সঙ্গে সুদৃশ্য বা বলিষ্ঠ পেশীর বিশেষ সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কেবল দেহের সাধারণত্বেই রহিমের অসাধারণত্ব ছিল না। ভারতের মতো পালোয়ানের দেশেও রহিমের মতো বড় যোদ্ধা বেশি দেখা যায় নি এবং তার পূর্ববর্তীদের মধ্যে কাল্লু ও পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম বখ্‌স ছাড়া যোদ্ধা হিসাবে আর কেউ তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না। কিন্তু তার চেয়েও যা উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে তাঁর শক্তির কাছে বার্ধক্যের হার মানা। বস্তুতঃ, যৌবনকালে তিনি কত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আজ আর তা জানার উপায় নেই। ভারতবর্ষে কাল্লু পালোয়ানের সুযোগ্য শিষ্য গুত্তা সিং ছাড়া এদিক থেকে আর কেউ তাঁর সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না যদিও গুত্তা ক্ষমতার নিরিখে ঠিক রহিমের সমকক্ষ হতে পারেন নি।

পাঞ্জাবী পালোয়ানদের মধ্যে কোনো কোনো বড় পালোয়ানের এরূপ রীতি ছিল যে, অখ্যাত বা নতুন মল্লদের সঙ্গে তাঁরা একেবারেই প্রতিযোগিতায় নামতেন না। সেক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জারদের আগে দলের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে লড়ে শক্তির পরীক্ষা দিতে হত। সম্ভবতঃ গোলাম পালোয়ান সর্বপ্রথম এ-রীতির প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর ৩৫ বছরের পরে। সে সময় তাঁর চ্যালেঞ্জারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন তাঁরই মধ্যম ভাই কাল্লু পালোয়ান। আখড়ার নিয়ম বা বয়সের বিচারে পরবর্তী স্থানের অধিকারী ছিলেন যথাক্রমে গোলামের কনিষ্ঠ ভাই রহমান এবং শ্রেষ্ঠতম ছাত্র রহিম। কিন্তু ১৯০০ অব্দে গোলামের মৃত্যুর পরে কাল্লু প্রধানতম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় আগ্রহান্বিত ব্যক্তিদের লড়তে হত রহমান বা রহিমের সঙ্গে। এতদুভয়ের মধ্যে রহমান আখড়ার অন্যান্য সভ্যদের শিক্ষার ব্যাপারে বেশি সময় নিযুক্ত থাকায় কার্যতঃ রহিমকেই বার বার দঙ্গল লড়তে হয়েছিল। অথচ গোলামের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩৩ বছর।

সাধারণভাবে একজন সুস্থ লোকের আয়ুষ্কাল ৬০ থেকে ৬৫ বছর ধরে নিলে ৩০ থেকে ৩২ বা ৩৩ বছরের সময় সীমাকে তার জীবনের মধ্যাহ্নকাল বলে গ্রহণ করা চলে। যৌবনকালে রহিম দঙ্গল লড়ে থাকলেও তাঁর তথ্য বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাঁর যা কিছু পরিচয় তা সবই ৩৫ বছরের পরে এবং ৬৪ বছরের মধ্যে।

লাহোর, অমৃতসর, পাতিয়ালা, মুলতান, জলন্ধর এবং শিয়ালকোটের মতো গুজরান জেলাও পাঞ্জাবের অন্যতম প্রসিদ্ধ কুস্তিকেন্দ্র রূপে সমাদৃত ছিল। রহিমের জন্ম হয় এই গুজরান সহরে আনুমানিক ১৮৬৭ অব্দে। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ভারতীয় পালোয়ানের মতো রহিমও ছিলেন 'খানদানি' পালোয়ান। তাঁর বাবা সুলতান পালোয়ান ছিলেন পূর্ব যুগের আলিয়া, রামজী, সুলেমান, আলী, বালি ও বুটার সমসাময়িক। কিন্তু রহিম বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই পিতৃহীন হওয়ায় তাঁর কুস্তি শিক্ষার ভার পড়ে গোলাম পালোয়ানের হাতে। যত দূর মনে হয়, গোলামের শিক্ষার গুণে ২২।২৩ বছরের মধ্যেই রহিমের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটে; বড় বড় দঙ্গলে নামার সুরুও হয় তাঁর এই সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে, গোলামের সমস্ত শিষ্যের মধ্যে রহিমই যে তাঁর অধিকাংশ কুস্তি কৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোথাও দ্বিমত নেই।

রহিমকে প্রথম কার বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল, তা সঠিক বলা শক্ত। তবে গোলামের মৃত্যুর পরে কিছুকালের জন্য তিনি বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে শ্রেষ্ঠ পালোয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন। সেই সময়, বোধ হয় ১৯০২ অব্দে, তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদেই শিয়ালকোটের প্রখ্যাতনামা পালোয়ান গামুর লড়াই হয়। শোনা যায়, প্রায় ২০ মিনিট প্রবল সংঘর্ষের পরে একটা সময়ে রহিমের মুহূর্তকালীন অসতর্কতার সুযোগে গামু তাঁকে চিৎ করে ফেলেছিলেন। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রহিমের এ পরাজয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন; স্বয়ং রহিম এবং নবাব বাহাদুরের তো কথাই নেই, তাঁরা উভয়েই নাকি উভয়কে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

এর পরে গামুকে পুনরায় রহিমের সঙ্গে লড়ার জন্য ১০০০০্ টাকা বাজি রাখা হয়েছিল, এবং পাঞ্জাবে তাঁদের কুস্তির জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গামু আর কখনো রহিমের সম্মুখবর্তী হন নি।

সেই সময়ে লাহোরের বড় গামা অমৃতসরের প্রসিদ্ধ সুলেমান পালোয়ানের ছেলে গোলাম উদ্দিনকে দাতিয়া সহরে পরাজিত করে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। দাতিয়ার মহারাজা ছিলেন গামার পৃষ্ঠপোষক। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, সুলেমান ছিলেন প্রসিদ্ধ গোলাম পালোয়ানের মামা এবং শিক্ষাদাতা। সে সময় সুলেমান জীবিত নেই, গোলামও নন। কাজেই গামার হাতে গোলামের মামাত ভাই গোলাম উদ্দিনের এই পরাজয়ে গোলামের শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়তম শিষ্য হিসাবে রহিম এগিয়ে এলেন গামার বিরুদ্ধে যদিও সেই সময়ে রহিমের বয়স ৩৬-এর কম নয়, আর গামার মাত্র ২৩। গামা তখন তাঁর শৌর্য ও শক্তির পরিপূর্ণ দীপ্তি নিয়ে উদিত হচ্ছেন। ১৯০৩ অব্দে দাতিয়া সহরে এই লড়াই হয়।

কুস্তির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহিম প্রবল বিক্রমে আক্রমণ চালালেন, গামা কেবল সেই অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে লাগলেন। বার তিনেক রহিম গামাকে নিচেও নামিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই গামা নিজেকে মুক্ত করতেও সমর্থ হন। কিন্তু সময় যত যায়, গামার অবস্থা ততই ঘোরাল হয়ে থাকে। দাতিয়ার মহারাজা এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দর্শকেরই ধারণা দাঁড়িয়ে গেল, এইভাবে কুস্তি চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত রহিমের হাতে গামার পরাজয় রক্ষা পাবে না। ফলতঃ রহিমের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দাতিয়ার মহারাজা ২০ মিনিটের মাথায় তাঁদের কুস্তি বন্ধ করে দিলেন।

রহিমের সঙ্গে গামার দ্বিতীয় লড়াই হয় তিন বছর পরে ইন্দোর সহরে ১৯০৬ অব্দে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল সে যুদ্ধে কেউ কাকেও মাটিতে পর্যন্ত নামাতে পারেন নি যদিও গামাকে এবারও কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। যে যুদ্ধে উভয়পক্ষই সমান তেজে লড়ে এবং কেউ কাকেও

বিশ্ব বধির ক্রীড়া

শ্রীদিলীপ নন্দী

> প্রবন্ধকার মূক-বধির তরুণ শ্রীদিলীপ নন্দী কলিকাতার ক্রীড়া-মহলে পরিচিত। ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব এসোসিয়েশন দলের পক্ষে তাঁহাকে নিয়মিত ক্রিকেট মাঠে দেখা গিয়াছে। গত বৎসরে হেলসিংকিতে বিশ্ব বধির ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনো ভারতীয় অংশ গ্রহণ না করিলেও শ্রীযুক্ত নন্দী অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে হেলসিংকির ক্রীড়া কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়াই বিশ্ব বধির ক্রীড়া সংগঠনে প্রেরণার উৎস। দুর্ভাগ্যে বিপর্যস্ত মূক-বধিরদের আনন্দদানে এবং আত্ম-বিকাশের ক্ষেত্রকে সুগম করিয়া তোলার সংকল্পেই এই অনুষ্ঠান আয়োজিত।

বিশ্ব বধির ক্রীড়া প্রাচীন অনুষ্ঠান নহে। আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণে ১৯২৪ সালে প্যারিসে সর্বপ্রথম এই ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয় এবং তদবধি চতুর্বার্ষিকী অনুষ্ঠান হিসাবে দেশে-দেশে ইহা আয়োজিত হইয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে বিশ্ব বধির ক্রীড়ার নিয়মিত অনুষ্ঠানে ছেদ পড়িয়াছিল।

তবে প্রাচীন অনুষ্ঠান না হইলেও সাম্প্রতিক কালে এই বধির আয়োজনের ক্রমপ্রসার ঘটিতেছে। আন্তর্জাতিক বধির সংস্থার প্রতিষ্ঠার সক্রিয়তার কল্যাণে ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী দেশ ও প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীর সংখ্যাও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে।

পারস্পরিক মিলন এবং সামাজিক জীবনে প্রবেশের পক্ষে বধিরদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের পরিচয় রাখার অনুকূলে বিশ্ব বধির ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান হয় মূলতঃ ফ্রান্সের মঃ রুবেন্স-আলকেসের উদ্যোগে। উত্তর পর্বে মঃ আলকেস এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের বধির কল্যাণ আন্দোলনের নেতৃবর্গের সক্রিয়তায় আন্তর্জাতিক বধির ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা সি আই এস এস নামে পরিচিত। পূর্ণ সংজ্ঞা কমিটি ইণ্টারন্যাশনাল স্পোর্টস সাইলেণ্টা।

প্যারিসের প্রথম অনুষ্ঠানের চার বছর পর ১৯২৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া-কেন্দ্র আমস্টারডামেই বিশ্ব বধির ক্রীড়ার দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠান হয় নুরেমবার্গে ১৯৩১ সালে। চতুর্থ আয়োজন লণ্ডনে ১৯৩৫ সালে ও ১৯৩৯ সালে স্টকহোমে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে বিশ্ব বধির ক্রীড়ার পুনঃ প্রবর্তন ঘটে ১৯৪৯ সালে কোপেন-হেগেনে, তৎপরে ১৯৫৩ সালে মিলানে এবং সর্বশেষ ১৯৬১ সালে হেলসিংকিতে। কথা আছে যে, পরবর্তী অনুষ্ঠান হইবে ১৯৬৫ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে।

হেলসিংকির অনুষ্ঠানকাল ছিল ৬ই হইতে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত। এই উপলক্ষে ভারতীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীতে উপস্থিত থাকার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ সুযোগের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার সুষ্ঠু আয়োজন এবং ইউরোপের নানান অঞ্চলের মূক-বধির কল্যাণ আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছিল।

চার লক্ষ লোকের বাসভূমি হেলসিংকি শহর অসংখ্য হ্রদ ও দূর-বিস্তৃত বনরাজি পরিবৃত। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের মূলধনে হেলসিংকির সংগঠন কমিটি এবারের ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া

হেলসিংকিতে লেখক (বামে)

হেলসিংকিতে কেবলমাত্র মূক-বধিরদের উদ্দেশ্যেই এক বিরাট প্রদর্শনী বসে। সেই প্রদর্শনীতে মূক-বধির কল্যাণ আন্দোলনের বিবিধ নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়।

হেলসিংকির বিখ্যাত স্টেডিয়ামে, যে স্টেডিয়ামে ১৯৫২ সালে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই ক্রীড়া-কেন্দ্রেই বিশ্ব বধির ক্রীড়ার আসর পাতা হয় এবং শহরের অন্য ক্রীড়াকেন্দ্রগুলিকে বধির ক্রীড়ার বিভাগীয় আয়োজনে ব্যবহার করা হয়। মূল স্টেডিয়ামে সাতাত্তর হাজার দর্শক-আসন আছে এবং প্রবেশদ্বারে স্থাপিত অবিস্মরণীয় অ্যাথলিট পাভো নুরমির এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি।

আগস্ট মাস হেলসিংকিতে গ্রীষ্মকাল। আবহাওয়ার তাপ গড়ে বাষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট। সাধারণতঃ এই সময় বৃষ্টি নামে না। প্রকৃতি যেন উপসাগরীয় উষ্ণতায় কিঞ্চিৎ গরম হইয়া থাকে। সূর্যালোক স্পষ্ট হইয়া থাকে দিনে প্রায় ষোল ঘণ্টা। তাই হেলসিংকিকে অনেকে বলে নিশীথ সূর্যের দেশ।

গত বৎসরের আগস্টের প্রথম ভাগে কিন্তু হেলসিংকিতে বৃষ্টি নামিয়াছিল। সৌভাগ্যের কথা, বধির ক্রীড়ার সূত্রেতেই পর্জন্যদেব প্রসন্ন হন। শহরে সুউচ্চ পাকা বাড়ীর সংখ্যা স্বল্প। মন্দির ও মনুমেণ্ট আকারে নির্মিত নাতিদীর্ঘ বাসগৃহ-গুলি সুন্দর শহর হেলসিংকিকে আরও সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের শহরের যে অঞ্চলে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, সেই অঞ্চলের পরিচয় ক্রীড়া-গ্রাম সংজ্ঞায়। গ্রাম নয়। আসলে গ্রামটি শহরের অভ্যন্তরে নির্মিত আর একটি ক্ষুদ্র শহর-বিশেষ। গ্রাম-ভবনগুলি মাথায় ছয়তলা উচ্চ এবং গঠন-সৌন্দর্যে মনোরম। নীচের তলা সম্পূর্ণ ফাঁকা। দ্বিতল হইতে থামের উপর ঘর বসানো হইয়াছিল। গ্রামে বসবাসের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল প্রশস্ত। হোটেল, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, সেলুন, পণ্যসামগ্রীর দোকান, বিচিত্রানুষ্ঠান কেন্দ্র, খেলার মাঠ, সমস্ত কিছুই।

হেলসিংকির আসরে কমপক্ষে চাব্বিশটি দেশের ৭১৩ জন প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনী উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য ইঁহাদের অধিকাংশই আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্নাঞ্চল আগত। তুরস্ক, ইরাণ ও নিউজিল্যাণ্ডের কয়েকজন ছাড়া কেবলমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রীড়াবিদেরাই হেলসিংকিতে হাজির ছিলেন—ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

দুঃখের কথা, এই আসরে, বিশ্ব বধির ক্রীড়ার সাম্প্রতিক আয়োজনে ভারতের কোনো প্রতিযোগী অংশ লন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় বধির ক্রীড়ার সামগ্রিক মান উন্নত। সুচিন্তিত পরি-কল্পনা অনুসরণে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ও আমেরিকান বধিররা ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানোন্নয়নে সফল হইয়াছেন। কিন্তু গঠন-মূলক পরিকল্পনার অভাবে, পরম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে আমাদের দেশে বধির ক্রীড়ার মান অনুন্নত। ভারতে এখনও বধির কল্যাণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। শিক্ষা-কেন্দ্র চালু করিয়া উপযুক্ত কোচদের প্রশিক্ষণে নিযুক্ত না করিতে পারিলে আমাদের স্বদেশীয় সমস্যা সমাধানের পথও শীঘ্র প্রশস্ত হইয়া উঠিবে না।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বধির ক্রীড়ামান যে কিরূপ উন্নয়নমুখী, হেলসিংকির বিবরণেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। হেলসিংকিতে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অবকাশে অনায়াসে পঁচিশটি বিভাগে পুরাতন রেকর্ড ভাঙিয়া নূতন করিয়া রেকর্ড গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছে।

ক্রমধ্যে কেবলমাত্র অ্যাথলেটিকে নূতন রেকর্ড

(শেষাংশ ২১৬ পৃষ্ঠায়)

সাধনার ফলশ্রুতি

শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র

অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অটল সংকল্প, একান্ত নিষ্ঠা আর অবিচল সাধন মানুষকে যে তার শ্রেষ্ঠ কাম্যস্থানে পেঁছিয়ে দিতে পারে অলিম্পিক বিজয়িনী উইলমা রুডলফ তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবশ্য তার সঙ্গে দৈব বা সুযোগের সংযোগ ঘটা দরকার। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে যে গোবিন্দের কৃপা হ'লে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন ক'রতে পারে। এটা যে শুধু কথার কথা নয় সুদূর আমেরিকায় নিভৃত পল্লীর সহায় সম্বলহীন এই উইলমার জীবনে তার সম্যক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। শিশুকালে পঙ্গুত্ব যাকে পরিবারের কাছে একটা ভারস্বরূপে করে তুলেছিল সেই শিশুটি যে উত্তরকালে বিশ্ব অলিম্পিকের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তিন তিনটে সোনার পদক জিনে নিতে পারে এ কল্পনা হয়তঃ সে নিজেই করেনি। তবে, শৈশবের এই শারীরিক ত্রুটি থেকে নিজেকে মুক্ত করে এই মেয়েটি অক্লান্তভাবে যে প্রচণ্ড সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করেছিল তাই পরে সোনা হয়ে দেখা দিয়েছিল। ১৯৬০ সালের রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে উইলমা শতমিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে অনায়াসেই দুইশত মিটার দৌড়েও প্রথম স্থান নেয় এবং মেয়েদের চারশত মিটার রিলে রেসে বিজয়িনীর পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। উইলমার সহায়তায় মার্কিণ মেয়েদের (চারজন) দলটি চারশত মিটার রিলে রেসে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেন। পঙ্গু জীবনের গ্লানি মোচন ক'রে বিশ্বের দ্রুততম মেয়েরূপে নিজেকে জাহির করে উইলমা নিজের জীবনের চরম বিকাশ দেখিয়েছে।

উইলমা রুডলফের জীবন কাহিনী এক কথায় অসাধারণ। গল্পের মতই চমকপ্রদ। আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের ছোট্ট একটি গ্রামে তার জন্ম হয়। এক সংগতিহীন বিরাট পরিবারে ষোড়শ সন্তান হচ্ছে উইলমা। বৃদ্ধ পিতা, জরাক্রান্ত ও কর্মশক্তিহীন, যাকে বলে একেবারে অক্ষম। এবাড়ী ওবাড়ী কাজ করে মাকেই তার সংসার প্রতিপালন ক'রতে হয়। রুডলফ পরিবারের বড় কষ্টে দিন চলে। এতগুলি ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ ত সোজা ব্যাপার নয়। কোনরূপে দিন গুজরাণ হয়। মিঃ ও মিসেস্ রুডলফ ছেলেমেয়েদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারলেও একটি পরম শিক্ষা তাদের দেন যে জীবনকে বিকশিত ক'তে হ'লে সৎশিক্ষা ও অটুট সংকল্পের পথে নিজেদের পরিচালিত ক'রতে হবে। উইলমার জীবনে তাঁদের এই শিক্ষা সাফল্যে সমুজ্জ্বল হয়েছিল।

উইলমার বয়স চার। তখন ডবল-নিউমোনিয়া ...

মেয়ের চিকিৎসার জন্য মিসেস্ রুডলফ ক্লার্কসভিলে গ্রাম থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী ন্যাশভিলে গ্রামের এক ডাক্তারখানায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতেন। ছোট্ট রুগ্ন মেয়েটিকে কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুদিন তিনি এইভাবে বাসে ক'রে যেতেন গ্রামের লোকের সস্নেহ সহানুভূতি আর আশীর্বাদ বর্ষিত হতো এই পঙ্গু মেয়েটির পরে। দু'বছরের শেষে পায়ের অবশ ভাবটা কেটে গেলেও নতুন করে একপ্রকার বিশেষ জুতোর সাহায্যে উইলমা আবার হাঁটতে শেখে। ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলায় উইলমার অসাধারণ আগ্রহ। দাদাদের কাছ থেকে নানান খেলার গল্প শুনতে তার ক্লান্তি আসেনি। এমনিভাবে বয়স যখন তার এগার তখন তাদের বাড়ীতে ভাই-বোনেরা বাস্কেটবল খেলা সুরু করে। বাড়ীর পেছন দিকটা একটা বাগানের মত। সেখানে বাস্কেটবলের একটা 'হুপ' খাটান হলো। বাস্কেটবলের খেলাতে উইলমা মত্ত হ'য়ে উঠলো। বাস্কেটবল আর বাস্কেটবল। ফাক পেলেই উইলমা চলে যায় বাগানে, আর বাস্কেটবলের প্রাকটিশ করে। দেখতে দেখতে এই খেলায় উইলমা খুব পটু হ'য়ে উঠলো।

বার্ট হাইস্কুলের জিমনাসিয়ামে দাদাদের সঙ্গে উইলমাও বাস্কেটবল খেলে। স্কুলের 'কোচ' সি সি গ্রে এই রোগা মেয়েটির নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হন। বলেন, রোগা হলেও মেয়েটা খুব দ্রুত, চটপটে আর খেলার সময় থাকে ঠিক জায়গায়। দেখতে দেখতে বছর দুই-এর মধ্যে উইলমা টেনিসি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃতি পেল। ১৯৫৫ সালে টেনিসি রাজ্যে প্রতিযোগিতায় সে ৮০৩ পয়েন্ট 'স্কোর' করে। এইটেই ছিল, সে বছরের রেকর্ড।

টেনিসি স্টেট কলেজের মেয়েদের দৌড় শিক্ষক, এডোয়ার্ড টেম্পল। উইলমা রুডলফের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার খেলা লক্ষ্য করে তাঁর মনে হলো যে উইলমা দৌড়ে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। একে যদি দৌড়ানীয়া হিসাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে তার কাছ থেকে অসম্ভব ফল পাওয়া যেতে পারে। তাই মিঃ টেম্পল বার্ট হাইস্কুলের শিক্ষক মিঃ গ্রেকে তাঁদের স্কুলে দৌড়ে মেয়েদের একটা দল গড়ে তোলবার অনুরোধ করেন। মিঃ গ্রে তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেন, আর উইলমা রুডলফ তার প্রিয় খেলা বাস্কেটবল ছেড়ে দৌড়ে মনোনিবেশ করে।

জীবনে যখন সুযোগ অসে তখন এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই তার দেখা মেলে। বাস্কেটবলের খেলোয়াড় যে শ্রেষ্ঠ দৌড়ানীয়ারূপে বিকশিত হয়ে উঠবে উইলমা রুডলফের অতি বড় হিতাকাঙ্ক্ষীর মনের কোণাতেও তা কোনদিন ঠাঁই পায়নি। বাস্কেট বলের প্রতিযোগিতা উইলমার জীবনে সেই সুযোগ এনে দিলে তাকে দৌড় শিক্ষক মিঃ এডোয়ার্ড টেম্পলের নজরের সামনে এনে। একেই বলে শুভ-লগ্ন। যে জীবন তার কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল সেই জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এডোয়ার্ড টেম্পল। আর তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবার কাজে সহায়তা ক'রলেন বার্ট হাইস্কুলের কোচ মিঃ গ্রে। মিঃ গ্রে প্রতিদিন এই মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ন্যাশভিলেতে টেনিসি স্টেট কলেজে নিয়ে গেছেন মিঃ টেম্পলের কাছে তার শিক্ষাকে সার্থকরূপ দিতে। তিন-তিন বছর প্রতিদিন অক্লান্ত চেষ্টায় এই দুই শিক্ষক গড়ে তুললেন উইলমা রুডলফকে এক অ-প্রতিদ্বন্দ্বী দৌড়ানীয়ারূপে। তাঁদের এই শিক্ষার গুণে হাইস্কুল দৌড় প্রতিযোগিতায় একটা রেসেতেও উইলমাকে কেউ আর পরাজিত করতে পারেন নি।

উইলমাকে তার এই অসাধারণ দ্রুততার কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, উত্তরে সে বলে 'আমি দৌড়াই। কেমন করে যে এত দ্রুত দৌড়াই তা আমি নিজেই জানি না।' তবে তার মূলে মিঃ টেম্পলের শিক্ষা যে শক্ত বনিয়াদ গড়ে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। মিঃ টেম্পল টেনিসি স্টেট কলেজের মেয়েদের দৌড় শিক্ষার যে ব্যবস্থা করছেন তা সত্যই অতুলনীয়। উইলমা ঐ কলেজেরই ছাত্রী। উইলমার মত আরও অনেক মেয়ে দৌড়ানীয়ার খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯৬০ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে যে দলটি রেকর্ড সৃষ্টি করে রিলে রেসে জয়ী হয় সেই দলের প্রতিটি মেয়েই তাঁর ছাত্রী।

উইলমা রুডলফ সত্যিই এক অসাধারণ মেয়ে। প্রতিটি কাজেই তার এক অনমনীয় সংকল্প। আর সেই সংকল্প সিদ্ধির জন্য অপূর্ব নিষ্ঠা দেখা যায়। বাস্কেটবল ত বাস্কেটবলই, তাতেই সেরা হবার চেষ্টায় অবিরাম সাধনা। আবার বাস্কেটবল ছেড়ে দৌড়ে। তাতেও সেই একাগ্রতা ও অদম্য উচ্চাভিলাষ। প্রতিটি বিষয়েই তার এই বৈশিষ্ট্য তাকে শীর্ষস্থানে পেঁছে দিয়েছে। পড়াশুনাতেও সে পেছিয়ে নেই। নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কেও সে সচেতন। কলেজেই কিছু কিছু কাজের বিনিময়ে সে তার নিজের পড়ার খরচা সংগ্রহ করে। এ-ছাড়া প্রতিদিন একান্ত নিষ্ঠায় সে তার নিজস্ব সাধনার বস্তু দৌড় অনুশীলনে এতটুকু শৈথিল্য দেখায় না। প্রতিদিন গড়ে দুটি ঘণ্টা এর জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ এই পাঁচ বৎসরে তার জীবনে উইলমা আমেরিকার সেরা সেরা দৌড় প্রতিযোগিতায় তেত্রিশটি ট্রফি জিতে এনেছে আর এনেছে ১৯৬০ সনে রোমের বিশ্ব অলিম্পিক থেকে তিনটি স্বর্ণ-পদক। বিশ বছরের মেয়ের জীবনে এই অসামান্য সাফল্য অনন্য সাধারণ সাধনার সার্থক দান।

কাকতালীয়

অজয় বসু

সংস্কার এক আজব চীজ বটে! যুক্তি নেই, মানানসই কৈফিয়ৎ নেই, কার্য কারণে সম্পর্কও নেই। তবুও সংস্কারের অক্টোপাস থেকে মুক্তি নেই। একবার পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে যাকে তার রেহাই মেলা রীতিমতো ভার।

খেলোয়াড় মহলে সংস্কারের প্রভাব খুব। একদল আছেন যাঁরা ভাবেন, বিশেষ সাজপোশাক না আঁটলে, বিশেষ কাজটি সময় মতো সম্পন্ন না করলে, বিশেষ নামটি না জপতে পারলে তাঁদের ভাগ্যে সাফল্য অনিশ্চিত।

কাণ্ড দেখে লোকে হাসে। স্নায়ু দুর্বল বলে বন্ধুরা দুয়ো দেয়। তবু, তাঁরা নাছোড়বান্দা। খেলোয়াড় জীবনের সূত্রে সেই যে বিশেষ এক সংস্কারের পায়ে তাঁরা দাসখৎ লিখে দিয়েছেন, তা থেকে আর মুক্তি মেলে নি।

যুক্তিবাদী মন ওঁদের দেখে অবাক মানে। দুর্জয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার শানিত আয়ুধকে প্রতি আক্রমণে ওরা খান্ খান্ করে দেন। লক্ষ-লোকের প্রত্যাশামুখো দৃষ্টির সামনে নিজেদের ক্রীড়াকীর্তির স্বাক্ষর রেখে ওঁরা সোরগোল বাধিয়ে তোলেন। ওঁদের স্নায়ু দুর্বল নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু, ওঁরা ভোগেন সংস্কারের চাপে। হয়তো সে ভোগান্তিতেই ওঁদের আনন্দ। সংস্কার যেন ওঁদের পোষা প্রিয় 'হবি'।

সংস্কারবদ্ধ খেলোয়াড়দের স্বতন্ত্র জাত নেই। সাদা কালো, দেশী-বিদেশী, পুরুষ-মহিলা সবাই সংস্কারের পায়ে মাথা খুঁড়েছেন। ভালো খেলা নিশ্চয়ই দক্ষতা সাপেক্ষ। তবু জাত খেলোয়াড়েরা সাফল্যের উৎস মুখে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা আবিষ্কার করেই সান্ত্বনা পেতে চান।

খেলোয়াড় মহলে যে কতো রকমের সংস্কার আছে তার ঠিকঠিকানাও নেই। এক-একটির পরিচয় যেমন বিচিত্র, তেমনি অভিনব। সকল খেলোয়াড়ের মন হরিহর আত্মা নয়, তাই তাদের সংস্কারের প্রকৃতিও আলাদা। অন্যের কাছে যার মূল্য কানাকড়িও নয়, ব্যক্তি বিশেষের কাছে তার দাম অনেক।

এমন 'অমূল্য পরধন'কে আত্মসাৎ করতে কার না সাধ জাগে! পড়ে পাওয়া সম্পদ। চারিদিকে ছড়ানো। কুড়িয়ে নিচ্ছি আমি শুধু মেজাজকে আরও একটু তরল করে নেওয়ার সাধু সংকল্পেই।

মাঠে নামার আগে জাগ্রত বিগ্রহ জ্ঞানে ক্রীড়া কেন্দ্রকে প্রণাম করে নেওয়া আমাদের দেশে প্রচলিত এক পুরানো রীতি। সম্প্রতি সূর্য প্রণামও এই রীতিতে যুক্ত হয়েছে। প্রভাকর পার্সীদের উপাস্য দেবতা। পলি উমরিগড় মাঠে নেমেই যদি উপাস্যের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন তাহলে সে প্রক্রিয়া হয় অর্থব্যঞ্জক। কিন্তু দেখাদেখি যদি অন্যেরাও সূর্য নমস্কারে মনোবল অর্জন করতে চান তাহলে কি সংস্কারের প্রভাবকেই শিরোধার্য বলে মানা হয় না?

অধুনা অনেকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার উমরিগড় প্রদর্শিত পথ পরিক্রমায় রত আছেন। বাংলা দেশের জনকয়েক খেলোয়াড়ও। এবং সবার ওপরে কজন মুসলমান ক্রিকেটারও!

ছিমছাম পোশাক আঁটা, আদব-কায়দা দুরস্ত ক্রিকেটারদের রুচিসম্মত বহিরঙ্গ দেখে ভুলেও ভাববেন না যে, ওঁরা সব সংস্কারমুক্ত পুরুষ। ঠিক ঠিক হিসেবে ওঁদের মতো সংস্কারবদ্ধ অন্য খেলোয়াড়েরা নন।

স্বচক্ষে দেখেছি এমন খেলোয়াড়কেও যাঁর খেলার ট্রাউজারের পকেটেতে ছিল ক্ষুদ্র সংস্কারের পুঁটলি। কেউ বা সাজপোশাক বদলের ঘরের এক নিভৃত কোণে সারাক্ষণ মুখ বুজে বসে থাকতেন। কেউ বা চশমা মুছতেন। কেউ আবার মাঠে নেমেই দু চোখের পাতায় আর বুকে হাত বুলিয়ে

স্বপন কথায় রবিনসন 'অন্তরঙ্গ'

নিতেন। উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়, হয়তো সে ভক্তির উৎস সাফল্য পরীক্ষার শঙ্কা।

প্যাটসি হেনড্রেনের নাম মনে পড়ে? ইংল্যান্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ টেস্ট খেলোয়াড়।

অমন দিলখোলা আমুদে মানুষ ক্রিকেট মাঠে আর আসেন নি। নিজেকে নিয়ে, সতীর্থদের কেন্দ্র করে কতো না মজার ঘটনা তিনি নিজের হাতে গড়ে রেখেছেন। কিন্তু এমন মানুষও লর্ডস মাঠে খেলার দিনে বিশেষ এক মুহূর্তে গোমড়া মুখো হয়ে বসতেন।

প্যাটসির মুখের হাসি মিলিয়ে যেতো যদি প্যাভিলিয়নের বিশেষ একটি অঞ্চল অন্য কোনো খেলোয়াড় দখল করে বসতেন। এই বিশেষ জায়গাটি দখলে রাখতে প্যাটসি কতোদিন রাত থাকতেই প্যাভিলিয়নে ঢুকে পড়েছেন অন্য খেলোয়াড়দের আবির্ভাব ঘটার আগেই! কতোদিন জায়গাটির জন্যে সতীর্থদের সঙ্গে খুনোখুনি পর্যন্ত বাধিয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড় মহলে নির্দিষ্ট অঞ্চলটি 'হেনড্রেনস কর্ণার' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। প্যাটসির ধারণা জায়গাটি না পেলে খেলায় তিনি সুবিধা করতে পারবেন না।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটের জনক ডাঃ ডব্লিউ জি গ্রেস মনে করতেন যে, কোনো জোড়-সংখ্যার পাশে নাম প্রকাশিত হলেই তাঁর রান ভাগ্যে জুটবে গোল্লা। অবশ্য এই ধারণার সত্য মিথ্যে যাচাই করা সম্ভবপর হয় নি। কারণ ডব্লিউ জির নাম বরাবরই এক জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে, দলের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে। হয় ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর না হয় দলপতিরূপে।

স্যার জ্যাক হবসের মতো নিখুঁত ব্যাটসম্যানও ভাবতেন যে, ক্রীড়া-কৌশল তাঁর অধিগত নয়। তাঁর সাফল্য নির্ভরশীল যেন প্যাড পরার ওপরেই। হবসকে প্রথমে বাঁ-পায়ে প্যাড লাগাতেই হবে। তারপর ডান পায়ে। ভুলে যেদিন ডান পায়ে প্যাড এঁটেছেন সেদিন আর তাঁর মনের মেঘ সরে যেতো না, তা তিনিই যতোই না কেন রান করুন। উত্তরকালে বিল এডরিচও হবস হতে চেয়েছিলেন, বাঁ-পায়ে আগে প্যাড গলিয়ে। কিন্তু পারেন নি। এডরিচও বড় খেলোয়াড়। কিন্তু হবস হবসই। সর্বকালের অন্যতম সেরা—ব্যাটসম্যানদের চিরকালের আদর্শ। এক সংস্কারে ভাগীদার হয়েও এডরিচ হবসের নাগাল ছুঁতে পারেন নি।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক গাবি অ্যালেনের পকেটে থাকতো একটি বিশেষ মুদ্রা। তাঁর বিশ্বাস, এই মুদ্রার কল্যাণে তিনি টসে বিপক্ষ দলনায়ককে হার মানাতে পারতেন। ঐ বিশ্বাস স্যার লেন হাটনেরও ছিল। এবং আরও দৃঢ়মূল হয়ে। পাঁচ শিলিং দামের মুদ্রাটি লেন হাটন উপহার পেয়েছিলেন পিতামহের এক বন্ধুর কাছ থেকে। যেদিন সেটিকে কাছ ছাড়া করেন সেই দিনই তাঁর একটি হাত ভেঙে যায়। পাক দলপতি হাফিজ কারদারের পকেটেও এমনি এক মুদ্রার চির অবস্থান ছিল। যেটা ষষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি সম্বলিত একটি পেনি। ১৯৪৬ সাল থেকে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত পেনিটি হাফিজের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছে।

পুরোনো জামা আর পুরোনো টুপি আঁকড়ে থেকে অনেক ক্রিকেটারই লোক হাসিয়েছেন। দৃষ্টান্ত ডগ ইনসোল, মরিস টেট, এভারটন উইকস। প্রথম সেঞ্চুরী করেছিলেন যে সার্ট পরে সেই সার্ট ইনসোলকে ছাড়তে হয়েছিল সজল চোখে। কারণ সেদিন সার্টটির অবস্থা ছিল শত-ছিন্ন, জীর্ণ।

কিন্তু মরিস টেট ছেঁড়া টুপিও ছাড়তে পারেন নি। মাথায় না দিতে পারলেও ব্যাগে ভরে খেলার মাঠে এনে তবে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছেন। উইকস বারবাদোজ দলের টুপি এঁটে ব্যাট করতে নামতেন। যেদিন জাতীয় দলের টুপি মাথায় ব্যাট করেছেন সেই দিনই নাকি প্রায় শূন্য হাতে ভাবুতে ফিরতে হয়েছে। পরের ম্যাচেই আবার সেই বারবাদোজের টুপির কল্যাণেই সেঞ্চুরী হাঁকড়েছেন। সুতরাং পয়া টুপিটি তিনি হাতছাড়া করবেন কেন?

শ্যোন দৃষ্টিতে নজর রাখলে এখনও হানিফ মহম্মদকে ব্যাটবলে করার পূর্ব মুহূর্তে পেটে, বুকে এবং শেষ পর্যন্ত টুপিতে হাত ছোঁয়াতে দেখা যাবে। মুদ্রাদোষ নয়। এও এক সংস্কার। টুপি চুম্বন করে দক্ষিণ আফ্রিকার অফ স্পিনার হিউ টেফিল্ড একজনকে আউট করেছিলেন একদিন। ব্যাস সেই থেকে টেফিল্ডের টুপি নিয়মিত চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো।

শুনেছি, আমাদের দলীপ সিংজী ড্রেসিং রুমে বসে, ক্রিকেট থেকে সরে থাকতে আপন মনে রেকর্ড বাজিয়ে শুনতেন। আর কে একজন যেন মাঠে নামার আগে নাক ডাকিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। সতীর্থদের ডাকে নাকি তাঁর আড়মোড়া ভাংতো!

দলীপ সিংজীর গান শোনার মতো ভ্যালেরি ব্রুমেলের বই পড়াও নিয়মিত অভ্যাস। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হাইজাম্পার ভ্যালেরি ব্রুমেল। আজকাল সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি ওপরে উঠতেও তাঁর কুণ্ঠা জাগে না। শুধু কুণ্ঠা অনুষ্ঠানকালে অন্য প্রতিযোগীদের ওপর নজর রাখায়। নিজে যখন লাফান না তখন ব্রুমেল প্রতিযোগিতা ভূমির উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ার টেনে বই নিয়ে বসেন। প্রতিযোগিতায় নিরাসক্ত, নির্বিকার মূর্তি দেখে দর্শকেরা বিস্ময়ে ভাবেন, ব্রুমেলের বুঝি স্নায়ু বলে কিছু নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রতিযোগিতাকালে মুখ ফিরিয়ে বই পড়াও যে ব্রুমেলের নিজস্ব সংস্কার নয়, এ কথাই বা হলপ করে কে বলতে পারে?

অমন শক্ত স্নায়ু যাঁদের, সেই জোয়ান মরদ মুষ্টিযোদ্ধারাও সংস্কারের শাসানিতে ভুগেছেন। এ নজীরও অজস্র আছে।

সর্বকালের অন্যতম সেরা তথা ভয়ংকর লড়িয়ে জ্যাক ডেমপসির কথাই ধরা যাক। একটা পুরোনো কোট ছিল ওঁর। সেইটি গায়ে চড়িয়ে উনি আসতেন মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ে। লুই ফারপোর সঙ্গে লড়ায়ের দিনে ম্যানেজার কিয়ার্নস একটি মূল্যবান শাদা সোয়েটার ওঁকে উপহার দিলেন। ডেমপসি হাত পেতে নিলেন বটে কিন্তু কিছুতেই গায়ে চড়াবেন না। ওদিকে কিয়ার্ণসও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত কিয়ার্ণস জিতলেন কিন্তু রিংয়ে নেমে ডেমপসি প্রায় পরাজয়ের মুখোমুখি আর কি!

বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন তিনি। জগতজোড়া নাম তাঁর। আর তাঁকে কিনা লুই ফারপো এক ঘুষির প্রচণ্ড ঘায়ে একেবারে রিংয়ের বাইরে ফেলে দিলেন। কলাগাছের মতো পড়ে গিয়ে ডেমপসি সে মুহূর্তে কিয়ার্ণসের মুণ্ডপাত করেছিলেন।

সামলে নিয়ে কোনো রকমে ডেমপসি সে লড়াইয়ে ফারপোকে হারিয়ে দিলেন বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিয়ার্ণসের সোয়েটারটিও হারিয়ে ফেলতে তাঁর সময় লাগে নি। বলা বাহুল্য ডেমপসির হাল দেখে ম্যানেজার কিয়ার্ণসও আর পেড়াপেড়ি করতে সাহস পান নি।

বিশেষ একটি পূর্ব ধারণা, দৃঢ় মূলে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে ভালবাসতেন অনেক মুষ্টিযোদ্ধাই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের এঁরা ভয় পেতেন না। কিন্তু সংস্কার ছিল যেন জুজুবুড়ো।

জো ওয়ালকট মুষ্টিযুদ্ধের দিন সঙ্গে রাখতেন ধর্মপুস্তক বাইবেল। আর জো লুই প্রস্তুতি পর্বে অনুশীলন করতেন জ্যাকি ট্রেনিং ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পটি ছিল পম্পটন লেকে। জার্মাণীর ম্যাক্স স্মেলিংয়ের সঙ্গে লড়ার আগে লুই তাঁর অনুশীলন কেন্দ্র সরিয়ে এনেছিলেন পম্পটন লেক থেকে লেকউডে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষফল। স্মেলিংয়ের হাতেই জো লুইকে সেবার সর্বপ্রথম হার স্বীকার করতে হয়। এরপর এক রকম নাকে খৎ দিয়েই জো লুই চিরদিনের মতো পম্পটন লেকে চিরস্থায়ী অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

জো লুইয়ের উত্তর সাধক সুগার রে রবিন্সন স্বপ্নে বিশ্বাস করতেন। কবে যেন স্বপ্ন—যুদ্ধে তিনি এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করে ফেলেছিলেন এবং বাস্তবেও সেই প্রতিদ্বন্দ্বী রবিন্সনের মুষ্টাঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই থেকে স্বপ্ন কাহিনীতে বিচলিত সুগার রে।

ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে যেদিন সুগার রের সঙ্গে জর্জ আব্রাহামের লড়াই স্থির সেইদিন ড্রেসিং রুমে এক সহযোগী কি কুক্ষণেই বলে বসে 'কাল রাতে স্বপ্নে আমি মৃত সহোদরকে দেখে ফেলেছি।'

শুনেই সুগার রে গোঁ ধরলেন 'আজকের লড়াই বাতিল করো। আমি কিছুতেই লড়বো না।'

বন্ধু-বান্ধবেরা বোঝাতে চাইলেন কিন্তু সুগার রে সংকল্পে অবিচলিত। শেষ পর্যন্ত সুগার রে অসুস্থ সাজলেন। চিকিৎসকেরাও মিথ্যে রায় দিলেন। লড়াই বাতিল হলো। হাজার হাজার লোক ফিরে গেলো অনুষ্ঠানকেন্দ্র থেকে 'রবিন্সন অসুস্থ' এই ঘোষণায় নিরুপায় বোধ করে।

ইউরোপের হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা নিনো ভ্যালেডেস কিছুতেই শাদা হাফপ্যান্ট ছাড়তে চাইতেন না। কালো প্যান্ট পরে তিনি আর্চিমুরের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। সেই থেকে কালো প্যান্টের কথা উঠলেই নিনো ভ্যালডেসের মুখ কালো হয়ে যেতো।

হরেক রকম সৌভাগ্যের প্রতীক সঙ্গে নিয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ খেলোয়াড়েরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসরে নেমেছেন। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু ক্রিস ভন সালজার নিত্য সহচর ছিল একটি বড়সড়ো কোলা ব্যাং। অবশ্য জীবন্ত নয়, নিছকই এক খেলনা।

সাঁতারু সালজার নিত্য সহচর কোলা ব্যাং

এই খেলনা সঙ্গে নিয়েই তিনি খেলার ছলে আন্তর্জাতিক সন্তরণ পুলে তুফান জাগিয়ে তুলেছেন। ব্যাংয়ের সঙ্গে জলের সহজাত সম্পর্ক। তাই বুঝি জলচর মণ্ডূকের সান্নিধ্যেই ক্রিস ভন সালজাও জলপথ উত্তরণে গুপ্ত মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন।

মুষ্টিযোদ্ধা ওয়েলস ময়্যানের সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল এক জোড়া শিশু পাদুকা। শ্রদ্ধাভরে এক পাশে পাদুকা জোড়া স্থাপন করে তবেই তিনি রিংয়ে নামতেন। জিম করবেট প্রতিযোগিতার আগে নিষ্ঠাভরে অশ্ব ক্ষুর দর্শন করে নিতেন। তবে ক্ষুরের মালিক বর্ণশ্বেত হলে তাঁর অস্বস্তি বাড়তো। ঘোড়ার ক্ষুর দর্শন না হলেই নয়। অথচ ঘোড়াটি শাদা ছাড়া অন্য রঙা হওয়াও চাই।

কতোরকম চাহিদা ওঁদের। বব ফিজসিমনস ভাল্লুক ছানা নিয়ে রিংয়ের ধারে আসতেন। টেরি ম্যাকগভার্ণের চিরাচরিত রীতি ছিল মুষ্টিযুদ্ধের আসরে আসার আগে সহধর্মিণীকে বিদায় চুম্বনে খুসী করে নিজেও খুসী হওয়া। একদিন ভুল হয়েছিল। আর যাবে কোথায়। অখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী অসকার গার্ডনার প্রচণ্ড ঘুষির ঘায়ে তাকে একেবারে নীল করে তুললো। টেরি ম্যাকগভার্ণ ভবিষ্যতে আর কোনোদিন ভুল করেননি এবং শ্রীমতী ম্যাকগভার্ণও আর ফাঁকিতে পাড়েননি।

আজগুবি কথা? না, সব তথ্যই প্রামাণিক। খেলোয়াড়দের বাইরের চেহারায় জানা যায় না। অন্দর মহলের আজব রীতি যুক্তি না থাক বিশ্বাস আছে। আর এই বিশ্বাসেই তো মিলায় বস্তু।

কাকতালীয়? হয়তো তাই। তবুও ওঁদের জীবনে কার্য কারণ সম্পর্কচ্যুত ঘটনারও অর্থ আছে, মূল্য আছে। দেখে শুনে লোকে যতো হেসেছে, নিজেদের সংস্কারকে ওঁরাও ততোই মাথায় তুলেছেন।

সত্যিই, আজব মনের আজগুবি আবিষ্কার এই সংস্কার।

মহামল্ল রহিম বখস

(২১১ পৃষ্ঠার পর)

চন্দন কশাই, রজ্জব পালোয়ান, কাল্লা পরতারা, গোরা পরতাবাকে তিনি হারিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে করদের বখশ্, চন্দন কশাই, কাল্লা পারতাবা এক সময়ে কিক্কর সিংয়ের কাছে হেরেছিলেন। এবং রজ্জব কাল্লু পালোয়ানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

কিন্তু রহিমের জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে চমকপ্রদ জয়লাভ ঘটে ১৯৩০ অব্দে গামুর ছেলে গোঙ্গার বিরুদ্ধে। এই ঘটনাটা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি আবার অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক। কেননা, গামুর কাছে পরাজিত হবার পরে বহু চেষ্টা করেও রহিম তাঁকে আর যুদ্ধে নামাতে পারেন নি এবং শেষে গামু অবসর নেওয়ায় রহিম তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে গামুর ছেলে গোঙ্গা পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। কেবল তাই নয়, তিনি লাহোরের যুদ্ধে ইমাম বখসকে হারিয়েছিলেন; পাতিয়ালার যুদ্ধে দৈব-ক্রমে পরাজিত হয়ে থাকলেও সেবারও তিনি ইমামকে কম বেগ দেন নি। মোট কথা, সে সময়ে গোঙ্গা কেবল সারা ভারতের শীর্ষস্থানীয় মল্ল নন, গামা ও ইমামের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পালোয়ানদের প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ রহিমের বয়স তখন ৬৩ বছর, সময়ের হিসাবে জীবনের সায়াহ্ন বেলায় উপস্থিত। কিন্তু তথাপি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম সীমানাহীন। নিজের পরাজয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি গামুর এ হেন জাঁদরেল ছেলেকেই বেছে নিলেন। লড়াইটা হয়েছিল সম্ভবতঃ গুজরান শহরে। গোঙ্গার বয়স তখন ৩৫ এর মতো।

কুস্তি সুরু হবার কিছুক্ষণ পরে রহিম একবার ভয়ে রিং থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ করিম বখসের পেহেলরওয়ালার ভৎসনায় তিনি ফিরে এসে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তারপর গোঙ্গা এক সময়ে রহিমের ওপর 'পট' প্রয়োগ করেন, কিন্তু রহিম পাল্টা টাং মেরে তাঁকে চিং করে ফেলেন।

কিন্তু গোঙ্গাকে পরাজিত করাই রহিমের জীবনের শেষ কাজ নয়। গোঙ্গাকে হারিয়ে দেবার পর তিনি বাস্তবিকই কুস্তি জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু এক বছর পরে তাঁকে আবার এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে লড়াইতে নামতে হয় এক বিদেশী পালোয়ানের বিরুদ্ধে। তখন হাডসন নামে এক ক্যানাডিয়ান পালোয়ান এসেছিলেন এদেশে। তাঁর উদ্দেশ্য পেশাদার ভারতীয় পালোয়ানদের একবার দেখে নেবেন! কিন্তু কাকে তিনি দেখবেন? কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী নয়। ভারতীয় পালোয়ানরা জানত, পশ্চিমী জাতের আর যাই থাক, কুস্তি তাদের রক্তে নেই। দেখতে-শুনতে যত সুন্দর এবং যত বিপুল পেশল দেহ তাদের থাক, এক ঝটকাও তারা সইতে পারে না। অতএব ভারতের নওজোয়ানেরা কেউ হাডসনের সাধ পূর্ণ করতে রাজী হল না। বাধ্য হয়েই তখন ৬৪ বছরের ঠাণ্ডা মেজাজী বৃদ্ধ রহিম এগিয়ে এলেন। সাহেব প্রথমটায় নাক সিঁটকালেন, কিছুটা উষ্মও হলেন। বিদেশী বলেই তাঁকে এমন ঠাট্টা করতে হবে? কিন্তু সবাই তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, ঠাট্টা নয়; তাঁকে সত্য সত্যই ওয়াটারলুর যুদ্ধে নামতে হবে।

ওয়াজিরাবাদ সহরে শেষ পর্যন্ত হাডসন নামলেন রহিমের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় ১৯৩১ অব্দে। কিন্তু হাত মিলানর পরেই সাহেবের চমক ভাঙ্গল,—একহারা দেহী এই বুড়োটা কি দৈবশক্তির অধিকারী? রহিমের দুটো হাত আর দুটো পা যেন অক্টো-পাসের আটটা শুঁড়ের মতো সাহেবকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি নিজেকে রহিম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইলেন। কিন্তু তা কি আর হয়? মাত্র ৩ মিনিট সাহেবের আস্ফালন দর্শন শেষ।

রহিমের দেহ বরাবর পাতলা ছিপছিপে গড়নের ছিল; সারা দেহে মেদের চিহ্ন ছিল না কোনোদিন, বৃদ্ধ বয়সেও নয়। প্রায় ৭১ ইঞ্চি উচ্চতায় তাঁর দেহের ওজনও কোনোদিন ১৮৫ পাউণ্ড ছাড়ায় নি; কিন্তু অধিকাংশ দঙ্গলে লড়েছিলেন তিনি ১৭৫ থেকে ১৮০ পাউণ্ড ওজনে। গায়ের রং ছিল বেশ ফরসা।

প্রতিযোগিতার সময় তাঁর মল্লক্ষেত্রে আবির্ভাব ছিল আর এক দৃশ্য। তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি আবার উদ্দীপনাময়। দেশ-বিদেশের প্রায় সমস্ত পালোয়ানই ভিতরে কটিবাস পরে বাইরে একটা লম্বা ঝুলের আলখাল্লা বা স্লিপিং গাউন জড়িয়ে মল্লমঞ্চে উপস্থিত হয়। ভারতীয় পালোয়ানরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু রহিম প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেন সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে, আর সে দেহ সিন্দুর বা লাল রং কিংবা গেরিমাটিতে লিপ্ত করা থাকত। শুধু তাই নয়, এই অবস্থায় তিনি হঠাৎ লাফাতে লাফাতে দ্রুতবেগে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতেন; মুখে তাঁর ভয়াবহ রণ হুংকার 'দীন দীন, আলী হায়দার!'

বিনয় নম্রতা এবং আলাপ ব্যবহারেও রহিম ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যদিও তাঁর চোখে-মুখে হাসি বা স্নিগ্ধতার চিহ্ন ছিল না। কথাবার্তাও তিনি খুব কম বলতেন। বাগাড়ম্বর বা আত্মপ্রচারের ছায়াও মাড়াতেন না। তাঁর আরো একটা গুণ ছিল এই যে, জয়ী হয়ে তিনি যেমন উচ্ছ্বাস দেখাতেন না, হেরে গেলেও তেমনি আবার দমে যেতেন না। তাঁর মতে, কুস্তিটা তাঁর জীবিকার উপায় হলেও স্পোর্টস ছাড়া কিছু নয়; জয়-পরাজয় স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। তাকে সহজভাবে গ্রহণ করা চাই। কিন্তু সাচ্চা যোদ্ধা হওয়াটাই আসল কথা এবং ত হওয়াই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

বিশ্ব বধির ক্রীড়া

(২১২ পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে এগারোটি, সন্তরণের পুরুষ বিভাগে ছয়টি ও মহিলা বিভাগে তিনটি। নূতন রেকর্ড-গুলি শুধুমাত্র বধির ক্রীড়ার পূর্ব নজীর ম্লান করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বৃহত্তর বিশ্ব-রেকর্ডও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। মার্কিণ তরুণেরা ট্র্যাক ও ফিল্ডের চারটি বিভাগে এবং রুশ তরুণেরা দুইটি ক্ষেত্রে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

বিস্তৃত হিসাব অনুযায়ী হেলসিঙ্কির আসরে রাশিয়া সংগ্রহ করিয়াছে ছাব্বিশটি স্বর্ণপদক সমেত মোট আটষট্টিটি পদক। জার্মাণীর মোট সংগ্রহও সমসংখ্যক পদক। তন্মধ্যে স্বর্ণপদক ছিল চব্বিশটি। আমেরিকা অর্জন করে সর্বাধিক সংখ্যক (ছাত্রিশটি স্বর্ণপদক), তবে মোট সংগ্রহ রাশিয়া ও জার্মাণীর অনুপাতে দুইটি কম। হাঙ্গেরীর মোট সংগ্রহ বাইশটি স্বর্ণপদক সমেত আটত্রিশটি পদক এবং যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক না পাইলেও কমপক্ষে এগারোটি স্বর্ণপদক সংগ্রহে তাঁহাদের অসুবিধা হয় নাই। কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা পদক সংগ্রহে ব্যর্থ হন। বিস্তৃত হিসাবঃ—

অ্যাথলেটিকের পুরুষ বিভাগে প্রথম আমেরিকা, দ্বিতীয় রাশিয়া, তৃতীয় পোল্যাণ্ড, চতুর্থ জার্মাণী এবং মহিলা বিভাগে প্রথম রাশিয়া, দ্বিতীয় জার্মাণী।

সন্তরণের পুরুষ বিভাগে প্রথম হাঙ্গেরী, মহিলা বিভাগে জার্মাণী।

ফুটবলে প্রথম যুগোশ্লাভিয়া, দ্বিতীয় স্থানে বেলজিয়াম।

বাস্কেটবলে শীর্ষাসন আমেরিকার, দ্বিতীয় স্থানে ফিনল্যাণ্ড।

ওয়াটারপোলোতে বিজয়ী হাঙ্গেরী, রাণার্স নেদারল্যাণ্ড।

জিমন্যাষ্টিকে রাশিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

গ্রীকো-রোমান মল্লক্রীড়ায় প্রথম রাশিয়া, দ্বিতীয় আমেরিকা, তৃতীয় ইরাণ।

টেবল টেনিসে প্রথম হাঙ্গেরী, দ্বিতীয় জার্মাণী।

সুটিংয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ইতালী ও সুইডেন।

সাইক্লিংয়ে ইতালীর একাধিপত্য।

এশীয় ক্রীড়ায় অর্জিত স্বর্ণ পদক

দেশের নাম	দিল্লী ঃ ১৯৫১	ম্যানিলা ঃ ১৯৫৪	টোকিও ঃ ১৯৫৮	জাকার্তা ঃ ১৯৬২
জাপান	২৪	৩৮	৬৭	৭৩
ভারত	১৫	৫	৫	১০
সিঙ্গাপুর	১১	১	১	১
ইরাণ	৮	×	৭	×
ফিলিপাইন	৫	১৪	৮	৭
পাকিস্থান	×	৫	৬	৮
ইন্দোনেশিয়া	×	×	×	১১
দঃ কোরিয়া	×	৮	৮	৪
জাতীয় চীন	×	২	৬	×
বর্মা	×	২	১	২
সিংহল	×	×	১	×
ইসরাইল	×	২	×	×
মালয়	×	×	×	২
থাইল্যাণ্ড	×	×	×	২
ভিয়েৎনাম	×	×	২	×

লক্ষ্মীবিলাস

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

বিনা টিকেটে

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

'বেহুলা' নাটকের গান খুব দরদ দিয়ে আরম্ভ করল:

"দ্যাখ্‌লো সখী দীঘির জলে ফুল ফুটেছে থরে থরে,
আয়লো আয় সাঁতার কেটে—কমল তুলি—'

ট্রেণের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে গলা সপ্তমে চড়তে লাগল ওর। আমার যে ভালো লাগছিল তা নয়, কিন্তু বাইরের গাছপালা, মাঠ, গাড়ীর শব্দে ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে দৌড়ে বেড়ানো বাছুরের দল, চাষার ছেলেদের ড্যাবা ড্যাবা চোখে ট্রেণের দিকে তাকিয়ে থাকা—অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ করে দিচ্ছিল।

কিন্তু জহর চুপ করে থাকার পাত্র নয়। খানিক পরে ডাকল: 'এই কাকু।'

'ডাকছিস কেন?'

'খুব মজা হয়েছে একটা।'

'কী হয়েছে?'

'গাড়ীতে পার্বতীপুরের জগৎ গার্ড যাচ্ছে—তা জানিস?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'জগৎ গার্ড আবার কে?'

জহর বিরক্ত হল: 'জগৎ গার্ড আবার কে হবে? এই গাড়ীর গার্ড সাহেব।'

'তুই চিনলি কী করে?"

'আমি কাকে চিনি না? পার্বতীপুর আর কাটিহারে যত রেলের লোক আছে— সব্বাইকে চিনি আমি। এমন কি, লালমুখো সাহেব-গুলোকে পর্যন্ত। হুঁ—হুঁ, আমি জহর চক্রবর্তী—যা-তা লোক পাসনি আমাকে।'

'সে তো বুঝলুম। কিন্তু এর মধ্যে মজাটা কিসের? জগৎ গার্ডের সঙ্গে বুঝি তোর খুব খাতির?'

'ধেৎ, ও চেনেই না আমাকে।'

'তা হলে মজা পেলি কোথায়?'

জহরের চোখ মিট মিট করে উঠল: 'তুই জগৎ গার্ডকে দেখিসনি তো? দেখলে বুঝতে পারতিস। মস্ত ভুঁড়ি আর মুখের দুপাশে রাজবাড়ীর দারোয়ানদের মতো ঝোল্লা গোঁফ। পার্বতীপুরে সবাই ওকে পেছন থেকে "ভুঁড়ো শেয়াল" বলে আর শুনলেই ও ভীষণ চটে যায়। আমি কী করেছি জানিস?'

'কী করেছিস?'

'ট্রেণে ওঠবার আগে দেখি, জগৎ গার্ড প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বড়বাবুর সঙ্গে কী সব গল্প করছে। আমি বেশ ছড়া কেটে বললুম, "বাঁশ বনের কাছে, ভুঁড়ো শিয়ালী নাচে।" যেই গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছে, আমি অমনি ওকে দু-হাতে কাঁচকলা দেখিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।'

শুনে, আমার খুব খারাপ লাগল।

'ছি-ছি, কেন ফাজলামো করতে গেলি?'

'ফাজলামো কিরে! এই সব লোক্‌কে ক্ষ্যাপাতেই তো মজা!'

'না রে, ভারী অন্যায় করেছিস!'

'আরে যেতে দে! দেখিস্ না নামবার আগে আবার কী করি।'

'না—না, কিছু করতে হবে না তোকে।'

'দেখা যাবে তখন।'—তেমনি দুষ্টুমিতে চোখ মিট্ মিট্ করে জহর আবার হেঁড়ে গলায় গজল ধরল: 'কে বিদেশী, মন উদাসী, বাঁশের বাঁশি, বাজাও বনে—'

ট্রেণ সেতাবগঞ্জ স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। মস্ত সুগার মিল হয়েছে এখানে—আগেই শুনে-ছিলুম। আমি গলা বাড়িয়ে চিনির কলটাকে দেখছিলুম। আখের একটা পাহাড় জমেছে মিলের সামনে—পঁচিশ-ত্রিশটা গোরুর গাড়ী আখের বোঝাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেণটা কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবে বলে মনে হল। জহর তখন চোখ বুজে আর একটা নতুন গান শুরু করেছে: 'চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়, কে গো দরদী—'

জহরের গানের টানেই বোধ হয় সেই দরদীটি আমাদের কামরার সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সোজা দরজা খুলে উঠে পড়ল ভেতরে। কর্কশ মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে: 'তোমরা কোথায় যাবে খোকা?'

জহরের গান মাঝ পথেই থেমে গিয়েছিল। কেন থেমেছিল, সেটা বুঝতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগল না। হাতে লাল নীল ফ্ল্যাগ, গায়ে রেলের শাদা পোশাক, মস্ত ভুঁড়ি, মুখে ঝোল্লা গোঁফ জগৎ গার্ড। আর কে হতে পারে সে ছাড়া? জগৎ গার্ডের দুটো বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ একবার আমার, আর একবার জহরের দিকে ঘুরে গেল। সে চোখে বজ্র দৃষ্টি।

জগৎ গার্ড আবার বললে, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

জহরের মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আমি বললুম, 'ঠাকুরগাঁ রোড।'

'টিকিট দেখি তোমাদের?'

বললুম, 'জহর, টিকিট দে।'

জহর নিঃশব্দে বসে রইল। টিকিট দেখাবার কোনো উদ্যোগ তার আছে বলে মনে হল না।

জগৎ গার্ড গর্জন করে বললে, 'কোথায় টিকিট?'

'এই, টিকিট দেখা না—' আমি বিরক্ত হয়ে একটা ধাক্কা দিলুম জহরকে।

জহরের ঠোঁটটা আস্তে আস্তে নড়তে লাগল। তারপর বললে, 'টিকিট কাটতে পারিনি স্যার—ঠাকুর্দার অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি—তিনি মরণাপন্ন—দৌড়ে এসে গাড়ী ধরতে হল, বড়ো বিপদ—'

জহরের মিথ্যার বহর দেখে, টিকিট করেনি শুনে আর জগৎ গার্ডের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে আমার হাত-পা জমে যাচ্ছিল। কিন্তু খামোকা বাবাকে মরণাপন্ন অসুখে ফেলে দেওয়ায় দারুণ রাগ হয়ে গেল। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, কিন্তু জগৎ গার্ডের হুঙ্কারে পিলে পর্যন্ত চমকে গেল একেবারে।

ঝোল্লা গোঁফটাকে বাঘের মতো ফুলিয়ে জগৎ গার্ড বললে, 'বড়ো বিপদ—তাই না? ঠাকুর্দার অসুখের জন্যে দৌড়ে এসে গাড়ী ধরেছ—কেমন? সেই জন্যেই গাড়ী ছাড়বার কুড়ি মিনিট আগে আমার নামে ছড়া কেটেছ আর নেচে নেচে কলা দেখিয়েছ? ছাড় বজ্জাত—বদমাস ছেলে! চলো ঠাকুরগাঁয়ে, শয়তানী বের করছি আমি। একরাত জি-আর-পি'র হাজতে কাটালেই তোমরা শায়েস্তা হয়ে যাবে!'

আমাদের কামরা থেকে নামল জগৎ গার্ড। সামনের দরজায় চাবি আটকে দিলে। গাড়ীর জোড় টপকে ওপাশে গিয়ে সে-দিকের দরজাতেও চাবি লাগালো। তারপর আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে আমাদের শাসিয়ে গেল: 'চলো ঠাকুরগাঁয়ে—দেখাচ্ছি তোমাদের।'

রাগে, আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে গেছে তখন, বুকের মধ্যে তুফান চলছে। আমি প্রায় কেঁদে ফেললুম।

'তোকে টাকা দিলুম, টিকিট করলি না কেন?'

ট্রেণটা ছেড়ে দিয়েছে তখন জহর ধাতস্থ হয়েছে একটুখানি। বললে, 'আরে, গিয়ে দেখলুম, আজকের ট্রেণে চেকার নেই। মিথ্যে কেন পয়সা নষ্ট করব? ভেবেছিলুম, দিনাজপুরে ফিরে টাকাটা দিয়ে দুজনে বেশ চপ-কাটলেট খাওয়া যাবে।'

'গার্ডকে খ্যাপালি কেন?'

'সবাই তো খ্যাপায়। তখনি কি জানি, ব্যাটা ঠিক এসে আমাদের খুঁজে বের করবে?'

আমি হাহাকার করে বললুম, 'কী হবে জহর? ঠাকুরগাঁয় নিয়ে গিয়ে যদি সত্যি সত্যিই রেলের থানায় আটকে রাখে? তা হলে বাড়ীতে আর ঢোকা যাবে না কোনো দিন। বাবা জানতে পারলে আর আস্তো রাখবে না আমাকে।'

জহর হেসে বললে, 'আরে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। জহর চক্রবর্তীকে হাজতে পাঠাবে? তার আগে নাম বদলে আসতে হবে জগৎ গার্ডকে।'

'কী করবি?'

'দেখতেই পাবি এখন। তুই পাগলের মতো হাউ হাউ করিসনি কাকু—বিপদের সময় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হয়।'

'বিপদটা তোকে গায়ে পড়ে টেনে আনতে বলেছিল কে?'

'চুপ কর্ কাকু। বী ব্রেভ। জানিস তো, কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি এ টাইম—'

দুবার ক্লাস সেভেনে ফেল করা জহরের মুখ থেকে ইংরেজি প্রবচন শোনবার উৎসাহ তখন আর ছিল না আমার। বরং হিতোপদেশে পড়া সেই 'হংস-সারসে'র গল্পটাই মনে হচ্ছিল বারে বারে। 'দুর্জন-সংসর্গের' ফল শেষ পর্যন্ত এ-ই হয়!

'সত্যি জহর, তোর জন্যে শেষকালে—'

জহর আর একটা রেড্ ল্যাম্প সিগারেট বের করলে। বিকৃত মুখে বললে, 'শাট্ আপ। মিথ্যে ভ্যান ভ্যান করিসনি কাকু। বললুম তো, তোর সঙ্গে জহর চক্রবর্তী আছে, একটা কথাও ভাবতে হবে না তোকে।'

ওর সঙ্গে কথা বলাই বৃথা। আমি জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলুম, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল লজ্জায়, অপমানে, ভয়ে. ছাত্র খারাপ নই, সবাই ভালো ছেলে বলে জানে, স্কুলে গুড-কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাই প্রত্যেক বছর। যদি রেলের হাজতে নিয়ে পুরে দেয়, যদি বাবা জানতে পারেন, যদি স্কুলে খবর যায়—

মাথা ঘুরতে লাগল, কাল ঘাম ছুটল সারা শরীরে। বাইরের মাঠঘাট কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না—সব তখন ছায়া ছায়া হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের পর স্টেশন যাচ্ছে—তাদের নামগুলো পড়তে পারছি না পর্যন্ত। দুটো স্টেশনে আবার জগৎ গার্ডকে দেখলুম—আমাদের কামরার দিকে তাকিয়ে দু-চোখে আগুন ঝরিয়ে সে চলে গেল।

ফাঁসির আসামীর শেষ রাতটা কেমন করে কাটে জানি না। কিন্তু সেদিনের সেই দুঃস্বপ্ন কোনোদিন ভুলতে পারব না। এই লাইনে এর আগে কখনো যাইনি, কিন্তু টাইম টেবিলের কল্যাণে স্টেশনের নামগুলো সব মুখস্থ। যথাসময়ে আমার খেয়াল হোল, এর পরের স্টেশনটাই ঠাকুরগাঁ রোড।

'জহর, কী হবে?'

'কী আর হবে? ট্রেণ স্টেশনে ঢোকবার আগে যখন আস্তে আস্তে চলতে থাকবে, তখন পেছন দিকের জানালা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ব।'

'সেকি! যদি চাকার তলায় পড়ে যাই?'

'পড়বি কেন? সাবধান হয়ে লাফ দিবি।'

'কিন্তু আমি তো কোনো দিন—'

'পারবি, পারবি, সব পারবি। একেবারে ননীর পুতুল হলে চলে? নে কাকু, একটা সিগারেট খা। মনে তেজ আসবে।'

আমি কেঁদে বললুম, 'না।'

এমনিতে যা অসম্ভব, প্রাণের দায়ে তা যে কত সহজ হয়ে যায়—সে অভিজ্ঞতাও জীবনে আমার সে-ই প্রথম। ট্রেণ স্টেশনে ঢোকবার আগে সত্যি সত্যিই আমরা জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দিলুম, পাশের কামরা থেকে চেঁচিয়ে আওয়াজ উঠল, নুড়ির ওপর পড়ে হাঁটুতে দারুণ চোট লাগল একটা। কিন্তু তখন আর কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে আমরা দুজনে ছুটতে লাগলুম, লাইনের তারের বেড়া টপকে একেবারে মাঠের ভেতরে পড়লুম, তারপর বন-বাদাড় ভেঙে পেছন দিকের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পার হয়ে, ঠাকুরগাঁ রোডে এসে যখন ঢুকলুম, তার আধ ঘন্টা আগে ট্রেণ তার টার্মিনাস স্টেশন রুহিয়ার দিকে চলে গেছে।

আমাদের কপাল ভালো, বাবা তখন কাছারীতে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খবরের কাগজ থেকে ভালো করে না তাকিয়েই বললেন, 'এসেছিস? আরে, জহরচন্দ্রকেও দেখছি যে। হয়েছে—হয়েছে, প্রণাম পরে হবে, এখন ভেতরে গিয়ে একটু জিরো।'

জিনিসপত্র নিয়ে ফিরেছিলুম পরদিন সকালের ট্রেণে। এবার আর জহরের ওপর ভার নয়, দুখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছিলুম। আর ট্রেণটা স্টেশনে ঢোকবার সময় বুকের মধ্যে তেমনি তুফান শুরু হয়েছিল—যদি এই গাড়ীতেও জগৎ গার্ড থাকে!

কিন্তু জগৎ গার্ড নয়। ছিল একজন লম্বা চেহারার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

তারপরে অনেক দিন পার হল। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়বার জন্য দিনাজপুর ছাড়লুম, জহরের সঙ্গে দেখা শুনোও বন্ধ হয়ে গেল সেই সঙ্গে। দু'একবার মাঝে মাঝে দু-চার মিনিটের জন্যে হয়তো দেখা হয়েছে, কিন্তু সে-সব মনে রাখবার কিছু নয়।

গুড-কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া গোবেচারা ছেলেদের সাধারণত যে পরিণাম ঘটে থাকে, আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি তার। মাষ্টারির পেশাই নিয়েছি। দিনাজপুরে পাকিস্তানে—কলকাতাতেই মাথা গুঁজতে হয়েছে। বর্ণহীন, একটানা দিনগুলো কেটে চলেছে একভাবে।

সেই বিনা টিকিটে ট্রেণ যাত্রার কুড়ি বছর পরে একটা কাজে কলকাতা থেকে কিছু দূরে যেতে হয়েছিল। স্টেশনে এসে দেখি, ট্রেণের কিছু দেরী আছে তখনো। প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছি, হঠাৎ কাঁধে একটা প্রকাণ্ড থাবড়া পড়ল।

'হ্যাল্লো কাকু!'

তাকিয়ে দেখি, জহর। চেহারা প্রায় সেই রকমই আছে, বিশেষ বদল হয়নি। শুধু রগের পাশে দু-একটা চুলে পাক ধরেছে, ক্লান্তির কিছু ছায়া নেমেছে চোখের কোণায়। গায়ে রেল কোম্পানীর কোট। তখন মনে পড়ল, শুনেছিলুম, তিনবারের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করবার পর সেজদা চেষ্টাচরিত্র করে ওকে রেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

জহর বললে, 'তারপর কাকু, এখানে কী মনে করে?'

'একটু কাজ ছিল।'

'বাঃ—এখানে এলি, আমার খবর নিলি না একবার?'

'কী করে জানব, তুই এখানে পোস্টেড?'

'তা বটে! কতকাল পরে যে দেখা হল! ভালো আছিস?'

'চলছে।'

'কাকিমা ও-কে? ছেলেপুলে ও-কে?'

হেসে বললুম, 'সব ও-কে। তোর?'

'আমারও সব ও-কে। মানে ছেলে পুলে হয়নি, আমি আর গিন্নী।'

আমার ট্রেণটা প্ল্যাটফর্মে এসে গিয়েছিল। সেদিকে পা বাড়িয়েছি—জহর আমাকে টেনে ধরল।

'আরে, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ট্রেণ আছে। এতদিন পরে দেখা, আমারও এখন ডিউটি অফ্—আমার কোয়ার্টারে একবার না নিয়ে গিয়ে তোকে ছাড়ব? তা ছাড়া তোর বৌমাকেও তো দেখিসনি।'

টেনেই নিয়ে গেল।

রেলের কোয়ার্টার যেমন হয়। দুটি ছোট ছোট ঘর, একফালি বাঁধানো উঠোন, রান্নাঘরের পাশে দুটো পেঁপে গাছ। ভেতরে ঢুকেই জহর গলা ফাটিয়ে চিৎকার ছাড়ল: 'কই, কোথায় গেলে? দ্যাখো—কাকে এনেছি।'

রান্নাঘর থেকে একটি সুশ্রী শ্যামবর্ণ বধূ বেরিয়ে এল। বছর পঁচিশেক বয়স হবে—পরনে আধময়লা ডুরে শাড়ী, বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখে শান্ত কৌতূহল। আমাকে দেখে কপালের ওপর ঘোমটাটা একটুখানি টেনে নামালো।

'আরে, লজ্জা করছ কাকে? এ যে কাকু—অন্তু কাকু। তোমাকে কতবার বলিনি?'

এগিয়ে এসে প্রণাম করল মেয়েটি।

জহর অড়বড় করে বলে চলল : 'কি রাঁধছ? তোমার ডাঁটা চচ্চড়ি না কড়াইয়ের দাল? ওসব ফেলে দাও এখন। সিলগীর কাকুর জন্যে লুচি-টুচি যা হয় করো।'

বললুম, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছিস জহর? এক পেয়ালা চা হলেই আমার চলবে। আমি খেয়েই বেরিয়েছি।'

'আরে সেকি কথা। শুধু চা খাওয়াব তোকে—অন্তু কাকুকে।' তোর ভাইপো জহর চক্রবর্তী গরীব হতে পারে, তাই বলে তাকে এমন ছোটলোক ঠাওরালি? যাও, শান্তি যাও। কাকুর কথায় তুমি কান দিয়ো না।'

হেসে চলে গেল মেয়েটি। শান্তি নামটা সত্যিই ওকে মানায়।

ভেতরের বারান্দায় দু-খানা লোহার চেয়ার রাখা ছিল, সেখানেই বসলুম দু-জনে। জহর পকেট থেকে বিড়ি বের করে বললে, 'খাবি?'

বললুম, 'না।'

'এখনো সেই গুড় বয়ই রয়ে গেলি!'—জহর বিড়ি ধরিয়ে বললে, 'কাকু, থেকে যা না রাতটা এখানে। মুরগীর ব্যবস্থা করি। গল্পও করা যাবে প্রাণ খুলে।'

বললুম, 'বাড়ীতে বলে আসিনি—ভাববে।'

'তুই হোপলেস্! তোকে নিয়ে—' বলতে বলতে জহর হেসে ফেলল : 'আরে, সব চেয়ে মজার কথাই তো বলিনি এখনো। তোর মনে আছে ছেলেবেলার কথা? সেই একসঙ্গে ঠাকুরনগর রোডে যাওয়া, বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া, সেই জগৎ গার্ড—'

বললুম, 'মনে আছে মানে? ভাবলে এখনো হৃৎকম্প হয়।'

'তা বটে! যা ভয় তুই পেয়েছিলি! আর ট্রেন থেকে লাফাতে গিয়ে কী আছাড়টাই না খেয়েছিলি!' —জহরের চোখ মিটমিট করতে লাগল : 'আর বরাতটা একবার দ্যাখ্। শান্তিকে দেখলি তো? কী মনে হল?'

'চমৎকার। ভারী খুশি হয়েছি বৌমাকে দেখে।'

'তা বটে। কিন্তু শান্তি কে, জানিস?'—গলা নামিয়ে বললে, 'সেই জগৎ গার্ডের ছোট মেয়ে।' দারুণ চমকে উঠে বললুম, 'সে কিরে! কী করে হল?'

'আরে আমি তার কী জানি! রেলে চাকরি করছি, বাবাই টেলিগ্রাম করলে, বিয়ে ঠিক হয়েছে, চলে এসো। বর সেজে গেলুম লাল-মনিরহাট। আর গিয়েই দেখলুম, সেই জগৎ গার্ড আমার শ্বশুর। রিটায়ার করেছে, মস্ত গোঁফজোড়া ধবধবে সাদা—মেজাজই অন্যরকম, মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই। কিন্তু সত্যি বলছি কাকু, বিয়ে করব কি, এই বেপরোয়া জহর চক্রবর্তীরও তখন বুক কাঁপছে। ভাবছি, বুড়ো যদি একবার চিনে ফেলে—'

'চেনেনি তো?'

'না।'

'বৌমাকে সে গল্পটা বলেছিস নাকি?'

'পাগল! প্রেসটিজ্ থাকে তা হলে?'

জহর কয়েকটা দ্রুত টান দিয়ে বিড়িটা শেষ করল। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলতে লাগল : 'কিন্তু কাকু, শান্তি একেবারে জগৎ গার্ডের মেয়েই বটে। আমার-মানে-ইয়ে জানিস তো ভালো ছেলে তেমন নই—এক-আধটু এদিক-ওদিক—বুঝতেই পারিস, আজে! কিন্তু কী যে নজর কাকু, তোকে কী বলব! এক গ্লাস খেলে প্রায় আধ-পো লবঙ্গ চিবিয়ে বাড়ী ফিরি। সন্ধ্যের পর ডিউটি না থাকলে—ইয়ে-কোথাও গিয়ে—মানে একটু গানটান শুনে মন ভালো করে আসব—তাতেও অনেক বাধা। দু-একবার যখন বাপের বাড়ী যায়, তখন একটু যা চরে খাই। নইলে—'
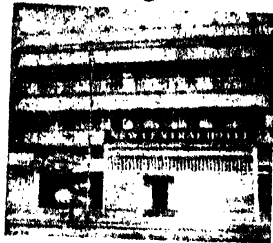
শান্তি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কেটলি হাতে কুয়োতলায় এল। জহর চুপ করে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। শান্তি কেটলি ধুয়ে জল নিয়ে ভেতরে যেতেই আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুচকি হাসল জহর।

'শুধু গার্ডের মেয়ে নয় কাকু, নিজেও একেবারে গার্ড। জানিসই তো রেলের চাকরিতে আম, মাছ, কমলালেবু, কপি, কয়লা এসব এক-আধটু ম্যানেজ না করলেই চলে না। যা মাইনে দেয়, তাতে ভদ্রলোকের পোষায়? কিন্তু গার্ডের মেয়ের তাতেও আপত্তি। আনলে রাগ করে, মাছ-আম-কপির একটা টুকরো মুখে দেবে না। বলে, আমাদের যেমন অবস্থা সেই ভাবেই থাকব। ডাঁটা চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের দালই ভালো—চুরির জিনিস আমার রুচবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুই তো বৌমাকে চমৎকার দেখলি কাকু। কিন্তু তোকে সত্যি বলছি, গার্ড সাহেবের পাল্লায় পড়ে লাইফটাই আমার "হেল্" হয়ে গেল! ট্রেনের জানলা টপকে পালানো যায়—এ গাড়ী থেকে পালাবো কেমন করে?

আমি একবার জহরের মুখের দিকে তাকালুম। সন্দেহ নেই, ও সুখী হয়নি।

কিন্তু দোষটা যে গার্ডের নয়, জহর নিজেই যে বিনা টিকিটের যাত্রী, এই কথাটাই ওকে কোনোমতে বলা গেল না।

ওদিকে গান গাওয়া শেষ হ'ল
এদিকে আবার গান
মাঝখানে কঠিন কঠোর গদ্য—
ভরে আছে অসংখ্য নিদ্রিত মুহূর্ত
ছেঁড়া ফুল—জন্মের যন্ত্রণা—
স্পর্ধিত বিবর্ণ প্রেম
তার পাশে নাস্তিক বিশ্বাস।

এই গান শেষ হবে—
মানুষের মৃত্যুর মত—
তা বলেই দেখা যায়
ফাটি-ফাটা আয়নায়
উচ্ছ্বসিত একই মুখের
অসংখ্য বিকৃতি—
নিজেই নিজের কাছে
অসম্ভব অচেনা মানুষ

তারপর আবার গান
মাঝখানে কঠিন কঠোর গদ্য
আর তার পাশে নাস্তিক বিশ্বাস।

শ্রেণী বদল

(৩৬ পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীর গতি কমে আসছে। নরেন সোজা হয়ে বসল। জিনিসপত্র যেখানে যা আছে ভাল করে দেখে নিলে। সবই ঠিক আছে—কেবল দুয়োরের কাছে বেঞ্চির নীচের রাখা সুটকেসটি খানিক বার হয়ে আছে। হঠাৎ টেনে নিয়ে নেমে যাওয়া সহজ।

উঠে সুটকেসটার কাছে এলো নরেন। হেঁট হয়ে সেটাকে বেঞ্চির আরও ভিতর দিকে ঠেলে দিলে। ওদেরই একটা পুঁটুলিতে পা ঠেকল। সেটা পা দিয়ে খানিকটা ঠেলে দিয়ে বলল, এই বুড়ঢা, আভি তো টিসন আ রাহে—আবহি উতারনে পড়ে গা।

দলটি চঞ্চল হয়ে উঠলো। পুঁটুলি প্যাঁটরা ছেলে-মেয়ে সব কিছু হাতে কাঁকে মাথায় করে দাঁড়ল। স্টেশনে গাড়ী থামতেই হুড়মুড় করে নেমে গেল।

কটাং করে দরজা বন্ধ করে সেফ্‌টি ল্যাচ্ এঁটে নরেন সীটে বসল। যাক বাঁচা গেল!

তারপরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল—দলটি কোথাও উঠতে পারল কিনা।

হাঁ উঠতে পারল। নিকটেই উঠলো প্রথম শ্রেণীর লাগাও যে এক টুকরো তৃতীয় শ্রেণী ছিল—যেটি ভৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট তারই দোরগোড়ায় এসে বৃদ্ধটি অভ্যস্ত রীতিতে হাত জোড় করে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দুয়োরটি খুলে গেল। ওরা হুড়মুড় করে উঠে পড়লো। যাক—তাহলে জায়গা পেল ওরা।

চামেলি বলল, কি দেখছ? ওরা উঠতে পারল?

হাঁ চাকরদের গাড়ীতে উঠছে। চেকার উঠলেই কিন্তু নামিয়ে দেবে।

চামেলি কোন কথা বলল না।

নরেন বলল, এইবার খাবার খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

চামেলি উঠে টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়েছে বাঙ্ক থেকে—এমন সময়ে দুয়োরে ধাক্কা পড়তে লাগল দড়াদ্দম।

চামেলি দুয়োরের দিকে এগোচ্ছিল—নরেন তাড়াতাড়ি বাধা দিলে, খবরদার দুয়োর খুলবে না, এখুনি আবার একদল থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার উঠে পড়বে। দাঁড়াও, জানালা দিয়ে দেখি কি ব্যাপার।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই সেই বুড়ো লোকটি পরম পরিচিতের মত এগিয়ে এলো ওর দিকে। ওকে নমস্কার করে ঝুঁকে পড়ল জানালার গায়ে। ওর ময়লা জামার গন্ধটা নাকে লাগতেই মাথাটা গাড়ীর মধ্যে টেনে নিলে নরেন। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, কেয়া মাঙ্‌তা?

বুড়ো কাকুতির ভঙ্গিতে বলল, মাঙ্‌তা নহি কুচ। লেকিন দেখিয়ে তো ই বেগ আপকা হ্যায় কি নহি? বলে একটা সুদৃশ্য মনিব্যাগ নরেনের সামনে উঁচু করে ধরলো।

নরেনের বুকটা অমনি ধক্ করে উঠলো। এতো তারই মনিব্যাগ, অনেকগুলি টাকা ছিল যে ওর মধ্যে।

তাড়াতাড়ি জানালার কাছে মাথাটা এনে জিজ্ঞাসা করল, ই তো মেরা বেগ হ্যায়। ই কাঁহা মিলা?

বো মালুম বাবুজী। হমরা গাঁটরি কা অন্দরমে মিলা। আপকো বেগ? লিজিয়ে।

ব্যাগ শুদ্ধ হাতটা তুলে ধরলো বুড়ো, হাত পেতে নিলে নরেন। গাড়ীর বাঁশী বাজতেই লোকটা আর দাঁড়াল না। নরেনকে নমস্কার করে পড়িতো মরি করে ছুটলো।

ব্যাগ হাতে বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল নরেন। নানা চিন্তা ওর মাথায় জটলা পাকাতে লাগল। ব্যাগটা কিভাবে ওদের পুঁটুলির মধ্যে গেল। সুটকেসটা নিরাপদ ব্যবধানে সরাবার সময় যখন হেঁট হয়েছিল—তখন বুক পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল? তাই হবে। টাকাগুলো ঠিক আছে তো?

তাড়াতাড়ি ব্যাগটা খুলে ফেলল নরেন। প্রথমেই বার হল একখানা একশো টাকার নোট। তারপরের ভাঁজে তিনখানা দশ টাকার আর বারোখা এক টাকার নোট মিললো। এই-গুলিরই হিসাব ছিল। ঠিক আছে। রেজগিগুলি গোনা ছিল না—তবু ব্যাগের পেট টিপে অনুমান করল ঠিক আছে।

লোকটা তাহলে চোর নয়।

মনটা খুসি হয়েও একটু যেন মুষড়ে পড়ল। ঈষৎ নরম হল। ভাবল, আহা, ওকে একটা কিছু বলা উচিত ছিল। ধন্যবাদ দেওয়ার কথা অবশ্য ওঠে না—ছুঁৎ ভাষা বা রীতি ওরা বুঝবে না, কিন্তু একটা টাকা বকশিস দেওয় যেতে পারত। ওটা উচিত ছিল। কিন্তু নিৰ্দিষ্ট করে কিছু বলা—

চিন্তাটা মনে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল।

ইতিমধ্যে খাবারের প্লেটগুলি সাজিয়েছে চামেলি। ছেলেদের হাতে প্লেট দিয়ে চাই নরেনের পানে। নরেন তখনও মাথা হেঁট ক ভাবছে।

খাবারের প্লেট ওর সামনে এগিয়ে দি দিতে চামেলি বলল, কি এত ভাবছ? টাকাক সব ঠিক আছে তো?

নরেন ঘাড় তুলল না—কোন কথা বলল ন খাবারের প্লেটটা ওর হাত থেকে নিয়ে অন্যদি মুখ ঘুরিয়ে বসল।

উজ্জীবন

সুশীলকুমার গুপ্ত

কেন বৃথা ডাকো আর?
আমি আজ পেয়েছি বাগানে
বসন্তের সাড়া,
স্থির জেনেছি শীতের পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ আমার প্রেম,
চলেছি যে উৎসের সন্ধানে
এসেছে খবর তার পাখিকণ্ঠে,
সবুজ পাতায়।

সাজাও তোমরা যারা রঙিনঘর কাগজের ফুলে,
পর্দায় আকাশ বোনো,
শূন্যে গড়ো তাসের মিনার,
অনুভব করো প্রেম মুখ ঢেকে সময়ের চুলে—
বুঝবে না কোন্ স্বপ্নে
পার হই ভয়ের পাহাড়।

হারাবো না পথ আর
কোনো চোরা কাঁচের গলিতে,
সময়ের হাতে ধরা পড়ে
ক্লীব দুরাশার কাছে
নেবো না দাসত্ব মেনে,
যাবো না কখনো গড়ে নিতে
পবিত্র স্বপ্নের মূর্তি
কামনার কলুষিত ছাঁচে।

এইবার পাবো যাকে,
তার স্পর্শে কালের জোয়াল
যাবে ভেঙে,
ধরা দেবে নির্বাসিত সূর্যের সকাল।

মানুষ কেন পাখির মতো উড়বে না?

(৫২ পৃষ্ঠার পর)

প্রশিক্ষিত অ্যাথলীটরা মিনিটখানেক সময় পর্যন্ত ১ অশ্বক্ষমতার উপর শক্তি উৎপাদন করতে পারেন। দু' মিনিট পরে আধ অশ্ব-ক্ষমতা হারে বেশ দীর্ঘকাল শক্তি উৎপাদন সম্ভব। সুতরাং এই জাতীয় প্লেন চালান একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রধান মুস্কিল এই যে, যাঁকে এরোপ্লেন চালাবার শক্তি যোগাতে হবে তাঁকেই আবার প্লেনের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার দেখতে হবে—তাঁর অবস্থা রিক্‌শ-চালকদের সঙ্গে তুলনীয়, একসঙ্গে ঘোড়া এবং কোচম্যানের ভূমিকা নিতে হবে। উপযুক্ত এনজিনিয়ারিং বিদ্যার সঙ্গে দৈহিক শক্তি এবং পাইলটিং-এর ক্ষমতা যুক্ত হলে তবেই এইভাবে ওড়া সম্ভব।

এই নতুন ধরনের স্পোর্ট অনেককেই আকৃষ্ট করছে। বিলেতের রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটিতে একটি বিশেষজ্ঞ-দল এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। মিঃ হেনরি ক্রেমার নামে জনৈক স্পোর্ট-অনুরাগী শিল্পপতি ৫,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আধ মাইল দূরে-বর্তী দুটি স্থান বাঙলা ৪-এর আকারে যিনি প্রথম মনুষ্যশক্তিচালিত প্লেনে ঘুরে আসতে পারবেন, তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

গত বছর নভেম্বর মাসে দুটি প্লেন প্রায় শ-খানেক গজ উড়তে পারে। প্রথম প্লেনটি সাদামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর দ্বিতীয়টি ডি হ্যাভিল্যাণ্ডের কারখানায় তৈরি। ডি হ্যাভি-ল্যাণ্ডের প্লেন 'পাফিন' এই বছরের ২রা মে তারিখে আধ মাইলের কিছু বেশি উড়তে পারে। এর ডানার বিস্তার ৮৪ ফুট। ওড়ার সময়ে গড় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৯ মাইল। আরও এই ধরনের প্লেন তৈরি হচ্ছে। সাউথ-এণ্ডে নির্মীয়মাণ প্লেন দুজনের উপযুক্ত।

ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে। হায়দরাবাদের বেগমপেট এরোড্রোমে শ্রীযুক্ত ভি শিবরাও হাওয়াই সাইকেল তৈরি করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। নামে সাইকেল হলেও শেষতক এর চাকা থাকবে না; পাখির মতো ডানা নেড়ে ওড়বার চেষ্টা হচ্ছে।

শমী বৃক্ষ

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

শুধুই দেখার জন্যে অস্থির হয়েছিল! তা ওর যন্ত্রণার শেষ হয়েছে...

পৈঠায় চুপ করে বসল শমী। মনে পড়তে লাগল তার অনেক দিনের অনেক কথা। ছোট বেলার সেই সব মিষ্টি দিনগুলোর কথা যা মনেই পড়েনি এতদিন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কত তফাং!

সে বলল, মানুষটাকে কোনদিন রাগতে দেখিনি। অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি কোনদিন। চিরদিন ছিল হাসিমুখে। এতবড় অসুখেও...

ত্রিভুবনে ওর কেউ ছিল না বাবা তুই ছাড়া, ভুবনেশ্বরী বললেন, তুই ওর একটা শ্রাদ্ধ-শান্তি করিস, নইলে ধর্মের কাছে অপরাধ হবে তোর। ভুবনেশ্বরীর কথাগুলো কেমন যেন জড়ানো জড়ানো। যেন তিনি ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন।

শমী চঞ্চল হয়ে উঠল। একটু অবাকও হল যেন সে মনে মনে।

বলল, অমন করছ কেন মা?

ভুবনেশ্বরী বললেন, তোর বাপ ছিল চির রুগ্ন। তোর আসল বাপ হল ও-ই...চাটুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে নয়।

সে কি? এ কি কথা বললে তুমি মা?

কিন্তু কোন জবাব দেবার আগেই প্রাণহীন দেহটা ভুবনেশ্বরীর লুটিয়ে পড়ল দাওয়ার ওপর।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকার এক শহরে দুটো কেরাণী মিলে সাতচল্লিশ লাখ ডলার মেরে সরে পড়েছে, চারদিকে হৈ-চৈ তোলপাড় চলেছে—কাল আপনি খোঁজ করছিলেন না কেসটার কী হ'ল, কাগজে আর কিছু লিখছে না কেন? আজ এইমাত্র পত্রিকা অফিসে ওনেই খবর নিতে গিয়েছিলুম। তাই ভাবলুম জানিয়ে যাই একটু—হয়ত উদ্বিগ্ন থাকবেন'—সামান্য একটু চোখ টিপে শেষ করলে কথাটা বাঘা, 'যা দিনকাল, ব্যাংকে যাদের টাকা আছে, সকলকারই বুক ঢুগবুগ করে সর্বদা!'

'হ্যাঁ—তা কী শুনলে?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করেন বংশীবাবু, ইতিমধ্যেই তাঁর কণ্ঠ ও দৃষ্টির ক্লান্তি পনেরো আনা কেটে গেছে।

'নাঃ, কোন হদিসই হয়নি। ছটা দেশের পুলিশে খুঁজছে তাদের, বহু এরোপ্লেন গাড়ি, জাহাজ ছুটোছুটি করছে, আরও লাখ লাখ ডলার খরচ হয়ে গেল কিন্তু একজনকেও ধরতে পারা গেল না এখনও।'

'তাই নাকি হে! বল কি আশ্চর্য ক্ষমতা তো লোক দুটোর। বাহাদুর বটে!...দিন কাল কী দাঁড়াল তাই ভাবি, ওদের দেশের পুলিশই যদি এমনি অকর্মণ্য হয়, আমাদের দেশের এদের ওপর আর ভরসা কী!'

কথাগুলো যাই বলুন—সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল ও শুনল, তাঁর চেহারার আর বলার ভঙ্গিতে কোথাও কোন অসুস্থতা নেই। দিব্যি সহজ মানুষ।

'কৈ রে, কেউ তামাক দিয়ে যা না রে! এ যে ছাই হয়ে গেছে একেবারে।'

তারপরই পঞ্চানন্দবাবুর দিকে নজর পড়াতে আর একবার ভ্রূ কুঁচকে যেন কী একটা মনে করবার চেষ্টা করলেন, 'তারপর মাষ্টার যেন কী বলছিলে তখন?'

তাড়াতাড়ি বাঘা যেন সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল করে দাঁড়াল পঞ্চুবাবুকে, 'না না, আমার সঙ্গে ওঁর একটু দরকার ছিল! ওঁর ইস্কুলে মরাল ট্রেণিংয়ের ক্লাস করাবেন, তাই ওঁর ইচ্ছা যে, আমি একটু সময় ক'রে পড়াই!'

'ভাল ভাল, উপযুক্ত লোককেই ধরেছেন। তা তুই যেন না বলিসনি। শুধুই নিজের কাজ নিয়ে থাকলে চলে না—ছেলেপুলোর আখেরও একটু দেখা দরকার।'

তারপরই তাঁর নজর পড়ল ডাক্তারের ওপর, 'আরে—ডাক্তার কী মনে করে?'

ডাক্তার জবাব দেবার আগেই এবারও উত্তরটা লুফিয়ে নিল বাঘা, 'ও এসেছিল ওদের সুন্দরবন সেবা সমিতির জন্য চাঁদা চাইতে।'

'চাঁদা!......তা তুই কি বললি?' ভীষণ শোনায় তাঁর গলাটা।

'আমি বলে দিয়েছি এখানে ওঁর চাঁদা না নেওয়াই ভাল। চাঁদা আমরা দিতে পারি, ভালই দেব—কিন্তু আমাদেরও তিনটে প্রতিষ্ঠান আছে,

যা দেব আদায় ক'রে নেব তার তিন গুণ! ও পাড়ার ডাক্তার, ওকে আর পাত্তা দিতে চাই না।'

'বেশ করেছিস, ভালই করেছিস। ডাক্তার ছেলে ভাল!' মন্তব্য করেন ভড় মশাই।

ততক্ষণে ডাক্তারের হাত ধরে টানতে টানতে সদর দরজার কাছে নিয়ে গেছে বাঘা, 'নাও, এবার সড়ে পড়ো দিকি, চুপচাপ, এমন ফুটো বিদ্যা নিয়ে আর এখানে ডাক্তারী করতে এসো না বার দিগর।'

ডাক্তার অর্ণব কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তা আমার ফীটা? আমাকে দস্তুর মতো ডেকে আনা হয়েছে, অমনি সেধে আসিনি!'

'কিন্তু ডাক্তারটা কী করল এসে শুনি! সেটা তো করলুম আমি, ফী তো উলটে তোমারই দিয়ে যাওয়া উচিত, গুরু দক্ষিণে! আবার ফী!' খিঁচিয়ে ভেংচি কেটে বিশ্রী একটা গলার স্বর বার করলে বাঘা, চাপা হুংকার দিয়ে উঠল, 'আর ফীয়ে কাজ নেই। মানে মানে সরে পড়ো ভাল চাও তো। মিছিমিছি আমাকে ঘাঁটিওনা।......নইলে তোমার ঐ যন্তর-পাতি আর ব্যাগ কেড়ে রেখে দেব—আর একবার আমার কাছে ডাক্তারীর এগজামিন দিয়ে তবে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আমার নাম বাঘা দে, মনে রেখো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর যে হাত ধরা ছিল তাইতে মোলায়েম অন্তঃটিপুনী চলছিল বোধ-হয়।

ডাক্তার সুশীল অর্ণব কোন মতে হাতটি ছাড়িয়ে এক লাফে রাস্তায় এসে পড়লেন।

নির্বাসিত ঈশ্বরের কাছে

॥ সুনীল ভট্টাচার্য ॥

হে অন্ধ নয়ন তুমি দৃষ্টি দাও আমাকে আবার
পিতামহ পিতামহী একদিন যে স্থির বিশ্বাসে
আকাশে নিঃশ্বাস নিত। যে উদাত্ত মন্ত্র উচ্চারণে
দেবতার পুতস্পর্শে ধন্য হতো কুণ্ঠিত ধুলোয়।
ফুলের উৎসবে ম্লান অশ্রুস্নিগ্ধ ললিত শিশিরে
হয়তো এখনো সেই দীর্ঘছায়া বলিষ্ঠ বিশাল
রৌদ্রের বিস্ময়ে মুগ্ধ নতজানু মন্দির প্রাঙ্গণে
করুণার শান্তিজলে স্থিরচিত্ত আত্মসমর্পণে।
হয়তো এখনো আছে সুনিভৃত সান্ত্বনা পরম
প্রার্থনা পবিত্র কোন দেবালয়ে স্তিমিত প্রদীপ
বোধিদ্রুমে কোন এক মহাশ্রমণ
সুজাতার প্রসন্ন প্রসাদে
বুদ্ধের উজ্জ্বল চোখে,
উৎসারিত নির্বাণের শ্লোক।
আমি ক্লান্ত একদিন অকস্মাৎ ঘরে ফিরে দেখি
ঘর বড় আলোহীন, অবরুদ্ধ গুমোটে গুমোটে
সমস্ত বিশ্বাস লুপ্ত নির্বাসিত আত্মবিস্মরণে
দেয়ালে আলেখ্যগুলি অপভ্রংশ মলিন ধূসর।

হে অন্ধ নয়ন তুমি দৃষ্টি দাও আমাকে আবার
ঈশ্বরের কাছে আমি রেখে আসি
শতাব্দীর শেষ নমস্কার।

ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা

(৮৪ পৃষ্ঠার পর)

বললেন, একটা কাজ করতে ইচ্ছা করছে।

—আবার কাজ!

—না, ঠিক কাজ নয়, খেলা।

—কি খেলা ?

—বই পড়তে ইচ্ছা করছে। বহুদিন গল্প-কবিতার বই পড়িনি।

—বেশ তো। যে বই পড়বার ইচ্ছা, আপনার লোকদের জানিয়ে দেবেন।

—আধুনিক গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই পড়তে ইচ্ছা করছে। ইংরিজি এবং বাংলা।

—বেশ তো। এক কাজ করা যাক।

—কি কাজ ?

—কেবিনের বাইরে একটা সাইনবোর্ড দেওয়া যাক ? আর ফল নয়, বই।

প্রেমতোষ হো হো করে হেসে উঠলেন। এমন জোরে যে শুধু ডাক্তার-নার্সই নয়, তিনি নিজেও চমকে উঠলেন। কর্মবীররা হাসে না। তাদের হাসতে নেই। প্রেমতোষও অনেকদিন হাসেননি।

বললেন, খুব ভালো হয়।

বহু চেষ্টায় ভিড় কমল।

মানুষেরও ফলেরও। তার বদলে আসতে লাগল প্যাকেট, প্যাকেট বই। সেও একটা পাহাড়। বিভিন্ন বইএর দোকান থেকে নির্বিচারে কেনা বই। ওর মধ্যে যে কি বই আছে আর কি নেই, কেউ জানে না।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ এতেও বিব্রত হয়ে পড়লেন। গন্ধ নেই বটে, কিন্তু ঘর যে বোঝাই হয়ে গেল।

প্রেমতোষ ভরসা দিলেন, তা যাক। যাবার সময় হাসপাতালকে দিয়ে যাব। লাইব্রেরী থাকে তো রাখবেন। কিন্তু আমি চাই কয়েকখানি কবিতার বই। বেছে দেয় কে ?

ডাক্তারদের তাতে আপত্তি নেই। তাঁরা একে একে প্যাকেটগুলি খুলতে লাগলেন। ইংরিজি আধুনিক কবিতার বই খান কয়েক আছে, কিন্তু বাংলা আধুনিক কবিতার বই একখানিও নেই।

প্রেমতোষ বললেন, দেখছেন ? যা পড়তে চাই, তার একখানিও নেই।

যাই হোক, একখানি ইংরিজি কবিতার বই নিয়েই তিনি পড়তে বসলেন।

এমন সময় নার্স একটি স্লিপ নিয়ে এল : সুনন্দা মিত্র।

সুনন্দা।

প্রেমতোষ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন : এক সুনন্দাকে তিনি জানতেন, ছেলেবেলায়। তাঁদের গ্রামের একটি মেয়ে। কিন্তু সে তো মিত্র নয়।

নার্স বললে, আমি কিছুতেই আসতে দোব না। কিন্তু তিনিও কিছুতেই ছাড়ছেন না।

—নিয়ে আসুন।

নার্স একটি মেয়েকে নিয়ে এল। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। পরনে একটি কালো ফিতে-পাড় শাড়ি আর সাদা ব্লাউস। ডান হাত রিক্ত, বাম করপ্রকোষ্ঠে একটি রিস্ট-ওয়াচ। গলায় সরু একগাছি হার। ঢলঢলে মুখ। মনে হয় বয়স চল্লিশের এপারেই হবে। কিন্তু মাথার কোঁকড়ান চুলে অল্প পাক ধরেছে।

তাঁদের গ্রামের সেই মেয়েটির মতোই। তবু প্রেমতোষ নিশ্চিত হতে পারছেন না।

হাতের রজনীগন্ধার গুচ্ছটি টেবিলের উপর রেখে মেয়েটি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, চিনতে পারছ না ? আমি সুনন্দা।

প্রেমতোষ ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন।

বললেন, গলার স্বরে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, তুমি সুনন্দা। কিন্তু মিত্র হলে কি করে ?

মনে হল সুনন্দা লজ্জা পেলেন। বললেন, মেয়েদের উপাধি কি বদলায় না ?

তাই বটে। বিবাহের পর মেয়েদের উপাধি বদলায়। কিন্তু সেটা প্রেমতোষের খেয়াল হয়নি।

বললেন, বোস, বোস। তুমি কলকাতাতেই থাক ?

—কয়েক বছর থেকে আছি।

—এতদিন দেখা করনি তো ?

—না।

প্রেমতোষ চেয়ে দেখলেন, সিঁথিতে সিন্দুর নেই। ঘোষ থেকে মিত্র হয়েছে, মিত্রই আছে, কিন্তু বিধবা। প্রেমতোষের মুখের উপর একটা কালো ছায়া খেলে গেল।

সুনন্দা তা লক্ষ্য করলেন। সুখ-দুঃখে মেশান অনেক পুরোনো কথা তাঁরও মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কথাগুলো যেন একটা গুরুভার বোঝার মতো। দুঃসহ।

অন্যদিকে চিন্তার মোড় ফেরানর জন্যে প্রশ্ন করলেন, সমারোহ তো খুব পড়ে গেছে। কিন্তু অসুখটা কি ?

প্রেমতোষ হেসে ফেললেন : তা আমিও জানি না। ডাক্তারে একটা ল্যাটিন নাম বলেছিলেন। আর বলেছিলেন হাসপাতালে যেতে হবে। চলে এলাম।

—ভালো করেছ।

—আসল কথা কি জান ? আমি ক্লান্ত। রাজনীতি আর ভালো লাগছে না। রাজনীতির ভিড় থেকে হাসপাতালের নিরিবিলি কোণে এসে বেঁচেছি।

প্রেমতোষ হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল রজনীগন্ধার গুচ্ছের উপর। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, ফুল কে আনলে ? তুমি ?

—হ্যাঁ। তাতে অবাক হচ্ছ কেন ?

—হচ্ছি। কারণ আমার যাদের সঙ্গে কারবার তারা ফুল আনে না, ফল আনে। এখানে এসে পর্যন্ত ফুল একটিও পাইনি।

সুনন্দা হাসলেন : তাই নাকি ?

এবারে তাঁর দৃষ্টি পড়ল প্রেমতোষের হাতের বইখানির উপর।

—কি পড়ছ ওটা ? এলিয়ট ?

—হ্যাঁ। অবাক হচ্ছ, না ?

—হচ্ছি বই কি ?

—হবারই কথা। তুমি এখানে কি কর সুনন্দা ?

—একটি কলেজে পড়াই।

—অধ্যাপিকা ! তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হচ্ছে সুনন্দা ?

—বছর ত্রিশেক হবে।

প্রেমতোষ কি মনে করে একবার চারিদিকে চাইলেন। বললেন, ত্রিশ বছর হিঁচড়েসে কতটুকু সময় ! অথচ মানুষের জীবনে কত পরিবর্তনই না আনে ! তুমি নিয়তি মান সুনন্দা ?

—না।

—আমিও না। তবু মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান, ওই জাতীয় কিছু একটা আছে। মানুষের ভবিষ্যৎ তার নিজের হাতে নয়।

অন্যমনস্কভাবে প্রেমতোষ কি যেন ভাবতে লাগলেন।

বললেন, ত্রিশ বছরেরও আগের কথা ভাব। আমি কলেজে পড়ি, স্বপ্ন দেখি অধ্যাপক আর কবি হবার। ছুটির সময় বাড়িতে বসে কবিতা লিখি। তুমি পাশে বসে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে কেমন আমি শব্দ আর মিল জড় করছি। কোথায় কাব্য, কোথায় অধ্যাপনা, দেখ তো কোন্ ভবিতব্যের মধ্যে এসে পড়লাম।

—তুমি খেয়ালের মাথায় কলেজ ছেড়ে দিলে, রাজনীতির আবর্তে এসে পড়লে, কি করে আর কবি-অধ্যাপক হবে ?

—ঠিক। কিন্তু যেটাকে তুমি বলছ খেয়ালের মাথায়, সেটা ঠিক তা নয় সুনন্দা। ওকে তুমি নিয়তিও বলতে পার। যা অনিবার্য, যা অবধারিত বলে তোমার এবং আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের বিবাহ, তাও ভেস্তে গেল।

সুনন্দা ব্যাকুলভাবে বললেন, ও প্রসঙ্গ থাক।

—না, থাকবে কেন ?—প্রেমতোষ জোরের সঙ্গে বললেন,—ত্রিশ বছর পরে দেখা, আমি কোথায় আর তুমি কোথায়, সুতরাং কোনো প্রসঙ্গই বাদ থাকবে না। ভাব তো, যদি আমাদের বিবাহ হত !

সুনন্দা দুরু দুরু বক্ষে চুপ করে রইলেন।

প্রেমতোষ বলতে লাগলেন, তাহলে আমি অধ্যাপক হতাম আর অনর্গল কবিতা লিখতাম। তুমি, তুমি ক্লাস সিক্স অবধি পড়া ঘরণী-গৃহিণী, দুপুরে একখানা নভেল বুকে নিয়ে পড়তে পড়তে নিদ্রা যেতে !

ঢং ঢং করে হাসপাতালের ঘণ্টা বাজল। যারা রোগীদের দেখতে এসেছে তাদের বিদায়-সংকেত। তার সঙ্গে অবশ্য কেবিনের দর্শনার্থীদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু সুনন্দা উঠল।

—আবার কবে আসছ ? —প্রেমতোষ জিজ্ঞাসা করলেন।

—আসব একদিন।

—খুব তাড়াতাড়ি একদিন। আর যখন আসবে দু'একখানা আধুনিক বাংলা কবিতার বই এন।

—কি হবে পড়ে ?—সুনন্দা হাসলেন।

—হবে। অনেক কিছু হবে। আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আর একটা কথা বলব ?

—বল।

—হাসপাতাল থেকে চলে যাবার পর তুমি মাঝে মাঝে আমার বাড়ি আসবে। আমরা আবার অতীত কালের মধ্যে ডুব দোব।

—কিন্তু অতীত তো মৃত।

প্রেমতোষ হা হা করে হেসে উঠলেন কিছুই মরে না সুনন্দা। যা বাঁচে তা একদিন মরে যায়, মৃত আবার একদিন বাঁচে। এমনি করেই পৃথিবী চলে। কিছুই বলা যায় না সুনন্দা, আমাদের জীবনেও অতীত আবার বর্তমান হতে পারে। আসবে তো ?

—আসব।—বলে সুনন্দা চলে গেল।

প থে র প্রি য়া

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে, শ্বশুড়োর হাটতলাতে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলবো; দেখবো, কেমন না রোগী-পত্তর হয়! ....অনাদি-দা যে! খবর কি।"

অনাদি বাড়ুয্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"বসুন, দাদা।"

"না ভাই, তুমি একবার আমাদের বাড়ী যাও দেখি; তোমার বৌদি——

"বুঝেছি; হোয়েচে কি—চাপা প্রফুল্লতায় শরৎয়ের মুখখানা উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো।

"ঐ যে, 'ফল-পষ্ঠানি' ব্রত নিয়েচে তোমার বৌদি, আজ সংক্রান্তি; তোমার হাতে 'ফল' দেবে।"

—শরতের রোদ-পড়া মুখে নিমেষের মধ্যে ছায়া পড়ে গেল। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মনে সে বাড়ীর মধ্যে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। দেখলে, বীরু গয়লা একটা শিশি হাতে নিয়ে তার দিকেই আসচে। বীরু রোয়াকের নীচে এসে দাঁড়াতেই, উৎসাহ-চঞ্চল কন্ঠে শরৎ জিজ্ঞাসা করলো—"এসো খুড়ো, খবর কি?—বোসো।"

বীরু বসলো না, বললো—"বৌঠাকরোণের কাছে এসেছি; একটু মধু আমাকে দিতে হবে। সেদিন বললেন কি-না—একটা শিশি দিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিস্‌, দোবো'খন একটু।"

বীরুর ওপর ভয়ানক চটে গিয়ে, শরৎ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল—"নাঃ! এখান থেকে ডিস্‌-পেন্‌সারী তুলে শ্বশুড়োতে খুলতেই হবে, নিশ্চয়ই।"

* * * *

সেদিন শরৎ মাকে ডাক্তো কোরে বোঝাতে লাগলো যে এ-গাঁয়ে ডাক্তারী চলবে না, শ্বশুড়োর হাটতলাতে ডিস্‌পেনসারী খুলতেই হবে। ওখানে জমিদাররা আছে, স্কুল, পোষ্টাফিস, হাট, দোকান-পত্তর; বহুলোকের যাতায়াত। কাদম্বিনী বললেন—"লোকে যদি ওষুধে তেমন ফল পায়, ত বনের ভেতরেও ছুটে আসে। তোর ঐ ওষুধে বাবু তেমন ভাল কিছু ফল হয় না।"

লাফিয়ে উঠে শরৎ বললে—"ফল হয় না! কি বোলচো তুমি? তোমার রক্ত-আমাশা আমার ওষুধে কি রকম সারলো বল দেখি? সারে নি?"

"সেরেছিল ত; ভেতর-ভেতর আমি কত-কি টোট্‌কা খেয়েছিলুম, তবে—

"আচ্ছা, তোমার বউকে জিজ্ঞাসা কর, ওর সেই নিত্যি-মাথাধরা সেরেছিল কি না।—কি গো! সারে নি?"

রাণী শাশুড়ীর পাশে ঘোমটা দিয়ে বসে-ছিলো, ঘাড় নেড়ে জানালো —সেরেচে।

কাদম্বিনী বললেন—"শ্বশুড়োয় গিয়ে ডাক্তারখানা কর না বাবা, আমি ত তোকে বারণ করচি না, তবে এক হাজার টাকা আমি এখন কোথায় পাব বল্‌। তুই কি মনে করিস—লুকোনো আমার অনেক টাকা আছে? যে কষ্ট করে তোকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েচি, তা তুই কি কোরে জানবি।"

শরৎ হতাশ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।

রাত্রে শুতে এসে শরৎ দেখলে, অত রাতেও রাণী ঘরের দেয়াল ঠেস্‌ দিয়ে বসে আছে। বললে—"বসে আছ কেন, শুতে পারনি?"

"কি করবো শুয়ে, ঘুম তো হবে না। শুলেই পায়ের চেটো এমন জ্বালা করতে থাকবে যে কিছুতেই ঘুম হবে না।"

"তাই না কি? 'বার্ণিং ফিট্‌ সিনড্রোম'। বলনি কেন এদ্দিন? দাঁড়াও, ওষুধ দিচ্চি; দুটো ডোজ খেলেই বারো-আনা কমে যাবে'খন। অ্যালোপ্যাথরা হোলে দিত 'প্যান্টোথিনিক্‌', তাতে ঘেচু সারে।" সেই রাত্রেই শরৎ এক ডোজ ওষুধ রাণীকে খাইয়ে দিলে। দিন-দুই পরে জিজ্ঞাসা করতে, রাণী বললে—"একেবারে সেরে গেছে, মোটেই আর পা জ্বালা করে না।"

"দেখলে ত। আর মা বলে কি না......। যাই হোক, পুজো এসে পড়লো; পুজো পর্যন্ত দেখবো। টাকার না যোগাড় করতে পারি, কোল-কাতায় চলে যাব। সেখানে গিয়ে, যেমন কোরে হোক টাকা যোগাড় কোরে, কোলকাতাতেই ডিস্‌পেন্‌সারী খুলবো।"

* * * *

দু-পাঁচদিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাণী শরৎকে ডেকে বললে—"দ্যাখো, তুমি কাল একবার শ্বশুড়োয় গিয়ে চাঁপাকে দেখে এসো।"—সেদিন খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলায় রাণী বাপের বাড়ী গিয়েছিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করলে—"চাঁপার কি হোয়েচে?"

"কি জানি কি হোয়েচে। খাচ্চে-দাচ্চে অথচ দিন-দিন কেন শুকিয়ে যাচ্চে। কাল একবার নিশ্চয় গিয়ে দেখে এসো।"

"কাকাবাবুর আমার ওষুধের ওপর খুব বিশ্বাস,—না?"

"ভয়ানক।"

—পঞ্চম-পরিচ্ছেদ—

চাটুয্যেদের সম্পত্তি থেকে নীট মুনাফা বছরে হাজার পাঁচেক টাকা হয়। তাছাড়া, গাঁয়ের জমি-জমা থেকে যে ধান পাওয়া যায়, তাতে বছরের ভাত-কাপড় প্রভৃতি হোয়েও কিছুটা বাঁচে। দু'একটা পুকুর-বাগানও আছে। বড় ভাই শিবদাসের অংশের আয়টা রাণীর হিসেবেই জমা হোয়ে থাকে।

আশ্বিন মাস পড়েচে। এবার শেষের দিকে পুজো, এ বছর সর্বত্র চাষের অবস্থাও ভালো। সুতরাং সকলকারই মনে এবার আনন্দ। আনন্দ নেই শুধু শরৎয়ের মনে। হয়—পুজোর পর হাজারখানেক টাকা যোগাড় কোরে সে শ্বশুড়োয় ডাক্তারখানা খুলবে, নয় ত—কোলকাতায় চলে গিয়ে, যেমন কোরে হোক সেখানে ছোট দেখে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী খুলবে।

চারদিকে শরতের রূপালী হাসির বন্যা বইতে সুরু হোয়েচে। আকাশে-বাতাসে-মাটিতে একটা যাদুস্পর্শ এসে লেগেছে। গাছ-পালা বর্ষা-বারি-স্নানান্তে সারা-অঙ্গে শুচি ও পবিত্র-তার ভাব নিয়ে, নীল শাড়ী পরে যেন জগজ্জননী অম্বিকাকে আবাহন করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

মহাষ্টমীর সন্ধ্যা; কাঁঠালগাছির 'কুলীন-পাড়া' থেকে বারোয়ারী দুর্গাপুজোর ঢোল-কাঁসির আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসচে। শ্বশুড়োয় বাবুদের বাড়ী খুব ধুম-ধাম কোরে পুজো এসেচে। রাণী বাপের বাড়ী গিয়েছিল, কিছুক্ষণ হোল ফিরে এসেচে। গয়না-গাঁটি, বেনারসী-শাড়ী পরে তাকেও যেন আজ মা-দুর্গার মত দেখাচ্ছে।

আজকের এই শুভ আর আনন্দের দিনে, শরৎয়ের মন ভারাক্রান্ত; সে তার ডিস্‌পেন-সারীর কথা ভাবচে। টাকার অভাবে যদি শ্বশুড়োতে না হয়, তা হোলে সে কোলকাতাতে যাবেই।

রাণী ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে ভক্তি-নত হোয়ে শরৎয়ের পায়ের ওপর মাথা আর সেই সঙ্গে একটা ছোট্ট পুঁটুলী রাখলে। শরৎ সেটা তুলে নিয়ে দেখলে—তাতে হাজার টাকার নোট। সঙ্গে সঙ্গেই সে সব বুঝতে পারলে। আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। প্রফুল্ল মুখে বললে—"বড্ড একটা ভাবনা থেকে তুমি বাঁচালে। এটা কিন্তু কোনোদিন আমি ভাবিও নি, আশাও করিনি। কি পুরস্কার তোমায় এর জন্যে দেবো বল ত?"

রাণী বললে—"মনে আছে—বার বছর আগে একদিন স্কুল যাবার পথে, আমার পিঠে কিল মেরে বলেছিলে—'হোমিওপ্যাথি ডোজে আজ পুরস্কার দিলুম, দরকার হোলে ভবিষ্যতে ডোজ বাড়িয়ে দেবো'—তাই আজ দাও"—বোলে আনন্দবিহ্বলভাবে তার গৌরবর্ণ কোমল নিটোল পিঠখানা স্বামীর সামনে এগিয়ে দিলে।

শরৎ উচ্ছ্বসিত-আনন্দে রাণীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিলে।

কথাটা নিয়ে সকলে আলোচনা করতে লাগল। মাকড়সা যেমন করে বাসা বোনে, সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে জটিল জাল সৃষ্টি রে তোলে। তেমনি কথাটা ছিল ক্ষুদ্র বিন্দুর তো, সেটা আলোচনার ঠাস বুনুনিতে হয়ে ঠলো স্থূল আর প্রকাণ্ড। তিল থেকে তাল। রা থেকে মহীরূহ।

আজকের কথাটা এতো জটিল হতে পারত া, যদি সেটা আলোর মত প্রখর না হতো, আর তে গোটা কতক পতঙ্গ পুড়ে ভগ্ন-পক্ষ না তো। সেটা চাপা পড়ে থাকতো সংসারের সংখ্য দুর্ঘটনার ভীড়ে; ছাইয়ের তলায় ভস্ত আগুন যেমন ধিকিধিকি জ্বলে। তারপর খন ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

এই জটলায় কফি চলছে। কেউ নিয়েছে ল্প াগানো ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল। সিগারেট ার পাইপের ধোঁয়া উড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল- ীল আলোর সঙ্গে।

ছাঁটা ঘাস লনের ওপর ইতস্ততঃ বিবিধবর্ণ চয়ার ছড়ানো রয়েছে। তারই একটা থেকে উঠে লেন শিবদাস মিত্র। হাতের লাঠিটা ঠুকে াঙ্গা দাঁতে হাসি নিয়ে ব্যঙ্গ চোখে তাকালেন ই এক ঝাঁক ছেলেমানুষের দিকে।

—এ ক্লাবে এমন একটি দ্রব্য নিয়ে এসেছিল ক? কার আমদানি হে?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা সকলে। পা গলায় সুধীর বলল,—'বলতে পারি না।' প্রৌঢ় মুখে বাঁকা হাসি দিয়ে বললেন,—

'তাইতো বলি কেউই জানে না অথচ এতো াছাই করে মেম্বার নেওয়া হয়। তা মন্দ হলো া, মুখরোচক গল্প তৈরী হলো।' একা-একাই াসলেন। আবার বললেন,—'তা তখন জানবেই া কেমন করে ভবিষ্যতে এমনটি হতে পারে। সব মেয়েদের এখানে আসাই ভুল। হাজার হোক টা হলো একটা রেসপেক্টেবল ক্লাব। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কয়েকজন আধুনিকাকে এধার সেধার দেখতে না পেলে মন ঠে না। হলোও তেমনি।'

কাগজে ফলাও করে বেরোল খবরটা।

কেলেঙ্কারী!

লাঠিখানা ঠক করে ঠুকে পিছন ফিরলেন শিবদাস মিত্র—'স্ক্যাণ্ডাল ফলোড হার।'

পাইপটা জোরে জোরে টানতে লাগল বিনয়। গভীর মনোযোগ দিয়ে স্ট্র পাইপ চোষা শেষ করতে লাগল সুধীর।

—ভেরি স্যাড। বলল, অনিরুদ্ধ গালে হাত দিয়ে।

—এ রকম কত হয়। এজন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?—সিগারেটের টুকরোটা পা দিয়ে ঘসতে লাগলো বিশ্বজিৎ।

—কিন্তু একটা প্রাণ তো গেল অকালে। অনিরুদ্ধ অতি দুঃখে বলল।

—আমি বাঁচাতে পারতাম হয়তো। প্রায় ফিসফিস করে উঠল সন্দীপ।

একসঙ্গে চমকে উঠলো চার জোড়া কান—চার জোড়া চোখের মণি ঝলসে উঠলো বিস্ময়ের আলোয়। নিস্তব্ধ হয়ে গেল ওরা খানিকক্ষণের জন্য। সুধীর, বিনয়, অনিরুদ্ধ, বিশ্বজিৎ প্রত্যেকেই নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগলো হঠাৎ; নিজেদের বিবেকের দিকে চুপি-চুপি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিল। ওরাও বাঁচাতে পারত। একটা মেয়েকে—বাঁচাতে পারত না?

কি এমন আশ্চর্য কথা, কি এমন অসম্ভব কাজ যা তারা করতে পারতো না? কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

—বাঁচানোর প্রশ্নটা যদি আগে মনে হতো! বলল সুধীর।

—তাহলে তুই পারতিস—কেমন, এই না?

—ধমক দিল অনিরুদ্ধ।

সন্দীপ আবার চাপা সুরে বলল,—'সত্যিই আমি বাঁচাতে পারতাম। আর সে তো বাঁচতেই চেয়েছিল। বলেছিল 'জীবনের ভিতর থেকে আমি অমৃত বার করে নেবো।'

যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে সন্দীপ; যেন ঘাসের বুকে লেগে বাজছে ওর বেদনা—গাছের পাতার মর্মর-ধ্বনিতে মিশিয়ে যাচ্ছে ওর নিশ্বাস।

—মৃত্যুর মধ্যে কি সে অমৃত পায়নি? মৃত্যুও কি আমাদের মতো নিষ্ঠুর? [illegible] নেই।

এখন সকলেই তার স্ক্যাণ্ডাল গাইছে। পুওর গার্ল।

চুলের গোছা কপাল থেকে তুলে ধরল সন্দীপ।

—অমৃতের পরিবর্তে বিষ!

—চেষ্টা করলে আমিও বাঁচাতে পারতাম। সুধীর আবার বলল।

—অসম্ভব! তুমি বাইগ্যামীতে ঝুঁকতে। বিনয় দাঁতে পাইপ চেপে বলল।

—সেই জন্যেই তো পারলাম না।

—তাই বল। নিশ্চিন্ত হল বিনয়।

সন্দীপের বুকের কাছে কি যেন একটা অস্বস্তি ছটফট করে উঠল।

লনের ওপারে লাল-নীল গার্ডেন আমব্রেলার নীচে বসত মেয়েটা। চাল-চলন, হাবভাব দেখে নাক সিঁটকাতো অনেকে। বেশী পরিচয় হয়নি মেয়েদের সঙ্গে। তার ছিল নিজের দল—নিজের গণ্ডী। একটা নিষিদ্ধ আলো ছড়াত তার উপস্থিতির চারি পাশে। সেই আলোতে পতঙ্গের মতো ভিড় করেছিল এরা। বেরিয়ে আসতে পারেনি।

ঐখানে ঐ ছাতার তলায়—আকাশে যখন লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের আলো—সাদা-নীল মেঘগুলো হেসে উঠেছে, তখন শ্রীমতী বলেছিল, 'আমি অমৃত চাই। আমার জীবন অভিশাপে জড়িয়ে গেছে, কিন্তু সে গ্লানি আমি মুছে ফেলতে পারবো; সে পাপ থেকে আমি মুক্তি পাবোই। ঈশ্বর জানেন—পাপ আমি করছি না; আমি বাঁচতে চাইছি; আমার অপরাধ নেই।' বলতে বলতে দুচোখের মণি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল; আর তাকে দেখাচ্ছিল কি অসম্ভব করুণ।

সন্দীপের বুকের কাছে শিরশিরিয়ে উঠল। শেষ দেখা হয়েছিল অজন্তা-কোর্টের দশ নম্বর ফ্ল্যাটে, যেখানে শ্রীমতী থাকতো।

সেদিন তার ঘরে জ্বলেছিল সবুজ আলো। সেই সবুজ আলোর বন্যায় স্বপ্নের মতো মোহময়ী হয়ে উঠেছিল শ্রীমতী। সন্দীপের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল—'আমি যে [illegible] চেয়েছিলাম সন্দীপ।'

কতটা রূপবতী তার পরিচয় ছবিতে পাওয়া যায় না। স্তাবকের দল জড়ো হলো, চিনির কাছে পিঁপড়ের মত।

শ্রীমতী ভেবেছিল সবচেয়ে আপত্তি আসবে মায়ের কাছ থেকে। কারণ ছোটবেলায় সে মায়ের কাছেই সিনেমার তীব্র নিন্দা শুনেছিল। কিন্তু মা কি আশ্চর্যভাবে চুপ হয়ে গেছেন। শ্রীমতীর ভালো-মন্দতে মতামত দেবার শক্তি নেই যেন!

বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করতেই হবে। যে টাকা আনে—সে টাকার চাবুক দিয়েই মুখ বন্ধ করে দিতে পারে।

শ্রীমতী আশা করেছিল মা যেন একটু প্রতিবাদ করেন। কিন্তু, তার ছবিতে আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারটাকে মেনে নিলেন অত্যন্ত আধুনিকার মতোই, নির্বাক অহঙ্কারের সঙ্গে। মনোযোগ দিলেন আর দুটি ছেলেমেয়ের প্রতি। তাদের নিয়ে একটি আলাদা গণ্ডী সৃষ্টি হয়ে গেল—শ্রীমতীর স্থান সেখানে নেই।

কয়েকটা বছর কেটে গেল অর্থ আর নামের নেশায়। আস্তে আস্তে সরে এলো সংসার থেকে। টাকার সঙ্গেই সংসারের যোগসূত্র। টাকার যাতায়াতের পথটা বন্ধ না হলেই হলো। তাহলে আরো তিনটি মুখ হতবাক হয়ে যাবে। সংসারের অজস্র খুঁটিনাটি অভাব প্রকট হয়ে পক্ষ বিস্তার করবে। অতএব নিজেকে আরো মেলে দিল শ্রীমতী।

মন লাগে না। সমাজ সংসারকে আগে মানতো। এখন গ্রাহ্য করে না। সমাজের সমালোচনা টাকায় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অর্থের মোহ অসাধারণ। শ্রীমতী জানতেও পারল না কখন সে ডুবে গেছে আর একটা খেলায়। মানুষ নিয়ে খেলা।

অজন্তা কোর্টের দশ নম্বর ফ্ল্যাটে সবুজ আলোর নীচে সমুদ্র কন্যার মতো গা ভাসিয়ে দিয়েছে। আর তারই মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছে একটি অপরূপ মণি।

এখানে যারা আসে তারা খেলতে আসে। শ্রীমতী বোঝে, এই খেলা বন্ধ করলে সংসারের চাকাও বন্ধ হবে। কিন্তু এদেরই মধ্যে একটি কোমল ফুলের মতো মন খুঁজে পেলো।

সন্দীপ ফুলের মতোই নরম। নরম চোখে চায়। অবাক হয়ে বসে থাকে। কথা বলে কি বলে না! অল্প কথা দিয়ে ছুঁয়ে যায় কেবল। ওর উপস্থিতিতে কিসের যেন একটা সৌরভ পায় শ্রীমতী।

কলেজের অধ্যাপক সন্দীপ। শ্রীমতী গভীর ভাবে উপলব্ধি করে, অধ্যাপকের মতো বিদগ্ধ মানুষ তাকে ভালোবেসেছে।

একদল বন্ধুর সঙ্গে হল্লা করতেই এসেছিল সে। এসে চমকে গেছে। এত রূপ এ মেয়ের? তবে তত নাম নেই কেন ছবির পর্দায়? আর এ মেয়ে কেন বাইরে বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে! এত মধুর চেহারা শ্রীমতীর! যেন এক ছড়া রজনীগন্ধা।

সন্দীপ একদিন বললো,—'তুমি কেন এ পথে নামলে শ্রীমতী? এ তোমাকে মানায় না।'

দরদটা কি সত্য! শ্রীমতী প্রথমে বুঝতে পারেনি সন্দীপের কথা। এ কথা আর কেউ বলেনি কেন এত দিন ধরে। পথে নামাবার জন্য এত বন্ধু পেয়েছে—অথচ তুলে নেবার মানুষ নেই।

কথাটা অবিশ্বাস করবে এমন শক্তি নেই নিজের মধ্যে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল—'অন্নের জন্য সন্দীপ।'

এরপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরটা। শুধু পাশের ফ্ল্যাট থেকে শোনা গেল রেডিওতে সেতারে ইমন-কল্যাণের সুর ছড়াচ্ছে।

গভীর সহানুভূতিতে সন্দীপ দীর্ঘনিশ্বাসটাও সন্তর্পণে চেপে নিল।

একটি কুসুম অন্নের জন্য পাপড়ি ছড়িয়েছে।

শ্রীমতী ধরা গলায় আবার বলল,—'আমি বাঁচতে চাই, তোমাদের মতো খেয়ে পরে।'

আরো, আরো মমতায় ভিজে গেল সন্দীপের মন।

—কিন্তু এই কি বাঁচা? সমবেদনায় গলে যায় সন্দীপ।

—এক রকমের বলতে পার। শান্ত হয়ে বলল, শ্রীমতী। পর মুহূর্তে জ্বলে উঠলো—'কিন্তু এ রকম বেঁচে কি হবে? কি হবে নাম নিয়ে, অর্থ নিয়ে? এ দিয়ে কি সুখ পাবো? টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না, জানি সন্দীপ।

কিন্তু গভীর জালে জড়িয়ে গেছি যেন। মুক্তির কৌশল জানি না।'
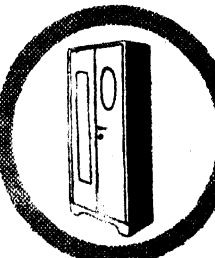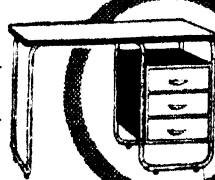
আকুল বেদনা থমথম করতে লাগলো ঘরের ভিতর।

সন্দীপ আপন মনে ভাবতে লাগলো—কখনও যদি, কোনদিন যদি সাহস হয়—যদি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তবে নিয়ে যাবে শ্রীমতীকে এখান থেকে। উঠিয়ে নিয়ে যাবে—ঘর দেবে, সংসার দেবে। এ মেয়েকে ঘরেই রাখতে হয়, কৌটোর মধ্যে ভরে রাখা মণির মতো।

অজন্তা কোর্টের দশ নম্বর ফ্ল্যাটে অগণিত মানুষ এসেছে; তাদের মধ্যে ভীরু খরগোসের মতো সরল ছেলেটি নিঃশব্দে আনাগোনা করেছে।

একদিন সহজ শান্ত অধ্যাপকটি কঠিন হয়ে গেল, যখন শুনলো এই রজনীগন্ধার ছড়ার মতো মেয়েটি আর থাকবে না; শেষ হয়ে যাবে।

নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। মহত্ত্ব দেখাবার এই সময়। বীরত্বের পরিচয় দেবার এই হলো সুযোগ। শ্রীমতীর দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে সন্দীপ বুঝি শুকোনো হয়ে গেল।

দুহাতে মুখ ঢেকে শ্রীমতী বলল,—'আমার বাঁচার উপায় আর রইল না। নিজেকে শেষ করে দেওয়া ছাড়া পথ নেই।' রেশমের মতো নরম নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিল সন্দীপ। খুব চাপা সুরে, খুব দ্বিধাভরে বলল,—'শ্রীমতী আমি পথ করে দেবো তোমার। রক্ষা করব।'

—'সে কেমন করে?' কান্নায় ভেসে যাচ্ছে শ্রীমতী।

—পুরুষরা তো রক্ষা করার জন্যেই।

—সত্যি বলছ? বিশ্বাস হয় না।

—ঠিক বলছি। কিন্তু একটা কথা বলবে শ্রীমতী! প্রায় নিশ্বাসের মতো মৃদু শব্দে বলল, সন্দীপ—'আমি কি অপরাধী?'

সন্দীপের হাতের পাতায় মুখ গুঁজে শ্রীমতী অস্ফুটে উচ্চারণ করল—'না!'

সাপের ল্যাজে পা পড়ার মতো ছিটকে উঠলো সন্দীপ; বিদ্যুতের আঘাতে- চিন-চিন করে উঠলো রক্ত-কণিকাগুলো!

—আমি নই? বিস্ময়ের চাবুক পড়লো ঘরের হাওয়ায়। মনটা ধড়ফড় করে উঠলো।

তবে কেন দায়িত্ব নিতে যাবে এত বড়? কে সে শয়তান? কার জন্য মুখে কালি মাখবে; বীরত্বের মহিমা নিমেষের মধ্যে সংকুচিত হয়ে গেল।

সবুজ আলোর নীচে শ্রীমতীকে ছেড়ে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে এলো সন্দীপ।

খবরটা কাগজে প্রকাশিত হলো। সন্দীপ দেখলো নিজের চোখে। নির্বোধের মতো যোগ-ফল মেলাতে সুরু করলো। কারা করল এমনটা? এমনভাবে প্ররোচনা দিল কে?

শ্রীমতী শেষ হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, দুজন ডাক্তারকে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলো।

'স্কাউন্ড্রেল'—দাঁতে দাঁত ঘষে স্বগতোক্তি করল সন্দীপ। মানুষের জীবন নিয়ে যারা এক্সপেরিমেন্ট করে তারা ক্রিমিনাল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখেই চাবুক পড়লো। নিজে কি? ভীরু—কাপুরুষ! সন্দীপের দন্ত ঘর্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল।

সবুজ লনের পাশে লাল কাঁকরের রাস্তার ওপর ফ্লুয়োরিসেন্টের স্বপ্নময় আলো।

—'ছি-ছি, এমনটা হবে কে জানতো? তাহলে কি এই সব মেয়েদের কেউ আনে একটা রেসপেকটেবল ক্লাবে?'—পাইপ নামিয়ে বলল বিনয়।

আলোচনাটা ঘুরছে কেবল—ঘূর্ণি জলের মতো। সিগারেট আর পাইপের ধোঁয়া উড়ছে সেই সঙ্গে।

—যাই বল, ব্যাপারটা খুবই শকিং—সুধীর দুঃখ করল।

—সন্দীপের উচিত ছিল কিছু প্রতিকার করা। কারণ চেষ্টা করলে সন্দীপই পারতো। অনিরুদ্ধ চেয়ারের হাতায় চাপড় মারলো।

সুইমিং পুল থেকে কারা যেন উঠে গেল ওদের পাশ দিয়ে, ড্রেসিং রুমের দিকে। ভিজে পায়ের দাগ পড়লো বাঁধানো চত্বরের ওপর। টুপ-টুপ জলের ধারা কতদূরে ছড়িয়ে গেল ওদের যাওয়ার পথে।

সেদিকে চেয়ে বিশ্বজিৎ তর্কের সুরে বলল,—

'বলা খুবই সহজ।'

—থাক সে সব কথা। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, সন্দীপ। উর্ণনাভের জাল আর কত বড় হবে?

মনের তলায় একটা সূক্ষ্ম কালো দাগ পড়ে গেছে; চত্বরের ওপর জলের দাগের মতো। দাগটা কতখানি চলে গেছে, একেবারে ড্রেসিং রুমের প্রলম্বিত পর্দার কোল ঘেঁষে মিশেছে।

দূরে ছাতার তলায় যারা এতক্ষণ ছিল, তারা চলে গেছে। ঐখানে বসত শ্রীমতী তার দলবল নিয়ে। ঐখান থেকে বাতাস আসছে ছাঁটা-ঘাস লনের বুকের ওপর দিয়ে; বলছে—'জীবন থেকে আমি অমৃত খুঁজে বার করবো।'

একটি অতৃপ্ত অশরীরী বাসনা গাছের পাতার মর্মর ধ্বনির সঙ্গে ছলছল করে উঠছে।

ভাঙ্গা দাঁতে হাসি নিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে শিবদাস মিত্র চলে গেলেন। কার-পার্ক থেকে অনেকগুলো গাড়ী চলে গেল একে-একে।

আজ সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি কোণ থেকে একই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে। ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রত্যেকটি কণ্ঠ থেকে। এখন সব শান্ত হয়ে গেছে।

সন্দীপ জানে সকলের অলক্ষ্যে যে গভীর হৃদয় অপমানিত হয়েছে, আহত হয়েছে— তার খবর কে রাখে? তার পরিচয় পেয়ে বিস্[...] হবার মানুষ কোথায়?

বিশ্বজিৎ বলল,—'চল—রাত হয়ে গে[...] বাড়ীতে বকাবকি করবে।'

সন্দীপের দিকে চেয়ে অনিরুদ্ধ সহানুভূ[...] [...]—'একটু মন খারাপ হবে, তারপর [...] ঠিক হয়ে যাবে।'

চত্বরের ওপরে জলের দাগটা প্রায় মিলি[...] এসেছে। শুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে একা[...] পরেই। সন্দীপের বেদনাও মিলিয়ে যাবে সময়ে[...] হাওয়া লেগে; হৃদয়ের গভীরে যে কালো দাগ[...] পড়েছে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ম[...] পড়বে না অমৃত পিপাসায় কে কবে আকুল হয়ে[...] মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

আলোর টুকরোকে [...]

বংশীধারী দাস

অসংখ্য আলোর টুকরো ইতস্তত
ছড়ানো [...]
টুকরো-টুকরো কিছু আলো দুহাতে
কুড়িয়ে [...]
নির্বোধ মমত্বে ধরে রাখতে চায়
বুকের [...]
ছোট ছোট প্রীতি, সুখ, স্বপ্ন, আশা,
স্মৃতির
জানালার ফালি রোদ, আকাশের
কিছু নী[...]
সমস্তই ধরে রাখে মোহ বশে
কিংবা কৌতু[...]

কালের নিষ্ঠুর হাত তার কাছ থেকে
সব [...]
হয়তো ছিনিয়ে নেবে কোনোদিন,
কুটিল ধা[...]
অস্ত্রে তার টুকরো-আলো দিয়ে গড়া
শখের [...]
ভেঙ্গে ফেলবে অন্ধকার, তবু সে
কখনো তার
লালন করে না ওই অনীহাকে
আত্মার অ[...]
লালন করে না কোনো বুদ্ধিদীপ্ত
সৌখীন বি[...]

বাইরে বৃষ্টির ঝাপটা, প্রতি কূল
হাওয়ার প্র[...]
ভাঙ্গা কাঁচ, ভাঙ্গা ইচ্ছা যত্রতত্র
জমে ও[...]
চারিটি দেয়ালে রুদ্ধ বাড়িটার
আনাচে-কা[...]
মৃত্যুর সিঁধেল চোর বার বার
হানা দিয়ে
ফিরে যায়, জানালার ঝাপ্সা কাঁচে
ফের সূর্য ব[...]
ভাঙ্গা কাঁচ, টুকরো ইচ্ছা— তন্মধ্যেই
মগ্ন হয়ে বাঁ[...]

সৌরজগতের বাইরে সভ্যতার বিকাশ কি সম্ভব?

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বছর পঞ্চাশেক আগে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন থেকে আমরা দেখে আসছি যে তত্ত্ব এগিয়ে চলে প্রয়োগের সামনে এবং তত্ত্ব প্রয়োগকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তার আগে ব্যাপারটা ছিল বিপরীত। প্রথম বাষ্পচালিত যন্ত্রটি আগে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, বাষ্প-যন্ত্রবিদ্যা সংখ্যার ভাষায় প্রকাশিত হয় তার পরে। কিন্তু আজকালকার জেট্‌ যন্ত্রের ক্ষেত্রে বা কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আগে জেট-যন্ত্রবিদ্যার আবির্ভাব প্রথম হয় কাগজে কলমে, তারপরে সেই বিদ্যার ভিত্তিতে তৈরি হয় জেটযন্ত্র। আজ তাত্ত্বিক প্রস্তুতি বাদ দিয়ে কোন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা হয় না। বিংশ শতকে প্রথম রকেট বা স্পুৎনিকের আবির্ভাবের বহু আগে বৈজ্ঞানিক সিয়লকভ্‌স্কি মহাকাশভেদী রকেটের তত্ত্ব ও নক্‌সা এবং গ্রহ-গ্রহান্তরে যাত্রার মহাশূন্যপোতের গতিবিধি রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আজও গ্রহান্তরে যাওয়া মানুষের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি কিন্তু হবে, শুধু চাঁদে, মঙ্গল বা শুক্রে যাওয়া নয়, সৌররাজ্য পার হয়ে অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে। বিজ্ঞান তার জন্য তাত্ত্বিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্য নক্ষত্রের রাজ্যে যাওয়া মানে সেইসব নক্ষত্রের গ্রহ উপগ্রহে যাওয়া। সেই রকম মহাবিশ্ব পরিক্রমার কল্পনা করতে বসে মানুষ ভাবছে সেই সব গ্রহেও কি আমাদের পৃথিবীর মত প্রাণী বা সভ্যতা আছে। অবশ্য প্রশ্নটি আজকের নয়। মহাবিশ্বের প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে মানুষ চিন্তা করে আসছে সভ্যতার আদিপর্ব থেকে। ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিকরা মনে করতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের অস্তিত্ব সর্বত্র। আনাক্‌সাগোরাসের মতে "প্রাণের অদৃশ্য বীজ" ছড়িয়ে আছে সারা মহাজগতে। প্রশ্নটি নিয়ে যুগে যুগে কত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মধ্যযুগে প্রথমে পৃথিবীকেই মহাবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করা হোত। কোপার্নিকাস ক্যাথলিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মত উপেক্ষা করে পৃথিবীকে সেই সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, মহাবিশ্ব ভূকেন্দ্রিক নয়, সূর্য কেন্দ্রিক। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্ব-বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গার্দানো ব্রুনো, কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্তকে আরো এগিয়ে নিয়ে লেখেনঃ—

"মহাবিশ্বে অসংখ্য সূর্য আছে, আছে সংখ্যাতীত ভূমন্ডল যেগুলি যে যার নিজের সূর্য প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই সব ভূমন্ডলে প্রাণী আছে।"

এর পর ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের সমস্ত রকমের নির্যাতন সহ্য করে ব্রুনোর ঐতিহ্য বহন করে অগ্রসর হন গ্যালিলিও, ডেস্‌কার্টেস ফঁতেনেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা। এঁরা সবাই অসংখ্য প্রাণসঞ্জীবিত ভূমন্ডলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ফঁতেনেল মনে করতেন ভূমন্ডল বিশেষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুসারে তার প্রাণীগুলির চরিত্র গড়ে ওঠে। বুধের ও শনির অধিবাসীদের বিষয়ে তিনি লেখেনঃ—"ওদের মাথাটা মোটা কারণ ওদের উদ্দীপনা অত্যাধিক" এবং শনিগ্রহের "অধিবাসীরা এত বেশি বোকা যে, একটি প্রশ্নের জবাব ভেবে বার করতে ওদের সারাটা দিন লাগে।"

অষ্টাদশ শতকে রুশ বৈজ্ঞানিক মিখাইল লোমনোসভ অরোরা বোরিয়ালিস সম্পর্কে তাঁর ধারণা কবিতার ছন্দে গাঁথতে বসে লেখেনঃ—

The men of wisdom do proclaim
Myriads of worlds fly there
through space
And countless suns pour forth
their flame. . . .

এরপর উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্‌ জীব ও জৈব জগতের আবির্ভাব ও অভ্যুদয় সম্পর্কে বহু বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেন। তিনি লেখেনঃ—ভেস্তার অনির্বাণ মশালের মত জীবন গ্রহ থেকে তৈরি বীজের মত গ্রহান্তরে পরি-বাহিত হয় না; জীবনের অভ্যুদয় হয় প্রতিবার নতুন করে যখন বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হয় প্রাণের জন্মের অনুকূল অবস্থা।

এঙ্গেল্‌সের এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই আমরা মহাবিশ্বে জীবনের অভ্যুদয় ও অস্তিত্বের প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে দেখতে পারি।

আমাদের সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মত একটি নক্ষত্র মাত্র যা আমাদের নিকটতম তারা পর্কাসিমা সেন্ট্‌রীর চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ কাছে। যে গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে সেগুলির একটির বাসিন্দা আমরা। অন্যান্য তারারও গ্রহ আছে এবং সেগুলির মধ্যে অবস্থা অনুকূল হলে জীবনের নবজন্ম হওয়া

নক্ষত্র উদ্ভিদবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গাভ্রিল তিখফ নক্ষত্রলোক পর্যবেক্ষণ করছেন।

স্বাভাবিক। কোটি কোটি বছরের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ফলে সেই সব গ্রহের কোন কোনটিতে জীববিশেষের উৎকর্ষ আমাদের পৃথিবীর মানুষকে যদি পিছনে ফেলে গিয়ে থাকে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বায়িত হয় বলে সেগুলির আবর্তনের সময় কমে যায়। যাই হোক হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে আমাদের ছায়াপথে ১৫০০০ কোটি নক্ষত্র আছে এবং তার মধ্যে কয়েক শত কোটির গ্রহ আছে।

পৃথিবী, মঙ্গল ও চাঁদের তুলনামূলক আয়তন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, কতগুলি গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের বাস সম্ভব? এখনো পর্যন্ত আমাদের জ্যোতির্বিদরা এমন কোন যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবন করতে পারেনি, যার দ্বারা আমরা অন্য কোনো নক্ষত্রের কোনো গ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। তেমনি প্রক্সিমা সেন্টরীর কোন গ্রহের অধিবাসীদের পক্ষে সৌর জগতের আমাদের এই গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়—এমনকি বৃহস্পতি বা শনির মত বড় গ্রহদুটিও তাদের পক্ষে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। অন্য নক্ষত্রলোকে কোনো গ্রহ যদি বৃহস্পতির চেয়ে অনেক বেশি বড় হয় তবেই তার অস্তিত্ব আমরা টের পেতে পারি। সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী [illegible] "[illegible]-৬১" নামে নক্ষত্রের যে গ্রহটির সন্ধান পেয়েছেন সেটি আয়তনে বৃহস্পতির [illegible] তার [illegible] সঙ্গে একই মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন [illegible]।

আমেরিকাবাসী [illegible] জ্যোতির্বিদ [illegible] সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে বিবর্তনের [illegible] মহাজাগতিক নীহারিকা পুঞ্জগুলি ক্রমাগত নতুন নতুন নক্ষত্র ও গ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে। [illegible] মহাবিশ্বের [illegible] আয়তনের অসংখ্য [illegible] ও [illegible] হচ্ছে এবং গ্রহবিশেষের [illegible] একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে [illegible] তাপ এত বেশি হয় যে তার ফলে [illegible] বিস্ফোরণ ঘটে। তখন সেই গ্রহটি [illegible] নক্ষত্রে। পৃথিবীর সমতুল্য গ্রহ [illegible] আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন। কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের গ্রহ থাকা সম্ভব নয় কারণ সব তারাই যে আকারে সূর্যের [illegible]। ছায়াপথে এমন সব অতিকায় নক্ষত্র আছে সেগুলির ঔজ্জ্বল্য ও [illegible] সূর্যের [illegible] বেশি। কিন্তু অনেক কম। নক্ষত্রের [illegible] সবক্ষেত্রে সমান নয়—৩০০০° থেকে [illegible]০০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপের নক্ষত্র আছে। ৭৫০০° সেন্টিগ্রেড থেকে আরম্ভ করে তাপ যত কমতে থাকে নক্ষত্রের আবর্তনের সময়ও তত কমতে থাকে। এই ব্যাপারের মধ্যে রয়েছে গ্রহের অস্তিত্ব। নক্ষত্রবিশেষের আবর্তন বেগের অনেকখানি [illegible] তার গ্রহ পরিবারের কক্ষ পরিক্রমার জন্য

জীবজগৎবিশিষ্ট গ্রহের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় প্রথমে দেখতে হবে জীবনের আবির্ভাবের অনুকূলে অবস্থাটা কিরকম।

জীবনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এঙ্গেলস্ লিখেছেন:—'জীবন হচ্ছে প্রোটিনঘটিত বস্তুর এমন এক অস্তিত্ব যার ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক বহিঃপরিবেশের সঙ্গে বিপাক ক্রিয়া বিনিময় করা। বিপাকক্রিয়া বন্ধ হলেই প্রোটিনের বিভাজন ঘটে এবং জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

হাইড্রোকার্বন প্রোটিনও জীবনের একটি প্রধান উপাদান। গ্রহবিশেষের তাপ ও মহাকর্ষের মাত্রা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে তবেই হাইড্রোকার্বন সজীব হয়ে উঠতে পারে। অত্যধিক বা অত্যল্প তাপে প্রোটিনে ভাঙন ধরে। তারপর জীবন ধারণের জন্য চাই আবহ। আবহ শুধু যে অক্সিজেনের জন্য প্রয়োজন তা নয়। আবহমণ্ডল না থাকলে তরল পদার্থ সামান্য তাপেই ফুটে ওঠে বলে, যে দ্রব পদার্থের মধ্যে জীবনের উদ্ভব হবে ত[illegible] হয়ে যাবে।

তারপর গ্রহে যদি আবহমণ্ডল না [illegible] তাহলে তার রোদ-পড়া পিঠটি অ[illegible] মত গরম হবে এবং অন্ধকার দিকটিতে [illegible] সেণ্টিগ্রেডের থেকে ২০০° পর্যন্ত ঠাণ্ডা [illegible] সেই অবস্থায় প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব।

বুধের মত ছোট গ্রহের মহাকর্ষ [illegible] এত কম যে তার দ্বারা কোন আবহমণ্ডল রাখা যায় না। কিন্তু গ্রহবিশেষের ম[illegible] যদি পৃথিবীর মহাকর্ষের মত হয় [illegible] সেই মহাকর্ষের আকর্ষণে অক্সিজেন, ন[illegible]জেন, কার্বন ডায়অক্সাইড, জলীয় বাষ্প [illegible] হাইড্রোজেন পৃথিবীর কাছে থাকতে বাধ্য [illegible] সৌর সাম্রাজ্যে পৃথিবী, শুক্র ও মঙ্গ[illegible] প্রয়োজনীয় তাপ ও মহাকর্ষ মাত্রা আছে ব[illegible] মনে হয়।

উচ্চাঙ্গের প্রাণীজগতের বিকাশ ঘটতে বে[illegible] কোটি বছর লাগে। সেইজন্য এই ধারণা [illegible] ভুল হবে না যে, যেসব নক্ষত্র প্রাচীন, [illegible] সেইগুলির রাজ্যেই প্রাণী জগতের অ[illegible] সম্ভব। সেই নক্ষত্রগুলির জ্যোতিও কে[illegible] কোটি বছর ধরে অম্লান থাকা চাই। এ[illegible] সেগুলির যুগ্মতারা হওয়া চলবে না কা[illegible] যুগ্মতারা গ্রহের কক্ষপথ সম্পূর্ণ গোলাক[illegible] হবে না বলে গ্রহপৃষ্ঠে তাপমাত্রার অত্যধি[illegible] হ্রাসবৃদ্ধি হবে যা জীবনের পক্ষে অসহনীয়।

আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্রগুলির রাজ্যে উচ্চাঙ্গের জীব ও সভ্যতার অস্তিত্বের ক[illegible] বিবেচনা করতে হলে মনে রাখতে হবে [illegible] প্রত্যেকটি সভ্যতার নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কো[illegible] সভ্যতাই অনন্তকাল থাকে না। তাই বলা যা[illegible] ছায়াপথের মধ্যে যে সব নক্ষত্র বহু প্রাচী[illegible] সেগুলির গ্রহে গ্রহে যে সভ্যতার অভ্যুদ[illegible] হয়েছিল আজ তার অবসান হয়েছে। সভ্যতার গড় মেয়াদ যদি কয়েক শো কোটি বছর বলে

(শেষাংশ ২৩৯ পৃষ্ঠায়)
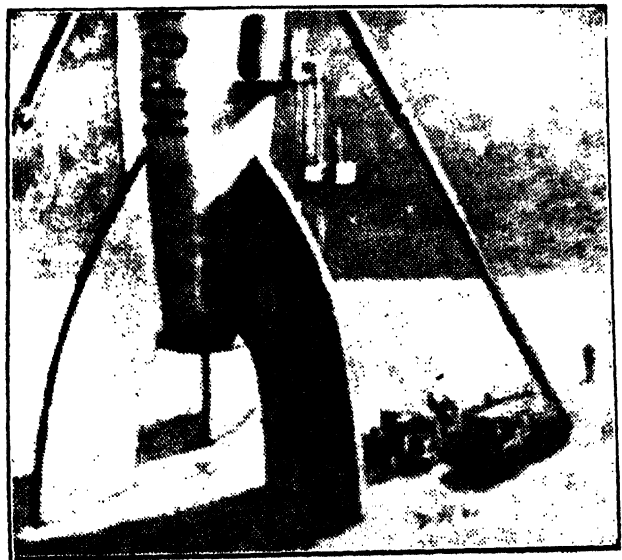
মঙ্গলে পৃথিবীর অভিযাত্রী (কাল্পনিক চিত্র)

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোং অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

জাতক

কৃষ্ণা দাস

বাড়ী দেখে রমা খুশী হল। বললো—এতদিনে একটা মনের মত আস্তানা জুটলো, —আলোবাতাস, ছিমছাম, নিজস্ব।

বললাম—আর ঘরের পাশের ব্যালকনির ছাদটি?—সে তো বলারই নয়। ভালবাসার আধিক্যে রমারাণী কণ্ঠলগ্না হলেন। চুপি চুপি বললো—ওখানে কিন্তু একটা বেতের চেয়ার টেবলের সেট। কিছু ফুল গাছের ব্যবস্থা করতে হবে।

বললাম—তথাস্তু।

অনেকদিন ধরে ঘর বাড়ী খোঁজার তালে ছিলাম। কিন্তু দিনকাল ভারী মন্দা, তাই কলকাতা শহরে আর যাই পাওয়া যাক, সুবিধে মত বাড়ী ঘর মেলে না।

যাই হোক, অনেকদিন অনেক পরিশ্রমের পর মানিকতলা স্ট্রীটের ফ্লাট বাড়ীর দোতলার অংশটুকু পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। অবিশ্যি আমার চাইতে রমাই বেশী উৎফুল্ল, অনেক দিন পর মনের মত নিজস্ব আস্তানা পেয়ে কোমর বেঁধে নতুন সংসারকে গুছিয়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে।

কিন্তু সংসার এবং তাকে কেন্দ্র করে যত কাজই থাক, মানুষের মনের স্বাভাবিক একটা খোরাক আছে,—সেটা ওর নিঃসঙ্গতা। কাজের জন্য আমাকে অধিকাংশ সময় বাইরে থাকতে হয় —রমা একলা, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে তেমন ভাব আলাপ হয়নি, আত্মীয় স্বজন বলতেও তিনকুলে তেমন কেউ নেই যে দুদিনের জন্য এসে থাকে। সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময় একলা থাকতে হয় বলে রমা মাঝে মধ্যে খুঁৎখুঁৎ করে। একদিন বললো—দুপুরটা যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার না?

বললাম—দক্ষিণ হস্তের ভাবনা না থাকলে অফিসের মুখ আমি কোন দিনও দেখতাম না।

রেডিও গ্রামোফোন পত্র পত্রিকার ব্যবস্থা করা ছাড়া তারপর আমার দ্বারা আর কিছু সম্ভব হয়নি।

একদিন, অফিস থেকে ফিরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসেছি, রমা বললো—জান, আজ একজনের সঙ্গে ভাব হল। সে বেশ মজার কাণ্ড, নিচের ফ্লাটে থাকে, নিজে উপযাচক হয়ে এসেছিল। আচ্ছা নিচে যেতে আসতে ও মেয়েটিকে কখনও দেখেছ?

রমা কার কথা বলছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। হেসে বললাম—রমারাণী ছাড়া আমার আর কারোর সঙ্গে প্রণয় নেই।

রমা আরক্ত হয়ে কিল দেখালো, যত রাজ্যের বাজে কথা।

একটু পরে ও নিজেই হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। —দেখে যাও।

বারান্দার রেলিংএ দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, নিচের দিকে চেয়ে দেখ। ঐ মেয়েটা—

চাইতে হল। ছোট্ট একটু চিলতে উঠোন। ইতিপূর্বে এতটা লক্ষ্য করিনি, প্রয়োজনে আসবে বলে মনেও করিনি। আজ মনে হল নিচে আর উপরের পার্থক্য এখানে অনেকখানি। প্রায়ান্ধকার ঘুপসী মত পরিবেশ। শ্যাওলা ধরা উঠোন, ছর-ছর ক'রে খোলা কলের জল সেখানে অবিরাম পড়ছে। আর তারই পাশের একটুকরো বারান্দায় একটা মেয়ে শিল-নোড়ায় কি যেন ঘাঁটছে আর আপন মনে কি যেন বকছে।

রমা এত সামান্য জিনিষ দেখাবার জন্য টানতে টানতে নিয়ে আসবে, ধারণায় ছিল না। তবু স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কৌতূহল, ওকে এবিষয় নিয়ে কিছু বললাম না। বললাম—এ আর এমন কি। তুমি যেভাবে আমায় টেনে আনলে আমি মনে করেছিলাম আলাদীনের প্রদীপ বুঝি?

আমার কথায় রমা হাসলো না। চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বললো—না গো, হাসি নয়। মেয়েটা পাগল।

ওর মাথা নেড়ে দিয়ে বললাম—তোমারই গোত্র তা হলে?

রমা কিছু ক্ষুন্ন হল। তবে সব কথাটা না বলেও ছাড়লো না। আজ দুপুরবেলা যখন ও হাতের সমস্ত কাজকর্ম সেরে দিবানিদ্রার কিছু ব্যবস্থা করছে, সিঁড়ির দরজায় তখন কড়ার আওয়াজ হয়। রমা মনে করেছিল, অন্য কেউ, আসতে পারে কিম্বা আমার আসাও অসম্ভব নয়, কিন্তু দরজা খুলে যাকে দেখেছিল, তাকে দেখার আশা করেনি। একতলা ফ্লাটের প্রায় মেছোহাটার মত পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হবার আশা খুব কম ছিল। কারণ, আমি বরাবরই কিছু নির্জনতাপ্রিয়। চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোল ঠিক বরদাস্ত করতে পারিনে। সেদিক দিয়ে রমাও তাই। সুতরাং আমরা এই দুটি নতুন মানুষ, একটা নতুন পরিবেশে এসে পাঁচজনের সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভাব আলাপ করার বদলে প্রায় কোণঠাসা হয়েই আছি। এমন কি সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠার সময়ও যদি ঐ বালখিল্যদের সামনে পড়তে হয়েছে, কিম্বা সেই রংশীকৃত গোঁফওলা লোকটি বাজারের থলে হাতে দুঃখী দুঃখী মুখে পথ হাঁটেন—এঁদের সবাইকে দেখেই আমি সভয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। কেন জানিনে, ওঁদের দেখলেই আমার মনে হয়েছে—সময় এবং সুযোগের বিন্দুমাত্র হাতে পেলেই এঁরা সখেদে দুঃখের পাঁচালী সুরু করে দেবেন।

কিন্তু আশ্চর্য, তাঁদের এড়াতে চাইলেও তাঁরা আমাদের ছাড়তে পারেন না বোধ হয়। তাই রমা একথা সেকথার পর বললো—আলাপ পরিচয় থাকা ভাল কিন্তু পাগল হলে মুস্কিল। দেখো মেয়েটা কাল আসবে বলেছে।

রাতের কথা দিনের আলোয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। পরদিন সকালের ঘটনা। চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসেছি, সিঁড়ির কড়া নড়ে উঠতে কিছু আশ্চর্য হলাম। এই সাত সকালে আবার কে আসতে পারে! কথাটা ভাবতে ভাবতেই আমি ফ্লাটের দরজাটা খুলে দিলাম কিন্তু দেখেশুনে অবাক হতে হয়।

দেখলাম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কালকের সেই নিচের সেই কাটনাবাটা মেয়েটি।

আমায় দেখার আশা করেনি বোধহয়। প্রথমটা মেয়েটির চোখের মধ্যে গভীর একটা বিস্ময়ের সংগে অসহায় ভাব ফুটে ওঠার পর একসময় আবার সাড়ীর আঁচলটা মুখে দিয়ে খুক-খুক করে হাসতে সুরু করে দিল।—রমাদি কোথায়?

রীতিমত আত্মীয় সম্বন্ধ। কাল সন্ধ্যারাতে দোতলা থেকে একতলার দূরত্বের মধ্যে যতটুকু দেখা যায় মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম। অবিশ্যি সে দেখার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। রমার আগ্রহ আর ছেলেমানুষিটুকুই দেখেছিলাম শুধু। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটিকে দেখে কেমন যেন ভারী ভাল লাগলো। বেশ চমৎকার দেখতে। চোখ দুটো বড়, সারা মুখে একটি ছেলেমানুষি সারল্য আছে। ভাল লাগে। তবে সব কিছুর মধ্যে একটা বদ-অভ্যাস নজরে পড়লো। ভারী নোংরা, জামা-কাপড় ছেঁড়া, ময়লা, চুল উস্কোখুস্কো, রুক্ষ অস্নাত। সারা শরীরে ছন্নছাড়ার ভাব।

অবিশ্যি এইটুকুতেই মানুষকে পাগল বলা যায় না। কিন্তু ওর পুরুন্ত শরীরটার সংগে চোখের সরল আর উদ্ভ্রান্ত ভাব ও অকারণ হাসি কিছুটা সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। বললাম—রমাদিকে কি দরকার?

—বাঃ আমায় যে আসতে বললো।

আমাকে ছাড়িয়ে মেয়েটির নজর বারান্দার এপাশ-ওপাশ ঘুরে এল। বললাম—সেতো বাথরুমে গিয়েছে। চান করছে।

—চান করছে? ঐ যা—মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দেরী লাগলো না। অসহায় কাতরভাবে বললো—রোজ চান করতে হয়, না? আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি দাঁড়ান।

বলেই আর তিলার্ধ অপেক্ষা নয়। দুর-দুর করে নিচে নেবে গেল।

বাথরুম থেকে ভিজে কাপড়ে বেরিয়ে রমা জিজ্ঞাসা করলো—কার সংগে কথা বলছিলে গো?

—তোমার চ্যালা।

রমা হেসে বললো—ওর নাম লীলা।

একটু পরে, সবে ভাত খেতে বসেছি সিঁড়ির দরজায় আবার খুট-খুট আওয়াজ। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রমা দরজা খুলে দিতে গেল। রমার গলা পেলাম—কেউ বকবে না তো?

—বয়েই গেল।

বেশ তাচ্ছিল্যের সুর। বুঝলাম লীলাময়ীর আগমন ঘটলো।

একটু পরে রমা লীলাকে নিয়ে এপাশে এল। দেখলাম লীলার শরীরে সকালের সেই রুক্ষতা নেই। স্নান করেছে। পিঠের উপর ভিজে চুলগুলো মেলা। পরনে একখানা ডুরে শাড়ী। রমা বললো—জান, লীলা বেশ গান জানে।

—বটে। অফিসের তাড়া ছিল, বাজে প্রসংগ একেবারে চেপে দিতে চাইলাম। বললাম—অফিস থেকে এসে শোনা যাবে।

লীলা উপরে আসা থেকে নীচেরতলার ভাড়াটেদের দিকে কিছু দৃষ্টি দিয়েছি। লীলার জনক-জননী বহু সন্তানের ভাগীদার। ভদ্রলোক কোন অফিসের কেরাণী জানিনে, তবে দিন চালাতে যে তার প্রতিদিনের দুঃসহ বোঝা একটু দেখার চেষ্টা করলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। এদেরই সংসারের বড় মেয়ে লীলা। মেয়েটি মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চলে যায়। মাথায় হয়তো কিছু বিকৃতি আছে কিন্তু তার জন্য লক্ষ্য নেই কারো। থাকা বা না থাকা দুটোই সমান। সুস্থদের নিয়ে দিন চালান যাদের যন্ত্রণার ব্যাপার পাগলের কথা তখন ভাবছে কে?

অবিশ্যি ভাল করার দিকে লক্ষ্য না থাকলেও শাসন করার দিকে এদের জ্ঞান বেশ টনটনে দেখি। মেয়েটির মাথার দোষ হয়তো মাঝে মাঝে বাড়ে, হয়তো এতটুকু জায়গায় থেকে সেটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তখন হয় পালায়—না পালাতে পারলে গুহায় বন্ধ জন্তুর মত আর্তনাদ করে। তখন অভিভাবকদের তর্জন-গর্জন এবং চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারি পিঠের উপরেও তার কিঞ্চিৎ আক্রমণ না পড়ে যায় না।

আশ্চর্য যন্ত্রণাদায়ক জীবন।

বুঝতে পারতাম লীলা এখানে ওখানে পালাবার মত উপরেও পালিয়ে আসে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতাম জায়গার জিনিষ স্থানচ্যুত হতে। হয়তো কলমটা পেলাম না, কিম্বা রুমালটা কি দরকারী কাগজপত্রের কিছু অংশ। একদিন একটা ফুলদানীর ভগ্নদশা দেখে শুনলাম সেটা লীলারাণীর কাজ।

ভারী বিরক্ত ধরে গেল। একি কাণ্ড লোকের দরজায় দরজায় মাথা খুঁড়ে বেরিয়ে দুজনের নিরিবিলি একটা ফ্লাট যোগাড় করলুম সেকি এই উঠকো আপদের জন্যে!

রমাকে বলতে হল। বললাম—মেয়েটা এতবার উপরে আসে কেন? যখন তখন?

রমা বললো—আসে কি করবো। তাড়িয়ে দেওয়া তো যায় না!

তাড়িয়ে দেবার কথা নয়, সিঁড়ির দরজা না খুললেই পার।

রমা আমার কথা কতটা রেখেছিল বুঝতে পারিনি লাম না, এরই মধ্যে একদিন—দিনটা সেদিন শনিবার, সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরেছি, ঘরে এসে তখনও জামা-কাপড় পাল্টাইনি, রমা ওপাশের ঘর থেকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সংগে লীলা। বললো—কি এনেছি দেখ।

ফিরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লীলা, কিন্তু ওর সেই ডুরে শাড়ী পরা পরিচিত দেহটি ঘিরে আজ লাল রং-এর একখানা পুরোন সিল্কের শাড়ী উঠেছে। আকাবাঁকা অস্পষ্ট সিঁথির মাঝে অনাড়ম্বর একটি খোঁপা। কপালে চন্দন আঁকার ব্যর্থ প্রয়াস। অর্থাৎ সমস্তটুকু মিলিয়ে একটি সকরুণ বেদনাময় মূর্তি। লীলা আমার দিকে চেয়েছিল।

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলুম না। অবাক হয়ে রমার দিকে চাইতে রমা জানাল—আজ লীলার বিয়ে।

বোঝা গেল পাগলের একটি খেয়াল নিয়ে কথা হচ্ছে। কিন্তু যে বস্তু হৃদয়বৃত্তির গভীরে গিয়ে আঘাত করে তাকে এত সহজে আমি স্বীকার করে নিতে পারলাম না। কিছু গম্ভীর হয়ে বললাম—সে আবার কি?
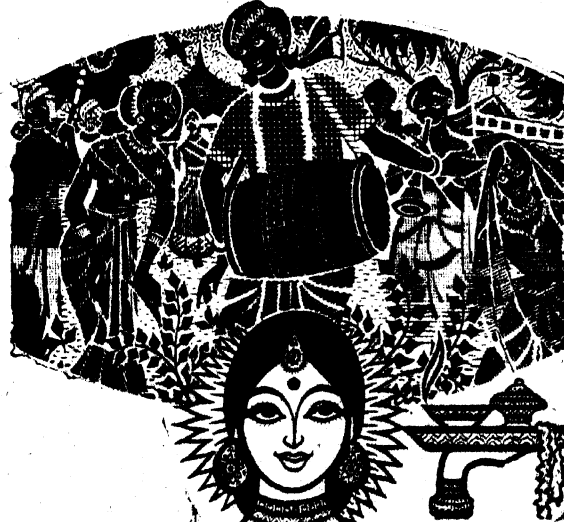
—বারে ঐ তো বললো, ওর আজ বিয়ে। দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, একেবারে সেজেগুজে হাজির। আচ্ছা বেশ, বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞেস কর—কি লীলা, তুমি বললে না, তোমার আজ বিয়ে?

লীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। অবোধ দুটো চোখ আমার মুখের উপর রেখে বললো,—আমার বিয়ে হবে না? বাঃ, এই তো দেখুন, বিয়ের জন্যে কাপড় কেনা হয়েছে।

লীলা কাঁধের আঁচলটা সামনের দিকে মেলে ধরে বললো—এ কাপড়ের দাম কত জানেন? অনেক। ছিরু মামা বলেছিল সবুজ কাপড় কেনো, লীলাকে মানায়, তা আগরপাড়ার ওরা বললো লাল চাই। তাই এই কাপড় কেনা হয়েছে।

বহুদিনের একখানা ব্যবহার্য লাল রং-এর শাড়ী, কার কোন বাক্স আলমারী হাতড়ে বার করে এনেছে, কে জানে। লীলা সেই লালের চিরাচরিত বেশ ধারণ করে অস্থির মাথায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে।

মেয়েদের অবস্থা কি সব সময়ই অপরিবর্তিত?

আমি কিছু আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে একটা জিনিষ দেখে ভারী অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল মুহূর্তের জন্য লীলার অবোধ দুটো চোখ বাঙ্ময় হয়ে উঠলো যেন। মনে হল ওর ঐ নির্বাক দুটি অক্ষিগোলক আমার চোখের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে চাইছে। কিন্তু চোখের ভাষা যাই হোক, মুখের ভাষা সেই অবোধের মত। কেমন অসহায়ভাবে বললো—আমায় লাল শাড়ীতে কেমন দেখাচ্ছে!

বিরক্ত হয়ে বললাম—বেশ দেখাচ্ছে।

রমা জানালার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছিল। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। বললাম—কি হাসছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ধমক খেয়ে কিছু থতমত খেল রমা। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি লীলার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। বললো—এখন নিচে যাও, আবার পরে এস।

ঘরে এসে বললো—বাবারে বাবা। তোমার সবতাতেই রাগ।

—রাগ নয় এটা দুঃখের কথা। বিরক্তিটা কিছুতেই যেন চাপতে পারছিলাম না। বললাম—মানুষকে নিয়ে খেলা কিসের? ওকে এভাবে আমার সামনে আর নিয়ে আসবে না।

—মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।

রমা হেসে নিজের কাজে চলে গেল।

রাতে শুয়ে ঠিক যেন ঘুম আসছিল না। বিকেলের দেখা লীলার সেই অর্থময় চোখদুটো বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জানি লীলা পাগল, কোথাকার কোন্ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ওকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে কিছুটা ভিন্নমুখী করেছে। তাই ওর খাওয়া শোওয়া বসা আদবকায়দার কোনটাই সাধারণের মত নয়। কিন্তু তবু ওর চোখের মধ্যে কি দেখলাম আমি? জীবন-ধর্মের অতি সত্য রূপ? সেখানে কি কোন মিথ্যা নেই। সেখানে লীলা রমা সবাই কি এক?

পাশে ছিল রমা, ওর অনর্গল কথায় ঠিক মত জবাব না পেয়ে একসময় ঠেলা দিল—কথা বলছো না?

নড়েচড়ে শুতে হল?—কি? সেই থেকে এত বকে চলেছি, একটা কথাতেও কান নেই। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

হেসে বললাম—তা পার। তবে একটা কথা ভাবছি।—পাগলের নিশ্চয়ই। রমা কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বললো—মহাশয়কে বিকেল থেকে কিছু বিচলিত দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, পাগলের ট্রাজিডি তাঁর কোন্ সাহিত্যের খবরে লাগবে।

এরপর যথারীতি কদিন লীলাকে উপরে আসতে দেখিনি। হয়তো এমনও হতে পারে আমি যখন থাকি না, তখন আসে, কারণ তার আগমনের নিদর্শনটি পাই হাতের জিনিষ স্থানচ্যুত হতে।

একদিন তারই মধ্যে রমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কিগো, তোমার সখী আর আসে না?

রমা মুখ টিপে হাসলো। বললো—বারণ করে দিয়েছি। তুমি রাগ কর, কি দরকার।

বুকের ভিতরটা কোথায় যেন মোচড় লাগলো। অনেক কথা জিজ্ঞাসার ছিল কিন্তু কোন কথা বলতে পারলাম না আমি।

ক'দিন পর, টেবলে সাজান রমার আমার মিলিত ফোটো ষ্ট্যাণ্ডটা পেলাম না। পেলাম না অবিশ্যি ঠিক নয়, নির্দিষ্ট জায়গাটি শূন্য রয়েছে—এমনিতেই নজরে পড়ে গেল। রমাকে জিজ্ঞাসা করতে ও কিছু বলতে পারলো না। বললো—কি জানি, মনে হচ্ছে খানিক আগেও যেন দেখেছি।

খানিক আগে দেখলেও সে জিনিষটির পাত্তা আর পাওয়া গেল না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরছি, সিঁড়ির গোড়ায় এসে লীলার মা ডাকলেন—একবার শুনে যান।

দাঁড়াতে হল। ভদ্রমহিলাকে সামনা সামনি দেখা সেই প্রথম। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বহু সন্তানের জননীর মতই একটি ক্ষয়িষ্ণু চেহারা। হাতে শাঁখা, মাথায় ময়লা শাড়ীর দীর্ঘ গুন্ঠন। বললাম—আমায় বলছেন?

লীলার মা ঘাড় নাড়লেন। একটু ইতস্ততঃ করে হাতের ভিতর থেকে আমার সেই ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডটা বার করলেন। বললেন,—সকালে লীলার হাতে দেখেছি; আপনার জিনিষ।

হাঁ জিনিষটা আমারই ছিল বটে, কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে লীলা সেটা নিয়ে এসেছে তার মর্ম আমি কিছুতেই উদ্ধার করতে পারলাম না। লীলাকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না। আমি বললাম—ওটা থাক। আমি ওটা লীলাকেই দিলাম।

—সেকি কথা। এ দামী জিনিষ নিয়ে ও কি করবে। লীলার মা কিছু সংকুচিত হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি কি মনে করেছেন জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও যাই হোক চোর নয়।

আমার অতি সহজভাবে বিষয়টাকে নেওয়াতে লীলার মা কি ভাবলেন আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বিব্রত হতে হল বড়। কারণ, লীলা যে চোর নয়, ও'র চাইতে আমার নিজেরই কি জানতে কিছু বাকি ছিল?

লীলার মা ঘোমটার ভিতর থেকে আরও কিছু খেদোক্তি শোনাতে সুরু করলেন। বিমর্ষ-ভাবে বললেন,—ও আগে এমন ছিল না, লেখাপড়া, সেলাই, বোনা সব কাজে বড় চৌকস ছিল, সেবার টাইফয়েড হল—তারপর থেকেই-

না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম,—বিয়ের চেষ্টা করেননি কেন, ও তো ঠি[…]
উন্মাদ নয়।

—কে নেবে বাবা। চেষ্টা কি কিছু কা[…]
হয়েছিল, আগরপাড়ার এক ঘরের সঙ্গে তে[…]
প্রায় সব কিছু ঠিক—তা কে যে কি উড়ো খবর দিল—বিয়ে আর হল না, ভেঙ্গে গেল। তারপর থেকে মাথাটা আরও খারাপ হয়েছে।

আমি আর কথা বাড়াতে চাইলাম না। শুধু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম পাশের ঘরের দ্বারপ্রান্তে পরিচিত শাড়ীর আঁচলের একটু অংশ দেখা গেল যেন।

ক'দিন পরের ঘটনা—রমাকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী যেতে হল। শ্যালকের বিবাহবার্তা এসে পোঁছতে মাত্র রমা যাবার জন্য রীতিমত উদ্যোগী। বহুদিন কোথাও যায় না, ঘর বন্দী বেচারা, একটু বাইরে বেরোবার নামে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে দেখলাম। তবু নিয়ম রক্ষা করতে বললো—একলা থাকতে তোমার খুব অসুবিধে হবে। তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া সেগুলোর ব্যবস্থাও—

বললাম—কোন দরকার নেই। পাশের অন্নপূর্ণা হোটেল থাকতে অন্নের অভাব ঘটবে না। আর একলা থাকা? দুচার-দিন টক ঝাল মিষ্টির ওলোট পালোট ঘটলে ভালই লাগবে।

পরদিন রমাকে ওর বাবা এসে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু ওর এই চলে যাবার কথাটা যত সগর্বে বলেছিলাম কার্যক্ষেত্রে এসে দেখছি ব্যাপারটা ঠিক তত সোজাভাবে ঘটছে না। শহরে তখন কিছু ইনফ্লুয়েঞ্জার আবির্ভাব ঘটেছিল—যেমন মাঝে মাঝে ঘটে থাকে—এবং কোথাও কিছু না আমাকে এসেই সে যথারীতি আক্রমণ করে বসলো। রমা যাবার পরদিন থেকে প্রবল মাথার যন্ত্রণায় পড়ে গেলাম।

সে কি ভীষণ কষ্ট! না পারি মাথা তুলতে, না বালিসে রাখতে। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া। উঠে হেঁটে যে বাইরে যাব, কি কোন ডাক্তার বৈদ্যের ব্যবস্থা করবো তার কোনটাই যেন সাধ্যের মধ্যে রইলো না।

ভয় ধরে গেল শেষ অবধি রমাকে নিয়ে আসতে হবে নাকি।

অফিসে ছুটি আগেই নিয়েছিলাম। ঠিকে ঝিটা যা পারলো একটু দুধ সাবু আর ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিল তাইতেই একটা রাত একটা দিন কোনমতে কেটে গেল। পরের দিনটাও যায় যায়—।

কোথা দিয়ে সময় কেটেছে জানিনে। কেউ তেমন এসেছে কি না এক ঝি ছাড়া তাও লক্ষ্য করিনি। করবার মত ক্ষমতাই ছিল না। মাথার যন্ত্রণা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে পারে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

তবে মাথার যন্ত্রণা কিম্বা খানিকটা জ্বরের জন্য হাসপাতাল যাওয়া বা নার্স রাখা মশা মারতে কামান দাগার মত অবস্থা হলেও আমি সারা অন্তর দিয়ে কোন আত্মজনের সাহায্য কামনা করেছি।

পরের দিন অস্পষ্টভাবে—চেয়ে দেখলাম, সন্ধ্যের অন্ধকার এখনও ঘোর হয়ে নামেনি। আমার জানলার পাশ দিয়ে রাস্তার আলোর টুকরোটা এখনও খাটের পাশে এসে পৌঁছচ্ছে

না। নিচের তলায় চিৎকার চেঁচামেচি তার মধ্যেই ভেসে আসছে, আর আমি বোধ হয় তারই মধ্যে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার মনে নেই, হঠাৎ অনুভব করতে পারলাম সারা মন দিয়ে যা কামনা করেছিলাম তা বুঝি পেয়ে গিয়েছি। মাথায় কে যেন পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রগের দুটো পাশ অতি মমতার সঙ্গে আস্তে আস্তে টিপে ধরছে, ঘুম পাড়ানী গানের মত অতি কোমল হাতখানা বার বার মাথার উপর দিয়ে চুলের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসছে।

আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। অতি শিশুকালের স্বপ্নের মত পাওয়া মায়ের সেই শীতল পরশটুকু আমার স্মৃতিপথে এসে গেল। কিন্তু তখনই মনে পড়লো—না, মা তো বহুদিন নেই। তাহলে কি রমা এলো?

মা আর রমা মুহূর্তের জন্য এক হতেই আচ্ছন্ন ভাব চলে যেতে দেরী লাগলো না। তারপর নিজের খেয়ালেই কখন ডান হাতখানা বাড়িয়ে সঞ্চালমান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে ফেলেছি—রমা। কখন এলে?

কিন্তু আমার মনের সুপ্ত ভাব কেটে যেতে মুহূর্ত লাগলো না। মৃদু হাতখানা হাতের মধ্যে প্রবল অস্বোয়াস্তিতে ছটফটিয়ে উঠলো। আমার কল্পনার ঘোর পালিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ পথ পায়নি। বললাম—কে?

—আমি, লীলা।

—লীলা?

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হলেও রাস্তার আলোর একটা তীরের মত টুকরো ঘরের মধ্যে এসে গিয়েছে। আর সেই আলোর নিশানায় ঘোর লাগা চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম এ লীলা কোনদিন পাগল ছিল না, পাগল নেই, শুধু ও চিরদিনের স্নেহে প্রেমে উন্মুখ একটি নারী হৃদয় মাত্র। বললাম—তুমি কি করে এলে?

—সিঁড়ির দরজা খোলা আছে যে। লীলার অবোধ দুটো চোখে ভয় উঠে এসেছে। বললো—আপনার অসুখ করেছে?

লীলার বয়স হয়েছে, লীলা বিকৃত মস্তিষ্ক, এই অন্ধকার ঘর আমার কিছু মনে হল না। শুধু সারা মন বললো এই রোগ জীর্ণ শরীরে ঐ আমার একমাত্র আত্মজন। আমার মা আমার রমা আমার লীলা—সবাই এক। পাগলের মত কখন বলেছি—আমার বড় অসুখ লীলা, মাথার যন্ত্রণা।

মাথা টিপে দেব?

পাগলের কাছে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে সমর্পণ করতে আমার আর এতটুকু ভয় হল না। বললাম—দাও।

লীলার হাত আমার মাথার উপর দিয়ে বার বার ঘুরে চললো। বড় গভীর বড় পরিচিত সে স্পর্শ। একান্ত মমতায় কি অপরূপভাবে হাতখানা মাথার উপর দিয়ে কপালের দুটি পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্নেহ শীতল কিন্তু গভীর উদ্বেগে সংতাপিত সে স্পর্শ। কিন্তু এই স্পর্শ এই সেবাপরায়ণা মনোবৃত্তি কি শুধু শুধু হয়?

হঠাৎ সারা অন্তরাত্মা যেন খাপছাড়াভাবে বিদ্রোহ করে উঠলো। এ আমি কি করছি! মানুষের মনকে আঘাত দিয়ে দিয়ে জাগাতে চাইছি? এত বড় স্বার্থপর আমি কবে হলাম। নাকি আমারই ভুল হচ্ছে?

আমার ঘুম আর যন্ত্রণা ছুটে যেতে দেরি লাগলো না। আমি কখন খাটের উপর উঠে বসেছি। কারণ ছাড়া যখন কোন কাজ হয় না লীলার আসাও কি তেমন উদ্দেশ্য ছাড়া? তিক্ত গলায় কখন ডেকেছি—লীলা।

লীলা ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে এল। দুচোখে গভীর প্রসন্ন চাহনি।—আমায় বলছেন? ব্যথা সেরেছে?

—আচ্ছন্নের ঘোরে যে মাকে আমার মনে পড়েছিল লীলার চোখের দিকে তাকিয়ে আবার তাকেই মনে পড়ে গেল। নিজের বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়ে যে এত সুখ—আমি আগে কখনও জানি নি।

পরম আদরে ওকে কাছে টেনে নিলাম—লীলা এভাবে আর এস না। আসতে নেই। কোনদিনও নয়। কেমন?

লীলার চোখের আলো নিবে যেতে দেরি হল না। বললো—আমি যাব?

—হাঁ যাও।

পরের দিন সকালে হৈ চৈ শব্দে ঘুম ভাঙলো। শুনলাম পাগলী পালিয়েছে।

রমা থাকলে বলতো—পাগলের কাণ্ড।

কিন্তু আজ আমায় স্বীকার করতেই হচ্ছে—এর জন্য কে দায়ী?
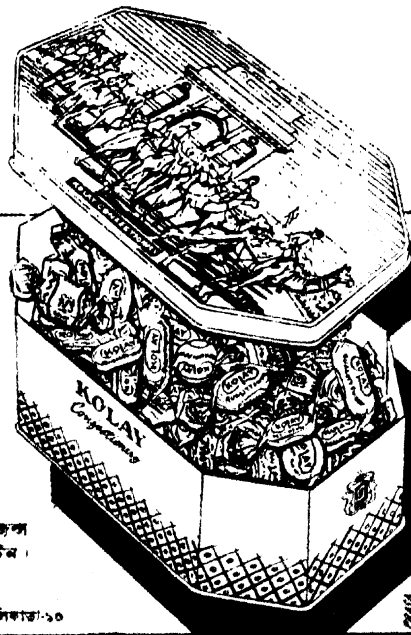
জেলেরা পা টিপে টিপে, পলো চেপে, মাছ ধরছিল।

আমি জানলার পাশে ইজিচেয়ারে বসে তমিস্রার কথা মন দিয়ে, সমগ্র মগজ দিয়ে, আমার শত সহস্র ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়ে ভাবছিলুম। অনেক ইঙ্গিত ইশারার সার্থকতা নিয়ে হিসেব করছিলুম, তমিস্রার মরুক যৌবন, ওর ঠোঁটের তিল, বুকের কাঁপুনি, চোখের বিষম উজ্জ্বলতা—সব কিছু মনের দু'হাতে নাড়াচাড়া করছিলুম। আমি একটা ভয়ংকর কিছু পরিণামই প্রত্যাশা করেছিলুম, কেন না আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিলুম, নিজের স্বাধীনতার চূড়ান্ত অবলুপ্তি ঘটিয়ে অস্তিত্বের বিনাশ সাধনে ধীরে, মৃদু পায়ে অগ্রসর হচ্ছিলুম।

ধীর, সতর্ক, নিঃশব্দ পা তুলে তুলে ওরা জল কেটে কেটে এগোচ্ছিল। ওদের কোমরে টর্চ বাঁধা, কারুর বাঁ হাতে কালি-পড়া ছোট লণ্ঠন। ডান হাতে বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী বড়ো ঢোঙার মত পলো। বর্ষায় পুকুর ভেসে মাঠে জল ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা মাছ ধরছে।

হঠাৎ আলোর ছোট বৃত্ত জলের ওপর স্থির হয় মুহূর্তের জন্য। ঝপ করে শব্দ ওঠে পলো চাপার। আমি চমকে চোখ তুলি। অপঠিত বই কোলের উপর আনত হয়। ওরা দু হাতে চেপে, ক্রমশঃ আরও চেপে, নরম কাদা মাটিতে পলো ঠিক মত বসিয়ে, মাছকে বন্দী করে। তারপর দুই হাঁটুতে পলো চেপে উপরের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বন্দী মাছের অনুসন্ধানে আটকানো স্বল্প জল হাতড়ে ফেরে। মুখে-চোখে কাদা, জল, ঝাঁঝি, পানা ছিটকে লাগে। ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা এখন সাধনায় নিমগ্ন।

আমি বলেছিলুম, তমিস্রা, তুমি কার?

ও কফি নেড়ে চামচটা কামড়েছিল এক সেকেন্ড। তারপর এ প্রান্ত থেকে চোখের সে প্রান্তে, অতল কালো বড়ো মণিকে নির্বাসিত করে, আদুরে মেয়ের মত বলেছিল, এটা আবার একটা প্রশ্ন বুঝি? আচ্ছা, উত্তর দিচ্ছি। আমি তার যে আমাকে বন্দী করে।

ওর রিনিরিনি মিষ্টি কণ্ঠে ও হেসে উঠেছিল। কেবিনের পর্দা সরে সে হাসি রেস্তোরাঁর অনেকের হৃদয়ে আমূল তীরের মত বিদ্ধ হয়েছিল। আমি নিমগ্ন প্রেমিকের মতই দু হাতে ওর মুখ অঞ্জলিতে কুসুম স্তবকের মত তুলে বলেছিলুম, তবু, আমার তমসা। তমিস্রারাণী, তুমি আলো আমার।

: আলো? ভালো করে ভেবে দেখবেন, আগুন। মানে, অগ্নি।

আমার প্রাণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। মনের মধ্যে আগুনে ঝলসানো ক্ষুর কে যেন কেটে কেটে বসাতো। এ সব প্রতীক শব্দ ওর অবচেতন মনের কাম্য অশুভ ভবিষ্যতের দ্যোতক। তুমি আগুনই বটে। কিন্তু আগুনকেও তো মানুষ বন্দী করেছে। আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে আমার ভালোবাসা দিয়ে বন্দী করব। আগুনকে বুকে বেঁধে, নিজে জ্বলে অপরকে আলো বিকিরণ করব।

আমি ক্রমশঃ নিমজ্জিত হতে হতে একটা কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলুম প্রাণপণ। আমি যে মুহূর্তে অনুভব করেছিলুম ওকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, সেই মুহূর্তেই জেনেছিলুম আমাকে কষ্ট পেতে হবে। যেন আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পেতুম। নিজেকে মনে করতুম অসীম জ্ঞানের বিশালাকৃতি জাহাজ।

বন্ধু শেখর বলেছিল, তুমি জ্ঞানের একটি ফুটো জাহাজ। একদিন তলিয়ে যাবে।

ওর পিঠ চাপড়ে হেসে বলতুম, মা হিংসী, হিংসা করিও না। আমি ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের রণ-জাহাজ তৈরী হচ্ছি।

: তা বটে। কিন্তু তলায় সাবমেরিণ নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছো। কখন টর্পেডোতে বিধ্বস্ত হও, নিজে জানো না।

: জাহাজ ডোবে, জ্ঞানের জাহাজ বন্দরে পৌঁছানো পর্যন্ত ঠিকই ভাসে।

এ আমার কোন অহমিকা নয়। আমি জানতুম, আমি জ্ঞানী। এই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিত মহাবিশ্ব, অনন্ত কাল থেকে প্রবাহিত ঋষি-দার্শনিক, কবি মনীষীর জ্ঞানের অপার সমুদ্র আমাকে অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে আশীর্বাদ করেছে। আমার জ্ঞানই আমাকে শিখিয়েছে, আমি জ্ঞানি। কিন্তু কি তুচ্ছতা। আমি যত জ্ঞানী হয়েছি ততবেশী দুঃখ পেয়েছি, ততবেশী অনুভব করতে পেরেছি, কি নিঃসীম অসহায় আর দুর্বল আমি। আমার যে জ্ঞানের নির্ভুল শক্তিতে প্রিয় পরিজন, বন্ধুবর্গ, মুগ্ধ, বিস্মিত, আমি জানি কত অসহায় শক্তিহীনতা তার কেন্দ্র বিন্দুতে—যে অঙ্গার জ্বলে, আলোকিত করে চতুর্দিক—তার কেন্দ্র-বিন্দু অনুজ্জ্বল, অন্ধকার। কেন না, সেই জ্ঞানের আলোতেই আমি আমার ভবিতব্য দেখতে পাই। অদূরের ভবিতব্য। যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হবে।

আমি জানতুম তমিস্রা আমাকে আঘাত দেবে। এ কিছু হস্তরেখা বিচার নয়, মোহান্তের ভবিষ্যৎ বাণীতেও বিশ্বাসী আমি নই। এ আমার অর্জিত জ্ঞানের সাধারণ উপপাদ্য মাত্র। তবু এত জানা সত্ত্বেও, আমার জ্ঞান আমাকে আমার হৃদয়ের ক্রন্দন থেকে রক্ষা করতে পারে না। ভালোবাসা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয় না, জ্ঞান সেখানে ভঙ্গুর রক্ষা কবচ। সক্রেটিসের সীমাহীন জ্ঞান কি তাঁকে বিষ পানে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল?

আমি সক্রেটিস নই। আমার জ্ঞানের সঙ্গে তার জ্ঞানের তুলনায় আভাষমাত্র দিতে চেয়েছি। এ যদি আমার অহংকার হয়, আমি নিরুপায়।

সমর্পিত প্রেমে সাড়া না পেয়ে একদিন অপমানিত সুজাতা ওর আগুনের মত রূপকে,

দাবানলের মত জ্বালিয়ে আমাকে বলেছিল, অহংকারী আপনি। নিদারুণ অহংকারী। কেন এত অহংকার আপনার?

আমার মন তখন নিমজ্জিত তমিস্রার প্রেমে। মুহ্যমান, মুগ্ধ, দুর্বল আমি স্থিতধী কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলুম, অহংকারই আমার অলংকার। আমি অহংকে জানি। তাই মনে হয় এত অহংকার।

সুজাতার উপর আমার রাগ ছিল না। ও আমার প্রেমে মুগ্ধ। কেমন করে ওকে আর আমি ভালোবাসি? যে ভালোবাসে,— নীরবে, হয়তো বা প্রসন্ন মনে, অন্তরে অন্তরেই, তার ভালোবাসা উপভোগ করা যায়, কিন্তু তাকে তো ভালোবাসা যায় না। কেন না, যে ভালোবাসে সে দুর্বল, মোহে দুর্বল, কুণ্ঠিত, আত্ম-অবমাননাকারী প্রার্থী মাত্র, সেই দুর্বল প্রার্থীকে কেউ কি ভালোবাসতে পারে? করুণা সম্ভব, মমতা সম্ভব, কিন্তু যে প্রার্থনা দ্বারা নিজেকে ছোট করে, তাকে সেই মুহূর্তে আমরা অনুকম্পা করি, ভালোবাসি না। হায় রে, ছলনাময়ী পৃথিবী, কি তোর নিগূঢ় নিয়ম।

আমি তাই বুঝেছিলুম, একই কালে প্রেমিক-প্রেমিকার দুটি হৃদয় পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে না। একে যখন ভালোবাসে, অপরে তখন আনন্দিত হয়, গৌরবান্বিত হয়, কিন্তু বিমুখ হয়।

তবে? তবে?? জেনে শুনেও তবে কেন আমি তমিস্রার প্রেমে নিমজ্জিত হলুম? তার উত্তরও কি আমার অজানা? প্রেম কোন সিদ্ধান্ত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক। হিসেব করে, সতর্ক থেকে, কে কবে প্রেমের তীব্র জ্বালা আর আনন্দের যুগপৎ আস্বাদনে উল্লসিত, দগ্ধ হতে পেরেছে? আমি যখন প্রেমিক, তখন আমি জ্ঞানের কবচকুণ্ডল হারিয়ে বসি। যখন জ্ঞানী, তখন অর্জুনের রথের সারথি, প্রেমিক না।

আঃ, আমি কি দুর্বল, আমি কি দুর্বল গো! আমার অহংকারের অলংকার এখন মুগ্ধতার তমিস্রায় মলিন।

সাপ! সাপ!

সাপে কেটেছে গো, সাপে কেটেছে।

একটি ছেলে পলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর বাঁ হাতের লণ্ঠন ছিটকে পড়ল জলে। শব্দ করে ফেটে গেল। তমিস্রা।

শেষদিন তমিস্রা আমাকে বলেছিল, আপনি ভতান্ত 'মীন মাইণ্ডেড। কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আপনার সঙ্গে।'

আমি বলেছিলুম, তোমাকে ভালোবেসে আমি সঙ্কীর্ণ হয়েছি।

ঃ কেন, কেন আপনি আমাকে ভালোবাসেন?

আমি ওকে ভালোবাসি, তাই ও আর আমাকে ভালোবাসতে পারছে না। এ কি তারই জ্বালা? কারণ, অস্বীকৃতিতেই তো যন্ত্রণা, স্বীকৃতিতে শান্তি, সমাহিত তৃপ্তি। ও শান্তি পাচ্ছে না, আমার প্রেমকে স্বীকার করতে না পেরে শান্তি পাচ্ছে না।

ঃ আপনি আমার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করবেন না।

—তমিস্রা শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল। পর মুহূর্তে অপ্রকাশ্য যন্ত্রণায় ওর দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। তমিস্রা কাঁদছে কেন?

ঃ কেন? দেখা করব না কেন? কারণ কি? বলো, খুলে বলো!

ঃ আমি আর একজনকে ভালোবাসি। আপনাকে নয়।

আঃ, ছলনাময়ী, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়ী পৃথিবী। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল, কত বড়ো সেই তোমার প্রেমিক? কত বড়ো? আমার চাইতেও সে বেশী জ্ঞানী? বেশী গুণী? বেশী কৃতী? না, বেশী রূপবান? হা রে, অজ্ঞান ভালোবাসার পাত্রী! জ্ঞানী হও, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কিন্তু জেনে কি লাভ? সবই তো হারিয়েছি আমি ওর চোখে, ওকেই ভালোবেসে, নিজেকে প্রার্থী বানিয়ে, ছোট করে।

তমিস্রার চোখের জল আমি মুছিয়ে দিলাম। তমিস্রা আমার হাত চেপে ধরে, আমার ঘাড়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কেন কাঁদছে ও? ওর আঙুলে এখনও আমার আংটিটা রয়েছে। আংটিটা খুলে ও আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে আমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান জানাল, তারপর চোখ মুখে, একটু হাসার করুণ চেষ্টা করে চলে গেল। রেস্তোরাঁর আলোটা সেই মুহূর্তে দপ করে ফিউজ হয়ে গেল। তমিস্রা। ঘন তমিস্রা। তুমি আমাকে এ কি অন্ধকারে ডুবিয়ে চলে গেলে?

কতগুলো লণ্ঠন, টর্চ কাছাকাছি জ্বলে উঠল। ওর চোখে-মুখে পড়ল। আঃ, সাপের বিষ! দেহ নীল হয়ে যাচ্ছে গো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখলাম। জানি, মৃত্যুঞ্জয় ওর নাম। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে এল ওকে শুকনো জমিতে। হাতের মুঠিতে সাপের ফণা ধরা, সাপের লেজ পেঁচিয়ে উঠেছে বাহু জুড়ে। কাপড় ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি সবাই বাঁধন দিল, বিষ উপরে মাথায় না ওঠে।

আমি বাঁধন দিলাম যুক্তি দিয়ে, প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার আমার যুক্তি আর জ্ঞান ফিরে এসে দৃঢ় হয়ে উঠছে। মাথায় বিকার না ওঠে। আমি যুক্তি আর জ্ঞানের প্রয়োগে সতর্ক হলাম।

তারপর মুগী কেটে কেটে ওর হাতের ক্ষতে চেপে চেপে বিষ নামান হল। ও ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

আমি চোখ তুলে মৃদু হাসলুম। যন্ত্রণাটা অনেক কমেছে। মৃত্যুঞ্জয় কখনো মরে?

দিন সাতেক পর মৃত্যুঞ্জয় যখন পলো হাতে আবার মাছ ধরতে এল, আমি তখন, এই প্রথম বাড়ির বাইরে যাব ভেবে রিস্টওয়াচটা বাঁধছি হাতে। প্রদীপের মত উজ্জ্বল, নম্র আমার কিশোরী বান্ধবী রুমার কাছে যাব, যদিও পরিণাম এবারও জানি, তবু প্রতিবারই শুধু ব্যর্থতার জ্বালাময় শঙ্খচূড়ই নয়—সফল প্রেমের উজ্জ্বল মাছও তো উঠতে পারে—জ্ঞানের অতিরিক্ত মানবিক আশায় এই বিশ্বাস তো নিরন্ত আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

তমিস্রা, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। কেন না, যতই আঘাত করো, মানুষকে ভালো না বেসে শেষ পর্যন্ত মানুষের উপায় নেই।
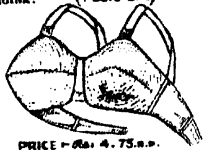
সৃষ্টির প্রথম যুগে পুরুষ চেয়েছিল তার প্রিয়াকে কেয়ূরে কঙ্কনে আরো কত-রূপে সাজাতে। সুরু হল নারীর বেশ বিন্যাসের পালা—আজো যা পুরোদমে চলেছে। অবশ্য যতদিন কবির কাব্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মানুষের সভ্যতা জীবিত থাকবে ততদিন নারীর রূপচর্চা বা বেশ-বিন্যাস থাকবেই। নারী বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্রতিভূ, তাই সে সাজতে ভালবাসে নানা আভরণে। কিন্তু এই পর্যন্ত এসে তাকে থামতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য যেখানে সুরুচিকে ছাড়িয়ে যায়, আড়ম্বর যেখানে বাহুল্যে পরিণত হয়, সেখানে তার রূপের শ্রী থাকে না।

বেশ-বিন্যাসের মধ্যে বাহুল্য বর্জন করাই সুরুচি। প্রসাধন বা বেশ-বিন্যাস যাই করুন আপনাকে মনে রাখতে হবে এর জন্য আপনি কতটা অর্থ ব্যয় করতে পারেন। সংসারের ছোট বড় হাজারো রকমের ব্যয় আছে যেগুলি অবশ্য-পালনীয়। ঘরের খরচ, খাওয়া, লেখাপড়া, চিকিৎসা, পরকে সাহায্য করা ইত্যাদি আছেই। পুরাকালে নারীর বেশ-বিন্যাসের খরচ এতটা ছিল না। তারা প্রাকৃতিক দ্রব্যের সাহায্যে রূপ-চর্চা করতেন। তাঁদের প্রয়োজনও যেমন অল্প ছিল তার আয়োজনও বাহুল্যবর্জিত ছিল। তাঁদের সরল জীবনযাত্রার মধ্যে বাহুল্যের প্রাধান্য ছিল না। না ভূষণে না বসনে। তাই তাঁরা দুহাত ভরে গরীব আত্মীয়-বন্ধুকে সাহায্য করেছেন। দেহে মনে তাঁদের দীনতা ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় আমাদের বেশ-বিন্যাসের ব্যয় অনেক বেড়েছে। আমি সাজ-সজ্জা করতে বারণ করি না, তবে রুচি ও সঙ্গতি অনুসারে ব্যয় করা উচিত। এখানে ব্যয় যেন বিশেষ ভার হয়ে না উঠে। ধনী ঘরের মেয়েদের অনুকরণ করার চেষ্টায় প্রায় দেখা যায় মধ্যবিত্ত ঘরের বৌটি স্বামীকে অস্থির করে তুলছেন, ঠিক ঐ রকম শাড়ী গয়না প্রভৃতি চাই। বেচারী স্বামী স্ত্রীর মন রাখবার জন্য কতই না চেষ্টা করেন, হয়তো বা এর জন্য বিপদেও পড়লেন। কিন্তু এই স্ত্রীর মনে রাখা উচিত শুধুমাত্র ফ্যাসান বজায় রাখবার জন্য অযথা ব্যয় করা উচিত কাজ কিনা? শুধু কাপড় গয়না দিয়ে নিজের মান বাড়ানো যায় বটে, তাতে যথার্থ রূপের প্রকাশ হয় না। সে শ্রীমতী 'শ্রী'ই তার একমাত্র রূপ। তার অশান্তি জর্জরিত দেহমনে 'শ্রী' থাকতে পারে না। শুধুমাত্র বাজারের কেনা প্রসাধনে সত্যিকার রূপ ফুটে উঠে না। এগুলি সাজের প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। আসল রূপ হলো কোমল দেহশ্রী। স্বাস্থ্যবতী মেয়ের মধ্যে Joy of Living মূর্ত হয়ে আছে। বহু ব্যয় করে কৃত্রিম জিনিস ব্যবহারের ফলে স্বাভাবিক বর্ণ মলিন হয়ে যায়। সুদীপ্ত ত্বকই হলো রূপের আধার। এর জন্য ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজন কী? আমাদের প্রাকৃতিক আব-হাওয়ার কথা মনে রেখে তেলে জলে দেহের কান্তি বজায় রাখতে হবে। দামী কোল্ড ক্রীমের বদলে ভাল মোম গোলাপ জলের সংগে

মিশিয়ে রোদে গরম করে নিয়ে মাখলে রং ক... হয়। দুধ-সর ময়দা, মসুরের ব্যাসন দি... মুখ পরিষ্কার করা যায়। লেবু, গ্লিসারি... শশার রস দিয়ে দেহ পরিষ্কার করা যায়... চন্দনের গুঁড়ো পাউডারের বদলে ব্যবহা... করলে চামড়া পরিষ্কার থাকে। আরো নান... ভাবে অল্প খরচে প্রসাধন করা চলে। ত... স্বাভাবিক লাবণ্যময়ী মেয়ে সাধারণ জামা-কাপ... পরলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুখানি বা... হাতে আর কানে দুটি দুল, সেই মেয়েটি... চমৎকার মানিয়েছে।

"...র পায়েতে তাই কে দিয়েছে চাঁদি—
...টি সোনার গাঁঠ কাঁকন দুখানি।"

তাই বলছি, সাজ-সজ্জা করতে প্রথমে চাই সুরুচি। অল্প দামের কাপড়-জামা প... লোকসমাজে যাওয়া যায় না—এই হীনতা ভ... রাখা ঠিক নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছদ অঙ্গে... সৌষ্ঠব বাড়িয়ে দেয়। কাপড় কেচে ইস্ত্রি ক... পরলে নিত্য নতুন কাপড় কেনার দরকার হ... না। অনেক মেয়ে আছে, দামী শাড়ী... আলনায় দু'চারদিন ফেলে রাখলেন। প্রা... নষ্টই হয়ে গেল। আবার নতুন একটা না হলে... বাইরে যাওয়া চলে না। তাছাড়া অনেকে কোথা... কি ধরণের শাড়ী জামা পরবেন তাই জানে... না। দামী শাড়ী পরে শোকসভাতে, দোকানে... বাজারে, দুপুর রোদে এখানে ওখানে গেলেন... অল্প দামী জিনিস বিশেষ করে তৈরী ও... ব্যবহারের ফলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে... গরমের দিনে সুতী শাড়ীই ভাল। বাড়ী... কাজে সুবিধা হয় সেমিজ ও শাড়ীতে। সন্ধ্যা... বেলা অপেক্ষাকৃত দামী পোষাক পরা চলে... রাত্রে শোবার জন্য শুধু একটি সেমিজ... ব্যবহার করা চলে এতে কাপড় ইত্যাদির খরচ... কম হয়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে যত হাল্কা... কাপড় পরা যায় ততই ভাল। বেশী উ... ... আমাদের ভালো লাগে না

কালো বা সাদা জুতো সব শাড়ীর সঙ্গে পরা চলে। প্রতিটি শাড়ী ব্লাউসের সঙ্গে মিলিয়ে জুতো কিনতে গিয়ে অযথা ব্যয় বাড়িয়ে লাভ কি?

'অলকে কুসুম' শুধু কবির চিত্তকেই জয় করে না। অনেক অকবিরও মন হরণ করে। মাথায় একগুচ্ছ ফুল বা একটি ফুল, গলায় একটি মাঝারি গোছের ফুলের মালা, হাতে দুটি ফুলের বালা পরে উৎসব বাড়ীতে গেলেন, গন্ধে ভরে রইলো আপনার দেহ—সৌরভময় হয়ে উঠলো আশপাশ।

গহনার বাহুল্য যত বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। এককালে সোনা ঘরে রাখার জন্য গয়না তৈরী করে রাখা হোত। প্রথম এইভাবে সোনা বা দামী রত্ন কিনে অনেকগুলো টাকা বন্ধ করা ঠিক নয়। ঐ টাকা ইচ্ছে করলে নানাভাবে খাটানো চলে। সেই টাকা মারা পড়বার ভয়ও নেই—সুদে আসলে সেই টাকা দিন দিন বেড়েই চলবে এ হলো অর্থনীতির কথা। জড়োয়া গয়না তৈরী করার অনেক খরচ কিন্তু বিক্রি করতে গেলে বিন্দুমাত্র দাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া গয়না বাড়ীতে রাখা নিরাপদও নয়। তাই হালকা দু'একটী গয়না পরাই যথেষ্ট। নানারকম পাথরের সুন্দর গয়না বা রুপোর গয়নাও পরা যায়। রুপোর শুভ্রতা ফুলের মত অতুলনীয়। মিনুকের বা নকসা করা গালার গয়না চমৎকার দেখতে। অনেকগুলি দামী ঝলমলে গয়না পরে শুধু পুতুল সেজে চুপচাপ বসে রইলেন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে—এতে অর্থের গরিমা থাকতে পারে কিন্তু আবার রুচির দীনতাও ধরা পড়ে।

পুরনো সিল্ক বা বেনারসী কাপড়ের ব্লাউজ কেটে ছোট থলে বা বটুয়া করে নেওয়া যায়। ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো সেলাই করে জুড়ে জুড়ে মানানসই করে বসিয়ে বেশ ব্যাগ তৈরী করা যায়। কাটিতে বোনা পুঁতির থলি সূচের কাজকরা বটুয়া হাতে থাকলে তার মাধুর্য অনেক বেশী নয় কি?

শীতকালে অনেক টাকা ব্যয় করে নিত্য নতুন ফ্যাসানের ওভার কোট প্রভৃতি তৈরী করে থাকেন অনেকে। দু'বছরেই ছোট হয়ে গেল কিম্বা ফ্যাসান বদলে গেল অর্থাৎ দামী পোষাক অচল হোল। কতটুকুই বা আমাদের শীতকাল। পোষাকের প্রয়োজন অল্পই। অযথা অত টাকা ব্যয় না করে অল্প দামের ভারতীয় শাল ব্যবহার করুন। সেই শালের ওপর অপূর্ব সূচীশিল্প থাকলে দেখতেও চমৎকার লাগে! ছাপা খদ্দরের শাল, মণিপুরী শাল, মটকা বা গরদের চাদর অনেক ভালো। এগুলি কখনো পুরনো হয় না।

প্রাচীনাদের চুল বাঁধায়, বসনে, ভূষণে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদে শিল্পের পরিচয় ছিল। সাঁওতাল মেয়ের রূপ যৌবন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেন কালো পাথরের জীবন্ত মূর্তি। মাথায় ফুল, হাতে গলায় পুঁতির গয়না, আঁটসাট কাপড় কোথাও ব্যয় বাহুল্য নেই কিন্তু কী সুন্দরী তারা! পশ্চিমদেশে বাহ্যিক প্রসাধন দিয়ে নিজেকে মনোহারিণী বেশে প্রকাশ করায় শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ শুধু অঙ্গ প্রসাধনে রূপের মর্যাদা বাড়ানোর চেয়ে বেশী নির্ভর করে অন্তরের সৌন্দর্য প্রসাধনে। চিত্ত-চরিত্রের সৌন্দর্য-প্রসাধন নারীকে বেশী মনোহারিণী করে। এবং তার প্রভাবও হয় সুদূরপ্রসারী। তাকে মনে রাখতে হবে তার সামনে উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্র। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা সমাজ গড়তে হবে। তার মনের অলঙ্কার দিয়ে নতুন করে দেশকে সাজাতে হবে। সে নিজে যেন বাহ্যিক অলঙ্কারের বোঝা না হয়। তাকে মনে রাখতে হবে শক্তির আধারে রূপ লাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুস্থ দেহ মনই সৌন্দর্যের আধার।

'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো।

তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।।'

দেবালয়ে প্রদীপ জ্বালতে ব্যয়ের বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি সব রকম বাহুল্য বর্জন করে দেবালয়ের প্রদীপের মত মানুষের দেহমন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।।

অর্ফিয়ুস

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু আছে বলে হায়
        জীবনে কি গান যাব ভুলে?
অর্ফিয়ুস, গান গাও তুমি।
        দক্ষিণের দ্বার খুলে'
বাসন্তিকা জাগে পুষ্পময়ী।
        শেষ আছে, ছেদ আছে,
বিচ্ছেদ বিরহ আছে,
        তবু জেনো আসে তারি পাছে
জীবদায়িনী প্রেম।
        সুরের তরঙ্গে পাল তুলে।

মৃত্যু আছে জানি,
        তবু জীবনে যাইনি গান ভুলে।।

মৃত্যুর মরমে পশি'
        প্রেম দেখে যাব ছিল পণ—
যে পণ হয়েছে পূর্ণ;
        দেখেছি মৃত্যুর কান্ত মনঃ
দেখেছি আলোর প্রেম
        ভীমকৃষ্ণ রাত্রির আঁধারে,
শুনেছি ব্যাকুল ছন্দে
        আর্ত কান্না আকাশের পারে,
দেখেছি অস্পষ্ট মেঘে
        প্রসারিত ব্যগ্র আলিঙ্গন।

মৃত্যু আছে জানি,
        জানি মৃত্যুরো অমৃতে আকিঞ্চন।।

সৌরজগতের বাইরে সভ্যতার বিকাশ কি সম্ভব?

(২৩০ পৃষ্ঠার পর)

ধরে নেওয়া যায় তাহলে বলা যায় যে, ছায়াপথে ১ কোটির মত গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

কল্পনা করা যাক সেই ভাবীকালের ছবি যখন মানুষ ১০০ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত নক্ষত্র দুনিয়ার উদ্দেশে মহাব্যোমযান পাঠাবে। ১০০ আলোক বৎসর দূরত্বের মধ্যে ১০ হাজার নক্ষত্র আছে এবং সেগুলিকে প্রদক্ষিণ করছে ১ লক্ষ গ্রহ। সেগুলির মধ্যে ৮।১০টিতে সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়।

সেই সব সভ্যতার সঙ্গে বার্তা বিনিময় করা কি সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব—তড়িচ্চৌম্বক প্রবাহের দ্বারা সম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রত্যেকটি সভ্যতা কোন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এই রকম বেতার প্রবাহ প্রেরণের যন্ত্র উদ্ভাবন করবে যার মান হবে ২১ সেণ্টিমিটার। ইতিমধ্যে সেইদিকে চেষ্টা চলেছে। আমেরিকার জাতীয় বেতার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মান-মন্দির ১১ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত সিটাস নক্ষত্রপুঞ্জ ও ইরিডেনাস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে নিশানা করে একটি বিরাট বেতার দূরবীন বসিয়েছেন সেই দুটি নক্ষত্রলোকের বুদ্ধিমান অধিবাসীরা যদি কোন বেতার সংকেত পাঠায় তা ধরবার জন্যে। অবশ্য সেই বার্তা এসে পৌঁছতেও ১১টি আলোকবৎসর লাগবে।

মানুষের হাতে গড়া প্রথম উপগ্রহ পার্থিব মহাকর্ষ জয় করে ১৯৫৭ সালে মহাবিশ্ব বিজয়ের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ গ্রহান্তরে যাত্রা করবে, এই আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয়। তারপরে আসবে সৌরলোকের ওপারে নিকটতম গ্রহগুলি জয় করার প্রশ্ন। কিন্তু সেখানেই কি অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি? প্রতিটি দশক, প্রতিটি শতক ও সহস্রক সঙ্গে নিয়ে আসবে নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন সাফল্য। সমগ্র মহাবিশ্ব, সমস্ত গ্রহতারা আবিষ্কার কোনদিনই মানুষ করতে পারবে না। ভাবীকালের মহাজাগতিক জাহাজের কর্ণধারদের মধ্যে এমন কলম্বাসের অভাব হবে না যাঁরা সগর্বে ঘোষণা করবেন নতুন জগৎ আবিষ্কারের কথা। কিন্তু এমন কোন মেগেলানের আবির্ভাব হবে না যিনি ঘোষণা করতে পারবেন যে, তিনি মহাবিশ্ব প্রদক্ষিণ করে এসেছেন, কারণ অসীম সেই মহাবিশ্ব।

মৃগতৃষ্ণিকা

গল্প

সাধনা দেবী

নালন্দা মহাবিহারের প্রধান সৌধ রত্নোদধির নয়তলা শিখর অস্তাভিমুখী সূর্যের রক্তাভায় ধীরে ধীরে ভাস্বর হয়ে উঠছিল।

রত্নোদধির সামনে মহাবোধি মন্দির। এ মন্দিরের সমতুল্য মন্দির সারা ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। মন্দির প্রাঙ্গণে চুয়ান্নটি সুবৃহৎ ও চুয়ান্নটি অপেক্ষাকৃত ছোটো মন্দির। মন্দির ঘিরে চারটি সত্র। তৃতীয় সত্রের সামনে বিল্ববৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়েছিল সন্ধিবিহারীক প্রভাকরপাদ। ঊর্ধ্বনেত্রে তন্ময় হয়ে প্রভাকর দেখছিল রত্নোদধির শ্বেতবরণ শীর্ষ কেমন করে আস্তে আস্তে রঙ্গীন হয়ে আসছে।

সহসা প্রভাকর সচকিত হয়ে উঠলো। সত্রের পশ্চিমে সংঘারামের সিংহদ্বার। সেখান থেকে একটা কি যেন গোলমালের আওয়াজ আসছে। কৌতূহলী হয়ে প্রভাকর এগিয়ে গেল। সিংহ-দ্বারের সামনে গিয়ে দেখলে দুজন প্রতিহারী এক আগন্তুকের সঙ্গে বচসা লাগিয়েছে। প্রভাকর জিজ্ঞাসা করলে, : কি হোলো তন্ত্রাসিং ?

তন্ত্রাসিং বিরক্তভাবে উত্তর দিলে, : সিংহ-দ্বার বন্ধ করবার সময় হয়ে গেছে কিন্তু কোত্থেকে এক উড়ো লোক এসে আবদার করছে ওকে এখন ঢুকতে দিতে হবে।

: আবদার আমি করিনি, দাবী জানাচ্ছি। গম্ভীর, ভরাট গলার আওয়াজে প্রভাকর চমকে তাকালো। সূর্যের আলো তখন অনেকখানি ম্লান হয়ে এসেছে তবু তার অস্পষ্ট দ্যুতিতে নজরে পড়লো নবাগতের ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মূর্তি। প্রভাকরও গলাটা গম্ভীর করবার চেষ্টা করলে।

: আপনার দাবী এখন গ্রাহ্য হতে পারে না কারণ সূর্যাস্তের সময়ে সিংহদ্বার বন্ধ হওয়ার নিয়ম। প্রাচীরের বাইরে ধর্মশালা আছে। আপনাদের মতো বহিরাগত অতিথিদের সেখানেই রাত্রি যাপন করবার ব্যবস্থাও আছে।

: বহিরাগত অতিথি ? যাদের গৃহে ঢুকতেই দেওয়া হোলো না তাদেরও অতিথি নাম দেওয়া হয় নাকি ? আপনাদের মহাবিহারে 'অতিথি' শব্দের ব্যাখ্যা দেখছি অন্য রকম।

আগন্তুক হেসে উঠলো। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভারে ওর দৃঢ় সম্বিবদ্ধ ওষ্ঠের দুকোণ বেঁকে পড়লো।

: যাকগে। দাবী আমি এখনো জানাচ্ছি কারণ সূর্যাস্তের আগেই আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।

তিক্তস্বরে প্রভাকর জিজ্ঞাসা করলে, : কোথা থেকে এসে পৌঁছলেন ?

: কাশ্মীর থেকে। দেশেতে শুনেছিলাম নালন্দায় সন্ধ্যার পর ঢোকা নিষিদ্ধ। সেজন্যেই অনেক দূরের পথ থেকে বহু আয়াসে সূর্যাস্তের মধ্যেই এসে পড়তে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেশে থাকতে আর একটা কথা শুনিনি। সূর্যাস্তের আগেও এখানে ঢোকা নিষিদ্ধ যদি না দ্বারীর মর্জিকে খুশী করা যায়।

আগন্তুক উৎকোচের ইঙ্গিত করাতে তন্ত্রাসিং আর প্রভাকর দুজনেরই মুখ ভ্রূকুটি-ভয়াল হয়ে উঠলো। চিবিয়ে চিবিয়ে প্রভাকর বললে, : আপনাদের পাহাড়ী প্যাঁচোয়া দেশে যে মর্জি খুশী করা নীতি খাটে এখানকার সরল সমতল দেশে সে নীতি অচল। যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে আর নয়। আপনার ইচ্ছে হলে স্থবিরের সঙ্গে কাল সকালে দেখা করতে পারেন। তন্ত্রা-সিং দ্বার বন্ধ করো।

প্রভাকরের নির্দেশের আগেই তন্ত্রাসিং বিরাট কপাটের অর্গল প্রান্তের জিঞ্জীর তুলতে সুরু করেছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিলে আগন্তুক। জিঞ্জীরের আরেকপ্রান্ত মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেও আকর্ষণ করলে। বহুদিন-ব্যাপী সুদীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ তবুও কি আসুরিক শক্তিমান। স্তম্ভিত প্রভাকর তাকিয়ে রইলো এক দৃষ্টে। বজ্রনির্ঘোষে আগন্তুক চীৎকার করে উঠলো, : সামান্য একটা কপাটের বাধা আমাকে দমন করতে পারবে না। আজ আমি বিহারে প্রবেশ করবোই।

সেই প্রচন্ড ঘোষণা সিংহদ্বার পেরিয়ে মঠ, চৈত্য, মহাকক্ষের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে রণিত হ লাগলো।

নিম্বচৈত্যের দ্বিতলের গবাক্ষে একখা সুকুমার মুখ উঁকি মারলে। ক্ষণকাল প পাথরের সিঁড়ি বেয়ে খট্ খট্ খট্ কাষ্ঠ পাদু সুউচ্চ ধ্বনি শোনা গেল। প্রভাকর সচ হয়ে উঠলো।

খট্ খট্ খট্ খট্। পদ্মক্ষোদিত প্রস্ত মার্গ ধ্বনিত করে এক মুন্ডিতমস্তক দীর্ঘদেহ আবির্ভূত হলেন। তখনো তন্ত্রাসিংয়ের সং আগন্তুকের জিঞ্জীর নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে প্রভাকর সসম্ভ্রমে জানু অবনত করলে আচার্যকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি শিকল ছে তন্ত্রাসিং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে।

: কি ব্যাপার এখানে ? আচার্য সংগব স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

আগন্তুক এগিয়ে এলো। ডান হাত দি কপালের স্বেদকণা মুছে ফেললো। তারপ ঈষৎ নত হয়ে বিনীত কণ্ঠে বললে, : আ আজ মহাবিহারে প্রবেশের অনুমতি চাইছি বহু ধৈর্য ধরে বহু পরিশ্রম করে এসে যদি পৌঁছলাম তো জ্ঞানতীর্থের প্রবেশ দ্বা আটকে পড়ে থাকবো ?

কোথা থেকে আসছো তুমি ? আচার্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষ করলেন।

কাশ্মীর থেকে।

তোমার পরিচয় ?

কাশ্মীর যুবরাজের সহচর রত্নবজ্র।

অভিজ্ঞান।

আজ্ঞে হ্যাঁ। রত্নবজ্র ব্যস্তভাবে উষ্ণীষ খুলতে গেল। আচার্য হাত তুলে নিরস্ত করলেন।

থাক্। দ্বারপালকে দেখাবে। আচার্যের পিছনে এতক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল দন্ডী সহচর। তাকে উদ্দেশ করে আচার্য বললেন : নয়নপাল—ওকে মহাকক্ষের পথ দেখিয়ে দাও।

কি যেন একটা চিন্তা করে আচার্য রত্নবজ্রের

দিকে তাকালেন, ঃ তোমার নিষ্ঠা দেখে প্রীত হয়েছি। পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি—আজ বিশ্রাম করো। তন্ত্রাসিং, এবার দ্বার বন্ধ করো।

খট্ খট্ খট্ খট্ .... খড়মের সুউচ্চ ধ্বনি তুলে আচার্য সংগবন্ধু যে পথে এসেছিলেন সে পথে ফিরে চললেন। তন্ত্রাসিং মুখ ফিরিয়ে দ্বার বন্ধ করার কাজে হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রত্নবজ্র অবহেলাভরে একবার প্রভাকরের দিকে তাকালো তারপর নয়নপালকে বললে ঃ চলো কোথায় নিয়ে যাবে।

প্রভাকর পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আচার্য ও দিকে একবার তাকালেন না অবধি...... কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় অভিমানে ওর দুচোখের পাতা ভারী হয়ে উঠলো। আট বছর ওর এই বিহারে কাটলো—শ্রমণ থেকে উপসম্পন্ন হয়েছে তবু এখনো অভিমানটুকু কাটলো না।

সারাটা সন্ধ্যা প্রভাকর অন্যমনস্ক হয়ে রইলো—মহাভণ্গ অধ্যয়নকালে 'দশশিক্ষাপদানি' আবৃত্তি করতে তিনবার ভুল করলে। অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। তারপর সত্রে গিয়ে নামমাত্র আহার করলে। হরিতকীর কুচি মুখে দিয়ে অন্ধকারে রত্নরঞ্জক সৌধের পিছনে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারী করে কাটালো। মুখশুদ্ধিটুকু চর্বিত হয়ে গেলে মুখ প্রক্ষালন করে নিজের কুঠুরীতে শুতে এলো। জলঘাড়িতে তখন রাত্রির প্রথম যাম ঘোষিত হচ্ছে।

কুঠুরীতে ঢুকে দেখলে কুলুঙ্গীতে দীপ জ্বলছে। নিশ্চয়ই বন্ধু বসু দত্ত জ্বেলে রেখে গেছে। কিন্তু না যায় নি তো, পাথরের বেদীর ওপরে শুয়ে আছে। বেদীর কাছে এসে প্রভাকর প্রশ্ন করলে, ঃ তুমি ধর্মালোচনা করতে যাওনি যে?

শায়িত ব্যক্তি উঠে বসলো। ঈষৎ হেসে বললো, ঃ ধর্মালোচনা কোনোদিন করেছি নাকি যে নিজের থেকে করতে যাবো!

একি? এযে সেই ভরাট গম্ভীর গলা।

প্রভাকর কুলুঙ্গীর কাছে সরে এসে দীপের শিখা উজ্জ্বল করে দিলে। তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, না ভুল হয়নি তারই শয্যায় বসে হাসছে রত্নবজ্র।

প্রভাকরের দু চোখ আবার টস্ টস্ করে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শীতল গলায় বললে, ঃ তুমি এখানে এসেছ কেন?

ঃ বাঃ আসবো না? অতিথিকে তোমরা এই-রকম মিষ্টি কথায় অভ্যর্থনা করো নাকি? এর চেয়ে দেখছি আমাদের পাথুরে দেশ অনেক ভালো।

প্রভাকর কোনো উত্তর দিলে না। মুখ ফিরিয়েই দ্বিতীয় বেদীটির ওপরে বসলো। বসে পুঁথির কুলুঙ্গী থেকে কয়েকটি পুঁথি নামালো।

রত্নবজ্র আড়ামোড়া ভাঙলো। উঃ কি কাণ্ড-কারখানা তোমাদের। নালন্দার বিরাট ব্যাপার চিরকালই শুনে আসছি কিন্তু এত যে বিরাট তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। আমাদের পাহাড় কেটে তৈরী দেশ—এক একখানা বাড়িতে বড়ো জোর তিনখানা ঘর। আর এটা তো একটা যোজনব্যাপী শহর বলতে গেলে—এর ভেতরে কত যে বাড়ি, কত যে ঘরদোর তার আর লেখা-জোখা নেই। দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম কোথায় যে তোমাকে খুঁজে পাই।

ঃ আমাকে খুঁজছো কেন? পুঁথি থেকে চোখ না তুলেই প্রভাকর প্রশ্ন করলে।

ঃ সে কি খুঁজবো না? দেখছো এখানে কাউকে চিনি না, জানি না, কি মুস্কিলে পড়েছি, একটা কথা বলার লোক নেই। একমাত্র তোমার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। নালন্দায় প্রথম ঢুকেই তোমার মুখ দেখেছি। তাও আবার নাম জানি না, শুধু মুখ চেনা। ভাগ্যিস তোমার এক বন্ধু নিজের থেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে খুঁজছো?' আমি তোমার চেহারার বর্ণনা দিতে আমাকে এই ঘরে এনে রেখে গেল। তোমার বন্ধু হলে কি হয় বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা ছেলেটির, তোমার মত এত তেঁতো গুলে খায়নি।

প্রভাকর এবার মুখ নীচু করেই হেসে ফেললে। ওর মনের মেঘ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। রত্নবজ্র উঠে এলো—দুহাতে প্রভাকরের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলে, ঃ কি বন্ধু, এখনো হাসবে না?

ঃ কাঁধের হাড়গুলো ভেঙে দিলে মানুষ আর হাসবে কি করে?

ঃ ওঃ তাই নাকি? লাগলো? —নিমেষে রত্নবজ্র অনুতপ্ত হয়ে উঠলো। সত্যি আমার এই চোয়াড়েপনায়........ এসো একটু ডলাইমলাই করে দিই।

ঃ থাক্, আমি তোমার পোষা ঘোড়া নই!

এর পর আর ভাব হতে দেরী হোলো না।

কিছুদিন কাটলে প্রভাকর বুঝতে পারলে রত্নবজ্রকে যতটা অদ্ভুত প্রকৃতি ও গোড়ায় ভেবেছিল [illegible] ততটা আসলে [illegible] সুগঠিত, শক্তিমান দেহের ভেতরে [illegible] একটি সরল জিজ্ঞাসু শিশু আত্মগোপন [illegible] আছে—কথায় কথায় উঁকি মেরে বাইরের [illegible] বিশ্বসংসারের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সব কিছু ওর জানা চাই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিটি অবধি। ওর প্রশ্নের [illegible] প্রভাকর মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করে। 'সামনের' আর প্রব্রজিতের মধ্যে তফাৎ কি, উপসম্পন্ন হবার কত বছর পরে অর্হৎ লাভ করা যায়, উপসম্পদা লাভের পর ভিক্ষু হতে কেন এতদিন লাগে, সংঘারামে ক'টি কক্ষ, সত্রে কি চাল রান্না করে, পূর্ব দ্বারপণ্ডিতের পদ বর্তমানে শূন্য কেন—সব কিছু ওর এক-নিঃশ্বাসে জানা চাই। দেহে যতটা শক্তি সে তুলনায় মস্তিষ্ক কিছুটা স্থূল। আর গৌড়ীয় পণ্ডিতের ছেলে প্রভাকর—ক্ষীণ দেহ সত্ত্বেও তার ধী ক্ষুরধার। অন্য সব সন্ধিবিহারীকেরা এই অসম বন্ধুত্ব নিয়ে তামাসা সুরু করে দিলে।

সেদিনও এমনি প্রশ্নোত্তরমালা চলছিল কুটুরীতে বসে। প্রভাকরের কুটুরীতে হর-গোবিন ছিল আগে—সে জ্ঞানমিত্রের অনুসঙ্গী হয়ে তিব্বতে যাওয়ার পর থেকে তার স্থান খালিই পড়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক আচার্য পদ্ম-রক্ষিতের অনুমতি নিয়ে রত্নবজ্র সে শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে। শোবার আগে পাশাপাশি কুশকচীনর শয্যায় বসে রত্নবজ্র তর্ক করছিল আদি নিরীশ্বর হীনযান বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বুদ্ধপূজা
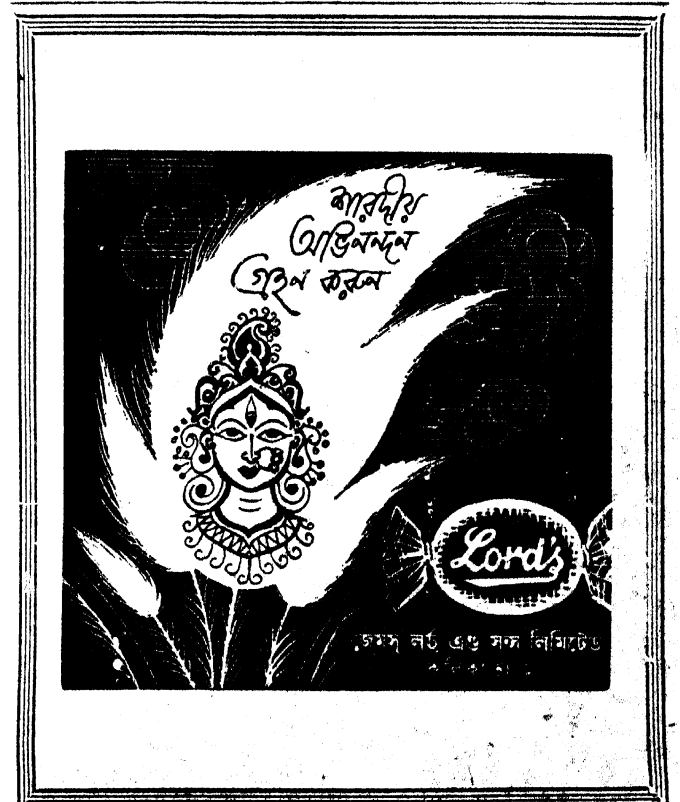
সর্বদিকের মধ্যেও সৌন্দর্য কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ। কেন ওকে 'হীন' এবং একে 'মহা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রভাকর গম্ভীরভাবে এক কথায় উত্তর দিলে,

: সে তুমি বুঝবে না।

: বুঝবো না? বেশ। কিন্তু এটা তো বুঝবো। সিংহদ্বারের দুপাশে দুটি স্তম্ভে কেন দুটি মানুষের মূর্তি খোদা আছে?

: তার কারণ ও'রাই নালন্দার ঐতিহ্য রক্ষা করছেন। ও'দের মূর্তি আমাদের প্রেরণা দেয়।

: ও'রা কারা?

: একজন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আরেকজন নাগার্জুন এখানকার প্রথম অধ্যক্ষ। তুমি চিনতে পারলে না?

: যা মূর্তি বানিয়েছে আর চেনবার উপায় রাখে নি। আচ্ছা, নালন্দা তো সারিপুত্তের জন্মস্থান, সারিপুত্তের প্রতিকৃতি ওখানে নেই কেন?

: সারিপুত্তের প্রতিকৃতি রত্নকক্ষে রাখা আছে।

: সংঘারামের দক্ষিণে নিম্বচৈত্যের কুড়ো লাগে রাখে যে সচল মূর্তিটি নজরে পড়ে সেটি কার?

প্রভাকর একটু বিব্রত হয়ে পড়লো প্রশ্ন শুনে চট্ করে উত্তর দিতে পারলে না। আশ্চর্য, রত্নবজ্রের মতো লোকও ও'কে লক্ষ্য করেছে? একটু ভেবে নিয়ে প্রভাকর বললে, : ও মূর্তিটি আচার্য জেতারির একমাত্র কন্যা চিত্রশ্রীর।

: হুঁ। আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, মহিলা এখানে রয়েছেন কেন? ভিক্ষুণীদের সংঘারাম আমি আগেই দেখে এসেছি—সে তো আলাদা।

: উনি বিক্রমশীলা বিহারে ভিক্ষুণীদের বর্ষাবাসেই থাকেন। সম্প্রতি ও'র পিতা আমাদের উপাধ্যক্ষ অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার সেবা করার জন্যেই উনি নিজ বর্ষাবাস ছেড়ে পিতার আবাসে এসেছেন। আজ থেকে ঠিক দু'মাস চারদিন আগে। আচার্য জেতারি অনেকটা সুস্থ হয়েছেন হয়তো উনি শীঘ্রই চলে যাবেন।

: এত কথা তুমি কেমন করে জানলে?

রত্নবজ্র কুঞ্চিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকালো।

: প্রতিটি সন্ধিবিহারীকই একথা জানে।

রত্নবজ্র অন্য কথা পাড়লে।

: আমাদের যুবরাজের কৈশোরের কয়েক বছর পাটলিপুত্রে কেটেছিল। যুবরাজের মা, আমাদের রাণীমা সুযাত্রা দেবীও শৈশবে পাটলিপুত্রে লালিতপালিত হয়েছিলেন। সেই জন্যে ও'দের একটা স্বাভাবিক টান আছে পাটলিপুত্রের প্রতি। সেই সময়েই যুবরাজ রাজা পাটলিপুত্র আলো করা এক কন্যাকে দেখেছিলেন। সে ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ কর্মদানের কন্যা। মাতুলালয় বড়গ্রামে মেয়েটি তখন পালিত হচ্ছিল—

: নিশ্চয়ই চিত্রশ্রী—উৎসাহিত হয়ে প্রভাকর মুখের কথা কেড়ে নিলে।

: এমন আলো করা মেয়ে আর দুটি আছে নাকি? তাছাড়া ও'র পিতা আচার্য জেতারিই তো নালন্দার বর্তমান উপাধ্যক্ষ কর্মদান।

: প্রধান অধ্যক্ষ আচার্য বুদ্ধ জ্ঞানপাদের কোনো কন্যা এখানে থাকেন না?

: না। প্রধান অধ্যক্ষ চিরকুমার। বিবাহিত ব্যক্তি প্রধান অধ্যক্ষ হতে পারেন না।

: আচ্ছা, এই তোমাদের মতো চপলমতি আটশো সন্ধিবিহারীকের সামনে অমন একটি মূর্তি আচার্য খাড়া করে রাখলেন কেন?

: যাঃ, কি যে বলো! প্রভাকর জিভ কেটে দুহাত কপালে ঠেকালে নমস্কারের ভঙ্গীতে।

: উনি আমাদের সকলেরই নমস্যা। গুরুকন্যা। তবে কি জানো.........প্রভাকর একটু সলজ্জ হেসে ফেললে : প্রতিদিন আমি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়ে দেখি পাটসৌধগুলির শুভ্র চূড়া কেমন ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে আসে। মনে মনে ভাবি অমনি করেই ঐ শ্বেত-বসনার চিত্তে মনোবাসনার রং লাগে না কেন?

: চমৎকার। একবার ও'কে ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করছে।

প্রভাকর একটু চিন্তা করলে। একে বিদেশী তায় নবাগত, ওকে কি দেখানো ঠিক হবে? কিন্তু রত্নবজ্রের মতো সরল শিশু...... মনস্থির করে প্রভাকর বললে : তা বেশ তো। চলো কাল ভোরেই চন্দ্রোশ পুষ্করিণীর ধারে তোমাকে নিয়ে যাই। ওখানে উনি প্রায়ই নীলপদ্ম তুলতে আসেন পূজার জন্যে। দেখা হতে পারে।

দেখা হোলো। প্রত্যূষের আধো আলো আধো ছায়ায় সদ্যস্নাতা আলুলায়িতা কুন্তলার একাগ্রচিত্তে মার্তণ্ড প্রণতারূপের দিকে রত্নবজ্র একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। প্রভাকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো—রত্নবজ্র কি জানে না যে মেয়েদের সঙ্গে শোভন আচরণ করতে হয়? প্রণাম সেরে ভিক্ষুণী চোখ মেললেন—শান্ত সুস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে রত্নবজ্রের ব্যগ্র আশিলষ্ট দৃষ্টির বিনিময় ঘটলো। মনে হোলো এক মুহূর্তের জন্যে ভিক্ষুণী থমকে দাঁড়ালেন কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যেই। তারপরেই দৃঢ় সংযত পদক্ষেপে আচার্যের বাসগৃহ অভিমুখে চলতে আরম্ভ করলেন।

রত্নবজ্রের সুগৌর মুখশ্রী হতাশায় কালো হয়ে উঠলো। প্রভাকর ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল—এত হতাশ হবার কি আছে? রত্নবজ্র কি আশা করেছিল ওর সুন্দর চেহারা দেখে ভিক্ষুণীর ব্রহ্মচর্য তখনি গলে পড়বে—খুশী হয়ে গদ গদ কণ্ঠে আলাপ সুরু করে দেবেন?

বিরক্ত কণ্ঠে ও বললে : ভায়া হে বড্ড বেশী তড়বড় করছো একদিনেই! দেখছ না বড়ো শক্ত ঘাঁটি।

ভিক্ষুণীর গমনপথে নিবদ্ধ দৃষ্টি রত্নবজ্র মুখ না ফিরিয়েই অন্যমনস্কভাবে বললে : জানি সে কথা।

যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হলো চিত্রশ্রী ফিরে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে দুপা এগিয়েও এলেন। তারপর যেন বহুদূরে হতে, কোন্ সমুদ্রের ওপার থেকে এক সুরেলা ক্লান্ত স্বর ভেসে এলো।

: রত্নবজ্র!

: দেবী—আদেশ করুন।

: রত্নবজ্র তোমাকে মিনতি করছি তুমি আর আমার পথে এসে দাঁড়িও না।

: আমি তো তোমাকে কোনোদিন বিরক্ত করিনি চিত্রা।

: না করোনি—সে কথা ঠিক......কিন্তু তুমি আর এসো না এমনি করে।

গার্হস্থ্যাশ্রমের সমস্ত সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার চুকে গেছে—স্বামীত্বের দাবী আর তোমার নেই।

: আমি তা জানি চিত্রা। কিন্তু—

: আর কোনো কিন্তু নেই। ভগবান তথাগতের আগামী জন্মদিনে আমি শ্রাবস্তী-শৃঙ্গেরী তীর্থ করতে যাচ্ছি। লোকালয়ে আর কোনোদিন ফিরবো না। কাজেই আর আমার দেখা পাবে না। ভগবান বুদ্ধ তোমায় মঙ্গল করুন।

চিত্রশ্রীর শিখাতনু ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল প্রাচীরের গর্ভে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রত্নবজ্র এদিকে ফিরলে। প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে একটু স্তিমিত হাসলে। সে হাসিতে কি যে ছিল আর কি যে ছিল না তা বলা কঠিন।

: তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না বন্ধু? ভাবছ এ আবার কি নাটক। সেদিন তোমাকে বলেছিলাম না কাশ্মীর যুবরাজ পাটলিপুত্রে এক আলোকরা কন্যা দেখেছিলেন? তার পরের ইতিহাসটুকু আর বলা হয়নি। সেই কন্যার জ্যেষ্ঠ মাতুল উদ্যোগ করে রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেন। সে এই হতভাগ্য।

চিত্রশ্রী তখন মাতুলালয় বড়গ্রামে পালিত হচ্ছিল। শিশুকালে ও মাতৃহারা হয়েছিল—তাই। কিন্তু দরিদ্র পরিবার রাজকীয় উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে অধিবাস পাঠাতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হোলো না যদিও চিত্রার জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি যদি প্রথমেই দবীয় অক্ষমতা স্বীকার করতেন তাহলে হয়তো ঘটনার গতি ফিরতো। কিন্তু তেজস্বিনী রাণী সুযাত্রা দেবী সেই অপরাধে পুত্রবধূকে ত্যাগ করে কাশ্মীর ফিরে গেলেন। আর সেই থেকে চিত্রশ্রী ভিক্ষুণী।

সেবার বড়গ্রামে দেখা করেছিলাম তখন ও সবে দীক্ষিতা হয়েছে। নিঃশব্দেই ফিরে গিয়েছিলাম—বাধা দিইনি। অনেক আশা করে, অনেক কষ্ট স্বীকার করে এবার নালন্দায় এলাম, সন্ন্যাসাশ্রম কিছুদিন পালন করেছে এবার বোধ হয় আমি পারবো ওকে সংসারাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

রত্নবজ্রের অন্তর মথিত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

: আর আমার এখানে থাকার প্রয়োজন ফুরোলো, আমার চিত্রাকে শেষ দেখা দেখে গেলাম।

তোমাকে অনেক বিরক্ত করেছি প্রভাকর—খুঁটিনাটি হাজার কথা জিজ্ঞাসা করেছি বার-বার—আমার শুধু জানবার ছিল কিসে চিত্রা এমন করে আকৃষ্ট হোলো—জীবন যৌবন, সর্বস্ব ও নালন্দাকে সমর্পণ করলে কেন?

কেন? ?

দুহাতে মুখ ঢেকে কাশ্মীর যুবরাজ পথের ধূলোর ওপরেই বসে পড়লো। যে পথ একটু আগে ভিক্ষুণীর কমলকোরকের মতো পায়ের ছোঁয়ায় ধন্য হয়ে উঠেছিল।

তখন সূর্য উঠছে।

ছায়াছবির স্মৃতি / শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগেকার কথা...

বনজঙ্গল কাটতে কাটতে তখন রাসবিহারী এভিনিউ গড়িয়াহাটের দিকে এগিয়ে চলেছে...

গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকে তখনো শেয়াল ডাকা নিশুতি অন্ধকারে ঘন-ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কেরাসিন-ডিবির আলোয় সন্ধ্যা নেমে আসতো...

সেই কেরাসিন-ডিবির আলো লক্ষ্য করে তিনটি তরুণ যুবা রোজ এই অঞ্চলে বেড়াতে আসতো...তিনবন্ধু...তিনজনেই সাহিত্য যশ-প্রার্থী...

শহর এগিয়ে আসছে...ভীত পরাজিত অরণ্য-পশুর মত গ্রাম সরে সরে যাচ্ছে...সেই পরিবেশ তাদের ভাল লাগতো...তাদের উদ্দাম কল্পনার ইন্ধন জোগাতো...সেই তিন বন্ধুর একজন হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আর একজন হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তৃতীয়জন, এই স্মৃতি-কাহিনীর লেখক...

শেষের দুজন যতই সাহিত্যের কথা তোলে, প্রথমজন ততই সে-কথা এড়িয়ে সিনেমার কথা তোলে...অথচ সাহিত্যে তখন সাতাকারের কিছু দাবী জন্মেছে প্রথমজনেরই...

শৈলজার কয়লা-কুঠির গল্প বাংলা-সাহিত্যের প্রচলিত ছোট গল্পের ধারাকে পেরিয়ে নিঃসন্দেহে এক নতুন ধারার শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে... সাধারণ পাঠকের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে ...প্রেমেনের খ্যাতি তখনো শুধু বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ...

তাই খ্যাতির সংসারে রোজগারী অগ্রজ হিসাবে শৈলজাকে আমি আর প্রেমেন খানিকটা খোসামোদ করেই চলতাম...

এই খোসামোদ করার একটা উদ্দেশ্য ছিল...

শৈলজার একটি বিশেষ গুণ ছিল...যদি তার দিকে যাবার ইচ্ছে হতো শৈলজা আমাদের বলতো, চল্ বাঁদিকটা একটু ঘুরে দেখি...

ছেলেবেলা থেকে সে তার দাদামশায়ের কাছে মানুষ হয়েছে...দাদামশাই ছিলেন সে যুগের একজন ধুরন্ধর জমিদারী-ম্যানেজার...মন্ত্র-গুপ্তি ছিল তাঁদের আদর্শ...

দাদামশায়ের কাছ থেকে শৈলজা এই মন্ত্র-গুপ্তির আদর্শ পেয়েছিল...অনেক চেষ্টা করে তার মনের কথা জানা যেতো...

তাই আমরা দুজনে খোসামোদে অসতর্ক করে তার মনের কথা পয়লা চোটেই জানতে চেষ্টা করতাম...

শৈলজাকে নিয়ে এই ছিল আমাদের খেলা...

এইভাবে যখন সে মনের গোপন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতো, তখন দুদিক থেকে আমরা দুজনে তাকে আক্রমণ করতাম...

আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সে হার স্বীকার করতো...কিন্তু তার এই হার স্বীকার করাটাও ছিল তার রণ-কৌশল...আমাদের দুজনকে এই-ভাবে অসতর্ক করে দিয়ে সে ঠিক তার ঈপ্সিত দিকেই আমাদের টেনে নিয়ে যেতো...এইভাবে তার কাছেই বার বার আমরা দুজনে হেরেছি...

একথা এত বিশদ করে এখানে বলছি এই জন্যে যে, আমাদের সমস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই প্রথম আমাদের দুজনকে সিনেমামুখী করে তোলে...

সিনেমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবে, একথা তখন আমি বা প্রেমেন, কেউই ভাবতাম না...কিন্তু শৈলজা মনে মনে সেইদিন থেকে স্বপ্ন দেখতো, কি করে সিনেমার রাজ্যে ঢোকা যায়...কিন্তু সে কথা আমাদের সামনে প্রথম প্রথম মুখে প্রকাশ করতো না...

আশ্চর্যের কথা, আমরা তিনজনেই পর পর একই দরজা দিয়ে সিনেমা-মহলে ঢুকেছি...

(২)

হঠাৎ একদিন বিকেলের এই নিরুদ্দেশ-ভ্রমণের সময় শৈলজা বল্লো, একটা সাপ্তাহিক কাগজ বার করবো...প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছি...

আমরা দুজনেই খুশী হয়ে উঠলাম...আত্ম-প্রকাশের জন্যে তখন মন ছটফট করছে...নিজেদের কাগজ থাকলে প্রাণ খুলে লেখা যায়...

সেদিন ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিন...বাংলা

শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর "নবদিগন্ত" চিত্রের একটি দৃশ্য। শিল্পী: বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা: অগ্রদূত। কাহিনী: বিশ্বনাথ রায়।

দেশে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে যুগের সাপ্তাহিক কাগজ জনমত গঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে...

প্রেমেন আর আমি এই রকম একখানা সাপ্তাহিক কাগজের কথাই ভাবছিলাম...প্রত্যক্ষ রাজনীতি তাতে থাকবে না কিন্তু তাতে থাকবে প্রাণবন্ত সাহিত্যের ইন্ধন...

তাই শৈলজার কথায় খুশী হয়ে উঠলাম...

রাত্তিরে ফিরে কাগজে কি কি ফীচার থাকবে তার একটা খসড়া তৈরী করলাম...

শৈলজা শুধু বল্লো, সিনেমা সম্বন্ধে একটু আধটু আলোচনা থাকবে না?

বল্লুম, সে-টা তুই লিখবি!

মাঝখানের কথা আর বলতে চাই না। কাগজ যখন বের হলো, তখন দেখলাম তার নাম হয়েছে, ছায়া...এবং সেটা পুরোদস্তুর সিনেমারই কাগজ হয়ে দাঁড়াল...

একটু-আধটু সাহিত্য আর সবখানি সিনেমার আলোচনা...

শৈলজা ঠিক আমাদের দুজনকে তার ঈপ্সিত দিকে টেনে নিয়ে এসেছে...

প্রতি সপ্তাহে সেই কাগজের মারফৎ শৈলজা সিনেমা-ষ্টুডিও-র রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করতে লাগলো, যে সাহিত্যিকদের তোমরা সিনেমা ষ্টুডিও থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, তারা না এলে তোমাদের সবাক ছবি কথা বল্লেও, প্রাণের কথা বলতে পারবে না...

অর্থাভাবে ছায়া বেশীদিন চলে নি কিন্তু যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে শৈলজা ছায়া বার করেছিল তা সিদ্ধ হলো...

শৈলজা নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে চাকরী পেলো...

পেছনের দিকে যেয়ে আজ বলতে ইচ্ছে যায়, সেদিন শৈলজার নিউ থিয়েটার্সে চাকরী করতে যাওয়া বাংলা দেশে সবাক ছবির ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা...

শৈলজার পর প্রেমেন...প্রেমেনের পর আমিও সেই একই দরজা দিয়ে সিনেমার নিষিদ্ধ লোকে প্রবেশ করি...

নিষিদ্ধ-লোক বল্লাম এই জন্যে যে সিনেমার মালিক ও পরিচালকেরা তখন সিনেমার কাজে সাহিত্যিকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিহান ছিলেন...বিশেষ আধুনিক সাহিত্যিক নামে যারা তখন কুখ্যাত ছিল...

সবাক চিত্রের গড়নের কাজে বাক-সাধকদের যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, আজকের পরিচালকেরাও সেই জায়গাটুকু খুশী মনে ছেড়ে দিতে রাজী নন...

সেই জায়গাটুকু হলো চিত্র-নাট্যকারের এলাকা...

কিন্তু আমি বিপথে চলে যাচ্ছি...

সিনেমা সম্বন্ধে কোন বিতর্কমূলক আলোচনা এখানে করতে চাই না... বহুদিন সিনেমার জগতে

এমকেজির রোমাঞ্চকর "রক্ত পলাশ" চিত্রে অনিল চ্যাটার্জি ও ল্যাসি

অন্তরঙ্গ ভাবে ঘুরেছি ফিরেছি, তারই খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আজ যা মনে পড়ছে, তারই কথা লিখতে চাই...

(৩)

চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে সিনেমার সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে, তাই যতই কেন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি, আমার বৃত্তির ব্যথা-বেদনা ও সমস্যা আপনা থেকে কলমের মুখে এসে পড়ে...

বাংলার সবাক ছবির সূচনা হয় চিত্রনাট্যকারকে বাদ দিয়ে...চিত্রনাট্যকারের জন্যে স্বতন্ত্র কোন আসন ছিল না...

একটা জোড়া-আসন ছিল, ছবির পরিচালকের জন্যে নির্দিষ্ট... চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে তিনি সেই জোড়া আসনে বসতেন...

এখনো পর্যন্ত সেই জোড়া আসনটি আছে...

তবে মাঝখানের জোড় ছিঁড়ে আসছে...

এখনো পর্যন্ত বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে একটা অলিখিত ঐতিহ্য আছে, বড় পরিচালক নিজের ছবির চিত্রনাট্য নিজেই রচনা করেন...

একান্ত দুঃখের বিষয় এই ঐতিহ্যের মোহ বজায় রাখতে গিয়ে অনেক বড় পরিচালক তলিয়ে গিয়েছেন...

স্বনামখ্যাত পরিচালক নীতিন বোসের সহকারী রূপে যখন নিউ থিয়েটার্সে চাকরী করতে ঢুকলাম, আমার কাজ হলো সাহিত্যিক হিসেবে পরিচালকের নির্দেশ মত সংলাপ লেখা...

এই কাজে নিউ থিয়েটার্সে, দুটি লোক ছিলেন, একজনের নাম যদু, ডাকনাম যেদো, আর এক-জনের নাম মধু ডাকনাম মেধো...বাংলা দেশের চিত্র-দর্শকেরা অবশ্য তাঁদের অন্য নামে জানেন, বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও শৈলজা মুখোপাধ্যায়...

এই যেদো-মেধোর দলে আমি গিয়ে পড়লাম...

নিউ থিয়েটার্সের তখনকার নাম-করা বড় বড় পরিচালকদের সঙ্গে বহুদিন ধরে ওঠা-বসার ফলে যেদো নিজের জন্যে একটা আলাদা আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন...মেধো নিউ থিয়েটার্স থেকে

অগ্রগামী পরিচালিত কবিগুরুর "নিশীথে"-এর চিত্ররূপের একটি দৃশ্য। শিল্পী: উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

বেরিয়ে এসেই একেবারে পরিচালকের পংক্তিতে গিয়ে বসলেন...

মেধোর পরিত্যক্ত আসনে গিয়ে আমি বসলাম বটে কিন্তু বুঝলাম, অর্থাৎ আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, চিত্রনাট্য রচনা করা একটা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ব্যাপার যা একমাত্র পরিচালকদের দ্বারাই সম্ভব, আমার যদি কিছু শক্তি ও প্রতিভা থাকে আমাকে সংলাপ রচয়িতা রূপেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে...

এই নিয়ে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা, বহু তিক্ত স্মৃতি আছে, তা আজ আর তিক্ততর করতে চাই না...

তবে আজ একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো, মধ্যদ্বের নীতিন চিত্রনাট্য রচনা শিক্ষায় আমার আদি গুরু......

বই-এর কাহিনীকে ছবির ভাষায় অনুবাদ করতে হলে যে ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন, নীতিন কঠিন গুরুর মতন সেই ব্যাকরণের সূত্রগুলি আমাকে দিয়ে কণ্ঠস্থ করিয়ে ছাড়ে...

কাশীনাথের চিত্রনাট্য যখন লিখি, তখন মনে আছে এক-একটা সীনের সংলাপ ষ্টপ-ওয়াচের সেকেণ্ডের কাঁটা ধরে গুণে গুণে বসাতে হয়েছে এবং চারটে কি পাঁচটে বাড়তি কথা কমাবার জন্যে বার বার করে সংলাপের অদল-বদল করতে হয়েছে...

প্রত্যেক সীনের একটা নির্দিষ্ট আয়তন ও ওজন আছে যার ওপর ঘটনার গতি বা টেম্পো নির্ভর করে...নীতিন অঙ্ক শাস্ত্রসম্মত ভাবে তা নির্ধারণ করতে পারতো বা পারে..

প্রথম প্রথম সে প্রত্যেক সীনের গায়ে নির্দিষ্ট সময়ের আয়তন লিখে দিতো, ৫০ সেকেণ্ড, ৪০ সেকেণ্ড বা ১ মিনিট ২০ সেকেণ্ড... সেই নির্দিষ্ট সময়ের আয়তনের মধ্যে সীন লিখতে হতো...নিজে পড়ে বা অভিনয় করে ষ্টপ-ওয়াচের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে হতো ঠিক ৪০ সেকেণ্ড কি ৫০ সেকেণ্ড হয়েছে কি না...এক-আধ সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না...

এই আঙ্কিক পদ্ধতিকে তখন নির্যাতন মনে হতো, স্কুলে ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে ছাত্রদের যা মনে হয়...
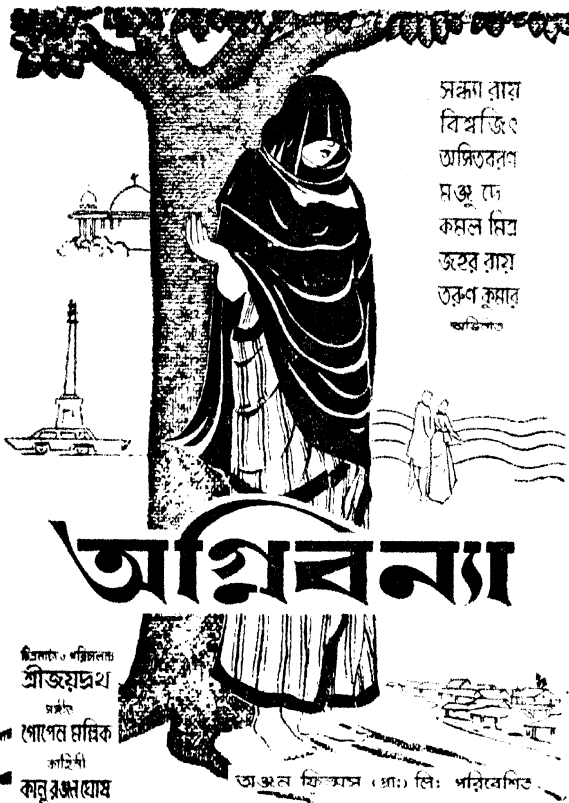
কিন্তু সব ব্যাকরণের প্রথম পাঠ এমনি শুষ্ক আঙ্কিক নিয়মে বাঁধা এবং ব্যাকরণের ভিত্তি ঠিক না হলে ভাষাজ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হয় না...

নীতিনের পরিচালনায় প্রত্যেক ব্যাপারে দেখেছি এই আঙ্কিক নিষ্ঠা এবং চিত্র গঠনের বিভিন্ন যান্ত্রিক বিভাগে দেখেছি তার বিস্ময়কর অনুশীলন...

একবার মনে আছে, অমূল্য তখন নীতিনের ক্যামেরাম্যান...অমূল্য সীনে আলো সাজিয়ে ঠিক করলে নীতিন ফ্লোরে আসবে...ফ্লোরে ঢুকে নীতিন একবার চোখ ছোট ছোট করে সব আলো-গুলো দেখে নিলো...হঠাৎ একটা জানলার দিকে চেয়ে নীতিন চীৎকার করে ডাকলো, অমূল্য!

অমূল্য ক্যামেরা থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো...

—ঐ জানলাটার আলো একটু কম লাগছে... কত পয়েন্ট দেখেছ?

অমূল্য যন্ত্র দিয়ে আলোর পয়েন্ট মেপে দেখে নি, তাই গম্ভীরভাবে বল্লো, আলো ঠিক আছে নীতিনদা!

নীতিন আধ চোখে আর একবার দেখে নিয়ে বল্লো, চল্লিশ পয়েন্ট হওয়া উচিত কিন্তু মনে হচ্ছে ৩৫ পয়েন্ট!

আলো মাপবার যন্ত্র বার করে অমূল্য দেখলো, সত্যই ৩৫ পয়েন্ট!

একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া বাংলায় প্রায় প্রত্যেক বড় পরিচালকের পরিচালনা আমি ফ্লোরে দেখেছি... আমার স্থির বিশ্বাস যান্ত্রিক দিক থেকে নীতিনের চেয়ে বড় পরিচালক আজও বাংলায় আসে নি।

সঙ্গল দত্ত পরিচালিত ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের 'সূর্যশিখা'র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

সভ্যতার প্রথম বিকাশ…

মিশরে, মধ্য এশিয়ায় বা ভারতে যেখানেই হয়ে থাক, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শস্য উৎপাদন। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম সোনালী ফসল ফলাতে সফল হলো সেদিনই তার যাযাবর জীবনে যবনিকা নেমে এলো, সে ঘর বাঁধতে শিখলো। এমন কি হাজার হাজার বছর পরেও পিরামিডের তলায়, হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া গেছে সেই প্রাক্-আর্যযুগের স্বর্ণশীর্ষ খাদ্যশস্যের সন্ধান।

তখনকার দিনে প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যব — বলা হত 'শূকধান্য'। আজকের দিনেও যাঁরা উত্তর ভারতে সমস্ত প্রকার শুভকাজের একটি অপরিহার্য উপকরণ হলো যব। প্রাচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে যবের ব্যবহার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন যবান্ন, যবশক্তু, যবমণ্ড ও যবাগু। যুগ যুগ আগে প্রচলিত যে যবের কথা বলা হলো সেই যব থেকেই তৈরী হয় আজকের দিনের সুপরিচিত বার্লি। স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য হিসেবে বার্লি চমৎকার!

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'র প্রস্তুতকারকদের পেছনে রয়েছে দেড়শত বছরেরও ওপর বার্লি তৈরীর অভিজ্ঞতা। সুপুষ্ট বার্লিশস্য থেকে সর্বাধুনিক কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এই বার্লি তৈরী ও টিনে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকেরা রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লিরই ব্যবস্থা দেন। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিদের, শিশু ও প্রসূতিদের পক্ষে বার্লি ও দুধবার্লি একাধারে উপকারী ও উপাদেয় পথ্য। তাছাড়া, পাতিলেবু বা কমলালেবুর রসের সঙ্গে বার্লির পানীয় পরম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড (ইংলণ্ডে সংগঠিত)

(WTRP)

(৪)

প্রত্যেক বিশিষ্ট পরিচালকের ছবি পরিচালনা করার, সীন গ্রহণ করার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

সেই সব বিভিন্ন ধারা বা টেকনিকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি অনেক পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি এবং ছাত্রের মনোভাব ও নিষ্ঠা নিয়েই তাঁদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেছি। এই মনোভাব থেকেই আমার এক সময় খুব ইচ্ছা হয়, প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কাজ করতে। তখন তাঁর খ্যাতি প্রচণ্ড। প্রযোজক নরেশচন্দ্র ঘোষ তখন বড়ুয়া সাহেবকে দিয়ে একটা বই তোলবার আয়োজন করছিলেন। চিত্রনাট্য লেখবার ভার আমার উপর পড়লো। রোজ তাঁর বাড়ীতে যেতাম, সারাদিনই সেখানে থাকতাম।

তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন খোলা জায়গায় তখন ভুট্টার চাষ করেছেন, সবুজ গাছে গাছে সবে তখন কচি-কচি ভুট্টা দেখা দিয়েছে...দুজনে সেই ক্ষেতের চারদিকে ঘুরে বেড়াই আর গল্প আলোচনা করি... আজও স্পষ্ট মনে পড়ে বড়ুয়া সাহেবের অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি আর বিচিত্র মধুর কণ্ঠস্বর......

প্রথম অভিজ্ঞতাতেই বুঝলাম, নীতিনের পদ্ধতির একেবারে উল্টো বড়ুয়া সাহেবের পদ্ধতি... এ লোক কোন প্রচলিত ব্যাকরণের ধার ধারে না ...... একটি মাত্র ব্যাকরণ তিনি অনুসরণ করেন...সে-ব্যাকরণ তাঁর নিজের তৈরী...তৈরী বলা ঠিক হবে না, কারণ সে-ব্যাকরণ অলিখিত......সমস্ত ছবিটা তাঁর মস্তিষ্কে ও মনে তরল অগঠিত অবস্থায় নদীর স্রোতের মত বয়ে চলেছে, তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব তট হয়ে সে-ধারাকে বেঁধে রেখেছে......

শ্রী[illegible] পরিচালিত "অগ্নিবন্যা"র নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়

যে-প্রতিভা সমস্ত নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে এগিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশের ছবির রাজ্যে বড়ুয়া সাহেব ছিলেন, আমার মনে হয়, সেই বিচিত্র প্রতিভার একমাত্র অধিকারী......পদ্ধতির চেয়ে তাঁর কা বড় ছিল, তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব...

এই ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় সম্পদ এ তাঁর সব চেয়ে বড় শত্রু......এবং এই শত্রুতার ব ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মধ্যেই...

পরিচালক হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধা প্রতিভাবান...অভিনেতা হিসাবেও তিনি ছিলে অসাধারণ প্রতিভাবান...যে-ছবির পরিচালক তি সে-ছবির প্রধান অভিনেতাও তিনি...প্রতিভার স্বৈত-প্রকাশ তাঁকে অনন্যসাধারণ খ্যাতি দিয়েছিল কিন্তু খ্যাতির আড়ালে নিঃশব্দে দিয়েছিল চরম ট্র্যাজেডীকেও......

পরিচালক বড়ুয়া অভিনেতা বড়ুয়াকে নিয় করতে পারেন নি...অভিনেতা বড়ুয়া প বড়ুয়াকে মেনে চলতে শেখেন নি...

জগতে একবার মাত্র ছবির রাজ্যে প্রতিভার আত্মবিদারণ বা বহুরূপে আত্ম-বিকাস সার্থক হ পেরেছে, সে হলো চার্লি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে চার্লিকে অনুসরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক......

এই সূত্রেই উপ-সিদ্ধান্ত হলো, ছ পরিচালকের পক্ষে ছবির চিত্রনাট্য রচয়িতা হওয় বিপজ্জনক......

পরিচালক হিসাবে তখন তিনি চিত্রন রচয়িতার অক্ষমতা বা ত্রুটিকে দেখতে পান না চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে তিনি পরিচালককে সাহ করার চেয়ে সমর্থন করতেই বাধ্য হন...

নিজে নিজের সেক্রেটারী হওয়া যায় না...হ একটা অসুবিধা হয়, সেক্রেটারীর ত্রুটি আর ত চোখে পড়ে না...চোখে পড়লেও, সেক্রেটারীকে ত ধমক দেওয়া যায় না...

একমাত্র চার্লি চ্যাপলিন পেরেছেন...

পরিচালক চার্লি গল্প লেখক বা চিত্রনাট্য লে চার্লিকে আলাদা করে দেখতে শিখেছিলেন, বহু অ ও বহু সময় খরচ ক'রে......

চার মাসের মধ্যে ছবি তোলা শেষ করতে তি বাধ্য ছিলেন না...দু'লক্ষ টাকায় ডিক্সের ব নিজেও তাঁকে ছবি করতে হতো না...

ছবি অংশত তুলে ফেলে রাখতেন...সম কোল্ড্-স্টোরেজে কিছুদিন ফেলে রাখার পরিচালক চার্লি চিত্রনাট্য রচয়িতা চার্লির কাজ খানিকটা নিস্পৃহভাবে দেখতে পারতেন...দেখার পরিচালক চার্লির যদি মনঃপূত না হতো, সম তোলা ছবিটাই ফেলে দিতেন, আবার নতুন ক ভাবতে আরম্ভ করতেন......

আজকের কোন বাঙালী পরিচালকের হা এমন অর্থ বা সময় থাকে না যার সাহায্যে তি আত্ম-বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিতে পারেন......

মনে আছে, প্রথম যখন কলেজ-জীবনে এ আধ দিন ট্যাকসীতে উঠতাম, চোখ সব সময় ট্যাকস মিটারের অঙ্কের দিকে থাকতো...ট্যাকসীর মিটা অঙ্ক পকেটের পয়সার অতি-সুনির্দিষ্ট সংখ্যা পে আগেই ট্যাক্সী থেকে নেমে পড়তে হতো......

আজকে বাংলা-ছবির পরিচালককে সব সময় রকম ট্যাকসীর মিটারের দিকে চেয়ে থাকতে হয় ছবির শেষ অবস্থায় অনেককে দেখেছি, ল পৌঁছবার আগেই ট্যাকসী থেকে নেমে পড়তে

এহেন অবস্থায়, অনেক সময় মনে হয়, আমা পরিচালকেরা সময় ও অর্থের শৃঙ্খলে আষ্টে-পি বাঁধা অবস্থায় যে-জাতের কাজ করেন, সত্যিই বিস্ময়কর......

এবং, এতখানি ঝুঁকির মধ্যে যাঁকে কাজ কর হয়, তাঁর পক্ষে নতুনতর ঝুঁকির দায়িত্ব নে নিশ্চয়ই বিপজ্জনক......

(৫)

আবার অভ্যাসের দোষে আমার গোলমা করেই চলেছি......

(শেষাংশ ২৫০ পৃষ্ঠায়)

বাঙলার চিত্রশিল্পের বিষম ক্ষণ / শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি)

পশ্চিম বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্প বেশ কিছু কাল ধরে এক ঘনায়মান সঙ্কটের রাহুগ্রাসে পড়ে আছে। যুদ্ধোত্তর যুগের আপাত-মধুর মরীচিকা মুদ্রাস্ফীতির ছলনায় যে ক্ষণিকের উচ্ছল সম্পদ এই শিল্পের কুটির প্রাঙ্গণে এসেছিল জলোচ্ছ্বাসের মতো, আচ্ছন্ন করেছিল তাকে একটানা সুখপ্রবাহে জীবনতরণী ভাসিয়ে যাওয়ার নিশ্চিন্ত স্বপ্নাবেশে, সে স্রোত আজ নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত। আজ সে দাঁড়িয়ে আছে গৃহহীনের মতো বালুচরের ওপরে।

পশ্চিম বাংলার নবরূপকার বিধানচন্দ্র তাঁর মানসকন্যাকে রূপৈশ্বর্যশালিনী ক'রে তোলবার সহস্র কর্মমুখর পরিকল্পনার মধ্যেও, তাঁর আপন নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি মেলে বাংলার এই অনাদর পালিত শ্রমশিল্পের পানে সেদিন তাকিয়েছিলেন, মরমীর স্নেহ ও ব্যাকুলতা নিয়ে যেদিন তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হ'য়েছিল যে জাতির শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির বিচারে তার সহায় সম্পদহীন ছায়াচিত্র শিল্পের সম্ভাবনা বড়ো কম নয়। তাই তিনি সেদিনকার বিপন্ন শিল্পের বাঁচবার জন্য কাতর প্রার্থনাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে তাঁর বরাভয় বাণী দিয়ে বলেছিলেন: বাঙলার অনেক কর্মযোগী সন্তানের বুকজোড়া শ্রম দিয়ে গড়ে-তোলা তার এই যে ছায়াচিত্র শিল্প—যার অমিত সম্ভাবনাময় স্নিগ্ধ আলো বাঙলার সাহিত্য ও শিল্পের অন্যান্য বহু শিখার সঙ্গে একত্রে মিলে তার একান্ত নিজস্ব অন্তর সম্পদকে দিয়েছে সুকুমার লাবণ্য, তাকে বাঙলাদেশ ও তার জাতীয় সরকার মরতে দেবে না। তার উপবাস মলিন মুখে দিতে হবে সঞ্জীবনী সুধা। দিতে হবে তাকে অর্থের সুযোগ, যান্ত্রিক সুবিধা, বাড়াতে হবে তার প্রসারের ও প্রচারের ক্ষেত্র।

একথা বলি না যে তাঁর এই অভয় বাণীর পর পশ্চিম বাঙলার সরকার গত দু'বছরের মধ্যে তেমন কিছু সুস্পষ্ট কল্যাণসাধন করেছেন এই শিল্পের, বা এমনকি সুচিন্তিত কোন স্থায়ী নীতি গ্রহণ করেছেন এর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যার বীজ বোনা হ'য়ে গেছে; শুধু যার সতেজ মহীরুহরূপে শাখাপ্রশাখা নিয়ে বেড়ে ওঠবার অপেক্ষা। তবু বলব—এই আশ্বাস বাণী সেদিনের মুমূর্ষু শিল্পকে দিয়েছিল বেঁচে ওঠবার, স্বাস্থ্যদৃপ্ত দেহে দাঁড়াবার নতুন আশা। বিধানচন্দ্রের সেই মর্মবাণীর কুণ্ঠাহীন আবেগ বুঝি কেন্দ্রীয় সরকারের বুকেও জাগিয়েছিল কিছু চাঞ্চল্য, সৃষ্টি করেছিল কিছু শিল্প হিতাগ্রহী মানসিকতা। যার ফলে সমগ্র ভারতের ছায়াচিত্র শিল্প সত্যজিৎ প্রমুখ ডেলিগেশানের নির্ভীক দৌত্যে সেদিন বর্ধিত করের দৌরাত্ম্য থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করেছিলেন।

এই শিল্পের উন্নতির জন্য বিধানচন্দ্রের আশা ও বিশ্বাস ছিল যেমন অদ্ভুত, তাঁর সমগ্র বাঙলাদেশকে শ্রমশিল্প মন্ত্রে উজ্জীবিত করবার কার্যসূচীও ছিল তেমনি বিরাট তালিকাবহুল। যাঁরা ভিতরের কথা কিছু জানেন, তাঁরা সাক্ষী দেবেন এই কর্মব্রতীর পরবর্তী প্রয়াসের বিষয়ে। তাঁরা বলবেন বিধানচন্দ্র এক যোগ্য হস্তে ভার দিয়েছিলেন,—কোন্ কোন্ রন্ধ্রপথে বাঙলার চিত্রশিল্পে ঢুকেছে শনি। কী কী তার দুঃখ, তার বিপাক। কী করলে তাকে সুস্থ সুন্দর ক'রে বাঁচিয়ে তোলা যায় ও তাকে সাধারণের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করা যায় জাতীয় শিল্পের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে। আমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি একটি সর্বাত্মক রিপোর্ট এক অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে। সে রিপোর্ট লেখা হ'ল তার জন্য বহুজনের বহু শ্রম স্বীকারের মধ্য দিয়ে, বহু শুভকামী বন্ধুর স্বার্থহীন সক্রিয় সহযোগিতার মূল্যে। তবু কেন সে রিপোর্ট সেলফ্-চাপাই পড়ে রইল, কেন সে জ্ঞাতরূপে দেখতে পেলনা দিনের আলো, সে রহস্য লুকিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণের এক বিশাল ও বিশিষ্ট নিয়ামকের টেবিলের রুদ্ধ কোণে। বোধ করি বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্ধান তথ্যেরও ঘটল চিরমৃত্যু।

তবে কি বাঙলার চিত্রশিল্পের ঘটিল অপমৃত্যু? আজকে তিলে তিলে, দিনে দিনে সঞ্চিত দুর্যোগের ও বিপর্যয়ের নিকষ-কালো অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করে ঘনিয়ে এসেছে দেখি এই শিল্পের সম্মুখে। অনেক বিপদের ও ঝড়ের মধ্যে, শুধু অন্তরের উষ্ণ উত্তাপ দিয়ে, সঙ্গোপনে জ্বালিয়ে রাখা তার সেই ক্ষীণ প্রদীপশিখাটি কি তবে আজ নিভে যাবে বাঙালীর হীন ঔদাসীন্যের হৃদয়হীন, চিন্তাহীন অপপ্রয়াসে? মরে যাবে বাঙলার এই চারুশিল্প চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ ও প্রাণান্ত তপস্যার পর শুধু জাতির অবহেলায় [illegible] অন্ধকারে?

আর ডি বনশল প্রযোজিত ও বিমল বর্ধন পরিচালিত "এক টুকরো আগুন" চিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণ

জন্য প্রদেশের বা ভিন্ন ভাষাভাষী নিম্নরুচি ব্যবসায়ীদের হস্তে প্রতিযোগিতায়? সে ছবির জঘন্য রুচি ও বিকৃত রুচি কি ভাবে তার যৌনসর্বস্ব ও স্থূল আবেদনের নিয়ে আমাদের এতো শতাব্দীর, এতো আত্মশক্তির বস্তু যশ সভ্যতার সুচিন্তিত অন্তর লাবণ্যকে গ্রাস করবে, সুদূর হবে তার উপরে রাষ্ট্রভাষা বা বিদেশী ভাষার ছবির নির্মম অভিযান? পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ কি আজন্ম মূঢ় মূকের মতো সেই বাঙলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদারুণ মৃত্যুযাত্রা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবে জড়ের মতো? তার সরকারও কি সেই দেশ প্রাণীর ঐকতানে যোগ দেবে ক্লীবের মতো? মরণের মুখে তাকে ফেলে সে দূরে যাবে চলে?

এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কবলিত আমাদের এই মূল্য শিল্পটি আজ যখন আসন্ন মৃত্যুর কবলে দুলছিল, তখন সন্ত আশার কথা যে পশ্চিম বাঙলার সরকার তার নবজীবনের মন্ত্রবারি নতুন আশার কমণ্ডলুতে ভরে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এই শিল্পকে নিরাময় করতে, সুস্থ করতে, জাতির জীবনের অগ্রগতিতে তাকে গ্রামশিল্পের সমৃদ্ধির পথে ও চারুশিল্পের শুভ্র-সুন্দর মহিমায় মণ্ডিত করে সার্থক ক'রে তুলতে। যাতে আবার সে জাতির যুগমানসকে দিতে পারে প্রেরণা, দিতে পারে ভাবপ্রদীপ্ত। তাই আজ সরকারী মহাপ্রাঙ্গণে ডাক পড়েছে কয়েকটি দেশপ্রেমিক মন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল কর্মীর, সকল মরমীর। সকলকে গিয়ে আজ সেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে হবে ভেদাভেদ ভুলে নীচ ও সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলে, নিরুদ্যম বৈকল্য পরিহার ক'রে।

যে ক্রমবর্ধমান শিল্প শিশুটি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বা আমাদের নিমীলিত দৃষ্টির গভীর ঔদাসীন্য-দোষে অর্থনৈতিক দুর্দৈবের জালে অসহায়ের মতো জড়িয়ে পড়েছে, তাকে উদ্ধার করতে পারে আজ একমাত্র আমাদের সম্মিলিত শুভবুদ্ধি, আমাদের উদ্বুদ্ধ-চেতনা সহাবস্থানের সংযুক্ত প্রয়াস। দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, এই মন্ত্র সম্বল ক'রে ও মরণপণ ক'রে আজ যদি আমাদের এই শিল্প-সংশ্লিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সরকারের এই সুন্দর ও উৎসুক আমন্ত্রণের টানে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের বাঙলার শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক ও প্রতীক এই অপরূপ শিল্পের রথযাত্রা পথে, তবেই বিগত যুগের বাঙলা ছবির পথিকৃৎদের শত দুঃসাধ্য সাধনায় হবে সিদ্ধি। তাঁদের আত্মত্যাগে মহিমা একান্ত ব্রতের হবে উদ্যাপন।

যেতে হবে আজ আমাদের চিত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিল্প সংস্থার, প্রতিটি কর্মীর, প্রতিটি শিল্পীর। সেই মহাব্রতে প্রত্যেকের থাকবে বিশেষ কোন অংশ ঋত্বিকের মতো। বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে আজ শেষ হয়ে গেছে এ-যুগে আত্মমগ্ন, সুযোগসন্ধানী, ব্যক্তিনীতিমূলক শিল্পোদ্যমের—এই চিত্র শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে। অনেকে মিলে আজ গড়ে তুলতে হবে চিত্রশিল্পের শুভ্র মহাসৌধ। গড়ে তুলতে হবে এক সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত শিল্প। শিল্পের সমস্যা ও বিপর্যয়ের মর্মমূলে প্রবেশ ক'রে গভীর সন্ধান ক'রে আবিষ্কার করতে হবে—কেমন ক'রে সেখানে অনর্থকারী, ক্ষয়রোগ জীবাণু প্রবেশ ক'রে তার জীবনীশক্তিকে বিষপ্রভাবে সমাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে।

বাহিরের কিছু-পরিমাণ কৃত্রিম আভিজাত্য, আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে এই শিল্পের প্রাণমূলে কী ক'রে এত অনটন, এত অস্বাচ্ছন্দ্য, এত উচ্ছৃঙ্খল অনাচার ও পাপ গভীর বাসা বেঁধে ছিল এত দীর্ঘদিন ধরে। আর কী ক'রেই বা আমরা জাতিগত হিসাবে সেই রোগজীবাণুর মারাত্মক আক্রমণ সম্বন্ধে এমন পরম দার্শনিক ঔদাসীন্য নিয়েছিলাম। আজও অবশ্য ... সমস্যার কথা ... সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের কথা শিল্পের অনুরাগী বাইরের লোকেরা বুঝতে পারছেন না ঠিক। বড় যা কিছুটা তাঁদের চৈতন্যে যা দিয়ে থাকে তবে সে হ'ল কতকগুলি বহিরঙ্গ সমস্যা বা সংকট। অন্তরঙ্গগুলি নয়। যেমন ধরুন এখানকার শিল্পে কিছুদিন যাবৎ প্রাপ্য পারিশ্রমিকের মান-নির্ধারণ নিয়ে কর্মী ও মালিকের মধ্যে আন্দোলন বাদানুবাদ, অসহযোগ, মামলা ও সালিশীর উৎপাত। এই মালিক-কর্মী সংঘাত কিন্তু আজ অবিচ্ছিন্ন সমস্যা নয় ঐ শিল্পের। শিল্পের মর্মমূলে আজ যে গভীর সংশয়, কর্মবিমুখতা, যে আড়ষ্ট মানসিকতার ক্রমপ্রবেশ ঘটছে শিল্পের সমস্ত চেতনা ও বিবেককে আচ্ছন্ন ক'রে, এই সংঘাত অবশ্যই তার একটি খণ্ডিত প্রকাশমাত্র। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আধুনিক শিল্পগত অর্থনীতিতে যে জটিলের বীজ নিহিত আছে, সাধারণ অর্থনৈতিক বোধের সাহায্যেই তা সহজে বোঝা যায়। কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এই জটিলতার মধ্যে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমস্যাগুলির সমস্যার আশু নিরসন সহজে সম্ভব বলেও মনে করিনা।

চলচ্চিত্রকুশলীদের প্রধান নালিশ প্রখ্যাত চিত্রতারকা বা পরিচালকের সঙ্গে তাদের সঙ্কীর্ণ আয়ের তুলনামূলক বৈষম্যকে কেন্দ্র ক'রে। তার সঙ্গে তাদের সমস্যাকে গভীর ক'রে তুলেছে তাদের কর্মের গভীর অনিশ্চয়তা। সাধারণভাবে বাঙলা চলচ্চিত্রের পরিসংখ্যান সম্বন্ধে যাঁরাই ওয়াকিবহাল তাঁরাই জানেন যে বাঙলা ছবির সংখ্যা বৎসর থেকে বৎসরান্তরে কি সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আর তারই ফলে বাঙলা ছবির চির-অর্ধাহারী শিল্পকুশলীদের একটা বৃহৎ অংশ প্রায় প্রতিদিনই কর্মহীন বেকারের অনাহারী জীবনকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের দারাপুত্র-পরিবার সমেত। এক্ষেত্রে মানসিক স্থৈর্যের একান্ত অভাব ঘটা অত্যন্তই স্বাভাবিক। যার ফলে দেখা দেয় অত্যন্ত দুঃখকর, উত্তেজিত সংঘর্ষের নীচ প্রকাশ। শিল্পের গণ্ডীতে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিসদৃশ অভাববোধ এই সংঘর্ষের মূল মনোভাবকে দেয় অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিপোষকতা। ছবি যাঁরা তৈরী করেন, সে ছবি যাঁরা ভাড়া দেন ও প্রদর্শন করেন, এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই এই শিল্পকর্মীদের প্রবল নালিশ। তাঁরা কর্মীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন না। কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য—এমন কথা এই সত্যনিরীক্ষার যুগে নির্ভেজ বিশ্বাসে বলবার লোক হয়তো খুবই কম। শুভকামী সমালোচক এক্ষেত্রে এইটুকুই মাত্র বলতে পারেন যে, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সাহায্যে যদি কোন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত তবে অন্ততঃ এই রুগ্ন চিত্রশিল্পকে শুধু মাত্র বেঁচে থাকবার প্রাণঘাতী চিন্তায় সর্বদা জর্জর থাকতে হতো না। এই বেঁচে থাকবার সমস্যাটি যে একান্তভাবেই সর্বজনীন এটা বুঝতে আজ আর বৃথা সময় ক্ষেপণের কথা নয়। কেননা, যখনই কোন অর্থনৈতিক বিপর্যয় সমাজ-জীবনে এসে দেখা দেয় তখন তার প্রথম বলি যাঁরা একান্ত অসহায়, সেই দরিদ্র সম্প্রদায়। দ্বিতীয় ধাপের বলি হন মধ্যবিত্তরা। আর একেবারে শেষ ধাপে বিনষ্ট হন উপরের মহল। সে বিনাশ আসে বিপ্লবের হাত ধরে। এই বিলোপ অবশ্যম্ভাবী এবং গভীর পরিতাপের বস্তু এই যে এই একান্ত বিলুপ্তির সম্ভাবনায় এতোটুকু চিন্তা আজও যেন এই শিল্পের বা এই শিল্প সংশ্লিষ্ট অনেকেরই মনের গভীরে প্রবেশ করেনি। তাই শুধু একক বা খণ্ডগোষ্ঠী হিসাবেই কিছু কিছু গোষাকী আলোচনা মাত্রই এ-পর্যন্ত হয়েছে এ সম্বন্ধে। সামগ্রিকভাবে, গভীরভাবে এবং একই ব্যাধির পীড়ায় কাতর গভীর সমদুঃখে-দুঃখীর ভাবে সমস্যার কোন প্রকৃত বিশ্লেষণ বা আলোচনা চিন্তাশীলতার সঙ্গে হয়নি। কেন তা হওয়া সম্ভব হয়নি উচিত সত্ত্বেও, সে আলোচনা এই প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। এই দারুণ দুর্যোগে কি ক'রে আমরা আমাদের শিল্পের বৃহৎ জগতের প্রতি আমাদের আত্মমগ্ন বিমুখ মনকে ফিরিয়ে আনব, কি ক'রে তীর্থঙ্কর মানবযাত্রীর মতো এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের শুভ সত্যকে লক্ষ্য করে একযোগে পদযাত্রা সুরু করতে পারব এই এ-প্রবন্ধের একমাত্র কাম্য। বহু-র মধ্যে একতার মিলন মন্ত্রকে আজ ধ্বনিত ক'রে তুলতে হবে প্রত্যেক মুখে। সমস্যার সমস্যাকে সর্বস্ব ক'রে আজ আমরা তীরে বসে নিমজ্জমানকে উপদেশ দেবার মতন ধৃষ্টতাও যেমন একদিকে দেখাব না, তেমনি অন্যদিকে আমাদের সত্যবদ্ধ হ'তে হবে—আমরা যদি প্রকৃত বাঙলার সন্তান হই, তবে বাঙলা ছবিকে, তার শিল্পকে অপঘাতে মরতে দেবনা নিজেরাও আত্মঘাতী হবোনা। যদি এই সত্য স্বরূপ নির্ভীক শিল্প কামনাকে আমরা আত্মশুদ্ধির আগুনে খাঁটি ক'রে নিয়ে স্বপ্রকাশ না ক'রে তুলতে পারি তবে আমাদের উত্তরসূরীরা আমাদের দিকে ঘৃণা অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে আমাদের জাতীয় বিশ্বাসহন্তার নামে অভিহিত করবে। ঐতিহাসিক সে কলঙ্ককালিমার অক্ষর কিন্তু সহজে মুছবে না।

ছায়া ছবির স্মৃতি

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী হয়েই প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কাজ করতে যাই, প্রতিভার ট্র্যাজেডী দে'খে ফিরে আসতে হয়...

আমার মনে আছে, একদিন বিকেলবেলা তিনি বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলেন, সকালবেলা কাগজে-কলমে, যেখানে ছিলাম, বিকেল পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি...সীনের পর সীন লিখছি...কাটছি পছন্দ হচ্ছে না ...mix-এর মুখে নায়ক সীনে ঢুকবে, কিভাবে ঢুকলে চোক-টা স্বচ্ছন্দ হবে অথচ মাঝখানের খানিকটা সময়ের ফাঁক ভরাট হয়ে উঠবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না...

খাতার দিকে চেয়ে বড়ুয়া সাহেব বল্লেন, সেই একই জায়গায় আছেন দেখছি......!

কুণ্ঠিতভাবে বলি, হাঁ...

—এত ভাবছেন কি?

আমার সমস্যার কথা বল্লাম...তিনি হেসে বলে উঠলেন, কিছু ভাবতে হবে না...আমিই তো নায়ক, আমি মোটর নিয়ে ঢুকে পড়বো...তাহলেই হয়ে যাবে!

কথাটা আজও কাণে বাজে...দর্শকদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনের কথা তিনি জানতেন... সেই সম্মোহনের উপর নির্ভর করতে করতে তাঁর প্রতিভা অলস হয়ে পড়ে...

বড়ুয়া সাহেবের কথা মনে হলেই, glamour-এর Tragedy-র কথাই মনে পড়ে....

যতক্ষণ glamour থাকে, দর্শকরা করতালি দেয়...কিন্তু প্রত্যেক করতালির সঙ্গে সঙ্গে দীপের শিখার তেজ কমতে থাকে......

শুধু glamour-এর ওপর যে শিল্প নির্ভর করে থাকে, একদিন অকস্মাৎ মধ্যরাত্রের অন্ধকারে দেখে, পিদিমের বুক জ্বলছে...সলতে পুড়ে এসেছে......অকস্মাৎ যে এসেছিল, অকস্মাৎ সে চলে গেল...

যা আলো হতে পারতো তা আগুন হয়ে সব পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে......

প্রভাতে পথিকেরা শুধু দেখবে, অগ্নিহীন উত্তাপহীন খানিকটা ছাই শুধু পড়ে আছে...

"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে হাওয়ার দোলায়
মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে,
মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত
নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-
লক্ষ্মীর বীণায়। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-
টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই
আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর
সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার
কাছে আরো বিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
JHANKAR
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র রিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

দুটি মনের কথা / মহেন্দ্র সরকার

চলচ্চিত্র বর্তমান শতকের বহু সম্ভাবনাময় শিল্প মাধ্যম এবং এটি একটি যৌথ শিল্প। শিল্পী, সাহিত্যিক, কারিগর, ব্যবসাদার প্রভৃতি অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে একটি ছায়াচিত্র। কিন্তু তাদের সকলের নেপথ্য ভূমিকা বা সহযোগিতা প্রসঙ্গ আমি বিশ্লেষণ করতে বসিনি। এ রচনায় উপেক্ষিত হয়ে হয়ত তাঁরা খুশি হবেন।

আমার বক্তব্যটুকু শুধু তাঁদের নিয়ে যাঁরা ছবির নিয়ামক, যাঁরা কর্ণধার। ছবির ভাল-মন্দের দায়-দায়িত্ব প্রধানত যাঁদের উপর। তাঁরা প্রযোজক ও পরিচালক। এঁদের এক কথায় বলা যেতে পারে চলচ্চিত্র স্রষ্টা বা চলচ্চিত্রকার।

সব দেশেই চলচ্চিত্রকারের দুটি ভূমিকা : তাঁকে শিল্পী হতে হবে, আবার ব্যবসাদারও। এই দুই সত্তার সমন্বয় যিনি ঘটাতে পারেন তাঁর পক্ষেই সার্থক চলচ্চিত্র-স্রষ্টা হওয়া সম্ভব। শিল্পী হিসেবে তাঁকে এমন ছবি করতে হবে যা শিল্প-পদবাচ্য, আর ব্যবসাদার হিসেবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে যাতে ছবিটি জনপ্রিয় হয়, সলাভ লগ্নি টাকা উঠে আসে এবং সেই অর্থ দিয়ে আরও ছবি করা যায়। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র-স্রষ্টাকে মনে রাখতে হবে যে সমাজের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে। বাংলাদেশ এতদিন সেই দায়িত্ব বহন করে এসেছে, তাই বাংলা ছবির এত কদর।

লিখতে বসে আমার একটা বে-খাপ্পা প্রশ্ন মনে এসেছে। লোকে সত্যিই কেন ছবি দেখে? এর বহু জবাব আছে আমি জানি। তার সবগুলো এক খুপরিতে পুরে বলা যায়, আত্ম-চিত্তানু-রঞ্জন : এই উদ্দেশ্য সাধনের স্থূল-সূক্ষ্ম আরো বহু পথ আছে। চলচ্চিত্রও কি শুধুই সেই বহু পথেরই একটি? আমার মন তা বলে না। মন বলে, লোকে ছবি দেখে নিজেকে দেখতে আবার নিজেকেই ভুলতে। নিজেরই কল্পনাগম্য প্রতি-বিম্বিত মহিমা দেখতে, আবার নিজেরই শত সহস্র চেনা অনুভূতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। কিন্তু মহিমার দিকটা ছাঁটাই করে দিয়ে শুধু স্থূল উপকরণে বিস্মৃতির ঢেউ তুললে সেটা কখনো সবশান্ত, কখনো পঙ্কিল হবে না কী?

বাংলা চলচ্চিত্রে এরই যেন সূচনা দেখছি। এই দেখাটা যদি ভুল হয়, আমিই সব থেকে খুশি হব।

সম্প্রতি বাংলা চিত্র-জগতে এমন কিছু কিছু পথ-ভ্রষ্ট প্রযোজক ও পরিচালকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মুনাফা শিকারকেই যাঁরা একমাত্র লক্ষ্য করে নিয়েছেন এবং এই অর্থলোলুপতার জন্যই দর্শক নামক জনতার পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অদ্ভুত কাহিনী, অতি নাটকীয়তা, অভিনেতা অভিনেত্রীদের যৌনতাসূচক গ্ল্যামার প্রভৃতি স্থূল উপকরণে ছবিকে ভরিয়ে তুলছেন। এক শ্রেণীর স্থূলে রঙ্গ-প্রিয় দর্শক তাই লুফে নিচ্ছে—ছবি 'হিট্' করছে, কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির আভিজাত্য যাচ্ছে ক্রমশ তলিয়ে। সে-সব ছবি সংস্কৃতির বুকেও নির্মমভাবেই 'হিট্' করছে।

এই কারণেই দার্শনিক রুসো একদা ফরাসী জনতার স্থূল রংগপ্রিয়তাকে লক্ষ্য করে বলে-ছিলেন, আধুনিক প্রমোদ সর্বৈব মন্দ, ভ্রান্ত। তাঁর ধারণা হয়েছিল বিবেকশূন্য প্রমোদ যতই প্রশ্রয় পাবে ততই মানুষের সূক্ষ্মবৃত্তি স্বাভাবিক ভদ্রতা এবং মানসিক সুস্থতার অপহ্নব ঘটাবে। মানুষের স্থূল রংগপ্রিয়তা উদ্দাম হয়ে উঠবে। মনীষী রুসোর এই মন্তব্যের তাৎপর্য আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। এর সত্যতা যে কোনো মানুষ সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা ছবির হিরো-হিরোয়িনের মত চুলের ফ্যাশান করছে, পোষাক পরছে, হাঁটছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা এমন কিছু দুর্লক্ষণ নয়। কিন্তু মনের উপরেও তো ছবির প্রভাব আছে। তা যদি না হবে তবে হাল্কা রুচির তুড়িমারা গান তরুণ-তরুণীদের গাইতে শুনি কেন, কেনই বা আনন্দের আতিশয্যে নির্লজ্জভাবে বঙ্গে ঢঙে নাচতে দেখি। ঠিক এমনি করেই সারা দেশের রুচি ও রসবোধ বিকৃত করে মুনাফা শিকারী গুটি কয়েক লোক হয়ত ফেঁপে উঠছেন এবং বলছেন মুমূর্ষু বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

(শেষাংশ ২৫৪ পৃষ্ঠায়)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত ও অজয় কর পরিচালিত আর ডি বি'র ছবি "সাত পাকে বাঁধা"য় একটি দৃশ্যে সুচিত্রা ও সৌমিত্র

আমাদের জাতীয় নাট্যশালা / দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র স্মরণীকে জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ইতঃপূর্বে যুগান্তর পত্রিকায় কিছু আলোচনা হয়েছে। পাঠক মহলের মতও তাতে খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু 'রবীন্দ্র স্মরণী' নাট্যশালা নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়া এর পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা অদ্যাবধি জনসাধারণ তা অবগত নয়। আমি যতদূর জানি, এখনো এমন কোনো সরকারী পরিকল্পনা নেই। হয়তো নাট্যশালাটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দু'চারজন কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষীয় কোনো বিশেষ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়ে থাকবে; কিন্তু নাট্যপ্রযোজনা, নাট্যশালা পরিচালনার ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা এযাবৎ করা হয়নি বলেই শুনেছি। অথচ রবীন্দ্র স্মরণীকে জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত-করণের ওপর আমাদের জাতীয় নাট্য আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। অতএব নাট্যামোদীদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

বর্তমানে আমাদের পেশাদার নাট্যশালাগুলিতে সমসাময়িক একই নাটকের শত শত রজনী অভিনয়ের দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকায় বাংলার ধ্রুপদী নাটকগুলির পুনরভিনয়ের পথ সেখানে আপাততঃ রুদ্ধ। অথচ বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রায় শতবর্ষব্যাপী একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। আজকের সাধারণ দর্শকদের কাছে সেই ঐতিহ্য তুলে ধরবে কে? অপেশাদার মহলের কোনো কোনো সংস্থা মাঝে মাঝে পুরনো নাটক মঞ্চস্থ করে থাকেন; কিন্তু নিজেদের নাট্যশালা না থাকায় নিয়মিতভাবে অভিনয় করার সুযোগ তাঁরা পান না। তাছাড়া সব দলের অভিনয় এবং প্রযোজনার মানও সমান নয়। এছাড়া আরো একটি বিচার্য বিষয় এই যে, সব দলের সব রকম নাটক মঞ্চস্থ করার শক্তিও নেই। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের মৌল নাটক এবং গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার দিকে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বটে; কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই অনেকক্ষেত্রেই নিষ্ঠার চেয়ে হুজুকের লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। মুষ্টিমেয় দলই রবীন্দ্রনাট্য উপস্থাপনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মতভেদ থাকলেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাট্য উপস্থাপনে এযাবৎ বহুরূপী গোষ্ঠী যে নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, এককভাবে আর কোনো দলই তা দিতে পারেননি। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অতীত বাংলার কীর্তিমান নাট্যকারদের আর কারো নাটকই তাঁরা এযাবৎ মঞ্চে উপস্থিত করেননি। এদিক থেকে বৈচিত্র্যের দাবি করতে পারেন লিটল থিয়েটার গ্রুপ। তাঁরা যেমন শেক্সপীয়ারের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, তেমনি করেছেন মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,' 'একেই কি বলে সভ্যতা,' গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' এবং 'তপতী'ও তাঁরা পাদপ্রদীপের সামনে এনেছেন। শৌভনিক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো পূর্বসূরী নাট্যকারের নাটকে যেতে পারেননি। শূন্যেচ্ছ শতবর্ষের বাংলা নাট্যসাহিত্য থেকে বাছাই করে কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় নাটক নিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণের চেষ্টা তাঁরা করছেন। অভিনেতৃ সঙ্ঘ মাঝে মাঝে দু'একখানা পুরনো নাটকের মঞ্চরূপ দিয়ে থাকেন; তবে তা খুবই অনিয়মিত। সম্প্রতি 'কালের যাত্রা' ও 'ব্যাপিকা বিদায়' মঞ্চস্থ করে রূপকার গোষ্ঠী সুনাম অর্জন করেছেন। শ্রীমঞ্চের 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'ও প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টাই বিক্ষিপ্ত। নাট্যকার ও নাটক নির্বাচনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কোনো দলের আছে বলে জানা নেই। বৃটেনে কয়েক বছর আগে 'ওল্ড ভিক থিয়েটার' যেমন একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে শেক্সপীয়রের ছোট-বড়ো যাবতীয় নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, অথবা আমেরিকায় 'অফ ব্রডওয়ে' থিয়েটারগুলি অর্থাৎ অপেশাদার নাট্য সংস্থাসমূহ যেমন দেশবিদেশের ধ্রুপদী নাটকসমূহ প্রতি বছর পরিকল্পিতভাবে উপস্থিত করে থাকেন; আমাদের দেশে আজো পর্যন্ত কোনো নাট্য সংস্থাই তেমন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামেননি। কিছুকাল পূর্বে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উদ্যোগে গিরিশ নাট্য পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল একমাত্র গিরিশচন্দ্রেরই নাটক উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে। গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটক তাঁরা মঞ্চে উপস্থিতও করেছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকই আমরা পাদপ্রদীপের সামনে আনবো যে কারণেই হোক এমন সংকল্প তাঁরা ঘোষণা করতে পারেননি বা তেমন কোনো সংকল্প থাকলেও অদ্যাবধি তা তাঁরা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হননি।

মোট কথা, মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি থেকে শুরু করে শচীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে একটি বিরাট নাট্যঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, বর্তমান যুগের নাট্যরসিকদের সামনে তার সামগ্রিক রূপটিকে তুলে ধরবার কোনো পরিকল্পনা এযাবৎ হয়নি। কোনো একটি বিশেষ দলের দ্বারা তা হয়তো সম্ভবও নয়। একমাত্র জাতীয় নাট্যশালার মধ্য দিয়েই এই বিরাট কর্ম সাধিত হতে পারে। জাতীয় নাট্যশালার ব্যয়ভার যদি সরকার গ্রহণ করেন, তবে লাভ-লোকসানের খতিয়ান না দেখে যা আমাদের জাতীয় সম্পদ তা মঞ্চে তুলে ধরা অনায়াসেই সম্ভব। নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলায় ধ্রুপদী নাটকে সফলতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী আজো অনেকেই জীবিত আছেন। জাতীয় নাট্যশালায় তাঁদের সম্মিলিত করে ধ্রুপদী বাংলা নাটকগুলিকে যদি উপস্থিত করা হয় তবে এ-যুগের দর্শকরা যেমন সেসব নাটকের মঞ্চরূপে দেখে আনন্দ পাবেন, তেমনি নবীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ধ্রুপদী নাটকের অভিনয়রীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবেন। তার দ্বারা প্রাচীন নাটকের অভিনয়ধারা অব্যাহত থাকবে। এই গোষ্ঠীর ওপর সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করার দায়িত্বও দেওয়া যেতে পারে।

জাতীয় নাট্যশালায় কেবল যে ধ্রুপদী বাংলা নাটক ও সংস্কৃত নাটকই স্থান পাবে এমন নয়। মোটামুটিভাবে এই চারটি ভাগ করা যেতে পারে: (১) সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ ও ধ্রুপদী বাংলা নাটক, (২) রবীন্দ্রনাথের নাটক; (৩) বিদেশের ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের বঙ্গানুবাদ এবং (৪) আধুনিক বাংলা নাটক। এই চার শ্রেণীর নাটক উপস্থিত করার জন্যে চারটি নিয়মিত নাট্যদল থাকবে। প্রতি নাট্যদলেরই একজন করে নিজস্ব নাট্য পরিচালক থাকবেন এবং সমস্ত বিষয় তদারক করার জন্যে একজন সাধারণ পরিচালক থাকবেন। এই পাঁচজন পরিচালক নিয়ে একটি পরিচালনা পরিষৎ গঠিত হবে এবং সাধারণ পরিচালক পরিচালনা পরিষৎ-এর সভাপতি হবেন। পরিচালনা পরিষৎ-এ সাধারণ

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উত্তরায়ণ" কাহিনীর চিত্ররূপের একটি দৃশ্যে। শিল্পী: উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

নিয়মানুসারে অধিকাংশের মতই গ্রাহ্য হবে; কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে উভয় দিকে যদি সমান সমান ভোট হয়, তবে সভাপতি তাঁর কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করে বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

পরিচালনা পরিষৎ ছাড়া থাকবে একটি সাধারণ পরিষৎ। রবীন্দ্র ভারতীর অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রীকৃত নাট্য-সংস্থাসমূহে, রবীন্দ্র ভারতী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারণ নাট্যশালাসমূহে, অভিনেতৃ সংঘ, নাট্যকার সংঘ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা থাকবেন এই সাধারণ পরিষৎ-এ। এছাড়া নাট্যবিশেষজ্ঞ এবং নাট্যকলা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী কয়েকজন প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত হবেন সাধারণ পরিষৎ-এর দ্বারা। প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালার গঠনতন্ত্র রচনার জন্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। সাধারণ পরিষৎ-এর সদস্য-সংখ্যা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের হার ও অন্যান্য নিয়মাবলী রচনা করবেন উক্ত কমিটি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সেই গঠনতন্ত্রের খসড়া অনুমোদন

"দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও নিরঞ্জন রায়

করলেই তা চালু হবে। নাট্য প্রযোজনার সাধারণ নীতি ও পরিকল্পনা সাধারণ পরিষৎ-এ আলোচিত হবে। পরিচালনা পরিষৎ তাদের পরিকল্পনা সাধারণ পরিষৎ-এ পেশ ও অনুমোদন করিয়ে নেবেন। জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার এটিই হবে যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

সাধারণ পরিচালক ও নাট্য পরিচালকগণ সরকারের বেতনভুক হবেন। পাঁচ বছরের চুক্তির ভিত্তিতেও তাঁদের নিয়োগ করা যেতে পারে। নেপথ্যকর্মী ও প্রয়োগশিল্পীদের স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেতনভুকও হতে পারেন বা নাটকের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাবার চুক্তিতেও আবদ্ধ হতে পারেন। নাট্যকারগণ অভিনীত নাটকের জন্যে নিয়মিত দক্ষিণা পাবেন।

এছাড়া নাট্যশালার তত্ত্বাবধানের জন্যে বেতনভুক স্থায়ী একদল কর্মচারী থাকবেন।

জাতীয় নাট্যশালার ব্যয় নির্বাহের জন্যে প্রতি বছর সরকারী তহবিল থেকে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এই অর্থ এভাবে ব্যয়িত হবে: (১) নাটক উপস্থাপনের জন্যে যদি ঘাটতি হয়, তা পূরণ; (২) কর্মচারীদের বেতন; (৩) অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক; (৪) নাট্যকারের দক্ষিণা; (৫) মঞ্চ-সংস্কার; (৬) পাঠাগার পরিচালনা; (৭) প্রচার; (৮) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে ও বিদেশে নাট্যদল প্রেরণের ব্যয় ও (৯) একটি সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরী থিয়েটার পরিচালনার ব্যয়।

নাট্য প্রযোজনার মান উন্নত রাখতে হলে জাতীয় নাট্যশালার সংশ্লিষ্ট একটি ল্যাবরেটরী থিয়েটার রাখা একান্ত আবশ্যক। সেখানে প্রধানত নাটকের মহড়া হবে। এছাড়া কোনো নাটক জাতীয় নাট্যশালায় সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করার আগে ল্যাবরেটরী থিয়েটারে সাধারণ পরিষৎ-এর সদস্যদের কাছে তার প্রাক্-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের মতামত গ্রহণ করে নাট্য পরিচালক প্রয়োজনবোধে নাটক ও প্রয়োগের পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন করবেন। সংশোধিত আকারে নাটকটি পুনরায় ল্যাবরেটরী থিয়েটারে উপস্থিত করলে অধিকাংশ সদস্য যদি অনুমোদন করেন, তবেই সেই নাটক তখন জাতীয় নাট্যশালায় সাধারণ দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা চলবে।

জাতীয় নাট্যশালার জন্যে সরকারী অর্থ বরাদ্দ বাজেটে নির্দিষ্ট থাকবে এবং প্রতি বছর বিধান-সভার বাজেট অধিবেশনে তা পাশ করিয়ে নিতে হবে। ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বিধানসভার সদস্যরা জাতীয় নাট্যশালার সাধারণ নীতি ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পাবেন। জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে তখন জাতির মতামত প্রতিফলিত হতে পারবে।

নাটক বলতে শুধু প্রচলিত মঞ্চনাটককেই বোঝাবে না। নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যও জাতীয় নাট্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রয়োজন হলে তার জন্যে দুজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

জাতীয় নাট্যশালা পরিকল্পনার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় একটি প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। যে মূল নীতিগুলি অনুসরণ করে জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠতে পারে, মোটামুটিভাবে এখানে সেগুলিই আলোচিত হলো। যাঁরা বাংলার নাটক ও নাট্যকলার যথার্থ কল্যাণকামী, তাঁদের এ সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ এবং নাট্যকলায় অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা একত্র হয়ে যদি জাতীয় নাট্যশালার পরিচালনা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করে রাজ্য সরকারের বরাবরে পেশ করেন, তবে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসতে পারে। সেই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে রাজ্য সরকার হয়তো এ সম্বন্ধে তাঁদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণের সুযোগ পাবেন। বাংলার অগণিত নাট্যামোদীদের এ-বিষয়টি ভালো করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

দুটি মনের কথা

(২৫২ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিকে কী এইভাবে অবক্ষয়ের বিকৃত রুচি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে? এই আত্মহনন অপেক্ষা দারিদ্র্যও কি শ্রেয় নয়? অথবা চলচ্চিত্র-স্রষ্টাদের কাছ থেকে শিল্প সৃষ্টির জন্য স্বার্থত্যাগ কি সমাজ আশা করে না? আর দারিদ্র্য বা স্বার্থ-ত্যাগের প্রশ্নই বা আসবে কেন? এদেশে কি পরিচ্ছন্ন অথচ রসোত্তীর্ণ ছবি কম হয়েছে, না সেই-সব ছবির নির্মাতারা পয়সা পান নি?

অনেকে হয়ত বলবেন শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে শিল্প-বৃত্তির পার্থক্য আছে। জানি পার্থক্য আছে। এও জানি যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পরিবর্তন যতই ঘটুক তাতে সঙ্গতি একটা থাকবেই, শিল্পের মাত্রাও মানতে হবে। আমার চোখে একটি ছবি একটি কাব্যের মত। যত বদল আর যত রকমফেরই হোক, সেটা কাব্যই হবে। সুরের কাব্য হবে, অ-সুরের কাব্য নয়। এই কাব্যে সুন্দর থাকবে, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কুৎসিতও থাকতে পারে। কিন্তু সে যদি জীবনেরই কাব্য হয়, সেই কুৎসিত সুন্দরকে আচ্ছন্ন করবে না কোনভাবে। এদিক থেকে যাচাই বাছাই করে ছবির ছাড়পত্র স্বাক্ষরের বিবাচনী সমিতি আছে। কিন্তু আমার আবেদন বা কটাক্ষ তাঁদের অথবা তাঁদের সতর্ক প্রহরার প্রতি নয়। আমার আবেদন তাঁদেরই কাছে যাঁদের অনুরাগে এত বড় শিল্প মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। চলচ্চিত্র-স্রষ্টাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এইটুকুই কাম্য।

পম্পাপুরী বিন্ধ্যাচল

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বিন্ধ্যশৈলমালার শ্যামনীলা, অরণ্য কুন্তলা, বনস্থলীর অঙ্গ বেষ্টন করে বয়ে চলেছে জীবনায়না জাহ্নবী। তরঙ্গ হিল্লোলে তার মৃত্তিকার মর্মকথা মর্মরিত। নীলাঞ্জনা আকাশের ছায়া তার বুকে জাগিয়ে তোলে অতীতের স্বপ্নময় স্মৃতি; আর বিন্ধ্যের প্রসন্ন দাক্ষিণ্য ভরা স্নেহসম্পুটে বিধৃত রয়েছে তার আবেগোচ্ছ্বাস।

এই গঙ্গাতীরে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। এ দেবীস্থান বহু কালের প্রাচীন এবং ততোধিক প্রাচীন ও প্রখ্যাত এর ইতিবৃত্ত ও স্থান মাহাত্ম্য। বিন্ধ্যাচলের কাহিনী নানাভাবে লোকমুখে প্রচলিত ও সর্বজন জ্ঞাত। তথাপি এ শ্রুতাখ্যান চির নূতন ও এই গাঙ্গেয় ভূমি চিরকালের নয়নমনানন্দকর সুরম্য স্থান। দেবীপুরাণে এ স্থান-মাহাত্ম্যের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম অংশ হৃদয় এই স্থানে পতিত হয়েছিল। বোধহয় হৃদয়ের সেই হ্লাদিনী শক্তিতেই বিন্ধ্যাচল এত মনোরম।

কষ্টিপাথরের রত্নখচিত সুন্দর দেবীমূর্তি ক্ষুদ্র গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিতা। পূজানুষ্ঠান এখানে বেশ নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন হয়। আর পান্ডাদের বিরক্তিকর উপস্থিতি মানুষকে অকারণে উত্যক্ত করে তোলে না, এটি বিন্ধ্যের একটি প্রসাদ গুণ বলতে হবে। এই বিদ্যুতের যুগে মন্দিরের মৃন্ময় দীপশিখা যেন সযত্নে ধারণ করে আছে কোন্ দূরাগত অতীতকে। অগণিত ভক্তপ্রাণ জনমানসের পুণ্য ক্রিয়ায় এ পীঠস্থান পূর্ণতায় প্রাণবন্ত। পরিবেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হলেও সমগ্র মন্দিরটি প্রকান্ড ও গঠন প্রণালী কারুশিল্পময়।

শিবস্থান বারাণসী ধামের মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে বিন্ধ্যাচল। এখানকার জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও রমণীয়। অতি সহজেই এই স্থানটিকে একটি উন্নতধরনের স্বাস্থ্য, ভ্রমণ ও তীর্থ কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে পারা যায়। বহিরাগত মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরাও জীবনযাত্রার অন্ধ গহ্বর থেকে মুক্তি পেতে পারে। কেননা এখানকার মানুষদের জীবনযাত্রার মান ও পদ্ধতি এক শতাব্দী পূর্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মনে হয় এই কল্যাণ কল্পের মাধ্যমে বারাণসীর জয়তিলক বিন্ধ্যাচলের ললাটেও অঙ্কিত হতে পারে অতর্কিতে। একদা এখানে একটি নামকরা স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। এখন সেটি হয়েছে জনশূন্য অর্গলাবদ্ধ। বাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলে অসহায় বাস্তুহারারা এসে নীড় বেঁধেছে। এখানকার পাথরের ব্যবসা অতি প্রসিদ্ধ। বেশ উন্নতধরণের পাথরের বাসন, শিল-নোড়া ও চন্দন পিঁড়ি এখানে প্রস্তুত হয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র রপ্তানি হয়। আর একটি জিনিষ এখানে বেশ প্রচলিত। সেটি হচ্ছে মাটি ও অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত সুরুচি ও শিল্পসুন্দর ছাঁচের নানা প্রকার খেলনা, বাসন-পত্র ও সৌখীন সামগ্রী। বস্তুর প্রাচুর্য দেখে মনে হোল জিনিষগুলি স্থানীয় নির্মিত। এদিক থেকে বিন্ধ্যাচলকে তাহলে শিল্পপ্রধান নগরী বলা চলে। অতঃপর তার গাঙ্গেয় ভূমি স্বভাবতঃই উর্বরা। কাজেই কৃষিপ্রধান নগরীও বলা চলে এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য বিন্ধ্যাচলের একদিকে বারাণসী ধাম, অপর দিকে এলাহাবাদ; উত্তর প্রদেশের দুটি প্রসিদ্ধ নগরীর অবস্থান সত্ত্বেও, স্তিমিত দীপশিখার মত তার এমন ম্রিয়মাণ অবস্থা যে কেন এটা সাধারণের বোধশক্তির অগোচর। মনে হয় দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপ সবলে বিন্ধ্যের কন্ঠরোধ করে আছে।

বিন্ধ্যাচলের প্রাচীন নাম পম্পাপুরী। হয়ত কোনও একদিন এখানে প্রবাহিতা ছিল পম্পা নদী। আজ বোধহয় গঙ্গায় হারিয়ে গেছে তার গীতিময় গতিমাধুরী। বিন্ধ্যের শৈলচূড়ায়, অরণ্যশোভায়, আর গেরুয়া মাটির ধূলিকণায় মিশে আছে অনেক ইতিহাস। কোনও নিস্তব্ধ মুহূর্তে গভীর শূন্যতায় একটু কান পাতলেই শোনা যায় অনেক কথা। ভারতীয় গল্প সাহিত্যের আদি জন্মস্থান এই বিন্ধ্যবিধৃত গাঙ্গেয় ভূমি। বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্বে পন্ডিতপ্রবর গুণাঢ্য এই স্থানে বসেই প্রথম লিখেছিলেন তাঁর অমূল্য গ্রন্থ "বৃহৎ কথা"। এই বৃহৎ কথা উপাখ্যান ভারতীয় গল্প সাহিত্যের প্রথম প্রতিভূ। পন্ডিত গুণাঢ্য তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী সংস্কৃত, প্রাকৃত বা কোনও দেশজ ভাষা ব্যবহার না করে পৈশাচিক ভাষায় নিজ [illegible] দিয়ে সাতলক্ষ শ্লোকের অনবদ্য গল্প সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের কথা তৎকালীন সমাজে তাঁর সেই সাহিত্য সমাদৃত না হওয়ায় গভীর মনোকষ্টে গুণাঢ্য সেই সকল দুর্লভ রচনা রাজি অগ্নি সহযোগে বিনষ্ট করে ফেলেন। ইত্যবসরে সেই সংবাদ রাজা সাতবাহনের কর্ণগোচর হলে তিনি মাত্র এক লক্ষ শ্লোকে রচিত একটি কাহিনী উদ্ধার করতে সমর্থ হন। সেই গ্রন্থই "বৃহৎ কথা" নামে দেশের প্রথম গল্প সাহিত্যরূপে ভারতীয় বিদ্যাভান্ডারে আজও [illegible] অনুপ্রাণিত—বিন্ধ্যাচলের পার্বতী মন্দিরের নিকটস্থ ভূমিখন্ডই ছিল পন্ডিত গুণাঢ্যের সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান। সেই জন্য বিন্ধ্যাচলের মাটি সমস্ত মানুষের কাছে পরম তীর্থক্ষেত্র।

স্টেশনের অনতিদূরে অসমতল পার্বত্য পথ সর্পিল গতিতে ক্রমশঃ উপরে উঠেছে। পথের দুই পাশে সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বৃক্ষরাজি। লতাপাতার জটিল জালে বনপথ সঙ্কীর্ণ। এক সময় সেই অরণ্যানীর মধ্য থেকে দৃষ্টিগোচর হয় একটি মন্দিরের উচ্চ চূড়া। এটী মহাকালীর মন্দির। স্থানীয় নাম কালী-কোঠা। জনহীন নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে এই দেবালয় করুণাঘন শ্রী ও শান্তিতে পরিদৃশ্যমান। একটী বনাচ্ছাদিত দীর্ঘ সরোবর মন্দিরের সুদৃশ্য আলেখ্য সযত্নে বক্ষে ধারণ করে আছে। তারই তীরে বলি ও যজ্ঞবেদী। চত্বরে বসে স্তবপাঠ করতে করতে পুরোহিত উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন যাত্রী সমাগমের দিকে। কিন্তু মনে হোল এখানে যাত্রী সমাগম বেশী হয় না। গঙ্গাতীরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দর্শন করেই যাত্রীরা পুণ্য কর্ম সম্পন্ন করেন। এমন শস্য-সমৃদ্ধ দেশের জনগণের জীবনের মান ও আর্থিক দুরবস্থা এত করুণ যে ভাবতেও কষ্ট হয়। অথচ মানুষ এরা সৎ, নিরীহ, কর্মঠ ও সরল প্রকৃতির।

পাহাড়ের উপর বট, পাকুড়, শাল আর মহুয়া বনে ঘেরা একটি প্রকান্ড দীঘি। তার নাম গেরুয়াতলাও। তারই সামনে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। মন্দিরটি অতি সাধারণ গঠনের হলেও ভিতরের দেব বিগ্রহ ভারী চমৎকার। পরিবেশটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্ত মধুর। এই বনে নাকি অনেক ময়ূর ময়ূরী আছে। আকাশে একটু মেঘের ঘনঘটা হলেই তারা আনন্দে পেখম খুলে নৃত্য সুরু করে দেয়। হরিণও আছে অনেক। সন্ধ্যার পর তারা দল বেঁধে এই দীঘিতে জল খেতে আসে। ভ্রমণার্থীরাও আসে এখানে অনেক দূর-দূরান্তর থেকে বন-ভোজনে। উপস্থিতির স্বাক্ষর তারা রেখে গেছে শাল পিয়ালের গায়ে ছুরির আঁচড়ে নিজেদের নাম লিখে। কিছু কিছু অবস্থাপন্ন মানুষদের সুরম্য আবাস ভবনও ছড়িয়ে রয়েছে বন-বীথির চতুর্দিকে। পর্বতের আরও নির্জন প্রান্তে গঙ্গার গবাক্ষ পথে পুণ্যবতী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানটি ঠিক তপোবনের মত। শুধু পাখীদের কল-কাকলি আর গঙ্গার কল্লোচ্ছ্বাস আর বনের শাখাপত্রের মর্মরাণি ছাড়া আর কোনও শব্দ এখানে নেই। গাছে গাছে প্রস্ফুট পুষ্পের স্তবকগুলিও ফলভারে অবনত হয়ে মধুর আতিথেয়তায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের এদিকে যেমন শুধু বন্ধুর বঙ্কিম পথ ওদিকে সেইরকম আবার গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত পথ আছে। আনন্দময়ী মা যখন এখানে অবস্থান করেন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক অনাবিষ্কৃত [illegible] [illegible]। কে বলে অতীত মৃত, [illegible] [illegible]? এই অতিবৃদ্ধা দেবীর পরিত্যক্ত [illegible] প্রতি পাথর ফিস ফিস করে বলছে, [illegible] এসেছ? এস, উঃ কতদিন পরে”?

[illegible] গা বেয়ে ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ে [illegible] চোখের জল। ভিজে ওঠে শ্যাওলা-শীতল [illegible]। পাথরের চোখেও জল আছে। বুকে দীর্ঘ-[illegible] ফাটল আছে। আনন্দের ত দেখা পাওয়া যায় না? শুধু অজ্ঞতা আর দারিদ্র্য সাধারণ মানুষের বুকে অভিশাপের মত চেপে বসে আছে। কবে আসবেন শ্রীরামচন্দ্র? তখন তাঁর [illegible] শাপমুক্তি হবে এই অহল্যা মাটীর।

বিস্মৃতির ছিদ্রপথে দৃষ্টি মেলে আমরা ঘুরে বেড়াই অরণ্যের জনহীন ছায়ালোকে। অদূরে বিস্ময় শস্যক্ষেত্রের তৃণাসন হয়ে বয়ে চলেছে বলভাষিণী গঙ্গা। কলমুখর টিয়ার [illegible] তার নিরুদ্দেশযাত্রার এই পথে তাঁর কুশল [illegible]। [illegible] তীরবর্তী সাতপুরা পর্বত-মালার বুকে সন্ন্যাসীদের এইরকম নিভৃত আশ্রম দেখেছি। লোকালয়ের সঙ্গে এদের কোনও সংস্রব নেই। তাই এদের আশ্রম-ভূমিও লোকাতীত মায়ার মন্ত্রমুগ্ধ যেন।

এই পর্বত থেকে উত্তরণের পথে আছে ঝাঁক উৎকর্ণ হয়ে শুনছে তার কলোচ্ছ্বাস। তারা কি জানে এই পম্পাপুরীর রহস্য কাহিনী?

একটি শাখা-প্রশাখার জটিল জালে অবনত সুপ্রাচীন বটগাছের তলায় অগ্নিদহনের চিহ্ন ঠিক বসুমতীর বুকে দারুণ ক্ষতের মত জেগে রয়েছে। একদিন হয়ত এখানে এসেছিল কোনও ভ্রমণার্থীরা বন-ভোজনে। এই আগুনে ফাটল ধরা নিরুচ্ছ্বাস মাটিতেও তাহলে পথিকের আনন্দোৎসবের শিহরণ জাগে মাঝে মাঝে। কিন্তু ওই জটা-বিলম্বিত বনস্পতি, ও, কে? উনি কি সেই ব্যর্থমনোরথ কবি গুণাঢ্য? স্বীয় রচনাসমূহ জন-সমাজে সমাদৃত না হওয়ায় দুঃখে অগ্নিতে ভস্মীভূত করছেন সেই দুর্লভ সাহিত্য সম্পদরাজি? বৃক্ষ সম্মুখস্থ অগ্নি-কুণ্ড কি সেই ভস্মাধার? সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়ের এক করুণ ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে এই পম্পাপুরী বিন্ধ্যাচলের গাঙ্গেয় মাটিতে।

মার্জনা

সুনীলকুমার লাহিড়ী

বাজের আগুনে ভরা কালো মেঘ
থমকানো আকাশে,
সুতীক্ষ্ণ ঈগল-চোখ ঊর্ধ্বতে-থাবায় ফেরে
শিকার সন্ধানে।
ভীরু মৃগশিশু—তার নাসায় বায়ুর
স্রোতে ভাসে—
মৃত্যুর অব্যর্থ মুষ্টি—লক্ষ্য তার
শিরে সে কি জানে?
চকিতে কখন চোখে অন্ধকার
দারুণ ঝলকে;
শিকারীর শরবিদ্ধ মৃগশিশু
লুটায় পলকে।

* * * *

নিষ্পাপ সরল প্রাণ দুনিয়ায়
শিকারীর-হাতে—
কি দুঃসহ নির্যাতনে লাখে লাখে
মরে দিনেরাতে।
অগ্নিগর্ভ কালো মেঘ পূর্ণ হ'লে
দুঃশাসনী কাল—
তরল অনল স্রোতে ধুয়ে দেয়
কুটিল জঞ্জাল।

এবার পূজোয় চলুন আন্দামান

বন্দনা গুপ্ত

"পূজোর ছুটীতে কোথাও যাচ্ছেন নাকি?" "না! আর হ'ল কই, অনেক টাকার দরকার......ভেবেছিলাম তো" ইত্যাদি ইত্যাদি—সংসারের চাপে পিষ্ট স্বল্প আয়ী ভদ্রলোক ফিরিস্তি দিতে থাকেন নানা সাংসারিক ঝামেলার। "কী ভাই পূজোর ছুটীতে এবার কি প্রোগ্রাম হ'ল?" "ও'র তো ইচ্ছে মুসৌরী বা নৈনিতাল যাবার—আমি বলেছি এবার আমি কাশ্মীর যাবোই" এই রকম বড় বড় আলোচনা শোনা যায় বড়লোকের গিন্নীদের মজলিসে। আবার সত্যিকারের দেশ ভ্রমণের নেশায় পাগলও অনেক আছেন—তাঁরাও মাথা ঘামাতে সুরু করেন পূজোর কিছুকাল আগে থেকেই—কোথায় যাওয়া যায়।

বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষে বেড়াবার জায়গার আবার অভাব! তবে হ্যাঁ, এমন লোকও আছেন যাঁর কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, এদিকে মণিপুর থেকে বোম্বাইএর সমুদ্রতট পর্যন্ত প্রায় সবই দেখা হ'য়ে গেছে। তিনি যদি বলেন, "বলুন তো মশাই এবার পূজোর ছুটীতে কোথায় যাওয়া যায়?" আমি নিশ্চয় বলব, "কেন আন্দামান চলে যান।" "কি এতবড় কথা, কেন আমি কি খুন করেছি।" চটে গিয়ে কেউ এমন কথা বললে আশ্চর্য হব না মোটেই, কারণ এমন এখনো অনেকেই বলেন। অনেকেই জানেন না ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং কলকাতা থেকে মাত্র ৭৫০ মাইল দূরে এত সুন্দর বেড়াবার একটি জায়গা রয়েছে। ইংরেজ আমলে এখানে দ্বীপান্তর দেওয়া হ'ত, সেই কালাপানি নামের কলঙ্ক এখনো এর সম্পূর্ণ ঘোচেনি।

এখানে হরিৎশোভাময় পাহাড়ের মালা নীল সমুদ্রের পশ্চাদপটে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, উপরে সুনীল আকাশ, উদার উন্মুক্ত, দূরে সমুদ্রের নীলে একাকার হ'য়ে গেছে। কর্ম-কোলাহলময় আধুনিক শহুরে জীবন থেকে বহুদূরে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, অবসর যাপনেরই উপযুক্ত স্থান। ভাড়াও বেশী নয়, ডেকে যদি যান তবে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। এখানে যেতেও বিশেষ কিছু হাঙ্গামা নেই। মাসে প্রায় দু'বার ক'রে দু'খানা জাহাজ পালাক্রমে মাদ্রাজ ও ক'লকাতা থেকে আন্দামানে যায়। আজ আপনি ক'লকাতা বন্দর থেকে "এম, ভি আন্দামান" বা "নিকোবর" জাহাজে চেপে বসুন চতুর্থ দিনেই পৌঁছে যাবেন সেখানে। হুগলী নদীতে সাবধানে চড়া বাঁচিয়ে পাইলটকে অনুসরণ ক'রে মোহনায় পৌঁছুতেই লেগে যায় বার চৌদ্দ ঘন্টা সময়। তারপর আস্তে আস্তে জাহাজ চলল বঙ্গোপ-সাগরের কালো জল কেটে আন্দামানের দিকে। ক্রমে মিলিয়ে গেল স্থলভূমির শেষ চিহ্নটুকু। পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পাবেন শুধু জল আর জল কিন্তু চিত্ত বিকল হওয়ার আগেই আবার চতুর্থ দিনে শেষরাত থেকে দেখতে পাবেন এক পাশে সারিবদ্ধ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পাহাড়গুলো। আন্দামানের মোট ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপের প্রায় সবই পাহাড়ে-ভূমি। জাহাজ ক্রমে এগোচ্ছে প্রধান শহর পোর্ট-ব্লেয়ারের দিকে। 'চ্যাথাম' জেটীতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে উন্মুখ জনতা। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র এই জাহাজ যেন পোর্ট-ব্লেয়ারকে সোনার কাঠির পরশে জাগিয়ে দেয়। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে খবরের কাগজ, চিঠিপত্র আসছে আর আসছে নানা রকমের পণ্যসামগ্রী। ওষুধপত্র ও প্রয়োজনীয় কত জিনিষ।

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত নাগরিক বলে ভাবনার কিছু নেই। রীতিমত আধুনিক শহর এই পোর্টব্লেয়ার। নেমেই ট্যাক্সী দেখে আপনার মনটা একটু আশ্বস্ত হবে। পীচ বাঁধানো রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলো, কলের জল সবই আছে। এছাড়া হোটেল, দোকানপাট, ক্লাব, সিনেমা কি নেই? এ সবের উপরে আছে এর অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যার তুলনা আছে খুব কম। জাহাজ ওখানে অন্তত পাঁচ ছয় দিন থেকে আবার ক'লকাতায় আসবে। যদি সেই জাহাজেই ফিরে আসতে চান তবে আর দেরী নয়। আজই দুপুরে বিশ্রামের পর বেরিয়ে পড়ুন। শহরের উত্তর ও পূর্বদিক জুড়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেখান দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আগে চলুন শহরের উত্তর-পূব কোণে সমুদ্রের ধারে সেলুলার জেল দেখতে। এই কুখ্যাত জেলটির গঠনপ্রণালীও দেখবার মত। মাঝখানে একটি উঁচু টাওয়ার থেকে সাতটি মহল যেন সূর্যের রশ্মির মত বেরিয়েছে। তারই প্রত্যেকটি অংশে অজস্র ছোট ছোট সেল। ওরই একটি মহলে ছিলেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বহু বীর সৈনিক। তাঁদের পবিত্র স্মৃতিমন্ডিত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আসুন জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা। তারপর চলুন আবার সমুদ্র উপকূলবর্তী রাস্তা দিয়ে মেরিণা পার্কে।

একটি ওঙ্গী পরিবারের সঙ্গে লেখিকা

এখানে অপরাহ্ন বেলায় ব'সে আপনার ভাল লাগবে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এই মনোরম পার্কেই বিশাল জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন নেতাজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছিলেন স্বাধীন ভারতের কথা। তিনি যে স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই বীজ বপন করা হ'য়েছিল এখানে।

আপনার সামনে অল্পদূরে, সমুদ্রের উপর ছোট্ট সবুজ দ্বীপটির নাম 'রস্'। ইংরেজ আমলে ওখানেই ছিল আন্দামানের প্রধান শাসক চীফ কমিশনারের বাড়ী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আবাসস্থল। এক সময়ে জাঁকজমকে, বিলাসব্যসনে এই দ্বীপটিকে বলা হ'ত নন্দনকানন। আজও এর ভগ্নাবশেষ দেখে পুরনো দিনের ঐশ্বর্যের কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এখন এটাকে লাইট হাউস রূপেই ব্যবহার করা হয়।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে তিন চার মাইল দূরে ছোট একটি বালুকাময় বীচ্ আছে যার নাম করবাইন্স্ কোভ। এটিই শহরের সবচেয়ে কাছে এবং সবচেয়ে সুন্দর স্নানযোগ্য বীচ্। এই বীচ্টি ছোট হ'লেও সৌন্দর্যে ও শান্ত পরিবেশের জন্য সকলেরই খুব প্রিয়। দু'পাশে সবুজ বনানীতে ঢাকা পাহাড় যেন এই নারিকেলের ছায়ায় ঘেরা বীচ্টিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। ছুটীর দিনে দলবেঁধে স্নানার্থীরা এখানে আসে এবং এখানেই সমস্ত দিন যাপন ক'রে থাকে। এখান থেকে একটু দূরে দেখা যায় স্নেক্স্ আইল্যান্ড (Snake's island) ছোট একটি দ্বীপ. সত্যি সত্যি সাপেরই বাসভূমি কিনা সে খবর নিতে ঐ জনমানবশূন্য দ্বীপে যাবার মত উৎসাহ থাকলে যেতে পারেন ওখানে। করবাইন্স্ কোভ থেকে আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে এগিয়ে গেলে "রাংগাচাং" নামে একটি মনোরম জায়গা আছে সমুদ্রের ধারে। চড়ুইভাতির অতি উপযুক্ত স্থান। সারিবদ্ধ নারিকেল বীথি বহু জায়গাব্যাপী সমুদ্রের ধারটিকে মনোরম ক'রে রেখেছে। এখানে সমুদ্র ক্রমে প্রসারিত হ'য়ে দিগন্তে মিশে গেছে বিশাল হ'য়ে।

সূর্যাস্তের সৌন্দর্য নানা জায়গায় নানাভাবে দেখেছেন। কিন্তু দক্ষিণ আন্দামানের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ো মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য না দেখলে পরে আপশোষ করতেই হবে। নীল আকাশের পটে আঁকা যেন একখানা ছবি এই চূড়োটি। সূর্যাস্ত দেখে নেমে আসতে আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে, তখন দেখবেন পাহাড়ের পাদদেশে জ্বলছে একটি বাতি। একটি জীবনদীপ নির্বাপণের করুণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে ঐ বাতির নীচে জমাট

"মাউন্ট হ্যারিয়েট"

বাঁধা অন্ধকারে। ১৮৭২ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো মাউন্ট হ্যারিয়েট থেকে সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হ'য়ে নেমে আসছিলেন ঐ পথে. অতর্কিতে এক দ্বীপান্তরিত পাঠান আসামীর ছুরির আঘাতে প্রাণ দেন তিনি ওখানে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ো "স্যাড্ল পীকের" গম্ভীর সৌন্দর্য দেখতে হ'লে আপনাকে যেতে হবে অনেক দূরে। পোর্টব্লেয়ার থেকে ৭০।৮০ মাইল দূরে মায়াবন্দর। 'আন্দামানের দ্বিতীয় সহর।' সরকারী ষ্টীমার "চলুঙ্গা" ক'রে চলুন সেখানে। সপ্তাহে একবার এটা পোর্টব্লেয়ার থেকে মায়াবন্দর যায়। এই সত্তর আশী মাইল রাস্তা ঢেউয়ের দোলায় যদি কাতর হ'য়ে শয্যার আশ্রয় না নেন তবে আপনার খুব ভাল লাগবে। উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক এই বিশাল সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠে আবার অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো বোটের উপর লাফিয়ে উঠে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মায়াবন্দর যেতে পথে পড়বে লং আইল্যান্ড। এখানে নেমেই যেতে হয় "রংগৎ" উদ্বাস্তু কলোনীতে।

মায়াবন্দর একটি সাধারণ ব্যবসা কেন্দ্র। এখান থেকে ষ্টীম বোটে খাড়ির ভেতরে বেড়াতে গেলে আর একটি নতুন দিক দেখা হবে আন্দামানের। খাড়ির ভেতরে যেতে আকাশ ছোঁয়া স্যাড্ল পীক দেখে হঠাৎ আপনার মনে হবে বিশাল একখন্ড জমাটবাঁধা মেঘ। এটিই আন্দামানের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ো। অনেক দূর পর্যন্ত খাড়ির দু'পাশে ম্যানগ্রুভ গাছের সারি জলের নীচ থেকে উঠে জলের উপর দিয়ে ডালপালা মেলে আছে। তারই নির্জন ছায়াঘন পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখবেন একটি বাঁশের তৈরী নড়বড়ে জেটী। এই জেটী উদ্বাস্তু কলোনীর লোকদের যাতায়াতের জন্য। একটু কষ্ট করে ওখানে বোট থেকে নেমে খানিকটা গেলে হঠাৎ শ্যাম অরণ্যের ছায়ায় ঘেরা উদ্বাস্তুদের ঘরগুলো মনে করিয়ে দেবে তাদের ফেলে আসা পূর্ব-বাঙলার গ্রামগুলোকে। আবার নতুন মাটীতে ধীরে ধীরে মনের শিকড় বসিয়েছে
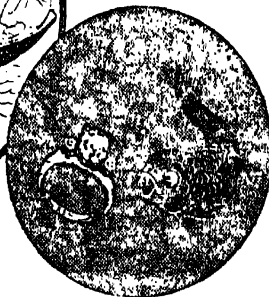
তারা। একদিন যা' ছিল শুধু হরিণ ও বুনো শুয়োরের বিচরণক্ষেত্র আজ মানুষের হাতের ছোঁয়ায় তাই হয়েছে লক্ষ্মীস্বরূপা।

ওখান থেকে বেরিয়ে আবার স্টীমবোটে উঠে আরও একটু গেলে খাড়ি থেকে বেরিয়েই একটি ছোট্ট দ্বীপের আকর্ষণ এড়িয়ে আসা মুস্কিল। ঐ 'সাউন্ড' দ্বীপের ছোট্ট বীচ্‌টিতে নেমে নিশ্চিন্তে স্নান করতে পারবেন যে কেউ, ঢেউ নেই একেবারেই আর হাঁটু জল অনেকটা পর্যন্ত। ভয় নেই, মনুষ্যবসতিহীন এই দ্বীপে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাঘ সিংহ আসবে না এগিয়ে। শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন এই আশ্চর্য দ্বীপপুঞ্জের কোথাও কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই বললেই হয়। শূকর ও হরিণ একমাত্র বন্যজন্তু, বিষধর সাপও খুব কম কিন্তু এখানকার মস্ত বড় বড় বিছাগুলোকে ভয় করে না এমন লোক কম আছে, ওগুলোর স্থানীয় নাম "কান খেজুরা"।

যাহোক জনমানবশূন্য এই দ্বীপে আপনার আতিথেয়তার ত্রুটী হবে না। সুস্বাদু নারিকেলের সুমিষ্ট জল পান করে তৃপ্ত হ'তে হাতছানি দিয়ে ডাকছে অজস্র ফলভারাক্রান্ত নারিকেল গাছ। এই সুন্দর বীচ্‌টির স্মৃতি মনে গেঁথে থাকবে অনেকদিন। ঘনসন্নিবিষ্ট ম্যানগ্রুভের শাখাকে আন্দোলিত ক'রে আপনার বোট আবার ফিরে আসবে মায়াবন্দরে।

মায়াবন্দর থেকে ফিরে চলুন পোর্টব্লেয়ারে। এবার পোর্টব্লেয়ার থেকে পঁচিশ তিশ মাইল দূরে পর্যন্ত উদ্বাস্তু কলোনীর মধ্য দিয়ে যে পীচ বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে এঁকে বেঁকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে চলুন। পোর্টব্লেয়ার শহরের আট দশ মাইল দূর থেকে সুরু হ'ল উদ্বাস্তুদের বসতিগুলো। এই রাস্তা দিয়ে সরকারী বাসও যাতায়াত করে। এই রাস্তায় মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি কলোনীগুলিতে আপনার ভাল লাগবে দেখে যে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এসে আজ ওরা আবার পেয়েছে মাটীর স্পর্শ, নতুন উদ্যমে বেঁধেছে ঘর। গৃহস্থের প্রাঙ্গণে সবজির বাগান, ঢেঁকিঘর, ধানের গোলা, গৃহকোণে লক্ষ্মীর আসন যেন বাঙলার গ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। এইসব বসতির যেখানে শেষ, সেখান থেকে দূরে ঐ কালো বনরেখার ৫০ গজের মধ্যে যাবেন না যেন ভ্রমণের নেশায়। আন্দামানের আদিম বন্যজাতি জারোয়াদের নিক্ষিপ্ত তীরের হাত থেকে রক্ষা নেই তা'হলে। ঘাবড়াবেন না, এখানে আপনি নিরাপদ, কারণ এখান থেকে ওদের আবাস অন্তত মাইল চারেক হবে। তাছাড়া নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর সরকার থেকে জারোয়া অঞ্চলের কাছে বুশ পুলিশের ঘাঁটি বসানো হ'য়েছে।

এই আদিম জাতি লোকালয়ে বিশেষ আসে না। জঙ্গলের আড়াল থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য তীর মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কোন অজ্ঞাত কারণে মানুষকে মনে করে এরা শত্রু। এদেরই আর একটি শাখা, নাম তাদের "ওঙ্গী", এরা কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন। প্রাচীনতম মানবের একটি নিদর্শন এই অঙ্গীদের বাসভূমি পোর্টব্লেয়ার থেকে ৬০ মাইল দূরে "লিট্‌ল্‌ আন্দামান" নামে একটি দ্বীপে। এদের না দেখলে আপনার আন্দামানের সবচেয়ে বড় বিস্ময়কেই দেখা হবে না। নিকষ কালো গায়ের রঙ, প্রায়নগ্ন এই আদিম মানুষরা আগুন পর্যন্ত জ্বালাতে জানে না। কোন্ যুগ থেকে আগুন সংরক্ষণ করে আসছে। দলবদ্ধ হ'য়ে একটি ঘরে বাস করে অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে। বনে সমুদ্রে শিকার ক'রে দলের সবাই ভাগ ক'রে খায় এরা। অকূল সমুদ্রে নিজেদের তৈরী নৌকো করে বিচরণ করে অনায়াসে। জন্ম থেকে জল ও জঙ্গলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। সদাহাস্যমুখ শান্ত এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনটিকে না দেখলে আন্দামান দেখা আপনার সম্পূর্ণ হবে না।

একদিন যদি সকালে মেরিণ জেটী থেকে একটি ফেরী বোটে চ'ড়ে বসেন তবে প্রথমে পানি-ঘাট, ব্যাম্বুফ্ল্যাট, তারপর ক্রমে ভাইপার, মিঠা-ঘড়ি প্রভৃতি নানান ঘাট ঘুরে আবার বেলা ১১টা নাগাদ ফিরে আসতে পারবেন মেরিণ জেটীতে। এই ট্রিপ ভারী উপভোগ্য। ভাইপার দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন আপনাকে মুগ্ধ করবে তেমনি ভয়াবহ এর ফাঁসী মঞ্চটি। আগেকার দিনে দ্বীপান্তরিত আসামীদের মধ্যে যারা বিপজ্জনক বলে গণ্য হ'ত তাদের এই দ্বীপে আলাদা ক'রে রাখা হ'ত এবং ফাঁসী
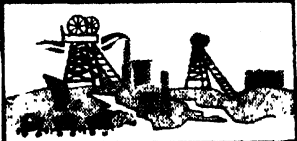
নেওয়া হ'ত এই মঞ্চে। এখনো ফাঁসী মঞ্চটি দেখলে আতঙ্ক হয়।

ব্যাম্বুফ্ল্যাটে নেমে চার পাঁচ মাইল জঙ্গলের দিকে গেলে পাবেন উইম্বার্লিগঞ্জ, এখানকার লোকের মুখে যার চলতি নাম "বিমলিগঞ্জ"। আদিম অরণ্যের সৌন্দর্য যদি দেখতে চান তবে আরও এগিয়ে চলুন। ঘন জঙ্গল পর্যন্ত ট্রলি লাইন চলে গেছে যেখানে বড় বড় গাছ কাটা হয়। সেইখানে সুশিক্ষিত হাতীরা কেমন ক'রে গাছের মস্ত মস্ত গুঁড়ি টানিতে বোঝাই করছে শুঁড় দিয়ে দেখতে ভারী মজার। যেতে রাস্তার দু'পাশে প্যাডক, গর্জন ইত্যাদি অসংখ্য গাছের সার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর রাস্তার ধারে দেখতে পাবেন পি সি রায় কোম্পানীর রাবার প্ল্যান্টেশন। সারি সারি গাছের রস থেকে রাবার নিষ্কাশিত হচ্ছে।

সমুদ্র থেকে অসংখ্য খাড়ি এসে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রেছে অনেক দূর পর্যন্ত। এই অপ্রশস্ত অথচ গভীর খাড়িগুলোর মধ্যে নৌকো বা লঞ্চে ক'রে আপনি মাইলের পর মাইল যেতে পারেন নির্ভয়ে। নিবিড় ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই ভ্রমণের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। যেতে যেতে দেখবেন অসংখ্য কাঠের গুঁড়ি একত্র বেঁধে ভেলার মত ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ক'রে স্রোতের টানে আপনিই তারা পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থলে।

বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব দুর্গাপুজো দেখা হ'ল না ব'লে মন খারাপ করার কোনই কারণ নেই। ষষ্ঠীর দিন ভোরে ঘুম ভেঙে চিরপরিচিত ঢাকের বাজনা আপনার কানে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা বয়ে আনবে। পোর্টব্লেয়ারে সার্বজনীন দুর্গোৎসব খুব ঘটা ক'রেই হয়। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই যোগদান ক'রে সার্থক ক'রে তোলে এই উৎসব।

উদ্বাস্তু কলোনীগুলোতেও দুর্গোৎসব হয়। বেশীর ভাগই চাষী পরিবার, কুমোর কোথায় পাবে? প্রতিমা হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, উপচার হয়তো সামান্য কিন্তু সব ত্রুটীই তারা সেরে নেয় ভক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে। পুজো প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী যাত্রা, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদি চলে। বাংলার এইসব অতুলনীয় সম্পদকে এত প্রতিকূল অবস্থায়ও এরা হারিয়ে ফেলেনি।

তারপর বিজয়া দশমীর দিনে বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে শহরের নানা রাস্তা পরিক্রমার পর সমুদ্রের ধারে এবার্ডিন জেটীতে প্রতিমা নিয়ে আসা হয় নিরঞ্জনের জন্য। শহরের কাছাকাছি উদ্বাস্তু কলোনী মংলুটন, বৃন্দাবন ইত্যাদি থেকেও প্রতিমা আসে এখানে। ঢাকের বাজনাতে বিদায়ের সুর পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। দলে দলে লোক জমায়েৎ হয় এসে সমুদ্রের ধারে। মোটামুটি আন্দামান দেখা আপনার শেষ হ'ল। এর পরে আছে নিকোবর দ্বীপমালা ৯০ মাইল দক্ষিণে, এটাকে পরের বারের জন্য রেখে দিন। এবার জাহাজ ফিরবে আবার ক'লকাতার দিকে। পোর্টব্লেয়ারের খাড়ি থেকে ধীরে ধীরে জাহাজ বেরিয়ে আসবে উন্মুক্ত সাগরে। তারপরও কিছুক্ষণ হরিৎশোভাময় দ্বীপমালার পাশে পাশে চলবে আপনার জাহাজ। তারপর একসময় দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবে এই নীল তটরেখা।

কিন্তু অনেকদিন পরেও আন্দামানের উদা[illegible] উন্মুক্ত আকাশ, সুউচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, নিবি[illegible] অরণ্যানী, ঘননীল সমুদ্র এবং তারই ধারে ধা[illegible] সবুজের সমারোহ আপনাকে টানবে এক দু[illegible] আকর্ষণে। অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভা[illegible] আন্দামান চিরদিনই আপনার মনের পটে অম্লা[illegible] হ'য়ে থাকবে।

চেনাবে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যে সন্ধ্যাকে বুনে গেলাম এই এ মাঠ ছেয়ে—
সে সন্ধ্যা কি গুল্মলতায় উঠবে গান গেয়ে?
দল বেঁধে মেঘ চল হয়েছে হ্রদের তীরে তীরে,
কুঞ্জ ভরে মঞ্জু গোলাপ গন্ধ পেল ফিরে?
ঝেলাম কবে মিলিয়ে গেছে নাগিন সরোবরে,
চার চিনারের ছায়ায় জাগে উইলো থরে থরে।
শিকারাদিন স্বপ্ন নবীন জল ভেঙে সে চলে,
কুয়াশারও কুন্ঠা যেন আপেল গাছে টলে।
সূর্যমুখীর ছন্দ নিয়েই নাসিমবাগের পথ
সূর্যনাটে চেনাবে সুরমা পর্বত!

একবার

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

শরীর খারাপ। আজ ছ-বছর ধরে দুবেলাই দই-ভাত খান। এর পনেরো বছর বাসে কোলা-পুরে যোশীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে-ছিলুম—তখনো সে দই-ভাত খেয়ে চলেছে।

যোশীর ভারি তিরিক্ষি মেজাজ। একবার যদি বলে এ আলোতে আমি ছবি তুলব না তাহলে তাকে দিয়ে আর কাজ করানো সম্ভব ছিল না। সূর্যের ওপর মেঘের আবরণ পড়লে আমাদের শেঠ যমুনাপ্রসাদ গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়তেন।

প্রতিদিন তাঁকে বাবার কাছে হিসেব দিতে হতো—কত ফুট কাজ হয়েছে। যমুনার বাবা ছিলেন মস্ত উকিল। গরমের চোটে লোক মরে যাচ্ছে, রোদের চোটে কাঠ ফাটছে—সেখানে রোদের অভাবে ছবি তোলা হয়নি একথা তিনি বিশ্বাসই করতে চাইতেন না।

যমুনাপ্রসাদ গালে হাত দিয়ে হতাশ হয়ে আকাশের দিকে চাইত আর আমাদের জিজ্ঞাসা করত—আরে ভাই, আচ্ছা বলতো ঐ মেঘটা সরতে কতক্ষণ লাগবে! একটুখানি খোলা রোদের আভাস পেলে যমুনা ব্যাকুল করে লাফ দিয়ে উঠে বলত—আরিয়া—আরিয়া—আরিয়া অর্থাৎ কিনা "আ রহা হ্যায়।" কিন্তু তখুনি হয়তো আবার আর একটা মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললে—আর অবাক হয়ে যমুনাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল।

একদিন এই রকম চলেছে—যমুনাপ্রসাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা কতক্ষণে রোদ খুলবে বলতো—

আমি বললুম—শেঠ, এক কাজ করুন—এক্ষুনি মেঘ সরে যাবে। এক ডজন বীর (বিয়ার) আর এক বোতল হুইসকি মানত করুন—

যমুনাপ্রসাদ চোখ বড় বড় করে বললে—সত্যি বলছ?

বললুম—করেই দেখুন না।

যমুনাপ্রসাদ বললে—কুছ্ পরোয়া নেই। তারপর আকাশের দিকে হাত জোড় করে আবার বললে—হে মেঘ, তুমি আর সূর্যকে ঢেকো না, তোমাকে এক ডজন বিয়ার ও এক বোতল হুইস্কি দেবো।

আশ্চর্যের বিষয় মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মেঘ সরে গেল ও পুরোদমে আমাদের কাজ সুরু হলো। বলা বাহুল্য, যমুনা তার মানত রক্ষা করেছিল।

আর একদিনের কথা। আমাদের ছবির যিনি নায়িকা তিনি ছিলেন একটি ফিরিঙ্গি মহিলা। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই জানাশোনা ছিল—এমনকি বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারা যায়।

একবার একটি থিয়েটার কোম্পানী নিয়ে ভারতবর্ষে পরিক্রমা করতে বেরিয়েছিলুম। এরা তিন বোন ও মা আমাদের সঙ্গে ছিল। পুণাতে গিয়ে আমরা প্রায় সকলেই দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। তখন তারা অক্লান্ত সেবা করে আমাদের সুস্থ করে তুলেছিল। আর একবার নিদারুণ অর্থ-সংকটে পড়ে আমরা প্রায় অনশনের সম্মুখীন হয়েছিলুম। এই রকম সুখ-দুঃখের দিন এক-সঙ্গে কাটিয়ে তারা আমাদের বন্ধুই হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন আমাদের কাজ হচ্ছিল—সরিফুন্নিসা (তখনও সে আনারকলি হয়নি) পারস্য না আফগানিস্থান —কোথা থেকে ভারতবর্ষে আসছে। এক জায়গায় রক্ষী দল একটু পিছিয়ে পড়েছে—এমন সময় মরুভূমির কুখ্যাত দস্যু কোহ্-ই-দমন ঘোড়ায় চড়ে এসে সরিফুনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে রক্ষিদল এসে কোহ্-ই-দমনকে গুলী করে মেরে ফেললো।

এখন গতকাল ছিল রবিবার। সেদিনে সমস্ত দোকান বন্ধ। বাজারে কোনো জায়গায় ফাঁকা কার্তুজ পাওয়া গেল না। সর্বকর্মে উৎসাহী শেখুপুরা বললে—কুছ পরোয়া নেই
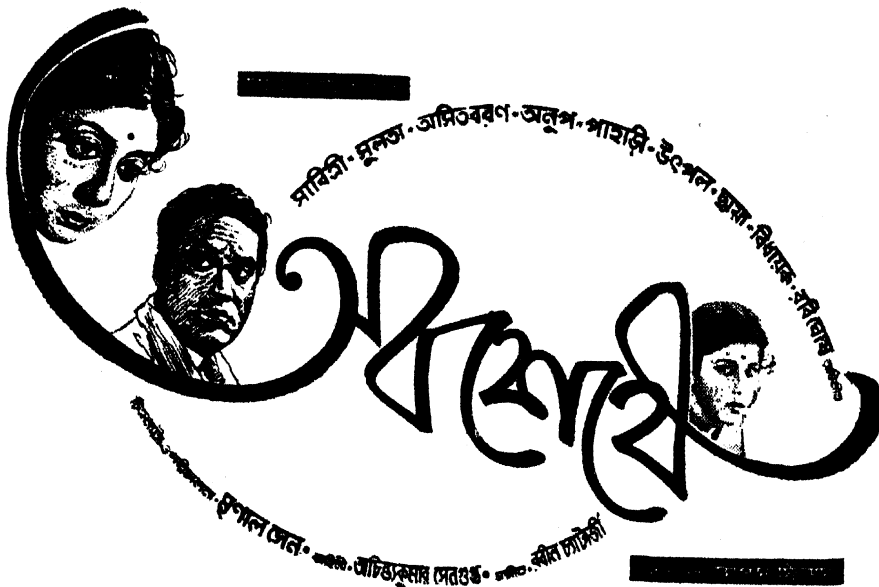
আমাদের বাড়ীতে যে সব কার্তুজ আছে তার থেকে গ্লী ছররা ইত্যাদি বার করে নিয়ে ক্যাপটা রেখে দিলেই তাতে আওয়াজ হবে। এই রকমই আটটা দশটা কার্তুজ খালি করে সে তাদের চার-পাঁচজন সেপাইকেও নিয়ে এল অভিনয় করবার জন্যে।

আমি একটু দূরে বসে ছবির বিবরণ লিখছিলুম, এমন সময় আমাদের নায়িকার মা আমার পাশে এসে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখ তোমরা যে ঐগুলি ছুঁড়বে—সেগুলো যথার্থ ফাঁকা তো।

বললুম—নিশ্চয়ই। তা না হলে আপনাদের মেয়েকে বুলেট মেরে আমাদের কি লাভ?

অভিনয় আরম্ভ হলো। আনারকলি কয়েকজন লোকের সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগলেন। রক্ষিদল পেছিয়ে পড়েছে। ইতি-মধ্যে কোহ্-ই-দমন কয়েকজন লোক সঙ্গে করে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করল। আনারকলিকে টেনে নিয়ে তারা তাকে ঘোড়ার ওপর তোলবার ব্যবস্থা করছে এমন সময়ে রক্ষিদল এসে গুলী চালালে। একটা-দুটো গুলী চলতেই আমাদের নায়িকা আকাশের দিকে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠল—

O, mummy, I am hart।

এক ঝলক দৃষ্টির দহনে আমাকে প্রায় ভস্ম করে দিয়ে মাম্মি তো চীৎকার করতে করতে মেয়ের দিকে ছুটলেন। মেয়ে তো তখন অজ্ঞান। হায় কি হলো—হায় কি হলো—করতে করতে সবাই সেদিকে ছুটলো।

হাসপাতাল—হাসপাতাল—গাড়ী—ইত্যাদি চীৎকার করতে করতে লোকজন একখানি যা গাড়ী ছিল—কারণ সে সময় সব গাড়ী গিয়েছে খাবার আনতে—তাতেই উঠে মা আর তিন বোন কাঁদতে কাঁদতে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে হাসপাতালের দিকে ছুটলো। আমাদের বিল্টুচরণ তাদের সঙ্গে গেল।

ব্যাপার দেখে মাঠশুদ্ধ লোক হতভম্ব। যমুনাপ্রসাদ ও শেখুপুরার মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি। শেখুপুরা বেচারী বন্ধুর সাহায্য করতে সেই ভোর পাঁচটা থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। তারই যে এই পরিণাম হবে সে কল্পনাও করতে পারেনি।

সে বার বার বলতে লাগল—ভেইয়া, ভেইয়া—আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি ওগুলোর ভেতরে একটারও ছররা ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে শহর থেকে গাড়ীতে আমাদের খাবার চলে এলো। কেউ খেলে—কেউ খেলে না। বেলা তিনটে নাগাদ আমরা আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। কাজকর্মের শেষে রোজই আমরা সকলেই সর্দখানায় এসে বসতুম। সেখানে কিছুক্ষণ জটলা হতো—তারপর যে যার বাড়ীর দিকে চলে যেতুম।

সেদিন ফটক পেরিয়ে গাড়ী প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকতেই দেখি বৈঠকখানার ঘরে আমাদের নায়িকা, তাঁর ভগ্নীরা এবং মাতুঃশ্রী বসে আছেন। নায়িকার পিঠে প্রকাণ্ড একটা ব্যাণ্ডেজ। মাতুঃশ্রী আমাকে দেখেই বললে—দেখ, কি করেছ তোমরা?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরো অনেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—হাসপাতালে গিয়েছিলে নাকি?

সে বললে—হাসপাতালে গেলে এতক্ষণে তোমাদের সবার হাতে হাতকড়ি পড়ে যেতো। পিঠে আঘাত লেগেছে—আমি নিজেই ব্যাণ্ডেজ করেছি।

ইনি নার্সের কাজও জানতেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—যমুনাপ্রসাদ কোথায়?

সে বেচারী ভয়ে পেছিয়েছিল। ডাক পড়তেই এগিয়ে এলো। যমুনাপ্রসাদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হতে লাগল। এক শেখুপুরা ছাড়া আমরা সকলেই সেখান থেকে চলে এলুম। সন্ধ্যে নাগাদ শুনলুম তারা খেসারতস্বরূপ হাজার টাকা নগদ আর এক মাসের ছুটি পেয়েছে।

আমাদের বিল্টুচরণ খবর শুনে বললে—সব ব্যাপারটাই যোগসাজসে আগাগোড়া ঠিক করাই ছিল। আমি নিজে দেখেছি—কিসসু হয়নি। পিঠের একটা জায়গা একটুখানি লাল হ'য়ে রয়েছে। খুবসম্ভব ক্যাপ ছিঁড়ে এসে সেই কাগজ খানিকটা এসে লেগেছিল পিঠে।

যাইহোক, তারা তো সেই রাত্তিরেই ড্যাং

ভ্যাং ক'রে কলকাতায় চলে গেল; আর আমরা লাহোর কেল্লার মধ্যে কাজ সুরু করলুম।

যমুনাপ্রসাদের অন্য এক বন্ধু এই কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। সে ছিল বিরাট ধনীলোক—আমাদের শেখুপুরার চেয়েও অনেক—অনেক বেশি ধনী। সে প্রায়ই রাত্তিরে আমাদের খাবার নেমন্তন্ন করত। নেমন্তন্নর সঙ্কেত ছিল—ভেইয়া—আজ গুলিকা রোগন-জুস।

ব্যস, আমরা বুঝে নিতুম ব্যাপার কি! সন্ধ্যের একটু পরেই পাঁচ ছজন তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হতুম। খেতে বসবার আগেই জারকরস আকণ্ঠ পান ক'রে খানিকটা হৈ-হুল্লোড় ক'রে খেতে বসতুম। সত্যিই—তার ওখানে গুলির রোগনজুস চমৎকার তৈরী হতো।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে তার প্রকাণ্ড মাস্টার বুইক বার করতো। তাতে আমরা পাঁচ-ছয়জন চড়তুম। চালক থাকত পাশে বসে আর সে নিজেই চালাত। ঘণ্টায় প্রায় সত্তর আশি মাইল বেগে গাড়ী ছুটে চলত। গ্রীষ্মের রাত্রে ঐ আহার্যের পর বড় আরামবোধ হতো। মনে হতো—এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না—

শহর ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটতো সেই শালামারবাগের দিকে—শহর থেকে প্রায় পাঁচ ছ'মাইল দূরে একটা অন্ধকার জায়গায় এসে থামতো গাড়ী। অতঃপর খানিকটা অন্ধকার পথ চলে এক অন্ধকার উঁচু-নিচু ভাঙা বাড়ীর মধ্যে দিয়ে একটু সরু গলিপথ—সেই পথ ধরে আরো খানিকটা চললে পাওয়া যেতো একটি নতুন একতলা বাড়ী।

বাড়ীর দরজায় এসে সে ঘা দিত। কিছুক্ষণ বাদেই একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিত। তার পিছু পিছু আমরা একটা মাঝারিগোছের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হতুম।

বৃদ্ধা সতরঞ্চির ওপরে একটা ময়লা চাদর পেতে দিয়ে আমাদের বসতে বলতো। আমরা জুতোশুদ্ধই সেই সতরঞ্চিতে বসে পড়তুম। তার কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসতো আর একটি প্রৌঢ়া—ইজের-কুর্তা পরা। প্রৌঢ়াকে দেখে মনে হতো এককালে সে সুন্দরীই ছিল। আমাদের সেলাম করে সে আমাদের সামনেই বসে পড়ত আর বন্ধুর সঙ্গে তার পাঞ্জাবী ভাষায় কথাবার্তা চলতো। এই কথাবার্তার একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই প্রৌঢ়ার কাছে আমাদের রেখে বন্ধু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতো। প্রৌঢ়া উর্দু ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপচারি করতো—আমাদের ছবির কথা, কলকাতার কথা, লাহোর কেমন লাগছে, পাঞ্জাব কেমন লাগছে—ইত্যাদি।

এরই মধ্যে বন্ধু দুটি অপূর্বসুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরতো। একটির বয়স বছর কুড়ি-একুশ আর অন্যটির বয়স ষোলো-সতেরো। বড়টি ছিল অপূর্ব সুন্দরী; ছোটটি অত সুন্দর নয়। বড়র মুখখানা আজও মনের মধ্যে ঝকঝক করে।

কি রকম সুন্দর সে ছিল—তার বর্ণনা দিতে আমি পারব না। নাক মুখ চোখ আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিয়ে সে সৌন্দর্যকে মেপে দেখানো যায় না। তারা এসে আমাদের সেলাম ক'রে বসে পানদানিটা টেনে নিয়ে পান সাজতে বসতো। এক এক খিলি ক'রে আমাদের পান দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতো। আমাদের বন্ধু কোনো কোনোদিন বলতো—এদের সঙ্গেও আলাপ করো—

তখন তারা চোস্ত উর্দু ভাষায় আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতো। তারপরেই হতো গান। এক একজন দাঁড়িয়ে গান গাইতো—না সারেঙ্গী না তবলা অর্থাৎ কোনো সঙ্গত থাকতো না। গান হতো পাঞ্জাবী গান—তার একবর্ণও আমরা বুঝতে পারতুম না।

তাদের পোষাকও ছিল বাহুল্যবর্জিত—একটা শাদা শালোয়ার, হাঁটু অবধি ঝুল কুর্তা আর একটা ক'রে চাদর।

সন্ধ্যাবেলার জারকরস রোগনজুসকে জীর্ণ ক'রে কখন চলে গিয়েছে তা টের পেতুম না। রূপের নেশায় ভরপুর হ'য়ে বাড়ীতে এসে শুয়ে পড়তুম।

আগেই বলেছি আমাদের বিশুচরণ সেখানকার লোকজনের সঙ্গে তেমন মিশতে পারতো না। কাজকর্ম সারা হ'লেই দিন থাকতে থাকতেই সে বাড়ীতে ফিরে আসতো। বাড়ীতে

ফিরে এসে চানটান ক'রে ছাতে শ্যুয়ে থাকতো।

আমার ঘরে ফার্ণিচার হিসেবে কর্তৃপক্ষ একটি ছোট টেবল-হারমোনিয়াম রেখেছিলেন। একদিন সেটাকে বাজাবার চেষ্টা ক'রে দেখি দুই বেলোতে বিরাট বিরাট ছিদ্র—ক্যাঁ কোঁ থেকে ভোঁস ভোঁস আওয়াজই তার থেকে বেশি বেরোয়। একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি দুই বন্ধুপত্নীর একজন প্রাণপণ চেষ্টায় সেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন আর অন্যজন চিল্ল-চীৎকার করে গান গাইবার চেষ্টা করছেন। আর তাঁদেরই সামনে শকুন্তলা বসে সাশ্রুনয়নে সেই গান শুনছে।

আমরা আসতেই বান্ধবীরা তো গা-ঢাকা দিলেন। শকুন্তলা উঠে এসে আমাকে বললে—রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছিল। আহা—কি অপূর্ব সুর আর গান! কথা বুঝতে না পারলেও মনের মধ্যে ভাবের আবেগ এসে পড়ে!

শকুন্তলার চোখ দুটো দেখলুম অস্বাভাবিক লাল আর তাতে জল ডব ডব করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

শকুন্তলা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—জানো, আজ আমরা একটা খুব ভালো জিনিষ খেয়েছি। আমি এবার থেকে রোজ এই জিনিষ খাবো। আমার কি মনে হচ্ছে জানো—

বললুম—না, কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে আমি যেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি—আমি যেন স্বর্গে গিয়েছি—ওঃ, কি অদ্ভুত অনুভূতি—এতটা বয়স আমার বৃথাই গেল—

জিজ্ঞাসা করলুম—কি খেয়েছ বলতো?

শকুন্তলা বললে—বাং—বাং। বিষ্টু রোজ খায়। আমরা তাকে বলেছিলুম—আমাদের একদিন খাইও। তাই সে বেচারী আজ কষ্ট ক'রে বাজার থেকে বাং নিয়ে এসেছিল।

এই বলেই শকুন্তলা তান ধরলো—ট্রা লা লা লা লা—

বললুম—শকুন্তলা, নিজ হিত যদি চাও তাহ'লে ঐ বাং-টাং না খেয়ে আমরাও সন্ধ্যে-বেলা যা খাই তাই একটু ক'রে খেয়ো—সেটা আরো ভালো জিনিষ।

শকুন্তলা বললে—দূর দূর—nothing like বাং।

এই বলে সে একরকম নাচতে নাচতে চলে গেল বান্ধবীদের খোঁজে। আমিও ছুটলুম তার খোঁজে। বললুম—শকুন্তলে, যে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তুমি এতক্ষণ অশ্রুসজল মুখে আকাশে উড়ছিলে সেই রবীন্দ্রনাথ ঐ আমরা যা খাই সন্ধ্যেবেলায়—তার সম্বন্ধে কি বলেছেন জানো—

"শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান।"

তা তোমাকে আমি 'অপরিমাণ' খেতে বলছিনে, পরিমিতই খেয়ো আমাদের সঙ্গে; দেখবে কত মজা পাবে—

শকুন্তলা কিন্তু শুনলে না। সে বলতে লাগল—আমি বাংই খাবো।

যাই হোক্‌, সেদিন তো কেটে গেল; পরের দিন কাজকর্ম সেরে বাড়ী ফিরে দেখি আমার ঘরে শকুন্তলা একলা সেই ভাঙ্গা হারমোনিয়াম বাজাবার চেষ্টা করছে। আমাকে দেখেই সে উৎসাহিত হয়ে বললে—জানো, আজকে আমরা কালকের ডবল ডোজ বাং খেয়েছি। ওঃ—আজ যা মনে হচ্ছে—

মন-মেজাজ বিশেষ ভালো ছিল না। তার কথা শেষ হবার আগেই বললুম—একটু বাইরে যাও দিকিনি—কাপড়চোপড় ছাড়বো—

শকুন্তলা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

সেদিন আর আমরা বাইরে কোথাও যাইনি। ছাতের এককোণে আমরা তিনজনে বসে গল্প-গুজব করছি—কি একটা কাজে নিচে নেমে দেখি—শকুন্তলা সেখানকার খোলা ছাদে একটা তক্তায় বসে আছে আর এক বন্ধুপত্নী তার মাথায় জলের চাপড়া দিচ্ছে—অন্য বন্ধুপত্নী তাকে বাতাস করছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে শকুন্তলা ছুটে এসে বললে—আমাকে বাঁচাও। আমি মরে গেলুম। আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে।

আমি বললুম—কেমন। 'বাং খাও—'বাং'?

শকুন্তলা বললে—ওসব কথা ছেড়ে দাও—আমাকে বাঁচাও—

তাকে ধরে নিয়ে খাটে বসিয়ে দিলুম। বললুম—শুয়ে পড়—

সে বললে—শুতে পারছি নি, শুলে আরও বাড়ছে। তুমি আমার বাবাকে টেলিগ্রাম ক'রে দাও। ও বাবা! তুমি কোথায়!

বান্ধবীরা ইতিমধ্যেই বরফ আনতে দিয়েছিল। তখুনি বরফ এসে হাজির হলো। তাকে শুইয়ে দিয়ে একজন তার মাথায় বরফ ঘসতে লাগল। আর একজন বাতাস করতে লাগল। শকুন্তলা সমানে চীৎকার করে যেতে লাগল—ও বাবা! তুমি কোথায়!

ঘণ্টাখানেক পরে একটু শান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ব্যাপার দেখে বিষ্টুচরণেরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক ডাক্তার ডাকতে হয়নি। সে যাত্রা শকুন্তলা এমনিতেই সেরে উঠল। তবে আমার বিশ্বাস "বাং" সে জীবনে আর খায়নি।

আমরা লাহোর কেল্লা ও শালামারবাগের কাজ আরম্ভ করলুম। লাহোর কেল্লার শিষ-মহল যেমন সুন্দর তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও তেমনি। শিষমহলের ওপরেই পাথরের ট্যাবলেট মারা। এইখানেই রঞ্জিৎ সিংয়ের সঙ্গে ইংরেজ-দের চুক্তি হয়েছিল। এই কেল্লাতেই রঞ্জিৎ সিংকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। কেল্লার একদিকের বাড়ীতে ছোট ছোট ঘর—ঘরের মধ্যে খিলেনের গোলকধাঁধা। একদিকে একটা ঝরোকা, তারই ভেতর দিয়ে একটু আলো আসে। আমি ভাবতুম এইসব ঘরে কারা থাকত! মন চলে যেতো সেই জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে অতীতের কোন্‌ সুদূরে। এইখানে যারা থাকতো তাদের সুখদুঃখের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতুম। কে জানে সেলিম এই ঘরে বাস করত কি না।

কোনো কোনো দিন আমাদের কাজ হতো শালামারবাগে। তিনতলা উদ্যান, অসংখ্য ফোয়ারা ও একটি আবসার অর্থাৎ শিলকোটার মতো খাঁজ কাটা কাটা একটি চওড়া পাথর—তারই গা দিয়ে জল ছাড়া হতো।

এই জলছাড়া অবস্থায় শালামারবাগকে খুব কম লোকেই দেখেছে। আমাদের শেঠেরা পয়সা খরচ ক'রে এই জলছাড়ার ব্যবস্থা করতেন ভালো ছবির জন্য। আবসারের গা দিয়ে যখন জল ঝরতো তখন মনে হতো যেন ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে!

চৈত্র মাসের শেষে আমরা কাজ আরম্ভ করেছিলুম—দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এসে পৌঁছলুম। আকাশে মেঘের দল ভীড় করতে লাগল। লাহোরের পরে আমাদের দিল্লী যেতে হবে—সেখানে মাস দুয়েকের মতো কাজ ছিল।

ক্রমে লাহোর ছাড়বার সময় উপস্থিত হলো। তিন চারটি বন্ধু আমাদের সঙ্গেই দিল্লী চললেন। আর একজন যেতে পেলে না, কারণ তাকে লাহোর ছাড়তে হ'লে সরকারের অনুমতিপত্র নিতে হতো। সে সময়মত দরখাস্তও করেছিল কিন্তু সরকার অনুমতি দিলেন না। বিদায়ের সময় সেই বন্ধু আমাদের হাত ধ'রে কাঁদতে লাগলো।

এবারকার এই শহরে আমাদের অবস্থান-কালে আমরা কয়েকটি বন্ধুরত্ন লাভ করে-ছিলুম—তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লোকই ছিলো। এদের সঙ্গ লাভের লোভে বারে বারে নানান ছুতোয় পাঞ্জাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আগের মতনই নিবিড় সঙ্গলাভ করে মুগ্ধও হয়েছি। তারাও এখানে অনেকবার এসেছে। আনন্দে আমাদের দিনগুলি কেটে গেছে। এদের মধ্যে কবি ছিল, সম্পাদক ছিল, তাছাড়া আরো নানান ব্যবসায়ের লোক ছিল। বিদায়ের সময় নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছি। তখনো বুঝতে পারিনি আমাদের সেই আলিঙ্গনের মধ্যে দুর্লংঘ্য ব্যবধান রচিত হচ্ছে। দেশ বিভাগের পর মুসল-মান বন্ধুদের কোনো খবরই আর পাইনি। হিন্দু বন্ধুদেরও অধিকাংশেরই খবর পাইনি। দু'এক-জনের কথা শুনেছি—তারা ছন্নছাড়ার মত জীবন কাটাচ্ছে।

ধ্যানেরি ধন

শ্রীনমিতা চক্রবর্তী

আজ শ্রাবণে তোমার বীণা
মুখর হয়ে বাজে।
শুনি, আমি শুনি শুধু
তোমার মহিমা যে।
ওগো আমার ধ্যানেরি ধন
তাই তোমারে চাই অনুখন
নূতন রূপে দাও গো দেখা
সাজো নূতন সাজে।।
ঐ কাননে কদম তলায়
বৃষ্টি ঝরে মুক্তা ধারায়
ময়ূর নাচে কিসের আশায়
কার সে সোহাগ যাচে।
আকাশে মেঘ গরজনে
কোন্ বিরহীর পত্র আনে
তোমার দেওয়া মধুর ব্যথা
মোর হৃদয়ে রাজে।।

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক লিখিত ও প্রাপ্ত পত্রগুচ্ছ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

যে আপনার আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি বিবরণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কথাটি বহুদিন পূর্বে ভাগলপুরে পূজনীয় রামতনুবাবুর সহিত জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাশয়ের তর্ক। যে ঘেঁটু পুষ্পের কথা বলিয়াছি তাহা সেবক প্রণীত একখানি কৌতুক নাট্য, নাম "একাকা"র— উদ্দেশ্য জাতিভেদ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।

ক্ষুদ্র নাটকের মধ্যে সংসারের অতবড় একটা কথার বিস্তার শুরু ও শেষ মীমাংসা অসম্ভব। বিশেষতঃ নাট্যশালার অধ্যক্ষতা আমার কার্য, অভিনয় আমার নাটকের প্রথম প্রয়োজন। প্রায়ই আমাকে অতি শীঘ্র লিখিতে হয়। এমন কি এক এক দৃশ্য লিখিয়াই অভিনয় শিক্ষার জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রেরিত হয়। অভিনয়ও একপ্রকার প্রচার সুতরাং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচার করিবার সময় অভিনীত পুস্তকের প্রায়ই কোন পরিবর্তন করা হয় না। আমি কিছু স্বভাবতঃ চপল, পক্ককেশ ও হস্তপদাদিকে সম্পূর্ণ স্থির করিতে পারি নাই—তাই প্রুফ দেখিতে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। এইসব কারণে অনেক মনের কথা "একাকারে" খুলিয়া বলিতে পারি নাই যাহা কিছু হইয়াছে আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল, বোধহয় এ ইচ্ছার সঙ্গে একটু আত্মশ্লাঘা হৃদয়ে অজ্ঞানিতভাবে লুক্কায়িত আছে। বহুদর্শনে আপনি এক প্রকার অন্তর্যামী হইয়াছেন অবশ্যই মনোভাব কার্যে বুঝিতে পারিবেন।

যদি কখন আবার বৈদ্যনাথধামে যাওয়া অদৃষ্টে থাকে তবে দুই দেবতাকে প্রণাম করিয়া জনম সফল করিয়া আসিব। এক্ষণে যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া অনুমতি করেন তবে সমাজ, সংসার, বা মনুষ্য হৃদয় লইয়া আমার আর যে ২।৩ খানি নাটক আছে শ্রীচরণোদ্দেশে প্রেরণ করিব।

ইতি—২২শে জ্যৈষ্ঠ
১৩০২ সন

দেবেন্দ্র পদে বিমোহিত
সেবক অমৃতলাল বসু

হারানো ঠিকানা

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

গোতম একথার উত্তর দিতে পারল না।

গোতম শুধু ওর ওই কাঁচের মত চোখের দিকে চেয়ে থাকল।

অতঃপর ড্রাইভারের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এইভাবে কথা চালিয়ে যেতে লাগল ওরা।

'আমি ভাবতেই পারিনি আজো তুমি—'

'কী যে বল গোতম। জীবনের প্রথম ভালবাসা কি ভোলবার?'

'আশ্চর্য! সতেরো বছর কেটে গেছে।'

'দিন তো এই ভাবেই ছোটে। কিন্তু দেখ, মনে হয় কি আমিও ছুটছি, আমার বয়েস হচ্ছে? হয় না। শুধু মনে হয় দিনগুলো আমার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, গড়িয়ে যাচ্ছে। আমি যা ছিলাম তাই আছি।'

'আমি কিন্তু ভাবতাম তুমি কবে আমাকে ভুলেটুলে গেছ।'

'কেন? তাই বা ভাবতে কেন? তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে? বল, ভুলে গিয়েছিলে আমায়?'

'উত্তর দেওয়া শক্ত। বোধ হয় না।'

'তার মানে ধরে নিয়েছিলে আমার চাইতে নিজে অনেক বেশী হৃদয়বান। কেমন?'

'হয়তো কিছুই ধরিনি। অ-ধরাকে নিয়ে কে আর কি ধরতে যায় বল?'

আরও কথা। ছোট ছোট কথা। অর্থহীন কথা।

কোনটা অস্ফুট, কোনটা উচ্ছ্বসিত।

'মেমসাহেব!'

চমকে উঠল অবন্তী। ড্রাইভার নির্দেশ চাইছে। আর কোনও দোকানে যেতে হবে, না বাড়ীতে?

'না না, এখন আর দোকানে নয়', অবন্তী বলে 'গঙ্গার ধারে নিয়ে চলতো। কি বল গোতম, সেই আউটরাম ঘাটের ওখানে চক্কর মেরে—'

আউটরাম ঘাট। যেখানের ধূলিকণায় হয়তো আজও তাদের কথাগুলো বিলীন হয়ে আছে। গিয়ে দাঁড়ালে চিনে ফেলবে। কথা বলবে। 'এই তো তারা!'

কথা! কথা!
অজস্র কথা অবন্তীর।
তারপর কি করলে বল?
তারপর কি ভাবলে বল?

গোতম এই স্রোতের মুখে পড়ে ভেসে যাচ্ছে। হয়তো নিজের ভিতরে একেবারে গভীর স্তরে যে কথা নিজের অগোচরে ছিল, সেই কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার নিজেরই কাছে। হয়তো অবন্তীর এই ব্যাকুলতায় নতুন 'কথা' সৃষ্টি হচ্ছে।

তবু—

সময়ের সীমা একেবারে লঙ্ঘন করা যায় না।

ফিরে আসতে হয়। আর ফিরে আসার সময় সহজ হয়ে আসে অবন্তী।

বলে, 'মেয়ের বিয়েতে আসতে হবে কিন্তু। 'না' বললে চলবে না।'

'তা' পরিচয়টা কি?'

'পরিচয়?' অবন্তী সগর্বে বলে, 'আমার বাল্যবন্ধু এই পরিচয়। মিস্টারকে দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিতে হবে না, কি রকম বন্ধু একখানা আমার— ?'

'তাক লাগাবার কি আছে?'

'বাঃ নেই? বলবো, এই দেখো। আমার জন্যে চিরবিরহী! আজও আমার মুখ স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।'

'আশা করি তোমার ড্রাইভার বাংলা ভাষায় অ-জ্ঞান?'

'তা' অ-জ্ঞানই।'

'তোমার জন্যে চিরবিরহী একথা আবার কখন বললাম তোমায়?'

'না বললেও বোঝা যায়।'

'ওই আনন্দেই থাকো। পয়সা নেই—, তাই বৌ জোটেনি।'

'তা একটু মধুরে মিথ্যেতেই বা দোষ কি? অত রূঢ় বাস্তব না হলেও চলবে। সত্যি শোন, আসবে লক্ষ্মীটি! আমি হাঁ করে বসে থাকবো।'

'অত ভীড়ে আমার যাবার কি দরকার বল?'

'আছে দরকার। অনেকের মধ্যে তুমি এক। একের মধ্যে অনেক। ভগবান তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন।'

'বেশ তো, না হয় পরেই একদিন যাবো।'

'তুমি কি আমার মেয়ের বিয়ের উৎসবের আনন্দটা মাটি করে দিতে চাও গোতম?'

রাত হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে।

এখন আর পথে পাওয়া বন্ধু কে ঘরে আসতে বলা যায় না। শুধু যা বলা যায় তাই বলল অবন্তী, 'তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'পাগল হয়েছ!'

নেমে পড়ল গোতম।

'আচ্ছা বেশ। বাড়ীটা চিনে গেলে তো?'

এটা আমার বড় ভাসুরের বাড়ী। এখান থেকেই বিয়ে। উনি আসবেন সেই বিয়ের দিন-তিনেক আগে। নেমন্তন্ন পর্যন্তও হয়তো আমাকে সারতে হবে। ......ওঃ তোমার ঠিকানাটা দাও। সব প্রথম যাবো তোমার কাছে, কার্ড ছেপে এলেই।'

'আমার কাছে কিন্তু লিখে দেবার সরঞ্জাম কিছু নেই। না কলম, না কাগজ। আছে তোমার সঙ্গে—'

'আচ্ছা মশাই হয়েছে—' তাড়া দিয়ে ওঠে অবন্তী, খুব ঠাট্টাটা করে নেওয়া হল। মানে তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিকানাটা ভুলে যাব, কি বল? হৃদয়ের পটে খোদাই হয়ে যাবে বুঝলে? বল বল।'

'মিথ্যেই মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ। স্বভাবে এখনো তেমনি আছো। নাও বিছিয়ে ধর তাহলে হৃদয়পট। কর খোদাই—আটাস্তর দুইয়ের তিন শ্রীনিবাস মল্লিক লেন।'

'কার বাড়ী?'

'দিদির। যখনই কলকাতায় আসি ওই দিদির বাড়ীই উঠি।'

'আশ্চর্য! আমরা দুজনেই কলকাতা ছাড়লাম।'

ছাড়াছাড়ির আগে একটা নিশ্বাস ফেলল অবন্তী।

বাড়ী ঢুকেই দেখে এক বিপর্যয়।

না কি ভাবী বেহাই বেহান, 'ভাবী বধূকে পাকা দেখা'র গহনা পছন্দ করাতে এসেছিলেন, বেহানের আশায় 'হা-পিত্যেশ' করে এইমাত্র চলে গেছেন।

বারো মাসের বাসিন্দা নয় অবন্তী যে জা-ভাসুর রাগ দেখাবেন। তবু মোলায়েম অনুযোগের সুরে যা বললেন, তা'ও কিছু কম নয়।

মেয়ে সুদ্ধ রাগে দুঃখে ছলছল।

'সব সময় আমার কাছে বসেছিল, কী খারাপ যে লাগছিল!'

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বসে থাকে অবন্তী। এবং সমবেত মহিলাবৃন্দ প্রশ্নে বিব্রত করতে থাকেন—এতক্ষণ কোন্ দোকানে ঘুরল অবন্তী? রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খুলে বসে থাকে কোন্ মহদাশয় দোকানী? আর তাই যদি থাকে, সেই ক্রীত বস্তুগুলি কই?

তারপর সবাই বলে, কী অপূর্ব জড়োয়া সেটটা এনেছিল ওরা। আহা অবন্তীর দেখা হ'ল না! আর এতক্ষণে অবন্তী উত্তর দেবার মত একটা কথা খুঁজে পায়। রাগ দেখিয়ে বলে, 'তা দেখা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এ বাড়ীতেই তো আসবে।'

স্বামীর উপর রাগ ধরে যায় হঠাৎ।

নিজেই যে বলেছিল, 'দেখো আমি তোমার মেয়ের বিয়ের কী গোল্লটাই করে রাখি',—সেকথা ভুলে গিয়ে ভাবল, নিজে ছুটির অভাবের অজুহাত দেখিয়ে, আমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি বসে আছেন।

অরুণ এখানে থাকলে তো আজ অবন্তী কেন দেরী হয়েছে সেটা বলতে পারতো। বলতে পারতো, রাখো বাবু তোমার বেয়াই বেয়ান। আমি বলে তখন আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছি।'

না, কাউকে বলা হ'ল না।

আনন্দে ছলছলিয়ে ওঠা মন, শুধু একা একাই ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকলো।

কিন্তু সে তো শুধু রাতটুকু।

সকাল হতে না হতে কাজের টানাপোড়েনে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কালকের দেখা সেই ছবিখানি। জেটির ঠিক নীচেটাতেই জল, গঙ্গার বাতাস লাগছে, জল কাঁপছে, একটি বিশেষ বিরতি নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে এসে পড়ছে জেটির ওপর।

ওসব মুছে ফেলে ওকে ভাসুরের কাছে বসে, খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসেব করতে হল, ডেকরেটাররা কি কি করবে, কীভাবে আলোক সজ্জা হবে, বরাসনটা কোথায় পাতা হবে।

ভাসুর সবই করিয়ে দেবেন, ইচ্ছাময়ী। থাকুক অবন্তী। দায়িত্ব নিতে রাজী নয় কেউ।

কিন্তু হিসেবের কি শেষ আছে?

সে তো চলছেই।

যত সমারোহ, ততই তো হিসেব। আর ততই তো দুশ্চিন্তা।

অতঃপর বিয়ের চিঠি ছেপে এল। আর এল অরুণ।

ও বলল, 'চল নেমন্তন্নটা তোমাতে আমাতে দু'জনে করে বেড়াই। ওটা আর বিধবার মত একা—'

অবন্তী রেগে ওকে বই ঠুকে মারল।

তারপর পরিপাটি করে সাজতে বসল। আর ঠিক এই সময় ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা!

হঠাৎ টের পেল গোতমের ঠিকানাটা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

মাথার মধ্যে যেন একটা তোলপাড় কাণ্ড হতে থাকল, আর সেই তোলপাড় কাণ্ডটা অবিরত শুধু একটা ঝাপসা শূন্যতায় ধাক্কা দিতে লাগল।

অরুণ বলল, 'কী হল?'

'শরীরটা কি রকম যেন লাগছে!'

উদ্বিগ্ন হল বেচারা। বলল, 'যেতে পারবে না?'

অবন্তী তারিখটা ভাবল।

দিন আর কই?

ভাবল, যাক এখন তো বেরিয়ে পড়া যাক। সেরে নেওয়া হোক এদিক সেদিক। ফিরে এসে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেই মনে পড়ে যাবে।

প্রথম নেমন্তন্নটা আর হল না।

অরুণকে এখন কিছু বলল না।

ভেবে রেখেছে অরুণ যখন অবাক হয়ে বলবে, 'এ ঠিকানায় আবার কে?'

তখন অবন্তী রহস্যের জাল বিস্তার করে বলবে, 'কেন তোমার চেনা জগৎ ছাড়া আর কোনও জগৎ আমার থাকতে নেই?'

কিন্তু সে কি আর অবন্তী বলতে পারে?

না, সে আর বলতে পারে না অবন্তী।

প্রতি মুহূর্তের একাগ্রতা আর প্রতি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা নিয়ে শুধু সেইটুকু বলবার মত পটভূমিকা হাতড়াতে লাগল, কিন্তু হল না।

নেহাৎ সাধারণ একটা নাম, আর সাধারণ একটা সংখ্যা হারিয়ে গেল চিরকালের মত। যেখানে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় অনন্তকালের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'খুব তো গুছিয়ে সব করছিলে ছোট বৌ, হঠাৎ কী হল তোমার? সবই দেখছি ভুলে ভুলে যাচ্ছো।...... মেয়ে শ্বশুর বাড়ী না পাঠাতেই এই!'

নেমন্তন্নর চিঠি সব বিলি হয়ে গেল. যারা আগে আসবার তারা আগে এসে ভীড় জমালো, যারা পরে আসবার, তারা বিয়ের রাত্রে এল।

ভাসুর বললেন, 'কলকাতায় কি লোক আর বাকী রাখিসনি অরুণ?'

জা বললেন, 'বড়মানুষী দেখাতেই তো সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়া!'

আলো জ্বলল বিস্তর, বাজনা বাজল বিস্তর, শাঁখ বাজল বিস্তর। যে যেখান থেকে এসেছে সবাই বলতে লাগল, 'হ্যাঁ অমুকের মেয়ের বিয়েতে আমোদ আহ্লাদ একটা করা হল বটে!'

অবন্তী মেয়ে সাজাল, বরণ করল, বাসি-বিয়ের কী লাগবে তা' গোছ করল, আর নিমন্ত্রিতদের আদর অভ্যর্থনা করতে গেল।

কিন্তু সত্যি তাই কি গেল অবন্তী?

নাকি হাজার মুখের মাঝখানে হঠাৎ এক-খানা অলৌকিকের স্বাদ বয়ে আনা মুখ দেখতে পাওয়া যায় কিনা, তারই সন্ধান নিতে গেল।

সবাইকে দেখে হাসতে হচ্ছে, 'আরে এসো এসো, এত দেরী করলে যে?......ওমা এ কত বড় হয়ে গেছে!......আচ্ছা তোমার এই এতক্ষণে আসা হল?'......এমন সব টুকরো টুকরো কথা অনবরত কইতে হ'ল, কিন্তু সেই ঝাপসা শূন্যতাটুকু যেন আড়াল করে রইল চেতনাকে।

অতএব সমালোচনাকে ঠেকানো যায় না। সে স্রোত বইতে ...মৃদু তীব্র তীক্ষ্ণ।

'কী রকম অহংকারী অহংকারী ভাব দেখছিস? মানুষকে যেন দেখেও দেখছে না, চিনেও চিনছে না।'

'সত্যি যেন আকাশে ভাসছেন!'

'আহা জানিস না, ও এক রকমের স্টাইল। যেন আমি আছি, অথচ নেই। যেন কি আমার হারিয়ে গেছে গো, সেই নিধি খুঁজছি, আমি বিশ্ব সংসারে চোখ ফেলে ফেলে। তাই বিশ্ব সংসার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে!'

'হি হি হি। এ স্টাইল আবার কবে থেকে চালু হল? লেটেস্ট বুঝি এটা?'

নিন্দে হচ্ছে।

হবেই।

এত আলো, এত উৎসব, এত সমারোহ, অবন্তীরই সব, অথচ অবন্তীর মন যদি এখন মাথা কুটতে চায় অন্ধকারে বসে একটু ভাববার জন্যে, সেটা কি অসংগত নয়?

এই 'অগাধ পাওয়ার' সমুদ্রে সাধের তরণী ভাসিয়ে চলতে চলতে অবন্তী যদি সামান্য একটা হারিয়ে যাওয়া ঢেউকে খুঁজে মরে, নিন্দে না করে করবে কি লোকে?

প্রথম নেমন্তন্নর প্রথম কার্ডখানা নয়, তবু একখানা অবন্তী নাম লিখে তুলে রেখেছে। এখনো, বর বাইরের আসরে বসে থাকার সময়-টুকুর মধ্যেই গাড়ী নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে অবন্তী। অনায়াসেই পারে। গিয়ে বলতে পারে 'খুব লোক তো! বাড়ী চিনিয়ে দিলাম, একবার বুঝি আসতে নেই? আর আমি ভেবে নিয়ে বসে আছি, রোজ দু'বেলা ধর্ণা দেবে। সত্যি গোতম, কাজের চাপে মাথা তুলতে পাচ্ছিলাম না।'

আপত্তি শুনবে না।

ধরে আনবেই তাকে।

বলবে, 'তুমি কি চাও আমি মেয়ের বিয়ের উৎসবের মাঝখানে অবিরত শুধু তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ফেলি?'

হয়।

এখনও এই সবই হয়।

যদি এখনও মনে পড়ে যায় সেই হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানাটার ভাষাটুকু। কত নম্বর...কি যেন লেন!

মন এত বিশ্বাসঘাতকতা করল! যে মন অহংকারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিল, 'কাগজ কি হবে? বলে যাও, খোদাই হয়ে থাকবে।'

তখন তো তাই ভেবেছিল অবন্তী।

সময়ের পায়ে মাথা খুঁড়ে সেই সময়টুকুকে একবার যদি ফিরিয়ে আনা যেত! সমস্ত অহমিকা বিসর্জন দিয়ে অবন্তী বলত, 'এই তো আমার বটুয়ায় কলম নোটবুক সবই মজুত।'

অবন্তীর মেয়ের বিয়ের উৎসবে অবন্তীর পুরনো বন্ধু এল না, এ দুঃখ আর সহ্য হচ্ছে না অবন্তীর।

শুধু এক অপরিসীম লজ্জা।

তাই বারে বারে শুধু মনে হচ্ছে 'ওর সঙ্গে যদি দেখা না হত!'

কী লাভ হল দেখা হওয়ায়?

দেখা না হলে তো অবন্তী এখন উল্লাসে উৎসাহে হৈ হৈ করে বেড়াতে পারত, মনের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে শুধু একটা ফাঁকা আকাশ হাতড়ে মরত না।

একটুখানি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের রেখা আঁকা একটি ঠোঁটের ভঙ্গী যে অবন্তীর সমস্ত সুখকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

অবন্তী দেখতে পাচ্ছে, সে ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হচ্ছে ছোট্ট একটি কথা, 'জানতাম! জানতাম ভুলে যাবে!'

ভুলে গেছে অবন্তী।

ছোট সেই ঠিকানাটুকু ভুলে গেছে।

কিন্তু সেই ভুলে যাওয়াটা ভুলতে না পেরে যে অবন্তীর প্রতিটি মুহূর্ত বিস্বাদ হয়ে গেল, বাকী জীবনটা একটা লজ্জার বিদারণ রেখায় বিদীর্ণ হয়ে থাকল, এ কথা কি জানবে সে?

না কোনদিন জানতে পারবে না।

পৃথিবী গোল, এই নিয়ম অনুসারে আবার যদি কখনো কোথাও তার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়, অবন্তী কি ওর হাত চেপে ধরে বলতে পারবে, 'গোতম! সত্যি তুমি?'

পারে না সবুজ করে দিতে

সুলেখা ঘোষ

সবুজ মনের মত বসন্তের দেবদারু বনে
কে যেন ছড়িয়ে দিল
একমুঠো সন্ধ্যার আবীর,
সে আবীর রং দিল বিহঙ্গের চলার পাখায়—
তাই বুঝি খুঁজে ফেরে
আপনার পরিত্যক্ত নীড়।
ঘন দেবদারু বনে রুপালী সে রোদের ইঙ্গিত
অনুরূপ জানায়েছে,
আজ বুঝি মধু সম্ভাষণে—
তাই কি অরণ্যে আজ বসন্তের নব সমারোহ
স্বাগত জানায় বুঝি
লজ্জারাঙ্গা আনত গুণ্ঠনে।
মনের অরণ্য আজ সজীবতা হারালো কোথায়
নীলাকাশ কালো কেন,
সন্ধ্যালগ্ন কেন বিভীষিকা,
জীবনের স্বরলিপি কেন তোলে বেহাগের সুর—
ফেলে আসা শূন্য গৃহে
যাবে নাকি আলোর কণিকা!
বসন্তের কিশলয়, দেবদারু পাতার মর্মর—
জীবনের ছায়াপথে দিয়ে গেল নবপরিচয়,
স্মরণের গ্রন্থিটুটে এ স্মৃতির প্রথম স্বাক্ষর
বিস্মৃত হবে না মন, এই মনে গভীর প্রত্যয়।
একমুঠো সন্ধ্যারাগে গান গায় পরিশ্রান্ত পাখী,
শিহরণ লাগে বুঝি
দেবদারু শাখায় শাখায়—
কিন্তু সে সন্ধ্যারাগ পারে না সবুজ করে দিতে—
যে মন গুঁড়িয়ে গেছে
আবর্তিত রথের চাকায়।

মালকোষ

(২২ পৃষ্ঠার পর)

শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলাম। কে যেন ওই সুরের মধ্যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে মাথা কুটে কুটে কাঁদছে, যেন অব্যক্তকণ্ঠে বলছে—হামারি দুখের নাহি ওর—

আমার শালা সত্যিকারের রসজ্ঞ লোক। সে মাথা নাড়ছে না, উরুতে তাল ঠুক্‌ছে না. ঘাড় নীচু করে স্থির হয়ে বসে আছে। আমিও একটা নিবিড় অনুভূতির মধ্যে ডুবে গেছি। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জানিনা, বোধহয় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হবে। এক সময় অনুভব করলাম, নাকে একটা গন্ধ আসছে। স্থান কাল বিবেচনায় গন্ধটা স্বাভাবিক নয়।

শুকনো তামাক পাতার কড়া গন্ধ! এতক্ষণ অর্ধনিমীলিত নেত্রে বাজনা শুনছিলাম, এখন চোখ আর একটু খুলে এদিক ওদিক তাকালাম। কৈ, তামাক পাতা তো কোথাও নেই। ওস্তাদজি ঘাড় গুঁজে বাজিয়ে চলেছেন, শালা নিবাত নিষ্কম্প বসে আছে। অন্য মানুষও কেউ আসেনি। তবে?

হঠাৎ নজর পড়ল চাতালের নীচে মাটির ওপর। বুকটা একবার গুরগুর্ করে উঠল।—

আমি বসেছিলাম চার ফুট উঁচু চাতালের কিনারা ঘেঁষে, নীচে নজর পড়তেই বুঝলাম গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। ঠিক চাতালের নীচেই একটা প্রকাণ্ড মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নিকষের মতন কালো গায়ের রঙ, আট হাত লম্বা ভাগড়া শরীর, সর্বাঙ্গে সোজার শলার মতন রোঁয়া খাড়া হয়ে রয়েছে। দুই বাহু দিয়ে মাথাটা বেড়ে নিয়ে দৈত্য পড়ে আছে।

ভূতপ্রেত দেখে ডরিয়ে ওঠার দিন আমার নেই, কিন্তু সাষ্টাঙ্গ প্রণামরত বিরাট দৈত্যটাকে দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখি, আমার ঠিক পিছনে আর একটা দৈত্য লম্বা হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনছে।

আর একটু হলেই হাউমাউ করে উঠেছিলাম আর কি! অতি কষ্টে সামলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে বসে রইলাম। চোখ খুলে তাকাবার সাহস নেই, হয়তো দেখব আরও অনেকগুলি আট হাত লম্বা জিন্ ভূমিষ্ঠ হয়ে মালকোষ শুনছে।

ভাই, আমি নানা জাতের ভূত দেখেছি, কিন্তু ভূতের গা দিয়ে তামাক পাতার গন্ধ বেরোয় এবং তারা উপুড় হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনতে ভালবাসে এ কথা জানা ছিল না। আরব্য উপন্যাসেও কিছু লেখেনি। হয়তো আরব দেশের ভূত এমনিই হয়। মালকোষ সুরটা কিন্তু খাঁটি ভারতীয় সুর, তার আদি নাম মল্লকৌষিক।

ওস্তাদজির বাজনা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। যেন একটা মর্মন্তুদ বিলাপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। ওস্তাদজি কিছুক্ষণ সেই ভাবে বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে সেতার নামিয়ে রাখলেন।

আমি চোখ বুজে বসে বসে অনুভব করলাম, তামাক পাতার গন্ধটা মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকালাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। জিনেরা চলে গেছে।

ওস্তাদজি আমার পানে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন,—'ওরা এসেছিল নাকি?'

বললাম,—'এসেছিল।'

তিনি তৃপ্তস্বরে বললেন,—'আজ বাজানো ভাল হয়েছে; মন বসে গিয়েছিল। তোমরা ভয় পাওনি তো?'

এতক্ষণে শালার ধ্যানভঙ্গ হল। সে পকেট থেকে একটি রুমাল এবং একটি গিনি বার করল; গিনি রুমালের ওপর রেখে রুমাল ওস্তাদজির পায়ের কাছে রাখল। তারপর লম্বা হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

তার ভূমিষ্ঠ প্রণামের ভঙ্গী দেখে মনে হল সেও একটি ছোটখাটো জিন্!

আমার নাটকীয় সফর

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু শোনা গেল, আমরা যেদিন দিনাজপুর ত্যাগ করব, ওখানকার ছোকরারা রাজপথের উপরেই আর একবার নাকি লাঠিবাজির খেলা দেখাবে। প্রথমে অসহযোগ-মন্ত্র শোনানো, তারপর লাঠালাঠি মাথা-ফাটাফাটি! চমৎকার!

কিন্তু দিনাজপুরের সাব-ডিভিশনাল অফিসার ছিলেন স্বর্গীয় অভিনেতা ভূমেন রায়ের বন্ধু। তিনি ভূমেনের মুখে সব শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেহি। যাও, শান্তিভঙ্গ না হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।"

তারপর দিন সন্ধ্যাকালে আমাদের দিনাজপুর ত্যাগ করার দৃশ্যটা হ'ল দস্তুরমত যুদ্ধযাত্রা কিংবা শোভাযাত্রার মত।

আমাদের দুইপার্শ্ব রক্ষা করতে করতে পদভারে মেদিনী কাঁপিয়ে চলল প্রায় দুই ডজন বন্দুকধারী মিলিটারী পুলিশ—তারপর আমাদের পুরুষের এবং তারপর নারীদের দল এবং চতুর্দিক আলোকিত ক'রে রাখলে কতকগুলো সমুজ্জ্বল পেট্রলের আলো। আমার মুখ লুকোবারও উপায় নেই—মন বললে, মেদিনী দ্বিধাবিভক্ত হও!

ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করা না পর্যন্ত বন্দুকধারী মিলিটারী পুলিশের পাহারা মোতায়েন রইল। বলা বাহুল্য যষ্টিধারীদের টিকিও আর দেখা যায় নি।

তারপর যাওয়া হ'ল রাজসাহীতে এবং সেখানেও যথানিয়মে হুলুস্থুলের অভাব হ'ল না। কিন্তু আর তা সবিস্তারে বর্ণনা করবার জায়গা নেই। সেখানেও গভীর রাত্রে নটনটীদের নিয়ে ফেরবার পথে মাথার উপরে ঘন ঘন এমন সব আধলা ইষ্টক বৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলোর একখানা লাগলে পরে স্কন্ধের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে যেত মুণ্ডের অস্তিত্ব।

সফরের সাধ মিটে গেল। পরদিন আমি নিজে একলাই কলকাতায় স'রে পড়বার জন্যে পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধব ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কিন্তু তা আর করতে হয় নি। কারণ পরদিন সম্প্রদায়ই কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করলে।

সেই থেকে থিয়েটারি সফরের কথা তুললে আমার গায়ে জ্বর আসে—শর্মা আর ওদিকে নেই!

সুন্দর-সন্ধান

সাধন চৌধুরী

রিক্ত ঋতুর প্রাণে বিদায়ের আয়োজন
অন্তরের মন্থর সংরাগে,
নয়ন-পল্লব হ'তে উলঙ্গ আলোর ফুল
দিনের দোলকে নিত্য জাগে।
আকাঙ্ক্ষার আকাশেতে ক্রমাগত ভাঙা-চাঁদ
ঠেলে চলে ক্ষুদ্র ভেলা তার,
হৃদয়-হ্রদের তীর অহরহ রাখে ঢাকি'
প্রতীক্ষার দীর্ণ অন্ধকার।
সত্তার প্রার্থনা-বাণী বিলাপ-গোলাপ-গন্ধে
শূন্যতায় যবে যায় মরে,
স্বপ্নের সারথি এসে অবসন্ন অন্ধকারে
প্রণয়ের থাকে হাত ধরে।
আশার আভাসে ভাসে আমার মঙ্গল-মালা।
ছল ছল তপ্ত অশ্রুজলে,
তীর হতে তীরে গিয়ে দুলিবারে সে যে চায়
কোন এক সুন্দরের গলে।
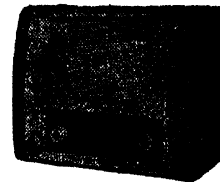
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলী

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

বোধ হইতেছে কয়টা দিন বড় সুখে যাইবে। বৃহস্পতিবার লণ্ডনে ফিরিয়া আবার পত্র লিখিব। আজ এই পর্যন্ত। তোমার মা, ছোট মা, বাড়ীর মেয়েরা, ছোট বড় সকলকে আমার সমুচিত ভালবাসা, শ্রদ্ধা, প্রীতি জানাইবে।

আর একটা কথা Miss Etlen, যাঁহার পিতা রামমোহন রায়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি রামমোহন রায়ের পাগড়ীটি আমাকে দিয়াছেন—সে পাগড়ী আমি দেশে লইয়া যাইতেছি। আজ এই পর্যন্ত।

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

---

(১) **মিস মেরী কার্পেণ্টার**—একজন সমাজ হিতৈষিণী য়ুনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; রাজা রামমোহনের ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে, ইঁহার পিতা ডক্টর ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার অন্যান্য বহু গুণীজ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের ন্যায় রামমোহনের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহনের অন্তিম দশায় এই মহিলা তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে "দি লাষ্ট ডেজ ইন ইংল্যাণ্ড অব দি রাজা রামমোহন রায়" নামক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। বিলাত প্রবাসী ভারতীয়গণের তত্ত্বাবধানের জন্য ইনি 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামক এক সমিতি স্থাপন করিয়া আজীবন উহার মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয়দিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্রত লইয়া তিনি কয়েকবার ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষাকল্পে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে "মেরী কার্পেণ্টার হল" নির্মিত হয়।

(২) **মিঃ হার্বার্ট টমাস**—ব্রিস্টল নিবাসী একজন ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, যাঁহার বাড়ীতে শাস্ত্রী মহাশয় দুই দিনের অতিথি হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী মিস মেরী কার্পেণ্টারের ভগ্নী ছিলেন।

(৩) ওয়েস্টন সুপারমেয়ার—ব্রিস্টল চ্যানেলের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র শহর, লণ্ডন হইতে ১৩৭ মাইল পশ্চিমে।

(৪) **প্রফেসর এফ ডব্লিউ নিউম্যান**—বহুবিদ্যা বিশারদ সুপণ্ডিত য়ুনিটেরিয়ান এবং চিন্তাশীল লেখক; ম্যানচেষ্টার নিউ কলেজ ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর; পরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হলের অধ্যক্ষ হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন হেনরি নিউম্যান প্রথম জীবনে এ্যাংগ্লিকান চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন, পরে রোমান ক্যাথলিক মতবাদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রগুণে পোপ কর্তৃক বহু সম্মানিত "কার্ডিন্যাল" পদবীতে উন্নীত হন।

(৫) **"স্ট্রীট"**—সমার সেট শায়ারের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম; ইহার অনতিদূরে গ্লাস্টনবেরী নামক ক্ষুদ্র শহরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি বিশাল মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে। বিশদ বিবরণের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের "ইংলণ্ডের ডায়েরি" নামক পুস্তকের ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬)

31, Hilldrop Road, London—N.
5th October 1888

মা লক্ষ্মী!

আমি তোমার পত্র সেই সঙ্গে প্রিয় ও যোগেনের (১) পত্র পাইয়া সমুদায় অবগত হইলাম। প্রিয় এবং যোগেনকে বলিবে স্বতন্ত্র পত্র লিখিবার সময় নাই, বড় ব্যস্ত।

আমি গতকল্য লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি। কয়েকদিন আমি 'স্ট্রীট' নামক এক পল্লীগ্রামে এক পরিবার মধ্যে বাস করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই পরিবারে এক বিধবা মাতা ও দুই অবিবাহিতা কন্যা। ইঁহারা তিনজনে যে কিরূপে দিন যাপন করিতেছেন, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা এ পত্রে হইতেছে না। ভবিষ্যতে লিখিব। ইংরাজেরা যে কি গুণে বড় হইয়াছেন তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

প্রফেসর নিউম্যান আমাকে পুত্রাধিক যত্নের সহিত দুইদিন তাঁহার ভবনে রাখিয়াছিলেন। ইঁহার বিদ্যার কথা কি বলিব। লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, আরবী, লেবিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ প্রভৃতি ভাষাতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। এমন বিষয় নাই যাহাতে গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রায় ৪৫০ খান আমাদের সমাজের লোকের ব্যবহারার্থে আমাকে উপহার দিয়াছেন।

ব্রিস্টল নগরের একটি ভদ্রলোক, যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তিনি আসিবার সময় তাঁহার সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপে আমার ব্যয়ের সাহায্যার্থ ৭০৲ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমাকে অনেকে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও উপহার দিয়াছেন। এই সকল লইয়া আমি লণ্ডনে আসিয়াছি এবং আমার ছোট ঘরটিতে আমার বই লিখিতে বসিয়াছি।

এখানে দিন দিন খুব শীত পড়িতেছে। আমার ঘরে সর্বদা আগুন জ্বলিতেছে। আমি আগুন পোহাইতেছি, আর এই পত্র লিখিতেছি। নভেম্বরের মাঝামাঝি বোধ হয় এ দেশ হইতে যাত্রা করিতে পারিব।......

জয়কালীর(২) জন্য যে বই কিনিতে লিখিয়াছিলে, তাহা কিনিয়া আজিকার ডাকে পাঠাইতেছি। পাইবামাত্র তাহাকে পাঠাইবে, নতুবা তাহার কাজে লাগিবে না। জানি না এখন পাইলেও তাহার কাজ হইবে কিনা। যাহা হউক তাহার প্রতি আমাদের একটি কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে।

আমি এখন বেশ আছি, মোটা হইতেছি। দুর্গামোহনবাবুর কয়েক দিনের খবর জানি না। তিনি আর কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রা করিবেন। বাড়ীর সকলকে আমার সমুচিত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে। ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিও না।

তোমার জন্য বিখ্যাত রমণীদের অনেক জীবনচরিত কিনিতেছি। এই সঙ্গে কমিটির জন্য একখানি পত্র পাঠাইলাম। মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট দিবে। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

---

(১) **যোগেন**—শিবনাথের দ্বিতীয় জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথের মধ্যমা কন্যা তরঙ্গিনী দেবীর স্বামী।

(২) **জয়কালী দত্ত**—একজন ব্রাহ্ম যুবক, এই সময়ে কলেজে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পরে ওকালতি পাস করিয়া রাঁচিতে আইন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

অনুভব

আশিস সান্যাল

যেন তার অতল গভীরে
নেমে গিয়ে একমুঠো জল,
পাইনি রে আলোর সবিতা।
মাঠ-ভরা পৃথিবির ফসল

ভরে নিয়ে ভেসে যাই দূরে;
আশ্বিনের পবিত্র অমল
ঝরে গেল নিরুপায় মিতা—
চোখে তার কাঁপে হলাহল।

যেন তার আঙিনার নদী,
ছুঁয়ে যেতে পারিনি সবিতা।
অবেলায় দিগন্ত অবধি
রমণীয় গভীর শীতল

নিতে গিয়ে আমি তার মিতা
পাইনি রে সহজ অমল॥

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতের যুদ্ধ কৌশল

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া দিল। ইহা একদিক দিয়া চূড়ান্ত জয় আনিয়া দিল। যখন হইতে রেকাব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় হইতে অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের প্রধান অস্ত্র হইয়া পড়িল। বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত অশ্বারোহী সৈন্য অজেয় হইয়া রহিল। অশ্বারোহণ করিয়া যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করা চলিত। একক বা দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা আরও সহজ হইয়া পড়িল।

মারাঠাদের পূর্বে ভারতের কোন হিন্দু-শক্তি তাদের সৈনাদলে অশ্ব-শক্তির বিপুল উন্নতি করিতে পারেনি। মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য এক-কালে সারা ভারতে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাদের অশ্বারোহী সৈন্য দেখিবার মত জিনিষ ছিল। যে সব মুসলিম বিজেতা ভারতে আসিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল অশ্বের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। অশ্বের ব্যবহারে তাদের রণনৈপুণ্যের, শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিত। রেকাবসহ অশ্বারোহণের আর্ট তারা মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। মোগলদের যুদ্ধ-নীতির ইতিহাস লেখক আইরভিং বলেন যে, মোগলদের যুদ্ধ জয়ের প্রধান কারণ ছিল তাদের অশ্বারোহী সৈন্য। অপরপক্ষে প্রাক্-মুসলিম যুগে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধ প্রধানতঃ নির্ভর করিত বিরাটকায় হস্তীর উপর। সে যুগে বহু অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পদাতিক দল থাকিত। তারা অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিত না। ভারতের হস্তীদল ও পদাতিক দল তুর্কি ও মোগলদের ঘোড়-সওয়ারের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িত। হিন্দু সৈন্যদলের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও শিক্ষিত হস্তী এ দুইটিই কার্যক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না।

সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর অধীনে যে সব পাঠান সৈন্য গাঙ্গেয় উপত্যকা ও মালওয়া দেশ জয় করিয়াছিল এবং যাহারা দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী সৈন্য। দূরবর্তী অঞ্চল আক্রমণ করিবার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যদলই ছিল আদর্শ অস্ত্র।

পাঠান যুগের অবসানের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল মোগলগণ। তাহারা আর একটা নূতন অস্ত্র আমদানী করিল—তাহা হইতেছে বারুদ বা আগ্নেয় অস্ত্র। বাবর পাঁচিশ হাজার সৈন্যসহ অশ্বারোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্যও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে কামান গোলা বারুদের ব্যবহার এই বুঝি প্রথম। স্থলপথে গোলন্দাজ সৈন্য এই প্রথম ভারতে প্রবেশ করিল। পাঠান, তুর্কি অথবা মোগলদের কেহই জল-পথের কথা চিন্তা করেন নাই। সুতরাং ভবিষ্যতের জলযুদ্ধের জন্য তাঁহারা কেহই দেশকে প্রস্তুত করেন নাই।

কিন্তু বাবরের ভারত আগমনের প্রায় পাঁচিশ বৎসর পূর্বে ভাস্কোডাগামা বাণিজ্য জাহাজ লইয়া কালিকটে পদার্পণ করিলেন। তিনি সঙ্গে কিছু কামানও আনিয়াছিলেন। এবং কামান দিয়া কালিকটের বন্দর আক্রমণ করিলেন। স্থল-পথের যুদ্ধে বাবরই প্রথম কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি যে অস্ত্রের সাহায্যে রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করিলেন তাহা ছিল তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী। নতুবা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

ভারতবর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন হইতে ঘোড়-সওয়ার ও কামান ব্যবহৃত হইতে লাগিল, বলা যাইতে পারে যে তখন হইতে যুদ্ধপ্রণালীতে একেবারে স্বতন্ত্র কৌশল অবলম্বিত হইতে লাগিল। ঘোড়সওয়ার ও কামান ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিল। তবুও একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য সময়ে ত বটেই, এমনকি মোগলদের যুগেও এদেশে উল্লেখযোগ্য কোন সামরিক ঐতিহ্য বিকশিত হয়নি। বহুক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়টা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিত। মোগলদের পদাতিক সৈন্যবাহিনী সুশিক্ষিত ছিল না। তারা সুশৃঙ্খলিত (Organised) ও সুগঠিতও ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সর্বদাই সুসজ্জিত থাকাটাই যেন যুদ্ধ জয়ের একটা প্রধান অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। মোগল পদাতিকগণ রেজিমেণ্টের কড়া শাসনের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। তারা দলবদ্ধভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া সুসংগত পদ্ধতিতে সংগ্রাম করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়নি।

ঐতিহাসিক অর্ম (Orme) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, মোগলদের পদাতিক দলে বহু ধরণের লোক লওয়া হইত। তাহারা এলোমেলোভাবে, শৃঙ্খলাহীনভাবে যুদ্ধ করিত। কাহারও হাতে থাকিত তরবারি ও ঢাল, কাহার হাতে বর্শা বল্লম। আবার কাহারও হাতে ছোট ছোট গাদা বন্দুক। যূথবদ্ধভাবে কোন ঘোড়-সওয়ারের আক্রমণ তারা সহ্য করিতে পারিত না। কিছু সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের হাতে থাকিত দীপশলাকাবিশিষ্ট বন্দুক। তাহাও আবার মাঝে মাঝে বিকল হইয়া যাইত। আর যদি কার্যকর অবস্থায়ও থাকিত তবুও অগ্নিবর্ষণ ব্যাপারে সেগুলি ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। সে সব বন্দুক কখন কখন যথাসময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে পারিত না। কতকগুলি পদাতিক সৈন্যের হাতে থাকিত শুধু গাদা বন্দুক। তাহা এত দীর্ঘ অথবা এত দুর্বল হইত যে, তাহা সঙ্গীন সময়ে কোন কাজেই আসিত না।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্যযুগে সরকারীভাবে কোন সৈন্য সংগ্রহ করা হইত না। সৈন্যদেরকে রীতিমতভাবে বেতন দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল না। সেনাপতি নিজের খেয়াল-খুসীমত সাধারণ কৃষক বা অন্য কাহাকে প্রয়োজনমত সৈন্যদলে ভর্তি করিতেন। তিনি তাদেরকে একত্র করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। সেনাপতির হাতে একটা নির্দিষ্ট মোটা অর্থ দেওয়া হইত। এ টাকাটা রাজকোষ হইতে

SIEMENS
INDIA

পূজার
শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন
সীমেন্স

সীমেন্স গ্র্যাণ্ড সুপার ৭৯০-ডব্লিউ রেডিও ৭টি ভালভ ও সেইসঙ্গে ম্যাজিক-আয় টিউনিং নির্দেশক। ৮+৫ পুশ বাটন, ৩টি টোন স্পেকট্রাম কন্ট্রোল। ৩টি লাউডস্পীকার (একটি ১০১/২"×৬" সিমফোনিক পি-এম স্পীকার ও সেইসঙ্গে ডাইভারজেন্স কোন্ এবং প্যানোরামিক ধ্বনির জন্য। সামনে দুইটি টুইটার ও দুইপাশে দুইটি ৪" পি-এম এইচ-এফ স্পীকার।) চমৎকার বাদামী রঙের দামী কাঠের ক্যাবিনেট। মূল্য: ৯৬০ টাকা (উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত।)

সীমেন্স স্ট্যাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১-ডব্লিউ-ও রেডিও ৬টি ভালভ, ও সেইসঙ্গে ম্যাজিক-আয় টিউনিং নির্দেশক। ৬টি পুশ-বাটন। ৫"×৭" ওভাল পি-এম স্পীকার। আধুনিক, দামী ভেনিয়ার-করা ওয়ালনাট কাঠের ক্যাবিনেট। মূল্য: ৩০৫ টাকা (উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত)

সীমেন্স স্পেশাল সুপার ৬৯২-ডব্লিউ-ও রেডিও ৬টি ভালভ ও সেইসঙ্গে ম্যাজিক-আয় টিউনিং নির্দেশক। ৬+৩ পুশ-বাটন। ৩টি টোন-স্পেকট্রাম কন্ট্রোল। ৩টি লাউডস্পীকার (একটি ৬"×১০১/২" সিমফোনিক পি-এম স্পীকার সামনে ও সেইসঙ্গে ডাইভারজেন্স কোন্ এবং পাশের দুইটার প্যানোরামিক ধ্বনির জন্য)। ওয়ালনাট, ট্রিমলাইন, ভেনিয়ার-করা কাঠের ক্যাবিনেটে রাখা। মূল্য: ৫৭০ টাকা (উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত)

প্রস্তুতকারক:

ইষ্টার্ন ইলেকট্রনিকস্

জার্মানীর সীমেন্সের লাইসেন্সপ্রাপ্ত

একমাত্র পরিবেশক:

সীমেন্স ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক: মেসার্স রাম এণ্ড কোম্পানী,
৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১ ফোন: ২২-৩৭৯৭

ডীলারগণ: ইণ্টারন্যাশনাল রেডিও এম্পোরিয়ম্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (ফোন: ২৩-৫২১১); ইলেকট্রনিকস ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৯৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ (ফোন: ৩৪-৭১৯৫); দি মেলডি, ৮১এ ও ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ (ফোন: ৪৬-২৪৭৪); মেলডি রুম, ৫২।১, রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৬ (ফোন: ৪৪-৪৯৪৪); রেডিও এ্যাণ্ড ফটো ষ্টোর্স, ৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১২ (ফোন: ২৪-৪৭৮৩); হ্যারি'স মিউজিক হাউস, ১৮।২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ (ফোন: ২৩-১৩৭৭); কুমার রেডিওজ, মেইন রোড, বিষ্টুপুর, জেলা জামশেদপুর (বিহার); ওরিয়েণ্টাল ইলেকট্রিক ষ্টোর, জি টি রোড, আসানসোল, জেলা বর্ধমান (ফোন: ২৫৮৫ ও ২৩৩১); ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেডিও এ্যাণ্ড সিনে সার্ভিস, ৫১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২; মেসার্স সাহা এ্যাণ্ড কোং, শকুন্তলা রোড, আগরতলা; মেসার্স জগৎ রেডিও মার্ট, সাউণ্ড রেডিও ইঞ্জিনীয়ার, ৩এ, এস পি মার্কেট, চিত্তরঞ্জন।

আসিত না। স্থানীয় জমিদার, সামন্ত রাজা বা কোন বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট লেভি বা কর বাবদ আদায় করা হইত। কখন কখন বন-জংগলের উপজাতিদেরকে জোর করিয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইত। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা সেনাপতিরা নিজেই সংগ্রহ করিতেন। তিনি বহু লোককে তাঁর অনুচর রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। যে সব দেশে যুদ্ধাভিযানে যাইতে হইবে সেই সব দেশের লোকজনের মনে ভয়ভীতি জাগ্রত করিবার জন্য এই শ্রেণীর অনুচরের একটা গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ইহারা প্রকৃত যুদ্ধের সময় সহায়ক না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িত।

বার্ণিয়ার সাহেব বিচক্ষণ দেশ পর্যটক ছিলেন। তিনি মোগল দরবারের বহু খবর রাখিতেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রাজধানীতে সম্রাটের চতুর্দিকে পনর হাজারের অধিক পদাতিক সৈন্য ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল বন্দুকধারী সৈনিক। আর কিছু ছিল সাধারণ সৈনিক। তাদের হাতে নিম্নস্তরের বন্দুকও থাকিত। পদাতিক সৈন্যের বিশেষ কোন ট্রেনিং ছিল না। কোন শৃংখলা বোধও ছিল না। সেই জন্য তাহারা গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ফলতঃ এইসব পদাতিক সৈন্যের বিশেষ কোন শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। ভালরূপে যুদ্ধবিদ্যাও জানা ছিল না। এই সব অল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সৈন্য দল যখন অধিকতর শিক্ষিত ও শৃংখলা-সম্পন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইত তখনই তাহাদের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হইত। মোগলদের পদাতিক সৈন্য শুধু যে অশিক্ষিত ছিল তাহাই নহে, তারা যুদ্ধকেও ভয় করিত। মোগলদের যে গোলন্দাজ বাহিনী রাজপুতদেরকে পরাজিত করিয়াছিল তাহারাও খুব উঁচুদরের সৈনিক ছিল না। পরবর্তী যুগের মোগল-সম্রাটগণ অপেক্ষা বাবরের যুদ্ধকৌশল অনেক উঁচুদরের ছিল। বাবর যখন ভারতবর্ষে অভিযান করেন, তখন সংগে আনিয়াছিলেন কতকগুলি সুদক্ষ টেকনিসিয়ান। তাহারা কামান তৈয়ার করিতে জানিত। বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় আগ্রাতে এইরূপ একটি কামান তৈরির কারখানার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারখানাটিতে ওস্তাদ কুলি খাঁর তত্ত্বাবধানে কামান তৈরি হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাবরের উত্তরাধিকারিগণ এইসব কাজের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। সেইজন্য যুদ্ধের টেকনিকের কাজের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। মোগলদের অস্ত্রাগারে যেসব ভারী ভারী কামান তৈরি হইত তাহা বিদেশী কুশলী শিল্পীর নির্দেশক্রমেই হইত। এদেশের লোকদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া শিল্পী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল না। মোগলদের গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবস্থাও খুব ভাল ছিল না। ওর্মি সাহেব তাঁর Military Transactionএ লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত এইসব সৈন্যদের দ্বারা কি ফল পাওয় যায় সে সম্বন্ধে কার্ণাটের সেনাপতিদে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। একা কামান হইতে প্রতি মিনিটে পাঁচ-ছয়ব গুলী নিক্ষেপ করা যে সম্ভব হয় এ ধার তাদের ছিল না। তাদের গোলন্দাজ বাহি অত্যন্ত জটিল ও এলোমেলো। তাদের গা ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। আর তারা মনে করিত পনের মিনিটে একবার কামান হইতে গু নিক্ষেপ করিতে পারিলে খুব ভালভাবে তারা যুদ্ধ করিতেছে।

মোগলদের অধীনে যে সব কামান গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সেগুলির দ্ব দেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলিত। সব গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আক ভারতের বহু অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। এ তাঁর বংশধরগণ এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু প যখন পাশ্চাত্য দেশের সৈন্যগণ উন্নত বন্দুক লইয়া নবতর পদ্ধতির সাহায্যে য করিতে আসিল তখন তাহাদের বিরু মোগলদের গোলন্দাজবাহিনী অকর্মণ্য হ পড়িল। তাছাড়া মোগলদের কামান বিশালকায়। কামানগুলিকে একস্থান হই অন্য স্থানে লইয়া যাইবার নানা অসুবিধা সৃষ্টি হইত। অতিরিক্ত ব্যবস্থার দ্বারা কামানগুলি চালু রাখিতে হইত। কামানের বি অংশকে আলাদা করিয়া বাঁধিতে হইত। ভাবে এক বিরাট স্তূপ তৈরী হইত। তার সেগুলিকে কুড়ি হইতে তিরিশটি বল দ্বারা টানিয়া স্থানান্তরিত করা হইত। ইহ দ্রুতগতি ব্যাহত হইত।

মোগলদের রণনীতির আর একটা মারা ত্রুটি ছিল। তাদের সৈন্যবাহিনীর অংশেরই রীতিমত ড্রিলের ব্যবস্থা ছিল মোগলগণ সেই মান্ধাতার আমলের মধ্য এশি ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিত। শেষের দি তাদের সেই ঘোড়সওয়ার মনোবৃত্তি চা যায়নি। পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দ ঘোড়সওয়ার দ্বারা আর সার্থক যুদ্ধ চলে না। ঘোড়সওয়ারের যুদ্ধে ব্যক্তি বীরত্ব দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ইহ সৈন্যদল গঠনের জন্য ততটা সুষ্ঠু ট্রেনিং প্রয়োজন ছিল না। সামরিক নেতারা সমা বিভিন্নস্তর হইতে পদাতিক সৈন্য বি করিতেন এবং এক একজন নেতাকে করিয়া তাঁর অধীনে পদাতিকবাহিনী গ হইত। কোন কোন পদাতিক বাহিনী ব ব্যবহার করিত। কিন্তু অধিকাংশ পদাতি হাতে বর্শা-বল্লম-তরবারিই থাকিত। যার যে অস্ত্র থাকিত সে সেই অস্ত্রই ব্য করিত। সৈন্যদের দেশের উন্নতির জন্যও করিতে হইত। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কোন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল না। উপযুক্ত ছিল না বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদা সৈন্যদল একটা সুগঠিত বাহিনী অপেক্ষা দল হাংগামাকারী জনতায় পরিণত পড়িত। এই সব সৈন্যদল যে যুদ্ধ তাহাকেও আসল যুদ্ধ মোটেই বলা যায় তাহা ছিল কতকটা খণ্ডযুদ্ধের মত। গণ তৈমুরলঙের নির্দেশ অনুসারে

আদর্শ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-বাহিনী সজ্জিত করিত। মোগল বাহিনীর প্রথম লাইনে হইত খণ্ডযুদ্ধ। তাহার পশ্চাতে থাকিত গোলন্দাজবাহিনী এবং তাকে সাহায্য করিবার জন্য দুইদিকে দুটি সহকারী ব্যূহ থাকিত। আর মধ্যস্থলে থাকিতেন প্রধান সেনাপতি। তিনি সেইখানে থাকিয়া নিজে সব-কিছু দেখা-শুনা করিতেন। দক্ষিণে ও বাম পার্শ্বে থাকিত রিজার্ভ বা সংরক্ষিত বাহিনী। প্রয়োজন হইলে ইহাদেরকে যুদ্ধে নামান হইত। প্রধান সেনাপতির পশ্চাতে থাকিত পশ্চাৎ-বাহিনী। এই হইল মোগলদের যুদ্ধক্ষেত্রের একটা নক্সা। কিন্তু একবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই প্রকার ব্যবস্থা উল্টাইয়া যাইত। এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র যুদ্ধটা কতকগুলি ধারাবাহিক খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হইত। এসব যুদ্ধে উৎকৃষ্টতর রণচাতুর্যের দ্বারা জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইত না। নির্ধারিত হইত সংখ্যাধিক্যের দ্বারা। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও হইত। উৎকৃষ্টতর রণনীতি ছিল না বলিয়া অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইউরোপীয় সেনাপতিরা বার বার ভারতের বিপুলসংখ্যক সৈন্যকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে পাশ্চাত্যজাতির যুদ্ধবিশারদগণ পরিষ্কারভাবে বুঝিলেন যে, যদি অল্পসংখ্যক সৈন্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে সৈন্যদল গঠন করা যায় তবে এমন এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইবে যার সামনে এদেশের বিশালবাহিনী পরাজিত হইবে। ফরাসী নেতা ডুপ্লে এদেশে কিছুদিন থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তিনি এদেশের একদল সৈন্যকে রীতিমত-ভাবে পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষাদান করিলেন। দেখা গেল তাহারা এদেশীয় সৈন্যদল অপেক্ষা সকল দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও দেশীয় সিপাহীদিগকে ইউরোপীয় মডেলে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন এবং এক অজেয়-বাহিনী গঠন করিলেন।

এদেশের পাশ্চাত্য বণিকগণ দেখিল যে, সিপাহী সৈন্যরা উপযুক্ত ট্রেনিং পায় না বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। যদি ইহাদেরকে ঠিকমত ট্রেনিং দেওয়া যায় এবং রীতিমতভাবে সংগঠিত করা যায় তবে ইহারাও অজেয় হইয়া উঠিবে। সিপাহী সৈন্য পোষণের খরচাও হবে কম। ইহারা ভারতের আবহাওয়ার সহিত খাপখাইয়া চলিতে পারিবে। সিপাহী সৈন্যগণ পাশ্চাত্য সৈন্য অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই কম নহে। তারা বিশ্বস্ত, সাহসী, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। ডুপ্লের সময় হইতেই পাশ্চাত্য জাতি কর্তৃক ভারতীয় সিপাহীদেরকে লইয়া নূতন সেনা-বাহিনী গঠিত হইতে লাগিল। ক্লাইভ যখন আর্কোটের যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া শিখযুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসরের যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সিপাহী সৈন্যের দ্বারা বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব নহে। বিদেশী জাতির অধীনে কাজ করিয়াও ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। বস্তুতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সিপাহী সৈন্যদের প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন।

সিপাহী সৈন্যদের উপযুক্ততা ও কার্য-কারিতা লক্ষ্য করিয়া দেশীয় রাজা মহারাজা ও নওয়াবগণ উহাদের আধুনিক পদ্ধতিতে ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ভারতের শাসকগণ সিপাহী সৈন্যদের দিকে বিশেষ নজর দিতে লাগিলেন। তাদের ড্রিল করান হইতে লাগিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও শিক্ষা দেওয়া হইল। তাছাড়া তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। এক একটা ইউনিট গঠিত হইল। পদাতিকবাহিনী আরও সুশিক্ষিত ও কার্যক্ষম হইল। সৈন্যদলকে রেজিমেন্টে, ব্রিগেডিয়ারে সংগঠিত করা হইল। সৈন্যদলের এক একটা ইউনিট শান্তির সময় ক্যান্টনমেন্টে থাকিত। এবং যুদ্ধের সময় নিজ নিজ অফিসারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করিত। সর্বোপরি বেতনের জন্য তাদেরকে কোন চিন্তা করিতে হইত না। প্রতি মাসে সকলকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। বাসের জন্য ঘর দেওয়া হইত। তাদের অসুখের সময় চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হইল। ছুটি এবং আরো নানাপ্রকার সুবিধা পাইতে লাগিল।

এই সব সুবিধা দেওয়ার ফলে সৈনাগণ হৃষ্টমনে কাজ করিত। যে মডেলে ইউরোপীয় সৈন্য গঠিত হইত, দেশীয় রাজাগণও সেই মডেল অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এদেশে ইংরাজ ও ফরাসীগণ ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া যে সৈন্যদল গঠন করিত তাহাতে ভেদবুদ্ধি স্পষ্টভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। তাহারা সিপাহী সৈন্যদের জন্য দুই প্রকার অফিসার পদ সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথমতঃ একদল মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয় অফিসারের অধীনে তারা কাজ করিত। সুবেদার, রিসালদার এই প্রকারে আরও কতকগুলি ছোট বড় অফিসার থাকিতেন। ইঁহারা ভারতীয় অফিসার। ইঁহারা একজন করিয়া ইউরোপীয় সর্বাধিনায়কের অধীনে থাকিতেন এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতেন। ভারতীয় সৈনাগণ তাদের ভারতীয় অফিসারের মাধ্যমে ইউরোপীয় অফিসারদের সহিত সংযোগরক্ষা করিতেন। ইউরোপীয় অফিসারগণ সাক্ষাৎভাবে ভারতীয় সৈন্যদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন না। তবে নির্দেশদান ও পরিচালনার দায়িত্ব সর্বদাই ইউরোপীয় অফিসারদের হাতে ন্যস্ত ছিল। সমাজের উচ্চতর স্তর হইতে কখন কখন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অফিসার করা হইত। তাঁহারা মেজর পর্যন্ত হইতে পারিতেন। তার ঊর্ধ্বের পদ ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত না। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইঁহারাই ছিলেন আসল নেতা।

ইউরোপীয় সৈন্যদলের গঠন প্রণালী হইতে ভারতের প্রণালী বহু দিক দিয়া পৃথক ছিল। ভারতের রাজাদের অধীনে যাঁহারা অফিসার কেডারের হইতেন তাঁহাদের কাজ ছিল অতি সামান্য। ড্রিল, ট্রেনিং, অস্ত্র ব্যবহার, যুদ্ধ কৌশল এসব বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা উচ্চদরের ছিল না। অথচ এসব বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকিলে ইউরোপীয় সৈন্যকে যুদ্ধে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তাই দেখা যায় যে, বিপুল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও দেশীয় সৈন্যগণ অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যদলের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধে ইহা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইল যে, সুশিক্ষিত ও সুগঠিত ইউরোপীয় সৈন্যদলের নিকট ভারতীয় যুদ্ধ-পদ্ধতি ব্যর্থ হইবে। সিপাহী দলের যে সব রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের অফিসারদের নিকট কোন কার্যকরী ও ফলপ্রদ নেতৃত্ব পায়নি। তাহারা কতকগুলি সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া মার্চ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ইহা বাহ্যিক দিক দিয়া খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন আসলভাবে যুদ্ধ করিতে হইল, তখন তাহাদের নেতারা তাদেরকে লইয়া সার্থক যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের নেতৃত্ব ব্যর্থ হইল। বাস্তবিকই সিপাহী সৈন্যদের বড় রকমের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। তাদের নিজেদেরও কোন বড় রকমের নেতা ছিলেন না। সৈন্যগণ ইউরোপীয় নেতৃত্বের অধীনেই যুদ্ধ করিতে পারিত।

ইউরোপীয়গণ সমর-নীতি ও রণ-কৌশলের যে নূতন পদ্ধতি এ-দেশে আমদানী করিল, তার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া এ-দেশের রাজা-মহারাজারাও তদনুসারে নিজেদের সেনা বিভাগে সংস্কার আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ও ইউরোপীয় নেতৃত্বের অধীনে তাহারা নিজেদের সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিলেন। মহীশূরে হায়দার আলি যে সৈন্যদল সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে তিনি ফরাসী রণবিশারদদের সাহায্য লইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম রেমণ্ডের অধীনে এবং সিন্ধিয়ার মহারাজা 'ডি বয়েন' এবং 'পেরোটের' নেতৃত্বে নিজেদের সৈন্যদল গঠন করিলেন। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংও 'এভেটা বিলের' নেতৃত্বে তাঁহার অজেয় শিখবাহিনী সৃষ্টি করিলেন। এই সব ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পাশ্চাত্যের নব পদ্ধতিতে সৈন্যদল গঠন করিলে সেনাদলে একটা বিপ্লব সাধিত হইতে পারে। আরও প্রমাণিত হয় যে, পুরাতন যুগের ও মান্ধাতার আমলের রণ-পদ্ধতির আমূলে পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশীয় রাজারা এই বৈপ্লবিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ-দেশের রাজা-মহারাজাগণ রণ-কৌশলকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই বোধ যদি

আরও একশত বৎসর পূর্বে জাগিত, তবে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল ভারতের ইতিহাসে এক সংকটময় যুগ। এখন হইতে রাজা-মহারাজাদের সমর বিভাগের রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। অশিক্ষিত সৈন্যদল অপসারিত হইল। এমন এক সুশিক্ষিত সৈন্যদল গঠিত হইল, যাহারা যে-কোন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিত। কিন্তু যুগের প্রতিভা গেল তাদের বিরুদ্ধে। যখন তাহারা সচেতন হইল, তখন দেখিল, বিজয়লক্ষ্মী বৃটিশ জাতির গলে জয়ের মালা পরাইয়া দিয়াছেন।

সিন্ধিয়ার মহারাজা ইউরোপীয় সমরকুশলী নেতার সাহায্যে এক বিরাট রেজিমেণ্ট গঠন করিলেন। যদিও তাঁর এই রেজিমেণ্ট আসাই (Assai) ও লাস্বরীর (Laswari) যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যের নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তবুও তাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেনি। কারণ তাঁর এই সুশিক্ষিত সৈন্যদল ভারতের অন্যান্য রাজাদের সৈন্যদলের তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্মদ ছিল। সিন্ধিয়া এই সৈন্যদলের সাহায্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর ওদিকে রণজিৎ সিং ইউরোপীয় নেতার নেতৃত্বে যে শিখ রেজিমেণ্ট গঠন করিলেন, তাহা ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কয়েকবারই পরাজিত করিয়াছিল। শিখদের বিরুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্যগণ যেসব যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই ইংরাজগণ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় শাসকগণ যেসব সৈন্যদল গঠন করেন, তাদের প্রধান দুর্বলতা এই ছিল যে, তাদের কোন উচ্চদরের ভারতীয় অফিসার ছিল না। রাজা-মহারাজারা ভালভাবে শিক্ষিত অফিসার কেডার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এমন কি মোগল সম্রাটদের সৈন্যদলেও গ্রেডেড় অফিসার-প্রথা সৃষ্টি করার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। তাঁদের যেসব অফিসার ছিলেন, তাঁহাদের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থিত কোন উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থাও ছিল না। এ-কথা সত্য যে, মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজী যে দুর্জয় মারাঠাবাহিনী সৃষ্টি করেন, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেনা বিভাগে লোক লইতেন। শিবাজীর সেনাদলে প্রধান সেনাপতি কর্তৃক নির্বাচিত ও মনোনীত একদল সুশিক্ষিত অফিসার কেডারের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের অফিসার ছিল হাবিলদার। এই হাবিলদার পাঁচশত ঘোড়সওয়ার লইয়া একটি ইউনিটের নেতৃত্ব করিতেন। এইরূপভাবে গঠিত পাঁচটি ইউনিটের উপর থাকিতেন একজন জমাদার। এইভাবে শিবাজীর সৈন্যদলে আরও উচ্চস্তরের নানা অফিসার থাকিতেন। সকলের উপরে থাকিতেন প্রধান সেনাপতি। প্রত্যেক গ্রেডের অফিসারের পরস্পরের মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ ছিল। কিন্তু শিবাজী যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহা তাঁহার পর স্থায়ী হইল না। তার প্রধান কারণ, রাজারামের অধীনে মারাঠা সৈন্যগণ আবার সামন্ততান্ত্রিক হইয়া পড়িল এবং অফিসারগণ কালক্রমে বংশানুক্রমিক জায়গীরদারদের অনুগত হইয়া পড়িল।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যদিও ভারতীয় শাসকগণ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্যদল গঠন করার রীতি প্রবর্তন করিলেন, তবুও তাঁহারা বিরাট আকারে যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন নাই। অথবা কোন প্রকার দূরদর্শিতামূলক সমর-কৌশলও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। যুদ্ধ একটা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হিসাবেই যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা, নানা উত্তর সমালোচনা ও আলোচনা করিতে হইবে। অতীত যুগে এ-দেশে যেসব যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস শিক্ষা করিতে হইবে। অতীতের যুদ্ধ-নেতা ও তাঁহাদের সমর-কৌশলের আদ্যন্ত ইতিহাস জানিতে হইবে। এ-সব না জানিলে যুদ্ধবিশারদ হওয়া অসম্ভব। এ-দেশের যেসব সৈন্যদলকে অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহারা যদি যুদ্ধের অতীত ইতিহাস না জানে, তবে তাহারা সমরবিশারদ হইবে কেমন করিয়া? নেপোলিয়ান ত ইউরোপ ও এশিয়ার বড় বড় যুদ্ধের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার, হানিবল, জুলিয়াস সীজার, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ—ইঁহারা স্বাভাবিক যুদ্ধ-নেতা। ইঁহাদের মত অলৌকিক প্রতিভাশালী নেতার পক্ষে কোন সমর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিবার দরকার না হইতে পারে। প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান যুগের অফিসারগণের সুদীর্ঘকাল, ধীরস্থিরভাবে ও অত্যন্ত যত্নসহকারে সমরবিদ্যা শিক্ষা করা দরকার। নতুবা কোন বৃহৎ যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সৈন্যদলের নেতাদের সুশিক্ষার একান্ত অভাব ছিল। ভারতীয় সৈন্যদল ইউরোপীয় প্রথাতে গঠিত হইত, তাহাদের মতই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। একই পদ্ধতিতেই শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী কার্যকরী অফিসারগোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আজ স্বাধীন ভারতের সমরবিশারদগণকে এ-সব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ১৮১৮ খৃ-অব্দ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের এই দীর্ঘকালে ভারতীয় সৈন্যদলের সংগঠন প্রণালী, ট্রেনিং, অস্ত্রসরঞ্জাম ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বৃটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে অতি সযত্নে ভারতবাসীকে উচ্চতর অফিসারের পদ হইতে অপসারিত করিতেন। যোগ্যতা দেখাইলেও, নানা অজুহাত দিয়া ভারতীয় অফিসারের পদোন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেন। প্রথম মহাসমর পর্যন্ত এইভাবে ভারতের দাবীকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। সুতরাং সমর বিভাগের নেতৃত্ব কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানদের একচেটিয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম মহাসমরের পরে তাঁহারা এই নীতি কতকটা পরিবর্তন করেন। এবং শেষ পর্যন্ত কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই অল্প সংখ্যক অফিসার বিভিন্ন রণাঙ্গনে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেন—প্রমাণ করেন যে, সমরক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় সৈনিকগণ একটা কার্যকরী সামরিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় নাই। আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধের কোন নীতি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ভারতের দেশরক্ষার কোন শক্তিশালী ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ভারতীয় সৈন্যদল প্রমাণ করিয়াছে যে, সাহস, সহনশীলতা, শৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ করার যোগ্যতা তাহাদের যথেষ্ট আছে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। আজ আমাদের দেশে সবকিছুই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। অতীতের ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া—ইহাই যদি ইতিহাস শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তবে দীর্ঘকালের যুদ্ধের ইতিহাস হইতেও বহু শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

আমি নিষেধ করেছিলাম লক্ষ্মীকে। সে কর্ণপাত করতে চায় না যেন।

যখন তখন এসে দেখা দেয় আমার ঘরে। অপ্রত্যাশিত আগমন, কিন্তু বিদায় নেওয়ার লক্ষণ থাকে না। যেতে বললেও যেতে চায় না। এসে কথা বলে যা খুশী। স্থান-কালের বিবেচনা পর্যন্ত নেই, এমনই বেহায়া আর নির্লজ্জ। লক্ষ্মীর ধরণ-করণ ভাল নয় আদপেই। বড্ড যেন চোখে লাগে। দৃষ্টিকটু ঠেকে চোখে। এতটুকু বোধ শক্তি নেই লক্ষ্মীর। অথচ কুমারী থাকলেও নেহাৎ কাঁচ খুকু নয় সে। মেয়ে মেয়ে যথেষ্ট বেলা হয়েছে।

—লক্ষ্মী, আর নয়। এবার এসো। মা হয়তো তোমায় খুঁজতে বেরুবেন।

বাধ্য হয়ে কত সময়ে বলতে হয় আমাকে। এই ধরণের কথা। সোজাসুজি বিদায় করতে পারি না, ভব্যতা বজায় রাখতে চক্ষুলজ্জায় বাধে।

কে কার কথা শোনে। লক্ষ্মী হয়তো খবরের কাগজের একখানি পৃষ্ঠায় চোখ রেখে একাগ্র মনে তখন পড়তে থাকে। কথা কানে যায় কি না যায়। একটা কথা একাধিকবার বললেই লক্ষ্মী আবার চটাচটি করে। বলে,—বিরক্ত করছেন কেন বলুন তো!

—কি আছে কাগজে? আমি শুধোই, যৎ-সামান্য একটা রহস্য ভেদ করতে। খবরের কাগজে এমন কি বা ছাপা হ'ল, লক্ষ্মীকে জানতেই হবে'।

—সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছি। কি কি নতুন ছবি এলো, তাই দেখছি। আপনার কিছু ক্ষতি হয়েছে, আমি কাগজ পড়ছি?

—না, ক্ষতি আর কি হবে। বললাম আমি মনের রাগ মনে রেখে। বললাম,—ওদিকে ঘড়িতে দেখেছো ক'টা বেজেছে? বেলা প্রায় দুটো।

আমার কাজের টেবলে আছে একটি টাইমপিস। এলার্মিং সমেত। রাখতে হয় আমাকে। ঘড়ি না থাকলে কাজের সময়ের হিসাব রাখা যায় না। রাজমিস্ত্রী, ফিটার, আর কুলী-কামিনদের মধ্যে কে কখন যায় আসে, ফাঁকি দেয় কতটা—লক্ষ্য রাখতে হয় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে।

—ওটা আপনার ঘড়ি নয়, ঘোড়া। অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বললে লক্ষ্মী। তাচ্ছিল্যের সুরে। কথা বলে, চোখ ফেরায় না কাগজের পাতা থেকে।

—যাই হোক, বাসায় যাও এখন। বেলা অনেক হ'ল। আমাকে কাজ করতে দাও। বলতে হয় আমাকে। হাতের কাজ বাকী পড়ে। কে কখন আসে, কে কখন দেখতে পায়, তাই ভীষণ অস্বস্তিতে থাকতে হয় আমাকে। যতক্ষণ লক্ষ্মী থাকে আমার ঘরে।

—আপনার হাত দুটোকে কি ধরে রেখেছি আমি? লক্ষ্মী বললে একটু কঠিন সুরে। বললে, কাজ করুন না আপনি। আমার দিকেই বা অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন? কে বলেছে হাতের কাজ বন্ধ রেখে—

—কেউ দেখলে কি মনে করবে! ভুল বুঝবে। মনে করবে হয়তো আমি—

আমার কথা এতক্ষণে তার কর্ণকুহরে পৌঁছেছে। দেখলাম কাগজ রেখে দিলে লক্ষ্মী। তারপর শাড়ীর আঁচল খুঁজতে থাকলো পিঠে হাত চালিয়ে। ঐ একখানি বোধ করি শাড়ীই আছে লক্ষ্মীর। বাসা থেকে যখন বেরোয় তখন শুধু পরে। একটি নীলাম্বরী শাড়ী। এখানে সেখানে সেলাই নীল সুতোর। সহসা চোখে পড়ে না। শাড়ীর রঙে সেলাই মিলিয়ে থাকে। আঁচল চেপে চেপে মুখ মুছতে থাকে লক্ষ্মী। মধ্যদিনের খর রো বাইরে। আমার ঘরের টিনের চালায়। বৈশা মাস। আগুনের বন্যা বইছে যেন বাতাসে ঘেমে উঠেছে লক্ষ্মী। একেই ক্ষীণকায়া, ছিপ ছিপে দেহগঠন। নিদারুণ উত্তাপে আর কাহিল দেখায় তাকে। কেমন যেন পাণ্ডু দেখায়। রক্তহীন যেন সে। আঁচল চেপে চেপে মুছলেও লক্ষ্মীর চোখের কোলের কালি যেমনকার তেমনি থাকে। নিত্যকার এই আক্ৰা তার। চোখের তলায় কালি।

—লোকে দেখবেই বা কি! আর বলবে বা কি! আমি তো ভেবে ঠাওরাতে পারছি না আপনি এত ভীতু কেন বলতে পারেন?

ধমকানির সুরে একটা একটা কথা বলে থাকে লক্ষ্মী থেমে থেমে। চোখ পাকিয়ে।

—তুমি দেখছি গরীবের চাকরীটা খোয়াবে এবার। বললে শুনবে না। ভান করবে অবুঝে মত। আমার চাকরী গেলে তুমি কাজ দেবে আমাকে? ওপরওয়ালাদের চোখে পড়লে আ রক্ষে থাকবে না।

—চাকরী! খিল খিল হেসে উঠলে লক্ষ্মী। হাসির অর্থ বোঝা যায় না। হাসে হাসতে বললে,—আমাকে একটা চাকরী দি না আপনার কাছে। কেনা গোলামের ম থাকবো। যাকে বলে বাঁদী। মাসে মাসে মাইে দেবেন।

চমকে উঠলাম আমি। আমি হেন চাকুর

জীবীর কাছে লক্ষ্মী কর্মপ্রার্থী! বললাম,—সম্ভব হবে না। আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম।

—আমার ভারী ইচ্ছে আমি নার্স হই। লক্ষ্মী বললে হাসি থামিয়ে। কথা বলতে বলতে আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসে। বলে, —সাধ আছে, সাধ্য নেই এই যা দুঃখু।

—খুব ভাল কথা। তুমি এখন বাসায় যাও। মা খোঁজাখুঁজি করবেন।

—মা? চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে লক্ষ্মী, —মা? মা এখন কোথায়! সে গেছে কাজ করতে। বাবুদের বাড়ী। বাসন মাজে। ফিরতে ফিরতে যার নাম সেই বেলা চারটে।

—তুমি কিছু খেয়েছো?

—মা এসে খেতে দেবে। বাসিভাত আর তরকারী আনবে। বাবুদের বাড়ী থেকে। রোজই আনে। বিনা দ্বিধায় কেমন কথা বলছে লক্ষ্মী। নিজেদের সংসারের চিত্র, অকপটে ব্যক্ত করছে। সহজ সুরে। সরল মনে।

—বাসি ভাত!

—হ্যাঁ তাই। খুব মিষ্টি লাগে। যারা খেতে পায় না তাদের মুখে। অমৃতের সমান।

—কিছু খাও লক্ষ্মী। কথা শোন আমার। ঐ যে আছে আমার টিফিন কেরিয়ার। বলতে বলতে আমিই এগিয়ে যাই।

—আপনার কম পড়বে। না থাক। আমি বাসায় ফিরে গিয়ে খাবো।

দুয়োরপানে এক পা এক পা চলতে থাকে লক্ষ্মী। যেন এখনই সে যাত্রা শুরু করবে। বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে।

দু টুকরো পাঁউরুটি আর একটা ডিম। তার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

হাতে যেন স্বর্গ পায় লক্ষ্মী। খানিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মুখে তোলে হাত। এক কামড় পাঁউরুটি মুখে তার। বললে,—আমি যাই এখন। আবার আসব ফাঁক পেলেই কাল-পরশু যেদিন সুবিধে হবে। আপনি মনের সুখে কাজ করুন। কাজ আর কাজ, আর কাজ—

কথা শেষ হওয়ার আগেই দুয়োর পেরিয়ে বেরিয়ে যায় লক্ষ্মী। কি একটা সস্তা গন্ধ-তেলের মৃদু সুগন্ধ রেখে যায়।

আমি স্বস্তির শ্বাস ফেললাম। মূর্তিমতী বাধা, বিপদ আর ভয় যেন ঐ লক্ষ্মী। অমঙ্গল তার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করে। প্রকট দারিদ্র্যের প্রতীক সে। নিঃস্ব আর রিক্ত। তৃষ্ণাতুর। ক্ষুধার্ত।

আমার আবার সরকারী চাকরী। মাস মাইনের। বেতন যাই হোক না কেন, লজ্জা আর সংকোচের, তথাপি সরকারী কাজ। সুখ-সুবিধে সুপ্রচুর। আজকের দিনে যখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অগণিত তখন আমার মত একজন নগণ্য ওভারসিয়ার যে শেষ পর্যন্ত একটা সরকারী কাজ পেয়ে যাবে—আমি নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। আমার সৌভাগ্যকে প্রশংসা করি আমি স্বয়ং। যদিও অবশ্য বেকার অবস্থায় প্রতি বছরেই লটারীর টিকিট কিনে কিনে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি আমি। শিকা আর ছিঁড়ে হয় না। স্রেফ টিকিট কেনাই সার হয়েছে। কলকাতার পথপ্রান্তে জ্যোতিষীকে হাত আর কপাল দেখিয়েছি। ভাগ্য-গণনার আশায়। আমার ভবিষ্যৎ জানতে। কপালে কি লেখা আছে? হাতের জটিল রেখার বক্তব্য কি? সব কিছু দেখে শুনে গ্রহাচার্য যা বলেছিলেন তারপর আমার উচিত ছিল আত্মহত্যার সাহায্য নেওয়া। কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে আর হাতের কাছে সেঁকো বিষ রেখে কতদিন চেষ্টা করেছি। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। দেশে আমার মা আছেন, বেরীবেরীতে অন্ধ বাবা আছেন, ভাই-বোনেরা আছে। তাদের মুখে অন্ন জোগাবে কে? তাই নানারকমের ভয়াবহ ব্যবস্থার পরে মরতে পারলাম কৈ? স্বেচ্ছায় মরণ বরণ শহীদরাই করতে পারে।

—বৃন্দাবন তো দেখছি এখানেই। আজকাল আবার নাম হয়েছে মধুচক্র! তাই নয়?

কথা বলতে বলতে আমার কুটীরীতে আসেন এস, ই। অর্থাৎ সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার। রাশভারী প্রকৃতির লোক। গম্ভীর কণ্ঠস্বর। হাসি কাকে বলে জানেন না। হাসতে ভুলে গেছেন যেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয় আমাকে। ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে সাহস হয় না। একটি কলমের খোঁচায় তিনি হয়তো আমাকে বরখাস্তের ব্যবস্থা করবেন। কিম্বা বদলীর আদেশ আনিয়ে দেবেন কলকাতার মহাকরণ থেকে। হয়তো আমাকে যেতে হবে সেই সিকিম আর গ্যাংটকে। পি, ডব্লিউ ডির পরি-চালনায় কাজ চলেছে সড়ক আর সাঁকো নির্মাণের।

—মেয়েটি কে হে চক্রবর্তী? বললেন স্টোরের খাতা টেবল থেকে তুলে নিয়ে! খাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেন এস, ই। বললেন, —দেখো, ফেঁসে যেও না যেন। গলায় না ঝুলে পড়ে।

—আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছি স্যার! বললাম আমি আমতা আমতা। ঢোঁক গিলে বললাম,—বিনা কারণে যখন তখন এসে পড়ে। এসে কাজের ক্ষতি করে। থাকে আশেপাশেই কাছেই কোথাও।

—আর কিছু নয়তো? এস, ই চালানের ফাইল তুলে নিলেন, স্টোরের খাতা রেখে দিয়ে। বললেন,—যা ভাবছি তা নয়?

আজ্ঞে না স্যার। একেবারেই তা নয়। বিশ্বাস করুন, হলপ ক'রে বলতে পারি। নিজের কুকুর পথ্য পায় না—

খুশী হলাম শুনে। নিশ্চিন্ত হ'লাম। এস, ই বলতে থাকেন নিস্পৃহ ভঙ্গিমায়। বললেন,—আরও খুশী হবো, আর যদি কোন-দিন দেখতে না পাই।

—আমি স্যার বহুৎ মানা করেছি। ভয় দেখিয়েছি। কান দিতে চায় না। যখন তখন এসে বিব্রত করে। কাজের ক্ষতি করে।

—কি চায় সে?

—কি জানি স্যার! কি যে চায় কিছুই ধরতে পারি না। তেমন কিছুই চায় না। শুধু আসে আর যায়। সময় নেই অসময় নেই এসে পড়ে যখন খুশী।

—মাথা খারাপ নয়তো? দেখে কেন তাই মনে হয়।

—তাও স্যার মনে হয় না। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। কোন লক্ষণ নেই মাথায় গণ্ডগোলের।

—তবুও শতহস্তেন বাজিনং, দূরে থাকাই ভালো। সাপ আর মেয়েছেলে দুই-ই সমান। সাবধানের মার নেই জানবেন।

এস, ই বলে গেলেন কথাগুলি, উপদেশের সুরে। কথার শেষে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন জোর কদমে। তিনি আসেন মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে। কাজের তদারক করেন। খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। কাজের গতি লক্ষ্য করেন। দেখেন, কাজে ফাঁকি পড়ছে কি না। মাল-মসলার ব্যবহার যথাযথ হয় কিনা।

কণ্ঠ শুকিয়ে যায় বোশেখী গরমে। এক গ্লাস জল খেয়ে তবে যেন শান্ত হয় বুকের দুরু-দুরু। সুবোধ্য কর্মীর মত আমি আমার নির্দিষ্ট কাজে মন দিই। খাতা আর কলম টেনে নিই। বিরাট একটি স্টেটমেন্ট তৈরী করতে হবে এখন। আজকের ডাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হবে অতি অবশ্য। মাল-মসলার হিসাব, ক্যাশের সর্বশেষ অবস্থা। কি কি বাবদে কত-টাকা খরচ হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। মরবার ফুরসৎ নেই আমার। অঙ্কে না ভুল হয়। হিসাবে না থাকে গরমিল।

—মিস্টার চক্রবর্তী আছেন না কি? চেনা চেনা কথার সুর। চালার বাইরে দেখে কথা বল-লেন কন্ট্রাক্টর। আশে পাশে যন্ত্র চলছে কংক্রীট মিশেলের। শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে কুলী-কামিনদের কলরোল। কামিনরা গান

গাইছে ছাদ পিটতে পিটতে। কুলীর দল হাসি-তামাসার সংগে কাজ করছে।

—কি খবর বলুন। আসুন, ভেতরে আসুন। অগত্যা বলতে হয় আমাকে। হাতের কাজ বন্ধ রেখে।

লোকটি স্থূলকায়। বিশাল বপু তাঁর। চলতে ফিরতে হাঁসফাঁস করেন। ঘরে এসে একটি চেয়ার দখল করলেন। বললেন,—এক পাত্র জল খাওয়ান দাদা। গরমের ঠেলায় আর পারি না। জান নিকলে যাচ্ছে।

জল গড়িয়ে দিলাম এক গ্লাস। ঢক ঢক শব্দ ভাসলো আমার চালাঘরে। হাতের গ্লাস রেখে দম নিয়ে বললেন,—বিলের টাকা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে, এস, ই কিছু বললেন না কি? টাকা না পেলে কাজ চালানো যাবে না আর। ধারকর্জ ক'রে টাকা জোগাতে আর পারছি না।

—সরকারের হাতে টাকা। ধ'রে নিতে পারেন এক রকম, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সময় হ'লেই পেয়ে যাবেন। বলতে হবে না। আমি আশার আলো দেখিয়ে বললাম। আর কি বলতে পারি আমি। বেশী বললে অন্য কিছু ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

পকেট থেকে একটি খাম বের ক'রে টেবিলে আছড়ে ফেলে দিলেন কণ্ট্রাক্টর। বললেন,—নিয়ে নিন না দু'শো একশো। সিমেন্টের হিসেবটা ঠিক ক'রে দিন। বিলটা না আটকে যায়। দেখবেন একটু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে হয় আমাকে। ইলেকট্রিক শক লাগে যেন। বললাম,—মার্জনা করতে হবে। আমি পারবো না টাকা নিতে। শেষে কি চাকরীটা হারাবো!

ফস ক'রে একটি সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন লোকটি। মুঠোয় ধরা সিগারেট টানতে থাকলেন ঘন ঘন। যেন তামাক খাচ্ছেন হুঁকোয়। এক মুখ ধোঁয়া উগড়ে দিলেন আমার মুখের উপরে। বললেন,—সবাই নেয় মশাই। সরকারী কাজে আমাদের দিতেই হয় চার-পাঁচ পার্শেণ্ট। দাদন দিতে হয় আমাদের। না দিলে কাজ চালানো যায় না। জানেন তো সবই। পকেটে রেখে দিন খামখানা।

আমি গান্ধীজীর ভক্ত আজন্ম। ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, সততার প্রতি আসক্তি আমার। জীবনে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলিনি। অন্যায় পাপের পথ এড়িয়ে চলতে চাই। প্রলোভন ত্যাগ করতে হয় অনেক। খামখানি ফিরিয়ে দিই আমি। ভদ্রলোকের বুক পকেটে সিঁদিয়ে দিই। বললাম,—আমাকে ক্ষমা করুন।

——হাসালেন মশাই আপনি। লোকটি হেসে উঠলেন দানবের মত। হাসতে হাসতে বললেন,—একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন, থাকবেন ভোগে-সুখে, তা নয়। দিন নেই রাত্তির নেই শুধু কলম পিষছেন। কথার শেষে সুর নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন,—মেয়েটা আসছে আর ফিরে যাচ্ছে উপোসী। দয়ামায়াও নেই মশাই আপনার! কেমন ধরণের মানুষ আপনি! আচ্ছা বেরসিক!

লোকটির যাতে মনের পরিবর্তন আসে, তাই আমি বললাম,—গান্ধীজী বলতেন যে—

—রেখে দিন মশাই ও সব ছাঁদাকথা। মামুলী বুকনি বড় বড়। কথা শেষ করতে না দিয়ে নিজেই বললেন সহাস্যে। চেয়ার পিছনে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। বললেন,—এক দিন দেখবেন, আমার কথা আপনার মনে পড়বে। তখন দুঃখ করতে হবে। আঙুল কামড়াতে হবে। খানিক থেমে আবার বলেন,—যান না একদিন, গাড়ী দিচ্ছি আমি। জীপখানা দিয়ে দিচ্ছি। মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে আসুন ফাঁকায়। ড্যাম-ট্যাম বারাজ-টারাজ দেখিয়ে আনুন। বাঙলোয় গিয়ে থাকুন একটা রাত।

—অনেক কাজ আমার। সময় কোথায়! মরবার ফুরসৎ নেই।

—ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় মশাই। কি আর বলি বলুন। বলতে বলতে লোকটি বিদায় গ্রহণ করলেন কত যেন অনিচ্ছায়। ঘরের বাইরে পৌঁছে বললেন,—ম'রেই তো আছেন মশাই। আবার মরবেন কি!

তাই থাকতে চাই আমি। মৃত্যু অনেক মংগলের। এই পাপের পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ নেই। নরকবাসের সামিল প্রায়।

দিন শেষে কাজ ফুরালে আমি ঘরেই থাকি। আমার চালার ঠিক বিপরীত দিকে সূর্যাস্তের পালা চলতে থাকে। নিরেট চক্রটা কেমন ধীরে ধীরে রক্তলাল আকার ধারণ করে! এক থালা অভ্র-আবীর যেন। পশ্চিম আকাশ জুড়ে সিঁদুর-লাল রঙ ছড়ায়। গাছের শীর্ষে যেন কে দুধ-আলতা ঢালে। অস্তভানু ডুবে যায় কখন।

আলো আঁধারির খেলা চলবে খানিক। তারপরেই পাখীর শেষ ডাকের সংগে সংগে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে চাঁদ উঠবে। আবছা অন্ধকার ছড়াবে আমার চালায়। দেখতে দেখতে কখন বিস্তীর্ণ, সীমাহীন, ফসলহীন শুষ্ক ফাট-ধরা জমিতে সোনালী আভা—চোখে পড়বে। একটি একটি তারা জাগবে মহাশূন্যে। আরও কিছুক্ষণ পরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হবে। সোনার থালা ঝলমলিয়ে উঠবে আকাশে। সুধা আর সুষমার ঝর্ণাধারা নামবে চাঁদের বুক থেকে। দেখতে পাওয়া যাবে চাঁদের চতুর্দিকে চন্দ্রবলয়।

সেদিনও প্রতীক্ষায় থাকি আশায় আশায়। সেদিন চতুর্দশী। শুক্লাতিথির।

কুলী-আর কামিনরা গান ধরেছে কাজের শেষে। মাদল বেজে চলেছে বস্তীর দিকে। বাতাসে ভেসে আসছে গানের সুর, নাচের ছন্দ। কুলীরা গান গাইছে। কামিনরা নাচের আসরে নেমেছে। হাঁড়িয়া বিতরণ করছে নিজেদের মধ্যে। যে যত পারো পান কর' মনের আনন্দে। এসো গান গাও। নাচের সংগী হও। অনাবিল হাসি আর নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসায় অবগাহন কর।

চন্দ্রোদয়ের সংগে চালা থেকে বেরিয়ে সীমাহীন প্রাঙ্গণে আশ্রয় নিই আমি। আরাম কেদারা আছে আমার একটা। টেনে নিই সে ক্যাম্বিশের সস্তা ডেক-চেয়ার। নতুন একটা মহাগ্রহ যেন হঠাৎ আবির্ভূত হয় আকাশে। অনেক বারের দেখা অনেক রাতে। তবুও মনে হয় এক অনন্যসাধারণ রূপ আর ব্যক্তিত্ব দেখা দিয়েছে আকাশপ্রান্তে। লজ্জায় যেন মুখ ঢাকছে পৃথিবী। চাঁদের শোভার তুলনায় পৃথিবী যেন ম্লান। কুটিল পাপের আঁধারে আচ্ছাদিতা।

দূরে যেন ডাক দেয় আমাকে। চাঁদ হাত-ছানি দেয়। ইশারায় আহ্বান জানায়।

আমিও চেয়ারের আরাম ভুলে উঠে চলতে থাকি মন্থরতম গতিতে। সারা দিনের শেষে, কর্মক্লান্ত আমি। বিশ্রামের আলস্যে যেন অবসন্ন। পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথ আমাকে নীরব নির্দেশ দেয়। কারও পদপাত পড়ে না এই নির্জন প্রান্তর-পথে। তাই ক্ষীণাঙ্গী সরীসৃপ ঐ পথ যেন দুঃখশ্বাস ফেলছে থেকে থেকে। চাঁদের আলোয় পথও আজ জেগে উঠেছে হঠাৎ। ঘুম ভেঙেছে তার।

সেদিন বাসনা হ'ল কেমন, দূরে যাই আমি। মাইল কয়েক গেলেই দেখতে পাবো এক টুকরো বসতি। জনতা থেকে অনেক দূরে আছে তারা। লক্ষ্য দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

একটিবার মনে পড়লো, ঘরের দুয়োর উন্মুক্ত রেখে এসেছি পেছনে। একবার ছ্যাৎ করলো বক্ষমাঝে। সুখের কথা, ঘরে কিছুই নেই আমার। কেন না আমার কিছুই নেই এমন, যা কেউ আত্মসাৎ করতে চাইবে। চুরি করবে দুর্নাম মাত্র কিনতে। আছে একটা জলের কলসী। শূন্য টিফিন কেরিয়ার। একটা তক্তা-পোষ আম কাঠের। প্যাটরায় কিছু জামা কাপড়। নগদ পাঁচ দশ টাকা।

যদি কোন রিক্তজন চুরি করে, লাভবান হয়, আমি আনন্দিত হবো আন্তরিক। কারণ উপরিউক্ত দ্রব্যাদি অপহরণে লোকসান বৈ লাভ নেই বিন্দুমাত্র। জামা-কাপড় যা আছে তাও পুরানো। জোড়াতালি দেওয়া। মূল্য নেই কিছুই। দশ টাকার নোটখানি অচল। নম্বরের দিকে ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

পথ যেন ডাক দেয় আমাকে। কত কাল পদপাত পড়ে না পথিকজনের। তাই এখানে সেখানে গুল্ম গজিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ঝোপ। পথের দুই পাশে বিস্তৃত ভূখণ্ড—সেই দিগন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় নজরে পড়ে অনেকটা। দেখা যায়, খেজুর আর তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রহরী তারা। অতন্দ্র, অনলস। এক জোড়া খরগোস, ছুটে পালিয়ে গেল আমার পদশব্দে। এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্য ঝোপে।

যেতে হবে বহু দূরে। কয়েক মাইলের ব্যবধান। বেশ লাগে একা একা চলতে। মনে হয় আমিই যেন এই আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথের একমাত্র অধীশ্বর। যথেচ্ছা চলবো, আবার থামবো যেখানে মন চাইবে। ক্লান্তি এলে ব'সে পড়বো পথপ্রান্তে। পথের ধূলোয়। সংকোচ থাকবে না। কেউ নেই দেখবার।

আকাশের চাঁদ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পথে আলো দেখিয়ে। আমাকে আঁধারের কবল থেকে, পথের কাঁটা থেকে রক্ষা করছে। আমি এগিয়ে চলেছি, অন্য এক গ্রহের সন্ধানে যেন। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে সেই বসতি। আজ দেখতে পাবো আমি। সাধ মিটবে কতদিনের।

সেবাগ্রাম। কে একজন সাহেবের সৃষ্টি। তাঁরই স্বপ্ন এক, বাস্তবে তার রূপান্তর। প্রতিষ্ঠাতার মেহনৎ পরিশ্রমে গ'ড়ে উঠেছে। ছোটখাটো একটি মনুষ্য-সমাজ আছে সেবাগ্রামে।

বেশ কিছু দূরে থেকে হ্যাজাকের দুগ্ধশুভ্র আলো চোখে পড়লো। অব্যক্ত উত্তেজনায় আমিও পা চালাই তাড়াতাড়ি। আর কতটা পথটা! আর কতক্ষণ! আমি যেন চলেছি এক মন্দিরে। জাগ্রত দেবতার সন্ধান পেয়েছি সেই দেবালয়ে।

হ্যাজাকের আলো স্পষ্টতর হ'তে থাকে। দেখার আনন্দে অধৈর্য আসে যেন। আর তর সইছে না। কূলে এসে গেছি। তরী ভিড়াতে হবে।

আলো জ্বালিয়ে মাঠেই ব'সে আছেন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ একজন। তাঁর পাশের বেতের মোড়ায় জনৈকা বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গিনী। দুজনে ফল বিতরণ করছেন এক পাল শিশুদের। আম, জাম, জামরুল, কদলী। লজেন্সের প্যাকেট।

ছোট ছোট পর্ণকুটির, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে যত্র তত্র। দেখায় যেন সাধুদের আশ্রম। পবিত্র, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। আমি একজন আগন্তুক। সাহেব আর মেম আমাকে দেখতে পেয়ে নতমাথায় অভিবাদন জানালেন। সাহেব বুকে ক্রুশ চিহ্নের সঙ্কেত জানালেন। আমিও নমস্কার জানালাম দেশীয় প্রথায়।

কিন্তু ওদের দুজনের মুখে যেন বিষণ্ণতা। কেমন যেন বিমর্ষ। শোকসন্তপ্ত। সেবার কাজে নেমেছেন, কিন্তু আছেন যেন মরণের প্রতীক্ষায়। শেষ ডাক শুনলেই সাড়া দেবেন তৎক্ষণাৎ।

পায়চারী থামিয়ে আমি কিছু বলবার জন্য দাঁড়ালাম ওঁদের দু'জনের সম্মুখে। সাহেব পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বললেন,—আমরা কি করতে পারি আপনার জন্য?

—কিছু নয়। আমি এসেছি আপনাদের দর্শনে। প্রণাম জানাতে। গান্ধীজী বলতেন যে, সেবাই নাকি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। তাই আমার সামান্য সাহায্য যদি গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হই।

অঙ্গুলি নির্দেশে সাহেব দেখিয়ে দিলেন, একটি সাদা বাক্স। গায়ে লেখা CHARITY BOX.

যৎসামান্য অর্থ, সসম্ভ্রমে রেখে দিলাম দাতব্য-আধারে। তারপর বিদায় জানিয়ে চললাম যে পথ ধ'রে এসেছি। কয়েক গজ অতিক্রমের পর ফিরে তাকাতে হয় একবার। আর একবার দেখতে চাই আমি। দেখলাম, একটি ফটকের ওপরে অর্ধ বৃত্তাকারে একটি সাইন বোর্ড। জোৎস্নালোকে স্বচ্ছ। পড়লাম, 'স্যামুয়েল মেমোরিয়াল লেপরসি হস্পিটাল।'

সাহেবের একমাত্র ছেলে না কি শোনা যায় অকালে মারা গেছে এই বাঙলা দেশেই। কুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হয় স্যামুয়েল। তারই স্মৃতি বহন করছে এই চিকিৎসালয়।

একটি উদ্যোগ, আন্তরিক উদ্যমের জীবন্ত পরিচয় চোখে দেখতে পেয়ে খুশীতে ভরা মন নিয়ে গভীর রাতে ফিরতে ফিরতে সহসা দূরে থেকে দেখতে পেলাম, আমার চালার সামনে কিছু লোক জমায়েৎ হয়েছে। চাঁদের আলোয় দেখতে পাই মাত্র, চিনতে পারি না কে বা কারা। আমার ঘরে আলো জ্বলছে—দৃষ্টিতে ধরা পড়লো।

ভীষণ বিস্মিত হ'লাম আমি। কল্পনাতীত এক ছবি দেখে। আমি ঘরে নেই, তবুও কেন এই জনসমাগম! কে বা তারা! কি বা চায়!

—কোথায় ছিলেন মশাই এতক্ষণ? এস, ই কথা বললেন আমাকে দেখেই।

কিছু বলতে পারি না উদ্বেগে। চালার মধ্যে ঢুকে দেখি, পল্লীমঙ্গল হাসপাতালের ডাক্তার। চেয়ারে ব'সে ব'সে কি যেন লিখছেন।

লক্ষ্মীর মার কোলে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। বিবর্ণ, নিস্পন্দ। মৃত্যুর স্নিগ্ধ ছায়া লক্ষ্মীর নিরুদ্বেগ মুখে। তার পাশেই প'ড়ে আছে একটি ফুলের তোড়া। শুধু গন্ধরাজ। লক্ষ্মী হয়তো এসেছিল আমাকে দিতে। প্রায়ই ফুল এনে দিয়েছে সে আমাকে।

ডাক্তার বললেন,—ডেথ্ ডিউ টু স্টার্ভেশন! অনাহারে মৃত্যু।

শ্বাস পড়লো আমার। চাকরী যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না ঘরে। লক্ষ্মী না অলক্ষ্মী কে জানে!

সতর্কে হাঁটতে শেখো

দুর্গাদাস সরকার

সতর্কে হাঁটতে শেখো যদিও ঊনিশ কেউ, কুড়ি
কিংবা তিরিশ চল্লিশ; তারো বেশি—
উত্তর-পঞ্চাশ।

...তাদের বয়েস নেই। মনে তাই তাদের উল্লাস
চিরকাল। সবাই সমান। কেউ চিবোয় বা মুড়ি।
কেউ যায় রেস্তরাঁয়—যার নিংড়ানো
লেবুর মতো

দুই ঠোঁট, ভোঁতা চোখ, তবু কাটে
শাণিত ইচ্ছায়।

গ্রীবার রেখার ঘামে কাদা জমে। উলঙ্গ ছায়ায়
যতোই কুৎসিত হোক, ঠিক ইতিকর্তব্যে সংগত।

অথচ অনেকে হেসে ফুৎকারে ওড়াবে তত্ত্ব-কথা;
ছেঁড়া কাগজের বাক্সে সব কথা জড়াবে জঞ্জালে।
কেননা মুহূর্তে হয় যে মানুষ বড়
বোদ্ধা নিজে—

সে নিজেই খুঁজে পায় স্নায়ুতে
যৌবন-উদ্দামতা।

এবং আমিও নিজে স্ববিরোধী হই
কোনো কালে
যতোই গোপন হোক তারি ইতিবৃত্তই লিখি যে।

বকশিশ

আমিনুর রহমান

* গল্প *

অমরদার শনিবারে আড্ডাটা সেদিন খুব জমে গিয়েছিল। গনাইমামার হাতঘড়িটা আটটা বেজে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে টেরই পান নি কখন রাত এগারটা বেজে গেছে। অবশ্য গনাইমামা আটটা থেকে এগারটার মধ্যে কম করে বার কুড়ি ঘড়ি দেখেছেন কিন্তু রকেটে চড়ে চাঁদের দেশে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনায় এতই মশগুল ছিলেন যে, একবারও খেয়াল করেন নি তাঁর ঘড়িতে প্রতিবারই আটটা দেখতে পাচ্ছেন।

মোটা, বেঁটে, ফর্সা, মাথায় টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুড়ো ঝাঁটার মত গোঁপ, সদা প্রসন্ন মুখ—আমাদের গনাইমামা এখন পুলিশে চাকরি করেন—সেদিন তাঁর ডিউটি ছিল রাত দশটা থেকে। ভাবের আতিশয্যে নড়বড়ে টেবিলের ওপর সজোরে একটা কিল মেরে, তিনটে চায়ের কাপ উল্টে, গনাইমামা বললেন, যাই বল চাঁদে আমি পাঁচ কাঠা জমি কিনবই, ঐ রুপালী নদীর ধারে—এ পোড়া দুনিয়ার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

হঠাৎ ভোম্বল লাফিয়ে উঠে বলল, চললুম—আমার একটা ভীষণ জরুরী এনগেজমেণ্ট আছে। —

অমরদা একটা কড়া তামাকের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, এত রাত্রে তোমার আবার জরুরী এনগেজমেন্ট কি হে ছোকরা? বড়লোকের ছেলে, বিয়ে থা করনি, ব্যাপারটা আদৌ ভাল ঠেকছে না। কোথাও টোপ গিলে বসে আছ নাকি?

ভোম্বল কোন কথা না বলে হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে গেল। লালু একটা বিরাট হাই তুলে বলল, এবার যাওয়া যাক্, অনেক রাত হয়ে গেল, গিন্নী রেগে আগুন হয়ে আছে।

গনাইমামা পুনরায় নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, আজ এদের সব হল কি? মোটে রাত আটটা—এরই মধ্যে সব কেটে পড়ছে!

রণু তার নিজের হাতঘড়িটা ও দেওয়ালে টাঙানো জাপানী ক্লকটা দেখে নিয়ে বলল, গনাইমামা এখন পারস্য দেশের ঘড়িতে কটা বেজেছে বলছ না আমাদের দেশের টাইম বলছ? তোমার বুঝি আজ 'অফ ডিউটি'?

গনাইমামা তখন নিজের হাতঘড়িটা কানে ঠেকিয়ে খানিকক্ষণ দেওয়াল ঘড়িটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে না না—আমার দশটায় ডিউটি আছে। এই সর্বনেশে ঘড়িটা আমার চাকরীর বারোটা বাজিয়ে দেবে দেখছি।

নিজের মনে গজর গজর করতে করতে গনাইমামা ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলেন অমরদার আড্ডা থেকে। দরগা রোড ধরে যেতে যেতে পার্কের সামনে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট বাগান বাড়ীটার কাছে গিয়ে গনাইমামা থমকে দাঁড়ালেন। পাঁচিলের ধারে নিম গাছের তলায় অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শীতের রাত্রি—পথে যানবাহন, লোকজন কেউ কোথাও নেই। এমন কি পথের কুকুরগুলো পর্যন্ত শীতে কাবু হয়ে যেখানে সম্ভব কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

গনাইমামা একটু তফাতে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলেন আর আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, সবই মায়ের কৃপা, তা না হলে ঘড়িটা বন্ধ হবে কেন আর এমন শিকার জুটবে কেন। ও বেটা ঠিক কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে চুরি করতে এসেছে। পোষাক দেখে মনে হচ্ছে মামুলী ছিঁচকে বা সিঁধেল চোর নয়—নিশ্চয়ই কোন নাম করা ডাকাতের সর্দার।

বেগমপুরের কুমার বাহাদুরের বিরাট বাগান বাড়ীর জৌলুষ এখন তেমন নেই। বাগানটা আগাছায় ভরে গেছে, দেওয়ালে, পাঁচিলে বহু স্থানে ফাটল ধরেছে। প্রৌঢ় কুমার বাহাদুর নিজে বাতে পঙ্গু, তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি দেবী মেদবহুল বিপুল শরীর নিয়ে নড়তে চড়তে হাঁসফাঁস করেন। তাঁদের একমাত্র আদরিণী ষোড়শী তনয়া কুমারী রাধারাণী চঞ্চলা হরিণীর মত সারাটা বাড়ী মাতিয়ে রেখেছে। রক্ষণশীল পরিবারে থেকেও কলেজে পড়ার অনুমতি সে পেয়েছিল।

একটু পরেই মৃদু শিস্ দেওয়ার শব্দ গনাইমামার কানে গেল এবং নিম গাছটার তলা থেকে সেই ভদ্রবেশী দুর্বৃত্তটি পাঁচিলের আরও কাছে সরে গিয়ে প্রত্যুত্তরে শিস দিল। গনাইমামা বুঝলেন কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে একটি তস্করের আগমন হয় নি, একাধিক দস্যু হানা দিয়েছে। সাদা পোষাকে একা গনাইমামার পক্ষে এই দুর্ধর্ষ ডাকাতের দলকে ধরতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু সময় নেই। কুমার বাহাদুরকে ডেকে সাবধান করে দিতে গেলে ডাকাতের দল পালিয়ে যাবে আবার থানায় গিয়ে ফোন করে লালবাজার থেকে পুলিশ বাহিনী আনাতে যে সময় যাবে তার মধ্যে ডাকাতের দল কাজ উদ্ধার করে চলে যাবে।

গনাইমামা আর ভাবতে পারছেন না। এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি জীবনে কখনও পড়েন নি। উত্তেজনায় তাঁর টাক গরম হয়ে গিয়েছে, শীতের মধ্যেও ঘেমে গিয়েছেন। প্রাণের চাইতে তাঁর কাছে কর্তব্য বড়, তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে খালি হাতে একাই সশস্ত্র ডাকাতের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য অগ্রসর হলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি এগিয়ে গিয়ে নিম গাছতলায় দণ্ডায়মান দুর্বৃত্তকে সজোরে জাপটে ধরে তাকে হিড় হিড় করে আলোর সামনে টেনে আনলেন গনাইমামা। পরক্ষণেই আচমকা ভূত দেখে মানুষ যেমন ভয়ে আঁতকে ওঠে তেমনি তিনি তাঁর শিকার ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে তিন পা পেছিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন, একি তুমি ভোম্বল এখানে কি করছ? আমি ভাবলুম কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে কেউ চুরি করবার তালে আছে।

ভোম্বল প্রথমে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, অতিকষ্টে সামলে নিয়ে বলল, ঠিকই ধরেছ গনাইমামা, কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে চুরি করতেই এসেছি।

গনাইমামা খানিকক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক

হয়ে পড়লেন, তারপর বার কয়েক টাক চুলকে নিয়ে বললেন, তুমি কি বলছ ভোম্বল? ধনী জমিদারের উচ্চ-শিক্ষিত সন্তান রাতদুপুরে চুরি করতে বেরিয়েছে—তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? কেন তোমার কিসের অভাব?

ভোম্বল গনাইমামার হাত চেপে ধরে বলল, দোহাই বাপু, তুমি অত চেঁচিও না—টের পেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অভাব না হলে কি আর চুরি করতে বেরিয়েছি। তবে ভয় নেই, আমি যে রত্নটি চুরি করতে এসেছি, তা একরকম চুরি করা হয়েই গেছে। মানে হৃদয়টা আগেই চুরি করে নিয়েছি এখন হৃদয়ের মালিককে নিতে এসেছি। তুমি আমার এই চৌর্যবৃত্তিতে একটু সাহায্য কর না।

গনাইমামার বুদ্ধিটা মোটা, খানিকক্ষণ নিজের ভুঁড়িতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, কি যে বললে ঘোড়ার ডিম কিছুই বোধগম্য হল না।

ভোম্বল একটু বিরক্ত হয়েই বলল, সোজা কথাটা মাথায় ঢুকল না? কুমার বাহাদুরের মেয়ে রাধার খবর রাখ? আমি সেই রাধাকে চুরি করতে এসেছি। আমরা দুজনে দুজনকে ভীষণ ভালবাসি এবং পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করব ঠিক করেছি—এতে কারও কোন আপত্তির কারণ হতেই পারে না। ওর বাবা আর মা বাধার পর্বত হয়ে আমাদের মাঝখানে পথ আটকে আছেন। এই পর্বত লঙ্ঘন করবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি।

গনাইমামা তাঁর পানদোক্তা খাওয়া দাঁত-গুলো বার করে একগাল হেসে বললেন, ও—ইলোপমেণ্ট—এইবার বুঝেছি। তা মেয়েটার যখন আপত্তি নেই বলছ তখন তোমায় আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আমাকে কি করতে হবে বল।

ভোম্বল গনাইমামার হাত ধরে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে বলল, হৃদয় চুরির বেলা কারও সাহায্য দরকার হয়নি, কারণ ওটা হাল্কা বস্তু, একাই ম্যানেজ করে নিয়েছি, কিন্তু হৃদয়ের মালিককে একা পাঁচিলের ওপর টেনে তুলতে পারব না, তোমাকে একটু হাত লাগাতে হবে। কোনরকমে একবার ওকে পাঁচিলের এধারে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে! মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি ঠিক করে রেখে এসেছি—তিন মিনিটে হাওয়া। তারপর কারো বাবার সাধ্য নেই আমাদের হদিস পায়। যাক, আর দেরী করা ঠিক হবে না—কাজে লাগা যাক্। গনাইমামা তুমি নিম গাছের ঐ ডালটা ধরে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়, আমি তোমাকে ধরছি—

মালকোচা মেরে গনাইমামা এক লাফে ডালটি ধরে ফেললেন কিন্তু পাঁচিলের ওপর না উঠে সোজা মাটিতেই লাফিয়ে পড়লেন এবং ফিস ফিস করে ভোম্বলের কানে কানে বললেন, পাঁচিলের ওপর শাড়ীর আঁচল দেখতে পেলুম, কেউ আছে নাকি র‍্যা?

ভোম্বল গনাইমামাকে একটা জোর চিমটি কেটে বলল, হ্যাঁ আছে বইকি—তবে এতক্ষণ ধরে কি বকে মরলুম। ও বোধহয় মই-টই দিয়ে ওধার থেকে পাঁচিলের ওপর উঠছে। তুমি চটপট উঠে পড়ে ওকে ধরে এপাশে নামিয়ে দাও দিকি। আমি ধরে নিচ্ছি।

গনাইমামা পুনরায় গাছের ডাল ধরে এবং ভোম্বলের কাঁধের ওপর একটা পা রেখে অতি কষ্টে পাঁচিলের ওপর চড়তে চড়তে বললেন, মডার্ণ রাধা, বাঁশির বদলে শিস শুনে ত ঘর থেকে বেরিয়েছে; এখন তোমার বদলে আমাকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না ত বাপু। গোলমাল বাধলে তুমি যেন সটকে প'ড় না, আমি মোটা মানুষ, চটপট পালাতে পারব না—ধরা পড়লে পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়ারা বেকসুর ধোলাই দিয়ে দেবে।

পাঁচিলের ওধার থেকে রাধারাণী এদের সব কথাই শুনতে পেয়েছে তাই ভোম্বলের কাছথেকে কোনরকম নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একটা মই জোগাড় করে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়েছে। গনাইমামা ইঙ্গিতে তাকে শব্দ করতে নিষেধ করে দিয়ে তার হাত ধরলেন। আবছা অন্ধকারে গনাইমামা দেখলেন রাধারাণী অপরূপ সুন্দরী, হাতটা নরম তুলতুলে। মনে মনে স্বীকার করলেন ভোম্বলের পছন্দ আছে। ফিস্ ফিস্ করে বললেন, এস মা এই শুভ লগ্নে আমিই কন্যাকর্তা হয়ে তোমাকে সৎ পাত্রে সম্প্রদান করি, দেখো যেন হড়বড় করে আমাকে শুদ্ধ ফেলে দিও না।

গনাইমামা সবল ও নিপুণ হস্তে রাধা-রাণীকে পাঁচিলের এধারে নামিয়ে দিলেন এবং ভোম্বলও তাকে সাবধানে ধরে নামিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে তারা দুজনে রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি বিদ্যুৎবেগে সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাঁচিলের ওপর একা বসে গনাইমামা চিন্তা করছে—কেমন করে নামা যায়। ভোম্বলের সাহায্যে তার কাঁধে পা রেখে কোনরকমে ওঠা গিয়েছিল, কিন্তু একা নামা মোটেই সহজসাধ্য নয়। চেষ্টা করতে গিয়ে যদি বেমক্কা পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে ত তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তিনি দিতে পারবেন না। এদিকে রাধারাণীর অন্তর্ধানের খবর যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত তাঁর অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়বে। মইটা পাঁচিলের গায়ে লাগানো ছিল। গনাইমামা মতলব করলেন কোনরকমে মইটা পাঁচিলের এধারে লাগাতে পারলে তাঁর পলায়নের পথ প্রশস্ত ও সহজ হয়ে যায়।

পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাগানের অপর প্রান্ত থেকে বামা-কণ্ঠে তারস্বরে চিৎকার শোনা গেল, রাধা এত রাত্রে বাগানে তুই কি করছিস? ও রাধা তুই কোথায় আছিস? কোন সাড়াশব্দ পাই না কেন? রাধা ও রাধা—নাঃ ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। সেই ছোঁড়াটা ঠিক আজ আবার এখানে মরতে এসেছে। ও তেওয়ারী ও লছমন সিং একবার চারদিক ভাল করে খুঁজে দ্যাখ্ ত রাধা কোথায় গেল।

বলতে বলতে রাধার মা মইয়ের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লেন। মই টেনে তুলবার

আর সময় নেই এবং মই ছাড়া গনাইমামার পক্ষে পাঁচিলের ওপর থেকে নামাও সম্ভবপর হচ্ছে না। এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় দাঁড়িয়ে মার খাওয়াও আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অগত্যা প্রাণের দায়ে আপাততঃ মই-এর সাহায্যে বাগানের মধ্যে নেমে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। গনাইমামা নামবার জন্য সবে মইয়ে পা দিয়েছেন অমনি রাধার মা মইটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলেন, ওমা এখানে মই এনে রাখল কে? আমার মেয়েকে তাহলে ঠিক কেউ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। ওরে ও কুড়ের বাদশা দেওয়ারী—জলদি কুমার বাহাদুরকে খবর দে।

মোটা মানুষ গনাইমামার পক্ষে ঐ রকম পরিস্থিতিতে নড়বড়ে মইয়ের ওপর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হল না। মইশুদ্ধ তিনি অচিরাৎ ধরাশায়ী হলেন। ধরাশায়ী হলেন বললে ভুল হবে কারণ তিনি গিয়ে পড়লেন অঞ্জলি দেবীর মেদবহুল বিপুল দেহের ওপর। এমন উদ্ভট কাণ্ডের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। অঞ্জলি দেবীর ওপর গনাইমামার আকস্মিক পতনে তিনি ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, আমার ঘাড়ের ওপর মামদো ভূত লাফিয়ে পড়েছে, ও মা গো......

চারিদিকে ভীষণ হৈ-চৈ ছোটাছুটি পড়ে গেল। টর্চ, লাঠি, বন্দুক, শাবল নিয়ে দারওয়ান, ঠাকুর, চাকর, মালি যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সবাই ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখে অঞ্জলি দেবী গনাইমামাকে সজোরে দুই হাতে জাপটে ধরে চোখ বন্ধ করে তারস্বরে চিৎকার করছেন আর গনাইমামা সেই অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছেন।

গনাইমামাকে পিছমোড়া করে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হল কুমার বাহাদুরের সামনে। চারজন জোয়ান ব্যক্তি গনাইমামাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, আশপাশে আরও অনেকে সশস্ত্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। অঞ্জলি দেবী একটা সোফার ওপর বসে ভীষণ রকম হাঁফাচ্ছেন আর ঘন ঘন আঁচল দিয়ে মুখ মুছছেন। কুমার বাহাদুর ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে কম্পিত হস্তে সেটা গনাইমামার দিকে তাক্ করে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, খবরদার, পালাবার চেষ্টা করেছ কি এক গুলীতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব। এখন বল কি জন্য এত রাত্রে চোরের মত আমার বাগানে ঢুকেছিলে আর তাছাড়া আমার মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

গনাইমামা নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, আমাকে সার্চ করে দেখতে পারেন।

কুমার বাহাদুর প্রচণ্ড ধমক দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ফাজলামি কর না। চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে দেব। আমাকে তুমি চেন না। ভাল চাও ত আমার মেয়ে কোথায় আছে বল, নইলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে. —কি চুপ করে আছ যে? ঠিক আছে, আমি আগেই থানায় ফোন করে দিয়েছি। পুলিশের কাছে তুমি কেমন মুখ না খুলে থাক দেখি।

গনাইমামা উল্লসিত হয়ে বললেন, পুলিশে খবর দিয়েছেন নাকি? যাক্ বাঁচালেন, আমি ভাবছিলুম কি করে একটু থানায় খবর দেওয়া যায়।

কুমার বাহাদুর বিস্মিত হয়ে বললেন, তার মানে?

তাচ্ছিল্যের সুরে গনাইমামা উত্তর দিলেন, পুলিশ এলেই মানে বুঝতে পারবেন। মিথ্যা অভিযোগে আমাকে এভাবে জবরদস্তি আটকে রাখার জন্য আপনাকে ....

ভীষণ চটে গিয়ে কুমার বাহাদুর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাইরে পুলিশের গাড়ীর শব্দ শুনে কান খাড়া করে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে বড়-দারোগা মার্চ করে ঘরে ঢুকলেন। গনাই-মামা এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে খট করে এ্যাটেনশন হয়ে একটা মিলিটারী সেলাম ঠুকে দিলেন। 'ও-সি' গনাইমামাকে ভালভাবে চিনতেন, তাছাড়া অমরদার আড্ডায় একসঙ্গে ব্রীজ খেলেছেন। গনাইমামার পিঠ চাপড়ে 'ও-সি' বললেন, কি ব্যাপার, আপনি এখানে? দশটার সময় থানায় রিপোর্ট করতে গেলেন না দেখে আমি ভাবলুম—

গনাইমামা কুমার বাহাদুরকে দেখিয়ে ভারিক্কী চালে বললেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, কেন আমি থানায় না গিয়ে এখানে, এই সময়ে এইভাবে আছি।

কুমার বাহাদুর রীতিমত ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে কয়েকবার ঢোক গিলে, আমতা আমতা করে বললেন, আমার মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার বিশ্বাস কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমার স্ত্রী খানিক আগে বাগানে মেয়ের সন্ধানে গিয়ে এই লোকটাকে দেখতে পান। ইনি আমার স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

'ও-সি' এবার গনাইমামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে সব খুলে বলুন ত?

গনাইমামা বিরক্তির সুরে বললেন, কি যে হয়েছে এঁরা আমাকে ভাল করে বুঝতে দিলে তবে ত বলব। যথাসময়ে যাচ্ছিলুম থানায়, বাইরে পাঁচিলের ধারে নিম গাছতলায় শিস দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম, তারপর পাঁচিলের ওধারে আবছা অন্ধকারে মানুষের মাথা দেখতে পেয়ে আমার মনে খটকা লাগল। কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে দুর্বৃত্তের আবির্ভাব হয়েছে ভেবে পাঁচিলের ঐ মাথায় উঠে আস্তে আস্তে নিম গাছটার দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখি একটা মই পাঁচিলের গায়ে লাগানো রয়েছে। ভাবলুম ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করে দেখাটা আমার কর্তব্য। নীচে নামবার জন্য সবে মইয়ের ওপর পা দিয়েছি অমনি কে যেন মইটা ধরে টান মারল, আর আমিও পড়ে গেলুম।

কুমার বাহাদুর 'ও-সি'কে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার আমার মেয়েকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করুন। তাকে সারা বাড়ীর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গনাইমামা একগাল হেসে বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, কেসটা যখন একবার হাতে নিয়েছি তখন ত আর আপনাদের ওপর রাগ করে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই আপনার মেয়ের সন্ধান এনে দেবই তবে যদি না পারি ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিব।

পরদিন সকালে রাধারাণীর সঙ্গে ভোম্বলের রেজিস্ট্রারী করে বিয়ে হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ভোম্বলদের পার্ক এ্যাভেনিউর বাড়ীতে বিরাট প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত জোগাড় করতে আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে অমরদার আড্ডার প্রত্যেকেই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। ভোম্বলের গুরুজন-দের তরফ থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিয়েতে সমর্থন ও আশীর্বাদ পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই কুমার বাহাদুর গনাইমামা কর্তৃক প্রেরিত এক পত্রে অবগত হলেন যে তাঁর একমাত্র কন্যা রাধারাণী পার্ক এ্যাভেনিউতে আছে, তিনি যেন অবিলম্বে সস্ত্রীক সেখানে চলে যান।

অমরদার আড্ডার প্রত্যেকেই ভোম্বলের নব-পরিণীতা স্ত্রীর জন্য সাধ্যমত উপহার নিয়ে এসেছে। কুমার বাহাদুর আর অঞ্জলি দেবী গাড়ী থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বড় হল ঘরটায় ঢুকতেই ভোম্বল আর রাধারাণী এসে তাঁদের প্রণাম করল। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। গনাইমামা এগিয়ে এসে গদগদ কণ্ঠে বললেন, দেখলেন ত স্যার, আমার কথা আমি রেখেছি।

কুমার বাহাদুর এক ধমক দিয়ে বললেন, শাট্ আপ!

'যেদিন রাণী হলাম'—ভিক্টোরিয়া

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত

মঙ্গলবার, ২০শে জুন, ১৮৩৭

ঘুমটা ভাঙল মায়ের ডাকে। মা জানালেন যে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং লর্ড কনিংহাম এখানে এসেছেন আর আমারই সঙ্গে দেখা করতে চান। উঠে পড়লুম বিছানা থেকে শুধু ড্রেসিং গাউনটুকু পরে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে এলুম তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এবং তা একাই। দেখা হতেই লর্ড কনিংহাম (লর্ড চেম্বারলেন) খবর দিলেন যে আমার হতভাগ্য জ্যাঠামশায় ইংল্যান্ডেশ্বর (১) আর পৃথিবীতে নেই। ভোর ২টা ১২মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং তাঁরা জানালেন যে অতএব ইংল্যান্ডের সিংহাসন এখন আমার। এই মুহূর্তটি থেকে আমি সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনের রাণী। নতজানু হয়ে লর্ড কনিংহ্যাম আমার হাত চুম্বন করলেন এবং সরকারীভাবে আমার কাছে রাজার মৃত্যুসংবাদটি ঘোষণা করলেন। আর্চবিশপ বললেন যে, রাণীর (২) ইচ্ছানুযায়ী তিনি আমাকে রাজার অন্তিমমুহূর্তের ঘটনাবলী জানাচ্ছেন। তাঁর কাছে জানলুম যে মৃত্যুর পূর্বে আধ্যাত্মিক চিন্তায় রাজা মনপ্রাণ নিমগ্ন করেছিলেন, তাঁর সমস্ত চিন্তা সেই সময়ে আধ্যাত্মিক চেতনায় ভরপুর ছিল। খুব নিশ্চিন্ততার মধ্যে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে তিনি বরণ করেছেন, শুধু তাই নয় মৃত্যুচেতনা তাঁর কিছু পূর্বেই এসেছিল আর সে বিষয়ে তিনি রীতিমত সচেতনই ছিলেন। লর্ড কনিংহামকে উইন্ডসারে আমার শোকতপ্তা জ্যাঠাইমাকে আমার সুগভীর সমবেদনা জানানোর নির্দেশ দিয়ে আমি ঘরে চলে এসে বেশ পরিবর্তন করে নিলুম।

আজ আমার জীবনে দায়িত্ব বিরাট, অনেক

১৮৩৭ সালের ২০শে জুন তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ গ্রহণ করছেন।

কর্তব্য আমার সামনে, বহুবিধ ভার এখন আমার উপর, আমার বয়েস যদিও নিতান্ত কম এবং অভিজ্ঞতাও অত্যল্প তবু একটি বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজাগ যে সৎকর্মের বাসনা এবং সকল সুকর্মে সহানুভূতিসূচক মনোভাব আমার আছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই।

প্রাতঃরাশের সময়ে প্রিয় স্টকমার (৩) এলেন। কথাবার্তা হল আমাদের দুজনের মধ্যে। লিওপোল্ড (৪) মামা আর থিওডোরকে (৫) চিঠি লিখলুম। লর্ড মেলবোর্ণের (৬) কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলুম যার মর্ম যে নটার কিছু আগেই তিনি আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এলেন ঠিক নটায়, একা এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঘরেই দেখা করলুম। আমার হাতখানি তিনি চুম্বন করলেন, আমি তাঁকে বললুম যে তাঁর নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাই মন্ত্রিপদে সমাসীন থাকুন। এ বাসনা আমার বহুকালের, দীর্ঘপোষিত, তা ছাড়া তাঁর চেয়ে যোগ্য নায়ক, নেতা, পরিচালক কোথায়? নেই-ই। তিনি উত্তরে আবার আমার হাতখানি টেনে নিয়ে তাতে ওষ্ঠ দিয়ে এঁকে দিলেন একটি চুম্বনের রেখা। তারপর যে ঘোষণাটি আমায় সংসদে পড়তে হবে সেটি আমায় পড়ে শোনালেন। ঘোষণাপত্রটি তাঁর নিজেরই লেখা। লেখাটি এককথায় অনবদ্য। তাঁর উপর আমার অসীম আস্থা আর—আর—আর তাঁকে আমার ভয়ানক ভালো লাগে। তিনি নির্ভীক, সৎ বুদ্ধিমান অর্থাৎ সুন্দর মানুষ। এরপর জ্যাঠাইমাকে একখানি চিঠি লিখলুম। বেলা এগারোটা নাগাদ লর্ড মেলবোর্ণ আবার এলেন এবং নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আলাপ-আলোচনা চালালেন। সাড়ে এগারোটা নাগাদ নীচে নেমে এসে লাল সালুনে আমরা আহূত একটি অধিবেশনে যোগ দিলুম।

সর্বক্ষণ বসেই ছিলুম। লর্ড মেলবোর্ণ এবং আমার দুই কাকা কাম্বারল্যান্ড(৭) এবং

(শেষাংশ ২৯০ পৃষ্ঠায়)

(১) ইংল্যান্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম (১৭৬৫—১৮৩৭)।

(২) তদীয় সহধর্মিণী রাণী অ্যাডিলেড (১৭৯২—১৮৪৯)।

(৩) ব্যারণ স্টকমার। ভিক্টোরিয়ার প্রধান উপদেশক। মহারাণীর ব্যক্তিগত জীবনকেও ইনি নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। জাতিতে জার্মান, পেশায় চিকিৎসক, বয়েসে ভিক্টোরিয়ার চেয়ে বত্রিশ বছরের বড়। ভিক্টোরিয়ার পিতামহী রাজা তৃতীয় জর্জের সহধর্মিণী মহারাণী শার্লোট (১৭৪৪-১৮১৭)। এঁরই হাতে হাত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

(৪) বেলজিয়ামের রাজা প্রথম লিওপোল্ড (১৭৯০-১৮৬৫)। ভিক্টোরিয়ার ছোট মামা।

(৫) ভিক্টোরিয়ার সহোদরা। জন্ম (১৮০৭, মৃত্যু ১৮৭২)। ভিক্টোরিয়ার জননী ডাচেস অফ কেন্টের (১৭৮৬-১৮৬১) প্রথম স্বামী লেনিঞ্জেনের যুবরাজের (১৭৬৩-১৮১৪) ঔরসজাত কন্যা। হোহেনলো লাইনগেনবের্গ যুবরাজের (১৭৯৪-১৮৬০) সহধর্মিণী।

(৬) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবনে এঁর প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। ভিক্টোরিয়ার সকল কর্মে এঁর প্রভাবের স্বাক্ষরটি থাকত প্রস্ফুটিত। শুধুমাত্রই প্রধানমন্ত্রী নয়, ভিক্টোরিয়ার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ও প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম।

(৭) তৃতীয় জর্জের ষষ্ঠ পুত্র। নাম আর্নেস্ট। জন্ম ১৭৭১, মৃত্যু-১৮৫১। ইনি হ্যানোভারের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

একদিন বাস স্টপেজে সুধা লক্ষ্য করল—পাড়ার নবাগত ভদ্রলোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে কালো চশমার স্বচ্ছ আবরণে বাসনার্ত চোখ-দুটোকে ঢেকে বারে বারে যেন ওর দিকেই ফিরে তাকাচ্ছেন। সুধা জানতো সে সুন্দরী। অনেক মুগ্ধ-দৃষ্টির আরতি পেয়ে এসেছে সে এতকাল। কিন্তু এমন হ্যাংলার মতো এমন লোভার্ত দৃষ্টিতে কেউতো কখনও তার দিকে তাকায়নি। তাই জ্বলে উঠল সুধা, "হ্যাঁ করে তাকাচ্ছেন কী মশায়, মেয়েদের আর দেখেন নি বুঝি?" ভদ্রলোক বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন—একটুখানি পিছিয়ে গেলেন, পরক্ষণেই ম্লান হেসে বললেন, "আমি অন্ধ।"

এবারে চমকে ওঠার পালা সুধার। তাইতো ভদ্রলোকের চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে, সে চোখে দীপ্তি নেই, রয়েছে শূন্যতা। "দুঃখিত।" থতমত খেয়ে বলল সুধা। চারপাশের অপেক্ষমাণ যাত্রীদের দিকে এক-ঝলক তাকিয়ে দেখল ও। কারুর মুখে ধিক্কার কারুর মুখে বিদ্রূপের হাসি। সুধা মাথা নোয়ালো।

বাস আসছে। একটা বাচ্চা ছেলে অদূরে দাঁড়িয়েছিল—সে হঠাৎ ছুটে এসে ভদ্রলোকটির হাত ধরল। স্টপেজে দাঁড়িয়েছিল ওদেরই পাড়ার আরেকটি মেয়ে নন্দা। সে এবার এক-মুখ হেসে সুধার কাছে এসে দাঁড়ালো, চাপা-গলায় বলল, "তুমি যে কী সুধাদি, কে না জানে কমলেশ রায় অন্ধ।" কমলেশ রায়! কোন্ কমলেশ রায়? বিখ্যাত সেতার বাজিয়ে যিনি?" "হ্যাঁ, তিনিই," নন্দা হেসে ফেলল।

এরপর রোজই ওকে দেখত সুধা। কলেজে যাওয়ার জন্য যখন বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত সে তখন উনি এসে ইউক্যালিপটাস গাছটার ছায়ায় ওরই পাশটিতে দাঁড়াতেন। মাঝে মাঝে ওর দিকে মুখ ফেরাতেন যেন বলতে চাইতেন কে তুমি? বল কে তুমি? কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সুধা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। দেখত, সুদর্শন মুখখানিতে কি বিষণ্ণতার ছায়া। বাচ্চা চাকরটা ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। যখনই বাস আসত তখনই তাকে প্রায় ঠেলেই বাসে উঠিয়ে দিত। কণ্ডাক্টর পরম-যত্নে তার হাত ধরে তুলে নিত, যাত্রীরা সরে জায়গা করে দিত। সুধাও ঐ বাসেই উঠত। কিন্তু কোথায় নামেন তা সুধা জানত না। কারণ সুধাকে নেমে যেতে হত ওর আগেই।

অনেক রাত হয়ে গেছে তবুও কমলেশ রায়ের চোখে ঘুম আসছে না আজ। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কিছুক্ষণ পরেই উঠে বসলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে সেতারটাকে তুলে নিলেন। ধীরে ধীরে সেতারের সুরের ঝঙ্কার রাতের অন্ধকারকে মায়াময় করে তুলল। কমলেশ রায়ের আংগুলগুলো খেলা করছে সেতারের তারে তারে। কিন্তু মন তার ভরে গেছে অসীম শূন্যতার হাহাকারে। অন্ধ চোখ-দুটো আকুল হয়ে উঠছে নিতল অন্ধকারের নিষ্ঠুরতায়।

এ জীবনে কি পেলুম, ভাবছেন তিনি। দিয়েছি তো অনেক; কিন্তু আমার সম্বল তো কিছুই নেই। নিঃশ্বাস ফেলেন কমলেশ রায়। এই আটত্রিশ বছর বয়সেও ভায়ের সংসারে দীন অবহেলায় দিন কাটছে তার। শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত তিনি। কিন্তু একটা ছোট্ট সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা নেই তাঁর। মরুজীবনের এই রিক্ততাটাই কি সেদিন ঐ মেয়েটি দেখতে পেয়েছে ওর মুখে? তাই কি অভিযোগে মুখর হয়ে উঠেছিল সে? কে জানে? কিন্তু এই তরুণী-কণ্ঠের তিরস্কারও তার জীবনে কম পাওয়া নয়।

নিরালায় নিভৃত জীবন কাটাবার জন্য কোলকাতা থেকে এসেছেন এই শিলঙে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে অনেক স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল তাঁর মনের মধ্যে। মেয়েটি যেন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল ঐ সব স্বপ্ন কোনোদিনই সার্থক হবে না তাঁর জীবনে। কিন্তু তবু কেন ঐ মেয়েটির কণ্ঠ তাঁকে নেশার মতো আকর্ষণ করে? রোজ বাস-স্টপেজে তাঁরই পাশে একটা মৃদু সুবাস অনুভব করেন তিনি। শাড়ীর খসখস চুড়ীর রিনটিন—সে কী ঐ মেয়েরই কে জানে? কে জানে নারীর রূপ কাকে বলে? সৌন্দর্য কাকে বলে? কমলেশ রায় ধীরে ধীরে সেতারটা নামিয়ে রাখলেন।

কী লজ্জা, কী লজ্জা, অনেক রাতে বসে ডায়েরী লিখছে সুধা। আমার নারীত্বের এত বড় অপমান আমি আর তো কখনো করিনি। রূপের দেমাকে চোখের মাথা খেয়েছি আমি। লিখতে লিখতে হঠাৎ কলম থামালো সুধা। নিজের সুগৌর সুঠাম হাত-দুটোর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল; আমার এই তিলোত্তমার মত রূপ আমি যদি ওকে দেখাতে পারতাম ভাবলো সুধা।

...শিলঙ পাহাড়ে আজ নেমেছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নীল পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় যে কালো মেঘগুলি লুকোচুরি খেলছিল তারা আরও ঘন হয়ে এসেছে। ঝরণাধারা উচ্ছল আবেগে উত্তাল হয়ে উঠেছে। দেবদারু আর পাইনের বন মাতাল হাওয়ায় হয়ে উঠেছে দিশেহারা।

সন্ধ্যার কাজল ছায়া তখন অতি ধীরে মেঘের ঘন মায়ার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে এতক্ষণে। আনমনা বাসের মধ্যে বসে সুধা ভাবছে চেরাপুঞ্জীর মেঘ হাওয়ায় ভেসে এসেছে বোধ হয়। আরম্ভ হলো শিলঙের রণরঙ্গিণী বৃষ্টি, কবে ক্ষান্ত হবে কে জানে।

স্টপেজে নেমেই সুধা অবাক হয়ে গেল: ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে অসহায়ের মত

(শেষাংশ ২৯০ পৃষ্ঠায়)

ঢেউভাঙা
গণেশ সিংহ

'যে দিন রাণী হলাম'

—ভিক্টোরিয়া
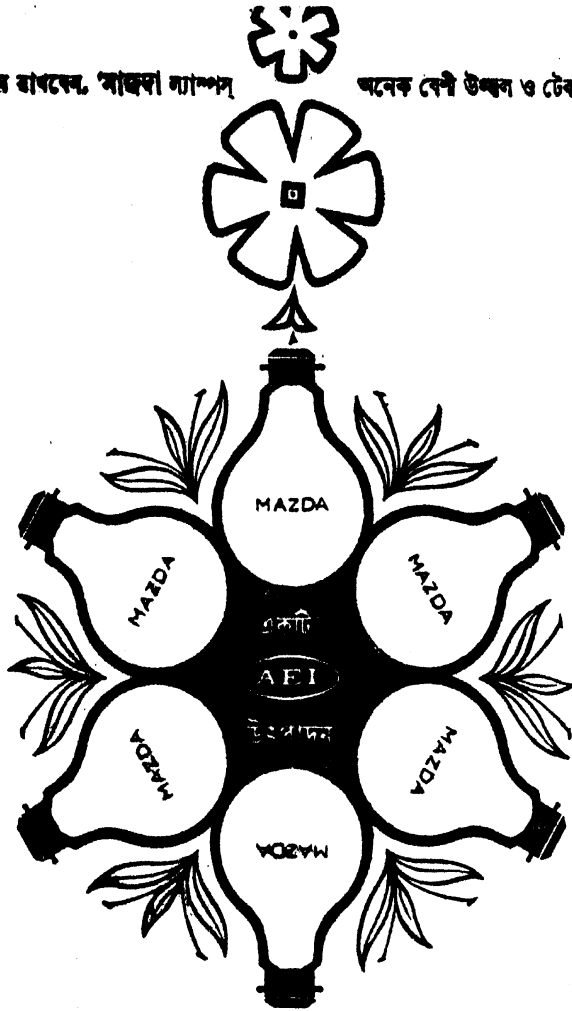
(২৮৭ পৃষ্ঠার পর)

সাসেক্সের(৮) দুই ডিউক আমার পরিচালিত করছিলেন। ঘোষণাপত্র পাঠ, প্রিভি কাউন্সিলার-দের শপথ গ্রহণানুষ্ঠান প্রভৃতি রাজকীয় প্রথাসম্মত কর্তব্যগুলি এক এক করে শেষ হল। আমি কিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি বরং আমি যা করেছি এবং যেভাবে করেছি তাতে জন-সাধারণ সন্তুষ্ট, আমারও তৃপ্তির যেন শেষ নেই। তারপর এক এক করে লর্ড মেলবোর্ণ, লর্ড জন রাসেল, লর্ড অ্যালবেমার্ল (মাস্টার অফ দ্য হর্স) এবং ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের সংগে আমার নিজের ঘরে দেখা করলুম এবং একা। দেখা করলুম ষ্টকমারের সঙ্গে। আরনেষ্ট মামাকে(৯) চিঠি লিখলুম। জ্যাঠাইমার চিঠি পেলুম। জ্যাঠামশায়ের কথাই কেবল মনে পড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি তাঁর অনাবিল স্নেহ ভোলবার নয়। জ্যাঠাইমার জন্যেই মনের মধ্যে দারুণ বেদনার সৃষ্টি হচ্ছে।

দিনলিপি লেখা শেষ করলুম। উপরে একা নৈশভোজ শেষ করলুম। স্টকমারের সঙ্গে দেখা করলুম। নটা বাজার প্রায় কুড়ি মিনিট আগে লর্ড মেলবোর্ণ এলেন এবং রইলেন প্রায় ঘণ্টা অবধি। যত তাঁকে দেখছি, যত তাঁর সংগে কথা কইছি, যত তাঁর সান্নিধ্যে আসছি ততই তাঁর প্রতি আমার নির্ভরতা ঘনীভূত হয়ে উঠছে। তাঁর প্রতিটি আচরণ আমার কাছে অপরূপ হয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্টকমারের সঙ্গেও দেখা হল।

নীচে নেমে এসে শুভরাত্রি জানালুম মাকে।

(৮) তৃতীয় জর্জের পুত্র অগাস্টাস। জন্ম ১৭৭৩, মৃত্যু ১৮৪৩।

(৯) স্যাক্সেসলফেল্ডের ডিউক প্রথম আর্নেস্ট (১৭৮৪-১৮৪৪)। ভিক্টোরিয়ার বড় মামা। এঁরই পুত্র আলবার্টের সংগে ভিক্টোরিয়া পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন।

স্মৃতি-সীমিতা

বটকৃষ্ণ দে

কখন যে এলো রজনীগন্ধা রাত,
কখনই বা গেলো—জানতেই পারিনি তো,—
অন্ধকারের দরোজা বন্ধ ক'রে
অন্ধ বৃদ্ধ কড়ি গোনে সমাহিত,
ঘরের বাইরে হাওয়ায় গন্ধ ওড়ে,
সময় গড়ায়, বুঝি বা হয় প্রভাত!

কখন কৃষ্ণচূড়া যৌবন আনে
আগুনে লাগিয়ে মরা বনে, ডালে ডালে,—
আমার হৃদয় পীত পত্রেরই জালে
রইলো জড়ানো, স্মৃতি শুধু পিছু টানে!

আগুনে জ্বলেনা, সময় বাঁধে না যারে,
আমি বাঁধা সেই স্মরণের কাঁটা তারে।।

চোখের আলো

(২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়িয়ে আছেন কমলেশ রায়। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ফিরে কিসের যেন সন্ধান করছেন। স্টপেজে আর জনপ্রাণী নেই। কে-ই বা থাকবে এই ভরা বর্ষার সন্ধ্যায়। সুধা বুঝতে পারল, বাচ্চা চাকরটার অপেক্ষায় আছেন তিনি। কলেজ থেকে ফিরতে প্রায়ই একই বাসে কমলেশ রায়কে ফিরতে দেখে সে। নেমেই দেখে বাচ্চা চাকরটা ওর জন্যে স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। আজ হয়ত একটু আগেই ফিরেছেন তিনি, চাকরটা এখনও আসেনি।

সুধা থমকে দাঁড়ালো। একটুখানি দ্বিধা করলো। তারপরই এগিয়ে গেল ওঁর দিকে, "যদি কিছু না মনে করেন আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পারি।" কমলেশ রায় চমকে উঠলেন। সেই সুবাস সেই চুড়ীর রিণ-টিন। "না না থাক আপনার অসুবিধে হবে।" "কিছু অসুবিধে হবে না—আপনার বাড়ীর কাছেই আমার বাড়ী।" তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন কমলেশ রায়। "আসুন আপনি" সংকোচ ঝেড়ে সুধা এসে ওর হাত ধরল, "কতক্ষণ দাঁড়াবেন—এই বৃষ্টির মধ্যে অসুখ করবে যে।" মমতা ঝড়ে পরল ওর কথায়।

সরলগাছের মতো দীর্ঘদেহী কমলেশের হাত ধরে সবধানে সে তাঁকে নিয়ে যেতে লাগল। "কে আপনি?" প্রশ্ন করলেন কমলেশ রায়। "কে আমি?" সুধা খিল খিল করে হেসে উঠল, "মনে নেই একদিন একজন আপনাকে বলেছিল, অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন মশায়? আমি সেই।"

কমলেশ রায় আর কিছু বলতে পারলেন না। মনের মধ্যে যেন সেতারের তার ঝংকৃত হয়ে উঠল। নিজের হাতের মধ্যে একটা কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। পরম পাওয়ার আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তার। আর সুধার মন নিবিড় তৃপ্তিতে হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ। সেদিনের ক্ষোভের গ্লানি হৃদয়ের দক্ষিণে মুছে ফেলছে আজ সে।

উঁচু-নীচু পাহাড়ের সরু আঁকা-বাঁকা পথে ওরা দুজনে দুজনের হাত-ধরে হাঁটতে লাগল। পথের পাশের মিষ্টি বনফুলগুলো ওদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। মাথার উপর সিক্ত বৃষ্টির স্পর্শ।

হে বন্ধু শোন তুমি—
অতল গভীর এই মন সেই ভীষণ রঙ্গভূমি।
গভীর গহন সেই হৃদয়ের পর—
দ্বন্দ্বযুদ্ধে সদাই লিপ্ত শয়তান ঈশ্বর।

—ডস্টয়েফস্কি—

(অনুবাদ—মায়া বসু)

কফি....

আনন্দে দিন আরম্ভ করতে

তাজা হয়ে দিন শুরু করুন। সকালে শুরুতেই এক কাপ কফি — তাজা করবে, প্রফুল্ল করবে, আর পরিতোষ দেবে। আপনার সারাদিনটা সুখেই কাটবে।

ভাল ক'রে কফি তৈরী নিতান্ত সোজা। পুস্তিকার জন্য আমাদের লিখুন। কোন ভাষায় চান, তাও জানাবেন।

মন যেমনই থাকে
কফি মন ভাল রাখে

কফি বোর্ড: বাঙ্গালোর

কাগজে দেখেননি খবরটা! কি আশ্চর্য! ওটাই তো ওদিনের কাগজের প্রধান আকর্ষণ। খবর বলতে ওটাকেই বোঝায় বুঝলেন মশাই!

তাও বলবেন পড়েননি। আইন-আদালতের খবর নয়! খাঁটি খবর। সংবাদপত্রের ভাষায় 'স্কুপ' নিউজ। যাক্‌গে খবরের কথা। আসলে অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন ছেলেটির।

চুপি চুপি চোরের মত মুখে ক্রসচিহ্ন মার্কা স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই মা এগিয়ে এলেন—কিরে খোকা! কি হয়েছে মুখে? পাস্টার কেনরে?

—কি হয়েছে দাদা! কোথায় পড়ে গিয়েছিলে? ওমা! দেখি দেখি তোমার চশমা কোথায় গেল?

—কি সর্বনাশ! ভাগ্যিস চোখটায় কিছু হয়নি! খুব বেঁচে গেছিস খোকা! ভগবান রক্ষা করেছেন।

—কেমন করে পড়লে দাদা! রাস্তায় নাকি? না বাস থেকে নামতে গিয়ে! ভাগ্যিস এক্সিডেন্ট হয়নি।

শ্রীপদ কথা বলবে কি, চুপসে যায় একেবারে ব্লটিং পেপারের মতো। তবু জবাব একটা দিতে হয়। ঢোক গিলে বলে আমতা আমতা করে—বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

—তাই নাকি? উঃ!

—মাগো ঃ ভাবতেও শিউরে ওঠে গা।

দিনটা কেটে যায় বাড়ীতে শুয়ে বসে। রাত্রে একটু টাটায় ব্যথাটা। যন্ত্রণাটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠে। ব্যথাটা মুখে না বুকে বোঝে না শ্রীপদ।

রাত্রিতে ভারী ভাল লাগে শ্রীপদর। অন্ধকারে ছেয়ে আছে সব। ঢাকা পড়ে আছে ঘটনা অঘটন।

সকালবেলায় হয় মুস্কিল। আলোর সামনে হার হতে হবে এখন। দেখা যাবে সব-কিছু।

কাগজখানা হাতে নিয়ে বোন শ্রীলেখা দাদার ঘরে ঢোকে।

—দাদা! দেখ দেখ কি মজার খবর দেখ।

—কি খবর রে! শ্রীপদও উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাগজের দিকে।

—ছিঃ! গায়ে গা লেগেছে বলে জুতো মারতে হবে একজন ভদ্রলোককে! তরুণীর স্যান্ডেলের আঘাতে যুবকের চশমা ভাঙিয়া কাঁচের টুকরায় মুখ রক্তারক্তি!

—এ্যাঁ! তাই নাকি? শ্রীপদ কাগজ দেখবে কি চমকে ওঠে খবর শুনে। হাত থেকে খসে পড়ে কাগজখানা। ফ্যাকাসে মুখটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বিবর্ণ মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে শ্রীলেখা, কে যেন নিঃশেষে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে শ্রীপদর মুখ থেকে।

—কি হোলো দাদা! চমকে উঠলে কেন? হঠাৎ ঘেমে নেয়ে উঠলে যে! মুখখানা কেমন?...

—জোর করে হাসি টেনে এনে শ্রীপদ বলে—না, মানে ব্যাপারটা মানে ঠিক নয়!

—কি ঠিক নয়! তুমি দেখেছ নাকি ঘটনাটা!

—না, মানে জুতো ঠিক নয়! হাত দিয়ে—আর ছিঃ!

—তবে চশমা ভাঙল কি করে? মনে......

—তা ঠিক—তবে টাকা দিয়েছে—টাকা আদায় করে নিয়েছি এই পর্যন্ত বলেই শ্রীপদ জিভ কাটে।

শ্রীলেখার চোখ এড়ায় না। বলে—দাদা তুমি! তুমি জুতো খেয়ে এসেছ একটা মেয়ের কাছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি লজ্জা! ব্যাটাছেলে হয়ে একটা মেয়ের কাছে জুতো খেয়ে এলে! ছিঃ!

ক্ষোভে দুঃখে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে ঘর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় শ্রীলেখা।

আর যায় কোথা। একান-ওকান হতে হতে খবরটা শ্রীপদর বন্ধুমহলেও ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। শ্রীপদ বাইরে না গেলে কি হবে, বন্ধুরা এসে হাজির।

শ্রীপদর ভয় ছিল সবচেয়ে বন্ধুদেরই বেশী। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল ওদের হাত থেকে। কিন্তু উপায় নেই। আর বোন চোখে চোখে রেখেছে ওকে। বাইরে যাবার উপায় নেই। ছোট ভাইটা পর্যন্ত বাঁকা চোখে তাকায় আর বিদ্রূপের হাসি হাসে। কথা বলে না কিছু।

মায়ের একটা কথাই কানে এসেছে তার।

—মাগো কি ঘেন্নার কথা। কি দজ্জাল মেয়ে গো। ব্যাটাছেলের গায়ে হাত তোলে।

শ্রীপদ ঘরের মধ্যেই থাকে সব-সময়। মুখের ব্যথাটা না সারলে কি করে বাইরে যাবে। ওর ধারণা দেশশুদ্ধ সবাই জেনেছে ব্যাপারটা। সবাই চেয়ে থাকবে ওর মুখের দিকে। হাসবে মুখ টিপে টিপে। দেবে টিটকারী।

কে র‍্যা! সু-সালা শ্রীপদ নাকি র‍্যা! মাইরি ঘেন্না ধরিয়ে দিলি জীবনে। মরদ ব্যাটাছেলে হয়ে সু-সালা মেয়েছেলের হাতে মার খেলি? সু-সালা ভেরুয়া!

—দূর সু-সালা! পাড়ার নাম ডোবালি! সা-সালা গুণ্ডা-বদমায়েস পর্যন্ত ভয় খেয়ে যায় এ পাড়ার নাম শুনে! তুই সেই পাড়ার ছেলে হয়ে—

—তুই আর মুখ দেখাসনে শ্রীপদ! তুই মেয়ে মানুষেরও অধম! এই নে পয়সা নিয়ে দড়ি-কলসি নিয়ে আয়।

বন্ধুদের মধ্যে কেবল নিতাই চুপ করে থাকে। কতক্ষণ আর থাকবে এভাবে। সবশেষে মুখ খোলে সে। বলে—তোরা শুধু ওর দোষই দিচ্ছিস্। ও কি করবে বলতো। হঠাৎ মেয়েটা মেরে বসেছে। ওকি আর বুঝতে পেরেছিল যে মারবে। আর মারার পর কি করতে পারে ও!

—যা যাঃ তুই সু-সালা ওর দলে। তুইও তো মেনীমুখো! মাইরি শ্রীপদ! এক কাজ করলে পারতিস, ভরতের মত মেয়েটার জুতোটা মাথায় করে নিয়ে এলে ভাল করতিস।

শ্রীপদ বসে বসে শুধু মার খায় বন্ধুদের কথায়। কি করবে সে।

মারলো কেন রে? সত্যিই গায়ে গা লেগেছিল না আর কিছু? বলনা মাইরি সত্যি কথাটা!

শ্রীপদ কথা বলে না। বোবা হয়ে বসে থাকে শুধু।

কয়েকটা দিন পর। বাড়ীর লোকেও ভুলে গিয়েছে প্রায়। শ্রীপদ আবার যথারীতি অফিস করছে। অফিসেও শুনতে হয়েছে অল্প-বিস্তর কথা। তবে তার তীব্রতা এসেছে কমে। অফিসে শুধু ঠাট্টা আর হাসি।

—সুন্দরী তরুণীর হাতে মার! সেও কত মধুর কি বলেন শ্রীপদবাবু!

—তাতো বটেই : হাজার হোক নরম হাততো!

শ্রীপদ কথা বলে না এখানেও। বোবার শত্রু নেই।

বাসে বেজায় ভীড়। বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে হয় সকলের মত শ্রীপদকেও। সেদিনে কোন-রকমে ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকেছে। বসার চিন্তাটা কল্পনা মাত্র। রড্ ধরে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ মেয়েলীকণ্ঠ কানে এল—বসুন না। দাঁড়িয়ে কেন? শ্রীপদ বুঝতে পারেনি প্রথমে। আর সে বুঝতেও চায় না। ওদের কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে চায়। মেয়েছেলে যেদিকে দেখে তার বিপরীত দিকে জোর করে চেয়ে থাকে।

—শুনছেন! কে যেন ওর জামা ধরে টান দেয় মৃদু!

এবারে আর না তাকিয়ে উপায় নেই! কিন্তু সেদিকে চেয়েই শ্রীপদর চোখ ছানাবড়া। আবার সেই মেয়ে। কি করেছে এবারে। সে-তো অনেক দূরে আছে তার থেকে। গায়ে গা লাগারও কোন সম্ভাবনা নেই।

—বসুন না! একরকম জোর করে বসিয়ে দিল শ্রীপদকে সেই মেয়ে যার হাতে একদিন খড়া ঝলমল করে উঠেছিল শ্রীপদর মাথার ওপর।

—আড়ষ্ট হয়ে বসে পড়ল শ্রীপদ তার পাশের খালি সিটটায়!

—কেমন আছেন? মুখের ব্যথা সেরেছে! অন্যদের কান বাঁচিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মেয়ে।

—ঘাড় নাড়ল শ্রীপদ।

—এখনও ক্ষমা করেননি দেখছি। জানেনঃ সেদিন সারারাত ঘুমুতে পারিনি!

এবারে ঘাড় ফিরিয়েছে শ্রীপদ! চেনাই যায় না সে মেয়েকে। মুখে মৃদু হাসি। চোখে মদির কটাক্ষ। এ যেন ছিন্নমস্তার কমলার বেশ!

এর পর দু-একদিন নয় প্রায় রোজই দেখা দুজনের। একই বাসে একই সময়। অফিস-যাত্রীর সংগে অফিস-যাত্রিণীর। একদিন দেখা না হলে উৎকণ্ঠা। পরের দিনে মান-অভিমান ইত্যাদি।

মা ও বোনের ভীষণ বিরোধিতা ও আপত্তি সত্ত্বেও ঐ প্রমীলাকেই বিয়ে করল শ্রীপদ। গম্ভীরমুখে মা বধূবরণ করলেন। বউভাতের দিন নিরিবিলি হতে রাত্রি হয়ে গেল অনেক। ভোজবাড়ী প্রায় ফাঁকা কেবল বন্ধুরা আছে তখনও। খাওয়া-দাওয়া সারা। বাড়ী যাবার মুখে আলাপ করিয়ে দিল শ্রীপদ বন্ধুদের সংগে।

মদন বলল—বৌদি! একটু পায়ের-ধুলো দেবেন?

প্রমীলা ইস্পাতটা বুকে নিয়ে মুখ নীচু করেছে লজ্জায়।

—এই মদনা থামতোঃ সু-সত্যি আপনি ছাড়া শ্রীপদকে টাইট করতে পারতো না কেউ!

এবারে মুখ তুলেছে প্রমীলা। আপনাদের বন্ধু বুঝি খুবই শান্ত!

বলবেন না বৌদি ওর যন্ত্রণায় আমরা পাগল! আপনার সংগে আলাপ হয়ে শান্ত হয়ে গেছে হঠাৎ।

ততক্ষণ চুপ করে ছিল শ্রীপদ। এখন মুখ খোলে ও। বলে—যে মূর্তি দেখে শিব পর্যন্ত পায়ের নীচে লুটোপুটি খায় সে মূর্তির সামনে শ্রীপদ দাঁড়াতে পারে!

মেঘ কেটে গিয়ে সারা ঘর হাসিতে ফেটে পড়ে যেন।

—তাই কর শ্রীপদ। ওই শ্রীপদের ধ্যান কর বসে বসে। আমরা আসি! নমস্কার বৌদি। ওদের উপহারটা বৌদির হাতে তুলে দিয়ে ওরা সরে পড়ে।

চমৎকার সাজানো এক ক্যাসকেট। অগ্রহের সংগে খুলে দেখে প্রমীলা সুন্দর এক-জোড়া চপ্পল।

কোনো যশস্বীর মৃত্যুতে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আমি তো জনতা হয়ে ছিলাম অদূরে রাজেশ্বর
তুমি এলে রৌদ্রে স্নান করে,
যশ অপযশ যার অঙ্গ থেকে ঝরেছে নির্ভার
ওষ্ঠে তার মৃত্যুর মক্ষিকা।
যেন স্থির সমুদ্রের মত এলে সকলের আগে
পিছনে অসংখ্য শির ছিন্নশির মৃত্যুর বাহিনী
কে ফুল ছড়াচ্ছে, জল কলসে কলসে, জানিলাম
এই উত্তেজনা বুঝি একদা ছিল না, চঞ্চলতা
রাহিবে না ক্ষণকাল পরে,
শুধু এই মুহূর্তে জ্বলেছে প্রেম উষ্ণতা অধীর
তুমি স্পর্শ করিলে না একবার।

পুষ্করিণী ভরে যাবে পুনর্বার জলজ উদ্ভিদে
কমলের চিহ্ন রহিবে না:
যদি মৃদুতম ঘ্রাণ কোথাও রাখিয়া গিয়া থাকো
সেথা অশ্রুপাত হবে সংগোপনে দীর্ঘ
দীর্ঘকাল॥

এক মহাজনের চার ছেলে ছিল।
মহাজন মরবার সময় চার ছেলেকে কাছে ডেকে বসালেন। কলিকালের ছেলে, তাদের বিশ্বাস কি? আজ না হয় বুড়ো আছে. সবাই এক-সঙ্গে বাস করছে। কাল বুড়ো চোখ-বুজলে যে যার হাঁড়ি আলাদা করে নেবে, এত ধন-দৌলত পাঁচভূতে লুটে খাবে। এই সব কথা ভেবেই মহাজন ছেলেদের কাছে ডাকলেন।

মহাজনের এক ভায়রাভাই ছিলেন বড় ন্যায়বান। তার উপর তাঁর কাকচরিত্র জানা ছিল। মহাজন তাঁর কথা স্মরণ করে ছেলেদের বললেন, আমি এতদিন ছিলাম বলে তোমাদের কোন ভাবনা ছিল না। তা আমি তো এখন চললাম। যদি তোমাদের কোনদিন ভিন্ন হবার ইচ্ছে হয় তো তোমাদের মেসোমশায়কে ডেকো। তিনি তোমাদের যার যা পাওনাগণ্ডা ভাগ করে দেবেন। তোমরা সেই ভাগ নিয়ে যে যার ঘর করবে। ঝগড়া করো না।

এই বলে মহাজন মারা গেলেন।

সেই চার ভায়ের মধ্যে বড়টি 'পাঠশাঠ' (পড়াশুনা) করে। মেজভাই 'ন্যায়নিশাপ' (বিচার-মীমাংসা) করে। ছোট দু-ভাই চাষের কাজ করে, জমি-জমা দেখে। এইভাবে চার ভাই থাকে। বড় দু-ভাই এক-আধ ঘণ্টা এধারে ওধারে যায়, ফিরে এসে বাড়ীতে পালঙ্কে গড়াতে থাকে। ছোট দু-ভাই সারাদিন মেহনৎ ক'রে রুদ্দুর-ঝড়-জল খেয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে যাহোক করে দুটো ভাত খেয়ে এখানে-সেখানে পড়ে থাকে।

বড় দুভাই ভালমন্দ খেয়ে আয়েস করছে আর ছোট দু-ভাই যেন মুটেমজুরের চেয়ে হীন। একি কখনো তাদের বউদের চোখে সয়? ভায়েদের কথা ভায়েরা বুঝুক, চার বউতো সমান। তার মধ্যে বড় দু-বউ কেন ঘরকন্নার কোন কাজ না করে পাটপীতাম্বরী পরে পান খেয়ে কেবল পালঙ্কে গড়াতে থাকবে? আর ছোট দু-বউ কী এমন অপরাধ করেছে যে দিন রাত খেটে খেটে তাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে? রাত্রে ছোট দু-বউ তাদের 'গেরস্তকে' নানারকম টিটকারী আর ধিক্কার দিয়ে বললে,

"যে যার গণ্ডা ভাগ করে নিয়ে থাকলে পারো। পরের অধীনে মাথাগুঁজে কতদি আর এমন করে পড়ে থাকবে? বড় দুভা কি দশমেসে আর তোমরা কি 'আটাে ছেলে?"

এই রকম শুনে শুনে ছোট দুভাই আ সহ্য করতে পারলে না। একদিন তারা ব দু-ভায়ের কাছে গিয়ে ভিন্ন হবার প্রস্তা করলে। বড় দু-ভাই বললে—"বাবা মরবার সম বলে গেছেন, মেসোকে ডেকে আনবো, তি যা ভাগ করে দেবেন, আমরা তাই মেনে নেবো তাতে তোমাদের আপত্তি নেই নিশ্চয়?"

ছোট দুভাই জানালে আপত্তি নে তখন সকলে মিলে মেসোর বাড়ী গেল।

'কাকচরিত্র' জানা মেসো তাদের 'অ,গা কথা' জানতে পারলেন। কিন্তু বাইরে না জানা ভাব করে তাদের আদর করলেন, পা ধোবা জল আনতে বললেন, দাওয়ায় বসবার জন্যে মাদুর পেতে দিলেন, 'সুখ-দুঃখ' জিজ্ঞাস করলেন।

মহাজনের ছেলেরা পৃথক হবার কথ বললে, আর বললে, "আপনি গিয়ে আমাদে পৃথক করে দিয়ে আসবেন, বাবা বলে গেছেন।"

মেসো আগে থেকেই সব জানতেন বললেন, "আমি কাল স্বপ্ন দেখেছি তোমর আজ আসবে, স্বপ্নে আমি হুকুম পেয়েছি তোমাদের আর বৌমাদের নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে যাব জগন্নাথকে প্রণাম করে ফিরে এসে তোমাদে ভিন্ন করে দেব।"

এককথায় চার-ভাই রাজী হল।

মেসো তাঁর চার শ্যালীপো আর তাদে চার বৌকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে বেরুলেন পুরী পৌঁছে মহাপ্রভুকে দর্শন করলেন প্রসাদ খেলেন। তারপর বাড়ীমুখো হলেন।

ফিরে আসতে আসতে রাস্তায় একটা ব মাঠ পড়ল। তখন বেলা দুপুর। হেঁটে হেঁটে সকলে ক্লান্ত হয়েছে। মেসো বললেন, "আ

হাঁটতে পারবো না। এইখানে খানিক জিরুতে হবে।” এই বলে গাঁটরি খুলে দেখেন, টাকার থলিটি নেই।

মেসো খুব ব্যস্ত হলেন। তারপর খুব খানিকটা হা-হুতাশ করে চুপ করলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, “তোমরা চার ছেলে তো উপযুক্ত হয়েছো। চার ভাই চারদিকে যাও। যে যা উপায় করতে পারবে নিয়ে এসো। সেই টাকা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে তারপর আবার রওনা হওয়া যাবে।”

চার ভাই চারদিকে ছুটল।

ছোট ভাইটি চাষে খুব মজবুত, যেতে যেতে দেখে মাঠে একটা চাষা জমি চষছে, কিন্তু গরু দুটো বড়ই অশায়েস্তা, চাষা হয়রান হয়ে পড়েছে।

কাছে গিয়ে মহাজনের ছেলে বললে, “তুমি পারছো না। কিন্তু আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব জমি চষে দেব। আমাকে কি দেবে বল?

চাষা শুনে ভারী খুসী হল। ঠিক হল সে মহাজনের ছেলেকে পাঁচসের চাল-ডাল, কিছু তরিতরকারি আর কাঠ দেবে। মহাজনের ছেলে রাজী হল।

চাষা সেই সব আনতে বাড়ী গেল। ফিরে এসে দেখে জমি চষা শেষ। জিনিষগুলি নিয়ে মহাজনের ছেলে ফিরল।

সেজ ছেলেটি আর একদিকে গিছল। দেখলে পাঁচ-সাত জন লোক একটা মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। জিগেস করতে তারা বললে, “এই জমিটাতে সব সময়েই জল থাকে, ধান মোটেই হয় না। এদিকে জমিদার কড়াক্রান্তি খাজনা বুঝে নেন। কি উপায় করলে এতে ফসল হয় বলতে পারো?”

সেজ ছেলেটিও চাষে খুব ধুরন্ধর। বললে, “কি দেবে বল, আমি উপায় বাৎলে দেব।”

তারা বললে, “তোমায় দুটি টাকা দেব।”

মহাজনের ছেলে রাজী হয়ে তাদের একটা খুব ভাল মতলব দিলে। মতলবটা তাদের খুব মনে লাগল। তারা তাকে খুসী মনে দুটি টাকা দিলে। টাকা দুটি নিয়ে বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে সেজ ছেলে ঠিকানায় ফিরে এলো।

মেজ ভাই আর একদিকে যেতে যেতে দেখলে রাস্তার ধারে এক বটগাছতলায় বসে একটি লোক কাঁদছে। লোকটির চেহারা সুন্দরপানা, বড়লোকের ছেলের মতো দেখতে। মহাজনের ছেলের প্রশ্ন শুনে বললে, “কাঁদছি কেন? শুনুন তবে। আমরা চার ভাই ভিন্ন হয়েছিলাম। এক একজনের ভাগে এক এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি পড়েছিল। সব ভাগ হল, শেষে একটা কালো বেরাল আর ভাগ হয় না। ওকে নেবে কে? কেউ নিতে চায় না। শেষে মধ্যস্থ এসে ভাগ করে দিয়ে গেল—চার ভায়ের চার পা। বেরালটি এজমালিতে রইল। দৈবযোগে বেরালটি একদিন লাফিয়ে পড়ে আমার ভাগে যে পা-টি পড়েছিল সেটি ভাঙলো। আমি সেই পায়ে তেলের ন্যাকড়া জড়িয়ে দিলাম; তারপর বেরালটি কোন এক সময় পাড়াপড়শিদের বাড়ি গিয়ে উনুনের কাছে শুয়েছিল। হঠাৎ কি করে তার পায়ের ন্যাকড়ায় আগুন লেগে গেল। বেরালটা ছুটোছুটি করে একজনের মাচায় উঠল। মাচা থেকে চালে আগুন ধরল। দেখতে দেখতে পাড়ার সমস্ত ঘর-দোর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। অনেক কষ্টে আগুন নিভল। কাল এই ব্যাপারের বিচার হয়েছিল। মধ্যস্থরা আমার দোষ দিলে। পাড়ার সব ঘর আমায় নতুন করে দিতে হবে। যত টাকা খরচ হবে আমায় দিতে হবে। অত টাকা দিতে গেলে তো আমার সব সম্পত্তি চলে যাবে। আমি তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। তাই কাঁদছিলাম আর ভগবানকে ডাকছিলাম। আমাকে যে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তাকে আমি অনেক টাকা দেব।”

মহাজনের ছেলে বললে, “আমি যদি তোমায় উদ্ধার করতে পারি, কত দেবে?”

ধনী ব্যক্তিটি বললে, “আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।”

মহাজনের ছেলে বললে, “যাও, গিয়ে পাড়ার সকলকে ডেকে সদরে বসাও। আমি যাচ্ছি।”

কিছুক্ষণ পরে সে সেখানে গেল। সকলেই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘটনাটি আর একবার শোনার পর মহাজনের ছেলে বললে, “বেরালের পায়ে আগুন লাগতে, বেরাল পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘরে আগুন

লাগল। আপনারা বলছেন, যে-পায়ে আগুন লেগেছিল সেই পায়ের দোষ। আচ্ছা, আমি জিগেস করি, যদি বেরালের চলবার শক্তি না থাকতো, তবে সে পালিয়ে যেতো কি করে? খোঁড়া পায়ে তো বেরাল চলতে বা দৌড়ুতে পারত না, আর তিনটি পা থাকতেই বেরাল পালিয়ে গেল আর তাইতেই ঘরে আগুন লাগল। এখন বলুন দেখি ঐ তিন পায়ের দোষ, না খোঁড়া পায়ের দোষ?"

মহাজনের ছেলের যুক্তি শুনে তো সকলে অবাক। কারুর মুখে উত্তর নেই। শেষে সকলে একবাক্যে বললে যে ঐ তিন পায়ের দোষ, খোঁড়া পায়ের দোষ নয়। তখন তিন ভায়ের উপরে দোষ বর্তালো। স্থির হল, অন্য তিন-ভাইকে পোড়া-ঘর বানিয়ে দিতে হবে।

ধনী ব্যক্তিটি রেহাই পেয়ে মহাখুশী হয়ে মহাজনের ছেলেকে পাঁচশো টাকা আর অনেক খাবার-দাবার দিয়ে বিদায় করলে।

বড় ভাই আর একদিকে গিয়েছিল। যেতে যেতে শুনতে পেলে পথের ধারে মস্ত একটা বাড়ীতে মহা কান্নাকাটি পড়ে গেছে। জিগেস করে জানলে, ওই বাড়ীতে রাজার মন্ত্রী থাকেন, আজ সকালে রাজা মন্ত্রীকে হুকুম দিয়েছেন, রাজার একদন্তা হাতীটার ওজন কত মন্ত্রীকে তা আজকের মধ্যেই ঠিক ঠিক বলে দিতে হবে। না পারলে, কাল সকালে মন্ত্রীর মুন্ড কাটা যাবে। এই জন্যেই মন্ত্রীর বাড়ী কান্নাকাটি লেগেছে।

মহাজনের ছেলে মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী বললে, "এ হাতীকে ওজন করে দিলে তোমায় এক হাজার টাকা দেব।"

মহাজনের ছেলে মন্ত্রীকে কাছের ডোবায় একটা বড় ডোঙ্গা আনতে বললে, ডোঙ্গা এলে পর হাতীটাকে নিয়ে গিয়ে তার ওপর দাঁড় করালে। ডোঙ্গাটা এক হাত ডুবে গেল। মহাজনের ছেলে ডোঙ্গার সেইখানে খড়ি দিয়ে দাগ দিলে। তারপর হাতীকে ডোঙ্গা থেকে নামিয়ে নিয়ে ডোঙ্গাতে বালী ভরতি করতে বললে। দাগটা যখন ডুবল তখন বালী ভরতি করা বন্ধ হল। তারপর সেই বালী ওজন হল। দেখা গেল, বালীর ওজন পঞ্চাশ মণ হল। মহাজনের ছেলে বললে, "হাতীর ওজন পঞ্চাশ মণ। তাতে আর ভুল নেই।"

মন্ত্রী মহা আনন্দে তাকে এক হাজার টাকা দিয়ে নিজের পাল্কী করে তাকে ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন।

রান্নাবান্না হল। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। তখন মেসো চার শ্যালীপো আর তাদের চার বউকে কাছে ডেকে, যে যা রোজগার করে এনেছিল, সকলকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এবার চল, তোমাদের বাড়ী গিয়ে চারজনকে পৃথক করে দিয়ে আসি।"

ছোট দুই ছেলে আর তাদের দুই বউ নিজেদের অযোগ্যতা বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হল এবং বড় দুই ভাই আর দুই ভাজের কাছে ক্ষমা চাইলে। তখন সব মনোমালিন্য দূর হল। ভিন্ন হওয়ার কথা আর কেউ মুখেও আনলে না। সকলে খুসীমনে বাড়ী ফিরলো এবং সেই দিন থেকে তারা মিলে-মিশে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল। *

* প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে ওড়িষ্যার সিংখেশ্বরপুরের জমিদারের ছেলে গোপালচন্দ্র প্রহরাজ অনেকগুলি ওড়িয়া কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংগ্রহ থেকে এই কাহিনীটি নেওয়া হয়েছে। —লেখক।

ব্যর্থ এবং হতাশায়
সে মরিয়া হয়ে চললো,
মাড়িয়ে দিয়ে কংক্রীটের পথ। তপ্ত।
কোথাও সে পেলো না একটু
ক্ষণেকেরও বিশ্রাম,
সান্ত্বনাও নয় কোন স্থানে।
এমনি অভিশপ্ত।

রূপচর্চার দোকানেও
সৌন্দর্যের লেখা নেই,
দেখলো শুধু পলেস্তারার কার্য!
তাই ব্রেক কষলো জীবনযাত্রায়;
তবু দেহ গেল না কারখানায়
মেরামতীর হিসেব হলো না ধার্য!

দেহপসারিণী রাত্রি জাগিছে
আর রাত জাগে চোর,
অসুস্থজন সেও রাত জাগে
অস্থির যাতনায়,
জগৎ প্রভুর কৃপার ভিখারী
দু নয়নে বহে লোর,
বিনিদ্র রাত কাটান সাধুও
ঈশ্বর সাধনায়।

—প্রবাদ—
(অনুবাদ—মায়া বসু)

বহুদিন বাদে সোমেশ্বর বাবুর সঙ্গে সেদিন সহসা মুখোমুখি দেখা। বহুদিন বলতে প্রায় দু-দশকের উপর ত হবে। হয়ত তারও বেশি। সেই যে-কালে জামাই ষষ্ঠীতে একজোড়া শান্তিপুরের নিখুঁত ধুতি চার-পাঁচ টাকায় পাওয়া যেতো—সেই কালে সোমেশ্বর বাবু আমাদের স্কুলে বাংলা পড়াতেন। তখনকার তাঁর সেই চেহারা......

থাক চেহারার কথা। যথাসময়ে সেই প্রসঙ্গে আসা যাবে। আপাততঃ সুদীর্ঘ অতীত থেকে বর্তমানের ব্যবধানে আমাকে দেখেই তিনি যে কেমন করে চিনতে পারলেন সেটাই আশ্চর্যের।

থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, চিনতে পার চিন্ময়? পারবে না—সে জানি। তাই বলে তোমাদেরকে কি আমি ভুলতে পারি?

বলেই হাসলেন। হাসি হাসি মুখে আবার আরম্ভ করলেন, ছবি আঁকার ঝোঁক এখনও বজায় আছে তো? সেই যে বাংলা মাষ্টারের ছবি এঁকেছিলে? নামকরণটাও হয়েছিল বড় চমৎকার! কাকে উপলক্ষ্য করে ছবি আঁকা হয়েছিল—সেও স্মরণ নেই বুঝি? বল দেখি, ঐ ছবির উপলক্ষ্যকে চাক্ষুষ সশরীরে এই মুহূর্তে সম্মুখে দেখলে চমকে উঠবে না তো? বলেই বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার তোড়ে সজোরে তিনি হাসতে লাগলেন। আর আমি ঐ হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম—এ-হাসি কি আমাদের সেই বাংলা মাষ্টারের!

আমার অবস্থা দেখে তিনি রাজপথে বারেক পা ঠুকে বলে উঠলেন, 'আমিই তোমার সেই 'তালপাতার সেপাই!' একালে সবাই বলে, পাঞ্জাবী সেপাইয়ের দল ছাড়া।

কতক্ষণ সোমেশ্বর বাবুর দিকে তাকিয়েছিলাম। আরও কতক্ষণ না জানি ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকতাম যদি না তিনি চট করে বলে উঠতেন—ওভাবে গিলে ফেলে কি দেখছ চিন্ময়? এবারে একখানি নতুন ছবি আঁকো দেখিনি!

তৎক্ষণাৎ মাথায় কি খেলে গেল—বলেই ফেললাম, যথার্থই স্যার, সেই কথাই ভাবছি—এমন আশ্চর্য পরিবর্তনের ছবি আঁকার সৌভাগ্য কি আর হবে?

কেন হবে না? তোমাদের মতন একালের শিল্পীদের হাতে সেকালের মাষ্টারের অমর হয়ে থাকবার বাসনা এমন আর দোষের কি?

কিন্তু........

মুখের কথা টপ করে কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন, ওঃ সিটিং দেবার কথা বলছ? স্বয়ং নেহরুজী শিল্পীদের সিটিং দেন, আমি তো কোন্ ছার। তা ছাড়া তোমরা হলে আমার হারনো দিনের স্মৃতি-সুবাস। কেমন উদাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সোমেশ্বর বাবু।

আমি বললাম, আসুন না স্যার, সময় করে একদিন। ষ্টুডিও দেখবেন। নতুন ছবির উপরে আপনার মতামতটা—

বেশ তো! আসবো। আসবো নিশ্চয়ই। মতামত কেন দেবো না? আমাদের মতামত চাইলেই দিই! হ্যাঁ, তা তোমার ঠিকানাটা?

পকেট থেকে পারুল কোম্পানীর সুমুদ্রিত কার্ড তুলে নিয়ে সোমেশ্বর বাবুর হাতে দিয়ে তখনকার মতো বিদায় হলাম।

বিদায় হলাম বটে, কিন্তু তাঁকে মন থেকে বিদায় করতে পারলাম না। সারাটা দিন তিনি মনের জগৎটা জুড়ে বসে রইলেন। স্মৃতি রোমন্থনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্রমশঃ সোমেশ্বর বাবু মস্তিষ্কের সমস্ত জায়গাটাকে দখল করে বসলেন।

কর্ণ-সুবর্ণ স্কুলের বাংলা মাষ্টার সোমেশ্বর বাবু বছরের কোন ঋতুতেই একদিনের জন্য ক্লাশ কামাই করতেন না। শরৎকালে পুজোর ছুটি হলেও আমাদের ছুটি উপভোগের উপায় ছিল না। প্রায়ই তিনি বাংলা পড়তে ডেকে পাঠাতেন। তাঁর কাছে পড়ে যত না আনন্দ পেতাম, তার চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেতাম ভদ্রলোকের অমোঘভাবে আমাদের পেছনে লেগে থাকার অপরিসীম ধৈর্য দেখে। আমরা তো ভাবতেই পারতাম না, কোনদিন স্কুলে তিনি অনুপস্থিত হবেন।

কিন্তু সেই অভাবনীয় দিনটি সত্যি-সত্যিই এলো একদিন। এলো এমনিই আকস্মিকভাবে—কেউই আমরা যেন অতটা আকস্মিকতার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম, মাষ্টার মশাইয়ের নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর অসুখ করেছে।

তার উপরে উমানন্দ নাচতে নাচতে মন্তব্য

বললো, তোরা কিছুই জানিস না। সোমেশ্বর বাবুর অসুখ তো লেগেই ছিল।

সেকথা শোনা থেকে ঔৎসুক্য বেড়ে গেল ওই লেগে থাকা অসুখের নাড়ির খবর জানবার জন্য। কিন্তু মাষ্টার মশাই হঠাৎ আকাশ ফেড়ে আবির্ভূত হন সেই আশঙ্কায় আমাদের কারো নাড়ির খবরের শিকড় ধরে টানাটানি করার সাহস হল না।

ওদিকে সোমেশ্বর বাবু আসবে না ধরে নিয়ে উমানন্দও ইতিমধ্যে ক্লাশ থেকে কেটে পড়েছিল। অগত্যা আমাদের ঔৎসুক্য আর আগে বাড়বার সুযোগ পেলো না।

পর পর কয়েকদিনই সোমেশ্বর বাবু অনুপস্থিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস হলো—তিনি আর আসবেন না।

কেবল না-আসাই নয়, জানা গেল—সোমেশ্বর মাষ্টার দেশ ছেড়েছেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। না। বজ্রাঘাতের একটা বিরাট দাহিকাশক্তি আছে। সে যাকেই সামনে পায় তাকেই দগ্ধ করে। সোমেশ্বর বাবুর দেশ ছাড়ার খবর দপ করে যেমন ছড়িয়ে পড়েনি তার দাহিকা-শক্তিরও তেমন কোন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং বাংলা পড়ায় যাদের তেমন গরজ ছিল না, সেই ছেলের দলতো রীতিমতো খুসিই হয়েছিল সোমেশ্বর বাবুর সহসা অন্তর্ধানে।

অনেকদিন আগে কবে সেই যে তিনি দেশ ছেড়েছিলেন, সেই থেকে কোথায় কেমন করে এতকাল কাটালেন কে তার খবর দেবে। তা ছাড়া কেনই বা তিনি দেশ ছেড়েছিলেন, সে রহস্য আমাদের কাছে রহস্যই রয়ে গেল এতকাল।

এর পরও ওই রহস্য ভেদ করবার কোন তাগিদ কোনদিন অনুভব করতাম কিনা সন্দেহ কেবল যে, সোমেশ্বর বাবু নিজেই আমাকে অকস্মাৎ তাগাদা দিয়ে অস্থির করে তুললেন।

দরজায় সেদিন সকালে ঘন ঘন করাঘাতের আওয়াজ উঠতেই বিরক্ত হয়ে যেই দরজা খুলেছি অমনি সোমেশ্বর বাবুর অভাবনীয় দর্শন যেমন উদ্দাম চেহারা তেমনি তার প্রবল প্রচণ্ড হাসির ঝরণাধারা—

বিরূপতা কঠিনভাবে চেপে বলতেই হলো আসুন।

গলার স্বরে যেটুকু অনাবশ্যক সুর ছিল সে যেন সোমেশ্বর বাবুর কানেই গেল না। তিনি দাঙ্গা লাগানো হাসিতে ঘর ভরে তুলে বললেন চমৎকার ষ্টুডিওটি তোমার! আহা কি সুন্দর সমুদ্রের ছবি! পাহাড়ের দৃশ্যও দেখছি! কা ছবি ...কছ! ......

এমনি অজস্র কথার ঝাঁক! প্রত্যেকটি ছবির প্রশংসা! প্রশংসায় তিনি যেন আত্মহারা।

নিজের কাছে আমার নিজের লজ্জা হতে লাগলো, এমন বিদগ্ধ লোককে ভেতরে অভ্যা[illegible] দুটিটুকু স্মরণ করে। ঐ ত্রুটি শুধরে নি[illegible] এক সময় নিজেরই অজ্ঞাতসারে জোড়-ক[illegible] নিবেদন করলাম : মাষ্টার মশায়, অনুগ্রহ ক[illegible] দুপুরে দুটি আহার করে কিন্তু যেতে হবে।

নিশ্চয়। নিশ্চয়।

উনি ছবি দেখছেন। তন্ময় হয়ে দেখছিলেন—বুদ্ধের উপদেশ চিত্রখানি। সেই ফাঁকে শ্রীমতী সুমনাকে খবর পাঠালাম, আমার মাষ্টার মশায় এসেছেন, দুপুরে খাবেন। মাংসের আয়োজন করতে যেন ভুল না হয়।

খাবার টেবিলে শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপ হলো সোমেশ্বর বাবুর। সুমনা মূর্তি গড়ে শুনে তাঁর যেন স্ফূর্তি আর ধরে না। উল্লাসে বলে উঠেন, চিন্ময়, তুমি বড় ভাগ্যবান! নিজে শিল্পী, স্ত্রী ভাস্কর। এমন সোনায় সোহাগা বড় একটা দেখা যায় না। বলেন আর যেন হাসিতে খুসিতে গলে গলে পড়েন।

কথার মোড় ঘোরাতে বলি, আরম্ভ করুন মাষ্টার মশাই।

এই করি! আচ্ছা হাড় দেখছি, এটা কি। মাংস নাকি? মা-মণি, মাংস তো আমি ছুঁই না।

সে কি! সুমনা যেন আকাশ থেকে পড়লো। আমিও। মাংসটা শ্রীমতী রান্না করে খাসা। তাই বিশেষ করে মাংস রাঁধতে বলেছিলাম। তা ছাড়া, সোমেশ্বর বাবুর এখনকার যে দেহশ্রী—অমন শরীরে মাংস না ছোঁয়ার কোন কারণ থাকতে পারে, সেও যে ভাবা অসম্ভব! তাই বড়ই বিস্ময় বোধ করলাম।

আমাদের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে তিনি অপরাধীর মতো বলতে লাগলেন, তোমরা উভয়েই আশ্চর্য হচ্ছ—এ কেমন কথা, সুস্থ সবল দেহে আমার মতন মানুষে আবার মাংস খায় না! কিন্তু কারণটা শুনলেই বুঝবে সংসারে আরো কত আশ্চর্য ঘটনা আছে যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অথচ……

সুমনা অমনি মুখ তুলে জানতে চাইলে, অথচ কি বলুন না?

নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সোমেশ্বর বাবু ডালের পাত্র উজাড় করে বললেন, মা মণি, তোমার হাতের সব রান্নাই অমৃত। মাংস খেতে আমার যে ঠাকুরের নিষেধ রয়েছে মা! নইলে অমন রূপঝরা রান্না কখনো কি ছাড়ে তোমার এই পেটুক ছেলে—

ঠাকুরের নিষেধ শুনেই আমার মনটা খচ করে উঠলো। প্রকৃত ঘটনাটা জানবার জন্যে মাষ্টার মশাইকে ধরা পড়া করায় তিনি বললেন, চিন্ময়, তোমার নিশ্চয়ই সেই ঘটনাটা মনে আছে—তোমাদের তালপাতার সেপাই বাংলা মাষ্টার একদিন দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সে নিরুদ্দেশের আসল কারণ ছিল তাঁর তখনকার অসহ্য পেটের যন্ত্রণা। ……

সে সময় কিছুই মুখে দিতে পারতাম না। জোর করে একটু কিছু মুখে পুরলেই পরক্ষণে প্রাণঘাতী যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সবই উগরে ফেলে দিতে হতো। দেশের গাঁয়ে ডাক্তার বদ্যি যা মেলে তাদের ওষুধপত্রে যখন কিছুই হল না—একদিন বাধ্য হয়ে দেশই ছাড়তে হলো।

দেশ ছাড়া বলা যত সহজ, কাজে তত সহজ ছিল না। সারা রাত অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে যে পথে যাবার কথা তার ঠিক উল্টো পথে অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। পরে কলকাতা সহরে এসে কি করে যে পড়েছিলাম, সে একমাত্র ঠাকুরই জানেন।

কলকাতায় ডাক্তাররা জনে জনে ধন্বন্তরী! তাঁরাও একে একে পরাস্ত হলে পর নিরাশ হয়ে এক্সরে করাই ঠিক হলো। কিন্তু তাতেও রোগের হদিস মেলা তো দূরে থাক, যন্ত্রণা আরো শতগুণ বেড়ে গেল। অকথ্য যন্ত্রণায় উন্মাদ হওয়ার প্রায়। এমন সময় আমারই এক আত্মীয় একদিন একরকম ধরে নিয়ে গেল কাঁকুরগাছির যোগোদ্যানে ঠাকুরের উৎসবে।

সুমনা বাধা দিয়ে বললে, ধরে নিয়ে গেল মানে—

মৃদু হেসে সোমেশ্বর বাবু বললেন, মা-মণি, ঠাকুরে কি আর বিশ্বাস তখন ছিল। ও বয়সে কজনেরই বা থাকে!

সুমনা বললে, তাহলে কেমন করে ঠাকুরভক্ত হলেন?

সেই কথাই তো বলছি মা-মণি, সোমেশ্বর বাবু বলতে লাগলেন, একে বয়স তখন অল্প তারপর দেশ জোড়া নামকরা ডাক্তার বাবুরা যে রোগ ধরতে পারেনি, তাই কিনা, আমার আত্মীয়ের কথায় কাঁকুরগাছির ঠাকুরের ভোগে সেরে যাবে! অতি দুঃখে তাই হাসবো না কাঁদবো—

তবুও আমার আত্মীয়টি নাছোড়বান্দা। সে পীড়াপীড়ি করে আমাকে ঠাকুরের ভোগ খাইয়ে ভাল করেই তবে ছাড়বে।

শ্রীমতী সুমনার যেন আর তর্‌ই সয় না। সে অধীরভাবে প্রশ্ন করে কাঁকুরগাছির ঠাকুরের ভোগ খেয়ে কি হলো—

হবে আর কি! যেমন তেমনি। এর পর আত্মহত্যার সাধ ছাড়া জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই রইল না।

সবিস্ময়ে বলে উঠি, সত্যিই কি আত্মহত্যা করতে গেছলেন?

মাষ্টার মশাই হাসি হাসি মুখেই উত্তর করলেন, গেছলাম বৈ কি। কিন্তু মানুষ যা করতে চায়, ঠাকুর তা করতে দিলে তো। তাই না আজ তোমাদের সঙ্গে বসে সমানে অন্ন ধ্বংস করে চলেছি। দাও মা-মণি, তোমার হাতের চচ্চড়িটা আর একটু দাও—

সুমনা সানন্দে চচ্চড়ি পরিবেশন করে বললে, তারপর?

সেবার ছিল বেলুড়ে স্বামীজীর জন্ম মহোৎসব। আমার সে আত্মীয়টি ঠাকুরে আমার বিশ্বাস শেষ হয়েছে জেনে আর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু আমি ভাবলাম, আত্মহত্যাই যখন করবো, মনের সাধে খেয়ে তবে মরবো।

বিরাট উৎসব। ভোগও অফুরন্ত। পরিবেশনে স্বামীজীরা অক্লান্ত। তবুও আমি যেন তাঁদের ক্লান্ত না করেই ছাড়বো না এমনিভাবে ভূরিভোজনে লেগে গেছলাম। খেতে খেতে ভোগ যেন কণ্ঠ পর্যন্ত ভরাট হয়ে এসেছিল। সে-আকণ্ঠ ভোজনের পরে অতি কষ্টে আসন ছেড়ে গঙ্গার ধারে এসে হাত মুখ ধুয়ে ভাবছিলাম, একটিবার গঙ্গার পুলের উপরে উঠে দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দিতে পারলে চিরশান্তি। পায়ে পায়ে আগাতে যাবো, কি ভেবে ঘাসের উপরে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম। কোথায় নির্মম যন্ত্রণায় ছটফট করে অস্থির হবো—তা-না গভীর ঘুমে চলে গেছলাম আর কোন্ এক জগতে।

ঘুম ভাঙতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। একী! আমি এখনো বেঁচে। দুহাতে দুচোখ রগড়ে আঁচ করতে চাইছিলাম, আমি কোথায়? আমার পেটের বেদনা যন্ত্রণা দাহ তারাই বা কোথায়?

আশে পাশে বাতি জ্বলছিল। উৎসব অঙ্গন জনশূন্য। গঙ্গার মৃদু মন্দ হাওয়া সারা শরীরে অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হতে চাইছিল না।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো—ঘরে ফিরে যা। কখনো ভুলেও মাংস খাস না।

সেই থেকে আর কখনো পেটের ব্যথায় এক ফোটাও ভুগিনি। মা-মণি, তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা কে জানে—এখন আমি সব খেয়ে অক্লেশে হজম করতে পারি কেবল মাংসটা কখনো চেখেও দেখি না। ঠাকুরের আদেশ কি-না।

কথা শেষ হতে না-হতেই সুমনা বললে, আর একটু ডালনা নিন না? সোমেশ্বর বাবু সানন্দে সম্মতি জানালেন।

মহাযোগী যাঁরা ব্রহ্মকে তাঁরা
জেনেছেন সাধনায়।
মায়া মোহ ভরা এই সংসারে
যদিও কর্মে রত
ভাল ও মন্দ সব ফলাফল
ঈশ্বরে সঁপে দিয়ে
আসক্তিহীন পদ্মপত্রে
জল বিন্দুর মত।

—গীতা—

(অনুবাদ—মায়া বসু)

মানুষ
রবিদাস সাহারায়

এই পৃথিবীর মানুষ যে আমি মৃত্যুর কৃতদাস,
জন্মলগ্নে হাতে নিয়ে আসি মৃত্যুর পরোয়ানা।
জানি সে আসবে পরম ক্ষণটি থামলেই নিশ্বাস,
তবুও আমার রঙীন জাল বুনতে নাই তো মানা।
জানি এই দেহ চির নশ্বর তবু তাকে ভালবাসি,
পরিপাটি রাখি প্রসাধনে আর বিবিধ অঙ্গরাগে,
চর্মে সে ঢাকা কংকাল ওঠে নৃত্য ও গানে হাসি,
রোমাঞ্চ ভয় বিষাদে পুলকে অবিরাম দোলা
লাগে।
কখনও ভাবি পৃথিবীর দ্বীপে আমি যে
নির্বাসিত,
জনারণ্যের মাঝে মনে হয় শুধু একা নির্জন
দিক দিগন্তে ছড়ানো আকাশ স্থবির ও
পরিমিত,
অযুত মনের স্পন্দনে জাগে শুধুই একটি মন।
জানি পৃথিবীর দুর্গম পথে যাত্রা যে দুঃসহ,
কলম্বসের আদিম কামনা এনে দেয় পায়ে গতি,
ফুল জানে ঝরে যাবে তবু তার গাছে গাছে
সমারোহ,
তাই তো আমার স্বপ্ন-ছন্দ নাহি মানে
মিল যতি।

প্রতিধ্বনি ফিরে আসবে বলে / নির্মলেন্দু গৌতম

প্রত্যাশার বুকে জন্মে প্রতিধ্বনি ফিরে
আসবে বলে

এখানে পেতেছি বুক; হৃদয়টা সম্ভাব্য কিছুর
অপেক্ষায় রেখে দিয়ে, রোমাঞ্চিত প্রত্যাশায়
আমি

এখনও শুয়েই আছি পৃথিবীর সবুজ আঁচলে!
কী আসবে জানি নে কো, মৃত্তিকার-আঘ্রাণ-
আশায়

সবুজ আঁচলে শুয়ে কান পাতি, প্রতিধ্বনি
ফিরে আসে কি না!

বিপন্ন কালের রথী নিরন্তর সূর্যকে কঠিন
পাহারায় বয়ে নিয়ে অনির্বাণ কালের যাত্রায়
পৌঁছে দেয়; তা না হলে যদি তীব্র
স্ফুরিত প্রত্যাশা

দুর্লঙ্ঘ্য-বিন্ধ্যের মত পুনর্বার মাথা তুলে ধরে!
কত সূর্য এই বুক এ হৃদয় অতিক্রান্ত
হয়ে গেলে পর

নির্বাক প্রতিধ্বনি অবশেষে আকাশের
শূন্যে পায় ভাষা!!

হঠাৎ প্লাবনে
বটকৃষ্ণ দাস

হঠাৎ প্লাবনে পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গে,
ক্ষুরধার জল দূরে হুংকার ছাড়ে;
মহিষবর্ণ দিগন্তে চারিধারে
অন্ধকারের সহস্র চোখ রাঙে।
ঈশানে মেঘের মত্ত মাদল বাজে,
প্রলয়ঙ্কর ঝড় ওঠে নৈঋর্তে;
বিদ্যুল্লতা নাচে নাগিনীর সাজে,
মৃত্যু ভয়ের ছায়া কাঁপে চারিভিতে।
নিস্তার নেই। কোথায় পালাবে তুমি?
সামনে, পিছনে বিপুল সর্বনাশ;
বিপন্ন বিশ শতকের পটভূমি
বড়ো অসহায়, নিঃস্ব নিরাশ্বাস।
হঠাৎ প্লাবনে চারিদিক একাকার,
প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে
গৃহ, দেবালয় ভেঙ্গে হলো চুরমার,
মানুষের পাশে বুড়ো ঈশ্বর ডোবে।।

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রেস, ১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

কালো কেশের
কোমল
শোভা
সুন্দর কেশ তনুশ্রীকে বিশেষ
একটি মাধুর্য দান করে।
তাই রূপ-চর্চায় চিরদিন কেশের
এত আদর। কেশের স্বাস্থ্য
ও শ্রী বাড়াতে হলে
নিয়মিত ব্যবহার করুন
জুয়েল আমলা।
ইহা একটি আদর্শ ভারতীয়
ভেষজ কেশতৈল।
জুয়েল আমলা
AMLA OIL
শ্রেষ্ঠতম
ভেষজ
কেশ-তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪।

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

বিষয় লেখক

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

খেলা-ধূলা

অভিনয় জগৎ

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

বিষয় লেখক

সূচীপত্র

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

পূজা পাততাড়ি

সূচীপত্র

পাততাড়ি

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথের বহুবর্ণ চি

বেংগল ইমিউনিটি কোম্পা সৌজন্যে প্রাপ্ত অতুল বসু কর্তৃক অংকিত রবীন্দ্রনাথের তৈলচি প্রতিলিপি।

Inv 91

মহাকাশচারী

ছিলাম আমরা মাটীর মানুষ মায়ের আচল ধরি
উড়ো জাহাজের পাখার শব্দে চোখ বুজে ভয়ে মরি,
সমুদ্র দেখে বুক কাঁপে আর পাহাড়েরে করি ডর
মরুভূমি আর মেরু মহাদেশ, নাম শুনে আসে জ্বর!
আমরা সকলে আদুরে গোপাল
হারু নাড়ু আর নিতাই নেপাল,
রক্‌বাজ যত জঙ্গ বাহাদুর
শাড়ীর পিছনে করি ঘুর্ ঘুর্—
কিন্তু আমরা পাই যদি বাধা
ছুড়ে মারি বোমা, জেনে রেখো দাদা,
অতএব মোরা বীর সন্তান,
খাই বিড়ি আর জর্দা পান!

তুমি কে হে বাপু, এমন সময় আকাশে মারিলে তুড়ি,
লাফ দিয়ে যেন উদিলে বিশ্বে উড়ালে রকেট-ঘুড়ি?
গগনে গগনে বাজাইলে তুমি নব বিজ্ঞান-বীণ,
তুমিই কি গগারিন?
পাখা নাই, তবু উড়ে চলে যাও
হাজার যোজন দূরে চলে যাও,
বিদ্যুৎবেগে উধাও উধাও কোন্ দূরে মহাকাশে?
অজানা লোকের কী মহা খবর আসে?
ভূলোকে দ্যুলোকে তুলনা বিহীন
গগনে গগনে ধায় গগারিন,
আগামী যুগের আসে মহাদিন
মানুষের মহাজয়!
ইতিহাস অক্ষয়!

জাগিছে চন্দ্র, জাগে মঙ্গল, সুধাইছে গ্রহতারা—
'সৌর জগতে নতুন অতিথি কারা?'
কেবা এলো এই গ্রহের দুয়ারে
কেবা এলো এই আকাশের পারে
পৃথিবী ছাড়ায়ে পৃথিবীরে কেবা
করিল প্রদক্ষিণ?
—তুমিই কি গগারিন?
প্রণতি জানাই নভ-চারী দূত,
তুমি বিস্ময়, তুমি অদ্ভুত,
আমরাও হবো তোমার যাত্রী, মহাকাশে মহাবীর,
ভল্‌গায় আর গঙ্গায় হবে নয়া তীর্থের নীর?
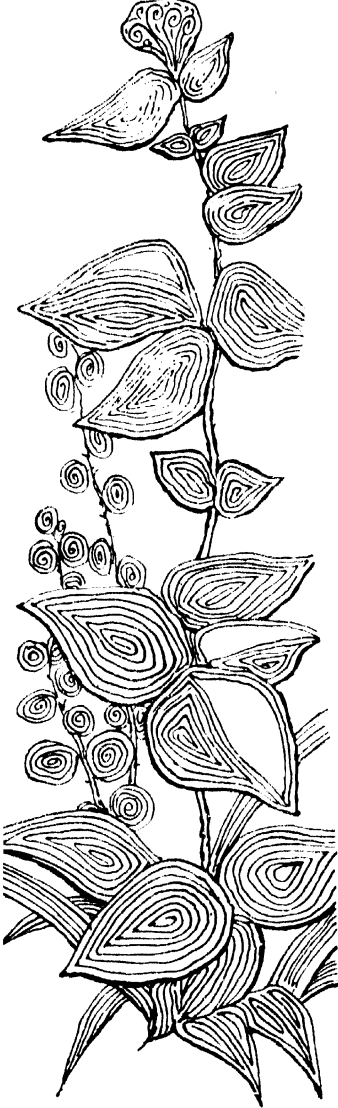
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।২৪)

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া পূজায় জগজ্জননীকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তুতির অনবদ্য মন্ত্রযোগে শত কোটি ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করি। বিশ্বেশবন্দ্যা, বিশ্বাত্মিকা বিশ্বেশ্বরীর শুভাশীর্বাদে বিশ্বের সকলেরই অখণ্ড কল্যাণ সাধিত হোক্।

মায়ের পূজায় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়ে সকলেই ছুটে আসুন। অনন্ত কল্যাণদাত্রী জগজ্জননী সকলেরই হিতসাধনের জন্য আজ সমাগতা। মায়ের পূজা সম্বন্ধে মহাভারত অতি সুন্দর করে বলেছেন—

"শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।" আজ দশরাত্র মহোৎসবে শবর, বর্বর, পুলিন্দ—জগতের সর্বজাতি, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে সমবেত হয়ে মাকে পূজা জানাবেন। দ্বাদশ-মৃত্তিকা দ্বারা মায়ের যে মহা স্নান, সেই মহা-স্নান সার্থক শুধু নয়—সম্পন্নই হয় না, যদি তাতে সর্বোপেক্ষিতার দ্বারের মৃত্তিকা না থাকে—এমনি সার্বজনীন পূজা, আমাদের মা মহামায়ার পূজা। মাতৃপূজার এই সার্বজনীনত্বের দিক অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, শাবরোৎসবে। এই উৎসব সম্পাদন করতে হয় বিজয়া দশমী দিনে—মায়ের বিসর্জন-কৃত্যের অঙ্গ হিসাবে। ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে কোনও ভেদ থাকতে পারবে না, এই উৎসবে। মাটিতে জল ছড়িয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলে মাতৃ-নাম-মন্ত্রের মহাধ্বনিতে জগৎ বিদীর্ণ করবেন, কাদায় গড়াগড়ি দেবেন, উচ্চ-নীচ ভাব মনের কোণেও পোষণ করতে পারবেন না। যদি করেন—ভগবতী ক্রুদ্ধা হবেন—

'পরৈর্নাক্ষিপ্যতে যস্তু যঃ পরান্নাক্ষিপতি।
তস্য ক্রুদ্ধা ভগবতী।'

এই সব বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেই ভবিষ্যোত্তর পুরাণ বলেছেন—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ। এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ।"

একদিকে মৈত্রীভাবনার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন যেমন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার একান্ত লক্ষ্যী-ভূত, তেমনি অন্তঃশত্রুর—ষড়রিপু প্রভৃতির—বিনাশ সাধনও চূড়ান্তভাবে কাম্য। উপরে উদ্ধৃত নারায়ণী স্তুতির মন্ত্রটিতে কি সুন্দর-ভাবেই না এ মূল কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে—

"হে দেবি! তুমি সর্বস্বরূপা, তুমি সর্বেশ্বরী এবং সর্বশক্তিমতী। সকল ভয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ কর। দেবি দুর্গে! তোমাকে প্রণাম।"

দেবী উপনিষদ ভগবতীর সর্বস্বরূপতা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন,— জননী দুর্গাই অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্ব দেবগণ, সোমপায়ী, অ-সোমপায়ী সকলেই। অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি সকলই তিনি। সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণ সকলই তিনি। জননী দুর্গাই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ স্বরূপা এবং কলাকাষ্ঠাদি কালস্বরূপিণী।

সর্বেশ্বরী পদের ব্যাখ্যা শশুনবী টীকায় এভাবে আছে—'সর্বস্য ঈশা স্বামিনী।' তত্ত্ব-প্রকাশিকায় আরো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে—যিনি সমস্ত কার্যকারণের নিয়ন্ত্রী বা প্রেরয়িত্রী—তিনিই সর্বেশা। দেবী যে আদি কারণ—এই পদে তাই সিদ্ধ হলো। ফলতঃ, দেবীর সর্বেশ্বরীত্ব সম্বন্ধে দেবী ভাগবত চমৎকারভাবেই বলেছেন—ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলছেন—

'যদিও দেবাসুর মানব সকলেই তোমাকে (ব্রহ্মাকে), আমাকে (বিষ্ণুকে) এবং মহাদেবকে সৃষ্টি, স্থিতি সংহারের কর্তা বলে জানেন, তা হলেও বেদবিদগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে মহাশক্তির বলেই—তুমি সৃষ্টিকর্তা, আমি পালন-কর্তা এবং মহাদেব সংহারকর্তা।—

যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
তেজানন্তি জনাঃ সর্বে সদেবাসুর মানুষাঃ॥
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ।
কৃতাঃ শক্ত্যেতি সংতর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ।।
(১, ৪, ৪৫-৪৬)

যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ৩,১০০, ৭-১০ শ্লোকে ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর সর্বশক্তিমত্তা অতি সুন্দরভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন। চামুণ্ডারূপিণী মহাজননী 'অষ্ট সখীসহায়া' হয়ে কি করে মহা-শত্রুর বিনাশ করে তা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে এবং শ্রীভগবতীকে এই নারায়ণী স্তুতির ১৩-২০ শ্লোকে ঐ ঐ রূপে প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে।

'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।' সমস্ত দুর্গ স্থান, দুর্গ বিষয় বিশেষতঃ অন্তঃশত্রুর অত্যাচার থেকে জননী উদ্ধার করেন বলেই তাঁর নাম দুর্গা। দেবী উপনিষদ মায়ের নামের তাৎপর্য বলতে গিয়ে বলেছেন—

'যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈব দুর্গাপ্রকীর্তিতা।
দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাদ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে।।'
যাঁর থেকে শ্রেয়ঃ আর কিছুই নেই, তিনিই দুর্গা। দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন বলেই মায়ের নাম দুর্গা।

জননী দুর্গার 'গায়ত্রী' আমরা পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে—
'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি
তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ'।
সায়ণাচার্যের মতে এখানে 'দুর্গা' শব্দের স্থলে 'দুর্গি' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে জননী দু[illegible]শভুজা 'দিগ্‌ভুজা'—এক একটি দিক [illegible]র এক একটি হাত। জননী দশপ্রহরণ[illegible]ণী, বিষ্ণু-ধর্মোত্তর তার ক্রমও নির্ণয় করে দিয়েছেন—তিনি দক্ষিণ দিকের করসমূহে ধারণ করেন ঊর্ধ্বাধঃ ক্রমে শক্তি, বাণ, শূ[illegible], খড়্গ ও চক্র; এবং বাম দিকের করসমূহে অধঃ ঊর্ধ্ব ক্রমে চন্দ্রাবিম্ব, খেট, কপাল, শূল ও চক্র॥ দশ দিক্ থেকে জননী সমস্ত বিপদ দূর করেন—'ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি'—এই ভক্ত সন্তানগণের শাশ্বত প্রার্থনা॥

দুর্গতিনাশিনী মহামায়া জগদম্বিকা সকল ভয় নিবারণ করুন, সকল দুঃখ-দৈন্য দূর করুন, জগতে শাশ্বত কল্যাণ বিরাজ করুক।।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলী

শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবীর সৌজন্যে

(১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাতে প্রবাসকালে জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতাকে লিখিত)

31, Hilldrop Road,
Camden Road, London,
3rd. August, 1888.

হেম,

তোমার ৭ই জুলাইর পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর ভাল আছে কিনা সত্য করিয়া লিখিতে বলিয়াছ। আগে আগে এক মাস দেড় মাস যেরূপ মাসে মাসে জ্বর হইত ও দুই-তিন দিন কষ্ট পাইতাম, সেরূপ আর নাই। তবে যেদিন বড় ঝড়-বৃষ্টি হয় কিংবা শীত পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় একটু হাত-পা কামড়ায় ও কখনও কখনও একটু জ্বর ভাব হয়। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ভাল হইয়া যায়। গতকল্য হইতে বৃষ্টি বাদল থামিয়া গিয়াছে, আকাশ প্রসন্ন হইয়াছে; সুন্দর সূর্যালোক দেখা দিয়াছে, আমিও বেশ আছি।

মা লক্ষ্মি আমি কি জানি না, আমার জীবনের মূল্য আছে! এই দেহ রক্ষা পাইলে এখনও অনেক দিন ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিতে পারা যাইবে। আমার এখন মনে হইতেছে আমি আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি তাহা কিছুই নহে। তুমি তোমার এক পত্রে লিখিয়াছ, তুমি আমার জীবন-চরিত লিখিবে। ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ করিও না। তোমার পিতার জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। ঈশ্বরের সেবাতে আমার এই শ্মশ্রু যখন শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইবে, এই রসনা তাঁহার গুণগান করিতে করিতে যখন বার্ধক্যবশতঃ নিস্তেজ ও অসমর্থ হইয়া আসিবে, এই চক্ষু তাঁহার বিশ্বাসীজনের মুখ দেখিতে দেখিতে যখন নিস্তেজ ও অন্ধ হইয়া যাইবে, যখন আমি তোমাদের স্কন্ধে হাত দিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনায় যাইব, এবং এখন যাহারা জননীর গর্ভে আছে, তাহারা আচার্যের কার্য করিবে, সেই জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকি এবং তুমি মা যদি বাঁচিয়া থাক, তবে তোমার বাবার সামান্য জীবন-বৃত্তান্ত লিখিও। তোমার পিতার জীবনে জগদীশ্বরের করুণা কিরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিও। এখনও ধর্মজগতে আমার শৈশব। শিশুর জীবনবৃত্তান্ত কি লিখিবে? আমার জীবন-চরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।

তোমার মা'র হাতে সংসারের ভার দিয়াছ, বেশ করিয়াছ। আমি পূর্ব পত্রে তোমাকে লিখিয়াছি যে, আমার বোধ হয় বাড়ীর গোলমালের মধ্যে থাকিলে তোমার পড়াশোনা হইবে না। এ বৎসর বড় সংকট। ফার্স্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। আমার বোধ হয় তোমার বোর্ডার হইয়া স্কুলে থাকিলে ভাল হয়। পূজার বন্ধের পর তাহা করিবে। ইতিমধ্যে জয়কালীর (১) নিকট ম্যাথম্যাটিক্সটা পাকা করিয়া লইবে।

প্রিয় আমাকে সুন্দর পত্র লিখিয়াছে। তাহার পত্রে অনেক কথা পাই, যাহা আর কেহ বলে না। আমাদের বাড়ীর মধ্যে সে পত্র লিখিতে পারিবে।......আমি দেখিতেছি তাহাকে জেনারেল ডিপার্টমেন্টে রাখাতে বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে।... তুমি প্রবোধকে (২) ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিও আর্টস স্কুলে এখনও ভর্তি করে কিনা, যদি করে প্রিয়কে ত্বরায় ভর্তি হইতে বলিবে। তারপর আপনি পড়িয়া শুনে লেখা-পড়া শিখিতে পারে শিখিবে। আর্টস স্কুলে তাহার ত্বরায় যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে। তাহাকেও কিছু করিয়া খাইতে হইবে।

(শেষাংশ ২৩৩ পৃষ্ঠায়)

Censored and Passed
Sd. S. Banerji
For D.I.G.
I.B. C.I.D.
24.11.26

Mandalay Jail
[C/o., D.I.G., I.B., C.I.D.
13, Elysium Row
Calcutta]
S. Kundu.

ইং ১৩।১১।২৬

প্রিয়বরেষু,—

আপনার অপ্রত্যাশিত পত্র ও দুইখানি পুস্তক পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। প্রাপ্তি সংবাদ দিতে এত বিলম্ব হইল, তার কারণ বোধ হয় অনুমান করিতে পারেন। ইচ্ছামত পত্র দিতে পারি না—তার উপর কিছুকাল যাবৎ শরীর তত ভাল নয়। সবে মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত হইতে সারিয়া উঠিতেছি। যাক।

আপনি যে আমার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপের কথা মনে রাখিয়াছেন এবং আমার মুখে কণারকের বর্ণনা শুনিয়া আপনার কণারক যাইবার ইচ্ছা হয়, এ কথাও ভুলেন নাই—ইহা শুধু আপনার মহান হৃদয়ের পরিচায়ক। আপনি যে কষ্ট করিয়া আপনার বই দুইখানি পাঠাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আপনার পুস্তকগুলি তাড়াতাড়ি একবার পড়িয়া গিয়াছি—শীঘ্রই আবার ভাল করিয়া পড়িব। আপনি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা করিয়াছেন এবং পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। পরিশ্রমের যে কোনও ত্রুটি করেন নাই তার প্রমাণ পুস্তকের সর্বত্র পাওয়া যায়। আপনি যে উড়িষ্যার শিল্প ও উড়িষ্যার শিক্ষা (culture) ভালবাসিতে পারিয়াছেন ইহা আমার পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে কারণ আমার জন্ম হয় উড়িষ্যায় এবং আমি উড়িষ্যাকে ভালবাসি।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি যে সংকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে যেন আপনি দিন দিন উন্নতি লাভ করেন। আপনি ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব সত্য—"........জ্ঞান আহরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আমাদের নিকট যতটা পরিশ্রম দাবী করে, ততটা দিতে আমরা প্রায়ই কুণ্ঠিত হই।" আমার বিশ্বাস আপনি exception-এর মধ্যেই পড়েন।

"কণারকের বিবরণে" মন্দিরের বাহিরের আরও কয়েকটা ফটো দিলে বোধ হয় ভাল হইত। সংস্কারার্থী অনুদেবের নামের অনুকরণে যে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে (মন্দিরের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি) তার ফটো খুব সুন্দর হইবার কথা। নবগ্রহের ফটোও খুব সুন্দর দেখাইত। ইহা ব্যতীত যে সব জায়গায় খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য এখনও পাওয়া যায় সেখানকার ফটো দিতে পারিলে পুস্তকটি সাধারণের পক্ষে আরও উপভোগ্য হইত। বোধ হয় আপনি যখন যান তখন আপনার সহিত 'ক্যামেরা' ছিল না। আমার সহিত যদি আপনার মতের মিল হয় তবে পরবর্তী সংস্করণে ফটোগুলি দিবার চেষ্টা করিবেন।

আপনার "উড়িষ্যা শিল্পশাস্ত্র" দেখিয়াও আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া উড়িষ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। আপনি যদি এইরূপে গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারেন তবে উড়িষ্যা ও বাঙলা—উভয়েরই সেবা করা হইবে।

উড়িষ্যার অতীত গৌরবময়। এ কথা ঐতিহাসিক ও ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানে। কলিঙ্গ একদিন বঙ্গ বিজয়ও করিয়াছিল। তা ছাড়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা culturally এক। উড়িষ্যার অতীত গৌরব উদ্ধার করিলে শুধু উড়িষ্যার সেবা করা হয় না; বাঙ্গলার তথা ভারতের সেবা করা হয়।

আপনি যে ভাবে উড়িষ্যার শিল্প ও শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন আমার সেইরূপ ভাবে এদেশের শিল্প দেখিতে ও শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার উপায় নাই। বস্তুতঃ এ দেশের শিল্প আমার নিকট খুব সুন্দর লাগে—ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষা করিবার অনেক শিল্প ও শিল্পসম্বন্ধীয় বস্তু এ দেশে আছে।

যাক্ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

ইতি ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

Sj Nirmal Kumar Bose
Sudhasindhu (সুধাসিন্ধু)
Puri

পুনঃ—শিল্পের দুইটি দিক আছে—technique-এর দিক এবং ভাব বা culture-এর দিক। উভয় দিকে গবেষণার আবশ্যকতা আছে। উড়িষ্যার পুরাতন শিল্পের সাহায্যে সমসাময়িক যুগের culture-এর বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, পুরীর "জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা" বৌদ্ধদের "বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের" রূপান্তর মাত্র। ইহার প্রমাণও অনেক আছে। কিন্তু কণারকের শিল্প হইতে আমরা সমসাময়িক culture-এর সঠিক খবর পাই কি? কণারকে অরুণদেবের পূজা হইয়াছিল কেন?

শ্রীসুভাষ

ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। এদেশে অনেক ভাষা, অনেক ধর্ম। যাঁরা উৎসাহের সঙ্গে এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্মের কথা ভাবছেন, তাঁদের ধারণা, এই-সমস্ত বিচিত্র জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে একটি অখণ্ড সত্তারূপে গ'ড়ে তোলার পথে এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে অন্তরায়। এ-জন্য তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাঁদের ইচ্ছা, সমস্ত অবস্থাকে পালটে দিয়ে, নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাষাগত এবং অন্যান্য বৈচিত্র্যকে খতম ক'রে দেওয়া। এবং যা কিছু বাধা আছে সব সরিয়ে দিয়ে তাঁদের ইচ্ছাটাকেই প্রবলভাবে চালানো।

এ সব ভাষাগত অথবা ধর্মগত বিষয়ে ভারতবর্ষের ইচ্ছা, সর্বভারতীয় একটি-মাত্র ইচ্ছা নয় এবং আমরা যদিও অধিকাংশই এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন-ইচ্ছায় বহু রকম পরিকল্পনা এবং বহু প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করছি, তবু আমরা কোন কিছুই নোতুন করে গ'ড়ে তুলতে পারছি না। বরঞ্চ আমরা অনেক জিনিস ভেঙ্গে দেওয়ায় সফল হয়েছি।

সৌভাগ্যের বিষয়, পুনর্গঠনের কাজে ধর্মকে আমরা বাইরে রেখেছি; কারণ ধর্মকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা বড়ই বিপজ্জনক। ধর্মগত অসহিষ্ণুতা ও স্বাতন্ত্র্য ধর্মান্ধতাতেই শেষে পর্যবসিত হয়, এবং এর উপর ভর ক'রেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতারূপ অভিশাপ দাঁড়াতে পেরেছে। এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে, চৌদ্দ বৎসর আগে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েছে, এবং আজও এই সাম্প্রদায়িকতা জীবিত থেকে ভিতরে ভিতরে শক্তি সংগ্রহ করছে। এবং তার ফলে ভারতবর্ষের আরো ক্ষতি হবে। আমাদের কেউ-কেউ বৃথাই আশা করেছিলাম যে, হিন্দীকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ ক'রলে এবং তাকে কেন্দ্র সরকারী ভাষারূপে এবং সর্বশেষে তাকে সমস্ত ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার এবং সংস্কৃতির ভাষারূপে গ্রহণ ক'রলে সমস্ত বিভিন্নতা ঘুচে যাবে, এবং হিন্দী ভাষার আওতায় এলে ভারতীয়েরা এক জাতি ও এক-ভাষাভাষী হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ এবং জোরালো সমর্থন এবং কোন কোন রাজ্য হিন্দী প্রচারে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এ চেষ্টা খুব সফল হয় নি। বরং যদি আমরা আর একটুকু খুঁটিয়ে দেখি, তাহ'লে দেখতে পাব, এর জন্যে ভারতবর্ষে আর একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা অতি ভয়ানক। এবং এটা বহু-ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে একটি অভিসম্পাতরূপে দেখা দিয়েছে। এবং এই সমস্যা দেশের প্রায় সবখানি অংশেই বিষ ছড়াচ্ছে। ভাষান্ধতার এটাই হচ্ছে অভিসম্পাত। এই জিনিসটি আমাদের ইতিহাসে কোনদিন ছিল না। স্বাধীনতার এই কয়েক বছরে এর আবির্ভাব ঘটেছে এবং তা ভারতীয় অখণ্ডতার মূলেই কুঠারাঘাত করছে। ফ্রাংকেনস্টাইনের গড়া দৈত্যটা হিন্দীকে অন্যান্য ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা থেকে জন্মেছে। মুখে খুব জোরের সঙ্গে অস্বীকার করা হ'লেও কার্যতঃ হিন্দীকে অন্য ভাষার উপর স্থান দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অখণ্ডতা এতে ভেঙ্গে যাচ্ছে, যেমন আমরা দেখছি পঞ্জাবে, আসামে, মাদ্রাজে (বা তামিলনাদে) এবং অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যে। আমাদের জাতীয় লজ্জার এই বিষয়টি নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার নেই। আমাদের এই যে জাতীয় লজ্জা, তা হ'চ্ছে কল্পনার, সহানুভূতির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির এবং কর্মদক্ষতার অভাবজনিত। আমাদের অন্যান্য ভাষা, অর্থাৎ তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষা, সেগুলি এই "জাতীয় ভাষার" পর্য্যায়েরই জাতীয় ভাষা। এগুলির সম্পর্কে আমাদের নিরাপত্তার জন্যে পুনরায় নোতুন করে আলোচনা হওয়া দরকার এবং বর্তমানে যে নীতি চলছে, তা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা ক'রে নেওয়া দরকার—এবং প্রয়োজন হ'লে আগাগোড়া বদল করা দরকার।

এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা বহু-ভাষাভাষী এবং বহু ধর্মীয় ভারতে আমাদের ছিল না। যেমন, আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষা, যা উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তি এবং বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের একমাত্র ভাষারূপে সমস্ত ভারতবর্ষের উপযোগী হ'তে পারে, এবং যা বহু সম্প্রদায়ের মিলনে গঠিত ভারতবর্ষের সবার কাছ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধা পেতে পারে। ভাগ্য আমাদের যা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং যা ইতিহাসের অনিবার্য নির্দেশ হিসাবে আমরা পেয়েছি, তা নিয়ে মন খারাপ ক'রে লাভ নেই। জাপানী, ইটালীয়ান, ইংরেজ এবং ফরাসী (শেষোক্ত দুটো দেশে ভাষার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও) ইত্যাদির মত আমরা সৌভাগ্যবান নই। আমাদের এমন কোন একমাত্র আধুনিক জাতীয় ভাষা নেই, যা আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষায়, সাহিত্যে, শাসনে, বাণিজ্যে এবং রাজনীতিতে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারি। অবশ্য, আমাদের সংস্কৃত ভাষা আছে, এবং এই ভাষাই আমাদের ভারতীয়ত্ব দান করেছে।—সমস্ত ভারতের সাংস্কৃতিক, আত্মিক, বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক ঐক্য দান করেছে। কিছু পরিমাণ ফারসী ভাষাও শাসনকার্য্যে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শুধু মুসলিম ভারত নয়, হিন্দু ভারতেরও ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এবং ফারসীও ভারতীয় ভাষার অন্যতম ভাষারূপে একটা স্থান করে নিয়েছে। এর পর আছে ইংরেজী। প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা অধিষ্ঠিত আছে; এবং এই ভাষা ইউরোপের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান আমাদের কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমতঃ এই ভাষা ভারতীয় মনকে আধুনিক করেছে; এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ভারতকে যে বৃহৎ ভূমিকায় নামতে হবে, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করেছে। আরও একটি বড় জিনিস সে করেছে, সে হচ্ছে এই ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রীয় একতার বোধ জাগিয়েছে, আমাদের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগিয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে না নামলেও, ইংরেজী ভাষাই ভারতের সমস্ত আধুনিক ভাষাকে আত্মপরিচয়লাভে সাহায্য করেছে।

আমার মনে হয়, ভাষা বিষয়ে একটা কিছু নোতুন করে স্থির করার এখনও সময় আছে। বৃটিশ আমলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় আমাদের এখনই ফিরে যাওয়া উচিত। শাসনকার্য্যের পক্ষে তখন ইংরেজী ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা এবং ইংরেজীর সে প্রতিষ্ঠা এখনও আছে। এ ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার ভাষা আগেও ছিল, এখনও আছে। এ ভাষা নিরপেক্ষ ভাষা, ভারতীয় অন্য কোন ভাষার সঙ্গে এর কোনও বিবাদ নেই, এবং তাদের অবাধ উন্নতির পথে কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি। বহুভাষী ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠন ধ্বংস করার জন্যে ভাষান্ধতা যে আগুন জ্বালিয়েছে, ইংরেজী ভাষার বর্ষণে যদি তা না নিভিয়ে ফেলি, তা হলে আর কোন্ অলৌকিক শক্তি আমাদের বাঁচাবে জানি না। হিন্দীকে পবিত্র গঙ্গোদক মনে করে এ কাজে যতই লাগাতে চাই না কেন, তার ভারতীয়ত্বকে যতই ভারতের মর্যাদার উপযুক্ত মনে করি না কেন, হিন্দীর দ্বারা কিন্তু সে আগুন নিভবে না। আগুন ইতিমধ্যেই জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

ভাষা সমস্যা এবং ভাষান্ধতা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যে একটিমাত্র লিপির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। ভাষা ও লিপি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিশেষ ক'রে জনসাধারণের মনে এই দুটির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। কারণ তারা ভাষা ও লিপিকে এক ক'রে দেখে। সম্প্রতি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীদের একটি অধিবেশন হয়েছে, তাতে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য হিন্দী-ভাষা ও হিন্দীলিপি (নাগরী) ব্যাপকভাবে

পূজার দিনে
লক্ষ্মী ঘি
বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের
বার্তা বহন
করে আনে
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘি
বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও হৃদ্য
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা-১২

ভারতবর্ষে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং যে-সমস্ত ভাষা নাগরীতে লেখা হয় না, সেগুলিকেও আস্তে-আস্তে নিজেদের লিপি ত্যাগ করিয়ে নাগরীতেই লেখবার কথা হয়েছে। কাজেই লিপির প্রশ্নটা হঠাৎ খুব বড় হয়ে উঠেছে। যাঁরা নাগরীর পক্ষপাতী তাঁদের ধারণা, সমস্ত ভারতে একমাত্র নাগরী চললে ভাষাও এক হওয়ার সুযোগ পাবে।

পরিকল্পনাটা খুবই লোভনীয় এবং যাঁরা নিজেদের মাতৃভাষা লিখতে নাগরী লিপি ব্যবহার ক'রে আসছেন তাঁদের পক্ষে খুবই কল্পনাদায়ক। কিন্তু এ পরিকল্পনা কল্পনারই অভাব সূচিত করছে। একে বলা চলে যারা আজন্মাবধি নাগরীর সঙ্গে পরিচিত নয়, সেই সব হতভাগ্যের প্রতি স্থূল নিষ্ঠুরতা প্রকাশ।

একথা সত্য যে, যাঁরা নাগরী ব্যবহার করেন না, তাঁদেরও কেউ-কেউ এই পরিকল্পনা সমর্থন করবেন। কিন্তু তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, একটি নোতুন লিপি কোটি কোটি নরনারীর ঘাড়ে চাপানোর অর্থ কি? সেন্টিমেন্টের কথা বাদই দিলাম। যদিও ভাবের দিক দিয়ে ঐক্যসাধন ক'রতে হ'লে, এ সেন্টিমেন্টকে বাদ দেওয়া চলে না। এ ছাড়াও সুবিধার প্রশ্ন আছে, সে হচ্ছে উচ্চারণ, কথা বলার অভ্যাসের দিক দিয়ে ঐক্যসাধন এবং তা কতখানি সম্ভব সেই প্রশ্ন। নাগরী হরফ চাপানোর উদ্দেশ্য মহৎ একথা খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কি হবে, সে সম্পর্কে কোন চিন্তা কেউ করছেন না। এমন অবস্থায় শুধু উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর ক'রে সব কিছু ভেঙ্গে দেওয়া কাজের কথা নয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে যেখানে এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রচারকারীরাই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছেন, তাঁদের সম্মান বাড়ছে এবং তাঁরা অন্যের উপর অহেতুক দুর্ভোগের বোঝা চাপাচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত অন্য প্রদেশের যাবতীয় লিপিকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে নাগরী লিপিকে ভারতের জাতীয় লিপিরূপে প্রতিষ্ঠা করার কি কোন জরুরী প্রয়োজন আছে? আমাদের কি উচিত নয় যে, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিস্তার অথবা কুশাসনের হাত থেকে মুক্তি—এই সমস্ত অধিকতর জরুরী বিষয়ের দিক দিয়ে ভারতীয়দের একতাবদ্ধ করা? লিপি বদলের চেষ্টা ক'রলে দেশকে সঙ্গে-সঙ্গে একটা গণ্ডগোল ও অরাজকতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, এবং তাতে লোকের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কারণ এ রকম চেষ্টার বিরোধিতা হবে অতি সাংঘাতিক। মাত্র নাগরী ব্যবহারকারী অঞ্চলগুলি এ দুর্দশা এবং অরাজকতা থেকে মুক্ত থাকবে। অন্য অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা বিস্তারের এক প্রবল বাধা উপস্থিত হবে।

নাগরী ব্যবহারকারীরা স্বভাবতঃ-ই নাগরী পছন্দ করবে। এবং আমরা যারা আমাদের নিজস্ব লিপি ভালবাসি, সেই আমরা এবিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি না। অন্যের সেন্টিমেন্ট সম্পর্কেও অনুরূপ সম্মানবোধ তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি। নাগরী-প্রেমিকেরা যাঁরা সমস্ত দেশে নাগরীর চলনে খুব উৎসাহিত, তাঁদের এই লিপির উৎপত্তি, এর প্রাচীনত্ব, এবং এর বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতি সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। তাঁদের আরো একটা ভুল ধারণা, এই লিপি বিশেষভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত ধারণা মানেন না। কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যেও এরকম অবৈজ্ঞানিক ধারণা খুবই সাধারণ। এই অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক জিনিস বলা হয়েছে এবং করা হয়েছে।

মাত্র দুটি জিনিস নাগরী লিপির স্বপক্ষে বলা যেতে পারে: (১) অন্যলিপি ব্যবহারকারীদের চেয়ে নাগরীলিপি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেশী। অর্থাৎ চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে আঠারো কোটি লোক দেবনাগরী ব্যবহার করে। বাকী বাইশ কোটির লিপি পৃথক। (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তেলুগু, তিন কোটি পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালী, চার কোটি পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, দুই কোটি তামিল, সিংহলের কুড়ি লক্ষ এবং অন্যান্য দেশে কয়েক লক্ষ, এক কোটি মলয়ালম, এক কোটি দু'লক্ষ কানাড়ী এবং এক কোটি ষাট লক্ষ উর্দু)। এছাড়া ভারতীয় অধিবাসীদের কয়েকটি বৃহৎ গোষ্ঠী রোমান লিপি ব্যবহার করে। এই হল মোটামুটি একটি হিসাব। এই অবস্থা ভারত ও পাকিস্তান পাশাপাশি থাকায় আরও জটিল হয়ে উঠেছে, এখন নির্ভুল সংখ্যা স্থির করা কঠিন। (২) নাগরীর স্বপক্ষে দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই লিপি সমস্ত ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার বাহন। এই দুটি যুক্তির উপর নির্ভর করে নাগরীর সমর্থকেরা নাগরীকেই জাতীয় লিপিরূপে সবচেয়ে সুবিধাজনক ব'লে প্রচার করেন এবং এ যুক্তিকে এ'দের কাছে অমোঘ ব'লে বোধ হয়।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই যে, নাগরী ভারতবর্ষের একটি আঞ্চলিক লিপিমাত্র। অবশ্য এলিপি ব্যাপক অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয় এবং উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষায়, রাজস্থানী ভাষায় এবং প্রাচীন গুজরাটী ভাষায় এ লিপি ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রের নিজস্ব "মোড়ী" নামক লিপি আছে। এই লিপি এখনো সেখানে ব্যাপকভাবে চলে। কিন্তু নাগরীলিপি তার স্থান দখল করছে। উর্দু ভিন্ন যাবতীয় ভারতীয় লিপি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। এবং প্রায় ১০০০ বছর আগে এখন এই সব লিপির যে রূপ দেখছি, প্রায় সেই রূপ গ্রহণ করেছে। যথা,—শারদা, প্রাচীন গুরুমুখী, নাগরী, বাংলা-অসমীয়া, মৈথিল, নেওয়ারী, উড়িয়া, তেলুগু-কানাড়ী, তামিল, গ্রন্থ এবং মলয়ালম—এগুলি সবাই পরস্পর-সম্পর্কে সহোদরা।

সংস্কৃতের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত হয়ে গত একশো বছরে নাগরী লিপি নতুন মর্য্যাদা পেয়েছে। সংস্কৃতের নিজস্ব কোন লিপি কোন কালেও ছিল না। মূলে সংস্কৃত ভাষা নিঃসন্দেহে খৃী'পূর্ব শতকগুলিতে ব্রাহ্মীর কোন প্রাচীন আকারে লেখা হত। তা ছাড়া প্রাকৃত উপভাষাগুলিও ঐ একই লিপিতে লেখা হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপির চেহারার পরিবর্তন হতে থাকে। সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষাগুলি ব্রাহ্মী লিপিতেই লেখা হ'ত। কিন্তু এগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলে বদলে যায়। সংস্কৃত সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল: এবং ব্রাহ্মীলিপি পর পর যেভাবে বদলেছে, সংস্কৃত ভাষাও পর পর সেই সব পরিবর্তিত ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা হয়েছে। নাগরীলিপির মধ্যে পবিত্র বা অলঙ্ঘ্য বলে কিছু নেই। তেলুগু, বাংলা, শারদা, গ্রন্থ, মৈথিল এবং মলয়ালম—এই লিপিগুলিও নিজ অধিকার বলেই সংস্কৃত ভাষারও লিপি। এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ওদের সংস্কৃতের সঙ্গে নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ করেছে। বহু সংস্কৃত পুস্তক বাংলা, তেলুগু, গ্রন্থ এবং মলয়ালম লিপিতে ছাপা হয়েছে, নাগরীতেও ছাপা হয়েছে। উত্তর বিহারে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুস্তক সবই মৈথিলী লিপিতে লেখা, এবং কাশ্মীরে প্রাপ্ত সব প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি শারদা লিপিতে।

নাগরী লিপি সর্বভারতীয় সংস্কৃতের লিপি হিসাবে গ্রহণ করার মূলে আছে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা। এবং ১৮৬০ সালের মধ্যেই ক্রমশঃ নাগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম সংস্কৃত বই ১৭৯২ সালে বাংলা লিপিতে কলকাতা থেকে ছাপা হয়। এই বইখানা হচ্ছে কালিদাসের ঋতুসংহার। কোলব্রুকের ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮০৫ সালে ছাপা হয়। এই বইতে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়। ভারতের ধর্মীয় কেন্দ্র বারাণসীতে সর্বভারতীয় পণ্ডিতদের সমাগম ঘ'টত, তাঁদের প্রত্যেকেই স্বদেশে নিজ নিজ লিপি ব্যবহার করতেন, নাগরীও শিখতেন। সেজন্য ইউরোপীয় সংস্কৃতের ছাত্র এবং পণ্ডিতদের কাছে নাগরীলিপি কিছু অনুমোদন পায়। কতকগুলি মূল্যবান ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভারতে এবং ইউরোপে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নাগরী লিপিতে ছাপা হয়। এই থেকেই সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণে নাগরী সর্বভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের লিপি হিসাবে ধীরে ধীরে গৃহীত হয়। এরপর অনেকগুলি বিদেশী পণ্ডিতের সম্পাদিত অথবা অনূদিত গ্রন্থ নাগরী লিপিতে ছাপা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ভাষা বা দেব-ভাষার কয়েকখানি বড় বড় বই ভারতে ও ভারতের বাইরে নাগরীতে ছাপা হয়। এই জন্যেই নাগরীর আগে "দেব" কথাটা যুক্ত হয়েছে, এবং "নাগরী" হয়েছে "দেবনাগরী"। যদিও নাগরী কথাটা এখনও চলে। যেমন, "নাগরী প্রচারিণী সভা" এছাড়াও আরো বহু কারণে সংস্কৃতের লিপি হিসাবে সর্বভারতে নাগরীর ব্যবহার বাড়তে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সাল থেকে নাগরীকে বাংলার পাশে অতিরিক্ত সংস্কৃতের লিপি হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেন। কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ১৮৫৭ সাল থেকে সংস্কৃতের লিপিরূপে নাগরী গ্রহণ করেন। সংস্কৃতির পক্ষে এবং ভারতের পক্ষেও এটা অবশ্য ভালই হয়েছে।

নাগরীর স্বপক্ষে যে কথাগুলি বলা হল, তা এর যথার্থ প্রাপ্য; কিন্তু অ-নাগরী রাজ্যসমূহে যে সমস্ত লিপি প্রচলিত তাদের কথা ভুলে যাওয়া এবং তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলবে না। বাংলা, তেলুগু এবং তামিল লিপি ব্যবহারকারীদের নিজ নিজ লিপির প্রতি আনুগত্য এবং আকর্ষণ সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং আবেগপূর্ণ। কারণ এই লিপি তাঁদের মাতৃভাষার লিপি এবং শুধু তাই নয়, সংস্কৃতেরও লিপি। এই সব লিপির ভিত্তি ততখানি বৈজ্ঞানিক, যতখানি বৈজ্ঞানিক নাগরী লিপির

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিকের সৌজন্যে

ষোল-সতেরো বছর আগে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়ে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে শিল্পীগুরুর সঙ্গে পরিচয় হয়। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারি তিনি ও আমার দাদু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র মল্লিক বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমি সাহিত্যচর্চা করি শুনে আমাকে পরে কলিকাতায় "গুপ্ত নিবাসে" দেখা করতে বলেন। সেখানে গেলে বহুক্ষণ নানা কথার পর আমাকে এই পাণ্ডুলিপিগুলি ও ১০।১২টি নিজের আঁকা ছবি দিয়ে বলেন, "কাছে রাখ্‌বি। আমি আর ক'দিন।"।

তারপর আমি নিদারুণ রোগে সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলুম। ইতিমধ্যে তিনিও চলে গেলেন। পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না। কেউ হয়তো পড়তে নিয়ে গেছেন আর ফেরৎ দেননি, এও হতে পারে। ছবিগুলোও হারিয়ে গেল।

কয়েক মাস আগে একটা অতি পুরাতন কাগজের বাণ্ডিল খুলে দেখতে গিয়ে পেলাম শিল্পীগুরুর হাতের লেখা। তারপর বলা বাহুল্য।

—বীঃ মঃ

(১)

এক পলকের নির্মিতি,—
চিকন্‌কারি কাচে ঢালাই শিষমহল্‌,
চিকন্‌ গাঁথনী এমন,
—যে আলোর ভারে ভাঙ্গলো বুঝি,
মিলিয়ে গেল বা হাওয়ায় হাওয়ায়
ফুলবাগান কাচমহল ঘিরে,
—ভাঙ্গা ফুলদান ঘিরে উজাড় বাগানটা,—
মালাকরের বোনা ফুলের গহনা যেন ছিঁড়েপড়া,
এ যেন ধ্বসে যাওয়া সর-লহর মিঠে বানের ॥

(২)

পরীস্তানের "খোশবু" হাওয়ার
একটুখানি ছোঁয়াচ পেয়ে
গুলজার যেন বাগিচা এখনো
বুলবুলির গানে ফুলে ফুলে গুলেস্তাঁর,
সকালে সন্ধ্যায় এখনো মনে হয়
—বনের তলায় বসে যায় সবুজ দরবার,
ফুলে ফুলে ফুল-বিছানো মসনদ্‌ জুড়ে,
ফুলের বাহার লাগে রোজই
—ফুলদানির ফুলের তোর'রা বাঁধা ফুলের
হিমে ফুটন্ত গোলাপ ফুলের
বুলবুলের মনলোভানো মালঞ্চে এইখানে ॥

(৩)

মায়াতে ঘেরা বেজান্‌ সহরের বাগান এখানা,
খোয়াব জাগায় দিক্‌ ভোলানো,
সুন্দর বুনন্‌ শুজ্‌নীর মতো আর এক বাগান,
মন-মাতানো রূপেতে রঙেতে
পৌঁছে যায় চোখের সামনে,
যেন আরেক দিনের রঙমহাল ঘিরে !

দেখি সেখানে খুশির জলুস্‌ সাতরঙা
দিচ্ছে ঝলক্‌ ফুলবাসরে,—
মহলে মহলে দিচ্ছে ঝিলিক,
—দেওয়ালে, আরসীতে,
কাচের ফুলদানে স্ফটিক ঝালর সামাদানে
মণি-কাটা পেয়ালাতে সোনাতে পোতে,
মণি-মাণিক্যে বিল্লোরে হি[illegible] দিচ্ছে রঙ
পহল-দার কানের দুলে মোতীর কর্ণফুলে
কালো চুলে হীরার ঝাপটায়,—
হাতের পহুঁছায় কণ্ঠমালায়,—

নূপুরে গুঞ্জরী পঞ্চমে পায়ের তলার
হেনার রঙে—
দেয় ঝলক্‌ লাগায় জলুস্‌ জলসার বাতি ॥

ভিত্তি। আমাদের সাধারণ ভারতীয় লিপিতে যে সমস্ত বর্ণ আছে, তাদের চেয়ে নাগরী বিশেষভাবে সুন্দরও নয় পবিত্রও নয়। তা ছাড়া নাগরী অক্ষর লেখা সহজ নয়। অন্ততপক্ষে অন্যান্য লিপির চেয়ে কম জটিল এবং ক্লান্তিকর নয়। তামিল অক্ষর সাধারণ নাগরী অক্ষরের চেয়ে ঢের বেশী সহজে। [illegible] মনে করে বাংলার সঙ্গে নাগরীর তুলনায় নাগরী বেশী জটিল এবং [illegible] নাগরীর পাশে বাংলা অক্ষরকে ঠিক মনে হবে যেন কালো মোটা। জার্মান অক্ষরের ভারি ওজন এবং জটিলতার পাশে ইউরোপীয়ান সাধারণ রোমান অক্ষরের কমনীয়তা এবং সরলতার রূপটি ধরা হয়েছে।

প্রত্যেক রাজ্যে ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে যে লিপি তার নিজ উদ্দেশ্য সাধন ক'রে আসছে, তা বর্জন ক'রে অন্য একটা লিপি এবং যে লিপি গ্রহণ করলে অতিরিক্ত কোন লাভই নেই বরং অতিরিক্ত জটিলতা বাড়বে, সেই লিপি অ-নাগরী অঞ্চলের সবাই গ্রহণ করা-মাত্র একাত্মক হয়ে যাবে, একথা কল্পনা করাই শক্ত। বাংলা, উড়িয়া তেলুগু, তমিল ইত্যাদির বদলে নাগরী চালানোর চেষ্টা সর্বত্র বিরোধিতার একটা প্রবল ঝড় জাগিয়ে তুলবে। এমনকি যে সব সংস্কৃত বই বিশেষ করে বাঙ্গালী, তেলুগু, উড়িয়া ইত্যাদির পাঠের জন্য লেখা বা ছাপা, সেগুলি তাদের নিজ নিজ লিপির পরিবর্তে নাগরীতে পড়তে হলে সবাই তাতে আপত্তি করবে। এতে সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত পাঠকের মাঝখানে একটা বাধার সৃষ্টি হবে। *এমন অবস্থায় একটি কথা সর্বশেষ কথারূপে মানতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চলেই তাদের নিজ নিজ লিপি প্রিয়।* এমন অবস্থায় ঐক্যের নামে একটিমাত্র লিপি অন্যান্য লিপিকে বর্জন করে অনিচ্ছুক লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

আপাততঃ আগে যেমন ছিল তেমনি থাকা উচিত। এবং লিপির ক্ষেত্রেও তাই। সাক্ষরতা এবং শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে তাদের নিজস্ব ভাষা এবং লিপিতেই প্রচারিত হোক, শিক্ষকের অভাব হবে না। কিন্তু যেখানে নাগরী লিপি জনসাধারণের মধ্যে অজ্ঞাত, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং সাক্ষরতা সম্ভব হবে কিরূপে? শিক্ষা কিছুদূর এগিয়ে গেলে, তারপর সর্বভারতীয় লিপির কথা ভাবা যাবে।

এই সর্বভারতীয় লিপির প্রশ্নটি ভাবাবেগের দিক দিয়ে বিচার না করে যুক্তির দিক দিয়ে

(শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায়)

শিউলি

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে।

অনেক খোঁচাখুঁচির পর দু'পক্ষ সবে মাত্র আখড়ায় নেমেছে, খেলা তখনও ভালো করে সুরু হয়নি। যুদ্ধটা ভারতবর্ষের কানের কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই আমাদের কর্ণধারেরা কলকাতা শহরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে নানা রকম পরখ-নিরীখ সুরু ক'রে দিলেন। রাত্রিবেলা শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান কলকাতা শহরের উপরে পাছে আক্রমণ চালায় এজন্য রাস্তায় গ্যাসের ফানুষগুলোতে আল-কাতরা মাখিয়ে কালো ক'রে দিলেন; ফুটপাথের ওপরে চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘর করে দিলেন—আচম্বিতে বোমারু আক্রমণ হ'লে পথিক যাতে সেই ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে; রাস্তায় সিগারেট খাওয়া মানা ইত্যাদি নানা রকম সাবধানতা কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করলেন। এত করেও সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে শেষকালে তাঁরা রাস্তার বাতিগুলো একেবারে নিভিয়ে দিলেন।

শুধু তাই নয়। লোকের বাড়ীতে ও খোলা জায়গায় জ্বালানো বাতি রাখতে পারবে না, এবং ঘরের ভেতরেও তেমনভাবে আলো রাখবে না—যার রশ্মি রাস্তা কিম্বা ওপর থেকে দেখা যায়। অর্থাৎ শহর এতদিন অবগুণ্ঠিত ছিল, এবার বোরখার অন্তরালে আত্মগোপন করলে।

চোর-জোচ্চোর-বাটপাড়-খুনেরা সুযোগ পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহিত হ'য়ে পড়লেন। এমন কি ঐ রকম মনোভাবাপন্ন লোকেরা—সুযোগের অভাবে যাঁদের প্রতিভা তেমন বিকশিত হয়নি, তাঁরাও কাজে নেমে পড়লেন। সন্ধ্যের পর পথচলা ভার—লোক চেনা যায় না—দূরে কেউ আসছে দেখলেই বুক দুরু দুরু করতে থাকে। এ সব ছাড়া আধিভৌতিক উৎপাত তো বেড়ে গেল; সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে রাজ্যের ছুঁচো ইঁদুর, ভাম এবং নানান রকম নাম-না-জানা জানোয়ার শহরের বুকের ওপরে যদিচ্ছা চরে বেড়াতে আরম্ভ করল। আবার এতদিন শহরের রাস্তায় যারা রাজত্ব করছিল, সেই কুকুর ও ধর্ম্মের ষাঁড়ের দল কোথায় যে গা-ঢাকা দিল তা সকলের গবেষণার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। অনেকে বলত—কুকুরো কিমা ও ষাঁড়ের ডালনা ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে সৈনিকদের জন্যে।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও মাসের মধ্যে কয়েকটা দিন সমস্ত শহর চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠত। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি যুগে যুগে মানুষের অন্তরে আনন্দের খোরাক জুটিয়ে এসেছে কিন্তু অবস্থার বিপাকে এই সব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিগুলি মানুষের মনে ত্রাসেরই সঞ্চার করত। সেদিন মানুষের হাত চাঁদ অবধি পৌঁছয়নি। আজকের দিন হ'লে হয়তো চাঁদের অঙ্গে আলকাতরা দিয়ে তাকে কালো করবার চেষ্টা করা হতো। কিম্বা হয়তো গোটা চাঁদটাকেই শেকড় সমেত উপড়ে এনে পূর্বসমুদ্র ভরাট করে একটা বিরাট কৃষিকার্য্যের পরিকল্পনা করা হ'তো। কিন্তু আজকের তুলনায় সেদিনকার বৈজ্ঞানিকেরা ছিলেন নাবালক, কাজেই এই সব দিনগুলোয় নীরবে সরকার পক্ষ শত্রু বোমার প্রতীক্ষা করতেন আর শহরবাসীরা সবংশে সিঁড়ির তলায় ব'সে রাত্রি যাপন করতেন। কত মধুনিশি এইভাবেই অতিবাহিত হ'তো।

এমনি এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে শোনা গেল জাপানীরা শিয়ালদা'তে বোমা ফেলে গেছে।

অনেকে বলতে লাগলেন—আওয়াজ পাওয়া গেল না—অথচ সেখানে বোমা পড়ল কি ক'রে?

বিশেষজ্ঞ গুজব সম্রাটেরা উত্তর দিলেন—জাপানীরা যেমন কথাবার্তা কম কয়—চুপচাপ কাজ সারে, জাপানী বোমাও তেমনি আওয়াজ করে না। কিন্তু যা কাজ করবার তা ক'রে যায়।

অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে গুজব সম্রাটেরা খুবই তৎপর হ'য়ে উঠলেন। এক দিন না দিন বাদেই চমকপ্রদ খবর—কোনো দিন বা গড়ের মাঠে অদ্ভুত চেহারার লোক দেখা গিয়েছে, মেটেবুরুজের গঙ্গায় একখানা জাহাজ পানকৌড়ির মতন ডুবছে আর উঠছে—এই সব স্বচক্ষে দেখা খবর প্রচার হ'তে লাগল। কেউ সেগুলো বিশ্বাস করলে—কেউ বা বিশ্বাস করলে না। আজগুবি কবিতার মত আজগুবি খবর নিয়েও মাতামাতি করবার লোকের অভাব হয় না। আস্তে আস্তে শহরের ভিড় পাতলা হ'তে লাগল। সাতপুরুষের মধ্যে দেশের কথা যাদের মনে হয়নি হঠাৎ তাঁরা দেশাত্মবোধের চেতনায় গ্রামমুখো ছুটলেন। অনেকে বলতে লাগল—খবরগুলো মিথ্যে বটে কিন্তু তা সত্যি হ'তে কতক্ষণ?

ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল—জাপানী সৈন্যরা সিঙ্গাপুর ঘুরে ঐ নতুন খালের ধার দিয়ে বেলেঘাটায় এসে পৌঁছেছে এবং সেখানে ভীষণ লড়াই চলেছে। শহরের ভিড় আরও পাতলা হ'তে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত হ'তে পারে ভেবে আমরা আগে থেকেই কলকাতা থেকে একটু দূরে গঙ্গার ধারে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে রেখেছিলুম—সময় মত সরে পড়বার জন্য। এই তালে ওনাদের সেইখানে চালান ক'রে দেওয়া গেল। কিছুদিন বাদেই এক জ্যোৎস্না রাত্রে সত্যি সত্যি শহরে দু-একটা জাপানী বোমা পড়ল। ফল যে অবশ্যম্ভাবী এবার তাই হ'য়ে গেল—শহর আধখানা খালি হ'য়ে গেল।

নতুন রকমের জীবনযাত্রা সুরু হোলো। বাড়ীতে একেবারে একা থাকি। সকালবেলা একটা লোক এসে সামান্য যা কাজকর্ম থাকে তা ক'রে দিয়ে চলে যায়। সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই স্নান ক'রে দরজায় ডবল তালা-চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যেই আপিসে গিয়ে কাজ সুরু করতে হয়। কারণ কর্তারা সে সময় দিবালোক সঞ্চয় করছিলেন। চৌরঙ্গীর এক হোটেলে রাইস-কারির নামে সাদা ছর্‌রা ও বোরের ঝোল যতটা পাওয়া যায় ততটা গলাধঃকরণের চেষ্টা ক'রে দৌড় দি। ওদিকে চারটের মধ্যে ছুটি। এদিক ওদিক ঘুরে সন্ধ্যে নাগাদ এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে জমায়েৎ হই। সেখানে রাত্রি এগারটা অবধি থ্রি হার্টস ও নো ট্রামস ক'রে বাড়ীমুখো রওনা হই। বন্ধুরা অতি যত্ন ক'রে এক গাঁজা লুচি ও এক বাটি মাংস ও তদুপযুক্ত তরকারী একটা বোকনোয় ক'রে

কাপড় দিয়ে ছাঁদা বেঁধে দেন তাই হাতে ক'রে অন্ধকারে হয় যাত্রা সুরু।

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে এক রাত্রে বন্ধুর বাড়ী থেকে ফিরছি—চলেছি নিজের বাড়ীর দিকে। কার্তিক মাসের শেষাশেষি। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাস্তায় জমাট বেঁধে আছে। দু'পা আগের লোক চিনতে পারা যায় না। তাই ঠেলে ঠেলে পা ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে এগিয়ে চলেছি। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই—অর্ধ রাত্রে শহরবাসীরা নিদ্রিত। পথের দু'পাশে মাঝে মাঝে সরু সরু গলি—ভয় হচ্ছে, কখন কোন্ গলি দিয়ে গুন্ডার দল বেরিয়ে এসে অতি যত্নে পুষ্ট এই দেহের মধ্যে নির্মমভাবে ছোরা বসিয়ে দেবে। মনে মনে ভরসা হয় ট্যাঁকে বড় জোর দু টাকার বেশি হবে না—কিন্তু ভয় জিনিষটা যুক্তি মানে না। সে সমস্ত যুক্তি ছাপিয়ে মনের উপর সওয়ার হয়ে বসে।

এক একটা গলি পেরিয়ে যাই আর মনে হয় আজকের মত একটা ফাঁড়া কেটে গেল। একবার মনে হোলো—পেছন থেকে কেউ যদি এসে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে এক চোপে গলাটা উড়িয়ে দেয়! ওঃ! কন্ধকাটা ভূত হ'য়ে এই অন্ধকারে ঘুরে মরতে হবে। পেটে দুর্জয় খিদে, হাতে খাবারের ছাঁদা কিন্তু মুখ নেই যে খাই! সে এক ভীষণ পরিস্থিতি—নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে ফেল্লাছ।

চলেছি তো চলেইছি। এক এক জায়গায় হেমন্তের শিশিরসিক্ত ধোঁয়ার কুন্ডলী পথের মাঝখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার সেই সব জায়গায় আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠে দস্তুরমতো পন্থ বিজন অতি ঘোর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

চলতে চলতে চৌধুরীদের বাড়ীর ধারে এসে পেঁছিলুম। চৌধুরীরা বিরাট ধনী লোক। চঞ্চলা লক্ষ্মী পাঁচ পুরুষ ধরে গৃহে অচলা হয়ে আছে। অর্থের সীমা নেই—অথচ ভাগীদার কম। প্রকান্ড প্রাসাদ—তার চারিদিকে বিস্তৃত সুরক্ষিত বাগান। পথের ধারে কোমর-ভোর চওড়া ইঁটের দেওয়াল—তার ওপরে দেড়-মানুষ-সমান ঘন লোহার রেলিঙ। রেলিঙের ধারে ধারে ছোট বড় ফুলের গাছ। কোনো কোনো গাছ রেলিঙ উপচে রাস্তার দিকে ঢলে পড়েছে। তারই ধার ঘেঁসে আমি চলেছি—ধীর মন্থর গতিতে। মনে হচ্ছে এই বাগানটা পেরুলেই আমার বাড়ীর গলি।

সদর দরজার তালার চাবি ঠিক আছে কি না—এক একবার হাতড়ে দেখছি—এমন সময় এক ঝোঁক শিউলির সুবাস আমার নাকে এসে লাগল। মনে হোলো—গাছটা যেন ডেকে বললে—কি বন্ধু, এত রাত্রে ফিরছ!

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর দু'-এক পা পেছু হেঁটে ওপারের ঝোঁপগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বললুম—কোথায় তুমি বন্ধু! টুপ করে শিশিরসিক্ত একটি ছোট্ট শিউলি মুখের ওপর এসে পড়ল। ফুলটা তুলে আল-গোছে মুঠোতে ধরে একটা গভীর নিঃশ্বাস টেনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে আরম্ভ করলুম।

শিউলির সুবাস আমার মনের মধ্যে স্মৃতির প্রবাহ উন্মুক্ত করলে। তারই স্রোতে গুন্ডো কন্ধকাটা ভূত কোথায় ভেসে গেল। মনে পড়ল শৈশবকালে আমরা গুটিকতক ছেলে চৌধুরীদের বাগানে সকালে শিউলি ফুল কুড়োতে আসতুম। চার দিক থেকে একটি একটি ক'রে অনেক মেয়েও সেখানে এসে জুটতো। অপর্যাপ্ত ফুল, আমরা ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে শেষ করতে পারতুম না।

চৌধুরীদের দারোয়ানদের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাড়ী ফেরবার মুখে আমরা সবাই দারোয়ানদের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সমস্বরে সুরে করে বলতুম—"সীতা রাম সিয়া রাম রাম সীতা রাম, রাধে গোবিন্দ বোলো প্রেমসে।" এই সমস্বরে গান শোনবার জন্যেই দারোয়ানরা আমাদের বাড়ীর মধ্যে যেতে দিত। স্মৃতির প্লাবনে ভেসে আসতে লাগল কত লোকের মুখচ্ছবি। পিতা মাতা ভাই বন্ধু—কত আত্ম-জন—সময় যাদের টেনে নিয়ে গিয়েছে কোন্ অতীতের গহ্বরে। মনে হলো আমাকেও সে একদিন তার পক্ষপুটে তুলে নিয়ে চলে যাবে। আমিও অচিরে তাদেরই মতন অতীত হ'য়ে যাব। মনের মধ্যে একান্ত ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

চৌধুরীদের বাড়ী ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ীর গলিটায় মোড় ফিরেছি, এমন সময় কে যেন পেছন থেকে ডাকলে—শুনুন!

আওয়াজটা কানে যেতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কিন্তু তখুনি মনে হোলো—এতো ঠিক গুন্ডার আওয়াজ নয়। আর যাই হোক, তারা কিছু আপনি আজ্ঞে ব'লে ডাকবে না। সাহসে ভর ক'রে ফিরে দাঁড়ালুম। পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বার ক'রে দেখবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ক্ষীণ সেই আলোকে স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। তবে মনে হোলো অদূরেই একজন দাঁড়িয়ে—তবে সে বোধ হয় মেয়ে-মানুষ। বীর-পদভরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম—কি চাই তোমার?

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে—কি চাই, বুঝতে পারছেন না?

পকেট থেকে টর্চটা বার ক'রে জেবলে নিজের শাদা মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে বললুম—বুঝতে খুবই পারছি, কিন্তু এদিকে দেখেছ?

সে বললে—এত রাত্রে যাকে পুরুষের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় তার আর অত বাছতে গেলে চলে না। এই কাছেই আমার বাড়ী—চলুন।

বাঃ রে! অমন সাফ ও চোস্ত জবাব পেয়ে খুশি হ'য়ে গেলুম। মনের মধ্যে তার সম্বন্ধে জানবার জন্যে কৌতূহল গর্জে উঠতে লাগল। আবার মনে হোলো—পকেটে তেমন বিশেষ কিছু নেই—আবার একটা ফ্যাসাদে পড়ব না তো! আমার চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়ে সে খপ করে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে—চলুন। রাস্তায় মিছে দাঁড়িয়ে দেরী আর করবেন না।

হাতখানা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবছি কি করব—এমন সময় সে বললে—দেখুন, ওরা যদি ধরে তাহ'লে বলবেন—আমি আপনাদের বাড়ী ঝিয়ের কাজ করি। আপনি চোখে দেখতে পান না—তাই রাত্রে আমায় নিয়ে বেরিয়েছেন—হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্যে।

ওঃ—এ যে দেখছি দস্তুরমত এ্যাডভেঞ্চার! নূতন এ্যাডভেঞ্চারের ইশারা পেয়ে মনটা নেচে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য তার কন্ঠস্বর! সে রকম কন্ঠস্বর আমি ইতিপূর্বে কোনো মানুষের কণ্ঠে শুনিনি। সে কন্ঠস্বর মধুর কিম্বা কর্কশ, মৃদু কিম্বা জোরালো—এ সবের কোনো পর্যায়ে পড়ে না। সে যেন ইহলোকের নয়, সুদূর লোকান্তর থেকে ইথারস্রোতে ভেসে-আসা শব্দতরঙ্গের একটি কণামাত্র যার কিছু শ্রুতিগোচর হয়—বাকিটা অনুভব করতে হয়। জিজ্ঞাসা করলুম—ওরা কারা?

—ঐ যারা যুদ্ধের জন্য রাস্তা গার্ড দেয়। বড় বদমাইস ওরা। এবার চলুন—এই কথা বলে আবার আমার ডান হাতখানা ধ'রে টান দিলে।

ডান হাতে খাবারের ঝুড়িটা ছিল। সেটাকে বাঁ হাতে নিয়ে তার হাতে হাতখানা সমর্পণ ক'রে বললুম—চল।

আমাদের যাত্রা সুরু হোল। অন্ধকার নগর-পথের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলুম। অন্ধকারের পর অন্ধকার, কোনো কোনো জায়গায় সন্ধ্যের ধোঁয়া পথের মাঝখানেই জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভেদ করে চলেছি। চলতে চলতে কখনো মনে হচ্ছে—কোথায় সারা দিন এক রকম অনাহারে কাটিয়ে রাত্রে বেশ ক'রে আহারপর্ব সমাধা ক'রে ঘুম লাগাব—না কোথায় এক মুহূর্তে সব ঘুরে গিয়ে চলেছি এখন চিত্রকরের বিষয়বস্তু হয়ে—অভিনয় করতে করতে। সম্পূর্ণ অপরিচিতা কে এই নারী—যার আকর্ষণে রাস্তা দিয়ে চলেছি অন্ধ সেজে। আবার কখনো বা মনে হচ্ছে—আমরা সকলেই তো এই রকম অন্ধ সেজে চলেছি সংসারের পথ বেয়ে। সব বুঝতে পারি কিন্তু করবার কিছু নেই। এই যাত্রার পরপারে কি দেখব তাও কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছি। জীবন-ব্যাপী লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় আহৃত অভিজ্ঞতার ভান্ডারে যে সব কন্টকহার থরে থরে সাজানো আছে সেখানে আর একখানি মালা যুক্ত হবে মাত্র। আবার এক অভাগিনীর অশ্রুজলে আমার অশ্রু মিলিত হবে কিনা—কে জানে?

চলেছি তো চলেইছি। চক্ষু কখনো একে-বারে নিমীলিত, কখনো বা অর্ধনিমীলিত, কখনো বা বিস্ফারিত। পথের পর পথ অতিক্রম করে চলেছি—কখনো বড় [illegible]তায়, কখনো গলিতে, আবার কখনো বড় রাস্তায়। মনে হতে লাগল—আমরা যেন কত যুগযুগান্ত ধ'রে এই অন্ধকার ভেদ করে চলেছি—কোথায় যাবো—তার ঠিকানা নেই।

একবার জিজ্ঞাসা করলুম—ওঃ, আর কত দূর!

সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমার ডান হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত ধ'রে বললে—আর এসে পড়েছি।

উঃ, কি ঠান্ডা তার হাত! মনে হতে লাগল যেন তার শরীরের সমস্ত শৈত্য আমার শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। বুকের মধ্যে শীতে গুরগুর করতে লাগল। একবার মনে হোলো—এতবার কথা বললে কিন্তু তার মুখতো এখনো পর্যন্ত ভালো ক'রে দেখা গেল না। কি জানি—এ কোনো অশরীরী অপদেবতা তো নয়! আমারই চিন্তা রূপ ধরে এসেছে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে লোকান্তরে।

তাই যদি হয়—তাই বা মন্দ কি! এই রকম চলতে চলতে এক জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ব। আমার চিন্তাধারাকে থমকে দিয়ে সে বললে—এইবার এসে পড়েছি—।

সত্যিই আমরা ঠিকানার কাছে এসে পড়েছিলুম। অনেক দূর এগিয়ে একটা চওড়া রাস্তার ডান দিকে প্রকান্ড বস্তি। ছোট বড় একতলা দোতলা খোলার চালের বাড়ী—তারই

একখানা একতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বাড়ীখানা পথের দিকে সাংঘাতিক-ভাবে হেলে পড়েছে। একটা বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে সে আমাকে বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, তবুও সাহসে ভর করে ঢুকে পড়া গেল। ঘরখানা এত হেলে পড়েছিল যে, দরজার পাল্লাটা ছেড়ে দিতেই সেটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধে জায়গাটা ভরে আছে। বললুম—বাতি জ্বালো।

সে বললে—মাদুরটা পাতি।

ইতিমধ্যে পকেট থেকে টর্চটা বার করে ঘরখানার চারদিক দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে হোলো যেন আমার পায়ের কাছে আর একটি মেয়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। তারও ওপাশে আর একজনও শুয়ে আছে বলে মনে হোলো। ইতিমধ্যে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে মেয়েটি বললে—বসুন।

আমি জুতো খুলে সেই জীর্ণ মাদুরে বসে জিজ্ঞাসা করলুম—কে শুয়ে আছে?

মেয়েটি বললে—আমার মা।

—আর ও পাশে?

ওর মা হাতটা মাথায় তুলে এমনভাবে শুয়েছিল যে, কিছুতেই তার মুখটা ভালো করে দেখতে পেলুম না। তার ওপাশে যে শুয়েছিল তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। আমি কেন—অসীম সাহসী লোকও সে মূর্তি দেখলে শিউরে উঠবে। শীর্ণ—এত শীর্ণ যে, মানুষ বলে তাকে আর চেনা যায় না। তবে বোঝা যায় যে এক সময়ে সে মানুষ ছিল। যাক—সেই বীভৎস মূর্তির বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম।

জিজ্ঞাসা করলুম—ওর কি হয়েছে?

মেয়েটি বললে—আজ এক বছর থেকে ও অসুখে ভুগছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে মুখ তুলে বললে—আমার নাম বকুল।

এতক্ষণ তার মুখখানা ভালো ক'রে দেখলুম। বয়স তার অল্প হ'লেও মুখের মধ্যে অল্প বয়সের কোনো মাধুর্যই নেই—দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছাপ সেখানে গভীরভাবে পড়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে লজ্জিত হয়ে শতচ্ছিন্ন শাড়ীখানা মাথায় টেনে দিল।

অদ্ভুত তার চোখ দুটি। অতি সুন্দর আয়ত চোখ নয়, সে এক রকম ভিজে ভিজে ছলছলে চোখ যা দেখলে মনে হয় এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। কিংবা এক্ষুণি সে কান্না শেষ করেছে। আমার মনে হতে লাগল—এ রকম এক জোড়া চোখ যেন কার মুখে দেখেছি। মনের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলুম—কোথায় কোথায় কোথায় দেখেছি এ চোখ? কোন সে নারী যে তার ছলছল চোখ দুটি আমার স্মৃতিমঞ্জুষায় জমা রেখে আত্মগোপন করেছে? আমার জাগ্রত মন অচেতন লোকে তার দিশা খুঁজতে লাগল তাকে। সে কি মীনাক্ষীর মন্দিরে অথবা কন্যাকুমারীর মন্দিরের অলিন্দে—কোথায় দেখেছি এ চোখ? সে কি তক্ষশিলার পথে না কি আনারকলির সমাধি মন্দিরে?—কিছুতেই সেই পলাতকার সন্ধান পেলুম না। শেষকালে বললুম তোমার মাকে ডাকো না?

সে ধাক্কা দিয়ে মাকে ডেকে তুললে। মা কপট নিদ্রায় পড়েছিল তবুও এমনভাবে উঠল যেন সেই ধাক্কাতেই উঠল। রুগ্নার প্রতি ইশারা ক'রে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ওর কি হয়েছে?

—ওর ক্ষয় রোগ হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তার ব'লে দিয়েছে—ও আর বাঁচবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—ও কি খায়?

সে বললে—কি আর খাবে! আমরা যা খাই তাই খায়। আজ দু'দিন আমাদের কিছু জোটে নি, ওর মুখেও কিছু দিতে পারিনি। আজ সকালে বকুল চারটে পয়সা এনেছিল—তাই দিয়ে এক কাপ চা এনে আমরা দু'জন খেয়েছিলুম। ওর মুখেও একটু দিয়েছিলুম—কিন্তু গিলতে পারলে না—কষ দিয়ে গড়িয়ে গেল।

এতখানি বলে সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে সে একটু হুঁ শব্দ করলে। তার মাথার চুল কিছু পাকা কিছু লাল আর কিছু কালো। নিষ্করুণ দারিদ্র্যের ছাপ তার মুখে দগদগ করছে। কিন্তু আশ্চর্য তার চোখ দুটি। কন্যা বকুলের মত ছলছলে ভাব—তবে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। আমার মন আবার ছুটল সে পলাতকার সন্ধানে—কোথায় কার মুখে দেখেছি সেই চোখ? সেও আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সেই দুটি অদ্ভুত চোখে।

হঠাৎ বিস্মৃতি টুটে গেল। সেই কপাল ও চোয়াল-বারকরা স্ত্রীলোকের মুখের ওপরে ফুটে উঠল আর একটি ছোট্ট বালিকার মুখ। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—দেখ ঐ মাণিকতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে চৌধুরীদের বড় বাড়ী আছে না—ছেলেবেলায় তুমি কি সেখানে সকালবেলায় ফুল কুড়োতে আসতে?

অভিভূতের মত অতি ক্ষীণ স্বরে সে বললে—হাঁ।

—আচ্ছা, আমার মুখ মনে পড়ে?

সে ঘাড় নেড়ে জানলে—হ্যাঁ, মনে পড়ে।

—তোমাকে আমরা কি একটা নাম ধ'রে ডাকতুম?

মন্ত্রমুগ্ধার মত ফিসফিস করে সে বলল—শিউলি।

—দেখ শিউলি, আজ অনেক রাত্রে সেই চৌধুরীদের বাড়ীর ধার দিয়ে আসছিলুম, আমরা যে গাছগুলোর তলায় ফুল কুড়োতুম তাদেরই কোনো বংশধর এই ফুলটি আমার হাত দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

শিউলি কিছুক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

(শেষাংশ ২৩৫ পৃষ্ঠায়)

১ যেহেতু বিধাতা ২ কতিপয় ৩ রুদ্রপ্রসাদ

মনীশ ঘটক

[১]

ফোটে ফুল, ফলে ফল। ঋতু পরিক্রমা
বাৎসরিক খতিয়ানে সব করে জমা।
দেনা বেশী হলে দিতে হয় ওয়াশীল
নতুবা মেলে না রেওয়া, থাকে গরমিল।
বিধাতা বেজায় কড়া হিসাবনবীশ,
লেখনী উঁচিয়ে জেগে আছে অহর্নিশ।
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, ধর্ষণ ভয়াল,
অশাসন, কুশাসন, ক্রুর করজাল,
বসুধার মর্মলোহু করিয়া শোষণ
দীনা ভিখারিণী বেশ করায় ধারণ।
বিধাতার মুক্তি নাই। ভ্রূকুঞ্চিত ভাল,
মসী ও লেখনীযোগে খাতা করে জাল।
সন্তান সন্ততি যার বিশ্বচরাচর,
কারে ফেলে কারে রাখে? মেলে না
উত্তর।

[২]

অগঠিত অবয়বে প্রাণ সঞ্চারিয়া
কেন কর্মময় বিশ্বে দিলে পাঠাইয়া
কতিপয় নরবেশী জীবে, হে বিধাতা!
অপুষ্ট মস্তিষ্কপূর্ণ অকর্মণ্য মাথা
উদ্ভট কল্পনা ভরা—করি সঞ্চালন
অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরে করে যথেচ্ছ তাড়ন।
নিষ্ঠা, সংকল্পের বেদী শূন্য বেবাক,
কষ্টসহিষ্ণুতা স্থানে ঘৃণ্য দেমাক.
মজ্জাহীন অস্থি, মেরুদণ্ড নড়বড়ে
কানা চোখ, ঠসা কান, জ্ঞান নাই ধড়ে।
সমর্থের সাথে ব্যর্থ প্রতিযোগিতায়
পরাজয় স্থির জানি কে তারে পাঠায়?
পুঁয়ে পাওয়া স্বাধীনতা চাপাইয়া
ঘাড়ে
শুধু বিদ্রুপের পাত্র করি দিলে
তারে॥

[৩]

শাঠ্যের সমাপ্তি আত্মঘাতে।
শঠ যে সে
আপনারে আপনি ঠকায়। স্মিত হেসে
দেশলক্ষ্মী তার তরে খোলে না দুয়ার
কোনো জয়স্তম্ভ 'পরে। অপ্রত্যয়ভার
জগদ্দল শিলাসম রোধ করে শ্বাস,
ভীরু বুকে জাগে ধীরে আত্ম
অবিশ্বাস।
আশা যেথা মায়া মরীচিকা, যেথা প্রাণ
নিজেরে নিঃশেষ করি' হয় ব্যর্থকাম;
একের বীরত্ব যেথা অরণ্যে রোদন,
প্রয়াসের পুরস্কার পরুষ পীড়ন,
মেধা ও মস্তিষ্ক যেথা হীন ক্রীতদাস,
সেথায় অসহ্য বাক-চাতুরী-বিন্যাস।
ক্ষীণ ক্ষমা নহে সেথা। রুদ্রের কৃপাণ
যেন ঝলে খরতেজে, আনিতে কল্যাণ॥

গল্প নেই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

না, অহিভূষণ আমার কোন গল্পে নেই। তাকে ঢেকে-ঢুকে সাজিয়ে-গুছিয়েও কোন গল্পে কখনো ব্যবহার করিনি।

সাধারণতঃ সাহিত্যিক যাঁরা হন তাঁদের সম্বন্ধে এবিষয়ে যে সুনাম বা বদনাম আছে তার মূলে কিছুটা সত্য বর্তমান। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকেই ঢেলে সেজে তাঁদের গল্প, উপন্যাস যে লিখবেন এটা ত স্বাভাবিক কিন্তু কখনো কখনো গোটা মানুষকেই নামটুকু শুধু পাল্টে তাঁরা কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেন।

অহিভূষণকে তা আমি কখনো করিনি ত বটেই তার ছায়াও কোথাও আমার গল্পে পড়েছে বলে মনে করতে পারছি না।

কারণ অহিভূষণের কোন ছায়া বুঝি নেই। সে সবটাই কায়া। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

স্কুলে কোন ক্লাসে তার সঙ্গে পরিচয় হয় ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার কায়াটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সেইটুকুই মনে ছিল।

বিরাট বিশাল কায়া সেই বয়সেই। একেবারে শেষের বেঞ্চিতে বসত। আর কেউ তার সঙ্গে বসতে সহজে রাজী হ'ত না বেঞ্চি ভেঙে পড়বার ভয়ে।

পেছনে বসলেও উপত্যকার সীমান্তে পাহাড়ের মত শান্ত ক্লাসটা সে যেন জুড়ে থাকত।

কিন্তু পাহাড় সে শুধু চেহারায় নয় তেমনি নীরব নির্বিকার এবং বুদ্ধি-শুদ্ধিতে প্রায় নিরেট।

একটা নীল রঙের বোতাম ছেঁড়া সার্ট আর একটা হাঁটুর নীচে সামান্য একটু নামা খাটো ধুতি পরে পায়ে একজোড়া নৌকোর মত ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো এঁটে সাধারণতঃ সে ইস্কুলে আসত। এসে প্রায় নীরবে শেষের বেঞ্চিতে বসে থাকত।

সহপাঠীরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপে খেপানোর চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত হয়রাণ হয়ে হার মেনেছিল। মাষ্টার মশাইরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে বিদ্যাদানের ব্যাপারে।

আমাদের ঠাট্টা ইয়ার্কিতে যেমন, মাষ্টারমশাইদের প্রশ্নে কি ধমকানিতে তেমনি সে কেমন একটু অসহায় করুণভাবে শুধু হাসত।

বেঞ্চির ওপর দাঁড় করাতে ভরসা না পেয়ে গোড়ায় গোড়ায় মাষ্টারমশাইরা তাকে নীল-ডাউন করিয়ে শাস্তি দিতে চেষ্টা করতেন। বিনা প্রতিবাদে সে-শাস্তি সে মেনে নিত কিন্তু ওই পুষ্টে কলাগাছের মত পা মুড়ে বেশীক্ষণ নীলডাউন হয়ে থাকতে পারত না। মেঝের ওপর বসে পড়ত। তখন তাকে ক্রেন দিয়ে ছাড়া তুলে বসান মাষ্টারমশাইদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শেষে সবাই তাকে একরকম ভুলেই থাকত।

ক্লাস থেকে ক্লাসে ওঠার চড়াই-এর পথে কিছুদূর পর্যন্ত কোনমতে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে আমাদের পিছনে উঠে আর সে পারেনি। একদিন পিছিয়ে পড়ে কখন আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে আমরা খেয়ালও করিনি।

অহিভূষণের কথা প্রায় ভুলেই গেছলাম। নামটাও ভালো মনে ছিল না। ছেলেবেলার অনেক বন্ধুর সঙ্গেই জীবনে আর দেখা হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। অহিভূষণের কথা মনেও পড়েনি কখনও।

সেই অহিভূষণের সঙ্গেই হঠাৎ আকস্মিক ভাবে একদিন দেখা হয়ে গেল বছর পাঁচেক আগে।

দেখা হ'ত না যদি সেই আমায় চিনে ডাকিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা না করত। আমি তাকে সত্যি কথা বলতে গেলে দেখার পরও চিনতে পারিনি।

তমলুকে যাবার পথে পাঁশকুড়ো স্টেশনে নেমে অপেক্ষা করছিলাম। বর্ষাকাল। আগের রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার জন্যে তমলুক থেকে যে গাড়ি আসবার কথা ছিল তা তখনো এসে পৌঁছায়নি।

ওয়েটিং রুম তেমন সুবিধের নয়। বাইরে পায়চারি করতে করতে প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একটা জটলা চোখে পড়েছিল। সাধারণ গ্রাম্য লোকেরই ভীড়। দু-একজন শহুরে পোষাক পরা লোকও তাদের মধ্যে আছেন। সবাই মিলে কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যস্ত মনে হল।

যাঁরা সসম্ভ্রমে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের ভিড়েই বিশেষ ব্যক্তিটিকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তেমন কৌতূহলও কিছু ছিল না। পাপী-তাপীদের উদ্ধার করতে যাঁরা কৃপা করে নরদেহ ধারণ করে এখানে সেখানে হঠাৎ দেখা দিচ্ছেন তাঁদেরই কেউ হবেন নিশ্চয়। উদ্ধার পাওয়া সম্বন্ধে নিজের একটা অহেতুক ভীতি আছে বলে উদ্যোগী হয়ে দেখবার চেষ্টাও করিনি।

তবু তাঁর সাক্ষাৎ লাভ থেকে বঞ্চিত হলাম না।

প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করে ক্লান্ত হয়ে একটি বেঞ্চিতে বসতে যাচ্ছি এমন সময় শহুরে পোষাকের এক ভদ্রলোক কাছে এসে স্মিতহাস্যে বিনীত নমস্কার জানিয়ে বললেন—কিছু যদি মনে না করেন, আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

ভদ্রলোকের নিবেদনের ভুল অর্থ করে উৎসুক হয়ে বললাম—গাড়ি এসেছে তাহলে?

আজ্ঞে গাড়ির কথা ত কিছু জানি না!—ভদ্রলোকটি একটু বিস্মিত মনে হ'ল।

নিজের অধৈর্যটা গলার স্বরে তেমন গোপন করবার চেষ্টা না করেই বললাম,—তাহলে কোথায় যেতে বলছেন?

আজ্ঞে আমাদের ঠাকুরভাই-এর কাছে। উনিই স্মরণ করেছেন।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর নিবেদনের এই ভঙ্গি ও ভাষায় মেজাজটা বিগড়ে গেল।

স্পষ্ট বিদ্রূপের স্বরেই বললাম—কে আপনাদের ঠাকুরভাই? আমার প্রীতি-ই বা এ অনুগ্রহ কেন?

একটু আলাপ করতে চান শুধু। ভক্তপ্রবর বিনয়ের অবতার হয়ে জানালেন,—আসুন না—নিজের চোখেই দেখতে পাবেন তিনি কে?

বলার ধরনে মনে হয় নিজের চোখে তাঁকে দেখতে পাওয়াও পরম পুণ্যফলে ছাড়া হয় না। রূঢ়ভাবে অসম্মতি জানাতে গিয়েও নিজেকে কিন্তু সংবরণ করলাম মনে মনে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই।

মুখে বললাম—চলুন, আপনাদের ঠাকুর-ভাইকে দেখে কৃতার্থ হই।

গিয়ে দেখলাম আমার অনুমান ভ্রান্ত নয়। ঠাকুরভাই পাপী-তাপীদের ত্রাতা একজন সাধুপুরুষই বটে।

চেহারাটা ভূমিকার সঙ্গে মানানসই। বয়সে প্রৌঢ় হলেও দেহটি শাঁসেজলে বেশ নধর-চিক্কণ। জটাজুট নয়, চাঁচর সুবিন্যস্ত চুল কাঁধ পর্যন্ত নামানো। দাড়ি গোঁফ আছে কিন্তু বাহুল্য নেই। গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবী চাদর সবই গৈরিকে ছোপানো। প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটি কাষ্ঠাসনে ভক্তবৃন্দকে নিয়ে বসেছেন কলকাতা যাবার গাড়ির অপেক্ষায়।

ভক্তটি ভিড় ঠেলে আমায় ভেতরে হাজির করতেই সহাস্যে ঠাকুরভাই আমায় অভ্যর্থনা করে বললেন—আসুন আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।

প্রথম যে আঘাতটা দেব বলে তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম সেটা 'আপনি' বলে সম্বোধন করায় ভেস্তে গেল। সাধারণতঃ এঁরা তুমি কি তুই বলে ডেকেই সকলকে কৃতার্থ করেন। ঠিক করেছিলাম সেরকম কিছু করলে পাল্টা সেই সম্বোধনেই জবাব দেব। সে সুযোগ পেলাম না। তবু কণ্ঠে কোন রকম মিষ্টতা না রেখে বললাম—শুনে বাধিত হ'তে পারলাম না। আপনার সঙ্গে কোনদিন পরিচয় হয়েছে ব'লে'ত মনে করতে পারছি না।

ভক্ত অনুরাগীরা বেশ সচকিত চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু ঠাকুরভাই একটু হাসলেন। বললেন,—পরিচয় না হয়ে থাকলে কি নতুন করে হ'তে নেই। যাকে জানি না তাকেও জানব বলেই ত বেঁচে থাকা!

বুঝলাম—ঠাকুরভাই যে গভীর জলে ফেরেন সেখানে হাত-ছিপের সুতো পোঁছোয় না।

তবু গলার স্বর না বদলেই বললাম—কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় করে লাভ কি! আপনাদের রাস্তা আমার নয়।

তাহলে'ত আরো বেশী করে পরিচয় দরকার। কিন্তু সত্যিই খুব আমাদের তফাৎ আছে কি? আপনারাও যা নেই তা বানান, আমরাও হয়ত তাই। আপনারাও কথা সাজান, আমরাও।

ঠাকুরভাই হাসতে লাগলেন।

ওই হাসিতেই আরো গা জ্বলে গেল। বেশ তিক্ত স্বরেই বললাম—হ্যাঁ আমরাও কথা সাজাই কিন্তু ফাঁকি দিয়ে মানুষের মাথায় হাত বুলোতে নয়।

ঠাকুরভাই এবার হাসলেন না। কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললেন,—তাই হবে হয়ত!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—আমার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে না থাক, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে নিশ্চয় আপত্তি নেই। তার কথাতেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি!

বন্ধু ঃ কে বন্ধু? এখানে বন্ধু আমার কেউ নেই!

উদ্ধতভাবেই ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম!

গাড়ি তখনো এসে পৌঁছোয়নি।

বিরক্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর আর একটু পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

সামনে ছোটখাট একটি মাংসের ঢিবি দাঁড়িয়ে। গায়ে জামা নেই পরনে খাটো ধুতি মাথা মোড়ানো জালার মত একটি মুখে সংকুচিত একটু হাসি।

আমি অহি ঃ কুণ্ঠিতভাবে কিম্ভূতকিমাকার মানুষটা জানাল।

অহি!—আমার মুখে বিরক্তির ভ্রূকুটি। অন্য কেউ হলে হয়ত বলতাম, আমি নকুল নই। কিন্তু এই গোবেচারী মাংসপিণ্ডকে তা বলা বিদ্রূপের অপব্যয়।

অহি-ই আবার বললে—আমি তোমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম। সেই সেভেন্থ ক্লাসে।

এক মুহূর্তে স্মৃতিটা ফিরে এল। পেছনের বেঞ্চিতে বসা সেই জগদ্দল পাহাড়।

তুই বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে বললাম—তুমি এখানে! কি করো?

ওই ঠাকুরভাই-এর সঙ্গে থাকি। ওঁর সেবা করি!—অহি সলজ্জভাবে জানালে।

ওই ঠাকুরভাই-এর সেবা করো, মানে ওঁর চাকর, বিনা মাইনের!—সময়ে গাড়ি না আসার ঝাঁঝটা বুঝি এইভাবেই ঝাড় করলাম—ওই ভণ্ড নচ্ছরটার!

অহি কিন্তু রাগ করল না। আগের মতই কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বললে—কে ভণ্ড কে ভালো, চিনব আমার কি সে বুদ্ধি আছে? সে তোমরা পারো।

ধক্ করে কোথায় যেন একটা ধাক্কা খেলাম। সেটাকে অগ্রাহ্য করে গলায় জ্বালা মিশিয়ে বললাম,—কতদিন ধরে এ গোলামী জুটেছে?

তা অনেক দিন। গোলামী ত কারুর না কারুর সবাই করে। আমায় গোলামীই বা দেবে কে!

এ কথার ঠিক জবাব না পেয়ে বললাম,—উনি তো ভক্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙেন, আর তুমি বুঝি কোয়া ছাড়িয়ে ওঁর মুখে দাও?

কথাটা বলেই বুঝলাম মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

অহি কেমন হতভম্ব হয়ে খানিক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, ওসব বুঝি না ভাই। ঠাকুরভাইএর কথাও বুঝি না। কিন্তু তবু ত মিষ্টি কথা বলেন। মিষ্টি কথাও যে কেউ বলে না।

এতগুলো কথা কোনরকমে গুছিয়ে বলে অহি নিজেই যেন কেমন অপ্রস্তুত।

একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম,—তুমি তাহলে খুশি-ই আছ?

হ্যাঁ ভাই! —অহির জালার মত মুখ অকৃত্রিম খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—বুদ্ধি-শুদ্ধি ত আমার নেই জানো। তবু কি করে জানি না খুশি থাকি!

বলা উচিত ছিল,—আহাম্মকের খুশি। কিন্তু মনে মনেও তা বলতে পারলাম না কেন কে জানে।

ইতিমধ্যে গাড়ি আসার খবর এসে পৌঁছল। অহির কাছে কোনরকমে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে যেতে যেতে বিকেলের বক্তৃতাটা মনে মনে কিছুতেই ভালো করে ভাঁজতে পারলাম না।

অহিভূষণের সঙ্গে দেখা হওয়াটা মনের কোন খোপে ফেলব ঠিক করতে না, পারাতেই বোধহয় এই অস্বস্তি।

বোবা । বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঈশ্বর! সত্যই যদি থাকতে তুমি! প্রার্থনা আমার
একমাত্র ছিল প্রভু ঃ মানুষ জাতকে করো বোবা,
(বোবারাই স্বভাবতঃ কালা হয়) শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বার
রুদ্ধ করো। ঘৃণাভরে 'রাম! রাম!'
কিম্বা 'তোবা! তোবা!'
বলবে না মানুষ কারো ভাষা শুনে। প্রাদেশিকতার
অবসানে। প্রার্থনায় ব্রহ্ম, আল্লা, গড্ বা জিহোবা,
কোনো নাম, কোনো শব্দ নরকণ্ঠে হবে না সোচ্চার।
রাষ্ট্ররথে কিম্বা পথে শান্তি পাবে নেহেরু, বিনোবা॥

ঈশ্বর বললেন ঃ বৎস, প্রার্থনাটা মন্দ নয়! আমি
থাকি বা না-থাকি, মূক বধির ভারত যদি হয়—
শান্তি কি আসবেই তা'তে? প্রগতির গতি অগ্রগামী
হবে কি নির্বাক দেশে? সম্পত্তি ও চাকরীতে সংশয়
থেকে যাবে সংহতির। শ্রেণীদ্বন্দ্বে রাষ্ট্র-উচ্চৈঃশ্রবা
লাফাবেই। আপাততঃ আপোষে সবাই হও বোবা।

নিরাপদবাবু চল্লিশ বছর হাওড়ার রেল অফিসে চাকুরী করে অবসর নিচ্ছেন, তাঁকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে পাড়ার হাই স্কুলে সভার আয়োজন হয়েছে। দিনটা রবিবার, সময়টা সন্ধ্যা, কাজেই লোকের অভাব হয়নি, তা প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন সভ্য সমাগম হয়েছে। পাশের বারান্দায় নিরাপদবাবু ধুতি-চাদর প'রে সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ করছেন, ডাক পড়লেই ভিতরে যাবেন। ঐ আলাপের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে সভ্যসংখ্যা দেখে নিচ্ছেন, কে, কে এলো। নাঃ মুস্তোফিটা নিশ্চয় আসবে না, ওকে ডিঙিয়ে উচ্চতর পদে গিয়েছিলাম। হাঁ, মৌলিক এসেছে দেখছি—লোকটি বরাবর আমার বশংবদ। ভালো দেখে একটি মালার আয়োজন নিশ্চয়ই হ'য়েছে, আর উপহারও কিছু দেবে বই কি, আর কিছু না হোক ধুতি-চাদর। অবশ্য গরদের জোড় প্রত্যাশা করা কিছু নয়—দুর্মূল্যের বাজার। আর মানপত্র। কে লিখেছে? মুখুজ্জ্যে লেখে তো ভালো হয়—ছোকরার হাত ভালো, হাতের অক্ষরও সুদৃশ্য—ধর্মঘটের দিনে দেয়ালপত্রগুলো তো ঐ লেখে। এই রকম অনেক সময়োচিত চিন্তার স্রোত বইছিল তাঁর মনের মধ্যে। এমন সময় দু'জন প্রধান সভ্য এসে তাঁকে সবিনয়ে ভিতরে আসতে অনুরোধ করলো। সময় হ'য়েছে নাকি বলে চমকে উঠে তিনি বললেন—চলো তা হলে। ভাবটা যেন তিনি এ সব বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন কেবল কর্তব্যের খাতিরেই।

পাঁচটার সভা যথা সময়ে সাতটায় আরম্ভ হ'ল। অফিসে নিরাপদবাবুর পদে নূতন আসীন গুপ্তবাবু সভাপতি, হাইস্কুলের হেড মাষ্টার প্রধান অতিথি (ঐ সর্তের ইঙ্গিতেই তিনি স্কুল ঘরটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন)। বাঙালীর সভা প্রায় নিখুঁত হয় না। প্রথমেই মাইকটি বিকল হ'য়ে গেল। অনেক চেষ্টাতেও যখন সারানো সম্ভব হ'ল না তখন সেটাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে খাড়া রেখে বক্তৃতা চললো। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যেহেতু চল্লিশজনের মহতী সভায় মাইকের প্রয়োজন হয় না। তারপরে মাল্যদানের সময়ে আবার গোলযোগ। একটি মালা তিনটি উদ্গ্রীব কণ্ঠ। যাই হোক সে সমস্যাও চুকে গেল, কেন না, নিরাপদবাবুর কণ্ঠটি বেঢপ লম্বা, অফিসে আড়ালে তাঁকে জিরাফ বলতো, তিনি গলা বাড়িয়ে দিয়ে নেকে জিতে মালাটি কণ্ঠস্থ করলেন। তারপরে উদ্বোধন সংগীত। তাতেও গোলমাল। সভ্যদের মধ্যে যাঁরা গাইয়ে তাঁদের পুঁজি Pool করে দেখা গেল একটি মাত্র গানই সম্বল— 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে।' কাজেই ঐ অনিবার্য রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হল। ভূতপূর্ব ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের পুরাতন ছবির ফ্রেমে নূতন বাঁধানো মানপত্র পঠিত হ'ল। হে দরদী বন্ধু, হে বিদায়ী সুহৃদ,

হে পূর্ব রেলপথের হাওড়া অফিসের মহা-করণিক, ইত্যাদি বয়ানে এক-একটি প্যারাগ্রাফ—নিরাপদবাবুর সত্য, আনুমানিক ও কল্পিত গুণে পূর্ণ। আমরা সভার দীর্ঘ ক্লান্তিকর বর্ণনার পুনরুক্তি করতে চাইনে, যে হেতু সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করেছেন। কেবল সভাপতি, প্রধান অতিথি ও নিরাপদবাবুর বক্তৃতার দু-চারটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করেই কর্তব্য সমাপন করবো।

প্রধান অতিথি হেড মাষ্টার মহাশয় অনুপস্থিত ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, হে ছাত্রগণ, সততা ও অধ্যবসায়ে যে কত উন্নতি সম্ভব তার মহৎ দৃষ্টান্ত নিরাপদবাবু। তিনি কুড়ি টাকা বেতনে চাকরী জীবন সুরু ক'রে আফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলংকৃত করেছেন। অতএব হে ছাত্রগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতির বক্তৃতা। তিনি মানপত্রখানি তুলে ধরে বললেন—দেশ স্বাধীন হয়েছে ব'লেই এমন সম্ভব হল—নতুবা সম্রাটের ছবি খুলে ফেলে সেই ফ্রেমে নিরাপদবাবুর মানপত্র বাঁধানো কি সম্ভব হ'তো। (করতালি)।

অবশেষে নিরাপদবাবু বললেন,—বন্ধুগণ চল্লিশ বৎসর আপনাদের মধ্যে বাস ক'রে আপনাদের ছেড়ে যেতে মন সরছে না। তবু যে যাচ্ছি তার কারণ জন্মগ্রামে ফিরে গিয়ে, জন্মগ্রামের সেবা করে বাকী জীবনটুকু কাটাবো। গ্রাম সেবাই দেশ সেবা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, জাতির জনক গান্ধীজী সকলেই এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

সভান্তে হাল্কা জলযোগের ব্যবস্থা ছিল—তারপরে যে যার ঘরে প্রস্থান করলেন। তার পরদিন সাতটা কুড়ির লোকালে নিরাপদবাবু মোটঘাট নিয়ে জন্মগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে গেলেন।

নিরাপদবাবু একজন আদর্শবাদী ব্যক্তি। তিনি বাল্যকালে ভোরবেলায় ছোলা ভিজা ও আদা খেয়ে ডন কুস্তি করেছেন, ভক্তিযোগ পড়েছেন; যৌবনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধ মুখস্থ করেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন, সরকারী চাকরে হওয়া সত্ত্বেও গোপনে চরখা কেটেছেন এবং গান্ধীজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পড়েছেন। আর এই সবের প্রভাবে আবিষ্কার করেছেন যে ভারতবর্ষ মানেই গ্রাম, আর গ্রামের সেবা মানেই দেশের সেবা। কিন্তু সে পক্ষে একমাত্র অন্তরায় গ্রামে তাঁর বাড়ী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে যাওয়ার উপায় তাঁর নাই, সহরের যূপকাষ্ঠে তিনি গলবদ্ধ রজ্জু। অবশ্য ছুটি-ছাটায় মাঝে মাঝে তিনি গ্রামে গিয়েছেন, গ্রামের সমস্যাগুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আর চলে আসবার পরেই গ্রামের লোকে বলেছে বাঁচা গেল, যত সব......। তিনি তাদের ভরসা দিয়েছেন যে অবসর নিয়েই গ্রামে স্থায়ীভাবে এসে বসবেন। ঘোরতর আদর্শবাদী না হয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাস্তববাদী হলে লক্ষ্য করতেন যে তাঁর এই আশ্বাস বাক্যে কারো মুখে আনন্দের লক্ষণ দেখা দেয়নি—বরঞ্চ হয় তো উল্টোটাই দেখা গিয়েছে। আজ তাঁর জীবনের ও তাঁর গ্রাম নোয়াপুরের জীবনের সেই শুভ দিন। নিরাপদবাবু গ্রামে স্থায়ীভাবে ফিরে আসছেন।

যে-লোকটা

অজিত দত্ত

যে-লোকটা বলেছিল, 'এদিকে গেলেই
পাবে ঠিক পথের নিশানা'—
নিজেই সে দেখি পথে পথে ঘুরে মরে
সব পথ-কানা।
কত গলিঘুঁজি ঘুরে বর্ষায় রোদ্দুরে,
সব দ্বার, সব জানালায় চিহ্ন রেখে
ভেবেছে সে, একদিন জলে ভিজে
রোদে তেতে পুড়ে,
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে ঘুরে-মরা
থেকে।
এখন ঘুমের ক্লান্তি পায়ে তার
শিকলের মতো,
তাপে ও তৃষ্ণায় তার দুটি চোখ
যেন পোড়া মাটি,
এখন সে সারাদিন খুঁজে ফেরে
গলিঘুঁজি যত,
কিছুতে পায়না খুঁজে নিজেরি
ঘরের ঠিকানাটি।
যে-লোকটা বলেছিল, 'দেখেছি অনেক,
অনেক জেনেছি, জানি, বলে দিই
যার দরকার।
এখন নিজেই দেখি নিয়েছে সে
ভিখিরির ভেক,
কেবলি সুধায়, 'জানো, আমি কার?
আমি কোথাকার?'

—

দিন আগে বাল্যবন্ধু নিতাইকে কিছু পাঠিয়েছিল বাড়ী-ঘরগুলো যেন মেরামত রাখে। বলা বাহুল্য টাকা পেয়েই নিতাই র দাদন করলো, আসুক তখন দেখা যাবে। দবাবু রেলে কাজ ক'রে শিক্ষা পেয়েছিলেন রেলগাড়ী ঠিক সময়ে চলে না। সেই ত্রুটি নিজ আচরণে সংশোধন ক'রে নিয়েছিলেন। ত তাঁর আনাগোনা। গ্রামবাসিগণের সমবেত সমূলে ধ্বংস করে যথা সময়ে তিনি গ্রামে উপস্থিত হলেন।

নতাই প্রথমে তাকে দেখতে পেলো, আনন্দের ণয্যে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে এসো, আমরা সবাই তোমার অপেক্ষায় া। তারপর এবারে স্থায়ীভাবে এলে তো! হ্ তো অনেক দেখছি—স্থায়ী বলেই তো হচ্ছে। যাক এবারে একটা নির্ভর করবার লোক পাওয়া গেল। যে দিন-কাল পড়েছে, ্ই তো পারছ।

নতাই ভাই বাড়ী-ঘরগুলো মেরামত করা ্ তো।

নশ্চয়, নিশ্চয়, দেখবে চলো।

াড়ী-ঘরের জীর্ণ দশা লক্ষ্য ক'রে নিরাপদ- বললেন,—এ যে সমস্তই ভাঙ্গাচোরা।

মাগে আরো বেশী ছিল, তবু তো এখন ক সাব্যস্ত হয়েছে। তা ছাড়া কীই বা য়েছিলো—আর কীই বা করবো। খড়, কাঠ, সবই মাগ্গি। সব শালা চোর, মন্ত্রী থেকে অবধি সব শালা চোর—কি আর বলবো. র তো অজানা কিছুই নেই।

না হয় নিজে থেকে আর কিছু খরচ করতে দিতাম।

করেছি বই কি! তাতেও এই দশা। তা যখন দিয়ো, না পারো না দিয়ো। তোমার কাছে ফিরে চাইবো না. তুমি তো এখন গাঁয়ের উৎসর্গীকৃত জীবনী। শেষের ঐ শব্দ সে শিখেছে তার ছোট ছেলের গান্ধীজী ন্ধ লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের আবাল- বনিতা বুঝে নিল যে একটি শাঁসালো র আবির্ভাব ঘটেছে, এখন নিজ নিজ জন অনুসারে দোহন ক'রে নিলেই হয়।

গ্রামের বারোয়ারী পুজোর চাঁদা আদায় ক্ষে ছেলের দল আসতেই নিরাপদবাবু ন্দ দশ টাকা নগদ বের ক'রে দিলেন, আর রে বারোয়ারী উৎসবের প্রয়োজন ব্যাখ্যা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলেন। ছেলেরা , স্যার এখন যাই, পরে সময় মতো এসে বা।

নিরাপদবাবু বললেন, বেশ তো আজ সন্ধ্যা- তে এখানে এসো। কেমন আসবে তো সব। আসবো বলে তারা সবেগে প্রস্থান করলো। কথায় দশ টাকা চাঁদা পাওয়ার বিস্ময় তাদের রে ভিতরে ঠেলা মারছিল।

তাদের অভিজ্ঞতা এই যে আট আনা চাঁদা য় করতে হ'লে দশবার হাঁটাহাঁটি করতে হয় াড়া অনুরোধ উপরোধ, কাকুতি মিনতি তো ই। আর এখানে কিনা এক কথায় নগদ টাকা, তারা স্থির করলো—লোকটা যেমন তেমনি নির্বোধ।

পটলা বলল,— লোকটার নিশ্চয় অনেক টাকা, । বয়সে সকলের ছোট, সে বলল, টাকা লেই হয় না, টাকা তো কেদার মহাজনেরও আছে। বোকা হওয়া চাই। টাকা আর বোকায় মিললে তবে তো লোকের ছ্হুল-বহুল।

তার বক্তব্যে সকলে অভিভূত হয়ে গেল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চিত্ত বালক।

বলা বাহুল্য বারোয়ারী পুজোর সার্থকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবার জন্যে কেউ এলো না নিরাপদবাবুর বাড়ীতে। তৈরী বক্তৃতা গলাধঃ- করণ ক'রে তিনি শুয়ে পড়লেন, শুয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত করলেন আমাদের গ্রামগুলোতে শুভেচ্ছা যথেষ্ট আছে কেবল উদ্যম কিছু কম। শীঘ্রই সে ভুলও ভাঙ্গলো। গ্রামে উদ্যমের সাড়াও কম নয়, তবে সব সময়ে তেমন উপলক্ষ্য জোটে না বলেই প্রমাণ পাওয়া যায় না, মনে হয় সব নিরুদ্যম।

ইতিমধ্যে কেদার মহাজনের গদী থেকে হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল। কেদার হাজার অঙ্কটাকে ফাঁপিয়ে দশ হাজার ক'রে থানায় গিয়ে ডায়েরী করলো আর গাঁয়ের ৫।৭ জন ছেলের নাম ক'রে এলো। দারোগা এসে গ্রেপ্তার ক'রে তাদের চালান দিল। এবারে মামলা। একদিন কেদার এসে নিরাপদর কাছে প্রস্তাব করলো যে আপনি যদি সাক্ষী দিতে রাজী হন যে ঐ ছেলে গুলোকে আমার গদীর কাছে সন্ধ্যাবেলায় যাতায়াত করতে দেখেছেন তবে বজ্জাতগুলোর সাজা হ'য়ে যায়—গাঁয়ে শান্তি আসে।

বিস্মিত নিরাপদ বলল—সে কি কথা মশাই?

কেদার বলল, কেন খারাপ কথাটাই বা কি? গাঁয়ে শান্তি আসুক এ কি আপনি চান না।

তা অবশ্যই চাই।

তবে না হয় দুটো কথা বানিয়েই বললেন, মিথ্যা বলতে তো আর অনুরোধ করছি না।

বানিয়ে বলা আর মিথ্যার মধ্যে যে এমন দুস্তর ব্যবধান তা এই প্রথম শুনলো নিরাপদ।

নিরাপদ বললেন নীতি বলে তো একটা কিছু আছে।

আছে বই কি। আমার ছেলের নাম নীতিশ মেয়ের নাম সুনীতিবালা, নাতিরা পড়ে নীতি মঞ্জরী, আমাকে নীতি কি শেখাবেন মশাই।

নিরাপদ চুপ করে থাকেন।

তবে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন না।

আচ্ছা দেখা যাবে। বলে চলে যায় কেদার মহাজন।

পরদিন দেখা দেয় বাল্য বন্ধু নিতাই, বলে, বড় বিপদেই পড়া গিয়েছে হে।

কে আবার বিপদ ঘটালো হে।

ঐ ক্যাপিটালিস্টটা—শালা কেদার! চুরির হাঙ্গামায় জড়িয়ে ধরিয়ে দিয়েছে ক'টা ছেলেকে হীরের টুকরো সব।

খুবই দুঃখের কথা বলেন, নিরাপদ।

এখন তুমি যদি ভাই বলো যে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়ীতে বসে কবিগুরু সম্বন্ধে বা জাতির জনক সম্বন্ধে, আলোচনা করছিল তা হ'লে ছেলেগুলো খালাস পেয়ে যায়।

নিরাপদ বলেন, সে কি ক'রে হয়—সত্য আছে তো?

আছে আর কই? সত্যকেও জড়িয়েছে।

না ভাই সত্যকে তোমরা জড়িয়ো না।

আরে আমরা আবার জড়ালাম কই, জড়ালো তো ঐ পুলিশে।

ভাই নিতাই আমি সে সত্যের কথা বলছি না।

নিতাই বলে আমরা তো এক সত্যকেই জানি, চিন্তাহরণের শালা। তা হলে তুমি পারবে না।

মিথ্যা বলতে পারবো না। আরে তুমি তো মিথ্যা বলছ না, কেবল কেদার বেটার মিথ্যাহ

(শেষাংশ ২৩২ পৃষ্ঠায়)

পাঁচমারি (ভ্রমণ)

প্রবোধকুমার সান্যাল

বিন্ধ্যগিরি শ্রেণী এবং সাতপুরার মাঝামাঝি অঞ্চলটায় আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য পরস্পরকে সেলাম ঠুকেছে। একদা অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যগিরি পেরিয়ে সেই যে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তিনি বোধ করি আজও ফেরেননি। তাঁর যাত্রার তিথি ছিল কোনও এককালের পঞ্জিকার পয়লা তারিখ!

সাতপুরার সর্বোচ্চ চূড়া ধূপগড়ের নীচে একটি ছোট্ট পার্বত্য শহরের একটি চায়ের দোকানে ব'সে মুক্তিস্বামী আমাকে স্থান কাল সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন। ডিসেম্বর শেষ হবার তখনও সপ্তাহখানেক বাকি।

মুক্তিস্বামী বললেন, মধ্যপ্রদেশের এখন আর সেদিন নেই! যে বনে কাঠুরিয়া আর কালো বাঘ ছাড়া ভিন্ন প্রাণীর দেখা পাওয়া যেত না—দেখে আসুন, সেই সব জঙ্গলের এখানে-ওখানে ইস্কুল-পাঠশালা বসে গেছে। মিশনারীরা গিয়ে ঢুকেছিল আদিবাসীদের আনাচে-কানাচে। খৃষ্টান করে ছেড়েছে হাজার হাজার পরিবার। এখন ওরা ধাক্কা খাচ্ছে এখানে-ওখানে। দেখে আসুন গে মধ্যভারতের নতুন চেহারা।

দোকানে রেডিয়ো বাজিয়ে গান হচ্ছিল। মুক্তিস্বামী তাঁর নিজের কাহিনী বলে যাচ্ছিলেন। গায়ের রং ঘন কালো, চোখ দুটোয় বুদ্ধির প্রখরতা। তাঁর পান-সিগারেট খাওয়ার ধুম দেখলে একটু খটকা লাগে। আমি প্রশ্ন করলুম, রামকৃষ্ণ মিশন আপনি ছাড়লেন কেন?

ছাড়িনি। শুধু বাঁধন কেটেছি!—স্বামীজী বললেন, নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ছাড়া আমার চলবে না! পান-সিগারেট? এ আমার বিদ্রোহের চিহ্ন। হ্যাঁ, আমি জানি আপনি অবাক হচ্ছেন—পরনে আমার কালাপাড় ধুতি ফেটা দিয়ে পরা গেরুয়া নেই, তাই আপনি অবাক, কেমন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে! মানে, দেখা অভ্যেস নেই কিনা—

স্বামীজী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরেকটি পানামা সিগারেট ধরালেন। পরে বললেন, শুনুন, এই আমার পরিচয় হোক—কিন্তু আমি [illegible]। ধর্ম নয়, গেরুয়া নয়, সন্ন্যাসের ষ্ট্যাম্পও নয়—মানি শুধু মানুষকে, যাদের কাজ করব। সেই কাজ মানুষের কল্যাণের!

কি প্রকার সেই কাজ? একটু আলোকপাত করুন।

বিনা কুণ্ঠায় স্বামীজী বললেন, রুগ্নের জন্য চিকিৎসা আর পথ্য এবং মূঢ় জনসাধারণকে শিক্ষাদান। আপনাদের শুভেচ্ছায় শুধু মধ্যপ্রদেশে আমি চল্লিশটি ইস্কুল বসিয়েছি। ডাঃ কাটজু আমাকে সাহায্য করেছেন যখন যা চেয়েছি! মন্ত্রীরা, পুলিশের কর্তারা কেউ আমাকে কখনও বিমুখ করেন না।— না, না, কথাটা ঠিক হল না! আমাকে বিমুখ করা যায় না!

কেন?—জিজ্ঞাসা করলুম।

আমি যে জাত-সন্ন্যাসি! না খেয়ে পথে প'ড়ে থাকব, এই আমার অহংকার!—মুক্তিস্বামী বললেন, অপমান ক'রে তাড়ালে স্বীকার করব না যে, আমি অপমানিত! আমি ত' মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেন্টের দয়া চাইনে, আমি চাই তাদের অন্নের উপর সাধারণের অধিকার! মন্ত্রী তার অন্নের ভাগ দিক্ একটি নিরন্ন কাঠুরিয়াকে,—সেইখানে আমার জোর। পুলিশ আমাকে অনেকবার ঠুকরেছে, কিন্তু আমি যে চরম অধিকারের জোর নিয়ে দাঁড়িয়ে! আমাকে মারো, যত পারো মারো, কিন্তু মানুষকে মারলে কিছুতেই সইব না। আমি যে তাদেরই লোক,—যারা ভাত-কাপড় না পেলে শুকিয়ে মরে!

হাসিমুখে বললুম, সত্যি সত্যি আপনি মার খেয়েছেন কখনও?

খাইনি?—পেয়ালা ছেড়ে প্রায় রুখে উঠলেন স্বামীজী এবং এতক্ষণ পরে ভালো ক'রে দেখলুম তাঁর মুখশ্রী! আরক্ত দুটো চোখ, কিন্তু সুন্দর। ঘন কালো মুখে টকটক করছে তাঁর পান-খাওয়া ঠোঁট। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য।

বললেন, খাইনি? বলছেন কি? হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওই তারা, যাদের জন্যে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরেছি। ব্ল্যাক-প্যান্থার বেরিয়েছে, ভয়ে গেছে রাত কাটিয়েছি। ভাতের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মাঠের ধারে ফেলে রেখে গেছে,—জানিনে বাঁচলুম কেমন ক'রে! মিশনারীরা গুণ্ডো লেলিয়ে দিয়েছে, বাইসন তাড়া করেছে,—কিন্তু হার মানিনি। কেন মানব? আমি যে তীরের ফলার মতন সোজা গিয়ে প্রাণের মধ্যে বিঁধতে জানি! বলুন, কে অস্বীকার করবে আমাকে? মার খেয়ে পিছিয়ে এলেই ত' মৃত্যু!

বেলা হয়ে যাচ্ছিল, এবার আমি উঠলুম। মুক্তিস্বামী বললেন, জায়গাটা বেশ। ঘুরে ঘুরে দেখবেন সব। আছেন কদিন?

এই দু'চারদিন।

লিখবেন কিছু নাকি এখানকার সম্বন্ধে?

আমি হেসে বেরিয়ে গেলুম।

ডিসেম্বরের শেষ। কিন্তু সাতপুরার এ[illegible] শহরে এবার শীত তেমন নেই। শহরটির নাম পাঁচমারি,—'পঞ্চমাঢ়ী', পাঁচটি গুহা। এই নামটি এসেছে এই উপত্যকার উপরিস্থিত পাঁচটি গুম্ফার থেকে। দূর প্রান্তরে একটি টিলা পাহাড় কেটে কবে কোন্ কালে কারা যেন পাঁচটি গুহা বানিয়েছিল, এটি আজও চলেছে পঞ্চ পাণ্ডবের নামে। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে বুঝি একবার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সনাতনীদের পর বোধ করি এটি কিছুকাল বৌদ্ধরা দখল করেছিলেন,—নাম রেখেছিলেন বৌদ্ধ বিহার। অর্থাৎ এই গুম্ফার পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনও তথ্যই নির্দিষ্ট নেই। সাধারণত যা হয়,—লোকশ্রুতির উপর এর নানা ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটি তথ্য কেবল পাওয়া যায় হাল আমলে, অর্থাৎ ইংরেজের শাসনকালে। আজ থেকে একশ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর পরোয়ানা নিয়ে ক্যাপ্টেন ফরসাইথ নামক একজন সামরিক কর্মচারী সাতপুরার আরণ্যক অধ্যুষিত বনময় গিরি শ্রেণীর মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকাটি আবিষ্কার করেন। পাঁচমারি উপত্যকা তখনকার আমল থেকেই মধ্যপ্রদেশের গোরা ছাউনিতে পরিণত হয়। আজও এটি মস্ত বড় ভারতীয় সৈন্যাবাস।

কৌতুকের বিষয় এই, এই উপত্যকার কোন কোনও খাদ্যসামগ্রী সামরিক বিভাগের দ্বারা

ন্বিত। একটু অবাক হয়েছিলুম এই কথা ন, যখন ছোট শহরটির প্রায় প্রত্যেক ানদার এই কথা জানাল, মাখন-পাঁউরুটি াদি সাধারণের জন্য নয়! খাঁটি দুধ, ডিম াদি প্রায় দুষ্প্রাপ্য। তাজা শাক-সব্জী, মাংস, প্রভৃতি যদি কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, তবেই ারণের ভাগে পড়ে। আমাদের রাষ্ট্রপতি ডাঃ ন্দ্র প্রসাদ যখন পাঁচমারির সুখ্যাতি করেন, ন সম্ভবত এটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়— । সুখ্যাতি শুনে স্বদেশী ও বিদেশী টকরা এই সুশ্রী উপত্যকাটি ভ্রমণ করার জন্য প্রাণিত হন।

দোকানে-দোকানে যখন ঘুরছিলুম তখন না একটি সুশ্রী যুবক কোথা থেকে যেন য়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, সে বাঙ্গালী। পরিমল। চেহারাটি ধবধবে, বলিষ্ঠ, কিন্তু না পোষাক। পরিমল পান খাচ্ছে প্রচুর। বহর তক আগে একখানি আয়নায় নিজের মুখখানি খ তার বিশ্বাস জন্মেছিল, বোম্বাই সিনেমার াতে হিরোর ভূমিকায় তাকে মানাবে ভাল! গিয়েও ছিল বোম্বাইতে। কিন্তু তাকে ফিরে নতে হয়েছিল কেন, কেনই বা সে কলকাতায় র ফেরেনি এবং কেনই বা সে এই পাঁচ-রতে সামান্য খাবারের দোকানের 'বয়' হয়ে বন কাটাচ্ছে, এটি তার কথাবার্তায় স্পষ্ট না!

পরিমলের সুদীর্ঘ আত্মকাহিনীর মধ্যে আমি কোথায় আমার নিজের প্রাচীন জীবনের ছায়া তে পেয়েছিলুম। তাকে সানন্দে তারিফ ছিলাম মনে মনে। এক সময় সোৎসাহে প্রশ্ন লুম, তুমি নিশ্চয় শুনো হাতে একদিন রায় পড়েছিলে, পরিমল?

এবার সে সলজ্জ কণ্ঠায় একটু ইতস্ততঃ ল। পরে মুখ তুলে বলল, আপনাকে লজ্জা র আর কি হবে? আমি পালিয়েই এসে-ছিলুম—!

বললুম বেশ ত—

পরিমল বলল, আমার কাছে ক্যাশ টাকা ছিল নেক। তা প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকার হাকাছি!

চায়ে চুমুক দিয়ে মহা খুশী হয়ে বললাম, না কি পরিমল? সেদিন তোমার সঙ্গে আমার থা হলে কি আনন্দ হত বলো ত'? আমার পাল!

পরিমলের এখন বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। বোধ করি সেইজনাই সে আমার বয়েস হা পাকা চুলের দিকে চকিতে একবার তাকাল। র সহাস্যে বলল, সে টাকা আমি দু হাতে ডয়েছি! বছর দেড়েকের মধ্যেই সব ফাঁকা! খ রাখিনি কিছু! তবে হ্যাঁ, ঠকিয়েও নিয়েছে উ কেউ। হাতে টাকা থাকলে কি কি পাওয়া য়, তা আমি দেখে নিয়েছি, স্যার।

এবার একটু হেসে বললাম, টাকাটা কি মার ক্যাশ থেকে না পেলে কোথাও থেকে?

সুন্দর রক্তহীন দাঁতগুলিতে পরিমল একটু হাসল। তারপর বলল, অত অল্প বয়সে আমি থায় অত টাকা পাব, স্যার? তবু ভাগ্যের জোরে পেয়ে গিয়েছিলুম! টাকাটা আমার এক সির—

কথাটা আর না বাড়ানই ভাল! পরিমল খিলি পান আবার মুখে গুঁজে বলল, মাদের দোকানের মালিক আমাকে খুব ভাল-বাসেন। ওঁরা মস্ত কারবারি এখানে। পাঁচ-মারিতে তিনখানা বড় বড় বাড়ি। আমি যখন যা চাই উনি দেন। চলুন, আমি আপনাকে সব জায়গায় নিয়ে যাব! এখানে সব আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

পরিমলের সঙ্গে তখন থেকে আমার খুব ভাব হয়ে গেল, এবং পাঁচমারির নানা অঞ্চলে আমার ভ্রমণের পক্ষে তার অকৃপণ সাহচর্য বিশেষ কাজে লেগেছিল। তাকে ছেড়ে আসতে ব্যথা পেয়েছিলুম।

দার্জিলিং বা মুসৌরী গেলে পথঘাটই জানিয়ে দেয় যে, ওরা পার্বত্য শহর। শিলঙে অতটা বোঝা যায় না, পাহাড়ী শহরে আছি কিনা। কিন্তু পাঁচমারির সমস্তটাই সমতল। সমুদ্র সমতা থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু,—কিন্তু আগা-গোড়া মসৃণ সমতল। দূর-দূরান্তর অবধি প্রান্তর, বড় বড় বাগান, স্কুল-কলেজের মাঠ, গোরা ছাউনির এক-একটি বিস্তৃত প্রান্তর,— অথচ বোঝবার যো নেই যে এটি পার্বতীয়। এমন জনবিরল, বন সৌন্দর্যময়, পাখী ডাকা এবং প্রজাপতি পতঙ্গভরা পাহাড়ী শহর অন্তত মধ্য ভারতের পক্ষে কল্পনাতীত।

ডাকবাংলাটির সামনে দিয়ে অর্ধ চন্দ্রাকার পথ চলে গিয়েছে নিরিবিলি মাঠের দিকে। এ যেন আপন মনের পথ! নিজের সঙ্গে কথা কইতে কইতে হাঁটো,—কেউ কোথাও নেই! কেউ কুশল প্রশ্ন করছে না, নমস্কার ঠুকে খেজো ধরণের আলাপ জমাতে চাইছে না,—অন্য রোগী-দেরও ভিড় নেই! আত্মগোপন করে থাকার মতো এমন জায়গা দুর্লভ।

ডাকবাংলার পিছন দিকে গিরি-খাদ। এই সকল খাদের নীচে দিয়ে পথ চলে গিয়েছে নানা জলপ্রপাতের দিকে। এইটুকু শহরের আশেপাশে গহন গভীর অরণ্যলোকে শিকারীদের সংশয় দিনে ও রাত্রে চোঁকছোক করে বেড়ায়। আমাদের ডাকবাংলার বুড়ো খানসামা এখানকার আদি-বাসী। নাম মিঃ লরেন্স। বুড়োর কাছে বন-জঙ্গলের দৈনন্দিন ইতিহাস খুব স্পষ্ট। লরেন্স বলল, গত পরশু এই ডাকবাংলার ধার থেকে যে মহিষটিকে বাঘে নিয়ে গেছে, সেই কৃষ্ণকায় বাঘটি এখান থেকে এখন চার ফার্লংয়ের মধ্যেই আছে, বেশি দূরে সে যাবে না! বাঘ নাকি প্রতিদিন এখানে আসে বার দুই। সন্ধ্যার ঝোঁকে এবং মধ্য রাত্রে। এখানে ধূপগড় যাবার পথে দুই পাশে ঘন জঙ্গল বহু দূর অবধি বিস্তৃত। এই সব জঙ্গলে বাইসনের আক্রমণে মাঝে মাঝে চাষীরা মারা পড়ে। বুঝতে দেরি হয় না, জন্তু জানোয়ার নিয়ে এরা এক প্রকার ঘরকন্না করে। সন্ধ্যার পর কেমন একটা করালচক্ষু নিশুতি ভাব এ অঞ্চলটায় ছমছম করতে থাকে। আমরা বাইরে বেরোবার সাহস পাইনে।

মিঃ লরেন্স সেই পুরনো আমলের খিদমদগার। সামান্য বেতন এবং তার চেয়েও সামান্য পোষাকপত্র; সে বাসন ধোয়, জল তোলে, ঘর ঝাড়ে, কাপড় কাচে, রান্না করে,—খানসামা মহাই যেমন। কিন্তু তার দুটি শিক্ষিত সাবালক ছেলে এখন উপার্জনশীল। মেয়ে বুঝি দুটি। কনিষ্ঠাটি যে মেয়েটির নাম গায়ত্রি বা গায়ত্রী,—সেটি মেয়ে-টিচার। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে শিক্ষয়িত্রী। বেতন একশ' দশ টাকা। মেয়েটি মিষ্টভাষিণী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমার কন্যা শ্রীমতী নন্দিতার সঙ্গে মধুর বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসল। শুধু তাই নয়, যেদিন আমরা চলে আসি সেদিন নন্দিতার হাতে সে গছিয়ে দিল কিছু উপহার-সামগ্রী, যার আর্থিক মূল্য নিতান্ত সামান্য নয়।

লরেন্সকে প্রশ্ন করেছিলুম। বুড়ো বললে, আমি নয়, আমার বাবা নিয়েছিলেন খৃষ্টধর্ম। ভাত-কাপড় পেয়েছি, কাজ পেয়েছি, অভাব ঘুচেছে, ইজ্জত ফিরেছে! আমরা লেখাপড়া শিখেছি নিখরচায়, স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি খৃষ্টীয় সমাজে। উঁচু-নিচু কেউ নয়, সব সমান। সুতরাং নাই বা রইলুম হিন্দু হয়ে। এ আমরা বেশ আছি, বাবু।

বুড়ো লরেন্স ইংরেজি বোঝে, খৃষ্টান সমাজের সর্বপ্রকার রীতিনীতির সঙ্গে সে পরিচিত। পর্যটকদের আদর অভ্যর্থনা সে জানে, —আবার ওরই মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে গির্জার সার্ভিসেও সে যায়। আমরা যেন অল্প-বিস্তর লরেন্স পরিবারের একটু অনুগত হয়ে উঠলুম।

পরিমল একদিন সকালে বলল, চলুন, জটাশংকর দেখতে যাবেন। আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।—

আমাদের প্রাতঃরাশের পর পরিমল আমাদের পান খাইয়ে তবে ছাড়ল। তার ধারণা এখানে আমাদের যত্ন হচ্ছে না, আমাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই এবং নতুন জায়গায় এসে আমরা কোথাও যেন থৈ পাচ্ছিনে।

পরিমল?—চলতে চলতে এক সময় ডাকলুম।

পরিমল মুখ ফিরাল। আমি বললুম, তুমি যে আমাদের সঙ্গে এখানে-ওখানে যাচ্ছ, তোমার ছুটি আছে ত?

কিছু ভাববেন না আপনি। কর্তা আমাকে ভালবাসেন ছেলের মতন। —পরিমল বলল, আমার স্বাধীনতা সব সময়ে আছে! চলুন—

মোট মাইল দেড়েক পথ। মাঠের পথ পেরিয়ে বড় রাস্তা ছাড়িয়ে ক্ষেতখামার ডিঙিয়ে আমরা প্রবেশ করছিলুম বনময় পথে। অতিকায় শাল্মলীর ঘন জটলায় নিচেকার পায়ে চলা অরণ্য পথ ছায়াচ্ছন্ন। রৌদ্রোজ্জ্বল বেলা প্রায় দশটা। কিন্তু অরণ্যের নিচের দিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে যেন। এপাশে-ওপাশে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল, ভিতরে ভিতরে তার বড় বড় ফাটল। হিমালয়ের গ্র্যানাইট নয়,—এরা সেই সিংভূম-ধলভূম-ছোটনাগপুরের আলগা পাথরখণ্ডের কালো কালো ছায়া যেন সঙ্গে এনেছে। এদের উপরে রয়েছে সেই আদিম ও প্রাচীন বালি-পাথরের ছিদ্রবহুল অবক্ষয়। হায়দরাবাদে এদেরকে দেখে বেড়িয়েছি, দেখেছি দক্ষিণ আরা-বল্লির কোথাও কোথাও। এরা হিমালয় অপেক্ষা অনেক প্রাচীন,—যখন ভারতবর্ষ ছিল না, ছিল শুধু জম্বুদ্বীপ। এখানে আমাদের পথের চারিদিকে বিশালকায় নির্বাক দৈত্যদল যেন সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজও কালপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে।

অরণ্যের প্রান্তে এসে গিরিখাদের নিচের দিকে নামতে লাগলুম। অনেক নিচে,—প্রায় সাড়ে তিনশ ফুটের মত। পাথরের ফাটলে এবং অন্ধ গুহার এখানে-ওখানে ভয় জমে আছে যেন। ভরা মধ্যাহ্নকাল ভিন্ন এখানে আসে না কেউ।

(শেষাংশ ২৫৭ পৃষ্ঠায়)

সকালে স্নানের সময় সিঁথিতে ঘসে ঘসে সাবান লাগাতে হয় সাবিত্রীকে। লালের আভাটুকু পর্যন্ত যাতে না থাকে। রোজই । আর খুলে রাখতে হয় হাতের লোহা হটা।

তারাপদ দেখে আর মুখ খিঁচিয়ে বলে, জ একবার করে যদি লোহা-সিঁদুর ঘষোতে তো, সন্ধ্যাবেলা ঘটা করে সেগুলো পরা ন? বলি কেন পরা আদিখ্যেতা করে?'

সাবিত্রীর আচার-আচরণ, বাক-বিন্যাস ণী, কোনটাই আর যাই হোক 'সাবিত্রী' াচিত নয়। তারাপদের এধরণের মন্তব্য সয়েও যায় না, উড়িয়েও দেয় না। কান্না ওয়ার কথা তো ওঠেই না। বরং সঙ্গে সঙ্গে দ করে ওঠে, 'জানো না কেন? লোহা সিঁদুর ানোর সুখ আনোদটা রোজ একবার করে ধ চেখে ভোগ করি।'

'তাইতো করিস!' তারাপদ আরো খিঁচোয়, ন থেকে খবর্দার আর ও সব পরবি না।'

সাবিত্রী ফর্সা শাদা ব্লাউসটার ওপর ফর্সা পাড় শাড়ীখানা গুছিয়ে পরিপাটি করে ত পরতে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'এই যে, ার হুকুমে উঠছি বসছি! আমার ইচ্ছে হলে , ইচ্ছে হলো মুছব, তোমার কথায় না, লা?'

সিঁদুর লোহা তুই কার খাতিরে পরিস ?' তারাপদ ভাঙা হাটুতে হাত চেপে আসে, 'এই লক্ষ্মীছাড়া তারাপদ রের পরমায়ুর খাতির নিশ্চই তো? মানা করছি, আমি দিব্যি দিচ্ছি। ফের তুই খেলাবাবুর বৌ সেজে লোহা সিঁদুর ন আর সিঁদুর পরবি তো দেখবি মজা। না করতে পারি না।'

রোজ করবো, নিশ্চয় করবো' বলে ভাঁজ-ছিটের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে চটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় সাবিত্রী।

তারাপদ খানিকক্ষণ বসে ফুঁসতে থাকে, র আবার হাঁটু ঘসটে ঘসটে ঘরের মধ্যে গিয়ে সকাল বেলা সাবিত্রীর গুছিয়ে রাখা জলখাবারটা তেজ করে খায়নি, সেটা টেনে খেতে বসে।

খেন খায়নি, পছন্দ হয়নি বলে।

বলেছিল, 'রোজ রোজ আর রুটির পিণ্ডি গিলতে পারি না। কেন, দুখানা পরোটা ভাজতে কি হাতে কুষ্ঠ ধরে? লুচি, কচুরী, নিমকি, সিঙ্গাড়ার তো বাপের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, দুখানা পরোটা, তাও আজ পাঁচ দিন বলে বলে হয় না। গলার দড়ি আমার, গলায় দড়ি, তাই তোর মতন পরিবারকে নিয়ে এখনো ঘর করি। ত্যাগ দিই না।'

বলেছিল, আর যে পাটা আস্ত আছে, সেই পাটা দিয়ে থালাখানা ঠেলতে ঠেলতে ঘরের কোণে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সাবিত্রীর কি উচিত ছিল না, একটু সাধ্য সাধনা করা? তারাপদ তাই ভাবে, রুগ্ন স্বামী, অকর্মণ্য স্বামী, তাকে একটু মায়া মমতা করবি না?

কিন্তু সাবিত্রীনামের কলঙ্ক সাবিত্রী একবারও বলেনি 'খাও।' শুধু মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলেছিল, 'এরপর আর ওই রুটির পিণ্ডিও জুটবে না, রাস্তার ধুলো খেতে হবে মুঠো করে।'

রাস্তার ধুলো খেতে যাবে, এমন ক্ষমতাই কি আছে তারাপদর? কেউ সাহায্য না করলে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে পারে না। তাই এখন ঘসটে ঘসটে এগিয়ে গিয়ে সকালবেলার পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া থালাটাই টেনে টেনে কাছে আনে।

চার পাঁচ বছর থেকে এই অবস্থা হয়েছে তারাপদর। সামান্য একটা সাইকেলের ধাক্কায় ডান হাঁটুটা জন্মের শোধ শেষ হয়ে গেছে।

কালী মন্দিরের গলি। দিনটা বোধ হয় শনি মঙ্গল কিছু হবে। মানুষের ভীড়ে আর মানুষ ভীড়ে ঠাসাঠাসি চলছিল, তার মাঝখান দিয়ে লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ্গা ঠ্যাঙ্গা পা দুখানা নিয়ে প্রায় 'রণ' পায়ের ভঙ্গীতে দ্রুতগতিতে আসছিল তারাপদ, তার মায়ের মন্দিরের নিত্য প্রসাদ ভোগপ্রসাদের গামলাখানা নিয়ে। এক হাতে পাঁঠার মাংসর কাঁচা প্রসাদ।

লাগল হাঁটুতে একটা সাইকেলের ধাক্কা। আচমকা ধাক্কা সামলাতে পারল না তারাপদ। হাঁটু দুমড়ে পড়ে গেল। গেল তো গেলই, সেই ধাক্কায় সবই গেল। ভীড়ের মাথায় উঁচু করে ধরা পেতলের গামলায় সাজানো ভাত, তরকারি, ডালসুদ্ধ হাত থেকে ছিটকে পড়ে ভীড়ের পায়ের তলায় পিষে গেল। এক হাতে ধরা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে বাঁধা বলির পাঁঠার দরুণ একপোয়া কাঁচা মাংস মাটিতে পড়ে থেঁৎলে গেল।

আর গেল তারাপদর মায়ের বাড়ীর চাকরী। যে চাকরী থেকে দৈনিক দুপুরে একটা করে অন্নপ্রসাদ আর এক পো করে কাঁচা মাংস জুটতো, সন্ধ্যেয় ফুলপাতা সিঁদুর চটকানো একডালা কাটা ফল জুটতো, আর জুটতো মাস গেলে ন'আনা রোজ হিসেবে গোটা সতেরো টাকা।

তারাপদর যা কাজ ছিল, তাতে ওই ন'আনাই রোজ। কিন্তু যাই হোক, হোক অকিঞ্চিৎকর রোজগারই হোক, তারাপদর আর সাবিত্রীর তো পেট চলে যেত। এক গামলা ভাত দুজনে খেয়ে উঠতেই পারত না রোজ।

চাকরী গেল।

মায়ের চরণের ফুলজল সরানোর চাকরী।

তারাপদ পারবে না বলেই নয় শুধু, অঙ্গহীন লোক মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবে না বলে। হাঁটুর সঙ্গে পায়ের তিনটে আঙ্গুলও গেছে যে!

কিছুদিন পর্যন্ত তারাপদ সাবিত্রীকে খোসামোদ করত, 'যা মায়ের মন্দিরে গিয়ে আঁচলটা পেতে বসগে যা, তাতেই দুটো পেট চলে যাবে।'

প্রথম সাবিত্রী ঝলসে উঠত, ক্ষেপে উঠত। 'কালীঘাটের ক্যাঙালী হবো? বলতে মুখে আটকালো না?'

তারাপদ প্রবোধ দিত, 'আরে বাবা ক্যাঙালী এ জগতে কে নয়? রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র থেকে আরম্ভ করে দুনিয়াখানাই তো ক্যাঙালী। কে না আঁচল পেতে বসে আছে? 'ভাত দাও কাপড় দাও' এ সব তো ছোট কথা। আরও কত দাও। যার সব আছে সেও ক্যাঙালীর মতন আঁচল পেতেছে 'ওগো আমায় মান দাও, যশ দাও, ভক্তি দাও, পুজো দাও, বাহবা দাও, ভোট দাও। দেখছি তো সব। এক ওই মায়ের মন্দিরে বসেই জগৎখানাকে দেখছি।'

(শেষাংশ ২৩৮ পৃষ্ঠায়)

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরনোর জন্যে তৈরী হচ্ছি। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এল। অগত্যা হাত-পা গুটিয়ে বসতে হল বারান্দায় এসে।

এখন ভাবি, যদি এই বৃষ্টিটুকু না হত! যদি দশটা মিনিট আগে বেরিয়ে পড়তে পারতাম! কিন্তু থাক সে-কথা।

বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে ঠুক-ঠুক করে এসে উঠলেন উমাপদ।

হাতজোড় করে বল্লেন, একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে দাদা। পাছে বেরিয়ে যান, তাই দৌড়তে দৌড়তে এসেছি।

উদ্বাস্তু প্রতিবেশী। খাল-পারের কলোনিতে থাকেন। মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভেবেছিলাম, নিজে আর যাব না। যাহক কিছু উপহার দিয়ে ছেলেকে পাঠাব। কিন্তু সরাসরি এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। কেমন করে আর না বলব?

বললাম, শরীরটা একটু নড়বড়ে হয়েছে। ভাবছিলাম ডাক্তারের ওখান থেকে প্রেসারটা একবার মাপিয়ে, তারপর যাব। আচ্ছা চলো। ফেরার বেলাই বরং ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে।

সহরতলীর পথ। পিট-পিট করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দুজনে চলেছি পাশাপাশি।

উমাপদ বললেন, ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছিলাম দাদা। কোথাও যে কিনারা পাব, ভাবিইনি তা। ভগমানের দয়ায় ঠাঁই পেলাম আপনাদের কাছে। দোকান-দানি করে চলেও যাচ্ছে কোন রকমে।

বললাম, যাবে বৈকি ভাই। উদ্যমী মানুষ যেমন করে হক দাঁড়িয়ে যায়। কপাল ধরে বসে থাকলে কিছুই হয় না কারো।

কিন্তু বড্ড দুশ্চিন্তা ছিল দাদা, উমাপদ বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে। ডাগর হয়েছে। তার ওপর আপনাদের মা-বাপের আশীর্বাদে মেয়ে আমার সুন্দরী। তারো ব্যবস্থা করে দিলেন ভগমান।

এই পর্যন্ত বলে একটা ঢোক গিললেন উমাপদ। তারপর গলা খাটো করে বললেন, আপনার কাছে লুকিয়ে কি করব দাদা? ভাব করেই ওরা করছে বিয়েটা...পয়সা-কড়ি লাগছে না।

তা করুক, আমি বললাম, আজ-কাল ত আখছার এমন বিয়ে হচ্ছে। তা ছেলেটি ভালো ত? কাজ-কম করে টরে ত?

আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন, উমাপদ, আপনার অনুগ্রহে তা করে দাদা। গ্রেট ইস্টার্ণ ব্যাঙ্কে চাকরি করে, পোণে তিনশো টাকা মাইনে। চেহারা ভালো, জাতেও বামুন...

মা-বাপ আছেন?

না, ওটাই যা একটু মনের মতো হল না দাদা। কেউ নেই। তা এক হিসাবে ভালোই। দুটিতে থাকবে সুখে-দুঃখে। কেউ...

হ্যাঁ, থাকে কোথায় ছেলেটি?

খালের ওপারে। ঠিক আমাদের বাসার উল্টো দিকে। মাঝখানে ছোট্ট খাল, আর তার ওপর কাঠের সাঁকো। যেতে আসতে লাগে মোট পাঁচটি মিনিট। ভগমানই জুটিয়ে দিয়েছেন।

বৃষ্টিটা ইতিমধ্যে ধরে গেল। ছাতা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম।

উমাপদ কিছু দূরে একটা বাঁকের মুখে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ হল গরীবের কুঁড়ে।

দেখলাম, সেখানে মাঝারি রকম একটা ভীড় জমেছে। নর-নারী ও কুচোকাচার আনাগোনা এবং হৈ-চৈ চলছে! বিয়ে বাড়ী ত!

হঠাৎ মহিলারা একযোগে উলু দিয়ে উঠলেন। মানুষের ছুটোছুটিটাও যেন বেশ একটু বেড়ে গেল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উমাপদ বললেন, বোধহয় বর এসে গেল। গোধূলি লগ্নে বিয়ে কিনা!

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত। তা, তুমি যাও উমাপদ, দৌড়ে চলে যাও। আমার জন্যে ভাবনা করো না। আমি আসছি।

* * *

ইচ্ছে ছিল আসার সময়েই ডাক্তারের কাছে হয়ে আসব। কিন্তু যাবার পথেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম তাঁর হাতে।

বনমালী ডাক্তার রাস্তার দিকের রোয়াকে বসে তামাক টানছিলেন। বৃষ্টি বলেই বেরোন নি বোধহয়।

হাঁক দিয়ে বললেন, পশুপতিদা, যাচ্ছেন কোথায়?

আমতা আমতা করে বললাম, এই ঠিক যাওয়া নয়। মানে উমাপদ, গরীব ব্রাহ্মণ, দেশের মানুষ, মেয়ের বিয়েতে বলেছে...

আবার নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন?

না, না, খাওয়া নয়। এই একটু গিয়ে দাঁড়ানো আর কি। ছেলে যাবে, উপহার টার যা-হক কিছু সে-ই দিয়ে আসবে। আমি ঐ একটু ভদ্রতা...

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা সে পরে যাবেন। আগে প্রেসারটা দেখে নিই, সেদিন থেকে ভারী ভাবছি আমি।

হেসে বললাম, আর ভাবাভাবির কি আছে ভায়া? চৌষট্টি বছর হল। এখন যে ক-টা দিন বাঁচি, তাইত একস্ট্রা!

বনমালী বললেন, আমরা ডাক্তাররা তা স্বীকার করি না। যতক্ষণ প্রাণ, আমাদের লড়াই ততক্ষণ। তার আগে ছাড়াছাড়ি নেই।

বিশালায়তন দেহে, বিশালতর আওয়াজ করে হেসে উঠলেন ডাক্তার।

বললাম, ভায়া, তোমার হাসি শুনলে দুর্বল মানুষেরা কিন্তু ভড়কে যাবে।

এ হল নিষ্পাপ মানুষের হাসি দাদা, জবরদখল করিনি, ফাঁকি দিয়ে লোন নিইনি, মেহনৎ করে টাকা কামাচ্ছি......

বুঝলাম, আশ পাশের রেফুজীদের সম্বন্ধেই এই বাঁকা টিপ্পনী কাটছেন ডাক্তার।

বললাম, তা অবশ্য বলতে পারো তুমি। তবে কি জানো? ভিটে-ছাড়া ইজ্জত-হারা হলে মানুষ নিরুপায় ভাবেই অন্যায় করে।

ও আমি স্বীকার করতে পারলাম না দাদা। বাঘ মাংস না পেলে অনাহারে মরে, ঘাস খায় না। সৎ কালচারের মানুষ...

বললাম, আচ্ছা, ও-তর্ক আর একদিন করব ভায়া। একবার বিয়ে-বাড়ীটা ঘুরে আসি।

* * *

ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পেলাম যখন, তখন প্রায় ছ-টা।

আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে। ছাতা খুলে জোর পায়ে চলতি।

দর্মা, টিন, আর খোলার ঘর সারি সারি চলে গেছে অর্ধ-চন্দ্রাকার খালের ধার ধরে। মাঝারি আকারের রাস্তা একটা তৈরি করে নিয়েছে উদ্বাস্তুরাই। বাড়ী-ঘরগুলো উঠেছে এই রাস্তাকে বেষ্টন করে।

সবই গৃহস্থ বাড়ী। তারি মধ্যে আবার কোনটা তরুণ ব্যায়ামাগার, কোনটা শহীদ লাইব্রেরী, কোনটা বাস্তু-হারা নাট্য সমিতি। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘিরে একটা পার্কও করা হয়েছে। হয়েছে একটা স্কুলও। মহা প্লাবনের মুখেও বাঁচবার এবং বাঁচাবার কি মহান চেষ্টা এই ক্ষুদ্র নিঃসম্বল মানুষদের!

দেখতে দেখতে চোখে জল এল। ভাবলাম,

(শেষাংশ ২৩৬ পৃষ্ঠায়)

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরনোর জন্যে তৈরী হচ্ছি। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এল। অগত্যা হাত-পা গুটিয়ে বসতে হল বারান্দায় এসে।

এখন ভাবি, যদি এই বৃষ্টিটুকু না হত! যদি দশটা মিনিট আগে বেরিয়ে পড়তে পারতাম! কিন্তু থাক সে-কথা।

বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে ঠুক-ঠুক করে এসে উঠলেন উমাপদ।

হাতজোড় করে বললেন, একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে দাদা। পাছে বেরিয়ে যান, তাই দৌড়তে দৌড়তে এসেছি।

উদ্বাস্তু প্রতিবেশী। খাল-পারের কলোনিতে থাকেন। মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভেবেছিলাম, নিজে আর যাব না। যাহক কিছু উপহার দিয়ে ছেলেকে পাঠাব। কিন্তু সরাসরি এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। কেমন করে আর না বলব?

বললাম, শরীরটা একটু নড়বড়ে হয়েছে। ভাবছিলাম ডাক্তারের ওখান থেকে প্রেসারটা একবার মাপিয়ে, তারপর যাব। আচ্ছা চলো। ফেরার বেলাই বরং ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে।

সহরতলীর পথ। পিট-পিট করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দুজনে চলেছি পাশাপাশি।

উমাপদ বললেন, ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছিলাম দাদা। কোথাও যে কিনারা পাব, ভাবিইনি তা। ভগমানের দয়ায় ঠাঁই পেলাম আপনাদের কাছে। দোকান-দানি করে চলেও যাচ্ছে কোন রকমে।

বললাম, যাবে বৈকি ভাই। উদ্যমী মানুষে যেমন করে হক দাঁড়িয়ে যায়। কপাল ধরে বসে থাকলে কিছুই হয় না কারো।

কিন্তু বড্ড দুশ্চিন্তা ছিল দাদা, উমাপদ বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে। ডাগর হয়েছে। তার ওপর আপনাদের মা-বাপের আশীর্বাদে মেয়ে আমার সুন্দরী। তারো ব্যবস্থা করে দিলেন ভগমান।

এই পর্যন্ত বলে একটা ঢোক গিললেন উমাপদ। তারপর গলা খাটো করে বললেন, আপনার কাছে লুকিয়ে কি করব দাদা? ভাব করেই ওরা করছে বিয়েটা...পয়সা-কড়ি লাগছে না।

তা করুক, আমি বললাম, আজ-কাল ত আখছার এমন বিয়ে হচ্ছে। তা ছেলেটি ভালো ত? কাজ-কম করে টরে ত?

আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন, উমাপদ, আপনার অনুগ্রহে তা করে দাদা। গ্রেট ইষ্টার্ণ ব্যাংকে চাকরি করে, পৌণে তিনশো টাকা মাইনে। চেহারা ভালো, জাতেও বামুন...

মা-বাপ আছেন?

না, ওটাই যা একটু মনের মতো হল না দাদা। কেউ নেই। তা এক হিসাবে ভালোই। দুটিতে থাকবে সুখে-দুঃখে। কেউ...

হ্যাঁ, থাকে কোথায় ছেলেটি?

খালের ওপারে। ঠিক আমাদের বাসার উল্টো দিকে। মাঝখানে ছোট্ট খাল, আর তার ওপর কাঠের সাঁকো। যেতে আসতে লাগে মোট পাঁচটি মিনিট। ভগমানই জুটিয়ে দিয়েছেন।

বৃষ্টিটা ইতিমধ্যে ধরে গেল। ছাতা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম।

উমাপদ কিছু দূরে একটা বাঁকের মুখে আঙুলে দেখিয়ে বললেন, ঐ হল গরীবের কুঁড়ে।

দেখলাম, সেখানে মাঝারি রকম একটা ভীড় জমেছে। নর-নারী ও কুচোকাচার আনাগোনা এবং হৈ-চৈ চলছে! বিয়ে বাড়ী ত!

হঠাৎ মহিলারা একযোগে উলু দিয়ে উঠলেন। মানুষের ছুটোছুটিটাও যেন বেশ একটু বেড়ে গেল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উমাপদ বললেন, বোধহয় বর এসে গেল। গোধূলি লগ্নে বিয়ে কিনা!

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত। তা, তুমি যাও উমাপদ, দৌড়ে চলে যাও। আমার জন্যে ভাবনা করো না। আমি আসছি।

* * *

ইচ্ছে ছিল আসার সময়েই ডাক্তারের কাছে হয়ে আসব। কিন্তু যাবার পথেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম তাঁর হাতে।

বনমালী ডাক্তার রাস্তার দিকের রোয়াকে বসে তামাক টানছিলেন। বৃষ্টি বলেই বেরোন নি বোধহয়।

হাঁক দিয়ে বললেন, পশুপতিদা, যাচ্ছেন কোথায়?

আমতা আমতা করে বললাম, এই ঠিক যাওয়া নয়। মানে উমাপদ, গরীব ব্রাহ্মণ, দেশের মানুষ, মেয়ের বিয়েতে বলেছে...

আবার নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন?

না, না, খাওয়া নয়। এই একটু গিয়ে দাঁড়ানো আর কি! ছেলে যাবে, উপহার টার যা-হক কিছু সে-ই দিয়ে আসবে। আমি ঐ একটু ভদ্রতা...

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা সে পরে যাবেন। আগে প্রেসারটা দেখে নিই, সেদিন থেকে ভারী ভাবছি আমি।

হেসে বললাম, আর ভাবাভাবির কি আছে ভায়া? চৌষট্টি বছর হল। এখন যে ক-টা দিন বাঁচি, তাইত এক্সট্রা।

বনমালী বললেন, আমরা ডাক্তাররা তা স্বীকার করি না। যতক্ষণ প্রাণ, আমাদের লড়াই ততক্ষণ। তার আগে ছাড়াছাড়ি নেই।

বিশালায়তন দেহে, বিশালতর আওয়াজ করে হেসে উঠলেন ডাক্তার।

বললাম, ভায়া, তোমার হাসি শুনলে দুর্বল মানুষরা কিন্তু ভড়কে যাবে।

এ হল নিষ্পাপ মানুষের হাসি দাদা, জবরদখল করিনি, ফাঁকি দিয়ে লোন নিইনি, মেহনৎ করে টাকা কামাচ্ছি......

বুঝলাম, আশ পাশের রেফুজীদের সম্বন্ধেই এই বাঁকা টিপ্পনী কাটছেন ডাক্তার।

বললাম, তা অবশ্য বলতে পারো তুমি। তবে কি জানো? ভিটে-ছাড়া ইজ্জত-হারা হলে মানুষ নিরুপায় ভাবেই অন্যায় করে।

ও আমি স্বীকার করতে পারলাম না দাদা। বাঘ মাংস না পেলে অনাহারে মরে, ঘাস খায় না। সৎ কালচারের মানুষ...

বললাম, আচ্ছা, ও-তর্ক আর একদিন করব ভায়া। একবার বিয়ে-বাড়ীটা ঘুরে আসি।

* * *

ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পেলাম যখন, তখন প্রায় ছ-টা।

আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে। ছাতা খুলে জোর পায়ে চলতি।

দর্মা, টিন, আর খোলার ঘর সারি সারি চলে গেছে অর্ধ-চন্দ্রাকার খালের ধার ধরে। মাঝারি আকারের রাস্তা একটা তৈরি করে নিয়েছে উদ্বাস্তুরাই। বাড়ী-ঘরগুলো উঠেছে এই রাস্তাকে বেষ্টন করে।

সবই গৃহস্থ বাড়ী। তারি মধ্যে আবার কোনটা তরুণ ব্যায়ামাগার, কোনটা শহীদ লাইব্রেরী, কোনটা বাস্তু-হারা নাট্য সমিতি। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘিরে একটা পার্কও করা হয়েছে। হয়েছে একটা স্কুলও। মহা প্লাবনের মুখেও বাঁচবার এবং বাঁচাবার কি মহান চেষ্টা এই ক্ষুদ্র নিঃসম্বল মানুষদের!

দেখতে দেখতে চোখে জল এল। ভাবলাম,

(শেষাংশ ২৩৬ পৃষ্ঠায়)

ভারতের গৃহিনীরা চিনতেন গাছগাছড়া
যাহা চুল ওঠা বন্ধ করে
চুল পাতলা হওয়া, মরামাস জমা, স্থানে স্থানে টাক পড়া—চুল পড়ে যাওয়ার এই সব লক্ষণে ভারতের মহিলারা তাঁদের নিজেদের ঘরে তৈরী ভেষজ কেশতৈল ব্যবহারে প্রায়ই বেশ সুফল পেতেন।
এখন এইরূপ ভেষজ কেশতৈল তৈরীর পদ্ধতি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।
অবশ্য কেয়ো-কার্পিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এমন একটি ভেষজ তৈল পাওয়া যায় যাতে ঘন ও সুন্দর চুল জন্মাবার ও মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সব উপাদানই আছে।
Keo-Karpin
HERBAL
মনোরম গন্ধযুক্ত
কেয়ো-কার্পিন
সুষ্ঠতর কেশচর্চ্চার জন্য ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল
দেজ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক
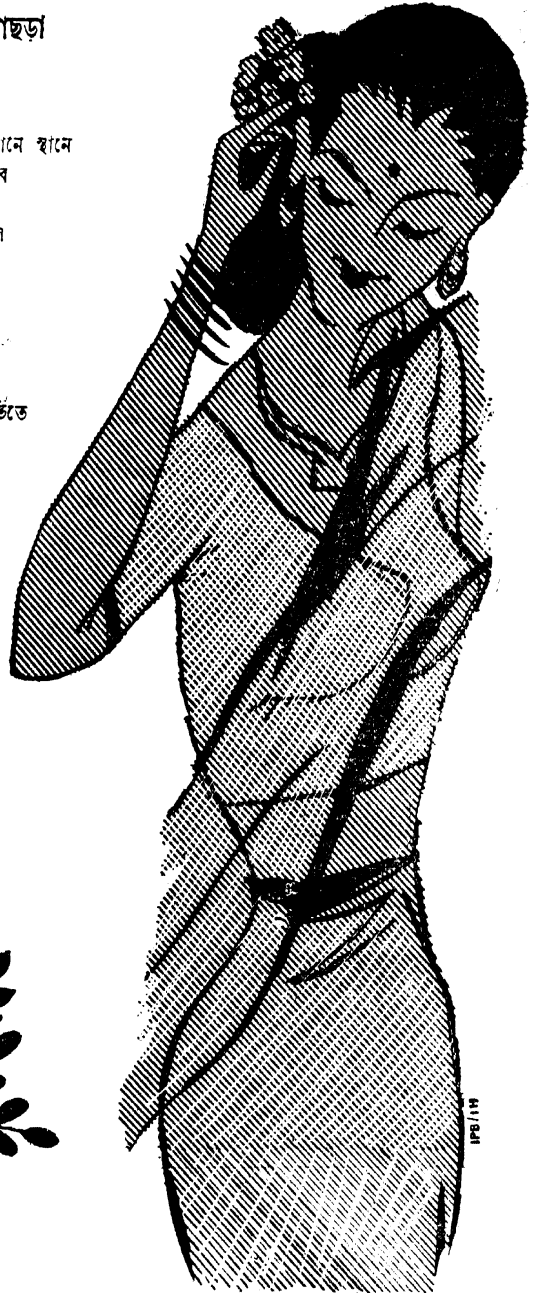
স্বর্ণ-সিঁদুর

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শেষ ফাগুনের এক সকালবেলায়, কনকলতা উঠোনের আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে সুরেশের উদ্দেশে বললে, "খিড়কীর আমড়া গাছের ডালের ওপর কি সুন্দর একটা পাখী এসে বসলো দ্যাখো।" সুরেশ স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—"তোমার চেয়ে সুন্দর?"

"আহা হা!" বোলে কনক রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এটা বিজপুর গ্রাম; হাওড়া-আমতা লাইনের ধারে। গ্রাম বড়ও নয়, ছোটও নয়। গ্রামের কোল দিয়ে একটা সংকীর্ণ নদী ক্রমশঃ আরও সংকীর্ণ হোতে হোতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ব'য়ে গিয়েছে। শ্রাবণ ভাদ্র মাস ছাড়া নদীতে প্রায়ই জল থাকে না; জায়গায় জায়গায় চাষীরা অনুচ্চ বাঁধ বেঁধে খানিকটা কোরে জল ধরে রাখে। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র দক্ষিণের আকাশ-রেখায় গিয়ে মিশে গেছে।

সুরেশের বাবা ছেলেকে এই গ্রামেই বিবাহ দিয়েছিলেন। সুরেশদের বাড়ী আর কনকদের বাড়ী এপাড়া-ওপাড়া। কয়েকখানা বাড়ী, বাগান আর একটা পুষ্করিণী মাত্র ব্যবধান। দুই বৈবাহিক তাঁদের বাল্যকাল থেকেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন এবং ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে, বছর পাঁচেকের মধ্যেই উভয় বন্ধু যেন যুক্তি করে পর-পর পরপারের যাত্রী হ'ন। তারপর সাত-আট বৎসর অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে সুরেশের জননীও স্বামীর পদানুসরণ ও পথানুসরণ করেচেন।

একটু বেলায় সুরেশ পাড়া বেড়িয়ে বাড়ী এলে কনক বললে—"এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলে?" গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে, দালানের দড়ির টানাটায় মেলে রাখতে রাখতে সুরেশ বললে—"ফটিক কোলকাতা থেকে বাড়ী এসেছে, একবার দেখা করতে গেছলুম তার সংগে। ও কি বলচে জান, ওদের আফিসে লোক নেবে, একখানা দরখাস্ত কোরে দিতে বলচে আমাকে।" কথাটায় কনকের কোনই উৎসাহ প্রকাশ দেখা গেল না; হস্তস্থ মুদী-দোকানের ছেঁড়া কাগজের ঠোঙাটার লেখাগুলোর মধ্যে সে যেন কিছু অমূল্য ধনের সন্ধান পেয়েচে। তা থেকে একবার মাথা তুলে চেয়েও দেখলো না। সুরেশ বলে গেল—"চাকরী নিয়ে কোলকাতা চলে গেলে মন্দ হয় না। ওখানকার আয়ে সংসারটা ওখানে চলে যাবে, এখানকার চাষ-বাসের আয়টা তাহোলে পুরো-পুরিই জমবে।" —ছেঁড়া ঠোঙাটায় আরো গভীরভাবে কনকের মন আকৃষ্ট হোয়ে পড়লো।

ছেলে রবি কিংবা মেয়ে কিরণকে সংগে নিয়ে রোজই বিকেলের দিকে কনক একবার কোরে বাপের বাড়ী বেড়িয়ে আসে। সেখানে মা, দাদা, বৌদির সংগে গল্পগাছা কোরে আসা তার নিত্যকর্ম। আজও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো না। রাত্রে খেতে বোসে সুরেশ বললো—"আবার ফটিকের সংগে দেখা হোল। ওকে বললুম, কালই তাহোলে দরখাস্ত একখানা লিখে তোমাকে দিয়ে যাব।"

কনক সংগে-সংগে কিছু বললে না, মিনিট-খানেক পরে বললে—"আমি কিন্তু কোলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবো না।"

"পারবে না?"

"না। এখানে এই ফাঁকা-ফরদা ছেড়ে, এই মাঠের হাওয়া, আলো-রোদ—

"এই পাখীর গান, নদীর তান, জ্যোছনা রাতের..............."

মুখখানাকে বেশ-একটু উজ্জ্বল কোরে কনক বললে—"আমি ত আর কবি নই যে ঐ সব বুঝব! কথা হচ্ছে, আমি কিছুতেই কোলকাতা গিয়ে থাকতে পারবো না।" উনানে যেন কিছু পুড়ে গেল, সেই রকম একটা ব্যস্তভাবে কনক দ্রুতগতিতে উঠে গিয়ে শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সেখান থেকে দ্বিধাশূন্য দৃঢ়কণ্ঠে বলল—"বিজপুর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।"

সুতরাং সুরেশের আর দরখাস্ত লেখার আবশ্যকই হোল না।

এই কাহিনীর আগাগোড়া বোঝাতে ও বুঝতে গেলে, কনকের পিতৃ-সংসারের ছোট্ট একরত্তি বৈষয়িক যে ইতিহাস আছে, সেটুকু বলা দরকার।

বিজপুরের প্রসন্ন ভট্টাচার্য—অর্থাৎ কনকের বাবা—আর কোলকাতার শাঁখারীটোলার হৃদয়-নন্দী মিলে এককালে ক্লাইভ-স্ট্রীটে লোহা-লক্কড়ের ছোট্ট একখানা দোকান করেছিলেন। দোকান চালাবার এবং দেখাশুনা করার ভার ছিল হৃদয় নন্দীর ওপর। একটুখানি দোকান। তা হোলেও এর থেকে বছরে হাজার পাঁচেক টাকা মুনাফা হোত। দুই অংশীদারের মধ্যে সেটা আধাআধি ভাগ হোত। এইভাবেই দিন যাচ্ছিলো। কিন্তু বছর দুই পূর্বে হৃদয় নন্দী মারা যান। তখন হ'তে তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোয়ে দোকান পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু এই সময় থেকে নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কারণে দিন দিন দোকানের অবনতি হোতে থাকে এবং মাস ছয় হোল, অবনতিটা চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। পূর্বে যে কারবার থেকে নীট পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা হোত, এখন তার থেকে অ-নীট পাঁচ শ'-ও হয় না। সুতরাং কনকের দাদা হরিশংকরকে এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ও বিচলিত হোয়ে পড়তে হোল এবং ঠিক করলেন, তিনি নিজে কোলকাতায় থেকে দোকানের পরিচালনা করবেন। এ অবস্থায় হরিশংকরের সপরিবারে কোলকাতা গিয়ে থাকাই স্থির হোল।

সুতরাং আর দু'-একটা মাস দেখে, বৈশাখের মাঝামাঝি দেশের বাড়ী-ঘর ও সম্পত্তি দেখাশুনা করবার একটা সুবন্দোবস্ত করে হরিশংকর সপরিবারে কোলকাতায় চলে গেল। এই সময় থেকে বিজপুরের চিরপ্রিয় মাটি ও বাতাস হঠাৎ কনকের সংগে ভীষণ শত্রুতা জুড়ে দিলে। বিজপুরের পথে-ঘাটে ধুলো এবং কাদার যথেষ্ট অসভ্যতাপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো। পাড়ার মধ্যে এবাড়ী-ওবাড়ী বেড়াতে গেলে, যত রাজ্যের কাঁটা তার পায়ে বেঁধে, তার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে দেয়, পুকুরের নির্মল জল ঘোলা এবং অব্যবহার্য হোয়ে পড়তে লাগলো, বদ সংগীর প্রভাবে রবির পড়াশুনায় ঘোর অমনোযোগ, তার স্কুলের মাষ্টারদের পড়ানোর কাজে ফাঁকি, গাঁয়ের লোকদের মধ্যে বেজায় স্বার্থপরতা ও দুষ্টামির আত্মপ্রকাশ.........ইত্যাদি ইত্যাদি। চিরকালের শান্তশিষ্ট বিজপুরে এবার নতুন বছরের গোড়া থেকেই যেন কনকের সংগে অশান্ত এবং অশিষ্ট আচরণ সুরু করে দিলে।

* * *

কালিদাসের যুগে, স্বর্গের দেবতাদের শাসনে ও নির্দেশে, পর্যায়ক্রমে ছয় ঋতু পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে কাজ করতেন। সে জন্যে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই জলভরা মেঘকে পৃথিবীর ওপর ছুটে আসতে হ'য়েছিল। এখনকার যুগে দেবতার সে শাসন ঢিলে হয়ে পড়ায়, এ বছর সেদিনের মত আষাঢ় আর মেঘের ভার নিয়ে এল না, এল তার পরিবর্তে

দাহকর খটখটে অট্টহাসি দিয়ে, যার দাপটে ন বিল পুকুর চুপসে গেল, গাছপালা শুকিয়ে ল, মাঠ-ঘাট ফেটে ফুটি-ফাটা হ'ল।

দেখতে দেখতে আষাঢ়ের অর্ধেক কেটে ল, কিন্তু বর্ষার অভিমান কাটলো না। শাখের শেষের দিকে কয়েকটা দিন কয়েক পলা বৃষ্টি হোয়েছিল, তাতে গাঁয়ের বীজ-নাগুলোতে একটা কোরে চাষ দিয়ে বীজ লতে পারা গিয়েছিল। কোন রকমে তার রাগুলোকে বাঁচিয়ে মাথায় জল প্রায় আধ ত কোরে মাথাচাড়া দিয়েছে। নদীর ধারে রেশের একখানা পাঁচ কাঠার বীজতলা ছিল। দিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে সুরেশ জতলাখানা দেখতে গেল। ফেরবার পথে নদীর ড়ের ওপর এক জায়গায় সে ঘাষের ওপর সে বসলো। সূর্য পশ্চিমাকাশে তখন নানা-ম রং নিয়ে খেয়ালী মনের খেলায় মেতেচেন। পারে বহুকালের একটা গাব গাছে পাতার ড়ালে বসে একটা চঞ্চল 'বসন্ত বাউরী' াগত কয়েকবার ডেকে ঐ দিকে উড়ে গেল। দিন চাঁদপুরের হাট ছিল। হাট-ফেরতা ওতাল যুবকরা বাঁশের বাঁশী বাজাতে বাজাতে য়ে ফিরছিল, তার সুর দূরের হাওয়াতে র করে সুরেশের কানে স্বপ্নের একটা আমেজ লিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। অদূরে গাঁয়ের শ্মশান। শান দেখে সুরেশের অনেক কথাই মনে উদয় াল, অনেক কথা ভাবতে লাগলো—এইখানেই র পূর্বপুরুষগণ চিরবিশ্রাম লাভ করেচেন। খানকার এই মাটিতেই তার ঠাকুর্দা, তার বাবা, র মা, তাঁদের সত্ত্বা লুপ্ত করে দিয়ে গেছেন। দের অদৃশ্য পদক্ষেপের শেষ চরণচিহ্ন এর ধ বুকের ওপর এসে চিরকালের জন্যে লিয়ে গেছে। সুরেশের মনে নানা ভাবের নয় হোল। এতে দুঃখ আছে, সুখ আছে, হর্ষ াছে, বিষাদ আছে।

আষাঢ়ের বেলা। দীর্ঘ হলেও এক সময়ে ার অবসান ঘটবেই। চারিদিকের আকাশে াতলা অন্ধকার নেমে আসতেই সুরেশ নদীর াড় থেকে উঠে গ্রামের পথ ধরে বাড়ীর দিকে চললো। খানিকটা এগিয়ে জোলা-পাড়ার মধ্যে কতেই রসীদ মিঞার সঙ্গে দেখা হোল। রেশ জিজ্ঞাসা করল—"কেমন আছ রসীদ াকা, ভাল ত?"

ভালো আর থাকবো কেমন কোরে ভাইপো? াকাশের ব্যাপার দেখছ ত? বৌটার ব্যারামে রাই ঝেঁটিয়ে সব ধান ছেড়ে দিতে হোয়েছে, খোরাকীর একটা ছটাকও ঘরে নেই।"

"কাকী ত বড্ড ভুগছিল শুনিচি, এখন কমন আছে?"

একটু খুসী মুখে রসীদ বললো—"খোদার াশীর্বাদে বৌটা বেশ ভালো রকম সেরে ঠেচে। তুমি ভরসন্ধ্যেবেলা এদিকে কোথায় গছ'ল ভাইপো?"

চলতে চলতে সুরেশ বললে—"নদীর াড়ের বীজতলাখানা একবার দেখে এলুম াকা।"

মিত্তিরদের আম-বাগান ছাড়িয়ে, গোষ্ঠ ময়রের 'শালয়ের পাশ দিয়ে, সুরেশ নন্দী-াড়ীর সামনে দিয়ে যেতেই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রেকালী বলল—"ভায়া! আছ কেমন?"

একটু ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সুরেশ বলল—"ভালো আছি দাদা, আপনার সব ভালো ত?"

"ভালো আর কোথায় ভাই! পূব মাঠের আমার সেই 'আড়াই বিঘেওয়ালা' জমিটা মিত্তির ত' ফাঁকি দিয়ে গ্রাস করে ফেললে।"

"শুনিচি দাদা। আপনার মেজ ছেলে সন্তুর খবর কি?"

"সন্তুর খবর ভালো ভাই, একশো সত্তর টাকা মাইনেতে আমার শালার আফিসে ওর চাকুরী হোয়েচে, পরে আরো বাড়বে।"

"খুবেই আনন্দের কথা, দাদা।"

সুরেশ ভাবতে ভাবতে আসতে লাগলো।—সুখ-দুঃখ দুই মিলিয়ে তবে মানুষ। বাড়ীর যেমন সদর দরজা আর খিড়কীর দরজা, প্রত্যেক মানুষেরই তাই। এক দরজা দিয়ে সুখ ঢোকে, আর এক দরজা দিয়ে দুঃখ ঢোকে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, হর্ষ-বিষাদ—এই নিয়েই জগৎ, এই নিয়েই সংসার, এই নিয়েই মানুষ। অবিচ্ছিন্ন সুখে সুখ হতে পারে না, অবিচ্ছিন্ন দুঃখে দুঃখ থাকতে পারে না। মানুষকে একটা ভাবনার মধ্যে থাকতেই হবে, হয় সুখের, না হয় দুঃখের।......বাড়ী এসে দালানে ঢুকে সুরেশ দেখলো, কনক বসে বসে পান সাজচে, মুখে তার গভীর ভাবনার ছাপ। জিজ্ঞাসা করলো—"কি ভাবচো? দেখো, জাঁতিতে আঙ্গুল কেটে ফেলো না।" কনক কোন কথা বললে না বা সুরেশের দিকে মুখ তুলে চাইলও না। খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠলো—"আমি বিজপুরে কিছুতেই থাকতে পারবো না।"

"কারণ?" যদিও কারণের কথা সুরেশ তার মুখ থেকে সবই শুনেছিল। দীর্ঘ আটাশ বছর পরে বিজপুরের যাবতীয় চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্—সর্বশ্রেণীর পদার্থই যে এক জোট হোয়ে কনকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এ সংবাদ সে স্ত্রীর মুখে ইদানীং বার বার শুনে আসচে।

"তা হোলে এখানে তুমি আর থাকতে চাও না ত?"

"না। এখানে কি আর থাকা চলে, বুঝচ না?"

"বুঝচি। তা হোলে কোলকাতায় গিয়ে থাকারই ব্যবস্থা করা যাক" বলে সুরেশ ঘরের মধ্যে চলে গেল।

* * *

ফটিকদের বাড়ী। ফটিক আবার বাড়ী এসেচে। সুরেশ ফটিকের সঙ্গে দেখা করে, অনেক কিছু বলবার পরে বললো—"তা হোলে একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দি?"

"হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই দে, এখনো লেগে যাবার আশা আছে।"

সেইদিনই সুরেশ ফটিকের অফিসে এক-খানা দরখাস্ত লিখে রাখলে এবং পরের দিন সেখানা রেজেস্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দিলে।

সুরেশের—কিংবা তার চেয়েও বেশী—কনকের ভাগ্যগুণে দিন পনর পরই অফিস থেকে সুরেশের নিয়োগপত্র এল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশ হরিশংকরকে তার চাকরীর কথা জানালে এবং তার জন্যে ছোট একটা বাসার কথাও লিখে পাঠালে। পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই হরিশংকরের কাছ থেকে চিঠির জবাব এল যে, তারই বাসার কাছেই সুবিধামত একটি বাসা পাওয়া গেছে, সুরেশ যেন শীগগিরই চলে আসে। সুতরাং আর বৃথা কালক্ষেপ না কোরে দু'তিন দিনের মধ্যেই দেশের বাড়ীর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকঠাক কোরে, সুরেশ সপরিবারে কোলকাতায় চলে এল এবং চাকরীতে যোগদান করলে।

* * *

এইবার হরিশংকরের কথা একটু বলা দরকার।

হরিশংকর কোলকাতায় এসে দেখলে যে, তাদের এতদিনের পৈতৃক দোকানখানার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এটা বুঝতে পারল কি না বলা যায় না। হৃদয়বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্রের পরিচালনার দোষেই কারবারটা এতটা চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েচে। তার আষ্টেপৃষ্ঠে এখন শুধু চাবুকের ঘা মারলে সে চলবে না, পায়ে কড্‌লিবার অয়েল মালিশ দরকার, সেক-তাপ দরকার, একটু পুষ্টিকর খাদ্যও দরকার। কিন্তু সে সব না কোরে, হরিশংকর উঠে-পোড়ে কারবারটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো। দিনরাত কোমর বেঁধে ডন-বঠ্‌কি দিতে দিতে সে কারবারের সর্বদিক পরিচালনা করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এই প্রচন্ড পরিচালনার ঠেলায়, ক্ষীণ মরণাপন্ন কার-বারটি ধুঁকতে সুরু করলে ও ক্রমে লুটিয়ে পড়লো এবং আরো ক্রমে তার নাভিশ্বাস উঠে, কারবারি জগতের হাওয়ার সঙ্গে তার শেষ শ্বাসটুকু মিশে গেল।

অতএব কোলকাতায় পড়ে থাকা হরিশংকর আর যুক্তিযুক্ত মনে করলে না। দুকূল সংসারের এক কূল যখন ভেঙ্গে গেল, তখন অপর কূল রক্ষা করা দরকার। কোলকাতা গেল, বিজপুর না যায়। সুতরাং হরিশংকর আর বৃথা কোল-কাতায় পোড়ে না থেকে বিজপুর আসবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। বৈশাখ মাসে যে কোলকাতা এসেছিল, পাঁচ মাস পরে আশ্বিনের মাঝামাঝি দুর্গাপুজার পঞ্চমীর দিন সে আবার বিজপুরে ফিরে এসে, ঠাকুরতলায় মা-দুর্গাকে প্রণাম কোরে, বাড়ীর তালা খুলে ঢুকলো।

* * *

কবি বলেচেন '... রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।' কথা ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, রমণী তার নিজের মনকেও বুঝতে পারে না। কনক কি তার মনের আসল পরিচয় পায়? তার বাইরেকার স্থূল মনের নির্দেশেই সে চলে, ভেতরের মনের সে নাগাল পায় না। তা পেলে তাকে চরকীর মত ঘুরতে হোত না, সে শান্ত ও অচঞ্চল হোয়ে দিন কাটাতে পারতো।

এবার পঞ্জিকায় লেখা আছে—'দেবীর গজে আগমন', কিন্তু মনে হয়, তা নয়, দেবীর এবার 'চরকী'তে আগমন। তা না হোলে কনকের মনকে এবম্প্রকার ঘুরপাক খেতে হচ্চে কেন? দেবীর না আসা পর্যন্ত বেশ একরকম কেটে যাচ্ছিলো, কিন্তু দেবীর আগমনের পর থেকেই যতসব অনাছিষ্টি কান্ড ঘটতে সুরু করে দিয়েচে। রবিটা বেশ পড়াশোনা করছিল, হঠাৎ সে বিগড়োতে আরম্ভ করেছে। তারও মন চরকীর মত, ফুটবল-মাঠ, সিনেমা হলের আর পার্কের আড্ডার ধারে ধারে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্কুলে পুজোর ছুটি, বাড়ীতে দুবেলা বই-পত্তর সামনে খুলে রেখে, খালি সাদা পাতার ওপর পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকে। মেয়েটাও যেন কেমন কেমন হোয়ে যাচ্ছে। কথা বললে শোনে না, কোন কাজ করতে বললে করে না, দিন দিন অসভ্যের ধাড়ী হোচ্চে। তার নিজের শরীরেও

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়)

রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট। কাজ, বিনাটিকিটে যাতায়াত বড় বেশি বেড়ে গেছে, সেই-দিকে দৃষ্টি রাখা। বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে হাতে। একদল পুলিস অধীনে; কয়েকজন টিকিট-চেকার। যে কোন সময়, যে-কোন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে, পুলিস-পাহারার মধ্যে টিকিট-চেক, সেইখানেই নিজের আদালত বসিয়ে বিচার, সংক্ষিপ্ত বিচার, উকিল-মোক্তারের হ্যাঙ্গামা নেই, যা করি কাজীর— ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। জরিমানা, অনাদায়ে জেল পর্যন্ত।

কাজীর বিচারই, কিন্তু এ-কাজীর বিচারে অবিচারের সম্ভাবনা নেই, কিম্বা থাকলেও নিতান্ত নগণ্য। বিচারের সবচেয়ে বড় কথা প্রমাণ, টিকিটের অভাব ঘটলে সেটার অভাব ঘটে না মোটেই। কতকগুলো গড়া-পেটা যুক্তি আছে, যেমন তাড়াতাড়ি টিকিট নিতে না পারা, কিম্বা হারিয়ে যাওয়া। তারা নিজেই বিশ্বাস করে না, সুতরাং বেশি আশাও রাখে না যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব করবেন। একটা বড় উপায় অবলম্বন করে—পাগল সাজা। তা, এমন বুদ্ধিমান পাগল যে রাঁচিতে পাঠাতেও হয় না, নাম করলেই আবার বেশ সহজ মানুষ হয়ে ওঠে।

কাজ হচ্ছে ভালো। আয় বেড়েছে রেলের। এক আমার সেকশনেই এই কটা মাসে ত্রিশ হাজার টাকা। বিনা আয়াসে এতখানি যশের অধিকারী হওয়া ভাগ্যের কথাই। ওপর থেকে উৎসাহ পাচ্ছি।

কিন্তু বড় একঘেয়ে বোধ হচ্ছে। সেই এক ট্রেণ থামানো, অপরাধীদের বাছাই করে নামিয়ে জড়ো করা; সেই এক প্রশ্ন, সেই এক উত্তর, সেই এক পাগল সেজে বেতালা-বেসুরে গান, সন্ন্যাসী সাজল তো মৌনীবাবা, আর যেন ভালো লাগছিল না। কয়েকবারই ভাবলাম কাজীর এলাকা থেকে পূর্বস্থানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি, উৎসাহজনক চিঠি পেয়ে আটকে গেলাম। তারপর বিরক্ত হয়ে ছাড়তেই যাব একটা দরখাস্ত, এই সময় একটা কথা কানে যেতে মনে হোল, আর যাই হোক এই পীড়াদায়ক একঘেয়েমিটা অন্তত ভাঙবে ক'দিনের জন্য। দেখেই যাই।

সামনে স্বাধীনতা দিবস আসছে, পনেরোই আগস্ট; এইদিনে ওরা একটা সুপরিকল্পিত গণ্ডগোল বাধাবে শুনছি।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। ওদের যে কটা গড়াপেটা যুক্তি ছিল তার মধ্যে বড় একটা এই যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, সুতরাং তার কোন কিছু সম্বন্ধেই আর ভাড়ার কথা ওঠে না। অবশ্য এ যুক্তিটা কেউ পেশ করত না, তবে এইটেই প্রবলতম এবং এইটের জোরেই বিনা টিকিটে যাত্রীদের যারা চাঁই তারা আন্দোলনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এখন শুনেছি ওরা স্বাধীনতা দিবসটা এই দিয়েই পালন করবে; যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ানো ট্রেণে ট্রেণে, যেথায় খুশি চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে নেমে যাওয়া, যেথায় খুশি ওঠা, ভেতরে যারা থাকবে তারা চেন টেনে থামিয়ে দেবে গাড়ি। বিয়াল্লিশ সালের আগস্টের সেই দিন-কটাকে ফিরিয়ে আনা। ওরা বলছে সেটা ছিল স্বাধীনতা অর্জনের উদ্যোগ, এটা হবে অর্জিত স্বাধীনতা উপভোগ। তাদের ছিল বিদেশী শাসকদের চ্যালেঞ্জ, এদের এটা স্বদেশীয়দের। শুনছি সেদিনের মতো এবারেও নাকি মেয়েরা পর্যন্ত যোগ দিচ্ছে।......অবশ্য একটা হুজুগেই; যৌবনের বাড়তি উৎসাহ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে।

যাই হোক, একটা অভিনবত্ব, আমি বদলির জন্য যে দরখাস্তটা করেছিলাম সেটা ছিঁড়ে ফেললাম।

কর্তারাও কিছু নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন না; ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন, লোক-বলও বাড়িয়ে দিলেন। খবর পেলাম স্কুল-কলেজগুলোর ওপরও বিশেষ নির্দেশ জারি করা হয়েছে। "সংশ্লিষ্ট মহলে" বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। খবরের কাগজে সত্য-কল্পিত পূর্বাভাস দিয়ে আরও ফাঁপিয়ে তুলল ব্যাপারটা; ভাষাটাও ওদের পাতা থেকেই নিলাম।

কিন্তু সুখের বিষয়ই হোক বা দুঃখের বিষয়ই হোক, কিছুই হোল না; অন্তত স্বাধীনতা দিবসটাকে চিহ্নিত করবার মতো তেমন কিছু নয়। সুখেরই নিশ্চয়, তবে খোটের রংবেরঙের অপরাধী ঘাঁটায় অভ্যস্ত বলে আমি নাকি একটু বৈচিত্র্যের আশা করেছিলাম, একটু নিরাশ হতে হ'ল।

ব্যবস্থার গুরুত্বের সন্ধান পেয়ে সাবধান হয়ে গেছে। ওদের আবার স্টেশনে স্টেশনে চর থাকে, 'বার্তা রটে যায়।'

এ বার্তা রটে গিয়ে সাবধান হয়ে যায় বলে আমাদেরও একটু রোখ চেপে যায়। একধরনের লুকোচুরি খেলাই তো।

জংশন স্টেশনে স্বাধীনতা উপলক্ষ্যেই একটা বড় ফুটবল ম্যাচ ছিল, এইতেই বেশি যাত্রী টানে, কিন্তু বিশেষ কিছু পেলাম না চেক ক'রে। তিনদিকের তিনটি লাইনে বিকাল পর্যন্ত সাতখানা গাড়ি, শেষেরটা পর্যন্ত চেক করিয়ে এইবার স্টেশন-মাস্টারকে লাইন-ক্লিয়ার দিয়ে দিতে বলব, দেখি একেবারে ইঞ্জিনের ওদিক থেকে একজন পুলিস একটা 'কেস' নিয়ে আসছে, সঙ্গে একজন চেকার।

কেসটা একটু নূতন ধরনের মনে হোল। একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, তাও বেশি করে বয়সটা ধরলে। শ্যামবর্ণ, গড়ন-পিটন অনেকটা মেয়েলি ধরনের, চোখ দুটি নরম, মাথার চুল বড়, প্রায় সমান করে ছাঁটা এবং ইচ্ছা করে অবিন্যস্ত। সেই ধরনের ছেলে যাদের নোট লেখার খাতার মধ্যে থেকে এক-আধখানা কবিতার খাতা বেরিয়ে আসতে পারে. কিন্তু যাদের সম্বন্ধে টিকিট ফাঁকি দেওয়ার ডাংপিটেপনা কল্পনা করা যায় না। আমার অভিজ্ঞতায় এমন 'কেস' যে একেবারে না পেয়েছি এমন কথা বলতে পারি না, তবে ঠিক এইভাবে নয়। এই ধরনের ছেলে দু' শ্রেণীর সঙ্গীদের মাঝখানে যেন দোল খেতে থাকে। একশ্রেণী গুণগ্রাহী, 'বাহবা' দিয়ে দিয়ে কবিতার খাতা ভরায়, কেশে-বেশে শৃংখলা বা পৌরুষ আনতে দেয় না; অপর শ্রেণী টিটকিরি দিয়ে দিয়ে অনভ্যস্ত পৌরুষের ক্ষেত্রে টেনে আনবার চেষ্টা করে। এ-ধরনের ছেলে আমি দলের মধ্যে অল্প-স্বল্প পেয়েছি, একক অভিযানে পেলাম এই প্রথম।

শরীরটা একটু সামনে-ঝোঁকা। স্বাভাবিক চালে ওদিকে ঝুঁকেই আসছিল, বরং যেভাবে আসতে হচ্ছে তার জন্য একটু বেশি ঝুঁকেই. প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে একবার গাড়ির দিকে অল্প ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ বুকটা একটু চিতিয়ে নিয়ে খানিকটা দৃপ্ত চালেই আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিচার আরম্ভ করে দিলাম—

"কোথা থেকে আসছ?"

—নাম করল। এখান থেকে উত্তরে চতুর্থ স্টেশন। বেশ একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বড়গঞ্জ। ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা স্কুল, সম্প্রতি একটি কলেজেরও পত্তন হয়েছে। বিশেষ করে রাজনীতি ——— এবং মুষ্টি দুই বেশ

ল। মোটের ওপর আধুনিক অর্থে বেশ ‌তিশীল গ্রাম, এবং তার গতিবেগের দু'-টা ধাক্কা আমার আদালতকেও মাঝে মাঝে নুভব করতে হয়।

তবে, যেমন বলেছি, এ-ছেলে অন্য ধাতের; া-ছাড়াই বলতে হয়।

নাম জিজ্ঞেস করেও টের পাওয়া গেল া। বলল—"হিমানীকুমার সান্ন্যাল।" কি ন হয় জানি না, তবে এটা তো ঠিক যে, বাড়িতে ছেলের নাম হিমানী সে বাড়ির ‌পথ একটু ভিন্নই।

প্রশ্ন করলাম—"কর কি?"

"পড়ি।"

"কি পড়।"

"বি-এ; থার্ড ইয়ারে।"

"গ্রামের কলেজে?"

"না, এখানেই। ওখানে বি-এ এখনও লেনি।"

'খেলা দেখতে এসেছ?'

চুপ করেই রইল। তাগাদা দিতে মাথা নেড়ে াল—না।

"টিকিট কেননি কেন?"

এবার যা চুপ করল, তাগাদাতেও কোন ফল ল না।

"তাড়াতাড়িতে কেনা হয়নি?"—ওদের ফের যুক্তি আমিই এগিয়ে দিলাম। মাথা ড় জানাল—তা নয়। আরও একটা ছাড়লাম—

"তাহলে?—হারিয়ে গেছে?"

মাথা নেড়েই জানাল—তাও নয়। বললাম—বে, এমন কাজ করতে গেলে কেন? সাজাটা জান?—কতই বা লাগত? তার জায়গায় াশ টাকা পর্যন্ত ফাইন, না দাও জেল। না আছে তো?"

চুপ করেই রইল। অর্থাৎ—জানে। না ার কথাও তো নয়। নিত্যই হচ্ছে।

বললাম—"জানতো এমন কাজ করতে গেলে ন?......বাহাদুরি একটা?"

ঘাড় নীচু করেই চোখ তুলে তুলে উত্তর চ্ছল, এবার ঘাড়টা একটু সোজা হয়ে গেল। ৎ চেয়েও রইল এমনভাবে ফ্যালফ্যাল করে বেশ বোঝা যায় আন্দাজটা কাছাকাছি গেছে। ার দৃষ্টিটা আপনি আপনিই একবার সমস্ত ীরটার ওপর বুলিয়ে গেল, যেন খুঁজছে াদুরি করার লক্ষণ কোন্‌খানটায় পাওয়া ।

প্রশ্ন করলাম—"হঠাৎ এ খেয়াল এল কোথা ক?"

—বেশ দ্রুত মুষড়ে পড়ছে, প্রশ্নটার যরুক্তি করতে একবার গাড়িটার দিকে চকিতে র চেয়ে আবার তখনই ঘাড়টা ফিরিয়ে নিয়ে ময়েও নিল।

বেশ চওড়া প্ল্যাটফরম, গাড়ি থেকে নকটা দূরেই রয়েছি, তবু সংকোচ মনে ঃ বললাম—"আরও আস্তে আস্তেই না হয় া।" পুলিস, চেকার সবাইকে সরেও যেতে লাম। এমনি ম্যাজিস্ট্রেট চেকিংয়ের সময় াটফরম থাকেও খালি। বললাম—"এবার া।"

সহানুভূতির আভাস পেয়ে মুখের কাতর টা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু তেরছা দাঁড়িয়েছিল, আর একবার চকিতে গাড়ির ক চেয়ে নিয়ে এবার ... সমস্ত গাড়িটা পেছনে রেখে দাঁড়াল। মুখে আরও যতটা সম্ভব কাতর ভাব ফুটিয়ে বলল, "ছেড়ে দিন দয়া করে এবারটি, আর কখনও হবে না।"

'কেস' আর হাতে নেই বলে খুব সংক্ষিপ্ত করবার তাগিদ নেই; তা ভিন্ন কৌতুকও মনে হচ্ছে এবং অবসর থাকায় একটা গবেষণা বৃত্তিও মনে জেগে উঠেছে এদের বাহাদুরির প্রেরণাটা কোন কোন দিক থেকে আসে একটু তলিয়ে দেখবার। বললাম,—"দিতে পারি ছেড়ে, হঠাৎ বাহাদুরির খেয়ালটা এল কোথা থেকে যদি ভেঙে বল। অবশ্য ঠিক ঠিক; ফাঁকি চলবে না; বুঝতেই পার; এই কাজই করছি।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার সেই কাতর অনুনয়—"ছেড়ে দিন আমায়—দয়া করে। এই প্রথম, আর করবও না।"

"বাহাদুরির কথাটা বলতেই হবে।"

এরপর একটু মন থেকে জুড়েও দিলাম—"ছেলেমানুষদের অপরাধের কারণটা লেখা থাকলে আমাদের ছেড়ে দেওয়াও সহজ হয়..."

"লিখে রাখবেন!!" —বেশ শিউরে উঠেই কাতর স্বরে বলল—"না, লিখে রাখবেন না। তা হলে..."

"বেশ, আপত্তি থাকে তো লিখব না, তুমি বলো।" —একটু হেসেই বললাম; মনে বেশ সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আর একবার মাথাটা গাড়ির দিক থেকে ঘুরিয়ে এনে বলল—"এখানে নয়।"

বললাম—"বেশ, সে ব্যবস্থাও করছি।"

টিকিট-চেকারদের একটা ছোট কামরা আছে, তারা নিজেদের হিসাবপত্র করে সেখানে। খালি করিয়ে দুজনে সেখানে চলে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "বন্ধ করে দিই কপাট?"

মনে হলো তাই চায়। তারপর একবার ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির দিকে দেখে বলল—"না, দরকার নেই। আপনার গরম হবে।"

একটু হেসে বললাম—"তাতে তোমার ভয় নেই, ঠাণ্ডাই রাখব মাথা।......বেশ, আধ-ভেজানো করেই দাও না হয়।"

এগিয়ে গিয়ে মুখটা একটু বাড়িয়ে দেখে নিয়ে, অল্প ভেজিয়ে ফিরে এল। বললাম—"এবার বলো।"

বার দুই তাগাদা দিতেও এবার চুপ করেই রইল, শুধু ঘাড়টা প্রত্যেক বারেই একটু একটু করে নীচের দিকে নেমে গেল। তারপর কণ্ঠস্বরে একটু ধমকের ভাব আনতেই ঘাড় তুলে বলল—"ঐ মেয়েটা।"

"কোন্ মেয়েটা!!" —বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম। "ঐ যে সেকেন্ড ক্লাসে বসে আছে।" —প্রথমবারেও গাড়ির দিকে ঘাড় না ফিরিয়েই বলেছিল, এবারেও তাই। সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। আমি উঠে গিয়ে দোরের একটু আড়াল থেকেই দেখি—সত্যই একটি মেয়ে তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই দিকে চেয়ে আছে, আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। একটু বিমূঢ়-ভাবেই আস্তে আস্তে ফিরে এসে চেয়ারে বস-লাম। প্রশ্ন করলাম—

"মেয়েটি কে?"

"দীপ্তি ভাদুড়ি। আসছে বছর স্কুল ফাইনাল দেবে।" —সঠিক উত্তর কতকটা এড়িয়ে বলল।

"তোমার সঙ্গে সম্বন্ধটা?"

চুপ করে রইল। সোজাই প্রশ্ন করলাম এবার—

"ভালোবাসা আছে?"

মৌন। বোঝা গেল সম্মতিরই। প্রশ্ন করলাম—"ভালোবাসে তো এমন কাজে ঠেলল কেন?"

"ঠেলেনি।"

"তবে?"

"দুঃসাহসী চায়।"

এবার নিজেকেই চুপ করে থাকতে হোল একটু। এরা ছেলেগুলোকে নিয়ে করছে কি! প্রশ্ন করলাম—

"তা অন্য উপায় অবলম্বন করলে না কেন? যেমন ধরো ছাত থেকে লাফানো, কি..."

"খোঁড়া চাইবে না তো।"

"সাবধানী দুঃসাহসী? মনে হয় বিয়ের কথাও হচ্ছে। কি?"

ঘাড়টা আবার একটু হেঁট হোল। আর লজ্জার দিকটা না টেনে বললাম—

"ও ও নিশ্চয় বিনা টিকিটে নেই? সাহস তো দেখলে, এবার দিয়ে দিতে পারবে ভাড়াটা? আমি সেটুকু নিয়েই না হয় ছেড়ে দোব। হ্যাঁ, একটা কথা..."

একটু বিমূঢ় হয়ে পড়বার জন্যই আমারও গুলিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—"একাই এসেছ, না, কারুর সঙ্গে? ...বীর জায়া হতে চায় তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। পরীক্ষা নিতেই আসা তো।"

প্রশ্নোত্তরে একটি ছোট কাহিনী যে বেরিয়ে এল তা মোটামুটি এই—

মেয়েটি স্কুলে একটু হুজুগে মাতামাতি নিয়ে থাকে। একেবারে লীডার না হোক, লীডা-রের সমীপচারিণী বটেই। কানাঘুষোয় একটা কথা বেরিয়ে পড়েছিল যে নিতান্ত রেল আইন ভঙ্গ জাতীয় কিছু না হোক, স্কুল থেকেও ছোটখাটো কিছু করতে চায় ওরা। এই কারণেই সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে দীপ্তি ভাদুড়িকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সে তার অনুরাগীর শৌর্য প্রত্যক্ষ করতেই যে এসেছে এমন না। নিয়ে যাচ্ছেন তার মামা। তিনি হিমানীকে চেনেনও না।

দীপ্তি হিমানীকে প্ররোচিতও করেনি। মামা তাকে চেনেন না, দীপ্তি যাচ্ছে, এই সুযোগে বেরিয়ে পড়েছে হিমানী। ম্যাজিস্ট্রেটের চেকিং চলবে খবর পেয়ে বিনা-টিকিটে রেল যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর একটা সুবিধা হয়েছে যে ভীড় না থাকায় দীপ্তির চোখে পড়েও যাবে সহজে।

ছেলেমানুষীর বহর দেখে মায়াও হয়। মোহান্ধ যুবক, অত না ভেবেই নিশ্চয় একটা চিত্র গড়ে নিয়েছিল মনে মনে বুক ফুলিয়ে পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে স্টেশনের মাঝখান দিয়ে যাবে—দীপ্তির বিস্মিত দৃষ্টি এসে পড়বেই। তারপর আর চোখ ফেরাতে পারবে না। দৃপ্তভঙ্গিতে দিয়ে যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কথার উত্তর—রেল আমাদের একথাটা স্বাধীনতা দিনে আমরা এইভাবেই চাই বোঝাতে।...যুক্তি ঠিক কিনা সেকথা তো আসে না—দুঃসাহস।

দীপ্তি মামার পাশে থেকে দেখবে।

যা হোল, একেবারেই কল্পনা করতে পারেনি। ও-ধাতের নয়, একেবারে ভেঙে পড়েছে।

একবার নেড়েচেড়ে দেখবার জন্য বললাম—"তাহলে, কি করবে এখন? দুঃসাহসের কাজ করেছ না হয় টের পেল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে কিনা জানা চাইতো ওর। সেইটেই তো আসল।"

সত্য কথা বলতে কি রোমান্সের অভিনবত্বটুকু আমার মনটা একটু করেছেই বিচলিত, বিশেষ করে মেয়েটির ভীত-উদ্বিগ্ন মুখখানি দেখবার পর থেকে যেন আরও। বললাম—"বেশ, দিচ্ছি ছেড়ে। না হয় বানিয়েই বোল'খন যে..."

"আমি মিথ্যে কথা বলি না। দীপা জানে সেটা।"

আবার চাইতে হোল বিস্মিত হয়েই। সত্যই মুখে সে ছাপটা আছে—নিরীহ সত্যবাদী ছেলের মুখের ছাপ। মনে তবু কিসের জন্যে যেন একটা সুড়সুড়ি লাগছেই. বললাম—"কেন, এইতো বেশ সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছ তার কাছে: সৎ সাহস!"

"দুঃসাহস তো নয়।"

একটু সজোরেই হেসে উঠতে হোল।

তারপর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেল আমার। মনটা বড় টানছে: এবার আবার দুটিতে। বললাম—"তুমি এক কাজ করো। একটু মিছে হয়তো হবে, তবে খুব বেশি নয়। তা ভিন্ন—নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ এ্যাণ্ড ওয়ার, জানই তো—ভালোবাসা আর লড়াইতে অত দেখতে গেলে চলেও না।"

বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলায়, তার ওপর সহানুভূতির ভাবটাও একটু রয়েছে দেখে জড়তাটা কেটে গেছে খানিকটা। ইংরেজী প্রবাদটাও বাইরে-বাইরে একটু লজ্জিত করে তুললেও ভেতরটা নিশ্চয় কতকটা চাঙ্গা করেই তুলে থাকবে। একটু যেন বুক টেনে নিজেকে সিধা করে নিয়েই বলল—"বলুন।"

পকেট থেকে পার্সটা বের করে দুখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললাম—"নাও......নাও, ধরো, আপত্তির কিছু নেই আমার নোট আমার কাছেই ফিরে আসবে এখুনি। প্লাটফরমে চলো।...থিয়েটার করা অভ্যেস আছে?"

"একটু একটু।"—বেশ একটু হতচকিতভাবেই চেয়ে বলল।

"কিসের পার্ট?"

"ফিমেল। কলেজের থিয়েটারে।"

দৃষ্টিটা সমস্ত শরীরটুকুর ওপর দিয়ে ঘুরে এল আর একবার অন্য পার্ট আশা করাই ভুল। বললাম—"তাইতেও হবে। ওরাও তো সব রসের পার্ট করছে আজকাল। তুমি বেরুতে বেরুতে এই নোট দুখানা আমার দিকে বাড়িয়ে—নাকের কাছে ধরতে পারলেই ভালো—বলবে—'কী মশাই! বিনাটিকিটে এসেছি তো এসেছি, তার জন্যে এত চোখ রাঙানি দেন কাকে? এই নিন আপনার জরিমানা, ব্যস! অত কথার ধারধারি না!

বেশ জোর গলায় বলতে হবে আরও যদি রোখের মাথায় কিছু বলতে পারো।...না, রাগ করব না, আমিই তো তালিম দিচ্ছি। নাও, আমি সুরু করছি...'

ভেতর থেকেই আরম্ভ করে দিলাম একটু হুমকি, চেঁচামেচি বেরুতে বেরুতে বেশ স্টার্টটুকু নিল হাত তুলে নোট দুখানা দোলাতে দোলাতে। গাড়ি-প্লাটফরমসুদ্ধ সমস্ত স্টেশনটা চকিত হয়ে উঠেছে হঠাৎ ঘটনা পরিবর্তনে। আমার যা প্রধান দ্রষ্টব্য—মেয়েটিও বিস্মিত-প্রশংসায় জানালার পাশে সোজা হয়ে বসেছে...

কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। ভয়, এক স্টেশন লোকের সামনে লজ্জা, দীপ্তিও রয়েছে, সবার ওপর বোধ হয় আমার এই দরদের প্রলেপ—আধাআধি পর্যন্ত কোন রকমে এগল, তারপরেই নোটসুদ্ধ দুটো হাতে মুখটা ঢেকে একেবারে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল।

মেয়েটির দিকেও গেল বৈকি দৃষ্টি আমার। যেন গাড়ি থেকে নেমে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। শুধু বুঝতে পারলাম না বরমাল্য নিয়ে, কি ধিক্কার, কি দরদ ভরা সান্ত্বনা।
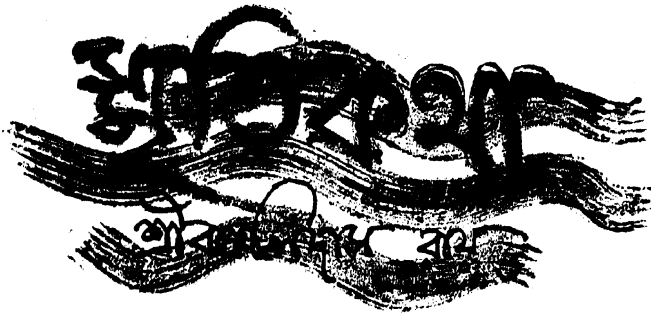
(বীরবল)

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ম'শায়ের সংগে আমার আলাপ হয় রংগপুর সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে। বছরটা ঠিক মনে নেই, ১৯১৬।১৭ সাল এইরূপ হবে। ডিমলার রাজবাড়ীতে গার্ডেন পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল ডেলিগেটদের। সেই পার্টিতে পুরাতত্ত্বজ্ঞ রমাপ্রসাদ চন্দ কিংবা রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ঠিক মনে নেই) চৌধুরী ম'শায়ের সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন। বীরবল বললেন—"তবে ত একটা Poets' Corner খুঁজে নিয়ে বসতে হয়।" এক কোণে একটা ছোট টেবিলের পাশে গিয়ে দুজনে বস্‌লাম।

আমি তখন রংগপুর জেলায় একটি স্কুলের হেডমাষ্টার। আমার সাধারণ পরিচয় ও কাজ কর্মের সম্বন্ধে দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্ন করলেন—"কি লিখছেন আজকাল?"

আমি—কবিতাই লিখি মাঝে মাঝে। আর কি লিখব?

বীরবল—গদ্য লিখুন—কবিরাই সব চেয়ে সরস গদ্য লিখতে পারেন। অনেক ভালো ভালো গদ্য লিখিয়েরা প্রথম জীবনে কবিতা লিখে হাত পাকিয়েছিলেন শুধু এদেশে নয়—ইউরোপেও।

আমি—গদ্য লিখতে গেলে উপযুক্ত বিষয়-বস্তুও চাই,—অনেক পড়াশুনা করার দরকার। সে সুবিধা এখানে নেই। গল্প উপন্যাস আমার কলমে আসে না।

বীরবল—এটা আপনাদের ভুল ধারণা। যে ভাব ও কল্পনায় কবিতা হচ্ছে—সেই ভাব ও কল্পনাতেই কথাসাহিত্য না হোক, প্রবন্ধ-সাহিত্য হতে পারে। তথাকথিত সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনার কথা বলছি না।

গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পণ্ডিতরা লিখুন—আমি বলছি প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা। হাতে বিদ্যে থাকলেও তা সংবরণ করতে হবে। আমার বিশ্বাস কবিরাই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্য রচনা করতে পারেন।

আমি—চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কে ছাপবে?

বীরবল—আমি ছাপব?

আমি—আপনার সবুজপত্রের সঙ্গে খাপ খায় এমন ভাষা বা ষ্টাইল আমি কোথায় পাব, স্যার?

বীরবল—আপনি লিখুন ত—তারপর খাপ খাওয়ানোর জন্য যেটুকু দরকার তা আমি করে নেব, যদি সে স্বাধীনতা আমাকে দেন। আপনার কবিতায় আমি কলম ছোঁয়াই না। কবিতাগুলো সব রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাই। মাঝে মাঝে যে ২।৪ লাইনের বদল দেখবেন তা তাঁরি হাতের।

এ সংবাদ পেয়ে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। গদ্য প্রবন্ধ লেখার কথা তখন পর্যন্ত আমার মনে আসেনি। বীরবলের কথায় আমি উৎসাহিত হ'লাম। কিন্তু কোন প্রবন্ধ লিখে তাঁর কাছে পাঠাইনি। কারণ, আমার সংকোচ কাটেনি।

সবুজপত্রের প্রসংগ চলতে থাকল। তিনি বললেন—যারা ওজনদরে বা গজের মাপে সাহিত্য বিচার করে তাদের জন্য এ কাগজ নয়। কাগজের পাতা আমি বাড়াব না, ভালো মোটা কাগজে বড় অক্ষরে ছেপেই এর বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছি।

আমি—বিজ্ঞাপন না নিয়ে কি চলবে?

বীরবল—নিছক সাহিত্য সেবার জন্য এ পত্রিকা, ব্যবসার সংগে এর কোন সম্পর্ক রাখতে চাইনা। তাতে লোকসান হয়ত হবে—সেজন্য ছবিটবি দিয়ে বা আয়তন বাড়িয়ে খরচ বাড়াতেও চাই না। লাভ কি হবে তা লক্ষ্য নয়—লোকসান কতটা কম হতে পারে—তাই হলো লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সৎসাহিত্য সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য, এর জন্য দাম যা দিতে হয় তা দিতেই হবে। গাইএর বাঁটে বাছুর মুখ দিলে সে যে দুধ দেয় না তা নয়, অধিকতর দুধ আদায় করতে হলে বাছুর গাইএর পালানে ঢুঁ মারে। সবুজপত্র সেই ঢুঁ মেরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাধেনুর কাছ থেকে বেশি দুধ আদায় করতে পারছে। কবি ইচ্ছা সুখে যে সব লেখা লিখতেন না—সে সব লেখা সবুজপত্রের তাগিদে তাঁকে লিখতে হচ্ছে। বাইরের দাবিটা যে রচনার পক্ষে একটা মস্ত প্রেরণা, কবি নিজেই তা স্বীকার করেন। সাধনার যুগ থেকে বাইরের তাগিদ তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ রচনার প্রেরণা দিয়েছে। সবুজপত্রের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে সে তাগিদ। এই হলো আমার একমাত্র ভরসা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'সভার বক্তৃতাগুলো আপনার কেমন লাগল?

বীরবল—Flatulent platitudes।

আমি—বিষয়বস্তু বড় কম, কেবল বাক্যজালের বিস্তার এবং নিতান্ত মামুলী ব্যাপার, তাই নয়?

স্যার আশুতোষ একদিন সভাপতিত্ব করে চলে গেলেন—যাবার সময় সভাপতির আসনে বসিয়ে গেলেন শশধর রায়কে। যাদবেশ্বর পণ্ডিত মশায় দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আশুতোষ চলে গেলেন ভবানীপুরে—তাঁর ললাটের শশধরকে রেখে গেলেন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য। আর চারিদিকে খুব হাততালি পড়ল।

বীরবল—এই রকম দু-চারটে সম্মেলনে যোগ দিলে সংস্কৃতে তর্জমা করা সাধুভাষার ঘটাছটা আড়ম্বরে বিভ্রান্ত হলে, মাতৃভাষাই ভুলে যেতে হয়।

আমি—আপনি এই সম্মেলনে এত দূরে আসবেন—তা প্রত্যাশাই করিনি।

বীরবল—আরে ম'শায়। এটা যে উত্তরবংগ সাহিত্য-সম্মেলন—আর আমি যে উত্তরবংগেরই লোক। এ'রা আমাকে বোঝালেন—আমিই সবেধন নীলমণি। না এসে উপায় ছিল না। কিন্তু দেখেছেন আমি কোন পার্ট নিইনি। উত্তরবংগে যথেষ্ট বড় বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী রয়েছেন। আমি আর কি করব?

আমি—আমার কিন্তু খুব লাভ হয়ে গেল আপনার সংগে পরিচয়ে।

বীরবল—কল্‌কাতায় গেলে দেখা করবেন। আমার একটা ইণ্টগোষ্ঠী আছে।

তারপর কল্‌কাতায় তাঁর ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর সংগে দেখা করেছিলাম কিছুকাল পরে। তখন আমার ব্রজবেণু বেরিয়েছিল। মালঞ্চ পত্রিকায় ব্রজবেণুর সমালোচনা বা'র হলে—তা নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ বেধে যায়। এই বাদানুবাদে যোগ দিয়েছিলেন—আমার বন্ধু কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, মালঞ্চ সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। বৈষ্ণব পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ। কাব্যের গুণাগুণ বিচার তাতে নগণ্য ও গৌণ হয়ে পড়েছিল—বৈষ্ণব পদাবলী প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক বস্তু কিনা এই প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। বন্ধুবর বিজয়কৃষ্ণ এই বাদানুবাদের একটা মীমাংসার জন্য প্রমথ চৌধুরী মশায়কে সালিশ মানেন। তিনি তখনও ব্রজবেণু পড়েননি—তাঁকে তখনও বই দিইনি। তার কারণ, আমার বিশ্বাস ছিল, যে বই দেশবন্ধুর খুব ভালো লেগেছিল, তা তাঁর ভালো লাগতে পারে না। তিনি আলোচনার কাপিগুলি পড়ে কি মতামত জানিয়েছিলেন, তা বছর তিন-চার আগের পূজার সময়ে প্রকাশিত দৈনিক বসুমতীর বার্ষিক সংখ্যায় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষকে লেখা দুখানি চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীকে অনাধ্যাত্মিক রোমাণ্টিক কবিতাই মনে করতেন। তিনি পত্রে লিখেছেন—"যদি আমাদের আটপৌরে হৃদয়বৃত্তিগুলি আধ্যাত্মিক হয়, তাহলে অবশ্য জয়দেব থেকে দাশুরায় পর্যন্ত সকল কবিই সমান আধ্যাত্মিক। আর যদি আত্মা অর্থে আমাদের সাংসারিক মনের অতিরিক্ত কোন বস্তু বুঝায় তাহলে ও সব কবির লেখায় আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই।"

পরিচয়পত্রে সসীম অসীমের কথা আছে ব'লেই কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করবে এ কথা তিনি স্বীকার করেননি। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন এক চিঠিতে—"নবীন কবিরা এই মামুলী ব্যাপারের মধ্যে একটা অনন্ত ও চিরন্তন তথ্য দেখতে চান, তাহলে অন্ততঃ এযুগে তাঁদের দৃষ্টি রক্ত মাংসের সীমায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না।"

বিজয় আমাকে চৌধুরী মশায়ের মতামত জানালে একদিন গিয়ে তাঁকে একখানা ব্রজবেণু দিয়ে এলাম। ৫।৭ দিন পরে আবার গেলাম। এবার তিনি আর আপনি সম্বোধন করলেন না।

বীরবল—ওহে তোমার ব্রজবেণু পড়লাম—এ যুগে ব্রজবেণু বিশ্ববেণু হওয়া উচিত ছিল।

আমি—কি করে করি স্যার! তাহলে যে রসাভাস হয়ে যাবে। যদি কবিতাগুলোয় মধ্যে

পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, অনন্ত, চিরন্তনের—এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কোন ইঙ্গিত ব্যঞ্জনাও থাকত তাহলেই আসল বৈষ্ণবদের কাছে তা রসাভাস হয়ে যেত। পদকর্তারা সে রসাভাস এড়িয়ে গেছেন।

বীরবল—সেজন্যইত পদকর্তাদের পদাবলী রোমান্টিক ও লৌকিক কাব্য হয়েছে—মিস্টিক বা আধ্যাত্মিক সাহিত্য হয়নি।

আমি—পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা অন্তর্নিহিত নয়, আরোপিত। তাঁরা শুধু কবি ছিলেন না—সাধকও ছিলেন। তাঁদের জীবন হতে আধ্যাত্মিকতা আরোপিত হয়েছে। তাঁদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মূলে একটা দার্শনিকতা ছিল, শ্রীচৈতন্যের পর এই দার্শনিকতা সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের আবেষ্টনীতে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল—তাঁদের শ্রোতা বা পাঠকের মন রাধাকৃষ্ণের লীলা মাধুর্যে পরিষিক্ত হয়েছিল। ফলে লীলাতত্ত্ব ও তদ্দ্বারা আবিষ্ট আবেষ্টনী হতে পদাবলী আধ্যাত্মিক সার্থকতা লাভ করত। কাজেই তাঁরা Intrinsic Spiritualism এড়িয়ে গেছেন।

বীরবল—বেশ কথা—আজ সে আবেষ্টনী কোথা? সে শ্রোতা কোথা? সে সাধক জীবনই বা কোথা? তুমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য? তুমি এ যুগে পদাবলী কার ভরসায় লিখলে?

আমি—লীলাতত্ত্বটা অনেকে জানেন। ভাবলাম তাঁদের কাছে এগুলো spiritual বা Symbolical significance পেতে পারবে। আর যারা লীলাতত্ত্ব বুঝেনা তাদের কাছে Pastoral poems হিসাবে আদর পাবে। রবীন্দ্রনাথের mysticism অনুসরণ করার শক্তি আমার নেই।

বীরবল—তবে এখন বলি। তোমার ব্রজবেণু বিশ্ববেণু হয়নি বটে কিন্তু বঙ্গবেণু হয়েছে। এজন্যই আমার ভাল লেগেছে। তুমি ব্রজ কথাটা কেটে অনায়াসে বঙ্গ বসিয়ে দিতে পার। এতে আমি বাংলার মাঠ ঘাট, বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মা, বাংলা পল্লীর কিশোরী যুবতীদের, বাংলার গোপ রাখালদের পেয়েছি—আর পেয়েছি সেই কিশোরী গোপ-কন্যাটিকে যে রাখালিয়া বাঁশী শুনে ঘরের কাজে মন দিতে পারে না।

আমি—তাহলেই যথেষ্ট হ'ল—এর বেশি কিছু আমি দাবি করি না।

বীরবল—তুমি ত দাবি কর না, তোমার সমালোচকরা যে ব্রজবেণুকে ব্রহ্মবেণু বানাতে চাচ্ছে। তার কি? তাই নিয়েইত বিজয়ের সঙ্গে অনেক পত্রালাপ করতে হয়েছে।

আমি—ও সব দাবিটাবি আমার নেই স্যার। আমি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের শিষ্য।

বীরবল—রাধাকৃষ্ণের মারফতে দেশের অনেক কবিই আদি রসের কবিতা চালিয়েছেন। তোমার বই-এ অবশ্য আদি রসের কবিতা বিশেষ কিছু নেই। সখ্য বাৎসল্য রসের কবিতাই বেশী। তোমার তো রাধা বাদ দিলে বেশ চলত।

আমি—আমার বৃন্দাবনের পট-ভূমিকার দরকার হয়েছিল প্রধানতঃ বাৎসল্য ও সখ্য রসের জন্য।

বীরবল—তা ঠিক, সখ্য রসের কবিতাগুলোই বেশ জমেছে—এ সখ্য বৃন্দাবনের বাইরে পাওয়া সোজা নয়।

কোন পত্রিকায় সনেট পঞ্চাশতের তীব্র সমালোচনা বের হয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে আমি এর একটা উত্তর ছেপেছিলাম। প্রধান বক্তব্য ছিল। 'সনেটগুলো একটা Experimental effort—লঘু হস্তে হালকা চালে অনেকটা Seriocomic ভঙ্গীতে লেখা। বীরবলের শ্রেষ্ঠ রচনা এগুলো নয়। কর্মের দিক থেকে এগুলোর মূল্য বিচার করতে হবে। এগুলোকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া ঠিক হয়নি। এটা পড়ে আমার এক বন্ধু (বোধ হয় সুনীতিকুমার) আমাকে বলেছিল—'বেশ ভাই, সনেট পঞ্চাশতের কবিকে তো সমর্থন করলে, এদিকে তাঁর বালিকা বধূ সনেটে তোমার বালিকা বধূ কবিতাটাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পড়ে দেখলাম, গেলাম ব্রাইট স্ট্রীটে। বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলাম 'এ কি আমার 'বালিকা বধূ' কবিতাটা পড়ে লিখেছেন স্যার?'

বীরবল—কই? তোমার বালিকা বধূ ব'লে কবিতা আছে নাকি? আমি ত পড়িনি। এটা আমার বাল্য বিবাহকে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা। বালিকা বধূ নিয়ে ২।৪টা কবিতাও পড়েছি। দীনেশবাবু বলেন, বাল্যকালে বিবাহ হলেও যৌবনপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত ৩।৪ বছর বর-বধূর পূর্বরাগের কাল। বাল্য বিবাহ এখন সভ্য সমাজে উঠে যাচ্ছে—এখন আর ওরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে বালাবধূ নিয়ে বাড়াবাড়ি কবিতায় শোভা পায় না। এখন কেউ যদি কুলীন কন্যার খেদ লেখেন—তবে তা কি উপভোগের যোগ্য হবে? এখন বালিকা বধূ নিয়ে আদিখ্যেতা করলে কৃষ্ণকীর্তনের যুগে মনকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে উপভোগ করতে হবে।

আমার বালিকা বধূ আর তাঁকে পড়তে দিইনি। পর্ণপুটের পরবর্তী সংস্করণে বালিকা বধূকে কিশোরী বধূ বানালাম, যুবতী বধূ ত আর চলে না। সেটা মিথ্যা কথা হবে।

আর একদিনের কথা। বীরবলকে বললাম,—'স্যার, চলতি ভাষার ব্যারিস্টারিতে আপনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন—লোকে বলছে—অবশ্য এরাও চলতি ভাষার পক্ষপাতী।

বীরবল—কি বাড়াবাড়ি বল'ত।

আমি—চলতি ক্রিয়াপদ চলুক, চলতি অসংস্কৃত শব্দও চলুক, তৎসম শব্দের বদলে তদ্ভব শব্দের প্রয়োগও চলুক, কিন্তু ভগ্ন তৎসম শব্দগুলোকেও লেখাতে চালাতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে।

বীরবল—যেমন?

আমি—যেমন নেমন্তন্ন, মাগ্গি, বেস্পতি, ছেরাদ্দ, পেল্লয়, অবিশ্যি অভ্যেস, মোদ্দা কথা, এদান্তী।

বীরবল—দেখ প্রাচীন বাংলাতেও ভগ্ন তৎসম শব্দ বহুৎ চলত যেমন—বিভা (বিবাহ), ব্যভার (ব্যবহার) বেকত (ব্যক্ত) ছিরি (শ্রী)। তা ছাড়া দেখ, তদ্ভব শব্দগুলোও একদিন ভগ্নতৎসমই ছিল, আজ তারা কৌলীন্য পেয়েছে, এগুলোও ক্রমে কৌলীন্য পাবে।

আমি—এর ত শেষ নেই—নানা স্থানের নানাজনের মুখের চলতি কথায় নতুন নতুন ভগ্নতৎসম রূপ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ক্রমে যে বাংলা ভাষা Slang এ ভ'রে যাবে। হুতোমী ভাষাও তাতে লজ্জা পাবে। বিনয় সরকার ত একে মুটে-মজুরের মুখের ভাষায় পরিণত করতে চাচ্ছেন।

বীরবল—আমার মনে হয় এর একটি Standard ঠিক হয়ে যাবে। চলতি শব্দেরও ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হবে। এ ভাষা চললেই তা হবেই। বলো না তোমার বন্ধুকে

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায়)

জয়তু আফ্রিকা
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মৌন মহারণ্যে জাগে নব-জীবনের
আলো ঝলমল প্রভাত।
জাগে গণতন্ত্রের গরিমাময়ী ঊষা!
আফ্রিকা, ভারতের কবি
একদা তোমাকে বলেছিল, 'মান-হারা মানবী'।
সেই মান-হারা মানবীর উন্নত শিরে
আজ বিজয়িনীর মুকুটমণির জ্যোতিঃ।
আফ্রিকা, তোমার এই মহাজাগরণের
ব্রাহ্ম মুহূর্তে গ্রহণ করো
নগণ্য এক বাঙালী কবির অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য।

নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদ অর্থ লালসায় উন্মত্ত হ'য়ে
দলিত মথিত করেছে তোমার হৃদয়,
দুঃসহ দুঃখের সুতীক্ষ্ম হলমুখে
দীর্ণ-বিদীর্ণ হ'য়েছে তোমার প্রাণ।
ক জানতো সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রন্ধ্রপথে
একদা বেরিয়ে আসবে নূতন প্রাণের শ্যামাঙ্কুর!
দেখতে পাচ্ছি, একটা দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের
জয়যাত্রা সুরু হয়েছে তোমার দিগ্‌দিগন্তে।
এই দিগন্তপ্রসারী অভিযানকে আমি
অভিনন্দিত করি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে।

ওদের সমুদ্র পার হ'তে কখন এলো
ঐ অর্থগৃধ্নু নরশিকারীর দল!
ওদের ক্ষুধিত চোখের শাণিত দৃষ্টিতে
লালসার লেলিহান শিখা!
তোমার নিস্তব্ধ অরণ্যের মৃগপক্ষীদের সচকিত
ক'রে মুহুর্মুহু গর্জাতে লাগলো ওদের
আগ্নেয়াস্ত্র:
স্বচ্ছন্দবিহারী বনাকুঞ্জরেরা
ধূলোয় পড়লো লুটিয়ে।
গজদন্তের পাহাড় জমতে লাগলো
লোভাতুর বণিকদের কুঠিতে কুঠিতে।

ওরে, হিংসার অভিযান যদি
জানোয়ারে এসে ফুরিয়ে যেতো;
কিন্তু লোভ ওদের গজদন্তে
সীমাবদ্ধ রইলো না।
শিকারীরা জীবন্ত মানুষকে
পরিণত করলো পণ্যদ্রব্যে।
মানুষের জীবন নিয়ে
চলতে লাগলো ছিনিমিনি খেলা।
আর্তনাদ উঠলো নদীতীরের
শান্ত লোকালয়ে লোকালয়ে,
সজল বনভূমির স্নিগ্ধচ্ছায়ায়
নিগ্রোদের কুটিরে কুটিরে,
গম্ভীর পর্বতমালার
নিদ্রাতুর উপত্যকায় উপত্যকায়।
আহত নরদেবতার মর্মভেদী হাহাকারে
কালো মহাদেশের আকাশ উঠলো মুখর হ'য়ে।

বাণিজ্য তরণীগুলি চলেছে আফ্রিকা থেকে
নূতন মহাদেশের উপকূলে,
মাল ভর্তি শিকলে বাঁধা
নর-নারী—যেন বলির পশু।

ভয়ার্ত পশুপাল চলেছে কোন্
নিষ্ঠুর রাজার যজ্ঞভূমিতে প্রাণ দিতে!
ওদের ভীতিবিহ্বল চোখে কিসের বিভীষিকা!
ওদের মনে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দেয় পিছনে
ফেলে-আসা স্বাধীন জীবনের সোনালি ছবি।

হীরের লোভে কাতারে কাতারে আসতে লাগলো
স্বার্থপিশাচ মুনাফাখোরের দল!
ভগবান যাদের মানুষ ক'রে তৈরী করেছিলেন
তারা হ'য়ে গেল খনির কুলি! নরনারায়ণ
পর্যবসিত হোলো বস্তুতে।
সিগার শ্যাম্পেন আর মোটরের উদগ্র লোভে
ভাই ভাইকে পরিণত করলো সহায়-সম্বলহীন
ক্রীতদাসে।
দরিদ্রের রুধিরে ফেঁপে উঠলো
স্বর্ণপাগলদের ঐশ্বর্য।

রাবণের মৃত্যুবাণ ছিল রাবণেরই ঘরে।
পশ্চিমেরও মৃত্যুবাণ তৈরী হ'তে
লাগলো পশ্চিমেরই অন্তঃপুরে।
অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজ তৈরী করতে লাগলো
আফ্রিকার ভাবী বিপ্লবকে স্তন্যরস দিয়ে।

পশ্চিমী ভাবধারার স্তন্যরস পান ক'রে
প্রস্তুত হোলো যাদের মন
তারা একে একে ফিরে এলো ঘরে!
তাদের হাতে যুগান্তরের জয়ধ্বজা,
চোখে স্বাধীন আফ্রিকার স্বপ্ন,
কণ্ঠে সাম্যের আর মৈত্রীর প্রশস্তি।
তাদের আত্মায় আফ্রিকা, মগজে ইউরোপ।
প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংগমে দাঁড়িয়ে
তারা ডাক দিলো, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।'
প্রাণের আহ্বানে প্রাণ দিলো সাড়া।

যুগ-যুগান্তের জড়তা থেকে জাগে
ঐ 'মানহারা মানবী!'
জাগে নাক্রুমার ঘানা, নাসেরের মিশর
আর লুমুম্বার কংগো।
জাগে কেনিয়াট্টার, কাউণ্ডার আর
বান্দার স্বপ্নের আফ্রিকা।
জাগে আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া,
গিনি, নিয়াসাল্যাণ্ড।
জাগে রোডেসিয়া, লাইবেরিয়া,
নাইজিরিয়া আর সোমালিল্যাণ্ড।

অত্যাচারীরা দিগন্তে মিলিয়ে যায়
কুয়াশার মতো।
স্বাধীনতা অমর! সাম্য চিরজীবী!
গণতন্ত্র মৃত্যুঞ্জয়।
আফ্রিকা, তোমার নবজন্মের এই প্রভাতে
আবার গ্রহণ করো আমার প্রণাম।

দেলি
মরিস স্যাভ (১৫১০-১৫৬৪)
অনুবাদ/অরুণ মিত্র

[তিন শ' বছরের উপেক্ষার পর ষোড়শ শতাব্দীর কবি মরিস স্যাভ আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ফরাসী কাব্যের একটি প্রধান ধারার তিনি উদ্বোধক। শিল্পী হিসেবে তাঁর সঙ্গে মালার্মে'র তুলনা করা হয় কোনো কোনো বিষয়ে। স্যাভের বিখ্যাত প্রেমের কাব্য 'দেলি'। দশ ছত্রের এক একটি স্তবকে এ কাব্য রচিত। দুটি স্তবক অনুবাদ করে এখানে দেওয়া হল। —অনুবাদক]

(১)

হেকাতের মতো তুমি
আমারে ঘুরাবে অনিবার
জীবিত বা মৃত শত বর্ষকাল
ছায়ার ভিতরে;
দিয়ানের মতো তুমি বাঁধিয়াছ
মোরে অমরার
গৃহ হতে, নামিয়াছি হেথা
এই মর্ত্যভূমি 'পরে;
ছায়ার রাজ্যের রাণী,
আমার দুঃখেরে হেলাভরে
কমাবে বাড়াবে তুমি
সুনিশ্চিত জানি তাহা হায়।
দেলি, তুমি চন্দ্রমার মতো
মোর শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত ছিলে, আছ,
রবে নিত্য একান্ত নিভৃতে,
প্রেম তোমা বাঁধিয়াছে
আমার নিষ্ফল ভাবনায়
এমন বন্ধনে যারে মৃত্যু কভু
পারে না খুলিতে।

(২)

তব উপস্থিতি-ভরা
মধুর সে বিগত দিবস
ছিল যেন অন্ধকার শীতে
এক কবোষ্ণ বিহার,
তুমি নাই, তাই রাত্রি;
নিরালোক এ রাত্রি বিবশ,
বিঘ্নিত বাঁচার মাঝে
দেহ মোর পায় যে আঁধার
তার চেয়ে বহুগুণ অন্ধকার
এ রাত্রি আমার
হৃদয়ের চোখে,
তাই অর্থহীন আমার জীবন।
যে মুহূর্ত হতে তুমি
গেছ চলি, আমি অনুক্ষণ
শশকের মতো বসি'
বিবরে ভুলিয়া দিবা সাঁঝ
উৎকর্ণ শুনেছি শুধু
একাকার জটিল গুঞ্জন,
সবই যে হারায়ে গেছে
মিশরের অন্ধকারে আজ।

ঘরটা যথাসম্ভব ভূতের গল্পের উপযোগী করে নিয়েছি। শাদা আলোর বদলে ঘরে নীল আলো জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনো দেশে অন্য কারো ঘরে বসে আছি।

আমার সকল ভৌতিক গল্পের উৎস শ্রীমতী বেবি, আমার নতুন অভিজ্ঞতার কথা শুনবে বলে ব্যাকুলভাবে বসে আছে আমার সামনে। তাকে আমি আমার সকল ভূতের গল্প বলতে বাধ্য, কারণ তার দাবীতেই আমি ভূত দেখতে আরম্ভ করেছি কিছুদিন হল।

সব গল্পই শুনিয়েছি তাকে, কোনোটায় ভয় পেয়েছে, কোনোটায় পায়নি। এবারে তার দাবী ছিল খুব বেশি ভয় না হয় এমন গল্প বলতে হবে, অথচ নিতান্ত জল মেশানো হলেও চলবে না। অর্থাৎ এমন গল্প যাতে শুধু রোমাঞ্চ আছে, বিভীষিকা নেই। কিন্তু আমি তো বানিয়ে বানিয়ে ভূতের গল্প বলি না। বছরে ভূত দেখি মাত্র চার-পাঁচটা, তাও আবার সব ভূতে গল্প হয় না। বছরে দুটো গল্পগর্ভ ভূতের দেখা পেলেই আমি খুশি।

কিন্তু এবারে যা দেখেছি তা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখেনি, দেখবে বলে কল্পনাও করেনি।

শোন বেবি, আমি এবারে ভূতের বিরাট এক দেশ দেখে এসেছি। দেশটা হিমালয়ের কোনো এক দুর্গম পাহাড়ে। সেখানে গহন বন আর হিংস্র জন্তু, আর পাহাড়ী ঝর্ণা। সেই পথেই গিয়েছিলাম মনে পড়ে। কিন্তু সেই ভূতের দেশটা পাহাড়ের পিঠের উপর না পেটের মধ্যে, তা জোর করে বলতে পারছি না। সে এমন দেশ যে সেখানে মানুষ যেতে পারে না, আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সেখানে অধিকাংশ ভূতই জীবনে কখনও মানুষ দেখেনি।

"তা হলে আপনি সেখানে গেলেন কি করে?" —বেবি প্রশ্ন করল।

যুক্তিসংগত প্রশ্ন। কিন্তু ভূতের দেশের যুক্তি কি আর মানুষের দেশে চলে? বেবির যুক্তিটা শুধু কলেজে পড়া লজিকের পথে। যথা—কোনো মানুষ যেতে পারে না, আমি মানুষ অতএব আমিও যেতে পারি না—সোজা ডিডাকশন।

শোন বেবি, সে সব কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। বড্ড মামুলি রীতিতে গিয়েছিলাম সেখানে। একেবারে সেকেলে গল্পের মতো শোনাবে। সাধুর কৃপায় কত কি ঘটত আগে, আমারও তাই ঘটেছিল, কিন্তু এ রকম ঘটা এ যুগে যে কত লজ্জাকর তাই বলতে বড় সংকোচ হয়।

কিন্তু শোন বেবি, বলতেই হবে সব। আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম দার্জিলিং-এ। কতবার তো গিয়েছি ওখানে, কিন্তু এবারে দুঃসাহসিক কিছু করতে ইচ্ছে হল। তাই আমি শহরে না ঘুরে, পথে না গিয়ে বিপথে রওনা হয়ে গেলাম। কল্পনা করতেও কি মজা! পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি হিমালয়ের জঙ্গলে। তার মানে সহরের কাছাকাছি থাকব, অথচ পথ হারাব, মজাটা হচ্ছে সেটাই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, যদি হঠাৎ কোনো পাহাড়ী ভূতের দেখা মিলে যায়। কিন্তু যেতে যেতে একটু বেশি দূর গিয়ে পড়েছিলাম। দিক ভুল হয়েছিল। কোথায় যে এসে পড়েছি কিছুই বুঝতে পারছি না, এমন সময় বেবি, সেইখানে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এক সাধু বসে ধ্যান করছেন। চেহারাটি জটাজুট আর ঘন দাড়িতে ভয়ংকর।

সাধু দেখে কিছু বিরক্ত হয়েছিলাম, বেবি। আর কিছু না, একা পথ হারিয়ে যে মজা সেই মজাটা যেন সাধুর দেখা পেয়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কৌতূহলও হল কম নয়। তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে ভূত দেখেছেন কোথাও?"

তিন ঘণ্টা বসে রইলাম উত্তরের অপেক্ষায়। সাধুর চোখ বোজা ছিল। দেরি দেখে উঠে যেতে ইচ্ছে হলেও উঠতে পারছিলাম না। সাধু আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে সে হবে সাধুর হাতে অপমানিত হওয়ার সমান। তাই জেদ চাপল, বসে রইলাম। খেয়াল ছিল না যে আমি পথ হারিয়েছি। মানুষের সঙ্গ বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল!

তিন ঘণ্টা পরে সাধু চোখ খুলে বললেন, "কাছে এগিয়ে আয় বেটা।"

শোন বেবি, সাধুর মুখে এই ভাষা শুনে মনে মনে বেশ চটে গেলাম। সাধুদের ভদ্রতা জ্ঞান নেই কেন? 'বেটা' সম্বোধন আমার কাছে বড়ই ইতর মনে হল। তবু বেবি, আমিই যখন প্রার্থী তখন ওটা হজম করে সাধুর কাছে এগিয়েই গেলাম। সাধু খপ করে আমার একখানা হাত ধরে কপালে কিসের একটা ফোঁটা এঁকে দিলেন। বললেন, "বেটা, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "সাবধান, আমি যা যা বলছি তার এক চুল এদিক ওদিক না হয়। তা হলে তোকে বাঁচাতে পারব কি-না সন্দেহ। একটি বড়ি দিচ্ছি, এইটে খেলে অদৃশ্য হয়ে যাবি। এর মেয়াদ মাত্র তিন দিন। মেয়াদ ফুরোবার আগেই চলে আসবি। মানে, মনে মনে ইচ্ছা করবি চলে যেতে। এই তিন দিন তোর খাওয়া-দাওয়ার কোনো দরকার হবে না।"

কিন্তু কিসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক হঠাৎ বুঝতে পারিনি, তবু বড়িটি খেয়ে ফেললাম। মনে মনে বাঞ্ছা তো কত রকমই আছে, তার যে-কোনো একটা পূরণ হলেই হল। কিন্তু বেবি, বেশিক্ষণ এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হল না, কার্যফল হাতে হাতে ফলল। আমি বড়িটি খাওয়ার মিনিট খানেকের মধ্যে স্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগলাম। প্রথমে আধা স্বচ্ছ, পরে একেবারে। নিজের হাত-পা নিজের চোখেই অদৃশ্য!

"আপনি ভূত হলেন?" বেবি হাসল।

না বেবি, পুরো নয়। ভূতেরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় না, স্বচ্ছ হলেও তাদের চেহারা দেখা যায়। আমি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে—কিন্তু বেবি, এ আমার অদ্ভুত সৌভাগ্য—আমি বুঝতে পারলাম আমি ভূতেদের দেশে এসে পৌঁছেছি। ইচ্ছা ছিল একটা অন্তত ভূত দেখব, কিন্তু এ যে একেবারে আশাতীত! দেখি ভূতেরা নিয়মিত একটি শহর চালাচ্ছে, তাদের খবরের কাগজ আছে, বই আছে, স্কুল কলেজ আছে—সব আমাদের মতো, শুধু একটুখানি উল্টো।

"সে আবার কেমন? সবার আকাশে পা?"

না বেবি, মাত্র একটা বিষয়ে ওরা আমাদের উল্টো। আর আমার আবিষ্কারের যা কিছু কৃতিত্ব সেও ঐ জিনিসটাতেই। শোন বেবি, দেখলাম, ওরা মানুষের ভয়ে অস্থির। মানুষকে কোনো কোনো ভূত দেখেছে এবং তাদের নিয়ে কত যে গল্প ওরা লিখেছে, পড়তে এত হাসি পেয়েছিল। মানুষ ভূতদের শ্মশানে চলাফেরা করে, পূর্ণিমার রাতে শ্মশানে গেলে দেখা যায়। ভূত দেখলেই মানুষ তার ঘাড় মটকাতে চায়। তারা অনেক সময় ভূতের মতো সুন্দর চেহারা নিয়েও দেখা দেয়। যে সব ভূত অপঘাতে মারা যায় তারা মানুষ হয়ে ভূতদের রাজ্যে ঘোরাফেরা করে।

বেবি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "ভূত মারা যায়? এবং অপঘাতে মারা যায়?"

যায় বৈ কি, বেবি। অনেক ভূত গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা বিষ খেয়ে, কেউ বা জলে ডুবে।

তারপর আরও সব মজার ব্যাপার আছে, শোন। কল্পনার মানুষ যে তাদের কাছে কত চেহারা পেয়েছে তার সংখ্যা নেই। মানুষের গল্প তাই ওদের একটা বিরাট দলের মধ্যে

খুবই জনপ্রিয়। অনেক ভূত মানুষের গল্প লিখে সংসার চালায়।

অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান পড়া ভূতেরা মানুষ মানে না, মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বলে ও সব ভ্রান্তি, চোখের ভুল, মনের সৃষ্টি। আবার যারা এ সব বলে তারা ভয়ও পায় অনেক সময়।

বেবি, খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে, না? অথচ অদ্ভুত কিছুই নেই সংসারে। সব জিনিস একভাবে দেখে দেখে সেটাই অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের। আর মনে হয় আমরা যা জানি একমাত্র সেটাই ঠিক। আর একজন যখন উল্টোটা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়, তখন তার দেখাকে আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিই। তাই না বেবি?

"একটু ভাবতে দিন আগে, এ সব প্রশ্নের উত্তর কি চট করে দেওয়া যায়?"

বেশ তো ভেবেই বলো একদিন। বেবি, বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি এক অদ্ভুত জিনিস জানতে পেরেছি। ভূতেদের মধ্যে যে যত বেশি প্রতারণা করতে পারে তার তত বেশি সম্মান। ওদের মস্ত বড় অহঙ্কার যাকে দুধ ঘি মাখন বলে তা ওরা খায় না, তার সঙ্গে ভেজাল মেশানো না থাকলে তা ওদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য হয় না। যে যত ভেজাল মেশাতে পারে তার সমাজে তত সম্মান।

"অ্যাঁ! খাদ্যে ভেজাল মেশায়?" —বেবি আকাশ থেকে পড়ল। তার চোখেমুখে আতঙ্ক।

বেবিকে আশ্বস্ত করে বললাম, তুমি ছেলে-মানুষ তোমার দোষ কি, আমরা বড়রাই তো এতকাল জানতাম না যে, খাদ্যে আবার ভেজাল মেশানো যায়! কিন্তু আমি ওদের দেশে গিয়ে জানতে পেরেছি যে, মানুষও এ কাজ করে। কি করে জানতে পেরেছি শোন।

আমি অদৃশ্য, তাই সব জায়গায় নিরাপদে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। আমি ঘুরে ঘুরে ওদের জীবনের সকল বিভাগটাই দেখে-ছিলাম যতদূর সম্ভব। এক জায়গায় গিয়ে দেখি কয়েকটি ভূত প্ল্যানশেটে বসে ভূতের মানুষ নামানোর চেষ্টা করছে। একটা ভূত

কয়েকটি ভূত প্ল্যানশেটে বসে ভূতের মানুষ নামানোর চেষ্টা করছে।

ডিয়াম হয়েছে। অবশ্য হরতনের আকারের বিলে যে পেন্সিলটা ছিল সেটাও মীডিয়াম। টি ভূতের হাতে সেই পেন্সিল।

এক ব্যবসায়ী মানুষের আবির্ভাব ঘটল র চক্রে। সেই অদৃশ্য মানুষ মীডিয়ামের ত দিয়ে ওদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে লাগল।

প্রশ্ন : ভূত মরে কি মানুষ হয়? তুমি কোন্ ভূতের মানুষ?

উত্তর : বলব না।

প্রশ্ন : মানুষরা সভ্য হয়েছে না অসভ্য অবস্থায় আছে?

উত্তর : ভারতের, অস্ট্রেলিয়ার এবং আফ্রিকার আদিবাসীরা প্রধানত সভ্য হয়েছে। বাকী পৃথিবীর লোকেরা অসভ্য।

প্রশ্ন : তুমি কোন্ দেশের লোক?

উত্তর : ভারতবর্ষের।

প্রশ্ন : তোমরা খাদ্যে ভেজাল মেশাও?

উত্তর : খুব সামান্য।

প্রশ্ন : অনুপাতটা বল।

উত্তর : আমরা প্রধানত জলে আর উদ্ভিজ্জ ঘিতে ভেজাল মেশাই। এক সের জলে এক ছটাক দুধ মিশিয়ে দিই, তেমনি এক সের উদ্ভিজ্জ ঘিতে এক ছটাক গাওয়া ঘি মেশাই। খাঁটি জল আর উদ্ভিজ্জ ঘি সেজন্য আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।

প্রঃ : শুনে খুব খুশি হলাম। আর কিছু জিজ্ঞাসা করব?

উত্তর : না। আমার বাঁধা সময়। আমি চললাম।

বেবি, এ সবই আমি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। মানুষেরা যে অসভ্য আছে তা ঐ ভেজালের অনুপাত শুনেই ওরা বুঝতে পারল। কারণ ভূতদের দেশে ওর চেয়ে অনেক বেশি মেশানো হয়। এবং তা কেউ ধরতে পারে না। একজন ভূত এক মণ ঘিতে এক মণ চর্বি এমন সুন্দরভাবে মিশিয়েছিল যে, কেউ ধরতেই পারেনি সেটি ঘি না চর্বি। তাকে ভূতের রাষ্ট্র থেকে বিল্বভূষণ উপাধি ও দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার ঘোষণার পর সেই ওস্তাদ ভূতকে নিয়ে ওরা বিরাট এক শোভাযাত্রা বার করে-ছিল। এত বড় সম্মান ভূতসমাজে কোনো ভেজাল মিশ্রণকারীই এর আগে পায়নি। আমি এ সব দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে-ছিলাম, বেবি।

"কি করলেন আপনি?"

আমি ভুল করে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি-লাম "বিল্বভূষণ মানে কি?"

"তার পর?" বেবি উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

শোন বেবি, আমি তো অদৃশ্য, কাজেই আমার কথাটি যেন শূন্য জায়গা থেকে ভেসে এলো। ভূতেরা তা শুনে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, কেউ অচেতন হয়ে পড়ে গেল, বাকিরা কেউ ব্রহ্মদৈত্য, কেউ ব্রহ্ম কেউবা বরমদেও বলে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল।

"তারপর?"

তারপর পালিয়ে এলাম ওখান থেকে। কিন্তু শেষে মনে হল পালাবার কি দরকার ছিল। আমাকে তো ওরা দেখতে পায়নি, শুধু আমার কথা শুনেছে। যাই হোক, আমি ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখতে লাগলাম। সব জায়গায় দেখি উত্তেজনা—মানুষের আলোচনা সবার মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশেষ সংস্করণ কাগজ বেরিয়ে গেল এবং তার প্রধান শিরোনামা—

"ভূতের শহরে অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর!"

যেসব ভূত অজ্ঞান হয়েছিল তাদেরই একজন জ্ঞান ফিরে পাবার পর খবরের কাগজে গিয়ে রিপোর্ট করেছে। সম্পাদক লিখছেন, "এখনও যেসব বিজ্ঞান-পড়া নব্য চ্যাংড়া ভূতের দল

বাকিরা কেউ 'ব্রহ্মদৈত্য' কেউ 'ব্রহ্ম' কেউবা 'বরমদেও' বলে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল।

মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তারা এই ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা পেতে পারবে।"

কাগজখানা পড়ে, বেবি, আমি সম্পাদককে দেখতে গেলাম। আমাকে তো আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তাই খুব সুবিধা। সেখানে গিয়ে দেখি সম্পাদকের ঘরে মস্ত বড় একখানা ব্রহ্মদৈত্যের ছবি টাঙানো আছে। এই দৈত্য-শিরোমণি একটি বেলগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। শোন বেবি, তখন হঠাৎ "বিল্ব-ভূষণ" উপাধিটার অর্থ মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। বেলগাছ ওদের উচ্চতম দেবতার বাসস্থান কিনা, তাই বিল্বভূষণই ওদের উচ্চতম উপাধি।

খবরের কাগজ থেকেই বেবি, আমি ওদের সমাজের কিছু কিছু জানতে পেরেছি। ভূতদের মধ্যে বিয়ে করাটা একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ওদের মধ্যে জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল এবং ভূত সমাজে প্রেমজ বিবাহ একেবারে অচল। জাতিতে জাতিতে মিলিয়ে ভূত বর বা ভূত কনে পাওয়া শক্ত। তাই ওরা এখন সমাজের রীতি ভাঙবে ভাঙবে করছে, নইলে ভূতদের অস্তিত্ব বিলোপ হতে পারে। তা ছাড়া নতুন শিক্ষিত ভূতের দল মনে করে ভূত মরে কখনও মানুষ হয় না, ভূতই ভূতের শেষ। ভূতের কোনো পরকাল নেই। ভূতের কোনো আত্মা বা মানুষ নেই।

বুড়ো ভূতেরা এ সব কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে। বলে, কি সর্বনাশ! ইহকাল আছে অথচ পরকাল নেই? জন্ম আছে মৃত্যু নেই? কিন্তু পরকালের ভয় না থাকলে ওরা তবে আর কিসের ভয়ে সংযত থাকবে? পাপ করলে নরকে যেতে হবে এমন ভয় আছে বলেই না ওরা পাপ করে না!

বেবি বলল, "ঠিক আমাদের মতোই দেখছি। আমরা পরকাল মানি বলে আমাদের সমাজে কোনো রকম পাপ নেই। এতক্ষণে বুঝেছি কথাটা। ভাগ্যিস আমরা পরকাল মানি!"

ঠিক বলেছ, বেবি। কিন্তু তারপর কি হল, শোন, আমি সব জায়গায় ঐ নব্য ছোকরা ভূতদের নিন্দা শুনে তাদের একটি বড় আড্ডা খুঁজে বার করলাম এবং তাদের আলোচনা শুনতে লাগলাম। তারা সমাজ-বিপ্লবী। অনেক

(শেষাংশ ৬২ পৃষ্ঠায়)

জীবিকা

শ্রী রামপদ মুখোপাধ্যায়

ওঁর সঙ্গে পরিচয়টা শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কিত. তিক্ত হবার কথা নয়। কিন্তু তিক্ত হয়েছিল সামান্য একটি কারণে। তখন নতুন বিয়ে করেছি—বার দুয়েক মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়েছি। প্রবাদ বাক্যকে মান্য করে সেখানে দুদিনের বেশী থাকিনি। সুতরাং শালী বা শালাজ সম্পর্কীয়াদের সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল ছিলাম না। তবে শুনেছিলাম ওই সম্পদে বাড়িটা এক রকম নিঃস্ব। অথচ কোন একটি হাটের মাঝখানে... ওই গোষ্ঠীরই একজন অতর্কিতভাবে আমাকে আক্রমণ করেছিলেন। আমার একটি কর্ণ-পীড়ন করে পরিহাস করেছিলেন, কি ভাই, মথুরার কথা কি একেবারে ভুলে গেলে? শঠ—চতুর কোথাকার!

অনেকগুলি মানুষ পরম তৃপ্তির সঙ্গে এই কৌতুক নির্যাতন উপভোগ করছিল। তাদের পানে চেয়ে আমার চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ জোর করে ওঁর হাতটা ঠেলে দিয়ে তিক্ত কন্ঠে বলেছিলাম, ছাড়ুন বলছি।

উনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে হেসে উঠেছিলেন। আহা দুধের বালক! লাগল বুঝি?

চার পাশের লোকগুলি অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিল। ভয়াল অগ্নি প্রবাহের মধ্যে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ইচ্ছা হয়েছিল প্রচন্ড একটি চপেটাঘাত করে এই ধৃষ্টতার সমুচিত উত্তর দিই। ভদ্র মনের বাধাবশত কিছুই করিনি, শুধু নিষ্ফল ক্রোধে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

এতদিন পরে দীর্ঘ দশটি বৎসরের ব্যবধানে বুঝলাম, কবির ভাষাতেই কে যেন কানে কানে বলল, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। মনের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যে ঘটনা—সে তিক্ত হয়েই বেঁচে ছিল এই দীর্ঘকাল ধরে। জীবনের ধনই বটে!

এখন কোন্ সূত্রে ওই ছোট ঘটনাটি মনে পড়ল তাই বলি।

বন্ধু রমেন এসে খবর দিল। পালপাড়ায় একবার যেয়ো হে—তোমার শ্বশুরালয়ের সম্পত্তির দুর্দশাটা দেখে এসো।

শ্বশুরেরা পশ্চিম প্রবাসী, দু পুরুষ ভিটে ছাড়া। আগে কালে-ভদ্রে কেউ কেউ দেশে আসতেন—কন্যাটির সদগতি হওয়ার পর অর্থাৎ আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর বেশ কিছুদিন ওঁরা এ মুখো হননি। বাড়িটা মেরামত অভাবে পড়ো-পড়ো। বর্ষার জলধারা জীর্ণ ইমারৎকে প্রায় ধরাশায়ী হবার অবস্থায় এনেছে, কিন্তু ওরই সংলগ্ন আম বাগানটার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বর্ষার জলধারার অতি সিঞ্চনে আম, জাম, বেল আর কাঁঠাল গাছগুলি সবুজ পত্র সমারোহে স্বাস্থ্যময় এবং গ্রীষ্মকালে ফল ভারে অবনতপ্রায় হয়ে উঠতো। বেশ মোটা টাকাতেই বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই আয়ে খাজনা ট্যাক্স মিটেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত অর্থটা যেখানে সঞ্চিত হবার কথা নয়—জনশ্রুতি সেইখানেই জমছে। অনেকদিন ধরেই শুনেছিলাম কথাটা। আজ সত্যাসত্য নির্ণয় করবার জন্য রমেনকে পাঠিয়েছিলাম সেই গ্রামে। ও ফিরে এসে শ্রুত অভিযোগটাকেই সমর্থন করলে।

বললাম, কি রকম?

রমেন বলল, বাগান জমার টাকা নিয়ে আর বেশী দিন মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ আম বাগানটাই লোপাট হয়ে আসছে।

তার মানে? গাছগুলো কেউ রাতারাতি উপড়ে নিচ্ছে বুঝি? পরিহাস করে বললাম।

রমেন বলল, উপড়ে নাই নিক, কেটে ফেলতে দোষ কি!

বল কি! চমকে উঠলাম। তুমি নিজের চোখে দেখে এলে?

তুমিও নিজের চোখে দেখবে চল। পঞ্চাশটা গাছের মধ্যে তিরিশটা আছে কিনা সন্দেহ। পাড়ার সবাই বললে।

কার কাজ?

কার কাজ আবার! যে রক্ষক—সেই ভক্ষক।

বল কি,—মেয়ে মানুষের এত সাহস?

রমেন বলল, কে মেয়ে মানুষ? নৃত্যকালী? বাপরে বাপ—সাতটা ব্যাটাছেলের কান কেটে দেয় যে—সে মেয়ে মানুষ!

একটু থেমে বলল, নামেও নৃত্যকালী, কাজেও তাই। আবার স্বপ্নেও পেয়েছে এক কালী—দয়াময়ী কালী। সারা গাঁখানাই নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আরও অনেক কথা বলল রমেন। আমি জানতাম কিছু কিছু। সব মিলিয়ে কাহিনীটা দশ-বিশখানা গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

বিধবা নৃত্যকালীর তিনকুলে কেউ ছিল না। নগদ টাকা-কড়ি, জমি-জমা, আত্মীয়-স্বজন—কেউ নয়। কোন রকমে প্রতিবেশীদের দয়ায় ও নিজের গতর খাটিয়ে উদরান্নের সংস্থান করতো। পেট যদি বা ভরতো—পরনে জুটতো না বস্ত্র। শেষে শুনেছি—ভিক্ষাও করতো প্রকারান্তরে। অর্থাৎ চাল, ডাল ইত্যাদি ধার নিয়ে যেত—শোধ দেবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ভিক্ষা নয় তো কি! বিয়ের সময় দেখেছি—কাজের বাড়িতে কি খাটুনীটাই খাটছে! কালো রং, মন্দ স্বাস্থ্য, বেশ মলিন; ছিপছিপে গড়নের নৃত্যকালীকে ভালবাসতেন শাশুড়ী। উনি দেশে এলে—ওঁর যাবতীয় কর্মভার নিজে হাতে তুলে নিত নৃত্যকালী। ওঁকে মা বলে ডাকত। শাশুড়ী ঠাকরুণ ওকে ভালবাসতেন মেয়ের মত, বিশ্বাস করতেন। বলতেন, নেত্য কাজের মেয়ে—বিশ্বাসীও। আমরা চিরকাল বিদেশে পড়ে থাকি—বাড়ি-ঘর দেখা-শোনা, বাগান জমা দেওয়া, টাকা আদায় করা, খাজনা টেক্সো মেটানো—যাবতীয় কাজ যা পুরুষ মানুষে না পারে—নেত্য একাই করছে। ওর ঋণ শোধ হয় না।

সেই সুবাদেই আমার সঙ্গে কৌতুক-রঙ্গের অধিকার পেয়েছিল ও। কিন্তু মাত্রা ছাড়ালে মধুর রসাশ্রিত কৌতুক যে কি পরিমাণ তিক্ত হতে পারে সে ধারণা ওর ছিল না।

আমার বিয়ের বছর পাঁচ পরেই একদিন শুনলাম নৃত্য এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে গৃহে। স্বপ্নাদ্য কালী, নাম দয়াময়ী। নৃত্যের পক্ষে তিনি অশেষ দয়াময়ী। তাঁর মহাত্ম্যে অশন-বসনে সচ্ছল হয়েছে নৃত্য। ওর একতলা কোঠা ঘরের উপর একখানি দোতলা ঘর উঠেছে—শনি, মঙ্গলবারে গ্রামান্তর থেকে দলে দলে

যাত্রী আসছে। পূজো, হোম, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ভাগ্য গণনা, গ্রহ-ফাঁড়া কাটানো, কবচ, মাদুলি, চরণামৃত বিতরণ ...নির্জীব পাড়াটা কলরব-মুখর হয়েছে—নৃত্যও পরম সুখে দিন যাপন করছে।

এত যার পসার প্রতিপত্তি সে কেন অপরের গচ্ছিত সম্পত্তির উপর লোভ করবে! প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য রমেনকে পাঠিয়েছিলাম। ওর কথা শুনে আমি তো অবাক। বিস্ময় কাটলে পুরাতন তিক্ততাটুকু মাথা তুলল ধীরে ধীরে। বিরূপ মনোভাব নিয়ে নৃত্যদের গ্রামে গেলাম। ওর বাড়ি ঢুকবার আগে আম বাগানটা দেখে নিলাম। কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল। অনেকগুলি গাছই আত্ম-বিলোপ করেছে—মনে হল।

আমাকে দেখে নৃত্য তো অবাক। হয়তো বা কিছু চিন্তান্বিত। কিন্তু সে ভাব তার বেশিক্ষণ রইল না—পরমুহূর্তে কৌতুক-রঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ওমা আমার কি ভাগ্যি! আজ কোন্ দিকে সূয্যি ঠাকুর উঠেছে—কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছি!

নৃত্যকে দেখে আমিও অবাক। কোথায় সেই এক যুগ আগেকার শীর্ণদেহা প্রৌঢ়া? তৈল্য-ভাবে রুক্ষ চুল, কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু, শিরা প্রকটিত দু'টি কর্মক্লান্ত বাহু আর মলিন বসনের ভাঁজে ভাঁজে ছড়ানো অভাব ক্লেশের অনেক চিহ্ন! এ যে সাচ্ছল্যের সূর্য কিরণে অভিষিক্ত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী উজ্জ্বল বর্ণা এক রমণী—পরনে গেরুয়া শাড়ী চতুর্বর্গ ফল-দায়িনীর মহিমায় উদ্ভাসিত। এর সামনে কি অভিযোগ বা পেশ করব!

তবু গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, যে ঘাটেই মুখ ধুয়ে থাকুন—পরে বুঝবেন কাজটা ভাল করেননি।

নৃত্য হেসে উঠল, বল কি, ডুমুরের ফুল চোখে দেখলেও ভাগ্য খোলে না?

বললাম, সে বিচার পরে হবে—আপাতত একটা নালিশ আছে।

নালিশ! একটু অবাক হল। পরে হেসে বলল, তা বলতে পার ভাই।...মা আসা অবধি অনেক নালিশ ফরিদ শুনতে হচ্ছে। এটা আদালতেরও বাড়া হয়েছে। তা নালিশটা কি তোমার?

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলাম, একটুও বিচলিত হয়নি—চিন্তার একটি রেখাও নাই মুখে। কৈফিয়ৎ দাবির ভঙ্গিটা বুঝে নিয়েও দিব্য অচঞ্চল অপ্রতিভ।

ওই দৃপ্ত ভঙ্গিতে মনের তিক্ততা বেড়ে গেল। গম্ভীর মুখে বললাম, লোকের মুখে অনেক কথাই শুনি, বিশ্বাস হয় না। আজ আম বাগানটা দেখে বুঝছি রটনা ভুয়া নয়।

ও হেসে উঠল। বুঝেছি ভাই—হিসাব নিতে এসেছ। তা প্রতি বছরই তো হিসাব দিয়ে আসছি মা-কে। পাড়ার লোক তো সজ্জন নয়—ওরা জোর করে ক'টা গাছ কাটিয়ে বিক্রী করল। আমি মেয়ে মানুষ কি করতে পারি। তবু মা-কে জানিয়েছিলাম যে—ওরা বারোয়ারির পাকা ঘর তুলবে বলে চাঁদা হিসেবে ক'টা গাছ বিক্রী করে দিয়েছে। মা লিখলেন, আমি গিয়ে ব্যবস্থা করছি। তা কই আর এলেন তিনি!

আর আপনি—আপনি কিছুই নেননি?

আমার শ্লেষতিক্ত কথাকে গ্রাহ্য না করে নৃত্য জবাব দিল, নেব না কেন—ডাল-পালা কিছু কিছু নিয়েছি। আর দুটো কাঁঠাল গাছ শুকিয়ে গিয়েছিল—তাও নিয়েছি। বলি মানুষের ভোগে সবটা লাগবে কেন—দেবতার ভোগেও ছিটেফোঁটা লাগুক। তা এসব তো অনেক পুরনো কথা। মা সবই জানেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছু করিনি। বস—ঠান্ডা হও। মা-কালীকে প্রণাম করবে এসো।

সরাসরি 'না' বলতে পারলাম না—কালী ঘরে এলাম। দেখলাম, মূর্তি নাই, ঘরের এক কোণে আধ পোঁতা একটি মাটির ঘট স্থাপিত রয়েছে। ঘটের গায়ে সিঁদুর মাখানো—রূপোর চোখ বসানো। মাথায় আম্র পল্লব ও একছড়া কলা, কয়েকটি জবা ফুল, বেলপাতা। ঘটের পিছনে মেঝেতে পোঁতা রয়েছে একগাছা ত্রিশূল। ওটিও সিঁদুর মাখানো এবং ওটির মধ্য ফলকে একগাছি আকন্দ ফুলের মালা আটকানো। নৈবেদ্যের ফলমূল, গাওয়া ঘি, ধূপ-ধুনা ফুল চন্দনের গন্ধে ঘরখানি দিব্য-লোকের মহিমা-স্নিগ্ধ। ঘটের সামনে একখানি কম্বলের আসন পাতা। পানিশঙ্খ, ঘণ্টা, আরতির পঞ্চ প্রদীপ প্রভৃতি পূজার উপ-করণগুলি ডাইনে-বাঁয়ে সাজানো। এসব ছাড়াও পিতলের পিলসুজে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সব মিলিয়ে চমৎকার একটি স্নিগ্ধ-সুবাসিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে।

তিক্ততা তখনও কাটেনি, তবু দেবস্থান—হাত জুড়ে প্রণামের ভঙ্গি করলাম।

নৃত্য সর্বক্ষণই চেয়েছিল আমার পানে। হয়তো অনুমানে বুঝতে চাইছিল আমার মনোভাব। ব্যথাও কিছু বোধ করছিল। আমাকে প্রথম দেখে যে কৌতুক-রস ওর সর্বাঙ্গে উচ্ছ্বিত হয়েছিল—তা আর দেখতে পাইনি।

আমাকে ডেকে নিয়ে এলো উপরের ঘরে। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। খান দুই চেয়ার, একটি টেবিল তার উপরে প্রসাধনের সরঞ্জাম আরসী, চিরুণি, ব্রাস, গন্ধ তেল, তরল-আলতা আরও কয়েকটা কৌটায় কি কি উপকরণ—হয়তো স্নো-পাউডার, সাবানই হবে। একটি সৌখীন আলনা আছে এক পাশে—আর আছে একখানি পালিশ করা খাট, গদি-তোষক, চাদর, তাকিয়া আর চালে নেটের মশারি দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি—ছোট-বড় মাঝারি নানান সাইজের কালী, দুর্গা, শিব আর পৌরাণিক কাহিনীর ছবি।

আমাকে চেয়ারে বসিয়ে জল খাবারের রেকাবিটা সামনে রাখল নেত্য। কাটা ফলমূলে আর দু'টি রসগোল্লা। বলল, ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দাও।

আমি ঘরখানির চারিদিকে লক্ষ্য করছি দেখে বলল, দেশ-বিদেশ থেকে অনেক বড় বড় ভক্ত আসেন কিনা—তাঁদের জন্য ঘরটি তৈরী করিয়েছি—আসবাবপত্র আনিয়েছি। মানী লোক সব পাছে কষ্ট পান বলেই এত আয়োজন। নাও—প্রসাদ মুখে দাও।

এক টুকরো ফল মুখে ঠেকিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছলাম। বিরূপ ভাবটা হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

নৃত্য বলল, ভাই—কোন কারণে তুমি আমার উপর বিরূপ হয়েছ বুঝছি। এও বুঝছি... পাঁচজনে তোমার কানভারি করেছে। কিন্তু আমার অবস্থাটা বোঝনি।—কেউই বোঝে না।

চুপ করে রইলাম।

একটি নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে একটু হাসল নৃত্য। বলল, কি জান, প্রতিবেশী না হলে চলে না মানুষের—আবার প্রতিবেশীর মত শত্রুও কম আছে। যখন দুঃখে কষ্টে আমার দিন কাটত—কতদিন আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে না পরে ভাবনায় চিন্তায় শুকিয়ে মরছি তখন কেউ ফিরেও দেখেনি—একবার জিগ্যেসও করেনি—নেত্য কি করে তোর দিন চলছে? সেই সময়ে বিছানায় শুয়ে নিত্যি ডেকে বলেছি মা-কালীকে, মা—আর কেন, তুলে নাও। তারপর স্বপনে একদিন মা দয়া করলেন। মা বললেন,—কাঁদিসনে মেয়ে—আমার ঘট প্রতিষ্ঠা কর ঘরেতে, নিত্যি পুজো-আচ্ছা দে, তোর অভাব ঘুচবে মনের কষ্ট দূর হবে। তাই তো একদিন... গললগ্নীকৃতবাসা নৃত্য সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানাল মা-কে।

প্রণাম সেরে উঠে বসল। বলল, দুঃখ ঘুচল—অমনি সকলের হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। অ্যাঁ—আমরা পুরুষ মানুষ হয়ে কিছু করতে পারছি নে, ও মেয়েছেলে হয়ে দিব্যি উপার্জন করছে, হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে। এখন মনের জ্বালায় নানান কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি চোর, জুয়োচোর, ভণ্ড, স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—শুনতে শুনতে দু'কান আমার পচে গেল ভাই।

একটু থেমে বলল, তোমরা পুরুষ মানুষের—আপিসে চাকরি করছ—মাইনে পাচ্ছ—সংসার চলছে দিব্য। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ যে যার [illegible] নিয়ে আছে—খাটছে খুটছে—খাচ্ছে ঘুরে [illegible] আমোদ-আহ্লাদ করছে আর আমি যদি [illegible] চাকরি নিয়ে তাঁর দয়ায় ভালভাবে খেতে পরে দিন কাটাই—সেইটিই দোষের? এ কেমনতর বিচার বলতে পার ভাই?

আমি তো স্তম্ভিত। বলে কি নৃত্যকালী! অসঙ্কোচে স্বীকার করছে ধর্ম নিয়ে ব্যবসার কথা!

নৃত্যকালী বলল, কথাটা বলতে খারাপ, শুনতেও খারাপ, কিন্তু সত্যিকারের ধর্ম নিয়ে ক'জনার মাথা ব্যথা বলতে পার ভাই? আমি তো বলব একজনেরও নয়। দেখলাম তো এই ক'বছরে—একটি লোকও মায়ের সামনে এসে বলল না, মা—তোমার কাছে ধন-জন, পুত্র-কন্যা চাই না—টাকা-পয়সা চাই না—মান-যশ আরোগ্য চাই না, শুধু তোমার উপরে অচলা মতি হোক। মা-কে পুজো দিয়ে সবাই চেয়েছে অর্থ, সম্পত্তি, পুত্র, মামলা-মোকদ্দমায় জয়, রোগশান্তি, স্বামী বশের ওষুধ—আরও নানা বিষয় যা শুনলে ভাববে এই পৃথিবী কি পশুর রাজ্য? হায়রে—মানুষের কামনা নিয়ে আসে ক'জন!

একটু থেমে বলল, আমি যদি সৎ পথে থেকে মায়ের পুজো-আচ্ছা করে নিজের ভরণ-পোষণ করি—সে কি খুব অন্যায়?

তিক্ততাটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে বললাম, মানুষের ভক্তিকে মূলধন করে এই ব্যবসা—

হেসে উঠল নৃত্যকালী। আবারও বলছ ভক্তি!

বিরক্ত হয়ে বললাম, যাই হোক—যে আশায় এখানে মানুষ আসে—তা পূরণ করতে পারেন? সত্যিই কি মা-কালী—

নৃত্যকালী মাথা নাড়ল। বলল, কথাটা

(শেষাংশ ৫০ পৃষ্ঠায়)

সমাধান

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

অঘটন কিছু নয়। এমন হয়ে থাকে। কিন্তু ওরা দুজনেই সমান ভাবপ্রবণ। দুজনেই গোঁড়া। তার উপর দুজনেই উপার্জনশীল। কেউ কারও অন্নদাস নয়। কেউ কারও অন্নদাতাও নয়। সুতরাং একটুখানি মাথা নীচু করে কেউ যে নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করবে, তাও হচ্ছে না।

অথচ সেদিন উপার্জনের কথাটাই দুজনে বড় করে ভেবেছিল। আর কিছু নয়।

অমৃত চাকরী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরখানায়। মাইনে পায় দুশো পনেরো টাকা। বিবাহের ইচ্ছা ছিল অথচ ভয় পেত। বিবাহ আজকাল ব্যয়বহুল। গহনার কথা ছেড়ে দিলেও শাড়ি-ব্লাউস, পাউডার-পেন্ট, সিনেমা-থিয়েটার, কত কি আছে। দুশো টাকায় সেই সমস্ত টাল সামলান যায় না।

ওর মন যখন এই রকম দুলছে, বিয়ে করা উচিত হবে কি হবে না, তখন সুপর্ণার খবর পেলে। মেয়েটি বি-এ পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে চাকরী করে। একশো ষাট টাকা মাইনে পায়।

ভবিতব্য আর কাকে বলে!

অফিসে ক'জন সমবয়সী সহকর্মীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, যা দিনকাল পড়েছে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে রোজগার না করলে সংসার চালান অসম্ভব।

ওদের সমবয়সীর দল এ বিষয়ে প্রায় একমত।

জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ি ভাড়াও। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে একটা শিক্ষিত ছেলেও যে টাকা রোজগার করে, একটু ভদ্র বাড়িতে একটু ভদ্রভাবে থাকতে গেলে সে টাকায় দুজনেরও চলে না,—ছেলেপুলে হলে তো কথাই নেই।

হরিবাবু মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। ছা-পোষা গৃহস্থ মানুষ। ওদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদের জৌলুস নেই। এরই মধ্যে একটু কোল-কুঁজোও হয়ে গেছেন। ওদের সঙ্গেই বসেন।

বললেন, ভায়া সকল, সমস্যা অত সহজ নয়।

—কেন, নয় কেন? দশটায় দুজনে অফিসে এল, ছয়টায় বাড়ি ফিরে কোনোদিন সিনেমায় গেল, কোনোদিন বা থিয়েটারে। কিছু নয় তো একটু মার্কেটিং করে এল। ভালো নয় কেন?

হরিবাবু মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বললেন, ছেলেমানুষ; দাম্পত্য জীবনের কিছুই বোঝ না। দুজনে একটু ছোট-বড় থাকা ভালো।

—বয়সের ছোট-বড়?

—সব দিকে। দুজনেই স্বাধীন হলে ঘর করা চলে না। বুঝতে পারলে না?

সবাই ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরিবাবু বললেন, এই অফিসে আমরা সবাই যদি কর্তা হই, অফিস চলে না। চলে?

—না।

—সংসারও একটা অফিস, বুঝলে? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি সংসারের কর্তা হয়, সংসার ডকে ওঠে।

—বাজে কথা! দুজন অংশীদারে কি কারবার চালায় না?

—চালায়। কিন্তু একবার দুজনে মন-কষাকষি সুরু হলে আর চলে না।

—মন-কষাকষি হবে কেন?

—প্রায়ই দেখা যায় হয়। অন্তত বাঙালী কারবারে।

ওরা বললে, কিন্তু যে পরিবারে স্ত্রী রোজগার করে না, সে পরিবারে কি বিরোধ বাধে না?

—বাধে, কিন্তু ডাইভোর্স অবধি গড়ায় না। যাই হোক, বয়সে তো বড়, বিজয়ার দিন স্ত্রী-স্বামীকে একটা প্রণামও করে। ভাবে, চলে গেলে খাওয়াবে কে? স্বামীও ভাবে, স্ত্রী নইলে সংসার চলবে না। সে চাকরী করবে, না ছেলেমেয়ে দেখবে?

হরিবাবু হাসতে লাগলেন: স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নির্ভরশীল হলে সম্পর্কের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। স্ব-স্ব-প্রধান হলে সম্পর্কে চিড় ধরে। আমার কথা শোন, রোজগেরে বৌ-এর বখেরা অনেক।

—বাজে কথা। বখেরা সবেতেই আছে আবার কিছুতেই নেই। ওসব দুজনের মনের উপর নির্ভর করে। 'মন চাঙ্গা তো কাঠোয়ামে গঙ্গা'।

অমৃত এখন ভাবে, হরিবাবুর কথা না ভেবে কি ভুলই না করেছে। হাজার হোক, ভদ্রলোক বয়সে বড়, অভিজ্ঞতাও বেশি।

বস্তুত অঘটন (অবশ্য যদি একে অঘটন বলা যায়) ঘটালে তারই একটি সহকর্মী।

ওরা যখন কৃতনিশ্চয় হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে রোজগার না করলে আজকের দিনে সংসার চালান যায় না, সেই সময় তার অফিসের সহকর্মীটি অমৃতকে সুপর্ণার খবর দিলে।

অমৃতের মনটা একটু দুললো। তবু বললে, দেখি ভেবে।

সে রোজই ভাবে আর বন্ধুটি রোজই কিছু-না কিছু সুপর্ণার খবর শোনায়।

অবশেষে একদিন বন্ধুটি বললে, চল না, কাল রবিবার আছে মেয়েটিকে একবার দেখেই এস না।

—কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ মেয়ে দেখতে যাব! —অমৃত পরিহাস-ভরে হেসে উঠল।

লজ্জিতভাবে বন্ধুটি বললে, না, না। তেমন করে যাবে কেন? তোমার সম্মতি পেলে মেয়েটির ভাই এসে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে যাবে কনে-দেখার জন্যে। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি যাব।

—তোমার কি চেনা-বাড়ি?

—বিশেষ চেনা।

এই সূত্রপাত।

মেয়েটি সুন্দরী নয়, কুৎসিতও নয়। বিশেষ, যে বয়সের ছেলেদের কাছে একটা বিশেষ বয়সের প্রায় সকল মেয়েই সুন্দর লাগে, অমৃতর সেই বয়স।

বন্ধুটির সঙ্গে সে একদিন গেল, দুদিন গেল, তারপর একদিন একাই গেল। তারপর অফিসের ছুটির পর প্রায় রোজই ওদের দেখা হতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে গড়ের মাঠে দুজনে বসে। সেখান থেকে রেস্টুরেন্টে। তারপর

সুপর্ণাকে তার বাসে উঠিয়ে দিয়ে অমৃত বাড়ি ফিরে আসে।

তারপরে অগ্রহায়ণের গোধূলি লগ্নে উভয়ের বিবাহ।

বিয়ের আগেই অমৃত সুপর্ণার সঙ্গে পরামর্শ করে একখানি সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল।

বাপ-মা আগেই গত হয়েছেন। একটি বিধবা দিদি ছাড়া বাড়িতে আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। তিনিই রান্না করতেন। আর একটি ঠিকা ঝি বাসন মাজত।

অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত তিনটে মাস যেন ওরা হাওয়ায় ভেসে কাটাল। সংসারের চিন্তা নেই। ওরা দুজনে একসঙ্গে অফিস যায়, একসঙ্গে ফেরে। তারপরে চা খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন থিয়েটারে। যেদিন বেরোয় না, সেদিন ঘরে বসে লুডো খেলে, নয়তো কোনো ইংরিজি বা বাংলা উপন্যাস নিয়ে একজন পড়ে, অন্যজন শোনে। মাঝে মাঝে মন্তব্যও করে।

একদিন খেতে বসে সুপর্ণা হাসতে হাসতে বললে, দিদি, রান্নাটা একটু আধুনিক করুন।

দিদি বললেন, আমরা সেকেলে মানুষ ভাই, আধুনিক রান্নার ধার ধারি না। সামনের রবিবারে তুমি বরং একবেলা হাঁড়ি ধর। অমৃতর মুখ ছাড়ুক, নিরামিষ রাঁধলে আমিও মুখ ছাড়াতে পারি।

কথাটা দিদি হাসতে হাসতেই বললেন। কিন্তু তারপরেই ফাল্গুনের শেষাশেষি একদিন তাঁর দেবরপুত্র এল জ্যাঠাইমাকে নিয়ে যেতে।

অমৃত অবাক : হঠাৎ?

দিদি তাড়াতাড়ি বললেন, হঠাৎ নয়। কিছুদিন থেকেই নিয়ে যাবার কথা লিখছিলেন। আমিই গড়িমসি করে কাটাচ্ছিলাম। এবার আর না গেলেই নয়।

দিদি চলে গেলেন।

একটু অসুবিধা হল। কিন্তু পুরোনো ঝি পাকা লোক। ঠিকের কাজ সেরে সেই এসে রান্নাঘরের ভার নিলে। একাধারে ঝি, ঠাকুর এবং বাজার-সরকার।

সুপর্ণা চালাক হয়ে গিয়েছিল। ওকে আধুনিক রান্নার ফরমাস করত। সিদ্ধ, অর্ধসিদ্ধ, অসিদ্ধ যা দিত, দুজনে চাঁদপানা মুখ করে খেয়ে নিত। মুখ ছাড়াবার দরকার হলে হোটেলের স্মরণ নিত।

ইতিমধ্যে আরম্ভ হল ফুটবল লীগ।

অফিস যাবার আগে খেতে বসে অমৃত বললে, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে।

সুপর্ণা বললে, আমারও।

বিস্মিতভাবে অমৃত বললে, আমি খেলা দেখতে যাব। তুমি আবার কোথায় যাবে?

—আমিও খেলা দেখতে যাব।

অমৃত খুসি হয়ে বললে, তোমারও খেলা দেখার সখ আছে নাকি?

—সখ মানে? নেশা বলতে পার। আমি তো ঈস্টবেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার।

—তাই নাকি? আমিও মোহনবাগান ক্লাবের মেম্বার। কিন্তু তুমি পূর্ববঙ্গের মেয়ে তা তো জানতাম না। কথায়-বার্তায় একেবারে কলকাতার মতো!

সুপর্ণা বললে, দুপুরুষে রয়েছি। কথা আর এখানকার মতো হবে না কেন? —হেসে বললে,—আমারও ধারণা ছিল তুমি পূর্ববঙ্গের ছেলে।

—কি করে এমন ধারণা হল?

—আমার কি রকম যেন মনে হত।

অমৃত হো হো করে হেসে উঠল : এ রকম ধারণা অন্যায়।

সুপর্ণা রেগে গেল : অন্যায় আবার কি! আমাকে পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে বলে ধারণা করাও তো অন্যায়।

—কিন্তু তোমার কথা-বার্তা, চাল-চলন দেখে কেউ বুঝতে পারবে না তুমি পশ্চিমবঙ্গের নও। আমার তো তা নয়।

—কথা-বার্তা, চাল-চলনে আজকাল আর কোনো তফাৎ নেই। দেশও ভাগ হয়ে গেছে। তুমি পূর্ববঙ্গের মেয়ে, পূর্ববঙ্গেরই মেয়ে।

অমৃত এ নিয়ে আর কথা বললে না। মনে হল, সুপর্ণা বিরক্ত হয়েছে। দেশ ভাগ হয়ে গেছে। এরা আর কোনো দিন পূর্ববঙ্গে ফিরে যাবে না। সেখানে হয়তো এদের আর সূচ্যগ্র ভূমিও নেই।

অমৃত জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশ কোথায়?

—বিক্রমপুর।

—গেছ কখনও?

সুপর্ণা হেসে বললে, না।

যায়নি কখনও। তবু ওর রক্তের মধ্যে রয়েছে বিক্রমপুর। আরও দু'-এক পুরুষ থাকবে বোধ হয়।

অমৃত বললে, ভালোই হল। ভাবছিলাম, আমি খেলা দেখতে যাব, আর তুমি একলা থাকবে। সে দুশ্চিন্তা গেল।

সুপর্ণাও হেসে বললে, আমিও ভাবছিলাম, আমার যে খেলা দেখার ঝোঁক আছে, তোমাকেই জানাই কি করে? বিকেলটা তুমি একলা থাকবে, ভাবতে বিশ্রী লাগছিল।

—সে দুশ্চিন্তা আর রইল না। আমরা একসঙ্গে যাব-আসব।

সুপর্ণা বললে, যাওয়া একসঙ্গেই চলতে পারে। কিন্তু বসবার জায়গা তো আলাদা। খেলা শেষ হলে ওই ভিড়ের মধ্যে কি কেউ কাউকে খুঁজে পাব?

—তাহলে তুমি আসবে কি করে? ভিড়ে ট্রামে উঠতে পারবে?

—তাই তো বরাবর আসি।

আসে বটে, কিন্তু অমৃতর মনে একটা দুশ্চিন্তা রইল। বললে, যাওয়া তো যাক। ফেরার কথা পরে ভাবা যাবে।

ওরা একসঙ্গে অফিস গেল, রোজ যেমন যায়। একসঙ্গে খেলার মাঠেও গেল।

যদিচ পৃথক গ্যালারী, কিন্তু একটা চোখ অমৃত সব সময় সুপর্ণার উপর রেখেছিল। সুপর্ণাও। তার ফলে দুজনকে খুঁজে পেতে দুজনেরই অসুবিধা হল না।

অন্য দুটি দলের খেলা।

খেলার শেষে ওরা ট্রামের ভিড় কাটাবার জন্যে মাঠেই বসে গল্প করলে। তারপর ভিড় কমলে বাড়ি ফিরে এল।

ক'দিন বেশ গেল। তারপরেই বিভ্রাটের সূচনা হল।

এতদিন চলছিল অন্য দলের খেলা, যাদের সম্বন্ধে অমৃত অথবা সুপর্ণা কারোরই কোনো উৎসাহ ছিল না। সেদিন হল ঈস্টবেঙ্গলের সঙ্গে অন্য একটি দলের খেলা।

হেরে গেল ঈস্টবেঙ্গল।

দুজনেই একসঙ্গে ফিরল বটে, কিন্তু সুপর্ণার মুখ বিষণ্ণ, গম্ভীর; আর অমৃতের ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসি থেকে থেকে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মারছিল। ঈস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের সঙ্গে মোহনবাগানের জয়ের পরোক্ষ সম্পর্ক এবং সম্ভাবনা জড়িত ছিল।

বাড়ির কাছে নেমে একটা সন্দেশের দোকানের সামনে অমৃত দাঁড়াল।

সুপর্ণা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, দাঁড়ালে কেন?

—কিছু মিষ্টি কেনা যাক।

—মিষ্টি কি হবে?

—খাব।

সুপর্ণা ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। বললে, কেন। আমি চললাম।

বলে হন-হন করে বাড়ি চলে এল।

মনটা তার খুব খারাপ। ঈস্টবেঙ্গলের হারা উচিত হয়নি। দুই : এক গোলে হেরেছে। অথচ তিনটে মোক্ষম গোল ওই গবেটটা মিস করল, ওকে যে কেন নামান হয়! নিশ্চয় মোহনবাগানের কাছ থেকে অথবা জুয়াড়ীদের কাছ থেকে মোটা টাকা খেয়েছে। নইলে ছেলেতেও ও রকম গোল মিস করে না। অন্তত দুটো গোল তো নির্ঘাৎ ছিল। তাহলে তিন : দুই গোলে আজ জিতে যেত।

নামজাদা খেলোয়াড়, অথচ এক একদিন এমন বিশ্রী খেলে যে ঘুষ নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

নীচে অমৃতর উল্লসিত পদশব্দে সুপর্ণা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। ফিরে এসে দেখে অমৃত টেবিলে দুজনের জন্যে খাবার সাজিয়ে নিঃশব্দে পা দোলাচ্ছে।

সুপর্ণা সেদিকে ফিরেও চাইল না। পাশের ঘরে প্রসাধন করতে গেল।

—সুপর্ণা!

প্রথম দু'ডাকে সুপর্ণা সাড়া দিলে না। তৃতীয় ডাকে বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কেন?

—খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সুপর্ণা আর পারলে না। ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে বললে, তুমি যে এত নীচ হতে পার, আমার ধারণা ছিল না।

—কি হল? —অমৃতর ঠোঁটে তখনও চাপা হাসি।

—কি হল? আমি কিছু বুঝি না, না? ঈস্টবেঙ্গল হেরেছে, মনটা খুব খুসী! কিন্তু জেনে রেখ ঈস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানকে হারতে হবে। ঈস্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান একটা টিমই নয়।

অমৃত জবাব দিলে না। শুধু খাবারের প্লেটটা নিঃশব্দে নিরীহভাবে সুপর্ণার মুখের সামনে ধরল।

আর যায় কোথায়! সুপর্ণা একেবারে বারুদের মতো ফেটে পড়ল। খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে বাইরে বারান্দায় ফেলে দিলে। ঝন-ঝন শব্দে ঝি পর্যন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল : কি হয়েছে? কি ভাঙল?

সুপর্ণা কোনো সাড়া দিলে না। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অমৃতের দিকে চেয়ে রইল।

সে রাত্রে কারও খাওয়াই হল না।

পরদিন ভাব হল বটে, কিন্তু আর যেন আগের মতো নয়। কথা হয়, একসঙ্গে অফিস যায়, একসঙ্গেই ফেরে। কিন্তু কোথায় যেন
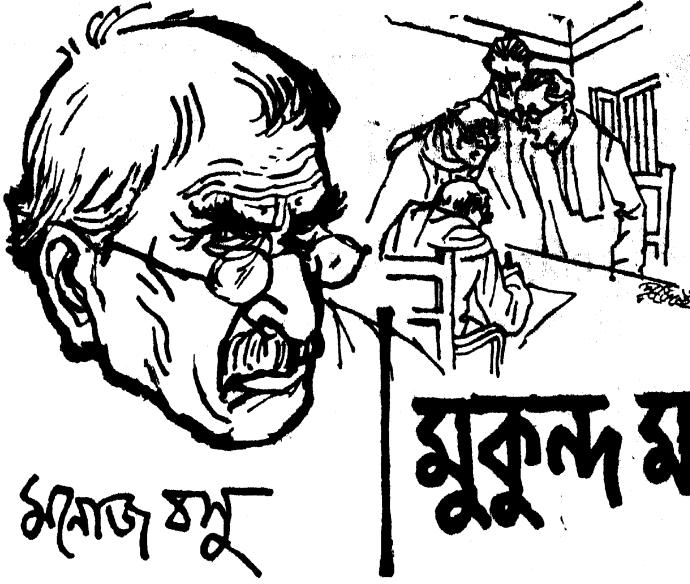
মুকুন্দ মাস্টার

মনোজ বসু

মিস্টার এ. কে. ভড় এম-এ, বি-টি। নব্যতন্ত্রের হেডমাস্টার, ছটফটে ভাব ষোল-আনা এখনো। প্যাণ্ট আর হাওয়াই-শার্ট পরে ইস্কুলে আসেন। হুঁকোয় তামাক খান না। মোটা বার্মাচুরুট সর্বক্ষণ মুখে আছে, ইস্কুলের সময়টা কেবল বাদ দিয়ে। ইস্কুল-কম্পাউণ্ডে ঢুকবার সময় চুরুট নিভিয়ে, কারুকর্ম-করা একটা কৌটা থাকে পকেটে, তার ভিতরে পুরে ফেলেন। তিন মাস এসেছেন, এরই মধ্যে ইস্কুলের খোল-নলচে পাল্টে যাবার অবস্থা। ছাত্র-শিক্ষক সকলে তটস্থ।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুকুন্দ মাস্টার মশায় কেবল যথাপূর্ব আছেন। ছেলেরা বাঘের মতো ডরায়। এই ইস্কুলে তিরিশ বছর একাদিক্রমে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। বুড়ো হয়ে গেছেন, একটি চুল কাঁচা নেই, তা সত্ত্বেও বাঞ্ছা রাখেন, আরও তিরিশ বছর পড়িয়ে যাবেন এমনি।

নতুন হেডমাস্টার খাপ্পা। বলেন, নিতান্ত সেকেলে মানুষ। এণ্ট্রান্স পাশ। কী জানেন ও'রা, আর কী পড়াবেন! বিদায় নিতে হবে ও'কে।

কথাটা মুকুন্দর কানে গেছে। আমল দেন না তিনি: নেবই তো বিদায়—চিরকাল কে থাকতে এসেছে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেব, সেই সঙ্গে ইস্কুল থেকে। তার আগে কে আমায় সরাবে!

রেগেমেগে হেডমাস্টার লম্বা রিপোর্ট করলেন মুকুন্দর নামে: সামান্য পড়াশুনো তো বটেই, তার উপর বেত নিয়ে যান ক্লাসে। পড়াশুনোয় একটু হেরফের হলে ছেলেগুলোকে বেদম পেটেন। কমিটির প্রেসিডেন্টের ছেলেকে এই সেদিন কান ধরে এমন টানলেন, নেতি ছি'ড়ে রক্ত বেরিয়ে গেল।

সত্যভূষণ কমিটির মেম্বার। মুকুন্দর ছাত্র। তার বাপও পড়েছিলেন মুকুন্দর কাছে। রিপোর্ট দেখে সত্যভূষণ হন্তদন্ত হয়ে মুকুন্দর বাড়ি এল: মাস্টারমশায়, এই বিপদ—

মুকুন্দ পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। সত্যভূষণ ঘটনা আদ্যোপান্ত বলে যাচ্ছে। বলা শেষ হয়ে গেল। ঘাড় হে'ট করে মুকুন্দ নম্বর দিয়ে চলেছেন যথারীতি।

সত্যভূষণ ব্যাকুল হয়ে বলে, কানে নিন একটু মাস্টারমশায়। আবার সে বলে যায়। এবারে জবাব পাওয়া গেল: এইটুকু ডিকটেশান দিয়েছিলাম, তার মধ্যে বারটা ভুল। কানটা যে একেবারে ছি'ড়ে নিই নি, ওর বাপের ভাগ্যি।

বলে ভ্রূকুটি করলেন। সত্যভূষণের ছাত্র-অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। আর বেশি বলতে সাহস হয় না। মুকুন্দ মাস্টারের সামনে।

কমিটির মিটিংয়ে যথাসময়ে মুকুন্দ মাস্টারের কথা উঠল। প্রেসিডেণ্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে একমত। অবসর নিতে বলা হোক মাস্টার মশায়কে।

সত্যভূষণ বলে, বহুদিনের পুরানো শিক্ষক। একতরফা রিপোর্টের উপর কিছু করা উচিত নয়। তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে।

মুকুন্দকে ডেকে আনা হল। রিপোর্টটা হাতে দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, পড়ুন এটা।

সত্যভূষণ বলে, মনোযোগ দিয়ে পড়ুন মাস্টারমশায়। তারপর আপনার কথা শোনা যাবে।

রিপোর্টের প্রতিটি শব্দের উপর আঙুল দিয়ে মুকুন্দ সত্যিই গভীর মনোযোগে পড়ছেন।

হেডমাস্টার মশায় বলেন, ঠিক লিখেছি কিনা বলুন।

মুকুন্দ ঘাড় নাড়েন: উ'হু—

টেবিলের উপর পেন্সিল পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে ঘচাঘচ কয়েকটা ভুল কাটলেন: প্রিপজিশনের ভুল...... বাড়তি 'দি' বসানো হয়েছে এখানটা ...... টেন্সেরও দেখি গোলমাল রয়েছে—

প্রেসিডেন্ট বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে ওঠেন: কী আপনার বক্তব্য, তাই বলুন মাস্টারমশায়—

মুকুন্দ মাস্টার বলেন, দশের মধ্যে চার দিতে পারি। টায়েটোয়ে পাশ হয়ে যায়। তার বেশি কিছু নয়।

একটা চিড় খেয়ে গেছে। মেরামতের পরেও তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মোহনবাগান আর ঈস্টবেঙ্গলের খেলা এসে গেল। সকাল থেকেই সুপর্ণা আর অমৃতের বুক কাঁপতে লাগল। হাসি যেন ফিকে। কথায় যেন রস নেই, নিষ্প্রাণ।

ভগবান কি যে করবেন কে জানে!

দুজনেই মনে মনে মানত করলে: একজন কালীঘাটে, আর একজন দক্ষিণেশ্বরে।

খেলা আরম্ভ হবার দশ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান একটা গোল দিলে। অমৃতের কী আনন্দ! দাঁড়িয়ে উঠে সে কোমরে হাত দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে। কালীঘাটের মা কালী মুখ রেখেছেন!

সুপর্ণার তখন মূর্চ্ছা যাবার মতো অবস্থা। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মা কালীও সামান্য নন। মিনিট পোনেরোর মধ্যে ঈস্ট-বেঙ্গল গোলটা শোধ দিলে।

মহিলা বলেই সুপর্ণা মাচটা ফিরিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু বেঁটে ছাতাটা খুলে খুব দোলালে।

হাফ-টাইম গেল। মিনিটের পর মিনিট যায় আর কিন্তু কেউ কাউকে গোল দিতে পারে না। কালীঘাটের মা কালীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর একটা আপোষ হয়ে থাকবে বোধ হয়।

হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের মা কালী একটা আচমকা গোঁত্তা মারলেন। শেষ মিনিটে ঈস্ট-বেঙ্গল একটা গোল ঢুকিয়ে দিলে!

মাঠের সে কী অবস্থা!

ঈস্টবেঙ্গলের গ্যালারী থেকে দর্শকের দল হুড়মুড় করে মাঠে নেমে পড়ল। তার মধ্যে সুপর্ণাও।

অমৃত চুপি চুপি গ্যালারী থেকে নেমে

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়)

দালালি করেছিলাম

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কার্সিয়াং থেকে পায়ে হেঁটে দার্জিলিং পৌঁছেও ডি আর (দীনেশরঞ্জন দাশ) গোকুলকে বাঁচাতে পারলেন না। ল্যান্ড স্লাইডে ট্রেণ আটক হয়ে দার্জিলিং পৌঁছতে অনেক দেরী হয়েছিল দীনেশরঞ্জনের, গোকুল তখন ওপারে রওনা হয়ে গেছে, এপারের অবচেতন মন প্রায় নিঃসাড় দেহটার মধ্যে ঘুমন্ত। সেই অবস্থায়ও দীনেশরঞ্জনের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে ছিল গোকুল, বলেছিলো দুটি কথা : কল্লোলকে দেখো।

যে দুর্জয় আকর্ষণে রেল থেকে নেমে পায়ে হাঁটা পথ ধরতে এক মুহূর্ত 'কিন্তু' করেন নি দীনেশদা, কলকাতায় ফিরে এসে সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণই তাঁকে দ্বিগুণ শক্তিতে আত্মনিয়োগ করালে কল্লোলকে দেখার কাজে।

গোকুলের অভাবে অনেক দিন ধরেই আড্ডার অঙ্গহানি হয়েছিল। কাজের অঙ্গহানি যেটুকু হয়েছিল সেইটুকু বরং পুরিয়ে নেওয়া যেতো, কিন্তু গোকুলবিহীন আড্ডা এবার সত্যি শ্রীকৃষ্ণবিহীন গোকুল হয়ে উঠল। দার্জিলিং-এ সে ছিল, অনেক দূরে, তা সত্বেও আমাদের ভাবখানা ছিল, সে তো রয়েছে আমাদেরই একজন, শুধু একজন নয়, বিশেষ একজন, হয় তো বা প্রধান। দূরে আছে, কাছে আসতে কতক্ষণ।

দীনেশদা যখন ফিরে এলেন তাকে নিশ্চিহ্ন করে, আমরা জানলাম সে নেই, কোথাও নেই। যদি থাকে তবে পটুয়াটোলার সেই ঘরের হাওয়ায় ভাসবে তার অদৃশ্য আত্মা।

দীনেশদা আরো জোর দিলেন কল্লোলের কাজে। গোকুলের অনূদিত জাঁ ক্রিশতফ সমাপ্ত করবার ভার নিলেন গোকুলের বৌদি শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী। ইতিমধ্যে শক্তিমান নতুনের সন্ধানও মিলতে লাগলো। ঢাকা থেকে মণীশ ঘটক এলেন দশের এক পটুয়াটোলার ঘরে, গাইলেন পটলডাঙ্গার পাঁচালি। যুবনাশ্বের বকলমে রচিত সেই পাঁচালি কাহিনী পড়ে বিস্ময় মানল সকলে। আমরা বললাম, আরো অনেকেও বললে, বাস্তব জীবনের এমন বলিষ্ঠ রূপ আর কেউ ফোটাতে পারে নি। যেন গাঁইতি মেরে পাহাড় কেটে ফোটানো। আর একদল বললে, সত্যি বিস্ময়কর। বাস্তব সাহিত্যের দোহাই পেড়ে মানুষ যে কত নীচ ও অশ্লীল রচনা কলম দিয়ে বার করতে পারে, ছাপাতে পারে পত্রিকার পৃষ্ঠায়, সেদিন তার চেয়ে বেশী বিস্ময় বোধ করার মত আর কোন কিছু ছিল না বাংলা সাহিত্যে।

যুবনাশ্বের কলম যতই বলিষ্ঠতার প্রমাণ দিক আমাদের কাছে তার কাছ থেকে লেখা আসত ন মাসে ছ মাসে। কেন, কখন ও কি অবস্থায় সে লেখা পাঠায়, তার কোন হদিশ আমরা পাই নি। আমারতো মনে হয়েছে এবং আজও মনে হয়, লেখা সম্বন্ধে তার নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাই শক্তির অসাধারণতায় কল্লোলের পৃষ্ঠা ঝলসে দিয়েও বাংলা সাহিত্যে যুবনাশ্ব গেল হারিয়ে।

আরো একজন লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, হাঁ, আবির্ভাবই, দিগন্ত আলো করে সবাইকে হকচকিয়ে। কিন্তু তাঁর বেলাতেও ঘটলো বোধনে বিসর্জন। জানি না গোকুলের চোখের দৃষ্টি তাঁর মধ্যে কতখানি আলোড়ন তুলেছিলো, কলকাতায় ফিরে সেই সুরেশ মুখার্জি পটুয়াটোলায় এসে ভিড়লেন। একদিন তাঁর হাত থেকে এক বিস্ময়কর গল্প বেরোল : দা-গোঁসাই। ব্যস্ ওই পর্যন্তই শেষ। আর কোন লেখা লেখাতে পারিনি আমরা তাকে। দা-গোঁসাই গল্পের একমাত্র স্থায়ী ফল হল, তাকে আমরা সবাই দা-গোঁসাই বলে ডাকতে লাগলাম।

কল্লোলে মনের মত লোকসংখ্যা বাড়ছে না। লেখক যদি বা মেলে, লেখায় তার অপারসীম কার্পণ্য। ওদিকে শৈলজানন্দ তখন মুরলীদার সঙ্গে 'কালি-কলম' নিয়ে মেতে আছে, প্রেমেনও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। তবুও মাঝে মাঝে অন্যের লেখার সঙ্গে অচিন্ত্য কল্লোলের আসর মাত করে রাখছে।

আর যারা তখন কল্লোলের আড্ডা মাত করে তাদের মধ্যে আমার মত ছাপোষা আর কেউ নয় তখন। তা বলে যতই কল্লোল নিয়ে মাতামাতি করি না কেন, কল্লোল এক পয়সা দিতে পারে না। তা নিয়ে ক্ষোভ নেই, আমার চিনি তখন চিন্তামণি যোগাচ্ছেন।

বুক কোম্পানীর গিরীন মিত্র মহাশয় তখন প্রখ্যাত জার্মাণ পন্ডিত অল্ডেন বার্গ রচিত 'বুদ্ধ-চরিত' ইংরেজী অনুবাদের এশিয়া সংস্করণে হাত দিয়েছেন। সে বই ছাপার কাজে প্রুফ দেখার সমস্যাটা কিছুটা জটিল কারণ ইংরেজী হরফে সংস্কৃত ও পালি শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ নির্দেশিত করবার জন্য বিভিন্ন অক্ষরের উপরে ও নীচে যে সব চিহ্ন সংযুক্ত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকলে প্রুফ দেখা সম্ভব নয়। আমি বেকার এবং অপন্ডিত, কিন্তু পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ওই কৌশলটি কিছু আয়ত্ত করেছিলাম। কাজেই গিরীনদা যখন আমাকে বুদ্ধচরিতের প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিতে বললেন, গ্রন্থ সম্পাদক 'সুরেন্দ্রকুমার তাতে সানন্দে সম্মতি জানালেন। একে তিনি বহু ভাষাবিদ, তায় তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরী) সুপারিনটেন্ডেন্ট, কাজেই তাঁর মত লোকের কাছ থেকে আমি কাজের ভার নিতে ভয় পেলাম না। তবে কথা রইল, দ্বিতীয় প্রুফটি তিনি স্বয়ং দেখে দেবেন।

প্রুফ দেখে দৈনিক পাঁচ থেকে সাড়ে সাত টাকা অর্জন করে আমি যুগের হিসেবে রীতিমত বড়লোক, তার উপর আমি তখন কল্লোল-এর অ-নিযুক্ত ম্যানেজার, অর্থাৎ যে কল্লোলে দলের কেউই বাইরের লোক নয়, সেখানেও আমি এবং দীনেশদাই কল্লোলের ঘরের লোক।

দীনেশদা যে ঘরের লোক হবেন, তার আর কথা কি! তাঁরই (অর্থাৎ তাঁর দাদার) বাসাবাড়ীর বাইরের ঘরেই তো কল্লোলের অধিষ্ঠান। সেখানেই দুপুর বেলা বসে দীনেশদা তাঁর অর্থকরী কাজটুকু করেন, অর্থাৎ কল্লোলের টেবিলই শিল্পী ডি আর এর স্টুডিও।

আমি ঘরের লোক হয়ে গেছি গায়ের জোরে, অচিন্ত্য তো ঢাক পিটিয়েই দিয়েছে, আমি যেখানে ঢুকবো, হাঁড়ির মুখে সরা হয়েই বসব। কল্লোলেও তাই হয়েছিলাম। দীনেশদাই সেখানে হাঁড়ি, আমি সরা হয়ে মুখ আগলাই খালি। ডাকের চিঠি পত্র এলে তাও আমি দেখি, সময় সময় জবাবও দিই। বলাবাহুল্য, দীনেশদার সম্মতি অবশ্য থাকতো, নির্দেশও দিতেন, কল্লোলে আমাদের লেখা নির্বাচনের কর্তৃত্ব একজনের হাতে ছিল না। দলের মধ্যে যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁদের সুপারিশ কদাচ অগ্রাহ্য হত। আর আমি তখন কল্লোল অফিসের 'রিসিভিং ক্লার্ক' হিসেবে নতুন লেখা সুপারিশ করবার অধিকার আগে থেকেই দখল করে বসে আছি।

আমি ছা-পোষা, বাসারেও বটে, আমার নিজের ডেরা কল্লোলের ঘরে। দুপুরের হ্রস্ব নিদ্রাটুকু আবশ্যক হলে ঘরের নেড়া তক্তপোষেই সেরে নিই। আর তারপর প্রুফ দেখা, আবশ্যক হলে চিঠির জবাব বা কাউকে তাগিদ দেওয়ার সেরেস্তাও ওই তক্তপোষ।

সেদিন আমি ঘুমোচ্ছি, দীনেশদা যথারীতি ছবি আঁকছেন। পিয়ন এসে ডাক দিতেই উঠে বসলাম। অন্যান্য চিঠিপত্র কাগজ ইত্যাদির সঙ্গে ছোট একটি বুকপোষ্ট, অমন বুকপোষ্ট সাময়িক পত্রের অফিসে অনেক আসে। তবু নতুন লেখকের সন্ধানে উদ্‌গ্রীব আমার মন ওই প্যাকেটটির দিকেই আগে আকৃষ্ট হল। প্রেরক হিসেবে উপরে ইংরেজী হরফে নাম লেখা রয়েছে টি ব্যানার্জি, লাভপুর, বীরভূম। মোড়কটি ছিঁড়ে ফেলতেই হাতে পড়ল একটি গল্প, নাম 'রসকলি'। চোখ বোলাতে গিয়ে সমস্ত মন একাগ্র হয়ে তার মধ্যে ডুবে গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়া শেষ করে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম : সামথিং অব এ ডস্টয়েভস্কি।

ছবি আঁকতে আঁকতে মুখ না তুলেই দীনেশদা জিজ্ঞাসা করলে, ডস্টয়েভস্কি কি ডাকে এলেন? এত উল্লাস কিসের?

কি অদ্ভুত গল্প, ডি আর! এই সব লেখকের জন্যই কল্লোল অপেক্ষা করে আছে। পড়ে দ্যাখো। পাঁচ মিনিট আঁকা বন্ধ রাখলে তোমার কারবার দেউলে হয়ে যাবে না।

দীনেশদাও পড়লেন, আমারি মত অভিভূত হয়ে। যথাসময়ে নৃপেন (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) আসতে তাকেও পড়তে দেওয়া হল। সবাই একমত : এ ডস্টয়েভস্কি না হলেও বাংলা সাহিত্যে এক নূতন বিস্ময়। গল্পটি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম।

পরদিন আমি লেখককে একখানা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলাম : আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি আমাদের আরো লেখা পাঠাবেন এবং কলকাতায় এলে আমাদের আড্ডায় অবশ্য আসবেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় রইলাম।

কিছুদিন বাদে এল নতুন গল্প : হারানো সুর। পরে একটি কবিতাও এসেছিল, তাও যথাসময়ে ছাপা হল।

নিজেও এসে হাজির হয়েছিলেন একদিন। আমি উপস্থিত ছিলাম না সেদিন। আর তা ছাড়া, আগে থেকেও জানা ছিল না। সে আগমনের ফল সুখকর হয় নি, কারণ যে তারাশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমরা অনেকেই সাগ্রহ প্রতীক্ষা করেছিলাম, সেই প্রথম আগমনেই তাঁর সঙ্গে কল্লোল-এর ঘটলো বিচ্ছেদ।

গ্রহ-নক্ষত্রেরই কারসাজি! ভাগ্যদেবতার বোধ হয় ইচ্ছেই ছিল এমনি। নইলে এমনটি হবে কেন? যে কল্লোল-এ অধিকাংশ সময়েই আমি ঘাঁটি আগলে থাকি, বেলা পড়লেই অথবা যখন তখন এসে হাজির হয় নৃপেন, অচিন্ত্য ও আরো অনেকে, সে কল্লোল-এ তারাশঙ্করের প্রথম পদার্পণ মুহূর্তে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। 'কেউ ছিলেন না' কথাটা যথার্থ নয়, কারণ স্বয়ং দীনেশরঞ্জন ছিলেন, কিন্তু তাঁর তখন শিরে সংক্রান্তি, আনন্দবাজার থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসছে, তাদের কার্টুনের কাজগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার জন্য। কাজেই, তারাশঙ্করের আত্মপরিচয় দান সত্ত্বেও দীনেশরঞ্জনের পক্ষে তাঁকে আশানুরূপ আপ্যায়ন সম্ভব হয় নি। দীনেশরঞ্জন তারাশঙ্করকে একটু অপেক্ষা করতে বলে জরুরি ছবির কাজটা সেরে নিতে চাইলেন। ইতিমধ্যে আরো একজন ঘরের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন অতিথিটিকে কোনরূপ স্বীকৃতি না দিয়ে। খাবার জন্য দই চিঁড়ে কিনে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। কিন্তু তিনি তো ঘরে বসা লোকটির পরিচয় জানতেন না।

দূরে থেকে লেখা পাঠানোর মাধ্যমেই শুধু যাদের সঙ্গে সম্পর্ক, একখানা পোস্টকার্ডে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানানো থাকলেও সে আড্ডায় উপস্থিত হতে স্বাভাবিক সঙ্কোচ নিয়ে এসেছিলেন তারাশঙ্কর; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে কল্লোল-এর সুদূর কলধ্বনিতে যে আবেগের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি, মরা কোটালে এসে হাজির হয়ে সেখানকার কলুধ্বনিও তাঁর কানে পৌঁছলো না।

পরে দীনেশরঞ্জন বলেছে মুখ তুলে দেখি আসন শূন্য, ভদ্রলোক নেই, কোন্ সময়ে উঠে চলে গেছেন। তাঁর পক্ষে অবজ্ঞাত বোধ করবার অভিমান হয় তো অসঙ্গত নয়। অস্বাভাবিক তো নয়ই। কিন্তু কল্লোল-এর তরফ থেকে সেদিনকার সেই অঘটনে অনুপস্থিত আমি কৈফিয়ত দিতেও ছাড়বো না। আমাকে সেই-সময়ে বাধ্য হয়েই অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিলো, কারণ বুক কোম্পানীর বুদ্ধচরিত-এর প্রুফ সংশোধনের জরুরি তাগিদ ছিল, আর আসলে কল্লোল-এ রিসেপ্শানিষ্ট-এর বিনা মাইনের পদটি আমিই করায়ত্ত করে রেখে ছিলাম। দীনেশরঞ্জনের ঘাড়েও সেই মুহূর্তে কড়া তাগিদের খাড়া ঝুলছে। আপন-ভোলা নৃপেন, সেই বেলায় ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে যাকে দই চিঁড়ে কিনতে বেরোতে হয়েছিল, তার কাছ থেকে অভ্যাগতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ছিল আশাতীত। তা ছাড়া নৃপেনকে আমরা জানতাম, ফরমালিটির ধার সে কোনদিনই ধারে নি, না নিজের জন্য, না পরের সম্পর্কে। আসলে ওই জিনিসটির অভাব কল্লোল-এ তো ছিলই। যে প্রাণোচ্ছলতার জোরে সেই অভাব পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হত সেই প্রাণোচ্ছলতা আমরা প্রত্যাশা করেছি, যাঁরা আমাদের ডাকে এসে হাজির হবেন, তাঁদের কাছ থেকেও। সূক্ষ্ম হিসেব মাপা আচরণ ঠিক যেমনটি যে ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করার কথা, সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না কল্লোল-গোষ্ঠী। জীবনকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যাওয়ার যে উচ্ছলতা, তার মধ্যে হিসেবীয়ানা না থাকাটাই তো স্বাভাবিক। তারাশঙ্করকেই আমরা জানিয়েছিলাম 'আপনি আমাদেরই'। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বিচারে সে বলায় না ছিল ফাঁক, না ছিল ভুল; কিন্তু কল্লোলী আড্ডার জীবনদৃষ্টির দিক থেকে তিনি নিশ্চয়ই অন্য জাতের মানুষ ছিলেন। জমিদারীর নিশ্চিন্ত জীবনের পরিবেশে আর আদর্শবাদী স্বদেশীয়ানায় যাঁর যৌবন কেটেছে, তাঁর সঙ্গে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবনের চারণদের জাত মিলবে কি করে!

যাইহোক, তারাশঙ্করের আর যে কটি রচনা বেরিয়েছিল কল্লোল-এ, —গল্প 'হারানো সুর' ও 'স্থলপদ্ম' এবং তারুণ্য বন্দনার কবিতা একটি। তাইতেই কল্লোল-এর সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক সীমিত। তবুও যে কারণেই হোক সমালোচক এবং সাহিত্য ইতিহাসকারেরা তারাশঙ্করকে কল্লোল যুগের অন্তর্ভুক্ত বলেই রায় দিয়েছেন এবং একটু আগেই আমিও স্বীকার করেছি যে, সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁকে 'আপনি আমাদেরই' দাবী কল্লোল-এর পক্ষে অনধিকার ছিল না।

অনধিকার ছিল না বলেই ঘুরে ফিরে সেই 'আপনি আমাদেরই' দাবী করা মানুষটির সঙ্গে তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠতর সাহিত্যিক যোগাযোগ ঘটলো।

আমি তখন 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করি। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগলের সহযোগী সহ-সম্পাদক। মোটামুটি গল্প উপন্যাস নির্বাচনের প্রাথমিক দায়িত্ব আমারই উপর ন্যস্ত ছিল। আজ এ কথা প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই অসমীচীন হবে না যে, চূড়ান্ত নির্বাচন-কর্তা ছিলেন মাখনদা (শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন)। কিন্তু সমগ্র আনন্দবাজারের সবখানি দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে কতটুকুই বা দেখতে পারতেন তিনি। কাজেই অনেক সময় আমার মুখেই ঝাল খেতে হত তাঁকে। তবে নতুন লেখকের লেখা প্রকাশিত হলে পর তিনি সব সময়ই পড়ে দেখতেন এবং দেশ পত্রিকায় সেই লেখকের ভবিষ্যৎ তার উপর অনেকখানি নির্ভর করত।

ইতিমধ্যে তারাশঙ্করের দু'খানি উপন্যাস বাজারে বেরিয়ে গেছে। তবে দেশ পত্রিকার সঙ্গে তখন পর্যন্ত কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। একদিন বর্মণ স্ট্রীটের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রসঙ্গতঃ বললেন, সব কিছু ছেড়ে লেখার কাজেই আত্মনিয়োগ করবেন, লেখাকে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন এই সংকল্প নিয়েই কলকাতায় এসেছেন। আমি আমার কল্লোল-এর সেই প্রথম প্রশ্নটিরই প্রায় পুনরাবৃত্তি করলাম, 'এত দিন কি করেছেন?' আট বছরে মাত্র দু'খানা উপন্যাস চোখে পড়েছে আমার। তারাশঙ্কর জবাব করলেন, করেছি স্বদেশী, আর কখনো বা থেকেছি জেলে।

সীরিয়াসলী লেখা নিয়েই থাকবেন?

থাকবো, যদি থাকা সম্ভব হয়। অন্তত, কলকাতা বাসের খরচটা পোষানো দরকার।

সে আর কত টাকা। এখানে আজকের পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, সেটা ছিল পাঁচ টাকা মণ চালের যুগ।

তারাশঙ্কর জানালেন, আপাতত দুটি গল্প সঙ্গে আছে, যদি সদ্‌গতি হয়।

গল্প দুটিই হাত পেতে নিলাম এবং মিনিট খানেক নেড়ে চেড়ে ছাপাবার জন্য রেখে দিলাম। পাঁচ থেকে পনেরো তখন গল্পের নির্ধারিত পারিশ্রমিক। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য—এই তিনজনই যা পনেরো টাকার লেখক। অতএব তারাশঙ্করকে দুটি গল্পের জন্য দু-দ্বিগুণে বিশ টাকার ভাউচার করে দিলাম। মাখনদা যে অনুমোদন করবেন এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

কিন্তু আমার বিলের অনুমোদন করলেন না মাখনদা, সেদিন অবশ্য টাকা পেতে কোন বেগ হয়নি তারাশঙ্করের। কিন্তু প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হতেই মাখনদার কাছে তলব পড়লো আমার। জিজ্ঞাসা করলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে গল্পের জন্য কত দিয়েছো?

কত দিয়েছি শুনেই বলে উঠলেন, খুব অন্যায় করেছো। পনেরো টাকা যাঁদের দেওয়া হয়, তাঁদের কারুর চাইতে লেখক হিসেবে ইনি ছোট নন। এঁর গল্পের পারিশ্রমিক পনেরো টাকা হিসেবেই দেবে।

যখন জানালাম আরো একটি গল্প তাঁর নেওয়া আছে এবং দশ টাকা করেই তারও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে, মাখনদা বলে উঠলেন, আমি চাই না, তুমি ওঁকে কম দাও, দুটি গল্পের দরুণ আরো পাঁচ দ্বিগুণে দশ টাকার ভাউচার করে ওঁকে দিয়ো।

এবার একদিন তারাশঙ্কর এলেন, লেখা নিয়ে নয়, প্রস্তাব নিয়ে। দেড়শোটি টাকা বিশেষ প্রয়োজন। তার বিনিময়ে একখানা উপন্যাস লিখে দেবেন দেশের জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে। কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, টাকাটা প্রয়োজন সত্যি বেশী। কিন্তু আমারও অসুবিধা রয়েছে। পত্রিকার প্রচলিত নিয়মমত পুরো উপন্যাস হাতে না পেলে তা নির্বাচন করা চলতে পারে না। পারিশ্রমিক দেওয়া তো পরের কথা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সম্পূর্ণ লেখাটা কত দিনে দিতে পারেন?

দু-তিন হপ্তার মধ্যেই দিয়ে দেবো, জবাব করলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু টাকাটা দু-তিন দিনের মধ্যেই না পেলে নয়।

অনেক ভেবে চিন্তে মাথায় এক ফন্দি আঁটলাম। আসলে যা করলাম, তা মাখনদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। আজ অকপটে তা প্রকাশ করছি। মাখনদা সহৃদয় চিত্তেই গ্রহণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। হয় তো হেসে বলবেন, খুব যে! তারাশঙ্করের প্রতি দরদে মাখনদাকে চোখ বুজে ঠকিয়ে গেলি! একটু বিবেকে বাধলো না।

সত্যি বিবেকে বাধে নি। কারণ, যে যুগে পুঁটিরামের দোকান থেকে দু টাকার কচুরি এনে ভাগ করে খাইয়ে কর্মচারীদের পেটের ক্ষুধা কোনমতে নিবৃত্ত করে, আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন মাখনদা, আনন্দবাজার-এর সেই জীবন-সংগ্রামের পর্ব অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে। আনন্দবাজার এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেই আনন্দবাজারের দেড়শো টাকায় যদি কোন প্রকৃত শক্তিমান সাহিত্যিকের উপকার হয়, তাহলে আনন্দবাজারের ক্ষতি হয়না কিছু। মাখনদার পক্ষে তাঁরই রচিত আইন লঙ্ঘনের অসুবিধাটুকু কাটানোর জন্যই আমাকে ছলনা করতে হয়েছিল। বিশেষ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারাশঙ্করের উপন্যাস না পছন্দ হবার নয়।

আমি তাঁকে জানালাম, তিন দিনের মধ্যে যে কয়টা ইনস্টলমেন্ট সম্ভব লিখে নিয়ে এলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

একটা খাতা ভর্তি লেখা নিয়ে এলেন তারাশঙ্কর। মনে হল গোটা তিনেক ইনস্টলমেন্ট হবে এবং তা ছাপা হতে হতে উপন্যাস যে সম্পূর্ণ হবে এমন কড়ারও করলেন লেখক।

পুরো গল্পটা শুনে নিয়ে খাতাখানা বগলে করে খইনি টিপতে টিপতে মাখনদার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ব্যাপার কি? কিছু বলবি? বগলে ওটা কি?

একটা উপন্যাস। যতটা সম্ভব উদাসীনতার ভান করেই বললাম।

কার?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমার কন্ঠ এবারও ভাবলেশহীন।

তা কটা ইনস্টলমেন্ট হবে?

এই গোটা পনেরো ষোল হবে হয় তো।

সবটা পড়েছিস?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। ভয় ছিল, এখনি হয়তো গল্পটা শুনতে চাইবেন। তার জন্য অবশ্য তৈরী হয়েই এসেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকাশিত গল্প দুটির ভিত্তিতেই বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না মাখনদা।

সোজা প্রশ্ন করলেন, কত দিতে চাস?

আমি জবাব করলাম, আপাতত শ' দেড়েক।

আচ্ছা ভাউচার করে দে। আর সেই গল্প দুটির হিসেবে বাড়তি দশ টাকাও এই সঙ্গে দিয়ে দিস।

সেদিন একশো ষাট টাকা নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের বাকী অংশ যথাসময়ে দেওয়া সম্পর্কে কথাও রেখেছিলেন তিনি। সেদিনের সেই 'কালপুরুষ' 'বাহ্ন' নামে প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও আজ 'আগুন' নামে প্রচারিত, তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

জীবিকা

(৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তোমার ঠিক হল না ভাই। মানুষের আশা কি কেউ পুরোতে পারে! একটা শেষ হলে আর একটা—তারপর আরও একটা। আশার শেষ নাই। আবার মানুষ দুর্বলও। আশা না পুরলে চিন্তা, চিন্তায় চিন্তায় বলক্ষয়। আমরা শুধু চেষ্টা করি আশাটুকু জাগিয়ে রাখতে—বলটুকু পুরিয়ে দিতে। পুজো-আচ্ছা জপতপ হোম নামকীর্তন সব ব্যবস্থাই তো মুনিঋষিরা দিয়ে গেছেন। সেইগুলি শুধু জানিয়ে দেওয়া। সত্যি বলছি ফাঁকি দিই না। মা-কালীর কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, মা—ওদের অমঙ্গল দূর কর, দুঃখ কষ্ট ঘোচাও, ভাল কর। একটুও ফাঁকি দিই না ভাই।

একটু থেমে বলল, বলতে পার—ওতে আমার স্বার্থ রয়েছে। ওরা সহজে বিশ্বাস করলে আমারই লাভ—তাহলে অন্নবস্ত্রের জন্যে পাঁচ দুয়োরে ঘুরতে হয় না। লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সইতে হয় না। স্বীকার করি এটুকু স্বার্থ আমার আছে। পাঁচজনের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে কি ভাল নয় এটা? আমি তো কারও মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছি না—কাউকে বঞ্চিত করছি না; নিজের ভার নিজে বইছি। এটা কি অন্যায়? পাপ?

মাথাটা আমার নুয়ে পড়েছিল। উত্তর দেবার জন্য ছটফট করছিলাম, অনেকগুলি কঠিন কঠিন কথাও সাজিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু মনের সেই উত্তাপটুকু খুঁজে পেলাম না—যা প্রত্যুত্তরকে শাণিত করতে পারতো। পরিবর্তে কাটা ফলের রেকাবিখানা কোলের কাছে টেনে নিয়েছি তখন।

সত্যাগ্রহী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নতুন বাসায় এসে বেশ খুশীই হয়েছিলাম। একে তো আজকাল মনের মতো ফ্ল্যাট পাওয়াই প্রায় অসম্ভব (অবশ্য আমাদের পকেটের মাপে, নইলে পাঁচ-সাত শ' টাকা ভাড়া দিতে পারলে আর ভাল ফ্ল্যাটের অভাব কি?) তার এমন ভদ্র পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ, এ একেবারে দুর্লভ যোগাযোগ বলতে হবে! এবার একটু শান্তিতে লেখাপড়া করতে পারব ভেবে বেশ খানিকটা আশান্বিতও হয়ে উঠেছিলাম।

অবশ্য প্রথম প্রথম বেশ শান্তিতে কেটেও ছিল। এর আগের বাসার ডাইনে-বাঁয়ে ঊর্ধ্ব-অধে (একটা তিনতলা বারাক বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকতাম আমরা) দিন-রাত যে কেচাকেচি, ঝগড়াবিবাদ বিকট হৈ-হল্লা ও বিকটতর হাসি, যখন-তখন তারস্বরে গান এবং আর কিছু না হোক অকারণ উল্লাসে মধ্যে মধ্যে অনর্থক পৈশাচিক চিৎকার লেগে থাকত, তার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে অন্তত বেঁচেছিলাম। এ পাড়ার বাড়িগুলো নিতান্ত গায়ে গায়ে নয়, তাছাড়া বাসিন্দারা অধিকাংশই বড় সরকারী চাকুরে কিংবা অধ্যাপক শ্রেণীর, দু'একজন উকীল ডাক্তারও আছেন অবশ্য—তবে তাঁরা কেউই খুব হৈ-হল্লা করার লোক নন্। সুতরাং অতঃপর একটা গালভরা বিষয় ও তদধিক গালভরা নামের একখানা মোটাসোটা বই লিখে ফেলাও অসম্ভব হবে না—মনে মনে এমন একটা আশ্বাসও উঁকিঝুঁকি মারছিল।

অবশ্য খুব যে একটা চেঁচামেচি এক্ষেত্রেও হয়েছিল—তা নয়।

নিতান্ত খুব শান্ত পরিবেশ ব'লেই সেটুকু গোলমাল কানে এসেছিল।

কোন এক ভদ্রলোক কোন ছেলেপুলেকে মারছেন আর তর্জন করছেন, তারই আওয়াজ। গোলমাল তাকে বলা চলেও না ঠিক, কারণ তর্জনটা হচ্ছিল এক তরফাই। অপরপক্ষ একেবারে নিরুত্তর, এমন কি কোনরকম কান্নাকাটির শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল না।

খুব কাছেই কোথাও, তবু ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে তা বুঝতে পারিনি। তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। অভিভাবকদের ছেলে শাসন করা ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ ঘটনা। এ তো ঘরে-ঘরেই আছে। তা ছাড়া দু'চার মিনিটের মধ্যেই সেটুকু শব্দও থেমে গেল।

কিন্তু এই ধরণের বিশেষ একটি তর্জনের শব্দ অতঃপর দু-একদিন অন্তর-অন্তরই পাওয়া যেতে লাগল। বেশীক্ষণও নয়, খুব বেশীও নয়। তবে এই পাড়ার একেবারে শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে একটু বেমানান, এই যা। কয়েকদিন শোনবার পর একটু কৌতূহলও বোধ করলাম। কে এমন অবাধ্য বেয়াড়া ছেলে যাকে প্রায়ই শাসন করতে হয় অথচ যে জবাব দেয় না, কাঁদেও না—কোন্ বাড়ির, কাদের ছেলে?

অবশেষে একদিন কৌতূহলটা মেটাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সাধারণতঃ আমি বাজারে যেতাম একটু দেরি ক'রেই—কারণ সকালে প্রাতঃকৃত্য, প্রাত্যহিক সেভ এবং তার খানিকটা পরে চা খাওয়া ইত্যাদিতে আমার অনেকটা সময় প্রয়োজন হয়, ঠিকমতো প্রস্তুত হয়ে রাস্তায় বেরোতে বেরোতে আটটা বেজে যায়; গৃহিণী রাগারাগি করেন প্রত্যহই। এখানে সব সুবিধা, কেবল বাজার কিছু দূরে, অতএব ফিরে আসতে আসতে ন'টা বেজে যায়, তারপর চাকরে সাড়ে ন'টায় ভাত দেয় কি করে? আবার ভাত খেয়ে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম না করলে চলে না। গৃহিণীর বক্তব্য যে, এতগুলি বদভ্যাসের অন্তত একটা না বাদ দিলে বা না বদলালে চাকর থাকবে না!

শুনতে শুনতে 'দুত্তোর' বলে একটা য়্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি কিনে এনে ছ'টার জায়গায় সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রায় সওয়া সাতটাতেই সেদিন বাজারে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আর বাড়ি থেকে বেরিয়েই দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল।

আমাদেরই পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। দোতলা ছোটগোছের বাড়ি নিয়ে থাকেন—নিজের কি না তা জানি না—তবে মনে হয় নিজেরই। সামনে একটু বাগান-মতোও আছে। ভদ্রলোক উকীল, নাম বঙ্কিমবাবু, প্রায়ই আমার সঙ্গে বোরোন কালীঘাট ডিপো পর্যন্ত এক বাসেই যান। বাজারেও দেখা হয় মধ্যে মধ্যে। সেই সূত্রে সামান্য একটু আলাপও হয়েছে।

এই তর্জনের শব্দটাই যে প্রত্যহ শুনি তাতে কোনও সন্দেহ রইল না। তেমনি একটা চাপা অথচ মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তর্জন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ির এত কাছে বলেই চাপা হ'লেও শুনতে পাই, দেখতে যে পাই না তার কারণ আমাদের ফ্ল্যাটটা ওদিকে, এঁদের আর আমাদের মধ্যে একটি সিঁড়ি ও এক সার ঘরের ব্যবধান আছে।

বঙ্কিমবাবু দেখি তাঁর এক ফালি বাগানে দাঁড়িয়েই ছেলেকে শাসন করছেন। এক হাতে কানটা ধরে আর এক হাতে ঠাস ঠাস ক'রে চড় মারছেন।

'বলবি, আর বলবি সত্যি কথা? আর কখনও বলবি! তোর সত্যি কথা বলা একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়ে না দিই তো আমার নাম নেই! হারামজাদা বজ্জাত বদমাইশ কোথাকার!'

মনে হ'ল ভুল শুনেছি। কিম্বা ভদ্রলোকই রাগের মাথায় উলটোপালটা বলছেন। সত্যি কথা বলার জন্যে কেউ কখনও ছেলেকে শাসন করে?

কিন্তু ছেলেটিকেও তো আমি জানি। বলাই নাম ওর—অন্তত সেই নামেই ওর বাবা ডাকেন—পনেরো ষোল বছরের ছেলে, বেশ শান্তশিষ্ট ধরনের, প্রায়ই দেখি বাগানের গেটের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন দিন কোন অসভ্যতা বা বাচালতা লক্ষ্য করিনি। হৈ-হল্লা তো নয়ই। তবে?

রহস্য আরও ঘনীভূত হ'ল—যখন ওপরের বারান্দা থেকে বলাইয়ের মা'র গলা পাওয়া গেল। ভদ্রমহিলা যে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন—অথবা এখনই এসে দাঁড়ালেন—তা লক্ষ্য করিনি। তিনিও চাপা অনুনয়ের সুরে বললেন, 'না গো না, কাল তিনবার মিথ্যে বলেছে—আমি নিজে স্বকর্ণে শুনেছি। মিছিমিছি অত বড় ছেলেটাকে রোজ রোজ অমন ক'রে মেরো না পাঁচজনের সামনে, একেবারে বিগড়ে যাবে। অভ্যেস কি আর একদিনে পাল্টায়?'

'পাঁচজনের সামনে' শব্দ দুটোতেই বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠে আমার দিকে অর্থাৎ রাস্তার দিকে তাকালেন বঙ্কিমবাবু। চোখাচোখি হওয়াতে তিনিও লজ্জা পেলেন—আমিও পেলাম। তাঁর ছেলেকে তিনি শাসন করছেন—আমি কেন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকি সেদিকে?

অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি কৌতূহলটা রয়েই গেল। বরং আরও প্রবল হ'ল—বলাই উচিত। বঙ্কিমবাবুর কথাগুলোকে উল্টো-পাল্টা বলে ভাবা চলত অনায়াসে যদি না ওঁর স্ত্রী আবার শেষের ঐ কথাগুলো বলতেন।

ব্যাপারটা যেন ক্রমশঃই বড্ড গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

সেদিন বাজারে বড় গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ সারাক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েই বাজার করলুম বলতে গেলে। ফলে ফরমাশী জিনিসের একটাও কেনা হ'ল না—এমন কি নিত্য-নৈমিত্তিক যেটা—আলু সেটাই ভুল হয়ে গেল।

আমার গৃহিণী কপালে চাপড় মেরে আত্ম-ধিক্কার দিলেন, 'এই লোককে নিয়ে আমার সংসার করার সাধ যে কেন তাও জানি না। আমার চাকরকে এই এত পথ পাঠাব তবে রান্না হবে! ধন্য ধন্যি... মাথাতে কি কিছু থাকতে নেই—ঐ ছাইভস্ম বইখাতা আর ছাত্তর ছাড়া।... তাও যদি আমার নদির ভাসুরের মতো দু'পয়সা রোজগার করতে পারছে তো বুঝতুম। বটঠা সেও তো একটা নামকরা প্রফেসার গো, কিন্তু সে টিউশ্যানী করে বই লিখে মানের বই লিখে তোমার তিনগুণ রোজগার করছে দ্যাখো গে যাও। তার ওপর সে সংসারও করছে; তোমার মতো শুধু কেলাস আর ছাত্তর আর পড়ানো নিয়ে এমন উন্মত্ত হয়ে নেই!'

এর পর আর কিছু বলা উচিত নয়, তবু খাবার সময় লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা বলেই ফেলি।

'ও হরি! অবাক করেছে! তুমি সেই কথা ভেবে মাথা খারাপ করছ সেই থেকে! না, মাথাটা তোমার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে—চিকিচ্ছে করাও!'

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

'ওমা, ওর কথা আবার এ পাড়ায় কে না জানে! কম বদমাইশ ছেলেটা? বাপ-মার হাড় ভাজাভাজা ক'রে খাচ্ছে একেবারে!

তবু বিস্ময়ের অবসান হয় না। বিহ্বল হয়ে বলি, 'কিন্তু ছেলেটাকে তো তেমন—''

'হ্যাঁ—মিচ্‌কেপড়া শয়তান। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি!'

এবার আসল কথাটা মনে পড়ে যায়; বলি, 'কিন্তু মিথ্যে কথা বলে না সত্যি কথা বলে! সত্যিকথা বলার জন্যে মারবে কেন? আমরা তো জানি ছোটবেলা থেকে এইটেই শেখানো হয়—সদা সত্য বলিবে! তা'হলে? ব্যাপার যে কি সেইটেই তো বুঝতে পারছি না!'

'ওগো মশাই, সদা সত্য বলিবে—ও কথাটা পুঁথিপত্রেই ভাল। ঘর-সংসার করতে গেলে কি অত যুধিষ্ঠির হওয়া চলে! তাও তো যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যে বলতে হয়েছিল। তার ওপর বঙ্কিমবাবু হলেন গে উকীল, মিথ্যে কথা বলাই ও'দের ব্যবসা, ও'র বাড়িতে যদি অমন সত্যিবাদী গজিয়ে ওঠে তো কি বিপদ বল দিকি!'

তবু কথাটা যে ঠিক মাথায় ঢুকছিল না, সেটা বোধ করি আমার চোখের চাউনি দেখেই বুঝতে পারলেন আমার গৃহিণী। তাঁর মুখে একটা অসীম অনুকম্পা ফুটে উঠল।

'বুঝতে পারলে না? ছেলেটা যদি বাড়ির মধ্যে বসে সত্যি কথা বলে তাহলে তো কোন অসুবিধা হয় না। ছোঁড়ার যত ঝোঁক ঐ বাইরের ঘরে। ধরো, বঙ্কিমবাবু হয়তো কোন মক্কেলকে বোঝাচ্ছেন যে পরের দিন তাঁর অনেকগুলো কেস আছে, নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পাবেন না—ছেলেটা দুম ক'রে বলে বসল, "তবে যে বাবা তুমি বলছিলে কাল দিদির জন্যে পাত্তর খুঁজতে যাবে চুঁচ্‌ড়োয়!" কী অপ্রস্তুত হ'তে হয় বল দিকি! একেবারেই যেদিন কাজকর্ম থাকে না, সেদিন হয়তো সকাল ক'রে আদালত থেকে এসে ঘুমোন ভদ্রলোক, কিন্তু সেকথা কি মক্কেলকে বললে চলে? সেদিন অমনি চলে এসেছিলেন, কে এক মক্কেল গিয়ে খুঁজে পায়নি। সন্ধ্যাবেলা এসে সে-কথা বলাতে বঙ্কিমবাবু সবে শুরু করেছেন—"হ্যাঁ আজ একটা কমিশান ছিল কি না, মোটা টাকার ব্যাপার, তাই বেরিয়ে গিয়ে-ছিলুম"—অমনি কুটুস ক'রে ছেলেটি বলে উঠল, "কমিশন বুঝি তা'হলে খুব তাড়াতাড়ি চুকে গেছে বাবা, তুমি তো সেই বেলা দেড়টায় বাড়ি চলে এসে ঘুমোচ্ছিলে!" আচ্ছা, এর পর কোন্ ভদ্রলোকের মাথা ঠিক থাকে বল দিকি!'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম। সত্য এক্ষেত্রে শুধু সত্য নয়—ইংরেজীতে যাকে বলে ঢ্যাগ্রেসিভ অর্থাৎ গায়ে-পড়া সত্য, তাই।

তখন আর কথা বাড়াবার অবকাশ ছিল না, দশটা বেজে গেছে, সেদিন আবার সকাল সকাল ক্লাশ—সুতরাং ও প্রসঙ্গে ঐখানেই ইতি টানতে হ'ল তখনকার মতো।

তারপর সারাদিন অবশ্য আর কথাটা মনে ছিল না, কাজকর্মের মধ্যে ভুলেই গিয়েছিলাম। কৌতূহল মোটামুটি নিবৃত্ত হয়েছে, অহরহ মনে খোঁচা দেবার আর কারণ নেই; কাজেই মনে থাকার কথাও নয়।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে বাস্ থেকে নেমে আমাদের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তাটায় পড়তেই প্রথম যাকে দেখতে পেলাম—সে হ'ল শ্রীমান বলাই। ওদের গেটটা ধরে বড় রাস্তার দিকেই চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিই দাঁড়িয়ে থাকে সে বেশীর ভাগ। ভীড়ে মেশার চেয়ে দূরে থেকে ভীড় দেখতেই তার ভাল লাগে বোধ হয়।

ওকে দেখেই সব কথাগুলো মনে পড়ে গেল। কেমন একটা কৌতূহল বোধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও। গতিটা ঈষৎ একটু বাঁকিয়ে ওর কাছাকাছি এসে পড়লাম। এর আগে কোনদিন ওর সঙ্গে কথা বলিনি কিন্তু আজ একটু থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী, বাবা কি করছেন? ফিরেছেন কাছারী থেকে?'

ছেলেটা একবার যেন ভয়ে ভয়ে ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিল, তারপর গলাটা নামিয়ে প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস ক'রে বলল, "বাবা তো আজও সেই দুটোর সময় ফিরে এসেছে। ঘুমোচ্ছে সেই থেকে পড়ে পড়ে। মক্কেলদের অবশ্য তা বলা চলবে না, তারা কেউ এলে বলতে হবে যে বাবা এই বাড়ি ফিরলেন, একটা জরুরী কনসালটেশ্যান ছিল হাইকোর্টে গিছলেন—তা আপনি তো আর মক্কেল নন, তাই আপনাকে বললাম!'

সত্য কথাটা বলতে পেয়ে ছেলেটা যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বেশ একটা মধুর হাসিতেও ভরে গেল ওর মুখখানা।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন বঙ্কিমবাবু।

'কী বলছিল, কী বলছিল ও হতভাগা বাঁদরটা বলুন তো—আপনাকে কী বললে ও?'

চেয়ে দেখি বলাইয়ের মুখটা ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে। একটু মায়াই হ'ল। বললাম, 'না', আমি এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমার বাবা কি করছেন। তা ও বললে, হাইকোর্টে নাকি একটা কি কনসালটেশন ছিল আপনার, তাই একটু আগে ফিরেছেন!

'বলেছে, তবু রক্ষে!'

স্পষ্ট একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল বঙ্কিমবাবুর মুখে। কিন্তু সে নিতান্তই স্বল্প-স্থায়ী। আমি বা তিনি আর কিছু বলার আগেই বলাই বলে উঠল, 'না বাবা, আমি বলেছি যে মক্কেল এলে ঐ কথা বলতে হবে। তা উনি তো আর মক্কেল নন, তাই ও'কে যা আসল কথা তাই বলেছি যে, তুমি দুটোর সময় বাড়ি ফিরে এসে ঘুমোচ্ছ।

অন্ধকার হয়ে উঠল বঙ্কিমবাবুর মুখ। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন তিনি। নিতান্ত আমি আছি ব'লেই বোধ হয় হাতটা বাড়াতে গিয়েও বাড়ালেন না।

'দেখলেন! দেখলেন হারামজাদার কাণ্ডটা! আপনি ওকে বাঁচাবার জন্যে একটু রেখেঢেকে বলতে গেলেন—কী রকম অপ্রস্তুতটা আপনাকে ক'রে দিলে!......না, না, হাসবেন না সূর্যবাবু, এ হাসবার কথা নয়। আমার পক্ষে এ মারাত্মক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। আসুন আসুন—একটু দয়া ক'রে অফিসঘরে বসবেন চলুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সব কথা বলা যায় না—'

আমি তাড়াতাড়ি বলতে গেলাম, 'আমি বরং খানিক পরে আসবখন—মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে?'

'না না—দয়া ক'রে এখনই একটু বসে যা... চা এক কাপ না হয় গরীবের ঘরেই খা... বেশীক্ষণ আটকাবও না আপনাকে। কিন্তু এমন হয়েছে, কথাটা কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে না পারলেও আর চলছে না। ছেলে তো নয়—গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে।

অগত্যা ও'র পিছু পিছু যেতে হ'ল ভেতরে।

আমাকে তাঁর অফিস ঘরে বসিয়ে এক দৌড় একবার ভেতরটা ঘুরে এলেন ভদ্রলোক—বোধ-করি চায়েরই ফরমাস ক'রে এলেন—তারপর ওধার থেকে তাঁর চেয়ারটা টেনে এনে একেবারে সামনাসামনি বসলেন আমার।

'আপনি তো মশাই নামকরা প্রোফেসর একজন—না-না, আপনি ঘাড় নাড়লে কি হবে, আপনার নাম আমি অনেকের মুখেই শুনেছি—ছেলেরা নাকি আপনার ইশারায় ওঠে বসে, সব আপনার হাতধরা।...আপনি দয়া ক'রে একটা উপায় বাতলান দিকি।...অনেকদিন ধরেই ভাবছি আপনার কাছে যাব পরামর্শের জন্যে—কিন্তু লজ্জাও তো করে, বুঝলেন না—ছেলেকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলাতে পারছি না, এ কি আর পরের কাছে বলবার মতো কথা?'

ক্ষোভে উত্তেজনায় সঙ্কোচে ভদ্রলোকের গলা যেন বুজে এল। কিছুক্ষণের মতো থামলেন তিনি। একটু উৎসুকভাবে তাকালেন আমার মুখের দিকে। কিন্তু আমিই বা কী বলব? মুখে যথাসম্ভব সহানুভূতির ভাব আনবার চেষ্টা করি শুধু।

একটু পরে তিনি যেন একটু কুণ্ঠিতভাবেই আবার বললেন, 'শুনেছেন সব নিশ্চয়ই,—এ কেলেঙ্কারী আর এ পাড়ায় কারই বা জানতে বাকী আছে বলুন, পাশাপাশি বাড়ি সব, ওর মা বলেন, যা করবে বাড়ির মধ্যে করো—পাড়ায় চিটিকার না হয়। কিন্তু সব সময় কি আর অত হিসেব ক'রে চলা যায়? আপনিই বলুন, মানুষের

শরীর তো! কী রকম অসহ্য রাগ হয় বলুন দিকি!'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু এতকাল শুনিনি, আজ সকালের ঐ ব্যাপারটা দেখে বাড়িতে গিয়ে বলাতে কিছু কিছু জানতে পারলাম।'

'যাই হোক্ জেনেছেন তো। এখন কী করি বলুন তো! আপনি তো অনেক সাইকোলজি-টজি পড়েছেন, এর কোন উপায় হয় না? অথচ দেখুন ছেলেটার এদিকে সব ভাল, যাকে বকাটে বলে তা আদৌ নয়। পড়াশুনোতেও বেশ মাথা, ফার্স্ট, সেকেণ্ড হয় ক্লাশে। এই এক রোগেই সব নষ্ট হয়ে গেল!'

'দেখুন এ হচ্ছে এক ধরণের মানসিক ব্যাধি।' সবিনয়ে স্বীকার করি, 'এর প্রতিকার বাত্লানো আমার কর্ম নয়। এ রকম কেসের কথা দু' একটা পড়েছি বটে, তবে ঠিক সেভাবে তো পড়াশুনো করিনি কোনদিন!'

তারপরই প্রসংগটা তখনকার মতো ছেদ টেনে সরে পড়বার গরজে তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি বরং আমার দু' একজন বন্ধুকে—যাঁরা এই সাবজেক্ট্ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব। যদি কোন রকমের চিকিৎসার কথা বলেন, তাও আপনাকে জানিয়ে যাব।'

'খুব ভাল হয়, খুব ভাল হয় তা হ'লে!' কৃতজ্ঞ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে ওঠেন ভদ্রলোক, 'যা বলবেন তাই করব। এ সব চিকিৎসা কোথায় হয় তা তো জানি না, তাহলে সেখানেই নিয়ে যেতাম এতদিন।'

'দেখি আমি খোঁজ নিয়ে, সব জানিয়ে দেব আপনাকে!' আশ্বাস দিয়ে বলি।

ততক্ষণে চা-ও এসে পৌঁচেছে। কানাভাঙা কাপে অপেয় একপ্রকার গরম পানীয়। একেই বোধহয় মক্কেলের চা বলা হয়। কোনমতে চোখ কান বুজে তার খানিকটা গলাধঃকরণ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

বঙ্কিমবাবুও আমার সংগে সংগে বাইরে এলেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'সত্যি, তবু অনেকটা ভরসা পেলাম আপনার কথাতে। আমি তো তাই বলি বাড়িতে, অতবড় একটা পণ্ডিত লোক এসেছেন পাড়ায়—এ আমাদের কতটা জোর, কতখানি ভরসার কথা!'

বলাই তখনও তেমনি গেট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে টুক্ ক'রে বলে উঠল, 'তুমি কোথায় তা বললে বাবা, মা-ই তো বলছিল যে পাড়ার লোক বলাবলি করছে লোকটা নাকি খুব পণ্ডিত, বিলিতী ডিগ্রি আছে—তুমি তো বরং বললে লোকটা বড্ড দেমাকে, চালবাজ, পাড়ার কারুর সংগে মেশে না, অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না—আরও কত কী!...এখন দেখছ তো কেমন ভাল লোক। আমার এক মাস্টার মশাই বলছিলেন, অত বড় পণ্ডিত তবু কেমন ভদ্র, মাটির মানুষ একেবারে—'

আরও কত কী বকে গেল সে। কিন্তু সেটা দাঁড়িয়ে শোনার মত মানসিক অবস্থা নয় আমার। কোনমতে ভদ্রতি সীমার বাইরে যেতে পারলেই বাঁচি তখন।

বঙ্কিমবাবুর মুখের ভাবটাও অনুমান মাত্র করতে পারলাম, তাঁর মুখের দিকে চাইতে আর সাহস হল না। তাড়াতাড়ি ফটকটা খুলে বাইরে বেরিয়ে দ্রুত বাড়ির পথ ধরলাম।

এর তিন চারদিন পরে কী একটা উপলক্ষে সকাল করে বাড়ি ফিরছি, দেখি শ্রীমান বলাই-দেরও স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, সেও বইখাতা হাতে বাড়ি ফিরছে। গলির মোড়েই দেখা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল ওকে একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

নিজে থেকেই ডেকে বললাম, 'কী বলাই, ছুটি হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ স্যার!' সপ্রতিভভাবে কাছে এগিয়ে এল।

'কী করবে এখন? ঘুমোবে?'

'না স্যার, এমনিই—গল্পের বইটই পড়ব। ঘুমোতে আমার ইচ্ছে করে না।'

'তা হলে চল না আমাদের বাড়ি। একটু গল্প করা যাক!'

'এক্ষুণি আসছি স্যার—এক মিনিট।'

সে যেন লাফিয়ে উঠল একেবারে। আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে একছুটে নিজেদের বাড়িতে ঢুকে, জানলা গলিয়ে বই-খাতাগুলো বাইরের ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়েই আবার একছুটে বেরিয়ে এল।

'চলুন স্যার! ওঃ আমার কত দিনের শখ, আপনার লাইব্রেরী দেখব। আমাদের হিস্ট্রীর স্যার বলেন, আপনার নাকি অনেক ভাল ভাল বই আছে।'

'কিন্তু সে তো তোমার ভাল লাগবে না বাবা, সে ছবির কি গল্পের বই নয়। মোটা মোটা ভারী বই সব—ইংরাজী, ফরাসী ভাষায় লেখা!'

একটু ম্লান হয়ে গেল—মুহূর্তের জন্য। তারপরই আবার উজ্জ্বল মুখে বললে, 'তা হোক, তবু চেহারাটা তো দেখতে পাব। আর কাল ইস্কুলে গিয়ে গল্প করলে আমাদের স্যারেদের যা হিংসে হবে!'

আপন মনেই সে হেসে নিল খানিকটা। প্রসন্ন সকৌতুক হাসি।

ওকে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরী ঘরেই বসালাম। বাড়িতে বলে দিলাম ওকে কিছু জলখাবার দিতে। দেখলাম বুঝুক না বুঝুক, বইয়ের দিকে ঝোঁক খুব, যেন ভাল ভাল বইতে হাত বুলিয়ে আনন্দ ওর। গল্প ক'রে বুঝলাম ছেলেটা সত্যিই ভাল, খাঁটি ইস্পাত। ঠিক মতো গড়ে নিতে পারলে ধারালো তলোয়ার হয়ে উঠবে একদিন।

একথা সেকথার পর আসল কথাটা তুললাম। বললাম, 'আচ্ছা বলাই, তোমার ব্যাপারটা কী বল দিকি? এত মার খাও, বকুনি খাও—তবু এমন গায়েপড়ে সত্যি কথা বলতে যাও কেন? যেখানে শুধু চুপ ক'রে থাকলেই চলে, মিথ্যে কথাও বলতে হয় না, সেখানেও নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে এমন বিভ্রাট বাধাও কেন?'

ঘাড় হেঁট করে রইল বলাই। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। লক্ষ্য করে দেখলাম, পাখার নিচে বসে থাকা সত্ত্বেও তার কপালে চুলের কোণে কোণে ঘাম দেখা দিয়েছে। গলার খাঁজটাও যেন চিকচিক করছে।

একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে আবারও বললাম, 'এইটে যদি খুলে বলতে পার তাহলে বুঝব তুমি সত্যি সত্যিই সত্যবাদী।'

এবার মুখ তুলে তাকাল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে বেচারী। চোখ দুটোও যেন কেমন ছল ছল করছে।

একবার মাত্র আমার চোখের দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'একদিন জোর করে বদমাইশী করবার জন্যেই ওটা অভ্যাস করেছিলুম, এখন আর ছাড়তে পারছি না। এখন কত চেষ্টা করি চুপ ক'রে থাকার, কিন্তু কী যে হয়, কথাটা যেন কে জোর ক'রে বলিয়ে দেয়।'

বিস্মিত হয়ে বলি, 'কিন্তু জেদ করে তখন অভ্যাস করেছিলে কেন?'

আরও হেঁট হয়ে যায় ওর মাথাটা। প্রায় চুপি চুপি বলে, 'সে তিন চার বছর আগের কথা, বাড়ির স্যার একটা টাস্ক দিয়ে গিয়েছিলেন—মনে ছিল না। বকুনি খাবার ভয়ে মিছে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম যে বাবার শরীরটা খারাপ ছিল, ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়েছিল তাই করতে পারিনি। সে স্যার বড্ড কথায় কথায় মারতেন, সেই জন্যেই যা মুখে এসেছিল বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেইদিনই কী জন্যে বাবা সে ঘরে এসে পড়লেন। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেল। স্যার তো খুব মারলেনই—তিনি চলে যেতে বাবা চেলা কাঠের বাড়ি এমন মারলেন, চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল, এখনও তার দাগ আছে। তার চেয়েও বড় কথা বললেন, আমি তাঁর মাথা হেঁট করে দিয়েছি—এমন ছেলে যার তার আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখানো উচিত নয়। এই ছেলের জন্য তাকে একদিন আত্মহত্যা করতে হবে। তারপর দিন থেকে রোজ আমাকে সামনে বসে একশ' আটবার ক'রে লেখাতেন—সদা সত্য কহিবে। রোজ ভোরে আর শোবার আগে দশবার ক'রে বলিয়ে নিতেন যে কোনদিন কোন কারণেই মিছে বলব না। সে-ই আমার কেমন রোগ চেপে গেল বুঝলেন, মনে মনে ঠিক করলুম যে এই সত্যি কথা বলেই বাবাকে জব্দ করতে হবে।...সেই যে অভ্যাস করলুম আর এখন ছাড়তে পারি না। খুব চেষ্টা করি, আমি নিজেই বুঝতে পারি বাবা কী রকম অপ্রস্তুত হন, অপমানিত হন আমার জন্যে, কিন্তু তবু—। কী যে হয়!...এক একদিন নিজেরই চোখে জল এসে যায়।'

ছেলেটার দেখি সবই বিচিত্র। যাই হোক তবু কাছে টেনে এনে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলি, 'মিছে কথা কোন অবস্থাতেই বলা ঠিক নয় অবিশ্যি, কিন্তু শাস্ত্রে আছে, প্রাণ রক্ষার্থে, মান রক্ষার্থে, খেলার সময়, ইয়ার্কি ক'রে আর স্ত্রীর কাছে মিছে বলাটা তেমন দোষের নয়। এটা তো মান রক্ষারই ব্যাপার, আর বাবার মান সকলের চেয়ে বড়। তা তুমি শুধু চুপ ক'রে থাকার অভ্যেসটাই কর না বাপু। যেমন করে অভ্যেস করেছ তেমনি চেষ্টা করলেই আবার ছাড়তেও পারবে!'

খানিকটা মাথা হেঁট করে বসে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'খুব চেষ্টা করছি, আরও করব স্যার। কিন্তু কী জানেন, আমার মনে হয় ভাল অভ্যেসটা করাই শক্ত, খারাপটা চট্ ক'রে হ'য়ে যায়!'

তারপর কি ভেবে একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে—'আচ্ছা আমি আসি স্যার' বলে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একজন ভাল ডাক্তারের নাম-ঠিকানাও যোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বঙ্কিমবাবুর কাছে, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়েছিলেন কিনা অথবা তার ফলাফল কী হ'ল তা' জানতে পারিনি।

ব্যস্তও ছিলাম ক'দিন খুব।

তবে যতই ব্যস্ত থাকি, কথাটা মনে ছিল।

(শেষাংশ ৬২ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণ-সিন্দুর

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যেন জুৎ নেই। পুজোর পর থেকেই শরীরটা যেন কি রকম-কি রকম লাগে।

ঠিক বয়সে মানুষের যদি চুল না পাকে, দাঁত না পড়ে, ভেতরে তখন তার বেশী কোরে ক্ষয় সুরু হয়, জরায় ধরে। মুখেতে আগুন দেওয়া তুবড়ী যদি সতেজে উর্ধে উঠতে না পারে, তাহোলে খোলের মধ্যেই গুমরে উঠে, খোলটাকে সে ফাঁসিয়ে দেয়। ভেতর ভেতর কনকের শরীরও সেই রকম দিনের পর দিন খারাপ হোতে লাগলো।

সুরেশ একদিন বললে—"কি হোয়েচে তোমার, খাওয়া-দাওয়া হঠাৎ এত কমে গেল কেন? খানিকটা চুপ কোরে থাকবার পর কনক বললে—"কি খাব? বাজারের পচা মাছ, শুকনো বাসি তরকারী আর গঙ্গার সাদা জল?"

সুরেশ বললে—"উপায় কি বলো? এ ত বিজপুর নয়, এ হোল কোলকাতা, এই খাওয়াই অভ্যেস কোরে নিতে হবে।"

"তাই নোব।"

কিন্তু তা হোল না। কনক যেন মনমরা হোয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো। ডাক্তার দেখানো হোল। ওষুধও কিছু কিছু চললো। কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হোল না। ডাক্তার বললেন—"গ্রাম থেকে হঠাৎ সহরে এসে থাকলে কারো কারো তা সহ্য হয় না। এ অবস্থায় বেশ একটু মনের আনন্দে থাকবার চেষ্টা করতে হয়।" সুরেশের পরিচিত এক কবিরাজ দু' হপ্তার 'স্বর্ণ-সিন্দুর' দিয়ে বললেন—"রোজ একমাত্রা কোরে খাইয়ে যান ত' মাখন-মিছরির সঙ্গে, দেখবেন সব ঠিক হোয়ে যাবে।"

কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে সুরেশ কনককে কোলকাতায় রাখা ঠিক মনে করলো না। তার শাশুড়ী ও শ্যালক এখানে থাকলে কোন কথা ছিল না। সুতরাং দু' একদিন পরে সুরেশ কনককে বিজপুরে তার মা-দাদার কাছে রেখে আসতে বাধ্য হোল। কবিরাজের সেই 'স্বর্ণ-সিন্দুরের' মোড়কটা কনকের হাতে দিয়ে বলে এলো, "রোজ এক মোড়া কোরে খেয়ে যেয়ো. শীগগিরই শরীর ঠিক হোয়ে যাবে।" বাসায় একজন ঠাকুর রেখে, সুরেশ কোলকাতায় তার চাকুরী বজায় রাখলে।

* * *

কনককে বিজপুরে রেখে আসবার দিন তিন-চার পরে, সুরেশ তাকে একখানা চিঠি লিখে জানালে যে, কোবরেজ মশাই বলেচেন, মাখন না পাওয়া গেলে দুধের সর দিয়েও 'স্বর্ণ-সিন্দুর' খাওয়া চলবে।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে কিসের উপলক্ষে পর পর তিনদিনের ছুটিতে সুরেশ বিজপুরে গেল। কনককে দেখে বললে—"বাঃ! সুন্দর! এই ত চেহারা বেশ সেরে গেছে! 'স্বর্ণ-সিন্দুরে' তা হোলে কাজ হোয়েচে দেখচি!"

সামনের আলমারি থেকে একটা মোড়ক বার কোরে সুরেশের বিছানার ওপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে কনক বললে—'স্বর্ণ-সিন্দুর' এক মোড়াও খাই নি. এমনিই সেরে গেছে।"

কিন্তু তা নয়, এমনিই সারে নি। 'স্বর্ণ-সিন্দুরেই' সেরেচে, তবে তা কবিরাজী 'স্বর্ণ-সিন্দুর' নয়, বিজপুরী 'স্বর্ণ-সিন্দুর'।

স মা ধা ন

(৪৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাঠের মধ্যে চলে গেল। রাত নটা পর্যন্ত বসে রইল একটা অন্ধকার কোণে।

ফিরে এসে ফ্ল্যাটে ঢুকতেই নাকে ইলিশ মাছের গন্ধ এল। অমৃত গুম হয়ে শার্টটা আলনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সটান খাটে শুয়ে পড়ল।

সে আর পারছে না। বুকের ভিতরটা কি রকম করছে যেন। এর আগেও কতবার ঈষ্ট-বেঙ্গলের কাছে মোহনবাগান হেরেছে, কিন্তু এমন কষ্ট সে কখনও পায়নি।

—এত দেরি হল যে! রাত হয়েছে খাবে চল।

অমৃত না চেয়েও টের পেলে সুপর্ণার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চাপা হাসি ঝিলিক দিচ্ছে।

অমৃত সাড়া দিলে না।

সুপর্ণা বললে, ওঠ। আজ আমি নিজে রেঁধেছি, আমাদের দেশের রান্না। খেলে আর ভুলতে পারবে না।

অমৃত ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। বললে, সেদিন আমি মিষ্টি এনেছিলাম বলে আমাকে নীচ বলেছিল। আজ এ কি!

—কি আবার? ইলিশ মাছ কি লোকে খায়না?

—খায়। ঈষ্টবেঙ্গল জিতলে বাঙালরা খায়।

—ঘটিরা তখন কি করে?

—কি করে দেখবে?

বিদ্যুদ্বেগে অমৃত রান্নাঘরে গিয়ে কড়াই শুদ্ধ ইলিশ মাছ নর্দামায় ঢেলে দিলে।

তারপরে আরম্ভ হল কলহ।

অমৃত বললে, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

—আমিও না।

বলে সুপর্ণা তৎক্ষণাৎ একটা ছোট স্যুটকেস হাতে করে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, তোমার মতো ইতরের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

লীগ খেলা শেষ হল। শীল্ডও। তারপরেও কিছুদিন কেটে গেল। পুজার দিন কয়েক আগে সুপর্ণার ছোট ভাই মণীশ অমৃতর ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত।

—কি খবর মণীশ! বহুকাল পরে?

মণীশ কাঁচুমাচু করে বললে, বহুকাল পরেই বটে! প্রায়ই আসব ভাবি। হয়ে ওঠে না। সামনেই প্রি-টেস্ট গেল। আপনার বিছানার চাদর কি হল জামাইবাবু?

—ছিঁড়ে গেছে। আর কেনা হয়নি।

—বালিশের অড় তো সাবান দিয়েও নিতে পারতেন। ঝিটা আছে তো? না পালিয়েছে?

—পালাবে কি! তার তো এখন চূড়ামণি যোগ চলেছে! হিসেব নেবার কেউ নেই।

—ভালো।

মণীশ পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে অমৃতর হাতে দিলে। সুপর্ণা লিখেছেঃ

মায়ের ইচ্ছা কাল শনিবার রাত্রে তুমি এখানে খাবে। নিশ্চয় এস।

অমৃতের মনটা মণীশকে পেয়ে একটু কোমল হয়েছিল। সুপর্ণার চিঠি পেয়ে আবার শক্ত হল।

বললে, আমার তো সময় হবে না ভাই। মাকে বোলো শনিবার আমার একটু অসুবিধা আছে।

—আবার অসুবিধা কি? মোহনবাগান তো জিতে গেছে।

অমৃত হেসে ফেললেঃ না, মোহনবাগানের জন্যে নয়।

—তবে আর কি? দিদি বলেছে, ইলিশ মাছও হচ্ছে না। শনিবার আমি নিজে এসে আপনার অফিস থেকে নিয়ে যাব। ওজর-আপত্তি চলবে না।

মণীশ চলে গেল এবং শনিবার অফিস থেকে পালাবার আগেই অমৃতকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল। মণীশের জবরদস্তি এড়ান অমৃতের পক্ষে খুবই কঠিন।

ও বাড়ি পৌঁছুতেই শাশুড়ী একথা-সেকথার পর বললেন, মুস্কিল হয়েছে তোমাদের দেশের নিয়মকানুন তো জানিনা। সাধ তোমরা ক'মাসে দাও?

—সাধ! —অমৃত আকাশ থেকে পড়ল। —সাধ কি?

শাশুড়ী জবাব দিলেন না। মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন।

এতক্ষণে অমৃত ব্যাপারটার আঁচ পেলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহের শিরা-উপশিরায়, কিছু লজ্জা কিছু আনন্দের একটা আশ্চর্য অনুভূতি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হল।

একটু পরেই সুপর্ণা এল। তার মুখের চাপা হাসি অঞ্চলপ্রান্তে আবৃত।

জিজ্ঞাসা করলে, কি গো, দেহের জৌলুস যেন বেড়েছে মনে হচ্ছে!

অমৃত সে কথার উত্তর দিলে না। সুপর্ণার পাণ্ডুর মুখ, রক্তহীন চোখ এবং অবসন্ন শিথিল দেহের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিপাতে সুপর্ণা লজ্জা পেলে।

অমৃত সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, সাধের কথা মা যেন কি বলছিলেন। সাধ কি?

সুপর্ণা বললে, সাধ তো কতই হয়। মায়ের ইচ্ছা ছিল, আমাদের বাঙাল দেশের ইলিশ মাছের পাথুরী করে খাওয়ান। আমিই নিষেধ করলাম।

—কেন নিষেধ করলে? তোমার কি ধারণা ঘটিরা ওসব খায় না?

—কত লোক ফেলেও তো দেয়।

—সে ঈষ্টবেঙ্গল জিতলে। জান, আমি মোহনবাগানের মেম্বারশিপ ছেড়ে দিয়েছি।

—কি আশ্চর্য! আমিও তো।

দুজনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

সুপর্ণা বললে, তাছাড়া আরও কি ঠিক করেছি জান? যে আসছে তাকে খেলার মাঠের ধারে-কাছে যেতে দোব না।

—আমি তোমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

দুজনে আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

কাদা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—ওরা পারে, তুমি পারো না? ওদের চাইতে তুমি কিসে কম?—স্ত্রীর এই জিজ্ঞাসায় মনোতোষের উৎসাহ আর আত্মপ্রসাদ এক সঙ্গেই জেগে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু কোনটাই হয় না। কুঁজো ঘাড়টাকে আর একটু নুইয়ে মশলার প্লেটের ভেতরে একটি অনুপস্থিত লবঙ্গকে সে সন্ধান করে চলে।

—কেন পারো না—শুনি? —রমলার হাতের মুরগীর পাখার ঝাড়নটা হিংস্রভাবে অকারণেই বইয়ের শেল্ফের ওপর পড়তে থাকে: তোমার কি বিদ্যে বুদ্ধি নেই? তুমি কি এম-এ পাশ করো নি?

পাশ করার কথাটা এই মুহূর্তে অস্বীকার করতে পারলে বাঁচা যেত। কিন্তু নিজেই সে পথ বন্ধ করে রেখেছে। সামনের দেওয়ালে যে ফটোটি মাথায় হুড্ এবং কোটের ওপর কনভোকেশন গাউন চাপিয়ে, ডিপ্লোমা হাতে নিয়ে মধুর হাসিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, সেটি তারই ছবি। নিজে তুলিয়েছে এবং নিজেই বাঁধিয়ে এনে দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মারাত্মক একটি স্বীকারোক্তি। সুতরাং চুপ করে থাকা যায় না। মনোতোষ চিঁ চিঁ করে বলে, এম-এ পাশ করলেই সব পারা যায় না।

—খালি দুশো আশী টাকা মাইনের কেরাণীগিরি পারা যায়—তাই না?

অত্যন্ত কূট প্রশ্ন। আরো কিছু কিছু পারা যায় বই কি। মাস্টারি করা যায়, টিউশন করা যায়, ইন্সিয়োরেন্সের দালালিতে (অবশ্য তার জন্যে এম-এ পাশ না করলেও চলে) ভিড়ে পড়া যায় এবং শ খানেক টাকা রোজগারও হয়তো বাড়ানো চলে। কিন্তু তার জন্যে বিসর্জন দিতে হয় পেঙ্গুয়িন-পেলিক্যানের দু-একখানা নতুন বই কিনে আনার আনন্দ—সন্ধ্যেবেলায় নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে একটুখানি সেতার বাজানোর অবকাশ।

—যদি রাগ না করো তা হলে বলি—রমলা শেল্ফের বইগুলোর দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায়। আর মনোতোষ একটা সুপুরির কুচি চিবুতে চিবুতে তৈরী হতে থাকে মনে মনে। সে রাগ করলেও রমলা বলবেই—এই ভদ্রতাটুকু তার উপরি পাওনা।

রমলা বলে চলে: তোমাদের বংশের ধারাই এই। তোমার কাকা কুড়ি বছর স্বদেশী করলেন, জেল খাটলেন, তারপর প্রায় বিনা চিকিৎসায় টি-বিতে মারা গেলেন। অথচ দলের সঙ্গীরা মন্ত্রী-টন্ত্রী কত কী হয়ে দিব্যি আছে। আমার শ্বশুর মশাই—রমলা একটু থামে: তাঁকে আমি ভক্তি করি—কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে তিনিই বা কী করলেন! জজ হওয়ার নমিনেশন পেয়েই ঝগড়া করে অত বড় চাকরীটা ছেড়ে দিলেন, শেষে একটা স্কুল মাস্টারি নিয়ে টিকিয়ে টিকিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। সেই বাড়ীর ছেলেই তো তুমি! তোমার আর কতদূর হবে!

অতএব অযোগ্যতাটা বংশগত—রমলা এটা ধরেই ফেলেছে। আর ধরে যদি ফেলেইছে—তা হলে এসব অনুযোগ করে কী লাভ হবে মনোতোষ তা বুঝতে পারে না।

—আমাকে কী করতে বলো তুমি? —আবার বিব্রত জিজ্ঞাসা মনোতোষের।

—চোখ কান খুলে রাখতে বলি।

—ও দুটো তো খোলাই আছে মনে হয়।

—না-নেই। চোখ রেখেছো বইয়ে, কান রেখেছ গানে। এমন মানুষের কোনোদিন কিছু হয়? অথচ দ্যাখো, মীরার যখন বিয়ে হল, তখন শ্যামবাজারের এক কানা গলিতে অন্ধকার ভাঙা বাড়ীতে গিয়ে উঠল—দিন আর চলে না এমনি অবস্থা। আর আজ? নিউ আলিপুরে কত বড় বাড়ী করেছে, তা জানো?

কুঁজো ঘাড়টাকে আবার নোয়ায় মনোতোষ। রমলার আসল ব্যথাটা এইখানেই। ছেলেবেলার বান্ধবী—গরিবের মেয়ে মীরার কোন এক আই-এ ফেল করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—অথচ আজ সে কোথায়! আর এম-এ পাশ করা স্বামীর হাতে পড়ে এই সাত বছরেও দুশো আশী টাকা মাইনের সীমাটুকুও সে পেরুতে পারল না। ভাগ্যিস মনোতোষের এই ছোট দোতলা পৈতৃক বাড়ীটুকু আছে আর নীচের তলা থেকে ষাট টাকা ভাড়া পাওয়া যায়! তা নইলে এই বাজারে—মাছের সের যখন পাঁচ টাকায় উঠেছে—তখন মাসের দশ দিন উপোষ দিতে হত।

স্ত্রীর লজ্জা মনোতোষ বুঝতে পারে। সতীর অপমানে বীর পুঙ্গবের পতির রণক্ষেত্রে নেমে পড়া উচিত—এই নৈতিক সত্যটাও তার অজানা নেই। কিন্তু মীরার স্বামী যে পথ ধরে নিউ আলিপুরের সুখ-স্বর্গে পৌঁছেছে, সে পথে পা বাড়ানো তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কতগুলো লিমিটেড্ কোম্পানী সে ভেঙেছে আর গড়েছে, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কতগুলো ব্যাঙ্কের জাল পেতে কত পেনশন্ পাওয়া অক্ষম মানুষ আর অসহায় বিধবার শেষ সম্বল সে ভাগাভাগি করে গ্রাস করেছে—তাও যে মনোতোষ একেবারে জানে না-তা নয়। সত্যি কথা—বংশের ধারাই তার মাথা খেয়েছে। মনে পড়ে কাকাকে। গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, পরনে খদ্দরের ধুতি, খালি পা। দুপুরের রোদ ঝন্‌-ঝন্ করছে মাথার ওপর, মাঠের মধ্যে ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে—মরা মরা বাবলা গাছের ডালে শুকনো গলায় চিল চ্যাঁচাচ্ছে আর ছায়াহীন পথ দিয়ে কাকা আট মাইল পথ পাড়ি দিচ্ছেন তাঁর কাটুনী সঙ্ঘের কাজ দেখতে। কাশতে কাশতে একবার বসে পড়লেন একটা কাল্‌ভার্টের ওপর, কাশির সঙ্গে রক্তের ছিটে মিশে গেল পথের লাল ধুলোর মধ্যে। মনোতোষ দেখেছে ঘামে ভেজা কপালের দুপাশে দুটো শিরা দপ্-দপ করে কাঁপছে তাঁর—জ্বর এসেছে নিশ্চয়। তবু কাকা এগিয়ে চলেছেন—থামবার তাঁর উপায় নেই।

আর বাবাকেও মনে পড়ছে। রিজাইন দিয়ে এসেছেন সরকারী চাকরিতে।

: ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করব? কৈফিয়ৎ দেব? এখনো মানুষের চামড়া গায়ে আছে। ভিক্ষে করে খাব, তবু ইংরেজের গোলামি আর করব না।

মনের সামনে ভেসে ওঠা স্মৃতির ছায়াগুলো ভেঙে যায়। রমলা চেঁচিয়ে উঠেছে: এ কি—অ্যাঁ এ কি!

এক তলার ভাড়াটে ভদ্রলোকের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে উঠে এসেছে ছবছরের খোকা। এবার রমলার লক্ষ্য তার দিকে।

—ছি-ছি-ছি! পরিষ্কার জামাটা পরিয়ে দিলুম—কী লাগিয়ে এলে তাতে?

খোকা ভয় পেয়ে বলে, ওরা যে আম খেতে দিয়েছিল।

—তাই তুমি অমনি করে ছোটলোকের মতো খেলে? দেখতে পাচ্ছ কী হয়েছে?

খুব মারাত্মক কিছু হয়েছে বলে মনে করতে পারে না মনোতোষ। গলার কাছে দু ফোঁটা আমের রস পড়েছে কি পড়েনি। মা-র ভয়ে খোকা যথাসম্ভব সাবধান হয়েই আম খেয়েছে সে-কথাটাও বুঝতে বাকী থাকে না। নিজের ছেলেবেলার ধুলো-কাদা মেখে ফিরে এলে বাবা বলতেন, 'বেশ করেছে—শক্ত হোক।' কিন্তু আলাদা মন রমলার—আলাদা তার চিন্তা।

রমলা তীব্র একটা ঝঙ্কার দেয়ঃ তোমার আর দোষ কী—যেমন বাপ তেমনি তো হবে। গোত্তরের গুণ যাবে কোথায়!—খোকার নড়াটা ধরে টানতে টানতে রমলা রওনা হয় কল-ঘরের দিকে। চিৎকার চলে সমানে—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ মনোতোষ আর বুঝতে পারে না।

চেয়ারের ওপর পিঠটাকে এলিয়ে দেয় মনোতোষ। কখনো কখনো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়ঃ সত্যিই কি সে সুখী হয়েছে? নিজের বই নিয়ে আর একটু মগ্ন হওয়ার সুযোগ কি সে পেতে পারত না—আর একটুখানি ভুলে থাকতে পারতো না নিজের সেতার নিয়ে?

অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতার বাতিক রমলার। রান্না-খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে বাকী সময়টা তার বাড়ীর পরিচর্যাতেই কাটে। হয় ঝাড়ন নিয়ে ধুলোহীন জিনিষপত্রের ধুলো ঝাড়ছে, নইলে তৃতীয়বার মুছতে শুরু করেছে ঘর, আর না হয় একবার মাত্র পরা গেঞ্জীটাকে প্রাণপণে কাচতে শুরু করেছে। ফল দাঁড়িয়েছে—সারা বাড়ী যেন ঝকঝক করছে নতুন গয়নার মতো। দিনের বেলা দুধের মতো বিছানাটির কাছে এলে সে চেঁচিয়ে উঠবে—শেলফের বই একটু অগোছালো হলে রক্ষা থাকবে না, অ্যাশট্রের বাইরে এক কণা সিগারেটের ছাই পড়লে বিপর্যয় কান্ড ঘটিয়ে বসবে! মনের ভুলে পায়ের জুতোটা চৌকাঠ পেরুলেই এক বাল্তি ফিনাইল-জল এনে হাজির করবে!

বাতিক ছাড়া কী আর!

দিনরাত সাবধানে থাকার অস্বস্তি আছে নিশ্চয়, তবু মনোতোষের খুব খারাপ লাগে না। যে নিজে দুর্বল, অন্যের ভেতরে শক্তি দেখলে তার শ্রদ্ধা জাগে, আশ্রয় নিতে চায়। স্বভাব অগোছালো মনোতোষ স্ত্রীর অতি পরিচ্ছন্নতায় কখনো কখনো বিব্রত বোধ করে বটে, কিন্তু নিজের বাড়ীর দোতলায় পা দিয়ে তার চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন কি, অন্য কারুর ঘরে গিয়ে এলোমেলো গৃহস্থালী, মেজেতে ধুলো, ছাতে ঝুল কিংবা রেলিঙে ময়লা কাপড় দেখলে তার গা ঘিন ঘিন করে। কাজেই এ ব্যাপারে স্ত্রীর সম্পর্কে তার ভয় আছে, কৃতজ্ঞতারও অন্ত নেই।

ভালো লাগে না এইটেই। টাকা—টাকা—টাকা!

অবশ্য মনোতোষ কাকার মতো নয়—টাকা পেলে খুশিই হয় সে। আরো বেশি টাকার অর্থ আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু দামি দু চারখানা বই কিনতে পারা, একটা ভালো গীটার কেনবার শখ আছে সেটা মেটানো, রমলার জন্যে এক আধ টুকরো গয়না—দু একখানা বাড়তি শাড়ী, দু একটা শৌখিন ফার্নিচার আনা, আর কোনো ছুটির আকাশের হাল্কা মেঘের সঙ্গে পাল্লা-দিয়ে-চলা-ট্রেণে কোথাও সাগর কিংবা পাহাড়ের দেশে দিনকয়েক বেড়িয়ে আসা। এটুকু সবাই চায়, মনোতোষও কি চায় না?

কিন্তু রমলা ওতে খুশি নয়। তার চোখের সামনে মীরার সেই না-দেখা নিউ আলিপুরের বাড়ী। লনে ফুল, দু-চারটে ইউক্যালিপ্টাসের গাছ (নিউ আলিপুরে ইউক্যালিপ্টাসের গাছ আছে নাকি কোথাও?), সোফা সেটি, এয়ার-কণ্ডিশানিং, মোজেইক মেজে, রেডিওগ্রাম, মোটর কুকুর, রুপোর বাসন—আরো কত কী তা মনোতোষের কল্পনারও বাইরে। সেই অসম্ভবের প্রতি অক্ষম লোভে রমলা মধ্যে মধ্যে হিংস্র হয়ে ওঠে। আর সেদিন মীরার আই-এ ফেল করা স্বামীর পাশে তাকে একটা পোকার মতো অধম বলে মনে হয়—কনভোকেশন গাউন আর এম-এ'র ডিপ্লোমা হাতে তার সেই ফোটোটা সেদিন তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে।

রমলা বলেছে, কী হবে এ সব চাকরি-বাকরি করে? ভেবে-চিন্তে কোনো ব্যবসায় মন দিতে পারো না?

—ব্যবসা? মনোতোষ খাবি খেয়েছে।

—তাইতো বলছি। ব্যবসার মতো কি আর জিনিস আছে? এই তো পটলবাবু—

কোনো এক কর্মযোগী পটলবাবুর অলৌকিক সাফল্যের ইতিহাসটা মাঝপথেই থামিয়ে দেয় মনোতোষ। চশমাটাকে অকারণে বারকয়েক খোলে এবং পরে, তারপর বলতে চায়ঃ পটলবাবুর কথা জানি না। কিন্তু ব্যবসায় মূলধন লাগে।

—লোকে ঘটি আর কম্বল নিয়ে এসে লাখপতি হয় কলকাতায়।

মনোতোষ প্রতিবাদ করেঃ ও সব মধ্যযুগের রূপকথা। এখন একচেটে ক্যাপিটালের যুগে ঘটি-কম্বল নিয়ে কলকাতায় এলে বড় জোর লাখপতির দারোয়ান হওয়া যায়, তার বেশি এগোনো চলে না।

রমলা ভ্রূকুটি করেঃ ওই এক শিখেছো বই পড়ে পড়ে। আর কিছু না পারো, লেকচার মুখে তৈরিই আছে। তোমার মতো অপদার্থ পুরুষ মানুষ আমি ভূ-ভারতে দেখিনি।

ভূ এবং ভারতের কতগুলো পুরুষ মানুষকে রমলা দেখেছে একথা জিজ্ঞেস করবার প্রলোভন হয় মনোতোষের। কিন্তু এই মুহূর্তে রমলার কাছে এ রকম নিরীহ রসিকতাও মারাত্মক। পৃথিবীতে সেই যে সব চাইতে অপদার্থ জীব এই সিদ্ধান্ত নিয়েও হয়তো তর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না মনোতোষের। নিজের পদার্থক্ষমতা সম্বন্ধে সে-ও তো নিঃসন্দেহ নয়।

রমলার এই লোলুপতা মনোতোষকে ক্লান্ত করে—পীড়া দেয়। শান্তিপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটার কাছে মধ্যে মধ্যে একান্ত বিস্বাদ হয়ে যায় জীবনটা। বাঙালী ঘরের বিচারে রমলা সুন্দরী মেয়েদের দলেই পড়ে। কিন্তু কখনো কখনো তাকে কী যে কুৎসিত দেখায়! যেন একটা ফাটা আয়নার ভেতরে তার প্রতিফলন দেখে মনোতোষ—অসংলগ্ন, বিকৃত, অদ্ভুত অমানুষিক বলে বোধ হতে থাকে তখন।

জীবনে কি সুখী হয়েছে মনোতোষ? তার বই, তার সেতার নিয়ে আরো একটু শান্তি আর আত্মমগ্নতার অধিকার কি তার ছিল না? কথাটা এইভাবে সে ভাবতে চায় না—কিন্তু জোর করেও ভাবনাটাকে ঠেকানো যায় না সব সময়।

মনোতোষের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

ছেলেকে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে পড়তে বসিয়ে রমলা ফিরে আসে।

ওকি হচ্ছে—আঁ?

মনোতোষ চকিত হয়। কখন অন্যমনস্ক হয়ে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে তার গোড়াটা চিবুতে শুরু করেছিল খেয়াল নেই। হাত থেকে তখুনি পেন্সিলটা কেড়ে নেয় রমলা।

—যত রাজ্যের নোংরা অভ্যেস! সাধে কি ছেলে অমন হয়?

মনোতোষ কিছু বলবার আগেই আর এক-দফা আক্রমণ।

—সেই কালকের ঘামে ভেজা গেঞ্জীটা আবার গায়ে পরেছ তুমি? কাচবার জন্যে বের করে রেখেছিলুম না? নাঃ—তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, আমাকে তুমি পাগল করে দেবে। ছাড়ো—ছাড়ো, গেঞ্জী ছাড়ো—

নিজে আর গেঞ্জী খোলে না মনোতোষ। ঠিক যেন ডাকাতের রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েছে—তেমনি করে হাত দুটো ওপরে তুলে দেয় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। গেঞ্জীটাকে টেনে খুলতে খুলতে রমলা বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! আমাকে সারাটা জীবন জ্বালাবে বলেই শাশুড়ী আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছেন। কী কপাল নিয়েই এসেছিলুম।

এবারে মনোতোষ চোখ বুজে চুপ করে থাকে। রমলার গলায় স্নেহ আর মমতা ঝরে পড়ে এক সঙ্গে। তখন একটু আগেকার চিন্তাগুলোর জন্যে মনোতোষ মরমে মরে যায়। আর সেই মুহূর্তে মনে হয় সংসারে তার মতো সুখী আর কে আছে। রমলা না থাকলে তার মতো নিরুপায় মানুষের গতিটাই বা কী হত!

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে মনোতোষের একটু চমক লাগে।

সাজানো-গোছানো বসবার ঘরটি আজ একটু বেশি সাজানো। তুলে রাখা কাশ্মীরী ফুলদানি দুটো বেরিয়ে এসেছে—ব্রাসোর সযত্ন পরিমার্জনে রুপোর মতো ঝিকমিক করছে, ঝিলমিল করছে তার মীনের কাজ। অম্লান শুভ্র রজনীগন্ধার গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ধূপের সুরভি। যে মণিপুরী টেবিল-ক্লথটি নোংরা হওয়ার ভয়ে চিরকাল বাক্সবন্দী থাকে, সেটি আজ টেবিলকে আলো করে রেখেছে। চেয়ারের পিঠে কয়েকটি নিষ্কলঙ্ক তোয়ালের শোভা। অ্যাস-ট্রে দুটোকেও ধুয়ে মুছে নিপুণভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। মনোতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে।

—ব্যাপার কি—তোমার ছেলের পাকা দেখা নাকি আজ?

অপরিচ্ছন্ন রমলা কখনো থাকে না, আজ সন্ধ্যের আগেই স্নান করেছে। ভিজে চুলে আলগাভাবে একটি গিঁট দেওয়া—সযত্ন প্রসাধনের মাদকতা একটি সুরভি-বলয়ের মতো ঘিরে আছে তাকে। ফিকে নীল পর্দার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে বিকেলের আলো একটা নীল ছায়া ছড়িয়েছে—রমলাকে একখানা ছবির মতো মনে হয়। শিল্পীর নেশায় রং দিয়ে আঁকা ছবির মতোই।

—বাঃ—বাঃ, ছেলের শ্বশুর যে তোমাকে দেখলেই পছন্দ করে বসবে আজ। তখন আমার গতিটা কী হবে?

সন্দেহজনক ভাবে এক্সে মনোতোষ এবং মতলবটা আন্দাজ করে সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় রমলা।

—খবর্দার, কোনো দুষ্টুমি করবে না এখন। যাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো জামা-কাপড় ছাড়ো—হাতমুখ ধোও। সাড়ে পাঁচটার সময় অশান্ত বাবু আসবেন, তখন এক সঙ্গেই চা দেব তোমাদের।

—অশান্তবাবু!

—হাঁ-হাঁ, অশান্তবাবু। তোমার সঙ্গে পড়তেন না কলেজে? আমাদের বিয়ের পরেও তো কতদিন এসেছেন! তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে!

অশান্ত—অশান্ত দত্ত রায়। না, আকাশ থেকে পড়েনি মনোতোষ। কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই যে উপরি পাওনা খুশিটুকু তাকে খানিকটা তরল আনন্দে দুলিয়ে দিয়েছিল, সেটা সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। একটা ছায়া পড়েছে মনে।

রমলা বলে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? যাও—হাতমুখ ধোও গে। পরিষ্কার গেঞ্জী, হাফ সার্ট, পা-জামা সব সাজিয়ে রেখেছি—সেগুলো পরে এসো। দেখো ময়লা গেঞ্জী আর আধ ময়লা লুঙ্গি পরে হাজির হয়ো না আবার। পাঁচটা বেজে গেছে—যাও যাও।

কলঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মনোতোষ। না চাইলেও গায়ে এসে পড়ে এমন ধরণের মানুষ অশান্ত। আসত, বকবক করত একটানা, মাথা ধরিয়ে দিত। বহু দুঃখে কেনা এক আধটা ভালো বই পড়তে নিয়ে যেত এবং কোনোদিন ফেরৎ দিত না। কলেজ সোশ্যালের সেক্রেটারী হয়ে টাকা-পয়সার বিশ্রী গোলমালে জড়িয়েও পড়েছিল একবার। অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে, বাপ কণ্ট্রাকটার, কিন্তু বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ফেরৎ না দেওয়াই ছিল তার আর্ট।

আগে নিয়মিত আসত যেত—চা সিগারেট ধ্বংস করত, রাজনীতি সাহিত্য যৌনতত্ত্ব সব কিছু নিয়ে অসহ্য বকবকানিতে মনোতোষের বই পড়ার একটুখানি অবকাশ কিংবা সেতার বাজানোর একটি সন্ধ্যাকে বিধ্বস্ত করে চলে যেত। তারপর বছর চারেক তার আর দেখা নেই, কে যেন বলেছিল, কণ্ট্রাকটারিতে সে দুহাতে টাকা রোজগার করছে আজকাল। ভালোই করছে, কিন্তু মনোতোষের ওপর হঠাৎ এই অনুগ্রহটা কেন?

শঙ্কিত সন্দিগ্ধ মন নিয়ে মনোতোষ বেরিয়ে আসে কলঘর থেকে। চিন্তার ওপর ছায়াটা আরো ঘন হয়ে চেপে বসে। বাইরের ঘরে আসতে চোখে পড়ে টেবিল-ক্লথের কোণাগুলো ধরে টানাটানি করছে রমলা—অর্থাৎ সাজানোটা এখনো তার মনের মতো হয়নি।

একটা চেয়ারের কোনা ধরে দাঁড়ায় মনোতোষ।

—অশান্ত আজ আসবে কে বললে তোমাকে?

—তুমি অফিসে বেরুবার পর খোকার জন্যে দুটো সার্ট কিনতে গিয়েছিলুম কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে। সেখানেই দেখা। সিল্কের শাড়ী কিনছিলেন। আমি প্রথমটা চিনতে পারিনি—বেশ মোটা হয়ে গেছেন। নিজেই বললেন, মিসেস রায় যে! মনোতোষের খবর কি? তারপরে আলাপ হল। ইউ-পি সি-পিতে কতগুলো বড় বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে ঘুরছেন—কলকাতায় প্রায় থাকেনই না। আমি বললুম, আসুন না একদিন। বললেন, তাই তো—আমি যে আবার কালই জব্বলপুরে চলে যাচ্ছি দেড় মাসের জন্যে। ও-কে, আজই আসব একবার সাড়ে পাঁচটায়—চা খেতে। —রমলার চোখ জ্বলজ্বল করে: জানো, কী বিরাট একটা গাড়ী কিনেছেন!

মনোতোষের বুকের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগে। টাকা! রমলার সুন্দর মুখের ওপর আবার সেই লোভের মুখোসটা নেমে এসেছে। অথবা সেই ভাঙা আয়নাটায় রমলার মুখের ছায়া পড়েছে—অদ্ভুত রকমের বিকৃত আর বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হয় এই ঘর থেকে এখুনি ছুটে বেরিয়ে যায় সে, পথে পথে পাগলের মতো বেড়িয়ে আসে খানিকক্ষণ।

কিন্তু মনোতোষ দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে—সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়ে, এমনি এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় তারা কাকাকে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিল।

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা যায়। বাড়ীর সামনে এসে থেমেছে।

—যাও যাও! উত্তেজিত হয়ে মনোতোষকে ছোট একটি ধাক্কা দেয় রমলা: অশান্তবাবু এসে পড়েছেন যে!

সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে একটা বিশ্রী রকম চীৎকার করতে ইচ্ছে হয় মনোতোষের। কিন্তু কিছুই করে না। কুঁজো ঘাড়টাকে আরো কুঁজো করে নেমে যায় সিঁড়ির দিকে।

এই তৃতীয়বার চা দিতে হয়েছে অশান্তকে আর প্যাকেট দুই সিগারেট শেষ করেছে। রাত আটটার কাছাকাছি। কিন্তু এখনো অশান্তর বক্তৃতা বন্ধ হয়নি।

—মাত্র দেড় লাখ দু লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট—তাতে পনেরো হাজার খাওয়াতে হলে কী থাকে বলো। আমি ব্যানার্জিকে বললুম, অল্ রাইট—সিমেণ্ট আর মাটি ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। লাগাও সুরকির সঙ্গে রাবিশ। অডিট্ যা কাটে কাটুক, তার পরেও ক্লীন ত্রিশ-চল্লিশ হাজার মার্জিন ধরে আনব।

—আনলেন?—রমলা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার দিকে আর তাকাতে পারছে না মনোতোষ। ঘাড় ব্যথা করছে, জ্বালা করছে চোখ।

—আনলুম। অশান্ত দত্ত রায়ের এক কথা। তোমরা ঘরে বসে পনেরো হাজার টাকা বিনা পরিশ্রমে মেরে দেবে আর আমি ওই জঙ্গলে সাপ তাড়িয়ে মশার কামড় খেয়ে হাপু গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরব? আমিও রাধাকান্ত দত্ত রায়ের ছেলে!

—তারপরে কী হবে কালভার্ট দুটোর?—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রশ্নটা ঠেকাতে পারে না মনোতোষ।

—যাবে তিন বছরের ভেতরেই।—অশান্ত খুশি হয়ে মেজের ওপর ছাই ঝাড়ে, কিন্তু রমলা দেখতে পায় না: পাবলিক চাঁচাবে, পি-ডবল্যু-ডি চোখ-কান বুজে থাকবে। আমাকে কে ছোঁয়? পার্টনার তো সবাই। নাড়াচাড়া করতে গেলে অনেক বড়ো বড়ো মক্কেলই ফেঁসে যাবেন। হা-হা—

রমলাও অল্প অল্প হাসে—যেন সমস্ত জিনিষটা তারও ভারী পছন্দ হয়েছে। মনোতোষ নিজের ঘাড়টাকে চেপে ধরে একবার। তীব্র তীক্ষ্ম যন্ত্রণার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেখানে—যেন ফেটে যেতে চাইছে।

অশান্ত গলা নামায়, বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে বলতে থাকে: তাই তো বলি মনোতোষ—ইফ ইউ

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

বিষন্ন বিজয়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায়
  আমার ঘরে
জ্বালাব না আলো;
  ঢেকে দেবে গাঢ় অন্ধকার
আমার লজ্জা, দেশের লজ্জা।
  সহিব কেমন করে
ব্যর্থ জীবনে হেন প্রহসন;
  জনে জনে এই বঞ্চনার
গ্লানিতে আকাশ থমথম করে
  বিনামেঘে হয় বৃষ্টিপাত
দুর্গতদের জীর্ণ কুটীরে
  উপায়হীনের বিহ্বলতা
যে দিকেই করি দৃষ্টিপাত
মনুষ্যত্ব দলিত মথিত,
  পৌরুষ আনে নিষ্ফলতা।

মাটির প্রতিমা মাটি থেকে গেল
  প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়নি তাতে,
তাই এতো মিছে পুতুল খেলা,
মা'র মহিমার ভেল্কিখেলার
  কঙ্কাল বাজে শিয়ালদাতে।
বিজয়া এবার নিদয়া বন্ধু
  তাইতো শুনিনু রাত্রি বেলা
রূঢ় অভিশাপ মেঘ গর্জনে;
  রুদ্রাণী মহাভয়ঙ্করী
কশাঘাত করে মূঢ় পূজারীরে,
  ভৎর্সনা করে অহঙ্কৃতে;
গৃহকোণে তাই রহিব গোপনে
  সকল দুয়ার বন্ধ করি
নির্লজ্জের উল্লাস আমি
  কেমনে দেখিব হৃষ্ট চিতে।
নিজের দেশের অঙ্গে যখন হানিছে
  আঘাত স্বদেশবাসী
স্বজন-হননে পাষণ্ড হয় আত্মঘাতী,
তখন পূজার উৎসবে
  আমি আনন্দে বল কেমনে হাসি?
শ্মশান-চিতার ভস্মে
  কেমনে মাতৃপূজার আসন পাতি?
অন্তরে দহে দিবস-রাত্রি অগ্নিজ্বালা
অহঙ্কারীর উদ্ধত হাত আকাশে ওঠে,
সেই হাত আজ সাজায় মায়ের বরণডালা
তাতে কি সবার বিষণ্ণ মুখে হাস্য ফোটে?
তাই ভাবি মনে কেন ঘরে
  পরে দেবে ও দৈবে বঞ্চনা,
অনেক মিথ্যা জমা হয়ে আছে জঞ্জালে,
ভোরের সানাই সুরে সুরে
  তার গভীর মরণ-যন্ত্রণা
রেখে দিয়ে গেছে বিজয়ার নর-কঙ্কালে।

উন্মীলন
জগদীশ ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ শ্রাবণ রাত্রি!
ঘুম নাই আকাশের চোখে।
ভরা নদী চলে দুলে দুলে, যৌবন-উচ্ছলা
সপ্তদশী, অভিসারে চঞ্চল চরণে।
শ্রোণীতটে অবনত মৃত্তিকার উদগ্র কামনা
ভেঙে পড়ে তটভূমি—
আসঙ্গ-অলস তনু এলায়িত যেন
প্রেয়সীর অঙ্গ 'পরে।
কম্পিত নিঃশ্বাস,
রতিশ্রান্ত স্নায়ু।
সিক্ত গন্ধে মাতাল বাতাস
করে লুটোপুটি যৌবনের তটভূমি ছুঁয়ে।
বিসুভিয়সের জ্বালা নিবে গেছে নিভৃত
নিশীথে

পম্পির বিলাস কক্ষে।
স্তিমিত অনল শিখা,
সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
অবসন্ন পঞ্জর পিঞ্জরে;
নীল দীর্ঘশ্বাস,
সান্ত্বনার করুণ আকুতি,
লীলায়িত মূর্ছনার মত
ভেসে চলে মন্থর বাতাসে—
ধূমরেখা অগ্ন্যুৎপাত শেষে।

রাত্রি যায়,
আসে দিন চতুর্থ প্রহরে
সূর্য-ওঠা দিগন্তের নতুন বারতা বহি।
ভোরের কাকলি
প্রভাতী আলোর ছন্দে তুলিছে ঝংকার,
সোনালী উষায়, পূর্ণপাত্র হাতে
আসে কোন আকাশনন্দিনী
ছড়াইয়া অঙ্গবাস শেফালীর বনে;
সিক্তকেশে কুরুবক,
স্বর্ণচাঁপা দোলে দুটি কানে।
নীবিতটে কহ্লার মেখলা,
কনক-কঙ্কণ হাতে,
দুটি চোখে পরিপূর্ণ আয়ু—
নিরুত্তাপ জীবন সংকেত।

মৃত্যুর অনল বেদীতলে
তাই আজি জীবনের নব আবাহন,
মৃত্তিকায় অমৃতের নতুন উৎসব!
উত্তাল তরঙ্গময় সাগর বেলায়
নব জন্ম পৃথিবীর!
বনহংসী হয়েছে উতলা,
আকাশের কণ্ঠে দোলে শ্বেতপদ্মমালা—
কাকলিমুখর বনভূমি:
শুভ্র কাশ বনে জীবনের সমারোহ
তুচ্ছ করে মৃত্যুর শাসন।
দানবের অট্টহাসি ম্লান হয়ে আসে,
ভ্রূকুটি জয়াল সিংহাসনে
স্তব্ধবাক্‌ আস্ফালন।

মৃত্যু নাই : মৃত্যুঞ্জয় বাজে হৃদয়দল।

আকাশনন্দিনী
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শরতের প্রসন্ন প্রভাত।
একটি কনকপদ্ম জননীর সুস্নিগ্ধ শয়নে
ঘুমে অচেতন।
উদয়-দিগন্ত হতে ভেসে এল ভোরের রাগিণী।
সূর্যের আগ্নেয় প্রেম
আলোর লাবণ্য মেখে
নেমে এল ধরণীর বুকে :
একটি চুম্বন এল অন্তহীন আকাশ পাথারে।
আধো ঘুমে আধো জাগরণে
কনকপদ্মের কুঁড়ি চোখ মেলে তাকাল আকাশে।
কপোল লজ্জায় রাঙা, দুনয়নে কবোষ্ণ আবেশ,
অরুণাভ ওষ্ঠাধর আদরের আনন্দে মদির,
সারা দেহ স্পর্শ সুধাময়।
মর্তের কমল বনে
পদ্মতনু সুন্দরীর জন্ম হল :
আলোর আদরে গড়া রূপের লাবণি,
সূর্যপ্রেম প্রাণের অমৃত।।

আকাশে চাঁদের জ্যোৎস্না
সানাইয়ের সুর হয়ে ঝরে,
নিম্নে নিয়নের আলো কোমল নীলিম,
নির্জন অঙ্গন।
মুখোমুখি আছে বসে
দুটি সত্তা,
শাশ্বত যুগল
অনন্ত কালের
আর অনন্ত প্রাণের।
—কথা কও, কথা কও—
বল, ভালবাসি।
কণ্ঠের অমৃত দিয়ে পূর্ণ কর শূন্যতা প্রাণের।
তৃষিত পুরুষ যেন সর্বরিক্ত ভিখারি মহেশ,
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে
অমৃতের অধীশ্বরী দেবীর নয়নে
করুণা-কাঙাল চোখে চায়।
—কথা কও, কথা কও—
বল, ভালবাসি।

উৎকণ্ঠ উৎকর্ণ হয়ে
সারাটা আকাশ বুঝি
চেয়ে আছে তরুণীর আনত নয়নে।
চেয়ে আছে ভিখারি মহেশ।
সেই চাওয়া
সেই দৃষ্টি সুধা হল নারীর হৃদয়ে।
কপোল রঙিন হল মধুর আবেশে,
দুটি চোখ হল দুটি তারা,
রক্তকমলের কলি অধর যুগল
অস্ফুট আবেশ ভরে
ধ্বনি পুষ্প ফোটালো আকাশে :
—তুমি—

ভাষা নয়, শুধু যেন আনন্দিত প্রাণের নিঃশ্বাস
মর্মের মমতা দিয়ে মধুময় প্রিয়সম্বোধন :
—তুমি—

যুগলের জপমন্ত্র প্রথম প্রেমের,
সর্বরিক্ত প্রার্থনার পরমা স্বীকৃতি
ভিক্ষাপাত্রে সঞ্জীবনী সুধা :
—তুমি—

নারীর মানসলোকে
জন্ম হল নবীন প্রেমের।

আমি কবি আনন্দিত,
এই শুভলগ্নটিতে
পৃথিবীতে বেঁচে আছি আমি।
দেখেছি দুচোখ ভরে
কমলের উন্মীলন-লীলা
রমণীর কমনীয় মুখে।
তার স্পর্শ
তার সুধা
পেয়েছি আমিও।।

বল, তার আগে...
মণীন্দ্র রায়

তারপর যা হল তা নাই-বা শোনালে।
আমি জানি, পরে কিছু হয়।
সে সব দূরের গল্প না-হয় সকালে
শোনা যাবে চায়ের সময়।

এখন অনেক রাত্রি, দেখ অন্ধকার
শ্বাস ফেলে বুকের ভিতরে।
এখন কী হবে শুনে, কে কার তৃষ্ণার
কতো শান্তি পেয়েছে শিকড়ে।

জানি তো সবারই হাতে একটি কি দুটি
তীর থাকে, এবং ধনুক।
কেউ পায় জয়মাল্য, কেউ-বা ভ্রূকুটি,
সে কাহিনী করে না উৎসুক।

পাওয়া আর না-পাওয়া যে সকলি এখানে
সমগ্রতা—শিল্পের আকাশ।
কী হবে সে কথা শুনে যার রূপধ্যানে
মিশে গেছে পূরবী-বিভাস।

বরং আগের কথা বল—অন্ধকারে
কী শুনেছ, কী দেখেছ তুমি?
যখন না-জন্ম-মৃত্যু, ছিলে একাধারে
ছবি আর শূন্য পটভূমি।

"সুবাসীর সুখ"

লীলা মজুমদার

সুবাসীর কান্ড দেখে এনা মাসিমা স্তম্ভিত হোয়ে যান। আর সব ছেড়ে দিলেও বয়সটা তো কমে যায়নি। মুখে সে যাই বলুক না কেন, দেখে তো সাতচল্লিশ আট-চল্লিশের বেশি বই মনে হয় না। তাকে কিছু আর প্রেমের বয়স বলা চলে না।

কয়েকদিন আগেও এনা মাসিমা ভাবতেন সুবাসীর মনটা বুঝি ওঁর নামতার মত মুখস্থ হোয়ে গেছে, কোন কথার উপরে সুবাসী কি বলবে আগে থাকতেই ওঁর জানা ছিল। কিন্তু সেদিন আর নেই, এখন স্কুল ছুটি হোলে বাড়ি ফিরতে এনা মাসিমার ভয় করে।

কম কষ্টে তিনি তো আর একসঙ্গে থাকেন নি। সেই সাতচল্লিশ সালে পাটনার চাকরি ছেড়ে এনা মাসিমাও কেষ্টনগরে এলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুবাসীও এসে জুটল। ঢাকায় মামাবাড়িতে থাকত, বালবিধবা, মামাবাড়ির জমিজমাও গেল আর সুবাসীরও ভাত উঠল। স্কুলের বড়দিদিমণি মহিলা উদ্বাস্তু সহায়ক সমিতির একজন চাঁই, তিনিই সুবাসীকে এনে এনা মাসিমার ঘর গেরস্থালি দেখাশুনোর কাজে লাগিয়ে দিলেন।

সেই অবধি আর এনা মাসিমাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। মোটাসোটা, মাথায় ছোট, শামলা রঙ, দেখতে কিছুই নয়, সুবাসী কিন্তু গুণের অবতার। রাঁধাবাড়া, সেলাই ফোঁড়াই, ঘর গোছানো, রোগসেবা, সব কিছুতেই পাকা হাত। কুকুর ভালোবাসে, বেড়াল ভালোবাসে, পাখি ভালোবাসে, গাছগাছলা ভালোবাসে। আলো ফিউজ হোলে নিজে সারায়, ষ্টোভ মেরামত করে, কম পয়সায় অদ্ভুত ভালো কেনাকাটা করে, হাতীদের মতো স্মরণশক্তি, ঘাড় ধরে কাজকর্ম, এনা মাসিমার হুকুমের একটুকু নড়চড় নেই, থামা নেই, ক্লান্তি নেই। অথচ ভদ্রঘরের মেয়ে, চিঠিপত্র লিখতে পারে, কথা কইতে জানে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝি চাকর থাকে বলে সে তো আর নয়, এনা মাসিমার আত্মীয়ার মতো। ঠেকায় পড়লে ওরি সঙ্গে যত পরামর্শ। ভূতপ্রেত ছাড়া কোনো কিছুকে ভয় করে না, কত বড় একটা সহায় এনা মাসিমার। মাটির পৃথিবীতে এর বেশি আর কি-ই বা আশা করা যায়।

হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে, এনা মাসিমা পা চালিয়ে এগুতে থাকেন। রোজই ফিরতে দেরি হোচ্ছে, স্কুলের বড়দিদিমণির তো আর আক্কেলবুদ্ধি নেই, এম-এ পাশ হোলে কি হবে। মাসের গোড়া থেকে হিসেবপত্র ছয়-নয় হোয়ে থাকে, মাসের শেষে সেসব গুছিয়ে তুলতে এনা মাসিমার প্রাণ যায়? বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা নামে। পা যেন আর চলে না।

তাই বলে হোস্টেলে থাকতে রাজী নন এনা মাসিমা। কিসের জন্য এত খাটা-খাটনি যদি নিজের মনের মতো একটা আস্তানাই না জুটল? ভেবেও মনটা ভারি হোয়ে ওঠে। একার বাড়ি যে বাড়িই নয়। বাড়ি করতে হোলে দুটি প্রাণীর দরকার, এনা মাসিমা আর সুবাসী। এনা মাসিমা সারাদিন আপ্রাণ খেটে বাড়ি ফেরেন, আর সুবাসী তাঁর জন্য ফর্সা তোয়ালে বের করে, জল গরম করে, বাইরের ঘরে আলো জেলে, সদর দরজা খুলে সজাগ হোয়ে বসে থাকে, এনা মাসিমাকে কড়াটি অবধি নাড়তে হয় না। সুবাসীর হাতের মটরশুঁটির ফুলকো কচুরী আর জিরে বাটার আলুর দম যে খায়নি তার নর-জন্মই বৃথা।

এখন সব গেছে এনা মাসিমার। আপিস ঘরে চাবি দিতে দিতে বড়দিদিমণি বললেন স্কুল কমিটি এনা মাসিমার পনেরো টাকা মাইনে বাড়া মঞ্জুর করেছেন, এপ্রিল মাস থেকে পেছু হিসেব হোয়ে এই পুজো অবধি ছয় মাসে নগদ নব্বইটা টাকা হাতে হাতে পাওয়া যাবে, দুজনার কাপড়-চোপড়, পর্দা, সুজনি, ষ্টেনলেস ষ্টিলের থালা গেলাস, সব কিছু কেনা যেত। কিন্তু কাকেই বা জানাবেন সে সুখবর, কার তাতে কি বা এসে যাচ্ছে। যাক গে, কিছু করে দরকার নেই। টাকায় যে সুখ বাড়ে না, এটা তো নিশ্চিত।

মোড় ঘুরলেই সামনে বাড়িটা যেন মুখ হাঁড়ি করে রয়েছে। এনা মাসিমার গলা ব্যথা করে। এই কি তাঁর এতকালের সেই হাসিমুখ বাড়ি, যে দিনান্তে রোজ তাঁকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। যাকে পেয়ে এনা মাসিমার যত সব না-পাওয়ার গ্লানি কেটে গেছে। একটা আলো দেখাচ্ছে না সেই বাড়ি!!

ঠেলা দিতেই সদর দরজা খুলে যায়। বাইরে আলো জ্বলেনি, কিন্তু রান্নাঘর থেকে হাসি গল্প শোনা যায়। এনা মাসিমার মাথা গরম হোয়ে ওঠে, তীক্ষ্ন কন্ঠে ডাকেন, সুবাসী!

চারদিক থম থম হোয়ে যায়, একেবারে চুপচাপ, তারি মধ্যে খিড়কি দোর খোলবার শব্দ কানে আসে। এনা মাসিমা রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, খোঁপায় একটা চাঁপাফুল গুঁজতে গুঁজতে একগাল হেসে সুবাসী বলে,—

"ওমা, এই দ্যাখ দিদি তুমি এসে গেলে আর আমার কিনা ঘড়ির দিকে খেয়াল নেই। তুমি হাতমুখ ধুতে ধুতেই আমি বড়াগুলো ভেজে ফেলছি—গরম জল দেব নাকি?"

সুবাসীর গালটা একটু লাল দেখায়। এনা মাসিমা মুখটাকে কালো করে বলেন, "না থাক। আমার মাথা ধরেছে, এখন আমি খাব না। খলে আমিই বলব।"

বলে দুম দুম করে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দেন। মনে ভাবেন এবার সুবাসী অভ্যাস মতো সাধতে আসবে, তখন বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে তবে খেতে আসবেন। কিন্তু সুবাসীর কোনো সাড়া শব্দ নেই। খুব খানিকটা কেঁদে নেন এনা মাসিমা, তারপরে মুখে জল দিয়ে, চুল আঁচড়ে দোর খুলে রান্নাঘরে যান।

কে একটা রোগা লোক উনুনের ধারে মোড়ায় বসে বড়া খাচ্ছিল, এনা মাসিমাকে দেখেই বাটি নামিয়ে রেখে, মুখ মুছে, খিড়কি দোর দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। সুবাসীও অমনি ব্যস্ত হোয়ে উঠল, "আহা, মাথাধরা নিয়ে উঠলে? একটু বললেই তো ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতাম? পড়ার ঘরে বোস না, একটু হাওয়া পাবে। এই আমি এলাম বলে।" সুবাসী হাসতে থাকে, এনা মাসিমার রাগে গা জ্বলে যায়।

"কে ঐ লোকটা, সুবাসী?"

সুবাসী যেন আকাশ থেকে পড়ল, "কোন লোকটা দিদি?"

"ন্যাকামো কোর না। এখানে বসে যে বড়া খাচ্ছিল।"

"ও, ওর নাম মোহি, সে আমাদের দেশের লোক, একটা দরকারে এসেছিল। ও কিছু নয়।"

বলে বাসনপত্র নিয়ে সুবাসী ভারি ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এনা মাসিমা পড়ার ঘরে গিয়ে অন্ধকারে বসে থাকেন। সুবাসী যে সাদা জামা ছেড়ে গোলাপী জামা পরেছে সেটা তাঁর চোখ এড়োয় নি।

সাতদিনে এমনি করে জগৎসংসার পাল্টে যেতে পারে এনা মাসিমার নিজের ঘরে না হোলে, বিশ্বাসই করতে পারতেন না। তারিখগুলো মনের মধ্যে লাল রঙে খোদাই করা। উনিশে সেপ্টেম্বর প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে লেবুর রসের খালি বোতলে গোলাপ ফুল দেখেই অশুভ আশংকায় এনা মাসিমার বুক দুরদুর করে উঠেছিল। হাঁ করে সেইদিকে চেয়ে থেকেছিলেন, মুখে কথা সরেনি। তাই লক্ষ্য করে সুবাসী বড় বেশি কথা বলতে সুরু করে দিয়েছিল। বেশি কথা সে বরাবরই বলে, তাই তার মনটা একটা বইএর খোলা পাতার মতো এনা মাসিমা পড়তে পারতেন, কিন্তু এ প্রগলভতা অন্য রকম। কিছু জানাবার জন্য যে এত কথা নয়, বরং কিছু ঢাকবার জন্য, সেটুকু এনা মাসিমা বুঝতে পারছিলেন। এর আগে তো কখনো দুজনার মধ্যে কেউ বাগানের ফুল কেটে ঘরে তোলেনি। সুবাসী একটু লজ্জিত হোয়ে বললে, "সবুজ বোতলে লাল ফুলটি মানায় ভালো।"

ঐ থেকেই পরিবর্তনটা সুরু হোয়ে গেল। দেখতে দেখতে ফুলের মতো সুবাসী নিজেও বিকশিত হোয়ে উঠল, ঘর দোরের চেহারা পাল্টে ফেলল, জানলা খুলে, ভারি পর্দা খুলে, রোদ হাওয়াতে বাড়ি ভরে দিল। বাগান থেকে আর ফুল তুলল না বটে, কিন্তু কোথা থেকে সব বুনো ফুল এনে ভাংগা গেলাসে, শিশিতে বোতলে সাজাতে লাগল।

কাজকর্মের মধ্যে হাতের রেহাই নেই, কিন্তু গলা থেকে অবিরাম গুন গুন করে গান বেরুতে লাগল। তাই শুনে ভয়ে এনা মাসিমা আধ-মরা। সুবাসীর কোনো গুরুতর অসুখ বিসুখ করেনি তো? ভাবনায় চিন্তায় এনা মাসিমার মেজাজের কিছু ঠিক থাকে না, সুবাসীকে যা-নয়-তাই বলতে থাকেন। এতটুকু বিরক্ত হয় না সে! আগে হোলে তর্ক করে নিজের নির্দোষিতা বোঝাতে চাইত, এখন হাসিমুখে সব কটু কথা মেনে নেয়।

পেট ব্যথা করে এনা মাসিমার, সুবাসীর ভালো ভালো রান্নাগুলো ছাইএর মতো লাগে! আর সে কি ভালো খাবার সব, অজানা কিসের ছোঁয়া লেগে সুবাসীর হাতও যেন খুলে গেছে। কোত্থেকে এতসব শিখেছে কে জানে, অশ্রুতপূর্ব সব নাম বলে, রোগনযুশ, রাইশালা। রোজ মাছ মাংস রান্না ধরেছে। দুজনেই নিঃসংগ, নিরাশ্রয় অসহায়া, শরীর রাখবার জন্য যদি আমিষ খানই, কারো কিছু বলবার নেই। নিজের রোজগারের পয়সায় কিনে, নিজের কেনা বাড়িতে বসে, নিজেরা রেঁধে খাচ্ছেন, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে? এনা মাসিমার বুকটাতে একশো মণ বোঝা চাপে।

সুবাসী ঘরে এসে আলো জেবলে দিল, ট্রেতে করে গরম গরম চিঁড়েভাজা, ফুরফুরে ফুলুরি, গরম চা আনল। তার গন্ধে আপনা থেকেই রাগটা পড়ে এল। আহা, বড় যত্ন করে সুবাসী। গরীবের ঘরের বালবিধবা, কোনো দিনো কোনো সখ করেনি, পরের ঘরে মানুষ, কি-ই বা পেয়েছে জীবনে? [illegible] এনা মাসিমা তো আজীবন রাজার হালে থেকেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন, খেয়েছেন, পরেছেন, চাকরি করে পয়সা এনে নিজের হাতে খরচ করেছেন। তাই যদি বলা যায়, যেটুকু ভোগ করেছে সুবাসী সে তো এনা মাসিমাই ওর হাতে তুলে দিয়েছেন তবে সে না। আহা, কম দুঃখী নয় ও। একটা ফিকে হলুদ রেশমি চাদর গায়ে দিয়ে সুবাসী এসে বলল, "একটু বেরুচ্ছি, দিদি। দিনের বেলাতেই তোমার খিচুড়ি আলুর দম করে রেখেছি। উনুনের ওপর গরম জলের হাঁড়ির মাথায় চড়ানো রইল, ঠান্ডা হবে না, সময় মতো নিয়ে খেও। খিড়কিতে তালা দিয়ে গেলাম, তুমি এদিকে বন্ধ করে শুয়ে পড়। সিনেমা ভাংগতে ন'টা বাজবে। আমার ফিরতে দেরি হবে।"

এনা মাসিমা রা কাড়তে পারেন না, সুবাসীও উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল, ঘরের বাতাস থেকে কি একটা মৃদু সুগন্ধ এনা মাসিমার নাকে এল। ঐ চাদর, ঐ এসেন্স অনেক বছর আগে এ বাড়ি কেনা হোলে গৃহ প্রবেশের দিন এনা মাসিমাই সুবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। এত পাটনার মেয়েরা দিয়েছিল, সেরকম পছন্দ হয়নি এনা মাসিমার। পেড়াপিড়ি করা সত্ত্বেও একদিনের জন্যও সুবাসী ওসব ব্যবহার করেনি এতদিন। আর আজ কিছু না বলতেই এত বাহার দিচ্ছে, সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে এনা মাসিমার। কোনো দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়েনি তো সুবাসী? কিন্তু বয়সও গেছে, টাকও গড়ের মাঠ, তাই বা কেন হবে?

আস্তে আস্তে উঠে সারা বাড়িখানিকে ঘুরে দেখেন। এই এত সুখের নীড়টাকে কি তবে সুবাসী ভাংগতে চলল? এতটুকু কৃতজ্ঞতাও নেই? থান পড়ত, একবেলা খেত, তাও ছাই পাঁশ ঘাস বিচুলি! এনা মাসিমাই ওকে সরু রঙিন পাড়ের কাপড় পরিয়েছেন, মুখে মাছ মাংসের আস্বাদ দিয়েছেন, মাসে মাসে হাত খরচ বাবদ দশটা করে টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা জমিয়ে জমিয়ে সুবাসীর গলায় সরু হার, দু হাতে সোনার নারকেল ফুল প্যাটার্ণের ফাঁপা বালা গড়িয়ে দিয়েছেন। সে সমস্ত কথা কি সুবাসী ভুলে গেছে?

হাঁ, তার বদলে পেয়েছেনও ঢের ওর কাছ থেকে, সে কথা এনা মাসিমা একশো বার স্বীকার করবেন। সুবাসী আসবার আগে একটা লক্ষ্মীছাড়ার সংসার ছিল এনা মাসিমার। নিজে বোর্ডিংএ মানুষ, মা ছিল না, ঘরকন্না শিখবেন কোত্থেকে? কিন্তু যতই বোর্ডিংএ দিন কেটেছে ততই নিজের একটা বাড়ির জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হোয়ে উঠেছে। একটা পয়সা বাজে খরচ করেন নি। শেষটা এই শান্তিপূর্ণ সহরটাতে আড়াই কাঠা জায়গার ওপর এই ছোট বাড়িখানি কিনে, বাগানে ফুলগাছ লাগিয়ে, কুকুর, বেড়াল, টিয়েপাখি নিয়ে, পৃথিবীর বুকে ছোট একটা স্বর্গ তৈরী করেছেন। সুবাসী কি তবে সেই স্বর্গে আগুন লাগাতে চায়? ও না থাকলে তো এর কিছুই করতে পারতেন না এনা মাসিমা, ও-ই তো সব করে, উনি খালি টাকা জোগান, আর ষোলো আনা ভোগ করেন। সুবাসীর তো কোনো সখও ছিল না, ও'র সুখেতেই সুখী ছিল।

চোখ ফেটে জল আসে এনা মাসিমার। গোছা করে স্কুলের খাতা নিয়ে বসেন, চোখের জলে লাল কালির দাগ ধুয়ে যায়। চোখ মুছে জোর করে কাজ সারেন। ঘড়িতে টংটং করে ন'টা বাজে। পাটনার স্কুল ছেড়ে আসার সময় মেয়েরা চাঁদা করে ঘড়িটাও দিয়েছিল, সবতাই ছিল সেকালে। সব জমা করে রেখেছিলেন, নিজের বাড়ি হোলে ব্যবহার করবেন।

খাতা তুলে খেতে যান এনামাসিমা। রান্নাঘরটি বেশ বড়, ওরই এক ধারে খাবার জায়গা। নিজেরা কাজকর্ম করলে এই ভালো। অন্যদিন সুবাসী রাঁধে বাড়ে, এনামাসিমাও এইখানে খাতা-পেন্সিল উল-বোনা নিয়ে এসে কোণার ঐ বেতের চেয়ারে আলোর নীচে বসে কাজ সারেন। এইটাকেই ও'দের বসার ঘর বলা উচিত, সামনের ঘরটাতো আসলে একটা ঘেরা বারান্দা, বাইরের লোকের জন্য। এ ঘরটা এনামাসিমার আর সুবাসীর।

নিঃশব্দে খেয়ে নেন এনামাসিমা, মনের দুঃখে না খেয়ে খাবার নষ্ট করার কথা মনেও হয় না। খেয়ে উঠে বাসন ধোয়ার বেসিনে,— সুবাসী আসার পর, এই প্রথম নিজের বাসন নিজে ধোন। সুবাসী আসার আগে তো কত ধুয়েছেন, রেঁধেছেনো ছাঁকাপোড়া কতই, নিত্যি মানুষ আসত-যেত, কারো কাজ পছন্দ হোত না, ভাংগা মাসের মাইনের হিসেব কষে কষে উঁচু ক্লাশে অংক শেখাবার ভয় গেছিল ভেংগে।

কি সুন্দর ব্যবস্থা সুবাসীর। বাসন ধুয়ে, ঝাড়নে মুছে, তাকে তুলে, ঝাড়ন নিংড়ে, তারের দড়িতে ক্লিপ এঁটে মেলে দেন এনামাসিমা। সুবাসী তাঁর অযোগ্য হোতে পারে কিন্তু তিনি কি করে সুবাসীর অযোগ্য হবেন?

রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে, বাইরের ঘরেরো দরজা-জানলা বন্ধ করেন। বাকি থাকে দুজনার দুটি শোবার ঘর। সুবাসীর ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়ান এনামাসিমা। দেয়ালে নতুন কেনা, এক কোণে ফুলের গুচ্ছ আঁকা, একটা আয়না ঝুলছে। তার পাশে বেঁটে আলমারির মাথায় একটা চিরুনি, এক কোটো পাউডার, একটা গন্ধ তেল।

এনামাসিমার পা কাঁপতে থাকে, সুবাসীর খাটের ওপর বসে পড়েন। বসতেই সুজনির নীচে কি একটা কাগজ খড়মড় করে ওঠে। কম্পিত হাতে এনামাসিমা একটা গোলাপি চিঠি টেনে বের করেন। অগুরুর গন্ধে ভুর ভুর করছে।

ভালোবাসার কথায় ভরা চিঠি। সে সব কথা উচ্চারণ করতেও এনামাসিমার লজ্জা করতে লাগল, মনে মনে পড়লেন। পড়তে পড়তে বুকের মধ্যেটা খাঁ খাঁ করতে লাগল, কে লিখেছে সুবাসীকে এমন চিঠি গো। তার নাম দিয়েছে মোহি। সুবাসী তাকে বিয়ে না করলে তার নাকি প্রাণ বাঁচবে না, সুবাসী যেন অতিনের মিষ্টি কথায় না ভোলে, মোহিকে বিয়ে করে তার সঙ্গে যেন বর্মায় যায়, সেখানে মোহি তাকে মাথায় করে রাখবে।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকেন এনামাসিমা। সুবাসীকে নতুন চোখে মোহির চোখে, অতিনের চোখে দেখতে চেষ্টা করেন। কোথা থেকে এল এরা সুবাসীর জীবনে? এনা মাসিমার কাছে তো এমন কেউ আসে নি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে তিনি সুবাসীর চেয়ে মন্দ? জ্ঞানে-বুদ্ধিতে তো নয়ই, বলতে নেই, ভগবান যাকে যা দেন—কিন্তু চেহারাটাই কি সুবাসীর তাঁর চাইতে ভালো?

সদর দরজার কড়া নাড়া শুনে চমকে উঠেন এনামাসিমা, গলা শোনেন পাশের বাড়ির অনিমেষবাবুর। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে দোর খুলতে হয়। অনিমেষবাবু শীলমোহর করা লম্বা একটা লালচে রঙের পুরু খাম দেন।

"বর্মা থেকে এসেছে, মাসিমা, আপনার সুবাসীর চিঠি। পিওন হাঁকডাক করে কারো সাড়া পায় নি, তাই আমাকে দিয়ে গেছে, আপনি যেমন পোস্টাফিসে বলে রেখেছেন। নিশ্চয় সুখবর মনে হচ্ছে, মাসিমা, খামটা দেখে অবধি মনে হচ্ছে ওতে ভালো খবর আছে।"

খামটা হাতে নিয়ে এনামাসিমা বললেন, "সুবাসী একটু বাইরে গেছে, সুখবর হোলে নিশ্চয়ই শুনতে পাবে বাছা।"

বর্মা থেকে চিঠি এসেছে সুবাসীর। মোহিও বর্মার কথা লিখেছে। তবে কি সুবাসীকে খোলাপাতার মতো চেনেন নি এনামাসিমা। কই সে তো বর্মার কথা বলে নি কোনো দিন, ঢাকার কথা বলেছে। ঢাকাতে সুবাসীর ছেড়ে-আসা মামাবাড়ির ঘরদোর এনামাসিমার খুব চেনা। সুবাসীর অন্তরের অজ্ঞাত আধখানা অনাবিষ্কৃত কোন দ্বীপপুঞ্জের মতো এনামাসিমার মনটাকে ব্যাকুল করে তোলে।

তারি মধ্যে রান্নাঘর থেকে তর্কাতর্কির শব্দ ভেসে আসে। সুবাসীর বন্ধুদের তো আস্পর্দা কম নয়, এনামাসিমার বাড়িতে গলা তুলে কথা বলে? রান্নাঘরে গিয়ে এনামাসিমা স্তম্ভিত হন। ঘরের সান বাঁধানো ভুঁয়ে যুঁই ফুলের ছড়াছড়ি, তারি উপরে দুটো লোক মারামারি করছে। আর এক পাশে দুহাতে মুখ চেপে ধরে সুবাসী দাঁড়িয়ে, চোখ দিয়ে তার জল ঝরছে।

মারামারি বন্ধ করতে এনামাসিমার বেশি দেরি লাগল না। আগে যখন নীচের ক্লাসে পড়াতেন, এমনি কত ঝগড়া থামিয়েছেন, এ আর এমন কি। এনামাসিমা এগিয়ে গিয়ে দুজনার কান ধরে গায়ের জোরে টান দিলেন। অমনি মারামারিও থেমে গেল।

চেয়ে দেখেন দুজনারি প্রথম যৌবন কোন কালে চলে গেছে, চুল পাতলা করে দিয়েছে, চোখের কোলে কালি ঢেলেছে, থুতনির নীচে ভাঁজ ফেলেছে, পেটের বাঁধনে ঢিল দিয়েছে, কিন্তু তেজ কমায় নি। এনামাসিমা কান ছেড়ে দিলেই পরস্পরকে ছিঁড়ে খায়।

হাত থেকে বর্মার চিঠিটা পড়ে গিয়েছিল। সেদিকে চেয়ে এনামাসিমা বললেন, "সুবাসী, বর্মা থেকে তোমার চিঠি এসেছে।" বলে ওদের কান ছেড়ে দিলেন। বর্মা থেকে চিঠি! তাই শুনে ওরাও যেন পাথর হোয়ে গেল। সুবাসী কম্পিত হাতে চিঠিখানি তুলে নিল।

এনামাসিমা চেয়ে দেখেন লোক দুটি এক ধরণের হোয়েও যেন দুরকমের। একজন গোলগাল বেঁটে ফর্সা, একজন ছটকা, লম্বা, কালো। সুবাসী শীল ভেঙ্গে খাম খুলে চিঠিটা এনামাসিমাকে দিয়ে বলল, "পড়ে দাও, দিদি, অত ইংরিজি বুঝব না।"

উকিলের চিঠি। সুবাসীর জ্যাঠামশাই বর্মাতে বিপত্নীক ও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, বাড়ি, বাগান, ব্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার টাকা, সব কিছুর মালিক একমাত্র সুবাসী।

এনামাসিমার মনের সব গ্লানি মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায়, খুসীতে ডগমগ হোয়ে ওঠেন।

"ওরে সুবাসী, তোর দুঃখের দিন ঘুচল-রে, কম কষ্ট পাসনি তো জীবনে।"

সুবাসী কেঁদে বলে, "আমাকে ক্ষমা কর দিদি, ওদের ভালোবাসার কথায় ভুলেছিলাম, জীবনে কেউ আমাকে ভালোবাসার কথা বলে নি, দিদি, ওরা যে আমার ঐ সম্পত্তির লোভে এসেছে, কেমন করে জানব?"

তারা দুজনে বারবার বলতে থাকে, সম্পত্তির লোভে শুধু হবে কেন, সুবাসীর গুণেও তারা মুগ্ধ!

এনামাসিমা তাদের বলেন, "কে তোমরা? এ-সব কথা কি করে জানলে?"

ছোটখাটো উকিল ওরা, বর্মায় থাকে, সুবাসীর জ্যাঠার উকিল ওদের লাগিয়েছেন সুবাসীর খোঁজ-খবরদারি করবার জন্য। বর্মায় না গেলে টাকাকড়ি পাওয়া যাবে না, এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকাকড়ি নিয়ে যাওয়ারো নানান অসুবিধে। টাকা ভোগ করতে হোলে সেখানে গিয়ে বাস করতে হয়।

সুবাসী এনামাসিমার পায়ে পড়ে। তাকে টেনে তুলে এনামাসিমা বলেন, "সত্যি কথা বল, সুবাসী, আমার কাছে থেকে তোর মনে বুঝি সুখ নেই? আর আমি ভাবি আমাদের মতো সুখী কেউ নেই!"

সুবাসী বলে, "কি জানি, দিদি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমারো এই রকম একটা নিজের জায়গা হোক, যেখানে আমার যেমন যেমন ইচ্ছে করবে সব কিছু সেই রকম হবে। তোমার বাড়িটা আমার এত ভালো লাগে বলেই ঐ রকম মনে হয়েছিল, দিদি। আমি ভেবেছিলাম মোহি—" সুবাসী চুপ করে।

সে লোক দুটো দাঁড়িয়েই ছিল, এনামাসিমা তাদের বললেন "বোস তোমরা। সুবাসী চায়ের জল চাপা দিকি নি, ঝপ্ করে মন ঠিক করিস নি। তুই গেলে আমারো একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

মোহি বললে, "কিছু মনে করবেন না, দেখুন, কিন্তু আমি যদি ওনাকে বিয়ে করে বর্মা নিয়ে যাই, ঐ অতিন আপনার দেখাশুনো করতে পারে। ওকালতিতে ওর মোটে পসার নেই—। আর আমি মন্দ লোক নই, দিদিমণি, আমার মাসি আছেন, আপনাদের ইস্কুলেই সেলাই শেখান, তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

অতিন বললে, "ওকালতিতে আমার পসার না থাকতে পারে, কিন্তু বহুদিন একটা ভালো হোটেলের ম্যানেজারি করেছি, এখন দেশের জন্যে মন কেমন করে। যদি আপনি—যদি আমি —মানে যদিও আমি খুবই অযোগ্য, কিন্তু সুযোগ দিলে আপনার ঘরকন্নার সমস্ত ভার নিতে আমি প্রস্তুত। ইয়ে—অর্থাৎ কিনা—মানে একটু চেনা জানা হোলে পর—"

এনা মাসিমার গাল দুটি এবার একটু রাঙ্গা হোয়ে উঠল। সুবাসীকে ডেকে বললেন, "মাখন দিয়ে বিস্কুট তৈরী করেছিলি না, সুবাসী, সেগুলো কই? পেয়ারা জেলিটা বের করলি না?"

মেকি?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঘর অন্ধকার। জানালার মধ্যে দিয়ে আসছে
তীব্র একফালি জ্যোৎস্না।
যেন ধারালো তরোয়াল
দ্বিধাহীন নিষ্ঠুরতায় বলি দিচ্ছে তাকে
(মানে সেই অন্ধকারকে)।

তাতে কার কী লাভ-লোকসান তুমিই জানো
(মানে এই জ্যোৎস্না জানে)।
আমার ঘরে এই জানালা দিয়ে
শুধু এক নিঃশব্দ অন্ধকার
এলেই তো পারে!
কেন শুধু শুধু জ্যোৎস্নার তরোয়ালের
এই অসহ্য বেয়াদপি!

তুমি জানো (মানে সেই তুমি)
অন্ধকারকেই ভালোবাসি আমি।
সেখানে চাই না জ্যোৎস্নার নিষ্ঠুরতা
চাই না তোমার বদান্যতা
চাই না, চাই না, পেলেও চাই না
জ্যোৎস্নার হায়না।
মায়াবী আয়না, যাতে মুখ দেখতে গেলেই দেখি
তোমার নিষ্ঠুর মুখ (সেই তুমি)—মেকি?

অন্ধকার দ্বিধাগ্রস্ত ঘর
আদিম পাথর।

প্রাচীন উদ্যান

(হান্স কারোসা)

নির্ঝর প্রান্তরে আর কাঠবাদামের কুঞ্জে,
উন্মুক্ত হল স্বর্ণময় তোরন;
সেখানে এখনো শারদ সূর্যস্রোতে প্রজ্বলিত
অর্ধম্লান প্রস্ফুটিত গোতুলাক।

নিয়ত এই শষ্পশয্যায় করেছি উপবেশন,
সূর্যাস্তের শেষে নিরুদ্দিষ্ট শিশুরে মত,
হৃদয়ের কত নিবিড় উৎকণ্ঠা ভুলেছি,
যখন আমি পাকা বীজগুলোকে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখেছি,
কালো দানাগুলো কেমন লাফিয়ে
উঠেছে হাতের মধ্যে,
যেটা আবার আলোকস্পর্শে
ভীষণ ক্ষিপ্রতায় হয়েছে ধূসর।

অন্ধকার হল সঘন
পর্বতে, নগরে আর উপত্যকায়।
ছোট ছোট প্রদীপগুলো উঠল জ্বলে
অসংখ্য জানালার ধারে।

চির-স্বচ্ছ, চির-প্রশান্ত,
তটিনীর ভ্রূ-বঙ্কিম স্রোতে—
এখন মর্তের নক্ষত্র-খচিত ছবি
স্বর্গের ঊর্ধাকাশে হল প্রদীপ্ত।

('Im Elterngarten'-এর জার্মাণ থেকে
অনুবাদ—ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়)

সত্যাগ্রহী

(৫৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছেলেটার সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু দুর্বলতাও দেখা দিয়েছিল মনের মধ্যে। তাছাড়া কৌতূহল তো ছিলই।

সময় মিলল একেবারে দিন দশেক পরে।

হাতে জরুরী কাজ না থাকলে নিজেই বাজার করতে যাই। সেদিনও বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। ও'দের বাড়িতে ঢুকব মনে মনে এ সঙ্কল্প ছিলই কিন্তু তার দরকার হ'ল না। ও'দের ফটকের সামনে আসতেই দেখি বঙ্কিমবাবুও থলে হাতে বেরোচ্ছেন, পিছনে বলাই।

'এই যে, বাজারে চল্লেন? ভালই হ'ল, চলুন এক সঙ্গে যাই!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন বঙ্কিমবাবু, 'তারপর, ভাল আছেন তো? কদিন দেখতেই পাইনি আপনাকে। ছেলেটা কেবল বলে, যাই খবর নিয়ে আসি। তা আমিই বারণ করি, বলি, তুই তো গিয়ে কেবল বক বক করবি, ওঁরা কাজের মানুষ, ক্ষতি হয় ও'দের।'

'না না, গেলেই পারত। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।'

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর? গিছলেন নাকি ডাক্তার ঘোসের ওখানে?'

'না না—তার দরকারই হয় নি।' সোৎসাহে গলা ছেড়েই বলে উঠেন বঙ্কিমবাবু, 'সেই জন্যই তো আরও কদিন খুঁজছি আপনাকে। আপনিই তো পেশেন্ট সারিয়ে দিলেন মশাই, আপনার কাছে গিয়েছিল, আপনি বুঝি খুব লজ্জা দিয়েছেন ওকে, তার পরই একেবারে চেঞ্জ, সে ছেলেই নয় আর। এখন একদম চুপ ক'রে থাকে। বেঁচেছি মশাই, ওঃ যা হয়েছিল। ......আপনার ঋণ শোধ হবার নয়।'

খুশী হলাম। আত্মপ্রসাদও বোধ করলাম একটু। দু' পা পিছিয়ে সস্নেহে বলাইয়ের কাঁধে হাত রাখলাম। অর্থাৎ আমার তরফ থেকেও কৃতজ্ঞতার একটা নীরব স্বীকৃতি জানাতে চাইলাম।

বলাই খুশিতে যেন গলে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই গলা নামিয়ে বলল, 'আমি অনেকটা শুধরে নিয়েছি সত্যিই স্যার, কিন্তু সে জন্যে নয়, বাবা কেন ডাক্তারের বাড়ি যায় নি জানেন? ঐ যে আপনি লিখে দিয়েছিলেন, ডাক্তারের ষোল টাকা ক'রে ফী, হয়ত সপ্তাহে দু' তিন দিন নিয়ে যেতে হবে আমাকে—তাইতেই বাবা পিছিয়ে গেল। বললে, "এ তো হাতীর খরচ, এত আমি পাব কোথা থেকে! ও'র আর কি, মোটা মাইনের চাকরী করেন, বলে দিয়েই খালাস।......আমাকে মক্কেল ঠেঙিয়ে খেতে হয়।"......তার আর দরকার হবে না স্যার, দেখে নেবেন। আমি অনেক ভাল হয়ে গিয়েছি।'

সব ভূতে গল্প হয় না

(৪২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কথাই শুনলাম। কিন্তু মানুষের ভয় যে তাদের মজ্জায় ঢুকে বসে আছে। আর এই কথাটি তারা জানত না, তাই এক বিভ্রাট ঘটে গেল।

শোন বেবি, আমারই অন্যায় এটা। আমি ওদের মধ্যে থেকে ওদের সমাজ দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার অদৃশ্য হওয়ার মেয়াদ যে মাত্র তিন দিন তা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই এই নব্য ভূতদের আসরে ওদের কথা শুনতে শুনতেই আমার নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়ল!

"বলেন কি! সাধু তো বার বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।"

কিন্তু আমার কেন যে সব ভুল হয়ে গেল। ওরা বস্ত ভয় পেয়ে গেল, বেবি। ছোটবেলা থেকে তারা শুনে আসছে মানুষ অতি হিংস্র, তারা ভূতের প্রেতাত্মা। এ বিশ্বাস তারা ছাড়লে কি করে? কিন্তু শোন বেবি।

ওরা মানুষ নিয়েই আলোচনা করছিল ওদের আসরে। এক দল তরুণ ভূত বলছিল, মানুষের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ভূত সমাজকে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে, আমাদের এখন উচিত হবে, কোথাও কোনো উপলক্ষে মানুষের নাম কেউ করতে পারবে না, খবরের কাগজে, বইতে মানুষ দেখা নিয়ে কোনো খবর বা গল্প ছাপা চলবে না। মোট কথা মানুষের মিথ্যা ভয় দূর হলেই ভূত সমাজের কাপুরুষতা দূর হবে।

শোন বেবি, এ কথায় এক মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ভূত বলল, "আমি যদিও ব্যক্তিগতভাবে মানুষ মানি না, মানুষ কখনও দেখিনি, তবু আমার বিশ্বাস তরুণ ভূতটি এইমাত্র যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন তা করার কোনো দরকার নেই। কারণ আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে হলে মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া আমাদের অত্যন্ত দরকার। ভয় বাদ দিলে জীবন থেকে রোমাঞ্চও বাদ পড়ে যায়। ভয়কে বাদ দিয়ে মনের পূর্ণতা হতে পারে না। ভয় না থাকলে ভূত-জীবন ব্যর্থ হবে। শুধু একটানা নির্ভীকতা, শুধু দুর্জয় সাহস নিয়ে অনেক কিছু হাতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভয় না থাকলে ভোগ করা যায় না। অতএব বই থেকে বা জীবন থেকে মানুষের প্রসঙ্গ বা মানুষের ভয় উড়িয়ে দিলে চলবে না।"

তরুণ ভূত কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা তা মানি না। আমরা ভয়হীন সমাজ গড়ে তুলব—বিশেষ করে মিথ্যা মানুষের ভয় সমাজ থেকে দূর করব।"

অধ্যাপক ভূত বলল, "তা হয় না, ভাই। প্রকৃতির ব্যবস্থা উল্টে দেওয়া যায় না। অন্ধকার উড়িয়ে দিলে আলো থাকে কি?"

এক তরুণী ভূত উঠে বলল, "আমরা চেষ্টা করব ভয়হীন সমাজ গড়তে, পরীক্ষা করে দেখব, ভয়ের অনুশীলন না করলে ভয় শুকিয়ে মরে কি না।"

বিশ্বাস কর বেবি, ঠিক এই মুহূর্তে আমার ৭২ ঘন্টার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল, আর তার ফলে কি বিপর্যয়টাই না ঘটল! বেবি, ওদের কথার মাঝখানে আমি নিজ মূর্তি ধারণ করলাম, আর যে তরুণী ভূতটা এতক্ষণ ভয়হীন সমাজ গড়বে বলে আশা করছিল, সেই সবার আগে "মা গো!" বলে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ল। অন্যান্য তরুণী ভূত যারা সেই আসরে উপস্থিত ছিল তারাও প্রায় সবাই মূর্ছা গেল। প্রৌঢ়রা রাম রাম করতে করতে পালিয়ে গেল।

শোন বেবি, একটি তরুণী ভূত এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে হঠাৎ তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি পিস্তল বার করে আমার দিকে নিশানা করে চেঁচাতে লাগল, "মানুষ মিথ্যা,
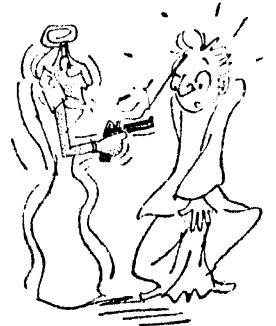
মানুষ মিথ্যা, মানুষ মিথ্যা, মানুষ মিথ্যা। মানুষ যদি সত্যি হয় তো আমার গুলিতে সে মরবে।

মানুষ মিথ্যা, মানুষ মিথ্যা। মানুষ যদি সত্যি হয় তবে আমার গুলিতে সে মরবে।"

বিশ্বাস কর বেবি, তরুণী ভূত যত চেঁচাচ্ছে তত কাঁপছে, আর তার পিস্তলের মুখে আমি কাঁপছি তার চারগুণ।

আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই আমি ভূত হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, ঠিক সেই মুহূর্তে কে আমাকে এক থাপ্পড় মেরে অদৃশ্য করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওখান থেকে। তরুণী ভূতের হাত থেকে এবারে পিস্তল মাটিতে পড়ে গেল। বুঝতেই পারছ বেবি, সাধুই আমার বিপদ অনুমান করে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন। আশা করি, আমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তোমার খুব ভাল লেগেছে, বেবি?

বেবি কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "ভবিষ্যতে এমন গল্পই বলবেন যাতে ভয় হয়।"

সংগুরু বিনা কভু হয় নাকো জ্ঞান,
সৌভাগ্যই সজ্জনের সঙ্গের কারণ।
মেলে না ঐশ্বর্য বিনা যোগ যাগ ধ্যান,
বল বিনা হটে নাকো কখনো দুর্জন।

সন্ত দাস (মায়া বসু)।

অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয় হয়ে আসছে। এ সমন্বয়ের ধারা কখনও ব্যাহত হয়নি। ভারতের এই সমন্বয়ের আদর্শটা রবীন্দ্রনাথ "ভারততীর্থ" কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে।" সমন্বয় সাধন—এইটাই যেন ভারতের অন্যতম মর্মকথা। শত শত বছর ধ'রে ভারতবর্ষে কত জাতি এসেছে, বসতি বিস্তার করেছে, রাজ্য স্থাপন করেছে। তারা পৃথক হয়ে থাকেনি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদানের ফলে তারা অবশেষে একদেহে লীন হয়ে গেছে। এই হ'ল ভারতের ইতিহাসের শিক্ষা। বিদেশ থেকে যারাই এদেশে এসেছে, তারা নিজেদের জিনিষ দিয়েছে যেমন, তেমনি ভারতের নিকট থেকে নিয়েছেও বহু জিনিষ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই ধারা চলে আসছে। আর্য, গ্রীক, শক, হূন, পাঠান, মোগল, ইংরাজ—বহু সভ্যতার স্রোত এসে ভারতের এই মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। ভারতে মুসলিম সভ্যতার আগমনের পর হিন্দু ও ইসলামিক সংস্কৃতির মধ্যে রীতিমতভাবে আদান-প্রদান হয়েছে। ফারসী ও আরবী ভাষা এ দেশের বহু হিন্দু শিক্ষা করেছে। আবার বহু মুসলিম সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করেছে। এইভাবে ভারতের সভ্যতার নিদর্শনগুলি মুসলিম-জগতে প্রচারিত হয়েছে। আবার মুসলিমগণও সাক্ষাৎভাবে ভারতের আর্য সভ্যতার সহিত পরিচিত হয়েছে। ভারতের বহু হিন্দু-মুসলিম সুধীগণ কি ভাবে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষার চর্চা করে সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদর্শকে সুদৃঢ় করেছিলেন, এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আরবগণ নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তারা যে-সব দেশে বসতি বিস্তার করেছিল, সে সব দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। বিভিন্ন জাতির ধর্মকে ঠিকভাবে জানবার জন্য নানা প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন করেছিল। আরব ও পারস্য দেশের বাইরে যে সব ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাদের সহিত ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনা করবার উদ্দেশ্যে আরবগণ বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখতে আরম্ভ করল। প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে আরবগণ কিছু না কিছু লিখে গেছে। আরবী সাহিত্যে য়িহুদী-খৃষ্টান জোরাস্ত্রীয় হিন্দু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আছে। আরবগণ তথা মুসলিমগণ যখন ভারতে আগমন করল, তখন তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ছিল যে, এদেশেও তারা হিন্দুদের ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবে। বাগদাদের আব্বাসীয়া খলিফাদের যুগে (৭৪৯ থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত) ভারতের ধর্ম, চিকিৎসা প্রণালী, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ, গণিত, গল্প-উপকথা, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের আরবী অনুবাদ হয়েছে। এ সব সম্ভব হয়েছিল সরকারী প্রচেষ্টার ফলে। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা বহু মুসলিম সুধী আরবী ও ফারসী ভাষায় ভারতের বিষয় নিয়ে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ জাহিজের (৮৬৪ খৃঃ) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতের হিন্দুদের গভীর জ্ঞান ছিল। ইয়াকুতি (৮৯৭ খৃঃ) অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ভারতের পণ্ডিতগণ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারতেন। গণিতের দশমিক পদ্ধতিটা যে আরবগণ ভারতের নিকট থেকে শিখেছিলেন, একথা আরব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। মহম্মদ বিন মুসা খারাজানী (খৃঃ ১০০৫) সর্বপ্রথম ভারতের সংখ্যাগুলিকে আরবী ছাঁচে তৈরী ক'রে প্রচার করেন। মুসলমানগণ সাধারণতঃ এস্ট্রোলজি বা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে না। কিন্তু তবুও এ নিয়ে সে যুগে বহু আলোচনা হয়েছিল। প্রথম দিকে আরব দেশের জ্যোতিষীদের মধ্যে ভারতের সিদ্ধান্ত পদ্ধতির বহু প্রচলন ছিল। ভারতের এই গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে আরবী ভাষায় আরও কতিপয় গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ সিদ্ধান্ত পদ্ধতির কতিপয় ভুলও সংশোধন করেন। এবং নিজেরাও নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। নবম শতাব্দীতে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়,—তাঁর নাম আবু মাশার। তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং বেনারসে একজন পণ্ডিতের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এখানে তিনি প্রায় দশ বছর ছিলেন। অপর দুজন আরব পণ্ডিত, ইয়াকুব-বিন-ইসহাক কিন্দি এবং মুতাহার—ভারতের দেবদেবী, পূজো পদ্ধতি ও বিবিধ প্রকার ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তক লিখেছেন। আলবেরুণী আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি ভারতের বেদ-বেদান্ত, ষড়দর্শন সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মূল্য আজও হ্রাস পায়নি। তাঁর "কেতাবুল হিন্দ" ভারত তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থের জন্য তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ভারতবিদ পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনের পর যখন মুসলমানগণ এদেশেরই বাসিন্দা হয়ে পড়ল, তখন তারা ভারতের ধর্মজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারল না। তারা কালক্রমে ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করল। প্রথম দিকে শাসক জাতিসুলভ একটা উচ্চ মনোভাব তাদের ছিল। সেই সময় বিজিত-দের মধ্যে ছিল একটা পরাজিত মনোভাব। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে যতই তারা পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করতে লাগল, ততই বহু লোকের অন্তর থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কার হ্রাস পেতে লাগল। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বুঝাপড়া হতে লাগল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কবি আমীর খুসরু উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি, ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করবার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি ভারতের প্রত্যেকটি বিষয়কে নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করতে চাইলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ "নুহ সিপাহরে" (১৩১৮ খৃঃ অব্দ) তিনি লিখলেন যে, "ভারতের সভ্যতার মধ্যে লুক্কায়িত আছে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান—কোথাও তার তুলনা নাই।" তিনি নানা গ্রন্থ আলোচনা করে দেখালেন যে, তর্ক বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান—এসবেই ভারতীয় পণ্ডিতগণের গভীর জ্ঞান ছিল। আমীর খুসরু আরও বলেন যে, "ঈশ্বরের একত্ব ও অনাদি-স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় ও অভ্রান্ত ছিল। একথা সত্য যে, তাদের অনেকে প্রতিমা-পূজা করত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও বিশ্বাস করত যে, সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান ও অদ্বিতীয়।" অতঃপর খুসরু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অজস্র প্রশংসা করেছেন। তিনি তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাদের ভাষা-সাহিত্য, তাদের সাংসারিক জ্ঞান ও তাদের পারিবারিক জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমীর খুসরু সঙ্গীত শাস্ত্রে ভারতীয় পদ্ধতি দেখে বিস্মিত হন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের একজন সমঝ-দার শিল্পী ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয়। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে সেই জ্যোতির সহিত তুলনা করেছেন, যা হৃদয় ও আত্মাকে আলোকিত করে। তাঁর মতে ভারতীয় সঙ্গীত অন্যান্য দেশের সঙ্গীত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তিনি বলেন যে, বনের পশু-পক্ষীকে যদি কেউ মুগ্ধ করতে পারে, তা হচ্ছে ভারতীয় সঙ্গীত। খুসরু ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে নূতন সুর প্রবর্তন করেন। তিনি ইরাণীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেন এবং এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। তিনি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন এবং হিন্দীতে উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করেন।

খুসরু ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার একটা সুফল পাওয়া

গেছে। গৌড়া ও পিউরিটান সুলতান ফিরোজ-শাহ তুগলক প্রথমদিকে ভারতীয় কালচারের ভক্ত ছিলেন না। তিনি খুসরুর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি নগরকুটের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হন, তখন সেখানে ভারতীয় বিদ্যার যে-সব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থরাজি ছিল, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। এই মন্দিরে একটি বিরাট পাঠাগার ছিল। তাতে প্রায় তেরশ খণ্ড অমূল্য প্রাচীন পুঁথি ছিল। ফিরোজ হিন্দু পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে আহিত হলেন এবং দর্শন-জ্যোতির্বিদ্যা ও ভবিষ্যৎ গণনা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি ফারসীতে অনুবাদ করার আদেশ দিলেন। এই অনুবাদের ভার পড়ল সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ইজ্জুদ্দিন খালিক খানির উপর। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম "দালা এলে ফিরোজশাহী।" ঐতিহাসিক ফিরিস্তা এই গ্রন্থের উপর মন্তব্য করে বলেছেন যে, বাস্তবিকই এটা এমন গ্রন্থ যাতে বিবিধ প্রকার বাস্তবগত ও তথ্যগত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। ফিরোজের সময় আরও কয়েকটি গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হয়—তাদের কয়েকটির নাম ঃ—জ্যোতির্বিদ্যার উপর লিখিত গ্রন্থ 'সারাওয়াতি'। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আর একখানি গ্রন্থের নাম "উদ্দিসা-তন্ত্র বা শাস্ত্র"। ফিরোজ-শাহের আদেশে বরাহমিহিরের "বৃহৎ সংহিতা" গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হয়। "তারিখে ফিরোজ-শাহীর" বিখ্যাত লেখক শামস্ ফিরোজ এই অনুবাদ করেন।

সেকেন্দার লোদির সময় আরগার মহাবেদক নামক একজন হিন্দু পণ্ডিতের লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তকের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ করেন বহ্ওয়াবিন খাওয়াস খাঁ। এই গ্রন্থের ফারসী নাম "তিব্বী সেকেন্দারী।" সে যুগে এই পুস্তকটি ছিল ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। সাধারণভাবে এর বহুল প্রচলন ছিল। উক্ত "তিব্বী সেকেন্দারী" গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে রোগের উপশম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড শরীর ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে।

এবার মোগল যুগের কথা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। মোগলদের সময়ে ভারতের বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল। ভারতের গাছপালা ও জীব-জন্তু সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হয়েছিল এই যুগে। এবং সে-সব গবেষণাগুলির বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকাকারে লিখিত হয়েছিল। মোগল সম্রাট বাবরের "স্মৃতিকথায়" আমরা ভারতের গাছপালা ও জীবজন্তুর পরিচয় পাই। আকবরের সময় আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতেও এ সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা আছে। বর্তমান যুগের জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এ দুইটি গ্রন্থ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাবেন।

মোগল যুগের একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতের নাম তাজুদ্দিন মুফতি আলমালিকী। তিনি সংস্কৃত হিতোপদেশকে ফারসীতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের নাম "মুফার রিহ্লে কুলুব" তিনি এ গ্রন্থটি হুমায়ুনকে উৎসর্গ করেন। আকবরের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১৫৮৭ সালে মহাভারত গ্রন্থটি ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল। কয়েকজন পণ্ডিত যুক্তভাবে এ কাজে সাহায্য করেছিলেন—যথা নাকিব খাঁ, আব্দুল কাদির বদাউনি, মুল্লাশিরি এবং সুলতান হাজী আনসারী। এর নাম দেওয়া হয় "রাজামনামা"। শুধু অনুবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। এর স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত ছবি অঙ্কিত করা হয়েছিল। উপরিউক্ত আব্দুল কাদির বাদাউনি ১৫৮৯ সালে রামায়ণ গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এবং চার বছর কঠিন পরিশ্রমের পর অনুবাদকার্য শেষ হয়। হাজি ইব্রাহিম সির হিন্দী অথর্ব বেদকে ফারসীতে অনুবাদ করেন। সংস্কৃত "লীলাবতী" একটি গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ। ফায়জি কর্তৃক এই গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মোকাম্মিল খাঁ একটি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তার ফারসী নাম "তাজাক"। "হরিবংশ" গ্রন্থটি শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা সংক্রান্ত। মোল্লাশিরি এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসের নাম "রাজতরঙ্গিনী"। এর অনুবাদ করেন "মুল্লাশাহ মহম্মদ শাহবাদী"। পঞ্চতন্ত্রকে অবলম্বন করে আবুল ফজল একটি গ্রন্থ রচনা করেন—তার নাম ইয়ারি দানেশ। নল ও

(শেষাংশ ১৫৮ পৃষ্ঠায়)

স্মৃতিকথা

(৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

(সুনীতিকে) একখানা ব্যাকরণ আর একটা অভিধান লিখতে। সেও ত চলতি ভাষারই পক্ষপাতী।

আমি—চলতি ভাষা নিয়ে আপনার চারি-দিকে একটা গোষ্ঠী রচিত হয়েছে—এ গোষ্ঠী কেবল গ্রন্থ রচনা নয়, ভাষার একটা Standard ঠিক করবার জন্য কিছু কিছু লিখতে পারেন।

বীরবল—তুমি ত বল্লে গোষ্ঠী, অনেকে যে বলছে সবুজপত্র চর্বণের লোভে গোষ্ঠ গড়ে উঠেছে। আমি উত্তরবঙ্গের লোক। উত্তরবঙ্গ হতে চলতি ভাষার পক্ষে আন্দোলনের সুরু হয়েছে—উত্তরবঙ্গ হতেই তার বিরুদ্ধে অভিযানও চলছে। (বীরবল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেছিলেন)। তোমার বন্ধু সতীশ ঘটক একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল মানসীতে—চলতি ভাষায় লেখা। সেটাকে সাধু ভাষায় ঢেলে সেজে মানসীতে বের করা হয়েছে। মহারাজার ভাষা পড়েছ ত? আমাদের ভাষার antithesis with a vengeance এ ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয়। একে পিতামহের ভাষা বলা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের ভাষাই আসল বাংলা ভাষা, এ ভাষাকে মাতামহী ভাষা বলতে পার। গোপাল উড়ে ছন্দে লিখলেও এবং উড়িয়া হলেও যে ভাষায় ভারতচন্দ্রের লেখার রূপ দিয়েছে সেটাই আসল মাতৃভাষা। উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতরা বাংলা গান ও কবিতার ভাষাকে ইতর ভাষা বলে গণ্য ক'রে রাশি-রাশি সংস্কৃত শব্দ এবং তাদের সন্ধি সমাস আমদানি ক'রে একটা কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। এর কৃত্রিমতা ধরা পড়ে গিয়েছে। এ ভাষা সেকালের বুনিয়াদী পরিবারের দরবারী ভূষার মত অচল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন যদি কেউ আবার সেই ভাষায় জোর ক'রে লিখতে থাকেন—তবে চলবে না।

তিনি বলতেন—তথাকথিত সাধু ভাষায় বিদেশী শব্দ, গ্রাম্য চলতি শব্দ ও বাংলার ইডিয়মগুলির স্থান হয় না। স্থান হলেও গুরু চন্ডালিয়া দোষ হয়। বাংলার ইডিয়ম-গুলিকে সাধুভাষায় পরিবর্তিত করলে তার অর্থ বজায় থাকে না।

'ঘরের ছেলেকে' 'গৃহের সন্তান' বললে যা হয় তাই। তথাকথিত সাধুভাষা এজন্য দুর্বল ও নিস্তেজ। অন্যপক্ষে চলতি ভাষার elasticity খুব বেশী—এতে তদ্ভব, গ্রাম্য, বিদেশী শব্দের সঙ্গে ইডিয়মগুলি সবই চলে, সেই সঙ্গে যে কোন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও চলতে পারে। এতে ক'রে ভাব প্রকাশের কত সুবিধা ভেবে দেখা উচিত।

আসল বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে তিনি এক পত্রে আমাকে লিখেছিলেন—

'নবদ্বীপের মহা-মহা পণ্ডিতরা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে এই বলে বিদ্রূপ করতেন যে, তিনি শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণের অধ্যাপক। ব্যাকরণকে শিশু-শাস্ত্র বলবার অভিপ্রায় কি জানিনে। সম্ভবতঃ বালকরা এ শাস্ত্র প্রথম অধ্যয়ন করত ব'লেই— ব্যাকরণের নাম হয়েছিল শিশু-শাস্ত্র। টোলে প্রথম ব্যাকরণ মুখস্থ করেই পরে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হয়। সম্ভবতঃ শিক্ষার এ পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে।

আমরাও ছেলেবেলা স্কুলে ব্যাকরণ অভ্যাস করতে বাধ্য হয়েছি। ফলে ব্যাকরণের নাম শুনতেই আমরা ভয় পাই। কারণ, শৈশবে না হোক বাল্যে আমরা যে দুর্বোধ শাস্ত্র কায়ক্লেশে কন্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি সে শাস্ত্রকে কে হিসেবেই শিশু শাস্ত্র বলা যায় না। এর কারণ, যে সব বই আমাদের বাংলা ব্যাকরণ ব'লে পড়ানো হ'ত সে সবই সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণ মাত্র। আর সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা যে শিশুর পক্ষে অসাধ্য সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মাতৃভাষা যে মৃত ভাষা নয়, এই জলজ্যান্ত সত্যটি পণ্ডিতেরা উপেক্ষা করতেন। এর ফলে সেকালের স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ ছিল প্রথমতঃ দুর্বোধ্য, দ্বিতীয়তঃ তা বাংলা ভাষার ব্যাকরণই নয়। বাংলা ভাষা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এ ভাষা সংস্কৃতের অপ-ভ্রংশ হ'লেও সংস্কৃত নয়। অতএব এরও যে একটি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, ক্রমে সে জ্ঞান লোকের হয়েছে।

বাংলা ভাষা আধা সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া অবশ্য আবশ্যক। আমরা যারা চলতি ভাষায় লিখি আমরাও আমাদের লেখায় সংস্কৃত শব্দ বর্জন করতে পারিনে। বরং গুণতি হিসেবে সম্ভবতঃ আমাদের লেখায় তদ্ভব শব্দের চাইতে তৎসম শব্দের সংখ্যা বেশি, তবুও আমাদের বিশ্বাস আমরা বাংলায় লিখি। নকল সংস্কৃতে লিখিনে।'

(১)—অ-ক

অমলা আর কমল। একই অফিসে কাজ করে। মাইনে কম, খাটুনি বেশি। এই উপলক্ষেই দুইজনের মধ্যে সম্প্রীতি। অনেক সময়ে অমলা কিছু ধার করে কমলের কাছে, আর পরের মাসের প্রথমেই সেটা শোধ করিয়া দেয়। আবার কখনো কমলই কিছু ধার নেয় অমলার কাছে, পরের মাসের প্রথমে শোধ দেয়। এই সামান্য আদান-প্রদানের ব্যাপারটা যে ক্রমে প্রেমে পরিণতি লাভ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাও বুঝিতে পারে নাই। প্রজাপতির অমোঘ ষড়যন্ত্র কেই বা সহসা বুঝিতে পারে।

উভয়েরই নিজ সংসারের দায়িত্ব অনেক। নিজেদের সামান্য আয় হইতে বিধবা মা, ছোট ভাই-বোন প্রভৃতির ভরণ-পোষণে সাহায্য করিতে হয়। এ বিষয়ে উভয়েরই চিন্তা বা দুশ্চিন্তা একই স্রোতে প্রবাহিত। কেহই নিজেকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চায় না। অথচ পঞ্চশর ক্রমাগত ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর-নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়াছেন।

সেদিন পূর্ণিমা। অফিসের পর দুজনে আসিয়া উপস্থিত হইল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তরদিকের মাঠে একটি নিভৃত অঞ্চলে। দিনের আলো প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে। পূর্বদিকের আকাশে চাঁদের সোনালি আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ মিষ্ট বায়ুর হিল্লোলে উভয়েই পুলকিত। পাশাপাশি বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই তাহারা বসিয়া পরস্পরকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছে। অর্থাভাবের কথা, অফিসের খাটুনির কথা যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কমল বলিল, আস্তে আস্তে একটা গান গাও না।

অমলা বলিল, যাও, মাঠের মাঝখানে আবার কেউ গান গায় নাকি?

তাতে কি? কাছে কেউ নেই। একটু আস্তে গাইলে কেউ শুনতে পাবে না।

তুমি যখন বলছ—এই কথা বলিয়া অমলা গাহিল—

আমি শুধু তোমারই দাসী
আর কারো নই, শুধু
তোমারেই ভালবাসি—ইত্যাদি।

গান শেষ হইল। উভয়ের মনের দ্বিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর অমলা ধীরে ধীরে বলিল, একটা কথা বলব? বল।

কথাটা তোমারই মুখ থেকে আমি শুনব, এইটেই আশা করছিলুম, কিন্তু—কিন্তু—

কথাটা কি, বলই না।

মানে আর বেশি দেরি করাটা কি ভাল হবে?

কিসের দেরি?

আহা, কিছুই বোঝ না যেন! আমাদের বিয়ের কথাটা আজ ঠিক হয়ে গেলে হয় না? আমাদের এই রকম এক সঙ্গে বেড়ান, এই সব নিয়ে অফিসে আর অফিসের বাইরে কতরকম কথা হচ্ছে।

বিবাহের কথাটা কানে যাইতেই কমল মনে মনে চমকাইয়া উঠিল। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিল, ও ব্যাপারটার কথা আমি ভেবে দেখিনি। তবে তুমি যখন বলছ, তখন একটু ভাবতেই হবে।

তুমি কিছুই ভাবনি? কি আশ্চর্য!

না, না, তা বলছি নে। মানে, এখনই, হঠাৎ—

হঠাৎ?

না, না, বেশ তো। তোমার কথাই ঠিক।

তা'হলে কথা দিচ্ছ?

মানে, কথা আমি দিচ্ছি বা তুমি নিচ্ছ—একই কথা। আচ্ছা, চল, এখন কিছু খাওয়া যাক। বেশ একটু খিদে পেয়েছে।

দুজনেই উঠিয়া চৌরঙ্গীর মোড়ের দিকে গিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া একটি রেস্তোরায় ঢুকিল। সেখানে একটি পর্দা ঢাকা খোপে বসিয়া কিছু খাবার অর্ডার দিয়া কমল বলিল, আজকের দিনটা মানে সন্ধ্যাটা বেশ কাটল। আবার কবে এদিন আসবে বল ত?

অমলা বলিল, সে তোমার ইচ্ছে। যেদিন আমাদের রেজেস্ট্রীটা হয়ে যাবে, তারপর—তারপর আর আজ আর কাল কি? শ্যামবাজার অঞ্চলে কিংবা বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট, কি বল? দুজনের মাইনে এক সঙ্গে করে বুঝে সুঝে চললে, কি বল?

তুমিই তো সব বলছ। আমার আর বলবার কি আছে?

ধীরে ধীরে খাওয়া শেষ হইল। হোটেলের চাকরের কাছে পয়সা চুকাইয়া দিয়া কমল তাহাকে বলিল, দুটো ভাল পান নিয়ে আয় তো?

পান আসিলে দুজনে পরস্পরের মুখে একটি করিয়া পান দিয়া বলিল, বেশ, মিঠে পান, না?

দুজনেই বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বেশ মিঠে!

হোটেল হইতে বাহির হইয়া দুইজনে দুই-দিকের দুইটি বাসে উঠিয়া পড়িল।

২—আ-খ

লেকের দক্ষিণদিকে সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে একখানি মোটর গাড়ী দক্ষিণমুখো হইয়া রাস্তার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া আছে আরতি আর খগেন। কতক্ষণ এমনি করিয়া বসিয়া আছে, কে জানে? এক সময়ে খগেন বলিল, তাহ'লে এবার মা বাবাকে বলা যাক, কি বল?

আমি আর কি বলব? তবে আমার মাকে কিছু বলার দরকার নেই।

কেন?

আমরা এখন বড় হয়েছি, এখন আর এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মা বাবাকে বিরক্ত করা কেন?

খগেন বলিল, তবু একটা সামাজিকতা, একটা লৌকিকতা বলে জিনিষ আছে।

আরতি বলিল, ও সব সেকেলেমি ছাড়। কাউকে কিছু বলে কাজ নেই।

খগেন বলিল, তাহলে কবে কোথায় কি-ভাবে কি হবে, তুমিই ঠিকঠাক কর।

হ্যাঁ, করা যাবে।

তোমার ওই করা যাবে, ভাবা যাবে—এসব আর না। এখনো কি মন ঠিক করনি?

আরতি বলিল, মন আমার বরাবরই ঠিক আছে।

কথার মোড় ফিরাইয়া খগেন বলিল, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

আরতি হাসিয়া বলিল, তোমার গানও অনেক দিন শুনিনি। গাও না একটা গান।

আমার আবার গান! গান তোমাদের গলায়ই মানায় ভাল, শোনায়ও ভাল।

আরতি বলিল, খুব বিনয় হচ্ছে বুঝি! গাও না একটা গান।

খগেন বলিল, তুমি যখন বলছ, তবে শোন। খগেন খুব নীচু গলায় গান ধরিল—

সকৌঠন লাজ তোর, অত কি ভালো,
সরমেতে ঢাকা মুখ খুলিবি কি লো—
ঘোমটা খুলে মুখটি তুলে
পেটে এনে হাসি
আঁখির তিয়াস সখি
মিটাবি কি লো?—ইত্যাদি

গান শেষ হইলে আরতি বলিল, কি সুন্দর

গাও তুমি। ইচ্ছে করে, দিন রাত তোমার গান শুনি।

খগেন। বেশ, শুনো এরপর। যখন এই সাদার্ণ এভিনিউ-এ কিংবা ওই ভূপেন বোস এভিনিউতে একটা ছোট্ট ফ্লাটে শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি দুজনে বাসা বাঁধব, তখন সারাদিন সারা রাত আমার গান শুনো, কোন বাধা থাকবে না। কবে বাসা বাঁধবে, বল না ?

বাঁধব, বাঁধব, শিগ্‌গিরই বাঁধব। এই কথা বলিয়া আরতি খগেনকে একটু আদর করিয়া ফেলিল।

খগেন গলিয়া গেল। বলিল, তা হ'লে মা বাবাকে কিছু না বলাই ঠিক, কি বল ? কিন্তু দু' চারজন বন্ধুবান্ধবকে না বললে কি ভাল দেখাবে।

আরতি বলিল, বেশ দেখাবে। মোট কথা, কাউকেই কিছু বলা হবে না।

খগেন অগত্যা বলিল, আচ্ছা, তাই ঠিক রইল। তা'হলে—

আরতি বলিল, তা হ'লে আর কিছু নয়। এখন লক্ষ্মীর মত ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসে গাড়ীতে স্টার্ট দাও।

খগেন বলিল, এবার তোমাকে ড্রাইভিং শিখতে হবে। সে তুমি দুচার দিনের মধ্যেই শিখে ফেলতে পারবে।

আরতি বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। গাড়ী ড্রাইভ করা আর এমন কি শক্ত কাজ। পুরুষ মানুষ ড্রাইভ করার চেয়ে অনেক সোজা।

গাড়ী লেক ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিল। বাড়ীর দরজায় আসিয়া আরতি 'টা টা' বলিয়া বিদায় লইল।

৩—অ-খ

আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলের একটি মেস-বাড়ী। ইহার মধ্যে পাশাপাশি দুইখানি ঘর মেসবাসীরা একদিনের জন্য খালি করিয়া দিয়াছে। এই খালি ঘর দুইখানি যথাসম্ভব পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। একখানি ঘরে কয়েকখানি টেবিল সাজানো, সেগুলির পাশে চেয়ার পাতা, দেখিলেই বুঝা যায় এখানে আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাশের ঘরখানি একটু বেশি করিয়া সাজানো। মেঝেয় বরকনের বাসর-ঘরের মতন করিয়া গালিচা, বিছানা, বালিশ, ফুলের তোড়া প্রভৃতি সুন্দর করিয়া সাজানো। ঘর দুইখানির দিকে একটু চাহিলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না যে এটা একটা বউভাতের আসর। একঘরে অতিথি-অভ্যাগতের আহারের ব্যবস্থা এবং আর এক ঘরে বরকনের শয়নের ব্যবস্থা।

সবই ব্যবস্থামত সম্পন্ন হইল। অতিথি অভ্যাগতেরা আপ্যায়িত হইয়া চলিয়া গেলেন। মেসের ম্যানেজারবাবু উদ্বৃত্ত খাবারাদি ঝি-চাকরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজেও কিয়দংশ লইয়া গেলেন। আর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা পাশের ঘরের এক পাশে রাখিয়া বরকনের কাছে বিদায় লইলেন।

মেস-বাড়ী। আড়ি পাতার লোক নাই। খগেন আলো না নিভাইয়া একটু জ্বালিয়া রাখিয়া একটি বালিশে শুইয়া পড়িল এবং কোমল কণ্ঠে ডাকিল, অমলা, শোবে এস।

দুইজনে পাশাপাশি শুইয়া প্রথমেই এক একটি বিরাট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ। খগেনই প্রথমে কথা বলিল, অমলা!

অমলা অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, কি বলছ ?

খগেন। বিয়ে ত হয়ে গেল, কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারবে ?

অমলা কাঁপিয়া উঠিল। ব্যাপার কি? তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সেই দিনকার সেই ছবি। প্রাণ-পণে মনকে শান্ত করিয়া বলিল, কেন এমন কথা বলছ আজকের রাতে ?

খগেন। কেন ? শুনবে ? হ্যাঁ, শোনাই ভাল। আমি ভালবেসেছিলাম আরতি বলে একটা মেয়েকে। খুব ভালবেসেছিলাম। মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। সে আমাকে কথা দিয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে শঠতা করতে, বিশ্বাসঘাতকতা করতে একটুও বাধল না তার। বিয়ে অবশ্য হয়নি। কিন্তু এ কথা তোমার কাছে আমি লুকোতে পারবো না যে আমার আজকের এ ভালবাসা কতকটা সেকেন্ড-হ্যান্ড। তুমি নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পাবে, শক পাবে এ কথা শুনে কিন্তু মনের আগুন চেপে রাখলে ফল ভাল হবে না বলে, তোমার কাছে সবই আজ বলে ফেললুম। লক্ষ্মীটি আমায় ক্ষমা করো।

খগেন মনে করিতেছিল, এইরূপ একটা শক পাইয়া অমলা একটা বিশ্রী কান্ড না করিয়া বসে। কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ অমলার মুখে চোখে একটা স্বস্তির ভাবই ফুটিয়া উঠিল। অমলা ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যখন সব কথা আমাকে খুলে বলেছ তখন আমারও নিজের কোন কথা আজকের রাতে তোমার কাছে না বলে আমি থাকতে পারছিনে।

খগেন সাগ্রহে বলিল, তোমার আবার কি কথা ?

'শোন তবে'—এই কথা বলিয়া অমলা কমলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাহার প্রতিশ্রুতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠের কথা, হোটেলের কথা সব বলিয়া তারপর বলিল উঃ কি নিষ্ঠুর! এইদিনের পরদিন অফিসে গিয়ে আর তার খোঁজ পাইনি। পরস্পর শুনলাম সে নাকি বম্বেতে কি একটা কাজ নিয়ে চলে গিয়েছে। সেখানেও চিঠি লিখলুম কোন উত্তর পেলুম না। উঃ, পুরুষ মানুষ-গুলো কি নিষ্ঠুর! এখন ভাবছি, আমার এই সেকেন্ড-হ্যান্ড ভালবাসায় তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারব কি ? তুমি আমাকে ক্ষমা করবে কি ?

খগেন উৎসাহের সঙ্গে বলিল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই কথা বলিয়া সে অমলাকে আর একটু কাছে টানিয়া লইল। অমলা বলিল, আমার আর একটু কথা আছে। আমার মা আর আমার ছোট ছোট ভাই-বোন—তাদের একটু সাহায্য তোমাকে করতে হবে, নইলে তারা মরে যাবে।

খগেন বলিল, ওসব কথা তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমলা বলিল, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। এই সব গোল-মালের মধ্যে আমি কিছু খাবার সুযোগই পেলাম না। আমি দেখলুম, কে যেন এক ... পান্তুয়া রেখে গেছে ঘরের ওই কোণে ... হয়, উদ্বৃত্ত খাবার। আমি গোটা কয়েক পান্তুয়া খাচ্ছি, তুমি কিছু মনে কর না।

খগেন বলিল, কিছু মনে করব না। সত্যিই তো, তুমি খেলে কি খেলে না তা দেখবার কেউ নেই এখানে। আমারই উচিত ছিল খোঁজ করা।

অমলা উঠিয়া গিয়া কয়েকটি পান্তুয়া খাইয়া মুখ মুছিয়া আসিয়া নিজের বালিশের উপর মাথা রাখিয়া এলাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বলিল, কতকাল যে এমন সুন্দর পান্তুয়া খাইনি, তা মনেই পড়ে না। তোমার ভালবাসাটা ফার্স্ট-হ্যান্ড কি সেকেন্ড হ্যান্ড তা নিয়ে আমার মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। তোমার পান্তুয়া-গুলো কিন্তু একেবারে টাটকা।

খগেন হাসিয়া বলিল, বেশ। তুমি রোজ পান্তুয়া খেয়ো—যতগুলি পার।

অমলা বলিল, সে তো হ'ল কিন্তু আমা-দের এই সেকেন্ড হ্যান্ড ব্যাপারটায় তোমার মনে কোন অশান্তি নেই ?

খগেন বলিল, ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কর না। এই হচ্ছে জগতের অনাগত সমাজের অ আ ক খ।

ঢপ কীর্তন, কীর্তন গানের ভাঙ্গা সুরের হাল্‌কা গান। এক সময় অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম বাউল, মোহন দাস ঢপ গানে খুব নাম করিয়াছিলেন। মধুসূদন কিন্নর (মধুকান) এই গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। মধুকান নিজেও ঢপের সুরে বহু গান রচনা করিয়াছিলেন, মধুকানের কীর্তন গানের দল ছিল। মধুর গান সারা বাঙ্গলাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি পালা গানও এই ঢপের সুরেই গাওয়া হইত। কিছুদিন পূর্বে পান্না দাসীও ঢপ কীর্তন গাহিয়া খুব নাম করিয়াছিলেন। এই ঢপ গানের সৃষ্টি-কর্তার নাম রূপচাঁদ অধিকারী। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে এই গানের উদ্ভব হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলায় তালিবপুর গ্রাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের ষ্টেশন সালার নামক এক বৃহত্তর পল্লীর অতি নিকটেই এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি অবস্থিত। প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের মাতুলালয় ছিল বেলডাঙ্গা গ্রামে। মাতুলের কোন সন্তানাদি না থাকায় মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রাণকৃষ্ণ বেলডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। মাতামহের দেব-সেবা ছিল, এবং শিষ্য-সেবকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। দেবসেবার সঙ্গে শিষ্যগণকে দীক্ষা দেওয়ার ভারও প্রাণকৃষ্ণকেই গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য চট্টোপাধ্যায় প্রাণকৃষ্ণের উপাধি হয় অধিকারী। প্রাণকৃষ্ণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রূপচাঁদ কনিষ্ঠ স্বরূপচাঁদ। পিতার মৃত্যুর পর রূপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিগ্রহ সেবার ও শিষ্যগণের অধিকার প্রাপ্ত হন। "মুর্শিদাবাদ কথা"র সংকলয়িতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে সন ১১২৯ বঙ্গাব্দে বেলডাঙ্গা গ্রামে রূপের জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালে শিক্ষা শেষ হইলে রূপচাঁদ স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন। তথায় কিছুদিন তিনি ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন। টোল পরিত্যাগপূর্বক তিনি কিছুদিন শ্রীমদ্‌-ভাগবতের কথকতা করিতেন। রূপের কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট এবং শৈশব হইতেই তিনি সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠের কথকতা এবং ভক্তিরসাত্মক পদাবলী গান সাধারণকে মুগ্ধ করে। অচিরেই তিনি সুকথক ও সুগায়করূপে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় সঙ্গীতে সুশিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার বিশেষরূপ আগ্রহ জন্মে। ঘটনাক্রমে সালারের অদূরবর্তী সিমুলিয়া গ্রামে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সন্ন্যাসী কৃপাপূর্বক তাঁহাকে মার্গ সঙ্গীত ও পদাবলী সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন। রূপের প্রতিভা, নিষ্ঠা ও শিক্ষায় অভিনিবেশ দর্শনে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদসহ রূপকে একটি ডুবকী দান করিয়াছিলেন। এই যাদুকরী ডুবকীর মধ্যে কি মোহিনী শক্তি নিহিত ছিল, জানি না, ডুবকী বাদ্যের সহিত রূপের মধুকণ্ঠ নিঃসৃত গান যে শুনিত সেই আত্মহারা হইত। রূপের কোনো দল ছিল না, ডুবকী মাত্র সম্বল লইয়া তিনি সারা বাঙ্গালায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। একক পদাবলী গান অসাধ্য জানিয়া এই প্রতিভাবান গায়ক একজনের গানের উপযোগী যে সহজে গেয় হাল্‌কা সুরের সৃষ্টি করেন তাহাই ঢপ নামে পরিচিত হয়। বোধ হয় ডুবকীর তালে গাহিতেন বলিয়া সুরের নাম হইয়াছিল ঢপ। আমাদের পল্লী অঞ্চলে ঢপের অর্থ সাদৃশ্য, অনুরূপতা। একটা শব্দ চলিত আছে—'বেঢপ', অর্থ অসঙ্গত, বেখাপ্পা, বিরূপ।

সেকালে রেলপথ ছিল না, বাস, মোটর যানাদি তো স্বপ্নলোকে ছিল। লোকে গরুর গাড়ীতে, নৌকাপথে ও পদব্রজেই যাতায়াত করিত। রূপচাঁদ পায়ে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিতেন। একদিন ভিন্ন গ্রামে গান গাহিয়া তিনি বেলডাঙ্গায় ফিরিতেছেন, পথে এক দল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তাহাদের নিকট মৃত্যুর পূর্বে সামান্য ক্ষণের জন্য শ্রীভগবানের নাম গানের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। দস্যুগণ সম্মত হইলে ডুবকী-সহযোগে শ্রীমহাপ্রভুর নাম গান করেন। গান শুনিয়া হিংসা ভুলিয়া দস্যুগণ তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। রূপচাঁদ তাহাদিগকে দীক্ষা দান করেন। তাহারাও চিরকালের দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দেয়। এই প্রবাদ আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বহু লোকের মুখে শুনিয়াছি।

রূপচাঁদের রচিত কোন গান আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। কীর্তনীয়া ফটিক চৌধুরী মহাশয় আমাকে রূপচাঁদ রচিত পাঁচটি গান শুনাইয়াছিলেন। সুর তাল লিখিয়া লই নাই। গানগুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম এখানে তুলিয়া দিলাম।

১

আমায় দংশেছে গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ।
বিষে জারিল জবলে গেল সর্ব অংগ।
এ ভুজঙ্গে দংশেছে অন্তরে
বিষ যায়না মণিমন্তরে
নাই তাগা বাঁধবার স্থান কিসে হবে ত্রাণ
শেষে যায় যে পরাণ আশার সঙ্গ॥
কলঙ্কিনী হৈলাম জাতি-কুল মজাইলাম
সাধে সাধে সখি সকলি হারাইলাম
ভুলি আঁখির ছলনে না জানি কি ক্ষণে
তার নয়নে নয়ন মিলাইলাম।
সেই দেখা আমার বুঝি শেষ দেখা
না দেখিয়া তারে দায় হলো প্রাণ রাখা
ছিলাম গৃহবাসী করিয়া উদাসী
সব নাশি রূপের করলে বাসা ভঙ্গ॥

ক রূপ হেরিনু কদম্ব মূলে।
কালিন্দ নন্দিনীর কূলে॥
জন্মাবধি এমন রূপ তো দেখি নাই
অপরূপ রূপের বলিহারি যাই
রূপ বলতে নারি মুখে দেখেছি এই সুখে
বুকের জ্বালা সয়ে আছি দুঃখ ভুলে॥
দুঃখ ভুলি তারে ভুলতে পারি কই
সে-কি জানে আমি কত জ্বালা সই
জানেনা অচেনা সেই জনা বই
আমি অপর কারো নই।
সব হারায়ে তারি পায়ে রূপ বিকালো
বিনামূলে॥

৩

যদি নাহি দিবে দেখা কেন বারেক দেখা দিলে।
কহিবে না কথা তবে আঁখিতে কি বাখানিলে॥
বল দেখি এ কি লীলে
নির্দোষে বিষে জারিলে
সর্বস্ব হারিলে যদি আমায় কেন নাহি নিলে॥
কেন এসো নিবারিলে
(তুমি) সুখ পাও কি (আমি) দুখ পাইলে
একেবারে মারিলে না মারিতে চাও তিলে তিলে।
বাহির হতে কেন আমায় অন্তরেতে লুকাইলে
এ-কি রকম লুকোচুরি দেখা পাই নয়ন মুদিলে
বাহিরে দেখা নাহি মিলে এ খেলা
কোথা শিখিলে
রূপচাঁদ বলে ভুলবে যদি তবে কেন ভুলাইলে॥

৪

বাঁকা শ্যাম গুণধাম নামটী তোমার প্রাণারাম।
আমি তো বামতা ছাড়ি তোমায় ডাকি অবিরাম॥
তবে কেন তুমি বাম এ কি তোমার গুণগ্রাম
যেমন রূপ তেমন নাম শুনি অনুপাম
সকল দুখের বিরাম কে বলে আনন্দধাম॥
সারা জীবন ডাকিলাম তবু তো না পাইলাম
অন্তিম কাল আসিবে না অনুমানে জানিলাম
আপন করতে নারিলাম মনের কথা বুঝিলাম
রূপচাঁদ বলে রাধাশ্যাম পূর্ণ হবে নাকি
মনস্কাম॥

৫

নব জলধর কুসুম কানড়
জিনিয়া তার তনু কাঁতি
নীলরতন দলিতাঞ্জন
তুচ্ছ করে দেহের ভাতি॥
অঙ্গ গন্ধে নানা ছন্দে
অলি গুঞ্জে পাঁতি পাঁতি।
বাজায় বাঁশী যোগী তপস্বী
শুনে আমি শ্রবণ পাতি॥
চরণ নূপুরে মধুর মধুর
মনে বাজে দিবা-রাতি।
রূপচাঁদ ভনে ধ্বনি শুনে
কাঙ্গাল হৃদয় ওঠে মাতি॥

গান কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ। "রূপ বলতে নারি মুখে দেখেছি এই সুখে বুকের জ্বালা সয়ে আছি দুখ ভুলে।" শুনিলে আধুনিক কবির লেখা বলিয়া মনে হয়। "রূপচাঁদ বলে ভুলবে যদি তবে কেন ভুলাইলে" গভীর বেদনার কথা। রূপচাঁদের ভিটা পড়িয়া আছে। পূজা করিবার লোক নাই। সত্যিই কি মুর্শিদাবাদে গুণীর আদর করিবার লোকের একান্তই অভাব ঘটিয়াছে। বাঙ্গালী পূজাপূজো বিস্মৃত হইয়াছে?

———

কাবেরী

পশুপতি ভট্টাচার্য

অনেক দিনের জন্য চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েছিলাম এক বড়লোকের বাড়িতে।

সে বাড়ির যিনি একচ্ছত্র গিন্নি তিনিই একচ্ছত্র কর্তা। তিনিই সব কিছুর সর্বমান্য মালিক। তাঁর উপরে কেউ নেই। সকলেই তাঁর বাধ্য এবং অধীন। তাঁর তিনটি রোজগেরে পুত্র, প্রত্যেকেই ভালো রোজগার করে। তারা যা কিছু পায় মায়ের হাতে এনে দেয়, মায়ের উপরেই সব কিছুর ভার। ছেলেরা কেবল টাকা এনে দিয়েই খালাস। গিন্নি প্রবল প্রতাপ রাজ্ঞীর মতো সংসার পরিচালনা করেন তাঁর তিন বধূকে নিয়ে। একটি গোযানে যদি তিনটি গরু জোতা হয়, তাহলে সেই গোযানের চালক যেমন তার হাতের বাড়ির দ্বারা তিন গরুর পিঠে এক একবার স্পর্শ জানিয়ে দিয়ে তাদের ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যায়, ইনিও তেমনি তাঁর তিন বধূকে ঠিক রাস্তায় চালিয়ে নিয়ে যান। তাদের বেচাল হবার কোন উপায় থাকে না। তারা আধুনিকভাবে শিক্ষিত আধুনিক কালেরই মেয়ে, কিন্তু চালাতে জানলে সকলকেই সোজা রাস্তায় চালানো যায়।

এই বাড়িতেই আমাকে চিকিৎসায় নিয়োগ করা হলো। অসুখ স্বয়ং গিন্নির। বয়স পঞ্চাশোত্তর, স্বাস্থ্য বেশ ভালো, সম্প্রতি তিনি অসুস্থ।

কি অসুখ তা ধরা প্রথমে খুবই কঠিন হলো। সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যথা এবং সর্বাঙ্গে জ্বালা। অষ্টপ্রহর একটা অসহ্য রকমের কষ্ট বোধ করছেন। তিনি যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু, সহজে কাতর হন না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। তখন মুখে কিছু না বললেও তিনি শুয়ে পড়েন। ব্যথার জন্য গরম জলের ব্যাগ দেওয়া হয়, তাতেও সে ব্যথা কমে না। জ্বালার জন্য কত কি প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতেও জ্বালা কমে না। দিনে-রাতে সাত-আটবার স্নান করেন, তাতেও গায়ের জ্বালার নিবৃত্তি হয় না।

অনেক দিন হতেই এমন চলছিল। নিশ্চিন্ত জীবনের সংসারে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া এসে পড়েছিল। গাছের মূলে কাণ্ডে যদি ঘুণ ধরে, তাহলে কি তার শাখা-প্রশাখা মুষড়ে না গিয়ে আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে! এ-বাড়ির সকলেই একান্তরূপে মা-নির্ভর। কেউ কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র জানে না, বোঝে না, মাথা ঘামায় না। মা যা করবেন তাই হবে, সকলেই সেই ধারাতে অভ্যস্ত। প্রথম পুত্র যখন যা খাবে, যা পরবে, মা তার গোছ ক'রে দেবেন। অফিস যাবার সময় তার এক ডিবা পান ও এক কৌটা জর্দা চাই, সেটা প্রত্যহ তৈরি থাকবে মায়ের কাছে। দ্বিতীয় পুত্র স্নান করতে চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়, মা তাকে বারে বারে তাগিদ দিয়ে প্রত্যহ তা করাবেন। তার অফিস যাবার সময় নিখুঁত ভাঁজ করা প্যান্ট চাই। ধোপদুরুস্ত হাওয়াই শার্ট চাই, মা তাকে বলে দেবেন কোথায় কোনটা ঠিক করে রাখা আছে। তৃতীয় পুত্রের অফিস যাবার সময় কোঁচানো ধুতি চাই, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরপ্রণাম করা চাই, অফিসে তার কাছে সরবৎ প্রভৃতি পৌঁছে দেওয়া চাই, মা ঠিক সময়ে এগুলির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। শুধু তাই নয়, চা জলখাবার খাবার সময়, দুবেলা আহারের সময় প্রত্যেকের কাছেই মায়ের হাজির থাকা চাই, নতুবা তাদের খাওয়া হবে না। কেউ ভাত খাবে, না লুচি খাবে, কেউ ডিম খায়, কেউ ডিম ছোঁয় না, কেউ মাছ ভালোবাসে, কেউ মাংস ভালোবাসে, কারো পাতে ঘি চাই, কারো পাতে মিষ্টি চাই,—এ সব ব্যাপারে যেন কোনো কিছু ব্যতিক্রম না হয় তার জন্যে মাকেই নিত্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক রকমের খুঁটিনাটি ব্যাপারে মায়ের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই হবে না। বাড়ির সকল বিষয়েই মা যা করবেন তাই হবে। একদিন তিনি ছুটি নিলেই গণ্ডগোল বেধে যাবে।

বৌদের সম্বন্ধেও একই কথা। তিন বৌকে তিনি তিন রকম কাজের ভার দিয়েছেন। প্রথমা অর্থাৎ রেখা-বৌকে তিনি ভার দিয়েছেন রান্নার তদারকের, কিন্তু কবে কি কি রান্না হবে তা তিনিই দেবেন বলে। দ্বিতীয়া অর্থাৎ সান্ত্বনা-বৌকে তিনি ভার দিয়েছেন ভাঁড়ার বের করার, কিন্তু কি কি জিনিস বের করতে হবে আর তেল ও ঘি কতটা লাগবে তাও তিনি বলবেন। তৃতীয়া অর্থাৎ ঝর্ণা-বৌকে ভার দিয়েছেন পান সাজবার ও সুপুরী কুচোবার, কিন্তু কতগুলো পান সাজতে হবে আর কতগুলো সুপুরী বের করতে হবে তাও তিনি বলে দেবেন। মায়ের হুকুম না নিয়ে কারো কোনো কিছুই কাজ ক… হবে না।

শুধু কি তাই! রেখা-বৌ বাপের বাড়ি যাবে, কোন্ রং-এর কোন্ কাপড়খানা পরে যাবে তাও মা দেখিয়ে দেবেন। সান্ত্বনা-বৌ বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবে, সে কি কি গহনা পরে যাবে তাও মা বের ক'রে দেবেন। ঝর্ণা-বৌ তার মাসতুতো বোনের ছেলের অন্নপ্রাশনে যাবে, সে কি গহনা পরে যাবে আর কি উপহার নিয়ে যাবে তাও তিনি ব্যবস্থা করবেন। তারপর তারা ফিরে এলে গহনাগুলি আর কাপড়গুলি যথাস্থানে তিনিই তুলে রাখবেন। প্রত্যেক বৌয়ের আলাদা আলাদা আলমারী আছে, কিন্তু চাবিগুলি আছে মায়ের কাছে। কারো কিছু জিনিস আলমারী থেকে বের করতে হলে মায়ের কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে যেতে হবে, নতুবা চাবি তারা হারিয়ে ফেলতে পারে। হারিয়ে গেছেও কয়েকবার।

শুধু কি তাই! রেখা-বৌয়ের মেয়ে সন্তু বড়ো হয়েছে, সে প্রত্যহ স্কুলে যায়, প্রত্যহ ঠিক সময়ে যাতে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির থাকে তার ব্যবস্থা মা-ই করবেন। সান্ত্বনা-বৌয়ের মেয়ে মিনু এখনো ছোটো আছে, তার জন্যে যাতে গোয়ালা বাড়িতে প্রত্যহ ঠিক সময়ে গরু এনে হাজির করে আর চাকর দাঁড়িয়ে থেকে খাঁটি দুধ দুইয়ে নেয়, তারও ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

শুধু কি তাই! চাকর-বাকরেরাও প্রত্যেকটি কাজ করবে মায়ের নির্দেশ নিয়ে। বাজার থেকে মাছ এলে তা কখানায় কেটে ভাগ করা হবে, কয়লা ফুরিয়ে গেলে, কত মণ কয়লা আনতে হবে, ঘুঁটে ফুরিয়ে গেলে কত ঘুঁটে কিনতে হবে, ভোরে উঠে কোন্ চাকরকে কোন্ দিন বাজারে যেতে হবে, কাকে রেশনের দোকানে যেতে হবে, মিষ্টির দোকানে গিয়ে কার জন্যে কি কি মিষ্টি কিনে আনতে হবে, ইত্যাদি সমস্তই তিনি বলে দেবেন। কোনো চাকরের কোনো কাজে সামান্যমাত্র ত্রুটি হবার উপায় নেই, তাহলেই তিনি ধরে ফেলবেন এবং তার জন্য প্রচুর তিরস্কার খেতে হবে।

অমন রকম সংসারের যিনি অমন রকমের কর্ণধার, তিনি হয়েছেন স্বয়ং অসুস্থ। কিন্তু অসুস্থ হলেও তাঁর কোনো কাজটাই …

থাকার উপায় নেই, তাহলে সমস্ত সংসারটা এক মুহূর্তে অচল হয়ে যাবে। অতএব তিনি সকল কষ্ট সহ্য করতে করতে সব কাজই করে যেতে থাকেন। বৌদের আলমারীগুলি গোছাতে গোছাতে যখন বড্ড কাতর হয়ে পড়েন, তখন সেখানেই একটু বসে পড়েন, মুখের ঘাম মুছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেন, আবার দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর কাজ শুরু ক'রে দেন। ছেলেরা বলে—"এবার তুমি একটু শোও মা", তখন তিনি বলেন—"হ্যাঁ, এই হাতের কাজটা সেরে নিয়ে যাচ্ছি।" কিন্তু শোয়া আর হয় না, আবার অন্য একটা হাতের কাজ এসে পড়ে। কাজের কোনো ফাঁক মেলে না।

ছেলেরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি উপায়ে মায়ের কষ্টের একটু লাঘব করা যায়! তিনি বরফের মতো ঠাণ্ডা জল খেলে একটু আরাম পান, গায়ের জ্বালাটা তখনকার মতো একটু কমে, তাই বড়ো ছেলে একটা রেফ্রিজারেটর কিনে আনলে। কিন্তু ঠাণ্ডা জলে পেট ঠাণ্ডা হলেও কি রোগের জ্বালা দূর হয়? মেজো ছেলে মাকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে একটা দামী ট্র্যানজিসটর রেডিও কিনে আনলে। কিন্তু অসুস্থ দেহে বেশীক্ষণ কি ঐ প্যানপ্যানানি শুনতে ভালো লাগে? তিনি একটু শুনেই রেডিও বন্ধ করে দেন। মায়ের শক্ত গদির উপর শুতে কষ্ট হচ্ছে দেখে ছোটো ছেলে একটা হাওয়াভরা ডানলোপিলোর প্রকাণ্ড গদি কিনে আনলে। কিন্তু তাতে শুয়ে এপাশ ওপাশ করার অসুবিধা হয়, তিনি দুদিন পরে সেটা টান মেরে ফেলে দিলেন। অস্বস্তি কিছুতেই গেল না। তিনি মুখে বিশেষ কিছু বলেন না, সংসারের সমস্ত কাজই যথারীতি ক'রে যেতে থাকেন, কিন্তু মুখ দেখলে তো বোঝা যায়, চেহারা দেখেও বোঝা যায়। মুখের ভাব সর্বদাই ক্লিষ্ট, চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মধ্যে সেই স্বাস্থ্যের প্রসন্নতা নেই। তিনি ঘোরাফেরা করছেন বটে পূর্বের মতোই, কিন্তু খুবই কাতর হয়ে। ভেঙে পড়েন নি, কিন্তু পড়বেন বলে আশংকা হচ্ছে।

চিকিৎসার দিক দিয়ে যে অবহেলা করা হয়েছে তাও নয়। প্রথমে ডাক্তারী ওষুধ কয়েক রকম দেওয়া হয়েছিল। ব্যথা কমানোর ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার ওষুধ, নানা রকম দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনটাতেই কিছু ফল হয়নি। কেউ কেউ বলেছিল কবিরাজী চিকিৎসা করিয়ে দেখ। কিন্তু তিনি কটু কষায় তেতো কোন ওষুধই খেতে পারবেন না, খেলেই বমি করে ফেলবেন। কাজেই সে দিক দিয়ে কিছু করা হয়নি। ডাক্তারী চিকিৎসার সুবিধা এই যে, তাতে নানা রকম ট্যাবলেট দিয়েই কাজ চালানো যায়, কিন্তু কবিরাজীতে তা হবে না। অতএব কিছু দিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হলো। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। অবশেষে টোটকা-টুটকি এবং ঝাড়-ফুঁক ও দৈব ওষুধেরও নানারূপ ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হতে দেখা গেল না।

বলা বাহুল্য প্রথম প্রথম এ ব্যাপারটা তেমন সিরিয়াসলী নেওয়া হয়নি। উপরওয়ালার আবার অসুখ কিসের! ও'কে কোন দিন অসুস্থ হতে দেখা যায়নি, এক দিনের জন্যেও বিছানায় শুতে দেখা যায়নি। উনিই বরাবর সকলের সেবা করেছেন, ও'র সেবা কাউকে করতে হয়নি। কাজেই সকলে ভেবেছিল যে এটা ওটা করতে করতে নিশ্চয় সেরে যাবে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, কিছুতেই সারছে না বা কমছে না, তখন সকলে বেশী রকম চিন্তিত হয়ে পড়ল। ছেলেদের খেলা দেখা, ফাংশনে যাওয়া, গান-বাজনা করা সব বন্ধ হয়ে গেল। বৌদের বাপের বাড়ি যাওয়া, সিনেমাতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন, মায়ের জন্য চিন্তাগ্রস্ত। পরস্পরে পরামর্শ করেত লাগল, কি করা যায়। বড়ো বৌ পরামর্শ করে মেজো দেওরের সঙ্গে, মেজ বৌ পরামর্শ করে ছোট দেওরের সঙ্গে। ছোট বৌ দুই ভাইয়ের মেয়ে দুটিকে আগলায়, পাশের ঘরে তাদের নিয়ে গিয়ে থামিয়ে রাখে, বলে—"চুপ চুপ, চেঁচিও না, ঠাকুমার শরীর ভালো নেই।" বৌদের কাজও অনেক বেড়ে গেল। তারা পালা ক'রে মায়ের কাছে বসে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, গরম জলের ব্যাগ ধরে থাকে, রাত্রি জেগে তাঁর কাছে বসে, সেবা করতে থাকে। চাকর-বাকরেরা কেউ কোনো কথা বলে না, নিঃশব্দে তাদের কাজ করে দেয়। বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল।

এই অবস্থাতে আমার উপর তাঁর চিকিৎসার ভার দেওয়া হলো। ছেলেরা বললে, আপনি যা করতে হয় করুন যাকে ডাকতে হয় ডাকুন।

বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞদের ডাকা হলো। একজন বললেন, পিঠের শিরদাঁড়ার হাড়ের কিছু দোষ হয়ে থাকতে পারে, তাই এই ব্যথা, এক্স-রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হোক। কিন্তু সে পরীক্ষায় কোন দোষ পাওয়া গেল না। একজন বললেন, ভিটামিনের অভাবে এমন হতে পারে, খুব চড়া মাত্রায় ভিটামিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হোক। তাও দেওয়া হলো, তাতেও কিছু ইতরবিশেষ ঘটল না। একজন বললেন, নার্ভের দোষ হচ্ছে, কিন্তু সে দিক দিয়ে চিকিৎসাতেও কিছু ফল হলো না। একজন বললেন, সুষুম্নাক্রিয়ার গ্রন্থিগুলির আভ্যন্তরীণ রসের অভাবে এমন হচ্ছে, বাঁদরের গ্রন্থির আভ্যন্তরীণ রস প্রয়োগ করা হোক। তাও হলো, কিন্তু রোগের কষ্ট তেমনই রয়ে গেল।

শেষে একজন বললেন, ডায়েবিটিসে এমন হতে পারে। রক্তের মধ্যে চিনির পরিমাণ কত সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হোক। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, তাই বটে, রক্তের মধ্যে চিনি আছে স্বাভাবিক অপেক্ষা তিনগুণ বেশী।

ডায়েবিটিস থেকে এমন মারাত্মক অবস্থা হয়েছে? অথচ তার কোন রকম লক্ষণই দেখা যায়নি, ঐ ব্যথা আর জ্বালা ভিন্ন। যাই হোক, যখন রোগ ধরা পড়ে গেছে, তখন আর চিন্তা কি? দুই বেলা ইনসুলিন ইনজেকশন করা শুরু হলো। আমাকে দুই বেলাই যেতে হতো।

ইনসুলিন ইনজেকশন চলল প্রায় এক মাস দেড় মাস। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, রক্তের চিনির মাত্রা তাতে কিছু পরিমাণে কমল বটে, কিন্তু কষ্টগুলি কিছুই কমল না, যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল।

তখন খাদ্যের দিকে আমি নজর দিলাম। ইনসুলিন ইনজেকশনের ফল আশানুরূপ না হওয়াতে আমার খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধেই সন্দেহ হচ্ছিল।

মোটের উপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, উনি চিনি খাবেন না, ভাত খাবেন না, আলু খাবেন না। ছানা বেশী খাবেন, আটার সঙ্গে ছানা মিশিয়ে তার রুটি খাবেন। মিষ্ট দ্রব্য মাত্রই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। চিনির বদলে স্যাকারিন খেতে হবে।

উনি সকালে ঠাকুর পুজো সেরে একটু জলখাবার এবং চা খান। রেখা-বৌ-এর হাতে এই জলখাবারের ব্যবস্থার ভার। তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, জলখাবার দেওয়া হবে ছানা, আর চায়ের সঙ্গে দেওয়া হবে চিনির বদলে কেবল স্যাকারিন। কিন্তু রেখা বৌ-এর কাছে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, একটু মিষ্টি না হলে তিনি কোন জলখাবার খেতে পারেন না বলে তাঁকে ছোট ছোট কয়েকটি গুঁজিয়া সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আর শুধু স্যাকারিন দিলে চা তিতো লাগে বলে ওর সঙ্গে আধ চামচ করে চিনি মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেখা-বৌকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হলো। সে বললে আচ্ছা, এও বন্ধ করে দেব।

এই প্রথমা রেখা-বৌটি বুদ্ধিমতী, তাকে বেশী বোঝাতে হয় না, সে অল্পেই বুঝে নিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়া সান্ত্বনা-বৌ একটু অন্য-প্রকার। তার বুদ্ধিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সরল। যখন বোঝে না তখন কিছুই বোঝে না, আর যখন বোঝে তখন একটু বেশী বোঝে। তার হাতে ভার মায়ের দুপুর বেলাকার খাবার তদারকের, সে ঐ সময়ে হাজির থাকে। সেই সময়ে একদিন উপস্থিত হয়ে দেখলাম পাতে একটু মধু দেওয়া হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এ কি, মধু কেন?"

সান্ত্বনা-বৌ বললে—"কেন, মধু তো চিনি নয়। শুধু শুধু ছানাটা একটু মিষ্টি না হলে খাওয়া যায় না, তাই চিনির বদলে মধু দিয়েছি।"

আমি বললাম—"মধুতে খুব বেশী চিনি থাকে, নইলে অত মিষ্টি হয় কেন? তাও কি বলে দিতে হবে?"

সান্ত্বনা-বৌ একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে—"মধু তো ফুল থেকে হয়। ফুলে কেমন ক'রে চিনি থাকবে?"

আমি বললাম—"মধুও চিনির ঘন নির্যাস, মৌমাছিরা তাই ফুল থেকে সংগ্রহ করে।"

সান্ত্বনা-বৌ একটু হেসে বললে—"ও বুঝেছি, তাই বুঝি ফুলের গন্ধ অত মিষ্টি হয়?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, তাই। তুমি ও'কে আর মধু দিও না।"

তার পরের দিন গিয়ে শুনলাম, তার বাপের বাড়ি থেকে এক রাশ বেলফুল আর যুঁইফুল এসেছিল, সে ঐ ফুল মায়ের ঘরে মোটে ঢুকতে দেয়নি, তখনই ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে যে, এই মিষ্টি গন্ধ মায়ের নাকে যাওয়াই উচিত নয় ওর মধ্যে চিনি আছে। মিষ্টি গন্ধ নাকে গেলে অর্ধেক চিনি খাওয়ার কাজ হবে।

তৃতীয়া ঝর্ণা-বৌ শিক্ষিতা, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্বের সময় সে তার বাপের বাড়িতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল যে বেশী মিষ্টি যেন কিছু পাঠানো না হয়, কারণ মায়ের ডায়েবিটিস। তার বাপের বাড়ি থেকে তাই এসেছিল কম মিষ্টি সন্দেশ ও গজা এবং ল্যাংড়া আম। তার হাতে মায়ের রাত্রের খাবারের ভার। তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করায় জানা গেল যে, লুকিয়ে লুকিয়ে সে মাকে তত্ত্বের খাবার

কিছু কিছু দিয়েছিল। সে বললে—"পুরোপুরি-ভাবে আমি খেতে দিইনি। কেবল চেখে দেখতে দিয়েছিলাম। সামান্যই উনি খেয়েছিলেন। তাও এখন ফুরিয়ে গেছে।"

যাই হোক, চারিদিক থেকে কড়া নজর রেখে আমি মিষ্টি খাওয়া যথাসম্ভব বন্ধ করে দিলাম। একেবারে বন্ধ করতে সফল হয়েছিলাম এমন কথা বলতে পারি না।

অতঃপর দেখা গেল যে, রক্তে চিনির পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। কিন্তু চিনি কমে গেলে কি হবে যা আসল কষ্ট অর্থাৎ গায়ের ব্যথা ও জ্বালা, তা বিশেষ কিছু কমতে দেখা গেল না। চিনি প্রভৃতি খাওয়া বন্ধ ক'রে এবং দুবেলা ইনসুলিন ফ'ড়েও তিনি সমানেই যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। তখন আমাদের চিকিৎসার উপর তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। রক্ত পরীক্ষার সুফল নিয়ে কি হবে, যদি কষ্ট তার না সারে।

তখন সকলে মিলে পরামর্শ করা গেল, উনি বাইরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গাতে গিয়ে কিছুকাল হাওয়া বদল ক'রে আসুন। তাতে যদি কিছু উপকার হয়।

বিহারে সিংভূম জেলার এক নিরিবিলি পার্বত্য জায়গাতে বাড়ি পাওয়া গেল। মাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেল মেজো ছেলে ও মেজো বৌ। বড়ো ছেলে ও রেখা-বৌ তাদের মেয়েকে নিয়ে রইল কলকাতার বাড়িতে। ঝর্ণা-বৌ গেল তার বাপের বাড়িতে।

সেখানে পৌঁছেই মা কয়েক দিন পরে বড়ো ছেলেকে চিঠি দিলেন,—ওখানে গিয়েই তাঁর ব্যথা ও জ্বালা সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে। শরীর খুব সুস্থ বোধ করছেন, কোন অসুখ নেই। তিনি প্রত্যহ দুবেলা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুব খিদে হচ্ছে। অতএব তিনি সেখানে ভাত মিষ্টি নতুন গুড় প্রভৃতি সব কিছুই খাচ্ছেন। এই সকল জিনিস খাওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যথা বা জ্বালা কিছুমাত্র দেখা দেয় নি। অতএব ডায়াবিটিস কথাটাই বাজে, তার জন্যে এ রোগ হয় নি।

বড়ো ছেলে সেই চিঠি পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে তার জবাবে লিখলে যে,—মা তুমি যদি তোমার সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে থাকো এবং তোমার এই সংসারের ভার যদি বৌদের হাতে তুলে দিতে চাও তাহলে যত খুশি মিষ্টি খাও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। নতুবা বন্ধ করো।

মা তার জবাবে পুনরায় লিখলেন,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমার সংসার আমিই রক্ষা করবো, কারো হাতেই তার দেবার দরকার হবে না, কারণ আমি এখনও অনেক কাল বাঁচব।

কিছুকাল পশ্চিমে কাটিয়ে আবার তিনি কলকাতায় ফিরলেন। তখন রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, রক্তের চিনির মাত্রা ঠিক আগের মতো না হলেও অনেকটাই বেড়েছে। এবং সেই ব্যথা প্রভৃতি আবার মাঝে মাঝে জানান দিচ্ছে।

এবার তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। যদি আবার সেই রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়। রেখা-বৌ বললে, মা আপনি ভাত খাওয়াটা ছাড়ুন। সান্ত্বনা-বৌ বললে, মা আপনি আর খাবেন না। ঝর্ণা-বৌ বললে, আলুও নয়।

তখন বাধ্য হয়ে আবার তিনি ডায়েবি বাঁধা খাদ্য খেতে শুরু করলেন। সেই ইনসুলিন চিকিৎসাও চলতে থাকল। বিশেষ ভয় পাওয়াতেই এটি হলো। এক হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যথা ধরল। অনেক কষ্টে ব্যথা থামানো গেল। তখন তিনি বুঝলেন ডায়েবিটিস অবহেলা করবার জিনিস সতর্কতা অবলম্বন করে থাকতেই হবে। খুশি খাওয়া চলবে না।

কিন্তু আশানুরূপ সুফল কিছু পাওয়া যায় না। রক্তে চিনির পরিমাণ খানি পর্যন্ত নেমে তার পর আর নামে না। বি আমরা যে তাই চাই।

তখন আবার অনুসন্ধান শুরু করলাম, কারণ আবিষ্কার করতে।

শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেল যে, অপরিবর্তনীয় কারণ আছে দুটি। এক কা হলো ঠাকুর ঘরের ঠাকুর, দ্বিতীয় কারণ ছে নাতনী মিনু ওরফে কাবেরী দেখতে যে ফুটফুটে, হাসিও তেমনি লুটোপুটি। সকলে তার বশ।

ঠাকুর ঘরে প্রতি রবিবারে অন্নভোগ দেও হয়। ঠাকুরের প্রসাদ তাঁকে প্রতি রবিবা খেতেই হবে, নতুবা সংসারের অমঙ্গল হবে সুতরাং এটা অকাট্য।
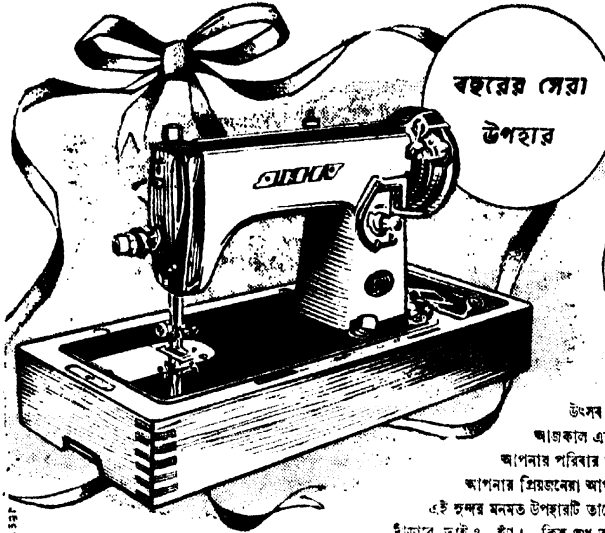
আর ঐ ছোট নাতনী তার ঠাকুমার সঙ্গে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

শীতের দেরী নেই আর। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাসে আসন্ন শীতের ইসারা।

সময় নেই অসময় নেই যখন তখন একেক ধরণের বর্ষণ চলেছে, আশ্বিনের শেষে। মন-মেজাজ বিগড়ে দেওয়া বৃষ্টির বিরাম নেই। থেমেও যেন থামতে চায় না। সারা দিনের প্রোগ্রাম ওলট পালট হয়ে যায়। ছক-বাঁধা রুটিন ভেস্তে যায়। কাজে মন লাগে না। অলস লাগে কেমন। বিষণ্ণ আকাশে জলভরা মেঘের কালিমা। খণ্ড খণ্ড মেঘ, থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ধারা-বর্ষণের পর কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অকালের বৃষ্টি। একেবারে অপ্রত্যাশিত। থমথমে আকাশ, শুধুই নিরাশা ছড়িয়ে দেয় দিগ্বিদিকে। শীত শীত হাওয়া, হতাশা ব'য়ে আনে। ঝিরঝির বৃষ্টি থেকে নিরুৎসাহ আর আলস্য ভেসে আসে। সংক্রামক ব্যাধি যেন এক, কাকেও রেহাই দেয় না। ধনী আর দরিদ্রের পার্থক্য বিচার করে না। প্রাকৃতিক আবহাওয়া নাকি এমনই গণতান্ত্রিক।

গাড়ী চালাতে মন চাইছে না।

হাল-আমলের আমেরিকান মোটর। বৃহৎ বপু। প্লিমাউত্ না পনটিয়াক কে জানে। হালকা রঙ শুভ্র-নীল। দেখলেই চোখ ঝলসে ওঠে না। বরং তৃপ্তি দেয় চোখে। ছিমছাম গঠন হ'লে কি হবে, আকৃতি বিরাট। মোটরের পিছুতে লক লক করছে ক্রোমিয়ামের ছুঁচালো ছড়ি। আকাশ-প্রদীপ যেন। রেডিওর এরিয়েল।

ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাড়ী চালাতে ভাল লাগে না যেন আর। বৃষ্টি-ভেজা এ্যাস-ফল্টের রাস্তা। চক্রযানের পক্ষে না কি বিপদজনক। চাকা হঠাৎ পিছলে যাওয়ার ভয়ে নিখিলেশ গাড়ী চালিয়ে চলেছে ধীর গতিতে।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রত্যহ সকালে গুঁজিয়া সন্দেশ খায়। ঠাকুমার সংগে না খেলে তার খাওয়া হয় না। সুতরাং তার জন্যই প্রত্যহ ঐটি তাঁকে খেতে হয়। নইলে যে তার মুখভার হয়। সুতরাং এটাও অকাট্য। তবে আর উপায় কি আছে। এখানে কোন ডাক্তারী নিষেধ খাটে না।

অগত্যা আমি হাল ছেড়ে দিলাম। সব চেয়ে ছোট মেয়েটি ঐ কাবেরীর কাছে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

ঢিমে-তেতালায়। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে গাড়ীর কাঁচে। চোখের দৃষ্টিকে ব্যাহত করতে চায়। কিন্তু মুছে যায় সংগে সংগে। ওয়াইপার চলেছে এক জোড়া। ঘড়ির কাঁটা যেন দুটো। দেওয়াল-ঘড়ির মত ওয়াইপার চলছে সশব্দে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

সে অপেক্ষা করছে কতক্ষণ, কে জানে। আছে হয়তো একা একা, অধীর আগ্রহে।

তবুও একটু জোরে গাড়ী চালাতে, একটু স্পীড্ তুলতে সাধ হয় না নিখিলেশের। সামান্য কিঞ্চিৎ পদপীড়নেই গাড়ী এখনই দ্রুততম ছুটতে পারে, কিন্তু নিখিলেশ যেন আজ নির্বিকার। মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝড়ের মত একটা দমকা বাতাসের তুফান ছুটে এসে আঘাত করছে গাড়ীর আশেপাশে। গাড়ীর ভিতরে থেকেও জোরালো হাওয়ার ধাক্কা অনুভব করে নিখিলেশ। প্রতিকূল বাধা মোটরের গতি যেন থামিয়ে দিতে চায় বার বার।

রাত্রে বিনিদ্রা। একটানা ঘুম হয় না নির্বিঘ্নে। ঘুমাতে পারে না নিখিলেশ। গত কয়েক মাস ধরে এই অনিদ্রা দেখা দিয়েছে। মাত্র কিছুক্ষণের পাতলা ঘুমের পর হঠাৎ উঠে পড়ে নিখিলেশ। জেগে ওঠে মধ্য রাতে ঠিক, যখন সারা কলকাতা হয়তো নিদ্রামগ্ন থাকে।

আকাশ ফর্সা হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে না। নিখিলেশের চোখের সমুখে কালো আকাশ ধীরে ধীরে সাদা হ'তে থাকে। তন্দ্রালু চাউনিতে নিখিলেশ প্রায় প্রত্যহ দেখতে পায়, টাটকা লাল সূর্য। মাথা তুলছে পূব দিগন্তে।

মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলেই আতঙ্ক এসে গ্রাস করতে থাকে নিখিলেশকে। অস্বস্তি বোধ করে মানসিক। অনেক চেষ্টাতেও পলকের জন্য ঘুম আসে না তখন আর। আতঙ্ক না সন্ত্রাস ঠিক ধরতে পারে না নিখিলেশ। প্রথমে তার মস্তিষ্কে, তারপর শরীরের শিরা উপশিরায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অজানা এক ভয়ের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকতে হয় যেন। কত রকমের দামী দামী ওষুধ খেয়েছে নিখিলেশ। ব্যর্থ হয়েছে সবই। টাকা গেছে মুঠো মুঠো, অকারণ অপব্যয়ে। ওষুধ ঘুম আনতে পারে শোনা যায়। অথচ নিখিলেশকে ঘুম পাড়াতে পারে না।

সে হয়তো এখনও প্রতীক্ষায় ব'সে আছে, পথ চেয়ে।

কবে যে মুক্তি পাওয়া যাবে এই সব থেকে, ভাবতে ভাবতে গাড়ী চালিয়ে চলেছে নিখিলেশ। মোটরের গতি এখন মাঝামাঝি; জোরেও নয়, ধীরেও নয়। আজ এখন এই মুহূর্তে, রাত্রির বিনিদ্রায় যেমন অসহ্য অস্বস্তি আসে, মন যেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে অজানা আশংকায়, তেমনি ঠিক বিরক্তিকর অনুভূতি আবার যেন ফিরে এসেছে বর্ষার এই অলস অপরাহ্নে। বিরামবিহীন বৈচিত্র্যতায় বৈকালিক সূর্যাস্ত আজ আর চোখে পড়ে না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের শেষে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলছে। কোথায় সার্চ লাইট জ্বলছে আর নিভে যাচ্ছে যেন।

মনে মনে আওড়াতে থাকে ঐ একটা কথা। কবে যে মুক্তি মিলবে! আরও কত দিনে যে মুক্তি পাবে সে! মধ্যে মধ্যে নিখিলেশের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, ভীষণ চিৎকার করে উঠবে। এর ফল যে কি হবে তা জানতে চায় না। চিৎকার করতে চায় গলা ফাটিয়ে। কণ্ঠ সপ্তমে উঠিয়ে।

পেছনে অন্য মোটর, ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে চলেছে, খেয়ালই নেই নিখিলেশের। হয় গাড়ীর স্পীড তুলতে হয়, নয়তো পেছনের গাড়ীকে আগে যাওয়ার পাশ দিতে হয়। নিখিলেশের গাড়ী যেন চলতে চলতে থেমে যায় আজ। কেন কে জানে, যা কিছু সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, আজ যেন নিখিলেশের কাছে তারা অসামান্যরূপে দেখা দেয় একে একে। রাস্তার দুই পাশে সেই একই,—হোটেল; পোষাকের শো-কেশ; বই আর কাগজের ষ্টল; ফার্মেসী (দিবা রাত্রি খোলা থাকে); আসবাবের দোকান; সেলুন। আজ আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে নিখিলেশ।

মুক্তি চাইছে সে। কিন্তু কি থেকে মুক্তি চায়, নিখিলেশ নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। মোটরের এক রত্তি আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখা যায় আপন মুখের। নিখিলেশ দেখলো, তার মুখে যেন ছাপ পড়েছে অসংযত জীবনের। অন্যায় কৃতকর্মের কালিমা যেন। আজ কেন কে জানে, নিখিলেশ তার অতীত দিনগুলি খতিয়ে নিতে চায়। যা চেয়েছে তাই পেয়েছে নিখিলেশ। বরং চাওয়ার অধিক পাওয়া গেছে। যা চায় না, তাও হয়ত পেয়েছে।

নিখিলেশ ভাবছে, অর্থ, সম্পদের কি অভাব আছে তার? বিত্ত আর বৈভব সে কি আইনসংগত উপায়ে, উন্নত রুচির সংগে সদ্ব্যবহার করেনি!

টিপের পাড় গোলাপী জমির। বিদেশী মসৃণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশ।

সেই শাড়ীখানা পরে এসেছে আজ সে। ফিকে নীল রঙের রেশমী একখানা। নিখিলেশেরই দেওয়া। গত পূজোর উপহার দিয়েছিল। সাদা সুতোর কাজের ডিজাইন শাড়ীতে। মুঠো মুঠো তারা ফুটে।

নীলাভ অঞ্চলে ঢাকা মাথায় এলিয়ে পড়েছে সে। কি একখানা সাময়িক পত্রের পাতা উলটে উলটে দেখছিল, সময় কাটাতে। নিখিলেশকে দেখেই সে পত্রিকা সরিয়ে রাখে একপাশে। পাখার বাতাসে মলাট উড়তে থাকে। [illegible] ঘরে এসে প্রথমে দেখতেই দেখে নিয়েছে নিখিলেশ। মুখে প্রসাধনী প্রলেপের সুষমা। চোখের কোণ প্রান্তে সূক্ষ্ম সুর্মা-রেখা। কপালে মৃদু চুলের কুন্তলিকা উড়ছে। খোঁপাটে বাঁধা কবরী। কি পাৎলা অল্প [illegible] আবরণের জামা পরনে! ধবধবে ফর্সা পেট আর পিঠ দেখতে পায় নিখিলেশ। নিরাবরণ কায়া। জলের বুকে ভাসমান বয়ার মত মেদভারী নিতম্ব। নীল শাড়ীতে ঢাকা।

পায়ে স্লিপার গলিয়ে নিখিলেশ খাটের এক প্রান্তে বসে পড়লো। কেস আর লাইটার বের করলো পকেট থেকে। চাঁপাফুল, ইভনিং ইন প্যারিস—দুই সুগন্ধে মিশলো দামী সিগারেটের সুবাস।

একটিও কথা বলছে না আজ নিখিলেশ। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেছে। ধোঁয়া ছাড়ছে মৃদু মৃদু, নির্বাক গাম্ভীর্যে।

ঘরের মাঝে নীরবতা। পাখা ঘুরছে মন্থর গতিতে।

—বাইরে কি এখনও বৃষ্টি হচ্ছে? কোমল কণ্ঠে শুধোয় সে। হঠাৎ যেন লক্ষ্য করে নিখিলেশের মুখাকৃতি। কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। তাকিয়ে আছে এক দিকেই, পলকহীন চোখে। মুখে ফুটেছে কাঠিন্য যেন।

—হাঁ, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। নিখিলেশ উত্তর দেয় ভারী গলায়। আবার নীরবতা ফিরে আসে ঘরে।

—দেরী করলে কেন এত? আবার জিজ্ঞেস করে সে। আন্তরিকতার সুরে।

—দেরী হয়ে গেল। নির্বিকার বললে নিখিলেশ।

—আমি কিন্তু তোমার কথামত ঠিক ছ'টার মধ্যে এসেছি।

—অনেক ধন্যবাদ।

—বাড়ীর খবর ভাল তো তোমার?

—হাঁ।

—[illegible] আর [illegible] জন্যে খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে, নয়? ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—তা ঠিক নয়।

—চা খাও।

—না, থাক।

—বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে, খাও না এক পেয়ালা চা। ঢেলে দিই আমি।

—উঁহু। না।

পর পর অনেকগুলি প্রশ্নের এমন টুকরো টুকরো জবাব পেয়ে সে যেন বিছানায় পিছলে এগিয়ে যায় নিখিলেশের পাশে। মুখের কাছে মুখ এগিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলে,—কি হয়েছে গো আজ তোমার?

তার [illegible] মুখে এই প্রথম আশঙ্কার ছায়া ঘনালো। সে যেন একেবারে ভড়কে গেল, নিখিলেশের মুখ দেখে। চোখের দৃষ্টি কঠোর। নিষ্ঠুর [illegible]।

অনেক দিন থেকে নিখিলেশ এখন তার [illegible] দেখতে পায়। কি [illegible] ঐ মুখে [illegible] যেন উদ্দাম মুখে [illegible] দিনের সুখ, উপভোগ করতে পারে না নিখিলেশ। মনের অবস্থা [illegible] তার সেই [illegible] দেখতে [illegible]।

পরনের শাড়ীখানা চিনতে পারে না নিখিলেশ। নিজের দেওয়া উপহার ভুলে গেছে। শাড়ীর [illegible] আঁচল হতে তুলে নেয় নিখিলেশ। [illegible] মুঠোয় [illegible] থাকে রেশমী শাড়ীর [illegible] চোখের চাউনি থমকে আছে শেষ [illegible]।

সে ভাবলো, নিখিলেশ হয়তো চায় না শাড়ীর আবরণ। আবরণ থেকে মুক্ত দেখতে চায় তাকে। [illegible] তার শুধু মাত্র দেহ-সম্ভার। [illegible] আবরণ নয়, দেখতে চায় সে [illegible]।

এই ভাবনায় [illegible] আঁচল বুক থেকে সরিয়ে দেয় সে। নিখিলেশকে তার কষ্ট করতে হবে না। [illegible] আলগা করলো সে। যদি চোখ ফেরায় নিখিলেশ। [illegible] নিখিলেশের নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা [illegible] পাওয়ার উগ্র লোভে। এখন এই [illegible] ছাড়া আর কিছু চাইছে না নিখিলেশ। [illegible] বলতে পারছে না লৌকিক ভদ্রতার খাতিরে।

সে আবার এলিয়ে পড়েছে, একটা বালিশ বুকের কাছে টেনে নিয়ে। তার সুন্দর মুখে সেই প্রতীক্ষা দেখতে পায় নিখিলেশ, ঘরে এসেই যা তার প্রথম চোখে পড়ে।

নিখিলেশ একটিও কথা বলছে না। তার কাছাকাছি উঠে বসলো। হাত রাখলো, তার নগ্ন কটিতে। হাতের আলতো স্পর্শ। নিখিলেশ চোখ ফেরায় না কিন্তু, একবারও নয়। ফিরেও দেখছে না এমন রূপ বৈচিত্র্য। যৌবনের জোয়ার। নিখিলেশ ভাবছে যেন অন্য কথা। অন্য কিছু [illegible]। চিত্ত-বৈকল্য দেখা যায় না কেন [illegible]।

তার কুঞ্চিত কেশদামে হাত দেয় নিখিলেশ। [illegible] করা মৃদু খোঁপায়। ফর্সা কপালে। [illegible], বুকে, হাত নেমে আসে ধীরে ধীরে। হাতের পরশে যেন নিখিলেশ অনুভব করে, তার বুকে উত্তেজনার চাঞ্চল্য। বুক তার কাঁপছে দুরু দুরু। অজানা আবেগে। যেন এক হিমঠাণ্ডা মৃতদেহ, অন্ততঃ নিখিলেশের তাই মনে হয়। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণীকে আজ হঠাৎ মরা মমির মত ঠেকছে। সাড়চেতনা-হীন ফসিল যেন। প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন।

প্রেম আসছে না আজ আর নিখিলেশের উদ্ভ্রান্ত মনে।

মেয়েটি তাকিয়ে আছে এখনও, অধীর আগ্রহ আর উদ্বেগে। তার চোখে জিজ্ঞাসা থমথম করছে। সে চাইছে নিখিলেশের মনের বর্তমান অনুভূতি জানতে। মানুষের মন যদি পড়তে পারতো মানুষ! একজনের নিষ্পৃহতায় মেয়েটি যেন অন্ধকার দেখছে চোখে। অনেক কিছু হারানোর আতঙ্ক। এমন কি নিখিলেশকেও।

মেয়েটির করুণ চাউনিতে আরও প্রতীক্ষার কণ্ঠকাতরতা। তার এই ব্যাকুল নয়নবাণে নিখিলেশের নিরাসক্তি অনাহতই থাকে। এখনও একটি বার চোখ ফিরিয়ে সে দেখলো না অঙ্গ-শোভা। মেয়েটির অনুপম মুখশ্রী। কত রূপ তার।

এক রোগিণী যেন শুয়ে আছে হাসপাতালের শয্যায় অপারেশন থিয়েটারে। নিখিলেশকে দেখায় যেন ডাক্তার। আশা ছেড়ে, হাল ছেড়ে বসে আছে। মেয়েটির বক্ষস্পন্দন গুণছে নিখিলেশ। পালস্ বিট্। চলতে চলতে কখন হয়তো আর চলবে না।

দৈহিক আবেদনে সাড়া মেলে না। রূপ-প্রদর্শনীতে নজর নেই।

পোষা কুকুরটাকে মনে পড়ে নিখিলেশের। মনে পড়ে, ক্ষুধা মিটিয়ে কুকুর কেমন মুখ ফিরিয়ে নেয় তার খাদ্য থেকে। [illegible] চায় না আর। হাজার রকমের খা[illegible] ও মুখরোচক, তবুও রুচবে না। নিখি[illegible] আপন মনে কথা বলে। বিড় বিড় বকতে থা[illegible]। বলে,—কুকুরটা আর খেতে চাইছে না। প্রচুর খেয়েছে যে।

—কোন্ কুকুরটা! প্রশ্ন করে সে উগ্র আগ্রহে। নির্লজ্জ বেহায়াপনায় একটুকু কুণ্ঠিত হয় না সে। বলে,—কুকুরটা কি খেয়েছে?

উত্তর পাওয়া যায় না। নিখিলেশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ঘন ঘন। উত্তপ্ত শ্বাস ফেলছে যেন।

মেয়েটি সোহাগসিক্ত সুরে আবার বলে,—আজ তোমার কি হয়েছে গো? কি ব্যাপার বলতে পারো?

নিরুত্তর নিখিলেশ। দেখছে তাকে, তির্যক চোখে। দেহের আভ্যন্তরীণ কষ্ট যত তীব্র হয় নিখিলেশের চোখের চাউনি তত বেশী ধারালো হয়ে ওঠে। তার চলমান দৃষ্টি, মেয়েটির বুকে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। একখানি কোমলশুভ্র হাতে নিজের বক্ষ যেন ঢেকে রেখেছে মেয়েটি। চাঁপার কলির মত এক আঙুলে একটি লাল চুনী বসানো সোনার আংটি। এক বিন্দু টাটকা রক্ত যেন ঐ রত্নটি। ডিম্বাকৃতি লাল চুনী।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আংটি লক্ষ্য করতে থাকে নিখিলেশ। দেখতে থাকে তার প্রায় নগ্ন ঊর্ধ্বদেহ। পাৎলা জামার টিপকলের বোতাম খুলে গেছে। যৌবনগর্ব উঁকি দেয় মোহনীয় রূপে। নিখিলেশের অবচেতন মনে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার জটলা লেগেছে যেন। অখুশী আর বিনিদ্রায় সঞ্চিত হয়েছে তিলে তিলে। হঠাৎ যেন ফেটে উঠলো নিখিলেশ, তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। জোরালো সুরে কথা বললে সে। মেয়েটির হাতের আংটি দেখিয়ে বললে,—কোথা থেকে এলো এই আংটি? কে দিয়েছে কে?

বিস্ময়বিহ্বলতা মেয়েটির আনত চোখে। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বললে,—তোমার মনে এখন অন্য চিন্তা। এই আংটি তুমি তো দেখছো কতদিন। মনে নেই তোমার, আগেও বলেছি। এটা আমার বিয়ের আংটি। উনি দিয়েছিলেন আমাকে। ফুলশয্যার রাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

আবার ফিরে আসে নৈঃশব্দ্য। দুজনের নীরবতা। বুকে একটা কেমন অব্যক্ত কষ্ট হয় যেন নিখিলেশের। অনিদ্রায় জ্বালা ধরে চোখে। এই কষ্ট-জ্বালায় সে যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। অন্যের সুখশান্তিতে হিংসা হয় তার। সুস্থ সবলের প্রতি মাৎসর্য আসে।

চার চোখের বিনিময় হয় একবার। মেয়েটি

[illegible] আন্তরিক চোখ নামিয়ে নেয় নিজের বুকে।

[illegible] নিখিলেশ। উঁচু লম্বা [illegible]। কথা বলছে হঠাৎ [illegible]। নিখিলেশের কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর। হঠাৎ [illegible]—লজ্জা করছে না তোমার? [illegible] এমন বেহায়ার মত [illegible] না বিবাহিতা! মনে পড়ে না, তোমার [illegible] আছে একটা?

[illegible] উদয় হয়েছে বলেও [illegible] না মেয়েটি। অনুমান, [illegible] উঠে বসলো সে। [illegible] খোলাখুলি বলতে বলতে [illegible]—কি বলতে চাইছো তুমি? কথাটা স্পষ্ট [illegible] হয়।

নিজেকে যেন সংযত করতে পারে না নিখিলেশ। [illegible] মাথাটায় ঝাঁকনি দেয় সজোরে। মেয়েটির কথার জবাব দেয় না কিছু। [illegible] সুরে আবার বললে,—লজ্জা করে না? ভেবে দেখো না, তোমার স্বামী আর ছেলে যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে পায় আমার বিছানায়, তারা কি মনে করবে? দেখতে পায় যদি তোমাকে [illegible]? যদি [illegible] সেই চরম সময়, যখন তোমার মুখখানা ভীষণ এক আবেগে লাল হয়ে উঠেছে? যদি তারা শুনতে পায় তোমার মুখের কথা? আমাকে যা যা বলো [illegible]?

অসংখ্য [illegible] শুনে শুনে মেয়েটি যেন কথা হারিয়ে ফেলে। [illegible] বলতেই তার বুকের [illegible] খোঁপা [illegible] হয়ে যায়। [illegible] আর পিঠে লুটিয়ে পড়ে। নিখিলেশের [illegible] ধরে তার দৃষ্টি ফেরাতে চায়। কেমন এক [illegible] সুরে বললে,—কি হয়েছে আজ তোমার? কেন তুমি আজ আমাকে এই সব কথা বলছো?

মেয়েটির আঁখিযুগল ছলছলিয়ে ওঠে। দুঃখ আর অপমানে চোখ ছলছল।

নিখিলেশ নিজেকে যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে। অনাসক্তির [illegible] বজায় রেখেছে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—আমি কেন আর কি বলতে চাই, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো।

হতবাক্ হয়ে খানিক থাকলো মেয়েটি। নিখিলেশকে যেন জানতে চায় সে। কি তার অভিরুচি! কি তার অভিসন্ধি। কি বক্তব্য। তারপর প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললে,—কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি। তোমার কি কোন কারণে ধারণা হয়েছে যে আমি তোমাকে ভালবাসি না?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি তোমাকে ভালবাসি না।

বলতে চায় নিখিলেশ, ঠিক এই কথাগুলি। বলতে গিয়ে যেন থেমে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। একটা তাজা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করে দেয়। তার ছায়া পড়ে দেওয়ালে। চলন্ত ছায়া। [illegible] একেকবার দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে যেন।

তখন মেয়েটি তার [illegible] চাইতে সচেষ্ট হয়। [illegible] একটা একটা। [illegible] এলোমেলো চুলের খোঁপা [illegible] বাঁধে।

হঠাৎ [illegible] নিখিলেশ। [illegible] এক [illegible]। নিখিলেশ [illegible], [illegible] দুই [illegible] আর সংশয়। [illegible] জানতে না তুমি, জানলে না আমি কি ও কে। আমার ভেতরে কি আছে, তাও জানলে না। অথচ না জেনেই তুমি আমাকে অফুরন্ত ভালবাসলে? হাসি পায় নিখিলেশের।

পায়চারী থেমে যায় হঠাৎ। একটি দেরাজের সামনে। এক টানে দেরাজের পাল্লা খুলে ফেলে নিখিলেশ। গ্লাস আর বোতল বের করলো। মেয়েটির কানে যায়, তরলীয় শব্দ মৃদু মৃদু। গ্লাসে পানীয় ঢালছে।

মুখ উঁচিয়ে পায়, কথা বললে মেয়েটি। ভারী গলায় বললে,—আমার নামে তোমার কাছে কেউ কি কিছু বলেছে? সত্যি কথা বল না।

গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে নামিয়ে দেয় নিখিলেশ। মেয়েটির চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। ক্ষীণ হাসি ঠোঁটের কোণে। মেয়েটির চোখে মুখে বিভ্রান্তি, অজানা ভবিষ্যতের ভয়ার্তভাব।

মেয়েটি কথার উত্তর পায় না। এক চুমুকে নিঃশেষ গ্লাস টেবিলে সশব্দে রেখে দেয় নিখিলেশ। জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললে,

—নাও উঠে পড়। আড়ষ্ট সুরে কথা বলছে নিখিলেশ। বললে,—এখন সবচেয়ে ভাল হয়, বিছানা থেকে উঠে শাড়ীখানা ঠিক ভদ্রভাবে পরতে পারো। তারপর আস্তে আস্তে বিদেয় হয়ে যাও এখান থেকে। নিজের ঘরে যাও।

—তুমি কি নিষ্ঠুর নিখিলেশ! কতটা হৃদয়হীন! পাষাণ!

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় মুক্তবেণী দুই হাতে ধরে পিঠে আছড়ে ফেলে মেয়েটি। বিছানা থেকে উঠে পড়ে তৎক্ষণাৎ। কথা বলতে বলতে থামলো। বললে,—হ্যাঁ ঠিক তাই, সবচেয়ে ভাল হয় আমি বিদেয় হয়ে গেলে। ঠিক আছে, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

দয়া হয় না এক রত্তি। পরিবর্তে মেয়েটিকে সাজা দিতে ইচ্ছা হয় কড়া রকমের। এমন শিক্ষা দেবে, যেন জীবনে কখনও না ভুলতে পারে।

বিদ্যুতের গতিতে নীল রঙের শাড়ী যথাযথ পরতে থাকে মেয়েটি। লজ্জার আবরণ টেনে দেয় যেন সর্বদেহে। আঁচলে বুক ঢেকে পিঠের বর্ণালীর দেহ সংজ্ঞাশীলার মত।

—এখন তুমি যেতে পারো।

পিছন ফিরে [illegible] বললে নিখিলেশ। স্ত্রী রূপে যেন তার বৈরাগ্য এসেছে। আর সে যেন দেখতে চায় না।

কপালে একবার সজোরে করাঘাত করলে মেয়েটি। হঠাৎ দুর্ভাগ্য। বললে,—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

—না আমার মাথা খারাপ হয়নি। কথা বলতে বলতে নিখিলেশ রুদ্ধ জানলার দিকে এগোয়। জানলা খুলে দেয় একটা একটা। প্রত্যাশিত বাতাস আসতে দেয় যেন। শীতের রাতের মত, ঠাণ্ডা হাওয়া। কখনো বেশীক্ষণ থাকলে তার সেই মনের অস্থির বুকের অশান্তি মাথা চাড়া দেয় যেন। নিখিলেশ ভাবে, সে আর পারবে না আগের মত হাসতে, মেয়েদের ভালবাসতে। সবই যেন বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সে। তুকতে মানুষ যত ধরকত চায় বাঁচার আশায়। নিখিলেশও চায় মনের এই অবস্থাকে জয় করতে। আজও যেন তখন বিষিয়ে উঠে তার মন। দেহের রক্ত কিন্তু ঠাণ্ডা হতে থাকে। চিন্তা-জ্বর এসে আক্রমণ চালায় যেন।

মেয়েটির মুখে বিশ্রী বিরক্তি। পায়ে জুতো গলাতে থাকে। নীচু হয়ে স্ট্র্যাপ বাঁধতে হয় পায়ে। প্রণাম জানাতে নত হয় যেন। চার-চোখের শেষ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে বলে—ঠিক আছে, আমি তো চ'লে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু তোমার চিকিৎসা করাও।

এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ। দুই বিন্দু জল চোখ থেকে ঠিকরে পড়লো মেয়েটির উন্নত বুকে।

দুয়োরে একটা শব্দ হয় শুধু। খোলা আর বন্ধ হওয়ার কাঠ শব্দ।

নিখিলেশ দেখতে পায়, সত্যিই ঘরে সে এখন একা। দ্বিতীয়জন কেউ নেই আর। নিঃসঙ্গ এখন সে।

জানলা উন্মুক্ত। কিন্তু বর্ষার কালো আকাশ রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য।

সোফা থেকে উঠে পড়ে নিখিলেশ। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শীত-শীত হাওয়া এসে ছোঁয়া দেয় তার উষ্ণ কপালে। দেখলো, বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। ঝির-ঝির ছন্দ আর শোনা যায় না।

বুকের ভেতরে সেই অসহনীয় অশান্তি, আবার যেন অসংখ্য পোকার মত দংশন শুরু করেছে। যন্ত্রণা সহ্যের অতীত হয়ে উঠে থেকে থেকে। নিখিলেশের মনে যেন বিষাদ ঘনো হয়েছে।

বাইরের অন্ধকারে চোখ মেলে থাকে সে। ল্যাম্প পোস্টের অল্প আলোয় দেখা যায় সারি সারি ইমারত, ইট আর সিমেন্টের। বাড়ী তৈরী হচ্ছে। কোথাও কোথাও লোহার রড্ আর ভারেস্ট উঁকি মারছে। বাঁশের ভারা দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। আবর্জনা, জঞ্জাল আর মাটির স্তূপ রাস্তার দু'পাশে। কোথাও বা আগাছা জন্মেছে। মন্থর পায়ে এগিয়ে চলেছে পাশা-পাশি কয়েকটা। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। নিখিলেশ অনুমানে ধ'রে ফেলে সে। রাস্তার দো-আঁসলা কুকুর। চোরের মত পা টিপে টিপে চলেছে। ওরা হয়তো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চলেছে আহার আর জলের সন্ধানে। রাস্তার সেই মোড়ে আছে একটা ডাস্টবিন। চলেছে সেই দিকেই, আশায় আশায়। দূরে বড় রাস্তা। রাজপথ থেকে ভেসে আসছে গাড়ীর ছুটন্ত হর্ণ, ট্রামের ঘণ্টার ঢং ঢং।

রাত্রি যত ঘন হয় নিদ্রার ভয়টা তত বেশী প্রকট হয়ে ওঠে যেন। সারা দুনিয়া যখন ঘুমে অচেতন, তখন কিনা জেগে বসে থাকতে হবে নিখিলেশকে। কত ওষুধ খেয়েছে এই কারণে। কত টাকা খরচ করেছে এতদিনে। তবুও এক তিল ঘুম আসে না চোখে।

ঐ যে চোরের মত পা টিপে টিপে কুকুরগুলো চলেছে। হঠাৎ নিখিলেশের মনে হয় ওরা হয়তো তার মতই ঠিক। কিম্বা তার চেয়ে ভাল হয়তো। ছায়া ছায়া কুকুরগুলো তো কানে যা শুনতে পায়, যা যা দেখতে পায় চোখে, নিখিলেশও সেই শব্দই শোনে। সেই দৃশ্যই দেখে। তবে কুকুরে আর মানুষে তফাৎ কোথায়?

(শেষাংশ ৮৬ পৃষ্ঠায়)

এতে কিন্তু গ্রহগুলির আপেক্ষিক দূরত্ব সঠিকভাবে দেখানো সম্ভব হতো না।

কাজেই গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান ও তাদের গতিবিধি সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্যে উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে। এর ফলেই প্ল্যানেটোরিয়াম উদ্ভাবিত হয়। প্রথমে ডাঃ বাওয়ার্সফেল্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০ ফুট বা তারও বেশী ব্যাসের একটা গম্বুজের গায়ে প্রোজেক্টরের সাহায্যে জ্যোতিষ্কগুলির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, এতে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল।

তারপর জেনার (জার্মেণী) জাইস কোম্পানী কর্তৃক আধুনিক উন্নত ধরণের প্ল্যানেটোরিয়াম নির্মিত হয়। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এবং নিখুঁত লেন্সের সাহায্যে এতে পূর্বেকার সবরকম অসুবিধা দূর করা হয়েছে। এই প্ল্যানেটোরিয়ামের সাহায্যে দর্শকেরা সৌরজগৎ এবং তার বাইরের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যাবতীয় ব্যাপার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

দেখানো হয়। আপেক্ষিক গতিবিধি ছাড়াও আলাদাভাবে যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের গতিবেগ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখানো যেতে পারে। বিভিন্ন প্রোজেক্টরের সাহায্যে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের প্রতিকৃতি প্ল্যানেটোরিয়ামের নকল আকাশের গায়ে ফুটিয়ে তোলা যায়। নক্ষত্রগুলিকে দেখবার জন্যে এমনভাবে প্রোজেক্টর স্থাপিত হয়েছে, যাতে সেটাও পৃথিবীর অক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে নিজের অক্ষরেখার উপর ঘুরতে পারে। বিভিন্ন গ্রহের কক্ষতলের কোণের পার্থক্যও সঠিকভাবে রাখা হয়েছে। উৎকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় উপবৃত্তাকার গতিও প্রায় সঠিকভাবেই দেখানো চলে।

প্ল্যানেটোরিয়ামের নকল আকাশে যে যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সেটি বসানো থাকে গম্বুজ-ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে। যন্ত্রটি দেখতে মোটামুটি একটা বিরাট ডাম্বেলের মত। তারই বিভিন্ন অংশে, স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য রকমের বিচিত্র যন্ত্রপাতির সমাবেশ। বিভিন্ন রকমের লেন্স সম্বলিত একটা গোলক থেকে উত্তর আকাশ এবং অপরটি থেকে দক্ষিণ আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অনুকৃতি, ছোট-বড় আলোর গোলকের মত তাদের স্বাভাবিক অবস্থান-স্থল অনুযায়ী গম্বুজের গায়ে প্রক্ষিপ্ত হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের আকাশ যেমন ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে দক্ষিণের আকাশ দেখা দেয়, যান্ত্রিক কৌশলে ডাম্বেলটিকে এদিকে বা ওদিকে হেলিয়ে দিয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই উত্তর বা দক্ষিণ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে ইচ্ছামত গম্বুজের নকল আকাশে প্রতিফলিত করা যেতে পারে। নিজের অক্ষরেখার উপর পৃথিবীর আবর্তনের ফলে দূরস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে রকম গতিবিধি দেখা যায়, ডাম্বেলের মত যন্ত্রটা লম্বা দণ্ডের উপর ঘুরলেই গম্বুজে প্রতিফলিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও ঠিক সেই রকম গতিবিধি দেখা যাবে। মোটের উপর, পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে যে অবস্থায় স্থান বা আকৃতি পরিবর্তন করতে দেখি, প্ল্যানেটোরিয়ামেও সেগুলিকে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাওয়া যায়।

জ্যোতিষ্কগুলির চলাফেরায় অনেকটা সময় লাগে। প্ল্যানেটোরিয়ামে সময়ের মাপ অনেক কম করে দেখানো হয়; অর্থাৎ কয়েক বছরের গতিবিধি দেখানো হয় কয়েক মিনিটের মধ্যে। দেখা যাবে, হয়তো এক মিনিটের মধ্যেই সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর এক বছরের পরিক্রমা হয়ে গেল। কিন্তু সময় কমিয়ে দিলেও প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের গতিবিধির আনুপাতিক সময় ঠিকই থাকে। মোটের উপর সব ব্যাপারই ঘটে, বাস্তবে যেমন ভাবে ঘটে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে—সূক্ষ্ম হিসাব বজায় রেখে। বছরটাকে ২—১ মিনিটের মধ্যে কমিয়ে আনলে দেখা যায়, জ্যোতিষ্কগুলি একবার এগিয়ে এসে আবার পিছু হটে আকাশের মধ্যে প্যাঁচানো পথে একটা আর একটাকে যেন তাড়া করে যাচ্ছে।
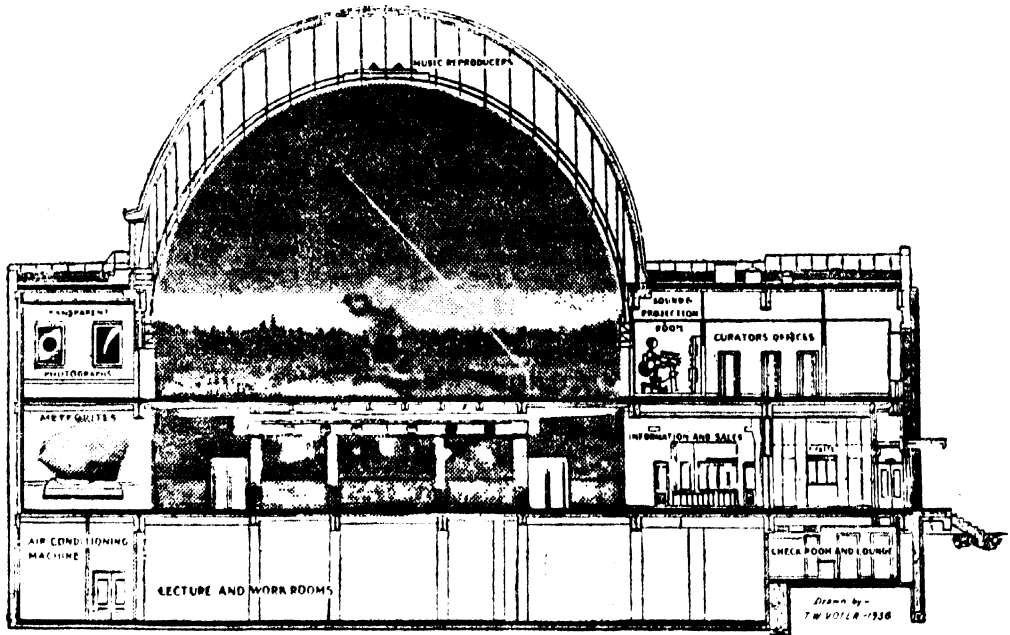
নিউ ইয়র্কের হেডেন প্ল্যানেটোরিয়ামের নক্সা। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কিভাবে প্রতিফলিত হয় ও ব্যাখ্যাতা কিভাবে বুঝিয়ে দেন তার ছবি।

উপরের দিকে তাকালেই মনে হয়—আকাশ যেন একটা বিশাল গম্বুজের মত গোল হয়ে আছে। এই গম্বুজাকৃতি আকাশের গায়েই আমরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলিকে দেখতে পাই। প্ল্যানেটোরিয়ামের জন্যে এই রকমের গম্বুজাকৃতি একটা সুবৃহৎ কক্ষের প্রয়োজন। গম্বুজের মসৃণ অভ্যন্তর ভাগ গোলাকার আকাশের মত অনুকৃতি। সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অনুরূপ ছোট-বড় আলোক-প্রতিকৃতি প্রোজেক্টরের সাহায্যে গম্বুজের গায়ে প্রতিফলিত করে তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি

আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, অতীত বা ভবিষ্যৎকালে কোন সময়ে আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান কিরূপ ছিল বা হবে, কোন্ কোন্ সময়ে গ্রহণ হয়েছিল

(শেষাংশ ৮৯ পৃষ্ঠায়)

যযাতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তেমাথার মস্ত দোতলা বাড়িটা তিনটে রাস্তারই অনেক দূর দূর থেকে দেখা যায়।

তবে চিন্তাহরণ মুখুজ্জের মত রোজই প্রায় অতক্ষণ ধরে বাড়িটা আর কেউ দেখে না হয়ত। চিন্তাহরণবাবুও আগে দেখতেন না। বহুকাল যাবত দেখছেন। রাতের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি নির্জনে নিজের ভাঙা একতলা বাড়ির সামনের বালি-চটা এবড়োখেবড়ো ফালি-বারান্দায় বসে অন্যমনস্কের মত এক একদিন কতক্ষণ যে নিষ্পলক চেয়ে থাকেন দূরের ওই বাড়িটার দিকে, নিজেরই হুঁস থাকে না। হুঁস হয়, যখন ছানিকাটা চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করে।

মোড়ের মাথায়, অর্থাৎ ওই বাড়িটার গায়ে সমস্ত রাত করপোরেশনের জোরালো আলো জ্বলে একটা। রাতে তাই টকটকে লাল বাড়িটা তকতকে দেখায় আরো। তার জলুস বাড়ে। চিন্তাহরণবাবুর অতদূর চোখ চলে না। তিনি যে ঠিক চোখ দিয়ে দেখেন তাও নয়; কতকাল আছেন এখানে সেটা এখন হিসেবের ব্যাপার। এদিকে তাকালেই সব কিছু গোটা-গুটি চোখে পড়ে তাঁর।

বাড়ির গায়ে সকাল-সন্ধ্যা সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে উৎসব বুঝি কিছু। উৎসব নয়, রোজই ওই রকম গাড়ির ভিড় লেগে আছে। এক একদিন তো কাছাকাছি গাড়ি ভিড়ানো যায় না।... ভাগ্যদেবীর শ্রীমুখখানি বোধ হয় দ্রৌপদীর বস্ত্রের ওড়নায় ঢাকা। যত খোলো যত টানো আবরণ পড়েই আছে। হাজার দেখলেও দেখা হয়ে ওঠে না, না-দেখার যাতনা যায় না, জ্বলা সরে না। কিন্তু একজন পারেন সেই আবরণ সরাতে। সরিয়ে দেখতে। যে সেখানে আছে সকলের হয়ে দেখতে। ওই লাল বাড়ির মালিক গোলক জ্যোতির্বাগীশ পারেন। কুসারী ছিলেন। এখন কুসারী বললে কেউ চিনবে না। ওই জ্যোতির্বাগীশ পারেন আবরণ সরাতে। তাঁর হিসেব-নিকেশ বিচার-বিশ্লেষণ আঁকি-জুকির ছকের মুখে পড়লে ভাগ্যাঙ্গনার অব-গুণ্ঠন খসে। তিনি দেখেন। দেখে বলে দেন। সে যেমন মাশুল গোনে তার হয়ে তেমন করে ছোঁয়াচে। একের বিশ্বাস তিন বিস্তার। বিস্তারের পরিধিটা বাড়ছেই। লোকে দিশে-হারার মত ছুটে আসে, সশঙ্কে আসে, আশার তাড়নায় আসে। বাঙালী, অবাঙালী—বিদেশীও আসে।

লোকের ওই ভাগ্যান্বেষী বিশ্বাসটুকুই মূলধন।

সে মূলধনের জোর কত ওই বাড়িটাই নজির তার। ওখানে গরু-মোষের খাটাল ছিল এককালে। চিন্তাহরণবাবুর চোখে ভাসে এখনো। খাটাল গিয়ে সেখানে পাকা-ভিতের ঘর উঠেছিল এক সারি। তারই দুখানা ঘর নিয়ে সপরিবারে থাকতেন গোলকভূষণ কুসারী। কত দিনের কথা আর...চল্লিশ বছরও নয়। কিন্তু তখনই নিজের ললাট-লিপিটি যেন আদ্যোপান্ত পাঠ করে রেখেছিলেন তিনি। স্থির বিশ্বাসে বলতেন এ-রকম দিন থাকবে না, দেখে নিও।

থাকে নি। দুখানা ঘরের সঙ্গে আরো দুখানা ঘর নিজস্ব হয়েছে জ্যোতির্বাগীশের। তারপর সেই চারখানা ঘরের জায়গায় একতলা পাকা দালান উঠেছে। তারপর আশপাশের সবটা জায়গার মালিকানা হাতে এসেছে। তারপর আবার সবকিছু ভেঙেচুরে সবটা জায়গা জুড়ে এই নতুন দালান উঠেছে।

চিন্তাহরণবাবু ঈর্ষা করেন না। শিক্ষিত মানুষ, সরকারী পেনসন পাচ্ছেন। ঈর্ষা করতে ঘৃণা করেন। তাছাড়া গোলক কুসারী তাঁর বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। টাকায় হোক বা বয়সের দরুন হোক মেজাজ একটু খিটখিটে হয়ে উঠলেও লোকটার একটুও নিন্দা করতে পারেন না চিন্তাহরণবাবু। আর যে দেমাকই থাক, টাকার দেমাক অন্তত নেই। এখনো প্রায় আগের মতই বন্ধুবৎসল। পুরনো বন্ধুদের কাউকে হেলাফেলা করেন না। রাত সাড়ে আটটার পর তামাক সহযোগে মহাভারতের আড্ডাটা টাকার লোভে ঘুচিয়ে দেননি এখনো। সাড়ে আটটার পর নিয়মিত সেই আড্ডা আজও বসে। দপ্তর বদলেছে, দপ্তরের সাজ-সরঞ্জামের অনেক উন্নতি হয়েছে—আড্ডা বদলায়নি, আড্ডার লোকগুলো বদলায়নি, সের-সের তামাক বদলে সিগারেট আসেনি।

ছক আঁকেন না জ্যোতির্বাগীশ, একটাও কোষ্ঠী ওল্টান না। বাইরের লোক থাকলে পরের দিনের প্রত্যাশা নিয়ে উঠে যেতে হয় তাঁকে। দপ্তরে বিপুলাকার মহাভারত আছে একখানা। তক-তকে আলমারী থেকে সেটা বার করে আনা হয়। বন্ধুদের দু'তিনজন পালা করে পড়েন। পালা করে আর সুর করে। আজ যে পর্যন্ত পড়া হল কাল তার পর থেকে। দরজার কাছে একটা চাকর মোতায়েন—সে মুহুর্মুহু তামাক সাজে। তামাক পোড়ে আর মহাভারত চলে। চলে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত। কোনো অংশ নিয়ে আলোচনা উঠলে পড়া অবশ্য বেশিদূর এগোয় না আলোচনাটাই সরগরম হয়ে উঠে। অর্ধ-শ্রান্ত জ্যোতির্বাগীশ কথা বেশি বলেন না। মেজাজ অপ্রসন্ন থাকলে ফরফর করে তামাক টানেন আর শোনেন। প্রসন্ন থাকলে গুড়গুড়িয়ে তামাক টানেন, মিটিমিটি হাসেন, আর শোনেন। দশটার বেশ আগে থেকেই অবশ্য একজন একজন করে ওঠা শুরু হয়। যে দুচারজন রাতের আহার সেরে আসেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত থাকেন। আসর ভাঙালে ওপরে উঠে জ্যোতির্বাগীশ ঠাকুর ঘরে মিনিট দশ-পনের জপতপ করেন বসে। হাত মুখ ধোয়ার কাজটা মহাভারত-পর্বের ফাঁকেই সেরে রাখেন। জপ শেষ হলে এক বাটি দুধ আর একটা সন্দেশ খেয়ে শুয়ে পড়েন। এতেই শরীর এই বয়সেও সকলের থেকে মজবুত তাঁর।

ঈর্ষা নয়। চিন্তাহরণবাবু ঈর্ষা একটুও করেন না।...ওই লাল বাড়িটা চিন্তাহরণবাবুর শান্তি হরণ করেছে। চোখের ঘুম কেড়েছে। সেটা কেউ জানে না। এমন কি জ্যোতির্বাগীশ নিজেও না।

চিন্তাহরণবাবুর বয়েস আটষট্টি এখন। আটষট্টির গোড়ার দিক। চেষ্টা চরিত্র করে উনসত্তরের গোড়ার দিকটা পর্যন্ত দেখতে পান তিনি। তারপর সব শূন্য, সব ঝাপসা, সব কালো, সব অন্ধকার। মাথা খুঁড়েও চিন্তা-হরণবাবু আর তার পরের হদিস পান না কিছু। তাঁর বাড়ির পাশের বড় রাস্তাটা ধরে খানিক এগোলে শ্মশান। সমস্ত দিনে কম শব যায় না দুদিকের দুটো রাস্তা ধরে।

দূরে থাক, জেগে থাকলেও সব সময় কানে যেত না। আজকাল ঘুম ভাঙো, কানে যায়। শ্মশানটা কাছে মনে হয়। দাহ-ধোঁয়ার গন্ধও যেন থেকে থেকে নাকে আসে। মাঝখানের চল্লিশটা বছর তাঁর নিজের চোখেই ধুলো দিয়ে বড় বেশি তাড়াতাড়ি কেটে গেল মনে হয়।

এতদিনের কথা, জ্যোতির্বাগীশের মনেও নেই নিশ্চয়। মনে থাকার কথাও নয়। চিন্তা-হরণবাবু নিজেও তো ভুলে গিয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর আগে হাত বা কোষ্ঠী গছাতে হত না গোলক কুসারীকে। নিজে থেকেই সাগ্রহে দেখতেন। তাঁর দেখেছিলেন। কি বলেছিলেন না বলেছিলেন সব মনে নেই। কতটা মিলেছে কতটা মেলেনি তাও মনে নেই। পরে আরো কতবার আপদে বিপদে হাত দেখেছেন, কোষ্ঠী দেখেছেন—এটাসেটা বলে দিয়েছেন। কিন্তু সব ছেড়ে প্রথমবারের একটা হালকা প্রসঙ্গ মনের তলায় এভাবে খোদাই হয়ে থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবেননি চিন্তাহরণবাবু।

চল্লিশ বছর আগের সেইদিন সব দেখা হতে চিন্তাহরণবাবু ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন, ভবিষ্যত তো একেবারে ঝরঝরে করে দিলে দেখি, এখন আয়ুটা কেমন দেখো তো।

গোলক কুসারী মনোনিবেশ সহকারে চোখে ঠুলি-কাচ লাগিয়ে আবারও হাত দেখেছিলেন, তারপর কোষ্ঠীর ছক খুলে হিসেবপত্র করে বলেছিলেন, ঊনসত্তরের মাঝামাঝি।

চিন্তাহরণবাবুর মনে চিন্তার একটা রেখাও পড়েনি সেদিন, হাসিমুখে হিসেব করেছিলেন বরং—একচল্লিশ বছর আরো। হালকা মন্তব্য করেছিলেন, অনেককালের ভোগান্তি দেখছি।

আটষট্টির শুরুতেই এতকাল আগের ভবিষ্যদ্বাণীটা মনে পড়ে গেল। প্রথম প্রথম আমল দিতে চাননি। মনে পড়লে অস্বস্তি কেমন। তাই মন থেকে ঠেলে দিতেই চেয়েছেন। কিন্তু ঘুরে ফিরে মনে পড়তেই লাগল। মনের ভিতরে কেটে কেটে বসতে লাগল। যত দিন যায়, ঘুম কমছে। আহারে রুচি কমে যাচ্ছে—আগে বেশ খেতে পারতেন। এখন ভিতরে ভিতরে তাঁর অষ্টপ্রহর একটা হিসেবনিকেশ চলছে। এক-জনের ভুল ধরার হিসেব। ভুল স্মরণ করার চেষ্টা। সামনা-সামনি তা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। কারণ গোলক আর কুসারী নয়, নামজাদা জ্যোতির্বাগীশ। তাঁরাও এখন জ্যোতির্বাগীশ বলেই ডাকেন। আর বলতে যাওয়ার দরকারই বা কি। তিনি জব্দ করতে চান না, ভুল ধরে বা ভুল স্মরণ করে নিশ্চিন্ত বোধ করতে চান। কিন্তু ভুলগুলো কমই মনে পড়ে। মনে পড়েই না। সে চেষ্টা করতে গেলে উল্টে লোকটার অদ্ভুত ফলিত-কেরামতি-গুলোই চোখের সামনে ভিড় করে আসে।

বলো হরি, হরিবোল—

শব্দটা পাড়ার দিক থেকে এলেই টুকটুক করে চিন্তাহরণবাবু বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন। মাঝরাতে হোক, বা দিন-দুপুরে হোক। চেনা লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করবেন, কে গেল ?

এতকালের নিবাস, গোটা এলাকায় কটাই বা অচেনা বাড়ি আছে। আর এলাকার বয়স্কদের

পেয়েছে ? অবশ্য গোলক জ্যোতির্বাগীশ সেই চল্লিশ বছর আগের মত ভয়ের ব্যাপারগুলো অমন ঠাস ঠাস করে মুখের ওপর বলে দেন না এখন। লোকে ঘাবড়ে গেলে পসারের ক্ষতি। তবে রাগলে বলেন। কেউ স্থূলভাবে অবিশ্বাস করছে দেখলে বলেন। তাঁর জ্যোতিষী নিয়ে কারো কোনো সংশয় সহ্য হয় না।

শব-বাহকদের কেউ জবাব দেয়, ওমুক বাড়ির ওমুকে গেলেন—

এলাকার লোক হলে ওমুক বাড়ির ওমুককে নিয়ে মহাভারত পর্বের আগে খানিকটা ছেদ পড়ে সেদিন। তাকে নিয়ে একটু আধটু আলোচনা হয়। আলোচনার সূত্রপাতটা চিন্তাহরণবাবুই করেন। প্রায়ই দেখা যায় ওমুক বাড়ির ওমুকের এই সময়টা যে খারাপ জ্যোতির্বাগীশ তা বহুদিন আগেই বলে দিয়ে-ছিলেন। আলমারীতে খেরোয় বাঁধানো মোটা মোটা খাতা আছে কতগুলো। বেশি কথা উঠলে তারই একটা টেনে নিয়ে ওমুক বাড়ির ওমুকের নামধামও দেখিয়ে দেন তিনি। খারাপ সময়ের নিশানা দেখান।

কিছুদিন আগেও এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল। পাড়ারই একজন সুপরিচিত বৃদ্ধ চোখ বুজেছিলেন। জ্যোতির্বাগীশ একটা নতুন লাল খাতা টেনে নিয়ে তাঁর খারাপ সময়ের লাল-দাগ কাটা ইঙ্গিতটা সুদ্ধু দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

কি জানি হয়েছিল চিন্তাহরণবাবুর সেদিন, বলে বসেছিলেন, তোমার নিজের কোষ্ঠীটা ভালো করে বিচার-টিচার করে রেখেছ তো হে ?

সকলে হেসেছিলেন। গড়গড়ার নল মুখে জ্যোতির্বাগীশও মুখ টিপে হাসছিলেন।—কি মনে হয়, দেখিনি ?

না, ওই পরমায়ু দেখে রাখার কথাটা বল-ছিলাম—। চিন্তাহরণবাবুর হালকা উক্তির মধ্যে চাপা ব্যঙ্গের ধার ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল। কিন্তু সে-শুধু তিনিই জানেন।

জ্যোতিষী প্রসঙ্গ উঠলে অনেক সময় অনেক অদ্ভুত উপমা দেন জ্যোতির্বাগীশ। দিয়ে মুখ-বন্ধ করেন সকলের। চুপচাপ খানিক গুড়গুড় করে তামাক টেনে ফস করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, এই যে তুমি আমাকে দেখছ, এদের দেখছ, রাস্তার এত লোক দেখছ—সকলের নাক চোখ মুখ কান আলাদা করে দেখো ?

চিন্তাহরণবাবু সঠিক না বুঝেই মাথা নেড়েছেন, আলাদা করে দেখেন না, গোটাগুটি দেখেন।

কারো ওগুলোর একটা না থাকলে বা তেমন খুঁত থাকলে তোমার আপনিই সেটা চোখে পড়ে, না পড়ে না ?

চিন্তাহরণবাবু আবারও মাথা নেড়েছেন, পড়ে—।

তবে ?

অর্থাৎ নিজের পরমায়ুতে খুঁত থাকলে আপনিই সেটা চোখে পড়বে। খুঁত নেই।

সেই রাতে ঘুম এক-রকম হয়-ই নি চিন্তা-হরণবাবুর। একজন তাঁর নিখুঁত লম্বা পরমায়ুর জোরে নিশ্চিন্ত। আর তাঁর সামনে ক'টা মাসের ওধারে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কল্পান্ত...। একটা করে দিন যায়, শ্মশানটা যেন কাছে এগিয়ে আসে, চিতার ধোঁয়া আরো বেশি

প্রকাশই করে ফেলেছিলেন জ্যোতির্বাগীশের কাছে।—শরীরটা বড় ভালো যাচ্ছে না হে, এখনো ওই পেনসনটুকুই বাড়ির অর্ধেক ভরসা, নইলে নিজের জন্যে আর ভাবনা কি ছিল—

বন্ধু আশ্বাস দিয়েছিলেন, এসো একদিন, দেখে দেব—

কিন্তু চিন্তাহরণবাবু সে-ভাবে যেতে পারেন নি। গেলে বন্ধুবৎসল লোকটা দেখে দেবে, আশ্বাস দেবে, সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু চিন্তাহরণবাবু আশ্বাস চান না, সান্ত্বনা চান না, এমন কি, পরমায়ুও চান না হয়ত। সত্যি যা তাই শুধু নিঃসংশয়ে জেনে নিতে চান, নিশ্চিন্ত হতে চান—শান্তি চান। কিন্তু সেই সত্যি কথাটাই গোলক আর কিছুতে বলবে না।.. বলবে, তিনি চোখ বুজলে...বলবে মহাভারত-পর্বের আর সকলের কাছে। গুড়গুড় করে তামাক টানবে, তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করবে, এটা তার জানাই ছিল।

কিন্তু ওই লাল বাড়িটা ঘিরে এমন এক মানসিক আলোড়নের সূচনা হবে কেউ ভাবেন নি। চিন্তাহরণবাবু না, বন্ধুরাও না। সন্ধ্যার মধ্যে বার দুই বাড়িটার কাছাকাছি এসে ঘুরে গেছেন চিন্তাহরণবাবু। বাইরে থেকে দেখলে কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়বে না। সেই চিরা-চরিত গাড়ির ভিড়, লোকের ভিড়। জ্যোতি-র্বাগীশ তেমনি ঠাণ্ডা মুখে আজও হাত দেখ-ছেন, কোষ্ঠী দেখছেন হয়ত। চিন্তাহরণবাবু খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সেই থেকে এদিকেই চেয়ে আছেন। শরীর ভালো না, মহাভারতের আসর প্রায়ই কামাই যাচ্ছে আজকাল। গতকাল এসে-ছিলেন—জ্যোতির্বাগীশের মেয়ের সনির্বন্ধ আকুতি ঠেলতে পারেননি বলে। আজ নিজে থেকেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'চোখ জ্বালা জ্বালা করছে।...ওই দুধের শিশুর সত্যি অঘটন যদি হয়ে বসে কিছু জ্যোতির্বাগীশ বার করবেন তিনি—বন্ধু বলে ছেড়ে কথা কইবেন না।

ওই বাড়িতে একটা শিশুর ঘোরালো অসুখ। জ্যোতির্বাগীশের মেয়ের তিন বছরের ছেলেটার। টাইফয়েড, সঙ্গে আরো কি। আজ আঠের দিন

হল ভুগছে। সময়ে সুচিকিৎসা হয়নি। টাকার অভাবে নয়—টাকা মেয়েরও আছে, মেয়ের বাপেরও আছে। হয়নি গাফিলতির দরুন। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার নিশ্চিন্ত আশ্বাসের ফলে। বাপের কথায় তাঁর ছেলে মেয়ের অন্ধ বিশ্বাস। মেয়ের বাবা অনেক আগেই নাতির কোষ্ঠী বিচার করে বলে রেখেছিলেন, দীর্ঘায়ু, বিদ্বান, কৃতী হবে নাতিটি তাঁর। গত সপ্তাহে অসুখটা ঘোরালো হয়ে পড়তে আবারও তার ছক নিয়ে কোষ্ঠী নিয়ে বসেছিলেন তিনি। দেখে মেয়েকে অভয় দিয়েছেন, কিচ্ছু ভাবিস না, সেরে যাবে—কিছু হতেই পারে না। বাপ বলেছে হতে পারে না, হবে কেমন করে? অবশ্য ডাক্তার দেখেছে, এখন তো বড় বড় ডাক্তারেরই আনাগোনা চলেছে। কিন্তু সময়ে যতটা হওয়া উচিত ছিল—হয়নি। হয়নি যে সে অনুশোচনা সকলের, এমন কি আসরের বন্ধুদেরও। অনুশোচনা নেই শুধু জ্যোতির্বাগীশের। তিনি নিশ্চিন্ত, কিচ্ছু হবে না। সত্যি নিশ্চিন্ত কিনা চিন্তাহরণবাবুরা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না।

চিন্তাহরণবাবু চমকে উঠলেন হঠাৎ। ছানি-কাটা চোখ দুটো নিজেরই অন্তস্তলে ঠেলে দিয়ে অসহিষ্ণুতায় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কি।... কী? সেখানে কেউ চাইছে না তো অঘটন ঘটুক? জ্যোতির্বাগীশের ভুল হোক—একটা বড় নিশ্চিন্ততার কারণ ঘটুক? রাস্তার কোণে দাঁড়িয়েই সবেগে মাথা নাড়লেন চিন্তাহরণবাবু। না! কক্ষনো না! কেউ তা চাইছে না। মেয়েটার আকুতিতে কাল তিনি ওই শিশুর কপালে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে এসেছেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি, নিষ্ঠা সহকারেই কাজ করেছেন। কাল সকালে ছেলেটা চোখ উল্টে দিয়েছিল। বাপের কিচ্ছু হবে না শুনেও মেয়ের মন—মায়ের মন ঠাণ্ডা হয়নি। ডাক্তারদের গম্ভীর মুখ তার আতঙ্কের কারণ হয়েছে। ছেলের কাছ থেকে আড়ালে সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে এসেছে। তাঁকে দেখে পা জড়িয়ে ধরেছে, কাকাবাবু, কিছু করুন—!

কিছু করেছেন।

সাধ্যমতই করেছেন তিনি। কেউ বলবে না মনের কোণেও কোনো ফাঁকি ছিল চিন্তাহরণবাবুর। কোনো ক্রুর অভিলাষ ছিল। মেয়েটাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতেন তিনি। সেই যখন ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যেত তখন থেকে। ফুট-ফুটে সুন্দর মেয়ে। মেয়েটা যখন একগাদা বই বুকে করে কলেজে যেত—পাড়ার অনেক ভালো ভালো ঘরের ছেলে ছোকরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরুতো, নিস্পৃহ চরণে দূরে থেকে সঙ্গ নিত। কিছুই নজর এড়াতো না চিন্তাহরণবাবুর। নিজের ছেলের আচরণও না। তাকেও ওই ঘড়ি-ধরা সময়ে উসখুস করতে দেখা যেত, ফাঁক পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত। তাঁর ছেলে তখন সরকারী অফিসের কেরানী। অবস্থার দিক বিচার করতে গেলে বামনের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর মত। কিন্তু অন্য বিচারও আছে। কুলীন-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি, বংশ-মর্যাদা কম নয়, তার ওপর মেয়ের বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কেরানী ছেলের জন্য মুখ ফুটে মেয়েটিকে চেয়েই বসে-ছিলেন তিনি। অবশ্য খুব হালকা করেই বলে-ছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটাকে আমার ঘরে দেবে নাকি হে?

গড়গড়ার নল মুখে অল্প অল্প হেসে-ছিলেন জ্যোতির্বাগীশ। তারপর বলেছিলেন, ওর ভবিতব্য অন্য-রকম যে হে—দেখে রেখেছি।

চিন্তাহরণবাবু একটুও ক্ষুব্ধ হননি। তখনকার মত একটু দুঃখিত হলেও সে দুঃখ আর নেই। মেয়ের ভবিতব্য অন্যরকম যে নিজের চোখেই তো দেখেছেন। মস্ত ঘরের পাস করা ডাক্তার জামাই এসেছে। জাঁক-জমক করে বিয়ে হয়েছে। গেল বছর জামাই বিলেত গেল আরো বড় কিছু হয়ে আসতে। এই একটা বছর মেয়ে বাপের কাছেই আছে বেশির ভাগ।... মেয়েটার লক্ষ্মীশ্রী। চিন্তাহরণবাবু আজও মনে মনে স্নেহ করেন তাকে। অমন সর্বনাশা চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারেন তিনি? কখখনো না! কথাটা মনে এলো বলেই নিজের ওপর মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ তিনি।

সাড়ে আটটা বাজে বোধহয়। গাড়িগুলো কখন একে একে চলে গেছে। বাইরের লোকও আর নেই মনে হয়। পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি।

মহাভারত পড়া শুরু হয়ে গেছে। গড়গড়ার নলটা জ্যোতির্বাগীশের হাতে। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। ঈষৎ অন্যমনস্কও। চিন্তাহরণবাবু ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন?

একরকমই। সংক্ষিপ্ত বিরক্তিসূচক জবাব দিয়ে মহাভারত শ্রবণে মন দিলেন তিনি। ফর্সা মুখ লালচে দেখাচ্ছে।

কিন্তু মহাভারতে মন বসছে না কারো। যিনি পড়ছেন তাঁরও না, যাঁরা শুনছেন তাঁদেরও না। ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তি থিতিয়ে আছে।

চিন্তাহরণবাবু বলেই বসলেন, আজ থাক না, পড়তে এ রকম...

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বাগীশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যেন। অস্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, বলছি তো কিচ্ছু হবে না—কিছু হতে পারে না! কেন তোমরা এ-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? কেন বাড়াবাড়ি করছ?

পড়া চলল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। জ্যোতি-র্বাগীশ নিজেই অন্যমনস্ক। সকলেই সেটা উপ-লব্ধি করছেন। গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে ঠেকাচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা হিসেবনিকেশ চলছে। ফর্সা মুখ থেকে আরো লাল হয়ে উঠেছে।

বন্ধুরা এক-একটা অছিলায় অনেক আগেই বিদায় নিলেন। চিন্তাহরণবাবু জ্যোতি-র্বাগীশের পিছন পিছন ওপরে উঠলেন। সমস্ত দোতলাটা থমথমে। কোণের একটা ঘরে নীল আলো জ্বলছে। সেই ঘরে রোগী। বারান্দায় একটা চেয়ারে ডাক্তার বসে। বড় ডাক্তারের এক-জন আস্থাভাজন সহকারী ডাক্তার গতকাল থেকে এখানেই আছেন।

জ্যোতির্বাগীশ শানিত দৃষ্টি মেলে স্তব্ধ পরিবেশটা দেখে নিলেন। তারপর পুজোর ঘরে নিয়মিত রাতের জপ করতে ঢুকলেন।

চিন্তাহরণবাবু পায়ে পায়ে নেমে এলেন আবার।

বলো হরি হরিবোল!

ধড়মড়িয়ে শয্যায় উঠে বসলেন চিন্তাহরণবাবু।

বহুক্ষণের ছটফটানির পর এই মাত্র চোখ দুটো লেগে এসেছিল মনে হল। কিন্তু না পুবের আকাশে প্রায় ভোরের আভাস। হরিধ্বনিটা পাড়ার দিক থেকেই যেন...।

তাই। হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন চিন্তাহরণবাবু। সর্বাঙ্গে কাঁপুনি।...কারা আসছে? লালবাড়ির দিক থেকেই তো! তবে কি হয়ে গেল! ছানি-কাটা চোখের সমস্ত জ্যোতি দিয়ে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি। ...ওই তো মুকুন্দ আসছে আগে আগে হন-হনিয়ে। পাড়ার একচেটিয়া শ্মশান-বন্ধু মুকুন্দ।

কে গেল মুকুন্দ?

জ্যোতির্বাগীশ মশাই।

জবাবটা দিয়ে মুকুন্দ সামনে এসে দাঁড়াল। —ওঁর মেয়ে বার বার আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন, একবার নামাতে বলি।

দেহ নিয়ে যারা আসছে তখনো তারা দূরে খানিকটা। মুকুন্দ তাঁকে ডাকার জন্যেই আগে আগে আসছিল। চিন্তাহরণবাবু চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন শুধু। মুকুন্দ ভুল করছে কিনা, বুঝছেন না।

মুকুন্দ বলল, একেই বলে ভাগ্যবানের মৃত্যু। জপে বসেছিলেন, প্রণাম করার জন্য মাথা নামিয়েছিলেন—আর মাথা তোলেননি। সব শেষ। রাত সাড়ে নটায় গেছেন, বাসী করতে নেই বলে একটু রাত থাকতে বেরুনো—

দেহ নামানো হল। হরিধ্বনি দিয়ে আবার তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা। চিন্তাহরণবাবুর হুঁস নেই।

হুঁস ফিরল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। রাজ্যের ঘুম যেন তাড়া করছে তাঁকে। চিন্তাহরণবাবু ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। তাকে একটা আয়না ছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখ টান করে তাকালেন।...নাক...মুখ...চোখ...কান ...আলাদা করে দেখেন না কিছু, কোনো একটা না থাকলে বা খুঁত থাকলে আপনি চোখে পড়ে। কোনো কিছুতে খুঁত থাকলে জ্যোতির্বাগীশেরও ঠিক তেমনি চোখে পড়ে। কিন্তু চোখে পড়েনি। জ্যোতির্বাগীশের ভুল হয়েছিল।...ভুলও হয়।

চোখ দুটো আর খোলা রাখতে পারছেন না চিন্তাহরণবাবু।...আশ্চর্য! আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিছানায় গা ছেড়ে না দিয়ে পারলেন না। আধ-বোজা অবস্থাতেই কান খাড়া করতে চেষ্টা করলেন। হরিধ্বনি তো আর কানে আসছে না। দূরে চলে গেছে বোধহয়।... একেবারে ঘুম আসছে তো নয় এখনো।...ভোরের দিকের বাতাসটা মিষ্টি ঠাণ্ডা লাগছে।... গোলক বাল্যবন্ধু...সহপাঠী...এভাবে চলে গেল ...বুকটা ফেটে যাবার কথা...যাচ্ছেও হয়ত... ঘুম ঠেলে কিছুই.........।

শেষবারের মত ঘুম ঠেলে নিজেকে চোখ রাঙিয়ে আচমকা-শোকটা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন চিন্তাহরণবাবু।

পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লেন। অঘোরে ঘুমুতে লাগলেন।

বাঘিনী

— হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সনাতনদা বললেন, বাঘ মারা এমন কিছু হাতি ঘোড়া নয়। খুব সোজা। কেবল হাতের তাগ থাকা চাই, আর ঠিক জায়গায় বাঘকে জখম করার জন্য দরকার।

স্থান ক্যানিংয়ের এক চায়ের দোকান। একটা নড়বড়ে টেবিল ঘিরে আমরা চারজন। দুটো বেঞ্চে আমি, নকুড়, মাণিক আর সনাতনদা।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল। অফিসের দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে কপালই জখম হল, ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ল না। আমরা তিনজন, মানে আমি নকুড় আর মাণিক একই বছরে ম্যাট্রিক পাশ করি, তারপর ঢুকি টাইপের স্কুলে। টাইপ মেশিনের চাবি টিপতে টিপতে ভাবতাম, আর বছর দুই, তারপর আমাদের নিয়ে অফিসে অফিসে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। তার ওপর আমি আর মাণিক আবার ফুটবল খেলতে পারি।

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি আমাদের অবস্থা ফুটবলের মতনই হবে। এক অফিস থেকে গড়িয়ে দেবে আর এক অফিসের দরজায়। টাইপ মেশিনের চাবি টিপব কি, বড়বাবুর আমাদের টিপে টিপে দেখে মুখ বেঁকাবেন রাঁধুনীর আধসেদ্ধ চাল টিপে মেজাজ বিকৃত করার মতন।

একটানা আড়াই বছর এই খেলা চলল। দরখাস্ত পাঠানো আর নোটিসবোর্ডের বোর্ডে মাথা ঠুকে বাড়ী ফিরে আসা। দু'একবার ডাক এল কিন্তু ইনটারভ্যুর বেড়ার ওপারে আর পৌঁছতে পারলাম না। মারাত্মক সব প্রশ্নের খোঁচায় ভীষ্মের শরশয্যার অবস্থা।

পাটের কারবার কিন্তু প্রশ্ন করল ইলেক-ট্রিসিটির আবিষ্কর্তা কে? মাণিক বলল, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই। নকুড় বলল, গ্যালিলিও।

আমাকে আরো প্যাঁচে পড়তে হয়েছিল। এক লালমুখো সায়েব হুঙ্কার ছাড়ল, এডিশন কিসের জন্য বিখ্যাত! উত্তরটা জানা ছিল। বললাম, এডিশন না এলে, সাবস্ট্রাকশন, মাল্টি-প্লিকেশন, ডিভিসন কিছুই আসত না। পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধানই হত না।

সায়েব ঢক ঢক করে দু গ্লাশ জল খেলেন। তারপর বেয়ারাকে বললেন, প্লিজ টেক হিম আউট অফ মাই সাইট।

কিন্তু তিনজনেই ক্ষেপে গেলাম। বিশেষ করে নকুড়। দুপুরবেলা গড়ের মাঠের বটগাছের তলায় তিনজনে বসলাম। নকুড় বলল, দাসত্ব আর নয়। এতে মানুষ ক্লীব হয়ে যায়। এবার মাছের ব্যবসা করব। লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যে।

আমরা একটু ইতস্ততঃ করলাম। কলকাতা শহরে নকুড়ের বাপের একটা বাড়ী আছে, টাকা পয়সাও কিছু আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের অবস্থা অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। ব্যবসা দরখাস্ত পাঠিয়ে হয় না, তার জন্য মূলধন দরকার।

নকুড় বললে, যে যা পার নিয়ে এস। আমি মোটা টাকা দেব। যে যেমন টাকা দেবে তার তেমনি বখরা। ক্যানিং থেকে মাছ কিনে শেয়ালদায় পাঠাব। দুদিনে একেবারে লাল। তখন আমরাই ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করতে পারব।

ইলেকট্রিসিটির দুঃখটা নকুড় কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

আমরা দু'জনে, মানে মাণিক আর আমি ঘড়ি আংটি বাঁধা দিয়ে সামান্য কিছু নিয়ে এলাম। মাণিক তার মায়ের গলার হারটাও নিয়ে এসেছিল। একবার ব্যবসা জমে উঠলে বিছে হারের বদলে অজগর হার গড়িয়ে দেবে। মাকে বোধ হয় তাই বুঝিয়ে এসেছে।

ক্যানিং পৌঁছলাম। তখন সমস্যা হ'ল একজন মুরুব্বি জোগাড় করতে হবে। পাকা লোক। ব্যবসার ফন্দীফিকির যার নখদর্পণে।

দু' একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই নামটা পাওয়া গেল। সনাতন আইচ। সবজান্তা লোক। গানে, বাজনায়, শিকারে, ব্যবসায় একেবারে অদ্বিতীয়। বহুদিনের বাসিন্দা। ক্যানিংয়ের নাড়ীনক্ষত্র হাতের মুঠোয়।

নকুড় খুশী হ'ল। বলল, এরকম লোকই আমাদের দরকার। তাঁর ঠিকানাটা কি?

ঠিকানায় তাঁকে পাবেন না। বরং গোকুলের চায়ের দোকানে খোঁজ করুন। মাতলার ধারে।

সেখানে গোকুলের চায়ের দোকান মিলল।

তৈরী করার কায়দা শেখাচ্ছেন।

আলাপ হ'ল। ব্যবসার কথা সনাতনদা মন দিয়ে শুনলেন, তারপর নকুড়ের পিঠ চাপড়ে বললেন, ঠিক আছে ভাই। এরজন্য ভাবতে হবে না। মাছের সবচেয়ে বড় ফড়ে মনোহর নস্করের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার আগে দিন কয়েক বাজারটা দেখ। মাছের দর, বিলি-ব্যবস্থা, পাইকারদের কায়দাকানুন।

সেই কদিন ধরে আমরা সকালে গোকুলের দোকানে এসে জমাছি। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি আর সনাতনদার গল্প শুনছি। ফাঁকে ফাঁকে পাইকারদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। এত রকম মাছ যে পৃথিবীতে আছে, এখানে আসবার আগে জানা ছিল না।

একদিন একথায় সেকথায় শিকারের কথা উঠল। পাখী শিকার।

সনাতনদা হাসলেন। অবজ্ঞার হাসি। বললেন, পাখী শিকার যদি হয়, তাহ'লে মশা মাছি শিকারও হয়। দুটো একই ব্যাপার। শিকার বলতে বাঘ সিংহ শিকারই বুঝি। তা এ পোড়া দেশে তো আর সিংহ শিকারের সুযোগ নেই! যে কটা ছিল, তাড়িয়ে গির জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করছে। বাঘ অবশ্য ঢের আছে। শিকার করেও সুখ।

বাঘ শিকারের প্রসঙ্গেই সনাতনদা বললেন, বাঘ শিকার শক্ত কিছু নয়, যদি কায়দাটা জানা থাকে। রাতের বেলা বাঘের দু চোখ জ্বলে। টর্চের সবুজ বাল্বের মতন। গুলী চালাতে হয় ঠিক তার মাঝখানটায়। বাস, আর দেখতে হবে না। যত বড় জাঁদরেল বাঘই হোক, বাঘ-লীলা তাকে সংবরণ করতেই হবে। তবে একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ। বাঘ ঘায়েল হবে কিন্তু মরবে না। আহত বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর দুনিয়ায় নেই। সে বাঘ তোমার জান নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেই।

আপনি জীবনে কটা বাঘ মেরেছেন সনাতনদা? প্রশ্নটা আমি করলাম।

সনাতনদা অমায়িক হাসলেন। ঠিক আর গুণে বলা যায় ভাই, না কোনদিন গুণেছি।

বাঘের চামড়াগুলো বাড়ীতে রাখেন নি?

যাচ্ছে। বাঘ মারা আমার নেশা। ওইটুকু করি। তারপর মরা বাঘটা 'বিটারনের' দিয়ে দিই।

দোকানের গোকুল সচরাচর কথা বলে না। কথা শোনে। সেদিন কিন্তু বলল, আচ্ছা সনাতনদা, সেবার যে সায়েব এল বাঘ শিকার করতে। আপনাকে সংগে নিয়ে যাবার জন্য অত খোঁজাখুঁজি করল, কোথায় ঘাপটি মেরে ছিলেন বলুন তো?

সনাতনদা চটলেন, কার ধার করে খেয়েছি যে, ঘাপটি মেরে থাকব? কথাটা বলেই সংশোধন করে নিলেন, অবশ্য তোর কাছে ছাড়া। তারপর আমাদের দিকে ফিরে নাক কান মলে বললেন, সেই ব্যাপার থেকে নাক কান মলেছি ভায়া, সায়েব নিয়ে আর শিকারে যাব না।

কি রকম? কি ব্যাপার? শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠল:

সনাতনদা গোকুলের দিকে চেয়ে বললেন, এক কাপ চা, একটা ডবল ডিমের পোচ। খরচটা অবশ্য নিউ বেঙ্গল ফিশিং করপোরেশনের। অর্থাৎ আমাদের। চা এল। ডবল ডিম।

সনাতনদা সুরু করলেন, ডানকান সায়েব শুনেলাম [illegible] বিখ্যাত শিকারী। বাঘ মারতে ভারতবর্ষে এলেন। খুঁজে বের করলেন আমাকে। জানেন সুন্দরবনের প্রত্যেকটি বাঘের কুষ্ঠী আমার কণ্ঠস্থ।

রাজি হলাম, তখন কি জানি, সায়েব নিজের দেশে শুধু স্নাইপ আর খরগোস শিকার করেছেন। জীবনে বাঘের ডাকও শোনেন নি।

মাচা বাঁধা হ'ল। একটু দূরে একটা মরা ছাগল ফেলে রাখা হ'ল গাছের নীচে। আমি আর সায়েব উঠলাম মাচায়। বন্দুক বাগিয়ে বসলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। বাঘ আর আসে না। সায়েব তো মহা খাপ্পা। শক্ত শক্ত ইংরেজীতে আমাকে গাল দিতে আরম্ভ করলেন। আমি চুপচাপ। একটি কথাও বললাম না। বাঘ শিকারে উত্তেজিত হ'লেই সর্বনাশ।

ভোর তিনটে নাগাদ বাঘ এল। এত বাঘ শিকার করেছি, কিন্তু এমন প্রকাণ্ড বাঘ আমি এর আগে দেখি নি। কাঁচা সোনার বর্ণ, অন্ধকারেও বন যেন আলো করে রয়েছে। গায়ে কালো কালো ডোরা। লাল টকটকে জিভটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝুলছে। ছাগলটাকে একবার শুঁকেই মুখ ফেরাল। বোঝা গেল বুড়ো বাঘ। বয়সকালে সাবধানী হয়েছে, পচা, বাসি মাংস মুখে তোলে না।

ছাগলের দিক থেকে মুখ ফেরাতেই আমরা নজরে পড়ে গেলাম। আমি আর সায়েব। এর আগে বোধ হয় গঙ্গামাটি রংয়ের মানুষ প্রচুর খেয়েছে, তাই আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সায়েবের দিকে দেখল তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রচণ্ড এক চীৎকার। ইউরেকা জাতীয়। মাচাটা থরথর করে কেঁপে উঠল। সংগে সংগে ডাল পাতা। তাক করতে করতেই আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সায়েব থর-থর করে কাঁপছেন।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভাবলাম ম্যালেরিয়া। হয়তো সায়েব এদেশের খানা-ডোবায় স্নান করেছেন। শিকারীরা খাবার বেপরোয়া হয় কিনা। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম ম্যালেরিয়া নয়, ভয়ের কাঁপুনি।

নীচে বাঘটা গোঁ গোঁ করছে, ওপরে সায়েব। এই দু রকম গোঁ গোঁর মাঝখানে আমার অবস্থাটা বোঝ। সমানে তাগ করে চলেছি। হিসাব করে দুচোখের মধ্যের জায়গাটা।

বাঘটা লাফিয়ে ওঠার সংগে সংগে ট্রিগার টিপলাম। দ্রুম। বাঘটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সায়েব আমার পিঠে। তারপর এক কাঁধে বাঘ, আর এক কাঁধে সায়েব নিয়ে ভোরবেলা বন থেকে বেরোলাম। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, সায়েব নিয়ে আর শিকারে যাচ্ছি না।

আচ্ছা সনাতনদা, এপর্যন্ত আপনার শিকার ফসকায় নি কোনদিন, তাই নয়? একেবারে বেকুবের মতন প্রশ্ন করে বসল মাণিক।

আমরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মাণিকের এ হেন অর্বাচীন প্রশ্নে সনাতনদা হয়তো ফেটে পড়বেন। কিন্তু আশ্চর্য সনাতনদা সে রকম কিছুই করলেন না। কেবল ডানহাতের একটা আঙ্গুল উঁচু করে দেখিয়ে বললেন, একবার।

একবার? কোথায়? সুন্দরবনে?

উঁহু উদয়পুরের জঙ্গলে. জীবনে এই একবার।

আমরা ঘন হয়ে বসলাম। বিচিত্র এক কাহিনী শোনার আশায়।

ওই রকম গাছে মাচা বেঁধে বসে আছি। একদিন, দুদিন। শিকারের দেখা নেই। মনে মনে ভাবলাম রাণা প্রতাপ অরণ্যে আত্মগোপন করে থাকার সময় বাঘের বংশনাশ করে গেছেন বোধ-হয়। তাই এ তল্লাটে একটিরও দেখা মিলছে না। ঠিক সেই সময় বিকট গর্জন করে একেবারে মাচার নীচে এসে দাঁড়াল বাঘ নয় বাঘিনী। দুটো চোখ জ্বলছে দপদপ করে। আমি হামা-গুড়ি দিয়ে বসে টিপ করতে আরম্ভ করলাম। দুটো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মধ্যস্থলে। সহজ, সরল হিসাব।

গুলী ছুঁড়লাম। লাগলও ঠিক। কিন্তু, আশ্চর্য, বাঘ কোথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, তা নয়, একবার আর্তনাদ করে তীরবেগে জঙ্গলে ছুটে পালাল। আমি হতভম্বের মতন রাতটা মাচায় কাটিয়ে সকালে ফিরে এলাম।

এটা কি করে হ'ল সনাতনদা? আমরা এক-যোগে বিস্ময় প্রকাশ করলাম। আপনার তাগ তো ভুল হবার নয়।

সনাতনদা হাসলেন, হয়েছিল ভাই, হিসাবে একটু গোলমাল হয়েছিল। সেই বাঘিনী ধরা পড়ল আড়াই বছর পর। মাথার ঘা ভীষণ বেড়েছে। ব্রেনের গোলমাল শুরু হয়েছে। আপন পর জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তাই জঙ্গল ছেড়ে বাঘিনী ধুঁকতে ধুঁকতে লোকালয়ে এসে হাজির। সেই সময় গোলমালটা ধরা পড়ল।

কিসের গোলমাল?

ওই হিসাবের।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা অবাক-চোখে সনাতনদার দিকে চেয়ে রইলাম।

বাঘিনীটা ট্যারা। সেই জনাই দু'চোখের মধ্যখানের হিসাবটায় একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নয়তো আমার লক্ষ্য ফসকাবার নয়।

সনাতনদা চায়ের কাপ নিঃশেষ করে সকলের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

নিউ বেঙ্গল ফিশিং করপোরেশন পাল গোটাল। নকুড়ই উদ্যোক্তা, সেই পিছিয়ে গেল। বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। বাড়ীর অবস্থা ভাল, কাজেই চাকরী না হলেও, পাত্রী জুটে গেল।

নকুড় বলল, এ ব্যবসায় থাকা চলবে না ভাই। বাসরঘরে ক্ষেপাবে।

আমাদের বলবার কিছু ছিল না। যা সামান্য সম্বল ছিল, সব পাইকারদের হাতে তুলে দিয়েছি। গোকুলের দোকানেও দিয়েছি কম নয়।

ঠিক হল যাবার আগে সনাতনদার সংগে একবার দেখা করে যাব।

চায়ের দোকানে দেখা মিলল। সব শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন, তোমাদের সংগে আলাপ হয়ে খুব ভালই লেগেছিল, তা ব্যবসা না কর, এসো মাঝে মাঝে। বেড়াবার পক্ষেও ক্যানিং খারাপ জায়গা নয়।

গোকুল মাঝখান থেকে গণ্ডগোল করল।

বলল, একটা কাজ করুন সনাতনদা। শেষ দিনটা আর দোকানের চা খাবেন না, এদের নিয়ে যান আপনার বাড়ী। একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি হোক।

মনে হ'ল সনাতনদার মুখে যেন ক্ষণেকের জন্য একটা ম্লান ছায়া দেখা গেল, কিন্তু তিনি সামলে নিলেন। আমতা, আমতা করে বললেন, বেশ তো, চল না তোমরা। এ আর বেশী কথা কি। তোমাদের বৌদি চাটা ভালই করে।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়া[illegible]

মাতলা নদীর ধার দি[illegible] রাস্তা। কিছুটা গিয়েই টিনের চালা দেখা [illegible]।

আমাদের দিকে ফি[illegible] সনাতনদা বললেন, তোমরা আস্তে আস্তে এসো ভাই। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে গিন্নীকে খবর দিই।

সনাতনদা এগোলেন। আমরা গতি একটু মন্থর করলাম।

মিনিট পনেরো কাটল। সনাতনদার দেখা নেই।

নকুড়ই বলল, কি ব্যাপার? সনাতনদা বিরাট আয়োজন করছেন নাকি? এত দেরী।

কথার সংগে সংগে নকুড় পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আমরা পিছন পিছন।

বেশী দূর যেতে হ'ল না। কাংস্য কণ্ঠের আওয়াজে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বলি লজ্জা-ঘেন্নার মাথা কি একেবারে খেয়েছ? একটি পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, একপাল বন্ধু-বান্ধব ডেকে আনছ চা গেলাতে! উনানের ছাই ধরে দেব সবাইকে।

মনে হল সনাতনদা ফিস ফিস করে কি বললেন। সব কথা শোনা গেল না, কিন্তু ওদিকের গর্জন আরো তীব্র।

তোমার বন্ধুদেরও বলিহারি। বাড়ীতে কিছু জোটে না, তাই তোমার বাড়ী চড়াও হয়ে ফিস্টি করতে এসেছে।

আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই সনাতনদা, যিনি অব্যর্থ লক্ষ্যে বহু বাঘ-বাঘিনীকে চিরকালের জন্য খতম করে দিয়েছেন, একটি মাত্র গুলিতে, তিনি আজ কত অসহায়, কত শক্তিহীন।

এ গর্জন থামাবার তাঁর কোন শক্তি নেই।

কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে? এবার কণ্ঠস্বর আরো নিকটে, তোমার বলতে লজ্জা করে, আমি বলছি। হার-হাভাতেদেরও সরম নেই। কি নির্লজ্জ গো সব।

নকুড় সামনে ছিল। ছুটে পালাতে গিয়ে

বালিগ্রামের ফিলিপ গাঙ্গুলির জীবনচরিত
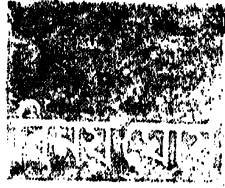
অভিমানে বালির 'দত্ত' গায় গড়াগড়ি। ফিলিপের বাস হাওড়ার বালিগ্রামে হলেও তিনি কায়স্থ 'দত্ত' নন। ব্রাহ্মণ 'গাঙ্গুলি'। দত্তদের মতন জাত্যভিমান তাঁর ছিল না, কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কুলকৌলীন্য দুয়েরই অভিমান বিসর্জন দিয়ে একদা তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দু পরিবারের অনেক খ্যাতনামা সন্তান খৃষ্টান হয়েছেন, সকলেই তাঁদের নাম জানেন—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রেভারেন্ড কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি—কিন্তু ফিলিপ গাঙ্গুলির কথা অনেকেরই জানা নেই। বাংলাদেশ তো দূরের কথা, বালিগ্রামের বাসিন্দারাও তাঁর বিষয় কিছু জানেন কিনা সন্দেহ। অথচ সমাজের ঘরের খবর পেতে হলে পূর্বোক্ত রেভারেন্ডদের মতন বিখ্যাতদের ছাড়াও ফিলিপের মতন সাধারণ অ-বিখ্যাতদের চরিতকথাও জানতে হয়। সামাজিক ইতিহাসের সাধকরা বলেন, যাঁরা জনসমাজের প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখতে প্রয়াসী হবেন, সম্ভব হলে শ্রুত অশ্রুত, নিন্দিত অভিনন্দিত, সকল লোকের জীবনকাহিনী তাঁদের সন্ধান করে সংগ্রহ করা উচিত। অশ্রুতদের কথা যদি অলিখিত না থাকত তাহলে সমাজের অজস্র আনাচ-কানাচ, অলি-গলি এবং আসল ভিত্তিভূমির ইতিহাস আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকত না। ফিলিপ গাঙ্গুলি তাই অশ্রুত হলেও তাঁর চরিতকথা শ্রবণযোগ্য।

ফিলিপ গাঙ্গুলির পিতৃদত্ত নাম জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলি। ইংরেজীতে তিনি লিখতেন—

JOGUTH CHUNDER GANGOOLY
(Baptised Philip)

এবং তাঁর যে ইংরেজী বই বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে, তার 'টাইটেল' এই—

Life and Religion
of
THE HINDOOS
with
A SKETCH
of
My Life and Experience.

খৃষ্টানধর্মের প্রেরণায় ফিলিপ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ইউনিটেরিয়ান চার্চের তরফ থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝির কথা। আমেরিকায় গিয়ে তিনি দেখেন যে সেখানকার ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে একটা আজব চিড়িয়াখানা মনে করে। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, চড়কের গাজনে বর্শা-বিদ্ধ সন্ন্যাসীর শূন্যে ঘূর্ণপাক, জগন্নাথের রথচক্রতলে ভক্তবৃন্দের আত্মবলিদান ইত্যাদির শ্রুতিরোচক কাহিনী বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও স্মৃতিকথায় শুনে শুনে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাদের একটা ভয়াবহ ধারণা হয়ে গেছে। ফিলিপ লিখেছেন, 'আমেরিকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা-বার্তার ভঙ্গি শুনে মনে হয় যেন তারা আমার চেয়েও, এমনকি আমার ঠাকুরমার চেয়েও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশি জানে। ভারতের দেব-দেবী, উৎসব-পার্বণ, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার সব যেন তাদের নখদর্পণে। শুধু ছেলে-মেয়েরা নয়, বড় বড় মার্কিন বিজ্ঞব্যক্তিরাও এই ধরণের অকাট্য অজ্ঞের মতন কথাবার্তা বলেন। কিন্তু দুদিন বা দু'চার বছর ভারতবর্ষে থেকে যদি তারা ধর্ম সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ ও গূঢ়

ফিলিপ গাঙ্গুলি অঙ্কিত জগন্নাথের রথ ও উৎসবের অন্যান্য উপকরণ।
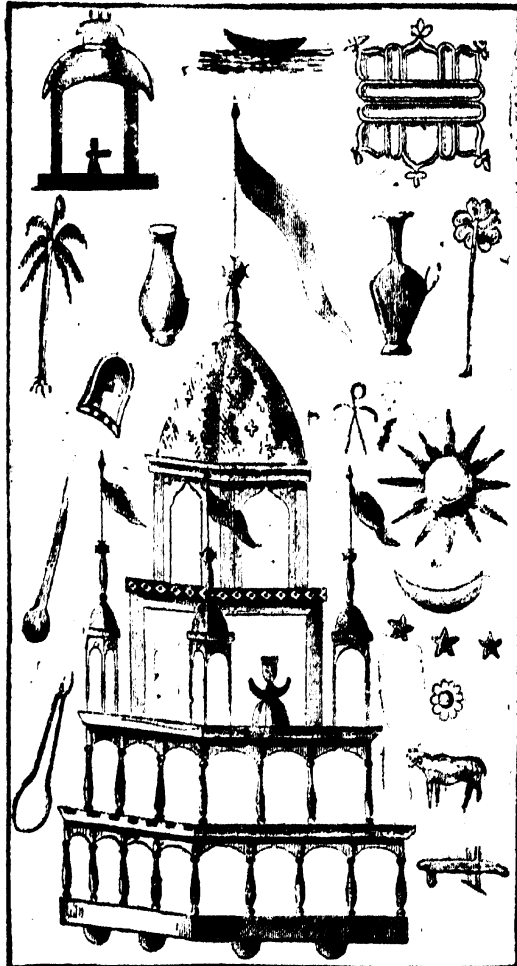
হোঁচট খেয়ে পড়ল। একেবারে কাঁটা ঝোপের ওপর।

আমরা সবাই মিলে তাকে টেনে তুললাম। অনেক জায়গা ছড়ে গেছে। রক্তও পড়ছে।

চোখ তুলেই আর চোখ নামাতে পারলাম না।

একেবারে সামনে। প্রায় পথ রোধ করে। এক হাতে অনেকগুলো আধ ময়লা কাপড়। বোধ হয় কাচবার জন্য নদীতেই যাচ্ছেন।

সনাতনদা কেন সুবিধা করতে পারছেন না, এবার বুঝতে পারলাম। দু'চোখের ঠিক মাঝখানে লক্ষ্য করার অসুবিধা রয়েছে। ভদ্রমহিলা রীতিমত ট্যারা।

ভারতবর্ষ বুঝে ফেলা সম্ভব হত তাহলে তো ভাবনাই থাকত না। সারাজীবন, এমনকি পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষে থেকেও আমরা যা বুঝতে পারি না, বিদেশী আমেরিকানরা তা কোনরকমে চোখের দেখা দেখেই বুঝে ফেলে দেন। অবাক লাগে এঁদের অজ্ঞতার বহর দেখে।"

আমেরিকানদের এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তধারণা দূর করার জন্য ফিলিপ গাঙ্গুলি সংকল্প করেছিলেন, ভারতীয় হিন্দুদের ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করবেন। তাঁর মিশনারী গুরুভাইরা একাজে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, মনে হয় দুটি কারণে। প্রথম কারণ, ফিলিপের খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস যদি অটল থাকে তাহলে হিন্দুধর্মের টীকা যাই করুন তিনি তাতে কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয় কারণ, ফিলিপ গাঙ্গুলির আগে আর কোন ভারতবাসী বা বাঙালী আমেরিকায় গেছেন কিনা জানি না। অন্ততঃ বাংলাদেশ থেকে ফিলিপই মনে হয় প্রথম মার্কিন দেশ যাত্রী। কাজেই তাঁর ভারত বৃত্তান্ত, তৎসহ আত্মজীবনবৃত্তান্ত থাকলে, মূল্যবান বলেই গৃহীত হবে। হিন্দুদের জাতি ও বর্ণতত্ত্ব, উৎসব-পার্বণ, সামাজিক-পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, টোল-পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি নানা-বিষয়ে ফিলিপ তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন হিসেবে নয়, শতবর্ষ পূর্বে বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন সাধারণ শিক্ষিত বুদ্ধিমান খৃষ্টধর্মী ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার বিবরণ বলে এর কদর হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ফিলিপের আরও একটি গুণের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি শুধু বই লেখেননি, ছবিও এঁকেছেন। লেখাতে যেমন, ছবিতেও তেমনি বেশ পাকা হাত ছিল ফিলিপের। বইখানির মধ্যে দুটি প্লেটে কতকগুলি টুকরো ছবি আছে তাঁর আঁকা। একটি প্লেটে হিন্দু ললনারা যেসব অলঙ্কার ব্যবহার করেন তার ছবি—চিরনলা ও কণ্ঠমালা হারের, হাতের বালার, কানের কান বালার ও ঝুমকোর এবং বাজুর ছবি। দ্বিতীয় প্লেটে জগন্নাথের রথের এবং তৎসহ রথোৎসবের সমস্ত উপাদান ও উপচারের ছবি। এই ছবি-গুলিরও ঐতিহাসিক উপকরণমূল্য অল্প নয়।

তিনশ পৃষ্ঠার বইয়ের প্রায় তিনভাগের একভাগ ফিলিপের স্বলিখিত জীবনবৃত্তান্ত। গোয়েন্দা কাহিনীর মতন রোমাঞ্চকর নয়, কিন্তু বেশ ভাল। আত্মজীবনীর মধ্যে লেখকের অজ্ঞাতসারেও যে আত্মম্ভরিতা উঁকি মারে, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না ফিলিপের আত্মকথায়। ভূমিকায় ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন কোন অসত্য ও অহমিকার ছায়া না পড়ে তাঁর রচনায়। বাস্তবিকই তা পড়েনি কোথাও। সহজ, সরল ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে গল্প বলার মতন তিনি তাঁর পরিবার, সমাজ ও জীবনের কথা বর্ণনা করে গেছেন। বোঝা যায়, অতি-রঞ্জনের আর্ট একেবারেই তাঁর অনায়ত্ত।

কোন সন তারিখের বালাই নেই তাঁর বইতে। কত সনে তাঁর জন্ম, কত সনে তিনি খৃষ্টানধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, তা কিছুই বলেননি, কেবল কবে আমেরিকা যাত্রা করেছেন তাই বলেছেন। তবু কালনির্ণয় করার অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান তাঁর বইতে আছে। তা থেকে মনে হয় উনিশ শতকের তিরিশের শেষে বা চল্লিশের গোড়ায়। তাঁর জন্ম, পঞ্চাশের শেষে বছর সতের-আঠার বয়সে খৃষ্টধর্মের আকর্ষণে আমেরিকা যাত্রা। ১৮৬০ সালের মধ্যেই তিনি আমেরিকা থেকে ইংলণ্ড ঘুরে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। দিনকালের এই পটভূমি মনে রেখে তাঁর জীবনকথা তাঁর নিজের জবানিতেই শোনা ভাল।

ফিলিপ গাঙ্গুলি লিখছেন : কলকাতা থেকে মাইল সাতেক দূরে বালি গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম। বালি বেশ প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ও বিদ্যাচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। অনেকগুলি পাড়ায় গ্রামটি বিন্যস্ত, এক-এক পাড়ায় এক-এক জাতের লোকের বাস। দক্ষিণপাড়ায় ব্রাহ্মণের বাস বেশি। এ ছাড়া কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, গোয়ালা, ধীবর, রজক, হাড়ি-ডোম পর্যন্ত সকল জাতের লোকের বাস আছে গ্রামে। আমার জন্মকালে প্রায় হাজার দুই ব্রাহ্মণের বাস ছিল বালিতে। দেবদেউলও ছিল অনেক। হাটবাজারও বেশ বড় ছিল, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব ছিল গ্রামের। দুজন ফরাসী ভদ্রলোকের দুটি রম্-চোলাইয়ের কারখানা ছিল, এবং বেশ বড় একটি চিনির কল বসিয়েছিলেন একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। তেল, বস্তা, ইঁট দড়ি ইত্যাদি ছোট ছোট কারখানাও বহু ছিল। গ্রামের ভিতর দিয়ে একটি বড় খাল বয়ে যাওয়ার ফলে উত্তরদিকের পাড়াটি মূল গ্রাম থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। উত্তরদিকের পাড়া বলেই পরে তার নাম হয়ে যায় 'উত্তরপাড়া'। দক্ষিণের সঙ্গে গ্রামের সর্বাংশের যোগাযোগ ছিল দুটি লোহার ঝুলানো সেতুর উপর দিয়ে। তার একটি তৈরি করেছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি, আর একটি তৈরি করেছিলেন গভর্ণমেণ্ট। কলকাতা থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকো করে যাওয়ার সময় মনে হত ব্রিজ দুটি শূন্যে ঝুলছে। তিন-চারটি ইংরেজী স্কুল ছিল বালিতে, তার মধ্যে একটি ছিল খালের উত্তর-দিকে উত্তরপাড়ায়, সরকারী স্কুল, ধনিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা সেখানে ইংরেজী শিক্ষা করত। কলকাতা থেকে বালি যেতে হলে তখন রেলপথেও যাওয়া যেত, নৌকো তো ছিলই।

আমার পিতাই প্রথম এসে বালিতে বসবাস করেন। পূর্বপুরুষরা জমিপুরে না কোথায় বাস করতেন সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। পিতৃমাতৃহীন বলে ছেলেবেলা থেকে বাবা তাঁর খুড়ো খুড়ীর কাছে মানুষ হয়েছেন অল্প বয়স থেকে কলকাতার এক ধনিক পরিবারের পুরোহিতের তল্পিতল্পা বইতে বইতে তিনি নিজেও পৌরোহিত্যের কাজকর্ম বেশ শিখে ফেলেন। পুরুতগিরি করে কিছু পয়সা
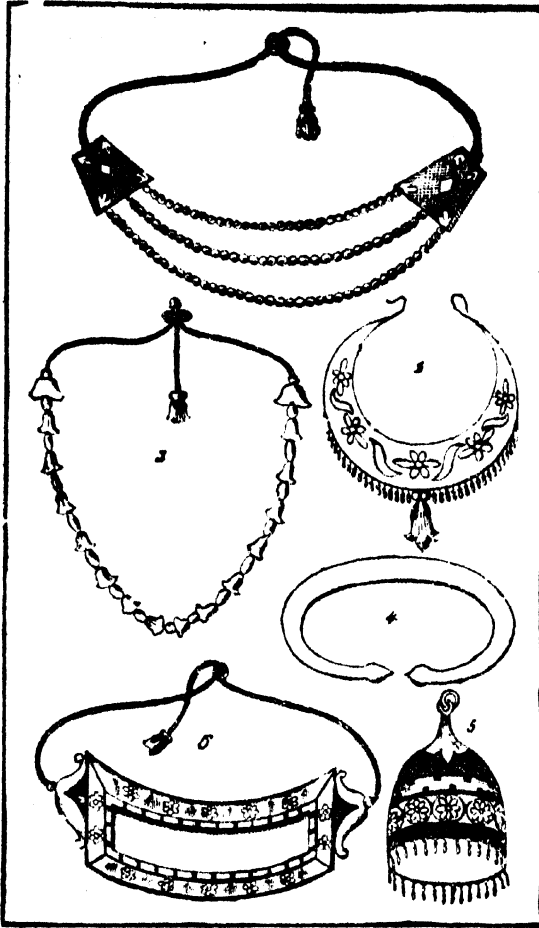
ফিলিপ গাঙ্গুলি অঙ্কিত ভারত-ললনাদের গহনা।

জমিয়ে তিনি বিবাহ করেন এবং একটুকরো জমি কিনে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে খুড়োর আশ্রয় ছেড়ে চলে আসেন। ক্রমে নটি সন্তান হয় তাঁর, পাঁচজন তার মধ্যে জীবিত। আমি হলাম চতুর্থ সন্তান। আমার একটি মাত্র ভাই হল, তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র, আর আমি হলাম জগৎচন্দ্র। বাকি সব বোন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন তখনও হয়নি বলে বোনদের শিক্ষার কোন সমস্যাই দেখা দিল না। দাদা কৃষ্ণচন্দ্রের পড়াশুনোর দিকে মতিগতি ছিল না। কাজেই বাবা আমাকে মানুষ করার জন্য সচেষ্ট হলেন, নিজে ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাই আমার মগজের বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলাই তাঁর কাজ হল। স্তবস্তোত্রমন্ত্র দিয়ে শুরু হল, অবিশ্বাস্য ভক্তির বন্যায় আমার বালকচিত্ত ভাসতে লাগল। শিব-দুর্গা কৃষ্ণবিষ্ণু সকল দেবদেবীর মন্ত্রতন্ত্র আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। পনেরোর বয়স হল ক্রমে, ব্রাহ্মণের ছেলে, যজ্ঞ বরণ করলাম। ভক্তির মাত্রা কৈশোরে আরও বাড়তে লাগল। দেবদেবী ঘরে যাঁরা আছেন, এবং ঘরের বাইরের পাড়ায় ও প্রতিবেশীদের গৃহে, একে একে তাঁদের সকলকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় না নিয়ে এক পাও বাড়াতাম না কোথাও।

পাঠশালায় লেখাপড়া শেখা হল। বেশ ভাল লিখতে পড়তে পারি। কিন্তু গুরুমশায়ের কাছে যা শিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি বাবার কাছ থেকে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, সুন্দর সুন্দর সব সংস্কৃত স্তবস্তোত্র আমি অনর্গল বলতে পারতাম। দেখেশুনে বাবা মনে করলেন, আমি ক্ষণজন্মা, ভবিষ্যতে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ-টুরুষ কিছু একটা হতে পারি। প্রতিবেশীরাও তাই ভাবতে লাগলেন। পাড়ার মেয়েমহলে আমার অসাধারণ প্রতিপত্তি বাড়ল। ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগল অন্দরমহলে, যেখানে বাইরের লোক তো দূরের কথা, সূর্যের পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। আমার সেখানে অবারিত দ্বার, বয়সের দিক থেকেও কোন বাধা নেই। বউ গিন্নী, বৃদ্ধা, যুবতী সকলেই আমাকে আদরযত্ন করেন। আমি তাঁদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত সব পাঠ করে শোনাই, স্তবস্তোত্র আবৃত্তি করি। মুখ দিয়ে অজস্র ধারায় অমৃততুল্য ভগবদ্বাণী ঝরে পড়ে। তারপর থালা থালা মিষ্টান্ন, ফলমূল নিয়ে ঠাকুমা-দিদিমা, পিসিমা-মাসিমা, বৌদি-দিদিরাণীরা আমাকে ঘিরে বসেন, পাখায় বাতাস করেন। নারীকণ্ঠে ধন্য ধন্য রব ওঠে। জগৎচন্দ্র সত্যিই জগতের চন্দ্র, মা আমার রত্নগর্ভা, এমন সোনার চাঁদ যিনি গর্ভে ধরেছেন তিনি সাক্ষাৎ দেবী ছাড়া কিছু নন। মা-বাবার বুক ফুলে ওঠে আনন্দে।

যখন আমার তের চোদ্দ বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। অকূল সমুদ্রে পড়ি। খুড়ো কিছুটা সহায় হন। আমাকে 'যবনের ভাষা ইংরেজী' শেখাবার জন্য তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষিত একজন যুবককে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরে উত্তরপাড়া গবর্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু দু একজন শিক্ষকের চাবুকের দাপটে সেখানে পড়া আর সম্ভব হয় না। অন্য আরও দু'চারটে স্কুলে ভর্তি হই, কিন্তু কোথাও পাঁচ ছ মাসের বেশি টিঁকে থাকতে পারি নি। পড়াশুনায় এইভাবে বাধা পাওয়ার ফলে আমার মন ক্রমে ঈশ্বর চিন্তার দিকে ধাবিত হতে থাকে। দ্বিগুণ উদ্যমে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা আরম্ভ করলাম। পড়াশুনা অবশ্য একেবারে ছাড়লাম না, স্কুল যাওয়াও চলতে থাকল। নিশ্চল নৈরাশ্যের মধ্যে মনে হল যেন একটু আলোর আভাষ পাচ্ছি। ক্রমে কালীকৃষ্ণ থেকে ক্রাইস্ট পর্যন্ত এই আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল আমার জীবনে।

অবশেষে একদিন ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের মূর্তি আমার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল, সমুদ্রের বুকে দ্বীপের মতন। আমার জীবনের ভাঙ্গা তরী ধীরে ধীরে সেই দ্বীপে ভিড়ল। কেমন করে তাই বলছি। শুনেছিলাম, কলকাতা শহরে রেভারেণ্ড আলেকজান্ডার ডাফ ও তাঁর সহযোগী মিশনারীরা নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকদের খৃষ্টান করছেন। খৃষ্টান ও খৃষ্টধর্মের উপর বিরক্তি আর অশ্রদ্ধায় মনটা বিষিয়ে উঠলো। সাধারণ হিন্দুদের তখন খৃষ্টান সম্বন্ধে আদৌ ভাল ধারণা ছিল না। খৃষ্টানরা গুরুজনদের তাচ্ছিল্য করে, অখাদ্য খায়, অনাচারের প্রশ্রয় দেয়, এই তাদের বিশ্বাস। আমারও তাই বিশ্বাস হল। যারা শান্তির কথা বলে, মৈত্রীর কথা বলে, তারাই দেখা যায় কারণে অকারণে যুদ্ধ করে, নিজেরা 'ডুয়েল' লড়ে, ইচ্ছা মতন জীবহত্যা করে এবং সবরকম সামাজিক বৈষম্যেরও আস্কারা দেয়। তাহলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কেন খৃষ্টধর্মের কাছে ক্ষুণ্ণ হবে? আমার মা পর্যন্ত একদিন ডেকে বললেন, "দ্যাখ জগৎ! মুখপোড়া সাহেবগুলো মুখে খেস্টানী ধর্মের বুলি কপচায় বড় বড় কাজে ঠিক তার উল্টো করে। দেশের লোকের ওপর কি অত্যাচারটাই না তারা করছে! মহারাণীর সঙ্গে দেখা হলে একবার ঝগড়া করতাম, বলতাম তোমার ধার্মিক ছেলেদের মানে মানে বিদেয় হতে বল, ঢের হয়েছে, আর দরকার নেই।"

মার কথা মিথ্যে নয়।

বিরক্তি থেকে আসক্তির, ঘৃণা থেকে প্রেমের উৎপত্তি। মনে হল, সবই তো শোনা কথা, আসল কথাটা কি একবার খৃষ্টধর্মের বইপত্র পড়ে দেখা যাক। গ্রামের নীচজাতের লোকদের হাতে দেখতাম খৃষ্টধর্মের পুস্তক-

পুস্তিকা। মিশনারীদের প্রচার তাদের মধ্যেই চলত বেশি। একদিন একজনের কাছ থেকে একখানা পুস্তিকা চেয়ে নিলাম, সেটি 'সার্মন অন দি মাউন্ট'। কি অপূর্ব তার সব কথা, মর্ম পর্যন্ত স্পর্শ করে, পাষণ্ডের হৃদয়েও সাড়া জাগায়। সার্মনগুলি পড়ে পুরো 'বাইবেল' পড়ার জন্য মন উদগ্রীব হল। কোথায় পাই বাইবেল? একদিন একটি ব্রাহ্মণ ছেলে কিছু কাগজপত্র ও একখানি বড় বই হাতে করে আমার কাছে এল, সেগুলি দিয়ে তাকে ঘুড়ি বানিয়ে দিতে হবে। বইখানি বাইবেল, মিশনারীরা গ্রামে গ্রামে বিলি করে বেড়ায়, সে একটা কপি পেয়েছে। অন্য কাগজ দিয়ে তাকে ঘুড়ি তৈরী করে দিলাম, বাইবেলটি হস্তগত করলাম। বাইবেল পড়া শেষ হল, অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকাও। চমৎকার বই। এদিকে চেঁচামেচি শুরু হল চারিদিকে, রব উঠলো জগৎ পাদ্রির পাল্লায় পড়েছে, খৃষ্টানী চালে চলছে, অখাদ্য খাচ্ছে অপাঠ্য পড়ছে, পরিবারের সর্বনাশ, দেশের কুলাঙ্গার। গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন, বললেন, "জগৎ, তোর মনে এত ছিল!"

মনে আমার সত্যিই কিছু ছিল না। আর বাইবেল পড়ে বা মিশনারীর বক্তৃতা শুনে রাতারাতি আমি খৃষ্টান হবারও সংকল্প করিনি। মনে আমার অনেক প্রশ্ন জাগতে থাকল। ক্রাইস্টের কথা সুন্দর, ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপে মন সায় দেয় না। সব চেয়ে খটকা লাগল—বাবার গড্, ছেলেও গড্, হোলি গোস্টও গড্—এই প্রত্যয়ে! এত 'গড' কেন? পিতা যদি ভগবান হন, পুত্রও ভগবান হন কি করে? এর চেয়ে হিন্দুদের ত্রিমূর্তির প্রত্যয় অনেক উচ্চস্তরের। ব্রহ্মা সৃষ্টির, বিষ্ণু স্থিতির, শিব প্রলয়ের দেবতা। সৃষ্টির পর স্থিতি, স্থিতির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি। এ চিন্তার একটা ছন্দ আছে, কিন্তু পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, পবিত্র প্রেতও ঈশ্বর—এ চিন্তার মধ্যে ছন্দ বা সামঞ্জস্য তো নেই-ই, যুক্তিও নেই। রামমোহন রায় এই বিষয় নিয়েই মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন এবং ক্রাইস্টকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর উপদেশ ও বাণী সংকলন করে প্রচারও করেছিলেন, কিন্তু ক্রাইস্টের অলৌকিক মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করতেন না। আমারও ঠিক একই অবস্থা হল।

এমন সময়ে আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। সে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। আমিও তার কথায় ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলাম। ঈশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয়, এই চিন্তাই তখন আমার প্রধান অবলম্বন হল। কিন্তু বেশিদিন ব্রাহ্ম থাকা সম্ভব হল না। ব্রাহ্মরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান, কিন্তু কোথায় যেন তাঁদের মধ্যে একটা উদারতার অভাব লক্ষ্য করলাম। তাঁরা ধর্মের দিক থেকে পৌত্তলিকতার বিরোধী, কিন্তু গৃহে অনেক দেবদেবীর উৎসব করেন। তাঁরা জাতিভেদ মানেন না, কিন্তু জাত ভেঙে বা কুল ভেঙে বিবাহাদি করতে খুব কম ব্রাহ্মকেই দেখা যায়। আহার-বিহারে, আচার-ব্যবহারে তাঁরা শান্ত, শুদ্ধ ও সামাজিক পদমর্যাদা বিলক্ষণ মেনে চলেন। এইসব দেখেশুনে আমার ভাল লাগল না। ব্রাহ্মদের মধ্যে সত্যকার ধর্মের উপলব্ধির ব্যক্তিও দু-চারজন দেখেছি, যেমন আচার্য মহেশ-চন্দ্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবতুল্য লোক, যেমন বিদ্যা, তেমনি ব্যক্তিত্ব, তেমনি পৌরুষ। কাছে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। কিন্তু ক'জন এরকম মানুষ আছেন? অতএব ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে আবার সেই দ্বীপের সন্ধানে ভেসে পড়লাম।

সি সি সিংহ নামে আমার এক খৃষ্টান বন্ধু ছিল। একদিন সে বলল যে ইজেন্স প্রাট সাহেবের কাছ থেকে শুনেছে, আমেরিকার একজন বিখ্যাত ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টান কলকাতায় এসেছেন। তাঁর নাম রেভারেণ্ড সি এইচ এ ডল। ডলের মুখের কথা শোনার জন্য কলকাতায় ছুটলাম। ইংরেজী শোনা বা বলা অভ্যাস ছিল না বলে তাঁর কথা প্রথমদিকে বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। পরে ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, নিয়মিত বালি থেকে কলকাতায় তাঁর রবিবারের স্কুলে ও প্রার্থনাসভায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করি এবং তাঁর দেওয়া বইপত্র পড়ি। অবশেষে আমার একেশ্বরবাদ-সিদ্ধান্ত-এর সন্ধান পাই ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্মের মধ্যে। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের আগে রামমোহনও তাই পেয়েছিলেন। রেভারেণ্ড ডলই পাকে সুযোগ করে দেন আমেরিকা যাবার।

যাবার দিন ঠিক হল। মাকে একটি কথাও বলিনি। সকালে উঠে স্নানাদি সেরে খেতে-খেতে বসেছি স্কুলে যাব বলে। গলা দিয়ে অন্নব্যঞ্জন কিছুই গলছে না, চোখে জল আসছে। মায়ের দৃষ্টি কিছুই এড়ায় না। অন্যমনস্ক দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে তোর জগৎ? কিছু খেতে পারছিস না কেন?" বললাম, কিছু হয়নি মা, এমনি। মা জানেন ছেলে আমার স্কুলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসবে। ছেলে জানে সে কোথায় যাচ্ছে, সুদূর আমেরিকায়, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় মা বললেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস জগৎ, খৃষ্টানদের বক্তৃতে শুনতে যাস নে, যা তা খাস নে।" মার মুখের দিকে না তাকিয়ে কোন কথা না বলে চলে গেলাম। বাগবাজারের ঘাটে নেমে পাল্কি করে গেলাম ডল সাহেবের বাড়ী। সাহেব ঘরে নিয়ে ধুতি কামিজ ছেড়ে প্যান্ট টুপি পরতে বললেন। কিছুতেই পরব না, সাহেবও নাছোড়বান্দা। বললাম, প্যান্ট টুপি পরলে খুব কুৎসিত দেখাবে আমাকে, আর তাতে তোমাদের খৃষ্টান ধর্মের মহত্ত্বও বাড়বে না। অবশেষে ডল্ রাজী হলেন, দেশীয় পোষাক পরেই জাহাজে উঠলাম। ভেবেছিলাম একটা বাঁশী কিনে নেব কলকাতা থেকে এবং চার মাসের সমুদ্রপথে জাহাজে বসে মধ্যে মধ্যে যখন বালি গ্রামের কথা মনে পড়বে, মায়ের মুখটা ভেসে উঠবে চোখের সামনে, তখন প্রাণ খুলে বাঁশী বাজাব। এদেশের বাঁশী, বাংলার বাঁশী। তাড়াহুড়োর মধ্যে বাঁশী কিনতে ভুলে গেলাম। ডল্ সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন, বাঁশী কিনে জাহাজে পৌঁছে দেবেন, কিন্তু তিনিও ভুলেছেন। জাহাজ ছাড়ল। ডল্ বলেছিলেন, রোজনামচা রাখতে। খাতা খুলে লিখলাম :

অদ্য বুধবার, ২৭শে জানুয়ারী ১৮৫৮ সন, কলিকাতা শহর হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহর অভিমুখে জলপথে যাত্রা করিলাম।

মা'র কথা মনে হল। জাহাজের বাঁশী বাজল। আমার বাঁশী নেই।

ফারখত

(৭৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই প্রশ্ন হঠাৎ কেন কে জানে, বিরাটরূপে জেগে ওঠে নিখিলেশের মনে। এই অসম্ভব আর অবান্তর প্রশ্ন। কুকুরে আর মানুষে আর নিখিলেশে পার্থক্য কি!

—আমি কত দুঃখী কেউ কি তা জানে! বিড় বিড় বকতে থাকে নিখিলেশ। আপন মনে বলে অস্ফুট কণ্ঠে। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখনও সে। বেশ লাগছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জলো-বাতাস। আবার কথা বলে চুপি চুপি, পাছে কেউ শুনতে পায়। বললে,— আমি মেনে নিতে পারি না কখনও এই অসহ্য কষ্ট।

নিখিলেশের বুকের মাঝে সদাশঙ্কিত অশান্তি। চোখ দুটি যেন জ্বলছে দিবারাত্রি।

তার চেয়ে আত্মহত্যাই মঙ্গলের। অনেক বেশী শ্রেয়ঃ। সহজলভ্য মৃত্যুই একমাত্র মোক্ষ।

ভাবতেও লজ্জা আসে। অপমান বোধ হয়। নিজেকে মনে হয় দুর্বল।

—না, না, আমি মরতে পারবো না। আবার বিড়বিড়িয়ে উঠলো নিখিলেশ। এই দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে হবে তাকে। দুঃস্বপ্ন কি অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পারে! হয়তো আবার একদিন নতুন জীবনে জাগবে নিখিলেশ। চোখ মেলে দেখবে এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দেখবে সূর্যোদয়। রাতের আকাশে অগণিত সোনালী তারা। দেখবে প্রাকৃতিক শোভা। আকাশ আর জল। মেয়েদের দিকেও দেখবে নিখিলেশ। যা কিছু সুন্দর সবই দেখতে পাবে নতুন এক দৃষ্টিতে।

তুমি ধৈর্য ধর। জাগরণ আসতে একদিন বাধ্য হবেই। আসবে সুনিশ্চিত। মুক্ত জানলা থেকে হিমার্ত বাতাস আসছে। আরামের পরশ দিয়ে যায় চিন্তাকুল নিখিলেশের বিক্ষুব্ধ ললাটে।

ঘুম আসছে কি! বহু প্রতীক্ষার পরে নিদ্রাদেবী কি আসছেন শব্দহীন পায়ে! নিখিলেশ সোফায় বসে পড়লো। তার চোখে পড়লো নীলাভ বিছানা। শয্যার আচ্ছাদন এলোমেলো এখনও। মেয়েটির দেহের ভারে হয়তো অবিন্যস্ত হয়েছে কখন।

নিশ্চুপ নিখিলেশ তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। দেখছে বিছানায় আলো ছড়িয়েছে। চিহ্ন পড়ে আছে—মেয়েটির একদা অস্তিত্বের।

নেই শুধু সেই মেয়েটি। জলভরা চোখে সে বিদায় নিয়েছে।

গা টা পথটাই চড়াই। বাজারের দিকটায় কিছু লোকালয়। ডিসপেন্সারি, দোকান-পাট, ডাকঘর দি সবই তার কাছাকাছি। তারপরেই র সেই নির্জন রাস্তা। পাহাড়ের কোল- আঁকা-বাঁকা সেই রাস্তার দু'ধার জুড়ে লালিত রং-বেরংয়ের অজস্র জংলী ফুল।

আফিস সেরে ঘরে ফিরবার সময় এই ড়ী পথটুকু একা একা চলতেই া লাগে স্বপনের। এই রাস্তা ধরে ন্য এগিয়ে গেলেই ডাইনে প্রথম এবং সেখান থেকেই সামনের দিকে তাকালে চোখে পড়ে আরেকটি। এই দ্বিতীয় মোড় একটি কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণ । নতুন ঐ কাঁচা রাস্তার ওপরেই বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় নিত্য এক দোকান য়ে বসে সোহাগিনী।

দাকান তো ভারি, চা-বিস্কুট আর পান- ও সিগ্রেটের অনেক দিনের এক অস্থায়ী ! তবে সামান্য হলেও এ দোকানেরও ইতিহাস আছে। বাপের অবর্তমানে মেয়ে গিনীই সেই ইতিহাসের বোঝা বয়ে ।

পরিচিতরা সোহাগিনীকে সংক্ষেপে ডাকে গী বলে। তাতে সে রাগ করে না কখনো, খুশিই হয় মনে মনে। তার নিজেরই কথা, ত ছোট হয় ততই ভালো, কারণ ছোট বেশি মিষ্টি লাগে। ওর এই মতটা জানা- হবার পরেই একদল ছেলে-ছোকরা মিলে রো একটা ছোট্ট নাম খুব চালু করে । ওরা সবাই ডাকে ওকে কাগি বলে। ও নামটা ওর মোটেই পছন্দ নয়। কারণ নামের সঙ্গে ওর কোথাও কোনো মিল য!

ভিড় তেমন একটা না জমলেও দু'চারজন সোহাগীর দোকানে লেগেই থাকে। কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে সামনেই একটা ছোট্ট কলোনী গড়ে উঠেছে কিনা, তাই এ পথেও যে লোক চলাচল একেবারে নেই তা বলা চলে না। তাছাড়া বড়ো রাস্তার লোকরাও এ দোকানে এসে হানা দেয়। একে শীতের দেশ, তায় চড়াই পথ। তাই চলতে চলতে চা-টা সিগ্রেটটা অনেকেরই আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। মোড়ের প্রায় মুখেই সোহাগীর এ দোকান ছাড়া তারা আর যাবেই বা কোথায়? তাছাড়া সোহাগীর নিজেরও একটা আকর্ষণ আছে। চা-সিগ্রেটের খদ্দের না হলেও ছেলে-ছোকরাদের কেউ কেউ ঐ গাছের ছায়ায় দোকানের সামনে বিশ্রাম করে। সময় সময় অনাবশ্যকভাবে সময় কাটায়।

স্বপনের অবশ্য সোহাগীর দোকানের সমুখ দিয়েই নিত্য আসা-যাওয়া। ঐ কাঁচা রাস্তার এখন সে নিত্যকার পথিক, কাজেই সোহাগীর দোকানের একজন রেগুলার খদ্দের। নতুন কলোনীতে একটি ভদ্র পরিবারের সঙ্গে পেয়িং গেস্ট হিসাবে সে আছে আজকাল। প্রথম সে উঠেছিলো বাজার এলাকায়ই এক সাধারণ হোটেলে। কিন্তু ষাট সত্তর টাকা করে হোটেলে দেবার পর মাসের প্রথমেই যে পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যায়! একজন কেরাণীর পক্ষে মাসের বাকি দিনগুলোর ছোটখাটো খরচই বা কী করে চলতে পারে, আর বাড়ি-খরচই বা তার পক্ষে কতোটা পাঠানো সম্ভব? এসব চিন্তা করেই স্বপন হোটেল ছেড়ে দিয়ে কলোনীতে উঠে এসেছে। প্রায় অর্ধেক খরচেই এখন তার থাকা- খাওয়ার সমস্যার সমাধান। মিলিটারী এ্যাকা- উন্টস-এ চাকরি করে স্বপন। কেরাণীগিরি। বদলি হয়ে এসেছে এখানে মাস তিনেক হলো। বাহাধিক্য ছাড়া জায়গাটা আর সব দিক থেকেই ভালো লেগেছে স্বপনের। চারদিকের পাহাড়ের চুড়োগুলো যখন পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘে ছেয়ে যায় সেদিকে তাকিয়ে এক এক সময় তন্ময় হয়ে ওঠে স্বপন। দূরে স্টেশনে ট্রেণের হুইসিল এখানকার পাহাড়ের গায়ে যে প্রতিধ্বনি তোলে সত্যি সত্যি তা অপূর্ব। স্থানীয় মানুষগুলোও ভারি শাদাসিধে। সোহাগীকেও তার সরলতার জন্যেই স্বপনের এতো ভালো লাগে।

প্রথম দু'তিন দিন অবশ্য স্বপনের কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আফিস থেকে ফেরবার পথে মোড়টা ঘুরে এগুতেই সোহাগীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল স্বপনের, আর সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে মুখ চোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মেয়েটার। স্বপনের মনটাও প্রসন্ন- তায় ভরে গেল তা লক্ষ্য করে। আফিসের শ্রম- ক্লান্তি ও গ্লানি সব কিছুই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

তারপর রোজকার মতোই এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনলো স্বপন এবং একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে দোকানের পাশেরই একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো। তারপরে সময় হলে ঘরের দিকে রওনা।

সেই থেকে এমনিভাবেই দিনের পর দিন কেটে এসেছে। সেদিনও তাই। সন্ধ্যে হয়ে এলো। এর পরে আর খদ্দেরের আশা কম। অন্যদিনের মতোই গোটা দোকানটাই চটপট গুটিয়ে নেয় সোহাগী। কিছু পিঠে, কিছু কাঁধে ঝোলাঝুলি ঝুলিয়ে নিয়ে পথ চলতে শুরু করে সে। হাতে এবং কাঁখেও কিছু কিছু মালপত্র থাকে। স্বপন চলে তার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করতে করতে। সময় সময় এক আধটা জিনিষ সে জোর করে কেড়ে নিয়ে সোহাগীকে সাহায্য করে। কিন্তু তার হাত থেকে কিছু কেড়ে নেওয়াই কি বড়ো সহজ ব্যাপার? সে বলে, আপুনি বাবু লোক, আপুনি কেন বোঝা নিবে?

সোহাগীর মুখের এমনি ভাঙা ভাঙা বাংলা কথা স্বপনের মনে খুশির খোরাক জোটায়। আর এমনি গল্পে গল্পেই সোহাগী আজকাল রোজ প্রায় এক মাইল পথ নিচে নেমে আসে। এতে ওর কষ্টবোধটা একটু কম মনে হয়। নিচের ঐ বস্তিতেই ওদের ঘর। রোজ ঐ

পর্যন্ত এসে সোহাগীকে এগিয়ে দিয়ে যায় স্বপন। তারপর পিছু হেঁটে নিজের কলোনীতে চলে যায়।

নিজে থেকেই সেদিন সোহাগী তার বাপের কথা তুলেছিল। বাপ থাকতে ওকে আর এমনিভাবে মোট বইতে হতো না, কথাটা উঠেছিলো এই প্রসঙ্গ থেকে। স্বপন ভেবেছিলো হঠাৎ মরা বাপের কথা বুঝি মনে পড়ে গেছে তাই সে কাহিনী তুলছে। সে আর কী করে জানবে যে এর মধ্যে আবার এত গোলমেলে ব্যাপার থাকতে পারে।

শহরে কোনো এক বড়ো লোকের বাড়িতে [illegible] মালীর কাজ করতো সোহাগীর বাবা। কিন্তু তাতে ওদের সংসার চলতো না। খুব কষ্ট হতো। সোহাগীর এক মাসীর অবস্থা ভালো ছিল। সে ওদের মাঝে মাঝে সাহায্য করতো। মাইনে বাড়াতে বলায় মালীর কাজে ইস্তফা দিয়েই চলে আসতে হয়েছিল সোহাগীর বাবাকে। সেই দুঃখের দিনে মাসী ওদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারই টাকায় সোহাগীর বাবা বস্তির মোড় খুঁজে খুঁজে গাছতলায় এই দোকান আরম্ভ করে বছর দুই আগে। মেয়েটা বড়ো হয়েছে। তাই সে বাপের একটা বড়ো অবলম্বন। সোহাগীকে নিয়েই প্রায় বছর দুই ধরে দোকানটা সে চালিয়ে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ওর বাপ যে কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে! সেদিন থেকে সোহাগীর মাসীও নিখোঁজ। সেজন্যেই রহস্যটা আরো ঘনীভূত।

তবু ভালো দোকানটা অনেক দিন থেকেই বেশ চালু হয়ে উঠেছে এবং সোহাগী তার বাপের কাছেই দোকানের কাজকর্ম বেশ ভালো ভাবে শিখে নেবার সুযোগ পেয়েছে। তা না হলে ওদের যে আজ কী অবস্থা দাঁড়াতো ভগবানই জানেন!

সোহাগীর মুখে ওর বাপের এই নিরুদ্দেশের কাহিনী শুনে শিউরে ওঠে স্বপন। সহানুভূতিতে ওর মন ভরে ওঠে।

অনেকের মতো স্বপনও ওকে প্রথম প্রথম কাঞ্চি বলেই ডাকতো। হঠাৎ একদিন মেয়েটার দিক থেকে আপত্তি উঠলো। ও বল্লে, আপনি আমাকে কাঞ্চি বলো কেন বাবু, আমার নাম সোহাগী।

সে কিরে, সোহাগীর চেয়ে কাঞ্চি নামটাই তো বেশি মিষ্টি! —স্বপনের একথা সোহাগীর মনে ধরে না, মুখ ভার করে ও যে উত্তর দেয় তা মেনে নিতেই হয়।

বেশ তো সোহাগী নাম আপনির যদি না পছন্দ আপনি তবে কুসুম বলে ডাকো। আমার বাবার দেওয়া আদরের নাম কুসুম। আমায় এখন কেউ ডাকে না সে নামে। —বলতে বলতে চোখ সজল হয়ে ওঠে সোহাগীর।

সেই থেকে মেয়েটাকে কুসুম বলেই ডেকে আসছে স্বপন।

আফিসে যাবার পথে এবং আফিস থেকে ফেরবার মুখে সোহাগী আর স্বপনের দেখা-সাক্ষাৎ ও কমবেশি কথা বিনিময়টা একটা বাঁধাধরা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে এতদিনে। কি ছুটির দিনেও দুবেলাই সময় মতো দোকানে হাজির হয় স্বপন। নিত্যকার এক প্যাকেট সিগ্রেট এবং কোনো কোনো দিন তার সঙ্গে একটা দেশলাই, বাস, এইতো কেনাকাটার ব্যাপার! তারপরে যতক্ষণ ধরে সম্ভব সোহাগীর সঙ্গে গালগল্প, ইয়ার্কি, ঠাট্টা-তামাসা।

এইভাবে দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। বাজার এলাকা থেকে স্বপনের কলোনীতে আসবার পর প্রায় ছ'মাস। নির্জনতার শূন্যতা বোধ এখন আর পীড়িত করে না স্বপনকে। বরং প্রতিদিন দু'বেলা ওর জন্যে কুসুমের প্রতীক্ষার ভাবটি লক্ষ্য করে ওর মন পরম প্রসন্নতায় ভরে ওঠে।

কুসুম হালে বেশ দুষ্টু হয়ে উঠেছে। তার এই দুষ্টামি বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে স্বপন। দূর থেকে স্বপনকে দেখে, আজকাল আর তার সঙ্গে চোখে চোখ মেলায় না কুসুম। নির্বিকার মনে যেন কাজ করে চলেছে, ঠিক তেমনি একটা ভঙ্গি নেয় সে। কিন্তু একটি প্রত্যাশিত মুহূর্তের জন্যে তার মনের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তাকে আর কুসুম চেপে রাখবে কী করে? স্বপনের চোখে তা সহজেই ধরা পড়ে। সেও দূরের একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসে পড়ে একমনে হাতের খবরের কাগজটা পড়তে লেগে যায়। কে আগে কথা বলবে তা নিয়েই এই মধুর লুকোচুরি।

আপনি চা খাবে না বাবু? কিংবা, এই নাও আপনির সিগারেট। —এমনি ধরণের কোনো একটা কথা নিয়ে কুসুমই এসে তাগিদ শুরু করে। সেই তাগিদে স্বপন হেসে ফেলে, সিগ্রেটটা মেয়েটার হাত থেকে নিয়ে নেয়, কিংবা চা আনতে বলে।

কুসুম মুখ ঘুরিয়ে দোকানের দিকে পা ফেলতেই কোত্থেকে একটা দমকা হাওয়া দুষ্ট দস্যুর মতো ওর লজ্জা হরণে উদ্যত হয়। কোনো কোনো [illegible] বসন্তকালের [illegible] নিলেও শির-শির একটা অনুভূতি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে শীতের ঘুম ভাঙছে। পৌষ মাসের অন্তে অন্তে তার হাড়কাঁপুনি [illegible] ক্রমশই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। কাজেই তা আরো প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেবে। এমন কি তাই আরো আগেই যে ঘরে ফিরতে হবে কুসুমের সে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এতো আর তার কাছে কোনো অজানা বিষয় নয়। তার বাপের সময়ও সে দেখেছে, শীতের দিনে দোকান বসেও দেরিতে, দোকান গুটানোও হয় আগে আগে। শীতের মধ্যে দোকান চলবে কাদের নিয়ে, রাস্তায় লোক চলাচল থাকলে তো! তা থাকে না।

সেই থেকে বিকেল বিকেলই বাড়ি ফেরে ওরা। দোকানে বসে বসে আর গল্প জমানোর সময় মেলে না।

বসোই না আরেকটু। এত তাড়ার কী আছে? —স্বপনের এ অনুরোধ থামাতে পারে না কুসুমকে। আকাশে রোদ থাকতে থাকতেই গাছতলার দোকান গুটিয়ে চলে সে।

আপনি দাঁড়াচ্ছো না বাবু, পাখির গায়েও শীতের কাঁপুনি লাগছে। ঐ দ্যাখো শালিখ দুটো জলের ধারে বসে মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে হয়রাণ, তবু জলে ঠোঁট ছোঁয়াবে না। জলে ওদের জোড়া ছবি দেখেই ওরা খুশি, এখন আর ওরা জোড়া ডুব দিতে যাবে না। শীতের বড্ড ভয় যে! আমারও আঙুলের ডগায়, নাকে, কানে বেশ শীত লাগছে। তোমার লাগছে না বাবু? —হাতের কাজ সারতে সারতে অনেকগুলো কথার পর প্রশ্ন করে কুসুম। খুব সহজ সরল প্রশ্ন। সে প্রশ্ন শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিলো স্বপন, তা ভিন্ন আর কোনো জবাব দেয়নি।

আরেক দিন ফেরবার পথে বাড়ির কাছাকাছি এসে স্বপনের একটা হাত চেপে ধরে কুসুম বল্লে, আপনি একদিন যাবে না বাবু আমাদের ঘরে? কালই এসো না কেন বাবু, কাল একটা পরব লাগবে।

কিসের পরব রে, তোর বিয়ের কথা পাকা হবে বুঝি কাল, সেই পরব? —স্বপনের এই উত্তরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কুসুম।

যাও বাবু, আপনির কেবল ঠাট্টা! থাক। আপনিকে আমাদের ঘর যেতে হবে না। —অভিমানের চাপে কুসুমের স্বর কেঁপে ওঠে এই কথা বলতে। কিন্তু এক ঝলক হাসির বিদ্যুতের মধ্যে স্বপনের চোখেমুখে সে যে আনন্দের আভাস লক্ষ্য করে তাতে তার মন গলে যায় একেবারে। সে তাই খুশি হয়ে স্বপনকে বলে পরদিন দু'ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে আসতে।

কিন্তু পরদিন দু'ঘণ্টার জন্যে নয়, এক মাসের জন্যে ছুটির আবেদন করতে হয়েছে স্বপনকে। কৃষ্ণনগর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, বাড়িতে মা গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী। অবিলম্বে তাকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসতে হবে। সেই ছুটির তদ্বির তদারক করতে করতে আফিস থেকে বেরোতে বেরোতে অন্য দিনের চেয়েও বেশি দেরি হয়ে যায় স্বপনের। কুসুমের নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়তেই দাঁতে জিভ কাটে সে। কিন্তু মনে হলেই বা হোক না, কীই বা তার করার ছিলো! মায়ের এরকম অসুখের খবর পেয়ে অস্থির হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। তারপরে একদিনের মধ্যে দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা করা সেও প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। তা করতে গিয়েই তার এই ভুল। তবে কুসুমকে বুঝিয়ে বললেই সে সব বুঝবে—তার ওপর রাগ আর করবে না, স্বপনের এই আশা।

সেই আশা নিয়েই স্বপন আফিস থেকে ছুটতে ছুটতে আসে সোহাগীর দোকানের দিকে। কিন্তু কোথায় দোকান, গাছতলা খালি। আফিস যাবার সময়ও সোহাগী তাকে বলে দিয়েছিল, তার জন্যে সে অপেক্ষা করবে। কিন্তু কোথায়? কাছের একটা রাখাল ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, প্রায় আধ ঘণ্টা আগে সোহাগী বাড়ি ফিরে গেছে। দোকান গুটিয়ে সে নাকি অনেকক্ষণ বসেছিলো, গুন গুন করে গান গাইছিলো—কখনো কখনো গলা ছেড়েও।

তাই নাকি, কি গান গাইছিলো রে? —স্বপন জানতে চায়।

ও পরাণ বঁধুরে!—কুসুমের গাওয়া গানের প্রথম কলির শুধু এটুকুই বলতে পারে রাখাল ছেলেটি, আর কিছুই তার মনে পড়ে না।

এইটুকু শুনেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে স্বপন। মায়ের অসুখের দুর্ভাবনাটাও যেন মুহূর্তের জন্যে চাপা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে ঠিক করে ফেলে রাত হয়ে গেলেও আজই কুসুমদের বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসবে।

স্বপন আজ একা একাই পথ চলে। সোহাগীদের ঘরের কাছে এসে আস্তে আস্তে ডাকে, কুসুম, ও কুসুম!

ঘরের ঝাঁপ সরিয়ে কুসুম নিজেই একবার লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকে যায়। অভিমানের মেঘভারে সারা মুখখানি তার বিবর্ণ, লণ্ঠনের স্বল্প আলোতেই

র তা চোখে পড়ে। কিন্তু সে একটা কথা পারেনি বলে কুসুম কি এতটা রাগ পারে যে, তাকে ওদের ঘরের দরজা ফিরে যেতে হবে?

প্রশ্ন স্বপনের মনে আসতে না আসতেই । ছোট ভাইটি এসে তাকে সাদর নায় ঘরে নিয়ে যায় তার মায়ের কাছে। রই এক কোনায় কুসুম চুপচাপ বসে।

রদ্রা লাঞ্ছিত কুঁড়ে ঘরের মধ্যেও সভ্য- একটা পরবের পরিবেশ নজরে পড়ে । চারদিকে সে একবার চোখ বুলিয়ে ই যা থাক তেমন কোনো সাজ-সরঞ্জাম, একটা ফিটফাট ভাব। দু পাশের দুখানা খাটিয়ার বিছানাপত্রগুলো এমন কাপড় কা, পরিচ্ছন্নতা যার জীর্ণতাকে দৃষ্টির করে রেখেছে। এক ধারে একটা টুলের ওপর একটা ঘটির মধ্যে এক- জনী গন্ধ। দুশোতে যেমনই লাগুক না তে চিত্তবিনোদনের যে কোনো হানি এ স্বীকার করতেই হবে। উঃ রজনী- কি অপূর্ব গন্ধ! মনে মনে উচ্ছ্বসিত ঠ স্বপন।

তু পরব হলেও তার সন্দেহটাই যে সত্য কথা স্বপন অবশ্য দুদণ্ড আগেও ভাবতে । সোহাগীর মা পরিষ্কার করে সব কথা র তবে সে বুঝতে পেরেছে। এমন কি র নিজের কথাও সে ঠিক ধরতে

ন ঘরে আসবার একটু বাদেই পিছনের য়ে রান্নাঘরে চলে যায় সোহাগীর মা। ক আপ্যায়ন করতে হবে না? বিশেষ অতিথি আমন্ত্রিত এবং যে অতিথির বার এত রকম রকম করে সোহাগী ার মাকে। সেই অতিথির জন্যে পিঠের গ থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। তার এক প্লেট ফল সাজিয়ে দিতে হবে, সে করতে গেছে সোহাগীর মা।

সেই সুযোগেই মান ভঙ্গ হয়েছে । তবু তখনো কুসুমের সুরে অভি- শ। স্বপনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে আপনি আসবে বলেছিলে, এলে না! অনেকক্ষণ দেরি করে করে আমি চলে এলাম। সুখনের সঙ্গে আপনার দেখা হলো না!—বলেই একটু মুচকি হেসে ফেলে কুসুম। আর ঠিক তখুনি পিঠের বাটি আর ফলের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে তার মা।

কি ব্যাপার, এত খাবার কিসের?—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে স্বপন।

ঐ যে সুখনের কথা বল্ল সোহাগী। সুখন আমার বোনের দেওরের বেটা। আমার সোহাগীর সঙ্গে ওর সাদি হবে। আজ সব কথা হয়ে গেল। ও এসেছিলো, ওর বাবা এসেছিলো। আপনার সঙ্গে দেখা হলো না বাবু। তাই সোহাগীর খুব দুঃখু হলো।

হঠাৎ বুকের খাঁচার হাড়গুলো স্বপনের যেন নড়ে উঠলো সোহাগীর মা'র কথা শুনে। ঠিক সময়ে না আসতে পারায় ভালোই হয়েছে, মনের কোণে এমনি ভাবনার উঁকি অনুভব করে সে। তবু কোনো রকমে সামলে নিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরে সে জানায় বিকেলবেলায় তার না আসতে পারার কারণ। পীড়িত মাকে দেখতে কালই যে সকালে সে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি রওনা হয়ে যাচ্ছে সে কথাও সে জানিয়ে দেয়।

কালই আপনি চলে যাবে বাবু? --ছুটে এসে স্বপনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে এই প্রশ্ন করে কুসুম। তার সেই দৃষ্টির আকুলতা বেদনায় মথিত করে তোলে স্বপনকে। সেও কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে কুসুমের দিকে। কয়েক মুহূর্তে দুজনেই নীরব। কথা বলার চাইতে না বলার মধ্যে দিয়েই বোধ হয় ওদের মধ্যে অনেক কথা বিনিময় হয়ে যায় এই কয়েকটি মুহূর্তে।

বাস্তবিক খাওয়া আর সম্ভব হয় না স্বপনের পক্ষে। সোহাগীর মায়ের অনুরোধে নিয়ম রক্ষা করেই বিদায় নিয়ে সে চলে আসে।

নির্জন রাস্তা। সেই পথে একা একা কলোনীতে ফেরবার সময় ইউকালিপটাস আর ঝাউ গাছের শন্-শন্ শব্দটা যেন বড়ো বেশী জোরে এসে স্বপনের কানের পর্দায় সে রাত্রিতে আঘাত করছিলো। আর বার বারই কেবল মনে হচ্ছিলো, ছুটির পর আর যদি কালিম্পঙ-এ ফিরতে না হয় তবেই রক্ষা!

যবনিকা

আনন্দ বাগচী

বাঘের গায়ের মত ডোরাকাটা আলো। অন্ধকার পোড়ো মঞ্চে শুয়ে আছে অর্ধনিমীলিত দুইচোখে আলস্য ছড়িয়ে থাবা, নিহত আয়ুর মত তার চারপাশে নিস্তব্ধতা, পরিতৃপ্তি। চোখের পলকে কুশীলব চলে গেছে, রেখে গেছে শোণিতের ঘ্রাণ, উচ্ছিষ্ট গল্পের স্বাদ, সূচিমুখ শোক দুঃখ স্মৃতি, বিলুপ্ত অঙ্কের মাল্য অদৃশ্য দৃশ্যের পরাভব; জনতা জন্মের মত নিরুদ্দেশ, সাজানো বাগান এখন মঞ্চের পরে কিছু নেই, পর্দায় বিরতি

নাট্যকার অন্ধকারে পা রেখেছে, পোড়ো মঞ্চে তোর আসার সময় হল, নটনটীর পদচিহ্নগুলি আহত পাখির মত, আহা মৃৎ শিল্প চমৎকার অকৃত্রিম ধূলি মাখছে, ধূসর শোকের মৌন তুলি বুলিয়ে দিয়েছে কেউ, মর্মান্তিক এই অভিনয় দাঁড়াও পথিকবর, নাট্যকার, হয়েছে সময়।

প্ল্যানেটেরিয়াম

(৭৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বা হবে—প্ল্যানেটেরিয়ামে তা সহজেই দেখানো যেতে পারে।

রাত্রি ও উষার আগমন প্ল্যানেটেরিয়ামে অতি চমৎকার দেখা যায়। ধীরে ধীরে দিনের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নকল আকাশে, হুবহু বাস্তব আকাশের মত একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠছে। তারপর অন্ধকার যতই গাঢ় হতে থাকে, সারা আকাশ উজ্জ্বল তারকায় ছেয়ে যায়; উষার আগমনও সেইরূপ—পূবের আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে ওঠে, আকাশের গায়ে বিচিত্র রঙের ছোপ ধরে। আলো যতই বাড়তে থাকে, তারকাগুলি ক্রমশঃ ততই স্তিমিত হতে থাকে—অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ্রহ-উপগ্রহগুলির কক্ষতল এবং তাদের গতিবিধি সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেবার জন্যে প্ল্যানেটেরিয়ামে যিনি বক্তা থাকেন, তিনি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় যন্ত্রটিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করে চতুর্দিকের গ্যালারীতে উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দকে একটি আলোক-দণ্ডের সাহায্যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে দেন।

পৃথিবীর অনেক দেশেই প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত কোন প্ল্যানেটেরিয়াম ছিল না। সম্প্রতি বিড়লা ব্রাদার্স কলকাতার ময়দানে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে একটি প্ল্যানেটেরিয়াম নির্মাণ করছেন। এইটিই হবে ভারতের প্রথম প্ল্যানে- টেরিয়াম।

মনের আকাশ

উমা দেবী

এ শহরে আরো এক বিভ্রান্ত দিবস হলো শেষ—
এতক্ষণে ফিরে এলো সেই মন—
যে মনের ছিল না উদ্দেশ।

যে মন লুকিয়েছিল ভয়ে—
প্রাত্যাহিক কর্মের উদয়ে—

যে মন ঘুমিয়েছিল ভয়ে
প্রাত্যাহিক কর্মের উদয়ে—

যে মন ঘুমিয়েছিল নরম আঁধারে
এই খাদে

বিকালে কলের জলে
ঝিরি-ঝিরি ধারা জলে
ধুয়ে গেল সর্বাঙ্গের তাপ—
এতক্ষণে সেই মন জেগে ওঠে নির্মল—নিষ্পাপ।

ঈষৎ পান্ডুর তিক্ত তিন্দুকের ফলরসে
মধুর কষায়
মালিনী নদীর তীরে বেতস কুঞ্জকে
কে বা চায়!
থাক গুপ্ত লতাগৃহ কন্দরে হিয়া
দুষ্মন্তের প্রতিশ্রুতি কে বা চায় আর।

ছাতের উপরে নীল চিলে-কুঠি এমন শীতল!—
এখানে সমস্ত স্বপ্ন ম্লান করে শুধু হয়—
কুলে কুলে টলমল ভরা অশ্রুজল।

এখনি একটু পরে জ্বলবে তারার দল
লাল নীল সোনালি সবুজ
শহরের পথে পথে ঝকঝকে বাতিগুলি
জ্বলবে যখন—
একটু রঙের রেখা পশ্চিম আকাশ থেকে
মুছে যেতে লাগে কতক্ষণ।

—টবের মাটিতে ফোটা দু'-একটি বেলফুলে
কতটুকু হতে পারে বাতাস অবুঝ।
ওটা রহস্যময় লাগবে দৃষ্টিতে হায়
আটপৌরে শাড়ীর সবুজ—

কতটুকু হবে আর আকুল অঞ্চল—
না না—জীবন চঞ্চল।

ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে এলে
নক ইচ্ছার মেঘ অলস হৃদয় স্রোতে
ভেসে চলে গেলে—
মেঘের প্রান্তদেশে উঠবে রসাল হয়ে
জ্যোৎস্নার আস্বাদ

উঠবে একটি রাঙা চাঁদ।
পৃথিবী থেকে আকাশকে কেড়ে নিতে
পারেনিতো কেউ—
—অনেক নীচে ভেঙেছে জোয়ার এসে
শহরের ঢেউ।

পৃথিবীকে ভালবেসে

গোপাল ভৌমিক

এখানে আমার অনেক দুঃখ জানিঃ
মাটি বাটি কিছু নেই,
রয়েছে টাকার টানাটানি।

রোজ রোজ করি অফিস বাজার
দেহে পুষে রোগ কয়েক হাজার,
ছেলে মেয়ে বৌ যায় নাকো কেউ কম:
প্রাণের ঘড়িটা প্রায় বিগড়ায়
তবু দেই রোজ দম।

মাঝে মাঝে ভাবি
পৃথিবীটা নয় বাঁচার মতন স্থান,
যত তার ফাঁকি
তত ফাঁকা তার যা-কিছু উট্‌টো দান।

পৃথিবীকে তাই যেতে চাই শুধু এড়িয়ে,
ক্ষোভের ছুরিকা নেই অভিমানে শানিয়ে।

পৃথিবী ছাড়ালে শুধু নীল মহাকাশ,
অসীম আঁধার করে আমাকেই গ্রাস।
ঘুরে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর চারপাশে
দেখি সে ভীষণ আঁধারে কেবল হাসে
এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে;
এ মাটির ঘ্রাণ আবার আমার নাকে।
পৃথিবীতে ফের ফেরে উঠি গাগারিন
ব্যথা বেদনায় কাটাতে নিজের দিন।

রঙ্গনাট্য

বটকৃষ্ণ দে

জীবনটা রঙ্গমঞ্চ—আমরা সব নায়ক-নায়িকা;
কেউ বা নেপথ্যে, কেউ দৃশ্যের প্রত্যক্ষে;
কাঁদি, হাসি
খেলা করি আমরা সব,—
সবি নাট্যের প্রয়োজন!
অনুক্ষণ নাট্যকারের অঙ্গুলি-হেলনে, ভালোবাসি,
ঘর বাঁধি; জীবন চিত্রিত করে স্বপ্নের তুলিকা;
কখনো আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কখনো বা দুঃখের প্লাবন!

শোনি ঋতু বদলের গান।
আকাশে তৃষ্ণার ছাপ আঁকা;
শোনি আবো মেঘ-মৃদঙ্গের
সুর-মূর্চ্ছনা ফাল্গুনী,
শ্যামল মাটির বুকে নিয়ে আসে দুর্লভ-প্লাবনি।
বসন্তের বন-বীথি মুখরিত করে পাখী-ডাকা।

নদীর ঢেউএর মতো আমরা সব ফেনার বুদ্বুদ!
দূর সমুদ্রের ডাকে সাড়া দিতে, না জেনেই, চলা
পারের মমতা পিছে ফেলে রেখে, নিরন্তর, অর্বুদ
বছর-বছর ধরে,—তারি মধ্যে ভাঙা-গড়া খেলা!

এই বাঙা রঙ্গনাট্যে নায়ক-নায়িকা এসো সবে,
প্রেম অপ্রেমের দৃশ্যে, মিলন-বিরহ উৎসবে।

প্রবহমান স্রোতে

কৃষ্ণ ধর

মনে রাখবে কি তুমি, আজকের এই আমি
বসে আছি তোমার শরীর ঘেঁষে
এক যুগ পরে কিংবা কয়েক দশক হলে পার?

খানিকটা চুপ করে, নরম ঠোঁটের প'রে ঠোঁট
রেখে, চোখের কাজল রেখা শ্রাবণের মেঘের
মতো ক'রে, সে আমাকে বলেছিল :

ঠিক মনে হবে। তোমার একান্ত চাওয়া, পবিত্রতা,
এই ভালবাসা, দর্পণে তাকেই পাবো
প্রবহমানের এক স্রোতে।

: আমি যে বয়স্ক হ'বো, দৃষ্টি হ'বে ক্ষীণ
চুলগুলো পেকে যাবে, বধিরতা, হয়তো বা
বৃদ্ধ হ'বো, কিংবা প্রৌঢ় আজকের চেয়ে।

বলেছিল : মন তো বুড়োবে না, আমার
পবিত্র প্রেম তোমাকে তখনও ডাক দেবে
অস্থির ঢেউয়ের পর, শান্ত এক নদীর
মতন হলে তনু, তুমি হবে দৃষ্টি শেষে
আকাঙ্ক্ষার নিষ্কম্প রামধনু।

আমরা সব পালানো হরিণ, তীক্ষ্ণ কোনো
শায়কের ভয়ে, উদ্দাম হ'য়ে ছুটি
নির্দিষ্ট সময়ের অলাতচক্র পার হয়ে।

: আজকের আমি কিংবা তুমি, সময়ের
হাত ধরে যদি যাই কয়েক দশক পথ হেঁটে,
তখন নদীর জল আমাদের এই মুখ
আর চিনবে না, স্থানান্তরিত হয়ে অন্য
কোনো মানুষের ঘরে, অপরিচিতের মতো,
তুমি কি আমার ঘনিষ্ঠ মুখের দিকে চেয়ে
চমকাবে না, শুচিস্মিতা? ম্লান দিনের
আলোয় চিনবে কি, কয়েক দশক আগে
কার মন, কা'র চোখ, উত্তপ্ত হাতের ছোঁয়া
কোন কথা বলেছিল? মনে হবে অন্য জন্মে
হয়তো বা পরিচয় ছিল, পুরাতন চোখের
আলোকে, মৃত প্রেম, মৃত মন, মৃত কোনো
প্রতিশ্রুতি রেখে।

আমার হাতের ওপর বিশ্বস্ত হাতখানি
রেখে বলেছিল : এই মাত্র যদি মিথ্যা
হয়, এই নদী সময়ের পিছু পিছু হৃদয়কে
বয়ে নিতে অনিচ্ছুক যদি হয়, তাহলে
বরং আজকের আমি সবটুকু ভালবাসা
নিয়ে মরে যাবো। তখন মাটির রেণু
ঘাস হয়ে জাগবে আবার, পরিচিত
মাঠে, তুমি চিনবে কি? আজ থেকে
অনেক বছর পর, এক যুগ পরে কিংবা
কয়েক দশক হলে পার?

শুধু হায় ঊর্ধ্বশ্বাসে, বিশ্বস্ততা বুকে নিয়ে থাকি
হৃদয়ের বিদীর্ণ চিত্ত, এ যন্ত্রণা কী দিয়ে বা ঢাকি?"

মত মোটা-মোটা শিক দিয়েছে তোমাদের কম্পানী অফিসারদের বাড়ীর জানলায়!"

বিনয় বলল, "আগে জানলায় কোন শিকই ছিল না। বাড়ীখানার চারপাশ নির্জন ছিল অনেক বেশী। এ-ছাড়া দেখছেন ওই গুর্খা-ঘরে সশস্ত্র পাহারাওয়ালা। কম্পানী থেকে সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছে একটা ঘটনার পর থেকে। জানলায় নূতন করে শিক বসাতে যেয়ে মজবুত দেখেছে, কিন্তু হটায়নি মেলেনি।"

"কোন্ ঘটনা?"

"এ বাড়ীতে মাস-কয়েক এসেছি আমি। এর আগের অফিসার কর্ণেল ধর ছিলেন বহু বৎসর যাবৎ। তাঁর সময়ে একটা বিশ্রী ডাকাতি ঘটে গিয়েছিল।"

"ডাকাতি! বল কি? এখানে ডাকাতি হয় না কি?"

"ওই একটাই হয়েছিল। কর্ণেল ধরের একজন আত্মীয় এসেছিলেন এখানে তাঁর অফিসের কাজে। এক-দুইমাস থেকে কিছু কনষ্ট্রাক্সনের কাজ তত্ত্বাবধান করছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন এঞ্জিনীয়র, বিদেশী ডিগ্রীও ছিল। দিন হিসাবে মজুর খাটিয়ে তাদের মজুরী দিনের শেষে মিটিয়ে দিতেন। বহু টাকার লেনদেন করতে হ'ত। চোখে পড়েছিল সকলের। তাই শেষে একদিন খুন হয়ে গেলেন।"

"ইস!" সাইকী শিউরে উঠল।

আমিও অস্বস্তি বোধ করে বললাম, "কি রকম করে ঘটল?"

"জানালা খোলা ছিল, কাচের পাল্লা। গরমের দিন। দক্ষিণের ওই ঘরটায় থাকতেন। খাট পাতা ছিল জানলার কাছে। খোলা জানলা দিয়ে দু'জন ডাকাত ঢুকে ও'কে মেরে ফেলে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছিল। মাথায় লাঠির ঘা। খুলি ভেঙে সারা বিছানা রক্ত লাল! বাঁচানো গেল না আর।"

"আহাহা! বয়স কত হয়েছিল? স্ত্রী-ছেলেমেয়ে?"

আমাদের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিল বিনয়, "না, সে দিকে বাঁচোয়া। বিয়েই হয়নি। তবে বিয়ের কথা না কি চলছিল। একটি মেয়েকে ভদ্রলোকের ভারি পছন্দ ছিল। এখান থেকে ফিরে গিয়ে বিয়ে করবেন এমন কল্পনা ছিল। কিন্তু আর তো ফেরাই হল না!"

করুণতার সমুদ্রে অবগাহন করে যেন রাত্রিটি নেমে এসেছে। বিষাদময় কাহিনীর অভিব্যক্তিতে বাতাসে আর্দ্রতা। গোলাপগুচ্ছে মধু যেন বিষ হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের মৃত্যু সেখানে। হাল্কা-স্বচ্ছ বাসনাবৃত্ত গল্প বলার পরী নেমে এল সবুজ ঘাসে ঘাসে।

বিনয় নীচু গলায় আবার বলে দিল, "সুন্দর চেহারা ছিল ভদ্রলোকের। অল্প বয়স। চমৎকার স্বভাব-স্বাস্থ্য। প্রকাণ্ড ধনী ঘরের ছেলে। বালিগঞ্জের দিকেই, আপনাদের দিকেই বাড়ী।"

কেমন যেন নিরুদ্ধ কণ্ঠে সাইকী জিজ্ঞাসা করল, "নাম কি ছিল?"

"শশাঙ্ক মজুমদার। ওকি, ভয় পেলেন না কি? আপনার ঘরটাই কিন্তু ও'র ঘর ছিল। আশা করি আপনার কোন কুসংস্কার নেই।"

সাইকীর মুখ তৎক্ষণাৎ নীল হয়ে গেছে—"ওই জানলার নীচে ওখানেই আজ আমার খাট পড়েছে—"

বিনয় সহাস্যে বলল, "সব থেকে ভাল ঘর ওটাই। আর, দেড় বছর আগের ঘটনা। এখন কত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন ভয় নেই।"

আকুল হয়ে সাইকী বলে উঠল, "না, না। ও-ঘরে আমি তো শুতে পারব না। শোবার কি অন্য ঘর নেই?"

এবার বিনয় একটু অপ্রতিভ হল, "আমাদের শোবার ঘরটা হিজিবিজি জিনিষে ভর্ত্তি। বাচ্চাটার খাট বাথরুম লাগানো বলে আমরা খোকার জন্যে ওই ঘরটাই ব্যবহার করি।"

"ও-ঘরে আমি শুতে পারি না?"

"ওখানে বাচ্চাটা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন ভয় নেই আপনার। আগে জানলে বলতাম না গল্পটা।"

"আমি একা শুতে পারব না ও-ঘরে।"

আমিও বিব্রত হয়ে উঠলাম। সাইকীর সাহস বিখ্যাত। কেন এমন করছে ও? রমণী-সুলভ ভীরু মন, না কি কারণ আরও গভীরে? বিনয় চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে। রেবা শোবেখন আপনার ঘরে।"

"না, না, শুধু রেবা নয়। আপনারা সকলেই শোবেন। ঘরের মধ্যে এক ইঞ্চি জায়গা যেন খালি না থাকে।"

আমি বিস্মিত হলাম, বিনয় বিব্রত। মাননীয়া অতিথির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে তারা। এখন খেয়ালিনীর খেয়াল অনুসারে সমস্ত ওলট্‌পালট হয়ে যায় যে!

ইতিমধ্যে সুসজ্জিতা রেবা এসে দাঁড়াল বন্ধ ঘরের চাবির তোড়া হাতে, "বড় দেরী হ'ল না? ঘরদোর বন্ধ করে এলাম। রাত্রে খাবার পাট নেই। খোকার ঝি আর চাকরের চাল-ডাল দিয়ে এলাম। চলুন, ওঠা যাক।"

বিনয় বলল, "তোমার অতিথি যে এধারে ভয়ে অস্থির।"

ঘটনা শুনে রেবা আম্‌তা-আম্‌তা করে বলল, "এখন তো যেতে হয়, নইলে দেরী হয়ে যাবে। ফিরে এসে দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।"

স্বামী-স্ত্রীর প্রমাদে আমি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলাম, "বাইরের বারান্দায় আমি শুয়ে থাকব। তোমার ভয় নেই।"

"না, আমি ওঘরে একা শুতে পারব না।"

আমি চাপা সুরে বললাম, "সাইকী, এরকম করছ কেন?"

"আমি—আমি ফিরে এসে একটা গল্প বলব।"

রাত্রির অন্ধকারের স্রোতের নীচে গোপন রহস্যের কথা কে বলে দেয়? দূর পাহাড়ের নির্জন গুহায় শ্যাওলা ফোটে ফুলের মত, দেবদারুর গাছ জড়িয়ে ওঠে লতা, তাদের আড়ালে কে বাস করে?

এই যে জলায় সাদা পদ্ম, এর মুখ আকাশে তোলা, এর প্রতিটি পরাগ উৎসুক—একদিনের শেষে এর ধ্বংস, সে কথা কে জানে?

কার তৃষ্ণা মেটেনি বলে, আজও সে অশান্ত?

সভা সেদিন রাত্রে জমল না।

সাইকী দায়সারাভাবে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করল। অথচ বাগ্মিতার যশ শুনে তাকে এ'রা এত তোড়জোড় ক'রে এনে-ছেন। ডিনারে বিশেষ কিছু খেল না সে। কেমন একটা উন্মনা—তটস্থ ভাব ওর! বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আর একটি বেলাও থাকতে রাজী হল না। ভোরের ট্রেণের ব্যবস্থা করার পরে শান্ত হল সে।

সাইকীর এমন ভাব দেখিনি পূর্বে। সাধারণ একটা হত্যার গল্প শুনে এমন করছে? ওর গল্পটা কি শুনতেই হবে।

বাড়ী ফিরে রেবা তার খোকাকে দেখে ঘরদোর খুলে জামা কাপড় মোচনাতে সরবৎ নিয়ে এল। সাইকী সেই বাগানেই বসে রইল, হাতপা ধোবার বা কাপড় বদলাবার উদ্যোগে গেল না। আমি ও বিনয়ও বসে রইলাম ওর কাছে। রাত বেশী হয়নি অবশ্য।

"এবার সাইকী, তোমার গল্প শুনি।"

গল্প শুনি, গল্প শুনি। ঘনীভূত হয়ে এল নিশা, আকাশের তারা যেন নিভে গেল। বহুদূরের কোন বিস্মরণ সমুদ্রের পার থেকে বাতাস বয়ে এল।

"শশাঙ্ক মজুমদার আমাকে চিনতেন।"

সাইকীর স্বীকারোক্তিতে বিনয়-রেবা বিস্মিত হলেও আমি হ'লাম না। এই রকম একটা কিছুই আমার অবচেতন মন আশঙ্কা করেছিল। সারা সন্ধ্যায় আমার মন নীচু সুরে এই কথাই বলে চলেছিল। সারা রাত্রি প্রেত কণ্ঠ এই রকম কিছুরই ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে। এখনও।

"আমাদের ওদিকে থাকতেন। বিরাট বড়-লোক। এখানে-ওখানে বহুবার আমাকে উনি দেখেছিলেন।"

"তারপর, সাইকী, তারপর?"

"উনি একদিন উভয়পক্ষের এক ভদ্র মহিলাকে পাঠালেন। আমাকে বিবাহ করতে চান।"

"তারপর—?"

"আমার মায়ের খুবই পছন্দ হ'ল সম্বন্ধ। বাড়ীর সকলেরও তাই। আমি রাজী হ'লাম না। পাত্র অপছন্দের প্রশ্ন নয়, আমি বিয়েই করব না, তাই।"

"তারপর?"

"আমাকে রাগে আনতে না পেরে ভদ্র-মহিলার কাছে মা বাধ্য হয়ে 'না' করে দিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'শশাঙ্ক মন স্থির করেছে, এই মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। সে অপেক্ষা করছে।"

"বল কি?"

"হাঁ, এই শুনে বাড়ীর সকলে আরও সন্তুষ্ট হয়ে অহোরাত্র আমাকে বোঝাতে লাগ-লেন। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে কয়েক মাসের জন্য অফিসের কাজে বাইরে চলে গেলেন। বলে গেলেন ফিরে এসে আবার চেষ্টা করবেন। আর তিনি ফিরলেন না।"

আমরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। রাত্রি আরও গভীর, আরও নিবিড় হ'ল। আমরা আস্তে আস্তে উঠলাম। আস্তে আস্তে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

নির্বাক দম্পতিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম,

(শেষাংশ ৯৬ পৃষ্ঠায়)

সচিত্র গুলজার নগর

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে-সব বইয়ের আলোচনা থাকে তাদের বাইরে এমন অনেক উল্লেখযোগ্য বই আছে যারা এখনো উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। নির্দিষ্ট কয়েকজন লেখক এবং বিশেষ কয়েকটি পুস্তকের আলোচনার মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস নিবদ্ধ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। বহু পুরানো গ্রন্থাগারে এখনো এ জাতীয় অনেক বই পাওয়া যায়। তাদের মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না।

কেউ কেউ বলেন, যে বই পাঠক গ্রহণ করেনি এবং অন্য লেখক যে বই দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য কতটুকু? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোনো বই যদি সাক্ষাৎভাবে পরবর্তীকালের লেখক ও পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার না-ও করে তথাপি তার নিজস্ব মূল্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ প্রত্যেক বই সমকালীন সাহিত্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ। ভালো বইয়ে প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। অন্য ধরনের বইয়ে তা হয়ত অস্পষ্ট। সাহিত্য-সৌধের প্রশস্ত ভিত্তি এই সব স্বল্প-খ্যাত বইয়ের দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর বইয়ের উৎকর্ষ বিচারের জন্যও একটু নিম্নমানের বইগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

এমনি একটি হারিয়ে যাওয়া, সম্পূর্ণ অনালোচিত বই "সচিত্র গুলজার নগর।" একালের কোনো সাহিত্যের ইতিহাস লেখক এ বইটির উল্লেখ করেছেন বলে জানি না। ঊনবিংশ শতকের কোনো পুঁথিপত্রে এর উল্লেখ আছে বলে জানা নেই। এমনকি বাংলা সরকারের ত্রৈমাসিক ক্যাটালগ থেকেও এর সন্ধান পাইনি। অবশ্য অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করতে আরো সময় লাগবে।

বইটির নাম-পত্রের নকল দেওয়া হল ঃ

সচিত্র গুলজার নগর।
রসে মাখা, বর্ণে আঁকা হয়ে
হরবোলা সেজে
দেখা দিলেন।
ভাঁড় সংকলিত।

—

খলের খলতা ভাল, ভালর ভাগ্যে মরা,
সুজনের শাস্তি দিয়ে একি বিচার করা?
নেকা বোকা ধোকা লাগে এমনি গুণে ভরা,
"চারবিদ্যে বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।"

কলিকাতা
আহিরী টোলা স্ট্রীট ৩৪ ভবনে বেঙ্গলি প্রিন্টিং
প্রেসে যন্ত্রিত।
১২৭৮ সাল।
মূল্য বার আনা
… পৃষ্ঠা সংখ্যা—ভূমিকা ১৪।১০৯

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রকাশিত হবার প্রায় দশ বছর পরে 'সচিত্র গুলজার নগর' বের হয়। যদিও 'সচিত্র' কথাটি রয়েছে, তবু বইয়ে কোন ছবি নেই। হয়ত চিত্র অর্থে লেখক 'পেন-পিকচার' বোঝাতে চেয়েছেন। 'ভাঁড়' লেখকের ছদ্মনাম। 'হুতোমের' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'ভাঁড়' নামে এক ভৃত্যের কথা আছে। তাই থেকে লেখক এই ছদ্মনাম গ্রহণের প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন। এ ছাড়া কলকাতার যে-সব ছবি পাওয়া যায় 'সচিত্র গুলজার নগরে' তাদের মধ্যেও হুতোমের প্রভাব পড়েছে। হুতোমের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, 'নক্শার' অনুকরণে বটতলার ছাপাখানায় "প্রায় দুইশত রকমারি চটি বই ছাপান" হয়। ভাষা ও বর্ণনার দিক থেকে বিচার করলে 'গুলজার নগরে' হুতোমের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবিতেই বাংলা সাহিত্যে এ বই স্থান পেতে পারে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটির সূত্রপাত হয়েছে 'সচিত্র গুলজার নগরে' তার পরিণতি এ কথা বলা যেতে পারে। এর মধ্যে আছে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও "হুতোম প্যাঁচার নকশা।" 'নববাবুবিলাসে' গল্পের বীজ আছে; "আলালের ঘরের দুলালে' সে বীজ অনেকটা প্রস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু হুতোমের নকশায় গল্প অনুপস্থিত। 'সচিত্র গুলজার নগর' একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। এর ভাষা হুতোমের মতোই কলকাতার চলিত ভাষা। আলালের ভাষার মতো সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ নেই।

'সচিত্র গুলজার নগরই' বোধ হয় কলকাতার চলিত ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। অবশ্য একালের অর্থে এর কাহিনী পাঠকদের নিকট হয়ত উপন্যাসের মর্যাদা পাবে না। কিন্তু ১৮৬০-৭০ দশকের কলকাতার সমাজ জীবনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাঠকদের যে আকৃষ্ট করে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

কাহিনী এই ঃ শুরু হয়েছে দুপুর রাত্রির বর্ণনা দিয়ে। "রাত্র দুইপ্রহর, চরাচর প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ, বোধ হয় কেউ জেগে নাই, কেবল গোচ্ছার কঠিন-প্রাণ জোনা পোকা, উই পোকা, ঢোঁড়া সাপ, কালপেঁচা ঝিঁ ঝিঁ ঝুনুঝুনু, কর্কশ ধ্বনি ও গর্জনে রাতটা সরগরম করবার উদ্যোগ পাচ্চে কিন্তু তাদের চেষ্টা কাঠবেড়ালের সাগর বাঁধার মতন বৃথা হচ্চে।" এমন দুপুর রাত্রিতে বকনা-পিয়ারীর এক ভাড়াটের ঘরে বালকের বুকফাটা কান্না শোনা গেল। বালকের নাম হেমাঙ্গ বসাক। তার বাবা মনসারাম দালালের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে হেমাঙ্গ কাঁদছে। সংসারে তার আর কেউ নেই; এক পয়সার সম্বল নেই। মৃতদেহ সৎকারের কি হবে, তার ভাবনা কি, এই সব ভেবে বালক কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিল না।

ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ীউলি বকনা পিয়ারী ঘরের মধ্যে এল। মাখনওয়ালার গলির এই ভীষণ-দর্শন স্ত্রীলোকটি ঐ অঞ্চলের সকলের ভীতির কারণ। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সে পুরুষ গুণ্ডাদেরও হার মানায়। "বকনার কেমন চেহারা আপনাদের মনে মনে জানতে ইচ্ছে হচ্চে। বকনা পিয়ারী দীর্ঘে সচরাচর স্ত্রীর মতন কিঞ্চিৎ খর্ব, আড়ে লম্বায় একুনে কালী কোরে সে তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় মোটা, যাঁরা ঐ আশ্চর্য অবতারের দর্শনসুখে বঞ্চিত আছেন তাঁরা পিয়ারীকে একটা মাংসপিণ্ডের ঢাকাই জালা কল্পনা করুন। বকনা পিয়ারী ঘাড়েগর্দানে এক, তার ঘাড়ে এক থাবা মাংস কুঁচকে শোভা পাচ্ছিল, মাথার চুল প্রায় ভালুকের লোমের ন্যায় মোটা ও খসখসে, কপালে সেঁধন ভ্রূ, শূন্য চোখ কুটুরে, থাঁদা নাক, আবার সেই নাকের নীচে বেশ একটু শুয়োর কাঁটার মতন গোঁপ, আর তার দাড়িতে একটা ভাঁটার মতন আব ছিল। তার দাঁতগুলি আমাদের দাঁতের দুণ, ঠোঁট জোড়া আধ ইঞ্চি পুরু, যুগল পাদপদ্ম বুড়ুক্ষের মতন গড়ন, মুখ, তার চেয়ে ভেড়া লম্বা আর ডবল চৌড়, আর রং কুচকুচে আঁধারে।" হেমাঙ্গ তার পায়ে ধরে কৃপা ভিক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বকনা পিয়ারী চৌদ্দ দিনের যে ভাড়া পাওয়া যাবে না সেই শোকে উন্মত্ত। তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে দেবার জন্য হেমাঙ্গকে কঠোর আদেশ করল। কিশোর বালক মৃতদেহ নিয়ে একা কোথায় যাবে? তার আকুল ক্রন্দন শুনে একজন প্রতিবেশী সহায়তার জন্য এগিয়ে এল।

পিতার দাহ শেষ করে হেমাঙ্গ কলকাতার পথে পথে ঘুরতে লাগল আশ্রয়ের সন্ধানে। আশ্রয় ও খাদ্য পাওয়া কঠিন। শোকের চেয়ে ক্ষুধার শক্তি প্রবল। "ডাক্তার জনসন বলতেন যে বন্ধু মলে কেউ কিছু কুলের পিঠে কম খাবে না। পেট এক দারুণ জমীদার, এমন পাপিষ্ঠ অনেক আছে যে স্ত্রীপুত্র খেতে না পাক আপনার পেটটা ভরলেই হলো, পেট নীলকর-দের চেয়েও ইন্দ্রিয়ের উপর অধিক পীড়ন করে, পেটের জ্বালায় জাতমান ধর্ম কিছুই থাকে না। তানসানের গানে, অরফিয়াসের তানে কি নারদের বীণায়, ঔদাস্যের গ্লানি উৎসন্ন হতে পারে, কিন্তু পেটের জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না, এ জ্বালা পুত্রশোকের বাড়া।" সুতরাং হেমাঙ্গ ভিক্ষার আশায় এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগল। দারোয়ানরা বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না, অপমানকর কথা বলে তাড়িয়ে দেয়; আবার কোথাও জাতিতে বসাক বলে আশ্রয় মেলে না। রাত্রিতে আশ্রয়হীন বালককে চোর সন্দেহে থানায় নিয়ে এল। যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখল তা "দেখলে বমি ওঠে...গন্ধে চামসা গন্ধে নাড়ী ওঠে, দুএকটি নামমাত্র জানালা আছে তাঁদের হাওয়ার সঙ্গে ইস্টিমকালে সম্বন্ধ হয় না, আশ্বিনের ঝড়ের সময় একবার পবন ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর হাঁদিপাঁদি বেরিয়েছে সেই অবধি তিনি নাকে খত দিয়েছেন আর এমন কর্ম করবেন না।"

এই অস্বাস্থ্যকর ঘরে থেকে হেমাঙ্গ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সকাল বেলা তার অবস্থা দেখে এবং চুরির কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ছেড়ে

অলংকার ও টাকাপয়সা ফিরিয়ে দিয়ে আর এক মুহূর্তেও সেখানে অপেক্ষা করল না। নবমালিকারা পালটি ঘর। হেমাঙ্গের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হল। নীরদচন্দ্র প্রচুর যৌতুক দিলেন বিয়েতে। এর কিছুকাল পরে নীরদচন্দ্র ও হেমাঙ্গ সপরিবারে গুলজার নগর ত্যাগ করে বামায় গিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

নব্বই বছর পূর্বেকার এই কাহিনী রচনায় কিছু নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকায় "ভাঁড়" বলেছেন, এ কাহিনী তাঁর নিজের রচনা নয়; গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়ে একটি খাতা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই কাহিনী তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কাহিনীর সমাপ্তি কিভাবে হবে তার আভাস পাঠক শেষ অধ্যায়ে না পৌঁছিলে পাবে না। গোয়েন্দা গল্পের মতো কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রথম থেকে চুরির ব্যাপারে বাদসার উপরে সন্দেহ হয়। কিন্তু অপরাধী হিসাবে আচাভূয়া ধরা পড়বার পর নতুন আবিষ্কারের আকস্মিকতায় পাঠক চমকিত হবে।

চরিত্র-চিত্রণে লেখক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। সংলাপের কল্যাণে প্রত্যেকটি চরিত্রের ব্যক্তি-গত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উপরে তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি। আর একটি দৃষ্টান্ত ছোট দিদি। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু-জীর সেবিকা। "সেটি কর্তার ছোট দিদি, কর্তা তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তাতে সকলে তাঁকে ছোট দিদি বলেন, তিনি সবচিনে ছোট দিদি। ছোট দিদির নাকটা নতিয়ে পড়েচে, তাতে দুএকটি মেচা পড়েচে, রং ফুটে বেরুচে, বয়স কিছু লম্বা, ছোট দিদি এক্ষুনে যেন পাকা আঁবটি—যেন দুধটুকু মেরে ক্ষীরটুকু হয়েছেন। ছোট দিদির স্বভাব অতি মৃদু ও পবিত্র, দেখলে ভক্তি হয়।" এই পবিত্রতার ভান নিয়ে ছোট দিদি কুলবধূদের শিকার করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে নিয়ে আসে।

লেখক ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রচুর ব্যব-হার করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনার মূল সুরে আন্তরিক সহানুভূতি ও মমতা। কারণ লেখক জানেন যে বাইরের ঘটনা দিয়ে মানুষকে চরম-ভাবে বিচার করা যায় না। মনই হল আসল। "মনের ভাব মনই জানে, এতে শিশুর আবদার আর উন্মাদের খেয়ালের মতন কখন যে কি ভাব হবে কেউ বলতে পারে না। মনের কাছে গণকের বুদ্ধি পেছু হাটে। উকীলের ইনডেকাসে ও বান্দর পৌতেয় মনের কথার নজির নাই......।" তাই আচাভূয়ার এত কুকীর্তির পরে যখন জানতে পারি যে কুৎসিত চেহারার জন্য ছেলে-বেলায় বাবার হাতেও সে অকারণে পীড়িত হয়েছে তখন তার উপর আমাদের সহানুভূতি জাগে। বুঝতে পারি, প্রথম জীবনের অবহেলা ও পীড়নের ফলে তার মধ্যে বিকৃত মানসিকতা জন্মলাভ করেছে।

এই কাহিনীর প্রধান সম্পদ উনবিংশ শত-কের ষষ্ঠ দশকের কলকাতার জীবন্ত চিত্র। কলকাতার পথঘাট; চোর-গুণ্ডা-জুয়াচোরের উপদ্রব; দাঙ্গা-হাঙ্গামা; বারবনিতা ও মাতালের আধিক্য ইত্যাদি সব নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য সবই উত্তর কলকাতার চিত্র। পাথুরেঘাটার এক গলির ছবি দেখুন: "ঐ গলির প্রকৃত কুচনীপাড়া তথায় বোধ হয় ভদ্র-লোকের বসতি নাই, রাজ্যের জুয়াচোর, হস্ত-কলুমে, খন্টে আঁখুরে, জালখোতে, ঘর্বলে আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাড়ে চারিদিক গিজ্‌গিজ কচ্চে, যেখানে সেখানে পাইখানা ও নর্দমার দুর্গন্ধে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে, ওর মধ্যে এক আধটা আস্তাবলও আছে, একখান জঘন্য বাড়ীর দ্বারের মাথায় টিনের একটা ভাঙ্গা হাতলণ্ঠন ঝুল্‌চে......।"

খাদ্যে ভেজাল তখনও ছিল: "......ঘোষের পো ফুঁকো দিলেন, পিটুলি দিলেন, পালো দিলেন, 'এক পো দুধে তিনপো জল' তার

সচিত্র গুলজার নগর।

কলিকাতা

সচিত্র গুলজার নগর-এর নামপত্র ।।

সংকেত হলো। ঘৃতয় কাঁঠালি কলা, নারকেল তেল, পোস্তর তেল, রেড়ির তেল, শেয মাছের তেল, আর শুয়রের চর্বি মিশানর প্রথা হলো।" বৃষ্টি হলে এখন যেমন কলকাতার পথ জলে ডুবে থাকে তখনও তা হত: "বৃষ্টির সময় অভাগা চিৎপুর রোড আর তারই সমান নরকের পথ, সাঁতারে বাবুর লাঞ্ছনা আর কেরাঞ্চির সোয়ারদের (শুকের) গঞ্জনা খেয়ে আরো গভীর নরকে ঝাঁপ দেয়, তাতে ঐ সাঁতারে বাবু আর সোয়াররা খোসবোয় মাখামাখী...।"

ভদ্রঘরের মেয়েদের রাস্তা দিয়ে একা চলা বিপজ্জনক ছিল। একা দেখলেই বদমায়েস লোক চারদিক থেকে ঘিরে অপমান করত। তাই লেখক এমনি একটি ঘটনার পর মন্তব্য করছেন: "এদেশের লোকেরা এত অসভ্য, তাঁরা রমণী-কুলের মর্যাদা এত তাচ্ছিল্য করেন যে, আমেরিকা খণ্ডের ইন্দিয়ানরা, আফ্রিকার হটেন্‌টটেরা, আর বন্য সাঁওতালেরা তাঁদের অপেক্ষা যোষাগণের মান রাখতে জানে।"

কলকাতার সাধারণ স্কুলের অবস্থা তখন কেমন ছিল দেখুন: "স্কুলের বখার ছেলেদের আঁটা ভার, মাষ্টার মশাই তা বেস জানেন, তাদের পাল্লায় কখন ঠেকেও থাকেন, ছেলে পড়ান ঝক্-মারি। হাবু বাবু ফক্কাড়ধরের গাল টিপে ছিলেন তাতে কেউ শিশ্ কেউ জন্তুর ঠক্‌ঠকি কেউ নাকে কাঁঠ দিয়ে হাস্য আরম্ভ করলে, হাবুবাবু রেগে টাঁই, হেড মাষ্টারের কাচে রিপোর্ট করতে যান, ছোকরারা অমনি নেচে হাততালি দিয়ে হো-হো হরিবোল কোরে উঠল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, দুড়দুম শব্দ হলো, হেড মাষ্টার নেউলের মতন ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবুবাবু [illegible] কোরে

চেষ্টা করেও মানুষ হতে পারিনি, ভাই! গৌর দত্ত

নতুন কলমটা হাতে নিয়ে মনটা আজ ছেলে-মানুষের মতো খুশি। এটা দিয়ে পুজোর বাজারে 'মার কেরা' মারকা একটা গল্প লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে। গল্পের পায়তারা কষতে কষতে মনে পড়ে গেল হিমাদ্রির মুখখানা। এ কলমটা আগে হিমাদ্রিরই ছিল। বেচারী হিমাদ্রি। কাল বিকেলে এল আমাদের আপিসে। খবরের কাগজের আপিস যেমন হয়। কথা ছোড়াছুড়ির খেলা তখন জমে উঠেছে। হিমাদ্রিকে দেখেই নিরুপম বলল—কি দাদা! বিয়ে থা করলেন?

নিরুপম একদা হিমাদ্রির 'মেয়ে দেখা' বিজনেসে পার্টনার ছিল। ওরা দুজনে এ-ওর পাত্রপরের সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিত। অমনি বিয়ের সম্পর্কের কথা উঠত। কথা ওঠা মানেই মেয়ে দেখার প্রশ্ন ওঠা। ওরা দুজনে মিলে দেখতে যেত মেয়ে—সেদিন রাতে খাওয়া খরচাটা বেঁচে যেত। বিয়ের কথা বেশিদূর এগোতো না। হপ্তায় গোটা দুই তিন পার্টি জুটত। ......অবিশ্যি সে কারবার বেশিদিন চলে নি। নিরুপম চাকরী পেল, বিয়ে করল। কারবার গুটোলো।

হিমাদ্রি ঠোঁটের চুরুটটা কামড়ে বলল—নাঃ এখনো পাত্রী তেমন জুটল না।

—বলেন ত সম্বন্ধ দেখি।

—তা দেখতে পারেন। তবে কোনো মেয়ে কি রাজী হবে! আমার বর্তমান আস্তানায় একমাত্র আমিই থাকতে পারি, সেখানে আর কেউ—

—কেন, কেন? বর্তমান আস্তানা মানে। তুমি কি বাড়ী ছেড়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। এখন বেলঘরিয়াতে দিব্যি আছি। ঘরখানা স্রেফ শোবার জন্যে। জুতোটি খোলো, শুয়ে পড়ো। দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঠুকে যাবে। একটু মোটা লোক হলে, পাশ ফেরবার সময় উঠে বসতে হবে। মাসিক ভাড়া এগারো টাকা।

নিরুপম দমে গেল—ও! তাহলে...

—না, না, সেজন্যে অনেক আর বাজে খরচ করতে পারবেন না। বিয়ে না হলেও আমার ঘরে ফেমিনিন টাচ্ ছড়ানো।

—সেটা কি রকম?

—আসলে ওটা পূর্বাশ্রমে রান্নাঘর ছিল। এলা চাঁড়িয়ে আমাকে শোবার ঘর হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। রান্নাঘরের নজীর হিসেবে একটা তাক রয়েছে। সেটার কালিমা এলার পালিশে চাপা পড়ে নি। এগার টাকায় এর চেয়ে বেশি কেউ আশা করতে পারে?

নিরুপম উঠে পড়ল। নিরুপম চেনে হিমাদ্রিকে। হিমাদ্রির সুদিনে অনেক ট্যাক্সি চড়েছে, সিনেমা দেখেছে, রেস্তোরায় রোস্ট কাটলেট উড়িয়েছে। তবে হিমাদ্রির টাকার জোয়ার অমাবস্যার বিদ্যুতের মতো। ফলে দুর্দিনেরা সংখ্যায় সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের জনগণের অরণ্য। আর দুর্দিন হলে হিমাদ্রি দশ বিশ টাকা থেকে শুরু করে আট আনা চার আনা পর্যন্ত নিয়েছে হাত পেতে। আমরাও নিরুপমের মতো হিমাদ্রিকে খুব রহস্যময় ব্যক্তি মনে করি, তার দরাজ হাতের কাটলেট, ট্যাক্সি আমাদের কপালেও পোঁছয়। অবিশ্যি তার ট্যাক্সও দিতে হয়।

কিন্তু এসব কেন ভাবছি। আমি ত গল্প লিখব। নতুন কলমে নতুন গল্প (নূতন রীতিতে? না, না, অতখানি পাগলামীর প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো)। শহর নিয়ে অনেক ত লিখেছি, এবার গ্রাম নিয়ে লিখতে হবে। বাংলা দেশে আমার বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখব না। একেবারে তাহিতি কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে লিখব। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতির রেকর্ড চৌচির করে দেবো।

কিন্তু কিছুই যে মগজে আসছে না। কলমটা আমাকে ভেংচী কেটে যেন চুরুট কামড়াচ্ছে। হতভাগা হিমাদ্রি। ঠকিয়েছে আমাকে। কিন্তু, কিন্তু ওরই বা কি দোষ, নিবটা নতুনের মতোই, খুব চমৎকার দেখতে, লেখাও সরে। তবে? তবে মুস্কিল হয়েছে, কলমের সঙ্গে হিমাদ্রির বিষণ্ণ হাসিমাখা মুখখানা হাজির থাকছে। তার গলার আওয়াজ কানে শুনতে পাচ্ছি। কাল ও যখন আমাকে বাইরে ডেকে এনে ওর বুক পকেটের দিকে চোখ ফেলে বলল—ভালো পেলিক্যান, দরকার আছে?

জবাব দেবার কথা খুঁজছি, ও বলল—কলমটা নিলে ঠকতে হবে না। গোটা কুড়ি টাকার দরকার। অবিশ্যি তোমাকে পনেরো টাকায় দিতে পারি। বাজারে চেষ্টা করলে কুড়ি-পঁচিশও পাবো, লাইফটাইম। পাইওনিয়ার থেকে পঁচাশীতে কিনেছি, দুমাসও হয় নি।

ওর কথাগুলো কানে বড় লাগল। ইচ্ছে হল, পনের টাকা এমনিই দিই, ধার। জানি, ওর হাতে টাকা এলে চাইলেই ফেরৎ পাবো। কিন্তু—কিন্তু কলমটা আজ না হোক কাল-পরশু ওর হাত ছাড়া হবেই। পনের টাকা ফুরোতে যা দেরী। হাসলাম। পকেট থেকে পনের টাকা বার করে দিলাম ভারি মনে। কষ্টও হয়েছিল। আবার সস্তায় একটা এত দামী কলমের মালিক হওয়ার আত্মপ্রসাদও যে হয় নি তা নয়।

কিন্তু হিমাদ্রির কথা ভাবলে ত পুজো সংখ্যার গল্প লেখা হবে না, তা সে কলমটা যত দামীই হোক না কেন?

মহৎ কার্যে বহু বিঘ্ন। কলমের সঙ্গে মোকাবিলা শেষ হবার আগেই মৃদুলা এল এক ঝলক প্রভাতী হাসির আলো ছড়িয়ে।

—কি ব্যাপার! এমন অসময়ে?

—এলাম তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে। তোমাদের স্বভাব বড় মন্দ।

—তা আমারও জানা আছে। কিন্তু সে খবর তুমি কুর পেলে?

দমে গেল। বলল—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে আপিস কামাই করে এসে পড়লাম। আর তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ?

—বলো, বলো, তোমার বারতা শুনি
তোমারি কুশলে কুশল মানি।

—মানো, না, ছাই। কাল তোমার আপিসে যাবার কথা, তা গেলাম না কেন! অ্যাকসিডেন্টে হাসপাতালে পড়ে রইলাম, কি, কি হল কিছু জিগ্যেস করলে না তো?

—জিগ্যেস করব কি জন্যে। তোমার খবর বলে দিতে পারি। এই ধরো পথের মধ্যে আমার বদলে আমার বন্ধুকে পেয়ে তার সঙ্গে খুব চা আর টা খেয়েছ ত!

—ওমা! তুমি জানলে কি করে!

—তোমার হিমাদ্রিবাবুই বলেছেন।

—উনি বুঝি এসেছিলেন?

—হিমাদ্রিবাবু তোমার বন্ধু। কিন্তু তোমরা ওঁর এত নিন্দে কেন করো বলতে পারো?

—নিন্দে, কই না তো?

—আমি যেন ঘাস খাই। ওঁকে দেখলেই কেমন অস্বস্তি হয় তোমাদের। কিন্তু যাই বলো মানুষটা বড় ভালো। আপিস থেকে ফিরছি, উনি ধরে নিয়ে গেলেন, বললেন, তুমি খুব ব্যস্ত আছো। তা ভাবলাম, লোকজন থাকলে না যাওয়াই ভালো।

—কেন?

—তুমি ত আর বেরুতে পারতে না। অথচ আমার দরকার ছিল একবার কলেজ স্ট্রীটে যাবার, বিয়ের প্রেজেন্টেশন কেনবার জন্যে। তা হিমাদ্রিবাবু নিজে থেকেই বললেন 'চলুন, আপনার কোনো কাজে আসতে পারি কি না।' ব্যস, কাজ হল।

—আর, তারপর?

—তারপর চা খেলাম আমরা, পয়সা আমিই দিচ্ছিলাম কিন্তু উনি এমন ধমক দিলেন 'খুকী' বলে যে থেমে গেলাম। মানুষটা সত্যিই পরোপকারী। আপিসের চাকরীটা যাতে আমার পার্মানেন্ট হয় সেজন্য মিনিস্ট্রিতে মুভ করবেন বললেন, ওঁর ত অনেক জানাশুনো।

মৃদুলার মুখ থেকে যা শুনেছি, এগুলো সবই শুনেছি, হিমাদ্রির মুখে। তবে তার বলার ধরণে আর মৃদুলার বলার ভঙ্গীতে ফারাক আকাশ-পাতাল। না, না, মেয়েলী আর পুরুষালী ঢঙে যে তফাৎ স্বাভাবিক তা ছাড়াও বিস্তর তফাৎ।

মৃদুলা বলল—তুমি অমন কাঠ হয়ে বসে কেন?

—কাঠ! না আকাঠ বলো।

—যাকগে, এক কথায় হিমাদ্রিবাবু তোমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক।

তা যা বলেছ। ট্যাক্সি করে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। আর আমি হলে ভিড়ের মধ্যে বাসে গলদঘর্ম হয়ে আধ মরা লাশ নিয়ে বাড়ি পৌঁছে মনে হয় যেন কৈলাসে এলুম, তাই না?

—ট্যাক্সিতে কিন্তু তোমার মতো বেয়াদপী করেন নি।

কিন্তু—

—কিন্তু কী! ওঁর সঙ্গে ট্যাক্সি করে গিয়েছি বলে রাগ করলে? আহা আমি যেন ট্যাক্সির কথা বলেছি। উনিই বললেন যে, টালীগঞ্জে একটা ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং আছে, জরুরী। তা উনি ত ট্যাক্সি করেই যাবেন, আমাকে পথে ভবানীপুরে নামিয়ে দিলেন, এই ত ব্যাপার।

আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনি। না, অবাক হই নি। হিমাদ্রির পক্ষে সবই সম্ভব। ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিংও তার মগজে গজাতে পারে, কোম্পানী, শেয়ার, বিল, পার্টি হাজার হাজার টাকা প্রফিট—সবই সে বসে বসে চুরুটের ধোঁয়ায় আমদানী করে। পুরনো বন্ধু। এককালে অনেক টাকার কারবার কোরেছে তাও ঠিক—কিন্তু আজ দীর্ঘশ্বাস পড়ল নিজের অনিচ্ছাতেই। আর সেই হলো ফ্যাসাদ।

মৃদুলা আমার হাঁচি-কাশিটুকু থেকে পড়তে পারে আমি কি ভাবছি। বলল—তুমি যেন কিছু একটা ঢেকে রাখছো।

—না, কিছু না। বাতাসিয়া লুপ!

ট্যাক্সিতে চড়া যে এতটা অপরাধ হবে তা জানলে হেঁটেই বাড়ি যেতাম।

—আরে না, না, তা নয়। বলছি ত বাতাসিয়া লুপ।

—তার মানে?

—নেহাতই না শুনে ছাড়বে না!

—থাক, যদি বলতে এতই আপত্তি থাকে।

—আপত্তি আমার তরফে কিছু নেই। তবে তোমার কাছে সেটা কেমন লাগবে সেটাই ভাবছি।

ঈষৎ বক্র ভঙ্গীতে জবাব দিল—তাহলে আমার কথা ভাবো?

—তুমি আমার কথা ছেড়ে হিমাদ্রির কথা ভাবতে থাকলেই কি আমিও তোমার জন্যে ভাবনা ছাড়ব!

আমার একটা নরম মুঠোর কিল—এসব অসভ্যতার মানে কি?

—মানে এই যে, হিমাদ্রি রাত আটটার সময় এসে বলল, আরো পাঁচটা টাকা চাই ভাই, এটা ডেট অব অনার, ফেরৎ দেবো।

—আরো পাঁচ টাকা মানে, আগেও নিয়েছেন।

—না সেটা ধার নয়, সেটা বিজনেস, এই যে কলমটা দেখছো—

মৃদুলার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল—ছি, ছি, ছি! এমন জানলে কি ওঁকে পয়সা খরচ করতে দিই! আচ্ছা বাউণ্ডুলে—

ওর কথা থামিয়ে দিলাম—আমার কাছে কলমটি বেচে বেরিয়েই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

—আমি কি ছাই এসব জানি?

মৃদুলাকে যেন পথে বসিয়ে দিল কে।

আমি বললাম—থাক, এরপর আর বাকীটা শুনতে চেয়ো না।

—বাকী আছে নাকি এর পরও?

—আছে সামান্যই—

—বলো, বলো—

—তোমার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে যে—ওদিকে হয়তো হিমাদ্রি আপিসে হাজির হবে—

—কেন?

চটে গিয়ে বলল মৃদুলা।

—তার ধারণা—

থেমে গেলাম, বলা উচিত হবে না।

মৃদুলা বলল—তার কি ধারণা বলো—

—তুমি তার প্রেমে পড়েছ। অন্ততঃ কাল রাতে এসে সেইরকমই রিপোর্ট করল।

বেশ করেছি। তোমারও কি তাই ধারণা? যদি তাই হয় আমাদের সম্পর্ক এখানেই খতম করে দাও।

—জানতাম। জানতাম মৃদুলা একথা শুনলে ফেটে পড়বে। তবু কেন বললাম? নিজের অসংযমে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।

মৃদুলা উঠে পড়ল—আচ্ছা আসি।

দরজার সামনে লাফিয়ে যেতে হল, নইলে ওকে রোখা যাবে না।

বললাম,— দাঁড়াও, দাঁড়াও। হিমাদ্রি যদি আপিসে গিয়ে তোমায় না পায় তাহলে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়বে। এককালে তোমার বড় সাহেব ওর কোম্পানীতে চাকরী করতো—

—এ সব নিয়ে তামাশা ছাড়ো। আমাকে এখুনি যেতে হবে আপিসে, চুরুটটা টান মেরে ফেলে দিয়ে গালে-গালে চড়িয়ে বাঁদর-চড়া করবো। মৃদুলা ব্যানার্জি পালিটিক্স করেছে, অনেক বেয়াদপকে ঠেঙিয়েছে!

তা ও যা মেয়ে, পারে। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। ওর হাত ধরে টেনে এনে চৌকীর ওপর বসিয়ে দিলাম—এখনো বেড়ালের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। পিঠে হাত বুলিয়ে গলায় এক রাজ্যের মিনতি ঢেলে বলি,—দুলু, একটা কথা রাখবে!

এর আগে যে ছোকরা ওকে ভালোবাসতো সে 'মৃদু' বলতো, তাই আমি ওকে 'দুলু' বলি।

ও ভুরু কুঁচকে বলল,—কী!

—না, তা হলে রাখবে না! বেশ—

—কই, আমি সে কথা কখন বল্লাম!

—তোমার মুখখানাই ত বলছে।

—মুখখানা বুঝি খবরের কাগজ?

—না! টেলিপ্রিন্টার! টক্-টক্-টক্— সর-র-র! একটা খবর হয়ে গেল।

—আচ্ছা হয়েছে। বলো কি কথা—

—কথা দাও যে, রাখবে!

—না-না। অমন হ্যাংলার মতো করছ কেন। দিনে-দুপুরে যদি কেউ এসে পড়ে—

—না, না, চ্যাংড়ামী নয়। একটা জরুরী কথা—

—বেশ, দিচ্ছি, রাখবো।

—তুমি হিমাদ্রিকে এ নিয়ে কিছু বলতে পাবে না।

—তা কি ক'রে হয়! এভাবে সে যা তা ভাববে, বলবে, আর আমি বরদাস্ত ক'রে যাবো, তা হয় না। কিছু না বললে যদি বাড়াবাড়ি করে—

—না, তা সে করবে না। সেদিক দিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই।

—না, নেই! তুমি ছাই বোঝো।

—আমি ঠিকই বুঝি! বেচারী আসলে কিছু পায়নি তাই স্বপ্ন দেখে যেটুকু তৃপ্তি পায়, পেলে কি ক্ষতি!

কলমটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখ ভ্যাংচানো বন্ধ হয়ে গেছে। কলমটাকে বড়ই করুণ মনে হচ্ছে।

মৃদুলা আমার দিকে তাকালো। ওর দুচোখে আবেশের মেদুর আমন্ত্রণ। ইচ্ছে করছে ওকে দুহাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরে পিষে ফেলি, মিশিয়ে ফেলি আমার বুকের মধ্যে। কিন্তু অসহায় আমি। কলমটা যেন হঠাৎ হিমাদ্রি হয়ে গেছে—তাকিয়ে দেখছে আমাদের দুজনকে। পারলাম না। গল্পও লিখতে পারলাম না, মৃদুলাকেও আদর করতে পারলাম না। কলমটা আমার এমন লগ্নে দুর্গ্রহ হয়ে টেবিলে রইল কেন! মৃদুলা বাতাসিয়া লুপের মতো হিমাদ্রিকে ঘুরে, নেমে আবার উঠে এল আমার মনে।

কোকেন-রাণী

রমেশচন্দ্র সেন

সকালের কাগজে কাগজে প্রধান বিচারপতির অসুস্থতার সংবাদ সারা সহরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। সর্বাধিক প্রচারিত 'বিশ্ববার্তা'য় বেরোল—

"প্রধান বিচারপতির মূর্ছা

'কোকেন-রাণীর' মামলার পরিণতি।"

বিশ্ববার্তার পাঠক মাত্রেই কোকেন-রাণীর মামলার খবর জানেন। গতকল্য চাঞ্চল্যকর এই মামলার শুনানীর সময় প্রধান আসামী কোকেন-রাণী বিচারপতি মিঃ তলাপাত্রের হস্তে নিজের লিখিত একটি জবানবন্দি দাখিল করেন। উহা পাঠ করিয়া বিচারপতি আদালত-কক্ষে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক।

আর এক পৃষ্ঠায় স্টপ প্রেসের খবর প্রকাশ—

রাত তিনটার সময় প্রধান বিচারপতি মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞা ফিরিয়া পান। তখন অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলেন, "এ সবই পরিহাস।" —পরক্ষণেই তাঁর আবার সংজ্ঞা লোপ পায়।

চায়ের দোকানে দোকানে, ফুটপাথের ধারে রোয়াকের আড্ডাধারীদের অনেকের মুখে একই প্রশ্ন—"ব্যাপার কি বলত ভাই?"

কেউ প্রশ্নের সোজা জবাব দেয়—"এতে রস আছে ভাই! কোকেন-রাণীর রূপ দেখেই বুড়ো মূর্ছা গেছে!"

কেউ বা মন্তব্য করে—"তলাপাত্রও হয়ত কোকেন-চুরির সঙ্গে জড়িত আছে। বড়লোকের ব্যাপার তো, ওরা জল খায় ডুবে-ডুবে।"

বিচারপতি মূর্ছিত হ'য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেঞ্চ-ক্লার্ক দেবেশ রায় সকলের অলক্ষ্যে তাঁর হাত থেকে কোকেন-রাণীর জবানবন্দি সরিয়ে ফেলে। নথিভুক্ত না ক'রে সেখানা নিজের পকেটে রেখে দেয়।

ঘটনার দিন বৈকালে এবং পরদিন অনেকেই দেবেশকে প্রশ্ন করে—"ব্যাপার কি বলত ভাই?"—সকলকে সে একই জবাব দেয়—"কিছু জানি না।"

এমন কি তার স্ত্রীকেও সে কিছু বলেনি। সে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করায় বরং বিরক্তিই প্রকাশ করেছে।

বান্ধবী রমলার সঙ্গে তার দেখা হ'ল সেই রাত্রে। সেও প্রথমেই ঐ প্রশ্ন করে বসল। দেবেশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে, ঘরে আর কেউ নেই দেখে বলল, "কোকেন-রাণী আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়ে জজের দিকে চেয়ে রইল। তিনিও তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। আমার মনে হ'ল, তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন। চিনতে না পারলেও অন্ততপক্ষে আসামীকে পরিচিত বলে মনে হয়েছে তাঁর। স্মৃতির গহবরে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এ কে?"

একটু পরে বিচারপতি আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম?"

"কোকেন-রাণী।"

"আর কোনও নাম নেই? এই চোরা কারবার আরম্ভ করবার আগে কী নাম ছিল তোমার? বাপ-মা কী ব'লে ডাকত?"

"মা বলতেন, রাণী; বাবা ডাকতেন, মহারাণী।"

"কোকেনরাণী নাম হয়েছে তোমার কবে থেকে?"

"ঠিক বলতে পারব না। তবে কিছুদিন থেকে এই রাস্তার লোকেরা আমায় বলে কোকেনরাণী।"

"কোন্ রাস্তা? কোকেনের চোরা কারবারীদের কথা বলছ বোধ হয়?"

আসামী কোনো উত্তর করল না। বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, "এই মামলায় তোমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তুমি জান?"

"হ্যাঁ, জানি। আমার ব্যারিষ্টার আমায় বলেছেন।"

"তুমি কি অপরাধ স্বীকার করছ?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

এই সময় কোকেন-রাণীর কৌসুলী হাকিমের উদ্দেশে বললেন, "আমার একটা আবেদন আছে, হুজুর। আজ এক সপ্তাহ থেকে আমার মক্কেলের কেমন যেন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিছু খান না উনি, ঘুমোতেই হয় না। কারো কথার জবাব দেন না, মাঝে মাঝে একাকী স্বগতোক্তি করেন। কেউ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলে চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকান। ও'র স্বীকারোক্তি প্রামাণ্য বলে—"

কোকেন-রাণী বাধা দিয়ে বললো—"না, হুজুর—আমি পাগল নই। সজ্ঞানেই বলছি, আমি অপরাধী।"

হাকিম বললেন, "তুমি যে স্বীকারোক্তি করছ, জান এই অপরাধের শাস্তি কি?"

"হ্যাঁ। আমার কৌসুলী বলেছেন। আমি সত্যই অপরাধিনী। কদিন বসে অনেক ভেবে-চিন্তে এই জবানবন্দি লিখেছি। এতে আমার পরিচয়, আমার জীবনের ইতিহাস, অপরাধ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—সবই আছে। আপনি দয়া ক'রে পড়ে দেখুন—" বলে কোকেন-রাণী তার ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে জেমস্ ক্লীপে আঁটা কয়েকখানি কাগজ বার ক'রে বিচারপতির দিকে তুলে ধরে।

এই সময় দেবেশের জন্য চা ও খাবার এলো, তার কাহিনীতে একটু ছেদ পড়ল। জল-যোগান্তে সে আবার আরম্ভ করল, "কোকেন-রাণীর হাত থেকে আমি সেগুলো বিচারপতির হাতে দেই।"

"তিনি একমনে এই জবানবন্দি পড়তে থাকেন আর মাঝে-মাঝে আসামীর দিকে তাকান। ফর্সা রঙ, সুন্দর চেহারা তার। কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখখানা কেমন বিবর্ণ হতে আরম্ভ করে। কপালে পড়ে চিন্তার ছাপ। খানিকটা পড়ার পর নীচের ঠোঁটখানাকে উপরের পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরেন তিনি। সবটা তাঁর পড়া হয়েছিল কি না, জানি না—বোধ হয় হয়েছে—শেষে একটুক্ষণ আবার আসামীর দিকে চেয়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। প্রথম দিকটায় কয়েকবার গোঁ-গোঁ শব্দ করেন।"

রমলা বলল, "ও'র কি ব্লাড প্রেশার ছিল?"

"শুনিনি তো কখনো।"

"আচ্ছা, কোকেন-রাণী কি খুব সুন্দর?"

"হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দরী। বয়েস পঞ্চাশ হবে, কিন্তু দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ। যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল... ভিক্টোরিয়া ... তেমনি ... ভিক্টোরিয়া ফেরার।

স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তি তার চোখে-মুখে, তার সর্বাঙ্গে।"

"শুনেছি, কোকেন-রাণী নাকি হিন্দুস্থানী নয়, বাঙালী। পশ্চিমের এই সহরে এসে এতবড় চোরা কারবার খুলল কি করে, তার জবানবন্দি পড়লেই জানতে পারবে।"

"আছে নাকি তোমার কাছে?"

"হাঁ।"

"পেলে কি করে?"

"হাকিম অজ্ঞান হয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমি ওটা তুলে রেখেছি।"

"তুমি পড়েছ?"

দেবেশ পকেট থেকে কোকেন-রাণীর জবানবন্দী বার ক'রে রমলার হাতে দিয়ে বলল, "হাঁ। একটু জোরে পড়, তোমার মুখ থেকে আবার শুনি।"

নীল রঙ দামী কাগজ, তার উপর পরিষ্কার সুন্দর হস্তাক্ষর। লাইনগুলো সোজা ও সমান্তরাল।

"বাঃ, সুন্দর লেখা। বেশ রুচি আছে তো কোকেন-রাণীর—" বলে রমলা পড়তে আরম্ভ করল—

মহামান্য বিচারপতি মহাশয়,

আপনাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করব, না 'আপনি' বলব, এই নিয়েই প্রথমে মনে একটা প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু শেষটায় নানাদিক বিবেচনা করে সম্মানসূচক 'আপনি' বলাই স্থির করলুম। কেন না, আপনি আজ পবিত্র ন্যায়াধীশের আসনে বসেছেন, আর আমি এসে দাঁড়িয়েছি বিচারাধীন আসামীর কাঠগড়ায়। আইনের চোখে, লোকের এবং সমাজের চোখে আজ আমি কলঙ্কিনী! আমার জীবিকা এবং ব্যবসায় কোকেনের চোরা কারবার। আর আপনি আজ স্বাধীন দেশের এক রাষ্ট্রের প্রধান বিচারক!

আপনাদের পরিবারে যেদিন আমি আপনার অগ্রজের বধূরূপে এসে উপস্থিত, সেদিন আমার রূপ দেখে যাঁরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন, আপনি তাঁদের অন্যতম। আপনি আমাকে দেখেই মন্তব্য করেছিলেন—'এ যে গোবরে পদ্মফুল দেখছি!'

কথাটা বলেছিলেন আমার পিতার দারিদ্র্যকে ইঙ্গিত ক'রে।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন, আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলুম। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব ছিল। শুধু সেদিন নয়, যতদিন আপনাদের পরিবারে ছিলুম, বরাবরই আপনার কথা-বার্তায় ও চাল-চলনে লক্ষ্য করেছি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ফাইন সেণ্টিমেণ্টের অভাব।

অল্পদিনের মধ্যেই আপনার অশোভন স্থূল রসিকতায় বিরক্ত হয়েছিলুম। মনে হ'ল, ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে এক তরুণের এ কী রুচির পরিচয়!

নিজের রূপের পূজারীকে নারী মাত্রই পছন্দ করে, কিন্তু আমি তার ব্যতিক্রম। আকৈশোর সৌন্দর্যের জন্য পুরুষের অযথা স্তুতি পেয়ে পেয়ে জিনিসটার উপর আমার কেমন যেন ঘৃণা ধরে গিয়েছিল!—আমার বয়স তখন আঠারো কি উনিশ—আপনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়—এম-এ পড়ছেন, তেমনি অধ্যবসায়ী ও সুবোধ তরুণ ছাত্র হিসাবে আত্মীয়-স্বজন মহলে আপনার খুব সুনাম। তবে, আপনার সুবুদ্ধির উপর আমার কোনো আস্থাই ছিল না, এমন কি, আপনার বুদ্ধির উপরও নয়।

যা সত্য বলে অনুভব করেছি তাই লিখলুম—আশা করি ক্ষমা করবেন।

দিন একরকম কেটে যাচ্ছে। আপনার দাদা দু'দুবার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করে বাপের পয়সায় একটা ডাক্তারখানা খুলে বসলেন আর আপনি বিলেত ঘুরে এসে হলেন হাকিম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পরই আপনার বিয়ে হয়, আর হাকিম-জীবন সুরু হয় আলীপুরে।

অল্পদিনের মধ্যেই আপনার দাদা মদ ধরেছিলেন। তিনি প্রায়ই বাইরে রাত কাটাতেন। আমিও নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতুম!

আপনার মধ্যে এতদিন যে সাপটা লুকিয়ে ছিল, আমার নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থা দেখে সেই সাপটা ফণা তুলে আমায় ছোবল মারতে চেষ্টা করল! আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম, আর আপনিও ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠলেন। একদিন বললেন, "আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত না হলে, আমি তোমায় বাড়ীছাড়া করব!"

আমি বললুম, "আমায় কেউ বাড়ীছাড়া করতে পারবে না! শ্বশুরের ভিটেয় আমি আছি নিজের অধিকারে।"

"মেয়ে-মানুষের আবার অধিকার!—হেঃ হেঃ"—বলে, হিংস্র শ্বাপদের মত গর্জন ক'রে উঠেছিলেন আপনি।

আজ সমাজে আপনার প্রতিপত্তি প্রচুর—আপনাদের দাম্পত্য-জীবনও নাকি সুখের। কিন্তু, সেদিন স্ত্রীর দিকে, সংসারের মান-মর্যাদার দিকে তাকান নি আপনি। আপনার মা প্রথম থেকেই আমাকে দেখতে পারতেন না। তাঁর রূপ ছিল না বলে হয়ত হিংসা ছিল আমার উপর। আর হয়ত ভয় ছিল সংসারে তাঁর কর্তৃত্বের আমি অংশীদার হব!

বুদ্ধির গভীরতা না থাকলেও আপনি বরাবরই কূটকৌশলী। আপনার মা এবং দুশ্চরিত্র দাদাকে আপনি ধীরে ধীরে বোঝালেন যে, আমি চরিত্রহীনা। তাঁদের দিয়ে আমাকে ঘরছাড়া করালেন। তাঁরা যখন আমাকে বাড়ীর বার করে দেন, সেই সময় আপনি জাপানী কিমানো গায়ে দিয়ে চুরুট টানতে টানতে দোতলার বারান্দা থেকে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। পাশে ছিল আপনার সহধর্মিণী সুরমা।

সে যেন আপনাকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনি তাকে ইংরেজীতে কড়া ধমক দিলেন। আপনার মুখ দিয়ে খুব সম্ভব একটি কথা বেরিয়েছিল—Rightly Served. প্রকৃতির একি পরিহাস—তারও আগে থেকে আজ পর্যন্ত Right ও Wrong—ভাল ও মন্দের বিচারের ভার রয়েছে আপনার উপর।

তখন বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তায় হাঁটু-সমান জল। আমিও সিঁড়ি জলে পড়লুম। আমার বাবা এরই মধ্যে মারা গেছেন, মা আছেন পল্লীগ্রামে দূর এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। কোথায় যাব, কে আশ্রয় দেবে ভাবছি। ভাবতে ভাবতে বেলা হয়ে গেল। আপনাদের বাড়ীর দেওয়াল ধরে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। আপনার মা ও দাদা ততক্ষণে বাড়ীর ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন।

পথচারী এক লম্পট মাতাল আমায় দেখে গানের কলি ভাঁজছে, আমি ভয় পেয়ে গেলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলার কথা। শুনেছিলুম, হিন্দুস্থানী এই বিধবা অনেক অনাথ আতুরকে আশ্রয় দেন। সেই বাড়ীটা চিনতুম—আমি প্রায় ছুটে গিয়ে সেখানে উঠলুম। সব শুনে তিনি আমায় আশ্রয় দিলেন।

অল্পদিনেই তাঁর প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলুম। তিনি আমায় ডাকতেন 'মেয়ে' বলে, স্নেহ করতেন কন্যাধিক। কিছুদিন পরে টের পেলুম যে, এই মহিলা কোকেনের চোরা কারবার করেন। তাঁর বৈভবের মূলে ঐ কারবার। টাকা দিয়ে তিনি সমগ্র পুলিশ আপিসটাকে কিনে রেখেছেন। হাকিমরাও খাতির করেন তাঁকে। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি যে, নিজের অজ্ঞাতে তাঁর এই কারবারে আমিও জড়িয়ে পড়েছি! যখন বুঝলুম, তখন আর আমার বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না। দেহকে পণ্য-সামগ্রী করার উপায় অবশ্য ছিল কিন্তু ঐ জীবনকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতুম। চোরা কারবারকে অপেক্ষাকৃত ভাল মনে করে, পনর-ষোলটা বছর কাটিয়ে দিলুম।

সুখেই ছিলুম। আমি তখন এই কন্যার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আমাদের আশ্রয়ে অনেক অনাথ-আতুর, অনেক রোগীর আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আমরা শিক্ষায় সাহায্য করি। সকলেই আমাকে দিদি বলে ডাকে; ঐ মহিলাকে বলে মা। আমিও তাঁকে মা বলি।

পুলিশের মধ্যেও সৎলোক আছেন। এই রকম সামান্য একজন সাব-ইন্‌সপেকটর আমাদের বিরুদ্ধে লাগলেন। বড় বড় রুই-কাতলারা তাঁর হাতের মধ্যে; তাই মা এই সাব-ইন্‌সপেক্‌টরকে উপেক্ষা করেন। সেই উপেক্ষাই হল আমাদের কাল। সাব-ইন্‌সপেক্‌টরের একান্ত চেষ্টা ও তদ্বিরে মায়ের ছ মাসের জেল হল।

সহরে তাঁর অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। আত্মসম্মান বোধও ছিল অসাধারণ। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি সেখানকার আস্তানা গুটিয়ে এই সহরে এলেন। মায়ের জন্য সেদিন কত অনাথ-আতুর যে অশ্রু বিসর্জন করেছিল, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যাক্ সে কথা—এই সহরে এসে তিনি নতুন নাম নিলেন; একটি কাপড়ের দোকান খুললেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু এখানেও কোকেনের কারবার চলতে লাগল। সহরে যে এত কোকেনখোর ছিল, তা জানতুম না। বছর কয়েকের মধ্যেই কোকেনের কারবার ফলাও হল; কাপড়ের দোকানেও লাভ প্রচুর।

মা এখানেও একটা দানসত্র খুলে বসলেন। দানশীলতার জন্য লোকে তাঁকে বলত রাণী-মা। তাঁর মোটর বা হাওয়া-গাড়ী সবচেয়ে সুন্দর ও দামী ছিল বলে ক্রমে ক্রমে 'রাণীমা' নামটি লোকের মুখে-মুখে পরিবর্তিত হয়ে হল 'হাওয়া-রাণী'।

তাঁর শরীর ভাঙতে লাগল। কারবার ও

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

সত্যি, বালিগঞ্জ প্লেস-এর ওই ঝকঝকে বাড়ীতে এরা কেবল বে-মানান নয়, যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়। ছেলেই ... নিজের দেওর আর তার ছেলেরা। ওদের ফটকের ভেতর ঢুকতে দেখলে, মিসেস বাসুর সমস্ত শরীর ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে: যেন পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ভূত কতকগুলো! 'আনকালচার্ড', 'আনসিভিলাইজড' ক্রিচার। সবচেয়ে তার রাগ হয় শশাঙ্কর ওপর। দশটি ছেলেমেয়ের বাপ হতে পেরেছেন, আর এটুকু জ্ঞান নেই যে, কলকাতায় আসতে গেলে ধোপ-দুরস্ত কাপড়ের সঙ্গে জামাটি ম্যাচ করে পরতে হয়, জুতোটা পালিশ করে, চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে ভদ্র বেশভূষায় আসতে হয়। বিশেষ করে যেখানে তার দাদা-বৌদিরা ছেলেমেয়ে নিয়ে কিরকম স্টাইলে, কি অভিজাত পরিবেশের মধ্যে বাস করে সে জানে এবং নিজে চোখে দেখে গেছে। ছিঃ। ছেলেগুলোকে যে সার্ট পরিয়ে এনেছে, তার হাত ছোট, ঝুলও কোমরের ওপর এসে পড়েছে। কেনার পর থেকে বোধ হয় কোনদিন ধোপারবাড়ী যায়নি, 'ইস্তেরী' হয়নি, কোন্ বাক্সপ্যাটরার তলায় গোজড়ানো, দুমড়ানো, কোচকানো অবস্থায় পড়েছিল, না বলে দিলে কার সাধ্য যে বোঝে, ওগুলো সিল্কের তৈরী। তার সঙ্গে ঘেঁটে ছিটের হাফপ্যান্ট, আর রোগা কাঠির মত পায়ে মোজা ছাড়া জুতো। জুতোগুলো সব বড়। কারুর পায়েই 'ফিট' করে না—তেবড়ে, বেঁকে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে রয়েছে, কখনও যে কালি ও বুরুশ পড়েনি, তার ঠিকঠিকানা নেই। দু'তিন বছরের পাড়াগাঁয়ের কাদা এখনো শুকিয়ে আছে তার গায়ে!

ছেলেদের কথা ছেড়ে দিলেও বাপের কি ছিরি! শশাঙ্কর বেশভূষার দিকে তাকালে গা বমি-বমি করে মিসেস বাসুর। কালরঙের একটা চিটচিটে ময়লা গলাবন্ধ কোটের ওপর, ফুলশয্যার তত্ত্বে পাওয়া সেই এক এবং অদ্বিতীয় সিল্কের চাদরটা ভাঁজ করে কাঁধে ফেলা, বহু ব্যবহারের চিহ্ন তার সর্বত্র বর্তমান—তেলের দাগ, পানের পিকের ছিটে, নেমন্তন্ন খাবার সময় মুখ থেকে অসাবধানে গড়িয়ে পড়া তরকারীর হলদে রং, কি নেই? বগলে যে ছাতাটা কেনার সময় তাতে যে কালোরঙের কাপড় ছিল তার ওপর দু'বার সাদা কাপড়ের ছাউনী পড়েছে কিন্তু তবু তার কৃষ্ণত্ব ঘোচেনি। পায়ে মোটর-টায়ার কাটা খাকীরঙের ক্যাম্বিসের যে জুতো তাতে দু'তিনটে করে তালি! এই শশাঙ্কর একমাত্র ভদ্রবেশ। ইতিপূর্বে দু' তিন বছর অন্তর অন্তর, যতবার সে কলকাতায় এসেছে, তাকে এছাড়া অন্য কোন সাজেই দেখেননি মিসেস বাসু। আর দেখবেন বা কি করে? ওছাড়া ভদ্রপোষাক বলতে শশাঙ্কর যে আর কিছু নেই। ওই বেশেই সদরে যায় কিস্তী দিতে, মামলা মোকদ্দমা, পাড়ার লোকের হয়ে সাক্ষী দেওয়া, আবার বরযাত্রী, শ্রাদ্ধবাড়ী, লোকলৌকিকতা সব কিছু রক্ষা করেন।

রাগের ঝালটা সব গিয়ে ঝাড়েন মিসেস বাসু স্বামীর ওপরে। আচ্ছা তোমার ভাইয়ের ও আক্কেল-বিবেচনা বলতে কি কিছু নেই? না হয় লেখাপড়া শেখেনি, পাড়াগাঁয়ে চাষ-আবাদ নিয়ে থাকে, তাই বলে নিজের দাদার 'পজিশনটা'র কথা কি একবারও চিন্তা করতে নেই? চেহারার কথা ছেড়ে দিলুম। ঈশ্বর যাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন, মানুষের তার ওপর হাত নেই। কিন্তু সেই চেহারাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, রুচিসম্মতভাবে সাজানোর প্রবৃত্তিটা ত ঈশ্বর মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

সবচেয়ে মাথা গরম হয়ে ওঠে তাঁর, বাড়ীর চাকরবাকরদের কাছে কি বলবেন। মনিবের ভাই-ভাইপো যদি এই হয়, তাহলে দাস-দাসীদের মনে ও'দের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে যে উঁচু ধারণা আছে, কোথায় তা নেমে যাবে।

এর আগে শশাঙ্ক যখন তার এই বড় তিনটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিল, তখন চাকর-বাকরদের কাছে মান রক্ষা করার জন্যে মিসেস বাসু বলেছিলেন, ওদের দেশে যে জমিদারী আছে, তার গোমস্তা, ছেলেদের নিয়ে কলকাতার শহর দেখাতে এসেছে।

যেমন মা, তেমনি তার মেয়ে পলির আত্ম-সম্মানবোধ প্রবল।

পলি তখন গোখেলে ক্লাশ এইটে পড়ে। তার এক বন্ধু, জন্মদিনের নেমন্তন্ন করতে এসে চুপি-চুপি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, হাঁ ভাই, ওই ছেলেগুলো কেরে, তোদের বাড়ীতে ত এর আগে কখনো দেখিনি। তোদের ঝিয়ের ছেলে বুঝি?

পলি ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিল, হাঁ ঠিকই ধরেছিস—'রাইট'।

মিসেস্ বাসুর কানে সে কথা খট্ করে বেজেছিল। কিন্তু তিনি মেয়েকে তিরস্কার না করে মনে মনে তারিফ করেছিলেন। হাঁ, ঠিকই বলেছে। 'রাইটলি সার্ভড'। সভ্যতা ভব্যতা বলতে যারা কিছু জানে না—বাপ মা যাদের এতটুকু 'শহুরে' শেখায়নি—তাদের এমনি সমাদরই প্রাপ্য। ভদ্রসমাজের কাছে তিনটে দিন ছিল। বাপরে বাপ, প্রাণ ওষ্ঠাগত। যেখানে সেখানে থুতু ফেলে, নাক ঝাড়ে, ধুলোকাদা পা নিয়ে ঘরের ভেতর তারা ঢুকে যায়। পরিষ্কার ধবধবে সোফা কাউচগুলোর ওপর কাদা-পা তুলে বসে—যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা।

ছেলেগুলোকে অসভ্যতা করতে দেখলেই মিসেস বাসু বলতেন, পা নামিয়ে সভ্য হয়ে বসতে হয়, নইলে শহরের লোকে নিন্দে করে। তারপর সোফার ওপর সিল্কের ফুলতোলা 'কভার'টা দেখিয়ে বলেন, দেখত কি রকম পায়ের কাদার ছাপ পড়েছে তোমার? তবু

তেমনি আর এক রকমের ব্যর্থতা শুরু হয়। সে ব্যর্থতা যে এত মর্মান্তিক তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আজকের মিসেস বাসুকে দেখলে তাই চেনা যায় না—যেন অন্য আর এক মহিলা বলে ভুল হয়। যাদবপুর কলোনীর কাছে একখানা ঘরভাড়া করে থাকেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। বালিগঞ্জের সে বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। তবে তাঁর সে উচ্চাশা তিনি পূর্ণ করেছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সেই পাত্রের সঙ্গে, জাঁকজমক ও আড়ম্বর কিছুই বাদ দেননি, রাজবাড়ীর ছেলের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বিশ হাজার টাকা খরচ করেছেন।

বড়ছেলে বাবলু, ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বিলেত থেকে ট্রেণিং নিয়ে এসে টাটা কোম্পানীতে বড় চাকরীও পেয়েছে কিন্তু মা-বাপকে একটি পয়সাও দেয় না। সে বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে—যা রোজগার করে নিজের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বাস করতে গিয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। উল্টে প্রতিমাসেই কিছু ধারদেনা হয়ে যায়।

মা-বাপ মনের দুঃখে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। দ্বিতীয় ছেলে বিলেতে পড়তে গিয়ে চার বছর পরে যখন দেশে ফেরবার কথা, তখন ওখানেই একটা মেম বিয়ে করে ঘরসংসার পেতেছে। মা-বাপ বেঁচে আছে কি মারা গেছে একটা চিঠি দিয়েও খবর করে না।

অথচ দুই ছেলের উপার্জনের ওপর ভরসা করেই বালিগঞ্জের বাড়ীটা ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রেখেছিলেন মিসেস বাসু। অন্নদাবাবু জমিটা তাঁর স্ত্রীর নামেই কিনেছিলেন, এ-একেবারে অপ্রত্যাশিত আঘাত। ওই সোনারচাঁদ শিক্ষিত ছেলেদের কাছ থেকে যা একেবারেই কল্পনা করতে পারেন নি মিসেস্ বাসু ও অন্নদাবাবু।

তাঁরা দুজনেই তাই একেবারে ভেঙে পড়লেন। এদিকে চাকরী থেকে রিটায়ার করে যা-কিছু পেয়েছিলেন, ওই ছেলেদের বিলাতে পড়াবার দরুণ যে দেনা হয়েছিল, তাই শোধ করতেই শেষ হয়ে গেল!

চোখের জল মুছতে মুছতে একদিন মিসেস বাসু স্বামীকে বললেন, আচ্ছা তোমার দেশের সম্পত্তির অর্ধেক ত তোমার প্রাপ্য, আমরা যদি তোমার ভাইপোদের কাছ থেকে কিছু চেয়ে পাঠাই তারা কি দেবে না!

অন্নদাবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, অর্ধেক দাবী করতে গেলে খাজনা প্রভৃতি জমিজমার দরুণ যা খরচপত্তর প্রতি বছর হয়, তার ত অর্ধেক দিইনি শশাঙ্ককে। তখন ত কল্পনাও করতে পারিনি যে একদিন ছেলেরা এমনিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তোমার মত মা, আর আমার মত বাপের সঙ্গে! বলে একটু ভেবে আবার বললেন, বরং আমি শশাঙ্ককে বলেছিলুম, খরচপত্তর চাইতে এলে যে, আমি তোমার জমির যেমন শেয়ারও চাই না, তেমনি খরচপত্তরও দিতে পারবো না। ও তুমিই সব নিয়ে নাও।

মিসেস বাসু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাও তোমার ভাই বেঁচে থাকলে যা-হয় হোতো—তোমার ভাইপোগুলি যে কি চীজ, তাত জানো! মূর্খ, অসভ্য জানোয়ার! চিঠি লিখলে একটা জবাবও হয়ত দেবে না।

হ্যাঁ। অন্নদাবাবু বলেন, এই বুড়ো বয়সে আর ওদের কাছে অপমানিত হতে চাই না। থাকগে। আর চেয়ে একবেলা নুনভাত খেয়ে থাকা ঢের সুখের।

এমনিভাবে আরো একটা বছর যখন কাটলো, তখন 'ব্লাডপ্রেসার'এর দরুণ মাথাঘুরে রাস্তাঘাটে পড়ে যেতে লাগলেন অন্নদাবাবু।

শেষে একদিন মরিয়া হয়ে বললেন, চলো একবার দেশে গিয়ে দেখি হালচাল কিরকম! যদি মরতেই হয়ত সেখানে মরবো।

এতকাল পরে জ্যেঠাজ্যেঠিকে দেশের বাড়ীতে পা দিতে দেখে ছুটে এলো ভাইপোর দল। তারা প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় দিতে দিতে বললে, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য! বাবা বেঁচে থাকলে কি আনন্দ যে করতেন, তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, আপনারা একবার দেশে আসেন! সেই যদি এলেন, তবে আর দু'টো বছর আগে কেন এলেন না। বলে শশাঙ্কর স্ত্রী অন্নদাবাবুর ভ্রাতৃবধূ চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। ছয় ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছলো।

তাঁরা দেখলেন, জমিজমা, বাগান-বাগিচা, পুকুর-পুষ্করিণীতে যেন মা লক্ষ্মী জাজ্বল্যমান! তারপর শুরু হলো রাজকীয় সমাদর। জ্যেঠাজ্যেঠি নয়—বাপের বড় ভাই গুরুর তুল্য! ছেলেরা এসে জনে জনে অন্নদাবাবুকে বলে, যখন এসেছেন, আর আপনাকে কলকাতায় যেতে দেবো না। এইরকম অসুস্থ দেহ নিয়ে কি করে সেখানে থাকবেন আপনারা দু'জনে। কে আপনাদের দেখবে! আর কিসের জন্যেই বা যাবেন! এই বাড়ীঘর জমিজমা যা-কিছু আমাদের, সবই ত আপনার।

মিসেস বাসু যখন বড় দেওরপোর মুখে শুনলেন, ওরা ছয় ভাই কেউই লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারে নি। দু'জন মাত্র ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। বাকী চারজনের বিদ্যে উল্লেখযোগ্য নয়। কেউ ক্লাশ ফাইভ্, কেউ সিক্স্। কেউ মাইনর স্কুল থেকেই সরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

মিসেস বাসু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন সেই অশিক্ষিত, মূর্খ, গ্রাম্যছেলেদের মুখের দিকে। যাদের তিনি 'আন্‌কাল্‌চার্ড' বলে এতকাল মনে মনে ঘৃণা করতেন, তাদের ব্যবহারে আজ তিনি মুগ্ধ, বিস্মিত, হতচকিত! নিজের গালে নিজের চড় মারতে ইচ্ছা করে যেন! কৃতঘ্ন ছেলেদের কথা মনে করতে গিয়ে চোখের জল বেয়ে পড়ে।

অন্নদাবাবুরও মুখে কথা জোগায় না। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন আর চিন্তা করেন। কি চিন্তা করেন, তা ঈশ্বর জানেন।

একদিন তিনি বললেন, দেখো, আমরা বড় ভুল করেছি। ছেলেদের উচ্চশিক্ষা যেন আর কেউ না দেয়।

শেষ কথাটা উচ্চারণ করার সময় তাঁর বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যেন শূন্য হয়ে যায়। মিসেস বাসু নিঃশব্দে বারকতক চোখের কোণ শাড়ীর প্রান্ত দিয়ে মুছে একটু থেমে বললেন, তোমার ভাই-ই ঠিক কাজ করেছে। আমরা বোকা, আমরা আহাম্মুক!

ঝরঝর করে তার দুই গণ্ড বেয়ে শ্রাবণের ধারার মত জল গড়িয়ে পড়ে। যত মোছেন তত যেন বাড়ে!

কোকেন-রাণী

(১০০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দানসত্রের সমস্ত ভার এসে পড়ল আমার উপর।

কিছুদিন পরে মা মারা যান। আমি তাঁর উত্তরাধিকারিণী হই। ততদিনে নিজের পিতৃমাতৃ-দত্ত 'প্রতিভা' নামটি ভুলে গেছি। 'হাওয়া-রাণীর' মেয়ে আমি—সমব্যবসায়ীদের মুখে-মুখে বনে গেছি 'হাওয়া-রাণীর' মেয়ে 'কোকেন-রাণী।'

আমাদের অনুগ্রহপুষ্টদের মধ্যে একজন ছিল পুলিশের স্পাই। লোকটার নাম বিজয়-প্রসাদ। আমি বরাবরই খুব চতুরতার সঙ্গে নিজেদের অপরাধ ঢেকে কারবার চালিয়ে এসেছি; কিন্তু বিজয় আরো গভীর জলের মাছ। সে মাকে ডাকত 'মাইজী', আমাকে বলত 'বাহিন।' এই গুপ্তচর ভাইটি শেষ পর্যন্ত তার বহিনকে ধরিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ আমায় 'কোকেন-রাণী' নামই জানে। তাদের রিপোর্টে আছে—মা এবং আমি, দু'জনই দেহোপজীবিনী ছিলুম। কথাটা নিছক মিথ্যা। লোকচোখে, বিশেষ করে বিচারপতি ও জুরীদের চোখে আমাদের হেয় করার জন্য তারা স্বভাবসিদ্ধ এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

নানাদিক বিবেচনা করে—সুস্থ মস্তিষ্কে সজ্ঞানে আমার এই জবানবন্দি লিখছি। আমি অপরাধিনী। এই অপরাধের প্রাপ্য শাস্তি আমায় দেবেন।

আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমার। যা হবার, হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে একই পরিবারের দু'জন—একজন দেবর আরেকজন ভ্রাতৃবধূ—এই নগরে এসে ছিট্‌কে পড়েছি।

উভয়ের অবস্থার পার্থক্য আজ অনেক। তবে এটা ঠিক যে, ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ডে ওজন করলে এ সংসারে ভাল ও মন্দ, পুণ্যবান ও পাপী—এর পার্থক্যটুকু বড় সূক্ষ্ম। ঠিক বোঝা যায় না, ওজনে কখন কোন্‌দিক ভারী হয়!—সমাজ চলছে, কিন্তু চলছে ধরা-বাঁধা অন্ধ এক নিয়মে। তার নিয়ামকরা রোলার চালিয়েছেন এক দলকে পিষ্ট ও দলিত-মথিত করে।

আবার অনুরোধ, আমায় শাস্তি দেবেন। আপনার দাদা কি অবস্থায় আছেন, আমি জানি না। আপনি এখানে আসার পর আপনার সব খবরই আমি পেয়েছি। আপনার স্ত্রী ও পুত্রকন্যার উপর আমার আশীর্বাদ রইল। তারা সুখে থাক। —ইতি, বিনীতা,

'কোকেন-রাণী'

চিঠি পড়া শেষ হলে দেবেশ ও রমলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। রমলা কোকেন-রাণীর মূর্তি কল্পনা করছিল। অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা—শান্ত সৌম্য দয়াময়ী। অথচ, ভাগ্যবিড়ম্বনায় ঘটনাচক্রে কোকেনের চোরা কারবারী।

সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনা করছিল বিচারপতি প্রবোধ তলাপাত্রকে। বিচারকের আসনে উপবিষ্ট এই মানুষটির শাস্তি ঠিকই হয়েছে। বিচারের তুলাদণ্ড এখানে কোনো ভুল করেনি।

মেঘ
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাদা কালো জর্দা পাড় লাগছে বেগনী
এ সব তো মেঘ নয়, চিত্রপটভূমি।
শীতের উত্তাপে সদ্য জন্ম মাটি চুমি
মুক্তাঙ্কুর, মর্মচোরা মিথ্যা সুখদানী।

নিষ্কলুষ শুভ্রতায় অনন্ত নীলে,
যে আত্মানন্দ রূপে স্বতন্ত্র থেকে দৃষ্টি
ব্যবসায়—
মর্মর কঠিন স্তূপে শুধু পক্ক কেন্দ্রবীজ মিশে
জড়ো হয় নানা বাঁধে, বিপাক ঊর্মির ত্রাস
কেটে যায়।

বিকীর্ণ আলো সব রং শুষে ঐ খাঁটি মেঘ
জবালার সত্যকাম, জীবনের সংহত আবেগ।।

এখনো তো মৃন্ময়
দিলীপ দাশগুপ্ত

আমি বুঝি শেষ কবি রবীন্দ্রযুগের।
শতাব্দীর মসীলিপ্ত চিত্তে সবুজের
পরমস্পর্শের ধ্যানে কবিতা আমার
হয়েছে চেতননিষ্ঠ তাই বারে বার।

পশ্চাতে আমার ছিলো যতো সমর্পণ
আমার প্রাণের সবই শান্তিনিকেতন
নিয়েছে হরণ করে রবীন্দ্রের নামে
ধন্য করে' লেখনীকে গানে ও প্রণামে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গসম এ হৃদয়
অন্তরলক্ষ্মীর গানে কতো পরিচয়
দিয়েছে অনেকবার; তবু নেই শেষ—
চক্ষে তাই ধরা দিলো দেশ-মহাদেশ।

তার পর যুগারম্ভ। কালকে দুলিয়ে,
যৌবনের ব্যথা যেন ফুলকে ভুলিয়ে
স্বর্গ ও মৃত্তিকার ব্যবধান সব
ভেঙে দিয়ে মুছিয়েছে অতীত উৎসব!

অবান্তিক স্তব্ধ হোলো : যন্ত্রের দানব
দোহনে শোষণে হোলো কী মহামানব!
সেই মানবের ঠোঁটে মুছে গেল হাসি :
ভাগাহতা ফুলদল,—চাঁদ সর্বনাশী!

নতুন স্রোতের বুকে তাই যাত্রীদল
কোথায় যেতেছে ভেসে—গতিই সম্বল,
ভুলে গেছে তরুকুঞ্জ বাধা নিষেধের।
ক্লান্তিকাল দু' নয়নে জ্বলে সম্পদের।

এ তরুণী আজও প্রতিস্মৃতিতে উজ্জ্বল
আজও মধুমাস তার মধু পরিমল
ছড়াতে যায়নি ভুলে মধুমিতা নামে
নিবেদনে সমর্পণে রবীন্দ্র প্রণামে!

রাইশস্যে লেখা ছিল নাম
• রামেন্দ্র দেশমুখ্য •

সেই রক্তহীন দেহে অন্তিম আলোকে
বিবর্ণ হলদে শোকে, পৃথিবীর স্নেহে
সদ্যমৃতা যুবতী ঘুমায়।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওড়ে শরতের ফুর-ফুরে
হাওয়ায়,
চৈতন্যকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় অভাবের ঝড়ে
বাঁশের হলদে পাতা ললিতার উড়ন্ত শরীর
ডুলিদের কাঁধে।

তুমি ললিতার ভাই, দ্যাখো অবসাদে
আগুনের চেলীপরা রূপ,
চন্দন তিলক সাধ পড়ে পড়ে ছাই,
অপাপ্ত তরুণী বধূ রাইশস্যে লেখা ছিল নাম,
কোনো দূর হেলেঞ্চায় পড়ন্ত ক্ষুধায়
ছোট গ্রাম ঝিলিমিলি নদী,
ললিতা এখনো বাঁচে যদি।

ক্ষুধিতা ললিতা,
দ্যাখো তাকে ভস্ম করে উদাসীন চণ্ডালের চিতা,
রক্ত-ঝরা সন্ধ্যালোকে পোড়ে যেন মনের আকাশ,
জাদুকর শয়তানের অট্টহাস্যে ভিখারির ত্রাস।
এরি মাঝে ফাঁকি দিয়ে ওড়ে
আমার তোমার চৈতন্যকে
আগুনের চেলীপরা আশাবাদী হাজার ললিতা।

বৃক্ষের স্তব্ধো
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

প্রাচীন বটের মতো কবে আমি দূরে দীর্ঘপথে
ছায়ার প্রশান্তি দিয়ে ঢেকে দেব মাটির বেদনা—
সেই প্রদোষের দিকে জীবনের সমস্ত প্রশাখা
মেলেছি নির্বাক চোখে।

রৌদ্র-দগ্ধ দিনের চেতনা
আমার পাতার বর্ণে কী উজ্জ্বল
প্রতিশ্রুতি রেখে
মিলে যাবে ছায়াচ্ছন্ন রিক্তবৃন্ত পথের প্রসাদে।
তারপর মৌন, ক্লান্ত, তপ্তদেহ, প্রবীণ, গভীর
সন্ধ্যা-স্নান করে নেবে।

স্তব্ধতম ধূসর আঁধারে
রাত্রির নৈঃশব্দ্য ছবি পান্থশালা ঢেকে
দিয়ে গেলে
সঙ্গীহীন বনস্পতি প্রার্থনার তৃণের আসন
বিছাবে পথের পাশে। সে তীর্থকে,
আকাশ পৃথিবী
প্রদক্ষিণ করে যাবে।

কবে আমি, এই দেহ, মন
প্রবুদ্ধ প্রাচীন মৌন ধ্যানমগ্ন বনস্পতি হবে,
সব গর্ব, উজ্জ্বলতা শান্ত হবে ধ্যানের গৌরবে।

আকাশ-পাতাল
* গোবিন্দ চক্রবর্তী *

আলো চাই
ওপরে তাকাই
রোদ-ঢাকা মেঘে—
ব্যথা পাই
তোমাকে জানাই
আছ না কি জেগে?
আছ না কি!
যতই জোনাকি
দু' ডানা বাড়ায়—
নিমেষে
লাফিয়ে এসে
তারারা দাঁড়ায়।
কত কাল
আকাশ পাতাল
ভাবব এমন!
ছোট ছেলে
মাকে ছেড়ে এলে,
কাঁদবে না মন?
কোন্ ভোরে
কার হাত ধ'রে
বেরিয়েছি সেই!
সন্ধ্যায়
কে বা সে না চায়
ঘরে ফিরতেই!!
মনে আছে
মনের কানাচে
কিছু-কিছু স্মৃতি!
ব্যথা পাই
তোমাকে জানাই
তারই উদ্ধৃতি।

অন্য আকাশ
প্রভাকর মাঝি

আর এক আকাশ আছে,
যে আকাশে চাঁদ তারা নেই.
আছে তার অতল বিস্ময়।
যত দেখি তবু কেন পাই নে সম্পূর্ণ পরিচয়।
কিছু ভুল থাকেই হিসেবে :
জীবনের রূপকথা সুরু হয় সেই কথা ভেবে।
সেই মোহময় স্মৃতি, সুর,
ছড়ায় সাহিত্যে শিল্পে। সময়ের সেতু পার হয়ে
চলে যায় আরো কিছু দূর।
চোখ, মুখ, নাক, কান কিছুই
স্বতন্ত্রভাবে নয় নির্বিশেষ,
তবু সব কিছু মিলে সে এক আশ্চর্য মহাদেশ।
দ্বিতীয় আকাশ।
ঋতুরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। সূর্যের অবার বর্ণে পূর্ণ
বারো মাস।
যন্ত্রণায় দগ্ধ করে। লুব্ধ চোখে জাগায় বিস্ময়।
সে কি, নারী, তোমার হৃদয়?

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হ'ল কেমন করে

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হয় সমস্যার জটিলতা তত বাড়ে। নতুন নতুন আবিষ্কারে যেখানে দুটো সমস্যার সমাধান হয় সেখানে দশটা নতুনতর প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই উক্তি সব বিজ্ঞানের পক্ষেই সত্য, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে—বিশেষ করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বেশি প্রকট বলে মনে হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কেমন করে হ'ল সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা মাত্র তিন দশকের কিছু বেশি চিন্তা করছেন। কিন্তু এরই মধ্যে সমস্যা এমন জটিল হয়ে পড়েছে যে, অনেকে মনে করছেন বোধ হয় কোনদিনই এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া যাবে না।

ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা

এই সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা আকাশে আলোর মেখলার মতো যে ছায়াপথ দেখতে পাই সেটি আসলে বহু তারার সমষ্টি। শুধু চোখে আমরা তারাগুলো পৃথকভাবে দেখতে পাই না বলে আলোর মেখলার মতো মনে হয়। এই তারাগুলো মিলে একটি নক্ষত্রপরিবার, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ইউনিভার্স, রচনা করেছে। সূর্য এই পরিবারের একটি নিরেশ মাঝারি তারা। একটি নক্ষত্রপরিবারে বহু কোটি তারা থাকে। তার চারিদিকে বিরাট ব্যবধান, তার পরে আবার নক্ষত্রপরিবার। বহু নক্ষত্রপরিবার আবার একসঙ্গে—মানে অবশ্য পাশাপাশি গায়ে গায়ে লেগে নয়—জোট বেঁধে বৃহত্তর গোষ্ঠী রচনা করে। এই রকম নক্ষত্রপরিবারের গোষ্ঠী মহাকাশে কোটি কোটি রয়েছে। পালোমারে যে বিরাট ২০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট প্রতিফলকযুক্ত দূরবীন রয়েছে তাতে ৩০০ কোটি আলোক-বছর দূরের নক্ষত্রপরিবার পর্যন্ত দেখা যায়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেটুকু আমাদের গোচরে আসে তারই ব্যাস হবে ৬০০ কোটি আলোক-বছর। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, সুতরাং এক বছরে আলো যাবে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইল। এই হারে ৬০০ কোটি বছরে কতদূর যাবে তা হিসেব করা যায় অনায়াসে কিন্তু এই বিশাল দূরত্বের ধারণা করা ততটা সহজ নয়। আমরা যেটুকু পরিচয় পাই তারই আকার এমন বিশাল সুতরাং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্ব হৃদয়ংগম করা—যদি তা সসীম হয়—নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এখন দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী আশা করছেন যে আন্দাজ আর এক দশকের মধ্যে এটুকু বলা বোধ হয় সম্ভব হবে যে এই সমস্যা সমাধান-যোগ্য কিনা অথবা এটি চিরকালই প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য রয়ে যাবে।

ডোপলার-চ্যুতি

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন যে, দূরবীক্ষণের পর্যবেক্ষণ-সীমার শেষ পর্যন্ত অসংখ্য নক্ষত্রপরিবার মোটামুটি সমান সমান দূরে অবস্থিত। কিন্তু দূর ও নিকট বিশ্বের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। দূরস্থ বস্তুর আলোর বর্ণালি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বর্ণালির রেখাগুলি কাছের বস্তুর তুলনায় লাল প্রান্তের দিকে খানিকটা সরে গেছে। অর্থাৎ এই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে অথবা কম্পনসংখ্যা কমে গেছে। কোন দ্রুত ধাবমান বস্তু থেকে নির্গত শব্দের বেলায়ও এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যেমন চলন্ত ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ স্টেশনের দিকে আসবার সময় তীক্ষ্ণতর শোনায় আর স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার সময় খাদে নেমে যায়। কম্পনসংখ্যা বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এই পরিবর্তনকে বিজ্ঞানীরা ডোপ্‌লার-চ্যুতি বলেন। এই চ্যুতির পরিমাণ থেকে ধাবমান বস্তুর বেগ নির্ণয় করা যায়।

নক্ষত্রজগতের অপসরণ

ত্রিশ বছরের কিছু আগে মার্কিন বিজ্ঞানী হাব্‌ল এই চ্যুতি পরিমাপ করে দেখলেন, নক্ষত্রপরিবারের দূরত্ব অনুসারে এই চ্যুতি বেড়ে যায়। যে বিশ্ব যত দূরে আছে সেটি তত দ্রুতগতিতে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। যে কোন নক্ষত্রপরিবার থেকেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক সর্বত্রই দেখা যাবে যে দূরের বিশ্ব প্রচণ্ড বেগে অপসৃত হচ্ছে। হাব্‌লের এই আবিষ্কার থেকে প্রসারণশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা এসেছে। আজকাল প্রায় সব বিজ্ঞানীরাই হাব্‌লের আবিষ্কার মেনে নিয়েছেন। অবশ্য মুষ্টিমেয় একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা মনে করেন দূরের নক্ষত্রপরিবারগুলো সত্যিই অপসৃত হচ্ছে না; তাদের বর্ণালির লাল প্রান্ত অভিমুখে সরে যাওয়ার অন্য কোন কারণ আছে। এই কল্পিত কারণ অবশ্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

মোট কথা দেখা গেল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ স্থিতিশীল নয়। এই সমস্যা তখনই বহু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কারণ এই সময়ে দেশ ও কাল অর্থাৎ স্পেস ও টাইম নিয়ে আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা

একটি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের দৃশ্য

চলছিল। দেশ ও কাল যে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নয় উভয়ের অঙ্গাঙ্গী মিলনে বাস্তব দেশের গঠন তখনই প্রথম শোনা গেল। অবশ্য এর আগে থেকেই দেশের জ্যামিতি যে ইউক্লিড বা নিউটনকল্পিত সত্যের অনুসরণ করে না এমন কথা শোনা গেছল। বস্তুত দেশ যদি সমতল হয় তাহলে তা হবে অসীম। দেশ যদি বক্র হয় তাহলে দুরকম ব্যাপার ঘটতে পারে। দেশের বক্রতা যদি পজিটিভ হয় তাহলে তা হবে সসীম কিন্তু সীমানাহীন। বক্রতা নেগেটিভ হলে দেশ হবে অসীম। সমান দূরত্বের মধ্যে ইউক্লিডীয় দেশের যা আয়তন হবে, পজিটিভ বক্র দেশে হবে তার চেয়ে বেশি আর নেগেটিভের বেলায় কম। দেশের বিচারে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তা হয় প্রসারিত হবে নয়তো সঙ্কুচিত হবে, এক অবস্থায় থাকবে না। বর্তমানে প্রসারণ ঘটছে, ভবিষ্যতে প্রসারণ থেমে গিয়ে সঙ্কোচন সুরু হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও বিজ্ঞানীরা বলেছেন। ক্রমান্বয়ে প্রসারণ ও সংকোচন অনাদি অনন্ত-কাল ধরে চলতে থাকবে। আইনস্টাইন প্রথমে এই মতের পোষক ছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করেন।

প্রসারণ বা বিবর্তন মতবাদ

প্রসারণ বা বিবর্তন মতবাদের উদ্যোক্তা বেলজিয়ান ধর্মযাজক-বিজ্ঞানী আবে ল্যামেতর। পরবর্তী কালে গামভের নাম স্মরণীয়। দূরের নক্ষত্রপরিবারগুলো ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব অতীতে তারা অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি ছিল। কালের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলে এমন একটি সময় হিসেব করে পাওয়া যাবে যখন সব নক্ষত্রপরিবার কিংবা তাদের উপাদান অতি অল্প আয়তনের মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে ছিল। এই অবস্থা একটি সুবিশাল 'অণুর' মতো কল্পনা করা যেতে পারে। অত্যন্ত কাছাকাছি আসার জন্য এই 'অণুর' উষ্ণতা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল, ফলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটল এবং প্রচণ্ড বেগে তার অংশগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ল। সেই আদিম বিস্ফোরণের ক্রিয়া আজও দেখা যাচ্ছে এই সব নক্ষত্রজগতের দ্রুত পারস্পরিক অপসরণে। মতবাদের অনেক সমর্থকদের মতে অপসরণের বেগ মন্দীভূত হয়ে আসছে। এই মন্দীভবনের হার যদি পরিমাপ করা যায় তাহলে তাঁদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তুর গড় ঘনত্ব এবং দেশের বক্রতা নিরূপণ করা সম্ভব। এঁদের হিসেব অনুসারে মহাজাগতিক আদিম 'অণুর' বিস্ফোরণ অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল ২০০ কোটি বছর আগে। পরবর্তী আবিষ্কারের আলোকে এই সময় আরও পিছিয়ে গেছে। অবশ্য প্রসারণ থেমে গিয়ে সঙ্কোচন যদি পুনরায় আরম্ভ হয় তাহলে হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত কল্পান্তরের মতো সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় পৌনঃপুনিকভাবে সংঘটিত হতে থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কবে হয়েছে প্রশ্নটি খানিকটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এমন ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা স্পন্দনশীল (পালসেটিং) বলতে পারি।

স্থিতাবস্থা মতবাদ

স্থিতাবস্থা মতবাদে (স্টেডি স্টেট থিয়োরী) উপরের মতের বিরোধিতা করা হয়েছে। একথা সত্যি বিবর্তন মতবাদের অনেক কিছুই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সে দিক থেকে নবতর স্থিতাবস্থা মতবাদ যে উৎকৃষ্টতর এমন কথাও বলা যায় না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করলে দেখা যাবে যে মাত্র তিনটি সম্ভাব্য ব্যাপার হয়ে থাকতে পারে ঃ

প্রথম, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু অনাদিকাল থেকে বর্তমান রয়েছে। দ্বিতীয়, এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে সৃষ্টি হবার পর থেকে পরিমিত নির্দিষ্টকাল বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। তৃতীয়, যে কোন বস্তুকণা যে কোন কাল স্থায়ী হতে পারে। অর্থাৎ কিনা বস্তুর সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে হয়ে চলেছে। এই সৃষ্টি হচ্ছে একেবারে শূন্য থেকে এবং মহাকাশের যে-কোন স্থান থেকে।

তিনটি সম্ভাবনার প্রথমটি অচল, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর বয়স অনন্ত বলে বোধ হয় না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ হাইড্রোজেন। মহাকাশের শূন্য স্থানেই যত-খানি হাইড্রোজেন আছে তার পরিমাণ নক্ষত্র-পরিবারগুলোর বস্তুর প্রায় সমান। অগণিত তারার অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন নিরন্তর অন্য অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ক্রিয়া অনন্তকাল চললে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হাইড্রোজেনের এত প্রাচুর্য থাকা সম্ভব হ'ত না। বহুকাল আগেই তা শেষ হয়ে যেত অন্য মৌল উৎপাদনে। কোটি কোটি তারায় যে রূপান্তর এখনও ঘটছে এবং যার ফলে আমরা তারা থেকে আলো ও অন্যান্য বিকিরণ পাচ্ছি তা অনেক দিন পূর্বে বন্ধ হয়ে যেত। একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হাইড্রোজেন অনন্তকাল চুপচাপ থেকে হঠাৎ কয়েক শত কোটি বছর হল এই রূপান্তরে লেগে গেছে। হাইড্রোজেন থেকে রূপান্তরিত ভারী মৌলগুলো ভেঙে গিয়ে পুনরায় হাই-ড্রোজেনের সৃষ্টি করছে এটাও অচিন্তনীয়, কারণ এই ধরণের রূপান্তরে শক্তি মুক্ত হয় না, বাইরে থেকে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন ঘটে। সেই শক্তি আসবে কোথা থেকে ?

বন্ডি, গোল্ডি ও হয়েল যখন প্রথম এই মতবাদ উপস্থাপিত করেন তখন বিবর্তন মতবাদ মেনে নেওয়ার আর একটি অসুবিধা ছিল। গামভ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে সৃষ্টি-কার্য সংঘটিত হয়েছিল ২০০ কোটি বছর আন্দাজ আগে। অথচ ভূতাত্ত্বিক বিচারে পৃথিবীর বয়সই ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর হওয়া উচিত। পরে অবশ্য বাডের আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভ আরও পিছিয়ে গিয়েছে। যাই হোক উপরে উল্লিখিত আলো-চনার আলোকে বন্ডি, গোল্ডি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই মত পেশ করলেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সম্পূর্ণ শূন্য থেকে হাই-ড্রোজেন আপনা থেকেই সৃষ্ট হচ্ছে। এই স্বয়ম্ভূ হাইড্রোজেন থেকে কালক্রমে নক্ষত্র-পরিবারগুলো গড়ে উঠেছে। যে সব প্রাচীন নক্ষত্রপরিবারগুলো ক্রমশ অপসৃত হতে হতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে—নবজাত নক্ষত্রপরিবারগুলো তাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোটামুটি চেহারা আজ যা আছে অতীতেও তাই ছিল এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। দেশ ইউক্লিডীয়, তার কোন বক্রতা নেই এবং অসীম।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পদার্থবিজ্ঞানের বৃহত্তম অনড় ভিত্তি পদার্থের অবিনশ্বরতার সূত্র বর্জন করতে হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃঢ় ধারণা পদার্থ সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না। অবশ্য পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। কিন্তু একেবারে শূন্য থেকে 'আউট অব নাথিং' পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে কেমন করে ? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি, যেমন পাওয়া যায়নি বিবর্তন মতবাদে মহাজাগতিক 'অণু' কেমন করে গড়ে উঠেছিল। একথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সৃষ্টিক্রিয়ার হার অত্যন্ত মন্থর। পৃথিবীর মতো আয়তনে দশ লক্ষ বছরে একটি হাইড্রোজেন অণু সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হলেই এই মতবাদ গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। কোন পরীক্ষা দ্বারা এই সৃষ্টিক্রিয়া পরিমাপ করা সুতরাং সম্ভব নয়।

আলোচ্য দুটি মতবাদের কোনটি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বর্তমানে নানা পরীক্ষা চলছে। সম্প্রতি রাইল এই সম্পর্কে 'রেডিও' তারার বহু পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 'রেডিও' তারার অধিকাংশই তারা নয়। মহাকাশে এমন কতকগুলো অঞ্চল আছে যেখান থেকে মহাজাগতিক রশ্মি বা অপর কোন রেডিও-টেলিস্কোপ-গ্রাহ্য বিকিরণ নির্গত হচ্ছে। এমনকি দুটি নক্ষত্র পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হলেও এমন ঘটনা রেডিও-টেলিস্কোপে 'রেডিও' তারা রূপে ধরা দেয়। রাইল সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ স্থিতাবস্থা মতবাদের অনুরূপ নয়। পক্ষান্তরে, বিরোধীরা বলছেন, রাইলের পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্তে আসবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ কি সেই প্রশ্নের সমাধান সহজে হবে না। আদৌ হবে কিনা তাও বলা কঠিন।

• বৃক্ষরূপ •

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কারা যেন একদিন এসেছিল এই পৃথিবীতে
তারা সব লেনদেন করে দিয়ে শেষ
হঠাৎ কোথায় যেন হল নিরুদ্দেশ
কি আশ্চর্য, আজ দেখি তারা আছে
অরণ্য-নিভৃতে।

তারা সব শাল তাল শিমুলেতে হয়ে রূপান্তর
গহন অরণ্যলোকে তোলে দেখি অস্ফুট মর্মর;
ঠিক আমাদেরই মত তাহাদের পুষ্পিত কামনা
পল্লবের আড়ালেতে মেলে রাখে স্পন্দিত এষণা;
কখনো বৈধব্য বেশ, অঙ্গ ঘিরে অরণ্য কুহেলি
কখনো বসন্ত দিনে নবোঢ়ার অরুণাভ চেলী,
শোকচিহ্ন ধরে দেহে, আনন্দের তোলে শিহরণ
তারা সব বশীভূত জরা ব্যাধি যন্ত্রণা মরণ।

এই দেহ ছেড়ে গেলে আমরা কি পাব বৃক্ষরূপ
আমরা কি পাব এই অরণ্য আশ্রয়
দেহ অন্তে ফিরে পাব এ মর্ত হৃদয়।
ঠিক এই ভালবাসা, এই কান্না, হাসি অপরূপ।

জীয়নকাঠি

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

কান্না ভুলে গিয়েছিলাম শোভন! আমি কান্না ভুলে গিয়েছিলাম। বল্ দেখি, কোনদিন কি আমাকে কাঁদতে দেখেছিস্?

অমলের কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে। বলছে,—"কাউকে কোনদিন ভালও বাসিনি শোভন! তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস্, তবুও তোদের ওপরও আমার হিংসা না থাক্, ঈর্ষাই ছিল। আজ সত্যি কথা বলছি।"

সত্যি অমলকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। ওর মুখে কোনদিন হাসি দেখেছি বলে মনেও পড়ে না। মনে মনে তার প্রতি একটা সহানুভূতি থাকলেও তাকে দেখলে কেমন যেন শিউরে উঠতাম।

ছেলেটা পাথর হয়ে গেছে রে। পাথর হয়ে গেছে। হাসিকান্না ভুলে গেছে। আহা বেচারী! —অদৃষ্টের লিখন!—মা কত আক্ষেপ করতেন।

সেই অমল! অনেক দিন পরে দেখা। প্রথমে চিনতেই পারিনি। আচমকা এসে আমার হাত ধরল। মুখে তার কি সুন্দর হাসি। কিন্তু সেই পাগলাটে ভাবটা রয়ে গেছে।

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাই।

চিনতে পারলি না? আমি অমল।

অমল!—হ্যাঁ, এই তো কপালে সেই কাটার দাগটা এখনো রয়ে গেছে। কাটার দাগ! সে দৃশ্যটা মনে পড়লে এখনো আঁতকে উঠি। দুহাতে মাথাটা ধরে কপালটা দেয়ালে ঠুকে ঠুকে থেঁতলে দিচ্ছিলেন অমলের মামা হরেনবাবু।

বল, বল,—আর কোনোদিন এমন কাজ করবি?—কাঁদে না, কাঁদে না, হতভাগার চোখে জলও নাই। পাথর হয়ে গেছে।—রাগে গরগর করছিলেন হরেনবাবু।

ছুটে গিয়েছিলেন আমার মা।—এ কি করছেন ঠাকুরপো। ছেলেটা যে মরে যাবে। একি? রক্তে ভেসে গেল যে! দেখি, দেখি—

হুমড়ি খেয়ে একপাশে পড়ে গেল অমল। উঃ—আঃ শব্দও করেনি। রক্ত আর রক্ত! আমি মায়ের পিছু পিছু ছুটে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেই পালিয়ে এসেছিলাম।

—শেষকালে ফাঁসিকাঠে ঝুলাবে তোমার এই ভাগনে। তা আমি বলে দিচ্ছি। এরকম খুনোখুনি করে আমাকে পথে বসাবে নাকি?—হুংকার ছাড়েন অমলের মামীমা মায়াদেবী!

মায়া?—বাপমা আদর করে নাম রেখেছিলেন মায়া। কিন্তু নামটা বিদ্রূপেরই সামিল হয়ে উঠেছিল। পাড়ার লোকে নাম দিয়েছিল 'কঠিন-মায়া'।

—কি বজ্জাত ছেলেরে বাবা! এ বয়সেই মিথ্যাকথা বলতে শিখে গেছে। চার পয়সার নুন আনতে দিলে, দু'পয়সার নিয়ে আসে। ও ছেলেকে দোকানে পাঠানো! ছিঃ ছিঃ, গলার দড়িও জোটে না। ভাত-কাপড় দিয়ে শত্রু পুষছি।—রাতদিন মামীমার তর্জনগর্জন শোনা যায়।

—বাপ ছিল মাতাল। ছেলে হবে বাউণ্ডুলে। এ বয়সেই বাপ-মা দু'জনকেই খেয়ে বসে আছে। এখন মামা-মামীর পিণ্ডি চটকাচ্ছেন। আমার নন্দাকে তো দেখতেই পারে না।—পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে মামীমার কত অভিযোগ।

গুম হয়ে বসে থাকেন হরেনবাবু। মা জল-টল দিয়ে ধুয়ে মুছে আমাদের বাড়ি থেকে আইওডিন নিয়ে গিয়ে অমলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন।

নেপথ্যে মামীমার মন্তব্য শোনা যায়,—মায়ের চাইতে মাসীর দরদ!

এমনি তার ছোটবেলার ইতিহাস। অমলের বাবা ছিলেন শিল্পী,—চিত্রকর। নাম ছিল তাঁর। কিন্তু বড় বেপরোয়া ছিলেন অমলের বাবা। কোন সংযমই ছিল না। রাতদিন মদ খেতেন। স্ত্রী কিংবা ছেলের দিকে তাকিয়েও দেখতেন না। অমলের বয়স যখন সাত কি আট, তখন তিনি মারা গেলেন। ছেলেকে নিয়ে ভাইয়ের সংসারে এলেন অমলের মা। তাঁকেও কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পেতে হয়েছে। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিনিও অমলকে ছেড়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। মায়ের কাছে শুনেছি,—সে বড় দুঃখের কথা। সে বড় করুণ কাহিনী।

তারপর?—তারপর চলল অমলের উপর নির্যাতন। তবুও হেলায় ফেলায় অমল বড় হতে লাগল।

আমার মা বলতেন,—কি সুন্দর হাসি-খুশী ছেলে ছিল রে। সবই যে শুকিয়ে গেছে। মাকে হারাবার দিন ছেলেটা সেই যে শেষ কান্না কেঁদে নিয়েছে, আর কোনদিন ওর চোখে জল দেখিনি। হাসিও তার কোথায় মিলিয়ে গেল।

সেই অমল মামা-মামীর কড়া শাসনে থাকে। স্কুলে যায়, আর বাড়ির ফাই-ফরমাস খাটে। মামা বলতেন,—কিচ্ছু হবে না। হতভাগার কিচ্ছু হবে না। তবু লেখাপড়া না শিখলে আপিসে বেয়ারার কাজও পাবে না।

মায়াদেবী হুংকার ছাড়তেন,—হবে না কেন? সেই বাপের ছেলে তো! ছেলেও আর্টিস্ট হবেন। ওর খাতাগুলো দেখো, হিজিবিজি এঁকে খাতা নষ্ট করে। খাতা কিনতে কি পয়সা লাগে না?

মামাও গর্জে উঠেন। এমনি করেই দিন কাটে। রাত্রে অমল আমাদের বাড়িতে চুপি-চুপি চলে আসত। আমারই বই নিয়ে রাত জেগে পড়ত।

আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু অমলের আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। মামা-মামীর সংসারে তার সময় কোথায়? বড় হয়ে উঠেছে, এখনও নির্যাতন চলেছে।

তারপর কি যে হয়ে গেল। কোথায় উধাও হয়ে গেল অমল। মামীমা চীৎকার করে বাড়িটা সরগরম করে তুললেন;—আমার নন্দাকে খুন করে ফেলেছে গো! আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে।

ঘটনাটা আর কিছু নয়, অমল ছবি আঁকে। কখন যে কি খেয়াল হয় বলা যায় না। আমিও দেখেছি, ঠিক্ ঠিক্ মানুষের ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু চোখ আর মুখের আভাস দিতে গিয়েই তার হাত থেমে যায়। একদৃষ্টে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এমনি এক সময়ে নন্দা এসে তার আঁকা ছবিটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় অমল। নন্দা হাউ মাউ করে চীৎকার করে ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়।

অমলও ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এই প্রথম অমলের হাত উঠল। সেই থেকে অমলের কোন খবরই নেই। হরেনবাবু দিন-কয়েক তর্জন-গর্জন করে ক্ষান্ত হলেন। মামীমা বললেন, এ ছেলে বাড়িতে ঢুকলে আমিই আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

অবশ্য তাঁকে পালাতে হল না। অমল আর ফিরে এল না। মা কয়েকদিন হা-হুতাশ করলেন। তারপর সবই চুপচাপ মেরে গেল। অমলের কথা বড় একটা মনেই পড়ত না।

বছর কয়েক কেটে গেছে।

আমার এক বন্ধুর বাবা শহরতলীর এ অঞ্চলে বাড়ি করবেন বলে জায়গা কিনেছেন। তাঁদের সংগেই এসেছি; হঠাৎ অমলের সংগে দেখা হয়ে গেল।

অমল বললে, চল আমার ডেরায়।

—ডেরায়?

—হ্যাঁরে। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশিদূরে নয়, ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

অমলের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বলতে কি নিজেরও কৌতূহল কম হয়নি। বন্ধুদের বলে অমলের সংগে এগিয়ে গেলাম।

টালির ঘর। পরিচ্ছন্ন উঠোনে ছোট ছোট ফুলের গাছ। এক কোণে তুলসীর বেদী। উঠোনে বসে ধুলো ঘাঁটছে উলংগ বা অর্ধ-উলংগ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে বড়টির বয়স সাত-আটের বেশী হবে না। তাদের চেহারায় পরিচ্ছন্নতা থাকলেও ভদ্রঘরের ছাপ আছে বলে মনে হল না। তবু মনে হল—তারা আনন্দেই আছে।

অবাক্ হই।—এ কার সংসার?

অমল বলে যায়, অবাক্ হবারই কথা রে! সেই যে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম; সে যে অনেকদিনের কথা; সংগে কিছুই ছিল না; দুদিন তো কলের জল ছাড়া কিছুই পেটে পড়েনি। রাতে নিঝুমে হয়ে রাস্তায় পড়ে-ছিলাম। হঠাৎ কে মাড়িয়ে দিলে। উঠে দেখি, মাতাল এক ভদ্রলোক। আমার দিকে চেয়ে বললেন, কি বাবা! ভদ্রলোকের ছেলে মনে হচ্ছে। যাবে আমার সংগে?

মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। তবু কৌতূহল ন; নিজের জন্যে। সেই ভদ্রলোকের সংগে গেলাম। তিনি এক আর্টিষ্ট। তাঁরই ষ্টুডিয়োতে কাজে লেগে গেলাম। অনেক কাজই তিনি করিয়ে নিতেন। কিছু কিছু পকেট-খরচাও দিতেন।

…সংগে অমলের গল্প শুনি।

অমল বলতে থাকে,—বেশ আরামেই ছিলাম। তিনি যে সব কাগজ ফেলে দিতেন, সুযোগমত তারই উপর ছবি আঁকতাম। আর ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রাখতাম। হঠাৎ একদিন তাঁর নজরে পড়ে গেল। তিনি বললেন,—বেশ হচ্ছে। তুমি তো জাত-আর্টিষ্ট। কিন্তু বাবা, এখনো তোমার ভেতরকার আর্টিষ্টটা জেগে উঠতে পারেনি। হাত-পা, মুখ-চোখ ঠিকই হয়েছে। কিন্তু না আছে হাসি, না আছে কান্না। না ফুটেছে কোন ভাব। ভাবই হচ্ছে শিল্পের প্রাণ।

হোঃ-হোঃ হেসে উঠতেন তিনি। মদ তাঁকে মাঝে মাঝে বেসামাল করে তুলত।

ছবি আঁকতাম। আর ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।—নাঃ, কিছুতেই প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেনা। আকাশ-পাতাল ভাবি।

মাতাল আর্টিষ্ট বলতেন,—ছবিও কথা বলে।

তাঁর এক মেয়ে ছিল। কি অহংকার তার! আমাকে সে চাকরেরই সামিল করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, চাকর ছিলাম বৈকি! গটগট করে ক্লাবে কিংবা সিনেমা দেখতে বেরিয়ে যেতো সেই মেয়ে ডলি। সে-ই আমার সেই আশ্রয় ঘুচালে। তার হাবভাব আমার ভাল লাগত না। সত্যি কথা বলতে কি সেই ছোটবেলা থেকেই মেয়ে জাতটার উপর আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। কিছুতেই তাদের সহ্য করতে পারতাম না। এখানেও মামার বাড়ির পুনরাবৃত্তি। কিন্তু নন্দা ছেলে-মানুষি করেছিল; আর এখানে ডলির মনে ছিল বিকার। এখন তা বুঝতে পারছি। ডলি প্রায়ই এসে বিরক্ত করে। একদিন এসে ছোঁ মেরে হাত থেকে আমার আঁকা ছবিটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হিঃ-হিঃ করে হাসতে লাগল ডলি।

সহ্য হল না। কষে একটা চড় বসালাম ডলির গালে। আমার পলায়ন। বুঝলি শোভন! আবার পালালাম। এবার কিন্তু শুধু হাতে নয়, কিছু টাকা জমিয়েছিলাম তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করেও কোন আশ্রয় মিলল না। এ ধরমশালায় দু'দিন, ও-ধরমশালায় চারদিন—এরকম করে কয়েকদিন কাটালাম। ছবি এঁকে রাস্তায় ফেরি করে বেড়াই; দু'চার আনা পাই। কোনরকমে দিন চলে যায়। বস্তির একখানা ঘরে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু ছবি আঁকি, নিজেই বুঝি সে ছবিতে প্রাণ দিতে পারি না। কাঁদতে চাই; বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে, কিন্তু কান্না বের হয় না; চোখে এক ফোঁটাও জল দেখা দেয় না।

আমার এ কি হল? আমি কি পাগল হয়ে যাবো?—বস্তির লোকগুলো পেছনে লাগল। মেয়েরা বলতে লাগল,—এ মিনসে ছোকরাটা কেমনধারার দেখেছিস্, চোখ-মুখে রস-কষ নেই। লোকটা পাথর—একেবারে পাথর। এ আবার ছবি আঁকে!

হাঁ, পাথরই বটে! হাসি ও কান্না সবই আমার কাছে সমান। জানিস শোভন! লোকের দুঃখ দেখলে আমার মনে একটুও আঘাত লাগত না। কারো মুখে হাসি দেখলে মনে হত, তার মুখে একটা ঘুষি মেরে হাসিটা ঘুচিয়ে দি।

বস্তিটা ছাড়তে হল। কখন যে শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছে পৌঁছে গেছি খেয়ালই নাই। ট্রেণের বাঁশী বাজছে, মনে হল আমাকেই ডাকছে।

গান

অনিল ভট্টাচার্য

জাগো আনন্দময়!
প্রেম-তীর্থে নিয়ে চলো মোরে
বন্ধন হোক ক্ষয়॥
তোমারি প্রেম-বন্দনা-গীতে
মুক্তি-মন্ত্র জাগুক এ চিতে
শত ক্রন্দন এই ধরণীতে
হউক নিমেষে লয়॥
নির্বাণ করো প্রেম-মণি-দীপ
দুর্বল চিত মাঝে
চঞ্চল চিত মুক্ত করো হে
তোমারি পুণ্য কাজে—
নিষ্কৃতি করো দুষ্কৃতি যত
ছিন্ন করো হে মায়াজাল যত
দূর করো মোহ-মলিনতা শত
হোক্ অরুণোদয়॥

ইঞ্জিনের তলায় পাথরের তৈরী দেহটাকে চুরমার করে দেবার জন্যেই ছুটে যাচ্ছি!—অমলের চোখ-মুখে উত্তেজনার ভাব ফুটে ওঠে।

অমল বলে যায়,—কিন্তু থামতে হল শোভন! হৈ-চৈ ব্যাপার। এক জায়গায় ভিড় জমে গেছে। কানে গেল—উদ্বাস্তু মশাই! উদ্বাস্তু! স্বামীটা মরে গেছে। বউটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে।

মনটা ঘুরে গেল। এগিয়ে গেলাম। কাঁদছে, তারা কাঁদছে। ছেঁড়া, ময়লা, নোংরা কাপড়-চোপড়ে অদ্ভুত এক নারীমূর্তি। সমস্ত বীভৎস। চোখে-মুখে বসন্তের দাগ। হাত-কখানাই সার। আর তাকে জড়িয়ে ধরে অ…ল-বিকুলি করছে তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের পাশে একটা মৃত-দেহ। সেটা আরো বীভৎস। মেয়েটি কাঁদছে: আর তারই পায়ে মাথা খুঁড়ছে। তার ছোট্ট মেয়েটি মায়ের গলা জড়িয়ে হাসছে; আর তার ছোট্ট হাত দিয়ে মায়ের চোখ মুছে দিচ্ছে।

—মনে হল সেই ছোট্ট মেয়েটি আমারই চোখের একটা কঠিন পর্দা ছিঁড়ে দিল। নতুন চোখ পেলাম শোভন! আমি নতুন চোখ পেলাম।

অমল এমনভাবে বর্ণনা করছিল, যেন আমি চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি।

—বুঝলি শোভন! হঠাৎ কে যেন বুকের ভেতরটা মুচড়ে দিয়ে গেল। সে দৃশ্য আমার চোখ ফুটিয়ে দিল। প্রাণের সাড়া পেয়ে গেলাম আমি। আমার দু'চোখ দিয়ে ধারা নামল। সেই ছবি আঁকলাম আমি। আমার ছবিতে জীয়ন-কাঠির পরশ পেয়ে গেলাম।

আমার ছবি আর কেউ হেলা-ফেলা করে না রে। এই যে,—এই যে তারা,—আমার আভা-দিদির ছেলেমেয়ে। এদের নিয়েই সংসার পেতেছি।

অমলের দু'চোখে ধারা নামে। তার চোখে-মুখে অশ্রুসজল হাসি। মনে হ'ল পাথর আজ প্রাণ পেয়েছে; শাপমুক্ত হয়েছে অমল।

জীয়ন-কাঠি!—সত্যই জীয়ন-কাঠির পরশ পেয়েছে অমল।

সিঁড়িটা ঠিক এমনি ঘোরান ছিল না, ঠিক এমনি সাপের মত পাকানো।

তখনো প্রমথ এই অভিজাত অঞ্চলের কানা গলিটার পাকা বাড়িতে উঠে আসেনি। ওপরে নীচে দুখানা কোঠার একটা অদ্ভুত নিটোল ফ্ল্যাট; বাথরুম, কিচেন, জলে স্বয়ংসম্পূর্ণ। টেলিফোন, রেডিওতে কোনো নালিশ নেই, শুধু মাঝখানে একটা যা সর্পিল সিঁড়ি।

এ বাড়িতে বসে চোখ বুজেও কল্পনা করতে ইচ্ছা করে না, কি জঘন্য পরিবেশই ছিল এই কিছুকাল আগে। এক পাশে রিকেটি মেয়ে মানুষের মত আদি গঙ্গা, অন্য পাশে ভাড়িখোর মাতালের মত সুরকির কল। একখানা ঘরে অসুস্থ বাপ, ভাই বোনেদের পড়াশুনা, দিনমানের খাটুনির পর প্রমথর বিশ্রাম।

প্রমথ অনার্স গ্রাজুয়েট হলেও আপাতত বেকার। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব আছে পুরোপুরিই। আর পাঁচটা বাঙালী পরিবারের মত পরগাছার চাহিদা মেটান দায়। এমন কিছু বাজনাবাবিয়ানার খরচ কেউ দাবী করে না, প্রাণ ধারণের ন্যূনতম রসদ। তাও জোটাতে হিমসিম খেয়ে যায় প্রমথ।

কোনো কোনো দিন বোশেখের একশ' দশ ডিগ্রি হিটে প্রমথ নিতান্ত অনিচ্ছায়ই টিনের চালায় মনের জ্বালায় ফিরে এসে দেখেছে, আশ্চর্য লাবণ্যময়ী হয়েছে প্রাচীন নিম গাছটি। থোকায় থোকায় কচিপাতা ছড়িয়ে দিয়েছে চালার ওপর। নিমের ফুলে ফুলে অপূর্ব মধুগন্ধ। সিম সিম করছে মাদক হাওয়া। অনেক মৌমাছির আনাগোনা, কয়েকটা প্রজাপতির পাখায় বুঝি ফুলরেণু। মরা গঙ্গায় জোয়ার এসেছে বুঝি। কিছুক্ষণের জন্য সুরকির কলটাও চুপ। হয়ত দুপুরের বিরতি।

মার চোখে দিবানিদ্রা নেই। দুপুর পর্যন্ত একটানা খাটলেও, এখন শুয়ে শুয়ে সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন রামায়ণ।

খানিকের জন্য তপোবন বলে ভ্রম জন্মে প্রমথর। আর মা যেন এ বয়সেও ঐ নিম গাছটার মতই নিজের প্রাণরসে আশ্চর্য লাবণ্যময়ী।

আজ আর টুকিটাকি কাজে তেমন সুবিধা করতে পারেনি প্রমথ। অনেক ক্ষোভ এবং চাপা নালিশ ছিল। ইচ্ছা ছিল ভাই বোনদের একটা মিথ্যা অজুহাতে কিছু বকাবকি করে, মাকে করে বার্ধক্যের অনুযোগ। কিন্তু ভাই বোন দুটি রইল সসম্ভ্রমে হুকুমের অপেক্ষায় তটস্থ হয়ে। মা এলেন পাখাখানা নিয়ে। বাবা ইসারায় বললেন, বস! সব অবসাদ দূর হয়ে গেল নিমের আবহাওয়ায়।

প্রমথ বললে, এম-এ টা পাশ না করলে আর সুরাহা হবে না।

বাপ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলেন, মা অথচ যেন পরম বিশ্বাসে বললেন, সব হবে যদি অন্তত এই চালাটা বজায় থাকে।

তখন অবশ্য প্রমথ তর্ক করলে না, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলে না, এই চালাটুকু বজায় থাকার মূল্য কি? তারা বাড়িওয়ালা নয় যে ভাড়া আদায় করে য়ুনিভার্সিটির মাইনে যোগাবে। কিম্বা কোনো দায় নিদানে চালা খুঁড়ে পাবে কপর্দক।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রমথ টের পায় সকলের খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে মা ঘর ছেড়ে গিয়ে নিম গাছটার তলায় বসেন। আসে সুরভির মা, দক্ষিণ কোণার ধরণীবাবু, সুরকিকল থেকে বুড়ো সুরদাস এবং মালতী ঠাকরুণ। পরস্পর পরস্পরকে সহানুভূতি জানায়, অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করে। মূল কথা বায় সংকোচ না করে কোনো বড় কাজ হওয়ার নয়। ফলে মার হাতের মুঠি আর একটু শক্ত হয়। নিজের মনের ও দেহের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়ে তিনি প্রমথকে পথ করে দেন।

একদিন প্রমথ পাশের খবর নিয়ে বাড়ি ফেরে। মা চৈতালী নিম গাছটির মত আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে আড়ালে গিয়ে খানিক চুপ করে থাকেন। ফিরে এসে বলেন, এতদিনে সার্থক হল তোমার পরিশ্রম।

কোথায় আর হল মা, চাকরি?

তাও হবে, যখন এই চালাটুকু বজায় আছে।

অদ্ভুত তোমার উক্তি! —প্রমথ হেসে হেসে বলে, সুরদাস না সুরভির মা আমায় চাকরি দেবে? রাত্তিরে বসে বুঝি এই সব রাজন কথা হয়? যা যার পিছনে ব্যাকিং নেই, তার এ-যুগে কোনো কিছু হওয়ার নয়।

একটু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিস, সব হয়ে যাবে।

প্রমথ আবার হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। ধরণীবাবু বুঝি এই কথা বলেন। যাক, এবার থেকে তোমার আঁচল ধরে নিমগাছতলা বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করব।

প্রমথ তার কথা রাখতে পারে না, কিন্তু মা দিয়ে চলেন ধৈর্যের পরীক্ষা। এবার বুঝি আর একতরফা তদ্বিরে শ্রীভগবান তুষ্ট হন না। তাই আর সিদ্ধিলাভ হয় না প্রমথর। কেবল জুতো জামা ছিঁড়ে, ক্ষোভ ফেনিয়ে ওঠে আকণ্ঠ। মা এক পায় খাড়া, ভাই বোন দাদাকে দেখলেই হাতজোড়, তবু প্রমথর খুঁতখুঁতি যায় না।

ইদানীং চলছে বস্তিটার ওপর আক্রোশ। —এখানে কি কোনো ভদ্রলোককে নিয়ে আসা যায়! নিজের দুর্বলতার কথা সব সময় আর তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

অসুস্থ বাপ ছেলে মেয়েদের ওর মধ্যেই ছিমছাম হয়ে থাকতে বলেন। নিজের হাতে কষ্ট করে আড়ালে সরিয়ে রাখেন পিকদানীটা। মা-ও যতটা সম্ভব গোছগাছ করে রাখেন ঘর-দোর, নিমগাছের নিচের চত্বরটা পর্যন্ত।

চাকরি-বাকরির ব্যাপার, সম্মানিত অতিথির জন্য বস্তি শুদ্ধ কৌতূহলী। মোটরের হর্ণ শুনলে ধরণীবাবু পর্যন্ত উৎকর্ণ। আবার না কেউ ঠিকানা বুঝতে কিম্বা বোঝাতে ভুল করে।

কেউই আসে না, অনেক ট্যাক্সি, মোটরের হর্ণ আশা জাগিয়ে দূরেই বিলীন হয়ে যায়। প্রমথর কেউ নেই এ কথাটা যেন সকলের বুকে শেলের মত ঠেকে। আহা শিক্ষিত প্রমথ!

চৈত্র যায়, বৈশাখ আসে। তখন ঐ হতাশ বস্তিতে আর কোনো উৎকণ্ঠার বাষ্পও নেই। কোনো প্রস্তুতি নেই আপ্যায়নের। মোটর ট্যাক্সি নয়, একটি কৃশাঙ্গী শ্যামলা মেয়ে প্রমথর সঙ্গে হেঁটে আসে। এক হাতে তার বৈধব্যের লক্ষণ, অন্য হাতে একগাছা সুবর্ণের কাঁকণ—সিঁথি দেখলে মনে হয় কুমারী।

মেয়েটি অতি ভদ্র, পরম লাজুক। এত লাজুক যে চারদিকে তাকিয়ে এক কাপ চাও খায় না।

এই মেয়েই কি চাকরির দেবে প্রমথকে?

হতে পারে, সুরজিত ঠাকরুণ মুখ টিপে হাসে।

প্রমথর বাপ বুকটা ছ্যাঁক করে ওঠে। এ বাংলা বুঝি ব্যঙ্গ নয়। তবু যদি মেয়েটি দেখতে শুনতে তেমন হত। প্রমথ লম্বা চওড়া—রঙটা পুড়ে গেলেও, সোনা। আর এ মেয়েটি ঢ্যাঙার ওপর একপোচ কালি। চোয়ালের হাড়-গুলোও কেমন শক্ত শক্ত।

কিছুক্ষণের মধ্যে মা জানতে পারলেন, এই মেয়েই প্রমথকে বাহাল করেছে চাকরিতে—তবে কোনো অফিসে নয়, নিজের ড্রয়িংরুমে। একশ' টাকা মাইনে, ঘণ্টা খানেক পাঠ দেবে। ভালভাবে পাশ করলে শিক্ষক পাবেন আশাতীত জলপানি।

আশা অত্যন্ত কাঁইৎকর্মা ছাত্রী, সে সর্ব বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে ফেল করে।

প্রমথ আশার বাবাকে নমস্কার জানিয়ে বলে, তবে আসি।

সেকি! ছাত্রী ফেল করছে বলে প্রাইজ নেবে না? তোমার জন্য হিউবার্টের বড় সাহেবকে ধরে একটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারী জোগাড় করে রেখেছি। আপাতত সর্বসাকুল্যে প্রায় চারশ'। এই দরখাস্তটায় সই করে দাও, শীগগিরই এ্যাপয়েন্টমেন্ট আসবে।

প্রমথ আশার বাবার মহত্ত্বে খানিক বিস্মিত হয়ে থাকে, তারপর কম্পিত হাতে সই করে দিয়ে খাড়ি ফেরে। এখন চারশ', ভবিষ্যতে হাজার হওয়া অসম্ভব নয়।

দিন যায়, মাস যায়, প্রমথর আর কেউ খোঁজ নেয় না। সে মাথা নুইয়ে আবার ছাত্রীর বাড়ি যাওয়া সমীচীন মনে করে না। তাতে আবার ফেল করা, চোয়ালের হাড়-জাগা ছাত্রী! একটু সুবিধা মত নতুন একটা চাকরির চেষ্টায় সে উঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু কুশ কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয় তার পা। সে চাণক্যের মত এই তীক্ষ্ণ কাঁটা সমূলে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়।

এবার বিজয়ী হয় প্রমথ। সে সেই চারশ' টাকার চাকরির সঙ্গে ব্যান্ড বাজিয়ে এই বস্তিতে প্রবেশ করে। এখন সে নীলকন্ঠ।

সেই অর্ধেক বৈধব্য অর্ধেক কুমারীর কঙ্কণক্লান্তা আশাকে ঘরে নিয়ে আসে। সে এসেই সংসারের চাবুক হাতে নেয়। প্রমথই শুরু করে বস্তিটার ওপর আক্রমণ।

মা বাড়ি বদলাতে হবে।

নিমগাছ ও তার চারদিকের মুখগুলোর কথা স্মরণ করে, মা ছলোছলো চোখে বলেন, বেশ!

তারপর অভিজাত পাড়ার কানা গলিটার সর্বাংসম্পূর্ণ এই অদ্ভুত ফ্ল্যাট—ওপরে নিচে ঘোরানো সিঁড়ি।

বৌর অল্প বয়স, তার পক্ষে সিঁড়ি ভাঙা তেমন শক্ত নয়। তাই সে যায় ওপরে, বুড়ী এবং রান্না নিয়ে মা থাকেন নিচে। একটু অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে তবু উপায় নেই। কলে প্রচুর জল। অবশ্য সকালেই তো হাত পাম্পটা চালাতে হবে। এ সব পাড়ায় এর চেয়ে ভাল বাড়ি পাওয়া সহজ নয়।

পাম্পটার গোটা কয়েক চাপ দিয়ে আশা তার স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলে, এ-আর এমন একটা কঠিন কি?

মা বলেন, হ্যাঁ বৌমা ঠিক।

ওপরের ঘরে ফার্ণিচার ওঠে, নিচের ঘরে জঞ্জাল নামে। ওপরের ঘরে যখন ফুলের টব, নিচের প্যাসেজে সার ও মাটির ঢিবি। নতুন বৌর সখ, কেউ কিছু বলে না। আসল কথা অনুগৃহীত পোষ্যদের তখন পর্যন্ত বিস্ময়ই কাটেনি। যাদের ঘরে অতি প্রয়োজনে একখানা গন্ধ সাবানও আসেনি, তাদের ঘরে ফুলের টবে ফুল ফুটবে, রেডিও টেলিফোনে হবে গান ও কথা!

সকলে রুদ্ধশ্বাসে কৃচ্ছ্রসাধনা করে। কষ্টকে কষ্ট বলে আমল দেয় না।

সময়মত টবে ফুল ফোটে, কিন্তু এ নিমের ফুল নয়, কৃপণ গন্ধ নিচে নামে না। রেডিওটা যখন চলে তখন পড়াশুনা, রান্না-বান্নার সময়, তাই আর কারুর ফুরসৎ হয় না ওপরে যেতে। মা তো সকাল সন্ধ্যা ব্যস্তই থাকেন, বাপ থাকেন শুধু নিঃসঙ্গ, কিন্তু তাঁর জন্য তো আলাদা একটা ব্যবস্থা করা যায় না। হরিনাম হলেও কথা ছিল। তাই নববধূর জন্যই ওটা রয়ে যায়।

রেডিও হয়েছে, টবে গোলাপ গন্ধ বিলাচ্ছে, তবু সোনার দাঁড়ে বসে ময়নার আদরের ছোলা ছাতু ভাল লাগে না। সে তার পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। তাই নানাপ্রকার দৈনিক এবং মাসিক আসে। একটু-খানি চোখিয়ে সে গাদা মেরে রেখে দেয়। যখন পচে ওঠে তখন যায় নিচে।

যে প্রমথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কিম্বা কোনো রকে বসে কাগজ পড়েছে, এটাকে একান্ত বাজে খরচ মনে করে। কিন্তু সে কারুর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দিয়ে অপ্রস্তুত হতে চায় না। কারণ অভিজাত সমাজে সে সবে আশার দৌলতে পরিচিত হচ্ছে। কৌলীন্যের মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। শুধু বিদ্যা বুদ্ধিতে হাজার টাকার লিফট পায় না। তাই সে ওপরতলা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, নিচের তলার দিকে আর নজর দিতে পারে না।

আশা কিন্তু স্বামী সেবায় আদর্শ বঙ্গ ললনা। নিখুঁত পঞ্চ ব্যঞ্জনে মা টেবিলটি সাজিয়ে রাখেন, আশা শুধু বলে, খাও, খাও—টমেটো ডিম না খেলে শরীর থাকবে না। মা চাটনিটায় দুটো মনাক্কা কেন দিলেন না?

কাল আর ভুল হবে না বৌমা।

একটু চোখে প্রমথ বলে, এমনিতেই বেশ, আবার মনাক্কা কেন?

তুমি আর ছেলেমানুষী করো না। লোকে শুনলে হাসবে। তোমার মত সকলের রুচি নাও হতে পারে। তোমার তো একখানা কাগজও লাগত না। যে কারণে টবে ফুল, সেই কারণেই চাটনিতে মনাক্কা। কত আর, মাসে সের দেড়েক লাগবে।

এরপর আর কথা চলে না। সমস্ত কথার খেই মেরে দিয়েছে নববধূ। তাই বাহুল্য হলেও লোকনিন্দার ভয়ে মনাক্কা আসে। ঠিক সেই কারণেই টেলিফোন। পিঞ্জরের পাখি বিকবকে বাদ দিয়ে এবার বাঙলাকে আহ্বান জানায়, ব্যাধের জালে ধরা পড়ে একা আছি, সুবিধা মত একটু এসে দেখে যাস ভাই! উত্তরে মিস্, মিসিসিপি সহানুভূতি জানায়, কিন্তু আসে না।

ওপরের ঘরে যত জৌলুস বাড়ে, নিচের ঘরে তত আরসুলা উৎপাত করে। একটা কোনো প্রতিষেধক ওষুধও আসে না। মাঝে মধ্যে অফিস যেতে মার সঙ্গে মুখোমুখি হলে, প্রমথ আর পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, বাবা কেমন আছেন?

মা ওপর তলার দিকে চেয়ে সংক্ষেপে বলেন, ভাল।

কোনো কিছুর দরকার হলে গোপন করো না কিন্তু। দেখছই তো আমার একেবারে মরার ফুরসৎ নেই।

মার মত একথা আর কে জানে! তাই কোনো নালিশ নেই। শুধু প্রাচীন নিমগাছটি আলো হাওয়ার অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে বুঝি।

আর একদিন প্রমথ হয়ত জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ মা?

মা হেসে বলেন, নিত্য দেখছিস দুবেলা, আমি আবার কেমন থাকব, ভাল।

প্রমথ সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু বিস্তারিত শোনার সাহস নেই। আবার হয়ত ওপর থেকে মন্তব্য হবে, এক্স্প্রেস বাসটা কি ফেল করবে?

পরপর দুদিন ফেল করলে হয়ত বলে বসবে অমুকে সাড়ে তিনশ' পেয়ে দিব্যি মোটর হাঁকাচ্ছে, আর তুমি কিনা আজও কিছু করতে পারলে না। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু অঘটন ঘটলে আমি জানিনে।

আশার রং এবং চোয়ালের হাড় দুখানা দেখতে যেমন হক, চোখ দুটো কিন্তু অপূর্ব। বিয়ের আগে একদিন কি যেন প্রশ্নে পারোকে ঐ চোখ দুটো নিমীলিত করে বলেছিল, সর্বং-সহা হয়েই সংসার করতে হয় নারীকে। তারপর কি যে কষ্ট করে প্রথম দিন হেঁটে এসেছিল রোদ্দুরে বস্তি বাড়িটায়! আজ স্বপ্ন বলে মনে হয় সব। এক কাপ যে চাও খেলে না, তার চাটনিতে নাকি মনাক্কা না হলে চলবে না! পাশার দান উলটে পড়েছে, প্রমথকেই সর্বং-সহা হতে হয়েছে।

টেলিফোনের দৌরাত্ম্যে বন্ধু বান্ধবরা অতিষ্ঠ। কে কবে একদিন আশাকে লেকের ধারে বসে ধন্যবাদ দিয়েছে, এক ভাঁড় চা অফার করেছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্যানে সেও বাদ যায় না।

পরিচিত অর্ধ-পরিচিতের লাইন পড়ে যায় বিকাল হতে না হতে।

কারু ঠোঁটে লিপষ্টিক, কারুর চুলে খোঁপা নেই—শুধু বাবরি, যেন মেয়ে ঠ্যাঙাড়ে। তবু হাতে ঠ্যাঙার বদলে সুগন্ধের বটুয়া। কেউ ফ্রক পরা, কেউ বা উলঙ্গিনী শাড়ি। এদের সঙ্গের পুরুষরাও ব্যবহারে বাহারে মেয়েদের টেক্কা দিয়ে চলতে চান। কেউ বা বাটার ফ্লাই, কেউ বা অনঙ্গ মূর্তি। চোখে গোপন সুরমার টান, রঙ বেরঙের পরিধান। নানা ফ্রেমের চশমা, কারুর পায় সু, কারুর পায় বা বাঘের ছালের চটি।

কলিং বেলটার আর্তনাদে পাড়া সরগরম। মা, মেয়ে ও প্রমথর ছোট ভাইটির পা জিরোয় না। কেবল উঠে উঠে ছুটে যাও—গেট খোলো আর বন্ধ করো। একটু দেরী হলে প্রমথর কর্কশ মন্তব্যের আশঙ্কা। কারণ সে থাকে সিঁড়িপথে মুখে বিনম্র, ভিতরে রুদ্ধ হয়ে—মাঝে মাঝে তাই রুগ্ন পিতাকেও বকুনি দিতে হয়।

যত দলে দলে অতিথি আসে তত চা জল-

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায়)

হোটেলের কামরায় বেশ গুছিয়ে নিয়ে বসেছিল সোমনাথ। ভেবেছিল, দু' হপ্তার ছুটিটা ওয়ালটেয়ারে কাটাবে নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে। কিন্তু সব গোলমাল করে দিল হোটেল রেজিস্টারে লেখা একটা নাম: মিসেস্ সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী।

অনেক ভেবেচিন্তে সোমনাথ সান্যাল এসেছিল ওয়ালটেয়ারে, একাকিত্বের সন্ধানে। পুরী বা দার্জিলিং-এ সে যায়নি'—ভয়, সেখানে হয়ত অনেক পরিচিত মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওয়ালটেয়ারে সুব্বা রাও অথবা লাল্-ভানিদের দল সোমনাথ সান্যালের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। কিন্তু নিয়তি এবার অত্যন্ত বিরূপ, তাই ওয়াল্টেয়ারের এই গ্র্যান্ড হোটেলেও তাকে পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

অবশ্য সে অনায়াসেই এই হোটেল ছেড়ে অন্য কোন হোটেলে উঠে যেতে পারে, এমন কি ওয়াল্টেয়ার থেকে চলে যেতে পারে সুদূর কোদাইকানাল বা উটকামণ্ড-এ। কিন্তু সীজন্ শুরু হয়ে গেছে, এখন অন্য কোথাও তিলার্ধ জায়গা পাওয়া যাবে না। আর ওয়াল্টেয়ারেই যদি থাকতে হয় তাহলে এই গ্র্যান্ড হোটেল ছাড়া গত্যন্তর নেই, কারণ সহরে ভদ্রগোছের এই একটি মাত্র হোটেল।

আচ্ছা, সুপ্রিয়া কি হলিডে করবার জন্যে সারা ভারতবর্ষে আর কোন জায়গা খুঁজে পেল না? তাকেও চলে আসতে হ'ল ওয়াল-টেয়ারের এই গ্র্যান্ড্ হোটেলে? সোমনাথও যে এই হোটেলে উঠছে তা' বোধ হয় সে জানে না! যদি জান্‌ত, নিশ্চয়ই এখানকার খাতায় নাম লেখাত না।

সুপ্রিয়া এসেছে আজ ভোরের ট্রেণে সোমনাথের আসার দু'দিন পরে। কিন্তু রেজিস্টারে নাম লেখার সময় সামান্য কৌতূহলের বশেও আগের পাতাটা উল্‌টে দেখেনি' সে? অথচ সোমনাথ ত এসেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যাগতদের নামগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিল, কোন বাঙালীর নাম নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তখন কি সোমনাথ কল্পনা কর্‌তে পেরেছিল যে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই হবে এই বজ্রপাত? সুপ্রিয়াও এসে আস্তানা গাড়্‌বে এই হোটেলে?

আজ ব্রেকফাস্ট্-এর পর বাইরে যাবার মুখে অভ্যাসমত হোটেলের রেজিস্টারে চোখ বুলিয়েছিল সে। চম্‌কে উঠেছিল ঐ নামটা দেখে। আড়ষ্টভাবটা কাটিয়ে উঠে অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে হোটেলের ম্যানেজারকে প্রশ্ন করেছিল, মিসেস্ রায়চৌধুরী কতদিনের জন্য ঘর বুক করেছেন। মোটেই খুশী হয়নি যখন শুনেছে যে সে থাক্‌বে দু' হপ্তা খানেক।

মিসেস্ সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী। অথচ মাত্র তিন বছর আগেও সে ছিল মিসেস্ সুপ্রিয়া বসু, তার বন্ধু অরুণ বসুর স্ত্রী!...অতি রূঢ়, নগ্ন সত্য, কিন্তু সুপ্রিয়ার রূপান্তর এই তিন বছরেও সোমনাথ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে উঠ্‌তে পারে নি'। আজও পার্‌ল না। একটা বেদনা যেন নতুন করে তার সারা গায়ে মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল।

সোমনাথ স্থির কর্‌ল সুপ্রিয়াকে এড়িয়ে যেতে যথাসম্ভব চেষ্টা কর্‌বে।

লাঞ্চ খেতে সোমনাথ ডাইনিংরুমে ইচ্ছে ক'রেই ঢুক্‌ল ভীড় সুরু হবার বেশ একটু আগে। উদ্দেশ্য, তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে সে চলে যাবে তার কামরায়, যাতে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও না হয়।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কফির পেয়ালাতে সোমনাথ চুমুক দিচ্ছে আর ভাব্‌ছে, একটা বিপদ্‌সংকুল মুহূর্ত বোধ হয় নির্বিঘ্নে কেটে গেল, এমন সময় ঢুক্‌ল সুপ্রিয়া।

সোমনাথ যে টেবিলটায় বসেছিল সেখান থেকে দরজাটা পরিষ্কার দেখা যায়। সুপ্রিয়া তাকে লক্ষ্য করেছে কি না বোঝা গেল না, কারণ আর কোন দিকে না তাকিয়ে সে চলে গেল ষ্টুয়ার্ড-এর সঙ্গে, তার জন্য যে টেবিলটা সংরক্ষিত রয়েছে সেখানে। সে বস্‌ল সোমনাথের দিকে পেছন ফিরে।

সোমনাথ একটু আহত বোধ কর্‌ল। সে আশা করেছিল, সুপ্রিয়া তার দিকে অন্ততঃ একবার তাকাবে এবং দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে দু'এক সেকেণ্ডের জন্য। কিন্তু তার চলা এবং বসার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল পৃথিবীর কোনদিকেই তার নজর নেই, নিজের মধ্যেই যেন সে সম্পূর্ণ।

তিন বছরে সুপ্রিয়ার চেহারা বদ্‌লেছে বই কি! সুপ্রিয়া তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না, কিন্তু সোমনাথ সুপ্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করবার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পেয়েছে।...বয়কে ইঙ্গিত করে সে আরেক পেয়ালা কফি চেয়ে নিল।

সুপ্রিয়া যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর, আরও বেশী লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। আর তার বেশভূষার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার নতুন পরিচিতি, ব্যারিষ্টার অনিমেষ রায়-চৌধুরীর অঙ্কলক্ষ্মী সে। ফ্যাসন সচেতন সোসাইটি লেডি, ব্যবসায়ী অরুণ বসুর গৃহলক্ষ্মী নয়।

নিতান্ত গতানুগতিকভাবে তার বন্ধু অরুণের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়েছিল ব'লেই কি তাদের যুগ্মজীবন এত শীগ্‌গীর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল? দুটি বছরও কাটে নি; তারই মধ্যে অরুণ অনুভব করেছিল সুপ্রিয়ার গভীর অতৃপ্তি। অবশেষে উপযাচক হয়ে সে নিজেই সুপ্রিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল। বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় অনিমেষ রায়চৌধুরী দাঁড়িয়েছিল তৃতীয় পক্ষের মূর্তিতে। ডিক্রিলাভ কর্‌বার বছরখানেকের মধ্যেই অনিমেষ সুপ্রিয়াকে বিয়ে ক'রেছিল।

সোমনাথ শক্ পেয়েছিল বই কি! বেশ গভীর শক্। অরুণের সংসার যে এইভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে তা সে কল্পনাও কর্‌তে পারে নি'। বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করে সে সুপ্রিয়াকে দু'চারটে কথা বল্‌তে চেয়েছিল, অরুণই বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, ভাঙা পেয়ালা জোড়াতালি দিয়ে কোন লাভ নেই, সোমনাথ।

তবু সে গিয়েছিল। মামলা সুরু হবার প্রাক্কালে সুপ্রিয়া যখন হোটেলে চলে যায়,

সোমনাথ তাকে খুঁজে বার করেছিল, তাকে অনুরোধ করেছিল, শেষ স্টেপ্‌টা নেবার আগে সে যেন শান্তভাবে ভেবে দেখে।

সুপ্রিয়া তার জবাব দিয়েছিল, অপরাধটা এক তরফা নয়, সোমনাথবাবু। আগে আপনার বন্ধুর স্বভাব বদ্‌লাবার চেষ্টা করুন্।

তারপর হেসে বলেছিল, যে আমাকে সত্যি ভালবাসে, আমার সমস্ত দোষত্রুটি উপেক্ষা করে আমাকে বরণ করে নিতে চায়, আমি তারই কাছে যাচ্ছি।

—অর্থাৎ অনিমেষ রায়চৌধুরী?

—হ্যাঁ, মিঃ রায়চৌধুরী।...দৃঢ়স্বরে জবাব দিয়েছিল সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াকে তার গোপনতম অনুভূতিটা জানাতে পারে নি' সোমনাথ। বল্‌তে পারেনি' যে সেও সুপ্রিয়াকে ভালবাসে, কিন্তু বন্ধুত্বের অমর্যাদা কর্‌তে সে অক্ষম।

দ্বিতীয় পেয়ালা কফিটাও শেষ হয়ে গেল। সুপ্রিয়ার অন্য কোন দিকে নজর নেই। আপন মনে সে লাঞ্চ্ খেয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ উঠে পড়্‌ল। পাশের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে এল, যাতে সুপ্রিয়া তাকে দেখ্‌তে না পায়।

অবশেষে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল সন্ধ্যার একটু আগে। বৈকালিক ভ্রমণ শেষ ক'রে সোমনাথ হোটেলে ফির্‌ছিল, দেখে ম্যানেজারের ডেস্ক্‌এর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া কি যেন বল্‌ছে।

পাশ কাটিয়ে সোমনাথ তার কামরার দিকে চলে যাচ্ছিল, ম্যানেজারই তাকে ডেকে বল্‌লেন, মিঃ সান্যাল, আপনার একটা চিঠি এসেছে।

বাধ্য হয়ে সোমনাথকে এসে দাঁড়াতে হ'ল সুপ্রিয়ার পাশে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা সে গ্রহণ কর্‌ল।

এবার সুপ্রিয়া চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য তার মুখের উপর দিয়ে এক ঝলক রক্তের ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু পরিচিতির কোন আভাসই সে দিল না।

সোমনাথই প্রশ্ন কর্‌ল। ভাল আছেন?

সুপ্রিয়া কোন জবাব দিল না। তার ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, প্রশ্নটা সে শুনতে পায় নি'।

সোমনাথ দ্বিতীয় প্রশ্ন কর্‌ল, ক'দিন থাক্‌বেন?

এবার বাধ্য হয়ে সুপ্রিয়াকে জবাব দিতে হ'ল। সোমনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে সংক্ষেপে সে জবাব দিল, খুব বেশী দিন নয়।

ব'লে সোমনাথকে আর কোন প্রশ্ন কর্‌বার অবকাশ না দিয়ে সুপ্রিয়া চলে গেল তার কামরার দিকে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সোমনাথও ঢুক্‌ল নিজের ঘরে।

একটা মাসিক পত্রিকার গল্পের মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সোমনাথ। ডিনারের সময় যে কখন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে সে খেয়ালও তার ছিল না। যখন হুঁস হ'ল রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি সে ছুট্‌ল ডাইনিং রুমের দিকে।

সুপ্রিয়ারও বোধ হয় দেরী হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কামরায় তখন আর কেউ ছিল না—একমাত্র সে ছাড়া।

সুপ্রিয়াকে উপেক্ষা ক'রেই সোমনাথ চলে যাচ্ছিল তার নিজের টেবিলের অভিমুখে। শুন্‌তে পেল সে ডাক্‌ছে, শুনুন...

ফিরে তাকাল সোমনাথ।

একটু যেন লজ্জিতভাবে সুপ্রিয়া বল্‌ল, আমার টেবিলে এসে বসুন না?

সুপ্রিয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করাটা কতদূর সঙ্গত হবে সোমনাথ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, বিশেষ ক'রে একটু আগেই যে অভ্যর্থনা সে পেয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে। সে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌ল।

সুপ্রিয়াই বয়কে ডেকে বল্‌ল, সাহেবের খানাটা এই টেবিলেই দাও।

অগত্যা সোমনাথকে বস্‌তেই হ'ল সুপ্রিয়ার টেবিলে।

—এই বয়সে ছেলেমানুষি করা আমাদের শোভা পায় না, নয় কি?...সুপ্রিয়া বল্‌ল।

এর কি জবাব দেবে সোমনাথ? সে চুপ ক'রে রইল।

সুপ্রিয়া বলে চল্‌ল, আমরা দু'জনের কেউই নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ক'রে এই হোটেলে আসিনি'। ভবিতব্যের বিধানে যখন এইভাবে কাছাকাছি এসে পড়েছি তখন স্বাভাবিক ব্যবহারই করা উচিত, কি বলেন?

স্বাভাবিক ব্যবহার? কি বল্‌তে চায় সুপ্রিয়া? প্রিয়বন্ধুর ভূতপূর্ব স্ত্রী, যে স্বেচ্ছায় তার আশ্রয় ছেড়ে চলে গেছে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হবার আগ্রহে, তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করা কি সম্ভব?

সুপ্রিয়ার সঙ্গে কল্‌কাতায় শেষ কথোপ-কথনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠ্‌ল সোমনাথের মনে। আর মনে পড়্‌ল সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে তার নিজের দুর্বলতার কথা, যা' সুপ্রিয়া জানে না।

—আপনাকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে। কোন অসুখ করেছিল নাকি? স্বরের মধ্যে যেন উদ্বেগ মিশিয়ে সুপ্রিয়া প্রশ্ন কর্‌ল।

এবার সোমনাথ জবাব দিল।

—না, আমি ভালই আছি। তবে অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম, তাই ওয়াল্‌টেয়ারে এসেছি।

—একাই এসেছেন?

সোমনাথ হাস্‌ল। বলল, না, অরুণ আসে নি'।

বিস্ময়সূচক ভ্রূভঙ্গী কর্‌ল সুপ্রিয়া। ভাবখানা যেন এই, অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে ফেলে একা হলিডে কর্‌তে এসেছেন। আশ্চর্যের কথা ত!...ভারী সুন্দর দেখায় কিন্তু সুপ্রিয়াকে, যখন সে চোখের দৃষ্টি দিয়ে কথা বল্‌তে চেষ্টা করে।

এবার সোমনাথের পালা। সে পাল্‌টা প্রশ্ন কর্‌ল, মিঃ রায়চৌধুরী এলেন না যে? এখন ত হাইকোর্ট ছুটি!

—আমার বুঝি একটা স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না? সব সময় ও'কে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হবে নাকি?

অভিযোগটা যে কার বিরুদ্ধে সোমনাথ বুঝতে পারল না, সে চুপ ক'রে রইল।

সুপ্রিয়া এবার একটু হেসে বল্‌ল, মিঃ রায়চৌধুরী না থাকায় আপনি অস্বস্তি বোধ কর্‌ছেন নাকি? তাহলে বল্‌ছি, উনিও আস্‌ছেন, কয়েকদিন বাদে। ততদিন আপনিই না হয় আমার তত্ত্বাবধান করুন, কেমন?

চটুল চোখে সোমনাথের দিকে সুপ্রিয়া তাকাল।

সোমনাথ জবাব দিল, বন্ধুর পক্ষ হয়ে তত্ত্বাবধানের অধিকার যখন ছিল তখন কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর্‌তে পারিনি'। এখন বেআইনীভাবে তত্ত্বাবধান কর্‌ব কোন্ সাহসে? তাছাড়া ব্যারিষ্টারদের আমি ভয় করি মিসেস্ রায়চৌধুরী।

—আপনি এখনও আগেরই মত বোকা রয়েছেন, সোমনাথবাবু!...ব'লে উচ্ছল হাসি হেসে সুপ্রিয়া উঠে পড়্‌ল।...বড্ড ঘুম পেয়েছে, আপনার ডিনার শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না, কিছু মনে কর্‌বেন না। গুড্ নাইট্!

—গুড্ নাইট্!...সোমনাথ জবাব দিল।

ডিনার শেষ ক'রে সোমনাথ আবার বেরিয়ে এল সমুদ্রের ধারে। কথার খেলায় সে যে সুপ্রিয়ার কাছে হেরে যাচ্ছে এই উপলব্ধি তাকে পীড়া দিতে লাগ্‌ল।...আচ্ছা, প্রথম প্রত্যাখ্যানের পর এভাবে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার কি অর্থ হতে পারে? সুপ্রিয়া কি তার মাধ্যমে অরুণের খবর জান্‌তে চায়। শুন্‌তে চায় অনুরাগের স্পর্শ অরুণের বুকে এখনও লেগে রয়েছে কি না? কিন্তু সে কিছুতেই সুপ্রিয়াকে জান্‌তে দেবে না যে অরুণ এখনও তাকে ভুল্‌তে পারে নি। আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি'। আর সে খুব সাবধান হবে তার নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সোমনাথ ঘরে ফির্‌ল।

পরের দিন। ঝির্‌ঝির্ করে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। ব্রেকফাষ্ট সোমনাথের ঘরেই দিয়ে গেছে, সে স্থির করেছে সুপ্রিয়ার সঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে চল্‌বে। সুপ্রিয়া যদি নিজে এসে ভাব জমাতে চায় তার প্রত্যুত্তর দেবে শীতল গাম্ভীর্যে।

দরজায় কে যেন টোকা মার্‌ল।

—ভেতরে আস্‌তে পারি?...সুপ্রিয়া উঁকি দিয়ে বল্‌ল, এবং সোমনাথের জবাবের অপেক্ষা না রেখেই সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল।

—এখনও তৈরী হন্‌নি? বেড়াতে যাবেন না? সুপ্রিয়া প্রশ্ন কর্‌ল।

—না। ক্লান্ত লাগ্‌ছে।...সোমনাথ সংক্ষেপে জবাব দিল।

—ওয়াল্‌টেয়ারে এসে বন্ধ ঘরে কোন ভদ্রলোক বসে থাকে নাকি? নিন্, চট্‌পট্ জামাটা বদ্‌লে ফেলুন, ফ্লাওয়ার শো হচ্ছে, শুনেছি দেখ্‌বার মত শো এটা!

—আপনার অভিসন্ধি কি বলুন ত, মিসেস্ রায়চৌধুরী?...সোমনাথ সোজা প্রশ্ন কর্‌ল।

নিষ্পাপ দুটি চোখ সোমনাথের চোখের উপর রেখে সুপ্রিয়া বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে জবাব দিল, অভিসন্ধি? অভিসন্ধি আবার কি থাকতে পারে? অচেনা জায়গায় চেনা লোককে পেয়েছি তার সঙ্গে দুটো কথা বলাটাও অপরাধ?

—কিন্তু আপনার স্বামী, মিঃ রায়চৌধুরী যখন শুন্‌তে পাবেন তখন?

—ওঃ, এই আপনার ভয়? তাচ্ছিল্যের সুরে সুপ্রিয়া জবাব দিল।...সেজন্য ভাব্‌বেন না, উনি ওয়াল্‌টেয়ারে আস্‌ছেন না।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সোমনাথ প্রশ্ন

কর্‌ল, এই না কাল আপনি বল্‌লেন মিঃ রায়-চৌধুরী কয়েকদিন বাদে আস্‌ছেন?

—ওটা বলেছিলাম যাতে আপনি দুঃসাহসী হ'য়ে না ওঠেন।...মুখ টিপে হাস্‌ল সুপ্রিয়া।

—আর এখন?

—এখন? আমি জানি, মিঃ রায়চৌধুরী আসুন বা নাই আসুন, দুঃসাহসী হওয়া আপনার বা আপনার বন্ধুর স্বভাবে নেই, কোন দিন ছিল না।

অবাক বিস্ময়ে সোমনাথ সুপ্রিয়ার দিকে তাকাল। সত্যি সুপ্রিয়ার নাগাল সে পাচ্ছে না।

সোমনাথের হতবুদ্ধি অবস্থা দেখে সুপ্রিয়ার বোধ হয় একটু দয়া হ'ল। সে বলল, যা ঘটেছিল তার মধ্যে আমারও হয়ত অনুমোদন ছিল, কিন্তু আপনার বন্ধু যদি জোর করে তখন আমাকে ধরে রাখতেন তাহ'লে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না, সোমনাথবাবু।

শেষের দিকটায় সুপ্রিয়ার স্বর যেন গাঢ় হ'য়ে এল।

পরক্ষণেই কথাবার্তার মধ্যে লঘুতা আন্‌বার প্রয়াস ক'রে সে বল্‌ল, কি যে সব ছাইপাঁশ কথা বল্‌ছি আমরা। উঠুন, আর দেরী কর্‌বেন না। তৈরী হয়ে নিন্‌।

ঠিক আগেরই মত নাছোড়বান্দা রয়েছে সুপ্রিয়া। ওর মাথায় যখন একটা খেয়াল চাপে যেমন করে হোক্‌ সে তা চরিতার্থ কর্‌বেই!

সোমনাথ বল্‌ল, আপনি বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়ান, আমি কাপড়টা বদ্‌লে নিচ্ছি।

হোটেলের বাইরে এসে সোমনাথ বল্‌ল, ফ্লাওয়ার শো কোথায় হচ্ছে আমি কিন্তু কিছুই জানি না। আপনাকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—ফ্লাওয়ার শোতে গিয়ে কি লাভ? ফুল অনেক দেখেছি, আপনিও নিশ্চয় দেখেছেন। তার চেয়ে বরং আসুন, এখানে বসেই গল্প করি।

সুপ্রিয়ার দ্রুত মত পরিবর্তনে সোমনাথ বিশেষ আশ্চর্য বোধ কর্‌ল না, বরং মনে হ'ল এটাই স্বাভাবিক। কোন আপত্তি না ক'রে সমুদ্রের ধারে একটা ঢিপির উপর সে বসে পড়্‌ল। সুপ্রিয়াও তার পাশে বস্‌ল, অনেকটা গা ঘেঁষে।

—ভয় কর্‌ছে না আশা করি?...সুপ্রিয়া প্রশ্ন কর্‌ল।

সোমনাথ কোন জবাব দিল না।

খানিক বাদে সুপ্রিয়া আবার বল্‌ল, কথা বল্‌ছেন না যে?

এবার সোমনাথ পাল্‌টা প্রশ্ন করল, মন খুলে আমাকে একটা কথা বল্‌বেন? মিঃ রায়-চৌধুরীর সঙ্গে আজকাল আপনার বনিবনা হচ্ছে না বুঝি?

সুপ্রিয়ার তরল হাসিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, আপনার সঙ্গে পুরানো পরিচয়টা ঝালাই করে নিচ্ছি ব'লে বুঝি আপনি ভেবে নিয়েছেন, স্বামীর প্রতি আমার অনুরাগ কমে গিয়েছে? নাঃ, আপনি সত্যি বড্ড বোকা!

আবার তার নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ। সোমনাথ গুম্‌ হ'য়ে রইল।

সুপ্রিয়া বোধ হয় বুঝ্‌তে পার্‌ল। প্রশ্ন কর্‌ল, রাগ কর্‌লেন নাকি?

সোমনাথ কোন জবাব দিল না।

—নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না! স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না আপনি?

স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার নিশ্চয়ই সোমনাথ কর্‌তে পারে, বিশেষ ক'রে তার দিক থেকে যখন আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুপ্রিয়া এখন তার বন্ধুপত্নী নয়, সে শুধু মিসেস্‌ রায়চৌধুরী, অনিমেষ রায়চৌধুরীকে সোমনাথ চোখেও দেখেনি'।

সুপ্রিয়া বল্‌তে লাগল, তাহলে বল্‌ছি কেন আপনার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা কর্‌ছি। ...মামলা সুরু হবার আগে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। মনে আছে বোধ হয়। আমি আজ আপনাকে জানাতে চাই, আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই। তিনিও যেন মনে কোন ক্ষোভ না রাখেন।

তারপর একটু থেমে সে প্রশ্ন কর্‌ল, আচ্ছা, আপনার বন্ধু আর বিয়ে কর্‌লেন না কেন, বলুন ত?

—জেনে আপনার লাভ?

—লাভ? না, লাভ বিশেষ নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে আমাকে মাপকাঠি ক'রে আপনার বন্ধু বাংলা দেশের সব মেয়েদের বিচার কর্‌ছেন। আমার মতে, ঐখানেই আপনা-দের ভুল। বাংলা দেশের সব মেয়েই সুপ্রিয়ার মত অস্থিরচিত্ত নয়।...আপনার বন্ধু আর কতদিন একাকী জীবন কাটাবেন? ওঁর একটি বিয়ে দিয়ে দিন্‌।

—ধন্যবাদ। অরুণের পক্ষে একটা অভি-জ্ঞতাই যথেষ্ট।

—এই একগুঁয়েমির জন্যই ত আপনাকে বার বার বোকা বল্‌ছি। ঝুড়ির একটা আম টক্‌ বেরিয়েছে বলে সব আমই যে টক্‌ হবে একথা আপনাকে কে বল্‌ল? অন্য আমগুলো মিষ্টি হ'তেও ত পারে!

—টক্‌ হওয়াও অসম্ভব নয়।...সোমনাথ বল্‌ল।...তাছাড়া, আপনার এত মাথা ব্যথা কেন? অপরাধের স্মৃতি স্খালন কর্‌তে চান্‌ বুঝি?

—অপরাধের উপলব্ধি কোনদিনই আমার ছিল না, আজও নেই। আমার অনুরোধের পেছনে আছে শুধু পুরানো বন্ধুর প্রতি একটু সমবেদনা।

—ওঃ, অরুণ বুঝি এবার বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠে এসেছে?

—শত্রু তিনি কোনদিনই ছিলেন না, সোম-নাথবাবু। যে কোন কারণেই হোক্‌, আমাদের মনের মিল হয়নি', স্বেচ্ছায় আমরা আলাদা পথ বেছে নিয়েছি, কিন্তু এমন মেয়ে নিশ্চয়ই আছে যার সঙ্গে আপনার বন্ধুর মনের মিল হতে পারে।

—ওই রিস্‌ক্‌ নিতে অরুণ প্রস্তুত নয়।... সংক্ষেপে সোমনাথ জবাব দিল।

ব্যবসারে তিনি কত রিস্‌ক্‌ নিচ্ছেন, আর বিয়ের বেলাতেই বুঝি যত ভয়?...সুপ্রিয়া সোমনাথকে কিছুতেই অব্যাহতি দেবে না!

হঠাৎ উঠে পড়্‌ল সোমনাথ। ক্লান্তস্বরে বল্‌ল, এই আলোচনাটা বন্ধ করলেই আমি খুসী হব, মিসেস্‌ রায়চৌধুরী। আপনার উপর আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই, থাক্‌তে পারে না, তবে অরুণ কি কর্‌ছে বা কর্‌বে তা' নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা থেকে আমাকে রেহাই দিন্‌।

আরও সাতদিন পরের কথা। সোমনাথের বিরক্তি দেখে সুপ্রিয়া যথাসম্ভব তাকে এড়িয়ে চলেছে, নিজের টেবিলে এসে বস্‌তে আর অনুরোধ করেনি, বাইরে বেড়াতে যাবার সময় তার সাহচর্যও চায়নি।'

সোমনাথ এতেও অস্বস্তিবোধ করেছে। তার মনে হয়েছে, সুপ্রিয়ার বিরামহীন অথচ অসংলগ্ন আলাপনে বাধা দেবার কি প্রয়োজন ছিল? মাঝখান থেকে ক্ষতি যদি কারো হয়ে থাকে তা'হলে হয়েছে তার। সুপ্রিয়ার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে।

হঠাৎ সে অনুভব কর্‌ল সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা কাটাকাটি তার যেন ভালই লাগছিল।

হলিডে সমাপন ক'রে পুরানো অনেক অতিথি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের জায়গায় এসেছেন কয়েকজন নূতন অতিথি। তারই একটা দলের মধ্যে ভিড়ে গেছে সুপ্রিয়া। আর সোমনাথ রয়েছে একক, সঙ্গীহীন।

বুকের মাঝটা খচ্‌খচ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল তার। অবশেষে সে স্থির কর্‌ল, উপযাচক হয়েই সে যাবে সুপ্রিয়ার কাছে, তাকে বল্‌বে যে তার ব্যবহারে যদি কোন রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহ'লে সে অত্যন্ত দুঃখিত।

কিন্তু সুপ্রিয়াকে একা পাওয়াই যে সবচেয়ে মুস্কিল। ভেঙ্কটরমণ দম্পতি সর্বদা তাকে ঘিরে রয়েছেন।

অবশেষে সুযোগ মিল্‌ল। সেদিন সুপ্রিয়া প্যারাসোল্‌টা হাতে নিয়ে বেড়াতে যায় হচ্ছিল, আর কোন সঙ্গী ছিল না, সোমনাথ তাড়াতাড়ি তার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাকে ধরে ফেল্‌ল।

—সঙ্গে আস্‌তে পারি?...সোমনাথ প্রশ্ন কর্‌ল।

চোখ দুটো বড় বড় করে সুপ্রিয়া তাকাল তার দিকে। বল্‌ল, স্বচ্ছন্দে।

নীরবে দু'জনে হাট্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক দূর গিয়ে সোমনাথ বলল, আপনার কথাগুলো ভেবে দেখেছি, মিসেস্‌ রায়চৌধুরী।

—কথা? কোন্‌ কথা?...যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছে না এই ভঙ্গীতে সুপ্রিয়া জবাব দিল।

ঢোক গিলে সোমনাথ বল্‌ল, ঐ যে অরুণের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল...

—ওঃ!...বল্‌ল সুপ্রিয়া।

—আপনার দিকটা চোখেই পড়েনি' এতদিন। বন্ধু প্রীতি আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল।

—এতে লজ্জিত হবার কি আছে, সোমনাথ-বাবু? আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছেলেবেলা অবধি, আমাকে আপনি কতটুকুই বা জানেন?

—না, তবু...আম্‌তা আম্‌তা কর্‌তে লাগ্‌ল সোমনাথ।

তীক্ষ্ণভাবে সুপ্রিয়া তার দিকে তাকাল। তারপর বল্‌ল, তাহ'লে শুনুন, সোমনাথবাবু। আমার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি আপনার পাওনা ছিল। প্রথমদিন হোটেলে আপনার প্রতি যে অসৌজন্য প্রকাশ করেছিলাম তারই স্খালন কর্‌তে চেষ্টা করেছিলাম পরবর্তী ব্যবহারে।

তারপর, এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আপনার বন্ধুর কথা উঠেছিল। তাঁর খবর জান্‌বার অভীপ্সা নিশ্চয়ই আমার জেগেছিল। হাজার হোক্, দু'বছর তাঁর ঘর করেছি, কৌতূহল হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়। হয়ত একটু কম হ'লে ভাল হ'ত, কিন্তু নিক্তির ওজনে ত সব জিনিষ মাপা যায় না!

—অরুণকে আপনি এখনও ভুল্‌তে পারেননি' মনে হচ্ছে মিসেস্ রায়চৌধুরী।

হঠাৎ যেন আঘাত পেল সুপ্রিয়া। বল্‌ল, কোন অভিজ্ঞতাই কেউ ভুল্‌তে পারে না, সোমনাথবাবু। কিন্তু জীবনের স্রোত বয়েই চলে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। যে স্রোতে আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছি তাকে অস্বীকার কর্‌বার মত নির্বুদ্ধিতা আমার এখনও আসেনি'। অথচ...

বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল সুপ্রিয়া।

—অথচ কি? সোমনাথ প্রশ্ন কর্‌ল।

—না, থাক্।...সুপ্রিয়া বল্‌ল।

—বন্ধু হিসেবেও আপনি আমাকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছেন না। মিসেস রায়চৌধুরী?... বেশ যেন ক্ষুব্ধস্বরেই সোমনাথ বল্‌ল।

বল্‌ছি চম্‌কে উঠ্‌বেন না যেন। আইন মতে আমি এখন আর মিসেস্ রায়চৌধুরী নই।

—তার মানে?...হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল সোমনাথ।

—মানে এই যে বিয়েটা বছরখানেকের বেশী টেকেনি'।

—কিন্তু, কিন্তু, খবরের কাগজে কোন কেস্‌এর উল্লেখ ত দেখিনি'!

—মিঃ রায়চৌধুরী ব্যারিষ্টার মানুষ, যদি ব্যাপারটা বেশী জানাজানি হ'ত তাঁর প্রোফেসনে ক্ষতি হতে পার্‌ত। বিচ্ছেদের ব্যাপারটা চুপি-চুপিই সেরে নেওয়া হয়েছিল।

—কিন্তু আপনি ত রেজিষ্টারে নাম সই করেছেন মিসেস্ সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী!

—একটা কিছু লিখ্‌তে হবে ত! সুপ্রিয়া বসু লেখাটা নিশ্চয়ই শোভন হ'ত না। তবে, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন, পিতৃদত্ত পদবীটা ব্যবহার করিনি কেন। তার জবাব খুবই সোজা। যার একবার নয়, দু'-দু'বার বিয়ে হয়েছে, তার পক্ষে কুমারী বয়সের পদবী ব্যবহার করাটা আরও বিসদৃশ হ'ত না কি?

এই ইতিবৃত্তে সোমনাথ কিছুতেই আস্থা স্থাপন কর্‌তে পার্‌ছিল না। তার মনে হ'ল, সুপ্রিয়া বোধ হয় তার সঙ্গে পরিহাস কর্‌ছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?...সুপ্রিয়া প্রশ্ন কর্‌ল।

—কাহিনীটা কি বিশ্বাস কর্‌বার মত?

তাহ'লে বিশ্বাস কর্‌বেন না। কোর্টের ডিক্রিটা ত সঙ্গে নিয়ে আসিনি' যে ওটা দেখিয়ে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌ব।

কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা অনেকদূর এগিয়ে এসেছিল। সোমনাথই প্রস্তাব কর্‌ল আসুন, বসা যাক্।

একটা বেঞ্চির উপর বসে সোমনাথ প্রশ্ন কর্‌ল, মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আপনার আবার কি গোলমাল হল?

—গোলমাল? গোলমালটা বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল। যে মেয়ে এক স্বামী ছেড়ে আস্‌তে পারে সুযোগ পেলে সে ত পরবর্তী স্বামীকেও ছেড়ে যাবে! বসুজায়াকে জোর ক'রে লাভ করার বৈচিত্র্য যখন কেটে গেল তখন মিঃ রায়চৌধুরী মনে মনে অনুতাপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। রকমসকম দেখে আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ওঁকে মুক্তি দিলাম, উনিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন।

—আপনি তাহলে কি কর্‌ছেন এখন?

—কেন? চাকুরী কর্‌ছি, আর মনের মানুষের অপেক্ষায় বসে রয়েছি!...শেষের কথাটা সুপ্রিয়া বল্‌ল অনেকটা তরলভাবে।

—বিয়ের সখ এখনও মেটেনি'?...বিস্মিত-ভাবে সোমনাথ প্রশ্ন কর্‌ল।

—কি ক'রে মিট্‌বে বলুন? দুটো বিয়ের একটাও ত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ কর্‌তে পার্‌লাম না!

নিশ্চয় ঠাট্টা কর্‌ছে সুপ্রিয়া। সোমনাথ তার দিকে তাকাল। কিন্তু, না ত, খুব গম্ভীরভাবেই কথা বল্‌ছে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয়া বল্‌ল, একটা কথা বল্‌ব?

—বলুন।

—নির্লজ্জ ভাব্‌বেন না ত?

—না, না, নির্লজ্জ কেন ভাব্‌ব?

—আমি বড্ড ক্লান্ত, সোমনাথবাবু। আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন্। এমন একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন্ যে আমাকে গ্রহণ কর্‌বে সমগ্রভাবে, আমার দোষত্রুটিসহ।

বল্‌তে বল্‌তে সোমনাথের হাতটা চেপে ধর্‌ল সুপ্রিয়া।

মুহূর্তের জন্য সোমনাথের শরীরের মধ্য দিয়ে একটা মৃদু ঢেউ খেলে গেল। কম্পিতকণ্ঠে সে বল্‌ল, সে রকম লোক ত খুব বেশী নেই, সুপ্রিয়া!

খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল সুপ্রিয়া, হাসি যেন থাম্‌তেই চায় না। বোকার মত তাকিয়ে রইল সোমনাথ।

—নাঃ, আপনারা সবাই এক সুরে বাঁধা। আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি আপনার কাছে প্রোপোজ করছি? মেয়েদের কি ক'রে জয় কর্‌তে হয় সে টেক্‌নিক্ আপনি এখনও শেখেননি'!... উঠুন, রাত হয়ে যাচ্ছে।

সারাটা পথ চুপ ক'রে রইল সোমনাথ। সুপ্রিয়া কিন্তু কথা বলে চল্‌ল অশ্রান্তগতিতে।

সে রাতে ডিনার খেতে সোমনাথ ডাইনিং রুমে গেল না।

পরের দিন ব্রেক্‌ফাষ্ট খেতে গিয়ে দেখে, হুলুস্থুল্ কাণ্ড। মিসেস্ ভেঙ্কটরমণ অঝোরে কাঁদছেন, আর হোটেলের ম্যানেজার হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ব্যাপার কি? সোমনাথ এগিয়ে গেল।

ম্যানেজার বল্‌লেন, কেলেঙ্কারি কাণ্ড, মিঃ সান্যাল। আমার এই কুড়ি বছরের হোটেল জীবনে এমন ব্যাপার ঘট্‌তে দেখিনি'।

—কেন? কি হয়েছে?...সোমনাথ প্রশ্ন করল।

—মিসেস রায়চৌধুরী মিঃ ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। আমি কি ক'রে জান্‌ব পেটে পেটে ও'দের এই বুদ্ধি! ভোরবেলায় মিসেস্ রায়চৌধুরী এসে বললেন যে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হচ্ছে, বিলটা চুকিয়ে দিতে চান। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিও ডেকে দিলাম। তার খানিকক্ষণ পরেই মিঃ ভেঙ্কটরমণ বেরিয়ে এলেন, দেখলাম উনিও ছুটলেন ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে।

—কিন্তু এ থেকে কি করে বুঝলেন যে মিঃ ভেঙ্কটরমণ মিসেস রায়চৌধুরীর সঙ্গে চলে গেছেন?

—তখন কি আর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মিঃ সান্যাল? যদি বুঝতাম তাহলে নিশ্চয়ই বাধা দিতাম, হাজার হোক্ আমার হোটেলের একটা সুনাম আছে ত! বুঝলাম, যখন মিসেস ভেঙ্কটরমণ এসে আমাকে দেখালেন তাঁর স্বামীর চিঠি। তিনি লিখে গেছেন যে, মিসেস রায়-চৌধুরীকে পৌঁছুতে তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন, হয়ত ফিরবেন না। যথেষ্ট টাকা পয়সা সুটকেসে রয়েছে, হোটেলের দাবী-দাওয়া চুকিয়ে দিতে মিসেস ভেঙ্কটরমণের কোন অসুবিধা হবে না।

সোমনাথের প্রথমে মনে হ'ল ভয়ানক একটা ফাঁড়া থেকে সে বেঁচে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর একটা অবসাদ তার শরীর মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। যন্ত্রচালিতের মত সে ডাইনিং-রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

পল্লীবধূর পত্র

শ্রীকৃষ্ণধন দে

শ্রাবণ রাত, আকাশ কালো, প্রহর ধীরে কাটে,
তালের বনে বাহিরে চলে ঝড়ের মাতামাতি,
ফসল-ভেজা গন্ধ আসে বাদল-ঝরা, মাঠে,
তোমারি কথা ঘনায় মনে, উতলা হোল রাতি।
ডাকিছে মেঘ, বিজলী কাঁপে, একেলা জাগি ঘরে,
পিতম্, আজি তোমারে মনে পড়ে!

সারাটা রাত বৃষ্টি ঝরে, পাখীরা নাড়ে ডানা,
শঙ্খচিল কাঁদুনে সুরে কোথায় বসে' ডাকে,
শেয়ালগুলো হঠাৎ এসে বাহিরে দেয় হানা
ক'কিয়ে-ওঠা বিড়াল ছানা খুঁজিছে তার মা'কে।
বিজন রাত, নিরালা ঘর, অজানা ভয় করে,

পিতম্, আজি তোমারে মনে পড়ে!
এ পোড়া চোখে ঘুম যে নাই, তবুও ক্ষণতরে
তন্দ্রা নামে, কোথায় যেন কদমফুল ফোটে,
সজল রাত সুরভি-ভরা স্বপন কত গড়ে,
কি যেন মধু কি যেন স্বাদ জড়ায় দুটি ঠোঁটে!
আকাশে ভাঙে মেঘের মেলা, আঁধার ধীরে সরে,
—পিতম্, আজি তোমারে মনে পড়ে!

বাদল ধারা হোল যে হারা, মনের চোখে ঘুম,
ঝিল্লীরবে আবার যেন বাতাস গেল ছেয়ে,
জাফ্‌রাণি চাঁদ হাল্কা মেঘের কপোলে দেয় চুম,
খেলার শেষে লুটোয় ঘুমে দুরন্ত কোন্ মেয়ে!
কুহেলি নামে, ভোরের ফুল গন্ধে যে ঘর ভরে,

পিতম্, আজি তোমারে মনে পড়ে!
যতই আমি বোঝাতে চাই মন যে বোঝে নাকো,
তোমারে চাই শ্রাবণ-ঘন এমনি মায়ারাতে,
এস গো তুমি, আমায় ছেড়ে
কোথায় দূরে থাকো?
একটি বারও চোখের দেখা
হবে না মোর সাথে?
এ চিঠি শুধু গেলাম লিখে তোমারি উদ্দেশে,
—পিতম্, এস আমায় ভালবেসে!

মৃগয়া শব্দ, সংস্কৃতে, মৃগের অন্বেষণ করে বধ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই শব্দটির পরিভাষা হয়েছে শিকার। কিন্তু তার প্রয়োগ আরও ব্যাপক। শুধু মৃগ অর্থাৎ পশুই নয়, পশু, পক্ষী, কুমীর, তিমি, সর্বক্ষেত্রেই শিকার কথাটি প্রয়োগ করা হয়।

আমাদের শাস্ত্রে, মৃগয়াকে প্রশংসা করা হয় নি বটে, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে ও সাহিত্যে শিকারের বহুল প্রচার ও প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। কিরাতার্জুনীয়ম, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যে শিকারের গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। তারও পূর্বে রামায়ণ ও মহাভারতেও শিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে শিকারে নানাবিধ অস্ত্র-ধনুর্বাণ, তরবারি, ভল্ল, পাশ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বারুদ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। সম্রাট আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। সম্রাট শেরশাহও ঢাল ও তরোয়ালের সাহায্যে একটি বাঘ মেরেছিলেন। রাজপুত-জাতির মধ্যেও শিকারের বহুল প্রচলন ছিল। আহেরিয়া তাদের বাৎসরিক শিকার উৎসব।

এদেশে বন্দুক রাইফেলের যখন বিশেষ প্রচলন হয়নি, তখন বাঘ ও বন্য বরাহ জাল পেতে, বড় বড় বর্শা দিয়ে শিকার করা হত। বাংলা দেশে তখন বাঘ, ভাল্লুক, মহিষ, গণ্ডার, সাপ, কুমীর, হরিণের অভাব ছিল না। আজ যেখানে আলিপুর বেলভেডিয়ার, নবাবী আমলে সেই স্থানে হরিণ শিকারের জঙ্গল ছিল।

বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ও বিভিন্ন পদ্ধতির শিকার ক্রমে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান যুগের প্রথম দিকে যদিও উন্নত ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, তবুও দেশে বেশী সংখ্যায় শিকার ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানীর রাজত্বকালে পুণার কাছে এক বৃটিশ অফিসার ছ'মাসের মধ্যে চল্লিশটি সিংহ শিকার করেছিলেন। সভ্যজগতে যদিও বন্দুকের প্রচলন হয়েছিল। বন্য জাতির মধ্যে তীর-ধনুকেরই ব্যবহার ছিল বেশী। গারো অঞ্চলে তল্ল ও দা (ম্লাম) শিকারের অস্ত্র।

ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি ভারতে পাশ্চাত্য ধরণে শিকারের প্রবর্তন করেন এবং Sir Samuel Baker নূতন ধরণের রাইফেল আবিষ্কার করার পর থেকেই বিভিন্ন হিংস্র জন্তু শিকার সহজসাধ্য হয়। কিন্তু একথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রাচীনকালে শক্তি ও বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অধিকাংশ শিকারীই যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন, সেইগুলি বর্তমান যুগের শিকারীদের মধ্যে কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমেই বলা দরকার, এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে কলমে অভ্যাস শিখতে হয়। তাই শিকার জগতে যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের সকলকেই বহু দিন ধরে শিক্ষানবিশি করতে হয়েছে। শিকারে চাই ব্যক্তিগত শৌর্য ও সাহস, ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে লক্ষ্যভেদ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, আগ্রহ আর একাগ্রতা, প্রখর দৃষ্টিশক্তি, সুস্থ সবল দেহ, আর চাই অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সেই সঙ্গে চাই আরণ্য জীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এর মধ্যে দিয়ে, একদিকে আমরা পাই জন্তুজানোয়ারের অভ্যাস ও আচরণের সংবাদ, অন্য দিকে প্রকৃতির লীলানিকেতন, আরণ্য ভূমির রহস্য আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রাণে তারুণ্যের স্পর্শ এনে দেয়। সেই সব গুণাবলী আমাদের জীবনে শিখিয়ে নেওয়াটাই শিকারী জীবনের সব চাইতে বড় কথা।

শিকার ব্যাধবৃত্তি নয়, পশু হত্যাই চরম কথা নয়। Sport কথাটির সঙ্গে অল্প-

রাজেন্দ্রনারায়ণ আচার্যচৌধুরী

বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে। আমাদের ভাষায় তার উপযুক্ত শব্দ, সম্ভবতঃ আনন্দদায়ক এবং বীরোচিত খেলা। কর্মক্লিষ্ট জীবনের অবসরে, এই খেলায় একদিকে যেমন পাওয়া যায় একটা সুগভীর তৃপ্তি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহস আর জীবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাই স্মরণাতীত যুগ হতে শিকার আমাদের জীবনে একটি বিশেষ মূল্যবান অধ্যায়।

আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্মরণীয় বাঙালী শিকারী। প্রথমেই বলে রাখি, যাঁরা আজ বেঁচে নেই, আমি শুধু তাঁদের কথাই বলব। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অতীতের শিকারীগণ আমাদের স্মৃতিপথে রাখবার মত যথেষ্ট নিদর্শন রেখে যাননি। এ সম্বন্ধে লিখিতভাবে শিকার বিষয়ে যে বিবরণ-টুকু পাওয়া যায়, তা নেহাৎ স্বল্প।

বর্তমান যুগে যাঁরা শিকারে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে এখানে আমি মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজেন্দ্র-নারায়ণ আচার্য চৌধুরী, কুমুদনাথ চৌধুরী ও লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিকার সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলব। এই প্রসঙ্গে কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, গোবরডাঙার জ্ঞানেন্দ্র-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুবাবু, নগেন্দ্রনাথ সেন, মালদহের ডোমন বাবু ও বিখ্যাত শিকারী জমিরুদ্দিন সাহেবের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে চাই—সুযোগ ও সুবিধামত তাঁদের সম্বন্ধেও অতঃপর পৃথকভাবে আলোচনা করা যাবে।

প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে, ময়মনসিংহের মহারাজা স্বর্গীয় সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী "শিকার কাহিনী" নামে একখানি গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ ও গারো পাহাড় অঞ্চলে তিনি যে সব শিকার করে-ছিলেন, তারই শিক্ষানবিশি অবস্থা আমরা "শিকার কাহিনীর" প্রথম খণ্ডে পাই। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায় বলে প্রকাশিত হয়নি। বাংলার স্মরণীয় শিকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সূর্যকান্ত সম্বন্ধে শুনেছি, লক্ষ্যভেদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ছর্‌রা নয়, গুলী দিয়ে উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকে, নির্দিষ্ট কোনও পাখীকে, আকাশপথ থেকে মাটির বুকে নামিয়ে আনতেন।

'শিকার কাহিনী' প্রথম খণ্ডে তাঁর শিকারী জীবনের প্রথম হাতেখড়ি কী ভাবে হয়েছিল, তার একটা মোটামুটি বর্ণনা আছে। তাঁর পূর্বে শিকার হয়ত অনেকেই করেছেন, কিন্তু তাঁদের শিকার নৈপুণ্য সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদই একমাত্র প্রমাণ। কালক্রমে সেই সব প্রবাদের অবলুপ্তি ঘটে, নূতন নূতন বহু সংযোজনা হয়, ফলে সেই সব কাহিনী কিছু পরিমাণে অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ স্বর্গীয় সূর্যকান্তই প্রথম শিকারী যিনি কাগজে-কলমে তাঁর শিকারের কিছুটা বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কাজেই কিংবদন্তী অপেক্ষা তাঁর নিজের লেখা বিবরণের উপরেই আস্থা রাখা উচিত।

'শিকার কাহিনীতে' বেশ চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ আছে। একবার ময়মনসিংহে "আনুই-রাজার বেড়ে" শিবির পেতে, সূর্যকান্ত অন্যান্য শিকারীদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে গিয়েছেন। সঙ্গে হাতী, লোকলস্কর। গ্রামের এক মোড়ল এসে খবর দিলে যে, জায়গাটা সুবিধের নয়—ভূতের ভীষণ উপদ্রব। বিবরণ যা পাওয়া গেল, দস্তুরমতো ভয়ের কথাই বটে!

যাই হোক, সূর্যকান্ত সপারিষদ সেই ভগ্ন রাজবাড়ী দেখতে গেলেন। নাম 'আনুই রাজার বেড়'—পূর্বে 'আনুইরাজ' নামে এক রাজা নাকি এ অঞ্চল শাসন করতেন। রাজবাড়ীর চারিদিকে পরিখা—বাড়ীঘর সব ভেঙে পড়েছে। জঙ্গল-সমাকীর্ণ সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে গিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই সূর্যকান্ত সেদিনের মত ফিরতে চাইলেন—কিন্তু সঙ্গী এক বাবুর আগ্রহে তাঁকে যেতেই হল। সেদিন সেখানে শিকারের কোনও খবরও ছিল না—তাঁরাও তৈরী হয়ে যাননি। তবু, এগোতেই মুখ্য

একজোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেয়েই সূর্যকান্ত এক ঝোঁকমায় হাত থেকে একটি বন্দুক নিয়ে এক গুলীতেই ঘায়েল করেন। কপালগুণে সেটা ছিল একটা গন্ধগোকুল। রাত্রে তারই গোঙানি শুনে লোকে ভাবত ভূতের উপদ্রব।

সেদিনের মত তাঁরা ফিরে এলেন বটে, কিন্তু পরদিনই গোটাকয়েক হাতী নিয়ে দস্তুরমতো শিকারে বেরিয়ে গেলেন। গ্রাম থেকে মাঠ—তারপর জঙ্গল তারপর বিল এমনি সব পাড়ি দিয়ে তাঁরা একটা ঘন জঙ্গলে ঢুকলেন। প্রথমেই ডাইনে গোখরো সাপ দেখে মনে হল, যাত্রা নিষ্ফল হবে না। সামনেই একটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে জঙ্গল—তার মধ্যে হাতী প্রবেশ করতেই, একটা প্রকাণ্ড কোলা বাঘ, জঙ্গল থেকে বের হয়েই হাতীর সামনে। সূর্যকান্ত তখন শিকারে শিক্ষানবিশি করেন, কাজেই প্রথমেই বাঘের ওপর চেষ্টা নেবেন না—কিন্তু সঙ্গী আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও যেন কেমন হতভম্ব হয়ে রইলেন। বাঘ চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। এই না দেখে সূর্যকান্ত নিজের হাতেই বন্দুক তুলে নিলেন। কিছু দূরে যাওয়ার পর একটা শালগাছের ঝোপের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি সম্বর হরিণ। বলাবাহুল্য সেটিকে ধরাশায়ী করতে সূর্যকান্ত এবার বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নি।

আর একবার তাঁকে এক ভাল্লুকের সামনে বিষম বিপদে পড়তে হয়েছিল। ভাল্লুকের সঙ্গে ব্যবধান আট দশ হাতের বেশী নয়, জানোয়ারটা দুপায়ে ভর দিয়ে মানুষের মত এগিয়ে আসে আর সেই সঙ্গে বিকট আওয়াজ। সূর্যকান্তও প্রত্যুত্তরে গর্জন করে ওঠেন "চোপরাও"। ভাল্লুকটা একটু ঘাবড়ে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুকে গুলী ভরে নিলেন, তারপর সেটাকে খতম করতে আর কতক্ষণ!

একবার কয়েকজন সাহেবকে নিয়ে শিকারে গেছেন, সামনেই বাঘ—সূর্যকান্ত উত্তেজিত হয়ে বন্দুকের গুলীর নলে ঘোড়া না টিপে অন্য নলে টিপতেই সমস্ত ছর্‌রা বাঘের চোখে-মুখে লাগায় সেটা অন্ধ হয়ে গেল—তখন গুপ্তু সাহেবের এক গুলীতেই সেটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি মহারাজা সূর্যকান্তের শিকারের প্রথম দিককার ঘটনা। পরবর্তী কালে তিনি বহু কঠিন ও বিপদসংকুল শিকার করেছেন। ব্যাঘ্র ও হস্তী শিকারেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের শিকারী মহলে তিনি অগ্রগণ্য।

বাংলার শিকারী-জগতে আর একটি চিরস্মরণীয় নাম 'কুমুদনাথ চৌধুরী'। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত পাবনা-হরিপুরের জমিদার-বংশীয় চৌধুরী পরিবারের সুযোগ্য সন্তান। স্বয়ং কৃতী ব্যারিস্টার। কিন্তু সুবিখ্যাত শিকারীরূপেই তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি। 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' তাঁর ইংরেজীতে লেখা 'Sports in jheels and jungles' গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থখানিতে ব্যারিস্টার চৌধুরীর শিকারী জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। বনভূমির বর্ণনায় তিনি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন, ঈশ্বর তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সামনে দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভাল পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" তাই তাঁর লিখিত বিবরণে একদিকে যেমন পাই বনজঙ্গলের গুরু-গম্ভীর মায়ার ঘেরা পরিবেশ, অন্যদিকে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের বিচিত্র রীতিনীতি

শ্রীসূর্যকান্ত আচার্য

বহুল জীবনযাত্রা, সেই সঙ্গে তাদের মানসিক উগ্রতা, তেজ, ভয়, খলতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয়।

যখন তাঁর বয়স সতেরো কি আঠারো, তখনই তিনি একটি চিতে বাঘ শিকার করেছিলেন। তাঁর বাঘ-শিকারের একটি বিশেষত্ব ছিল—তিনি বেশীর ভাগ পায়ে হেঁটেই শিকার করতেন। বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকলেও, তাঁর মতে এই পন্থাই নাকি সবচেয়ে নিরাপদ। তিনি বলেছেন, শিকারে জীবনের আনন্দ ও বিপদ দুই-ই আছে। "ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদ দেওয়া উচিত।"

স্বর্গীয় কুমুদনাথ চৌধুরী জীবনে বহু বাঘ মেরেছেন। অধিকাংশই পায়ে হেঁটে—কখনও একাকী, কখনও বা দল বেঁধে। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্য ভারতেই তাঁর আনাগোনা ছিল। বহু বিপদসংকুল অবস্থার কথা তিনি বলেছেন। কখনও বাঘ আশী হাত দূরে থেকে তাঁর দিকে তাড়া করে এসেছে, আর তিনিও অপেক্ষা করে আছেন, মাঝখানের সবরকম বাধা ব্যবধান সম্পূর্ণ দূর না হলে গুলী করবেন না—বাঘটা খুব কাছে এসেই হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র গর্জন। গুলী করলেও সম্মুখের একটা বাঁশে লেগে ফস্কে যায়। আশ্চর্য দ্বিতীয় গুলী করার আগেই, ব্যাঘ্রবীর আক্রমণ না করে, লাঙুল তুলে কোথায় যে চম্পট দিলে, আর পাত্তা নেই। একটা চলতি বিশ্বাস আছে যে বাঘের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালে সে ভয় পায়। কিন্তু কুমুদনাথ বলেছেন, সেটা মোটেই ঠিক নয়। সাধারণতঃ বাঘ বা চিতে বাঘের চোখে মানুষের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। যদি এরূপ কোনও অবস্থায় ব্যাঘ্র পুঙ্গব আক্রমণ না করে চলে যায়, তাহলে সেটা মৃগয়াক্ষেত্রে নির্ভীক হয়ে থাকার ফল। তিনি আরও বলেন, "কতবার এই অবস্থায় বাঘ আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, আমি চঞ্চল হইনি, শত্রুতাচরণের জন্যে কোনো ব্যগ্রতা দেখাইনি, শেষে সময় বুঝে ধীরে সুস্থে আপন মতলব হাসিল করে নিয়েছি।" মাত্র তিন বছর সময়ের মধ্যে তিনি আটত্রিশটা চিতে বাঘ শিকার করেছিলেন কিন্তু তার মধ্যে অন্ততঃ পনেরোটি ক্ষেত্রে বাঘ তাঁকে দেখতেই পায়নি। বাঘের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই যেন তিনি শিকারে নামতেন—যে পর্যন্ত না তাকে ঘায়েল করা যায়, কুমুদনাথের বিশ্রাম ছিল না। কিন্তু হাতীর ওপর তাঁর কেমন একটা দুর্বলতা ছিল—আত্মরক্ষা কিংবা পাগলা হাতী না হলে তিনি কখনও হাতীর ওপর গুলী করেন নি।

স্বর্গীয় কুমুদনাথ বলেছেন, "ইংলণ্ড প্রবাসের কয় বৎসর ছাড়া বড়দিনের ছুটিটা আমি আজ পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে শিকারের পেছনে কাটিয়েছি।" শুধু বাঘই নয়, বরাহ, ভাল্লুক, সম্বর হরিণ, বারশিঙ্গা হরিণ ইত্যাদি বহু জন্তু জানোয়ার তিনি শিকার করেছেন। ভল্লুক শিকারের চমৎকার বর্ণনা তিনি নিজে দিয়েছেন। মধ্য প্রদেশে ভাণ্ডারায় শিকার করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে তিনি সেখানকার বনপরিদর্শক কর্মচারীর সঙ্গে তাঁবুতে ছিলেন। বাঘের খবর পেয়ে শিকারে বের হলেন—এক মহুয়া গাছের ডালে মাচান বাঁধা হয়েছিল। তাঁরা মাচানে গিয়ে বসলেন। একটা মোষের খানিকটা আহার করেই বাঘটা অদৃশ্য হয়েছে, আর দেখা নেই। রাত প্রায় আটটা। এমন সময় একটি ভালুক 'হুক্ হুক্' আওয়াজ করতে করতে পাশ দিয়ে চলে যায়। অন্ধকার রাত। আন্দাজে বোঝা গেল, ভালুকটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। একই সঙ্গে বাঘ ও ভালুকের আনাগোনায় জঙ্গলের আবহাওয়া যখন বেশ সরগরম, তখন হঠাৎ অর্ধভুক্ত মোষটার উপর কালোমত কী যেন একটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে গাছ থাকায় পরিষ্কার দেখা যায় না; কিন্তু সেটা যে ভালুক, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। জানোয়ারটি মোষটাকে ধরে টানাটানি সুরু করে—চোখের সামনে তার লম্ফ ঝম্প দেখে কুমুদনাথ Paradox গুলী করলেন—জানোয়ারটা পড়ে গেল বটে, তার পরই উঠে অদৃশ্য। সেদিনের মত তাঁরা ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। পরদিন ভোরেই আবার বেরিয়ে পড়লেন এবং রক্তচিহ্ন অনুসরণ করে বেশ কিছুদূরে যাওয়ার পর ভালুকের আশা ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু ভালুক যে এমন মাংসলোলুপ, সেটা প্রথম চাক্ষুষ করে তিনি চমৎকৃত হয়ে গেলেন।

স্বর্গীয় কুমুদনাথ চৌধুরী শুধু অগণিত বাঘ আর ভালুকই শিকার করেন নি—বাইসন শিকারেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বাইসনকে একমাত্র বুনো হাতীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে। প্রকৃতপক্ষে তারা অনেক সময় বুনো হাতীর দলে মিশে যায়। এদের জীবনী শক্তিও অপরিসীম। কুমুদনাথ বিশেষ ফরমাস দিয়ে Holland & Holland and Co-তে .577 Cordite Rifle তৈরী করিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজস্ব 12 Bore Royal Nilro Paradox দিয়ে একটি পুরুষ বাইসনকে হত্যা করা দেখে

Holland & Holland কোম্পানীও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু এই সব বড় বড় শিকারেই যে কুমুদনাথ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাই নয়, বরাহ শিকারে, Pig-Sticking-এ বুনো হাঁস, নানান জাতীয় পাখী, স্নাইপ, সব রকম শিকারই তিনি করেছেন। নমুনা স্বরূপ তাঁর গৃহখানি সেই গৌরব বহন করে যেন একটা মিউজিয়াম

কুমুদনাথ চৌধুরী

হয়ে উঠেছিল। এখন সেগুলি কলকাতার যাদুঘরে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা—যিনি স্বীয় জীবনে শতাধিক বাঘ শিকার করেছেন—শিকারের প্রত্যেকটি নিয়ম যিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন—সেই বিখ্যাত শিকারী ব্যারিস্টার কুমুদনাথ চৌধুরী অবশেষে কালাহান্ডির জঙ্গলে শিকারে গিয়ে এক বাঘের হাতেই জীবন দিয়েছেন। যে উপদেশটি তাঁর লেখায় পাওয়া যায় যে বাঘ শিকার করে সঙ্গে সঙ্গেই কাছে যাবে না—সেই ভুলটি তিনি নিজেই করেছিলেন। এক গাছের ওপর থেকে একটি বাঘকে ধরাশায়ী করেছেন—দেখে মনে হয় বাঘটি পঞ্চত্ব পেয়েছে। তিনিও তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে যেই বাঘের কাছে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গেই জানোয়ারটা লাফিয়ে উঠেই সেই মহাশিকারীর প্রাণান্ত করে ছেড়ে দেয়।

লালগোলার স্বর্গীয় মহারাজা স্যার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বিখ্যাত শিকারী ছিলেন। আমি তখন বালক মাত্র। একদিন তিনি আমাকে একটি 'এয়ার গান' উপহার দিয়ে বললেন, "ঐসব ভূত প্রেত রাক্ষসের গল্প না পড়ে হাতেকলমে সাহসী হতে চেষ্টা কর।" সেই কথার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছিল আমার স্বল্পভাষী পিতামহের আন্তরিক বাসনা—তাই 'এয়ার গান' থেকে যখন বন্দুকে প্রমোশন পেলাম, তাঁর চোখেও ফুটে উঠতে দেখেছি যেন তাঁর অতীতের কোনও উন্মাদনাময়ী স্মৃতি। তাঁর শিকারের কোনও লিখিত বিবরণ না থাকলেও আমি তাঁর মুখেই শুনেছি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি—হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শিকারের উত্তেজনাময় বর্ণনা। Pig-Sticking-এ যোগীন্দ্রনারায়ণের সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব এডিনবরা যখন ভারতে আসেন, তিনি আমাদের লালগোলার কাছেই দেওয়ান সরাইতে ক্যাম্প করেন। এই শিকারে যোগীন্দ্রনারায়ণ ডিউকের সঙ্গী হয়েছিলেন।

Pig-Sticking-এর বিশেষত্ব এই যে, ঘোড়া ছুটিয়ে বর্শা দ্বারা দাঁতাল বন্যবরাহ বিদ্ধ করে, বল্লম তুলে নিতে হয়। শিকারের নিয়মানুযায়ী অতিথিকেই সর্বসুযোগ দেওয়া উচিত। ডিউক একটা দাঁতাল বরাহকে বিদ্ধ করার পরই তাঁর বল্লমটি হস্তচ্যুত হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় তাঁর ঘোড়াটি হঠাৎ ভড়কে গিয়েছিল। তখন যোগীন্দ্রনারায়ণ ঘোড়া ছুটিয়ে সেই শূকরকে বিদ্ধ করে ধরাশায়ী করেন। ডিউক মহারাজার সাহস ও নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজের একটি উৎকৃষ্ট রাইফেল উপহার দেন। সেটি আমরাও দেখেছি। ঠাকুর্দার কাছেই শুনেছি, সেই রাইফেলে তিনি অনেক জন্তু জানোয়ার শিকার করেছেন। আমার নিজস্ব জীবনে যেটুকু শিকার প্রবৃত্তি—সেটাও তাঁর কাছেই পাওয়া, যদিও আমার পিতৃদেব এ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ ছিলেন।

Theory of alternate inheritance এর প্রভাব যাবে কোথায়?

যোগীন্দ্রনারায়ণ শিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিকার-হত্যার বিরোধী। শিকারকে রাজকীয় বিলাস অথবা ক্রীড়ারূপে গ্রহণ না করে, তিনি এর মানবিকতার অংশটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাই নরখাদক ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারের অত্যাচারে যখনই প্রজারা তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, তিনি এগিয়ে গিয়েছেন তাদের বিপদে; অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে পারদর্শী যোগীন্দ্রনারায়ণ সেই সব হিংস্র প্রাণীদের নিধন করে প্রজাদের রক্ষা করেছেন। শিকারের এই দিকটাই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সব চাইতে বেশী।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা আচার্য চৌধুরী পরিবারের 'ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর নাম তৎকালীন শিকারিগণের মধ্যে সুপরিচিত। তিনিও 'শিকার ও শিকারী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই তাঁর অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাই। সমসাময়িক বিখ্যাত শিকারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁর আয়োজনে বহু শিকার অভিযান রচিত হয়েছে। বাঘ, ভালুক, হরিণ, বাইসন, বরাহ প্রভৃতি জন্তু শিকার, হাতী খেদা ও ফাঁস দিয়ে হাতী ধরায় তিনি সুনিপুণ ছিলেন। "শিকার ও শিকারী" গ্রন্থে তিনি নিজের বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। পায়ে হেঁটে বা মাচান বেঁধে শিকারে যেমন শিকারী অনেক সময় জানোয়ারের চোখের আড়ালে থাকে, হাওদা-শিকারে সেরূপ হয় না—এ যেন ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে চ্যালেঞ্জ করার মত একটা গুরু গম্ভীর বেপরোয়া ব্যাপার। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ হাওদা শিকারেই অভ্যস্ত ছিলেন। আসাম, গারো পাহাড়, সিলেট, নেপালের তরাই অঞ্চল ও ভুটানের দুয়ার প্রদেশে তিনি হাওদা শিকার করেছেন। নেপাল টেরাইতে শিকার করার সময় একদিন একটি প্রকাণ্ড অজগর সাপ শিকার করে তার পেট চিরে একটা গোটা হগ্-ডিয়ার পেয়েছিলেন—হরিণটার মাথায় ছোট ছোট শিংও ছিল। হাজারীবাগে নেকড়ে বাঘ ও হায়েনা শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁকে কসাইখানাতেও রাতের আঁধারে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে—রাত্রিকালে হায়েনা রক্তের লোভে সেখানে হানা দিত।

ভালুক শিকারে প্রায়ই তিনি .12 Nitro Paradox ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটো গুলীর প্রয়োজন হয় নি। শিকার দূরে থাকলে 500 Express Rifle ব্যবহার করতেন। একবার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ একটি সাদা বাঘ মেরেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, বাঘটি সাদা নয়, Albine রোগগ্রস্ত হয়ে মানুষের শ্বেতি রোগের মত তাদেরও গায়ের চামড়া সাদা হয়ে যায়। এই রোগ হলেও তাদের বলবীর্যের হানি হয় না। এই রকম সাদা বাঘকেই অনেক শিকারী স্নো-লেপার্ড বলে থাকেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওগুলি শ্বেতিরোগাক্রান্ত বাঘ।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজের শিকারী-জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন—"বাঙ্গলা ১২৯৭ সনে আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতেই আমি শিকার আরম্ভ করি। প্রথম বৎসরই মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, আমার পূজনীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর শিকার পার্টিতে যোগদান করি। তখন সেই

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায়)

উদয় তারা :
বন্দে আলী মিয়া

সেদিন রূপালি রাত—
তুমি ছিলে পাশেতে আমার—
জনতো মুখের গন্ধ—
উৎসব ছিলো চারিধার।
আমার একান্তে আসি
চুপি চুপি কহিলে গোপনে :
কথার মালিকা দিও—
চিরদিন রহিবে স্মরণে।

সেদিন শেফালী মনে
ভালোবাসা ছিলো কি জানি না,
সেদিন আছিলো শোভা—
সুরে সুরে বেজেছিলো বীণা।
আমার অরুণাচলে ছিলো
গীতি কামনা মদির—
তোমার বাণী কি বহে
ঢেউ হয়ে কাবেরী নদীর!

সেদিন রূপালি রাতি—
তুমি আমি ছিলাম দুজনে
আজিকে ভুলিয়া গেছ
সে কথাটি নাহি আর মনে।
হয়তো ক্ষণিক তরে
ছিলো তব স্বপন বিলাস
আমার নয়ন তলে
এসেছিলো মধুপের মাস।

মনে সে ছন্দ নাই—
নাই আর রঙিম সাধ
গোধূলী আকাশে মোর
তীর হানে নিঠুর নিষাদ।
একটি পৌর্ণমসী
জীবনেতে হলো অক্ষর—
আমার গহন দুখে
মানিলাম আজি পরাজয়।

তোমার উদয়তারা চেয়ে আছে
নয়নে আমার
মনের সন্ধ্যা তাই
শূন্য করি রাখিলাম দ্বার।
সেদিন বর্ষ প্রান্ত—
লভি তব জীবনের গীতা
আজিকে নিরালা ক্ষণে
লিখিলাম শেষের কবিতা।

জীবন দিশারী
অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি আলো
তুমি দীপশিখা।
যে শিখায় তমিস্রার ক্ষয়
দূরে যায় সর্ব আর্তিভয়,
যে শিখায় দেবারতি হয়
তুমি সেই শিখা,
অনির্বাণ আলোকবর্তিকা।
(গান্ধীজীর উদ্দেশে)

অরুন্ধতী
॥ শ্রীশান্তি পাল ॥

হেমন্ত এসেছে দ্বারে,—ডাক দেয় আজি,
পরিপক্ক হৈমীশস্য বাতাসেতে দোলে—
সপ্তপর্ণতল শূন্য, রিক্ত ফুলসাজি,
লোধ্রের পরাগ ঝরে কানন-কুন্তলে।
ছিন্ন মালতীর মালা গড়াগড়ি যায়—
বাজে না কঙ্কণ-কাঞ্চী সান্ধ্য-সরোবরে
অধর-পল্লব টিপি অলক্তক পায়
আর কেহ নাহি আসে গ্রাম পথ ধ'রে।
এই ছাতিমের তল বড়ো ভালোবাসি—
এর মাটি, ফুল-ফল, এরি লতাপাতা,
একখানি ক্ষুদ্র মুখ, অশ্রু আর হাসি,
মেদুর মল্লিকাবলী স্বর্ণসূত্রে গাঁথা।
কোথায় লুকাল সেই মুগ্ধ বনাঙ্গনা,
বিরহ-বিধুর বুকে কে দিবে সান্ত্বনা?
মনে পড়ে একদিন, অপরাহ্ণ-বেলা—
সহসা হেরিয়া মেঘ পশ্চিম-আকাশে
ক'য়েছিল কানে মোর—'করি অবহেলা,
যেয়োনাক' প্রিয়তম সুদূরে প্রবাসে।
নদী-পথ-যাত্রী একা—রূপসার বাঁকে,
'ঝটিকা-আবর্তে পড়ি' ক্ষুদ্র তরীখানি
নিমজ্জিত হ'ল হায়। —পড়িয়া বিপাকে
কোন্ কূলে উঠেছিনু তুমি জানো রাণী।
সহস্র তারায় ঢাকা সেই গ্রামখানি
শ্যামশষ্পে আবরিত কপোতাক্ষ তীরে—
সর্ব-রস-সার যারে তীর্থ ব'লে মানি,
সপ্তঋষি সন্ধ্যা-স্নানে নামে যার নীরে।
কোথা অরুন্ধতী মোর? —ডাকি নাম ধরে
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে 'হা-হা' রবে ওরে!

⁕ একটি গ্রামের স্মৃতি ⁕
শিবদাস চক্রবর্তী

কত স্মৃতি গেছে মুছে, কত কথা
অলীক কল্পনা,—
একটি গ্রামের স্মৃতি আজো করে সহসা উন্মনা।
সভ্যতার রূপসজ্জা আজো তাকে করেনি কৃত্রিম,
এখনো সে রমণীয় নিয়ে তার আকৃতি আদিম।
গেরুয়া মাটির কোলে বিহারের একখানি গ্রাম,
নিখুঁত ছবির মতো রসিকের নয়নাভিরাম।
দিগন্তে নীলের নীচে পাহাড়ের ঘন-সন্নিবেশ,—
সে যেন ঘুমের শেষে সদ্য-দ্যাখা
স্বপ্নের আবেশ।
সর্পিল বন্ধুর পথ ঘুরে ঘুরে চলে গেছে দূরে
প্রৌঢ় ফসলের ক্ষেত পার হয়ে
কোন্ স্বপ্নপুরে।
আমন ধানের ঘ্রাণে অঘ্রাণের হৈমন্তী বাতাস
জাগায় গ্রামীণ মনে জীবনের নিশ্চিত আশ্বাস।
নিবিড় স্তব্ধতা মাঝে শব্দ বাজে পাতার মর্মরে,
অ-ব্রস্ত পথের বুকে জনতা ও যানের ঘর্ঘরে।
আকাশ-মাটির বুকে নীল আর হরিতের খেলা,
দু' চোখে প্রশান্তি আনে প্রাতে আর
অপরাহ্ণ বেলা।
সেখানে নিসর্গ, সে যে—স্বর্গের বিশ্বস্ত
প্রতিনিধি,
প্রসারিত করে দেয় পথিকের মনের পরিধি।

পাইনের ছায়া
......জগন্নাথ চক্রবর্তী......

হৃদয় এমন যদি বেদনায় দ্বিধা,
কুয়াশা-মসৃণ এই পাইনের ছায়া
ক্রমশঃ জটিল কিংবা আরো দীর্ঘ হোক।

একটি নীরব ক্ষণ বিঁধে আছে দেখ
পীড়িত দেয়ালে।
কাঁটা দিয়ে সূঁচ কেউ তুলেছো কি?
যদি তোলো,
হয়তো কাউকে দেবে, কিংবা দিতে পারো,
অযাচিত এতটুকু রোদ,
অথবা সকাল-স্নাত এক ঝিনুক অবাক শিশির
অথবা মুহূর্ত-শান্তি।

একটি নির্জন ক্ষণ—সময়ের মুখ—
বিঁধে আছে ব্যথার দেয়ালে,
অনন্তকালের ফিতে
হঠাৎ ছিঁড়েছে কিংবা আটকে গেছে
সেই একখানে—
সেখানে পাইন গাছ ধীরে ধীরে বড়ো হ'ল।

পাহাড়কে যদি কেউ ভাঙো
গাছের শিকড় থেকে কিছু জল যেন ধার নিও—
কেউ যদি নাও থাকে যাকে দেবে
পিপাসার ওষ্ঠ যদি নাও দেখে থাকো—
কেননা হয়তো কোনো—অন্য কোনো—
সময়ের সূঁচ
মুহূর্তের মৃত্যুর মতন
কাউকে বিঁধবে এসে,
অনন্তকালের ফিতে হঠাৎ আটকে যাবে
দশ বিশ পঁচিশ ফাগুনে,
তখন পাহাড় চিরে
সিন্ধু নয়, ঝর্ণার ঝিনুকে
একটু করুণা হয়তো
কাঁটা হয়ে সূঁচ তুলে নেবে,
তুলে নিতে পারে।

আপাততঃ পাইনের ছায়া—
হৃদয় এমন যদি ক্লিষ্ট দ্বিধা—
ক্রমশঃ জটিল কিংবা আরো দীর্ঘ হোক।

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

হৃদয় তো এলানো ছড়ানো—
মুঠো মুঠো ফেনার জীবন,
আকাশ তো নীল চেতনায়
ছুঁয়ে যায় বিহঙ্গের মন।

দুধারে দেয়াল-আঁটা—
বাঁধা চোখ, অঙ্কে গরমিল
হিসাবের খাতা দেখি
ভগ্নাংশের দোর-আঁটা খিল।
চোখে ভুল,—মনে চোখ মেলা
দুদণ্ডের খেলা—
কৃষ্ণচূড়ায় রোদ, শোনা যায় আকাশের ডাক
শরীরে দেয়াল-আঁটা, হৃদয়েরে মন ছুঁয়ে থাক

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের দোহাই পাড়ে মহীনাথ কথায় কথায়। কোনকিছু অপছন্দ হল, অমনি বলবে, 'আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে ওসব অচল।' শতাব্দীর কথাও তোলে। স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা বিংশ শতাব্দী এবং এখন তার তৃতীয় পাদের প্রথম পাদ গেছে উত্তীর্ণ হয়ে। আমি সেকেলে মানুষ, আমার বয়সও তো চলছে ওই সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। মহীনাথের কথা শুনে কখনও লজ্জা পাই, কখনও বা তাজ্জব মানি।

বিশেষ ক'রে দেখতে পাই, টাকাকড়ি খরচের ব্যাপারে তার হিসেববুদ্ধি একেবারে বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তব। সে যোগ্য অধিকারীও বটে। বিজ্ঞানের স্নাতক। বি এস-সি পাস করেছে। আমাদের এই শহরতলিতে এক নামজাদা কম্পানির কারখানার প্রয়োগশালায় চাকরি করছে গত কয়েক মাস ধ'রে। গত মাসে চাকরিতে পাকা হল। বয়স বছর-তিরিশ। স্বাস্থ্যটি ভাল। চলনে বেশ চালু—আর বেশি হলে চাল্লুশ বলা যেত। দোচোঙ-হাউইকুর্তা প'রে চলে। মহীনাথ হল আমার পিসতুতো কাকীমার খুড়তুতো ভাইপো। বড়দা ডাকে আমাকে।

চাকরি পাওয়া থেকে মহীনাথ আমার বাড়িতেই খায়। তার দরুণ টাকা দেয়। এতদিন থাকতও আমার বাড়িতে। গত মাস থেকে আমার পাশের বাড়িটা খালি হয়েছে দেখে সেটা ভাড়া নিয়েছে। আসছে মাসে নাকি ছুটি নিয়ে বাড়ি থেকে তার মা-ভাইবোন সকলকে নিয়ে আসবে এখানে। পাত্রী দ্যাখাই-বাছাইও চলছে। মহীনাথ এখন পাশের বাড়িতেই থাকে একা। খাওয়া এখনও আমার বাড়িতেই চলছে। নিজের ভাড়াবাড়িতে বাস করলেও, সে এখনও আমার পরিবারেরই সদস্য শতকরা সত্তর ভাগ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাণী আর সমুকে লেখা-পড়ায় সাহায্য করছিলাম নিজের ঘরে ব'সে। বাণী আমার মামাতো বোন। রূপে লক্ষ্মী। কিন্তু বাণী নাম সত্ত্বেও গুণে সরস্বতী হতে পারে নি। তবার বি-এ ফেল ক'রে ফের পড়াশোনা করছে পাস করার জন্যে। তবে, এক দিক দিয়ে নাম সার্থক। দুষ্টসরস্বতীর আসনটি তার মগজ-মহলে। প্রাণশক্তি তার একটু বিশেষ রকম প্রবল। সে যে একটি আধুনিকা তরুণী ও-বিষয়ে তার কোন জ্ঞানগম্যি নেই। এই সেদিনও আমগাছের মগডালে উঠে যখন নাকি শুনতে পেয়েছে যে খবরটা আমার কানে এসেছে, তৎক্ষণাৎ পাশের নারকেলগাছ বেয়ে স্লাং ক'রে নেমে এসে একেবারে নিপাট লক্ষ্মী মেয়েটি। একেবারে নাগালের মধ্যে অমন একটি সুযোগ্য পাত্র থাকা সত্ত্বেও ওদিকে তার কিছুমাত্র মনো-যোগ নেই। অবশ্য মহীনাথেরও প্রশ্রয় নেই বিন্দুমাত্র। পণের খাতে এক নয়াপয়সাও ছাড়তে হবে তেমন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। আর সমু হল আমার কনিষ্ঠ

লম্বা হয়ে পড়ে আছে মহীনাথ

কুমার সমীরণ। সর্বকর্মে বাণীর সুযোগ্য সহকারী। অসহ হয়ে উঠলে আমি তাকে সমীরণকুমার ব'লে তিরস্কৃত করি, কিন্তু তার কোন সুফল উপলব্ধি করতে পারি নি। অবসর-জীবনে আমি যেসব কাজকর্মে নিয়োজিত, তার মধ্যে ওদের দু'টিকে বাড়িতে পড়িয়ে টিউটরের খরচ বাঁচানো একটি। সেদিন সন্ধ্যায় ওদের নিয়ে সবে বসেছি, অকস্মাৎ পাশের বাড়ি থেকে একটা বুককাঁপানো আর্তনাদ উঠল। মহীনাথের গলা! আতঙ্কে উঠলাম। কী হল!

ছুটে গেলাম—এ বয়সে যতখানি ছোটা যায়। শহরতলি আধা শহর—এরই মধ্যে পাড়ার প্রচুর ব্যাটাছেলে, ছেলেছোকরা আর ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেছে বাড়ির দরজায়। সাড়ে তিন ফুট চওড়া দরজা দিয়ে প্রত্যেকেই ঢুকতে চায় বাকি সকলের আগে।

বয়সের ধারে কেটে পথ ক'রে কোনমতে গেলাম ভেতরে। ব্যাপার দেখে চক্ষুস্থির। বাড়ির মাঝখানে ছোট উঠোনে লম্বা হয়ে পড়ে আছে মহীনাথ। কয়েকজনে তাকে হাওয়া করছে, অন্য সকলে সামনের ঘরের দরজার দিকটা বাদ দিয়ে বাকি তিন দিকে ব্যূহ রচনা করেছে। বাণী কাছে ব'সে জল-ঝাপটা দিচ্ছে মহীর চোখেমুখে। সমু জলের বালতি নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে। ঢের আগেই পৌঁছে গেছে ওরা।

মহীনাথের জ্ঞান হারাবার কারণ ভয়াবহ। উঠোনের সামনেই যে ঘরটিতে সে থাকে তার সিঁড়ির নিচের ধাপে একটা মানকচুপাতার ওপর রয়েছে একটি মড়ার মাথার খুলি, তার সামনে গুণ চিহ্নের মত রয়েছে লম্বা দুটো হাড়—মানুষের ঊর্ধ্ববাহুর হাড় বোধহয়। করোটির কপালে সিঁদুর দিয়ে এক দুর্বোধ্য চিত্র আঁকা। হাতের হাড়-দুটোতেও কয়েকটি ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা। হাড়-দুটোর অবস্থিতির চার ফাঁকে কয়েকটি কাঠকয়লা, কিছু চুল আর কাটা নখ, দুটি জবাফুল এবং কয়েকটা পানের ওপর কিছু ছাগলের নাদি।

মহীনাথ চাকরি থেকে ফিরে, তালা খুলে, বাসায় ঢুকে, ঘরে উঠতে গিয়ে ওসব বস্তু দেখেই আর্তনাদ ছেড়ে প'ড়ে গেছে। জ্ঞান হবার পরে বলল যে, অজ্ঞান সে হয় নি, সম্ভবত হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। উঠে ব'সে বড় বড় চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সিঁড়িতে মান-পত্রাসনের সেই বীভৎসতার দিকে। ব'সে আছে উঠোনের শানবাঁধানো অংশে পা ছড়িয়ে, সেই অবস্থায় দু'হাত ছুঁড়ে গলা ছাড়ল, "শুশালারা! শালারা, বিদ্যের জোরে, মাথার জোরে, হাতের জোরে চাকরি নিতে পারলি নে, এখন টান দিয়েছিস আমার প্রাণ নিয়ে! আমি কি মামার জোরে চাকরি পেয়েছি রে, শোরের বাচ্চারা—মা-কালী বোনাইএর জোরে পেয়েছি......"

বললাম, "ছিঃ! মুখ খারাপ কোরো না, ভাই মহী, তুমি শিক্ষিত ছেলে। মাথা ঠাণ্ডা কর। দেখি, ব্যাপারটা আগে বুঝে দেখি, কী হয়েছে?"

মহীপতির এ চাকরিতে প্রতিযোগী ছিল অনেক। তার ধারণা, এ চাকরি পাবার চেষ্টায়

যারা ব্যর্থমনোরথ হয়েছে, তাদের অনেকেই তার অনিষ্ট-সাধনে গোপনে সচেষ্ট।

বাণী শুধোল, "আচ্ছা, ঘরে উঠতে গিয়ে আপনি কি ভূতের আসনটা ছুঁয়ে ফেলেছিলেন মহীদা? মনে করবার চেষ্টা করুন দেখি?"

চেষ্টা করল মহী। সেদিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর মিয়ানো গলায় বলল, "তা তো ঠিক বলতে পারছি নে। কচু-পাতাটা বোধহয়..."

"এই রে!" ভিড়ের ভেতর থেকে কোন অভিজ্ঞ কণ্ঠ বলল, "তবে তো ভাবনার কথা!"

আমি বললাম, "কী হয় ও ছুঁলে? দেখি, কী হয়?" ব'লে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু বহু হস্ত একসঙ্গে আমায় বাধা দিল, "আ-হা-হা-হাঃ! করছেন কী আপনি—করছেন কী? ও ছুঁতে নেই। ছুঁলেই তো সর্বনাশ। ছোঁয়ার জন্যেই তো রেখে দেওয়া হয় অমন ক'রে।"

আর একজন বলল, "যে আগে ছোঁয়, তারই ক্ষতি হয়। তারপরে কেউ ছুঁলে কিছু হয় না। মহীবাবু যদি ছুঁয়ে ফেলে থাকেন, তা হলে আপনি ছুঁলে ঘোড়ার ডিম হবে আপনার।"

ভিড়ের একেবারে পেছনের একপাশ থেকে অভিরাম বলল, "কে বললে, ঘোড়ার ডিম হবে? যে ছোঁবে তারই ক্ষেতি হবে। তবে, যে আগে ছোঁয় তারই সব্বনাশ। পরে কেউ ছুঁলে তার হানি ত্যাততা নয়।"

অভিরাম গেঁয়ো লোক। বয়স হয়েছে পঞ্চাশের কাছাকাছি। আগে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। পরে এখানকার এক কারখানায় চাকরি জুটিয়েছে। কাছের জবরদখল কলোনিতে বাড়ি ক'রে এখন সেখানেই বাস করে সপরিবার। নিজের কর্মঠ মধুর স্বভাবের গুণে সে এখনও আমাদের বাড়িরই একজনের মত। পাড়ার লোকের কাছেও তার কদর আছে। লোককে তাবিজ-কবচ-জলপড়া-টড়া দ্যায় অভিরাম, রোগে-ব্যাথায় ঝাড়ফুঁক করে। মন্ততন্ত্র নাকি জানে কিছু। কাজেই তার কথা শুনে চুপ ক'রে গেল সবাই।

বললাম, "কিন্তু ওই ভূতের আসন তো প'ড়ে থাকতে পারে না ওখানে। সরাতে তো হবেই। ছুঁতে হবেই কাউকে-না-কাউকে।"

অভিরাম বলল, "সে তো হবেই, বড়দা। তবে, গুণিন ছাড়া ও-আসন আর কারও ছোঁয়া চলবে না।"

বললাম, "তা, গুণিন কেউ আছে এখানে তোমার জানাশোনা?"

বাণী বলল, "অভিদা নিজেই তো নাকি জানে ওসব। কত ভূতের গল্প করত আমাদের কাছে। ওর বাবা তো ছিলেন নাকি ডাকসাইটে ওস্তাদ।"

সবিস্ময় তাকালাম অভির দিকে, "এসবও জান নাকি তুমি?"

জিভ কেটে, দু' হাতে নিজের দুই কর্ণমূল স্পর্শ ক'রে বলল, "সে-কথা কি বলতে পারি? তবে, বাপ তো শেখাবার কসুরি করেন নি, দাদা-বাবু; এখন, আধার যদি খুদ্দুরে হয়, তাতে ধরবে কতটুকুন, তাই বলুন, আজ্ঞে?"

জ্ঞানীর মত কথা। মনে হল, অভি যা জানে তাও সামান্য নয়। বললাম, "তা, তুমি একবার দ্যাখনা!"

বলল, "আজকাল তো এসবের বড় কদর-আদর নেই, কত্তা। কাজেই হাতও ত্যাততা চালু নেই। তবে, হ্যাঁ, আজ্ঞে যদি করেন—ভরসা ক'রে ছেড়ে যদি দ্যান আমার হাতে, তবে দেখে নিই শালা কতবড় গুণিন!"

বললাম, "একশ'বার আজ্ঞে করছি ...!"

বাধা দিল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, "কিন্তুক, এখেনে যে আপনার আজ্ঞেতে চলবে না, বড়দা-ঠাউর। যাঁর বাসা, তাঁর আজ্ঞে চাই। আসনটা পাতা হয়েছে তো তাঁরই জন্যে।"

মহীনাথ ডুবছে। হাতের কাছে যে-কাঠ পেয়েছে, তা কি ছাড়ে? গলা ছেড়ে আদেশ দিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আদেশ দিলাম তোমায়?"

অভি তার কাঁধের গামছা মাথায় বাঁধল। পরনের ধুতির প্রান্ত দিয়ে কোমর বাঁধল ক'ষে। নিচু হয়ে হাত দিয়ে মাটি ছুঁয়ে সেই হাত ঠেকাল নিজের কপালে, বুকে, দুই বাহুমূলে, দুই কর্ণমূলে আর জিভের ডগায়। কোমর টান করে দাঁড়াল সোজা হয়ে। দু' হাত জোড় ক'রে সটান তুলে দিল আকাশপানে, মুখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে, তারপর যুক্তকর নিচে নামিয়ে বারবার ঠ্যাকাতে লাগল নিজের কপালে।

জনতা স্তব্ধ। থমথম করতে লাগল দশ-দিকের সন্ধ্যারাত। সামনের আবছা অন্ধকারে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অভিরাম। ডান হাতটা সোজা এগিয়ে দিল সামনে তর্জনী উঁচিয়ে। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল, "কার আজ্ঞে?"

চুপ করে খানিকক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিজেই জবাব দিল, "ভূতনাথ মহাদেবের আজ্ঞে।"

হাত নামিয়ে নিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মহী-নাথের দিকে। মহীনাথ শানের উঠোনে তখনও সেই ব'সেই আছে, তবে পা গুটিয়ে এখন আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। যেন এই কৃত্যে তার এভাবে বসাই রীতি। অভিরামের এ রূপ আমার একেবারে অজ্ঞাত। সকলের সঙ্গে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। অভি জিজ্ঞেস করল মহীনাথকে, "দাদাবাবু, আপনি আসন ছুঁয়ে-ছেন কিনা বলতে পারেন?"

মহী শুকনো গলায় বলল, "মনে হচ্ছে যেন কলাপাতা আমার পায়ে লেগেছিল।"

অভিরাম বলল, "অবশ্য ছুঁয়ে যদি থাকেন, তবে তার পষ্ট পেরমানই পাওয়া যাবে।"

"কী প্রমাণ?"

"আজ্ঞে রোগ না, কিছু না, কালি হয়ে যাবেন। খাবেন-দাবেন শুকিয়ে উঠবেন। এ যা আসন হয়েছে, এর মেয়াদ হল ছ' মাস থেকে আঠারো মাস।"

শুধোলাম, "কিসের মেয়াদ?"

বিনয়ের সঙ্গে রহস্যপূর্ণ হাসি মিলিয়ে অভিরাম বলল, "আজ্ঞে, কিসের মেয়াদ, এ আর বুঝলেন না, কত্তাবাবু? পেরানের মেয়াদ আরকি।"

মহীনাথ শিউরে উঠল, "কাটান নেই?"

"নেই মানে? কাটান তো কাটান—একেবারে করাত-কাটান যাকে বলে। খাঁড়ার কাটান নয় যে, এক কোপে চুকে গেল ল্যাটা। এ, আজ্ঞে যাকে বলে আপনার, করাতের মত পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটবে। খামোখা মিছিমিছি যে পরের ক্ষেতি করতে যায় .....আচ্ছা, দাদাবাবু, আপনি কারও ক্ষেতি করেছেন?"

মহী বলল, "কক্‌খনও না। জ্ঞানত আ
কারও কোন ক্ষতি কোনদিন করিনি, অভি। ত
এই যে চাকরিটা পেলাম—অনেকের আশায় ছ
পড়ল তো?"

"বুঝতে পেরেছি। থাক্‌, কারও
করবেন না আপনি। মনে কারও কথা থাবে
যদি, তার নাম মুখে আনবেন না। যাক
হলে অনুমতি করুন, আমি কিরা শুরু ক
দিই?"

মহী বলল, "অনুমতি করলাম তো, অভি

অভি বলল, "তা হলে আগে দেখতে হ
যে, আপনাকে অর্শেছে কিনা।"

"তার মানে?"

"আজ্ঞে, আসনটা তো আপনার হানি ক
বার জন্যেই পাতা হয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে
এখন, ওটা আপনি ছুঁয়েছেন কিনা, ছুঁয়ে
থাকেন তো আপনার ওপর ওর মারণ-বি
ফলাবে কিনা, তার একটা পরীক্ষে আছে।"

মহীনাথ কাতর কণ্ঠে বলল, "সেইটেই অ
ক'রে দ্যাখ, অভি।"

"তয় আজ্ঞে করুন, আমি একবার বা
গিয়ে উপকরণটা নিয়ে আসি—মানে, যা দি
পরীক্ষে করতে হবে।"

আজ্ঞে করা হল।

"কিন্তু ভয়ের কারণ আছে, আজ্ঞে। আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে।" সামনেই সমীরণকে দেখতে পেয়ে অভি বলল, "তুমিই চল দেখি, সমুবাবু।"

চ'লে গেল সমুকে সঙ্গে নিয়ে। ফিরতে বেশি দেরি করল না। খুব কাছেই তো বাড়ি। ফিরে এসে অভি বলল, "একটা ঘটি দিন।"

ঘটি এনে দেওয়া হল একটা। সেটা নিয়ে অভি চ'লে গেল বাড়ির পেছনে আমাদের পুকুর-ঘাটে। একা গেল না। সঙ্গে লোক নিল আর-একজন কা'কে যেন। মুখ-হাত[illegible] ধুয়ে, এক ঘটি জল নিয়ে ফিরে এল। [illegible]নকটা জল মাটিতে ছড়িয়ে, বাকি জল স[illegible] ঘটিটা তার ওপর রাখল। উবু হয়ে ব'[illegible] দু'হাত জোড় ক'রে রাখল ঘটির মুখের ও[illegible]র। চোখ বুজে মন্ত্র পড়ল খানিকক্ষণ, প'ড়ে তিনবার ফুঁ দিল নিজের জোড়করা হাতের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াল। দু'হাত মেলে সকলের সামনে ধ'রে বলল, "দেখুন সকলে, আমার হাতে রয়েছে একটা কাঠের কতকগুলো টুকরো। পেত্যেককে দিচ্ছি এক টুকরো ক'রে, আপনারা হাত পাতুন।"

হাত পাতল সকলে। ক্ষুদ্র আকারে কাটা সেই কাঠের টুকরো প্রত্যেকের হাতে দিল একটা ক'রে। মহীকেও দিল। বলল, "আপনারা সকলেই ওটা মুখে দিন—চিবোন। কোন ভাবনা নেই। কিচ্ছু ক্ষেতি হবে না কারও। চিবোতেও খারাপ লাগবে না।"

সকলেই সেই কাঠের টুকরো মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল।

অভি বলল, "দয়া করে বলুন দেখি, সোয়াদটা কেমন?"

সকলেই বলে উঠল, "মিষ্টি। মিষ্টি।"

আমিও চিবোচ্ছি। বললাম, "যষ্টিমধু যেন!"

"আজ্ঞে, ঠিকই বলেছেন, দাদাবাবু। যষ্টি-মধুই দিয়েছি সবাইকে—তার সোয়াদ মিষ্টি হবেই।"

"গুঞ্জরি তান
উঠিল তোমার
সোনার বীণার তারে"
শ্বেত শুভ্র কাশের বনে-হাওয়ার দোলায় মালতী-শেফালীর বিকীর্ণ সুরভে, মরালের ছন্দিত ডানায় আর অবারিত নীল আকাশে ঝংকার উঠেছে শারদ-লক্ষ্মীর বীণার। প্রতি বছর এই শুভমুহূর্ত-টিকে আমরা স্মরণীয় করে রাখতে চাই আমাদের জীবনে। 'ঝংকার' রেডিওর সুরের স্পন্দনে এই আনন্দ আপনার কাছে আরো বিমূর্ত হয়ে উঠবে।
ঝংকার
রেডিও
অপূর্ব ম্যাগনাটোন-সহ
JHANKAR
পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:—
রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

কিন্তু মহীর মুখ থেকে একটা গলাচাঁতা আওয়াজ বেরোল। তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে! "তেতো! তেতো! এ-হে-হে!"

"তেতো!" দু'চোখ বড় হয়ে উঠল অভির, "ভাল করে চিবোন, মহীদাদা।"

"খুব চিবিয়েছি, অভি। যম-তেতো!" কাঁদোকাঁদ হয়ে উঠল মহীনাথের গলা।

অভি বলল, "দাঁড়ান। দাঁড়ান মুখের দেব্যোটা মাটিতে ফেলবেন না। এগিয়ে যেয়ে আলগোচে ওই আসনের কচুপাতার উপর ফেলুন থুক্ করে।"

তাই করল মহী। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল অভির দিকে। যেন হিম হয়ে যাচ্ছে মহীনাথ।

গোটা ভিড়টা একেবারে নিস্তব্ধ। কারও মুখে একটি কথা নেই। একই জিনিস চিবিয়ে সকলেই পেল তার স্বাভাবিক মিষ্টি স্বাদ আর মহীর মুখে সেটা লাগল তেতো!

অভি আত্মগতভাবে বলল, "শালা তো ভাগ গুণিন দেখছি। দ্যাখ্যা পেলে শালার কান ধরে জিজ্ঞেস করতাম, শালা, খামোখা পরের সব্বনাশ করে হারাম খাস, তোর গুষ্টিতে বাতি দিতে থাকবে কেউ?"

বললাম, "এখন কী করতে হবে বল দেখি?"

বলল, "কাটান-করণ করতে হবে বড়দাবাবু। করতে চান যদি—কিছু খরচ তো লাগবে।"

"লাগুক।" মহীনাথ বলল, "প্রাণের চেয়ে তো টাকা বড় নয়। কর তুমি কাটান-করণ। কত লাগবে?"

অভি বলল, "ফর্দ ধরে দেখি আজ্ঞে। তবে, খুব যে বেশী কিছু লাগবে তা নয়। ও আর আপনাদের কাছে কী? লাগবে ধরুন, একটা কালো পাঁঠা, কালো চুলপাড় দশ-হাতি ধুতি একখানা, পাঁচহাতি গামছা একখানা, রবির দক্ষিণে আর শিবের দক্ষিণে—এক টাকা স'-পাঁচআনা করে। এখনকার ধরুন তেত্রিশ নয়া পয়সা আর কি। আর আপনার মারণ দক্ষিণে আড়াই টাকা ধরুন। আর......আচ্ছা, কাল সকালে আমি ফর্দ দিয়ে যাব।"

"অর্থাৎ, অন্তত তিরিশটি টাকা।" মহীনাথের দিকে তাকালাম। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে একেবারে। নিরুপায় কাঁদোকাঁদ স্বরে বলল, "হোক, তাই দেব।"

অভিরাম সেই ঘটির জলে একটু গোবর মিশিয়ে নিল। সেই জলের খানিকটা উঠোনের এক জায়গায় ঢেলে তার ওপর দাঁড়াল। নিজের বুকে ডানহাত রেখে মন্ত্রপাঠ করল বিড়বিড় করে। সেই হাত নিজের মাথায় রেখে আঙুলের পাব গুনে গুনে জপ করল। তারপর সেই আসনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কটমট করে। হঠাৎ ডান হাতটা সামনে প্রসারিত করে, তর্জনী খাড়া করিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, "কার আজ্ঞে?......ভূত পেরেত দত্যি দানা পিশাচের বাপের বাপ—তস্য বাপের ঠাকুর শিব-শম্ভু মহাদেবের আজ্ঞে!"

বলে সোজা চলে গেল সেই মারণ-আসনের কাছে। বলল, "আসনটা আমি তুলে নিয়ে গেলেই ওখানটাতে গোবরজল ছড়িয়ে দেবেন। আর, বাসা যেন রাতের বেলা ফাঁকা না থাকে। মালিক নিজে শোবেন। একা ভয় লাগলে, সঙ্গে আর কেউ শোবেন। তবে, ভয়ের কিছু নেই। [illegible] আমি তুলেই নিয়ে যাচ্ছি।"

ওই বাসায় একা শুতে, মহীনাথের রীতিমতই ভয় দ্যাখা গেল। অভিকে বলল, "তুমিও রাত্রে শোবে আমার বাসায়।"

কিন্তু এ সপ্তাহে অভির রাতের ডিউটি চলছে কারখানায়। অগত্যা আমিই রাজি হচ্ছিলাম মহীকে সঙ্গ দিতে, কিন্তু সমু এগিয়ে বলল, "তার চেয়ে আমিই শুই না কেন মহীকাকুর সঙ্গে।"

তাই ঠিক হল। অভি জনতাকে বলল, "আপনারা দয়া করে পথ খোলশা করে দাঁড়াবেন। আসন তুলে নিয়ে যাবার সময় বাধা যদি পাই—আমার দম যদি পড়ে, তবে সব পন্ড হয়ে যাবে।"

সকলে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। অভি আসনের সামনে দাঁড়িয়ে দমভর নিশ্বাস নিল। নিশ্বাস বন্ধ রেখে চট্ করে কচুপাতাটা দিয়ে জড়িয়ে ফেলল তার ওপরের বস্তুগুলি, জড়িয়ে সেই পুঁটুলি তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল বাড়ির বাইরে। তারপরে নিশ্বাস ফেলে হন্‌হন্ করে হেঁটে চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে। পিছু ফিরে তাকাল না।

পরদিন সকালে এসে ফর্দ দিল অভিরাম। আগের দিন যা যা বলেছে, সেগুলিই প্রধান, সেই সঙ্গে তামার মাদুলি, কালো কার ইত্যাদি আরও কয়েক দফা যুক্ত হয়েছে; তবে সেগুলির দাম সামান্যই। মোটমাট তিরিশ টাকার মধ্যে কুলিয়ে যাবে আশা করা গেল। কিন্তু পাঁঠার কী দাম পড়বে, সেটাই বড় প্রশ্ন। তার চেয়েও সমস্যা হল নিখুঁত কালো পাঁঠা পাওয়া। অর্থাৎ, পাঁঠার গায়ে কোথাও একটু কাটা-ছেঁড়া-ঘাএর দাগ-টাগ থাকা চলবে না এবং তার গায়ের কালো রোঁয়ার মধ্যে অন্য রঙের রোঁয়া থাকা চলবে না একগাছিও।

পরোপকারে অভিরাম চিরদিনই এক পাএর ওপর খাড়া। রাতের বেলা ডিউটি, আর দিনের বেলা চলল টোঁ টোঁ করে ঘোরা। পুরো চারটে দিন ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত জুটিয়ে ফেলল নিখুঁত কালো পাঁঠা—কোন্ সুদূর গাঁএর এক চাষীর বাড়ি থেকে। ধর্মকৃত্যের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত পাঁঠা—তার সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক নয়, কিন্তু জীবটি প্রকৃত নধর এবং মাংসল। দেখে মন-রসনা অধীর হয়ে ওঠে। দামও বেশি পড়ল না, মাত্র তেরো টাকা।

ঠিক হল, রবিবার সকালে করণ হবে। বললাম, "এসব তো শুনেছি শনি কি মঙ্গল-বারে হয় রাত্রে-টাত্রে।"

অভিরাম বলল, "আজ্ঞে, না। আমাদের তো রবিসিদ্ধি কিনা—যার জন্যে রবির দক্ষিণে ধরা হল এক টাকা তেত্তিরিশ নয়া পয়সা।"......

বাণী আর সমীরণ গোড়া থেকেই এসব ক্রিয়াকরণের বিরুদ্ধে নানা রকম মন্তব্য করছে। স্বাভাবিক। তারা আধুনিক কালের ছেলে-মেয়ে। কিন্তু অবাধ্য নয়। যত ডানপিটেই হোক, বেয়াদপ নয়। যা আদেশ করব, মাথা নিচু করে পালন করবে। তাদের এরকম সং স্বভাব গড়ে উঠেছে বলে আমি গর্ববোধ করি। আমার শিক্ষার ধারাও অন্য রকম। একেবারে বন্ধুর মত ব্যবহার করি ওদের সঙ্গে আমি। শুধু ওদের সঙ্গে কেন? আমার সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গেই এবং পরিবারের সকলের সঙ্গেই। সমুর মা'র সঙ্গে পর্যন্ত। আমাকেও ছোটবড় সকলেই বন্ধুর মত ভালবাসে—এক শুধু ওই সমুর [illegible]

আর বাণীর মনে যতই বিরূপতা থাকুক না [illegible] মহীপতির শত্রু-উৎপাটনের করণের ক[illegible] তাদেরও খাটাখাটুনি কম হল না। কেনাকা[illegible] ব্যাপারে সমুকে ছোটাছুটি করতে হল বিস্ত[illegible] আর পাঁঠা তো তারই হেপাজতে। বাণীর [illegible] পড়ল শনিবার থেকে। মহীপতির বা[illegible] পুজোর জিনিসপত্র সব গোছানো, পু[illegible] জায়গা করা, কম কাজ? পাঁঠা বলি দে[illegible] হাঁড়িকাঠ পোঁতার কাজটা অভিরামই করল।

রবিবার সকালে করণ পাতা হল। বাই[illegible] লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা বাই[illegible] লোক নই। মহীনাথ এখনও আমাদের প[illegible] বারের লোক—শতকরা সত্তর ভাগ। তবে [illegible] ছেলেমেয়েদেরও ওখানে যাওয়া নিষিদ্ধ হ[illegible] কেননা, কঠিন ক্রিয়া, একান্ত মনঃসংযো[illegible] আবশ্যক। ছোটরা থাকলে গোলমাল করবে[illegible] সমুকে ছোট বলে গণ্য করা হল না। সে [illegible] কাজকর্ম নিয়ে আছেই এবং থাকবেই। বাণ[illegible] তো ছোট নয়। আমিও না। সমুর মা সে[illegible] সন্ধ্যা থেকেই কাঠ হয়ে আছেন, এদিকে[illegible] এগোন না। একান্ত বাইরের লোক বলতে[illegible] আর একজন থাকল অভিরামের সহকারী রূপে[illegible] ভোলা—সে অবশ্য অভিরামের শ্যালক; তাকেও একেবারে বাইরের লোক বলা যায় না।

করণ পাতা হল মহীপতির বাসার উঠোনে[illegible] নতুন কাপড় পরে অভিরাম পুজোয় বস[illegible] কাছেই কলাপাতার আসনে বসল স্বয়ং মহ[illegible] নাথ। কথা ছিল পদ্মাসনে বসবার, কি[illegible] অনেক চেষ্টায়ও তাতে সক্ষম হয় নি, দুবার চি[illegible] হয়ে পড়েছে পা গোটানো অবস্থায়। শে[illegible] পর্যন্ত তাকে এমনি আসনপিঁড়ি হয়েই বসব[illegible] অনুমতি দিয়েছে অভিরাম। মহীনাথ কল[illegible] পাতার ওপর বসে আছে চোখ বুঁজে, শি[illegible] দাঁড়া টান করে। অভিরামের দেহটি বলিষ্ঠ[illegible] দেহের রংটি মিশকালো, মাথার চুল ঝাঁকড়[illegible] ঝাঁকড়া, অনেক দিন পরামানিকের কাঁচি[illegible] পর পেতে পারে নি বলে লম্বাও হয়েছে। সে গলা[illegible] পরেছে জবাফুলের মালা—মাঝখানে ঝুলে[illegible] একটা ধুতরোফুল। তার কপালে তেল[illegible] সিঁদুরের তিলক। দুই কানে গুঁজেছে জব[illegible] ফুল।

ঘণ্টাখানেক ধরে, দশদিকে সরষে ছিটিয়ে[illegible] মাষকলাই ছড়িয়ে, তুড়ি দিয়ে, হাততালি মেরে[illegible] গাল বাজিয়ে সে যা করণ চলল—স্থিরচক্ষে[illegible] দেখবার মত। দেখে আমার চক্ষু আপন[illegible] থেকেই স্থির হয়ে গেছে। বিড়বিড় কর[illegible] অভিরাম মন্ত্র পড়ে, মাঝে-মাঝে—সম্ভবত এক[illegible] একটা মন্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলেই—হাঁক ছাড়ে[illegible] "কার আজ্ঞে?......ভূত পেরেত দত্যি দানা যক্ষ রক্ষ ডাকিনী যোগিনী পিশাচের বাপের বাপ[illegible] তস্য বাপের ঠাকুর শিব শম্ভু মহাদেবের আজ্ঞে।"

শেষদিকে মনে মনে মন্ত্র পড়ে পড়ে মহী-নাথের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ফুঁক দিল বার বার। বলল, "আপনি তৈরি হয়ে বসুন, দাদাবাবু, এবার আসল কাজ।"

পাঁঠাকে স্নান করিয়ে নিয়ে এল সমু আর ভোলা। পাঁঠার গলায় পরানো হল বেলপাতা আর জবাফুলের মালা। মন্ত্র পড়ে, তার পায়ে জল ঢেলে, তার মাথায় চাল-দুর্বা ধরে তাকে উৎসর্গ করা হল। তারপরে বলি।

উঠোনের যে-পাশে শোবার ঘর, সেদিকটা

ড়া হয়েছে সেখানে। ভোলা মালকোঁচা র করণতলায় সাষ্টাংগ প্রণিপাত জানিয়ে তুত হল। অভিরাম আনুষ্ঠানিকভাবে া তুলে দিল তার হাতে।

অভিরাম পাঁঠার সামনের দুই পা মুড়ে ড়নে নিয়ে ধরল ডান হাতে। তারস্বরে ংকার করতে লাগল পাঁঠা। অভি বাঁ হাতে ঠার পেছনের দুই পা ধরল জোর করে। ই অবস্থায় তাকে শূন্যে একটা আছাড় রতেই তার চিৎকার গেল থেমে। ফেলা ল পাঁঠাকে হাঁড়িকাঠে। হাঁটু গেড়ে বসেছে চালা, সে খাঁড়া তুলল শূন্যে। উপস্থিত শকজন মুদিল নয়ন'। আমিও।

চোখ মেলে দেখি, যেভাবে ধরেছিল, সেই-রবেই দু'হাতে ধরে অভিরাম ছিন্নমুণ্ড পাঠার ড়টা রেখেছে উপবিষ্ট মহীনাথের মাথা বরা-। অজস্র ধারায় তীরবেগে রক্তের ফোয়ারা টে পড়ছে মহীনাথের গায়ে মাথায়। রক্তস্নান রছে মহীনাথ। মন্ত্রবলে শত্রুর সত্ত্বা তো ঠার মধ্যে বর্তেছে কিনা, সেই শত্রুকে বলি য়ে, শত্রুরক্তে স্নান করছে আরকি মহীনাথ। খ্যাটা বীরত্বব্যঞ্জক বলতেই হবে।

অতঃপর অভিরামের অনুমতি পেয়ে রক্ত-াত মহীনাথ বাসার পেছন-দরজা দিয়ে নামল য়ে আমাদের পুকুরে। উত্তমরূপে ধৌতাবগাহন র, পরনে ভিজে গামছা নিয়েই এসে দাঁড়াল ভরামের সামনে—ভক্তিনত শিরে। কাটা ঠার ঘাড় থেকে অভি খড়্গ দিয়েই অতি ছোট্ট টুকরো মাংস কেটে নিয়ে তামার মাদুলিতে রল। মাদুলির মুখ বন্ধ করল মোম দিয়ে, রপর কালো কার দিয়ে সেটা বেঁধে দিল ীর দক্ষিণ বাহুতে। বলল, "নিন, ভক্তি-র ওপরদিকে চেয়ে সূর্য্যি নমস্কার করে, বর রাথনা করুন বাবা ভূতনাথ মহাদেবের ছে।"

তাই করল মহীনাথ। অভিরাম বিধান ল, "রোজ তিন বেলা মাদুলিটা ডুবিয়ে এক ডুষ করে জল খাবেন।"

মারণ-করণ নির্বিঘ্নে চুকে গেল বেলা ন'টার ধাই। অভিরামকে জিজ্ঞেস করলাম, "পাঁঠা া হবে?"

বলল, "পাঁঠা আবার কী হবে? আপনারা বেন।"

"খেতে পারি আমরা?"

"সে তো পারেনই। এ আবার কী জিজ্ঞেস রছেন, কত্তাদাদাবাবু? ও কি আর এখন ঠা আছে? ও তো এখন পেসাদ।"

"পাঁঠাতেও আপত্তি নেই আমার। মহী তে পারবে?"

"তিনি তো পারবেনই। তিনি তো পাঁঠার ড় চিবোবেন না—শত্তুরের হাড় চিবোবেন তের সুখে, মনের সুখে।"

বললাম, "তা হলে তোমারও নেমন্তন্ন খানে। আর ভোলারও।"

বলল, "নেমন্তন না পেলে কি পেসাদ না য়ে নড়ছি নাকি আমরা আপনার বাড়ি কে?"

অভিরাম নিজেই ছালটাল ছাড়িয়ে বানিয়ে ল। রবির দক্ষিণা, শিবের দক্ষিণা, মারণ-ক্ষিণা, সব কুড়িয়ে নিয়ে সমু দিতে গেল ভিকে। অভিরাম জিভ কেটে বলল, "ও আমাদের নিতে নেই, কাকু। তুমি বেরাম্মন, তোমায় দান করলাম।"

আমি আপত্তি করতে গেলাম। বাণী হেসে আমাকে থামিয়ে দিল, বলল, "ও ঠিক আছে, বড়দা। মাংস খেতে তেল-ঘি-মশলা-টশলা তো চাই; তার একটা খরচ তো আছে।"

কথাটা শুনেই কেমন যেন খটকা লাগল। মনের ভাব মনে চেপে অভিরামকে বললাম, "তা, তুমি যে এত কষ্ট করলে, তুমি পেলে কী? পুরুতঠাকুরে পুজো করে তো দক্ষিণা-টক্ষিণা নেন।"

অভি নিজের পরনের নতুন ধুতি দেখিয়ে বলল, "আমি তো এই নতুন কাপড় পেলাম আজ্ঞে।"

বললাম, "তা হলে মহীও নতুন গামছা পেল। পেতে আর বাকি রইল না কেউ।"

এক অতিথিও পাওয়া গেল। বাণীর বান্ধবী। আমাদের এখানে নাকি মেয়েটির আত্মীয়-বাড়ি আছে, বাণীর সঙ্গে একটা দরকারী কথা সেরে সে চলে যাবে সেখানে। কিন্তু বাণী তাকে ছাড়ল না। বাড়িতে এমন একটা ভোজের আয়োজন, এমন দিনে ভাগ্যবশে সমুপস্থিত অভ্যাগতাকে কেউ কি ছেড়ে দিতে পারে?

নির্ভয় নিশ্চিন্ত হল মহীনাথ। খেতে বসে শত্রুমাংস খেলও কম নয়। কড়মড় করে হাড় চিবোয় আর বলে, "শত্তুরের হাড় চিবোচ্ছি।"

আমার সেকেলে অবৈজ্ঞানিক মনটার মধ্যে গোড়া থেকে কেমন একটা খচখচ করছিল। অভিরাম যখন দক্ষিণার টাকাগুলো সমুকে দান করল আর বাণী যখন বলল যে, মাংস রান্নার তেল, ঘি-মশলারও তো খরচ আছে, তখন মনের ভেতরে উঠল একেবারে খট করে। খটকা লেগে গেল রীতিমত। চোখ, কান, মন সব খাড়া করে রাখলাম।

বিশেষ গোয়েন্দা কর্মের দরকার হল না। সকলের সঙ্গেই মিশি আমি বন্ধুর মত। অবসরই নিই আর চুলই পাকুক, আসলে আমি বুড়ো হইনি, ওদের বয়সের আমিটা এখনও আমার মধ্যে একান্ত প্রবল। ভাসা-ভাসামত কিছুটা তথ্য উদ্ধারও ক'রে ফেললাম। তাতেই চমক ধরে গেল মনের মধ্যে।

বাণীকে একান্তে ডেকে সাদর কণ্ঠে বললাম, "দ্যাখ, এ কাণ্ডের ওপরটা আমি ভাল করেই দেখেছি। জেনেছিও অনেকখানি। এবারে ভেতরের কথাটা আমায় বল দেখি, বোন।"

তারও দরকার ছিল বলবার। একটা বৃহৎ কর্মে যদি পুরো একশ ভাগ সাফল্য অর্জিত হয়, তবে তা প্রচার করতেই হবে। এঁকে-বেঁকে গাইগুঁই করে শেষটাতে ব'লে ফেলল বাণী।

মহীনাথের যখন চাকরি হয়েছে তখন থেকে সমু তাকে অনেকবার বলেছে খাইয়ে দিতে। মহীও তাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে বরাবর। তারপর সম্প্রতি যখন সে চাকরিতে পাকা হয়ে গেল তখন বাণীর সামনেই সমু মহীনাথকে বলেছে, এবার আমাদের মাংস খাইয়ে দিতে হবে।

জবাবে নাকি মহীনাথ বলেছে, "তা, তোদের মাংস খা না তোরা। নিজের গায়ের মাংস কামড়ে' কামড়ে' খা।"

কাকার জবাব বটে! সেই জবাব শুনে বাণী বলেছে, "আমাকেও কি ওই জবাব?"

মহীনাথ বলেছে, "মেয়েছেলের আবার মাংস খাবার নোলা কেন অত? ছিন্নমস্তার মত নিজের মাথা নিজে কেটে রক্তপান করলেই পার।"

সেই থেকে বাণী আর সমীরণের জেদ চেপেছে মহীনাথের ঘাড় ভেঙে মাংস খেতে হবে।

হেসে বললাম, "সেই সঙ্গে প্রমাণ করতে হবে যে, বুদ্ধিতে মহীও পাঁঠার চেয়ে কম যায় না?"

বাণী নিচের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল মুখ টিপে।

শুধোলাম, "মানুষের মাথার খুলি, হাড় এসব যোগাড় করলে কোত্থেকে?"

বলল, "আমার যে বান্ধবীটি এসেছিল অতিথি হয়ে, ও তো ডাক্তারী পড়ে কিনা। ওর কাছে একটা আস্ত মানুষের সব হাড় আছে।"

"আসন পেতেছে কে? ভূতের আসন?"

"অভিদা কায়দা-টায়দা বাতলে দিয়েছিল। আমি আর সমু ও বাসায় গিয়ে......"

"কী ক'রে গেলি?"

লজ্জাবোধ করল বাণী, "পাঁচিলের ওপর দিয়ে।"

আমাদের বাড়ি আর মহীর বাসাবাড়ির মাঝখানে একটা ছ ফুট উঁচু পাঁচিলের মাত্র ব্যবধান। ওটা পেরোতে ওদের পিসী-ভাইপোর মই দরকার হয়েছে ব'লে মনে হয় না। সেটা জিজ্ঞেস ক'রে আর লজ্জা বাড়ালাম না কল্যাণীয়ার। বললাম, "আচ্ছা, ওই যে যষ্টি-মধুর টুকরো মহীর মুখে তেতো লাগল, সে-ব্যাপারটা কি?"

বলল, "মহীদাকে দেওয়া হয়েছিল চিরতার কাঠ।"

"অভিরাম তো জবর ওস্তাদ! ওটাকে এমন ক'রে দলে ভেড়ালি কি ক'রে?"

"অভিদা তো চিরদিনই আমাদের দলে। এখনও সময় পেলেই এসে কত গল্প শোনায়, কত আবদার রাখে আমাদের। মাংস খাওয়ানোর কথায় মহীদা আমাদের ওই জবাব দিয়েছে শুনে অভিদারও মনে জেদ চেপে গিয়েছিল ভীষণ। তা ছাড়া, মজাও তো আছে। তার ওপর নতুন কাপড়ের লোভটা ফাউ।"

মহীনাথকে সুযোগ মত ডেকে বললাম সব কথা। শুনে একেবারে চিড়বিড় ক'রে চটে গেল। হাতের মাদুলি ছিঁড়ে দূর ক'রে ফেলে দিল। তাই দেখে বললাম, "তুমি রাগ কোরো না, মহীভাই। বোনটাকে আর ছেলেটাকে আমি আচ্ছা ক'রে ব'কে দিয়েছি। আর তোমার যা খরচ গেছে, সেটা বরং দিয়ে দেব আমি।"

রাগে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করতে করতে প্রস্থান করেছে। কিন্তু পরদিনে এসে ক্ষমা চেয়েছে।

মুশকিল হয়েছে এই যে, ব্যাপারটা এখানেই চুকে যায়নি। কয়েকদিন পরে মহীনাথ এসে এক প্রার্থনা জানিয়েছে, সে নাকি বাণীকে বিয়ে করতে চায়। অর্থাৎ বুকে গেছে।

এক কথাতেই বিদায় করার জন্যে বললাম, "অসম্ভব। পণ দেবার ক্ষমতা নেই।"

কিন্তু ভবি এতে ভাগল না। আশ্চর্যের চেয়ে পরমাশ্চর্য, মহীনাথ নাকি পণ চায় না এক কানাকড়িও।

এদিকে বাণীর কানে কথাটা উঠতে সে বলল, "অমন ভূতস্য ভূত—পাঁঠাস্য পাঁঠাকে বিয়ে করার আগে আমি বরং তে-বাঁকা নারকেল গাছে উঠে, তার মগডাল থেকে লাফিয়ে পড়ব নীচে।"

চুকে না গিয়ে ব্যাপারটা মহীনাথের বুকে যাবার পরিণতিটা আমার মনে হচ্ছে সম্পূর্ণই বিজ্ঞানসম্মত। এখন সতর্ক নজরে অপেক্ষায় আছি, দেখি, কতদূর গড়ায়—কোথায় দাঁড়ায়।

উদ্ভিদ-রসিক উইলিয়ম কেরী ও অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি

ডঃ তারকমোহন দাস

বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক উইলিয়ম কেরী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন—ঠিক দুইশত বৎসর পূর্বে। তাঁর বহু দিকে বিস্তৃত চিন্তা ও কর্মধারার এক অজ্ঞাতপ্রায় অধ্যায় নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিবেদন করা হল।

—লেখক

নির্জন, মনোরম পরিবেশ, আলিপুর রোডের ওপর জাতীয় পাঠাগারের দরজা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে কিছু দূর এগিয়ে যান একটি সুন্দর বাগান আপনার চোখে পড়বে, গেটের পাশে ক্যাকটাস, ক্রোটন ও অর্কিডের চারা—কাচের শো-কেসে সাজানো—বিক্রী ও বিজ্ঞাপন দুয়েরই জন্য। এটাই রয়্যাল অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার বাগান—ভারতের অন্যতম অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। গেট পার হয়ে ভেতরে আসুন, ব্যুগনভিলিয়া, কনক চাঁপার গাছের পাশ দিয়ে, পুকুরের ধারের রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান, একটি শ্বেত পাথরের আবক্ষ মূর্তির সামনে আপনার পথ ঘুরে গিয়েছে। লাল ব্যুগনভিলিয়ার বিতানের ছায়ায় স্মিতহাস্যে তাকিয়ে আছে পাথরের মূর্তিটি আপনার দিকে। তলায় ইংরাজীতে লেখা আছে 'উইলিয়ম কেরী ডি ডি, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি রয়্যাল অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা করেন।'

এই কি সেই উইলিয়ম কেরী যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান লিখে ছাপিয়েছিলেন? ১৪টি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন? আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি অবিস্মরণীয় খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে,—তিনি ছিলেন একজন খাঁটি উদ্ভিদ রসিক পুরুষ। তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিকটি প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে। উদ্ভিদের প্রতি অনুরাগ তাঁর চরিত্রের ছিল এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গাছপালার সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। মনে হয় এই জন্যই তাঁর চরিত্রে তারুণ্য ও সজীবতার কোনদিন অভাব ঘটেনি।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের নরদামটনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন—এখন থেকে ঠিক ২০০ বছর আগে। তিনি দরিদ্রের ঘরেই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা এডমণ্ড কেরী নিজের হাতে তাঁত বুনে সংসার চালাতেন, পরে তিনি স্কুল মাষ্টারের কাজ নেন। মাত্র বারো বছর বয়সে উইলিয়ম কেরী কৃষিবিদ্যা শেখবার জন্য এক খামারে ভর্তি হন। হাতে-কলমে প্রায় বছর দুই ধরে তিনি কৃষিবিদ্যা শিখেছিলেন। তারপর শোনা যায় তিনি এক ধরণের চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ায় রৌদ্রতাপ সহ্য করতে না পারায় এই পেশা ত্যাগ করেন। এরপর জুতো সেলাই-এর কাজও শিখেছিলেন কয়েক বছর। কিন্তু বই-এর প্রতি তাঁর কৌতূহল বরাবরই ছিল। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মগ্রন্থ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের বইগুলি যথেষ্ট পড়েছিলেন। বই-এর জ্ঞান ছাড়াও তাঁর ছোটবেলা থেকেই নানা রকম গাছ-পালা ও পশু-পক্ষী সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের বাতিক ছিল। এই কৌতূহলই উত্তর-কালে উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা কার্যে তাঁর সহায় হয়েছিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জন টমাসের সঙ্গে মিশনরীর কাজ নিয়ে উইলিয়ম কেরী সপরিবারে ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন। সকল বিষয়ে আগ্রহ, শুভ ইচ্ছা এবং গঠনমূলক কর্মপ্রেরণার গুণে নিজস্ব পেশা মিশনরীর কাজ ছাড়াও তিনি এদেশের বহু কল্যাণকর কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

ভারতের কৃষি ও ফল-ফুলের উন্নতির জন্য তিনি অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ সালে যখন এই সোসাইটি স্থাপিত হয় তখন ভারতে একটিও বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল না, সত্যকার কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানও ছিল না। উইলিয়ম কেরীই সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে প্রথম যাঁরা চাষবাসের উন্নতির মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের মঙ্গলের নিখুঁত ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই পথে বহু দূর অগ্রসরও তিনি হয়েছিলেন। ১৮২০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে তিনি একটি মিটিং ডাকলেন। এই মিটিং-এ তিনি কলকাতার সমবেত নাগরিকদের কাছে তাঁর সংকল্প ঘোষণা করলেন,—এদেশে ইক্ষু, তুলা, কফি, নীল, আলু, গম, ধান ও নানারকম ফল ও ফুলের উন্নতির জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের খুবই দরকার। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ঐ সব ফসলের উন্নত জাতের চারা ও বীজ সংগ্রহ করা এবং দেশের সর্বত্র তা সম্প্রসারণ করা। ঐদিন সন্ধ্যায়ই অ্যাগ্রি-হর্টিকাল্চারাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হোল কলকাতায়। প্রথমে এর নাম ছিল অ্যাগ্রি-কালচারাল সোসাইটি, কিছুদিন পরে এই নামের সংগে হর্টিকালচার শব্দটি যোগ করা হয়।

সেইদিন সন্ধ্যায় উইলিয়ম কেরী নিশ্চয়ই একটু হতাশ হয়েছিলেন, কলকাতার বিরাট টাউন হলে মাত্র পাঁচজন ব্যক্তি তাঁর সামনে বসেছিলেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই অনুপস্থিত। পুরোনো দলিলপত্র থেকে জানা যায় এই পাঁচ-জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন, রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও জোশুয়া মার্শম্যান। উইলিয়ম কেরী হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না, তিনি ১৮ দিনের মাথায় সোসাইটির দ্বিতীয় বৈঠক আহ্বান করলেন। ঐদিনই ১৩ জন সদস্য নিয়ে কার্যনির্বাহ সমিতি তৈরী হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেই সময়-কার গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেস্টিংসকে পৃষ্ঠপোষক করা হল। তারপর থেকে ভারত-বর্ষের সকল গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে আসছেন; বর্তমানে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদও এর পৃষ্ঠপোষক।

রেভারেণ্ড কেরী কাজের লোক ছিলেন। তিনি এই সোসাইটিকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সান্ধ্য আসরে পরিণত হবার সুযোগ দেননি। এর প্রতিষ্ঠা দিবসে যে মূলনীতির কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন আক্ষরিক অর্থে তা পালনও করে গিয়েছেন। তিনি মরিসাস দ্বীপ থেকে সর্বোন্নত আখের কাটিং আনালেন এবং কলকাতাতেই তার চারা বার করা হল। আখের চাষের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল এই নূতন সংযোজনে। এইভাবে তুলার বীজ আনান হল আমেরিকা থেকে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে, ম্যানিলা থেকে, এমন কি চীনদেশ থেকেও। তুলার চাষের আধুনিক যুগের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিল উইলিয়ম কেরীর হাতেই।

অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির মাধ্যমে তারপর আরো অনেক জাতের ফল-ফুল ও শস্য বহির্ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছে আমাদের দেশে। আমরা যে পাটনাই ফুলকপি ও নৈনীতাল আলু পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাই তাও শোনা যায় ভারতবর্ষে প্রথম এসেছে এই সোসাইটির চেষ্টায়। পাটনাই ফুলকপি এসেছে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে, নৈনীতাল আলু এসেছে ইংলণ্ড থেকে। এ ছাড়া আমেরিকা থেকে ভুট্টা বীজ, নিউ গ্রাণাডা ও ক্যারোলিনা থেকে ধান, ফ্লোরিডা থেকে আঙ্গুরের চারা ও চীনদেশ থেকে বীজশূন্য লিচুর কলমের আমদানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সোসাইটির সব-চেয়ে বড় কাজ হল ভারতবর্ষে কুইনাইন তৈরীর জন্য সিনকোনা চাষের পত্তন করা এবং কাছাড়ের জঙ্গলে দেশীয় চা গাছের আবিষ্কার। আগে আমাদের দেশে চায়ের আবাদ খুব কমই ছিল। প্রায় সমস্ত চা-ই আসত ভারতবর্ষের বাইরে থেকে। এই সোসাইটির আসাম অঞ্চলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্যাপ্টেন ভার্ণার কাছাড়ের গভীর জঙ্গলে এদেশের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত এমন চা-গাছের প্রথম আবিষ্কার করেন, তার কৌতূহলজনক বিবরণ সোসাইটির পত্রিকার ন' নম্বর খণ্ডে লেখা আছে।

অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রথম বাগান ছিল ব্যারাকপুরে, তারপর এটি উঠে আসে বজবজ রোডের ওপর এবং কিছু অংশ কড়েয়ায়। তারপর ১৮৩৩ সালে খোদ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে এই সোসাইটি

স্থানান্তরিত হয়। প্রায় ২৫ একর জায়গা জুড়ে ৩৩ বছর ধরে এই সোসাইটির বাগান বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যেই ছিল। ১৮৬৬ সালে সেটি আবার স্থানান্তরিত হয় খিদিরপুর ব্রীজের পাশে টেলিগ্রাফ স্টোরসের খালি জায়গাটিতে। সবশেষে ১৮৭২ সালে ১নং আলিপুর রোডের তাঁদের বর্তমান জমিতে চলে আসে।

১৮২০ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই ফুল-ফলের নানারকম চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আসছে এই সোসাইটি। উইলিয়ম কেরীর আমলে বাগানের মালীরাও ভাল ফুল-ফল উৎপন্ন করে দেখাতে পারলে পুরস্কার পেত। কৃষির যন্ত্রপাতি ও উন্নত সেচ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল এই সব প্রদর্শনীতে। আজও এ'রা নানারকম প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন। সাধারণের কাছে এর দরজা আজ আরও বেশী উন্মুক্ত হয়েছে। সাধারণের মধ্যে উদ্যানতত্ত্ব শিক্ষার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমেরও আয়োজন সম্প্রতি করা হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডীন অধ্যাপক পবিত্রকুমার সেনের নেতৃত্বে।

এই প্রবন্ধটি পড়ে যদি কেউ ভাবেন উইলিয়ম কেরী কৃষি ও উদ্যান চর্চায় মগ্ন থাকতেন অধিকাংশ সময় তাহলে তিনি ভুল করবেন, তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনের এটি ছিল একটি বিশেষ দিক, এই রকম আরো বহু বিষয়ে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত হিসাব করে সময় ব্যয় করতেন, তাই তাঁর সকল কাজের মধ্যে এক চমৎকার শৃংখলা ছিল। তিনি অসম্ভব পরিশ্রমও করতে পারতেন; তাঁর একদিনের কাজের হিসাব শুনলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন পোনে ছটায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করতেন সাতটা পর্যন্ত। তারপর সপরিবারে উপাসনায় বসতেন, বাংলাভাষার মাধ্যমে সে উপাসনা হত। প্রাতঃরাশের আগে পর্যন্ত তাঁর মুনশীর সংগে ফরাসী পড়তেন। প্রাতঃরাশের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংগে রামায়ণের অনুবাদে বসতেন। তারপর কলেজে গিয়ে বেলা দুটো অবধি অধ্যাপনা করতেন। বাড়ীতে ফিরে তিনি প্রেসের সমস্ত প্রুফ দেখতেন অথবা নানা সভা-সমিতির কাজ করতেন। সন্ধ্যায় আহারের পর তিনি পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করতেন, তারপর তেলিঙ্গা পণ্ডিতের কাছে ভাষা শিখতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একলা বসে বাংলা অনুবাদ করতেন। রাত্রি ১১টার সময় গ্রীক বাইবেলের এক অধ্যায় পড়ে তিনি শুতে যেতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হলে এই ধরণের পরিশ্রমে কখনও তিনি বিমুখ হতেন না। অসুখেও তিনি খুব কম পড়েছেন।

শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরীর নিজস্ব একটি বাগান ছিল। খুব সাধারণ বাগান সেটি ছিল না। অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রাক্তন সেক্রেটারী পার্শী ল্যাংকাস্টারের মতে ফুলে-ফলে সুশোভিত কেরী সাহেবের বাগানের স্থান ছিল সে যুগে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরই। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডক্টর উইলিয়ম রক্সবারো ছিলেন কেরী [illegible] অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। [illegible] বাগানে হুগলী নদীর তীরে বসে বহু সন্ধ্যা দুই বন্ধুতে কাটিয়েছেন গল্পগুজব করে। ডক্টর রক্সবারো ছিলেন সে যুগের শুধু ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। তিনি ভারতবর্ষের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত তন্ন-তন্ন করে খুঁজে হাজার হাজার উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন—যা আজ আমাদের এক অমূল্য উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে।

একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় উইলিয়ম কেরী না থাকলে এই উত্তরাধিকারের কতটুকু আজ আমাদের হাতে আসত? উইলিয়ম কেরীই তাঁর বন্ধুর দীর্ঘ ৩৫ বছরের গবেষণার ফলাফল গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে। ছাপাখানার তখন শৈশব যুগ, একটি বিজ্ঞাপনও নিখুঁতভাবে ছাপানো তখন ছিল রীতিমত সাধনার বিষয়। রসজ্ঞ পাঠকের সাক্ষাৎ পাওয়াও ছিল অনেকটা সৌভাগ্যের কথা। সেই যুগে রক্সবারো সাহেবের 'ফ্লোরাইণ্ডিকার' মত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ছাপাবার সংকল্প নিয়ে তিনি যে রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

এক ধরণের বই আছে যার মূল্য নির্ধারিত হয় পরবর্তী যুগে। 'ফ্লোরাইণ্ডিকা' সেই ধরণের বই। এই বই-এর লেখক বা প্রকাশক কেউই এর সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে এই বইখানি বাজারে বিক্রী হত পাঁচ পাউণ্ড দরে। তখনকার দিনে পাঁচ পাউণ্ড বড় কম নয়। বইখানি সেই সময় মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য-তালিকারও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'ফ্লোরাইণ্ডিকার' ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে লণ্ডন ও কলকাতার থ্যাকার স্পিংক অ্যাণ্ড কোং ১৮৭৪ সালে বইখানি পুনর্মুদ্রিত করবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেই মুদ্রণও আজ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। এখন যে কোন মূল্যে এই বইখানি কিনতে পারে এমন বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আছে।

এই 'ফ্লোরাইণ্ডিকা' শেষ পর্যন্ত চরম মূল্য লাভ করেছে প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ স্যার জে ডি হুকারের হাতে। তিনি এই বইখানির ওপরই ভিত্তি করে তাঁর সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ফ্লোরা অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া' সম্পাদনা করেন। এই ঋণ তিনি অকপটে স্বীকার করে গেছেন তাঁর বই-এর অসংখ্য স্থানে। উইলিয়ম কেরীর দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞানের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগের ফলেই যে উদ্ভিদ শাস্ত্রের এক মহান উত্তরাধিকার সেদিন যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উদ্ভিদ শাস্ত্রে উইলিয়ম কেরীর গভীর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এত দূর স্বীকৃতি লাভ করেছিল যে, রক্সবারো সাহেবের অবসর গ্রহণের পর উইলিয়ম কেরীকে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিয়োগের কথাবার্তা এক রকম পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছিল। তখনকার দিনে উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ। পরে কোন অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। উইলিয়ম কেরী ইংলণ্ডের উদ্ভিদবিদ ও কৃষিবিদদের প্রখ্যাত সভা লিনিয়ান সোসাইটি ও রয়্যাল অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইংলণ্ডের সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া তিনি অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ভারতবর্ষের আধুনিক কৃষি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান যে এই মহাপুরুষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী তা অবশ্যই স্বীকার্য।

কলঙ্ক

সুশীল রায়

নতুন টাকা হয়েছে আমার। নতুন বড়-লোক হয়েছি। অনেক ঘা খেয়েছি জীবনে। টাকার অভাবে অনেক নাকালও হয়েছি। কিন্তু সে সব কথা ভাবতে এখন ভালো লাগে না। এখন ভালো লাগে কেবল টাকা। আর, ভালো লাগে কয়েকজন মানুষকে। টাকা-ওলা মানুষকে।

আগে মিশেছি অনেক লোকের সঙ্গে। না মিশে উপায় ছিল না।

কলকাতার ঐ যে কার্জন পার্কটা? এখন তার চেহারা অন্য রকম হয়েছে। ট্রাম-লাইন এঁকে বেঁকে ওটাকে ঝাপটে ধরেছে এখন। কিন্তু তখন ওর দশা এমন নয়। অনেক গাছ-গাছড়ায় তখন ভরা ছিল ওটা। আমি তখন প্রায়ই যেতাম ওখানে। দুপুরটা প্রায়ই কাটত ওখানে।

জায়গাটার উপর আমার একটু টান ছিল। আমার এক খুড়তুতো দিদির স্বামী সুই-সাইড করেছিলেন ওই পার্কে।

তিনি যখন সুইসাইড করেন, আমরা তখন ছোট। শুনেছিলাম, আপিসের এক মোটা টাকার হিসাব মেলাতে না পেরে নাকি তিনি আত্মহত্যা করে বসেন।

তিনি লোকটা নাকি সৎ ছিলেন। টাকা নাকি তিনি নেননি। কেবল দুর্নাম রটবে, এই ভয়েই তিনি নাকি নিজেকে লোপ করে দেন।

আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি সেই কথা। অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। অথচ, বছর কয়েক পরে, আমরা যখন খানিকটা বড় হয়ে উঠেছি, তখন বাসন্তীদির রকম-সকম দেখে কেমন খটকা লেগেছে। ছেলেপুলে তাঁর হয়নি। মানুষ তিনি একা। কিন্তু একা মানুষের বাঁচার জন্যেও তো টাকাপয়সা চাই। বাসন্তীদি টাকা পান কোত্থেকে?

যখন তাঁর স্বামী সুইসাইড করেন, তখন তাঁর বয়স তিরিশের মত। এখন তাঁর পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে।

সরু কালো-পেড়ে ধবধবে সাদা কাপড় পরেন বাসন্তীদি। গায়ে সাদা জামা। দু হাতে চারগাছা করে চুড়ি—সে সোনায় পালিশ ভালো ছিল, একটু আলো পড়লেই ঝিকমিক করত। নাকে ছিল ছোট্ট সাদা পাথরের একটি নাক-ছাবি, [illegible] ঝলকা মকমচেন।

বেশ পরিপাটি মহিলা বাসন্তীদি। পান খেতেন, আলতাপাটি সিঁদুরের মত ঠোঁটের কিনারায় দিয়ে লাল রেখা দেখা যেত। জর্দার গন্ধটা এত ভালো লাগত যে, বাসন্তীদির গলা জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলতাম, "তারার গল্প বলো বাসন্তীদি, চাঁদের গায়ে ও কিসের দাগ বলো।"

গলা থেকে হাতের বেড় খুলে দিতে দিতে তিনি উঠে গিয়ে পিক ফেলে এসে আঙুল দিয়ে ঠোঁট সাফ করে নিতে নিতে বলতেন, "কলঙ্ক"।

জিজ্ঞাসা করতাম, "কলঙ্ক কি?"

হাসতেন বাসন্তীদি, বলতেন, "কালো দাগ।"

তাঁর কাপড়ের পাড়ের দিকে তাকাতাম, কিছু ধরতে পারতাম না। হয়তো কিছু বুঝতেন তিনি, কিন্তু কিছু বলতেন না।

বলতাম, "বলো-না! কিসের দাগ?"

ভুরভুর জর্দার গন্ধ বেরত তাঁর মুখ দিয়ে। অমন সুন্দর গন্ধ আজ পর্যন্ত পাইনি কোনো জর্দায়। সেরা সেরা দোকানের পয়লা নম্বর জর্দা নিজে কিনে খেয়েও দেখেছি, অমন গন্ধ খুঁজে পাইনি।

আঙুলে কাপড়ের আঁচল জড়াতে জড়াতে বলতেন, "এই সাদা কাপড়ের এই কালো পাড় কেন জানিস?"

"কেন?"

"কলঙ্ক। তোর জামাইবাবু মারা গেছেন নাকি আমার দোষে।"

আপত্তি জানিয়েছি, বলেছি, "বারে, তিনি তো আত্মহত্যা করেছেন।"

"তাই তো!" হেসেছেন বাসন্তীদি, বলেছেন, "কিন্তু আমার জন্যেই নাকি!"

একটু থেমে বলেছেন, "বিনা দোষে দোষী হওয়ার নামই হচ্ছে ওই?"

"কি?"

"কলঙ্ক।"

চাঁদের গায়ের ওই দাগও নাকি আসলে কালো দাগ না; ওটা যে কি, লোক নাকি তা জানেই না, সেই জন্যেই ওর একটা নাম দিয়েছে তারা, বলেছে কলঙ্ক।

কলঙ্ক কথাটার মানে তখন জানা ছিল না। বাসন্তীদির কাছ থেকে মানেটা জেনে মন খুব প্রফুল্ল হল। এমনি করেই তো কথার মানে শেখা যায়। একে একে, এক-এক করে।

মানেটা শিখলাম বটে, কিন্তু মনের একটা খটকা থেকেই গেল। বিধবা মানুষ বাসন্তীদি, কিন্তু এমন বাবু সেজে থাকেন কি করে?

আর-আর বিধবা যাঁদের দেখেছি—যেমন, ফুরকুনির মা, বঙ্কার ছোট কাকিমা, হেমন্তর পিসি—তাঁরা তো থাকেন অন্যভাবে। এর মধ্যে বাসন্তীদিটা যেন কেমন আলাদাধরণের মানুষ।

তাঁকে নিয়ে আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে কথা হত। সুধীর চাকী আমাদেরই খেলার সঙ্গী, কিন্তু আমাদের থেকে একটু বেশি পাকা ছিল। সে বলল, "বাসন্তীদির কথা বলছিস? উনি অমন সাজগোজ করতে পারেন কেন জানিস?"

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

সুধীর একটু চাপা গলায় বলল, "জানিস নে বুঝি? ওঁর যে কলঙ্ক আছে।"

কলঙ্ক কথার মানে আমি শিখেছি, সেই জন্যে বললাম, "সত্যি, ওঁর কোনো দোষ নেই।

আমার কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠল সুধীর, বলল, "তার মানে? যত দোষ সব বুঝি তবে দিলীপদার?"

আকাশ থেকে পড়লাম। বাসন্তীদির কথায় মধ্যে হঠাৎ একটা নতুন মানুষকে এনে ফেলল কেন সুধীর, তা ঠিক ধরতে পারলাম না।

কিন্তু কলকাতার কার্জন পার্কের সম্বন্ধে আমার মনে কৌতূহল ক্রমেই বড় হতে লাগল। ঐ পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে নাকি বাসন্তীদির স্বামী—

বড় হয়ে সোজা চলে এসেছি এই কার্জন পার্কে। এখানে আসার কোনো পাসপোর্টের খোঁজ করতে হয়নি, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ছাড়পত্র পেয়ে গেছি। কাজের খোঁজ করার জন্যে আপিসে-আপিসে যাতায়াত করতে হচ্ছে, হয়রান হয়ে পড়লেই সোজা চলে আসতে হচ্ছে এখানে, গাছের ছায়া আছে এখানে, ঘাসের বিছানা আছে।

জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছি এই পার্কে। আর ভেবেছি, হয়তো ঠিক এই বেঞ্চটাতেই শেষ বসা বসতে এসেছিলেন বাসন্তীদির স্বামী।

কথাটা ভাবা মাত্র শরীর শিউরে উঠেছে।

নিজের মনের অবস্থাও তখন ভালো না, চারদিকে এত ঘোরাঘুরি করা সত্ত্বেও কোনো সুবিধে করা যাচ্ছে না, কখনো কোনো সুবিধে করা যে যাবে, এমন ভরসাও পাওয়া যাচ্ছে না—এমন অবস্থায় মানুষের মনে যত রকম চিন্তা আসতে পারে তা এসেছে। জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলে মানুষের মনে যে ইচ্ছে জাগে, তাও জেগেছে। যেমন জেগেছিল বাসন্তীদির স্বামীর মনে।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি আমি। হঠাৎ যদি বাসন্তীদির স্বামীকে নিজের জীবনের আদর্শ মনে করে তাঁরই মতন কাজ করে বসতাম, তাহলে আজকে আমি এমন একজন আদর্শ-পুরুষ হতে পারতাম না।

অনেক টাকা এখন আমার। অনেক খাতির। এত টাকা কি করে হল, সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। কিন্তু সে সব কথায় এখন কাজ নেই। নিজেকে নিয়ে আমি গর্ব করি। ফুটপাথে আর পার্কের বেঞ্চে যার জীবন আরম্ভ, সে কিনা আজ—কিন্তু সে কথা থাক্‌। মোট কথা আমি বড়লোক হয়েছি। শুধু তাই না, অনেকের কাছে আমি আদর্শ-পুরুষ। চেষ্টা থাকলে আর নিষ্ঠা থাকলে অত ছোট থেকে এত বড় হওয়ার আমি একটা উদাহরণ।

হাসবেন না। নিজের ঐশ্বর্যের কথা এমন চেঁচিয়ে বলছি বলে হাসবেন না। নিজের কথা নিজে না বলে উপায় কি। আমার কথা অন্য কেউ এমন দরদ দিয়ে কি বলবে?

আমার এখন জাহাজ আছে পাঁচটা। বিদেশের বন্দরে-বন্দরে সেগুলো নোঙর ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন। কেবল এই দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই না, বিদেশের লাখপতি ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমার নাম ছড়াছড়ি যাচ্ছে—মিস্টার চ্যাটার্জি অব ইণ্ডিয়া।

কলঙ্ক কথার মানে এখন জানি। আমার জীবনে অনেক কলঙ্ক আছে স্বীকার করব, কেলেঙ্কারিও কিছু কিছু ঘটেছে। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করিনে। সে সব নিয়ে মাথাও ঘামায় না কেউ। অত টাকার মানুষের ও সব একটু হয়ই—একথা স্বীকার করে সকলেই। আমিও তা স্বীকার করি।

দুঃখ হয় ওই লোকটার কথা ভেবে। নেহাৎ মনের জোরের অভাবেই ভদ্রলোক হত্যা করলেন নিজেকে। সেদিনের সেই ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই হয়তো বেঁচে থেকেন অনেক দিনের মত, এবং বলাই কি যায়—হয়তো একটা মস্ত মানুষও হয়ে উঠতে পারতেন।

নিজে বড় হয়েছি, এখন সেইজন্যে মনে হচ্ছে প্রত্যেক লোকই এ কাজ পারে, চেষ্টা করলেই পারে।

বিস্তর মহিলার মজলিসে বসে যখন ঘটা দেখি নানা ধরণের সাজের, সেই জাঁকজমকে যখন চোখ দুটো ঝলসে ওঠে তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় অন্য সাজের কথা। মনে পড়ে অন্য একটা চেহারা; যখন এই মহিলাদের জনতার মধ্যে নানা রকম সুগন্ধের ও সুবাসের ঢেউ ওঠে, তখন মনে পড়ে অন্য একটা গন্ধের কথা।

বাসন্তীদি কোথায়?

মনটা ছটফট করে উঠল। কিন্তু গর্বিত লোকের ছটফট করতে নেই, টাকাওলা লোকের এ ধরণের চাঞ্চল্য সাজে না, ধনীদের ডাক্তে নেই ওসব সামান্য ও সাধারণের কথা—এসব নিয়ম জানা সত্ত্বেও, এবং পদে পদে সে সব মেনে আসা সত্ত্বেও মনটা কেমন যেন উড়ু-উড়ু করে উঠল।

পৃথিবীর বন্দরে-বন্দরে যার নাম ছুটোছুটি করছে, সেই মিস্টার চ্যাটার্জির এই অধঃপতন দেখে দুঃখিত হলাম, মর্মাহতও হলাম। কিন্তু উপায় নেই, অধঃপতন যখন ঘটবার ঘটবেই, তা রোধ করা যাবে না। জীবনে যে সব কলঙ্কের দাগ লেগেছে, যে সব কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি, সে সবও তো একদিক থেকে ধরতে গেলে অধঃপতন।

নিজের অহংকার নিজের গর্ব নিজের দাপট আর টাকার গরম—সব-কিছু যেন পকেটস্থ করে নিলাম। বাসন্তীদির সঙ্গে দেখা করার জন্যে চললাম। নিজেরই আশ্চর্য লাগতে লাগল, চললাম আমি কোথায়, চললাম আমি কেন।

সাঁইথিয়াতে ভোরবেলা নামলাম ট্রেণ বদলের জন্যে। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ট্রেণ পেলাম দুবরাজপুরের। সাঁইথিয়া থেকে দূরত্ব সামান্যই, কিন্তু তার জন্যে পুরো একটা ঘণ্টা নষ্ট করতে হল। মিনিটে যার কয়েক হাজার টাকা রোজগার, এই সময়টা তার কাছে সামান্য না নিশ্চয়।

দুবরাজপুরে যখন নামলাম, তখন এত চেনা জায়গাও কেমন অচেনা ঠেকতে লাগল, অথচ লক্ষ্য করে দেখলাম, যেখানকার যা সেইখানেই সব আছে। সেই ষ্টেশন, ষ্টেশনের ইয়ার্ডের গায়ের সেই পাকুড় গাছটা, আমাদের খেলার সেই মাঠ—সব আগেরই মত।

কেবল আমিই বদলেছি, আমি আর আগের মত নেই।

পাল্কি গাড়িতে করে চলেছি গ্রাম্য রাস্তায়। নিজেকে কেমন বেমানান লাগছে। আমার এই দামী পোষাক, বাদামী রঙের এই কোটপ্যাণ্ট, এ সব যেন মানাচ্ছে না এখানে। রাস্তার দুপাশের লোক তাই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

এই বাড়ি। দেখেই চিনলাম। কিন্তু চেনার মত চেহারা তার নেই। আস্তর খসে গেছে, ইঁট বেরিয়ে পড়েছে।

গটমট করে ঢুকে পড়লাম। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। সেই জমজমাট বাড়ির দশা দেখে হাসি পেল। ডাক দিলাম, "বাসন্তীদি, বাসন্তীদি—"

জর্দা দিয়ে পান খেয়ে আলতাপাটি সিমের মত দুটি ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে আবির্ভূত হল না কেউ। তাই আবার ডাক দিলাম। "বাসন্তীদি—"

বাইরে থেকে ছুটে কে যেন ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

আমার দিকে চেয়ে বলল, "কাকে খুঁজছেন?"

"বাসন্তীদিকে।"

"আপনি কে?"

তাঁর মুখের দিকে চেয়েই বুকের মধ্যে কেমন চাপ বোধ হল, বললাম, "আমি নকুল।"

বাসন্তীদি চেপে ধরলেন আমার হাত, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, অবশেষে বললেন, "তুমি মস্ত মানুষ হয়েছ শুনি। শুনি আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে। এস, এস, বোসো।"

বসতে হল। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না। বাসন্তীদির শরীরের সব আস্তরও যেন খসে গেছে, যেন ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটোও ফ্যাকাশে।

বললেন, "আশীর্বাদ করি। আরও বড় হও।"

মাথা পেতে আশীর্বাদ নিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইলাম। কি কথা বলব জানি নে। খুঁজে পাচ্ছিনে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন বাসন্তীদি, বললেন "লোভ করেছিলাম ভাই, তার শাস্তি পাচ্ছি। টাকা বড় পাজি জিনিস।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের লোভ? কিসের টাকা?"

"থাক্‌।" বাসন্তীদি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "থাক্‌ সে কথা। নিজের কলঙ্কের কথা ঢাক পিটে আর বলতে চাইনে।"

বললাম, "বুঝেছি। কিন্তু তা তো ফুরিয়েছে। এখন চলছে কি করে?"

"চলছে কি আর? উনি চালাচ্ছেন।" বাসন্তীদি একটা হাত শূন্যের দিকে তুলে বললেন।

তাঁর কথা ধরতে না পেরে চাপা গলায় বললাম, "কে? দিলীপদা?"

চমকে তাকালেন বাসন্তীদি আমার দিকে, যেন ধরা পড়ে গেছেন হঠাৎ। তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তাকালাম তাঁর দিকে। পরনে থান, ময়লা হয়ে কেমন হলুদ রং হয়ে গেছে, দু-হাত খালি, গলা শূন্য।

রুষ্ট গলায়ই যেন বললেন, "ও নাম তোমাকে কে বলল নকুল? মরা মানুষকে নিয়ে কেন ওসব কথা?"

উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম দুজনে অনেকক্ষণ। চলে যাব, না অপেক্ষা করব—ভাবছি। হঠাৎ বেকুবের মত বলে বসলাম, "জর্দা দিয়ে একটা পান খেতে হবে তোমাকে।"

বাসন্তীদি বললেন, "ছি। আমি কি আর আগের মানুষ আছি? বিধবারা কি ওসব খায়?"

উত্তর দিতে পারিনি। শুধু ভেবেছি বাসন্তীদির ভবিষ্যৎ।
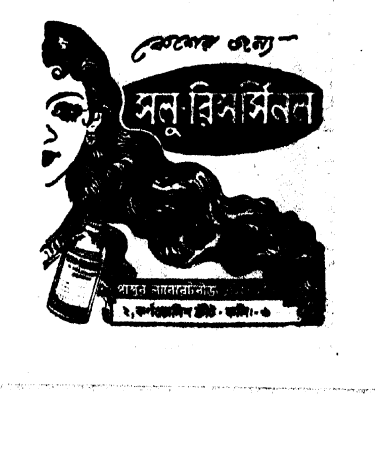
NEW
DELICIOUS
TANDOORI
DISHES
IN
AIR CONDITIONED
COMFORT
ENTRAL
HOTEL
90, CHITTARANJAN AVENUE CALCUTTA-12
Bowbazar Street and
Chittaranjan Avenue Crossing

অথচ সিঁড়িটা এক দিন এমন ছিল না

(১১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

খাবার ওপরে ওঠে। ডিস পেয়ালা প্লেট ধোয়ার জল যোগাতে যোগাতে হাতপাম্পটা ক্ষেপে যায়। এই সময় প্রমথও চরম হয়ে ওঠে। অভ্যাগতরাও বুঝতে পারে এ বাড়ির ঝি চাকরগুলো কিছু নয়।

ক্রমে ক্রমে মা ও ছেলের মধ্যে এমন একটা ব্যবধানের পাঁচিল খাড়া হয় যে, তা ডিঙিয়ে কেউই কথা বলে না। বললেও তা পরোক্ষে কিম্বা আকারে ইঙ্গিতে।

প্রমথর শ' খানেক টাকা মাইনে বাড়ে, কিন্তু তার শ্রী ফেরে না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে আশারও ফিরিস্তি বাড়ে। প্রগতির সঙ্গে গতির প্রতিযোগিতা না দিয়ে সে কি করে বাঁচবে! সে দমাদম হাল ফ্যাসানের গয়না ভেঙে মধ্য-যুগীয় ডিজাইন ধরে। রুমিদির থিয়েটারের আসরে সে একটা পার্ট বলবে এই নূতন গয়না পরে। পরীক্ষার খাতায়, রূপের বাজারে সে উঁচু দরে বিকাতে না পারলেও, এবার স্বামীর পয়সায় নিজেকে বিকশিত করবে। ইতিমধ্যেই তো তার আপ্যায়নের দুন্দুভি বেজে উঠেছে সর্বত্র।

সব শুনে একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলে, তুই ষষ্ঠীতলায় ধর্ণা দে প্রমথ। একটি ছেলেমেয়ে হলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

প্রমথ ধীরে ধীরে বলে, আমি যেন জন্ম-জন্মান্তর নিঃসন্তান থাকি। কে যোগাবে নার্সিংহোম, তারপর সাহেবী ইস্কুলের খরচ? দু হাজারেও কুলাবে না।

দূর বোকা অল্পতেও হয়। তার নজির তুই আর আমি।

এবার প্রমথ গভীর অনুতাপের সুরে বলে, তোর কথা জানিনে ব্রজেন, আমি কোনো নজিরই নই, অনেক কষ্ট দুঃখ করে আমাকে পাশ করিয়েছেন মা।

ব্রজেন জবাব দেয়, পিতা মাতা এমনি করেই সন্তানের ভিতর দিয়ে বাঁচতে চান—প্রকৃতির নিয়মই এই।

জানা কথাটা যেন নতুন করে জানে প্রমথ। তার মনে পড়ে ক্ষণিকের তপোবনের স্মৃতি। কত অল্পে সব দিক বজায় রেখে চলতেন মা। কত অল্পে ছিল তুষ্টি! আজ বারবার প্রমথকে বিবশ করে সেই চাল, সেই নিরক্ষর সুরদাস, সুরভি ঠাকরুণ, আর প্রাচীন নিমগাছটির গন্ধ। তার হৃদয় কেনই আজ যেন মা, মা করতে থাকে। কত দিন সে গলা খুলে ডাকেনি।

প্রমথ সোজা বাড়ি ফিরে আসে। ধীরে ধীরে কলিং বেলের বোতাম টেপে। সালংকারা আশা বেরিয়ে আসে নৃত্যপরা উর্বশীর মত। কিশোরী বালিকার মত প্রমথর হাত দুখানা ধরে বলে, আমি তো সুন্দরী নই, কিন্তু বল তো আমায় আজ কেমন মানিয়েছে? এই আমার অভিনয়ের সাজ। আলেয়া প্রমথকে হাত ধরে ওপরে টেনে নিয়ে যায়—বাঁকানো সিঁড়ি—প্রমথর মর্মমূলের ডাকটি আর ভাষা পায় না। তা নিভৃতেই রয়ে যায়।

অথচ একদিন সিঁড়িটা এমন ছিল না।

শিকারে স্মরণীয় যাঁরা

(১১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পার্টিতে গোবরডাঙ্গার স্বনামখ্যাত জমিদার 'জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুবাবু শিকার করিতেন।"

সুদীর্ঘকালের শিকার সাধনায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার ইতিহাস এক বিরাট ব্যাপার। প্রায় দু'শ বাঘ তাঁর শিকার পার্টিতে ঘায়েল হয়েছিল। হরিণ ও মহিষের রেকর্ড রাখা হয়নি। মুক্তাগাছার দশ মাইলের মধ্যে বিস্তর লেপার্ডের আনাগোনা—বাড়ীতে বসেই তাঁরা বছরে দশ পনেরোটা লেপার্ড খতম করেছেন। বাঘ শিকারে গিয়ে বহুবারই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে কিন্তু অতিরিক্ত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলেই তিনি কার্যোদ্ধার করে নি[illegible] ফিরে এসেছেন। একবার এক বাঘের পেছনে ছুটোছুটি করে তাঁর হাতী একটা গর্তের পারে এসে পড়েছিল—বাঘটাও যে সেই খাদের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে—তা পূর্বে জানা যায়নি। হঠাৎ একটু এগিয়ে যেতেই হাতীটা উপুর হয়ে গর্তে পড়ে গেল। তাঁর হাতের 500 Express Rifle হাওদার ডাণ্ডায় লেগে ডান নলে আওয়াজ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘেরও বিরাট গর্জন।

হাতীটা উঠে দাঁড়ালো বটে কিন্তু তার উপর মাহুতকে দেখা যায় না—সে 'দুল্‌শী'তে ঝুলছে। হাতী চালাবার জন্যে তার গলার রজ্জুগুচ্ছকে দুল্‌শী বলে। মাহুত এর সঙ্গে পা আটকে রেখে হাতী চালায়—ঘোড়ার রেকাবের মত কাজ করে। দেখা গেল মাহুতের পা দুটো ওপরে মাথা নীচে প্রাণ আছে কি নেই। এদিকে বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাতীর মাথার উপর—পেছনের দু'পা' শুঁড়ে আটকে রেখে সামনের দুপা দিয়ে হাতীর মস্তকে নখ বসিয়ে দিয়েছে। ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ পাকা শিকারী। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাঘের ঘাড়ে বন্দুকের নল লাগিয়ে একটি গুলী—ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গেই তারও পরলোক প্রাপ্তি। বাঘটা মাপে সাড়ে ন' ফুট।

'ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর শিকারী হাতীটির নাম ছিল মোহনলাল—সে শিকারেও যেমন শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি অন্য হাতীদেরও শায়েস্তা করতে মজবুত।

হরিগোপাল মুখুজ্জে এবং হরকান্ত চাটুজ্যে দুই বন্ধু হরিহর আত্মা। হরি হর বলিতে অজ্ঞান, হর হরি বলিতে অজ্ঞান। নাম শুনিয়া আপনারা ভাবিতেছেন দুজনেরই বয়স বেশি; আসলে কিন্তু দুজনেরই বয়স কম। দুজনেই তরুণ। বয়সে, লম্বায়, ওজনে, মেজাজে, মগজে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে দুজন প্রায় সমান। দুজনে একই অফিসে সমান বেতনে চাকুরি করে এবং এক মেসে একই দুই বিছানাযুক্ত অর্থাৎ 'টু-সীটেড' ঘরে দুজনে থাকে। দুজনেই নিরামিষ খায়, দুজনের কেহই ধূম পান করে না, কেহই পান খায় না এবং—বোধ হয় বলা বাহুল্য—পানদোষ কাহারও নাই। ভুবন জুড়িয়া প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে শুনিতে পাওয়া যায়; হরি বা হর কেহই এখন পর্যন্ত সেই ফাঁদে পড়ে নাই। কিন্তু এইভাবে তাহাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের ফর্দ দিতে গেলে গল্প বলা পিছাইয়া যাইবে, সুতরাং ফর্দ এই পর্যন্তই থাকুক। এইবার গল্প শুরু করি।

একদিন হরি বলিল, "হর, কিছুদিন যাবৎ একটা কথা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের ভিতর ভ্রমরের মত গুণগুণ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ দুনিয়ায় আমরা দুজনেই বড় একা। দুজনেই অনাথ, আত্মীয়হীন, স্বজনহীন। তোমার বন্ধু দুনিয়ায় মাত্র একজন, আমারও ঠিক তাই। আমাদের গলগ্রহ কেহ নাই, আমরাও কাহারও গলগ্রহ নহি। আমরা বেকায়দায় পড়িলে কেহই সাহায্য করিতে আসিবে না। ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য নহে কি? এসো আমরা ব্যাংকে কিছু কিছু করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকি, অর্থাৎ একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলি।"

হর বলিল, "কথাটা মন্দ বল নাই হরি। আমরা দুজনই যা রোজগার করি, তাহা আমাদের পক্ষে যথেষ্টর চেয়ে বেশি। খরচা বাদে ফালতু যে টাকা প্রতি মাসে বাকি থাকে, সে টাকা ব্যাংকে জমাইয়া রাখাটা কিছু মন্দ নয়। কিন্তু ভাই, আমাদের দুজনের আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হইবে, ইহা কোনও মতেই হইতে পারে না। আমরা দুই বন্ধু অভিন্ন হৃদয়, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সুতরাং একটি ভাল ব্যাংকে দুজনে মিলিয়া একটি যুগ্ম সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলিল এবং দুজনেই প্রতি মাসে সমান পরিমাণ টাকা তাহাতে জমা দিতে লাগিল। একই অ্যাকাউন্টে দুই বন্ধুর টাকা জমিতে ও বাড়িতে লাগিল। সেই জমার টাকা হইতে একটি তাম্র মুদ্রাও তোলা হইত না।

দিন যায়। রাতও যায়। কিন্তু চিরদিন বা চিররাত কাহারও সমান যায় না। ইহাদেরও গেল না। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনেকে যাহা সন্দেহ করিতেছেন, ঠিক তাহাই হইল। ইহারা দুইজনই জীবনবীমার দালালের পাল্লায় পড়িল। ঝানু দালাল অম্লান বাড়ুরী। ইহার পাল্লায় পড়িয়া বহু ঝানু বীমা-বিরোধীও জীবনবীমা না করাইয়া পারে নাই, হরিহর তো তাহাদের তুলনায় নিতান্তই গোবেচারা। আপন

হরিহর আত্মা

আপন জীবনবীমা না করাইয়া ইহারা যে কি ভয়ংকর ভুল করিতেছে, তাহা অম্লান বাড়ুরীর মুখে শুনিয়া দুজনেই এক সঙ্গে হায় হায় করিয়া উঠিল। অম্লান বাড়ুরী তখন দুজনের জন্য দুখানা ফর্ম বাহির করিল।

কিন্তু হরি বলিল, "আমরা ব্যাংকে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলি নাই, বীমাও আলাদা আলাদাভাবে করিব না। কি বল হর?"

হর বলিল, "তাহাই বলি।"

অম্লান বাড়ুরী বলিল, "খুব ভাল কথা। আমাদের কোম্পানীর যুগল বীমা পলিসিও আছে।"

হরি আর হর দুই বন্ধু এক সঙ্গে বিশ বছর মেয়াদী দশ হাজার টাকার একটি যুগল বীমা পলিসি করিল। দুজনেই মাসে মাসে সমান প্রিমিয়াম দিয়া যাইবে। বিশ বছর বাদে দুজনে এক সঙ্গে দশ হাজার টাকা পাইবে। ইহার পূর্বে একজনের মৃত্যু হইলেই বাকিজন দশ হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাইবে, প্রিমিয়ামও আর দিতে হইবে না। বিশ বছর বাদে যখন এক সঙ্গে দশ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তখন কি মজাই হইবে, ভাবিতে ভাবিতে দুই হরিহর-আত্মা বন্ধুর চিত্ত এক সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার বহু পূর্বেই যে বিধাতা অনেক কিছু কাণ্ড ঘটাইতে পারেন, সেই সহজ কথাটা সহজ বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের কাহারও মাথায় ঢুকিল না। এইভাবে দিন এবং রাত যাইতে লাগিল।

পলিসির সর্তগুলি ছাপার হরফে পড়িতে পড়িতে একদিন হরিগোপাল মুখুজ্জের হঠাৎ মনে হইল, "আমাদের টাকা বীমা কোম্পানী বিশ বছর শুদে খাটাইয়া মুনাফা মারিবে। কিন্তু ভগবান না করুন, হর যদি কালই পটল তোলে, তবে তো বীমা কোম্পানীর সেগুড়ে বালি। দশ হাজার টাকা তখন আমার পকেটে সঙ্গে সঙ্গেই গুঁজিয়া দিতে বাধ্য হইবে।" কথাটা ভাবিয়াই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত, ব্যথিত হইয়া হরিগোপাল জিভে কামড় দিল এবং আপন মনে বলিল "ছি ছি, আমি হর-র মৃত্যু কল্পনা করিতেছি। এই মৃত্যু কল্পনার মধ্যে মৃত্যু কামনা প্রচ্ছন্ন নাই তো? তবে কি শীঘ্র দশ হাজার টাকা পাইবার লোভে আমি অবচেতন মনে হর-র মৃত্যু কামনা করিতেছি? কি লজ্জা! কি লজ্জা!" কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল "অনর্থক একতরফা নিজেকেই দোষী করিতেছি কেন? হয়তো হরও ঠিক এইরূপই ভাবিতেছে।"

হরিগোপাল ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। হরকান্ত চাটুজ্যেও ঠিক অনুরূপ ভাবনাই ভাবিতেছিল, অর্থাৎ হরিগোপাল অক্কা পাইলে বীমা কোম্পানীর পকেট হইতে দশ হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে হরকান্তর পকেটে আসিবে। ভাবিয়াই হরকান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবিল "আমার একা লজ্জা পাইবার কারণ নাই। হরিগোপালও নিশ্চয় আমার মতই ভাবিতেছে।"

যুগল বীমার আগে হরিহর-আত্মা দুটি বন্ধুর প্রাণে যে সুখ এবং স্বস্তি ছিল, যুগল-বীমার কল্যাণে—অর্থাৎ অকল্যাণে—তাহাতে ভাটা পড়িল। দুজনে এক সঙ্গে সুখী ছিল, এখন দুজনে আলাদাভাবে অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। হরি ভাবিতে লাগিল, "হর

বোধ হয় দশ হাজার টাকার লোভে আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে।" হর ভাবিতে লাগিল "হরি সম্ভবতঃ ভাবিতেছে আমি কবে ফেঁসিয়া যাইব এবং বীমার দশ হাজার টাকা তাহার পকেটে ঢুকিবে।" আবার হরি সন্দেহ করিতে লাগিল হর তাহাকে সন্দেহ করিতেছে, এবং হর সন্দেহ করিতে লাগিল, হরি তাহাকে সন্দেহ করিতেছে। সুতরাং দুজনেই একদিকে

প্রথম দর্শনেই হরকান্ত
মেয়েটির প্রেমে পড়িয়া গেল

যেমন অনুতপ্ত, অন্যদিকে তেমন ক্ষুব্ধ হইয়া রহিল। এ বিষয়ে দুই বন্ধুর একটা খোলাখুলি আলোচনা এবং বোঝাপড়া হইয়া গেলে গোল মিটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু গোল মিটানো বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং হরি ও হর এ বিষয়ে কেহই কাহাকেও কিছু বলিল না। কিন্তু হরি বুঝিল হর তাহাকে কিছু বলি বলি করিয়াও বলিতেছেনা, হরও বুঝিল হরি তাহাকে কিছু বলি বলি করিয়াও বলিতেছে না। সে এক তীব্র অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। হরি ও হরের আত্মার হরিহরত্ব আর রহিল না।

এই পরিস্থিতিতে হরিগোপাল একদিন ঠান্ডা লাগিয়া জ্বরে পড়িল। ক্রমে জ্বর বাড়িল, প্রলাপ শুরু হইল। প্রলাপের ঘোরে হরি বলিল, "ভাই হর, আমি চলিলাম। আমি চলিয়া গেলে বীমার দশ হাজার টাকা পাইয়া তুমি—"

বাধা দিয়া হরকান্ত চাটুজ্যে বলিল, "ছিছি হরি, তুমি এ সব কি বাজে কথা বলিতেছ ? এই সামান্য জ্বরে কি আর মানুষ মরে ?"

হরিগোপাল উক্তরূপ প্রলাপ বকা শুরু করিবার ঠিক আগেই হরকান্ত সত্য সত্যই ভাবিতেছিল এই জ্বরে হরি মারা গেলে দশ হাজার টাকা তাহার পকেটে আসিবে। এখন তাহার মনে হইল "আশ্চর্য ! হরির কি দিব্য-কর্ণ খুলিয়া গিয়াছে ? নতুবা আমার মনের চিন্তা শুনিল কি করিয়া ?"

হরকান্ত মরিয়া হইয়া বন্ধু হরিগোপালের সেবাশুশ্রূষা শুরু করিল, কারণ হরি যদি এ যাত্রা না বাঁচে, তবে নিজের বিবেকের কাছে হর আর মুখ দেখাইতে পারিবে না।

বিধাতার বিধানেই হোক বা বীমা কোম্পানীর সৌভাগ্যবশতঃই হোক, হরিগোপালের অসুখ সারিল। সে যাত্রা হরিগোপাল বাঁচিয়া গেল। বলিল, "ভাই হর, এ যাত্রা তোমার জন্যই বাঁচিয়া উঠিলাম।"

হর বলিল, "আরে রাম রাম ! আমি নই, ভগবান তোমাকে বাঁচাইয়াছেন।" বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল হরির কথার সুরে যেন একটু ব্যঙ্গের খোঁচা ছিল। "হরি কি ভাবিয়াছিল আমি চাহিয়াছিলাম, এই অসুখেই সে গঙ্গা পাক ?" এই চিন্তা তাহার মন জুড়িয়া রহিল।

কিছুদিন গেল। হরি আবার আগেকার মতই সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। একটা কথা আগে বলিতে মনে ছিল না, সেটা এইবারে বলি। হরি ও হর দুজনেই একটি ব্যায়ামাগারের সদস্য ছিল। হর ছিল প্যারালেলবারের ভক্ত, হরি করিত বারবেল এবং বিভিন্ন ধরণের ওজন তোলার ব্যায়াম। এক সন্ধ্যায় হরি আর হর ব্যায়ামাগারে গেল। হর বলিল, "আজ প্যারালেলবারে একটা নতুন শক্ত খেলা অভ্যাস করিব। বার হইতে উল্টাদিকে ডিগবাজি খাইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িব। ভাই হরি, তুমি হুঁশিয়ার হইয়া পাহারা দিও। বেকাদায় পড়িতেছি দেখিলে কাঁধ ধরিয়া উপরদিকে ঠেলিয়া দিও যেন মাথা নিচে দিয়া মাটিতে না পড়ি।"

এ ধরণের পাহারা দেওয়া হরির পক্ষে নূতন নহে। সে বলিল "আচ্ছা" কিন্তু কি ছিল বিধাতার মনে, হঠাৎ আধা সেকেণ্ডের এদিক ওদিক হওয়ায় হরির হাত ফস্কাইয়া হর বেকাদায় মাটিতে পড়িয়া গেল। ঘাড় ভাঙ্গিল না বটে, কিন্তু হর যেচোট পাইল তাহার ফলে তাহাকে পনেরো দিন বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইল।

হরি বলিল "ভাই, ক্ষমা করো আমাকে। আমার একটু ভুলের জন্য আরেকটু হইলেই তোমার প্রাণ যাইত।"

হর বলিল "আরে রাম রাম। তুমি তো আর আমাকে মারিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া ভুল কর নাই। ইচ্ছা করিয়া করিয়াছিলে কি ?"

শুনিয়া হরির সন্দেহ হইল হর সন্দেহ করিয়াছে হরি ইচ্ছা করিয়াই ভুল করিয়াছিল, যেন "প্যারালেলবারে ব্যায়াম করিতে গিয়া দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু' শিরোনামায় হরকান্ত চাটুজ্যের অকাল মৃত্যুর সংবাদ শীঘ্রই সংবাদপত্রে ছাপা হইতে পারে, এবং হরকান্তর মৃত্যুর ফলে বীমার দশ হাজার টাকা হরিগোপালের পকেটে আসে।

হর যাহা ভাবিয়াছিল তাহা অনেকটা এইরূপ "পড়িয়া আমি ঘাড় ভাঙিয়া মারা যাই, সচেতন মনে হরি এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এত বড় শয়তান হরি নিশ্চয়ই নয়। ইচ্ছাটা সম্ভবত হরির অবচেতন মনেই জাগিয়াছিল এবং তাহার ফলেই সে হঠাৎ ঐরূপ আনমনা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও তো আমার পক্ষে কম মারাত্মক নয়। হরির অবচেতন ইচ্ছার ফলেই মরি, অথবা সচেতন ইচ্ছার ফলেই মরি, আমার পক্ষে একই কথা।"

এইভাবে দুজনের ভিতরে পারস্পরিক সন্দেহ ঘনাইতে লাগিল। কিন্তু দুজনেই সন্দেহ আপন মনে গোপন রাখিল। দুজনে একই সঙ্গে থাকিতে, আফিস যাইতে, যুগ্ম ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে এবং যুগল বীমার প্রিমিয়াম দিতে লাগিল। কিন্তু—ঐ যে আগেই বলিয়াছি—হরিগোপাল এবং হরকান্ত আর হরিহর আত্মা রহিল না। এই অবস্থায় (অথবা পরিস্থিতিতে) একদিন......

অফিসের কাজের শেষে বড়বাবু হরিগোপালকে বলিলেন "হরি, আজ আরেকটু থাকিয়া যাইতে পার ? একটা জরুরি কাজে আমাকে যদি একটু সাহায্য কর তো বড় ভাল হয়।"

হরি থাকিয়া গেল। চাকুরি জীবনে এই প্রথম হর অফিস ফেরৎ একা পথে বাহির হইল। এতদিন হর ভাবিত অফিস হইতে হরিহীন হইয়া ফিরিতে না জানি কি খারাপই লাগিবে! কিন্তু আজিকার এই একা ফেরার ভিতর হর বেশ নূতনত্বের স্বাদ পাইল। টিকেট কিনিয়া একটা সিনেমা হলে ঢুকিয়া পড়িল। ইহার পিছনে বিধাতার কিঞ্চিৎ চক্রান্ত (বা মতলব) ছিল বলিয়াই মনে হয়, কারণ হলে ঢুকিয়া নিজের নম্বরী আসনে বসিয়াই হরকান্ত দেখিল তাহার পাশের আসনে এক অনিন্দ্য সুন্দরী অষ্টাদশী। প্রথম দর্শনেই হরকান্ত মেয়েটির প্রেমে পড়িয়া গেল। এই প্রেমের ফলে বেচারার ভাল করিয়া ছবি দেখা হইল না, সুন্দরীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সারাক্ষণ আনমনা হইয়া রহিল। ছবি শেষ হইবার পর হরকান্ত মেয়েটির পিছু নিয়া দূর হইতে তাহার বাড়ী চিনিয়া আসিল।

বড়বাবুর সঙ্গে আধ ঘন্টা কাজ করিয়া হরিগোপাল মেসে ফিরিয়া দেখিল হরকান্ত ফেরে নাই। হরকান্ত ফিরিল রাত ন'টায়।

হরি শুধাইল "কোথা গিয়াছিলে হর! এত দেরি হইল ?"

হর বলিল "সিনেমায়।"

হরি বলিল "ও।" এই একটি আওয়াজে বোঝা গেল হর একা সিনেমায় যাওয়াতে হরি মনে বড় আঘাত পাইয়াছে।

হরি বা হর কখনও সিনেমায় যাইত না। কথাটা এ যুগের পাঠক পাঠিকাদের কাছে একটু অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে, কিন্তু কথাটা আমি এতটুকু বাড়াইয়া বলি নাই। হরি ভাবিল "হর শেষকালে সিনেমায় গেল ? তাও আমাকে ছাড়া, আমাকে লুকাইয়া ?" তারপর ভাবিল "না না, লুকাইল কোথায় ? প্রশ্ন করা মাত্রই তো বলিল সিনেমায় গিয়াছিল।" তারপরই আবার ভাবিল "স্বীকার কি আর সাধে করিল ? বড়বাবু আমাকে এত শীঘ্র ছাড়িবেন,

দুজনের ভিতরে পারস্পরিক সন্দেহ
ঘনাইতে লাগিল

হর তাহা ভাবিতে পারে নাই। মেসিতে ফিরিয়া আমার সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়িয়া গিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল সিনেমায় গিয়াছিল।"

হরির মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল; হরির মুখের ভাবে তাহা প্রকাশ পাইল, কিন্তু মুখের কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না। হর সিনেমায় কি ছবি দেখিয়া আসিল, কেমন

লাগিল, হরি এসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না। একা সিনেমা দেখিয়া আসিয়া হর ভিতরে ভিতরে কিঞ্চিৎ অনুতাপের জ্বালা অনুভব করিতেছিল, হরি এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করিলে দুই চারি কথা বলিয়া ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া ফেলা যাইত। কিন্তু হরি হরকে সে সুযোগ দিল না। হরকান্ত সন্দেহ করিল ইহা হরিগোপালের শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নহে, মনে মনে কৌতূহলে ফাটিয়া পড়িতেছে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেছে না। হরির এই কপট নির্লিপ্ততায় হর অপমানিত, আহত বোধ করিল, ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিল না। নির্বিকারত্বের ভান করিয়া হরির নকল নির্বিকারত্বের জবাব দিল। দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের মাঝখানে যে ফাটল ধরিয়াছিল, সে ফাটল ক্রমেই বৃহত্তর হইতে লাগিল।

হরকান্ত সিনেমা দেখিয়া প্রথম দর্শনেই যে মেয়েটির প্রেমে পড়িয়াছিল তাহার নাম মীনাক্ষী, সংক্ষেপে মীনা। মীনা মাতৃহীনা, কিন্তু পিতৃহীনা নহে। এবং হরকান্ত তাহার অতি-রোমান্টিক চোখে মীনাকে যতটা সুন্দরী দেখিয়াছিল, আসলে সে ততটা সুন্দরী নহে। এই আসল কথাটা মীনাকে একাধিকবার দেখিয়াও মুগ্ধ তরুণ হরকান্ত চাটুজ্যে বুঝিতে পারিল না। তারপর কিভাবে মীনার সঙ্গে, এবং পরে তাহার বাবার সঙ্গে হরকান্ত আলাপ জমাইল এবং হরিগোপালের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাদের বাসায় যাতায়াত করিতে লাগিল সে এক আলাদা কাহিনী, এখানে বলার দরকার নাই। মীনার বাবার পরিচয়টা দেওয়া দরকার, নাম না বলিলেও চলিবে। তিনি জনৈক পেনশনপ্রাপ্ত সরকারী কেরাণী, মাসে মাসে রোগা পেনশন পাইয়া থাকেন। নিজের চাইতে মেয়েকে বেশি যত্ন করেন বলিয়া মেয়েটি তাঁহার পেনশনের মত হয় নাই।

হরকান্ত একদিন মীনাকে আবেগকম্পিত কণ্ঠে তাহার প্রাণের কথা বলিল। মীনা বলিল "বাবাকে বল।" হরকান্ত তাহাই করিল, অর্থাৎ মীনার বাবাকে তাহার (হরকান্ত চাটুজ্যের) প্রাণের কথাটা বলিল। বলিল "আমি আপনার মেয়ের প্রেমে পড়িয়াছি।" মীনার বাবা বলিলেন "বেশ। এখন কি করিতে চাও?" হরকান্ত বলিল "মীনাকে আমি বিবাহ করিতে চাই।" মীনার বাবা বলিলেন "মীনার মত আছে?" হরকান্ত বলিল "আছে। এখন আপনার মত হইলেই হয়।"

শুনিয়া মীনার বাবা কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন "দেখ বাপু, এ জীবনে লায়লা মজনু, শিরীন ফরহাদ, রোমিও জুলিয়েট অনেক দেখিয়াছি। প্রেম ট্রেম ঐ দু'চার দিনের ব্যাপার, ধোপে টেকে না। সুতরাং তোমার প্রেমের ওজন কত, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি কি চাকুরি কর? বেতন কত? ফিউচার প্রস্‌পেক্ট কিরূপ?"

হরকান্ত বলিল। শুনিয়া মীনার বাবা বলিলেন "হুঁ।" বলার ভঙ্গি এবং আওয়াজ শুনিয়া বোঝা গেল হরকান্তর জবাব মোটামুটি রকমে তাহার মনঃপূত হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটু 'কিন্তু' রহিয়া গিয়াছে।

হরকান্ত বিনীত কণ্ঠে বলিল "মীনাকে যদি আমার হাতে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে—"

মীনার বাবা বলিলেন "তোমার বেতনটা আরেকটু বেশি হইলে খুশী হইতাম হরকান্ত। অবশ্য এই বেতনেও আপত্তি করিতাম না, যদি—"

"যদি????"

"তোমার হাতে কিছু পুঁজি থাকিত।"

"কত?"

"এই ধর হাজার কয়েক।"

ফস করিয়া হরকান্তর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল "দশ হাজার?"

মীনার বাবা বলিলেন "অন্তত। ও টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকিলে শতকরা তিন টাকা হইলেও মাসে পঁচিশ টাকা সুদ হইবে। পঁচিশটা টাকা এ বাজারে কিছুই নয়, তবু যা হোক তাহাতে মীনুর খুচরা হাত খরচার কিছুটা চলিতে পারিবে।"

মীনার বাবার সঙ্গে এই পর্যন্ত কথা হইয়া রহিল। হরকান্ত বুঝিল মীনার বাবা এক কথার মানুষ, এবং দশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট দেখাইতে পারিলেই তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহার এক আধলা কমে রাজি হইবেন না। তাহার (হরকান্ত চাটুজ্যের) ও মীনার মিলনের একমাত্র সেতু এই দশ হাজার টাকা। সঙ্গে সঙ্গে দশহাজারী যুগল-বীমার কথা মনে পড়িল, আর সঙ্গে সঙ্গেই হরকান্ত ভাবিল "ছিঃ!"

হরি ও হর যুগ্মভাবে কয়েকবার লটারির টিকেট কিনিয়াছিল, দুজনের ভাগ্যে টাকা পাইবে আশা করিয়া। একবারও পায় নাই। হরকান্তর এখন মনে হইতে লাগিল হরিগোপালের দুর্ভাগ্যের জন্যই পায় নাই। সুতরাং এবার হরকান্ত গোপনে একাই লটারির টিকেট কিনিল। কিন্তু এই গোপন কথাটা গোপনে হরিগোপালের গোচর হইল। হরি মনে বড় আঘাত পাইল, কিন্তু মুখে হরকে কিছুই বলিল না। হর জানিল না তাহার গোপনে লটারির টিকেট ক্রয়ের খবরটা হরি গোপনে জানিয়া ফেলিয়াছে। সে গোপনে আশা করিতে লাগিল মীনার ভাগ্যে এবার প্রথম পুরস্কার অন্তত হাজার চল্লিশেক টাকা উঠিবেই। (হরকান্ত তাহার নামের টিকেটের উপর 'নম-ডি-প্লুম' অর্থাৎ পোষাকী নাম লিখিয়াছে 'মীনা'।) উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া—এবার আলাদাভাবে শুধু নিজের নামে—কুমারী মীনাক্ষী দালালকে শ্রীমতী মীনাক্ষী চাটুজ্যে বানাইয়া মেস ছাড়িয়া দিবে। হরি একাই মেসে বিরাজ করুক। মেস ছাড়িয়া আলাদা একটি নূতন বাসা করিবে, না শ্বশুর মহাশয়ের ঐ বাসাতেই থাকিবে, সে কথাও হরকান্ত ভাবিল। মেয়ে-জামাই আলাদা বাসা করিলে এই বয়সে বিপত্নীক ভদ্রলোক একা থাকেনই বা কি করিয়া? যাহা হউক, সে সম্বন্ধে মীনুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যা হোক ঠিক করা যাইবে। মনের এই চিন্তাধারা হর হরির কাছে কিছুমাত্র প্রকাশ করিল না। যুগল বীমার প্রিমিয়াম হরি ও হর দুজনেই সমানভাবে নিয়মিত দিয়া যাইতে লাগিল।

(শেষাংশ ১৪২ পৃষ্ঠায়)

পরশ যে এত সরস এবং তা থেকে যে এত হরষ আমদানি হতে পারে তা যৌবনপ্রাপ্তি ঘটা না পর্যন্ত কল্পনাতীত। দেহটার উপর চামড়ার আস্তরণ যেন ঠিক ফলের ওপর খোসা। তা হলে আমরা নিশ্চয় কোন ফলের মত যা কিছু? ঠিক জানবেন এ এক এক রকম মাকাল ফল বিশেষ। এখন মলাটের স্বর্ণযুগ। বই-এর ওপর যেমন চকচকে মলাট হলেই চলে তেমনি বউ-এর ঝকঝকে ললাট হওয়াই লোভনীয়। ভিতরে কি থাকল আর না থাকল সেটা কিছু বড় কথা নয়। বাইরের খোলসটা খোলতাই হলেই দাম খুব মাপ। কটা চামড়ার জয় সর্বত্র। সবাই তাই-ই পেতে চায়। যাদের চামড়া জন্মে সাফ নয় তাদের আছে নানা চেষ্টা চরিত্র—ঘষে-মেজে, সেজে-গুজে ভোল বদলে হবার বাসনা নীলবর্ণ শৃগালের মত শ্বেতবর্ণের যা কিছু।

দোষ আমাদের কারও নয়। মামাই অমন কাণ্ডটা বাধালেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেদের ওপর সূর্যি মামার দান অকৃপণ—প্রখর তপন-তাপে গায়ের চামড়া হয়ে ওঠে তাই। চোখের কাজল পিছলে গিয়ে সর্বাঙ্গে বুলোনো হয়ে যায়। ভাগ্য চামড়ার সাফ হওয়া বা না হওয়ার ওপর মনের সাফ থাকা বা না থাকা নির্ভর করে না।

চামড়া আছে তাই রক্ষে—নিজ নিজ মূর্তির আড়ালে আবডালে আমরা 'ভদ্রলোক'-এর মত হয়ে আছি। সবাই কিন্তু আসলে এক-একটি কর্মচোরা জাম। দেহের ওপর চামড়ার একাধিক কাজ। তার প্রথম দায়িত্ব সমস্ত দেহের ওপর চৌকীদারী করা। কোথাও থেকে না বহিঃ-শত্রু দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ যৌবনপ্রাপ্তির পর সারা দেহে কান্তির প্রলেপ বুলোনো হয় এই ত্বক থেকেই। তখন সারা দেহের ত্বক তেল চুকচুকে মসৃণ হয়ে থাকে। অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ত্বক শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। দেহকে সাজানর ব্যাপারে চামড়ার দান অনেক—লোম লাগিয়ে কিংবা পালক পরে অথবা আঁশ বাগিয়ে শরীরকে এগিয়ে দেওয়াতে এই ত্বকের প্রয়োজন অশেষ। সব প্রাণীর দেহেই কিছু না কিছু আবরণের আচ্ছাদন থাকে। এককোষী জীব অ্যামিবারও গায়ে আছে তার মত আচ্ছাদন—নিজের সেলের চৌহদ্দী রচনা করছে তার সেল-মেমব্রেণ। বহু-কোষী জীবদেহে ত্বক তৈরী হয় যে বাইরের এপিডারমিস স্তর ও ভিতরের ডারমিস স্তর দিয়ে। এপিডারমিস ত্বক হিসাবে কখনও একক বা বহুস্তরবিশিষ্ট হতে পারে। এপিডারমিসের বাইরে থাকে শক্ত কিউটিকলের আর এক আচ্ছাদন। কিউটিকল সজীব স্তর নয়। মেরু-দণ্ডী প্রাণীর অঙ্গবাস আরও অনেক বেশী চমকপ্রদ। মাছের গায়ে যে ত্বক থাকে তার বহুনিরাদ তৈরী এক স্তর বিশিষ্ট এপিডারমিস দিয়ে এবং সেখানে অনেক গ্রন্থির সমাবেশ দেখা যায়। এই সব গ্রন্থি থেকে দেহ ভিজিয়ে রাখার জন্য সব সময়ে শ্লেষ্মা বার হয়। তাই মাছের গায়ে হাত দিলে এত পিছল লাগে। এছাড়া থাকে ডারমিস যা থেকে আঁশ তৈরী হয়। ব্যাঙ জাতীয় জীবের বহিঃআবরণে সর্বদা সিক্ত ভাব থাকে এবং সেখানেও ত্বকে অনেক গ্রন্থি দেখা যায়। সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের গা অনেকটা শুখনো। এদের এপিডারমিস বহুকোষ দ্বারা গঠিত। ওদের ত্বকের দুটো ভাগ—বাইরের দিকে এপিডারমিস ও তার ভিতরের দিকে ডারমিস স্তর। এই ডারমিস স্তরে বহু রকম জিনিষ সাজান থাকে। এপিডারমিসের বাইরে কিউটিকলের প্রলেপের এনামেল। এপিডার-মিসের স্তর কঠিন আকার ধারণ করে পায় করনিফায়েড এর অবস্থা।

এই ডারমিস স্তরে বহু রকমের জিনিষের মধ্যে অজস্র কেশ গ্রন্থি দেখা যায়। দেহের কেশ-সম্ভার উত্থিত হয় এক-একটি কেশ গ্রন্থি থেকে। রক্তের সঙ্গে কেশ তৈরীর মাল-মসলা আসে—এই সব কেশ গ্রন্থিতে তা পরিপাক হয়ে কেশের আকার ধারণ করে। জীবন ভোর অন্ততঃ যতদিন চুলের বাড় দেখা যায় ততদিন রক্ত থেকে মাল-মসলা নিয়ে কেশ গ্রন্থিতে চুল তৈরীর কারখানা কাজ করে। এছাড়া ডারমিসে আছে বহু ঘর্ম-গ্রন্থি। রক্ত থেকে দূষিত জলীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে ঘর্ম-গ্রন্থিতে তাদের আলাদা করা হয় এবং ঘর্মনালী দিয়ে শরীরের বাইরে পাঠান হয়। ঘর্ম-গ্রন্থিদের কাছে আছে বরুণদেবের আর এক পিচকারী। ঘর্ম-গ্রন্থি ছাড়াও এই স্তরে আছে তৈল গ্রন্থি—যার ভাল নাম সিবেশাশ গ্রন্থি। এই সব সিবেশাশ গ্রন্থি থেকে তেল জাতীয় পদার্থ সিরাম নির্গত হয় শরীরকে তেল চুকচুকে রাখার জন্য। তৈল গ্রন্থি থেকে নালী উঠে ত্বকের বাইরে কিউটিকলের দিকে মুখ খোলে। তা ছাড়া এ স্তরে মজুত থাকে রঞ্জক বা পিগমেন্ট। পিগমেন্টের প্রাচুর্যে গায়ের রং গাঢ় দেখায়। অভাবে হাল্কা। সূর্যালোক অবিরত প্রতিফলনে অধিক সংখ্যক পিগমেন্ট তৈরীতে সাহায্য করে। গায়ে পিগমেন্ট থাকলে সূর্যালোক সহন শক্তিও বাড়ে। এই সব পিগমেন্ট নষ্ট হয়ে গেলেই শ্বেতী বা ধবল। এছাড়া ডারমিসের মধ্যে চুল দাঁড় করানোর পেশী, স্নায়ুর যোগাযোগ, রক্তের ঝিল্লি প্রভৃতি আরও জিনিষ আছে। ডারমিসে যে মাংসপেশীর তৈরী হয় তা বিভিন্ন নালী দিয়ে এপিডারমিসের বাইরে এসে মুখ খোলে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ত্বকও একটি বিশেষ ধরণের অঙ্গ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের মত এও দিনে দিনে বাড়ে। ত্বকের চিরসজীব অংশটি হল এপিডার-মিসের ভিতরকার ম্যালপিঘির স্তর—সেখা[ন] থেকেই এই বাড়ার ইন্ধন ক্রমাগত যোগানো [হয়] ও তারা এপিডারমিস থেকে ডারমিসে এসে বাসা বাঁধে।

কদাচিৎ কখনও ত্বকের ওপর গলার পাশে [বা] ঠোঁটের কোণে খুদে একখানি তিল থাকে ও [তা] অপরূপ হয়ে ওঠে—তার দাম লাখ টাকা। এ [...] হল সাবেকী আমলের চামড়ার উপরে মোড়[ক] করার প্রথা। তখন মুখে মুখে এই মুখের ক[থা] কত কাণে কাণে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কা[ছে] সৌন্দর্যের আর এক রূপ আছে। দেহলাব[ণ্যে] অসামান্য কোন জনের ত্বককে অতি বৃ[হৎ] আকারে এবং অতি নিকট থেকে যদি দেখা য[ায়] তা হলে যে দেখছে তাকে নিরাশ হতেই হ[বে]। অত সুন্দর, মসৃণ, কমনীয় ত্বককে তখন ম[নে] হয় বসন্তের দাগের মত অসংখ্য ছোট [...] ফুটোয় ভর্তি। তা ছাড়া স্পষ্ট করে [...] আরও ধরা পড়বে খুদে খুদে বাঁশ ঝাড়ের [মত] অসংখ্য কেশাগ্রভাগ। যেমন Yarrow Visit[ed] এর চেয়ে Unvisited ভাল তেমনি sk[in] observed এর চেয়ে skin unobserv[ed] হয়ে থাকাই ঢের ভাল।

কার্যক্ষেত্রে ত্বকের নানা রূপান্তর ঘটে থা[কে]। আমাদের দাঁত, নখ এসব হল ত্বকের রূপান্ত[রের] দৃষ্টান্ত। তাবৎ পশুকুলে এই ত্বকের কত বি[চিত্র] রূপান্তর হয়েছে। আজব আকার পেয়েছে মা[ছের] আঁশে, ব্যাঙের হতকুচ্ছিত বহিরাবরণে, স[রী]সৃপের আঁশে, পাখীর পালকে, স্তন্যপা[য়ীর] চুলে। আমাদের চোখের ভিতরের দে[খার] লেন্সটারও উৎপত্তি ভ্রূণের ত্বক থেকে। পা[খীর] চঞ্চু, গরু, ভেড়ার পায়ের খুর, নিজেদের [...] কচ্ছপের পিঠের খোলা, গণ্ডারের শিং [...] ত্বকের বিচিত্র রূপান্তর। কোন কোন প্রা[ণীর] ত্বকের নীচে পুরু করে চর্বির আর একটা [স্তর] থাকে—দেহের তাপ সুরক্ষিত রাখার জন্য। এ[র] দৃষ্টান্ত মেলে তিমি, সীল প্রভৃতি প্রাণ[ীর] মধ্যে।

সবচেয়ে বড় কথা চামড়া শর[ীরের] স্পর্শেন্দ্রিয়। চামড়ার মধ্যে আমাদের অনুভ[ূতির] মৃদঙ্গ চাপা আছে। কেমন করে কে কো[ন] কাকে টোকা মেরে কি বোলতাল তুলবে তা [...] থেকে জানা নেই। কবি বলেছেন শুধু বাণী [নয়,] পরশখানি দিও। সকল রকম পরশের [...] মাধুর্য আমরা বুঝতেই পারতুম না য[দি] আমাদের ত্বকের ওপর বিভিন্ন জায়গায় বি[ভিন্ন] রকমের স্পর্শকোষ এবং তাদের সঙ্গে স্[নায়ু]মণ্ডলীর যোগাযোগ থাকতো। এই স্পর্শকো[ষের] আলোড়নের ফলে হয়ে উঠে অমৃত পরশ [...] উল্লসিত প্রাণ। সারা শরীরের মধ্যে আঙ[ুলের] প্রান্তে, ওষ্ঠে, কাণের পিছনে স্পর্শবে[দী কোষের] সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সুখ স্পর্শ অনুভব [...] ছাড়া শীতলতা বা উষ্ণতা অনুভব করার [জন্য] আছে রকমারি স্পর্শকোষ।

ত্বক শুধু দৈহিক নয় সামাজিক ধম[...] বাঁচিয়ে চলার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন ওরাদের [...] বহুরকমারি পাশ বালিশ লুকানো অ[...] টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না জামা কেমন। এ[...] পশুকুলে রব উঠেছে নিতে হলেও মা[...] চামড়াই নেওয়া ভাল। ও বহুরূপী সাজের [...] নেই। মানুষ যে এত সুক্ষ্মচারী তা বো[...]

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

পরগাছা
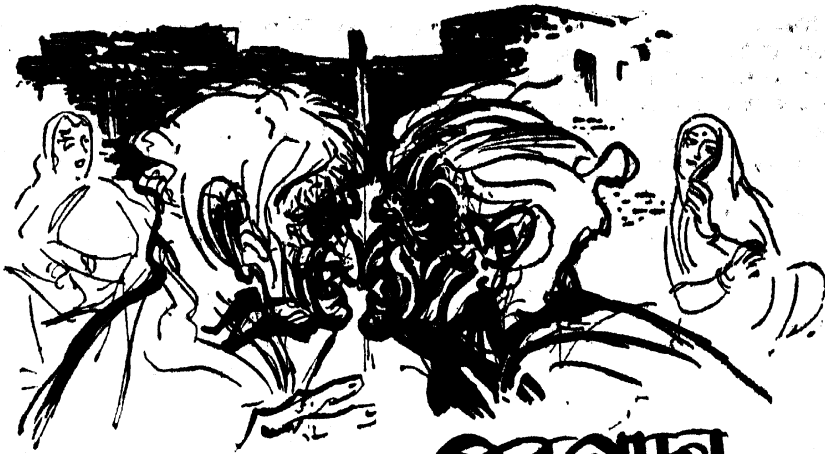
মায়া বসু

ছোট তরফ বড় তরফ। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো দুই ভাই। দুই শরীক। এ-মহল, ও-মহল।

একদা প্রাসাদের মত বিরাট দত্ত বাড়িটায় পার্টিশন উঠেছে বহুদিন। অবশ্য পুরোপুরি মুখ দেখাদেখিটা বন্ধ করা যায়নি। উপায় ছিল না তাই।

তবু সেটাতো নিজেদের হাতের মধ্যে। চট করে সরে গেলেই হল দেখতে না পাবার ভাণ করে!

অথবা ভারী পর্দাটানা জানলা-দরজাগুলোর কপাটগুলো বন্ধ করতেই বা কতক্ষণ?

কিন্তু মুখ না দেখালেও কানতো আর বন্ধ করে রাখা যায় না ওগুলোর মত। ভাগ করা বাড়িটার পাঁচিলের এ-পিঠ ও-পিঠ বইতো আর নয়। বরং সমস্ত ইন্দ্রিয় বাদ দিয়ে যখন ঐ ইন্দ্রিয়টিকেই খুলে রেখে উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয় সদা-সর্বদা?

আর যখন নাকি দুই তরফের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি হিংসা দ্বেষ তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত ঝলসাচ্ছে অনবরত!

এ বাড়ির মামলা-মোকদ্দমা জেতার খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই এ তরফের ছোটবাবু শিবনাথ দত্তের দূ—দূর সম্পর্কের পিসি মোক্ষদার গলাটা আনন্দের চোটে ঢোলের মত ঢন ঢন করে বেজে ওঠে। ও তরফকে ভাল করে শুনিয়ে শুনিয়ে।

পাঁচ ইঞ্চির ইঁটের দেওয়াল কেন, সাউণ্ড প্রুফ ওয়াল হলেও বোধ করি ও বাজখাই গলা পেঁছিত যথাস্থানে।

শেষ পর্যন্ত আমার শিবুই মামলা জিতে এলো। ও ছোট বৌমা, সব কাজ ফেলে বেশ ভারী করে ডালা সাজাও। একশো আট জবার পুজো মানত করা আছে কালীঘাটে, মনে নেই সে কথা? একটু তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে তো আবার?

এই পর্যন্ত বলে দেওয়ালের ধার ঘেঁসে এগিয়ে এসে কানটা খাড়া করে মোক্ষদা পিসি অপেক্ষা করে থাকে।

ও তরফ থেকে প্রতিবিধানের কোন সাড়া শব্দ আসে কিনা শোনবার জন্যে।

কিন্তু ও দিক নিঃশব্দ। তখনও। সুতরাং গলার জোর বাড়ে। আগের বারের চেয়েও।

আমার শিবু তো 'অধম্মো' করেনি জীবনে, তাই মামলা জিতে ড্যাং ডেংগিয়ে উঁচু মুখ করে বাড়ি ফিরে এলো। বলি পারলি তোরা কেউ ওর সঙ্গে? সবাই যুদ্ধে বশ হয়, ভগোমান হয় না। মাথার ওপর চাঁদ সুয্যি নিয়ে ড্যাব-ড্যাবিয়ে দেখছেন তো চেয়ে চেয়ে।

সকাল পেরিয়ে বেশ একটু বেলাই হয়েছে। দু তরফের কর্তাবাবুরা অন্দর মহল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। এদিককার মত পার্টিশনের ওপাশ থেকেও ভেসে আসছে সকালবেলার সংসার-চক্রের দ্রুত ঘূর্ণির শব্দ। ঝাঁটার আওয়াজ। ছড় ছড় করে জল পড়ার শব্দ। বাসন মাজা, কাপড়কাচা সেই সঙ্গে ঠাকুর চাকর ঝিদের কাজ-কর্ম নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি। প্রত্যেকেই এক সঙ্গে প্রমাণ করতে চাইছে যে, সে একলাই সব কাজ করে মরে, বাদবাকী সবাই ফাঁকিবাজ।

কিন্তু সেই সব শব্দ, [illegible] করতালের মত খন খনে গলা শোনা যায় এবার।

বলি ও সুবল, এই যে বাজার [illegible] জলজ্যান্ত মাছ নে এলি পুকুর থেকে, তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থে কর। ও মণ্ডলের মা, ইদিকে এসো না বাপু মশলাটা বেটে দে। এতো আর বাজার থেকে সেরখানেক পচা কাটা পোনার টুকরো নয়, যে পাঁচ মিনিটে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে।

মর্মঘাতী তীর যথাস্থানেই বিঁধলো। আগের দিনেই ছোট তরফের বাজার থেকে আনা মাছটা বেশ একটু নরম ছিল। কোটবার সময় তাই নিয়ে চাপা গলায় বেশ একটু কথাবার্তাও হয়েছিল। পাঁচ ইঞ্চির দেয়াল ভেদ করে যা ঠিক ও-বাড়ির বড় তরফ শম্ভুনাথ দত্তের সহধর্মিণী রাজলক্ষ্মীর মায়ের মাসতুতো বোন ভবতারিণীর সে দেয়ালে পেতে রাখা কান ঠিক গিয়ে [illegible]। আজ মোক্ষদা পিসির প্রত্যুত্তরে [illegible] থেকে শানিয়ে রাখা [illegible] যথাস্থানে [illegible]—যথাসময়েই।

এই [illegible] আরো [illegible] উঠলো ওপারে [illegible]। [illegible] কথা কাটাকাটি এবার সম্মুখ সমরের [illegible] হল।

ওলো ও ভাই, [illegible] এ-বাড়ি রইছি, শিবুকে কোলে পিঠে [illegible] করিচি, তোদের পুকুরের কথা তো [illegible] বাপু? তোর শ্বশুরবাড়ি বুঝি নতুন পুকুর কেটেছে? মণ মণ মাছ ধরে আনছিল, যেমন [illegible] আর বেড়াল তপস্বী সেজে থাকিস কেন, তুইও [illegible] কর—

ও পক্ষও গলা চড়ালো। পাড়াকে কথা সভার মাঝে যার কথা তার গায়ে লাগে। মুখ নাড়িসনি লো মাকি, মুখ নাড়িস নি। তবু যদি তোর একাদশীর দিনের খাওয়া চোখে না পড়তো। আমার শ্বশুরে বাড়ির মাছ কোন দুঃখে খাবে না আমার শম্ভু? জেলেরাও মরেনি, আর পুকুরও শুকোয়নি পিসীধিমির। [illegible] বাছা আমার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনছে, সস্তায় পচা মাছ খাবার [illegible] দরকার হবে না। এমন দশা হয়নি এখনো, বুঝলি?

কি বললি আঁ? [illegible] এত বড় কথা? আমার শিবু [illegible] খায়? ওলো তাই, তবে শোন। [illegible] ছেলেমেয়েরা যা খায়, তা দেখলে [illegible] কাঁড়ি টাকা আনেওয়ার' চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

পার্টিশনের এ [illegible] ও [illegible] একসঙ্গে খোল-করতাল বেজে উঠলো। [illegible] বাড়ির দুই

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উপায় নেই কারণ মানুষের গায়ে আছে এই অদৃশ্য খোলস। হিংস্র বাঘ দাবী করছে—তোমরা তোমাদের স্বধর্ম বজায় রাখতে আমাদের বাঘছাল নাও, আমরা আমাদের রাখতে নেবো এবার মনুষ্য ধর্ম।

হিমালয়ে না গিয়ে সংসারে থাকলে ও বাঘছাল নিয়ে কার কি লাভ? এখন আমাদের বরং বেঁচে থাকতে হলে যা সবচেয়ে প্রয়োজন হয়ে উঠছে তা হচ্ছে গণ্ডারের চামড়া নেওয়া।

তরফের নিজস্ব পারিবারিক ব্যাপার।

কিন্তু আশ্চর্য, এই চিৎকার, ঝগড়া কোন তরফই থামতে বলে না কাউকে। না ছোট, না বড়। বরং জ্বলন্ত আগুনে আরো উসকে দেয় প্রশ্রয়ের ঘি ঢেলে।

এক বিন্দু মাথা ঘামায় না কেউ এ নিয়ে।

যতক্ষণ চলে, চালাতে পারে চলুক। যার জিভ যতখানি বিষ ঢালতে পারবে, তার আদর সে পক্ষে ততখানিই বেশী হবে। এ যুদ্ধে তাই সহজে কেউ হারতে বা থামতে চায় না।

কারণ?

কারণ আছে বই কি। না হলে কোন ছেঁড়া সম্পর্কের সূত্র ধরে পড়ে থাকা প্রায় অনাত্মীয় দুটি মুখরা বৃদ্ধাকে এভাবে প্রশ্রয় দেয় ছোট গিন্নি মধুমালা আর ও তরফের বড় গিন্নি রাজলক্ষ্মী?

এ এক অদ্ভুত মানসিকতা।

বাড়ির কর্তা, পুরুষ সিংহরা থাকেন বাইরে বাইরে। তাঁদের রেষারেষি বিবাদ বিসম্বাদের পরিধি বহু বিস্তৃত। পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ লাঠালাঠি কাটাকাটি সব কিছুর সুরু শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে আদালত হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্ট অবধি। দু পক্ষের পরামর্শদাতাই বা কত। বন্ধু বান্ধব নায়েব গোমস্তা মোসাহেব। বৈষয়িক যুদ্ধের তাতেও কি পরিসমাপ্তি ঘটে? কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বিবাদের রেশ থেকে যায় পরবর্তীকালের উত্তর পুরুষের মধ্যে।

কিন্তু অন্দর মহলের সঙ্কীর্ণ কোণে পড়ে থাকা মেয়ে মানুষ? পুরুষদের মত বিবাদের ক্ষেত্র যাদের বিরাট নয়। শক্তিসামর্থ্যেও যারা অনেক হীন! অথচ হিংসাদ্বেষ ঝগড়াঝাটির ব্যাপারে যারা অগ্রগামিনী।

কি অস্ত্র আছে তাদের? বঁটি ঝাঁটা খুন্তি?

সে সব সেকেলে অস্ত্র উঠে গেছে বহু যুগ আগে। আছে একমাত্র মুখ। যে অস্ত্রের তুলনা হয় না। বিচিত্র ভাবে ভঙ্গিতে ঠিক সময়ে ক্ষুরধার রসনায় ঠিকমত এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে পারলে, বাদ বাকি পৃথিবীর সমস্ত শাণিত অস্ত্রগুলিও বোধ হয় ভোঁতা হয়ে যায়।

কিন্তু তাতেও একটা অসুবিধা আছে। সব সময়ে সব কথা নিজের মুখে বলা চলে না। শোভা পায় না।

কত বড় ঘরের মেয়ে তারা। কত শিক্ষা-দীক্ষা। কত বড় বংশের বৌ। ছোট লোকের মত, বস্তির অশিক্ষিত বাসনমাজা ঝিগুলোর মত গলা উঁচু করে ঝগড়া করা কি সাজে তাদের? কি বলবে বাড়ির লোকেরা? আত্মীয়-স্বজন? পাড়ার পাঁচজন? এমন কি ঐ সব ঝি চাকরেরা?

লজ্জায় অপমানে মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?

তাই দুপক্ষের শত্রুতার, অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের জ্বালা মেটানোর জন্যে দরকার হয় এই দুই পরগাছা বুড়ির।

মধুমালা আর রাজলক্ষ্মীর শাণিত অস্ত্র! ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলে। কখনো জ্বালা ধরায়, আবার কখনো জ্বালা বাড়ায় অপর পক্ষের। শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে কেউ কম যায় না অবশ্য কথার মার-প্যাঁচ কায়দা-কানুন প্রায় সবই আশ্রয়দাত্রীদের কাছ থেকে ধার করা।

অথচ একে অপরের কেউ নয়। রক্তের সম্পর্ক দূরে থাক, মুখ দেখাদেখিও বা কতটুকু? দুই তরফের পক্ষ নিয়ে অনবরত লড়াই করে করে এই বুড়ি দুটো যেন পরস্পরের পরম শত্রু হয়ে উঠেছে।

ও তরফের পড়া শোনায় ভাল ছেলেটির ভাল ভাবে পরীক্ষা পাশ করার খবর পেয়ে মোক্ষদা পিসির গাত্রদাহের এতটুকু কারণও থাকবার কথা নয়। আর এ বাড়ির অল্প বয়সী ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি ভাল ঘরে বরে পড়লে ও বাড়ির ভবতারিণী মাসির বুকখানা 'শতখানা' হয়ে ভেঙে যাবার কথাও নয়।

তবুও—

তবুও দিনের পর দিন দুপক্ষের মধ্যে এরাই জ্বালিয়ে রেখেছে শত্রুতার অনির্বাণ আগুন। যেন ওদের মুখের উপরই নির্ভর করছে মধুমালা আর রাজলক্ষ্মীর মান-সম্মান।

শুধু কি বাড়িতে?

হ্যাঁ বাইরেও বেরুতে হয় বই কি। ষাট পাঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি, ইহলোকের সব কিছু খুইয়ে যারা পরকালের অক্ষয় স্বর্গের দিকে তাকিয়ে 'হা পিত্যেশ করে' তাকিয়ে বসে আছে, বাইরে তাদের দৌড় যতটা হওয়া উচিত। কলুষনাশিনী গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত।

ভোরবেলা কাপড় গামছা হাতে নিয়ে গোটা-কতক ডুব দিয়ে দৈনন্দিন 'পাপের বোঝা' নামিয়ে যাবার ধরাবাঁধা সময়টাও দুজনের একেবারে ঠিক এক সময়ে। বাড়ির শত্রুতার রেশটুকুও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ভুল হয় না এতটুকুও।

তবে এটা তো কর্ত্রীদের প্রশ্রয়পুষ্ট চার দেয়ালে ঘেরা জায়গা নয় যে, যা ইচ্ছে চেঁচালে চলবে?

খোলা ঘাট। মেয়েদের জন্যে। বেশী রকম চেঁচামেচি সুরু করলে অন্য পাঁচজন পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়। বেশ ভাল করেই। মুখরা স্ত্রীলোকের অভাব নেই সংসারে।

কাজে কাজেই প্রকাণ্ড কিছু একটা ঘটে ওঠবার আগেই মনের ঝাল মনে রেখে উঠে পড়তে হয় দুজনকেই। ঘাটের 'পাঁচ কথা' শুনিয়ে দেওয়া অন্যান্য স্নানার্থিনীদের উপর বিষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

সেদিন ভবতারিণী মাথার চুল কগাছা গামছা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে আড় চোখে অদূরে পূব-মুখো হাতজোড় করে চোখ বন্ধ করা মোক্ষদাকে ঠেস দিয়ে পার্শ্ববর্তিনী স্নানরতা বুড়ির ঠাকুমাকে উদ্দেশ করে সুরু করলো, যাই বল দিদি, আমার ইন্দরনাথের মত হীরের টুকরো ছেলে আজকাল আর হয় না। সম্পর্কে ভাশুর-পো বটে, কিন্তু মায়ের বাড়া মান্যিগণ্যি করে আমাকে। দেখা হলেই কান্নাকাটি। ও খুড়ি, চল আমার বাড়ি। মাথায় করে রাখবো তোমাকে। বৌটাও খুড়িমা বলতে অজ্ঞান। তা কি আমার শম্ভু আর রাজু শোনে? পষ্ট মুখের ওপর বলে, ওটি হচ্ছে না বাপু। মাসিকে যেতে দেব না। মাসি চলে গেলে আমার রাজ্যপাট অন্ধকার। খুড়ির জন্যে কিচ্ছুটি ভেবনি, আমরা রইচি না? মাসি বলে মুখেই ডাকে, নইলে রাজু আমার পেটের মেয়ের বাড়া।

বন্ধ চোখ, জোড় করা হাত খুলে গেল। এক ঝটকায় মোক্ষদা এদিকে ফিরে গলা ছাড়লো। ওলো ও ভবি, অংখারে যে ধরাকে সরা জ্ঞান করচিস। তোর শোনের নুড়ির জলের ছিটে লেগে যে আমার পুজোপাট মাটি হলো, চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছিস না? এতো বড় ঘাটে যেন আর খ্যাংরা কাঠি কগাছা ঝাড়বার জায়গা নেই। ইন্দিরের বৌ তোকে বাড়ি নে যাবার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছে? রাজু তোকে দাড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে না? আ মলো যা। তবু যদি হাঁড়ীর খবর সব না জানতুম। কোন চুলোয় তোর কে আছে শুনি? ভাগ্যিস দত্ত বাড়ি জায়গাটুকু জুটেছিল, না হলে কোন ভাগাড়ে মরতিস এতদিন, কে জানে? রাজু আর শম্ভু! ওর সাতকেলে ব্যাটা বেটি! কথায় বলে না আদেখলের ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল। তোর হয়েছে তাই।

চুল ঝাড়া মাথায় উঠলো। গামছাখানা ঝপাং করে কাঁধে ফেলে দু পা এগিয়ে এসে মোক্ষদার মুখের সামনে শিরাবহুল শীর্ণ হাত দুখানা নেড়ে, চোখ মুখ ঘুরিয়ে ভবতারিণী খন খন করে উঠলো—

আমার 'সুখ সমিশ্যির' দেখে হিংসেয় বুক ফেটে মলি যে লো মুকি। তুই নিজে সাতকুল খেয়ে ও তরফে দুটো পেটের ভাতের জন্যে পড়ে আছিস, এ কথা পিরথিমি সুদ্দু লোক জানে। মুখে বড় বড় কথা কইলেই তো আর সব নোকের মন ভোলানো যায় না? তিলক কাটলেই বোষ্টুম হয় না। পৈতে পরলেই বামুন হয় না। তোর আদরের বোনপো বোনপো বৌ তোর ঝগড়ার চোটে তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি? মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়নি? তোর আবার অত ট্যাঁক ট্যাঁকানি কিসের লা?

কোমরে দুহাত দিয়ে মোক্ষদাও এগিয়ে এলো এবার।

আমার বোনপো আমাকে তাড়াবে কোন্ দুঃখে শুনি? শিবুর বাবা আমার সাক্ষাৎ ভাই। সেই জোর করে নে এসেছিল আমায় ঐ শিবুকে মানুষ করবার জন্যে। ওকে এই মুকি পিসিই এত বড়টা করেছে, বিয়ে থা দিয়েছে তুই আর কদিন এইছিস যে এত কথা জানবি? চোখের মাথা না খেলে মাস গেলে দেখিস গবরমেন্টের নোক তকমা এঁটে নগদ টাকা এনে বাড়ি বয়ে দিয়ে যায় এই মোক্ষদাবালা দাসির নামে। আর সে টাকা পাঠায় ঐ বোনপো। বুঝলি?

সমানে প্রত্যুত্তর এলো অপর পক্ষ থেকে। জানি লো জানি। সাত সতেরো খানা চিঠি নিকে নাকে কেঁদে সাত মাস ধরে হয়রান হবার পর পাঁচটা টাকা ভিক্ষে দেয়। তা আবার বড় মুখ করে বলিস কি করে?

এবার একজন বর্ষীয়সী স্নানার্থিনী ওদের ঝগড়ায় বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁগা, বাড়িতে তো শুনি রোজই তোমাদের লেগে আছে। কেউ কারো খাও না পর না, বড় লোকের কুটুম, ভাবনাচিন্তা নেই তবু এত ঝগড়া কেন বুঝি না বাপু। তা-বাড়ি বসে যা ইচ্ছে কর, কর। নাইতে এখানে ঘাটে এসেও যদি প্রত্যেক দিন চেঁচাও দুজনে, তবে তোমরা বাছা দুজনে দু ঘাটে স্নান করতে যেও, না হয় একজন চলে গেলে আরেক জন এসো। আমরা আর পাঁচটা প্রাণী আসি, তোমাদের গলাবাজির চোটে দুটো ডুব দিয়ে ঠাকুর দেবতার নাম করতেও ভুলে যাই। এত বয়েস হয়েছে, তবু তোমাদের স্বভাব গেল না। ছি ছি।

কিন্তু সত্য সত্যই বুঝি এতদিন বাদে দু-তরফের শত্রুতার অবসান হতে চললো। মোক্ষদা আর ভবতারিণীর, দুটি মুখের শাণিত অস্ত্রের ঠোকাঠুকিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে দুপক্ষকে আর তাতিয়ে রাখবার দরকার হবে না।

অনেক দিন থেকেই কথাটা কানাকানি হচ্ছিল। এবার প্রকাশ্যে সবাই জানতে পারলো। দত্তবাবুদের এই বিরাট পার্টিশন করা জরাজীর্ণ পুরোনো প্রাসাদের মত বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আর কটা দিন পরেই দখল নেবে। বাড়ি ভেঙে সরকারি রাস্তা সোজা চলে যাবে। এ জন্যে অবশ্য দুপক্ষই মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, দুতরফের মধ্যে যত ঝগড়া বিবাদ শত্রুতা আর মামলা মোকদ্দমা থাক না কেন, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে দুজনেই এক কথায় রাজী।

এমন সুযোগ ছাড়বার কোন মানেই হয় না। প্রায় মাথায় ভেঙে পড়ো পড়ো বাড়ি যখন জীবনেও কেউ গাঁটের পয়সা খরচ করে সারাবেন না। ভাগের মা কোন কালেই গঙ্গা পায় না, কে না জানে এ কথা?

একজন উত্তর, অপর দক্ষিণ। দুতরফ দুদিকে চলে যাচ্ছেন। দালাল লাগিয়ে বাড়ি কেনাও শেষ। নতুন বাড়িতে বড় গিন্নি আর ছোট গিন্নি আত্মীয়-স্বজন ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিনেই গৃহপ্রবেশ করবেন। দিনও স্থির হয়ে গেছে।

আর বাদ বাকি লোকজন?

স্বল্প পরিচয় আর দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সুড়ঙ্গ পথ ধরে যারা একদিন এসেছিল। দিনের পর দিন যারা জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছিল দুবেলা দুমুঠো পরম অবহেলার ভাত খেয়ে। আশ্রয়দাত্রীদের পায়ে তেল দিয়ে। খোশামোদ করে। সামর্থ্য মত গতর খাটিয়ে।

কি হবে তাদের?

নতুন বাড়িতে এই সব অপদার্থ লোক সঙ্গে করে নিয়ে যাবার মত অসম্ভব কল্পনাও কেউ করে নাকি?

অবশ্য তাদের মধ্যেও বাছবিচার করা হয়েছে বই কি। যাদের বয়স কম, কাজকর্ম করার মত শক্তি সামর্থ্য যাদের আছে; তাদের প্রয়োজন ফুরোয় না কোন কালেই। তারা সঙ্গে যাবে।

কিন্তু ভবতারিণী আর মোক্ষদার মত প্রায় স্থবির মুখসর্বস্ব বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কি কোন মানে হয়?

ওদের সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে মধুমালা আর রাজলক্ষ্মীর শান্তির সংসারে।

যুদ্ধ শেষে, প্রয়োজনহীন ভোঁতা, ভাঙা অস্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া কে-আর যত্ন করে তুলে রাখে?

আগেকার দিন চলে গেছে। পূর্বপুরুষের আশ্রিত প্রতিপালনের বদান্যতার একবিন্দুও অবশিষ্ট নেই তাঁদের উত্তর পুরুষদের ভিতরে।

তবু কর্তারা দয়া করলেন। ধনী পূর্ব-পুরুষদের দানে কাশীতে যে আশ্রয়হীনা বিধবাদের জন্যে নারী কল্যাণ আশ্রম খোলা হয়েছিল এককালে, সেখানে একটু আশ্রয় দেবার জন্যে দুই বুড়িকে দুখানা চিঠি লিখে দিলেন। যে কটা দিন বাঁচবে, ভালই থাকবে তীর্থে।

এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে সব কুল খাওয়া বুড়ি দুটোর?

দুই বাড়ির জিনিষপত্র চলে যাচ্ছে ঠেলাগাড়িতে লরীতে। বিরাট শিকড় ছড়ানো বহুদিনের সংসারটাকে তুলে নিয়ে যাবার দরুণ দুপক্ষই হিম সিম খাচ্ছে। তাই বাড়ির ভিতর মোক্ষদা আর ভবতারিণীর ক্ষুরধার জিভ আজ স্তব্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু গঙ্গার ঘাটে পরদিন সকাল বেলা দেখা হতে না হতেই আরম্ভ হল।

মোক্ষদা বাঁ হাতের তেলোতে এক খাবলা ছাই রেখে ডান হাতের আঙুলে তুলে তুলে দাঁত মাজতে মাজতে সদ্য আগত ভবতারিণীকে দেখেই বাঁকা গলায় সুরু করলো, যাক, তোর তাহলে একটা হিল্লে হল। তা ওলো ও ভবি, কাশি যাচ্ছিস কবে?

কাশী!! এমন আশ্চর্য কথা যেন কোনকালেই শোনেনি, দুচোখ কপালে তুলে তোবড়ানো গাল আরো ডুবড়ে ভবতারিণী হাতের গামছাটা ঘাটের সিঁড়িতে রেখে জবাব দিল, কাশী আবার কে যাবে?

কেন তুই যাবি! ভাল মানুষের মত নিরীহ মুখ করে এক মুখ ছাই পিচ্ কেটে সামনের নড়বড়ে দাঁত কটা ঘষতে ঘষতে মোক্ষদা বললে, তবে যে শুনলাম তুই যাবি কাশীতে সেই বেধবা আশ্রমে। যাদের কোন চুলোয় জায়গা জোটে না তারাই তো থাকে সেখানে। তোকেও নাকি শম্ভু পাঠাচ্ছে ওখানেই? তা তোর পেটের বাছা মেয়ে রাজু বুঝি তোকে সঙ্গে করে নে যাবে না নতুন বাড়িতে? কোন্ চুলোয় আর যাবি বল, ওখানেই তো থাকতে হবে এবার থেকে। তা ভালই থাকবি।

মোক্ষদার কথার হুলের বিষে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো ভবতারিণী। আমি কোথায় যাই না যাই, তোকে দেখতে হবে না। তোর নিজের কোন্ চুলোয় মরবার ঠাঁই জোটে তাই দ্যাখ। তোকেও তো শুনেছি দূর করে দিয়েছে তোর নিজের হাতে বিয়ে দিয়ে আনা শিবুর বৌ? যা, বোনপোর বাড়ি। চতুর্দোলা সাজিয়ে নে যাক, তোকে, নয়ন ভরে দেখি। কত তো নম্বা নম্বা বচন শুনি, আমার বোনপো মাসি বলতে অজ্ঞান, যা তার কাছে?

মোক্ষদা কিন্তু মোটেই চটল না। হাত দিয়ে গঙ্গার জল কেটে কুলকুচো করতে করতে বেশ ঠাণ্ডাভাবেই জবাব দিল। চতুর্দোলা না পাঠাক বোনপো তার বাড়ি যাবার গাড়ি ভাড়া পাঠিয়ে দিয়েছে। কাল পিওন এসে নগদ এক কাঁড়ি টাকা গুণে হাতে দিয়ে গেছে। চিঠিও নিকেছে পত্রপাঠ তার কাছে চলে যেতে। মাসি, তুমি এলে আমরা হাতে স্বগ্‌গো পাবো। আমি থাকতে তোমার কোন ভাবনা নেই। ড্যাং ডেঙিয়ে চলে যাচ্ছি সেখানে। বেধবা আশ্রমে বিদেশ বিভুঁই এ পরের দরায় ভিক্ষের অন্ন খেতে যাবো কোন্ দুঃখে শুনি? বোনপো বৌ নিজে হাতে চিঠি নিকেচে। পড়তে যদি পারিস, চোখে যদি ছানি না পড়ে থাকে, এসে ভাল করে পড়ে দেখিস। বুঝলি?

এক ফুঁএ নিভে যাওয়া জ্বলন্ত প্রদীপের মত ভবতারিণী নিভে গেল মোক্ষদার কথায়। হতশ্রী জীর্ণ মুখখানা আরো যেন চোয়াল ওঠা হাড় বার করা শুকনো হয়ে গেল। তবু গলা নামাল না। আমার ইন্দির বেঁচে থাক। অক্ষয় পেরমাই হোক। আমিতো পা বাড়িয়ে বসে আছি ওর কাছে যাবার জন্যে। এতো আর

মায়ের বাপের বাড়ির সম্পর্কে নয়, খাঁটি শ্বশুর বাড়ির রক্তের সম্বন্ধ। একখানা ঘর তো কবে থেকে আমার জন্যে ঠিক করে রেখেছে। সেদিন এসে হাত ধরে সেকি কান্না বাছার। খুড়িমা, আমি থাকতে তুমি অন্য কোথাও যাবার নামটি যেন কর না। তোমার ইন্দির তোমার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে, দুবেলা দুমুঠো খেতে সে দিতে পারবে। সেই তো জোর করে আমায় নে যাচ্ছে তার বাড়ি। এমন আপনার জন থাকতে মরতে কাশীতে যাবো কেন জাতকুল খাওয়া অজাত-বেজাত মাগীগুলোর সঙ্গে থাকতে? মরণ-দশা আমার।

শেষ কথাগুলো কেন কানেই গেল না মোক্ষদার। উত্তর দেবার ঝগড়া করবার মত সব উৎসাহ যেন হঠাৎ হারিয়ে গেছে। উদাসীনভাবে ভবতারিণীর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দুকানে আঙ্গুল দিয়ে ডুব দিতে লাগলো বার-বার।

ওর মুখ-চোখের চেহারাও যেন কেমন বিবর্ণ পাংশু—মড়ার মত বিশ্রী ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ততক্ষণে।

নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমাটা ভাল করে এঁটে লণ্ঠনের আলোয় ক্ষীণ দৃষ্টি বিস্ফারিত করে মোক্ষদার শ্রান্ত ক্লান্ত আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে একটু আগেই পড়া চিঠিখানা তার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে সুখদায়িনী নারী কল্যাণ আশ্রমের বয়স্কা বিধবা তত্ত্বাবধায়িকা বললেন, এত দেরী করে এলেন কেন? ট্রেণ তো সেই কখন এসেছে। ঘরতো খালি নেই। যাওবা ছাতের সিঁড়ির চিলে কোঠাটা ছিল সেটাও আজ দুপুরে একজন এসে দখল করেছে। এই তো মাত্র কটা ছোট ছোট ঘর। কত লোককেই যে ফিরিয়ে দিতে হয় জায়গার অভাবে। আপনি ঐ চিঠিটা নিয়ে যদি আগে আসতেন, তবে ঐ চিলে কোঠায় জায়গা দেওয়া যেত। এখনতো আর কোন উপায় নেই।

বুকের উপর ধরে থাকা পুঁটলিটা ভাল করে সামলে জীর্ণ থানখানার আঁচলে কপালের ঘাম মুছে করুণকণ্ঠে ছল ছল চোখে মোক্ষদা বললো, 'মা বড় পোড়া কপাল আমার। নইলে আজ এমনভাবে পথে পথে একটু ঠাঁই-এর জন্যে ঘুরে মরি? এত রেতে অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় যাবো বল? আজকের মত যেখানে হোক একটু শুতে জায়গা দাও, কাল সকালে উঠে না হয় যেখানে হোক চলে যাবো। পথের ধারে, গঙ্গার ঘাটে, কোন গাছতলায় পড়ে থাকবো। বাবা বিশ্বনাথ কি এটুকু দয়া করবেন না? তুমিই বল মা, পথঘাট চিনি না কোথায় যাই এই রেতে?

নিঃস্ব রিক্ত বুড়ির প্রায় কুঁজো হয়ে আসা চেহারার দিকে, বলীরেখাঙ্কিত মুখ, ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল সরোজিনী দেবীর। আচ্ছা চলুন আমার সঙ্গে। যিনি আজ এসেছেন চিলে কোঠায় তিনি যদি আপনাকে থাকতে দিতে রাজী হন আজ রাত্রের মত। অবশ্য তাঁর ঘরেও দুজন শোবার মত জায়গা নেই। তবু বলে কয়ে দেখা যাক একবার—

দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই কালিপড়া

ছুটি

গোরাচাঁদ নন্দী

তৃতীয় পক্ষের পাঁচশালা প্রণয়িনী-মগ্ন
মনটাকে ভুলিয়ে শৈলসুতা তটিনীর কাছে
নিয়ে যেতে পারো গভীর রাতে? দেখাতে পারো,
জীবন্ত জ্যোৎস্না তরুণী সর্পিলাকে
কেমন জড়িয়ে
ঘুমিয়ে আছে আর আনত শাখায়
ছায়ার বাতাস।
বোঝাতে পারো, নিশির নিসর্গ
আকাশের আশীষ
দিগন্তের তরঙ্গ আর বনানীর নিবিড় উজাড়—
নীরবে মিলে এরা কি স্বর্গ রচনা করেছে!

লণ্ঠনের চিমনির ফ্যাকাশে আলোয় দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

সরোজিনী দেবী কোন কথা বলবার আগে ঘর থেকে ভবতারিণীই আগে সাড়া দিল। মাথাটা নীচু করে ঢুকিসলো মুকি নইলে ঠুকে যাবে জোর। যা নীচু দরজা।

ওঃ আপনাদের চেনাশোনা আছে তাহলে? যাক ভালই হল। আর কোন অসুবিধা হবে না আপনার। আমি চলি তাহলে।

সরোজিনী নিশ্চিন্ত মনে নীচে নেমে গেলেন।

নিজের জন্যে পাতা সতরঞ্চিটার গোটানো অংশটা খুলে পাততে পাততে ভবতারিণী খর খর করে উঠলো। থাক থাক। রেলের ছত্রিশ জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি ঐ মেলেচ্ছ বিছানা আর খুলতে হবে না। এতেই কোন মতে শুয়ে পড় দিকিনি আলোটা নিবিয়ে—।

গুটিসুটি মেরে পরিশ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো মোক্ষদা। কিন্তু একটু পরেই ইতস্ততঃ করে আস্তে আস্তে ডাকলো. ভাবি, ও ভাবি ঘুমুলি নাকি?

ঘুমোবো না তো কি জেগে ...কবো? একেতো বাতের ব্যথাটা চাগিয়েছে সকাল থেকে। বিরক্ত চিত্তে উত্তর দিল ভবতারিণী। উহু হু হু—

একটা বালিশ-টালিশ দেনা? বালিশ না হলে যে আমার আবার ঘুম আসে না ছাই।

আ মল যা। একটা মাত্তর বালিশ আমার, সেটা ওনাকে দিয়ে আমি খালি মাথায় শুই আর কি। কথায় বলে না, আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে। মামাবাড়ির আবদার আর কি। কেন একটা বালিশও আনতে পারিসনি সঙ্গে করে?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ভবতারিণী।

নিরুত্তর মোক্ষদা একটু সরে পাশ ফিরে শুলো।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে আর কোন সাড়াশব্দ নেই। উশখুশ করে গলা নামিয়ে ভবতারিণী এবার ডাকলো, ওলো ও মুকি ঘুমুলি নাকি?

উঁহু। সাড়া দিল মোক্ষদা।

এই নে। থান দুত্তিন কাপড় পাট করা। মাথার তলায় ভাল করে ঠেশে দে দিকিনি, বেশ হবে। মাগীর আবার ঢং কত। বালিশ না হলে ঘুম হয় না। মরণ আর কি!

যক্ষ্মা চিকিৎসায় প্রচুর আলো ও খোলা বাতাস, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, পুষ্টিকর খাদ্য এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম অপরিহার্য বলে বহু দিনের বিশ্বাস। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে পর্যন্ত যক্ষ্মা চিকিৎসায় এই সব ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বদল ঘটেছে এবং অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্বাস্থ্যনিবাস বা স্যানাটোরিয়াম

লোকালয় থেকে বহু দূরে পাহাড়ের উপর বা সমুদ্রের তীরে যেখানে বিশুদ্ধ বাতাস ও প্রচুর সূর্যকিরণ পাওয়া যায় সেখানে যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাস বা স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করা হত। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভাল ভাল খাদ্য ও তাদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের বন্দোবস্ত থাকত। স্বভাবতই এতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হত কোন দেশের পক্ষেই সেই ব্যয়ে দেশের সব যক্ষ্মা রোগীর জন্য স্যানাটোরিয়ামে স্থান সংকুলান করা সম্ভব হত না। স্বাস্থ্যনিবাসের অনুকূল আবহাওয়ায়, নির্মল আলো-বাতাসে পর্যাপ্ত বিশ্রাম উপভোগ ও প্রচুর পুষ্টিকর আহার সত্ত্বেও ফলাফল অনেক সময় অনিশ্চিত থাকত। দীর্ঘদিন ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর যাদের রোগ আয়ত্তাধীন হত তাদের কর্মজীবনে ফিরবার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে রোগের পুনরাবির্ভাবও অনেকটা অনিশ্চিত থাকত।

'চেস্ট ক্লিনিক'

রোগ নির্ণয়ে এক্সরে প্রচলনের পর যক্ষ্মা-রোগ বেশী দূরে অগ্রসর হবার আগেই চিনবার সুবিধা হল। দেখা গেল প্রথমাবস্থায় রোগ ধরা পড়লে অপেক্ষাকৃত কম সময়েই রোগ আয়ত্তাধীন হয়। সন্দেহজনক লক্ষণ প্রকাশ পেলেই লোকে যাতে সহজে উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে বুক পরীক্ষা করাতে পারে সেই জন্যে চেস্ট ক্লিনিক বা বুক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হল। রোগ নির্ণয় করা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও চেস্ট ক্লিনিক থেকে রোগ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হত।

যক্ষ্মা হাসপাতাল

কৃত্রিম উপায়ে অথবা অস্ত্রোপচার করে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ফুসফুসকে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে সংকুচিত করে চিকিৎসার (আর্টিফিসিয়াল নিউমোথোর্যাক্স, ফ্রেনিক অ্যাভালস্যান, থোরাকোপ্ল্যাস্টি ইত্যাদি) ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার পর আগেকার চেয়ে চিকিৎসায় সুফল বেশী পাওয়া গেল। অস্ত্রোপচারের জন্য উপযুক্ত হাসপাতালের প্রয়োজন হল। দেখা গেল যে, সুদূর পাহাড়ে ঠান্ডা আবহাওয়ার আরামদায়ক পরিবেশে যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপন না করলেও চলে। যে কোনও আবহাওয়ায় সাধারণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলামেলা বাসস্থানে উপযুক্ত বিশ্রাম ও আহার দিলে চিকিৎসার ফল ভালই দেখা গেল। কাজেই যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার জন্য দুর্গম পাহাড়ের বদলে সহর-বাজারের কাছাকাছি, যেখানে জল, আলো, খাদ্যদ্রব্য, যানবাহন ইত্যাদি সহজলভ্য, সেরকম জায়গায় হাসপাতাল স্থাপন করা সুবিধা হল।

বাড়ীতে চিকিৎসা (ডমিসিলিয়ারী ট্রিটমেন্ট)

যে কোনও আবহাওয়ায় যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা সম্ভব প্রমাণিত হওয়ার পর আশা করা গিয়েছিল যে, অসংখ্য যক্ষ্মা রোগীর জন্য হাজার হাজার হাসপাতাল স্থাপন করা অসম্ভব হলেও তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বহু রোগীর নিজ বাড়ীতে খোলামেলা ঘর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের একান্ত অভাব। তা ছাড়া পূর্ণ বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্যও বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের যে শ্রেণীর মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বেশী তাদের পক্ষে রোগীর জন্য পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য এবং পরিবারের অন্য সুস্থ লোকেদের থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা আর্থিক অনটনের জন্য নিতান্তই দুঃসাধ্য। এর উপর চিকিৎসার ব্যয় ত আছেই।

এই সব কারণে বাড়ীতে চিকিৎসার ফল বিশেষ ভাল হয় নাই। চিকিৎসার গোড়ার দিকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে কিছুদিন রোগীকে রাখলে ফল ভাল পাওয়া যেত। যক্ষ্মা হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে রোগীর যে কেবল পর্যাপ্ত বিশ্রাম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্য লাভ হয় তাহাই নয়; ভবিষ্যতে রোগ যাতে আবার না বাড়তে পারে তার জন্য নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা রোগী হাসপাতালে পায়। নিজের থেকে অপর সুস্থ লোক যাতে রোগের ছোঁয়াচ না পায় তার নানা উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা এবং সেই সবের অভ্যাসও রোগী হাসপাতালে পায়। যে সব রোগীর কাসি বা শ্লেষ্মার সঙ্গে রোগের জীবাণু নির্গত হচ্ছে, তাদের বাড়ীতে পৃথক রাখবার স্থানাভাব হলে হাসপাতালে স্থানান্তর করা রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও সহবাসীদের রোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য খুব দরকারী।

বর্তমান নীতি

বহু সংখ্যক চেস্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল স্থাপন করে সরকারী ব্যয়ে সকল রোগীর ব্যবস্থা করা যক্ষ্মা সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় বলে নীতি হিসাবে সমীচীন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ রোগীর জন্য এ ব্যবস্থা করা যে কতটা দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই চেস্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ডমিসিলিয়ারী চিকিৎসার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক ওষুধ আবিষ্কারের ফলে এ বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে।

জীবাণুনাশক ওষুধ

যক্ষ্মা জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী ওষুধের মধ্যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, প্যাস (প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসাইলিক এসিড) ও আইসোনিয়াজিড্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি ওষুধের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়ার ফলে যক্ষ্মা রোগীর অবস্থা এত দ্রুত পরিবর্তন হয় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার কর্মক্ষমতা ফিরে আসে এবং তার কফ বা শ্লেষ্মা জীবাণুমুক্ত হয়। এই সব ওষুধ ব্যবহারের ফলে যে কেবল স্যানাটোরিয়ামের বা হাসপাতালের রোগীদেরই উপকার বেশী হয় তাহা নয়। দেখা গেছে যে, যে সব রোগীর পক্ষে উপযুক্ত বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না তারাও অনেকে এই সব ওষুধের সম্যক প্রয়োগের ফলে আরোগ্যলাভ করতে পারে।

'বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য ও খোলা হাওয়া'

যক্ষ্মা চিকিৎসায় বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য ও খোলা হাওয়া ইত্যাদির উপকারিতা এতদিন যাবৎ নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই সব বাদ দিয়ে যক্ষ্মা চিকিৎসার সম্ভাবনা এতই চাঞ্চল্যকর যে, যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া এ কথা বিশ্বাস করা সহজ নয়। পশ্চিমের অনেক উন্নত দেশ থেকে এবং পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু অনুন্নত দেশে যক্ষ্মা রোগীদের বিশ্রাম না দিয়ে কেবল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় সাফল্য লাভের খবর অনেক বেরিয়েছে। যাঁরা এরকম সাফল্যলাভ করেছেন তাঁরা যক্ষ্মা সমস্যার সমাধানে এই রকম চিকিৎসার সম্ভাবনার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। তাঁরা মনে করেন, যে সব দেশে এখন যক্ষ্মা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে এবং যাদের পক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যায় যক্ষ্মা চিকিৎসার হাসপাতাল স্থাপন করে দেশের সব যক্ষ্মা রোগীকে, অন্তত যারা রোগ ছড়াচ্ছে তাদের—হাসপাতালে ভর্তি করে রোগ সংক্রমণ বন্ধ করার মত আর্থিক সঙ্গতি অদূরভবিষ্যতে সম্ভব নয়, সেই সব দেশে রোগীদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম খরচায় (রোগীদের নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যেই রেখে ওষুধ দেবার ব্যবস্থা করে)—অতি অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। ব্যাপকভাবে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে অল্প দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ রোগী রোগমুক্ত হবে এবং যক্ষ্মার প্রসারও কমে যাবে। এই চিকিৎসা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করবার

দিকে আরও একটা সুবিধা এই যে, তিনটি ওষুধের মধ্যে দুইটি মুখদিয়ে দেওয়ার মত ও বিতরণ করার মত করে ট্যাবলেট আকারে প্রস্তুত করা যায়। ইনজেকশ্যান দেওয়ার দরকার হয় না। কাজেই বাড়ী বাড়ী ঘুরে ওষুধ প্রয়োগ করবার জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় না। রোগী-দের অথবা তাদের আত্মীয়দের কিছুটা উপদেশ দিলেই তারা নিজেরা নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে পারে।

এরকম চিকিৎসা ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ভাবে সমর্থন করবার আগে বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চান। অনেকে মনে করেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কতগুলি বাছাই করা রোগীকে চিকিৎসকের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রেখে হাসপাতালের বাইরে এবং তাদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও খাদ্যের উপর জোর না দিয়ে কেবলমাত্র নিয়মিত ও উপযুক্ত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল হয়ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে গরীব দেশের শিল্পাঞ্চলে অথবা ঘনবসতিপূর্ণ সহরের বস্তি অঞ্চলে স্বল্প আয়ের মানুষ নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে কোন রকমে জীবনধারণ করে, যেখানে স্ত্রী পুরুষ কাহারও একান্ত শয্যাশায়ী না হয়ে পড়লে খাটুনী থেকে অব্যাহতি নাই, সেখানে এই চিকিৎসা যে কার্যকরী হতে পারে অথবা এর ফলাফল হাস-পাতাল বা স্যানাটোরিয়ামের চিকিৎসার তুলনায় যে নিকৃষ্টতর নয় তার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই।

স্যানাটোরিয়াম বনাম বস্তি চিকিৎসা

আমাদের দেশে কিছুদিন আগে এরকম একটা তুলনামূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন তার ফলাফল জানা গেছে। মাদ্রাজ সহরের যক্ষ্মা রোগীদের মধ্য থেকে ১৬ জন রোগীকে নিজের নিজের বাড়ীতে এবং ১৭ জন রোগীকে একই সময় একটা স্যানাটোরিয়ামে রেখে একই রকম ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হল এক বৎসর ধরে। এই সব রোগীর মধ্যে যারা উপার্জনক্ষম তাদের মাসিক আয় গড়ে ৫২্ টাকা। বেকার ও স্ত্রীলোক রোগীদেরও পারিবারিক আয় ঐ রকমেরই। কাজেই বোঝা যায় এই সব রোগী সমাজের গরীব শ্রেণীর লোক যাদের জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত নীচে। স্যানাটোরিয়ামে অথবা বাড়ীতে চিকিৎসার জন্য রোগীদের দুই দলে ভাগ করবার সময় বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল যাতে দুই দলের মধ্যে রোগের গুরুত্ব, রোগীর অবস্থা, বয়স ইত্যাদি সম্পর্কে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না হয়।

চিকিৎসার জন্য দুই দলকেই আইসোনিয়া-জিড্ ও প্যাস একই রকম ভাবে শরীরের ওজনের অনুপাতে মাত্রা ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। স্যানাটোরিয়ামের রোগীরা নার্সদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত ওষুধ সেবন করে। বাড়ীর রোগীদের নিজ নিজ দায়িত্বে ওষুধ খাওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীরা ঠিক মত ওষুধ খাচ্ছে কিনা দেখবারও একটা ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে রোগীদের বাড়ীতে তাদের খবর নেওয়া হত। তারা রোগীর ওষুধের হিসাব নিত। কত বড়ি দেওয়া হয়েছিল, কত খাওয়া হয়েছে ও কত বাকি আছে, তার হিসেব নিয়ে রোগী ঠিক পরিমাণে ওষুধ খেয়েছে কিনা বোঝা যেত। রোগীর প্রস্রাব মাঝে মাঝে নিয়ে পরীক্ষা করা হত। ওষুধ ঠিক মত খাওয়া হচ্ছে কিনা প্রস্রাব পরীক্ষায়ও ধরা যায়। এই পরীক্ষায় ওষুধের পরিমাণ কম ধরা পড়লেই রোগীকে সাবধান করে দেওয়া হত। দুই দল রোগীকেই এক বৎসর একটানা ওষুধ দেওয়া হল এবং স্যানা-টোরিয়ামে রোগীদের এই এক বৎসরই [illegible] রাখা হল। মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে [illegible] দ্বারা ও রক্ত কফ ইত্যাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগীর অবস্থা দেখা হত।

খাদ্য এবং বাসের ব্যাপারে স্যানাটোরিয়ামের রোগীদের তুলনায় বাড়ীর রোগীদের স্বভাবতই অনেক নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে চিকিৎসা হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, বাড়ীর রোগীদের প্রায় অর্ধেক লোকই দৈনিক এক ছটাকের কম প্রোটিন খেত। মাছ মাংস দুধ ডিম প্রভৃতি জান্তব প্রোটিনের পরিমাণ এদের শতকরা ৯০ জনের ভাগ্যেই দৈনিক আধ ছটাকের বেশী জুটত না। এদের বাসস্থানও ছিল সহরের বস্তি অঞ্চলে এবং বেশীর ভাগ বাড়ীতেই লোকের তুলনায় স্থান কম।

বিশ্রাম সম্বন্ধে বাড়ীর রোগীরা অনেকটা স্বাধীন ছিল। সব রোগীকেই প্রথম দুই মাস বাড়ীতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়। কিন্তু বাড়ীতে যখন রোগীদের পরিদর্শন করা যেত তখন একমাত্র বিশেষ অসুস্থ রোগী ছাড়া কাউকেই বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা যেত না। অনেক রোগী গোড়া থেকেই নিজ নিজ কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। আর অনেকে একটু সুস্থ বোধ করতেই কাজে লেগে গিয়েছিল। যারা বেকার তাদেরও প্রায়ই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। স্যানাটোরিয়ামে প্রত্যেক রোগীর শোওয়া বসা হাঁটা বেড়ান রোগের অবস্থা অনুযায়ী ধরাবাঁধা নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

দুই দল রোগীর চিকিৎসায় এই সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক বৎসর পর তাদের রোগের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ফলাফল প্রায় সমান সমান। দুই দলের রোগীর মধ্যেই শতকরা ৯০ জনের আর কোন রোগ লক্ষণ পাওয়া গেল না। বুকের এক্সরেতে রোগ সেরে যাবার লক্ষণ পাওয়া গেল এবং কফও জীবাণুশূন্য। দুই দলেই একটি করে মৃত্যু এক বছরে হয়েছে এবং এক বৎসর চিকিৎসার পরও দুই দলে ৯ জন করে রোগীকে রোগমুক্ত করা যায় নাই।

আসল রোগ সম্বন্ধে ফলাফল একরকম হলেও দেখা গেল যে, স্যানাটোরিয়ামে যাদের চিকিৎসা হয়েছে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং ওজন বৃদ্ধি হয়েছে বেশী। স্যানা-টোরিয়ামে উন্নত জীবনমান এবং পুষ্টিকর খাদ্যই এর কারণ। কিন্তু আসল রোগের উপ-শমের জন্য এ সবের বিশেষ গুরুত্ব নাই বলেই প্রমাণিত হল।

এরপরও আরও প্রশ্ন থেকে গেল। এক বৎসর চিকিৎসাধীন [illegible] বাড়ীর রোগীদের রোগ দমন হল, কিন্তু তাদের স্বাস্থ্যের মান স্যানাটোরিয়াম রোগীদের মত হল না। তার জন্য চিকিৎসোত্তর সময় রোগের পুনরাক্রমণ এদের মধ্যে বেশী হবে কিনা? অথবা স্যানাটোরিয়ামের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে থেকে যে সব রোগীর রোগ দমন হল তারা নিজেদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফিরে গেলে তাদের রোগের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা কতটুকু? এই সম্ভাবনার জন্য আরও কিছুদিন এদের দুই দল রোগীকেই ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন আছে কিনা?

এই সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আরও এক বৎসর পরীক্ষা চালান হয়। প্রথম বৎসরের চিকিৎসায় যে সব রোগী রোগমুক্ত হয় তাদের ১২৬ জনকে দ্বিতীয় বৎসরও নজরে রাখা হয়। এদের মধ্যে ৬৯ জনের চিকিৎসা হয়েছিল স্যানাটোরিয়ামে। এদের সকলকেই তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে তাদের রোগ আক্রমণের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল। সকলেই নিজ পেশা অনুযায়ী কাজকর্ম করে যেতে লাগল। এই ১২৬ জনের ৬৫ জনকে আরও এক বৎসর আইসোনিয়াজিড্ ট্যাবলেট দেওয়া হল আর ৬১ জনকে দেওয়া হল কেবল ক্যালসিয়াম বড়ি। ১২৬ জনের মধ্যে মোট ৫ জনের দ্বিতীয় বৎসরে রোগের পুনরাবির্ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পেল। এই ৫ জনের মধ্যে ৪ জনের চিকিৎসা পূর্ব বৎসর হয়েছিল স্যানাটোরিয়ামে। অপর একজনের চিকিৎসা হয় বাড়ীতে। ৫ জনের মধ্যে ৩ জন রোগী আইসোনিয়াজিড্ খাওয়া সত্ত্বেও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর ২ জন খাচ্ছিল ক্যালসিয়াম।

কাজেই দেখা যাচ্ছে রোগ সেরে যাবার পর রিলাপ্স বা রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসার ফল (পুষ্টিকর খাদ্য ও [illegible]স্থ্যকর পরিবেশের অভাব সত্ত্বেও) স[illegible]টোরিয়ামে চিকিৎসার ফলের তুলনায় খারাপ [illegible]

নতুন সম্ভাবনা

এই সব পরীক্ষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যক্ষ্মা সমস্যা সমাধানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। সব রোগীকে স্যানাটোরিয়াম বা হাসপাতালে পাঠানই একমাত্র উপায় বলে আর স্বীকৃত নয়। প্রচুর টাকা ব্যয়ে বড় বড় যক্ষ্মা চিকিৎসার হাসপাতাল নির্মাণের দিকে চেষ্টা না করে যদি হাজার হাজার যক্ষ্মা রোগী, যে যেমন অবস্থায় আছে সেই রকম অবস্থাতেই যাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ উপযুক্ত মাত্রায় সময়মত এবং দীর্ঘদিন ধরে পায় তার দিকে যদি সব শক্তি প্রয়োগ করা যায় তবে অল্পদিনের মধ্যেই শতকরা ৯০ জন রোগীকে সুস্থ করা যায় এবং তাদের রোগ ছড়াবার ক্ষমতা বন্ধ করা যায়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে আইসোনিয়া-জিড ও প্যাস এই দুইটি ওষুধ দেশে প্রচুর পরিমাণে সুলভে পাওয়া যাওয়া চাই। এই দুইটি ওষুধ প্রচুর পরিমাণে দেশে যাতে প্রস্তুত হয় তার ব্যবস্থা করা জাতীয় পরিকল্পনায় একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত।

ঘৃণার গভীর মূলে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা
[illegible] কোথাও কিছু নেই।
যে মেঘ দিয়েছে
বৃষ্টি সেই হানে সতীর্থ অশনি,
যে-নদী শস্যের মূলে
সেই আনে ক্রুদ্ধ বন্যাধ্বনি,
যে-সূর্য শীতের মিত্র
গ্রীষ্মকালে জ্বালায় যে সেই।
সুহৃদ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
বারবার সন্ধানী হৃদয়
খুঁজেছে তৃপ্তির উৎস,
প্রণয় চেয়েছে অঙ্গীকার;
এক চক্ষু বাসনারা
বিতৃষ্ণার নেপথ্য-শীকার,
দুর্দিনে দুঃস্বপ্ন আনে
নবনীতে মাত্রারিক্ত ভয়।

লাবণ্য নিহিত দ্যাখো
মুঠি মুঠি এখানে-ওখানে;
উদ্যোগের থেকে প্রেমে,
প্রেম থেকে সমাহিততায়
নিখুঁত তৃপ্তির উৎস;
তবে কেন হিংসার নির্মাণে
গোপন হাতের শখ;
ঐ দ্যাখো স্পর্শধন্যতায়
অভিষিক্ত হতে চায়
বিক্ষুব্ধ জীবন। ভালোবাসা
ঘৃণার গভীর মূলে কাজ করে,
জাগায় প্রত্যাশা।।

টিউলিপ

সুনীল বসু

টিউলিপ ফুলগুলি কি সুন্দর, দেখ দেখ চেয়ে।
নাও না এক টাকার, সাজাব তোমারই ত ঘর।
আচ্ছা বলেছিলে তুমি মুক্তোর মালা কিনে দেবে।
হাঁটতে পারছি না আর ডাকো না রিক্সা
বা মোটর।
না না নার্শিসাস নিলে নির্ঘাত
তোমার সঙ্গে আড়ি
ও ফুল আমি নিয়েছি অনেক,
নাও না অন্য ফুল!
মেরিগোল্ড আহা ও তো গাঁদা,
সুইট পী কি বাহারি!
কারনেশানে মানায় কিন্তু মেয়েদের কালো চুল!

বেলুন কিনছ কেন, তোমার অদ্ভুত যত শখ
না, পেয়ালার দোকানে আমি আর
যেতে পারছি না,
এই ছবিটা কেনো না ট্রয়ের যুদ্ধ,
বাঃ প্রসার্পিণা—
মুখখানা কি সুন্দর, চুনা-পাথরের এই বক।
যে আংটিটা হারিয়েছ, বিয়েতে দিয়েছে স্যারেগুন;
দেখ দেখ অবিকল সেটার মতই গোল্ডস্টোন॥

তাস

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মনে হয় এ জীবন এক জোড়া
ছেঁড়া এক তাসের বাণ্ডিল?
কেউ লাল, কেউ কালো,
হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, চিড়ে,
কেউ ছেঁড়া রঙ চটা, কেউ শক্ত,
উজ্জ্বল ভোলাস, কেউ বা শিথিল,
সাহেব বিবির মতো টেক্কা ও গোলাম
আসে যায় জীবনের নানান সড়কে
নানা তাস—বিচিত্র মিছিল।

এ জীবন এক জোড়া তাসের বাণ্ডিল।
বেঁটে দিই বার বার
নব নব উপলব্ধি,
নতুন কল্লোল—নব ঝিলমিল।
এক তাস একই অর্থ
বয়ে নিয়ে আসে কি কখনো?
এক পথ-পরিক্রমা শেষে
আকাশের সীমাহীন শূন্যতার পর
পাখিরা কুলায় ফেরে রোজ—
শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মনও
টেনে চলে—তবু এক পথ বেয়ে নয়;
সমুদ্রের তরংগ-বিলোল
এক ভঙ্গীকল্প, তবু এক নৃত্যে নয়।
বিচিত্র জীবন-পথে এক তাস বার বার এসে
নানা বর্ণ নানা গন্ধ নিয়ে
নানাভাবে ধরা দেয়—অধরা আবেশে।
আমি ভাবি এক তাস, এক রঙ
এক টেক্কা, এক বিবি, সাহেব ও গোলাম
তবু কত বিচিত্র বিভাব, কত ভিন্নদাম
হৃদয়ের পাটে তারা কত না বিচিত্র সঙ
কত রূপ, কত ঢঙ, কত চেনা,
কতক অচেনা, কেউ সাদা, কেউ কালো
কেউ পীত বেগুনী ও নীল—
মিল রেখে কেউ আসে,
কেউ বুঝি বেহিসেবী, কেউ বা অমিল!
এ জীবন মনে হয় তাই
এক জোড়া তাসের বাণ্ডিল।

প্রতীক্ষার পত্র

শচীন দত্ত

ছলনা নয় ছায়ার মতো কেউ
কখন যেন ছুঁয়েছে তার
বুকের ভাঙা অন্ধকার ঢেউ
গোপন গানে, কান্নাময় রাতে
স্মৃতির সারা শরীর ঘিরে, হায়।

ফোটেনি তবু ফোটেনি ফুল ফোটেনি
মধুপ মন জোটেনি...
অজানা দিন আলোর পিপাসায়।

ছায়াতে নেই ছবিতে নেই গানেও নেই যদি
ধাতুর পর্দাচিহ্ন আঁকা, শঙ্খ বিষ
আকাঙ্ক্ষার নদী
কেন যে ছোটে উর্ধ্বমুখ নীরব নিরবধি।
হাওয়ার কাঁপা স্বর্ণরঙ সুরের শারদীয়
কি হবে তবে প্রিয়!!

মেরিন-ড্রাইভ : বোম্বাই

[illegible] গোস্বামী

[illegible] মাথা খোঁড়ে,
দিন শেষে মুক্তি পায় তারা
উন্মত্ত যৌবন স্রোত ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ধারে ঃ
খুশির মিছিল চলে, রাজপথে [illegible] যায় সাড়া—
সে আনন্দ মেতে উঠি,
নিজেকে হারাই বারে বারে।

মধুর স্বাপ্নিল সন্ধ্যা ঃ ভাল লাগে,
শুধু চেয়ে থাকি—
'মেরিন-ড্রাইভ' ঘিরে আলোছায়া
আলপনা আঁকে,
আকাশে সাঁতার কাটে চক্রাকারে ছোট এক পাখি
রুপালি ডানায় তার স্বপ্ন-ঝরা
সোনা রঙ মাখে।

সুন্দরী মারাঠী মেয়ে, বেলফুল পরে সে
খোঁপায়—
গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটে, দেখে এই বিচিত্র মিছিল ঃ
ফেরিওলা ফেরি করে, তাকে ঘিরে
ভিড় জমে যায়
আলোর ওড়না গায়ে কি আশ্চর্য
'মালাবার হিল'।

অভিজাত সৌধশ্রেণী,
চন্দ্রালোকে করে প্রসাধন—
হেমন্তের রাত্রি বাড়ে, চঞ্চল বাতাসে ওঠে ঝড় ঃ
হাসি গানে মত্ত তারা উচ্ছ্বসিত নবীন যৌবন
সে আনন্দে কেঁপে ওঠে
নিস্তরঙ্গ আরব সাগর।

এবার চাঁদ উঠবে

রানা বসু

অন্ধকারকে নিয়ে আমরা খেলা করি,
জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ কী—
আমরা ব্রাত্য।

আমরা অপাংক্তেয়
তমসাচ্ছন্ন অন্ধ-গুহায় আমাদের
প্রহর কাটে।
অষ্ট প্রহর কালনাগিনীর ছোবলে ছোবলে
জীবন বিষাক্ত
অমৃতের বদলে হলাহল পান করে
মত্ত-পাগল আমরা ফোটাই
রাত্রি শেষের শ্বেত-শতদল।

নাতনামা অরণ্যে
মুক্তি-পিয়াসীর বিবেক দংশনে
দ্বিতীয়ার চাঁদ হেসেছে।

মরুভূমিতে দুরন্ত ঝড় উঠেছে
জন গণেশের সহস্র পদ-সঞ্চারে
তমিস্রা বুঝি বা কাটে॥

কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়ে ইকনমিক্স-এর একটি ডিগ্রী নিয়ে অশোক ফিরে আসছে দেশে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অমূল্যবাবু কেমন এক রকম মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন, কোন কিছুতেই তাঁর যেন আর উৎসাহ ছিল না কিন্তু ছেলে ফিরে আসছে শুনে এতদিনে তিনি নিজেকে কতকটা সংযত করে নিলেন। কোন এক নতুন প্রেরণায় আবার যেন তিনি জেগে উঠেছেন। এতদিন পর অশোক বিলেত থেকে ফিরে আসছে তার যেন কোন অসুবিধে না হয়, আজ বেচারার মা নেই। তাই অগোছালো ঘরদোরগুলো তিনি নিজে একাবারে সাজিয়ে তুলতে মনোযোগ দিলেন। নিউ মার্কেট থেকে দুটো ফুলদানি এনে প্লাস্টিকের বুগেনভিলিয়া দিয়ে ভরে অশোকের রাইটিং টেবিলে রাখলেন। এটলাস নার্সারি থেকে কয়েকটা ক্যাকটাসও কিনে ওর জানলায় থারগুলো সাজিয়ে দিলেন। তারপর অশোকের পৌঁছবার দিনটির অপেক্ষায় রইলেন।

হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে সেদিন বেশ একটা ছোটখাট ভীড় জমে উঠেছিল অশোককে রিসিভ কোরতে, তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। মেয়েরা বেশীর ভাগই ওর কলকাতার কলেজের বান্ধবী। ওর সংগে পড়তো এমন মেয়েদের মধ্যে গত পাঁচ বছরে অনেকেই বিয়ে-থা করে তিন-চার ছেলের মা হয়ে পড়েছে, তবে আবার অনেকেই আজো অবিবাহিতা। তাদের সবার ছিল অশোকের উপর অটুট শ্রদ্ধা, কারণ মেয়েদের সংগে ও যতই মিশুক না কেন কারু সংগে ও বিলেত যাবার আগে কোন প্রকারেই জড়িয়ে পড়েনি। মেয়েদের বাবা মা-রাও যেন ওর প্রতি একটু বেশী রকম মনোযোগ দিতেন। তবে ওর মত একজন বিদ্যে, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারার ছেলেকে জামাই কোরতে কার না সাধ হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। অশোক বিলেত থেকে ফিরলেই অমূল্যবাবুর কাছে সোজাসুজি একটা প্রস্তাব নিয়ে যাবেন।

ট্রেণটা লেট কোরছিল, তবে সবাই যখন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করতে সুরু করেছেন ঠিক সেই সময় ইঞ্জিনটা হুস্-হুস্ শব্দ করে ট্রেণ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। ট্রেণ থেকে নেমে সবার সংগে অভিবাদন প্রত্যাভিবাদনের পালা শেষ কোরে নমিতার বাবার বিশেষ অনুরোধে অশোক আর অমূল্যবাবু ও'র বড় ডজ কিংস-ওয়েতে উঠে বাড়ীর দিকে চললেন। নমিতা আর তার কলেজের সহপাঠিনীর কয়েকজন জয়শ্রীর ছোট স্ট্যাণ্ডার্ডটায় গিয়ে উঠলো। আর মালপত্র নিয়ে অশোকের পুরানো চাকর বিশু একটা ট্যাক্সিতে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

অশোক ফিরে আসার পর থেকে ওদের পাড়ার আর বন্ধু মহলে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে লোকে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। রিটায়ার্ড অধ্যাপক অমূল্যবাবুর এক-মাত্র ছেলে কলেজে অনার্স নিয়ে ভালোভাবে বি-এ-টা পাশ করার পরই বিদেশে পড়বার জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপটা যখন পেয়ে গেল, তখনই সবাই ধরে নিয়েছিল যে, দেশে ফিরেই ও একটা বড় রকম চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু অশোক ফিরে আসার পর দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল, তবু আজও একটা চাকরিতে বসা ওর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। অবশ্য এর মধ্যে নমিতার বাবা অশোকের সংগে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা অমূল্যবাবুকে একদিন জানিয়েছিলেন এবং অশোকের বেকারত্বের কথা ওঠায় তিনি বলে-ছিলেন গড়িয়ায় তাঁর নতুন ফ্যাক্টরীটা তৈরী হলে অশোককেই তিনি সেখানকার ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অশোকের এতে মত ছিল না, কারণ নমিতা যতই ভালো মেয়ে হোক না কেন, একেবারে বেকার অবস্থায় ঐ বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে কোরলে স্ত্রীর কাছে ওকে সব সময় নীচু হয়ে থাকতে হবে, তা-ছাড়া শ্বশুরের কারখানায় ঐ সব লোহা-লক্কড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। যারা স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর কোরে জীবন কাটায় অথবা শ্বশুরের টাকায় বড়লোকমি করে, বিলেতে লোকেরা তাদের জিগোলো বলে, ও কি শেষকালে একটা জিগোলো অর্থাৎ প্রফেসনাল লাভারে পরিণত হয়ে পাঁচজনের ঠাট্টার পাত্র হবে। যুক্তি শুনে অমূল্যবাবু খুবই খুসী হয়েছিলেন, ছেলে তাঁর শিক্ষার উপযুক্ত হয়েছে দেখে তিনি মনে-মনে একটু গর্ব অনুভব করলেন এবং নমিতার বাবা যাতে কোন রকম আঘাত না পান এই-ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সম্বন্ধটা ভেঙে দিলেন। কিন্তু অশোক ভুল করেছিল। বিলেতে যাই হোক না কেন, এদেশে জিগোলোরা ঠিক যে ঠাট্টার পাত্র নয় এটা জানবার সময় ও পায়নি। শ্বশুরের টাকায় যারা বড়লোকমি করে লোকে তাদের চালাক বলেই মনে করে এবং কতকটা শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। তাই রটে যায় ওর চাকরি-বাকরি নেই বলেই নমিতার বাবা ওর সংগে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা দিতে রাজি হননি। অমূল্য প্রফেসরের অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও।

ওর কোয়ালিফিকেসনের জোরে যে কটা বড় বড় চাকরির সম্ভাবনা ছিল তার, তার মধ্যে একটা ও নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন অমূল্যবাবু, কিন্তু তার মধ্যে একটাও যখন লাগলো না তখন তিনিও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বিলেত থেকে ফেরবার পর চারদিক থেকে অশোকের যে সব নেমন্তন্ন আসতো, বিশেষ করে অবিবাহিত মেয়েদের বাপ-মায়ের কাছ থেকে, তার সংখ্যা ক্রমশঃ কমে কমে আজকাল একদম শেষ হয়ে গেছে। অমূল্য-বাবুকে রাস্তায় দেখতে পেলে দিন-কতক আগে যাঁরা উৎফুল্ল হয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসতেন তাঁরাও যেন এখন একটু পাশ কাটিয়ে সরে পড়েন। অবশ্য অমূল্যবাবু ঐ ধরণের পাশ কাটানোয় বরং খুসীই হন, কিন্তু সহ্য করতে পারেন না কেউ যখন অশোকের আজও একটা চাকরি হল না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন অথবা দু-একটা অযাচিত উপদেশ ছাড়েন। কোথায় কার চাকরি দরকার, এক ধরণের লোক ঠিক তার খবর পেয়ে যায়। ট্রামলাইনের মোড়ের রেস্টুরেণ্টে অশোককে দেখতে পেয়ে কালীপদ মিত্তির ওর সংগে আলাপ জমিয়ে নেয়, তারপর ওদেরই অফিসে এক ভেকেন্সির খবর ওকে দেয়। প্রথম দিন কালীপদ জোর করেই নিজের সংগে অশোকের রেস্টুরেণ্টের বিলটাও দিয়ে দেয় এবং পরের দিন ঐখানেই সে ওকে ভেকেন্সির খবরটা সঠিক জানিয়ে দেবে প্রতি-শ্রুতি দেয়। পরের দিন সত্যি কালীপদ আসে এবং বলে ও খবর নিয়ে জেনেছে ওদের ফার্মের ইকনমিস্ট অন্য এক জায়গায় বড় চাকরি পেয়েছেন, তাই ওঁর জায়গায় লোক দরকার। বৃটিশ ফার্ম, মাইনে ১০০০ টাকা, প্রতি বছর বোনাস দেয়। ও নিজে ঐখানেই

স্ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, তাই বড় সাহেবকে াল দেখা হলে বলবে অশোকের কথা এবং হয় এইখানেই এসে জানিয়ে যাবে। পরের কালীপদ বলে যে বড় সাহেব ওর কোয়ালি- ফসনের কথা শুনে এক রকম রাজিই হয়ে ন, তবে যে ভদ্রলোক আছেন তিনি এক পরেই নতুন কাজে জয়েন করবেন, তবে বে নাকি এখনই ওর সংগে কথাটা পাকা ত চান।

প্রথম যেদিন ওদের দেখা হয় সেদিন ীপদই ওদের চায়ের বিলটা দেয়, কিন্তু পর থেকে প্রতিদিন অশোকই জুগিয়ে ছিল ওর টোস্ট, ওমলেট, চা, কেক দির বিল। আর দিন-দুই পর অশোকের কালীপদ ওর সাহেবের আলাপ করিয়ে এমন সময় সে এক বিপদে পড়ে াকের কাছে একশো টাকা ধার চেয়ে বসে। র মধ্যে একটা বড় বাড়ী দেখিয়ে সে বলে- যে, এটাই তার মামার বাড়ী, তাই অশোক এক সদ্‌বংশের ছেলে ভেবে সরল বিশ্বাসে াটা টাকাও দিয়ে দিয়েছিল। এরপর ীপদর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। কোম্পানীতে ও সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট বলে াককে পরিচয় দিয়েছিল সেখানে খবর জানা যায় ঐ নামে অথবা ঐ চেহারার লোককে ওরা কোন দিন চোখেও দেখেনি। ীপদ নিশ্চয় জানতো অশোকের মতন শের হালচাল না জানা উচ্চশিক্ষিত বিলেত ই লোকেরা সাধারণতঃ সন্দেহপ্রবণ হয় অশোক এ ব্যাপারটা অমূল্যবাবুকে আর য়নি। বিলেতে অনেক সময় অচেনা নগণ্য করা অপ্রত্যাশিতভাবে ওর অনেক কাজ দিয়েছে, তাই কালীপদকে ও অবিশ্বাস ত পারেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে ও জানতে কলকাতায় আজকাল চাকরি করে দেবার একদল লোক অনেককে ঐ ভাবে ঠকিয়ে াচ্ছে, এইটাই তাদের পেশা। অনেকে রভিউ বিক্রি করে, অর্থাৎ দালাল মারফৎ সের বাবুরা টাকা পেলে হাজার হাজার াস্তর মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে টাকা দেওয়া ককে ইণ্টারভিউ পর্যন্ত পেণছে দেন। ঐ ায় চাকরির ব্যবস্থা যে হয় না তা নয়, তবে অনেক টাকার ব্যাপার, কারণ তাতে অনেক দর নাকি ভাগ দিতে হয়। শোনা যায় াবে সত্যি কয়েকজন চাকরি পেয়েও গেছে। তু বেশীর ভাগ লোকই দালালদের হাতে দিয়ে মার খেয়েই যায়। একদিন সকালে ল্যবাবু ইংরিজি খবরের কাগজ নারের' বিজ্ঞাপনের একটা পাতা ন্দোজ্জ্বল মুখে অশোককে দেখিয়ে বলেন দেখ্, এটা তোর নিশ্চয় লেগে যাবে খোকা, ই দরখাস্ত করে দে। অশোক পড়তে সরকারী শিক্ষা বিভাগে কর্মখালি, ামিক্সে ডিগ্রী থাকা চাই। বাঞ্ছনীয়—বিদেশী াবিদ্যালয়ের ডিগ্রী, স্পোর্টসে পারদর্শিতা, ী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান াদি......অশোক চেঁচিয়ে পড়ছিল, হাসতে- তে অমূল্যবাবুকে শুনিয়ে এর সংগে জুড়ে এরোপ্লেন চালনায় পারদর্শিতা, ইংলিশ নল পার হওয়া, চৌদ্দতলা বাড়ী নির্মাণের জ্ঞতা এবং সম্ভব হলে স্পুটনিক চালনা বন্ধ বিজয়ে পারদর্শিতা—ওরে বাবা তারপর ন......বেতন মৌলিক ১৫০্ টাকা সুরু, মাগ্‌গিভাতা ১০্ টাকা ও বিশেষ ভাতা ৩্, অবশ্য যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ হারেও বেতন সুরু হইতে পারে। পদটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য, তবে ঐ সম্প্রদায়ের সুযোগ্য প্রার্থী না থাকলে সকলে সমান বিবেচ্য। আবেদনের সংগে ১০্ টাকার পোষ্টাল অর্ডার সংযুক্ত না থাকলে দরখাস্ত গ্রাহ্য হবে না। হাঃ হাঃ হাঃ কি হবে এনিয়ে মাথা ঘামিয়ে বলুন তো! অমূল্যবাবু একটু গম্ভীরভাবেই বলেন, তোর সবতাতেই ঠাট্টা, আমি বলি আর দেরি না করে এখুনি তুই দরখাস্তটা করে দে, তোর কোয়ালিফিকেসনে ওরা তোকে নিশ্চয়ই চার-পাঁচ শো টাকায় স্টার্ট দিতে পারবে। দেখি আমিও কিছু যদি করতে পারি, শিক্ষা দপ্তরে এখন উঁচু পোষ্টে আছে আমার এক ছাত্র। একজামিনের সময় কতবার ওর বাড়ী গিয়েও পড়িয়ে এসেছি। ওকে বল্লে এ ব্যাপারে ও তোকে নিশ্চয় সাহায্য করবে।

আজকাল ভাবনায়-চিন্তায় অশোকের সুন্দর চেহারাটা ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছিল। গালের হাড় দুটো বেরিয়ে আসার সংগে চোখের কোলেও ফুটে উঠেছিল কালি, ফর্সা রংটাও রুদ্দুরে ঘোরার জন্য কেমন যেন কালো হয়ে উঠছিল। অমূল্যবাবুও ছেলের জন্য ভেবে-ভেবে আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আজকাল উঁচু পোষ্ট হাঁকড়ে বসেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন রকম ফেবার আদায় করা ছিল তাঁর প্রিন্সিপলের বিরুদ্ধে। তবু আর উপায় না দেখে তাঁর যে ছাত্রটি শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাকে একটা চিঠি দিয়ে অশোককে অনুরোধ করলেন তার সংগে দেখা করতে। পাছে অমূল্যবাবু ক্ষুন্ন হন তাই শেষ পর্যন্ত অশোক দরখাস্তটা পাঠিয়ে দেয় এবং ওঁর সেই ছাত্রটির কাছে একটা চিঠি নিয়ে একদিন দেখাও করতে যায়। কিন্তু উচ্চপদস্থ লোকেদের সংগে দেখা করতে গেলে আগে নাম, ঠিকানা ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতে হয় বিভাগীয় দপ্তরের একতলায় অবস্থিত এক পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সাহায্যে। অশোক তার নাম ঠিকানার সংগে সে যে অমূল্যবাবুর ছেলে এবং তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠিও নিয়ে এসেছে সে কথাও লিখে অফিসারটির হাতে দিয়ে দেয়। কিন্তু অপেক্ষা কোরতে কোরতে ঘণ্টা দুই পার হয়ে যায়, তবুও ওর ডাক পড়ে না, তাই শেষে ও অফিসারটিকে জিগ্যেস করতে বাধ্য হয় যে, তার নামটা যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে কিনা। অত্যন্ত বিনয়ের সংগে অফিসারটি বলে যে ওর কথা বহুক্ষণ জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনও কোন জবাব আসেনি। আরও কিছু-ক্ষণ বসে থেকে অশোক অধীর হয়ে চলে যাবার জন্য উঠেছে ঠিক সেই সময় অফিসারটি ওকে ডেকে বল্লেন আপনার জবাব এসেছে, উনি বলে পাঠিয়েছেন যে এখন একটু ব্যস্ত আছেন, তাই আজ আর দেখা করতে পারবেন না। আপনি অন্য একদিন আসবেন এবং আসবার আগে চিঠি লিখে এপয়েণ্টমেণ্ট করে আসবেন, না হলে দেখা হবে না। কথাগুলো শুনে রাগে অশোকের মুখ থেকে বেরিয়ে যায় লোকটা এক আপস্টার্ট দেখছি, এই কথাটাই একটু আগে বলে পাঠালে কি ওনার চাকরি যেত? অফিসারটি আগের মতই বিনয়ের সংগে বলে, দেখুন আমার তো কোন হাত নেই, উনি যখনই বলে পাঠিয়েছেন সংগে সংগেই আপনাকে ডেকে বলে দিয়েছি, আপনার এই কাগজটাও নিয়ে যান। কাগজটা ওরই নাম, ঠিকানা লেখা যাতে ও স্পষ্টই লিখেছে ও কার ছেলে এবং অমূল্যবাবু যে একটা চিঠি দিয়েছেন তারও উল্লেখ আছে। কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সেখান থেকে ও বেরিয়ে আসে। বাড়ী এসে "লোকটির সংগে ওর দেখা হয়নি" অমূল্যবাবুকে শুধু এই কথাটাও বলে।

অমূল্যবাবুর ছাত্রটির সংগে দেখা না হলেও এবং কোন দালাল মারফৎ কাউকে কোন টাকা পয়সা না দিলেও ওর চাকরির দরখাস্তের জবাবে একদিন ওকে ইণ্টারভিউ দিতে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু ও তখন কলকাতায় ছিল না। এখানকার সব খবর জানিয়ে ওর বিলেতের এক বন্ধুকে ও একটা চিঠি লিখেছিল, তাই বন্ধুটি ওকে বম্বের এক বিলিতি ফার্মে ওর জন্য একটা চাকরি ঠিক করে ওকে চিঠি দেয়। তাই বিলেত থেকে ফিরে দু'বছর পর আবার ও বাংলাদেশ ত্যাগ করে যায়। ওর দরখাস্ত করা চাকরিটার ইন্টার-ভিউতে যে প্রহসন হয় তার খবরটা ও বম্বেতে বসেই একজনের মুখে শুনতে পায় যে ঐ ইন্টারভিউতে উপস্থিত হয়েছিল। চাকরিটা ইকনমিক্‌সের জন্য হলেও চা আর সন্দেশ খেতে খেতে কমিশনের একজন মেম্বার নাকি জিগ্যেস করেছিলেন ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে ক্যান্ডিডেটের কোন জ্ঞান আছে কিনা। শেষে ঐ পোষ্টে যাকে নেওয়া হয় তাকে যে নেওয়া হবে আগে থেকেই সেটা নাকি ঠিক ছিল। যদিও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত অনেক কোয়ালিফিকেসনই তার ছিল না কিন্তু উচ্চপদস্থ এমন একজনের সংগে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে ইন্টারভিউ না দিলেও হয়তো তার চাকরি না হয়ে যেত না।

অশোক কবে যে কলকাতা ছেড়ে গেছে পাড়ার বেশিরভাগ লোকই তা জানতো না এবং জানলেও সে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। তখন খাদ্য আন্দোলন, ব্যাঙ্ক স্ট্রাইক, চীনের ভারত আক্রমণ নিয়েই কোল-কাতার লোকেরা ব্যস্ত। এর মধ্যে ঘরদোর বন্ধ কোরে অমূল্যবাবুও যে কবে ছেলের কাছে চলে গেছেন তাও কেউ খেয়াল করেনি। অশোকের বম্বে আসার পর আরও দু'বছর কেটে গেছে। যে বৃটিশ ফার্মে ইকনমিক্‌সের পদে ও চাকরি নিয়ে এসেছিল সেখানে নিজের গুণে এরই মধ্যে ও অস্থায়ী ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে, মাসে প্রায় চার হাজার টাকা ওর মাইনে। অমূল্যবাবু সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, অশোক তখন মেরিণ ড্রাইভে ওর ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমে বসে একটি মেয়ের সংগে কথা বলছিল। চার বছর আগে হাওড়া স্টেশনে যে কজন ওকে রিসিভ করতে এসেছিল এ মেয়েটি হল তাদেরই একজন। এই মেয়েটির বাবাই একদিন অশোকের সংগে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু অশোকের তখন বিয়েতে মত হয়নি। এই মেয়েটির নামই হল নমিতা। অশোকের চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের ছোট, কলেজে ছিল ওর জুনিয়র। এক সোস্যাল ফাংসনে ওদের প্রথম আলাপ হয়। চার বছর বাদে অভাবিতভাবে এই বম্বে

সহরে হঠাৎ আজ ওদের দেখা হয়ে গেছে। অশোক বলছিল, "তুমি না ডাকলে সত্যি তোমার সংগে কথা বলার সাহস আমার হত না নমিতা।" "কিন্তু কেন?" "একে এক কোটিপতির মেয়ে, তার উপর আজ আবার আর এক কোটিপতির পুত্র-বধু। এক দরিদ্র কলেজের ফ্রেন্ডকে চিনতে পারবে কিনা।"......"এসব কি বলছ বলতো? আমি আবার কোন্ কোটিপতির পুত্রবধু হলুম?" "কেন পরিতোষ রায়ের ছেলে রমেনের সংগে কি তোমার বিয়ে হয়নি তাহলে?" "না।" "কেন এখানে আসবার আগে ওরই সংগে তোমার সম্বন্ধটা পাকা হয়ে গেছে বলেই তো শুনেছিলাম। ওতেও তোমার বাবা শেষ পর্যন্ত রাজী হননি বুঝি?" অশোক একটু ঠেস দিয়েই বলে। "না আমিই মত দিইনি।" "কিন্তু রমেনের সংগে বিয়েতে তোমার আপত্তি হল কেন?" "ওর কলঙ্কিত চরিত্রের কথা শুনে নয়। তোমার সংগে একদিন একটা বোঝাপড়া করতে পারবো শুধু এই আশাতেই। ঐ নিয়েই বাবার সংগে হোল ঝগড়া আর তারপর দিল্লীতে একটা চাকরি পেয়ে গত ক'বছর ঐখানেই আছি। বম্বেতে এসেছি একটা ডেলিগেসনে সাত দিনের জন্য, তার মধ্যে তিনদিন কেটে গেছে, এসে অবধি ভাবছিলুম কি করে তোমার সংগে দেখা করি। ঐ কথাই ভাবছিলুম ঠিক যে সময় দেখা হোল তোমার সংগে মেরিণ ড্রাইভে।" "কিন্তু কি বোঝাপড়া করবে আমার সংগে নমিতা?" "বাবার মত হয়নি বলেই আমাদের দিক থেকে যাই রটানো হোক না কেন, তুমি মত দাওনি বলেই যে তোমার সংগে সম্বন্ধটা ভেংগে গিয়েছিল এটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না। কিন্তু কেন? কেন? আমি কি তবে তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম?" "না না, তুমি ভুল বোঝনি। আজও ওর শোবার ঘরে দেখবে ও তোমার একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। তবে সেদিন যে বাধা ছিল আজ আর তা নেই। সেদিন ও ছিল বেকার কিন্তু আজ ও প্রায় চার হাজার টাকা মাইনে পায়। এখন ও তোমার ভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে।" অমূল্যবাবু সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে কখন যে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা ওরা জানতে পারেনি, তাই হঠাৎ ওঁর কথা শুনে ওরা একটু চমকে উঠেছিল। নমিতা দাঁড়িয়ে উঠে ওঁকে প্রণাম করে। অশোক উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে, "কিন্তু বাবা আপনাকে বলবার সময় পাইনি, আমি যে একাজে ইস্তফা দিয়েছি এবং আমার আগ্রহ দেখে কোম্পানীর পরিচালকরাও আমায় মুক্তি দিতে রাজি হয়েছেন। যদিও অন্য জায়গা থেকে আরও বেশি মাইনের অফার পাচ্ছি কিন্তু সেজন্য আমি ইস্তফা দিইনি, দিয়েছি, যেখানে একদিন আমার ১৫০্ টাকার একটা চাকরিও জোটেনি সেই বাংলাদেশে ফিরবো বলে। ঐখানেই আজ আমার অনেক কাজ. অধঃপাতের মুখ থেকে দেশকে ফেরাতে হলে অনেককে আজ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কি জন্য চাকরি ছাড়ছি এটা হয়তো আমাদের অফিস থেকেই রটে গেছে, তাই সকল দলের দালালেরা এর মধ্যেই আমায় বাজিয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু বাম-পন্থী বা দক্ষিণপন্থী যেই হোক স্বার্থের জন্য যারা দেশের ভাগ্য নিয়ে খেলতে পারে তাদের সংগে আমার যোগ থাকবে না। আমার রাস্তা হল অন্য। দেশের নৈতিক চরিত্র ফেরাতে কতদূর সফল হব জানি না। তবু সেই চেষ্টাই আমার কাজ। মানুষের সেবার জন্য হয়তো আমায় ঘুরতে হবে গ্রামে গ্রামে। যেতে হবে বস্তির মধ্যে. নমিতা বড়লোকের মেয়ে, ওর পক্ষে কি সম্ভব?" ......একথার উত্তর নমিতাই দেয়. "নিশ্চয় সম্ভব, আমি বড়লোকের মেয়ে কি গরীবের মেয়ে যাই হই না কেন প্রথম থেকে এই আশাই করেছিলুম যে কাজের সময় তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবো। সাধারণ গেরস্থ জীবনের চেয়ে শুধু সেইটুকু সুযোগ পেলেই আমি সুখী হব।" বাইরে তখন অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে। আকাশে অসংখ্য তারা। আর নিচে কূলহারা আরব সাগর। কে জানে ঐ ঢেউগুলো কত হাজার বছর ধরে উঠছে আর পড়ছে।

যুগল বীমা

(১৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একদিন দুই বন্ধু যথারীতি একসংগে অফিসে রওনা হইল। হরিগোপাল একটি চলতি ট্রামেই উঠিয়া পড়িল। হরকান্ত ঠিক করিল যা থাকে বরাতে সেও ঐ ট্রামেই উঠিবে, কারণ এ ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে অফিসে পৌঁছিতে দেরী হইয়া যাইতে পারে! এ পর্যন্ত কখনো হাজিরা দিতে দেরী হয় নাই, আজই বা দেরী হইবে কেন? হরির পর হরকান্ত যখন ছুটিতে ছুটিতে ট্রামে উঠিতে চেষ্টা করিল তখন ট্রামের বেগটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছে। হরিগোপাল হাত বাড়াইয়া হরকান্তকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, কিন্তু তাহার হাত হইতে হরকান্তর হাত পিছলাইয়া গেল। হরকান্ত অত্যন্ত বেকায়দায় রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। পিছন হইতে একটা দোতলা বাস বেগে এইদিকেই আসিতে-ছিল। ভাগ্যিস ড্রাইভার খুব হুঁশিয়ার এবং পাকা ছিল, তাই সে সময় মতো ব্রেক কষার ফলে বাসটা ঠিক হরকান্তর কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া গেল। আরেকটু হইলেই চাকার তলায় পিষিয়া হরকান্ত পটল তুলিত।

পরের স্টপে ট্রাম হইতে নামিয়া হরিগোপাল ছুটিয়া আসিয়া বলিল 'ভাই, তোমাকে স্বয়ং ভগবান হাতে ধরিয়া বাঁচাইয়াছেন। আমি তো চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু—'

হরকান্ত রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলিল. 'হ্যাঁ ভাই হরি, তুমি চেষ্টার কিছু ত্রুটি কর নাই'।

হরকান্তর উক্তিটি হরিগোপালের কানে একটু শ্লেষপূর্ণ শুনাইল। হর যেন ইংগিতে বলিতেছে, 'তুমি তো ইচ্ছা করিয়া হাত ফসকাইয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা ভালভাবেই করিয়াছিলে। কিন্তু বিধি বাম, তুমি আর কি করিবে? যুগল-বীমার দশ হাজার টাকা এবারেও তোমার ফস্কাইল'।

এইভাবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া হরি ও হর ভিতরে ভিতরে দুজনে দুজনকে সন্দেহ করিতে লাগিল। এমন সময় একদিন......

কি একটা উপলক্ষে মেসের সবাই চাঁদা তুলিয়া নৌকা ভাড়া করিয়া নৌকা-বিহারে চলিল। বাকি সকলের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া হরি এবং হরও উহাদের সংগে গেল। হরি ভাবিল, হর-র সংগে তাহার মনোমালিন্য যাহাই থাক না কেন, অপরকে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিবার দরকার কি? সুতরাং দুজনেই নৌকার এক ধারে পাশাপাশি বসিল, হাসিয়া কথাও বলিল। এখানে বলিয়া রাখি হরি ও হর, এই দুজনের মধ্যে একজন সাঁতারে একদম আনাড়ি ছিল (অর্থাৎ সাঁতার জানিত না), অন্যজন অল্প জানিত। কিন্তু এ খবর মেসের অন্যান্য বাসিন্দারা, অর্থাৎ নৌকার বাকি আরোহীরা জানিত না। একথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কারণ তাহাদের এই অজ্ঞতার ফলে একটু পরে যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা শুনিয়া আপনারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না।

এইবার ঘটনাটা বলি। নৌকাটির অল্প দূর দিয়া একটি স্টীম লঞ্চ নদীর বুকে প্রবল ঢেউ জাগাইয়া চলিয়া গেল। ঢেউয়ের প্রবল ঝাপটায় নৌকাটি ভীষণভাবে দুলিয়া উঠিল। দোলা লাগিয়া হরি উল্টাইয়া জলে পড়িয়া গেল। তাহার পরেই দেখা গেল হরির হাত ধরিয়া হরও নৌকা হইতে জলে পড়িল। নৌকা আগাইয়া গেল। নৌকা থামানো হইল। সবাই ভাবিল হরি ও হর ডুব সাঁতার দিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিবে।

কিন্তু হায়, তাহারা জীবিতাবস্থায় আর ভাসিয়া উঠিল না। পরে যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন দুজনই প্রাণহীন। যুগল বীমার দশ হাজার টাকা দাবী করিতে দুজনের কেহই রহিল না।

ইহাদের যুগল মৃত্যু সম্বন্ধে মনে নানারূপ জল্পনার উদয় হইতেছে। হয়তো এক বন্ধুকে বাঁচাইতে গিয়া অপর বন্ধুও সলিলে সমাধি লাভ করিয়াছিল। অথবা হয়তো অল্প সাঁতার জানা বন্ধু সাঁতার-না-জানা বন্ধুকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং সাঁতার-আনাড়ী বন্ধুটি ভাবিয়াছিল 'ভাই, আমি মরিব আর তুমি যুগল-বীমার টাকাটা একা মারিবে? তাহা হইবে না তুমিও আমার সংগে সলিল-সমাধি লাভ কর'।

এ সকলই আমার অনুমান মাত্র। তবু, যুগল-বীমার কথা যাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহারা হরি ও হর, এই দুটি হরিহর-আত্মা বন্ধুর করুণ কাহিনী যেন একবার স্মরণ করেন।

ক্ষুধা

পৃথিবীতে যত ব্যাধি আছে তার
সব সেরা ব্যাধি ক্ষুধা,
একটি উপায়ে সে রোগ মুক্তি—
অন্ন জীবন সুধা!
ক্ষুৎ নিবৃত্তি লাগি শুধু খেও,
নয় কভু লোভ ভরে
সংযমহীন খাদ্যলোভীরা
খেয়ে খেয়ে ভুগে মরে।

শৈব সংহিতা (মায়া বসু)

ভূমিকা ঃ—পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের মধ্যে যতো রকমের রোগ হয়, তার মধ্যে আমার মনে হয় রক্তাল্পতা সবচেয়ে বেশী। হাসপাতালে দৈনন্দিন যতো রোগিণী পরীক্ষা করি, তাদের প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর রক্তাল্পতা রোগে ভোগেন। রক্তহীন কথাটা বলতে চাই না, কারণ বিনা রক্তে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষ কেন? অ্যামিবা প্রভৃতি কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী ছাড়া, কেউই রক্তহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। প্রাণীর প্রাণের স্পন্দনের জন্য অহরহ অক্সিজেন বায়ুর প্রয়োজন এবং এই প্রাণ-সঞ্জীবনী বায়ু রক্তের সাহায্যে দেহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চালিত হয়। কেবল অক্সিজেন বায়ু নয়, দেহের পুষ্টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহন করে নিয়ে যায় রক্ত। এর ঠিক বিপরীতভাবে দেহের দূষিত পদার্থ কোষ থেকে রক্ত বহন করে নিয়ে গিয়ে শরীরের বাইরে ফেলে দেয়। শরীরের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি থাকা সত্ত্বেও অক্সিজেনের অভাবে সারা শরীর অকেজো হয়ে পড়ে, যেমন উনুনের ওপর কয়লা, ঘুঁটে সাজিয়ে রাখলে কোন কাজ হয় না, তাতে আগুন দিতে হয় উত্তাপ সৃষ্টি করার জন্য। এই আগুনই হল অক্সিজেন। বিনা অক্সিজেনে শর্করা, চর্বি বা প্রোটিন দাহ হবে না এবং দাহ না হলে শরীরের উত্তাপ হবে না। উত্তাপ না হলে কর্মক্ষমতা জন্মাবে না। অতএব, দেহকে সচল রাখার জন্য অক্সিজেনের আগুন প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন।

রক্তাল্পতা কাকে বলে?—রক্তাল্পতা বলতে আমরা সহজ কথায় বুঝি, স্বাভাবিক অনুপাতের চেয়ে দেহে রক্ত কম। সাধারণ দৃষ্টিতে রক্ত লাল এবং জলীয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রক্তের মধ্যে জলীয় পদার্থ ছাড়াও আরও কঠিন বস্তু আছে। প্রোটিন এবং কণিকাগোষ্ঠী কঠিন পদার্থের অন্তর্গত। প্লাজমা নামক পদার্থটি হল জলীয়। জলীয়র ভিতর কঠিন পদার্থগুলি ভেসে থাকে এবং সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সাঁতরে যেতে পারে। পাড়ের ওপর থেকে নদীর দিকে তাকালে মনে হয় নদীতে কেবল জল আছে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জলের ভিতর মাছ এবং অন্যান্য জলীয় প্রাণী আছে। রক্তের মধ্যেও সেই একই ব্যাপার ঘটছে। বাইরে থেকে মনে হয় রক্ত জলীয় কিন্তু ভিতরে কঠিন পদার্থ বিদ্যমান।

রক্ত লাল কেন?—রক্ত কেন লাল? লোহিত-কণিকার জন্য। এই কণিকাগুলি দেখতে লাল এবং সাদা চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যায় এই কণিকাগুলির মধ্যস্থল সরু এবং উভয় দিক অপেক্ষাকৃত মোটা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই কোষের কোন নিউ-ক্লিয়াস নেই। এই কণিকাগুলি যখন সরু উপশিরা বা প্রশিরার মধ্যে প্রবেশ করে, এগুলি আপনা থেকেই লম্বা হয়ে ক্ষীণ শিরার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। যদি কোন কারণে লম্বা হবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়, তাহলে কণিকাগোষ্ঠী পরস্পর যুক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। এইভাবেই মারাত্মক করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের সৃষ্টি।

লোহিত কণিকার সঙ্গে রক্তের লাল রঙের সম্পর্ক কি জানতে হলে একটি লোহিত কণিকাকে ফাটিয়ে ফেলতে হবে। কণিকাটি ফাটিয়ে ফেললে ভিতর থেকে লাল রঙের একটি পদার্থ বেরিয়ে এসে প্লাজমার সঙ্গে মিশে যাবে এবং প্লাজমা-জলকে রাঙিয়ে তুলবে। এই রাঙিয়ে তোলার বৈজ্ঞানিক নাম হিমোলিসিস অথবা হিমোলাইসিস। লাইসিস কথাটার অর্থ গলিয়ে ফেলা। পুরো কথার মানে করলে দাঁড়ায় হিমকে গলিয়ে ফেলা। সত্যিই তাই হয়। লোহিত-কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে একটি লাল রঙের পদার্থ আছে। এই হিমোগ্লোবিন লোহিত-কণিকার মধ্যে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই কাজ করতে পারে, কণিকার বাইরে এলে হিমো-গ্লোবিন গলে যায় এবং কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ-রূপে নষ্ট হয়ে যায়।

এই হিমোগ্লোবিনই হল রক্তের লাল-রঙের সৃষ্টিকারক। হিমোগ্লোবিনের রং লাল, তাই রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয়েছে, হিম্ এবং গ্লোবিন্ পদার্থের সমন্বয়ে। হিম লোহাধাতু দিয়ে তৈরি এক রকমের রঙ এবং গ্লোবিন প্রোটিন বিশেষ। হিমোগ্লোবিন তৈরী করতে গেলে লোহা এবং প্রোটিন-এর প্রয়োজন সমানভাবে। এর একটির অভাব ঘটলে অন্যটি কাজ করতে পারে না। হিমোগ্লোবিনই হল রক্তের কর্মকেন্দ্র। অক্সি-জেনকে বহন করে নিয়ে যায় হিমোগ্লোবিন আবার কার্বণ-ডাই অকসাইডকে শরীরের বাইরে নিয়ে যায় ফুসফুসের মাধ্যমে এই হিমোগ্লোবিন। শতকরা কত ভাগ হিমোগ্লোবিন আছে দেখে বলতে পারি, কোন্ রোগীটির রক্ত অল্পতার পরিমাণ কতোখানি।

বাঙালীর রক্ত ঃ—বাঙালীর রক্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছি অধিকাংশ বাঙালীর রক্তে হিমোগ্লোবিন-এর ভাগ কম, জলীয় পদার্থের ভাগ বেশী। বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের অধিকাংশ পুরুষের হিমো-গ্লোবিন শতকরা ষাট থেকে সত্তর ভাগ থাকে এবং স্ত্রীলোকের পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ থাকে, অথচ সুস্থ অবস্থায় হিমোগ্লোবিনের ভাগ থাকা উচিত শতকরা আশী থেকে একশো ভাগ। আমি যখন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক অফিসার ছিলাম, তখন প্রত্যহ বহু লোকের রক্ত পরীক্ষার সুযোগ পেয়েছি এবং পরবর্তীকালে যখন সেবা সদনের প্রসূতি বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছি তখন বহু নারীর রক্ত এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি। বাঙালী পুরুষ এবং নারীর স্বাস্থ্য এবং রক্ত বিশ্লেষণের একটি স্বচ্ছ ছবি আমার কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা ভৌগোলিক কারণে অনেকটা রক্তাল্পতায় ভুগি। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাম নির্গত হয় এবং ইদানীংকালের গবেষণায় দেখা গেছে ঘামের সঙ্গে কিছু পরিমাণ লোহ-ধাতু দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। ডাঃ পট্টবর্ধন ও ডাঃ হুসেন এ বিষয়ের তথ্যকথা বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ সালগানিক তাঁর গবেষণায় প্রকাশ করেছেন যে ঘামের সঙ্গে লোহধাতু ছাড়া আরও অনেক কিছু পুষ্টিকর দ্রব্য দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। আমাদের ঘাম ভৌগোলিক অবস্থার জন্য একটু বেশী হয় এবং তার জন্য আমরা সর্বদাই রক্তাল্পতার জন্য ভুগি।

পরিপূর্ণভাবে রক্ত তৈরী করতে হলে আমাদের দুটি জিনিষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। একটি ধাতব লোহা, অপরটি গ্লোবিন-প্রোটিন। এর একটির অভাব হলে হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হবে না। লোহিত কণিকাকে সৃষ্টি করার জন্য প্রোটিন এবং লোহা ছাড়াও আরও অনেক রকমের খাদ্যপ্রাণ, বিশেষতঃ ভিটামিন সি এবং তামা (কপার) ধাতুর প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেহের পুষ্টি অনেক কম। এর জন্য খাদ্যের অভাব যতোটা, তার চেয়েও বেশী খাদ্যের সময়ের অনিয়মানু-বর্তিতা। আমরা সাধারণতঃ সকালে চা-সহযোগে জলখাবার গ্রহণ করি, দুপুরবেলায় ভাত এবং অন্যান্য তরি-তরকারী খাই, যেটা দিনের প্রধান খাদ্য। বিকেল বেলায় চা-বিস্কুট এবং রাতে আবার ভাত। খাবার সময়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমরা ইংরেজ সময়ের অনুসরণগত। ইংল্যণ্ড এবং অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের লোকেরা এইভাবেই খাদ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের সঙ্গে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খাদ্যের সময়ের একটা পার্থক্য আছে। সাল-গানিক তাঁর অনুসন্ধানে দেখেছেন, পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আদিবাসীরা ভোরবেলায় প্রধান খাদ্য খেয়ে নেন। সূর্যের প্রচণ্ড তেজে হজমের গোলমাল হবার যথেষ্ট ভয় থাকে। দুপুরবেলায় অল্প এবং হাল্কা পানীয় গ্রহণ করেন এবং রাতে সূর্য অস্ত যাবার পর আবার প্রধান খাদ্য গ্রহণ করেন। আমাদের দেশেও পল্লীবাসীরা তাই করতেন। ভোরে ফ্যানে ফ্যানে ভাত, তেল বা ঘি দিয়ে সেদ্ধ আলু, পটল

সহযোগে খেয়ে যেতেন মাঠে চাষ করতে। দুপুরে বাড়ী থেকে সামান্য কিছু খাদ্য মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে স্নান করে একপেট ভাত খেয়ে পাড়ায় বেরোতেন গল্প-গুজব করতে। বর্তমানকালের মত এত শৌখীন খাদ্য তাঁরা খেতেন না, তা সত্ত্বেও তাঁদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল।

বর্তমানকালের মধ্যবিত্ত সমাজ একেবারে শীতপ্রধান দেশের মত তৈরী হয়ে গেছে, যা আমাদের গরম আর্দ্র দেশে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আমাদের সাংসারিক নিয়মকানুনও শীতের দেশের মত নয়। সকালে উঠে বিলেতের লোকেরা মুখ-হাত, পা ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসেন। একই টেবিলে সবাই এসে বসেন। বাড়ীর কর্তা-গিন্নী থেকে আরম্ভ করে শিশুটি পর্যন্ত। প্রত্যেকে যথাযথ পেট ভরে খেয়ে যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। আমাদের সমাজে নারী পতি-দেবতাকে না খাইয়ে কিছুই গ্রহণ করেন না। সকালে উঠে উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে খাবার করতে বসে যান। সকালের জল খাবার তৈরী হয়ে গেলে, ছেলেমেয়ে, স্বামীকে খাইয়ে বাড়ীর গিন্নী ছোটেন স্নানের ঘরে। যাবার সময় স্বামীর অফিসের ভাত চড়িয়ে দিয়ে যান। ফিরে এসে ভাত নামিয়ে, একটা ঝোল একটু ভাজাভুজি করে অফিসের ভাত বেড়ে দেন। স্বামীকে অফিস পাঠিয়ে, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে তিনি যখন জলখাবার নিয়ে বসেন তখন দশটা বেজে গেছে। স্বাভাবিক ক্ষুধা তখন নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কিছুই খেতে পারেন না। যা খান ভাল-ভাবে হজম হয় না।

আমি হাসপাতালে অত্যন্ত অসুস্থ এবং প্রায় রক্তহীন ফ্যাকাশে সাদা রোগিণীকে যখন ভর্তি হবার কথা বলেছি, তখন নিরুপায় কন্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছেন, আমি হাসপাতালে ভর্তি হলে সংসার দেখবে কে? সংসারকে এমনভাবে ভাল-বাসতে আমি আর কোন জাতকে দেখিনি, আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মেয়ে সংসারের জন্য এমনভাবে প্রাণ দেবে না। রোগিণীর পা ফোলা, মুখ ফোলা, চোখে ফ্যাকাশে চাউনি, মুখে পান্ডুর বিবর্ণতা। তবু ঠোঁটের দুপাশে একটু হাসি লেগে আছে।

এ চিত্র দারিদ্র্যতার জন্য নয়। এ চিত্র অত্যন্ত ভাবপ্রবণতার জন্য। হাসপাতালে ভর্তি হলে বাড়ীতে কে দেখাশোনা করবে, কে সকলকে সময়মত খেতে দেবে এই চিন্তায় সামনে মৃত্যু আসছে জেনেও দিনের পর দিন হাসিমুখে কাজ করে যাচ্ছেন।

রক্তাল্পতা দূর করতে হলে কি করা প্রয়োজন?—পুষ্টিকর খাদ্য খেলেই যে স্বাস্থ্য সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে এ ধারণা মিথ্যে। যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তা ভালোভাবে হজম করতে পারলে তবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ডালভাত পেট ভরে খেয়ে হজম করলেও মাংসপোলাও-পুষ্ট ছেলের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর স্বাস্থ্য তৈরি হবে। এ বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশে বহু গবেষণা হয়ে গেছে।

সামাজিক নীতি ছাড়া আরও অনেকগুলি কারণে আমাদের দেশে এতো রক্তাল্পতা। অজীর্ণতা এবং অন্ত্রের গোলযোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি আমাশয় রোগে ভোগেন না। আমাশয় রোগ প্রধানতঃ দূষিত জল থেকে হয়। যেখানেই জল খান না কেন, আপাতদৃষ্টিতে জল যতোই বিশুদ্ধ হোক না কেন, যে কোন মুহূর্তে জলের সঙ্গে আমাশয় রোগের কীটাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে। আমাশয় ছাড়া আরও নানা রোগের বীজাণু জলের সঙ্গে পেটে প্রবেশ করে এবং অজীর্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যতোই পুষ্টিকর দ্রব্য খান না কেন, অজীর্ণতার জন্য তার কোন ফল হয় না।

এক প্রকারের কৃমি, ইংরিজীতে যাকে 'হুক-ওয়ার্ম" বলে, মানুষের রক্ত সেবন করে বেঁচে থাকে। বাংলা দেশের অধিকাংশ শিশু এই কৃমি রোগে ভোগে এবং মা বাবা যতোই পুষ্টিকর খাদ্য দিন না কেন, শিশু ক্রমশঃ রক্তহীন হয়ে পড়ে এবং শিশুর পরিবর্তে কৃমিগুলি পুষ্ট হয়ে ওঠে।

রক্তাল্পতার ভয়াবহতা : বাংলা দেশের রক্তাল্পতার আর একটি কারণ অহেতুক লজ্জা। মেয়েদের জরায়ু সংক্রান্ত কোন রোগ সহজে ডাক্তারকে দেখান না। রক্তক্ষরণ হতে হতে যখন একেবারে রক্তহীন হয়ে পড়েন এবং সাদা কাগজের মত হয়ে যান, তখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। প্রতিদিন অল্প অল্প রক্ত ক্ষরণের মতো মারাত্মক রোগ আর নেই। একদিন কোন দুর্ঘটনায় প্রচুর রক্তপাত হওয়া যতো মারাত্মক, তার চেয়ে শতগুণ খারাপ অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হওয়া। ক্রমাগত অল্প রক্ত-ক্ষরণে দেহ দুর্বল হয়ে যায়, বিশেষতঃ হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে যায়, কারণ রক্তাল্পতার জন্য অক্সিজেন বায়ু প্রচুর পরিমাণে পায় না, ফলে, হৃৎপিন্ডের পেশী দুর্বল হয়ে যায়। এমনভাবে দুর্বল হয়ে যায় যে, রক্ত দিতে গেলে সে রক্তের চাপ হৃৎপিন্ড সহ্য করতে পারে না, ফলে হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা দুর্ঘটনার রক্তপাতে যতো রোগী মরতে দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি এই রকম ক্রমাগত রক্তপাতের জন্য। রক্তাল্পতার পর যদি হঠাৎ কোন রোগী কি রোগিণীর রক্তপাত হয়, সে রক্তপাত অত্যন্ত মারাত্মক, এমনকি মৃত্যু অবধি ঘটতে পারে। দুটি রোগিণীর কথা বলছি, তাতে বোঝা যাবে রক্তাল্পতার পর রক্তপাত কত মারাত্মক। এক ভদ্রমহিলা সন্তান প্রসবের জন্য মাঝরাত্রে হাসপাতালে এলেন। প্রসবাগারে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম, তিনি প্রায় রক্তহীন। অক্সিজেনের অভাবে তাঁর হৃৎপিন্ডও ক্ষতিগ্রস্ত। ছ্যাকড়াগাড়ির মত কোন মতে হৃৎপিন্ড চলছে। তক্ষুণি রোগিণীর রক্ত টেনে রক্ত সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। দু' বোতল রক্ত এসে গেল ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। রক্ত দেবার চেষ্টা করা হল রোগিণীকে কিন্তু কিছুতেই দেওয়া গেল না। একটু রক্ত দিলেই শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। অক্সিজেন দেওয়া হল, তাতেও লাভ হল না। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হৃৎপিন্ড প্রসবের হঠাৎ-ধকল সহ্য করতে পারলো না। দ্বিতীয় রোগিণীর রক্তাল্পতা ছিল না, কিন্তু প্রসবের পরেই এত রক্তস্রাব হল যে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ব্লাড-প্রেসার এত কমে গেল যে রক্ত আর যায় না। শেষে আমরা গ্লুকোজ সিরিঞ্জে রক্ত ভরে, সেই রক্ত রোগিণীর শিরায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। এই ভাবে আমরা তিন বোতল রক্ত দিই। তারপর ধীরে ধীরে পাল্‌স্‌ ফিরে আসে এবং রোগিণী প্রাণলাভ করে। বেশ মনে আছে সেদিন কোন পুজোর ভাসান ছিল। বাইরে রাস্তা দিয়ে তখন বাজনা বাজিয়ে প্রশেসন চলেছে, রোগিণী প্রথম চোখ খুললেন। দ্বিতীয় রোগিণীকে বাঁচানো গিয়েছিল কেবল হৃৎ-পিন্ডের অবস্থা ভাল ছিল বলে। প্রথম রোগিণীর মত তাঁর হৃৎপিন্ডের অবস্থা যদি খারাপ থাকতো তা হলে তাঁকেও বাঁচানো যেতো না।

আমাদের দেশের রক্তাল্পতার আর একটি প্রধান কারণ সংখ্যাধিক সন্তানের জন্মদান। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পরিবার পরি-কল্পনা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী উঠে পড়ে লেগেছে, তখনও আমাদের দেশে সন্তান সৃষ্টি হয়ে চলেছে। হাসপাতালের অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনার মূল কথা এখনো সাধারণ লোকের প্রাণে গিয়ে পৌঁছয়নি। এখনো সন্তানবন্ধের কথায় রোগিণীরা অযথা লজ্জা পান। এ বিষয়ে যদি ভালোভাবে আলোচনা করা না হয়, তাহলে আমাদের দেশ থেকে রক্তাল্পতা কোনদিনই কমবে না। রক্তাল্পতার সমস্যা না দূর করলে দেশ কোনদিনই সবল স্বাস্থ্যবান হবে না।

হাসপাতাল

সুলেখা ঘোষ

পাশাপাশি শয্যাপাতা, শুভ্র যুঁই
বিছানার ঢাকা,
মাথার উপরে আছে মরু ঝড় সৃষ্টি করা
সনাতন পাখা
পাশেই "লকার",
রোগীর জিনিষপত্রে ক্ষণস্থায়ী একটি সংসার।
অপরিচিতের রাজ্যে অশ্রুঝর্ণা ওঠে ছলছলি
নির্ঝরের মত তাই মনে হয় বলি,
চূর্ণ কর, ছিন্ন কর, মুক্তি দাও খোল এ বাঁধন
হৃদয় সাগরে ওঠে ক্ষুব্ধ প্রভঞ্জন।
অপগত হয়ে যাক রোগের যন্ত্রণা
ব্যথিতের ঘন নীল দুঃসহ বেদনা—।
পাশেই রোগীর কান্না, বাষ্পের মতন মিশে যায়
বাতাসের শিরায় শিরায়।

কাস্তে চাঁদ শুক্লা-তিথির,
প্রভাতের কাঁচ রোদ তমাল বীথির—
সীমানা ছাড়িয়ে এসে বন্দী হয়
বিষন্ন শৃঙ্খলে
অবসিত সময়ের ইতিহাস হয়ত বা বলে।
তারপর আসে ক্রমে
প্রতীক্ষার সোনালী বিকাল
সময় সমুদ্রে যেন অতি ক্ষুদ্রতরঙ্গ উত্তাল
রোগীর শয্যার পাশে শুভার্থীর শঙ্কাজাগা মন,
ললাটে বুলায়ে হাত করে স্নেহে
কতো সম্ভাষণ।
সময় উত্তীর্ণ হলে বিশীর্ণ দেহের স্পর্শে
এই সত্য হয়,
ওষুধ, ডাক্তার, নার্স আর কিছু নয়।
তারপর বাড়ে রাত সমস্ত নিঝুম
নয়নের ছোটো হ্রদে ভেসে আসে বেদনার
ঘননীল ঘুম।

সুভদ্রা মাসির ছেলে

— জয়ন্তী সেন —

কানাগলির শেষে পুরোন নোনাধরা দেওয়ালের গায়ে চক দিয়ে লেখা একটা অস্পষ্ট নম্বর হয়তো নজর করলে দেখা যায়, কিন্তু সুভদ্রা মাসির বাড়ী বললে এখানে যে কেউ পথ দেখিয়ে দেবে। ভাঙা-চোরা একটা একতলা বাড়ী, পেছনে গোয়ালাদের খাটাল আর ঘিঞ্জি বস্তি। সেইখানে একটা ঘরে মাসে সাত টাকা ভাড়া দিয়ে সুভদ্রা মাসি থাকে। সম্বল একটা পুরোন, মেরামত হওয়া দরকার সেলাই-এর কল আর একটা ফটো। সেলাই-এর কলে পাড়ার মেয়েদের ফরমাসী সেলাই কিছু কিছু করে আর ছাঁট-কাট শিখিয়ে নিজের খরচটা মোটামুটি চালিয়ে নেয় সুভদ্রা মাসি। এ-ছাড়া দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় কিছু টাকা পাঠান নিয়মিত, তাই খাওয়া-পরার ভাবনা ভাবতে হয় না। গলির রাস্তায় যে ছেলেরা মার্বেল খেলে তাদের ঘরে ডেকে নিয়ে এক আনায় দশটা মাছ-লজেন্সের প্যাকেট খুলে বিলি করতে করতে দেওয়ালের টাঙানো সেই একটিমাত্র ফটোর গল্প সে হামেশাই করে। ছবিটা তার ছেলে গোপালের, নিজের অতীত জীবনের অন্য সব পরিচ্ছেদ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কেন না আমরা ছেলেবেলা থেকে বহুবার লজেন্স অথবা মুড়ির মোয়ার লোভে তার ঘরে গিয়েছি আর শুধু তার ছেলের গল্পই শুনেছি। কিন্তু আর কিছুই শুনিনি। বাড়ীতে দিদিরা কৌতূহল প্রকাশ করলে সুভদ্রা মাসি মাথা নেড়ে বলেছে—

"সে সব কতকালের কথা বাপু—সে কি ছাই মনে আছে কিছু! হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন—তোমাদের বোনপোর দাঁত ওঠার কথায় মনে পড়ে গেল আমার গোপালের কথা। কি আশ্চর্য কি বলব, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ছেলে আমার শাড়ীর আঁচল চিবুচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। শেষকালে টেনে-হিঁচড়ে আঁচলটা কেড়ে নিয়ে দেখি—ওমা, দুটো দাঁত মুক্তোর মত চিক্ চিক্ করছে। জ্বরজারি নেই, কখন যে আপনা হতে দাঁত বেরোল—বুঝতেই পারিনি।"

দেওয়াল বিবর্ণ, ছবির ফ্রেমটাও পুরোন হয়ে গেছে। তবু শাড়ীর আঁচলে তার হলদে কাঁচ বারবার মুছে পাড়ার কোনো চেনা-জানা বাড়ীর নতুন অতিথিকে সুভদ্রা মাসি বোঝাতে চেষ্টা করে তার ছেলের অসামান্যতা।

"এটা অনেককাল আগেকার ছবি ভাই—কিন্তু ও বয়সেই ছেলের চোখদুটো কিরকম চনমনে দেখেছেন? ওর পাতানো-মা বলতো ঘরের বাইরে কোথাও কারো পায়ের শব্দ শুনলে দুধটুকু খাওয়া ফেলে চমকে উঠতো। আর রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে 'মাগো' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা—সেত বড় হয়েও যায়নি।"

'পাতানো মা'। যে সুভদ্রা মাসিকে চেনে না, সে অবাক হোত। প্রদীপের আলো যেমন এক ঝটকায় নিভে যায়, তেমনি দপ্ করে মুখের হাসি মিলিয়ে যেতো সুভদ্রা মাসির।

"কি আর করব। আমার গোপাল যখন তিন বছরের, তখনইত ওর বাবা মারা গেল। ছেলেকে মানুষ করি, সে সাধ্যই ছিলো না। তখন আমার মাসতুতো ননদ লক্ষ্মী ওকে পুষ্যি-পুত্তুর নিতে চাইলো। বড়লোকের ঘরের বউ, অথচ ঘর তার খালি খাঁ-খাঁ করে। আমার গোপালের দুধে-আলতা গোলা রঙ অমন সুন্দর মুখ দেখে লক্ষ্মীর শাশুড়ী ভারি খুশী—বলে বৌমা, এ ছেলেটিকে তুমি বড়সড় কর—কি আর করি, সাত-পাঁচ ভেবে ছেলেটাকে দিয়েই দিলাম—!" টপ্ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ত সুভদ্রা মাসির—কোঁচকানো গাল বেয়ে।

"তা বেশত—ভালই হয়েছে"—শ্রোতার সহানুভূতির ভাষা খোঁজে—"ছেলে আপনার নিশ্চয় ভালো আছে। তাকে মাঝে মাঝে দেখতে যান তো?"

'না দিদি—' সুভদ্রা মাসির মিয়োন গলা আরও করুণ হয়ে ওঠে, "ওর পাতানো-মা বেশী দেখাশুনো হওয়া পছন্দ করে না। কি জানি, ছেলে যদি টের পেয়ে যায় সব কিছু।" গোপালের গল্প একবার শুরু হলে সহজে শেষ হয় না। তার ছেলেবেলার অনেক দুষ্টুমির কথা, ইস্কুল-জীবনে নানা সাফল্যের কথা, একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকে সুভদ্রা মাসি। আমরা অনেক শুনেছি, তাই কান দিই না সেদিকে।

পাড়ায় আমি, মাখন আর পলটু একসঙ্গে ম্যাট্রিক দিয়ে বেশ ভালো ভাবে পাশ করে গেলাম। কলেজে ভর্তি হওয়ার জল্পনা-কল্পনা চলছে। সুভদ্রা মাসি হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে আমাদের বাড়ী এলো। মাকে বলল—

'আপনিই একমাত্র আমার দুঃখ বোঝেন দিদি—বাকিরা ত হিংসেয় মরে। তাই সুখবরটা দিতে এলাম। আমার গোপালও পাশ করেছে—দশ টাকার জলপানি পেয়েছে।'

'খুব ভালো খবর', মা হাসিমুখে বললেন, 'কিন্তু এ তোমার ভারি অন্যায়—মিছিমিছি এতগুলো পয়সা নষ্ট করা কেন?'

'আমার ছেলে যদি আজ আমার থাকত, তবে কি আর পয়সার কথা উঠত দিদি! আমার আনন্দের দিনে ছেলেদের সামান্য দুটো মিষ্টি খাওয়াতে কি সাধ হয় না?'

শেষ পর্যন্ত পাড়ার কলেজেই ভর্তি হোলাম আমরা। শুনলাম সুভদ্রা মাসির ছেলে গোপালও নাকি একটা নামজাদা কলেজে যাচ্ছে। আমরা সিধুদার আখড়ায় বিকেলে ব্যায়াম করতে যাই শুনে সুভদ্রা মাসি বলল তার গোপালের শরীর এমনিতেই খুব লম্বা, চওড়া—সাহেবদের মত টকটকে রঙ। এই ত সেদিন বরানগরে ওদের দেখে এলো সে। না, মাকে চিনতে পারেনি। লক্ষ্মী কি একটা মনগড়া পরিচয় দিয়েছিলো—তবুও পায়ের ধুলো নিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে ছেলে। গাড়ী নিয়ে বাজার করে এনেছে তখুনি—আম, মিষ্টি, এক-জোড়া নতুন থান। আমরা একটু অসহিষ্ণু হয়ে হয়তো অন্য কথা তুলতে চেষ্টা করেছি নিজেদের মধ্যে, কিন্তু সুভদ্রা মাসি তার কথা না শুনিয়ে ছাড়বেই না।

"দুটো আম হাতে করে এনেছি রাজু—" আমার সার্টের কোণটা ধরে একটু টেনে ফিস-ফিস করে বলেছে—'তোর জন্যে রেখেছি। একবারটি এসে নিয়ে যা। খুব মিষ্টি আম গোপাল এনেছিলো।'

এমনি ভাবে আমাদের মত সুভদ্রা মাসির ছেলে গোপালও ক্রমশঃ একে একে পরীক্ষায় পাশ করেছে, চাকরী পেয়েছে, বিলেতে ট্রেণিং নিতে যাওয়ার কথাও উঠেছে তার অফিস থেকে। সুভদ্রা মাসি আমাদের ডেকে ডেকে সে সব কথা শোনায়। আমরা দেখি সময়ের সংগে সংগে সুভদ্রা মাসির চেহারা ক্রমশঃ বাজ-পড়া তাল গাছের মত শুকিয়ে গেছে। আজকাল চোখেও তেমন ভালো দেখে না বলে পাড়ার মেয়েদের সেলাই শেখানো বা সেলাই-এর ফরমাস প্রায় বন্ধ হয়ে দুরবস্থায় পড়েছে। মাসের গোড়ায় সামান্য কটা টাকা মণি-অর্ডার করে কোনো দয়ালু আত্মীয় পাঠিয়ে দেন, তাতে ঘর ভাড়া আর কিছুটা চলে যায় কোনগতিকে। একাদশীর পরদিন হয়তো আমাদের বাড়ী সাত-সকালে এসে গল্প ফাঁদে ছেলের বিয়ের।

'গোপালের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল দিদি, মেয়েটি নাকি দেখতে রাজকন্যে। বাপের অবস্থাও শুনেছি ভালো—মেলা জিনিসপত্তর দেবে। কিন্তু লক্ষ্মীর আক্কেলটা দেখলে দিদি, ছেলের বিয়ের খবর আমাকে কিনা পরের মুখে শুনতে হয়। দু'লাইন চিঠি লিখেও ত জানাতে পারত।' অভিমানে গলা ধরে আসে কথা বলতে বলতে।

মা বৌদিকে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিয়ে সুভদ্রা মাসিকে বলেন—"আজ এবেলা এখানেই খেয়ে যেও। আমার ত নিরিমিষ ঘরে কদিন রাঁধতেই হচ্ছে, বড় ননদ এসেছেন কিনা। আর রাজু কাল খুব মিষ্টি কমলা লেবু এনেছে, তাই দুটো আগে খাও।"

মুখে কিছু না বললেও সুভদ্রা মাসির চোখ দুটো আশ্বস্ত হয়ে ওঠে আর কেমন ভিজে ভিজে দেখায়। এমনকি গোপালের বিয়ের গল্পও আর শোনায় না। দেওয়ালের গায়ে ক্লান্ত শরীরটা ঠেকিয়ে ছেঁড়া মিলের ধুতির আঁচলে কপাল আর সে সংগে চোখও রগড়াতে শুরু করে। মা ঘরের বাইরে এসে বলেন—'আহা বেচারী—বুড়ো বয়সে দেখবার কেউ নেই।'

কথাটা কদিন ধরেই কানাঘুষোয় শুনছিলাম। মিত্তিরদের বাড়ীর মেয়ে মঞ্জু শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে কদিনের জন্য। এসেই বুঝি সুভদ্রা মাসিকে ডেকে পাঠিয়েছিলো তার ছেলের দু-চারটে জামা সেলাই করাবে বলে। তার ব্যাগে দুটো দশ টাকার নোট ছিলো, আর ব্যাগটা সে বিছানার উপর ফেলে রেখেছিলো অসাবধান হয়ে। তারপর সুভদ্রা মাসি চলে যাওয়ার পর ভাই-বোনদের সিনেমায় নিয়ে যাবে বলে টাকা বার করতে গিয়ে দেখে একটা দশ টাকার নোট পাওয়া যাচ্ছে না। পরেশের মার আঁচলে তিনটে টাকা বাঁধা ছিলো, সুভদ্রা মাসির সংগে গল্প করতে করতে দুপুর বেলা কেমন তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো। তারপর নাকি আঁচলে টাকার হদিস না পেয়ে সে খুব হৈ-চৈ করেছে। অভাবে পড়ে মানুষের স্বভাব মন্দ হয়ে যায়, সেই কথাই সকলে আলোচনা করছিলো। কিন্তু উত্তেজনা চরমে উঠলো, যখন হালদারের মেয়ে মিনুর গলার হারটা সেদিন বিকেল থেকে পাওয়া গেল না। বছরখানেক বয়স মেয়েটির, তার মা বিকেল হলে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা ছোট ঠেলাগাড়ী করে ঝির সংগে গলি পেরিয়ে বড় রাস্তার পার্কে বেড়াতে পাঠায়। সেদিনও গিয়েছিলো, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরে এলে তার গলায় হারটা ছিল না। প্রথম সন্দেহ ঝিকেই করা হয়েছিলো, কিন্তু সে জোর গলায় নিজেকে নির্দোষ বলেছে, আর সে সংগে দোষটা চাপিয়েছে সুভদ্রা মাসির ঘাড়ে। ঠেলাগাড়ী দাঁড় করিয়ে গলির মোড়ে পানের দোকানে সে পান কিনতে গিয়েছিলো। সে সময়ে সুভদ্রা মাসি নাকি মিনুকে কোলে নিয়ে আদর করে একটা গোলাপী ঝুমঝুমি দিয়েছে। ভারি দাম জিনিষটার, আসলে হারটা সরানোর ছল।

'এ তোমাদের অন্যায়', মা সব শুনে একটু অনুযোগের সুরে বললেন, 'মানুষটা গরীব হতে পারে, কিন্তু তা বলে চুরি করবে'!

'হারটা ওর ঘরে পাওয়া গেছে যে', মিনুর জেঠিমার মুখে একটু বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে, 'আমরা তখুনি সেখানে গিয়ে বললাম বাক্স সার্চ করা হবে। আপত্তি করেছিলো খুব, কিন্তু গ্রাহ্য করিনি। আর যত সব ছেঁড়া ন্যাকড়া ভরা সেই বাক্সর মধ্যে হারটা ছিলো।'

'কি বললে?' মা নীচু গলায় বললেন।

'বলবে আবার কি—হারটা নিয়ে তখুনি চলে এলাম। চুরি করে বলবার মত মুখ আছে নাকি ওর। ভারি বজ্জাত বুড়ীটা—মিথ্যা কথার ঝুড়ি একেবারেই।'

ওদের বসিয়ে রেখে মা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—

'রাজু, একবার সুভদ্রা মাসিকে বলে আয় একটু বাদে যেন আমার সংগে দেখা করে।' ইদানীং অনেককাল সুভদ্রা মাসির ঘরে যাইনি। ছেলেবেলার মাছ লজেন্স আর মুড়ির মোয়ার লোভ অনেককাল ঘুচে গেছে, আর নানা কাজ-কর্মের ভীড়ে ওর গোপালের গল্প শোনবার অবসরও হয় না। মধ্যে মধ্যে গোপাল নামধারী সেই অচেনা মানুষটার উপর রাগও হয়। আগে যেমন ঈর্ষা হোত। মনে হয় সে নিশ্চয় সত্যি-কারের সম্পর্ক এতকালে জেনে গেছে, আর ইচ্ছা করেই অভাবগ্রস্ত নিঃসংগ দুঃখী সুভদ্রা মাসিকে এড়িয়ে চলেছে। আমাকে দেখে সুভদ্রা মাসি কিন্তু হাসিমুখেই এগিয়ে এলো। ঘরটা বিশৃংখল, এখানে ওখানে জিনিষপত্র ছড়ানো। সেগুলো একে একে গুছিয়ে তুলছিলো বেচারী!

'এসো বাবা রাজু। দাঁড়াও, খাটের উপরটা একটু গুছিয়ে দিই, বোস এখানে।'

'বসতে আসিনি। মা তোমাকে একবার ডাকছেন।'

'হালদার গিন্নী এসেছে নাকি?' সুভদ্রা মাসির চোখে মুখে আতংক ফুটে উঠলো।

'কি জানি?' আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম, 'আমি কাউকে দেখিনি।'

'সত্যি বলছি রাজু, হারটা আমি চুরি করিনি। একবার কেবল মতি স্যাকরাকে দেখাবো বলে নিয়েছিলাম। আমার গোপালের খোকা হয়েছে—তাই রোববার দেখতে যাব। নাতির মুখ কি শুধু হাতে দেখা যায়! তা, ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলে না। এমন কি এমন কথাও বললে যে আমার ছেলে নেই, নাতি নেই—। সব মিথ্যা—সব বুজরুকি—!'

'লোকের কথায় তোমার কান দেওয়ার দরকার কি?' সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, 'তোমার ছেলে তোমারই থাকবে, যে যাই বলুক না কেন!'

'আমি কিন্তু ওদের ভুল ভাঙবই। এবার বরানগরে গিয়ে গোপালকে, বৌমাকে সব খুলে বলে নাতিকে আমার কাছে নিয়ে আসব—।' সুভদ্রা মাসি কান্না থামিয়ে হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'হ্যাঁ, আমি আজই যাব। ক'আনা পয়সা দিতে পারো বাবা, বাস ভাড়ার মত।'

তখন সকাল দশটা। বাস ভাড়া নিয়ে সুভদ্রা মাসি তখুনি চলল বড় রাস্তার মোড়ে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, চুরি অপবাদের ফলে সারা রাত না ঘুমিয়ে চোখ মুখ বসে গেছে। কিন্তু একটা অসম্ভব জেদের চিহ্ন ওর চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুভদ্রা মাসির ছেলে নেই, এ সন্দেহ হঠাৎ এতদিন বাদে আমার মনেও দোলা দিতে লাগল। কিন্তু সত্যিই কি একটা মানুষ আজীবন এমন একটা আলেয়ার পেছনে ছুটতে পারে—এত নিদারুণ বঞ্চনাকে অনায়াসে চোখ বুজে উপেক্ষা করতে পারে? মাকে সব কথা বলাতে তিনি সেই অনেকদিন আগেকার মত মাথা নেড়ে বললেন—'আহা বেচারী!'

কিন্তু সুভদ্রা মাসি বিকেলের আগেই ফিরে এলো। সকাল বেলায় সেই শোকার্ত চেহারা নিয়ে নয়, আনন্দের ও আত্মগৌরবের আভিজাত্যে সে যেন তখন এক অন্য মানুষ। আর কোলে

তার একটি কচি ছেলে। মোমের মত মঞ্জ সোনালী চুল, রেশমী শাল জড়ানো।

'কই দিদি, আমার নাতিকে দেখে যান এবারে—। আর যারা আমার কথা মানে না, তাদেরও দেখান।'

'কোথা হতে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে কে জানে?' হালদার গিন্নী ঠোঁট উলটে বললেন। কিন্তু তিনিও কৌতূহলী হয়েছেন বোঝা গেল, কেন না অসময়ে আমাদের বাড়ীতে কি একটা ছুতো করে এসে হাজির হলেন। শুধু তিনি নন, পাড়ার অনেকেই একে একে জুটল। মাঝখানে ঘুমন্ত ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সুভদ্রা মাসি সগৌরবে তার পুরোন ইতিবৃত্ত গোড়ার থেকেই শুরু করল। কালকের অপমানের কালি তার ক্লান্ত অথচ বেশ খুশী খুশী চেহারায় কোথাও নেই।

'কি বলব দিদি, গোপাল সব কথা শুনে খুব রাগ করলে। বললে আমার মা সেই বস্তিতে পড়ে আছে, সে আমি সইতে পারবো না। আর কিছুতেই ফিরতে দেয় না। বৌমা কত আবদার, তার হাতের রান্না আমাকে খাওয়াবে। অনেক বলে কয়ে আমার খোকনমণিকে নিয়ে চলে এলাম। হ্যাঁ, ফিরে যাব আজই, সন্ধ্যে হলেই। খোকনমণির আবার সাতটার সময় দুধ খাওয়ার সময় কিনা। দেখছ হাতের বালাটি, এই যে মুখের কাছে সাদা পাথর দেখছ—আসল হীরে। বউমা আরও কত গয়না দেখালে, এক বাক্স বোঝাই।'

সুভদ্রা মাসির অনর্গল গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও অন্ত ছিলো না এধারে। তবু কেন জানি ঐ ছোট ছেলেটাকে দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলাম। সুভদ্রা মাসির গল্পের পরিণতি এছাড়া অন্য কিছু হয়, তা বোধ হয় চাইনি। কিন্তু উপসংহার ঘটল অন্যভাবে। আমাদের অপ্রশস্ত গলির মাঝখানে একটা লম্বা চওড়া আভিজাত্যময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো সকলকে সচকিত করে। দাঁড়ালো আমাদের বাড়ীর সামনেই। গাড়ীর দরজা খুলে নামল একটি রোরুদ্যমানা মেয়ে, আর একটি বর্ষীয়সী মহিলা। পেছনে একজন ভদ্রলোকও ছিলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়সও খুব বেশী হবে না। সুভদ্রা মাসির নাম করতেই আমাদের বাড়ীর সামনে মজা দেখতে ভীড় করা কেউ একজন হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি এসে প্রায় জোর করে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিলো সুভদ্রা মাসির কোল থেকে। কথা বলবার ক্ষমতা বোধ হয় তার ছিলো না। সে ভার নিলেন অন্যজন। রূঢ়, রুক্ষ গলায় তিনি বললেন—

'এবার তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে হবে। এরা আর তোমাকে মাপ করবে না। বলি, এজন্যেই কি মাসে মাসে তোমাকে টাকা জুগিয়েছি! উঃ, একেই বলে কলিকাল—! ভেবেছিলাম একটা যা হোক সম্পর্ক রয়েছে, না খেয়ে মরে যায় সে ত দেখতে পারব না। তাই বড়োকে বলে কয়ে মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম। আর গোপালকে নিয়ে আদিখ্যেতা তাতেও কিছু বলিনি। সাতকুলে কেউ না থাকলে অমন ছিটের ব্যারাম অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু তা বলে তুই কচি ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে আসবি—!'

একবার নিঃশ্বাস নিতেই বোধ হয় থেমেছিলেন, হালদার গিন্নী সে সুযোগ ছাড়লেন না। সহানুভূতি জানিয়ে বললেন—'কি হয়েছে শুনি ত!'

'হবে আবার কি?' সুভদ্রা মাসির ঠক্ ঠক্ করে কাঁপা শরীরটা তখন দেওয়ালের গায়ে হেলে পড়েছে—সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নির্মমভাবে তিনি বলে চললেন—'আমারই এক দূর সম্পর্কের ভাজ—। ছেলেপুলে হয়নি বলে গোপালকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করত। বলত—আমার ছেলে, ওকে মানুষ করতে দিইছি। সে সব সহ্য করেছি বলেই আজ ওর এত সাহস। কেন—কেন চুরি করেছ আমার নাতিকে বলতে পার?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে এগিয়ে এসে তার মায়ের হাত ধরে বললেন—

'ঠিক আছে মা। খোকনকে পাওয়া গেছে, সেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে নিজেরাই সাবধান থেক। এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

'আর ওমুখো হতে দিচ্ছি', বর্ষীয়সী মহিলা গর্জন করে উঠলেন। তারপর গাড়ী আবার সমস্ত পাড়া সচকিত করে বেরিয়ে গেলো। সুভদ্রা মাসি একটাও কথা না বলে তার ঘরের দিকে চলে গেল। পরদিন সকালে পুলিশ এসে যখন দড়ি কেটে তার দেহটা নামালো, তখন সুভদ্রা মাসিকে আর চেনা যায় না।

কবিতা তো অনেক লিখেছি
        ফুল, পাখী, চাঁদ, তারা নিয়ে।
        কি যে হবে, সে কবিতা দিয়ে—
        কিছুই জানিনে।
    তোমাদের কথা আর কিছুই মানিনে।
সে কবিতা লিখে আর কি বা হবে বলো!

তার চেয়ে চলো—
শিলচরে যাই
বাঙালীর তরে যারা নির্ভীক বুকে—
দিয়ে গেল নিজ-প্রাণটাই।
শুধু আজ তাহাদের তরে,—
চলো গিয়ে রেখে আসি—
কবিতার কাল্পনিক পুষ্প থরে থরে।
যারা নিজ বারুদের গুলি
নিজ বুকে তুলি'—
অমানুষ আমাদের তরে;
চলো যাই, একফোঁটা শুধু অশ্রুজল
রেখে আসি তাহাদের ঘরে।।
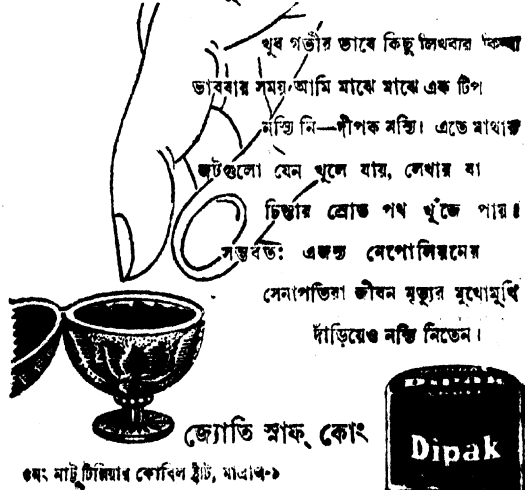
প্রাচীন ভারতে কি রকম ঐক্য ছিল

ডঃ রমা নিয়োগী
ভারতবর্ষে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য বিরাজিত—একথা আমরা শুনে আসছি ছোটবেলা থেকেই। তবু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্নে আমাদের মধ্যে বিভেদ প্রবল হয়ে ভৌগোলিক সংহতিকে বিনষ্ট করেছে এবং তারপরেও আজ দিকে দিকে আরও বিভেদ অনৈক্য মাথা তুলে ভারত রাষ্ট্রের সংহতিকে বিপন্ন করছে। অবশ্য এখনও বহু মনীষী আমাদের প্রাচীন গৌরবময় এক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান অনৈক্যের গুরুত্ব হ্রাস করবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতের ঐক্যের প্রকৃতি ও শক্তি বিশ্লেষণ করে আজকের অনৈক্যের রূপ নির্ধারণ করে রাষ্ট্রিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে মিলনের নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টির সময় এখন এসেছে।

প্রাচীন ভারতে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঐক্যের কয়েকটী মূলসূত্র যে কোন সময়ে গড়ে উঠেছিল তা ঠিকই। বেদানুগ বা বেদোদ্ভূত ধর্মের মোটামুটি কাঠামোতে বিশেষ কিছু পার্থক্য ঘটেনি উত্তর দক্ষিণ কিংবা পূর্ব পশ্চিম ভারতে। বেদ-বিরোধী ধর্মও প্রাথমিক প্রতিরোধের পর ধীরে ধীরে অপর ধর্মের এবং সংস্কৃতির প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে। ধর্ম বিষয়ে ত বটেই, অন্যান্য বিষয়েও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয় একটি ভাষাতেই—সংস্কৃত। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে। নিষ্ঠাভরে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন, যথাসাধ্য তীর্থদর্শন, এক ভাষায় ধর্মশাস্ত্রাদি আলোচনা, পুরাণ মহাকাব্য পাঠ করে প্রাচীন ভারতে এক ঐতিহ্যও গড়ে উঠে-ছিল। রাজা মহারাজার স্বপ্নে আর রাষ্ট্র-নীতিবিদের চিন্তায় আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এক অখণ্ড ভারত রূপ পরিগ্রহ করত। আদিম এবং আগত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল এক সহিষ্ণু এবং গ্রহিষ্ণু সভ্যতার। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বর্তমান ধারণা মত জাতিগঠনের অনেকগুলি উপাদানই ভারতে ছিল প্রাচীন যুগে; মধ্য যুগের শেষে এসেছে মোটামুটি শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, বিংশ শতকে খণ্ডিত ভারত পেয়েছে স্বাধীনতা। তবু আজ ভারতের জাতীয় ঐক্য বিপন্ন কেন?

প্রাচীন ভারতে [illegible] আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী [illegible] হয়ে গিয়েছে মনে হয় [illegible] ভারতীয় সভ্যতার সব চেয়ে [illegible] প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির ফলেই সংস্কৃতির গতি কোনও দিন ঐক্যবিন্দু স্পর্শ করলেও সেখানেই থেমে থাকে নি; তাকে অতিক্রম করে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, এই বিভিন্নমুখী প্রবাহকে পুষ্ট করেছে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতা। সমুদ্র পর্বতমালাবেষ্টিত ভারতের উপর একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করতে পারে নি প্রাচীন ভারতের কোন রাজা। অশোকের সাম্রাজ্য সিরিয়ার প্রান্ত স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু সুদূর দক্ষিণকে গ্রাস করে নি, কামরূপ সম্বন্ধে ছিল উদাসীন। এর পর ভারতের চক্রবর্তী রাজাদের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ছোটই হয়েছে। তবু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাঠামো মোটের উপর এক ছিল; দেব ভাষার প্রভাব অধিকাংশ রাজসভায় ও উচ্চকোটিতে অক্ষুণ্ণ ছিল এবং রাজতন্ত্রের সেই যুগে এরাই ছিল শাসনযন্ত্রের চালক এবং সংস্কৃতির ধারক: সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতির উপরের স্তরে বড় কোনও বিভেদ ধরা পড়ে নি। তবু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বিশেষতঃ ভাষার ক্ষেত্রে ঐক্য জনগণের সর্বস্তরে বেশীদিন বজায় থাকে নি। অথচ ভাষাই হলো সবার মতে নাকি জাতি গঠনের সর্বোত্তম উপাদান। অশোকের যুগেই সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত এক ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে; ওদিকে প্রাগ্‌বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সাহিত্যে উদীচ্য মধ্য-দেশীয় প্রাচ্য—এই তিন আঞ্চলিক কথ্য ভাষার উল্লেখ আছে। প্রথম খৃষ্ট শতকে অশ্বঘোষের নাটকে মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সৌরসেনী, মহা-রাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃত অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষার নাম আছে। এই সময়ে এবং এর পরেও কোনও কোনও অঞ্চলে প্রাকৃত ছিল রাজভাষা। পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রাকৃত ব্যাকরণ রচিত হয়ে এ ভাষাকে শক্তিশালী করে। পূর্ব ভারতের অতি প্রাচীন চর্যাপদগুলিতে প্রাচীন বাংলার আদি রূপ পাওয়া যায়। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমী হিন্দী, কোশলী হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, বাংলা, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়া-লাম আরও আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ উত্তর ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান হবার আগেই নিম্নকোটির মধ্যে ভাষাগত ঐক্যের অবসান হয়েছে। অশোকের পরেও যদি তাঁরই মত শক্তিশালী আরও কয়েকজন সম্রাটের আবি-র্ভাব হত, তাহলে হয়ত রাজনীতিক ও শাসন-তান্ত্রিক ঐক্যের ফলে ভাষার এই বিভিন্নমুখী বিকাশে যথেষ্ট বাধা পড়তো। [illegible] হয়ই নি, বরং মধ্যযুগের আঞ্চলিক মুসলমান শাসকরা দেবভাষার বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে রাজসভায় মর্যাদা দেওয়াতে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাগত পার্থক্য বেড়েই চলেছিল। আরও দেখা যায় প্রাগ্‌ মুসলমান যুগে দেবভাষা ও রাজভাষা সংস্কৃত শেখার তাগিদ উচ্চকোটির মধ্যে যথেষ্ট ছিল কিন্তু মুসলমান যুগের শাসকরা একে পরিহার করায় সংস্কৃত চর্চা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেই সীমায়িত হয়; অন্যদিকে প্রতি অঞ্চলেই এখন আঞ্চলিক ভাষা উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির মধ্যে সমান সমাদর পায়; সর্বোপরি দেখা যায়—এই সময়কার ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সমস্ত ধারাই সংস্কৃত ভাষার বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে অবলম্বন করেছিল।

ধর্মের ক্ষেত্রে বেদোদ্ভূত এবং বেদবিরোধী ধর্মের সংঘাতের যুগ শেষ হলে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়ে বিচিত্রভাবে রূপ পরিবর্তন করেছে সত্য; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ব্যবস্থার সহিষ্ণু ঔদার্যের সুযোগে একই দেবতার ভক্তদের মধ্যেও বিভিন্ন নীতি ও ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখা যায় এবং এরা যে সর্বদাই অহিংস সহাবস্থান করত না তারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের শেষে ভারতের ধর্মনীতির কাঠামো এক থাকলেও বেশ ঢিলে ঢালা যে হয়েছিল আর বিভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে সক্রিয় সহানুভূতির অভাব যে ঘটেছিল তা বোঝাই যায়। মধ্যযুগের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এ কাঠামোকে দৃঢ় করতে পারেনি—পারে নি কোনও সামগ্রিক ঐক্য বিধান করতে; বরং পর-বর্তী যুগের জটিলতর অবস্থার বীজ বপন করেছিল।

ভাষা আর ধর্মের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। প্রাগ্‌ মুসলমান ভারতের নিম্ন-কোটিতে ধর্মে ও ভাষায় যে আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল, অনুমান করা যায় তার সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃতিতেও পার্থক্য এসেছিল যথেষ্ট—যদিও উচ্চকোটি-সৃষ্ট সাহিত্যে তার প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে কোথাও ধরা পড়ে নি।

পরবর্তীকালে ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য আরও প্রখর হয়েছে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত এক ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতে সুপ্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে। বিপরীতমুখী দুই ধর্ম ও সংস্কৃতি এখানে পরস্পরকে ধ্বংস বা গ্রাস করতে পারে নি; পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু মিলন ঘটাতে পারে নি। প্রায় একাদশ শতাব্দী পাশাপাশি বাস করে, চারশ বছর একই রকম শাসন ও কুশাসন ভোগ করেও এরা এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারে নি। মনীষীরা বলেন জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির এক মূল্যবান উপা-দান হলো শুধুই এক ঐতিহ্য নয়, একই বেদনার স্মৃতি আর জয়ের আনন্দকে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া, একই উপকথার রোমাঞ্চ আর বীরগাথার গৌরব অনুভব করা। দূর অতীতে বৈদিক ও পৌরাণিক (কবে সেটা? গুপ্ত যুগ পর্যন্ত কি এর প্রসার?) যুগ ছাড়া ভারতে এ উপাদান বিশেষ মেলে না। রাজনীতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রাচীন ভারতের এক অঞ্চলের বীর ছিল অন্য অঞ্চলের শত্রু; একের জয় ছিল অন্যের পরাজয়। পরের যুগেও এরই পুনরাবৃত্তি; রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ রাণা সংগ আর রাণা প্রতাপ ত যুদ্ধ করে-ছিলেন মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে, মারাঠা কুলতিলক শিবাজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর পরবর্তী মারাঠা বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে ভেদ করেন নি। এঁদের বীরত্ব প্রেরণা দিয়েছে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে; সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি-ভূমি এতে দুর্বলই হয়েছে। বৃটিশ যুগে

(শেষাংশ ১৫০ পৃষ্ঠায়)

অমূর্ত

মানবেন্দ্র পাল

আনন্দময়ী চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলেন। কী উত্তর দেবেন। একেবারে 'না' বলা চলে না—হাজার হোক ওর লিখছে। তারপর দায়ে পড়েই লিখছে। রচ-খরচার জন্যে চিন্তা নেই সে কথাও চিঠিতে লখা আছে। টাকার জন্যে ভেবো না। সে দিন তোমার গায়ে যাতে আঁচড়টি পর্যন্ত না াগে সেদিকে খেয়াল থাকবে। এমনকি বাড়ি মরামত—রঙ করা ইত্যাদির জন্যে এখুনি দুশো াকা তোমার নামে পাঠিয়ে দিতে পারি, যদি ুমি অমত না কর।

সব শেষে মিনতি—আজ মাথার ওপর দাদা নেই। কল্যাণের বিয়ের সব দায়িত্ব তোমারই। া তোমারই ছেলের বিয়ে—তোমার বাড়ি থকেই হবে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে আনন্দময়ী অনেকক্ষণ াকা ঘরে বসে রইলেন। এ চিঠির সব কথাগুলিই ত্য। কল্যাণের বিয়ে। কল্যাণ তো তাঁরই ছলের মতো। এক সময়ে যখন দেশের বাড়িতে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন তখন ঐ কল্যাণ আর তাঁর রবি এক সঙ্গেই তাঁর কোলে মানুষ য়েছে। আজ স্বতন্ত্র হয়ে আছেন বলে তো ম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। যদিও সম্পর্কটা তদিন প্রায় অস্বীকার করবার চেষ্টা করে সেছে ওরাই। রাগ, অভিমান করে সুযোগ্য াদাটি তো আলাদা হয়ে এলেন, কিন্তু তাতে য অসুবিধেতে পড়তে হল তা একা তিনিই ানেন। উপায়ের যোগ্যতা নেই—একত্রে থাকার ময় জমির ধান, চাল, গম, আলু, পেঁয়াজের ন্যে ভাবনা ছিল না—সবার ওপর বড়ো থা আশ্রয় ছিল—মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল। ভিমানী পুরুষ সব স্বত্ব ত্যাগ করে চলে লেন। তারপর থেকে এই ভাড়াটে বাড়িতে াস। আনন্দময়ী এসব বিষয়ে স্বামীকে নতেন। তাঁর কথার ওপর কথা বলার ক্ষমতা ল না। সবই মেনে নিতে হয়েছিল।

এখানে এসে তবু দিন চলছিল কোনো-কমে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেটি ানুষ হল না। এই অবস্থাতেই কর্তা চোখ ুজলেন। তারপর থেকে কী করে যে দিন লছে তা তিনিই জানেন। এত বড়ো বিপর্যয়ের পরেও দেওর কোনোদিন এসে খবর নেয়নি। এসে খবর নেয়নি বটে, তবে মেয়ের বিয়ের সময় টাকা পাঠিয়েছিল, আর তার দাদার অসুখের সময় লিখেছিল ডাক্তারের যা বিল হবে তা যেন তার কাছে পাঠানো হয়। অবশ্য এ করুণাটুকুও বড়ো কম নয়।

সেই দেওরেরই ছেলে কল্যাণের বিয়ে। এবার বন্যায় খুব ক্ষতি হয়ে গেছে—বাড়ি-ঘর এখনো মনের মতো করে সংস্কার করা হয়নি. তাই বিয়ের ব্যাপারটা এখান থেকেই সারতে চান। এক্ষেত্রে আর তিনি সম্মতি না দিয়ে কী করবেন।

আনন্দময়ীদের এই দোতলা বাড়িটা দেখলেই মনে হয়, এ যেন দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। পাকা বাড়ি, দোতলা বাড়ি। কিন্তু কতকাল যে মিস্ত্রীর হাত পড়েনি তার ঠিক নেই। দেওয়াল ফেটে গেছে। কবে যে কোন্ ভূমিকম্পের একটু কাঁপনেই বাড়িখানি ধূলিসাৎ হবে কে জানে। কিন্তু উপায় নেই। বাড়িওলা ভাড়া পান না নিয়মিত। তবু যে এঁদের উঠিয়ে দেন না সেটা বাড়িওলার মহানুভবতা ছাড়া আর কী। টাকার অভাব নেই। এই মফঃস্বল শহরেই অমন পাঁচখানা বাড়ী রয়েছে।

আনন্দময়ী নিরুপায়। মা আর ছেলের সংসার। এটা ওটা করে চলে যায় কোনোরকমে। কিছু টাকা আছে পোস্টাপিসে—আর আছে কিছু গহনা। সময়ে সময়ে দেওরও কিছু পাঠায় অনুগ্রহ করে। কিন্তু দুঃখ তাঁর, ছেলেটা মানুষ হল না।

মানুষ হল না এ যতটা দুঃখ, তারচেয়ে বেশী দুঃখ ছেলেটা অমানুষ হল। বয়েস হয়েছে আটাশ—কল্যাণের চেয়েও বড়ো। কিন্তু কেমন যেন বিকারগ্রস্ত। বুদ্ধিও নেই—দেহের স্বাস্থ্যও নেই। ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারা। একটু একটু গোঁপের আভাস। ঘোলাটে চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ভালো করে কাপড়ও পরতে পারে না। জোর করে না বসালে চুল কাটতে ভুলে যায়। কথায় জড়তা-মুখে হাসি নেই। আপন মনে বসে থাকে ঘরে কিম্বা বেড়ায় ছাতে। বন্ধু-বান্ধব নেই—আজ নেই। অবশ্য ও যে বেরোয় না তার কারণ আছে। ও বেরোলেই পাড়ার ছেলেগুলো এমনকি যারা তার হাঁটুর বয়সী তারাও তার পেছনে লাগবে।—ও রবিদা, তোমার নাকি বিয়ে!

রবি রাগ করতেও পারে না। ঝগড়া করতেও পারে না। যখন খুব অসহ্য হয়, চলে এসে মায়ের কাছে বসে। মা বুঝতে পারেন বাইরে থেকে নিশ্চয় কোনো আঘাত লেগেছে। নালিশ করতে জানে না—কিন্তু ঐ যে তার অসহায় আত্মগোপন—ঐ যে ভীরু চোখের চাহনি, ওতেই মা সব বুঝতে পারেন।

—যা ছাতে গিয়ে বোস্। এই বলে ঘরকুনো ছেলেটিকে ছাতে পাঠিয়ে দেন। ছাতে এলে রবি খুব খুশি। মাথার ওপরে নীল আকাশ— হু হু করে বাতাস। রবি পায়চারি করে বেড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একদিন পাড়ার লোক সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। দেখল, সেই ভাঙা বাড়ির গায়ে রং লাগানো হচ্ছে। এ-বাড়িতে মিস্ত্রী খাটতে দীর্ঘকালের মধ্যে কেউ দেখেনি। তারপর একদিন দেখা গেল বাড়ির ছাতে বাঁশ বেঁধে পাল টাঙানো হচ্ছে। এ-যেন তাজ্জব কাণ্ড। আলাদিনের সেই পিদিম পেল নাকি রবির মা!

রবি বাজার করতে যায়—পাড়ার ছেলেগুলো অমনি পিছু পিছু ছোটে—ও রবিদা, তোমার বিয়ে বুঝি! ও রবিদা—

তারপর একদিন দেখা গেল আনন্দময়ীর বাড়ির সামনে সার সার সাইকেল রিক্‌সা দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় কল্যাণ জীবনে এই প্রথম এল এখানে। শুধু কল্যাণ নয়, গোটা একটি পরিবার। শুধু পরিবার নয়—বিয়ে বাড়ির সব জিনিসপত্রও আছে। সেই লোকজন আত্মীয়-কুটুম আর তাদের জিনিসপত্রের ভিড়ে একটি বিধবা আর তার নির্বুদ্ধি পুত্র কোথায় যে চাপা পড়ে গেল তার আর কোনো হদিস রইল না।

দুদিন ধরে এই বর এবং বরযাত্রীর দল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালো, গঙ্গা স্নান করল, সম্ভব অসম্ভব জায়গায় গিয়ে কারণে অকারণে ছবি তুলল। এতকাল যে বাড়ি বৃদ্ধ মুমূর্ষু রুগীর মতো ধুঁকছিল—আজ হঠাৎ সে বাড়ি নব-যৌবনে জেগে উঠল।

তারপর একদিন উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে বৌ এল এ-বাড়িতে। পাড়ার কারও

কারও নেকনজর হবে। তারা বৌ দেখে মুগ্ধ। চমৎকার বৌটি।

এবার ফিরে যাবার পালা। নববিবাহিতা বৌ-ভাত হয়ে গেল। মাঝে দুদিন বিশ্রাম। তার পরেই চলে যেতে হবে।

সেদিন বেলা তখন তিনটে। রোদ আছে কিন্তু তেজ নেই খুব। পাড়ার লোকে যে যার ঘর থেকে সবিস্ময়ে দেখল, আনন্দময়ীর সেই ভাঙা বাড়ির নেড়া ছাতে যেন উৎসব বসেছে। দু-তিনটি ছেলে, দুটি দুই মেয়ে আর বরকনে। গোল হয়ে বসে গল্প করছে। আর মাঝে মাঝে তাদের প্রাণখোলা হাসি ছিটকে আসছে পাড়ার ঘরে ঘরে। ছাতে যারা রয়েছে তারা সকলেই বাইরের। কাজেই পাড়ার কারও জন্যে তাদের সংকোচ নেই। একসময়ে দলের একজন উঠল। কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে বললে—রেডি--রেডি! অমনি বর দুটি-দুটি একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে একটু নাড়িয়ে সরিয়ে, পাঞ্জাবিটা একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে, চুলটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়ে বর ছবি তোলার জন্যে প্রস্তুত হল। এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে বৌটি মুখ টিপে টিপে হাসছিল। নতুন বৌয়ের এই সংকোচহীন নিঃশব্দ হাসিটুকুও ভারি মিষ্টি। হঠাৎ বর বললে—আমি একাই ছবি তুলব নাকি? সকলে সমস্বরে বললে—না না, তাই কি কখনো হয়। বৌদি! যান্ শিগ্‌গীর!

হাসতে হাসতেই নব-বধূ বরের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ালো।

উঁহু আর একটু হেলে দাঁড়ান বৌদি!

সত্যি সত্যিই বৌটি আরও একটু কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো।

—কল্যাণদা, হাতটা না হয় বৌদির কাঁধেই রাখুন না।

বাধ্য ছেলেটির মতো বর হাতটি বৌয়ের কাঁধে রাখলে। বৌ বাধা দিল না। ছবি উঠল।

এমনি একটা নয়—নানা রকমের ছবি তোলা হল।

এতক্ষণ সকলের দৃষ্টি এদের দিকেই ছিল। এবার লক্ষ্য পড়ল সেই উৎসব সভায় কখন আনন্দময়ীও এসে চুপি-চুপি আড়ালে বসে দেখছিলেন। পাশেই ছিল রবি। এদের আনন্দে সেও খুব হাসছিল।

এবার সেই ছবিতোলার দল আনন্দময়ীকে গ্রেপ্তার করে আনলে। তাঁকেও ছবি তুলতে হবে নতুন বৌয়ের সঙ্গে। জেঠশাশুড়ী আর বৌয়ের ছবি উঠল। বৌয়ের আপত্তি নেই কিছুতেই। তার মুখে আজ যে স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল হাসিটি ফুটে উঠেছে তা যেন কিছুতেই নিভবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন ওরা সবাই চলে গেল। বাড়ি খাঁ খাঁ। আবার সেই নেড়া পাঁচিল—শূন্য ছাত। দেওয়ালের গায়ে গোলা ফেবানো হয়েছিল—সেইটেই কেবল একটা প্রমাণ হয়ে রইল যে এ-বাড়িতেও একদিন উৎসবের বাঁশি বেজেছিল। এ নইলে আর তেমন কোনো চিহ্ন নেই।

দিন চলেছে মন্থর গতিতে। উৎসবের বাঁশির সুর দূরে থেকে বহুদূরে মিলিয়ে গেল। সেই ছাতে যে সত্যিই একদিন এক দ্বিপ্রহরে হাসির ঝংকার উঠেছিল, তা যেন আজ আর কল্পনাও করা যায় না। স্বপ্নের জগৎ থেকে কারা যেন একদিন নেমে এসেছিল এই নিষ্ঠুর মর্ত্য-ভূমিতে। তারপর সময় হতে না হতেই তারা চলে গেল। না ডাকতেই এসেছিল—কিন্তু আজ আর ডাকলেও তাদের সকলকে পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ, ও-বাড়িতে আর কোনোদিন উৎসবের অনুষ্ঠান হবে না—ও-বাড়ির ঐ ভাঙা নেড়া ছাতে আর কোনোদিন অমনি করে কোনো দ্বিপ্রহর আনন্দে ভরে উঠবে না।—অমনি কোনো নব-বধূর সরল শুভ্র হাসি মাটির বুকে রজনীগন্ধার মতো আর ফুটে উঠবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, ওরা চলে যাবার পর থেকে এই একটা সুখের ব্যাপার ঘটেছে যে, সেই ছেলেটাকে আর ছাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় না।—ও যেন মূর্তিমান দুঃখ—পুরুষের সব-কিছু ব্যর্থতা যেন ঐ একটি দেহের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে। সুখের কথা—ঐ দৃষ্টিকটু পদার্থটাকে এখন আর ছাতে দেখতে পাওয়া যায় না।

আনন্দময়ী নিচ থেকে ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন—রবি, তুই কি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিবি?

উত্তর পাওয়া গেল না।

আনন্দময়ীর যেন কেমন ভয় হল। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিতেও তর সইল না, দ্রুত পায়ে ওপরে চলে এলেন। না, দরজায় খিল দেওয়া নেই, ঠেসানো আছে। সন্তর্পণে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলেন, বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রবি তন্ময় হয়ে কী যেন দেখছে।

কৌতূহলী জননী নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। অমনি চমকে উঠলেন। ছি ছি ছি ও যে নতুন বৌ-এর ছবি! একবার ভাবলেন, ধমক দেন ছেলেকে—একবার ভাবলেন ছিনিয়ে নেন ছবিটা। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জায় বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত জননী চোখের জল সামলে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনিভাবেই চলে গেলেন।

প্রাচীন ভারতে কি রকম ঐক্য ছিল

(১৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরাধীনতা ও কুশাসনের জ্বালা হয়ত সমস্ত অঞ্চল আর সব সম্প্রদায়ই অনুভব করেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ ওঠেনি সবার কণ্ঠে সমান জোরে। ভারতের নব জাগৃতি আর জাতীয় প্রতিবাদ সংগঠনে কারুর সক্রিয় অংশ বেশী, কারুর বা কম। স্বাভাবিকভাবেই কেউ বেশী সামনে এসেছে কেউ পিছিয়ে পড়েছে। তাব থেকেই এসেছে অসহিষ্ণুতা, অভিযোগ, বিরোধ এমন কি বিচ্ছেদও। গত এক হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতির পার্থক্যের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক গণ-মানস আজ গণতন্ত্রের সুযোগে পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্য সংস্কৃতির ঐক্যের উপকথাকে অস্বীকার করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায় স্বভূমিতে। ভারতীয় জাতির, রাষ্ট্রের ভিত্তি আজ কোথায়? ভাষার ঐক্যে নাই, ধর্মের ঐক্যে নাই, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের ঐক্যে নাই: শুধু আছে এক রাষ্ট্রভূমি আর এক শাসন ব্যবস্থায়—যার উদ্দেশ্য ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আঞ্চলিক পার্থক্য নিষ্পেষিত করে সাংস্কৃতিক ঐক্য আনা।

উপমহাদেশ বলে খ্যাত ভারতের ইতিহা এই গতি অস্বাভাবিক কিছু যে নয় ইয়োরোপের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা কর খানিকটা বোঝা যায়। একদা রোমক আ পত্যের যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরো অধিকাংশ ভোগ করেছিল এক ভাষা, এক শা এক ধরণের সভ্যতা আর এক ধর্মও। বি পরবর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে একে এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ঐক্যের অবসান ঘটে। ওা দশম, একাদশ শতাব্দী থেকেই নানাদিকে ব গত রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে; অষ্টাদশ শত শেষে ঊনবিংশের প্রথমার্ধে বিভিন্ন অ জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হলে ক্রমশঃ জা রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রায় শতাব্দীব্যাপী রোমীয় ঐক্যও ইয়োরো একজাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেনি।

সুখের বিষয় এ তুলনা আমাদের ে আজও সর্বথা প্রযোজ্য নয়; এখনও ভা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিন্তু অস্বীকার করলে চলবে না যে সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় প্রাচীন ঐে উপকথার জাল বুনে মোহ সৃষ্টি করে নিজে বিভ্রান্ত করে লাভ কি? গত সহস্র বছ ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তবতাকে স্বী করে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বি তারপরে ইতিহাসের ইঙ্গিত কি? ইয়োরো মত বৃহত্তর রাষ্ট্রিক ঐক্যের বিনাশ ছাড়া পরিণতিও ত ইতিহাসে আছে। ত্রিভাষিক রাষ্ট্র সুইৎজারল্যাণ্ডের কথা বাদ দিে উপমহাদেশপ্রতিম আরও একটি বৃহৎ রয়েছে ইউ, এস, এস, আর—যেখানে এ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে সমমর্যাদাসম্পন্ন বহু আর বহু জাতিকে নিয়ে। তাছাড়া বিপ পৃথিবীতে জাতীয় রাষ্ট্রের উপাদান সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাই ত শেষ হয়ে যায় নিরবধিকাল আমাদের ন সমাধা সুযোগও দিতে পারে। বর্বর শারী নিষ্ঠুরতা কিম্বা সুসভ্য মানসিক পীড় মধ্য দিয়ে অনৈক্য পার্থক্যকে ধ্বংস শ্মশানসাম্য স্থাপনের চেষ্টা না করে, চিরা ভারতীয় মনোভঙ্গীতে আমরা সা সহিষ্ণুতায় ভারতের সব আঞ্চলিক ভাবা সংস্কৃতিকে সমান মর্যাদায় স্বীকার করে নে কোনও পরমসূত্র আবিষ্কার করে প্রকৃ ধর্মনিরপেক্ষ একজাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তু পারি হয়ত। এ সম্ভাবনা আজও আক কুসুম নয়, কারণ ভাষা সংস্কৃতি, ধর্ম ঐতিহ্য বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্যই থাক, একথা আজও সত্য যে, এক ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান এমনকি এক অভারতীয় এশিয়াবাসীর সঙ্গেও এক ভারতীয়ের এসব বিষয়ে পার্থক্য তার চে অনেক বেশী। ভারতীয় সংস্কৃতি আ ভারতে সামগ্রিক ঐক্য আনতে পারেনি কিন্তু বহু যুগ থেকেই অভারতীয় সংস্কৃ থেকে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি লা করছে। ভারতীয় জাতীয়তার এই নেতিমূ সংজ্ঞাকে ইতিমূলক রূপ দিতে পারলে সা হবে ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সাধনা।

ব-সময় মনে রেখ, হাজার হাজার জীবন থাকবে তোমাদের হাতে। একটু অসাবধান হয়েছ কি ওরা চিরকালের মত অন্ধকারে রিয়ে যাবে। নিস্তব্ধ হলঘরের ভেতরে জয়ের গলার স্বরটা গম গম করতে গল।

শ্রোতাদের একাগ্র দৃষ্টি আর গম্ভীর খের দিকে লক্ষ্য করে আবার সে বলল, ভূগর্ভের ভেতরে যে তাপ থাকে, আর্দ্রতা কে, মোটের ওপর একটা জীবের বেঁচে থাকার ন্য যে অনুকূল পরিবেশ থাকে, ঠিক সেই ম্পারেচার সেই হিউমিডিটি থাকে, এই নকিউবিটার মেশিনে। তোমরা একে আর্টি-ফিসিয়েল 'ওম্বও' বলতে পারো—

—ডিম ওর ভেতরে দিলেই বাচ্চা ফুটে রিয়ে আসবে?

—হ্যা মুরগীরা তা দিয়ে যা করে সেটা য় এই যন্ত্রে। এক সঙ্গে দেড় হাজার ডিম তে করে সাজিয়ে ওর থাকে থাকে রেখে বে। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে ইনকিউবিটার লেলেই দেখতে পাবে প্রত্যেকটি ডিমের খোল ভেঙে বাচ্চা বেরিয়ে আসছে—

ইনকিউবিশান সেকশনে নতুন বদলি হয়ে াসা পোলট্রির দুই কর্মী সোমা আর সবিতা বস্ময়ে হতবাক হয়ে শোনে এগ স্পেশালিস্ট ভেটারিনারী সার্জেন অজয়ের কথাগুলো আর লমারির মত উঁচু সুদৃশ্য ইনকিউবিটারটার দকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওরা—

—হ্যাঁ, মেশিনটা ভাল করে দেখে নাও। এতদিন তোমরা ডিম কুড়ানোর কাজ করেছো াচায় খাঁচায় ঘুরে। কিন্তু এবার করবে, সব-চয়ে "রেসপনসিবল" কাজ, চোখদুটোকে চকে মোমের আলোয় যেমন করে কোন ডমের বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না রীক্ষা করে ঠিক তেমনি করে সোমা আর বিতার মুখের দিকে তাকাল অজয়। তারপর াথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে যেন নিজের মনেই স বলতে লাগল, পারবে—তোমরা ঠিক ারবে।

সোমা আর সবিতা। দুই বন্ধু। ওরা 'জনেই বিজয়গড় কলোনীতে থাকে। বাপ মার দাদার অভাব-অনটনের সংসারে বোঝার পরে শাকের আঁটি হয়ে না থেকে ওরা দুই বছর আগে চাকরি নিয়েছিল এই পোলট্রি ফার্মে।

পোলট্রির বিশাল মাঠ জুড়ে প্রায় দেড়শো 'পেন' (মুরগীরা যেখানে থাকে) রয়েছে। সেই পেনে পেনে রাউণ্ড দিয়ে ডিম সংগ্রহের কাজ দেখে ওদের ওপর খুসী হয়েছিলেন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট। তাই ইনকিউবিশান সেকশনে প্রমোশন দিয়ে ওদের এনেছেন।

পদোন্নতি হওয়ায় সোমার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সবিতা বলে, পেনে আর রাউন্ড দিতে পারবো না আমরা।

—পেনে যাবি কেমন করে? ইনকিউবিশান ঘরের ডিউটি থেকে নড়তেই পারবি না।

সবিতার মুখখানা ম্লান হয়ে যায়।

—ও বুঝতে পেরেছি, তোর ব্ল্যাক সুমাত্রা ল্যাকেন ভেণ্ডার আর রেড আইল্যান্ড রেড মুরগীদের তুই আদর করতে পারবি না। এই জন্যই তো—

—না রে না এই কাজটার দায়িত্ব বড় বেশি—সবিতাকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। গলার স্বরটা করুণ হয়ে ওঠে।

সোমা নতুন সেকশনে এসে কাজ করে সমস্ত অন্তর ঢেলে দিয়ে। ছুটে ছুটে ইন-কিউবিটারের তাপ পরীক্ষা করে। তারপরেই কোন ইনকিউবিটার খুলে ডিমগুলো উল্টে রাখে, আবার কোনটা খুলেই উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, স্যার দেখে যান ডিমের খোল ভেঙে ভেঙে কেমন করে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে আসছে।

সোমার কাজ দেখে অজয়ও খুব খুসি হয়। বলে, ইনকিউবিটারের চার্জে তুমিই থেক—

—আর সবিতা?

অজয়ের কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। বিড়বিড় করে বলল, মেয়েটা কেমন যেন। বড় আনমাইণ্ডফুল। মেশিনের ব্যাপার তো—

হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সোমার মুখখানা। তীব্র একটা আনন্দ মনের ভেতরে চেপে বলল, এই সেকশনে এসেই ও কেমন যেন হয়ে গেছে স্যার। সব-সময় কি যে অত ভাবে—

—স্টোর তো ইনকিউবিশনের সঙ্গে কম্বাইন্ড। ওকে স্টোরেই রাখবো ভাবছি।

এসব কথায় সবিতা থাকে না। সে ফাক পেলেই পেনে পেনে ঘোরে। ব্ল্যাক সুমাত্রা, ল্যাকেন ভেণ্ডার মুরগীদের কোলে নিয়ে মাথায় নিয়ে আদর করে। আর ভাবে, বরিশালে থাকতে তাদের বাড়ীতে যেমন ফার্ম ছিল তেমনি করতে হবে। নিজের মনের মত করে মুরগী পুষবে সে।

কয়েকদিন পর। রাত নয়টায় ডিউটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোমা চলে গেল। আজ-কাল আর সবিতাকে ডাকেও না।

গায়ে স্কার্ফ জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল সবিতা। আবছায়া অন্ধকারে পোলট্রির মাঠে সারি পেনগুলোকে থাবা উঁচিয়ে বসে থাকা শিকারী জন্তুর মত মনে হচ্ছে।

ছয় নম্বর পেনের সামনে এসে দাঁড়াল সবিতা। লাল টুকটুকে ঠোঁট। গায়ে কালো পশমের মত ঘন লোম। সবিতার অতি প্রিয় ব্ল্যাক সুমাত্রা মুরগীরা এখানে থাকে। যখন তার ডিম কুড়ানোর কাজ ছিল তখন সে সময় পেলেই এখানে এসে ব্ল্যাক-সুমাত্রাদের আদর করে করে একেবারে অস্থির করে তুলতো।

—ক্লক—ক্লক—কড়—ড়ড়—হঠাৎ একটা মুরগীর তীব্র আর্তস্বরে যেন চমকে উঠল অন্ধকার রাত্রিটা। পেনের পাশে পুঁইশাকের জঙ্গলের ভেতরে দৌড়ে পালানোর থব থব পায়ের শব্দ আর শাড়ির খসখসানিও শোনা গেল।

—কে ওখানে?

—আমি সবিতাদি, নাইটশিফটের ডিম সংগ্রহকারী পপি বলল, দেখুন মুরগীগুলো কী চালাক হয়ে গেছে। লেয়িং বক্সের ভেতরে আর ডিম পাড়ে না—ঐ পুঁইশাকের জঙ্গলে লুকিয়ে ডিম পেড়েছিল। আমি যেই আনতে গেছি, অমনি আমার হাত আঁচড়ে দিয়েছে।

সবিতা তার কথা যেন শুনতেই পেল না। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল একটা করুণ দৃশ্য দেখে। সদ্য মা হওয়া মুরগীটা তার নাড়ি ছেঁড়া ধন—ডিমটা হারিয়ে উন্মাদের মত চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। মাটি আঁচড়াচ্ছে, আর কাঁদছে — ক্লক — ক্লক— কড়ড়-ড়—

—আরে তোর ডিম পাওয়া যাবে বলেই তো তোকে এত আদর করে পোষা হয়।

মুরগীটার লোক দেখে পপি হাসে—হি-হি-হি।

হঠাৎ পপিকে একটা কদাকার মাংস-পিণ্ডের মত মনে হল, তারা মেয়েমানুষ নয়। রাক্ষসী! শুধু পপি নয়, মায়া, মঞ্জু, সোমা, ওরা কেউই মুরগীদের এই ব্যথাটা বুঝতে পারে না। ওরা কি মেয়ে নয়?

না ওরাও যেন ইনকিউবিটারের মত এক একটা মেশিন হয়ে গেছে। এগ কালেক্‌টিংয়ের মেশিন। ডিম পাড়ার সংগে সংগে সদ্য-প্রসূতির কাছে থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ডিম ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। ডিমটার ওপর বসে তা দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে তার ভেতর থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে তোলার মধুর আরামের আবেশ থেকে, মাতৃত্বের গৌরব থেকে মুরগীদের নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। ইনকিউবিটার মেশিনের ভেতরে ঐ ডিম তাড়াতাড়ি দিতে না পারলে এক-সংগে দেড় হাজার বাচ্চা পাওয়া যাবে কেমন করে?

আশ্চর্য! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষ! নিজের প্রয়োজনটাই তার কাছে সব চাইতে বড়। মায়া নেই, দয়া নেই, মমতা নেই—ক্রূর, নিষ্ঠুর সে। তা'না হলে কচি বাছুরকে আধ-পেটা দুধ খাইয়ে নিজে সব দুধটুকু শুষে নেয়। ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল সবিতার মাথার ভেতরটা।

পশ্চিমের আকাশে কুয়াশা জড়ানো চাঁদটা মরা শকুনের চোখের মত ঘোলা হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডুবছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল সবিতা, সে নিজে যখন মুরগী পুষবে, তখন ইচ্ছামত ওদের ডিমে তা দিতে দেবে। বাচ্চা যখন ফোটে—ফুটুক।

সবিতা স্টোররুমের আলমারির থাকে থাকে ডিম সাজিয়ে রাখছিল। অজয় সে ডিমগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে যে তাদের বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই হ্যাচেবল এগগুলোকে সংগে সংগে গুনতেও হচ্ছিল।

সোমা এসে দাঁড়াল। মুরুব্বীর মত বলল, ভাল করে কাজকম্মো কর সবিতা। তোর ওপর অজয়বাবুর নোশান খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

ম্লান হাসি ফুটে উঠল সবিতার মুখে। বলল, কি করবো ভাই, তোর মত গায়ে পড়ে মেলামেশা করে আমি তো তার নোশান ভাল করতে পারবো না—

—কী। সোমার চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল রেগে আর কোন কথাই বলতে পারল না।

সেইদিন থেকে সুরু হল। সুরু হল কারণে অকারণে ওদের খিটিমিটি। সবিতার ছায়া দেখলেই যেন জ্বলে উঠতে লাগল সোমা।

একদিন অজয়কে বলল সোমা, হ্যাচেবল এগ দুটো কম মনে হচ্ছে স্যার?

—সে কী! অজয় এল স্টোররুমে। বলল, দুটো হ্যাচেবল এগ কি করেছো?

সবিতার মুখখানা পাথরের মত নির্বিকার।

—চুপ করে আছ কেন? অজয় বিরক্ত হয়।

—আমাকে বিপদে ফেলার জন্য সোমা এই

—নিজে অন্যায় করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছো। তুমি—

—সবিতা দিদিমণিকে বকবেন না বাবু, বহুদিনের পুরানো ও বিশ্বাসী বুড়ো বেয়ারা হীরালাল বলল, একটু আগেও সোমা দিদিমণি ঐ তিন নম্বর ইনকিউবিটারে কাজ করছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল ইনকিউবিটারটার আড়ালে কি যেন লুকিয়ে রাখল। সোমাদিদিমণি একটু বাইরে যেতেই দেখলাম দুটো হ্যাচেবল এগ! সংগে সংগে এসে সবিতাদিদিমণিকে বলে দিলাম—

ইনকিউবিটারের পেছনে যেতেই ডিমদুটো পেল অজয়। সোমার দিকে রক্তবর্ণ চোখ করে বলল, ছি ছি, তুমি এত নীচ! আর যদি এরকম করবে তাহলে তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব—

কিন্তু সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে সুরু করল সবিতাই। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্যানার্জির সংগে দেখা করে বলল, স্যার আমাকে ব্ল্যাকসুমাত্রা জাতের দুটো হেন আর একটা কক দেবেন?

—কেন, বাড়ীতে ফার্ম করবে না কি?

—হ্যাঁ। আমার বহুদিনের ইচ্ছা স্যার।

—তুমি বুঝি মুরগী খুব ভালবাসো, না?

কোন কথা বলে না সবিতা। তার চোখ-দুটো খুসীতে অগাধ হয়ে ওঠে।

—এ্যানুয়্যাল ইনস্পেকশনটা হয়ে যাক। তোমাকে দেব—

স্বপ্ন নেমে আসে সবিতার চোখে। ব্ল্যাক-সুমাত্রার ফুলের মত সুন্দর কচি কাচি বাচ্চা-গুলোকে সে বুকে চেপে ধরে আদর করছে। অনেক—অনেক বড় ফার্ম হয়েছে তার। তীব্র আবেগে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

দিন কাটে। অধীর আগ্রহে সবিতা দিন গোনে। কবে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাকে হেন আর কক দেবেন। কবে সে বাড়ীতে নিজের মনের মত করে ফার্ম করবে!

কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদিন এলেন একটু রাত করেই। অজয়কে বললেন, কাল সকালে ডিরেক্টার সাহেব আসছেন ফার্ম দেখতে। আমি তোমার স্টকটা একটু দেখে রাখতে চাই—

—সবিতা, সব এগ রেজিষ্টারগুলো নিয়ে এস তো—অজয় হেঁকে বলল।

সোমার মুখে হাসি চিকচিক করতে লাগল। ওর হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে সবিতার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। আবার কোন সর্বনাশ করে রেখেছে না কি?

না। হ্যাচেবল এগের হিসাব মিলে গেল। খুসী হয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্যানার্জি বললেন, সবিতার কাজ খুব পরিষ্কার। টেবিলের ওপরে তাঁর নজর পড়লো। বললেন, টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে রাখা ঐ ডিমগুলো কি হে অজয়?

—পেন থেকে বিকেলে এসেছে। এখনও এগজামিন করা হয়নি স্যার—

—দেখি পেন থেকে আসা ডিমের রেজিষ্টারটা!

সবিতা খাতাটা এগিয়ে দিল। তার শান্ত বিষণ্ণ মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটল। ব্যাপারটা বেশ গুরুতর দেখে সোমা এগ টেষ্টিং রুমে

কাঁপছে। যদি কোন ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে, তা তো দোষ হবে তারই!

খাতার দিকে তাকিয়েই মিঃ ব্যান বললেন, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দেখছি নম্ব ডিম জমা করা হয়েছে। ওখানে কটা আছে অজয়?

—নম্বরইটা লেখা আছে? অজয় অ আমতা করে; কিন্তু এখানে যে বিরাশীটা দেখছি স্যার! তার কপালে বিন্দু বিন্দু জমে ওঠে।

—পাঁচ, ছয়, সাত আর আট নম্বর; চারটি পেনের আটটা ডিম এসেছে সব শেষে। খাতায় যা দেখছি। এক মুহূর্ত ... করে বললেন মিঃ ব্যানার্জী, দেখ তো ও ডিমের গায়ে পেন্সিল দিয়ে লেখা পেন ... আর ডেট!

অজয় প্রত্যেকটি ডিমের গায়ে লেখা ন গুলো দেখে হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকা অস্ফুটস্বরে বলল, না স্যার ঐ চারটি পে কোন ডিমই দেখছি না—

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কঠিন দৃষ্টিতে সবি দিকে তাকিয়ে বলল, খাতায় তুমি নিজে ... করেছো। চারটা পেনের আটটা মুরগীর ... থেকে আটটা ডিম এসেছে। অথচ ডিম ... কেন?

একটু আগেও তো দেখেছি মোট নম্বরু ডিমই ছিল স্যার, কাতর কান্নার মত শোনা সবিতার গলার স্বর। সে স্থির দৃষ্টিতে ক মুহূর্ত মিঃ ব্যানার্জীর মুখের দিকে তাকি রইল। একটা জোর নিশ্বাস টেনে নি ভেতরে ভেতরে যেন একটা শক্তি সংহত করে বলল, আমার অনেক শত্রু অ এখানে। সোমা একদিন ডিম লুকিয়ে ... আমাকে বিপদে ফেলেছিল স্যার—

—বাঃ এখানে এসবও হয় না-কি! ... টুকরো ব্যঙ্গের হাসি ঝুলতে লাগল সুপা ন্টেণ্ডেণ্টের ঠোঁটে। বললেন, অজয় যেখান ... পার ডিম খুঁজে এনে রাত্রেই স্টক মি রেখ। জুতো মসমসিয়ে তিনি চলে গেলেন

অপমানের জ্বালায় লাল হয়ে উঠল অজ কান দুটো। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রই পাশের ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থর-থর ... কাঁপছে সোমা। স্টোররুমে ডিমের স্তূ ভেতরে ঘাড় গুঁজে বসে রইল সবিতা। ... সেই নিস্তব্ধ ইনকিউবিশান ঘরের ভেতরে ... দূরে থেকেও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ভারী জুত মচ-মচ শব্দটা বাজতে লাগল।

রাগে গর-গর করতে করতে অজয় ... গেল সোমার কাছে। তার উত্তেজিত ... মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে অস্ফুটস্ব সোমা বলল, এবার আমি কিছু করিনি স্যা

—আমি কোন কথা শুনতে চাই ... তোমাদের জন্য আমি কথা শুনবো, কি পে তোমরা? অজয়ের চোখ দিয়ে যেন আ ঝরছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, যাও কো রেখেছ ডিম—নিয়ে এস শীগগির। তা নাহ এখুনি তোমার নামে রিপোর্ট করবো—

জলভরা দুটো করুণ চোখের দৃষ্টি ... ধরল সোমা অজয়ের মুখের দিকে। হাত ... করে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাকুল গলায় বলল, বিশ্ব করুন স্যার। আমি ডিম চুরি করিনি। দি

ছায়াছবি

কৃষ্ণকলি
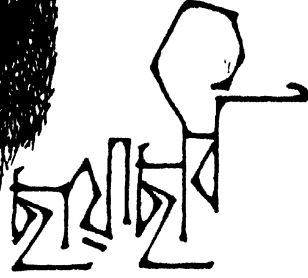
কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়লো। ব্যস্তহাতে পান সাজছিল ছায়া, বন্ধু অনিতা বললো,—ছবি শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে তোর দিন কাটানই ভার হবে কিন্তু।

একথা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী মিলিয়ে সবাই বলেছে। বলেছে ছবি চলে গেলে ছায়ার চলবে কি করে!

বর আসার পর থেকে নিচে ভাঁড়ার ঘরে আত্মগোপন করে আছে ছায়া। উপরে তো যায়ই না, এমন কি বর নিরঞ্জনের সামনে অবধি নয়।

শুধু সকলের কাছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা কথাই মনে পড়ছে যে, ছবি কি করছে? তাকে খুঁজছে কি না? ইত্যাদি।

অনিতার কথায় ছায়া জানতে চাইলো।

—ছবি কি করছে রে?

—কেন, বরের পাশে রাণীর মত বসে আছে! ধ্বক করে উঠলো বুকের মধ্যে। হাঁ রে আমি যে উপরে গেলুম না, বিয়ের সভায় থাকলুম না, ছবি আমার কথা জানতে চাইলো না?

—কৈ, আমায় তো কিছু বলেনি। অনিতা সাজা পানগুলো মুড়তে লাগলো।—যাই হোক, বোনের বেশ বিয়ে দিলি। চমৎকার বর হয়েছে। খরচপত্রও বেশ করতে হয়েছে—কি বলিস?

—হাঁ, তা হলো বৈ কি! ছায়া একটু হাসলো।

—রূপ যতই থাক তার সঙ্গে রূপোর যোগান ঠিক মত না থাকলে সে রূপের কোন মূল্য নেই।

ছায়ার শিরাবহুল খালি হাতের দিকে চেয়ে অনিতা বললো,—তা বটে!

বাইরে থেকে কে একজন পান সাজার তাড়া লাগাতে, সাজা পানগুলো নিয়ে চলে গেল অনিতা।

বাড়তি কাজগুলো সারতে সারতে নিজের হাতের দিকে নজর দিল ছায়া। কালো বাঁশের মত শ্রীহীন হাত। কিন্তু এই হাতই একদিন সামান্য একটু ছন্দোময় হয়ে চোখের সামনে ভাসতো। দু'গাছা করে চুড়ি থাকতো সেখানে। শুধু সোনার নিরেট চুড়ি—ছবির বিয়ে উপলক্ষে স্ব-ইচ্ছায় খুলে দিয়েছি।

স্বল্প আলোকোজ্জ্বল ভাঁড়ার ঘরের কোণে বধূবেশিনী ছবির চেহারাখানা অপূর্ব এক সৌন্দর্যে ভেসে বেড়াতে লাগলো। চন্দন কুমকুম সিঁদুরে উজ্জ্বল নতুন ছবি, যে ছবিকে ইতি-পূর্বে কোনদিন দেখেনি ছায়া।

কিন্তু সন্ধ্যা রাত থেকে এই রাত বারোটা অবধি ছবি একবারও তার খোঁজ করলো না! যাকে না হলে একদণ্ড চলে না, তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়ে নিশ্চিত আরামে নির্বিঘ্নে এতখানি সময় কাটিয়ে দিল।

অদৃশ্য একটা জ্বালা সারা শরীরময় ছড়িয়ে পড়লো। ছায়াকে চাপা উত্তেজনায় অস্থির করে মারতে লাগলো।

ছায়া ছবি দুই বোন। মায়ের পেটের। পাঁচ বছরের ছোট বড়। কিন্তু ছোট বড়র কথা বয়ঃসীমায় এসে দু'জনেই ভুলে গিয়েছে। এবং এই বয়সের কথাটা বিস্মৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দু'জনের কাছে এক অপূর্ব প্রীতি-মাধুর্যে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

ছায়া বড়। শুকনো কালো হতশ্রী চেহারা। ছবি ছোট, এক স্বর্গীয় রূপে লাবণ্যে অনবদ্য স্বাস্থ্যের অধিকারিণী।

কিন্তু চেহারা নিয়ে এই বিপরীতধর্মী দুই বোনের মাঝে কোন সমস্যা মাথা চাড়া দেয় নি। আশ্চর্য ওদের ভালবাসা,—মনে প্রাণে ভাবে ভঙ্গিমায় এক। এক জায়গায় খাওয়া শোয়া ওঠা বসা। দু'জন দু'জনকে সামান্যক্ষণের জন্য না দেখলে থাকতে পারে না। এবং এই জিনিষটা সবাই জানতো। সবাই এর জন্য হেসেছে। মাণিকজোড় বলে ঠাট্টা করেছে, কেউ কেউ বলেছে গত জন্মে তোরা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলি, এ জন্মে দুই বোন হয়ে এসেছিস।

ছায়া ছবি দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে, কথা বলে নি। কারণ, বলার মত কিছু ছিল না। দু'জনের মনের কথা দু'জনে জানতো। নীরবে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে কি তৃপ্তি পেত—কেউ বলতে পারতো না। কারণ এর সবটাই ছিল হৃদয়ের কথা, ভাষা দিয়ে বোঝাবার কথা নয়।

সেই ছবির বিয়ে হচ্ছে। বিয়েটা ছায়াই দিচ্ছে। অর্থাৎ দুটি বুকের মধ্যে যে একটি হৃৎপিণ্ড ছিল, স্ব-ইচ্ছায় তার আধখানাকে উপড়ে ফেলতে হচ্ছে।

মার্চেণ্ট অফিসে টাইপিস্টের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে মুখখানা দেখার জন্য সারা মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো, সেই মুখ কতকালের মধ্যে দেখবে, তার কোন ঠিক নেই।

বুকের মধ্যে একটা অংশ বড় বেশী শূন্য বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু সেই শূন্যতা সব সময় থাকছে না, একটা জ্বালা আসছে। সারা শরীর আগুনের আভাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

বর নিরঞ্জন এসেছে রাত আটটায়, বিয়ে দশটায় এবং এখন রাত একটায় ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। এতখানি সময়ের মধ্যে একবারও ছবি তার কথা জিজ্ঞাসা করেনি? কাউকে বলে নি,—দিদি কোথায় গেল, তাকে ডাক! ডাকতে এলে ছায়া যেত—তখন ওর রক্ত শিরাবহুল কঠিন হাতখানা নিজের আভরণ সিঞ্চিত সুডোল হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে দোষ ছিল কোথায়,—দিদি, তুই কোথায় ছিলি? অনেকক্ষণ দেখতে পাই নি। আমার পাশে বোস।

স্পর্শের অনুভূতিটুকু চোখে জল আনলো। ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল ছায়া। নিচের তলাটা কিছু ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু এ ঠাণ্ডা বেশীক্ষণ রইলো না, চমক ফিরলো হুড়-মুড় করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা মানুষের গলার আওয়াজে। জনাপনেরো বরযাত্রী। এতক্ষণে বাইরে ছায়াকে দেখে বরের ছোট ভাই কাছে এগিয়ে এল।—এই যে দিদি, এসে অবধি দেখতে পাইনি, কোথায় ছিলেন?

—বাড়ীতেই ছিলুম। ছায়া হাসলো একটু—বাড়ী ছাড়া আমার [illegible] জায়গা কোথায়।

—যাবেনই বা কেন? কিন্তু আপনাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে যে, শরীর খারাপ নাকি?

—খারাপ না হয়ে উপায় আছে? ভাইয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়ে কি শাস্তি দিয়েছ মনে নেই। ছায়া একটু ব্যঙ্গ করলো,—যাতায়াতে ঘোড়-দৌড়ও হার মানে। দু'পাটি জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে জল হয়ে গেছে।

কে একজন বললো,—জুতোর তলা না ক্ষইয়ে কখনও মেয়ের বিয়ে হয়?

—সে আমার মত মেয়েরা। উত্তর দিতে ঘাড়ের শিরা কঠিন হয়ে উঠলো—দু' পাটি কেন, দু'শো পাটি ক্ষইলেও অবাক হতাম না,

কিন্তু রাণীর মত যার রূপ, রাজার ঘরের ছেলে এসে যাকে সেধে নিয়ে যাবার কথা ছিল,—তার জন্যে দিনের পর দিন তোমাদের কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে যেতে হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের গায়ের জ্বালা কিছু মেটালো ছায়া। বরযাত্রীরা এ কথার পর কোন উত্তর দিল না এবং আরো কিছু পরে শুভেচ্ছা বিনিময় করে যে যার চলে গেল।

সারাদিনের কোলাহলময় বাড়ীখানা নিস্তব্ধ লাগছে। উঠোনে পাতা শূন্য চেয়ারগুলো, মাথার উপর শামিয়ানা টাঙানো, একশো পাওয়ারের বাতি সবই কেমন যেন প্রাণশূন্য মরা মানুষের মত দীপ্তিহীন।

বাসর ঘর থেকে গান ভেসে আসছে—"তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—"

সদর বন্ধ করে উপরে উঠে এল। সিঁড়ির মুখোমুখী মায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন,—তোর চোখ মুখ এমন কালো দেখাচ্ছে কেন?—কালো নয়তো কোনদিন হলুদবর্ণ ছিল শুনি? খিঁচিয়ে উঠলো ছায়া; —এতখানি রাত হল, আমি খেলুম কি মলুম একবারও খোঁজ নিয়েছ তোমরা? আমার জন্য কার কত দরদ জানা আছে!

মাকে শান্ত কথা শুনিয়ে উপরে উঠে গেল ছায়া। আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে গেছে। বাসর ঘর থেকে গান ভেসে আসছে। নিরুপদ্রব ছন্দোময় পরিস্থিতি। কোথাও এতটুকু বেধে যাওয়া, অসম্পূর্ণ হওয়া—কিছু নয়। এমন কি ছায়া যে এল না, বিয়ের সভায় দাঁড়াল না,—তার জন্য এতটুকু খোঁজ অবধি নয়।

অর্থাৎ ছায়া না থাকলে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, কারণ সমস্ত কাজের সম্পূর্ণতা করেই ছায়া বিদায় নিয়েছে।

মনের ঝাল অকারণে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দালানে পাঁচশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছিল। শব্দ করে নেবাল। অসংখ্য পায়ের ছাপ, নোংরা, খালি সিগারেটের প্যাকেটের উদ্দেশ্যে গালি দিতে লাগলো।

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে কালী নেমে আসছিল, খুড়তুত ভাই। বিয়ে বাড়ীর দালান অন্ধকার দেখে অবাক হল।—একি রে, আলো নিবিয়েছিস কেন?

—না নিবিয়ে উপায় কি? বিয়ে দিতে কত ধার হয়েছে জান? এর উপর ফুলশয্যার তত্ত্ব, লাইটের খরচ—হিসেব কর।

—তোর হিসেব তুই কর। এখন খাবি আয়, উপরে পাতা হয়েছে।

—ছবি খাবে না? ওকে ডেকেছ?

—ডাকলেই আসবে? তোমার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে খাবার দিন চলে গেছে। এখন যার সঙ্গে খাবার কথা তার সঙ্গেই খেয়েছে।

বুকের মধ্যে হাতুড়ীর বাড়ী পড়লো। সবেগে মাথা নেড়ে ছায়া বললো—ঠিক আছে! আমারও খাবার ইচ্ছে নেই। তোমরা খেয়ে নাও। আমি এখন ঘুমোব।

নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবি না? সারা সন্ধ্যে রাত তোর পাত্তা পাইনি, ছিলি কোথায়?

—যমের বাড়ী।

নিজের ঘরে চলে এল ছায়া। এতদিন এ ঘরের মালিক দুজনে ছিল। খাট বিছানা আলনা [illegible] সব [illegible] তার [illegible] লেগে রয়েছে।

[illegible] একখানা [illegible] রাখা, কিন্তু লাল্পা আলনা [illegible] মনের মত একখানা শাড়ী পেল না। [illegible] নিজেরও অগোচরে কখন মাকে ডেকেছে—ও মা, মা।

[illegible] চিৎকারে মা ছুটে এসেছেন।

—কি রে ডাকছিস কেন?

—আমার শাড়ী কৈ, সেই সবুজ রং-এর?

মা অবাক হলেন,—তুই তো সেখানা ছবিকে দিয়ে দিলি!

ছবিকে দিয়ে দিলুম? ক্ষোভে গলার স্বর অদ্ভুত শোনাল।—যা কিছু আছে ছবি রাণীকে দিয়ে দিলেই আমার স্বর্গে বাতি পড়বে, কেমন?

মা আস্তে বললেন,—কাপড়খানা এনে দেব! পরবি?

—না থাক। দিয়ে নিয়ে আর কলঙ্কের ভাগীদার করতে হবে না। তুমি এখন ছবির বন্ধুদের বাড়ী যেতে বল! রাত তেরোটা অবধি সুর দিয়ে প্রাণ বাঁধার কাঁদুনী ভাল লাগছে না।

মা চলে গেলেন। আরও খানিক পর ও ঘরের গান সহ হৈ-চৈ থেমে গেল। নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ভগ্নীপতি করার ব্যাপারে যার আগ্রহ সব চাইতে বেশী ছিল, তার এভাবে পালিয়ে বেড়ান উচিত হয় নি।

কিন্তু বাসরঘরে যেতে গিয়েও হঠাৎ এক কথা মনে পড়লো। ছবি কি করছে? চোখের সামনে একটা পরিচিত স্বপ্ন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে চায়!—বরের সঙ্গে গল্প করছে? হাসি-ঠাট্টা তামাসা? বা আর কিছু?

চলন্ত পা দু'খানা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। ছাদে শেষ পংক্তি খেতে বসেছে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বাসরঘরের কাছে ফিরে এল ছায়া।

দরজা অর্ধেকটা ভেজান। চোখ রাখলো সেখানে। যা ভেবেছিল তা সত্য নয়। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল,—ছড়ানো বিছানার একপাশে ছবি ঘুমোচ্ছে, নিরঞ্জন সিগারেট খাচ্ছে।

দরজা থেকে সাড়া তুললো ছায়া,—আসতে পারি?

গলার শব্দে নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি সিগারেটটা সরালো।—আসুন দিদি, আসুন। আপনাকে আজ এসে অবধি দেখতে পাইনি!

—খুব ব্যস্ত ছিলুম। নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছায়ার নজর ছবির উপর পড়লো। শুয়ে থাকার মধ্যে একটা সুনিশ্চিত আরাম ও নিভাবনার স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে।

সারা শরীরের মধ্যে ঘুমন্ত অজগরটা যেন পাক খেয়ে উঠলো। নিজের নিরাভরণ হাতখানা নিয়ে যা দেখলো সব কিছু কুৎসিত লাগলো। কিন্তু কেন এমন হল? একজন রূপে লাবণ্যে সৌভাগ্যের সৌধ চূড়ায় উঠবে, অপরজন সমস্ত রকমে হীনতার মধ্যে আজন্ম শুধু মার্চেন্ট অফিসে টাইপিস্টের চাকরী নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবন চালাবে—এমন তো হবার কথা ছিল না!

এবং সমস্ত রকমে নিঃস্ব মেয়েটির যথা-সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে সে কি পেল?

নিরঞ্জন বলছে—দিদিকে আজ খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে। ছবি চলে যাবে বলে খুব মন কেমন করছে, নয়?

—তা একটু করছে বৈ কি? গলাটা অকস্মাৎ ধরে এল ছায়ার। —তবে একটা জিনিষে এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

—বোনকে পার করার নিশ্চিন্ত?

—ও ছাড়াও কারণ আছে। ছায়া গলা খাটো করলো।

—ছবিকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।

—কেমন? বলার ভঙ্গিমায় নিরঞ্জন সোজা হয়ে বসলো। —চোখে চোখে রাখবো কেন?

শরীরের মধ্যে কিলবিলে অজগরটা এমন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে, ক্ষণকালের জন্য সমস্ত কিছু বিস্মরণের পটভূমিকায় ঢেকে গেল। কথা বলতে ছায়া বিষম খেল। —বলতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবা নেই, একটা ভাই নেই, এতদিনে আমার দায়িত্ব যখন আপনার ঘাড়ে চাপাচ্ছি, তখন বলা উচিত।

ছায়া একটু থামলো। —ছবির স্বভাবটা—মানে,—ছায়া আবার থামলো—হাজার হোক সুন্দরী তো, তা ছাড়া সব মানুষ চরিত্রে ব্যক্তিত্বে কিছু সমান হয় না। তাই বলছিলাম যদি ও ভুল ত্রুটি কিছু করে, আপনি ক্ষমা করে নেবেন।

কথাগুলি বলতে বলতে আবার গলাটা ধরে এল। পরম নিশ্চিন্তে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছায়া।

[illegible] অতীত

[illegible] ভট্টাচার্য

তুমি প্রশ্ন করেছিলে,
"আর নয়, শুধু এইটুকু—
তুমি আমি এত কাছে,
তবু এক অনন্ত সুদূর
এমনি রবে জেগে,
মাথা তুলে দুর্গম বন্ধুর
ঝিনিমিনি খেলা যাবে
হবে [illegible] কিছু ভুলচুক?—"
"জীবন কৃপণ [illegible]—
[illegible]—এত নিরুৎসুক,
মাপা মাপা পদক্ষেপ—
ভয় পাছে বেঁধে তৃণাঙ্কুর—
পোষমানা পাখী যেন
তুলবে না বিদ্রোহের সুর—
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে
পানপাত্রে ছোঁয়াবে না মুখ?"
পারিনি উত্তর দিতে—
খুশী হই তুমি বলে দিলে—
হিমাদ্রি নীরব ধ্যানে
কেন চেয়ে আকাশের নীলে—
সমুদ্র আকুল কেন
নিশিদিন ফেনিল কান্নায়?
মৌমাছি ফুলের কাছে
আসে কেন, ফেরে বারে বার,
এপারের চক্রবাক,
এপারেই দুচোখ ভাসায়
দেখি আর ভারী হয়
বোঝা কেন চির জিজ্ঞাসায়?

স্মৃতি

শ্রীপ্রান্তিক

হু হু করে গাড়ীটা এগিয়ে চলেছে। আকাশের চাঁদ সমানতালে নেমেছে প্রতিযোগিতায়। ভাবটা যেন 'কিছুতেই হারিয়ে দিতে পারবে না, যত জোরে চলতে ইচ্ছে হয় চলো না—আমিও আছি তোমার সংগে' সেই আকাশের গায়ে চলন্ত প্লেনটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়।

মোটরে পার্থ বসে আছে স্বপ্নার পাশটিতে—ওরা কি ভাবছে ঐ চাঁদ আর আকাশের ভাসমান প্লেনটার কথা? গাড়ী ছুটছে। স্বপ্নার উড়ো চুল পার্থের নাকে চোখে লাগে। কেমন যেন মিষ্টি একটা অনুভূতি অনেক আগে মাখা পাউডার—সেন্টের মিশ্রিত গন্ধ—সবই যেন ভালো লাগে পার্থের। কত চেনা কিন্তু কত নতুন। অন্ধকারের যেমন একটা রূপ আছে, ঠিক তেমনি আছে নিস্তব্ধতার একটা আকর্ষণ। ওরা দুজনে বোধহয় তারই আমেজ অনুভব করছিল।

পার্থ কথা কয়ে উঠলো 'মনে আছে সেদিনের কথা, হাত দেখার অছিলায় যেদিন দিব্বি তোমার হাতটি টেনে নিয়েছিলাম—ভাবলে আজও এত মিষ্টি লাগে!

'কি দুষ্টু তুমি, কি করে অমনিভাবে হাতটা টানতে পারলে? কতটুকু চিনতে আমাকে সেদিন—ভয় হলো না?' কথাগুলো বলতে বলতে স্বপ্না আরও এগিয়ে আসে পার্থের কাছে।

জানো সোনা ভালোবাসার নিজস্ব একটা শক্তি আছে, পার্থের গল্পটা দার্শনিকের মত শোনাচ্ছে, তুমি আমি এমনি যা দেখতে পাই না বা বুঝতে পারিনে, তা তার কাছে অতি সহজ। বুদ্ধি যেখানে আপত্তি জানাতে চেয়েছিল আর হৃদ্দ সেখানে সহজেই পারলো হাতটা টেনে নিতে। সে বুঝেছিল তুমি শুধু ওইটুকুর জন্যে একান্ত অপেক্ষা করছো।

কখনো না, আমার বয়েই গেছে অপেক্ষা করতে তোমার হাতের জন্যে'।

পার্থ হেসে উঠে বলে, 'আজও তোমার লজ্জা করে সত্যকে মেনে নিতে?

স্বপ্না মেনে নেয়, মনে মনে স্বীকার করে, সেদিন ওই রকম কিছু যেন সত্যিই চাইছিল সে।

চেনা সামান্য হলেও খুব সামান্য ছিল না সেদিনের অনুভূতিটা।

গাড়ী ঘোরে। স্বপ্না নির্দিষ্ট জায়গাটিতে নেমে পড়ে। পার্থ জানায়, পরদিন ঠিক আবার সে আসবে ঠিক সাড়ে ছটায়।

এমনি দিন যায়।

ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেছে অনেক আগে। স্বপ্না বার হ'তে চায় বাড়ী থেকে, সাড়ে ছ'টার আর বেশী দেরী নেই, হাঁটতে হবে অনেকখানি। পেছন থেকে মার ডাকে স্বপ্না দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রশ্ন শোনে 'সন্ধ্যাবেলা কোথা বার হচ্ছিস—সবাই রাতেরবেলা বার হওয়া একদম পছন্দ করে না একথা বার বার তোকে মনে করিয়ে দিতে হবে কেন? তুই তো মা ছেলে মানুষ নস্।' স্বপ্না দাঁড়িয়ে পড়ে। ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে অনুমতি পাবার বাসনায়। যখন রাস্তায় নেমে আসে তখন ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। পার্থ রাগ করবে, কিন্তু অপেক্ষা করবে নিশ্চয়ই।

গাড়ী এগিয়ে চলে। স্বপ্নার হাত পার্থের মুঠোর মধ্যে। অন্ধকারেও বুঝতে পারে পার্থ চেয়ে আছে তার দিকে। জিজ্ঞাসা করে 'অমন করে কি দেখছো? মনে হচ্ছে যেন এই তোমার প্রথম দেখা।'

পার্থ এড়িয়ে যায় তার প্রশ্ন, বলে, 'যদি এমন হয়, তুমি পারলে না আর অপেক্ষা করতে। প্রয়োজনের তাগিদে গ্রহণ করলে জীবনের নতুন পথ, তখনও কি এমনি করেই আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো? উদারতার গর্ব আমার আছে, বিশ্বাস করি আদর্শে মানুষকে সুখী করার জন্যে নিজেকে বঞ্চিত করার লোভ যে নেই তাও নয়। কিন্তু যেখানে তুমি, সেখানে নির্মম স্বার্থপর আমি—কোন ক্ষমা নেই আমার অভিধানে। তুমি যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে অন্যের সংগে আলাপ করো তখন তাতে কোন অন্যায় নেই জেনেও পারি না তা স্বীকার করে নিতে—সমস্ত সংযম যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। আমার ভবিষ্যৎ তো আমি দেখতে পাচ্ছি, তবু এমন হয় কেন?'

স্বপ্না নিরুত্তর। পার্থ আবার বলে গেল, 'সেই তুমি যখন পরের হয়ে যাবে, তখন এই আমি পারবো তা সহ্য করতে। বলো না স্বপ্না সেদিন কি হবে আমার প্রশ্ন আর কিই বা হবে আমার উত্তর?'

স্বপ্না দেখে পার্থের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখে যেন তার কত দূরের অদেখা জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ছোট্ট করে সে আদর করে বলে, ভবিষ্যতের ভাবনা স্থগিত রেখে দয়া করে একটু কি বর্তমানে ফিরে আসবে? আমারও ভয় করছে সেই ভবিষ্যৎকে ভাবতে। পায়ে ধরি তোমার শরীরের কথা ভুলে যেও না। তারপর আবদার জানায় তাদের জীবনের তীর্থ, মিলনের একান্ত জায়গাগুলো আবার ঘুরিয়ে আনতে। হাল্কা কাব্য করে বলে, 'তারই মাঝে আছ তুমি, আছি আমি।'

পার্থ কথা রাখে স্বপ্নার। গাড়ী এগিয়ে চলে তার বহু পরিচিত পথ দিয়ে মানুষের কোলাহলের বাইরে। এরই মাঝে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ে পথের পাশটিতে। স্বপ্না মনে মনে কেন জানি এই স্মৃতির সাক্ষী গুলোকে প্রণাম না জানিয়ে পারে না।

এমনি করে মেলার দিন ফুরিয়ে আসে। দাঁড়িয়ে থেকে স্বপ্নার বিয়ের সব আয়োজনই দেখতে হয় পার্থকে। বিয়ের রাত্রে সবাই ব্যস্ত বর আর বরযাত্রী নিয়ে। কেউ কেউ পার্থেরও খোঁজ নিয়ে যায়। মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, কনে বসে আছে বরের পাশটিতে। কাপড়ের টান পড়ায় নবাগতের হয় বসার অস্বস্তি। বুঝতে পারে তা তার পার্শ্বোপবিষ্ট বধু। ওরই ভেতর সাহায্য করে তার বসার অসুবিধা লাঘব করতে। পার্থ ঠিক ঐ সময় এসেছিল চুপিসাড়ে। একবারটি দেখতে। আবার যেন তার জন্ম দেখা দিচ্ছে। দেখলো সে সবই। মাথাটা ক্ষণিকের জন্যে কেমন যেন হয়ে উঠলো, সামলে নিল তক্ষুণি। আস্তে

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

বিকেলের আপ গাড়ীখানা শেষ পর্যন্ত যাহক চলে গেল।

আজ প্রায় এক ঘণ্টা দেরী। যাবার কথা পাঁচটা চুয়াল্লিশে। কিন্তু গাড়ীর ধোঁয়া যখন দেখা গেল তখন চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

গাড়ীর দেরী হবে কিনা গেটম্যানের তা জানবার কথা নয়। দুখু নিয়ম-মাফিক সময় মতো লেভেল ক্রসিং-এর ভারী গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু গাড়ীর পাত্তা নেই। ওদিকে গেটের দু'পাশে খানচারেক মোষের গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়োয়ানেরা অনুনয় বিনয় করলে। কোনো ফল হল না। আরও দু-একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালে। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই মিলে গালি-গালাজ সুরু করলে। দুখুও পালটা গালাগালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে, ইটা শালা তোর গাড়োয়ানির চাকরী পেয়্যাছিস বটে! একসিডিন হলে কোম্পানী বাহাদুরের হামুতে জবাবটা কাকে দিতে হবে তা বল্ না কেনে? গাড়ী পাশ করাবো গেট খুলবো, ব্যস্।

গুমটির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দুখুর মেয়ে চাঁদমণি ফিক্ করে হেসে ফেললে। দুখু তাকেও এক ধমক দিলে।

হাসিছিস কেনে? হাসির কথা হল ইটা?

চাঁদমণি থতমত খেয়ে ঘরে ঢুকে গেল। পনেরো ষোলো বছরের ডাগর মেয়ে। মা নেই, বাপের আদরেই এত বড়োটি হয়েছে। দরকার মতো বাপকে দু-এক সময় শাসনও করে। কিন্তু ভয় করে তার চেয়ে বেশি। দুখুর লালচে ঘোলা চোখ দুটির দিকে তাকালেই তার কেমন বুক কাঁপে।

লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গাড়ীখানা চলে গেল। ব্যাকলাইটের লাল চোখটা দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। সেদিকে তাকিয়ে আপন মনেই কি খানিকটা গালিগালাজ করলে দুখু। তারপর গেট খুলে দিয়ে হেঁকে বললে, লাও সব—রোড কিলিয়ার।

... বয়সী যে গাড়োয়ানটি ... আ...

ফাকে ফুটে উঠ...

সবাইকে শুনিয়ে সে বললে, দুখুদা বটে মরদের ব্যাটা মরদ। ঘরের মাগ লাথি মেরে চলে যায়, তাকে আটকায় না। কিন্তুন আমাদিগে আটক রেখে কি তেজটা দেখাইছে, অ্যাঁ?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলে।

দুখুর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে। গায়ে সরকারী নীল কোর্তা, হাতে সরকারী নিশান। এর অনেক দায়িত্ব। রক্ত গরম করতে নেই। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, আমার খুশী আমি উটাকে ছেড়্যা দিলম। তাড়াই দিলম বটে।

সবাই আর একচোট হেসে নিলে। দুখুর ঘর থেকে টুনকি মেঝেন চলে যাওয়ার ঘটনাটি এ অঞ্চলে সবাই জানে। লোকটা তবু কিছুতেই স্বীকার করবে না কিছু।

গরু আর মোষের গাড়ীগুলো সারি দিয়ে পার হয়ে গেল লেভেল ক্রসিং। সবুজ নিশানটাকে গুটিয়ে নিয়ে গুমটির দাওয়ায় বসে দুখু ডাকলে, চাঁদি, হেই চাঁদি।

চাঁদমণি বেরিয়ে এলো। বাপের হাত থেকে নিশানটা নিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, বাজারকে যাবি বটে?

দুখু মেয়ের মুখের দিকে তাকালে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলে গুমটির সামনে ছোট চত্বরটার দিকে। সারি সারি ডাগর চারায় ফুটেছে অনেকগুলো নয়নতারা। চাঁদমণির নিজের হাতের গাছ। একটা চারা নষ্ট হলেও চোখ ছলছল করে মেয়েটার।

দুখু বললে, তকে আমি আরও চারা এন্যে দিব চাঁদি। ফুলগুলান ভারী বাহারী বটে!

চাঁদমণি আড়চোখে একবার বাপের অন্যমনস্ক মুখখানার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলে। তার বুকের ভেতরটায় কি এক অব্যক্ত বেদনা যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগলো। আস্তে আস্তে বললে, আর চারাকে দরকার নাই। ই চারাগুলা থেকা আরও কত চারা হবে।

দুখু আর কিছু বললে না। একটা বিড়ি ...িয়ে চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। বিড়িট

শেষ হয়ে যাবার পর বললে, কামিজটো বাজারকে ঘুরে আসি।

চাঁদমণি ঘর থেকে একটা ছিটের ... এনে দিলে। নীল কোর্তাটা খুলে রেখে ... পরে নিলে দুখু। চাঁদমণি গেটের মাথায় ... বাতি দুটো ঝেড়ে-পুছে তেল ভরে রেখে... আলো জ্বালিয়ে সে দুটোকে জায়গা ... বসিয়ে দিয়ে দুখু বললে, লাইনকে ... রাখিস। মালগাড়ি শালাগুলার তো টেইম নাই।

বিকেলের গাড়ীটা চলে যাবার পর ... চারেকের মধ্যে আর প্যাসেঞ্জার গাড়ী নেই। সময়টুকু দুখুর অবসর। গাড়ীটা চলে য... পরই গেটে বাতি জ্বালিয়ে রেখে সে বাজা... পথ ধরে। তাড়ির দোকানে গিয়ে না পৌঁ... পর্যন্ত ছটফট করতে থাকে তার মন। তা... এক সময় ফিরে আসে আবার ...টিতে। পেট তাড়ি খেলেও দশটার আগে সে ফিরে... প্রায় বাইশ বছরের চাকরী হয়ে গেল। ... ব্যতিক্রম কোনোদিন ঘটেনি।

অন্ধকার বেশ গাঢ় হ'য়ে এসেছিল। দু... অপসৃয়মাণ মূর্তিটা ওপাশে রাস্তার ব... হারিয়ে গেল। চাঁদমণি সেদিকে তাকিয়ে ... রইলো দাওয়ায়। রাশি রাশি নয়নতারা ফুটে... খুব মৃদু একটু গন্ধ মাঝে মাঝে ভে... আসছে। অন্ধকারে মিশে যাওয়া ফুলগুলো... আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চাঁদমণি ... ফিরিয়ে তাকালে পেছন দিকে। দু' প... ভাঁটার মতো দুটো লাল চোখ তার দিকে ... তাকিয়ে আছে। তার নিজের হাতে তেল ... দেওয়া বাতি দুটোর আলো। লাল কাঁ... ভেতর থেকে যেন দুটো লাল চোখের ম... জ্বলছে।

গাড়োয়ানদের সেই ঠাট্টা সেও শুনেছি... দুখুর জবাবটাও তার কানে এসেছে।

চাঁদমণির বুকের ভেতর সুগভীর এ... বেদনা আবার যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

অনেক ছোটবেলার কথা।

চাঁদমণির মা বলতো, মেয়েকে সে ... ...ায়ে নিয়ে বিয়ে দেবে। কোথায় কোন্ ...

কোপপাড়া ইস্টিশানে নেমে তাদের বাড়ীতে যেতে হয়। কিন্তু সেই কোপপাড়া চাঁদমণি আজও পর্যন্ত দ্যাখেনি। এই গুমটি ঘরেই তার জন্ম। এই তার দেশ, এই তার বাড়ী। চাঁদমণির মা বলতো, দেশ ছেড়ে তাদের স্বজাতি যারা সব এদেশে এসেছে, তারা খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েগুলো বেহায়া হয়ে যায়, মরদেরা আর মরদ থাকে না। যে মরদ পরের কথায় ওঠে বসে, ধমক খেয়ে সায়েবের টুলি ঠেলে সে আবার মরদ কিসের। চাঁদমণিকে সে এমন মরদের হাতে দেবে, যে দরকার পড়লে টাঙ্গির এক কোপে একটা বাঘের গলা নামিয়ে দিতে পারে।

চাঁদমণির ভারী অবাক লাগতো। সে আজ পর্যন্ত বাঘ দেখেনি। বারহারোয়া লুপ লাইনের এই ছোট্ট গুমটি ঘর, রেল লাইন, রাস্তা আর বড়জোর বাজার—এইটুকুই তার পরিচিত জগৎ। কিন্তু তার মা এ সবকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। তবু কিন্তু এই ঘর, এই সংসার ছেড়ে সে কোনোদিন যায়নি। একেবারে চলে যাবার ডাক যখন এলো তখন গেল। কোপপাড়া ইস্টিশনে নয়—একেবারে এই দুনিয়ার বাইরে। মদ খেয়ে এসে কতদিন রাগের মাথায় মাকে অমানুষিকভাবে মারধোর করেছে তার বাবা। কতদিন রেগে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছে। তবুও সে এই সংসার ছেড়ে কোথাও যায়নি। নির্মমভাবে মাকে মারতে দেখে ছোটবেলায় কতদিন চাঁদমণি কেঁদে ফেলতো। কিন্তু বাপের চোখে চোখ পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠতো। কান্না থেমে যেতো। রেগে গেলেই দুখু একটা কথা বলতো। মরদ যিখানকেই থাক্, সে মরদ বটে—তা জানছিস? আমি কোম্পানীর চাকরী করি তাতে তর বাপের কি হ'ল তা বল কেনে? আমার দাপট দেখছিস নাই?

আবছাভাবে কথাগুলো তার মনে আছে। বিশেষ ক'রে মনে আছে একটা ঘটনা। তখন চাঁদমণির বয়স চার-পাঁচ বছর।

ভোরবেলায় দুখুর হাঁক-ডাকে চাঁদমণির ঘুম ভেঙে গেল। দুখু লাল নিশানখানা নিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলে গেল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাঁদমণি দেখলে অনেক দূরে গাড়ীর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। তার বাবাও লাল নিশান হাতে সেদিকে ছুটছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অজগরের মতো গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে গেল। লোকজন ছুটে নেমে এলো। তারপর কতক্ষণ ধরে ছুটোছুটি ঠোকাঠুকির পর গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চলে গেল। চাঁদমণি পরে জানতে পেরেছিল, লাইনের কোথায় কি একটা গলতি দেখতে পেয়ে তার বাবা অতবড়ো গাড়ীখানাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

সেদিনকার বিস্ময় আজও সে ভুলতে পারেনি। তার বাপ যে এতখানি ক্ষমতা রাখে তা ভেবে ছোট্ট মেয়েটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। মা আর বাবার মৃদু ঝগড়ার সূচনা ঘটলেই মায়ের ওপর রেগে গিয়ে সে বলতো, হুই অতবড়ো গাড়িটো তু থামাই দে তো!

তার মা হেসে ফেলতো। দুখু একগাল হেসে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বলতো, মেয়্যার কথার জবাবটো দে বটে?

চাঁদমণি অবাক হয়ে কত কি ভাবতো। তার বাবা নিশান দেখাবে তবে গাড়ী থামবে। তার বাবা গেট না খুললে কারও ক্ষমতা নেই একখানা গরুর গাড়ীকে লাইন পার করায়। তার বাবা [illegible] দেখালে [illegible] রেল গাড়ীটাকে থামতেই হবে!

গাড়ীর সময় হলেই যেখানে থাক্—ছুটে এসে চাঁদমণি বাপের পেছনে দাঁড়াতো। দু'চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে বার বার ক'রে তাকিয়ে দেখতো তার বাবাকে আর দৈত্যের মতো গাড়ীখানাকে।

সেই ছোট্ট মেয়ে দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠলো। অনেক কিছু সে বুঝতে শিখলে। গেট খোলা আর বন্ধ করা যে তার বাবার ইচ্ছামতো হতে পারে না, তাও জানতে পারলে চাঁদমণি। নিশান ধরা যে তার বাবার চাকরী, সে কথাও স্পষ্ট হল তার কাছে। কিন্তু শৈশবের অবুঝ মনের বিস্ময়টুকু একেবারে লুপ্ত হল না।

বছর তিনেক আগের কথা।

দু'দিনের জ্বরে চাঁদমণির মা মারা গেল। চাঁদমণি গুমরে গুমরে কাঁদলে মায়ের জন্যে। তবু কোথায় কি যেন একটা মুক্তির আনন্দ। মা বেঁচে থাকলে হয়ত সেই কোপপাড়ার কোনো এক বুনোর ঘরেই তাকে যেতে হত। চাঁদমণি অনেক ভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছে। দুখুর পেশাকে তার মা পছন্দ করতো না। তবু এই ঘর ছেড়ে তো সে কোথাও যায়নি। নিজের বাড়ী নয়—কোম্পানীর দেওয়া ঘর। তবু এই গুমটি ঘরটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা তো তার কম ছিল না। নয়নতারার চারাগুলো চাঁদমণির মা প্রথম লাগিয়েছিল। দুখুর হাতে এত মারধোর খেয়েও ফুল গাছগুলোর যত্ন করতে তার মা কখনো ভোলেনি!

চাঁদমণি বুঝতে চেষ্টা করে। তার মা মুখে যাই বলুক, মনে মনে তার এই সংসারকে সে বড়ো বেশী ভালোবাসতো।

চাঁদমণির মা মারা গেল মাঘ মাসে। পাঁচ মাসও পার হল না, ধাত্রী গ্রামের কোন্ এক গ্যাংম্যানের ঘর ভেঙে দিয়ে টুনকি মেঝেন এসে উঠলো দুখুর গুমটিতে। টুনকির ওপর একটা প্রচণ্ড রাগে ক্ষেপে উঠলে চাঁদমণি। তার চালচলন, তার বেহায়াপনা বরদাস্ত না করতে পেরে যা মুখে আসতো তাই বলতো সে। টুনকির যত আক্রোশ ওই নয়নতারার গাছগুলোর ওপর। একদিন সে রাগের মাথায় দু'টো গাছকে উপড়ে ফেলে দিতেই চাঁদমণি ঝাঁপিয়ে পড়লে তার ওপর। সমস্ত শক্তি দিয়ে টুনকির চুলের মুঠি ধ'রে টানতে টানতে চেঁচিয়ে উঠলো, বিহায়া মাগী, তর শরম নাই? একটা ঘর ভাঙ্গি দিছিস, আবার ইটাকে ভাঙতে এস্যাছিস?

টুনকি সে কথার জবাব মুখে দিলে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে চাঁদমণির মুখখানাকে কাঁকরমাটিতে ঘষে দিতে দিতে রক্তারক্তি করে দিলে। চাঁদমণি তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। নির্মম মার খেয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। সে রাতে মদ খেয়ে দুখু যখন ফিরে এলো তখনও চাঁদমণি ঘুমোয়নি। মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দুখু সেই যে টুনকিকে মারতে সুরু করেছিল তা থামলো আধ ঘণ্টা পরে। টুনকি তখন গুমটির দাওয়ায় পড়ে গোঙাচ্ছে—উঠে বসবার শক্তিও নেই।

টুনকির সেই চেহারা দেখে চাঁদমণি কেঁদে ফেলেছিল। দুখু নির্বিকার। রাত দশটার গাড়ী আসার সময় হল। রোজকার নিয়ম মতো গেট বন্ধ করে দিয়ে ঘরে এসে সে শুয়ে পড়লো। আর গেট খোলার দরকার [illegible] সারা-রাত ওই ভাবেই গেট বন্ধ থাকবে।

অনেক রাতে চাঁদমণি পা টিপে-টিপে উঠে গিয়ে টুনকির কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে দিয়েছিল। দুখুও জানে না, টুনকিও তা জানে না।

পরের দিন দুখু নির্বিকারভাবে টুনকিকে বললে আমার ঘর করতে হলে গা-গতর শক্ত রাখতে হবে বটে। চাঁদির মা মাগীটা জানতো।

টুনকি কোনো জবাব দিলে না। ঘরে চলে গেল। চাঁদমণি তখন উপড়ে ফেলা চারা দুটোকে পরখ করে দেখছিল। সে নিজেই জানে না, হঠাৎ কি একটা তীব্র উল্লাসে তার বুকের ভেতরটা ভরে উঠলো।

টুনকি আসার পর থেকে থানায় একটা সেপাই মাঝে মাঝে আসতো। সে এনে দিয়েছিল কতকগুলো নয়নতারার চারা। তারপর থেকে টুনকি আর ফুল গাছ নিয়ে ঘাঁটায়নি চাঁদমণিকে। সেপাইটার সঙ্গে টুনকি হাসাহাসি করতো, ঢলাঢলি করতো। রাগের জ্বালায় চাঁদমণি বার বার বাপকে বলতো, তু হাড়িয়া কিনে এন্যা ঘরকে রাখ্—সাঁঝবেলাকে বাজার যাওয়া হবেক নাই।

দুখু চোখ বড়ো বড়ো ক'রে বলতো, আই রে বাপ, সরকারী বাড়ীকে হাড়িয়া এন্যে রাখতে লারবো রে চাঁদি।

মাসখানেক আগে।

দুপুরে হঠাৎ বেরিয়ে গেল টুনকি। যাবার সময় বললে, তর বাপকে আর একটা বিয়া করতে বলিস চাঁদি। আমি অমন মরদের ঘরকে থুক দিই।

যার উদ্দেশে বলা, সে দাওয়ায় বসে বাতির ফিতে পরিষ্কার করছিল। কথাটা শুনে মুচকি হেসে দুখু বললে, যা না কেনে কোথাকে যাবি। গর্দানা ধরে এন্যে ফেলবো আবার। আমার তেজ জানছিস নাই?

কোনো জবাব না দিয়ে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল টুনকি। গেট পেরিয়ে চলে গেল রাস্তার দিকে।

চাঁদমণির কেমন যেন মনে হচ্ছিল। মৃদু স্বরে বললে, কোথাকে গেল বটে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দুখু বললে, যাবে কোথা'ক? আবার ইখানকেই ফিরি আসবে।

কিন্তু টুনকি আর ফিরলে না।

তিনটে চৌত্রিশের আউন গাড়ীর একটা জানালায় তাকে দেখেছিল চাঁদমণি। টুনকির পাশে বসে সেই সেপাইটা। দু'জনে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হাসছে। টুনকি যেন হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে।

গাড়ীখানা চ'লে গেল।

গেট খুলে দিয়ে নিশান গুটিয়ে দুখু যখন দাওয়ায় এসে দাঁড়ালে তখন আর মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলে চাঁদমণি। পোড়ামাটের যে গর্বে দুখুর কোটরে বসা চোখ দুটো জ্বলতো, তা যেন দপ্ ক'রে নিভে গেছে।

হঠাৎ বুক ঠেলে কান্নার একটা বেগ ঠেলে আসতে লাগলো। ঘরের মেঝের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো চাঁদমণি। তার বাবাকে অগ্রাহ্য ক'রে তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে যে গাড়ীতে বসে টুনকি চলে

(শেষাংশ ২৬০ পৃষ্ঠায়)

মধ্যযুগে সংস্কৃত গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ

(৬৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দময়ন্তীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন ফায়জি। আমীর খুসরুর কাব্য গ্রন্থটির পর এমন উচ্চাঙ্গের কবিতার বই খুব কমই রচিত হয়েছিল। ফায়জী আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ ও জগৎপুরাণের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। তিনি সোমদেবের "কথাসরিৎসার" অবলম্বন করে ফারসী ভাষায় একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদের ব্যাপারে বিভিন্ন মুসলিম সুধীগণ যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়ে চলতেন। মোল্লা আব্দুল কাদির বদাউনি সংস্কৃত বিখ্যাত গ্রন্থ "বত্রিশ সিংহাসনের" ফারসী অনুবাদ করেন এবং এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেন "নামায়ে খিরাদ-আফজা।" বদাউনি আর একটি গ্রন্থের অনুবাদ করে তার নাম দেন "বাহরুল আসমর"।

ঐতিহাসিক আবুল ফজলের কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার বহু গ্রন্থ পাঠ করেছেন। তিনি তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-দর্শন, পাতঞ্জলি, জৈনবাদ, নাস্তিকতাবাদ, কর্মবিপাক, ঈশ্বরতত্ত্ব—এই সব নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। শুধু তাই নয়। এ গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীত নৃত্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সে যুগের সামাজিক রীতিনীতি, ক্রিয়াকান্ড, উত্তরাধিকার আইন, বেচাকেনার রীতি, বিবাহ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। এ যুগের গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ আবুল ফজলের এ-গ্রন্থ থেকে বহু নির্ভরযোগ্য উপাদান লাভ করতে পারেন।

জাহাঙ্গীরের শাসনকালে শেখ সাদুল্লাহ মসিহ্ রামায়ণ গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন এবং তার নাম দেন "রাম ও সীতা"। সুফী শরীফ আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। যোগবাশিষ্ঠকে ফারসীতে অনুবাদ করেন। সে গ্রন্থের নাম "আতওয়ার দর হাল-ই-আসরার"। এবং গ্রন্থকে তিনি জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গ করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে পন্ডিত শের খাঁ যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম —"মিরাতুল খেয়াল"। এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীতের বিবিধ জটিলতা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শাহজাহানের রাজত্বের অষ্টম বছরে ভাস্করাচার্যের "বীজগণিতকে" আতাউল্লাহ রশীদ ফারসীতে অনুবাদ করেন। এই আতাউল্লাহ ছচ্ছেন তাজমহলের স্থপতি আহম্মদ মিসরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই যুগে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য সরকার থেকে বহু উৎসাহ দেওয়া হ'ত। কারণ সম্রাট-পুত্র দারা শিকোহ্ এ-সব ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখেছিলেন। এবং সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদেরকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি নিজে গীতার ফারসী অনুবাদ করেন। তাঁর একখানা পুস্তকের নাম "মোকামায়ে দারাশিকো ও বাবালাল"। ভারতের সাধুদের জীবনের বৈশিষ্ট্য, মানবীয় ও স্বর্গীয় আত্মা, সাধু সন্ন্যাসীদের কর্তব্য, নিরামিষ আমিষ আহারের পার্থক্য ও ফলাফল, এই সব হচ্ছে এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এর সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের কতিপয় কাহিনীও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

যোগবাশিষ্ঠের ফারসী অনুবাদ দারাশিকোহর অন্যতম অবদান। যোগবাশিষ্ঠ ঋষি তাঁর শিষ্যকে যে সব মহামূল্য উপদেশ দিয়েছেন, এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে সেই সব উপদেশ। দারাশিকোহ উপনিষদকেও ফারসীতে অনুবাদ করেন—তার নাম "সিরার-ই-আসরার" অর্থাৎ "ভেদের ভেদ"—এর রচনাকাল ১৬৫৭ সাল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় দারা লিখেছেন যে, ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল অটল। ইউরোপ দারার এই ফারসী অনুবাদ থেকে উপনিষদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। আনকুইটিল দুপের' এই ফারসী গ্রন্থকে লাটিনে অনুবাদ করেন। তাঁর এই লাটিন অনুবাদ ১৮০১ ও ১৮০২ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। শোপেনহায়ার এই অনুবাদ পড়ে উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বে এ গ্রন্থের তুলনা নেই। দারার আর একটি মৌলিক গ্রন্থ হচ্ছে "মাজমাউল বাহরায়েন"। এতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মাদর্শ প্রায় একই প্রকার। তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থনে উভয় ধর্ম থেকে প্রায় সমতুল উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সংস্কৃত চর্চা একেবারে বন্ধ হয়নি। তাঁর রাজত্বকালে মিরজাবিন ফকরুদ্দিন মহম্মদ একটা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার নাম "তুহাফাতুলহিন্দ"। গ্রন্থটি সম্রাটপুত্র আজম শাহের শিক্ষার জন্য লিখিত হয়। হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সাহিত্য সংক্রান্ত বহু বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি মুসলিম সুধীদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এই যুগে। একজন অজ্ঞাতনামা লেখক দু'খানা বই লেখেন —"তানজিম" এবং "বুরহানুল কিকায়েত"। এ বই দুটি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। আর একজন লেখকের নাম কাবুল মহম্মদ আনসারি—তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম "রিসালাদার ইলমুন নুজুম"। আবু সইদ আল হাসান আর রিজবীর গ্রন্থের নাম "নিজামুল নুজুম"। এই গ্রন্থগুলির কোনটা সংস্কৃত থেকে সরাসরি অনুবাদ অথবা সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বন করে রচিত। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সে যুগে মুসলিম সুধীগণ রীতিমতভাবে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করতেন এবং প্রয়োজনমত তার স্বাদ ফারসীভাষীদের নিকট পরিবেশন করতেন।

একথা সকলেই জানেন যে, গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলিম নেতারা সঙ্গীত চর্চা করতেন না। তাঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সঙ্গীত চর্চা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের আবেদন এত সর্বব্যাপী যে, নিষেধ সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ বরাবরই সঙ্গীত চর্চা করেছিল। ভারতের মুসলিমগণ রীতিমতভাবে সঙ্গীত চর্চার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আমীর খুসরুর কথা উপরে লিখিত হয়েছে। মোগল যুগেও রীতিমতভাবে সঙ্গীত চর্চা হ'ত। ভারতীয় সঙ্গীতকে তাঁরা বর্জন করেননি। জৌনপুরের রাজা হোসেন শাহ ভারতীয় সঙ্গীত খুবই ভালবাসতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর অবদানের কথা সঙ্গীতজ্ঞমাত্রই স্বীকার করেন। তিনি সঙ্গীতের বারটি "শ্যাম" উদ্ভাবন করেছেন—মালহারশ্যাম, গৌরীশ্যাম, ভূপালিশ্যাম, কানহরশ্যাম, সাহশ্যাম, রামশ্যাম, মেঘশ্যাম, বসন্তশ্যাম ইত্যাদি।

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয় নিয়েও বহু ফারসী গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এখানে কতকগুলি নামোল্লেখ করা গেল। ভূপাল শাস্ত্র হিন্দু বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একজন অখ্যাতনামা লেখক এই গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করেন। নাজমুদ্দিন আহম্মদের লেখা "রিসালায়ে শাস্ত্রীয়া"—এতে আছে হিন্দু পদ্ধতিতে ধ্যানযোগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। তাঁর আর একটি পুস্তকের নাম "রায়াহিনুল বাসাতিন"। এতে হিন্দুদের আদর্শ মত নির্বাণ ও মুক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। মৌলানা আবদুর রহমান চিশতীর বিখ্যাত গ্রন্থ "সিরাতুল আসরার" —এতে আছে মহাদেব ও পার্বতীর কথোপকথনের মধ্যে হিন্দু দর্শনের আলোচনা। হিন্দুদের দৃষ্টিতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। ঐ একই লেখক গীতার একটি ফারসী অনুবাদ করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ "অমৃতকুন্ডের" ফারসী অনুবাদ করেন গোয়ালিয়ারের মহম্মদ। সে গ্রন্থের নাম 'বাহরুল হায়াত'। এতে ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় ও দার্শনিক আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়েও বহু মুসলিম সুধী ফারসী ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। একটি পুস্তকের নাম "ইখতিয়ারাতে কাসিমী" অথবা "দাস্তুরাল আতিব্বা।' এ গ্রন্থটি ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ওষুধ বিজ্ঞানের সংগ্রহ। এ গ্রন্থটি তারিখে ফিরিস্তার বিখ্যাত গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত। চরক, সংযোগ, ভোজদেব, সুশ্রুত এবং অপরাপর হিন্দু চিকিৎসকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু মুসলিম চিকিৎসক ফারসীতে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মহম্মদ মোমিন হাসানি একটা পুস্তক লেখেন, তার নাম—"তুহফাতুল মোমিনি"। এতে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাকিম মহম্মদ শরীফ খাঁর পুস্তকের নাম "তালিফে শরীফ"—এটা তিনি দ্বিতীয় শাহ আলামকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থটি ভারতীয় মেটিরিয়া মেডিকার অনুবাদ। এতে আছে ভারতের গাছপালা শিকড়াদির গুণাবলী ও তাদের রোগনাশক শক্তির কথা। ১৮৩৩ সালে কলিকাতায় ডাক্তার জর্জ প্লেফেয়ার এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে পশুচিকিৎসার গ্রন্থও ফারসীতে অনুবাদ হয়েছে। "রিসালায়ে ফারাসনামা"। এর লেখক মহম্মদ আলি হাজেন। অশ্ব চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম "তারজুমানে শালিহোত্তরা"। এটা "শালিহোত্তরা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আহমদ ওয়ালিউল বাহমন এটি অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম ভালবাসার রোমান্টিক কাহিনীগুলি মুসলিম লেখকগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করতেন। তাঁরা এ ধরণের বহু গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করেন।

কাদা

(৫৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

া ডিক্লায়ার—এসো, ভিড়ে পড়ো আমার সঙ্গে। ন্ডার ডিপোজিট—ওগুলো আমি চালিয়ে দেব। রপর একটা ভালো কণ্ট্রাক্ট গাঁথতে পারলে না ক্যাপিটালেই মোটা ক্যাপিটাল তোমার ঘরে লে আসবে। আর এখন তো কেবল কনস্ট্রাকশন, ার কনস্ট্রাকশন, কয়েকটা জুৎসই মুরুব্বি াগাতে পারলে পাঁচ বছর পরে তোমার টাকা খায় হে!

উৎসাহ ঝরে পড়ে রমলার গলায়ঃ আমি তো কে কতদিন বলি সে কথা। তোমার এত সব ালো ভালো বন্ধু আছে, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে রতর করে—তুমি কেবল তোমার কেরাণীগিরি ার বই নিয়েই ডুবে রইলে। একটু উঠে দাঁড়াও—ণ্টা চরিত্তির করো, বুদ্ধি আছে—বিদ্যে াছে—

মনোতোষ ঘাড়ের সেই তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক ন্ত্রণাটাকে আস্বাদন করতে করতে তাকিয়ে থাকে মজের দিকে। নির্মল নিষ্কলঙ্কতার ওপর তগুলো পোড়া ছাই উড়ে বেড়াচ্ছে পাখার াওয়ায়। রমলা এখন এসব দেখেও দেখতে াচ্ছে না। ভাঙা আয়নার কাচে তার বিকৃত ুখটা এখন কল্পনারও বাইরে চলে গেছে নোতোষের। দাঁতে দাঁতে সে চেপে ধরে—নিচের পাটির একটা নড়া দাঁত চিন্‌চিন্‌ করে ওঠে তার।

অশান্ত বলে, আকাশ থেকে তো আর টাকা পড়ে না—নিজের জোরে আদায় করে নিতে হয়। চেষ্টা চাই, ব্রেন চাই। এই নতুন বারো লাখের কন্ট্রাক্টটাই বলছি। দেখলুম কেবল টাকায় হবে না, বোতলেও নয়—লোকটার আরো বেশি খাঁই। হি লাভস্‌ এনিথিং উইথ এ স্কার্ট অন্‌—আর রোজই নতুন নতুন দরকার। বললুম, ও-কে ম্যান, অশান্ত দত্ত রায় তাতেও পিছপা হবে না, সে রাধাকান্ত দত্ত রায়ের ছেলে! দিলুম জুটিয়ে—ওয়েল মনোতোষ? কী হল? মনোতোষ দাঁড়িয়ে পড়েছে তখন। অবরুদ্ধ স্বরে বলে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভাই। অফিসে খবর পেয়েছিলুম পিসিমার অসুখ। তুমি এসেছো বলে খেয়াল ছিল না, কিন্তু একবার দেখা না করে এলেই নয়।

—তাই নাকি? যাও—ঘুরে এসো তা হলে।—আর একটা সিগারেট বের করে অশান্তঃ ডিউটি ইজ ডিউটি। আমার জন্যে ভেবো না—সন্ধ্যেটা অফ করেই বেরিয়েছি, রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিতে পারব। তা ছাড়া—দুটো উগ্র উজ্জ্বল দৃষ্টি রমলার মুখের ওপর ফেলে আচ্ছন্ন গলায় বলেঃ আই হ্যাভ্‌ গট্‌ দি মোস্ট চার্মিং হোস্টেস্‌। আজ সন্ধ্যেয় মিসেস রায়কে যা দেখাচ্ছে সে আর কী বলব!

মনোতোষ শেষ কথাগুলো শুনতে চায় না—শুনতেও পায় না। গলার ভেতরে তার যেন বমি ঠেলে উঠছে। রমলার দিকে না চাইবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে শোবার ঘরের দিকে এগোতে থাকে।

আর তখুনি একটা অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণ স্বর জেগে ওঠে রমলার।

—একা যাবে মানে? পিসিমার অসুখ—আমায় ফেলে যাবে? আমিও যাচ্ছি। অশান্তবাবু, তা হলে আপনি আজ উঠুন। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অশান্ত। সমস্ত ব্যাপারটা তার কেমন আকস্মিক আর নতুন ধরণের মনে হয়।

—তা-তা—আমার তো গাড়ী রয়েছে। আমি বরং গাড়ী করে—

—না, না, আপনি যান। কতক্ষণ বসে থাকবেন? তৈরী হয়ে নিতে দেরী হবে আমার।

কিছুক্ষণ বোকার মতো অশান্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে বলে, আচ্ছা আসি তবে—নমস্কার। চলি হে মনোতোষ—জুতোর শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। মোটর স্টার্ট নেবার আওয়াজ আসে। তেমনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে মনোতোষ।

দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাবে না পিসিমার ওখানে?

মনোতোষ চরম দুর্যোগের জন্যে তৈরি হয়। তাকায় মাথা তুলে। রমলার মুখখানা তখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পায় না—কতগুলো অসংলগ্ন আঁকাবাঁকা রেখার সমষ্টির মতো মনে হয় তার।

—পিসিমার অসুখ নয়। মিথ্যে কথা বলেছিলুম।

—বাঁচালে! তবু বিদায় হল লক্ষ্মীছাড়াটা! কী নোংরা—কী নোংরা! মাগো—যেন গঙ্গাস্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সিগারেটের ছাই ঝেড়েছে মেজের—কাদাশুদ্ধু জুতো নিয়ে ঢুকে ঘরটাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। খুব হয়েছিল আমার—যেচে আপদ এনেছিলুম।
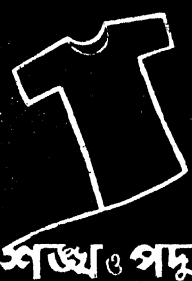
এইবার রমলার মুখ দেখা যায়। সেই বিকেলের নীল রঙ আর নেশা দিয়ে রাঙানো, অশান্তর উগ্র সিগারেটের গন্ধ মিলিয়ে গেছে রজনীগন্ধা, ধূপ আর প্রসাধনের সুরভিতে মদির হয়ে উঠেছে ঘরটা।

মনোতোষের কী যে হয় এক মুহূর্তে—লোভীর মতো এগোতে চায় রমলার দিকে।

রমলা সরে যায়, বলে থামো থামো! খোকা দেখছে যে! তা ছাড়া অনেক কাজ এখন। সারা ঘর ধুয়ে পরিস্কার করতে হবে, ওই চেয়ারটা ভালো করে মুছতে হবে লাইজল দিয়ে। তুমি বরং সেতারটা একটু বাজাও—কাজ করতে করতে আমি শুনি।

চার বৎসর। রমলা নিজে থেকে মনোতোষকে সেতার বাজাতে বললে আজ চার বৎসর পরে।

াব্দুশ্‌ শুকুর বাজামি "পদ্মাবতী" গ্রন্থটি ফারসীতে অনুবাদ করেন। মির আসকরী াকিল খাঁও "পদ্মাবতীর" আর একটি অনুবাদ করেন। এই শেষোক্ত লেখক তাঁর ফারসী অনুবাদের নাম দেন "শামাও পরওয়ানা"। মধুমালতীর গল্পের প্রতিও ফারসী লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এর দুটি ফারসী সংস্করণ আছে। একটি লেখেন নূর মহম্মদ। অপর লেখকের নাম অজ্ঞাত। মহম্মদ কাজিম হোসেনি অনুবাদ করেন কামরূপ ও কামলতার কাহিনী। এটা প্রথমে গদ্যে অনুবাদ করা হয়। পরে মহম্মদ মুরাদ এই গদ্য গ্রন্থটি পদ্যাকারে লেখেন। তখন এর নাম দেওয়া হয় "দস্তুরই হিম্মত"। ১৭২২ সালে ইজ্জাতুল্লাহ "বাকাওয়ালী" গ্রন্থটি ফারসীতে অনুবাদ করেন। ১৭৩২ সালে আমানত নামক একজন লেখক শ্রীকৃষ্ণের কথা নিয়ে একটি ফারসী গ্রন্থ রচনা করেন।

সংস্কৃত ভাষার বিবিধ বিষয় নিয়ে শত শত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। অথচ এ সংবাদ বর্তমান যুগের খুব কম লোকই জানে। মোগল যুগে হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে যে উভয় সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি ও প্রথা প্রবেশ করেছিল, তার প্রধান কারণ সাহিত্য। সাহিত্য মানুষের সঙ্কীর্ণতা দূর করে। হিন্দুরা ফারসী চর্চা ছেড়ে দিল, আর মুসলমানেরা সংস্কৃতকে বর্জন করল। তার ফলে কিছু দিনের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হল। স্বাধীন ভারতে এই ব্যবধান দূর করতে হবে। তার একটি প্রধান পন্থা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ফারসী ও সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করতে হবে।

দুয়ার যদি সে না খোলে
আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

বারে বারে হানি করাঘাত তার দুয়ারেই,
তবুও সে তার দুয়ার তো আজো খোলে না!
অন্ধকারের দেয়াল ঘিরেছে দু'ধারেই—
পেছনে নিষাদ আমার নিশানা ভোলে না।

সম্মুখে তারই রুদ্ধ দুয়ার ভরসা—
কী হবে আমার, দুয়ার যদি সে না খোলে?

সাত সমুদ্র তেরোটি নদীর ওই পারে
সেদিনও আমার সংগী ছিল না যদিও,
তবুও হৃদয় আশা-নিরাশার দুই তারে
বাজতো এবং বাজাতো সাগর-নদীও।

যদিও চোখের আকাশ নামাতো বরষা,
বক্ষের ভয়ে আগুন ছিল না আসলে!

নিদেন-কালের দিনগুলি ছিল ঝরাফুল,
গন্ধ তাদের রোগিণী-চোখের চাউনি,
তবুও তাতেই চমকে উঠেছে মরা কুল
গানের খুঁটিতে তুলেছে বাঁচার ছাউনি।

মনের আবাদী জমিন ছিল না সরসা,
স্বপ্নের ডাক তবুও ফলেছে মাদলে।

এমন দিনেই সে পাঠায় তার আহ্বান
আকাশে আমার ইন্দ্রধনুর চিঠিতে;
নদী ও সাগর ফণা তুলে বলে : সাবধান!
তবু ঝাঁপ দিই পাল্লা বদলের রীতিতে।

তারপর নদী-সাগরের বিষে একেলা
কতকাল ডুবে মরেছি তবুও মরিনি।

কালোমুখ নিয়ে অনেক জ্বালার এই তটে
ভিড়েই দেখেছি সম্মুখে তারই দরজা,
হাওয়ায় তখন বরুণের বাঁশি নেই বটে—
মাঠে-ঘাটে ছিল আলো-ছায়াদের তরজা!

কিন্তু হঠাৎ সুরু হলো কেন এ-খেলা?
এ-দুঃস্বপ্ন কল্পনা কভু করিনি।

অন্ধকারের দেয়াল ঘনালো দু'ধারেই,
পেছনেই এক নিষাদে ধনুক তুলেছে;
বারে বারে হানি করাঘাত তার দুয়ারেই
তবু সাড়া নেই, আমায় কি তবে ভুলেছে?

একি নির্মম খেলা তারই আজ এ-বেলা?
আগেই তাহলে মরেও কেন বা মরিনি!

ব্ল্যাক সুমাত্রার স্বপ্ন

(১৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে বলছি স্যার, বলতে বলতে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সোমা।

রাত নেমেছে গভীর হয়ে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘন অন্ধকারে পোলট্রির বিশাল মাঠ যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সবিতার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিন্তু তখনো ছায়ালোকের অভিশপ্ত একটা মূর্তির মত পেনগুলোর কাছে ঘুর-ঘুর করছে। ইনকিউবিটার ঘরের কাছে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছটার পাতায় পাতায় সাঁ-সাঁ বাতাস কান্নার মত বাজছে।

খট্-খট্-খট্। পোলট্রির নাইট গার্ডদের বুট জুতোর আওয়াজ। ওরা পাহারা দিচ্ছে। শিয়াল কি কুকুর মুরগী নিয়ে যেন পালিয়ে না যায়। যেন কেউ ডিম চুরি না করে!

চুরি! বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সবিতা। মনে পড়ল সেদিনের কথা। সদ্য পাড়া ডিমটা হারিয়ে মা-মুরগীটা উন্মাদের মত মাটি আঁচড়াচ্ছিল। কাঁদছিল। আর সফল শিকারীর মত হিংস্র হাসি হাসছিল নাইট সিফটের ডিম সংগ্রহকারী পাপি। শুধু একদিন নয়। দিনের পর দিন সে দেখেছে ওদের ডিম হারানোর সেই বেদনাকাতর তীব্র যন্ত্রণা। আর তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠেছে। কিন্তু—

আজ বহুদিন পর কেন যেন এই কুয়াশাভরা অন্ধকার শীতার্ত রাত্রিটাকেও বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর মনে হল সবিতার। কেন?

অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে পাঁচ, ছয় সাত, আট, এই চারটি পেনের ব্ল্যাক সুমাত্রা আর ল্যাকেনভেন্ডার জাতের আটটা মুরগীকে তাদের নিজের নিজের পাড়া ডিমের ওপর বসে তা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তারা নিজেদের সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। এইজন্যই কি!

স্মৃতি

(১৫৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আস্তে বেরিয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে।

পরের দিন না বলে চলে আসার শাস্তি স্বরূপ আসতে হলো তাকে। নতুন বরের সঙ্গে আলাপ তাকে করতেই হবে। শুয়েছিল তারা। দরজা খুলিয়ে সকলের সঙ্গে ঢুকতে হলো। স্বপ্না শুয়ে আছে, নির্লিপ্ত সহজ মাথাটা আবার ঘুরে উঠলো পার্থর, সামনের চেয়ারটা তাকে বাঁচিয়ে দিল সুনিশ্চিত পড়ে যাওয়া থেকে।

* * *

স্বপ্না চলে গেছে অনেক দূরে। পার্থ আজও প্রতি সন্ধ্যায় অপেক্ষা করে কার জন্যে।

তারপর গাড়ীটা চালিয়ে দেয় নির্দিষ্ট পথের দিকে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, হাত তুলে প্রণাম করে—আবার এগিয়ে চলে—আজও কি স্বপ্না বেঁচে আছে ঐ রাস্তার মাঝে?

যান্ত্রিক

(১৫৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গেল, সেই গাড়ীকে সবুজ নিশান দেখিয়ে চ'লে যেতে দিয়েছে তার বাবা। ইচ্ছে করলে লাল নিশান দেখিয়ে গাড়ীকে রুখে দিতে পারতো দুখু। তারপর গাড়ীতে উঠে সেপাইটাকে এক লাথি মেরে চুলের মুঠি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে নামিয়ে আনতে পারতো ওই গরবিনী মেয়েটাকে। কেন তা হ'ল না?

মৌসুমি বৃষ্টির মতো তার কান্নার বেগ হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। তার বাবার ক্ষমতার দেমাকটুকু একেবারে মিথ্যে। যে গাড়ীতে বসে টুনকি তার বাবার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল, সে গাড়ীকে রুখে দেবার ক্ষমতা তার বাবার নেই।

টুনকিকে এ সংসারে সে চায়নি। কিন্তু মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে দুখু অন্তত একবার এখানে এনে আছড়ে ফেলুক, এটুকু সে চেয়েছিল।

ঘরের মেঝেতে পড়ে সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল চাঁদমণি।

বিভোর হয়ে কতক্ষণ বসে যে সে ভাবছে খেয়াল নেই। হঠাৎ চমক ভাঙলো দুখুর গলার সাড়া পেয়ে। দুখু এসে বসে পড়লে দাওয়ার একপাশে। তাড়ির গন্ধে ভরে উঠলো বাতাস।

চাঁদমণি উঠে দাঁড়ালে। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ফুলগাছগুলোর দিকে। তারপর একটা একটা ক'রে গাছগুলো উপড়ে ফেলে দিতে লাগলো। দুখু প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। নেশার ঘোরে ঘোলাটে চোখে একটু তাকিয়ে থেকে তারপর টলতে টলতে উঠে এসে জড়িত স্বরে বললে, ফুল গুলান্ ফেলাই' দিচ্ছিস কেনে রে?

চাঁদমণি মৃদুস্বরে জবাব দিলে, তু লতুন চারা এন্যা দিস। ইগুলান পুরানা হই গেঁইছে।

দুখু হা হা করে খানিকটা হেসে বললে, ঠিক করেছিস। ই চারা গুলান্ দেওয়া করেছিল সি শালা সেপাইটো।

চোখের কোণ জলে ভরে এলো চাঁদমণির। অন্ধকারে দুখু তা দেখতে পেলে না।

চাঁদমণি শেষ গাছটা উপড়ে ফেলে দিয়ে বললে, কাল থেক্যা গাড়ীর লেট হ'লে গাড়োয়ানগুলানকে ছেড়্যা দিস্ বাবা। অরা ভালো লোক নাই।

দুঃস্থ দুঃখী তোমার করুণা
কেউ যদি চেয়ে থাকে
যেটুকু সাধ্য দিও সান্ত্বনা,
বিমুখ করনা তাকে।
যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করে
কর না কখনো দান,
প্রকৃত দাতাই বিচার শূন্য—
আর সব করে ভান।

শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি (মায়া বসু)

স্বপনবুড়োর চিঠি

গল্প-ছড়ার সাতটা ডিঙি ভসিয়ে দিলাম জলে,
সকাল-সাঁঝে চল্লো ভেসে, চল্লো কুতুহলে।
ভোরের রবি চোখ মেলে চায়
বন-ময়ূরী পেখম ছড়ায়
দুইটি তীরে কাশের বনে দোলায় পাখা ছলে ॥

পূবের হাওয়া উল্লাসেতে ওড়ায় ডিঙির পাল,
সুনীল ঢেউয়ে সোনালী মাছ রাখছে সাথে তাল।
জাগল পুলক শিশুর মেলায়
শারদীয়ায় সুরের ভেলায়
শেষ মোহানায় থামবে ডিঙি তাইত' সোজা চলে ॥

ছোটদের পাততাড়ি,
যুগান্তর ॥
১৩৬৮ ॥

শুভার্থী
স্বপনবুড়ো

দুটি ভাই

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই

আলপনা : শিল্পী: লাহিড়ী
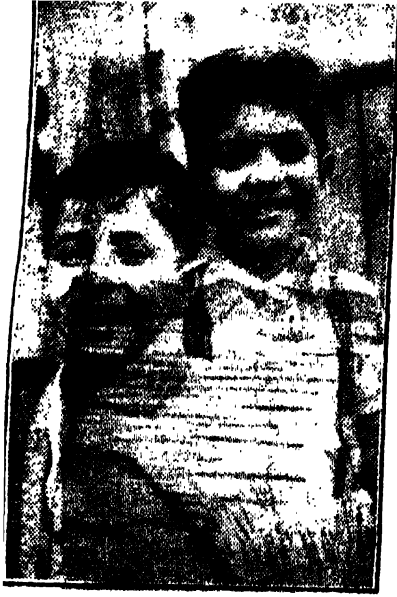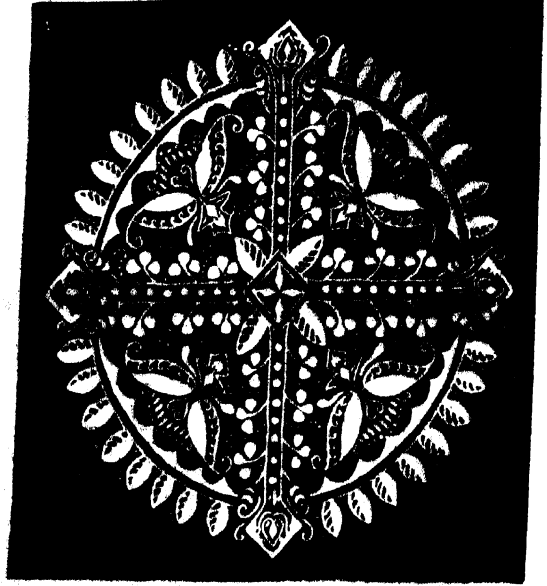
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে। আলোকচিত্র : প্রদীপ্তনারায়ণ চক্রবর্তী

ছবি ঃ— কাফী খাঁ ঃঃ ছড়া— হিরেন ঘটক

পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে
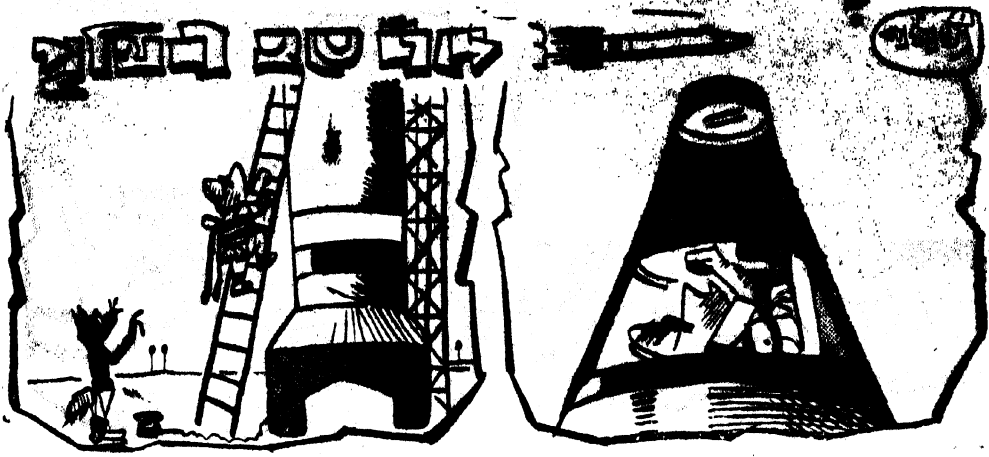
টপাটপ্ উঠে পড়ো সোজা এই রকেটে,
নোটবই পেন্সিল থাকে যেন পকেটে।

মোর এই 'ক্যাবিনের' সবকিছু 'ও-কে' যে,
ছাড়বার অনুমতি দিনু তাই তোকে যে।
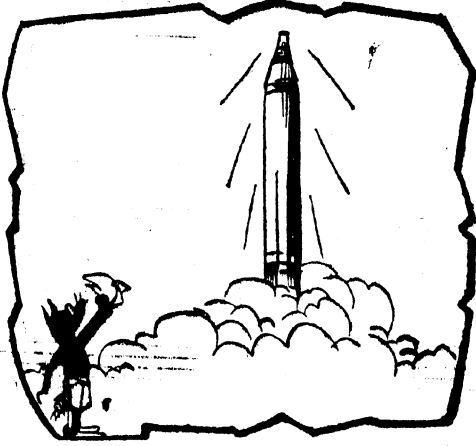
চাঁদলোক জয় ক'রে এসো, খুড়ো—বাই ! বাই !
ঘুরে ঘুরে ওদেশের নানা ছবি আনা চাই।
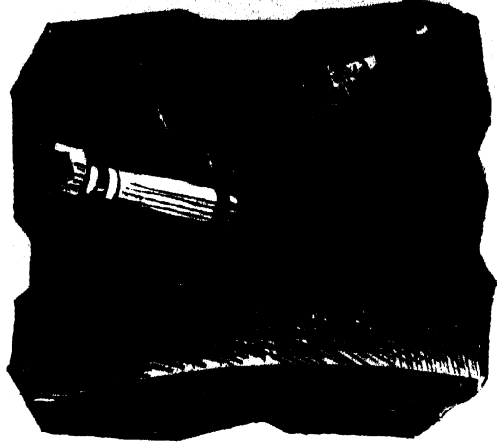
এই মহাশূন্যের আহা মরি শোভা যে,
দেখে দেখে বিলকুল ব'নে গেছি বোবা যে।
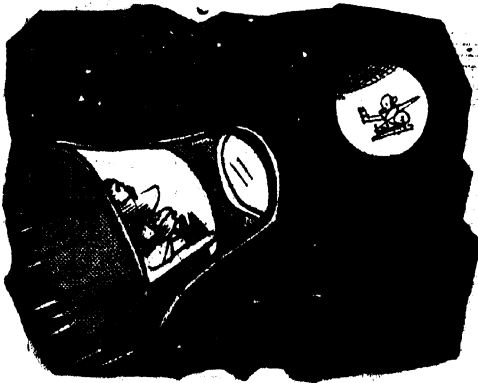
ঘড়্ ঘড়্ চরকার শুনি মিঠা তাল যে
চাঁদ-বুড়ি সুতো কাটে ব'সে চিরকাল যে।
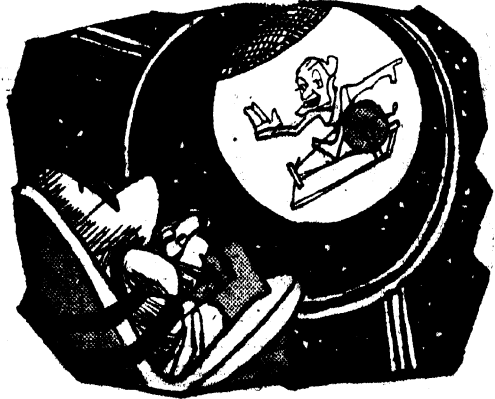
কোথা থেকে এলে তুমি, পৃথিবীর প্রাণী কি ?
চাঁদলোক ঘুরি যদি হবে কোন হানি কি !

গিরি গুহা গহ্বর সারা চাঁদময় যে,
মর্ত্যের মত এটা মনোরম নয় যে।

ফের আমি ফিরে এনু চাঁদ থেকে বেরিয়ে
পৃথিবীর পরিবেশে, মহাকাশ পেরিয়ে।
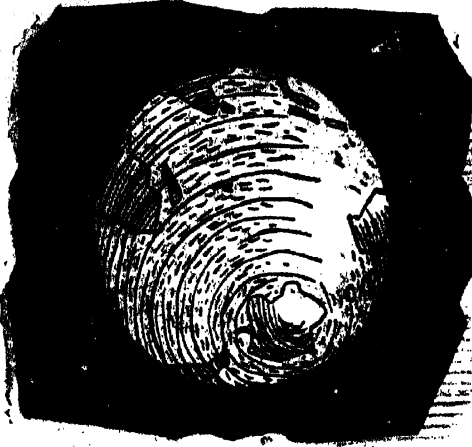
দিয়ে কটা চক্কর আপনার কক্ষে—
সোঁ সোঁ ক'রে নেমে যাবো পৃথিবীর বক্ষে।

বুকে ফিরে এনু তোর হে মাতগঙ্গে,
এই প্ল্যান-ই হয়েছিলো শেয়ালের সঙ্গে।
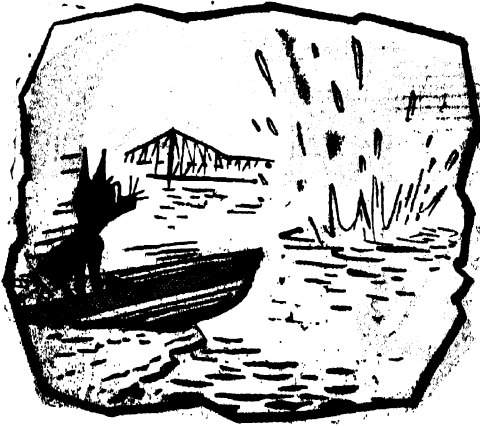
সাবাস! সাবাস! খুড়ো কী যে তুমি দক্ষ।
টিটভ, কি গাগারিণ নয় সমকক্ষ।

চাঁদে যদি কোন প্রাণী চায় কেহ নামাতে,
দিনমাত্র হবে তাকে মাথা বহু ঘামাতে।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

মিটুয়া

দাদুরে মনে করে
লিখেছ এ চিঠি
তাই ভাবি দাদুতেও
আছে কিছু মিষ্টি।
সেটা কি অহৈতুকী প্রীতি,
অথবা চকোলেটের স্মৃতি?
এ কথাটার সম্বন্ধে
নয় খুব সোজা,
হয় তো বছর কয়
যাবে নাকো বোঝা —
তবু যদি এ লিখে নাও তাতে ক্ষতি নেই
সংক্ষেপে এই —
ভিতরে এনেছ তুমি বিধাতার চিনি
আমি যে বাহির হতে বাজারের কিনি।

[illegible] দাদু

মনু হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানস-পুত্র, আর মনুই হলেন মানবজাতির আদি পুরুষ। মনুর জন্ম হল কি করে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি—এই চার যুগে ব্রহ্মার হল একদিন। আর ঐ এক ব্রহ্ম-দিবসে চতুর্দশ মনুর হল জন্ম। চতুর্দশ মনুর নাম—স্বায়ম্ভুব স্বরোচিষ, ঔত্তমী, বৈবস্বত ইত্যাদি। ব্রহ্মার দেহ থেকে জন্ম বলে নাম হল স্বায়ম্ভুব। এ'দের ভেতর বৈবস্বত মনুর গল্পটি বেশ চমৎকার।

বৈবস্বত মনু দশ হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহাতপস্বী। একদিন তিনি নদীতে স্নান করছেন, এমন সময় ছোট্ট একটি মাছ এসে বললো,—'প্রভু, বলবান মাছেরা আমায় খেয়ে ফেলবে। আমায় রক্ষা করুন।' এই শুনে, ইনি মাছটিকে নিয়ে এক জালার মধ্যে রাখলেন: জালার মধ্যে রাখতেই মাছটা বড় হল। তখন তাকে এক জলাশয়ের মধ্যে রাখলেন। জলাশয়ে রাখতে আরো বড় হল। তখন তাকে এক বড় নদীতে ফেলে দিলেন। সেখানে সে আরো প্রকাণ্ড বড় হল। তখন তাকে সমুদ্রের জলে ফেললেন। এই মৎস্যটি একদিন এ'কে বলছে,—'আপনি আমায় রক্ষা করেছেন—আমার রক্ষাকর্তা। এখন প্রলয়কাল উপস্থিত। সব জলে ডুবে যাবে—কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। এক কাজ করুন আপনি। সুদৃঢ় এক নৌকা তৈরী করিয়ে সপ্তর্ষিদের নিয়ে সেই নৌকায় আপনি উঠবেন। উঠে অপেক্ষা করতে থাকবেন। আমায় তখন স্মরণ করলেই আমি দুটি শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার কাছে উপস্থিত হব। আপনি তখন আমার শৃঙ্গে দড়ি বাঁধবেন। আমি নৌকা টেনে নিয়ে যাব।'

তাই হল। এই মনু সপ্তর্ষিদের নিয়ে এক নৌকায় উঠলেন। মাছকে স্মরণ করতেই সে এসে উপস্থিত। তার দুটি শৃঙ্গে দড়ি বাঁধতেই সে খুব দ্রুতবেগে নৌকা নিয়ে চললো। সমস্ত পৃথিবী তখন জলে ডুবে জলময় হয়ে গেছে। নৌকা দ্রুতবেগে চলতে-চলতে বহুদিন পরে হিমালয় পর্বতের নিকট গেল। মৎস্যটির উপদেশ মতো মনু তখন পর্বত শৃঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গের নাম হল—'নৌবন্ধন'। তারপর?

তারপর মৎস্য নিজের পরিচয় দিয়ে বললো,—'আমি হলুম ব্রহ্মা। তোমাদের ভয়মুক্ত করবার জন্যই আমার এই মৎস্যরূপ আর এই খেলা। এখন তুমি এই পৃথিবীতে সৃষ্টির কাজ করতে থাক।' এই বলে মৎস্যটি অন্তর্হিত হল।

মনু আবার তপস্যায় বসলেন। আর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। যেমন—মানুষ, জীব-জন্তু, স্থাবর, জংগম ইত্যাদি। মনুর সৃষ্ট বলেই মানুষের নাম মানব।

।। এক ।।

বাবা, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ দেখতে যাব। সাত বছরের মেয়ে জবহরের এ-কথায় বিস্মিত হলেন জয়ৎ সিংহ বুন্দির রাজা। কন্যাকে হাসিয়া বলিলেন, "সে ত হয় না মা!" "কেন হয় না বাবা? আমি যে রাঠোরের রাজার কন্যা। রাঠোর বংশে আমার জন্ম। আমি শুনেছি চারণদের মুখে বীরগাথা, শুনেছি 'রামায়ণ', 'মহাভারতের' রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরতের কাহিনী, দশানন রাবণ বধের কথা, শুনেছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ বীরদের কথা, শুনেছি বাবা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিচিত্র বীরত্ব বিবরণ, সেখানে ধরেন নি কি ক্ষত্রিয়া মহিলারা তীরধনু? বাবা মনে করে দেখ, অর্জুন মহিষী সুভদ্রার ও অভিমন্যুর বীরত্ববার্তা। তাঁরা যদি পারেন যুদ্ধ করতে তবে আমি কেন পারবো না?" বিস্মিত হলেন রাণা, নীরবে গম্ভীরভাবে শুনিলেন সব কথা। নিষেধ করিলেন বারবার।

এমন সময়ে দরবারে ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। রাজ্যের প্রান্তে ছিল ভীলদের দেশ। দেশটি বড় মনোরম। চারিদিক বেড়িয়া ছিল নিবিড় ঘন কৃষ্ণকায় গিরি, কোথাও বা ধূসরকায় গিরিশ্রেণী। এই সব পর্বতচূড়ায়, উপত্যকায় ও অধিত্যকায় ছিল শ্রেণীবদ্ধ ভীল পল্লী। শান্তিতে তাহারা বাস করিত। কোন অশান্তি ছিল না। ছেলে-মেয়েরা মাঠে মাঠে পাহাড়ের গায় গায় উর্বর শ্যামল বনানী বেষ্টিত পথে চরাইত গো-মেষ-মহিষ—স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি ছিল তাহারা, বীরত্বের আদর্শ ছিল তাহারা; রাজার সাথে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে কাটিত তাহাদের দিন।—চিরদিন ত সমানভাবে যায় না। এমন সময় ঘটিল এক বিপদ। দূরে নিকটে বাস করিত গুর্জরের সুলতান বাহাদুর শাহার একদল বিজাতীয় দস্যু সর্দারের দল, তাহারা প্রায়ই অতর্কিত-ভাবে আসিয়া ভীল পল্লীতে, ভীল নগরীতে করিত অত্যাচার। গোরু-মহিষ অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। নিশীথের ঘনঘোর অন্ধকারে আসিয়া নিরীহ ভীল পল্লীতে দিত অগ্নি জ্বালাইয়া। ভীলেরা ইহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহারা বার বার এই অত্যাচারে নির্যাতিত হইয়া দলে দলে লাঠি, বল্লম, তীরধনু হাতে আসিল রাজধানী, রাজ-দরবারে—শত শত ভীল সর্দারদের ঐক্যবদ্ধ ভাব দেখিয়া রাণা জয়ৎ সিংহ হইলেন বিস্মিত! রাজা বলিলেন ভীল সর্দারদের—সর্দার কি হয়েছে? কেন তোমরা এসেছ আমার কাছে?

সর্দার বলিল—রাজা তু' আমাদের বাঁচা। রক্ষা কর ডাকাত দস্যুদের হাত থেকে। সব কাহিনী, অত্যাচার নিপীড়নের কথা—বিদেশী দস্যুদের কাহিনী সে বলিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভীল

সর্দার, ছোট-বড় লোকজন সকলে মিলিতকণ্ঠে বলিল—রাজা তুই আমাদের বাঁচা।

জয়ৎ সিংহ বলিলেন—মলুক সর্দার, কোন ভয় নেই আমি আছি তোদের রক্ষাকর্তা—চল্ আমি তোদের সাথে যাব। আনন্দে মহা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো ভীলগণ—জয় রাণার জয়, জয় একলিঙ্গ মহাদেও কি জয়, চণ্ডী মাই কি জয়! ওরে সব নাচরে, রাজা তুই যাবি আমাদের সাথে—আয়রে সব নেচে নেই, রাজা যাবে লড়তে আমাদের সাথে—বল জয় জয় জয়।

সে মুহূর্তে সেখানে ছিল বালিকা জবহর বাই। সে মধুরকণ্ঠে বললো—পিতাজী! ভীল দাদাদের সঙ্গে আমিও যুদ্ধ করতে যাব।

মলুক বলিল, রাণাজী বেটি কি বোলে?

রাণা হাসিয়া বলিলেন—ও তোদের সাথে লড়াই করতে যাবে। বলিস কি রে! জয় চণ্ডী মাই, জয় কালী মাই। তারা আনন্দে জবহর বাইকে ঘিরিয়া বর্শা, তরোয়াল, লাঠি ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।—বিস্মিত হইলেন রাণা। জবহর বাইয়ের নয়নে জ্বলিতেছিল কালী-করালবদনী জননীর তীব্রদীপ্তি।

পিতার সাথে সৈন্যদলের সাথে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিল বালিকা জবহর বাই—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে। বাজিয়া উঠিল রণডঙ্কা, বাজিল রণদামামা। মিলিত শক্তির ভীষণ আক্রমণে দস্যুদল হইল পরাজিত, অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া ভীতচকিতভাবে মরুভূমির ঊষর প্রান্তর দিয়া বালিয়াড়ী স্তূপ ভেদ করিয়া ধূলির ঝড় তুলিয়া তাহারা পলাইতে লাগিল। ভীল ও রাঠোর সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীরধনুর মারে কেহ কেহ প্রাণ দিল—দূরে দিগন্তে তপ্ত মরুভূমির অন্তরালে হইল অদৃশ্য। জয় জয় রবে কন্যাসহ সৈন্যগণের উন্মত্ত জয়ধ্বনিতে প্রফুল্লচিত্তে রাণা ফিরিলেন রাজধানীতে। আদরে কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"মা, তুই আমার চণ্ডী মায়ী।" বিভিন্ন ভীল দল সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করায় শত্রুরা হইয়াছিল পরাজিত। যেখানে ঐক্য সেখানেই বিজয়।

।। দুই ।।

পবিত্র শিশোদীয় বংশের রাজা ছিলেন বিক্রমজিৎ। চিতোরের রাণা বংশে গৌরবে খ্যাতিমান ছিলেন বিক্রমজিৎ। জয়ৎ সিংহ শিশোদীয় বংশের গৌরব চিতোরের রাণা বিক্রমজিতের সঙ্গে জবহর বাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই রাঠোর রাজকুমারীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। বীরবালা চিতোরের মেবারের শৌর্য-বীর্যশালী বীরবংশে পরিণীতা হইলেন।

বিক্রমজিৎ ছিলেন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ, গৌরকান্তি শ্রীসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল যে, তিনি ছিলেন চঞ্চলচিত্ত এবং অব্যবস্থিত চিত্তের লোক। তিনি ছিলেন খেয়ালী, রাজ্য শাসন সংরক্ষণে ছিলেন উদাসীন। নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই মনে করিতেন সবচেয়ে উত্তম। এইরূপ রাজার সহিত ন্যায়নিষ্ঠ, বিচারদক্ষ, বিচক্ষণ মন্ত্রী, সেনাপতির হইল মতানৈক্য। বিক্রমজিৎ দূরদর্শী মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কথা অবহেলা করিলেন। মন্ত্রী পরিষদের সকলে হইলেন বিদ্রোহী—রাজ্যে দেখা দিল অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তি।—চিতোর ছিল সে সময়ে রাজপুতানার মধ্যে বৃহৎ ও সুন্দর নগরী—দুর্গ, প্রাচীর, স্তম্ভ, সরিৎ ও দীর্ঘ দেওয়াল ঘেরা উচ্চ পর্বতের উপর অধিষ্ঠিত নয়নমনোহর শ্যামল বনশ্রেণী বেষ্টিত। দূরে নিকটে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী, ধূসর ও শ্যাম-সবুজ শোভায় শোভাময়। গিরি নদী কুলুকুলু রবে স্বাধীনতার পবিত্রবাণী প্রচার করিয়া ছুটিতেছিল প্রান্তরে প্রান্তরে পল্লীতে পল্লীতে! রাজস্থান, পুণ্য-পবিত্রস্থান, দেশ দেশ নন্দিত স্বাধীন দেশ রাজস্থান। বিক্রমজিৎ ছিলেন এই পুণ্যভূমি মেবার ও চিতোরের নরপতি।

দৈব বিড়ম্বনা। মেবারের রাষ্ট্রনেতা সর্দারদের সহিত কলহ ও মতানৈক্যের ফলে, বিক্রমজিৎ চিতোর ত্যাগ করিয়া আসিয়া বুন্দিপ্রদেশে, লৈবা নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ে ঘেরা ক্ষুদ্র প্রদেশে। মেবার পড়িয়া রহিল—রাজাহীন অরাজক দেশ। এসময়ে গুর্জর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন বাহাদুরশাহ তুর্কী। কৌশলী বীর যোদ্ধা, নির্ভীক এবং জয়াকাঙ্ক্ষী বিদেশী মুসলমান সুলতান। মেবারের এই অবস্থা, পরিত্যক্ত রাণাহীন রাজধানী ও পরস্পরের কলহ বিদ্বেষের কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না কৌশলীচক্রী বাহাদুরশাহ তুর্কীর। তিনি সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। তুর্কী সৈন্য 'আল্লাহো আকবর' রবে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বীরবেগে অশ্বের খট্‌খট্ শব্দ করিতে করিতে, বর্শা তরবারি ঊর্ধ্বে সূর্যালোকে প্রদীপ্ত করিয়া প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করিল, সেই স্বল্প লোকের অধ্যুষিত বিক্রমজিতের আশ্রয়স্থান, বুন্দী লৈবা। লৈবার সুন্দর গিরিপ্রদেশে ধ্বনিত হইল রণদুন্দুভি। লৈবা রক্ষা পাইল না—বাহাদুরশাহের হাতে পড়িল। উঠিল দুর্গ শিখরে অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত মোস্লেম পতাকা। এ দুঃসংবাদ অতি অল্প সময়েই পৌঁছিল চিতোরে। সেখানে এই পরাজয়ের কথা রাণার ভীরুতার কথা তাহাদের প্রাণে জাগাইয়া দিল অপমানের তীব্র দাহন। সাজ সাজ রবে চিতোরের গিরি প্রান্তরে আরাবল্লীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাজিয়া উঠিল রণবাদ্য ভীষণ উদ্যমে।

।। তিন ।।

রাজপুতেরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে সাজিলেন রণসাজে। হিন্দুর বীরত্ব খ্যাতি মেবার-চিতোরের ঐশ্বর্য বীর্যের কথা কে ভুলিতে পারে? রাণী জবহর বাই শুনিলেন সব কথা। ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল তাঁহার কণ্ঠ। সাজিলেন তিনি বীরাঙ্গনা বেশে। সমর-রণনিপুণা দেবী চণ্ডিকার মত ধরিলেন তরবারি-বর্ম-বর্শা। আহ্বান করিলেন নারীগণকে—চল সকলে অচল-অটলভাবে, চল সব রাজপুত নারী শত্রু দমনে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ আহ্বানে তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধারা পর্যন্ত রণসাজে বীরাঙ্গনা বেশে সাজিল।

রাজপুত বীরেরা সাজিল তুরঙ্গম পৃষ্ঠে। জয় দেবাদিদেব একলিঙ্গ দেবের জয়। রাণা পরাজিত বন্দী। চিতোর হইতে দূরে বাহাদুরশাহের সৈন্য দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত সে নগর। বীরনারী জবহর বাইকে চিতোরে রাখিয়াই রাণা পলায়ন করেন। বিচিত্র এ ব্যবস্থা।

রাণী বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাজপুত নারীদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর আক্রমণ বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃপাণ ধরিলেন।

এদিকে বাহাদুরশাহের সেনাপতি লারিখাঁ তুর্কী সৈন্যসহ আসিয়া চিতোর দুর্গে আক্রমণ করিলেন। গুড়ুম্ গুড়ুম্ রবে গর্জিয়া উঠিল বারুদের সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্র। চিতোর দুর্গের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল দুরুম দুরুম দুম্ দুম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে।

বীরাঙ্গনা জবহর বাই রণ জয় গাহিতে গাহিতে শত্রু সৈন্যদল বিধ্বস্ত করিতেছিলেন—তাঁহার সহচরীরা অসাধারণ বিক্রমে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করিতেছিল, রাজপুত বীরেরা দেখাইতেছেন অসাধারণ বীরত্ব।

সহসা একটি রক্তিমবর্ণ ভীষণ গোলা আসিয়া দুর্গপ্রাকারে দণ্ডায়মানা জবহর বাইয়ের উপর পড়িল। সেই ভীষণ গোলাঘাতে জবহর বাই হারাইলেন প্রাণ! রাজপুত মহিলারা নিরাশ হইলেন না তবু, তাঁহারা মহাবিক্রমে পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া শত্রুদের নিধন করিতে লাগিলেন। এ যুদ্ধের ফলে লারিখাঁ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও চিতোরের নরনারী জবহর বাইয়ের বীরত্ব

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ক্যাবলার ছোট ভাই ভ্যাবলা। বিদ্যা-বুদ্ধিতে দু-ভাই-ই ঢুঢু ভ্যাবারাম! তার উপর ক্যাবলা কানে শোনে কম, আর ভ্যাবলা চোখে ভালো দেখে না।

বামুনের ছেলে তারা। বাপের সাথে দু-ভাই কি বছরে শিষ্য বাড়ীতে যায়। এবারে বাপ নিজে যেতে পারলেন না, শিষ্যদের কাছে পাঠালেন দু-ছেলেকে।

রাত ভোর হ'তেই ক্যাবলা আর ভ্যাবলা কপালে তিলক কেটে, কাঁধে নামাবলী ফেলে, গলায় পৈতা পেটের উপর ঝুলিয়ে শিষ্য-বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

যাওয়ার পথে তারা দেখে এক বুড়ো তাঁর ঘরের দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। সকালবেলা দুজন বামুনের ছেলেকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে কপালে হাত ছুঁইয়ে বুড়ো ব'লে উঠলেন—'প্রাতঃ-প্রণাম!'

বুড়োর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে দু-ভাই এগিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়েই ভ্যাবলা বলল,—'হ্যাঁ, দাদা, ঐ যে শুনলুম কার কথা—প্রাতঃ-প্রণাম—, তা কি আমাদেরই বলা হয়েছিল?'

ক্যাবলা বলল—'আমাদের ছাড়া বলা হয়েছিল আর কাকে? পথে তো আর কেউ ছিলও না। আর, দেখিসনি, আমাদের দিকে চেয়েই কপালে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করেছিলেন?'

ভ্যাবলা বলল,— 'কিন্তু আমরা তো দুজন, শুনলুম একবারই শুধু প্রাতঃ-প্রণামের কথা। তা হ'লে প্রণাম তো করা হয়েছিল আমাদের একজনকেই।—কাকে?—তোমাকে, না আমাকে?'

ক্যাবলা বলল—'আমি তো দেখলুম আমার দিকেই চেয়ে তাঁকে হাত জোড় ক'রে কপালে ছোঁয়াতে। মুখে কিছু ব'লে থাকলে, তাও আমাকেই বলা হয়েছিল। আমি তো তোর বড়, আমাকে ছেড়ে বলতে যাবেন কি তোকে?'

ভ্যাবলা ব'লে উঠল—'ধ্যেৎ! লোকটি তোমার দিকে চাইলেন কখন? দেখলুম মুখ তুলে আমার দিকেই চাইতে। প্রাতঃ-প্রণামও তাই বলেছিলেন আমাকেই। আমি তো চলছিলুমও তোমার আগে আগেই।'

—'আগে চলছিলি ব'লেই কি প্রণামটাও তোকেই করা হ'লো?'—ক্যাবলা মুখ ভেংচিয়ে জবাব দিল। তারপর আবার বলল,—'ও'রা সাবেকী লোক রে, বড়-ছোটর বিচার ক'রেই কাজ করেন। বড় ভাইকে সামনে দেখলে ছোট-ভাইকে কি কেউ প্রণাম করতে যায়?'

ভ্যাবলা দাদার এ যুক্তি মানতে রাজী নয়। পথের মাঝে দাঁড়িয়েই তাই দু-ভাইয়ের তর্ক চলল। ভ্যাবলা বলে—প্রণাম করা হয়েছে তাকেই। ক্যাবলা বলে—কখখনো নয়। ছোট ভাইকে প্রণাম করে কেউ বড় ভাইয়ের আগে?

তর্কাতর্কির মীমাংসা হচ্ছে না দেখে শেষে দুজনে ঠিক করল—সেই বুড়োর কাছেই ফিরে যাওয়া যাক। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কার কথা ঠিক।

দু-ভাই ফিরে গিয়ে বুড়োকে তাদের কথা বলতেই তিনি অবাক হ'য়ে তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাদের দেখে বুঝতেও তাঁর দেরী হ'লো না দুটি ভাই-ই গোবর গণেশ, মগজে তাদের রামছাগলের বাসা। কিন্তু বামুনের ছেলে তারা, তাদের মুখের উপর কি বলা চলে—তোমরা দুটি রামছাগল! তাদের তর্কের মীমাংসা করতে গিয়ে বুড়োকে তাই মোলায়েম ক'রে বলতে হলো—'এক জনাই হো'ন আর দুজনাই হোন, আপনাদের মত লম্বকর্ণ থাকতে আমি প্রণাম করেছি কি অন্য কাউকে?'

লম্বকর্ণ কথাটা ভ্যাবলা ঠিকই শুনতে পেলো। কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারল না। ক্যাবলা কানে খাটো, সে লম্বকর্ণকে শুনল লম্ফকর্ণ। সংগে সংগে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ছোট ভাইয়ের কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে সে বলতে লাগল—'শুনলি তো, ভ্যাবলা, আর বুঝলিও তো এবার, আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা। আর, দেখেছিস, লোকটা কি গুণী, জ্যোতিষ শাস্তরটাও নিশ্চয়ই ও'র ভালো জানা আছে। নইলে, কি ক'রে জানলেন সেবার পাড়ার থিয়েটারে আমি কর্ণ সেজেছিলাম; তখন অর্জুনকে মারার জন্য আমাকে লম্ফঝম্পও মারতে হয়েছিল অনেক। সেইজন্যই লম্ফকর্ণের কথা বলে জানিয়ে দিলেন লম্ফকর্ণকেই প্রণাম করে-ছিলেন তিনি। সেই লম্ফকর্ণ কে, এতক্ষণে বুঝলি তো?'—ভ্যাবলাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েই ক্যাবলা হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিন্তু দাদা যে লম্বকর্ণকে লম্ফকর্ণ শুনে বাহাদুরী নিতে চায়, ভ্যাবলা তা মেনে নেবে কেন? দাদার পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে শুধু ভাবতে লাগল—লম্বকর্ণ কথাটার মানে কি? ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল কর্ণ মানে কান। আর লম্ব—কথাটারও সে মানে করল লম্বা। দুয়ে মিলিয়ে তা হ'লেই হ'লো লম্বাকান, অর্থাৎ কান যার লম্বা কিংবা কানকে যে লম্বা করেছে। সে তখন লম্বকর্ণের মানে বুঝতে পেরে ক্যাবলাকে বলল—'দাদা, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। তুমিই তো বলেছ—লোকটা গুণী আর জ্যোতিষবিদ্যায় পণ্ডিত। আমিও দেখলুম সত্যিই তাই। সেই জন্যই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমরা যখন সীতা হরণ পালা থিয়েটার করি তখন আমিই সেজেছিলুম সুর্পণখা; আর লক্ষ্মণ যখন আমার নাক-কান কাটে তখন তাড়াতাড়িতে নাক কাটার সময়ে সুযোগ না পেলেও, কান কাটার বেলায় একটু সময় পেয়ে আমি দু-হাতে দু-কান লম্বা ক'রে টেনে ধরেছিলুম যাতে দৃশ্যটা সকলে স্পষ্ট দেখতে পায়। সেই ব্যাপারটা জেনেই আমাকে বলেছেন লম্বকর্ণ।'

ভ্যাবলার মুখের লম্বকর্ণ কথাটা ক্যাবলা আগেরই মত শুনল লম্ফকর্ণ। সে চ'টে উঠে জবাব দিল—'তোর খুসীমত লম্ফকর্ণের অর্থ হবে নাকি? এমন নামজাদা বীর কর্ণকে ছেড়ে তোর কথারই তার অর্থ হ'য়ে গেল অন্য কিছু?

এবারেও লম্ফকর্ণ আর লম্বকর্ণ শব্দ নিয়ে দু-ভাইয়ের তর্ক বেধে গেল। কেউ-ই হার মানতে চায় না। তখন আবার দু'জনে ফিরে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠার ২য় কলমে)

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মর্তা গৌরবের' সহিত গাহিয়া থাকে—মরিয়াও মরিলেন না জবহর বাই:—

ধন্য তুমি বীরাঙ্গনা, চিতোরের গরবিণী
রাঠোর রমণী আর চিতোরের রাণী।
রতশেষে বীর্যবতী রেখে গেল বীরকীর্তি
সূর্যবংশে রবে গাথা নাম যশ চিরদিনি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্বপনবুড়ো,
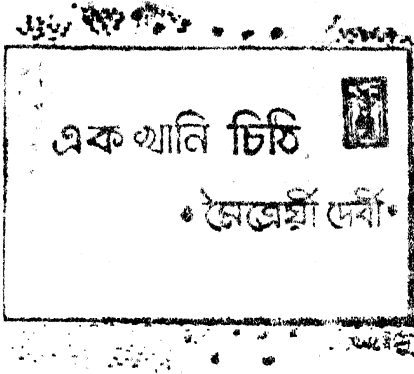
আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমার কন্যা মধুশ্রীকে (মিন্টু) লেখা কবির এই কবিতাপত্র পাঠালাম। এই চিঠিখানি যখন লেখা হয় তখন তাহার বয়স ছিল তিন। আপনার কথামত সেই সময়ে কবির সংগে তোলা তার একখানি ছবিও পাঠালাম।

কবিতা পত্রটির মধ্যে শিশু মধুশ্রীকে (যাকে রবীন্দ্রনাথ মিঠুয়া বলে ডাকতেন) একটি প্রশ্ন আছে—'এটা কি অহৈতুকী প্রীতি অথবা চকোলেটের স্মৃতি?" এই প্রসংগে বলছি, কবির লেখবার টেবিলের উপর বা হাতের কাছে সেলফের উপর সর্বদাই নানা রকম বোতলে টফি চকোলেট প্রভৃতি নানাবিধ বাল-মনোহারী সুখাদ্য থাকত। লেখার মাঝে মাঝে যেমন বড়দের সংগে হাস্য পরিহাসে তার কাজের বিঘ্ন বোধ করতেন না—যত বড় কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন, ক্ষণে ক্ষণে মানুষের সংগ তাঁর প্রয়োজন হত; তেমনি শিশুর উৎপাতও আহ্বান করে আনবার জন্য হাতের কাছেই রাখতেন লোভনীয় সুখাদ্য। বাঁশীর তানে মোহিত হবার সময় যাদের হয়নি তাদের জন্য যথোপযুক্ত প্রাকটিক্যাল উপায় অবলম্বন করতেন মহাকবি। ঐ সব সুখাদ্যগুলির মধ্যে একটি জিনিস ছিল যা আর কোথাও কখনো দেখিনি—চীনা শুকনো লিচু। চীন-দেশে ঐ লিচুর কিসমিস তৈরী হয়। খোসা শুদ্ধ লিচুটির মধ্যে ফলটি শুকিয়ে থাকে। কাগজের বাক্সে প্যাক হয়ে সেই খোসা শুদ্ধই শুকনো লিচু এদেশে আসে—ঐ শুকনো লিচু খুব সুস্বাদু। আমার এই মন্তব্য থেকে অবশ্যই অনুমান করবেন, কবির টেবিলে ছোটদের জন্য যা সাজান থাকত যারা অহৈতুকী প্রীতির কারবার করতে শিখেছে সেই বড়রাও উপরি পাওনা হিসাবে মুষ্টি ভিক্ষা পেয়ে যেত। জানি না সেই চৈনিক লিচু কোথাও পাওয়া যায় কিনা? তাহলে আপনার আসরের ভাই-বোন, যাদের সংগে আপনার অহৈতুকী প্রীতির কারবার, তাদের একবার খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এ রকম হেতুর সাহায্যে প্রীতি আরো কতটা বেড়ে যেতে পারে।

নমস্কারান্তে—

ইতি

মৈত্রেয়ী দেবী

২।৯।৬১

১৩।১, পাম এভিনিউ
কলিকাতা—১৯

(তুর্কি রূপকথা)

এক গরীব ঝুড়িওয়ালা ঘরে বসে ঝুড়ি, চুবড়ি তৈরী করে করে বাজারে বেচে যে পয়সা পায়, তাতেই তার কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে। একা মানুষ—ঘরে বৌ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, আছে শুধু একটি পোষা বেড়াল।

একদিন বাজারে ঝুড়ি-চুবড়ি বেচে সে ঘরে ফিরছে, দেখে পথে কতকগুলো ছেলে একটা সাপের ছানাকে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারছে। দেখে তার মমতা হলো। ছেলেদের সে বললে,—আ-হা-হা মেরো না, মেরো না ওকে। আমি তোমাদের পয়সা দিচ্ছি তোমরা সে পয়সায় দোকান থেকে খাবার কিনে খাও গিয়ে! সেদিন ঝুড়ি বেচে যা কিছু সে পেয়েছিল সব পয়সা সে দিলে ছেলেদের—ছেলেরা পয়সা পেয়ে সাপকে ছেড়ে খুশী মনে ছুটলো দোকানে!

ঝুড়িওয়ালা তখন সাপের ছানাটিকে নিয়ে ঘরে এলো। ইট লেগে তার গায়ের দু-চার জায়গা ছড়ে রক্ত পড়ছিল—পাতা ছেঁচে সাপের সে কাটা ঘায়ে সে দিলে প্রলেপ, তারপর তাকে একটু দুধ খেতে দিলে।

দুদিনে সাপ সেরে উঠলো—সেরে সে বেরলো ঘর থেকে— বেরিয়ে বার বার থামে, থেমে ঝুড়িওয়ালার পানে চায়। ঝুড়িওয়ালা বুঝলো সাপ চায় ঝুড়িওয়ালা তার সংগে আসে।

ঝুড়িওয়ালা চললো সাপের সংগে। মাঠ-ঘাট, জলা পার হয়ে সাপ এলো ঝুড়িওয়ালাকে নিয়ে পাহাড়ের কোলে। সেখানে এসে সাপ এক জায়গায় কুন্ডলী পাকিয়ে বসে ঝুড়িওয়ালার দিকে তাকায় চায়—ঝুড়িওয়ালা এগিয়ে এসে দেখে, সেখানে নিরেট লোহার বড় একটা চাকতি—চাকতির মাঝখানে বড় রিং। সেই রিং ধরে টানতে ঝুড়িওয়ালা দেখে, মস্ত সুড়ংগ...... ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। সাপ ঢুকলো সুড়ঙ্গের মধ্যে—ঝুড়িওয়ালাও ঢুকলো তার পিছনে— সুড়ংগে ঢুকে সাপ থর-থর করে কাঁপছে......কাঁপতে কাঁপতে তার

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চলল সেই বুড়োরই কাছে তর্কের মীমাংসা করতে।

দু-ভাইয়ের কথা শুনে বুড়ো প্রথমে হো-হো ক'রে হেসেই অস্থির। তারপর তাদের বললেন—'লম্বকর্ণের অর্থ কর্ণের লম্ফ-ঝম্পই বলুন, কিম্বা লম্বা কানই বলুন, আপনারা দুজনেই খাঁটি লম্বকর্ণ। আগে আপনাদের চিনতে পারিনি, এবারে ঠিক চিনেছি— আপনারা দুটি ভাই-ই দুটি অমূল্য রত্ন!'

ভ্যাবলা খুশী হ'য়ে বলল—'আমাদের বাবাও বিদ্যারত্ন— নবদ্বীপের টোলে প'ড়ে উপাধি পেয়েছেন।'

গা থেকে সাপের খোলশ গেল খসে—সাপের ছানা হলো পরমা সুন্দরী কন্যা। দেখে ঝুড়িওয়ালা অবাক্।

কন্যা বললে,—আমি হলুম নাগরাজের কন্যা—এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমার বাবার রাজ্য—তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছো, বাবাকে বলবো—আমি তোমার ভালো করতে চাই। বাবা খুশী হয়ে তোমাকে অনেক মণি-রত্ন দিতে চাইবে কিন্তু তুমি মণি-রত্ন নিও না। বাবা জিজ্ঞাসা করবে কি তুমি চাও? আমার বাবার কাছে ছোট একটি সোনার ছড়ি আছে—তুমি সেই সোনার ছড়ি চাইবে। সোনার ছড়ি ছাড়া আর কিছু নিতে যেয়ো না।...... এখন এসো আমার সঙ্গে।

ঝুড়িওয়ালাকে নিয়ে কন্যা এলো বাপ নাগরাজের কাছে—বাপকে সব কথা বললো কন্যা। শুনে বাপ খুশী হয়ে ঝুড়িওয়ালাকে বললে—তুমি আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছো, বলো, কি তুমি চাও? মণি-রত্ন...রাজ্য যা চাও, দেবো। ঝুড়িওয়ালা বললে,— আপনার কাছে আছে সোনার ছোট ছড়ি......সেই ছড়ি ছাড়া আর কিছু আমি নেবো না।

নাগরাজ বললে,—ছড়ির কথা কন্যা তোমাকে বলেছে,—বুঝেছি! তা বেশ এই নাও সে ছড়ি।

ঝুড়িওয়ালাকে নাগরাজ দিলে সে ছড়ি......কন্যা বললে, ঝুড়িওয়ালাকে—এ ছড়ি বার করে তিনবার শুধু বলবে—ছড়ি, ছড়ি, ছড়ি......তাহলে এক জোয়ান আরব এসে সামনে দাঁড়াবে—তাকে তুমি তখন যে হুকুম দেবে সে তা তামিল করবে!

সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত এসে ঝুড়িওয়ালাকে কন্যা বিদায় দিয়ে সুড়ঙ্গে গেল।

ছড়ি নিয়ে মাঠঘাট ভেঙ্গে ঝুড়িওয়ালা চলেছে বাড়ীর দিকে—ভয়ানক খিদে পেয়েছে, একটা গাছতলায় সে বসলো। বসে তিনবার বললে—ছড়ি, ছড়ি, ছড়ি—

সঙ্গে সঙ্গে ইয়া জোয়ান এক আরবের আবির্ভাব। আরব বললে, কি হুকুম হুজুর?

ঝুড়িওয়ালা বললে—খুব খিদে পেয়েছে। আমার চাই মুর্গীর ঝোল, রুটি আর হালুয়া।

চকিতে তার সামনে খাবারের পাত্র—আরব হলো অদৃশ্য!

খেয়ে-দেয়ে ঝুড়িওয়ালা ফিরলো তার ঘরে।

তারপর আর ঝুড়ি বোনা নয়—ছড়ির জোরে তার হলো বাড়ী, গাড়ী......আর প্রচুর ধন-দৌলত।

তখন একদিন সে এসে দাঁড়ালো রাজার সভায়, রাজা বললেন, কি চাই?

ঝুড়িওয়ালা বললে—আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।

রাজা চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, কিন্তু তুমি তো রাজপুত্র নও......ঝুড়িওয়ালা ছিলে—

ঝুড়িওয়ালা বললে,—কিন্তু আমার যে ঐশ্বর্য আছে তেমন ঐশ্বর্য কোনো রাজপুত্রের নেই।

রাজা বললেন,—তোমার কেমন ধন-দৌলত আছে তার পরিচয় চাই।

ঝুড়িওয়ালা বললে,—কি করলে সে পরিচয় পাবেন, বলুন।

রাজা বললেন,—কাল আমাকে দিতে হবে এক উট বোঝাই চল্লিশ বস্তা মুক্তো আর একটা উটে বোঝাই চল্লিশ বস্তা হীরা, চুণী, পান্না!

ঝুড়িওয়ালা বললে,—পাবেন মহারাজ।

রাজা বললেন—আরো ফরমাস আছে। আমার পুরীর সামনে যে মাঠ, ঐ মাঠে তিরিশ দিনের মধ্যে চল্লিশ কামরাওয়ালা প্রকাণ্ড পুরী তৈরী করাতে হবে। আমার কন্যা সেই পুরীতে থাকবে—আমার পুরীর সামনে।

ঝুড়িওয়ালা বললে,—তাই হবে মহারাজ।

ঘরে ফিরে ছড়ির আরবের মারফৎ রাজার কাছে মুক্তো আর হীরা-চুণীর বস্তা পাঠানো হলো—

তার পর তিশ দিনে পুরীর সামনে মাঠে তৈরী হলো চল্লিশ কামরার প্রকাণ্ড পুরী।

দেখে রাজার চক্ষুস্থির—তাই তো, এর আশ্চর্য ক্ষমতা তো'—তবু...রাজপুত্র নয়...ঝুড়িওয়ালা!

ঝুড়িওয়ালা এলো—এসে বললো—এবারে বিয়ের তারিখ ঠিক করুন মহারাজ।

রাজা বললেন করবো...দুদিন সবুর করো!

রাজ্যে আছে এক বুড়ী ডাইনী, রাজা তাকে ডাকালেন...বললেন ঝুড়িওয়ালার এমন সামর্থ্য কিসের জোরে—খবর জেনে আমাকে বলবি।

বুড়ী ডাইনী এলো ঝুড়িওয়ালার বাড়ী—খুব দুঃখের কাহিনী বললো বানিয়ে—বললে—তার ছেলেমেয়ে মরে গেছে, আশ্রয় নেই—খেতে পরতে পায় না—তুমি যদি বাবা দয়া করে আশ্রয় দাও।

ঝুড়িওয়ালার সরল মন...নিজে দুঃখ কষ্ট পেয়েছে—তাই গরীব দুঃখীর উপর তার মনে মায়া-মমতা, সে বললে বেশ তুমি থাকো আমার বাড়ীতে।

বুড়ী রইলো—ঝুড়িওয়ালাকে খুব মায়া-মমতা দেখায়—স্নেহ দেখায়। ঝুড়িওয়ালা কখনো স্নেহ মমতা পায়নি—তার মন গলে' গেল।

একদিন বুড়ী বললে—তুমি তো বাবা চিরদিন ঝুড়ি বেচছে—তোমার এমন ঐশ্বর্য হলো কি করে?

সরল মনে ঝুড়িওয়ালা বললে বুড়ীকে তার ঐ ছড়ির কাহিনী।

তারপর রাত্রে ঝুড়িওয়ালা ঘুমোলে বুড়ী ছড়িটি নিয়ে পালালো—পালিয়ে একেবারে রাজার হাতে দিলে সে ছড়ি পরের দিন।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে ঝুড়িওয়ালা দেখে, বুড়ী নেই—সে ছড়িও নেই; বুঝলো—বুড়ী শুনেছে ছড়ির গুণের কথা তাই সে সেই ছড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে : কোথাকার বুড়ী জানে না, খোঁজ করবে কি—বেচারী মনের দুঃখে তার পোষা বেরালটিকে বুকে নিয়ে আদর করে ছড়ির শোক ভোলবার চেষ্টা করলো।

রাজা ওদিকে বুড়ীর মুখে ছড়ির গুণের কথা শুনে আরবকে ডাকলো। আরব হলো ছড়ির দাস। আরব এলে রাজা বললেন—ঝুড়িওয়ালা যেমন আছে, যে অবস্থায় আছে, তাকে তুলে এনে আমার বাগানের পিছনে যে পুরোনো মজা ইঁদারা আছে তার মধ্যে ফেলে দাও।

যেমন বলা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল : ঝুড়িওয়ালাকে তার বেড়াল সমেত তুলে আরব তাকে ফেললো ইঁদারার মধ্যে!

ঝুড়িওয়ালা বুঝলো—এ, ঐ বুড়ীর কাজ। এখন এখান থেকে কি করে উদ্ধার পাবো?......

হঠাৎ দেখে, একটা ইঁদুর বেরুলো তার গর্ত থেকে—ইঁদুর দেখে বেড়াল তাকে ধরলো—ঝুড়িওয়ালা বললে—না, না, না, ওকে ছেড়ে দে পুশি।

বেড়াল তখন দিলে ইঁদুরকে ছেড়ে। ইঁদুর বললে—আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, বলুন আমি আপনার কি উপকার করতে পারি?

ঝুড়িওয়ালা তখন বললে তার সব বৃত্তান্ত......ছড়ির গুণের কথা—বুড়ীর সে ছড়ি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কথা, তারপর তার এই ইঁদারার মধ্যে পড়ার কথা।

শুনে ইঁদুর বললে—আমরা করবো আপনার ছড়ির সন্ধান—সন্ধান করে ছড়ি নিয়ে আসবো।

পরামর্শ করে চারটি ইঁদুর বেরুলো ছড়ির সন্ধানে। রাজ-পুরীতে ঢুকে ঘরের কড়ি বরগা বয়ে বয়ে করে সন্ধান। দেখলো, রাজার শোবার ঘরে একটা হুকে রেশমী দড়িতে বাঁধা সোনার ছোট ছড়ি

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)
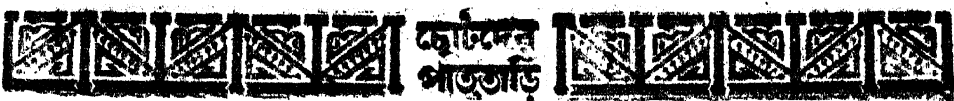
শিশুদের এ উৎসব সুসার্থক হোক—
ঝরুক ইহার মাঝে স্বর্গের আলোক।
স্বাধীন দেশের শিশু গুণে-গরিমায়,
সকলের বড় হবে নিজ প্রতিভায়।
আচরণে নম্র-নত হবে অনুক্ষণ,
দেহের মনের-স্বাস্থ্যে হবে অতুলন।
চরিত্র ও স্বভাবেতে হোক ত্রুটিহীন—
করুক ন্যায়ের পথে যাত্রা চিরদিন।
মলিনতা কুটিলতা হয়ে যাক্ দূর,
আনন্দ-সঙ্গীতে হৃদি হোক ভরপুর।
উৎসাহের উৎস মাঝে করে নিজ স্নান,
উৎসব সার্থক হবে, তৃপ্ত হবে প্রাণ।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঝুলছে। অমনি সে দড়ি কেটে ছড়ি নিয়ে তাড়া এসে সে-ছড়ি দিলে ঝুড়িওয়ালাকে।

ইঁদুরেরা বললে—রাজার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেছে এ ছড়ি!

বটে! তাহলে রাজার ফন্দী! ঝুড়িওয়ালা ডাকলো আরবকে। আরব এলে তাকে বললে—ইঁদারা থেকে তুলে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দাও।

বেড়ালসমেত ঝুড়িওয়ালাকে আরব পৌঁছে দিলে তার বাড়ীতে। তখন আরবকে ঝুড়িওয়ালা বললে—সেই ডাইনী বুড়ীকে সানে আছড়ে মারো—মেরে দুর্জন রাজাকে বেঁধে আমার কাছে আনো।

বুড়ীকে মেরে আরব নিয়ে এলো রাজাকে বেঁধে।

ঝুড়িওয়ালা বললে—রাজা হয়ে কথার খেলাপ করো—তুমি এমন শয়তান। এখন যদি তোমার রাজ্য ছারেখারে দিই, আর তোমাকে হাত-পা বেঁধে সাগরের জলে ফেলে দিই?

রাজা হাতজোড় করে বললেন—আমাকে মাপ করো—বাবা, যাক—আমি দেবো আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ।

রাজাকে তখন ঝুড়িওয়ালা দিলে মুক্তি—রাজা আর দেরী করলেন না—পুরীতে ফিরেই কন্যার বিবাহের আয়োজন—এবং ঝুড়িওয়ালার সঙ্গে হলো রাজকন্যার বিবাহ।

চলো এবার পুজোর ছুটিতে আমরা ওলান্দাজের দেশে বেড়িয়ে আসি। ওলান্দাজের দেশ কোনটা জানো? Holland বাংলায় H অক্ষরটা অর্থাৎ 'হ' বর্ণটা শক্ত ব'লে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, বাকিটুকু হ'ল Olland এই 'ওলান্দ' থেকেই ওদের দেশকে আমরা বলি ওলান্দাজের দেশ! তোমাদের যদি ভূগোল পরিচয় জানা থাকে তাহলে ইউরোপের মানচিত্রে দেখতে পাবে জার্মানীর বাঁ পাশে বেলজিয়মের ঠিক মাথার ওপর এই ছোট্ট দেশটি। দক্ষিণ থেকে 'নর্থ সী' যা উত্তর সাগরে প্রবেশ পথের দক্ষিণ তীরে এই 'হল্যান্ড'।

হল্যান্ডের নাম হয়েছে এখন 'নেদারল্যান্ড'। আমরা ওলান্দাজের দেশই বলবো। দেশটি ছোট হ'লেও কিন্তু চমৎকার। একেবারে সমুদ্রের ধারে। আজ-কাল ওদের দেশে লোক অনেক বেড়ে গেছে। স্থানাভাব। ওরা তাই সমুদ্র তীরের খানিকটা অগভীর জল ঘিরে তার ওপোর বালি, মাটি, পাথর চাপা দিয়ে দিয়ে ক্রমে বুজিয়ে ফেলে অনেকটা জমি বাড়িয়ে নিয়েছে! কেমন বুদ্ধি বলো? আর আমাদের দেশে নদীর জলের তোড়ে স্রোতের টানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কত নগর, গ্রাম, জনপদ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে। আমরা তা বন্ধ করতে পারছিনে।

ওলান্দাজদের আর একটা কীর্তি শুনলে তোমরা অবাক হ'য়ে যাবে। ওদের দেশের একটা দিক সাগর সমতল থেকে অনেকটা নীচু। এখানে সাগরের জল ঢুকে প'ড়ে পাছে দেশের কিছু ক্ষতি ক'রে, তাই এরা উঁচু বাঁধের বেড়া দিয়ে সাগরকে বেঁধে রেখেছে। দেশের মধ্যে ঢুকতে দেয় না। এই বাঁধের বিশাল ফটক যদি একবার খুলে যায়, সমস্ত নেদারল্যান্ড দেশটাই সমুদ্রের জলের তলায় তলিয়ে যাবে। আমরা 'জীল্যান্ড' আর 'জুদাজী'তে গিয়ে এই সব ডাইক বাঁধ দেখে এসেছি।

ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হ'য়ে আমরা বেলজিয়মের 'অস্টেন্ড' বন্দরে এসে নেমেছিলুম। বেলজিয়মে সাত-দিন থেকে সমস্ত দেশটি ঘুরে দেখে তারপর হল্যান্ড বা নেদার-ল্যান্ডে বেড়াতে যাই। নেদারল্যান্ডে ঢোকবার মুখে সীমান্ত সহর 'রুজেনদালে' যাত্রীদের 'পাশপোর্ট' ও 'ভিসা' অর্থাৎ 'ছাড়পত্র' আর অনুজ্ঞা বা অনুমতি পত্র পরীক্ষা করা হয়। আমাদের ট্রেণ এখানে এসে থামলো। গাড়ীতে গাড়ীতে পুলিশ এসে 'পাশপোর্ট' আর 'ভিসা' পরীক্ষা করতে লাগলো।

আমার খেয়াল ছিল না যে বেলজিয়মে পাঁচদিনের বদলে সাতদিন থাকায় আমাদের ওলান্দাজের দেশে যে তারিখে যাবার 'অনুজ্ঞা' ছিল তা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে! কাজেই বিনা অনুমতিতে ওদের দেশে প্রবেশ করার অপরাধে পুলিশ আমাকে ধরে ট্রেণ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে আমার স্ত্রী রাধারাণী দেবী ও কন্যা

নবনীতাও ঘাবড়েছেন। আমাদের প্রথম নামবার কথা 'হাগ' স্টেশনে। হল্যান্ডের এই 'হাগ' শহরকে ছেলেবেলায় আমরা বরাবর 'হেগ' (Hague) বলে এসেছি। এখানে এসে শিখলুম এই শহরটির নামের নির্ভুল উচ্চারণ হ'ল—'হাগ'।

সে যাই হোক, এই বিদেশে বিভুঁয়ে পথের মাঝখানে পুলিশ আমাকে ধরে নামিয়ে থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুনলে পাছে ওরা ভয়ে আঁৎকে উঠে কিছু হাঙ্গামা করে বসেন, তাই, ইংলিশ চ্যানেল পার হবার সময় জাহাজে যে দুটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, তারাও আমাদের সহযাত্রী হয়েছিল বলে তাদের চুপিচুপি বলে দিলুম, তোমরা ওদের 'হাগ' স্টেশনে নামিয়ে নিয়ে অপেক্ষা কোরো। আমি পরের ট্রেনেই গিয়ে হাজির হচ্ছি। মেয়েদের বুঝিয়ে বোলো, আমাকে বিশেষ কাজে এখানে একটু নামতে হয়েছে। পুলিশে ধরেছে বোলো না।'

পুলিশ আমাকে তাদের 'ভ্যানে' তুলে নিয়ে চললো রুজেন-ডাল থানার হেড কোয়ার্টারে। পুলিশ ভ্যান থেকে যেটুকু দেখা গেল তাতে বোঝা গেল যে এটি ঠিক শহর নয়। একটি 'বর্ধিষ্ণু গ্রাম' বলা যেতে পারে। দেখতে ভালই। বেশ একটা শান্তশ্রী আছে। শ্যামলতারও অভাব নেই। রাস্তাঘাট ঝকঝকে পরিষ্কার। ছোট ছোট বাড়ী। উঠোনে বাগান আছে। মেয়েরা খুব খাটে। দেখলুম কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে। শুনলুম বাড়ীঘর ঝাঁটপাট দেয়, রান্না করে, আবার উল নিয়ে মোজা, কম্ফর্টারও বোনে।

আমাকে পুলিশ যে অফিসারের কাছে নিয়ে গেল, তিনি অতি সজ্জন লোক। আমাদের ভিজিটিং কার্ড দেখে, পরিচয় পেয়ে এবং আমার কাছে সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সাত দিনের জন্য হল্যান্ড ঘুরে দেখে যাবার জন্য 'ভিসা' দিলেন। তবে আমাকে এই নতুন ভিসার জন্য আরও ছ'টাকা ফী জমা দিতে হল। পুলিশ অফিসার দু'জনকে তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন আমাকে সযত্নে নিয়ে গিয়ে যেন পরের ট্রেণেই তুলে দেওয়া হয়। বললেন, আপনারা কবি, লেখক, দেশে ফিরে যেন হল্যান্ডের নিন্দা করবেন না।

দু'পাশে দুই বডিগার্ড নিয়ে আমি রুজেনডাল স্টেশনে আসবামাত্র পরের ট্রেণ খানি পাওয়া গেল। আমিও 'দুর্গা', 'দুর্গা' বলে উঠে পড়লুম। এইবার মনে আসতে লাগলো যত দুর্ভাবনা। ছেলে দুটির সঙ্গে পথেই আলাপ। একজন ইঞ্জিনীয়ার আর একজন আইনজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরছে। যাবার আগে ইউরোপের কয়েকটি দেশ দেখে যাবার ইচ্ছায় বেরিয়েছে। এই অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয়। যা বলে দিয়েছিলুম তাই কি করবে? যদি না করে? শুনেছি অনেক আন্তর্জাতিক গুন্ডা-বদমাইসের দল আছে, যারা বেশ নিরীহ সেজে যাত্রীদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তারপর তাদের ঠকিয়ে সঙ্গের টাকাকড়ি, অলংকারপত্র সব নিয়ে সরে পড়ে! এরা যদি সে দলের হয়? পত্নী ও কন্যার যে কী ভীষণ দুর্ভাবনা হচ্ছে কল্পনা করে মনটা কাতর হয়ে পড়লো!

'বাবুলাবাবু!' একটা সরু গলার মিহি চিৎকারে চমকে উঠলুম। এ ত আমার মেয়ে নবনীতার গলা! দেখি মেয়েটা ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের ওপোর দিয়ে ছুটছে। 'হাগ' স্টেশনে গাড়ী ঢুকছিল তখন। আমার কোনো খেয়াল নেই। ট্রেণ থামতেই ছেলে দুটি এসে আমায় নামিয়ে নিয়ে গেল। আমার স্ত্রী দেখলুম খুব রেগে রয়েছেন। বললেন, তুমি কি রকম দায়িত্বহীন মানুষ! তোমার কান্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। জবাব দেব কি আমি নিজেও অবাক!

ছেলে দুটি বড় ভাল। ইতিমধ্যেই স্টেশনের কাছাকাছি একটি হোটেল ঠিক ক'রে এসেছিল। আমরা সেই হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কুলি পাওয়া যায় না। শেষে স্টেশন মাস্টারকে বলে রেলের ঠেলা-গাড়ীতে আমাদের মালপত্র নিয়ে যাওয়া হ'ল। হোটেলে ... তারপর হোটেলের কুলিরা যে যার ঘরে মাল পৌঁছে দিলে, তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরে পা দিতেই চমক লাগিয়ে দিলে প্রবেশপথের মুখে এদেশের প্রকাণ্ড এক স্টীলের চক্রাকার নাগর-দোলা। অনেক উঁচুতে ঘুরঘুরে করে দাঁড়ানো ইলেকট্রিক পাখার মতো ঘুরছে। সেই ইলেকট্রিক ঘূর্ণীচক্রে ঝুলছে অনেকগুলি দোলনা। ছেলে-বুড়ো অনেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। দোলনায় কিন্তু কোনো লোক নেই। দোল খাচ্ছে সেখানে বসে রকমারী রংয়ের ফুল-পরীরা। অর্থাৎ প্রত্যেক দোলনায় এরা রংবেরংয়ের আলো দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে রংবেরংয়ের ফুল-ফোটা কাঠের রঙীন টব। নাগর-দোলা অনবরত ঘোরার ফলে মনে হচ্ছে যেন আকাশের সেই সাত-রঙা রামধনুকে এরা মর্ত্যে টেনে এনে খানিতে ঘুতে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

আমরা শনিবার সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছিলুম। রবিবার ভোর-বেলা ঘুম ভাঙলো একসঙ্গে বেজেওঠা গির্জাগুলোর ঘণ্টার শব্দে। এখানকার গির্জাগুলি দেখতে ভারি সুন্দর। এদের ঘণ্টাধ্বনি যেন ঘুমন্ত সহরকে ডেকে বলছে—ওঠো তোমরা। রাত ফুরিয়েছে। প্রভাতের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ভগবানের উপাসনায় সময় হয়েছে। সবাই দলে দলে ধর্ম-মন্দিরে চলে এস। ঘণ্টা এখানে শুধু রবিবারেরই নয় সর্বদিনই ভোরে উপাসনা মন্দিরে বাজে।

ইউরোপের সব হোটেলেই দেখা যায় একটা বেশ ভাল নিয়ম আছে। ভোরবেলা তোমাকে জাগিয়ে বিছানায় 'বেড-টি' দিয়ে যায়। চা খেয়ে ঘুমের আলস্য যাতে দূর হয়। একটা কিছু ফলও দিয়ে যায়, যদি তোমার খিধে পেয়ে থাকে, খালি পেটে চা খেতে হবে না। ৮টা না বাজতে বাজতেই শোনা যায় প্রাতরাশের ঘণ্টা, অর্থাৎ 'ব্রেক-ফাস্ট' উপবাস ভঙ্গ করবে এস। তারপর বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন বা ল্যাঞ্চ। এ দু'বারই খাবার জন্য হোটেলের ডাইনিং রুমে যেতে হয়। বিকেলের চা-জলযোগ নিজেদের ঘরে নিয়ে খেতে পারো। কিন্তু 'নৈশভোজ বা রাত্রের ডিনার খেতে আবার হোটেলের সেই খাবার ঘরে আসতে হয়। তবে, ঘরে খাবার দিয়ে যাবার কিছু অতিরিক্ত মজুরী দিলে ওরা ঘরেও খাবার দিয়ে যায়।

এমনিতর কঠিন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে ইউরোপের ছেলে-মেয়েদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা একেবারে চেন দিয়ে বাঁধা। কাজের সময় কাজ, পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, খাওয়ার সময় খাওয়া। তাই তারা সারাজীবন সুশৃঙ্খলে নিয়মানুবর্তী হয়ে চলতে পারে। এদেশে ছেলেমেয়েদের বড় কাউকে বাড়ীতে পড়তে হয় না। সব পড়া স্কুলেই পড়িয়ে তৈরি করিয়ে দেয়। এমনকি হাতের লেখা, ছবি আঁকা, অংক, অনুবাদ এসে যা প্রবন্ধ লেখা সবই করায়।

সকালে গির্জের ঘণ্টা থামবার পরই আবার বেলা ৮।৯টার মধ্যে শুরু হয় পথে পথে হাজার হাজার সাইকেলের 'বেল'। এই সময় যত অফিস, স্কুলের ছেলেমেয়েরা, দোকানের কর্মচারীরা চলেছে তাদের কাজে। এদের পরিধানে যেমন নানা রংয়ের পোষাক, এদের সাইকেলও তেমনি নানা রংয়ের। কালো রংয়ের সাইকেল এদেশে নেই। এরা বেশ সৌখীন লোক। রাখালেরা সকালেই গরু চরাতে যায়। এদের গরুর গলায় নানা আকারের আর আওয়াজের ঘণ্টা। প্রাতরাশের ঘণ্টা পরবার আগেই শোনা যায়। সন্ধ্যেবেলা যখন গরুর পাল ঘরে ফেরে তখনও আবার টুং টাং ঘণ্টা বাজে। ভারি মিষ্টি লাগে। ভিন্ন ভিন্ন গোয়ালের গরুর গলায় ভিন্ন ভিন্ন সুরের ঘণ্টা ঝোলে। এই ঘণ্টার আওয়াজ থেকে এরা বুঝতে পারে এগুলি কোন্

রাখালের গোয়ালের গরু! হল্যাণ্ডের তৈরি গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ পৃথিবীশুদ্ধ লোকেই ভাল বলে জানে।

আগে এদেশের ছেলেমেয়েরা যে কাঠের জুতো পায়ে দিত আর ঘোমটার মতো একরকম মাথাঢাকা টুপী মেয়েরা পরতো, এখন আর তার চলন নেই। তবে, ওরা রেখেছে প্রদর্শনীর মতো করে ওদের দেশের একটি পুরানো গ্রামকে। সেখানে গেলে প্রাচীন হল্যাণ্ডের কি চেহারা ছিল তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। বলা বাহুল্য যে এটা সরকারী চেষ্টায় খাড়া করে তোলা একটি নকল সেকেলে গ্রাম। এখানে যারা প্রাচীন সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘরকন্না বাজারহাট করছে, দোকানপাট চালাচ্ছে, তারা সবাই সরকারের বেতনভুক অভিনেতা অভি-নেত্রীর দল। আমরা একদিন সারা সকালটা এই গ্রামে ঘুরে বেড়ালুম। কাঠের জুতো, রঙীন পুতুল নবনীতার জন্য কিনে দিতে হল।

হাগে আমরা অনেক জিনিষই দেখলুম। এইখানেই ওলান্দাজ-রাজের প্রাসাদ। শাসন ও ব্যবস্থাপক সভাও এখানে। 'শান্তিপ্রসাদ' দেখলুম। এটা সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের 'লীগ অফ্ নেশান্সের পীস প্যালেস। এখানকার বিখ্যাত 'বাইনেন্ হফ' পল্লী দেখলুম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থাৎ সাতশো বছরের পুরোনো ঘর-বাড়ী কতক কতক এখনও সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে এখানে। এখানকার যাদুঘর-গুলিও দেখবার মতো। বিখ্যাত ওলান্দাজ শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে এখানে।

এই হাগের পাশেই 'সাগর বেলা-বিলাসী' এবং 'সমুদ্রস্নান প্রিয় নরনারীর ভীড় হয়। সেখানে তার নাম 'শেভেলিংগে'ন। এখানটিও আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। মধ্যাহ্নভোজনের আগে পর্যন্ত সারা সকালটি আমরা একদিন এইখানে কাটিয়েছিলুম। এর কাছাকাছি দক্ষিণে আছে নাকি হল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফুল-ফলের বাগান 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' এটা আর আমরা দেখতে যাইনি কিন্তু 'হুক অফ হল্যাণ্ড' আর 'রটারডাম' দেখতে গেছলুম। হুক অফ হল্যাণ্ড সমুদ্রতীরের একটি বন্দর নগর। রটারডামও তাই, তবে অনেক বড় আর প্রাচীন। এখানে সেই সময় এক বিরাট প্রদর্শনী চলছিল। বন্দর আর নৌবিভাগীয় প্রদর্শনী। আমরা পুরো একটি দিন এই প্রদর্শনীতেই কাটিয়ে এলুম। এখানে একটি ভারতীয় ছাত্রের সংগে পরিচয় হল। সে এখানে নৌবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য এসেছে। প্রদর্শনীতে এ ভলাণ্টিয়ারের কাজ করছিল। নৌবিভাগের ছাত্রদেরই পালা করে এ ভার নিতে হয়েছে।

হাগ থেকে আমরা হল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডমে এলুম। অদ্ভুত সহর। যতবা রাস্তা ততবা খাল। অর্থাৎ রাস্তার ধারে ধারে সমানে খালও চলেছে। রাস্তা দিয়ে যেমন মোটর লরী, বাস, ওয়াগন ইত্যাদি চলেছে, সংগে সংগে তেমনি খাল দিয়েও চলেছে যাত্রী-বোঝাই মোটর বোট, মাল-বোঝাই ভড়, ফেরী নৌকা, প্রমোদতরী ইত্যাদি। এখানেও দেখলুম বেগুলো পুরোনো খাল তার এক-পারে চার-পাঁচশো বছরের পুরোনো বাড়ী কিছু কিছু বেশ সযত্নে সারিয়ে মেরামত করে রাখা হয়েছে। সহরের সামঞ্জস্য রাখবার জন্য এরা আবার অনেক নূতন খাল কেটে সহরটায় যাকে বলে পাশাপাশি রাস্তাঘাট বসিয়েছে। নতুন রকম লাগলো খুব। একদিন বোটে চড়ে খালে খুব বেড়িয়ে আসা গেল একেবারে উত্তর সাগরের মোহানা পর্যন্ত; ভারি ভালো লাগলো। আমাদের দেশে যেমন রাস্তার দু-ধারে সব বড় বড় গাছ আছে এদের খালগুলির দুধারেও তেমনি দেবদারু আর বাদাম গাছের মতন বড় বড় সব পুরোনো গাছ আছে। কলকাতায় যদি রাস্তার পাশে পাশে গভীর চওড়া খাল থাকতো তাহলে বোধ হয় বর্ষায় সহরের রাজপথে জল-জমে নদী বয়ে যেত না।

আমরা একদিন এদের হাটবাজার শিল্প-বাণিজ্য জাদুঘর প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখে এলুম। 'বেলজিয়ান কাট্' হীরে বলে যেসব দামী হীরা বাজারে বিক্রী হয় তার অধিকাংশই এই হল্যাণ্ডের কারি-গরেরা কাটে। সৌখীন লোকেরা এদের কাটা হীরে খুব পছন্দ করে। অনেক দামে বিক্রী হয়। আমষ্টার্ডামের উইলেট্ মিউজিয়াম যে বাড়ীতে, সেই সপ্তদশ শতাব্দীর বাড়ীখানাই ঐতিহাসিক প্রাচীন বাড়ীর এক বিশিষ্ট নমুনা। এর ভেতর আছে পুরোনো পোর্সিলেনের হরেক-রকম জিনিস, পুরোনো আসবাবপত্র আর শিল্প ও চারুকলার গ্রন্থা-গার। আরও অনেক জাদুঘর আছে এখানে। যেমন 'রিক্সমিউজিয়াম' এখানে বিশ্ব-বিখ্যাত ওলান্দাজ শিল্পী রেমামব্রান্টের আঁকা ছবি আছে। এই শিল্পীর পৃথিবী প্রসিদ্ধ ছবি 'রাতের প্রহরী' (Night watch) এখানেই রাখা হয়েছে দেখলুম। বাজারহাটের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটি খুব ভাল। পৌর জাদুঘর বলে একটি মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়মও আছে। এদের বিমান বন্দরের নাম কি জানো? 'আকাশ-কুসুম' (Schiphol) একদিন পিটার দি গ্রেটের বাড়ী দেখে এলুম। এখানে উইণ্ডমিলের ছড়াছড়ি। বাতাসের জোরে চাকা ঘুরিয়ে এরা ছোটখাটো কল চালায়। 'আলসমীয়ারে' এদের যে ফুলবাগান আছে দেশ-বিদেশের ফুলপ্রিয়রা তা দেখতে আসে। এইখানেই ওলান্দাজের দেশ বেড়ানো শেষ করে আমরা দিনেমারদের দেশে চলে গেলুম।

[সহরতলীতে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি। রাত্রি ১১টা। পথের ধারে ঘরটিতে এই বাড়ির ছেলে তপনকুমার রাত জাগিয়া পরীক্ষার পড়া পড়িতেছে।]

তপন। "অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যা সূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্ ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে;......"

[বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ]

তপন। কে?

রমেন। আমি রমেন। দোরটা খোল ভাই তপন!

[তপন দরজা খুলিয়া দিল। উদ্‌ভ্রান্তভাবে রমেনের প্রবেশ]

রমেন। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই তপন!

তপন। সে কিরে রমেন?

রমেন। এবার আর আমার পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

তপন। না না, ব্যাপার কি খুলে বল্ রমেন!

রমেন। কাল আমার পরীক্ষার ফী দাখিল করতে হবে। মহু

কষ্টে মা মাত্র পঁচিশটা টাকা জোগাড় করতে পেরেছিল। বাকী ছিলো পঁচাত্তর। নিজের শেষ সম্বল সোনার হারটা তুলে দেন আমার হাতে। স্যাকরার কাছে বাঁধা দিয়ে ওই পঁচাত্তর টাকা জোগাড় করতে।

তপন। স্যাকরা টাকা দিলো না?

রমেন। না দেবার কোনো কারণই ছিলো না। কিন্তু স্যাকরার দোকানে গিয়ে দেখি আমার পকেটটি ফাঁকা।

তপন। পিক্-পকেট?

রমেন। তা ছাড়া আর কি?

তপন। কোথায়? কোন্ পকেটে রেখেছিলি হারটা?

রমেন। নীচের পকেট থেকে একবার একটা মানিব্যাগ উধাও হয়েছিলো বলে এবার হারটা রেখেছিলাম খুব সাবধানে—একটা কাগজে মুড়ে এই ঘড়ি পকেটে।

তপন। ব্যাপারটি ঘটলো কখন?

রমেন। আজ বিকেলে। তুমি আর আমি তিন নম্বর বাসে একসঙ্গে বের হলাম তো?

তপন। হ্যাঁ, তুমি নেমে গেলে ভবানীপুরে, আমি নামলাম কালীঘাটে।

রমেন। ভবানীপুরে নেমেই গেলাম স্যাকরার দোকানে। টের পেলাম তখন।

তপন। বাসের ওই ভীড়ে তুই তো আগাগোড়া আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলি। বাসে উঠেও ছিলাম এক সঙ্গে। তখনো যদি তুই আমাকে বলতিস্, তোর পকেটে রয়েছে হার, আমি চোখ রাখতাম। কেন বলিস্নি আমাকে?

রমেন। মায়ের হার বাঁধা দিতে নিয়ে যাচ্ছি, এটা তো বলবার মতো কথা নয় ভাই! অকালে মারা গেলেন বাবা। কি কষ্ট করে মা যে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, পাশের বাড়ি বাস করিস—এটা তুই ভালোই জানিস্ তপন! হারটা ছিলো মায়ের শেষ সম্বল! সেটাও আজ গেল! পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে মায়ের দুঃখ দূর করবো, সে আশাও আজ খতম হলো!

তপন। তবু বলবো তুই বড় অসাবধান!

রমেন। সে কথা ভাই স্বীকার করছি। সেবারে সেই একটা ফাউণ্টেন পেন—

তপন। এমন আলগো হয়ে তোমার পকেটে ঝুলছিলো যে, আলগোছে সেটা আমি তুলে নিয়েছিলাম তোমার পকেট থেকে। না নিলে বাসের ভেতরই পড়ে যেত ওটা।

রমেন। সে কথা সত্যি। আমার খেয়াল বড় কম। তুমি যে তুলে নিলে কখন, টের পাইনি আমি। আমাকে বলোওনি তুমি তখন।

তপন। ইচ্ছে করেই বলিনি। ভেবে দেখলাম শিক্ষা হোক্ তোমার!

রমেন। তা খুব শিক্ষা হয়েছিলো। দু'দিন লিখতে পারিনি কিছু। খুব ভুগিয়েই তুমি পেনটা ফেরৎ দিয়েছিলে। হারটাও যদি তুমি এবার নিয়ে থাকো, ফেরৎ দাও আমাকে।

তপন। সে কি? তোর হার আমি তুলে নিয়েছি, এই তোর ধারণা?

রমেন। কি জানি ভাই, আমার ঠিক নেই। যদি নিয়ে থাকিস্ ফিরিয়ে দে আমাকে। কাল পরীক্ষার ফীস্ দাখিলের শেষ তারিখ। স্যাকরার বাড়ি থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, যদি সেই ফাউণ্টেন পেনের মত এবারো তুই—

তপন। রমেন তোমার বোঝা উচিত, সেটা ছিলো পাঁচসিকে দামের একটা ফাউণ্টেন পেন। আর এটা হলো গিয়ে একটা সোনার হার—

রমেন। আমি তোর ঘরটা সার্চ করতে চাই। হ্যাঁ, মরীয়া হয়েই আমি একথা বলছি।

তপন। আমার ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাও রমেন।

রমেন। শোনো তপন, তোর আর আমার মধ্যে এত দিনের বন্ধুত্ব। আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলে সে বন্ধুত্বটা যাবে।

তপন। যাক্।

রমেন। সন্দেহটা কিন্তু থেকেই যাবে। কিন্তু তোমার ঘর সার্চ হলে সব সন্দেহের অবসান হতো।

তপন। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনে রমেন। তুমি এই মুহূর্তে বের না হলে, আমি তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে—

রমেন। তপন, আমি তোর পায়ে পড়ছি—হারটা আমাকে ফিরিয়ে দে।

তপন। (রমেনকে লাথি মারিয়া) বেরিয়ে যাবি কিনা বল্!

রমেন। হ্যাঁ যাচ্ছি। একটা পকেটমারের ঘরে আর থাকতে চাই না আমি।

[রমেনের প্রস্থান। তপন দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। চেয়ারে বসিয়া পুনরায় পড়িতে চেষ্টা করিল।]

তপন। "উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি; বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

[কিন্তু অশান্ত মনে তপন আর পড়িতে পারিল না। সে বই বন্ধ করিয়া বাতি নিবাইয়া দিল। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ঘরে, চাঁদের আলো ঝাঁপাইয়া পড়িল। তপন টেবিলের পার্শ্বের শয্যায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। হঠাৎ বাতায়ন পথে দেখা গেল একটি লোক নিঃশব্দে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।]

তপন। কে! ওখানে কে?

লোকটি। চুপ! কথা আছে। দরজা খোলো।

[তপন শয্যা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল]

তপন। তোমাকে তো আমি—এত রাতে—কি কথা?

লোকটি। দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছো?

তপন। নিজের বাড়িতে আবার কেউ ভয় পায় নাকি?

লোকটি। তবে দরজা খুলছো না কেন?

তপন। খুলছি

[তপন দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরের লোকটি ভিতরে আসিল]

লোকটি। বসবো?

তপন। বোসো। তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি আমি! হ্যাঁ বোধহয় আজই দেখেছি। কিন্তু কোথায়, ঠিক মনে করতে পারছি না!

লোকটি। কলকাতার সহর, পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সারাদিন যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, সবাইকে চিনে রাখা—মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, বিশেষ কারণ থাকলে ব্যক্তিবিশেষকে মনে থাকে বৈকি! যেমন তোমাকে আমি আজ একবার দেখা মাত্র ভুলতে পারছিনে।

তপন। ভনিতা রেখে বল দেখি কি চাই! কেন এসেছো?

লোকটি। তাহ'লে, সোজাসুজি কথাবার্তাই হোক। আজ তুমি একটা সোনার হার চুরি করেছো?

তপন। খবরদার!

লোকটি। চোর যখন ধরা পড়ে তখন ঐ কথাই বলে বটে!

তপন। মুখ সামলে কথা বলো!

লোকটি। ধরা পড়েও চোর এমনি করে শাসায় বটে!

তপন। বেরিয়ে যাও—ভালো চাও তো বেরিয়ে যাও!

লোকটি। বেরিয়ে যেতে তো আসিনি। বাস থেকেই তোমার পিছু নিয়েছি আমি। হ্যাঁ, এই আমার কাজ। গায়ে আমার পুলিশের

ছোটদের পাততাড়ি
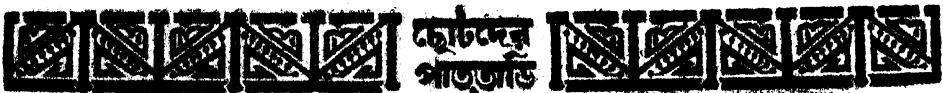
ইউনিফর্ম নেই বটে, কিন্তু তাই বলে যদি তুমি মনে কর, আমি পুলিশ নই তবে তোমার মতো 'বুদ্ধিমান' আর নেই।

তপন। পুলিশকে ভয় করবে চোর। (আস্তিন গুটাইয়া) বেরিয়ে যাও—

লোকটি। চোরের মা'র বড় গলা—এটা জানি, কিন্তু চোরের এত দাপট এ'ত বড় দেখা যায় না। বিশেষ, চোরাই মালটা যখন দেওয়ালে ঝুলোনো ঐ কোটটার পকেটেই জ্বল জ্বল করছে। শোনো তপনবাবু, স্থির হয়ে শোনো। কোটের পকেটে হারটা যদি না থাকে, তুমি আমাকে জুতো মেরে বের করে দিও। কিন্তু যদি থাকে—

তপন। বটে! আচ্ছা—তবে জুতো মেরেই বিদায় করছি!

[তপন ছুটিয়া গিয়া কোটটি আনিয়া লোকটির সম্মুখে ধরিল]

তপন। কোথায় হার, বের করো—

লোকটি। সে কষ্টটা তুমিই স্বীকার কর বন্ধু!

তপন। বেশ!

[তপন পকেটে হাত দিয়াই যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার হাতে কাগজে মোড়া কি যেন ঠেকিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মোড়কটি পকেট হইতে বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল সোনার হার।]

লোকটি। এখন কে কাকে জুতো মারবে বল ভাই!

তপন। কিন্তু একি হোল? কি করে এটা আমার পকেটে এলো?

[তপন অবাক হইয়া লোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল]

লোকটি। এখন যে থানায় যেতে হবে ভাই! তারপর কোর্টে, তারপর জেলে।

তপন। দাঁড়াও। তোমাকে আমি আজ দেখেছি—যে বাসে আমি আর রমেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এখন মনে পড়ছে, তুমি আমাদের দু'জনের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছিলে!

লোকটি। বাসে চলতে গেলে হুমড়ি খেতেই হয়, আর তাতে কারো হয় ক্ষতি কারো হয় লাভ। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম বলেই না বন্ধুর পকেট থেকে সোনার হারটি বেমালুম তুলে নিজের পকেটে চালান দিতে পেরেছিলে। সেজন্যে কৃতজ্ঞতা তো নেই, আস্তিন গুটিয়ে মারতে এসেছিলে আমাকে। যাক্ এখন বমাল ধরা পড়েছো, থানায় চলো।

তপন। আমি হার নেইনি।

লোকটি। হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ তো, সেটা থানায় গিয়ে বলবে চলো!

তপন। আমি থানায় যাবো না। আমি রমেনকে ডাকছি। হারটা তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

লোকটি। আর তো তা' চলে না বন্ধু! এ হার এখন কোর্টে জমা থাকবে! বিচার হবে—তোমার জেল হবে—তারপর যার হার সে পাবে।

তপন। উঃ! আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

লোকটি। আত্মহত্যা করতে এখন তোমাকে দিচ্ছে কে? তোমার প্রাণ এখন পুলিশের জিম্মায়! নাও ওঠো চলো—। ......কি ভাবছো? চুপ করে রইলে যে? কি ভাবছো তাও আমি বলে দিতে পারি।

তপন। আমার মনে যে কি ঝড় উঠেছে, তুমি তা বুঝবে না—বুঝবে না।

লোকটি। বুঝবো না! শুনবে, তুমি কি ভাবছো? ভাবছো ব্যাপারটা কি কোনো মতে চাপা দেওয়া যায় না! ভাবছো, রমেনকে যখন একবার তাড়িয়ে দিয়েছি তখন তার কাছে হার নিয়ে গেলে চোরের অপবাদ—সেও হবে, হারটাও যাবে হাতছাড়া হয়ে। তার চেয়ে পুলিশের সঙ্গে রফা করাই হয়তো ভালো!

তপন। এ্যাঁ!

লোকটি। হ্যাঁ। ভাবছো সেই সংস্কৃত শ্লোকটা—'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'?

তপন। তুমি এতে রাজি আছো?

লোকটি। রাজি হওয়া উচিত নয়, তবে তুমি যখন আত্মহত্যার ভয় দেখাচ্ছো তখন তোমার মনের অবস্থাটা বুঝে একটু বিচার বিবেচনা করতেই কেন যেন ইচ্ছে হচ্ছে। বেশ, চুপি চুপি হারটি নিয়ে বেরিয়ে এসো। রাতের অন্ধকারেই জানাশোনা একটা স্যাকরার দোকানে কাজটা সারা যাক্।

[তপন কি ভাবিতে লাগিল]

লোকটি। না না, নষ্ট করবার মতো সময় তো আমার হাতে নেই। হার নিয়ে চুপি চুপি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো, নইলে চেঁচামেচি করে লোকজন ডাকতে হবে। তোমাকে বমাল গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে হবে থানায়। আমি এক-দুই-তিন গুণছি। এর বেশি সময় দিতে পারবো না আমি।

[তপনের জীবনের চরম পরীক্ষা দেখা দিলো।]

লোকটি। এক—দুই—

তপন। (হার মুঠিতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) চলো আমি যাচ্ছি!

[দুইজন ঘর হইতে বাহির হইবে এমন সময় বাহির হইতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল রমেন]

রমেন। দাঁড়াও!

[তপন এবং লোকটি চমকাইয়া উঠিল]

রমেন। ভাগ্যিস্ আমি এই ঘরটির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম, তাই চুরিটার কিনারা করতে পারলাম।

তপন। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) রমেন! তোর পায়ে পড়ছি, আমাকে ক্ষমা কর!

রমেন। না না, বরং তুই আমাকে ক্ষমা কর তপন!

[দুই বন্ধু পরস্পরকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের চোখে জল। ইতিমধ্যে উন্মুক্ত দরজা দিয়া লোকটি পলায়ন করিল। কিন্তু রমেন ইহাতে বিস্মিত হইল না।]

রমেন। চোরটা পালালো। পালিয়ে বেঁচে গেল দেখছি!

তপন। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ঐ লোকটাই তবে?

রমেন। হ্যাঁ।

তপন। তবে ও পুলিশ নয়।

রমেন। ওর সাত পুরুষে নয়। মারাত্মক পকেটমার ওটা! ওই লোকটাই বাসে হুমড়ি খেয়ে আমাদের দু'জনের গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। আমি কট্‌-মট্‌ করে তাকাতেই সরে গিয়েছিল আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু তখন কোনো সন্দেহ হয়নি আমার। লোকটাকে তোর জানালায় এসে দাঁড়াতে দেখেই ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। ও যখন ঘরে ঢুকলো, পা টিপে টিপে এসে আমি দাঁড়ালাম তোমার ঐ জানালার তলে। কথাবার্তা যা শুনলাম তাতে আর কোনো সন্দেহ রইলো না আমার। স্পষ্ট বুঝলাম ঐ লোকটাই হারটা আমার পকেট থেকে নিয়েছিলো তুলে।

তপন। কিন্তু হারটা আমার পকেটে এলো কি করে?

রমেন। বাসে ও যখন আমাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো, কট-মট করে তাকিয়ে ছিলাম আমি। ধরা পড়বে বলে ওর তখন ভয় হলো। মুহূর্তের মধ্যে হারটা তোর পকেটে দিলো গলিয়ে। আর তা দিলো বলেই ও তোর পিছু নিলো ফাঁক পেলেই তুলে নিতে।

তপন। কিন্তু এত সব বুঝলে কি করে?

রমেন। ওকে এখানে দেখেই বুঝলাম ও পুলিশ নয়। কারণ পুলিশই যদি হতো তবে এত রাতে এসে এমন চুপি

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠার ২য় কলমে)

আসছে পূজায় আমরা যখন লম্বা ছুটি পাব,
চড়ুইভাতি করতে সবাই শুকতারাতেই যাব।
চক্‌চকে ঐ চাঁদটা বটে অধিক দূরে নয়,
অক্সিজেনের ঘাটতি সেথায় তাইতো জাগে ভয়,
চন্দ্র-লোকের চরকা-কাটা বুড়ীর কাছে এসে,
জলছাড়া কই মাছের মত, হাঁপিয়ে উঠি শেষে!
তাহার ওপর জানিয়ে দেছে বৈজ্ঞানিকের দল,
সুধার কণা দূরের কথা, একটি ফোঁটা-জল,
ঝামায় শুধু থাকতে পারে, আস্ত চাঁদে নাই,
যাত্রাপথে আমরা যাব, চাঁদটা ছুঁয়ে তাই।
টানটা তাহার অল্প আবার এটাও এখন জানা,
ছুটোছুটি করায় সেথায়, বিপদ আছে নানা।
আমাদেরই দলের মাঝে, যানের থেকে নেমে,
হঠাৎ যদি লাফায় কেহ, বেগ গেলে তার থেমে,
ছিটকে উঠে, পড়তে হবে বলের মত ভূঁয়ে,
যাবার সময় তাই আমরা চাঁদটা যাব ছুঁয়ে।
এখনকারের কবির ভেতর, বলছে আবার কেহ,
ঘুরে ঘুরে, জ্বলে পুড়ে গেছে ওটার দেহ;
ছন্নছাড়া কেউবা ওদের চাঁদটা দেখেই জ্বলে,
ছন্দ ছাড়া ছড়ায়, লেখে পোড়া রুটি বলে;
সবাই যখন বলছে ওটা পোড়ামাটির দেশ,
আমরা বলি ছুটির সময় শুকতারাটাই বেশ।
আম কুড়াতে যখন ছুটি ঊষা জাগার আগে
সকল তারাই ঘুমিয়ে থাকে—শুকতারাটাই জাগে।
ভূতের মত তখন দেখায় গাছপালা সব কালো,
ঝাপসা পথে, ঐ তারাটাই দেখায় কিছু আলো।
শরৎকালের সন্ধ্যাবেলা অস্তাচলের ঘাটে,
ছুটির আগে সূর্য যখন এসে বসে পাটে,
কোদাল-কুড়ুল মার্কামারা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে,
আকাশ পটে সোনার জলের চিত্র যখন আঁকে,
লক্ষ তারার সভার মাঝে, সবার আগে এসে,
একলা বসে ঐ তারাটাই সন্ধ্যা-তারার বেশে।
খোকন সোনার চাঁদ কপালে, 'টি' দিয়ে ও-ই যায়,
ঘুম জড়ানো চক্ষে খোকন ওরই পানে চায়।
বেলুন যানের পিছন দিকে হাউই বাজী জুড়ে,
পুচ্ছে তাহার আগুন দিয়ে, আলোর বেগে উড়ে,
মহাব্যোমের শূন্যপথে, সারা দিবস ভেসে,
সন্ধ্যাবেলা জ্বালবো বাতি, শুকতারাতে এসে।
ছেড়ে আসা ভাই-বোনেদের আর তোমাদের টানে,
কতোদিনে ফিরবো ঘরে স্বপনমুড়োই জালে।

বার-বাড়ির দাওয়ায় বসে জমিদার শাসমল মশাইকে তেল মাখাচ্ছিল ফকরে। হঠাৎ বাগানের ফটকের দিকে চেয়েই সে বলে উঠল, 'হেই বাবু, দেখেন-দেখেন,—হেথাকেই আসতেছে বে গো!'

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চুপি তোমার ঘরে ঢুকতো না। বুক ফুলিয়ে হাঁক-ডাক করে ঢুকতো।

তপন। কিন্তু পুলিশের মধ্যেও তো এমন কেউ কেউ থাকে, যারা চোরাই মালের বখরা নেয়। এ কথা কেন তোমার মনে হচ্ছে না রমেন?

রমেন। অর্থাৎ তুই বলতে চাস, হারটা তুই-ই তুলে নিয়েছিলি আমার পকেট থেকে?

তপন। আমি না বললেও হারটা যখন আমার পকেট থেকে বেরুলো, আমাকে চোর বলতে তোর বাধা কোথায়, আমি ভেবে পাচ্ছিনে রমেন।

রমেন। যদি তুই-ই হারটা নিতিস, প্রথমতঃ বাড়ি ফিরে সেটা পকেটে রেখে দিতিস না কখনো। অন্য কোনোখানে চালান করতিস ওটা; দ্বিতীয়তঃ ও লোকটা যখন বললে হারটা রয়েছে পকেটে তখন কোটটা টেনে এনে পকেট থেকে সেটা বের করে দেবার মতো বোকা আর যে হোক, আমার বন্ধু এই তপন চাটুজ্জে নয়। তৃতীয়তঃ—

তপন। (মুখে হাসি ও চোখে জল লইয়া) তৃতীয়তঃ?

রমেন। আমি ভেবে দেখলাম, তুই যখন আমার বন্ধু, এত ছোট কখনো হতে পারিস না তুই! চল্‌, হারটা নিয়ে মা'র কাছে যাই। গিয়ে বলি, মা, তোমার গলার হার তোমার বাক্সেই থাক। এবার পরীক্ষা আমি দেব না।

[তপনকে লইয়া বাহিরে যাইবে এমন সময় ভেতরের দরজা ঠেলিয়া তপনের দাদার প্রবেশ। তাহার হাতে এক'শ টাকার একখানি নোট।]

দাদা। দাঁড়াও!

তপন। দাদা!

দাদা। ঘুমোতে গিয়েছিলাম কিন্তু কানে এলো এ ঘরে কি সব কথা বার্তা হচ্ছে! মনে হতে লাগলো রেডিওতে একটা নাটক শুনছি। যাক। মধুরেণ সমাপয়েৎ। মা-মা, এটা ধারই দিচ্ছি তোমাকে। পরীক্ষায় পাশ কর, ভালো রোজগার কর—তারপর একদিন আমাকে ফেরৎ দিয়ো রমেন।

[রমেন ও তপন উভয়েই দাদাকে প্রণাম করিল। যবনিকা নামিল]

শাসমল মশাই সেদিকে না চেয়েই বলে উঠলেন, 'কে আসছে, চিনিস না তুই?'

'ওনারে আমি কেমন করে চিনবো কত্তা,— ও যে ম্যামসাহেব গো!'

জমিদার মশাই এবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, সত্যিই একজন মেম তাঁর বাগানের মধ্যে ঢুকছে, আর তার পেছনে-পেছনে আসছে একজন সাহেব। দু'জনেরই গোলাপের মত লাল টুকটুকে রঙ, আর পরনে দামী পোষাক।

সর্বনাশ! শাসমল মশাইয়ের পরনে একটি ছোট্ট পাড়-হাতি তেল-ধুতি, আর গায়ে তেল জবজব করছে—এই সময় কিনা মেম-সাহেব। তিনি কঙ্কনকে ধাঁধিয়ে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি শীগগির— কাপড়টা ছেড়ে, গায়ে একটা জামা দিয়ে আসি।'

সত্যিই মেম আর সাহেব দু'জনেই এসে দাঁড়ালেন একেবারে তাঁর বার-বাড়ির বৈঠকখানার সামনে।

ইতিমধ্যে শাসমল মশাই কাপড়-জামা বদলে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়েছেন। সাহেব-মেমকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি ঘরে এনে বসালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

কিন্তু তাঁর সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মেম-সাহেব বিনীত কন্ঠে এক গ্লাস জল চাইলেন।

তাঁরা দু'জনেই যে অত্যন্ত ক্লান্ত তা তাঁদের দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। শাসমল মশাই আর কোন কথা তোলার আগেই দুটো বড় বড় ডাব পেড়ে আনলেন গাছ থেকে, আর সেই সঙ্গে গাছের উৎকৃষ্ট কয়েকটা মর্তমান কলা এনে ধরলেন মেম-সাহেবের সামনে।

পেয়াপেট মিষ্টি ডাবের জল আর কলা খেয়ে সাহেব ও মেম দু'জনেই যেন প্রাণ ফিরে পেলেন; বার বার তাঁরা ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন শাসমল মশাইকে। তারপর মেম-সাহেব একটু মিষ্টি হেসে বললেন তাঁদের এখানে আসার কাহিনী।

ঘটনাটি হচ্ছে: ভোরের দিকে কলকাতা থেকে প্লেনে করে তাঁরা বেরিয়েছিলেন পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে। হঠাৎ প্লেনের ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায়, বাধ্য হয়ে এই অজানা জায়গায় তাঁদের নামতে হয়েছে। তারপর বহুক্ষণ ধরে তাঁরা ইঞ্জিন মেরামতের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে না পেরে, অগত্যা লোকালয়ের মধ্যে এসেছেন, ট্রেনে করে কলকাতা যাবার পথ আবিষ্কারের জন্যে। এদিকের পথ-ঘাট কিছুই তাঁদের জানা নেই।

মেম-সাহেবের কথা শুনে শাসমল মশাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কিছু ভাববেন না, আপনারা ক্লান্ত একটু বিশ্রাম করুন, তারপর আমি আপনাদের কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

দিলেনও তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকজন পাঠিয়ে, ছুটো-ছুটি করে, মেম-সাহেবকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন শাসমল মশাই।

এখনকার মত তখনকার গ্রামাঞ্চলে তেমন পথ-ঘাটও তৈরী হয়নি, আর বাস-মোটরও চলত না। এই গ্রাম থেকে সাত-আট ঘন্টার পথ গেলে তবে তাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনের কণ্টাই স্টেশনে পৌঁছতে পারবেন। এই পথ অতিক্রম করার একমাত্র বাহন ছিল তখন পাল্কী। মেম-সাহেবদের জন্যে এই পাল্কীরই ব্যবস্থা করেছিলেন শাসমল মশাই।

পাল্কীর কথা শুনে মেম-সাহেব তো অবাক—'পাল্কী আবার কি জিনিষ?' একটু ইতস্ততঃ করে তিনি প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে শাসমল মশাই বললেন, 'পাল্কীকে ইংরেজীতে বলে 'প্যালাঙ্কুইন।'

'ও-আই সি!— নাম শুনেছি বটে, তবে স্বচক্ষে দেখি যাই হোক কোন রকমে এখন স্টেশনে পৌঁছতে পারলেই হ' বললেন ইংরেজ মহিলাটি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষোল-সতেরোজন বেয়ারা হই-হই ক তিনখানা পাল্কী সমেত এসে হাজির হ'ল জমিদারবাবুর বাড়ির সদ দরজায়। অভিনব এই পাল্কীর চেহারা দেখে সাহেব ও মেম দু'জনে হেসে ফেললেন।

জমিদারবাবু অতিথিদের বসতে যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্যে পাল্কীর ভেতর মোটা তোশক পেতে দিলেন, আর সেই সঙ্গে একটা ঝুড়িতে কিছু ফল-পাকড় ও দুটো বোতলে ভরে দিলেন দু' বোতল জল। বাগান থেকে মালীকে দিয়ে তুলিয়ে দুটো ফুলের তোড়া দিলেন দু'জনের হাতে। এরপর মেম সাহেব দু'জনেই মহা খুস হয়ে পাল্কীতে গিয়ে উঠলেন, আর সেই সঙ্গে আর একটা পাল্কীতে গিয়ে উঠলেন জমিদার মশাই নিজেও। তিনি স্টেশনে তাঁদের গাড়িতে তুলে দিতে যাবেন।

'হুকুম ধাড়ে, হুকুম ধাড়ে' করে আওয়াজ তুলে, তিনখানি পাল্কী পর পর গ্রামের পথ মুখর করে স্টেশন অভিমুখে এগিয়ে চলতে লাগল। খানা-ডোবা, ক্ষেত-খামার পেরিয়ে, মাঠের আলের উপর দিয়ে রাস্তা ধরে পাল্কী যথাসময়ে স্টেশনে এসে পৌঁছে গেল সকলের মুখেই ফুটে উঠল 'আনন্দের চিহ্ন'।

স্টেশনে পৌঁছেই মেম সাহেব শাসমল মশাইকে প্রচুর ধন্যবা দিয়ে বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম, এবার আপনি বাড়ি ফিরে যান—আপনার উপকারের কথা কখনও ভুলব না।'

শাসমল মশাই কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'তা হয় না মেম সাহেব, আপনাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে আমি ফিরব।' বলেই প্ল্যাটফরমের একটা বেঞ্চে তিনি বসে পড়লেন।

সাহেব ও মেম তখনই তৎপর হয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে কি যেন সব ঠিক করে ফেললেন। তখন ইংরেজদের রাজত্ব সর্বত্রই লালমুখের খাতির। সাহেব-মেমের উপস্থিতিতে সারা স্টেশনে সোরগোল পড়ে গেল। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কেটেছে-কি-কাটেনি এমন সময় গমগম করে একখানা ইঞ্জিন প্ল্যাটফরমে এসে ঢুকল। ইঞ্জিনখানার সঙ্গে মাত্র একখানি সুসজ্জিত ফার্স্ট ক্লাস কামরা। রেল কর্মচারীদের সকলেই সাহেব-মেমকে সাদর অভিবাদন জানিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলে।

ট্রেণখানি রওনা হবার মুখে সকলের সামনেই শাসমল মশাইয়ের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক' করলেন মেম ও সাহেব। তারপর কর্ণবিদারী হুইসিলের সঙ্গে ট্রেণখানি স্টেশন ছেড়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল চোখের সামনে।

এই ঘটনার প্রায় পাঁচ-ছ মাস পরে যখন শাসমল মশাইয়ের কাছে মেম সাহেবের স্মৃতি প্রায় মুছে এসেছে, তখন হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টেই চমকে উঠলেন তিনি। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না শাসমল মশাই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দু-চারজন সম্ভ্রান্ত লোকও এসে হাজির হ'ল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন শাসমল মশাই—কাগজে বেরিয়েছে সে খবর।

সৌজন্যের পুরস্কার হিসাবে এই উপাধি দিয়েছেন তাঁকে তখনকার বাংলার গভর্ণর। স্ত্রীর অনুরোধেই গভর্ণর যে এই উপাধি দিয়েছিলেন শাসমল মশাইকে তাতে আর ভুল ছিল না।

এই ইংরেজ মহিলা ছিলেন তৎকালীন গভর্ণরের স্ত্রী এবং এ শাসমল মশাই ছিলেন মেদিনীপুরের বিখ্যাত নেতা দেশপ্রা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দাদা।

(এক)

সেই রোম্যান যুগের কথা।

ইংরাজের দেশ তখন জলা জঙ্গলে ভরা, মাঝে মাঝে দু-একখানা আর নগর। তখনও ওদেশে পাকা বাড়ী তৈরী হয়নি; সবই মাটির ী। কয়েকটি করে জনপদ নিয়ে এক একজন রাজা, এক একটি ়।

এখনকার এসেক্স অঞ্চলে তখন একটি রাজ্য ছিল, তার রাজা ন ক্যারেকটাকাস। একখানি মাটির বাড়ীতে তিনি থাকতেন— া রাণী আর একটি মেয়ে।

দিন সুখেই কাটছিল। কিন্তু সে শান্তি আর রইল না। ছোট বাদ সাধলো।

রাজা সিমবেলিস বড় ছেলেকে রাজ্য দিয়ে যান। ছোট ছেলে মনের মত হয়নি, তাই তাকে তিনি কিছুই দিয়ে যাননি। রাজার ্র পর বড় ভাই ক্যারেকটাকাস যখন রাজা হলো, ছোট ভাই বেরিকাস ন হিংসায় জ্বলে মরতে লাগলো। শেষ অবধি মনের জ্বালা াবার জন্য সে দেশান্তরী হলো।

বাইশ মাইল সমুদ্র পার হলেই গল রাজ্য, এখন সেখানকার নাম ছ ফ্রান্স। এই গল পর্যন্ত জয় করে রোম্যানরা তখন রাজ্য করে। কাস গলে এলেন। সেখান থেকে তিনি গেলেন রোম সম্রাট য়াসের কাছে। বললেন—সম্রাট, আপনাকে বৃটেন জয় করতে হবে। ্যানরা বীর, তারা গল অবধি রাজত্ব বিস্তার করলো, আর বাইশ ল সমুদ্র দেখে পিছিয়ে গেলো। এই কি বীরত্ব!

সম্রাট বললেন—আমরা বৃটেন জয় করলে তোমার কি লাভ?

বেরিকাস বললো—আমার লাভ শত্রুর শেষ করা। যারা আমাকে রাজ্যের অংশ দিল না, আমাকে তাড়িয়ে দিল, তাদের রাজ্যও আর বে না। আর সে দেশ জয় করে যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে, রাজ্য থেকে তারা আমায় তাড়িয়েছে, আমি সে রাজ্যের শাসনকর্তাও পারি।

সম্রাট বললেন—বেশ, তুমি সেই দেশ জয় করার জন্য আমাদের ায্য কর, তোমাকেই আমরা সেই রাজ্যের শাসনকর্তা করবো।

বিশাল রোম্যান বাহিনী তৈরী হলো। জাহাজ করে তারা সমুদ্র হলো। বেরিকাস তাদের সঙ্গে চললো,—তাদের পথ দেখিয়ে লা।

বিশাল সুসজ্জিত রোম্যান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মত ও অস্ত্র তখন ক্যারেকটাকাসের কোথায়? তিনি স্ত্রী কন্যা নিয়ে ণর গেলেন। বিদেশী সৈন্যের অত্যাচারের ভয়ে প্রজারাও রাজ্য ড় পালিয়ে গেল। নগরে পৌঁছে রোম্যানরা লড়াই করার মত মানুষ খুঁজে পেলে না। কিন্তু যুদ্ধে রোম্যানরা সেখানে জাঁকিয়ে বসলো, এবং ধীরে ধীরে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়লো।

রোম্যানরা বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে ক্যারেকটাকাস ক্রমে পালিয়ে যান। শেষে রোম্যানরা এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরলো যে ক্যারেকটাকাস আর পালাবার স্থান পেলেন না।

সামান্য এক যুদ্ধে ক্যারেকটাকাস বন্দী হলেন।

বেরিকাস ভাবলো এইবার তার সুবিধা হবে। কিন্তু রোম্যানরা তাকে আর আমলই দিল না। তাকে দেখেও আর চিনতে পারে না, এমনি ভাব। বেরিকাস জনতার মাঝে হারিয়ে গেল।

রোম্যানরা ক্যারেকটাকাসকে স্ত্রী কন্যা শুদ্ধ ধরে নিয়ে এলো রোমে। রোম নগরী দেখে ক্যারেকটাকাস তো অবাক। রাজসভায় তিনি বললেন—যাদের এমন নগর, এতো বড় বড় বাড়ী, এতো সমৃদ্ধি, এমন সাজানো দেশ, তারা গেল কিনা আমার দেশের কয়েকখানা মাটির ঘর দখল করতে, জঙ্গলে রাজা হতে!

সম্রাট বললেন—আমরা তো যাইনি, তোমার ভাই বেরিকাস আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে।

—তার কি লাভ হলো?

—দেশদ্রোহীর আবার লাভ কি হবে? আজ সে ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে, কাল সে আমাদের বিরুদ্ধে আর কাউকে ডেকে আনবে।

রোম সম্রাট ক্যারেকটাকাসকে নির্বাসিত করলেন।

দেশদ্রোহী বেরিকাসের কি হলো কেউ জানে না। বিভীষণ যে চার যুগ বেঁচে আছে, বেরিকাস তার এক যুগের নমুনা।

(দুই)

সাগরের পারে ইতালির ছোট্ট একটি সুন্দর নগরী ভিনিস। সেকালে এই ভিনিসের সদাগরদের খুব সুনাম ছিল। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব পাড় থেকে মালপত্তর কিনে এনে পশ্চিম পাড়ে তারা বেচতো, লাভ করতো প্রচুর। পয়সার জৌলুসে ভিনিস নগরী জম্ জম্ করতো।

ভিনিস নগরীর একটা বড় বিশেষত্ব এই যে, এখানে কোন রাজপথ নেই, শুধু খাল। খালের ধারে যত বাড়ী। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে হলে নৌকা করে যেতে হবে। খাল গিয়ে পড়েছে সাগরে। বাড়ীর দরজার সঙ্গে সাগরের সোজাসুজি যোগ। জন্ম থেকেই তাই ভিনিসের লোকেরা নৌকা চড়তে আর নৌকা চালাতে ওস্তাদ।

ভিনিসের সদাগররা দেশ বিদেশে যেত বাণিজ্য করতে। যে একবার জাহাজ নিয়ে সাগরে ভেসে পড়তো সে যে কবে ফিরবে, কোথায় আছে, সে খবর সহজে মিলতো না। তখনকার দিনে তো আর পোষ্টাপিস ছিল না।

ছোট্ট ছেলে মার্কো একা থাকে বাড়ীতে। ছেলেবেলায় মা মারা গেছে। বাবা ও কাকা গেছে বাণিজ্য করতে। বাড়ীতে আপনার জন বলতে আর কেউ নেই, মাঝে মাঝে মন কেমন করলে নৌকা নিয়ে সে আসে বন্দরে, দেখে কোন জাহাজ এসে ভিড়েছে, জানা চেনা কেউ আছে কি না, কেউ বলতে পারে কিনা তার বাবা-কাকার খবর।

মুখ চেনা কাউকে কোন জাহাজে দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করতো —আমার বাবার খবর কিছু জানেন?

কেউ বলতো—তারা গেছে পারস্যে।

কেউ বলতো—তারা দুভাই আছে চীনদেশে।

আবার কেউ বলতো—তাদের কোন পাত্তা পাইনি।

দশ বছর হয়ে গেছে বাবা ও কাকা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, এখনও

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

কোন এক সহরে একটি কৌতূহলী ছেলে থাকতো। সে প্রত্যেক কিছু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে বেড়াতো।

একদিন সেই কৌতূহলী ছেলেটি একটি বিজলী বালবের উজ্জ্বল আলোয় আকৃষ্ট হলো।

সে বললে, "প্রিয় ছোট বালব, বল তো তোমাকে এমন উজ্জ্বলভাবে জ্বালাচ্ছে কে?"

বালবটি সহাস্যে উত্তর দিলে, "সূর্য।"

ছেলেটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বালবটির দিকে তাকালো।

সে বললে, "এ অসম্ভব! পথে পড়ে থাকে যে সব কাচের টুকরো তারা রোদে ঝক্ ঝক্ করে—সেগুলো সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে থাকে। চাঁদও সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়। আমি এ সব ইস্কুলে শিখেছি। তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছো কেন, বালব?"

বালবটি উত্তর দিলে, "তোমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করব কেন? আমাকে যদি তুমি বিশ্বাস না করো, তাহলে নিজেই গিয়ে খুঁজে বার করো কে আমাকে আলো দেয়।"

এই মন্তব্য করে ক্ষুদ্র ছোট বালবটি নিভে গেল।

ছেলেটি কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর যে বিজলী-তারগুলো বাড়ি বাড়িতে বিজলী-আলো এনে দেয় সেগুলোকে অনুসরণ করে বরাবর চলতে লাগলো।

যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বিজলী-ষ্টেশনে পৌঁছলো ততক্ষণ সে কেবলই চলতে লাগলো। সেখানে ঢুকে দেখলো প্রকাণ্ড এক বিজলী-কল এত তাড়াতাড়ি ঘুরছে যে ঘরের মধ্যে হচ্ছে ঘোর ঘর্ঘর শব্দ।

কলটা করছে "ঘরররর..........."

ছেলেটি বললে, "ওহে বিজলী-কল! তুমি বিজলী বালবের জন্যে আলো তৈরি করো?"

বিজলী-কলটি উত্তর দিলে, "করি। কিন্তু নিজে নয়। আমার একটা জল-টারবাইন ঘোরায়। তার মানে সেটা বিজলী-বালবে আলো দেবার জন্যে আমাকে কাজে লাগায়।"

কৌতূহলী ছেলেটি জল-টারবাইনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে বিজলী-বালবের জন্যে আলো তৈরি করে কী?

সে বললে, "হাঁ। কিন্তু আমার নিজের শক্তিতে আমি ঘুরি না। জল আমাকে ঘোরায়। আমার পাখাগুলোর ওপর জল পড়ে আর আমায় ঘোরায়। তার মানে জল আমাকে আর আমার বেলা বিজলী-কলকে বিজলী-বালবের জন্যে আলো তৈরির কাজে লাগায়।"

ছেলেটি যদি তেমন কৌতূহলী না হোত তাহলে ওতেই সন্তুষ্ট হোত। জল টারবাইনকে ঘোরায়......টারবাইন ঘোরায় বিজলী-কলকে... বিজলী-কল বিজলী তৈরি করে। এতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু সে জানতে চাইলো জল কি বলে, কারণ বস্তুর মূলে কী তাই জানার তার আকাঙ্ক্ষা।

তাই সে বিরাট জলাধারের উঁচু বাঁধের ওপর উঠে গেল।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফিরলো না। তবে তারা কি এখনও বেঁচে আছে? পনেরো বছরের ছেলে আর ভাবতে পারে না।

একদিন সন্ধ্যা বেলা উদাস ভাবে ছেলেটি জানালায় বসে আছে, এমন সময় একখানি নৌকা এসে লাগলো বাড়ীর ঘাটে। নৌকা থেকে নামলো দুটি লোক, ডাক দিল—মার্কো—মার্-কো!

মার্কো চমকে উঠলো। ছুটে গেল দরজায়। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা ও কাকা।

বাবা বললেন—ইস্, তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!

কাকা বললেন—তোকে পাঁচ বছরের দেখে গেছি, সে তো এ-ই এ-তো টুকুন!

মার্কো বললো—বারে ঃ, তোমরা তো দশ বছর পরে বাড়ী ফিরলে।

বাবা বললেন,—কোথায় গেছিলাম জানিস? সেই চীন দেশে। সেখানকার সম্রাট কিছুতেই আসতে দেবে না। অনেক বলে-কয়ে তবে ছুটি পেয়েছি।

তারপর বাবা ও কাকা সুরু করেন দেশ-বিদেশের গল্প— বোখারা, সমরখণ্ড, চীন দেশ। দশ বছরের ভ্রমণ কাহিনী, সহজে ফুরায় না।

দুটি বছর গল্প শুনেই কেটে গেল। তারপর বাবা বললেন,— আবার যেতে হবে, চীন সম্রাটের দরবারে। দুটি জিনিষ নিয়ে যাবার কথা আছে। জেরুসালেমে যীশুর সমাধির পাশে যে পিদিমটি জ্বলে তার একটু তেল, আর দু-একজন ভালো পণ্ডিত লোক।

মার্কো বলে,—এবার আমিও যাব। এখানে একা একা থাকতে আমার ভালো লাগে না।

বাবা ও কাকার সঙ্গে সেবার মার্কোও বেরিয়ে পড়লো। ভিনিস থেকে প্যালেস্টাইন।

প্যালেস্টাইনের বন্দরে নেমে বরাবর হাঁটা পথ।

পারস্য পার হয়ে ইক্ষু নদী। তারপর পামিরের মালভূমি। তারপরই চীনদেশ।

চীনদেশের সম্রাট কুবলাই খাঁ, জেরুসালেমের পিদিমের তেল পেয়ে ভারী খুসী হলেন। মার্কোকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এটি কে?

বাবা বললেন,—এটি আমার ছেলে মার্কো।

—বেশ ছেলেটি তো, বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। একে আমি আমার কাছে রাখবো। আজ থেকে এ হলো আমার বিশেষ কর্মচারী।

মার্কো চীন সম্রাটের স্নেহভাজন হলো।

কিন্তু তা বলে সম্রাট তাকে বসিয়ে রাখলেন না। নানা কাজে নানা দেশ মার্কোকে ঘুরতে হলো। বিশ বছর ধরে শুধু তাকে ঘুরে বেড়াতে হলো দেশে-বিদেশে।

ঠিক কুড়ি বছর পরে মার্কো বাপ ও কাকার সঙ্গে আবার ভিনিসে ফিরলো।

তখনকার দিনে অত্যে বেশী ঘোরাঘুরি আর কেউ করেন নি। মার্কো যত ঘুরেছে ততো দেখেছে। যখন সেই সব কথা সে বলে, তখন কেউ তা বিশ্বাস করে না। বলে—যত সব মনগড়া গল্প।

শেষে মার্কো আর মুখে কাউকে কিছু বলেন না, বসে বসে শুধু লেখেন। পুরো একখানি বই তিনি লিখে ফেললেন। সেই ভ্রমণ কাহিনী একদিন বিশ্ববিখ্যাত হলো, আজও লোকে মার্কো পোলোর সেই ভ্রমণ-কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। একখানি বই মার্কো পোলোকে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করে রাখলো।

সংস্বভাব ও সৎসাহস উভয়েই সম্মানের সোপান। অপরের সম্মান নষ্ট করলে একদিন নিজের সম্মানও নষ্ট হবে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা। জগতে বহু জীবই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। মানুষই কেবল মনের ভাব মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে অন্য ভাব প্রকাশ করে। এজন্যে মানুষ মিথ্যাবাদী, অন্য জীব মিথ্যা কথা বলে না। তাই তারা দৈবী শক্তি পায়। মানুষের মত মানুষ যারা, তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না, তাই তাঁরা মহৎ। যে মানুষ মিথ্যা কথা বলে না, সে অসাধারণ আত্মশক্তি লাভ করে। এই শক্তিবলে সে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল অস্থির আর অসংযত। মনকে সংযত ও শান্ত রাখা দরকার, তা না হলে জগতে উন্নতি করা যায় না। মনোবৃত্তিগুলিকে সংযত করার জন্য অভ্যাস চাই। অভ্যাসের অসীম শক্তি। যে নিজেকে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেন। অতীতের জন্য উদ্বেগ অনুভব করা অনর্থক। ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়াও সমানভাবে অনর্থক। উদ্বেগে মন ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ ছুটতে থাকে, ফলে বর্তমানের কাজগুলো ঠিকমত হয় না। বর্তমানকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলাই একান্ত আবশ্যক। মনের ওপর উদ্বেগ কখনও রাখতে নেই, এর সুনিশ্চিত অনিষ্টকারিতা ও অসারতা আছে। কোন বিষয়ের উদ্বেগ এলে দেখতে হবে, সে বিষয়টি আয়ত্ত করা যায় কিনা, যদি তা আয়ত্ত করা যায়, তাহলে আয়ত্ত করতে হবে আর যদি তা আয়ত্তের বাইরের বিষয় হয়, তা হলে সে সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করা উচিত নয়, কেন না এর পরিণাম নিজের অনিষ্ট সাধনই করে। নিজের দোষ ও দুর্বলতা দূর করার জন্যে দৃঢ় প্রচেষ্টা করতে হবে, নতুবা জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। যারা অলস, তাদের কুরসুৎ কম। আলস্যই অভাবের জনক। কথায় সংযমী, কাজে সুদৃঢ় না হোলে মানুষ হওয়া যায় না। একের বোঝা দশের লাঠি। সমাজে, সংসারে শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে দশের সাহায্য আবশ্যক। যেখানে হাতটান, সেখানে সব মাটি হয়ে যায়। শিল্প বাণিজ্য কৃষি সমাজ সংসার সব এই হাত-টানের জন্যে ধ্বংস হোতে পারে। এজন্যে সৎ হওয়া আবশ্যক। যে জাতির প্রত্যেক লোকই সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ, সে জাতি বড় হয়ে ওঠে। যে জাতির কর্তব্যের ঠিক নেই, যে জাতির প্রত্যেকটি মানুষ অসৎ, আত্মকেন্দ্রিক ও কর্তব্যজ্ঞানহীন, সে জাতির অবনতি হোতে বাধ্য। যত ক্ষুদ্রই হোক্ কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করতে নেই। পরিশ্রম জগতে আপনার অস্তিত্ব রক্ষার একটি উপকরণ। যে কাজ নিজে করতে পারা যায়, কখন তা অপরকে আদেশ করা অনুচিত। আত্ম-নির্ভরতাই মানুষকে কৃতী পুরুষ করে—শ্রমশীলতা ও সময়ের সদ্ব্যবহার ভিন্ন উন্নতির সোপানে ওঠা যায় না। কর্মে পরাঙ্মুখ হওয়াই অবনতির প্রধান কারণ। লোকের কাছে যেরূপ ব্যবহার আশা করবে সেইরূপ ব্যবহার নিজেও করবে। সৎপথে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও বরং অসৎপথে থেকে লাভবান হওয়া অপেক্ষা অনেক ভালো, কেননা তাতে হৃদয়টা তবু শান্তিতে থাকে। সঙ্কল্পের অপূর্ণতাই অকৃতকার্যতার মূল কারণ। সকলেই চিত্রকর, সকলেই কবি, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাকে যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন সে সেইরূপ কার্যে প্রবেশ করে একনিষ্ঠ-ভাবে কর্মী হলে পারদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী। বাগ্মিতা একটা মহাশক্তি—বক্তৃতায় জাতিকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয়, মানবকে সাহসী করে—এই বাগ্মিতাই রোমের ধ্বংসের কারণ। অহরহ মতলব পরিবর্তন করা সাংঘাতিক, কিছুতেই কোন কাজেই সফলতা লাভ হয় না। এজন্যে একটা মতলব স্থির করে সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাতে লেগে থাকতে হয়, তাহলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হবে। জীবনে সাফল্য সিদ্ধিলাভ করতে হোলে ভালো জীব অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবান মানুষ

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সে জিগ্যেস করলে, "বিশাল জলাধার, তুমিই কী আমাদের জন্যে বিজলী তৈরি করো?"

ব্যস্তভাবে ফুলে-ফেঁনিয়ে উঠতে উঠতে জলাধার বললে, "আমার জল টারবাইনের পাখাগুলোয় পড়ে আর ওটা ঘোরে। কিন্তু আমার জল আমি পাই আমার মা নদীর কাছ থেকে। এ সম্বন্ধে তুমি তাকে জিগ্যেস করো।"

ছেলেটি নদীর কাছে গিয়ে তাকে নমস্কার করে জিগ্যেস করলে, "তোমার ছেলে ঐ প্রকান্ড জলাধারকে যে জল দাও তা কোথা থেকে পেয়ে থাকো?"

সে বললে, "আমার জল নিয়ে থাকি আমার ভাই-বোন ছোট ছোট নদী আর জলধারার কাছ থেকে। আর ওরা জল নেয় বর্ষা-মেঘের কাছ থেকে। আরও বেশি খবর জানবার জন্যে তুমি বর্ষা-মেঘের কাছে যাও।"

বর্ষা-মেঘ উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ঘুমোচ্ছিল। ছেলেটি চূড়ায় উঠে গিয়ে মেঘের সঙ্গে কথা বললে এই ভাবে, "অতি শ্রদ্ধেস্পদ বর্ষা-মেঘ, বলুন তো কার কাছ থেকে আপনি বৃষ্টি পান?"

বর্ষা-মেঘ উত্তর দিলে, "সূর্য আমায় বৃষ্টি দিয়ে থাকে।"

কৌতূহলী ছেলেটি বুঝতে পারলো না, তপ্ত আর শুষ্ক সূর্য কি ভাবে বর্ষা-মেঘকে জল দিতে পারে, কিন্তু আরও অনুসন্ধান করতে লজ্জা অনুভব করলো।

যা-হোক, বর্ষা-মেঘ নিজেই ব্যাপারটি খোলসা করে বললে।

"দেখ, সূর্যের তপ্ত রশ্মিতে সাগর-মহাসাগরের জল বাষ্প হয়। সেই বাষ্প বর্ষা-মেঘে পরিণত হয়ে থাকে। বর্ষা-মেঘ পৃথিবীর ওপর ভেসে বেড়ায়, বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। বৃষ্টি নদী-নালা-পুষ্করিণী ভরে তোলে..........."

এবার ছেলেটি সব বুঝে সানন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে সে বিজলী-বালবকে বললে, "বালব-মণি, আমায় ক্ষমা করো। এখন আমি জানলাম কে তোমায় উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে রাখে।"

বালবটি আবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে শুরু করলো। ঠিক তখনই সূর্য ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বললে, "আমার নাতনীর মেয়েকে কে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে রাখে তা খুঁজে বার করে ঠিক কাজই করেছো। সব রকমের উৎকৃষ্ট রহস্যের মূলে কি আছে তা জানবার চেষ্টা করবে, কৌতূহলী হবে, বাবা। তোমার ভালো হোক!" *

---

* ইয়েতজেনী পারমিয়াক—রুশ লেখকের কাহিনী থেকে।

হওয়া আবশ্যক। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেছেন, ভারতের ছেলেরা শ্রমকাতর নিশ্চেষ্ট এজন্যে সময়াভাবের ওজর করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এদের প্রকৃতই ইচ্ছার অভাব, সেইজন্য অলস আর অকর্মণ্য। উন্নতি করবার দৃঢ় সংকল্পের প্রতি লক্ষ্য থাকলে সময়ের অভাব হয় না, এটা সুনিশ্চিত। কৌতূহলবশে সখ করেও কখন পাপের পথে পদার্পণ করা উচিত নয়। নৈতিক অধঃপতনই পাপের জনক। মানবের নৈতিক ধর্ম সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। সকল বিষয়ে সুসমঞ্জস পরিস্থিতিই প্রকৃত সভ্যতা। গোঁড়ামি ধর্ম নয়। সর্বজীবে ভগবানের মূর্তি দেখার অভ্যাস না করলে গোঁড়ামির ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। প্রার্থনার দ্বারা ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। কুঅভ্যাস বিষবীজাণু—উপেক্ষা করলেই সর্বনাশ। ঘুষ খেয়ে আর সামাজিক অকল্যাণ করে যারা বড়লোক হয়, তারা জীবনে বহু কষ্ট পেয়ে প্রাণত্যাগ করে, জন্মজন্মান্তরেও কষ্টভোগ করে। মানুষের চতুর্দিকে বিপদ, অসতর্ক হলেই সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হোতে পারে। পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যয় আর পরিমিত কথা, এইগুলি সদ্গুণ আর সুখের আকর। যে মানুষ সরল, সত্যবাদী, দয়ালু ও সদাপ্রসন্ন, সে-ই শান্তি সুখ অবাধে উপভোগ করে। যার ধর্মের আবরণ নেই, সে যত বস্তুই পরিধান করুক না কেন, তার দরিদ্র বেশ। শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করতে নেই। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শুধু যে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় তা নয়, সাংসারিক জীবনে বহু বিষয়ে সাবধান সতর্ক হয়েও চলতে পারা যায়। সৌভাগ্য ও যশ অনায়াসসাধ্য নয়। অদৃষ্টবাদী আশার আশায় বসে থাকে, তার কোন দিন উন্নতি হয় না। টাকা জাতীয় ধন নয়, শক্তিশালী মানুষই জাতীয় ধন। কর্মের অনভ্যস্ততা দারিদ্র্যের পোষাক। বর্তমান শিক্ষায় পাটোয়ারী বুদ্ধির উৎকর্ষতা হওয়াতে দেশের নৈতিক অবনতি ও অন্নসমস্যার আধিক্য ঘটেছে। সৌন্দর্য মন ভুলায়, গুণ হৃদয় জয় করে। নিজের কল্যাণের জন্যে নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, ভয় ও আলস্য এই ছয়টি দোষ পরিহার করা দরকার। কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যের দিকে আঙুল বাড়ানো শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। কারো গা ঘেঁষে বা কনুই দিয়ে ঠেলে চলা উচিত নয়, রাস্তা চলতে সর্বদাই ডান রেখে চলতে হয়। দয়া ধর্মের আর অভিমান নরকের মূল। কুপথ্য, বহু জনতা ও দুশ্চিন্তা যথাসাধ্য পরিবর্জন করা উচিত। যে লোক নিজের বর্তমান অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করবার জন্যে প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হয় না, তার দফারফা অর্থাৎ সে লোক জীবনেও উন্নতি করতে পারবে না। কখন দুঃখ ধার করে টেনে আনা উচিত নয়, যদি দুর্ঘটনা আদৌ না ঘটে তাহলে দুর্ঘটনার ভয়ে অহরহ চিন্তা করা অনাবশ্যক আর ক্ষতিকর। জীবন নশ্বর, কিন্তু জীবনের কর্ম অবিনশ্বর—অক্ষয় কীর্তিই ইহজগতের নামের স্মৃতি আর অস্তিত্ব রক্ষা করে। চরিত্রহীন ব্যক্তির জীবনে কোন স্থির লক্ষ্য নেই। বায়ুতাড়িত তরণীর মত সে জীবনের স্রোতে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সঙ্গতি সত্ত্বেও চরিত্রবিহীন সফলতা লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র ধন থাকলেই পরের উপকার করা যায় তা নয়—শরীর, মন, বাক্য ও কার্য দ্বারাও অপরের বিস্তর উপকার করা যেতে পারে। যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়াকে ন্যায়পরতা বলে। ন্যায়পরতাই সমাজ রক্ষার মূল। ন্যায় বুদ্ধির অভাব হোলেই মানুষ পশুত্বে পরিণত হয়। তখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির স্বত্ব লোপ করে আর এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে অন্যায়রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ধরাতল নরশোণিতে প্লাবিত করে থাকে। কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার গ্লানি করা বা তার কলঙ্ক রটনা করাকে পরনিন্দা বলে। পরনিন্দুক জোঁকের মত। জোঁক যেমন মাতৃস্তনের দুধ পান না করে রক্ত পান করে, পরনিন্দুকও সেই রকম পরের সদ্গুণ সমস্ত ত্যাগ করে দোষগুলিই গ্রহণ করে থাকে। যারা পরনিন্দা শ্রবণ করে বা এর প্রশ্রয় দেয় তারাও ক্রমশঃ হৃদয়ের উচ্চতা ও সাধু সঙ্কল্প নষ্ট করে নিজের চরিত্র কলুষিত করে। সংসর্গের ক্ষমতা অসীম। সঙ্গ দ্বারাই মানুষের চরিত্র বিচার হয়ে থাকে।

ক'লকাতাতে দুর্গা এলেন
সিংহী মামার পিঠে
পাড়ায় পাড়ায় ছড়ায় হাসি
গন্ধ মিঠে মিঠে।
অলিগলি সব খানেতে
ঠাকুর পেলেন ঠাঁই
ঠন্‌ঠনে সেই কালীবাড়ীর
ঢং খানা সে নাই।
ভীড় জ'মেছে ট্রামে বাসে
ভীড় জ'মেছে মাঠে
হুল্লোড়েতে ছেলেমেয়ের
ব'সলো না-মন পাঠে।
লক্ষ্মী ঘোরেন হাজার বাজার
"পূজোর জামা কই?"
সরস্বতী বলেন, "কোথায়—
রঙিন মজার বই!!"
গড়ের মাঠে কার্তিকেরই
ময়ূর উড়ু উড়ু
ফচ্‌কে ছেলে মুচ্‌কি হাসে
কুঁচ্‌কে কালো ভুরু।
বাস্তু-হারা আস্ত-অসুর
মস্ত মোষের পেটে
থাপ্‌সা চোখে ভেপ্‌সে গেল—
ঢ্যাপ্‌সা, মোটা, বেঁটে।
গণেশ হাসেন শুঁড় দুলিয়ে
ভীড় জ'মেছে দেখে—
সিদ্ধি খেয়ে শুদ্ধি হোলো
বুদ্ধি পেটে রেখে।
ইঁদুর, পেঁচা, হংসরাজের
বংশ যত আছে
সবাই আসে পিল্‌পিলিয়ে
দুর্গা মায়ের কাছে।
কৈলাসেতে নন্দী কাঁদে
ভৃঙ্গী খেলো ঘোল
ক'লকাতাতে গোলমালেতে
আমরা বাজাই ঢোল।

দিগম্বর পতির ছেলে নটবর পতি। বাড়ী ঢেঙ্কানল। দিগম্বর কলকাতায় চাকরী করে। সেবার ছুটিতে বাড়ী যেতে ছেলে ধরে বসল তাকে সহর দেখাতে হবে। যে সে সহর দেখালে চলবে না—খোদ কলকাতা সহর দেখাতে হবে।

কি আর করা? দিগম্বর ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এল।

কলকাতায় এসে নটবর দিশেহারা হয়ে পড়ল। গ্রামের ছেলে সে, এর ওর কাছে বড় বড় সহরের গল্প একটু আধটু শুনলেও এ ধরণের ব্যাপার সে কল্পনাও করতে পারে নি। সবচেয়ে মুস্কিল হ'ল রাতের বেলায়। কখন যে দিন শেষ হয়ে রাত সুরু হচ্ছে সে ধরতেই পারত না। রাস্তা জুড়ে একটির পর একটি ফ্লুওরোসেণ্ট লাইট জ্বলেছে। দুধের মত সাদা তার আলো, কিন্তু এমনি স্নিগ্ধ যে চোখে একটুও জ্বালা ধরে না। দোকানে, বাজারে, এমন কি ঘরের মধ্যেও সেই আলো! তাদের গাঁয়ের মিটমিট্ করে জ্বলা কেরোসিনের ডিবের সঙ্গে তফাৎটা যেন বড় বেশী। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে। দিগম্বরকে অগত্যা আবার ফিরে যেতে হ'ল দেশে,—ছেলেকে পৌঁছে দেবার জন্য।

বাস্তবিক দুনিয়া যেন বড়বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। ফ্লুওরোসেন্ট আলো অবশ্য কলকাতায়ও খুব বেশী দিন আসে নি, তবে চোখ-ঝলসানো নিওন আলোর আমদানী হয়েছে অনেক দিন। সাধারণ বিজলী বাতির তো কথাই নেই।

আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু বিজলী বাতিও এত বেশী দেখা যেত না। কেবলমাত্র সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই ও-জিনিষের চল ছিল। বাড়ীর কাজে মোমবাতি, কেরোসিনের ল্যাম্প বা হারিকেন-লণ্ঠনই ব্যবহার হ'ত বেশী, আর কলকাতার রাস্তায় জ্বলত উজ্জ্বল গ্যাসের আলো। হ্যাঁ, উজ্জ্বলই বলা যায় তাকে। এখনকার কলকাতার কোন কোন রাস্তায় যে মিটমিটে গ্যাসের আলো দেখতে পাওয়া যায় তখনকার সে আলো কিন্তু সে রকম কমজোরী ছিল না মোটেই। বরং বিজলীবাতির চেয়ে বেশী সাদা এবং উজ্জ্বলই লাগত তাকে। গ্যাসের আলোর এই অবনতির জন্য ততটা দায়ী বোধ হয় গ্যাস নয়—যতটা দায়ী ঐ গ্যাস যারা তৈরী করছে তারা।

এই গ্যাস লাইটের প্রবর্তন বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কত বড় একটা অভাবনীয় ঘটনা তা ভাবতে অবাক্ লাগে।

সেখানকার রাজা-রাজড়াদের জমকালো সভার বর্ণনা যখন পড়ি তখন মনে হয়, না-জানি কি ঝলমল করা, ঐশ্বর্য-সমারোহপূর্ণ ছিল সেই সভা! ঐশ্বর্যের বাড়াবাড়ি হয়তো ছিল ঠিকই, কিন্তু ঝলমল করা সভা তাকে মোটেই বলতে রাজী নই আমরা। বিশেষ করে রাতের সভা। হয়তো একসঙ্গে হাজারটা মোম বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত। ছাদ থেকে ঝোলানো ঝাড়ের মধ্যে বসানো সেই মোমবাতি ঝাড়ের কাঁচ প্রতিফলিত হয়ে হাজার হাজার টুকরোয় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত—সেটাও ঠিক। কিন্তু তবু বলব, সে আলো এখনকার তুলনায় ছিল নিতান্ত নগণ্য।

আলোর রাজ্যে প্রথম বিপ্লব আনে এই গ্যাস লাইট।

গ্যাস লাইট কি করে আবিষ্কার হ'ল, কি করে লোকে তা কাজে লাগাতে শিখল সে কাহিনীও কম কৌতূহলপ্রদ নয়।

গল্প সুরু করার আগে একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞেস করে নেই। গ্যাস লাইটের এই যে গ্যাস আসলে সেটা কি তা জান তো? এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে কোল্ গ্যাস,—অর্থাৎ কয়লা-গ্যাস। কয়লাকে যদি বন্ধ করা পাত্রে রেখে তেমন ভাবে পোড়ানো যায় তা হলে ধোঁয়ার মত যে জিনিষটা বেরিয়ে আসে তারই নাম কোল্-গ্যাস। আসলে কিন্তু এটা একটা গ্যাস নয়—অনেকগুলি গ্যাস মেশানো আছে এর মধ্যে,—বিজ্ঞানের ভাষায় অনেরকে বলা হয় হাইড্রো-কার্বন। হাইড্রো-কার্বন ছাড়াও কিছু কিছু অন্য গ্যাস ওর মধ্যে আছে। সবগুলো মিলে সহজ নামকরণ হয়েছে কোল্ গ্যাস।

অনেক দিন আগেকার কথা। ইংল্যাণ্ডে হোয়াইট হেভেন নামে একটি জায়গায় ছিল অনেকগুলি কয়লার খনি। সেখানে প্রায়ই দেখা যেত,—কয়লা থেকে ধোঁয়ার মত কি একটা জিনিষ বেরুচ্ছে আর কোন রকমে আগুনের ছোঁয়া পেলেই দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে। খনির লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও সে আগুন নেভাতে পারত না। অগত্যা ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, তারা কয়েকটা বড় বড় চিমনি তৈরী করে দিল, যাতে ধোঁয়াটা সেই চিমনি বেয়ে উঠে যেতে পারে। যেতও তাই; কিন্তু সেখানেও, অর্থাৎ চিমনির মাথায় উঠেও সে আলো সমানে জ্বলতে থাকত আর আশপাশের সমস্ত জায়গা উজ্জ্বল করে রাখতো।

এই ঘটনাটা একটা খবরের কাগজে পড়ে ক্লেটন নামে এক ভদ্র-লোকের মাথায় খেয়াল চাপল ব্যাপারটার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি একটা কেটলির মধ্যে খানিকটা কয়লা ভরে আগুনে চাপিয়ে দিলেন, আর একটু পরেই যখন কেটলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল তখন সেই ধোঁয়া নিয়ে একটা রবারের ব্লাডারের মধ্যে পুরে ফেললেন। এইবার ব্লাডারের গায়ে একটা ছোট ফুটো করতেই সেই ফুটো দিয়ে সোঁ সোঁ করে গ্যাস বেরুতে লাগল, আর তার সামনে আগুন ধরতেই তা দপ্ করে জ্বলে উঠল। ক্লেটন রাতের অন্ধকারে এই পরীক্ষা করে দেখলেন। অন্ধকারে সেই জ্বলন্ত গ্যাস তীব্র আলোকচ্ছটা বিকীরণ করতে লাগল। ক্লেটন বন্ধুদের ডেকে এই "মজার কাণ্ড" দেখালেন। তারাও এসে এই মজা দেখে তারিফ করে চলে গেল।

ক্লেটন কিন্তু তাঁর পরীক্ষা ঐখানেই শেষ করলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটা ছিল শুধুই একটা "তামাসা"; ওর মধ্যে যে আর কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

যিনি ভাবলেন তাঁর নাম উইলিয়াম মারডক্। আরও পঞ্চাশ বছর পরের লোক তিনি।

তোমরা জেমস্ ওয়াটের নাম নিশ্চয়ই জান—ষ্টীম্ ইঞ্জিনের আবিষ্কারক হিসেবে যাঁর নাম অমর হয়ে আছে। মারডক্ ছিলেন এই ওয়াটেরই কারখানার এক কর্মচারী। তুখড় বুদ্ধির অধিকারী কিন্তু স্বভাবে অত্যন্ত লাজুক।

দিনের বেলায় মারডক্ কারখানায় কাজ করতেন, কিন্তু আর সবাইকার মত রাতের বেলায় আড্ডা দিয়ে আর হৈ-হৈ করে সময় নষ্ট করতেন না। রাত্রে তাঁর কাজ ছিল বসে বসে বই পড়া আর নানা রকম খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করা। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় ঐ সব কাজ করতে তাঁর খুবই অসুবিধা হত। প্রায়ই ভাবতেন একটা উজ্জ্বল জোরালো আলোর ব্যবস্থা করা

যায় না কোন রকমে? যা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলবে,—অনেকটা জায়গা জুড়ে এবং অনেকটা তীব্র আলো ছড়িয়ে?

শেষে এমন হ'ল যে মারডক অন্য সব বিষয় ছেড়ে শুধু ঐ নিয়েই পড়াশোনা আর ঐ নিয়েই পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন তাঁর হাতে কি করে ক্লেটনের সেই 'তামাসার' বিবরণ এসে পড়ল। মারডক একটা নতুন পথের সন্ধান পেলেন যেন।

আবার চল্‌ল তাঁর পরীক্ষা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, একটির পর একটি দোষ-ত্রুটি শুধরে নিয়ে অবশেষে মারডক সত্যি সত্যি তাঁর বাগানে বেশ খানিকটা কোল্‌ গ্যাস তৈরী করে ফেললেন। যে পাত্রে ঐ গ্যাস তৈরী হচ্ছিল সেই পাত্রের সঙ্গে একটা লম্বা নল জুড়ে দেওয়া হ'ল। মারডক সেই নল জানলা ফুটো করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন, তারপর তা ঝুলিয়ে দিলেন ঘরের কড়ি কাঠে। নলের ভিতর দিয়ে হু-হু করে গ্যাস আসতে লাগল, আর তা জ্বালিয়ে দিতেই ঝলমাল আলোয় সমস্ত ঘরটা আলোময় হয়ে উঠল।

সেই প্রথম মানুষের ব্যবহারে সত্যি করে লাগানো হ'ল 'কোল্‌ গ্যাসকে'। ইংল্যাণ্ডের এক অখ্যাত পাড়া গাঁয়ে এক লাজুক বিজ্ঞানী লোকচক্ষুর অগোচরে বসে এ কাজ হাঁসিল করলেন।

কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কার, এ কি গোপন থাকতে পারে? দেখতে দেখতে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল মারডকের আবিষ্কার কাহিনী। যারা ব্যবসায়ী তারা মারডককে টাকার লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগল। মারডক্‌ কিন্তু পুরোনো মনিবকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হলেন না।

তা মারডক নিজে না গেলে কি হবে, তাঁর আবিষ্কারের সুযোগ নিতে ছাড়ল না অনেকেই। দেখতে দেখতে তাঁর আবিষ্কৃত সেই অদ্ভুত আলোর ব্যবহার সুরু হয়ে গেল—নানা অঞ্চলে। সহরের রাস্তা আলোকিত করা হ'ল ঐ গ্যাসের আলো দিয়ে। বড় বড় ইমারত,—আপিস, আদালত, লোকের বসত বাড়ী—সর্বত্রই সৌখীন লোকেরা চায় গ্যাসের আলো। গ্যাস কোম্পানীগুলোর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা।

প্রথম প্রথম হাসি-ঠাট্টাও সহ্য করতে হয়েছিল মারডককে অনেক। সে যুগের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক স্যার ওয়াল্টার স্কট্‌ তো ব্যাপারটা শুনে হেসেই কুটিপাটি হয়েছিলেন। তিনি নাকি লোকের কাছে গল্প করতেন,—'আরে শুনেছেন, লণ্ডনে এক মাথাপাগলা এসেছে, বলে কিনা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে সহরটা আলো করে দেবে!' পরে অবিশ্যি তাঁর ভুল ভাঙে এবং এমনও শোনা যায় যে শেষে তিনি নিজের বাড়ীতেই ঐ আলোর ব্যবস্থা করেন এবং রাত্রে লিখতে হলে ও আলো ছাড়া এক কলমও লিখতে পারতেন না।

লণ্ডনের পার্লামেণ্ট ভবনে যখন ঐ আলোর ব্যবস্থা হ'ল তখন কোন কোন মন্ত্রীও নাকি প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, আগুনটাই বুঝি নলের ভিতর দিয়ে আসছে। তাই নল বসালে দেয়াল পুড়ে যাবে এই ভয়ে তাঁরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। আসলে যে নলের ভেতর ঠান্ডা গ্যাস ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং সে গ্যাস যে নলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পরে তবেই জ্বলে এ ব্যাপারটা বুঝতে তাঁদের বেশ সময় লেগেছিল। প্রথম যেদিন সেখানে আলো জ্বালানো হ'ল সেদিন নাকি পার্লামেন্টের অনেক সদস্য হাতে দস্তানা পরে ভয়ে ভয়ে এসে নলের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন নলটা সত্যি ঠান্ডাই রয়েছে না গরম হয়ে গেছে! নলটাকে ঠান্ডা দেখে কেউ কেউ রীতিমত অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর অবিশ্যি গ্যাস লাইটের আরও উন্নতি হয়। নলের মুখে ম্যান্টল বসাবার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হবার পর সে আলোর তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

কলহীন কলের নৌকা

পরিতোষ কুমার চন্দ্র

'কলহীন কলের নৌকা' এই অদ্ভুত নামটা পড়ে তোমরা হয়তো,—হয়তো কেন,—নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, নৌকাটা যখন কলহীন তখন সেটা আবার কলের নৌকা হয় কি করে? তোমাদের এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন উত্তরটা শুনবে তখন স্বীকার করতে বাধ্য হবে এই নামকরণে কিছুমাত্র ভুল হয়নি। আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

যে নৌকা কলের সাহায্যে চলে সেটাই হলো কলের নৌকা। এখন কল বলতেই তোমরা বোঝো লোহা বা অন্য কোনো ধাতুর তৈরী কোনো যন্ত্র। কিন্তু অভিধানে 'কল' কথাটার দুটো মানে দেওয়া আছে। একটা হলো—যন্ত্র, আর অন্যটা হলো—কোনও জিনিসের যে অংশ ঘুরানো ফিরানো যায় এবং যাহাতে কৌশল আছে।' আমার কলহীন নৌকা কাঠের তৈরী এবং তাতে এমন একটা কোনো জিনিস আছে যেটা কাঠের তৈরী এবং ঘোরে, আর সেই ঘোরার প্যাঁচে পড়ে নৌকাটা চলে। এটা শুনেই হয়তো তোমরা বলবে, বারে, ওটাকে কল বলবো কেন? ওটাতো একটা কৌশল। হ্যাঁ, ওটা একটা কৌশলই। কিন্তু বাপু, কৌশল মানেই তো কল। সুতরাং এটা কলের নৌকা। আর এই নৌকাতে ধাতুর তৈরী কোনো যন্ত্র নেই, তাই এটা কলহীন। যাহোক, তর্কাতর্কি এখন থাক। এবার কাজের কথায় আসা যাক। এখন শোনো কি করে 'কলহীন কলের নৌকা' তৈরী করবে।

এই নৌকা করতে দুটুকরো কাঠের দরকার হবে, আর দরকার হবে ইঞ্চি আষ্টেক লম্বা সিকি ইঞ্চি চওড়া রবারের ফিতা বা ফালি। এছাড়া লাগবে কিছুটা শিরিষ কাগজ, কাঠের টুকরো দুটো ঘষে মসৃণ করার জন্য। আর কিছু না।

প্রথমেই এক ইঞ্চি মোটা ও ১০"×৩½" মাপের হাল্কা জাতের কাঠের একটা টুকরো যোগাড় করো। সেই কাঠের টুকরোটারই একটা
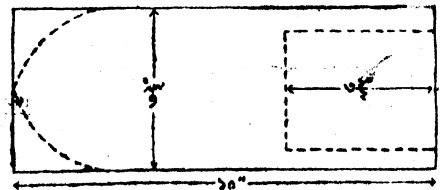
১নং চিত্র

প্রান্ত একটু ছুঁচলো করে কাটো এবং অন্য প্রান্তের দুপাশে আধ ইঞ্চি করে ছেড়ে মাঝখান থেকে ২½"×৩½" একটা অংশ কেটে বের করে ফেলো। এটাই হবে নৌকা। ১নং ছবিটা দেখলেই কাঠটার কোন্‌খানে,

---

ইতিমধ্যে গ্যাস লাইটের আরও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে,—যার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তবু গ্যাস লাইটকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারেনি তারা। আজও বহু জায়গায় এর ব্যবহার সচল রয়েছে প্রায় আগেরই মত।

কিভাবে ও কতোটা কাটতে হবে তা ঠিক মতো বুঝতে পারবে। নৌকার পেছনদিকের খানিকটা কেটে ২½"×৩½" মাপের যে টুকরোটা পাবে সেটার দুধার থেকে লম্বাভাবে এবং অন্য যে কোনো একটা দিক থেকে এড়োভাবে সিকি ইঞ্চি করে কেটে বাদ দাও। এতে সেটার মাপ দাঁড়াবে ২"×৩¼"। এটাই হবে নৌকার প্যাডেল, যার সাহায্যে নৌকাটা চলবে। প্যাডেলের কাঠের টুকরোটা নৌকার পেছন থেকে কেটে বের করবার সময় যদি ভেংগে যায় বা সেটার কাটা ধার এ'কাবে'কা হবে যায়, তবে অন্য একটা কাঠের টুকরো থেকে ঐ ২"×৩¼" মাপের একটা টুকরো কেটে প্যাডেল তৈরী করে নেবে। নৌকা ও প্যাডেল তৈরী হোলে সে দুটোর সর্বাংগ,—বিশেষ করে প্যাডেলের চারটা ধার এবং নৌকার পেছন দিকে কাটা জায়গাটার তিনটা ধার শিরিষ কাগজ দিয়ে খুব মসৃণ করে দেবে। এটা ভালোভাবে না করলে নৌকার কল ঠিক মতো চলবে না।

শিরিষ কাগজ ঘষা হয়ে গেলে প্যাডেলটা নৌকার পেছনেই ফাঁকের ঠিক মাঝখানে সমান করে বসিয়ে তার দুপাশে নৌকা থেকে বের করা আধ ইঞ্চি সরু বাহু দুটোর সংগে রবারের ফিতা দিয়ে বেঁধে দাও। এই বাঁধার ওপরই কলের আসল কৌশল নির্ভর করে। তাই রবারের ফিতাটা কি রকম করে বাঁধবে আগে সেটা ভালো করে বুঝে নাও।

ঐ যে নৌকার পেছনের বাহু দুটোর কথা আগে বলেছি, তারই একটার ওপরে, ঠিক মাঝখানে রবারের ফিতার একটা মুখ বা প্রান্ত রেখে চেপে ধরে ফিতাটা প্যাডেলের তলা দিয়ে ওধারে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাহুর ওপরে নিয়ে এসো। তারপর ফিতাটা সেই বাহুর অর্থাৎ দ্বিতীয় বাহুর ওধার দিয়ে ঘুরিয়ে নীচের দিকে এনে এবারে প্যাডেলের ওপর দিয়ে এদিকে এনে, প্রথম বাহুর নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে ওপরে ফিতার প্রথম প্রান্তের সংগে বেঁধে দাও। এধার থেকে ওধার, আবার ওধার থেকে এধার ঘুরিয়ে, পাক দিয়ে বা পেঁচিয়ে ফিতাটা নিয়ে যাবার সময় বেশ টান দিয়ে দিয়ে করবে। টান করে না বাঁধলে কলের নৌকা ভালোভাবে চলবে না। রবারের ফিতা দিয়ে নৌকার সংগে প্যাডেল বাঁধা হয়ে গেলেই কলের নৌকা তৈরী করার কাজ শেষ হবে।

২নং ছবিটা দেখলে—রবারের ফিতা বাঁধবার কায়দাটা বুঝতে

২নং ছবি
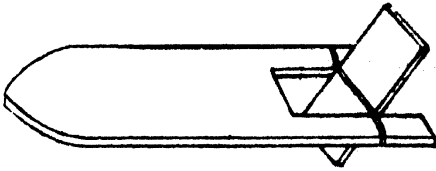
পারবে আর প্যাডেলটা কিভাবে ঘুরবে তারও একটা আন্দাজ করতে পারবে।

এখানে বিশেষ একটা কথা বলা দরকার। রবারের ফিতায় আটকানো প্যাডেলটা সামনের দিকে বা পেছনের দিকে—যেদিকেই ঘোরাবে সেদিকেই সেটা ঘুরবে। এখন দেখতে হবে ঘোরাবার সময় সেটা যেন নৌকার পেছনে কাটা খাঁজের সামনের কাঠটার ধারে না ঠেকে। যদি ঠেকে তবে ফিতার বাঁধন না খুলেই প্যাডেলসুদ্ধ ফিতাটা যতটুকু সরানো দরকার ঠিক ততটুকুই পেছন দিকে ঠেলে সরিয়ে দেবে।

সবই তো হলো! নৌকাও হলো,—তাতে প্যাডেলও ফিট্ করা হলো। এবার কেমন করে চালাবে সেটা শিখে নাও। রবারের ফিতায় আটকানো প্যাডেলটা বেশ কয়েকবার পেছনের দিকে পাক দিয়ে ঘুরিয়ে, সেটা সেই অবস্থায় ধরে রেখে জলের ওপর নৌকাটা রেখে দিলেই রবারের ফিতাটা উল্টো পাক খেয়ে প্যাডেলটাকে সামনের দিকে ঘোরাবে, আর তাতেই তোমার 'কলহীন কলের নৌকা' চলতে আরম্ভ করবে।

মাছ চাই

শ্রীধীরেন বল

পাড়ার ঘরে মিটিং বসে, খোকন সভাপতি,—
বুঝছ না কি তুচ্ছ এ নয়, সমস্যা ঘোর অতি!
আজ কত দিন মাছের সাথে নেইকো দেখা কারো,
কোথায় গেলে মিলবে ও-চীজ বাংলাতে কেউ পারো?
গাগারিণের মতোই মাছের আকাশ-ছোঁয়া দাম,
কিনতে গেলে তাইতো সবার বেরোয় যে কালঘাম!
বড়রা সব উঠলো ক্ষেপে, ফলটা হলো বেশ,
হামলা করে সামলে নিতেই মাছের বাজার শেষ!
বন্ধ মাছের দোকান বটে, বন্ধ ত নয় খিদে,
সন্ধ্যে-সকাল ছুটছি ঠিকই রান্নাঘরে সিধে।
মাছ-খেকো সব বংগবাসী সাজলো মাড়োয়ারী,
মাছ বিনে আর উঠবে কি সে ঐ না ভাতের হাঁড়ি?
সুন্দরবন হয় বা হজম নিরিমিষ্যি খেতে,
খাবার নামে আবার সবার মেজাজ ওঠে তেতে!
আমরা কি আর ডাইনোসরাস কিংবা জিরাফ হাতী,
ঝোপ-জংগল খেয়ে কতই করবো মাতামাতি!
ঘাস-পাতা খায়, গরু-ঘোড়ায়, তাই কি হবে সার?
সেই ভয়েতে মিটিং ডেকে করছি হাহাকার!
বড়রা চায় দাম কমাতে, আমাদের চাই মাছ,
আমরা ওসব গিলতে নারাজ—জংলী যতো গাছ!
সবাই বলে—বেশ বলেছে! ধন্য সভাপতি!
এসব কথায় কান না দিলে অশেষ দুর্গতি!
গাছ আমরা চাই না খেতে, দুইবেলা মাছ চাই,
মোদের দাবী মিথ্যে ত নয়, বিলকুল সাচ্চাই!
আমাদের এই প্রস্তাব পাশ, ভাঙলো এ মিটিং,
কাল থেকে ঠিক রান্নাঘরে চলবে পিকেটিং!!

ছোটদের পাততাড়ি

তখনও দুরু দুরু কাঁপছে বুকটা।

সেই কাঁপা বুক নিয়েই হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে সুপর্ণ।

সুপর্ণ!

নিজের নামটা মনে পড়তেই একটা গভীর খুশির মিষ্টি হাসিতে সুপর্ণর কচি মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সুপর্ণর মনে পড়ল প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার আবেদন-পত্র পূরণ করবার দিনটির কথা।

সবে কলম তুলেছে সুপর্ণ আবেদন-পত্রে নিজের নামটি লিখতে বাধা দিলেন প্রধান শিক্ষক হরিনাথবাবু। শশব্যস্তে বললেন, দাঁড়া বাবা, একটু ভেবে দেখি।

কী ভেবে দেখবেন হরিনাথবাবু? আবেদন-পত্রে নাম-ধাম-পরিচয় লিখবে, তার মধ্যে আবার ভাবনার কি আছে? বৃত্তি যে এ ছেলে পাবেই সে বিষয়ে তো সব শিক্ষকরাই একমত। যেমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। তবে আর ভাবাভাবির কি আছে?

চতুর্থ শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষার ছাত্র-তালিকাটি খোলা রয়েছে হরিনাথবাবুর সামনে।

আর একবার সেটার উপর চোখ বুলালেন হরিনাথবাবু। শতকরা নব্বুইয়ের উপর নম্বর পেয়ে যে ছেলেটি প্রথম হয়েছে পরীক্ষায় তার নাম ফ্যালারাম চক্রবর্তী।

চোখ তুলে সামনে উপবিষ্ট নিরীহ কচি ছেলেটির দিকে একবার তাকালেন তিনি। প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল। উন্নত নাসিকা। প্রশস্ত ললাট।

এই ছেলের নাম ফ্যালারাম চক্রবর্তী?

চকিতেই আর একটি দিনের কথা হরিনাথবাবুর মনে পড়ে গেল।

কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার জন্য যেদিন ফ্যালারামকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তার মা।

বাড়িতে কাচা থান কাপড়ে সারা দেহ আবৃত করে ছেলের হাত ধরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল সে। যেন ভয়েই জড়সড়।

ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন ভাল লেগেছিল হরিনাথবাবুর। আজীবন ছেলে পড়িয়েই চুল পাকিয়েছেন। ছেলের মুখের দিকে চাইলেই কেমন যেন ভাল-মন্দ বুঝতে পারেন তিনি। এ কোন ঐশী শক্তি নয়। নেহাৎই বহুদর্শিতার ফল।

ফ্যালারামকে দেখেই কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল, হবে, এ ছেলের লেখাপড়া হবে।

সংকুচিতা নারীমূর্তিকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার কি চাই মা?

ঘোমটার আড়াল থেকেই নারীমূর্তি কাঁপা গলায় উত্তর দিল, আজ্ঞে, আমার এই ছেলেটাকে আপনার চরণে একটু ঠাঁই দিতে হবে বাবা।

—বেশ তো, ছেলেকে ভর্তি করাতে চাও, ভর্তি করে দাও।

এবার চোখ তুলে তাকাল নারী। দুই চোখ জলে ভরা। কান্নার অবরুদ্ধ গলায় বলল, আমরা যে বড় গরীব বাবা। রিফুজি। ওর বাবাও নেই।

হরিনাথবাবু বললেন, এটা তো ফ্রি স্কুল মা, তোমার ছেলের মাইনে-পত্তর কিছুই লাগবে না। আর বই-পত্তরের খরচ? সে যা হয় আমিই দেখব। তুমি কিছু ভেব না। ছেলেকে ভর্তি করে দাও।

ভর্তি করবার সময়ই ওর নাম শুনলেন ফ্যালারাম।

চমকে চোখ তুলে তাকালেন হরিনাথবাবু। বললেন, ফ্যালারাম?

মা জবাব দিল, হ্যাঁ বাবা, ওই নামেই ওকে আমরা ডাকি। আপনাকে বলতে আমার লজ্জা নেই বাবা, ও পেটে থাকতেই ওর বাবা আমাদের ফেলে চলে যায়।

—ঠিক আছে মা, আমি ওই নামই লিখে নিলাম খাতায়।

সেদিন সেই নামই খাতায় লিখে নিয়েছিলেন হরিনাথবাবু। কিন্তু তাঁর মনটা কেমন যেন খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। এমন প্রতিভাদীপ্ত সুন্দর ছেলেটির নাম ফ্যালারাম?

বৃত্তি-পরীক্ষার আবেদন-পত্র পূরণের দিন কিন্তু মনের সেই খুঁৎ খুঁৎ ভাবটাকে তিনি আর চেপে রাখতে পারলেন না। উদ্যত-লেখনী ফ্যালারামকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়া বাবা, একটু ভেবে দেখি।

একটুক্ষণ ভাবলেন চোখ বুঁজে। তারপর বললেন, তোর ওই ফ্যালারাম নামটা বাবা পাল্টে দেব এবার।

সবিস্ময়ে ফ্যালারাম বলল, পাল্টে দেবেন?

—হ্যাঁরে। তুই পরীক্ষায় ভাল ফল করবি। একদিন অনেক বড় হবি। কত লোকে তোর নাম করবে। সেদিন কি ওই ফ্যালারাম নাম তোকে মানাবে? নারে না, তোর নাম আমিই আজই পাল্টে দেব।

সহর্ষে উচ্ছ্বসিত গলায় ফ্যালারাম বলল, কি নাম দেবেন স্যার?

—কি নাম দেব, না? আচ্ছা বল্‌তো সুপর্ণ মানে কি?

অবলীলাক্রমে জবাব দিল ফ্যালারাম, আজ্ঞে, সুপর্ণ মানে সুন্দর পাখা যার, অর্থাৎ গরুড়।

হরিনাথবাবু হেসে বললেন, ঠিক আছে, তোর নাম লেখ্ সুপর্ণ চক্রবর্তী।

গভীর খুশিতে ফ্যালারাম সেদিন খস্‌খস্ করে নিজের নাম লিখেছিল সুপর্ণ চক্রবর্তী।

বহুদর্শী প্রবীণ শিক্ষক হরিনাথবাবু হয়তো তখন মনে মনে আবৃত্তি করেছিলেন রবিঠাকুরের কবিতা—

তরুণ গরুড়-সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশে........
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়!

নিজের সেই নামকরণ পর্বের কথাটা মনে পড়তেই একটা গভীর খুশির মিষ্টি হাসিতে সুপর্ণর কচি মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হন্ হন্ করে সে এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে।

বুঝি বা তখন পাখা মেলেই উড়তে চায় তরুণ গরুড়।

হরিনাথবাবু স্কুলের দারোয়ানকে পাঠিয়েছিলেন সুপর্ণদের বস্তি-বাড়িতে। জরুরী তলব, সুপর্ণ যেন এখনি দেখা করে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে।

দারোয়ানের সঙ্গেই স্কুলে যেয়ে হাজির হল সুপর্ণ।

শিক্ষকমশায়রা অনেকেই তখন ভীড় করেছিলেন প্রধান শিক্ষকের ঘরে।

সুপর্ণ ঘরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন হরিনাথবাবু। গভীর আনন্দে তাঁর সারা শরীর তখন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ছোটদের

ঠাকুর দাদার ঝুলি
সেকি   শুধুই মিছে বুলি?
চাঁদের বুড়ি সেকি
বলো   আজকে হবে মেকি?
না, না।
মানুষ ওড়াক ফানুস
তবু মানুষ সে তো মানুষ,—
কল্পনা তার পাখা
কত রঙিন স্বপ্ন-মাখা!
দেবে   চাঁদের দেশে হানা
তবু   হবেই সে রাত-কাণা!
নিঝুম চাঁদের পুরী—
সেথা   আদ্যিকালের বুড়ি
যদি নাই বা পড়ে চোখে
তবু স্বপ্ন-বোনার ঝোঁকে
সে যে   শুনবে পেতে কান
বুড়ির চরকা-কাটার গান।।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাঁপছে। আবেগে কাঁপা গলায় তিনি বললেন, ব্রাভো মাই বয়, ব্রাভো! তুই আমার মুখ রেখেছিস সুপর্ণ, বৃত্তি পরীক্ষায় তুই ফার্স্ট হয়েছিস্।

সেই ফার্স্ট হবার খবর নিয়েই দুরু দুরু কাঁপা বুকে হন্ হন্ করে রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছে সুপর্ণ।

মাকে যে খবরটা দিতে হবে। সকলের আগে দিতে হবে। হরি-নাথবাবু যে বলেছেন, তুই বড় হবি বাবা, অনেক বড় হবি। সার্থক তোর নাম দিয়েছিলাম সুপর্ণ। আকাশের অনেক উঁচুতে উড়বে তোর পাখা।

ঘ্যা-অ্যা-অ্যা-স্ করে ব্রেক কসে যেন একটা আর্তনাদ করে থেমে গেল দোতলা বাসটা।

হায় হায় করে উঠল রাজপথের জনতা।

হৈ-চৈ, কোলাহল, কলরব।

কালো পিচে ঢাকা রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেছে।

নীল আকাশের স্বপ্ন মুছে গেছে সুপর্ণর মৃত্যুনীল দুটি চোখ থেকে।

হায় সুপর্ণ! হায় হরিনাথবাবু!

অবশেষে ক্যালারামই 'ত্য হল!

শিবঠাকুরের বিয়ে আর তিন কন্যা দানের কাবত তোমরা সবাই পড়েছ। কিন্তু সত্যি শিবের বিয়ে তো তোমরা দেখনি? উঁহু দেখোনি। সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, ম্যাজিক মেলা সবই দেখে থাকতে পারো শিবের বিয়ে দেখনি একথা বলতে পারি। কিন্তু শিবের বিয়ে আমি দেখেছি। সেই গল্প তোমাদের শোনাই; শোনো—। তখন আমি খুব ছোট। আশ্বিন মাসের পুজোকে আমরা দুর্গা পুজো বলি—হিন্দু বাঙ্গালীদের এত বড় উৎসব আর কিছু নেই। এই পুজো কেন আরম্ভ হয়েছিল তা হয়তো তোমরা রামায়ণের গল্পে শুনেছ বা পড়েছ। এত বড় পুজো, এত হৈ-চৈ এত কাণ্ড-কারখানা কিন্তু তবু একে অকাল বোধন বলে। শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণের সংগে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই অকাল বোধন করলেন অর্থাৎ দেবীর আরাধনা করলেন আর সেই থেকে আশ্বিনে বা শরৎকালে দেবী পুজোর প্রচলন হয়ে গেল।

এই পুজোর সমারোহের কথা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু চৈত্র মাসে আর একটি এই রকম দুর্গা পুজো হয় তার খবর তোমরা কি রাখো? পুজো পদ্ধতি একই রকম—প্রতিমার রূপও একই রকম। একে বলা হয় বাসন্তী পুজো।

বাসন্তী দেবীর পুজো শেষ হয় যথা নিয়মে বিজয়ায়। দুর্গা পুজোর বিজয়ার মত এত বড় উৎসব নেই সত্যি কিন্তু অন্য এক বিরাট উৎসব হয় নবদ্বীপে।— সেটা হলো বিবাহোৎসব।

ভাবছো তোমরা, সে আবার কি? সে ভারী মজার ব্যাপার। যাকে বলে শিবঠাকুরের বিয়ে—এ তাই। আর বয়সে ছোট হলেও এই বিয়ে আমরা মজা করে দেখেছি।

বিজয়া শেষ হলো অর্থাৎ প্রতিমাকে নিয়ে বাহকরা বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু গঙ্গায় তারা গেল না—সারা নবদ্বীপ সহরের বাছা বাছা রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে গিয়ে পোড়ামাতলায় এসে থামবে। চারটি পাড়ায় চারটি মহাদেব আছেন—যেমন বুড়োশিবতলার বুড়ো-শিব (যদিও চেহারায় তিনি একই বয়সে আছেন), যোগনাথতলার যোগনাথ আর অন্য দুটি বালকনাথ ও দণ্ডপাণি—বিগ্রহগুলি কেবল শিলা মূর্তি। কিন্তু এদের যখন 'বেশ' ধারণ করান হয় তখন সেকথা মনে হয় না।" রাজবেশে সেজে সোনার চোখ, নানা বস্ত্রালঙ্কারে ও ফুলে সেজে চতুর্দোলায় চড়ে যখন তাঁরাও সহর প্রদক্ষিণ করেন—তখন মন্দিরের ভিতর প্রতিদিন দেখা শিলামূর্তির সংগে কোনও মিল থাকে না।

এই চার পাড়ার শিবের সংগে চার বাড়ীর বাসন্তী প্রতিমার বিবাহ হয়—একটা বড় উৎসবের মধ্যে দিয়ে।

পোড়ামাতলাটি নবদ্বীপ সহরের বিখ্যাত পীঠস্থান। এর
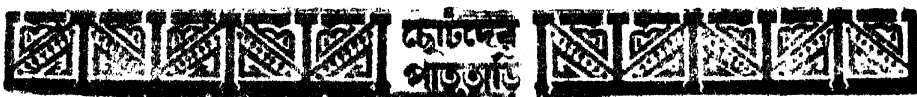
একদিকে ভবতারিণী কালীমূর্তি—মন্দিরে বিরাজ করছেন—আর সামনের দিকে পীঠস্থান—যেখানে প্রতিদিন পোড়ামায়ের পূজো আরাধনা চলে। এইখানেই সামনের বিরাট চত্বরে বিবাহ মণ্ডপ তৈরী হয়। এই মণ্ডপই দেখবার মত। ওখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁদের জিনিষপত্র দিয়ে সভা সাজিয়ে দেন। যেমন বাসন ব্যবসায়ীরা তাদের সেরা সেরা বাসন দিয়ে দানসামগ্রী সাজাতেন,—এইভাবে বিবাহ সভায় যে সব দান দেওয়া হয় তেমনি কাপড়-চোপড় আসবাব-পত্র অলঙ্কার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খুব রুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়—মাঝখানটিতে বর-কন্যার স্থান নির্দিষ্ট হয়। আমি যখনকার কথা বলছি তখন অবশ্য গ্যাসের আলো, পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদি আলোয় উজ্জ্বল করে তোলা হতো—তখন ওখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না। তারপর সবজারি পুতুল বা সং। তাদের আকার এক-একটা মানুষের মত। তোমরা যারা নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের মৃত্তিকা শিল্প দেখেছ তারা কিছুটা অনুমান করতে পারবে। এই মানুষ পুতুলগুলি বড় বড় কড়াই-এ করে ভিয়েন করছে, রসগোল্লা, পানতুয়ার কড়াগুলির উপর ঝাঝড়া ধরে রসুইকররা যেভাবে তৈরী করছে—একেবারে খুব নিকটে না গেলে তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না এগুলো মাটির—এমন কি উনানে চড়ানো কড়াই-এ যে বড় বড় পানতুয়া, রসগোল্লা, নবদ্বীপের বিখ্যাত ছানা জিলাপীগুলি রয়েছে সেগুলো দেখলে লোভের উদ্রেক হবে,—আর যখন জানতে পারবে এগুলি মাটির তখন অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে যাবে। এই রকম মাটির পুতুল বা সং-এর সংখ্যা কম নয়। শুধু খাবার-দাবারই তো নয়—বিবাহ সভায় নাপিত, পুরুত থেকে সুরু করে যা যা থাকে তার কোনোখানে ত্রুটি নেই। একদিকে বরাসন—সেখানে বিয়ে বাড়ীতে সত্যই যে রকম আসন থাকে ঠিক সেই রকম করে সাজানো হয়—আর থাকে নন্দী-ভৃঙ্গী—বড় বড় দুটি মাটির মানুষ—শিব ঠাকুরদের চেলা আর তাদের সঙ্গীরাও—কেউ সিদ্ধি বাটছে—কেউ তৈরী করছে, কেউ খাচ্ছে। এই বিরাট স্থানটিতে যে বিবাহ সভা হয় তা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে, কারণ প্রত্যেকটি জিনিষ এত নিখুঁত ও পরিপাটি যে নকল কিছু মনে হওয়া দূরের কথা এত মনোনিবেশ হয়ে যায় বা মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় তা ঠিক বলে বোঝানো যায় না।

তারপর বিকেলে বা সন্ধ্যায় চার বাড়ীর প্রতিমা বেরিয়ে সহর ঘুরে রাত একটা দেড়টা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছে বিবাহ সভায় অপেক্ষা করবেন। বর তখনও পৌঁছয়নি—তাঁদের সেজেগুজে বেরিয়ে সহর ঘুরে আসতে রাত দুটো আড়াইটা বেজে যায়—তারপর বর যখন এসে পৌঁছলেন তখন গাড়ী করে করে বরযাত্রীর দল এলো—তারা অবিশ্যি পুতুল নয়—মানুষরাই শিবের অনুচরদের সাজ-পোষাকে ছাই মাটি মাখা এসে পড়ে—তারপর বিবাহ প্রস্তাব—তারপর ছাদনা তলায়। এক এক শিব উঠে আসছেন—বরবেশ পরাই আছে। আর কোন বাড়ীর প্রতিমার সঙ্গে কোন পাড়ার শিবের বিয়ে হবে তা বহু পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট আছে। কারণ এতো প্রতি বছরের ব্যাপার—তাছাড়া বিজয়ার দিন সকালে শিবের বাড়ী থেকে বাসন্তী দেবীর বাড়ী গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসে—তাতে খাদ্য বস্তু তেল, হলুদ এই সব থাকে। আর আসে জলসইবার দল। তখন মেয়েরা পথে গান গেয়ে দল বেঁধে বেড়াবার রেওয়াজ ছিল না—বিশেষ ও সব স্থানে। কাজেই কিশোর এবং যুবকরাই চমৎকার বেণী দুলিয়ে, খোঁপা বেঁধে বস্ত্রালঙ্কারে সেজে আসতেন দল বেঁধে গান গেয়ে। গানের একটি লাইন এখনও মনে পড়ে—বুড়ো শিবের হবে গো বিয়ে জল সাধিগে আয়।

এই চার বাড়ীর প্রতিমাদের কাছেই এই বিভিন্ন জল সয়ার দল এসে গান গেয়ে—বসে জলযোগ করে—তেল, হলুদ মেখে চলে যেতো।
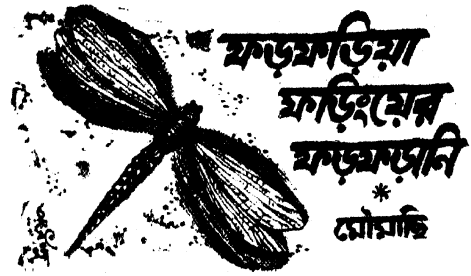
প্রতি বছরের মত এবছরও তাগিদ এসেছে 'স্বপনবুড়ো' দাদার কাছ থেকে। তাঁর পুজোর আসরে ছোট বন্ধুদের জন্যে নতুন কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লিখে পাঠাতেই হবে। এই নতুন জ্ঞান পাই কোথা থেকে বলতো? কিন্তু স্বপনবুড়োর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জো'টি নেই।

হঠাৎ দেখি আমার ঘরের বাইরে মহা সোরগোল! কানে এলো দলবাঁধা গড়া ছড়া পড়ার সুরে চেঁচামেচি—

ফড়ফড়িয়া ফড়িং ভায়া
এবার কোথায় যাবে!
মৌমাছিদার কাছে চলো
অনেক খবর পাবে।"

তাদের সঙ্গে থাকতো বাজনা। খুব ভাল করে জানা না থাকলে বোঝা মুস্কিল হত যে ছেলেরা মেয়ে সেজে এসেছে।

বিবাহ সভায়—বরের দল শিবের চতুর্দোলা নিয়ে দাঁড়ালো—আর কনের দল বাসন্তীকে নিয়ে এলো—দুজনে সামনা-সামনি হলেই একটু পরে বাসন্তীর বাহকরা প্রতিমাকে নিয়ে পেছিয়ে গেল। এই পেছিয়ে যাওয়াটা এমনভাবে করা হয় যেন বাসন্তী প্রতিমা মাথা নেড়ে না-না বলছেন। একজন কথক থাকে—ঘটনাটা বর্ণনা করে যায়—"কনে বলছে বুড়ো বর বিয়ে করবে না। শিব তো শ্মশানে ঘোরেন, ভূত-প্রেত নিয়ে থাকেন—এমন বর চাই না।" আবার শিবের চতুর্দোলা এগিয়ে গেলো—কথক বলতে লাগলো—"আচ্ছা এবার থেকে শিব গৃহবাসী হবে—আর শ্মশানে ভূত-প্রেত নিয়ে ঘুরবেন না।" এই রকম করে অনেক কথাবার্তার পর কনে রাজী হলে বিয়ে হয়—মালা বদল, শুভ দৃষ্টি, নাপিতের কথা সব শেষ হতে বেশ সময় লাগে। চার শিবের বিয়ে শেষ হতে হতে আকাশ ফরসা হয়ে আসে। তার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া হৈ-হুল্লোড় সবই চলে। সামনে আশে-পাশে যে সব বাড়ীর ছাদ, বারান্দা, জানলা আছে, পথেরও কিছু কিছু স্থান দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এইভাবে যখন সব শেষ হলো—তারপর চার বাড়ীর প্রতিমা 'শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি' বলে গঙ্গায় চলে গেলেন—আর শিব ঠাকুররা দোলায় চড়ে তাঁদের মন্দিরে ফিরে গেলেন।

আস্তে আস্তে সভা, ছাদ, বারান্দা, জনশূন্য হতে লাগলো।

বিবাহসভা থেকে যখন আমরা বাড়ী ফিরতাম—সারা রাত্রি জাগায় চোখ দুটি ঘুমে ঢুলে পড়ছে। শরীরে দারুণ ক্লান্তি, মুখে চুরি করে খাওয়া পানের দাগ। তবু ফিরবার পথে জোর করে চোখ খুলে তাকালে দেখতে পেতুম—অন্ধকার সরে গিয়ে আকাশ ফরসা হচ্ছে—সামনে বড় তারাটা তখনও জ্বলছে। বাড়ী ফিরে বিছানায় শুতে শুতে ভাবতাম যে সব দেখা হলো না সেগুলো আসছে বছর নিশ্চয় দেখবো।
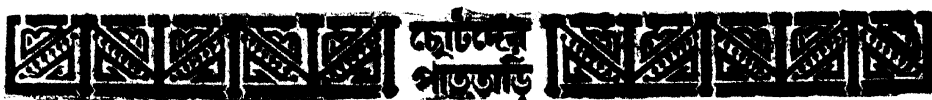
কান টান করে ছড়াটা শুনেই আঁচ করি ব্যাপারটা। বুঝতে পারি আসছেন আমার বকমবাজ শ্রীমানদের দল।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই! হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ঘরে ঢুকে পড়লো—নিতু, শংকর, মিঠু, তুতুল, অন্তু আর পুঁচকে কিন্তুটা পর্যন্ত। শংকরের হাতে দেখি ল্যাজে সুতো-বাঁধা ফড়ফড়িয়া ফড়িং একটা। উড়ছিল সেটা ফড়ফড় করে। ওরা ঘরে ঢুকতেই বসে পড়লো সেটা আমার টাকের ওপরে! করকরে পায়ের ছোঁয়ায় টাকটা উঠলো সুড়সুড় ক'রে, আর অমনি হ্যাঁচ্চো করে এক হাঁচি। ফড়িংটা ভয়ে টাক থেকে নেমে পড়ল। চড়লো টেবিলে-রাখা চশমার টেকোটার ওপর!

আমার বাচ্চা বন্ধুর দল হেসে গড়িয়ে পড়লো ঘটনাটা ওভাবে ঘটতে দেখে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম "এ আপদ আবার কোথা থেকে জুটিয়ে আনলি তোরা?"

শংকরটা টপাস করে বলে বসলো—"আপদ কি গো! তোমার বিপদ ঘোচাতেইতো একে ধরে এনেছি চার পয়সার আলু কাবলি কবুল করতে মটরু মামা ছিপের ডগা থেকে ধরে দিলে।

'তার মানে?' আমি একটু রেগেই বলি।

অন্তু আর কিন্তু দুভায়ে জিব বার করে বললে—'তুমি যে লেখবার বিষয় ভেবে পাচ্ছিলেনা, তাই ওকে আনা হয়েছে। এখন ফড়িং নিয়ে ভাবো, আর আমাদের নতুন কথা শোনাও। আর সেগুলোই লিখে পাঠাও স্বপনবুড়োর কাছে। ইচ্ছে করলে এই ফড়িংটাকেই পাঠাতে পারো তাঁর কাছে।"

ওদের কথা শুনে মনে হলো—ভাগ্যিস্ এই পুঁচকে পন্ডিতেরা ছিল, তাই ভাববার, বলবার ও লেখবার বিষয় হামেশাই পাই, আর এবারও পাওয়া গেল। বড়রা ছোটদের বোকা বললেও, আসলে ছোটরা কিন্তু সবাই ভারি বুদ্ধিমান।

নিতু তখুনি ফট্ করে আরও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেললে। প্রশ্ন করলে—"ভাবছো কি আর! এখন বলতো দেখি ছিপের ডগায় এই যে চার ডানাওয়ালা রং-বেরংয়ের ফড়িংগুলো এসে বসে—এগুলোর নাম কি?'

মাথাটা আমার চুলকিয়ে নিতেই—এই ফড়িংগুলোর অনেক নামই মনে পড়তে লাগল। ওদের বললুম "আগে বোস্ তোরা গোল হয়ে চুপ করে'—তবেতো।"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঘিরে বসে আমাকে। ফড়িংটাও ফড়ফড় করে উড়ে এসে বসল—আমার বেতের ভাঙা চেয়ারটার হাতলের ওপরে। সেখানে বসেই দিব্যি মুরুব্বিয়ানা চালে দেখে নিলে ঘাড়-মাথা ঘুরিয়ে ছোট্ট বন্ধুদের সকলকে আর আমাকেও।

তুতুল বললে—দেখছো দাদাভাই; ফড়িংয়ের মুন্ডুটা কেমন চারধারে ঘুরছে!

আমি অবাক হলুম—ঐটুকু মেয়ের নজর করার কেরামতি দেখে। ছোটদের নজরে কিছু এড়ায় না। বড় কড়া নজর!

আমি বললুম—"হ্যাঁ দিদু! এ ফড়িংগুলোর মস্ত বাহাদুরী ঐ মাথা ঘোরানোর কেরামতিতে—ওদের মাথা এমনিভাবে তৈরি যে আশে-পাশে, নীচে ওপরে, চারিধারেই ওরা মাথাটা যেমন খুশি ঘুরিয়ে দেখতে পারে।

'কিন্তু' ধাঁ করে বলে বসলো—"ওদের চোখ আছে? ক'টা করে চোখ থাকে ওদের মৌমাছি।"

—"তোমাদের যেমন দুটো ক'রে ড্যাবড্যাবা চোখ—ফড়ফড়িয়া ফড়িংয়ের তেমনি বড় বড় দু'-দুটো জবরদস্ত চোখতো আছেই—তাছাড়া আরও তিনটে করে খুদে চোখ। এই পাঁচটি চোখের সাহায্যেই ওরা সব কিছু দেখে—তাছাড়া বড় চোখ দুটোর এক একটায় আবার তিরিশ হাজার করে চোখ-মণি (ফ্যাসেট) থাকে। মাছিদের চোখের এক একটায় মাত্তর সাত হাজার চোখ-মণি।'

নিতু বললে—'সব ভন্ডুল করে দিবি তোরা ফড়িংগুলোর নাম কি সেটা আগে না জেনেই নাক-চোখের খবর!'

আমি বলি—"নিতুবাবু ঠিকই বলেছেরে—নাম ঠিকানা না জেনে কি পরিচয় হয়? আসলে এই ফড়িংগুলোকে ইংরেজিতে বলে 'ড্রাগন ফ্লাই'। তাছাড়া আরও ইংরেজী নাম আছে এই ফড়িংগুলোর। সে নামগুলো পেয়েছে এরা মানুষদের কতকগুলো ভুল ধারণা থেকে!—যেমন ধরো—"হর্স-স্টিঙ্গার" অর্থাৎ ঘোড়াকে এরা হুল ফোটায়। 'স্নেক ফিডার'ও বলে কেউ কেউ—এ নামটা হয়েছে এই জন্যে যে, অনেকের ধারণা সাপেরা এই ফড়িং খেয়ে বাঁচে। আবার আমেরিকায় কেউ কেউ একে বলে—ডার্নিং নীড্ল বা সেলাইফোঁড়ের ছুঁচ! যদিও এই ফড়িং ছুঁচের মতো বেঁধা ফোঁড়ার ধারই ধারে না। অর্থাৎ এর সব নামগুলোই বেশ ভয়পাওয়ানো।"

শংকর বলে বসল—"একে 'ড্রাগন ফ্লাই' বলে কেন? এটাতো ড্রাগনের মতো ভয় পাওয়ানো কিছু নয়!"

—"ছোটোখাটো পোকা-মাকড়দের তুলনায় ওদের শরীরের গড়ন আর স্বভাবটা ড্রাগনের মতো বিচিত্র বলেই নাম হয়েছে—ড্রাগন-ফ্লাই। আরও একটা কারণ হচ্ছে—'ড্রাগন'রা যে-যুগে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো—ইনিও সেই যুগ থেকেই আছেন পোকামাকড়দের জগতে। এদের পূর্বপুরুষদের ফসিল থেকে জানা যায় যে, কয়েক কোটি বছর আগেই—এরা পৃথিবীতে এসেছিল। অন্তু ফস করে ফোড়ন ছেড়ে বসলো—"এই ফড়িংগুলোর নাম পরী ফড়িং রাখলেই ভালো হতো না মৌমাছি? দেখতেও যেমন সুন্দর, তেমনি ফুলের মধু খেয়েই থাকে।"

শিউরে উঠে জবাব দিতে হয় আমাকে "আরে না! না। মোটেই তো নয়। ওরা ফুলের মধু কস্মিনকালেও খায় না। ফুলে গিয়ে বসে ওরা—অন্য সব ক্ষুদে পোকামাকড় গেলবার তালে। এই ফড়িংগুলোই ছোট ছোট উড়ন্ত জ্যান্ত পোকামাকড় ছাড়া অন্য কিছু খায় না। তাছাড়া রাক্ষুসে খিদেও ওদের পেটে। নিজেদের ওজনের চেয়ে বেশি খাবার ওরা পেটে পুরতে পারে। শুধু তাই নয়, এই ফড়িংগুলোকে যদি উপোস করিয়ে রাখো—তাহলে দেখবে নিজেই নিজের শরীরটা খেতে শুরু করেছে। মিঠু এতক্ষণ কথাটি কয়নি। চোখ বড় বড় করে এবার সে বললো—'তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ওদের নাম 'ড্রাগন ফ্লাই বা রাক্ষুসে ফড়িং দেওয়াটা ঠিকই হয়েছে।"

আমিও ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম।

পুঁচকে কিন্তুটা বলে উঠল—"কিন্তু ফড়িংগুলোর পাখনা চারটে আর রঙের বাহার দেখবার মতো।

—"ওদের পাখনা চারখানা শুধু বাহারী আর সুন্দর নয় বেজায় কাজেরও বটে। বলতে পারো, ড্রাগন ফ্লাই বা ঐ ফড়ফড়িয়া ফড়িংগলো আসলে বাঁচে ঐ পাখনা চারখানার ওপর নির্ভর করেই। ঐ পাখনার জাল মেলেই ওরা খুদে খুদে পোকা মাকড় মারে ধরে। ঐ পাখনা ঘুরিয়েই মুখে পোরে শিকারকে। শুধু তাই নয়—মেয়ে ফড়িংরা পাখনার ওপরেই ডিম পাড়ে—লম্বা লেজ মুড়ে। তারপর ছিপের ডগায় ঘাসের ডগায় বসে সেই ডিম ছাড়ে পুকুর, নদীর জলে।—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে নিতু বললে—হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমাদের পড়ার বইতে ওসব পড়েছি। ড্রাগন ফ্লাই বা ফড়ফড়িয়া ফড়িংগুলো জলের তলায় ডিম ফুটে—তিনবার চেহারা বদলে কি করে আস্ত ফড়িং হয়ে উড়ে যায়। মিঠু, শংকরও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো "আমরাও সেকথা পড়েছি, আরও অনেকেই পড়েছে—সে সব কথার দরকার নেই!"

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

আমাদের ঠাকুরমা অর্থাৎ বাবার মা, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আশী বছর বয়েস হয়েছে তাঁর, তবু এখন বেশ শক্ত-সমর্থ রয়েছেন। ঠাকুমাকে আমি বহুদিন দেখিনি, সেই কবে ছোটবেলায় দেখেছি।

এবার ঠাকুমাকে কলকাতায় আসতে হল। দিদির বিয়ে। প্রথম নাতনীর বিয়ে—ঠাকুমা না এলে কি চলে!

আগেই বলেছি, ঠাকুমার হাতে অনেক টাকা। তাই আমরা সকলে মিলে ঠিক করলুম, ঠাকুরমার কাছ থেকে কিছু টাকা চাইব, তারপর সবাই মিলে বেশ আমোদ করা যাবে এই এদিক-ওদিক ঘোরা, বায়োস্কোপ দেখা, আর ফিস্ট করা।

ও হরি! ঠাকুমা আমাদের এত ভালবাসেন কিন্তু টাকা চাইতেই বললেন, "টাকা নিয়ে কি আজে-বাজে খরচ করে মানিক! একদিন তোদের সবাইকে নিয়ে কালীঘাটে যাব, তারপর মায়ের পুজোর পেসাদ সবাই মিলে খাবি! ওসব বাজারের যা-তা জিনিস খাওয়া মানেই রোগের গোড়া।"

বাড়ীর সবাইকে বলে দিলুম, "দেখ বাপু আমাদের কোন কিছুতে বাধা দিও না তোমরা। ঠাকুমার কাছে আমাদের পুরো দাবীর টাকা আমরা ঠিক বার করব।"

মা শুধু একবারটি বললেন, "কেন মিছে বুড়োমানুষকে জ্বালাতন করবি, চিরদিন দেখে আসছি মা ঠাকুর-দেবতা আর অপদেবতা ছাড়া খরচ করেন না। দেবতা-অপদেবতার জন্য মা হুড়হুড় করে টাকা বের করেন।"

আমি বললুম "এবার দেখে নিও কেমন না টাকা আদায় করি! দরকার হলে দেবতা-অপদেবতাও সাজব আমরা!"

তারপরদিনই সকলে কোণের একটা ঘরে চুপচাপ আমরা বসে রইলুম। সন্ধ্যের পর ছাদ থেকে নেমে এসে ঠাকুরমার কাছে সকলে আমরা গল্প শুনি। সেদিন আর ঠাকুমার কাছে যাবার উচ্চবাচ্য করলুম না, ঘরটায় সবাই যেন মুহ্যমান হয়ে ঝিমুতে লাগলুম।

যথাসময়ে ঠাকুমা আমাদের গল্প বলার জন্য ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছেন—"কোথায় রে সব কেউ এদিকে মাড়াচ্ছ না।" শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে এসে হাজির হলেন ঠাকুমা। এসেই বললেন, "কিরে ভাই, তোরা অমন করে সব বসে কেন? কি হয়েছে? আমি কত ডাকাডাকি করছি—আর কটাদিনই বা আবার ত সেই নিবন্ধ-পুরীতে ফিরে যাব।"

আমি কোনরকমে টলতে টলতে উঠে এসে ঠাকুমার কানের কাছে আস্তে আস্তে বললুম, "আর বল কেন, এমন ভয় পেয়েছি সকলে যে

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তুতুল জিগ্যেস করে বসলো—"হ্যাঁ দাদাভাই—এই ফড়িংগুলো ঘন্টায় কত মাইল বেগে উড়ে যায়?"

জবাব দিই—"ওরা মিনিটে কমসে কম ১৬০০ বার পাখনা নাড়িয়ে—ঘন্টায় ৬০ মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে।

"উরি ব্যাস্!" বলে চেঁচিয়ে উঠল কিন্তুটা—অন্তু তখুনি দাদাগিরি ফলিয়ে তার মুখটা চেপে ধরল। শঙ্করও ঠাস্ করে অন্তুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে। সে যে তারও দাদা! অন্তুকে চড়াতে গিয়েই ফড়িংটার ল্যাজে বাঁধা সুতোটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল।

ফড়ফড়িয়ে ফড়িংটাও সেই সুযোগে ফড়ফড়িয়ে উড়ে গেল।

ফড়িংটার পেছন পেছন হুড়মুড়িয়ে ছুটল ছোট্ট বন্ধুর দল। ফড়িংয়ের কথাও থামাতে হলো তাই আমাকে।
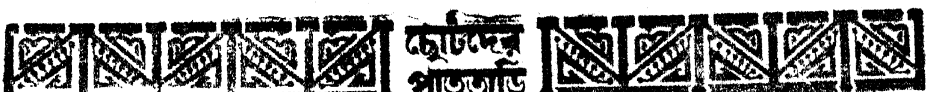
। শোনার অবস্থা নেই, গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না ঠাকুমা।”

“ওমা বিয়েবাড়ী চারদিকে লোক গিসগিস করছে, ভয়টা কিসের ।” ঠাকুমা বল্লেন। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, চারটোর নাকি?”

পিণ্টু বললে, “ঠাকুমা যে কি বলে—চোর এলে আমি একাই রে ভূত ভাগিয়ে দেবো!”

ভূতের নামে ঠাকুমা যেন চমকে উঠলেন, ‘ছিঃ ভাই এই ভর-ন্ধ্যেবেলা তেনাদের নাম করতে আছে! আর কখনো বোলোনি ভাই, তেনারা সর্বত্রে ঘুরছেন।” তারপর বার বার হাতজোড় করে নমস্কার রে বললেন, “অপরাধ নিওনি বাবারা—ছেলেদের অপরাধ নিয়োনি—অবোধ ছেলে সব ত!”

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। যাক, জমি তৈরী এখন বীজ বপন করা শুধু বাকী। পটলাকে বললুম, এই বলনা তুই, আমার হাত পা আসছে না।”

পটলা অমনি ভয়ের ভান করে বললে, “বাবারে আমি কিছু বলতে পারব না, এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! শামুটা খুব ওস্তাদি করে—এই শামু বল না তুই।”

শামু “বাবারে”! বলে ভয়ে মুখ ঢাকলে।

শেষে অজয় বললে, “ধোৎ ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছেন—তোরা কিরে! ঠাকুমা তুমি বস এখানে, আমি তোমায় চুপিচুপি বলি—এসব কথা জোরে না বলাই ভাল, কে জানে বাবা কোথা থেকে কি হয়!”

ঠাকুমা শুধু বললেন, “ওমা এ আবার কি জ্বালাগো! তা বল দেখি, এই আমি বসছি।”

অজয় বলতে লাগল, “আর বল কেন ঠাকুমা, ছাদের উপর দক্ষিণ-দিকে একটা অশ্বথ গাছ রাস্তা থেকে উঠে একেবারে ডালাপালা শুদ্ধ খানিকটা ছাদের কোণ একেবারে ছেয়ে অন্ধকার করে রেখেছে, বেশ আড়াল হয়ে আছে ঐদিকটা। এখন আমরা ঐখানে বসে গল্পগাছি করি, কেরাম লুডো খেলি। আজ দেখি একটা কালো পোষাকপরা লম্বা মত লোক গাছের মগডালে বসে—ওরে বাবা!” বলেই অজয় নানা ভঙ্গিমা করে আবার বলতে লাগল, “খুব বেঁচে গেছি বাবা, লোকটাকে অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না—মানে, মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না আর কি। আমরা তেমন গা-করিনি, ওমা লোকটা আমাদের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলে উঠল ‘ও খোকারা আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমায় কিছু খাওয়াও না। আজ কদিন উপোসী রয়েছি।’ বলেই লোকটা হি হি করে হেসে উঠল।”

একথা শুনেই ঠাকুমা বললেন, “ওসব লোককে আসকারা দিওনি বাবা, ওরা নানা মতলবে ঘোরে!”

—“আহা শোনই না, লোকটার হাসি আর থামে না, এমন বেয়াড়া হাসি! শুনে আমাদের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল, ভাবলুম পাগল না কি রে বাবা!”

শেষে লোকটা হাসি থামিয়ে বললে, “দেখ বাপু, গিয়ে পাতপেড়ে খাওয়া হবে না, আমি না দেখা দিলে কেউ আমায় দেখতে পায় না; আমি কোথাও যাইনে, এই গাছেতেই থাকি, তোমরাও আমায় আর দেখতে পাবে না। তা এক কাজ কর, আমার জন্যে কিছু খাবার এনে সন্ধ্যের সময় ছাদের আলসেতে রেখে দিয়ে যেও। আর শোন খোকারা, তোমাদের মত আমি দু'চারটে মিষ্টি খাইনে! তাই বলছি, আমার জন্যে এই ধর—দু'হাঁড়ি রসোগোল্লা, এক হাঁড়ি পান্তুয়া, দু'হাঁড়ি রাবড়ী, ব্যস এই ত গেল মিষ্টি আর এক ঝুড়ি সিঙ্গাড়া কিম্বা কচুরী রেখে যেও, তাহলেই আমার জলযোগটা একরকম সারা হবে!”

ঘোড়ার ওড়ার জন্যে
পাখা ছিল যে সময়,
সেটা যে সত্যযুগ
জানা আছে নিশ্চয়।
কারিগরী বিদ্যাটা
হাতে ছিল বাঁদরের
যে সময়, ত্রেতাযুগ
জেনো সেটা আদরের।
সাপেরা বলত কথা,
ছিল নাক দাঁতে বিষ,
সেটাই দ্বাপর যুগ,
বোকারাম বুঝেছিস?
মানুষে মানুষ হল,
জন্তুরা জানোয়ার
যে আমলে, কলি তাই,
মজা কিছু নেই তার!

লোকটা কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু ওকে আর দেখা যাচ্ছে না, আমরা সবাই উঁকিঝুঁকি দিয়ে আবার তাকে দেখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোথায় কে! এই না দেখে আমরা ত সবাই কুপোকাত! কাকেই বা বলব আর কেই বা বিশ্বাস করবে!”

এই না শুনেই ঠাকুমা চোখ বুজে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলেন।

আমি বললুম, “যাক্ গে অজয়—যেতে দাও; ঠাকুমা ভয় পাচ্ছে, ওসব আর বলিসনি, খায় আমাদেরই খাবেখন!”

ঠাকুমা হাতজোড় করে রাম নাম জপ করছিলেন, আমার কথা-গুলো কানে যেতেই বললেন, “ষাট ষাট, অমন কথা বলোনি ভাই, তেনাদের পায়ে কোটি কোটি পেন্নাম হই। আমার কত ভাগ্যি, কোন অনিষ্ট না করে—আহ্লাদ করে খেতে চেয়েছেন তোদের কাছে। যা চেয়েছেন, সব আনা চাই—নইলে অনিষ্ট হবে। কারুকে কিছু বলোনি, বিয়ে বাড়ী বলে কথা, কত রকম মানুষ-জন আসছে যাচ্ছে, কেউ হয়ত বিশ্বাস করবে কেউ করবে না, কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তাহলে কি আর রক্ষে আছে! আমি কাল খাবারের ব্যবস্থা করে দেবো, তোমরা ভাই খাবার সব এনে কালই সন্ধ্যের সময় ছাদের আলসের উপর রেখে দিয়ে আসবে।”

পরদিন সকাল না হতেই ঠাকুমা আমার হাতে তিরিশ টাকার তিনখানা নোট দিয়ে বললেন, “আর দেরী করো না ভাই, খাবার এনে শীগগির যা করবার কর।” ঠাকুমা টাকা দিয়েও বার বার করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগলেন।
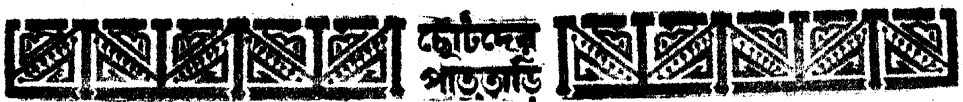
আদ্যিকালের বাদ্যিবুড়ো

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তিব্বতের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তিব্বত আমাদের প্রতিবেশী। তার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বহু মূল্যবান পুঁথি পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বছর আগে রচিত বাংলা কাব্য 'চর্যাপদ'ও তিব্বত থেকেই উদ্ধার করা হয়। চর্যাপদের আগে রচিত কোনো বাংলা সাহিত্যের সন্ধান এযাবৎ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তিব্বতের সঙ্গে ভারতের নাড়ীর যোগ আছে বলা যেতে পারে।

একথাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ জানতে চেয়েছে তার আদি পুরুষ কে? কোথা থেকে কিভাবে প্রথম এলো মানুষ! পুরাকালে এই নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের অবধি ছিল না, আর এ নিয়ে কত কাহিনীর যে সৃষ্টি হয়েছে তারও অন্ত নেই। তখনকার দিনে কল্পনার সাহায্যে মানুষ গড়ে তুলতো আদি মানুষের জন্মকথা। এক-এক দেশে এক-এক রকম। প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্ব; সুতরাং মানুষও তাঁরই সৃষ্টি। ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসাগরে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, তাঁর পাশে ছিলেন পত্নী লক্ষ্মী। সেই অবস্থায় বিষ্ণুর নাভিমূল থেকে একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় আর সেই পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত হন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।

বলা বাহুল্য, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত তিব্বতীয় সংস্কৃতির মিল ছিল বলে পুরাকালের তিব্বতীরা হিন্দু পুরাণের এই কাহিনীই বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের মূলে একটা কারণও ছিল। ভারতীয় পুরাণে যে মেরু পর্বতের কথা উল্লেখ আছে, ভারতবাসীরা মনে করতেন সেই পর্বতই হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। তাদের এ ধারণাও ছিল যে, হিমালয় পর্বতের উত্তরে তিব্বতীয় এলাকায়ই রয়েছে এই মেরু পর্বত। এই ধারণা অনুযায়ী তিব্বত থেকেই সৃষ্টির উৎপত্তি একথা ভেবে তিব্বতীয়রা গর্ববোধ করতেন এবং নির্বিবাদে হিন্দু পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বকে মেনে নিতেন।

এই ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি কিন্তু তিব্বতে আদি মানুষের জন্মরহস্য নিয়ে এমন একটি উপকথা চলে এসেছে যার সঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনেকখানি মিল আছে। এই উপকথাটি আজগুবি হলেও তিব্বতের জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত। সেই মজার উপকথাটিই আজ তোমাদের শোনাবো।

সেই আদ্যিকালের কথা। কবে কোন্ যুগে কেউ কি তা বলতে পারে! স্বর্গ থেকে অবলোকিতেশ্বর একদিন মর্ত্যে নেমে এলেন বানরের রূপ ধরে। মর্ত্যে এসেও তপস্যা করবেন তিনি। কিন্তু কোথায় করবেন? তপস্যার জন্যে চাই নির্জন স্থান। তিব্বতেরই এক নির্জন পর্বতগুহা বেছে নিলেন তিনি তপস্যার জন্যে। বাইরে জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই—দিন-রাত্রি বসে থাকা তপস্যা আর তপস্যা।

এর মধ্যে একদিন অকস্মাৎ দেখা দিল এক বিপদ। তাঁর তপোভঙ্গের জন্যে একদিন একটা রাক্ষসী রূপসী সেজে সেখানে এসে হাজির। অবলোকিতেশ্বরকে সে বলে—আমায় তুমি বিয়ে করো। সে তো শুনে অবাক। তপস্বী লোক—সে বিয়ে করবে কি! কিন্তু রাক্ষসীর বায়না। সে বলে—আমায় যদি বিয়ে না করো, আমি আত্মহত্যা করবো।

অবলোকিতেশ্বর তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। কি করেন তিনি। চোখের সামনে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করবে—সে তো আর হতে পারে না। নিরুপায় হয়ে তিনি চলে গেলেন পবিত্র পোতালা পর্বতে। তিব্বত থেকে অনেক অনেক দূরে সেই পর্বত—ভারত মহাসাগরের তীরে। সেখানে থাকতেন তাঁর যমজ ভাই। ভাইকে বললেন তিনি—পরামর্শ চাই তোমার। আমাকে তুমি সাহায্য করো।

ভাই তো শুনে গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন।

পথটা বাতলালেন অবলোকিতেশ্বরই। তিনি বললেন,—এক কাজ করো ভাই। রাক্ষসীকে তুমি বিয়ে করো। তোমাদের ঘরে ছেলেপিলে হোক।

দাদার কথা আর অগ্রাহ্য করে কি করে ছোট ভাই! অগত্যা তিনি রাজী হলেন।

রাক্ষসীর সঙ্গে বিয়ে হলো ছোট ভাইয়ের। দেখতে দেখতে তাঁদের ঘরে ছ'টি শিশু এলো—সব ক'টিই বানর। শিশুরা খায়-দায়, নাচে-গায়। বাপ-মা তাদের নিয়ে আছেন আনন্দে। কিন্তু তারা একটু বড়ো হয়ে উঠতেই দেখা দিল সমস্যা। বাচ্চা অবস্থায় সামান্য খাবার পেলেই তাদের চলে যেত। কিন্তু বড় হয়েও তো আর তা দিয়ে চলে না। বেশী করে খাবার চাই। কিন্তু বাপ-মা অত খাবার পাবেন কোথা? মহা ভাবনা। দুশ্চিন্তায় রাত্তিরে তাঁদের আর ঘুম হয় না। ঘরে যা খাবার মজুত ছিল একদিন তার সবটাই গেল ফুরিয়ে। কি আর করেন বাপ? ছ'টিকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন কাছেরই এক অরণ্যে। গিয়ে বললেন—এখানে ফল-মূল যা পাবি তাই কুড়িয়ে খাবি।

দেখতে দেখতে তিনটা বছর কেটে গেল। একদিন বুড়ো বাপ গেলেন সেই অরণ্যে ছেলেপিলেদের দেখতে। সর্বনাশ! তারা আর এখন ছ'টি নেই! বংশ বেড়ে হয়েছে প্রায় পাঁচশ'! অরণ্যের ফল-মূল সব শেষ। এখন তারা খাবে কি? উপোস করে মরবে যে সবগুলো! বাপকে দেখতে পেয়েই তারা সবাই মিলে তাঁকে ঘিরে ধরলো আর কিচিরমিচির করে কান্নার সুরে বলতে লাগলো—আমরা এখন খাবো কি? খিদের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে আমরা মরব নাকি?

ছেলেদের কষ্ট দেখলে কি বাপ কখনো স্থির থাকতে পারেন! দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন পোতালা পর্বতে। সেখানে এসে অবলোকিতেশ্বরকে সব খুলে বললেন। মন দিয়ে শুনলেন তিনি সব কথা। তারপর ছোট ভাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই। এখন থেকে সৃষ্টি যতদিন লোপ না পাবে ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের ভার নিলাম।

ভাইকে আশ্বাস দিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন দেবলোক মেরু পর্বতে। তুষারের দেশে মেরু পর্বত। সেখান থেকে তিনি ধরায় ছড়িয়ে দিলেন পাঁচ রকমের শস্য: জই, ন্যাস, গম, শিম ও যব। দেখতে দেখতে সেগুলো অঙ্কুরিত হয়ে উঠলো আর ফসল ফলালো

প্রচুর। বুড়ো বানরের বংশধরদের নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। গিয়ে তো তাদের মহা আনন্দ। পেট ভরে খেতে লাগলো সবাই। কিছুদিন যেতে না যেতেই জায়গাটার নামই হয়ে গেল 'ভোজন-পাহাড়'।

দেবতার কৃপায় বানরদের আর খাওয়ার অভাব নেই। দেবতার প্রসাদ পেয়ে ভেতরে ভেতরে তাদের যেন কি রকম একটা পরিবর্তন হতে লাগলো। গায়ের লোম যেতে লাগলো কমে, ধীরে ধীরে লেজও গেল খসে। মনের ভাব প্রকাশের জন্যে আর তারা কিচিরমিচির করে না, মানুষের মতন কথা বলে। একদিন সত্যি তারা মানুষ হয়ে গেল। তিব্বতীদের তারাই পূর্বপুরুষ।

মানুষ হলেও বাপ-মায়ের স্বভাব কিন্তু রয়ে গেল তাদের মধ্যে। বাপের স্বভাব যারা পেল, কালে কালে তারা দয়া-মায়া, বিচার-বিবেচনা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হলো। তাদের মন গেল সৎ কাজের দিকে আর সুন্দর ভাষাও সৃষ্টি করলো তারা। আর মায়ের স্বভাব পেল যারা, তাদের মধ্যে দেখা দিল লোভ, হিংসা, কোপনতা, প্রতারণা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার প্রভৃতি যত দোষ। তারা হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও দাঙ্গাবাজ। প্রথম পিতা-মাতার অর্থাৎ সেই বানর ও রাক্ষসীর ঘরে যাদের জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে দুটি বিষয়ে খুবই মিল ছিল : যেমন ছিল তাদের মজবুত দেহ তেমন ছিল অদম্য বল, যার ফলে তাদের সাহস ছিল অসীম; আর লড়াইয়ের দিকে ঝোঁক ছিল সবারই।

আদ্যিকালের এই সব মানুষ প্রথমে বসত করতে লাগলো তুষারের দেশে। পাহাড়-পর্বতের ঢালুতে তারা গাছপালা লাগাতে শুরু করলো, ক্রমে শিখলো তারা খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করতে। তারপর তারা নেমে এলো আরো নীচের দিকে অর্থাৎ সমতল ভূমিতে। সেখানে আরম্ভ করলো তারা চাষের কাজ। তারপর তারা গড়ে তুললো জনপদ ও নগর।

তুষারের দেশের এই খবর যখন ভারতে পৌঁছলো তখন সেখানকার এক অজানা রাজকুমার রওনা হলেন এদিকে। হিমালয়ের এক গিরিশৃঙ্গে উঠে তিনি চারদিকে তাকালেন। উত্তর দিকে য়ারলুঙ উপত্যকার মনোহর দৃশ্য নজরে পড়লো তাঁর। রওনা হলেন তিনি সেদিকে। অনেক কষ্টে উপস্থিত হলেন গিয়ে তিনি সেই উপত্যকায়। তিব্বতের মেষপালকরা অর্থাৎ বানরের বংশধরেরা গিয়ে ঘিরে ধরলো সেই রাজকুমারকে। প্রশ্ন তাদের : কোথা থেকে এসেছেন তিনি? রাজকুমার তাদের ভাষা জানেন না, কাজেই উত্তর দেবেন কি করে! তিনি শুধু আঙুল দিয়ে পর্বতটা দেখিয়ে দিয়ে বোঝালেন যে সেখান থেকেই এসেছেন তিনি। মেষপালকেরা কিন্তু ঠিক ধরতে পারলো না তাঁর ইংগিত। তারা মনে করলো স্বর্গ থেকে দূত নেমে এসেছেন তাদের দেশ শাসন করার জন্যে। মহানন্দে তাঁকে চতুর্দোলে চড়িয়ে কাঁধে করে নাচতে নাচতে চললো তারা আর রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলো স্বর্গ থেকে দেবদূত এসেছেন তাদের রাজা হয়ে। রাজার নাম হলো নাখ্রি সাঙ্পো অর্থাৎ 'স্কন্ধাসন বীর'।

তাঁর মৃত্যুর পর একত্রিশজন উত্তরাধিকারী তিব্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের সবাই পৌরাণিক যুগের রাজা। তাঁদের সম্পর্কে কাহিনী আছে; কিন্তু কোনো ইতিহাস নেই। তিব্বতের প্রথম যে রাজার ইতিহাস পাওয়া যায় তাঁর নাম সঙৎসান গাম্পো। খৃষ্টীয় ৬০৫ থেকে ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর আমলেই তিব্বতের পৌরাণিক যুগের অবসান হয়ে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়।

উড়ন্ত বটে—তবে রকেট নয়, নিতান্তই একটা রেলগাড়ি। তাই এই রেলগাড়িতে চেপে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়ে চাঁদের দেশে পৌঁছে যাওয়া তো দূরের কথা, মাটির উপর দূর পাল্লার দেশান্তরে যাওয়াও ত আপাততঃ চলবে না। তাহ'লে এই উড়ন্ত রেলগাড়ির দরকারই বা কি? বিশেষ করে মাটির উপর ছুটন্ত রেলগাড়ি তো রয়েছেই। মাটির উপরে কেন শুধু মাটির নীচেও তো দিব্যি চলাচল করছে ওরা। টেমস্ নদীর সুড়ঙ্গ পথটাকেও পর্যন্ত রেহাই দেয়নি রেলগাড়ি। গরজ বড় বালাই। আর গরজে পড়ে খোদার উপর খোদকারী করতেও তো কসুর করেনি মানুষ। ময়দানবের মাথা খাটিয়ে বিশ্বকর্মার হাত লাগিয়ে মানুষ আদিম অরণ্যকে করলে শূন্য, গড়লে গাঁ। আবার গাঁকে পীচের পোষাক পরিয়ে ইট-পাথর আর লোহা-লক্কড়ে বানালো শহর। আদ্যিকালের অখন্ড অবসরটাকে ভরে দিলে আধুনিককালের গতিব্যস্ততায়। আজ আবার সেই সাধের শহরের সখের সজ্জা ভরে উঠেছে মানুষের ঠাসা ভীড়ে। ভীড়ের চাপে শহরের নাভিশ্বাস উঠেছে। অথচ এই ভীড়টাকে আজ সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হলে গোটা দুনিয়াটাকেই একটা আস্ত অতিকায় নগরী বানিয়ে তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদিকে ভীড় যদি একেবারে না থাকে তাহ'লে শূন্য শহর শ্মশানপুরী হয়ে দাঁড়ায় যে। মহানগরীর আসল সমস্যা তাই মানুষের ভীড় নয়। তার দুশ্চিন্তা, কেমন করে সকাল বেলায় সে শহরকে কানায় কানায় ভরে দেবে জনস্রোতের জোয়ারে আবার সন্ধ্যের আগেই ভাটার টানের মত সেই জমাট ভীড়টাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দূর দূরান্তরে। যানবাহন যে কিছু কমতি আছে এমন নয়। বড় বড় শহরগুলোতে ভীড় আর এখন ফুটপাতের পরিধিতে আঁটেনা সত্যি। কিন্তু রাস্তার বুকটাও তো দিন-রাত্রি দুরুদুরু করছে চলন্ত চাকার দাপাদাপিতে। ফুটপাতে মানুষের মাথাগুলো যত না ঠোকাঠুকি করছে রাজপথের আঁটসাঁট গন্ডীর মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বাহনবৃন্দ তার চাইতে অনেক বেশী মাথা ফাটাচ্ছে। রাজপথের সংখ্যা বাড়ানো হলো গুণতিতে, পরিধিও বাড়লো দৈর্ঘ্যে প্রস্থে। মাটির উপরকার আলোর সড়ক ছেড়ে রেলপথকে সেঁধুতে হলো ভূগর্ভের অন্ধকার অন্দরে। রাজপথের হরেক রকমের বাহন আর রেলপথের দৈত্যদেহী গাড়িগুলো মিলেও যখন সমস্যার কোন সুরাহা হলো না তখনই আবার মানুষের ময়দানবদের মাথায় টনক নড়লো। জনতার সাথে যুঝতে হলে চাই আরো অনেক রেলগাড়ি। কিন্তু ধর, পূর্ব আফ্রিকার তাঙ্গানিকা অঞ্চলের কথা। ওখানকার কয়লাখনি থেকে অবিরাম চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে কয়লা আর কুলীদের বয়ে বেড়ানো তো রেলগাড়ির পক্ষে সম্ভব নয়। আর মাটির উপর রেলপথ বসাতে হাংগামাও কি কিছু কম। তাল উঁচু রাস্তা চাই। তারপর বাড়ীঘর ভাঙ, গাছপালা কাট,

নদী-নালার উপর শত পুল বানাও, কেটেকুটে সমতল জমি বানাও—আরো কত কি। অতএব এই রেলগাড়িটা যদি শূন্যপথে উড়ে চলে তা হলে? শেষ পর্যন্ত কিন্তু দাঁড়াই শূন্যপথে সুরু হলো রেল চলাচল।

সে আজ প্রায় উনআশী বছর আগেকার কথা। আলজিরিয়াতে তৈরী হলো এমনি একটি রেলপথ। বছর চারেক পরেই আয়ারল্যাণ্ডেও তৈরী হলো এমনি আর একটি লিষ্টওয়েল আর বালিবুনিয়ন শহরের মধ্যে। অবিশ্যি যাত্রীর অভাবে খুব বেশী দিন চালু থাকতে পারেনি এরা। তবে আজ ষাট বছর ধরে আর একটি উড়ন্ত রেলগাড়ি কিন্তু দিব্যি চালু রয়েছে এখনও পশ্চিম জার্মাণীতে। আট মাইল দূরের দুটি শহরের মধ্যে চলাচল করছে এই রেলগাড়ি। এই রেল পথটির বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হলে ইংরেজী বর্ণমালার আদি অক্ষর 'এ'র কথাটি মনে পড়ে যায়। ওয়াপার নদীর দিকে চেয়ে দেখ। মনে হবে আলাদীনের প্রদীপের যাদুতে ইংরেজী বড় হাতের 'এ' অক্ষরটি যেন ইস্পাতের কাঠামো পরে মাটি থেকে বিশ ফুট মাথা উঁচিয়ে সারিবন্দী দাঁড়িয়ে পড়েছে ওয়াপার নদীর দুই পাড়ে দুই পা রেখে। মাথার দাঁড়ি আঁটা হয়েছে মস্ত কড়িকাঠে। এই কড়ির গায়ে আঁটা রেলপথ—একটিমাত্র লাইন। কড়িতে ঝোলানো রেলগাড়িগুলো এই লাইনটির উপর দিয়ে শূন্যপথে চলাচল করে। এক ইঞ্চি ব্যবহারযোগ্য জমির ব্যয় নেই। অথচ নদীর বুকে যান চলাচলেও কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি এতে। আট মাইলের পাড়িতে আঠারোটি ষ্টেশনে গাড়ী থামে। যাত্রীর ভিড়ের সময় তিন মিনিট অন্তর গাড়ী ছাড়ে টারমিনাস ষ্টেশন থেকে। প্রতি ঘণ্টায় আট হাজারের মত যাত্রী বইবার ক্ষমতা আছে গাড়ীগুলোর, আর ঘণ্টায় পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে চলে গড়পড়তা পঞ্চাশ হাজার যাত্রী পারাপার করে প্রতিদিন।

কিন্তু এ তো গেল সেকেলে এক গাড়ির ফিরিস্তি। হাল-ফ্যাশানে এর এই সেকেলে চেহারাটির অনেক অদল-বদল হয়েছে। দু'পাশে দুসারির বদলে এখন এক সারিতেই সারিবন্দী হয়ে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরু সরু সিমেন্টের কংক্রীট করা থাম। বাসুকী মহারাজের বংশধরগণ যেন কামড়ে ধরে আছে মাইলের পর মাইল লম্বা মস্ত একটা কড়িকাঠ। এই কড়ির গায়ে আঁটা রেল লাইনের উপর দিয়ে চলাচল করছে এক কামরা বা দু কামরা গাড়ি। দুকামরাওয়ালা ট্রামের মতই চেহারা অনেকটা। গাড়ির মাথায় মাঝখানে এক সার চাকা। একটি মাত্র লাইন—তাই চাকাগুলোও একটি সারে সাজানো। গাড়ির উপরে ইংরেজী 'ইউ'-এর মত চেহারার কয়েক সার চাকা কামড়ে ধরে আছে কড়ি কাঠটাকে। কামরার সংখ্যা বাড়তে পারে। কিন্তু একটি মাত্র লাইনের উপর চলাচল করে বলেই এর নাম 'মনোরেল'। বেচারা কলকাতার কথাই ওঠেনা। নইলে দুনিয়ার বাকী বড় বড় শহরগুলোতে আজ মনোরেলের ব্যাপক প্রচলনের চেষ্টা চলছে। তবে মূল ছাঁচটা এক রকমের হলেও চেহারার আদলে কিংবা কারিগরী কায়দায় একটু আধটু তফাৎ আছে বৈকি। টোকিও শহরে মনোরেলের স্তম্ভগুলোর চেহারা বাংলা 'ঁ'কারের মত না হয়ে ইংরেজী 'ওয়াই'এর মত অনেকটা। কেউবা চেষ্টা করছে কড়িকাঠের উপর-নীচে উভয়দিক থেকে একই সঙ্গে দুখানা গাড়ি চালানো যায় কিনা। আমেরিকার শহরে শহরে নাকি এই মনোরেলের পরীক্ষা নিরীক্ষাটা খুব জোর রকমের চলেছে। টেক্সাস, নিউ অরলিনস বা লসএঞ্জেলসের পরীক্ষায় দেখা গেছে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগেও মনোরেল স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। জার্মাণ বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, আবার দুশো মাইল বেগে চলাটাও মনো-রেলের পক্ষে খুবই সম্ভব। কিন্তু শুধু গতির কথাটাই তো আর শেষ কথা নয়। নিরাপত্তা! কারিগরী বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটির উপর দুটিতে রেলের চাইতে শূন্যপথে উড়ন্ত রেলে চড়ে বেড়ানো অনেক বেশী নিরাপদ। বোধ হয় কথাটা সত্যি। পশ্চিম জার্মাণীর ঐ সেকেলে রেল পথটিতে গত ষাট বছরের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটেছে মোটে তিনবার। হাল ফ্যাশানের গাড়িতে আছে অটোমেটিক লক। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলো ষ্টেশনে পৌঁছে আপনা থেকে খুলে যায় আবার গাড়ি ষ্টেশন ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া আছে স্বয়ংক্রিয় ডেলাইট সিগন্যাল মানে অগ্রগামী ষ্টেশন থেকে আগের গাড়িখানি যতক্ষণ না ছাড়ছে ততক্ষণ পেছনের গাড়িখানি পরের ষ্টেশন ছেড়ে কিছুতেই নড়বে না। আর তা ছাড়া মনোরেল চালু করতে খরচ কম, যাত্রীদেরও আরাম। অন্ততঃ মাটিতে চলার ঝাঁকুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে তো।

কারিগরী বিজ্ঞানের কল্যাণে চলন্ত সিঁড়ি, ঘুরন্ত বাড়ি, তারে ঝোলানো চলন্ত গাড়ি, উড়ন্ত মোটর হাল আমলে তৈরী হয়েছে। কিন্তু মনোরেলের প্রয়োজন সবার বাড়া হয়ে দেখা দিয়েছে। অতবড় মার্কিণ মুলুকেও নাকি গাড়ি দাঁড়াবার জায়গারও অভাব ঘটেছে। অতএব এমন একটি কল্পতরু বাহনের যে ব্যাপক চলন হবে একথাও জোরের সংগে বলা চলে।

য়্যাটম্ মানে পরমাণু, তাও জানোনা হনু?
অণু বুঝিস্? ক্ষুদ্র কণা। য়্যাটম্—অণুর অণু।
তুই, আমি আর বেঞ্চি, চেয়ার, স্কুল-কলেজের স্যার,
নানান জাতের মানুষ যত, বৃক্ষ, লতা আর
পশু-পাখী-কীট, পতংগ যা করছে আনাগোনা,
হীরে, জহরৎ, কয়লা, লোহা, দস্তা, সীসে, সোনা,
জল, বায়ু, নদ, নদী, সাগর, পাহাড়, মাটির ঢেলা,
এই জগতের যা-কিছু সব পরমাণুর খেলা।

জুলজুলিয়ে চাইছিস্ যে? বুঝলি নাকো কিছু?
দেখছিস্ না, এক মাটিতেই আম, আমড়া আর লিচু!
শুনতে যত কটমট—শক্ত না তা বোঝা।
একটু ভেবে দ্যাখ্, দেখবি—বাঁশের মত সোজা।
উদাহরণ চাস্? বলছি—সবার যেটা জানা—
যেমন ক'রে লেবুর রসে দুধ কেটে হয় ছানা।
একটা য়্যাটম্ ইদিক-উদিক হলেই গণ্ডগোল,
এক্কেবারে বদলে যাবে নলচে থেকে খোল।
য়্যাটম্ খেয়েই বাঁচি আমরা, মরি য়্যাটমের ঘায়—
এর চে' সহজ কথাতে বা আর কি বলা যায়।
কেউ পণ্ডিত, কেউ বে পাগল, কেউ কাজী, কেউ পাজী,
বিশ্লেষণেই দেখবি, সবই য়্যাটমের কারসাজি।
তারই ফলে কেউ গ্যাগারিণ, কেউ তুই, কেউ আমি,
কেউ বা চালাক, কেউ বা বোকা, 'ফসিল' বা কেউ 'মামি।'

সারারাত বৃষ্টি, একটানা ডেকে চলেছে ব্যাঙের দল, পেট আর গলা ফুলিয়ে যখন ডাকে মনে হয় যেন ব্যাগপাইপ বাজছে। ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টির সংগে ঘ্যাঙর ঘ্যাঁ আওয়াজটা মিলিয়ে সৃষ্টি করে সুন্দর একটা সুর, শুনতে শুনতে ঘুম এসে যায়। জলে একাকার গোটা মাঠটা; ক্ষেত-খামার, খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, সব এক। বিদ্যুতের ঝলকে ঝলসিয়ে উঠছে জলের উপরটা, মনে হয় রূপোর চাদর কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর গাখানা মুড়িয়ে।

চারখানা হাত-পা মেলে সাঁতার কেটে চলেছে সোনা ব্যাঙ. পিছনে একগাদা বাচ্চা, মাঝে মাঝে লাফ দিচ্ছে; বাচ্চাগুলোকে শেখাচ্ছে কি করে বাঁচতে হয় আর কেমন করে চলতে হয়। জলের তলায় কাদার মধ্যে দেহটাকে মিশিয়ে দিয়ে পড়ে আছে কেঁচোর দল। মাথার উপর যমদূতেরা যেভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে প্রাণটা যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কুচি-কাঁচা বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করতে মাছ মায়েরা অস্থির। ঝাঁকের নীচে পাহারা দিচ্ছে সারা সময়। যেন সোনা ব্যাঙ-এর সাহস না হয় এদিকে আসবার। এলেই গুঁতো মেরে তাড়িয়ে দেবে সোনা ব্যাঙকে। আধসেরী ব্যাঙ-এর একপোয়া পেটে একেবারে ঢুকে যাবে অমন তিন চারশো বাচ্চা, বংশ নির্মূল হয়ে যাবে এক লহমায়।

জলপোকাদেরও শান্তি নাই; তারাও ভয়ে অস্থির। দলবল নিয়ে একবার হানা দিলে উজাড় হয়ে যাবে সমস্ত পাড়াটা—তাই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা দিচ্ছে ধেড়ে পোকাগুলো। বিপদ এলে যেন সংকেত দিতে পারে, সবাই যেন লুকোবার সময় পায় কোন নিরাপদ কুটোর মধ্যে। বেশ একটু বিপদেই পড়েছে সোনা ব্যাঙ। কতকাল পর আবার এসেছে বর্ষার জল, প্রাণে জেগেছে নূতন আনন্দ, কিন্তু পেটে কিছু না থাকলে কিছু কি ভাল লাগে? নাঃ এদেশে আর থাকবে না সোনা ব্যাঙ। দেহের সর্বশক্তি সঞ্চয় করে প্রচণ্ড এক লাফ দেয়, যেন ছুটে চলে স্পুটনিক আকাশের পথে।

এসে পৌঁছায় সোনা ব্যাঙ অন্য এক জলের রাজ্যে, জলে জাগে প্রচণ্ড আলোড়ন; তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেসে চলে অনেক দূরে, বয়ে নিয়ে যায় এক মহা বিপদের সংকেত। চঞ্চল হয়ে ওঠে জল-পোকার দল. ছুটে পালিয়ে যাবার আগেই নির্মূল হয়ে যায় দু'একটা পরিবার। হাহাকার জাগে পাড়ায় পাড়ায়। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ঘাসের তলায় আত্মগোপন করে জলপোকা মা। কাদার মধ্যে দেহটাকে মিশিয়ে দেয় কেঁচো গিন্নী ছানাগুলোকে নিয়ে।

কড় কড় করে বাজ ডাকে। বৃষ্টিও নামে প্রবলভাবে। জলের ঝাপটায় ঘাসের মধ্যে আর থাকা যায় না, বের হয়ে আসতে হয় জলের টানে। আর একেবারে আশ্রয় নিতে হয় সোনা ব্যাঙের নাদা পেটের মধ্যে। নির্মূল হয়ে যায় জলপোকার বংশ, তবুও সোনা ব্যাঙের পেটের এক কোণাও ভরে না। কচকচে পোকাগুলো পেটের মধ্যে যেন কেমন খর-খর করছে। মনে হয় ওরা যেন এখনও খেলা করছে সোনা ব্যাঙের পেটের মধ্যে। এবার একটু নরম মাংস খাওয়া দরকার। জলের তলায় ডুব দেয় সোনা ব্যাঙ।

মাথার উপর নেবে আসে দীর্ঘ ছায়া। আর্তস্বরে ঈশ্বরকে ডাকে কেঁচো গিন্নী। নিরীহ প্রাণী, কারুও অনিষ্ট করেনি কোনও দিন, দিবা-রাত্র মাটিতে ছিদ্র সৃষ্টি করে ধরিত্রীকে করেছে সরস, আর তার কপালে মৃত্যু এক অপ্রয়োজনীয় রাক্ষসের হাতে? ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সোনা ব্যাঙ। বাঁচবার কোন আশা আর নাই। গভীর আতংকে সমস্ত দেহ হতে রস ঝরে কেঁচো গিন্নীর, তার জীবন যায় যাক। কিন্তু বাচ্চাগুলো বাঁচুক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোনা ব্যাঙ খুঁজে বেড়ায় জলের তলাটা। চারখানা পায়ের ঝাপটায় সরে যাচ্ছে কাদার পাতলা আবরণ। ধীরে ধীরে কমে আসছে দূরত্ব, শেষবারের মত ঈশ্বরকে স্মরণ করে কেঁচো গিন্নী। শরীরের সমস্ত রস ঝরে পড়ে, সুতোর মত সরু হয়ে যায় সমস্ত দেহটা।

তীব্রবেগে কি যেন ছুটে আসছে জলের উপর দিয়ে। কেঁচো গিন্নীর আকুল আহবান কি পৌঁছেছে ঈশ্বরের অন্তরে, তাই কি তিনি তীর হেনেছেন ব্যাঙকে হত্যা করবার জন্য? আর এদিকে হত্যার আনন্দে উন্মত্ত সোনা ব্যাঙ বুঝতেও পারে না। পিছনে তারই মৃত্যু। কেঁচো গিন্নীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় সোনা ব্যাঙ। হাঁ করে গিলে খেতে আসে সরুগুলো বাচ্চাকে একসংগে, নরম মাংসের গন্ধে জিভে জল ঝরতে থাকে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কেঁচো গিন্নী।

পিছনে এক প্রচণ্ড আকর্ষণ। কে যেন টেনে ধরেছে সোনা ব্যাঙকে পিছন হতে। আর্তনাদ করে ওঠে সোনা ব্যাঙ। এ স্বর সবাই জানে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবাই। সোনা ব্যাঙকে মুখে তুলে নিয়ে মাথাটা উঁচু করে জলের আনন্দে সাঁতার কেটে চলে যায় বিরাট এক সাপ।

সুব্রতবাবু ভেবেছিলেন এক, আর হল এক। তাঁর ধারণা ছিল এখানে কেউ তাঁকে চিনবে না। তিনি মনের সুখে এখানে বিশ্রাম নিতে পারবেন। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা হয় না। পাড়ার ছেলেরা কি করে জেনে গেল, সুব্রতবাবু একজন পাকা গোয়েন্দা। তারপর হতেই ছেলের দল তাঁকে ঘিরে ধরল। সুব্রতবাবুর মুখে তারা গোয়েন্দার কাহিনী শুনবে। সুব্রতবাবু প্রথমে আপত্তি তুললেন, কিন্তু ছেলেদের আবদারের নিকট তাঁকে হার মানতে হল। এখন তাঁর ঘরে প্রতিদিন ছেলেদের আড্ডা বসে, তিনি তাদের নিকট গোয়েন্দার কাহিনী বলেন। এইভাবে ছেলেদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। ছেলেরা এখন তাঁর অনুগত। সুব্রতবাবু যখন যা বলেন, তারা তৎক্ষণাৎ তাই করে দেয়।

একদিন ছেলেরা আবদার ধরে বসল, তাদের গোয়েন্দাগিরি শিখিয়ে দিতে হবে। নইলে তারা কিছুতেই তাঁকে ছাড়বে না।

এবার সুব্রতবাবু খুব বিপদে পড়লেন। গোয়েন্দার গল্প বলা যত সহজ, গোয়েন্দাগিরি শিখান তত সহজ নয়, বিশেষত বালকদের পক্ষে। কিন্তু ছেলেদের আবদার, তিনি অবহেলা করতে পারলেন না। তিনি বললেন, সুযোগ এলেই তিনি শিখিয়ে দেবেন।

একদিন সত্য সত্যই সুযোগ এসে গেল। ছেলেদের দল নিয়ে সুব্রতবাবু বেড়াতে চললেন। অনেক ঘুরে ফিরে শেষে এসে উপস্থিত হলেন নদীর পাড়। সামনেই সুবর্ণরেখা নদী। তার পাড়ে ঘন ঘাস বন, ছোট ছোট ঝোপে ভরা। তারি ভিতর দিয়ে একটা সরু পথ দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে। ছেলের দল হল্লা করতে করতে চলেছে। সুব্রতবাবুর চোখ চারিদিকে। তিনি দেখলেন দুটো লোক কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেদের নিয়ে সুব্রতবাবু তাদের নিকট এলেন।

সুব্রতবাবু লোক দুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি একটা বলদ হারিয়েছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সুব্রতবাবু আবার বললেন, বলদের পিঠে নিশ্চয়ই একটা ছোলার বস্তা ছিল। কেমন ঠিক কিনা?

—ঠিক বলেছেন হুজুর। ছোলার বস্তা আছে।

সুব্রতবাবু একটু হেসে বললেন, বলদটার বোধ হয় ডান চোখ কানা। আর সামনের দুটি দাঁত নেই। কেমন ঠিক তো?

লোক দুটি হাত জোড় করে বলল, আপনি নিশ্চয় আমাদের বলদটাকে দেখেছেন। নইলে এত কথা বললেন কি করে। এখন দয়া করে বলে দিন, বলদটা কোন্ পথে চলে গেছে।

সুব্রতবাবু বললেন, সত্যি বলতে কি, তোমাদের বলদকে আমি দেখিনি। তবে বলে দিতে পারি, বলদটা কোন্ দিকে গেছে। এই পথ ধরে সোজা চলে যাও। মনে হয় বেশী দূর যায় নি। একটু ছুটে গেলেই ধরতে পারবে।

লোক দুটি খুসী হয়ে ছুটল।

দেখে-শুনে ছেলের দল একেবারে হতভম্ব। সুব্রতবাবু নিশ্চয় গুনতে জানেন। তাই যদি না হবে, এত কথা বললেন কি করে। তারা বাড়ি থেকে একসঙ্গে বের হয়েছে। একসঙ্গে নদীর পাড় এসেছে। বলদ তো দূরের কথা, একটা ছাগলও তাদের চোখে পড়েনি। ছেলেরা বলল, আপনি বলদ কখন দেখলেন—স্যার। আপনি তো বরাবর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন?

—এই দুটো চোখ দিয়ে দেখেছি ভাই।

—আমাদের তো চোখ রয়েছে, কই আমরা তো দেখিনি?

—তোমাদের চোখ থেকেও নেই। দেখবে কি করে! দাঁড়াও কি করে দেখতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছি।

ছেলের দল খুসী হয়ে উঠল, বলল, দিন শিখিয়ে দিন। আমরা শিখব।

সুব্রতবাবু বললেন, লোক দুটির অবস্থা দেখে তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ—ওরা কিছু হারিয়েছে।

—হ্যাঁ, সে ঠিক। কিন্তু তারা বলদ হারিয়েছে, সে কথা কি করে জানলেন স্যার?

—এই দেখ, বলদের পায়ের খুরের ছাপ। আর এই দেখ ছোলার দানা, যে পথে বলদ চলে গেছে—পড়তে পড়তে গেছে।

—ও তো, গরুও হতে পারত?

সুব্রতবাবু হাসলেন, বললেন, আমাদের দেশে গরু দিয়ে কেউ মোট বহায় না। কাজেই বলদ। আর বলদের পিঠে ছোলার বস্তা।

—আপনার কথা মেনে নিলাম স্যার। কিন্তু, বলদের দাঁত নেই, তার ডান চোখ কানা, এ আপনি কি করে জানলেন?

—বলদ যে পথে চলে গিয়েছে, তার দুই ধারে ঘাস বন। বলদ বাঁ ধারের ঘাস, লতা পাতা খেতে খেতে চলে গিয়েছে। কিন্তু, ডান দিকের ঘাস সে খায়নি। সে যদি ডান দিকের ঘাস খেতো তাহলে বোঝা যেতো, তার দুটি চোখই আছে। খায়নি বলেই ধরে নিতে পেরেছি—তার ডান চোখ কানা। আর দাঁতের কথা বলছ, লক্ষ্য করে দেখ, বলদ দাঁত দিয়ে যে ঘাস ছিঁড়েছে, তার মাঝের ঘাস অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। কাজেই সহজে অনুমান করা যায় বলদের সামনের দুটি দাঁত নেই।

ছেলের দল দেখে-শুনে একেবারে অবাক। বাস্তবিক সুব্রত-বাবুর তদন্তের ক্ষমতা অসাধারণ। এমন সময় বলদটিকে ধরে সেই লোক দুটি এসে উপস্থিত হ'ল। সকলে দেখল,—সুব্রতবাবু যা বলেছেন, হুবহু সব মিলে গেছে। ছেলের দল এর ওর মুখের দিকে চাইল।

সুব্রতবাবু সব লক্ষ্য করে বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। চোখ দিয়ে দেখতে শিখলে, সব জিনিষই সহজ হয়ে যায়। আমরা যে আসামী গ্রেপ্তার করি, এমনি ভাবেই করে থাকি। তোমরা যদি চোখ দিয়ে সব জিনিষ দেখতে শেখ, দেখবে, কত কঠিন সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।

ছেলের দল চুপ করে রইল। তাদের মুখে আর কথা বের হ'ল না।

ঠোঁটে ভরা মাছ তার ছোট এক বাচ্চার,
চুপচাপ বসে আছে, কে বলবে নচ্ছার।
মার দিকে চায় আড়ে
মা গেছে পুকুর পাড়ে
চুনোচানা মিরগেল ধরবে সে গুচ্ছার।
মা বললে, এতগুলো ভুলে যেন খাস না,
কম করে সাত দিন আর খেতে চাস না।
কত আছে তস্কর
মাছ পাওয়া দুস্কর
সাত দিন চলা চাই তার আগে চাস না।
ঠোঁটে ভরা মাছ তার থলি ভরা খাদ্য
তাই নিয়ে বসে থাকা হয় কার সাধ্য?
এক ঢোকে কোঁক করে
গিলে ক্যালে ভুল করে
কম করে সের চার হপ্তা বরাদ্দ।

* * *

কী বকাই দিলে মা, 'পেলি যদি থেলি ক্যান?
পেটুক বলবে লোকে বলবে না পেলিক্যান।

এই কলকাতা—এই যে সহর—লোহা আর ইঁটে গাঁথা
জানো কি কখন আসে এইখানে মহাসাগরের ঢেউ?

জনহীন কোন্ প্রবালের দ্বীপে দুলে ওঠে তালবন—
কালো গ্র্যানিটের বুকে ফেটে পড়ে ফেনায়িত গর্জন
আহত তিমির রক্তের ঘ্রাণে ছোটে হাঙরের পাল
রাতের বাতাসে আসে তার কথা—তোমরা কি জানো কেউ?

এই কলকাতা—এই যে সহর—কাজের চাকায় ঘোরে
জানো কি কখন এইখানে নামে লক্ষ যুগের ঘুম?
কত কোটি কোটি যোজনের পারে কোন্ সে অজানা তারা,
চির তুষারের মরণের কোলে ঘুমায় আপন হারা
তার তুহিনের ছোঁয়া এসে লাগে তোমারই জানালা বেয়ে—
জেনেছো কখনো সুদূর পারের সেই মায়া নিঝ্ঝুম?

এই কলকাতা—এই যে সহর—একটানা কাটে দিন,
শুনেছো কখনো আসে সেইখানে বিশ্বজয়ের ডাক?
থরে থরে জমে ঘন কালো মেঘ—জয়ের নিশান ওড়ে,
গুরু গুরু গুরু বজ্রের রোলে আগুনের চাকা ঘোরে,
তারি মাঝে ছোটে রুপালি বিমান দুরন্ত প্রাণবেগে
জানো কি তোমায় হাতছানি দেয় দুরন্ত বৈশাখ?

কেমন জব্দ

অণিমা নাগ

নুটুবাবু রুগ্ন সে আজ শুয়ে খাটের 'পরে
মনটি তবুও আছে পরে পাশের খাবার ঘরে।
পেট কামড়ে কাবু নুটু শুয়ে আছে তাই
নইলে কি আজ নুটুর দেখা শোবার ঘরে পাই?
থরে থরে কত খাবার আছে টেবিল ভরে
কল্পনাতে দেখে নুটুর নোলাতে জল ঝরে'
আসবে কত নতুন মানুষ ভোজ হবে আজ বড়
বরাত ভেবে নুটুবাবু ভয়েই জড়সড়।
কি কুক্ষণে বলেছিল মায়ের কাছে ভুলে
পেটের কামড় লাগছে বড় যাব না আজ স্কুলে।
পাকের বড়ি খাইয়ে সোজা শুইয়ে দিল খাটে
কাণ্ড দেখে নুটুবাবুর জলেতে চোখ ফাটে।
পড়া যে আজ হয়নি করা দিচ্ছিল তাই ফাঁকি
আশংকাতে ভাবছে নুটু, "টের পেল মা নাকি?"
সারাটা দিন উপোস করে কাটল যে দিন হায়
এমনি সুখ ভুলেও যেন কেউ কভু না চায়।
অপেক্ষাতে থাকে নুটু মায়ের ঘুমের তরে
পায় কে তারে শোবার ঘরে একটুখানি পরে?
একটু সবুর সইলে তবেই ফলবে মেওয়া ফল
এমন কথা ভাবতে চোখের শুকিয়ে গেল জল।
ঝনাৎ! সে এক শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখে
কখন যে মা গেছেন উঠে নুটুর পাশে থেকে।
ইয়া বড় মস্ত তালা দোরে দিল যেই
ডুকরে কেঁদে বলে, "মা মোর পেটের ব্যথা নেই।"
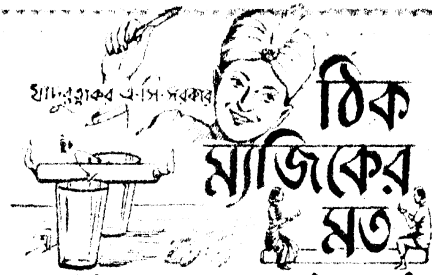
দেখে ম্যাজিক মনে হলেও আসলে ম্যাজিক নয় এমনি একটা মজার জিনিষের কথা তোমাদের কাছে বলছি। এ জিনিষটার নাম তোমরা দিতে পারো ম্যাজিক দোলনা।

একটা মোমবাতি নিয়ে তার মাঝখান বরাবর আড়াআড়িভাবে ফুটিয়ে দেবে একটা বড় ছুঁচ। এবার দুটো গ্লাস পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে তার মাঝখানে এই মোমটাকে এমন করে রাখবে যেন ছুঁচের দুই প্রান্ত লেগে থাকে গ্লাসের কানার উপরে আর মোমটা দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ির মতন থাকে ঝুলন্তভাবে।

এখন মোমবাতিটার দুই প্রান্তে যদি আগুন লাগাও তবে দেখবে একটা মজার ব্যাপার। 'সী-স্য'র মতন এই ঝুলন্ত মোমবাতিটা হেলতে দুলতে থাকবে। একবার এ-প্রান্ত আর একবার ও-প্রান্ত নামা-ওঠা করতে থাকবে।

একটা কায়দা করতে পারলে এই খেলাটাকে তোমরা আরও মজাদার করে তুলতে পারো। কার্ডবোর্ড কেটে দুটো ছেলেমেয়ের পা ঝুলিয়ে বসা মূর্তি তৈরী করে নিয়ে আলপিন দিয়ে যদি আটকে দিতে পারো মোমবাতিটার দুই প্রান্তে শিখা দুটোকে আড়াল করে, তবে হেসে লুটোপাটি খাবে তোমাদের বন্ধুরা কার্ডবোর্ডের মূর্তি দুটোকে 'সী-স্য'তে দুলতে দেখে।

আসলে ব্যাপারটা কি হয় জানো? আগুনের উত্তাপে গলে গলে মোম পড়তে থাকে মোমবাতির প্রান্ত দুটো থেকে। এক দিকের প্রান্ত থেকে যেই মাত্র এক ফোঁটা মোম পড়ে তখন সে প্রান্তটা হয় একটু হালকা আর তা উপর দিকে ওঠে এর মধ্যে অন্য প্রান্তটা থেকে এক ফোঁটা মোম গলে পড়ে—এরই ফলে হয় এই ওঠা-নামার খেলা।

আলপনা— ইন্দিরা বিশ্বাস

ট্রাইবুন্যাল

আমিনুর রহমান

আমাদের গনাইমামাকে মনে পড়ে ত? মোটা, বেঁটে, ফর্সা, মাথায় টাক্, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুড়ো ঝাঁটার মত গোঁপ, পরনে আজন্ম রজকদর্শন বঞ্চিত গ্রে প্যান্ট ও মেরুন রং-এর সার্ট; ঠোঁটের ফাঁকে সস্তা দামের সিগারেট অথবা বিড়ি—যখন যেটা জোটে। গনাইমামা দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ—'খায়, দায় গান গায় তাইরে নারে না' গোছের। রোজগারের কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

গনাইগিন্নী কিন্তু ভীষণ ধর্মভীরু মহিলা। মুখে হাসিটি নেই। গুরুর মন্ত্র নিয়েছেন; পরকালের চিন্তায় এতই মশগুল যে ইহকালের সকল প্রকার সাধ আহ্লাদ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখেছেন। আবার এমন শুচিবাইগ্রস্ত যে সারাদিনই ঘরদোর ধোয়া, জামা কাপড় কাচা, থালা ঘটি বাটি মাজা ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। গনাইমামার হাসি ঠাট্টা তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন না।

সম্প্রতি গনাইমামা একটা ছোট্ট কারখানায় ঠিকে চাকরি জুটিয়েছেন। বেতন যা পান তাতে স্বামী স্ত্রীতে ভালভাবেই চলবার কথা। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে, ফ্লাশ খেলে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে সারা মাসের রোজগার তিনদিনে উড়িয়ে দিলে সংসার আর চলে কি করে! ফলে গনাইমামা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ গনাইগিন্নী একটানা বিলাপ করতে থাকেন, আমার পোড়া কপাল, ওর সংসারে ভূতের বেগার খেটে খেটে গতরে ঝাঁঝরা পড়ে গেল। কি করে যে দুবেলা দুটো খাবার জোগাড় হয় তা গুরুদেবই জানেন, চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে—দেখতে পায় না আমার সাড়ীতে আর তালি মারবার জায়গা নেই, বালিশের খোল ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে গেছে…

সেদিন সোমবার, 'হপ্তা' পাওয়ার দিন। গনাইমামা ভোর বেলা উঠে কারখানায় চলে গেছেন। বেলা নটার সময় তাঁকে হঠাৎ বাসায় ফিরতে দেখে গনাইগিন্নী হাত থেকে জলের বালতিটা দুম্ করে মাটিতে রেখে, ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, চাকরিটা খুইয়ে এসেছ ত?

গনাইমামা স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থে যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, না চাকরি ঠিকই আছে, তবে ধর্মঘট করেছি।

গনাইগিন্নী চোখ কপালে তুলে বললেন, তার মানে? ভারি চোদ্দ সিকে রোজের ঠিকে চাকরি তার আবার ধর্মঘট কি? কুঁজোর আবার চিত হয়ে শোয়ার সখ, লেংগটের আবার বুক পকেট!

গনাইমামা মহা অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে বললেন, কি করব, ইউনিয়ন থেকে যা ঠিক হবে তা না মেনে উপায় কি? একজন কামাই করেছিল, তার রোজ কেটে নিয়েছে বলে আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়েছি।

গনাইগিন্নী বিস্ময়ের ভংগিতে গালের ওপর দুটো আঙুল রেখে বললেন, ওমা, এ আবার কি অনাসৃষ্টি কথা? কামাই করলে মাইনে কাটবে না ত কি বাড়ী বসিয়ে রেখে কোম্পানী তোমাদের টাকা দেবে? মামার বাড়ীর আব্দার! 'হপ্তা' না নিয়ে কাজ ছেড়ে বাড়ী চলে এলে যে—গিলবে কি?

প্যান্টের পকেট থেকে একটা তোবড়ানো টিনের কোটা বার করে তার থেকে একটা বিড়ি বার করতে করতে গনাইমামা বললেন, যতদিন 'স্ট্রাইক' চলবে ততদিন ইউনিয়ন থেকে আমাদের আট আনা ক'রে খোরাকী দেবে।

রাগে ফেটে পড়লেন গনাইগিন্নী, একবার পেতুম যদি তোমাদের ইউনিয়নের পাণ্ডাকে ত মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে তার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়তুম। বলি এই বাজারে আট আনায় গুষ্টির পিণ্ডির ব্যবস্থা হয় নাকি? তোমার ঐ জালার মত পেট ভরাবে কি দিয়ে শুনি? ভাল চাও ত এক্ষুণি কাজে চলে যাও তা না হলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

খানিকক্ষণ টাক্ চুলকে নিয়ে গনাইমামা বললেন, ইউনিয়নের নির্দেশ অমান্য করলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে না? ভাত দাও, খেয়ে বেরুতে হবে—অনেক কাজ আছে—চাঁদা তুলতে হবে, ইস্তাহার বিলি করতে হবে, পোস্টার মারতে হবে, বিকেলে মিছিল করে ময়দানে যেতে হবে মিটিং করতে—

গনাইগিন্নী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, কোন্ জাহান্নামে যাবে যাও না—কেউ ত তোমাকে ধরে রাখে নি। ভাত টাত হবে না। রোজগার করে টাকা নিয়ে এসো ভাত পাবে, নইলে বাসি চুলোর ছাই ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

বাইশ বছর ধরে গিন্নীর সংগে ঘর করে গনাইমামা তাঁকে হাড়ে হাড়ে চিনেছিলেন। বুঝলেন এখন আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না বরং ঘণ্টাখানেক পরে মেজাজটা একটু নরম হলে হয়ত দুটো গরম ভাত জুটতেও পারে। অতএব মানে মানে সরে পড়াই ভাল। বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, প্যান্টের পকেটে হাত ভরে, শিস্ দিতে দিতে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে গনাইমামা মন্থরগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গনাই গিন্নী খানিকক্ষণ কট্-মট্ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তি করলেন, ছোটলোক, ইতর, চাষা, অভদ্র, গেঁয়ো, ভূত……।

একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গনাইগিন্নী অনেকক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করলেন তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে জলের বালতিটা চট্ করে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে হুশ্ করে জলটা ঢেলে দিলেন। তৈজস-পত্রগুলি দুমদাম্ করে তাকের ওপর তুলে রেখে রান্না ঘরে শিকল তুলে দিলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে পরনের ছেঁড়া সাড়ীটা বদলে ফেললেন এবং চুলটা আঁচড়ে নিলেন। খুঁজে পেতে একটুকরো সাদা কাগজ ও একটা পেন্সিল জোগাড় করে ধরে ধরে মোটা মোটা অক্ষরে লিখলেন—"আমি ধর্মঘট করেছি—ইতি শোভারাণী।"

সদর দরজায় তালা দিয়ে কাগজটা কড়ার সংগে বেঁধে দিলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় নেমে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করে দিলেন কারখানার দিকে। কারখানায় পৌঁছে তিনি বড় সাহেব অর্থাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সংগে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। সঙিনধারী দারওয়ান কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দেবে না। আধা হিন্দী আধা বাংলায় অনেক অনুনয়, বিনয়, গালাগালি, মুণ্ডুপাত করে বহু কষ্টে বড় সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হলেন। গনাইগিন্নী নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আমি জানতে চাই কেন আমার স্বামীকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

বড় সাহেব বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন,

আপনার স্বামী কেন কাজে এলেন না সে কৈফিয়ৎ তাঁর কাছ থেকেই নিন না। আমরা ত আর তাঁকে কাজ করতে বারণ করিনি।

গনাইগিন্নী তখন কথায় তুবড়ি ছেড়ে দিলেন এবং কখনও তিরস্কারের সুরে কখনও আদেশের সুরে তিনি যা বললেন তার সারাংশ হল যে এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়, শ্রমিকরা আস্কারা পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল, কুঁড়ে, সংসারের প্রতি কর্তব্যবিমুখ হয়ে পড়ে। সুতরাং মিল কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে যাতে ধর্মঘট বন্ধ হয় সে বিষয়ে তৎপর হওয়া। বড় সাহেব তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই ধর্মঘটের ব্যাপারে মিল মালিকের কোন হাত নেই। আজকাল প্রত্যেক মিলের শ্রমিকদের নিয়ে দল পাকানো হয়, তার নাম ইউনিয়ন। এইসব ইউনিয়ন যারা চালায় তাদের আর কোন কাজকর্ম নেই, কেবল শ্রমিকদের রোজগারের পয়সায় ভাগ বসায় আর তাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়।

সব শুনে গনাইগিন্নী হতাশার সুরে বললেন, দেশ থেকে আইন আর শৃঙ্খলা কি উঠে গেল? ছন্নছাড়া হাঘরের ব্যাটারা উড়ে এসে জুড়ে বসে যা খুশি তাই করবে আর আপনারা চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে মজা দেখবেন আর যত জুলুম আমাদের উপর। আজ আমি এর একটা বিহিত না করে বাড়ী ফিরব না প্রতিজ্ঞা করেছি। আপনাকেও শুনিয়ে রাখছি আজ থেকে আমিও ধর্মঘট করছি, যতদিন আমার স্বামী কাজে যোগদান না করছে ততদিন আমিও ধর্মঘট প্রত্যাহার করব না।

এই কথা শুনে বড় সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট অট্টহাসি দিয়ে উঠলেন। হাসি থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে নিয়ে বললেন, আপনি একটি 'জিনিয়াস', আপনার মত বিচক্ষণা, বুদ্ধিমতী, বীরাঙ্গনা মহিলা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদি থাকত তাহলে ভেড়ার পাল স্বামীগুলো অনেক দুর্গতির হাত থেকে বাঁচত। বেচারা গনাইবাবুর জন্য সত্যই দুঃখ হচ্ছে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার অসাধারণ বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ধর্মঘট বন্ধ করতে পারেন।

আর কিছুক্ষণ বড় সাহেবের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে একগাদা নাম ঠিকানা লেখা কাগজের তাড়া ও ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের নাম ঠিকানা নিয়ে গনাইগিন্নী কারখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। তালিকার প্রথমে যে ঠিকানা ছিল সেই বাড়ীটা খুঁজে বার ক'রে গনাইগিন্নী দরজায় কড়া নাড়া দিলেন। দরজা খুলতেই তিনি বললেন, আমি রতন হালদারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

হালদারগিন্নী নিজের পরিচয় দিতেই গনাইগিন্নী এক নিশ্বাসে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। সব শুনে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে হালদারগিন্নী বললেন, না, দিদি ঐ সব অনাছিষ্টি কাজ আমার দ্বারা হবে না। ওরে বাবা, এ রকম কথা চিন্তা করলেও পাপ হয়, ভয়ে এখুনি আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আমি কোন দিন ও'র অবাধ্য হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি নি।

গনাইগিন্নীকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তাঁর নাকের ওপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই তিনি 'ভীরু কাপুরুষ, ভেড়া' ইত্যাদি বলতে বলতে রাস্তায় নামলেন। তাঁর পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টায় এ রকম শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হওয়ায় খানিকটা মুষড়ে পড়লেন। তালিকার দ্বিতীয় ঠিকানাটা দেখে নিয়ে পরক্ষণেই দৃঢ় পদক্ষেপে সেই দিকে রওনা হলেন।

নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে সজোরে কড়া নাড়া দিতেই ভেতর থেকে বাঁশ ফাটা বাজখাই গলায় গৃহকর্ত্রী সাড়া দিলেন, কে র‍্যা, একটু আস্তে কড়া নাড়তে পার না? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়ল—বাবা রে বাবা—মুখপোড়া মিন্সে একটু যদি বাড়ীতে থাকত তাহলে আর এই সব উড়ো ঝঞ্ঝাট আমাকে সইতে হত না। রাজ্যময় দেনা করে বেড়াবে আর পাওনাদার ঠেকাবার বেলা আমি। ইচ্ছে করে যে দিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ি—

একটু পরেই দুমদাম করে পা ফেলে যিনি দরজা খুলে আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁকে দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। ছ'ফুট লম্বা, আড়াই মণ মেদবহুল চণ্ডী মূর্তি ধরে আবির্ভূতা হলেন দত্তগিন্নী। গনাইগিন্নীর মত দজ্জাল মহিলাও রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত সমীহের সঙ্গে এমন অসময়ে বিরক্ত করার জন্য প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে তাঁর আগমনের হেতু প্রকাশ করলেন।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে গনাইগিন্নীর দিকে তাকিয়ে সব শুনে পুরো আড়াই মিনিট মুখব্যাদন করে থাকার পর দত্তগিন্নী হঠাৎ আগন্তুকের গলা জড়িয়ে ধরে হিড় হিড় করে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, এ যে আমার মনের কথা টেনে বার করেছ বোন। আমি আজ সকাল থেকেই ভাবছি এই রকম একটা কিছু না করতে পারলে মুখপোড়া মিন্সেদের জব্দ করা যাবে না।

গনাইগিন্নী তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আশাতীত রকম সাফল্য লাভ করে তাঁর পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং হালদারগিন্নী তাঁর সঙ্গে কি রকম অভদ্র ব্যবহার করেছে তাও বললেন। দত্তগিন্নী আশ্বাস দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না বোন, আজকের এই যুদ্ধে আমিই তোমার প্রধান সেনাপতি। তুমি এক মিনিট বস ভাই, আমি এখুনি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছি।

ত্বরিতে দত্তগিন্নী পরিধানের বারহাত শাড়ীটা বদলে ফেললেন। একটা ঠোঙ্গার কাগজ জোগাড় করে রান্নাঘর থেকে এক টুকরো কাঠকয়লা এনে মোটা মোটা অক্ষরে লিখলেন, "আমিও ধর্মঘট করেছি—ইতি মাতঙ্গিনী"। সদর দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলিয়ে কাগজটা সুতো দিয়ে কড়ার সঙ্গে বেঁধে দিলেন এবং দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গনাইগিন্নীর হাত থেকে নামের ফর্দটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে দত্তগিন্নী বললেন, তুমি কিছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। প্রথমে চল রতন হালদারের বাড়ী; তার বৌ কেমন রাজী হয় না আমি একবার দেখতে চাই।

তিন মিনিটের মধ্যে দত্তগিন্নী রতন হালদারের বৌকে ঘরের দরজায় তালা মেরে, ধর্মঘটের নোটিশ টাঙ্গিয়ে, তাঁদের সঙ্গে বেরুতে বাধ্য করেছিলেন। তারপর মহাদেব ঘোষের বাড়ীতে ঢু মেরে দেখেন গৃহকর্তা সবে পাতপেড়ে খেতে বসেছেন। ঘোষগিন্নী একটা তালপাতার পাখা নিয়ে সামনে বসে বাতাস করছেন। দত্তগিন্নী খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে কোন রকম ভণিতা না করেই বললেন, এই যে এখানে একটা কুঁড়ের বাদশা কাজে ফাঁকি দিয়ে বৌ-এর আঁচলের তলায় বসে কব্জি ডুবিয়ে গিলতে বসেছেন আর পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী পদসেবা করছেন। লজ্জা করে না নিজেরা রোজগার না করে বাড়ী বসে কাঁড়ি কাঁড়ি গিলতে। যেমন নাম তেমনি চেহারা, যেন গাঁজা টেনে ব্যোম্ ভোলানাথ হয়ে আছেন, কিছুই কানে যাচ্ছে না।

ঘোষের পো'র খাওয়া মাথায় উঠে গেল। ধর্মঘটের সংবাদ তিনি নিজের স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিলেন। এমন অতর্কিতে যে তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে আসন থেকে তিনি উঠে পড়লেন এবং রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। ঘোষগিন্নী কিছুই বুঝতে না পেরে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে নারী বাহিনীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন পরে ব্যাপারটা সব শুনে নিয়ে স্বেচ্ছায় এই দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

দত্তগিন্নী যেন একটার পর একটা যুদ্ধ জয় করে চলেছেন এমনিভাবে বীরদর্পে লিস্ট মিলিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাঁর দল ভারি করতে লাগলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা পূর্ণ সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কোথাও যদি কেউ একটুকু আপত্তি জানিয়েছে ত আর রক্ষা নেই। তোপের সামনে যদিও বা দাঁড়ানো যায় দত্তগিন্নীর অভিধান বহির্ভূত, পিলে চমকানো, হাড় জ্বালানো কটাক্ষ আর বজ্রগম্ভীর ধমক ও আদেশের সামনে বেশিক্ষণ টিকে থাকার সাধ্য কারো নেই।

এদিকে গনাইমামা অমরদার আড্ডায় গিয়ে খালি পেটে কয়েক কাপ চা ও এক বাণ্ডিল বিড়ি ধ্বংস করার পর উপলব্ধি করলেন যে, খিদেটা যে রকম জাঁকিয়ে উঠেছে তাতে তরল বা গ্যাসিও পদার্থ দ্বারা তা বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এক ফাঁকে উঠে বাড়ী গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। তাঁর ধর্মপরায়ণা সাধ্বী গৃহিণী যে ধর্মঘটের নোটিশ টাঙ্গিয়ে সদর দরজায় তালা মেরে চলে যাবেন এটা তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি। আশপাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে অনেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে দেখে গনাইমামা সাহেবী কায়দায় প্যান্টের পকেটে হাত ভরে শিস্ দিতে দিতে চলে গেলেন, ভাবখানা যেন 'সব্ ঠিক্ হ্যায়'।

ব্যাজার মুখে মন্থর গতিতে অমরদার আড্ডায় ফিরে আসতেই ধুম্‌সো মোষের মত চেহারা নিয়ে সার্টের আস্তিন গুটিয়ে রুখে এলো রতন হালদার, এডা হইত্যাছে কি? এ্যাক্ ঘুষিতে তোমার কাল্লা ফাডাই দিমু না? আমার বৌরে তোমার বৌ ক্যান্ ফুশ্‌লাইয়া গরের বাইর করল? হুস্তা না পাইয়া ম্যাজাজের ঠিক নাই—এগারউগা পোলাপান লইয়া থামু কি। বাত খাওনের লাইগা বাড়ী গেছি—দেহি পোলাপানেরে পাশের বাড়ী রাইখা বউ আমার বিবাগী হইল। হায় হায় আমার বৌডার মাথাডা চিবাইয়া খাইল তোমার বৌ। তুমি হালায় জানস্ আমার বৌ কোই আছে—

গনাইমামা হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেলেন, তারপর অতিকষ্টে দুই হাতে পেট টিপে ধরে হাসি থামিয়ে বললেন, হাতে হাত মেলাও দাদা, আমার কপালেও আজ অন্ন জোটে নি। এইবার খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি আমার গিন্নী কোথায় কি মতলবে বেরিয়েছে। ভয় নেই এগারটা সন্তানের জননী সংসার ত্যাগী হবেন না; একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, যথাসময়ে বাড়ী ফিরবেন।

ইতিমধ্যে একে একে কারখানায় আরও কয়েকজন সহকর্মী অমরদার আড্ডায় হানা দিতে লাগল এবং গনাইমামাকে ঘেরাও করে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ জানালো এবং তাদের এই অশেষ দুর্গতির জন্য গনাইমামাকেই ষোল আনা দায়ী করল। তারাপদ তার গোল আলুর মত নাকের মধ্যে একগাদা কড়া নস্য ঠেঁসে দিয়ে পকেট থেকে একটা নোংরা ন্যাকড়া বার করে নাকটা কয়েকবার ঘষে লাল করে বলল, আমাল্ বাওয়া খিডেয় নাড়ী হুজম হুবাল্ জোগাল্। ভ্যালা খেল্ দেখাচ্ছে তোল্ বৌ। মট্লবখানা কি বল্ টে?

অনেকে আবার গনাই দম্পতিকে কোম্পানীর দালাল বলতেও কুণ্ঠিত হল না। তাদের ধারণা এই রকম বেকায়দায় পড়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়বে। পেটে অন্ন নেই, ট্যাঁকে পয়সা নেই, এমন অবস্থায় সকলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, যেন গনাইমামাকেই ছিঁড়ে খাবে। বহু কষ্টে তাদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে, অমরদার কাছ থেকে দুটো টাকা ধার নিয়ে সবাইকে তেলে ভাজা, মুড়ি ও চা কিনে খাইয়ে গনাইমামা বললেন, চল আমরা সবাই মিলে আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী গিয়ে তাঁকে সব কথা জানাই। আমার মনে হয় ভেতরে ভেতরে এ ব্যাপারে কোম্পানী উস্কানি দিচ্ছে।

ওদিকে গনাইগিন্নী ও দত্তগিন্নীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে ক্ষুদ্র বাহিনী গড়ে উঠল তা সত্যই অভূতপূর্ব। একটা পার্কে বসে মিনিট দশেকের মধ্যে তাঁরা তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিলেন। দত্তগিন্নী একবার মিলিটারী গলায় জিজ্ঞাসা করে নিলেন, সবাই প্রস্তুত? কেউ নিরস্ত্র নয় ত? যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্কেত পাওয়া মাত্র প্রত্যেকের আক্রমণ তৎপর ও লক্ষ্য অব্যর্থ হয় যেন।

সদলবলে নারী বাহিনী গিয়ে হাজির হলেন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ভূপাল রায়ের বাড়ীতে। আধুনিক, রুচিসম্পন্ন, মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত বাড়ীখানার সামনে লন ও সাজানো ফুলের বাগিচা। ভূপাল রায় তখন সবে দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাপনান্তে তাম্বুল চর্বণ করছিলেন। বাইরে একাধিক নারী-কণ্ঠের কল্লোল শুনে তিনি ত্রস্তে ঘরের বাইরে এলেন। দত্তগিন্নী তাঁর মেদবহুল আড়াইমণি বপুটা ভীড়ের পুরোভাগে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে হেড্মাস্টারি ঢং-এ বলতে সুরু করলেন, এই যে ভেড়ার পালের সুযোগ্য নেতা কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, সবাই উলু দাও।

ভরা দুপুরে স্তব্ধ নীরব পল্লীটি শত নারী কণ্ঠের কর্ণ-বিদারক উলুধ্বনিতে সচকিত ও মুখরিত হয়ে উঠল। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ যে যেখানে ছিল চারিদিকের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছুটে এলো ব্যাপার কি জানবার জন্য। দত্তগিন্নী তখন চিৎকার করে উকিলের জেরা করছেন, কতগুলো পদ দিয়ে ভোজনটা সারা হল? মাছ, মাংস, টক, দই, মিষ্টি কিছু বাদ যায় নি ত? কাদের পয়সায় এ রকম আহার রোজ জুটছে? এই বাড়ী, বাগান, আসবাবপত্র কাদের পয়সায় হয়েছে? কাদের রক্তজল করা হপ্তার পয়সায় ভাগ বসিয়ে এই বিলাসিতা হচ্ছে? জবাব দাও—

শতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "আমরা জবাব চাই।" দত্তগিন্নী ততক্ষণে মেঠো বক্তৃতা আরম্ভ করে দিয়েছেন, এতগুলো শ্রমিককে আজ বেকার বসিয়ে তাদের অনাহারে রেখে নিজের গলা দিয়ে পিণ্ডি নামল কি করে? কমরেড্, বন্ধু, ভাই বলে যাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ভেড়া বানিয়ে নিজের স্ফূর্তির পয়সার জোগাড় কর তাদেরই সর্বনাশ করবার জন্য কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ খেতে বিবেকে বাধে না? তিন মাস আগে এদের মাগ্গিভাতা বাড়াবার দাবী নিয়ে যে বেআইনী ধর্মঘট করিয়েছিলে তাতে কোম্পানীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা খেয়ে এদের বোকা বুঝিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নাও নি?

ইতিমধ্যে ভূপাল রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী আপাদমস্তক অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত করে চারিদিক দেখতে দেখতে স্বামীর হাত ধরে বললেন, এ ম্যা আমার এত সাধের মরশুমি ফুলের বেড্গুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে, পানের পিক্ ফেলে কি রকম তছ্নছ্ করে ফেলেছে। এরা সব মানুষ না কি গা? একটুও ম্যানার্স জানে না? চল ডার্লিং ঘরে চল—এই সব ছোটলোক বস্তির মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে হা করে তাদের বেলেল্লাপনা দেখতে হবে না।

বারুদের গুদামে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শের ন্যায় উন্মত্ত নারী বাহিনী গর্জে উঠল, বটে আমরা সব ছোটলোক, বস্তির মেয়ে। আমরা গতর খাটিয়ে সৎপথে রোজগার করি বলে ছোট-লোক? ম্যানার্স জানি নে? আর গরীবকে ঠকিয়ে, ইউনিয়নের টাকা মেরে চটকদার সাজ-পোষাক পরে তোমরা হলে ভদ্রলোক। তবে দ্যাখ্ ছোটলোক কাকে বলে—

দত্তগিন্নী তাঁর আঁচলের ভেতর থেকে একটা বিরাট পচা মাদ্রাজী হাঁসের ডিম বার করে ছুঁড়ে মারলেন ভূপাল রায়ের মাথা লক্ষ্য করে। ভূপাল রায় চট করে মাথাটা সরিয়ে নিতেই ডিমটা তাঁর স্ত্রীর কপালে লেগে ফট্ করে ভেঙ্গে গিয়ে সারা মুখ-চোখ দুর্গন্ধময় নাল-ঝোলে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহিলাবৃন্দ স্ব স্ব আঁচলের ভেতর থেকে পচা টম্যাটো, পচা মাছের নাড়ি, পচা গোবরের তাল ইত্যাদি যত রাজ্যের নোংরা পূতিগন্ধ বস্তু যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই ছুঁড়ে নব-দম্পতিকে অকথ্য মন্তব্য সহ অভিবাদন জানাতে লাগল।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ভূপালবাবু এবং তাঁর তরুণী ভার্যা এমন হক্চকিয়ে গেলেন যে চট্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চিন্তাটা কারও মাথায় আসে নি। ফলে মিনিট-খানেক ধরে তাঁদের ওপর মুষলধারায় নোংরা বর্ষণের পর যখন তাঁরা রাশিকৃত রাবিশের মধ্যে নানা প্রকার রসাল দ্রব্যে চর্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে 'ওয়াক্ থু' করতে করতে মুখ মুছছিলেন তখন তাঁদের দেখে সবাই হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারছিল না।

এদিকে গনাইমামা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ভূপাল রায়ের নিকট নিজেদের দুর্গতির কথা জানাতে এসে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তার অপর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন এ রকম ভয়াবহ ও সঙ্কট-জনক পরিস্থিতি থেকে তাঁদের প্রিয় নেতা ও নেতাপত্নীকে কি ভাবে সাহায্য করা সম্ভব হতে পারে। এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড্, পুলিশ কোন্টা ডাকা যে যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে কিছুতেই তাঁরা একমত হতে পারছিলেন না। রতন হালদার লালবাজারে খবর দিয়ে এক লরি নারী পুলিশ আনবার প্রস্তাব করলেন। গনাইমামা বিজ্ঞের মত বললেন, নারী পুলিশের কর্ম নয় এদের ঠ্যাকানো, উল্টে এদের আক্রমণ থেকে নারী পুলিশদের রক্ষা করবার জন্য এক ব্যাটালিয়ন মিলিটারী ডাকবার দরকার হয়ে পড়বে।

দূরে গনাইমামাদের দলকে দেখতে পেয়ে ভূপাল রায় ভেউ ভেউ করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ভাইসব, আমি এই মুহূর্তে তোমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ধর্ম-ঘট প্রত্যাহার করে নিচ্ছি; তোমরা অবিলম্বে কাজে যোগদান কর।

দত্তগিন্নী একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে গনাই-মামাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কি হল, এখনও দাঁড়িয়ে কেন? কাজে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী বসে অন্ন ধ্বংস করা গেল না বলে ভারি আপশোষ হচ্ছে না?

কাল বিলম্ব না করে গনাইমামাদের দল পড়ি কি মরি করে কারখানা মুখো ছুট্লেন। বলা ত যায় না ও'দের আঁচলের নীচে আর কোন্ মারাত্মক অস্ত্র লুক্কায়িত আছে! কর্ম-ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ট্রাইব্যুনাল আছে কিন্তু গিন্নীরা ধর্মঘট করলে কাকে সালিশ মানা যায় গনাইমামা তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

মায়াহরিণ

চিত্তরঞ্জন পাল

সে মায়াহরিণ। তার কস্তুরীর গন্ধ নাস্তিকূপে।
আত্মাহারা আনন্দে সে মায়াবিনী প্রকৃতির রূপে
খোঁজে পূর্ণতার ছবি। সুচারু স্বপ্নের মুখে তার
বাসনার কারুকার্য ক্ষণে ফুটে হারায় আবার
সময়ের বর্ণালীতে মনে রাখে চকিত ইশারা
সুদূরের কল্পলোকে সে-দেখার স্মৃতি গন্ধহারা।
নিরন্তর খোঁজাখুঁজি ঘোরাঘুরি
জানে না বিরাম ঃ
কি যে পায় কি হারায়—
জানে না সে সন্তোষের নাম,
ব্যর্থতাই সঙ্গী তার। ক্লান্তশ্বাস কুণ্ঠিত সময়
নৈরাশ্যের চেয়ে ভারি। এদিকে পাখিরা কথা কয়
সবুজ পাতার আড়ে। খোঁজার ধাঁধায় বাঁধা কাজে
খ্যাপার মতন ঘুরে জীবনের অর্থ বোঝে না সে।
যে পারে হৃদয় ভরে আলো দিতে,
তারে কাছে পেলে
সে দেবে প্রাণের সুধাপাত্র তার করপুটে ঢেলে।

অনিমেষের সংসার গুছিয়ে সেখানে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনবে। আট মাসের অবহেলায় অনেক জঞ্জাল সেখানে জমেছে। পাড়ার বৌ-ঝি-গিন্নীরা বেড়াতে এসে আড়ালে বলাবলি করলে—"আদিখ্যেতা।" কেউ বা বললে—"জন্ম-গিন্নী, মা-মরা মেয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হলে এমনিই হয়।" বয়সে যারা বড় তারাতো ওকে গ্রহণ করলেই না—যারা ছোট বা সমবয়সী তারাও সরে গেল।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এই কৃচ্ছ্রসাধন তাকে পোষ মানাতে পারলে না বসুধা। মা বলা দূরে থাক, অতটুকু মেয়ে রুমা, সে তাকে নিস্পৃহ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখলে। যখনই চোখে চোখ পড়তে লাগল কেমন এক-ধরণের ঠাণ্ডা দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হতে থাকল। যে মেয়ে এত কাঁদত সে একেবারে কান্না ভুলে গেল। বসুধার সঙ্গে তার সমস্ত আলাপ গুটিয়ে এলো মাত্র দুটো শব্দে—'হ্যাঁ' বা 'না'।

বিয়ের পর থেকে পাশের ঘরে বুড়ী ঝির কাছে থাকত রুমা। বসুধা বললে—"তা হয় না ও আমাদের কাছে থাকবে।" অনিমেষ আপত্তি করতে চেয়েছিল, বসুধা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—"ছিঃ—ঝি-চাকরের কাছে যদি মেয়ে মানুষ হয় তাহলে আমি এলুম কেন?"

সেইভাবেই বিছানা হল। একদিকে অনিমেষ অন্যদিকে বসুধা, মধ্যে রুমা। কিন্তু মেয়ে সরে গেল, বাপের গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল। অনিমেষ বললে—"এ'ত আমাকেই বিপদে ফেললে দেখছি—এমনি কদিন চলবে।"

বসুধা এ সমস্যার সমাধান তক্ষুণি করে ফেললে। বললে—"এদিকে আমি থাকি বলেই ও অমনি করে সরে যায়। কাল থেকে আমি মেঝেতে বিছানা কোরে শোব।"

অনিমেষ মুখ তুলতেই হেসে বললে—"মামার বাড়ীতে আমি চিরকাল মেঝেতে শুয়েছি, আমার কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা না হলে মেয়ে আরো দূরে চলে যাবে।"

সংসারের এ-দিকটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসুধা মেয়ের চিকিৎসা নিয়ে পড়ল। মেয়েটা জন্মরুগ্না। তবুও মা যতদিন ছিল ততদিন তার মধ্যেই কিছুটা ভাল ছিল, কিন্তু গত আট মাসে যা হাল হয়েছে তা আর দেখা যায় না। পুরানো ওষুধপত্রের প্রেসক্রিপসন যা পেল তার থেকে এবং অনিমেষকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে যেটুকু বুঝলে তাতে তার মনে হল মেয়ের চিকিৎসা গুছিয়ে কোনদিনই হয়নি। একদিন অনিমেষকে বললে—"দেখ আমি ভাবছি রুমাকে একজন চাইল্ড স্পেশ্যালিষ্ট দেখাব—কিছু খরচ বোধ হয় হবে—বাড়তি আয় যখন নেই, তখন আমি বলি কি আমার বালাজোড়া বেচে দাও।" তারপর অনিমেষের মূঢ় মুখের দিকে চেয়ে বলল—"কি হল, ওসব বাপু আমার পরতে ভাল লাগে না, থাকলে অবশ্য রুমারই থাকত—কিন্তু কি আর করা যাবে, আগে ওকে সারিয়ে তোলা দরকার।"

অনিমেষ অবশ্য বালাজোড়া নিলে না। অফিসের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে রুমার চিকিৎসা সুরু করলে। একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়েছে, তার ভারী ইচ্ছে হল ওর থেকে কিছু নিয়ে বসুধাকে একটা কিছু উপহার দেয়। কিন্তু বসুধা যা মেয়ে তাকে না জানিয়ে কিছু করে চমকে দেবার ভরসা হলনা তার। ভীরু কণ্ঠে প্রস্তাব করতে সত্যিই ধমক খেলে—"ছিঃ ছিঃ তোমার মুখে আটকাল না। মেয়ের চিকিৎসার জন্য টাকা ধার করে তার থেকে শাড়ী গয়না করব—আমার ত' নরকেও জায়গা হবে না।"

অনিমেষের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। ছি-ছি এ কি করলে সে। মেয়েত তারই—তারই ত এ-কথা ভাবা উচিত ছিল। তার বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে মায়া হল বসুধার—হেসে ফেললে—"আচ্ছা, তুমি কি বলত—বুড়ী হলুম না— তা ছাড়া আমার আবার শাড়ী গয়নার অভাব!"

"তুমি বুড়ী—!" প্রতিবাদ করতে গেল অনিমেষ।

"ও মা বুড়ী নয়!—দেখছ না কতবড় মেয়ে—" হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বসুধা।

ঠাট্টা করে গেল নাকি বসুধা? লজ্জা পেল অনিমেষ। নিজেকে অপরাধী মনে হল তার। পুরুষের উত্তপ্ত কামনার কাছে নির্মলা অনেক দূরে চলে গেছে—স্মৃতি থেকে বিস্মৃতি। নির্মলা আর বসুধা প্রায়ই সমবয়সী। তবু নির্মলার চেয়ে বসুধা অনেক সুন্দর—অনেক বেশী তার আকর্ষণ। সেই সৌন্দর্যকে তার মনের মমতা সুষমায় মুড়ে দিয়েছে। তাছাড়া প্রতিহত করতে করতে সেই আকর্ষণকে উন্মাদ করে তুলেছে বসুধা। তাই কয়েক মাসের মধ্যে নির্মলার স্মৃতিকে সম্পূর্ণ আবরণ করে দাঁড়িয়েছে। মনে পড়ল—মেয়ের যত্ন হবে এই আশা নিয়ে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। সে আশা তার ব্যর্থ হয়নি। না—না নেতিবাচক উত্তর নয়। সার্থক হয়েছে, ষোল আনার উপরে যদি কিছু থাকে তাই—শুধু হতভাগী মেয়েটা যদি ওকে একটু ভালবাসতে পারত! আর সার্থক হয়েছে বলেই কি তার বাসনা এমন করে হাত বাড়াচ্ছে। সেই বাসনাই কি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। না আর কিছু! অনিমেষের সাদামাঠা মন আর বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝতে পারেনা।

—"আয় মা রুমী ওষুধ খাবার সময় হয়েছে—লক্ষ্মী মেয়ে এদিকে আয়—"

ওদিক থেকে জবাব এলো—"না"।

বসুধা জানে 'না' কে 'হ্যাঁ' করান তার সাধ্যাতীত। তাই ঝিকে ডেকে বললে, দেখনা ভাই যদি মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওষুধটুকু খাইয়ে দিতে পার।"

কিন্তু ভোলাবার দরকার হল না। বসুধার প্রতি অবজ্ঞাকে যেন সম্পূর্ণ করতেই রুমা ঝির হাত থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়ে ফেললে। বসুধার চোখটা জ্বালা করে উঠল—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করল। মনের এমনি অবস্থায় ওর ভেতর থেকে একটা আদর্শের ছায়া মূর্তি বাইরে এসে ওকে বরাবর সান্ত্বনা দেয়। "ভয় কি বসুধা, দেখছ না ওর শরীরের অবস্থা, একটু ভাল হলে আর একটু বড় হলেই ও তোমাকে চিনতে পারবে। ফুলশয্যার রাতে কি সংকল্প নিয়েছিলে মনে নেই—উঠে পড়।" উঠে পড়ল বসুধা।

দীর্ঘ চিকিৎসা আর সতর্ক শুশ্রূষার ফলশ্রুতি দেখা গেল রুমার দেহে। কনে দেখা আলোর লাবণ্য এসেছে তার শিশুদেহে। ঝাঁকড়া একমাথা চুল আর সুডৌল চিবুকের মধ্যে তার চোখদুটো আরো সুন্দর আরো গভীর হয়ে উঠেছে। জেগে থাকতে কোনদিন রুমাকে আদর করতে পারেনি বসুধা। শুধু ঘুমিয়ে পড়লে কাছে বসে আস্তে আস্তে ওর চুলের জট ছাড়িয়ে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে তার গালের উপর নিজের গাল রেখে অস্পষ্ট ভীরু কণ্ঠে ডেকেছে 'রুমা, রুমী, রুমঝুম।' কান্নায় গলা বুজে এসেছে। তারপর এক সময় উঠে গেছে।

স্বাস্থ্যের সঙ্গে রুমার মধ্যে একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিতে অনিমেষ চিন্তিত হয়ে উঠল। বসুধার প্রতি তার শৈশবের তাচ্ছিল্য বাল্যের নিষ্ঠুরতায় রূপ নিয়েছে। সে নিষ্ঠুরতার কোন নির্দিষ্ট ধারা বা সীমা নেই। একদিন ঘুমন্ত বসুধার একমুঠো চুল কাঁচি দিয়ে কেটে দিল। অনিমেষের কাছে মার খেলে প্রচুর—বসুধা কিছুতেই আটকাতে পারল না। ছোটবেলায় রুগ্ন ছেলেমেয়ে বেশী আহ্লাদে স্বভাবতঃই একটু জেদী হয়ে ওঠে। তাই ফল ভাল হল না। মেয়ের জন্য মানত করেছিল বসুধা—পুজো দিতে কালীঘাটে গিয়েছিল। ফিরে এসে গরদের শাড়ী বদলে সংসারের কাজে মন দিয়েছিল। এক সময় ঘরে গিয়ে শাড়ীখানা তুলে রাখতে গিয়ে দেখলে সেখানা ইতিমধ্যে কে কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে রেখেছে। পাছে অনিমেষ দেখতে পায় তাই তাড়াতাড়ি সেগুলো লুকিয়ে ফেললে বসুধা।

রাধাকৃষ্ণের যুগল মৃণ্ময় মূর্তি উপহার পেয়েছিল বিয়ের সময়। ঠিক প্রতিষ্ঠা নয়—ঘরের কোণে একটা জলচৌকীর উপর সেটি রেখে একটা পুজার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল বসুধা। দিনের মধ্যে কোন না কোন সময় কিছুক্ষণ চোখ বুজে তার সামনে গিয়ে বসে থাকত—নিজের মহৎ সংকল্পের শক্তি খুঁজত ওই মূর্তির উৎস থেকে। একদিন সেটাও দেখলে ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে উঠল। গম্ভীর ভাবে ডাকলে "রুমা।"

কেউ জবাব দিলে না। বাইরে গিয়ে দেখলে রুমা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দালানের কোণে বসে একটা পুতুলকে কাপড় পরাচ্ছে। বসুধা প্রশ্ন করলে—

"ঠাকুর তুমি ভেঙ্গেছ?"

"হ্যাঁ"—সংক্ষিপ্ত জবাব এলো।

"কেন ভাঙ্গলে রুমা" আশঙ্কা মিশ্রিত বেদনার সঙ্গে প্রশ্ন করলে বসুধা।

"ইচ্ছে—"উপেক্ষার জবাব এলো।

"ঠাকুর ভাঙ্গলে পাপ হয় জান?"

"পাপ কি?" কৌতূহলী জবাব এলো।

"ঠাকুর রাগ করেন—মা মরে যায়" অকারণ কিছু একটা আশা করেছিল বসুধা। এই প্রথম সে নিজেকে মা বলে উল্লেখ করলে।

"যাকগে।"

বেদনার মধ্যে কোথায় যেন স্বীকৃতির আনন্দ পেয়েছে বসুধা। তাই তার ঠোঁটের উপর হাসির ছোঁয়া লেগেছে। একটু আবদারের সুরে বলতে গেল—"আচ্ছা আমি যদি তোমার পুতুলটা ভেঙ্গে দিই তাহলে তোমার কষ্ট হবেনা রুমা?"

রুমা এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রকপরা কোমরে হাত রেখে বলল—

"ভেঙ্গে দেখনা!"

তার উদ্ধত ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললে বসুধা। কাছে গিয়ে আদর করে মাথাটা বোধ হয় একটু নেড়ে দিতে চেয়েছিল, রুমা এক ঝটকায় ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াল।

(শেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায়)

এশিয়ার মানচিত্রে পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লাগোয়া দেশ আফগানিস্থান। চৌদ্দ বছর আগেও আফগানিস্থান ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল, আবার তারও বহু আগে থেকে ভারতের সংগে আফগানিস্থানের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার আসা-যাওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহাকাব্যের যুগে, "মহাভারতে" গান্ধার দেশের (কান্দাহার) মেয়ে গান্ধারীকে রাজবধূ হয়ে ভারতে আসতে দেখি।

আফগানিস্থানের অধিবাসীদের আমরা কাবুলিওয়ালা বলে থাকি। ইঁহারা জাতিতে বেশীর ভাগই "পাঠান", অবশ্য আফগানিস্থানে ভারতীয় হিন্দুর সংখ্যাও অল্প নয়। কাবুলিওয়ালা কথাটি যদিও ভুল, আসল কথা কাবুলী। কাবুলিওয়ালার ঝুলির মধ্যের অদেখা জিনিষের প্রতি ছোট বয়স হতেই আমাদের যে কৌতুহল জাগে, ঠিক সেই রকমই মনোভাব জাগায় কাবুলিওয়ালার দেশ, আর ততোধিক সেই দেশের মেয়ে।

১৯১৯ সালের মে মাসে আফগানিস্থান একটি বাফার ষ্টেটে পরিণত হয়। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেও আফগানিস্থান তার প্রাকৃতিক অবস্থান ও মোল্লাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হতে বিচ্ছিন্ন ছিল। ২ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ-মাইল আয়তনের এই ভূখন্ড, ১২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, তবুও বহুদিন পর্যন্ত রক্ষণশীলতা ও সনাতন আচার পদ্ধতির বেড়াজাল ছাড়িয়ে যেতে যে পরিমাণ শিক্ষা ও আন্দোলনের প্রয়োজন, তার প্রচুর অভাব ছিল। "বাদশা আমান উল্লা" নতুন জগতের নতুন ধারায় দেশবাসী ও দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মোল্লাতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রের পেষণে তা সম্ভব হয়নি। "আমান উল্লার" স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। দেশের সর্বত্র পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে বহু জলাধার, রাস্তা, কারখানা, জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করা হচ্ছে।

আফগানিস্থানের মেয়েরা তাদের পুরুষদের মতই সাহস, বল ও স্বাধীনচিত্তের অধিকারিণী। কাবুলীদের চরিত্রে বিশেষ করে দুটি গুণ লক্ষণীয়—আড্ডা দেওয়ার প্রথা ও রসিকতা জ্ঞান। এই দেশের মেয়েরা যদিও পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসিনী কিন্তু এই রকম রসিকা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। আজ যুগের প্রভাবে এঁদের মধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু কি প্রাচীনা কি নবীনা সকলের মধ্যেই এই জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পুরোমাত্রাতেই বর্তমান।

গ্রামের মেয়েরা যদিও চাদ্দরী (বোরখা) পরে থাকেন, কিন্তু মাঠের চাষের কাজের সময় ক্ষেতে গৃহপালিত পশুদের চরাবার সময় পাহাড়ের ছায়াঘেরা চারণভূমিতে পুরুষদের পাশে সমানতালে দেখতে পাওয়া যায়। পাঠান মেয়ে কেন, পৃথিবীর যে কোনও দেশের গরীব মেয়েরা অন্ততঃ নিজের গাঁয়ে পর্দা মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে পর্দা মেনে তথাকথিত ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে, কিন্তু অসুবিধা হলে গাঁয়ের প্রথা বজায় রাখে। গ্রামের মধ্যে নতুন কিছু দেখলে অবাকবিস্ময়ে হয়ত বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সম্বিৎ ফিরে এলে আমাদের দেশের মেয়েদের মতই মুখের উপর ঘোমটা টেনে দেয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বোরখা পরে থাকেন।

ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ীর স্ত্রীরাও তাঁদের নিজেদের কাজ বেশীর ভাগই নিজেরা করে নেন। ঝি চাকর থাকলেও সব ভার তাদের উপর ফেলে না দিয়ে প্রত্যেকটি কাজের তদারক তাঁদের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় একটি বড় রকমের "সূচী।" দৈনন্দিন আহারের কতকগুলি জিনিষ প্রায় প্রত্যেক গৃহিণীই বাড়ীতে তৈরী করে থাকেন। মাখন, দই, ঘোল, এক-রকমের ঘরে তৈরী পনীর (যাকে ওদেশে ছক্কা বলা হয়।) ইত্যাদি। কোনও গৃহপালিত জন্তু বার্ধক্যে বা দুর্ঘটনায় মারা পড়লে বাড়ীর গৃহিণীরা নিজে তদারক করে তাদের ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে কিছুটা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করেন, আর কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখেন। আবার যেদিন কোনও বিশেষ উপলক্ষে বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা থাকে সেদিন নিজেরা তদারক করে নধর পরিপুষ্ট দুম্বাটিকে জবাই করার ভার নেন। বাড়ীতে অতিথি থাকলে, এই পশুবধের খবর তাঁকে জানতে দেওয়া একটি গর্হিত কাজ।

আফগান পুরুষের মত আফগান মেয়েরাও অতিথিবৎসল। এঁদের আতিথেয়তা জগতে অতুলনীয়। আফগান পরিবারের মেয়েদের সংসার কেবল স্বামী-পুত্র নিয়ে নয়, আমাদের পুরোনো দিনের মতই বেশীর ভাগ একান্নবর্তী যৌথ পরিবার। কাবুলী মেয়েরা কড়া পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সংগে নিকট আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারও বিশেষ আলাপ হওয়ার জো নেই। যদিও তাঁরা অতিথি-সেবার জন্য নিজে হাতে রাঁধেন, কিন্তু পর্দা প্রথার জন্যে পরিবেশন করেন না। খাঁটি পাঠানের খাবার কায়দা—কায়দাই বটে। কার্পেটের উপর চওড়ায় দুহাত লম্বায় বিশ ত্রিশ হাত বা প্রয়োজনানুযায়ী একখানা সাদা কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। এই চাদরটিকে বলে "দস্তারখান"। সেই "দস্তারখানের" দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তারখানের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয়। আফগানিস্থানে নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায়ই নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ীতে রাত্রি কাটিয়ে যান। অতিথিদের রাত্রিবাসের সরঞ্জাম যেমন লেপ, তোষক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জোগাড় করে রাখা গৃহিণীদের অবশ্য কর্তব্য। গৃহিণীদের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত একান্ত আবশ্যকীয়। না হলে প্রায় আমাদের দেশের একঘরে হওয়ার অবস্থা হয় আর কি। যেমন, বিয়ে, বাক্‌দান—(পাকা-দেখা), নবজাতকের ছ'দিন বয়সের উৎসব (আমাদের ষেঠেরা পুজা) বা শ্রাদ্ধবাসরে সব ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে কর্মবাড়ীতে সাধ্যানুযায়ী সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে অবশ্যই করতে হয়। এর ব্যতিক্রম নিন্দনীয়।

গ্রাম্য মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা সাধারণভাবেই হয়ে থাকে। যখন সে তার ছোট ছোট পা-দুখানিতে হেলেদুলে চলতে থাকে সেই তখন থেকেই তার পা'দুটি যেন জিনিষ বয়ে আনার তালে তালে বাঁধা থাকে। এর পর থেকে প্রায় ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাপ-মার সংসারে থাকে তারপর বিয়ে হয়ে গেলে নিজের সংসারে চলে যায়।

প্রায় ৩০ বছর আগে পর্যন্ত আফগানিস্থানের নারী-সমাজে, কি শহরে কি গ্রামে প্রায় সব জায়গাতেই পূর্বোক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ আফগানিস্থানের শহরে এর চিহ্নমাত্র পাওয়া যাবে না, তবে গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু হয়ত অবশিষ্ট আছে। বিংশ-শতাব্দীর প্রথমে ভারতীয় নারী-সমাজ যে রকম ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, আফগান নারীরাও প্রায় ২৫ বছর ধরে সেই সুযোগ গ্রহণ করে প্রায় সব-কিছু পুরাতনকে হটিয়ে ফেলেছেন। আগেকার দিনে কি গ্রামের এবং কি শহরের সকল মেয়েই মোল্লাদের কাছ হতে পুঁথিগতবিদ্যা যৎসামান্যই লাভ করত। প্রত্যেকেরই কোরাণ এবং ভগবদ্বিষয়ে মোটামুটি ভালো রকমই জ্ঞান ছিল। ছয় থেকে বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষালাভের সময় মোল্লাদের কাছ হতে যৎসামান্য ধর্মীয় শিক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরা সাধারণতঃ গোঁড়া ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতেন। আফগানিস্থানে মোল্লাতন্ত্র ছিল, এবং এই মোল্লাতন্ত্র কায়েম রাখতে গেলে, শিক্ষার এই ধারাই কার্যকরী। প্রায় ৩৫ বছর আগে বাদশা আমান উল্লাই প্রথম এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আফগান মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোতে স্ত্রী-স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মোল্লাতান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন

দেশবাসীর কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করে সিংহাসন ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আজকের কাবুল দেখলে মনে হয় যে "আমান উল্লার" স্বপ্ন সফলতার পথে অনেক ধাপ উঠেছে। আজ সেখানে পর্দা প্রথার বালাই আর নেই। বোরখা বলে যে একটা জিনিষ ছিল, সেটা স্বপ্নের মত। আজ বাজারে গিয়ে মেয়েরা নিজেরাই তাঁদের প্রয়োজন-মত জিনিষপত্র সওদা করছেন, একলা একলা, গাড়ীতে, বাসে, চড়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাতায়াত করছেন। অন্য সকল দেশের মেয়েদের মত আফগানিস্থানের মেয়েদের কাছেও আজ 'মার্কেটিং' একটি মস্ত বড় অবসর বিনোদন।

আধুনিক মেয়েরা বিয়ে করে সংসারে ঢোকার আগে নিজেরা উপার্জন করে আর্থিক স্বাধীনতালাভ করে স্বাবলম্বী হতে চান। তাঁদের ধারণায় নারীর আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে সংসারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

পাশ্চাত্যের অন্যান্য অগ্রসর দেশের মতই কাবুলী মেয়েরা স্কুলে শিক্ষয়িত্রী, যে কোনও হাসপাতালে নার্স, এয়ার হোস্টেস, বেতার কেন্দ্রে শিল্পী ও কর্মচারী, সেলুনে কেশ-বিন্যাসকারিণী, পোষাকের দোকানে দর্জি ইত্যাদি সমস্ত পদেই দক্ষতা ও নিপুণতার সংগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শুধু এই হাল্কা ধরণের কাজই নয়, কল-কারখানায় পুরুষের সংগে সমান তালে কায়িক পরিশ্রমের দুঃসাধ্য কাজগুলিও করে যাচ্ছেন। কিছুদিন ধরেই এঁরা চান্দরী (বোরখা) প্রথা তুলে দিয়েছিলেন (ব্যবহারিক প্রসংগে) কিন্তু গত ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আইন করে বোরখা প্রথা উঠে গেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে আফগান নারী সমাজ, বিংশ-শতাব্দীর শেষার্ধের প্রগতির যুগে প্রায় একলাফে এসে পৌঁছেছেন। এই যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, মাত্র দশ বছরের মধ্যে আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার হয়। আজকের আফগান নারী-সমাজকে অভিনন্দন জানাই।

প্রতীক্ষা

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

সে আসবে, নিশ্চয় আসবে,
বলেছে সে, যদি আমি তাকে
ভালোবাসি। যদি তার জন্য
এ হৃদয়ে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকে,
যদি তার উৎকণ্ঠিত প্রেমে
স্থির থাকে উজ্জ্বল বিশ্বাস,
তাহলে সে নিশ্চয় আসবে
এই গৃহে বলেছে আমাকে।।

সুতরাং এইখানে তাকে
আমি আজ কল্পনার চোখে
নিত্য দেখি। দেখি তার
শান্ত সাম্যভাব স্নিগ্ধ গৃহলোকে।
দেখি কর্মে উদ্দীপিত তাকে,
দেখি নর্মে বয় তপ্তশ্বাস
এবং সর্বদা দেখি তাকে
উদ্ভাসিত শান্তির আলোকে।।

মনে হয় তার ঘন চুল
ভবিষ্যের দৃপ্ত গন্ধ বহ,
তার শ্যাম অংগে অংগে যেন
হিল্লোলিত শস্য সমারোহ
এবং পীবর স্তনে তার
নবজাত শিশুর আশ্বাস।
তাই তার পথ চেয়ে আমি।
তাই তার অসহ্য বিরহ।।
তারই জন্য যন্ত্রণা যাপন।
তারই জন্য মরি আর বাঁচি।
সে আসবে, নিশ্চয় আসবে ঃ
আমি তার প্রতীক্ষায় আছি।।

সন্ধি

(১৯৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বসুধার চোখের বেদনা ঠোঁটের হাসিকে মিলিয়ে দিলে—ভুল হয়েছে তার। তার বুকের মধ্যে ওই কমনীয় শিশু দেহটাকে একবারও জড়িয়ে ধরবার তৃপ্তি পেলনা বসুধা।

তা না পাক—সম্প্রতি তার নিজের মধ্যে এক শিশু দেহের সঞ্চালন অনুভব করছে বসুধা। শোনা অবধি অনিমেষের মুখ শুখিয়ে গেছে। সে যেন নির্মলার ছায়া দেখলে বসুধার মুখে। বললে—"মামার বাড়ী যাবে বসুধা!" বসুধা হেসে বললে—"না—না—ওদের বড় সংসার অনেক অসুবিধে। তাছাড়া এখানেই ত ভাল, তুমি বরং আগে থেকে হাসপাতালের টিকিট করে রাখ। তাছাড়া রুমার কথা ভাব, তাকে কে দেখবে। দেখছ ত—আজকাল কত দুরন্ত হয়েছে!"

এ নিয়ে আলোচনা আরো কয়েকবার হল। তারপর আর প্রয়োজন হলনা। বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল বসুধা। হাসপাতাল থেকে ওকে যখন ফিরিয়ে দিলে তখনো ও অতিরিক্ত দুর্বল—গায়ে একফোঁটা রক্ত নেই—সারা শরীরটা কাগজের মত সাদা—চোখের কোলে গাঢ় ছায়া। এখনো তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে খুব কম হলেও একমাস।

রুমা এই কদিনের ঘটনা একরকম ঔৎসুক্যের সংগে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছে। ছোটা-ছুটি ডাক্তার ওষুধ এ্যাম্বুলেন্স! সমস্ত ঘটনার সংগে স্বপ্নের মত তার যেন ঝাপসা পরিচয়।

কদিন পরে অনিমেষ আজই প্রথম অফিস গিয়েছে। দুপুরবেলা, ঝি কি যেন কিনতে বাইরে গেছে। রুমা পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সাদা চাদরে সবটা ঢাকা দিয়ে বসুধা শুয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রুমা। ওর শৈশব-স্মৃতির এলোমেলো ছবিগুলো যেন মনের উপর দুলছে—অনেকটা বাতাস লাগা সুতোয় ঝোলান বেলুনের মত—ধরি [illegible] করেও কিছুতেই যেন ধরা যাচ্ছে না। এই ঘর...এই খাট...এমনি সাদা চাদরে ঢাকা......

পা টিপে টিপে আরো এগিয়ে গেল রুমা। এবার বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো আরো বড় হয়ে উঠেছে। কি যেন একটা পেয়েও পাচ্ছে না—খাট...... বিছানা......ঘর......সাদা চাদরে ঢাকা...

"মা—" অস্ফুট আর্তনাদের মত উচ্চারণ করল রুমা। ওর শিশু মনের অবচেতনার সিংহদ্বার যেন ওর নিজের ডাকেই খুলে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে বসুধাকে জড়িয়ে ধরে "মা-মা" বলে কেঁদে উঠল।

আরো একদিন কেঁদেছিল রুমা—অমনি একটি চাদরে ঢাকা দেহকে জড়িয়ে ধরে। সেদিন নির্মলা তার কান্নায় সাড়া দেয়নি। আজ বসুধার দুটো দুর্বল বাহু তাকে চাদরের মধ্যে উত্তপ্ত বুকের উপর টেনে নিয়ে চুমায় চুমায় আর চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে। তার কচি গালের উপর নিজের বিবর্ণ গালখানা রেখে বার বার কাঁপা গলায় বলতে লাগল—"মা—মা—রুমা, রুমা—আমার রুমঝুম!"

এমন মেয়ে পৃথিবীতে খুব কমই আছে, যে নিত্য একবার দু'বার আয়নার কাছে গিয়ে না দাঁড়ায়। অবিন্যস্ত কুন্তলের গুচ্ছ সমান করে দিতেই হোক সকলেই নিজের ছবি দেখে নিতে চায় আর চায় সেই ছবিকে সুন্দর করে তুলতে। সৌন্দর্যের বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথম যৌবনে নব-বর্ষার মত উচ্ছল-রূপ সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে যায় তখন নিজেকে নারী ডাক দেয়, বলে, আরো রূপ সঞ্চিত আছে আমার কাছে। তারপরে সেই সঞ্চিত সম্ভার নিয়ে দেখা দেয় বসন্ত প্রকৃতির লীলার মতই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। তারপরে? তারপরে ভরা ভাদরের মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ রূপ। তবে তার মধ্যে থাকে আসন্ন শীতের অস্পষ্ট বাণী। তখন রূপসী চায় সে নিষ্ঠুরতার ছবিকে দূরে সরিয়ে রাখতে।

আমাদের এই প্রবন্ধে মেয়েদের তিনটি বয়সের বেশ-বিন্যাস কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। তিনটি সময় বলতে কিশোরী, তরুণী ও প্রৌঢ়া—এদের কথা।

যে মেয়ে সৌন্দর্য চর্চা করছেন, লোকের চোখ-ধাঁধানো তার উদ্দেশ্য হবে না। নিজেকে তিনি ভালবাসেন, তাছাড়া আছে রেখা, রং আর বৈশিষ্ট্যবোধ। প্রথমতঃ মূল রূপকে ভাবতে হবে, বয়সের কথা চিন্তা করতে হবে, তারপর দেহের রংয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরতে হবে শাড়ী, ব্লাউজ, গহনা আর সেইভাবে প্রসাধনও করতে হবে, তাহ'লেই বেশ-বিন্যাসের আবাস রচনা করা খুব সহজ হয়ে পড়বে। যদিও বেশভূষা সম্পর্কে কারুর ধারণাকে কেউ শেখাতে পারে না—তবুও 'আপরুচি খানা আর পররুচি পহেন না' এ কথাটির গুরুত্ব দিতে গিয়েই সাহস করে দু'চার কথা বলব।

চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়েকেই আমরা কিশোরী বলে থাকি। সেই কিশোরী যদি তার দিদির মত বেশভূষা করে, তাহ'লে কেমন দেখায় বলুন তো? বেশ তো কিশোরীও সাজবে বৈকি! অবশ্য যদি সে কিশোরী স্বাস্থ্যবতী হয়, তাহলে তাকে ঠিক পাউডার আর রুজ, লিপষ্টিক দিয়ে নিজেকে সাজাবার দরকার হবে না। নেহাৎ যদি ইচ্ছে করে তাহ'লে হাল্‌কা পাউডার ব্যবহার করাই ভালো। এই বয়সে যত কৃত্রিম বেশভূষা বর্জন করা যায় দেখতে ততই ভাল হয়। শাড়ী ব্লাউজও হাল্কা রংয়ের পরতে হবে। অলংকারের বাহুল্য না থাকাই ভাল। একটা বিনুনী পিঠের উপর

ফেলে সাদাসিধে কাপড় জামা পরে বেশ সপ্রতিভ হয়ে চলাফেরা করলে কিশোরীকে সবচেয়ে সুন্দর মানায়। এই বয়সে বেশ-বিন্যাস খুব সংযম সহকারে করতে হবে, কারণ 'অল্প' যেখানে সৌন্দর্য সহায়ক, "বিস্তর" সেখানে সৌন্দর্য বিনাশক।

এরপর তরুণীদের কথা—এই বয়সে সাধারণতঃ দেহের রং পরিষ্কার হবে, চোখ হবে রেখাহীন উজ্জ্বল, কাজেই এই বয়সে বাইরের জিনিসের সাহায্য নিলেও খুব বেশী না নেওয়াই ভালো। তাই বলে সৌন্দর্যচর্চার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে বলছি না। কিন্তু এই সময় কিছুটা নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। কোনমতেই এর নড়চড় হওয়া চলবে না—যদি সৌন্দর্য সত্যি সত্যিই রক্ষা করতে চান। এই বয়সে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে গরম জল ও ভালো সাবান দিয়ে মুখখানি ধুয়ে ফেলতে হবে যেন কোথাও একটুও পাউডার বা ক্রীম অথবা ধুলো ময়লা না জমে থাকে। এবারে বেশভূষার কথা—এই বয়সে অবশ্য শাড়ী ব্লাউস যে যাঁর রুচিমত পরতে পারেন তবে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে। বিকেলে কোথাও বেড়াতে যেতে হলে একটু হাল্কা রংয়ের শাড়ী জামা পরাই ভালো। রাত্রে আলোতে শুধুমাত্র কোথাও নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অথবা কোনো উৎসব ক্ষেত্রে যেতে হলে যে কোনো গাঢ় রংয়ের শাড়ী জামা পরা যেতে পারে। গহনাও সেইমত পরা যেতে পারে—বিশেষ করে বিয়ে বাড়ী হলে দামী বেনারসী শাড়ী ও জড়োয়া গহনা পরাই ভালো। সম্ভব হলে সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে তাতে ফুল ও জড়োয়ার সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য কুড়ি বাইশ বছরের অবিবাহিতা মেয়েরা এতটা জাঁকজমক না করলেই ভালো। তার বদলে হাল্কা দামী শাড়ী জামা ও যুপোর বা সোনার গহনা, পায়ে জুতো বা জরির চটী, হাতে ঐ শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। কিন্তু দুপুরে বাজার দোকানে যেতে গেলে একেবারে সাদাসিধে বেশভূষা—বেশ আঁটসাট করে চুল বাঁধবেন। সাদা বা যে কোনো দেশী ছাপা বা তাঁতের শাড়ী পরাই ভালো সঙ্গে থাকবে চামড়ার একটি থলে বা ব্যাগ। হনার বাহুল্য করবেন না। প্রসাধন দ্রব্য খুব াবধানে ব্যবহার করতে হবে। মেক-আপ যদি রতেই হয় তাহলে গায়ের রংয়ের সঙ্গে সেড মিলিয়ে করবেন। আমাদের দেশের মেয়েদের ত নানা স্তরের রং বিদেশে নেই। তাই তাদের শের প্রসাধন সামগ্রীর রংগুলি আমাদের ক্ষে বেশী হাল্কা। কাজেই একটু বিবেচনা রে ব্যবহার করবেন। লিপষ্টিক যদি ব্যবহার রতে চান তাহলে যাঁদের রং খুব ফর্সা তাঁরা মলালেবু, অল্পগোলাপী মেশানো হাল্কা :-এর লিপষ্টিক ব্যবহার করবেন। যাঁদের রং র্সা নয়, তাঁদের লিপষ্টিকের রংও হবে গাঢ় বং লাল ধরণের। যাঁরা রুজ পছন্দ করেন াঁরা মাঝের আঙ্গুলের ডগাটি রুজের উপর ল্কাভাবে বুলিয়ে নিলে যেটুকু রুজ তাতে লাগবে, সেইটুকু গালে বেশ করে ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। মোটকথা রূপ-সজ্জার দ্বারা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আভাটুকু ফুটানো প্রয়োজন—মুখে লাল, গোলাপী ও সাদার মুখোস পরা উদ্দেশ্য নয় এবং তা করলে মেয়েদের সুশ্রীর চেয়ে কুশ্রীই দেখায়।

সবশেষে প্রৌঢ়া মেয়েদের বেশভূষার কথা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো। যাঁদের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে তাঁরা যতদূর সম্ভব সাদা শাড়ী ব্যবহার করবেন। অবশ্য গরদ, তসর, মটকা খদ্দর এগুলো পরতে পারলে খুবই ভালো হয়। রঙীন শাড়ী এই সময় থেকে বর্জন করাই ভালো। যদি নিমন্ত্রণ বাড়ী বা কোনো পার্টিতে যেতে হয় তাহলে সাদা সিল্ক বা হাল্কা সাদা বেনারসী তাতে জরীর পাড় না হয়ে রেশমী সুতোর পাড় অথবা এক রংয়ের কোনো পাড়ও পরা যেতে পারে। গয়নাও খুব বেশী না পরে হাতে বেশ ঝক-ঝকে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ও বালা, কানে সোনার ফুল, গলায় সরু সোনার হারের সঙ্গে বেশ বড় একটি লকেট বা পেনডেন্ট—তাহলেই যথেষ্ট। এই বয়সে অনেকেই মুখের চামড়া যতই কুঁচকে যাক বা মুখের শোভা নাই থাকুক, তবুও তাকে ঢেকে রাখবার জন্যে পরি-পাটি করে রং-চং মাখেন। এটি কিন্তু ভারী দৃষ্টিকটু লাগে অন্যের চোখে। তার চেয়ে বরং পরিষ্কার করে মাথা আঁচড়ে একটু সামনের দিকটা ফাঁপিয়ে নিয়ে ঘাড়ের কাছে এলো-খোঁপা বাঁধবেন। মুখখানিও পরিষ্কার করে নিয়ে একটু স্নো মেখে সামান্য একটু পাউডারের তুলিটা বুলিয়ে নিয়ে, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ দিয়ে সাদাসিধে শাড়ী জামা পরে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন। সবাই আপনার এই বেশভূষার প্রশংসা করবেন।

আর একটি কথা—বেশভূষার ক্ষেত্রে কখনো দেশী বিলাতীর সংমিশ্রণে নিজেকে সাজাবেন না। কারণ, লোকচক্ষে তা বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হবে। সাজগোজের ব্যাপারে অবশ্য 'ধারণার একতা' বলতে আমার যা মনে হয়েছে তাই শুধু সংক্ষেপে বললাম। কিন্তু এই জিনিষ ঠিকভাবে শেখানো যায় না—কষ্ট আর অধ্যবসায় দিয়ে শিখতে হবে। 'অমুক এত বয়সে এখনও অত সাজে আমি কেন সাজব না' ইত্যাদি ধরণের মনোভাব নিয়ে বেশভূষা করতে গেলে আপনি নিজেই লজ্জায় পড়বেন। কাজেই আমি এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে বয়স অনুপাতে মোটামুটি একটি বেশভূষার ধারার কথা বললাম—তালিকা দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, তাতে পাঠিকাদের কাছে হয়তো বিরাগভাজনই হতে হবে, কাজেই অতটা সাহস করে এগিয়ে যেতে পারলাম না।

চিত্রাঙ্গদা

রাণু ভৌমিক

রাত এখন দশটা। আমি এইমাত্র খেয়ে উঠলাম। কাল ওরা এসে অবাক হয়ে ভাববে, কি করে আজ আমি তৃপ্তির সঙ্গে শেষ খাবার খেয়েছি। শেষ খাবার—হাঁ আজই আমার শেষ খাওয়া—আজই আমার শেষ লেখা। আজ আধঘণ্টার মধ্যে মালতী সরকারের সব শেষ। সে আর খাবে না, ঘুমুবে না, কথা বলবে না, হাসবে না—

আমি মালতী সরকারের কাহিনী লিখতে বসেছি। এ সেই মেয়েটি যে নিজেকে এত ভালবেসেছিল, যে নিজেকে শেষ করতে বাধ্য হয়েছিল। 'আত্মা'র জন্য আত্মহত্যা।

অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, মৃত্যুকে আমার প্রয়োজন। কিন্তু, সেই মৃত্যুদূত যখন নিজে থেকে এল না তখন তাকে নিজের জোরেই আনাতে হল। এতে রাগ নেই, দুঃখ নেই, বিদ্বেষ নেই, অন্যায় আচরণ নেই—এ শুধু প্রয়োজন।

কাল খুব ভোরে দুধওয়ালা আসবে—নিঃশব্দে বোতল নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে—তারপর আসবে কাগজওয়ালা—একবার বেল টিপবে—সাড়া না পেলে দুধের বোতলের পাশে কাগজ রেখে চলে যাবে।

তার পরেই, হরিয়া—আমার বহু পুরাতন ভৃত্য। যে নাকি আমাকে হতে দেখেছে—হাতে করে মানুষ করেছে। ও এসে বেল টিপে সাড়া না পেয়ে অবাক হয়ে অপেক্ষা করবে—কিছুক্ষণ পরে (জানিনা সে কতক্ষণ) ও আস্তে আস্তে আব্দুলের কাছে গিয়ে বলবে, আব্দুল।

আব্দুলের চোখ দুটো ঘষা কাঁচের মত। সেই চোখ তুলে আব্দুল ওর দিকে তাকাবে। হরিয়া আর কোন কথা বলবে না। ও জানে, লিফট্‌ম্যান আব্দুল ফ্লাটের অধিবাসীদের গতিবিধি সম্পর্কে কোন কথা বলে না।

হরিয়া আরও অনেকক্ষণ বসে থাকবে পাথরের মূর্তির মত। হঠাৎ গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকবে। চমকে ও যেন চেতনা ফিরে পাবে। অনবরত বেল টিপতে থাকবে।

ওর এই পাগলের মত আচরণে অন্যান্য ফ্লাটের নির্বিকার অধিবাসীদের মধ্যেও একটু চেতনা জাগবে। তারা এগিয়ে আসবে।

তারপরে, লোকজন, পুলিশ, মর্গ আরও কত কিছু সব জানিও না, জানতেও চাই না।

পুলিশ আমার আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে। বৃথা চেষ্টা। আমি নিজেই জানি না—কেন আত্মহত্যা করছি। আমি মালতী সরকার—একটি বড় কোম্পানীর একটি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ—আড়াইশো টাকা ভাড়ার ফ্লাটে থাকি—কিসের অভাব আমার!

জলে ডুবে মরবার সময় নাকি অতীতের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ এই মুহূর্তে জীবনের পুরোন কথাগুলি ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসছে আমার মনে…

আমার বাবা রতিকান্ত সরকার বড় অফিসার ছিলেন এবং অফিসার স্টাইলেই তাঁকে চলতে হত—বেশ বড় একটি গাড়ী, মাঝারি সাইজের ফ্লাট এবং অতি আধুনিকা স্ত্রী।

আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। আমার দিকে তাকাবার সময় কিংবা ইচ্ছা কিছুই মায়ের ছিল না। তবে আমার পরিচারিকার প্রতি আদেশ ছিল যে, আমাকে যেন সব সময়ই ছেলেদের পোষাক পরিয়ে রাখা হয়। মায়ের মতে, মেয়েলী পোষাক পরলেই যত রাজ্যের ন্যাকামী এসে মেয়ের মাথায় জুটবে।

এইভাবেই বড় হয়েছি। ছেলেদের সঙ্গে মিশেছি—প্রতি বিষয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছি—আর হ্যাঁ, আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই—অন্তরে অন্তরে ওদের ঘৃণা করেছি—কারণ, প্রতিযোগিতায় কখনও ওদের সঙ্গে পারিনি।

আমার সঙ্গে যারা পড়তো তারাও চিত্রাঙ্গদার আধুনিক সংস্করণ। তবে, বাড়ীতে তাদের ট্রেণিং ছিল—আমার মত সম্পূর্ণভাবে মেয়ে থেকে মানুষে পরিবর্তিত হয়নি।

সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেই আমি বিলেতে চলে গেলাম—সেখানে অনেকদিন রইলাম। ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবা মারা গেছেন। বাবার সঞ্চয় কিছুই ছিল না। ইন্সিওরেন্স ছিল মায়ের নামে। এতে আমার সুবিধেই হল। মা আলাদা হয়ে রইলেন। আমি বিলেত থেকেই একটা চাকুরী নিয়ে ওদের ভারতীয় ব্রাঞ্চে এলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একা থাকতে ভালবাসতুম। ভিড়ের মধ্যেও আমি সেই একা। আমার মুখে যেন একটা মুখোস থাকতো—শুধু দৃষ্টি দিয়েই ভোগ করতাম জীবনকে।

—তুই তো একটা ইগোয়িস্ট, রেবা বলত।

—ইগোয়িস্ট। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক। হাসতুম আমি, প্রতিভাবান ছাড়া কেউ আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না। তা নয়…আমি…

একটু থেমে বলতাম, আমি মানুষকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই—এই মাত্র।

রেবা অবাক হয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে বলত, পাগল।

এই ফ্লাটটি আমার খুব প্রিয় ছিল। ধবধবে নরম বিছানায় দামী নেটের মশারির নীচে আমি জেগে শুয়ে থাকতাম। চারিদিকে ফিকে অন্ধকার আমাকে ঘিরে থাকত। বিরাট কালো টেবিলটায় আমি একা খেতাম—বড় বড় সোফাসেটগুলি আমারই অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকত। খুব ভাল লাগত।

তারপরে, ধীরে ধীরে কি রকম একটা বিরক্তিকর অবসাদ। ঘুম হত না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতাম—উঠতাম, জল খেতাম, পায়চারী করতাম…

এভাবে জীবন কাটতে পারে না। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম। ঘুমের পিল খেতে সুরু করলাম। ডাক্তারবাবু বললেন, জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন আনুন। সন্ধ্যেবেলায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-চৈ করে কাটাবেন—আর...। একটু থেমে নীচু কণ্ঠে বলেন, বিয়ে করুন। বিয়ে করা আপনার দরকার।

দরকার। সে কথা তো আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি—আমার দেহের শিরা উপশিরা প্রতি রক্তকণা একবাক্যে চেঁচিয়ে বলছে দরকার। দরকার। কিন্তু, বিয়ে আমি করতে পারব না। একটি লোককে প্রতি মুহূর্তে সহ্য করতে পারব না—

—বিয়েটা বড় দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর সম্পর্ক, আমি ডাক্তারবাবুকে বলি, নারী-পুরুষের ক্ষণ-স্থায়ী সম্পর্ক কি হতে পারে না?

—হতে পারে—এবং হচ্ছেও। ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, কিন্তু...কোন মেয়ে তাতে সুখী হতে পারে না।

ডাক্তারবাবু, এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি আপনার কথা কতটা সত্যি। তখন ভেবেছিলাম, আপনি মেয়েদের সম্বন্ধে পুরোন থিয়োরী নিয়ে আছেন—এখন বুঝতে পারছি—মেয়েরা চির-দিনই একই রকম—এমন কি, পুরুষালী পোষাক ও পরিবেশে যে মেয়ে 'মানুষ' হয়—সেও—মেয়েরা যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকেই ভালবাসে।

অলককে বলেছিলাম, আমাকে কোনদিন ভালবেস না—বিয়ে করতে চেও না। অলক সে কথা অক্ষরে অক্ষরে রেখেছে। গত দু' বছরের মধ্যে ও একবারও ভালবাসার কথা বলে নি—আমার তৃষিত অবাধ্য হৃদয় কিন্তু বারবার কাঙালিনীর মত ঐ একটা কথাই শুনতে চেয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় ও কত সহজে বলল, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ও কাল থেকে আর এখানে আসবে না। এমন কি কোথাও দেখা হলে পরিচয় স্বীকার করবে না।

আমি চুপ করে ওর শান্ত স্নিগ্ধ তৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি যা চেয়ে-ছিলাম ও ঠিক তাই হয়েছে—নির্বিকার নিস্পৃহ-ভাবে মিশেছে আমার সঙ্গে। আমাকে ও এত-টুকু ভালবাসে নি। আর আমি...

আমি আজ পরাজিত। সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। ওকে আমি ভালবাসি—গভীরভাবে ভালবাসি। আর, সেই মুহূর্তেই মন স্থির করে ফেললাম তিলে তিলে কষ্ট পাবার চেয়ে নিজেকে শেষ করে দেব আমি। আজই...এখনই...এই উঃ...

হঠাৎ চমকে ওঠে মালতী সরকার। বেল বাজছে। এত রাত্রে কে বেল বাজাচ্ছে! একটু ভয় পায় মালতী। পরক্ষণেই আপন মনে হেসে ওঠে। যে মরতে যাচ্ছে তার আবার ভয়।

দরজা খুলেই চমকে যায়। অলক দাঁড়িয়ে আছে। একটি কথাও না বলে অলক গম্ভীর-ভাবে ঘরে ঢোকে—পাল্লা ঠেলে দিতেই নিজে থেকেই দোর বন্ধ হয়ে যায়।

কোন [illegible] না করে, নিজের এরকম অসময়ে আসবার কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে অলক বলে, আজ সন্ধ্যে থেকে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি—মালতী—শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি—তুমি আমাকে ভালবাস?

মালতীর নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, জানি, প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—এ কথা উচ্চারণ করব না। তাই এই দুটো বছর অসহ্য কষ্ট পেলেও কখনও বলি নি। আর সেজন্যই বিয়ের মিথ্যে অজুহাতে দূরে সরে যাচ্ছি—কিন্তু, যাবার আগে একটি কথা আমাকে জানতেই হবে—তুমি......একি, তুমি কাঁদছ?

মালতীর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলে, কেন মালতী? আর, মালতী ওর পায়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে, ভালবাসা ছাড়া কি আমি বাঁচতে পারি? আমি যে একটি মেয়ে।

কুমায়ুন কান্তি কৌসানী

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

কুমায়ুন শৈলমালায় অটল গাম্ভীর্যে ভরা বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে একটি রহস্য বিন্দুর মত অফুরন্ত জিজ্ঞাসায় বাঙময় হয়ে রয়েছে কৌসানী। হিমালয়ের গন্ধর্ব-লোকের বার্তা হয়তো বা গুপ্ত রয়েছে তার মনে, আরণ্য বিলাসে তার আদিম সভ্যতায়। বিংশ শতাব্দীর কর্মচঞ্চল মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তার সান্নিধ্যের নিস্পৃহ নির্জনতায়। পার্বত্য কৌলীন্য তার কোনও কৃপাকার্পণ্য নেই। মুক্তরূপা, মুক্তমনা, মমতা মাধুর্যে সে শুচিস্মিতা।

সমতল ভূমি থেকে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় শুধু পাইন, ওক, সাইপ্রাস, আর দেওদার বৃক্ষের ঘন অরণ্যে ঘেরা ছোট্ট একটি গ্রাম কৌসানী। রাণীক্ষেত থেকে ত্রিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রমণান্তে কৌসানীর রংমহলের দ্বার-প্রান্তে এসে হানা দেয় আমাদের যন্ত্রযান। ঘুম ভেঙে যায় হিমালয় কন্যার। রডডেনড্রন ফুলের স্তবকে স্তবকে ফুটে ওঠে তার মনের চকিত চমক। এখানে আমরা ভিন্ন অন্য কোনও যাত্রী নেই। নিকটস্থ একটি চায়ের দোকান থেকে দুটি পাহাড়ী শ্রমজীবী এসে মালপত্র-গুলির ভার সানন্দে স্কন্ধে তুলে নিল। নিকটে দূরে কোথাও কোন মনুষ্য মূর্তি চোখে পড়ে না। এখানে সাধারণতঃ বহির্যাত্রীরা আসে হিমালয় দেখার জন্য ও পিন্ডারী গ্লেসিয়ারে যাবার উদ্দেশ্যে। আমাদের মনোবাসনাও ছিল অনুরূপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথের দুর্গমতার জন্য আমাদের আর পিন্ডারী গ্লেসিয়ারে যাওয়া হয়নি।

অবশেষে বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে হিমতুহীন বাতাসের স্পর্শে সর্বাঙ্গ সংকুচিত করে আমরা এসে উপস্থিত হলুম দুটি পাহাড়ের শীর্ষ-দেশে অবস্থিত একটি মনোরম ডাকবাংলোয়। ভারী সুন্দর আরামপ্রদ আস্তানাটি। একেবারে রাজসিক আয়োজন। এমন মনোরম আস্তানাটি পেয়ে স্নানাদি সেরে আমরা এসে বসেছি উত্তরমুখী একটি বারান্দায়। যদিও হিমালয়ের হিমশৃঙ্গগুলি ঘন মেঘের জটায় তখন ছিল লুপ্ত। তথাপি এই হিমকন্দরের নিভৃত লাবণ্য যেন কথা কয়ে উঠল মনে মনে। কে বলে পাষাণ মৌন হিমালয়। আমি শুনেছি তার কথা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ফাটলের মধ্যে থেকে। মুগ্ধ হয়েছি তার প্রেমালু আতিথ্যে।

এক ঝাঁক সবুজ পাখী মটর ক্ষেতের মধ্যে কূজন করছিল, এমন সময় বাংলোর চৌকিদার হবিবুর রহমন সেখানে এসে ভেঙে দিল আমাদের রমণীয় দিবাস্বপ্নটি। তার প্রশ্ন, সন্ধ্যার পর সে নিজের বাসায় চলে যাবে। এই অচেনা অজানা রাজ্যে রাত্রে আমরা এখানে থাকবো কি? যদিও তার ঘর একটু নীচেই। ডাকলেই সে আসবে। তথাপি এই পাহাড়ের শীর্ষে নিকটে আর কোনও মনুষ্য বসতি নেই। আমরা বিদেশী তাই এই সতর্কতা। নীচে বাস টারমিনাসের অদূরে একটি কটেজ আছে, ইচ্ছা করলে আমরা সেখানে থাকতে পারি। সত্যি, এই গহীন অরণ্য কন্দরে যখন রাত্রি নেমে আসবে আঁধার গুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে, তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনও ক্ষুধার্ত বন্যজন্তুর আগুনের চোখ যদি ঝলসে ওঠে, তখন আমাদের এই স্বপ্নালু চোখ তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারবে কি? অতএব সেই ভালো, আবার চলো নীচে নেমে। হবিবুর তখন বলছে, কার কার আগমনে ধন্য হয়েছে এই প্রাচীন বাংলো। তার মধ্যে আমরা দুটি পরিচিত নাম পেলুম। একজন মহাত্মা গান্ধী, অপরজন প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীপ্রবোধ সান্যাল। তিনি তাঁর দেবতাত্মা হিমালয়ের কিছু অংশ নাকি এখানে বসে লিখেছিলেন। কথাটা শুনে বড় ভালো লাগল। এ বাংলো ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু এই বরফ জমা হিমের দেশে যখন নেমে আসবে নিস্তব্ধ রাত্রি, আশে-পাশে কেউ নেই, পথও অচেনা তখন? অতএব, "চল মুসাফির, বাঁধো গাঁঠোরিয়া"—

সেদিন অপরাহ্ন বেলায় কৌসানীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকের আকাশটি ভরে ঝলমল করে উঠল হিমালয়ের তুষার সৌন্দর্য। পথ চলতি একটি ছেলে বলে উঠল, "হিমালয়, হিমালয়"—ওরা জানে আমরা হিমালয় দেখতেই এখানে আসি। তাই অঙ্গুলি ইঙ্গিতে দিক-নির্দেশ করে সে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম। পাইন আর দেওদারের অরণ্যে আকাশ যেখানে ঢাকা, তারই পশ্চাতে মেঘমুক্ত আকাশে ভাস্বর হয়ে উঠেছে সেই হিমস্বপ্নপুরী। বনবীথি পিছনে রেখে আমরা এসে দাঁড়ালুম একটি মুক্তস্থানে। চোখের সামনে কে যেন খুলে দিল ইন্দ্রপুরীর রংমহলের বারোহাজারী দ্বার অন্তকরণ সূর্যের সুবর্ণচ্ছটায় সেই হিমকুহেলী মুঠো মুঠো হাস্যকণিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ ও মাটি একাত্ম হয়ে মহাশূন্যের সেই তরঙ্গায়িত তুষার তমিস্রাকে ধারণ করে আছে আপন বক্ষে। এ মিলন মনাতীত মনোময়। আরণ্য অরুন্ধিমায় অনির্ণেয়। দেওদার গাছের নীচে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর আমরা বসে আছি। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে শুধু পর্বতমালা। সম্মুখে ঢালু হয়ে নেমে গেছে অতলস্পর্শী খাদ। তারই শীর্ষদেশে বরফের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। মনে হয় খানিকটা ছুটে গেলেই বুঝি স্পর্শ পাওয়া যাবে ওই নগাধিরাজের। ধূসর গিরিগাত্রে যেখান থেকে হিমকণাগুলি জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, সেই সাদায় কালোয় বিচিত্রিত স্থান-গুলি মনে হয় যেন আমাদের মুঠির ভিতর রয়েছে। একঝাঁক টিয়ার মত আমরা এখনি উড়ে যেতে পারি সেখানে।

বৈজনাথে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির। ফোটো : মধুছন্দা ভাদুড়ী

গ্রাম কৌসানীর সারল্য মধুর সুষমায় হিমালয়ের এই স্বর্গীয় শোভা সত্যই অবর্ণনীয়। সূর্যাস্তের বর্ণানুরঞ্জনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে অদ্ভুত সুন্দর ও মায়াময় হয়ে উঠতে লাগল সেই হিমশৃঙ্গগুলি। অতঃপর সন্ধ্যার অন্ধকার সঘন হবার পূর্বেই বিচিত্র এক রামধনু রং-এ রঙ্গীন হয়ে উঠল সেই বরফের দেশ। আমাদের চেতনা থেকে তখন লুপ্ত হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এ আমরা কোথায় এসেছি? অরোরা বলিয়ারিশের দেশে নাকি? আকাশে সূর্য কই? চাঁদই বা কোথায়?

একসময় সেই রামধনু রং মিলিয়ে গিয়ে কোজাগরী জ্যোৎস্নায় কাশ ফুলের মত দুলে উঠল সেই হিমারণ্য দেশ। বনস্থলীর পাষাণ কন্দরে সুপ্তোত্থিতের মত যেন জেগে উঠল কারা। রডডেনড্রন পুষ্পকুঞ্জে ফিস্ ফিস্ করে

কথা কয়ে উঠল মাটী। সোনায় মুখোর, সবুজে ও পীতাভায় মেশা জ্যোৎস্নায় হিমাদ্রিশিখরের রহস্যঘন স্তব্ধতা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল পাইনারণ্যের মর্মর মূর্ছনায়। এ এক প্রাকৃতিক প্রেম। দৃশ্যাতীত উপলব্ধিতে যার পূর্ণ প্রতীতি।

গ্রাম হলেও কৌসানী নিতান্ত অজ্ঞ বা অবজ্ঞাত নয়। এখানে ছেলেমেয়েদের স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, টুরিষ্ট অফিস, খাদি আশ্রম ইত্যাদি সবই আছে। আরও আছে তিনটি বিখ্যাত বাংলো। স্টেট বাংলো, ফরেষ্ট বাংলো ও ডাকবাংলো। বাংলোগুলি সাধারণ মানুষদের জন্য না হলেও তার ঘন আপেল আর আখরোট বাগান ও রডডেনড্রন ফুলের ঝাড়গুলি অহরহ আমাদের ডাক পাঠিয়েছে তাদের নিভৃত নিলয় থেকে। তাদের আতিথ্যে আমরা সূর্যোদয়ের হিমালয়কে দেখেছি আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়তররূপে। প্রথম উষার আরক্তিম রাগে রঙ্গীন হয়ে উঠেছে চৌখাম্বা, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী আর পাঞ্চুলির গগনচুম্বী হিম শৃঙ্গগুলি। ডালিম বনে পাখীদের ঘুম ভেঙেগেছে। ঝরণার কলতানের সঙ্গে মিশে গেছে তাদের কলকাকলি। ঘুম ভাঙছে গ্রাম্য মানুষদের। নিরীহ দরিদ্র অজ্ঞ মানুষ। অভাবী হলেও অসৎ নয়। বিশেষ করে হিমালয়ের মেয়েরা অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী। ঘরে বাইরে এদের কর্মোদ্যম ও শ্রম আমাদের কল্পনাতীত। স্বাস্থ্য-শ্রীও এদের প্রশংসনীয়। সারল্যের ও দারিদ্র্যের আবরণে এদের আত্মিক মর্যাদা আরও কতদিন যে এমনভাবে অবহেলিত থাকবে তা কেউ জানে না। কেউ ভাবেও না।

প্রখ্যাত হিন্দী কবি শ্রীসুমিত্রানন্দন পন্থের জন্মভূমি এখানে। পিতার কর্মস্থল এখানকার একটি বিখ্যাত চা বাগানে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। কৌসানীর একটি বৃহৎ ব্যবসায় কেন্দ্র গরুড়। বাসপথে দশ মাইল পথ। এখান থেকে একটি পথ গোয়ালদাম হয়ে গেছে রূপকুণ্ড পর্যন্ত। এবং ওই গাড়োয়ালের পথে কেদারনাথ বদ্রীনাথ যাতায়াতেরও রাস্তা আছে। গরুড় থেকে বাগেশ্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সমতল ভূমি। বাংলা দেশের মত আম আর কলা বাগানের প্রান্ত ছুঁয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। যার স্থানীয় নাম কোশী। নদীর থেকেই বোধ হয় জায়গাটির নাম হয়েছে কৌসানী। গরুড় থেকে এক মাইল দূরে একটি প্রসিদ্ধ স্থান বৈজনাথ। এবং সেখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে বাগেশ্বর।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা এসে বাগেশ্বর পৌঁছালুম। সরযূ আর গোমতী নদী এখানে এসে মিশেছে। খরস্রোতা সরযূ উত্তরাখণ্ড থেকে নেমে এসে ধীর প্রবাহিনী নীলা গোমতীর সঙ্গে একীভূত হয়ে মিশে গেছে। সঙ্গমস্থলটি ভারী সুন্দর। তার তীরবর্তী বালুকা বেলায় ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি নানা ধরণের, নানা রং-এর নুড়ি পাথর। স্বর্ণবিন্দু চিহ্নিত বিশেষ এক ধরণের সুন্দর লাল রং-এর পাথর এখানে আছে। এমনটি আর কোথাও দেখিনি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কোনও কুশলী শিল্পীর হাতের একখানি নিপুণ ছবি।

নদী সঙ্গম তীরে বাগনাথ মহাদেবের একটি অতি প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির আছে। আরও আছে একটি ব্রহ্মার মন্দির। ভারতবর্ষে পুষ্করের পর এই দ্বিতীয় ব্রহ্মার মন্দির। যদিও মধ্যপ্রদেশের সারগুজা জেলায় একটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার মন্দির ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে মন্দির কালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মীচাঁদ প্রথম এই বাগনাথ মন্দির নির্মাণ করেন। প্রকাণ্ড তাম্র পঞ্চপাত্রের উপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পার্বতী বিষ্ণু গণেশাদি সমস্ত দেব বিগ্রহ এখানে আছে। সাধু সন্ন্যাসীও অনেক আছেন সরযূ তীরে। নিম বেল আর চাঁপা গাছের অসংখ্য শাখা প্রশাখায় আর তার মৃত্তিকাস্থ শিকড়ে সুপ্ত রয়েছে এই প্রাচীন মন্দিরের অনেক ইতিহাস।

বাগেশ্বর থেকে একটি পথ চলে গেছে আরও উত্তরে কাপকোঠ হয়ে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার পর্যন্ত। এ পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুর্গম। শুধু বালু আর বরফের রাজ্য। সব কষ্ট অস্বীকার করেও মানুষ যাচ্ছে অজ্ঞেয়কে জানার জন্য সেই বরফের রাজ্য পিণ্ডারী গ্লেসিয়ারের কাছে। কৌসানীতে বসে আমরা যখন দূর থেকে নন্দাঘুন্টিকে দেখছি সেই সময় তাকে জয় করার জন্য সেই দুর্গম দুঃসাধ্য পথে বরফের মধ্যে সংকল্প অটুট মনে এগিয়ে চলেছেন নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রী দল। আমরা তাঁদের শুভ সংকল্পকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

বাগেশ্বরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। বাস না থামার জন্য আমাদের বৈজনাথ মন্দির দেখা হবে না শুনে তিনি সানন্দে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। কণ্ডাক্টারকে কি বলে তিনি নিজে গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের পাশে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হাতে নিয়ে। তারপর বৈজনাথে এসে গোমতী নদীর তীরে প্রাচীন জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে, আমাদের সঙ্গে গিয়ে সব কিছু যত্ন করে দেখালেন। একদা কোন সুদূর অতীতে বিবাহের পর কৈলাস থেকে হর-পার্বতী এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এখানকার সংগ্রহশালাটি অত্যন্ত মূল্যবান ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনে পূর্ণ। অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আছে। সেই অসময়ে সংগ্রহশালার দ্বার খুলিয়ে ভদ্রলোক আমাদের বহু দুষ্প্রাপ্য রত্নাদি দেখালেন। তারপর গরুড় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসে হেসে বিদায় নিলেন।

এমন মানুষ এ যুগে দুর্লভ। এ হয়ত হিমালয়ের শিক্ষা। যার জন্য রাজপুত্র যুগে যুগে পরিধান করেছেন ছিন্ন কন্থা।

কৌসানীর রহস্যকুণ্ডলিত হিমঘন গিরিশৃঙ্গের নৈকট্য লাভের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছি, মাটী ও মানুষের অন্তরস্থ সত্যের নিবিড় আত্মিক যোগৈশ্বর্য।

দুজনকে নিয়ে গল্প

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওদের দুজনকে নিয়ে গল্প—সমীরণ আর সীমা। কোন্ শুভ লগ্নে কবে তাদের প্রথম আলাপ তা আজ ওরা হলফ করেও বলতে পারে না। প্রথম বছরে কলেজের করিডরে দেখা, দুজনে দু ক্লাসে পড়তো, দ্বিতীয় বছরে কলেজ ফেরতা একসঙ্গে বেরুতো, কফি হাউসে কাজু বাদাম, কফি খেতো, হয়তো বা তিনটের শোতে সিনেমা, একজন আর একজনের নোট চেয়ে নিতো, পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে হতো তর্ক আর বিচার, অধ্যাপকদের উপর ক্যারিকেচার। তৃতীয় বছরে তারা গঙ্গা পেরুলো, বোটানিকসে পিকনিক করলে, বাসে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে—চতুর্থ বছরে তারা ঘুরলো বারাকপুরের গান্ধীঘাটে, চন্দননগরের স্ট্র্যান্ডে, ব্যান্ডেলের পুরোনো গির্জের ছায়ায়, আবৃত্তি করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সমালোচনা করলে পঞ্চ বার্ষিকী প্ল্যান।

সে তোমার মত ভ্যাগাবন্ডের......

সবাই ভাবতো ওদের দুজনের জোড় বুঝি পাকাপোক্ত বনেদই নেয় ভবিষ্যতের কংক্রিটে কিন্তু দেড় হাজারী ফি'ওয়ালা ব্যারিষ্টার বাপের যৌবনবতী মেয়ে ভানুমতীর খেল জানে। তার উপর ঝানু আই-সি-এসের নাতনী। সীমা যে কেরাণী কাকার আওতায় মানুষ মাষ্টার বাপের ছেলে সমীরণকে কাঞ্চন-কৌলীন্যের নিষেধ ডিঙিয়ে আভিজাত্যের বেড়া ভেঙে গলায় মালা পরাবে একথাও যেন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হোত না। তাছাড়া সীমা অপরূপা রূপসী না হলেও তার বর্ণচিকন শ্যামতনু দীর্ঘ দেহটিতে সহজ লাবণ্যের অভাব ছিল না। তার উপর সে ছিল প্রসাধন সাধনে চতুরা, স্মার্ট সেটের একজন। কথাবার্তাতেও সে ছিল ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, শ্লেষবাণ সন্ধানেও নিদারুণা। তাদের সমাজে তার শুধু কুলগত প্রতিষ্ঠাই নয়, ব্যক্তিগত প্রভাবও ছিল এবং তার আশে-পাশে মধুলোভী ভ্রমরেরও অভাব ছিল না। তার সঙ্গে সমীরণের সম্পর্কটাকে অনেকেই দেখতো অনুগ্রহ বর্ষণের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিদ্রূপ আঘাতরূপে। তাছাড়া সবাই সীমাকে জানতো প্র্যাকটিকাল ধরণের মেয়ে বলে, কথায়, কাজে, চলনে বলনে শুধু সংযত নয়, আত্মনিষ্ঠায় বিশ্বাসী। সমীরণ ছিল ঠিক উল্টো, বড়ো বড়ো আদর্শবাদের কথা বলতো, বড়ো বড়ো স্কীম কল্পনা করতো, একদিন বললো—জানো সীমা, তুমি আর আমি চলো বেরিয়ে পড়ি এক অজানা পাড়াগাঁয়ে, সেখানে খুলি অন্নসত্র নয় শিক্ষাসত্র—রোগা পিলে বার হওয়া কালো ছেলেগুলোর কানে দিই মন্ত্র, হাতে দিই খড়ি, বলি—দেশ মাটি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে—একটি ছোট্ট চালা, কয়েকটি ছোট্ট ছেলে আর মেয়ে—আগুনের একটি দীপশিখা জেবলে দেবো—তুমি আর আমি—

সীমা হেসে বললে,—ব্রাভো, সোহং স্বামী, কাউন্সিল কনফারেন্সে যাচ্ছ নাকি আজকাল! বুঝলাম ত মশাই কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা চলবে কি করে—সকালে উঠে চাও জুটবে না, বিকেলে কফি—নেই চাবি টিপলে বিজলী, কল টিপলে জল, চেন টেনে স্যানিটারী ব্যবস্থা—আর ম্যালেরিয়ার মশারা শুধু মশক নিবারণী প্রতিকার সমিতিই খুলবে না—সন্ধ্যের পর শিয়ালের রা'র সঙ্গে যখন ঐক্যতান তুলবে তখন ঝিল্লী-ঝাঁঝর পল্লীবাটের কাব্য শিল-নোড়ায় থে'তো হয়ে ভোতা হবে। শুধু যবনিকাই দিনের কল্লোল পরে।

বেচারী রবীন্দ্রনাথকে ধরে টানো কেন?

তবে কি সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়াবো—তাই সই—

সব বিষয়েই ঠাট্টা আর ঠান্ডা জল ঢালা—প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে, কষ্ট, অভাব অনটন ত হবেই।

হ্যাঁ, তাহলে অন্ততঃ আদর্শের খাতিরে ট্রেনের রিটার্ণ টিকিট কেটে যাওয়া যেতে পারে—

তোমার চোখে স্বপ্ন কি জাগে না সীমা—একটা ছেলে, একটা মেয়েকেও যদি আমরা সত্যিকার মানুষ করে তুলতে পারি, সেই ত বোধন হলো, নরের মধ্যে নারায়ণ জাগলেন—কবি কি বলেছেন জানো—

কবিবর কি বলছেন তাতো শুনেছি—মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান—গান বিরচিব ব'লে—তা আমি যে তোমার সঙ্গে গ্রামের অন্ধকারে

এ অধম আশ্রমে মৃগকে আর মারা কেন?

শব সাধনায় বসবো, তা আমার পরিচয়টা কি হবে, উত্তর সাধিকা, কাপালিনী, ভৈরবী না গৃহিণী সচিব, সখি, মিথ, প্রিয়-শিষ্যা—ওখানে ললিতকলার নৃত্য চলবে। শুধু বন্ধুর প্রিয়-বান্ধবী বললে বন্ধুর পথই বন্ধ হবার সম্ভাবনা।

সীমা আরো বললো—এবার সত্যিই ভাবতে হয়, মহাভাব নয়, মহাভাবনা—তোমার সঙ্গে এরকম হৈ-হৈ করে আর কদ্দিন চলবে—একটা কিছু বোঝাপড়া করতে হয়, তা না হলে মা দেখলুম বেশ কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন আমার সম্বন্ধে, তার চেয়ে বেশী চিন্তিত আমি

(শেষাংশ ২১৮ পৃষ্ঠায়)

"সাবধান দেবী দশভুজা,
মহিষাসুর আমি
দেবেন্দ্র বিজয়ী"
প্রতিবছর দুর্গাপূজার উৎসবে বাংলার
কোন এক গ্রামে যাত্রা গানের পালায় চন্দ্রমোহন
মহিষাসুরের পার্ট করে। সুগঠিত
স্বাস্থ্যবান, পেশীবহুল তার দেহ, একমাথা
মিশকালো বাবড়ীচুল নিয়ে, সে
যখন তার পাঠ উদাত্ত কণ্ঠে বলে, দর্শকদের
মধ্যে পড়ে হাততালি, উচ্ছ্বসিত
সে প্রশংসা পায় সকলের নিকট থেকে।
বহুবছর ধরেই চন্দ্রমোহন ওই পার্ট
করছে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়ে অনেক
কিছুই ওর বদলে গেছে। মাথার ওই
ঘনকালো বাবড়ীচুল ছাড়া। এর কারণ চন্দ্রমোহন
চুলে নিয়মিত ব্যবহার করে
লোমা
পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হেয়ার
অয়েল ও হেয়ার ডার্কেনার
একমাত্র প্রতিনিধি ও রপ্তানীকারক :
এম. এম. কাম্বাটওয়ালা, আমেদাবাদ। (ভারত)
প্রতিনিধি : সি. নরোত্তম এ্যাণ্ড কোং বোম্বাই—২।

মল্লজগতে বিস্ময়—কিঙ্কর সিং

— শ্রী অমর বসু —
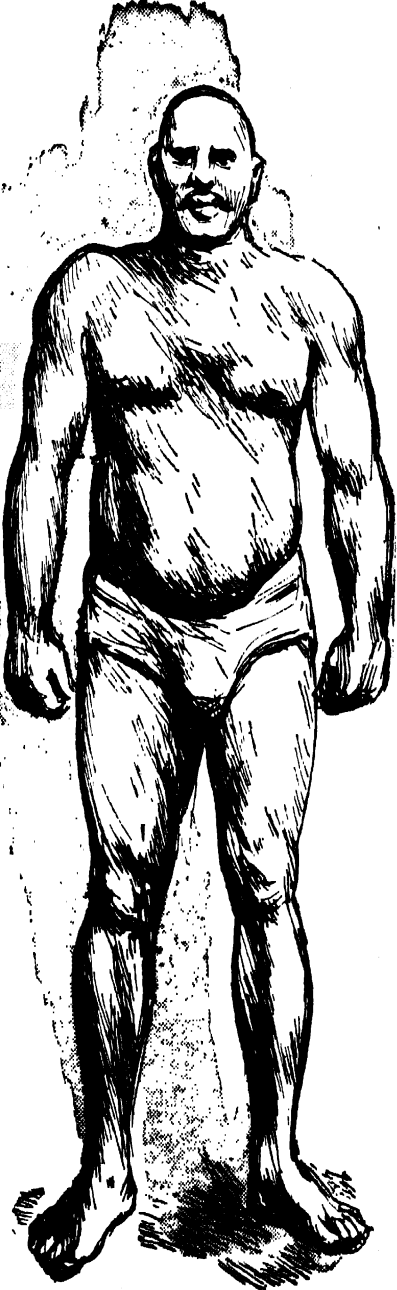
[আমাদের দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে বাদশাহ্ আকবর ছাড়া নিকট অতীতে আর কারো দ্বারা কুস্তিবিদ্যা রাষ্ট্রগতভাবে সমৃদ্ধ হয়নি। কেননা জীবিকার প্রয়োজনে কিংবা অন্য যে কারণে হোক, আমাদের পালোয়ানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশ পরম্পরা কুস্তির চর্চা করায় স্বভাবতই পুঁথিগত শিক্ষা পেত না। তা'ছাড়া কুস্তিতে নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি না থাকায় এ নিয়ে প্রায়শঃ অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হত। তাই অ্যাকাডেমিক শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কুস্তিকে ছোটলোকী কাজ মনে করে ঘৃণা করত। কিন্তু সাধারণভাবে কুস্তির প্রচলিত রূপ যাই হোক না কেন, বিদ্যা বা বিজ্ঞান হিসাবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে যা একনিষ্ঠ সাধনা ছাড়া সারা জীবনেও আয়ত্ত করা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে বংশ পরম্পরা সাধনার বলে ভারতীয় পালোয়ানেরা কুস্তি-জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করে থাকলেও আজন্ম সঞ্চিত বিরূপতা বশতঃ তথাকথিত ভদ্র-সমাজ কর্তৃক সে ইতিহাসও রক্ষিত হয়নি। এমন কি বড় বড় ঐতিহাসিক কুস্তির বিবরণগুলি সাধারণ সংবাদ হিসাবেও আমাদের কাগজ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। তাই আজ ভারতীয় কুস্তি ও কুস্তিবিদদের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার পর, যে দেশে শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, যে দেশের মানুষ ইতিহাস লেখার চেয়ে গল্পকেই বেশী পছন্দ করে এবং অতিরঞ্জন-প্রিয়তার ঝোঁক যাদের আরো বেশী, সর্বোপরি যে দেশে পালোয়ানদের মধ্যে দলাদলির তীব্রতা সীমানাহীন, সে দেশে উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাবে পালোয়ানী কাহিনী স্বভাবতই লোকের মুখে মুখে বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হতে বাধ্য এবং পরগাছার বাহুল্য ঘটলে যেমন আসল গাছ ঢাকা পড়ে যায়, ভারতের পালোয়ানী কথাগুলিও তেমনি পরস্পর বিরোধী মতামত ও অতিরঞ্জনের দাপটে তলিয়ে গেছে।

কিঙ্কর সিং ছিলেন বিগত যুগের এক বিস্ময়কর মহামল্ল যাঁর সম্পর্কে দেশময় অজস্র উদ্ভট কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অমানুষিক শক্তি কীর্তি এবং দেহকাঠামো সম্পর্কেও মত-বিরুদ্ধতার অন্ত নেই। তবু বিনা দ্বিধায় বলা যায়, এমন উল্লেখযোগ্য পালোয়ান পৃথিবীর বুকে বড় একটা দেখা যায় নি। আজ এখানে তাঁরই উত্থান-পতনের চমক্‌প্রদ কাহিনী, আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে যতটা সম্ভব, সংক্ষেপে বলব।—লেখক]

১৮৮৪ অব্দ। ভারতবর্ষে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের চেষ্টা উদ্যোগে জম্মু নগরে এক বিরাট ঐতিহাসিক কুস্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। মল্লক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবীন ও প্রবীণ বহু মল্ল এ লড়াই দেখতে সমাগত হয়েছেন। নানা রাজ্যের কুস্তি সমর্থক রাজা মহারাজাও উপস্থিত হয়েছেন। উভয় প্রতিযোগীই পাঞ্জাব রাজ্যের অমৃতসর সহরের বাসিন্দা। তাঁদের একজন প্রখ্যাত-নামা গোলাম পালোয়ান, আর একজন একান্তই নওজোয়ান পালোয়ান কিঙ্কর সিং। কিঙ্করকে হাজির করেছিলেন মহারাজা প্রতাপ সিং নিজে।

যথাসময়ে দুই মহাবীর এসে মল্লক্ষেত্রে দাঁড়ালেন। কিক্‌করের বয়স হয়তো তখনো ১৮ পূর্ণ হয়নি; অথচ সে বয়সেই দৈত্যের মতো দীর্ঘ তাঁর দেহ, বোধহয় সাড়ে ছয় ফুটের কাছাকাছি। ওজন তিনশত পাউন্ডের কিছু নিচে হবে। দেহে মেদের চিহ্ন মাত্র নেই। চোখে মুখে তাঁর আনন্দের দীপ্তি। গোলাম ছিলেন মাথায় অনেকটা খাটো, নিটোল পাথরের মতন দৃঢ় তাঁর দেহ; ওজন হয়তো ২৫০ পাউন্ডের কিছু বেশী। চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল হলেও স্নিগ্ধতায় ভরা; দৃষ্টিতে গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ।

কুস্তি আরম্ভ হলে কিক্‌করকেই প্রথম আক্রমণ করতে দেখা গেল, গোলাম কেবল আত্ম-রক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমশঃই গোলাম তাঁর লড়ার টেক্‌নিক্ বদলে নিতে লাগলেন এবং শেষে দুই ঘণ্টার মাথায় তিনি কিক্‌করকে ধরাশায়ী করেন। কিন্তু গোলামের মতো পালোয়ানের বিরুদ্ধেও কিক্‌কর যেরূপ বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তাতে প্রবীণ মল্লরা সবাই স্বীকার করলেন, কালে দিনে কিক্‌করের প্রাধান্য কেউ ঠেকাতে পারবে না। পরে কিন্তু তাঁদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হয়েছিল।

বস্তুতঃ কুস্তি জগতে কিক্‌করের অভ্যুত্থান অবিস্মরণীয় হলেও আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কেননা, ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লরা অনেকেই ছিলেন 'জাত পালোয়ান' (Traditional wrestlers) বংশোদ্ভব, কিঙ্কর তা ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল অমৃতসরের এক সাধারণ চাষী পরিবারে ১৮৬৬ অব্দে। তাঁর বাবা দেহের বিপুলতা ও শক্তির জন্য খ্যাতিমান হলেও কুস্তি

(শেষাংশ ২১৪ পৃষ্ঠায়)

চ্যানেল সাঁতরে ফিরে আসার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছেন "চ্যানেল সাঁতরাবার সময় আপনার ভয় করে নি? তখন আপনার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল? যদি কিছু বিপদ হোতো তাহলে কি করতেন?" এমনি সব নানান রকমের জিজ্ঞাসা।

মানুষ যতই সাঁতার শিক্ষা করুক না কেন; তবুও জলকে মানুষ চিরকাল ভয় করে এসেছে, আসছে এবং আসবেও, সুতরাং স্বভাবতঃই জলের ভয়ের কথা মনে উদয় হবেই, তার উপর চ্যানেলে সাঁতার কাটার একটা ভয়াবহতা তো আছে।

ন বছর বয়সে বাবা যখন আমাকে সাঁতার শেখবার অনুমতি দিলেন, তখন কিন্তু ঠাকুরমা আঁৎকে উঠেছিলেন এবং বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছিল তারপর অবশ্য সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। সাঁতার শেখবার পর যেদিন প্রথম গঙ্গায় সাঁতার দিতে যাই সে দিনটির তারিখ আজ মনে নেই বটে তবে অভিজ্ঞতা যা হয়েছিল তা কখনও ভুলি নি। স্থির জলে সাঁতার শিখেছি, স্রোতের জলে কখনও সাঁতার কাটিনি। প্রথমে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে তীর থেকে প্রায় বিশ হাত দূরে চলে গিয়েছিলাম, সেই সময় তীরের দিকে তাকাতেই দেখি যেখান থেকে জলে নেমেছিলাম সেখান থেকে স্রোতের টানে বেশ খানিকটা সরে গিয়েছি এবং যাচ্ছি, তখন মনে হয়েছিল একি আমি ভেসে যাচ্ছি যে, কি কোরবো? কিন্তু তারপর মনে সাহস এনে স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার দিতে লাগলাম আর তীরের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম এবং আস্তে আস্তে আবার তীরে ফিরেও এলাম। মনে একটু ভয় এসেছিল কিন্তু সাহস এনে আবার সাঁতরে এগিয়ে গেলাম। এবারে অবশ্য স্রোতের বিপরীত দিকে মুখ রেখে। এইভাবে কয়েকবার সাঁতার দেওয়ার পর মনের ভয় ভেঙে গেল। তারপর কতবার যে গঙ্গা পারাপার করেছি তার ইয়ত্তা নেই। চ্যানেলে সাঁতার দেওয়ার আগে প্রস্তুতি হিসাবে যখন হুগলী ব্রীজ থেকে বালী ব্রিজ পর্যন্ত সাঁতার অনুশীলন করেছি তখন কিন্তু মনে ভয়ের কোন চিন্তাই আসেনি।

চ্যানেল সাঁতার দেওয়ার ইচ্ছা যখন মনে এলো তখন চ্যানেলের ভয়াবহতার সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলাম না, থাকলে হয়তো ঐ চ্যানেল সাঁতরাবার ইচ্ছা জাগতো না। তবে এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, আর চ্যানেলে সাঁতার দেবে? আমি না বোলবো না। তবে চ্যানেল পার হওয়াটা নির্ভর কোরবে আমার দৈহিক পটুতা, আবহাওয়া (জলের গতি, জলের তাপ ইত্যাদি) ও ভাগ্যের উপর। প্রথম যেদিন চ্যানেলের জলে নেমেছিলাম সেদিন ছিল ২৫শে জুলাই ১৯৫৯ সাল। ডোভার বন্দরেই অনুশীলন চলে, কারণ ডোভার বন্দরের জলই চ্যানেলের জল। অনুশীলনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম তখন প্রায় ৯টা। সেই সময় দেখি ঐ দেশের ছোট বড় সবাই 'কসটিউম' এ'টে জলে নির্বিবাদে সাঁতার কাটছে। তাদের দেখাদেখি অলিভ তেল গায়ে মেখে জলে নামবার জন্য এগিয়ে গেলাম। প্রথমে যে ঢেউটা পায়ের উপর পড়লো তাতে শরীরটা শিরশির করে উঠলো, তারপর আর দাঁড়ালাম না। তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে নেমে পড়ে সাঁতরাতে সুরু করলাম। সাঁতার সুরু করলাম বটে কিন্তু মনে হলো যে শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। জল এত ঠাণ্ডা! শরীরটা ক্রমশ অবশ মনে হতে লাগলো। আর এগিয়ে গেলাম না, তীরের দিকে ফিরতে শুরু করলাম, যখন তীরে পেঁছুলাম

জলে নামার আগে প্রস্তুতি।

তখন মাথা ঘুরছে। কোনরকমে হোটেলে ফিরে এসে সোজা স্নানের ঘরে গিয়ে গরম জলের কলটা খুলে দিলাম। প্রথমে শরীরে যেন সাড় ছিল না। কিছুক্ষণ পর শরীরটা একটু সুস্থ হলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দেখি মাথাটা ধরে উঠেছে, আর চোয়ালের পেশী-গুলিতেও টান লাগছে। রীতিমতো চিন্তিত হলাম: কি করে চ্যানেল পার হবো? ১৫ মিনিট সাঁতার কাটতে গিয়ে এই অবস্থা তাহলে ১৫ ঘণ্টা ঐ হিমশীতল জলে থাকবো কি করে? পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম সেদিন জলের উত্তাপ ছিল আটান্ন ডিগ্রি ফারেনহাইট। যাই হোক পরের দিন থেকে বন্ধুবর শ্রীব্রজেন দাসের সঙ্গে পরামর্শ করে অনুশীলনের পরিকল্পনা রচনা করলাম এবং আস্তে আস্তে অনুশীলনের সময় বাড়াতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অনুশীলন করেছি।

১৯৫৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বিকাল বেলা জাহাজে চড়ে এলাম ডোভার থেকে ক্যালেতে। সন্ধ্যায় উঠলাম গ্রিজনিজের এক হোটেলে। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার পাইলট বোট, ডিঙ্গি বোট ১০ই সেপ্টেম্বরের ভোর রাত্রি ১টায় সময় গ্রিজনিজের উপকূলে উপস্থিত হবার কথা। আমি ও ব্রজেন রাত্রি প্রায় ১টা নাগাদ রওনা হলাম হোটেলের মালিকের গাড়ী চড়ে। আমাদের সঙ্গে সেই হোটেলের এবং আশেপাশের অনেক ফরাসীও রওনা হলেন সমুদ্র উপকূলের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে দুজন ফরাসী দেশের সাংবাদিকও ছিলেন। দর্শকদের সংখ্যা প্রায় ৩০।৪০ জন। তীরে উপস্থিত হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি যে একটা ছোট আলো সেই অন্ধকারের বুকে উঠছে আর নামছে, বুঝলাম নৌকা ঠিক সময়ে এসে গিয়েছে। মনটা আশ্বস্ত হোলো, টর্চের আলো দিয়ে সঙ্কেত কোরতেই পাইলটের নৌকা থেকে আলোর সংকেত পেলাম। মনটা ক্রমশ যেন নিজের অজানিতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই একটা অদ্ভুত শিহরণ শরীরের ও মনের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। কতক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না হঠাৎ ব্রজেনের ডাকে চমক ভাঙলো। "বিমলদা ১টা ১০ মিঃ। তাড়াতাড়ি পোষাক বদলান। গ্রিজ মেখে নিতে হবে।" কসটিউম পরে চোখে চশমা এ'টে নিতেই ব্রজেন আমাকে গ্রিজ মাখিয়ে দিলে। যখন আমি তৈরী হলাম তখন ছোট ডিঙ্গি নৌকা তীরে এসে গিয়েছে। সরকারী পর্যবেক্ষক মিঃ স্মিথ আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন "Dr Chandra are you ready" বল্লাম Yes Mr Smith" ব্রজেন বল্লে 'আর দেরী নয়।' আস্তে আস্তে জলের ধারে এগিয়ে যেতেই একটা বড় ঢেউ আছড়ে আমার পায়ের উপর পড়লো। মনে হলো, জল বুঝি বরফকেও হার মানাচ্ছে! একে ভোর রাত্রি

(শেষাংশ ২১৬ পৃষ্ঠায়)

স্বপ্ন ও সাধনা

শঙ্করবিজয় মিত্র

পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতায় খেলার মাঠে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক বিজয়ী দলের কোন ফুটবল খেলোয়াড়কে আশীর্বাদ করেছিলেন তোমরা আজকে যা করেছ তার জন্যে আশীর্বাদ করছি। কিন্তু এতেই ত শুধু হবে না ঐ কেল্লার মাথায় ঐ ইউনিয়ন জ্যাকটা যেদিন নামবে সেইদিনই তোমাদের এই জয়লাভ সফল হবে।

ব্রাহ্মণের এই আশীর্বাণী শুধু তাঁর নিজের প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি ছিল না, সে যুগের জনসাধারণের মনের কথার প্রতিচ্ছবি এটা। আজকের দিনের ফুটবল দর্শকদের পক্ষে এ কথা হৃদয়ংগম করা হয়ত সহজ হবে না; তবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইংরাজ বিতাড়নের যে মনোভাব সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল খেলার মাঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেই মনোভাবই কাজ করতো।

১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই এফ এ শীল্ড বিজয় শুধু খেলা জেতাই ছিল না, পরানত জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের উচ্ছল জোয়ার নেবে এসেছিল সেদিনের বিজয় উল্লাসকে কেন্দ্র করে। মোহনবাগান সেদিন নিছক একটা নাম নয়। এই নামের আড়ালে যে প্রাণ ছিল অন্য দিকে পথ না পেয়ে এই পথেই সেই মুক্তিপাগল প্রাণের বন্যা দুর্দাম বেগে ফেটে পড়েছিল। তাই ঐ একদিনের ঘটনা মোহনবাগানকে জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে চড়িয়ে দিয়েছিল।

সাধারণের এই স্বপ্নের সংগে সেদিনকার মোহনবাগানেরও এমনি একটা স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন ও সাধনার কথা অনেকেরই হয়ত জানা নেই। তাই একটা কাহিনী বলি। ১৯০৫ সাল। চুঁচুড়ায় গ্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইনাল খেলা। ফাইনালে উঠেছে একদিকে মোহনবাগান, অন্যদিকে সে যুগের কলকাতার ফুটবলের সেরা টিম ডালহৌসী। ডালহৌসী সেবার সদ্য সদ্য আই এফ এ শীল্ড জিতেছে বাঘা টিম ক্যালকাটাকে [illegible]-২ গোলে হারিয়ে দিয়ে। ডালহৌসীর তখন যে দাপট তাতে করে কাপ জেতার কথা মোহনবাগানের মনে ঠাঁইও পায় নি। তবে কারও কারও মনের তলায় আবার ক্ষীণ স্রোত বইছিল এই ভেবে ডালহৌসী হয়ত মফঃস্বলের খেলায় পুরো টিম না নামাতেও পারে। মাঠে নেমে দেখা গেল ডালহৌসী আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী প্রায় পুরো টিমকে নিয়েই খেলতে নেমেছে। মোহনবাগান দলে খেলছে তরুণ শিব দাস, বিজয় দাস ও রামদাস ভাদুড়ী। চকিতে তিন ভায়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। সমস্ত দলের মধ্যে কথা কানাকানি হয়ে গেল, খেলায় জিততেই হবে। ঠিক হলো ডালহৌসী খেলা আরম্ভ করে জমাবার আগেই গোল হাঁসিল করতে হবে। হোলোও তাই। রেফারীর হুইসিল বাজার সংগে সংগেই বল শিবদাসের পায়ে। তীব্র গতিতে বল নিয়ে প্রতিপক্ষ রক্ষণব্যূহ ভেদ করে শিবদাস চকিতের মধ্যে কোণাকুণি শটে গোল করে বসলেন। ডালহৌসীর খেলোয়াড় আর অগণিত দর্শক বুঝতেই পারলো না কি করে কি হলো। মিনিট তিনেক যেতে না যেতেই ডোঙ্গা দও (এ দত্ত) বল ঠেলে দিলে শিবদাসের পায়ে। এবারেও সেই একই খেলা। হাফব্যাক, ব্যাক, গোলকিপার সকলকে হতভম্ব করে দ্বিতীয় গোল দিলেন শিবদাস। এরপর মোহনবাগানের সে কি খেলা। যেন সিংহ খেলছে অমিতবিক্রমে। সারাক্ষণের মধ্যে দুর্ধর্ষ ডালহৌসীকে আর মাঠে খুঁজেই পাওয়া গেল না। মোহনবাগান জিতলো ৬-১ গোলে। সেই দিনের সেই উদ্দীপনা মোহনবাগানের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ সুগম করে দিলে।

কাপ জেতা মোহনবাগান দলের পক্ষে এই প্রথম নয়, কারণ এর আগেও তারা ট্রেডস ও কোচবিহার কাপও জিতেছে কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন কাপ জয়ের বিশেষ গুরুত্ব এইখানে যে, কলকাতার তখনকার দিনের অন্যতম সেরা টিম ডালহৌসীকে পর্যুদস্ত করে এই কাপ জেতা হয়েছিল। মোহনবাগানের খেলার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

কলকাতার আর একটি সেরা টিম—অভিজাত ইংরেজদের নিয়ে গড়া টিম ক্যালকাটার সংগে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে গেল মোহনবাগান ঠিক পরের বছরেই। বড়লাট-পত্নী লেডী মিন্টোর নামে ভারতে নার্স ব্যবস্থার প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। তার সাহায্যকল্পে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো। সেবারকার ট্রেডস কাপ বিজয়ী মোহনবাগান দলকে এই খেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান হলো। ব্রিটিশ প্রাধান্যের সেই যুগে মোহনবাগান ছিল একমাত্র ভারতীয় দল যাদের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে ডাকা হলো। মোহনবাগানের ভাগ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী পড়লো ক্যালকাটা। ক্যালকাটা তখন লীগ আর শীল্ডের সেরা টিম। পর পর প্রায় কয়েক বৎসরই শীল্ড জিতে চলেছে। একে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তায় অকালের খেলা। কলকাতায় তখন কনকনে শীত। দলের সেরা ফরোয়ার্ড শিবদাস চাকুরীর কাজে আসামে, ব্যাক শুকুলও কাশীতে। বিজয়দাস ভাদুড়ী পড়লেন মহা ফাঁপরে। নাম আর মান বাঁচাতেই হবে। তাই তিনি ন্যাশন্যালের প্রফুল্ল বিশ্বাসের শরণাপন্ন হলেন। শিবদাস শুকুলের অভাবে পুরো আস্থা নেই। ওদিকে শীল্ড বিজয়ী ক্যালকাটা পুরো টিম নিয়ে নেমেছে মিন্টো ফিট কাপের এই প্রতিযোগিতায়। প্রাণ দিয়ে খেলতে লাগলো মোহনবাগান। প্রবল বিক্রমে খেলেও ক্যালকাটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারলে না ফায়সালা করতে মোহনবাগানকে। তাই অতিরিক্ত সময় খেলান হলো। শেষ মুহূর্তে বিজয়দাস অপূর্ব চাতুর্যের সংগে হাফব্যাক, ব্যাক প্রভৃতি সকলকে কাটিয়ে বল নিয়ে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ক্যালকাটার প্রথিতযশা গোলরক্ষক ডডস ছুটে এসেছিল বিজয়দাসের পা থেকে ছোঁ মেরে বলটিকে নিতে। কিন্তু এদিক-ওদিক কাৎ হোয়ে বিজয়দাস অপূর্ব ভঙ্গীতে গোল করে বসলেন।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলো। ডালহৌসী ও ক্যালকাটাকে হারিয়ে এখন আই এফ এ শীল্ডে যোগদানের স্বপ্নে মেতে উঠলো মোহনবাগান। ১৯০৮ সালে শীল্ডের প্রতিযোগিতায় যোগ দিল মোহনবাগান। প্রথম রাউণ্ডে শক্তিশালী ইউরোপীয়ান দল ওয়াই এম সি একে হারালেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দলের কাছে বৃষ্টিতে ভেজা মাঠে হেরে গেল মোহনবাগান। তখনকার দিনে খালি পায়ে ভিজে মাঠে প্রায়ই হারতে হয়েছে মোহনবাগানকে। কিন্তু শুকনো মাঠে সেরা সেরা গোরা দল হার মেনেছে এদের খালি পায়ে খেলার চাতুর্যের কাছে।

যে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দলের কাছে তিন তিন গোলে হেরে গেল মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ডের খেলায় পরে লক্ষ্মীবিলাস কাপের ফাইনাল খেলায় সেই গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দলের সংগে পাঁচ দিন 'ড্র' করার পর ষষ্ঠ দিনে হারিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করলে তারা। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দলের তখনকার যে দাপট তাতে একদিন টিকে থাকাই দায়। সেই অবস্থায় মোহনবাগান শুধু পাঁচ পাঁচ দিন 'ড্র' করেই নয়, ষষ্ঠ দিনে তাদের হারিয়ে দিয়ে ফুটবলের যে উৎকর্ষ ও চাতুর্য প্রদর্শন করেছিল তাতে গর্ডন দল বিস্মিত হয়ে বলেছিল যে, মোহনবাগানের আই এফ এ শীল্ড জেতা মোটেই অসম্ভব নয়। অনতিকালের মধ্যেই তাদের এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

কিন্তু যা বলছিলাম খেলাটা সেদিন শুধু খেলা জেতাই নয় জনসাধারণের মানস স্বপ্নের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোহনবাগান। তখনকার ব্রিটিশ প্রাধান্যের যুগে মোহনবাগানের এই সাফল্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল জনগণের স্বাধিকারের স্বর্ণচ্ছটা। খেলার মাঠে আজ স্বাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে অহরহ যে লড়াই চলেছে তারই বীজ রোপণ করা হয়েছিল ইংরেজের কুক্ষিগত আই এফ এ প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে স্বদেশীয়দের অধিকার ছিনিয়ে আনায়।

ইংরেজদের প্রমোদ বিলাসের মধ্যে বাংলার মাটিতে ফুটবলের প্রবর্তন হলেও এবং পরে বাংলার বিদ্রোহী যুব সমাজকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে সরকারী সহযোগিতায় ফুটবলের প্রসার ঘটলেও সেই ফুটবলই যে এ দেশের মাটি থেকে ইংরাজ বিতাড়ন সংগ্রামের এক শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠবে সে কথা কূটবুদ্ধি ব্রিটিশ শাসকদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। বুদ্ধির খেলায় বাঙ্গালী এখানে ইংরাজদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ব্রিটিশ রাজপুরুষ যে ক্রীড়োদ্যমকে তাঁদের সহায়ক হবে মনে করেছিলেন বাংলার সংগ্রাম-সচেতন যুব সমাজ তাকেই তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করেছে।

আই এফ এ শীল্ডের প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের ১৯১১ সালের প্রথম সাফল্য তাই এত উদ্দীপনাময়। এই প্রথম সাফল্যেই মোহনবাগান সেদিন জনমানসের সাদর সম্বর্ধনায় অভিনন্দিত হয়েছিল। জনমানসও একটা মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার পথের সন্ধান লাভ করেছিল। কালের যাত্রাপথে আমাদের অনেক স্বপ্নই সফল হয়েছে আবার অনেক স্বপ্ন চূর্ণও হয়েছে, কিন্তু স্বাধিকারের যে প্রশ্ন মানুষকে যুগে যুগে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই সংগ্রামের একটি সেতু হিসাবে ১৯১১ সাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ বছর আগেকার আশীর্বাদ আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ফোর্ট উইলিয়ামের উপর আজ শোভা পাচ্ছে অশোকচক্রলাঞ্ছিত স্বাধীন ভারতের শোভন পতাকা। কিন্তু স্বাধিকারের সংগ্রাম আজও অব্যাহত গতিতেই চলেছে। ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে পদানত ভারতে ভারতীয়দের হোয়ে মোহনবাগান যে সংগ্রাম ভারতে সুরু করেছিলেন আজ ক্রীড়া সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব বর্তেছে স্বাধিকারপ্রিয় ক্রীড়ামোদীদের ওপরে।

তখন ক্রিকেটের একেবারেই শৈশবাবস্থা। খেলার নিয়ম বলতে নামমাত্র গুটিকয়েক। প্রয়োজন নেই তাই আইনের কেতাবে নতুন নতুন আখর এ'কে ক্রিকেট আর ক্রিকেটারদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেওয়ার চিন্তাও মনে উঁকি দেয়নি।

সেদিনের ক্রিকেটের সংগে আজকের ক্রিকেটের কাঠামোর মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। মেলাতে গেলে পুরোনো দিনকে মনে হবে যেন অজ পাড়াগেঁয়ে। পিচ্ বলতে একখণ্ড এবড়ো-খেবড়ো জমি। ব্যাট, বল, স্টাম্প, সব কিছুই আজকের দৃষ্টিতে কেমন যেন বাঁকাচোরা, অসম্পূর্ণ।

হ্যাম্বলেডন, এম সি সি এবং দু'একটি কাউন্টি ক্লাবের সদস্যরা তাই নিয়েই শহরতলী আর গ্রামের খোলা মাঠে ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছেন। উৎসাহ যথেষ্ট, কিন্তু ব্যাপকভাবে খেলার নিয়মাবলী প্রণয়নের যাথার্থ্য তখনো উপলব্ধি করা যায়নি।

'রাউণ্ড-আর্ম',' মানে কাঁধের ওপর হাত উঁচিয়ে বল করার রেওয়াজ তখনও চালু নয়। বল করা হয় 'আণ্ডারহ্যাণ্ড' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ কোমরের নীচে হাত দুলিয়ে বোলাররা বল ছাড়েন সময় মতো।

এমনি সময়ে একদিন কেন্ট কাউন্টি ক্লাবের খেলোয়াড় জন ওয়াইলস কি ভেবে যেন একটি খেলায় কাঁধের ওপর হাত তুলে বল ছাড়তে সুরু করে দিলেন।

১৮০৭ সালের ঘটনা এটি। রীতিমতো ব্যতিক্রমের বেমানান নজীর। ওয়াইলসের রকমসকম দেখে মাঠ শুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ, হাঁ করে তেড়ে এলো। 'একি! এতো একেবারে বে-আইনী। এমনভাবে বল করা চলবে না!' সবাই উঠলো ফুঁসিয়ে। প্রচণ্ড প্রতিবাদের সামনে ওয়াইলস সেদিনের মতো থমকে দাঁড়ালেন।

দাঁড়ালেন বটে। কিন্তু একেবারে থেমে পড়লেন না। কেনই বা থামবেন? ওয়াইলস চিন্তা করেই বুঝে নিয়েছিলেন যে বোলারদের মারণাস্ত্র লুকিয়ে আছে 'রাউণ্ড-আর্ম' বোলিং পদ্ধতিতে, আণ্ডারহ্যাণ্ড'এ নয়। নতুন পদ্ধতিতে যেমন জোরে বল করা যায়, তেমনি বলের গতিপথ বাঁকাতে পারায় পাওয়া যায় অতিরিক্ত সুবিধে।

উইকেট আগলাতে ব্যাটসম্যানের হাতে রয়েছে ব্যাট। ব্যাটসম্যান যেমন খুসী তেমনিই ব্যবহার করতে পারে নিজের হাতিয়ারকে। কিন্তু বোলার কেন পারবে না তা? বাড়তি সুবিধে চাইছি না, চাই সমান সুযোগ—দাবী নিয়ে ওয়াইলস্ ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলের দোরে দোরে ধর্ণা দিলেন কিছুদিন। কিন্তু গোঁড়া ইংরেজ বোলারের ন্যায়সংগত যুক্তিটি সেদিন কানেই তুলতে চায়নি।

শেষে একদিন আপোষহীন মন নিয়ে জন ওয়াইলস লর্ডস মাঠে নামলেন ১৮২২ সালে এম সি সি সি'র বিপক্ষে কেন্টের পক্ষে খেলতে। আর সুযোগ পেয়েই কাঁধের ওপর হাত তুলে বল ছাড়তে লাগলেন বেপরোয়াভাবে।

কিন্তু তাতেও সুবিধে হলো না। কাঁধের ওপর হাত তোলা মাত্রই আম্পায়ার নোয়া ম্যান হেঁকে বসেন 'নো—বল!' যতোবারই ওয়াইলস চেষ্টা করেন ততোবারই ম্যান তাঁর উৎসাহে জল ছিটিয়ে দেন "নো-বল, নো-বল" চীৎকারে।

বোলার আর আম্পায়ারে যেন ঠাণ্ডা লড়াই বেঁধে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম আম্পায়ারের দিকে মুখ

'গুগলীর' স্রষ্টা বোসানকেট

ফিরিয়ে বোলার বলতে চেয়েছিলেন, 'এই কি সুবিচারের নমুনা?' কিন্তু নোয়া ম্যান্ নির্বিকার অকরুণ! শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারই জিতলেন। জন ওয়াইলস 'দূর ছাই!' বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে সেই যে ক্রিকেট মাঠ ছেড়ে গেলেন আর সেখানে ফিরে এলেন না।

বিদায় নিলেন জন ওয়াইলস। তবে তাঁর ভূমিকার ক্ষীণধারাটি ক্রিকেট মাঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হলো না। বরং মন্ত্র-শিষ্যদের সক্রিয়তায় উত্তরকালে সেই ধারা আবার উজ্জীবিত হলো।

মন্ত্র-শিষ্য ইংলণ্ডের খেলোয়াড় উইলিয়াম লিলিহোয়াইট এবং সাসেক্স কাউন্টির জেমস ব্রডব্রিজ। লিলিহোয়াইট, ব্রডব্রিজের দলও কাঁধের ওপর হাত তুলে ক্রিকেট মাঠে তুমুল হৈচৈ বাধালেন সময় সময় ছোটখাটো দাংগাহাংগামাও।

সোরগোলে, দাংগাহাংগামায় খেলা ভেংগে যেতে লাগলো। দেখে এবার যেন ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এম সি সি'র সামান্য চেতনা জাগলো। ১৮২৮ সালে তাই তাঁরা করুণার্দ্র চিত্তে ঘোষণা করলেন, এখন থেকে বোলাররা কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতে পারবেন। এতোদিন পারতেন কনুই পর্যন্ত।

কিন্তু 'কাঁধ পর্যন্ত' হাত তোলার সুবিধে কতোটুকু? জন ওয়াইলসের মন্ত্র-শিষ্যরা এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা চাইলেন কাঁধের ওপর হাত তোলা এবং ওপর থেকে নীচের দিকে হাত ঘুরিয়ে বল ছাড়ার অধিকার। অর্থাৎ 'স্ট্রেট-আর্ম' নয়, পুরোপুরি 'রাউণ্ড-আর্ম'এর সুযোগ। আরও আন্দোলন ও আরও সোরগোলের পর এম সি সি এই দাবীও মেনে নিলেন যখন তখন জন ওয়াইলসের উপস্থিতি কোথায়! কোথায়ই বা তাঁর অশরীরী অস্তিত্ব!

কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলায় সম্মতি আদায় করতে একুশ বছর সময় লেগেছিল। আর কাঁধ থেকে আরও ওপরে হাত বাড়াতে এবং নীচের দিকে হাত ঘুরিয়ে বল ছাড়তে বোলারদের লাগলো আরও ছত্রিশটি বছর। অর্থাৎ ১৮৬৪ সালে 'রাউণ্ড-আর্ম' বোলিং হলো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত ও আইন মতে সিদ্ধ।

যেকালে 'আণ্ডার-হ্যাণ্ড বোলিংই ছিল যুগধর্ম' সেকালে ওয়াইলস হঠাৎ 'অধর্ম' করার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথায়? অনেকে বলেন যে ওয়াইলসের প্রেরণার উৎস ছিলেন টম্ ওয়াকার।

ইংলণ্ডে ক্রিকেটের প্রসারে পথিকৃৎ হ্যাম্বলেডন ক্লাবের বিশিষ্ট চৌকশ খেলোয়াড় টম্ ওয়াকারই সর্বপ্রথম কাঁধের ওপর হাত উঁচিয়ে বল করার খেয়ালে মাততে চেয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। কিন্তু তিনি বাধা পান হ্যাম্বলেডন ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষের বিচারে 'রাউণ্ড-আর্ম' তো বটেই, কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলাই বে-আইনী!

টম ওয়াকার পেশাদার। ক্লাব কর্তৃপক্ষের মর্জির বিরুদ্ধে আর্জি পর্যন্ত পেশ করার উপায় তাঁর ছিল না। তাই কর্তৃপক্ষের ধমকানি শুনে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সুযোগেই তিনি অপেশাদার জন ওয়াইলসের কানে তুলে ধরলেন 'রাউণ্ড-আর্ম' বোলিংয়ের স্বপক্ষে নানান্ মন্ত্র।

দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৯০৬ সালে জেন্টলমেন বনাম প্লেয়ার্স দলের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে। দুজন দুপক্ষের খেলোয়াড়।

তবুও নিবিড় সখ্যতার সূত্রে তাঁরা এসেছিলেন পরস্পরের খুব কাছে। আসলে ওয়াকার ও ওয়াইলস ছিলেন এক পথেরই পথিক, একই চিন্তালোকের বাসিন্দা।

মতের আদান প্রদানে ওয়াইলসের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে যায় সেই প্রথম সাক্ষাৎকার উপলক্ষেই। পরের বছরই তাই তিনি প্রথম হাত উঁচিয়ে বল করেন ইংলণ্ডের বাছাই দলের বিপক্ষে। এই ঘটনা ঘটেছিল পেনেনডেন হিথ্ মাঠে।

বোলিংয়ের আর এক যুগান্তকারী আয়ুধের সৃষ্টি হয় এই ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে। নতুন সৃষ্টি 'গুগলী' —স্রষ্টা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের, মিড্‌লসেক্স কাউন্টির ও ইংলণ্ডের খেলোয়াড় বার্নার্ড জেমস্ টিন্‌ডল বোসানকেট্ বা সংক্ষেপে বোসানকেট্।

বোসানকেট্ বেশীদিন খেলেননি। টেষ্ট ক্রিকেটে উপস্থিত ছিলেন মাত্র তিন বছর। তিন বছরের সাতটি টেষ্ট ম্যাচে নতুন হাতিয়ারে তিনি 'বধ' করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার পঁচিশ জন খেলোয়াড়কে। মস্ত কীর্তি তাঁর ১৯০৫ সালে নটিংহাম টেষ্ট মাঠে মাত্র ১০৭ রাণের বিনিময়ে অষ্ট্রেলিয়ার ডাফ্, হিল, ডার্লিং, নোবল, আর্মষ্ট্রং, ম্যাকলিয়ড, গ্রেগরী ও লেভার প্রমুখ ধুরন্ধর ব্যাটসম্যানদের তাঁবুতে ফিরিয়ে দেওয়ার নজীর। সবই তাঁর নিজের উদ্ভাবিত নতুন অস্ত্র প্রয়োগের সুফল।

অবশ্য উইকেটে পাওয়ার সাফল্যের চেয়ে নতুন সৃষ্টি 'গুগলী'ই বোসানকেটের বৃহত্তর ও মহত্তর কীর্তি। প্রথম শ্রেণীর খেলায়, গায় টেষ্ট ক্রিকেটেও অগুন্তি বোলার অসংখ্য উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব যুগে যুগে অনেকেই দেখিয়েছেন। কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করার গৌরব পেয়েছেন কজন?

'গুগলী' আসলে 'অফ ব্রেক' বল। ছাড়তে হয় 'লেগ-ব্রেক'-এর ভঙ্গীতে। কিন্তু 'লেগ ব্রেক' ও 'গুগলী'র সাদৃশ্য শুধুমাত্র ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ। কাজের দিক থেকে 'গুগ্‌লী' আর 'লেগ ব্রেক' একেবারেই বিপরীতধর্মী। 'লেগ ব্রেক' বল মাটী ছুঁয়ে অফ ষ্টাম্পের বাইরের দিকে ছোটে। আর 'গুগলী' মাটীতে পড়ে ষ্টাম্পের দিকে ঝোঁকে। এক কথায় 'গুগলী' হলো প্রয়োগরীতি কৌশলে 'লেগ স্পিন'এর সাজে 'অফ স্পিন' বল।

ব্যাটসম্যানদের উল্‌টো পাল্‌টা বোঝাতে, ঠকিয়ে অপ্রস্তুত করে তুলতে 'গুগলী'র জুড়ি নেই। এই যাদুকরী অস্ত্রের সৃষ্টি সম্ভব কেমন করে হলো, স্রষ্টার নিজের ভাষাতেই সে কথাটা বলি :—

'১৮৯৭ সালে কজন বন্ধু মিলে এক ছেলে-খেলায় মেতেছিলাম। খেলার উপকরণ একটি টেনিস বল আর কাঠের টেবিল। টেবিলের দু প্রান্তে দুজন খেলোয়াড়। একজন টেবিলে বল ছুঁড়বেন, অপরজন ধরবেন। টেবিলে পিচ পড়া চাই-ই। ফস্কাবেন যিনি হার হবে তাঁরই। ছেলে-খেলার নাম দিয়েছিলাম "টুইসটি টৌসটি"।

'খেলতে খেলতে মনে হলো, আচ্ছা, এমন কায়দায় কি বল ছাড়া যায় না যাতে এঁকে বেঁকে বল যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর নাগাল এড়িয়ে? যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। চেষ্টা করতে লাগলাম।

'আঙুল ঘুরিয়ে, কব্জী ফিরিয়ে কনুই উঁচিয়ে, নানান চেষ্টা চললো। হরেক রকম কসরতে সুফলও ফললো। দেখি কি প্রতিদ্বন্দ্বী আমার কায়দা ধরতে পারছেন না! তিনি ভাবছেন এক, আসলে ঘটছে অন্য রকম। তাঁর আন্দাজ যা, বল ফিরছে ঠিক তার উল্‌টো মুখে। গুগলীর জন্ম সেই মুহূর্তেই।

'টেবিল থেকে ক্রিকেট নেটে এসে শক্ত বলকে দিয়ে আমি এবার উল্‌টো পাল্‌টা কাজ করাতে চাইলাম। প্রথম প্রথম পারি নি। অনুশীলনে কাটলো পুরো দুটি মরশুম। বন্ধুবান্ধবেরা "পাগলামী" দেখে হাসতেও কসুর করেন নি। কিন্তু তারপর ....।'

তারপর ১৯০০ সালের ক্রিকেট মরশুমে লর্ডস মাঠে সেদিন লিষ্টারশায়ারের নামী ব্যাটসম্যান কোয়ে মিডলসেকসের বিপক্ষে খেলছেন। হাত জমে উঠেছে তাঁর। রাণও করেছেন গুনে গুনে ৯৮টি। এমন সময় বোসানকেট ছেড়ে দিলেন তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। সংগে সংগে যুদ্ধ জয় হয়ে গেল। কোয়ে বুঝলেন উলটো। লেগস্পিন ভেবে খেলে লুকানো অফ স্পিনে তিনি একেবারে নাজেহাল। সেঞ্চুরী পূরণে বাকী দুটি রাণ করা সে যাত্রায় কোয়ের অসমাপ্তই থেকে গেল।

উল্‌টো-পাল্‌টা ব্যাপার ঘটায় আজও যতি পড়ে নি। বোসানকেটের মানসপুত্র গুটি গুটি পায়ে হেঁটে টেবিল থেকে মাঠে নেমে সেই যে উলটা পালটা কাণ্ড বাধাতে সুরু করেছে, আজও থামেনি।

বোসানকেটের হাত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভলগার, স্কোয়ারজ, হোয়াইট, ফকনার, অষ্ট্রেলিয়ার আর্থার মেইলি, ক্ল্যারি গ্রিমেট, বিল ওরাইলি, ব্রুস ডুল্যাণ্ড, ম্যাককুল, ইংলণ্ডের ফ্রিম্যান, ডগলাস রাইট, জেঙ্কিন্স, ভারতের সি এস নাইডু, সুভাষ গুপ্তের হাতে পড়ে সেদিনের শিশু পরম নিষ্ঠায় লালিত পালিত হয়েছে। কাল থেকে কালান্তরে ঘুরে শিশু আজ পরিণতপ্রায়।

তবু 'গুগলী' স্বধর্ম ছাড়ে নি। পরিণত প্রক্রিয়ার তার কার্যকারিতা আরও বেড়েছে। দিনে দিনে ব্যাটসম্যানেরা যতো তৈরী হচ্ছেন, 'গুগলী' যেন ততোই তাঁদের উল্‌টো পাল্‌টা বোঝাচ্ছে। সাধে কি আর বিশেষজ্ঞরা 'গুগলী'র নামকরণ করেছেন 'wrong-un!'

"গুগলীর অরাও এক নাম 'বোসি'। স্রষ্টা বোসানকেটের অক্ষয় নামে চিহ্নিত।

'ওয়াইলস ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই যে মাঠ ছাড়লেন..........'

অশান্ত চ্যানেলে

(২১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মিঃ উড, শ্রীআরতি সাহা ও আরো অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। মিঃ উডের কথার রেশ এখনও কানে বাজছে—

'You are the first Indian to swim the channel from France to England and you did it in your very first attempt'.

বলতে দ্বিধা নেই। শুনে গর্ববোধ করেছিলাম। মুহূর্তে মা, বাবা আর আমার সাঁতারের গুরু গোঁসাইদার কথা মনে করে চোখের পাতা ভিজে উঠলো। আনন্দ তখন চাপতে পারিনি। বোধ হয় চাপতে চাইও নি। ব্রজেনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলাম আবেগের ঘোরে। চ্যানেল সাঁতারে ব্রজেন সত্যিই আমার বন্ধু, উপদেষ্টা ও পরিচালক।

মল্লজগতে বিস্ময়—কিক্কর সিং

(২০৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বা নিয়মগত শরীর চর্চা করতেন না। সামান্য জমি চাষাবাদ করেই কোনো রকমে সংসার চালাতেন। কিক্কর জন্মসূত্রে দেহ কাঠামো ও শক্তিতে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তার ওপর বাল্যকাল থেকে পিতার সহযোগী হিসাবে কঠিন পরিশ্রম করতে থাকায় কায়িক শক্তি তাঁর আরো বেড়ে গিয়েছিল। শোনা যায় মাত্র ১০।১২ বছর বয়সেই শক্তি ও বলিষ্ঠতায় তিনি ১৬।১৭ বছরের ছেলেদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, কিক্কর তাঁর পারিবারিক নাম নয়। তরুণ বয়সে একবার সতীর্থদের সংগে বাজি রেখে দুই হাতের টানে তিনি নাকি একটি 'কিক্কর' গাছকে মূলসূদ্ধ উপড়ে ফেলেছিলেন এবং সেই থেকে 'কিক্কর' নামে পরিচিত হন। এই গল্পের সমর্থন পাই নি। যাই হোক, তখন ভারতে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে, মল্ল-যুদ্ধের জনপ্রিয়তা ছিল অত্যধিক এবং অর্থকরী বিদ্যা বলে জোয়ান জোয়ান ছেলেরা কুস্তি চর্চায় ব্রতী হত। কিক্করের বাবাও আত্মীয় পরিজনের পরামর্শে প্রলুব্ধ হয়ে ছেলেকে আখড়ায় পাঠিয়ে দেন। একদা এখানেই তিনি ভারত বিখ্যাত বুটা পালোয়ানের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কার্যতঃ এই সময় থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তখন তাঁর বয়স তেরো বছরের বেশী ছিল না।

কিক্করের সংগে বুটার যখন পরিচয় হয়, তখন তাঁর বয়স ৩৫-এর কম নয় এবং তখন তিনি বরোদার গাইকোয়াড় খান্দে রাওর বেতনভুক্ত পালোয়ানদের শীর্ষমণি। অমৃতসরের রামজী, আলিয়া বখ্শ্ ও সুলেমান, শিয়াল-কোটের বাল্লী ইত্যাদিও তখন খ্যাতিমান মল্ল ছিলেন। কারো কারো মতে তখন রামজী পালোয়ানই সবচেয়ে বড় ছিলেন যদিও বুটার সংগে তাঁর সমান কুস্তি হয়েছিল। এমন কি এ কুস্তিতে রামজী বেটাল হয়ে একবার বসেও পড়েছিলেন; কিন্তু আবার নিজেই সামলে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

মল্লগুরু হিসাবেও বুটার খ্যাতি ছিল। তাঁর শিক্ষার গুণে কেবল কিক্কর নন, করিম বখ্শ্ পেহেলারিওয়ালাও মহামল্ল হতে পেরেছিলেন। বুটার শিক্ষাধীনে মাত্র তিন বছরে কিক্করের এমন অভাবিত উন্নতি ঘটেছিল যে, গুরুর নির্দেশে কিংবা সম্মতিক্রমে বিশ্বে সবচেয়ে কম বয়সে অর্থাৎ মাত্র ১৬ বছরের মধ্যে তিনি পেশাদার মল্ল হয়ে যান। তার পর আরো কতকগুলি কুস্তিতে জয়ী হয়ে তিনি মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মাত্র ১৮ বছরে গোলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ানর সুযোগ পান।

অবশ্য গোলামের সংগে পরে তাঁর আরো বার তিনেক কুস্তি হয়েছিল। কিন্তু সে সব কুস্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্টাপাল্টা কথা চালু আছে। যেমন, একবারের কুস্তিতে কিক্করের 'হাত' খেয়ে গোলামকে মাথা ঘুরে বসে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু কোন্ কুস্তিতে এ অবস্থা হয়েছিল? কারো কারো মতে, সেটা ছিল কিক্করের ১৮ বছরের কীর্তি, তার মানে জম্মুর প্রথম কুস্তিতে সেটা ঘটেছিল। কেউ কেউ বলেন, লাহোরে প্রথম বারের কুস্তিতে তা হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে এটি ইন্দোরে তাঁদের শেষ লড়াইর ঘটনা। কাজেই যে মতই গ্রহণ করা হোক, কিছুটা মত-বিরোধ থাকবেই। অবশ্য, তাঁদের সর্বশেষ যুদ্ধেও কিক্করের চাপড় খেয়ে গোলামকে যে সাময়িকভাবে হতচকিত এবং বিভ্রান্ত, এমন কি অসহায়ের মতো কাঁদতে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবু, মান্যবর গোবরবাবুর সংগে সাম্প্রতিক আলোচনার পরে এটিকে লাহোরের প্রথম কুস্তির ঘটনা বলেই গ্রহণ করতে হচ্ছে।

লাহোরে এ কুস্তী হয়েছিল জম্মুর কুস্তির বছর খানেক পরেই। এ ক্ষেত্রেও কিক্কর গোড়া থেকে আক্রমণ সুরু করেছিলেন। কিন্তু গোলাম বার বারই সে আক্রমণকে ব্যর্থ করতে লাগলেন। এক সুযোগে কিক্কর গোলামের ঘাড়ে এক প্রচণ্ড 'হাত' বসিয়ে দিলেন। চলতি ভাষায় যাকে 'রদ্দা' বলা হয় পালোয়ানী ভাষায় তা-ই 'হাত' নামে পরিচিত। এই চাপড়ের ফলে গোলামের চোখে বিশ্ব সংসার অন্ধকার হয়ে গেল এবং দুই হাতে কাণ ও ঘাড় চেপে ধরে তিনি বসে পড়লেন। তারপরে দুই হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে অতি কষ্টে সময় নিতে লাগলেন। অভিজ্ঞ মল্লরা বলেন, সেই মুহূর্তে গোলামের ঘাড়ে হাঁটুর চাপ দিয়ে জাঙিগয়া ধরে টানলেই তাঁকে সহজে চিৎ করা যেত। কিক্করের সমর্থকরা চিৎকার করে তাঁকে সে উপদেশ দিয়েওছিল। কিন্তু তরুণ বয়সোচিত অনভিজ্ঞতার জন্য হোক বা গোলাম সম্পর্কে তাঁর অহেতুক ভীতি বশতঃই হোক, কিক্কর ভেবে নিলেন, কুস্তির জহুরী গোলামের এও এক অভিনব চাল! তাই জড়াজড়ি যুদ্ধ পরিহার করে তিনি তাঁকে আবার চাপড় মারার ফিকিরে রইলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না।

বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হবার পরে এক সময়ে কিক্কর এগিয়ে এলেন এবং গোলামের ঘাড়ে হাঁটুর চাপ দিয়ে জাঙিগয়া ধরে উল্টানর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে গোলাম অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তাই পলকের মধ্যে কিক্করকে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন এবং হৃতশক্তি পুনরুদ্বোধনের জন্য 'আলী আলী' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সেই চিৎকারে এ হেন কিক্করের বুকও কেঁপে উঠল; তিনি সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে জানালেন, আর লড়বেন না। অতএব এ যুদ্ধে কিক্করের 'টেকনিক্যাল' পরাজয় ঘটেছিল বলতে হবে যদিও সাধারণের কাছে এটি অমীমাংসিত যুদ্ধ বলেই গৃহীত হয়ে এসেছে।

গোলামের সংগে কিক্করের তৃতীয় যুদ্ধও লাহোরে হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮৮৬ অব্দের গোড়ায়। শুনেছি, এ যুদ্ধের দিন কয়েক আগে গোলাম বাঁ হাতে একটা চোট পেয়েছিলেন যার জন্য এবারও তাঁকে আগাগোড়া আত্মরক্ষা করে লড়তে হয়েছিল এবং বার কয়েক নিচেও নামতে হয়েছিল। তথাপি ২ ঘণ্টার পরে এ কুস্তি সমান থেকে যায়।

গোলামকে পরাজিত করার জন্য কিক্করের শেষ চেষ্টা হয় ইন্দোরের মহারাজার উপস্থিতিতে ইন্দোর সহরে বোধ হয় ১৮৮৮ অব্দের প্রথম ভাগে। এবারের যুদ্ধে গোলামই আক্রমণকারী ছিলেন এবং কিক্করকে প্রায় সব সময় আত্মরক্ষায় নিরত থাকতে হয়েছিল। একথা সত্য যে কুস্তির কলাকৌশলে গোলাম অনেক বেশি উন্নত ছিলেন, কিন্তু তাই বলে কিক্করও তো বাজে লোক ছিলেন না। বরং দৈহিক শক্তিতে তিনিই তামাম দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাই, দুই একবার তিনিও গোলামকে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমন কি, একবার এক সুযোগে তিনি গোলামের ঘাড়ে নিদারুণ এক চাপড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। আর সে আঘাতে গোলাম মুহূর্তকালের জন্য বজ্রাহতের ন্যায় কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন এবং অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝটিকার বেগে পুনরাক্রমণ করে তিনি কিক্করকে দিশাহারা করলেন এবং ঠিক ২০ মিনিটে পরাজ[য়] করলেন।

অভিজ্ঞ মল্লরা বলেন, গোলামের পরে কিক্করে[র] সমান আর কোনো পালোয়ান ছিলেন না যদিও কিছু কিছু লোকের ধারণা, ফিরোজ, চিরাগ এবং কাল্লু পালোয়ানও কিক্করের চেয়ে কম ছিলেন না। এরূপ ধারণার সূত্র হয়তো এই যে ফিরোজ ও চিরাগ উভয়েই গোলামের সংগে একবার ক[রে] সমান কুস্তি লড়েছিলেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, তাঁদের কেউ গোলামকে কিক্করের মতো বার বার এত বেগ দেন নি কিংবা গোলামের সংগে বার বার লড়ার সাহসও তাঁদের ছিল না। তার পর কাল্লুর কথা।

কাল্লু ছিলেন গোলামেরই মধ্যম ভাই এবং ক্ষমতায় প্রায় গোলামের জুড়িদার। কিন্তু কুস্তির ক্ষেত্রে কুস্তির মেজাজে তাঁদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। গোলামের চরিত্র ছিল পর্বতের মতো শান্ত এবং উদার—প্রতিপক্ষ অসংগত ব্যবহার করলেও তিনি তাঁকে পাল্টা আঘাত করতেন না। এদিক থেকে কাল্লু ছিলেন বিপরীত, সামান্য সুযোগ পেলেও তিনি প্রতিপক্ষকে আঘাত দিতেন। কিক্করের সংগে কাল্লুর অন্ততঃ বার পাঁচেক লড়াই হয়েছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটা কুস্তিতে কিছু না কিছু গোলমাল হওয়ায় এসব কুস্তির ফলাফল নিয়ে পালোয়ান মহলে বিস্তর মতবিরোধ দেখেছি। যেমন, ১৯০৩ অব্দে অমৃতসরের কুস্তিতে কাল্লুকে উপুড় করে ফেলে জাঙিগয়া ধরে উল্টাতে গিয়ে কিক্করের ডা[ন] হাতের পাঞ্জা কেটে যায় এবং তার ফলে ভীষ[ণ] রক্তপাত সুরু হয়। কিক্কর হাত তুলে দেখাতে দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ সুরু হয় এবং সে গোলমালে কুস্তিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে বলতে শোনা গেল, কাল্লু কোমরে তার জাঙিয়া[য়] রেখেছিলেন! শুধু কি তাই? কাল্লু কিক্করকে ছুরি মেরে জখম করেছেন বলেও জনরব উঠেছিল। লাহোরের কুস্তিতে আবার কিক্কর মাটি নেওয়ায় কাল্লু তাঁকে নাড়াতে অসমর্থ হয়ে বেতোয় মারপিট করেছিলেন। সেদিনও দর্শকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এবং সে কুস্তির জয়-পরাজয় নিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিক্কর বহু প্রসিদ্ধ পালোয়ানকে পরাস্ত করেছিলেন; তাঁদের সব নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মুলতানের কাদের বখশ ... এবং দিল্লী[র] পালোয়ান, লাহোরের চমন কশাই, শিয়ালকোটের গামু পালোয়ান, এবং শাহ নওয়াজ ননীওয়ালা কালা পরতাবা প্রভৃতি যাঁরা কিক্করের হাতে মার খেয়েছেন, তাঁরা সকলেই ভারতের প্রথম শ্রেণীর এবং শীর্ষবর্তী মল্ল ছিলেন।

অবশ্যই, কাল্লু-কিক্করের গোলমেলে লড়াইর কথা ছেড়ে দিলেও কয়েকটি সাধারণ কুস্তিতে কিক্করের হাস্যকর পরাজয়ও ঘটেছিল। তবে তার কারণ নিশ্চয়ই ভিন্ন। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে একটা জোরাল অভিমত চলে আসছে যে, কিক্কর ছিলেন ভীষণ অর্থপিশাচ এবং সামান্য অর্থের বিনিময়ে তিনি নাকি স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করতেন। একথার সমর্থনে দৃষ্টান্তও দেখান অনেক। কিক্কর-মীরণের কুস্তির কথা ধরা যাক।

১৯১০ অব্দে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে কিক্করের বিরুদ্ধে যখন অমৃতসরের মীরণ বখ্স্ দাঁড়ালেন, তখন অনেকের কাছেই বিষয়টি হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছিল। কারণ চেহারা শক্তি বা অন্য কোনো বিষয়েই মীরণকে কিক্করের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা যেত না। কিক্করকে মাটিতে ফেলা দূরে থাক, দুই এক গজ ঠেলে নেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব বলে কেউ বিশ্বাস করত না। তবু, কার্যকালে দেখা গেল, ছুঁতে না ছুঁতেই কিক্কর যেন বার বার পড়ে যাওয়ার উপক্রম করছেন! এ এক অদ্ভুত দৃশ্য হয়েছিল; শেষে সত্যই যখন তিনি মাটিতে

ন, তখন ঘটোৎকচের মতোই পতনোন্মুখ রের অনিচ্ছাকৃত সামান্য ধাক্কায় শ্রীগণও প্রায় ত এসে পড়েছিলেন। সংগে সংগে সমস্ত কে বিস্ময়াবিষ্ট করে দিয়ে কিঙ্কর নিজেই চিৎ যান; বিষয়টি এমন অপ্রত্যাশিত ছিল যে, রের সমর্থকরা তাঁর ওপর ক্ষেপে উঠেছিল চয়ে বেশি। লোকে প্রায় প্রকাশ্যেই বলতে যে, পনেরো হাজার টাকা খেয়ে কিঙ্কর হার ার করেছেন!

পূর্বেই বলে এসেছি কিঙ্করের শক্তি ও কীর্তি র্ক বহু উদ্ভট গল্প সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটি মাত্র উল্লেখ করব। সাধারণ লোকের অনেকেরই বিশ্বাস, কিঙ্কর এত শক্তিধর পুরুষ ন যে ইলেক্‌ট্রিক কারেন্টে তাঁর মৃত্যু ঘটবে এই গল্পটি প্রচলিত হবার কারণ, একবার ীরের মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আমন্ত্রণে রে বাছা বাছা মল্লরা অনেকেই তাঁর আতিথ্য করেছিলেন। সেখানে একদিন বাতব্যাধি ৎসার জন্য আনীত একটি ইলেকট্রিক র নিয়ে পালোয়ানদের মধ্যে মহা হাসির ড় পড়ে যায়। ইলেক্‌ট্রিক শক্‌কে উপেক্ষা করে ক্ষণ ব্যাটারির হাতল ধরে থাকতে পারেন নিয়ে পালোয়ানদের মধ্যে মহা ঔৎসুক্য এবং কাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিঙ্কর চলনে বলনে বতঃই একটু অলস ছিলেন বলে তিনি এই দল একটু দূরে ছিলেন। ইলেক্‌ট্রিক শক্‌ খেয়ে একে যখন সবাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চার ার করলেন, তখন সেটা কিক্‌করকে দেওয়া তিনি দিব্যি সহজে হাতলটি ধরে রইলেন; কি ব্যাটারির শেষ শক্তি প্রয়োগ করার পরেও হাতল ছাড়েন নি, অসুবিধার কথাও নি। মনে রাখা দরকার, এ ধরণের ব্যাটারি- কখনো মানুষের মৃত্যু ঘটানর মতো শক্তি- ন্ট করে তৈরী হয় না। তাছাড়া, দৈহিক া সহ্য করার শক্তি একটা ভিন্ন জিনিষ, কায়িক র সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিঙ্করের দেহ গঠন ছিল অত্যন্ত উল্লেখ- য বিষয় এবং এ নিয়ে একটু পরিষ্কার আলো- দরকার। আমি যতদূর সংবাদ রাখি তাতে তাঁর প্রমাণসই Proportioned অতিকায় সারা পৃথিবীতে আর দেখা যায় নি। ভাগ্য- তাঁর দেহের একটি মাপ দীর্ঘকাল পূর্বে র হাতে পড়ায় এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত সুযোগ পেয়েছি। তাঁর দেহ সম্বন্ধে আলো- করতে হলে তাঁর জীবনের তিনটি স্টেজের বলতে হয়। প্রথম জীবনে অর্থাৎ প্রায় ২৫ পর্যন্ত তাঁর দেহ লম্বাটে এবং বেশ দৃঢ় ও ঠিত ছিল বলে শুনেছি। আর সে দেহে র চিহ্ন মাত্র ছিল না। কিন্তু তার পরেই ধীরে তিনি স্থূলতর হতে থাকেন এবং থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর ন্ত পরিণতি ঘটেছিল। তখন তাঁকে ছোট- একটি জীবন্ত মেদের পাহাড় ভিন্ন অন্য মনে হত না। সেই সময়ে তিনি কুস্তির রে নেমেও স্বচ্ছন্দ গতিতে লড়তে পারতেন ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাঁকে শুধু ট দেহভার ও পদ-শক্তি প্রয়োগ করতে হত। ই বোঝা যায়, ক্রমশঃ তিনি কুস্তি ও তের মাত্রা কমিয়ে ভোজন ও বিশ্রামের মাত্রা য়েছিলেন।

কিঙ্করের চেয়ে দীর্ঘতর বা স্থূলতর মানুষ বীতে আর কেউ ছিল না, এমন নয়। কিন্তু ত মর্যাদায় তাদের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। াদেশের মহামান্য জোনা হাভী (১৬৬৫— ১৩) ৮ ফুট দীর্ঘ হতে পারেন কিংবা ল্যান্ডের বার্ণ ওব্রীন্ (১৭৬১—১৭৮৩) দৈর্ঘ্য প্রাপ্তির পূর্বেই ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সে তুলনায় তাঁরা ভারি ছিলেন না। পৃথিবীর নানাদেশে সাড়ে ছয় ফুট মল্ল অনেক দেখা গেছে, কিন্তু তাঁরাও কদাচিৎ ৩৫০ পাউণ্ডে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। প্রায় ৭৯ ইঞ্চি উঁচু বান্তা সিংকেও আমি দেখেছিলাম। তিনিও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

স্থূলত্বের প্রশ্নেও দেখা যাবে, ফিলাডেল্‌ফিয়ার বেজা রাজিও (৭৫৬ পাউণ্ড), লীস্টার শহরের ডানি ল্যাম্বার্ট (৭৪৭ পাউণ্ড), স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ব্রীয়ারলী পাহাড়ের বাসিন্দা জর্জ লোভাট (৫৮৮ পাউণ্ড) কিংবা ডাব্‌লিনের রিচার্ড হ্যারোর (৫৬০ পাউণ্ড) কাছে কিঙ্কর শিশুতুল্য ছিলেন। শুধু পুরুষের কথাই বা বলি কেন? নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ব্রিস্টলের 'শ্রীমতী' লুসি মুর (৬৩০ পাউণ্ড) এবং ইতালির আর এক 'শ্রীমতী' দোমেনিকা জাঞ্জিও (৫৬০ পাউণ্ড) দৈর্ঘ্যে না হোক্‌ প্রস্থে কিঙ্করকে ঢেকে রাখতে পারতেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাঁরা কি দেহচর্চা করে দেহকে বাড়িয়েছিলেন? বরং উচ্চতার অনুপাতে দেহের অনাবশ্যক স্থূলত্ব ও বিসদৃশ পরিমাপ তাঁদের লজ্জা ও অশান্তির কারণ হয়েছিল। এদিক থেকে কিঙ্কর অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন এবং তাঁর দৈত্যমূর্তির বিভিন্ন মাপের মধ্যে খুব বেশি অসঙ্গতি ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা, তা হচ্ছে পূর্বোক্ত নরনারীদের দেখে লোকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত, অথচ কিঙ্করকে দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ দূরে থাক, লোকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত। অতএব তাঁর দৈহিক বিপুলতাও সার্থক হয়েছিল।

এক সময়ে অ্যামেরিকান ব্যায়াম সাংবাদিক মার্ক বেরি অ্যামেরিকান সার্কাস ক্লাউন ল্যাম্বার্টের ৮০ ইঞ্চি বুকের মাপকে 'বিশ্ব তালিকা' বলায় আমার এক বন্ধু, শচীন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষ হয়তো পিছনে পড়ে গেল—এই দুশ্চিন্তায় কিঙ্করের বুকও '৮০ ইঞ্চি' বলে দারুণ প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু একটা মানুষের উচ্চতা যত, বুকের মাপও ততটা হলে তাকে কতটা বিশ্রী ও হাস্যকর দেখায়, সে খেয়াল তাঁর ছিল না। আশ্চর্য এই, বিশ্ববন্দিত ইউজেন সাণ্ডোর মতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও একবার অনুরূপ ভুল করেছিলেন যখন আজ থেকে প্রায় ৭১ বছর আগে, অর্থাৎ তাঁর যৌবনকালে জার্মানির আখেন সহরে তিনি কার্ল ভেস্টফাল নামে এক শ্রমিককে দেখেন। সাণ্ডো বলেছিলেন, এই ব্যক্তির উচ্চতা ছিল ৭৪½ ইঞ্চি এবং ওজন ছিল প্রায় ৪০০ পাউণ্ড; বুকটা ছিল 'প্রায় ৮০ ইঞ্চি'! তিনি মোটাও ছিলেন না, বরং অস্থিমান এবং পেশিক (Bony and muscular) ছিলেন। অথচ ৭৪½ ইঞ্চি উচ্চতায় ৪০০ পাউণ্ড ভার হলে সে ব্যক্তি কুদর্শন হতে বাধ্য, পেশীর সামান্যতম বিভাজন রেখাও তার থাকতে পারে না। তার ওপর ৮০ ইঞ্চি বুক হলে অর্থাৎ উচ্চতার চেয়েও বুকের মাপ বেশি হলে কি দৃশ্য দাঁড়াবে, তা অনুমানের বিষয় মাত্র। আসলে সাণ্ডো তাঁর সহযোগিতায় শো দিতেন বলে তাঁর বিষয়ে মানুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য এসব মজার কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলতে চাই, ৮০ ইঞ্চি বা তারও বেশি বুকের মাপ পৃথিবীতে কোনোদিন দুর্লভবস্তু ছিল না। একবার এক কাগজে গারগানটুয়া নামে এক জার্মানের ৯৮ ইঞ্চি মাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ওজনও বলা হয়েছিল ৮০০ পাউণ্ডের বেশি। একেও তুচ্ছ মনে হবে যদি বলি, ১৮০৯ অব্দে মৃত্যুর পূর্বে লীস্টার সহরের সেই ডানি ল্যাম্বার্টের কোমরের মাপটাই ছিল কমসে-কম ১০৮ ইঞ্চি। তাহলে তাঁর বুকের মাপ ছিল কত? আর তাঁর চেয়েও স্থূলতর ফিলাডেল্‌ফিয়ার জো রাজিওর বুকই বা কত হতে পারে? কিন্তু সে জবাবের প্রয়োজন নেই। যাঁরা দুনিয়াটাকে নিতান্তই মুষ্টিমেয় মনে করেন, এ প্রশ্নের জবাব হয়তো তাঁরাই দিতে পারবেন। বাস্তবিকপক্ষে দেহ গঠনের বিচারে কিঙ্কর ছিলেন অনেকটা মল্লগুরু পরেশনাথ ঘোষ, ক্যানাডার বলী সম্রাট লুই শির কিংবা অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত শক্তিবীর কার্ল স্‌ভোবোদার সমগোত্রীয়, কিন্তু বৃহত্তর সংস্করণ।

কিঙ্করের ঘাড়ের বলিষ্ঠতাও দর্শনীয় ছিল। তাঁর ঘাড়ের পেশীগুলি ছিল পাথরের মতো দৃঢ়; তাছাড়া দুইটি খাঁজের ফলে সে পেশী তিনটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আর এক দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর সবলতম বাহুর প্রচণ্ডতম চাপড়েও সে ঘাড় কিছুমাত্র দুলত না। অবশ্য বিরাটত্বের প্রশ্ন ছেড়ে দিলে গ্রীবাগত বৈশিষ্ট্য রুমানিয়ার বলী জর্জ ইউনেস্কোকে কিঙ্করের পরবর্তী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা যায়। খাঁটি বৃষস্কন্ধ বলতে যা বুঝায়, ইওনেস্কোর ঘাড় ছিল অনেকটা সেইরকম; স্ফীতা- বস্থায় তা ঠিক ২৩ ইঞ্চিতে পৌঁছাত। কিঙ্করের স্বাভাবিক গ্রীবার মাপই ছিল ২৬ ইঞ্চি।

কিঙ্করের ভোজন কাহিনীও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যথার্থ ভোজনবীর বলে যাঁরা পরিচিত, এরূপ ডজনখানেক লোককে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্য তাঁরা উদরসাৎ করতেন বলে শুনে- ছিলাম, কার্যকালে তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি তা পারতেন না। হাঙ্গারির কিংকং এবং ভারতের গোরা সিংয়ের কথা ধরা যাক্‌। কিংকং তাঁর খাদ্যের দীর্ঘ ফর্দ উপস্থিত করলেও তার ওজন উল্লেখ থাকত না এবং সেসব খাদ্য খাওয়ার শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। গোরা সিং ৬০ পাউণ্ড ভেড়ার মাংস খান বলে প্রচারিত হলেও তা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আসল কথা, ক্ষমতার নিরিখে যাঁরা অপাংক্তেয় হন, তাঁদেরকে বাধ্য হয়েই অন্যান্য উপায়ে জনপ্রিয়তা বা খ্যাতিলাভের চেষ্টা করতে হয়। মাত্রাহীন ভোজন ক্ষমতার প্রচার তার অন্যতম পন্থা। আর এ-ধরণের প্রচারের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাঁদেরকে বাধ্য হয়েই যথাসাধ্য খাওয়ার বহর দেখাতে হয়। তার ফলে এসব ফালতু জোয়ানদের দেহ ক্রমশঃই স্থূল ও ঢিলে হয়ে শেষপর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে যায়। কিংকং এবং গোরা সিংও আজ প্রায় সেই অবস্থায় পৌঁছেছেন। কিঙ্কর সিংও শেষজীবনে অত্যধিক মোটা হয়ে কুস্তিবীরের গুণাবলী হারিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে ক্ষমতার নিরিখে কিঙ্কর অপাংক্তেয় ছিলেন না, বরং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মল্লদের মধ্যেও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

কিঙ্কর সর্বদা অসাধারণ পরিমাণের কিছু খেতেন না, অর্থাৎ নিজের ঘরে নিজের ব্যয়ে তিনি যথানিয়মে যথাযোগ্য পরিমাণ খেতেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হয়ে কোথাও গেলে কিংবা প্রতিযোগিতার দিন আসন্ন হলে তাঁর খাদ্যের পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, একবার তিনি এক বৈঠকে ৫০।৬০খানা চাপাটির সংগে ৮।১০ সের মাংস সাবাড় করেছিলেন একবারে এবং প্রায় এক চুমুকে ১০ সের দুধ খাওয়াও তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ ছিল না!

অবশ্য, পালোয়ান হিসাবে কিঙ্কর যত উঁচু স্তরেই উঠে থাকুন, কুস্তিতে তিনি নিজস্ব ঘরানা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর ছেলেরাও কুস্তিতে সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। কেবল এক ছেলে, নামটা বোধহয় সুচ্ছিৎ সিং, পেশাদার পালোয়ান হিসাবে কিছুকাল পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাবের বাইরেও নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু মল্ল হিসাবে তিনি কিঙ্করের সিকিভাগ ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন না।

—

অশান্ত চ্যানেলে

(২১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তার উপর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মিথ্যে বলবোনা, একবার ভেবেছিলাম কেন মরতে এখানে এলাম! কিন্তু পর মুহূর্তে কে যেন বল্লে ছিঃ "বাঙ্গালীকে জগতের সামনে ছোট কোরো না। দুর্বলতা ত্যাগ কর। বাঙ্গালীর সাহসের পরিচয় দেবার এই সুযোগ নষ্ট কোরো না।" পিছনে তখন ফরাসী দর্শকদের হাততালি সুরু হয়ে গিয়েছে। ঠিক ১টা ২০ মিনিটে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আর হাতপাড়ি দিতে শুরু করলাম। মিনিট ৫।৭ সাঁতার দেবার পর মনে হলো হাতে যেন কি ঠেকছে। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি সমুদ্রের ঐ অংশটা খুব অগভীর তাই হাঁটতে সুরু করেছি। অমনি ব্রজেন চীৎকার করে বল্লে, "বিমলদা হাঁটবেন না, তাড়াতাড়ি হাত পাড়ি দিয়ে সাঁতরাতে আরম্ভ করুন তা নাহলে শীতে কষ্ট হবে।' আর কোন কথা কানে এলো না। আবার হাতপাড়ি দিয়ে সাঁতার সুরু করলাম। ছোট ডিঙ্গি নৌকা তখন আমার সঙ্গে হাত ৫।৭ তফাতে থেকে চলেছে। ব্রজেন টর্চের সাহায্যে সংকেত দিচ্ছে। সাঁতরে চলেছি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বড় পাইলটের নৌকাটিকে দেখলাম আমার পাশে এসে আমার সঙ্গে চলেছে। কিছু পরে একটু থেমে জিজ্ঞাসা কোরলাম ঠিক চলেছি তো? বোট থেকে আওয়াজ এলো "হ্যাঁ ঠিক চলেছো সাঁতার বন্ধ কোরো না"। সামনে তাকাতেই দেখি একটা বড় ঢেউ; চোখ বুজলাম আর দম নিয়ে মাথা নীচু করে রইলাম। মাথার উপর দিয়ে ঢেউটা চলে গেল। মনের মধ্যে তখন কি রকম ভয় হোতে লাগলো—এত বড় ঢেউ! তারপর ঠিক করলাম যে ঢেউ-এর সঙ্গে গা ভাসিয়ে না সাঁতার দিলে ঠিকভাবে এগিয়ে যেতে পারবো না। চারধারে অন্ধকার যেন একটা কষ্টিপাথর। পেছনে দিকে একবার তাকালাম, দেখি গ্রিজ-নিজের বিজলী ঘরের আলোটা ঘুরছে। এইভাবে এগিয়ে চলেছি। পাইলটের মোটর বোটের ইঞ্জিনের আর আমার হাতপাড়ির শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন কানে আসছিল না।

একবার সজোরে হাঁকলাম 'ঠিক চলেছি তো?'

উত্তর এলো 'হ্যাঁ। ঠিক আছে। থামবেন না।'

এইভাবে ঘণ্টা ছয়েক সাঁতরাবার পর আমাকে জানানো হলো যে তখন ভোর সাতটা। আর অর্ধেক পথও আমি উতরে এসেছি। শুনে আনন্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি উৎসাহ দেবার জনাই যেন পাইলট বোট থেকে ছিপি আঁটা শিশিতে দুধবিহীন গরম কফিও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতেই কফিটুকু গলাধঃকরণ করে নিলাম।

চ্যানেলের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। অনুকূল স্রোত পেয়ে গিয়েছি। ছ'ঘণ্টায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছি। আনন্দ আর ধরে না। বোধহয় অতি উচ্ছ্বাসে মনের কোনে গানের দু'এক কলিও ভেঁজে গিয়েছিলাম।

ছ'ঘণ্টায় যদি অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসে থাকি তাহলে ৩৫।৪০ মাইলের মধ্যে কতোটা পথ আমি এলাম? মনে মনে আঁক কষে ঠিক পেলাম যে প্রায় মাইল কুড়ি পেরিয়েছি অর্থাৎ ঘণ্টায় তিন মাইলের মতো গতিবেগ নিয়ে চলেছি। গতিবেগের হিসাব খুবই আশাব্যঞ্জক। উৎসাহভরে আরও ঘণ্টা তিনেক পাড়ি দেবার পর আবার খেতে চাইলাম।

এবার আমাকে দু-আউন্সের মত সুপ দেওয়া হোলো। সুপ খেতে খেতে দেখি একটি বড় জাহাজ আবার আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। প্রায় ১১টা নাগাদ আমাকে বলা হোলো যে দূরে একটা লাল রঙএর জাহাজ দেখতে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম হ্যাঁ। ওটা হচ্ছে গুডউইন লাইটশিপ, ওরা বল্লে। আসল জাহাজ নয় তবে জাহাজের মতই। আপনি যেখানে সাঁতার কাটছেন সেখানে থেকে লাইটশিপ মাত্র এক মাইল পথ আর সেখান থেকে চ্যানেলের উপকূল মাত্র তিন মাইল। জোরে সাঁতার কাটুন। মনে মনে হিসাব করে ফেললাম—এক মাইল আর তিন মাইল মানে মোট ৪ মাইল। উল্লাসে অধীর হয়ে গেলাম। আর কি চ্যানেল বিজয় আমার হাতের মুঠোর মধ্যে! কিন্তু বোধহয় আমার মনের কথা জেনে বিধাতা তখন অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। কারণ পরের সময়টুকু যে কি ভাবে কেটেছে তা চ্যানেল সাঁতারু ভিন্ন আর কেহই উপলব্ধি করতে পারবে না। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতরে চলেছি কিন্তু আগের মত গতিবেগ নেই। কারণ ১০ ঘন্টার উপর সাঁতার হয়েছে আর সুপ খাবার আধ ঘন্টা পরে বেশ বমিও হয়ে গিয়েছে খানিকটা। ঠাণ্ডা জলের মধ্যে সাঁতরাতে সাঁতরাতে শরীর ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। যাইহোক যখন গুডউইন লাইটশিপ-এর কাছে এসে পড়লাম তখন জিজ্ঞাসা করে জানলাম ১২টা বাজে। মানে ১ ঘন্টায় ১ মাইল পথ এসেছি। ভাবনা হোলো। কি হবে? পার হোতে পারবোতো? এরপর আবার একটা উপসর্গ দেখা দিল, সেটা হোলো আমার ডান কাঁধেতে যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ সহ্য করে হাত পাড়ি দিতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যথা বেড়েই চল্লো। মনে মনে ভীষণ দমে গেলাম, ভয়ে বোটের কাউকে ঐ ব্যথার কথা বোলতে পারছি না। পাছে যদি আমাকে বোটে তুলে নেয়; কি হবে? জিজ্ঞাসা কোরলাম। কত মাইল বাকী? ব্রজেন বল্লে মাত্র তিন মাইল। একটু সাঁতার বন্ধ কারে দূরে তাকালাম, হ্যাঁ ঐতো ইংলণ্ডের তীরের ক্লিফ দেখা যাচ্ছে। মন একটু আশ্বস্তও হোলো। কিন্তু কাঁধের ব্যথার কথা ব্রজেনকে না বলে থাকতে পারলাম না। ব্রজেন বল্লে "কষ্ট তো হবেই জানা কথা। কষ্ট না করলে কি চ্যানেল সাঁতরানো যায়। আগেই তো বলেছি কষ্ট হবেই।"

অগত্যা চুপ করতেই হলো। আবার জিজ্ঞাসা কোরলাম, কত মাইল বাকী? উত্তর এল তিন মাইল। সে কি? ইতিমধ্যে কি একটুও এগোতে পারি নি? তারপর হাতপাড়ি বাড়াতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। কাঁধে কষ্ট হচ্ছে। ব্রজেনকে বল্লাম "কাঁধে লাগছে। ব্রজেন এবার ধমকে উঠলো 'কষ্ট হোক আপনাকে সাঁতরাতে হবেই। একবার চিন্তা করুন যদি পার হ[তে] না পারেন তো দেশে গিয়ে কি বোলবেন? দেশের লো[ক] 'ছিঃ ছিঃ করবে যে। বদনামের একশেষ তো হবে[ই] উপরন্তু কেউই কষ্টের কথা বিশ্বাস কোর[বে] না।" ব্রজেনের এই কথাগুলি শুনে প্রথমে রে[গে] গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ব্রজেন ভীষণ বড় বড় কথ[া] বোলছে, তারপর বুঝলাম ব্রজেনই ত কষ্টের কথ[া] বোঝে, আর সত্যিই তো দেশের লোক ভাববে কি

এর পর আর উঠে পড়বার কথা মনে আ[সে] নি। তারপর হঠাৎ দেখি ডোভার বন্দরের জাহা[জ] আর ক্রেণগুলি চলেছে। মনে ভাবলাম, আরে এ[সে] গেছি তো, জিজ্ঞাসা কোরলাম কত মাইল বাকী উত্তর এল আর এক মাইল বাকী। হাতের ব্য[থা] ভুলে গিয়ে সাঁতরাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বা[দে] দেখি বড় বোটটা দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ডিঙ্[গি] নৌকাটা ব্রজেন, মিঃ স্মিথ ও একজন মাঝিকে নি[য়ে] আমার পাশে পাশে চলেছে। ব্রজেন আমাকে উৎসা[হ] দেবার জন্য হাতের কাছে আর কিছু না পে[য়ে] একটা টিনের বাক্সের ওপর পা থেকে জুতো খু[লে] তালে তালে পেটাচ্ছে, অন্য সময় হলে হয়তে[া] উৎসাহ পেতাম না। কিন্তু তখন পেলাম, আ[র] সামনের দিকে দেখলাম যে তীর থেকে মাত্র ৪০[০] গজ দূরে আছি। ব্রজেন বল্লে "বিমল দা নি[ন] এবার একটা চারশ মিটার স্প্রিণ্ট করে ফিনি[শ] তুলুন। আগে তো অনেক ফিনিস তুলে ফা[র্স্ট] হয়েছেন। এবার একবার শেষবারের মতো।" উত্ত[র] দিলাম না। মনের মধ্যে খুশিকে চাপতে না পে[রে] সব ব্যথা ভুলে গিয়ে যতটা সম্ভব জোরে ফিনিশ করলাম। হাত পাড়ে ঠেকতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম কিন্তু পড়ে গেলাম। যাই হোক হামাগুড়ি দিয়ে জলের সীমানাটা পেরিয়ে ইংলণ্ডের তীর ডোভার বন্দর থেকে ১ মাইল পশ্চিমে অ্যাবট ক্লিফে নুড়ির ওপর দাঁড়ালাম। তখন মনের মধ্যে কি যে আনন্দ হচ্ছে তা লিখে বলা যাবে না। মিঃ স্মিথ আর ব্রজেন আগেই ডিঙ্গি নৌকা ভিড়িয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মিঃ স্মিথ জানালেন তখন ঠিক তিনটে বেজে দশ মিনিট। ব্রজেন আমায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ডিঙিগতে তুললো। তারপর ডিঙ্গি থেকে মোটর বোটে। বোট চললো ডোভার বন্দর অভিমুখে।

মিনিট কুড়ি পর বোট ভিড়লো বন্দরে। সেখানে চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী

(শেষাংশ ২১৩ পৃষ্ঠায়)

চ্যানেল উত্তরণের পর আরতি সাহার দেওয়া এক পেয়ালা গরম দুধ।

দুজনকে নিয়ে গল্প

(২০৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, যদি কিছু করে ফেলি—বলা ত যায় না আজকালকার মেয়ে—এম-এ পাশ—বয়স একুশ পেরিয়েছে—তার আবার মানুষের স্বভাবই হচ্ছে প্রেমে পড়লে বোকা হয়ে যায়—আচ্ছা আমি সত্যিই কি প্রেমে পড়েছি—আর বিশুদ্ধ প্রেমের শেষ কথা যে ঐ সেকেলে বস্তাপচা রোমাণ্টিক মর্বিডিটির মাকাল ফল—বিয়ে—এ কথাটা কে না জানে। মা বলছিলেন যে, আমি যদি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে একটা ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ে আসি বা কেম্ব্রিজে সিভীজিকের ডিগ্রী সেটা মন্দ হয় না—কি বল হে কুলীনকুলাবতংস কেরাণীকুল গৌরব।

কথাগুলো হচ্ছিল সেদিন সন্ধ্যায়, তারা-জ্বলা আকাশের নীচে গংগার ধারে। পরিবেশ ছিল শান্ত, বাতাসে ছিল না মত্ততা, জলে ছিল না ঢেউ। দূরে দু-একটা জেলে ডিংগি ভরাগাংগে মাছভাদরের খরস্রোতে ইলশেগুঁড়ি জাল তুলে রেখে মাছ ধরার দুশ্চেষ্টায় সময় কাটাচ্ছিল। সাত সাগরে ঘোরাফেরা করা জাহাজ-গুলো বিজলী আলোর নীচের ল্যাংবোটগুলোকে আলো আঁধারির মাঝখানে ফেলে দিয়ে মরালগ্রীব হয়ে হাসতে হাসতে ভাসছিল। তার দিকে চেয়ে সমীরণ চমকে উঠলো—সত্যিই, পরীক্ষা হয়ে গেছে, পাশ করেছে ভালো করে, বে-সরকারী কলেজে ঢুকেওছে! ততঃ কিম্, সীমাকে শুধু জবাব দিলে—ভাবনা কি? দুজনে দুজনকে জানি, তাড়াতাড়ির কি আছে—

সীমা খানিকক্ষণ চুপ করে বললে,—সত্যিই জানো।

সমীরণ বললে,—একটু দাঁড়াতে দাও নিজের পায়ে ভর করে। তুমি বড়লোকের মেয়ে—আমার অন্ততঃ মাসে একটা এক হাজারী মনসবদারী জোটাতে হয়, তা না হলে ঘণ্টায় হাজার টাকা ফি লেনেওয়ালা ব্যারিষ্টার সাহেবের কন্যার পাণিগ্রহণ কি সম্ভব—তোমারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য—

তবে এই যে বলছিলে—গাঁয়ে গিয়ে স্কুল করবে,—পিদিম জ্বালবে—আপনার করে গৃহ-দীপ জেবলে দেবে—

হ্যাঁ তার জন্যও চেষ্টা করতে হবে বই কি—একটা ফাণ্ড তুলে একটা গ্রাম নিয়ে বসে গেলেই হয়—ধরো নিউ এম্পায়ারে একটা চ্যারিটি শো—স্কীম আমার ঠিক করাই আছে—কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের দল পালা করে ক্যাম্প করবে গ্রামে, তার সংগে ধরো তুমি আমিও দু-একদিনের জন্য যাবো, থাকবো,—বেশ সবাই-এর সংগে মিলেমিশে—গভর্ণমেণ্টও নাকি আজকাল এই সব বিষয়ে সাহায্য করে—তবে কাগজে-কলমে প্রেসে-এ্যাসেম্বলীতে প্রোপাগাণ্ডা দরকার।

সীমা হাই তুলে বললে,—চলো যাই, সাচ এ নাইট, এমন রাতে যমকে রিপ্রেস নেহাৎ বর্বরতা, দেশোদ্ধার, প্রেম, ক্যান ওয় অপেক্ষা করতে পারে।

সীমা কিন্তু সমীরণকে ভাবিয়ে তুলো তার পরের দিনই সীমার বাবার কাছে চেম্বারে ধর্ণা দিয়েছিল সে।

হেমন্ত বোস বা মিঃ এইচ বলেছিলেন,—বাই জোভ, ইয়ংম্যান, তো উচ্চাশার প্রশংসা করি—ড্রাইডেন পড়েছো—ন যাট দি ব্রেভ ডিসার্ভস দি ফেয়ার—বীর আর রমণীরতন আর কারে শোভা পায় কিন্তু মাই গড—সীমা, সে তো চলেছে কেম্ব্রি —আর কি বললে, তার অমত হবে না—বল কি—আমি আমার মেয়েকে চিনি না—মাই সি ইজ এ জুয়েল—সে তোমার মত ভ্যা বণ্ডের—বেগ ইয়োর পার্ডন—বাঁদরের গ মালা দেবে এ অসহ্য—সিম্পলি ইনটলারেব টাকা রোজগার করো—অর্থ—ড্রাফট, সিকউরিটি—যা পাও লুটে নাও—দুনিয়া যায়েগা—করতলগত—ভালো করে সংস্কৃত প ছিলুম,—যাক বড্ড ব্যস্ত আমি—আর এক এসো কাজের কথা বলবো, টিপস দে মেয়েদের পেছনে ছুটে সময় নষ্ট কর না, ট জমাও দেখবে সব পাবে—বাই, বাই—মাই ইস মনি—

রাত্রে কথাগুলি হুবহু তিনি বল স্ত্রীকে। সীমার মা শুনলেন মন দিয়ে, জ দিলেন,—আমার ঐ রকম একটা সন্দেহ কিছু থেকেই হচ্ছিল—ক্লাবে শাস্তাদিও ঐ ক বলছিলেন—হোয়াট দ্যাট হ্যাড অফ উম্যান উইথ এ টাং—থামো, বৃহন্নলাগুল মহৎ তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ তা জা কিন্তু এককালে ঐ শুটকি পেত্নীর পিছ করেয়া পিরেতের দল কত ঘুরেছে তাও অজ নেই, তুমিও ত অনুরাগী ভক্তদের এক মক্ষিরাণীর মধুর লোভে ঘুর করতে মিলি, ডিয়ারি, ডোণ্ট বি লি—বয়সকাল হয়েছে, সে সব ত বারড বাই লিমিটেশন অধম আশ্রম মৃগকে আর মারো কেন— সমীরণ ছেলেটি মন্দ নয়, তেমন তেমন হ আমরাই পাঠাতে পারি বিলেতে, তাছা তোমার ত জানা শোনার অভাব নেই—ধরে ক সরকারী পয়সাতেই যেতে পারে—কত ছেলে যাচ্ছেও স্কলারশিপ, ট্রেণিং ফেলোশিপ—

হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু ভাবোতো তোম জাঁদরেল আই-সি-এস বাবা স্বর্গ থেকে দেখবে যে তাঁর নাতনী এক স্কুল মাষ্টারের স্ত্রী হ ঠাকুর ঘর পুঁচছে—সবই বুঝলাম কিন্তু টাক চাই-ই, টাকা না থাকলে—কত টাকা তোমা ছিল—গোল্ডার্স গ্রীণে যখন তিনচর্ম ডিনা খেয়েই কাত হয়ে পড়েছিলে আর বাবাকে মা মাসে পাঁচশো করে ঢালতে হয়নি তোমা পেছনে, যখন বার লাইব্রেরীতে বসে সুনিদ্রা দি আর রাজা-উজির মারতে আর রাত্রে তারই রাগে অনুরাগে ক্লাবে গিয়ে হুইস্কীর সাদা কালো আস্বাদন।

কর্তা-গিন্নীর কোর্টশিপ হয়েছিল একেবারে কেতাদুরস্তভাবে লণ্ডন সহরে, বিলেত র মুহাম্থানে, সেকালের জি কনসেশনের জো

প্যারিসে হয়েছিল হনিমুন যেখানে সুন্দরীদের সময়বিশেষ কটাক্ষ একটা ফুলডোজে আবাসাদের কাজ করে।

মিঃ ভোস শুধু বললেন পাইপটা ঠুকে—আর জ্বালিয়ো না, কাল দুটো পার্টহার্ড আছে—পেপার বুকগুলো এখনো দেখা হয়নি।

সীমাকে ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে জানিয়ে দিয়েছিলেন কর্তা-গিন্নী তাঁদের অভিমত বা শুক-সারীর আলাপ কথা।

সমীরণকে পরের দিনই সীমা বলেছিল—আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো এই মিথ্যে থেকে—আমি চাই আমাকে কেউ নিক নিছক আমার জন্য, আমার বংশের জন্য নয়, বাপের টাকার জন্য নয়, মায়ের আভিজাত্যের জন্য নয়—এমন কি আমার রূপ-যৌবনের জন্য নয়—

সমীরণ ওর হাত দুটো ধরে বলেছিল—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছো—ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন—উপকরণ চান না তিনি, তিনি চান অমৃত, শুনে রাখো তোমার ভালোবাসার বদলে তোমাকে অকিঞ্চনের সম্মান দেবো না, আমি তোমাকে উপকরণও দেবো—সমানে সমানে তোমাকে তোমার বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো অর্থের গৌরবে—

তাতে আমার বাইরের দাম বাড়তে পারে বটে কিন্তু ভিতরের মূল্য যে কমে যাবে—

সমীরণ বললে,—কটা বছর পারবে না অপেক্ষা করতে, তোমার বাবাই বলে দিয়েছেন একজনকে, বড় কণ্ট্রাক্টার—ভাবছি তার সংগে কাজে লাগবো—

হঠাৎ সীমা বললে,—তা হলে আমার নিজস্ব কোন দাম নেই তোমার কাছে—

কবিতা পড়ে পড়ে কাব্যলোকেই বাস করছো তুমি—তুমি ত শুধু তুমি নও, তুমি হচ্ছো সব নিয়ে—

সীমার সত্তা ডুবে যায় এক গভীর যন্ত্রণা-দায়ক নিভৃতিতে যেখানে সে একেবারে নিঃসঙ্গ। উপলখণ্ডে ব্যথিত কলস্বনার মুখের কথা যেন হারিয়ে যায়—কোথায় যেন এক বালির বাঁধের গোড়া চুঁইয়ে জল ঝরতে সুরু করেছে।

দিন যায়, সমীরণের মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা। কোথা থেকে কি হয়। অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে সে ধরে তিসির দালালি। পাটের কেনাবেচা, ষ্টক এক্সচেঞ্জে যাতায়াত। সরস্বতী কমলবনে আশ্রয় নিলেও মালক্ষ্মী বিমুখ হন না—সারস্বত হংসবলাকা হেথা নয় বলে চলে গেলে কোটরস্থ পেঁচকের দল গভীর রাতে জানান দেয় যে তারা আছে।

সমীরণের বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে, সঞ্চয়ের নেশা জমে। সে ব্যবসায়ের খাতিরে শুধু বিলেত কণ্টিনেণ্টই যায় না, চিলি ও পেরুও ঘুরে আসে। জাপানে তার এজেন্সী, ভ্যাঙ্কুভারে সে মাল পাঠায়। কলকাতার কাঠ-ঠোকরা সমাজে সে আজ চিনি গো চিনি হয়ে উঠেছে। উদ্বিগ্ন যৌবনা তপ্তাঙ্গীরাই তাকে টেনিসের পার্টনার হতে আমন্ত্রণ করে না, পুষ্পধনু মার্কা, সাজ-গোজে, রুজে-রং-এ প্রলেপিতা প্রাকপ্রৌঢ়ারাও আবদার ধরে। মিসেস ভোস কিন্তু তাকে তাঁর স্পেশ্যাল প্রটেজি বলেই মনে করেন—মিঃ ভোসেরও টনক নড়ে। সীমা অবশ্য মুখে কিছু বলে না কিন্তু যেন ওকে এড়িয়েই চলতে চায়।
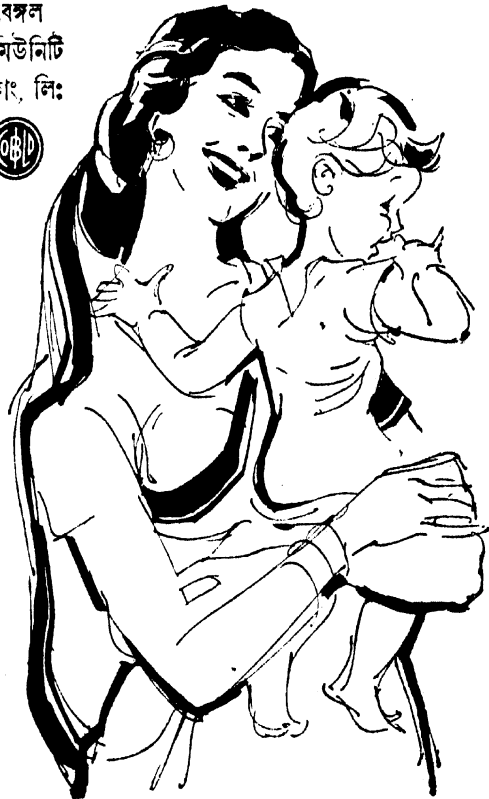
ওর শার্সস্কীন স্যুট যতো উগ্র হয়, ওর শাড়ীর মিহি সূক্ষ্মতা ততোই মোটা হয়। সমীরণ যখন চড়ছে নতুন ষ্টুডিবেকার, সীমা তখন বাসে চড়ে চলেছে সহরতলীতে মাষ্টারনীর কাজ করতে।

মায়ের সঙ্গে দু-একবার এ নিয়ে তর্ক অভিযোগ, অভিমানও হয়ে গেছে সীমার। মা অবশ্য সুসভ্য সমাজে বলেন,—সোসাল ওয়ার্ক করছে সীমা। সমীরণের সঙ্গে বিয়েটা পাকা-পাকি করবার জন্যও বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠলেন মিসেস ভোস—সমীরণ এবার কণ্টিনেণ্ট থেকে ফিরতেই আপনি সেধে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন তাকে। সীমাকে যখন বললেন, তখন সে বললে,—বাঃ আগে বলতে হয়, আমার যে স্কুল কমিটির জরুরী মিটিং আছে, আমি ত থাকতে পারবো না—

মিঃ ও মিসেস ভোস উর্ধনেত্রে ধ্যানস্থ হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। মিঃ ভোস শুধু বললেন,—বয়, পেগ লে আও—

মিসেস ভোস বললেন,—তোর মতলবটা কি বলতো সীমা? ভদ্রতাও কি ভুললি—

কথা না বাড়িয়ে সীমা ও'দেরই খাতিরে একটু বসে গেলো। বিরাট ক্যাডিলাককে করে ঢুকলো সমীরণ—আমেরিকা থেকে সদ্য আনানো। সে কথাই শোনালে সে সকলকে যে কত কষ্ট করে ইম্পোর্ট বন্ধের দিনেও সে গাড়ীটা পেয়েছে। যোগমায়া উপাশ্রিত হয়ে শুনলেনও, সবাই তারিফও করলেন সাধু সাধু।

সীমার জরুরী কাজ আছে শুনে টক্ করে লাফিয়ে উঠে সমীরণ ড্রাইভারকে ডেকে বললে, পৌঁছে দিয়ে এসো দিদিমণিকে আর অপেক্ষা করে নিয়েও এসো—ততক্ষণ আমি এখানে বসছি—এখান থেকে মাইল দশ—কতক্ষণই বা।

সীমা হেসে বললে—অতো বড়ো চকচকে গাড়ীতে গিয়ে নামলে সেখানকার লোকেরা ভির্মি যাবে—তা ছাড়া গাড়ীটা ত সবটা পথ যাবে না—খানিক দূর যাওয়া যায় বটে—তোমার রথ মনোরথ হয়েই থাক—

সমীরণ বললে,—টেলিফোন করে দাও, বিশেষ কাজে যেতে পারবে না—চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি—

সীমা জবাব দিলে—টেলিফোন থাকলেও বা কথা ছিল, আর কাজটা সত্যিই জরুরী—আর গঙ্গার ধার—মা জাহ্নবী ত মজছেনই—এখানে জাহ্নু-কন্যা একেবারে সেকেলে কুলকামিনী—জারিজুরি দম্ভ প্রতাপ রূপ যৌবন সবই গেছে, কলস্রোতের আর ধার নেই, ঠিক যেন আমার মত। থাকগে, এসো না, আর একদিন—পিকনিকে নিয়ে যাবো, আমাদের স্কুলে খিচুড়ি খেতে দেবো আর তালের পিঠে।

তার সাতদিনের মধ্যেই একটা বড় কণ্ট্রাক্টের হাঙ্গামায় খাড়া পাড়ি দিতে হলো সমীরণকে রিও-ডি-জ্যানেরিয়ো। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে ফিরি ফিরি করতে করতেও কয়েক মাস ঘুরে গেলো। এসে শুনলে ভোস্ সাহেব হঠাৎ মারা গেছেন করোনারী থ্রম্বসিসে, মিসেস ভোস্ বাসা নিয়েছেন দেরাদুনে বড়ো মেয়ের কাছে—লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে দেনার দায়ে। আর সীমা চলে গেছে তার স্কুলে। তার সঠিক ঠিকানা কেউ দিতে পারলে না।

দেখা অবশ্য হলো অনেক সন্ধানের পর। সহর থেকে বেশী দূরে নয়, তিনকাল পেরোনো এক গ্রামে, একটা পুরোনো মজা দীঘির ধারে। পুকুরটার নাম রবিঠাকুরের কথা চুরি করে বলা যায় লোচনদীঘি। এবং তাঁরই ভাষায় বলা যায় সেখানে ভুলে যাওয়া তারিখের ঝাপসা অক্ষর পটওয়ালা অশ্বত্থের পাঁজরের নীচে আশ্রয় দিয়েছে একটি ভাঙা দেবালয়কে। তারি ধারে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের বড় আটচালা ঘর সেখানে কনে দেখা আলোতে নতুন করে সীমাকে দেখলে সমীরণ।

'মা-মণি' বলে দাঁড়ালো একটি কালো শুকনো মেয়ে—এই ভদ্রলোকটি তোমায় খুঁজ-চেন।

চমকে উঠেছিল সমীরণ, থমকে গিছলো সীমা। সমীরণ মা-মণি ডাক শুনে, সীমা সমীরণকে দেখে। সীমা তখন পাঠশালার সংলগ্ন বাগানে ছোট্ট ঝারি হাতে সবজি ক্ষেত্রে জল দিচ্ছে। প্রথম দেখায় সমীরণ কোনো সম্ভাষণ করতে পারলে না, সীমাও কোন প্রশ্ন নয়। শুধু সীমা চোখ্ নীচু করে দেখে সমীরণের দামি জুতা জোড়াটায় কতটা এঁটেল কাদা লেগেছে, তার ঝকঝকে প্যাণ্টটা কতটা টোল খেয়েছে। সমীরণ দেখলে ছাইরংএর মোটা শাড়ী পরা একটি মেয়েকে যাকে সে কোনদিন চিনতো বলে মনেই পড়ে না—পায়ে জুতো নেই, হাতে নেই গয়না, চিলে খোঁপা, মুখে লেগেছে পাড়াগাঁয়ের শ্যামলা রং। কপালে সিঁদুর আছে কিনা বোঝা গেল না। হঠাৎ জামার হাতায় সোনা বাঁধানো আসল মুক্তোর বোতামটার দিকে চেয়ে সীমা বললে—ছি, ছি, কি কাণ্ড বল দিকিন্—এই মাটির ভিতর তোমায় ডেকে আনে—তবে আমার সঙ্গে আমাদের লাউডন্ ষ্ট্রীটের সৌখীন বাগানে অনেকদিনই ত সখের মালীগিরি করেছো—ঘাস-গুলো নিড়িয়ে দেবে নাকি—বিনা পারিশ্রমিকে নয়, ঐ লাল গোলাপটা দিতে পারি—বাটনহোলে খুব খারাপ দেখাবে না—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ত তোমাদেরই হাতে—অর্থাৎ যাঁরা চক্র-পাণির চক্র হতে স্বর্ণচক্র সংগ্রহ করেন—কলির ভূভার হরণও...ছিঃ ছিঃ কি কথাই বলছি—চলো বসবে চলো—

থাকো কোথায়—

দেখবে—বলে সীমা নিয়ে গেলো তাকে স্কুলেরই আর এক ধারে। দালানের পূব দিকে চেঁচা বেড়ার পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা ঘর—একটা কাঁঠাল কাঠের তক্তপোষ, তার উপর গোটানো বিছানা। টুলের উপর একটা সেলাই-এর কল—দেওয়াল ঘেঁষে ঠেসান দেওয়া ছিটের খাপে ঢাকা একটা সেতার—নীচে একটা শীতল পাটি পাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কিন্তু বাহুল্য নেই। ছোট্ট একটি টেবিল, একটি আলমারী আর একটি বই রাখার শেল্‌ফ, একটা টাইমপিস ঘড়ি, লেখাপড়া করার কিছু সরঞ্জাম, কয়েকটি ছবি—

বই শেল্‌ফে নজর পড়তেই একটা বই সে চিনতে পারলে—নিজের হাতে নাম লিখে সে দিয়েছিল সীমাকে তার এক জন্মদিনে। তাতে লেখা আছে—দেখো ত চেয়ে আমায় তুমি চিনতে পার কি?
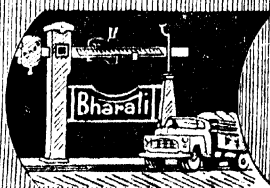
রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী, বিবেকানন্দের ছবি ও বাস্টের ... এখানে একটা ছবিকে সে চিনতে পারলে না ... চোখে তার দূর ভবিষ্যতের আলো, ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা আঁটা। কার ছবি এটা কার, ভাবতে বসলো সমীরণ।

সীমা ফিরে এলো জলখাবার হাতে—চিঁড়ে, কলা, নারকেল নাড়ু, এক বাটি ঘন দুধ, বললে—চা ত নেই, জানলে আনিয়ে রাখতাম—কী করি বলো—

খুঁচি নেই বললে সত্যি হোত কিন্তু খেতেই হলো। সীমা বললে—ভারী ভালো লাগলো তুমি এলে—তোমার ঐ দামী মোটরে কলকাতা থেকে আর কতক্ষণ লাগে—যাকগে, তোমার খবর বলো, বৌ কেমন হলো জিজ্ঞেস করবো না—এসব চিপ্ রোমান্সেই চলে, তোমার হাঁচি কাশির শব্দ পর্যন্ত কাগজে রেডিয়োয় বেরোয়—কাজেই বিয়ে যে করোনি তাও জানি—

ছবিটা কার—

উনিই ত এনেছিলেন আমাকে এই কাজে—দুর্গেশনন্দিনীকে উপকরণের দুর্গ থেকে—

তিনি কোথায়—

সীমা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—ঐখানে, ব্রিটিশ যুগে বছরের পর বছর কাটিয়ে

ছলেন জেলে। তারই দেনা শোধ করলেম সুরেন—আসলে বুকের রক্ত তুলে। এ যুগে আশ্রয় পেলেন হাসপাতালে অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর। আমায় ডেকে বললেন—দিদি, ভার রইল ঐ ক'টা ছেলেমেয়ের—তার পর চলে গেলেন ঐ তারাদের রাজ্যে। আছে, আছে রাতের সব কিছুই দিনের আলোতে আছে।

জুটিয়েছো ত দেখছি অনেকগুলোকে—ঐ সব হাড়গিলে চেহারা—চলে কি রকম করে—তোমার বাবা ত শুনলুম রেখে যাননি বিশেষ কিছু—

সীমা বলতে যাচ্ছিল—তোমার ত অনেক আছে, দাও না কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য, কিন্তু বলতে পারলে না। কোথায় যেন বাধলো—দু'ফোটা উদ্গত অশ্রু যেন চোখে ঠেলে এলো।

সমীরণ বললে—দেখো আজকাল প্ল্যানিং-এর যুগ, সেকালের কবিতা মার্কা সমাজ উন্নয়ন পল্লী সংস্কার চলবে না—চলতো রবিঠাকুরের যুগে, গান্ধী মহারাজের আস্তায়, চলতো যখন বিদেশী সরকার ছিল—এখন স্বাধীন দেশ—কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সোসিও ইকনমিক প্ল্যান হচ্ছে, ট্রাক্টর আসছে, ফ্যাক্টরী বসছে—এখন কি আর একা একা কিছু করা যায়, না করা উচিত।

সমীরণ উঠে পড়লো—তার পকেটে একটা আসল কমলহীরের আংটী খোঁচা দিচ্ছিলো—বিলাত থেকে নিজে বেছে নিয়ে এসেছিল অনেক পাউন্ড দিয়ে সীমার হাতে সুবিধামত পরিয়ে দেবে বলে।

ষাট মাইল স্পীডে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ জলাতি পথের ধারে একটি পুকুরের পাড়ে ঝুপ করে একটি শব্দ হলো। একটি হীরের টুকরো ডুবে গেলো কালো জলের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সীমা বসেছিল গল্প বলতে—কেউ তার কোলে শুয়ে, কেউ তার গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছে, কেউ হাত ধরে টানছে সে শুনবে রাক্ষসের গল্প, খোক্কসের ইতিহাস—তার মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে ততক্ষণে—একটি ছোট মেয়ে বললে—দেখতে পাচ্ছো মা-মণি, কতো হীরে জ্বলছে আকাশে—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাণিক।

সীমা বললে—হীরের টুকরো ত তোমরাই।

* [রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার সামান্য ছায়া পড়েছে এই গল্পটিতে]

অপরিশোধ্য

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

এক হাতে নিয়ে আর হাতে ফিরে দিতে
সাগর-হৃদয় পাবো নাতো কোনোদিন;
তাই বয়ে যাই সবার অলক্ষিতে
অপরিশোধ্য তার সে প্রেমের ঋণ।

সাগর দু' চোখে করুণ মিনতি তার,
কাজল আমার হৃদয়ে হেনেছে শর;
ঘন যবনিকা অভিমান-কুয়াশার
সরে যেতে দেখি, শূন্য তাসের ঘর।

গল্পের মতো, অথচ গল্প নয়;
যতো খুশী রঙ দিতে পারো ক্যানভাসে;
অনেক শ্রাবণ-শর্বরী ব্যথাময়
পোহালো, ফোটেনি সে হাসি শারদাকাশে।

তবু মনে পড়ে—এনেছিল আলো-স্বর,
সাগরের ফেনা ডানা থেকে গেছে ঝরে;
এখন মরুর মরীচিকা—নশ্বর
ঝলসায় চোখ, হৃদয় পাগল করে।
ভুল করে গেছি, সে-প্রেম মৃত্যুহীন—
অপরিশোধ্য; ঋণী রবো চিরদিন।

ন'টাই বাজল' তাহলে, কি বল?"
"হ্যাঁ ঠিক রাত ন'টা। কিন্তু—"
"কিন্তু কি?—"

তীর্থ'র ঠোঁটের রেখায় কেঁপে ওঠে একটু অনুরোধ, হয়তো বা একটু প্রার্থনাও।

"বাসবি!

"বল।

"একটু, আর একটু বস তুমি। হয়তো এইটুকুর মধ্যেই আমি আমার কাজ শেষ করতে পারব, বেশী সময় লাগবে না।"

সামনেই বাসবীর নিশ্চল মূর্তি।

পুরানো, রং পালিশ চটা একটা টুলের 'পরে স্থির হয়ে বসে আছে ও। উজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে কানের আর গলার গহনাটা। উড়ছে শ্যাম্পু করা চুলের প্রান্ত আর নাইলনের আঁচল, যে আঁচলটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢেকেছে ওর দেহের খানিকটা, বাকিটুকু কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে পেছনে।

শাড়ীর রঙীনপাড়টাকে চটির ডগায় আলতোভাবে একটু চাপ দেয় ও, হাসে; অনুকম্পার হাসি—

: নাঃ! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। একটুর পর আরও একটু অনুরোধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছ। কিন্তু, এ অনুরোধ রাখতে আমাকে যে কি অসুবিধায় পড়তে হয়—তা যদি একবারও ভাবতে!"

: ভাবিনে বলেই কি ধ'রে নিলে শেষ পর্যন্ত?—" হাতের ব্রাশ আর সামনের ক্যাম্বিশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে তীর্থ। দুই চোখে ওরও খুশীর ঝলক—

: মনে মনে যা খুশী ভেবে নিলেই হল। আর সেটাকেই যে আমি মেনে নেব স্বচ্ছন্দে এ আশাই বা তুমি ক'রলে কি ক'রে?—

—: যেমন করে পুরানো বন্ধুত্বের স্মৃতিটা আজও টিকে রয়েছে।—যদি বলি তেমনি ক'রে।

: হোঃ! হোঃ!—"

তীর্থ হাসে; মনখোলা হাসি। যেন, অনেকদিনের বন্ধ হাসির স্রোতটাকেও আজ খুলে দিয়েছে আবার—; সবল বুকটাকে কাঁপিয়ে সে স্রোত গড়িয়ে চলেছে—চারিদিকে।

: হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সামনের জানালা খোলা। ওখান দিয়ে দেখা যায় পাশের বস্তি, আর তার ঘরে ঘরে মানুষ। কত কাজেই না ব্যস্ত ওরা—! যার জন্যে এদিকে তাকাবারও সময় নাই।

এ একরকম ভালই বলতে হবে বৈকি! নইলে তীর্থ যতটুকুই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করুক,— বাসবীর পক্ষে অস্বস্তির সীমা পরিসীমা থাকত না।

তবু একবার তাকায় হাতঘড়িটার দিকে। ছোট কাঁটাটা বড় তাড়াতাড়ি ঘুরে চলে যেন! ওর সঙ্গে সমতা রেখে এঁকে চলে তীর্থও। ক্যাম্বিশের বুকে রংয়ের পর রং চাপিয়ে—ও যেন টেনে আনতে চায় কো সুদূর কল্পনাকে—যাকে আজ প্রায় ভুলে বসেছে।

তবু আঁকতে হবে!

সামনে একটামাত্র জানালা এঘরের; জানালা খুলেই রেখেছে ও। ওদিকে তাকা দেখা যায় বড় জোর একটুকুরো আকাশ সে আকাশও রাত্রের: সে অন্ধকারে ফু উঠেছে বিন্দু বিন্দু আলোর ফুটকি —অসংখ্য নক্ষত্র।

অন্যদিন হলে হয়তো ঐখানে গিয়ে দাঁড়াত—তীর্থ। চোখভরে দেখত রাতের অন্ধকারকে; কিন্তু, আজ আর সে সময় নাই ওদিকে তাকাবার কথাও ভুলে গেছে যেন একহাতে রংয়ের পাত্র, অন্য হাতে ব্রাশ চালিয়ে চলেছে—ক্যাম্বিশে—! মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে সেই এক সংকল্প।

ছবি তার আঁকতেই হবে—! আর, সে সময় আজই ধরা দিয়েছে হঠাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে।

: বাসু!

: আবার কি?

: আমি কি ভাবছি, জান?

: না।

: আজকের দিনটা সকাল থেকেই যেন খুশীতে ভ'রে এসেছিল আমার কাছে। কেন—তা বুঝিনি; মনে হয়েছিল, হয়তো বা শুধু অকারণের এ খুশী। কিন্তু, পরে জেনেছিলাম তা নয়; কারণ তার কিছু ছিলই—আর সে কারণটা স্পষ্ট হয়েছিল তোমার আসার সঙ্গে। তুমি এসেছ দেখা করতে। এ দেখা বহুদিন পরের,—যার জন্যে আমার সমস্ত অনুভূতি হয়তো উৎসুক হ'য়ে ছিল,—কিন্তু বাইরে জগতে আমি হয়েছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত— তাই বিস্ময় বোধ হল তোমায় দেখে। ভেবে নিলাম, সহুরে তো পোর্ট্রেট আঁকিয়ের অভা

টৌনি, তবে—[illegible]
সবারই বা কি দরকার ছিল তোমার—।

—"খেয়াল—তীর্থ, শুধু খেয়াল। বহু-কাল ধরেই তো এ খেয়ালের সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার, তাই না।"

"আছে ব'লেই তো যত ভাবনা! অনেকদিন আগের যে খেয়ালী মেয়েটিকে আমি চিনতাম, আজ তার মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেছে হয়তো। কিন্তু তা যদি না সইতে পারি!"

"না পারলেও নালিশ করবো না?"

বাসবীর মুখে-চোখে ছায়া এসে প'ড়েছে যেন কোন একটা আধভোলা অতীতের—

: কিন্তু, কথা ব'লছো না যে?

: আজ থাক্।—

হাতের ব্রাশটাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায় তীর্থ—

: আজ অনেক রাত হ'য়েছে বাসবী, অন্য একদিন এ আলোচনা করা যাবে বরং। আজ তুমি বাড়ি যাও।"

: আর তুমি?—"

: আমি?—

ও, হাসতে চেষ্টা করছে যেন—

: আমি কি করবো না ক'রবো,—সে খবর জেনে তোমার লাভ নেই। চল, তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"—

—"ধন্যবাদ! আমি একাই যেতে পারবো এটুকু। দরজার দোদুল্যমান পর্দাটাকে দুই-হাতে সরিয়ে ধরে তীর্থ। দেখে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাসবী। ওর পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘোরানো কাঠের সিঁড়িটা। যেটা তার ঘরের দরজা ছুঁয়ে নেমে গেছে একেবারে নীচের তলায়—সেখানে ঘরে ঘরে মানুষের ঠেসাঠেসি, তারও একপাশে জমছে বাসিন্দাদের সারাদিনের আবর্জনা। ছাই-পাশ আরও কত কী। এসব পাশে রেখেই নেমে যায় ও, তারপর শেওলা জমা কলতলায় পা ফেলে ফেলে পার হয়ে যায় পেছলের জায়গাটুকুও—।

[illegible] পাতাগুলো ঝির-ঝির আওয়াজ করছে থেকে থেকে। আজও শ্রাবণ নেমে এসেছে প্রতিবারের মত। বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছু আগেও। ভিজে মাটিতে খুশী জেগেছে ঝিঁঝিঁর, খুশীতে মন ভরে উঠেছে বোধ হয় পোষা ময়ূরটারও তাই ও ডাকছে থেকে থেকে।

ঘর ছেড়ে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বাসবী। গায়ে ওর রাতের পোষাক। নিরাভরণ দেহটা জুড়ে সজ্জাহীন সহজ সৌন্দর্য!—

রেলিংয়ে হাত রেখে তাকায় ও নীচের দিকে।...ওখানে স্থির হ'য়ে আছে আলো অন্ধকারের আলপনা। দরজার পাশে বসে ঝিমুচ্ছে মনিবের প্রতীক্ষাক্লান্ত শিউশরণ, আর ওর মাথার ওপর জলন্ত আলোটাকে ঘিরে অবিশ্রান্তগতিতে চ'লেছে বাদলপোকার ওড়াউড়ি।

ঐদিকে তাকিয়ে তাকিয়েই আজ যেন ও ডুবে যায় ভাবনার মহাসমুদ্রে,—যেখানে কূল নাই—কিনারারও হদিশ মেলে না কিছু।

এক-সময় চমক ভাঙে; দেখে—শিউশরণ ফটক খুলে দিচ্ছে, আর লাল কাঁকরঢালা পথে এগিয়ে আসছে বিভাসের নতুন গাড়িখানা।

:—এ-কি?

বিভাসের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়—

: কি করছো এখানে?

হাসতে চায় বাসবী, যেন, জোর ক'রেই হাসি দিয়ে ঢাকা দিতে চায় বিভাসের ঐ ঔৎসুক্যটাকে—

: কিছু করিনি—।

: তবে?—

: দাঁড়িয়ে আছি, ঘুম আসছে না,—তাই।

: ও!

হাসে বিভাসও।

যে বিস্ময়টাকে হঠাৎ ও প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, সেটাকেই যে ঢাকা দেবার এ চেষ্টা, বাসবী তা বোঝে। শোনেও—ও ব'লছে—

: ঘুম না এলে অবশ্য ঠাণ্ডা হাওয়াটা মন্দ লাগে না। [illegible] কি? রাতও তো অনেক হয়েছে।—"

একটু থামে। বলে—

: আমি ভেবেছিলাম হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছ এতক্ষণ!" ওর হাতের স্নেহস্পর্শ এবার এসে পৌঁছায় বাসবীর কপালে—

—: "আর একটা কথা!—"

—"বল!"

—: অনেকদিন ধ'রেই বলবো ভাবছি তোমাকে—। কিন্তু—"

—: অবাক করলে তুমি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও কথা ব'লতে গেলে যদি ভাবাভাবির দরকার হয়, তাহ'লে—"

: হ্যাঁ,—তাহ'লে ধ'রে নিতে হয় যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানেও একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হ'য়েছে!......"

—কথায় শেষে হঠাৎ হেসে ওঠে ও। চমকায় বাসবীও। শোনে,

: এই সুযোগে তোমাকে একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলুম না,—তার জন্যে ক্ষমা ক'রো। কিন্তু, এটা সত্যিই যে তোমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। ভেঙেছে,—অনেকদিন ধরেই এ ভাঙ্গার সুরু। তাই ভেবেছি—কিছু-দিনের জন্যে চেঞ্জে নিয়ে যাব। ঠিক ক'রেও ফেলেছিলাম মনে মনে, আজ সীট্ রিজার্ভেশন করে এলাম,—যাতে কালই বার হতে পারি—

—: সে-কি?—"

বাসবীর বুকচিরে একটা আর্তনাদ বার হ'য়ে আসে যেন—

: কে ব'লেছে তোমাকে এসব ক'রতে? অন্ততঃ একবারও আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই—"

হঠাৎ-ও-ছুটে যায় ঘরের দিকে—

—: না, আমি যাব না,—এখান ছেড়ে কিছুতেই যাব না—" বাদল হাওয়া যেন ওর সেই কাতরানো আওয়াজটা ছুড়ে মারে

(শেষাংশ ২২৮ পৃষ্ঠায়)

চারণ ভূমি
দেব দত্ত

কুমারিকায়
ম্‌রজা দে

প্রায়শ্চিত্ত

সম্বুদ্ধ
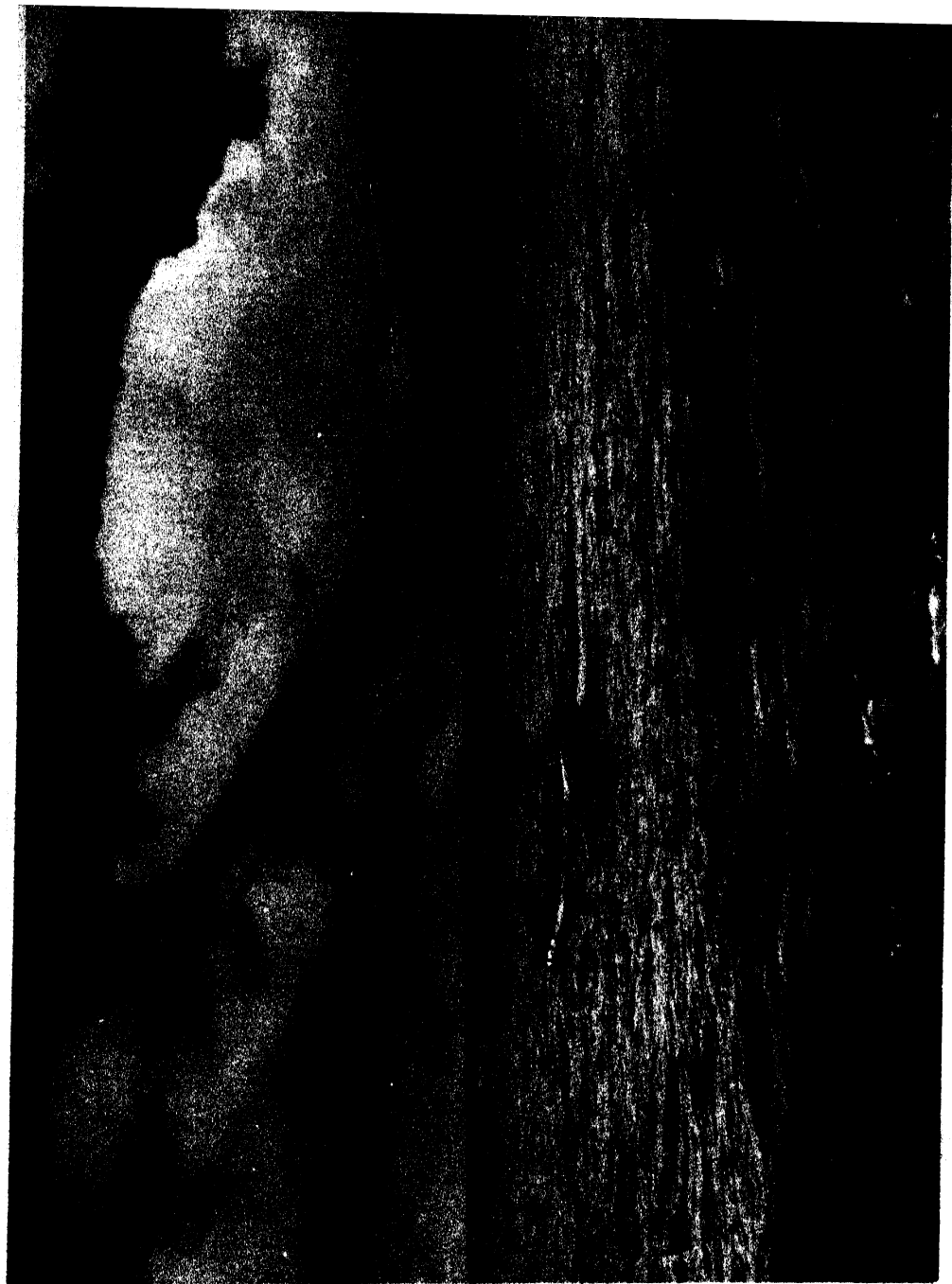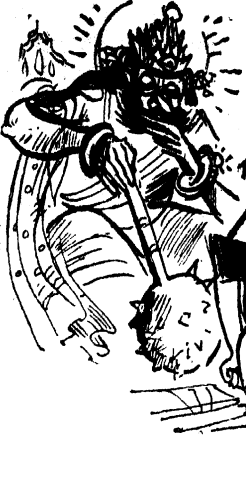
খড়দার ঘাটে একটি নৌকো এসে ভিড়ল। ইলিশ মাছ। পাঁচটি মোটে। তাই নিতে ঝুঁকে পড়ল গ্রামসুদ্ধ।

ধীরেন চক্রবর্তী একটি মাছকে হাতে করে নিয়ে দর করছে, নিতাই মুখুজ্যে দু'আনা বেশী হেঁকে দিলেন। ধীরেন রিফিউজী, পদ্মাপার ছেড়ে গঙ্গাতীরে এসে ঠাঁই নিয়েছে। বললে, খবরদার।

নিতাই মুখুজ্যে আদি বাসিন্দা, মাতব্বর ব্যক্তি। বললেন, তুমি খবরদার।

তাই নিয়ে প্রথমে তর্ক, তারপরে ঝগড়া, তারপরে মারামারি। বেলাভূমির তরল গঙ্গা-মৃত্তিকায় নিতাই মুখুজ্যেকে গড়াগড়ি খাইয়ে দিয়ে বীরদর্পে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরল ধীরেন চক্রবর্তী।

বৌ শোভনা নেয়ে এসে কাপড় মেলে দিচ্ছিল। মাছটা তুলে ধরে ধীরেন তার আহরণ বৃত্তান্ত সগর্বে বিবৃত করল। কাব বললে, তুমি কুটে ফ্যালো, আমি সর্ষে বেটে দিচ্ছি। আজ পেট ভরে খাওয়া হবে, সর্ষে দিয়ে মাছভাতে।

রান্নাঘরের ভেতরে শিলনোড়া। সর্ষে বেটে নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, মাছ উঠোনে পড়ে। শোভনা ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে।

বললে, কি হ'ল? কুটলে না মাছ?

নো রিপ্লাই।

আবার ডাকল। আবার।

তিনবারের বার জবাব এল। ও ছাই যে এনেছে, সেই কুটে রেঁধে খাক।

—কেন?

—একটা মাছের জন্যে মারামারি করে এলে, এত নোলা? লজ্জা করল না?

নাম শোভনা, কিন্তু অত্যন্ত অশোভন ভাষা।

ধীরেন গুম খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মারামারি করেছে, ঠিক কথা। কিন্তু, করেছে কার জন্যে? কিসের জন্যে? শোভনাকে খাওয়াবে বলে। তারই মুখে এই?

একটা বেড়াল ছানা এসে মাছটাকে চাটতে বসেছিল। শোভনাকে হাতের কাছে না পেয়ে তার বেড়ালের ওপরেই রাগটা পড়ল। লেজ ধরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনের ওপারে। তারপর রাগ আরও বেড়ে গেল। মাছটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের চাল পার করে বাঁশ-বাগানে। তারপর রাগ আরও বাড়ল। বললে, বেশ, মাছ খাওয়াই ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

কাপড় শুকোবার দড়িটা খুলে নিলে, হনহন করে বাইরে বেরিয়ে গেল, কাঁঠাল গাছে উঠে দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়ল। পড়তে পড়তে বললে, থাক তুই, পচে মর আলো চাল খেয়ে, অবাধ্য কোথাকার।

কিন্তু অবাধ্যই যদি, তবে এ-হুকুমইবা শুনবে কেন! শোভনা অশোভন কথা কয়, কিন্তু পতিব্রতা, খাঁটি সহধর্মিণী যাকে বলে। ধীরেন ঝুলে পড়তে পড়তেই সেও কর্ম শেষ করেছে, আঁশবঁটি গলায় লাগিয়ে, সেই ঘরের ভেতরে।

রাজযোটকে বিয়ে। রাজযোটকে মৃত্যু। মরাটরা শেষ করে অচিরাৎ দুজনে যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়াল বাড়ির বাইরে পথের ওপরে, দুজনেরই মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে। একজনের কাটা গলা দিয়ে মাথার রক্ত নেমে গেছে ও অন্য জনের অক্সিজেনের অভাবে ব্লাডপ্রেসার লো হয়ে গেছে।

শোভনা বললে, মাথা-গরমের ছাতু। এখন কি করবে?

ধীরেন অনন্দিকে তাকিয়ে বললে, যাব চলে যেদিকে দুই চক্ষু যায়।

শোভনা বললে, তাই চল।

ধীরেন বললে, চল মানে? আমি একা যাচ্ছি।

শোভনা বললে, ইস্। রাস্তা কারু কেনা নয়।

ধীরেন বললে, কথা না শুনলে ভাল হবে না বলছি।

শোভনা বললে, ভাল ত কত হচ্ছে। শুনবার মত কথা না হলে আমি শুনিনে।

ধীরেন বললে, আবার?

শোভনা বললে, বারংবার। অনিবার। দুর্নিবার।

দুই যমদূত দুজনের জন্যে এসে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল—আবার যদি কিছু হয়, দেখবার আশায়। এবার এগিয়ে এসে বললে, চলুন।

মস্ত বড় সিংহাসনে, মস্ত বড় মুকুট মাথায়, মস্ত বড় দণ্ড হাতে, যমরাজ বসে। পাশেই চিত্রগুপ্ত, মস্ত বড় খেরো-বাঁধানো খাতা নিয়ে। অন্যান্য অনুচর আর দূতেরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

দুজনকে নিয়ে যমরাজের সামনে দাঁড় করানো হল।

চিত্রগুপ্ত খাতা খুলে তাদের পরিচয় এবং জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে শোনালেন; তারপর মৃত্যুর অব্যবহিত ইতিহাসও বিবৃত করলেন।

যমরাজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, তোমা-দের কি বক্তব্য?

ধীরেনের ফ্যাসাদে পড়লে ভাষা যোগায় না। তো-তো-তো করে কি বলতে যাচ্ছিল। শোভনা থামিয়ে দিলে। নিজে এগিয়ে এসে বললে, আমাদের বক্তব্য কিছুই নেই। আপনি কি বলতে চান বলুন। আমরা শুনে নিচ্ছি।

যমরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—শুনে নিচ্ছি মানে?

—মানে আগে ত শুনে দেখি। তারপর যদি কিছু বলার থাকে বলা যাবে।

যমের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হল। বললেন, তোমার কথায় কিছু বেশী তেজ দেখা যাচ্ছে। কৃতকর্মের জন্যে তুমি অনুতপ্ত নও।

—অনুতপ্ত হব কিসের জন্যে? কৃতকর্মটা কি?

—আত্মহত্যা।

—আত্মহত্যা মানে? আত্মা কোথায় যে তাকে হত্যা করলাম?

—আত্মা নেই?

—নিশ্চয় না। ছিল হয়ত, কোনকালে। সে ভুলে গেছি। দেশ ছেড়ে যে দিন পালিয়ে আসতে হল, আত্মা, মন, প্রাণ সব সেদিন ফেলে রেখে এসেছি পেছনে। ছিল খোলাটা, সেটাকে ফেলে আসাকে আত্মহত্যা করা বলে না। তাহলে কাদামাখা ছেঁড়া কাপড় ছাড়াকেও আত্মহত্যা বলতে হয়।

—হুঁ! সবই যদি ফেলে এলে, এলে কেন তবে?

—এলাম, একটিমাত্র জিনিসের মায়ায়, ইজ্জত। সেটাও যখন গেল, তখন আর বসে থাকব কাকে নিয়ে?

—গেল কেন?

—গেল, রইল না বলে। পেটে না খেয়ে

থাকলে ইজ্জত থাকে না। পদ্মার ধারে বাড়ি ছিল, ইলিশ মাছ পচিয়ে বাগানে সার দিতাম। একটা ইলিশ মাছের জন্যে মারামারি অবধি নামতে হ'ল, ইজ্জত আর থাকে কোথায়?

—তাহলেও, এভাবে মরা উচিত হয়নি। হাজার হোক স্বামী। তার ওপরে রাগ করতে নেই।

—রাগ করলে ত থেকেই যেতাম। মরব কেন?

—রাগ করনি? ত মরলে কেন?

—তাকে বাঁচাতে। আর কখনও ঐভাবে মাছ আনতে না যায়। আমার জন্যেই ত মাছ আনতে চেয়েছিল।

—ঠিক বলছ, রাগ করনি? রাগ করে আত্মহত্যা করনি?

—নিশ্চয় না। অনুগামিনী হয়েছি। শাস্ত্রের বিধান। সতী নারীর কর্তব্য। যা সাবিত্রীও পারেনি।

সাবিত্রীর নামে যমের হৃৎকম্প হল। সেই এক ঠ্যাটা মেয়ে, ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল। এও তারই চ্যালা মনে হচ্ছে। ব্রতস্থিত করত হয়ত।

বললেন, সে যাক। তবু তোমরা অন্যায় করেছ। দুজনেই। এর শাস্তি নিতে হবে।

—কি শাস্তি?

—পুনর্জন্ম।

—সেরেছে। তার চেয়ে বরং নরকেই দিন। সে না হয় দুঘা ডাণ্ডশ-টাণ্ডশ মারবে, একরকম সয়ে নেওয়া যাবে। পুনর্জন্ম? নো। নেভার। সত্যাগ্রহ করব।

—মানে?

—মানে, জন্মাবামাত্র মরে যাব। আত্মহত্যা করব। যতবার পাঠাবেন ততবার।

সব চুপ করে রইলেন। নিজ মূর্তি ধরে বুঝি!

শোভনা বললে, তাছাড়া, পারেনও না পাঠাতে। আমি অনুমরণে মরেছি, সতীর পাওনা অক্ষয়-স্বর্গ আমার বাঁধা। আমার পুণ্যে এঁরও সব পাপ কেটে গেছে, এঁরও স্বর্গ। পুনর্জন্ম হবে কেন?

চিত্রগুপ্ত উঠে এলেন। যমের কাছে গিয়ে কিছু ফিসফাস করলেন। তারপর এদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমরা কমিউনিস্ট?

শোভনা বললে, কম পেয়ে আর কম খেয়েই ত এলাম সারা জীবন। আমরা বেশি-উনিস্ট।

—এস এফ?

—পাশ? সে এস এফ ছেড়ে বি-এ অবধি হ'য়ে গেছে।

—বেশ। শোন তাহলে। যমরাজ, ধর্ম-রাজ। বড় দেবতা। তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করা, তোমরা হিন্দু ঘরের ছেলেমেয়ে, তোমাদের একান্ত উচিত।

শোভনা বললে, সে ত জানা কথা, হিন্দুর ঘরে যখন জন্মেছি, তখন অনেকের অনেক পাপের বোঝা বইতে হবে, তা, আপাততঃ কি করণীয়?

—তুমি বলেছ ঠিকই, অক্ষয়-স্বর্গ তোমাদের অবধারিত। কিন্তু যমরাজ নেহাৎ বলে ফেলেছেন কথাটা, পুনর্জন্ম ত এক আধটা নিতে হয়।

—বলেছেন বলেই? আবদার!

—আহা, বুঝে দেখ। মানী লোক, বলে ফেলেছেন একটা কথা। না রক্ষা হলে ওঁর অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, ভাবো।

—আর, আমাদের সেখানে কি অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল, সেটা ভেবেছিলেন কি? তখন বুঝি জহরলাল আর বিধান রায়? কেন, যারা আমাদের ভিটে ছাড়া করে পাঠাল, এই নিখাকীর দেশে, তাদের জন্যে যমদূত পাঠাতে পারেন নি? না, সেটা শক্ত ঠাঁই, কোৎকার ভয়?

—না না, সেটা মানে কি জান, ওরা হচ্ছে ম্লেচ্ছ, বেদ, গীতা, কিছু মানে না। যমকে মানবে কেন!

—ও। আর আমরা হিন্দু বলেই চোর। মার খাব, কথা বলব না। মারে ঝ্যাটা হিন্দুয়ানীর মাথায়।

—ছি ছি ছি। তুমি কুলবধূ, অমন বলতে নেই।

—না, বলতে নেই কিছুই, শুধু বিনা দোষে গুঁতো খেতে আছে আর বক্তিমে শুনতে আছে। যাক গে। বাজে বক্তৃতা রেখে দিন, কাজের কথা কিছু থাকে ত বলুন।

—তাই ত চাইছি বলতে। দিচ্ছ কই।

—বেশ, বলুন।

—শোন। যম যখন বলেছেন, পুনর্জন্ম একটুখানি হতেই হয়। তাছাড়া, স্বর্গবাসের অধিকার অর্জন করেছ বটে, কিন্তু পাপও একটুখানি লেগে আছে ঐ সঙ্গে। সেটা স্খালন
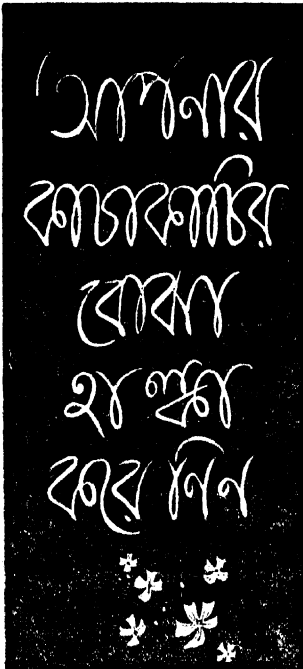
হবে—নিষ্পাপ না হয়ে ত স্বর্গে প্রবেশ যায় না।

—পাপ কিসের?

—আত্মহত্যার।

—কি কথাই শোনালেন! সেখানে আধমরা লুকিয়ে থাকব, এ'রা দূত পাঠাতে ভুলে ন, আমরা আত্মহত্যাও করব না। মাণ্টার লে ছেলে অমনি পাশ করে। মাণ্টার ফাঁকি গ ছেলেকে বাধ্য হ'য়ে টুকতে হয়। তার স্বাবলম্বন।

—ঐ হল। যাক গে, যা হয়েছে হয়েছে। ন আমি বলি, একটা মধ্য পন্থা স্থির করে ন। তোমাদেরও স্বর্গবাস হাতে ধরা থাক, রাজেরও মান বাঁচুক, ফাঁকতালে তোমাদেরও ত্মহত্যার পাপটা খন্ডে যাক।

এতক্ষণে ধীরেন কথা বললে। বললে, আত্মহত্যা পাপ, স্বীকার করা গেল না। তবে া, একটা দোষ করে এসেছি। নিতাইটাকে— কাদায় গড়িয়ে দিয়েছি, এই ত? সেটা কিছু য়। কারণ মনে কর কাদাটা আসল গঙ্গা-মৃত্তিকা, বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে গোলা, তাও একেবারে খাস ভাগীরথীর গর্ভে।

—আরে ধুর। গড়িয়ে দিয়েছি বলে দুঃখ নয়। দুঃখ যে আরও ভাল করে চুবিয়ে দিয়ে আসা গেল না। তাই ভাবছি, পুনর্জন্ম একটা নিলেও মন্দ হয় না—সে ব্যাটাকে আরও গা-কতক দিয়ে আসা যেত।

চিত্রগুপ্ত বললেন, এই। আমিও ত এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। তা মেয়ে আমায় কথাই বলতে দেয় না।

ধীরেন বললে,—ওটা ডোন্ট মাইন্ড, স্যর, ওর বুদ্ধিটাই ঐরকম। মানে, জানেন ত, স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তায় আবার ইস্কুলে কলেজে পড়েছে। ইউনিয়ন-টিয়ন করতে, ...তেই পারেন।

শোভনা চোখ পাকিয়ে বললে, কি বললে?

ধীরেন বললে, আহা, এখানে ওরা সবাই রয়েছেন, একটু লজ্জাসরম রাখ। আমি ত পালাচ্ছি না, সেখানে গিয়ে তখন আবার হবে।

শোভনা বললে,—বেশ, তাই হবে। একবার পুনর্জন্ম হোক, রাজী।

চিত্রগুপ্ত বললেন, এই ত বুদ্ধিমতীর মত কথা। পুনর্জন্ম হবে, যে দোষ করে এসেছ, তার খণ্ডন হবে, ব্যস, সোজা স্বর্গধামে চলে যাবে দুজনে।

শোভনা বললে—কিন্তু, বেশীদিনের জন্যে নয়। পুনর্জন্ম বলে ত কথা? জন্মালেই হ'য়ে গেল। তারপর কিন্তু আর নয়, জন্মেই মরে যাব।

—ছেলেমানুষ। তাই কখনও হয়?

—না হবে কেন?

—জন্ম মানে, সচেতন জীবন। সদ্যোজাত শিশুর চেতনা নেই। তাই কর্মভোগও নেই।

—কর্মভোগ। তা কি করতে হবে বলে দিন।

—কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে। মানে, ধর অন্তত বছর কুড়ি-বাইশ।

—অত!

—তার কমে হয় কি ক'রে! ধর জন্মালে—ধীরেনের আঠারো—তোমার চৌদ্দ বছর বয়সের আগে বিয়েই হতে পারবে না। পুলিশে ধরবে। তারপরে, অন্তত গোটা দুচ্চার বছর সেখানে না কাটিয়ে এলে চলবে কেন?

ধীরেন বললে, হ'ল, কিন্তু চার বছর ছেড়ে চল্লিশ বছর কাটাতে রাজী আছি, ওকে কিছু মাথা ঠাণ্ডা আর মুখ সভ্য করে চলতে হবে। সেটা বুঝিয়ে বলে দিন।

শোভনা বললে,—বটে! আমার মাথা গরম আর মুখ খারাপ?

চিত্রগুপ্ত বললেন, যাট যাট কে বলেছে! ওটা এখনই শুরু কোরো না। শুনে নাও। তোমাদের আত্মহত্যার সদ্য কারণ ছিল কলহ, তার মূলে ছিল মৎস্য-লোভ। অতএব সে পাপের খণ্ডনও হবে সেই মূলের মূলোৎপাটনে। মানে মৎস্যলোভের নিবৃত্তিতে। চার বছর বা চল্লিশ বছর বলে কথা নয়—। মাছ খাওয়ার প্রতি লোভ নিবৃত্ত হলেই তোমাদের পুনর্জন্মের কাজ শেষ। তখন সোজা স্বর্গে চলে আসবে।

ধীরেন ভেবেচিন্তে দেখলে কথাটাকে। তারপর বললে, রাজী। দিন তাই পাঠিয়ে। কিন্তু বাংলা দেশে আর নয়। বাংলা দেশে জন্মালেই মাছ খেতে ইচ্ছে করে, বাংলাদেশ আঁশটে প্রবৃত্তির জন্মভূমি। হরিদ্বারে জন্মাব।

চিত্রগুপ্তে-যমে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। যম ইঙ্গিতে জানালেন, হোক বাবা তাই হোক, তাই দাও পাঠিয়ে।

চিত্রগুপ্ত পি, এ লোক, অত সহজে টলেন না। ধীরেনকে বললেন, তা ত হয় না। হরিদ্বারে মাছ খাওয়া নেই। মাছ দেখবেও না সেখানে, লোভও হবে না। যেখানে লোভের প্রবৃত্তি নেই, সেখানে নিবৃত্তি কথাটাই অর্থহীন। কষ্ট না হলে আর প্রায়শ্চিত্ত হল কই—প্রায়শ্চিত্ত মানেই কৃচ্ছ্রসাধন। বাংলা দেশেই জন্মাতে হবে তোমাদের। মাছের দেশে, মাছের মধ্যে।

ধীরেন খুশী হয়ে বললে, তাই ভাল। তবু ত আবার কিছুদিন নদীর জল আর সুপুরির পাতা চোখে দেখতে পাব, পদ্মার ইলিশ খেতে পাব।

শোভনা নাক কুঁচকে বললে, সাধ কত! সে হবে না। পাকিস্তানে আমরা আর জন্মাচ্ছি নে।

চিত্রগুপ্ত বললেন, কেন?

শোভনা বললে, মাইগ্রেশন দেয় না। পাকিস্তানে যদি পাঠান, নির্ঘাত বলে দিচ্ছি—গিয়ে কথা বলতে শিখেই আয়ুব খানকে বলে দেব। তারপর যায় যেন যমদূতে, অ্যায়সা প্যাঁদানি দিয়ে ছেড়ে দেবে, বাবা, তার নাম গুঁতো।

যম এবার কথা বললেন। খুব জলদগম্ভীর স্বর করে বললেন, পাকিস্তানে নয়। কলকাতায় পাঠাব। মাছের নাম শুনবে, মাছ খাবার লালসায় পুড়ে মরবে, মাছ চোখেও দেখবে মাঝে মাঝে, খেতে পাবে না। লোভের আগুনে পুড়ে পুড়ে আর হতাশার অশ্রুতে ভিজে ভিজে ক্রমশঃ পাকা মজবুত হ'য়ে যাবে রোদ-জল খাওয়া বাঁশের মত। তখন নিজে থেকেই বলবে চাইনে মাছ খেতে, রেশন-কার্ডে দিলেও খাব না। তার নাম মোক্ষম নিবৃত্তি।

সেই অবস্থাটা এলেই আর কথা নেই। বাট স্বর্গে উঠে আসবে।

ধীরেন আর শোভনা বর কনের মত হাত ধরে একসঙ্গে বললে, তথাস্তু।

তোমাকে পাব না জানি

॥ দেবব্রত ভৌমিক ॥

তোমাকে পাব না জানি,—তবুও তোমার
নামের শব্দের ধ্বনি শুধু বারবার
বৃষ্টি হয়ে নামে মনে, নদী হয়ে বয়।
শীতের রোদের মত আমাকে জড়ায়
তোমার আতপ্ত স্মৃতি। তোমার করুণা,
স্নিগ্ধ কথা, কখনো-বা মৃদু হাসিকণা,
চেয়ে থাকা চোখে-চোখে, মনে মনে দেখা,
অর্থহীন প্রয়োজনে নাম ধ'রে ডাকা,
অদর্শনে উৎকণ্ঠা, যন্ত্রণায় জ্বলা:
ধূপ হয়ে পোড়া আর মোম হয়ে গলা—
সব কথা মেঘ হয়, সন্ধ্যা হয় কালো.
জল হয়, বায়ু হয়,—ভোর, গান, আলো।
সারাক্ষণ মনে বাজে তবুও মূর্ছনা:
তোমাকে পাব না জানি, তোমাকে পাব না।

অ নু চ্ছে দ

(২২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিভাসের দিকে। ডেকে ওঠে নিচের ময়ূরেটা। দেবদারুর পাতাগুলো আবার শব্দ করে—

—শির্‌। শির্‌...

আসতে পারি?...

পর্দার বাইরে দেখা যায়, লুটোনো শাড়ির নিচে সুন্দর পা-দুখানা! সে পায়ের রেখায় রেখায় নেল্‌-পালিশের বদলে আজ আঁকা রয়েছে আলতা। সাদা গরদের লাল-টুকটুকে পাড়ের রংটা যেন ছায়া ফেলেছে তারপরে—ও।

তীর্থ ডাকে

—ঃ এসো।

পর্দাটা সরায় আজ বাসবী নিজেই। নিজেই টেনে নিয়ে বসে টুলখানা।

জানতে চায়—

—ঃ কি দেখছো অমন ক'রে?—

তীর্থ হাসে—

ঃদেখছি তোমাকে; তোমার এই সজ্জাহীন সহজ সৌন্দর্যকে, যা এতদিন দেখিনি।"

ঃকতদিনই বা হবে?......

সময়ের একটা মোটামুটি হিসেব যেন দাখিল করতে চায় বাসবী—

ঃ বড়জোর সাতটা বছর। এই সাত বছর আগে তুমি আর আমি এক-সঙ্গে খুলেছিলাম একটা স্টুডিও। কিছুদিন চলেও ছিল সেটা; কিন্তু তারপরে কি করে যে কি হ'য়ে গেল,—আজও বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম—খোঁজ ক'রলাম তোমার—' দেখলাম তুমি নেই, স্টুডিও নেই, নেই আমার পুরানো পারিপার্শ্বিক। তার বদলে সমস্ত জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে বিভাস—' আমার স্বামী—যার হাতে আমায় সমর্পণ করে গেছেন আমার বাবা।..."

সমস্ত ঘরখানা থেকে হাওয়া যেন নিশ্চিহ্নে সরে গেছে, এমনি অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে বাসবী,—

—ঃ তারপর,—

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় তীর্থ—

—ঃ পুরানো কথা। এতকাল পরে আর ও সমস্ত ভেবে লাভ!

ঃকিছু না—।

বাসবীর গলার স্বর মৃদু থেকে আরও মৃদু—! কিসের স্পর্শে কাঁপছে—

ঃকিন্তু, যে লাভ আর যে লোকসানের হিসেবে আমার খাতা ভরতি,—তার খবর তুমি রাখবে কি করে?—কি দিয়ে ঢাকবে—যা রং নয়, ক্যাম্বিশ নয়—কিম্বা...

চুপ করে বাসবী। যেন গলার স্বরের সঙ্গে চোখ দুটোকেও বন্ধ করে অনুভব করতে চাইছে নিজের সমস্ত মনটাকে,—সমস্ত অতীতটাকেও।

বাধা দেয় না তীর্থ, কেবল তুলে নেয় ব্রাশটা—তারপর আবার রং চাপায় ছবিটাতে। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় ওর হাতের কাজ—। আজ যেন ও থামবেনা বলে পণ করেছে, এমনি একাগ্রতায় ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

বাসবী চোখ খোলে হঠাৎ! হঠাৎই যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে ও—

ঃঅত তাড়াতাড়ি করছো কেন? কি আঁকছো তীর্থ?—"

—ঃছবি।

অনেক দূর থেকে যেন কথার আওয়াজ ভেসে আসছে ওর—

—ঃওসব পুরানো কথা না ভেবে, নতুন কথা ভাবো কিছু।—ভাববার মত কিছু খুঁজে না পেলে এই ছবির কথাও ধ'রে নিতে পারো। ধরো,—কালই এ ছবি তুমি পাবে। তারপর—"

ঃতারপর কি?—

—ঃতারপর তোমার এই অপরূপ রূপ-চিত্র দেখে—প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে ভক্ত-কণ্ঠ। পাবে মুগ্ধ দৃষ্টির অজস্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

—ঃ কি!—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় বাসবী—। দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে ওর—

ঃ প্রশংসার ছলে তুমি আমাকে ধিক্কার দিতে চাচ্ছ আজ? মনে ভাবছো কিছু একথার বুঝতে পারবো না, কেমন?

তীর্থ নির্বাক।

তাকিয়ে দেখে, যেমন তাড়াতাড়ি বাসবী এসেছিল, তেমনি তাড়াতাড়িই চলে যাচ্ছে দরজা পার হয়ে।

যেতে যেতে একবারমাত্র মুখ ফিরাল; কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো—

—ঃ প্রত্যাশা না করলেও ও আমারই পাওনা, আমি তা জানি। কিন্তু এটাও তোমার জানা উচিত যে, ওকথা আমাকে মনে না করিয়ে দিলেও চলে,—আর এইজন্যেই তোমার মত সাধারণের সঙ্গে আমার পার্থক্য '

কেটে গেছে কয়েকটা দিন, কয়েকটা রাতের অন্ধকারও পার হয়ে গেছে ধীরে ধীরে, এসেছে আর এক সন্ধ্যা! গোধূলির আলো এইমাত্র মুছে গেল—আকাশ থেকে,—নেমে এল অন্ধকার...।

ঘুরানো সেই কাঠের সিঁড়িটা!...ওরই ধাপে ধাপে পা ফেলে উঠতে উঠতে বাসবী ডাক দেয় আবার—

—ঃ তীর্থ, তীর্থ!...

উত্তর আসে না।

সামনের দিকে তাকায় বাসবী,—নির্দিষ্ট দরজাটা আজ তালা বন্ধ! ওরই সঙ্গে ঝুলছে ঘর-ভাড়া দেওয়ার আর একখানা নোটিশ—আর ওখানা?...

—অবহেলায় অনাদরে ফেলে রাখা পোর্ট্রেটখানা তুলে নেয় ও দরজার পাশ থেকে।—

তীর্থ—ইচ্ছে করেই এটাকে ফেলে রেখে গেছে, যেমন বরাবর গিয়েছিল।...

দুই চোখে নেমে আসে জল!

এ জলকে আজ আর ঢাকতে চায় না বাসবী।

বিরস বসন্ত
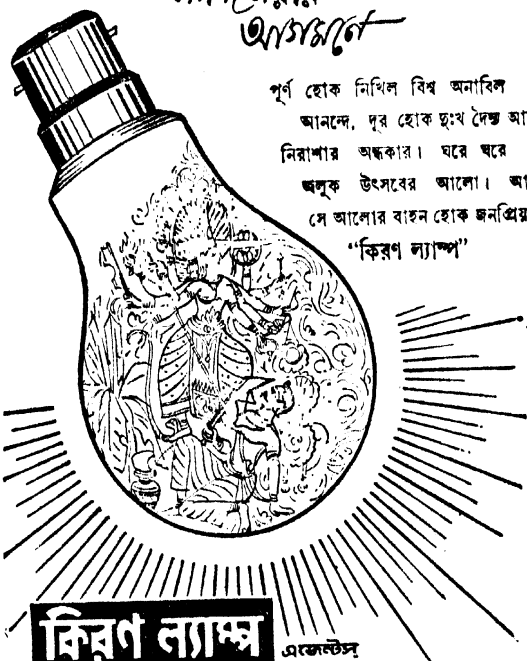
— বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত —

এ পাশে অফিস, ও পাশে জলযোগের ঘর। ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার অফিস ঘরে ঢুকেই হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "এই যে আপনারা এসে গিয়েছেন, আসুন! আসুন! দাঁড়িয়ে কেন, ওই ত চেয়ার রয়েছে, বসে পড়ুন।" বয়স পার করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে এসেছেন অধ্যাপক দত্ত ও অধ্যাপিকা বসু। সলজ্জে, স্মিতহাস্যে প্রতি নমস্কার জানিয়ে তাঁরা আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্কোচ ও কুন্ঠা যেন আর দূর হ'তে চায় না। অধ্যাপিকা বসু মাথা হেঁট করে রইলেন মেঝের দিকে চেয়ে, অধ্যাপক দত্ত তাকিয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে।

ম্যারিজ রেজিষ্ট্রারই মৌন ভঙ্গ করলেন। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" বলেন আমাদের মনীষীরা। বিয়ের ব্যাপারে এমন আদর্শ-যোগ ক'জনার ভাগ্যে ঘটে? আমার অফিসেই বা এমন বিয়ে ক'টা রেজিষ্ট্রি হয়েছে? আমি নিজেই ত কত গৌরব বোধ করছি। বয়সের কথা ভাবছেন? ও কিছু নয়, কিছু নয়। আপনার পঞ্চাশ, ওঁর পঁয়তাল্লিশ। এই ত ঠিক বয়েস! আপনিও অধ্যাপক, উনিও অধ্যাপিকা। এ ত একেবারে রাজযোটক! ভাবতেও কত আনন্দ!

সঙ্কোচের ঘোর কাটিয়ে অধ্যাপিকা বসু বল্‌লেন, 'আপনার মতো সবাই কি আর ভাবতে শিখেছে না ভাবতে চায়?'

'ঠিক চাইছে আর চাইবেও। চোখের সামনেই ত দেখা যাচ্ছে যে যুগের হাওয়া বদলে গেছে। আপনাদের ত এই প্রথম বিয়ে। পাত্রের বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, পাত্রীর বয়স বিশ-বাইশ এমন কত বিয়ে হয়ে গেল এই অফিসেই। আর বিচ্ছেদ বা বিয়োগের পরেও কত বিবাহের জোড় মিলে যাচ্ছে হর-হামেসা। যার যাকে ভালো লাগে তারা মিলবে, তাদের বুঝ তারাই বুঝে নেবে। সমাজের লোক কেন তাদের পথ আগলে দাঁড়াবে? দেশে আইন রয়েছে, তার বাইরে না গেলেই হ'ল।'

নর-নারীর মিলনের বহু সমস্যার সমাধান করেছে সিভিল ম্যারেজ। সামাজিক পীড়ন, আত্মীয়তার আতিশয্য, অনাবশ্যক আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, সর্বস্বান্ত করার উৎপীড়ন ও ব্যয়-বাহুল্যের অত্যাচার থেকে সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়েছে এই সিভিল ম্যারেজ। সমাজের নানা-রকম ছড়াছড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি এড়িয়ে অধ্যাপক দত্ত ও অধ্যাপিকা বসুর. বিবাহ-মিলনের পথ প্রশস্ত করেছেও এই রেজিষ্টার্ড ম্যারিজ প্রথা।

ফুটপথে পা বাড়াবার পূর্বেই অধ্যাপিকা বসু বামদিকে একবার দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, আবার ডানদিকে। তারপর অধ্যাপক দত্তর হাত ধরে বললেন, 'চলো।'

অধ্যাপক দত্ত সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন, 'অত ক'রে কি দেখ্‌ছিলে? খুঁজছিলে কা'কে?'

দত্ত থাকেন কাশী, বসু থাকেন কলকাতায়, নইলে চট্ করেই কারণটা ধরতে পারতেন।

বহু ছাত্রী পড়িয়েছেন বসু এই সহরে। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন নানা বিষয়কর্মে চারিদিকে। হঠাৎ যদি জানাশোনা কারুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় এ সময়ে। ভীরু নয়নের দৃষ্টি সেইটেই লক্ষ্য করছিল!

এই ট্যাক্‌সি! ট্যাক্‌সি!

গাড়ীর শব্দে ছুটে এসে গৃহভৃত্য দরজা খুলে দিল। খাবার সময় হয়ে গেছে। বসু বল্‌লেন, খাবার জোগাড় কর, তাড়াতাড়ি। ভৃত্য রতন মুচ্‌কি হেসে জানালে, কলেজ থেকে দারোয়ান এসেছিল। প্রিন্সিপাল চারটার পরে একবার দেখা করতে বলে গেছেন আপনাকে।

তা'তে হাসবার কি হয়েছে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সে বললে, দরোয়ান জানতে চাইলে যে দিদিমণি কোথায় গেছেন। 'আমি শুধু বলেছিনু রেজিষ্টারি অফিস বোধহয়। দরোয়ান ছাড়ে না, বলে এখুনি মিষ্টি আনো। দিদিমণির বে' আমরা মিষ্টি পাবো না? যত বলি দিদিমণি আসুন তাঁকে ব'লো। সে তত বলে ঘরে যা আছে আগে ত তাই বার করো। যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, এর পরে আর একলা হলে হবে না। আমরা সবাই মিলে এসে মিষ্টি খেয়ে যাবো কিন্তু। সেটা যেন মনে থাকে।

হাতের ব্যাগটা টিপয়ের উপর রেখে ধপ্ করে ইজি চেয়ারটায় বসে পড়ে শ্রীমতী বসু। বলে এই যাঃ! যে জানাজানির ব্যাপারটা একটু আড়াল করে চলবে ভেবেছিল, তা একেবারে ঢাকের কাঠিতে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল? কলেজের প্রিন্সিপালের কিছু অজানা নেই। তার কথা আলাদা। কিন্তু এর পরে সব-অধ্যাপিকাদের নিকটই বা মুখ দেখানো যায় কি করে, আর ছাত্রীরাও ক্লাশের মধ্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে যদি কেউ হেসে ফেলে, তখন তার অবস্থাটা কি হবে?

'কি আর হবে? যা সকলের হয়ে থাকে, তারও তাই হবে' উৎসাহ দেন অধ্যাপক দত্ত। যা সবাই করে, তারাও তাই করেছে। বেশী কি হয়েছে? মিথ্যাও নয়, প্রতারণাও নয়, বিধবার বিয়েও নয়, বিচ্ছেদান্তিক বিয়েও নয়, এতে ভাববার কি আছে? একটু বেশী বয়েস? তা এ যুগে বিয়ের আবার বয়স আছে নাকি? বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হ'লেও না হয়, বলবার মতো কিছু একটা আবিষ্কার করা যেত।

যুক্তিগুলো হয়তো ঠিক, উক্তিগুলোও অসত্য নয়। তবু অধ্যাপিকা বসু তার মনের সঙ্কোচ দূর করবে কি দিয়ে? যৌবন পার করে দিয়ে এল বিয়ের চিন্তা, শুক্‌নো ডালে এল ফুল ফোটাবার আকুলতা। অপরাহ্নে পূরবীর তানে কে বাহবা দেবে?

কলেজের খাতায় নাম সই করতে গিয়ে হঠাৎ খট্‌কা লাগে। কি সই করবেন তিনি, সুরমা বসু না দত্ত? এখন মিসেস দত্ত হ'লেও সে অনেক ভেবে কলেজের খাতায় সুরমা দত্তই লিখলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিস সুরমা দত্তকে মিসেস সুরমা বসু করাতে গেলে অনেক ফ্যাসাদ। পিতৃকুলের পদবী স্বামীর কোলে এসে লোপ পেয়ে যায়। যারা চাকরি করে, তাদের এতে বাধা বিপত্তি অসুবিধা ঘটে পদে পদে। যেখানে যেটা সহজ ও সুবিধাজনক তাই লিখেই চালাতে লাগলেন অধ্যাপিকা বসু, কখনও মিসেস বসু, কখনও দত্ত।

বিবাহিতা নারীর সিঁথির সিঁদুর এ যুগে অপরিহার্য নয়, ওটা না হ'লেও চলে যায়। পোষাক-পরিচ্ছদের কি হবে? নারী অধ্যাপকদের পোষাকের চাকচিক্য সম্পর্কে বরাবরই সতর্ক থাকতে হয়। কেউ যেন তাদের বিলাসিনী মনে না করে। কিন্তু ঘরে বাইরে, সিনেমা থিয়েটার, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে?

গোল বাধালো তিনশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ীটা। এটা তাঁর স্বামীর প্রথম প্রণয়োপহার। কাশীর অনেক দোকান ঘুরে ঘুরে, একটা পছন্দ-সই মনের মত শাড়ী পেয়েছেন তিনি। তার যেমন রং তেমন আভা। 'আলমারীতেই তোলা যেন না থাকে' অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর স্বামী হরিহর দত্ত। ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল সুরমার যেন তার বয়েস অনেক কমে গেছে।

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হ'ল অঙ্গে অঙ্গে। নিজের রূপ দেখে নিজেরই কত ভালো লাগছে সুরমা দেবীর। পাশ ফিরিয়ে, পিছন ঘুরে, কাঁধের উপরে আঁচলটা আঙ্গুল দিয়ে একটু নেড়ে পায়ের কাছে সোনালি রংএর পাড়টার দিকে তাকিয়ে পুলকের শিহরণ লাগে! খস্‌খস্‌ করা শব্দটাও কত মিষ্টি! যে তার এই তনুশ্রী দেখে তন্ময় হতে পারত, সে রয়েছে অনেক দূরে। বিয়ের পরে মাত্র এক সপ্তাহ কেটেছে এক সঙ্গে। বড়দিনের ছুটি আসতে এখনো দু'মাস।

মুখখানা তার একবার একটুখানি ঘুরিয়ে নীচু করে দেখতেই আয়নায় দেখা গেল চিবুকের নীচেটা যেন একটু ঝুলে পড়েছে। কুঁচকে রাখলে কপালের রেখাটাও দেখা যায়। আপশোষ হয়, বিয়ের ফুল যদি ফুটলোই, তবে বিশ বছর আগে তা কেন ফুটলো না?

বয়স বুড়িয়ে গেলেও মানুষের মন বুড়িয়ে যায় না। তারুণ্যের তৃষ্ণা চিরন্তন। স্রোতধারা শুকিয়ে গেলেও ফল্গুর মতো তা অন্তঃসলিলা।

পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে যে গলিটা গিয়ে পেঁৗছেচে পল্টন মাঠের পথে, তারই এক বাঁকের মুখে ছোট্ট দোতলা বাড়ীটি অধ্যাপক দত্তের বাড়ী। বাড়ীটি কেনা হয়েছে বিয়ের পরে। নিরি-বিলি, ভদ্রলোকের পাড়া, আপন মনে আপনজন নিয়ে আছে সবাই। কারো কেচ্ছা কেত্তন দিয়ে পাড়া মাতাতে হয়না তাদের।

বাড়ীটা পছন্দ হ'লেও রাস্তার নামটা পছন্দ হয়নি সুরমা দেবীর। 'লাভলক ষ্ট্রীট' নামটা যেন তাদের বিয়ের সাক্ষাৎ-বিদ্রূপ। বলতেও লজ্জা, লিখতেও সংকোচ। অধ্যাপক হরিহর দত্ত অভয় দিয়ে বলেছিলেন, কল্‌কাতায় কর্পোরেশনে আবার রাস্তার নাম নিয়ে ভাবনা! 'লাভলক ষ্ট্রীট' 'লাভলি ষ্ট্রীটে' পরিণত হ'তে কতক্ষণ?

ঘর হয়েছে ঘরকন্না জমছে না। যে দুঃসহ, নিঃস্ব নিঃসঙ্গতা দূর করতে তাঁদের বিয়ে, সে সঙ্গ-সান্নিধ্যের সুখ কতটুকু! দু'এক দিনের ছুটি-ছাটায় হরিহর দত্ত ছুটে আসেন কল্‌-কাতায়, দু'এক দিনের ছুটি বাড়িয়ে সুরমা দেবী চলে যান কাশী। বিজলী চমকের মতোই তা ক্ষণস্থায়ী, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে না দিতেই ফুরিয়ে যাওয়া। পিপাসা পড়ে থাকে, তৃষ্ণা মেটে না। আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা নিয়ে ফিরে আসতে হয় দু'এক দিনেই।

সুরমা দেবী ভাবেন কাশী যদি কল্‌কাতা হ'ত। হরিহর দত্ত ভাবেন, কল্‌কাতা যদি কাশী চলে যেতে পারতো! হপ্তায় একবার করে চিঠি আসে। হরিহর দত্ত ইতিহাসের অধ্যাপক, সুরমা দেবী প্রাণিতত্ত্বের। স্ত্রী লেখেন, ইতিহাস মানে কি হাসির ইতি? স্বামী উত্তর দেন, প্রাণিতত্ত্ব কি প্রাণকে দূরে ফেলে?

একজন কাজ ছেড়ে দিলে হয়তো এর মীমাংসা হ'ত। কিন্তু বার্দ্ধক্যের সামনে টাকার মায়াও কম নয়। ঘর আছে, ঘরকন্না আছে, অথচ টাকা যদি না থাকে, তবে তারা কোথায় দাঁড়ায়? অতএব সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেছে।

সুযোগ একটা এসেছিল বটে! হরিহর দত্তের একটা চাকুরির সম্ভাবনা হয়েছিল কল্‌-কাতায়! সেই মুহূর্তেই খবর এল, সুরমা দেবীর ট্রান্সফারের হুকুম হয়েছে বহরমপুরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিহর দত্ত কল্‌কাতার চাকরিটা ছেড়ে দিলেন, সুরমা দেবী খবর পেলেন তাঁর ট্রান্সফারের আদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে।

দুধের নীর মরে হয় ক্ষীর, ক্ষীর মরলেই চাঁছি। তাদের বয়সের নীর মরেছে, ক্ষীরটুকুও শুকিয়ে যাবার পথে। দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর, প্রয়াগ, হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, শিলং, দার্জিলিং তারা কয়েকবার একসঙ্গেই ঘুরেছে। কিন্তু বারে বারেই মনে হয়েছে বয়সটা যদি কিছু কম হ'ত! দেহ জুড়িয়ে এলে দেশ ভ্রমণেও তেমন পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না। রমণীর রমণীয়তার বয়স পার হ'লে বসন্তের হাওয়া লেগেও ভাঙ্গা জানালার মতো ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে থাকে। সোহাগ, সমাদর সামান্য যা অবশিষ্ট তাও যেন বাধোবাধো, কেউ দেখে

না, কেউ জানতে পায় না, একটু অনুরাগের বাড়াবাড়িতেই কেন একান্তে মনে হয়, এই বয়সে কি আর এত শোভা পায়?

হরিহর দত্তকে কাছে পেয়ে যা বলতে ইচ্ছা হয়, তা বলা হয় না, যা করা যায় তা করতে সরম জাগে। মুখের কাছে মুখ এনেও তা সরিয়ে নিতে হয়। তরুণীরা যেন নিকটে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসছে আর বলছে,—'ওই দ্যাখো।'

গরমের ছুটিতে হরিহর দত্ত এসেছেন কল্‌কাতায়। দেড় মাসের দীর্ঘ ছুটি কাটানো যাবে একসঙ্গে। তাঁর স্যুটকেস, বিছানার সঙ্গে এসেছে দু'টো বাক্‌স, তাতে চারশো পরীক্ষার খাতা, আরো চারশো আসবে লক্ষ্ণৌ ও পাটনা থেকে। এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা। হেলাফেলার উপায় নেই। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার প্রশ্ন সেট করে পাঠাতেও হবে দু-সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকেই। কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষার খাতাগুলো ফেলে রেখে এসেছেন কাশীতেই।

সংখ্যায় কম হ'লেও সুরমা দেবীর ছয় বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতাও স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। ছুটি ফুরোবার আগেই তা দেখা শেষ করে পেঁছে দিতে হবে হেড একজামিনারের বাড়ীতে। তারপর আসবে ফিরে দেখবার খাতাগুলো। ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার বিভীষিকা পরীক্ষক, পরীক্ষার্থিনীদেরও খাতা দেখার বিভীষিকা। টাকা না হ'লে সবই ফাঁকা। অতএব দেখতেই হবে।

এ পাশের চেয়ারটায় খাতা খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে মার্ক গুণতে গুণতে হরিহর দত্ত ভাবেন, দূর ছাই! এ বোঝা নামাতে পারবো কবে? ও পাশের টেবিলে খাতার বোঝা সামনে রেখে সুরমা দেবী ভাবেন, এরই নাম কি বিয়ে? একদিকে বসে, হরিহর দত্ত চশমা মোছেন, অন্য-দিকে সুরমা দেবী এলিয়ে পড়েন তাঁর ইজি চেয়ারে। তারপরে উভয়েই আবার সাতপাঁচ বারো, বারো আর তিন পনেরো।

বিদ্যের বয়েস নেই। তা অফুরন্ত। বিয়ের বয়েস আছে, অল্পেই তা ফুরিয়ে যায়। জুড়িয়ে গেলে জীবনকে আর তৃপ্ত করা যায় না। বিধাতার বেড়িতে আবদ্ধ করেছেন হরিহর দত্ত ও সুরমা দেবী তাঁদের জীবনকে বিবাহের সূত্রে। মিলনের সুতোটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে নিবিড়তার অভাবে। উতলা হাওয়া ডাক দিয়ে যায় বারে বারে। তবু যে বসন্তের হাওয়ায় নূতন পাতার অঙ্কুর গজায়, সেই হাওয়াতেই জীর্ণ পাতা খসে পড়ে। জীবন বসন্তে যে কোকিল ডেকেছিল তারা তাতে সাড়া দেয়নি, বিগত যৌবনে এখন কানে বাজে শুধু কাকের ডাক। বিরস বসন্ত, বিগত যৌবন বিবাহ তাঁদের বাঁধবে কি দিয়ে। উন্মনা মন সচকিত হয়ে উঠে রোদনভরা দীর্ঘশ্বাসে।

—

যার যেথা স্থান

(২৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রতিরোধ করছ। তাহলে আসি, কিন্তু কাজটা ভালো করলে না বলে—নিতাই প্রস্থান করে।

শূন্য গৃহে বসে নিরাপদ চিন্তা করতে চেষ্টা করেন এ কেমন ক'রে সম্ভব হল! সহরে যেখানে থাকতো নানা হাঙ্গামা, আজ ধর্মঘট, কাল মিছিল, পরশু বোমা, পটকা কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে তো কেউ তাকে এমন পীড়াপীড়ি করেনি। এখানে সব এমন কেন? নিরাপদ চিন্তা করেন, বাল্যকালের সে সুখের স্বপ্নের মাধুর্যের গ্রাম কোথায় গেল? কোথায় গেল সে সব সুহৃদ। ঘোরতর আদর্শবাদী না হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে বাল্যকালের সুহৃদগণের অর্ধেক মৃত, আর বাকি অর্ধেকের অর্ধ ভাগ গ্রামান্তরী হয়েছে—অবশিষ্টের মতে আর মনে এমন পরিবর্তন হয়েছে যে চিনবার উপায় নাই। আর কালেরও পরিবর্তন ঘটেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে। সহরের নিকৃষ্ট দোষগুলো গ্রামে এসেছে, আসেনি সহরের গুণগুলো। গ্রাম দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে প্রচন্ড মামলায় মেতে উঠলো——নিরপেক্ষ ঐ নিরাপদ। কিন্তু নিরপেক্ষ যে সব সময়ে নিরাপদ নয়, তার প্রমাণ হাতে হাতে মিললো। আজ তার ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে গেল, কাল তার মরাই লুট হ'ল, পরশু কপির বাগান তছনচ হল, তারপর দিন একরাতের মধ্যে পুকুরের মাছ চুরি হয়ে গেল। কেউ তার বাড়ী আসে না, কেউ তার সঙ্গে কথা কয়না, পথেঘাটে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন কি সার্বজনীন পুজোর চাঁদা চাইতেও কেউ গেল না তার কাছে। গ্রামের মধ্যে একঘরে নিরাপদ। তবে দীর্ঘকাল একঘরে অবস্থাতে থাকতে হ'ল না, একদিন রাতে আগুন লেগে ঘরখানি পুড়ে গেল—কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলেন নিরাপদ। সর্বস্বান্ত নিরাশ্রয় নিরাপদ ফিরে রওনা হলেন শহরে।

সন্ধ্যাবেলায় শহরের সেই পুরাতন ক্লাবঘরে নিরাপদবাবু প্রবেশ করবামাত্র অনেকগুলি উল্লসিত কন্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, এই যে নিরাপদ, নিরাপদ বাবু, নিরাপদ দাদা, নিরাপদ কাকা! কখন এলে, কখন এলেন, হঠাৎ খবর না দিয়েই।

তিনি বললেন, তবু ভালো যে ভুলে যাওনি।

একজন বলল, এরই মধ্যে?

অন্যজন বলল, আমরা তো ভাই তোমার গাঁয়ের লোক নই।

তৃতীয়জন বলল, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তির কথা মিথ্যা নয়। পুজোর আগে ক্লাবের মেম্বারগণ থিয়েটার করবে। থিয়েটারে নিরাপদের খুব শখ, তিনি একজন ভালো অভিনেতা।

নিরাপদদা পুজোর আগে শরৎবাবুর রমা অভিনয় করবার ইচ্ছা, তোমার অভাব বড় অনুভব করছিলাম—যাক এসেছ ভালোই হয়েছে।

একজন বলল, নিরাপদকে বেণী ঘোষালের পার্ট দাও। এই কয়মাস গাঁয়ে থেকে অনেক বেণী ঘোষাল দেখেছে।

অনেকে হেসে উঠলো। বোঝা গেল যে, তারা নিরাপদের গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতা জানে। না জানবার কারণ নাই, নিরাপদ নিয়মিত চিঠি লিখতেন।

নিরাপদ বললেন, বেণী ঘোষাল নয়, বয়সে মিললে রমেশের পার্ট নিতাম।

কেন মাথাও ফাটিয়েছে নাকি, না ফৌজদারি মোকদ্দমায় ফেলেছে?

ওসব কিছুই নয় ভাই, গাঁয়ের লোকগুলো খুব বোকা। নইলে আমার ঘর পুড়িয়ে দিত না।

সকলে বিস্ময়ে বলে ওঠে, ঘরও পুড়িয়েছে নাকি? তবে না হয় এবারে গৃহদাহ অভিনয় করা যাক। কি সাজবে—মহিম নাকি?

নিরাপদ গোটা কয়েক পান মুখের মধ্যে দিতে দিতে বলল, মহিমও থাক, রমেশও থাক—আমি এবারে সিনের দড়ি টানবার ভার নিলাম।

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে যাওয়ার শখ কেন?

কেন বলবো? এতদিন গ্রামকে দেখেছিলাম দর্শকের আসন থেকে, এবারে দেখে এসেছি নেপথ্য থেকে। শেষেরটাই বেশি চিত্তাকর্ষক।

নিরাপদের বিশ্লেষণ শুনে ঘরশুদ্ধ সকলে হেসে উঠল—কেবল নিরাপদ সে হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর হয়ে রইলো।

॥ মহাজনো যেন গতঃ ॥

বেদ ভিন্ন। স্মৃতি ভিন্ন
নানা মুনি আছে, নানা মত,
মহাজন যেই পথে চলেছেন
একমাত্র সত্য সেই পথ।

(মায়া বসু)

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলী

(১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জয়কালী ও নীলরতন (৩) যে আমার নিকট টাকা লইতে চাহিবে না ইহা স্বাভাবিক। তাহারা আমার দেশের লোক, আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহা জানি; কিন্তু জয়কালী বেচারাকে করিয়া খাইতে হয়, সে এত সময় দিবে অথচ কিছু লইবে না, এই ত মুস্কিল! তাহার শ্রমের উপযুক্ত অর্থও আমাদের দিবার সাধ্য নাই, তবে যৎসামান্য কিছু দিতে চাহিলে, যদি তাহার এতই ক্লেশ হয় যে, সে আর পড়াইতে না চায়, তবে আমি তাহাকে লইতে বলি না, কিন্তু সে যেন নিজের আর্থিক ক্ষতি না করে। যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই খাটে। তুমি আমার পত্রের এই অংশটুকু তাহাকে দেখাইতে পার অথবা পড়িয়া শুনাইতে পার।

আমি পরশু দিন এখানকার 'স্যালভেশন আর্মি'র প্রধান বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহারা তাঁহাদের কাজের বিষয় জানিবার জন্য আমাকে অনেকগুলি বই দিয়াছেন। আমি পড়িয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। ইঁহাদের উৎসাহ অধ্যবসায় ও স্বার্থত্যাগকে ধন্যবাদ। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক সুরা পান ও বিবিধ পাপাচরণে ডুবিয়া থাকিত, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঁহারা অনেকের হৃদয় পরিবর্তন করিয়াছেন, অনেককে ধর্মপথে আনিয়াছেন। এই লণ্ডন সহরে অনেক বালিকা পিশাচ প্রকৃতি বিশিষ্ট পুরুষদিগের দ্বারা বিপথে নীত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, এইরূপ (১৩০০) তের শত মেয়েকে ইঁহারা গত দুই-তিন বৎসরে আশ্রয় দিয়া সুপথে আনিয়াছেন। যে সকল মেয়েকে অন্যান্য সম্প্রদায় অস্পৃশ্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ইঁহারা আলিঙ্গন করিতেছেন। ইহাকেই বলে ধর্ম-প্রচার! জেনারেল বুথ এই "সৈনা" দলের অধ্যক্ষ, তাঁহার স্ত্রী, কন্যাগণ, পুত্রগণ, পুত্রবধূগণ সকলে এই প্রচার ব্রতে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। ইঁহার পুত্রবধূ কুলটাদিগকে ফিরাইবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। আমি ইঁহাদের কার্যের বিষয় খুব চিন্তা করিতেছি।

বাড়ীর সকলকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

পুনশ্চঃ তুমি মিস য়্যালিসকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া সকলে বড় সুখী হইয়াছে। এই সঙ্গে মিস য়্যালিসের এক পত্র পাঠাইলাম।

31, Hilldrop Road,
Camden Road, London N,
24th. August, 1888.

হেম,

গতবার শুক্রবার তোমার পত্র পাইয়াছিলাম, আজ শুক্রবার এখনও পত্র পাই নাই। বোধ হয় মেইল পৌঁছিতে দেরী হইতেছে। এবারে নূতন বলিবার বা লিখিবার বড় কিছু নাই। এখন লণ্ডনের গ্রীষ্মাবকাশ, সকল রকম কাজ-কর্ম এক-প্রকার বন্ধ হইয়াছে। আমি এখন ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত ও কার্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি পুস্তক লিখিতে ব্যস্ত আছি। সেইজন্য আর সঞ্জীবনীতে লিখিতে পারি না।

একটা নূতন খবর আছে। এখানকার "স্যালভেশন আর্মি" পঞ্চাশজন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য পাঠাইতেছেন। গত বুধবার রাত্রে এখানকার একটি হলে ইঁহাদের বিদায় দিবার জন্য সভা হইয়াছিল। "সৈন্য" দলের 'সেনাপতি' জেনারেল বুথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার পুত্র Bramwell Booth, বাম পাশে তাঁহার কন্যা Mrs. Booth Tucker, যিনি ভারতবর্ষের প্রচারক টকারকে বিবাহ করিয়াছেন। মিসেস বুথ-টকার এই পঞ্চাশজনের অধিনায়িকা হইয়া চলিয়াছেন। যখন এই পঞ্চাশজন পুরুষ ও রমণী খালি পায়ে ও গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া আসিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইল, তখন আমার মনে অভূতপূর্ব আনন্দ হইল। ভাবিলাম ধর্মপ্রচারের জন্য এইরূপ করিয়া না করিলে কি প্রচার করা যায়? জেনারেল বুথ তাঁহার বক্তৃতাতে যখন তাঁহার কন্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন—কন্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যখন বলিতে লাগিলেন,—এই কন্যা আমার ধর্মপথের সহায়, এই কন্যা জন্মাবধি একটি দিনের জন্যও আমাকে বিষণ্ণ বা চিন্তিত

করে নাই, এই কন্যা আমার রোগে শুশ্রূষা করিয়াছে, বিষাদের সময় আশা ও আনন্দ বিতরণ করিয়াছে; আমি আজ ইহাকে দারিদ্র্য ও সহস্র প্রকার অসুবিধার হস্তে সমর্পণ করিতেছি—তখন কি সন্দেহ দেখাইয়াছিল তোমায় বলিতে পারিব না। আমি মনে মনে বলিলাম,—জগদীশ্বর, আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে সেদিন কবে আসিবে যখন আমাদের প্রচারকগণ এইরূপ সপরিবারে মাতিয়া যাইবেন।

আমি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতেছি। এমন একটি ঘণ্টা যায় না, যখন নির্জন হইলেই এই চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া না উঠে। আমরা যেরূপ দুর্বলভাবে কাজ করিতেছি, তাহাতে চলিবে না। প্রেমের অগ্নি এমন করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিবে যে আমাদের স্বার্থপরতা, সুখাসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখ, লালসা পুড়িয়া যাইবে তবেই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি লোকে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এ আগুনকে দপ্ করিয়া কে জ্বালিয়া তুলিতে পারে? ইহা মানুষের কর্ম নয়। আমরা যতই ঈশ্বরের ইচ্ছার ভিতরে আপনার ইচ্ছাকে রাখিতে পারিব, যতই তাঁহার প্রেরণাশক্তির অনুগত হইব, ততই ঐ শক্তি আমাদের নর-নারীর হৃদয়ে জাগিবে। তাঁহার শক্তিকে ছাড়িলে, আমরা দুর্বল, হীন ও অপটু; তাঁহার শক্তির অনুগত হইলে আমরা কেমন সুন্দর কাজ করিতে পারি! আজ এইভাবে একটি গান বাঁধিয়াছি, তাহা পাঠাইতেছি। ইহার সুরটা "আর কারে ডাকব মাগো" এই সুর। ব্রজবাবুকে দিয়া গাওয়াইবে ও তত্ত্ব-কৌমুদীতে দিবে।

আর কারে ডাকব মাগো—সুর
তুমি গুরু আমি প'ড়ো
তুমি শিখাও আমি শিখি,
তুমি বলাও আমি বলি
তুমি দেখাও আমি দেখি।
আমি যদি লিখি একা
আখর সব যে হয় বাঁকা,
বোঝা যায় না লেখা-জোখা,
শিব আঁকিতে বানর আঁকি।
হাতের ভিতর নিয়ে হাতে,
লিখাও একবার জগত পাতে
কাঁটান্তরে বলাও মোরে,
আমি তোমার নামটি লিখি।
নর-নারীর হৃৎপ্রস্তরে,
লিখি লোহার কলম ধরে
'দয়াল নামে পাপী তরে'
জন্মের মত লিখে রাখি।

মহলানবিশ (৪) মহাশয়কে সংবাদ দিবে যে, দুর্গামোহনবাবুর (৫) শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে। হাঁপ কাশ, অর্শ প্রভৃতি হইয়া তিনি এক হাসপাতালে গিয়া আছেন। সেখানে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। এই অসুখের জন্য মহলানবিশ মহাশয়ের পত্রের জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি একটু সারিয়া উঠিলেই বাড়ীতে যাইবেন।

আমি কবে এ স্থান পরিত্যাগ করি তাহা ঠিক নাই। হয়ত দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে যাইতে পারি, না হয়ত বিলম্বও হইতে পারে। যদি তাঁহার সঙ্গে না যাই, তোমার জন্য কতকগুলি বিখ্যাত রমণীয় জীবন-চরিত ও আরও কিছু কিছু পাঠাইব। আমি তোমার জন্য বই কিনিয়াছি। আমি শারীরিক সুস্থ আছি। শরীর সারিয়া উঠিয়াছে, দিন দিন বল বাড়িতেছে।

বৌঠাকরুণকে (৬) বলিবে যে, বইখানা লেখাতে ব্যস্ত আছি বলিয়া বড় একটা পত্র লিখিতে পারি না। বাড়ীর প্রত্যেককে আমার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইবে। আগামী শনিবার অর্থাৎ কল্য এখানকার একটি স্থানে ভারতবর্ষের বন্ধুদিগকে একত্র করিয়া, রামমোহন রায়ের জীবন বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিব। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

পুনশ্চঃ—সঙ্গের পত্রখানি মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবে।

31, Hildrop Road,
Camden Road, London N.
31st, August, 1888.

মা লক্ষ্মি,

আজ আগষ্ট মাসের ৩১শে। লণ্ডনের অনেক লোক বেড়াইবার জন্য নানাস্থানে গিয়াছে। সভা-সমিতি সমুদায় বন্ধ হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই গ্রীষ্মকালে একটু বেড়াইয়া আসিব, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে একখানি বই লিখিতেছি, তাহাতে এখন ডুবিয়া আছি। এমনকি সঞ্জীবনীতে যে লিখিতাম, তাহাও বন্ধ করিতে হইয়াছে। আরও ১৪।১৫ দিন এই বই লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইবে তারপর বাহির হইব। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে যাইব। সেখানে একটা সভা করিবার ইচ্ছা আছে। তারপর কোন কোন স্থান বেড়াইয়া অক্টোবরের মধ্যভাগে লণ্ডনে আসিব। ইহার মধ্যে যদি দেশে ফিরিবার জন্য কমিটির তাগাদা আসে তবে এখান হইতে অক্টোবরের শেষে যাত্রা করিব। কিন্তু
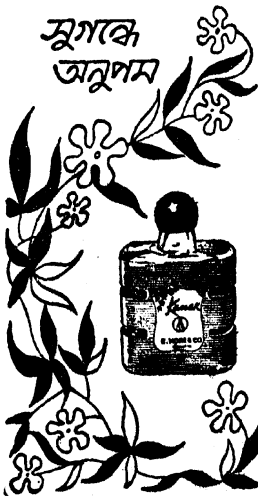
(১) জয়কালী দত্ত—একজন যুবক ব্রাহ্ম ঐ সময়ে কলেজে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পরে ওকালতী পাশ করিয়া, রাঁচীতে প্রাকটিস করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(২) প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা গুরুচরণ মহলানবিশের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সাংখ্যায়ন অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতা।

(৩) নীলরতন—স্বনামখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার।

(৪) মহলানবিশ মহাশয়—গুরুচরণ মহলানবিশ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা।

(৫) দুর্গামোহনবাবু— বিখ্যাত আইনসেবী ও সমাজ-সংস্কারক দুর্গামোহন দাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ইনি ব্যারিষ্টার এস আর দাশ (ভারত গভর্ণমেন্টের এ্যাডভোকেট জেনারেল ও আইন সচিব) ও জাষ্টিস জে আর দাশের পিতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

(৬) বৌঠাকুরাণী—জগত্তারিণী দেবী. ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের সহধর্মিণী; প্রফেসর
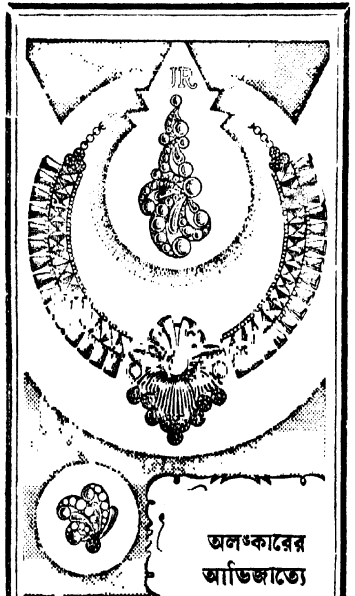
আমার বইখানা ছাপিবার জন্য হয়তো বিলম্ব হইতে পারে। বই ত লিখিতেছি, ছাপিব কিরূপে তাহার স্থিরতা নাই, সে অনেক টাকার কর্ম। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে, সে সকল কিছু স্থির নাই, অথচ দিনরাত্রি খাটিয়া লিখিতেছি কর্তব্য বোধে।

এরূপে একখানি বই আমাদের বড় দরকার। আমি কলিকাতায় কাজের ভিড়ের ভিতর পড়িয়া সময় করিতে পারি না। এখন দূরে আসিয়া যদি একটু সময় পাইয়াছি তবে এ কাজটা করিয়া রাখি।

তোমরা সঞ্জীবনীর টাকা আর পাইবে না অথচ খরচপত্রের প্রয়োজন হইবে। রামব্রহ্ম বাবুর (৭) নিকট হইতে আবশ্যক মত দশ টাকা করিয়া লইবে। আমি তাহার উপায় করিব।

... ...

শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবে দুর্গামোহন বাবুর অত্যন্ত পীড়া। তিনি ম্যাটলক (Matlock) নামক একটি স্থানের এক হাসপাতালে আছেন। এই স্থানটি লন্ডন হইতে অনেক দূর। তাঁহার হাঁপ-কাশ, প্লুরিসি ও জ্বর হইয়াছে। পার্বতীবাবু লন্ডন হইতে সেখানে গিয়াছেন। আমি একজন ডাক্তার লইয়া কল্য যাইব। তাঁহার জন্য আমার বড় ভয় হইতেছে। গত তিন মাসে তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য ও শরীর খারাপ গিয়াছে, তাহার উপর এই জ্বর।

দেবেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে (৮) নামক কৃষ্ণনগরের একটি ছেলে এগ্রিকালচারাল কলেজে পড়ে, সে এখন ছুটিতে লন্ডনে আছে। আমার বাসার নিকট তাহাকে একটি বাসা দিয়াছি। সে আমাকে বইখানি লেখা বিষয়ে খুব সাহায্য করিতেছে। দুজনে সমস্ত দিন একঘরে বসিয়া লিখি, বৈকালে দুজনে একত্রে বেড়াইতে যাই ও রাত্রে দুজনে প্রতিদিন একত্রে উপাসনা করি। দেখ মা! আমি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি,—আমরা আজ পর্যন্ত যেরূপে কাজ করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আরও উৎসাহের সহিত কাজ হওয়া উচিত। ঈশ্বর করুন, আমাদের পরিবারে যেন তাঁহার ধর্ম দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

তোমার জন্য আমি অনেক বিখ্যাত স্ত্রীলোকের জীবনচরিত অনেক ছবি ও অনেক বালক-বালিকার উপযোগী পুস্তক লইয়া যাইব। তুমি কেবল এক অজার উপাখ্যান লিখিয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। দেশের শিশুদিগের জন্য তোমাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। সেবিষয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করিব।

তোমার জন্য একটি ঘড়ি লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব। আদিনাথ বাবুকে (৯) আমার নমস্কার দিয়া বলিবে, তাঁহার পত্র পাইয়াছি। সময়াভাবে স্বতন্ত্র উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহাকে খুব বড় পত্র লিখিতে বলিবে।

সঙ্গের পত্রখানি মহলানবিশ মহাশয়কে পাঠাইয়া দিবে। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

পুনশ্চ—এইমাত্র খবর পাইলাম, দুর্গামোহনবাবুর পীড়া গুরুতর। আমি আজই সেখানে চলিলাম। স্থানটি লন্ডন হইতে একশত চল্লিশ মাইল হইবে।

(৭) রামব্রহ্মবাবু—রামব্রহ্ম সান্যাল, আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট ব্রাহ্ম।

(৮) দেবেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে—এই ব্রাহ্ম যুবক সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ঐ সময়ে বিলাতে ছিলেন। শিক্ষান্তে দেশে ফিরিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(৯) আদিনাথবাবু—আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের অন্যতম।

শিউলি

(২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমি শিউলি ফুলটি তার হাতে দিতেই সে বার কয়েক হাতখানা নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ফুলটা নিয়ে তার রুগ্ণা অচৈতন্য মেয়ের কপালে চোখে কয়েকবার ঠেকিয়ে তার বালিশের ওপর রেখে দিলে। কন্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখতে পেলুম তার স্বাভাবিক ছলছলে চোখ দুটিতে দু' ফোঁটা অশ্রু টলটল করছে।

আমার চোখও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললুম—অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, এবার আমি চলি, দু'তিন দিন বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা এসে তোমাদের সব কথা শুনব।

পকেটে একটা টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিল, সেগুলোকে বকুলের হাতে দিয়ে বললুম—দেখ, আমার কাছে খাবার আছে। তোমাদের কোনো পাত্র থাকে তো দাও ঢেলে দিই।

কথাটা বলা মাত্র বকুল দেয়ালে হেলানো একটা চটা-ওঠা কলাই-করা থালা এগিয়ে দিলে। আমি পাত্রখানা উজাড় করে লুচি, মাংস, তরকারী—যা ছিল ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন আবার সেই রাত্রি এগারোটার পর গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে খাবার নিয়ে যেতে যেতে বকুল আর শিউলির কথা ভাবছিলুম। আমাদের গলির মোড়টার কাছে আবার শুনতে পেলুম সেই আকুল আহ্বান—শুনুন।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম বকুল দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—অনেকক্ষণ থেকে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। জিজ্ঞাসা করলুম—কেন?

সে বললে—আজ দুপুরবেলায় দিদি মারা গিয়েছে। তার দেহ সৎকার করি এমন পয়সা আমাদের নেই। সন্ধ্যে থেকে ঘরে ঘরে টাকা দুই জোগাড় হয়েছে। কিছু সাহায্য করতে পারেন?

আমার কাছে কিছুই ছিল না। বললুম—কাছেই আমার বাড়ী। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বাড়ীতে এসে দশটি টাকা তাকে দিয়ে বললুম—শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক আছে?

বকুল বললে—কে আর আছে? মা আর আমি—আমরা দু'জনে মাথায় করে নিয়ে যাব।

সে তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—আর কিছু বলবে?

কিন্তু বকুল কিছুই বললে না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ওতেই হবে?

বকুল ঘাড় নেড়ে জানালে—ওতেই হবে।

বললুম—পরশু দিন সন্ধ্যেবেলা তোমাদের ওখানে যাবো।

বকুল বললে—আচ্ছা তাহ'লে যাই।

বকুল চ'লে গেল। আমি দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে ওপরে উঠে গেলুম।

দিন দুয়েক পরে সন্ধ্যার ঝোঁকে একদিন বকুলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাদের বাসস্থান চিনতে আমার কোনই কষ্ট হোলো না। সেদিনের মত ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বার দুয়েক বকুলের নাম ধরে ডাক দিলুম। কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললুম। ভেতরের অন্ধকার যেন একটা বিরাট হাঁ করে আমাকে গিলতে উদ্যত হোলো। ঘরের দরজাটা দুহাতে ধরে রেখে আবার ডাকলুম—বকুল!

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলুম—কেউ কোথাও নেই। ছেঁড়া মাদুর ও ফুটো কলাই-করা থালা অন্তর্হিত হয়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। দরজার পাল্লা দুটো যেন বিদ্রূপ করে আমার মুখের ওপরেই বন্ধ হ'য়ে গেল।

অন্ধকারে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল,—অন্ধকারেই তারা মিলিয়ে গেল।

দোষ

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একদিনও আসিনি কেন এদের দেখতে? লজ্জা হল ভেবে!

হঠাৎ দেখি, হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে উমাপদর ভাগনে গৌর।

আমার সামনে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

বলল, আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম।

কেন রে গৌর, জিজ্ঞাসা করলাম কৌতূহলী হয়ে।

গৌর বলল, লগ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে মামা বর আনবে না ছাঁদনাতলায়। আমাকে তাই বলল, গৌরে, তুই দৌড়ে যা। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে আয় দাদার।

লজ্জায় সংকুচিত হয়ে বললাম, দূর, সে কি? চল আমি জোর পায়ে যাচ্ছি।

তরুণ ব্যায়ামাগারের পাশেই একটু ঘেরা জায়গায় তক্তপোষে বালিস-বিছানা দিয়ে বরের জন্যে আসন করা হয়েছে। দুটো পেতলের ফুলদানিতে দু-কোণে রাখা হয়েছে নানা রঙের একরাশ বুনো ফুল। মাঝখানে তাকিয়া ঠেস দিয়ে চন্দন-চর্চিত কপালে বসে আছে বর। কোলের কাছে তার ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে একটি, সে হল নিতবর।

উগ্র হ্যাসাকের আলোর নীচে ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালাম বরের। পিছু পিছু এলেন উমাপদ।

উমাপদ ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে বললেন, এই আমার জামাই দাদা। আশীর্বাদ করুন, যেন জীবন ওদের সুখের হয়।

একটু দম নিয়ে জামাইকে বললেন, প্রণাম করো বাবা। প্রেমসারের বিখ্যাত রায়বাহাদুর গণপতি বাড়ুজ্যের বড় ছেলে পশুপতিবাবু। ওনার দয়াতেই এই জায়গাটুকু পেয়ে...

জামাই হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিতে এগুতেই, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল আমার, ছিণ্টে না? দ্বারিকের ব্যাটা ছিণ্টে তুই ...

থতমত খেয়ে গেল প্রথমটা জামাই। তারপর খাটো গলায় বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাথায় হাত রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। আস্তে আস্তে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলাম।

পিছু পিছু এলেন উমাপদ। আলাভোলা মানুষ তিনি কিছুই লক্ষ্য করেননি। বললেন, একটা পান যদি অন্তত দয়া করে গালে ফেলেন দাদা...

বললাম, না, শীগ্গী একটা রিক্সা ডেকে দাও উমাপদ। ভীষণ বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে।

* * *

পরের দিন সকালে উমাপদ হু-হু করে কাঁদতে কাঁদতে এসে ধড়াস করে লুটিয়ে পড়লেন আমার সামনে। রুক্ষ চুল, লাল চোখ, তাকানো যায় না তার দিকে।

বললেন, বাসর-ঘর থেকে উঠে গিয়ে বর

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

জাগ্রত দেবতা

(২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গেলেন। শতছিন্ন কাপড় চোপড়ের ভিতর দিয়া যৌবন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাকে নিজের আঙিনায় ঠাঁই দিতে তিনি সাহস করিলেন না। কাজ [illegible] শুনিয়া আবার মাথা ঝাঁকাইয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া আসিল কেশিয়া। আর সে কোথাও চাকরির সন্ধানে যায় নাই। সারাদিন পীরবাবার পাহাড়ের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পীরবাবার সমাধির কাছে ঢিল বাঁধিয়া কোনও মানত সে কোনদিন করে নাই। কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা অভিমান-ভরা আকুতি পীরবাবার দরবারে সম্ভবতঃ পৌঁছাইয়াছিল। 'পীরবাবা, আমার দুঃখ মোচন করিবে না?' বোধ হয় ইহাই ছিল তাহার নিগূঢ় আবেদন। কিন্তু একদিন স্পষ্ট করিয়া সে যাহা বলিল তাহা অন্য রূপে। মানত করিয়া গোবিন্ হালুয়াই বিবাহের দশ বৎসর পরে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া মহাসমারোহে মিষ্টান্নসম্ভার লইয়া সিন্নি চড়াইতে আসিয়াছিল সে। পীরবাবার নিকট যে ফকিরটি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া থাকে এবং পীরবাবার সমাধির সম্মুখে নমাজ পড়িয়া সিন্নি নিবেদন করিয়া দেয় তাহার জন্য একটি গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং টুপিও আনিয়াছিল গোবিন্। ঢাক-ঢোলের বাজনায় পীরপাহাড় সরগরম হইয়া উঠিল। কেশিয়া তখন জঙ্গলের ভিতর সেই চৌকোণা পাথরটার উপর বসিয়া পা দোলাইয়া দোলাইয়া কুল খাইতেছিল। হঠাৎ সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—"ইস্, পীরবাবাকা পূজো! কব্বর কা পূজো! হামকো কোই কাহে নৈ পূজেছে।" ইহার অর্থ—ইস্, পীরবাবার পূজো! কবরের পূজো! আমাকে কেউ পূজো করে না কেন! কেশিয়ার মনের ইচ্ছা হঠাৎ সেদিন বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার প্রায় মাসখানেক পরে পূজারীর দর্শন পাওয়া গেল। লালন দোসাদ। লোকটা প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত পার হইয়া গিয়াছে। দারোগা সাহেবের সহিস। কয়েক বছর আগে তাহার বউ মরিয়াছে, ছেলেমেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলে ফরক ফরক মানে আলাদা আলাদা থাকে। লালন একা পড়িয়া গিয়াছে। কেশিয়াকে দেখিয়া পুনরায় তাহার সংসার পাতিবার বাসনা জাগিল। পীর পাহাড়ের জঙ্গলের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করিতে লাগিল সে। শিস দিল না বা গান গাহিল না। কেশিয়ার সহিত মুখোমুখী হইয়া গেলে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিত এবং ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিত। ছাগল ছানাটা এদিক ওদিক চলিয়া গেলে খুঁজিয়া আনিত। কেশিয়া লালনের চোখের দৃষ্টিতে পূজা এবং আচরণে ভক্তির লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিল। যাহাকে সকলেই চিরকাল অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছে, দূর ছাই করিয়াছে।

তাহার পক্ষে এই নীরব অভিনন্দন তুচ্ছ করিবার মতো নয়। তা ছাড়া লালন পাত্র হিসাবে ভালই। দারোগার সহিস। মাস দুয়েক পরে কেশিয়া একদিন মাথা বাঁকাইয়া স্ব-ঝঙ্কারে বলিল—হিঁয়া ঘুর ঘুর করি কে কি হোতৈ। বাবু কে যা কে বোল্ নি। এখানে ঘুর ঘুর করে কি হবে, বাবাকে গিয়ে বল্ না। লালন বুঝিল কেশিয়ার সম্মতি আছে। কৃতার্থ হয়ে গেল।

বিবাহের মাস দুই পরে কিন্তু ছক্ পাল্টাইয়া গেল একেবারে। দারোগা সাহেব বদলি হইয়া গেলেন। নূতন যে দারোগা সাহেব আসিলেন তিনি ঘোড়া চড়েন না, বাইক চড়েন। লালনের সেই যে চাকরি গেল, আর হইল না। নিজে আর সে তেমন চেষ্টাও করিল না। তাহার মনোগত ইচ্ছা তাহার জোয়ান বউই তাহাকে রোজগার করিয়া খাওয়াক। বল্টুবাবুর জমিতে হীরু কেশিয়াকে বাহাল করাইয়া দিল। সেখানে সে মজুরনীর কাজ করিত। জমির ঘাস পরিষ্কার করা, গম ঝাড়া, মকাই ছাড়ানো—এই সব কাজ। কিন্তু এসব কাজ বরাবর থাকে না। মাঝে মাঝে কেশিয়া বেকার হইয়া যায়। তখন হীরুর আয় হইতেই কোন রকমে চলে তিনজনের। খুব কষ্টে চলে। লালন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে আর কাজ করিবে না। মনোমত কাজ জোটেও না, তা ছাড়া লালনের বয়স হইয়াছে, ক্রমশ সে অসমর্থও হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময় অর্থোপার্জনের একটা সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাজন বুলাকিলালের যুবক পুত্র মহেশলাল কেশিয়ার নিকট একটি প্রস্তাব পাঠাইল যে সে যদি তাহার বাড়ীতে গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে 'গিলুলা' (খোরাক সমেত) ষোল টাকা বেতন দিবে। লালন উল্লসিত হইয়া উঠিল। মহেশের সঙ্গে দেখা করিয়া বার বার প্রণাম করিয়া সে বলিয়া আসিল—কেশিয়া নিশ্চয় আসিবে। কেশিয়া কিন্তু গেল না। সে বুঝিয়াছিল সেখানে গেলে মহেশলালের রক্ষিতা হইয়া থাকিতে হইবে। মহেশ আর একবারও এই প্রস্তাব করিয়াছিল কেশিয়ার বিবাহের পূর্বে। কেশিয়া রাজি হয় নাই। হীরুও ফট্ করিয়া একদিন মরিয়া গেল। লালনের কোমরের ব্যথাটাও এমন বাড়িল যে প্রায় শয্যাগত হইয়া পড়িল সে। মহা মুশকিলে পড়িল কেশিয়া। কিন্তু সে দমিবার মেয়ে নয়।

ঘাস 'গাড়িতে' আরম্ভ করিল। পীরবাবার পাহাড়ের নিকট বাহি নদীর তীরে প্রচুর দুর্বা ঘাস হয়। তাহাই সে প্রতিদিন কাটিয়া কাটিয়া প্রকাণ্ড বোঝায় বাঁধিয়া হাটে হাটে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মনিহারী, কাজিগ্রাম, মেদিনীপুর—প্রত্যেক জায়গাতেই সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসে। সেখানে ঘাসের বোঝা সহজেই বিক্রয় হইয়া যায়। তা ছাড়া সে ছাগল পোষে। তাহাতেও কিছু কিছু আয় হয়। কিন্তু লোকসানও হইয়া যায় মাঝে মাঝে। গোয়ালা বস্তির ছোঁড়াগুলো অতি পাজি। সুযোগ পাইলেই তাহারা পাঁঠা চুরি করিয়া খাইয়া ফেলে। কেশিয়া কিন্তু দমে না। সে যেখানে ঘাস কাটে সেখানেই পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া দেয়। হাটে যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া যায়। হাটে পাঁঠার খরিদ্দারও জুটিয়া যায় অনেক সময়।

এই ভাবেই চলিতেছিল। একদিন কিন্তু সব ওলট পালট হইয়া গেল। রেল লাইন পার হইয়া কাজিগ্রাম যাইতে হয়। ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া এবং ছাগল ছানাটি সঙ্গে করিয়া কেশিয়া সেদিন রেল লাইন পার হইতেছিল কাজিগ্রামের হাটে যাইবে বলিয়া। হঠাৎ ছাগল ছানাটা হাতের দড়ি ছাড়াইয়া রেল লাইনের ধারে যে দুর্বাগুলি গজাইয়াছিল তাহাই খাইতে লাগিল। কেশিয়া সভয়ে দেখিল ট্রেন আসিতেছে। সে ছুটিয়া গেল ছাগলটাকে রেল-লাইন হইতে সরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু পারিল না। হু হু করিয়া ট্রেনটা আসিয়া পড়িল এবং তাহার পর কি হইল কেশিয়া আর জানে না। একটু পরে যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন দেখিল সে হাসপাতালে রহিয়াছে. ডাক্তারবাবু তাহার উরুতে ব্যান্ডেজ বাঁধিতেছেন। তাহার ডান পা টা উরুর মাঝামাঝি কাটিয়া গিয়াছে।

......ক্রমশঃ তাহার কেশিয়া নাম ঘুচিয়া গেল। নূতন নামকরণ হইল লেংড়ি। একটা লাঠির সহায়তায় সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল। আর একটা ঘটনাও হইল। বল্টুবাবুর মা একদিন তাহাকে দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। নিয়তির অভিশাপে অমন দুর্ধর্ষ মেয়েটা একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছে! বলিলেন, তুই আমার বাড়িতেই থাক। ডালটাল ভেঙে দিস। সেই হইতে লেংড়ি বল্টুবাবুর বাড়িতেই রহিয়া গেল। বল্টুবাবুর মা তাহাকে বেতন দিতেন, কাপড় চোপড় দিতেন এবং এত সিধা দিতেন যে তাহাতে লালনেরও কুলাইয়া যাইত।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল কেশিয়ার ঘরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ধূপ ধুনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। উঁকি মারিয়া বল্টুবাবু যাহা দেখিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য। লেংড়ি চিৎ হইয়া শুইয়া তাহার কাটা পা-টা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। আর লালন সেই কাটা পায়ে সিঁদুর চন্দন লাগাইয়া করজোড়ে তাহার পূজা করিতেছে।

"কি রে এ কি করছিস?" —সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন তিনি। লালন একটু অপ্রতিভ হইল। তাহার পর বলিল,—'এরই দৌলতে তো আমাদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচেছে। তাই একে পূজো করছি!"

পীরবাবা জাগ্রত দেবতা। তিনি কেশিয়ার মনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাত্রে স্কুলবাড়ীর মধ্যে গলায় দড়ি দিয়েছে দাদা। এ কি হল, এ-কি সর্বনাশ হল আমার?

মুখে কথা এল না। আস্তে আস্তে মাথায় একটা হাত দিলাম তার।

বললাম, আমিই এ-সর্বনাশের কারণ উমাপদ। দ্বারিক ধোপা আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে কাপড় কাচত। ছিষ্টিধর তারি ছেলে, ও বামুন নয়।

একটু ভেবে বললাম, কেঁদো না উমাপদ, তোমার মেয়ের বিয়ে আমি দিয়ে দোব।

ওরা যে দুজন দুজনকে ভালোবেসেছিল দাদা, বলেই উঠে তীরবেগে দৌড়ে চলে গেলেন উমাপদ।

স্থির হয়ে বসে রইলাম। মনে হল, কাল বিকেলের বৃষ্টিটা যদি না হত! যদি বেড়াতে বেরিয়ে যেতাম উমাপদ আসার আগেই!

সাবিত্রী

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এত উদাহরণ দেখাল তারাপদ, তবু সাবিত্রী অনমনীয়। বলে, ও-সব ভিক্ষেতেই চোখে দেখা যায় না। এ যে প্রত্যক্ষ! কালীঘাটের ক্যাঙালী হতে পারবো না।'

ক্রমশঃ সাবিত্রীর সামান্য যা কিছু সোনার আঁচড়টুকু গায়ে ছিল, সে সব গেল, তারপর পৈত্রিক ঘটিবাটি পেতল, কাঁসা যা ছিল তা গেল, শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর অনেকখানি তেজও গেল।

ভিক্ষে না করুকে, রোজগারের চেষ্টায় পথে বেরোতে হল সাবিত্রীকে।

ভাঙা পচা ওই একতলা ঘর দু'খানা পৈত্রিক আমলের ছিল বলে, তবু মাথাটা গোঁজবার আশ্রয় ছিল, নইলে পৃথিবীর জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে যেতে হত তারাপদ হালদারকে আর সাবিত্রী হালদারকে।

আরও রক্ষে, ছেলেপুলে হয়নি। শুধু দুটো পেট, দুটো মুখ।

কিন্তু সাবিত্রীর মতন মুখ্যু মেয়েমানুষের রোজগারের আর পথ কি, রাঁধুনী বৃত্তি ছাড়া? হালদার বামুনের মেয়ে, রান্নার কাজ জুটে গেল সহজেই। কিন্তু তাদের মস্তবড় সংসার, দু'বেলায় চল্লিশ পঞ্চাশখানা পাত পড়ে, জল খাবারের পত্তনই একটা পুরো রান্না। কাজেই বলতে গেলে চারবেলা রান্না। সাবিত্রী পারল না। সাবিত্রী নিজের সংসারে নিজে কখনো রেঁধে খায়নি, প্রসাদেই চালিয়েছে।

বেশী দিন শরীর রইল না।

বেশ বড় করে অসুখে পড়ল। হাঁড়ির হাল করে কাটল সে ক'দিন। চাকরীটা গেল।

এবারে সাবিত্রী একটা ছোট সংসার খুঁজল।

কাজ খুঁজতে গিয়েই পুরো পেশাদার রাঁধুনীর মতন জিগ্যেস করতে সুরু করল, 'বাড়ীতে কজন লোক? ক'জন বড়, কজন ছোট?'

কলকাতা শহরে ভ্যারাইটির অভাব নেই। চাহিদা মত চাকরী সাবিত্রী পেয়ে গেল। কিন্তু কপালে যার সুখ নেই, তার যন্ত্রণা ভুঁইফুঁড়ে ওঠে। বাড়ীতে মেম্বার কম, গিন্নীর কাজ কম অতএব কাজের জন্যে লোক রেখে গিন্নী তার পিছনে টিকটিক করা কাজটি বেছে নিলেন। তাছাড়া—তাঁর কৌতূহল অদম্য। সাবিত্রীর জীবনের নিভৃত কোণটুকুর পর্যন্ত খবর নিতে চান তিনি। চান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

স্বামী আছে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই। তবে সাবিত্রী চাকরী করতে বেরোল কেন, এই তাঁর প্রশ্ন। কেন বেরোল, সে সত্য প্রকাশ করলেই চুকে যেত, কিন্তু সাবিত্রীরও গোঁ, বলবে না তার স্বামী খোঁড়া, স্বামী ঘরে বসে থাকা।

বলে যে, স্বামীর টাকা ধার শোধে যায়।

ধার শোধে?

তা' এত ধারই বা করল কোন্ উপলক্ষে? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়নি, ছেলের পৈতে দিতে হয়নি, ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়নি।

তা' কত কি থাকে মানুষের। সাবিত্রী বলে ভারী রোগ হয়েছিল একবার স্বামীর তাতেই ধার।

ওমা, গেরস্থ ঘরে এত কি চিকিৎসার খরচ? সাহেব ডাক্তারকে দেখিয়েছ নাকি? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা! আর তিন কুলে কেউ নেইও নাকি? বাপ, মা, ভাই, বোন?

প্রশ্নের জ্বালায় সে কাজ ছেড়ে দিল সাবিত্রী।

তারপর বারে বারে ঘাট বদলে বদলে অনেক ঘাটের জল খেল, কিন্তু দেখল সব ঘাটের জলই একটা জায়গায় এক। মুখে দিলেই লোণা।

সাবিত্রীর স্বামী আছে, পাঁচটা ছেলেপুলে নেই, তবে সাবিত্রী রাঁধুনীগিরি করে কেন এ প্রশ্ন সবাইয়ের মনে। কারো বা সেটা মুখে ফোটে, কারো বা চোখে ফোটে।

সাবিত্রী বলতে সুরু করল স্বামীর রোজগার কম, কুলোয় না।

ঠিক আছে। কিন্তু কেন কম? কোথায় কাজ করে? কি কাজ করে? স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আবার দু'একজন বললেন হাতে চাকরী আছে একদিন এনো তো তোমার বরকে। দেখব বিদ্যে বুদ্ধি কি রকম!

সাবিত্রী যে দেখতে একটু ভাল, সাবিত্রীর যে বয়েস কম, এইটাই সকলের যন্ত্রণা!

কিন্তু ভুল সাবিত্রীরই।

খোঁড়াকে খোঁড়া বললেই সব মিটে যেত। বলে না। এততেও বলে না।

কাজেই কাজ ছাড়া আর ঘোরা ফেরি। অবশেষে গোঁয়ো একটু ভাঙন ধরল। বলতে লাগল স্বামীর অসুখ।

অসুখ!

চোখ কপালে উঠে গেল মনিবের। কি অসুখ? কত দিন ভুগছে? কোনও খারাপ রোগ নয় তো? না বাবা দরকার নেই, পিছটানওলা লোকে কাজ নেই তাঁদের।

একজন তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই বসলেন, 'না বাছা এ ধরণের লোক খুঁজছি না আমি। তুমি সধবা মানুষ, বয়েস কম, কাজ করতে করতে কাচ্চাবাচ্চাই বা হয়ে পড়ল, বলা তো যায় না! ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই আমি। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা মানুষ খুঁজেছি।'

সেই ভদ্রমহিলার কথার মধ্যে যেন সাবিত্রী অনেক দিনের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেল।

নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা পেলে আর কেউ অত প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠবে না। বিধবা, তিনকুলে কেউ নেই, কাচ্চা-বাচ্চা বর্জিত নির্ঝঞ্ঝাট, রাঁধুনী চাকরাণী রাখতে এটাই আদর্শ।

পাড়া ছেড়ে অনেক দূরে—এগিয়ে গেল সাবিত্রী, কাজ করতে। সংস্কার ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেল, সে কাজে প্রশ্নহীন সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে।

পরনে শাদা ব্লাউজ, শাদা কালা পাড় শাড়ী,

স্পষ্ট চিহ্ন, মনিবন্ধে একগাছি কেমিক্যাল চুড়িতে যেন ভাগ্যকে অস্বীকারের ক্ষীণ প্রয়াস।

কেউ কোথাও নেই।

ত্রিভুবনে কেউ না। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়।

তবে দুবেলা বাড়ী গিয়ে কি করে সাবিত্রী। একজনের জন্যে রেঁধেই বা মরে কেন? মনিব বাড়ী থাকলেই পারে।

বাঃ, প্রশ্নের কি আর উত্তর নেই? শ্বশুরের ভিটেখানা যে রয়েছে। আর রয়েছে গৃহ-বিগ্রহ। তাতেই তো এত বন্ধ সাবিত্রী। সেই দামোদর শিলার জন্যে ভোগের অন্ন যে রাঁধতেই হবে। শ্বশুর শাশুড়ী এই এক ঠাকুর গলায় গেঁথে দিয়ে কম জব্দ করে রেখে গেছেন সাবিত্রীকে?

যাক, এতদিনে যেন পায়ের তলায় মাটি পায় সাবিত্রী। আর কারো চোখের কোণে সন্দেহের ছুরি তীক্ষ্ন হয়ে উঠতে দেখা যায় না। যেখানে 'ঠাকুর' সেখানে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা।

মৃত শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা, গৃহদেবতায় ভক্তিমতি আচারপরায়ণা বিধবা সাবিত্রীকে সবাই সমীহ করে চলে, 'মান্য করে।' ঘরে ওর একটা রক্তমাংসের মানুষ আছে ভাবলেই অনেক অস্বস্তি। পাথরের পুতুল আছেন, শুনলে কান জুড়োয়, প্রাণ জুড়োয়।

এ বাড়ীর গিন্নী স্নেহশীলা, ভক্তিমতি।

একাদশী দ্বাদশীতে ইচ্ছে করে সাবিত্রীর হাতে একটু মিষ্টি গুঁজে দেন, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সাবিত্রীর ঘরের দামোদরের নাম করে শশাটা কলাটা ধরে দেন।

তিনিই একদিন পাড়লেন কথাটা।

বললেন, 'আমার সংসারে তো কাজ কম, তোমার সময় বেশী লাগে না, আর একটা ছোট্ট কাজ করতে পারবে বামুন মেয়ে?'

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল।

যে মূর্তি তারাপদ দেখে, সাবিত্রীর সে মূর্তি বাইরের জগতে অচেনা। বাইরে সে শান্ত স্বল্পভাষী।

গিন্নী বললেন, 'আমার এক দূরসম্পর্কের ভাই বিয়ে থাওয়া করে নি, মা-টি আর ছেলেটি ছিল। সম্প্রতি মা মারা গেছেন, কিন্তু চাকর-বাকরের হাতে মোটে খেতে পারে না, কষ্ট পাচ্ছে। তুমি যদি আমার কাজ সেরে গিয়ে ওই একটা মানুষের রান্নাটুকু করে দাও। তার হচ্ছে বেলায় কাজ, দশটায় গেলেই হবে।

শঙ্কিত সাবিত্রী বলল, 'বাড়ীতে আর কেউ নেই?'

'ওই একটা চাকর আছে। একলার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না বামুন মেয়ে, সে ভাই আমার দেবতা। সোনায় কলঙ্ক আছে তো, তাতে কলঙ্ক নেই। আর তোমাকেও তো দেখছি বাছা! এ কালে এমনটি চোখে পড়ে না। তাই তো বলছি সাহস করে। জানি সাহসের মান তুমি রাখবে।'

ঝট করে চোখ নামাল সাবিত্রী।

হ্যাঁ, সাহসের মান সে রাখবে।

বলল, 'কবে থেকে করতে হবে বলুন?'

'আজ পারো তো কাল বলি না।'

একটা কেরোসিন স্টোভ, একটা স্পিরিট স্টোভ, একটা প্রেসার কুকার, একটা ইলেকট্রিক-হীটার, আর একটা ইকমিক। একজনের রান্না, দশ রকম সাজ সরঞ্জাম। দেখে শুনে সাবিত্রী বসে পড়ে, বলে 'এত কি হবে কেষ্ট?'

কেষ্ট চুপি চুপি বলে, 'পাগল পাগল বামুন দি, বদ্ধ পাগল! আমার রান্না পছন্দ হয় না, তাই বলে, 'নিজে রাঁধবে। এসব হচ্ছে কিসে সুবিধে হয়, কিসে সহজে শীগ্‌গিরে হয়, তার পরীক্ষে। তা পারলে তো? না খেয়ে জান যাচ্ছে। ও বাড়ীর পিসিমা তাই তোমাকে ঠিক করে দিল।'

অতঃপর বাবুর সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরিবেশন করে কেষ্ট হেসে হেসে। সাবিত্রী হাঁ করে শোনে। হাঁ করবে না তো কি. সাবিত্রীর জীবনে এমন মানুষ কবে দেখেছে? যে মানুষ মাইনের টাকা এনে চাকরের হাতে ধরে দেয়, ধোবা দশটা জিনিষ হারিয়ে দিলে টের পায় না, চাকরকে শীতে লেপ আর বর্ষায় ওয়াটারপ্রুফ দেয়, এবং সে সিনেমা থিয়েটার দেখতে চাইলে শুধু যে ছুটিই দেয় তা নয়, দেখতে টাকাও দেয়।

'মানুষ দেবতুল্য' কেষ্ট বলে, 'তবে কিনা জ্ঞানগম্যি বলে কিছু নেই।'

জ্ঞান-গম্যি যে নেই, এ কথা ক্রমশঃ সাবিত্রীও টের পায়। মনিব হঠাৎ রান্নার মাঝখানে এসে বসে পড়ে মহোৎসাহে বলে, 'রোস সাবিত্রী, আমি তোমায় একটা নতুন রান্না শেখাই।' বলে আর জল ঢেলে বাসন ছড়িয়ে একাকার কান্ড করে শেষ পর্যন্ত কেষ্টর কাছে বকুনি খেয়ে সরে যায়, এবং সরবে বলে, 'হতো ঠিকই, আর একটু হয়ে হলেই—'

কেষ্ট বলে 'হোক গে বাবু, আপনি যানতো—! বামুনদিকে রাঁধতে দেন। ওকে বাড়ী ফিরতে হবে না কি?'

লজ্জিত হয় তখন মনিব।

বলে "ইস তাইতো, দেরী করিয়ে দিলাম তোমার সাবিত্রী! রাগ করনি তো?'

রাগ কেষ্ট করে। বলে 'চাকর-বাকরকে কি ওকথা বলতে আছে বাবু? মনিবের ওপর রাগ করবে?' মনিব বলে, 'কেন করবে না? মানুষ নয়?'

আবার এমনও অনেক দিন হয়, মনিব রাঁধুনীকে ডেকে বলে, 'এত বেলা হয়ে গেছে, তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাওনা সাবিত্রী! খিদে পেয়েছে-তো?'

সাবিত্রী আগে আগে কথা বলত না, ঘোমটা দিত, এখন জোর গলাতেই কথা বলে। উপায় কি, যেমন মানুষ! ও কথার উত্তরে বলে, 'খেয়ে যাব মানে? আমি কি আমার চাল নিয়েছি?'

মনিব নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলে, 'তাতে কি, আমাদের না হয় একটু কমই হল! ....কি বলিস কেষ্ট, দুজনের ভাত তিন-জনে ভাগ করে খাওয়া যায় না? কত তো বেশী বেশী হয়।'

কেষ্ট হাসে। বলে, "কি বামুনদি খাবে?'

সাবিত্রী তাকে বকে ওঠে, 'তুই থাম্ দিকি কেষ্ট!'

মনিব আরও ম্রিয়মাণ হয়ে বলে, 'তা' চাল তো চারটি বেশী নিলেই পারো সাবিত্রী!'

সাবিত্রী অনেক সংস্কার ত্যাগ করে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই ঝঙ্কার দিয়ে বলে

ওঠে 'কী যে বলেন! বামুনের বিধবা এই সব হে'সেলে খেতে পারে, না খায়?'

'ওঃ ইস! ছি ছি! ধোৎ!'

তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায় পাগলা মনিব।

কেষ্ট বলে, 'বাবু ওমনি। নিত্য ঠাকুমাকে বলে বসত, 'রান্না যা হয়েছে মা ফাস্ট ক্লাশ, খেয়ে দেখো বুঝবে।'

ঠাকুমা রাগ করে বলতো, 'হতভাগা ছেলে ওই সব আমি খাই?'

তখন ভয়ে এমনি করে ছুট মারতো।

সাবিত্রী চুপি চুপি বলে 'এই পাগলাপনার জন্যেই মা বিয়ে দেয়নি, কি বল কেষ্ট?'

'তাই হবে।' বলে কেষ্ট নিজের কাজ সংক্ষিপ্ত করে।

কিন্তু কেন কে জানে, পুরনো চাকরীর ওপর এই বাড়তি চাকরীর কথাটা সাবিত্রী তারাপদর কাছে বলে না। কেন বলে না, সে কথা হয়তো সাবিত্রীর অন্তর্যামীও জানে না।

বলতে ইচ্ছে হয় না।

জানে না তারাপদ।

কাজেই মেজাজ তার ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠে ওঠে। সাবিত্রীর ফিরতে এই হঠাৎ বেশ খানিকটা দেরী সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। রোজই বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় একপালা।

কুৎসিত ভঙ্গীতে মুখভঙ্গী করে তারাপদ বলে, 'এতক্ষণ হচ্ছিল কি? মনিবের সঙ্গে নতুন করে সোহাগ বাড়ছে বুঝি? তাই বেলা দুপুর অবধি তার গোয়ালে ধোঁয়া দিচ্ছিলি!"

সাবিত্রী দাওয়ার ধারে বসে আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে, 'বাড়ছেই তো সোহাগ। থাকবোই তো বেলা দুপুর অবধি। যতক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকি ততক্ষণই শান্তি' ওই শ্রীমুখের বাক্যি শুনতে হয় না।'

'হুঁ, এ শ্রীমুখের বাক্যি এখন তো তে'তো লাগবেই, অনেক নতুন মুখ দেখছিস যে! কদর বাড়বে বলে বিধবার সাজে সেজে যাচ্ছিস সোহাগের মনিবের মন ভোলাতে! বুঝি না কিছু আমি?'

'তা' আর বুঝবে না কেন!' সাবিত্রী সত্যিচ্ছিল্যে বলে 'খোকা তো আর নও। মন্দ মেয়েমানুষ চোখে কখনো দেখনি, তাও নয়।'

'তোর মুখে কিছু আটকায় না কেন বলতো লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষ! যা খুসি তাই বলিস যে!'

সাবিত্রীও সমান তেজে বলে, 'বলবো না কেন? তোমাকে আমি পরোয়া করি? পরিবারের রোজগারে বসে বসে খেতে হয় যাকে, তার আর অত নাক নাড়া সাজে না, বুঝলে?'—বলে উনুন ধরিয়ে কাপড় কাচতে যায় সাবিত্রী।

আবার এক প্রস্থ রান্না!

সেই আদি থেকে অন্ত।

দিনে তিন দুগুণে ছবার করে রান্না!

চাল ধোয় আর ভাবে সাবিত্রী। কিন্তু পাগলা বাবুর বাড়ীর রান্নায় যেন কোন কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই। সে যেন খেলা, না গান গাওয়া! বাড়ীটায় ঢুকলেই প্রাণটা আহ্লাদে ভরে ওঠে। শরীরে শক্তির জোয়ার আসে।

হবে না কেন, কেমন মানুষের বাড়ী! মানুষতো নয় দেবতা, বাড়ীতো নয়, মন্দির! ধুপ-ধুনো জ্বলে না, তবু যেন মনে হয় ধুপ-ধুনোর গন্ধ খেলছে।

আর এই উনচুটে বাড়ীতে এসে ঢুকলে? আগুন, আগুন জ্বলে ওঠে মাথা থেকে পা অবধি। এ গলিতে ঢোকার আগে থেকেই আগুনের সুরু।

একে স্বামী, তায় খোঁড়া অনড়, তাকে খাওয়ার খোঁটা দেওয়া মহাপাপ, তা কি বোঝে না সাবিত্রী—? কিন্তু মানুষের শরীর তো তার? তুমিই বা কেমন স্বামী যে, সাত ঘণ্টা খেটে এসে ঢুকল যে মানুষটা তাকে অকথা-কুকথা, গাল মন্দ!

ছি ছি! কত জন্মের পাপ ছিল, তাই এমন ইতর ছোটলোকের হাতে পড়েছিল সাবিত্রী।

বামুন!

বামুনের মুখে মারো ঝাঁটা! ওই তো মানুষ দেখে আসছে সাবিত্রী। সে না কি কায়স্থ, তারাপদ যাদের শুদ্দুর বলে। অমন শুদ্দুরের পা ধোওয়া জল খেলেও তারাপদর মতন বামুন তরে যায়।

উঃ সাবিত্রী যদি শুদ্দুরের ঘরের মেয়ে হত তাহলে অন্ততঃ তারাপদর হাতে পড়তে হত না তাকে।

কিন্তু কার হাতে তবে পড়ত সাবিত্রী?

কার হাতে পড়লে সুখী হতো?

উঃ পাগলা না পাগলা!

কি বলে আর কি না বলে! কি কাণ্ডই করল আজ! ভাগ্যিস তখন কেষ্ট বাজারে যাচ্ছিল। তারাপদর ভাত বাড়তে বাড়তে ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল সাবিত্রী, তখনকার কথাটা। ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়, তবু ভাবে।

তখনও সেই ভাত বাড়ার সময়।

দু'হাতে থালা নিয়ে আসতে গিয়ে মাথার কাপড়টা গেল খস্ করে খুলে। সাবিত্রী ভেবে পায় না কি করে। কোন রকমে থালাটা পাতের সামনে নামিয়ে দিয়ে হাত উল্টে ঘোমটা টানতে যাবে, আর ঠিক সেই মহা মুহূর্তে বাবু খপ্ করে সাবিত্রীর একগোছা চুল ধরে বলে উঠল, 'ইস সাবিত্রী তোমার কত চুল! আর কী বাহার!'

সাবিত্রীর যে অনেক চুল, আর সে চুলের অনেক বাহার, একথা সাবিত্রী জীবনে এই প্রথম শুনল। তবু সাবিত্রী গম্ভীর হল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এত লেখা-পড়া শিখেছেন বাবু, আর কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় শেখেন নি! দাসী-বাঁদীদের চুলের বাহারের কথা মনিবের বলতে আছে?'

সাধারণতঃ পাগলাবাবু সবতাতেই একটু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু আজ হয়নি। আজ সেও গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তোমাকে আমার দাসী-বাঁদী বলে মনেই হয় না।'

'তবে কি মনে হয় শুনি?'

'এমনি', ভাতে ডালে চটকে মাখতে মাখতে পাগলাবাবু বলেছিল, 'এমনি বাড়ীর লোক বলে মনে হয়।'

'বাড়ীর লোক মানে?' ভুরু কোঁচকায় সাবিত্রী।

'মানে আবার কি!' পাগলাবাবুও রেগে গিয়ে বলে, 'এমনি যেমন বাড়ীর লোক হয়। মা বোন বৌ, এই রকম আবার কি?'

সাবিত্রী ফস করে বলে বসেছিল, 'আপনি সময়ে একটা বিয়ে করলে ভাল করতেন বাবু! বিয়ে না করেই আপনি এ রকম নাবালক থেকে গেলেন। বিয়ে না করলে পুরুষ মানুষের বুদ্ধি পাকে না। করেন নি কেন বলুন তো?'

পাগলাবাবু বলেছিল, দিব্যি সহজেই বলেছিল, 'কি জানো সাবিত্রী মেয়ে-টেয়ে দেখলেই আমার বরাবর কেমন ভয় লাগত। তাই মা যখনি বিয়ের কথা বলতো 'না না' করতাম।'

'কই এখন তো আর ভয় লাগে না?'

তীক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল সাবিত্রী।

পাগলাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'ও বাবা, করে না আবার! খুব করে। রাস্তায় তো শুধু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটি।'

তবু সাবিত্রীর কথা বলায় ভয় পেয়েছিল। ভূতে পাওয়ার মতই প্রায়।

'কই আমাকে দেখে তো ভয় করে না আপনার?'

তারপরটা আর যেন ভাবতে পারে না সাবিত্রী, ভাবতে গেলে চোখে ধোঁয়া দেখে! পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল,—ঠিকই বলেছিল কেষ্ট। আর নয় তো একেবারে অবোধ শিশু।

অবোধ শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে সাপের ছানাটা তুলেও মুখে দিয়ে বসে, পাগলাটা তেমনি স্বচ্ছন্দে বলে বসেছিল 'তোমার কথা আলাদা। তোমায় এত ভালবাসি, তোমায় দেখে ভয় করবো কেন?'

উঃ কি করে যে সেখান থেকে রান্নাঘরে পালিয়ে এসেছিল সাবিত্রী ঈশ্বর জানেন।

কতক্ষণ যেন বুকের কাঁপুনি থামে নি। তা' এখনি কি থেমেছে?

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওঠে তারাপদ, ভাত বাড়তে বাড়তে কোন ভাবের লোকের কথা ভাবছিস? জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিস না কি? আঁচল খসে পড়ে যে ডালের বাটিতে মাখামাখি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস? একেবারে ম্লেচ্ছ বনে গেলি?'

না, সাবিত্রীর চুলের বাহারটা দেখতে পায় না তারাপদ, তার আচার-ভ্রষ্টতা দেখতে পায়।

কিন্তু আশ্চর্য! তারাপদর এতবড় কটূক্তির উত্তর দেয় না সাবিত্রী। শুধু নিঃশব্দে আঁচলটা তুলে নিয়ে ধুতে চলে যায়।

খেতে খেতেও খিঁচোয় তারাপদ, 'কাল থেকে আগে যেমন টাইমে ফিরতিস, তেমনি ফিরবি। আমার নিযাস 'সন্দ' হচ্ছে, তুই রোজ রোজ আর কোথাও যাচ্ছিস।'

বলে, আর অবাক হয়ে তাকায় তারাপদ। কই সাবিত্রী তো কোমর বেঁধে তেড়ে আসে না। বলে না, 'যাই-ই তো, একশোবার যাই। তা গেলে তুমি কি করবে শুনি? ক্ষ্যামতা থাকে তো টিকটিকি পুলিশ হয়ে যেও পিছু পিছু!'

না, কোন কিছুই বলে না সাবিত্রী। শুধু কাছে এসে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আর ভাত চাই?'

'উচ্ছন্নে গেছিস! উচ্ছন্নে গেছিস! নির্ঘাৎ মন্দ হচ্ছিস!' বিড়-বিড় করে বলে তারাপদ।

সাবিত্রী যেন অন্য হয়ে গেছে। কেমন এক রকম ভদ্র ভদ্র। যেন এ বাড়ীতে ওকে মানাচ্ছে না। সাবিত্রীর ওই এ বাড়ীতে বেমানান চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে তারাপদ, 'মন্দ না হয়ে গেলে, তোর চোখের চেহারা অমন মরামাছের মত দেখায় কেন? তোর সে তেজ কোথা গেল? মেয়েমানুষের তেজ গেছে মানেই চরিত্তির গেছে।'

তবুও তেজ দেখায় না সাবিত্রী। শুধু উঠে যায়। আর উঠে যাবার সময় শান্ত গলায় বলে যায়, 'বেশ তো চরিত্তির খারাপ পরিবারের হাতে আর খেয়ো না।'

ঘরে গিয়ে অন্ধকার দেখা চোখে দিশেহারার মত ভাবতে থাকে সাবিত্রী। সে কি কাজ ছেড়ে দেবে? কাজ ছেড়ে দেবে? সে তো সত্যিই তারাপদর কথার উত্তর দিতে পারল না। সে তো বোঝে চরিত্তির শুধু এই দেহখানাই বজায় রাখলে সব মিটে যায় না, মনেরও চরিত্তির রাখতে হয়। পর-পুরুষকে ভাল লাগাও পাপ।

কিন্তু সকাল হতেই কে যেন সহস্র বাহু দিয়ে টানতে থাকে। ও বাড়ীর স্নেহশীলা মনিবানী বললেন, 'বামুন মেয়ে, তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? রান্নায় তো তেমন জুত দেখি না আজকাল!'

সাবিত্রী থতমত খায়। রান্না ভাল করবার চেষ্টা করে। শতবার ভাবে এই মুখে বলে বসবে, 'দু' জায়গায় টানা-পোড়েন আর পারছি না আমি। আপনার ভাইয়ের জন্যে অন্য লোক দেখুন।'

বলতে পারে না।

দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ আর আতঙ্ক, এই দুটোর টানাটানি চলে, আর আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যেতে থাকে সাবিত্রী।

আর সব কিছু খালি ভুলে যায়।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য পড়ল, সকালে আর সিঁথিতে সাবান ঘসতে হচ্ছে না। কতদিন থেকে যেন সিঁদুর পরতেই ভুলে গেছে। যে সিঁদুর তারাপদর অত খিঁচুনি সত্ত্বেও দিনান্তে একবার অন্তত পরতে ভুলত না। তারপদর কল্যাণ কামনা করতো আর মোটা করে রেখা টানতো। ঘাট মানতো মা কালীর কাছে।

সাবিত্রী কি তবে সত্যিই উচ্ছন্ন যাচ্ছে?

স্বামীর কল্যাণ অকল্যাণেও কিছু এসে যায় না তার?

যাচ্ছে, সাবিত্রী খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নইলে নিজের বাড়ী তার এত বিষ লাগে কেন আজকাল? কেন তার ইচ্ছে করে সেই একখানি ছবির মত ছোট্ট বাড়ীর ঠাণ্ডা চকচকে বারান্দার কোণে আঁচল বিছিয়ে পড়ে থাকে!

সারাদিনের এত খাটুনি সত্ত্বেও রাত্রে ঘুম আসতে চায় না, আকাশ-পাতাল ভাবনা আসে। এ তার কি হল! পরপুরুষের দিকে মন এত টানে কেন! সে না বামুনের মেয়ে? মা কালীর উঠোনের ধারেই না বাস তার?

কিন্তু আবার সকাল হলেই—শাদা ব্লাউস আর শাদা কালাপাড় শাড়ী টানতে থাকে তাকে। নীরবে পরে, বেরিয়ে যায়।

তারাপদর খিঁচুনিতেও আজকাল যেন ভাঁটা পড়ে এসেছে। তবু সে জড়িয়ে জড়িয়ে, যাবার সময় বলে, 'যাচ্ছিস তো রাঁধুনীবিত্তি করতে, রোজ এত ফর্সা পোষাকের ঘটা কেন শুনি?'

কথার ঝঙ্কার গেছে, ছন্দ গেছে, আছে শুধু শব্দের শবদেহ। সেই শবটুকু দিয়ে বলে সাবিত্রী, 'বাসন মাজতে তো যাচ্ছিনা। ময়লা কাপড়ে গেলে হাতে খেতে প্রবৃত্তি হবে মানুষের?'

সে কথা পাগলাবাবুও বলে, 'এই তুমি কেমন ফর্সা কাপড় পরেছ সাবিত্রী! দেখলে ভাল লাগে। আর কেষ্টা রাঁধতে আসবে একটা তেলচিটে হাফপ্যাণ্ট পরে। হাতে খেতে প্রবৃত্তি হয়?'

কেষ্টাকে সেদিন বলে সাবিত্রী, 'এই ফর্সা কাপড় পরতে পারিস না?'

কিন্তু কি থেকে যে কি হয়ে যায়, কেষ্ট ফট্ করে একটু মুচকি হেসে বলে বসে, 'আমার আবার ফর্সা ময়লা। আমার দিকে তো আর কেউ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না বামুনদি!'

পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়। সাবিত্রী হাতের খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলে 'কি বল্‌লি?'

কেষ্ট অপ্রতিভভাবে বলে 'ঠাট্টা করেছি বাবা, ঠাট্টা করেছি!'

সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে বলে, 'ঠাট্টা! তুই করবি আমায় ঠাট্টা? অভাবে পড়ে কাজ করতে এসেছি বলে ভাবিসনে কেষ্ট, পায়ে মাথায় এক হয়ে গেছে।'

পায়ে মাথায়! উদাহরণটা চাবুকের মত।

কেষ্টরও শরীরে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে। সে বলে, 'তা' তো বটেই বামুনদি! তোমার সঙ্গে আমি? এই দেখনা কেন, তোমার মাইনে ঠিক হয়েছিল দশ টাকা, বাবু আমার হাত দিয়ে এই তিরিশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে তোমায় দিতে। আমায় দেবে তা?'

'তার মানে?' ঠিকরে ওঠে সাবিত্রী।

'মানে তুমিই জানো। বাবুর মায়ার শরীর,' হিংসুটে কেষ্ট হাসে, বলে—বাবু বল্‌লে 'আহা

যখন বৃষ্টি নামল

অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

যখন বৃষ্টি নামল
তখন আমি ঘুমিয়েছিলাম বটে
যখন সে ঘুম ভাঙ্গল
তখনও ছবি মেলায়নিক পটে।
যেটুকু বাকি ছিল
আমার মনের মাধুরীখানি
সেটুকু ভরে নিল।
আমি তো জানি তোমার ছবিখানি
হয়েছে আঁকা সূর্যতারা গ্রহান্তর ছানি।
আমিত সেই রঙের সাগর মাঝে
ডুবিয়ে আমার মানস তুলি
রসের রসাঙ্গনে
তোমার ছবি আঁকি,
না হয় প্রাণের বেচা কেনার হাটে
আমার ঘরে জমল শুধু ফাঁকি।

দশ টাকায় ওর কি করে চলবে কেষ্ট! গরীব মানুষ! এইটা দিয়ে দিগে তুই, আমার লজ্জা করে।'

সাবিত্রী নিঃশব্দে এঁটো হাত ধুয়ে টাকাটা হাতে নেয়, তার থেকে একটা নোট আঁচলে বেঁধে, বাকী দু'খানা নোট নিয়ে এ ঘরে এসে বলে, 'টাকা আপনার বেশী থাকে বাবু, রাস্তার ভিখিরিকে দেবেন। আর আমারও ভিক্ষের ভাত খেতে হয়তো মায়ের মন্দিরে আঁচল পেতে বসবো। বড় মানুষ বাবুর দয়া হাত পেতে নিলে আমাদের জাত যায়। রান্নার কিছু বাকী আছে, কেষ্টকে বলে যাচ্ছি। ওবেলা থেকে আমি আর আসবো না।'

দুটি বিস্ময়ে অভিভূত চোখের সামনে থেকে সরে এসে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সাবিত্রী।

পরপর দু'দিন দেখে তারাপদ আর থাকতে পারে না, বলে, 'কিরে, কাজে যাচ্ছিস না যে বড়?'

'যাচ্ছি না, ইচ্ছে হচ্ছে না।'

ইচ্ছে হচ্ছে না! বাঃ।' তারাপদ প্রমাদ গণে, বলে, 'তোর ইচ্ছের বশে মনিব চলবে?'

'মনিব আবার কিসের!' সাবিত্রী গম্ভীরভাবে বলে, 'মনিব টনিব কেউ নেই আমার। আমিই আমার মনিব।'

'ও! চাকরী গেছে বুঝি?'

'গেছে!' সাবিত্রী ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'সাবিত্রী বামনীর চাকরী কখনো যায় না। সে নিজেই ছাড়ে। চাকরী আর করবো না আমি।'

ভবিষ্যতের ভয়ে ক্ষিপ্ত তারাপদ খিঁচিয়ে ওঠে, 'চাকরী করবো না! করবি না তো চলবে কিসে?'

সাবিত্রী উদাস গম্ভীর মুখে বলে 'ক্যাঙালীদের যাতে চলে। চাকরী যদি আমি চিরকাল না করতে পারি! চিরকাল যদি গতর না চলে, জোর আছে কিছু? কাল থেকে ভিক্ষেয় বসবো। ভিখিরি ছাড়া আর কে কি ভাবে আমাদের!'

থিয়েটার আজকের ও কালকের

শম্ভু মিত্র

কথায় বলে, স্টাইলেই মানুষটার প্রকাশ। কিন্তু শুধু তাই নয়, এক একটা যুগও নিজেকে প্রকাশ করে এক একটা স্টাইলে। সম-সাময়িক অনেক ব্যক্তিগত স্টাইল একটা যুগের স্টাইলেরই সুরবৈচিত্র্য। আজকের দিনের স্টাইলটি কী? চারিদিকে তাকিয়ে কেমন যেন মনে হয় স্টাইলের স্থান অধিকার করেছে স্টান্ট। আর, এ খালি মঞ্চে নয়, সর্বত্র। যেমন আধুনিক গানের সুরে, তেমনি গল্পে উপন্যাসে—যার চলতি নাম সাহিত্য,—সর্বত্রই এ রোগের মহামারী।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, শহরগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হচ্ছে, মানুষজনের ব্যক্তিগত বা সমাজগত ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ক্রমশঃই ক'মে যাচ্ছে—কাজেই এই অস্থির-চিত্ত ভীড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে অস্বাভাবিক একটা কিছু কাণ্ড করা চাই। এই চেহারাই একটু একটু ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে বাংলা নাট্যাভিনয়ে, তা সে ব্যবসায়িক মঞ্চেই হোক বা তার বাইরে নতুন কোনও নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যাভিনয়েই হোক।

সাধারণ কথোপকথনে দেখেছি অনেক ব্যক্তি এইসব বিষয়ে ব্যবসায়িক মঞ্চকে অপার করুণায় মার্জনা ক'রে থাকেন। বলেন,—'ওদের অবশ্য ওগুলো করতেই হয়, কারণ ওটা তো ব্যবসা। কিন্তু অপেশাদারী দলগুলো—যারা শিল্পটাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেনি, যাদের ওপর দেশের সংস্কৃতি নির্ভর করছে—তারা কেন দর্শক-নিরপেক্ষ হয়ে কেবল বিশুদ্ধ শিল্পের চর্চা করবে না?'

অর্থাৎ লোকে দেখতে যাক বা না যাক, টিকিট বিক্রী ক'রে খরচ-খরচা উঠুক বা না-উঠুক, অপেশাদারী দলগুলো ব্রাহ্মণবাড়ীর বালবিধবার মতো কঠোর সংযমে ও ব্রতনিয়মে আমাদের মহান সংস্কৃতির গৌরবময় ধ্বজা আকাশে উত্তুঙ্গ রাখবেন। আর যেখানে মঞ্জুলিকার বাপের খাদ্যের মতো চারটে পাঁচটা ভাজাভুজি হবে ও পাঁঠা হবে রুটি-লুচির সাথে সেখানকার ভোজ সমারোহে বিদ্বান-মূর্খ নির্বিশেষে উক্ত ব্যক্তিরা সবাই ব্যবসায়িক প্রেক্ষাগৃহে ভিড় ক'রে সেই মহান সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের দায়িত্বের অংশ পালন করবেন।

অবশ্য এটাও হ'তে পারতো যদি অপেশাদারী দলগুলোর সবাই ধনীব্যক্তির সন্তান হোত, এবং প্রত্যেকেই পিতার সম্পত্তির বেশ কিছুটা অংশ

আর ডি বনসাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত 'অতল জলের আহ্বান' ছবির নায়িকারূপে তন্দ্রা বর্মণ

সেই বাবদেই ব্যয় করতে মনস্থ করতো। কিন্তু ইতিহাসের কোনও এক নিগূঢ় নিয়মে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে যারাই শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে গভীর ও নিষ্ঠাবান তাদের নিরানব্বইজনই ধনীর সন্তান নয়। কাজে কাজেই ঘটনাটা সম্ভব হ'তে পারছে না।

আর এক উপায় আছে। যদি সরকার সমস্ত অপেশাদার দলের খরচের ভার কাঁধে তুলে নেয় তাহলে হয়তো দর্শক-নিরপেক্ষ মহান সংস্কৃতির চর্চা একরকম সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমাদের উপদেশ না দিয়ে সরকারকে উপদেশ দিয়ে বাগ মানানো ভালো। ইতিমধ্যে অবশ্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তর থেকে কিছু পয়সা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তার ফল যে কী হবে তা এক্ষুণি বলা শক্ত। তবু, যেহেতু নিজের দেশকে একরকম ক'রে চিনি ও মনুষ্যচরিত্রও নানাভাবে ঠেকে খেয়ে একরকম ক'রে বুঝি তাই কিছু কিছু দুশ্চিন্তাও হয়। মনে হয় যে, সরকারী খয়রাতি সংগ্রহ করবার জন্য যে ঠেলাঠেলির প্রতিযোগিতা হবে তার মধ্যে এমন অনেক দল বঞ্চিত হবে যারা কিছু নবীন চিন্তা নিয়ে এসেছে, আর এমন অনেক দল অনুগৃহীত হবে যাদের নাট্যচিন্তা গতায়ু বিগত যুগের। ইতিমধ্যেই এ ঘটনা ঘটেছে।

যে-মন্ত্রণালয় থেকে নাট্যোন্নতির এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নাট্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনও বিশেষ জ্ঞান নেই। তাঁরা চাকরী করতে এসেছেন। এবং এই বিভাগ থেকে বদলি ক'রে ভারতের পুষ্করিণীজাত শামুক-গুগলির সংরক্ষণ ও উন্নতির ভার দিলে এরা সমান তৎপরতার সঙ্গে পরের দিন থেকেই ফাইল দেখে চিঠিপত্র সই করতে থাকবেন। এঁদের লক্ষ্য অন্য, চরিত্র অন্য, এবং জীবনের সাধনাও অন্য। তাঁরা যখন লক্ষ লক্ষ টাকা দানসত্র করতে বসেন তখন সেটা সরকারের লিপিবদ্ধ আইন বা আইনের কারচুপি অনুযায়ীই ব্যয় হবে এটা স্বাভাবিক।

তাছাড়া, সরকার তো সমগ্র ব্যয়ভার নিতে পারে না। কেবলমাত্র এক একটা নাট্য প্রযোজনায় কর্থঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারে মাত্র। তার দ্বারা বড়োজোর এই হ'তে পারে যে যদি নাট্যাভিনয়টি দর্শকদের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয় তাহলে প্রথম খরচটা কিছু হাল্কা হোল এবং নাটকটা কিছুদিন চলতে পারবে।

কিন্তু যদি অনুগ্রহ না পায় তাহলে সেটা জোর করে চালাবার পয়সা কোথা থেকে আসবে? অর্থাৎ আবার [illegible] আস্তে হোল দর্শকদের মুখোপেক্ষী হয়ে।

[illegible]টা একটা খুব পুরানো কথা এবং আসল কথা [illegible]মাত্রেই ভোক্তার মুখাপেক্ষী। এককালে যখন [illegible]রাজা বা একজন জমিদারের দ্বারা পুষ্ট [illegible] যেত তখন সেই একজনকে তুষ্ট করতে পারলেই আপন চিন্তানুযায়ী শিল্পসৃষ্টির পথে কোনও প্রতিবন্ধক হোত না। এখন সে অবস্থা গেছে। এখন বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জনসাধারণকে ভালো লাগানো। এক ছবির ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম, কারণ মোটা দাম দিয়ে যারা প্রদর্শনী থেকে ছবি কেনেন তাঁরা ঠিক জনসাধারণের দলে পড়েন না, তাছাড়া গল্প উপন্যাস, মঞ্চ চলচ্চিত্র সবই জনসাধারণের রুচির মুখাপেক্ষী। এবং সেই ভালো লাগানোর প্রচেষ্টায় লারে লাপ্পা-র সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়ারেই পরীক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে কোনও অভিমান না রাখাই ভালো। পুরাকালে গ্রীস্ দেশের উৎসবে সফোক্লিসকে অন্য অনেক নাট্যকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছিল এবং তখনকার বিচারে সেইসব অখ্যাত নাট্যকারদের কাছে হারতেও হয়েছিল। তবু সফোক্লিস সফোক্লিস!

আজকের দিন হোল, বিশেষ ক'রে, ডিমোক্র্যাসীর দিন। যিনি এতোবড়ো একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, ভাগ্যবিধাতা হবেন, তাঁকেও সাধারণ লোকের দোরে গিয়ে ভোট ভিক্ষে করতে হবে। এটার মধ্যে যেমন কোনও দোষ নেই, তেমনি যে-কেউ শিল্পপ্রয়াস করবে তাকেও সাধারণ দর্শকের মনোগ্রাহী হবার চেষ্টা করতে হবে, এতেও কোনও দোষ নেই। কারণ, শিল্প মানেই যোগস্থাপন।

কিন্তু গোলমাল বাধে এই চিন্তায় যে কার সঙ্গে যোগস্থাপন! দর্শক বলতে কাদের বোঝায়? তারা সবাই তো বোধের দিক দিয়ে একস্তরভুক্ত নয়, সুতরাং কোন্ স্তরের সঙ্গে সেতুবন্ধন? কিংবা যদি মুষ্টিমেয় একটা দর্শকশ্রেণী কারোর থাকেও তবু তার স্বল্পতায় শিল্পীর আর্থিক ও মানসিক কোনওটারই স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না। তার ওপরে চোখের সামনে যখন সে অন্যের জনমন তোষণের সাফল্য দ্যাখে তখন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। কারণ সাফল্য মানেই টাকা, আর টাকা মানেই সামাজিক সম্মান। শুধু তাই নয়, সাফল্য মানে দেশের বেশীর ভাগ লোকের কাছে তার শিল্পের স্বীকৃতি। এটা কোন্ শিল্পী না আকাঙ্ক্ষা করে!

তার ওপর অপক্ক রাজনীতিগন্ধী একরকম শ্লোগান আছে যে, মোটা কথা মোটা ক'রে মোটের মাথার লোককে বুঝিয়ে দেওয়াও নাকি এক ধরণের শিল্প-প্রগতি। অতএব এই সমস্ত টানা পোড়েনের মধ্যে প'ড়ে এই যে বৃহৎ এবং এলোমেলো দর্শক-শ্রেণী তাদের সকলকেই এক সঙ্গে এক ক্ষেপ লা জালে ধ'রে ফেলবার ইচ্ছে হয়। আর সেই জন্যেই লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের অঙ্কে নেমে যেতে হয়।

আজকের সমস্ত মানুষই বড়ো ব্যতিব্যস্ত। অন্তরের কী যেন একটা ফাঁককে জোর ক'রে চাপা দিয়ে কলের পুতুলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দের ভান ক'রে যাচ্ছে। যে আনন্দ শান্ত, সমাহিত, যার পরিপূর্ণতায় মানুষের মনটা নিটোল মুক্তার মতো টল্‌টল্ করে সে-আনন্দের আস্বাদ আমাদের দর্শকের মধ্যে ক'জন জানে? শুধু তাই নয়, তার জন্য চেষ্টা করতেও আমরা বিমুখ। কারণ, মনে মনে জানি যে তাতে আমাদের অনেক লোভ সম্বরণ করতে হবে, অনেক দৃঢ় হ'তে হবে। তাই তার পরিবর্তে যতোটা সময় পারি হৈ-হট্টগোলের মধ্যে থাকতে চাই, নিজের মনের অস্থির প্রশ্নগুলোর হাত এড়াতে বাইরে আরো অস্থির হয়ে ঘুরি।

এই অস্থিরতাই আমাদের দর্শক-সাধারণের একটা বড়ো লক্ষণ হয়ে উঠছে। এবং এটা আর্থিক সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। যে-কোনও বড়ো হোটেলের বুকস্টলে বা পান-ভোজনাদির জায়গা থেকে ফুট-পাথের পত্রিকার দোকান ও সস্তা রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত আমাদের দর্শক-সাধারণের চেহারার প্রকাশ। অতএব, এহেন অস্থিরমতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে গেলে স্টান্ট্ চাই, জিভে সাড় আনতে গেলে ঝাল-মশলা চাই। কাজে কাজেই ব্যবসায়িক মঞ্চের ভিতরে বা বাইরে আমরা সবাই স্টান্ট্ মারফৎ মনোহরণ করতে চাইছি। এক্ষেত্রে নবনাট্য আন্দোলনের ধারা এবং ব্যবসায়িক মঞ্চের ধারা এক হয়ে মিলে গেছে। এইবারে অনেকদিন পর আবার বলা যায় যে, ব্যবসায়িক মঞ্চগুলি আমাদের জাতীয় মঞ্চে পরিণত হোল। কারণ বাইরের কোনও দলের তো আর বিশেষ ক'রে আলাদা কিছু করবার থাকছে না। বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে কেবল মোটা আবেগে আপ্লুত করবার চেষ্টা যেমন ব্যবসায়ীর তেমনি সকলের। সবাই তো এখন এক পথেরই পথিক। এবং সে-পথে ব্যবসায়িক মঞ্চের দাপট বেশীই হবে, কারণ তাদের এ শিক্ষাও অনেকদিনের, আর এই বাবদে অর্থ ব্যয়েরও ক্ষমতা বেশী।

এর মধ্যে স্টাইল তাই আসতে পারছে না। স্টাইল তো একটা আরোপিত জিনিষ নয়। সেটা মানুষের চরিত্রের মতোই ভিতর থেকে রূপ পায়। এবং সেটা নির্ভর করে জীবনটা কতো গভীর ক'রে বোঝা গেল তার ওপর। ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে জীবনবোধের বালাই নেই, ব্যবসায়িক ফিল্মেও নেই। অথচ অন্য দেশে আছে। আর্থার মিলার বা ওয়েসকার বা ইওনেস্কো বা এরকম অনেক নাম করা যায়—এদের সকলের নাটক অভিনয় করবার জন্যে কেবল অপেশাদারী সৌখীন দলকেই কোমর বেঁধে লাগতে হয়নি, বা কোথায় মহান্ আর্ট থেকে বিচ্যুতি ঘটলো সেই সম্পর্কে অজ্ঞাতকুলশীল সমালোচকদের কাছ থেকে নিখরচায় আক্রমণাত্মক উপদেশ শুনতে হয়নি। সেসব দেশের থিয়েটার তাহলে কারা চালায়? নিশ্চয়ই এরকম নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আগ্রহী দর্শক সেখানে অনেক। এখানেও যদি তাই থাকতো তাহলে ব্যবসায়িক মঞ্চের মালিকরাও অর্থের জন্যেই গভীর-বোধ-সম্পন্ন নাটক করতেন। এ'রা না করুন, অন্য মালিক এসে করতেন। কিন্তু আমার সন্দেহ যে তেমন শ্রেণীর দর্শক এখনো দেশে যথেষ্ট পরিমাণে হয়নি। ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে আজ পর্যন্ত বোধ হয় 'বহুরূপী'ই সবচেয়ে বেশী দর্শকদের পোষকতা পেয়েছে। সে সমস্ত জেনেই কিন্তু আমার এই উক্তি। এর বিশদ ব্যাখ্যা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, খালি এটুকু বলা যায় যে, এ আনুকূল্য সত্ত্বেও 'বহুরূপী'-কে খুব কষ্ট ক'রে চলতে হয়েছে।

এহেন অবস্থায় দর্শকদের ঔদাসীন্যে স্বাভাবিক কারণেই মানুষের ভিতরকার জোর ক'মে যায়, নিজেকে প্রকাশ করবার পরিবর্তে শিল্পী ভাবে কোনওরকমে দর্শকের মনোহরণ করা দরকার।

তার ওপর এই নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে বহু নতুন কর্মী এসেছেন যাঁদের অন্নের রোজ-গারের জন্য কিছুদিন পরেই ব্যবসায়িকদের দ্বারস্থ হ'তে হয়েছে। এবং সেই মঞ্চকে পরিবর্তিত করার বদলে নিজেরাই ধীরে ধীরে সেই আবহাওয়ার মধ্যে বদলে গেছেন।

যদি তাঁরা আপিসে চাকরী করার [illegible] সেখানে কেবল চাকরী ক'রে বাকি সময়টা নিজেদের দলের সৎ-নাট্য প্রচেষ্টায় সমানে অংশ গ্রহণ ক'রে যেতেন তা'হলেও এ আন্দোলনের জোর বজায় থাকতো। কিন্তু বেশীর ভাগের পক্ষেই সেটা নানান কারণে সম্ভব হয়নি। আর তাই আরো যে-সব নতুন কর্মী এসেছেন নাট্য আন্দোলনের মধ্যে তাদের বেশীর ভাগেরই লক্ষ্য রয়ে গেছে একদিন ব্যবসায়িক মঞ্চে বা ফিল্মে চলে যাওয়ার দিকে।

এর মধ্যে কিন্তু কোনও দোষারোপ করার উদ্দেশ্য নেই। মানুষকে খেয়ে পরে সমাজে বাঁচতে গেলে টাকার দরকার। অন্য আর সকল লোকেই অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্যে যথেচ্ছ পন্থা অবলম্বন করে যাবে, কেবল নতুন বোধ-সম্পন্ন শিল্পী অনাহারে কাটাবে এবং পরে একদিন 'দুঃস্থ শিল্পীর সাহায্যে' ব'লে তার জন্য একটা চ্যারিটি শো বা ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, এ ভবিষ্যৎ কারুরই কল্পনা করতে ভালো লাগে না। এবং যতদিন পর্যন্ত না সমাজের শুভবুদ্ধি এদের কাজ করবার ক্ষেত্র এবং মানুষের মতো বাঁচার সুবিধা ক'রে দিচ্ছে ততোদিন বড়ো গলা ক'রে কোনও দাবী জানানো শোভাও পায় না, শালীনও হয় না।

আজ আমাদের দেশ একটা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার পর আমাদের

(শেষাংশ ২৫২ পৃষ্ঠায়)

'চিত্ররথ' পরিচালিত ফিল্ম-এজ'এর 'কুমারী মন' ছবির নায়ক-নায়িকারূপে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

চিত্রনাট্যকারের ট্র্যাজেডি

বিধায়ক ভট্টাচার্য

পৃথিবীর সব দেশেই কিছু কিছু কাহিনীকার আছেন, যাঁরা চিত্রনাট্যকারও বটেন। অর্থাৎ সিনেমা কোম্পানী কাহিনী ক্রয় করলে, চিত্রনাট্যও কাহিনীকারকেই করে দিতে হয়। গ্রন্থকার-চিত্রনাট্যকারের প্রথম ট্র্যাজেডি এইখানে। মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার গ্রাহাম গ্রীণের একটা লেখা পড়েছিলাম, তাতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন—

"If you sell a novel outright you accept no responsibility; but write your own script and you will observe what can happen on the floor to your words, your continuity, your idea, the extra dialogue inserted during production (for which you bear the critic's blame) the influence of an actor who is only concerned with the appearance he wants to create before his fans . . . . He (script writer) knows that even if a script be followed word by word there are those gaps of silence which can be filled with the banal embrace, irony can be turned into sentiment by some romantic boob of an actor . . . . no, it's better to sell outright and not to connive any further than you have to at a massacre. Selling outright you have atleast saved yourself that ambiguous toil of using words for a cause you don't believe in—words which should be respected, for they are your livelihood, perhaps they are even your main motive for living at all."

ভদ্রলোকের কথাগুলোর মধ্যে কতকগুলো মর্মান্তিক সত্য লুকিয়ে আছে। আমার লেখা গল্প আমি বিক্রী করে দিলাম, প্রযোজক অথবা পরিচালক সেই কাহিনী নিয়ে গিয়ে নিজেরাই চিত্রনাট্য করে নিলেন। পরে যদি নিমন্ত্রিত হই, তবে ছবি দেখতে গিয়ে গল্পটিকে এদিক-ওদিক করা হয়েছে দেখে বেদনা বোধ করলাম, কিন্তু হতভম্ব হবার অথবা প্রচণ্ড আঘাত পাবার মতো কোন কারণ ঘটলো না। কারণ গল্প যদি ছাগশিশু হয়, তবে তা কিনে নিয়ে যাবার পর 'বক্স অফিস' নাম মহাকালীর দরবারে যদি তাঁরা সেটিকে লেজের দিক থেকেই কাটেন তবে সেই ছাগশিশুর ভূতপূর্ব মালিকের বলবার কিছু থাকতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রে আছে—দ্রব্য, মূল্যের দ্বারা শোধিত হয়। সেই হেতু ক্রীত জীবটির স্বত্ব ও স্বামিত্ব সবই ক্রেতার।

কিন্তু কাহিনীকারকেই যদি চিত্রনাট্য করতে হয় (যেটা শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রেই হয়) এবং সেই চিত্রনাট্যই যদি নাট্য বাদ দিয়ে চিত্রে পরিণত হয় তাহলে সে দুঃখের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। ঘটনা পরিবর্তন তো দৈনন্দিন ঘটনা, কিন্তু যত্ন করে লেখা, ধ্যান দিয়ে লেখা সংলাপগুলি যখন দেখা যায় যে, যদৃচ্ছ বদল হয়ে গেছে, তখন অন্য চিত্রনাট্যকারের মনে কী হয় জানিনে, তবে আমার তো মনে হয় যে, শহরের উপকণ্ঠে যে কোন একটা গলির মধ্যে একটা মশলার দোকান খুলে বসলে বোধ করি এর চেয়ে শান্তি পেতাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এমন হয়? পাঠক-পাঠিকা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, "আপনি ভাল সংলাপী বলে আপনার একটা উপাধি আছে। আপনি কেন এমন ব্যবস্থা যা চুক্তি করে রাখেন না, যাতে সর্ত থাকবে যে, সংলাপ বদলানো চলবে না!" কেন এমন হয় সে কথা পরে বলছি, তার আগে চলচ্চিত্রের অমরাবতী হলিউডে কী হয়—সেটা আগে বলি। টমাস ওয়াইজ্‌ম্যান নামে এক ভদ্রলোক হলিউডে গিয়ে সেখানকার প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংগে দেখা করে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। সেই যথাযথ আলাপ-আলোচনাগুলি ছেপে তিনি একটি বই প্রকাশ করেছেন। তাতে এক জায়গায় অভিনেতা ক্যারী গ্র্যান্টের সংগে তাঁর কথা হচ্ছে—

"We discuss the changing acting techniques of Hollywood. Grant belongs to the old school of personable actors who usually play themselves." "You'd be surprised how difficult it is," says Grant. "I am a great admirer of Marlon Brando. But you know, frankly, it's the easiest sort of acting when you can make faces all the time and hide behind them. Half these brillliant young actors from actors' studio, when they are told to pick up a glass and take a drink—they can't do it. They have to put some significance into it. They have to load it with hidden meanings. When Brando does a role he starts with the skeleton and adds to it detail by detail, filling it in. It's all intellectually worked out. But these boys—they can't just pick up a glass and take a drink so that the ice doesn't clink in the glass and sound like a thunderstorm on the sound track and so that the lights don't reflect on the glass. The technicians work like blazes to cover for them. Now Spencer Tracy, when he is told 'stub out your cigarette and take a drink', he doesn't ask, 'What is the hidden motivation?' He just does it. And he can do it so the ice doesn't clink".

এতো গেল মদের গেলাসে টুকরো বরফের শব্দ না হওয়ার কথা। এই সূত্র অনুসরণ করলেই আমরা দেখতে পাব, সংলাপের ক্ষেত্রেও অভিনেতা বলছেন—'এত কথা কেন বলবো?' 'এসব কথার মানে কী?' কাটুন, কাটুন; ছোট করে দিন। একদল বলেন উপরোক্ত কথা। আর এক দল বলেন—এত কথাই আমি বলবো না। এই বলে মুখ ফিরিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসেন।

বাংলা দেশে এই রোগ এনেছিলেন একজন নাম করা অভিনেতা। কিছু দিন পরে দেখা গেল সেই অভিনেতারই একজন প্রিয় অভিনেত্রীও বলতে শুরু করলো—এ কি! এত কথা লিখেছেন কেন? কোন মানে হয় এ সব কথার? কাটুন!

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমি শোনা কথা বলছি। তা নয়। যা বলছি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। প্রযোজকের একান্ত

বাদল পিকচার্স-এর নির্মীয়মাণ 'আগুন' ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। কাহিনী ঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা ঃ অসিত সেন।

অনুরোধে আমি চিত্রনাট্য নিয়ে সেই অভিনেত্রীর বাড়ীতে গেছি শোনাতে। যে চিত্রনাট্যটি লিখতে আমার হয়তো দীর্ঘ দুমাস সময় লেগেছে, তিনি সেই চিত্রনাট্যটি শুনে এক মিনিটে তাঁর মতামত দিয়ে দিলেন। বললেন—এ ঠিক হয় নি। কথা কেটে দিন। কথা কেটে দিন। আর চরিত্রটিকে এই ভাবে টেনে ওইভাবে শেষ করুন। শেষ দৃশ্যের ডায়লগ কিছু লিখতে হবে না। ও আমার মুডে যা আসে, তাই বলবো। তখন লিখে নেবেন। কেমন?

পরিচালক এতক্ষণ হতাশভাবে আমার পাশে বসেছিলেন। প্রযোজক (তিনি কাঠের ব্যবসা করেন। মোটা কথা মোটা করে বোঝেন। মিহি ব্যাপার বোঝবার কোন গরজ তাঁর নেই) তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললেন যে, টাকা খেয়ে পরিচালক একজন বাজে চিত্রনাট্যকারকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন। মনে মনে তিনি চটলেন। একবার বলেও ফেললেন—তাহলে না হয় অন্য কাউকে দিয়ে—। পরিচালক অবশ্য সে কথা কানে তুললেন না। আমতা আমতা করে সেই অভিনেত্রীকে বললেন—"তাহলে মুড্টা এলে এখনই যদি বিধায়কবাবুকে বলে দিতেন, তাহলে ভাল হতো। কেননা, পরশু স্যুটিং।

—বাঃ! পরশু স্যুটিং কী রকম? স্ক্রিপ্টই পছন্দ হলো না এখনো, স্যুটিং মানে? বললেন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী।

—দেখুন, একটু দয়া না করলে চলে কী করে? প্রায় তৃণের মতো নীচু হয়ে পরিচালক বললেন—সেট্ রেডি হয়ে গেছে। সবাইকে কল্ কার্ড দেওয়া হয়ে গেছে।

দেবী চটলেন এবার। বললেন—ও! কন্ট্রাক্ট সাইন করে টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছি বলে বুঝি মনে করেছেন—যা ইচ্ছে করাবেন আমায় দিয়ে? যান। আমি পার্ট করবো না। আবার হাতে পায়ে ধরাধরি কান্নাকাটি ইত্যাদি।

বাইরে বেরিয়ে বললাম—আমাকে মুক্তি দিন মশায়। এই বয়সে নতুন করে সংলাপ লেখা শিখতে পারবো না। ছেড়ে দিন। এবার পরিচালক মশায়ের চোখে দেখলাম জল। যাই হোক যথাসময়ে দেবী সেটে এলেন এবং অবিকল সেই বিখ্যাত অভিনেতার অনুকরণে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। "এত কথাই বলতে পারবো না। শুধু শেষ লাইনটা বলছি।" সেদিন সেটটা শেষ করতে না পারলে—পরদিন আর নায়িকার ডেট নেই। অতএব—?

বিপদের শেষ এখানেই নয়। সেটে এসেই অভিনেত্রী বলতে সুরু করলেন—আজ কিন্তু দুটোর সময় আমি চলে যাব। এত শরীরটা খারাপ। শুধু আপনার বই বলে আমি এলাম। তিনটি কাটের পর একবার মূর্ছিতও হয়ে পড়লেন। এর থেকে নিশ্চয় অনুমান করে নিতে পারা যাবে যে, এই তাড়াহুড়ো, ডেটের অভাব, তার ওপর মনিটার দিতে বসে অভিনেতা-অভিনেত্রীর "কি—কেন কোথায়" এর জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়। অতএব যে চিত্রনাট্য পরিশ্রম করে, চিন্তা করে দাখিল করা হয়, সেটা যদি পুরোপুরি ছবি না হয়, তবে সে দোষ কার?

এবার প্রশ্ন হচ্ছে—চিত্রনাট্যকার কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য করবেন কী ভাবে? কাহিনীর (সে নিজেরই হোক, অথবা অপরের হোক) যে বিন্যাস, সেই বিন্যাসই কি হবে চিত্রের? এ নিয়ে অনেক তর্ক অনেক আলোচনা পৃথিবীতে হয়ে গেছে, এখানেও হয়েছে। কিন্তু নিজের ধ্যানের রসে রসানো যে সুর, সেই তো সত্যিকারের সুর। মনে পড়ছে—বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক **Sergei Eisenstein** তাঁর **Film Form : Film Sense** নামক বইয়ের একটা জায়গায় একটি ঘটনা লিপিবন্ধ করেছেন। ঘটনাটি গ্রিফিথ সম্বন্ধে। লিখে রেখেছিলেন লিন্ডা আরভিডসন গ্রিফিথ।

"When Mr. Griffith suggested a scene showing Annie Lee waiting for her husband's return to be followed by a scene of Enoch cast away on a desert island, it was altogether too distracting. "How can you tell a story jumping about like that? The people won't know what it's about."

"Well", said Mr. Griffith, "doesn't Dickens write that way?"

"Yes, but that's Dickens; that's novel writing; that's different."

"Oh, not so much, these are picture stories; not so different."

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, উপন্যাসের যে বিন্যাস এবং বিস্তার, চিত্রনাট্যেরও তাই হওয়া উচিত। আসল কথাটা হচ্ছে গল্পের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত নাটক। যে নাট্যবোধ না থাকলে এক... ভাল উপন্যাস কখনই লেখা যায় না, ঠিক সে... নাট্য চেতনাই উদ্বুদ্ধ করে চিত্রনাট্যকারকে ভা... চিত্রনাট্য রচনা করতে। অন্ততঃ এ ব্যাপারে কাহিনীর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মৌলিক লেখকে... উপর নির্ভর করলে, পরিণামে ভালই হয়।

কিন্তু রসবোধের তো কোন ফরমুলা নেই... অতএব চিত্রনাট্যকারেরও কোন রক্ষা কবচ নেই... চিত্রনাট্যকারের ট্র্যাজেডি লিখতে বসেছি—কাজে... কিছু কিছু ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখলে... অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়।

গত বছর এক বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক আমাকে... একটি গল্পের আউট লাইন বললেন। বললেন—এটি... বিদেশী কাহিনী বটে, কিন্তু বাংলার Soil-এ... একে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কথাটা হল—কোন... প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকার অফিসে বসে ততোধিক প্রসিদ্ধ জনৈক চিত্র সাংবাদিকের সামনে। ... প্রযোজকের সেই ছবি করবার কথা, তিনি আমাকে... কিছু টাকা দিয়ে বললেন—এগিয়ে যান।

অনেক দিন আর কোন খোঁজ-খবর নেই... তারপরে ডাক পড়লো কোন নামকরা পরিবেশকের... ঘরে। সেই পরিচালক ছিলেন সেখানে। বললেন—... এঁরা করবেন ছবিটা। কন্ট্রাক্ট করে টাকা নি... যান। বললাম—সেই ভদ্রলোক কোথায় গেলেন... পরিচালক বললেন—সে আমি বুঝবো। আপনি... কাজ করুন। কাজ সুরু করলাম। প্রথমবার... দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার। প্রত্যেকবারে আগের... বারের স্ক্রিপ্টকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নতুন ক... লিখলাম। ইতিমধ্যে সংসারের প্রয়োজনে আরো... কিছু টাকা এনেছি। প্রত্যেকবারই শুনে সে... পরিচালক বললেন—নাঃ! লাগছে না। এর ম... বিধায়ক ভট্টাচার্যকে খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি!

—হ্যাঁ। বিধায়ক ভট্টাচার্য কই এর মধ্যে?

চার বারের বারও ওই কথা বললেন। ... উদ্বেগ প্রকাশ করেই বললেন—"এরা চাপ দি... আমার ওপর অথচ—! কী করা যায় বলুন তো... আরতো অপেক্ষা করবারও সময় নেই।

বুঝলাম। খুব পরিষ্কার করেই বুঝলা... ব্যাপারটা। দিনের আলোর মত স্পষ্ট বুঝ... পারলাম যে, পরিচালক আর একজন কাউকে ক... দিয়ে রেখেছিলেন। তাকে সাহায্য করতে চাইছে... এবার। বললাম—আপনি অন্য কাউকে দি... করিয়ে নিন। আমার অক্ষমতার জন্য আমি খুব লজ্জিত।

—কিন্তু আপনার কন্ট্রাক্ট?

—ক্যান্সেল করে দিন। টাকা যা পেয়েছি—আর চাই না।

—স্বত্ব ত্যাগ করলেন বলে আপনি সই ক... দেবেন তো? আমি কী করবো বলুন। এরা ব... তাড়া দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু—

—ঠিক আছে। বললাম।

সই করে দিলাম। "এ গল্পের ওপর আমার অ... কোন স্বত্ব বা স্বামিত্ব রইলো না। আপনারা আমা... চিত্রনাট্য থেকে যে কোন দৃশ্য যে কোন সংলা... (পুরো বা আংশিক) ব্যবহার করতে পারবেন, তা... আমার কিছুই বলার অধিকার রইলো না। ব... বাহুল্য, পরিচালক নতুন দলের একজন। ত... প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর রসবোধ... আমি তৃপ্ত করতে পারলাম না, সে আমার দুর্ভাগ্য। আমারই একান্ত অক্ষমতা।

আরো কিছুদিন পরে—সেই প্রখ্যাত চি... সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা। তিনি রাগ করে বললে... —তোমার ওপর আমি রাগ করেছি। অমুক ব... ছিলেন—তুমি তাঁর স্ক্রিপ্টটাই শেষ করে দাও...

মুক্তি প্রতীক্ষায়—
সন্ধ্যারাণী
সৌমিত্র
অনিল
নির্মলকুমার
কনিকা মজুমদার
সন্ধ্যা রায়
অভিনীত
বাদল পিকচার্সের নিবেদন
তারাশঙ্করের
আগুন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অসিত সেন
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী
"দ্রুত সমাপ্তি পথে"
একটি অমানুষ মানুষের চলমান জীবনোপাখ্যান
উত্তম কুমার
অরুন্ধতী
অভিনীত
শিউলি বাড়ি
ছবি বিশ্বাস · রঞ্জনা · দিলীপ রায় · জহর রায় · তরুণ কুমার
• একমাত্র পরিবেশক ; প্রভা পিকচার্স •

বাঙলা ছায়াচিত্রের সংগ্রামী শিল্পী

এন-কে-জি

পঞ্চাশোত্তর সংখ্যা থেকে নামতে নামতে বাঙলা চিত্রশিল্পের বার্ষিক উৎপাদন সংখ্যা আজ, সালতামামীতে দেখা যায়, পঁয়ত্রিশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা বলছি গত বছরের 'পুজো থেকে এ বছরের 'পুজো পর্যন্ত পুরো বারো মাসের হিসাবের কথা,—বাঙালীর শত দুঃখে বেদনায় মথিত জীবনেও শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর অবকাশকেই তার সমাজ-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ধরে নিয়ে।

শুধু সংখ্যামূলক বিচারেই নয়, আরো নানা জটিল সমস্যা ও অপ্রত্যাশিত বাধাবিপত্তির কবলে পড়ে বাঙলা ছবির অবস্থা আজ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রেরই মতো। আশঙ্কিত শুভানুধ্যায়ীরা বলছেন, তার নাভিশ্বাসের আর বড়ো বিলম্ব নেই। বর্ধিত শুল্ক ও আমোদ-করের গুরুভারে সে আজ অবনমিত। সম্ভব ও শালীনতার গণ্ডি অনেকখানি পেরিয়ে যাওয়া তার ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী উৎপাদন-ব্যয়, অনেকগুলি প্রকৃত সুন্দর ও সুফল সম্ভাবনা-মণ্ডিত 'বড়ো' ছবির শোচনীয় ব্যবসায়গত ব্যর্থতা,—এবং এ সবকিছু ছাড়িয়ে আজকে যে কুশ্রী ও নির্মম, আত্মবিধ্বংসী, অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব তার নাগপাশ বিস্তার করে এই শিল্পেরই আপন প্রাঙ্গণে ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে শিল্পী ও কর্মীকে প্রযোজকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলে গোটা চিত্র প্রযোজনার শিল্পগত অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে,— এই এতোগুলি প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে জর্জরিত চিত্রশিল্পকে কোন্ পথে ও কিভাবে সাহস ও সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এ সমস্যায় এই শিল্পের চিন্তানায়কেরা আজ বিভ্রান্ত। এর সম্মুখ ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে আজ নিকষ কালো।

নানা বিপত্তি ও বিপর্যয়ের ঝঞ্ঝা এই সহায় সম্বলহীন কিন্তু আপন লাবণ্যরসে উজ্জ্বল বাঙলা চিত্রশিল্পের মাথার ওপর দিয়ে এর আগেও বয়ে গেছে, কিন্তু সে ঝড়ে তাকে বিমূঢ় ও বিধ্বস্ত করতে পারে নি। তার বৃহত্তর ও মহত্তর শিল্প প্রেরণাকে প্রাণের ঠাকুরের মতো তার মগ্নচৈতন্যে জাগ্রত রেখে সে তামসী রাত্রির ভয়ঙ্কর বিপদে এগিয়ে গেছে সাবধানে। সাধারণ হিন্দী ছবির নয়নমনোলোভন নির্লজ্জ যৌন-উত্তেজনা, তার কুৎসিত কাহিনীগত মূর্খতা ও অতি নাটকীয় অবাস্তবতার বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সে অগ্রাহ্য করেছে; সেই হাস্যকর লাস্য, নৃত্য, সঙ্গীত ও কৃত্রিম ঘটনাচক্রের চাঞ্চল্যকর, আসুরিক আবেদনকে তার অর্থকরী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও অবহেলায় উপেক্ষা করে, বাঙলা ছবি শুধুমাত্র মরমী ও রসিক দর্শকের সূক্ষ্মমধুর আনন্দ-রসকেই একমাত্র পাথেয় করেছে। কিন্তু আজ এত করেও মনে হচ্ছে, সে শিল্পের মৃন্ময়-কুটির বুঝি বা ভেঙেই পড়ে। বাইরের শত্রু, বাইরের প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্থ প্রাবল্যের অহঙ্কৃত শ্লেষাত্মক হাতছানিকে বাঙলা ছবি এতকাল ঘৃণায় অতিক্রম করে আজ নাকি সে এসে প্রযোজক ও কর্মীর অর্থনৈতিক বিরোধের চোরাবালিতে পড়ে অতলে নিমজ্জিত হতে বসেছে। কেউ নাকি কারুর কথা শুনবে না। এ যেন দ্বিমুখী নাগিনী পরস্পরকে একই দেহের দুই প্রান্ত থেকে আক্রমণ করে গ্রাস করে ফেলা, উভয়ে উভয়ের অবলোপ সাধনের সাধনায় উন্মুখ নাকি। তৃতীয় পক্ষ তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস দিয়ে মোহমান করে উভয়পক্ষকে উৎসাদনের পথে ক্রমেই ঠেলে নিয়ে চলেছে উত্তেজক বাক্যসুরায় মদির করে। তার চতুর মুখোসের নীচে আত্মগোপন করে সে তার খলহাস্যকে চাপা দিয়ে রেখেছে, চরম ধ্বংস সাধনের নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে অট্টরোলে ভেঙে খান্ হয়ে পড়বার দুর্বার লোভে।

দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে পড়ে বাঙলা শিল্পের দীন সাধকেরা আজ চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে। কি করে প্রতিকূল ও বিমুখ মনোভাব ও ধ্যানধারণা মিলিত ও সুগ্রথিত করা যায় এবং এদের আ… শিল্পগত লক্ষ্য ও ভারসাম্যকে সংবদ্ধ পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় নতুন করে শিল্পের প্রাণধর্মকে নতুন সৃষ্টির দীক্ষায় দীক্ষিত করে, সেই চিন্তা আজ স্থির ও নিরপেক্ষ শুভাকাঙ্ক্ষীদের অস্থির করে তুলেছে। শুধু শিল্পের গরিমায় মহিম দীন চিত্রসেবকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজ বুঝি ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত দস্যু দানবের হাতে পড়ে ভাঙতে বসেছে। ভাই যখন ভাইয়ের গলা টিপতে বসেছে, সূক্ষ্ম আইনের কঠিন অস্ত্রশস্ত্রে ও বর্মে সুরক্ষিত হয়ে দুই পক্ষ মরীয়া হয়ে পরস্পরকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত করতে চলেছে, অবহেলিত কলা-লক্ষ্মী তখন ধূলিশয্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। হিন্দী ও ইংরেজী ছবির অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যা করতে পারে নি, সরকারী ঔদাসীন্য ও অর্থগৃধ্নুতার রক্তশোষা নিষ্পেষণচক্র যা করতে পারে নি, আজ বোধ হয় সেই বহু অজ্ঞাত শত্রুর অভীপ্সা সাধিত হতে বসেছে বিচারবুদ্ধিভ্রষ্ট, ন্যায়ভ্রষ্ট আত্মসংগ্রামের নির্মম ধ্বংসলীলায় আজ… হয়ে এই সংগ্রামের শেষে দুই ক্লান্ত পরিজনের, দুই বিধ্বস্ত সৈনিকের রক্তধারা যখন ভাঙা কুটিরের আঙিনাকে লাল করে তুলবে, তখন দেখা যাবে বাঙলা চিত্রশিল্পের সেই প্রসন্ন…নয়না, বরাভয় কুটিরলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন … অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে অশ্রুমার্জনা করতে করতে। বীণাপাণির অতুলপ্রসাদ হিংসায় কালো ও পূতিগন্ধময় বাতাসে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মারা যাবে।

অথচ, এ কথা কল্পনা করতে কষ্ট হয় যে বাঙলা ছবির মালিকেরা, তার প্রযোজকেরা এতোকাল যাবৎ কেবল তাদের কর্মীদের শোষণচক্রে নিষ্পেষিত করেই তাদের কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি পরিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কেননা, মোটা সত্যটা এই যে শোষণকারী চতুর ব্যবসায়ীর যে অর্থবল থাকা প্রয়োজন সেই অগাধ অর্থস্বাচ্ছন্দ্য তার কোনদিনই হয়নি। একথা সবাই জানেন, শুধু ধ্বংসের দেবতা 'তৃতীয় পক্ষ' ছাড়া, যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে অযাচিত। কৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁরা তাদের নির্দয় রাজনৈতিক অভিযান-এর রথচক্রে বিজয়াভিযান চালাতে আজ বদ্ধপরিকর। কে আছে তিমিরবিদারী, অলকবিহারী কৃষ্ণমুরারি রূপে অবতীর্ণ হয়ে এই কুরুক্ষেত্রের দানবলীলাকে স্তম্ভিত করবেন, তার ওপরে শান্তিবারি নিক্ষেপ করবেন? আজ আমরা, বাংলা ছায়াছবির অসহায় কুশলকামী কলাপিপাসুরা কাতর নয়নে চেয়ে আছি দিগন্তের পানে। সেই অনাগত দেবতার শঙ্খবাণীর আশায়।

চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে যাঁরা আজ উভয় পক্ষকে পথ দেখাতে চাইছেন তাঁদের প্রতিরোধ করা কিনা, এ সমস্যা চোখ যাদের, সেই উত্তেজিত একই ঘরের দুই অধিবাসীর। তাঁদের আজকে ভেবে দেখতে হবে চিত্রশিল্পের কর্মী ও প্রযোজকে

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ফিল্ম এন্টার প্রাইজার্সের 'দুই ভাই' ছবির একটি দৃশ্যে সুলতা চৌধুরী ও উত্তমকুমার।

পরের নিকটে ঋণ ও দেনা-পাওনার হিসাবটা অর্থের অঙ্কের খাতেই চলবে কি না; র কোন বৃহত্তর মহৎ শিল্পীর পূজারীর আছে কিনা পরস্পরে অটুট বিশ্বাস নির্ভরতার নিগড়ে নিগড়ে নিজেদের বেঁধে র। পঁয়ত্রিশখানার স্থানে পাঁচখানা ছবিও যদি বেরোয় হৃতবিশ্বাস আতঙ্কিত প্রযোজকদের প প্রেরণার ভাণ্ডার শূন্য করে, তবে কে র কার মুখে অন্ন-জল? যে বাঙলা ছবির জয়-ন আজ ভারতের আকাশবাতাস মুখর, যার ক্ষু শিল্পরসের উৎসবারিতে আজ প্রতি বিভিন্ন দেশের শিল্পপূজারী আবহস্নান করতে চাইছেন, ক্ষু রসলাবণ্য সৃষ্টির সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষা তে, সেই বাঙলা ছবি আজ চরম দুর্দিনের মুখীন। গণমতের প্রতিনিধি আমাদের রাষ্ট্র-য়ক ও কর্মনায়কেরা আজ নতুন ভারতের যে বাত্মক জাতীয় গঠনের পরিকল্পনার মধ্যে জাতীয় শিল্পকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন, তার রিধি থেকে তাঁরা এতো বড়ো দেশের এতো বড়ো একটা সুকুমারশিল্প—যা সমস্ত পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম চিত্রশিল্পের খ্যাতি অর্জন করেছে—তাকে সযত্নে বাহিরে নিক্ষেপ করেছেন, কুলাঙ্গার, ত্যাজ্য-পুত্রের মতো। এর স্বপক্ষে একমাত্র যে যুক্তি এঁরা দেখিয়েছেন, সরকার ও লোকসভার সর্বদলীয় সদস্যারা প্রায় এককণ্ঠে, তা হলো একান্ত অর্থাভাব। তৃতীয় পরিকল্পনার খাতে তাই এই নিঃশোষিত, অবহেলিত চিত্রশিল্পের উদ্দেশে এক অঞ্জলি প্রাণ-বারিও উৎসর্গ করা গেল না। এতো বড়ো একটা সুমহৎ শিল্পের মধ্যে নিহিত রয়েছে শিল্পের সুকুমার সৃজনরসের যে সুধাধারা, তা দিয়ে ভারতের তথা বাঙলার জনসাধারণের বিশাল মানবশক্তি, বিরাট প্রাণচৈতন্যকে তার আপন মনপ্রাণ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের সুক্ষ্ম কর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার অতুল আদর্শের চিন্তা কেউ করলেন না। কেউ চেয়েও দেখলেন না যে দেশের এই সুক্ষ্মতর রসসঞ্জাত উৎপাদন শিল্পের স্থায়ী ভিত্তি রচনা ও বহুল প্রসারের মধ্য দিয়ে বাঙলার ও ভারতের যাদুকরী ও সৃজনী ললিতকলা শিল্পকে কতোখানি জাতির উন্নয়নের কাজে লাগানো যেত।

এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, রাম বিনা যেমন হয় না রামায়ণ, জাতীয় যে কোন শ্রমশিল্পের, এমন কি সুকুমার শিল্পরসের সম্ভাবনাকে—ফল-প্রসূ করতে গেলেও তেমনি গোড়ারকথা, তার শ্রমকল্যাণ সাধন। কেননা, কৃষ্টির ক্ষেত্রে একজন শিল্প-শ্রমিক অত্যন্ত নগণ্য, সাধারণ কর্মী হলেও তার পরিচয় তো ওইটুকু মাত্রই নয়। শিল্পরসোৎপাদনের ভেতর দিয়ে ফলাতে হবে যে জাতীয় শিল্পরসের সমৃদ্ধি, যা হবে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ কৃষ্টির ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, তার সেই অফুরন্ত প্রাণশক্তির জীবন-কাঠি আছে এরই হাতে। বহু কর্মীর অনলস শ্রমে ও সাধনায় গড়ে ওঠা অজস্র শিল্পরস সৃষ্টির এই কীর্তিস্তম্ভ। আজকের দিনের সাহিত্য সঙ্গীত ও অন্যান্য সর্বোচ্চ কলাশিল্প যেমন, আমাদের এই চিত্রশিল্পও তেমন এই ক্ষুদ্র, সাধারণ কর্মী ও শ্রমিকের অসাধারণ বিরাট কীর্তি গাথায় উজ্জ্বল। সেই বিরাটত্বকে অনুভব করতে হবে তার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে। ললিত শিল্পের তাজমহলে আজ আর তাই শুধু সাজাহানেরই পরিচয় থাকে না, শুধু শিল্পপতির জয়গানই মুখরিত হয় না। অগণ্য কর্মীর লক্ষ হস্তের অদৃশ্য শক্তি তিলে তিলে গড়ে তোলে সে সৌধকে। কিন্তু তেমনি তাদেরও ভেবে দেখতে হবে যে তাদের অক্লান্ত শিল্পসেবা জাতির সমৃদ্ধি-সাধনার যাত্রাপথে প্রসারিত করতে গেলে তাদের তরফেও প্রশ্ন আছে আত্মত্যাগের, মিলিত শুভ-বুদ্ধির, দেশের সুকুমার শিল্পের প্রাণশক্তিতে গড়ে তোলার কার্যে নিঃস্বার্থ একাত্মবোধের। তাদেরও জানতে হবে যে জাতির কলালক্ষ্মীর প্রতিমার পায়ে তাদেরও কৃতজ্ঞ নমস্কারের স্বীকৃতিতে নমিত হতে হবে। শুধু স্থূল অর্থের বিনিময়ে সেই লক্ষ্মীর পায়ে শ্রম বেচবার মূর্খ চেষ্টা না করে তার মূল শিল্পশিখাকে তৈলসঞ্চারে উদ্দীপিত করে তুলতে হবে। জাতির নাড়ীর সঙ্গে এদেরও সাধন করতে হবে একান্ত সংযোগ-সূত্রের। সেই নিঃশব্দ দানের ইতিহাস, যার আলোকবর্তিকাকে বাঙলার চিত্র-কর্মীরা এতো বছর ধরে অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেও সমস্ত বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবারির মধ্যেও সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে চলেছেন, তার অগ্রগতির পথে তাদের নিজ দায়িত্বও তাদের পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই বাঙলা ছবি বাঁচবে, বাঙলা ছবি বাঁচলে তার প্রযোজকরা বাঁচবে, আর তারা বাঁচিয়ে রাখবেন এর এই অগণিত সংগ্রাম-শিল্পীকে। যাঁরা বলেন, বাঙলা ছবির মালিকেরা দুহাতে অর্থ কুড়োচ্ছেন সোনামুঠি দিয়ে, তাঁরা হয় পাগল, নয় মারাত্মক গৃহশত্রু। উভয়ে মিলে আজ তাই এক বৃহৎ ও সুখী অন্নপূর্ণার কলামন্দির গড়ে তুলতে হবে। শিল্পপতি প্রযোজক ও কর্মীর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তারই মূলনীতি হবে আজ উত্তরপক্ষের নতুন মনোদর্শন। বাঙলা ছবির দীনদরিদ্র কিন্তু মনের দীপ্তিতে সুস্থ, সুন্দর শিল্পীদের অনাবিল ও অদম্য কর্মশক্তিকে বিকশিত করতে হবে ত্রিমুখী মূলশক্তি দিয়ে,—শ্রম, পুঁজি ও কলারস। এই ত্রিবিধ কল্যাণের মধ্য দিয়ে আসবে বাঙলা ছবির নবজীবন, স্বতঃস্ফূর্ত নতুন সমাজ-হিতকর চেতনা। সেই গভীর দায়িত্ববোধ আজ ফিরে আসুক প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট কর্মী ও সাধকের বুকে। তা যদি না পারি, তবে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আজকের আমাদের মুখ চির কলঙ্কে মলিন হয়ে যাবে।

স্বর্ণমৃগ

মহেন্দ্র সরকার

সেদিন এক বহুল প্রচারিত বিলেতী সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটি প্রবন্ধের ওপর চোখ পড়ল। প্রবন্ধটির নাম 'হলিউডস হ্যাপি এন্ডিংস্' অর্থাৎ, হলিউডী চিত্রে অভিরাম সমাপ্তি। নাম দেখে কৌতূহলী হলাম। কিন্তু যত আশা নিয়ে প্রবন্ধটি পড়তে সুরু করেছিলাম, পড়তে গিয়ে দেখি অভিনব কিছু নয়, অনেকটাই মামুলী আলোচনা। মনে হলো লেখক একজন ঝানু ব্যবসায়ী। তাঁর বক্তব্যের সার মর্ম,—ছবির শেষ পরিণতিটুকু সুখের হওয়া চাই, তাহলেই সে ছবি টিকিট-ঘরে বাজী মাত করবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে লেখক বলছেন: সিনেমা ব্যবসায়ীর পণ্য, এবং যেহেতু এটা পপুলারাইজেশোনের যুগ সেহেতু ফিল্মকে বাঁচতে হলে পপুলার বা জনপ্রিয় হতে হবে। এবং পপুলার হতে হলে দর্শকের চাহিদা তাকে মেটাতে হবে। সে চাহিদার ফর্দ অবশ্য লম্বা—যেমন নাচগান, প্রণয়, রহস্য, রোমাঞ্চ, রঙ্গকৌতুক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উপকরণ যাই হোক্, ছবিটির শেষ করতে হবে মিলনে। তাতে যদি বাস্তবতা ক্ষুন্ন হয় ক্ষতি নেই।

সত্যিই আজকের দিনে দর্শক নামক জনতা কঠিন বাস্তবের নিগড় থেকে মুক্তি চায়। বাস্তব-জীবনে যে স্বপ্ন, যে ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ হলো না, ছবিতে তাই সত্যরূপে প্রতিভাত দেখতে চায়। উপরোক্ত লেখকের জনতার এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে তার মানস-পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারলেই ছবি 'হিট' করে—এ-বক্তব্যও হয়ত একেবারে অসত্য নয়। কেননা, চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি হলিউডের ঢেউ এদেশেও লেগেছে। এখানকার অধিকাংশ ছবির মিলনে সমাপ্তি অথবা ওই গোছের একটা কিছু।

এসব ছবির সবগুলোই যে 'হিট' করেছে এমন কথা কেউ বলবেন না। তাহলে ওই লেখকের দৃষ্টি অভ্রান্ত বলি কি করে?

যাঁরা ছবি নিয়ে ভাবেন তাঁদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি অনেক। এক একজনের এক-এক রকমের মত। এবিষয়ে এক পোড়-খাওয়া প্রযোজকের অভিমতটুকু উল্লেখ করার মত। ইনি অনেক দেখেছেন, অনেক ঠকেছেন, শেষে ফরমুলায় বিশ্বাস হারিয়েছেন। এঁর মত হচ্ছে: যেকালে বলা হ'ত আমেরিকানরা রোমান্টিক ছবি ভালবাসে, জাপানীরা ভালবাসে ট্র্যাজেডি, আর ভারতীয় দর্শক অ্যাডভেঞ্চার বা অ্যাকসন ছবি—সে-সব দিন গেছে। অভিজ্ঞ চিত্রনির্মাতারা বুঝে নিয়েছেন দর্শকের ভাল লাগার কোনো ছকে বাঁধা নিয়মানুবর্তিতা নেই—তাই কোনো শ্রেণী বিচারও নেই। ইনি বলেন, যে-ছবি ইংরেজের ভাল লাগে, ভারতবাসীকেও তা সমান আনন্দ দিতে পারে—এমন প্রমাণ আছে ভূরিভূরি। আসল কথা হলো ছবি—ছবি হওয়া চাই। অর্থাৎ ভালো ছবি হওয়া চাই।

কিন্তু ভালো নামক এই লোভনীয় বস্তুটি যে কী, আজ পর্যন্ত কেউ তার সংজ্ঞা খুঁজে পান নি। পাওয়া সম্ভবও নয়। কারণ, মানুষে মানুষে রুচির তফাৎ। আপনার যা ভালো লাগে আমার তা ভালো না-ও লাগতে পারে। আমার যে ছবি ভালো লাগলো তাই ভাল ছবি। আর সে ছবি যদি আরও দশজনের

এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে। মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল এক বাঁয়ে-ঘেঁষা সাপ্তাহিক পত্রিকায়। উল্লেখ করার মত বলেই সেটি এখানে তুলে ধরছি।

"সিনেমাজগতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবদান 'পথের পাঁচালী' আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়া এখানে আসর জমাইয়াছে। ছবিখানি দেখিয়া প্রথমেই প্রশ্ন ওঠা উচিত—এটা কি দেখাইতে আমেরিকায় পাঠানো হইয়াছিল? বাঙ্গালীর ঘরে ছেলেমেয়ে শিশুকাল হইতে চোর হইয়া গড়িয়া ওঠে, শক্তিমান বাঙ্গালী দুর্বল বাঙ্গালীর সব কাড়িয়া নেয়, বাঙ্গালীর পিসীমারা তাড়কা রাক্ষসীর মেজবোন, বাঙ্গালীর বউয়েরা ননদিনীদের খাইতে দেয় না, অভুক্ত ননদিনীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া বউ দুধের বাটিতে চুমুক মারে, ননদিনী জঙ্গলে পড়িয়া মরিলে তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে না, বাঙ্গালাদেশের প্রাথমিক স্কুল মুদীরা চালায়, লেখাপড়া শিখিলে গ্রামে বাস করা অসম্ভব—ইত্যাদি, এই তো? বাঙ্গলা সরকার দুই হাতে বাঙ্গালীর গায়ে চূণ-কালি মাখাইয়া যদি আমেরিকায় নিয়া নাচান এবং আমেরিকানরা যদি তাহা দেখিয়া মনের আনন্দে হাততালি দেয় তবে কি সেটা আমাদের পক্ষে খুব গৌরবের সার্টিফিকেট হয়? বাঙ্গলার নিয়ম এবং ব্যতিক্রমের তফাৎ বিদেশী বুঝিবে কিরূপে? বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পথের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন একটি শিশুর মনের উপর সম্ভব অসম্ভব ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয় তাহা দেখাইবার উদ্দেশে। ঘটনা তাঁর কাছে প্রধান ছিল না, প্রধান ছিল অপুর মনস্তত্ত্ব। অপুর পারিপার্শ্বিক যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তার সবটা বাস্তব নয়, তাহাতে কল্পনার স্থান অনেকখানি আছে। পারিপার্শ্বিককে তিনি অপুর মনস্তত্ত্বের পিছনে রাখিয়াছেন, তাহার মনের উপর [illegible] প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন। কোন জায়গায় ত[illegible] চেয়ে পারিপার্শ্বিককে বড় করিয়া তোলেন [illegible] ছবিতে ঠিক উল্টা করা হইয়াছে। অপুর ড্যাবা[illegible] পিট পিট করিয়া তাকানো এবং লাফাইয়া বে[illegible] ছাড়া আর কিছুই দেখানো হয় নাই। অপুর [illegible] বারবার কাশী ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন তার বাবা দেশে থাকিতে চাহিয়াছেন। শেষপর্যন্ত অপুর মার কথাই সত্য হইল। প্রমাণ হইল লেখাপড়া শিখিলে গ্রামে টেঁকা তো যায়ই না, বাঙ্গলাদেশে বাস করা অসম্ভব, ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতে কাশী যাইতে হয়। ছবির শেষে অপুরা যখন দেশত্যাগ করিতেছে তখন একটি চমৎকার রূপক দেখানো হইয়াছে—একটি অজগর সাপ[illegible] অজগর তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সর্বস্ব গ্রা[illegible] করিয়াছে, অপুরা দেশ ছাড়িয়াছে। এই অজগর[illegible] কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার?"

এই মন্তব্যের প্রধান আসামী অবশ্য পশ্চিমব[ঙ্গ] সরকার, কিন্তু এতে ছবিটি সম্পর্কেও অভিম[ত] প্রকাশ করা হয়েছে। আমার বক্তব্য ওই অভিমতটু[কু] নিয়ে। ওই মতের সঙ্গে আমি মনের মিল খুঁ[জে] পাইনে, কারণ ছবিটি ছবির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচা[র] করা হয় নি। এবং সম্ভবত আমার মত অনেকে পথের পাঁচালী ছবি সম্বন্ধে এই মতে সায় দি[তে] পারবেন না। কারণ দর্শক ছবিটি নিয়েছিল নিয়েছিল দেশে ও বিদেশে এবং ছোট বড় শিক্ষি[ত] অশিক্ষিত নির্বিশেষে। যিনি এমন তীক্ষ্ম মন্ত[ব্য] করেছেন ছবিটি নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন আবে[দন] সৃষ্টি করতে পারে নি, অতএব তাঁর চোখে পথে[র] পাঁচালী অসার্থক ছবি। আর আমার মত যাঁ[দের] কাছে এ-ছবি ভাল লেগেছে—পথের পাঁচালী তাঁদে[র] কাছে সার্থক ছবি।

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্প অবলম্বনে জীবন গ[ঙ্গো]পাধ্যায় প[রি]চালিত জোয়ালা প্রোডাকসন্স-এর

খন প্রশ্ন হতে পারে ঘোড়ায় চেপে অথবা চেপে চলন্ত রেলগাড়ীর সংগে পাল্লা দিতে যে দর্শক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে হাততালি -সেও তো কোন না দর্শক-শ্রেণীর চোখে ক ছবি? সে ছবি তুলতেই বা তাহলে আপত্তি র?

আপত্তি নেই। বৃহত্তর জন-মানস যদি এমন ই ভক্ত হন—তাহলে এই ছবিই তুলতে হবে। ত হবে, কারণ, এর থেকে উঁচুদরের ছবি তাহলে য না বুঝতে হবে। কিন্তু এ-ধরণের জন-মানসের টা ততোবড় না হলে বিপরীত ফল অনিবার্য। জন-চিত্ত অনুধাবনের সাফল্যে অথবা ব্যর্থতায় র সব কিছু নির্ভর। আমার ধারণা ছবির াজক বা পরিচালক এই জনচিত্ত নিয়ে গবেষণার ছেন। কিন্তু সেটি কি ঠিক গবেষণার বস্তু? চিত্ত আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, কাল তো সেখানে ড়ে নেই! তাহলে কোন্ পথ?

আমি পথ দেখাতে বসিনি। সমস্যার কথাই লাম। তবে একটা ধারণা ব্যক্ত করতে পারি। নির্মাতারা জনচিত্তের চাহিদার কথা ভেবে ষ্টি-চক্ষু আচ্ছন্ন না করে তাঁরা যদি নিজেদের ঢটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বেশ স্পষ্ট করে অনুধাবন েন, তাহলে হয়ত গোটাগুটি না হোক, এক বৃহত্তর জনচিত্তের সাড়া তাঁরা পাবেন। জনচিত্ত জয়ের আকাঙ্ক্ষায় যত গোঁজামিল, যত হাস্যকর অবাস্তবের ভিড় ছবিতে এসে পড়ে, নিজের চিত্ত-তুষ্টির সৃষ্টিতে সেগুলো অন্তত বাতিল হবার সম্ভাবনা। ছবির মর্মকথা তাতেই অনেক সহজ অনেক সরল অনেক আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

আর, আরও একটা ধারণার কথা বলতে পারি। সূর্যের সহজ আলোটা রশ্মি-বিচার-বিশ্লেষণে অক্ষম মানুষও যেমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে, সহজ আবেদনের ওই তারমুক্ত ছবিও সকল বিশ্লেষণের অগোচরেই হয়ত হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে।

মূলকথা, ছবি নিয়ে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের শেষ নেই। কমেডি ভাল কি ট্র্যাজেডি ভাল, ছবি মিলনে শেষ করা ভাল না বিচ্ছেদে—এ-প্রশ্নেরও শেষ নেই। কেউ কেউ হয়ত বলবেন ওসব কিছু নয়, সোজাকথা ছবিতে নতুনত্ব চাই। কিন্তু নতুনই বা বলব কাকে? কোন জিনিষেরই নতুনের অখণ্ড পরিচয় নেই। নতুনত্বের ঢেউ লেগে আজ যা ভাল লাগছে কাল হয়ত তা লাগবে না। তখন আবারও নতুন পথে পা বাড়াতে হবে। এই পা বাড়ানোরই জয় হোক্।

চিত্রনাট্যকারের ট্র্যাজেডি

(২৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শেষকালে তিনি বিরক্ত হয়ে অন্য লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

তার আগের বছরের আর একটা ঘটনা।

আর একজন প্রসিদ্ধ পরিচালক এসে গাড়ী করে নিয়ে গেলেন। সেও একটা ইংরেজী গল্পের বাংলা করতে হবে। গল্প করাই ছিল—তাঁর একজন আত্মীয়ার নামে। গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন —তোমাকে আগে টাকা দেব না। কাজ শেষ করে দিলে তবে দেব। প্রসিদ্ধ পরিবেশকের অফিসে বসে কথা হল। পাঁচশো টাকা দিলেন। সামনে পুজো। বললেন পুজোর আগে শেষ করে দাও। টাকাটা কাজে লাগবে।

দিন রাত্রি পরিশ্রম করে পুজোর আগেই দিলাম। বললেন—বেশ হয়েছে। আজ পাঁচশো নিয়ে যাও।

বাকীটা?

পুজোর পরে। আমি একটু দেখে-শুনে নিই। যদি কিছু করবার থাকে, করে দিও। টাকাও নিয়ে যেও।

হায়! সেই পুজোর পরের দিনটা আর এল না। দিনের পরে দিন গেল। স্যুটিং সুরু হল। ছবি শেষ হল। ছবি রিলিজ হল। তাঁর সংগে অনেকবার দেখা হল, কুশল জিজ্ঞাসা হল। কিন্তু সেই বাকী টাকাটা দেবার তারিখটা আর এল না। শুনেছিলাম—তিনি অনেকের কাছে দুঃখ করে বলেছেন—বিধায়কতো কাজ শেষই করে দেয় নি। ভাগ্যিস, নিজের লেখার একটু আধটু অভ্যাস ছিল, তাই ইত্যাদি।

বাংলা দেশের আর সব চিত্রনাট্যকারদের কথা বলতে পারবো না। কিন্তু নিজের কথা বলতে পারি, সবটাই ট্র্যাজেডি। চিত্রনাট্যকারেরও যে সমাজ আছে, সংসার আছে, পরিবার-পরিজন আছে এবং টাকার প্রয়োজন আছে,—এ কথাটা যেন বাজে কথা।

কত সময় মনে করেছি—টাকা পুরো না নিয়ে চিত্রনাট্য ছাড়বো না। পার্টিও রাজী হয়েছেন। একশো এক টাকা দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে চিত্রনাট্য করতে বলে গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে এলেন। বললেন—স্ক্রিপ্টটা একবার দিন। ডিষ্ট্রিবিউটারকে দেখিয়ে (শুনিয়ে নয়) চেকটা নিয়ে আসি। নিয়ে গেছেন, আর আসেন নি। কিম্বা আমার অভদ্রতার ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চেক লিখে দিয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে গেছেন। পরের দিন ব্যাংক জানিয়েছেন—Refer to Drawer কিম্বা full Cover not received।

বন্ধুবান্ধবেরা বলেন,—কোর্ট থেকে টাকাটা আদায় করো না কেন? এর কোন জবাব নেই। পুরো লিখে দিয়েও যখন শুনতে হয় কিছুই লিখি নি। কোর্টে গেলে তো প্রচার হবে, অমুকে খুব মামলাবাজ। খবরদার যেয়ো না ওর কাছে।

আমি এ কথা বলছি না যে, সর্বত্রই চিত্রনাট্যকার হিসাবে এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে। এমন অনেক পার্টি এসেছেন বা আসেন এখনো, যাঁরা কাজের আগেই পুরো টাকা দিয়ে দেন, অথবা চিত্রনাট্য দাখিল করার দিনই পাই-পয়সা চুকিয়ে দেন।

এতো গেলো চিত্রনাট্যকারের আর্থিক অনর্থ-পাতের কথা। এ ছাড়া ট্র্যাজেডির আরো দিক আছে। কিছুদিন আগে আমার একটি বিখ্যাত নাটকের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। নাটকটি ছিল
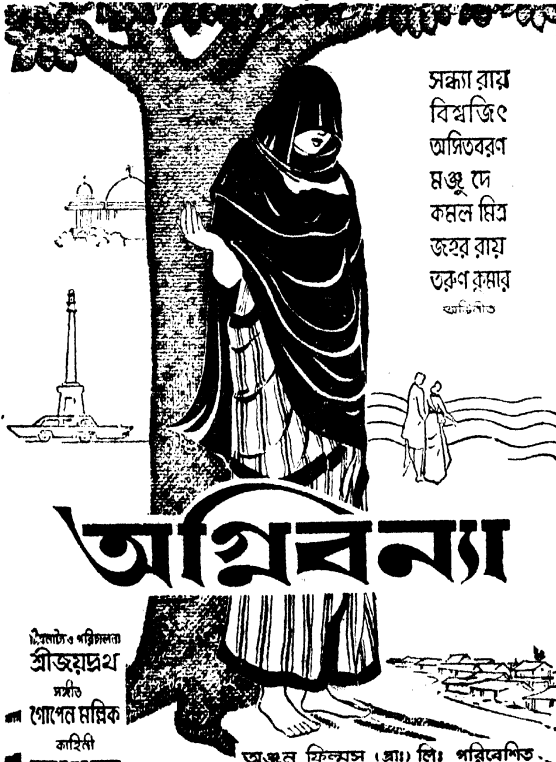
(শেষাংশ ২৫৩ পৃষ্ঠায়)

থিয়েটার আজকের ও কালকের

(২৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জেলা-জানার মধ্যেই কতো লোক রাষ্ট্রদূত হয়েছে, বা মন্ত্রী হয়েছে বা সরকারী দপ্তরে সেক্রেটারী হয়েছে। কতো লোক ডেলিগেশনে বিদেশ বেড়িয়ে আসছে। কতো নতুন বড়ো বড়ো ব্যবসার পত্তন হচ্ছে। এক কথায়, এ-রকম সুযোগ স্বাধীনতার আগে অকল্পনীয় ছিল। কাজে কাজেই একটা তাড়া প'ড়ে গেছে যে, কে এই বেলা কতোটা কাজ গুছিয়ে নিতে পারে।

তার ওপর বিদেশ থেকে আমরা প্রচুর ঋণ করছি। সেই টাকা দেশময় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি দেশের সম্পদ ততো পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে? কি জানি! ডি-ভি-সির মতো ঘটনা তো বহু হচ্ছে, যেখানে খরচ হিসাবের চেয়ে অনেক বেশী হোল, কিন্তু লাভ হিসাবের চেয়ে তেমনি কম হোল। সাধারণ লোকের হাতে টাকা বেড়েছে সন্দেহ নেই, তাই থিয়েটার বা সিনেমার বিক্রী বেড়েছে। হিন্দী ছবি এখন একটু ভালো চল্লেই কোটির ওপর মুনাফা দেয়। কিন্তু সে অর্থ-বৃদ্ধি জীবনের শান্তিকে দৃঢ়ভিত্তিক করছে কি? যে টাকা বেশী পাচ্ছে লোকে তা তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবার মতো যথেষ্ট কি?—এ-সব কথা অবশ্য অর্থনীতিবিদরা বেশী জানেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের ভয় যে একদিন তো এই বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করতে হবে, সেদিন আমাদের দশা কি হবে?

এই অবস্থার মধ্যে তাই শিল্পেও কিছুটা বিভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক। এবং এসেওছে। তাই আজ যারা হাতে কলমে কাজ করছে তাদের অনেকের মধ্যেই অস্পষ্ট উদ্দেশ্যের ব্যাকুলতা। প্রথম যখন 'নবান্ন হয়েছিল তখন কর্মীদের মনে এতো সমস্যা ছিল না। তখন জীবনের অংক অনেক সহজ মনে হয়েছিল। সেই অংক চলেছিল 'নতুন ইহুদী' 'ছেঁড়া তার' পর্যন্ত। কিন্তু তার পরেই অবস্থা বদলাতে লাগলো। কেউ কেউ অবশ্য উল্লিখিত নাটক তিনটির কেবল লোমহর্ষক দিকটা অসমঞ্জস-রূপে বাড়িয়ে বলাৎকার, হত্যা আর হাহাকার দিয়ে নাট্যাভিনয় জমাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ তাদের নামও কারুর মনে নেই।

'নবান্ন' ও 'নতুন ইহুদী'-র মধ্যে বিশেষ ক'রে একটা নতুন স্টাইল এসেছিল। সেটাকে বলা যায় প্যানোর‍্যামিক ভিউ। বিশেষ ক'রে 'নবান্ন'-কে বলা যায় যেন একটা ব্যাপক দৃষ্টিতে গ'ড়ে তোলা একটা বিরাট অর্কেস্ট্রেশন। একটা বিরাট ইতিহাস যেন মূর্তি পায়। 'নতুন ইহুদী'-তেও তা ছিল।

'নবান্ন'-র সমসময়ে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একটা কবিতা লিখেছিলেন—মধুবংশীয় গলি। আজও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সেটি অনন্য। তাতেও সমাজের এমনি একটা প্যানোর‍্যামিক পরিচয় ছিল। অর্থাৎ সেই সময়টা এসেছিল এই রকম একটা বোধের, যেখানে সমগ্র সমাজটাই উপলব্ধির বস্তু।

তারপরে (অবশ্য আমার ধারণায়) তেমন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে 'রক্ত-করবী'-তে, যে নাটক লেখা হয়েছে এদের সকলেরই অনেক আগে।

কিন্তু আজ যতো বিভ্রান্তিই এসে থাকুক, আমাদের আশা যে সেটা সাময়িক। আমাদের জাতির জীবনের মূলে যদি কিছু শক্তি থেকে থাকে তা'হলে তা একদিন এই অমাবস্যা কাটিয়ে প্রকাশ পাবেই। সেদিন এই জটিল জীবনের উপলব্ধি নতুন শিল্পীর নতুন স্টাইলে আমাদের মুগ্ধ ক'রে দেবে।

আজ সর্বত্র তর্ক উঠেছে আঙ্গিক নিয়ে। এক-দলের মতটা প্রায় এই রকম যে, কোনও প্রকার মঞ্চসজ্জা বা আলোর ব্যবহার থাকলেই যেন নিন্দার্হ। যেন সেটা ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে

তারাশংকর রচিত ও অগ্রদূত পরিচালিত 'বিপাশা' চিত্রের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন।

ও সস্তা। একমাত্র একরঙা পর্দার সামনে ফ্ল্যাট আলোয় অভিনয় করাই যেন শিল্পের চরম উৎকর্ষ। এ-সব কথায় খুব একটা বিস্মিত হবার নেই। কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রই হচ্ছে অস্বাভাবিক ঝোঁক দেওয়ার। বিপরীত দুটি জিনিষকে সুচ্ছন্দে বাঁধাই যে জীবনের নিয়ম তা আমরা ভুলেই যাই। দুটো পায়ে ব্যালান্স করতে পারে বলেই মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে, নইলে এক পায়ে ঝোঁক দিলে প্রত্যেক পদক্ষেপের পরেই হুমড়ি খেতে হোত।

কিন্তু এই সমস্ত তর্কাতর্কির ফলে নতুন নির্দেশকদের মনে ধাঁধা লাগছে যে, নাটককে সে সজ্জিত করবে কীভাবে, কী করলে অহেতুক দোষের ভাগী হ'তে হবে না। অর্থাৎ নিজের সৃষ্টির আনন্দ মুক্তি পাচ্ছে না, কেবল এই অবাস্তব তত্ত্বগত হিংটিংছটে দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে। এই সমস্ত মাকড়সার জাল ছিন্ন ক'রে নতুন শিল্পীদের ভাববার সময় এসেছে যে কেবল-মাত্র বর্জনের দ্বারা বড়ো হওয়া যায় না, পরিপাক ক'রে জীর্ণ করবারই প্রয়োজন।

প্রয়োজন হচ্ছে সকল রকম ছোট তর্ক পরিহার ক'রে মনকে বড়োতে নিবিষ্ট করা। ব্যক্তি আর সমাজ, এই দুয়ের সংঘাত এবং কোন্ পথে এদের সামঞ্জস্য—এই নিয়ে আজ পৃথিবীময় চিন্তার জগতে আলোড়ন। মানুষ সম্পূর্ণ হবে কী ক'রে বাঁচবে কোন্ পথে, এই নিয়ে আজ চিন্তা। টলার বা ওডেট্স্-এর স্টাইলের জায়গায় আজ নতুন স্টাইল এসেছে। ব্রেখ্‌টের অননুকরণীয় স্টাইল এসেছে। আরো এসেছে। মার্কিন দেশে এসেছে ইংলন্ডে এসেছে, ফ্রান্সে এসেছে, শুনেছি রাশিয় ও চেকোশ্লোভাকিয়াতেও এসেছে। এ সমস্তই কিন্তু বোধের পরম্পরায় যুক্ত। এতো সব নতুন কথা বলবার দরকার হচ্ছে যে পুরানো কাঠামোতে তাকে ধরানো যাচ্ছে না, তাই নতুন কাঠামো তৈরী হচ্ছে। আমাদের দেশের নাট্য-প্রচেষ্টার যদি কোনও যৌবন থাকে তা'হলে সেও তার গভীর উপলব্ধির কথা বলবে নতুন স্টাইলে।

এবং তখনই ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মতো কতো কটূক্তি তাকে ছিঁড়ে খাবার চেষ্টা করবে। দর্শক সাধারণের নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যও তার পথ রুদ্ধ করবার চেষ্টা করবে। এবং সবাই মিলে তাকে নিশ্চিহ্ন করার পর তার স্মৃতিসৌধ গ'ড়ে তাকে পুজো করার ছলে আরো নতুনদের বিদ্রূপ করবে। কিন্তু তবু যৌবন দুর্মর। সে আবার আর এক দেহে আবির্ভূত হয়ে উচ্চহাস্যে নিজের উপস্থিতি জানাবে। এ সে জানাবেই।

—

চিত্রনাট্যকারের ট্র্যাজেডি

(২৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিয়োগান্ত। এবং সেটি একটি রেকর্ড ভঙ্গকারী জনপ্রিয় নাটক। চিত্রনাট্যও আমি বিয়োগান্তই করেছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল অভিনেতা-অভিনেত্রীর রুচি মাফিক কিছু কিছু এদিক ওদিক করতে হচ্ছে গল্পের। সব শেষে প্রযোজক আমাকে বললেন ওটাকে কমেডি করে দাও!

সে কি!

হ্যাঁ পাবলিক আর কাঁদতে চায় না। হাসি-মুখে ছবি দেখে বাড়ী যাক্ সবাই।

কিন্তু এটা যে অত্যন্ত নামকরা নাটক। এর ট্র্যাজেডির রূপটাই জনপ্রিয়। কমেডি করলে—

ভালই হবে। ক'রে দাও।

না। বললাম। এবং তিন মাস পর্যন্ত এটাকে আমি ধরে রেখেছিলাম। শেষে একদিন প্রযোজক এসে আমাকে বললেন—টাকা যায় আমার যাবে, তুমি কমেডি করে দাও। দিলাম। ব্যবস। ভাল হয়েছে—না মন্দ হয়েছে জানি না; তবে আমাকে বহু লোকের কাছে এর কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাঁদের কাছ থেকে কটু কথাও কিছু শুনতে হয়েছে।

এরি মাঝে মাঝে মেঘান্ধকার দিনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মধ্যে কখনো কখনো এসে পড়েন—এক আধজন রসিক চিত্র-পরিচালক। তাঁর সংগে কাজ করতে বসলেই মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। মনে হয়, এখনো সব ফুরিয়ে যায় নি। এখনো এমন কেউ কেউ আছেন—যাঁরা যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার না করে যন্ত্রকে দিয়ে আপন রসবোধকে রূপায়িত করেন। মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার মধ্যে যে আশ্চর্য নাটক লুকিয়ে আছে, সেই নাটককেই প্রতিষ্ঠা করতে চান—চিরন্তনী সুষমায় মণ্ডিত করে।

চিত্রনাট্যকারের জন্য মহাজনদের অনেক ভাল ভাল উপদেশ আছে। যেমন Pudovkin বলেছেন,—

"The novelist expresses his keystones in written descriptions, the dramatist by rough dialogue, but the scenarist must think in plastic (externally expressive) images. He must train his imagination, he must develop the habit of representing to himself whatever comes into his head in the form of a sequence of images upon the screen. Yet more, he must learn to command these images and to select from those he visualises the clearest and most vivid; he must know how to command them as the writer commands his words and the playwright his spoken phrases."

অবশ্য কথাটা নতুন কিছু নয়। প্রত্যেকটি চিত্রনাট্যকারকেই এইভাবে এগোতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চিত্রনাট্যে নাটকের ধারাবাহিকতা নিয়ে আজ যে কারো কোন মাথা ব্যথা আছে তাতো মনে হয় না। না থাকাই মংগল। কেননা আজ দেশে চিত্রনাট্যকারের প্রয়োজন নেই বললেই হয়। অনেক পরিচালক আজকাল ওই সহজ কাজটি নিজেই করে নিচ্ছেন। যে পরিচালক আজকের দিনে কাহিনী লিখতে, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখতে ও তাকে যথাযথ চিত্রায়িত করতে পারবেন—অনর্থক তিনি ভাষা ও ভাবের জন্য অন্যের স্বারস্থ হবেন কেন?

চিত্রনাট্যকারের পারিশ্রমিকের কথাটা বলে এই বিশ্রী বৃত্তির ট্র্যাজেডির কাহিনী শেষ করতে চাই। আগে যে সময় অল্প খরচে ছবি শেষ করা যেতো—তখন চিত্রনাট্যকারের পারিশ্রমিক একরকম ছিলো। কিন্তু পরে যখন বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলো, ষ্টুডিয়ো ভাড়া দৈনিক এক হাজার টাকায় রূপান্তরিত হলো, ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো—সিনেমা কর্মবৃন্দের থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী পর্যন্ত সকলের পারিশ্রমিক, তখনো চিত্রনাট্যকার যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রইলেন।

তারও পরে, কোন কোন বিভাগের একজনের একক পারিশ্রমিক লক্ষ টাকা স্পর্শ করলো বা করতে চললো। বিভাগীয় পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সংগে ফিল্মেরও দাম বাড়লো। বাড়লো না শুধু চিত্রনাট্যকারের সামান্য পাওনার অংশটুকু। আজ ষ্টুডিয়োতে ক্ষুদ্রতম একজন কর্মীর প্রতি অবিচার ঘটলো তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন এগিয়ে আসবে। কিন্তু চিত্রনাট্যকারের প্রতি অবিচার হলে, তাকে তা মাথা পেতে নিতেই হবে। কেউ আসবে না এগিয়ে তাকে সাহায্য করতে।

কেন আসবে? আমি নামকরা চিত্রনাট্যকার। আমি জানি আমার কাছে পার্টি আসবেই। কোথায় কোন্ ছোটখাটো চিত্রনাট্যকারের প্রতি কী অবিচার ঘটলো, তা নিয়ে আমি কেন মাথা ব্যথা দেখাতে যাব? বরং এক পক্ষে সেটা ভালই হল বলতে হবে,—যেহেতু সে পার্টিও আমার কাছে এলো বলে। কারণ হারাধনের ছেলের সংখ্যা এখানে বেশী নয়। সামান্য অতি সামান্য।

সব শেষে আর একটি কথা নিবেদন করব। সেটি হচ্ছে এই প্রবন্ধে চিত্রনাট্যকার বলতে আমি আমাকেই ভেবেছি আর কাউকে নয়। এবং আর যাদের উল্লেখ আছে তাঁদের প্রত্যেকের সংগেই আমার সম্প্রীতির সম্পর্ক আছে। ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছি শুধু চিত্রনাট্যকারের ট্র্যাজেডি বোঝাবার জন্যে। নইলে যে সব ঘটনাকে আমার ভাগ্যের ফল বলে মেনে নিয়েছি, আজ তা নিয়ে আমার মনে কোন খেদ নেই। অতএব তাঁদেরও যেন না থাকে।

আসল কথা, আমার অভিমত হচ্ছে—বাংলা দেশে চিত্রনাটকের ট্র্যাজেডি মোটে ট্র্যাজেডিই নয়। আসলে সেগুলো হল কমেডি, গম্ভীর ট্র্যাজেডি হল অন্নসংস্থান বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিত্র-নাট্যকার হওয়া।

সমুদ্র পাখীরা নয় আত্মার আত্মীয়

॥ কমলা চট্টোপাধ্যায় ॥

সমুদ্র-পাখীরা এইমাত্র উড়ে গেল।
সন্ধ্যার আকাশে কালো কালো ছায়া হয়ে
তোমার আমার হয়তো পৃথিবীর সব মানুষের
সবুজ-সোনালী আশা নিয়ে গেল
তাদের পাখায়।

সমুদ্র-পাখীরা দিগন্তের পারে চলে গেল,
আমরা রয়েছি বসে ওদের রেখে যাওয়া
প্রচ্ছন্ন কৌতুক বুকে নিয়ে, সাগরের
ঢেউয়ে ঢেউয়ে
আবেগ কম্পিত কান্না আরও তীক্ষ্ন হ'ল।

ওই যে ঢেউ-এরা কাঁদে ফুলে ফুলে
অব্যক্ত ব্যথায়
বোঝেনা তা' সমুদ্র-পাখীরা, বোঝে
শুধু দীর্ঘশ্বাস ঝরানো পৃথিবী।
আর সহানুভূতিতে
গ'লে পড়ে তোমার আমার মত পৃথিবীর
আত্মার আত্মীয়।

একজন ইকারাসের খেদ

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দেখ, ভালোবাসা নেই। স্বপ্নের বিলাসে
কিছু স্পর্শ হৃদয়ের তটে আছড়ায়।

আটাশ বসন্ত গেল। পাখি কী উল্লাসে
প্রত্যুষের শাখে গায়, এ-মন ভরায়।

তারপর দিবসের খর প্রবহতা;
জীবিকার অন্ধকারে, আকাশ চৌচির!

মনে পড়ে, প্রত্যুষের গাঢ় নিবিড়তা!
অপরাহ্নে খোঁজে জল অবসন্ন তীর।

সুদীর্ঘ যৌবন চাই, জীবন-সম্ভোগ।
জীবনে নারীও কাম্য, সন্তান-সন্ততি

চাই, মন ও মনের মতন নীরোগ
অভ্যাস, ভাবনা। ব্যস্, স্বপ্নের ব্রততি

হেলেদুলে; কিন্তু এর মধ্যে ভালোবাসা
কোথায়, সে-ইচ্ছা চূর্ণ, দেহমন ভস্ম।

জাতিস্মর মনে পড়ে, অপরাহ্নে আশা
অন্ধকারে বৃথা খোঁজা, কালজয়ী শস্য।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশের গায়ে লেগে রয়েছে দু' চারটে ঝিমন্ত তারা। ভোরের ছাই রঙের নিস্তব্ধ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে ফুল। নরম নরম, মুঠো মুঠো ফুল; সাদা পাপড়িতে একটুও ধুলো নেই—এক ফোঁটাও দাগ লাগে নি। স্বর্গ থেকে সৌরভ এনেছে ওরা। এসে টুক টুক করে ঝড়ে পড়ছে পৃথার মুখের ওপর, গায়ের ওপর। আবেশে নিঃসাড় হয়ে রইল পৃথা।

এই ফুল, এই আকাশ, এই ভোরের মিষ্টি হাওয়া আর জানালার ফাঁক দিয়ে যে ঝিমন্ত তারাগুলো দেখা যাচ্ছে, ওরা থাকবে না আর এক ঘণ্টা পরে। পৃথার পৃথিবী জেগে উঠবে: ডোভার লেনের মস্ত বাড়ীর তিন তলার ফ্ল্যাটের প্রকাণ্ড শোবার ঘরে বেড সাইড টেবিলের ওপর টাইমপিসটা চীৎকার করে এলার্ম দেবে। পৃথা শুনতে পাবে কিন্তু নড়বে না। একটু পরে মণীশ হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে এলার্ম বন্ধ করবে।

বিছানা থেকে উঠে পড়বে। আওয়াজ হবে না। পৃথা যাতে জেগে না ওঠে তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে মণীশ। রান্নাঘর থেকে চায়ের ট্রে টা নিজেই নিয়ে আসবে। ফ্যাক্টরীতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে যায় মণীশ। টাই বাঁধতে বাঁধতে এক ফাঁকে অতি সন্তর্পণে চা ঢেলে নেবে। চোখ বুজে সমস্ত বুঝতে পারে পৃথা।

তারপর মণীশ যখন ওর মাথাটায় একটু নাড়া দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—'চলি, গাড়ী এসে গেছে।' একটা ভারী হাতের আদরের চাপ অনুভব করল; তবু চোখ খুলল না।

ও জানে, চোখ খুললেই আকাশটা আরো ফিকে হয়ে যাবে; তারাগুলো হারিয়ে যাবে, আর ঐ ফুলগুলো? আকাশ থেকে ভোরের হাওয়ার ভেসে আসা নিদাঘ সুগন্ধি ফুলগুলো মিলিয়ে যাবে স্বপ্নের মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে।

এই ফুলের মতোই তো? কাল সন্ধ্যায় সুব্রত চেয়ে ছিল এমন করে। সিঁড়ির মুখে বিদায় নেবার সময় বলল—'তাহলে, পৃথা, তোমার সঙ্গে কিছুই কথা হল না।' —'না' ঘাড় নাড়লো পৃথা। তাকালো সুব্রতর দিকে; ঝক-ঝকে হাসি, মিষ্টি চোখের চাওয়া। ঠিক যেন ফুল ঝরে পড়লো পৃথার মুখে, চোখে, মাথায়। যেন মধুর গন্ধে ভরে গেল নিশ্বাসের হাওয়া। বসবার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে মণীশ ও তার বন্ধুদের উচ্চ হাসির শব্দ।

পৃথা মুখ তুলল না। চোখ তুলে তাকাতে পারল না সুব্রতর চোখের দিকে—যদি সে ফুল-ঝরা স্তব্ধ হয়ে যায় হঠাৎ।

রাত্রে আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে দেখতে লাগলো পৃথা সন্ধ্যার ছবি; একটা অশরীরী স্পর্শ অনুভব করতে লাগল; গভীর সুখে ছড়িয়ে গেল হৃদয়ের পাপড়ি।

মণীশের ঘুমন্ত নিশ্বাসের অস্পষ্ট শব্দ মিশে যাচ্ছে টাইমপিসের অতি মৃদু টিকটিক শব্দের সঙ্গে। তার স্বামী। ডোভার লেনের মস্ত বাড়ীটা তার। সে বাড়ীর তিন তলায় মডার্ন ফ্ল্যাটের মধ্যে এই তার সাজানো সংসার। বাইরে ট্যাবলেটে মণীশের নামের সঙ্গে দু লাইন বিলিতি ডিগ্রী আছে খোদাই করা। বসবার ঘরে ভেনিস থেকে আনা কাট গ্লাসের ফুলদানীতে রজনীগন্ধা রয়েছে। লম্বা লম্বা পর্দা ঝুলছে পেলমেটের আড়াল থেকে। ডাইনিং রুমের কাঁচের আলমারীতে দেশ বিদেশের বাসনপত্র। দালানের ওপর বিরাট ঘড়িটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় সুর ছড়ায়। সব ওর। নিস্পৃহ চোখে পৃথা শুধু চেয়ে দেখে: কত সুন্দর অথচ এগুলো কত মিথ্যে। রান্নাঘরে চাবি টিপলেই গ্যাসের আগুন জ্বলবে। তেল নয়, ঘুঁটে কয়লার আবর্জনা নয়—ঝুল নেই ধোঁয়া নেই।

সব পরিপাটী। পৃথা এ বাড়ীতে পা দেবার আগে থেকেই সব গুছিয়ে রাখা। কোথাও এতটুকু সুবিধার অভাব নেই। ওর বান্ধবী এসেছিল একদিন সাজানো গৃহস্থালী দেখে তারিফ করে বলল—'ঠিক যেন বিলেতে এসেছি। তোর বাড়ী কি সুন্দর পৃথা! রান্না-ঘরটা কি ওয়াণ্ডারফুল। আমি হলে রোজ নতুন রান্না বানাতুম। তুই কেন তোর স্বামীর জন্যে করিস না?'

দু' হাতে আলসা ভেঙে পৃথা বলল—'কি হবে? ঐ তো বাবুর্চি ভালো ভালো খানা বানায়।' দু একবার রান্না করেছিল পৃথা। মণীশ খেয়ে বলল—'বেশ হয়েছে।' আধসিদ্ধ বলে, নুন কম বলে ঠাট্টা নয়, উপহাসে অতিষ্ঠ করে দেওয়া নয়, রান্নার অপটুতার জন্যে হাসা-হাসি নয়; কিংবা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নয়। শুধু ভাল হয়েছে বলে কৃতার্থের হাসি হাসা। স্বামীরা এমনি হয় নাকি? এমনি ভালো মানুষ, শান্ত স্বভাব: আর দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে এসে বলা—'বল কোথায় যাবে? সিনেমা না মাসীর বাড়ী, কিংবা লম্বা একটা ড্রাইভ। কোনটা?' ভারী মুস্কিল হয় পৃথার। ও বলবে আর তাই পালন করে ধন্য হবে মণীশ। এ কি রকম! কেন ঝগড়া করে না—পৃথার ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করে না কেন? শরীরের প্রত্যেকটা রক্তকণিকা বিদ্রোহ করে ওঠে। কেন রোমাঞ্চ লাগে না মণীশ যখন আদর করে তাকায়! কেন অসাধারণ নয় মণীশের হাতের স্পর্শ? শরতের বৃষ্টির মতো কেন ঝিরঝির করে ঝরে না ওর চোখের আলো; ভালো লাগায় শিউরে ওঠে না মুখের লাবণ্য?

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আর ছাই রঙা আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে পৃথা আঙুলে দিয়ে গোণে—এক, দুই......পনেরো। পনেরো বছরের বড় মনীশ ওর চেয়ে। একজন ভদ্রলোক। ওর ছোট কাকার মতো একজন ভদ্রলোক। অভাবহীন একটি সংসারী মানুষ। ওর সব আছে, একটি স্ত্রীও আছে। এই পরিপূর্ণতার সঙ্গে একটি নিশ্ছিদ্র তৃপ্তিতে ভরাট হয়ে আছে মণীশ। বাইশ বছরের একফোঁটা শরীরের মেয়ে পৃথা—যার মনের পাতায় পাতায় এখনও কলেজের দুষ্টুমীর ছবি—যার শরীরের স্তরে স্তরে চঞ্চলতা—বসন্তের সবুজ রঙের আভাস; তাকে পিছিয়ে যেতে বলছে মণীশের স্থুল অস্তিত্ব।

সুব্রত অনেক ছোট মণীশের চেয়ে। এ বাড়ীতে সুব্রতর অনেকদিনের আসা-যাওয়া। তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। মণীশের চেয়ে পৃথার সঙ্গেই বন্ধুত্বটা বেশী। সুব্রত পৃথাকে রাগায়, ঝগড়া করে। ঝগড়া হলে আধঘণ্টা কথা বন্ধ

খ। যেদিন বাড়ীতে আরো অনেক লোক কে সেদিন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সবার লক্ষ্যে মুখ ভেংচে চলে যায়। মণীশ হাসে—গ্মল চোখে বাৎসল্যের দৃষ্টি এনে ওদের কে চেয়ে দেখে।

আলোয় ভেসে গেল শোবার ঘরটা। দিন ারম্ভ হল। এখন ভাবতে হবে কি করবে ারাটা দিন ধরে? একটু অন্যমনা হয়ে রান্না-ের গেল, কিংবা রেকর্ড বাজাল। রেডিওর াবিটা দিগ্বিদিক ঘুরিয়ে হরেক রকম শব্দ ুনে ক্লান্ত হল। আর সব মেয়েরা তাদের াড়ীতে কি করে? সেলাই করে। পৃথা সেলাই জানে না। প্রাক্-বিবাহ যুগের খাস বেয়ারা বসন্ত মণীশের জামা-কাপড়ের তদন্ত করে, শার্টে বোতাম লাগায় আর টাই ইস্ত্রি করে। এখনও পৃথার হাতে তার অধিকার ছাড়তে র নয়। আসবাবপত্র ঝাড়া মোছার মতো তুচ্ছ কাজটাও পৃথার ঘুম ভাঙার আগে শেষ হয়ে যায়। সমস্ত বাড়ীটা ওকে অভ্যর্থনা জানায়। যেন অতিথি; যেন বলছে, তুমি আছ বলেই এতো সযত্ন প্রসাধন করছে সংসারটা। তাই বাঁধা রুটীনের একটিমাত্র সুরে তানপুরাটা বাঁধা রয়েছে টান করে; সে তার ঢিলে হয় না। সে তারে একটি মাত্র সুর বাজে—একই ছন্দ জাগে।

খাপ খুলে এসরাজ বাজাতে বসলো পৃথা। এলোমেলো আঙ্গুল চালাতে চালাতে কখন রাগিণী বেজে উঠলো; আর মনে হতে লাগলো এমন সুন্দর কাট গ্লাসের ফুলদানী দিয়ে সাজানো বাড়ীটা তার নয়।

সন্ধ্যাবেলা মণীশ ফিরে এসে শার্টটা হ্যাংগারে ঝোলাতে ঝোলাতে বলল—'কি করলে সারাদিন?'

—ঘুমোলাম। নিশ্চিন্ত, ঠান্ডা জবাব দিলো পৃথা।

—এসরাজ বাজালে?

—বাজালাম।

—আজ কি বাজালে? মনীশ কথাবার্তা টেনে চলে।

—সে আর বলে কি হবে। যা বাজাবো, নিজেই তো শুনবো।

মিষ্টি হাসি হেসে মণীশ বলল—'আচ্ছা, আচ্ছা। আজ সন্ধ্যের প্রোগ্রাম, বারান্দায় বসে তোমার বাজনা শোনা, কেমন রাজী তো?'

আকাশে সন্ধ্যাতারা। বারান্দায় অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। খাপ খুলে এসরাজ বাজাতে বসলো পৃথা। মণীশ আধশোয়া হয়ে পাইপ টানতে লাগলো। এ বাড়ীতে পৃথার ইচ্ছার প্রতিবাদ হয় না। তাই ইচ্ছার জোর নেই। যদি বলতো, তুমি একা শুনবে কেন! আরো পাঁচ-জনকে ডাকো, তবলচি ডাকো; চা সরবৎ জল-যোগের আয়োজন কর সেই উপলক্ষ্যে; মণীশ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যেতো, একবারও দ্বিধা করতো না। কিন্তু আজ একা মণীশকেই শোনাবে পৃথা।

অনেকক্ষণ পরে যদি মণীশ প্রশংসা করে বলে—'তোমার বাজনা তো আমি শুনিনি পৃথা—আমি দেখেছি তারের ওপর তোমার হাতের আঙ্গুলগুলো কেমন খেলা করছে: পর্দার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা একফালি আলো এসে পড়েছে তোমার চোখে; আমি শুধু তাই দেখেছি।'

কিংবা সুব্রতর মতো তিক্ত সুরে বলবে—'আচ্ছা পৃথা, এই যে নাকি সুরের বাজনা বাজাচ্ছো, আর আমাকে জবরদস্তি করে শোনাচ্ছ, এর মধ্যে কি নিষ্ঠুরতা নেই।' মণীশ কোনটাই বলবে না। এসব কথা ওর মুখে বেমানান। ছেলেমানুষী মনটাকে কবে কোথায় ফেলে এসেছে জানেও না; এসরাজে ছড়ি টানতে টানতে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ করছে পৃথা আর ভাবছে—এসব কথা বললে, মণীশকে কি অসম্ভব বোকা বোকা লাগবে।

গোল মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মণীশ শুধু বলতে পারে—'বেশ বাজালে! ভালো।' হয়তো বাজনা শোনেই নি সে। পৃথা জানে না—সামনে স্ত্রীকে এসরাজ দিয়ে বসিয়ে রেখে মণীশ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ফ্যাক্টরীর কথা ভাবছে। ভাবছে কটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে; কাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে; কোন্ কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে নেকস্‌ট প্রোডাকসনের আলোচনাটা করা যেতে পারে। বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ তখনও থামেনি, বেল বেজে উঠলো। একটু পরেই বসন্ত এসে হাতে একটা কার্ড দিয়ে বলল—'ইনি দেখা করতে চান।' এক ঝলক সেদিকে চেয়ে নিয়েই মণীশ বলে—'আজ একটা জরুরী কাজ পড়ে গেল পৃথা—ডোণ্ট মাইণ্ড।'

মণীশ বসবার ঘরের দিকে উঠে গেল।

পৃথা তেমনি বাজাতে লাগলো আপন মনে, তারপর একসময় থামিয়ে দিলো। বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো দূরে রাস্তার মোড়ে কখন দেখা যাবে একটা চেনা কালো গাড়ী; পরিচিত একটা হর্ণ আনন্দের সুর ডেকে আনবে। সুব্রত আসবে, তখন প্রাণ খুলে কথা বলবে পৃথা।

যদি সুব্রত না আসে তো দাঁড়িয়ে থাকবে এমনি করে। গুণবে একটার পর একটা কালো গাড়ী বিচিত্র সুরের হর্ণ দিতে দিতে, মোড় ঘুরে বাঁক পেরিয়ে চলে যাবে। যদি আটটা, নটা বেজে যায় তো একটা ফোন আসবে হয়তো। বলবে, 'মণীশদা কাজ পড়ে গেল আজ যেতে পারলাম না।' পৃথা জানে এর কোনটাই হবে না। না এলে না আসবে সুব্রত। তার জন্য এপোলজি চাইবে কেন!

ফোন এলো পরদিন সকালে। না সুব্রত নয়। মণীশ। বলল—'আড়াইটে নাগাদ তৈরী থেকো পৃথা, সিনেমা যাবে। কি খুশী তো?'

নিতে এলো সুব্রত। 'মণীশদা এলো না, বেরসিক। বল্লাম, চলো, পৃথা গান বাজনা ভালোবাসে। এটা একটা মিউজিক্যাল ছবি। তা ওনার কাজ পড়ে গেল। বললে, তুই নিয়ে যা পৃথাকে। বেচারী একা একা থাকে। আমার তো দেখেছিস্ নিশ্বাস ফেলবার জো নেই। কাজ নিয়ে গেল লোকটা।" ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগলো সুব্রত। 'একটা টিকিট নষ্ট।' আড়চোখে পৃথার দিকে তাকিয়ে বলল—'বয়ে গেল। মণীশদা না এলো তো না এলো—কি বল? আমাদের ছেলেমানুষের দলে কি করবে বল এসে?'

পৃথার মুখে হাসি খেলে গেল, চিবুকে টোল পড়ল। বেশ ভালো লাগছে। সুব্রত এসেছে—কথা বলছে—ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে—এর বেশী কিছু জানতে চায় না পৃথা।

:বিশ্বরূপা:

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

পূজার মূরতি ধরি'
কাছে আছ সদা নিশিদিন,
করিতেছে—স্নিগ্ধোজ্জ্বল
ধ্যানে জ্ঞানে বিচিত্র রঙীন।
রংয়ের খেলায় মেতে
পুলকিছে দেহ প্রাণ মন,
শিহরিছে—প্রতি অঙ্গ
প্রতি পলে নহে তো স্বপন।
পথহারা মরু পথে
অতীতের যত কিছু শোক,
কাল স্রোতে ভেসে গেছে
ভুলায় যে মুক্তির আলোক।
অনন্ত চলার পথে
এইরূপে নব রূপ ধরি,
ভ্রমিতেছি তীর্থে তীর্থে
সাথে আছ প্রাণের প্রহরী
তোমার সান্নিধ্যে ধন্য
দেহ মন প্রেমে ভরপুর,
ধ্বনিতেছে সুখে বুকে
কানে প্রাণে চরণ নূপুর।
পূজার কি মন্ত্র তন্ত্র
বৃথা খোঁজা চাহি না জানিতে,
তুমি সদা কাছে আছ
প্রেরণায় কণ্ঠের বাণীতে।
সাধনায় বেদনায়
নিত্যানন্দে নব প্রেরণায়,
একী দেখি বিশ্বরূপ
"বিশ্বরূপা" প্রণমি তোমায়।

হলে বসে ফিসফিস করে সারাক্ষণ কথা বলল ওরা। সিনেমার পর টিরুমে গিয়ে চা খেল। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফুলওয়ালার কাছে এক ঝাড় গোলাপ কিনল। পৃথা জানে এই বাড়তি ফুলগুলোর কোন দরকার নেই। ফুল যতটুকু দরকার, যেখানে থাকবার, পৃথার ঘুম ভাঙ্গার আগেই সাজগোজ শেষ করে বসে থাকে। গাড়ীতে বসে পৃথা বলল—'আচ্ছা বলতো সুব্রত, এই ফুলগুলো নিয়ে এখন কি করি! এতে ফুলের চেয়ে কাঁটাই বেশী।'

—এক কাজ কর। ফুলগুলো ছেঁড়ো আর কাঁটাগুলো গায়ে ফোটাও।

—এতো অর্থহীন কথা বল কেন?

—আমি যে ছেলেমানুষ।

—আর কতদিন ছেলেমানুষ থাকবে সুব্রত।

—যতদিন পারবো। আমি সেই হযবরল'র উদো বুদো। বয়সটাকে তিরিশ পর্যন্ত নিয়ে যাবো—তারপর আবার নামিয়ে দেবো। দেখ্‌তো তুমি বুড়ি হয়ে গেছ। মোটকা হয়েছ; তোমার তিস্পল মাংসতে বুজে গেছে। চুলগুলো ফাঁক হয়ে গেছে। হাহা করে হাসতে লাগলো সুব্রত।

একটা ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় লাগাল পৃথা।

—দেখতো কেমন লাগছে।

—বিশ্রী! না দেখেই জবাব দিলো সুব্রত।

—জানো, তোমার মণীশদা হলে বলতেন—সুন্দর লাগছে পৃথা তোমাকে।

—মণীশদা তোমার স্বামী—সে তো বলবেই। স্ত্রীকে খুশী রাখতে হবে না? আমি তোমাকে

অহেতুক খোসামোদ করতে যাবো কেন? —সুব্রত তাকালো ওর চুলের দিকে। আর সেই রকম কোমল চাউনির স্পর্শ এসে লাগলো ওর অনুভূতিতে।

পৃথা যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বাড়ী ঢুকলো, মণীশ তখন একপট চা নিয়ে অফিসের ফাইল খুলে বসে আছে। হঠাৎ মনে হল এই মানুষটা কি বোকা! একটুও সন্দেহ করছে না পৃথাকে। পৃথার মনটা এত উন্মনা কার জন্যে সে কথা ঘুণাক্ষরেও আমল দিচ্ছে না। স্নেহের দৃষ্টিতে তাকায়; সব সময় স্ত্রীকে খুশী করার চেষ্টা করে, এত স্ফূর্তি কেন পৃথার বোঝে না। মানুষটা নিশ্ছিদ্র পরিতৃপ্তিতে ভরে আছে।

যেই মনে হল মণীশ ওকে সুব্রতর কাছে নির্বিবাদে ছেড়ে দিচ্ছে; পৃথার মুখের ঔজ্জ্বল্য দেখে ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করছে না। অমনি সব রোমাঞ্চ হারিয়ে গেল যাতে ভয় নেই, ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই, তাতে রোমাঞ্চ নেই। যার ঈর্ষা নেই, বিন্দুমাত্রও ছেলেমানুষী নেই, হৃদয় যার উদ্বেল হয় না, বয়সের ভারে শান্ত হয়ে গেছে তাকে কি বলা যায়?

ভরাট শান্তির ডোভার লেনের ফ্ল্যাটে একদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে অসময়ে ফিরে এলো মণীশ। এতদিন পরে নিস্তব্ধ বাড়ীতে কলিং বেলটা চীৎকার করে বেজে উঠলো। খাস চাকর বসন্ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। অফিসের দু' চারজন সহকর্মী মণীশকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। ডাক্তারের বন্দোবস্ত তাঁরাই করলেন। কিন্তু ওষুধ বা ইঞ্জেকশনে বিরক্ত করার আগেই মণীশ চোখ বুজলো চিরকালের মতো। পৃথা বোকার মতো এঘর ওঘর ঘুরতে লাগলো। কাকে ডাকবে, কাকেই বা চেনে—মোটে তো সাত মাস বিয়ে হয়েছে। সুব্রত এসে আত্মীয়স্বজনকে খবর দিল।

এরপর কখন যে লোকজন এলো; মণীশের দাদা, দিদি, মামা, কাকার দলে ভরে গেল বাড়ীটা। প্রতিবেশীরা এসে পৃথাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। শূন্য মনে শুধু দেখতে লাগলো পৃথা। সবাই বলাবলি করলো—'আহা! পাথরের মতো হয়ে গেছে; একফোঁটা জল নেই চোখে। গভীর শোক এমনি জিনিষ।'

—ওকে একটু কাঁদাবার চেষ্টা কর—কে একজন গভীর সহানুভূতি দিয়ে বলল।

পৃথা বোঝাবে কি করে ওর কান্না আসছে না! তার জন্যে লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল কতগুলো দিন। বাড়ী ফাঁকা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে এতদিন ভরে ছিল বাড়ীটা।

বাবা ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

বললেন—'তুমি কি ঠিক করলে পৃথা, আমার সঙ্গে চল। এক সময় এসে এ ফ্ল্যাটটা খালি করে দেওয়া যাবে। ভাড়াও দিয়ে দিতে পারো।'

—'তা হতে পারে না'। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠলো। এখান থেকে চলে গেলে সুব্রতকে হারাতে হবে। ঘাড় নাড়লো পৃথা—"আমি কোথাও যাবো না এখান থেকে। এ সব

আশ্চর্য হয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—'তাহলে কি বলতে চাও তুমি একা থাকবে? একটা ছেলেমানুষ মেয়ে—কোন অভিভাবক নেই।'

—'কেন বসন্ত রয়েছে তো? তাছাড়া আমার বিয়েই হয়ে গেছে—সব শেষও হয়ে গেছে, অভিভাবকের দরকার কি?'

সুব্রত সোফায় বসে পা নাচিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছিল। ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে বলল—'খুব একটা বাহাদুরী হবে না? তুমি যাও বাবার সঙ্গে।' চোখের চাউনি ক্রুর হয়ে এলো পৃথার; তিক্ত কণ্ঠে বলল—'আমি যাবো না। তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পারো।'

পৃথা গেল না বাবার সঙ্গে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেই পরিচিত বাঁধা সুরে চলতে লাগলো দিনের রুটীন। সন্ধ্যার সময় বারান্দায় আধখানা ঝুঁকে পড়ে সেই রাস্তার বাঁকে চেয়ে থাকা, কখন আসবে সুব্রত একটা কালো গাড়ীর হর্ণ বাজিয়ে। তারপর অনর্গল কথা বলবে। নয়তো বেরিয়ে যাবে বেড়াতে, বসন্তর বাঁকা চাউনির পাশ দিয়ে। পাড়া প্রতিবেশী আড়ালে বলাবলি করবে—'এই সেদিন অমন স্বামী চলে গেল—শোক নেই; এরই মধ্যে নাটক সুরু করেছে দেখ।'

বলুক। হাসি পায়। মোটে সাত মাসের স্বামী, তাকে কতদিন মনে রাখবে? নিজের বাবা-মাকেই ভুলে গেল অনায়াসে। এই বেশ আছে। শুধু মণীশ নেই, আর সব আছে তেমনি ছন্দোবদ্ধ, তেমনি শৃংখলায় স্তব্ধ হয়ে।

মণীশ নেই। সুব্রত বাজনা শোনে। বারান্দায় সন্ধ্যার কালো ছায়া নামে। পৃথা এসরাজে ছড়ি টানে। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে সুব্রত হঠাৎ বলে উঠলো—উঃ থামো থামো! এই প্যানপেনে বাজনা আমার বিশ্রী লাগে।'

মৃদু হেসে পৃথা বলল—'এমন করে বলছ! তোমার মণীশদা হলে কি বলতেন জানো?'

—'জানি জানি।' অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিলো সুব্রত। 'মণীশদা তোমার স্বামী—তিনি অনেক কিছু বলতেন, কিন্তু মণীশদা তো নেই, অনেক দিনই নেই। এতদিনেও কি ভুলে যাও নি?'

এসরাজটা ক্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল পৃথা। এর জন্যে এতদিনের প্রতীক্ষা ছিল—অথচ কিছু বলতে পারছে না।

—'আমি মণীশদা নই।' এক ঝটকায় ওকে হাত ধরে টেনে তুলল সুব্রত। 'তুমি এরকম একা থাকবে না।'

—তাহলে কি করবো—কোথায় যাবো?

—আমি নিয়ে যাবো তোমাকে।

—না। দাঁত চেপে জবাব দিল পৃথা। মুখটা সাদা হয়ে গেছে; চোখে জল এসে গেছে।

কপাল কুঁচকে গেল সুব্রতর—'তবে কেন তুমি বাবার সঙ্গে গেলে না? কেন গেলে না?—পৃথাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো ও।

—সে কি তোমার কাছে যাবো বলে?

—নিশ্চয়। আমি তোমাকে বুঝেছি। ঠাস করে যেন চড় পড়লো পৃথার মুখে; রোমাঞ্চ লাগল না

—আমি বিবাহিত সুব্রত! কিছুদিন পরে তোমার খারাপ লাগবে।

বৈশাখ, বৈশাখ

হরপদ চট্টোপাধ্যায়

এখানে অনেক সূর্য ছাই হয়ে গেলো,
এত তেজ মুখর্ অংগারের।
অনেক চাঁদের বন্যা, প্রেমের মৌসুমী,
কল্পনার নর্মদা কাবেরী.
অবোধ্য মরুর গর্ভে হারালো হৃদয়।
কত উল্কা জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে গেলো,
এত গ্লানি মুখর্ অংগারের।

কত মন জাগে।
কোটি স্বপ্ন মেতে ওঠে নীল কামনায়,—
রাঙাবার রঙিন আশায়।
অমনি সে আলোড়ন জাগে;
ক্লেদাক্ত স্ফোটক কেঁপে, গর্জে গর্জে ওঠে।
রক্তলিপ্ত লাভাস্রোতে তারা
গলে, পুড়ে, জ্বলে, জমে ওঠে।
প্রাণ জমে' নিকষ পাথর।
বঞ্চনার বিচিত্র কটাহে
মানুষের খুলি দিয়ে মানুষের আহার-বিলাস,
এই আজ নির্মম দর্শন।

তবু কবি বলে গেছে, তাই,
মরু থেকে বিদায়ের আগে
সহস্রেরে ডাক দিয়ে যাইঃ
পারে যদি গড়ে যেন তারা
বিরাট মরুর প্রান্তে একটিও ছোটো মরুদ্যান।

—লাগবে না।

—তাছাড়া তোমার মণীশদা তো অনুমতি দেননি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল পৃথা।

এতদিন মণীশের সামনে সুব্রতকে ভয় করেনি। অকস্মাৎ মনে হল সহস্র জোড়া চক্ষু ওকে তাড়া করে বলছে—কি হচ্ছে পৃথা। কি করছ, কোথা যাচ্ছ!

—এ্যাবসার্ড! ভেংচে উঠলো সুব্রত। মণীশদা কি স্বর্গ থেকে নেমে এসে অনুমতি দেবেন? দরকার হলে তোমার বাবাই অনুমতি দেবেন!

—তা হয় না সুব্রত! ভয়ে চোখ বুজলো পৃথা। সুব্রতর শক্ত মুঠির মধ্যে হাতটা ঘেমে জল হয়ে গেছে। মণীশের হাতের সাজানো বাড়ীটা যেটা প্রতি প্রভাতে নতুন করে অভ্যর্থনা জানায় তাকে যেন অপমান করছে পৃথা।

সুব্রত চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো একটা কঠিন অন্ধকার অভিভাবকের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল পৃথার চেতনাকে। তা থেকে মুক্তি নেই। ডোভার লেনের নিরেট শান্তির বাড়ীটা মণীশের অশরীরী অলঙ্ঘ্য আদেশ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে শাসন করছে; যে পবিত্র ফুলগুলো সুব্রতর চোখের আলো থেকে ঝরে পড়ে সেগুলো যেন পুড়ে যাচ্ছে। সুগন্ধে আর ভরে যাবে না নিশ্বাসের হাওয়া; কোমল স্পর্শে আবেশ আনবে না। সব হারিয়ে যাবে প্রত্যাহের আঘাতে—; ছাই হয়ে যাবে শাসনের আগুনে।

সুব্রত আসবে। আবার তাকাবে পৃথার দিকে; কিন্তু পৃথা জানে মুঠো মুঠো ফুল ঝরবে না ওর চোখ থেকে।
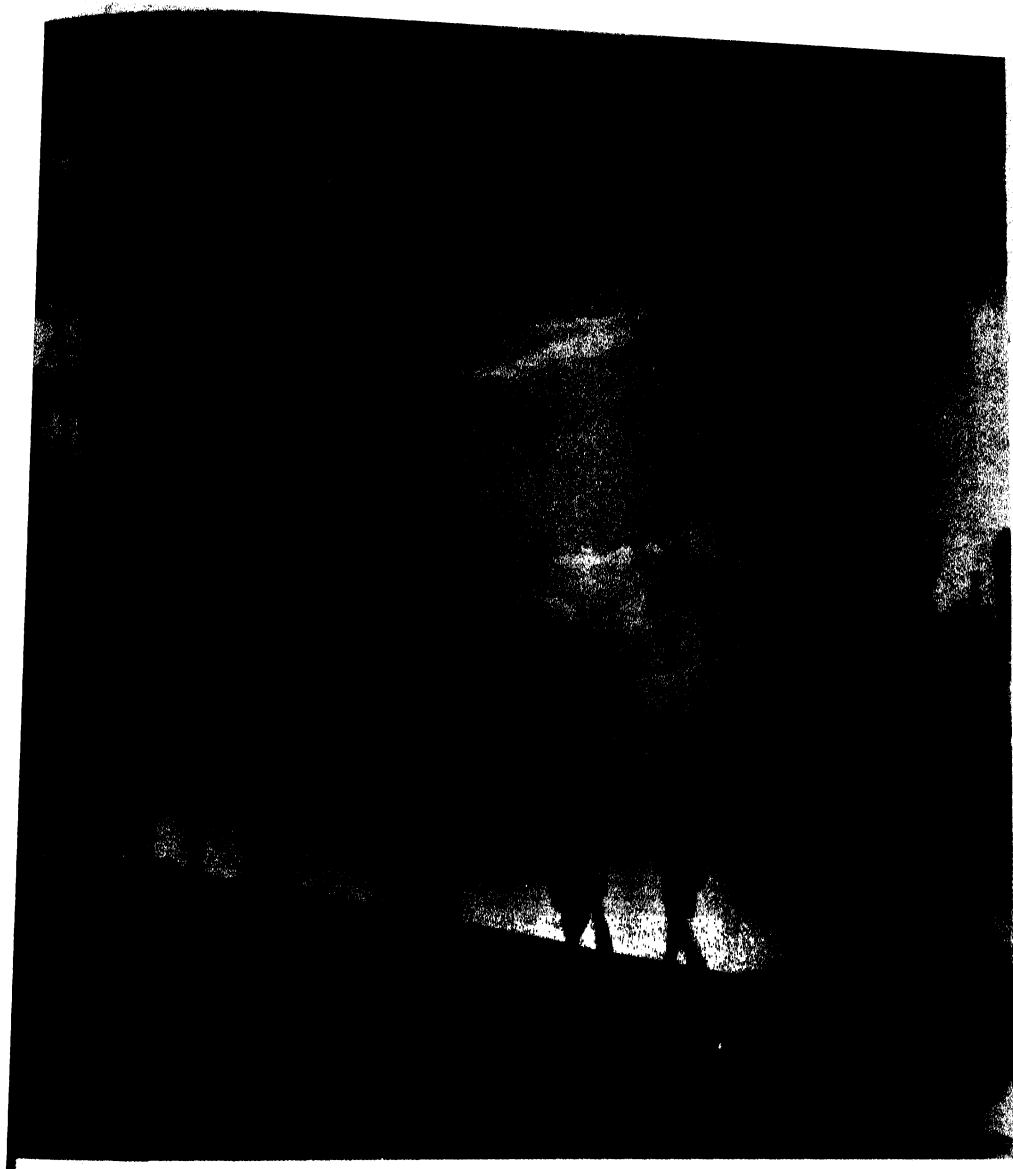
যারা রেলগাড়ির চেয়ে দ্রুত যায়

চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়
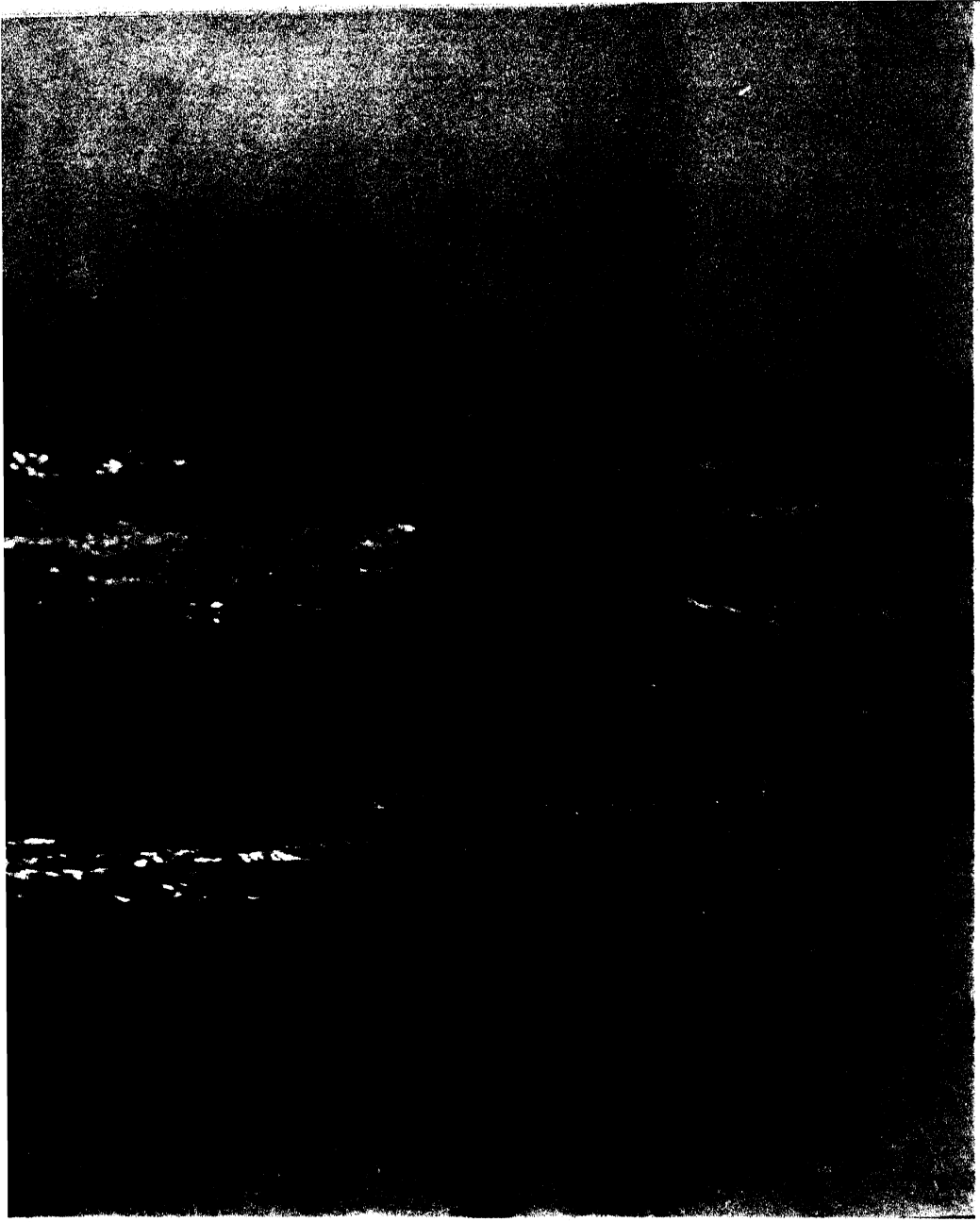
সাগর সৈকতে

সোনা চৌধুরী

ভারতে এক লিপি প্রচলন কার্যতঃ কতদূর সম্ভব

(১৮শ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিচার করা উচিত। এই সম্পর্কে যে লিপির কথাই স্থির করা হোক, অবিলম্বে তা সবার গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং কাগজে কলমে যদি বা তা সম্ভব হয়, অন্তত দু'তিন পুরুষ পাশাপাশি দুটি লিপি শেখার পর নোতুন লিপি তাদের মধ্যে কিছু এগিয়ে যেতে পারবে। অতএব এবিষয়ে ধৈর্য দরকার।

ভারতে বর্তমানে ব্যবহৃত দুটি লিপি ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় লিপিরূপে চলতে পারে কিনা সে কথা বিবেচনা করা যেতে পারে—নাগরী এবং রোমান। অবিলম্বে নাগরীকে অনুমোদন করা যায় না। কারণ, তাতে ভাষান্ধতার আগুনে ইন্ধন যোগাবে মাত্র। লিপির কথা ভাবতে আরো একবার আমরা ভাষার কথা চিন্তা করে দেখি। অনেক জাতীয়তাবাদীর কাছে এটি উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু এর পশ্চাতে অনেক গভীর কারণ নিহিত আছে।—অহিন্দী রাজ্যসমূহে অনেকেই হিন্দী একটি ভারতীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে বেশী পছন্দ করবে। বহুবার ইংরেজী ভাষার পক্ষ সমর্থনকারী ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ বার-বার এর হেতু প্রদর্শন করেছেন, কাজেই সে কথার পুনরুক্তি আমি করব না। আমরা সবাই জানি মুখে হিন্দী হিন্দী বলি বটে এবং যা আন্তরিকতাহীন ভানমাত্র—কিন্তু ইংরেজীর চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ, শাসন পরিচালকগণ, মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্যেরা, এমনকি হিন্দী অঞ্চলের মধ্যেও যাঁরা ইংরেজী হটিয়ে হিন্দী প্রচারে কৃতসঙ্কল্প, তাঁরা নিজেরা, নিজেদের পুত্র এবং পৌত্রদের ইংরেজী স্কুলসমূহে—যথা, রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট, খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুল ও কলেজ, এবং পাবলিক স্কুলসমূহে পাঠান, এবং ইংরেজী শেখার জন্যই পাঠান। যাঁরা ইংরেজীকে সর্বভারতীয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক কাজে এবং সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে খোলাখুলিভাবেই রাখতে চান, তাঁরা চান ইংরেজী ভাষার প্রবেশপথ শুধু ভাগ্যবানদের সন্তানদের জন্যই নয়, সবার জন্যেই খোলা থাক। বহুভাষাভাষী স্বাধীন ভারতে ইংরেজীকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারব বলে মনে হয় না, কারণ আমরা অখন্ড জাতি হিসাবে থাকতে চাই। এবং সংস্কৃতি এবং রাজনীতির দিক দিয়ে সে একতার বন্ধন ইংরেজী ভাষায় গড়া হলেও ক্ষতি নেই। এতে ভারতীয় ভাষাগুলি স্বাধীনভাবে সমৃদ্ধি লাভের পুরো সুযোগ পাবে। এই সুযোগ সাহিত্যে এবং কর্মজীবনে ভারতের সকল অঞ্চলই পাবে। এবং জনসাধারণ তাদের সব কথাই আপন আপন মাতৃভাষায় শুনাতে পারবে ঠিক এই মুহূর্তে উর্দু, গুরুমুখী, পাঞ্জাবী, বাংলা, উড়িয়া, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী এবং মলয়ালম ভাষার উপরে নাগরী লিপি জোর করে চাপানো অথবা ভিতরে অনুপ্রবেশ করানো কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হিসাবে সমর্থনযোগ্য নয়। এর ভার অ-নাগরী ব্যবহারকারীদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

নয়

আমি আরও একবার জনসাধারণের সামনে সর্বভারতের এক লিপি হিসাবে রোমান-লিপির পক্ষ সমর্থন করছি। এই চেষ্টা আমি গত কয়েক বছর ধ'রে ক'রে আসছি। কোন-কোন মহল থেকে জোর প্রতিবাদ হবে জানি, বিশেষ ক'রে যে সব ধর্মীয় গোঁড়ামি বিশেষ একটি লিপিতে লেখাকে পবিত্র জ্ঞান করে। আর যাঁরা দেশপ্রেমিক, এবং যা কিছু সবই ভারতীয় হোক তা চান তাঁরাও রোমান লিপিতে আপত্তি করবেন। শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্ত সম্প্রদায় বর্তমানে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন—একদল স্বেচ্ছায় এবং নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, এবং চান এই বিশ্বাসে যে ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ অবদান সত্ত্বেও বিশ্ব-মানবেরই একটি অংশ এবং এই বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গেই তাঁকে হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। এবং অন্যদল চান—বহির্বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র থাকতে। তাঁদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অনেক উঁচুতে অধিষ্ঠিত। তাঁরা বিদেশীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চান। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোভাব দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে একটি বর্তমান প্রচলিত লিখনরীতির মধ্যে। তাঁদের সাহিত্যে শুধু ইংরেজী বইয়ের নাম অথবা লেখকের নামই নয়, ইংরেজী উচ্চ সাহিত্য থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও নাগরী অক্ষরে লেখা হচ্ছে। তাঁরা রোমান লিপি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, যেন রোমান-লিপি অস্পৃশ্য, এবং নাগরী-হিন্দীর পাতায় স্থান পাবার অনুপযুক্ত। এর ফলে ট্র্যান্‌স্লিটা-রেশনে (প্রত্যক্ষরীকরণে) অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? ভারতীয় লিপির পবিত্রতা ত রক্ষা হল। আর এক দলের মতে নাগরী এবং ভারতীয় অন্যান্য লিপি বৈজ্ঞানিক বিচারে সুসম্পূর্ণ এবং রোমানলিপি অসম্ভব রকমের অবৈজ্ঞানিক, এবং ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় দুই প্রকার ভাষার পক্ষেই এই লিপি বৈজ্ঞানিক বিচারে অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ তর্কের দিক দিয়ে আমরা দুই রীতির লিখন-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করছি। এক-কথায়, অক্ষরের আকার বিচারে একথা স্বীকার করতে হবে যে নাগরী (এবং সম-জাতীয় ভারতীয় লিপিসমূহ) রোমান লিপির তুলনায় বেশি সুবিধাজনক নয়। রোমান লিপির সরলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই লিপি ঝরঝরে ও পরিষ্কার এবং যথাযথ এবং দূরে থেকেও সহজপাঠ্য। নাগরী লিপির ভিত্তি খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়। শুধু বর্ণমালায় এর যথাযথ বিন্যাস ও পারম্পর্যের মধ্যে ধ্বনি-বিজ্ঞানের কিছু মূলসূত্রের পরিচয় আছে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সত্ত্বেও কার্যতঃ মূল ধ্বনির চিহ্নরূপে খুব সম্পূর্ণ নয়। কাগজে-কলমে ভারতীয় লিখনপদ্ধতি বর্ণাত্মক। প্রত্যেকটি অক্ষর একটিমাত্র স্বর অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির চিহ্ন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এই লিপিনিবদ্ধ শব্দগুলি অক্ষর বা সিলেবল্ ধ'রে লিখিত হয়। ভারতীয় বর্ণ-মালায় প্রত্যেকটি বর্ণ একক; একের বেশী ধ্বনি এক-সঙ্গে যুক্ত এলে পরে—এক বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ ও তার সঙ্গে একটি স্বর-বর্ণ লেখার সময় সবগুলোকে এক-সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়। রোমান লিপিতে অথবা লাটিনে একটি শব্দ যতগুলি বর্ণ দিয়ে গড়া, তাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র উচ্চারণ, এবং পাশাপাশি অবস্থান। যথা: s, t, r এবং i—পাশাপাশি লিখলে এরকম দাঁড়ায়—stri, কিন্তু নাগরীতে এ সবগুলো একটার ঘাড়ে আরেকটি বসাতে হয়। (বাংলাতেও এইরূপ "স্ত্রী")। অবশ্য কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে আধুনিক নানা ভাষা রোমান লিপিতে লেখার সময় তার নিজস্ব ধারা থেকে কিছুটা সরে এসেছে। যেমন, দুটো বা দুটোর বেশি অক্ষর একটি শব্দ উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। (যথা তালব্য-শ-য়ের উচ্চারণে sh, ti প্রভৃতি ইংরেজীতে, এবং ফ-এর ধ্বনির জন্য gh যথা—enough)।

ভারতীয় ভাষাসমূহে অতিরিক্ত ধ্বনির জন্য রোমান লিপির যে বিস্তারের কথা বলা হয়েছে তা কোন কোন ক্ষেত্রে করা রয়েছে বিশেষ উচ্চারণ-নির্দেশক চিহ্ন দ্বারা, কিংবা পৃথক অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা। এবং অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারা যাচ্ছে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান লিপির এই বিস্তার ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে সব চেয়ে পরিপূর্ণ একটি পদ্ধতি। ভারতীয় কোন লিপিই এভাবে পরিপূর্ণ নয়।

রোমান লিপির গঠন সরল, এর প্রত্যেকটি বর্ণ অন্য ধ্বনি নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব একক ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। সেজন্য প্রাচীন অথবা আধুনিক যাবতীয় লিপি-পদ্ধতির মধ্যে রোমান লিপি আয়ত্ত করা সবচেয়ে সহজ। ছোটদের পক্ষে, অথবা যারা নিরক্ষর বয়স্ক লোক, তাদের পক্ষে রোমান লিপি একটি আশীর্বাদ স্বরূপ। এই সব নব শিক্ষার্থীদের ভারতীয় লিপি (বা উর্দু, সিন্ধী এবং কাশ্মীরী) শিখতে যে সময় লাগে, রোমান লিপিতে তার অর্ধেকেরও কম সময় লাগবে। ভবিষ্যতে আমাদের দেশে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে লিপি পরিবর্তন করতে হলে, সময়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি হিসাবে নেওয়া উচিত। রোমান লিপিতে শুধু সময় সংক্ষেপ হবে তাই নয়, ব্যয়-সংক্ষেপও হবে। ছাপার দিক দিয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ মস্তবড় কথা। রোমান অক্ষরে অন্যান্য ভারতীয় লিপি ও নাগরীর মত দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব দরকার হয় না। এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বে পুরো অক্ষর ও তার সঙ্গে অন্য অক্ষরের অংশ যুক্ত হয়। কিন্তু রোমানে মাত্র ছাব্বিশটি অক্ষর ভিত্তিস্বরূপ নিয়ে এবং তার সঙ্গে সামান্য দু একটা পৃথক্ চিহ্ন জুড়ে দিলেই, যথেষ্ট হবে। পক্ষান্তরে নাগরীর ক্ষেত্রে ৪০০টির উপরে অক্ষর বা অক্ষরাংশ দরকার হয়। এবং কোনো কোনো বিশেষ লিপিতে আরো বেশি দরকার হয়। অবশ্য রোমান অক্ষরে ভারতীয় ভাষা লিখতে গেলে স্বরবর্ণগুলি পুরো লিখতে হবে বলে প্রতি ছত্রে জায়গা একটু বেশি লাগবে। কিন্তু দেখামাত্র সহজে বুঝা যাবে বলে এর সুবিধে অপরিমিত।

পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশে রোমান-লিপি ব্যবহৃত হয় এবং এই লিপিই পৃথিবীতে বর্তমানে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। রুষলিপি রোমানলিপির রীতিতেই রচিত। চীনাদের চিত্রময়, ভাবপ্রদর্শক এবং ধ্বন্যাত্মক এবং অন্যান্য অক্ষর মিলিয়ে বেয়াল্লিশ হাজার পৃথক অক্ষর আছে। তারা সহজে এই পদ্ধতি ছাড়তে পারবে না। বরং কম্যুনিষ্ট চীনে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তারা আরো অক্ষর বাড়াচ্ছে। এই রীতি তাদের চলে আসছে তিন-হাজার থেকে চার হাজার বছর আগে থেকে। অতএব এরা যদি এখন এ লিপি ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের সংস্কৃতির ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাবে, জাতীয় একতাতেও ঘা লাগবে।

উত্তর আফ্রিকার আরব-অংশ ভিন্ন বাকী সমস্ত আফ্রিকাতেই রোমানলিপি প্রচলিত। চল্লিশ বছর আগে তুরস্ক দেশেও রোমানলিপি প্রচলিত হয়েছে। ইন্দোনেসিয়াতেও রোমান-লিপি চলে; এবং ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে যখন আপন ইচ্ছায় রোমান লিপি গ্রহণ করবে তখন সে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের দলভুক্ত হতে পারবে।

এর জন্যে জনমত গড়ে তোলার দরকার। তবে সমস্ত লোকের যখন অক্ষর পরিচয় হবে এবং তারা যখন মাতৃভাষায় শিক্ষার পথে কিছু দূর অগ্রসর হবে, তখনি এ প্রশ্নটিতে গুরুত্ব আরোপ করা যাবে। তখন দেশই বিচার করবে অক্ষর বদল একান্তই দরকার কি না; এবং যদি দরকার হয়, তখন নাগরী গ্রহণ করা হবে—না আন্তর্জাতিক রোমানলিপি গ্রহণ করা হবে।

আমার মতে, আপাতত সকল দেশের জন্য এক লিপি, সেও আবার নাগরীলিপি গ্রহণ করার কথায়, কার্যতঃ গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। নাগরী জোর করে চাপিয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়। এখন যেমনটি আছে তেমনটিই চলুক। এখন মাতৃভাষার বেলায় নিজেদের লিপি, এবং সংস্কৃতেও নিজেদের লিপি চলুক। নাগরী অথবা অন্য লিপি পরস্পরের ভাষা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন হিন্দী অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা চলতে পারে। বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য অন্যান্য ভাষা থেকে অনেক বই-ই অনুবাদ হচ্ছে: তার সঙ্গে মূল ভাষাটিও বাংলা অক্ষরে লেখা হচ্ছে। এবং হিন্দী অনুবাদে হিন্দী ও নাগরী পাঠকের সুবিধার্থ বাংলা উড়িয়া তেলুগু ভাষায় লেখা পাঠগুলি নাগরী অক্ষরে দেওয়া হচ্ছে।

যে দেশে বহু ভাষা ব্যবহৃত হয় সে দেশে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের পুরো স্বাধীনতা দেওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নীতি। অন্য ভাষা বাদ দিয়ে কোন একটি ভাষা বা লিপির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো উচিত নয়।

(ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।)

॥ কথা ॥

কথা যে বলতে জানে তার কাছে
কথা যেন অমূল্য রতন;
মাপ করা কথা কন—
সেই জ্ঞানী নিক্তির ওজন।
—প্রাচীন হিন্দী দোঁহা (মায়া বসু)

পাঁচমারি

(২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নামতে নামতে আমরা এসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের তলাকার অন্ধকারে ঢুকলুম। এক পাশে জটাশঙ্কর মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মুণ্ড-বিগ্রহ বসানো, তার উপরে একটি জটাছত্র। অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না,—কেউ বোধ হয় সিঁদুর মাখিয়ে গেছে। ফুল পড়ে রয়েছে দু-চারটে। পাথরের নিচের দিকে কালো জল ছলছলিয়ে শব্দ তুলে কোন্ দিকে যেন বয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন পশ্চিমের কোনও বিরাট এক ইঁদারার সুগভীর তলদেশে নেমে এসেছি,—গা আমাদের ছম ছম করছে! সন্ধ্যার দিকে জন্তু ও সরীসৃপ এখানে গুঁড়ি মেরে এসে বুঝি জল খেয়ে যায়। এই জলেতেই একটি স্রোতস্বিনীর জন্ম হচ্ছে। সেই নদীটির নাম 'জম্বুদ্বীপা!'

মিনিট পনেরোর বেশি এই ছায়াময় গিরি-খাদের তলায় থাকার উৎসাহ আসে না। আমরা আবার সেই চড়াই সিঁড়িপথ ধরে উপরে উঠে এলুম।

পাঁচমারির আদি অধিবাসী যারা,—তারা চিরদিন দারিদ্র্যের বোঝা বয়ে চলেছে। সেই বীভৎস দারিদ্র্য তাদের কারো কারো ঘরে ঢুকে দেখেছি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তারা জীর্ণ। মাঝে মাঝে মিলিটারির পথঘাট তৈরির কাজে এক এক দলকে ডাকা হয়। তখন তারা কাজ পেয়ে বাঁচে। সেই পুরনো সব বস্তির নোংরা নর্দমার ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা, সেই সর্বহারার দল, সেই বিনা চিকিৎসায় মুখ বুজে ইহলীলা সাঙ্গ করা,—সেই সকাতর প্রার্থনা রেখে যাওয়া ভবিষ্য মানুষের দরবারে! ওদের বস্তির ভিতরকার জীবনযাত্রার চেহারাটা রাষ্ট্রপতির নজর এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

নতুনকালে পাঁচমারিতে এসে যারা জায়গা জুড়েছে তারা ছোট বড় ব্যবসায়ী। তারা কেউ খাদ্যসামগ্রী আনে, কারও মহাজনী দোকান, কেউ হোটেল চালায়, কারও হাতে বা সেগুনের জঙ্গলের ইজারা, কেউ বা আবার সরকারী ঠিকাদার। প্রতি বছরে এপ্রিল, মে এবং জুন—এই তিন মাস এখানে মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেন্টের দপ্তর উঠে আসে। তখন গমগম করে এই পাঁচমারি। প্রতি বাড়ি ও বাংলোর ভাড়া দশগুণ বেড়ে ওঠে। নৈলে অন্য সময়ে প্রকান্ড বাগান-সমেত আট-দশটি বৃহৎ সুন্দর সুসজ্জিত ঘর-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ বাড়ি দৈনিক পাঁচ টাকা ভাড়াতেও সহজে মেলে। কলকাতার হারে দেড়শো টাকার বাড়ি শীতকালে পাওয়া যায় পনেরো কুড়ি টাকায়। যারা হোটেলে গিয়ে ওঠে, তারাও তেমন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে না,—কেননা খাদ্য-সামগ্রীর প্রাচুর্য লাভ করে মন খুশী থাকে।

পাঁচমারির যেটি শ্রেষ্ঠ অঞ্চল,—সেখানে আজও ইংরেজ আমলের জীবনযাত্রাটা সুস্পষ্ট। পাঁচমারি ক্লাব, হোটেল, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস—এগুলি সব মিলিয়ে আছে পাশাপাশি। এরা সবাই আমাদের ডাকবাংলার প্রতিবেশী।

হঠাৎ হোটেলের ওই প্রাঙ্গণে দেখা হয়ে গেল এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। নাম কমল সরকার। সেই আমাদের কমল! মনে পড়ছে এককালে মিহি পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি পরে কমল ইস্কুলে যেত। ওদের অবস্থা ছিল ভাল। সেদিনের মতো আজও কমলের মুখ হাসি ও সৌজন্যে ভরা। নন্দিতাকে সে প্রথম দিনেই পালিতা কন্যা বলে ধরে নিল। কমল বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড়। কিন্তু ওর প্রবীণ চেহারা পক্ক কেশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভয় পেলুম!

কমল উচ্চকণ্ঠে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, না না, মিথ্যে কথা, তুমি তেমনই আছ। বুঝলে ভাই, বয়স হল মনের। বুড়ো ভাবলেই বুড়ো! —এসো, আমরা এসেছি দলবল নিয়ে। ওই দ্যাখো, দৈনিক সাড়ে চার টাকায় রাজ বাড়ি! প্রতি হলে খাট-পালঙ্ক-দেরাজ আর ফায়ার প্লেস। বৈঠকখানা দেখলে তাক লাগবে। বিকেল বেলায় বাপ-বেটি চা খাবে আমাদের ওখানে!

কমল আজও দারপরিগ্রহ করে নি। স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকলে নাকি তারা বিড়াল আর ময়না পাখি পোষে। পুরুষ পোষে কুকুর, আর নয়ত বেকার এক ভাগ্নে! কমলের সখ, সে গাছ পুষবে! সে যেখানেই যায়, দু-চারটে চারাগাছ সংগ্রহ করে আনে! গার্হস্থ্য জীবনে শিশুর পাল নাকি তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কমলের বিধবা ভগ্নি এসেছেন সঙ্গে তাঁর একটি ছেলে ও কন্যা জামাতাকে নিয়ে। মেয়েটির নাম মাধুরী, জামাইটি মিঃ মিত্র। সঙ্গে মাধুরীর উৎসাহী বালকপুত্র।

আমাদের একটি দল বেশ পাকিয়ে উঠল।

নতুন জায়গার দ্রষ্টব্য বস্তুর ফর্দ বাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এমন একটি ক্ষুদ্র, অনুচ্চ এবং লোকলোচনের বাইরেকার পার্বত্য শহর আমার দেখতে বাকি ছিল,—যার সীমানার এক মাইল থেকে তিন মাইলের মধ্যে মোট ছত্রিশটি জলপ্রপাত দেখে নেওয়া যেতে পারে। জনশূন্য বনভূমি, গিরিদরি এবং গিরিখাদগুলির শোভা সৌন্দর্য, অজানা রহস্যলোকের আকর্ষণ, সন্ধ্যাবেলাকার জন্তুজানোয়ারদের শঙ্কাসঙ্কুল কাহিনী,—এই সমস্ত মিলিয়ে সাতপুরার পাহাড়শ্রেণী একটি পৃথক ছবি যেন মনের সামনে তুলে ধরে। শীতের রৌদ্র উজ্জ্বল, নীল আকাশ যেমন নিবিড়, বায়ু তেমনি নির্মল। আলস্যে এবং আনন্দে আমাদের স্থিতিকাল মধুর হয়ে উঠেছিল।

পরিমল আমাদের নিয়ে চলল অম্বিকা দেবীর মন্দিরে,—শহর থেকে কিছু দূরে। সামান্য মন্দির, ভিতরে ক্ষুদ্র দেবীর বিগ্রহ। আশে-পাশে গাছপালা ছাওয়া পার্বত্য পরিবেশ। পরিমল বলছিল, দেবী বড় জাগ্রত! আপনি যা কিছু কামনা করবেন তাই পাবেন। এই ধরুন না, একজন গুজরাটি ব্যবসায়ী তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন এই কিছুদিন আগে। এ তল্লাটে অম্বিকাদেবীর মাহাত্ম্য সবাই জানে। আপনিও মানত করুন বৃদ্ধ পূজারীর কাছে!

আমার কামনার কথা শুনে বৃদ্ধ পূজারী এবং তাঁর প্রবীণা পত্নী শুধু হাসলেন। বৃদ্ধ বললেন, এ আর এমন কি! ঠিক আছে। আজ আমি যজ্ঞ করব। খরচ হবে বারো টাকা! টাকাটা আপনি দিয়ে যান। কাল সকালে অন্তত লাখ দুই টাকা আপনি পাবেন!

আমিও উৎসাহের সঙ্গে বললুম, কুচ পরোয়া নেই! আমার একাউন্টে আপনি বেশ বড় রকমের যাগযজ্ঞ করুন। তারপর কাল বেলা বারোটার মধ্যে আসুন আমাদের ডাকবাংলায়। যা পাবো তার আধা-আধি বখরা আপনাদের। —তারপর পরিমলের দিকে চেয়ে বললুম, তোমারও এই সুযোগ ভাই। সেই যে তুমি চৌদ্দ হাজার টাকা নিয়ে একদিন বেরিয়ে এসেছিলে,—সেই টাকাটা আমিই তোমাকে দিয়ে যাব, পরিমল।

পরিমল অবশ্য মহা খুশী। কিন্তু অম্বিকা দেবীর সম্পর্কে এইসব কাজ-কারবার ধারে করা যায় কি না, এই প্রশ্নটি নিয়ে পূজারী মহাশয় এতক্ষণ তোলাপাড়া করছিলেন। আমরা তখনকার মতো এই জাগ্রতা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

বলা বাহুল্য, পরদিন মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেল, কিন্তু পূজারী মহাশয় টাকা নিয়ে এসে আর পৌঁছলেন না! পরিমল আমাদের ডাকবাংলার বারান্দায় অধীর আগ্রহে এবং একান্ত বিশ্বাসে বৃদ্ধ পূজারীর আগমনের অপেক্ষায় বসে ছিল। কিন্তু কোনও দিক থেকে কোনও আশ্বাস যখন এল না, তখন পরিমল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে লাগল, এবার বুঝলুম সব মিথ্যে। যজ্ঞ করে দেবীর মন ভোলানো? আপনি কেন ঘুষ দিতে যাবেন? কে দিচ্ছে টাকা? কোত্থেকে আসছে? দুই লাখ টাকা সোজা কথা? ওই বুড়োটা এতদিন ধরে আমাকে সব মিথ্যে বুঝিয়ে এসেছে। সব ফাঁকি! সব বুজরুকি!

পরিমলের মানসিক উত্তেজনার চেহারা দেখে একটু দুঃখিত হলুম। দেবী মাহাত্ম্যের গুণে সে তার সেই পুরনো চৌদ্দ হাজার টাকাটা যেমন করেই হোক ফিরে পাবে,—এইটি এক মনে সে বিশ্বাস করেছিল!

আরাবল্লি, সাতপুরা এবং বিন্ধ্য,—এই তিনটি গিরিশ্রেণী ছড়িয়ে রয়েছে মধ্য ভারত, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব রাজস্থানে। এরা কাজ করেছে ভারতের এক একটি পঞ্জরাস্থির মতো। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলায় এসে এই তিনটি গিরিশ্রেণীর মধ্যে সাতপুরাই সর্বোচ্চতা লাভ করেছে। পাঁচমারির পারিপার্শ্বই হল এই উচ্চতার সংযোগস্থল। প্রধানত সাতপুরা এবং বিন্ধ্যগিরির তলায় তলায় চলে গিয়েছে অনেকগুলি নদী—যেমন চম্বল, বেত্রবতী, বানাস, শোন, নর্মদা ও তপতী। প্রথম কয়েকটি গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিন্ধ্যগিরির তলায় তলায়। চম্বল ও বেত্রবতী গিয়েছে যমুনায়, শোন গিয়েছে গঙ্গায়, এবং নর্মদা ও তপতী পশ্চিম ভারতের ভিতর দিয়ে গিয়েছে কাম্বে উপসাগরে। নর্মদার জন্ম হয়েছে মহাকাল পর্বতের আশে-পাশে অমরকন্টক নামক একটি পার্বত্য অঞ্চলে। এই সকল পাহাড় হল বিন্ধ্যগিরি ও সাতপুরার শিরা-উপশিরা।

পাঁচমারির বৈশিষ্ট্য হল, এটি সাতপুরার প্রাকার বেষ্টিত। ইংরেজ এতকালের মধ্যে জানতে দেয় নি,—মধ্যপ্রদেশ যখন জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তখন সেখানে এমন একটি নিভৃত নিকুঞ্জলোক আছে যেখানকার স্নিগ্ধ গিরিখাদগুলির নিচে নেমে গিয়ে নির্মল ও সুশীতল ঝর্ণার জলে স্নান করে ছায়ানিবিড় প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নেওয়া যায়! ইংরেজের ভয় ছিল, এ জায়গাটা জানাজানি হলে পাছে নেটিভদের ভিড় বেড়ে ওঠে! একথাটা বলা চলে, স্বাধীনতা লাভের পর যেন এই ক্ষুদ্র ও সুন্দর পার্বত্য নগরীটির ঘুম ভেঙেছে

পিরালী সমাজের কথা

কল্যানাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পিরালী সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একাধিক কাহিনী শোনা যায়। কারণ এর কোন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। কাহিনীগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা আছে। এই রচনাটিতে যে কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে এইটিই যে অভ্রান্ত এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তবে অন্যান্য-গুলির তুলনায় এই কাহিনীটিই বেশী সমর্থন পেয়েছে। তা ছাড়া গল্প হিসেবে বা কাহিনী হিসেবে এই একাধিক কাহিনীর মধ্যে যেটি আমার অন্তরে আবেদন এনেছে—সেইটিকেই *আমি এখানে পল্লবিত করার চেষ্টা করেছি। এই কাহিনীটিকে অভ্রান্ত সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি।—এ ধারণা যেন পাঠক-পাঠিকার* মনে জন্ম না নেয়, তাঁদের দরবারে এই আমার সবিনয় অনুরোধ। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আমার পূজনীয় আত্মীয় সাহিত্যরথী স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, আমার প্রণম্য প্রমাতামহ সাহিত্য সাধক স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলী থেকে এই লেখার জন্যে উপকরণ সংগ্রহ করেছি। —লেখক]

সে এক আঁধার রাতের বিস্ময়ভরা কাহিনী। সারাটা রাত যেন কালো ক্লোক পরে রয়েছে। গোটা রাতটা যেন সূচীভেদ্য তমসার সুবিস্তীর্ণ লীলাভূমি। চারদিক নিঃঝুম, মানুষের সাড়া নেই, সারাটা অঞ্চল ঘুমিয়ে রয়েছে। আশেপাশে চতুর্দিকে এক থমথমে আবহাওয়া।

কে-কে-ওকে-এই নিবিড় ঘন নিশীথ আঁধারে কে ওই গুন্ঠনবতী রহস্যময়ী। মুঠো মুঠো রহস্যের সৃষ্টি করে সান্দ্রচরী ওই অপরিচিতা—ও কে—আপাদমস্তক দু'জনেরই কালো কাপড়ে ঢাকা। রাতের আঁধারের সংগে চমৎকার মিলে গেছে, গহন অন্ধকারে কারোর চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই।

কোথা থেকে এল শরতের মেঘের মতন, কেনই বা এল, কোথায়ই বা চলে গেল চকিতা পৃথিবীর মত তখন কেউ তা জানল না। চারদিকে তখন গহন অন্ধকার, আঁধার শুধু আঁধার।

রাত্রির অবসান হল। তারারা মিলিয়ে গেল, পাখীর কুজন শোনা গেল। অন্ধকারের কালো পর্দাটা সরে গেল। পূবের আকাশে একটু একটু করে দেখা দিতে থাকে লাল রঙের আভা।

বেলা বাড়তে থাকে। জনগণে পূর্ণ হয় দেবালয়ের আঙিনা। এই দেবমন্দিরই হোক বর্তমান আখ্যায়িকার কেন্দ্রবিন্দু। মণিমাণিক্য-খচিত এক বহুমূল্য তাঞ্জাম এসে দাঁড়াল মন্দিরের দ্বারদেশে। তাঞ্জাম থেকে নামলেন এক প্রৌঢ়। জনতা সসম্ভ্রমে তাঁকে করে দেয় পথ, তাঁকে আবাহন জানাতে সবিনয়ে এগিয়ে আসেন সানুচর পূজকপ্রধান।

কি আশ্চর্য, সকাল থেকে এত লোক এল, এত লোক গেল—কারুর চোখেই পড়ল না মন্দিরের দেয়ালে অঞ্জন দিয়ে উৎকীর্ণ করা সেই দু'লাইন সংস্কৃত শ্লোক—আর তা পড়ল কেবলমাত্র এই প্রৌঢ়েরই চোখে। থমকে জিজ্ঞাসাভরা দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন প্রৌঢ়, শশব্যস্ত হয়ে লাইন দুটো মুছে দিতে এগিয়ে আসেন প্রধানপূজক—বাধা দেন প্রৌঢ়। গৌড়াধিপতি মহারাজা বল্লাল সেনের আদেশে নিরস্ত হলেন পূজারী। তারপর একে একে সকলের চোখেই ধরা যায় লাইন দুটি। সকলেই একবার করে পড়ে গেল—

পতত্য বিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

যুবরাজ লক্ষ্মণসেন দীর্ঘদিন রাজধানী থেকে নিরুদ্দেশ, কোথায় আছেন কেউ তা জানে না, কবে যে আসবেন তাও সকলের অজানা, মনে শান্তি নেই মহারাজা বল্লাল সেনের, বিরহের তীব্র দংশনে মনে মনে ছটফট করেন সুন্দরী রাজবধূ। মিলিয়ে গেছে তাঁর মুখের হাসি, হারিয়ে গেছে তাঁর জীবনের প্রতি বিশ্বাস, লুপ্ত হয়ে গেছে তার কাছে জীবনের আত্মবোধ। সকলের অজ্ঞাতসারে রাতের অন্ধকারে মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে দু'লাইন কবিতা উৎকীর্ণ করেই কি বিরহের সমগ্র রূপের নিখুঁত বর্ণনা করা সম্ভব? বিরহ গরল যে সর্প বিষের চেয়েও তীব্র।

পংক্তি দুটির অন্তর্নিহিত সূত্র সম্যক উপলব্ধি করতে বাকী থাকে না প্রজাপাল বল্লাল সেনের। বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে কার মনোবেদনা দিনের আলোর মত ফুটে উঠছে এই পংক্তি দুটির মধ্যে দিয়ে। দরবারে এলেন বল্লাল সেন। এসেই করলেন এক রাজকীয় ঘোষণা। মোটা পুরস্কারের বিনিময়ে লক্ষ্মণ সেনকে ফিরিয়ে আনা চাই। সকলের উদ্দেশ্যেই করা হল রাজকীয় ঘোষণা, যে পারবে সেই পাবে পুরস্কার। প্রধান-মন্ত্রী থেকে অপ্রধান ভিক্ষুক পর্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল এই ঘোষণায়। শেষ পর্যন্ত এই প্রায়-অসম্ভব কার্যকে সম্পূর্ণ সম্ভব করল জলচর একজন মানুষ, নাম তার সূর্য মাঝি। যুবরাজকে রাজধানীতে ফিরিয়ে এনে রাজ্যের আনন্দের বন্যাধারা বইয়ে দেওয়ার জন্যে পারিতোষিক-রূপে তাকে দেওয়া হল কয়েকটি গ্রাম। এই গ্রামগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পরগণার সৃষ্টি হল, পরগণার নাম তার নামানুসারেই রাখা। যশোর ও খুলনা জেলার অন্তর্গত সুজদীয়া (সূর্যদ্বীপ) পরগণার নাম অনেকেরই সুপরিচিত। সূর্য মাঝির অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাম নিলেন সুলতান। খুব সম্ভব সুলতানপুর পরগণার নাম তাঁর নামানুসারেই রাখা হয়।

এই সময় আর একটি পরিবার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে লাগল। গুড়-চৌধুরী বংশ। এই বংশের রমাপতি এগিয়ে এলেন প্রবল প্রতাপান্বিত এই জালিক প্রাধান্যের অবসান ঘটাতে। গুড়-চৌধুরীদের হাতে অবনতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হ'ল সুলতান মাঝিকে। বল্লাল-পৃষ্ঠপোষিত সূর্য মাঝি প্রতিষ্ঠিত বিরাট বিশাল জমিদারীর মালিকানা চলে গেল গুড়-চৌধুরীদের হাতে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাঝি-বংশের ভাগ্যপতাকা। জালিকের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ এসে গ্রহণ করলেন প্রজা পালনের ভার।

আদিশূরের ছেলে ভূশূরের কাছ থেকে অর্ঘ্যস্বরূপ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত (সহর থেকে ছ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত) গুড় গ্রামখানি পেলেন কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর আদিপুরুষ দক্ষের চোদ্দটি সন্তানের মধ্যে অন্যতম ধীর। ধীরের অধস্তন একাদশ পুরুষই স্বনামধন্য রঘুপতি আচার্য কনকদন্ডী। কারো মতে কনকদাঁড় গ্রামে বাস করার জন্যে ইনি কনকদন্ডী নামে হন অভিহিত, আবার কারো মতে নিজের হাতের স্বর্ণদণ্ডের জন্যে পরিচিত হলেন কনকদন্ডী আখ্যায়। সেই স্বর্ণদন্ড তাঁকে দিয়েছিলেন ভারতের জ্ঞানের ও সংস্কৃতির বিকাশ কেন্দ্র কাশীধামের বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজ তাঁর অসাধারণ ও অপরিমাপ্য মেধা ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ। রঘুপতি আচার্যের সংগে সংগেই ঐ বংশের বিদ্যানু-শীলন, জ্ঞানানুশীলন, ধর্মানুশীলন শেষ হয়ে গেল। তাঁর ছেলে রমাপতির জীবনধারা বইতে লাগল অন্যভাবে, অন্য ছন্দে লেখা হল তাঁর জীবনের ইতিহাস, তিনি চাইলেন ভোগ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ। কিন্তু তা ঐ এক পুরুষেই। রমাপতির পর তাঁর পুত্র অমৃতানন্দ ছিলেন বিষয় বৈরাগী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, অপর-পুত্র জ্ঞানানন্দ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পিতামহের

পদাঙ্কই করেছিলেন অনুসরণ। এদিক দিয়ে জ্ঞানানন্দের পুত্র জয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীও ছিলেন পিতার সুযোগ্য পুত্র। আবার এদিকে রমাপতির প্রভাবও মিলিয়ে যাবার নয়, তাঁর ধ্যানধারণার ছায়া নিপতিত হল পুত্র-পৌত্রকে অতিক্রম করে প্রপৌত্র নাগরনাথ ও দক্ষিণানাথ ভ্রাতৃদ্বয়ে। এই দুটি ভাই ছিলেন পুরোপুরি বিষয়ী। এঁদের জীবনের প্রধান কর্মসূচীই ছিল নিজেদের জমিদার-শ্রেণীভুক্ত করে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করা। সংস্কৃতির ছায়ামাত্র স্পর্শ করল না এঁদের, জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনই এঁরা করলেন না অনুভব, যে গৃহ-প্রাঙ্গণ ধন্য হোত দেশ-কাল বন্দিত সুধীবৃন্দের পদস্পর্শে, যে প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে থাকত গীতায় উল্লেখিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চিরদৃপ্ত মাভৈমন্ত্র উচ্চারণে সেখানে এখন কেবল বাণিজ্য-জীবী, অর্থগৃধ্নুদের ভীড়, সেখানে এখন কেবল জমা-খরচ, পাওনা বাকী খাজনা হস্তবুধের চুলচেরা হিসেবনিকেশ। যবন-শাসক সম্প্রদায় প্রথম জনকে দিলেন 'রায়' উপাধি, তার দ্বিতীয় জনকে 'রায় চৌধুরী' উপাধিতে করলেন বিভূষিত। যতদূর মনে হয় দক্ষিণডিহীর নাম-করণ হয়তো দক্ষিণানাথের নামানুসারেই করা হয়েছে। দক্ষিণানাথের চার ছেলে ছিলেন। তাঁদের নাম—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব আর মেয়ে ছিলেন রত্নমালা। ইতি-হাসের চরম পরিবর্তন ঘটল এই চার ভাইকে কেন্দ্র করে, শুধু তাই নয়, সমাজ জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবালোড়ন সৃষ্টি করে, রীতিমত ওলোট-পালোট সাধন করে, ইতিহাসের বুকে, রাজনীতির বুকে আর সমাজের বুকে এক গভীর রেখা এঁকে দিয়ে নতুন এক সমাজের পত্তন হল এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে, জন্ম নিল বহু-খ্যাত ও বহুবিস্তৃত পিরালী সমাজ। ভারতের নব চেতনার জন্মদাতা ঠাকুর পরিবারের কালজয়ী সন্তানেরা জন্ম নিলেন এঁদেরই দৌহিত্রবংশে।

যবনাধিপত্যে তখন ছেয়ে আছে বাঙলা দেশ। হজরত মহম্মদের অনুরক্তের দল তখন পুরো-পুরি কায়েম করে ফেলেছে বাঙলার রাষ্ট্রতখত। যাদের ছায়া পর্যন্ত ছিল অস্পৃশ্য, কাজের খাতিরে এমনকি প্রাণের ভয়েও সমাজের নিষ্ঠাবান পুরুষেরা মিশতে বাধ্য হলেন সেই যবন পুরুষদেরই সঙ্গে, মেশা শেষে দাঁড়াল ঘনিষ্ঠতায়। স্বেচ্ছাচারিতা (কদাচারিতা বললেও অত্যুক্তি হয় না) যবন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত তাদের এই প্রবৃত্তির ছিদ্রপথ দিয়েই হিন্দু সমাজে প্রবেশ করল গলদ। এই ঘনিষ্ঠতার ফলেই সৃষ্টি হল অসংখ্য মেল, থাক, ভাগ ইত্যাদি, ওদিকে পাঠান পৃষ্ঠপোষিত দেবীবর রটনা করলেন দোষ নাই যার কুল নাই তার। সেদিনকার হিন্দু সমাজে কুল ছিল ইষ্ট কবচের চেয়েও মূল্যবান, কুল রক্ষার জন্যে নিজেরা মনগড়া একটি দোষারোপ নিজের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করলেন না। সেই কল্পিত দোষারোপই কালে প্রামাণ্য হয়ে উঠল। ইতিহাসের মুখ দিয়ে ঘোষণা করানো হল যে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেকেই সমাজ অনু-শাসনের ক্ষেত্রে দোষী। এখানেই দেখতে পাচ্ছি যে শুধু পলাশীর যুগেই মীরজাফর ছিলেন না আরও চার-পাঁচশ বছর আগেও তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল ভিন্নরূপে।

গৌড়ের স্বাধীন পাঠান সুলতানের দরবার

থেকে সুন্দরবন আবাদ করার সনদ নিয়ে যশোরে এলেন আলী খাঁজাহান। পথে পরিচিত হলেন পিরল্যা (পিরালিয়া) গ্রাম নিবাসী মহম্মদ তাহেরের সঙ্গে। নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণের দৌহিত্র মহম্মদ তাহেরের মন-বিনিময় হল এক মুসলমানীর সঙ্গে, রূপ-যৌবনবতী এই তরুণী তন্বীর আকর্ষণকে তাহের করতে পারলো না অতিক্রম, বন্দী হয়ে গেলেন তার মনের মধ্যে। ফলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ ও মহম্মদীয় ধর্মে দীক্ষা লাভ করে যৌবন স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিলেন সুন্দরীর ভুজ পল্লবদ্বয় অধিকার করে চিরকালের জন্যে। অত্যন্ত কর্মপটু ছিলেন তাহের, অচিরে অপরিহার্য প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন খাঁজাহানের। যে কাজের ভার নিয়ে এসেছেন খাঁজাহান তার জন্যে বিস্তর রসদ ও শ্রমিকের প্রয়োজন। যবন-সংবিধানে নিয়ম ছিল যে রাজকর্মচারী রাজকীয় কার্যে (বা দুষ্কার্যেও) কোথাও গেলে স্থানীয় জমিদার তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন। এই প্রথারই দরবারী নাম ছিল 'মদত দেওয়া'। চেঙ্গুটিয়া জমিদারদের কাছে মদতের নির্দেশ গেল। দক্ষিণানাথ রায় চৌধুরীর ছেলেরা অর্থাৎ চেঙ্গুটিয়ার ভূস্বামীরা মদতে স্বীকৃত হলেন কিন্তু বললেন, 'যে জমি আবাদ হবে তা আমাদের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।' উপায়ান্তর না দেখে খাঁজাহান মেনে নিলেন সেই প্রস্তাব। দেখতে দেখতে দুর্ভেদ্য আলোহীন অরণ্য পরিণত হয়ে উঠল মনোরম নগরীতে, বৃক্ষ-রাজির সমূল উৎপাটন করে সেখানে নির্মাণ করা হল নয়নলোভা হর্ম্যমালা। যেখানে ছিল ঝোপঝাড় সেখানে দেখা গেল সুন্দর একটি চলার পথ। প্রতিপদে যেখানে ছিল জীবনের ভয়, পরম আনন্দময় নিশ্চিন্ত-চিত্তে মানুষ সেখানে সক্ষম হল চলাফেরা করতে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই বিরাট ভূখণ্ড পত্তনী পেলেন রায় চৌধুরীরা আর জমিদারী স্বত্ব পেলেন খাঁজাহান স্বয়ং। আজকের দিনে খুলনার বাগেরহাট যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বহু পূর্বসূরীরা একদিন সেইখানেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন খাঁজাহান ও রায় চৌধুরীদের নির্মিত নতুন মহানগর। খাঁ-জাহান প্রথমে হলেন জমিদার, তারপরেই হলেন নবাব। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই উজীর হলেন মহম্মদ তাহের। রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্যে নবাবের কাছেই রয়ে গেলেন কামদেব আর জয়দেব। চেঙ্গুটিয়া পরগণার দক্ষিণডিহীতে থেকে নিজেদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে থাকলেন রতিদেব ও শুকদেব।

সেদিন ছিল শবেরাতের সন্ধ্যা। সারাদিন অভুক্ত থেকে সন্ধ্যার নামাজের পর খাদ্য গ্রহণ করা ছিল মুসলমান সমাজের রীতি। নামাজের আগেই এক কর্মচারী কয়েকটি সুগন্ধি কলম্বা-লেবু উপহার দিল নবাব আর তাঁর উজীরকে, সুন্দর ঘ্রাণে আমোদিত হয়ে উঠলেন উজীর, বার-বার নিতে লাগলেন তার আঘ্রাণ। কামদেব-জয়দেব কাছেই ছিলেন, পরিহাসের ছলে উজীরকে বললেন 'রোজাটা মাটি করলেন তাহলে?'—'কেন' শঙ্কিত উত্তর আসে উজীরের কাছ থেকে। কামদেব তার উত্তর দিলেন হেসে—'আমাদের শাস্ত্রে বলে যে ঘ্রাণেই অর্ধভোজন সমাপ্ত হয়, নিরুত্তর উজীরের মুখমণ্ডল হয়ে উঠল ক্রোধে ও লজ্জায় আরক্তিম।

তারপর একদিনের একটি ঘটনা। একটি সন্ধ্যায় খুব অল্প সময় নিয়েই এ ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তারপর অনেকগুলো যুগ পিছনে রেখে এসে অনেকগুলো শতাব্দী পেরিয়ে এসেও আজও তার স্মৃতি অম্লান। ষাটগম্বুজ মসজিদের প্রাঙ্গণে বসেছে বিরাট মজলিস। নিমন্ত্রিত হয়েছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্ভ্রান্ত পুরুষ। ফূর্তির অফুরন্ত বন্যা বয়ে যাচ্ছে সকলের প্রাণে চমক-দোলা লাগিয়ে, কেন্দ্রমণিরূপে শোভা পাচ্ছেন স্বয়ং নবাব। দাসানুদাসদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়েছে—একদল খানা-পিনা-সরবৎ-সরাব পরিবেশন করছে, আর এক দল সদাসর্বদা নবাবকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যনিয়ামক তিনিই; পীর খোদা-পয়গম্বর নাকি নবাবের কথাতেই উঠছেন-বসছেন। তাহেরও সেখানে উপস্থিত, তার মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় যেন তার মনের পরতে পরতে কি এক অভিসন্ধি গোপনে গোপনে দানা বেঁধে উঠছে। সকলের অগোচরে নিকটস্থ ভৃত্যকে ইঙ্গিত করলেন মুসলমানী খানাপূর্ণ পাত্রটির ঢাকা সরিয়ে দিতে—সঙ্গে সঙ্গেই নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধে আসর ভরে উঠল, বহু হিন্দু তৎক্ষণাৎ আসর পরিত্যাগ করলেন—অতিরিক্ত বুদ্ধিমান কামদেব-জয়দেব নিজেদের ধর্মের রক্ষণশীলতা বেশী করে দেখাবার জন্যে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে সভা পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প করলেন। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন ধূর্ত তাহের। শবেরাতের সন্ধ্যায় কলম্বা-লেবুর ঘটনাটা ভোলেননি তাহের, আর ভোলেননি বলেই সেই বিদ্রূপের সমুচিত প্রতিশোধ দেওয়ার জন্যেই সেদিনকার সন্ধ্যার সেই বিরাট আয়োজন। বলা বাহুল্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিই তাহেরের কল্পনা-জাত। নাকে কাপড় চাপা দেখে হেতু জিজ্ঞাসা করেন নবাব, ভ্রাতৃদ্বয় বললেন—জাঁহাপনা, এখানের গন্ধ আমাদের অগ্রাহ্য। কর্কশকণ্ঠে পিছন থেকে প্রশ্ন করেন তাহের—চৌধুরী-সাহেবরা কি আগে থেকেই নাকে কাপড় দিয়েছেন না গন্ধ পাবার পর? ভ্রাতৃদ্বয় হেসে বললেন—গন্ধ না পেলে নাকে কাপড় চাপা দেব কেন? হাসি ফুটে উঠল তাহেরের মুখে, নবাবকে বললেন, এঁদের মুখ থেকেই শোনা যে এঁদের শাস্ত্রে আছে যে ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সুতরাং হিন্দু ধর্মের নিষিদ্ধ মাংসের ঘ্রাণ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মাংসের অর্ধভোজন এঁদেরও হয়ে গেছে—সুতরাং এঁদেরও জাতি গেছে জনাব, এখন আমাদের সঙ্গে খানাপিনায় আর আপত্তি কি?—সেই রাত্রেই কয়েদ করে রাখা ভ্রাতৃদ্বয়কে কলমা পড়িয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হল। কামদেব হয়ে গেলেন কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী আর জয়দেব হয়ে

গেলেন জামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী। নবাব-দত্ত শিঙিয়া গ্রামেই (মতান্তরে তার নিকটস্থ মাগুড়ায়) নতুন করে বাসা বাঁধলেন জাতিভ্রষ্ট ধর্মচ্যুত, হতভাগ্য ভ্রাতৃযুগল।' (১)

সমাজ প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ'রা তখন শীর্ষপুরুষ। এ'দের গ্লানির কথা তাই দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্তরে। সমাজ-পুরুষরা দাবী করলেন যে রতিদেব ও শুকদেব স্বীয় কৌলীন্য রক্ষার জন্যে সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করুন জাতিচ্যুত অগ্রজদের সঙ্গে। রতিদেব-শুকদেব উত্তর দিলেন, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সব আজ মিথ্যা হয়ে যেতে পারে কিন্তু তাঁদের মধ্যে রক্তগত যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সেটা কি করে মিথ্যা হবে—পিতামাতা তাদের পরস্পরকে যে সম্পর্ক বন্ধনে বেঁধে গেছেন তাকে মিথ্যা করে দেওয়ার কল্পনাও অসম্ভব। সমাজ-অনুশাসনের প্রতি অবহেলা সহ্য করলেন না সমাজপতির দল। বড়-মেজ হয়েছেন জাতিচ্যুত, সেজ-ছোট হলেন সমাজচ্যুত। সমাজের কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এ'দের যোগ আর রইল না। সামাজিকতার গণ্ডীর বাইরে রয়ে গেলেন অটল প্রতিষ্ঠ দক্ষিণানাথের ভাগ্য-বিড়ম্বিত পুত্রেরা। সমাজের সঙ্গে যে এ'দের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করার জন্যে সাধারণ্যে এ'রা চিহ্নিত হলেন 'পিরালী' আখ্যায়। মরমে মরে গেলেন রতিদেব রায়চৌধুরী। সমস্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে দান করে সামান্য জমি নিয়ে বাস করতে লাগলেন ভৈরব নদের তীরে। (২)

কামদেব-জয়দেব কামাজ-জামাজ হলেন বটে, তেমনই হিন্দু সমাজের অনুশাসনের সীমার বাইরে চলে গেলেন, তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সমাজের রইল না, রতিদেব সরে গিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু এই সব ঘটনার ফলে সত্যিকারের বিপদগ্রস্ত হলেন শুকদেব। কেন না তাঁর অবিবাহিতা বোন এবং মেয়ের বিবাহ দেওয়ার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত। এদিকে ক্রমেই তারা লতাপাতার মত বেড়ে উঠছে। এখন পঁচিশ বছরের মেয়েরাও খুকী সেজে বেড়ান তখন ঐ বয়েসে মেয়েরা দৌহিত্রের চাঁদ মুখ দেখে নিজেরা দিদিমার পর্যায় গণ্যা হতেন। শুকদেবের দুশ্চিন্তা ক্রমেই ব্যাপক হতে থাকে। তাঁরা যে সমাজচ্যুত, স্ব-সমাজের কোন পাত্রই সম্মত হবে না তাঁদের পরিবারের কন্যাকে গ্রহণ করতে। এক্ষেত্রে কোন হরই এগিয়ে আসবেন না, কোন অর্জুনই করতে চাইবেন না লক্ষ্যভেদ, কোন পৃথ্বীরাজের পদার্পণ ঘটবে না এই সমাজতাক্ত পুরুষের আঙ্গিনায়।

ভিনদেশের এক যুবক এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন শুকদেবের। জাতিতে ব্রাহ্মণ, অকৃতদার, লাফিয়ে উঠলেন শুকদেব। মনে করলেন সাক্ষাৎ দৈব অনুগ্রহ, কৌশলে যুবককে বন্দী করে রেখে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকেই করলেন ভগ্নী সম্প্রদান। রত্নমালার বিয়ে হয়ে গেল দোপাতি মুখোপাধ্যায়ের ছেলে মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চেঙ্গুটিয়ার মধ্যেই আড়াই শ' বিঘে ভূমি ও বিস্তর ধনরত্ন দিয়ে শুকদেব মঙ্গলানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সংসার-জীবনে। (৩)

ছেলে জগন্নাথ বিয়ে করলেন শুকদেব রায় চৌধুরীর মেয়েকে। মঙ্গলানন্দকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন শুকদেব, জগন্নাথকেও করলেন তিনিই। পিতৃকুলত্যক্ত জগন্নাথ শ্বশুরের কাছ থেকে পেলেন বারপাড়া গ্রাম সপরিবারে বসবাসার্থে।

একটি কথা এখানে সবিনয়ে উল্লেখ করি, শুকদেবের জামাতারূপে জগন্নাথের স্থলে তাঁর পুত্র পুরুষোত্তমের নাম অনেক লেখকই উল্লেখ করেছেন। ঘটক নীলকান্ত ভট্টের লেখা "দেখিয়া সুন্দরী মেয়ে, পুরুষোত্তম কল্লেন বিয়ে"—পংক্তি দুটি পাঠ করেই এই সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হয়েছেন এ ধারণা আমরা করতে পারি, কিন্তু পুরুষোত্তম শব্দটি যে এক্ষেত্রে জগন্নাথের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্র কারিকাটি পাঠ করলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারিকার বিভিন্ন স্থানে বারবার নানাভাবে জগন্নাথের নাম উল্লেখিত হয়েছে যেমন—"জগন্নাথ ন্যায় পঞ্চানন ...কর্তেছেন গমন", "ভট্টনারায়ণ বংশধর জগন্নাথ তারপর "জগন্নাথ আজ হবেন ঠুঁটো", জগন্নাথ পড়িয়া বিষম পাকে, যতনেতে জগন্নাথ বশ ইত্যাদি আর "পুরুষোত্তম জগন্নাথ, চল্লেন শুকদেবের সাথ" এই লাইনটি পড়লে একটি বালকও বুঝতে পারবে যে, এখানে পুরুষোত্তম শব্দটি জগন্নাথেরই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ বহুবন্দিত তথ্যান্বেষীর দল কেন যে এই সামান্য কথাটুকু বুঝতে না পেরে পিতা-পুত্রকে কেন্দ্র করে এরকম একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করলেন তার সূত্র আবিষ্কার করা দুষ্কর।
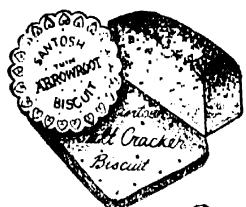
সুসজ্জিত বজরায় চড়ে ভৈরব নদের উপর দিয়ে পুরোনো কশবার দিকে চলেছেন খুলনা জেলার পিঠেভোগ গ্রামের জগন্নাথ কুশারী। কেয়াতলার কাছে এসে দেখা পেলেন ঘোর দুর্যোগের। ঝড় উঠল। প্রতিমুহূর্তেই ঝড়ের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে বজরা উল্টে যেতে পারে, জীবন বিপন্ন, বজরা থামাতে বাধ্য হলেন জগন্নাথ, আশ্রয় নিলেন নদীতীরস্থ কালীমন্দিরে, যে কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দক্ষিণানাথ। সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথের আগমনবার্তা কর্ণস্থ হল শুকদেবের, সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন অতিথিকে, জানালেন জগন্নাথ জাতিতে ব্রাহ্মণ, আরও জানালেন তিনি অবিবাহিত। সুযোগ দিলেন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার নিজের অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে। একটি যুবক, একটি যুবতী। একজন সুন্দর, একজন সুন্দরী, ক্রমশঃই মনের দিক থেকে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেলেন। তারপর একদিন বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ, শোনা গেল হুলুধ্বনি, পুরবাসিগণের অনুপম আনন্দের মধ্যে যুবকের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দিত্ব গ্রহণ করল যুবতীর কোমল করপল্লব।

"বেণী-সংহার"এর স্রষ্টা মহামতি ভট্ট-নারায়ণের পঞ্চদশ পুত্র দীন বর্ধমানান্তর্গত কুশ গ্রামের মালিকানা পেলেন মহারাজা ক্ষিতি-শূরের দরবার থেকে। সেই থেকেই এ'র বংশধরেরা সাধারণ্যে অভিহিত হলেন কুশারী আখ্যায়। এই বংশের রামগোপালের

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙলাদেশের মনন সাগরে যে নবজাগরণের ঢেউ খেলতে লাগল—সেই গৌরবের জন্যে বহুলাংশে আমরা দায়ী করতে পারি শুকদেবের মেয়ের সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহকে। বাঙলাদেশের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবগঠনের ইতিহাসে এই বিবাহ যেমনই উল্লেখনীয় তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। এ'দের মেজ ছেলে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পুরুষোত্তমের বংশে জন্মগ্রহণ করলেন পঞ্চানন কুশারী। জ্ঞাতি কলহে তিক্ত হয়ে কাকা শুকদেবের সঙ্গে বারপাড়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে আবার অন্যদিকে নতুন জীবনধারার তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরের আদি গঙ্গার তীরে করলেন বসতি স্থাপন। পেশা হ'ল জাহাজের কাপ্তেনদের নিয়মিত ফল সরবরাহ, ক্রমে সব কিছু সরবরাহের ভার পেলেন পঞ্চানন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে একদিকে ছিল কাপ্তেন প্রমুখ জাহাজের বিদেশী কর্মিবর্গ আর একদিকে ছিল নীচজাতীয় জেলে-মালো-কৈবর্ত প্রভৃতি, এদের মধ্যে মাত্র এক ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন—কুশারীরা খুড়ো-ভাইপো। পঞ্চাননের আকৃতি ছিল দেবোপম সৌম্যময়। ললাটে হোমটীকা, গলায় যজ্ঞোপবীত পায়ে পাদুকা। খালাসী থেকে শুরু করে জেলে কৈবর্ত প্রভৃতি জননির্বিশেষে তাঁকে ডাকতে আরম্ভ করল ঠাকুর মশাই বলে। কুশারী হয়ে গেল অতীত আর ঠাকুর হল বর্তমান। কুশারী হয়ে গেল মহেঞ্জোদারো আর ঠাকুর হল নব দেহলি, কুশারী আবদ্ধ হয়ে রইল ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় আর ঠাকুর ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে, বচনে উল্লেখে। পঞ্চাননের পূর্ব-পুরুষ জগন্নাথ কুশারীর বিবাহকে আমরা কিছু পূর্বেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছি, তার কারণ এই পঞ্চাননের বংশেই জন্মগ্রহণ করে বংশে, জাতি ও সারা দেশকে ধন্য করলেন বিশ্ব-বরেণ্য ঠাকুরপুরুষেরা। নিজেদের কালজয়ী অবদানে যাঁরা সারা দেশকে করলেন সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত, মানুষের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী, বুদ্ধি বৃত্তির মোড় ফেরালেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে এক নবতম রূপ দিয়ে, ভারতের শাশ্বত আত্মার অনির্বচনীয় রূপ বিকশিত হয়ে উঠল যাঁদের মাধ্যমে, ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে সার্থক করে তোলায় যাঁরা দিলেন পথনির্দেশ, সাহিত্যে -দর্শনে-শিল্পে-সঙ্গীতে- জনসেবায়-রাষ্ট্রনায়কত্বে—সমাজ কল্যাণে যাঁরা সৃষ্টি করলেন নতুন যুগ, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা......

সে আর এক ইতিহাস।

---

(১) কামদেবের বংশধরেরা এখনও বিদ্যমান।

(২) রতিদেবের বংশধরেরা পরবর্তীকালে শুকদেবের বংশে পুরোহিতের আসন অলংকৃত করে থাকেন। দূরে সরে যাওয়ায় সমাজের শোন-দৃষ্টি রতিদেবের উপর বিশেষ পতিত হয় নি, পিরালী শুকদেবের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে তাঁদের পূর্বতন পুরোহিত আর সম্মত না হলে রতিদেবের পুত্র শ্রীদেব খুল্লতাতকে পুরোহিত-সংকট থেকে রক্ষা করেন। সেই থেকে ঐ বংশের অনেকেই এ বংশে পৌরোহিত্য করেছেন।

(৩) মঙ্গলানন্দের এক নাতির নাতি লক্ষ্মণ দেব নবাবের দরবার থেকে "মুস্তফী" উপাধি প্রাপ্ত হন। এর অর্থ অনেকের মতে Surveyor-General, এ'দের অধীনে আমীন, মজুমুয়াদার (মজুমদার), শার্ণা (Chain man) প্রভৃতি কাজ করতেন। লক্ষ্মণ দেবের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন নটকুলশেখর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম রূপদাতা 'ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং এই বংশে বিবাহ করেন 'মহিলা'র স্বনামধন্য কবি 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (তাঁর পিতৃদেব প্রসন্ন-চন্দ্রও) ও স্বনামধন্য বাগ্মী বিশিষ্ট নাগরিক 'অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, শুকদেবের বংশধরেরা বর্তমান এবং তাঁদের মধ্যে ভারতবরেণ্য ভাস্কর শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরন্ময় রায়চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

> যুবতী রমণী প্রদীপ শিখার মত—
> ওরে মূঢ় মন পতঙ্গ সম
> যেওনা সেদিকে উড়ে।
> সাধুর সঙ্গ কর অবিরত
> কামমদ তেয়াগিয়া,
> তুলসীর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র থাকুন
> হৃদয় জুড়ে।।
> —তুলসীদাস রামায়ণ (মায়া বসু)

ব্যাধি

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মনোরঞ্জন ট্যাক্সি চালায়। গত পাঁচ বছর ধরেই চালাচ্ছে। প্রথম প্রথম তেমন সুবিধে হত না। আজকাল ভাল উপায় করে। সংসারের চেহারাটাও বদলে ফেলেছে। অবশ্য সংসার বলতে বুড়ো বাপ মা আর দুটি অবিবাহিতা বোন। ওদের কথা ভেবেই আজও সে বিয়ে করেনি। মা মাঝে মাঝে তাগিদ দিলেও মনোরঞ্জন গা করে না। বোনেদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, ওদের একটা হিল্লে হলে তবে সে নিজের কথা ভেবে দেখবে।

মা প্রকাশ্যে দুঃখ জানালেও অন্তরে গর্ব বোধ করেন। একটা পরম সুখানুভূতিতে মনটা ভরে উঠে। দুহাত জোড় করে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানান। ওর মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করো ঠাকুর।

মনোরঞ্জন বলে, এইত সবে কিস্তির টাকাটা শোধ হল। আর কিছুদিন চুপ থাক মা... এবার থেকে পুরো টাকাটাই ঘরে আনতে পারব।

মার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। এই হাসিটিই অম্লান রাখতে চায় মনোরঞ্জন।

মিটার বাক্সটি লাল শালুতে ঢেকে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ীর পথে চলেছিল মনোরঞ্জন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ ব্রেক কষল একটা আর্ত আহ্বানে, ট্যাক্সি......

আশ্চর্য কিছুক্ষণ আগেও এমনি বহু আহ্বানকে সে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এসেছে। অথচ......

না মনোরঞ্জন এ আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাকে থামতে হল।

আহ্বানকারী মেয়েটি দ্রুত এগিয়ে এসে গাড়ীতে প্রবেশ করে স-শব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই প্রশ্ন হল, কোথায় যাবেন?

জবাব পাওয়া গেল না। মেয়েটির ঠোঁট দুখানা তখনও থর থর করে কাঁপছে। বুকের মধ্যে চলেছে একটা অস্বস্তিকর দাপাদাপি।

মনোরঞ্জন পুনরায় প্রশ্ন করে, কোথায় যাবেন বললেন না ত'?

মেয়েটি এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। ভীরু গলায় বলল, বাগমারী।

মুহূর্তের জন্য একবার পিছন ফিরে দেখে নিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নিল মনোরঞ্জন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মৃদু গলায় সে জিজ্ঞেস করে, আপনি ত শুভাদিদি? আমাকে চিনতে পেরেছেন কি? আমি মনা।

কোন জবাব পাওয়া গেল না।

মনোরঞ্জন পুনরায় একই প্রশ্ন করতে শুভা জানাল, পেরেছি।

চৌরাস্তার লাল আলো জলে উঠতেই মনোরঞ্জন ব্রেকের উপর পা তুলে দিল। গাড়ী দাঁড়াল।

মনোরঞ্জন বলল, চিনবারই কথা। এমন কিছু বেশী দিনের কথা ত' নয়। তাছাড়া আপনাদের বাড়ীতে খুব বেশী যেতে হত কিনা—

কেন যেত সে কথা মনোরঞ্জন অবশ্য বললে না কিন্তু শুভার সব কথা স্পষ্টই মনে আছে। ক্ষেতের সব্জি, গাছের প্রথম ফল কিংবা পুকুরের সেরা মাছ শুভার বাবাকে নিবেদন না করে ওরা কোনদিনই নিজেদের ঘরে তোলেনি। এই দেওয়ার মধ্যে মনোরঞ্জনের বাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। একদিনের উপকার পরবর্তীকালে ভুলতে চায়নি বলেই কারণে অকারণে এগিয়ে এসেছে। শুভার বাবা প্রত্যাখ্যান করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেননি। তার মুখের পানে চোখ পড়তেই তিনি থেমে গেছেন। সেদিনের গ্রহণ করার মধ্যে হীনমন্যতা ছিল না। প্রয়োজন ছিল না বলেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। আজ কিন্তু শুভাদের সেদিন নেই। অতীত আজ তাদের কাছে নিতান্তই একটি কাহিনী। বর্তমান সেদিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। অথচ উঠে দাঁড়াবার জন্য তারা কত চেষ্টাই না করে চলেছে, বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য অভিশাপ তাদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। নতুন করে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম বলি তার বড়দা। পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পেয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর উঠল না। যক্ষ্মায় মারা গেলেন তার বড়দা।......

সবুজ আলো জলে উঠেছে। গাড়ী আবার চলতে সুরু করল।

শুভা ভাবছিল, তাদের চলার পথের লাল আলোটা কি অনন্তকাল শুধু লালই থেকে যাবে, নইলে মেজদাকেও দাদার পথ অনুসরণ করতে হবে কেন...বড়দা চলে যেতে বাবা কথা বন্ধ করলেন। মেজদা যাবার পরে আবার তাঁর মুখে কথা ফুটল। আজকাল অনর্গল তিনি শুধু কথাই বলেন। গভীর তার অর্থ। কিন্তু লোকে বলে তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

ছোট ভাইটি বকে গেছে। দিনান্তে এক-আধবার সে বাড়ীতে আসে। অন্য কোথাও কিছু না জুটলেই দেখা দেয়। বলে, এই দিদি ঘরে কিছু আছে? ক্ষিদে পেয়েছে।

থাকলে দেয়—না থাকলে গালমন্দ দিয়ে বিদায় করে দেয়। ভ্রূক্ষেপ নেই। কখনও হাসে—কখনও মুখ কাল করে চলে যায়। কখনও চোখ দুটো জলে উঠে।

বড়দা গেছেন, মেজদা গেছেন, এইবার হয়তো শুভার পালা। তারপর...তারপর আর কি...সম্মুখে তাদের অতল গহ্বর...কিছুই চোখে পড়ে না...অন্ধকারের এক সীমাহীন পথ।

ভয় পেয়েই সে পথের সন্ধানে এসেছিল—যে পথে নেমে এসে করুণা তাদের সংসারের চেহারা ফিরিয়েছে। সীমা বস্তী ছেড়ে পাকা বাড়ীতে গেছে। শুভা এতদিন পারেনি। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওদের অপমান করে দূর করে দিয়েছে। কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তবুও ওরা আসে। খোঁজ খবর নেয়। বলে, না হয় আমাদের কাছ থেকেই কিছু টাকা পয়সা নে—নইলে কতদিন আর তোর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবি।

শুভার মনে হয় ওরা হয়ত দাদন দিতে চায়। তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মন বলে ওরা মোটেই মিথ্যে বলছে না। আশে-পাশে যতদূর তার দৃষ্টি যায় সর্বত্রই সে আগ্রহ আর আশা নিয়ে খুঁজে ফিরেছে একটা সহজ আর সম্মানজনক পথ। অথচ পায়নি। পা বাড়াতেই পায়ের তলায় কাঁটা ঠেকেছে। সভয়ে পা সরিয়ে নিয়ে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে। কাঁটার খোঁচায় পা দিয়ে তার রক্ত ঝরবার অবকাশ না পেলেও বুকের রক্ত ক্ষরণ রোধ করতে পারেনি। অভাব, অনটন আর অনশনের আঘাতে প্রতিদিন তা ঝরে ঝরে পড়ছে। জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে তার আজন্মের বদ্ধমূল ধারণাটা ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে যেতে এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যে...মন তাকে আজ অন্য পথের দিকে ইঙ্গিত করতে সুরু করেছে। যে কথা ভাবতেও একদিন

শুভা ঘৃণায় শিউরে উঠেছে সেই পথেই পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছিল সে, কিন্তু প্রারম্ভের অসম্মানজনক বাস্তবের সম্মুখীন হতেই তার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে। নামতে গিয়েও তাকে থামতে হয়েছে। কিন্তু তারপর...

একটু পরেই হয়ত মনোরঞ্জন হাত পেতে ট্যাক্সির ভাড়া চাইবে—হয়ত চাইবে না। কিন্তু এই দ্বিবিধ পরিস্থিতির কোনটিই তার কাম্য নয়। সম্মানজনক নয়......

সম্মানজনক...শুভা মনে মনে একটু হাসল। হাসির কথাও। সত্যি সত্যি এই শব্দটির কোন অর্থই আজ আর তাদের কাছে নেই। কিন্তু যুক্তি বিচারকে মানুষ সব সময় মেনে নিতে পারে না বলেই শুভার মনে এত দ্বন্দ্ব, বেদনা আর হতাশার ভীড়।

শুভার এতক্ষণের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, এবারে বাঁদিকে যাব কি?

অকারণেই একটু চমকে উঠে জবাব দিল শুভা, না আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে।

গাড়ী পুনরায় চলতে সুরু করেছে। আর একটু এগোলেই পৌঁছে যাবে। বাবা হয়ত পথের পানে চেয়ে বসে আছেন। অন্যান্য বোধশক্তি তাঁর শিথিল আর বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও ক্ষুধা বোধটা ষোল আনা ছাড়িয়ে আঠার আনায় পৌঁছেছে। ক্ষুধার সময় আহার্য না পেলে ছেলেমানুষের মত হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেন।...

আবার হুঁচোট খেল—শুভার চিন্তাধারা। হ্যাঁ এখানে—এখানে দাঁড়ালেই হবে। অত সরু গলির মধ্যে গিয়ে আর কাজ নেই। শুভা দরজা খুলে রাস্তায় নামল। মনোরঞ্জনও ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাড়ার কথাটা কোন তরফ থেকেই কেউ তুলল না।

শুভা চলে যেতে গিয়েও পারল না।

মনোরঞ্জন বলল, আপনার বাবার সঙ্গে একবারটি দেখা করে যাব ভাবছি। এতদূর এসে তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে গেলে মন খুঁত খুঁত করবে । তাছাড়া বাবা শুনলেও রাগ করবেন।

শুভা মুহূর্তের জন্য একটু দ্বিধা করে মনোরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হল। চলতে চলতে মৃদু কণ্ঠে বলল, বাবার সঙ্গে দেখা হলে আরও দুঃখ বাড়বে। তিনি আজ আর স্বাভাবিক মানুষ নেই। দুঃখে, কষ্টে আর শোকে কেমন যেন হয়ে গেছেন।

মনোরঞ্জনের কণ্ঠে খানিকটা বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, কেন? আপনার দাদারা কি এত-দিনেও কিছু করে উঠতে পারেন নি!

শুভার একটি নিঃশ্বাস পড়ল। ফিস ফিস করে সে জবাব দিল, তাঁরা নেই......

মনোরঞ্জন যেন আর্তনাদ করে উঠল, নেই...

না নেই—শুভা বলতে থাকে, দাদা অনেক দিনই গেছেন। মেজদাও সেদিনে গেলেন। শুভার কণ্ঠস্বর বুজে এল। একটু দম নিয়ে সে পুনরায় ধরা গলায় বলতে লাগল, সময় থাকতে বাবা গ্রাম ছেড়ে এলেন না। তাঁর এক কথা—দেশ বিভাগ অস্বাভাবিক। এ কখনও টিকতে পারে না। কি পারে আর কি পারে না তা আজও বুঝলাম না কিন্তু আমাদের শেষ পর্যন্ত একেবারে খালি হাতেই চলে আসতে হয়েছে। তারপর যাদের ভরসায় বাবা নতুন করে বুক বাঁধলেন তারাও একে একে ফাঁকি দিল।

শুভা চুপ করল। মনোরঞ্জনের মুখেও কথা নেই। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শুভাই পুনরায় মুখ খুলল, এই দরজা দিয়েই ভিতরে যেতে হবে।

●

শুভার বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি মনোরঞ্জন।

মনোরঞ্জন! তিনি অপলক দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে অস্থিরভাবে মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে কাত করে জবাব দিলেন, নন্দর ছেলে মনা তুমি। তোমাকে চিনব না কেন বাপু। কিন্তু আজ যে বড় খালি হাতে এসেছো তুমি?

শুভা ডাকল, বাবা—

এ আহ্বানকে তিনি আমল দিলেন না। তেমনি মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে থাকেন, তোমাদেরও বুঝি সব গেছে। জোর করে নিয়েছে...নিজেই হলো আর কি...না বেচে কিনে সব পেটায় নম...

তিনি টেনে টেনে খানিক হেসে পুনরায় বলতে থাকেন, আমি কিন্তু বেচিনি। আর

ক্লান্ত এ পাখা কত আর রাখি মেলে?
অপার আকাশে কত আর চলি
দুটি ডানা ঠেলে ঠেলে?
চলার বোঝায় নুয়ে পড়া দেহটাতে—
টেনে বয়ে চলি অসীম শূন্যতাকে—
এ ক্লান্তি বোঝা ক্ষণেকের তরে নামাই
কি করে নামাই?
এ শূন্যপথ পরিক্রমাকে বারেক
কি করে থামাই!
ঘন কালো মেঘে ছাওয়া এ আকাশে
উঠেছে ঝড়—
ছোট ক্ষীণ মুঠি আঁকড়ি শাখায়
পাতা কাঁপে থর্থর।
অসীম শূন্যে আছে চারিদিকে মেলা—
কালো ঝড়ে আর বাঁকা-বিদ্যুতে
পথ ভোলাবার খেলা।
তবুও ক্লান্ত এ পাখাদুটিকে রেখেছি মেলে,
এ বোঝা হয়ত নামবে কখনো দুরন্ত
রাত গেলে।
হয়ত আবার এ শ্রান্তিভার ঘুচবে
সন্‌জীবনীর মন্ত্রে দু'ডানা আকাশের
অমা মুছবে,
সোনার সকাল অন্ধ রাতের আড়াল ঠেলে—
কালো আকাশের আলো ঝলমল
মুখখানি দেবে মেলে।

পেয়েছি লবডঙ্কা...হাত তুলে তিনি বুড়ো আঙুল দেখাতে থাকেন।

মনোরঞ্জন ব্যথিত ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে শুভার পানে মুখ তুলে তাকাল। শুভা মাথা নত করল। সময়মত শুভার ছোট ভাইও চীৎকার করতে করতে এসে ঘরে ঢুকল। তোর পয়সা নেই তো ট্যাক্সি করে বাড়ী এলি কি করে? সারাদিন পয়সা নেই বলে না খাইয়ে রেখেছিস মিথ্যাবাদী কোথাকার...

শুভা লজ্জায়, অপমানে আর রাগে ফেটে পড়ল. অনুপ—

অনুপ এতক্ষণে মনোরঞ্জনের উপস্থিতি টের পেয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা না বলে যে পথে এসেছিল সেই পথেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুভার বাবা তখনও বলে চলেছেন, নেই তো খাবি কি? লবডঙ্কা...লবডঙ্কা...

মনোরঞ্জন মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শুভাদি—

একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শুভা মুখ তুলে তাকাল। কোন কথা বলল না।

মনোরঞ্জন কিন্তু হয়ে বলল, আমার কাছে লজ্জা করবার কিছু নেই। তাছাড়া ভগবান যখন আপনাদের মধ্যে এনে ফেলেছেন তখন জেনে শুনে একেবারে চুপ করে চলে যাই কেমন করে।

খান দুই দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে সে পুনরায় অনুনয় করে বলে, এই টাকা কটা রাখুন। আমাকে পর ভাববেন না। আমি আবার খোঁজ করে যাব।

শুভা একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে মনোরঞ্জন পুনরায় বলে, না হয় সময়মত শুধে দেবেন। বিপদে পড়লে মানুষে ধারও ত করে।

মনোরঞ্জন শুভার সংকুচিত হাতের মধ্যে নোট দুখানি গুঁজে দিয়ে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। দ্রুত প্রস্থান করল।

মনোরঞ্জন চলে যেতেই শুভার বাবার অকস্মাৎ সারাদিনের উপবাসের কথাটা মনে পড়ল—সেই সঙ্গে মনে পড়ল তার অনুপস্থিতির কথাটাও। প্রচুর অসংলগ্ন কথার মধ্যে দিয়ে অনুযোগ দিলেন তিনি।

শুভা মুখ বুজে শুনে যায়। এ ছাড়া, আর কি করতে পারে সে। অভুক্ত ছোটভাই ক্ষুধার অন্ন চায়—ক্ষুধার্ত পিতা আহার্য পায়নি বলে অনুযোগ দেয়...হাত পেতে মনোরঞ্জনের কাছ থেকে টাকাকটা না নিয়ে উপায় কি! সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম চেষ্টাই সে আজ করে দেখেছে কিন্তু...মনে মনে শুভা শিউরে উঠল। মনোরঞ্জনের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা গ্রহণ করায় হয়ত অসম্মান আছে কিন্তু গ্লানি নেই। শুভা ভাবছিল, মনোরঞ্জন আবার আসবে বলে গেল। ঠিক আজকের মত হয়ত হাতের মধ্যে টাকা গুঁজে দিয়ে যাবে কিন্তু এভাবে কতদিন চলতে পারে। তাছাড়া মনোরঞ্জনের দেবার যেমন একটা সীমা আছে তাদের গ্রহণ করবারও তেমনি একটা অবধি থাকা উচিত। এ পথ অভাব মোচনের পথ নয় বলেই কথাটা বার বার শুভা ভাবছে। আজ নিতান্ত আকস্মিকভাবে মনোরঞ্জন তাদের দুরবস্থার এই নগ্ন, বীভৎস আর করুণ দিকটার সম্মুখীন হ'য়ে মনের যে দিকটা তার দাক্ষিণ্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে দুদিন পরে সেই হাত যে আবার সংকুচিত হ'য়ে যাবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে। গত ক বছরের অভিজ্ঞতা শুভাকে এই পথে চিন্তা ক'রতেই শিখিয়েছে। মনোরঞ্জন এর ব্যতিক্রম একথা সে কোন্ যুক্তিতে ভাবতে যাবে? বরং তাদের সংসারের নিদারুণ অভাবের যে দৃশ্যটি আজ সে নিজের চোখে দেখে গেল তা ওকে আতঙ্কিত ক'রে তুলবে......আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

●

দূরে সরিয়েই মনোরঞ্জনকে নিয়েছে। শুভার অনুমানই এখন পর্যন্ত ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। বিস্মিত হবার কিছু নেই! বরং এর ব্যতিক্রম ঘটলেই শুভা আশ্চর্য হ'ত। বিরূপ চিন্তায় সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠত। এ বরং ভালই হয়েছে। মনোরঞ্জন সত্যি সত্যিই তাদের ভাগ্যকে বদলে দিতে পারত না। তার স্বল্প সামর্থ্যে বেশী কিছু করা সম্ভবও নয়। কিন্তু শুভাদের দিন আর চলছে না। একেবারেই থেমে যাবার উপক্রম হ'য়েছে। বাবা কিছু বোঝেন না। বুঝবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। ছোট ভাইটা বরং অনেকখানি বুঝতে শিখেছে। হাতে ধরে না দিলে ইদানীং আর খেতেও চায় না। কদিন ধরেই ওর চালচলনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে শুভা। কিছু একটা লুকোবার প্রয়াস।

আজকের দিনে কুড়িটি টাকায় আর কদিন চলতে পারে। তবুও ত শুভা প্রায় মাসখানেক ঐতেই টেনে নিয়ে এসেছে। আজ একেবারে রিক্ত। দাওয়ার উপর বসে বসে ভাবছিল সে, আর খানিক পরেই বাবার চীৎকার সুরু হবে। সময় বুঝে তাঁর ক্ষিধেও বেশী পায়। ইতিমধ্যে অনুপ এসে দিদির আনত চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ফিরে গেছে। শুভা টের পায়নি। নিমগ্ন হ'য়ে ভাবছিল।

বস্তীর লাগোয়া গেঞ্জি কলের মালিকের ছেলের মুখে ভাত। বিস্তর চেঁচামেচি আর উৎসব আনন্দের ঢেউ থেকে থেকে ভেসে আসছে। বিরাট আয়োজন। হাজার দুই লোক খাবে। যুদ্ধের বাজারের ফাঁপা টাকায় বড়লোক। টাকার হিসেব নেই। হিসেব করাটাই ওদের কাছে বে-হিসেব। একটু আগেই কে একজন ব'লতে ব'লতে যাচ্ছিল। কথাকটি শুভার কানে গেল কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না।.........

দিদি—

কী আশ্চর্য আকাশের ছাদ ঃ
ওই ছাদে পাখা মেলে মন আর মাটির আবাদ।
সারাদিন সারারাত ছায়া ঘন-নীল
ওখানে হৃদয় হয় অপরাহ্নে চিলের মিছিল।
দিগন্তে হেমন্ত নামে। পলাতকা মেঘ
শিশির-সমুদ্রে আনে স্বপ্নময় দুরন্ত আবেগ।
পল্লবিত পাতার মর্মরে ঃ
রৌদ্রের নির্জন গান সোনালি
ধানের মত ঝরে।

লাখে লাখে পাখি উড়ে আসে
অনেক মানচিত্র ঘুরে ছোট এই
আমার আকাশে।

পড়ন্ত বেলায় তারা একই বৃত্তে ঘোরে
একই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মাথার ওপরে।
সমস্ত হৃদয় হয় অকারণ কাকলীমুখর ঃ
আমিও বিহঙ্গ হবো আজ রাতে
যদি ওঠে ঝড়।

শুভা মুখ তুলে তাকাল।

তুই কাঁদছিস দিদি?

না রে কাঁদিব কেন—শুভা টেনে টেনে হাসতে থাকে।

অনুপ ফিস ফিস করে বলতে থাকে, ঐ যে যাঁর ছেলের ভাত তিনি আমাকে ডেকে অনেক ভাল ভাল কথা ব'ললেম দিদি। খেতেও দিলেন—আর ব'ললেন—তুই একবার বললেই গেঞ্জি কলে আমার একটা চাকরী হয়।

শুভার মুখভাব কঠিন হ'য়ে ওঠে। বলে, না।

অনুপ আর্তনাদ করে উঠে, আমরা কি তাহ'লে না খেয়ে মরবো—

অন্যমনস্ক ভাবে শুভা জবাব দেয়, হু......

অনুনয় করে অনুপ বলে, লক্ষ্মী দিদি শুধু একটিবার বলে দে।

শুভা যেন ঠিক নিজের মধ্যে নেই এমনি ভাবে বলে, শুধু মুখের কথায় হবে না অনুপ। আমাকে বিরক্ত করিস নে যা।
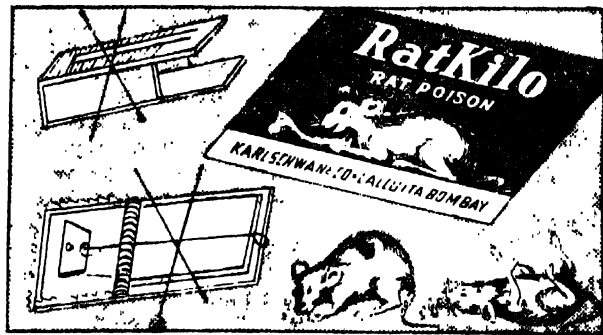
তথাপি কিছু বলবার জন্য চেষ্টা করতেই শুভা তাকে ধমক দিল, যা খাবিসনে তা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করিস না অনুপ।

এর পরে অনুপ আর দাঁড়াল না। বিমর্ষ ভাবে চলে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে বাবার আহ্বান এল খেতে দে শুভি। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কি খেতে দেবে শুভা। তার গায়ের মাংস?......গায়ের মাংস......তাই হয়ত শেষ পর্যন্ত দিতে হবে। রক্ত আর মাংস। জীবনের ঋণ শোধ ক'রতে হবে না! বড়দা ক'রেছেন—মেজদাও ক'রেছেন। এইবার তার পালা।

●

এই যে শুভা তুমি এখানেই আছ। বলি ভাইটাকে কি একেবারে আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছ? উচ্ছন্নে গেছে যে। মীনার দাদা ঘরে ঢুকে ব'লল।

শুভা তার বক্তব্যটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে চেয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

মীনার দাদা বলে, চালের গাড়ী খালাস করা হ'চ্ছিল রাম ভগতের দোকানে। বস্তা ফুটো ক'রে কোঁচড় ভর্তি চাল নিয়ে হাওয়া। ধরতে পারলে হাড়-মাংস আলাদা ক'রে দিত তা জান। একটু নজর রেখো শুভা। শেষ পর্যন্ত কিনা চুরি। ভদ্দরলোকের ছেলে তুই। আরে ছিঃ-ছিঃ।

চলে গেল মীনার দাদা। একথা আজ সে ব'লতে পারে। মীনা পাকা বাড়ীতে বাস করে, সেখান থেকে টাকা পাঠিয়ে দাদার সংসারের চেহারাটাও পাল্টে দিয়েছে। পেটের জ্বালার কথা আজ হয়তো মনেই নেই। ভুলে গেছে।

চোখ দিয়ে শুভার জল গড়াচ্ছে। কিন্তু বুকের মধ্যে কোথাও অভিযোগের আভাস মাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু ব্যথায় এবং বেদনায় তার সমস্ত সত্ত্বা বিবর্ণ হ'য়ে গেল। এমনি করেই যায়! এমনি করেই যাবে। সমাজের ঘুণ ধরা স্বাস্থ্য শুধু উপর থেকে প্রলেপ দিয়ে কতদিন টিকিয়ে রাখবে।

দিদি—

সাড়া দেয় না শুভা। বাবার আকুতি এতক্ষণে কান্নায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। এতখানি বেলা হ'য়ে গেল খেতে দে শুভি। খেতে দে।

অনুপ আবার ডাকল, চাল এনেছি দিদি নে।

শুভা ক্লান্ত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে হাত বাড়িয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে। বাবার চীৎকার আর এক পর্দা উঁচে উঠেছে। প্রায় গা সওয়া হ'য়ে গেছে। তবুও মানুষ ত' বটে। মনটা মাঝে মাঝে ভিজে যায়।

অনুপ বলছিল, মিত্তিরদের বাগানবাড়ীর পুকুরে অনেক শাপলা আর কলমি শাক দেখে এলাম। তার থেকে নিয়ে আসছি চাট্টি।

অনুপ চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই শুভা যেন নিজেকে ফিরে পেল। শক্ত করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বলল, তার আগে বল্ চাল তুই কোথা থেকে আনলি?

অনুপ মুহূর্তের জন্য একবার দ্বিধা ক'রল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, রাম ভগতের চাল থেকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি।

শেষ পর্যন্ত চুরি ক'রতে শিখেছিস অনুপ! শুভার গলার আওয়াজ ভিজে উঠেছে।

অনুপের দু-চোখ ছল-ছলিয়ে উঠল। কাতর কণ্ঠে বলল, রামভগত যখন চুরি করে! সের সের কাঁকর চালে মেশায়? ওজনে কারচুপি করে?

শুভা কঠিন হ'য়ে উঠল। বলল, তাই বলে তুই চুরি করবি? এ কাজ আর কোনদিন করিসনে ভাই—তোর দিদির দিব্যি রইল।

অনুপ মাথা নত করল।

একেবারে বয়ে গেছে ব'লে মীনার দাদা যতই বলুক না কেন সত্য ভাষণের সাহস দেখে অনুপের মুখের পানে চেয়ে দেখতে দেখতে অভিযোগটা শুভা পুরোপুরি বিশ্বাস ক'রতে পারল না। কিন্তু যে পথে অনুপ পা বাড়িয়েছে সেইপথ থেকে ওর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনবে কেমন ক'রে এই সমস্যাটাই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন হয়ে তার চোখের সম্মুখে দুলতে লাগল।

●

সন্ধ্যা বুঝে আবার দেখা দিয়েছে মীনা চুপি চুপি বলল, দাদার কাছে খবর পেয়েই ছুটে এসেছি [illegible]।

[illegible] পারেনি এমনিভাবে প্রশ্ন করল, কি খবর পেলে?

রূপের মিছিলে আমি

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

চলে বিশ্ব চলে তার অণুপরমাণুসহ,—আর
প্রাণ থেকে প্রাণ চলে জীব-প্রাণী
মানবের বুকে।

এই চলা নৃত্যদোল দুলিতেছে আঁখির পলকে।

এই গতি, এই গান, ছন্দ লয় অনাহত সুরে
যার বুকে এই খেলা তার কাছে
দূরেও অ-দূরে'!

ক্ষণে ক্ষণে চলে রূপে অরূপের অকূলে মিলায়,
এই নৃত্যে সুরে খালি ধরিয়া রাখিতে চায় ছবি,
কিন্তু হায় কোথা পথ করোটির দ্বারে কাঁদে মন,
কী দিয়ে অমর করি যাহা মোর হৃদয়ের ধন?—

আমি এক জল-বিম্ব, প্রাণ-বিন্দু অনন্ত
পাথারে;—
মানব-সমুদ্র মাঝে;—প্রাণ উৎস ঝর্ণামুখে
—নীড়।
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ক্ষণিকের
ছবি আমি শুধু!—
মরুর বালুকা-কণা অগ্নি-প্রাণ-বেদনায় ধূধূ!!
বাগিচায় ফুটি আর ঝরে যাই অনন্তের মাঝে!!

অসীমের চাঞ্চল্যের মাঝে হেরি—সহসা কে তুমি
'এ-ক্ষণ-আমি' রে আজ যাদুমন্ত্রে
ধরিয়া রাখিলে!

ওমা! মীনু আকাশ থেকে পড়ে বলল অনুটা নাকি শেষ পর্যন্ত চুরি ক'রতে সুরু করেছে—

শুভা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মীনার মুখের পানে তাকিয়ে হি হি করে হেসে উঠল। মুখ বাঁকিয়ে বলল, হঠাৎ তোর দাদা দেখে ফেলেছেন বলেই না—নইলে...শুভা আর একবার হেসে উঠে বলল, তার চেয়ে তোর আসল উদ্দেশ্যটা কি তাই বল। আবার কোন্ হৃদয়বানের এই গরীবদের উপর নজর পড়ল...

এতবড় আঘাতেও কিন্তু মীনা জ্বলে উঠল না। বরং আরও সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, একে একে সবাই মরার চেয়ে একজন মরে আর সকলকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে ভাই।

শুভা রূঢ় কণ্ঠে বলল, সেই জন্যই বুঝি তুমি মরেছো মীনা! কিন্তু ও বোধটা সকলের এক না। তুমি এখন যেতে পার।

মীনা তথাপি রাগ করে না। চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, কথাটা আর একবার ভেবে দেখো শুভা......

শুভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, তুমি চলে যাও মীনা। নিজেকে আর ছোট করো না।

মীনা চলে গেলেও তার কথাটা রেখে গেল। যা আবার নতুন ক'রে তাদের বর্তমান সংসারের জরাজীর্ণ অসহায় চেহারাটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কি অর্থ হয় তাদের এভাবে বেঁচে থাকার! বাবার কথা ইদানীং আর

শুভা ভাবতে চায় না। নিজের কথাও ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু অনুপ? আজও তাকে এই পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিতে পারলে হয়ত ভবিষ্যতে একদিন মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে পারবে। মীনা মরেছে...করুণা মরেছে...তাকেও ওরা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রক্ত মাংসের দাম পাওয়া যায়। পরিপূর্ণ একটা সুস্থ মানুষের কোন দাম নেই। শুভার দুচোখ একটা রুদ্ধ রোষে জ্বলছে। মাংসপেশীগুলো থেকে থেকে সংকুচিত হচ্ছে। নিজেকে শুভা আজ গভীর দৃষ্টিতে দেখছে; দেখছে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যংগকে একান্ত মমতাভরা দৃষ্টিতে। একটা অব্যক্ত বেদনায় গুমরে গুমরে উঠছে তার আত্মা।

●

চৌরংগী রোডের একটা বড় রেস্তোরাঁ থেকে বার হ'য়ে এল গেঞ্জি কলের মালিক বরাট সাহেব আর শুভা। তিলে তিলে আত্মহত্যা করার চেয়ে মীনার যুক্তি মেনে নিয়েই সে এগিয়ে এসেছে। শুভা আর ভাবতে পারছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভাল আর মন্দ...অর্থহীন দুটি শব্দ। মীনা নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে দিয়েছে। শুভা আর একবার মমতাভরে নিজেকে দেখে নিল। আজও এই দেহটার দাম আছে। এই রক্তমাংসের দেহটাই সত্য।......

রেস্তোরাঁ থেকে বার হয়ে এসে প্রথমেই যে ট্যাক্সিটা পেল তাতেই শুভাকে নিয়ে উঠে বসল বরাট সাহেব। ইচ্ছে করেই নিজের গাড়ী সে নিয়ে আসে নি। পাছে তার সামাজিক জীবনে এতটুকু কালির দাগ লাগে এই ভয়ে।

বাইরের পথে পা বাড়াবার পূর্বে যে যুক্তি-গুলি তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল—ট্যাক্সিতে পা দিয়েই তা অনেকখানি চুপসে গেল কিন্তু তার একদিনের মত আজ সে আর্তনাদ ক'রে উঠল না। একটা অসহায় [illegible] নিজেকে এলিয়ে দিল। তার ভিতরটা কেমন যেন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে।

ট্যাক্সি চালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কোথায় যেতে হবে স্যার—

চমকে উঠল শুভা। এ কণ্ঠস্বর তার পরিচিত। আর একদিনও ঠিক এমনি করেই জিজ্ঞেস ক'রেছিল। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার মধ্যে ছিল একটা সহজ স্বাভাবিক আন্তরিকতার সুর। আর আজ যেন মনোরঞ্জন খানিকটা অসম্মানজনক তপ্ত শ্লেষ ছুঁড়ে মারল। অন্ততঃ শুভার তাই মনে হল।

বরাট সাহেবের উত্তর শোনা গেল, আপাততঃ আউটরাম ঘাটের দিকে। তারপর বেহালায়।

বেহালায় নাকি তার মস্ত বাগান বাড়ী আছে। একটু আগে গল্পের ছলে বরাট সাহেব শুভাকে রেস্তোরাঁয় বসে জানিয়েছে। শুভা খেতে খেতে শুনেছে। প্রাণভরে আজ সে খেয়েছে। মরবার আগে শেষ খাওয়ার মত। কিন্তু বহুদিনের অনভ্যস্ত পাকস্থলী এত ভার বহন ক'রতে পারছে না। তার উপর জলের বদলে এক ধরণের পানীয় দেওয়া হয়েছিল। গন্ধটা তার অপরিচিত হলেও শুভা বাধা দেয়নি। বাধা না দিয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যই সে আজ পথে নেমেছে। এখন মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি। পেটের সংগে সংগে তার মাথাটাও যেন পাক খাচ্ছে।

এমনিতেই কদিন ধরে শুভার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সন্ধ্যার দিকে রোজই একটু একটু জ্বর হচ্ছে। আজও হয়েছে। সামান্যই হয়েছে। কি হবে আর নিজের কথা ভেবে। ভাবনা চিন্তা শেষ ক'রে দিয়েছে বলেই না আজ...মনোরঞ্জনও তাকে ঘৃণা করবার সুযোগ পেল। বয়ে গেছে শুভার ঘৃণা আর সুখ্যাতিতে। অথচ একদিন...

...আবার পাক দিয়ে উঠল তার সর্বাংগ।... এখুনি হয়ত একেবারে ভেংগে পড়বে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে গংগা নদীকে ডাইনে রেখে। বড় বড় দৈত্যের মত জাহাজগুলি ঘুমের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বরাট সাহেব ইতিমধ্যে রীতিমত ঘন হয়ে বসেছে। সহসা খানিকটা অন্তরংগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রল। মনোরঞ্জনের সজাগ কানে তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ল। তার ষ্টিয়ারিং ধরা হাতটা ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে দিল। সব নিয়ে নেমে গেলে হয় না। পতিতপাবনীর গর্ভে।......

মনোরঞ্জনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। তাদের গ্রামের এতবড় একটি আদর্শ পরিবার আজ কার অপরাধে এমনি ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়িয়েছে—নিজেকেও সে মনে মনে অপরাধী বলে ধিক্কার দিল। কিন্তু চিন্তাটা শেষ হবার আগেই বরাট সাহেবের প্রচন্ড ধমকে চমকে উঠে ব্রেকের উপর পা তুলে প্রাণপণে চাপ দিল। প্রবল-ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে প্রায় তীর ঘেঁষে গাড়ীটা থেমে গেল। শুভা এ ধাক্কা সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে গল গল করে বমি ক'রে ফেলল।

রুদ্ধ রোষে চীৎকার করে উঠেই হঠাৎ একে-বারে চুপসে গেল বরাট সাহেব। শুভার মুখ দিয়ে শুধু খাদ্যবস্তুই উঠে আসে নি, সেই সংগে দেখা দিয়েছে খানিকটা রক্ত। রক্তের ঋণ শোধ করতে শুভার বুকের রক্ত উঠে এসেছে।... শুভা কতকটা পাগলের মত হি হি ক'রে হাসতে থাকে। আর বরাট সাহেব আতংকে গাড়ী থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল, ভগবান রক্ষা করুন।

শুভা আর একবার হি হি ক'রে হেসে উঠেই এলিয়ে পড়ল। তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল কয়েক ফোঁটা জল কিন্তু মুখে ফুটে উঠল খানিকটা পরিতৃপ্তির হাসি।

॥ বিপরীত শক্তি ॥

কি যে বিচিত্র এই মানুষের মন!
দুটি বিপরীত শক্তি করিছে
দুদিকে আকর্ষণ।
একদিকে টানে শয়তান দেখি
ঈশ্বর টানে আর—
আজীবন ধরে যায় নাকো বোঝা—
কার জিৎ! কার হার!
—বোদলেয়ার (মায়া বসু)
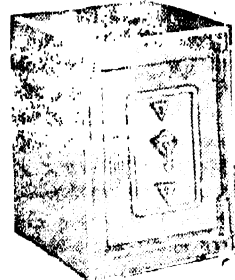
জড়োয়ার নেকলেসটা গলায় পরে প্রসাধন বেশ-ভূষা সমাপ্ত করল স্নিগ্ধা। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়ে গেল। এত রূপ ছিল তার দেহে। এ তো শুধু তার দেহের রূপ নয়, তার মনেরও সুষমার মহিমান্বিত রূপে দাঁড়িয়েছে অপরূপ এক স্নিগ্ধা। প্রস্ফুটিত যৌবনের রূপে রসে অপূর্ব সম্ভারে পরিপূর্ণ আজ তার জীবন। সার্থক তার নারীজন্ম।...আজকের এই দিনটির জন্যই সে যেন কত যুগ যুগান্ত পথ চেয়েছিল। কতদিন—কতদিন ধরে পলে পলে মধু সঞ্চয় করে ভরে উঠেছে আজকের এই দিনটি। আজই বিমানের সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট। অনুরাগে আরক্ত গাল দুটিতে টোল খেয়ে গেল স্নিগ্ধার...

ঝপাৎ করে কলমটা টেবিলের উপর ফেলে দিল স্বনামধন্যা লেখিকা অন্তঃসলিলা সেন। রাগে গড় গড় করতে লাগল ঃ ইস্, অত রূপ না হাতী! লিখব না, লিখব না আমি যে তোর অত রূপ, কি করতে পারিস তুই আমার? অ্যাঁ? ভারী তো ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে, তার আবার অত সাজ-সজ্জা! অত ভাল ভাল দামী দামী শাড়ী ব্লাউজ পাবে কোথায় সে? ইস্কুল মাষ্টার হঠাৎ লটারীর টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছিল? না, তা হয়নি। ও লাইনটা কেটে দিলাম, বুঝলি? এবার? এবার কোথায় পাবে তোমার অত বাহারের সাজ-সজ্জা আর গয়না? বাহারের চুড় আর নেকলেস পরা তোমার হবেনা ব্যাস্। আর রূপ? অত রূপ কোত্থেকে এল শুনি? পোষাকে আর প্রসাধনেই তো বেশি চক্‌চক্ করছিলি। আসলে তোর দেহের গড়নও অত সুন্দর না আর গায়ের রংও এমন কিছু ফর্সা না। মা তো চিররুগ্না শয্যাশায়িনী; সংসার আর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে হাড়মাস কালি হয়ে গেছে তার। চোখের কোণেও কালি পড়ে গেছে। আর চুল? চুলও উঠে গেছে। মোটা মোটা কালো সুতোর গুছি দিয়ে চুল বাঁধা হয়। সখ তো আছে প্রাণে! আবার অত পার্টি, এনগেজমেন্ট--এ সবের কি দরকার? সোজা কথা—স্নিগ্ধার আজ পাকা দেখা। ইস্কুল মাষ্টার বাবা অনেক কষ্টে কন্যাদায় উদ্ধার করবার জন্য একটি পাত্র যোগাড় করেছে—মেয়ের আজ পাকা দেখা। মায়ের বিয়ের সময়কার পুরোনো ফুলকাটা বেনারসী শাড়ীখানা পরেছে, পাশের বাড়ীর নতুন বিয়ে হওয়া বৌ-এর হাতের চুড়ি আর গলার হার পরেছে স্নিগ্ধা। পিসিমা বসে বসে গুছি দিয়ে মাথায় চ্যাপটা খোঁপা বেঁধে দিয়েছে। ব্যাস্—এর বেশি তোর হবে না।

......তবুও স্নিগ্ধার মনে ভ্রমর গুন গুন করে ওঠে। এ সংসারের সব দৈন্য, সব কষ্ট সে ভুলেছে সেদিন, যেদিন বিমান তার আয়ত চোখ দুটি ওর মুখের উপর তুলে ধরে দেখতে পেয়েছিল স্নিগ্ধার মনের রূপ। রূপ তো নারীর দেহে নয়, রূপ প্রেমিকের চোখে। প্রেমই তো নারীর রূপ। তাই দীনের কুটিরের সামান্য মেয়ে স্নিগ্ধা আজ তার প্রেমের ঐশ্বর্যে হয়েছে অসামান্যা......

এঃ! প্রেম না আরও কিছু। ওসব প্রেমটেম হয়নি বাপু তোর। এ তো আর আধুনিক বাড়ি না যে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা মিলে মিশে বেড়াচ্ছে অবাধে, আর ইচ্ছেমত প্রেম করছে? আবার যার সঙ্গে প্রেম তার সঙ্গেই বিয়ে? অত সুখে কাজ নেই তোর। তার চেয়ে যেমন ছিলি তেমনই ভাল। মেয়ের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তায় মা-বাপের চোখে ঘুম নেই। শেষটায় অনেক কষ্টে একটি পাত্রের যোগাড় হয়েছে। কিন্তু বড় ঘরে হাত বাড়ালেই তো আর হয় না? এখন ঘটি বাটি পর্যন্ত বিক্রি না হলেই বাঁচা যায়। মেয়ে না তো যেন সাত জন্মের শত্তুর।

এইবারে একটু ধাঁধায় পড়ল অন্তঃসলিলা। যেমন করেই হোক বিমানের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়েটা হয়ে গেলেই বোধ হয় স্নিগ্ধার সৌভাগ্যকে আর আটকান যাবে না। বিমানের যা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে যে সে যে কোনো নারীর পক্ষেই উপাস্য তাতে সন্দেহ নেই। এখন তো আর বিমানকে টেনে হিঁচড়ে নামানোও যায় না। তবে কি বিয়ের পরে কিছুদিন ওরা সুখে থাকবে? তার পরেই সুরু হবে একটা বিয়োগান্ত অধ্যায়?......না! দরকার নেই অত বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা হয়ে ঐ একটা শাঁকচুন্নি মেয়ের! তারচেয়ে--

......বড়ই দুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত স্নিগ্ধার বিয়েটা ভেঙেই গেল। গোড়াতেই তার স্কুল মাষ্টার পিতার বোঝা উচিত ছিল যে, এরকম অসামঞ্জস্য বিয়ে হতে পারে না। তোমাদের পয়সা নেই, রূপ নেই, মেয়ে তোমাদের একটা পাশ পর্যন্ত করেনি। এ মেয়ের কি অত ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়? দেনা পাওনার অজুহাতেই বিমানের পিতা শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসলেন। তার পরের ঘটনা গতানুগতিক। নতুন করে সুরু হলো স্নিগ্ধার জীবন সংগ্রাম......

ইস্! যে না মেয়ে তার আবার নামের বাহার দেখনা। স্নিগ্ধা! স্নিগ্ধা নাম আবার কে রাখল তোর? তার চেয়ে তোর নাম থাক ধিঙ্গী। তোর ধিঙ্গীপনায় অস্থির হয়ে তোর মা তোকে ধিঙ্গী বলে ডাকতো। তারপর তোর ঐ ধিঙ্গী নামই থেকে গেল।

......ধিঙ্গী মুখের চুনকালি ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে লেগে গেল নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। পরিত্যক্ত বইখাতা নিয়ে আবার লেখাপড়ায় মন দিল। মা ওর মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন না। কিছু দরকার হলে বিছানার পাশ দিয়ে শুয়ে শুয়েই বলেন। ধিঙ্গী নিঃশব্দে সংসারের কাজ করে যায়। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পড়া-শোনা করে। ধিঙ্গীর বাবা শেষ পর্যন্ত মেয়ের লেখাপড়ায় একটু আধটু সাহায্যও করেন। যাহ'ক একটা গতি তো করতে হবে?...একটা পাশ করে ধিঙ্গী কলেজে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো।...

কিন্তু কেমন করে কলেজে পড়বি তুই? কে চালাবে খরচ? সামান্য স্কুল মাষ্টারের মেয়ে তুই, তুই কি আর ও-বাড়ীর সবিতাদির মত রিসার্চ স্কলার হতে পারবি? না, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, না বড় কোনো দেশনেত্রী কি রাষ্ট্রনেত্রী হতে পারবি? আরে আমি যে আমি, আমি নিজেই কি ওরকম কিছু হতে পেরেছি যে আমি তোকে যা নয় তাই তৈরী করব?

ব্যবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা? তার চেয়ে বরং একটা কাজ করা যাক—

......মায়ের মৃত্যুর পর এ সংসার ধিঙ্গীর সামনে খুলে দিল জীবনের মস্ত পথ। বাবার চোখে ছানি পড়ায় তিনি আর স্কুলে চাকরী করতে যেতে পারেন না। কিছু কিছু সহৃদয় অভিভাবকের অনুগ্রহে বাড়িতে বসে বসে গুটি কয়েক ছাত্র পড়িয়ে যৎসামান্য রোজগার করেন। সংসারে এখন তাঁরও ধিঙ্গী ছাড়া আর কোনো অবলম্বন নেই......অবশেষে ধিঙ্গী একটা হাসপাতালে নার্সিং-এর কাজে ঢুকলো......

আচ্ছা! এই হাসপাতালে আবার বিমানকে ডাক্তার করে নিয়ে এলে কেমন হয়? বাঃ! বেশ আইডিয়া পাওয়া গেল!......না না না, তা কি হয়? তা কি হয়? সে কি একটা কথা হ'লো? বিমান কি আর এতদিন বসে আছে? তার তো এতদিনে হয়তো বিয়েই হ'য়ে গিয়েছে। আর না হয় বিমান হয়তো এতদিনে অন্য কারও প্রেমেও পড়ে গেছে—এমনকি হয়তো কোনো লেখিকারই—দূর! সে যেন বড্ড বেশি ন্যাংলামো হ'য়ে যায়। তার চেয়ে বরং ধরা যাক ও বিমান টিমান কেউ ছিলই না—যাঃ! কেটে দিলাম ওর নামের অধ্যায়টা। তুইও পেলি না, আর কেউও পেল না। মিটে গেল ঝামেলা।

এখন তুই ধিঙ্গী ওই হাসপাতালেই কাজ করতে থাকলি। তবে সাবধান! হাসপাতালের বাতাস নাকি দুই কানে শির শির করে প্রেমালাপ করে। ওসব চোরাবালিতে পা দিতে যাসনে যেন। নাইট এঞ্জেলস্-এর কথা মনে আছে তো? ভগ্নী নিবেদিতার কথা?

......আহা! ধিঙ্গীর বড় কষ্ট। হাসপাতালের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তারপর বুড়ো বাপের সব দায়িত্ব মাথার উপর, মায়ের অসুখের সময়কার কিছু ঋণও চেপে রয়েছে মাথার উপর। আত্মীয় স্বজন যারা অতি দুঃসময়ে দূরে ছিল, এখন তারা ধিঙ্গী রোজগার করছে দেখে মাঝে মাঝে এসে হাত পাততেও কসুর করে না। সংসারের চাপ যেন ধিঙ্গীর জীবনের সবটুকু রস নিংড়ে নিচ্ছে। চেহারায় কালি পড়ে গেছে। মুখে হাসি নেই, কথা নেই। দুই কাঁধ পেতে বয়ে চলেছে সংসারের জোয়াল। দিনগুলো চলে তার যন্ত্রের মত। হাসপাতালে পীড়িতের আর্তি আর মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্যহীন জীবন তার। এদিকে প্রকৃতির রূপে যে কতবার বসন্ত এল গেল তা কি টের পেয়েছে সে?......

......আ-হা! অত কষ্টই বা কিসের শুনি? তুই কি একলা? দেখছিস না হাসপাতাল ভর্তি আরও কত নার্স কাজ করে চলেছে? শুধু নার্স কেন, কতদিকে কত মেয়েই তো খেটে খাচ্ছে। তাদের দেখে কি আর পাঁচজন আহা উঁহু করছে? দ্যাখ্ ধিঙ্গী, যা করেছি যথেষ্ট করেছি। একেবারে জলে জঙ্গলে ফেলে দিইনি তো তোকে? অন্ততঃ নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তো আরও কত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। আমার তো আর অত পরের ভালয় চোখ টাটায় না? তাহ'লে দেখতিস তোকে কি করতাম—হ্যাঁ! আর তোর উন্নতির পথ তো এখনও খোলাই রইল। ছোট নার্স থেকে বড় নার্স, তারপর আরও বড়—অনেক কিছুই হওয়া যায়। তবে তোর বোধ হয় বেশি কিছু হবে না আর।

নীল পাহাড়ের মেয়ে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

নীল পাহাড়ের সারি
নীল আকাশের গান গায়,
বুকে তার বনানী সবুজ,
পাগলা-ঝোরার তানে
আঁকাবাঁকা পথে নিতি ধায়
পাহাড়িয়া মেয়েটি অবুঝ।
হেলে দুলে চলে পথ
কালো চুল উড়ে দখিনায়,
রাঙা ঠোঁটে উদাসী পবন,
কূলে কূলে ঢেউ জাগে
আনমনে ফিরে শুধু চায়,
ছুটে চলে কোথা অনুখন।
নিশুতি রাতের চাঁদ,—
দূরে কোন পাপিয়ার তান
সরলের বনে সুর তোলে,
যউবন মদিরা নেশায়
খেয়াল খুশীর প্রাণ
দোদুল দোলায় মিছে দোলে,
উতরাই পথে যবে
বাঁশী শুনে উতলা বিভল,
অজানায় ছুটে পথ ধীরে,
মেঘের ভেলায় আসে
ক্ষণিকের সুধা পরিমল
জীবনের গান জাগে নীড়ে;
বাদল নিশীথ রাতে
নীলাকাশে লুকোচুরি খেলা,
ভেসে আসে অজানার তান,
হরিৎ মাঠের বুকে
অচেতন সবুজের মেলা
জেগে ওঠে শিশিরের গান;
ফুলের সুবাস মাখা
ঘুমপরী যায় কোথা ভেসে
ডাকে যেন কারে অজানায়,
ফিরে কারে পেতে চায়
স্বপনের কোন দূর দেশে,
মিলনের নিবিড় ছায়ায়।

মনে পড়ে

অনিলবরণ ঘোষ

স্থবির দিনগুলি আর কাটতে চায় না। বন্ধ বলে অফিস ছাড়িয়ে দিয়েছে। সংসারে অবসর। গিন্নী তার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিন নিয়ে নতুন করে ঘর সাজাতে ব্যস্ত। আর বাইরের ঘরে শুষ্ক একটা তক্তপোষের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখেন সমরেশবাবু।

সামান্য প্রেসের 'প্রুফ-রিডার' সমরেশবাবুকে সংসারের জন্য খাটতে হয়েছে অনেক বেশী। ফলে স্বাস্থ্য ভেঙেগেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ আর মন ভারাক্রান্ত।

ছেলেরা মানুষ হয়েছে, মেয়েদের সময়মত বিয়ে হয়েছে। বড় বাসা ভাড়া করা হয়েছে। একটা খুশির আমেজ সারা বাড়িতে। খুশির ঢেউ মাঝে মাঝে সমরেশবাবুকেও স্পর্শ করে। চারপাশে গোল হয়ে ধরে নাতি-নাতিনের দল। হাসি, গানে, কথায় আর খেলায় বুড়ো মানুষটাকে অস্থির করে ছাড়ে ফূর্তির টুকরো-গুলি।

সেদিন এমনই এক খুশির হাটে একটা কলম নিয়ে বেধে যায় খণ্ড প্রলয়। বড় পিসি ভুল করে তার কলমটা ফেলে রেখে গেছে বাপের বাড়ি। বেওয়ারিশ মাল। দখল নিয়ে দস্যুদলে জোর মারপিট।

গম্ভীর কণ্ঠে দুই ধমক দিয়ে সমরেশবাবু কলমটা নিয়ে নিলেন। হাতে নিয়ে অপলকে কলমটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। সোনার খাপের জায়গায় জায়গায় চটা উঠে গেছে। প্যাঁচ ক্ষয়ে গেছে। নিব পাল্টানো হয়েছে। তবু চিনতে ভুল হয় না। বড় মেয়ে সুষমাকে একদিন এই কলমটা তিনি দিয়েছিলেন।

স্মৃতির দুয়ারে লাজুক লাজুক একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে। সঙ্কোচ মাথাচাড়া দেয়। অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। তবু একটা গ্লানি আর অনুশোচনায় মন ভরে যায়। মনে হয়, এই সেদিনের কথা।

অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন সমরেশ-বাবু। 'টিউশ্যানি' থেকে ফিরে এসে সুষমা বলে, এ মাসে পাঁচ টাকা রেখে দিলাম বাবা।—দশ টাকার দুটি নোট তুলে দেয় সমরেশবাবুর হাতে।

আঁতকে ওঠেন সমরেশবাবু, কঁকিয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ। সে কিরে, পাঁচ টাকা রাখছিস। গত মাসে তোর মার অসুখের দরুণ ডাক্তারের বিলের কিছু টাকা যে এ মাসে না দিলেই নয়।

বাবার করুণ মুখের দিকে অসহায়ে তাকায় সুষমা। মৃদু প্রতিবাদ করে, আমার এ মাসে পরীক্ষা শুরু, একটা কলম না কিনলে কিছুতেই চলবে না।

আচ্ছা মা, কলমের জন্য ভাবিসনে, এ মাসেই একটা কলম তোকে কিনে দোব।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুষমা প্রতিবাদ করে বলে, তোমার কলমের ভরসায় দু বছর কেটে গেছে, আর নয়, এ মাসে আমাকে কিনতে হবেই।

সমরেশবাবু ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, বলছি কলম এনে দোব, তবু হচ্ছে না, যত সব—

সুষমা আর প্রতিবাদ তোলে না। কালো মুখে টাকা পাঁচটা দিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে বসে থাকে। অভিমানে ছল ছল করে তার দু চোখ।

মেয়ের দিকে ক্ষণেক তাকালেন সমরেশবাবু। সুষমা তাঁদের প্রথম সন্তান। কত আনন্দ আর আশার স্বপ্নের মধ্যে ওর জন্ম। পরিবারের গর্ব সুষমা। স্কুল ফাইনালে বৃত্তি পায়নি, দেখিয়ে দেবার কেউ নাই বলে। একটু যত্ন নিলে ফল অনেক ভাল হ'ত। গরীবের ঘরে কেন ওরা জন্ম নেয়! জন্মের পর থেকে শুধু দুঃখ আর কষ্ট। সমরেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। অফিসের সময় হয়ে গেছে, দাঁড়াবার সময় নাই। জুতোয় পা গলিয়ে তবু মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে যান।—মন খারাপ করিসনে। পরীক্ষার আগে কলম তোকে দোবই—

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বছর অতি সস্তা দামের একটা কলম তিনি সুষমাকে কিনে দিয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটের বছরও একটা কলমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে কলম আর কিনে দেওয়া হয়নি। প্রতিবারই একটা কলমের আশ্বাস দেন। কিন্তু সঙ্কুলান আর হয় না। সুষমা অবশ্য ধরে নিয়েছে, বাবা বলেই আনন্দিত, আর তাকেও শুনেই খুশি থাকতে হবে। তাই আজ সমরেশবাবুর আশ্বাসে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না মেয়ের মধ্যে।

দিন এগিয়ে যায়। সুষমা ডুব দিয়েছে পড়া-শুনায়। পরীক্ষার দিন এসে গেছে। সমরেশ-বাবু তাকিয়ে দেখেন মেয়েকে। কয়েকটা টাকার চেষ্টা করেন। সত্যি ওকে একটা কলম কিনে না দিলে নয়। প্রেসের মালিকের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে, কবে মিলবে ঠিক নাই। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চেয়ে দুটি টাকা যোগাড় হয়েছে। বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে মেয়ে, আরও একটু ভাল কলম দেওয়া উচিত। অন্ততঃ চারটে টাকা চাই।

অফিস ফেরৎ বাস। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি লোকে। একটু নড়বার উপায় নাই। ভিড়ের মধ্যে সমরেশবাবু রড ধরে ঝুলছেন। ভাবছেন এ সব কথা। শুধু কি কলম। দু'বেলা পরীক্ষায় একটু 'টিফিন' করে দেওয়া উচিত। নিদেন একটা ডাব আর একটা সন্দেশ। নিজের পরীক্ষার দিনগুলি মনে পড়ে। তিনিও গরীবের সন্তান ছিলেন। তবু স্বর্গীয় বাবা পরীক্ষার মধ্যে অফিস ছুটি করে টিফিন নিয়ে যেতেন। দুটো শাক আলু

দুটো শসা, কখনও একটা ডাব। যত সামান্যই হোক, নিরস পরীক্ষার মধ্যে কত মধুর না লাগত।......

সমরেশবাবুর চিন্তায় বাধা পড়ে। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক ধাক্কা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নামবার জন্য এগিয়ে যায়। একটু ধাক্কাধাক্কি হয়। ভদ্রলোকের পকেট থেকে কলমটা ছিটকে এসে পড়ে সমরেশবাবুর গায়ে, তারপর গড়িয়ে যায় পায়ের কাছে।

সুন্দর কলমটা—তাকিয়ে দেখেন সমরেশবাবু। একেবারে আনকোরা নতুন কলম। কলমের মালিক নেমে গেছেন। বাস হু-হু করে ছুটছে আর স্টপে স্টপে দাঁড়াচ্ছে। লোকজন ওঠানামা করে।

পা বাড়িয়ে কলমটা জুতোর নীচে চাপা দেন সমরেশবাবু। আলগোছে পা রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য তাঁকে টিপ্পনী শুনতে হয়, ধাক্কা খেতে হয়। তবু নড়তে পারেন না। কে যেন আঠা দিয়ে পা দুটি জুড়ে রেখেছে।

হাত বাড়িয়ে কলমটা তুলতেও পারেন না। যতবারই কলমটা তোলবার জন্য মন স্থির করেন, ততবারই তাঁকে একটা দ্বিধা আর সঙ্কোচ বাধা দেয়। কি করতে যাচ্ছেন তিনি! ভাবতে গিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যান। তাঁর ভদ্রমন বিদ্রোহ করে। কলমের উপর থেকে পা তুলে এগিয়ে যাবার তাড়া আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন। নিঃশব্দে কলমটা তুলে পকেটে রাখেন। স্টপে বাস দাঁড়াতে আর দশজনেরই মত ঠেলে-ঠুলে নেমে পড়েন।

এক ঘরের সংসার। শীতের সন্ধ্যা সকাল করেই ঘনিয়ে আসে। মাকে ঘিরে গোল হয়ে পাঁচ বোন আর দুই ভাই বসে আছে। হাল্কা কথাবার্তা চলছে। সমরেশবাবু এলেই চা পর্ব শুরু হবে। পর্ব মানে শুধু এক কাপ করে চা। গরীবের সংসারে দুবেলার আঠারো কাপ চায়ের মূল্যে কম নয়।

অন্যান্য দিনের মত জুতোর শব্দ ওঠে না আজ। কোন সাড়া নাই। নিঃশব্দে সমরেশবাবু ঘরে ঢোকেন। কলরবে ছেলেমেয়েরা স্টোভের উপর ঝুঁকে পড়ে। ঝরঝরে ভাঙ্গা স্টোভ নানা কসরতে ধরান হয়। জল ফোটবার দেরী সয় না। গুঁড়ো দুধ গুলে দেয় এক মেয়ে। কাপে কাপে চিনি মেপে দেয় অন্যজন।

তক্তপোষের কোণে চুপটি করে বসে এক-দৃষ্টিতে সমরেশবাবু তাকিয়ে আছেন সুষমার দিকে। পকেটের ভেতর মুঠিতে ধরা কলমটা ঘামছে, বার করতে পারেন না। এক পাহাড় সঙ্কোচের চাপে কলম ধরা হাতটা থর-থর করে কাঁপছে।

চায়ের কাপ নিয়ে আসে সুষমা। কাপ নিতে গিয়ে মেয়েকে কলমটা দিয়ে দেন সমরেশবাবু। সুন্দর ঝক্‌ঝকে একটা কলম। আনন্দে ডগমগ সুষমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলমটা দেখে। যদিও মেয়ে কলম নয়, তবু কত সুন্দর! বাবা ওর জন্য অত দামী কলম কিনে আনবে, সুষমার বিশ্বাস হয় না, সম্ভবও নয়। কলমটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলে, এটা কার কলম বাবা?

চায়ের কাপে বড় বেশী ঝুঁকে পড়েছেন সমরেশবাবু। অস্ফুট কণ্ঠের উত্তর শোনা যায়, তোকে দিলাম।

ইতিমধ্যে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সকলে সুষমাকে ঘিরে ধরে। হাতে হাতে কলমটা ঘুরতে থাকে। কলমের সোনালী খাপে আলো চমকায়। ছোটগুলি বায়না ধরে, আমাদেরও দিতে হবে বাবা, দিদির মত সোনার হওয়া চাই কিন্তু—

বড় বড় চুমুকে চা শেষ করে সমরেশবাবু উঠে দাঁড়ান। দাঁতে-দাঁত চেপে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলেন, তোরা আগে দিদির মত বিদ্বান হয়ে নে, নিশ্চয় দোব।

অফিস থেকে এসেই কোথায় যাচ্ছো?

স্ত্রীর প্রশ্নে কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন সমরেশবাবু। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেন, একটু কাজ আছে......

সেদিন ঘর থেকে পালিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে অনেক পথ হেঁটেছিলেন। কিন্তু অস্থির মনে সোয়াস্তি মেলেনি বহুদিন। একটা জ্বালা আর আত্মগ্লানি ভেতরটা কুরে কুরে খেয়েছে। চোরাই কলম উপহার দিয়ে মেয়েকে তাক লাগিয়েছেন এ কেমনে তিনি ভুলবেন!

তবু ভুলে গিয়েছিলেন একদিন। অপকর্মের কথাটা সত্যি একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে, এ আনন্দের বাইরে এখন আর কিছু তিনি চান না। এ আনন্দ বুকে ধরেই যেন চোখ বুজতে পারেন।

আজ হঠাৎ এতদিন পর কলমটা চোখের সামনে এসে জাগিয়ে দেয় পূর্বস্মৃতি। কাল কেউটের বিষের মত একটা ঘৃণায় পুড়ে যায় অন্তস্তল। মেয়ের সঙ্গে বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা করেছিলেন। না বলে অন্যের জিনিষ তুলে নিয়েছিলেন......

দিশাহারা বৃদ্ধ সজল চোখে আকাশের হীরা-পান্না ঝিকিমিকি নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠেন। বিকৃত কণ্ঠে প্রার্থনা করেন, তোমাদের পায়ের নীচে একটু ঠাঁই দিও, ওগো সপ্ত ঋষি, ক্ষমা করো—।

আনন্দ-আশ্বাস

রণেন্দ্রনাথ মল্লিক

ছবিতে রঙের খেলা;—পান্নার প্রান্তর,
কৃষ্ণচূড়া হেলে পড়া পলার লালাভাটুকু
ছড়ানো সুন্দর,
গোমেদী গাছের গুঁড়ি নীলাচ্ছন্ন নদীটির বুকে;
ঝিরি ঝিরি ঢেউ তোলা মোতির ফুলকুঁড়ি নিয়ে
চাঞ্চল্য-উৎসুক।
হীরেমন দাঁড়ে বসে সোনার কিরণে
দোলা খায় বিচিত্র বরণে।

অথবা কি গাঢ় রঙ গ্রামের ধূসরে—
সোনা রোদে ডাল-পাতা আল্পনা বিতরে,
ভাঙা মেটো ঘরটুকু খড়ে ছাওয়া তাম্রাভই আর
দাওয়ার ফাটল কত হয় তো বর্ষায়!
জীবন বিচ্ছিন্ন নয় কোন মতে এসব ছবিতে
শিল্পীর তুলির রঙ কালো বা হরিতে।

সাটীকলে পাখিদের পাখার পালকে—
স্বচ্ছন্দ সময় নিয়ে দুধ-ধোয়া জ্যোৎস্নাই
বা সূর্যের আলোকে,
চিকচিকে তারা চোখে জ্যোতির প্রপাত;
মনের দিগন্ত যেন বৃহত্তর বৃত্তই নির্ঘাৎ!—
আশার আশ্বাস ক্রমে বাসা বাঁধে মনে
একান্ত নির্জনে।

ছবিতে ছড়ানো রেখা; রঙ আর রূপ,—
হৃদয়ে সহজ শোভা আনন্দ আশ্বাস নিয়ে
লাবণ্য স্বরূপ।
কোমল গান্ধার সুরে স্বাতন্ত্র্য সেতারে
জীবন-জিজ্ঞাসা কত অনুরাগ বেদনা-বিহারে;
অমৃত-রূপসু সুখী আশার আকাশে,—
যদিও বেহালা বাজে সময়ে বা কারুণ্যে প্রকাশে।

সেদিন সন্ধ্যায়

কালিদাস দত্ত

আমি ঠিক করলুম হেঁটে হেঁটে নিজেকে ক্লান্ত করব। আমার এই শরীরের সমস্ত আক্ষেপকে পরাজিত করে আমি ঘুমাব। আমার মন আছে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং তাকে প্রাধান্য দিয়ে, প্রতিনিয়তই লাই দিয়ে শরীরের ক্ষতি করেছি। এখন শরীর মনের শক্তির উপর হুমকি দেয়, বিদ্রোহ করে। আমি শরীরকে 'দাস' খাটাব ঠিক করলাম। ওকে শায়েস্তা করে মেরে ফেলা দরকার। মনকেও নির্বাসিত করব।

জুন মাসের সন্ধ্যা। সারা দিন তপ্ত ক্ষুরের মত রোদ্দুর কেটে কেটে গায়ে বসেছে, ময়লা গেঞ্জীর তলায় আলপিনের মত ফুটেছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘাম গড়িয়েছে। এখন এই সন্ধ্যায়ও সেই স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ প্যাচপেচে গরমের অবসান হয়নি, বেড়েছে। বাতাস বইছে না। কিন্তু বাতাসের প্রত্যাশায় দলে দলে নর-নারী পথে-মাঠে আকাশের নীচে পিল-পিল করে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাস আরও রুদ্ধ হয়ে গেল। শরীরের উত্তাপে যত্ন-লাগানো পাউডার, স্নো মোমের মত গড়িয়ে পড়ল গালে, গলায়, পিঠে। মোমের মত শিরা উঁচিয়ে আটকে রইল।

একটু শীতলতার জন্য ওরা যেমন উন্মুখ, এই উত্তাপ যেমন ওদের সহ্য হচ্ছে না, সেইজন্যে ওরা যেমন ছুটছে, কিন্তু পাচ্ছে না, আমিও তেমনি—না, ঠিক তেমনি নয়। সে রকম ভাবা ঠিক নয়।

এয়ার কণ্ডিশনড্ সিনেমায় ওরা অনেকে ঢুকল, অনেকে নিজের বাড়ি, মোটর, বাথরুম এয়ার কণ্ডিশনড্ করল। আমার এই ছুটে চলার সঙ্গে ওদের মিল নেই। এখানে কণ্ডিশন চলে না। ছুটতে হয়। ছুটতে ছুটতে অবশেষে—

সিনেমার সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিয়ন আলো। অন্ধ গায়কের ব্যাঞ্জো। 'রেস কোর' হেঁকে ডবল-মার্চ দৌড়। ধাক্কা—স্পর্শ, স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। সাজ। কি সেজেছে মেয়েটি। তাকালাম।

সাজ মানেই আমন্ত্রণ। ডেকরেশন মীনস্ ইনভিটেশন। বিয়ে বাড়ি সাজাই। কনেকেও। অভিসারিকা মলিন বেশ ধরে না। বেশ কথাটি সুশ্রী। কিন্তু বেশ থেকেই বেশ্যা—বেশের বাড়াবাড়ি। বাড়াবাড়ি মানেই কদর্যতা।

তৎক্ষণাৎ, দু পা ডাইনে হেঁটে ঘাড় ফিরিয়ে মুখটা ভালোভাবে না দেখেও বুঝলাম, সুর্মা নয়। সাজে সুর্মার মন আছে, রুচিও আছে, বেশের কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি তার নয়।

সুর্মা নয় বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃসহ ব্যথায় মন অন্ধকার হয়ে গেল, পায়ে মুহূর্তের জন্য শক্তি কমে গেল। মনে হল এইখানে একটু বসি এই ফুটপাথে, এই জনস্রোতের পায়ের তলায়। ওরা এত কাজ করছে, ব্যস্ত, উৎফুল্ল, কাজ শেষে আবার একটু স্বস্তির জন্য, শীতলতার জন্য মাঠে, ফাঁকায়, আকাশের নীচে যাচ্ছে, মনের এই সূক্ষ্ম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে না, বিষণ্ণ না, অবসাদ ওদের ছোঁয় না। সুখী, সহজ, তৃপ্ত। আর আমি? আমি এত জ্ঞানী, এত অর্থবান, অথচ—

ঃ কত নম্বর বাস আপনার? ফাইভ-বি এখানে থামে?

পা বাড়িয়ে ছিলাম। আবার দাঁড়ালাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। বাড়াবাড়ি-বেশ সেই মেয়েটি। জিভের বল্গা টেনে স্বতঃপ্রবৃত্ত উত্তর আর দিলাম না। আরও শুনেছি এই ভাবে: চোখ তুলে চাইলাম।

ঝুটো পাথরের মালা গলায়, ইয়ারিং কানে, ডান মণিবন্ধে ঘড়ি—সাতটায় এখনো ছ'টা (আমার চোখে জোর আছে)—খুবই শেলা, বাঁয়ে আয়নার চুমকি বসানো কঙ্কণ, বিবর্ণ ভ্যানিটি ব্যাগ স্ফীত অথবা ফাঁপানো বুকে চাপা, খুব নামী বাজে-লেখকের সস্তা, চটকদার প্রচ্ছদ সমেত চালু একটা বই—বহু ভ্রমণে যার জ্যাকেটের সুতো ঝুলেছে, চোখে কাজল (সুর্মা কথাটা ব্যবহার করতে গা রী-রী করল), ভ্রু-সঙ্গমে কুমকুমের কালচে টিপ, খাটো ব্লাউজের নীচে মেদ-শূন্য কটিতে রঙিন রুমাল গোঁজা, ছাপা শাড়ির নীচে গোলাপী শায়ার সাদা লেস জরি-ওঠা চপ্পলের চুলে মুখ লুকিয়ে। উপরে তাকালাম। শ্যাম্পু করে ফাঁপানো চুলের ও পিঠে খোঁপায় বসানো টাটকা ফুল সাপের ফণার মত দুলছে। মেয়েটি খাটো, কাজেই খোঁপার খানিকটা দেখলাম। ভিতরে ট্যাসেল আছে।

ঃ এইখানে ফাইভ-বি—

ঃ কলকাতায় নতুন বুঝি?

ঃ না তো—। আপনি বুঝি?

মেয়েটি পরমাত্মীয়ের মত হাসল, ঠোঁট টিপে, শরীরে ঢেউ দিয়ে, চোখে একটা কুৎসিত অর্থ এনে। কুৎসিত না হতে পারে, আমার মনে হল।
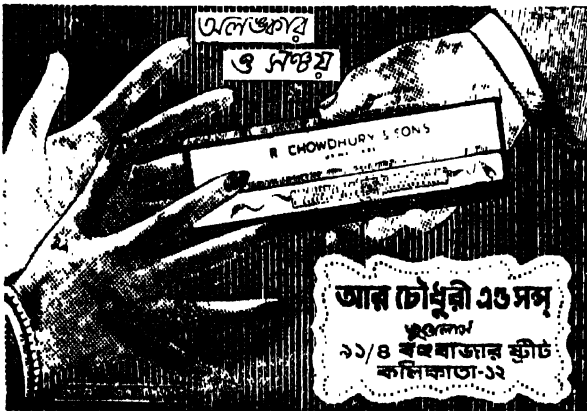
রণ, আমি তা চাইছিলাম।

: ফাইভ-বি বাস এখান দিয়ে যায় না, কোনদিন যেত না, কোনদিন যাবে বলেও মনে হয় না। আসলে ফাইভ-বি বলে কোন রুট কলকাতায় আছে আমার জানা নেই। শুনিনি।

: নেই। জানি।

: তবে?

: খুব গরম পড়েছে। ওদিকে একটু নিশ্চয়ই হাওয়া আছে—উই ওইদিকে? যাচ্ছে সবাই। যাবেন?

অন্ধকার মাঠের ওপারে গঙ্গার দিক দেখাল। কাছে সরে এল। যেন আমারই সঙ্গিনী।

আমি চলে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ভালোও লাগছিল। কেন ভাল লাগছিল তখনই ঠিক আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। যেমন এক-একটা গন্ধ মাঝে মাঝে ভালো লাগে, মানুষ লুকিয়ে ঘ্রাণ নেয়, তেমনি এই প্রগলভতা, অশ্লীল চটুলতার আঘাতের জন্য বুঝি আমার মন উন্মুখ হয়ে ছিল, যে কারণে আমি হাঁটিয়ে শরীরকে ক্লান্ত করতে চাইছিলাম—সেই কারণেই এই হীন আঘাত আমার রুচি, মন, চিন্তা, চৈতন্য, শরীরের উপর হয় তো প্রার্থনা করছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে হাইড্রান্ট খুলে হোস পাইপে আমার নাকে-মুখে তীব্র বেগে জলের ফোয়ারা দিয়ে আঘাত করলে আমি নিশ্চয়ই সরে যেতুম না, বরং এক হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে দু হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে নিতুম, দম আটকে হাওয়ার জন্য মাথাটা মাঝে মাঝে শিহরণ দিয়ে উপরে তুলতুম।

: যাব। কিন্তু হাঁটতে হবে। আমি হাঁটব ঠিক করেছি। অনেক—অনেকক্ষণ ধরে—

: খালি হাঁটবেন? শুধুই হাঁটা?

: শুধুই হাঁটা—আর কিছু নয়।

: খাবেন না?

: না।

: ট্যাক্সি? ফিটন? রিক্সা? রিক্সাও না?

: কিচ্ছু না।

: কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। তা হোক। কিন্তু কি দেবেন?

: সব। আমার সব। পুরো আমাকেই—

: অসভ্য, আপনি একটি ছোটোলোক, অভদ্র—

এক ঝটকায় মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিলে, ওর খোঁপার ফুলের একটি পাঁপড়ি ছিটকে পড়ল, চোখে প্রায় জল এসে পড়েছে, গরমে ব্লাউজের বাহুমূলে ভিজে জবজবে, গলার ভাঁজে পাউডারের দাঁড় গলছে, হন্-হন্ করে এগিয়ে গেল মেয়েটি। এবার পুলিশের খপ্পরে পড়বে। আমি ব্যথা পেলাম।

অবাক। অবাক। আমি অবাক।

সুর্মাকে মনে পড়ে গেল। সুর্মা আমার সুর্মা। সু-রমণীয়া ইতি সুরমা। মানে অত শত বুঝে মা-বাবা নাম রাখে না নিশ্চয়ই। সুরমা কিন্তু সত্যিই সুরমা। মনকে ভরিয়ে দিত। মনকে মনে পড়িয়ে দিত। মনকে স্বীকার করেছিলাম। দেহের স্তেপভূমি থেকে পর্বত শীর্ষের মত মনকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রমণীয়তার ঝর্ণায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে পর্বত-শীর্ষ, দুর্বল পর্বত-শীর্ষ, পলি মাটি হয়ে গেছে, স্তেপাঞ্চল বিস্তীর্ণ, ব্যাপক, অধিকতর পরাক্রমী হয়েছে। আমি মরেছি। ক্রমে ক্রমে আরও মরছি। নিজেকে হাঁটিয়ে মারতে চাইছি।

অথচ পর্বত-শীর্ষ হতে চেয়েছিলাম। ওই রকম উন্নত মন, উদার, ব্যাপক। বলেছিলাম, তুমি আকাশ হও, তোমাকে আমি সব দেব, আমার সব, এই আমাকে।

অংশের বদলে সমগ্র দিতে চেয়েই আমি ভুল করেছিলাম। আজ আমার চোখ খুলে গেল। কেন না, মানুষ অংশেই আনন্দিত, সবটুকু দিতে চাইলে নিজেকে সে দীন মনে করে, দান দুর্বহ হয়ে পড়ে, অবিশ্বাস আসে, এবং তদুপরি ঘৃণা জাগে। সবখানি দিয়ে যে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ বানাতে চায়, মনে মনে আমরা তার মৃত্যু কামনা করি। সে থাকতে স্বমহিমা প্রকাশ পায় না। দাতা দান করেই তাকে গ্রাস করে।

ঠিক একই। এই মেয়েটির মতই সুরমার চোখেও জল উপচে উঠেছিল, সে-ও মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল, এই মেয়েটি রাগে এবং অবিশ্বাসে, সুরমা গিয়েছিল ভয়ে—আত্ম-অবলোপের ভয়ে। কিন্তু সুরমার সঙ্গে এই মেয়েটির কখনও, কোনো অবস্থাতেই, আমি তুলনা দিতে চাই না। কারণ সুরমা সুরমা। নৈশ-বধূ নয়।

সেদিন রাত্রে আমি খুব ঘুমিয়েছিলাম। একবার মনেও পড়ল না এখন সুর্মা অন্য কোন চোখে।

তোমাকে ডেকেছি আমি

লাবণ্য পালিত

তোমাকে ডেকেছি আমি,
থাক তুমি সুদূরে প্রবাসে,
রাত্রের বিক্ষুব্ধচিত্তে
কখনো বা নির্মল আকাশে।
আমার ঘুমন্ত চোখে
তুমি যেন স্বপ্নের গান—
পরিপূর্ণ আনন্দের,
সমস্ত দিনের কালি ম্লান।
ডেকেছি চপল সন্ধ্যা যেখানে খেলায়
মন থেকে মনে চলে যায়—
সেখানে তুমি ও আমি শুধু একা, একা,
দূর থেকে ডেকে ফেরে কেকা।
আবার রজনী এল,
বসি আর পাশে,
মূর্ত হয় সুগভীর শ্বাসে—
তোমার কবিতাগুলি।
আঁখি আসে ঢুলে,
বিচিত্র মনের পর্দা যায়
খুলে খুলে—।
আবার তোমাকে চাই—
প্রভাতের গ্লানিহীন
স্বচ্ছ বায়ে তুমি আস তাই।

বালিশে মুখ গ‍ুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো কল্যাণী। এম্‌নি ক'রে আর কোনোদিন সে কাঁদেনি, আর কোনোদিন তাকে এম্‌নি ক'রে কাঁদতে দেখেনি কেউ। কোলের মেয়ে টিঙ্কু অবধি তার নিজের কান্না ভুলে মেঝেয় ব'সে মায়ের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। মায়ের চোখে জল তার চোখে এই প্রথম, প্রথম তেম্‌নি দীপুর চোখেও। দু'দুটি সন্তানের মা হ'য়ে কল্যাণী এমনি ক'রে শিশুর মতো কাঁদতে পারে, একথা পাশের বাড়ির মেজো বউ রঞ্জনা অবধি ভাবতে পারেনি। এ-তল্লাটে কল্যাণীর দু'টো মনের কথা বলার মানুষ রঞ্জনা। স্বামীকে ধ্যান ক'রে তবে কাছে পেতে হয়, আর কাছে পেলেও ঢ্যারা-পিটিয়ে তার কানে কথা ঢোকাতে হয়। এমন পুরুষকে নিয়ে আজ ছ' বছর ঘর ক'রেও কল্যাণী বুঝতে পারলো না—স্বামী কী? অথচ লোকেশ লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে একটু যা জ্বলে ওঠে, নইলে আগাগোড়া শান্ত। চাকরীও এমন চাকরী করে যে, বাড়িতে বিশেষ পা পড়ে না। সেই সময়টা পাশের বাড়ির মেজো বউ রঞ্জনার সঙ্গে দু'টো সুখ-দুঃখের কথা ব'লে তবু মনটাকে হাল্কা ক'রে নেয় সে। নইলে ভাসুরে-দেওরে আর ননদে মিলে ইদানীং সংসারের যে আবহাওয়া দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারতো না কল্যাণী।

বালিশে মুখ গ‍ুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো সে. আর দুঃখে ব্যথায় আপন মনে ব'লতে লাগলো : 'জানি সব দোষ আমার; ভাসুরকে তাড়ালাম, দেওরকে তাড়ালাম, ননদকে তাড়ালাম, আমার অপরাধের কি ক্ষমা আছে! অথচ একে একে সবাই তো যার যার নিজের বুঝে বুঝে স'রে প'ড়লো! এরপর বড় হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমার দীপু আর টিঙ্কুও স'রে প'ড়বে। সেও তো আমারই অপরাধে। আমি শুধু পাথরের মতো ব'সে ব'সে দেখবো আর ভাববো—কবে ওদের মতো আমার যাবার দিন আসবে!'

অথচ কল্যাণীর দুঃখটা যে কোথায়, এ সংসারে আজ অবধি কেউ তা জানতে চায়নি, এমন কি লোকেশ অবধি নয়।

বিয়ের পর এ-সংসারে কল্যাণী এসে যখন দাঁড়ালো, দেখলো—মাথার উপর ভাসুর আর বড় জা র'য়েছেন; পাঁচটি সন্তান তাঁদের, প্রথম তিনটি ছেলে—বিনয়, বকুল আর বরুণ, পরের দু'টি যমজ মেয়ে—চীনু আর মীনু। ননদ বীথি স্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছে। দেওর পিনাকী ভালো চাকরী করে, তার বিয়ের জন্যেও মেয়ে দেখা হ'চ্ছে। জম-জমাট বাড়ি। বেশ লেগেছিল এসে কল্যাণীর। জিয়াগঞ্জে তার নিজের বাপের বাড়ি ঠিক এম্‌নি। জ্যাঠা, খুড়ো, পিসী, তাঁদের ছেলেপুলে, এজ্‌মালি পরিবার; আম-জাম-নারকেল লিচু-কাঁঠাল কলা কামরাঙা রোয়াল—বাড়ি ঘেরা প্রকৃতির অফুরন্ত দান, বাঁধানো ঘাট, বারো মাস জল থই-থই করে পুকুরে। ছোটবেলা থেকে এই পরিবেশে মানুষ হ'য়ে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতেই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল কল্যাণী। এই কারণে যোগ্য ঘর আর যোগ্য বর পাওয়া সত্ত্বেও তার তিন-তিনটে সম্বন্ধ এসে এসে ফিরে গিয়েছিল। কল্যাণীর মেজো জ্যাঠা ব'লেছিলেন—শূন্য ঘরে ফাঁকা বাড়িতে এবাড়ির কোনো মেয়েকে দেবো না।' শেষ পর্যন্ত কল্যাণীর জন্য লোকেশ। বড় ঘর, বড় বাড়ি, অনেক আত্মীয়-স্বজন, সকলের আদরে কল্যাণীর সেখানে সুখে দিন কেটে যাবে। লোকেশকে তাই সকলেরই মনে ধরলো। শুভদৃষ্টির সময় কল্যাণীও একবার মনে মনে ভাবলো—বুঝি বা সত্যিই সুখী হবার মতো পুরুষ।

এ-বাড়িতে এসে অবধি সেই সুখের স্পর্শ পেয়েছিল বৈকি কল্যাণী! ভাসুর সতীশ আর বড় জা সুনয়নী ছোট বোনের মতই তাকে কাছে টেনে নিলেন, পিনাকী আর বীথি মেজো বৌদি ব'লতে অজ্ঞান। বিনয়, বকুল, বরুণ চীনু আর মীনুর চান-খাওয়া থেকে সুরু ক'রে রাত্রে ঘুমোনো অবধি শুধু কাকিমা আর কাকিমা!

লোকেশ এক সময় ব'ল্‌লো : 'এবাড়িতে সবাই তোমাকে সারাক্ষণ পায়, আর আমি কি একটু ক্ষণের জন্যেও পাবো না?'

তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কল্যাণী ব'ল্‌লো : তুমি তো পেয়েই আছো, ওরা পায় না তাই কাছে চায়।'

কিন্তু দু'দিন পর থেকে সেই লোকেশকেই যে কাছে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠবে, একথাই কি ছাই কল্যাণী জানতো? তবু স্বস্তি ছিল—তার চারপাশে সবাই ভিড় ক'রে আছে, যেমন ভিড় করে থাকতো তাদের জিয়াগঞ্জের বাড়িতে সবাই।

এম্‌নি ক'রেই একদিন বছর ঘুরে এলো। কোলে এলো দীপু, প্রথম ছেলে; দীপের মতো আলো ক'রে এলো তার জীবন। বাড়িতে দীপুকে নিয়ে সকলের টানাটানি, এর কোল থেকে ওর কোল, ওর কোল থেকে তার কোল। এম্‌নি ক'রে দীপু যখন সকলের কোলে পুরোনো হ'য়ে এলো, তখন নতুন এসে সেই কোলে জুড়ে ব'সলো টিঙ্কু। এর মাস কয়েক বাদে একসঙ্গে সুনয়নীর চীনু আর মীনু এলো। তখন কাকে কে কোলে নেয়? দুই ঘরে সুনয়নী আর কল্যাণী তখন নিজেদের বাচ্চা আগ্‌লাতে অস্থির। গোয়ালা আগে আগে ভোরে এসে দু'সের ক'রে দুধ দিয়ে যেতো, এখন আর সেই দু'সেরে চলে না; সুনয়নীর ছেলে-মেয়েদেরই তাতে টান প'ড়ে যায়। এক সময় কল্যাণীর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে কথায় কথায় সুনয়নী ব'ল্‌লো : 'ঠাকুরপোকে বোলো, গোয়ালার সঙ্গে কাল থেকে যেন আরও দু'সের দুধের ব্যবস্থা ক'রে নেয়।'

কথাটায় কিছু মনে ক'রবার ছিল না

কল্যাণীর, সহজ কণ্ঠেই তাই ব'ল্‌লো : 'বলবো।'

কিন্তু কিভাবে ব'ল্‌তে হবে, সে কথাটা জানতো না কল্যাণী। শুনে শান্ত মানুষ লোকেশ হঠাৎ ফস্‌ফরাসের মতো জ্ব'লে উঠলো। ব'ল্‌লো : 'কেন, গোয়ালাকে বাড়্‌তি দু'সের দুধের জন্য আমাকে ব'ল্‌তে হবে কেন? সংসারের সব কাজ তো এতদিন বৌদির ফরমাসেই হ'য়ে আসচে; তা—দুধের ব্যাপারে হঠাৎ আমি কেন? দীপু আর টিংকুর জন্যে বৌদি কি তবে আলাদা ক'রে দুধ রাখতে ব'লছে?'

কল্যাণী ব'ল্‌লো : 'বাঃ-রে মজা, তা—আমি কি জানি!'

কিন্তু ব্যাপারটা যখন প্রায় সকলেই জানলো তখন সুনয়নী আর মুখ বুঁজে থাকতে পারলো না, ব'ল্‌লো : 'চিরকাল সংসারটা শুধু আমিই আগ্‌লাবো, এই বা কেমন? এবারে নিজেরাও দেখ। সংসারে কত আসে, কত ব্যয় হয়, তার হিসেব এখন তোমাদের সকলেরই রাখা উচিত।'

এরকম কোনো কথার জন্যে লোকেশ প্রস্তুত ছিল না। সে যা মাইনে পায়, তা থেকে প্রতি মাসের গোড়ায় দু'শো টাকা ক'রে বৌদির হাতে এনে ফেলে দেয়। দাদা কত কি দেয় না দেয়, তার হিসেব লোকেশ রাখে না, তবে জানে—ছোটভাই পিনাকী চাকরীতে ঢুকে অবধি নিয়মিত প্রতি মাসে সংসার খরচ বাবদ প'চাত্তর টাকা ক'রে দিয়ে থাকে। তার পক্ষে প'চাত্তর টাকাই যথেষ্ট। বাড়িটা পৈতৃক, তা নিয়ে ভাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া এ টাকায় এতকাল মোটামুটি বেশ চ'লে যাচ্ছিল, অন্ততঃ চ'লে যাচ্ছিল ব'লেই লোকেশের ধারণা। তাই বৌদির কথায় এবারে হঠাৎ সে জ্ব'লে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো : 'তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছো আমি বুঝেছি। এ পরিবারে ইদানীং গুটিচারেক বাচ্চা এসে সংসারটাকে হঠাৎ অচল ক'রে দিয়েছে, তাই না বৌদি? বেশ তো, দীপু আর টিংকুর জন্যে কাল থেকে আলাদাই দুধের ব্যবস্থা হবে। সংসারের খরচ থেকে এসব তোমাকে দেখতে হবে না।'

সুনয়নীর ইদানীং সত্যিই যেন কি হ'য়েছিল! সেও থেমে থাকলো না, ব'ল্‌লো : 'সব কথার অত বাঁকা মানে ধরলে একসঙ্গে বাস করা চলে না ঠাকুরপো। আমি বাচ্চা-গুলোকে আগ্‌লাবো না সংসার আগ্‌লাবো? কল্যাণীও তো সংসার দেখতে পারে! তোমার দাদা এখন যা দেয়, তখনও তাই দেবে।'

লোকেশের এবারে বড় ঘৃণা হ'লো। ইচ্ছে হ'লো না—এই নিয়ে বৌদির সঙ্গে সে আর তর্ক করে। তবু রাগের মাথায় চুপ ক'রে থাকতে পারলো না, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ব'ল্‌লো : 'রাতটুকু কাটাবার জন্যে তো মাত্র বাড়িতে পা দিই, তাও তোমাদের এক-একজনের অভিযোগের ঠেলায় অস্থির। বলো তো সামনের মাস থেকে আমি কোনো ভাড়া-বাড়িতে উঠে যাই।'

সুনয়নীর এবারে চোখের জলের পালা। নিজের মনেই সে ব'লতে লাগলো : 'তোমরা কেন ভাড়া-বাড়িতে উঠে যাবে? যেতে হ'লে আমিই যাবো। বাড়িও তো দেনার দায়ে তলিয়ে আছে। এ বাড়িই বা ক'দিন টিকবে?'

কিন্তু বাড়ির এ-ব্যাপারটাও লোকেশকে কোনোদিন তলিয়ে দেখতে হয়নি। দিনকয়েক বাদে যখন এই নিয়ে নতুন ক'রে কথা উঠলো, তখন বড় ভাই সীতেশ তিন ভাইবোনকে ডেকে হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিল—সংসারের ঘাট্‌তি পূরণের জন্যে শুধু বাড়িটাই মর্টগেজে বাঁধা নেই, সেই সঙ্গে সুনয়নীর দু'ছড়া হারও গেছে। এরপরে কি ক'রে আর তার পক্ষে সংসার দেখা সম্ভব?

লোকেশ, পিনাকী আর বীথি নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ-চাওয়া চাওয়ি ক'রে যে যার মতো উঠে গেল। উঠে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। অনেক তর্কের বিষয় ছিল ; তারা ব'ল্‌তে পারতো—তাদের অগোচরে বাড়িটা মর্টগেজে গেল কি ক'রে, আর সংসারের এমনই বা কি খরচা—যাতে বাড়ি মর্টগেজ না রেখে উপায় ছিল না? কিন্তু সীতেশের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা নিরর্থক। তাতে কোনো কাজ হবে না, উল্টে অশান্তি বাড়বে। অতএব—

বীথি একসময় ব'ল্‌লো : 'আমি বরং এবারে একটা কোনো কাজে ঢুকে পড়ি ছোড়দা, তবু তো যাহোক্‌ কিছু আস্‌বে! কতকাল আর এম্‌নি ক'রে তোমাদের ঘাড় ভেঙ্গে ব'সে ব'সে খাবো, বলো তো?'

সজোরে তাকে একটা বকুনি দিয়ে পিনাকী ব'ল্‌লো : 'নে, তোকে আর জ্যাঠামি ক'রতে হবে না। পড়াশুনো নিয়ে আছিস, পড়াশুনো কর। তোকে কি করতে হবে না ক'রতে হা[...] আমি বুঝবো।'

কিন্তু মজা এই যে, বীথির ব্যাপা[র] পিনাকী বুঝতে চাইলেও সুনয়নী এ-সংসা[রে] আর কিছুই বুঝতে চাইল না। ইতিম[ধ্যে] টুকিটাকি আরও অনেক বিষয় নিয়ে ম[...] কষাকষি তীব্র হ'য়ে উঠলো। দেখে শ[...] কল্যাণী নিজেই একসময় সুনয়নীর সঙ্গে ভ[...] ক'রতে গেল, ব'ল্‌লো : 'এ সংসারে য[খন] এসেছিলাম, তখন ছোট বোনের মতো তু[মি] আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে দিদিমণি[...] সে বেশী দিনের কথা নয়। এত অল্প সময়ে[র] মধ্যেই তুমি আমাকে এত দূরে সরিয়ে দিলে ক[ি] ক'রে, বলো তো?'

মীনুকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মুখ ন[া] তুলেই সুনয়নী ব'ললো : 'কে ব'ল্‌লে সরি[য়ে] দিয়েছি? সংসারে আমি নিজে যা পারছি না[,] তোমার উপর তারই ভার দিতে চাচ্ছি।'

—'আমিই বা সে ভার বইতে পারবো কেন[...]' বলে সুনয়নীর আরও একটু পাশ ঘেঁষে ব'স[তে] চাইল কল্যাণী।

কিন্তু সুনয়নীর কপাল ভালো যে, ই[...] বসরে হঠাৎ খাট থেকে মেঝেয় পড়ে গি[য়ে] চিৎকার করে কেঁদে উঠলো চীনু। কল্যাণী[র] কথাটার আর জবাব দিতে হলো না। চীনু[কে] সাম্‌লাবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে গে[ল] সুনয়নী।......

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। কি[ন্তু] অন্যান্যবার এসংসারে যেরকম কেনাকাটার ধ[...]

যায়, এবারে তার কোনো আভাসই
। গেল না। অথচ ছেলেপুলের সংসারে
চরেই বা থাকা যায় কি করে?

লোকেশকে এক-সময় ধরে বসলো
ণী: 'পুজোর বাজার করতে আমাকে
শাটা টাকা দিতে হবে। এতে তুমি না
ত পারবে না।'

লোকেশ জিজ্ঞেস করলো! 'কেন, এবার
ঃ কি পালা ক'রে পুজোর বাজার করা
হলো নাকি?'

কল্যাণী বললো: তা আমি কি জানি?
টাকাটা কিন্তু আমি কালই চাই!'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে লোকেশ
গালে ঝাঁকনি দিয়ে দেখি, ফল পড়ে
কি!'

কিন্তু ফল ঠিকই পড়লো, টাকাটা এসেও
ণীর হাতে যথাসময়েই পৌঁছালো। দেখে-
ন কল্যাণী তাই দিয়ে সকলের জন্যে জামা-
ড়, শাড়ী ব্লাউজ, ইজের, ফ্রক, সার্ট-প্যান্ট
কিনে নিয়ে এলো। সেই সঙ্গে লোকেশকে
জানিয়ে নিজের বড় বিছে-হারটাকে ভেঙে
, আর মীনুর গলার দুটো চেন আর
থির কানের দুটো ইয়ারিং গড়িয়ে আনলো।

কিন্তু কেউ যে খুসী হলো, মনে হলো
।

বীথি বললো: 'এমনি করে মিছেমিছি
ন তুমি খরচ ক'রতে গেলে মেজো বৌদি?'

সুনয়নী বললো: 'এ তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। সংসারে আরও অনেক খরচ আছে, সেদিকে না তাকিয়ে এতগুলো টাকা এদিকে খরচ করার কোনো মানে হয় না। বাচ্চারা প্রতিবার যেমন পায়, এবারও তেমনিই পেতো। এমনি করে সকলের জন্যে খরচ করে তোমার দেখাবার কিছু ছিল না।'

সত্যিই হয়তো ছিল না, কিন্তু কেন যে এমনি করে দেখিয়ে ফেললো কল্যাণী, তা সে নিজেই কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। তাই কাকে কি জবাব দেবে, কিছু মাথায় এলো না তার।

এরপর বোধ করি ছ'টা মাসও ভালো করে কাটলো না। সুনয়নীকে আড়ালে রেখে সীতেশ নিজে থেকেই একদিন বলে বসলো—সামনের মাসের পয়লা থেকে তারা অন্যত্র উঠে যাচ্ছে। সুনয়নীকে অনেককালের জন্য ডাক্তাররা রেস্ট নিতে বলেছেন। বাড়িটা লোকেশ, পিনাকী আর বীথি মিলে অনায়াসে রক্ষা করতে পারবে। এর উপর সীতেশ এবং তার সন্তানদের কোনো দাবী রইল না।

লোকেশ বললো: 'সব ব্যবস্থাই যখন ক'রে ফেলেছ, তখন বাড়িটাও একেবারে ডিক্রি করিয়ে দিয়ে গেলেই পারতে। দু'দিন বাদে তো ডিক্রি হবেই, সেটা তুমি থাকতে থাকতে হলেই ভালো হতো।'

সীতেশ ছোট্ট করে শুধু বললো: 'তোরা হয়তো চেষ্টা ক'রে আবার রাইট নিতে পারবি!'

তারপর নিজেকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাঝখানে বাকী যে ক'টা দিন রইল, বকুলের জ্বর আর ছাড়ে না। কল্যাণী তার নিজের দীপু আর টিংকুকে ফেলে রেখে দিন-রাত বকুলের শিয়রে বসে কাটিয়ে দিল। মাঝে মাঝে বকুল বলতে লাগলো: 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো কাকিমা? আমি তোমাকে ছেড়ে একটা দিনও কোথাও থাকবো না।'

জবাব দিতে গিয়ে কথা হারিয়ে গেছে কল্যাণীর কণ্ঠে; নীরবে শুধু দু'ফোটা চোখের জল ঝ'রে পড়েছে বকুলের শিয়রে। ইদানীং কিছু কিছু বুঝতে শিখেছিল বকুল, কাকিমাকে তাই আর পাল্টা প্রশ্ন না করে পাশ ফিরে চোখ বুঁজিয়ে নিয়েছে।

তারপর বকুল একদিন সুস্থ হয়ে উঠলো; দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, একে একে তাদের মালপত্র নিয়ে গাড়িতে তোলা হলো। কল্যাণী এসে এক-সময় আছড়ে পড়লো সুনয়নীর কাছে। বললো: 'তোমাদের মুখ চেয়ে আমার বাপ আর জ্যাঠামশাইরা একদিন আমাকে তোমাদের ঘরে পাঠিয়েছিলেন। অনেক বড় পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাউকে কেউ ছেড়ে নেই। আজ এ সংসারে যদি তোমরাই না রইলে, তবে আমিই বা কি নিয়ে থাকবো দিদিমণি? আমি যদি কোথাও কোনোদিন নিজের অলক্ষ্যে অপরাধ করে থাকি, যদি কোনোকিছু নিয়ে অজান্তে তোমাদের মনে

এতটুকুও দুঃখ দিয়ে থাকি, তবে সে সব তুমি আমাকে ক্ষমা করো দিদিমণি। তুমি এসংসারে সকলের বড়, ক্ষমা তুমি না করলে কে ক'রবে? দু'টি পায়ে পড়ি তোমার, এমনি করে তোমরা চলে যেয়ো না; আমরা সবাই মিলে এসংসারে সকলকে আরও বেশী করে দেখবো। ভাসুর-ঠাকুরকে বলো, গাড়ি ফিরে যাক্।'

সুনয়নী বল্‌লো : 'আর তা হয় না।'

তারপর ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে স্বামীর অনুগমন করে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

বিনয়, বকুল আর বরুণ এতদিন কাকিমা ভিন্ন কিছু জানতো না। চোখের জল গোপন করে নিতে গিয়েও লুকোতে পারলো না তারা। কিন্তু ততক্ষণে তাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

বাড়িটা কেমন যেন একমুহূর্তে একেবারে ফাকা হয়ে গেল। ঘরে এসে জানালার শার্সিতে মুখ রেখে কিছুক্ষণ নীরবে বসলো কল্যাণী। কখন যে ও বাড়ির রঞ্জনা এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল টের পায়নি সে। এবারে তার পিঠের উপর হাত রেখে রঞ্জনা জিজ্ঞেস করলো : ও'রা তা হলে সত্যি সত্যিই চলে গেলেন?'

কল্যাণীর উত্তর দেবার কিছু ছিল না, তাই রঞ্জনার চোখের দিকে একবার নিজের চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রে নীরবে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে একইভাবে বসে রইল।

এরপর থেকে পিনাকী আর বীথির কাছে সে আরও বেশী সহজ হ'তে চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল লোকেশের মধ্যে। জীবনটাকে যত সহজে সে গ্রহণ করেছিল, এতদিনে এসে দেখলো—ঠিক তত সহজ নয়। সেখানে মিষ্টির অংশ বরং কম। ঝালটাই বেশী। এতদিন ঘরেও সে কম থেকেছে; কথাও কম বলেছে। এবার থেকে কথাগুলো তার কেমন যেন বাঁকা বাঁকা হয়ে উঠলো। তার ওপর রং চাপা দিতে হিম্‌-সিম্ খেয়ে উঠতে হলো কল্যাণীকে। মাঝে মাঝে লোকেশের এই মানসিক পরিবর্তন তাকেও বড় কম বিঁধলো না, কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করে এসংসারে নতুন আগুনের ইন্ধন জোগাতে চাইল না সে।

সুনয়নী চলে যাবার পর মাসকাবারে পিনাকী এবারে তার দেয় প'চাত্তর টাকা কল্যাণীর হাতে এনে তুলে দিল।

কল্যাণী বল্‌লো : হাতে এনে যখন তুলে দিলে, তখন ফিরিয়ে দেবো না, কিন্তু এ টাকা যে সংসারের প্রয়োজনে খরচ করবো, তাও পারবো না ঠাকুরপো। তোমার নামে আলাদা পাশ বইতে এ টাকা লাগিয়ে রাখছি, তোমার বউ এলে তার হাতে তুলে দেবো।'

মুখ টিপে হেসে পিনাকী ব'ললো : 'তা-হলে আর আমার বিয়ে করাই হবে না, দেখতে পাচ্ছি।' কিন্তু মেয়ের বাপেরা মাঝে মাঝেই যে এবাড়িতে এসে ঘুরে যাচ্ছিল, এ কথাটা পিনাকী জানতো বৈ কি।

সহাস্য অধরে কল্যাণী বললো : 'যে রেটে সম্বন্ধ আসতে সুরু করেছে, তাতে বিয়ে আর তুমি ঠেকাতে পারলে না ঠাকুরপো। এলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। আমার একটা ছোট বোন হবে।

পিনাকী বললো : 'এরপর সে এসে আবার আমাকে নিয়ে এ সংসার থেকে ভাগুক। এই তো চাচ্ছো তুমি?'

কল্যাণী বল'লো : 'তার আগে আমি যেন চক্ষু বুজে চলে যেতে পারি ঠাকুরপো!'

পিনাকী এবারে প্রাণ খুলে হো-হো-করে হেসে উঠে কল্যাণীর একটা হাত চেপে ধরে বললো : 'পিনাকী শর্মার এই মুঠো থেকে স্বয়ং যম এসেও তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পারবে না ছোট বৌদি, বুঝলে?'

বুঝলো বৈ কি কল্যাণী? এইটুকু বুঝতেই যে এ সংসারে সে এসেছিল!

কিন্তু পিনাকীর আর বেশীদিন বাড়ির ভাত খেয়ে অফিস করা সম্ভব হলো না। যে আপিসে সে চাকরী করে, সেখানে সারা বছর ট্রান্সফার লেগেই আছে। এবারে হঠাৎ একদিন পিনাকীর ট্রান্সফার নোটিশ এসে হাজির। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে গিয়ে জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চের চার্জ নিতে হবে।

শুনে কল্যাণীর মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে গেল। বললো : 'এ ট্রান্সফার কি কিছুতেই রদ করানো যায় না? তোমার ছোড়দা যদি চেষ্টা করে?'

—'তাহলেও না।' বলে অফিসেরই কি একটা জরুরী কাজে উঠে পড়লো পিনাকী। তারপর দু'একদিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে জল-পাইগুড়ি রওনা হয়ে গেল সে।

বীথি সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছিল, যাবার সময় পিনাকী তাকে বলে গেল : 'মন দিয়ে পড়াশুনো করে দেখ সময়মতো যাতে বি-এটা পাশ করতে পারিস! কলকাতায় হোস্টেলে রেখে তোকে আমি এম-এ পড়াবো।'

শুনে অবধি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মনে মনে কলকাতার স্বপ্ন দেখছিল বীথি কোনোরকমে এম-এটা দিয়ে বেরোতে পারলে অনায়াসে সে কোনো-না-কোনো কলেজে একটা প্রফেসারি জুটিয়ে নিতে পারবে। তারপর তারপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এসংসারে ঋণের বোঝা কিছুটাও অন্ততঃ লাঘব করতে পারবে বৈ কি সে? এই স্বপ্ন নিয়েই দিন গুলি কাটছিল বীথির।

কিন্তু কল্যাণীর মন থেকে স্বপ্নের তার গুলো ক্রমেই যেন কেমন টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ছিল। দীপু আর টিঙ্কু যতক্ষণ জেগে থাকে, তবু বাড়িটা কলরবে মুখর হয়ে থাকে! কিন্তু ওদের চোখে ঘুম নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাড়িটা যেন কেমন শ্মশানের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে পড়ে বিনয়, বকুল, বরুণ, চীনু আর মীনুকে। বকুল তার অসুখের সময় বলেছিল : 'আমি তোমাকে ছেড়ে এক দিনও কোথাও থাকবো না।'—এ সংসারে এ

থি তাদের সব কটি ভাই-বোনের জন্যে না করেছে কল্যাণী? সেটুকু যদি একটা-নের জন্যেও ভেবে দেখতো সুনয়নী? সারে তার নিজের স্বার্থটাই বড় হলো, র কেউ কিছু নয়।—ভাবতে গিয়ে আর এক-র চোখ-ফেটে জল এলো কল্যাণীর। অতি-ষ্টে সেটুকু সে নিজের মধ্যে সম্বরণ রে নিল।

লোকেশ এবারে এক নতুন পাচক এনে ড়িতে নিয়োগ করলো। তার নিজের অফিস, থির কলেজ, দীপু আর টিংকুকে নিয়ে একা না হেঁসেল আগলাতে হিমসিম খেয়ে ঠছিল কল্যাণী। পাচক রাখায় তবু যদি জকে কিছুটা সামলে নিতে পারে সে।

সেদিন রাত্রে এক-সঙ্গে খেতে বসে সাংসারিক বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল। এ সংসারে দাদা, বৌদি আর পিনাকী থাকতে সাধারণতঃ কী সব হতো অথচ কি হতে পারতো এরকম নানা কথা।

বীথি হঠাৎ ব'লে ব'সলো: 'তখন আজকের তো বাড়িতে পাচক থাকলে বৌদি অনেক বেশী শান্ত থাকতো। সেই ভোর থেকে অমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমটা তো আর বৌদিকে ক'রতে হ'তো না!'

কথাটা লোকেশের ঠিক মনঃপূত হ'লো না, ব'ললো: 'কেন, পাচক না ছিল, তোরা তো ছিলি! তোরা কি তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতিস?'

ভাতের গ্রাস হাতে তুলে নিয়ে বীথি ব'ললো: 'নাকে তেল দিয়ে ঘুমবো কেন? সংসারে সকলেরই নিজের নিজের কাজ আছে। সে কাজ বাদ দিয়ে সকলের পক্ষে সব সময় হেঁসেল আগ্‌লানো সম্ভব নয়।'

লোকেশের দিকে মুখ তুলে কল্যাণী ব'ললো: 'আঃ, খেতে ব'সেছ, খাও না, কেন আবার পুরনো কথা নিয়ে দু'জনে লাগ্‌লে?'

কিন্তু সে কথায় কান দিল না লোকেশ। ব'ললো: 'বড় যে এতদিনে বড় বৌদির জন্যে তোর দরদ উথ্‌লে উঠলো বীথি! তা সঙ্গে গিয়ে সাহায্য ক'রলেই তো পারতিস!'

বীথি কিন্তু একথায় চুপ ক'রে রইল না, ব'ললো: 'তা নিয়ে গেলে করতাম বৈ কি! আমার সেখানেও যে রকম, এখানেও সেরকম।'

লোকেশ ব'ললো: 'তবে তাই যা না, বড় তরফে বেশ বড়মানুষী চালে থাকতে পারবি।'

কল্যাণী এবারে তাড়া দিয়ে ব'ললো: 'খাওয়া হ'য়ে থাকলে চলো উঠি ঠাকুরঝি, ব'সে ব'সে তোমার দাদার কথা শুনে লাভ নেই।'

বীথির চোখমুখ এতক্ষণ লাল হ'য়ে উঠে-ছিল, এবারে হঠাৎ সে ব'লে ব'সলো: 'কিন্তু অন্ন যে এ সংসার থেকে আমারও উঠেছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

লোকেশ এবারে ধাতানীর সুরে চেঁচিয়ে উঠে ব'ললো: 'যা নয়, তাই যদি মুখে আনবি বীথি, তবে তোর ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।'

অপ্রস্তুতের মতো অবস্থায় প'ড়ে কল্যাণী ব'ললো: 'আচ্ছা, তুমি ভেবেছ কি, বলো তো? খেতে ব'সে এম্‌নি ক'রে কেউ নাকি বাজে কথা নিয়ে মিছেমিছি মাথা গরম করে! ছি। ওঠো ঠাকুরঝি, ওর কথায় কান দিয়ে দরকার নেই। ওঠো, উঠে এস।'

বীথির দু'চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়ছিল; এবারে ত্রস্তে উঠে প'ড়ে কোন রকমে হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ থুব্‌ড়ে শুয়ে প'ড়লো সে।

কল্যাণী এবারে বিপদে প'ড়লো। সে এখন বীথিকে সামলায়, না স্বামীকে সামলায়? থালা-বাসন যেমনকার তেমন প'ড়ে রইল; বীথির পাশে এসে ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কল্যাণী ব'ললো: 'তোমার মেজদার কথায় তুমি যেন কিচ্ছুটি মনে কোরো না ভাই; ওর আজকাল কি যেন হ'য়েছে, কথায় কথায় কেবল রেগে ওঠে। আমার হ'য়েছে জ্বালা। এ সংসারে তুমি ছাড়া আজ আমার দু'টো কথা কইবারও লোক নেই। তোমার দাদার হ'য়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, তুমি যেন রাগ ক'রে থেকো না ঠাকুরঝি!'

কিন্তু বীথি না তুল্‌লো মুখ, না কিছু একটা ব'ললো। অনেকদিন ধ'রেই তার মনে মনে দারুণ একটা দ্বন্দ্ব চ'লছিল, আজ সেই দ্বন্দ্ব যেন কেমন একটা ঝড়ের অশনি সংকেতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগ্‌লো।

কোনোদিন যা হয়নি, সেই রাতটা তাই হ'লো। লোকেশের সঙ্গে কল্যাণীর অনেক রাত অবধি ঝগড়া হ'লো। বার দু'তিন দীপু আর টিংকু জেগে উঠেছে, রাগে দুঃখে শক্ত হাতে তাদের গা টিপে দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সে। এম্‌নি ক'রেই সে-রাতটা কেটে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল—বীথির ঘরের দরজা খোলা। হয়তো আজ তবে অনেক সকাল সকালই ঘুম ভেঙেছে বীথির। এগিয়ে গিয়ে কল্যাণী দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক্‌লো: 'ঠাকুরঝি!'

কিন্তু বীথির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সারা বাড়ি খুঁজে দেখ্‌লো কল্যাণী, কিন্তু না, কোথাও নেই বীথি। চোখ দু'টো হঠাৎ ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠ্‌লো কল্যাণীর। লোকেশকে এসে বিছানা থেকে ঠেলে তুলে সে ব'ললো: 'তুমি তাড়া-তাড়ি একবার বাইরে বেরিয়ে খোঁজ নাও, নয়তো থানায় খবর দিয়ে ঠাকুরঝির খোঁজ পাবার যা-হোক্‌ একটা ব্যবস্থা করো। এমন কান্ড তুমি বাধালে যে, আমার এখন গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতে ইচ্ছে ক'রছে।'

উত্তরে লোকেশ ব'ললো: 'খুব সদিচ্ছা তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু বীথি যদি চ'লে গিয়ে থাকে, তবে ঠিক জায়গা মতই গেছে, তা নিয়ে তোমাকে না ভাবলেও চ'লবে।' বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবারে বিছানা ছেড়ে উঠে কোনো রকমে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে প'ড়লো লোকেশ। কিন্তু কোনো কাজ হ'লো না।

এর ঠিক দু'দিন বাদে জলপাইগুড়ি থেকে এক্‌স্‌প্রেস্‌-ডাকে কল্যাণীর নামে পিনাকীর এক চিঠি এসে উপস্থিত। লিখেছে—

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)
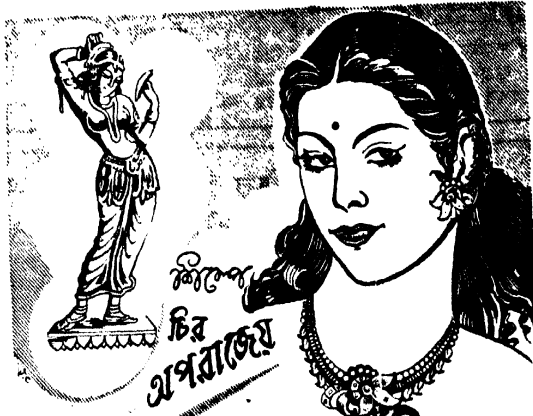
প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

তরুণী ঊষার কোল আলো করে অভ্যুদিত হচ্ছে শিশু তপন—রত্নোদধির নবতলা সৌধশীর্ষ তার লালিমার স্পর্শে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিনই নবারুণকে প্রথম স্বাগত সম্ভাষণ জানায় রত্নোদধি—সমগ্র তক্ষশীলার মধ্যে সর্বোচ্চ সৌধশিখর। তার বহু পরে সাড়া দেয় রত্নরঞ্জক। আর প্রতিদিনই রত্নরঞ্জক গ্রন্থাগারের ছাদে দাঁড়িয়ে হিরণ্যক দেখে বিশ্ব-দেবতা ভাস্করেরও আশীর্বাদও সর্বনির্বিশেষে নয়—তাঁর দানের মধ্যেও উচ্চ-নীচ বৈষম্য আছে।

খট্ খট্ খট্ খট্। নীচে গ্রন্থাগারে খড়মের শব্দ হচ্ছে। সু-উচ্চ শব্দ কিন্তু প্রতিটি শব্দের মাধ্যমিক যতিটুকু সমান—আচার্য জেতারির সমতাজ্ঞান প্রসিদ্ধ। ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্ তিনবার ঢক্কানিনাদ হোলো অর্থাৎ কমল মিশ্র এবার তন্ত্রশিক্ষা দেবেন। অন্তেবাসিকদের প্রস্তুত হবার সঙ্কেত ঐ ঢক্কানিনাদ। আর ছাদে দাঁড়িয়ে অবকাশ উপভোগ করার বিলাস চলে না—অনিচ্ছুক পায়ে হিরণ্যক নামতে লাগলো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে।

নীচের তলায় নেমে প্রথমেই দেখা হোলো আর্যমিত্রের সঙ্গে—তার হাতে একটা সিধের ডালা, ব্যস্তভাবে হন্ হন্ করে সে যেন কোথায় চলেছে। হিরণ্যক উঁকি মেরে দেখলে ডালা ভর্তি জম্বীর, জায়ফল, কর্পূর, সুপারি আর মহাশালী চাল। দেখে হেসে ফেললে সে—“সকালবেলাতেই চাল-ডালের বোঝা বয়ে বেড়ালে পড়াশুনা করবে কখন? এজন্যেই কি সুদূর রাজগৃহের রাজত্ব ছেড়ে নালন্দায় এলে?”

বন্ধুর হাল্কা ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে আর্য-মিত্রও হাসলে একটু, “কি করবো বলো—উপাধ্যায়ের আদেশ নবীন পরিব্রাজকের সিধের ভার আমাকেই বইতে হবে। প্রকৃতি উপাসক হবার মতো মন যদি থাকতো তাহলে না হয় সংসার ছেড়ে সকালবেলায় কাব্যি করবার জন্যে নালন্দায় চলে আসার একটা মানে হোতো কি বলো?.........হ্যাঁ ভালো কথা, উপাধ্যায় ধর্মপা তোমাকে একবার ডেকেছেন।”

“আমাকে??” হিরণ্যক বিস্মিত হয়ে গেল কিন্তু আর প্রশ্ন করবার অবকাশ মিললো না আর্যমিত্র ততক্ষণে ত্বরিতগতিতে ওদিকের চত্ব নেমে গিয়েছে।

অগত্যাই পা পা করে হিরণ্যক এগোলে উপাধ্যায় ধর্মপাদ সকালে থাকেন রত্নসাগরে তিনি একলা থাকলে কিছু অসুবিধে নেই আকৃতি যেমন সৌম্য, তেমনি ক্ষমাসুন্দর অন্ত উপাধ্যায়ের। কিন্তু যদি সুরজ্যোতিও থাকে তাঁর সঙ্গে?

তবেই হয়েছে!

রত্নসাগরের নীচের তলায় প্রশস্ত ক উপাধ্যায় ধর্মপাদ মাথা নীচু করে দুহাত পিছ জড়ো করে অস্থির পাদচারণা করছিলেন। ঘ আর কেউ নেই। কিন্তু তবু হিরণ্যক স্বস্তি পেল না। তাঁকে এরকম অস্থির হতে হিরণ কখনও দেখেনি, হয়তো কেউই কোনো

দেখেনি। বিস্মিত হিরণ্যাক কাষ্ঠাসনের পিছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দ প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

সমস্ত কক্ষটি আগাগোড়া একবার পরিক্রমণ শেষ করে উপাধ্যায় গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পিছন দিকে না তাকিয়েই শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, "হিরণ্যাক, শুনলাম গত এক সপ্তাহ যাবৎ তুমি চন্দ্রোশ পুষ্করিণীতে স্নান করছো না, স্নান করতে সঙ্ঘারামের বাইরে যাচ্ছ।"

হিরণ্যাক সসম্ভ্রমে উত্তর দিলে : "আজ্ঞে হাঁ।"

"কারণ ব্যক্ত করো।"

হিরণ্যাকের মাথা নীচু হয়ে গেল।

"চন্দ্রোশ পুষ্করিণীর মতো অপূর্ব পুষ্করিণী আমি আর দেখিনি। অত সুন্দর নীলপদ্ম শোভিত—"

"সেজন্যেই কি তুমি ওতে স্নান করতে পারো না?"

"সেজন্যেই। স্নানের জন্য নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। তা ছাড়া........"

হিরণ্যাক ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

"বলো।"

"ভিক্ষুণীরাও ঐ পুষ্করিণীতেই স্নান করেন। আমার......আমার মনে হয় আমাদের জন্য পৃথক পুষ্করিণী নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত।"

"এটি তোমার ব্যক্তিগত মত, কেমন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"নালন্দার দশ সহস্র ছাত্রের কর্তব্য অধ্যয়নরূপ তপস্যা করা। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করা নয়, অথবা অধ্যক্ষের কর্ম-নির্দেশ করাও নয়। আমার ধারণা ছিল এটুকু তোমার জানা আছে।"

হিরণ্যাক আনতনেত্রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো।

"শোন হিরণ্যাক—চন্দ্রোশ পুষ্করিণী শুধু একটি মনোলোভা পুষ্করিণী মাত্র নয়......ওটি প্রাচীনকালে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি। ওর জলে অবগাহন স্নান করলে ধীশক্তি বৃদ্ধি পায়। সেজন্যেই অধ্যক্ষের নির্দেশ দেওয়া আছে ছাত্র ছাত্রী ভিক্ষু, ভিক্ষুণী সকলে ঐ বিশেষ পুষ্করিণীতেই স্নান করবে। মেয়েদের স্নানের সময় পৃথক করে দেওয়া আছে, সুতরাং তাতে কোনো পক্ষেরই অসুবিধা হবার কথা নয়। আর..........আমার ধারণা তুমি একজন অন্তেবাসিক।"

সামান্য শ্লেষের আঘাতেই হিরণ্যকের মাথা আরো নীচু হয়ে গেল।

আশ্চর্য এই তুচ্ছ ঘটনাটুকুও অধিকর্তাদের চোখ এড়ায় না—সহস্র অন্তেবাসিকদের মধ্যে একজন কোথায় স্নান করতে গেল সেদিকেও এঁদের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। কিন্তু কেমন করে চন্দ্রোশতে স্নান করতে যাবে হিরণ্যক। ভিক্ষুণীদের স্নানের সময় তাদের অনেক আগে একথা ঠিক কিন্তু এত আগে নয় যে, তাদের স্নানের রেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে। হিরণ্যক স্নান করতে গিয়ে দেখেছে জলে তখনো তাদের গাত্র মার্জনার সুবাস

তারকার আলো

ধীরেন্দ্র মল্লিক

মাঝে মাঝে পলাতক এ ভীরু হৃদয়
চোখ মেলে উর্দ্ধপানে চায় আকাশের দিকে;
খোঁজে বুঝি দূরে এক ছায়াপথে
তারকার আলো,
যে-আলো দেখেছে সে যে
কোনো এক চোখের তারায়।
এমনি ত এই আলো দেখেছিনু
আমি ত প্রথম;
উচ্চারিনু প্রথম প্রাণের মন্ত্র বাঁচিবার:
দিগন্ত মুছিয়া তাই ক্ষুধা আর
হিংস্র বন্যতার
আমি ত দিলাম জন্ম এই সভ্যতার।
সেদিন স্মরণে নেই।
তখন ছিল না বাঁধা দড়াদড়ি দিয়ে এ হৃদয়,
ভীত আর সদাই শঙ্কিত:
পুরুষসিংহের মত করেছি গর্জন,
কেঁপেছে পাহাড় ছোঁয়া নদী মাঠ অরণ্যের মন।
আজ এ হৃদয় কত ভীরু!!
মিট্ মিট্ সেই আলো জ্বলে আজো
কোনো কোনো চোখের তারায়:
এ হৃদয় আজ শুধু শান্ত চোখে
ফিরে ফিরে চায়,
আর চায় হতে পলাতক ওই দূর নীলিমার গায়।
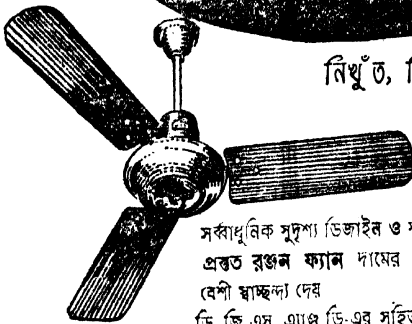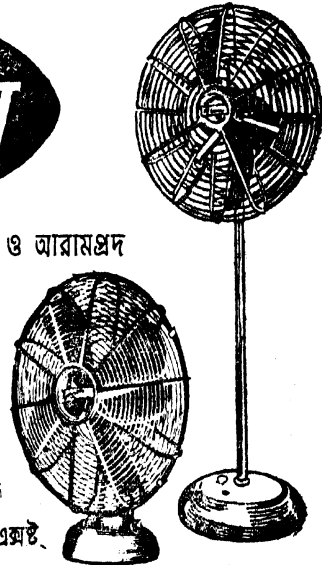
থাকে, থাকে কেশের সৌরভ, বাতাসে থাকে তাদের সঙ্ঘাতীর খস্‌খসানি—আরো থাকে—সবচেয়ে বেশী করে থাকে ঐ চন্দ্রোশেরই জলে সুরম্নার সাময়িক স্থায়িত্বের স্বাক্ষর—নীল-পদ্মের পাপড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো সুকৃষ্ণ, কুঞ্চিত অলক—প্রতিদিন জলকেলি অন্তে সুরম্না কেশার্ঘ্য নিবেদন করে রেখে যায়—কিন্তু কেমন করে একথা সে গুরুকে নিবেদন করবে?

চমক ভাঙলো উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে।

"শুনে হয়তো বিস্মিত হবে হিরণ্যক, আরো অন্য ব্যক্তি স্নানের ব্যাপারে এই অভিমতই প্রকাশ করেছে।"

হিরণ্যক সত্যি বিস্মিত হয়ে গেল।

"আরো কারুর মনে তাহলে এ প্রশ্ন উদিত হয়েছে?"

আর্যমিত্র বলেছে কি গুরুদেব?"

"না। বলেছে নবীনা শ্রমণী সুরম্না।"

"সুরম্না!!!" উপাধ্যায়ের কথার শেষের তিনটি অক্ষর হিরণ্যক অস্পষ্টস্বরে আবৃত্তি করলে।

হ্যাঁ, যাই হোক একাধিক ব্যক্তির মনে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জেগেছে, তখন আমি দ্বারপালকে জানাবো। তবে তিনি নতুন কোনো আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পূর্ববৎ ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে।

কাল থেকে তুমি চন্দ্রোশতেই স্নান করবে।"

"যথা আজ্ঞা।"

"আর শোনো। স্নান করবে বটে, তবে আমার নির্দেশ জলে কোনোরূপ অভিজ্ঞান রেখে আসবে না।

তোমাদের চিত্ত নির্মলতর হওয়া প্রয়োজন।"

"জলে অভিজ্ঞান রেখে আসি? আমি??"

"হ্যাঁ। চন্দ্রোশতে যখন তুমি পূর্বে স্নান করতে তখন একদিন নীল-পদ্মের মৃণালে তোমার ত্রিরত্নের অঙ্গুরীয়ক পরানো ছিল। এই দেখ সেই অঙ্গুরীয়ক, 'হিরণ্যক' নাম খোদাই করা। সুরম্নার উদ্দেশে তুমি এই অঙ্গুরীয়ক রেখে এসেছিলে। তখনো হয়তো চিত্তকে সঠিক অনুধাবন করতে পারোনি। আরো একদিন একটি উত্তরাসনের ছিন্নাংশ পদ্মপত্রের ওপরে ভাসছিল, তাতে তোমার নামের আদ্যক্ষর সীবন করা ছিল। এগুলি সুরম্না আজ প্রভাতে আমার কাছে দিয়ে গেছে।"

"সুরম্না দিয়ে গেছে? সুরম্না আমার নামে অভিযোগ করেছে? মিথ্যা মিথ্যা সব মিথ্যা"। ক্ষিপ্তের মতো চীৎকার করে উঠলো হিরণ্যক।

"মিথ্যা?" উপাধ্যায়ের সৌম্যমুখশ্রী লহমার মধ্যে কঠিন হয়ে উঠলো। ঋজু পদক্ষেপে ধর্মপাদ দ্বারের বাইরে এলেন—অঙ্গুলী সংকেতে দ্বারীকে ডাকলেন। তারপর তুলট কাগজে গুটিকতক কথা লিখে দ্বারীর হাতে দিলেন। মুখে শুধু বললেন, "বর্ষাবাস।" দ্বারী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলে।

উপাধ্যায় গম্ভীর-মুখে পুনরায় গবাক্ষের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন। হিরণ্যকের দিকে না-ফিরেই বললেন, "সুরম্নাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তার অভিযোগের সত্যতা সেই প্রমাণ করবে।"

হিরণ্যক ততক্ষণে আবার স্তব্ধ হয়ে গেছে! সুরম্না। একি অদ্ভুত আচরণ বিচিত্ররূপিণী

শর্বরী

(য়োসেফ ফ্রাইহের ফন আইশেনদর্ফ
১৭৮৮ - ১৮৫৮)

আমি দাঁড়িয়ে আছি বনের ছায়ায়
যেন জীবনের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি,
সমস্ত প্রান্তরে যেন প্রদোষের বসন পাতা,
ঝর্ণা যেন রুপোলী জরি।

দূরে থেকে ভেসে আসছে সময়ের নির্ঘোষ
এখানে বনের গহিনে,
ত্রস্তা হরিণী মাথা তুলে দেখে
আবার তন্দ্রালু চোখ বন্ধ করল।

বন তার তরুশীর্ষে দিল দোলা
ঋজু পর্বতের স্বপ্নে হয়ে বিভোর,
কারণ, পাহাড়ের উপর দিয়ে যে গেছে চলে
আশীর্বাণীতে শান্ত পৃথিবী দিয়েছে ছেয়ে।

('Nachts' কবিতার জার্মাণ থেকে অনুবাদ—
মানসকুমার রায়)

নারী। তবে কেশগুচ্ছের আমন্ত্রণলিপির অর্থ কি? চিরদিন কি তুমি এমনি করবে? আকর্ষণ বিকর্ষণের এক বিচিত্র দ্বন্দ্ব ছলনাময়ীর। হিরণ্যকের প্রেম যেদিন ওকে ঘিরে উত্তাল দুর্বার হয়ে উঠলো ঠিক তখনি, ধরা দেওয়ার চরম মুহূর্তে সুরম্না শেল হানলো—তার তখনো সময় হয়নি—নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজ করে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা আগে দরকার। সুরম্না ফিরিয়ে দিলে—আশাহত হিরণ্যক সংসার ত্যাগ করে চলে এলো সঙ্ঘারামে তার আশ্চর্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরম্না এলো ভিক্ষুণীদের বর্ষাবাসে। শত্রুতার শেষ এতেও হোলো না সুরম্না এত কাছে আছে তাই হিরণ্যক অহোরাত্র আপ্রাণ লড়াই করছে নিজের সঙ্গে। দীক্ষা নিয়ে রিপুগুলোকে যখন কিছুমাত্রায় বশে আনতে পেরেছে, তখন সুরু হোলো সুরম্নার নবতম ছলনা প্রক্রিয়া। বেশ তাই হোক। হিরণ্যকও পুরুষ! এত সহজে হার স্বীকার অন্ততঃ সে করবে না।

নিঃশব্দ লঘু পদক্ষেপে সুরম্না এসে দ্বারের কাছে দাঁড়ালো। আপাদমস্তক শুধু একটি গৈরিক সংঘাতীতে আবৃত, নিরাভরণ দেহ। বৎসরাবধি কৃচ্ছ্রসাধন ওর রূপবহ্নিতে এক অপরূপ স্বর্গীয় বিভা দান করেছে। হিরণ্যক চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারলে না। কতদিন, কত কতদিন পরে আবার সুরম্নার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো—হিরণ্যকের সব কিছু গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু উপাধ্যায় নির্বিকার। অমন রূপ-প্রতিমার দিকে তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না—কঠিন নিরাসক্ত স্বরে শুধু বললেন, "হিরণ্যক বলছে ওর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা।"

"না সব সত্য।" দৃঢ়কণ্ঠে সুরম্না উত্তর দিলে।

"চন্দ্রোশের জলে আমি নিজে ওর উত্তরাসনের ছিন্ন অংশ পেয়েছি।"

তাতো পাবেই। তার কারণ আমার উত্তরাসন এক-সময়ে তুমিই যে সবচেয়ে ভালো করে জানতে। আচার্যদেব বিশ্বাস করুন আমি কোনো

অভিজ্ঞান রেখে আসিনি—আপনারা দিব্যজ্ঞানী, সত্য মিথ্যার প্রভেদ আপনারা বোঝেন,—আমার উত্তরাসন জীর্ণ হয়েছিল। আমার অজ্ঞাতসারে ছিঁড়ে গেছে। স্নানের সময় আর...আর ঐ অঙ্গুরীয়ক আমি সুরঞ্জাকে উপহার দিয়েছিলাম বহুকাল আগে—বিহারে অন্তেবাসিকদের কোনোরূপ মুদ্রা, অলঙ্কার থাকা নিষিদ্ধ। কেমন করে আমার কাছে এখন অঙ্গুরীয়ক থাকবে?"

সুরঞ্জা মুখ ফিরিয়ে নিলে। মনে হোলো তার দুই আয়ত নয়ন প্রান্তে কৌতুকের ঝিলিক।

আচার্যের যুগ্ম ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। "তবে তুমি চন্দ্রোশ পরিত্যাগ করলে কেন? তোমার মন নিশ্চয়ই দুর্বল হয়েছিল?"

"আমার পক্ষে আর কোনো অর্ঘ্য গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় বলে। যে বিষাক্ত চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সংঘারামে ছুটে এলাম, এখানেও এসে কি তার হাত থেকে রেহাই মিলবে না?"

আচার্য চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন। "বুঝলাম না তোমার কথার অর্থ। সুরঞ্জা হয়তো বুঝতে পারে। আচ্ছা, যাই হোক তোমরা এখন যাও। কাল প্রত্যূষে প্রাতিমোক্ষ পাঠ সভায় দুজনেই উপস্থিত থাকবে। তোমাদের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করা হবে তা কালকে ঐ সভাতেই সর্বসমক্ষে জানানো হবে।"

উপাধ্যায় শান্তরক্ষিত প্রাতিমোক্ষ পাঠ করছিলেন। সহস্র অন্তেবাসিকদের সঙ্গে বসেছিল হিরণ্যক। তন্ময়চিত্তে শোনবার চেষ্টা করছিল আর মনে মনে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিল। অন্তেবাসিকদের পক্ষে 'করণীয়ানী'-গুলি সে নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকে—পিণ্ডিয়ালোপ ভোজন, বৃক্ষমূলে সেবাসন, পাংশুকুলক চীবর, পূতিমুক্তভেষজ। কিন্তু 'অকরণীয়ানী'-গুলিও কি সে করে না? দ্যূতক্রীড়া ও নারী আসক্তি?

প্রতিমোক্ষের পঠনীয় অধ্যায় শেষ হোলো। মৃদু গুঞ্জন উঠলো সভাস্থলে। আচার্য ধর্মপাদ একটা হাত তুললেন। তৎক্ষণাৎ সকলে নিবৃত্ত হোলো।

"আচার্য ধর্মপাদ প্রশান্ত উদার স্বরে ঘোষণা করলেন—"অন্তেবাসিক হিরণ্যকদেব, আমার মতে তোমার আরো কিছুদিন সংসারাশ্রম পালন করা উচিত। ভোগতৃষ্ণা অন্তে নিবৃত্তি আসবে। সেদিন সংঘারামের দরজা তোমার জন্যে খোলাই থাকবে।

আর শ্রমণী সুরঞ্জা—"তোমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। মহাস্থবির তোমাদের দুজনকেই অনুমতি দিয়েছেন।"

বহুদূরে শ্রমণীদের বেষ্টনী হতে একটি করতললগ্না কপোলা হঠাৎ সচলা হয়ে উঠলো। অকম্পিত পায়ে এগিয়ে এলো সুরঞ্জা। এগিয়ে এসে অকুণ্ঠিতভাবেই সহসা হিরণ্যকের হাত ধরলো সর্বসমক্ষে। "চলো হিরণ্যক, আরাম বিহার আমাদের জন্য নয়। ছোট্ট নীড় আমরা গড়ে নেবো। আমাদের আশীর্বাদ করুন আচার্য ধর্মপাদ।"

বিস্ময়ে হতবাক হিরণ্যক সুরঞ্জার আকর্ষণে আচার্যের চরণে প্রণত হোলো।

আচার্য দক্ষিণ করতল ওদের মাথার 'পরে স্থাপন করলেন। "আশীর্বাদ করি তোমরা জীবনের মাহাত্ম্য জানবে, সুখ ও শান্তি ভোগ

যৌথ

(২৮৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

'ছোটো বৌদি, বীথি আমার এখানে এসেছে। তার জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না। এতদিন সংসারের অনেককিছু বুঝতাম না। বড়দা আলাদা হ'য়ে যাওয়ায় প্রথম কিছু বুঝতে শিখলাম। তোমাকে আমার ভালো লাগতো; কিন্তু বীথি আজ এখানে চ'লে আসায় বুঝতে পারছি—সংসারের আসল ব্যাধিটা কোথায়! একটা জিনিষ আমার কাছে আজও পরিষ্কার হ'লো না যে, তুমি আমাদের সংসারে আসার পর থেকেই আমাদের সংসারটা এভাবে ভাঙতে সুরু ক'রলো কেন? ভেবেছিলাম—অফিস-কর্তাদের সঙ্গে একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফিরে গিয়ে আবার বাড়ির ভাত খেয়ে অফিস ক'রবো; কিন্তু বীথি আসায় ঠিক ক'রলাম—ব্যবস্থা যদি কিছু একটা ক'রতেই হয়, তবে এখানেই যাতে পার্মানেন্ট্‌লি থাকতে পারি, সেই ব্যবস্থাটাই দেখবো। আশা করি এ সংবাদে নিশ্চয়ই তোমরা সুখী হবে। ইতি—পিনাকী।'

লোকেশ কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। চিঠি প'ড়ে চোখের জল চেপে রাখতে পারলো না কল্যাণী। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌লো সে। এম্‌নি ক'রে এ জীবনে আর কোনোদিন সে কাঁদেনি, আর কোনোদিন তাকে এম্‌নি ক'রে কাঁদতে দেখেনি কেউ।

কাঁদতে লাগ্‌লো। আর বুক ভেঙে যেতে লাগ্‌লো তার। কাঁদতে কাঁদতে আপন মনেই ব'লতে লাগ্‌লো কল্যাণী: 'জানি সব দোষ আমার। এ যৌথ পরিবারে আমি শত্রু হ'য়ে এসেছিলাম; তাই ভাসুরকে তাড়ালাম, দেওরকে তাড়ালাম, ননদকে তাড়ালাম; আমার অপরাধের কি ক্ষমা আছে? কিন্তু ওদের মত আমি এ সংসার থেকে যেতে পারবো কবে?...

দীপু আর টিঙ্কু এতক্ষণ অবাকবিস্ময়ে মায়ের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিল। কল্যাণীর খোঁজ ক'রতে এসে রঞ্জনা তাদের দুটিকে এক-সঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে কল্যাণীর পিঠের উপর আলগোছে হাত রেখে ব'ললো: 'অনেক কেঁদেছ, এবারে চোখের জল মোছো। সংসারে যত কাঁদা যায়, তত কান্না পায়। দীপু আর টিঙ্কুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ তো, ক্ষিদেয় কেমন মুখখানি শুকিয়ে গেছে! ওঠো, উঠে ওদের খেতে দাও।

কিন্তু কল্যাণী সে কথায় কান না দিয়ে রঞ্জনাকে জড়িয়ে ধ'রে আরও জোরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। এ কান্নার বুঝি শেষ নেই, এ কান্না বুঝি কোনো সান্ত্বনাতেই থাম্‌তে জানে না।

—

করবে—ভগবান বুদ্ধ ত্রিতাপ জ্বালা থেকে তোমাদের মুক্তি দেবেন।"

দু পাশে নির্বাক শ্রমণেরা সারি দিয়ে বীরাসনে বসেছে। তারি মধ্যেকার সংকীর্ণ পথ দিয়ে আচ্ছন্ন হিরণ্যক চলতে লাগলো সুরক্ষার সংগে হাতে হাত গাঁথা দুজনের। বিহারের প্রধান দ্বার অতিক্রম করে বাইরে এসে কিন্তু তার মোহের ঘোর ভাঙল। তপস্যা করে সে বোধিলাভ না করুক, মানসদয়িতাকে পেলো জীবনসঙ্গিনী করে এটা কম বড়ো পাওনা নয়। সুরক্ষার হাতটা পিষে ধরলো হিরণ্যক।

"রক্ষা। চলো।"

কিন্তু সুরক্ষা সহসা স্থাণু হয়ে গেছে। যে আবেগ তাকে সহসা উচ্ছ্বসিত করেছিল, সে আবেগ সহসাই প্রশমিত হয়ে গেছে।

"কি হোলো রক্ষা? চলো!"—সুরক্ষার কোমল করপল্লব হিরণ্যক আবার পীড়ন করলে।

"না!" অপরূপ দুটি চোখের পরিপূর্ণ চাহনি মিলোলো সুরক্ষা হিরণ্যকের উগ্র আশ্লিষ্ট দুই চোখের সঙ্গে।

"কী নির্বোধ তুমি হিরণ্যক। তুমি কি এখনো বুঝতে পারোনি তোমার প্রতি আমি কোনোদিন আকৃষ্ট হইনি, কোনোদিন আকৃষ্ট হতে পারি না? তোমাকে আমি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ওর চোখে পড়তে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঈর্ষার দাহনে যদি ওর সন্ন্যাসের খাদ পুড়ে গিয়ে সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে—কিন্তু কি হোলো! এত সাজানো খেলা সব ব্যর্থ হোলো হিরণ্যক......ওর পৌরুষই নেই তা জাগবে কি—বুদ্ধ সব পুড়িয়ে খেয়েছে...... জানো......"

এতক্ষণে বড়ো বড়ো দুটি চোখের পল্লবের বাঁধ ভেঙে জলের প্লাবন নামলো।

"কী করে পারলো ও—হিরণ্যক বলো, তুমিও তো একজন পুরুষ, তুমি কি পারতে তোমার স্ত্রীকে নির্বিকারচিত্তে আরেকজনের হাতে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করতে? হোক্ না সে স্ত্রী গার্হস্থ্যাশ্রমের তবুও তো সে স্ত্রী..... অগ্নি ব্রহ্ম ত্রিলোক ভুবন সাক্ষী করে একদিন তো তার সকল ভার নিয়েছিলে—বুদ্ধ তো গোপাকে কোনো অন্তেবাসিকের হাতে তুলে দেয় নি—ধর্মপাদ কি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো..."

হঠাৎ উন্মত্তার মতো সুরক্ষা প্রাচীরের খোলা দ্বারপথে দৌড়াতে সুরু করলে যে পথ দিয়ে এসেছিল একটু আগে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ভাবে হিরণ্যক কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো একই জায়গায়, তারপর কোন্ অন্ধ আবেগবশে ধীরে ধীরে সুরক্ষার অনুসরণ করলে।

কিন্তু ধরতে পারলে না। কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই অবিশ্বাস্য রকম বেগে দৌড়ে গিয়ে সুরক্ষা চন্দ্রোশিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হিরণ্যক যতক্ষণে গিয়ে ঝাঁপ দিলে, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। অমন সুন্দর পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জল তোলপাড় করতে করতে ঘোলা হয়ে গেল হিরণ্যকের হাতে। কিন্তু সব বৃথা।

প্রশান্ত সহিষ্ণু স্বরে ধর্মপাদ আহ্বান করলেন, "উঠে এসো হিরণ্যক। দেহ পরে এক সময়ে ভেসে উঠবেই। প্রার্থনা করো ক্লিষ্টা নারীর আত্মা যেন মুক্তি পায়। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

ধর্মপাদের কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকম প্রশান্ত, তবু যেন সূক্ষ্ম ভ্রূর কুঞ্চনে, দু'চোখের পাতার কম্পনে সেদিনের সেই অশান্ত পরিক্রমার আভাস ধরা পড়লো চকিতের জন্যে।

চন্দ্রোশির জলে কটা বড়ো বড়ো বুদ্বুদ ভেসে উঠলো। তারপর ফেটে গিয়ে সফেন কুচিতে একাকার হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

ধীরে ধীরে জল আবার নির্মল হয়ে এলো।

অলাতচক্র
॥ দুর্গাদাস সরকার ॥

সত্তরের পাঁচের বি ডায়মণ্ড হারবার রোডে
লোহার গরাদ দেওয়া জানালার পাশে
তক্তাপোষে—
আরশোলা-মশাদের সংগী করে শুয়ে কিংবা
বসে—
দেখা যায় একেক দৃশ্যের অভিনয় শব্দ-কোড়।
ট্রামের বাসের শব্দ (স্ট্রাইকের দিবস ব্যতীত);
ফুটপাতে একপাল কুকুরের মিলন-বিরহ,
ঘুমন্ত পাগল হাসে ঘুমের ভেতরে খলখল,
আরেক উদ্বাস্তু এসে যে-জায়গা করে বেদখল
দুজন পকেটমার করে গেছে সেখানে কলহ।
পথেই মিলেছে যেন বর্তমান এবং অতীত।

এছাড়া হয়তো আছে খাপছাড়া জীবন-সংগীত।
চিড়িয়াখানায় বুড়ো সিংহের গর্জন; শিয়ালের
আচমকা গলাসাধা; সা-রে-গা-মা-পা-ধা
রেডিওতে,
হিন্দী শিক্ষার আসর, লঘু সুর, কথাও হালের;
আর ক্রিং ক্রিং শব্দ পাশের বাড়ির টেলিফোনে।
জীবনের মানে খুঁজে এই সব শব্দের ভেতরে
জানালায় মুখ রাখো চোখ বুজে যুগ যুগ ধরে
তাহলে দেখতে পাবে সে-পথেই একদা শোণিত
চাকার তলায় নয়, অলাতচক্রেই দুর্বিষহ।

যে আসামকে আমি জানি

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

আসামের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের সম্পর্ক। প্রথম যৌবনে বহুবার আসামে বেড়াতে গিয়েছি। এই রমণীয় প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কখনো ট্রেণে, কখনো স্টীমারে, কখনো বা পদব্রজে ভ্রমণ করেছি। অভ্রভেদী গিরিচূড়ায় উঠে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবলোকন করেছি বহু নিম্নস্থ কানন-কুন্তলা, নদনদীমেখলা সমতল ভূমির নিরুপম সৌন্দর্য। কিন্তু আসামের প্রকৃতির চেয়েও বেশী ভালো লেগেছিল ওদেশের মানুষকে। বাঙালী ও অসমীয়াদের মধ্যে সেদিন যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিচয় পেয়েছিলাম তা আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আসামকে কখনো পরদেশ বলে মনে হয়নি। যখনই ওদেশে গেছি তখনই মনে হয়েছে যেন পরমাত্মীয়দের মধ্যে অবস্থান করছি। আমি জানি সেই আসামকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একদা যেখানে রচিত হয়েছিল বাঙালী ও অসমীয়াদের এক উদার মিলনক্ষেত্র—বাংলা ও অসমীয়া সংস্কৃতির সমন্বয়ভূমি সেই আসামের কথাই বলব।

প্রথম যেবার আমি দরং জেলার রাজধানী তেজপুরে যাই তখন বয়স অল্প। তেজপুরে দুটি জিনিষ আমার মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল : শহরের প্রান্তবাহী ব্রহ্মপুত্রের তীব্র গতিশীল বারিরাশির অনন্ত প্রসার আর ওখানকার ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরির গ্রন্থসম্ভার। রোজই চলে যেতাম লাইব্রেরিতে। গ্রন্থাগারিক ছিলেন জনৈক প্রৌঢ় বাঙালী, নাম দেবনারায়ণ ঘোষ। বাংলা এবং অসমীয়া উভয় ভাষাতেই ছিল তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি, তখনকার দিনের কোনো কোনো বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুত। বইয়ের উপর আমার টান দেখে তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহাসক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর নিকট প্রশ্রয় পেয়ে আমি মনের আনন্দে লাইব্রেরির বই ঘাটতে সুরু করে দিলাম। অসমীয়া বইয়ের তুলনায় বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল ঢের বেশী। অসমীয়ারা লাইব্রেরিতে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাংলা বই পড়তেন, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। শুধু অসমীয়া বইয়ের জন্য শহরে আলাদা কোনো লাইব্রেরি ছিল না। এই লাইব্রেরিতে যে সকল বাঙালী নিয়মিতভাবে আসতেন তাঁদের মধ্যে অসমীয়া পুস্তকের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া, লক্ষ্মীনাথ বেজ-বরুয়া, পদ্মনাথ গোহাইন বরুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হিতেশ্বর বরবরুয়া, অম্বিকা-গিরি রায়চৌধুরী, বেণুধর রাজখোয়া প্রমুখ নামকরা অসমীয়া সাহিত্যিকদের প্রায় সমস্ত বই-ই ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরিতে ছিল।

লাইব্রেরিতে অসমীয়া বই ঘাটাঘাঁটি করতে করতে অসমীয়া ভাষা শেখবার সংকল্প আমার মনে উদিত হয়। বাংলা এবং অসমীয়া এই উভয় ভাষার হরফ হুবহু এক—পার্থক্য যেটুকু সে শুধু দুটি অক্ষরে—আমাদের র অসমীয়া পেটকাটা ব আর য় হচ্ছে ৱ। বর্ণমালার এই সাদৃশ্য হেতু প্রথম দৃষ্টিতেই অসমীয়া ভাষাকে আপনার জিনিষ বলে মনে হয়েছিল এবং ঐ ভাষা মোটামুটি শিখতে আমাকে খুব বেগ পেতেও হয়নি। কেননা অসমীয়া সাহিত্যিক ভাষার বাক্যের গঠনরীতি প্রায় বাংলা ভাষারই অনুরূপ এবং অসমীয়া পুস্তকে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই সুপরিচিত। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, বাঙালীর পক্ষে ভারতের অন্য যে-কোনো ভাষা অপেক্ষা অসমীয়া ভাষা আয়ত্ত করা ঢের বেশী সহজ। এর প্রমাণস্বরূপ একখানি অসমীয়া বই থেকে নীচে খানিকটা উদ্ধৃত দিচ্ছি :

"ঈশ্বর দয়ার সাগর, তেওঁর করুণা অপার। তেওঁ জগতর মূলাধার, জগতর সৌন্দর্য মানব জীবনের মনুষ্যত্ব। ভক্তর অমূল্য রত্ন। সাধকর পরম আত্মা। প্রেমিকর প্রেম দরিদ্রর ধন! নিরাশ্রয়র আশ্রয়! তেওঁ নিত্যানন্দ জ্ঞানময়, জ্যোতির্ময়। তেওঁ আনন্দময় আনন্দতে জগতর জন্ম। আনন্দতে মানবত্ব।"

এই রচনাংশের উপর বাংলা গদ্যরীতির প্রায় ষোল আনা প্রভাব সুপরিস্ফুট। মোটামুটি লেখাপড়া জানা এমন বাঙালী কি কেউ আছেন যিনি এই ছত্র কয়টির অর্থ পরিগ্রহ করতে পারবেন না?

বাংলা সাহিত্যের সহিত অসমীয়া সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং পুনর্মুদ্রিত 'ফুলমণি ও করুণা'ই সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার অনতিপরেই অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্য-সমালোচক শ্রীবিরিঞ্চিকুমার বরুয়া তাঁর Modern Assamese Literature নামক পুস্তকে লিখেছেন :

Phulmoni aru Karuna is a translation from a Bengali novel of the same title. The book was written by Mrs. Mullens who was born in a Missionary family in Calcutta in 1826 A.D.".

অর্থাৎ, 'ফুলমণি আরু করুণা' ঐ একই নামের একখানি বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ। এর লেখিকা শ্রীমতী মুলেন্স নাম্নী এক ইংরেজ মহিলা। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এক মিশনারী পরিবারে এঁর জন্ম হয়।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তিপত্তনে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার ন্যায় অসমীয়া গদ্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টরূপে আসামের খৃষ্টান মিশনারীদের কৃত্যসমূহের কথাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফুলমণি আরু করুণা তাঁদের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়। এখানি অসমীয়া ভাষায় প্রথম প্রকাশিত মৌলিক উপন্যাস 'কামিনীকান্তের' (১৮৭৭) পূর্ববর্তী। কামিনীকান্তের রচয়িতা G. S. Gurney নামক জনৈক ইংরেজ।

ফুলমণি আরু করুণারও আগে (১৮৫৫ খৃঃ) বাংলা থেকে অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। অনুবাদ করেন নিধি লেভি ফারওয়েল নামক জনৈক অসমীয়া খৃষ্টান। Modern Assamese Literature P-4).

অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাবের কথা বিশদভাবে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনবোধে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা মাত্র বলব।

অসমীয়া ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা হচ্ছেন ভোলানাথ দাস (১৮৫৮-১৯২৯), তাঁর 'সীতাহরণ কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে—এতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত অসমীয়া নাট্যকার চন্দ্রধর বরুয়াও মধুসূদনের কাব্যনাটকাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুখানি নাটক লিখেছেন—মেঘনাদ বধ (১৯০৪-১৯০৫) এবং 'তিলোত্তমা সম্ভব'—দু'খানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তিলোত্তমা সম্ভবকে বলা চলে নাট্যকাব্য।

অসমীয়া সাহিত্যের এই সকল শ্রেষ্ঠ রত্ন-রাজির মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তেজপুরের ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরিতে। বর্তমান আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার রচনাসমূহ পড়ে সেদিন যে বিমল আনন্দ লাভ করেছিলাম আজও তা ভুলতে পারিনি। ইনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, কবি, প্রাবন্ধিক, জীবনীকার এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক। এঁর লেখা 'শঙ্করদেব আরু মাধবদেব' অসমীয়া সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত। 'হাজো' নামক (১৩৩৪ সালের ভারতবর্ষে প্রকাশিত) একটি প্রবন্ধ রচনায় এই বইখানি থেকে আমি কিছু সাহায্য পেয়েছিলাম। জয়মতী, চক্রধ্বজ সিংহ এবং বেলিমার—বেজবরুয়ার এই তিনখানি নাটকই অসমীয়া সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

আসামের আর একজন দিকপাল সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাইন বরুয়া থাকতেন তেজপুরেই। মুখ্যতঃ নাট্যকার হিসেবেই ছিল তাঁর প্রসিদ্ধি। জয়মতী, গদাধর, সাধনী, লাচিত ফুকন প্রভৃতি তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি অসমীয়া সাহিত্যের সম্পদ। 'ফুলর চানেকি' নামে এঁর একটি কাব্যগ্রন্থ এবং 'লহরী' ও 'ভানুমতী' নামে দুখানি উপন্যাসও আছে। যতদূর মনে পড়ে তেজপুরে এঁর লেখা 'গাঁওবুড়া' নামক একটি

প্রহসনের অভিনয় দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম।

ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরির অসমীয়া গ্রন্থসমূহ আমার কাছে যেন আসামের আত্মাকে উন্মাটিত করে দিয়েছিল। স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হবার সময় দু'চোখ ভরে উপভোগ করেছিলাম এই রমণীয় প্রদেশের অনুপমেয় বাহ্য রূপ, আর তেজপুরে এসে মন দিয়ে চেখে চেখে তার সাহিত্যের মর্মকোষে সঞ্চিত মধুর আস্বাদ গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হলাম। তরুণ বয়সে সাহিত্যের মাধ্যমে আসামের সঙ্গে সেই যে মানসিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তাকে আমি জীবনের একটা মস্ত বড় লাভ বলে মনে করি এবং অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, বাণীমাল্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আসাম ও বাংলা এই দুইটি প্রদেশের পারস্পরিক যোগসূত্র কখনো ছিন্ন হবে না।

তেজপুর থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে এসে উপস্থিত হলাম গোহাটিতে। কামাখ্যা শুক্রেশ্বর, উমানন্দ প্রভৃতি তীর্থমন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করলাম। আমার মনকে কিন্তু গভীরভাবে টানছিল ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরের একটি পায়ে চলার পথ, যে পথ আমাকে পৌঁছে দেবে হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরে।

এই হাজোর মন্দিরের কথা, তার পূর্বগৌরবের কাহিনী আমি জানতে পারি ভিক্টোরিয়া জুবিলী লাইব্রেরিতে মণিকূট নামক অসমীয়া ভাষায় লেখা একটি কবিতার বই পড়ে। তার দুটি পংক্তি আজও মনে আছে ঃ

'নর্তকী হস্তরে নৃত্য করে
ভাব দিয়া নানা ভঙ্গী করে।'

আসামের নিভৃত পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত এই দেবনিকেতন—যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় দেবদাসীদের নৃত্যচ্ছন্দে হয় দেবতার পূজারতি, আমার কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

একদিন ফেরি স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হলাম এবং পথযাত্রীদের সঙ্গ ধরে গিয়ে হাজির হলাম হাজোতে। আশ্রয় নিলাম এক পান্ডার বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পরে মণিকূট পাহাড়ের উপর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির দেখতে গিয়ে কিন্তু নিরাশ হলাম। কোথায় শঙ্খঘণ্টার আরাব, কোথায় নর্তকীর নূপুর নিক্কণ, আর কোথায় বা পুণ্যলোভীর বিপুল ভিড়। নগরের কোলাহল থেকে বহু দূরে অবস্থিত এই বিরাট মন্দিরটি প্রায় জনশূন্য। কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলাম তার সঙ্গে এর কিছুমাত্র মিল দেখতে পেলাম না। বুঝলাম এই মন্দিরের পূর্বগৌরবের কিছুমাত্রও আজ আর অবশিষ্ট নেই।

কামাখ্যার ন্যায় কামরূপে কোচ রাজাদের অন্যতম কীর্তি হাজোর এই হয়গ্রীব মাধবের মন্দির। কামরূপের চরম গৌরবের দিনে এই মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন কোচ রাজা নরনারায়ণ।

হাজোতে গিয়ে আমার সব চেয়ে বড় লাভ হয়েছিল [illegible] পল্লীবাসীদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা। এ দের অনুরোধে একটি সপ্তাহ আমাকে হাজোতে থাকতে হয়। এই কয়দিন ঘুরে বেরিয়েছি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি পল্লীজীবনের মাধুর্য। পল্লী প্রাঙ্গণে, নামঘরে শুনেছি মহাপুরুষ শঙ্করদেব রচিত বরগীতঃ

'পায়ে পরি হরি করোহোঁ কাতরি
প্রাণ রাখিবি মোয়।'

'নারায়ণ হরি রাম গোপাল গোবিন্দ।
ভজোহোঁ তোমার দুই পদ অরবিন্দ'।—এই অসমীয়া ভজন আর অগণিত ভক্তকণ্ঠে 'হরি হরি' ধ্বনি শুনে বঙ্গপল্লীর হরিসংকীর্তনের আসরের কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়েছে; মনে মনে প্রণাম জানিয়েছি বাংলার শ্রীচৈতন্যেরই মত কৃষ্ণগতপ্রাণ মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে, বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করে আসামকে যিনি উদ্ধার করেছিলেন বীভৎস তান্ত্রিকতার হাত থেকে।

তেজপুরে আসামকে জেনেছিলাম মুখ্যতঃ বইয়ের মাধ্যমে, হাজোতে পল্লীর মানুষের সংস্পর্শে এসে পেলাম অসমীয়া জাতির প্রাণসত্তার প্রকৃত পরিচয়।

হাজো থেকে ফিরে এলাম গোহাটিতে। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে প্রত্নদ্রব্যের সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম। জানতে পারলাম এই সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শ্রীহট্টের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের অক্লান্ত প্রয়াসের কথা। একদা এঁর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অসমীয়াদের তাঁদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। এঁর 'কামরূপ শাসনাবলী' একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আহোম রাজকুমার গদাধরের পত্নী সতী জয়মতীর আত্মত্যাগের কাহিনী আসামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই কাহিনী প্রথম যিনি অসমীয়াদের শোনান তিনি একজন পরলোকগত এবং অধুনা-বিস্মৃত বাঙ্গালী। নাম গোপালকৃষ্ণ দে। শ্রীহট্ট জেলার সুখৈর গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন গোহাটিতে। অসমীয়া ভাষায় ছিল তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি এবং দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র থেকে জয়মতীর কাহিনী উদ্ধার করে অসমীয়া ভাষায়ই তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এই সতী নারীর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও মৃত্যুবরণের কাহিনী অর্ধ শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল ধরে উদ্বুদ্ধ করে আসছে আসামের কবি এবং সাহিত্যিকদের কল্পনাকে। ১৯০০ সালে পদ্মনাথ গোহাইন বরুয়া লেখেন 'সতী জয়মতী' নাটক, পরবর্তীকালে কবি হিতেশ্বর বরবরুয়া রচনা করেন 'তিরোতার আত্মদান' নামক কাব্য; আসামের সাহিত্য-সম্রাট লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'জয়মতী' নাটকও বিশেষ সমাদর লাভ করে।

সতী জয়মতীর কাহিনী অবশেষে বাংলাদেশেও প্রচারিত হয়। আমি যতদূর জানি এ সম্বন্ধে প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লেখেন শ্রীহট্টের রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় এবং প্রবন্ধটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহুকাল পূর্বে অসমীয়া গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আচার্যদেব একবার আসামে গিয়ে তেজপুরে দিনকতক অবস্থান করেছিলেন। প্রবন্ধটি তেজপুরেই লিখিত হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতেই।

আসাম সম্বন্ধে বাংলাভাষায় নানা তথ্য পরিবেশন করে যাঁরা বাঙ্গালীদের পক্ষে আসামকে জানবার ও বুঝবার পথ সুগম করে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও শ্রীহট্টের লোক, নাম শ্রীরাজমোহন নাথ। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত তাঁর The Background of Assamese Culture নামক পুস্তকখানি থেকে শুধু যে আমরা আসামের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয়ই পাই তেমন নয়, আসামের মানস-সংস্কৃতির উপর বাংলার প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক তাও অবগত হই। আমরা জানতে পারি যে, কামরূপের কোচরাজা বিশ্বসিংহকে শৈব ধর্মে দীক্ষিত করেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কালীচরণ ভট্টাচার্য। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন বাংলাদেশ এবং কানৌজ থেকে উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান লোকেরা এসে সমবেত হলেন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে নিজ রাজ্যে সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেন নরনারায়ণ।

শুধু আসামের সমতল ভূমিতে নয়, যে সকল পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে আসাম রাজ্যটি গঠিত, প্রাগ্‌বৃটিশ আমলে সেগুলিতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার করেছেন বাংলার ব্রাহ্মণ। কাছাড়ী রাজা তাম্রধ্বজ সিংহকে বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু বলে ঘোষণা করলেন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, কাছাড়ীদের কথ্য ভাষায় নারদীয় পুরাণ অনুবাদ করলেন ভুবনেশ্বর বাচস্পতি। ওদিকে জৈন্তার সিন্টেং রাজা বরগোঁসাই এবং রাজমহিষী কাসামতীকে তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিলেন হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায়।

অতীতে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বাংলার দান বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছিল আসামের সাংস্কৃতিক জীবনকে। ভারতের আর কোনো প্রদেশই আসামের ন্যায় এমন অবলীলাক্রমে বাংলার সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নেয়নি। সমগ্র ভারতের মধ্যে অসমীয়াদের সঙ্গেই বাঙ্গালীর মানসিক আত্মীয়তা সকলের চেয়ে বেশী। আত্মঘাতী আত্মীয়বিরোধের অবসান ত্বরান্বিত হওয়া তাই আজ একান্ত কাম্য।

খুড় খুড়ো এক বুড়ো—
অলক্ষ্যে থেকে পেষণ যন্ত্রে
করে সব গুঁড়ো গুঁড়ো।
ঢিমে তেতালায় যদিও চালায় হাত,
তবু এক মনে ঘোরায় জাঁতাটি
সারা দিন সারা রাত।
আজ নয় কাল, দেরীতে হলেও
চূর্ণটি হয় তার
অতীব সূক্ষ্ম! অতীব চমৎকার!
Somerset Maugham
(The Moon and Six Pence)
—(মায়া বসু)

গৌরী
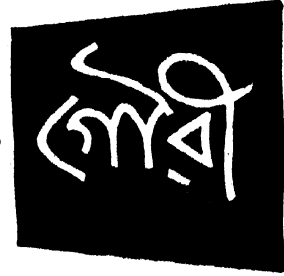
শীলা চট্টোপাধ্যায়

গৌরীর নাম রাখা হয়েছিল গিরিরাজের সুন্দরী মেয়ের নামে। কিন্তু সে ছিল ভয়ংকর কালো আর কুৎসিত। মার থেকে চেহারা পেয়েছিল, মার মতনই কালো ঝুল রং আর প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের মতন চওড়া চ্যাপটা নাক, মোটা বেরকরা উঁচু ঠোঁট। তবু মার দিনরাত বলার কামাই ছিল না—কি জানি কোথা থেকে আমার এমন কুৎসিত মেয়ে জন্মালো!

গৌরীর বাবাকে দেখতে মন্দ নয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখা-পড়ায় ভাল ছিলেন। বই নিয়ে ডুবে থাকতেন বলে জীবনে উন্নতি করতে পারেন নি। যাদব কেমিকেলের হেড অফিসে এখন তিনি কেরাণী। আজও তাঁর পড়ার নেশা আগের মতোই প্রবল আছে।

গৌরী বাবার কাছ থেকে পেয়েছে পড়ার সখ। দুঃখের বিষয় তার তিন ভাইএর ভেতর একজনেরও এই লেখা-পড়ার প্রতি টান নেই। 'আহা আমার গৌরী যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাত!' মা বলেন প্রায়ই। লেখাপড়া শিখলে গৌরী একা তার তিন ভাই মিলে এক-সংগে যা করবে তার চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারত। অবশ্য গৌরীকে ইস্কুলে পাঠানো অসম্ভব, পয়সার যখন এত টানাটানি। 'মেয়েমানুষকে এমনিতেই লেখাপড়া শেখানোর মানে হয় না' মা বলেন 'তাকে শেখাও ঘর-কন্না, ছেলে মানুষ করা, শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে সেবাযত্ন'।

গৌরী ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাল করে শিখেছিল মেয়েমানুষের কর্তব্য কাজ—বাধ্য হয়েই, অভাবের সংসারে। ভোর থেকে রাত অবধি সে ঝাঁট দিচ্ছে, ঘর মুছছে, রাঁধছে, বাসন মাজছে, ঝাড়ছে, রিপু-তালি দিচ্ছে।

গৌরীর মা মেয়ের বিয়ের চিন্তায় অস্থির। কেউ তাকে ঘরের বৌ করতে রাজি নয়।—'ভাবনায় আমার গলা দিয়ে ভাত নামে না;' মা বলেন বাবাকে। 'গৌরীর ১৯ বছর বয়স হল, কাল ২০ বছর হবে।' গৌরীর মা সব সময় মেয়ের বয়স এক বছর বাড়িয়ে বলেন।

—'ওকে বয়সের মতন বড় দেখায় না কিন্তু,' গৌরীর বাবা বলেন একটু আশার আলো দেখিয়ে। ১৮ বছরে গৌরী ছোট্ট রোগা, পাকানো। কখনও পুষ্টিকর খাবার দরকার মতন পরিমাণে খেতে পায়নি, তার ওপর দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তাই ওর শরীরের কোন বাড় নেই।

ওদের ফ্ল্যাটে সরু একফালি এক বারান্দা আছে মরচে পড়া লোহার রেলিং দেওয়া। সন্ধ্যের দিকে গৌরী সেখানে বসে থাকে জনবহুল রাস্তার দিকে চেয়ে, রেলিং-এর ফাঁকে মুখ রেখে। সে দেখে নতুন বিয়ে করা স্বামী স্ত্রী চলেছে, অল্পবয়সী প্রেমিক প্রেমিকারা যাচ্ছে পাশাপাশি। তার মনে একটা স্বাভাবিক ছেলেমানুষী ইচ্ছা আছে ভালবাসা পাবার, তার বিয়ে হবে, স্বামী হবে, একজন পুরুষ তাকে ভালবাসবে। সবারই বিয়ে হয়। তারও হবে একদিন, আর তখন কী অফুরন্ত আনন্দ!

গৌরীর পিসী এক বিয়ের সম্বন্ধ পাঠালেন, যে ভদ্রলোক বিয়ে করতে চান তাঁর বয়স ৫০এর ওপর। যেমন হয় আর কি, আগের পক্ষের স্ত্রী অনেক ছেলেপিলে রেখে গিয়েছেন। গৌরীর বাবা আপত্তি করলেন। মা নিরাশ হয়ে বললেন, 'এছাড়া আর উপায় কি আছে?' গৌরী রক্ষা পেল যখন ওকে কী ভীষণ কুৎসিত দেখতে দেখে বর নিজেই আশ্চর্য হয়ে চমকে চলে গেল।

শেষকালে সত্যি গৌরীর এক বর পাওয়া গেল। অলৌকিক ঘটনা মনে হয় যখন জানা যায় গৌরীকে কি কুৎসিত দেখতে। কিন্তু এই অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার বাঙ্গলা দেশের সব বিয়ে-না-হওয়া মেয়ের ভাগ্যেই এক সময় ঘটে, যতই তাকে কুৎসিত দেখতে হোক না কেন।

বরের বাবাই একা গৌরীকে দেখে গেলেন। তিনি বলে গেলেন মেয়ে সম্প্রদানের আগে এক হাজার টাকা নগদ দিতে হবে, আর কিছু সোনার গয়না। তিনি বললেন ছেলেকে ভদ্রভাবে মানুষ করেছেন। তাঁর ছেলে বিয়ের আগে কনে দেখতে চাইবে একথা মনে করতেও পারে না।

লোকটির টাক মাথা, ধূর্ত চনমনে চোখ, টিয়াপাখীর মতন বাঁকা নাক। গায়ে ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, ফুটো দিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দুটো বেরিয়ে আছে। তিনি বললেন কলকাতার কাছেই তাঁর বাড়ী, নিজের কিছু জমি-জমা আছে। কথা বলেন তিনি খুব লম্বা-চওড়া, কিন্তু অতিশয় বিনয়ের সংগে। তাঁর চার ছেলে, এটি হচ্ছে সবার বড়। বাপের জমি-জায়গা দেখাশুনো করে।

গৌরীর বাবা ছেলে দেখতে গেলেন, দেখে খুশী হলেন। ছেলেটির বয়স কম, তবে লেখা-পড়া একদমই জানে না। ছেলের বাবা বহু দূরে ছড়ানো ধান-জমির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন এ সবই তাঁর। একতলা বাড়ীটা ছোট্ট, জীর্ণ, ভেঙ্গে পড়ছে, তাতে গৌরীর বাবার কিছু মনে হল না, কারণ তিনি নিজেও এর চেয়ে ভাল বাড়ীতে কোনদিন থাকেন নি। তিনি মনে করলেন এরা বোধ হয় কোন ছোট গোছের জমিদার হবে।

—'যে করে হোক আমাদের টাকার যোগাড় করতে হবে।' গৌরীর মা বললেন। 'গৌরীর জন্যে ভাল পাত্রের যোগাড় করতে ত' কম চেষ্টা করিনি। এখন আর বাছাবাছির সময় নেই।'

গৌরী ভারি খুশী [illegible] ছেলের সংগে বিয়ে হচ্ছে শুনে, তার বিশ্বাস এছাড়া ওরা অবস্থাপন্ন লোকও বটে।

ওর মার একছড়া গলার হার আর কয়েকটা সোনার চুড়ি হাতে ছিল, এগুলি গালিয়ে তিনি

মেয়ের নতুন গয়না গড়িয়ে দিলেন। মার খালি গলা আর হাতে কাচের চুড়ি দেখে গৌরীর আসন্ন বিয়ের আনন্দ অনেকটা মিইয়ে গেল। 'মা আমার কোন গয়না চাই না'—সে বললে।

—'তুই কি চাস না চাস সে কথা নিয়ে কে ভাবছে? কথা হচ্ছে তোর শ্বশুর কি চেয়েছেন। মন খারাপ করিস না। নিজের পেটের মেয়েকে জিনিষ দিতে কোন দুঃখ নেই। তোর বাবা কি এ সময়ে কখনও সোনা কিনতে পারত?'

গৌরীর বাবাকে পণের টাকা ধার করতে হয়েছে। সব সময়ে তাঁর মন আর অস্বোয়াস্তি। ভারি বোঝার মতন মাথায় চেপে আছে নতুন দেনার ভাবনা। 'কী করে জীবনে শোধ দেব?' স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন। যদিও স্ত্রীর কোন ধারণাই নেই কী করে শোধ হবে; তিনি ওঁর ভাবনা হালকা করতে চেষ্টা করেন বলেন, যে করে হোক টাকা জমাবেন, তাছাড়া শিগ্‌গিরি ছেলেরা বড় হয়ে যাবে, তারাও বাপের সঙ্গে টাকা রোজগার করতে পারবে।

মেয়ের বিয়ের রাত্তিরে গৌরীর মা-বাবার বড় আনন্দ আর ভারি নিশ্চিন্তি; যাক তাঁদের কাল কুৎসিত মেয়ের শেষ অবধি বর পাওয়া গিয়েছে। বরকে এক রকম ভাল দেখতে। খুব মন দিয়ে বর সেজেছে, সস্তার জৌলুস দেখিয়ে। ছোট কপালে লবঙ্গ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা কাটা। বরের সঙ্গে যারাই আলাপ করে দেওয়া হচ্ছে সে তার সঙ্গে চোয়াড়ে কিন্তু চট্‌পটে ঠাট্টা তামাসা করছে।

সম্প্রদানের পর বর গোমড়া আর অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে গেল। গৌরী শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় গৌরীর মা কাঁদতে কাঁদতে জামাইকে বললেন মেয়ের দোষ অপরাধ ক্ষমা করে তাকে দেখাশুনো করতে। জামাই কোন উত্তর দিল না, খালি ভুরু কোঁচকালো।

গৌরীর বাবা-মা মেয়ের শ্বশুর বাড়ী গেলেন ফুলশয্যার নেমন্তন্নয়। তাঁদের ভেতরে নিয়ে যেতে দরজায় কাউকে পেলেন না। গৌরী একটা সুতী শাড়ী পরে বসে আছে, কনের সাজ পোষাকে নয়, কেঁদে মেয়ে আকুল হচ্ছে। তার কাছে কেউ নেই। পাশের ঘরে এক ভীড় জমেছে তার শাশুড়ীকে ঘিরে, তিনি দেয়ালে মাথা ঠুকে কপালে রক্ত বের করছেন আর থন্‌খনে গলায় চেঁচিয়ে পোড়া ভাগ্যকে গালমন্দ দিচ্ছেন প্যাঁচার মত কুৎসিত তাঁর এক বৌ হয়েছে বলে। কেউ হেসে মজা দেখছে, কেউ কেউ তাঁকে থামাবার চেষ্টা করছে। ভয়ে জড়সড় হয়ে গৌরীর মা দাঁড়িয়ে রইলেন লজ্জায় হেঁট হয়ে। তাঁদের জামাই ঘরে এসে শ্বশুর শাশুড়ীকে অশ্লীল গালাগাল আর শাপমন্যি করল, ঠকিয়ে তার সঙ্গে অমন কুৎসিত মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে। চেঁচাতে লাগল যে ওঁরা ওর বাবাকে ঘুষ খাইয়ে রাজি করিয়েছেন।

গৌরী মা-বাবাকে বলল ফিরে যেতে। তার জন্যে তাঁরা যেন দুঃখে ভেঙ্গে না পড়েন। তার বিয়ে হয়েছে, এখন নিজের ভাগ্যে ওকে চলতে হবে। কথা বলছে যেন অন্য লোক। তিনদিনের অসহ্য মনের দুঃখে ২০ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে তার অভিজ্ঞতায়।

বাবা বলেন মাকে—'গৌরীর বিয়ে না হলেই ভাল হোত।'

—'চুপ করো। ওরকম কথা মুখে এনো না গো। মেয়ে হয়ে যে জন্মেছে সে বিয়ে না করে কী করবে?' গৌরীর মা বলেন।

মেয়ের সঙ্গে তাঁরাও মনে মনে দগ্ধে যান। —'একটু চুপ করে সহ্য করো, সব ঠিক হয়ে যাবে সময়ে।' গৌরীর মা বোঝান 'মনে নেই আমার মামাতো বোন সুচারুর কথা? প্রথমে বরের বৌ পছন্দ হয়নি। সুচারুর রং আলকাতরার মতন, আর স্বামী হলেন রূপে কার্তিক। শেষে তাদের এমন ভাব ভালবাসা যে দেখলে চোখ জুড়োতো।'—কিন্তু স্বামীকে সামনে যদিও দেখান না, মনে মনে আশঙ্কায় তিনি জরজর। চোখের কোলে গাঢ় কালি।— 'মেয়ে মানুষের ভাগ্যই দুঃখ ভোগ করা, কিন্তু এত কষ্ট নয় ঠাকুর, এত কষ্ট নয়।' নিজের মনে বিড়বিড় করে বলেন সংসারের কাজকর্ম করতে করতে।

এক মাস পরে গৌরী একা ফিরে এল বাপের বাড়ী। সঙ্গে কোন মালপত্তর নেই। গায়ে কোন গয়না নেই। তার ছোট ছোট চোখ লাল আর আচ্ছন্ন। অল্পবয়সী কপালে বুড়ো বয়সের রেখা। 'আমি বাড়ী ফিরে এলাম।' বললে অসীম স্বস্তির সঙ্গে, খানিক পরে যেন মনে পড়তে বলল 'ওরা আমায় তাড়িয়ে দিলে।'

—'কিন্তু তোমার শ্বশুর?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে।

—'তিনিও ওদের চেয়ে কিছু ভাল লোক নন। খালি টাকাই চেয়েছিলেন ত'। ওরা খুব গরীব। যে ধানজমিগুলো দেখিয়েছিল ওদের নিজেদের নয়।'
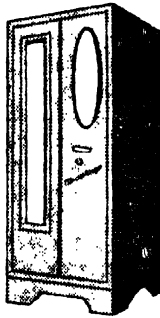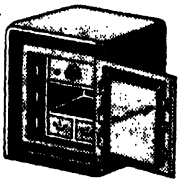
তুহিন-ঘুম

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

দুচোখে স্বপ্ন ঃ এখন মিষ্টি বৃষ্টিরাত,
ভিজে চুলগুলি উৎস তোমার সুগন্ধের।
স্বল্প আলোকে কত নির্জন দুখানি হাত
যোথ-লগ্নে খুলেছে কবাট দিগন্তের॥

কোন্ আশ্বিনে কী চেয়েছি, আর কী দুর্লভ
সত্যসন্ধ রক্তে নেমেছে আজ জোয়ার।
অকৃতদারের অংকসূত্রে কী বৈভব
হৃদয়ের মানচিত্রে এঁকেছে বৃত্ত তার॥

ব্যাপ্তিতে এর না জানি কখন আসবে ভোর,
বাইরে ক্ষেতের সবুজ ফসলে চলছে দোল।
মৃত্যুবাসরে নদীসংগম কত বিভোর
ও-চোখে জ্বালবে প্রদীপ,
গণ্ডে হাসির টোল॥

আনাচে কানাচে ঘনরাত যবে হবে নিঝুম,
পৃথিবী ছুঁড়বে তোমার দুচোখে তুহিন-ঘুম।

'হাঁদা মেয়ে কোথাকার। শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে কখনও চলে আসে?' মা চেঁচিয়ে উঠলেন। কোন সময়ই তিনি কান্ডাকান্ডজ্ঞান হারান না।

—'আমার আর কোন উপায় ছিল না। স্বামী ধরে মারধোর করল আর শাশুড়ী গয়নাগাটি কেড়ে নিলেন। আমার গলার হার আর হাতের চুড়িগুলো ওদের দিতে চাইনি, কারণ ওগুলো তোমার। আমি নিজের জন্যে ওগুলো চাইনি।' ফাটা শুকনো ঠোঁট দুটোতে জিব বুলিয়ে নিলে। 'ওরা সোনা যা ছিল কেড়ে নিলে। ওরা বললে আমার যে গয়না পরে বিয়ে হয়েছিল তা সব ওদের, কারণ আমাকেই ত দান করে দেওয়া হয়েছে সম্প্রদানের সময় ওদের কাছে। ...আমাকে, আমি যা কিছু পরেছিলাম আমায় যা যা দিয়েছে...শাশুড়ী বললেন এখন একটা ভাল দেখতে বৌ আনবেন। আমাকে সেই মেয়েটাকে অনেকবার দেখিয়েছেন। শ্বশুরও এখন আপত্তি করবেন না, এখন টাকা পেয়ে গিয়েছেন। তোমাদের জামাই ত' কোন দিনও রাত্তিরে আমার সঙ্গে শুতে আসেনি। দৈবাৎ আমায় দেখে ফেললে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বাপান্ত করবে। আজ সকালে শাশুড়ী স্বামীকে বললেন আমাকে তাড়িয়ে দিতে। ও আমাকে লাথি-চড় মারতে শুরু করলে। দুবার ফিরে গেলাম কুকুরের মতন। আবার আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। শাশুড়ী সামনের দরজায় খিল দিয়ে দিলেন যাতে আর না ঢুকতে পারি।'

গৌরী হাতে পিঠে ফোলা কালশিরার দাগ দেখালে। তারপর চুপ করে বসে রইল, শূন্যের দিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন চাউনিতে। কাঁদল না।

গৌরীর মা কান্নাকাটির মধ্যেই তোড়জোড় করে নিলেন স্বামীকে সঙ্গে করে গৌরীকে তার শ্বশুরবাড়ী ফেরৎ রেখে আসার জন্যে।—'মা কিছু লাভ নেই কিন্তু চেষ্টা কর।' গৌরী বলল অসীম ক্লান্তিতে। কিন্তু মা মন স্থির করে ফেলেছেন।

গৌরীর শ্বশুর ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন এখন আর তিনি গৌরীকে ঘরে নিতে পারেন না। যখন সে নিজের ইচ্ছেতে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই তার চরিত্র খারাপ। গৌরীর মা-বাবা হাতে-পায়ে ধরে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্বশুর টললেন না, ভাব দেখালেন যেন তাঁর প্রতি ভীষণ কোন অবিচার করা হয়েছে। 'আমার ছেলের আসছে হপ্তায় একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে। আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছে। গৌরীর বাবা-মা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন।

মার কান্নাকাটিতেই গৌরী মরিয়া হয়ে উঠল। মা সারারাত ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদেন আর গৌরী না-ঘুমিয়ে ফালি বারান্দায় বসে আপ্রাণ চেষ্টা করে শক্তি আনতে নিজের মনে তার এই অবস্থা সহ্য করবার জন্যে।

—'মা, আমার ত' বাড়ী ফিরে এসে আনন্দ হয়েছে। সত্যি বলছি মা। তুমি এত কাঁদ কেন? তুমি এমন কান্নাকাটি কর যেন আমি মরে গেছি।'

—'তাহলেও ভাল ছিল। তাহলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারতাম।' মা বললেন শোকে তারুণ [illegible] হয়ে [illegible]।

—'বিধবারাও ত' বেঁচে থাকে।'

—'তোর অকথা তাদের [illegible]। তুই হচ্ছিস খেদিয়ে দেওয়া বৌ। [illegible] কী লজ্জা! ধরণী দ্বিধা হও।'

গৌরীর মা গৌরীকে ভুলে যেতে দেবেন না, শোক আর একটানা হাহুতাশের পালা। এভাবে বাইরে প্রকাশ করলে মার দুঃখ একটু হালকা হয়। আর গৌরীর দুঃখ—যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই বাতাসে মিশে আছে, যে আলো চোখে দেখছে সেই আলোতে, তার প্রতি হৃদস্পন্দনে। তার মনে হয় সে অনাদি-কাল ধরে পৃথিবীতে আছে, যেন সে বহু জীবনের যন্ত্রণা একাই ভোগ করেছে। সে তার দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তার দুঃখ বিষ হয়ে মিশে রয়েছে তার নিজের রক্তে। তার দুঃখ তার বেঁচে থাকার অস্তিত্বে। একমাত্র মুক্তি হচ্ছে মরণ।

বাবা লক্ষ্য করলেন গৌরীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা, তার চোখের আধো উন্মাদ হতাশা। দিনের বেশীর ভাগ সময়ে সে বারান্দার এক কোণে নিঝুম হয়ে বসে থাকে, কারণ ওই জায়গাটুকুতেই সে অপেক্ষাকৃত একা থাকতে পায়।

—'তুমি কী করতে চাও?'—একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আস্তে জিগ্যেস করলেন মেয়েকে।

চমকে উঠে তাকিয়ে গৌরী জিগেস করল, 'কেন?'

—'এমনি।'

—'আমি...আমি ভাবছিলাম।'

—'আমিও কিছু ভেবেছি', বললেন বাবা।

—'কী? কোর্টে নালিশ করবে? ওতে কিছু লাভ হবে না। ওদের না হয় শাস্তি হবে, আমায় ত' ওরা ফিরিয়ে নেবে না...আর আমি যাবোও না।'

—'সে নয়। এই দ্যাখো, এগুলো তোমার জন্যে এনেছি', বলে তিনি এক বাণ্ডিল নতুন বই দেখালেন। 'তোমাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে পারতাম। কিন্তু আসছে বছর যদি স্কুল ফাইন্যাল এগজামিন দাও তবে বাড়ীতেই তাড়াতাড়ি শিখবে। আমি তোমাকে পড়াবো। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবেই।'

গৌরী কিছু বুঝতে না পেরে একবার বইগুলো আর একবার তার বাবার মুখের দিকে তাকালে,—'বইয়ে যা লেখা থাকে তা জানতে তোমার চিরদিনই খুব ভাল লাগে। ছোটবেলা থেকেই। তা নয় কি মা?' গৌরীর বাবা জিগ্যেস করলেন।

ক্রমে গৌরী বুঝতে পারল যে তার বাব তার সামনে বাঁচবার একটা উপায় তুলে ধরছেন, শুধু মুখের কথার সান্ত্বনা নয়। চোখ ভাসিয়ে কান্না নামল তার। বাবা চুপ করে দেখলেন তার কান্না। গৌরী বুঝল, জলে ডোবা মেয়েকে বাবা টেনে তুলে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন তার নিজের দুঃখের বাইরে একটা জিনিষে তার মন ফিরিয়ে দিয়ে।

—'আমি বাঁচতে চাই। আমি মরতে চাই না বাবা।' মার কথাতে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে মনে হয়েছিল বলেই শুধু' ...গৌরী তার প্রাণের দুঃখ ঢেলে দেয় অস্ফুট কথার দুরন্ত স্রোতে। 'আমি এত কুৎসিত, আমার কখনও বিয়ে করা উচিত হয় নি। এক যদি আমার এই চেহারা দেখেও কেউ আমাকে ভালবেসে নিজের স্ত্রীভাবে নিতে চাইত...অবশ্য আমার পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব...আমার স্বামীকে দোষ দিতে পারি না, তার বয়স কম, সে চায় সুন্দর বৌ। আমার কখনও বিয়ে করা উচিত হয়নি। আমার বোঝা উচিত ছিল অন্য মেয়েদের থেকে আমার কী তফাৎ...কিন্তু আমিও বাঁচতে চাই। আমি মরতে চাই না, আত্মহত্যা করতে চাই না।'

—'দোষ আমাদেরই, তোমার কোনই দোষ নেই মা,' বললেন বাবা মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। গৌরী অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল হাতে মুখ ঢেকে, তারপর কান্নায় ফোলা চোখ মুছে বলল—'আমি এবার থেকে শক্ত হব। ও সব শেষ হয়ে গিয়েছে।...আমিও বাঁচতে পারি।' কান্নাভেজা মুখে ফুটে উঠল হাসি, তার চোখে নবজন্মলাভের অবাক বিস্ময়। চকচকে নতুন বইগুলো তুলে নিল বহু যত্নে সম্ভ্রমের সঙ্গে।

তমস্বিনী

[illegible] দাস

[illegible] মুখরিত সমুদ্রের
আঙুলে ঝংকৃত [illegible];
[illegible] শব্দের ব্যঞ্জনায়
ঘোমটা খোলে দূরে [illegible]।

সহসা কম্পিত দিগঙ্গন—
আকাশে যেন কার পদক্ষেপ ;
মুগ্ধ আশ্বিনে স্বয়ম্বরা
সূর্যমুখী তাই ঊর্ধ্বগ্রীব।

বিদেহী প্রার্থনা ঊর্ধ্বগ্রীব—
স্তব্ধ শয্যায় অহল্যার
তবুও কেন ম্লান পাষাণরূপ
বৃষ্টিশেষ এই প্রত্যুষেও?

এখন প্রোজ্জ্বল প্রত্যূষের
বাতাসে শান্তির স্বস্ত্যয়ন.;
জানলা খুলে দাও, তমস্বিনী,
রুদ্ধ শার্সি যে আরক্তিম!

ঝরেছে বৈশাখে আরক্তিম
গোলাপ, কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া ;
নিহত স্বপ্নের যন্ত্রণায়
বৃন্তে সম্বল অন্ধকার।

ছিন্ন তবু এই অন্ধকার—
আকাশে সূর্যের তীক্ষ্ণনখ ;
শয্যা ছেড়ে এসো, তমস্বিনী,
শুভ্র ভোরে হোক মুক্তিস্নান॥

বঙ্গোপসাগর যেখানে কূলহারা ভারত মহাসাগরের বুকে মিশেছে তারই কাছাকাছি নারকেলকুঞ্জ ঘেরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্য ও অজানা রহস্যের আবরণ গায়ে দিয়ে। চারিদিকে ঘন নীল জলরাশি ঘেরা এই হরিৎ শোভাময় দ্বীপের দুর্নিবার আকর্ষণ হাতছানি দেয় সুদূর সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের।

নিকোবরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় সৈকতে বসে শোনা যায় নিকোবরীর জীবনের কত কথা—কত কাহিনী; তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের বিশাল বক্ষে গুমরে ফেরে সে কথা। নিকোবরীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনের ইতিহাস রচিত হয় এই সমুদ্রকে ঘিরেই। সমুদ্র-সন্তান নিকোবরীর জীবনে সমুদ্রের প্রভাব তাই অত্যন্ত প্রবল। সমুদ্রের মতই তাদের চরিত্রে উদ্দামতা, ভয় কাকে বলে জানে না তারা। জন্ম হয় তাদের সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত 'প্রসূতি আগারে'। শৈশবকাল থেকে সমুদ্রের জলে খেলা ক'রে বড় হয় নিকোবরী শিশুরা। আবার যৌবনে নিকোবরী যুবক-যুবতীদের প্রেমলীলার সাক্ষীও এই বিশাল জলধি। সমুদ্রের ধারেই এদের 'পাব্লিক হল', যা কিছু আনন্দ অনুষ্ঠান সবই এই পাব্লিক হলে অনুষ্ঠিত হয়। আবার জীবনাবসানে সমুদ্রের ধারেই সমাধি দেওয়া হয় নিকোবরীদের।

কর্ম-কোলাহলময় আধুনিক জগৎ থেকে অনেক দূরে—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যেন একটি সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। উত্তরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মাত্র দেড়শ' মাইল দূরে এবং সুমাত্রা থেকে এর দূরত্ব ৯১ মাইল। কিন্তু সমাজ, জাতি, ভাষা, প্রকৃতি—সব দিক থেকেই এই দ্বীপপুঞ্জ একেবারে আলাদা।

কুড়িটি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ। ১০° ডিগ্রী চ্যানেল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে গিয়ে যেন পাশাপাশি এই দুই দ্বীপপুঞ্জকে পৃথক ক'রে দিয়েছে সব রকমেই। নিকোবর আন্দামানের মত পাহাড়ে-ভূমি নয়। এটা ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জগুলির মতই প্রবাল দ্বীপ। এর প্রায় সবটাই সমতল ভূমি। আন্দামানের মত এখানে গম্ভীর অরণ্য নেই। কোন অদৃশ্য কারিগরের নিপুণ হস্তে প্রোথিত এখানকার অজস্র নারিকেল গাছই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু এর মনোরম শোভার জন্যই নয়, এই সুস্বাদু ফল একাধারে খাদ্য ও পানীয়রূপে অতিথির তৃপ্তিসাধনও করে।

কার নিকোবর, চাউরা, টেরেসা, নানকৌড়ি, কন্ডুল, গ্রেট নিকোবর ইত্যাদি কুড়িটি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ। নিকোবরীরা আন্দামানের আদিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চীনা ও মালয়ীদের প্রভাব এদের মধ্যে খুব বেশী। নিকোবরীদের ধারণা তাদের পূর্ব পুরুষ কুকুর ছিল। তামাটে গায়ের রঙ, শক্ত সুগঠিত দেহ, উচ্চতায় মাঝারি হয় এরা। সদা হাস্যমুখ নিকোবরীদের স্বাস্থ্যই দেহের রূপ লাবণ্য।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিকোবরীদের জীবন যেমন সমুদ্রকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয় তেমনি নৌকোও (Canoe) নিকোবরী জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রচণ্ড ঢেউ-এর দোলায়—ছোট্ট ছোট্ট ডিঙ্গী নিয়ে এরা সমুদ্রের বুকে এগিয়ে যায় নির্ভয়ে। এই ডিঙ্গীতে চড়ে দূরন্তর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে তারা মাছ ও নানা সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করতে। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়া, সামুদ্রিক খোল সংগ্রহ এ সবই এই নিজেদের তৈরী অতি সাধারণ ডিঙ্গী নৌকোতে চ'ড়েই এরা করে। এই আশ্চর্য জলযান এরা নিজেরাই তৈরী করে—প্রয়োজন হয় না কোন ইঞ্জিনীয়ার বা কোন বিশেষজ্ঞের। একটা গাছের কাণ্ড খুঁড়ে তৈরী করে এই নৌকো এবং জলের উপর এর ভারসাম্য রক্ষার জন্য লম্বা একখণ্ড কাঠ ভেলার মত এর পাশে ভাসতে থাকে—

নিকোবরীদের গ্রাম সুন্দর ক'রে সাজানো। এক-একটি দ্বীপে কয়েকটি ক'রে গ্রাম রয়েছে। প্রতিটি গ্রাম সমুদ্রের ধার থেকে সরু ক'রে দ্বীপের কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে। গ্রামগুলো কেন্দ্র থেকে ক্রমশঃ পরিসরে বেড়ে বালুকাবেলায় এসে সুপ্রশস্ত হয়েছে। তাই অনেকটা ত্রিভুজের মত দেখায়। প্রত্যেকটি গ্রামকে মোটামুটি কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলকে এরা ব'লে এল পানাম। এখানে এদের প্রসূতিগৃহ, 'পাব্লিক হল' ও সমাধি-স্থান থাকে। এর পরেই সুরু হ'ল এদের গ্রামের বসতি অঞ্চল। এই অঞ্চলে ওদের বাসগৃহ এবং ওরা বলে তুহেত অঞ্চল। নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় কুঁড়েঘরগুলোই এদের আবাসস্থল। তারপর আরম্ভ হ'ল এদের বাগিচা অঞ্চল—এদের ভাষায় যার নাম 'তুলং'। এই এলাকায় প্রধানতঃ নারকেল, সুপারি গাছ জন্মায়। এছাড়া প্যাণ্ডানাস (কেয়া জাতীয় গাছ), সুপারি জাতীয় অন্যান্য গাছও আছে। এর পরেই ডাভাত অঞ্চল অর্থাৎ জঙ্গল। এখানে সাধারণতঃ কচু, মেটে আলু, কলা, প্যাণ্ডানাস, পেঁপে প্রভৃতির চাষ হয়। এছাড়া বাঁশ, বেত এবং বড় বড় গাছও হয় এই 'ডাভাত' অঞ্চলে। গ্রামের বাসগৃহ ছাড়াও এই সব গাছপালা ও শূকর পালনের জন্য বাগিচা এবং জঙ্গলেও এদের ঘর থাকে। এখানে পরিবারের কেউ কেউ এসে থাকে—এই সব দেখা শোনা করবার জন্য। এদেশের শূকররা কিন্তু বেশ ভোজনবিলাসী—নারকেল এদের প্রিয় খাদ্য। নারকেলগুলো শক্ত খোলার ভেতর থেকে বের ক'রে বেশ পরিপাটি করে এরা খেতে দেয় শূকরকে। ঝুড়ি বোঝাই ক'রে নিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে সংকেত করতেই শূকররা বুঝতে পারে এবং দলে দলে এসে নারকেল খেয়ে যায়।

কোন রকম শস্যের চাষ জানে না নিকোবরীরা। এখানকার মাটি চাষের উপযুক্তও নয়। তবে কোদাল জাতীয় অস্ত্র দিয়ে এরা মাটি খুঁড়ে কলা, কচু, প্যাণ্ডানাস, বেগুন, আখ ইত্যাদি বোনে। agriculture না জানলেও horticulture জানে তারা।

নিকোবরীদের আদি পোষাক নারকেল

শূকরকে নারকেল খাওয়ানো

শূকরের জন্য নারিকেল বহনে রত নিকোবরী

পাতার তৈরী কোমড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঘাগরার মত থাকে এরা বলে "নঙ"। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নগ্ন।

তবে আজকাল অনেকেই কাপড়-চোপড় ব্যবহার করতে শিখেছে। মেয়েরা সাধারণতঃ ব্লাউজ আর লুঙ্গি আর ছেলেরা পরে সার্ট, প্যান্ট।

নিকোবরীদের ঘরগুলো দেখতে ঠিক যেন এক একটি মৌচাক। উঁচু কাঠের মাচার উপর এরা বাড়ী তৈরী করে। বাড়ী বলতে বুঝায় প্রকাণ্ড একখানা ঘর। এই একটি ঘরের মধ্যেই পরিবারের সকলে রাত্রে একত্র শোয়। জানালা, দরজার বালাই নেই বললেই চলে। শণের ছাউনি দেওয়া গোল চাল। মাথার ওপরে।

ভারী সহজ সরল জীবনযাত্রা এই নিকোবরীদের। এদের মুখ্য খাদ্য প্যান্ডানাস ফল (কেয়া জাতীয়)। এই ফল এরা খুব ভালবাসে। এই ফলগুলো অনেকটা কাঁঠালের মত। এর কোয়াগুলো ঘসে ঘসে রস বের করে জ্বাল দিয়ে তৈরী করে এই প্রিয় খাদ্য। শুয়োরের মাংস যদি হল তবে তো মস্ত বড় ভোজই হয়ে গেল। আর রয়েছে অফুরন্ত নারকেল। ক্ষুৎপিপাসা কাতর নিকোবরীর সামনে প্রকৃতি স্বহস্তে সাজিয়ে রেখেছে অমৃতভাণ্ড। জীবন এদের অন্ন-বস্ত্র সমস্যাজর্জরিত নয়। তবে আজকাল সে কথা বললে সত্যি বলা হবে না। কারণ বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে এরা অনেকেই আজকাল অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে এবং আধুনিক জগতের নানা জটিলতাও ক্রমে প্রবেশ করছে এদের সহজ আনন্দময় জীবনে। উৎসব নাচ আর গান লেগেই আছে নিকোবরীদের জীবনে। উপকূলবর্তী সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা ও গুঞ্জনধ্বনি তাদের পায়ে দিয়েছে নৃত্যের ছন্দ ও মনে তুলেছে সুরের ঝংকার। নাচ বলতে নৃত্যকলার কিছু আশা করলে হতাশই হতে হবে—সংগীতও কিছু উঁচু দরের নয় কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ বলেই এর মূল্য অনেকখানি।

নিকোবরীদের রান্নার প্রণালী কিন্তু লক্ষ্য করবার মত। হাঁড়ির ভেতরে প্রথমে খানিকটা জল দিয়ে তার একটু উপরে বাঁশের কাঠি সাজিয়ে দেয় এমন করে যাতে ক'রে তার উপরে খাদ্যদ্রব্যটি রাখা যায়। তারপর আগুনের উপর হাঁড়িটি চড়িয়ে দেয়। হাঁড়ির জল গরম হ'লে তারই গরম বাষ্পে সুসিদ্ধ হয়ে যায় খাদ্যদ্রব্যটি। এই রান্না শুধু স্বাস্থ্যসম্মতই নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

এই উৎসবপ্রিয় জাতির সবচেয়ে বড় দুটি উৎসব হচ্ছে 'কা-না-হাউন' এবং 'ক্যানো-রেস' বা নৌকা বাইচ। ক্যানো (Canoe) নিকোবরীদের বড় আদরের জিনিষ। ক্যানোকে নিয়ে এরা যে কত অজস্র গান রচনা করে তার ইয়ত্তা নেই। নৌকা বাইচ এদের খুব বড় উৎসব। বাইচ করতে হলে প্রথমে এক গ্রামের অধিবাসীরা প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক এমনি অন্য একটি গ্রামকে আমন্ত্রণ জানায়। ক্যানোকে অবলম্বন করে নতুন গান রচনা করে উপহার দিয়ে আসে তাদের এবং সেই গান তাদের শিখিয়ে দিয়ে আসে যাতে করে প্রতিযোগিতার দিন উভয় দলের সকলে মিলে গানটি গাইতে পারে। ঠিক তেমনি আমন্ত্রিত গ্রামও ক্যানোর গান তৈরী ক'রে শিখিয়ে দিয়ে যায় অপর পক্ষকে। এমনি করে সংগীত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একপক্ষ নিমন্ত্রণ করে এবং অপর পক্ষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার দিন ঠিক হলে নির্ধারিত দিনে প্রতিযোগীদল সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হলে প্রথমেই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে মল্ল-যুদ্ধ হয় এবং সমুদ্রতীরের পরিক্রমা হলে তার সংগে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান ইত্যাদি হয়। তারপর সুরু হয় নৌকা বাইচ। যে গ্রাম জয়লাভ করে সেই গ্রামে গিয়ে আবার খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান করে জয়ী ও বিজিত দল একসংগে মিলিত হয়ে।

এদের আর একটি মস্ত বড় উৎসব কানা-হাউন। আগেই বলেছি মৃতকে এরা কবর দেয় সমুদ্র তীরবর্তী সমাধি স্থানে। বছরখানেক পরে যখন এরা মনে করে যে মৃতদেহ পুরোপুরি কঙ্কালে পরিণত হয়েছে তখন সেই রকম কয়েকটি কবর খুঁড়ে কঙ্কালগুলো তুলে জংগলে বা সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামের লোক সব একসংগে হয়ে নাচ-গান, পান, ভোজন ইত্যাদি করে সমুদ্র তীরের পার্শ্বে হলে। এই উৎসবটি বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান গোছের। প্রতি বছর এমনি করে পুরাতনেরা নতুনের জন্য কবরখানা থেকে উঠে জায়গা ক'রে দিয়ে যায়—তার ফলে কবরখানায় স্থানাভাব হয় না কখনো এদের।

নিকোবরীদের আদি ধর্ম Spirit-এর পুজো করা। এদের বিশ্বাস 'সিয়া' নামক অপদেবতা সব দুঃখ কষ্টের মূল। ওঝারা এদের তাড়াতে পারে। চাউরা দ্বীপের অধিবাসীদের এই Spirit-কে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রয়েছে বলে এরা বিশ্বাস করে, তাই তারা এদের পুরোহিতের মর্যাদা দেয়।

বছরে একবার কার নিকোবর থেকে দল বেঁধে নিকোবরীরা চাউরায় যায় ব্যবসায়ের জন্য। মাটির পাত্র, বেতের ঝুড়ি, চাটাই ও Canoe আনতে যায় এরা এই দ্বীপে। বিনিময় প্রথায় এদের ব্যবসা চলে। চাউরাতে খাবার জিনিষের অভাব, তাই নিকোবরীরা সাধারণতঃ শূকর ও নানা রকম খাওয়ার জিনিষের বিনিময়ে ক্যানো, মাটির পাত্র ইত্যাদি নিয়ে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও এই দ্বীপে যাওয়াটা ওদের কাছে যেন কোন ধর্মস্থানে তীর্থ করতে যাওয়া। বিশেষ করে নিকোবরী ছেলে যখন জীবনে প্রথম চাউরাতে যায় তখন তার কাছে এটা একটা অতি পবিত্র কাজ। কলাপাতার তৈরী নেকলেস গলায় পরে হাতে-পায়ে রূপোর রিং পরে বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে রওনা হয় চাউরার উদ্দেশে।

চাউরা থেকে Canoe নিয়ে আসে এবং এই ক্যানোকে কি রকমভাবে যত্নে রাখতে হবে সে বিষয়েও তাদের উপদেশ মতই চলে। ক্যানো নিকোবরীদের কাছে প্রাণহীন জড় পদার্থ নয়। ঝড় জলে অশান্ত সমুদ্র বক্ষে—তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু এই ক্যানো। তারা বিশ্বাস করে—এই ক্যানোরও Spirit আছে এবং তাকে খুসী রাখার জন্য নিকোবরীরা রীতিমত অনুষ্ঠান সহকারে এর পুজো করে। চাউরাবাসীদের নির্দেশমত প্রতি শুক্লপক্ষে একাদশী, দ্বাদশী বা মাঘীর দিন তারা ক্যানোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে—তার সামনে কচি ডাবের মুখ কেটে তাতে বসিয়ে দেয় কোন একটি বিশেষ গাছের পাতা ঠিক যেন আমাদের আম্রপল্লব শোভিত মংগলঘট।

অরন্য নগর

প্রজাতী দত্ত

স্বপ্ন নয়, আমি তো দেখেছি
এক নতুন জীবন,
অরণ্যের অন্ধকার ঝাঁকেনিতো
পৃথিবী আমার
ধান কাটা ফাঁকা মাঠে আজ শুধু
বিষন্ন আকাশ ঃ
কুহেলী সন্ধ্যার তীরে মন তবু
করে হাহাকার।
এক গ্রাম, মনে পড়ে
ফেলে আসা আমার সমাজ,
উজ্জ্বল আনন্দ শয্যা
কলহের প্রীতি, কোলাহল
ঐশ্বর্য কামনা মিথ্যে
ছিল তবু কিছু পরিচয় ঃ
ভাসমান পাখীদের
পাখা শুধু করে টলমল।
জোনাকীরা আলো জ্বালে ফড়িঙেরা
শুধুই লাফায়,
হাত পেতে বসে আছি কোথা আজ
সেই কলরব—
অরণ্যের গাছ কাটি মাটি ফেলি
গড়ি এ নগর ঃ
জানি তো আসিবে নেতা আবার করিব
তার স্তব।
দণ্ডক অরণ্য নয়—আজ গড়ি
নতুন নগর,
পৃথিবী সবুজ হোক—আমার এ
বুভুক্ষু মরণে—
আবার আসিবে জানি আসিবে তো
বাণিজ্য বহর
স্বাক্ষর রবে না কোন জানি আমি
অতীত স্মরণে।

তারপর নিজেদের প্রিয় খাদ্য সব সাজিয়ে দেয় ক্যানোর সামনে। ক্যানোকে অবলম্বন ক'রে রচিত গান ও নাচ চলে তারপর সকলে মিলে।

পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি 'কিনেম' হয়—নিকোবরীদের প্রত্যেক গ্রামে এমনই কয়েকটি করে কিনেম আছে। একটি কিনেমের অন্তর্ভুক্ত সকলেই পরস্পরের কোন না কোন আত্মীয়। এই কিনেমই জমি, নারকেল বাগিচা, জংগল প্রভৃতির মালিক। ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা এখানে কেউ জানে না। যা কিছু সব কিনেমের সকলে ভাগ করে নেয়। আগে আগে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষ যেমন বাসন, চামচ ইত্যাদিও ব্যবহারকারীর মৃত্যুর সংগে সংগে নষ্ট করে ফেলা হত। সত্যিকার সাম্যবাদ যদি কোথাও থাকে তবে তা এই কার নিকোবরেই। তবে এই সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু শুধুমাত্র কার নিকোবরেই প্রচলিত। অন্যান্য দ্বীপে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে।

প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে এবং তার মোড়ল রয়েছে। কোন কোন গ্রামে মোড়লকে সাহায্য করবার জন্য দুইজন সহকারীও থাকে। নিকোবরী ভাষায় এর নাম 'মা পানাম', তবে নিকোবরে কিন্তু 'ক্যাপ্টেন' নামটাই

(শেষাংশ ৩০৪ পৃষ্ঠায়)

শিকার

শ্রীমতী সুষমা দেবী

হীরেন, অলক ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে মিলি শিকারে বেরিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই ওর শিকারের খুব শখ। বাবার কাছ থেকেই এটা সে পেয়েছে। মিস্টার নিয়োগী বয়সকালে দুর্দান্ত শিকারী ছিলেন, অনেক সময়ে মাচান বা হাতিতে না উঠে মাটিতে দাঁড়িয়েই বড়ো বড়ো জানোয়ার মেরেছেন। মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন, তাই মিলিও আজ ভালো শিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কদিন হল নয়াগ্রামের ডাকবাংলোয় এসে মিলিরা উঠেছে। তার বাবা কনজারভেটর অফ ফরেস্টস্, এখানের জঙ্গল দেখতে এসেছেন। আজ মিলিদের সঙ্গে শিকারে আসবার তাঁরও খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজে আটকে পড়ায় আসতে পারেন নি। হীরেন, অলক, সিতাংশু সবাই সরকারের অফিসার মেদিনীপুর শহরেই থাকে। শিকারের খবর পেয়ে সকলে মিস্টার নিয়োগীর ওখানে এসে উঠেছে। মিলি তাদের কাউকে চিনত না, মাত্র আগের দিনই তাদের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে।

সকাল সকাল ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে দুখানা জীপ নিয়ে তারা এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে সুবর্ণরেখার ধারে এসে থামল। তখন প্রায় দুপুর, চারদিক রোদের ভাপ আসছে। জীপ থেকে নেমে ওরা যে যার বন্দুক বা রাইফেল কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর এগিয়ে চলল। সঙ্গে দুজন চাকর টিফিন ক্যারিয়ার ও খাবার জলের জায়গা নিয়ে চলেছে। একটু যাবার পরই জঙ্গল গভীর হয়ে এল, বড়ো বড়ো শাল গাছে জায়গাটা ভর্তি, নীচেও আগাছার জঙ্গল, পথ চলাই মুস্কিল। সাবধানে পা ফেলে মিলিরা এগোতে লাগল। হীরেন সান্যাল পথ দেখিয়ে সকলের আগে যাচ্ছে। সে নাকি আরও দু একবার এখানে শিকারের সন্ধানে এসেছিল যদিও তার ভাগ্যে কোন কিছুই জোটে নি।

মিলির পরনে ব্রিচেস ও ভারি বুট কাঁধে ম্যাগাজিন রাইফেল, মাথায় শোলার টুপী চোখে কাল চশমা। ওকে মেয়ে বলে মনেই হচ্ছে না। অলক ঘোষ এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে পা ফেলে আঁতকে উঠছে, আর থেকে থেকে মিলির দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে দেখছে। শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ পেয়ে খরগোশগুলো প্রাণভয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটো-ছুটি করছে।

আরও খানিকদূর যাবার পর একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে মিলিরা সেখানে দাঁড়াল। চাকর-দের দিকে চেয়ে হীরেন জিজ্ঞাসা করল, "নকুল, জঙ্গল ঠ্যাঙগাবার লোকজন সব কোথায় গেল? কই, কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না? আজ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত তাদের যে যার গাঁ থেকে বেরোবার কথা? শেষকালে সব তোড়জোড় পণ্ড করবে না কি?"

"না হুজুর, চিন্তা করবেন নাই। হুই যে হোথা দেখা যেছে? মাচানও দেখি বাঁধা করাইয়া রাখছে।"

মিলি ব্যস্ত হয়ে বলল, "চলুন, চলুন, তাড়াতাড়ি গিয়ে মাচানে উঠে পড়া যাক। বীটারগুলো হাঁড়িয়া খেয়ে যে রকম মাদল বাজানো শুরু করেছে, কখন কোন্ দিক থেকে গেম বেরিয়ে পড়ে ঠিক নেই, তখন আর রাইফেল তোলবার সময় মিলবে না। কি বলেন, মিস্টার ঘোষ?"

সেখানে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে অলক মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হচ্ছিল, বীটারদের মাদলের শব্দে বুকের ভিতরটা তার গুরগুর করে উঠছিল। সে বলল, "আর একটু পরেই বেলা পড়ে যাবে। আজকে আর না এগিয়ে ডাকবাংলোয় ফিরলে কি ভালো হত না? অন্য দিন না হয় আরও সকাল সকাল রওনা হয়ে আসা যেত। আপনারা ত আরও দুদিন আছেন?"

"বলেন কী আপনি? সমস্ত বন্দোবস্ত করে এতদূর এসে ফিরে যাব? এখনও যে আড়াইটে বাজে নি? আপনার বুঝি ভয় করছে? তা হলে এলেন কেন? এই ত কাল আমার কাছে গল্প করলেন, কত শিকারে গেছেন, এমন কি ম্যান-ঈটার মেরেছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এ পথে আজই আপনি প্রথম পা বাড়িয়েছেন।"

"না, না, ভয় পাব কেন, মিস নিয়োগী? ভয় পাবার লোক আমি নই। আপনারই কষ্ট হবে ভেবে ও-কথা বলেছিলাম।"

সকলে পা বাড়িয়ে মাচানগুলির দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে হীরেন মিলিকে বলল, "আমি কিন্তু আপনাকে মাচানে একলা বসতে দোব না, আমার মাচানে আপনি আমি দুজনে থাকব। মিস্টার ঘোষ বরং সিতাংশুর সঙ্গে বসুন। ভগবান না করুন যদি একটা বিপদ হয় তখন আমি মিস্টার নিয়োগীকে গিয়ে কি বলব? আমিই উৎসাহ দেখিয়ে আজকের এই শিকারের বন্দোবস্ত করেছি। আমাকে বিশ্বাস করেই তিনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন।"

"আমার নিজের ওপর বাবার বিশ্বাস না থাকলে কি তিনি আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠাতেন? এ বিষয়ে আপনার অযথা চিন্তা করবার কারণ নেই। আপনি বরং মিস্টার ঘোষের সঙ্গে মাচানে বসুন গে।"

মোটা গুঁড়িওয়ালা তিনটে গাছের উপর দড়ির খাটিয়া দিয়ে মাচান তৈরী করা হয়েছে। মাচানের চার পাশ সবুজ লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, যাতে দূর থেকে দেখলে গাছ বলেই মনে হয়। মিলি দড়ির মই বেয়ে সামনের মাচানে উঠে বসল। সেখান থেকে সে অলককে বলল, "মিস্টার ঘোষ আপনি মিস্টার সান্যালের সঙ্গে এক মাচানে বসুন। আমি এখানে একলাই থাকব।"

হীরেন ক্ষুণ্ণস্বরে অনুযোগ করল, "এটা কি ঠিক হবে মিস নিয়োগী? উনি অতবড় শিকারী, আমার সঙ্গে এক মাচানে বসতে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন। উনি বরং ঐ শেষেরটাতে উঠে বসুন।"

অলক বিনা বাক্যব্যয়ে মিলির মাচানে উঠে তার পাশে গিয়ে বসল। "আমি এখানেই বসলাম, বুঝলেন মিস্টার সান্যাল? আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, যে কোনও একটা মাচানে উঠে পড়ুন গে।" মিলির দিকে ফিরে সে বলল, "আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস নিয়োগী। এখানে বসলে আপনার কম্প্যানি পাব, তা ছাড়া আমার সাহসও অনেক বাড়বে।"

আই-এ-এস অফিসারের ধরণ দেখে হীরেন অবাক হয়ে গেল। মাত্র অল্পদিন হল ভদ্রলোক মেদিনীপুরে এসেছেন। হীরেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সেজন্য ভালো করে ওঁর সঙ্গে মিশতেও পারে নি। যতটুকু মিশেছে, তাতে ভদ্রলোকের মুখে কেবলই রাজা উজির মারার গল্প শুনে তাঁর সম্বন্ধে সে রকম ভালো ধারণা তার হয় নি।

মাচানের উপর দাঁড়িয়ে পাশের মাচানে হীরেনকে দেখে মিলি বলল, "মিস্টার সান্যাল, আজ আর আমার ভাবনা নেই, বড়ো শিকারী আমার পাশে বসে। শুধু হাতে আর ডাক-বাংলোয় ফিরছি না, নিদেন পক্ষে একটা হায়েনাও মেরে নিয়ে যাব। আর দেরী নয়, ঐ শুনুন পটকার আওয়াজ হচ্ছে। বীটাররা এগিয়ে আসছে।"

মাচানের সামনের পাতার বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে বাইনকুলার দিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে মিলি চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, "এখন যদি সেই লেপার্ডটা আমাদের মাচানের সামনে দিয়ে যায়, তাহলে বুঝি বাছাধনকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। দুজনের মধ্যে অন্ততঃ একজনের গুলীতে ঘায়েল হতেই হবে। কিছুদিন ধরে আশপাশের গ্রামে একটা বড়ো লেপার্ড ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করেছে, মানুষের গরু বাছুর রাখা দায় হয়েছে।"

"তা যা বলেছেন, মিস নিয়োগী। এসবে ভয় আমার কোনও কালেই ছিল না। তবে ইদানীং একটু আউট অফ প্র্যাকটিস হয়ে পড়েছি। অফিসের কাজ আর মফঃস্বলে ইন্সপেকশন করে নাইবার খাবার সময়ই পাওয়া যায় না, তা শখ করব কখন? নইলে কত যে শিকারে গেছি মনে করলেও আনন্দ হয়। জলপাইগুড়ির জঙ্গলে এই বড়ো বড়ো রয়্যাল বেঙ্গলকে এক গুলীতেই, জানেন..." বলতে বলতে মিলির মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল অলক। কথা ঘুরিয়ে সে বলল, "আপনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। এই রকম নির্ভীক মেয়েই আমাদের দেশে দরকার। যদিও আমাদের পরিচয় মাত্র দুদিনের, তবুও মনে হচ্ছে—"

বাধা দিয়ে মিলি চাপা গলায় বলল, "চুপ করুন। এই ভাবে কথা বলতে থাকলে কোনও গেম এদিকে আসবে না।"

মিনিটের পর মিনিট ওরা চোখ কান খাড়া করে স্থির হয়ে বসে রইল। হঠাৎ খানিক দূরে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কেমন একটা খসখস শব্দ হল। মিলি সম্পূর্ণ নিঃশব্দে রাইফেল উঠিয়ে নিয়ে তার সেফটি ক্যাচ খুলে দিয়ে সেই শব্দের দিকে নিশানা করে পাথরের মতো বসে রইল। অলক তার পাশে বসে গলগল করে ঘেমে উঠল, বুকের ভিতর যেন তার হাতুড়ি পড়তে লাগল। কেন তার এ দুর্মতি হল? কেন মরতে সে আসতে গেল? নিজের দো-নলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে অলক নাড়াচাড়া করতে লাগল, মিলির কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বলল, "একটা ফায়ার করে দিই? কী বলেন? দুটো ব্যারেলই লোড করা আছে।"

বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে মিলি তাকে বারণ করল, একইভাবে স্থির হয়ে সে বসে রইল। ভয়ে অলকের কান-মাথা আগুন হয়ে উঠল, গায়ের ভিতর শিরশির করতে লাগল। বন্দুকটা স্থিরভাবে না রেখে নাড়াচাড়া করতে করতে সেটা হঠাৎ তার হাত ফসকে মাচান থেকে মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুলী বেরিয়ে ভীষণ জোর আওয়াজ হল। তার কান্ড দেখে মিলি স্তম্ভিত হয়ে গেল, ইচ্ছা হল তাকেও ধাক্কা মেরে বন্দুকের মতো মাটিতে ফেলে দেয়। শব্দ হওয়ার পর মুহূর্তেই আগাছার জঙ্গল থেকে জানোয়ারের বদলে একটি মানুষের মাথা দেখা গেল। ওদের মাচানের সামনে এসে সহজভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি মিস্ সাহেব? বাঘ মারতে এসে এখনই যে মানুষ মেরে বসছিলেন?"

গোবিন্দবাবুকে দেখে মিলি বলল, "গোবিন্দবাবু, আপনার বুঝি এই কীর্তি? না হয় বড়ো শিকারীই আছেন, প্রাণের ভয়ও কি নেই? বীটাররা যে এসে পড়ল? তাদের মাদলের আর পটকার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? এ সময়ে জঙ্গলের ভেতর আপনি কি করছিলেন? ওদের নিয়ে ভোর বেলাতেই আপনার বেরোবার কথা ছিল, কখন এসে পৌঁছালেন? এসে ত আপনাদের পাত্তাই পেলাম না! যাক্, আর কথা বলার সময় নেই, তাড়াতাড়ি যে কোনও একটা মাচানে উঠে পড়ুন।"

রুমালে হাত মুছতে মুছতে পরম নির্বিকারভাবে গোবিন্দবাবু বললেন, "কি করব, বলেন মিস সাহেব? সেই কোন সকালে কুলিদের নিয়ে বেরাইছিলাম। সারাদিন খাওয়া হয় নি, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল। তাই আপনারা আসতেই সান্যাল সাহেবের বেহারাকে জিগ্যাস করলাম সঙ্গে কিছু আনছে কি না। সে বলল, আপনাদের টিফিন ঐ বড়ো শাল গাছটার তলায় রাখা আছে। সেই জেনেই খেতে গেছলাম। কিন্তু খামকা বন্দুকটা ছুঁড়লেন কেনে?"

"দেখছেন না, পড়ে গেছে? এই ভদ্রলোকের হাত ছিটকেই পড়েছে। ফায়ার কেউ করেনি, গুলী আপনা থেকেই বেরিয়ে গেছে। বন্দুকটা তুলে নিয়ে আপনি শীগগির চলে যান।"

"আচ্ছা ভয়টা দেখাইছিলেন! আমি ভাবলাম, চিতাটা বুঝি বেরাই পড়ছে। কেনে, ঘোষ সাহেব ত শুনেছিলাম পাক্কা শিকারী? ওঁয়ার হাত থেকে বন্দুক পড়ল কেমন করে?"

"কথা শুনছেন না কেন, গোবিন্দবাবু? বিপদের কথা কেউ বলতে পারে না।"

তখন গোবিন্দবাবু বন্দুকটা উঠিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে গিয়ে শেষের মাচানটাতে উঠলেন। বলিষ্ঠ বিরাট তাঁর দেহ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাথার ঘন কোঁকড়ানো চুলগুলি পর্যন্ত পিঙ্গল। যেমন দেহের বল, তেমনি মনের সাহস, ভয় কাকে বলে জানেন না। প্রায় জন্মাবধি বনে জঙ্গলে ঘুরে আর সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তিনি তাদের পরমাত্মীয়ের চেয়ে বেশী হয়ে গেছেন। 'গোবিন্দ' বলতে তারা অজ্ঞান।

মাদলের শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল, তার সঙ্গে পটকা। একটা দুটো বন-মোরগ ছুটে উড়ে গেল, তিন চারটে খরগোশও তীরবেগে ছুটে চলে গেল। ভয়ে, উত্তেজনায় অলকের হাত-পায়ের তলা ঠান্ডা হল, কাঠের পুতুলের মতো কোনও দিকে না চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে সে বসে রইল। সামনে আগাছার জঙ্গলটা জোরে নড়ে উঠল। মিলি অভ্যস্ত হাতে নিঃশব্দে সেই দিকে রাইফেল ঘুরিয়ে ট্রিগারে আঙুল ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বাঘ নয়, একসঙ্গে এক জোড়া ভালুক বেরিয়ে এল, চার পায়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে। মিলি ট্রিগার টেপবার আগেই সিতাংশুর বন্দুক গর্জন করে উঠল, কিন্তু ভালুকের গায়ে না লেগে গুলি তাদের পাশেই একটা গাছের গুঁড়িতে লাগল। ভালুক দুটো চমকে উঠে উপর দিকে চাইল, মাচানের উপর মিলিদের দেখতে পেয়ে তারা সেই দিকে ছুটে এল, মাচানের ঠিক নীচে এসে গাছ বেয়ে উপরে উঠতে গেল। মাচানের দড়ির ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করে মিলির রাইফেল থেকে দুবার ফায়ার হল। প্রচণ্ড ফোর-নট-ফাইভ কার্তুজের আঘাত পাওয়া মাত্র ভালুক দুটি সেই মুহূর্তেই নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, আর একটিবারও নড়ল চড়ল না।

দেখতে দেখতে বীটাররা এসে পড়ল, ভালুকের লোম ছিঁড়ে নেবার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। গোবিন্দবাবু এক লাফে মাচান থেকে নেমে এসে দুই ধমক দিতেই তারা নিবৃত্ত হল, তার পর মাদল বাজিয়ে তাদের নাচ শুরু হল।

ওদিকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে মিলি দেখল অলক মাচানের উপর হাত পা শক্ত করে সেই জায়গাটুকুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে। দুবার ডেকেও তার সাড়া না পেয়ে মিলি রাইফল হাতে নিয়ে সাবধানে মাচান থেকে নামল। হীরেন ও সিতাংশুও নেমে তার কাছে এল। হীরেন বলল, "কার শটে ভালুক দুটো পড়ল, আপনার, না মিস্টার ঘোষের? তিনি যখন বসেছেন, তখনই জানি তাঁর হাত থেকে কোনও গেমেরই পরিত্রাণ নেই। মার্ভেলাস্ শুটিং! দুটো শটে দুটো বড়ো বড়ো ভালুক পড়ল, একটু শব্দ পর্যন্ত করল না! তিনি গেলেন কোথায়?"

মাচানের দিকে হাত দেখিয়ে মিলি বলল, "এসব কথা পরে হবে, আগে ঐ ভদ্রলোককে নামিয়ে আনুন, মাথায় মুখে জল ছিটিয়ে দিতে বলুন। ওঁর বোধ হয় জ্ঞান নেই।"

"সে কী কথা?" হীরেন দৌড়ে গেল, তিন-চারজন সাঁওতালের সাহায্যে অলককে মাচান থেকে নামানো হল। মাথায় মুখে খানিকক্ষণ জল ঢালবার পর তার জ্ঞান ফিরে এল। ভীত চোখে চার দিকে চেয়ে সে বলল, "ভালুক দুটো কোথায় গেল? মিস নিয়োগী বেঁচে আছেন?"

"বেঁচে থাকবেন না কেন? কী হয়েছে?"

অলক তাদের সাহায্যে মাটি থেকে উঠল, সামনেই মরা ভালুক দুটোকে দেখে সে হীরেনকে জড়িয়ে ধরল। "আমায় শীগগির এখান থেকে বার করে নিয়ে যান, নইলে আবার আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব।"

"অমন করছেন কেন, মিস্টার ঘোষ? ও দুটো ত মরা ভালুক?"

"হোক গে মরা, ও সব আমার জানবার দরকার নেই।"

মিলি বলল, "বেশ ত, আপনারা ওঁকে নিয়ে ফিরে যান। আমি ভালুক দুটোকে নিয়ে অন্য জীপটায় যাচ্ছি।"

হীরেন বলল, "তা কী করে হবে, মিস নিয়োগী? জীপ ত দুটো আছে? সিতাংশু বরং ঘোষ সায়েবকে নিয়ে ফিরে যাক। তারপর আমরা যাব এখন।"

"বেশ, তাহলে তাই করুন", বলে মিলি ভালুক দুটোর কাছে এগিয়ে গেল।

(শেষাংশ ৩০৪ পৃষ্ঠায়)

সারা পৃথিবীতে এখন নগরীপূজার ধূম পড়েছে। পল্লী ভারতের পল্লীবাসীরাও উনিশশত একষট্টি সালের এই শারদীয়াতে আরও বেশি মাত্রায় নগরমুখীন হয়ে উঠেছে। আর যে দেশে পল্লী জীবন বহু আগেই নগরের গ্রাসে রাহুগ্রস্ত সে দেশের মানুষের তো কথাই নেই।

কেনো এমন হচ্ছে?

এ প্রশ্নের উত্তর আছে আমাদের আধুনিক সভ্যতার অন্তরালে লুকানো। আধুনিক সভ্যতা বললেই—"নগরী সভ্যতা" সে কথা না উল্লেখ করলেও চলে।

নগর কেন্দ্রিক একালের আধুনিক সভ্যতা মানুষের কাছে তার সর্বগ্রাসী দাবী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। পূজা দাও, ভোট দাও, ভোগ দাও। দেবতার স্থান অধিকার করেছে সর্বগ্রাসী নগরী, আর তার দাবী সকল দেব-দেবীর দাবীকে ক্রমশঃ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেবতা-দের পূজা বর্তমানেও সামান্য পাঁচ পয়সাতে হতে পারে, কিন্তু নগরীর পূজা প্রাণের শেষ রক্তবিন্দু উজাড় করে না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন নগরী বলে, "ভাগো, এ নগর থেকে।"

অথচ ভাগবার উপায় নেই, পলায়নের পথ বন্ধ। শেষ পর্যন্ত নগরীর কোনো নরকের রাজত্বে অর্থাৎ বস্তীর অন্ধকূপে কিংবা জরাজীর্ণ আট ফুট-ছ ফুট ফ্ল্যাটের গহ্বরে রাবিশ চাপা পড়ে নগরীর দেনা শোধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এমন ঘটনা একালেরই কেবল নয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন বহু কাল বহু শতাব্দী আগেও সেই সময়কার নগরী পূজার দাবীতে মানুষ রীতিমত আমিরী মানুষ শেষ পর্যন্ত নগরীর "পায়রার খোপে" প্রাণ ত্যাগ করেছে তবুও নগরী থেকে অদূরে দেশের মাটিতে পল্লীতে ফিরে যাবার সাধ আর হয়নি।

যেমন

'Diodorus tells us of a deposed Egyptian King who was reduced to living in one of these wretched tenements of Rome.'

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের প্রতিটি সহর নগরে যে হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সে হার জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধির হার নয়। দিনের পর দিন পল্লী অঞ্চলের মানুষ দলে দলে গ্রাম ছেড়ে পল্লী পথের স্নিগ্ধ ছায়ার মায়াকে বিসর্জন দিয়ে ... ধারণার অতীত; ঐরূপ কত ভয়ংকর, কত "ভস্মলোচনে" ওর সর্বদেহ সুসজ্জিত।

প্রকৃতপক্ষে জন্ম সংখ্যার হার ইদানীং কালে নগরীতে নগরীতে পূর্বাপেক্ষা কম বৈ বেশি নয়। যেখানে অর্ধেক বিবাহযোগ্য রমণী অবিবাহিত, প্রায় সমসংখ্যক কিংবা তারও কিছু বেশি পুরুষও চির-কুমার ব্রত উদযাপনকারী, সেখানে নগ-জাতকের হার বৃদ্ধি অসম্ভব। তদুপরি নগরীর পরিবার পরিকল্পনাও তুচ্ছ নয়। আধুনিক জীবনের চিন্তার প্রবাহে ও আধুনিক অর্থ-নৈতিক অবস্থা দৈনো বিবাহিত নরনারীর সন্তান সংখ্যাও সীমিত ও সর্বনিম্ন সংখ্যায় স্বল্প রাখাই নগরী পূজার অন্যতম দাবী। নগরীর বিচিত্র দাবী-দাওয়ার মতোই এই দাবীকেও অপূর্ণ রাখা একালের নাগরিকদের একরকম সাধ্যাতীত।

ভারতবর্ষের নগর পত্তনের গোড়ার কথা ইংরেজ আমল থেকে আমাদের অজানা নয়। কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ এই তিনটি নগরী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বণিক সভ্যতারই দান। এই বণিকেরা এসেছিল মানদণ্ড হাতে করে, পরে তাদের সেই মানদণ্ড রূপান্তরিত হল একদিন রাজদণ্ডরূপে। বিশ্বকবির ভাষা!

"সেদিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপণির এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী—
রাজদণ্ডরূপে।"

বঙ্গপ্রান্তের আগেই ইংরেজ বণিকের আগমন হয় মাদ্রাজের সমুদ্রতটে। কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনের ও সাম্রাজ্য ত্যাগের প্রকৃত ভূমিকা প্রস্তুত হয় বঙ্গপ্রান্তের ওই বণিকরাজের নিজের হাতেগড়া 'মোহিনীয় নগরী কলকাতাতেই।

কলকাতাকে ইংরেজরা দাবী করতো বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীরূপে। দেশীয় সাহিত্যিকরা একে আখ্যা দিলেন "শ্মশানভূমির স্বর্ণপ্রদীপ"। বোম্বাই-য়ের মারাঠী নাম "মুম্বই" যার অর্থ মোহিনী। বোম্বাই নগরীর মারাঠী ও গুজরাটি সাহিত্যিকরা এই সভ্যতার সংকট মুহূর্তে নগরীকে কি নামে ... সে জানা নেই; তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, "মুম্বই" মোহিনী ও শতভস্মলোচনে সুশোভিতা এ কালের রূপসী ভয়ংকরী মাত্র। আর মাদ্রাজ শ্যামশোভা সমারোহঘেরা এই দাক্ষিণী নগরীর ক্ষুধা-লালসা ধীরে ধীরে উগ্র আগুনে তীব্র হয়ে উঠেছে।

কোম্পানী আমল থেকে বৃটিশ আমল, তারপরও দীর্ঘদিন কলকাতা ভারতে বৃটিশ রাজত্বের রাজধানী ছিল। বৃটিশ শাসনের সর্বাত্মক দাবীতে এই নগরীর কেল্লা থেকে কেরাণীশালা পর্যন্ত সমৃদ্ধিতে ফেটে পড়ছিল সেকালে। কলকারখানা, রেলপথ—সমুদ্রপথের প্রাণকেন্দ্র দেশের নানা দিক থেকে লোককে টেনে এনেছিল সোনালী ভবিষ্যতের ইসারা হেনে রূপসী নটী কলকাতা। সামান্য তিনটি গণ্ডগ্রাম ইতিহাসের পথ চলার এক শতাব্দী কালের মধ্যে নিজেদের পুরাতন পরিচয় চির দিনের জন্য বিলুপ্ত করে দিয়ে একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম সুন্দরী রূপসী কলকাতা হয়ে মাথা তুলে যেদিন দাঁড়াল, উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে সেদিন সারা দুনিয়ার দৃষ্টি তার প্রতি না পড়ে পারেনি। কিন্তু সে সময়েও পল্লী বাংলার প্রাণশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পল্লীর নর-নারী ওই নগরীর রূপে একান্ত অসহায়ের মত আত্মবিসর্জন দিতে বর্তমানের মতন অধীর হয়ে ওঠেনি।

তবে সিপাহী বিদ্রোহের পরে দেশে বৃটিশের আইনের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে আর সেই রাজত্বের ছত্রছায়ায় দেশ বলতে ইংরেজ সৃষ্ট নগরীতে ক্রমশঃ শিল্প বাণিজ্যের যখন প্রসার হচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে তখন দেশের সাধারণ মানুষের মনের আকর্ষণ ক্রমশঃ ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে নগরীর দিকে। নগরী কেবল শিল্প সমৃদ্ধ নয়, তার বুকে কেবল কলকারখানাই বাসা বাঁধেনি, সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন এক সভ্যতা নতুন এক সংস্কৃতি। নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজ ভারতের প্রথম তিন বিশ্ব-বিদ্যালয়। কলকাতায়, বম্বে, মাদ্রাজে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে ছুটেছে শত শত ভাবী নাগরিক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পল্লীতে ফেরা প্রথম প্রথম অসম্ভব না হলেও, ক্রমে এমন এককালের আবির্ভাব হয়েছিল যে কালে আর পল্লী আগত বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত মানুষ, পল্লীমুখে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পেল না। তখন তার রুজিরোজগার তথা সংস্কৃতির গাটছড়া নগরীর শিরায় শিরায় বাঁধা পড়ে গেছে। কেবল যারা রুজি-রোজগারের টানে বাঁধা পড়লো; তাদের চেয়েও নবতম সংস্কৃতি সভ্যতার টানে যারা বন্দী হল তাদের দশা আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল অদূরভবিষ্যতে। সেই ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান বই তো নয়!

কলকাতার মতনই বোম্বাই মাদ্রাজের বিবর্তন ঘটেছে। কেবল পার্থক্য, কলকাতায় ইংরেজ আমলে যেখানে প্রায় সকল কলকারখানার একচেটিয়া মালিক ছিল বিদেশী বণিক ও শিল্পপতিগণ, বম্বেতে যেখানে কলকারখানার মালিকানা দেশী গুজরাতি মারাঠীদের হাতে বেশ কিছুটা মুষ্ঠিবদ্ধ থাকায় মুম্বই নগরীর ... মুম্বইবাসিগণ কলকাতার মতন আগোগোড়াই নিঃস্ব ও বিপর্যস্ত হয়ে যায় নেই। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে কলকারখানার প্রাদুর্ভাব এই তো সবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে আরম্ভ। তাই এ নগরীর দেনা পাওনার হিসাব-নিকাশ কষার সময় এখনও বয়ে যায়নি। বরং

তার কিছু দেরীই রয়েছে। অভিশপ্ত নগরী সভ্যতার অগ্নিশ্বাসে কলকাতা যতটা বেশি দগ্ধ হচ্ছে, বোম্বাই, মাদ্রাজ ততটা হয়ত নয়।

নগরীর অমোঘ আকর্ষণে একালের প্রায় প্রতিটি মানুষ নগরীর বুকে ভীড় করতে উদ্‌গ্রীব। দেশ থেকে যারা একবার নগরীতে এসেছে তারা আর দেশে ফিরতে রাজী হয়নি। বেশি কালের কথা নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকেই এ ঘটনা ঘটে আসছে। পৃথিবীর ওই বৃহত্তর মহাযুদ্ধের কল্যাণে বাংলাদেশে ও মাদ্রাজে যে মন্বন্তরের আবির্ভাব ঘটে তার এক প্রচণ্ড প্লাবন পল্লীর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে নগরীর রাজপথে! "ফ্যামের" জন্যই কেবল নয়, কলকারখানায় কাজের জন্য কাপড়-জামার জন্যও এমন কি শিশুর দুধের জন্যও দলে দলে মানুষ নগরে ভীড় জমাতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের বাজারে কনট্রোল, চোরা কারবার, পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদি চুম্বক আকর্ষণ নগরী সভ্যতার নবতম অবদানরূপে দেখা দেওয়ায় কত সুদূর পল্লীবাসী পর্যন্ত ছুটে আসে নগরীতে। জীবনধারণের জোর তাগিদ যাদের, জীবিকা উপহারের প্রলোভন তাদের সামনে তুলে ধরেছিল যে রূপসী নগরী; সেই কালে রাক্ষসী হয়ে দাঁড়াল—তখনও এবং এখনও এ রাক্ষসী ছদ্মবেশী, এর ছলাকলা বুঝবে এমন সাধ্য কার?

যুদ্ধের আমলে যে বস্তুটির ভীষণ প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, তার সুপরিচিত নামটি "টাকা" আর অপরিচিত নামটি "মরণ চুম্বক।" জন্ম থেকে উনিশশত উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত টাকা কোনোদিন এর আগে অপ্রতিহত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি। আগের দিনে টাকা দিলে সকল জিনিস সকল সময় পাওয়া যেত যে তেমন নয়। জিনিসের অধিকারী টাকাকে উপেক্ষা করলেও করতে পারত। কিন্তু পৃথিবীর মহত্তর যুদ্ধ থেকে অতীত অবস্থা গেলো একদম পালটে। টাকাই হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান।

অতীতে একদিন সভ্যতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে একজন খ্যাতনামা জার্মাণ ঐতিহাসিক দার্শনিক নগরী সভ্যতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন এখানে ঃ

"Gold is no longer measured against the cow, but the cow against the gold." সেই পর্যায়ে এসে পড়ল আমাদের আধুনিক নগর সভ্যতা উনিশ শত চল্লিশ সালে। তারপর যতই দিন যাচ্ছে, টাকার কদর দেখে কে? টাকাই এখন একমাত্র কাম্যবস্তু পৃথিবীতে। কারণ সর্বশক্তিমান টাকা দিয়ে এ যুগে কেনা যায় না, এমন বাঞ্ছনীয় বস্তু ভূভারতে নেই। ফলে যা ছিল মুখ্য, তাই বর্তমানে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এককালের গৌণ বস্তু স্থান নিয়েছে মুখ্যের মহাসিংহাসনে।

নগরী সভ্যতায় বর্তমানে টাকা হলে মানসম্মান থেকে বিদ্যা ও সংস্কৃতি পর্যন্ত কিনতে পারা যায়। যে যত বেশি টাকার মালিক সেই তত সম্মানী ও সংস্কৃতিবানও বটে। টাকাওয়ালারাই একাডেমি, সংস্কৃতির ব্যবস্থা করে, ছবি কেনে, সাহিত্যিকের মুরুব্বি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির পকেটে টাকা নেই সে কৃপণ। টাকার দিকে কোন্ অন্ধ আকর্ষণে ছুটে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তার সত্তাকেই হারিয়ে ফেলে আত্মা বিক্রী করতে অগ্রণী হয়। এই আত্মা বিক্রীত দলের লোক একে একে সভ্যতা সংস্কৃতি সোনালী যুগের সমাপ্তি টেনে আনছে একালে।

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের বাসিন্দাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে—বহু লোকই একদিন গ্রাম ছেড়ে এসেছিল গ্রামে ফেরার ইচ্ছা নিয়েই। কিন্তু নগরী তাদের দিনের পর দিন রক্ত মোক্ষণ করে চোখে রূপের নেশা ধরিয়ে দিয়ে তাদের এমন ক্রীতদাসে পরিণত করেছে যে, একটি দিনের জন্যও যদি গ্রামে যেতে হয় কখনো, প্রাণ যায় যায় অবস্থা। গ্রামে কি আছে? বিজলি সেখানে যদিও পৌঁছে থাকে, তার তেজ নেই, বিজলি শক্তিতে সেখানে জলের প্রবাহ নেই, ড্রাই ক্লিনিং-এর কাচা জামা কাপড় নেই, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ নেই, ট্রাম নেই, সিনেমা নেই—নেই তোষামোদলোভী উচ্ছিষ্ট দাতার দল পর্যন্ত। কেবল নেই নেই নেই। আগের দিনের জমিদার বাড়ী এখন জনশূন্য। ঠিক সেকালের মালঞ্চ দেখতে একালে যেমন। পল্লীর বাবুতলা বা চণ্ডীমণ্ডপতলায় যাত্রার আসর—সেও শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর গাজীর গীত, মনসামঙ্গল, রামায়ণ গাথা আজকাল যেন অতীতের স্মৃতিকথা।

আর মহানগরীতে কি নেই? দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা খুললেই প্রতি প্রভাতে চোখে পড়ে চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, দুর্নীতি, দলাদলি, রেষারেষি, গুপ্তহত্যা, প্রকাশ্য হত্যা, আত্মহত্যা থেকে স্বামী হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, পুত্র হত্যা প্রভৃতি স্নায়ু উত্তেজক কাণ্ডকারখানা লেগেই চলেছে। রীতি-নীতি-সংযম-স্বধর্ম-সেবা-সংকার্য—উদারতা, মানবতা, শালীনতা ইত্যাদি দিনের পর দিন পথ ছেড়ে দিচ্ছে রীতিনীতিহীন অসংযম অধর্ম-ঘৃণা - ঈর্ষা - দুষ্কৃতি - নিষ্ঠুরতা - অমানবিকতা ও কুশ্রীতাকে। আগের দিনে এসব ছিল না, এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সেদিন এ সমস্তই সমাজজীবনে হেয় বলে

ধিক্কৃত হত এবং যথেষ্ট গোপনে আত্মপ্রকাশ করত চরম লজ্জায়, আর একালের নাগরিক জীবনে এ সমস্তই ধিক্কারের বাইরে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে গর্বভরে আত্মপ্রচার করতে কুণ্ঠিত নয়। এই যে বিরাট পার্থক্য, এর পরিণামও ভীষণ। নগরীতে আরও আছে সিনেমা, চমৎকার চমৎকার রেস্তোঁরা, দেশী বিদেশী গানের নামে, নৃত্যের নামে রক্ত গরম-করা উত্তেজনা, তদুপরি রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের বাজার গরম-করা আত্মসিদ্ধি সাধনা। এক এক নগরীতে যত ইট পাথর জড় হয়েছে এ পর্যন্ত, তত প্রবঞ্চনায় ফেঁপে উঠেছে নগরী।

কেবল কী সংগীত ও নৃত্যের নামে বেলেল্লাপানা চলছে? চিত্র, ভাস্কর্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে কিছু টাকাওয়ালার মন ভজানোর কাজ হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। সেই সকল অর্থবান একালে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যাঁরা ধাতুর ওজনে ভাস্কর্যের মূল্য নিরূপণ করতে আর রং তুলি তথা ছবির "বিশেষ ইঙ্গিত" দেখে ছবি কিনতে অগ্রণী হচ্ছেন নতুন যুগের নতুন সংস্কৃতিবান হবার দুরাশায়। ফলে প্রকৃত শিল্পীদের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে।

এ যেন সেই বাজার চলতি মাল তৈরির জোয়ার এসেছে। থিয়েটারের শততম, দ্বিশততম রজনীর ক্রমাগ্রগতিতে কেউ যেন ভুল না করেন, অসাধারণ কিছু অভিনয় প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। সেই জন্যেই কী "অভিনয় বড়, না আলোকসম্পাত বড়?" নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখির বান ডেকে যায় মধ্যে মধ্যে।

"What is practised as art to-day is impotence and falsehood."

গানের কথায় ফিরে আসা যেতে পারে। একজন দেশমান্য সংগীতরসিক ও সংগীত সমালোচকের কথায়, "আধুনিক গান? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনোটাই বুঝি না। রাগ? কোনো রাগ নেই, রাগের মিশ্রণও নেই, ... কারা এদের গান শেখায়?" প্রশ্ন তুলেছেন সংগীতরসিক সংগীত সমালোচক। আধুনিক গানের প্রতিনিধিরা দাবী করেন নতুনত্ব কিছু তো চাই। নতুনকে বুঝতে পারলে সে!

এ সম্বন্ধে সমালোচক বলেন, "নতুনের কি এতই মোহ? নতুনত্ব নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু নতুনত্বের পর একটা কিছু নতুন ভাব ফোটাতে চাই। তা হচ্ছে না; এরা নতুন, অত্যন্ত নতুন এবং নতুন ছাড়া আর কিছু নয়।"

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নতুনকে বুঝতে পারেন না, এমন কথা ধোপে টেঁকে না, কাজেই এ সম্পর্কে বেশি কথা অবান্তর।

কেবল কলকাতা মহানগরীই নয়, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী এর সর্বত্রই গানের যে দুরবস্থা সে আকাশবাণীর কল্যাণে কার না জানা। যাঁরা সত্যিকারের গান ভালবাসেন তাঁরা কতদিন রেডিও খোলেন না? খোঁজ নিলে জানা যাবে—রেডিও খোলার চেয়ে, না-খোলার দিনই বেশি তাঁদের বছরে। সংগীত সম্মেলনে একালে ক'জন যথার্থ সংগীতজ্ঞ ও সংগীত সমজদার উপস্থিত থাকবেনই বা? নৃত্য প্রদর্শনী থেকে চিত্র প্রদর্শনী তথা অভিনয় থেকে সকল শিল্পকলার ক্ষেত্রেই ঐ একই অবস্থা।

যে বস্তু শিল্পের নামে বর্তমানে বহুল [illegible] বলা চলে,

"Something that will 'catch on' with a public for whom art and music and drama have long ceased to be spiritual necessities."

কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ নগরীর কথা হতে হতে নয়াদিল্লীর আবির্ভাব। ভারতের এই নব-নগরী, বাঘিনীর মতন রক্তের প্রথম স্বাদে আরও ভয়ংকরী। আজকাল এখানেই যত "নিউ রিচ"-এর সমাগম।

কলকাতার পরই নয়াদিল্লী হয় ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। এখন সে ভারত সরকারের কেবল রাজধানীই নয়, সুয়োরাণী। এখানে কোনো রাজা নেই—কারণ ভারত সরকার গণতান্ত্রিক। কিন্তু আছেন সেকালের রোমের "আদর্শ স্থানীয়" সেনেটরদের মতন এম-পি'র দলবল। তাঁদের খুসী করতে আছে অজস্র "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ" ও "ভুঁইফোড়" বুর্জোয়া সমাজ। "সামান্য কিছু করে নিতে হলে", "করে খেতে হলে", তেমন কিছু না করে বাড়ী-গাড়ী-প্রাসাদোপম হোটেলে 'আবাস' রাখতে হলে, "দেশ দেশ নন্দিত সুন্দরীদের" হাতে হাত মেলাতে হলে এম-পি'দের সহযোগিতা চাই। আর চাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধার ও অধিকর্তাদের আশীর্বাদ। রাষ্ট্র-কর্ণধারদের চারপাশে তাই কত ভীড়। অধিকর্তাদের তোয়াজকারীদের তাই কত আনাগোনা, উপহার উপঢৌকনের কতই না বাড়াবাড়ি। সেই অনুপাতে নয়াদিল্লীতে ইদানীং খুনের ছড়াছড়িও লক্ষণীয়।

নতুন এক অভিনব অভাবনীয় সংকটময় অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির দিন কাটছে একালে। নয়াদিল্লীর দিন এখন। তাই এককালের সকল কিছু ক্রিয়াকান্ডের স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতার দিন আর নেই। এখন কলকাতার অনেকেই নয়াদিল্লীর সংস্কৃতির প্রেমে পড়েছেন। যেমন পড়েছেন বোম্বাই মাদ্রাজবাসীরাও। না পড়ে উপায় নেই—একটু কিছু করে নিতে হলে নয়াদিল্লীর স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিতি প্রয়োজন।

স্বদেশে নয়াদিল্লীর যে দৃশ্য বিদেশে নানা রাজধানীর ছায়াও অনুরূপ। বৃটিশ, আমেরিকা রাশিয়া কোনো দেশেই বাদ নেই। নগরীর রূপ ওদেশেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করছে মানুষ ও তার সভ্যতা সংস্কৃতিকে।

বৃটিশের ইতিহাসে ইদানীংকার মতন সংস্কৃতি দৈন্য আর কোনো কালে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। প্রথম কেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরও অভাব এখন ইংরেজী সাহিত্যে, এজন্য বহু সুধীর মনে আক্ষেপের অন্ত নেই। আমেরিকার কথা কে না জানে, তার দেশে মিনিটের ব্যবধানে খুনের হিসাব বেরিয়েছে—অন্যান্য অপরাধের কথা না তোলাই শ্রেয়। রাশিয়াতে বিপ্লবের পর চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলেও কোনো টলস্টয় তো দূরে থাক, গোর্কির পর্যন্ত দেখা নেই। দলের মধ্যে দলাদলি, রাত্রির ব্যবধানে প্রখ্যাত নেতাদের নিরুদ্দেশ স্রোতের সমান প্রবাহ বয়ে চলেছে রুশ নগরীতে সেই অতীতের মতই। তবুও নগরীর লেলিহজিহ্বার রক্ত লোলুপতা একটুও কমবার লক্ষণ নেই।

মানুষের হাতে গড়া নগরী এখন মানুষের ভাবী শ্মশানে সুপ্রাচীন মিশর পাটলিপুত্রের মতন মাথা তুলে অট্টহাস্যের সুখ স্বপ্ন দেখছে বিলাস-বিবসনা ভয়ংকরী রূপসী!

পুরাতন রোমে একদিন নগরী রূপসী ঐ অট্টহাস্যের স্বপ্ন দেখতো—সে স্বপ্ন তার বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক-পর্বে ফরাসী দেশে প্যারী ও অন্যান্য নগরী সুন্দরীরা ওই একই স্বপ্নে মশগুল হয়েছিল। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবার সুযোগ পায়নি। সারা ফরাসী দেশের সুধী সাহিত্যিক সমাজ নগরী সভ্যতার বিষাক্ত পরিবেশে আচ্ছন্ন না হয়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টির আহ্বান ঘোষণা করেছিলেন, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সেদিন এগিয়ে এসেছিল ফরাসী দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী। তাই এতদিন বাদেও প্যারী ও অন্যান্য ফরাসী নগরী তাদের অট্টহাস্যের বিলাস স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারেনি। পরবর্তীকালে মস্কো, পেট্রোগ্রাদ (বিপ্লবোত্তর লেনিনগ্রাদ) প্রভৃতিতেও বিলাসিনী নগরীর অট্টহাস্যের সুখ স্বপ্ন রুশ সাহিত্যিকগণ ব্যর্থ করার কারণ হয়ে বিশ্বময় খ্যাতি লাভ করেছেন।

একালের নগরী সভ্যতার মহাসংকট মুহূর্তে কোথায় সেই সাহিত্যিকগণ যাঁরা নগরী সভ্যতাকে বিলাস নটীর লেলিহ গ্রাস থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নেবেন, এই সভ্যতাকে আসন্ন অপমৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নগরী জীবনের নতুন জয়গানে নতুন সভ্যতার উদ্বোধন করবেন?

সেই রাতে
কৃষ্ণা সোম

সেদিন কাঁদবে না তুমি। উঠবে কি হেসে
কপালে চন্দন এ'কে
যখন বসবো আমি চিত্রিত পিঁড়িতে
সুস্বর সানাই-সুরে, মন্ত্রপড়া রাতে।

আমিও ভুলবো সব। অপগত
গল্পের স্বাক্ষর।
শ্রাবণী রাতের মত অঝোর কান্নায়
গোপনে ভেঙো না তুমি অব্যর্থ তিথিতে।

এ-অভাব পূরণীয়। মনে করো বিবর্ণ অধ্যায়
খসে-পড়া অতীতের। সর্বনাশা কোনো
এক গ্রহ।

এখানে আমার বুকে শিহর যন্ত্রণা
এবং তোমার মনে মুক্তির নিঃশ্বাস।

কোনো ব্যথা রেখোনাকো মনে। জুড়ে দিও
আসন্ন প্রহরে নিজকে।
হেসে ওঠো ভেবে সেই পুতুলের খেলা
ফের যদি মনে আসে।
আর বলি
দিওনা বালির বাঁধ, অজান্তেই
পড়ে যাবে ধ্বসে।

গটিকয়েক বিষয় টুকে নিচ্ছিলাম নোট-বুকে : এখানকার বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতির কথা—শকথেরাপী, ড্রাগ-থেরাপী, হাইড্রোথেরাপী ইত্যাদি। ডাক্তার খাসনবীশ নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে দেখাচ্ছিলেন ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ড। প্রশস্ত একটা ঘরের সামনে এসে তিনি সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভিতরে চোখ চালিয়ে বললেন "আমাদের এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি স্বচক্ষে দেখে যান। এ অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত। বিষের এ্যান্টিডোট বিষ! 'তিনি এক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন : 'টেবিলের ওপর শোয়ান ওই যে মেয়েটিকে দেখছেন, তার ব্যবস্থা হয়েছে ইলেকট্রোকনভালশন থেরাপীর। সর্বাঙ্গে তার পাস করান হচ্ছে ইলেকট্রিক শক্। দেখলে মনে হবে অমানুষিক। কিন্তু দেখুন, রোগিণীর একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই, সে জানেই না কি হবে বা কি হয়।'

সত্যি তাই, ষোল-সতেরো বছরের শীর্ণকায় একটি মেয়েকে টেবিলের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। আর অমানুষিক উপায়েই বুঝি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ দেহের মধ্যে তার পাস করান হচ্ছে। সেই অদ্ভুত শিহরণ দেখে আমি নিজেই ঘাবড়ে গেছি। মাত্র সেকেণ্ড কয়েক বোধ হয়, তার পরেই রোগিণী সম্পূর্ণ অচেতন।

ডাক্তার খাসনবীশ আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের ঘরে এসে বসলেন চেয়ারে। বললেন : 'বলুন কেমন লাগল? কি ইম্প্রেশন নিয়ে ফিরছেন এখানকার মেণ্টাল হাসপাতালের?'

'সে তো কাগজেই দেখতে পাবেন।' আমি হেসে জবাব দিলাম।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা পাবো বই কি?' ডাক্তার খাসনবীশও হাসলেন একটু পাকা গোঁফের আড়ালে। বললেন : 'আপনারা হলেন সাংবাদিক—সংবাদপত্রের লোক, আপনারাই তো দেশের কাছে—দশের কাছে অসহায় পঙ্গু এসব মানবাত্মাদের কথা—অন্ধ, অ-চেতন এসব জ্ঞান-শিশুদের কথা তুলে ধরবেন। লিখবেন তাদের রুগ্ন অসুস্থ মনের কাহিনী।'

ডাক্তার খাসনবীশের কথা শেষ হোল না। বাইরে একটা হৈচৈ গণ্ডগোল শোনা গেল। আর একটু পরেই পর্দা ঠেলে হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। ছাব্বিশ-সাতাশ হবে বয়স। আলু-থালু বেশ। শাড়ীর আঁচলখানি লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। লম্বা ছিপ-ছিপে গড়ন। চুলগুলি কোঁকড়ান। অনেকটা বুঝি নিগ্রোবটুদের মত। ভুরুর উপরটায় কাটা একটা দাগ। কোনকালে হয়ত পড়ে গিয়ে কেটে ফেলে থাকবে। ঘা এখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু চিহ্ন মিশায়নি।

'আমায় বাঁচান ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান!' আর্ত বিনীত কণ্ঠস্বর।

ডাক্তার খাসনবীশ উঠে দাঁড়ালেন। অভ্যাসমত সাদা এ্যাপ্রোনটি গায়ে চাপিয়ে নিলেন। প্রশ্ন করলেন : 'কেন, কি হয়েছে?'

'আমি যে বিষ খেয়েছি ডাক্তারবাবু। বিষ—আফিম।'

'হ্যাঁ, আফিম খেয়েছো?' ডাক্তার খাসনবীশ ষ্টেথসকোপটি তুলে নিয়ে ছদ্ম আতঙ্কে ছুটলেন মেয়েটির দিকে। জিজ্ঞেস করলেন : 'কখন?'

চুপচাপ; নিরুত্তর মেয়েটি আপন মনে এক সময় বলে উঠল :

'সুইসাইড করলাম কিনা। ঘ্যাঁচ্—!'

'সুইসাইড?' ডাক্তার খাসনবীশ একবার পিছিয়ে এলেন।

'হ্যাঁ, ঘ্যাঁচ্ করে বিঁধিয়ে দিলাম কিনা ছোরাখানা। স্কাউণ্ড্রেল!'

'কাকে?'

আবার চুপচাপ। নিরুত্তর কিছুক্ষণ। মেয়েটি এবার সহসা চিৎকার করে উঠল ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে :

'খুন—মাগো খুন করে ফেলল! ঘ্যাঁচ্—!'

তারপর আবার চুপচাপ। দেয়াল ঘড়ির টিক্‌টিক শব্দটাই শুধু বুঝি ঘরের স্থির নীরবতাকে খানখান করে চলেছে ভেঙে। মেয়েটি হঠাৎ বলে বসল :

'তাই তো আফিম খেলাম।'

'কখন খেয়েছ?'

'এইতো—একটু আগে।' মেয়েটি জবাব দিলে সচ্ছন্দে : 'হ্যাঁ, হবে কিছুক্ষণ। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। দেখুন তো, কি মুসকিল!'

'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি ওষুধ দিচ্ছি!'

'তাই দিন, ডাক্তারবাবু। আমায় বাঁচান। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।' সত্যি, ডাক্তার খাসনবীশের পায়ে সে লুটিয়ে পড়ছিল। অধ্যক্ষ তাকে দুহাতে তুলে বসালেন ইজি-চেয়ারখানায়। মাথার বিস্রস্ত চুলগুলি এক হাতে সরিয়ে দিলেন মুখ থেকে। নাড়িটা দেখলেন হাতের। ষ্টেথসকোপটা বসালেন বুকে। না, পালসের বীট ভালই আছে। মানসিক উত্তেজনার জন্য বোধ হয় খানিকটা বেড়ে থাকবে।

তার উত্তেজনার চাপ কিছুটা হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই ডাঃ খাসনবীশ বুঝি কথা পাড়লেন। শুধালেন : 'তা মা, বিষ খেতে গেলে কেন?

'ঘ্যাঁচ্ করে বিঁধিয়ে দিলাম কিনা ছোরাখানা—স্কাউণ্ড্রেল!'

অধ্যক্ষ ডাক্তার খাসনবীশ আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন। চুপিসারে বললেন : 'লক্ষ্য করবেন কথাগুলি। ওটাই ওর অবসেশন!'

তিনি এবার মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালেন। শুধালেন : 'মানে?'

'মানে? টরে-টক্কা—! ঘ্যাঁচ করে দিলাম বিঁধিয়ে। স্কাউণ্ড্রেলটা শুরু করলে কিনা বড় বাড়াবাড়ি।'

অসংলগ্ন বকবক করে মেয়েটি তারপর যা বলে গেল, মর্মোদ্ধার করা তা একরূপ দুরূহ হয়ে উঠল। নিশ্চুপ থেকে কিছুক্ষণ মেয়েটি সহসা বলে উঠল :

'ডু ইউ নো, হাউ ওল্ড আই য়্যাম? আই য়্যাম অনলি টোয়েণ্টি সিক্স—অনলি টোয়েণ্টি-সিক্স। মরবো কেন বলুন তো?' মেয়েটি তারপর আবৃত্তির ঢঙে বলে চলল : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—মরণ রে তুঁহু মম...টরে-টক্কা—!'

আমি রুমালে মুখ ঢাকলাম। মেয়েটি

তখনও সমানে বকবক করে চলেছে : 'জানেন, আত্মহত্যা করা কি যন্ত্রণার?'

'জানি বই কি?' ডাক্তার খাসনবীশ জবাব দিলেন। মেয়েটি কিন্তু তা কানেই তুললে না, বললে :

'মরবো কেন বলুন, "মরণ রে তুঁহু" মম শ্যাম সমান?...ঘ্যাঁচ''

উঃ, সে কি কষ্ট আত্মহত্যায়?' মেয়েটি এবার দুহাতে আপন মুখ ঢাকলে। হু হু করে কেঁদে ফেলল সহসা।

প্রগলভ আর অসংলগ্ন তার চিন্তাধারার মর্মোদ্ধার করে বুঝলাম সে বলতে চাইছে : সুইসাইড করা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। তাদের পাড়ার এক বীণুদি নাকি একদা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ওরা তখন নাকি খুবই ছোট ছিল। বিধবা হয়ে বীণুদি বাপের বাড়ি এসেছিলেন। আফিমের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ইঁদারার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাঁচ!......

অধ্যক্ষ তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন : 'তুমি এখন একটু ঘুমাও তো দেখি।'

'না না, ঘুম নয়।' মেয়েটি সহসা হাঁ হাঁ করে উঠল। তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে চলল : 'ঘুম নয়। ঘুম আর মৃত্যু যে এক। তুঁহু' মম শাম সমান।—দুই সহোদর। একজন এনে দেয় ক্ষণ-বিস্মৃতি। অপরে দেয় চির-বিস্মৃতি। ঘ্যাঁচ!'

ডাক্তার খাসনবীশের দিকে এবার সে ফিরে তাকাল। প্রশ্ন করল :

'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, পৃথিবীতে ঘুম যদি না থাকত, কেমন হোত বলুন তো! কি মজার না?' হি হি করে এবার সে হেসে উঠল।—'এ দেখুন, কি পাগলের মত বকে চলেছি। মৃত্যু আছে বলেই তো ঘ্যাঁচ—!'

ডাক্তার খাসনবীশ পাশের সিস্টারের দিকে এবার তাকালেন। কিসের যেন নির্দেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন :

'ঘুমের একটা ওষুধের ব্যবস্থা করে দিলাম। নইলে কান দুটো, আপনার ঝালাপালা হয়ে উঠত এমনি ধারা কাব্য আর দর্শন চর্চা শুনতে শুনতে।

ডাক্তার খাসনবীশের কথা আমার কাণে যাচ্ছিল না। মেয়েটিকে নিয়ে নার্স চলে গেল। কিন্তু ওই মেয়েটির এই বিচিত্র আবির্ভাব আর কথাবার্তা আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি এদেরই ইতিবৃত্ত জানতে এসেছি—কিন্তু জানা যে এত মর্মান্তিক আগে উপলব্ধি করিনি।

আমার আগ্রহ দেখে এই মেয়েটিরই মর্মচ্ছেদী ইতিহাস বলে গেলেন অধ্যক্ষ ডাঃ খাসনবীশ :

মধ্যবিত্ত একটি পরিবার। কাচ্চা-বাচ্চা অনেক। মেয়েটিই বড়। বাবা ছিলেন প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। মেয়েটিকে নিজ হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মেয়েটিও ছিল মেধাবী। বাবা ছেলেদের যে শিক্ষায়তনে পড়াতেন, মেয়েটিও সেখানে পড়াশুনা করত বিশেষ অধ্যবসায়ের সংগে। ছেলেদের সংগে দিত সমান পাল্লা। সহপাঠীদের ছাড়িয়ে যেত পরীক্ষায়। কলেজ জীবনেও তাই। তারপর যথারীতি প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরিও লাভ করল ভাল একটা রেল বিভাগে। মুরুব্বীর জোর ছিল না। ছিল বুদ্ধিমত্তা আর অধ্যবসায়। অল্প দিনেই কর্মস্থলের পরপর অনেকগুলি সিঁড়ির ধাপ গেল সে ডিঙিয়ে সহকর্মীদের চোখ টাটিয়ে। প্রমোশনের পর প্রমোশন। ইনক্রিমেণ্টের পর ইনক্রিমেণ্ট! এখানেই শেষ নয়। আরও চাই লিফ্‌ট!

অপিসের 'বস্' এতদিন শুধু ছিপের সুতোই ছেড়ে চলেছিলেন। এবার গুটোতে সুরু করলেন।

মেয়েটি অবশ্য দিন কয়েক ঘাই মেরে বেড়াল। চাকরি ছাড়ার সংকল্প জানালে। কিন্তু সে সংকল্প শুধু সংকল্পই থেকে গেল। বাপ নেই, থেকেও। চোখে তিনি দেখতে পান না। অনেকগুলি ভাই-বোন। তাদের সকলের লেখা পড়া : রক্ষণা-বেক্ষণ : ভরণ-পোষণ। দায়িত্ব সব তার উপর। চাকরি আর ছাড়া হোল না।

মিস্টার সান্যালের ফাঁদেই পা দিতে হোল অবশেষে! অপিসের অধীনস্থ হতভাগিনী অনেককেই নাকি এমনি ধারা পা দিতে হয়েছে। মান-সম্ভ্রম খোয়াতে হয়েছে।

উইক-এন্ড-র প্রতিটি মধুযামিনী তাদের এর পর কাটতে লাগল স্যালুন কারে অথবা দূর কোন হোটেলে কিংবা টুরিষ্ট বাঙলোয়। মধুছন্দা দিনগুলির একদিন পড়ল ভাঁটা। 'বস' যখন চাইলে নিষ্কৃতি; ও চাইলে স্বীকৃতি। কিন্তু চাইলেই কি হয়? এমনি ধারা কতজনাই না চেয়েছে আগে আগে? কত ধানে কত চাল, তার অজানা নয়। বাড়াবাড়ি কিছু একটা করবার পূর্বেই, রাতারাতি মেয়েটাকে দিলেন তিনি ট্রান্সফার করে অন্যত্র। কিন্তু তাতেও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। মেয়েটার পেছনে লেলিয়ে দিলেন ষণ্ডা মার্কা এমনি গুটিকয়েক বেকার যুবককে যাদের চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে আসছেন তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যুবকগুলি মেয়েটির নামে শুধু স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়েই ক্ষান্ত হোল না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলে : সাহেবের নামে কেলেংকারীর কথা কিছু জানা-জানি হলে, তাকে খুন করতেও তারা ইতস্ততঃ করবে না। ভয়ে মেয়েটি মুখ বন্ধ করল। কিন্তু তার অবচেতন মনের পর্দায় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এই মহাবিভীষিকার। ঘুম আর জাগরণে সারাক্ষন অকস্মাৎ সে তখন থেকে চিৎকার করে উঠত :

'খুন—খুন—মাগো, খুন করে ফেললে, ঘ্যাঁচ্!'

কে বা কারা রাত্রির অন্ধকারে এসে ঘ্যাঁচ করে তার বুকে আমূল ছোরা বিঁধিয়ে দিয়ে গেল—মহা আতংকে তাই বুঝি সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

(শেষাংশ ৩০৪ পৃষ্ঠায়)

উত্তর কলকাতার ডাকসাইটে ধনী মনোহর দত্তর বাড়িতে বিয়ে। ফটকে নহবৎ বাজছে। বাড়ি সরগরম। চারিদিকে লোকজনের ছোটাছুটি। কাতারে কাতারে গাড়ি দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। বর এলো বলে। ঘড়িতেও আটটা বেজে গেল।

বার মহলের নাচ ঘরে গান গাইছেন কোন বাইজী। মেঝেতে কার্পেট পাতা। বাইজী গাইছেন কখন বসে, কখন দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়াম, সারেংগী, তবলা ইত্যাদি নিয়ে আরো দুচারজন বসেছেন তারই পাশে। ছেলে ছোকরাদের বসবার জায়গা ঐ কার্পেটে। কর্তারা বসেছেন কার্পেটের চারিপাশে সোফা কোচে। মাথার ওপর জ্বলছে আট ডালের ছটা বাতির ঝাড়। মাঝের ঝাড়টা ষোল ডালের। হলে টাঙগানো আছে এ বাড়ির দু তিন পুরুষের কর্তাদের তেল রঙে আঁকা বড় বড় ছবি। রাজা রাণী ও সাহেব মেমের কয়েকখানা ছবিও টাঙগানো আছে কর্তাদের ছবির সংগে।

অন্দরমহলের 'হল' ঘরেও আর এক বাইজী গান ধরেছেন। সে ঘরে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। গানের ফাঁকে ফাঁকে বাইজীর সংগে গল্প করছেন কোন কোন বাড়ির বাচাল গিন্নীরা। সব ব্যাপারে তাঁদের মাথা গলানো চাই। কচি বৌরা বসেছে শাশুড়ীদের সংগে ঘোমটা দিয়ে। শুনছে গান বা আলাপ আলোচনা।

ঃ আচ্ছা ভাই তোমার লজ্জা করে না পুরুষমানুষদের সামনে গান গাইতে?

ঃ দেখি তোমার হীরের চুড়িগুলো! বাঃ বেশ মানিয়েছে তো! ...কমল না পোলকী?

ঃ ওমা পায়ে সোনার মল পড়েছ কেন? সোনা কি পা দিয়ে ছুঁতে আছে?

ঃ কোন্ দেশে তোমার বাড়ি গো? বেশ তো বাংলা বলতে পার? তোমার বাড়িতে কে কে আছে? ইত্যাদি—

এঁদের মধ্যে অনেকেই মন দিয়ে গান শুনছেন না। পাশের মহিলার সংগে গল্পে মশগুল। পানের ডিবে থেকে অনবরত পান জরদা মুখে পুরছেন আর হাসতে হাসতে ধাক্কা দিচ্ছেন এ' ওকে। গান শোনার মনও নেই, গান বোঝেনও না। ঘরোয়া গল্পই তাঁদের ভালো লাগে।

বাইজীরাই ভালো। বেশীক্ষণ এ একটানা গাইতে হয় না। একটু গেয়ে অনেকক্ষণ গল্প করা চলে। বাইজীর গানের চেয়ে তার গল্প শোনার দিকে সকলের ঝোঁক বেশী। কেউ কেউ আবার বায়না ধরেন বাংলা গান শুনবো। বাইজী বাংলা টপ্পাও শুনিয়ে দেয়। ইংরাজি গানের ফরমাসও সময় সময় তামিল করতে হয় তাকে।

হঠাৎ রব উঠলো বর এসেছে, বর এসেছে। আয়, আয়, ওঠ, ওঠ।

হুড়মুড় করে সকলেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইজী ঘরে একলা বসে। তার পাশে কেউ নেই।

অন্দর মহলের মেয়েরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে বারবাড়ি, বারান্দার ঝিলিমিলির ধারে। উঠন ভরে গেল বরযাত্রীতে। অনেকেই আবার দুপক্ষের লোক। বরের ঘরের পিসে, কনের ঘরের মেসো।

বরকে বসানো হল ঠাকুর দালানে ভেলভেটের গদীতে। দু পাশে চীনে ভাসে ফুলের তোড়া। পদ্ম ছাপানো সিল্কের রুমাল বিলি করা হল সকলকে। দূরে কয়েকটা টেবিল ফ্যানের সামনে রাখা হয়েছে বরফের চাঁই ঠান্ডা হাওয়ার জন্যে।

নাচ ঘরের গান বাজনা আর জমলো না। হৈ চৈ-এ গানের আওয়াজ আর শোনা যায় না। বার বার ডাক আসছে—আর বসে কেন খাওয়া দাওয়া সেরে নিন। বরযাত্রীদের ছাদে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখনো অনেক সাজানো পাতা পড়ে আছে। সকলে দয়া করে উঠুন।

কর্তাদের আর বসে থাকা চলে না। নড়ে চড়ে শেষ পর্যন্ত উঠতে হলো। তাঁদের ভালো লাগে না সিঁড়ি ভেংগে সেই ছাদে ওঠা। কার কার যজ্ঞিবাড়ির খাবারের গন্ধ নাকে গেলে গা বমি করে। কার মাদুলী আছে—আমিষ গন্ধ শুঁকতে নেই। কার মিষ্টি খাওয়া বারণ, কার নোনতা খাওয়া বারণ। নানান লোকের নানান বায়নাক্কা।

শেষ পর্যন্ত জাঁদরেল দত্তমশাই সকলকেই একরকম ঠেলে ছাদে তুলে দিলেন।

ঃ খান না-খান ছাদে অন্ততঃ দাঁড়াতেও তো হবে একবার। আয়োজনের কোন ত্রুটি হল কি না তাও তো বলবেন! ......কতো দিন পরে এই আমার শেষ কাজ।

মল্লিক, ঘোষ, শীল, মিত্তির, বসাক, গাংগুলী, শেঠ, লাহা সকলেই এসেছেন, ম্যারাপ বাঁধা ছাদে। চুনীপান্না বসান হাতলওয়ালা ছড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াতে লাগলেন ছাদে। খাবার আগেই পান জর্দা বিনিময় হল বার বার নিজেদের মধ্যে। ঘরের আড্ডা ছাদে উঠে এসেছে—এইটুকু মাত্র তফাৎ।

আরে দ্যাখো দ্যাখো মল্লিক! দত্ত তো বিরাট আয়োজন করেছে! ট্রে করে গোলাপী রং-এর ওটা আবার কি দিয়ে যাচ্ছে পাতে? ... আগে তো দেখিনি ...তা বেশ বেশ। মিষ্টি দেখছি দশরকমের।

ঃ লেডিগেনি আর দরবেশটা না দিলেলেই ভালো হতো। ওগুলোতে কি আবার পাত সাজানো হয়! উল্টে পাত নোংরা দেখায়।

ঃ আটটা করে খুরি, একটা মিষ্টির ডিস আর একটা ফ্রাই-এর ডিস্। ভালোই মানিয়েছে কি বল?

ঃ লাল কেক-সন্দেশ আর সবুজ পেস্তার বরফীর মাঝে একটা হলদে রংয়ের কোন মিষ্টি থাকলে ভালো হতো। মিষ্টির ডিস্ রঙিন দেখাতো।

ঃ এতোই যখন করলেন তখন কিছু জলের ব্যবস্থা করলেন না কেন দত্ত মশাই!

হঠাৎ দত্ত মশাই কোথা থেকে ছুটে এসে বললেন, এখনো আপনারা গল্প করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? দয়া করে কিছু মুখে দিন, নইলে যে দুঃখ পাব।

ঃ মুখে কিছু না দিয়ে আমরা কেউই নড়ছি নে। তুমি কেন মিথ্যে এদিকে এলে ভায়া? আমরা তোমার পর না কি? ... সব ব্যবস্থা নিজেরা করে নোব, ...তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

দত্ত মশাই আশ্বস্ত হলেন না। তবুও তাঁকে সরে যেতে হল সেখান থেকে। আরো পাঁচ দিকে তাঁকেই তো খেয়াল রাখতে হবে। তিনি যে কনের বাপ। যত ঝক্কি তাঁরই ঘাড়ে।

খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। পাঁচ শ লোকের আয়োজন উঁচু ছাদে। নীচু ছাদে ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ছোট ছাদ নিরামিষভোজীদের জন্য। পরিবেশন করছে তিন 'সেট' লোক।

একটির পর একটি খাদ্য এনে পরিবেশন করা হয় না। সব কিছু খাদ্য আগে থাকতে পাতে দিয়ে তারপর সকলকে খেতে ডাকাই প্রথা। চাটনী, দৈ, মিষ্টি, রাবড়ি ইত্যাদি সব কিছুই আগে থাকতে দেওয়া হয়ে গেছে। লুচি পোলাও গরম গরম দেওয়া হল খেতে বসার সংগে সংগে।

বিশিষ্ট প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অতিথিরা এখনো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ছাদে। দত্ত মশাই বার বার খেতে বসতে অনুরোধ করলে তাঁরা বলেন,—আমাদের জন্যে কেন ভাবছো, আমরা ঠিক আছি, ওদিকটায় বরং তুমি দেখাশুনো করো। আমরা কি তোমার পর? —যে বার বার সাধবে?

শেষ পর্যন্ত এঁরা কেউই পংক্তিতে বসলেন না। বেশ-বেশ-খুব ভালো—চমৎকার আয়োজন হয়েছে—ইত্যাদি মন্তব্য করতে করতে নীচে নামবার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছাদের দরজা বন্ধ। দত্ত মশাই দাঁড়িয়ে আছেন দশ পনেরো জন হিন্দুস্থানী লেঠেল নিয়ে। না খেয়ে কেউ নীচে নামতে পাবে না, তা সে যেইই হোক। কড়া হুকুম—আগে খেতে হবে তারপর নীচে নামার অনুমতি। এতো কষ্ট করে যে আয়োজন করা হল তা কি বাঃ বাঃ, বেশ বেশ শোনবার জন্যে? —মুখ চালাও নয়তো মাথায় লাঠি পড়বে। দত্ত মশাই বড্ড গোঁয়াড়। একবার হাঁ বললে না করার উপায় নেই।

হীরের আংটি পরে চুনী পান্নার ছড়ি দোলান বন্ধ হয়ে গেল। মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হল পরস্পরের। এমন ব্যবস্থা তো কেউ করেনি আগে। পাত সাজানো দেখে বাঃ বাঃ বেশ বেশ বলে নীচে নেমে যাওয়া এই তো নিয়ম!

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল বুড়োদের মধ্যে।

ঃ এ কী ভদ্রতা! এ কী গোয়াতুর্মী! কখনো

খেয়েছি কোথাও, যে আজকে খেতে হবে। মগের মল্লুক পেয়েছে না কী?

ঃ আমাদের বয়সী লোক পংক্তিতে খেতে বসলে লোকে বলবে কি? খাওয়ার বয়েস থাকলে খেতাম। যে বয়সে যা মানায়।

ঃ আদেগুলো খোলাচাটা নই তো যে বললেই খাবো! খাওয়া না খাওয়া আমার ইচ্ছে। কারো হুকুমের চাকর কি?

ঃ নিমন্ত্রণ করেছ, এসেছি—তাই বলে খেতে হবে এ কোন দেশের জুলুম। এমন তো দেখিনি আগে কোন বাড়িতে। সমাজ মেনে চলতে হবে, যা ইচ্ছে একটা করলেই হল না! খেয়ে শেষকালে নিন্দের ভাগী হই আর কি?

মহা ফাঁপরে পড়লেন কর্তারা। গোঁয়াড় দত্ত মশাই কারও কথায় কান দেন না। মারপিট হয়ে যাক পরোয়া নেই। খাইয়ে তবে তিনি ছাড়বেন। রাত দশটায় বিয়ে বাড়িতে থমথমে ভাব।

শেষ পর্যন্ত দত্ত মশাই-এর জেদ্ই বজায় ছিল। সকলকে খাইয়ে তবে তিনি ছেড়েছিলেন।

পংক্তির ভোজন বিলাসীরা খেতে খেতে মজা দেখেছিলেন সে রাত্রে। তাতে তাঁদের খাওয়া আরো জমেছিল। জেদী লোকের অন্যায় জেদ জব্দ হলে কার না ভালো লাগে?

শোনা যায় সেই থেকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে ছাদে উঠে পংক্তিতে না বসে 'বেশ বেশ' বলার রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।

খুনী

(৩০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দিন কয়েকের ছুটি নিলে মেয়েটি। চাইলে বুঝি অপিসের কলকোলাহল আর সহকর্মীদের হাসি টিটকারী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু হিতে হোল বিপরীত। ঘরের নির্জনতা বুঝি টুঁটি তাঁর টিপে ধরলে। মহা আতংক গেল তার আরও বেড়ে। বাধ্য হয়েই ইস্তফা দিতে হোল চাকরিটি। কিন্তু চাকরিতে রিজাইন দিয়ে বাড়ি ফিরে স্বস্তি পেল কই! ভাই-বোনদের কাতর চাহনি; বাপের অর্থহীন সকরুণ দৃষ্টি; আত্মীয়স্বজনদের বিজ্ঞ অভিযোগ—গায়ে পড়া উপদেশ; পাড়ার লোকদের টিটকারী আর মায়ের সরব গঞ্জনা এবং অবশেষে একদিন মুখ ফুটে বলা ঃ

'ধাড়ি আইবুড়ো মেয়ে, রেলের অমন চাকরিটা হাতে ধরে ছেড়ে দিয়ে এল। এক গুষ্টি এখন খাবে কি? গলায় দড়ি জোটে না?'

দড়ি অবশ্য তার জোটে নি। জুটল শুধু খানিকটা আফিম। তাও আবার ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তাই সে গিলে বসলে একদিন রাত্রে আর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। কিন্তু বিষ খেয়ে মরা হোল না। হোল শুধু হাসপাতাল—থানা-পুলিশ—আইন আদালত। আর আত্মহত্যা প্রচেষ্টার গুরু অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড।

কারাগারের বন্ধ প্রাচীরের মধ্যে তার মনের রোগের উপশম হোল না। বরং মানসিক বিকৃতি গেল বেড়ে। ইনস্যানিটি দিল দেখা পুরোপুরি।

কারাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত তদারকে কেসটা অবশ্য বেশী দূর এগোতে পারে নি। তাঁর লেখালেখির ফলে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। নতুন কেস। পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে এখনও। হোপলেস নয়।

ডাঃ খাশনবীশ থামলেন।

শিকার

(২৯৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অলককে নিয়ে সিতাংশু চলে যেতে মিলি বললে, "জানেন, মিস্টার সান্যাল, আজ নেহাৎ বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গেছি! আপনাদের ঐ একস্পার্ট শিকারীকে পাশে বসিয়ে কী নাকাল যে সারা দিন হয়েছি বলবার নয়! যাক, আশা করা যায় ভদ্রলোকের শিকারের শখ মিটে গেছে, আর উনি এমুখো হবেন না। ভালুক দুটো আমাদের দেখতে পেয়ে প্রায় মাচানে এসে উঠেছিল। ভাগ্যক্রমে দুটো শট্ই ঠিক জায়গায় লেগেছিল, গাছে আর তাদের উঠতে হয়নি, সেই মুহূর্তেই নিঃশব্দে মাটিতে পড়েছে। না হলে আর আজ আমায় এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইতে হত না।"

"......গোবিন্দবাবু কোথায় গেলেন? ভালুক দুটো জীপে ওঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, এদিকে সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই।"

সমুদ্র সন্তান নিকোবরী

(২৯৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বেশী চলে। বোধহয় নানা দেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই ক্যাপ্টেন কথাটা এখানে এসেছে এবং চালু হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেনের কাজ হচ্ছে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সরকারের আদেশ গ্রামবাসীদের মধ্যে জারী করা। বড় বড় চুরি, ডাকাতি, হত্যার খবর সরকারকে জানানো; ছোটখাটো অপরাধের বিচার অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েৎই করে। মোড়ল সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে করা হয়।

প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষই আপন আপন কিনেমের বাইরে বিয়ে করে। বিয়ে এদের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দ ক'রে করে। এ বিষয়ে তারা পুরোদস্তুর আধুনিক। তবে বিয়ের আগে মা-বাপের সম্মতি নেয়। বিয়ের পর কনে বরের বাড়ী যাবে না বরই কনের বাড়ী গিয়ে বসবাস করবে সেটা নির্ভর করে তাদের আর্থিক অবস্থার ওপর। কনের পরিবারের জমি, বাগিচা ইত্যাদি যদি বেশী থাকে তবে তাকে বিয়ে করতে হলে বরকে সেই কনের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে হয়। আমাদের সমাজের মত বরপক্ষ হলেই প্রবলপক্ষ হতে হবে তা' নয়। এদের কন্যাপক্ষও সমান প্রবল।

কার নিকোবরে আজ প্রায় অর্ধেক লোক খৃষ্টান হয়েছে—কিছু সংখ্যক নিকোবরী মুসলমান ধর্মও গ্রহণ করেছে। নারকেল পাতার ঘাগরা পরা আদিম নিকোবরীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। জামা জুতো পরে সভ্যভব্য হয়ে গীর্জায় যায় তারা প্রার্থনা করতে। খৃষ্টান মতে হয় তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান। কিন্তু বাইরের জগতের সংস্পর্শে যতই সে আলোকপ্রাপ্ত হোক তাদের জাতীয় উৎসব আনন্দে সে আদিম নিকোবরী। কা-না-হাউন উৎসবের নৃত্য-গীত ধ্বনি ক্যানো রেসের দুর্দমনীয় আকর্ষণ, অশান্ত সমুদ্রের চির-পরিচিত কল্লোল নিকোবরীর রক্তের প্রতিটি কণায় দেয় দোলা—তখন সভ্যতার বন্ধন পারে না তাকে বেঁধে রাখতে—নাই তার অন্য কোন পরিচয়—তখন সে আদিম ও অকৃত্রিম সমুদ্র-সন্তান নিকোবরী।

ভ্রম সংশোধন

১১৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ছবির নিচে লাল-গোলার স্বর্গীয় মহারাজা স্যর যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়—নামটি পড়তে হবে।

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রেস, ১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।

কোমল ও কমনীয়

ফিটফাট সুন্দরী রমণীর পরিচ্ছন্ন রূপটি তার
ব্যক্তিত্বকে মাধুর্য্য দান করে। তার
কোমল কমনীয়তায় সবাই হয় মুগ্ধ। আর
তার সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ করে তার **মনোহর**
কালো কেশ। তাই যে সকল মহিলা
চুলের শোভা সম্পর্কে সচেতন তারা
সবাই কেশচর্চ্চায় অনিবার্য্য ভাবেই ব্যবহার
করে থাকেন ভারতের অনবদ্য
কেশ তৈল **কোকোলা।**

চুল উৎপাদনে এবং সংরক্ষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেশ তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউমার্স কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা—৩৪।

সুচী পত্র

কথা ও কাহিনী

সূচী পত্র

কথা ও কাহিনী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচী-পত্র

কথা ও কাহিনী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

সুচী-পত্র

প্রবন্ধ

কবিতা

সূচী-পত্র

কবিতা

সূচী-পত্র

কবিতা

খেলা-ধুলা

সুচী পত্র

অভিনয় জগৎ

পুজো পাতভাড়ি

মাটি কার ?

মাটি কার ? মাটি কার ?
শুধাইনু বার বার !
লাঠিধারী এলো পাইক
হলো সভা, এলো মাইক
বলে হেঁকে বলে ডেকে
নামজাদা জমিদার
'এ মাটি আমার !'

মাটি কার ? মাটি কার ?
শুধাইনু বার বার
এলো চাষী মৃদু হাসি
বলে, 'মাটি ভালোবাসি'
'লাঙ্গল রয়েছে যার
এ মাটি নিশ্চয় তার !

* * *

নেমে এলো মেঘ অন্ধকার
চারিদিকে বর্ষণের ভার
ঝরিতেছে ঝর ঝর জল
জাগিতেছে শ্যাম তৃণদল
আবার শুধানু আমি
'কেবা এই মৃত্তিকার স্বামী ?'
হেসে উঠে কচি কচি ঘাস
নেচে উঠে লতা ফুল গাছ
হাততালি দেয় বার বার
'এ মাটি আমার !'

রাত্রি হলো বেজায় গভীর
ভেঙে গেল শহরের ভীড়
ঘুমালো কি সমস্ত জগৎ
ঘুমালো কি অরণ্য পর্বত ?
শুধু দূর নক্ষত্রের দল
আলো করি রাখে নভস্তল
হঠাৎ পাতিয়া কান
শুনি যেন মৃত্তিকার গান :
গান গায় কি যে এক পোকা
বলে, 'তুমি এত বড় বোকা
জানো নাকি এই মাটি কার ?
এ মাটি আমার !'

তার পর রাত্রি হলো শেষ
পূর্ব প্রান্তে আলোকের রেশ
সূর্যেরে করিনু নমস্কার
নম্র কণ্ঠে শুধানু আবার
'এই মাটি কার ?'
আলোরশ্মি হাসে বার বার
'এই মাটি তার—
সূর্যালোকে অধিকার যার !'

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পূর্বাচলের পানে

স্মৃতিকথা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কলকাতার বাজার সরগরম, চারিদিকে খুব ডামাডোল চলেছে। মজঃফরপুরে পড়েছে ক্ষুদিরামের বোমা, প্রফুল্ল চাকী ট্রেনে ধরা পড়ে বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করেছে, মুরারিপুকুরের বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব খবর শহরবাসীদের কানের কাছে নিত্য বোমারই স্বরূপ দমাদ্দম ফাটছে। চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। সরকারী চাকরী যাঁরা করতেন তাঁরা সন্ত্রস্ত। সবাই ছেলেপিলেকে সামলাতে লাগলেন। কারণ, তাঁদের বাড়ীর ছেলেপিলে যদি কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে ছেলেপিলে তো যাবেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপিলের চেয়েও বড় জিনিস অর্থাৎ কিনা চাকরী তাও যাবে।

আমার জীবনে এই সময়কার একটি কথা লিপিবদ্ধ করছি—সুদূর অতীতে জীবনে নব-নব অভিজ্ঞতার সমারোহে উজ্জ্বল সেই দিনগুলি মানস সরোবরের গভীর অতলে কোন পাঁক-এর অন্তরালে নিহিত ছিল। এই দীর্ঘদিন ধরে যাদের কোন সাড়াই আমি পাইনি আজ তারা হঠাৎ জেগে উঠে মনের মধ্যে ভিড় করছে, শুধু তাই নয়, যে দিনগুলি সেদিন অর্থহীন, কেবল মাত্র সময় ক্ষেপণের যন্ত্র বলে মনে হয়েছিল, আজ অন্তরাগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত হয়ে সেগুলি অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সে দিনগুলি তখন ছিল নীরব আজ তারা অর্থপূর্ণ সঙ্গীতে মুখর।

এইরকম যখন চলেছে অর্থাৎ বোমা-ভয়-চকিত সহরবাসীরা যখন বিহ্বলপ্রায় সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবা, মা আমায় ডাকলেন। তাঁদের কাছে গিয়ে মুখের থমথমে ভাব দেখে ঘাবড়ে গেলুম। মা বললেন—এইখানে বোস। তুই তো সত্যিকথা ভুলেও বলিস না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি সত্যি উত্তর দে।

গুরুজনদের কাছে সে সময় আমার সত্যি কথা বলবার উপায় ছিল না। প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতো আত্মরক্ষার্থে। যেখানে আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রী ত্যাগ এবং আরো প্রয়োজন হলে ধনসম্পদ ত্যাগের বিধান আছে সেখানকার ছেলে হয়ে আমি আত্মরক্ষার জন্য দু'চারটে মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়াকে খুব অন্যায় বলে মনে করতুম না। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা কর্তব্য মনে করছি যে, আত্মরক্ষার জন্য কখন কখনও সত্যের আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। যাই হোক, মা বললেন—ওদের দলের সঙ্গে তোর কি কোন সম্পর্ক আছে?

জিজ্ঞাসা করলুম—কাদের মা?

—ঐ যারা বোমাটোমা তৈরী করছে, গুলী-গোলা ছাড়ছে!

আমি বললুম—রাম বলো! ওসবের মধ্যে আমি নেই।

বলা বাহুল্য, তাঁরা আমার কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না; অবিশ্যি বিশ্বাস না করার পক্ষে অনেক কারণ ছিল। ইতিমধ্যেই বারদুয়েক ভূ-প্রদক্ষিণ করবার মানসে বাড়ী থেকে সরে পড়ে ব্যর্থ মনস্কাম হয়ে ফিরে এসেছি; তাছাড়া আরও অনেক গুণাবলীর কথা যা আজ আর প্রকাশ করে লাভ নেই, তখনকার দিনে বাড়ীতে যা প্রকাশ হয়েছিল এই সব কারণে আমার কথা-গুলো তাঁরা বেশ একটু লবণ সহযোগেই গ্রহণ করতেন। তার ফলে সেই দিনই রাত্রি বেলার এক ট্রেনে আমাকে বালেশ্বর যাত্রা করতে হলো। সে সময় আমার বড় ভাই বালেশ্বর শহরে চাকরী করতেন। সেখানে তিনি থাকতেন একা।

আজকে বালেশ্বরের চেহারা কি রকম হয়েছে জানি না। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় বালেশ্বর একটা স্বাস্থ্যনিবাস বলে গণ্য হতো। অনেক লোক স্বাস্থ্য লাভের জন্য সেখানে আসতেন এবং হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ফিরে যেতেন। সে যুগের কলকাতার তুলনায় সেখানকার জিনিসপত্রের দামও ছিল অসম্ভব সস্তা। সুন্দর ছবির মতো সহর, লাল মাটির নতোন্নত রাস্তা, শুকনো খট খট করছে, মনে হয় যেন পাহাড়ে জায়গা অথচ পাহাড় কোথাও নেই। শহরটি বেশ বিস্তৃত অথচ সেই তুলনায় লোকজনের সংখ্যা খুবই কম।

তখন বৈশাখ মাস। দারুণ গরম হলেও দিন রাত হৈ-হৈ ক'রে এলোমেলো বাতাস ছুটেছে। দাদা সরকারী যে বাড়ীখানা পেয়েছিলেন সেটা সহরের এককোণে। দশ বারো বিঘে বাগানের শেষ প্রান্তে সুন্দর একখানি খড়ো চালের বাড়ী। দেওয়াল ইঁটের ছাউনি খড়ের, অনেকগুলি ছোট বড় ঘর কতগুলি ঘরে সাদা ধবধবে ক্যাম্বিসের সিলিং দেওয়া। উঠোনের চারিদিকে উঁচু থামওলা ঢাকা দরদালান। বাড়ীর বাইরের দিকে কয়েকখানা ঘর তারি দু'তিনখানায় আপিস বাকিগুলো খালি। লোকজনের মধ্যে দাদার একজন সহকারী ধর্মদাস মহান্তি আর মালি দিবাকর পান। এরা দু'জনেই ঐ দেশীয় লোক। আর ছিল আমাদের পূর্ণে। তার পুরো নাম ছিলো পূর্ণশশী দে। পূর্ণে কলকাতায় আমাদের বাড়ীরই লোক ছিলো। বিদেশে একজন জানাশোনা লোক না থাকলে চলে না, তাই পূর্ণেকে দাদার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিলো।

কিসের জন্য তার যে অমন শাহারে নাম হয়েছিল তা বলতে পারি না। পূর্ণশশী তো দূরের কথা প্রতি পদের শশীকেও তার চেহারার তুলনায় পুষ্ট বলে মনে হতো। রোগা কালো হাড় বার করা চেহারা, তার ওপরে তিনি বেশ মোটা মাত্রায় ওহিফেন সেবন করতেন। চক্ষু দুটি থাকতো সর্বদাই ঢুলুঢুলু, আর থেকে থেকে ছাড়তো দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সে ছিল যেমন চালাক আর তেমনি কাজের লোক। এখানে এসে দেখলুম পূর্ণে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার শুটকো হাড় বার করা মুখ ফুলে একেবারে রাগবি বলের মতো দেখতে হয়েছে। ভুঁড়িটি বেশ নিটোল, হাত-পাগুলোও তার উপযুক্ত হয়েছে। আগেই বলেছি তার চোখদুটো সদাই ঢুলুঢুলু অবস্থায় থাকতো। এবার দেখলুম সে দুটি অর্ধনিমীলিত হয়েছে।

—দাদা বললেন পূর্ণের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। পূর্ণশশীর জ্যোৎস্নাচ্ছটায় সহর একেবারে উদ্ভাসিত। আফিং-এর মাত্রা বোধহয় ডবল করে দিয়েছে, কোন কথা সে কানেই তোলে না। টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি যাই দাও না কেন খুচরো পয়সা আর সে ফিরিয়ে দেয় না। তার গুণের কথা আর কত বলব। এখানে কিছু দিন থাকলেই সব টের পাবি। তুই এসেছিস টাকা পয়সা তোর কাছে রাখ, দেখ ওকে সিধে করতে পারিস কিনা।

—দাদা আমার হাতে টাকা পয়সা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার কাজে চলে গেলেন।

—দাদা সকাল বেলা উঠে তাড়াতাড়ি কাজে বেরিয়ে যেতেন। আপিস বেশী দূরে নয় এই বাড়ীরই বাইরের দিকে ছিলো আপিস। সকাল বেলা দশটা এগারোটা অবধি আপিসে লোকজন যাওয়া-আসা করত তারপর সব ভোঁভাঁ। দাদা বেলা বারোটা অবধি সেখানে কাজকর্ম করে বাড়ীর ভিতরে আসতেন। আহার সেরে কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমোতেন ঘুম সেই বেলা তিনটে অবধি। আমি বাইরের দিকে রাস্তার ধারে একটা ঘর নিজের জন্য পরিষ্কার করে নিয়েছিলুম, সারা দিন কোন কাজ নেই বাড়ীর কাছেই ছোট্ট একটা বাজার বসত। সকালবেলা চা খেয়ে সেই বাজার থেকে মাছ প্রভৃতি এনে পূর্ণেকে দিয়ে দিতুম, তারপরে সারাদিন ছুটি। বাগানের একদিকে ফুলের বাগান ছিলো। সেদিকে চলে যেতুম, দেখতুম দিবাকর কাজ করছে, তাকে নানান প্রশ্ন করতুম, সে কাজ করতে করতে জবাব দিতো। কাছেই একটা বস্তিতে তার বাড়ী। বাড়ীতে তার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে আছে, তার বড় ভাই ও ভাজ আছেন, তবে তাদের আলাদা সংসার। জিজ্ঞাসা করলুম।

—দুই ভায়ের আলাদা সংসার কেন?

—সে জানালে তার দাদা আদালতে পিয়নের কাজ করে, সতেরো টাকা মাইনে পায়! তারা বড়লোক তাই তারা আলাদা সংসার করেছে।

—দিবাকর পাঁচ টাকা মাইনে পেতো, জিজ্ঞাসা করতুম পাঁচ টাকায় তোর সারা মাস চলে কি করে? সে বলত পাঁচ টাকায় চলে না; মেয়ের জন্য দুগাছি বালা আর একজোড়া রূপোর মল গড়িয়ে দিতে হয়েছে। স্যাকরাকে প্রতি মাসে আট আনা করে দেনা শোধ দিতে

হয়। দুবেলা নুন সহযোগে দু'টি পান্তাভাত এই তাদের আহার্য। যদি কোন মাসে একখানা ধুতি কিংবা একটা শাড়ী কিংবা একটা গেঞ্জী কিনতে হয় দিন কয়েক অনাহারে থাকতে হয়। কোনদিন সে কোনদিন তার স্ত্রী অনাহারে থাকে।

—আমি জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটি কি খায়?

সে বলে দাদাদের সংসারে তাকে খেতে দেয়।

—এমনি করে ধীরে ধীরে তার খবর জানবার চেষ্টা করি। দিবাকর আবার কাজে মন দেয়। আমি বাগানের মধ্যে ঘুরতে থাকি। এখন বড় বড় আমগাছগুলো ছোট ছোট ফলে ভরে উঠেছে। বেলগাছগুলোতে পাঁচ নম্বরের বড় বড় ফুটবলের মত বেল ঝুলছে। অত বড় অমন সুগন্ধ ও সুস্বাদু বেল তার আগে জীবনে কখনও খাইনি। সারি সারি পেঁপে গাছ, তাতে অসংখ্য পেঁপে ধরে আছে, কাঠবিড়ালীর দল চীৎকার করতে করতে গাছে উঠছে ইচ্ছা মত গাছ-পাকা পেঁপে খাচ্ছে। দুপুরে বেলা আসে বুলবুলির দল। তারা পেঁপে খায় আর রাতে আসে বাদুড়ের পাল তারা কিছু খায় কিছু নষ্ট করে। উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকে তা এতদিন পুণের ভোগে লাগছিল, আমি এসে তাতে ভাগ বসালুম। পুকুরের এক কোণে দুটো-তিনটে বাঁশ ঝাড়। আকাশচুম্বী বড় বড় বাঁশ হেলে পড়েছে পুকুরের দিকে। পুকুরের কালো জলে তাদের কালো ছায়া পড়েছে। একটুখানি আওয়াজ পেলেই তারা আহ্লাদে চীৎকার করে ওঠে। বাগানের চতুর্দিকে কেয়া, মোরণ্ডা ও বেতের ঘন জঙ্গল বেড়ার কাজ করে, তা ভেদ করে গরু ছাগল ঢুকতে পারে না। আরেকদিকে তিন-চারটে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ জায়গাটা একেবারে অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে।

—কোন কোন দিন দুপুরবেলা রাস্তার দিকে জানলার ধারে বসে থাকতুম, দেখতুম বাড়ীর সামনের একটা পুকুরে আমাদের হাঁস-গুলো সাঁতরে বেড়াচ্ছে। আমি সাঁতার জানতুম না। হাঁসগুলোকে দেখে দেখে আমার হিংসে হতো। কেমন অবাধে অবলীলাক্রমে তারা পুকুরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে দেহটা ভাসিয়ে রেখে গলাটা ডুবিয়ে দিতো জলের গভীরে তারপরে উঠেই মুখ নাড়তে নাড়তে একদিকে চলে যেত। সামনের লাল সরু রাস্তা দূরে থেকে পুকুরটাকে গোল হয়ে বেড়ে আমাদের বাড়ীর গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে দক্ষিণ দিকে। এক একদিন দুপুরবেলা উঠত ঝড়—লাল ধুলোর ঝড়। সেই ঝড়ের পরশ পেয়ে চারিদিকের গাছগুলো উঠত চেঁচিয়ে, তাদের সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে। দেখতে দেখতে আমার মনের মধ্যেও উঠত ঝড়, ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতুমনা, মনে হতো ঝড়ের সঙ্গে আমিও উড়ে যাই। আস্তে আস্তে বাগানে ঢুকে সেখানকার খিড়কী দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তুম। চলেছি তো চলেইছি, নির্জন রাস্তা দুপাশে ঘন কেয়ার বন চলতে চলতে আরেকটা রাস্তায় এসে পড়তুম সেটা পূর্বদিক থেকে এসে সহরকে ঘিরে গোল হয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিমমুখো।

—আমি চলতুম পূবমুখো অজানা উদ্দেশ্যে। একটু দূরে গিয়েই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী মার্টিন সাহেবের বাড়ী। আমাদেরই মতো ইঁটের দেওয়ালের উপর খড়ের চাল, চারিদিকে প্রকাণ্ড জমি।

মার্টিন সাহেব ছিলেন কুলির আড়কাঠি। এই তল্লাট থেকে কুলি সংগ্রহ করে তিনি আসাম ও আরো অনেক জায়গায় চালান করতেন। তাঁর বাড়ীর জমিতে দুটো তিনটে খুব বড় বড় দো-চালার ঘর। কুলি সংগ্রহ হলে চালান যাবার আগে তারা এই ঘরে বাস করে। দাদা মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে মার্টিন সাহেবের ওখানে যেতেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী, বাড়ী ছিলো লণ্ডনের কোন জায়গায়। দিব্যি দিল-খোলা খুশী মেজাজের লোক। কথাবার্তার লোক। কথাবার্তা বলতে বলতে মাঝে মাঝে দিগ্বিদিক্ কাঁপিয়ে উচ্চহাস্য করতেন। এখানে একলা থাকেন, মাঝে মাঝে দেশে যান। আবার মধ্যে মধ্যে তাঁর স্ত্রী আসেন মাস ছয়েক স্বামীর কাছে থেকে ফিরে যান। ছেলেমেয়েরা কেউ আসে না। তারা সব দেশে পড়াশুনো করে। মার্টিন সাহেব খুব সৌখীন লোক ছিলেন। তাঁর তিনটে বাবুর্চি ছিলো, ভালো ভালো গাই দু'তিনটে আর একপাল হাঁস মুরগী ছিলো। তিনি আমাদের অনেক ভালো ভালো জাতের মুরগী দিয়েছিলেন। অর পিংটন, রোড্স্ আইল্যান্ড লেগ্ হরন্, ব্যান্টাম এমনি কতকি। তাঁর বাড়ীতেই প্রথমে ইনকিউবেটার অর্থাৎ ডিমে তা দেবার কল দেখি। দাদা যখন তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করতেন আমি তখন কিছুক্ষণ সেখানে বসেই উঠে গিয়ে ডিমে তা দেওয়া, মুরগীর পালকে কিভাবে পালন করা হচ্ছে ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে দেখতুম। পুকুরও ছিল তাঁর অনেকগুলি, এসব ছাড়া তাঁর একপাল দরওয়ান ছিল। কুলি-দের টাকা দাদন দেওয়া, দালালদের অগ্রিম দেওয়া আরো কি কি সব কাজের জন্য তাঁকে অনেক নগদ টাকা বাড়ীতে রাখতে হতো চুরি-ডাকাতির ভয়ে। তাছাড়া রং রুটের সময় প্রায়ই মারা-মারি হতো, এইসব ঠিক রাখবার জন্য অনেকগুলি দরওয়ান তাঁকে পুষতে হতো। এরা সব বিকেল বেলা আখড়ায় কুস্তি লড়ত, আমি অনেক সময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ব্যায়াম দেখতুম। একদিকে কুস্তি লড়া হচ্ছে তারই একটু দূরে বড় মোটা লাল প্রকাণ্ড বাটীতে ইয়া মোটা একটা নিমের ডাণ্ডা দিয়ে সিদ্ধি ঘাটা হতো। আমি মধ্যে মধ্যে তাদের মিষ্টি-মুখ করবার জন্য পয়সা দিতুম তারা আমায় ভারী খাতির করতো। আখড়ার ধারে চাটাই পেতে দিতো বসবার জন্য, তাদের অনেকেরই মুখ আজও আবছায়ার মতো মনে পড়ে। সেই মাতাব সিং, উদিত, নারাণ, লছমন পাড়ে, দোবে প্রভৃতি। এরা একবার আমাকে এক বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো। সে কথা পরে বলব।

মার্টিন বাড়ী বাঁয়ে রেখে আমি এগিয়ে চলতুম। সম্মুখে পথ পড়ে রয়েছে লোকজন জন্তু জানোয়ার কেউ কোথাও নেই, দু'পাশে ঘন বাবলার বন সাঁ সাঁ করছে তারই মধ্যে দিয়ে সরু লাল রাস্তা। তারই ওপরে আমি একা পথচারী চলেছি নিরুদ্দেশ যাত্রায় এমনি করে কতদিন যে পথ চলেছি তার ঠিকানা নেই। একদিন এই রকম চলতে চলতে বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে দূরে জলের রেখা দেখে সেদিকে অগ্রসর হয়ে দেখলুম একটি নদী বয়ে চলেছে মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই জলোস্রোত— এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম ওর নাম বুড়ো বালাম। এরই কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন মুখুজ্যের দলের সঙ্গে পুলিশের লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে বাঘা যতীনের জীবনান্ত ঘটে।

এমনি এক একদিন প্রকৃতির সঙ্গে মনও যখন উদ্দাম হয়ে উঠতো মাঠে, জঙ্গলে নদীর ধারে; রাস্তায় নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াতুম আমার মনও চাইত প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে। ঐ উধাও উদ্দেশ্যহীন দমকা হওয়ার সঙ্গে উড়তে। পথের লাল ধুলি, নদীর কুল-কুল স্রোতে চারিদিকে গাছপালা, আকাশ পৃথিবীর সবার মধ্যে রেণু রেণু হয়ে মিশে যেতে চাইতুম। সারা দিন আনন্দের জোয়ারে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম। তেমনি আবার কোথা থেকে মেঘ এসে আমার মনের মধ্যে জমা হতো। একটা গ্লানিকর জড়তা ও ঔদাস্য আমার মনকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলতো। মনে হতো বাহিঃ-প্রকৃতির সঙ্গে আমার যেন কোন সম্বন্ধই নেই—আমি যেন একটা সৃষ্টিছাড়া জীব। এই আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি নন। আমি বিমনা হয়ে দুপুর থেকে রকে বসে থাকতুম, দেখতুম সারা দিনের জলকেলীর পর তারা তীরে উঠে দল বেঁধে আমারি পাশ দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যেত। দু-একজন লোক কাজ সেরে বাড়ী ফিরতো। দেখতুম বটে কিন্তু মনের মধ্যে কোনই ছাপ পড়তো না কারণ যেখানটা থাকতো অন্ধকার বিকেল গড়িয়ে পড়তো সন্ধ্যায় সন্ধ্যা মিশে যেতো রাত্রির অন্ধকারে কিন্তু আমি স্থির হয়ে বসে থাকতুম রাত্রির অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে। হঠাৎ দিবাকরের কণ্ঠে চমক ভাঙত। এইভাবে নিত্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত আমার দিনগুলি আলোকে আঁধারে বিচিত্র হয়ে উঠত। কখন আলোকে কখন অন্ধকারে আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলি কাটতে থাকতো।

সপ্তাহের মধ্যে কখনও একদিন কখনও বা দু'দিন আমি ও দিবাকর জেলখানায় যেতুম সরষের তেল আনতে। সেখানে ঘানি ও খাঁটি সরষের তেল পাওয়া যেত, বাড়ী থেকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হতো। জেলের চারদিকে প্রকাণ্ড জমি কাঁটা-তার দিয়ে বেড়া। দেখতুম কয়েদীরা সব্জীর বাগানে খাটছে, কারো হাত-পা খোলা কারো বা কোমর থেকে শেকল ঝোলান দুই পায়ে বেড়ি। দিবাকর বলত ওরা সব সাংঘাতিক অপরাধী। গায়ে ছোট ছোট হাত-কাটা কোর্তা হাফপ্যান্ট পরা, মাথায় চৌরস করে চুল ছাঁটা একটু একটু দাড়ি আছে—মূর্তিগুলো আজও চোখের সামনে ভাসছে। দেখে নিতান্তই গোবেচারা বলে মনে হতো।

জেলখানাটি ছিল ছোট্ট। আমরা মোটা মোটা রেলিং দেওয়া একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম, দূরে একজন কয়েদী বসে থাকতো। সে আমাদের দেখে উঠে এসে দরজার ওপারে দাঁড়াতো। আমরা রেলিংএর ফাঁক দিয়ে তেলের পাত্র তার হাতে তুলে বলে দিতুম কতটা তেল চাই। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে পাত্রখানা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। কিছুক্ষণ বাদে পাত্রটি ভরে নিয়ে এসে আমাদের হাতে তুলে দিতো তারপরে পয়সা গুণে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যেতো। সবদিন একই কয়েদী থাকতো না। তাদের ডিউটি বদল হতো। একদিন একটা কয়েদী তেলের দাম নেবার সময় ফিস ফিস

(শেষাংশ ২৬৬ পৃষ্ঠায়)

তপতীকে বিবাহ করিতে গিয়া বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। গুরুজনরা বলিলেন তপতী ছোটজাতের। উহার বাপদাদারা নাকি নদী হইতে মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। আমরা উচ্চ জাত। আমাদের বংশের অনেকে গলায় মোটা পৈতা ঝুলাইয়া পথে পথে পাঁউরুটি বেচিয়াছেন বা হোটেলে হোটেলে হাঁড়ি ঠেলিয়াছেন। তপতীর মত মেয়ে আমাদের বংশে ঢুকিলে বংশটাই আঁশটে হইয়া যাইবে কিন্তু আমি যে চপ্পলের স্ট্র্যাপের ফাঁক দিয়া তপতীর তিনটি আরক্ত কোমল আঙুল আর হীলের সন্ধান পাইয়াছি। আমার মন তাই নিম্নাভিমুখে পয়োরাশির ন্যায় দুর্নিবার। আমাকে রুখিবে কে? গুরুজনদের প্রতি আন্-সিভিল হইয়াই সিভিল ম্যারেজ করিলাম।

বিবাহ করিতে, প্রথম প্রথম তপতীরও আপত্তি ছিল। সে বলিত, 'স্লেভ হইতে চাহি না।' আমি বলিতাম, 'বেশ, স্লেভ ওনার হও। আমিই, না হয়, তোমার স্লেভ হইয়া থাকিব।"

সে বলিত, 'না, ওনার হইতেও আমার অরুচি। এখন সাম্যের দিন। আমাদের মধ্যে একজন উঁচু দরের আর একজন নীচু দরের এমন কথা কেহ মনে করিতে পারিবেন না। আমরা দুজনেই এক পদবীর, দুজনেই স্বাধীন থাকিতে চাই, এবং প্রতিজ্ঞা করিতে চাই, কাহারও স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিব না।

বলিলাম, 'তথাস্তু। কিন্তু একটা গোল ঠেকিতেছে। তুমি যখন আড়চোখে আমার ঘাড়ের দিকে দেখিতে থাকিবে, তখন আমাকেও কি তোমার ঘাড়ের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে?

তপতী। না, তা কেন? তোমার ঘাড় বে বেশী সুন্দর একথা বলিতে পারিবে না।

আমি। আচ্ছা, বলিব না।

তুমি বলিবে ত?

তপতী। কক্ষনো নয়।

আমি। কিন্তু আমি হয়ত বলিয়া ফেলিব তোমার গ্রীবার ডৌল ও বক্ষের বন্ধুরতা পরম সুন্দর। পরম সুন্দর!

'যাও' বলিয়া তপতী আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

(২)

তিনতলায় এক ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়াছিলাম। উপরে উঠিবার সিঁড়ি চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। গৃহ প্রবেশের দিন, এই সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, দুই দেওয়ালের মধ্যে জাম হইয়া আঁটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হইল।

ওটাকে তাড়িয়ে দাও

তপতী বলিল, এত গুঁতাগুঁতি করিয়া লাভ কি? একটু আলাদা হও না।'

বলিলাম, 'আলাদা হইলে সাম্যের ব্যাঘাত হইবে যে—একজন উপরের ধাপে, অন্য একজন নীচে।"

তপতী। নীচে সমান থাকিলেই হইল।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নীচের ধাপে নামিয়া গেলাম। সাম্যবাদিনী স্ত্রীর সম্মান রাখিবার জন্য উপরের ধাপে উঠিলাম না।

শয়ন ঘরে একটি ডবল খাট আছে, দেওয়াল ঘেঁসিয়া। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এই খাটে শুইতে হইলে, আমাদের মধ্যে একজনকে ফাঁকায়, আর একজনকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া শুইতে হইবে। এই খাটের অবস্থান সংশোধন করিয়া মাথার দিকটা দেওয়ালের দিকে ফিরাইয়া দিলাম। এখন খাটের দুইদিকে দুইটি জানালা পড়িল। একটি বারান্দার দিকে খোলা, আর একটি রাস্তার দিকে খোলা, রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে।

খাটের দক্ষিণ দিকে যিনি শুইবেন, তিনিই দক্ষিণা বাতাসটা পুরাপুরি ভোগ করিতে পারিবেন। এই অসাম্য দূর করিবার জন্য দুইটি জানালাই বন্ধ করিয়া দিলাম।

ঘরের মধ্যে গুমট ও অন্ধকার বাড়িল বটে, কিন্তু সাম্যের গায়ে আঁচড় পড়িল না।

তপতী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'ছি ছি, একী করিয়াছ!"

আমার কৈফিয়ৎ দিলাম।

তপতী বলিল, 'না, না, জানালা খুলিয়া দাও। তুমি বরং জানালার দিকে শুইও। আমি কিছু মনে করিব না।'

ভালই হইল।

রাত্রে, তপতীর পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করিলাম, দক্ষিণা বাতাসে দেহ এলাইয়া। কিছুক্ষণ পরে তপতী আসিল। ঘরের মধ্যে

(শেষাংশ ২৭৪ পৃষ্ঠায়)

কবির বিবাহ

— কালিদাস রায় —

(নক্‌শা)

কিংশুক রায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে দুবছর আগে। বড় সরকারী চাকুরের আদুরে দুলাল। রোগা ছিপ-ছিপে গড়ন, রং ফর্সা। সে কবি, তার কবিতা-গুলি নব্য ও প্রাচীন ধারার মাঝামাঝি। কিংশুক প্রাইভেটে এম-এ দেবে কথা ছিল, কিন্তু সাহিত্য চর্চার সুবিধার জন্য আর্য-ভারতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হয়ে পড়ায় সে মতলবটা মুলতুবী আছে। কিংশুকের চাকরি বাকরির দিকে মন নেই জেনে পিতা তার ব্যবসার জন্য মূলধন সঞ্চয় করছেন। কিংশুক পকেট খরচ পায় আর্যভারতী অফিস থেকেই। তার গল্প লেখারও অভ্যাস আছে। দুই চারটা প্রবন্ধও সে লিখেছে, কিন্তু তার ভাষা এত জটিল যে তার বক্তব্য কি তা কেউ বুঝতে পারেনি। কবিতাও দুর্বোধ্য।

কিংশুকের সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। এই প্রেম তার মানসী কিংবা কোন অনির্দিষ্টা মানুষীর উদ্দেশে। কিংশুকের পরম বন্ধু ছিল ময়ূখ। ময়ূখই কিংশুকের কবিতার প্রধান অনু-রক্ত, উপভোক্তা, ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ও স্তাবক। সেওয়েল বললেও চলে। কিংশুকের সঙ্কল্প ছিল—সে বিবাহ করবে না। কারণ বিবাহে কবি জীবনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। ময়ূখ একদিন কিংশুককে বলল—"দেখ, দেহাতীত প্রেম নিয়ে লেখা কবিতাগুলো অবাস্তব হয়ে পড়ছে। কেউ কেউ বলছে—ওসব কবিতা রবীন্দ্রনাথের অনু-করণ। এ যুগে দেহাতীত অবাস্তব প্রেমের কবিতা আর চলবে না। তোমার দরকার রক্তমাংসে জীবন্ত নারীদেহকে আশ্রয় করে প্রেম কবিতা রচনা করা।" একথা শুনে কিংশুক চমকে উঠল—হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে সে যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। সে ভাবল—কথাটা ময়ূখ ঠিকই বলেছে—এখন উপায়? তাহলে ত বিয়ে করতে হয়। কিংশুক মহাসমস্যায় পড়ে গেল। সে বিবাহ করব না বলায় বাড়ীর লোক বিবাহের নামই করে না। যাই হোক, কিংশুকের বিবাহে সম্মতি আছে তা ময়ূখের ভগিনীর মারফতে কিংশুকের মাসীর কাছে পৌঁছুতে দেরী হল না। তখন নানা স্থান থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। কিংশুকের পিতা পাত্রী নির্বাচনে কিংশুককেই ভার দিলেন। কাব্য সাহিত্যে অনুরাগিণী কিংবা কবিতা রচয়িত্রী যুবতীর সন্ধান চলতে লাগল। কিংশুক ময়ূখের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্রশ্নমালা রচনা করে নিল। এই প্রশ্নপত্র নিয়ে দুইজনে পাত্রী দেখতে যেত। ময়ূখই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করত। প্রশ্নগুলি এই—

১। বিদ্যা কত দূর? ২। নাচ-গান জানা আছে কিনা? ৩। আর্যভারতী পত্রিকা পড় কিনা? ৪। কার কার কবিতা পড়তে ভাল লাগে? ৫। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে পারো? পাঠ্য-পুস্তকের কবিতা হলে চলবে না? ৬। কবিতা লিখতে পারো কিনা? ৭। বাড়ীতে কার কার কবিতার বই আছে ইত্যাদি।

যতগুলি পাত্রী কিংশুক পরীক্ষা করল তাদের মধ্যে কেউ পাশ করতে পারল না। বিশেষতঃ আর্যভারতী পত্রিকার নামই কেউ শোনেনি। অধিকাংশ প্রশ্নেই পাত্রীরা নিরুত্তর। একস্থলে কিংশুক খুব অপদস্থ হয়ে গেল। একটি পাত্রী সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে। ১। সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ি। ২। গান জানি—নাচ জানি না, কারণ সিনেমায় নামবার ইচ্ছে নেই। ৩। আর্যভারতী পত্রিকার নাম কদিন হলো শুনেছি, এককপিও চোখে দেখিনি। ৪। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভাল লাগে। ৫। রবীন্দ্রনাথের একটা কেন, ৭।৮টা কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, আবৃত্তি করে তিনবার মেডাল পেয়েছি। ৬। সামান্য সামান্য কবিতা লিখতে পারি, কলেজ ম্যাগাজিনে বেরোয়। বাড়ীতে সব বড় বড় কবিরই কবিতার বই আছে—কতকগুলো প্রাইজ পেয়েছি। কাল বৈকালে কিংশুকবাবুর "সুদুর্লভা" ও "স্বপ্ন সহচরী" দাদা কিনে এনে দিয়েছেন।

কিংশুক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ময়ূখ বলল—আপনার উত্তরে আমরা খুশী হলাম। কিংশুক ময়ূখের কানে কানে কি যেন বলল। ময়ূখ জিজ্ঞাসা করল—"সুদুর্লভা ও স্বপ্ন সহচরী পড়ে কেমন লাগল?

পাত্রী—পড়ে কিছু বুঝতে পারলাম না—রবীন্দ্রনাথের লেখার মতো সহজ লেখা নয়।

ময়ূখ—আমরা তবে এখন উঠি।

পাত্রী—আমার যে কতকগুলো প্রশ্ন ছিল।

ময়ূখ—বলুন?

পাত্রী—আপনার বন্ধু কি স্পোর্টস জানেন?

ময়ূখ—কবি আবার স্পোর্টসম্যান হয় না কি?

পাত্রী—আমি যদি একটা গান গাই তাহলে উনি রাগিণীটা কি তা বলতে পারবেন?

ময়ূখ—তা পারবেন না বোধ হয়।

পাত্রী—উনি কি জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন ছাড়া অন্য কোন কবিতা আবৃত্তি করতে পারবেন?

ময়ূখ—তা পারবেন না; পরের কবিতা উনি মুখস্থ করেন না—নিজের সব কবিতা ওঁর মুখস্থ।

পাত্রী—উনি কিসে অনার্স, কোন্ ক্লাশ?

ময়ূখ—ইংরাজিতে সেকেন্ড ক্লাশ।

পাত্রী—উনি ইংরাজিতে এম-এ পড়লেন না কেন?

ময়ূখ—প্রাইভেটে এম-এ দেবেন?

পাত্রী—বাংলার এম-এ প্রাইভেটে চলে, ইংরাজিতে সুবিধা হবে না। ওঁর ভবিষ্যৎ জীবিকা কি হবে?

ময়ূখ—এখনো স্থির হয়নি—তবে সম্ভব উনি আর্যভারতীর মালিক হবেন—তখন ওঁর পিতা পত্রিকাখানার উন্নতির জন্য দশ হাজার টাকা দেবেন।

পাত্রী—এতগুলো টাকা জলে দেবেন? আপনারা এবার আসতে পারেন।

পথে যেতে যেতে কিংশুক বললে—এই পাত্রীটি বেশ স্যুট করবে। চোখে মুখে কি বুদ্ধির দীপ্তি! কি সপ্রতিভতা! বেশ গুণবতী! দেখতেও মন্দ নয়। ময়ূখ ঝোঁকে উঠে বলল—"দূর! দূর!! একটা নির্লজ্জ জ্যাঠা মেয়ে! রংটাও ফর্সা নয়। প্রশ্নগুলোর অর্থ বুঝলে না? নাচের কথা হয়েছে বলে স্পোর্টসের কথা তুলে গঞ্জনা দিলে। যে গান শুনে রাগিণী বলতে পারে না—সে গানের মর্যাদা কি বোঝে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হয়েছিল বলে জীবনানন্দের কবিতার কথা তুলল। প্রত্যেক প্রশ্নের গূঢ় অর্থ আছে। তোমাকে কথায় কথায় আঘাত করলে। কিংশুক কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক—ঐ মেয়েটির বাড়ীতে পাত্র পক্ষের সম্মতি গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষ বিবাহে রাজী হয়নি। এখানেই প্রথম পর্বের শেষ।

আর্যভারতীতে অনেক অনূঢ়া কিশোরী ও যুবতী ছাপাবার জন্য কবিতা পাঠাত। তাদের কবিতাগুলি সংশোধন করে কিংশুক আর্য-ভারতীতে ছাপতে সুরু করল। ক্রমে চারজন কবিতা লেখিকার সঙ্গে কিংশুকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাদের কবিতা কিংশুক তাদের সাক্ষাতেই সংশোধন করে দিত। এদের একজনের নাম শুভা। কিংশুক একদিন তাকে বলল—"দেখ, দীর্ঘকাল তোমার কবিতা সংশোধন করবার সুযোগ পেলে তুমি রাধারাণী দেবীর

চেয়ে বড় কবি হতে পারো। কিন্তু তোমাকে এর পর আর পাবো কোথায় ? তুমি হয়ত কোন দিন এক অকবি অরসিকের জীবন-সঙ্গিনী হবে। কোন কবির জীবন-সঙ্গিনী হলে তোমার জীবন সার্থক হতো।" এর পর সেই বুদ্ধিমতী মেয়েটি আর্যভারতীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করল। পরে শোনা গেল, এক কাঠখোট্টা ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ার অভিভাবকের কাছে ময়ূখের মারফতে প্রস্তাব গিয়েছিল। তিনি কিংশুকে কবি একথা শুনে বলেছিলেন—"দূর! দূর! যে কবিতা লেখে তার সঙ্গে কোন প্রকৃতিস্থ বাপ মেয়ের বিয়ে দেয় ? তার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তৃতীয়ার পিতার কাছেও প্রস্তাব গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—"ওরূপ পাত্র পেলে আমি ধন্য হতাম, আমি যদিও গরীব মানুষ তবুও অসবর্ণ বিবাহ দিতে পারব না।"

চতুর্থীর কাছে কিংশুক সরাসরি নিজেই প্রস্তাব করে বলেছিল—এসো না আমরা দুজনে আর্যভারতীর সেবা করে একে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় দাঁড় করাই। সে বলেছিল—আমার সঙ্গে যার বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করা আছে সে দুমাস পরেই বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে আসছে। আমি আপনার কবিতার ভক্ত, আপনাকে চিরদিন গুরুর মত ভক্তি করব। আমি "প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—হয়েই থাকব এর বেশী কিছু সম্ভাবনা নেই।

একজন শিক্ষয়িত্রী জলপাইগুড়ি থেকে আর্যভারতীতে লেখা পাঠাতেন—তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর সঙ্গে কিংশুক পত্র বিনিময় করত—একবার পত্রে কিংশুক লিখেছিল—"বরারোহাসু" পত্রের ভাষা এত কবিত্বময় যে তা প্রায় প্রেম নিবেদনেরই মতো। তিনি লিখেছিলেন—খট্টারূঢ়েষু—আপনি সংস্কৃত জানেন না—সংস্কৃত পুস্তকে বাংলা অনুবাদে বরারোহা, পৃথুজঘনা, তুঙ্গস্তনী, ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা, কৃশোদরী রম্ভোরু, করভোরু, গজেন্দ্র গমনা ইত্যাদি নারীর অনেক বিশেষণ পাবেন। কদাচ ঐ শব্দগুলি কোন ভদ্রমহিলার উদ্দেশে প্রয়োগ করবেন না। সংস্কৃত অভিধান দেখবেন। খট্টারূঢ় কথাটারও অর্থ দেখবেন।

আর একজন লেখিকার সঙ্গে কিংশুকের পত্র বিনিময় চলত—তাতে কাব্যালাপ প্রেমালাপের গা ঘেঁষেই চলত। কিংশুক তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল—সে লিখেছিল—"সত্যই আপনি কবি, আমাকে না দেখেই যে প্রস্তাব করেছেন তাতে আমি ধন্য হলাম। আমি দেখতে কুৎসিত, চিররুগ্ন—তা ছাড়া আমি আবাল্য খঞ্জ। এ জন্যই আমার বিবাহ হয়নি।"

এইখানেই দ্বিতীয় পর্ব শেষ।

এবার অমৃতবাজারে ময়ূখ বিজ্ঞাপন দিল—একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর একমাত্র পুত্র সুদর্শন, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, সুসাহিত্যিক পত্রিকা সম্পাদকের জন্য উচ্চ বর্ণের ও অশ্যামবর্ণের শিক্ষিতা, সাহিত্যসেবিকা কাব্যানুরাগিণী পাত্রী চাই। বয়স, বিদ্যা, উচ্চতা ও ওজন কত জানাইতে হইবে। পাশপোর্ট সাইজ ফটোসহ আবেদন করুন, বক্স নং......... ...। ত্রিশখানি আবেদনপত্রের মধ্যে ৫।৬ জনকে ইন্টারভিউ দিতে লেখা হল। আর্যভারতী অফিসে সকাল বেলায় ইণ্টারভিউ নেওয়া হল। একজন প্রার্থিনীর ভ্রাতা প্রথমে এলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি সাহিত্যিক আপনার কোন উপন্যাস পুরস্কার পেয়েছে ? কতগুলি উপন্যাস লিখেছেন ?"

ময়ূখ—উনি কবি, ঔপন্যাসিক নন।

ভ্রাতা—তা তো বিজ্ঞাপনে লেখেননি। কবি ? আরে রামঃ, মিছিমিছি হয়রানি। নমস্কার।

আর একজন প্রার্থিনীর পিতা এলেন—তিনি এসেই বললেন—সংবাদ নিলাম, আপনি তো সম্পাদক নন,—আপনি সহকারী সম্পাদক।

উনি সত্বরই সম্পাদক এবং মালিক হবেন।

পিতা—এত দেনা হয়ে গেছে কাগজের যে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের একমাত্র পুত্রকে সম্পাদক ও মালিক দুই-ই হতে হবে ? মিছিমিছি হয়রানি, নমস্কার মশায়।

আর একজন প্রার্থিনীর পক্ষ থেকে এসেছেন মামা। মামা এসেই বললেন—আর্যভারতী থেকে কত পান ?

ময়ূখ—২৫০, টাকা।

মামা—মাসে না বছরে ?

ময়ূখ—বছরে মানে ? মাসে ছাড়া আর কি ?

মামা—এত মাহিনা সহঃ সম্পাদকের ? তবে তো কাগজের নাভিশ্বাস উঠেছে। আর্যভারতীর ব্যাঙ্কের পাশ বুকটা দেখতে পারি ?

ময়ূখ—তা আপনাকে দেখাবো কেন ?

মামা—দেখাবার হলে সগর্বে ড্রয়ার টেনে বার করে সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে দিতেন। যাক, কিংশুকবাবু, আপনার বি-এ পাশের সার্টিফিকেটটা একবার দেখাবেন ?

ময়ূখ—যান, যান, ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে !

মামা—আচ্ছা নমস্কার।

এবার একজন শিক্ষয়িত্রী এলেন। এসেই তিনি বললেন, মনোনীতা হবার জন্য আমি আসিনি। আমি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত। কিংশুকবাবু, আপনি সুশ্রী যুবক, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, পদস্থ ব্যক্তির একমাত্র সন্তান, আপনি সুপাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবাহ স্বতন্ত্র জিনিস। বিকৃত মস্তিষ্ককে কেউ বিয়ে করতে পারে না। আপনি ইংলিশে অনার্স, আপনার এম-এ পড়বার কথা, বি-এল পড়বার কথা, বিলাত যাবার কথা উচ্চতর শিক্ষার জন্য, আপনার সামনে ভবিষ্যৎ বড় বড়, আপনার মতো সুবিধা কজনের ভাগ্যে ঘটে, পড়াশুনায় আপনি অমনোযোগীও ছিলেন না। আপনি কিনা একটা মাসিক ছাত্রকার তলে ভেকের মতো আশ্রয় নিলেন ছড়া পাঁচালীর মক-মকানির দোহাই দিয়ে। যান এম-এ ক্লাসে ভর্তি হোন গিয়ে।

ময়ূখ—অসহ্য ! অসহ্য !! যান যান অযাচিত উপদেশ দিতে আপনাকে ডাকা হয়নি।

শিক্ষয়িত্রী—আর একটা কথা। কিংশুকবাবু, কবিতা লেখা ছেড়ে দেন আর এই বন্ধুটিকে ছাড়ুন।

আর একজন পীনাঙ্গী শিক্ষয়িত্রী এলেন। তিনি বললেন, আমিও ২৫০, মাহিনা পাই। মনোনীতা হলেও কিন্তু চাকরি ছাড়ব না।

কিংশুক- না তা ছাড়তে হবে না।

পীনাঙ্গী—একটা মুশকিল আছে—আমিও কিন্তু কবিতা লিখি।

(গান)

বেদনার ক্ষণফুলে গাঁথিলে পলে পলে
চেতনার অমর মালা কে কবি, ধরাতলে ?
হৃদয়ের শঙ্কা যত
অভয়ের অনাহত
বাণীরূপে সুরে তোমার ফলিল নয়ন জলে :
"যুগে যুগে সীমার বুকেই
অসীমের কান্তি ঝলে।"
অধরার নৃত্য নশ্বর ঝরালে কতই তালে !
নিরাশার ক্লান্ত ভালে দুরাশার টিপ পরালে।
বর্ণে গন্ধে গানে
প্রতিভার বরদানে
সাজালে ছন্দ সাজি সুষমার রংমহলে !
এ-জীবন মায়ার খেলা—কে সে বৈরাগী বলে ?
আগুনের পরশমণি হাতে কে নিয়ে এলো
দেবতার দূত ?
—কহিলে এত রূপ কোথায় পেলো ?
সুন্দর তারে হেসে
নিবিড় ভালো বেসে,
প্রতি তার ছোঁওয়ায়,
মরি, অপরূপে তাই উছলে ;
যে পারে আপনি পারে ফোটাতে নীলকমলে।
সকলের সঙ্গী হয়ে ছিলে অসঙ্গ তুমি :
পঙ্কের বুকে, অমল, উঠিলে তাই কুসুমি।
করুণের কারাগারে
অরূপের অভিসারে
চলিলে কে গো দুলি' মরণে চরণতলে
প্রতিটি ঝংকারে যার মরু ছায় ফুলে ফলে।

কিংশুক—বেশ ত, আমি তো তাই চাচ্ছিলাম। তাহলে তো সোনায় সোহাগা !

পীনাঙ্গী—আমি কবিতা লেখা ছাড়ব ? আপনাকেই কবিতা লেখা ছাড়তে হবে।

কিংশুক—তা কেন ?

পীনাঙ্গী—দুজনেই কবি হলে সংসার চলে না। একজনের অন্ততঃ প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। নইলে ছন্দে ছন্দে দ্বন্দ্ব বাধবে। ইস্পাতে ও চকমকিতে সংঘর্ষ হলে শোলায় আগুন ধরে, পুং কবিতে স্ত্রী কবিতে দ্বন্দ্ব হলে সংসারে আগুন ধরে। আপনার যা যা নেই, তাই তাই যার আছে—তারই সঙ্গে আপনার বিবাহ হওয়া উচিত। আপনি তো হাফম্যান। পূর্ণ মানুষ হতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। দেখুন বিধাতা পরিপূর্ণ মিলনের জন্য নারীকে পুরুষের কম্প্লিমেণ্টারী করে সৃষ্টি করেছেন। দুইএর মধ্যে সাম্য যত অল্প থাকবে মিলন তত সার্থক হবে।

কিংশুক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। ময়ূখ বিরক্ত হয়ে পীনাঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল—কি আবদার ! এত বড় কবি সে কবিতা লেখা ছেড়ে দেবে আর আপনি ছাই ভস্ম কি লেখেন তাই লিখতে থাকবেন—যান, যান, খুব বিদ্যে জাহির হয়েছে। ময়ূখ কিছুই জিজ্ঞাসা

(শেষাংশ ২৭২ পৃষ্ঠায়)
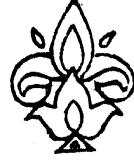
চাঁদনীচকের যে দিকটায় সোনেরী মসজিদ তার মুখোমুখী একটা তেতালা বাড়ীর চিলে কোঠার ধারে ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে নূরবাঈ তাকিয়ে আছে চাঁদনীচকের দিকে, চোখে পড়ে জহুরী বাজার, মেওয়া বাজার, জুম্মা মসজিদ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে চোখে পড়ে কিলা-ই মুবারক বা লালকেল্লা। কিন্তু ঘাড় ফিরোবার বা ছাদ থেকে নামবার কোন লক্ষণ নাই নূরবাঈ-এর—সে যেন কোন যাদুতে ছাদের আর একটি স্তম্ভে পরিণত হয়ে গিয়েছে। দিল্লীর চৈত্র মাসের সূর্য পায়ে পায়ে আকাশের মধ্যস্থলে উঠেছে, চিলেকোঠা, আলসে, থামগুলো প্রহরে প্রহরে ছায়া স্থানান্তর করেছে—কিন্তু সেই যে শীতের আমেজ লাগা ভোর বেলায় বাঁ হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে নূরবাঈ দাঁড়িয়েছিল—মধ্যাহ্ন গতে এখনো সেই অবস্থায় আছে। না চৈত্র মাসের রোদ, না হতাহতের আর্তনাদ, না আক্রান্তের আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা কিছুতেই তার সম্বিৎ ফেরেনি। ঐ যে লাল্টুপিওলা ইরাণী কিজিলবাস সৈন্যের দল এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালিয়ে বিভ্রান্ত জনতাকে কচু-কাটা করছে ঐ যে সামরিক পুলিশ নশকচির দল বন্দুক চালিয়ে ধড়াধড় মানুষগুলোকে ফেলে দিচ্ছে—ঐ যে রক্তের স্রোতে চাঁদনীচকের নহর রাঙা হয়ে উঠেছে, এ সব দৃশ্য তার দেখবার কথা, কারণ চোখের মণিতে দৃশ্যমান বস্তুর ছায়া না পড়ে যায় না, কিন্তু তার অর্থ মগজে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিনা সন্দেহ, পৌঁছিলে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে পারে না, সহ্য করা দূরে থাকুক।

বাঁদী বারে বারে গোসল আর খানার তাগাদ নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছে, মালিকার স্থাণু মূর্তি দেখে ডাকতে সাহস করেনি। শুধু স্থাণুতায় হয়তো সে ভয় পেতো না কিন্তু মালিকার মুখে চোখে এমন একটা উৎকট উল্লাসের আভা মাখানো ছিল যে বাঁদী একেবারে হতবাক হয়ে গেল। মালিকার কাছে অনেক দিন আছে সে, মালিকা যে আর দশ জন মানুষের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর এমন তো কখনো মনে হয়নি, বরঞ্চ কোন কোন ঘটনায় বুঝতে পেরেছে তার মনটা বড়ই কোমল। একবার গুলতিতে আহত একটা কবুতর ছাদের উপরে এসে পড়ে, সেটাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে কি পরিশ্রম না করেছিল নূরবাঈ। তারপরে যতদিন জীবিত ছিল পাখীটি, ছিল তার সবচেয়ে পেয়ারের। আর একদিনের কথা মনে পড়লো বাঁদীর, একটা বেগানা কুকুরকে প্রহার করবার অপরাধে কী না তিরস্কৃত হয়েছিল মালিকার কাছে। মন তো তার কঠিন নয়—তবে এমন তন্ময়ভাবে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখাই বা কেন, আর মুখে চোখেই বা ফুটে ওঠে কেন এমন উৎকট আনন্দ! কিছু বুঝতে না পেরে হাত উল্টে দুর্বোধতার একটা মুদ্রা করে নেমে যায় ছাদ থেকে সে। অনেকবার তার ইচ্ছা হয়েছে মালিকার মাথায় একটা ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—রোদ সহ্য করতে পারে না তার মালিকা, কতবার সামান্য একটু রোদে যাতায়াত করে সারাদিন মাথাধরায় ভুগেছে। কিন্তু ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলে পথের দৃশ্য না দেখে উপায় নেই। এমনিতেই কান বিদীর্ণ হয়ে গেল, তার উপরে আবার চোখের দেখা! অনেকবার ভেবেছে পালিয়ে যাবে কিন্তু যাবে কোথায়; বাড়ীর বাইরে পা দেওয়া মাত্র হয় বন্দুকের গুলীতে নয় তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারাতে হবে। আর প্রাণে যদি বা বেঁচে যায়, এমন দুর্দশাও হতে পারে যার চেয়ে প্রাণে মরা ভালো। সব দৃশ্যেরই খসড়া দেখতে পেয়েছে ছাদের উপর থেকে, জানলার ফাঁক দিয়ে। চার পাশের বাড়ীর নারীর করুণ মিনতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে পুরুষের আর্তনাদ—মেয়েদের চোখের জল আর পুরুষের দেহের রক্ত মিশে প্রবাহিত হয়েছে, কোনটার পরিমাণ বেশি অনুমান করা সহজ নয়। এ বাড়ীও বাদ যেতো না, চাকর-বাকরদের রক্তের সঙ্গে মিশে বইতো তার আর মালিকার চোখের জল। সে স্থির করে রেখেছিল, ধরা পড়বে না ইরাণী খুনেদের হাতে।

তবে কি করবি শুধিয়েছিল নূরবাঈ।

কেন, অত বড় ইঁদারাটা আছে কেন?

লাফিয়ে পড়ে ডুবে মরবি?

আশ্চর্য হচ্ছ কেন মালিকা? খোঁজ নিয়ে দেখো বাড়ীতে বাড়ীতে এই ব্যাপার চলছে। পারো তো একবার জল মেপে দেখো, চোখের জলে ফুলে ফেঁপে বেড়ে উঠেছে, ধন্যি মেয়ে তুই।

আর তুমি কি করবে মালিকা?

নূরবাঈ ছোট একখানি ইস্পাহানি ছোরা দেখিয়ে বলল, চোখের জল এত সস্তা নয় বাঁদী।

তুমি কি লড়াই করবে নাকি খুনেগুলোর সঙ্গে?

(শেষাংশ ৩০৯ পৃষ্ঠায়)

এখন

আপনি আপনার মনোমত স্বাস্থ্যবর্ধক টনিক ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড ভিটামিন যুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করুন

বর্তমানে আপনি ভারতের জনপ্রিয় স্বাস্থ্যদায়ক টনিক ভিটামিনে সমৃদ্ধ অবস্থায় কিনতে পারবেন। ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ডের বিখ্যাত ফর্মুলা স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তিদায়ক ভিটামিনে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছে। ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন কম্পাউণ্ড নানা দিকে দিয়ে আপনার শরীরের পক্ষে ভালো। এটি রক্ত বৃদ্ধি করে, হৃত শক্তি ও সামর্থ্য ফিরিয়ে আনে, স্নায়ুগুলিকে সবল করে' পেশীসমূহকে পুষ্ট করে তোলে ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে তোলে। অসুস্থতার পর স্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধার করে।

ওয়াটারবেরীজ

ভিটামিন

কম্পাউণ্ড

আপনার খাদ্যের পরিপূরক

এছাড়াও পাবেন—সর্দি-কাশির জন্য
ক্রিওজোট ও গুয়াইকল সহযোগে প্রস্তুত লাল
লেবেল মার্কা ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

১৯১৯-এ গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ফোটো

শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে

শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে

১৯১৯-এ গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ফোটো

॥ ভারত-ইতিহাসের তিনখানি পাতা ॥

The following letter has been sent by Sir Rabindranath Tagore to His Excellency the Viceroy:

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government
in the Punjab for quelling some local disturbances
has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness
of our position as British subjects in India. The disproportionate
severity of the punishments inflicted upon the unfortunate
people and the methods of carrying them out, we are convinced,
are without parallel in the history of civilised governments,
barring some conspicuous exceptions, recent and remote.
Considering that such treatment has been meted out to a
population disarmed and resourceless, by a
power which has the most terribly efficient organisation
for destruction of human lives, we must strongly assert
that it can claim no political expediency, far less moral
justification. The accounts of insults and sufferings undergone
by our brothers in the Punjab have trickled through the
gagged silence, reaching every corner of India,
and the universal agony of indignation roused in the
hearts of our people has been ignored by our rulers —

possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgment from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the nobler vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to

3. (16)

suffer degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully

Rabindranath Tagore

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার 'সার' খেতাব বর্জন করে বড়লাট চেম্সফোর্ডকে যে ইতিহাস-বিখ্যাত পত্রখানি লেখেন, সেই পত্রের খসড়ার তিনখানি পাতার প্রতিলিপি "যুগান্তর"-এর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন শ্রীঅমল হোম। মূল লিপিটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত আছে। এ স্থানে মুদ্রিত প্রতিলিপিটি সেখান থেকে প্রাপ্ত।

এই প্রতিলিপিটির প্রথম পৃষ্ঠাটির উপরে লেখা আছে—"The following letter has been sent by Sir Rabindranath Tagore to His Excellency the Viceroy" এবং তার পরের লাইনে "Your Excellency"—তাহা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নহে। প্রতিলিপিটির তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষে যাহা লেখা আছে তাহাও কবির হস্তাক্ষর বা স্বাক্ষর নয়। সংবাদপত্রে পাঠাবার জন্য এই চিঠির নকল 'টাইপ' করাবার সময় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ঐ কথাগুলি চিঠির উপরে ও নিচে লিখে দেন। পত্রখানি ভাইসরয়ের নিকট চলে যাবার পর অধ্যাপক মহলানবিশ তা সাধারণে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিকট এই চিঠির আর-একখানি খসড়া আছে।

এই চিঠিটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য শ্রীঅমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকখানি হ'তে নিম্নে সংকলিত হ'ল:—

"ভাইসরয়কে চিঠি লেখবার আটদিন আগে, ২২শে মে—শান্তিনিকেতনে তখন নিদারুণ গ্রীষ্ম—তিনি একখানি চিঠিতে তাঁর একটি স্নেহাস্পদাকে [রাণু অধিকারী]—এখন লেডী রাণু মুখার্জি] লিখছেন (মেয়েটি তখন সিমলা পাহাড়ে)—'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল'।

"রাতের পর রাত কবি ঘুমুতে পারছেন না। শেষে, আর সহ্য করতে না পেরে, শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলেন কলকাতায়—২৭শে মে। এসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গেলেন তাঁর প্রীতি-ভাজন কোনো একজন বিখ্যাত দেশনেতার কাছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন [মংপুতে রবীন্দ্রনাথ]—'তাকে বললুম যে, একটা প্রটেস্ট মিটিংয়ের ব্যবস্থা কর, আমিও বলবো, তোমরাও বলবে'। রাজী হলেন না তিনি; আরও কয়েকজনের কাছে গেলেন, রাজী হলেন না কেউ। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট তখনো চেপে বসে রয়েছে দেশের বুকের উপর—কি জানি, কি হয়! ভয়ে মুহ্যমান সারা দেশ। ......রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি, তখন তিনি গান্ধিজীকে জানালেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবে যেতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধিজী রাজী হলেন না।

"২৮শে মে, ২৯শে মে এই দুদিন গেল এই বৃথা চেষ্টায়। ২৮শে মে'র সকালে তিনি গেলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে। তাঁর এই বন্ধুর মতামতের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল চিরদিন। শেষে, ২৯শে রাত্রিতে, লিখলেন তাঁর চিঠি ভাইসরয়কে। কবি বলেছেন—'রাত চারটের সময় চিঠি শেষ ক'রে আমি শুতে যেতে পেরে-ছিলুম। কাউকে বলিনি এবিষয়ে, রথীদেরও (এমনকি তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ বা অপর আত্মীয়-দেরও) নয়। পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়'। ["মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"] তাঁর সদ্যলিখিত চিঠির কথা রবীন্দ্রনাথ, এক অ্যান্ড্রুজ সাহেব ছাড়া তাঁর ধারেকাছের আর কাউকে জানতে দিতে চাননি।

"আমার বন্ধু প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে শুনেছি যে, তিনি এ-সময় প্রতিদিনই কবির কাছে যেতেন এবং পাঞ্জাব প্রসঙ্গে কবির অন্তর্দাহ কী গভীর তা' দেখে ক্ষুব্ধ অন্তরে বাড়ী ফিরতেন। ২৯শে মে রাত্রিতে প্রশান্ত কবির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁকে বললেন—'প্রশান্ত, কাল তুমি এসো না'। এমন কথা কবি কেন বলছেন, প্রশান্তের এ-বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু জানালেন—'কারণ আছে'। কবির নির্দেশমতো একদিন পরে যখন (৩১শে মে) প্রশান্ত কবির কাছে গেলেন, তখন তিনি কোনো কথা না বলে ভাইসরয়কে লেখা চিঠির খসড়াটি শুধু তাঁর হাতে দিলেন। সে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র-পত্রাবলী

শ্রীঅমল হোমকে লিখিত

১৯১০ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীঅমল হোমকে লিখিত চিঠিপত্র থেকে নির্বাচিত এই আঠারোখানি পত্র তিনি ''যুগান্তর''-এর শারদীয় সংখ্যার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এই পত্রগুলি অ-পূর্ব প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত হোমকে কবির লেখা আরো বত্রিশখানি চিঠি ইতিপূর্বে "বিশ্বভারতী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-এর অষ্টম খণ্ডে সেই সমুদয় ও আরো অনেকগুলি পত্র বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। —সম্পাদক।

॥ ১ ॥

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার জন্মদিনের প্রণামপত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার তরুণ জীবনের স্পন্দন ছন্দসুষমাবন্ধ হউক—তাহার যত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ কল্যাণে ও সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হউক ইহাই আমার অন্তরের আশীর্বাদ। ইতি ২৬শে কার্তিক, ১৩১৭।

কল্যাণকামী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ২ ॥

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি আজ সকালে পেয়েছি। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

সেদিন তোমাদের সমাজে যে প্রবন্ধ পড়েছি (১) তাতে যে সকলকে খুসী করতে পারিনি তা আমি জানি। প্রাচীনেরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু একথা কোনমতেই স্বীকার করতে পারব না যে সাম্প্রদায়িকতা থেকে ব্রাহ্মসমাজ মুক্ত। ব্রাহ্মসমাজ যে আজ একটা গণ্ডীর মধ্যে বাসা বেঁধেছে একথা স্বীকার করতে যদি কুণ্ঠিত হই তবে নিশ্চিত জানব যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকে আমরা ব্যর্থ করতে চলেছি। ব্রাহ্মসমাজের সাধনা কোথাও পারে না স্তব্ধ থাকতে। ব্রাহ্মসমাজের যুবচিত্ত জাগ্রত হোক সেই সমাপ্তির অপঘাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে। ইতি ১৪ই মাঘ ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুকুমারকে (২) বোলো যে ছাত্রসমাজে (৩) কিছু বলবার প্রতিশ্রুতি আমি মনে রাখব।

পত্র-পরিচয় :

(১) ১৩১৭।১২ই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত প্রবন্ধ—"ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা"।

(২) পরলোকগত সুকুমার রায় (আবোল-তাবোলের কবি)।

(৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত যুব-প্রতিষ্ঠান—"ছাত্রসমাজ"।

॥ ৩ ॥

5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
[Feb. 1912]

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলাম।

তোমার ইন্‌স্টিটিয়ুটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় (১) আমার খুব ভাল লেগেছিল। বৈকুণ্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়ীতে গগন অবনদের (২) ছাড়া আর কারুরেই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার (৩) আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্ট আমার ছিল। ২৩ মাঘ ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) কবির পঞ্চাশোত্তম জন্মোৎসবের পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কর্তৃক ১৩১৮।১৪ই মাঘ কলিকাতার টাউন হলে তাঁহার বিপুল সংবর্ধনার পর, পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ ২০শে মাঘ পরিষদ-মন্দিরে এক সান্ধ্য সম্মেলনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেই উপলক্ষে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের জুনিয়র মেম্বাররা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন।

(২) কবির ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় একাধিকবার "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করেন।

(৩) সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরের অভিনয়ে কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তখন তিনি ছাত্র।

॥ ৪ ॥

জোড়াসাঁকো
[Oct. 1911]

কল্যাণীয়েষু,

বিনয়েন্দ্রবাবুকে (১) বোলো কাল সন্ধ্যার পর যদি তিনি আসেন খুব খুসী হব। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। তোমাদের ওখানে (২) হিন্দু য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পড়তে না পারায় তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কিছু একটা পড়বার সুযোগ পাব। কাল গৌরহরিবাবু (৩) এসে চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্য ওটা ঠিক করে গিয়েছেন। স্থান ও তারিখ এখনোও পাকাপাকি হয়নি—বোধহয় রিপণ কলেজ হলে আসচে শনিবার (৪)। তুমি এসো। ৬ই কার্তিক ১৩১৮

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার লোক সকালে চিঠির উত্তর না নিয়েই চলে গিয়েছিল।

পত্র-পরিচয় :

(১) পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

(২) ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট। তখন শ্রীঅমল হোম অন্যতম আণ্ডার সেক্রেটারি। সেখানে বক্তৃতা ও আলোচনা-সভার আয়োজনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ইন্‌স্টিটিউটে পাঠের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক সার্কুলার জারী করেন যে, কোনো সরকারী কর্মচারী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া যে তুমুল বিতণ্ডা চলিতেছিল তাহাতে কোনোভাবেই যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখন ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারী। রবীন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউটে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন অথচ তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছেন—ইহা জানিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধটি অন্যত্র পড়িবার ব্যবস্থা করেন।

(৩) পরলোকগত গৌরহরি সেন—চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

(৪) পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবন্ধটি ১৯১১।২৯শে অক্টোবর রিপণ কলেজ (এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) হলে পঠিত হয়। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চিঠি তখন সিমলার পথে।

"ভাইসরয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির প্রসঙ্গে প্রশান্ত তাঁর একান্ত-কাছে-থেকে দেখা এবং শোনা সমস্ত প্রামাণ্যতথ্য নিপিবদ্ধ করে কবির স্বাক্ষর নিয়ে রাখেন তাতে।

"অ্যান্ড্রুজ-সাহেবের কাছে আমি শুনেছি, ৩০শে মে সকালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে চিঠিখানি দেখালেন, তখন তিনি সেটিকে একটু মোলায়েম করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ জানালে, তিনি সাহেবের দিকে এমনি করে তাকিয়েছিলেন, যা তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না কোনদিন—

'Such a look as I had never seen in the eyes of Gurudev before or after'!"

ভারত-ইতিহাসের এই চিঠিখানির ভাষায় একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়—'কাটাকুটির চিহ্ন কিছুই নেই খসড়াটিতে—যেন বাধাবন্ধহীন আগ্নেয়গিরিস্রাব নেমে এসেছে দুর্বার ধারায়'। ["পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ"—অমল হোম। ২য় [illegible] পৃ ৭৪—৭৯ দ্রষ্টব্য।]

॥ ৫ ॥

37, Alfred Place
South Kensington,
London W.
Oct. 18, 1912.

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি নিয়ে এলো ধূম্রমলিন লন্ডনে শরতের আগমনী। মনটা হু হু করে উঠলো আমার কাশ ঝলমল শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

দেশের এত খবর আর কেই বা দিতে পারত তোমার মতো। খবরের কাগজের কর্তিতাংশ সাজিয়ে তোমার রচিত পাক্ষিকী শুধু উপভোগ্য নয় অবলম্বনও আমাদের বিদেশে। সাধু!

সমাদর সম্বর্ধনায় হাঁপিয়ে উঠেছি। শীঘ্রই পাড়ি জমাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে আমেরিকায়। এবার নির্জন বাস।

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"র কবিতাগুলি জুনের শেষে চিত্রশিল্পী রোদেনস্টাইনের গৃহে কবি ইয়েটস একটি কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাগমে পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত হইতে আরম্ভ করেন। কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে নানা সংবাদ বাহির হইতে থাকে এবং নানা স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনা হয়। ইয়েটস্-এর ভূমিকা লইয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"র একটি বিশিষ্ট সংস্করণ ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন।

॥ ৬ ॥

Urbana, Illinois
U.S.A.

২৯শে নভেম্বর ১৯১২

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার দাবী মেটানো সহজ হবে বলে মনে হয় না। ওরা মোটে ৭৫০ কপি ছাপিয়েছে (১)। তার মধ্যে আমাকে দিয়েছে একখানা। কিন্তু সে সব রয়েছে লন্ডনে। এখানে আমার কাছে এসেছে দুচারখানা। ইন্ডিয়া সোসাইটিতে আমি লিখে দেখব ওরা যদি পাঠাতে পারে একখানা। না যদি পারে ম্যাকমিলান ছেপে বের করলেই তুমি পাবে (২)। সে ব্যবস্থা সহজ হবে।

আমার আশীর্বাদ জেনো। দেশের খবর সব তোমার চিঠিতে যেমন পাই এমনটি আর পাইনে কারুর কাছ থেকে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" একটি বিশিষ্ট সংস্করণে মাত্র ৭৫০খানি প্রকাশ করেন ১৯১২ অক্টোবরের শেষে কি নভেম্বরের গোড়ায়। কবি তখন আমেরিকায়। এই ৭৫০ কপির মধ্যে ৫০০ কপি ছিল সোসাইটির সদস্য ও কবির আত্মীয়বন্ধুদের জন্য, আর বিক্রয়ার্থ ছিল ২৫০ কপি।

(২) ১৯১৩। মার্চ-এ ম্যাকমিলান কোম্পানী GITANJALI (Song-offerings) প্রথম প্রকাশ করেন।

॥ ৭ ॥

শান্তিনিকেতন
[Postmark 21 Nov 13]

কল্যাণীয়েষু,

নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে তোমার লেখাটি চোখে পড়েছে বৈকি (১)। ও বস্তুটি কী তা প্রবাসীর পাঠকদের অনেকেরই জানা থাকবার কথা নয়, তোমার লেখাতে সে কাজটি হোলো। তুমি নোবেল প্রাইজ প্রসঙ্গে সাহিত্য বিচারের চেষ্টা করনি, বলনি কিপলিং যে প্রাইজ পান তা আবার রবীন্দ্রনাথ পান কি করে! এর উত্তর আমি জানি না যদিও প্রশ্নটা হয়েছে আমারি উদ্দেশে। কোন এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর এখানকার এক মাষ্টারমশাই সুহৃৎকে করেছেন। এও আমি জানি না নোবেল প্রাইজ আমাকে ওরা দিয়েছে কেন।

পরন্তু যাঁরা স্পেশাল চড়ে আসছেন (২) তুমি তাদের মধ্যে আছ না কি? ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) "প্রবাসী"র ১৩২০ / অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল প্রাইজ' প্রবন্ধ।

(২) ১৯১৩।১৩ই নভেম্বর কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি সংবাদ ঘোষিত হয়। ২৩শে নভেম্বর কলিকাতা হইতে বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি একটি স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন।

॥ ৮ ॥

শান্তিনিকেতন
[May, 1914]

কল্যাণীয়েষু,

অমল, প্রবাসীর পুস্তক সমালোচকদের মধ্যে তোমার আবির্ভাব হয়েছে শুনে কৌতুহল হোল। খুসী হতে পারলাম না। লেখকদের অক্ষমতা তার অপরাধ নয় এ কথাটা ভুলবে কেন? —কে অমন করে অপ্রস্তুত নাই করতে। ভাল বলতে না পার কটু বলবে কেন? সমাজপতিকে (১) আদর্শ কোরো না। তোমার সাহিত্যবিচার সহিষ্ণু হোক। ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "সাহিত্য"-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্য-সমালোচনাকশাঘাতে তদানীন্তন কালে তাঁহার দোসর ছিল না।

॥ ৯ ॥

শান্তিনিকেতন
[August, 1915]

কল্যাণীয়েষু,

অমল, প্রমথ (১) তোমার লেখা কেন ছাপেননি সে কথা আমার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা কর না কেন? আমার ভালো লেগেছিল বলে তাঁরও ভাল লাগবে এমন কথা নয়। সবুজপত্রের মানদন্ড ঠিক প্রবাসীর নয়। অজিতেরও (২) কোনো একটি লেখা চলেনি শুনেছি। ৮ই ভাদ্র ১৩২২।

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজার ছুটিতে কোথায় যাব জানি না। তার আগেই একবার এসো না কেন?

পত্র-পরিচয় :

(১) "সবুজপত্র"-সম্পাদক পরলোকগত প্রমথ চৌধুরী ('বীরবল')।

(২) অকালপরলোকগত বিশিষ্ট রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

॥ ১০ ॥

জোড়াসাঁকো
[Jan., 1916]

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের বেঙ্গলীতে (১) ফাল্গুনীর (২) যে আলোচনা বেরিয়েছে কেউ কেউ আমাকে বলচেন তা নাকি অজিতের লেখা। লেখাটা অজিতের, (৩) মতটা ব্রজেন্দ্রবাবুর, (৪) এমন কথাও উঠেছে। বিশ্বাস করতে পারচিনে। অজিত সেদিন এসেছিল কিন্তু তার সঙ্গে এ কথা বলবার সুযোগ পাইনি। তারপর আর তার দেখা নেই। সে নাকি বাসা বদলেচে। তুমি হয়ত জান কোথায়—তাকে পাঠিয়ে দিও। ইতি ২০শে মাঘ ১৩২২।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—এই মাত্র সুরেন দাসগুপ্ত (৫) এসেছিল। তার কাছে খবর পাওয়া গেল যে লেখাটা জিতেন বাঁড়ুয্যের (৬)। মিথ্যে রটনায় আমাদের কী আনন্দ কী আনন্দ দিবারাত্র! অজিতকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

পত্র-পরিচয় :

(১) দেশনায়ক পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক—"The Bengalee" সে সময়ে শ্রীঅমল হোম উক্ত কাগজের সহিত যুক্ত ছিলেন।

(২) ১৯১৬ সনে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নিরন্ন নর-নারীর সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জোড়াসাঁকো ভবনে "ফাল্গুনী" নাটক অভিনয় করেন।

(৩) পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তী।

(৪) পরলোকগত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

(৫) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত সচিব ও "বেঙ্গলী" পত্রিকার অন্যতম লেখক পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

(৬) পরলোকগত সুবিখ্যাত অধ্যাপক, লেখক ও বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'ফাল্গুনী'-অভিনয় সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী'তে যে সব মতামত প্রকাশ করেন, তাহা কবির মনঃপুত হয় নাই।

॥ ১১ ॥

জোড়াসাঁকো
বুধবার
[1917]

কল্যাণীয়েষু,

সেদিন মেয়েদের সভায় বৌমার বক্তৃতার (১) এক বিকৃত রূপ কাগজে বেরিয়েছে। ওটিকে ওরকম অপাংক্তেয় করলে ওর প্রতি অবিচার হবে। ভদ্র ইংরেজী বেশে ওকে বের করতে পার না কি? তুমি একটা খাড়া করে তুললে আমি দেখে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকের হাতে লেখাটা পাঠালাম।

পত্র-পরিচয় :

(১) ১৯১৭ সনে ভারতে হোমরুল আন্দোলন-নেত্রী মিসেস্ অ্যানি বেসান্টের 'ইন্টার্নমেন্ট'-এর

প্রতিবাদে কলিকাতার মহিলাগণের এক সভায় কবির পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী একটি ভাষণ দান করেন।

॥ ১২ ॥

6, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
[Aug. 1917]

কল্যাণীয়েষু,

কর্তার ইচ্ছায় কর্মের (১) যে তর্জমা তুমি করেচ ভালই হয়েচে। সুরেনকে (২) দেখতে পাঠিয়েছি। ওর হাতের ছোঁয়ায় আরো ভাল হবে জেনো।

কালিদাস (৩) এসেছিল। বিপিনবাবুর (৪) ভাল লাগেনি কেন তার কাছে বিশদ শোনা গেল। লাগবার কথা নয়। সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছেন যাঁরা তাঁদের চোখে বড় আলোর আঘাত মার্জনার অতীত এ বুঝতে কষ্ট হয় না। নারায়ণে (৫) প্রতিবাদ বের হচ্চে। না হলেই আশ্চর্য হতাম। ইতি ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

১। মিসেস অ্যানি বেসান্ট-এর 'ইনটার্নমেন্ট'-এর প্রতিবাদ প্রসঙ্গে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রাজনৈতিক ভাষণ—"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"। প্রবন্ধটি প্রথম দিন (৪ঠা আগস্ট। ১৯১৭) পঠিত হয় কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে, দ্বিতীয় দিন অ্যালফ্রেড থিয়েটারে।

২। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস তিনি ইংরাজিতে তর্জমা করিয়াছেন।

৩। ডক্টর কালিদাস নাগ।

৪। পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল।

৫। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"-এর প্রতিবাদে "বুদ্ধিমানের মর্ম" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

॥ ১৩ ॥

6, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
[Sept. 9 1917]

কল্যাণীয়েষু,

অমল, কাল প্রাতঃকৃত্য সেরেই চলে এসো এখানে—তোমাকে দৌত্যে নিযুক্ত করা হবে (১)। সুরেনকে (২) ডেকে পাঠিয়েচি আমার চিঠিখানা (৩) মুসাবিদা করবার জন্য। এসব ব্যাপারে ওর মুন্সীয়ানার পরে আমার নির্ভর একান্ত।

কাল তোমাদের ডেপুটেশন (৪) চলে যাবার একটু পরেই এলেন নীলরতনবাবু (৫) মিসেস বেসান্টের উপর তাঁর গভীর অনাস্থা। কৃকলাশপ্রবৃত্তিতে নাকি তাঁর জুড়ি মেলা ভার—ক্ষণে ক্ষণে নাকি রং বদলায় তাঁর। এদিকে সুরেশ সমাজপতি (৬) মতপরিবর্তন-প্রতিভায় আমাকে আমার চরিত্রচিত্রকর বিপিন পালের সমপর্যায়ে ফেলেছিলেন (৭) অতএব আমি যে বেসান্টের দিকেই থাকব এতে অসঙ্গতি কোথায়? যাহোক ডাক্তারবাবু (৮) খুবই বিচলিত। সেদিন রাত্রে যখন রামানন্দ বাবুর সঙ্গে মন্ত্রণায় গিয়েছিলাম তাঁরও সমর্থন পাইনে তুমি জান (৯)। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না। অর্জি মর্জিমতন করে ফেলেছি। আমি দলের মানুষ নই শুধু এই কথাটি জানিয়ে আমি চলবো (১০)।

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—

কাল তোমার বাড়ী ফিরতে দেরী হবে। বাগবাজার (১১) থেকে তোমাকে আবার আসতে হবে জোড়াসাঁকোয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অভুক্ত থাকবে না। বৌমা আছেন—ভোজ্যতালিকা থেকে কোন পদই বাদ যাবে না। চলে এসো নির্ভয়ে।

পত্রের পটভূমিকা :

১৯১৭।২০শে আগস্ট বিলাতের পার্লামেন্টের সমক্ষে তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতের ভাবী শাসনের কিঞ্চিৎ আভাস দেন। এই ঘোষণা প্রকাশিত হইলে দেশে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 'মডারেট' বা দক্ষিণপন্থীরা ইংরেজের দাক্ষিণ্যে খুশি। 'একস্ট্রিমিস্ট' বা বামপন্থীরা ভারতীয়দের হস্তে দেশের শাসনভার ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে দেওয়া হইবে এই সন্দিগ্ধ কৃপণের দান সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন। বামপন্থী দল কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, অন্তরীণাবদ্ধ (ইন্‌টার্নড) অ্যানি বেসান্টকে ডিসেম্বর (১৯১৭) মাসে কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রী করা হউক। দক্ষিণপন্থীদের আপত্তির কারণ যে, শ্রীমতী বেসান্ট রাজকোপে পড়িয়া অন্তরীণাবদ্ধ, তাঁহাকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিলে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতে পারেন—এই ছিল তাঁহাদের আশঙ্কা। নানা প্রকার ওজর-আপত্তি তুলিয়া মডারেট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গঠিত কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি বেসান্টের নাম সভানেত্রীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, অভ্যর্থনা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। বামপন্থী নেতারা রবীন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ কবিকেই কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হইয়া মিসেস্ বেসান্টকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসাইয়া বাংলার মান তাঁহাকেই রাখিতে হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বামপন্থী নেতাদের ডেপুটেশন আসিল। সে ডেপুটেশনের নেতা ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক ও আরো কয়েকজন। দীর্ঘ আলোচনা হইল। রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিতভাবে তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র মিসেস্ বেসান্টকেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা কর্তব্য কিন্তু ডেপুটেশনের সদস্যগণকে ইহাও বলিলেন যে, ১৯০৭-এ প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন ব্যাপারে মতভেদ ও মনোমালিন্য চরমে উঠিয়া সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন যেমন ভাঙিয়া যায়, তাহার পুনরাবৃত্তি যেন কলিকাতায় না ঘটে, কেননা কংগ্রেসের শত্রুদিগকে দলাদলির সুযোগ দিলে সেই মত দেখিয়া গ্রহণ করিয়া ভাববেন স্বরাজলাভে সুদূরপরাহত হইবে। ডেপুটেশনের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে, বামপন্থিগণ কর্তৃক গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদ তিনি গ্রহণ না করিলে মিসেস্ বেসান্টকে কোন মতেই কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি করা যাইবে না এবং তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যেন তিনি সে-পদ গ্রহণে সম্মতি দান করেন। কবি দুই দিন সময় চাহিলেন। সেই দিন রাত্রিতে তিনি তাঁহার একান্ত আস্থাভাজন বন্ধু 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী' সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। রামানন্দবাবু মডারেট ছিলেন, কিন্তু মিসেস্ বেসান্টের উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। কবিকে তিনি সেই কথা বলিলেন। দুইদিন পরে, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্রনাথ মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, যদি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের পদ সত্যই অর্থাৎ বিধি অনুযায়ী 'শূন্য' হইয়া থাকে এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং মিসেস্ বেসান্টকে সভাপতি পদে বরণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তবেই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণে ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু যিনি চেয়ারম্যান আছেন (পরলোকগত রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বা কোনো দলের নেতারূপে যেন তাঁহার নাম কোন রকমেই ব্যবহার করা না হয়। অভ্যর্থনা সমিতির বামপন্থী সদস্যগণ বৈকুণ্ঠনাথকে অপসারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দক্ষিণপন্থীরাও মিসেস্ বেসান্টকে সভাপতি করিতে সম্মত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে পুনরায় আসনে বসাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ ত্যাগ করিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকা এই উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন : "এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে।"

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পত্র-পরিচয় :

(১) মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্রখানি রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমল হোমের মারফৎ তাঁহাকে পাঠান। সেটি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ছাপাইবার জন্য মতিবাবু তাহার একখানি নকল করাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত পীযূষকান্তি ঘোষকে দিবার পর অমলবাবু—তাঁহারই নিকট শুনিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মূল পত্রখানি চাহিলে মতিলাল সহাস্যে বলেন—"ওরে পাগল এবার দেখছি চিঠিও লুঠ করবে"। মূল পত্রটি অমলবাবুর কাছে আছে। তাহার প্রতিলিপি "Calcutta Municipal Gazette"-এর Tagore Memorial Number-এ (Sept. 13 1941) ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা ছিল—

Calcutta
Sept. 10, 191 .

Dear Mati Babu,

With reference to our conversation when you and other friends kindly came and saw me on the morning of the 8th instant, it should be clearly understood that I am willing to be the Chairman of the Reception Committee of the Calcutta Congress only in the event of the seat being vacant and subject to the sanction of the All-India Congress Committee being given to the holding of the Congress in Calcutta and Mrs. Besant being its president. Please do not use my name in any way as a rival candidate standing against the present Chairman, or leading any party acting counter to the final decision arrived at by the All-India Congress Committee.

Yours sincerely
Rabindranath Tagore

(২) পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবির ভ্রাতুষ্পুত্র।

(৩) মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্র (উপরুল্লিখিত)।

(৪) রবীন্দ্রনাথের নিকট বামপন্থী নেতাগণের ডেপুটেশন। পত্রের পটভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(৫) পরলোকগত ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার।

(৬) "সাহিত্য-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

(৭) ১৩১৮। চৈত্র সংখ্যার "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চরিত্রচিত্র' প্রকাশিত হইলে পরের মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' প্রসঙ্গে সমাজপতি মহাশয় লেখেন যে, মতপরিবর্তন-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের ও বিপিনচন্দ্রের মধ্যে ঐক্য থাকায় বিপিনবাবু বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ঘন ঘন মত বদলানোর কথা উল্লেখ করিতে সংকোচবোধ করিয়াছেন!

(৮) ডাক্তার নীলরতন সরকার।

(৯) মিসেস বেসান্টের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যখন "প্রবাসী"-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে যান শ্রীঅমল হোম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

(১০) মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য।

(১১) "অমৃতবাজার পত্রিকা" কার্যালয়।

॥ ১৩ ॥

জোড়াসাঁকো
২৮।১২।১৭

ভাইজ

রথী তোমার কাছে কাল তোমাদের সঙ্ঘ-উৎসবের কথা (১) আজ সকালে চিঠিতে শুনলাম। আগাগোড়া শরীরটা অপটু ছিল—নইলে নিশ্চয় যেতেম তো কি। তোমার নীচে কাজের অবধি ছিল না, কালীবাবু দুর্গতিতে কেবল খাটতে হয়েছে। ডাক্তার মৈত্রের (২) কী দশা!

কংগ্রেসের প্রতিনিধি ডাকঘর দেখবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে (৩)। তোমার কাজ আছে। এসো তোমার হাঙ্গামা চুকলেই।

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) ১৯১৭।২৭শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে First All India Social Service Conference-এর অধিবেশন অনুষ্ঠানকারী শ্রোতা-দর্শকদের বিশৃঙ্খল আচরণে পণ্ড হইয়া যায়। দুইদিন পরে College Street Branch Y. M. C. A. হলে টিকিট লইয়া সভায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইলে অধিবেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

(২) বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী বা Bengal Social Service League এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীঅমল হোম এই কনফারেন্সের যুগ্ম কর্মসচিব ছিলেন।

(৩) জোড়াসাঁকোর 'লাল-বাড়ির' দোতলায় 'বিচিত্রা'র হলে দুইদিন "ডাকঘর" অভিনয় হয়—একদিন 'বিচিত্রা'র সদস্যদের জন্য ও আর একদিন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। শেষ দিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অ্যানি বেসান্ট, বালগঙ্গাধর টিলক ও মদনমোহন মালবীয়।

॥ ১৫ ॥

শান্তিনিকেতন
[1918]

কল্যাণীয়েষু,

স্বাধিকারপ্রমত্তের যে তর্জমা তুমি তোমার কাগজে (১) প্রকাশ করেছ তা দেখে খুসী হলাম। দেশকে আমরা সত্যই পাইনি তা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? কালীবাবুর (২) মতের সঙ্গে আমার মিল নেই। তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি এই যথেষ্ট।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) লাহোর হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র—"ট্রিবিউন"। শ্রীঅমল হোম তখন উক্ত পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক।

(২) ট্রিবিউন-সম্পাদক পরলোকগত কালীনাথ রায়।

॥ ১৬ ॥

শান্তিনিকেতন
(Postmark : 20 May 18)

কল্যাণীয়েষু,

এণ্ড্রুজের কাছে জানলাম তিনি তোমাকে প্রেসিডেন্ট উইলসনকে লেখা আমার চিঠির (১) একটি নকল দিয়ে এসেছেন সিমলায়। সেটি তোমার কাগজে (২) যেন ছাপানো না হয় এই নির্দেশ রইলো তোমার উপর।

শুনে খুসী হলাম সাহেবের কাছে যে কমান্ডেত তোমার প্রতিষ্ঠা তোমার নিজের যোগ্য আসনই পেয়েছে। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) ১৯১৮ সনের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এণ্ড্রুজ সাহেব বাংলার তদানীন্তন লাটসাহেব লর্ড রোণাল্ডশের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুর্লে সাহেবের সহিত কবির বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যান, কেননা তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ চলিতেছে। কথাপ্রসঙ্গে গুর্লে এণ্ড্রুজ সাহেবকে বলেন—সানফ্রানসিস্কোতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে কয়জন ভারতীয় যুবকের বিচার হইতেছে, তাহাদের কাগজপত্র হইতে নাকি জানা গিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ সেই ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গুর্লে আরো বলেন যে, কবির সম্বন্ধে এমন কথাও প্রচলিত যে, তিনি ১৯১৬ সনে জার্মানদের অর্থানুকূল্যে জাপান হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন। এই সব মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া কবি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন—আমেরিকায় যাইবার সংকল্পই পরিত্যক্ত হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে এই সর্বৈব মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি প্রেসিডেন্ট উইলসনকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার প্রতিলিপি এণ্ড্রুজের মারফৎ সিমলায় বড়লাট চেমসফোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিমলায় শ্রীঅমল হোমের সঙ্গে এণ্ড্রুজের দেখা হয়। কবির চিঠির নকল তিনি তাঁহাকে দেন।

(২) শ্রীঅমল হোম তখন লাহোর "ট্রিবিউন" কাগজের সম্পাদক কালীনাথ রায়ের প্রধান সহযোগী।

॥ ১৭ ॥

শান্তিনিকেতন
(March 1919)

কল্যাণীয়েষু,

অমল, ছুটি নিয়ে আসচো জেনে খুসী হলাম। (১) দুচার দিন এখানে কাটিয়ে যেয়ো। অনেকদিন দেখা নেই।

ঈশানে মেঘ ঘনিয়ে আসচে—কাজে হয়ে উঠতে দেরী নেই দেশে। ইতি ১৭ ফাল্গুন ১৩২৫

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) দিল্লীর লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্ব্লীতে তখন সবে মাত্র রাওলাট বিল পাশ হয়েছে। দেশময় প্রবল উত্তেজনা।

॥ ১৮ ॥

শান্তিনিকেতন
২৭।৫।১৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার চিঠি কদিন হোল পেয়েছি।

আজকের কাগজে দেখলাম ট্রিবিয়ুনে আবার বেরিয়েছে—তোমার হাতে (১)। খুসী হয়েছি কিন্তু শঙ্কা রয়েছে মনে। কর্তৃপক্ষদের কুটিল ভ্রুকুটি কাটেনি এখনো। সন্তর্পণে তুমি এই ভার বহন কর—এই আমার কামনা।

জেলে কালীনাথ রায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ সংবাদে উদ্বিগ্ন রয়েছি (২)। তাঁর মুক্তি প্রার্থনা করে মণ্টেগু (৩) ও লর্ড সিংহ (৪) দুজনকেই লিখেছি। ফলাফলের অপেক্ষা ছাড়া আর কি করবার আছে। ভরসা বেশি রেখো না।

শংকরণ নায়ার (৫) কি করলেন? ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করলে হয়তো ভাল হোত। তোমার বোধ হয় এখন সিমলা যাওয়ার সুবিধা হবে না। এণ্ড্রুজ কয়েক দিন পরে যাবেন। তারপর লাহোরে। তোমাকে জানিয়েছেন বোধ হয়। 'সাহেব' (৬) খেপে আছে। ও জানে পাঞ্জাবের কালিমা ইংরেজের কোনদিন মুছবে না।

আমার আশীর্বাদ জেনো।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-পরিচয় :

(১) ১৯১৯-এর পাঞ্জাব হাঙ্গামায় জঙ্গী-আইন-কবলিত "ট্রিবিউন" পত্রিকা প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকিবার পর আবার যখন বাহির হইল, তখন সম্পাদক কালীনাথ রায় মহাশয় জেলে। তাঁহার স্থান লইয়াছিলেন সহকারী-সম্পাদক শ্রীঅমল হোম।

(২) রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড দিয়া জেলে কালীনাথ রায়কে ঘানি পিষিতে দেওয়া হইয়াছিল—পাঞ্জাবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছোটলাট স্যর মাইকেল ও'ডায়ারের নির্দেশে। এইরূপ সশ্রম কারাবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে চিরদিনের মত নষ্ট হয়।

(৩) তদানীন্তন ভারত-সচিব বা সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—এডউইন স্যামুয়েল মণ্টেগু।

(৪) লর্ড [সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন] সিংহ তখন ছিলেন সহকারী ভারত-সচিব বা আণ্ডার-সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া।

(৫) স্যর শংকরণ নায়ার ছিলেন বড়লাট চেমসফোর্ডের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার।

(৬) রবীন্দ্রনাথ আদর করিয়া এণ্ড্রুসকে "সাহেব" বলিয়া উল্লেখ করিতেন—"চার্লি" বা "সার চার্লস" বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রাবণের ধারা ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে, জংগলের গাছপালাগুলো ধারা জলে স্নান করে উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে। চারিদিক নির্জন, কয়েকটি পাখী শুধু গাছের ডালে বসে স্নান করে নিচ্ছে। একটি মস্তবড়ো বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি বছর সাতেকের মেয়ে। বৃষ্টির জল তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলি বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ছে, ছোট্ট ডুরে শাড়ীখানি ভিজে গায়ের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে। মেয়েটি খুঁজছে একটি ওষুধের গাছ, বাগ্দিদের কাতির ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে পায়ের ফোড়াতে, কোন ওষুধে নাকি ভাল হচ্ছে না তার ফোড়া। মাকে লুকিয়ে দুপুরবেলা সে চুপিচুপি বলে এসেছে আমি একটা ওষুধ এনে দেব জঙ্গল থেকে, দেখিস্ ঠিক ভাল হয়ে যাবে তোর ফোড়া। কাতি যদিও একটু আপত্তি করেছিল ভরদুপুরে তার একা জংগলে যাওয়াতে। এবং মনে একটু সংশয়ও হয়েছিল, একটুকু মেয়ে ওষুধ জানে কী সত্যি। কিন্তু সংশয় ছিল না মেয়েটির মনে, তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বনের মধ্যে গেলেই সে দেখতে পাবে ফোড়ার ওষুধ কোনটি আর কাতিকে সেটা দিলেই কাতি ভাল হয়ে যাবে একেবারে। তারপর চুপ চুপি বাড়ী ফিরে মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই শুয়ে পড়বে বিছানায়। এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী থেকে বেরোনো তার ওপর আবার বাগ্দিপাড়া ঢোকা মা জানলে আর রক্ষে নেই তার। বাগ্দিরা তাদের এত ভালবাসে, কত কাজ করে দেয় তাদের তবু যে মার এত রাগ কেন তাদের ওপর এ সমস্যার সমাধান মেয়েটি অনেক ভেবেও করতে পারত না সেদিন। আর সবচেয়ে বিপদ ছিলো তার ওষুধে ওরাই যা একটু বিশ্বাস করত, নইলে বামুনপাড়া, কায়েতপাড়ার লোকেরা হেসেই উড়িয়ে দিত তার ওষুধের কথা। তার তাই বাগ্দিদের পাড়ার দিকেই ওর টানটা ছিল একটু বেশী, এবং তার ফলে মার কাছে শাস্তিভোগও কম করতে হয়নি তাকে।

হঠাৎ একটি ছোট্ট লতা চোখে পড়ল তার, দৌড়ে গিয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু কী শক্ত লতারে বাবা, কিছুতেই ওঠে না, তার নরম মেয়েটি মোটা সাদা ধবধবে হাত দুখানি লাল হয়ে উঠলো তবু ছেঁড়ে না লতাটা। এমন সময় হঠাৎ বজ্রপাত। একটা টোকা মাথায় দিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল প্রতিবেশী দিনুদা, "এই মনো, কী কচ্ছিস এই বৃষ্টিতে ভিজে? একা একা এলি কি করে এই বনের মধ্যে? এমন ডাকাত মেয়ে ত কোথাও দেখিনি বাবা, ভয়ডর বলে কিছু নেই তোর?" কাঁদ কাঁদ মুখে মেয়েটি এসে হাত ধরলো দিনুদার "এই লতাটা তুলে দাওনা দিনুদা"

কাল এগিয়ে চললো—কত ঢেউ এলো, কত ঢেউ চলে গেল ফিরে, সেই ছোট্ট মেয়েটির জীবনও এগিয়ে চললো কত উত্থান, কত পতন, কত পরিবর্তন নিয়ে, কিন্তু মানুষের সেবা করার ইচ্ছা, আর্ত মানুষকে নিরাময় করে তোলার ইচ্ছা তার মনে ধ্রুবতারার মত জেগে রইলো চিরদিন। একদিন সত্যিই ভালো চিকিৎসা করতে শিখলেন তিনি। তিনি নিজের চেষ্টায় শিখলেন, গরীব দেশের উপযোগী সহজ গাছগাছড়া দিয়ে চিকিৎসা। বেদে, বেদেনীদের সাহায্য নিয়ে প্রবীণ কবিরাজদের সাহায্য নিয়ে বনে-জংগলে ঘুরে ওষুধের গাছ লতা চিনে নিলেন। ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন কোথায় কী প্রাচীন গ্রন্থ আছে চিকিৎসা সম্বন্ধে। প্রাণপাত পরিশ্রম করে আয়ত্ত করলেন যন্ত্রণাকাতর মানুষকে নিরাময় করে তোলার বিদ্যা।

তারপর সারা জীবনভোর চললো এই চিকিৎসা, এই সেবা। একবেলার জন্য কোথাও বেড়াতে গেলেও জুটে গেছে একপাল রোগী। জোটানর ব্যাপারে অবশ্য নিজেই বেশী উৎসাহী ছিলেন। শিশি হাতে কারো যাবার উপায় ছিল না রাস্তা দিয়ে তাঁর সামনে, বলতেন, এ রোগ ত কঠিন নয়, নিয়ে এস অমুক পাতা, তুলো অথবা কিনে আন চার পয়সা ছয় পয়সার অমুক ছাল, সাত দিনে সুস্থ হয়ে যাবে রোগী। ওষুধের টাকাটা রেখে দাও রোগীর পথ্যের জন্য। পথ্য, ওষুধের চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। আবার রোগীবিশেষে বাড়ীতে রান্নাবান্না বন্ধ করেও পথ্য তৈরি করেও দিতে হত, নিজেদেরই সব কিনেকেটে। কোন রোগীর সেবা করার লোকেরও অভাব হত, তখন ছুটতেন সেবা করতে নিজেই নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে, ওরে বাবা সেবাই যে সবচেয়ে দরকার ওষুধের চেয়েও। তাঁর জীবনের এ ইতিহাস একবারে যা সংক্ষেপে লেখা অতি কঠিন ব্যাপার এবং এর জের চলেছে তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে পর্যন্ত। কত হতাশ রোগীকে যে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন তাঁর সেবা দিয়ে, চিকিৎসা দিয়ে, আশা উৎসাহ দিয়ে আজ তার সংখ্যা করা সুকঠিন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুরু। শত দুঃখ, শত আঘাত সত্বেও কেমন করে বেঁচে থাকার শক্তি লাভ করা যায়, সেই মন্ত্র দিয়েছিলেন তাঁর গুরু তাঁকে।

একবার যখন রবীন্দ্রনাথ বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি পাঁচন খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর। কিন্তু সে ওষুধগুলি বোলপুরে সংগ্রহ করা কঠিন ছিল বলে, রবীন্দ্রনাথ সেগুলি বোলপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই সম্পর্কে কয়েকখানি চিঠি নীচে ছাপা হ'ল। কি সরল বিশ্বাস আর নির্ভরতার সুর প্রত্যেকটি কথাতে। তুচ্ছ মানুষ আর তুচ্ছ বস্তু তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না, এই ছোট্ট কখানি চিঠি তার আর এক প্রমাণ।

ॐ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। আমার শরীরের ক্লান্তি ও দুর্বলতার জন্যে যে ওষুধের তালিকা পাঠিয়েছ তা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব। এ-জায়গায় সবগুলি পাওয়ার আশা করিনে।

তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—
১৫ চৈত্র, ১৩৪১

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু,

তোমার প্রেরিত ওষুধগুলি তোমার হাতের শুশ্রূষারূপে গ্রহণ করছি। আজ হতে যথানিয়মে সেবন করব। ওষুধগুলির পাঠাবার ভার তুমি নিয়েছ এতে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। এখান থেকে সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সাধ্য হোতো না। তুমি আমার কৃতজ্ঞচিত্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—৩০ চৈত্র, ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ॐ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে নয় মোড়ক ওষুধ [illegible] পাঠিয়েছিলে আজ তা শেষ হয়ে গেল। [illegible] আরো আমার প্রয়োজন আছে যদি আবার কিছু যদি পাঠিয়ে দিতে পারো তবে আবার ব্যবহার করব। তোমার [illegible] এই দায় চাপাতে হোলো কারণ এখানে এসব জিনিষ সংগ্রহ করা অসম্ভব। তুমি আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি—৬ বৈশাখ, ১৩৪২

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যুকে

তোমাকে করি না ভয়
জানি সুনিশ্চয়
জীবনের শেষ নয় বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে
ভাস্বর গরিমা এক আছে মহামৃত্যুর ওপারে।
(হিউ স্টুয়ার্ট)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-শ্বাসে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। শাখা-প্রশাখাময় একটা বিদ্যুৎ আকাশকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেবার পরই প্রচণ্ড শব্দ করে বজ্রপাত হল। তারপর আবার সব চুপ চাপ। তারপরই সোঁ সোঁ শব্দ করে' ঝড় এল। কামান-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল যেন সোনাটুঁপি গ্রামের প্রান্তে যে অরণ্যটা আছে তার গাছগুলো হাহাকার করতে লাগল। অরণ্যের পাশেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুটো শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাক বক উড়তে লাগল বিভ্রান্ত হয়ে। তারপর বৃষ্টি নামল। বেশ মুষল ধারে। ঝড়-বৃষ্টি দুটোই সমানে চলতে লাগল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল ক্রমশঃ। গাছের ডালপালা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাঠে। মনে হল মৃত সৈনিকের দল আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন। ঝড়-বৃষ্টি আর অরণ্য মিলে শব্দেরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল একটা। কখনও মনে হচ্ছিল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কাঁদছে। আর্তনাদের সঙ্গে খিকখিক হাসি, হাসির সঙ্গে হাততালি, হাততালির সঙ্গে ডম্বরু নিনাদ যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা আতঙ্কজনক। এতক্ষণ কোনও মানুষ দেখা যায়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল। বনোয়ারি বেরুল জঙ্গল থেকে। ছুটে বেরুল। যেন পালাচ্ছে। অদ্ভুত তার চেহারা। মুখময় প্রকাণ্ড গোঁফ। হাতে ব্যাগ। ফুল প্যান্টের উপর লম্বা ঝোলা কোট পরেছে একটা। পায়ে বুট জুতো। মাঠের মধ্যে পড়ে সে ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইতে লাগল। তার পিছনে কেউ ছুটছিল না, কিন্তু বনোয়ারির ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, তার যেন আশঙ্কা হচ্ছে কেউ তাড়া করে' আসছে তাকে পিছু পিছু। মাঠের অপরপ্রান্তে বাড়ী ছিল একটা। পোড়ো বাড়ি। বনোয়ারি সেই-দিকে দৌড়তে লাগল।

...পোড়ো-বাড়িটা নীলকুঠি ছিল এককালে। এখন ওটা স্থানীয় জমিদারের সম্পত্তি। জমিদার কলকাতায় থাকেন সুতরাং বাড়িটা পোড়ো-বাড়িই হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের বাড়ি, রেকাব গাঁথুনি, একেবারে পড়ে যায়নি। দেয়ালগুলো খাড়া আছে। কপাট-জানালা-গুলোও আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের কপাট-জানলা চোরে খুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তর-দিকের ঘরটা, দক্ষিণদিকের ঘরটা আর পূর্ব-দিকের ঘরটা ঠিক আছে। পূর্বদিকের ঘরটাই বড়। 'হলে'র মতো। তার সামনে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার উত্তরে আর দক্ষিণে ঘর।

বনোয়ারি ছুটতে ছুটতে এসে পূর্বদিকের ঘরের সামনের চওড়া বারান্দাতে উঠে হাঁপাতে লাগল। আর একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল পূর্বদিকের বড় ঘরটাতে। [illegible] কপাট বন্ধ করে' [illegible] পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। **উৎকর্ণ হয়ে** দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝড় বৃষ্টির **তুমুল** গর্জন হচ্ছিল, কিন্তু বনোয়ারি তা **শুনছিল না**. সে শোনবার চেষ্টা করছিল, **কারও পায়ের শব্দ** পাওয়া যাচ্ছে কিনা। গত সাত দিন ধরে' সে ওই পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে **চাইছে**, কিন্তু পারছে না। সোনাটুঁপির **জঙ্গলে** ঢোকবার পর আর সে শব্দটা **শুনতে পায়নি।** কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে **ছপছপ শব্দ** শুনেছিল। নিশ্চিত শুনেছিল, তার ভুল হয়নি। কিন্তু একবার মাত্রই শুনেছিল, আর শোনেনি। সে আশা করবার চেষ্টা করছিল, তবে কি **হাড়-**গিলা তাকে রেহাই দিলে?

খটে খটে করে শব্দ হল বারান্দায়। **চমকে** উঠে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি, **তার** শরীরের সমস্ত পেশীগুলো **শক্ত হয়ে উঠল।** কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঝড় জলের দাপাদাপি, আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল বনোয়ারি. ছরছর করে' জল-পড়ছে বারান্দায়. আর কোন শব্দ নেই। ছাগলের ডাকের মতো ওটা কি শোনা যাচ্ছে? এই ঝড়ে বৃষ্টিতে কারো **ছাগল** মাঠে বেরিয়ে পড়েছে নাকি! কিন্তু একটা **ছাগল** তো নয়। অনেক ছাগলের ডাক। **তারপর** বনোয়ারি বুঝতে পারল, ব্যাং ডাকছে! আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর

(শেষাংশ ৩০৯ পৃষ্ঠায়)

॥ পরিস্থিতি ॥

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

কয়দিন থেকে নেমেছে বৃষ্টি,
ভাসায়ে দিবে কি সকল সৃষ্টি,
বিধাতার এ কি কোপন দৃষ্টি
পড়িল মাথার 'পর।

ঝড়ে পড়িয়াছে খুঁটির বংশ,
লুপ্ত হয়েছে কুটির-অংশ,
চোখের সামনে হ'লো যে ধ্বংস
পাশের রান্নাঘর।

তিনকড়ি বাবু চিন্তাগ্রস্ত,
বামহাত খানা গণ্ডে ন্যস্ত,
হুঁকার পৃষ্ঠে দখিন হস্ত
ব্যস্ত ধূম্রপানে।

সারা রাত্তির জাগি অতন্দ্র,
বদন-লগন হুঁকার রন্ধ্র,
তাহারো ভিতরে জলদ-মন্দ্র,
গরজিছে টানে টানে।

হেনকালে গতি অতি-সদম্ভা
চরণ চালিয়া লম্বা লম্বা
বিপুলাঙ্গিনী গুরুনিতম্বা
উদিতা ভার্যা তথা।

না চাহে কর্তা, না নড়ে মূর্ধা,
ভাবিছে ভামিনী অশ্রুরুদ্ধা—
চলে গেছে প্রেম ছাড়িয়া হৃদ্দা,
তে হি নো দিবসাগতা!

বঙ্কিম দিঠি ক্ষণেক মাত্র
শানিয়া হানিয়া, ঝাড়িয়া গাত্র
কহিল গৃহিণী—"দিবস-রাত্র
হুঁকোটি করেছো সার।

এমনি ব'সে কি কাটাবে দিনটি,
না আছে আনাজ—আলু বা ভিণ্ডি—
কি দিয়া গলায় গলিবে পিণ্ডি,
ব্যবস্থা করো তার।"

মুখ তুলি তবে চাহে তিনকড়ি,—
গৃহ-মার্জনে আসে কিঙ্করী,
শিরে মল্লিকা, করে খিঞ্জরী,
সৃক্কে রক্তরাগ।

কহে বাবু ধরি একটি মুদ্রা,—
"দাসীরে পাঠায়ে দাও গো রুদ্রা,
আনে যেন দুটি চিংড়ি ক্ষুদ্রা,
আর কিছু কচুশাক।

"আনে যেন ভরি দেড়েক নস্য,
সজিনার ডাঁটা অতি অবশ্য
হবে যুগপৎ চর্ব্য চোষ্য
পোষ্য তো দুই জনা।"

ঝি-রে বলে—"কাঁচা টাটকা লঙ্কা,
এনো কিছু, নাহি করিয়ো শঙ্কা,
কুলাইয়া যাবে; লহ এ তঙ্কা—
চিংড়িটি ভুলিয়ো না।"

"দুটি চিংড়িই আনিব কর্তা,
খাইয়ো দু'জনে ভার্যা-ভর্তা,
দু'জনের পাতে তা গড়পরতা
পড়িবে একটি করি।"

এত বলি টাকা লইয়া হস্তে
সগরবে দাসী শশব্যস্তে
মুখ ঝামটিয়া চলিল গস্তে
সমুখের পথ ধরি।

শুনিল গৃহিণী বাজার ফর্দ,
ঝঙ্কারি বলে, "হে বলীবর্দ,
আগে হে জোয়ান, হে মোর মর্দ,
বাড়ি করো মেরামত।

"বাড়ি ঘর দেখে পেতেছে কান্না
আজ নাহি খাওয়া, নাহিক রান্না,
অনেক সয়েছি, সহিব আর না,
নাকে কানে দিনু খৎ।"

এত বলি ভাঙি প্রেমের ভিত্তি,
বচনে পতির জ্বালায়ে পিত্তি,
মদ-পদভরে কাঁপায়ে পৃথ্বী
পশিল সে গোঁসা-ঘরে।

সাজে সেথা ধনি নানান রঙ্গে—
মসীর দণ্ডে রচি ভ্রূভঙ্গে,
উজ্জ্বল রাগ নখর-অঙ্গে
অধর-ওষ্ঠ 'পরে।

বসনে ভূষণে করিয়া সজ্জা,
আলোড়ি পতির অস্থিমজ্জা,
রতি-রূপ-রসে দানিয়া লজ্জা,
বাহিরিল বাড়ি ছাড়ি।

ভার্যাটি তার চির অবশ্যা,
রীতিনীতি বুঝা ভার যে তস্যা,
স্বামিচিতে জাগে নানা সমস্যা—
ভাবনা হইল ভারি।

নিম্নবিত্ত সে যে দরিদ্র,
বহু দিন-রাতি গেছে অনিদ্র,—
হয়ে নিরুপায় নাসার ছিদ্র
দিয়াছে নস্যে ভরি'।

চিন্তার আর নাহিক অন্ত,
হ'য়ে নিরুপায় হন্তদন্ত,
গৃহে তালা দিয়া অতি তুরন্ত,
ভাবিছে পথের 'পরি ঃ

হেঁসেলের ঘর হয়েছে চূর্ণ,
মুটে বা মজুর আনিয়া তূর্ণ,
করিবারে হবে সুসম্পূর্ণ
এ কাজ সবার আগে।

পথে নাহি জনমানব চিহ্ন,
হেরি তিনকড়ি হইল খিন্ন,
কুকুর বিড়াল ছাগল ভিন্ন
কিছু নাহি পুরোভাগে।

প্রতি গৃহ চাবি-কলুপ বন্ধ,
সারা পল্লীটি নিথর স্তব্ধ,
একটি শ্রমিকও হ'লো না লব্ধ
তিনকড়ি ফিরে ঘর।

বসিয়া পড়িল আনত মুণ্ডে,
কলিকায় জ্বালি অগ্নিকুণ্ড,
হুঁকো মুখে রাখি আপন তুণ্ড,
এলায়ে দিল সে ধড়।

ভাবিতে লাগিল কী হ'লো অদ্য—
দেশটা শ্মশান হ'লো কি সদ্য!
ভেবে ভেবে আদি অন্ত মধ্য
নাহি পারে বুঝিবারে।

দেখে তিনকড়ি ঘুরায়ে অক্ষি,—
না ফিরেছে দাসী, না গৃহলক্ষ্মী;
চলে অগত্যা বাজার লক্ষ্যি'
কিঙ্করী খুঁজিবারে।

দ্যাখে বাজারের ফটক বন্ধ,
নাহি সেথা জনমানব-গন্ধ,
শুধু বসে বসে জনেক অন্ধ
আনমনে গাহে গান।

দেখিল হঠাৎ ঃ নয়ন-ঊর্ধ্ব
ছুটে একজন শ্বাস-নিরুদ্ধ;
শুধাইল তিনু হ'য়ে প্রবুদ্ধ—
"মশায়, কোথায় যান ?"

সে শুধু হাতের করিয়া ভঙ্গি,
ইঙ্গিতে বলে হইতে সঙ্গী;
চলে তিনকড়ি রাস্তা লঙ্ঘি'
পিছনে পিছনে তার।

ছুটিছে দু'জনে হইয়া ক্ষিপ্ত;
দেখিল অদূরে জনতা দৃপ্ত,
আসিয়া সেথায় দুজনে তৃপ্ত,
সার্থক স্বেদ-ধার!

জনতারণ্যে ইতর-ভদ্র
বাঙালী-বিহারী-আসামী-মদ্র
মাদ্রাজী আর উড়িয়া অন্ধ্র
সবে এক প্রাণ-মন।

এসেছে তিনুর সারাটি পল্লী,
হেরিল প্রিয়ার সে ভুজবল্লী,
হেরিল দাসীর খোঁপার মল্লী,
বাজারের জনগণ।

মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চ
তাহাতে সিংহ-আসন পঞ্চ,
প্রতি আসনের সমুখে খঞ্চ
পাঁচটি বরণ-ডালা।

মুড়াইয়া যত কুসুম-কুঞ্জ,
আসিয়াছে ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
ভকত-কণ্ঠে ভ্রমর-গুঞ্জে—
হাতে হাতে ফুল-মালা।

সহসা বাজিয়া উঠিল বাদ্য,
উপবাসী-চিতে মিলিল খাদ্য,
তরুণীবৃন্দ আসিল পাদ্য-
অর্ঘের নিবেদনে।

রচিয়া রম্য শোভা নিসর্গ,
মর্ত্য-উপরি সৃজিয়া স্বর্গ
বন্দে-চিত্রতারকাবর্গ
বসিল পঞ্চাসনে।

■ ——— ,

বঙ্গ সাহিত্যে নারী

মৈত্রেয়ী দেবী

বঙ্গ সাহিত্যে মেয়েদের দান সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা চলেছে। এর মধ্যে গত পঞ্চাশ বৎসরের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব থেকে কবিতার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সেই প্রসঙ্গে নারী সাহিত্যিকের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। বাংলা ভাষাকে কৃত্তিবাসের সময় থেকে মাইকেল পর্যন্ত যদি ছোট ছোট যুগে ভাগ করে আনা যায়—তাহলে দেখা যায় প্রত্যেক যুগেই মহিলা কবিদের কিছু কিছু দান আছে। এমন কি স্ত্রী শিক্ষার অন্ধকারতম যুগেও তা একেবারে শূন্য নয়।

এখানে আমরা রবীন্দ্রযুগকে কেন্দ্র করে মহিলা কবিদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। এক যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সুরু করে মাঝামাঝি সময়ে থেমেছেন, তাঁর সমসাময়িক, আর তাঁর সময়ে সুরু করে যাঁরা আজও লিখছেন। এর মধ্যে জীবিত লেখিকাদের রচনার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত সময়ে হবে না, তাছাড়া সে সাহসও নেই, কবিরা তা স্ত্রীই হোক কি পুরুষই হোক বড় স্পর্শকাতর! আমরা শুধু মহিলা রচনার ভাবধারার প্রবাহটি লক্ষ করব।

সাহিত্যসৃষ্টির ঊষালোকে কবিতার জন্ম। ভাবের প্রথম প্রকাশ কবিতায়, গদ্যে নয়—সমস্ত ঐতিহাসিক মহাকাব্যগুলি ছন্দোবদ্ধ—তার কারণ মনের আবেগ যখন প্রবল হয়ে প্রকাশের পথ খোঁজে তখন যুক্তিযুক্ত যথাযথ তথা গ্রথিত সংকীর্ণ পথে চলতে চায় না। সে অনুভবের শক্তিকে একত্রিত করবার জন্য বিচিত্র কল্পনার ও ছন্দের গতিকে আশ্রয় করে। সেই ছন্দাশ্রিত চিত্তশক্তিই মন্ত্রশক্তি। যেমন সমগ্র সাহিত্যের আদিতে কবিতা, তেমন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনেও অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় কাব্য দিয়ে সুরু। পরবর্তীকালে গদ্য সাহিত্য রচনায় যাঁরা পাকা হয়েছেন দেখা গেছে তাঁরা অনেকেই কবিতা দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। তার আরো একটা কারণ সার্থক কবিতা রচনার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন কম। লোকগীতিগুলির উৎকর্ষ ও মনোহারিতায় তার প্রমাণ। অনুভবের শক্তির তীব্রতা, আনন্দ বেদনার স্পর্শে স্পন্দিত বোর মত সূক্ষ্ম চিত্তন্ত্রীই কাব্যের ধ্বনি বাজিয়ে তুলে অন্য চিত্তে সমভাব ধ্বনিত করে তুলতে পারে। এই অন্তর্নিহিত কারণের জন্যই বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্র একেবারে রুদ্ধ ও অদৃষ্ট পাথরচাপা দেওয়া থাকলেও মাঝে মাঝেই আঁধারের মধ্যে হঠাৎ ফোটা ফুলের মত কবিমনের প্রকাশোন্মুখ অস্ফুট ভাবনা আলোকপ্রার্থী হয়ে ইতস্ততঃ ফুটে উঠেছে।

কিন্তু যতই না কেন কবিতার উৎস Subjective বা অন্তর্গতবিশিষ্ট হোক সমাজের পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে সে ছাড়া পেতে পারে না। কারণ মানুষের অন্তরে তো সমাজের বা প্রকৃতির আসঙ্গ ত্যাগ করতে পারে না। যে বিশেষ দেশে যে বিশেষ সমাজে সে জন্মেছে, যে মাটির তৈরী দেহ তার মনের ছাঁচ, সেই তো আকার দিয়েছে তার সত্তাকে। যেমন বাংলাদেশের কবিতায় autumn leaves-এর বর্ণনার কোন জোর হয় না তেমনি লণ্ডনের কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভভরা নবযৌবনা বরষার গৌরব বোঝা যায় না। শুষ্ক তৃষিত মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে প্রাণসুধাবাহী মেঘের আশ্বাস বাণী—শীতে কাঁপতে কাঁপতে কি বোঝা যায়। যেমন প্রকৃতি তেমনি সমাজ এই দুইদিকই সাহিত্যের গতি নির্ধারিত করে। তার জন্য যথোপযুক্ত পথ কেটে রাখে, কোথাও এঁকে বেঁকে ছায়াচ্ছন্ন ছোট গলি চলে, কোথাও প্রশস্ত উন্নত রাজপথ নূতন উদার স্বর্ণদ্বারের দিকে নূতন নূতন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে জয়কেতন উড়িয়ে যেতে আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের জন্ম থেকে বহু মহিলা কবির জন্ম হয়েছে—কবিপ্রাণ কবিত্বশক্তি ও অনুভবের তীব্রতা নিয়ে অনেক নারী জন্মেছেন। শক্তির তারতম্য থাকলেও তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে সুরু করলে সরোজিনী নাইডু পর্যন্ত অন্ততঃ ৫২ জন নারী কবির পাঠযোগ্য বই আছে। সরোজিনী নাইডু যদিও বাংলাভাষায় কবিতা লেখেননি—তবু তিনি বাঙ্গালী মেয়ে বলে তাঁর উপর আমাদের দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আরো প্রায় তিশ বছর ধরে আরো অনেক মহিলা কবি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছেন। এক সময় কবি যশঃপ্রার্থিনীর সংখ্যা একটু বেশীই হয়ে পড়েছিল। যাইহোক এখানে বিস্তারিতভাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মহিলা কবির উল্লেখ করে তাঁদের কাব্য আলোচনা করবার সময় হবে না। সংক্ষেপে আমরা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীকাব্যের গতি আলোচনা করব। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া বিশেষভাবে মহিলা রচিত সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনার কোন অর্থ নেই। কারণ সাহিত্যের কোন লিঙ্গ নেই—সে অকায়া অব্রণ, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

অল্পদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে শুধু মেয়েদের কেন সমগ্র সমাজেরই পরিসর ছিল সংকীর্ণ—পরিবার গ্রাম ও সংস্কারে বদ্ধ অচল মন ভাবের ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য মুক্তি পেলেও সমগ্র জীবনে তা প্রতিধ্বনিত করতে পারত না। সেক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থার ত কথাই নেই। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে গতিপথ মুক্ত করে দেওয়ার ফলে একটি সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার স্বাধীনতা ক্ষীণগতি নদীর ধারার মত নিজের জ্ঞান সমুদ্রের দিকে দ্বিধাভরে চলতে সুরু করেছিল। তারপর আজ একশ বছরের উপর হয়ে গেল অতি ধীরগতিতে সেই নদী মোহনার দিকে বিস্তৃত হয়ে এসেছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত পুরুষেরই উৎসাহে, উদ্যোগে, অক্লান্ত কর্মে সুরু হলেও বিস্ময় বোধ হয় যে, জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিকরা এ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও কম করেননি। একে ত মেয়েদের এমন অজ্ঞতা যে লোকচক্ষুর সামনে তাদের বইর পাতাটি খোলবার উপায় নেই, তার উপর হেমচন্দ্রের বাঙ্গালীর মেয়ের অপযশ কীর্তন adding insult to injury-র দৃষ্টান্ত। যে প্রথিত-

(শেষাংশ ২৯৫ পৃষ্ঠায়)

খবরটি হঠাৎ কানে এল। পাড়াপ্রতিবেশী মহলে এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। এ-বাড়ি ও-বাড়ির জানলা-দরজা খুলে গেল, এবং যেহেতু ওটা ছিল আপিস-ইস্কুলের বার, সেজন্য ভরদুপুরে জোয়ার এ পাড়ার অধিকাংশ মহিলারাই সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। নিত্যনিয়মিত যে-ঘটনা আশে-পাশে ঘটছে তারই একটি পুনরুক্তি মাত্র। কোনও এক রেবতীবাবু এই কাছাকাছি কোথাও এক নারকেলতলার কোন্ বস্তিতে কি যেন দুরারোগ্য এক রোগে ভুগছিলেন,—তিনি একটু আগে মারা গেছেন। তাঁর চিকিৎসাপত্র নাকি তেমন কিছু হয়নি, এবং শেষের দিকটায় তাঁর আহারাদিও নাকি জোটেনি। সবাই স্বীকার করবে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই ঘটেছে।

বিশেষ কাঁদল না কেউ। একবারটি বুঝি কোন্ এক মহিলা উঁকি দিয়ে দেখে এসেছেন,—গোলপাতার চালার ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে যেন কার অস্ফুট ফোঁপানি শোনা গিয়েছিল। ওর বেশি আর কিছু নয়। ও বাড়ির গিন্নি একবার নাকি সহানুভূতি জানিয়ে বলে দিলেন, আহা, বড় কষ্ট পাচ্ছিল, মরে বাঁচল!

তা হবে। এ সম্বন্ধে অধিকতর ঔৎসুক্য নেই কারও। উচ্চকণ্ঠে কান্নাকাটি শুনলে তবেই পারিপার্শ্বিক সমাজে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। কান্না নেই বলেই কৌতূহল নেই।

মহিলারা একটু হতাশ হয়েই যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তা ছাড়া আরেকটা কথা ছিল বৈ-কি। নারকেলতলার ওই বস্তি-পল্লীর আশে-পাশে ঠিকে-ঝিয়েদের সমাজে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে, সে সম্বন্ধে তেমন উদ্বেগও কারও কিছু ছিল না। পূর্বোক্ত রেবতীবাবু নাকি বছর দুই আগে কোন্ ছাপাখানায় হরফ সাজাবার কাজ করত। তা হবে। অমন অনেক অজানা জনের কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও নেই।

হাসি মুখে দেবরায় গল্পটা ধরেছিল। শীতের দিনে হাওয়া দিয়েছে সন্ধ্যার দিকে। পশ্চিমের একটি সহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে 'চাচাই' জলপ্রপাতের ধারে এসে দেবরায় তার দলবল সহ আড্ডা নিয়েছে সামনের সুন্দর ডাকবাংলোয়। ইঞ্জিনীয়ার, ওভারশিয়ার, সার্ভেয়ার এবং মুন্সী ইত্যাদি মিলিয়ে মোট বারোটি সাহেব। এখানে শীঘ্রই সেণ্ট্রাল পি ডবলিউ ডির নানা নির্মাণ কার্য আরম্ভ হবে। নিকটতম সহর হল রেওয়া।

সামনেই ফুলবাগান, এবং তারই ডানদিকে প্রায় তিনশ ফুট নীচে এখানকার সমতলভূমি পেরিয়ে একটি নদীর ধারা সগর্জনে নেমে যাচ্ছে। জনবিরল প্রান্তরে এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলে দৃশ্যটি মনোরম।

ডাকবাংলোয় রান্না-বান্নার মোগলাই আয়োজন চলছিল।

ছোট লাউঞ্জটিতে আরাম কেদারাগুলিতে বন্ধুরা সবাই বেশ গুছিয়ে বসেছিল। মাঝখানে টিপাইয়ের উপর পানাদির সরঞ্জাম সাজানো।—

... হ্যাঁ, ছুটি নিয়ে সেই সময়টায় বাড়িতেই ছিলুম,—দেবরায় তার গল্পের সূত্র ধরে বলল, সেদিন ওই দুপুরবেলা স্নানাদি সেরে সবে মাত্র খেতে বসব এমন সময় আমাদের ঠিকে-ঝি এসে খবর দিল, উক্ত মৃত রেবতীবাবুটির স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্। তাঁর কিছু আবেদন আছে। তাঁর বর্তমান সমস্যার কথা আমাকে শুনতে হবে।

বাইরের দিকে আসতে হল। আমাদের ছোট্ট ফটকটির সামনে যে বউটি একগলা ঘোমটা দিয়ে এসে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়েছে, তার মুখটি আমি দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু তার হাত-পায়ের স্বাস্থ্য-শ্রী ও বর্ণ দেখে বিশ্বাস করলুম, বউটি রূপবতী। আমি কোনও প্রশ্ন করার আগেই রাধুর মাসি বলল, মানুষ মরলেও ত তার খরচ আছে? খাট আসছে কোত্থেকে? খাট খরচ দিচ্ছে কে? হবিষ্যি করার পয়সা নেই! নতুন কাপড় না কিনলে চলবে না। এ ছাড়া নমো নমো করে ছেরাদ্দটাও ত সারতে হবে! তাই এসে আপনার কাছেই ওকে হাত পাততে হচ্ছে। আপনি যা হয় কিছু একটা ব্যবস্থা করুন, বাবা। আমি গিয়ে মড়া তোলবার লোক ডেকে আনি। ছনু পালের দোকানে ওদের যেন কে চেনাশোনা লোক আছে,—দেখিগে একবার।

বউটি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আমি ত সাধ্যমতো যৎকিঞ্চিৎ এনে রাধুর মাসির হাতে দিলুম। বউটি হেঁট হয়ে আমাকে নমস্কার জানিয়ে যখন পিছন ফিরে চলল, আমি একবারটি ওর দিকে তাকালুম। শোকে তাপে বউটি অতিশয় জর্জর, একথা আমার মনে হল না। চলনের ভঙ্গীতে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য দেখে বরং আমার মনে হল, বউটি তেমন একটা কিছু আঘাত পায়নি! মৃত্যুর আগে বহু নির্বোধ স্বামী এই ধারণা নিয়ে যায়, বৈধব্যের আঘাতে তাদের স্ত্রীরা বুঝি একেবারে ভেঙে পড়বে! কিন্তু স্ত্রীরা যে বহু আগে থেকে তাদের কর্মপন্থা অনেকটা স্থির করে রাখে এটি তারা জেনে যায় না বলেই শান্তিতে মরে!

কথাটা শুনে মুন্সী মথুরাপ্রসাদের সঙ্গে ত্রিবেদী সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। দুচারজন বন্ধু দেশী হুইস্কির গ্লাসে হাসিমুখে চুমুক দিয়ে বাদাম-ভাজা মুখে তুললেন। আসরটা বেশ জমে উঠেছিল।

শ্রাদ্ধশান্তির পর রাধুর মাসি একদিন বলল, মেয়েটাকে যত ন্যাকাবোকা মনে করেছিলুম, ততটা নয়, বাবা—বুঝেছ?

প্রশ্ন করলাম, কেন বলত?

শুনুন বাবা তা হলে। আমরা বললুম, তিল-কাঞ্চন ছাদ্দ করছ, অন্তত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ডেকে খাওয়াও? —সুশীলা বললে,

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

ঠন্‌ঠনে বনাম তালতলা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সংস্কৃত কলেজের মহাসভা-কক্ষে
বসেছে বিরাট সভা, আছে এক পক্ষে
বৃথ যত লোকায়ত মত-অবলম্বী,
ষড়্‌দর্শনী দল ক'রে চলে তাম্বি
তাদের বিপক্ষে। ছিল [illegible]
মহামহোপাধ্যায় মেলে এক সঙ্গে।
মেলা মানে—দুই দলে মেলাই সে দ্বন্দ্ব
মেলে বটে দুদলের নস্যের গন্ধ!
লোকায়ত-নেতা নীলমণি ভট্টাচার্য,
প্রস্তাবে তাঁর সভা ধরিলেন ধার্য—
মীমাংসা হওয়া চাই [illegible] মধ্যে,
ত্রিষ্টুপানুষ্টুভ ছন্দে বা গদ্যে।
পনের মিনিটকাল প্রত্যেকে বলবে;
বাক্-ভূমা ভাল নয়, সুখ অল্পে।
ষড়দর্শনী-নেতা হলধর শর্মা
প্রকৃষ্ট দর্শনে [illegible]
হাতে লয়ে হুঁকোটি বলেন, [illegible]
কেঁপে ওঠে [illegible]।

রাত্রি যখন [illegible]
[illegible]-ঘড়ির ঘণ্টা
বেলা [illegible]
[illegible] এখনো রণটা।
বলে [illegible]
আমার [illegible]
"বৃথা বাগজাল, [illegible]
[illegible]রোধীরা ঘৃণ্য,
ঘৃতলোভী [illegible]
[illegible]-কর্ণচ্ছিন্ন।"
নীলমণি ন্যায়বাগীশ [illegible]
উঠিল মুক্তকচ্ছ,
বলিল, "ভণ্ডে শাস্ত্র বলে তার
দৃষ্টি স্ফটিক-স্বচ্ছ
পায় যে দেখিতে পরমাত্মায়
মূলে নাই যেথা, সেই না-পাওয়ায়;
মূঢ়ের চক্ষে ধূলি দেওয়াটাই
ভণ্ডের কুলধর্ম!
খোল নির্মোক, জানুক ত্রিলোক
প্রবঞ্চকের মর্ম।"

হলধর ছিল হুঁকোধর, ছোড়ে
হুঁকো নীলমণি লক্ষ্য,
ম্লেচ্ছ প্যান্ডিমোনিয়াম পশে
আর্যের সভাকক্ষ!
জীমূতমন্দ্রে হলধর হাঁকে,
"প্রহারো পাদুকা পশ্চাতের টাকে।"
নীলমণি হেসে কয়, "গর্দভ
হেরে গিয়ে কর চীৎকার!"
থামে কুৎসিত কোলাহল দিতে
সভাপতি সবে ধিক্কার।

ভায়াস ছেড়ে পণ্ডিতেরা রাগে গরগর করতে
করতে নেমে এলেন জুতো খড়ম চটি পরতে।
ভিতর-বাহির-কাঁপুনিতে আবিল ছিল দৃষ্টি,
এটা পরতে ওটা পরেন, ঘটান অনাসৃষ্টি।
ঠন্‌ঠনিয়ার কালো চটি হলধরের অভ্যাস,
রাগের মাথায় তালতলাতে পা ঢোকালেন যাই, খাস
মনে হ'ল ফিট করেছে। রংটা হোক্ না বাদামি,
শুক্তটা না হয় তোলা—লোকে করে অনেক গাধামি
মাথায় যখন রক্ত চড়ে বিষম রাগের বিকারে;
চণ্ডাল রাগ পরিত্যাজ্য, শাস্ত্রে আছে লিখা রে।

রাগে গুম্ হয়ে নীলমণি
মঞ্চে বসিয়া থাকে একা,
সেথা হতে নামিল যেমনি
দেখিল হইয়া ভ্যাবাচ্যাকা
তালতলা চটির বদলে
একজোড়া ঠন্‌ঠনে চটি
এক ভাঁড় অমৃতের স্থলে
যেন হলাহল এক ঘটি।
বেয়ারা হদিস দিল তায়—
চটি তার যে ছাড়েছে হঁকো—
অগত্যা ঠন্‌ঠনে পায়
যায় তালতলা-ঘরমুখো।

ঠনঠনেতে হলধরের বাসা
পাঁচ মিনিটে হয় যে যাওয়া-আসা
কলেজ থেকে; অনেক কষ্ট ক'রে,
আজকে ফেরেন জীয়ন্তে প্রায় ম'রে।
নিঝুম পাড়া, গভীর তখন রাত,
গিন্নী জেগে—সামলে বাড়া ভাত।
চটি খুলে খাটের তলাটাতে
কর্তা সটান ওঠেন গিয়ে ছাতে।
গিন্নী বোঝেন গতিক ভাল নয়,
পুত্র সুদর্শনও পেল ভয়।
কী জানি কী ঘটল অঘটন—
ঠান্ডা হাওয়ায় ঠান্ডা যদি হন।

হঠাৎ ওঠেন গর্জিয়া অসংস্কৃত ভাষা—
বলেন, "ছুঁচো নীলমণিটা আকাট গাড়োল চাষা!
প্রিন্সিপালের নাই পেয়ে ওর খুব বেড়েছে বাড়,
দেখব বাছাধনের কাঁধে শক্ত কত হাড়!
ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি পাজী হারামজাদা—"
বাজলো ফোন, নীচে গিয়ে ধ'রেই শোনেন, "দাদা,
এতকাল তো তোমায় জানি স্রেফ ঘটিচোর ব'লে,
আজকে পেলে নতুন খেতাব চটি চোরও যে হ'লে!"
"কী বল্‌লি বৌদ্ধক বাঙাল, আমি চটি-চোর?
মোদক খেয়ে বুঁদ হয়েছিস, হুঁস নাইকো তোর
আয় চ'লে আয়, দেখিয়ে দেব চটি কাকে বলে!"
নীলমণি কয়, "তাকিয়ে দেখ আপন পদতলে।"
হলধরের হঠাৎ হ'ল বুদ্ধি পরিষ্কার,

(শেষাংশ ৩০৪ পৃষ্ঠায়)
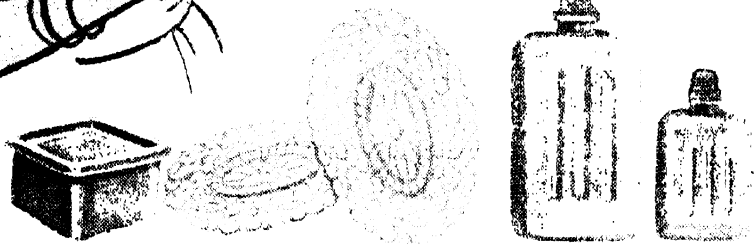
কলিকাতা ইণ্টালী নিবাসী দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের গৃহে
পূজিত দুইশত বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা।
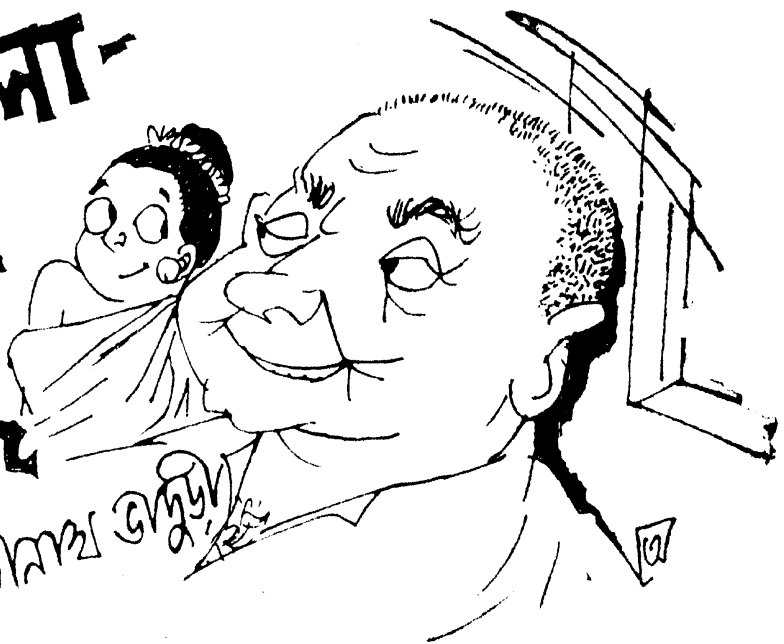
শিল্পী শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার কর্তৃক অঙ্কিত।

অসম্ভব ভিড় থার্ড ক্লাস গাড়ীটিতে। আসাম থেকে সাঁওতাল কুলিরা বাড়ী ফিরছে। এদের লাঠি, ঝুড়ি, বস্তা, ভার বইবার বাঁক ইত্যাদি থেকে জানা-অজানা জিনিসের মধ্যে কোনোমতে হেঁটে, প্রতিকূলে বাঙ্কের উপর পা ঝুলিয়ে বসবার জায়গা করে নিয়েছি। চোখের উপর আবার এক আলো। খুব পোকা উড়ছে। বাঙ্কের উপর বসবার জায়গা পেয়ে ভেবেছিলাম তিন ঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, কিন্তু যা ভাবা যায় তা কি হবার জো আছে এ পৃথিবীতে। পোকাগুলো এক মিনিটের জন্যও নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না। জামা কাপড়ের বাইরের দিকটা এদের কেন যে অপছন্দ, বুঝি না! এসবের উপর আবার আছে শালপাতার বিড়ির দম-আটকানো ধোঁয়া। ধোঁয়া চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে না বেরিয়ে ছাতের দিকে কেন ওঠে তার বৈজ্ঞানিক কারণটা ভেবে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছি; এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল। আমার ঠিক নীচে বেঞ্চের উপর যে সাঁওতাল স্ত্রীলোকটি বসেছে সে-ই শালপাতার বিড়ি খাচ্ছে। বিড়িতে টান মারবার পর, ঘাড় উলটে, মুখ বাঙ্কের দিকে তুলে, ঠোঁট ছুঁচালো করে, ধোঁয়ার পিচকারি ছাড়ছে আমার দিকে লক্ষ্য করে; আর অন্য কার দিকে চেয়ে যেন দুষ্টুমির হাসি হাসছে। আমি দেখছি বাঙ্কের কাঠের ফাঁক দিয়ে। তাই বুঝতে পারলাম না ওপরের ব্যক্তিটিকে। তবে এরা যে ইচ্ছা করে আমাকে জ্বালাতন করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। কিছু বলবার সময় পেলাম না। তাকে তাকে থাকলাম, হাতেনাতে ধরবার জন্য। যথা সময়ে নীচের সাঁওতালনীটা আমার বাঙ্কের দিকে আর একদফা ধোঁয়া ছাড়তেই তাড়া দিয়ে উঠি—"আয়! ও কি হচ্ছে!"

ভয় পেয়ে গিয়েছে স্ত্রীলোকটি।

বেঞ্চের অন্যদিক থেকে একজন শিখিয়ে দিল তাকে কথাটার কি জবাব দিতে হবে।

"বল—কাঁচা প্যাসেঞ্জারকে ধোঁয়া দিয়ে পাকানো হচ্ছে!"

"চোপ রও! মুখ সামলে কথা বলবে!" মাথা গরম হয়ে উঠেছে আমার। ধমক দেবার সময় বাঙ্কের থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে, সেই ফাজিল লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হল। কম্পার্টমেন্টের ওদিকটার সবাই সাঁওতাল-সাঁওতালনী—কেবল এই লোকটি বাদে। মাথা কামানোর পাঁচ সাত দিন পরে যেমন হয়, সেইরকম ছোট ছোট করে মাথার কাঁচা-পাকা-মেশানো চুলগুলো ছাঁটা। গোঁফ-দাড়ি এত পরিষ্কার করে কামানো যে মনে হয় এর আগের জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নাপিতকে দিয়ে এ কর্ম সমাধা করা হয়েছে। বেশ তেল-চকচকে চেহারাটি। প্রথম দর্শনেই কেন যেন মোগল অন্তঃপুরের প্রহরীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পাকা চুল না দেখলে এর বয়সের আন্দাজ পাওয়া শক্ত হত। লোকটা খৈনি ডলছে। ওর গায়ের উপর হেলান দিয়ে একটি সাঁওতালনী ঘুমোচ্ছে। সাঁওতাল নয়, অথচ ওরে সাঁওতালদের দলের মধ্যের একজন, একথা লোকটির ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়। পথে হঠাৎ দেখা হওয়া যাত্রীর সঙ্গে এরকমের অন্তরঙ্গতা সম্ভব নয়—বিশেষ করে সাঁওতালদের। চেনা চেনা লাগছে মুখখানা।

"বাঙ্কের থেকে ঝোলানো পা দুখানা কেটে না নিয়ে, ওতে যে ধোঁয়া দিচ্ছে এই আপনার ভাগ্যি। আসুন! খৈনি চলবে আপনার?"

চোখ মুখে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের হাসি ভঙ্গী। গায়ে হেলান-দেওয়া ঘুমন্ত সাঁওতাল মেয়েটিকে কান ধরে ঠেলে সরিয়ে, সে খৈনি-ভরা হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

সেই মুহূর্তে তাকে চিনেছি।

তাচ্ছিল্য দেখাবার এই ভঙ্গী আমার অতি পরিচিত। একটি রাজনৈতিক পার্টির অফিসে তখন আমরা থাকি। একবার একজন বড় নেতা এসেছিলেন আমাদের অফিস ইন্সপেকশন করবার জন্য। নিজের কাজ আরম্ভ করবার আগেই নেতাসুলভস্বরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'গ্রামে এত কাজ। আপনারা করেন কি অফিসে বসে বসে?'

ও তখন সম্মুখে বসে খৈনি ডলছিল। ঠিক এইরকম তাচ্ছিল্যভরা হাসি মুখে এনে ও জবাব দিয়েছিল—বাবু মোহন্তগিরি। আপনিও মঠের মোহন্ত, আমরাও মঠের মোহন্ত। অন্ধ ভক্ত, যজমান এনে দেয় চাল-কলা, তাই লুটেপুটে তো খাওয়া! এই নিন! আসুন! ও আপনারা বুঝি ধোঁয়াপ্রেমী লোক—খৈনি চলে না? কিন্তু যাই বলুন 'লীডারজী', এ শালা তামাকের নেশার যতই রকমফের করুন, ইনি কিছুতেই দেহের মধ্যে টেকেন না। এঁকে বার করে দিতেই হবে। সিগারেট, তামাক খান, ধোঁয়া বার করতে হবে; জরদা, দোক্তা, খৈনি খান থুতু ফেলতে হবে; নস্যি নেন, নাক ঝাড়তে হবে।'...বলে হাসতে হাসতে এক টিপ খৈনি ঠোঁটের নীচে পুরেছিল।

এই ছিল ওর ধরণ। ওকে চিনতে কি কখন ভুল হয়,

"ও তুমি! নাটোয়ার লাল! কোত্থেকে? কোথায় আজকাল? কোথায় যাচ্ছ?"

"ও আপনি! বলতে হয়।"

সে হেসেই আকুল। হাসির দমকে ভুঁড়ির উপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

যার সেকালের প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণগুলো আজও আমাদের রসের খোরাক জোগায়, সেই সব পুরনো অতিকথার রহস্যময় নায়ক আজ সশরীরে আমার সম্মুখে। সেকালে প্রত্যহ ওকে আমি ঈর্ষা করেছি; আজও করলাম।

"নাটোয়ার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বিশ বছরের উপর হবে, না?"

সে আমার কথার জবাব দিল না। সাঁওতালনীটার চোখের ঘুমের ঘোর এখনও যায়নি। ঢলে ঢলে পড়ছে তার গায়ের উপর।

"দ্যাখ একবার এর কাণ্ড!"—বলে নাটোয়ার সাঁওতালনীটার কনুইয়ের উপরটা খাবলা মেরে ধরে বেশ করে ঝাঁকিয়ে দিল।

এই হচ্ছে চিরকালের পরিচিত নাটোয়ার লাল। সকলেই তাকে বিশ্বাস পায়। সাঁওতাল পুরুষেরা সুদ্ধ তার আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করছে না।

তার সে ক্ষমতা দেখছি এখনও আছে। সেকালে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশবার তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হতাম। হাবভাবের ধরণ ছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। কান ধরে টেনে, হত কথাবার্তার আরম্ভ। তারপর গল্প করবার সময় মধ্যে মধ্যে কনুইয়ের উপরের দিকে হাতের কোন অংশ খামচে ধরত। কথাবার্তার বেশীরভাগই ইতর রসিকতা এবং কথার সুর ছিল বিদ্রুপের। মজা হচ্ছে, যে বয়স নির্বিশেষে মেয়েরা তার এই ভাবভঙ্গী পছন্দ করত, আর পারলে পরেই পাল্টা জবাব দিত, তার গোঁফ আর ভুঁড়ি খামচে ধরে। উভয় পক্ষেরই সহজ সপ্রতিভ ভাব। মেয়েরা কখন নাটোয়ারকে দেখে লজ্জা বোধ করেনি। আর নাটোয়ারের মনেও কোনদিন দ্বিধা কুণ্ঠার স্থান ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য যে, মেয়েদের স্বামী পুত্রদের কোনদিন এর জন্য বিরক্ত হতে দেখিনি। অবশ্য আমি বলছি সাধারণ স্তরের মানুষদের কথা। সে নিজে লেখাপড়া শেখেনি; তার গতিবিধিও ছিল গরীব চাষী মজুর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা নিত্য দেখতাম, মেয়েরা বিনা পয়সায় অফিস কম্পাউণ্ডের চোরকাঁটা পরিষ্কার করতে, বা দেয়ালে মাটি লেপতে আসত, শুধু তার সঙ্গে একটু ফষ্টি নষ্টি করবার লোভে।

শুধু যে পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকদের উপরই তার প্রভাব খাটত তা নয়। একবার মনে আছে, ইলেকশান'এর মরসুমে আমরা এমন একটা বাজারে পৌঁছেছিলাম, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে আমাদের খেতে দেবার মত একজনও লোক ছিল না। আমাদের হাতে সেদিন পয়সা নেই; আতিথেয়তার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করেই আমরা বেরিয়েছিলাম। বাজারের বাইরের তাঁবুর বাসিন্দা এক রূপোপজীবিনীর কাছ থেকে, নিজের পদ্ধতি প্রয়োগ করে, নাটোয়ারলাল একটা টাকা আদায় করেছিল, আমাদের খাওয়ার জন্য। কি বলেছিল, শুনিনি, তবে হাসতে হাসতে প্রথম সম্ভাষণ করে যে তার কানটা ধরে নেড়ে দিয়েছিল, তা' আমরা একটু দূর থেকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম। সেদিনও ওর উপর হিংসা হয়েছিল।

কোন্ গুণে স্ত্রীলোকরা তাকে ভালবাসত ও এমন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করত, সে কথা আমি কোনদিনই ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে নাটোয়ারলালকে জিজ্ঞাসা করলে সে হাসতে হাসতে বলত,—কান মললেই দেখবেন ওদের মন গলবে।'

সাঁওতালদের সঙ্গে একটা কি যেন রসিকতা করে, এখনও হাসছে নাটোয়ারলাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন আছ কোথায়?"

"চা-বাগানে। এদের সঙ্গে। নীলজানি টি এস্টেট।"

"মজদুর মোর্চায়?"

জোরে জোরে হাসতে হাসতে সে বলল—"হ্যাঁ—শ্রমিক সেবা। পৃথিবীসুদ্ধ কোটি কোটি লোক অষ্টপ্রহর সেবা করে চলেছে অপরের।"

আঙুল দিয়ে নিজের ভুঁড়িটা দেখিয়ে দিল সে।

"ওখানে চলছেত বেশ?"

"আপনাদের আশীর্বাদে।"

"কান মলে এদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করছতো?"

"সে দরকার হয় না। এদের মধ্যে থাকি বলে কোম্পানি দরকার পড়লে কিছু কিছু দেয়। মজদুর মোর্চা বাবা—ছেলে খেলা নয়!"

তার হাসির গমক গাড়ীসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শ্রমিক-সেবার কাজ করে, অথচ কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নেয়, এ সংবাদে আমি বিস্মিত হইনি। কেন না এসব বিষয়ে তার নীতিবোধ কোনদিনই বিশেষ ছিল না। পার্টি অফিসে থাকবার সময়ও দেশের রাজনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি। একবার মনে আছে একটা সেফটি-রেজর নিয়ে ঝগড়া হবার পর সে কিছুদিনের জন্য চলে গিয়েছিল অন্য একটা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে।

একজন সাঁওতাল বলল "সাহেব ম্যানেজার নাটোয়ারলালকে খুব ভালবাসে। এবার ওকে একটা লম্বা-কোট করিয়ে দিয়েছে। গরম কোট।"

"ওভারকোট?"

নাটোয়ারলাল হেসে স্বীকার করে "হ্যাঁ।"

সেকালে প্রতি 'ইলেকশান'এর সময় ধনী-পদপ্রার্থীদের কাছ থেকে সে একটা করে গরম ওভারকোট আদায় করত। বছরের মধ্যে পাঁচ মাস সেই ওভারকোটটা চব্বিশ ঘণ্টা পরে থাকত। সেই জামা গায়ে দিয়ে, হাতে একখানা পুলিসের ছড়ি নিয়ে, সে সকালে বিকালে বেড়াতে বার হত। আমরা বলতাম ট্যাক্স আদায় করতে বেরিয়েছে। কোনদিন কাগজি-লেবু, কোনদিন আতা, কোনদিন তামাকপাতা, কোনদিন পেয়ারা, একটা না একটা কিছু সে প্রত্যহ আদায় করে আনত মেয়েদের কাছ থেকে। পয়সা নেবার অপবাদও মধ্যে মধ্যে কানে এসেছে।

একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোক বলল—"মেম সাহেবই সাহেবকে বলেছিল ওর গরম জামা তয়ের করিয়ে দেবার কথা।"

"তাই নাকি?"

আমার সঙ্গে সঙ্গে নাটোয়ারলালও হাসছে।

"নাটোয়ার, মেমসাহেবগুলোর কান ঠাণ্ডা না গরম হয় রে?"

"জানবার সুযোগ হয়নি আজও।"

কথার ইঙ্গিতটুকু ধরতে না পেরেও সাঁওতালরা আমাদের হাসিতে যোগ দিয়েছে।

"মনে আছে সেই একুশ বছর আগে—"

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে— 'আপনি কি আজকাল কয়লাখনির মজুরদের মধ্যে কাজ করেন?'

"না তো। তোমার এ ধারণা হল কোথা থেকে?"

"আপনার গায়ের রঙটা দেখছি আজকাল একেবারে কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছে কি না, তাই মনে হল।"

হাসির দমকে তার ভুঁড়ি কাঁপছে। তার সঙ্গিনীরাও না বুঝে হাসছে।

"বেশ আছ তুমি নাটোয়ারলাল।"

"ছিলাম তো বেশ; কিন্তু এই জংলী মেয়েটা আর থাকতে দিচ্ছে কই!"

ঘুমকাতরে সাঁওতাল মেয়েটাকে সে কান ধরে সোজা করে বসিয়ে দিল।

"মনে আছে নাটোয়ার সে-ই......"

নাটোয়ার হঠাৎ মেয়েটার কনুই-এর উপরটা ধরে দাঁড় করিয়ে দিল—"ঘুমচ্ছে! যা, বাবুর পায়ে প্রণাম করে আয়। বড়কা লীডার।" শুধু মেয়েটা নয়, সব সাঁওতালরাই আমাকে প্রণাম করল একজন বড় নেতা ভেবে।

"আচ্ছা নাটোয়ার, তুমি কি চা-বাগানের মজদুর-মোর্চার মহিলা ইনচার্জ নাকি?" সে হো হো করে হেসে ওঠে। মাথা নাড়িয়ে সে জানাল যে আমি ধরেছি ঠিক। আমরা কথা বলছি একুশ বছর আগেকার আমাদের মধ্যের সাঙ্কেতিক ভাষায়। সাঁওতালরা সে ভাষা বুঝবে কি করে।

সেকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর অভাব ছিল। অথচ গরীব শ্রেণীর লোকের মধ্যের নানারকমের স্ত্রীলোকঘটিত 'কেস' সালিসীর জন্য প্রত্যহ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ত। এগুলো আরও বেশী আসত, লোকজনের সঙ্গে নাটোয়ারলালের পরিচয়ের ফলে। ওই সব বিষয়ে তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। বিকালে ওভারকোট পরে ট্যাক্স আদায় করবার সময় ওইসব সংক্রান্ত বহুরকমের খুচরা খবরও মেয়েদের কাছ থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসত সে। সাধারণ গরীব লোকদের মধ্যে তার খাতির ছিল খুব; তাই সবাই তাকে সালিস মানতে রাজী। কাজেই আপনা থেকে এসব কাজের ভার এসে পড়ত তার উপর। শেষকালে একদিন আমরা সবাই মিলে ওকে স্থানীয় পার্টির মহিলা বিভাগ ইনচার্জ করেদিলাম। সকলে সংক্ষেপে ওকে বলত মহিলা ইন-চার্জ। ও খুব খুশী এই নামে। মহিলা ইন-চার্জ পদে বহাল হবার দিন আমরা

(শেষাংশ ২২০ পৃষ্ঠায়)

চৈত্র মাস। দখিন-দ্বার ঠেলে উদার বাতাস নাচতে নাচতে এসে সকলকে তার সঞ্জীবনী স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে. আর সেই ছোঁয়াচ পেয়ে কিংশুকের মুখ উথলে উঠে লালিমায় তার অঙ্গ ভরে উঠেছে, শিমুলের কর্ণমূলে পর্যন্ত সারা মুখখানা লালে-লাল আর কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া আহ্লাদে গলে পড়ে—প্রিয়তমের জন্যে তাদের আঙিনায় রাঙা আসন বিছিয়ে দিচ্চে। এ হেন সময়ে 'বসন্ত-বাউরী'র যে কিসে 'চোখ গেল'—তা বলা শক্ত—যখন দিকে দিকে বসন্তের ঢেউ এমনি কোরে খেলে যাচ্চে।

সে ঢেউ গ্রাম ছেড়ে সহরেও এসে লেগেচে। কোলকাতা সহরে। সহরের বসন্ত-চিকিৎসকরা বৎসরান্তে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠচে। তাঁদের পুরোনো সাইনবোর্ডগুলো আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ব স্ব স্থানে শোভা বিস্তারের সঙ্গে লোকের মনে কিছু ভীতিরও সঞ্চার করচে। অলিতে-গলিতে, বস্তিতে-বস্তিতে অবাঞ্ছিত অতিথির আগমন আভাস সূচিত হচ্চে। সকলে সভয়ে ত্রস্ত।

আসন্ন সন্ধ্যা। শংকর বাড়ী থেকে বেরিয়ে খান চার-পাঁচ ভদ্র বাড়ী ছাড়িয়ে একটা জীর্ণ ও অভদ্র বাড়ীর মধ্যে ঢুকে, প্রবেশ-পথেই যে তরুণীটির সঙ্গে তার দেখা হোল, তাকে জিজ্ঞাসা করলো—"সন্ধ্যার সময় কোথা যাচ্চ, রাধু?"

"সন্দেশ খেতে।"

"কোথায়?"

"আপনাদের বাড়ী।"

"ওঃ! শুনেচ তা হোলে!"

এদের কথার সাড়া পেয়ে যে প্রৌঢ়া রমণীটি ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে রোয়াকের ওপর এসে

"এস বাবা। শুনে ভারি আনন্দ হোল। এইবার তা হোলে ল পড়বে ত? তুমি বাবা হীরের টুকরো ছেলে, তুমি যে পাস করবে, এ ত জানা কথা, বাবা!"

"রাধু বোধ হয় আমাদের বাড়ী আজ গেছল, মার কাছ থেকে শুনে এসেচে? হীরের টুকরো নয় খুড়ীমা, আপনাদেরই আশীর্বাদ"—বোলে শংকর জাহ্নবী দেবীর পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম কোরে বললো,—"কাকাবাবু ঘরে আছেন ত?"

"না বাবা, একটু আগে রাধুর জন্যে এক-জনকে বলতে গেলেন। মেয়েটার ত কোনও কিনারাই হোয়ে উঠচে না, দিন দিন ওর বয়সই বেড়ে যাচ্চে। খিদিরপুরে নাকি কে একজন ভালো ঘটক আছে, তারই কাছে গেলেন।"

"কে বল্লুন ত? জীবন ভট্টাচার্য না কি?

"তা হবে। হ্যাঁ, কি ভট্‌চার্যই বটে।"

"ওরে বাবা! ও'র দ্বারা ত হবে না খুড়ীমা! উনি ত এ রকম ভাঙ্গাচোরা একতলা বাড়ীর ঘটকালী করেন না। কম সে কম লাখ টাকার মালিক আর তেতলা বাড়ীর ছাড়া অন্য কারোর বিয়ের ঘটকালী উনি করেন না। ও'র নামই হচ্চে—বাইশতলী ঘটক।"

'তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, খুড়ীমা। হাজারের কম ত ও'নার ফীই নয়।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, খুড়ীমা।"

"তাই ত! মেয়েটার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাবা, আমাদের গলা দিয়ে যে আর ভাত গলচে না।"

"অত ভাবচেন কেন খুড়ীমা? রাধুর মত মেয়ে বড় একটা হয় না, ওর বিয়ে ভালো

বোলে রেখেছি। সেই বিজ্ঞাপনের দুজায়গায় কাকাবাবু চিঠি দিয়েছেন ত?"

"দিয়েচেন বোধ হয়। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ত অনবরতই চিঠি দিচ্চেন, ঠিক ত আর কোথায়ও হচ্চে না!"

"বিজ্ঞাপন দেখে ঠিক এ সব কাজ হয় না, অথচ এ ছাড়া উপায়ও নেই। যাকে, রাধুর বিয়ে ভালো জায়গাতেই হবে খুড়ীমা। আপনি অত ভাববেন না।"

"হ্যাঁ বাবা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলচ, উঠে এসে বোসো, আমি চা কোরে আনি।"

"না খুড়ীমা, এখন আর বসবো না, বিশেষ একটা কাজে যেতে হবে।"

শংকর চলে গেল।

* * *

"**পাত্রী চাই**—পাত্র পঃ বঃ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০) সরকারী কর্মচারী (২৬০) সুপুরুষ, কলিকাতায় নিজ বাটী গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী গৃহকর্ম-নিপুণা অন্ততঃ স্কুঃ ফাঃ পাত্রী। পাত্রী পছন্দে দাবী-দাওয়া গৌণ—বক্স নং কে, পি, আই ২৪৩।"

আজকের দৈনিকে প্রকাশিত 'পাত্রপাত্রী'র এই বিজ্ঞাপনটা আশুবাবু কয়েকবারই পড়েচেন, তথাপি আবার ওটা পাঠ কোরে রান্নাঘরে এসে স্ত্রী জাহ্নবী দেবীকে পড়ে শোনালেন। জাহ্নবী দেবী বললেন—"ছেলেটি কি পাস তা ত কিছু লেখেনি।"

"যে পাসই হোক, গভর্ণমেন্ট অফিসে ২৬০ টাকা মাইনেয় যখন চাকরী করে, তার ওপর কোলকাতায় নিজের বাড়ী—এ ত খুব ভালো পাত্র।"

"তা চিঠি একখানা দাও এইখানে। আর কোন ছেলের কথা নেই?"

উপযুক্ত এটা ছাড়া আর একটা আছে। সেটাও পড়ি, শোন—

'পাত্রী চাই—পাত্র (৩২) সম্ভ্রান্ত কাশ্যপ সুদর্শন, শিক্ষা বিভাগে কর্মে নিযুক্ত। সুশ্রী, সুগঠন, নম্রস্বভাব, অনূর্ধ্ব ২৩, মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রী। পত্রালাপ। কোনরূপ দাবী নাই। বক্স ডি, জে, এইচ ৩০১।'

জাহ্নবী বললেন—"এটিও নেহাৎ মন্দ হবে না। দাও, এদেরও একখানা চিঠি দাও। ছেলেটি কোথায় কাজ করে বুঝতে পারলুম না।"

এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট; স্কুল ইন্সপেক্টার হতে পারে, সরকারী কলেজের প্রফেসার হতে পারে, কিংবা ঐ ধরণের বড় অফিসারও হতে পারে।"

"মাইনে কত পায়, তা কিছু লেখেনি।"

"তিনশোর কম হবে না বলেই ত মনে হয়। কেন না, শিক্ষা বিভাগে যদি স্কুল ইন্সপেক্টার হয় কিংবা কোন সরকারী কলেজের প্রফেসারও হয়, তা হোলেও...

"এ দুটো ছাড়া আজকের কাগজে আর কোনও খবর নেই?"

"আর দু-একটা আছে বটে, কিন্তু সে সব হবে না।"

"কালেজে-পড়া মেয়ে চায় বোধ হয়, না হয়ত বেশ কিছু দাবী-দাওয়া আছে,—তাই হ?"

"ঠিক তা নয়, একজন চায়—মেয়ে ম্যাট্রিক হলেই চলবে, আর দাবী একপয়সাও নেই। তবে মেয়ের 'হাইট' অর্থাৎ উচ্চতা হবে ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি ৩॥ জ।"

"সে কি গো! বিয়ে করবে, তা এ রকম মাপ-জোক কেন? লোকে দিয়ে দেরাজ-আলমারি বানাবে না কি? এরকম ছিষ্টিছাড়া কথাও ত কখনো শুনিনি!"

"তুমি এসব খবর জানো না; আজকাল এই রকম হোয়েচে; তার মানে, ছেলেপুলে সব যাতে সায়েবদের মত লম্বাধাঁচের হয়, তাই খুব......"

"আরে, বাঙালী ত বাঙালীর মতই হবে, তারা সায়েবের মত হবে কি করে? আর সেটাই ভালো নাকি?"

"তা বোলে কি মেয়ে বেঁটে কুরকুটে হওয়াটাই ভালো?"

"যাক গে, অন্যগুলো কি রকম চায়?"

"আর একজন লিখচে, বিয়ের বদলে তাকে 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে।'—বুঝতে পারলে?"

"না। 'প্র-তি-ষ্ঠি-ত'!—আমরা ত চিরকাল জেনে আসছি—তখনকার লোকে 'গাছ-প্রতিষ্ঠা' 'পুকুর প্রতিষ্ঠা' বা কোনও ঠাকুর প্রতিষ্ঠা' করতো, তা বিয়েতে আবার কি প্রতিষ্ঠা করতে হবে বুঝতে পাচ্ছি না ত।"

"আহা-হা! ও-সব তুমি কিছু বুঝবে না। মোট কথা, সেই জামাইটিকে ঘর-বাড়ী, চাকরী—এইসব দিয়ে, তার সংসার পেতে দিতে হবে।"

"যাক ছেড়ে দাও, ও-ছাড়া আর কিছু নেই ত?"

"আর একটা আছে, কিন্তু সেটা ত চলবেই না; সে পাত্রটি বিষয়-সম্পত্তি, পয়সাওলা বাপের একমাত্র কন্যা বিয়ে করতে চায়।"

"ছেড়ে দাও ও-সব। বিয়ের নামে দাঁও মারতে চায় আর কি। যাক, ঐ আগের দু' জায়গায় চিঠি দিয়ে দাও।"

সুতরাং পাত্রীর বিবরণ দিয়ে দু'জায়গাতেই চিঠি দেওয়া হোল এবং যথাসময়ে তার উত্তরও এলো। তারপর উভয় পক্ষ থেকেই পাত্র-পাত্রী দেখা ও সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনাদি হোল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'জায়গাতেই বিফল হওয়া ছাড়া আর কোন ফল হোল না। প্রথমটির পাত্রী পছন্দ হল বটে, কিন্তু 'পাত্রী পছন্দে দাবীহীন' পাত্রের পিতা বললেন—"দাবী আমার কিছু নেই বটে, কিন্তু ছেলের বাপ হোয়ে, বিয়ের যাবতীয় ব্যয় অর্থাৎ যাকে বলে 'ঘর-খরচা' সেটা আমি আমার নিজের গাঁট থেকে যে করবো, তাও ত আর হতে পারে না, সেটা আপনাকে দিতে হবে, আশুবাবু।"

"সেটা কত আন্দাজ হবে?"

"আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আমার বহু; তারপর আরো সব 'ইত্যাদি' আছে; সুতরাং কমপক্ষে হাজার দুই-আড়াই টাকা ত ঘর খরচা লাগবেই। এ ছাড়া একটি পয়সা আমি চাই না। ছেলের বিয়ে দিয়ে নিজের বাক্স ভর্তি করা, সে ধরণের লোকই আমি নই। তবে দানসামগ্রী, বা ছেলের আংটি, বোতাম, ঘড়ি, পেন আর একটা বুককেস, একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানচার চেয়ার,—এ ত আপনার জামাইকে আপনি দেবেনই। আর মেয়েকে আপনার গহনা দেওয়া সম্বন্ধে আমার কোন ফরমাশই নেই। তবে অন্ততঃ বিশ ভরির কম ত কিছুতেই আপনার মেয়েকে আপনি দিতে পারবেন না আর দেওয়াও চলে না, আপনি তাই-ই যদি দেন, আমি তাইতেই রাজি। আমি মশাই, চামার নই; ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপকে নিংড়ে নেওয়া, সে ধাতের লোকই আমি নই। সুতরাং..."

সুতরাং 'বক্স কে পি আই ২৪৩'য়ের আশা আশুবাবুকে দুঃখে ও বিরক্তির সঙ্গেই ত্যাগ করতে হোল। অতঃপর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ—'বক্স ডি, জে ৩০১' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাতে জানা গেল যে, ছেলেটি শিক্ষা বিভাগেই কর্ম করে বটে। বিদ্যার বহর ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। পাড়ার মধ্যে দুবেলা দুটো বাড়ীতে সাতটি ক্ষুদে ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা বিভাগীয় কর্ম সম্পন্ন করেন; বেতন পান ৮ ও ৭—অর্থাৎ দুবাড়ী মিলিয়ে তিন গণ্ডা তিন টাকা অর্থাৎ পনর। সুতরাং এ 'সম্বন্ধটার সম্বন্ধে উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করবার পর আশুবাবু, জাহ্নবী দেবী ও শংকরের তাচ্ছিল্যভরা মিলিত হাসির ঠেলায় ডি জে এইচ ৩০১ একেবারে উর্ধ্বপথের মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাহ্নবী দেবীর বুকের ভেতর একটা বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বার হোয়ে এল।

* * *

"কি বলবো দিদি, ভাবনায় রাত্রে ঘুমুতে পারি না। এত জায়গায় চিঠি দেওয়া হচ্চে, তা পোড়া-কপালীর ভাগ্যে কোথাও একটা লাগচে না!"

অপরাহ্নের দিকে শংকরদের নীচের দালানে বোসে জাহ্নবী দেবী ও শংকরের মায়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল। জাহ্নবী দেবী বললেন—"আজকাল ঘটক-ঘটকীর পাঠ উঠে গেছে, তার বদলে হয়েচে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন দেখে কখনো এ সব কাজ হয়? মেয়েটার বিয়ের জন্যে কি যে করি দিদি, ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হোয়ে যাবার যোগাড়!"

"অত ভাবিস কেন, যেখানে হোক এক জায়গায় লেগে যাবেই। ফুল ফুটলে, কোথা দিয়ে যে কি হবে, তা তখন বুঝতে পারবি।"

"তাই বলো দিদি; তোমাদের সকলের আশীর্বাদে এ দায় থেকে শীগগির যেন উদ্ধার পাই।"

"পাবি, নিশ্চয় পাবি। অমন মেয়ে তোর, ওর বরাতে ভালো বরই জুটবে।"

"তাই বলো, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

"রাধুকে বউ করবার আমার বড্ডই ইচ্ছে ছিল; কিন্তু মুখপোড়া ছেলে যে আমার বিয়ের নামেই লাফিয়ে ওঠে; নইলে জানা-শোনা ঘর, রূপে-গুণে সোনার প্রতিমে মেয়ে, কিন্তু শংকরার ধনুক ভাঙা পণ, বিয়ে এখন ও কিছুতেই করবে না। বলে, বিয়ে করলে এখন যা দেশের কাজ কচ্চি, তা আর হবে না, ৪।৫ বছর পরে, করতে হয় যদি তখন করবো। ওই যে এলেন; সেই ভাত খেয়েই বেরিয়েছিলেন, দেশের কাজ কোরে, বাবু এখন ফিরলেন। "হ্যাঁ রে, এই চোত্ মাসের রোদ্দুরে কোথায় টো-টো কোরে ঘুরে এলি বলতো?"

শংকর কোনও কথা না বোলে ওপরে চলে যাচ্ছিলো, জাহ্নবী বললেন—"বাবা, কাল সকালে একবার যেয়ো, হাটখোলার সেই তারা চিঠি দিয়েচে, কাল সকালে মেয়ে দেখতে আসবে।"

যেতে যেতে শংকর দাঁড়ালো।

"ওঃ? সেই শিবদাস না শিবনারায়ণ ঘোষাল; তাই না খুড়ীমা?"

"তা হবে, বাবা।"

"আমি সন্ধ্যের পর কাকাবাবুর কাছে যাবখন খুড়ীমা" বলে শংকর ওপরে চলে গেল

শংকরের মা বললেন—"এরা [illegible] ঘোষাল? তা মন্দ হবে না। ছেলেটির বয়স কত? চাকুরী-বাকুরী কি করে?"

"বয়সের কথা কাগজে কিছু লেখা ছিল না। ছেলের বাপ-মা নেই। কোলকাতায় দু'খানা বাড়ী, খুব বড় ব্যবসা, দেশেও বিষয়-সম্পত্তি আছে।"

"এত খুব ভাল পাত্র। রাধু তোর খুব ভাল হাতেই পড়বে, দেখে নিস।"

"তুমি সতী-লক্ষ্মী দিদি, তোমার কথাই যেন ফলে।"

* * *

পরের দিন।

বেলা প্রায় ন'টা।

হাটখোলার পাত্রটি নিজেই পাত্রী দেখতে এসেচেন। সঙ্গে আর কেউ নেই; একা। দালানের একাংশে একখানা সতরঞ্চের ওপর আশুবাবু ও শংকর বসে আছে আর তাদের সামনে হাটখোলার পাত্র-বাবাজী মাল-কোঁচা বেঁধে, উপুড় হোয়ে 'ডন' ফেলচেন আর হাঁপাচ্ছেন। বিস্ময়-নির্বাক আশুবাবু আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—"থাক্ থাক,—হোয়েচে, আপনি বসুন এসে।"

(শেষাংশ ২১৭ পৃষ্ঠায়)

উনিশ শো তেইশ-চব্বিশ সাল।
আমাদের তখন কল্লোল চলছে। মন-ভরা, কিন্তু পেট ফাঁকা। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সপ্তাহে তিন-চারটির বেশী মিল জোটাতে পারি না। যা প্রচুর খাই তা হলো পান, চা, কলের জল। থাকি কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাসের বিপরীত দিকের একটা তেতলা বাড়ীর মেসে।

একদিন চোদ্দ নম্বর পার্শী বাগানে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর আড্ডায় কথায় কথায় ব্রজেনদা (ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে যাবেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলের অধিকর্তা। ছুটিতে বাসা করে কলকাতায় আছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক হলেও তাঁর ঐতিহাসিক উৎসাহ ছিল প্রাণহীন প্রস্তরে নয়, প্রস্তরে যে প্রাণবন্ত মানুষ ও সমাজ ধরা পড়ে, তাদের সম্পর্কে রাখালদাসের উৎসাহের সীমা ছিল না। তাই এক দিকে তিনি মন্ত্ররসিক ও নাট্য-সমালোচক, অপর দিকে সাহিত্যিক আন্দোলনে তাঁর প্রবল আগ্রহ। ইতিহাসের গবেষণা করেন ও প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস লেখেন, কিন্তু ইতিহাসকে সজীব করে তোলেন তাকে উপন্যাসের রূপ দিয়ে। কাজেই ইতিহাসের কিছু না জেনেই আমি রাখালদাস সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহবোধ করলাম। বিশেষ. ব্রজেনদা বলেন, অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি পরিচয়ের সূত্র খুঁজেছেন।

ঠিক হয়ে গেল। একদিন বিকেল পাঁচটায় ব্রজেনদা এলেন আমার মেসে। সেখান থেকে দুজনে বেরিয়ে চলে এলাম পঁয়ষট্টি নম্বর সিমলা স্ট্রীটে।

রাখালদাস তখন অসুস্থ, কার্বাঙ্কল-এ ভুগছেন। গুরুগম্ভীর কাজে মন নেই, অথচ কর্মী লোক বিনা কাজে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

ব্রজেনদা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আধুনিকতম সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রচুর কৌতূহল প্রকাশ করলেন রাখালদাস। এবং আমাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের মতন লোকের সাহচর্য ভালোই লাগবে তাঁর।

সেই জন্যই তার পরেও কয়দিন গিয়েছিলাম বেড়াতে, কিন্তু আমার বয়স ও যোগ্যতা নিয়ে কোন দিনই মাথা ঘামাননি, তাঁর উদার সহৃদয় ব্যবহারে তাঁকে আপনজন বলেই গ্রহণ করেছিলাম। একদিন কিন্তু থেকে যেতেই হ'ল তাঁর কলমচী হয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব খবরটুকু বার করে নিয়েছেন এর মধ্যে। জেনে ফেলেছেন, আমার প্রচুর কাজ থাকলেও আমার অস্টেনসিবল্ মীনস্ অফ লাইভলিহুড নেই। আমার স্টেপ্ল্ ফুড—কলের জল।

প্রস্তাবটা নিজে থেকেই করলেন, 'দ্যাখো ভাই, আমি বসে থাকতে পারি না, কিন্তু লেখাপড়া করতে শরীরের উপর যে স্ট্রেন হয় তার জন্য কাজও তেমন কিছু করতে পারছি না। তুমি যদি আমার কলমচী হও, তাহলে এই অবসর সময়টায় অনেক কিছু লিখতে পারি। অবশ্য সামান্য কিছু হাত খরচা তার বদলে আমি দেবো।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। তার কারণ এ নয় যে, আমার একটা হিল্লে হ'ল, বরং সত্যি কথা বলতে গেলে বলা উচিত, আমি রাখালদাসকে ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

রাখালদা বলে যান, আমি লিখি, ইংরেজী এবং বাংলা। তার মধ্যে থাকে ইতিহাসের জটিল সমস্যা ছাড়াও উপন্যাস, নাটক, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ, বিশেষ করে নাটক সংক্রান্ত রচনা।

লিখবেন বলে আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত, হয়তো দু-চার পংক্তি লেখাও হয়েছে, এমন সময় শিশির ভাদুড়ী, ডাঃ কালিদাস নাগ অথবা ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা আর কেউ এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আমার কলম থেমে গেল, আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপে মেতে উঠলেন। তখনকার মত লেখা বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক কখন যে তিনি আমাকে চান সেটা নিশ্চিত করে আমাকে জানাতে পারেন না, তাই যখন-তখন—এমন কি, ভোর রাত্রিতেও আমাকে ডেকে পাঠান। মেসে শেষ রাত্রে আমাকে ডাকতে এসে কেউ চেঁচামেচি করলে স্বভাবতঃই আর পাঁচজন ক্ষুণ্ণ হয় আমার উপর। তাই একদিন সংকোচ কাটিয়ে রাখালদাকে বলেই ফেললাম, এ রকম অসময়ে ডাকাডাকিতে আমার যে অসুবিধা। একটু উষ্মাও বেরিয়ে গেল। আমি তাঁর চাকরি করি, আমার ঘুম-ভাঙানোর অধিকার তাঁর আছে, কিন্তু মেসের আর কেউ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মচারী নয় যে তাদেরও ঘুম থেকে উঠতে হবে তাঁর খেয়াল-খুশীতে।

আশ্চর্য, একটু বিকৃতি দেখলাম না তাঁর মধ্যে। একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, তিনুর মাও বলছিলেন বটে। (তিনুর মা রাখালদাসের পত্নী) তিনি বলছেন, তোমার নাকি মেসে থাকার কোন দরকার নেই। আমাদের পাঁচজনের থেকেই দুমুঠো ভাত তুমিও ভাগ পেতে পার।

পারতেই হ'ল। পরদিন চটিপট্টি বেঁধে নিয়ে এসে উঠলাম সিমলা স্ট্রীটে। এবং বেশ [illegible] রাখালদার কাছে তাঁর আশে-পাশে থাকতে পারায় তাঁর অন্তরের [illegible] ঝিলিক চোখেও পড়েছে।

একদিন কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন, নজরুল কোথায়? যখন জানলেন যে, বহরমপুর জেলে আটক আছে। বললেন, কবি মানুষ, নিঃসঙ্গ জীবনে প্রচুর পড়বার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। একটু থেমে বললেন, তুমি পারবে পবিত্র, আমার এক সেট বই বহরমপুর জেলে কবিকে পৌঁছে দিতে? হরিদাকে (গুরুদাস লাইব্রেরীর অন্যতর মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়) চিঠি দিয়ে দিই এক সেট বই দেবার জন্য।

সেই রাত্রেই বই নিয়ে আমাকে রওনা হতে হয়েছিল বহরমপুর। নজরুলের সঙ্গে সকালে দেখা করবার অনুমতি পেলাম না, বইগুলি জেল কর্তৃপক্ষের হেপাজতে রেখে কলকাতায় ফিরে এলাম।

রাখালদা আগ্রহভরে জানতে চাইলেন, কবির শারীরিক কুশল সংবাদ। পরে বললেন, ভালো যে নেই, তা তো জানা কথা, কারণ জেলে বসে বিনা কাজে সময় কাটাতে কার ভালো লাগে বলো!

সেদিন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। ঘরে অবশ্য তখনও আলো জ্বলেনি। এসে হাজির হলেন পুরণচাঁদ নাহার মহাশয়, সঙ্গে তাঁর কিশোর পুত্র শ্রীমান বিজয়সিংহ।

পুরণচাঁদ ধর্মে জৈন, মাছ-মাংসের গন্ধ থেকে বহুদূরে থাকেন, অথচ ইতিহাসের মড়া ঘাটায় প্রচুর উৎসাহ। পুরোনো জিনিষ, যার কোন পুরাতাত্ত্বিক মূল্য আছে, তা দেখলে নিজেকে সামলাতে পারতেন না পুরণদা, যেন ছোট ছেলের সামনে লাল বেলুন। আর এ বিষয়ে যাচাই করবার জহুরী ধরেছেন তাঁর স্নেহাস্পদ বন্ধু রাখালদাসকে।

পুরণদা ঘরে ঢুকতেই রাখালদা হাঁকলেন, ওই যে গঙ্গার ইলিশটা এসেছে, তা থেকে খান-চারেক ভেজে চা সমেত পুরণদাকে দিয়ে যা[illegible]

পুরণদাও এতদিনে বুঝে গেছেন যে [illegible] ইলিশ মাছটা হয়তো আদৌ এ বাড়ীতে আসেইনি, হয়তো বা ধরাও পড়েনি, তবু পুরণচাঁদকে দেখলে 'রাখালের' ইলিশ মাছ ভাজতে বলা চাই। ভাজা যখন হবে না তখন ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনের আশংকাও নেই।

তিনি হেসে বললেন, তোমার ইলিশ মাছ তুমিই খেয়ো, আর সেটা হজম করার জন্য সঙ্গে এগুলোও খেয়ো। —বলে বার করে দেন আচার আর পাঁপড়।

রাখালদা বললেন, বেশ, ফিঃ তো নিলাম, কাজটা কি শুনি?

—তিনটে কয়েন এনেছি, এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কি, আর কি দামেই বা কিনতে পারি?

—এই অন্ধকারে? —বললেন রাখালদা, জানোই তো আমার চোখের অবস্থা এমনিতেই ভালো না। আজ রেখে যাও, কাল দেখে দেবো।

নাহার মহাশয় মুদ্রা কয়টি বার করে দিলেন রাখালদার হাতে। রাখালদা আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে সেগুলি অনুভব করতে লাগলেন একটি একটি করে।

একটি করে আঙুলে পরীক্ষা করেন আর আমার হাতে দিয়ে বলেন, কলম দিয়ে ওর উপর

(শেষাংশ ২২৪ পৃষ্ঠায়)

চরিত্রহীন

আশাপূর্ণা দেবী
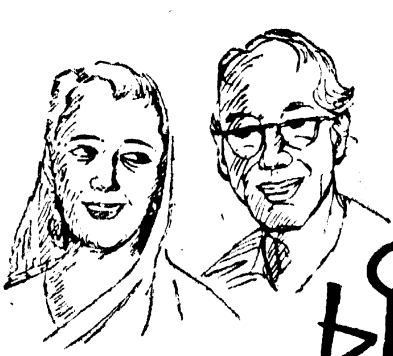
এখনো? এই বয়সে?

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম!

সত্যিই কি মানুষের বাসনার শেষ নেই? নেই অসংযমের মাত্রা? চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

মনে মনে বয়সটার—একটা মোটা হিসেব ধরে নিয়ে আন্দাজ করলাম রাখাল মামার বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সেই রাখাল মামা—এখনো! আশ্চর্য!

বিদেশে থাকি, কালে-কস্মিনে কলকাতায় আসি, তা'ও সামান্য ছুটিতে। নিকটতম আত্মীয়দের খবর নিতেই সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারি না, তা' জ্যেঠতুতো! পিসতুতো! রাখাল মামা এ যাবৎ বেঁচে বর্তে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন কিনা তাই জানতাম না, অন্য খবর তো দূরের কথা। রাখাল মামার ছেলে নীতুদা আজ আমার মার কাছে দুঃখগাঁথা গাইতে এল বলেই শুনলাম। আর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছি বটে রাখাল মামার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, বৌ, ছেলে সংসার সব থাকতেও নাকি একটি উপসর্গ আছে তাঁর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার উপসর্গটি আর কোথাও নয়, দেশ ভিটেয়। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত যাই হোক, পৃথিবী উল্টে গেলেও তিনি যে বরিবারে বরিবারে দেশে যান, সেটা ভিটের টানেও নয়, পিসি খুড়োর টানেও নয়, সেই লক্ষ্মীছাড়া মাগী'র টানে।

তখন আমরা বালক বলে যে আমাদের কান বাঁচিয়ে কোন কথাবার্তা হতো এমন মনে পড়ে না। কাজেই তখনই আমরা জেনে ফেলেছিলাম রাখাল মামা খারাপ লোক।

কিন্তু সে কি এ যুগের কথা?

এই যুগ-যুগান্তর পরে আবার কিনা কানে এল রাখাল মামা সেই 'লক্ষ্মীছাড়া মাগী'র টানে!—

না, এখন বুড়ো বয়সে আর হপ্তায় হপ্তায় যাওয়ার ক্লেশ সহ্য হয় না, তাই দেশের বাড়ীতেই বসবাস করছেন রাখাল মামা।

ছেলেরা কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্যে সহস্র সাধ্য সাধনা করছে, নড়িয়ে আনতে পারছে না তাঁকে।

ছুতোরও অভাব নেই রাখাল মামার। মাথা খুব পরিষ্কার।

ছুতো হচ্ছে, এই বয়সে আর কলকাতার ভাড়াটে বাড়ীতে 'গুড়ের নাগরী ঠাশা' হয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। পারবেন না পাজী, বদ নাতি-নাত্নীগুলোর দৌরাত্ম্যি সহ্য করতে। সারাদিন বৌদের কলহ কচকচিও তাঁর অসহ্য।

'তাছাড়া', ছেলেদের প্রশ্ন করেছেন রাখাল মামা, 'পারবে তোমরা, আমার শরীর, স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যা দরকার তা'র জোগান দিতে?

কি উত্তর দেবে ছেলেরা?

'হ্যাঁ পারবো' বলবে কোন ভরসায়? বয়স হয়েছে বলে শরীর, স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যে রাখাল মামার অনেক কিছু চাই। চাই একসের করে খাঁটি দুধ, নিত্য ভাতের পাতে ছটাকখানেক করে সরতোলা গাওয়া ঘি, দু'বেলা সদ্য মাঠ থেকে তোলা টাটকা শাক, পাতা, ডাঁটা প্রতিদিন তাজা চারা পোনার ঝোল আর বাটি ভর্তি চুনো মৌরলার টক! এছাড়া আর যাই হোক, এগুলো অবশ্যই চাই। এই রকম নিয়ম মতে থাকতে পারলে নাকি আরও পনেরো বিশটা বছর হেসে-খেলে, হেঁটে-ছুটে বেঁচে থাকতে পারেন রাখাল মামা।

আর, বাঁচতেই চান তিনি।

কলকাতায় কি পয়সা ফেললেই এ সব মেলে? এখন অবশ্য গ্রামে ঘরেও আগের মত কিছুই নেই তবু কিছু আছে। প্রচুর না মিলুক সামান্যও মেলে, যদি চেষ্টা যত্ন থাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা যত্ন করে কে?

'কে আর!' নীতুদা ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বলে, 'সেই তিনিই। আমরা তো বলতে গেলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। নেহাৎ মাসকাবারি টাকাটা, আর যেবারে যা ফরমাস থাকে সেই সব নিয়ে মাসে একবার করে—'

'টাকা বন্ধ করে দিতে পারিস না?' আমার মা বীরাঙ্গনা বিক্রমে বলে ওঠেন, তা' হলে কেমন না সুড়-সুড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন দেখি?

নীতুদা হতাশভাবে বলে 'তাই কি হয়?'

'হবে না কেন?' মা পুনরায় উদ্দীপ্ত, 'তোরা বলবি,— আমরা ছাপোষা, মোট মোট নগদ টাকা যদি দিতে না পরি? একসঙ্গে থাকো, খাও দাও বাস!'

'তা'হলে আবার তোমরাই বলবে, কি কুলাঙ্গার ছেলেরা গো! বুড়ো বাপকে খেতে দেয় না।'

'কেউ বলবে না।' আবার সবেগোক্তি করেন মা, 'বাপ বাপের মত হয়তো, মাথায় করে রাখবে ছেলেরা, বাপ অচ্ছেদ্দার কাজ করলে আবার মান্য কি?

নীতুদা মলিন মুখে বলে, 'সে আর কে বুঝবে? বরং সকলেই ভাবে বৌরা বুঝি বুড়ো শ্বশুরের ঝামেলা পোহাতে রাজী হয় না, তাই ছেলেরা বাপকে বনবাসে দিয়েছে। এর ওপর আবার টাকা বন্ধ!'

'কিন্তু এত বাড়াবাড়িটা হল কবে?' মা বলেন, 'এ রোগ ছিল চিরকালই জানি, সুশীলাদি তো গ্রাম সম্পর্কে আমাদের বোন হয়, দেখেছি বরাবর। হাসাহাসিও করেছে সবাই, কিন্তু এত এমন বেহেডপনা ছিল না। ওই রাখালদা রবিবারে রবিবারে বাড়ী যেত, দেখা-সাক্ষাৎ, গল্প-গুজব করতো, এই পর্যন্ত। তবে মাস মাস খরচাটি দিয়েছে সুশীলাদিকে।'

ঈষৎ কৌতুহলী হয়ে বলি, 'তা' তখনকার দিনে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজ এ সব এ্যালাউ করতো? সুশীলাদির বাপ-মা রাগ করতেন না?'

'বাপ-মা কোন চুলোয়? জ্ঞানের আগে সব খেয়ে তো কাকা, খুড়ির সংসারে ভর্তি। তা' ছেলেবেলায় নিত্যি খুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বলতো; 'কাজে নেই গেলায় আছো, দেব না ভাত। এর-ওর দোরে গিয়ে দাঁড়াতো মুখ শুকিয়ে। লোকে মায়া-দয়া করে দু'মুঠো ভাত দিত! সবই তো জ্ঞাত-গোত্তুর!'

'শ্বশুর বাড়ী?'

'সেখানেও তেমনি। যেমন কপাল তেমন কাকা-খুড়ি একটা বর জোগাড় করে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করেছিল। ছ মাসের মধ্যে তাকে শেষ করে আবার সেই কাকা-খুড়ির ঘাড়ে। তাদেরই বা ভাল লাগবে কেন? নিত্য খিটিমিটি। সেই সূত্রেই দয়া উথলে উঠলো রাখালদার। বললো, 'শুধু একবেলা এক মুঠো ভাতের জন্যে এত লাঞ্ছনা! আমি দেব সুশীলার ভাত খরচা।' তখন রোজগার করতো ভাল, সদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিল, দয়ার মেজাজ দেখাবার মুরোদ ছিল। তা সেই দয়া দেখানোই 'কাল' হলো! সুশীলাদি একেবারে গলে গেল, মাথা-মাখি বেড়ে উঠল। কাকা গলা ধাক্কা দিয়ে **বিদেয় করে দিল বিধবা মেয়ের রীত চরিত্তির**

দেখে। আমার অবিশ্যি এ সব শোনা কথা। স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমরা সুশীলাদিকে দেখেছি বাপের ভিটের একখানা ভাঙ্গা ঘরে পড়ে থেকে, আর রাখালদার পয়সায় খেয়ে গাঁ সুদ্ধ লোকের কাজ করে বেড়াতে। অসীম গতর যার যাতে ঠেকা পড়ে, সেই ডাকে 'সুশীলা!' কিন্তু এ বিষয়ে এতটা বেপরোয়া—'

নীতুদা বাধা দিয়ে বলে, 'এতটা হয়েছে মা মারা গিয়ে অবধি। মাও গেলেন, বাবার চাকরীও গেল—'

'চাকরী গেল!'

'ওই যে অফিসে নতুন ফ্যাসান হল বুড়োদের বিদেয় করো।' অথচ বাবা তখনও ওই যাট বছরেও দুটো জোয়ান লোকের খাটুনি খাটতে পারতেন। কিন্তু সে যাক, গেল। আর যেতেই অমনি বাবা বুড়ো হলেন। 'অফিসে যেতাম সারাদিন, এক রকম কেটেছে, এখন অষ্টপ্রহর বাড়িতে থাকতে পারবো না।'

আমরা ভাবলাম, তা মন্দ কি, দৌর, [illegible] রাতদিন বাবা এই বললেন, বাবা তাই বললেন। বলে অশান্তি করছে, দেশে গিয়ে থাকতে পারেন দু পক্ষেরই ভালো। চার ভাই পাঠাবো টাকা, [illegible] দেব উনি স্বপাকে খাবেন, আর পুরোনো মুনিষের ছেলেটা কাজ-কম্ম করে দিয়ে যাবে, এই ব্যবস্থা। বাবার তো খুব উৎসাহ, খুব স্ফূর্তি। তখন কি জানি এই সব অসভ্যতা হবে? পরের মাসেই গিয়ে দেখি রান্নাঘরে সুশীলা পিসি রাঁধছেন, দেখে মনের অবস্থা কি হলো! এ সব জানতাম বরাবরই, কিন্তু একেবারে এ রকম প্রকাশ্যে! কৈফিয়ৎ দিলেন—ওঁর ও হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া কষ্ট, ওর ও দিকে ঘর পড়ে গেছে, থাকার কষ্ট, অতএব!'

মা উগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোরা বললি না কিছু?'

'কি বলবো বলুন? ওঁদের লজ্জা নেই, আমাদের তো লজ্জা আছে! কিছু না বোলার ভান করে চলে এলাম। এখনও যাই, একবেলা থাকি, যাই চলে আসি। কিন্তু দেখুন এই বাজারে সংসার থেকে মোটা করে টাকা দেওয়া! কলকাতার বাড়ীতে থাকলে তো—'

বুঝলাম নীতুদার মূল ব্যথাটা কোথায়!

অতঃপর নীতুদাতে আর মাতে প্রবল পরামর্শ চলতে লাগলো, কি করে এই অশেষ কাণ্ডের একেবারে কাণ্ডচ্ছেদ করা যায়! ব্যবস্থা হলো মা একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে যাবেন, এবং সেই যত নষ্টের মূলকে যাচ্ছেতাই করে, আর রাখাল মামাকে ধিক্কার দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়বেন, সমাজের মধ্যে থেকে এ সব অসামাজিকতা চলবে না। বলবেন, ওই পাপকে বিদেয় না করলে ছেলেরা মাসোহারা বন্ধ করে দেবে। কেনই বা বন্ধ করবে না? তুমি বাপ হয়ে যদি ছেলেদের [illegible] মুখ দেখাতে না করতে পারো, ওদের আর টাকা দেবার অপরাধ কোথায়?

আমি বলি 'তুমি [illegible] কেন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে মা? যে যা করতে করুক না, তোমার কি?'

মা ধিক্কারে আমাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলেন, 'ওই বালাই কি রে বল, আমার কি? ভিটেটা আমার বাপ-ঠাকুর্দার নয়? সেখানে বসে যে যা করছে, করবে? বেটাছেলে বাইরে বাইরে যা করে করুক, ভিটেয় পাপ এনে তুলবে?'

লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলি, 'পাপের আর কি? বয়সের তো গাছ-পাথর নেই বাবা!'

মা তাতে দমেন না, বলেন, 'থাম তুই বল, বয়সের বিচার কি করছে ওরা? এখনো যখন এত ইয়ে, তখন আর— যাক গে তুই পেটের ছেলে কি আর বলবো! মোট কথা রাখালদাকে বুঝিয়ে আসবো ভিটেয় বসে এত অনাচার চলবে না। লজ্জা নেই? ঘেন্না নেই? ছেলেদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে ভয় নেই? প্রবৃত্তিকে বলিহারী!'

শেষ পর্যন্ত আমার স্কন্ধে ভর করেই মা বারুইপুরে যান। নীতুদা বলেন না, এক্ষেত্রে ছেলেরা মুখোমুখি না হওয়াই ভালো।

কি আর করা!

তবে সত্যি বলতে কি, খুব অনিচ্ছে হচ্ছে না, আমারও কৌতূহল হচ্ছে সেই সত্তর বছরের প্রেমিক পুরুষটিকে দেখতে।

দেখলাম!

আর দেখেই প্রথমটায় মনে হলো, সত্যি চরিত্রহীন হ'লে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ!

সোজা সতেজ খাড়া দেহ, উজ্জ্বল মুখ, চোখ যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি!

লজ্জা, কুণ্ঠা, দ্বিধা, সঙ্কোচ, কোন কিছুর বালাই মাত্র নেই, একেবারে মুক্ত পুরুষ! মাকে দেখে ইয়ংম্যানের মত হৈ-হৈ করে উঠলেন, 'আরে কে রে! বুলবুলি না? কি ব্যাপার! তুই কোথা থেকে? ইস কতদিন পরে দেখা! বাপ ঠাকুর্দার ভিটেটাকে তাহলে মনে আছে এখনো? কেউ আসে না, বুঝলি বুলবুলি, কেউ আর দেশে আসে না, দেশ একেবারে কানা পড়ে আছে।'

মা তো এই মুহূর্তেই বলতে পারতেন, কেন তুমি তো রয়েছো, দেশ, গ্রাম বংশ সব কিছুর মুখ উজ্জ্বল করে!' অথবা এও বলতে পারতেন 'লোকে আর আসবে কোন সুখে? তোমাদের মত কুলধ্বজরা যেখানে বসবাস করছেন!' বললে কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকতো। কিন্তু বললেন না। জানি না—বললেন না, না বলতে পারলেন না। বহুদিন বিস্মৃত 'বুলবুলি' শব্দটা কানে গিয়ে গলাটা ভারী হয়ে এল কিনা! মোট কথা দেখতে পেলাম, মা হেঁট হয়ে বেশ পরিপাটি করেই পায়ের ধুলো নিলেন রাখাল মামার।

ততক্ষণে রাখাল মামা আর একবার হৈ-হৈ করে উঠেছেন, 'ওরে সুশীলা, কি তোর ঘোড়ার ডিমের কাজ নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছিস! বেরিয়ে এসে দ্যাখসে কে এসেছে। বুলবুলি, আমাদের সেজ কাকার মেয়ে বুলবুলি। কি একখানা গিন্নিবান্নী হয়ে গেছে! হ্যাঁরে এইটি বুঝি তোর বড়ছেলে? সেই এতটুকুনটি দেখেছিলাম। কাজ-কম্ম কি করে ছেলে?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই গড় গড় করে প্রশ্ন করে যান রাখাল মামা, আর যেন ছুটো-ছুটি করতে থাকেন।

খুশিটা যে যথার্থ আন্তরিক, তা বোঝা যায় ওঁর অস্থিরতায়। আবার হাঁক পাড়েন, 'অ সুশীলা, কানের মাথা খেয়েছিস না কি?'

ততক্ষণে সুশীলা এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সুশীলা!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

এর জন্যে একটা মানুষ যুগ-যুগান্তর কাল ধরে সংসারে অশান্তি এনেছে, সমাজে বদনাম কিনেছে, অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করেছে আর এই জীবনের শেষ ঘাটে এসেও ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়, প্রতিবেশী সকলের কাছে হেয় হচ্ছে!

কালো রোগা ঢ্যাঙা এক বুড়ি, চুলগুলো ছাঁটা, সামনের দুটো দাঁত পড়া!

সেই দাঁতপড়া মুখে একটু হেসে মাকে সম্ভাষণ করলেন, 'তুই তো ছেলের কাছে বিদেশে থাকিস, তাই না? এলি কবে? ওমা এইটিই বুঝি ছেলে?' বিলু না কি যেন ডাকনাম ছিল ছোটবেলায়।'

'বিলু না। বলু! বাবা এতও তোমার মনে আছে সুশীলাদি!' বলে দিব্যি অম্লান বদনে, যে পাপকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হানা দিয়েছেন, সেই পাপের চরণে প্রণিপাত করলেন মা!

'ওকে থাক হয়েছে। আয় বোস। থাকবি তো কিছুদিন?'

'না, থাকবো আর কি করে!' মা আক্ষেপ করেন 'ছেলেদের তো সোনাদিনের ছুটি!'

আরও কিছু হয়তো বলতেন মা, কিন্তু ওদিকে রাখাল মামা তাড়া দিয়ে উঠেছেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে, আগে ওদের হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে দিকি। গল্প একবার জুড়লে তো রক্ষে নেই! বুঝলি বুলবুলি, তোর এই সুশীলা দিদি আজ ওর তোকে বাড়ে ঘুমোতে দিয়েছে! দেখবি তোকে গাঁয়ের এই তিরিশ বছরের ঘটনা কাহিনীর পরিচয় দেবে বসে বসে। জানেও বটে সকলের নাড়ি নক্ষত্র!

অতঃপর অতিথি সৎকারে তৎপর হয়ে উঠলেন রাখাল মামা।

কোনও বারণ মানলেন না, প্রচণ্ড রোদ্দুরে নিজে গেলেন মিষ্টি আনতে। কোথায় কোন জেলেনিকে বলে এলেন, যে করে হোক একটা মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসতে, আর এসে অনবরত সুশীলাকে তাড়া দিতে লাগলেন, 'তোর হলো? দুটো মানুষের রান্না করতে তুই যে বুড়ো হয়ে গেলিরে সুশীলা!'

আমরা যত ব্যস্ত হতে বারণ করি, রাখাল মামা ততই আরো বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

একী ঘুষ? না অভিনয়?

কিন্তু মার ব্যাপারটা কি? সেও কি অভিনয়?

দেখছি, আর অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আর মজা এই, একবারও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন না মা।

শুনতে পাচ্ছি রান্নাঘরে গল্পের স্রোত বইছে।

সেই তিরিশ বছরের ইতিহাস আওড়ানো হচ্ছে বোধ হয়। কত অজস্র নাম কানে আসছে। ভাবছি, কী আশ্চর্য! এই দীর্ঘকাল ভারত-বর্ষের আর এক প্রান্তে কাটিয়েও মা বারুই-পুরের প্রত্যেকটি মানুষকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে এসেছেন!

তিরিশ বছরের মধ্যে অবশ্য আমি না এলেও মা এক-আধবার এসেছেন। সেই কথারই উল্লেখ শুনেছি মার কণ্ঠে, 'সেবার যখন এসে-

ছিলাম, সুশীলাদি. মা গো মা, বাড়ী দেখে যেন কান্না পেয়েছিল। উঠোন ভর্তি আগাছা, দেয়ালের বালির চাপড়া খসে খসে আর ইঁদুর ছুঁচোর উৎপাতে ঘর-দালান একেবারে ওচনচ, রান্না ঘরের উনুন দুটো ভেঙে হুমড়ে পড়ে আছে, তুলসী মঞ্চের গাছটা শুকিয়ে কাঠ. মাগো মা সে কী দশা! এবারে এসে যেন চোখ জুড়োলো। সেই পুরনো বাড়ী এখন যেন পড়লে সিঁদুর উঠছে। চিরকালের খাটিয়ে মেয়ে তুমি!'

সুশীলা দি কি কোন মন্ত্র জানেন?

বশীকরণ মন্ত্র!

আর সেই মন্ত্রের জোরেই রাখাল মামাকে—?

কিন্তু রাখাল মামা মন্ত্রের গুণের কথা বলেন না, বলেন হাতের গুণের কথা।

আমাকে কাছে নিয়ে খেতে বসেন, সেই ওঁর সরতোলা গাওয়া ঘী, বাড়ীর গরুর দুধের ঘন ক্ষীর. টাটকা পুকুরের মাছের ঝোল, সদ্য মাঠ ভাঙা আনাজ তরকারি, মৌরলা মাছের কড়া টক, সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সহযোগে। আর আমার চাইতে তিনগুণ বেশী অন্নব্যঞ্জন পার করে হাত চাটতে চাটতে প্রসন্ন-মুখে সামনে বসে থাকা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, হাতের গুণে. বুঝলি বলবুলি. সুশীলার হাতের গুণে নটেশাকও বাহবার হয়ে ওঠে। যা রাঁধে তাই যেন অমৃত! ওর হাতের রান্না খেলে রুগীর রোগ সারে, সহজেই পরমায়ু বাড়ে। এই দ্যাখনা, আমার যে আটষট্টি বছর বয়েস পার হতে চললো, দেখে বুঝতে পারছিস?

না, হাসেন, তা বোঝা যায় না বটে।

রাখাল মামা সোৎসাহে বলেন, তাইতো বাড়ীঘর ভাল করে সারিয়ে নিয়েছি। সে-ওরের আরও বিশ বছর বেঁচে থাকবো আমি দেখে নিস।

রাখাল মামার বাঁচার এত বাসনা কেন? মনে হচ্ছে এই বাসনার জোরেই সত্যিই হয়তো আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন রাখাল মামা।

কিন্তু কিছুতেই যেন লোকটাকে পাপী বল, অসচ্চরিত্র, অপবিত্র মনে হচ্ছে না। মনে করতে চেষ্টা করেও না।

মারও কি ওই একই আনন্দ?

তাই তিনি রাখাল মামার কথার উত্তরে সহাস্যে বলেন, 'আমাকে আর দেখতে হবেনা দাদা, দেখি তো সেই ওপর থেকে দেখবো।'

...দের মেয়ে মানুষদের ওই এক কথা! সব শেয়ালের এক 'রা'। বেঁচে দরকার নেই, বেঁচে কাজ নেই—কেন রে বাপু! কিন্তু কথায় কথায় যে বেলা গড়িয়ে গেল। বলি সুশীলা, তোর আক্কেলখানা কি? তোর না হয় তিনপহর বেলাতেও পিত্তি পড়ে না, এরা হলো শহুরে মানুষ, সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস।......নাও নিজেও পিণ্ডি দুটো গিলে নাও এই সঙ্গে, অনর্থক দেরী করে লাভ নেই। বলু, চলহে আমরা বরং বৈঠকখানায় গিয়ে বসি গে।......

যেতে পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন রাখাল মামা, বললেন, 'নিজেদের কিছু রেখেছিস না নিরামিষ পদগুলোও সবটাই আমাদের ধরে দিয়েছিস?

(শেষাংশ ২২১ পৃষ্ঠায়)

হেলেনের প্রতি

একটি সুন্দর তোড়া পাঠানু তোমারে,
স্ফুট পুষ্পে সাজায়েছে আমার অঙ্গুলি;
আজিকে সন্ধ্যায় যদি না নিতাম তুলি',
আগামীকালই তারা ঝরিত দুধারে।

অবশ্য মানিও তুমি দৃষ্টান্ত ইহারে,
যদিও তোমার রূপ উঠিয়াছে দুলি'
বিকচ শোভায়, তাহা পড়িবে যে ঢুলি',
পুষ্পসম যাবে ঝরি' পৃথিবী মাঝারে।

সময় যে ক্ষয় পায়, সময়, হে নারী,
না গোনা সময় নয়, আমাদেরই ক্ষয়,
আমরা অচিরে হব মৃত্যুপথচারী।

যে প্রেমের কথা কই, নাহিক সংশয়,
সে প্রেম নীরব হবে, তাই হে প্রেয়সী,
ভালোবাসো মোরে আছো যাবৎ রূপসী।

রঁসার (১৫২৪—১৫৮৫)

সুন্দর স্বর্ণাভ ওই

সুন্দর স্বর্ণাভ ওই কেশগুচ্ছ নয়,
নয় ও ললাটপট মহিমা যাহার
অপরূপ, নয় ওই ভুরুদ্বয় যাহার
দুচোখের, শত চোখ যেথায় তন্ময়;

ও দুটি প্রবাল নয়, যদিও নিশ্চয়
ভালো লাগে ওই দুটি অধর আমার,
অঙ্গের যে বর্ণ দীপ্ত প্রত্যুষ-ছটার
তাও নয়, কিম্বা অন্য প্রেমের বিষয়;

নয় ও গোলাপ পদ্ম, রত্নমালা-রাগ
তাও নয় কণ্ঠে যার নিবিড় সোহাগ;
ওরা নয় ওরা নয়, স্বর্গের অতুল

উপহার ওই মন দেহের আধারে,
ও মনের রূপে তার রশ্মিতে আমূল
বাঁধিয়াছে মোর আঁখি হৃদয় আত্মারে।

দ্যু বেলে (১৫২৫—১৫৬০)

ছাব

অনুবাদিকা / ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়

স্টেফান স্বাইগ (১৮৮১—১৯৪২)

রাত্রি-নিদ্রিত অঙ্কুরগুলো নিঃশ্বাস নিচ্ছে
উষ্ণ হচ্ছে হৃদয় মোহাচ্ছন্ন সুরভিতে,
কুয়াসা উঠছে রূপালী ধোঁয়ার মত
গুমোট মেঘের বায়ুস্তর থেকে।

দূরান্তে বজ্র ঝটিকার বিদ্যুৎ ভ্রুকুটি
মসীকৃষ্ণ দিগন্তের 'পরে।
মেঘগুলো ঘিরেছে ত্রস্ত বিহঙ্গের মত
চাঁড়িগুম্ফিত চাঁদকে।

বজ্র গর্জিত গভীর নির্ঘোষ
প্রতীক্ষ মর্তভূমিতে—
শঙ্কা স্পন্দিত কর্ণকুহরে
যেন এক বোবা হস্তস্পর্শ

(মূল জার্মান হইতে অনুবাদ)

রজনীগন্ধা

অনুবাদ / মানস রায়

য়োসেফ ফন আইশেনদর্ফ (১৭৮৮-১৮৫৮)

রাত্রি যেন প্রশান্ত সমুদ্রের মত,
কামনা আর বেদনা আর প্রেমের হতাশ্বাস
এখানে এসে এমন দিগভ্রান্ত হয়
মৃদু তরঙ্গের আঘাতে।
আশাগুলো যেন মেঘের মত,
পাল তুলে চলে শান্ত শূন্যতার মধ্যে,
কবোষ্ণ বাতাসে কে বলতে পারে,
একি চিন্তাস্রোত না স্বপ্নরাশি?
আমিও এখন হৃদয় ও সুখকে বন্ধ করেছি
যারা তারাগুলোকে এমন পীড়িত করছিল
সন্তর্পণে আমার হৃদয়ের সমুদ্রে
রইল তরঙ্গের মৃদু আঘাতগুলো।

স্কেচ

অমল বিশ

তহবিল তছরুপের অপরাধে পুরোনো নায়েবের চাকরী গেল। ডিহি শ্রীহর্ষপুরে নতুন নায়েব এল। বয়স চল্লিশের এদিকেই হবে। ধপধপে রং, লম্বা-চওড়া বেশ মজবুত চেহারা।

ডিহি শ্রীহর্ষপুরে একখানি ছোট মৌজা। পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবারের বাস। অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। কোনোমতে জাল টেনে, নৌকা বেয়ে, হাল চালিয়ে দিন আনে দিন খায়।

সুতরাং জমিদারী ছোট হলেও নায়েবের প্রতাপ অসামান্য। এই ডিহির নায়েবের ক্ষমতা একটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন মানতে হয়। কিন্তু নায়েব আইনের ঊর্ধ্বে। মারতে মারতে প্রজা খুন করে ফেললেও তার বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস এই ডিহির কারও নেই।

খাতাপত্র এবং হালচাল বুঝে নিতে নতুন নায়েব তারিণী প্রসাদের একটা সপ্তাহ গেল। তারপরে একটা বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরুবার সময় হল।

সঙ্গে পাইক লক্ষ্মণ দাস।

লক্ষ্মণ দাস এই গ্রামেরই লোক। ওরা পুরুষানুক্রমে এই কাছারীর পাইক এবং পুরুষানুক্রমেই বিখ্যাত লাঠিয়াল। খুন-জখম, আগুন লাগানো, প্রজা শাসনের প্রয়োজনে যত নৃশংস কাজ করতে হয়, পুরুষানুক্রমেই তার কিছুতে ওরা পিছু-পাও নয়।

এখন মন্ত্রীদের সঙ্গে যেমন সশস্ত্র পাহারা থাকে, তখন নায়েবের সঙ্গেও তেমনি লাঠিধারী পাইক থাকত। তার মানে নায়েবের জীবনও তখন মূল্যবান বিবেচিত হত।

গ্রামের এক প্রান্তে কাছারী বাড়ি। দুখানি মাটির ঘর। তার কোলে বারান্দা। তারপরে উঠান। উঠানের এক প্রান্তে একটা বুড়ো বেলগাছ।

সারাদিন একটানা এই বদ্ধ জায়গায় কাটাবার পর তারিণী পাইক নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুলো।

সরু রাস্তা। তার দুপাশে মাটির নিচু নিচু চালা ঘরগুলি যেন পথের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

অধিকাংশই জীর্ণ মাটির ঘর। চালের খড় পাতলা হয়ে এসেছে। অল্প বাড়িই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বেশির ভাগই অরক্ষিত, পাঁচিল নেই। গত বর্ষায় পড়ে গেছে, আর তুলতে পারেনি। পথ চলতে অন্দর পর্যন্ত দেখা যায়।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ তারিণী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দু চোখে গভীর বিস্ময়।

খিড়কির ঘাট থেকে গা ধুয়ে একটি বধূ বাড়ি এল। ভিজে শাড়ি চম্পকবর্ণ দেহের সঙ্গে লেপটানো। কাঁখে মাটির কলসী। মাথার গুণ্ঠন চোখের ভ্রূ পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার নিচে ভ্রমরের মতো কালো দুটি তারা।

নায়েবকে দেখে বৌটিও থমকে গেছে। কিন্তু তখনই দ্রুতপদে আড়ালে চলে গেল।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ একটা সম্মানজনক দূরত্ব রক্ষা করে চলছিল। এখন কাছে এসে নিম্নস্বরে বললে, হয়বর সিং-এর বৌ।

—হয়বর সিং!

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। আমাদের প্রজা।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তারিণী বললে, হুঁ।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, পাঞ্জাবী?

লক্ষ্মণ হেসে বললে, আজ্ঞে না বাবু, পাঞ্জাবী হবে ক্যানে? খুব রোগা, লম্বা শরীর। লগবগে লম্বা লম্বা হাত-পা। লোকে ঠাট্টা করে বলে, হয়বর সিং।

—অবস্থা কেমন?

—আজ্ঞে খুব গরীব। কোনোদিন খাওয়া হয়, কোনোদিন হয় না।

—হুঁ।

ওই একটি মাত্র হুঁ।

লক্ষ্মণকে এর বেশি বলার দরকার হয় না। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

বলে, তিন পুরুষ ধরে নায়েব চরিয়ে আসছি। ওনারা হাঁ করলে পেটের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাই।

সুতরাং ওই একটি 'হুঁ'ই যথেষ্ট। বৌটির পিছনে দূতী লেগে গেল। কেষ্টদাসী।

দুবেলা তার আনাগোনা সুরু হল।

প্রলোভন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে : কত কাপড়-গয়না-টাকাকড়ি, কত প্রতিপত্তি, গাঁয়ের লোক হাত জোড় করে থাকবে।

নায়েব যার হাতের মুঠোয় তার আবার ভাবনা গা?

শশিমুখী ছোট মেয়ে নয়, পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। দূতীর কথা শোনে, রাগ করে না। জানে, রাগ করার মতো জোর নেই, না তার নিজের, না তার স্বামীর।

অন্যদিকে নায়েব প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। যেমন লোকবল, তেমনি টাকার জোর। তাকে যদি একদিন জোর করে তুলে নিয়ে যায় কাছারীতে, দিনের বেলায় সদর রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলেও এ গ্রামে কারও সাহস নেই একটু শব্দ করে।

শশিমুখী শোনে, সাড়া দেয় না, শুধু ভাবে।

অবশেষে রাত্রে একদিন হয়বরকে বললে, চল, এ গাঁ ছেড়ে আমরা চলে যাই।

হয়বর বিস্মিতভাবে বললে, ক্যানে বল্‌-দিকি? তিন সনের খাজনা বাকি পড়েছে বলে?

শশিমুখী বিষণ্ণভাবে বললে, তা জানি না। কিন্তুক আমার কেমন ভালো লাগছে না। ভয় করছে।

শশিমুখী সত্য সত্যই স্বামীর গা ঘেঁষে এল।

হয়বর হো হো করে হেসে উঠল : ভয় আমারও করছিল। তিন সনের খাজনা বাকি।

সোজা তো লয়। কিন্তু লতুন লায়েব লোকটা ভালো রে, দয়াধম্ম আছে।

উত্তেজনায় উঠে বসে হয়বর একটা বিড়ি ধরালে। বললে, আজ বিকেলে দেখা। আমাকে কি বললে জানিস। বললে, তোমার বাকি খাজনার জন্যে ভেব না হয়বর। যা দিনকাল পড়েছে, গেরস্ত কি আর খাজনা দিতে পারছে? ধীরে সুস্থে দিও, তাহলেই হবে। সুদ, বাব, সব তোমার মাফ।

বিড়ির আগুনের আভায় হয়বরের চোখ যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু শশিমুখী চুপ। অন্ধকারে তার চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

একটু পরে শশিমুখী বললে, মানুষটা কিন্তুক ভালো লয়।

—লয়?—হয়বর তখনও উত্তেজিত।—সুদ, বাব, সব মাফ! আর কী ভালো চাস?

শশিমুখী চুপ করে রইল। এর বেশি আর কিছু বলতে পারলে না।

—খুব ভালো লোক রে। না জেনে ভদ্দর লোকের নিন্দে করতে নেই।

হয়বর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পা নাড়তে লাগল। একটু পরে ঘুমিয়েও পড়ল। শশিমুখীর কিন্তু ঘুম আসে না। ভয়। গা ছমছম করে। বাইরে হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে চমকে ওঠে।

কিন্তু হয়বরকে সব কথা বলা যায় না।

এর কদিন পরে কাছারীতে হয়বরের তলব এল।

কাছারীর নামে গ্রামের লোক কাঁপে। এ গ্রামের লোকের জীবনের সমস্ত বিভ্রাট যেন ওইখানে জমে আছে। ওই ছায়াহীন প্রশস্ত উঠানে। ওই পত্রহীন বেলগাছের নিচে।

কিন্তু হয়বরের ভয় ঘুচে গেছে। সেদিন নায়েবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই। মানুষটার দয়া ধর্ম আছে।

সে স্ফূর্তির সঙ্গে কাছারীর দিকে চলল।

সদর দরজা পার হয়ে উঠানে পৌঁছুতেই নায়েব গমস্তাকে বললে, ওই যে হয়বর এসেছে। ওর খাজনাটা মিটিয়ে নাও।

—খাজনা! —হয়বর যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার গলা শুকিয়ে গেল।—খাজনা তো আনি নাই। আপনি ডেকেছেন শুনে ছুটতে ছুটতে...

নায়েব বাধা দিয়ে বললে, ডেকেছি আর ছুটতে ছুটতে এসেছ! আমি কি তোকে মিষ্টি খাবার জন্যে ডেকেছি? উল্লুক কোথাকার! ওর খাজনা মায় সুদ, বাব, তহুরী হিসেব করে দাও তো হে!

এ রকম সম্বর্ধনার জন্যে হয়বর মোটেই প্রস্তুত ছিল না। উঠানে রোদে দাঁড়িয়ে সে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

হিসাব হল, একুনে উনিশ টাকা সাড়ে বারো আনা।

নায়েব বললে, যাও নিয়ে এস। এখুনি চাই। উঠোনে থুতু ফেলে যাবে, থুতু শুকোবার আগে টাকা নিয়ে আসবে। নইলে জল-বিছুটি দিয়ে চাবকানো হবে।

কী সর্বনাশ!

শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে কম্পিত কণ্ঠে হয়বর বললে, বাড়িতে আমার একটি [illegible]

নায়েব সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল: হাঁড়ি-ফাটক! লক্ষ্মণ, ওই বেলগাছের নিচে হারামজাদাকে হাঁড়ি-ফাটক দে। ওর বৌ খাজনা নিয়ে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

হাকিম ফেরে তবু হুকুম ফেরে না। অমোঘ এ হুকুম।

লক্ষ্মণ ঠেলতে ঠেলতে হয়বরকে বেলতলায় নিয়ে এসে হাঁড়ি-ফাটক দিয়ে দিলে। হয়বর দুই হাত দুই হাঁটুর নিচে নিয়ে চাপিয়ে দুই কান ধরলে। বেলতলায় চনচনে রোদ। ছায়ার চিহ্ন নেই।

চুপি চুপি লক্ষ্মণ বললে, এসব কিছুই হত না। যত ঝামেলা বাধালে তোমার বৌ।

—বৌ!—হাঁড়ি-ফাটক নিতে নিতেই হয়বর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সে আবার কি!

ফিস ফিস করে লক্ষ্মণ বললে, হ্যাঁ। সেই যত নষ্টের গোড়া। কাল কেষ্টদাসীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কেষ্টদাসী সেই দূতী। কিন্তু শশিমুখীর তাকে অপমান করবার কি আবশ্যক হতে পারে তার কিছু হয়বর বুঝতে পারলে না। এইটুকুই সে বুঝলে যে, শশিমুখীর সেই অপরাধের জন্যেই আজ তার হাঁড়ি-ফাটক।

যত বেলা বাড়ে, তত রোদ চড়ে।

হয়বরের চামড়া পুড়ে যায়। দর দর ধারায় ঘাম ঝরে। মাথা ঝিম ঝিম করে। হাঁড়ি-ফাটকের জন্যে হাত-পা ক্রমেই অবশ হয়ে আসে। চোখ ঝাপ্সা। নাক দিয়ে আগুনের মতো গরম নিশ্বাস পড়ে।

এ-সব শশিমুখীর জন্যে।

ঘন্টা দেড়েক এই রকম অবস্থায় থাকবার পরে লক্ষ্মণকে নায়েব ইসারা করতেই লক্ষ্মণ এসে হয়বরকে মুক্তি দিলে। এমনিতে সে দুর্বল। তাকে যখন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল তখন সে কাঁপছে, দেহ টলছে।

লক্ষ্মণ তাকে ধরে ধরে নায়েবের কাছে নিয়ে এল।

নায়েব জিজ্ঞাসা করলে, কত দিনের মধ্যে খাজনা শোধ করবি, কড়ার কর।

করজোড়ে কম্পিত কণ্ঠে হয়বর বললে, সাত দিনের সময় দিন হুজুর। গরুর খোরাকী ক' আঁটি খড় আছে তাই বেচে খাজনা শোধ করব। মা কালীর দিব্যি।

—তারপরে গরু খাবে কি?

—ওটাও বেচে দোব হুজুর। এ গাঁ ছেড়েই আমরা চলে যাব। হয়বর ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

নায়েবের মন তাতে গলল বলে মনে হল না। একটা কুটিল কৌতুক-কটাক্ষ হেনে বললে, আচ্ছা, আজ ছেড়ে দিলাম। আবার সাতদিন পরে দেখব। তারিখটা টুকে রাখ তো হে।

কাছারীর সদর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সে কাঁদলে।

এ সব শশিমুখীর জন্যে।

কে জানে কেষ্টদাসী কেন এসেছিল। কেনই বা তাকে খামোকা অপমান করা।

হয়বর রাগতে লাগল। হাঁড়ি-ফাটকের দৈহিক যন্ত্রণাটাই তার দুর্বল শরীরের কাছে তখন বড় হয়ে এসেছে। ছোটবার ক্ষমতা নেই, যথাসাধ্য পা চালিয়ে বাড়ি এসে দেখে, শশিমুখী [illegible] হাওয়ায় [illegible] বসে রান্না

করছে। হয়বরের শাস্তির কথা সে হয়তো জানেই না।

রাগে হয়বরের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই।

প্যাঁকাটির মতো সরু লম্বা ঠ্যাং দিয়ে মারলে শশিমুখীর কোমরে একটা লাথি।

আচমকা লাথি খেয়ে শশিমুখী মাগো বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার ধারণা জমিদারের লোকের কাণ্ড। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, জমিদারের লোক নয়, তার বীরপুরুষ স্বামী অদূরে দাঁড়িয়ে লম্বা হাত উঁচিয়ে আস্ফালন করছে!

তখনও তার দেহ ঠক ঠক করে কাঁপছে। হয়বরের আস্ফালন বাক্য তখনও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না।

হয়বরের দেহ রোদে পুড়ে বেগুনী হয়ে গেছে। গা বেয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে। কিছুটা প্রচণ্ড রোদে হাঁড়ি-ফাটক নেওয়ার জন্যে, কিছুটা রাগে তার চোখ রক্তবর্ণ, দেহ ঠকঠক করে কাঁপছে।

—কি হয়েছে! কি হয়েছে!

—কী হয়েছে? হারামজাদী ন্যাকা মাগী, জান না কি হয়েছে? তোর জন্যে আজ আমার হাঁড়ি-ফাটক হল, যা কখনও হয়নি!

শশিমুখীর শরীর তখনও উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় কাঁপছে, আমার জন্যে? আমি কি করেছি?

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হয়বর চীৎকার করে উঠল: ক্যানে তুই কেষ্টদাসীকে অপমান করেছিস? জানিস না সে জমিদারের লোক, আর তুই ঘুঁটেকুড়োনীর বিটি! তোকে আজ আমি খুন করব, তবে আমার নাম...

খুন করবার জন্যে হয়বর বোধ হয় লাঠির সন্ধানে যাচ্ছিল। কিন্তু কেষ্টদাসীর নামে শশিমুখীও তখন ক্ষেপে উঠেছে। কোমরে শাড়িটা আঁট করে জড়িয়ে সামনের বঁটিটা তুলে নিয়ে সে উঠানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—তবে রে ঘাটের মড়া, তুই আমাকে খুন করবি! এত বড় আস্পর্ধা! আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। দেখি তোর কত গায়ে জোর!

শশিমুখীর হাতের বঁটি এবং রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে হয়বর তখন বড় ঘরের দাওয়ায় উঠেছে। শশিমুখী সেইখানে তাড়া করে যেতেই সে এক লাফে প্রথমে উঠানে এবং সেখান থেকে শীর্ণ লম্বা দুই বাহু ঝাপটাতে ঝাপটাতে একেবারে বাড়ির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়ির মধ্যে তখন প্রতিবেশীর ভিড় জমে গেছে। মেয়ে এবং পুরুষ দুই-ই। পুরুষেরা বাইরে আর মেয়েরা অন্দরে।

কি হয়েছে! কি হয়েছে!

মুহূর্ত কয়েক শশিমুখী সেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতেই কটমট করে সকলের দিকে চাইলে লজ্জা পেলে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে। বিশেষ করে এর ভিতর কার নিগূঢ় কদর্যতার জন্যে, প্রকাশ করলে উৎসাহী লোকের কল্পনায় যা আরও কদর্য হয়ে উঠবে।

—কিছু হয় নাই।

শশিমুখী কোমরের জড়ানো কাপড় খুলে শান্তভাবে আবার রান্নাঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিলে।

([illegible] ২২২ পৃষ্ঠায়)

হোটেলে পৌঁছেই মনোরমা চটে গেল। শিববাবুই অগত্যা ঘরদোর গুছানো নিয়ে লেগে গেলেন। কিন্তু মনটা পড়ে থাকল হোটেলের বারান্দায় অপরেশের পায়ের কাছে। কদ্দিন বাদে দেখা, সেই ইস্কুলের বন্ধু অপরেশ। আর সে সময় অপরেশকে দেখে শিববাবুর যা যা মনে হত সব কটিই কি না ফলে গেছে! আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠতে চাইছে শিববাবুর মনটা, এত বেশি আনন্দ হচ্ছে যে, মনোরমার কাছ থেকেও গোপন করা যাচ্ছে না।

হোটেলের পশ্চিমমুখী ছোট শোবার ঘরটার জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনেরামা বললে,—

সমস্ত হোটেলটার মধ্যে এইটেই সব থেকে খারাপ ঘর। শিববাবু অবাক হলেন। যখনি এসেছেন তখনি তো এই ঘরটাই ঘোষবাবু ওঁদের জন্যে দিয়েছেন। ঘরটা যে মনোরমার এতই অপছন্দ সে কথা তো সে বলে নি কখনো! বেশ তো ঘরটা, শীতের দেশে পুবের ঘর না পেলে পশ্চিমের ঘরই ভালো, বিকেলের রোদটা পেয়ে, রাতে দিব্যি গরম হয়ে থাকে। মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো দেয়াল আলমারির নিচের তাকে নিঃশব্দে রাখতে রাখতে, শিববাবু আড়চোখে একবার মনোরমাকে দেখে নিলেন।

পঁচিশ বছর বিয়ে হয়েছে, তবু গায়ে এক ছটাক মাংস লাগতে দেয়নি মনোরমা। আগে দেখতে ভালোই ছিল, পাৎলা, ফর্সা, কোঁকড়া চুল। এখন বড় কাঠ কাঠ দেখায়, [illegible]টা যেন বড়ই ফ্যাকাসে, চুলগুলো এমনি ঘেঁচড়ে টেনে বাঁধা যে, কপালটাকে এত বড় মনে হয়। জোড়াভুরুর মাঝখান থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত দুটো লম্বা লম্বা বিরক্তির রেখা। বিয়ের সময় বটু বলেছিল, জোড়াভুরু মেয়ে বিয়ে করতে হয় না।

মনোরমা বললে, তোমাকে যতই দেখি, ততই অবাক হই! কিছুই কি তোমার গায়ে লাগে না। কোনো একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত [illegible]

শিববাবু হাঁটু গেড়ে ছিপটিপগুলো গুছোচ্ছিলেন, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু আমতা আমতা করে বললেন,

তা থাকবে না কেন? আমার জীবনের স্বপ্ন একদিন বুড়ো বাহাদুরকে ধরব। সেই আশাতেই তো প্রায় প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে এখানে আসি।

মনোরমা তাই শুনে হেসে উঠল। এমনি অদ্ভুত সে হাসি যে, শিববাবু পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে বললেন,

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, মনোরমা? ঘোষকে বলব ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনুক?

মনোরমা কর্কশ স্বরে বলল, কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। যার জীবনের স্বপ্ন একটা বুড়ো শোল মাছ ধরা, তার কাছ থেকে আমি কিচ্ছু আশা করি না। যাও।

নতুন বঁড়শীর বাক্সটা আস্তে আস্তে তাকের ওপর রেখে শিববাবু নরম গলায় বললেন, শোলমাছ নয়, মনোরমা। ওটা সত্যিকার বিলিতী ট্রাউট মাছের বংশধর। ত্রিশ বছর আগে হোল্ডার সায়েব ছোট পানির খানিকটা জায়গার দুধারে জালের বাঁধ দিয়ে বিলিতী ট্রাউটের বাচ্চা ছেড়েছিল। এ তাদেরি বংশধর। শোল নয়।

গলা থেকে কি রকম একটা অধৈর্য নয়তো ঘেন্নার শব্দ বেরোয় মনোরমার। মুখে বলে, সারাটা জীবন একই ভাবে কেটে গেল। কেবল হিসেব কষে কষে, কোথা দিয়ে কি করব তাই ভেবে ভেবে! তোমার ঐ অপরেশের স্ত্রীকে দেখে বুঝতে পারি কত ব্যর্থ আমার জীবনটা।

মনোরমা বালিশে মুখ গুঁজে চোখের জল ঢাকতে চায়।

এতো মহামুস্কিল! কোথায় তাড়াতাড়ি চায়ের পর্ব চুকিয়ে, অপরেশকে টেনে নিয়ে গিয়ে, ছোটপানির বুড়ো বাহাদুরের একটু চেষ্টা দেওয়া যাবে তা না, এখন মনোরমাকে ঠাণ্ডা করতেই না বিকেলটা কেটে যায়!

[illegible] কি মনোরমা, [illegible]

কাঁদাকাটি করে শরীর খারাপ করলে মনু মাই না কি বলবে বল তো?

মনুমার নাম শুনে মনোরমা উঠে বসে। চোখটা ভিজে ভিজে, নাকের ডগা লাল। মনোরমা বললে,

অপরেশবাবুর জামাই আই-এ-এস তা জানো? এখনি আটশো টাকা পায়। আর তোমার একমাত্র সন্তানের বিয়ে দিলে তিনশো টাকার মাষ্টারের সঙ্গে! ওর নাম মুখে আনতে লজ্জাও করে না!

শিববাবু সত্যি অবাক হয়ে যান। বলে কি মনোরমা, পুলিন হীরের টুকরো ছেলে, হাজারে একটা ওরকম দেখা যায় না, মনুমা কি সুখী! কেন, ক্লাবের হীরেনবাবুরা তো সেদিনো বলেছে, শিবু, তুমি ভাগ্যমন্ত, অমন জামাই আমাদের কারো হয়নি! তবে এসব কথা এখন মনোরমাকে বলতে যাওয়া মানে আগুনে ঘি ঢালা!

অপরেশ এসে দরজায় টোকা দেয়।

কই শিবু, এ বয়সেও গিন্নির সঙ্গে গল্প শেষ হয় না? এসো, একসঙ্গে চা খাওয়া যাক।

শিববাবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন, এই যে আসি, অপরেশ।

মনোরমা ঠোঁট উল্টে বলে, যত সব বড়-লোকি চাল! গরীবকে দয়া দেখানো হচ্ছে!

ভারি ভালো অপরেশ। ক্লাসে শুধু যে সব জড়িয়ে ফার্ষ্ট হত তা নয়, প্রায় প্রত্যেকটা বিষয়ে ও আলাদা করে ফার্ষ্ট হত! সেকেণ্ড মাষ্টার বলতেন, অপরেশ, তুই রাজা হবি!

তা হয়েছেও রাজাই! অত বড় ব্যারিষ্টার বড় একটা দেখাই যায় না! মাসে নাকি আট দশ হাজার টাকা কামায়! বাবা! শিববাবু তো অত টাকার কথা কল্পনাও করতে পারেন না! অপরেশটা মাসে মাসে তাই রোজগার করে! গর্বে বুক ফুলে সাত হাত হয়ে উঠে!

মনোরমাও আর কথা বলে না, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিচে অপরেশদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে।

সুন্দরী বটে অপ[illegible] স্ত্রী নলিনী। এই [illegible] শিববাবু ওকে; ওদের বিয়ে

সময় বাবা মারা যান, তাই আর যাওয়া হয়নি। কে বলবে ভদ্রমহিলার বেয়াল্লিশ বছর বয়স, ঐ যা একটু মোটাসোটা। কিন্তু কি হাসিখুসি, কি মিষ্টি কথা। আর মুখটা যেন ফুলের পাপড়ি। চারদিকে কিসের একটা সুগন্ধ ছড়াতে থাকে।

পরে মনোরমাকে সে কথা বলাতেই সেতো রেগে চতুর্ভুজ! বড়লোক কিনা, তাই অত সুন্দর লেগেছে! বেহায়া মেয়েমানুষ, বুড়ো বয়সেও লাজ দেখ না! জর্জেটের সাড়ি, ক্রেপ-ডি-সিনের ব্লাউজ, মুক্তোর মালা, হীরের টপ, হীরের আংটি! মাগো, দেখে লজ্জায় মরে যাই! আর তোমার মুখে দেখি তার প্রশংসা আর ধরে না! তা আর ধরবে না!

মাথা ধরেছে বলে মনোরমা সেই যে গিয়ে শুলো, রাতে খাবার জন্যেও উঠল না। অথচ খাসা মুর্গি রেঁধেছিল, নরম নরম মোটা মোটা পরটা করেছিল। অবিশ্যি একদিক দিয়ে ভালোই হল। লম্বা বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে গল্প করতে করতে রাত দুপুর করে দেওয়া গেল। দশটার পর অপরেশের স্ত্রী শুতে গেল। বাকিদের গল্পের আর শেষ হয় না।

বুড়ো বাহাদুরের কথা শুনে অপরেশেরো ভারি উৎসাহ! আশ্চর্য তো, আমাদের দেশের মধ্যে এই ছোট একটা পাহাড়ে সহরে সত্যিকার বিলিতী ট্রাউটের ছানা?

শিববাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, ছানা আবার কিরে? ব্যাটাচ্ছেলের বয়স কম সে কম বারো বছর! আরে, দশ বছর ধরে তো আমিই ওকে ধরবার চেষ্টা কচ্ছি। আর শুধু আমি কেন, কত বড় বড় মাছ ধরিয়েরা সব মুখ চুণ করে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছেন! বুঝলি অপরেশ, ও ব্যাটাকে আমি না ধরে ছাড়ব না!

ততক্ষণে অনেক দিন না দেখার আড়ষ্টতাটুকু একেবারে কেটে গেছে। স্বচ্ছন্দে তুই-তোকারি চলছে।

বেশ রেখেছে শরীরটাকে অপরেশ। চল্লিশের বেশি মনেই হয় না। এখনো তেমনি কথায় কথায় ইংরেজি কবিতা আওড়ায়। শিববাবুও এককালে পাল্লা দিয়ে কবিতা বলতে পারতেন, আজকাল কেমন যেন ভুলে ভুলে গেছেন। নাকি পাঁচবার বিলেত গেছে অপরেশ, তার মধ্যে চারবার সপরিবারে। ভারি ভালো ছেলে জামাইটি, মেয়েও ভারি সুখী।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান শিববাবু।

আরে আমার জামাইও খাসা ছেলে। হায়দ্রাবাদে প্রফেসারি করে। তিন শো টাকা মাইনে পায়; কি একটা রাসায়নিক বিষয় নিয়ে বই লিখছে। লোকে কি বলে জানিস, অপরেশ? আমার ক্লাবের বন্ধুরা বলে আমার নাকি জামাই ভাগ্যি বড় ভালো।

বোকার মতো হাসতে থাকেন শিববাবু। অপরেশও হাসে। গভীর রাতে, নির্জন বারান্দায়, চাঁদের আলোয় বসে, বোকার মতন হাসতে ভারি ভালো লাগে ওদের। মনোরমার কথা মনে পড়াতে একটু বিবেক দংশন করে, কিন্তু তাকে যখন ডেকে আনবার সাহসে কুলোয় নি, তখন আর ভেবে লাভ কি?

কোন সূত্রে যেন মনোরমার কথাও বলে ফেললেন শিববাবু। বেচারার শরীরটা কোথাও ভালো থাকে না, মেজাজটাও তাই একটু খিটখিটে হয়ে গেছে, ওর জন্যে কিছু করতেও পারেন না শিববাবু, যদি মাছধরারো অভ্যাস থাকত তাহলেই সুখী হবার একটা সহজ উপায় হয়ে যেত, কিন্তু সেদিকেও তার বিন্দুমাত্র সখ নেই!

অপরেশ হেসে ওঠে। যাঃ! কি যে বলিস, মেয়েরা কখনো মাছ ধরে না। ওরা ও রসে একেবারে বঞ্চিত! মাছ কুটবে, রাঁধবে, খাবে অথচ মাছ ধরার নামেই বেশির ভাগ মেয়েই খাপ্পা হয়ে ওঠে!

এই রকম যুক্তিশূন্য ব্যাপার নিয়ে আরো খানিকটা হেসে ওরা শুতে গেল।

ঝুপ করে রাতটা কেটে গেল। এ ঘরে সকালে রোদ আসে না, শীত শীত করে। মনোরমা গায়ে লম্বা হাতা গরম জামা পরে, পায়ে ছাই রংএর গরম মোজা টানতে টানতে বলল,

ওদের ঘরটা পুবমুখো, সকালে রোদে একেবারে ভরে যায়। বিয়ের পর প্রথম যেবার এসেছিলাম ঐ ঘরটা নিয়েছিলে। কি বড় ঘর। ওর চানের ঘরটাই প্রায় এ ঘরটার সমান হবে। কপালে না থাকলে কি সুখ হয় নাকি কারো?

তখন আড়াইশো টাকা মাইনে ছিল শিববাবুর, পঁচিশ বছর ধরে দশ টাকা করে বেড়ে বেড়ে এখন পাঁচশোতে দাঁড়িয়েছে। কি এমন মন্দ? ক্লাবের হীরেনবাবুরা তো ওকে বড়লোক বলে মস্করা করে। ওকে দিয়ে পান আনায়, ওর ঘাড় ভেঙে মাঝে মাঝে চা সিঙ্গাড়া খায়। সত্যিই কি এমন মন্দ অবস্থা? মনুমার বিয়ে হয়ে গেছে, আর বিয়ে হয়েছে অমন একটা হীরের টুকরোর মতো ছেলের সঙ্গে! আরে, ঐ নতুন বঁড়শী আর লাল বিলিতী ফড়িং তো ও-ই কিনে দিয়েছে, অবিশ্যি মনোরমাকে সে কথা বলা বারণ! মনোরমার ভারি আত্মসম্মান, বলে নাকি জামাই-এর কাছ থেকে যখন তখন উপহার নেওয়াটা ভারি অভদ্রতা। সেবার যখন ইলাষ্টিক লাগানো মোজা কিনে দিয়েছিল পুলিন, মনোরমার সে কি রাগ! দেখাতে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুত শিববাবু, একেবারে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল! পরে মনুমোরা তাই শুনে খুব হেসেছিল, কিন্তু মনোরমাকে কিছু বলবার সাহস কারো হয়নি। কি জানি, পরে যদি শিববাবুকে আবার কিছু বলে বসে!

আসার দিন মনুমা আর মনুমার এক বছরের বাচ্চাটা, দুজনেই শিববাবুর নাকের ডগায় চুমো খেয়ে দিয়েছিল। বাচ্চাটাতো কচি কচি দাঁত দিয়ে কামড়েই দিয়েছিল। নাকের ডগায় কেমন একটা আরামের শিহরণ লাগে শিববাবুর! গুটি গুটি মনোরমার পেছন পেছন খাবার ঘরে গিয়ে ঢোকেন শিববাবু। অপরেশরা আগেই এসে গেছে, ওদের দেখে হৈচৈ করে উঠল। বেয়ারা ডেকে দুটো টেবিল একসঙ্গে জুড়ে, একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা করে ছাড়ল!

ছোট্ট এক টুকরো অমলেট গিলে নলিনী বললে,

তাহলে আজকের প্রোগ্রাম কি হবে?

শিববাবু তো অবাক! এখানে এসে মাছ ধরা ছাড়া আবার কি প্রোগ্রাম হতে পারে? শুকনো গলায় মনোরমা বললে,

আর [illegible] এই জন্যে কোন সখও নেই, বোঝেনও না কিছু। তবে জই রোডের বড় সিনেমা হলে খুব ভালো বাংলা ছবি আসে। আমি সেখানে যাই।

অপরেশ বললে,

তার চেয়ে চলুন না সবাই একসঙ্গে। শিবু বলছে ওর মাছ ধরার কি একটা গোপন জায়গা আছে, সে নাকি ভারি সুন্দর। সেখানে আমরা মাছ ধরি আর আপনারা চড়ুইভাতি করুন। বললেই নিশ্চয় এখান থেকে খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়।

শিববাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ও অপরেশ, সে কি খুব ভালো হবে? বেশী কথা টথা বললে মাছগুলো সব ভেগে যায় তা জানো না?

নলিনী বলে, তাহলে কি সারাদিন মুখ বুজে মাছ ধরতে হয় নাকি? বিরক্ত লাগে না?

শিববাবু মৃদু মৃদু হাসেন। বিরক্ত লাগবার সময় কোথায়? চার ধারে উঁচু উঁচু সরল গাছ, বাদাম গাছরা ঘিরে রয়েছে। পাথরের পাশ দিয়ে ঝির ঝির নদী বয়ে চলেছে, যেখানে কম গভীর সেখানে কেউ মাছ পাবে না। মাছরা থাকে যেখানে জল বেশি। ছিপ ফেলে, চুপ করে বসে বসে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকতে হয়, আর কানে শোনা যায় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শির শির সর সর করে বাতাস বইছে, আর দেখতে পাওয়া যায় মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে নীল আকাশে একটা কালো দাগের মতো চিল ঘুরছে—

কাষ্ঠ হাসি হাসে মনোরমা। হয়েছে! এবার কাব্যি শুনুন তাহলে! তবে এটাও বলে রাখি, যতই বক্তৃতা করুন মাছ একটাও বঁড়শীতে গাঁথে না! মাছ ধরার কথা উঠলে শিববাবু কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারেন না।

পড়ে বই কি, মনোরমা, বাঃ, সারাদিন বসে থাকি, আর একটাও মাছ পড়ে না, তাই কি হয় নাকি?

মনোরমা বিরস গলায় বলে, কই, দেখি না তো।

ছোট মাছগুলোকে যে ছেড়ে দিতে হয় মনোরমা, মাছ ধরারও কতকগুলো [illegible] আছে।

নলিনী বললে, আমাদের দেশের বাড়ীতে আমার বাবা পুকুর থেকে এই বড় বড় কাৎলা মাছ ধরাতেন জাল ফেলিয়ে। সে খেয়ে শেষ করা যেত না, একে ওকে বিলিয়ে দেওয়া হত।

মনোরমা খুশি হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, ও রকম মাছ ধরার তো একটা মানে হয়, পাঁচজনে খেয়ে আনন্দ পায়। এ আবার কি রকম ধারা, সারাদিন পা ছড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া, দুটো কথা বলার যো নেই, আর রোজ সন্ধ্যাবেলা খালি হাতে বাড়ী ফেরা!

অপরেশরা খুব হাসতে থাকে! কিরে শিবু, মাছ ধরতে যাস তো মাছ ধরিস না কেন রে?

শিববাবুও হেসে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, এক মাঘে শীত কাটে না। ধরব যখন দেখিস, একেবারে বুড়ো বাহাদুরকেই ধরে নিয়ে আসব! তখন তোদের মুখগুলো সব 'দিস কাইন্ড অফ স্মল' হয়ে যাবে! আজকাল অন্য মাছ আমার ধরতেই ইচ্ছে করে না!

মনোরমা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, না, তা আবার করে না! পারে না, তাই! আর বুড়ো বাহাদুর ধরা তোমার কম্ম নয়। গত বছর দু'মাস

([illegible] পৃষ্ঠায়)

জনমত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

একে অসহ্য ভীড় তায় দুঃসহ গরম। কামরার প্রত্যেকটি লোকই ভেতরে ভেতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। দু-একটা ছোটখাট ঝগড়া তো প্রতি মুহূর্তেই বেধে উঠছে—কিন্তু সেই গরমের মধ্যে চেঁচামেচিও ভাল লাগছিল না বলে সকলে মিলে ভাল রকম বাধবার আগেই থামিয়ে দিচ্ছিলাম—যাকে বলে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

গত বছর পুজোর সময় সেটা। পুজো কনশেসনের ভীড়। আজকাল অর্ধেক কামরাই থাকে 'সংরক্ষিত', সীট রিজার্ভ না করলে ওঠবার উপায় নেই। ভুল বলছি—অর্ধেক নয়, বেশীর ভাগই। ভাল ভাল ট্রেণগুলোর একটি মাত্র ক'রে বগী থাকে থার্ড ক্লাসের জন্য—যাতে যে খুসী উঠতে পারে। আর সেকেন্ড ক্লাসের মাত্র একটি কামরা। সীট রিজার্ভ করাতে গিয়ে দেখেছি পরের দিন যে টিকিট দেবে সে টিকিটের জন্য আগের দিন সন্ধ্যাতেই লম্বা লাইন পড়ে গেছে। অত সময় আর ধৈর্য আমাদের নেই—সুতরাং এই একটি বগীতেই উঠতে হয়েছে। বলং বলং বাহুবলং—সেই সনাতন ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি ভরসা।

ছোট কামরা, 'ষোলজন বসিবেক'—সে জায়গায় উঠেছি আমরা যেটের জন পঁচিশ। একেবারে যাকে বলে সর্দি গর্মির দাখিল। মাঙ্গে ও মানুষে চাল পর্যন্ত ভরে উঠেছে গাড়ির ভেতরটা। তবু আমরা তো ভাল আছি খবর পেলাম পাশের কামরাতে এইমাত্র রক্তারক্তি হয়ে গেল। এমন অবস্থা যে এমন মজার দৃশ্যটাও মুখ বাড়িয়ে দেখে উপভোগ করতে পারলুম না। যারা দোরের কাছে বা দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছ থেকে পাওয়া বাসি খবরে খুশী থাকতে হ'ল।

এই অবস্থা, বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কখন ট্রেণ ছাড়বে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লোক আসবে—অথচ এর ভেতর আরও লোক উঠবে ভাবতেই মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঠাকুর ঠাকুর করছি—কোনমতে ছাড়লে হয়!

কিন্তু ঠাকুর আমাদের কথা শুনলেন না। শেষ মুহূর্তে একটি লোককেই ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিলেন। ওঁদেরই চেলাচামুণ্ডা দলের—অর্থাৎ গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী!

তা লোকটির বাহাদুরী আছে মানতেই হবে। দরজার কাছে সেই নিরেট নিরন্ধ্র ভীড়—বাইরে হ্যান্ডেল ধরেই ঝুলছে অন্ততঃ জনা আষ্টেক লোক, তার মধ্যে কী করে যে তিনি এক সময় ভেতরে এসে দাঁড়ালেন তা বোধ করি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অথবা সন্ন্যাসীটিরই কোন অলৌকিক ক্ষমতা।

প্রতিবাদ কিছু কম হয়নি। ঠেলাঠেলির অবশ্যম্ভাবী ফল গালাগালিও বর্ষিত হয়েছিল প্রচুর। চেঁচামেচির একটা তুফান উঠেছিল বলতে গেলে কিন্তু স্বামীজী নির্বিকার। তিনি কারুর কথার প্রতিবাদ করলেন না, গালি গালাজের উত্তর দিলেন না—তেমনি কারুর বাধাকেও গ্রাহ্য করলেন না। যেন কোন এক ঐশী শক্তির বলে অথবা জাদু প্রভাবেই অবলীলাক্রমে এগিয়ে এসে একটা পাখার নিচে দাঁড়ালেন।

বলা বাহুল্য তাঁর এই ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনায় আমরা সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। অথবা অনেকক্ষণ ধরে অনেক কারণেই বিরক্ত হয়েছিলাম—এখন সেই বিষ উদ্গীরণ করবার মত একটা লাগসই আধার পেয়ে বাঁচলাম। হঠাৎ যেন এক মুহূর্তে এই কামরার পঁচিশ ছাব্বিশ জন লোক এককাট্টা ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সকলের মনের চাপা বিষ গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। গালিগালাজ বিদ্রূপ বক্রোক্তি; যার তূণে যা ছিল সবাই ঐ একটিমাত্র লোককে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করতে লাগল।

কিন্তু সেই লোকটি—সকলকার 'সাধারণ শত্রু', ইংরেজীতে যাকে বলে কমন এনিমি—সেই সন্ন্যাসী কিন্তু অবিচল। তাঁর কোন ভাবভঙ্গীতে একবারও মনে হ'ল না যে এর একটি বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন বা তাঁর কানে যাচ্ছে। এক সময় এমনও সন্দেহ হ'ল যে তিনি হয়ত জন্ম-বধির এবং সেই কারণেই বোবা। কিন্তু হঠাৎ ডাউন লাইন দিয়ে একটা ট্রেণ যাবার আকস্মিক শব্দে চমকে উঠে সেদিকে তাকাতে বুঝলুম তান যাই হোক—তিনি কালা নন।

কিন্তু তাহলে এমন নির্বিকার আছেন কেমন করে? —এমন প্রসন্ন উদাসীন? এমন নিরাসক্তি কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

এতক্ষণে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। লম্বা চওড়া গৌরবর্ণের মানুষ। জটাধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসী নয় তা বলাই বাহুল্য। মাথা ও দাড়ি-গোঁফ চাঁচা আধুনিক স্বামীজী। অর্থাৎ গেরুয়া বহির্বাস ও গেরুয়া রঙের কাঁধ ঝোলাটি না থাকলে সন্ন্যাসী বলে চেনবার উপায় নেই। গেরুয়া জামাও আছে একটা অবশ্য—তা সে তো আজকাল অনেক গৃহীও পরে। তবে রংটা ঠিক পুরোপুরি গেরুয়া নয়—কমলালেবু রঙ, ঈষৎ রক্তাভ। অর্থাৎ পরিচিত কোন মঠ-মিশন-সঙ্ঘের সাধু নন—কিছু স্বতন্ত্র। হয়ত স্ব-সঙ্ঘেরই।

কিন্তু বেশভূষা যাই হোক—রিপু যে তিনি জয় করতে পেরেছেন—অন্তত দ্বিতীয় রিপু—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমরা এতগুলি লোক মিলে যে সম্মিলিত 'সাড়াশি আক্রমণ চালালুম, তাতে বোধ হয় হিমালয়েরও মাথা গরম হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি সেই যখন প্রথম গাড়িতে উঠলেন তখনও যেমন দেখেছিলুম, প্রশান্ত ললাট কোথাও কোন উষ্মা বা বিরক্তির কুঞ্চন নেই সেখানে—সুন্দর সুঠাম অধরে স্মিতপ্রসন্ন একটি হাসির ভঙ্গী—এখনও ঠিক

তেমনি। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। যেন মনে হ'ল তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এতগুলি লোকের কটূক্তি সহ্য করছেন না— কোন সম্বর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে লেখা মানপত্র পাঠ শুনছেন!

এমন লোককে আর কত গালাগালি করা যায়—ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল সবাই। তবে একেবারে বন্ধ হল না। কটূক্তিটা বক্রোক্তির পথ ধরল মাত্র।

এক ভদ্রলোক বললেন, 'সাধে কি নেহরু ওদের দু'চোখে দেখতে পারে না। সোস্যাল প্যারাসাইট্ বলে ঘেন্না করে। শুধু পরের পয়সায় বসে বসে খাবে এই লোভে ওদের গেরুয়া নেওয়া, ছ্যাঃ!

আর একজন বললেন, 'প্যারাসাইট কি বলছেন। সোস্যাল পেস্ট! ...গ্যাংগ্রীনের মত সমাজ দেহটাকে পচিয়ে তুলছে একটু একটু করে।

আর একজন বললেন, 'ঠিক বলেছেন ক্যান্সার! কুরে কুরে খাচ্ছে। অলিগলিতে দেখি সন্ন্যাসী—আর মহাপুরুষ। আজকাল আবার এটা হয়েছে একটা বড়মানুষির অঙ্গ—এই সন্ন্যাসী দেখে গুরু করা! তার ফলে আমাদের হয়েছে মশাই প্রাণান্ত। পাড়ার সব বড়লোকদের বাড়ি একজন করে গুরু আসবেন মধ্যে মধ্যে—আর আমাদের বাড়ির মেয়েরা ছুটবেন মহাপুরুষ দেখতে। ফুলের মালা আছে, সন্দেশ আছে, প্রণামী আছে— একগাদা খরচান্ত। তারা তো ওসব ছোটখাটো জিনিষ গ্রাহ্যই করে না—দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলিয়ে দিয়ে নির্লোভ নাম কেনে—আসল চীজ—রূপচাঁদ ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না—সে যাই হোক আমাদের মত গরীব গুর্বোর পক্ষে ঐ খরচাই কি কম! একী ঘোড়ারোগ বলুন তো! আবার বলে মন্তর নেন। আমার বাড়ির ইনি তো বাতাসের আগে ছোটেন, সন্ন্যাসী দেখলে হয় একবার!'

আর একজন মৃদুকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলেন, 'তা মিশনের ও'রা কিন্তু অনেক কাজও করেন—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে পূর্বের বক্তা বলে উঠলেন, তাঁরা তেমনি শিষ্য ত্রাণ করতে আর পয়সা কুড়োতে শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি মাইফেল খেয়ে বেড়ান না। সে সময় তাদের নেই। এই সব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সন্ন্যাসীদেরই ভয়!'

এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এর মধ্যেই তাঁর ছোট কল্‌কেটি ম্যানেজ করছিলেন, তিনি জানলার দিকে মুখ করে ধোঁওয়াটা ছেড়ে নিয়ে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, সাধু মহাত্মা কাঁভ এয়সা হোতা হ্যায়? উ লোক পাহাড়মে তীরথমে রহতা হ্যায়। এয়সে শহরমে বাজারমে থোরাই আয়গা কোই আচ্ছা মহাত্মা'। ...ইসব ফ্রসট্ হ্যায় বাবুজী। বিল্‌কুল ফ্রসট্!'

কিন্তু এই সব উক্তির লক্ষ্য যিনি—হিন্দী ব বাংলা কোন আক্রমণই তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল বলে মনে হল না। তিনি যেমন সহজভাবে সামনের নোটিশটির দিকে তাকিয়েছিলেন তেমনই রইলেন, মুখের শান্ত প্রসন্নতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল না।

ক্রমশ সকলেই শ্রান্ত হয়ে চুপ করল এক সময়। যথাসাধ্য গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। কষ্ট হচ্ছে সকলকারই—তার ওপর অনর্থক কত বকা যায়? একটু একটু করে কামরার ভেতরটা থিতিয়ে এল।

এক্সপ্রেস ট্রেণ। বড় বড় কটা ষ্টেশন পার হয়ে গেল। দু'একজন যে আরও ওঠবার চেষ্টা করল না তা নয়, নেহাৎ অসম্ভব বলেই পারল না হয়ত। কে যেন বললে এসব ষ্টেশনে টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দিয়েছে। তা হবে। আসল কথা আমরা সকলেই একান্ত ক্লিষ্ট—কিছুতেই যেন আমাদের আর কোন কৌতূহল নেই। শুধু এই কণ্টকময় পথ কখন শেষ হবে একমাত্র চিন্তা।

ক্রমে রাত গভীর হ'ল। যে যেখানে ছিল সকলেই ঢুলতে শুরু করল। মায় যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিল তারা পর্যন্ত। খাওয়ার চেষ্টাও করলে দু'একজন। ষ্টেশনের খাবারওলারা এদিকে এসে পৌঁছতে পারছে না। যা দু'একটা জিনিস আসছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না। শুধু 'চা' শব্দটা কানে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে, কোন কোন জানলারধার-রূপ স্বর্গের অধিবাসী দয়া করে দু'এক ভাঁড় এগিয়ে নিচ্ছেন—যাকে বলে ডাক বসিয়ে দেওয়া—সেই উপায়ে, আবার সেইভাবেই পয়সাও পৌঁচচ্ছে চাওলার কাছে। মাড়োয়ারী দুজন বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলেন। আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল কিন্তু সে ঝুড়িটা যে এখন কোথায় তা খুঁজে বার করা আমাদের সাধ্যাতীত—অগত্যা আহারের ইচ্ছা সম্বরণ করলুম। একটা রাত না খেলে মানুষ মরে যায় না। ঢুলছি সবাই। মধ্যে মধ্যে চমক ভেঙ্গে ঘড়ি দেখছি রাত আর কত বাকী। কোমর কন কন করছে, হাঁটু দুটো খসে যাচ্ছে। দুটো য়্যাসপিরিন খেয়েছি—আর খেতে ভরসা হচ্ছে না। সকাল হলে দু'চারজন নামবে—এই যা আশা। পা দুটো হয়ত তখন কিছু মেলাতে পারব এমনি এক চমক ভাঙ্গার অবসরে তাকিয়ে দেখি সাধুজী কখন দিব্যি জেঁকে বসেছেন। একটু উচ্চাসন অবশ্য—মানে একটা ট্রাঙ্কের ওপর পর পর দুটো হোলড অল-এ বাঁধা বিছানা, তার ওপর উঠে বসতে হয়েছে—তবু আমাদের চেয়ে ঢের ভাল আছেন। কখন এটা "ম্যানেজ' করলেন কে জানে, চেয়ে দেখলুম আর কেউই এ ব্যবস্থা করে নিতে পারেননি। যাঁরা যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা এখনও দাঁড়িয়েই আছেন। তবে স্বামীজী ঢুলছেন না একটুও, ঠিক যেমন ঐ নোটিশটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনিই আছেন। মুখেরও যে প্রসন্নতা এতটুকু ম্লান হয়নি—শুধু তখন দাঁড়িয়েছিলেন, এখন বসেছেন এই মাত্র।

কী একটা বড় গোছের ষ্টেশন এল। 'চা' 'চা'—রব পড়ে গেল চারিদিকে। এই চা—এ গরম চা, ইধার আও। ইধার। জল্‌দি" ইত্যাদি। সকলেই দেখলাম একটু সোজা হয়ে বসবার বৃথা চেষ্টা করলেন একবার করে। আগের মতই ডাক বসানো চা এদিকে আসতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এক কাণ্ড করে বসলেন, এক ভাঁড় চা স্বামীজীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পিজিয়ে গা, মহারাজ?'

স্বামীজী তাঁর শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চোখদুটি দেওয়ালের নোটিশ থেকে নামিয়ে এনে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন একবার তারপর মুখের আর একটু প্রসন্ন ভঙ্গী করে বললেন, 'দিজিয়ে!'

ভাঁড়টা নিয়ে দু-হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বোধকরি বা ধন্যবাদই দিলেন ভদ্র-লোককে তারপর মুহূর্তকাল চোখ বুজে—সম্ভবতঃ চা-টাও ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে বেশ সহজেই খেতে লাগলেন।

একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিই বিলকুল ফ্রসট্ বলেছিলেন না?

অবশ্য আরও অবাক হলাম আর একটু পরে—যখন তাঁর চা-পান শেষ হ'তে 'সোস্যাল প্যারাসাইট' আখ্যাদাতা ভদ্রলোকটি শশব্যস্তে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দিন স্বামীজী আমি ফেলে দিচ্ছি—'

এতক্ষণে সেই ভাবলেশহীন পাথরের মুখে একটু ভাবান্তর দেখা দিল। ঈষৎ কুন্ঠিতভাবে বললেন, 'আপনাকে আবার এটা—।'

'তাতে কি হয়েছে? আপনি নাববেনই বা কি করে। ও কোন সঙ্কোচ করবেন না—সামান্য ব্যাপার!'

আর কথা বাড়ালেন না স্বামীজী। নিঃশব্দে শুধু ভাঁড়টা এগিয়ে দিলেন।

এ ষ্টেশন থেকেও ট্রেণ ছাড়ল। আবার শুরু হল দুলুনি ও ঢুলুনি। আমরা যে যার ভাগ্যের কাছে আবার আত্মসমর্পণ করলাম কিছুক্ষণের জন্য। গাড়ির মধ্যেটা আবার স্তব্ধ হয়ে এল।

একেবারে সচকিত হয়ে উঠলাম আবার ভোরের দিকে। কী-একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কিন্তু তার জন্য নয়— এমন তো থামছেই—এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে সেই সাধুটি নেমে গেলেন। এবার অবশ্য আর তাকে কিছু কসরৎ করতে হ'ল না, যোগ-বিভূতিরও শরণ নিতে হল না—এবার সবাই যেন সযত্নে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। তিনি তাঁর কাঁধ-ঝোলা ও সুটকেসটি নিয়ে অনায়াসে নেমে গেলেন।

তখনও তাঁর সেই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন [illegible] স্মিত প্রসন্ন মুখ।

সারারাত্রি জাগরণেও এতটুকু কালিমা লাগাতে পারেনি সে মুখে।

এবার ট্রেণ ছাড়লে আবার দুলুনি শুরু হল বটে কিন্তু তন্দ্রার ভাব আর এল না। ওদিক থেকে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে কে একজন এগিয়ে এসে সাধুজীর পরিত্যক্ত আসনে বসলেন। আমাদের ভাগ্যের কোন পরি-বর্তনই হ'ল না। সমস্ত শরীরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। যদি একটু দাঁড়াতেও পারতাম!

সুতরাং ঢুলুনির বদলে আবার শুরু হ'ল বকুনি। অর্থাৎ আমাদের কামরার ঘুম ভাঙল।

'সোস্যাল প্যারাসাইট'ই প্রথম কথাটা পাড়লেন। বললেন, 'আমাদের বোধহয় কাল একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল—কী বলছে শঙ্কর? অতটা বলা—লোকটা একটা কথারও জবাব দিল না, বিন্দুমাত্র অফেন্স নিলে না—তা' লক্ষ্য করলে? খুব কিন্তু সহ্য গুণ।'

শঙ্কর অর্থাৎ 'গ্যাংগ্রীণ' মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, 'হুঁ, তাই ভাবছিলাম—কিছু বোধহয় আছে লোকটির মধ্যে। একটু ঊর্ধ্বে না উঠলে ঠিক অতটা উদাসীন হওয়া যায়

(শেষাংশ ২০৪ পৃষ্ঠায়)

তুমিই আমার প্রভু

মাঘের বুকে সকৌতুকে

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাঘের বুকে সকৌতুকে যার আনাগোনা তার লীলা কেবল কাব্যে নয়—জীবনেও। জীবন থেকে কাব্যের উদ্ভব, কিন্তু কাব্য থেকে জীবনকে গড়তে চাইলে যা সৃষ্টি হয়, তা শুধু কৌতুক নয়, আরও কিছু বেশি। রসের দায়ভাগে অবশ্য মাঘের চেয়ে ফাল্গুনের যৌতুকটা বড়। যা কিছু পুরাতন আর জীর্ণ, যেখানে দৈন্য আর মালিন্য শুধুই দীর্ঘনিঃশ্বাস মাত্রার আবহ নিয়ে আসে, তাকে আমরা কেউই চাই না। কেবল নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে বাধ্য হই। তুষার-ঘরে পচন নেই, সত্য। কিন্তু জেগে থাকবার উজ্জীবনী মন্ত্রও নেই। তাই প্রাণের দায়ে ব্যাকুল অভ্যর্থনা জানাতে হয় নতুন প্রাণের উদ্গত অঙ্কুরটিকে। নিরন্তর ধূসর থেকে চোখ চলে যায় শ্যামলের দিকে [illegible] আশ্বাস পেয়ে।

ঐ আশ্বাসটুকুই সরস প্রাকৃত দান। শীতের জড়তায় মুমূর্ষু পৃথিবী প্রাণের স্পর্শ ফিরে পায় বসন্তের মৃত-সঞ্জীবনী হাওয়ায়। সারা প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ কোমল উত্তাপে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। এই আদিম সৃষ্টি-সত্য আদিম মানুষের কাছে একদিন পরম বিস্ময় ও উল্লাস এনেছিল। সেই জন্য প্রাচীন সভ্যতার প্রাথমিক সাহিত্যে এত কাল্পনিক, পৌরাণিক উপকথার ছড়াছড়ি। শীতের সুষুপ্তি থেকে ধরিত্রীর পুনর্জন্ম—এই ভেজিটেশান মিথ বা উদ্ভিদের উদ্গমকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। তামুজ আর ওসিরিস্‌-এর কাহিনী থেকে শুরু করে কালিদাসের ঋতুসংহার আর রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ পর্যন্ত সর্বত্রই এই প্রাকৃতিক রূপান্তরের মূল তত্ত্ব কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। আজও সেই পালা-বদলের গান থামেনি, বাস্তবের সহস্র বঞ্চনা সত্ত্বেও নির্মম শীতান্তে প্রথম ফাল্গুনী স্পর্শ তেমনি অভ্রান্ত এবং রমণীয়।

তাই পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক যুগে আষাঢ়ে বর্ষণ নেই, শীতে শীত হয় না জেনেও মন আশান্বিত হয়, ঋতু বদলের আলোচনা চায়। কেউ বা মনে মনে ভাবেন, শীত যদি যায়—যায় তো হায়-হায় করবার কিছু নেই। যায় যদি যাক্ না, ক্ষতি কি? এমন কিছু বাহাদুরির ব্যাপার নয় যে বিদায়-সঙ্গীত অথবা আগমনী গাইতে হবে ঘটা করে! বর্তমান জীবনে আয়োজন-উপকরণের এমন কিছু প্রাচুর্য নেই, যাতে প্রতিটি ঋতুকে সামিষ কিংবা নিরামিষ উপায়ে রসিয়ে উপভোগ করা চলে। সাপ্তাহিক ভবিষ্য-গণনায় যেমন আয়-ব্যয়, স্বস্তি-দুশ্চিন্তা, সুযোগ-দুর্যোগ, লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা, রাজ-সম্মান ও বন্ধন-ভয় আশ্চর্যভাবে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শীত-বসন্ত তেমনি পরস্পরের এলাকায় ঢুকে পড়ে কোনও মতে আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

আর যেহেতু নুনই একমাত্র সস্তা খাদ্য, অতএব খুঁজে-পেতে গুণ না গাইলে নয়।

—তাহলে পাপী তাপী অস্থির পুরুষগণের হৃদয় চাঞ্চল্য যে কত বেশী হতে পারে সেটা শুধু গবেষণার বস্তু নয়, আশঙ্কারও।

বিশেষ করে, ছোটবেলা থেকে শীত-বসন্তের প্রিয় রূপকথা যখন মনের গভীরে শিকড় চালিয়েছে, তখন থেকে-থেকে তাদের আনুষঙ্গিক কয়েকটি সুখ-দুঃখের স্মৃতি ছবির মতন এখনও জেগে ওঠে।

রক্তের চাপ যাঁদের কম ছিল, তাঁরা শীতের সন্ধ্যায় হিম ঝরার ভয়ে মাথায় টুপি, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে বালাপোষ আর পা পর্যন্ত ইজের মোজা এঁটে আগেকার দিনে গোলদীঘিতে বেড়াতেন। কিন্তু ছোটদের কাছে শীতের অর্থই

খেজুর গুড় আর নতুন মোয়ার গন্ধ।

ছিল খেলাধুলো এবং কোনও প্রকারে বার্ষিক পরীক্ষার হাঙ্গামাটা চুকে গেলে অন্ততঃ এক পক্ষ কাল নিভাবনার ছুটি। ক্লাশে ওঠাওঠির পর মলাট-ছেঁড়া বই বাতিল, ঝকঝকে নতুন বই-এর গন্ধটা বারে বারে আঘ্রাণের অপেক্ষায়, ইতি-মধ্যে ঢাউস বালির কাগজ-বাঁধা অঙ্কের পুরানো খাতাগুলো ঝাল চানা এবং আলু-কাবুলি-ওয়ালার কাছে বিনিময় প্রথায় পাচার। এ সব দায়িত্বহীন সোনালি মুহূর্ত শীতকালের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। মাঝে-মাঝে অবশ্য স্নানের অনিচ্ছা এবং খোস চুলকানির দুর্ভোগ থাকলেও খোসমেজাজের অভাব হত না।

শহর আর পল্লীর পরিবেশে কিছুটা তারতম্য ঘটলেও ছেলে-মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত খুশি ও খেয়ালকে উত্তুরে হাওয়া উড়িয়ে দিতে পারত না। এক দিকে নতুন কড়াইশুঁটি আর টোপা কুলের স্বাদ, খেজুরে গুড় আর নতুন মোয়ার সুগন্ধ। অপর দিকে ফেরিওলার মন-মাতানো আহ্বান—মুড়ির চাক, জোলার চাক 'আলুর চপ ও ডালপুরী গরম'। কমলালেবু আর নলেন গুড়ের সন্দেশে অরুচি ধরলে ছিল পায়েস আর পিঠে এবং কত রকমের! কেক চকোলেটের অভাব বোঝা যেত না। আর সেই সঙ্গে কপাটি ও ডাংগুলির উত্তেজনা, মার্বেল খেলায় গাব্বু খটান এবং পেয়ারা কাঠের রঙীন লাট্টু নিয়ে হাত-সৌত্তের পুনরাবৃত্ত কীর্তি!

অভিভাবকরা সদয় হলে সার্কাস দেখার অনুমতি মিলত এবং কখনো কখনো নির্বাক ছবির যুগে বায়োস্কোপ দেখার জন্যে একটি রূপোর সিকি। ক্লাউনের ক্রমাগত ভাঁড়ামি আর শাদা পর্দার বুকে মাঝে মাঝে [illegible] কালো ঝিলিক দিয়ে ছবি ছিঁড়ে যাওয়া এবং তার পর দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠা [illegible] কম্পিত মিনিট একাশোবার [illegible] ছোটাছুটি, লাফ দিয়ে পড়া [illegible] মুখভঙ্গীর চাঞ্চল্যকর আনন্দস্মৃতি অবিস্মর-

শীর। শীতে পল্লী অঞ্চলে বারোয়ারি যাত্রার আসর আর শহরে একের পর এক বিয়ের লগনসা। ভিজে-ভিজে গাঁদা ফুলের রাশ নারকেল কুলের স্তূপ এবং বিসর্জনের আর্টি-স্টিক মূর্ত্যবিহীন সরস্বতীর প্রতিমা। দোকানের শিকের ঝোলানো বীরখণ্ডি আর ধামা ভরতি চিনির মঠ ও কদমা। অথবা উৎসবের অঙ্গনে চড়া কারবাইডের আলো এবং কড়া গন্ধ, অপটু সানাইয়ের একঘেঁয়ে বাজনা—থেকে থেকে বেসুরো—আর শীতের ভোরবেলায় রাস্তার ধারে ভাঙ্গা গেলাস, ক্ষীরের খুরি ও এঁটো কলাপাতার দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

কাজেই শীতকাল একেবারে বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, নিরানন্দ ছিল না। অবশ্য তখন চোখ আর মন ছিল আলাদা। বাল্যের, যৌবনের, বার্ধক্যের শীত এক বস্তু নয়, জানি। কিন্তু পৃথিবীই যখন বদলাচ্ছে, ঋতুর চেহারা এবং গুণাগুণও কিছু-কিছু বদলাতে বাধ্য। তাই শীত স্বভাব-প্রাজ্ঞ হলেও এখন আড়ালে আবডালে একটু হুজুগে মেতেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস, বিজ্ঞান শিল্প আর সাহিত্য-অধিবেশনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, মেলামেশা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের পালাটুকু সেরে নেয়। আয়ুর মাপে হ্রস্ব হলেও শীতের সেরা দিন হল বড়দিন। বড়দিনে হগ্ সাহেবের বাজারে দোকান সাজানোর ধুম আর চৌরঙ্গী অঞ্চলে সাহেবী পাড়ার উৎসবময় আলোর সাজ নাই বা থাকল। বর্তমানে বর্ষসন্ধি আর বয়ঃসন্ধির দুর্ভাবনা ছেড়ে শীত এখন আড়ামোড়া ভেঙে একটু যেন উচ্ছ্বাস-প্রবল, কর্মব্যস্ত, সংস্কৃতি-পরায়ণ আর সম্মিলন প্রধান হয়ে উঠছে। তাই যাবার আগে বৃদ্ধ শীত এক কর্মিষ্ঠতা এবং সামাজিকতার প্লাস্টিক মুখোস পরে কলপ-লাগানো নবীনত্বের অভিনয় করে যায়। করুণ কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। দিন কয়েকের জন্যে এই আবু-হোসেনী মেজাজ-খেলা মন্দ জমে না। বিদায় আসন্ন জেনেই মিলনের প্রগলভ প্রয়াস।

শীত যখন যাই-যাই করে, তখন নানা জনের নানা মনোভাব। গাড়ী বারান্দার নীচে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ভিখারী চায় নির্মম শীতের হাত থেকে মুক্তি। ধনীর আক্ষেপ—আরও কিছুদিন থাকলে ভালো হত। বিরত ও বিরক্ত ভাব নিয়ে শাল আলোয়ান গরম স্যুট সযত্নে ন্যাপথলিন দিয়ে আবার আগামী শীতের জন্যে গুছিয়ে তুলে রাখেন। নবান্ন নেই বললেই চলে। তবু ওঁর মধ্যে কৃষকের মনে একটা অলস ভোগের সুখকর ক্লান্তি। আর সাধারণ মধ্যবিত্তের মনোভাব সুখ-দুঃখের মাঝামাঝি।

নধর বেগুন, শাঁসালো মুলো, ফুলন্ত কপি আর পালং বিট গাজরের আস্বাদ হয়তো ফুরিয়ে এল। তবে নিমের ঝোল, কচি আমের সর্ষে-ফোড়ন অম্ল-মধুর জল, সজনে ফুল ভাজা আর এঁচোড়ের প্রথম আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এই যা ভরসা। রসনার সামগ্রী বলে ভোজ্য বস্তু রস-সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত অকুলীন হয়ে আছে। কিন্তু কবি কালিদাস কি বলেন, দেখা যাক্......

অন্যান্য ঋতুবর্ণনের চেয়ে শীত-বর্ণনা অনেক সংক্ষেপে সেরে কবি বলছেন, 'শিশির সময়' হল 'প্রচুর গুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ।' প্রচুর গুড়, শালি ধান আর আখ—তিনটেই যে ভালো জিনিস এবং খাদ্যসারে ভরপুর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শীতকাল 'প্রমদা-জনপ্রিয়' এবং 'কন্দর্পের দর্পবৃদ্ধিকারী' কি করে হয়? কালিদাসের কালে ভারতের শীত কি তেমন জোরালো ছিল না? না কি প্রমদারা আরো বলদা ছিলেন এবং প্রণয়ি-দল কোনও কৌশলে রক্তাধিক্যের উত্তাপ সঞ্চার করতেন? আমরা তো জানি, শীতকালে বাসক-সজ্জা অচল। কন্দর্প যতই অগ্নিশর নিক্ষেপ করুন, কনকনে শীতে ফুলশয্যার মতো বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। তখন নবীনতম দম্পতির দেহে যে শিহরণ জাগে, তা রভস-পুলক নয়। হিমশীতল করস্পর্শে মেরুদণ্ডের আকুঞ্চন, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আর বসন্তবর্ণনে কালিদাস তো সত্যিই কবির রাজা। অশোক-মল্লিকা, কিংশুক-মাধবী, মলয়-চন্দন, কোকিল-আম্রমঞ্জরী, ভ্রমর ও মধু, চন্দ্রকিরণ আর সুশীতল কান্তা, সবই যেন প্রগলভ রমণীয় হয়ে উঠেছে। এ সময়ে 'আকম্পিতানি হৃদয়াণি মনস্বিনীনাং।' স্থিরচিত্ত কামিনীদের মনই যদি বিচলিত হতে থাকে, তা-হলে পাপী-তাপী অস্থির পুরুষগণের হৃদয়-চাঞ্চল্য যে কত বেশি হতে পারে বসন্ত-সমাগমে, সেটা শুধু গবেষণার বস্তু নয়—আশঙ্কারও! অতএব মধুমাসে সীধুপানের প্রয়োজন নেই, এমনিতেই দেহমন বিবশ। 'সর্বং রসায়নামিদং কুসুমায়ুধস্য।' রবীন্দ্রনাথও উজ্জীবনী মন্ত্রগান করেছেন—'ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু'—জর্জর শীতেও বসন্তের বোধন করেছেন, বলেছেন, 'ভরা পাত্রটি পূর্ণ করে সে ভরিতে নূতন করি।' ফাল্গুনের আলো সোনার কাঠিতে কেমন করে কী মায়া লাগায়, দাড়িম্ব বন প্রচুর পরাগে রক্তিম হয়ে ওঠে আর পলাশ তার আরতি-পাত্রে রক্তপ্রদীপ সাজিয়ে ধরে, তার রহস্য একমাত্র কবি-দৃষ্টিই প্রকাশ করতে পারে, যদিও আমরা বহু দিন বেঁচে নিত্য দেখি।

বসন্তের পরিস্রুত সুর হয়তো শুনতে পাই শীতের দিগন্ত থেকে। কিন্তু মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃত এইভাবে অঞ্জলি ভরে নিতে জানি না। কারণ আমরা স্থূলসর্বস্ব, নগদ দেনা-পাওনার কারবারী। তবে অতি-সাধারণ গতানু-গতিক জীবনে বিদায়ী শীতের তাৎপর্যটা কি, তাও জানা দরকার। একটি আরোগ্য-নিকেতনের ছাদ থেকে পাশেই এক পুরানো আমগাছের নতুন মুকুল সাজ দেখে চমকিত হয়েছিলাম এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। সে দিন মনে হল, শীতের শেষে এই অসংখ্য মউলগুচ্ছ যেন প্রসার্পিনকে ফিরিয়ে এনেছে প্লুটোর অন্ধকার প্রেতপুরী থেকে। এই আশ্বাসময় নয়নলোভন দৃশ্য যে বাতায়ন থেকে দেখা যাচ্ছে, সে রোগী বা রোগিণী নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্। শহরের জনসংকুল পথেও যখন প্রথম কোকিলের ডাক শুনি, তখন বুঝি আকস্মিকের অথচ অপরিবর্ত্য বিধির পরম সহজ সৌন্দর্য।

অথচ সেই সৌন্দর্যই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে মধ্যে মধ্যে বিপদও নিয়ে আসে বৈ কি!

প্রথম তাপে বেশি ঠাণ্ডা পাণীয় আর রাত্রি কালে অতিমাত্রায় চন্দ্রকিরণ সেবন, কোনোটাই স্বাস্থ্যকর নয়। পৌষের শীতে বাঘ কাঁপে আর 'আধা মাঘে কম্বল কাঁদে'—এ কথা ঠিক। কিন্তু ভোর বেলায় গাঢ় ঘুমে গায়ের চাদর কিছুক্ষণ সরে গেলে অম্বলিত ভ্রু... হয়ই, অসুখও বেধে যায়। বস্তুতঃ একদিকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ আর একদিকে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মৃত্যুর হার যে বেশ বেড়ে যায়—এটা রেকর্ড দেখলেই বোঝা যায় এবং চিকিৎসকদেরও মত।

ভয় দেখাতে চাই না, কিন্তু সন্ধিকালটা বরাবরই গোলমেলে ব্যাপার। শীত যায় যায়, আবার নির্বাণ-দীপে তৈলদানের ফলে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া শেষ মহড়ায় কয়েক দিনের জন্যে মারাত্মক রসিকতা করে যায়। যাই যাই করে এই রকম ফিরে চাওয়া আর প্রথম দক্ষিণী হাওয়া সম্বন্ধে অসুস্থ এবং বয়স্থ ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বসন্তের রাজটীকার ভয় থাকলেও কোনও কোনও অবুঝ উদাসী মন অবশ্য মধুমুখী অনামিকার আশায় উচাটন হয়। যৌবনের বুভুক্ষু বিষাদ তখন কবিরাজী কথা ভুলে কবিতার কোলে ঢলে পড়ে। আর গুণ-গুনিয়ে ওঠে খোলা আকাশে এলোমেলো বাতাস :

> 'হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা
> নিমেষ-গণন হয়নি কি মোর সারা?'

জীবনিকা

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

স্বপন নাই, তবু আছো তুমি।
আছো পাশে পাশে,
মনের সবুজ ঘাসে : শরৎ প্রভাতে,
হিমালি হাওয়ায় ঝরে-পড়া শেফালির মত :
অশরীরী স্বপ্নময়ী মায়া।
বাজে তার কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
রক্তে লাগে দোলা—
যৌবনের শতদল ফুটে ওঠে নিভৃত প্রহরে :
মন করে কানাকানি অজানার সাথে।
ব্রীড়াময়ী অনাগতা,
অর্ধনিমীলিত আঁখি—
ঢাকে মুখ শিথিল কুন্তলে,
বক্ষে রাখি হাত :
ভীরু লজ্জা,
সিক্ত শ্রোণী,
ওষ্ঠপুটে অধীর স্পন্দন :
স্তব্ধ বন পথে যেন চকিতা হরিণী
ব্যাধ-ভয়ে আড়ষ্ট অধীর,
গণিতেছে মহাক্ষণ!
যুগ আসে, যুগ চলে যায়।
ঝরে পড়ে শতদল;
বনস্থল জ্বলে দাবানলে।
তবু জাগে নূতনের সাড়া :
স্পর্শে তব আনন্দ হিল্লোল
ঢেউ তোলে ধরিত্রীর বুকে;
ঘুম-ভাঙা শিশু
জেগে ওঠে জীবনের শাখায় শাখায়,
প্রস্ফুটিত পুষ্পদল ব্যর্থ করে মৃত্যুর প্রয়াস :
ছিন্ন তারে বাজে নব সুর :
ভুলে যাওয়া গান,
ঝরে পড়া শেফালির বনে
জেগে ওঠে অতীত মধুর :
স্বপন নাই, তবু আছো তুমি :
তাই মৃত্যু তোমার দুয়ারে
কেঁদে মরে ভিক্ষাপাত্র হাতে।

সময়টা ভাল যাইতেছিল না।

বড় বিঘ্ন-বিপদ কিছু, এমন নয়। ছোট-খাটো ঘটনা, যাহাতে লোকসানের চেয়ে বিরক্তি বেশী। দায়ের কোপ নয়, জুতার পেরেক।

যেমন ধরুন : বন্ধু-পুত্রের বিবাহ, যাইতেই হইল, প্রচুর সমারোহ, প্রভূত সমাদর, আহারের বিপুল সমাবেশ। খুব নিকটে বসিয়া, খুব পীড়াপীড়ি করিয়া, খুব ঠাসিয়া, আহার করাইলেন। পেটুক মানুষ, অজীর্ণও নাই, আপত্তি করিলাম না।

খাওয়া সারা হইতে ঘন্টা-খানেক লাগিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, দ্বারের বাহিরে জুতা-জোড়াটি নাই। তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলাম, যতক্ষণ না আসি এখানে থাক্। আমার বিলম্বে সে অধীর হইয়াছে হয়ত ভাবিয়াছে আমি আর জীবন্ত ফিরিব না, ভাবিয়া অন্য কাহারও পদা-শ্রয় আশ্রয় করিয়া কোন নূতন গৃহবাসে প্রস্থান করিয়াছে।

জুতাকে দোষ দিই না, বুদ্ধিমান জুতা—কাহার জুতা সেটা দেখিতে হইবে। কিন্তু, সেই দুপুর রাত্রে খালি পায়ে বাড়ী ফিরিতে হইল। জুতাটা মাস-দেড়েক পূর্বে কেনা—পনর টাকায়। দেড় মাসে ডিপ্রিসিয়েশন ধরুন টাকা দুই। যে ভোজ খাইয়াছি তাহার মোট মূল্য, এই দুর্বৎসরেও বড় জোড় টাকা চারেক, তাহাতে উশুল কাটিয়াও, অন্ততঃ নয়টি টাকা লোকসানের ঘরে পড়ে। সারা রাত্রি ধরিয়া এই সহজ বিয়োগ অঙ্কলব্ধ বিয়োগ-ব্যথা মনের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

পরদিন, নূতন জুতা কিনিয়া তবে বাহির হইলাম। ফেরার পথে, ধর্মতলায় কাজ ছিল। ড্যালহৌসি হইতে ধর্মতলার মোড়ে হাঁটিয়া আসিলাম। নয় টাকা লোকসানের পাঁচ পয়সা উশুল হইল ভাবিয়া মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল। মন হাল্কা হইলে পদক্ষেপও লঘু হয়। নূতন জুতার মসৃণ-তলা, মেট্রোর সমুখে মসৃণ ফুট-পাথের সহিত তাহার মতভেদ হইল। সামনে ছিল এক মেমসাহেব ও এক সাহেব। ভুলক্রমেও মেমসাহেবের গায়ে ঘষা খাইব এমন ভাগ্য করিয়া আসি নাই। পড়িলাম সাহেবের গায়ে। বোধহয় শুয়ার-টুয়ার খায়। সেই রকম ঘোঁৎ-[illegible] ইংরাজীতে কি যেন বলিল। তারপর ঘুষি তুলিল। ইংরাজী ভাল বুঝি না, তাই রক্ষা। বুঝিলে, আমারও ত গায়ে রক্ত আছে, একটা খুনাখুনিই হইয়া যাইত। মেমসাহেব ঠেকাইল। পিং পিং চিক্-চিক্ করিয়া সাহেবকে কি যেন বলিল। চক্ষু বাঁকা-বাঁকা করিয়া আমার দিকে বার-বার তাকাইল। তারপর সাহেবকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ভাষা এবারেও বুঝি নাই। কিন্তু দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইল না : "মারিয়া কি হইবে, এ ব্যাটা নিশ্চয় পাঁড় বাঙাল।"

রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি- করিতে লাগিল। বাঙালই ত, একশ বার বাঙাল। কিন্তু বরিশাল জেলার দুধমাছ ফেলিয়া এই জুতা চুরি আর পা-পিছ্লানোর দেশে আমাদের টানিয়া আনিল, কে? তোরাই ত, যারা বজ্জাতি করিয়া আর বোকা ভুলাইয়া দেশটাকে দুই খণ্ড করিয়া দিলি—যখন দেখিলি এ হাঁড়ির অন্ন উঠিয়াছে তখন হাঁড়িটাকেই ফাটাইয়া দিয়া গেলি যেন আর কাহারও ভোগে না লাগে?

আর, আগে যা ছিল ছিল। এখনও স্বাধীন ভারতের এই বারো বছরের আঁতুড় যাইবার পরও, সাহেবরা আমাদের কথায় কথায় ঘুষি তুলিয়া আসিবে, বাঙাল বলিয়া হেলায় ক্ষমা করিয়া যাইবে? ঝাড়ু মারো এমন না—মর্দী স্বাধী-নতার মাথায়।

এর চেয়ে ইংরেজ রাজত্ব ভাল ছিল। অন্তত খবরের কাগজে লেখালেখি করা যাইত। এখন সে পথ বন্ধ। থাকিত সেকাল, কী গরম গরম ওজস্বিনী ও তেজস্বিনী ভাষায় কাগজে পত্র পাঠাইতে পারিতাম, মনে মনে তাহার মুসাবিদা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিলাম। সারা রাত্রি ধরিয়া সেই চিঠির ভাষা ও তাহার বহুবিধ সংশোধন সংযোজন ও সংবর্ধন মাথার মধ্যে ঘোড়-দৌড় করিতে লাগিল।

পরদিন অফিসে বসিয়া ঘুম পাওয়া অতি স্বাভাবিক। অথচ, ঈষৎ একটু ঝিমুনি লাগিয়াছে কি লাগে নাই, কর্তা কড়্কাইয়া দিলেন। ইহার পূর্বে জানিতাম, অফিসে কিছুক্ষণ ঢুলিয়া লওয়া স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। কড়কানি খাইয়া উপলব্ধি হইল, মৌলিক অধিকার বটে, [illegible] ওটা বিশেষ ভোগ্য। তিনি প্রত্যহ ঘুমান অফিসে, আমি একদিন ঘুমাইলেই অপরাধ! সাম্য-টাম্য ভাঁওতা। আসলে মানুষে মানুষে অধিকার ও মর্যাদার বিভেদ স্বীকার করিয়াই ভারতীয় সংবিধান রচিত হইয়াছে। এই চিন্তায় সে রাত্রিও বিনিদ্র কাটিয়া গেল।

এইরূপ অবস্থা, হেনকালে এক সহকর্মী বলিলেন, হাতটা একবার দেখান না কাউকে।

—হাত দেখাব মানে?

—মানে, জ্যোতিষীকে।

—রেখে দিন। বদ্যির ছেলে, জ্বর হবে কি-না হাত দেখে বলা যায় সেটা জানি। বিয়ে হবে কি-না সেটাও বলা যায় একথা মানিনে।

—আরে মশাই, তেমন লোক হলে পারে। নেপোলিয়ন, হিটলার জ্যোতিষে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন, জানেন?

—সেই জন্যেই মরেছেন। হিটলারকে জ্যোতিষীরা ইংরেজের ঘুষ খেয়ে তাঁকে উল্টো বুদ্ধি দিয়েছিল, সে কথাটা জানেন?

—শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে নীলা পরতেন, জানেন?

—অপঘাতে মরেছেন, সে কথা জানেন?

মস্তবড় একটা সাক্‌সেস্, এবং তার পরে ক্রমে একটা (Violent) মৃত্যু, নীলার এই ফল। হিটলারও পরতেন।

—আহা, সে হ'ল, কাল পেরিয়ে গেলে তার পরেও খুলে না ফেলার দোষ, কিন্তু নীলার ফল আছে, এ-কথা তাহলে স্বীকার করছেন?

—না করে নিস্তার আছে?

—তবে? ঠিকমত বিচার করে পরতে পারলে ফল হয়, একথাও মানতে হচ্ছে।

—হ'ল। কিন্তু বিচারটি করবে কে. হিটলারকে যারা ভবিষ্যৎ গুণে দিত, তারা ইংরেজের ঘুষ খেলে, হিটুকে ডোবালে। শ্যামা-প্রসাদকে যিনি নীলা পরতে বলেছিলেন, তিনি কখন আবার খুলে ফেলতে হবে সেটা বলে দেন নি তাঁকে। না মশাই, আমার দ্বারা ও হল না।

সেদিনের কথা আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু ভদ্রলোক অধ্যবসায়ী। দিন পনের পরে আবার একদিন বলিলেন, আপনার রাশিটা কি বলুন ত।

রহস্যময়ী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমার রক্তের স্রোতে শুনি তব বিচিত্র সংবাদ,
হে রহস্যময়ী,
আমার মানস-তীরে নিত্য শুনি তব কলনাদ
সর্বকাল জয়ী।
আমার আশার কুঞ্জে মধুকর-নবগুঞ্জরণে
বিপুল সঙ্গীতে,
অদৃশ্য মায়ায় তুমি মৃদু মৃদু পদ সঞ্চরণে
ললিত ভঙ্গীতে,
শুধু এক মুহূর্তের লাস্যভরা ছন্দের দোলায়
দেখা দিয়ে যাও—
আপনারে ধরা দিতে, কোন্ এক অজ্ঞাত লীলায়
নিমেষে উধাও!
উদার অম্বর ঘিরি বিথারিয়া সে কোন্ কৌতুক
থাকো অন্তরালে,
ধরণীর শ্যামাঞ্চলে কুন্দশুভ্র প্রাণের যৌতুক
দিলে কোন্ কালে;
বিন্দু বিন্দু সমাহারে সিন্ধুবুকে সুনীল উত্তাল
নিবিড় উল্লাস
জাগালে আলসে বসি' ছড়াইয়া কোন্ ইন্দ্রজাল
কোন্ মোহপাশ?
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এতটুকু জাগ্রত চেতনা
দিলে তুমি ঢেলে,
অপার্থিব রসায়ণে সঞ্জীবিত করিলে বেদনা,
স্নেহপক্ষ মেলে।
তোমারি লাগিয়া তাই অতন্দ্রিত নিখিল বসুধা
স্পন্দিত হরষে
প্রতীক্ষিয়া আছে শুধু মিটাইতে পরাণের ক্ষুধা
তোমার পরশে।
জিজ্ঞাসার সীমাশেষে কেবা তুমি কর বিহরণ—
মায়ার কাজলে
আঁকিয়া সৃষ্টির আঁখি, আবরণ কর চিরন্তন
একী খেলাচ্ছলে?
নিশিদিন খুঁজে ফিরি সে রহস্য ভেদ করিবারে
মহামন্ত্রখানি,
দাও মোরে ফিরে দাও, অভিষিক্ত করি সাধনারে
অবিনাশী বাণী।

—বিরাশি, তিরাশি, চুরাশি, এর মধ্যেই হবে একটা যা হয়।

—আহা বলুন না।

—জানা নেই। গণটা জানি, বিয়ের সময় শুনেছিলাম।

ধ্যেৎ, জেনে আসবেন বাড়ি থেকে। কেউ কি জানে না?

—কি করে বলব। কিন্তু রাশি কি হবে?

—এই দেখুন।

একটা পত্রিকা বাহির করিলেন, সাপ্তাহিক বর্ষফল। কোন্ রাশির জাতকের সে সপ্তাহটি কেমন যাইবে, তাহার ফিরিস্তি পড়িয়া দেখিলাম। বেশ ভাল ভাল কথা। কাহারও ধনাগম, কাহারও পদ-বৃদ্ধি, কাহারও প্রণয়ে সাফল্য। বলিলাম, আচ্ছা, দেখব খুঁজে।

প্রশ্ন করিতেই পাল্টা প্রশ্ন শুনিতে হইল। কেন, রাশির খোঁজ কেন, বুড়ো বয়সে? এখনও সাধ আছে নাকি?

—হলে দোষ কি।

—ভালই ত। থেকো নতুন বোয়ের মুখ-নাড়া খেয়ে। আমার কি, আমি ড্যাং-ডেঙিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব। হাড় জুড়োবে।

—অতি ভাল কথা। তাহলে দেন ত খুঁজে, লেখাটেখা আছে নাকি কোথাও।

—দেখতে হবে না, জানাই আছে। মিথুন রাশি, কর্কট লগ্ন, পুনর্বসু নক্ষত্র, রাক্ষসগণ। হবে?

—খুব, খুব, তুমি তাহলে ঘটি-বাটি গোছাও, আমি দেখি কদ্দুর কি হয়।

পরদিন সেই পত্রিকা মিলাইয়া দেখা হইল। বেশ পছন্দসই কথা। ধনাগম, সদ্ব্যয়, পদোন্নতি, কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা লাভ। সংসারে কলহ—তা হোক, ও এক-আটুকু সকলেরই

সহকর্মী কহিলেন, কি রকম দেখছেন?

কহিলাম, আরে দূর, ও-সব কি আর সত্যি-করে হয়।

—হয়, হয়, মশাই। বিশ্বাস রাখতে হয়।

তা রাখিলাম। প্রত্যেকটি সপ্তাহ ফল খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়ি। তারপর সারা সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যাশা করিয়া থাকি। প্রতি সপ্তাহে প্রায় একই রকম সব ভাল ভাল ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। মানে গোটা-আষ্টেক ভাল কথার মধ্যে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া গোটা-পাঁচেক এক-এক সপ্তাহে লেখা হয়। ফলে কি ফলে না, ঠিক ঠাহর পাই না—তা হোক, খোশ-খবরের আশাও ভাল। ক্রমে নেশা ধরিল, সারাটি সপ্তাহ প্রতীক্ষা করিয়া থাকি আবার কবে সপ্তাহ-ফলের দিনটি আসিবে।

অন্য কাগজ কিনিতাম। বদলাইয়া ঐটি কিনিতে আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ আবিষ্কার করিলাম, গৃহিণীও পরম আগ্রহে ওটি পড়িতে সুরু করিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, এবারের ফল দেখেছ তোমার?

খুব ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া বলি, কে পড়ে ও-সব—যত্তো সব ইয়ে।

—আহা হতেও ত পারে, এত লোক, সবাই ত পড়ছে। একেবারে না মিললে কি আর কেউ প্রতিবাদ করত না।

—বেশ ত, বিশ্বাস রাখো, একদিন আচমকা কৃষ্ণ মিলে যাবে।

—আমার আর কৃষ্ণ মিলে কি হবে এ বয়সে। তোমার যদি রাধা মিলে যাবার ভরসা থাকে তবেই হল।

বাড়িতে ঔদাসীন্যের ভাণ করি। কিন্তু অফিসে আসিয়া সেটা আর থাকে না। সহকর্মীকে বলি, কই মশায়, বেল পাকে কই

—আহা ধৈর্য ধরতে হবে বই-কি। একদিনেই কি হয়।

—একটুও ত হবে। কিছুই যে হচ্ছে না।

কিছুই হচ্ছে না বলতে পারেন না।

—যথা? প্রতি সপ্তাহে তো বলছে পদোন্নতি হবে। কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা লাভ হবে, কি হচ্ছে তার?

—হচ্ছে না তাই বা কে বললো। আর, প্রাইক হচ্ছে না, রিট্রেঞ্চমেণ্ট হচ্ছে না এই কি কম?

পদোন্নতি মানে প্রোমোশন, বা অন্তত, ইনক্রিমেণ্ট, এই তো। তার একটা বাঁধা সময় আছে। সেই সময়টা ত আসা চাই।

—এই বার্তা? তার জন্য জ্যোতিষীর কি দরকার। আগামী বছরে এই দিনে আমার বয়স এক বছর বেশী হবে, এটা জানতে জ্যোতিষী লাগে না।

—লাগে। ইতিমধ্যে যদি মরে যান, তবে বয়সটা বাড়ছে কি করে? বেঁচে থাকবেন, কি থাকবেন না, সেইটেই ত জ্যোতিষী বলে দেবে।

—তা বটে। কিন্তু কত কালে যে কি হবে, তার কোন পাত্তাই মিলছে না।

দৌড়ঝাঁপ করে কি হয় সব কিছু।

—আহা হতে হবে ত। না কি, হবে হবে করেই চলবে মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত? তারপরে আর হয়েই বা কি লাভ।

ইতিমধ্যে জানা গেল, মহাপ্রলয়ের তারিখ স্থির হইয়াছে, ১৪ই জুলাই। কহিলাম, ও দাদা, ও দিকে যে হয়ে এল।

—আরে ছেড়ে দেন। ওদের দেশের জ্যোতিষী বলেছে, জ্যোতিষের কি জানে? মহাপ্রলয় না হাতী।

এক্সচেঞ্জের
মোজা
সর্ব্বঋতোপযোগী
ও
আধুনিক রুচিসম্মত
এক্সচেঞ্জ হোসিয়ারী
কলিকাতা-৭

মধুলিকা

U.C. KARMAKAR & SONS
FISHING TACKLES & BATES
157, BOWBAZAR STREET
CALCUTTA-12

পেটের গ্যাস
কলিকপেন ও
হজমের গোলমালে
গ্যাসকিউ
(সর্ব্বত্র পাওয়া যায়)

বর্ষাকাল।

একরাশ মানুষ ভিজে কাপড়-জামায় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছি সেকেণ্ড ক্লাস-ট্রামে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে পোঁটলা-পুঁটুলি কিছু আছেই—ফাউ স্বরূপ আছে ভিজে ছাতা। ছাতা থেকে জল ঝরছে বলে—সেগুলিকে এক পাশে একসঙ্গেই রাখতে হয়েছে। তবে যে যার জিনিষের প্রতি নজর রেখেছে যথাসাধ্য, বদলা-বদলি না হয়।

বৃষ্টি পড়ছে। আজ তিনদিন ধরে ঝরছেই জল।

"শনির সাত—মঙ্গলের তিন—আর সব দিন দিন—এই প্রবাদ বাক্যকে অগ্রাহ্য করেই অবিরাম বর্ষণ চলেছে সোমবার থেকে। সহরের পথঘাট কাদায় পিছল হয় না—জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। পথচারীরা হাঁটুর উপর কাপড় জামা তুলে পথ চলছে। বাস বা মোটর চলে গেলে ঢেউ উঠছে জলে, সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ঘটছে সে জল ছিটকে গায়ে লাগছে যখন : পথচারীদের মনে নিশ্চয় অভিযোগ জমছে। তারা অভিশাপ দিচ্ছে মেঘ-দেবতাকে ও মোটর বিহারীদের। আমরা সামান্য পয়সা খরচ করে ট্রামে বসে এই দৃশ্য উপভোগ করছি। বৃষ্টির দুর্ভোগকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারছি না। যে কেউ জল-ঝরা ছাতা নিয়ে গাড়ীতে উঠছেন— সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার তুলছি আমরা, সামলে দাদা—সামলে মশায়।

সর্বদাই সচকিত হুঁসিয়ার থাকতে হচ্ছে। এই দুর্যোগে ব্যাগ, ছাতা ও পুঁটুলি-গুলিকেও সাবধানে আগলাতে হচ্ছে। যে কোন অসাবধান মুহূর্তে—ঈষৎ অসতর্ক ক্ষণে মালিক বদল করানোই ওদের রীতি। কিন্তু যায় না—যেমন ঘটল আমাদের চোখের সামনেই। ব্যাপারটা খুলে বলি।

বাইরে বৃষ্টির দরুণ উঠা-নামায় সকলেরই ত্বরান্বিত ভাব। যে যার জিনিষ নিয়ে এক রকম দৌড়ে দৌড়েই এই কাজটি সারছে। হ্যারিসন রোড ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর মোড়ে অনেকক্ষণ থামে গাড়ী। বড় রকমের ক্রসিং এটা। কিন্তু ধীরে-সুস্থে ওঠা-নামার জো কি—পিছনে বৃষ্টির চাবুক ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ-গুলিকে। কম-বেশী ভিজেছে সবাই, তবু আরও না ভিজবার জন্য কি প্রাণপণ চেষ্টা!

আমার পাশেই বসেছিল কালো মত একটি ছোকরা—ট্রাম থামতেই সে ত্বরিত গতিতে নেমে গেল। আরও অনেকে নামল, উঠলও অনেকে। ওই ছোকরার পাশে বসেছিলেন চাকা মুখো এক প্রৌঢ়। তিনি এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনেই বসে-ছিলেন। ছোকরা নেমে যেতেই সচকিত হয়ে এক পাশে ঠেসানো ভিজে ছাতাটি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। ওঁর ছাতা পরীক্ষার ধরণে বুঝলাম—অঘটন কিছু ঘটেছে।

একজন কৌতূহলী দর্শক প্রশ্ন করল, কি দাদা—চক্ষুদান দিয়েছে তো? ছোকরা যখনই হন্তদন্ত হয়ে নেমে গেল— তখনই বুঝেছি -

চাকামুখো প্রৌঢ় মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন সামান্য। কিন্তু ওঁর মুখে একটুও ক্লেশ চিহ্ন ছিল না। প্রশান্ত অনুদ্বিগ্ন মুখ, হারানোর বেদনায় কিংবা প্রাপ্তির উল্লাসে নির্বিকার। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম—কেন?

কারণ হয়তো এই—যে ছাতাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন—সেটার চেহারা খুব খারাপ নয়। আনকোরা নতুন না হোক—ছেঁড়া নয়, তালি মারা নয়, কাপড়ের রং যদিও ঈষৎ ফ্যাকাসে কিন্তু বৃষ্টির জল থেকে মাথা মনে সংশয় জাগল—ভদ্রলোক যেটি খোয়ালেন—সেটি এর চেয়েও মজবুত কিনা? নূতন এবং সুন্দর কিনা? না হলে এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেনই বা কেন? মনে মনে নিশ্চয় তুলনামূলক বিচার করছেন—ঠকলেন, না লাভবান হলেন?

বললাম, পাল্টেছে তো?

হুঁ। মাথা নাড়লেন হাসিমুখে।

আপনারটি কি নূতন ছিল?

না ঠিক নূতন নয়। তবে, ঢোক গিলে ছাতায় মনোনিবেশ করলেন।

আমার একটি অভ্যাস আছে—প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করি। শ্লোকগুলি অবশ্য মনে রাখতে পারি না, এক একটি পুরো শ্লোক—অথবা শ্লোকের ভগ্নাংশ স্মৃতিতে লেগে থাকে। এখন একটি শ্লোকাংশ মনে পড়লো ওর এই নির্বিকার অবিচল ভাবটি দেখে। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। শ্লোকাংশ যেন দৃষ্টান্ত মেলে সামনে বসে রয়েছে—হাতে তার সদ্য-বদল করা ছাতা। হারানো প্রাপ্তিজনিত ছায়া-আলোর খেলা নাই মুখে। বরং ছায়ার বদলে আলোটিই স্থির হয়ে ভাসছে। আশ্চর্য!

মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল— নিজের উপর অনুযোগ জমতে লাগল। প্রতিদিন গীতা পাঠ করেও শ্লোকের মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারি না—অথচ এই প্রৌঢ় এ হেন পরিবর্তনে কেমন ধীর-স্থির প্রসন্ন মুখ। ইনি কি গীতা পাঠ করেন প্রত্যহ? বেশ-বাস, ভাব-ভঙ্গী চেহারা দেখে তো মনে হয় না। (যেন ভাব-ভঙ্গী বেশ-বাস, চেহারায় মানুষকে জানা যায়)। অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। দু-একটি কথা যা শুনেছি তাতে মনে হয় না শিক্ষিত। (শিক্ষার মানটাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি চিহ্নে নির্ভরশীল)। কারণ

অবন পটুয়ার ভিটে

॥ উমা দেবী ॥

(১)

অবন পটুয়ার বাড়ী
জোড়াসাঁকোর ধারে—
পাঁচ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে।
অনেক ঘর আর অনেক মহল চেনা অচেনার ফাঁকে ফাঁকে—
অনেকখানি জায়গা জোড়া বাগানে
যার একদিকে নিম-গাছে খেলছে পাপদুরো
টুনটুনি শালিক টিয়া পায়রা
গোলোক-চাঁপা গাছে ফুটেছে ফুল ভারী রেশমের তৈরি যেন।
ঈশান-কোণে মস্ত একটা দৈত্যের মত তেঁতুল গাছ
মোটা মোটা কালো ডালের হাত বাড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছে
মাটির তলে পোঁতা মণি-মাণিকের ভাণ্ডার।
আর উত্তর দিকে সার সার তিনটি বাদাম গাছ
শীতের হাওয়া আর বার্ধক্যের প্রকোপকে আটকে রেখেছে।
অন্দর মহলে সৌন্দর্য ও সঞ্চয়—
যার মহলে লক্ষ্মীর ইন্দ্রজালে আর বাণীর মায়াজালে
সোনালি-রূপালি ভাবনার টানা-পোড়েনে জীবন-শিল্পীর সাধনা।
—অবন পটুয়ার বাড়ী—জোড়াসাঁকোর ধারে।
কত তার ভাগ—রান্নাবাড়ী, পুজোবাড়ী, গোয়ালবাড়ী, আস্তাবলবাড়ী—
ভাঁড়খানা, তোষাখানা, বাবুর্চিখানা, নহবৎখানা, কাছারীখানা,
গাড়িখানা, নাচঘর, স্কুলঘর, দেউড়ি, দর-দালান—
তেতলার অন্তঃপুরে পদ্মাসন আর দোতলায়
দক্ষিণ বারান্দার আমদরবার।
কিন্তু সব ডিঙিয়ে সব চেয়ে শেষে পরীস্থানের দেশ—
একতলার সিঁড়ির নীচে—সারাদিন তালা বন্ধ করা এক অন্ধকার ঘরে—
যার মধ্যে লুকোনো আছে তিনপুরুষের ঐশ্বর্য
আর রুচি-বদলের ইতিহাস—
পুরোনো ঝাড়লণ্ঠন আর চিনেমাটির বাতিদান যেখানে
কাঁচমোড়া ঘুলঘুলি থেকে ছিটকে আসা
অস্ত-সূর্যের সোনাঝরা আলোয় জ্বলছে,
মৃদু মৃদু হাওয়ায় দুলছে তিনকোণা কাঁচ—
নাচছে টুং টাং যত স্মৃতির পরীরা,
পায়ে তাদের সুরের ঘুঙুর বাঁধা—
অবন পটুয়ার বাড়ী—জোড়াসাঁকোর ধারে।

(২)

শুনেছি স্বর্গলোকে উর্বশীরও তালভঙ্গ হ'লে
ইন্দ্রদেব তাকে ক্ষমা করেন না—
কুবেরের সম্পদের হিসাবে ত্রুটি ঘটলে
অলকাবাসী যক্ষেরও ঘটে নির্বাসন,
তাই কি অবন পটুয়ার বাড়ী গেল হারিয়ে স্বপ্নের মতন—
গেল ইন্দ্রজালের মতন মিলিয়ে—
কোথায় গেল পদ্মদাসী তার কড়ির মত শাদা চোখ নিয়ে—
কোথায় গেল নক্সাকাটা পান্নার সবুজ ঝিলিক!
শোনা গেল ওখানে উঠবে মস্ত পাদের গুদাম;
এবারে আর হিসাবে ভুল হবে না,
মোটা মোটা লাল খেড়োর খাতায় থাকবে মোটা অঙ্কের হিসেব,
লক্ষ্মী পড়বেন আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা।
উত্তর চিৎপুর রোডের লালজি সিংজি দোবে চৌবে আগরওয়ালার দল
পাকাবে মোটা পাটের দড়ি যাতে বাঁধা পড়বে সম্পদের গজরাজ।—
সরস্বতীর মরাল তার ডানা মেলে পাড়ি জমাবে মানস সাগরে।
দেশ জুড়ে হাহাকার উঠল—অবন পটুয়ার ভিটে গেল!

(৩)

হায়রে!—অবন পটুয়ার ভিটে কি ঐ ট্রামচলা পথের পরে—
পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দু-দশ হাত জায়গায়—
যা অনায়াসেই বিকিয়ে যেতে পারে নিলামের ডাকে।
বাণীর পদ্মবনে যার ডাক পড়েছে—অশ্রু দিয়ে পূর্ণ করে দিতে
লীলাসরসীর টলটলে নীলজল,
হৃদয়ের শোণিত ধারায় আরক্তিম করে তুলতে রসের কমলগুলি,
প্রাণের নবীনতায় আরো একটু সবুজ করে দিতে পদ্মডাটার আশাকে,
তার ভিটে যে পড়ে আছে রসিকের জীবন জুড়ে।
তার জন্মতারার আলো অন্তরীক্ষ ছেদন ক'রে ছায়াপথ ঠেলে
অসীমের স্থির নীলমণিকে গেঁথে দিয়েছে পৃথিবীর সুনীল সমুদ্রের
মধুর অভিমান ভরা মায়ায়—
আর পাতালের ভোগবতীও অধীর হয়ে উঠেছে
তারি বাঁধনে বাঁধা পড়তে।
মৃত্যুর কালো পাহাড়ের অন্ধকারে—
বহু বিচিত্র জীবন-পাখী তার ডানা মেলেছে
লেগেছে তাতে চিরন্তনের সোনাঝরা আলো।
জীবনের হাটে হাটে যার সব সংগ্রহ রঙে-রসে মূর্ত হয়ে উঠেছে চিত্রে
আলোকের অদৃশ্য রহস্যও ধরা দিতে এসেছে
যার তুলির মায়ামোহ স্পর্শে,
সেই অবন পটুয়ার ভিটে বিকাবে কোথায়।
সে আছে বনবাসের আনন্দিত নির্বাসনে
জীবন-রসের পূর্ণ কূপের পাশে—
দেখা-অদেখার উজান-ভাটির খেলায়।
সেখানে আজও চলেছে সব কিছু সঞ্চয় করে—
উজাড় করে দেওয়ার মাতন—
অবশেষে সব শেষে যেখানে তিনটি ঘট পূর্ণ হয়ে রয়েছে
জীবন-নিংড়ানো তিন রঙা মধুতে—আনন্দে, বেদনায় ও স্মরণে।

ছিলেন, বাবু—দেখেন তো—দামটা ঠিক ঠিক নিয়েছে তো? সাক্ষর নয় যে মানুষ—সে কেমন করে গীতা পাঠ করবে, গীতার মর্মার্থ বুঝবে? অথচ দেখছি—

ততক্ষণে চারিধারে মন্তব্য শুরু হয়েছে। লাভ লোকসানকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে চলছে আলোচনা। সরস আলোচনা, হাসি, ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতা। লোকটিও ছাতা হাতে করে সে সব

হাসছেন উনি? একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে কি?......

সত্য—এক হিসাবে এই মুক্তি কি আরামের! যত উৎকৃষ্ট মনোহর লোভনীয় হোক বস্তু—সে যখন প্রতিক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে তখন তার বর্ণ রস বৈচিত্র্য—মোহ বা মহিমা হারায় না কি?

তার সঙ্গ তখন পীড়নের নামান্তর নয় কি! প্রতিদিন একই মূল্যবান মোটরে চেপে যদি

নূতন রঙের নূতন ধাঁচের গাড়ী বদল করেন কেন সমর্থবানেরা? একই ধরণের প্রাসাদে তাঁদের রুচি থাকে না কেন? এক সময়ে পছন্দ করে তৈরী করা অলংকারে সীমন্তিনীদের বেশী দিন মন ভরে না কেন? এক ডিজাইনের পাড় ও রং-ওয়ালা শাড়ী রুচি বিকার ঘটায় কেন? প্রতিদিনের অতি উত্তমও উত্তম নয়। নতুন গাছ, নতুন ফুল, ফল, পাতা, নতুন বন্ধু,

অচিন প্রিয়

প্রাণতোষ ঘটক

দেশ দেখতে বেরিয়ে বিদেশের হেথায় সেথায় ঘুরতে ঘুরতে চোখ যাঁদের ধাঁধিয়ে ওঠে, সেই বিস্ময়বিহ্বল ও প্রশংসায় মুখরদের দলে যে আমার ঠাঁই হবে না কোনদিন, তা আমার অজানা নয়। দেশ দেখার নামে বিদেশ দেখে এসে বিমুগ্ধজন যখন মুখ-রোচক গল্প-বর্ণনা শুনিয়ে চলেন তখন আমি যত্নের অলক্ষ্যে হাসি লুকাই। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের মানচিত্রের কোথায় কি অবস্থান করছে, প্রশ্ন করলেই তৎক্ষণাৎ তাঁদের মৌন-অবলম্বন করতে হয়। এই নিরুত্তরের জন্য স্রেফ শূন্য পাওনা হয়, তাঁরা স্বীকার করুন চাই না করুন।

আমার কথা শুনে আমার সহযাত্রী যেন কিছু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। চোখে আকুল জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন, শুনতে চাইছেন আমি আরও কি বলতে চাই। যদিও তাঁর যেন ঠিক কোন বক্তব্য নেই, অথচ নীরব প্রতিবাদের প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু মুখে। ভদ্রলোক মুখ থেকে চুরুট নামালেন না। অর্থাৎ তিনি যেমনকার তেমনি নির্বাক থাকলেন।

শ্রাবণের ঝিরঝির, চলন্ত ট্রেণের বাইরে। কাঁচের জানালা থেকে চোখের দৃষ্টিতে আমার ধরা পড়ে, দিগন্তলে শ্যামসবুজ ধান্যক্ষেত্র। লক্ষ্মীর অকৃপণ দান, ছড়িয়ে আছে সীমাহীন বিস্তারে। বৃষ্টিজলে কিছু বা অস্পষ্ট। দেখা যায়, একের পর এক মাইলপোষ্ট। প্রকৃতির বুক থেকে মাথা তুলেছে গণিতের সংখ্যা' জল', জমি আর জঙ্গলের পরিমাপ। মাইলপোষ্টের ঐ অঙ্ক, দেখতে দেখতে মনে কেমন দূরত্ব আর ব্যবধানের বিরহ জাগায় যেন। মাঝে মাঝে দু' চারটি পর্ণ কুটিরের জটলা এখানে সেখানে। জনবসতি। পায়ে-চলা শীর্ণ আর আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে চলেছে চাষার ছেলে। লজ্জার বালাই নেই নাঙ্গলাকের। নিরাবরণ, নগ্ন। একটা লোহার সরু চাকার পিছু পিছু ছুটে চলেছে তীরের বেগে। হাতে একটা পাকাটি।

ছুটন্ত ইঞ্জিনের ঘন ঘন সান্টিং বেজে চলেছে। দিকে দিকে প্রতিধ্বনি উঠছে যেন। ভয় পাওয়া ছাগলের পাল, রেল-লাইনের ধার থেকে পালিয়ে যায়। দূর থেকে দেখায় যেন, এক পাল সাদা আর কালো হরিণশিশু। শিকারীর তাড়া খেয়ে ছুটছে।

আমার আবার হিল্লী দিল্লী লাহোর ভাল লাগে না আদপেই। যেমন অসহ্য মনে হয় কলকাতা, বোম্বাই, কানপুর। মনে হয়, নকল পৃথিবী। আপনি দিনের বা রাত্রির ট্রেণে যেতে যেতে দেখবেন, যত ট্রেণযাত্রী বড় বড় নামজাদা শহরের ষ্টেশনে নেমে পড়ছে। কি এক অদম্য মোহ আর আকর্ষণ তাদের চোখে চোখে। মেকী শহরের হাতছানির লোভ সামলাতে পারে না। আশ্চর্য!

ভদ্রলোক মুখ থেকে চুরুট নামালেন এতক্ষণে। স্বল্প হাসির আভাষ ফুটিয়ে বললেন,—তবে আর এত লোক ভারতদর্শনের টিকিট কাটছে কেন বছর বছর? তোমার কথায় একমত হ'তে পারি না আমি।

প্রৌঢ়ত্বের দাবীতেই সহযাত্রী যেন 'তুমি' সম্বোধনের সূত্রপাত করলেন। আমিও আপত্তি জানালাম না ইদানীং কালের উগ্র আত্ম-সম্মানীর সচেতনতায়। কেন না, ভদ্রলোকের পাশেই একজন সালঙ্কারা ব'সে আছেন, চোখে উদাসী চাউনি মাখিয়ে। জামরঙের তাঁতের শাড়ীর অল্প গুণ্ঠন নেমেছে কপালে। সহযাত্রী যদি কিছু মনে করেন সেই আশঙ্কায় আমি তাকাতে সাহস পাই না সরাসরি। কিন্তু এক দেহে এত রূপ আর এত অলঙ্কার, সহসা দেখতে পাওয়া যায় না। ষোড়শী না সপ্তদশী ঠাওরানো যায় না। যেন কৃষ্ণবর্ণা উর্বশী, যার কোন বয়স নেই। যে চিরঅনুন্নতী।

আমি আবার বলতে থাকি। সহযাত্রীর কথার সূত্র ধরি। বললাম,—ঠিকই বলেছেন আপনি। কত লোক চলেছে ভারতদর্শনে, তার সংখ্যা গণনায় ধরা যায় না। ভারতদর্শনের স্পেশালে টিকিট কেটে পুরো দেড় মাস ধ'রে ঘোরাঘুরির রেলওয়ের দৌলতে, মুখের কথা নয়। কিন্তু এই পুণ্যদেশের যতেক তীর্থক্ষেত্র, মাঝে মাঝে স্পেশাল ট্রেণের সাময়িক বিরতিতে ধন্য হয়ে ওঠে। দেশ দেখা আর তীর্থদর্শন এক নয়, আশা করি আপনি অস্বীকার করবেন না। পীঠস্থান বাদ দিলে দেখে বেড়াও যত প্রকৃতি-সুন্দর দেশ। নয় পাহাড়, কিম্বা সমুদ্র। অসহ নিদাঘদিনে গ্রীষ্মের দেশ থেকে যাও হিম-শৈলের উচ্চশিখরে। নীচে থেকে ওপরে।

সহযাত্রী হো হো শব্দে হেসে উঠতেই তাঁর পাশের অল্পগুণ্ঠনার আয়ত আঁখিযুগলে বিরক্তি দেখা দেয়। টানা টানা সূক্ষ্ম ভুরু, ঈষৎ বক্র-আকার ধরে। হাতের রুমাল মুখে চেপে যেন রাগের আভাষ চাপলেন।

হাসতে হাসতেই বললেন সহযাত্রী,—যা বলেছো ভায়া। আমিও সস্ত্রীক গিয়েছিলাম কাশ্মীরে। হপ্তাখানেক হয়েছে ফিরেছি।

সহাস্যে আমি বললাম,—তাই না কি? এখন কোথায় চলেছেন?

আবার হো হো হেসে উঠতে গিয়ে সহ-যাত্রী হয়তো তাঁর স্ত্রীর মুখাকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেই থেমে গেলেন তখনই। মুহূর্তের মধ্যে মুখের হাসি উবে যায়। আমতা আমতা সুরে বললেন,—আজ এখন চলেছি শ্বশুর-বাড়ী। বৌকে বাপের বাড়ীতে রাখতে চলেছি।

আশাতীত কথা শুনে আমি আবার একবার অবাক হই। আমি ধারণা করেছি, হয়তো কন্যা বা পুত্রবধূ। চোখের বিস্ময় লুকিয়ে ফেলতে চাই আমি। এক লহমায় দেখে নিই, উর্বশী যেন বেশ রুষ্ট হয়ে উঠলো। চাপা ক্রোধের অস্থিরতা তার ভাবভঙ্গীতে। [illegible]

জয়শ্রী

মণীশ ঘটক

কাল ভোর রাতে
নক্ষত্র নিচয়ের দিকে চেয়ে দেখলাম
কী শুভ্র নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য
কুয়াসাচ্ছন্ন ছায়াপথ প্রান্তবাসিনী
পুষ্যা, আর্দ্রা, অরুন্ধতীর।
হঠাৎ চোখে পড়ল জেট্ প্লেনের সার
মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে ছুটে চলেছে
আর্দ্রার দিকে,
কী তাদের গর্জন।
এড়িয়ে গেল, বেরিয়ে গেল,
পিষে ফেলবে মনে হোলো
পুষ্যা, আর্দ্রা, অরুন্ধতীকে।
হাহাকার করে উঠলো আমার মন।
দেখেছিলাম
নোয়াখালী চৌমুহানীর খাল পারে
কাপুড়ে পটির প্রান্তে
বৃন্দাবন সার মেয়ে জয়শ্রীকে।
দাঙ্গার সময় দোতলার বারান্দায়
দৃপ্ত আস্ফালনে দাঁড়িয়ে ছিল
হাতে নিয়ে বাপের টোটা ভরা দোনালা বন্দুক
হিংস্র নেকড়ের মতো সতেরটা লুঠেরা,
জিভ দিয়ে তাদের লালা ঝরছে,
ছুটে চলেছে তাক করে
জেট প্লেনগুলোরই মত তির্যক পাশববে।
আশে পাশে অন্যান্য বাড়ীতে
কান্নায় ভেঙে পড়া আরো মেয়ের দল।

নির্ভীক নির্বিকার জয়শ্রী
যেন বুক ফুলিয়ে বলছিলো,
আয়,
সোজা আমার কাছে আয়,
তাকাস্নে এদিকে ওদিকে।
তোদের চাঁদমারির চাঁদ আমি,
আমিই তোদের আর্দ্রা,
পুষ্যা অরুন্ধতীর মধ্যমণি।

মন ও মনন

বিমল চন্দ্র ঘোষ

নৈতিক কর্তব্যবোধে স্বদেশ স্বজাতি প্রেমে আর
লেখে না কবিতা কেউ। যে মরুক, যে বাঁচুক তাতে
কারো কোনো দায় নেই। অহংবাদী ক্লীব বাসনার
সূক্ষ্মতার অর্ধোচ্চার প্রলাপের আত্মিক সংঘাতে
তারুণ্য প্রমত্ত আজ।

অসম-চেতনাকীর্ণ পথ,
গ্রাম নগরের বুক ভাব দ্বন্দ্বে রাত্রিদিন জ্বলে
একথা বোঝে না কিম্বা বুঝেও পাণ্ডুর মনোরথ
প্রতিভা হাঁপায় ডুবে মৃত্যুকল্প তমসার জলে।

তবু দেশ থেমে নেই কাব্যে থাক্ না-থাক্ বিক্ষোভ
গণগঙ্গা উদ্বেলিত রক্তঘাম কান্নার প্লাবনে!
এক দিকে তীব্র ঘৃণা অন্য দিকে নভঃস্পর্শী লোভ
জমে ওঠে জীবিকা ও জীবনের কুটসন্ধিক্ষণে!

আকাশ থম্ থম্ করে, বিদ্যুৎ চমকায় কৃষ্ণমেঘে,
যন্ত্রণায় রক্তমুখ গোটা দেশ নিরুদ্ধ আবেগে।

অনভ্যস্ত হাতের ছররার ঘায়ে
ছটকে পড়ছিলো
একটার পর একটা খ্যাপা হুড়ার,
ঘায়েল হয়ে জমি নিচ্ছিলো ফুটো একটা।
কিন্তু কতক্ষণ?
গণতিতে বেশী জানোয়ারের কাছে আর কতক্ষণ!
অসহ্য বেদনায়,
অসহায় আক্রোশে,
চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম সেদিন।
কিন্তু
হাহাকার জাগেনি সেদিন মনে,
জেগেছিল জয়ধ্বনি।

আঁচল পিঠে একবার ফেললে সশব্দে। প্রতিবাদের ইচ্ছা আছে যেন তার; উপায় নেই শুধু।

সহযাত্রী হেসে হেসে বললেন চুপিচুপি। আমার কানের কাছে মুখ আগিয়ে বললেন,—ভায়া দেখতে পেয়েছো কি ভীষণ চটেছে আমার গিন্নী। দ্বিতীয়পক্ষ কি না, তাই রাগটা একটু বেশী।

আমি হাঁ না কিছুই বলি না। অস্বস্তি বোধ করি, মেয়েটির অপ্রস্তুততার লজ্জা আর চাপা ক্ষোভে। আমি আবার জানালার বাইরে চোখ মেলি। সেই একের পর এক মাইলপোস্ট। সেই পিছুপানে ধাওয়া গাছের সারি। টেলিগ্রাফের তারে ব'সে আছে মিশকালো বুলবুলি। হলুদ-নীল মাছরাঙা। রেল-ইঞ্জিনের চিমনির ধোঁয়ারেখা, আকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে মন্থরগতিতে। ধোঁয়ার ধূমকেতু যেন।

—তুমি কোথায় চললে ভায়া, শুনি একবার? সহযাত্রী মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে শুধোলেন। কৌতূহলী কণ্ঠস্বর।

—কিছু ঠিক নেই। আমি পছন্দ করি নাম-না-জানা স্টেশনে নামতে। তাই বলছিলাম, আমার কাছে শহর আর শহরতলীর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান বাঙলা দেশের একটি অবহেলিত গ্রাম, যার নাম কেউ কখনও শোনেনি।

সহযাত্রী বললেন,—অর্থাৎ যত ম্যালেরিয়ার ডিপো আর ভূতুড়ে জায়গা?

—হ্যাঁ, তা আপনি যা বলেছেন। আমি বললাম, ভদ্রলোকের বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে। বললাম,—শহরের কোন' ইতিহাস নেই, শহর হাল আমলের। বাঙলা দেশে ঐতিহাসিক গ্রাম

(শেষাংশ ১৯৬ পৃষ্ঠায়)

তিরিশ দশকের এক গল্প

শ্রীমতী বাণী রায়

"বলো, বলো আরোও বলো।"

ভাঙা হলদে ইঁটের প্রাচীর পাশের ডোবার জলে সাঁৎসেতে। লম্বা-লম্বা ঘরগুলো বিজলির অভাবে অন্ধকার। কোণে উঁচু টুলে একটা বড় হাত-লণ্ঠন জ্বলছে। প্রাচীন আমলের ফুললতা-ক্ষোদা খাটের বুকে শীতলপাটি পাতা। সেখানে গল্পের আসর জমেছে। কাছে কাঠের এড়বো-খেবড়ো টেবলে চায়ের অবসিত-পাত্র।

আমরা পাওলার পৈত্রিক বাগান-বাড়ীতে তারই আমন্ত্রণে দুদিন কাটাতে এসেছিলাম। অকালবর্ষণে ঘরে আবদ্ধ হয়ে গল্পের ঠাকুর-মায়ের ঝোলা খোলা ভিন্ন উপায় নেই। পাওলার বাবা বাঙালী। বিদেশ গমনের ফলে স্বদেশিনীকে বিবাহ ঘটে ওঠেনি। পাওলার নামটি তার মা কোন আদরের আত্মীয়ের নামে রাখলেও পাওলা আদ্যন্ত বাঙালী।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর দলটির সঙ্গে দুই-চারজন বয়স্কা মহিলারাও এসেছেন। তাঁদের মধ্যে মধ্যবয়সী শান্তি সেনকে আমরা তাঁর জীবনের কোন অকথিত কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম।

"আমার জীবনের অকথিত কাহিনী? তার মানে তোমরা শুনতে চাও কোন রোমাণ্টিক কাহিনী। কিন্তু, সে তো তিরিশ দশকের গল্প।"

"মানে?" চঞ্চলা সেহানবীশ ললাটে চক্ষু তুলে প্রশ্ন করল।

"মানে তিরিশ দশকে আমার যৌবন ছিল, আমার স্বপ্ন ছিল, আমার প্রেম ছিল।"

"শান্তিদি, তখন তুমি বিদেশ চষে বেড়িয়েছ। তাহলে তোমার প্রেম অথবা রোমাণ্টিক আখ্যান কণ্টিনেণ্টাল, না?"

রচনার পাশে পাকাচুল, গাত্র-চর্ম কুঞ্চিত, পেশী শিথিল, শাড়ীর রং বিলীয়মান—এমন যে শান্তিদি, তিনি আজ মনের মুক্তা-পেটিকা খুললেন আমাদের অনুরোধে। পাওলা এক [illegible] করছিল। তারি দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"পাওলা আমাকে অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। তাই এবার এলাম ওদের বাগান-বাড়ীতে।"

বাইরে অশান্ত ঝিঁঝির ডাক, বাগানের অসংখ্য পুষ্প-সুবাস, পাতায়-পাতায় বৃষ্টির চুম্বনের শব্দ, ভিজে অন্ধকার মাটির নীচের গহ্বর উন্মোচিত করে আনল সহস্র দলে বিচ্ছুরিত জীবন-উৎপল। প্যাশানের শ্বাস-মলিন নয়, প্রেমের শতদল।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। পাওলার কেউ না কি? আমাদের কৌতূহল খণ্ডন করে শান্তিদি বলে চললেন—

আজ কেন জানি না এখানে বসে মনে পড়ছে জার্মানীর কথা। তখন বিদেশে ছিলাম। কিন্তু ছুটির সময়ে কলেজের বন্ধুদের সাথে আশেপাশের দেশ-গুলোয় বেড়াতে যেতাম, কখনও বা যখন খুসী যেতাম। প্রবাসিনী কন্যার জন্য মোটা-দাগে পিতা অর্থ পাঠাতেন। পড়াশোনার জন্য ব্যস্ত ছিলাম না। সত্যিই গোটা কণ্টিনেণ্ট চষে বেড়িয়েছি। ব্যাভেরিয়ার পল্লী অঞ্চলে এলাম কয়েক দিন থাকতে। দূরে তুষারময় আল্পস, উঁচু পাহাড়ের জমির বুকে ভেড়ার পাল চড়ে বেড়াচ্ছে। জুলাই মাসের সূর্য-তপ্ত নীল আল্পসের সানুদেশে পাইন বনের ছায়ায় মনে স্বপ্ন ভাসে। সে স্বপ্ন অধরার স্বপ্ন। ক্লোভারের গুচ্ছে গুচ্ছে দোলা খায় মন। সোনার রাই-শস্যের ক্ষেতে সোনালী স্বপ্ন বোনে। যবের চূর্ণে তৈরী হয় বিয়ার। লাল টালি মাথায় সাদা দেওয়াল ঘেরা ছোট-ছোট কুটীরে কত আনন্দ উৎসব। গ্রীষ্মে জার্মানির পল্লী। হিটলারের নাৎসী-প্রপীড়িত জার্মানি নয়, তিরিশ দশকের জার্মাণী, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের উপাসক।

আমরা আশে-পাশের সহরগুলো দেখলাম। মিউনিকের কারখানার চিমনি, গথিক প্যাটার্ণের [illegible]

কৃষকের ঘরে অতিথি হলাম। আমরা দুই বন্ধু।

বৃদ্ধ চাষীর ক্ষেতখামারে প্রাচুর্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোতলায় একটি চমৎকার কাঠের ঘর পেলাম।

আমার বন্ধু নিবেদিতা চিত্রশিল্পী। স্কেচ-বই হাতে বেশীর ভাগ সময় বাইরে সে কাটাত। আমি বাড়ী বসে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতাম। সেই নিঃসঙ্গতা আমার আত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। জন্ম বা মৃত্যুর প্রারম্ভে মানবাত্মা এমন নিঃসঙ্গ থাকে। আমার জীবনের শেষ জাগরণ আমার জীবনের প্রথম মৃত্যু।

এক নির্জন সন্ধ্যা। চাষীর ছোট মেয়ের বিবাহ হয়নি। সে 'ফোলক্সগুলে' [illegible] জার্মাণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ও অবকাশ সময়ে সঙ্গীত-চর্চা করে। কৃষক নিজেও বেহালা বাজায়।

বেহালার করুণ মধুর স্বরে আজও বসবার ঘর উদ্বেল হয়ে উঠেছে। একপাশের চেয়ারে বসে শুনেছি, আমার মাথার উপরে ক্রসবিদ্ধ যীশুর সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি। প্রেমের দেবতা।

"সুর বোঝেন কিছু, ফ্রয়লাইন? শুনেছি ভারতবর্ষে বড় গানবাজনার আদর।"

তোমাদের বিদেশী সুর তেমন বুঝি কি? তোমাদের দেশ তো সুরের রাণী। তবে ভাগ্‌নারের অপেরায় গেছি—"

আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, হঠাৎ ছোট মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "ভাগনার আপনার ভাল লাগে? আমি তো পাগল। যত বিষয়ই হোক, আমার ভাল লাগে সব থেকে। লোহেনগ্রিন আঃ, পিয়ানোটা বড় বাজে, ভেঙেও গেছে। আমার ঠাকুরমা চাষীর ঘরের ছিলেন না, একজন ডাক্তারের মেয়ে ছিলেন। ওঁরই পিয়ানো। মা তো পুরো-পুরি গৃহস্থ আমিই যা বাজাই এক-আধটু। বাবার বেহালার সঙ্গে। আপনাকে একটু শোনাতাম। আচ্ছা একটু [illegible] শুনুন"— [illegible]

…ঙ্গে সঙ্গে যেন ঘরের বৃহৎ জানালা দিয়ে …র চলে এল—হংসরাজকুমার। জার্মানির …াক-সাহিত্যের মনোহারী এক নায়ক লোহেন-…্রন। ছদ্মবেশী প্রেমিক তার পত্নীকে প্রতিজ্ঞা …রিয়ে নিয়েছিল সে কখনও রাজপুত্রের প্রকৃত …রিচয় জিজ্ঞাসা করবে না। তাহলেই কুমার …দৃশ্য হয়ে যাবে। নির্বোধ নারীর জীবনে …্র্যাজেডি এসেছিল তার কৌতূহলে।

জানলার বাইরে জার্মাণীর সমগ্র পল্লী-…কৃতি ভাঙা পিয়ানোর, কাঁচা হাতের সুরে …মল করে কাঁপতে লাগল। সুরের যাদুকর …াগ্‌নার! ভাগ্‌নার! জার্মানির আকাশে-…াতাসে যার সুর মাখানো। যার অপেরার মধ্যে …রা দিয়েছে জার্মাণীর প্রেম, ভালবাসা, শৌর্য-…ীর্য, মহত্ত্ব, রূপক। রাইন নদীর উন্মাদ জল-…ল্লোল, আল্পস শিখরের ধ্যান-স্তব্ধতা সমস্ত …ছু, ভাগ্‌নারের অপেরা-সঙ্গীত।

পাইন বনের বাতাসে শিহরণ জেগে উঠল। …াচ ফল অন্ধকারে দোলা খেল। আপেলের …ুকে রস-সঞ্চার হল। আর আমার আবেশ-…গ্ন চোখের সম্মুখে জেগে উঠল ক্ষিপ্র, উৎকর্ণ তুহিনশুভ্র দুইটি রাজহংস-টানা রথ। তার …ুকে সূর্যদেবতা আপোলোর মত দাঁড়িয়ে আছে …ার্মাণ-লোকগাথার রাজকুমার লোহেনগ্রিন। …ীল চোখে তার উন্মুখ আকাশের দাক্ষিণ্য, পাকা ধানের ঔজ্জ্বল্য তার চামড়ার, সমগ্র দেহে …ার আল্পস শিখর ম…্রী-র দৃঢ়তা! সে আমারি সম্মুখে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে।

আমি চমকে উঠলাম, ভীত হলুম। আমার স্বপ্নের ছায়া কি মূর্তি ধরে এল, না সুর …ূর্তি ধরেছে? জানালার প্রবেশ পথে অস্পষ্ট …ায়ার মত, দাঁড়িয়ে আছে সে? ও কে?

আমার ভীত-কণ্ঠের অস্ফুট চীৎকারে পিয়ানো বন্ধ হল। নিনা লাফিয়ে উঠল, ওর বাবা এগিয়ে অভিবাদন করল, "এই যে হের ডক্‌টর, কোথা থেকে?"

মূর্তিটি এগিয়ে এল, আজানু একটি প্যান্ট, সাস্‌পেণ্ডার সার্টে তোলা। পায়ে হাই-কিং-এর উপযোগী মোটা জুতো-মোজা। পিঠে ভারী হ্যাভারস্যাক।

"নেমে এলাম সেই ৎসুগ স্পিটসে থেকে" -

"বলেন কি হের ডক্‌টর, ও যে আট হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু।" কৃষক অটো এগিয়ে একখানা চেয়ার ঝেড়ে দিল, "ডাক্তারী ছেড়ে দিলেন না কি, পর্বতশৃঙ্গে পর্যটক হবেন না কি?"

'আরে না, না। বার্লিন আমার জন্যে হাহাকার করছে। আমি ডাক্তারী ছাড়বো? এমন গ্রীষ্মটা একটু পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি মাত্র। টিরোল অঞ্চলে ঘুরছিলাম। কিন্তু, ওঁর সঙ্গে তো আলাপটা"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি হচ্ছেন অতিথি। কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন। ওঁর নাম ফ্রাউলিন সেন।"

"সেন! —তবে কি উনি?"

"উনি ভারতবর্ষীয়, বাঙালী।"

তরুণ আমার দিকে ফিরে হাসল, হাল্কা অন্ধকারে তার হাসি যেন মুক্তাবৃষ্টি। রাজা সোলেমনের উপমা মনে পড়ল, দাঁত যেন যুগল মেষশাবক। আমার দিকে ফিরে বলল, "অভি-বাদন গ্রহণ করুন। আমি বাঙালীদের ভালবাসি।"

আনাড়ি জার্মাণ ভাষায় কি বলেছিলাম [illegible]

সৃজন হয়েছে। আমার জীবনে আমার লোহেনগ্রিন এসে গেছে।

সেই উন্মাদনাময় বসন্তের তুলনা নেই। নিবেদিতার নিষেধ সত্ত্বেও মনপ্রাণের বল্গা ছেড়ে দিলাম। দিগন্তব্যাপি সোনালী রাইক্ষেতে, নীলাভ হ্রদের ধারে জন্ম নিল প্রেম। বেসিল আর শুক্তি। নিবেদিতা ছবি আঁকত, আমাকে তিরস্কার করত, "শুক্তি, চল চলে যাই। আর না। মাথা খারাপ হয়েছে? একজন জার্মাণ ডাক্তার তোমাকে কি সত্যি ভালবাসবে? ওর এটা ছুটির দিনের আমোদ।"

"কিন্তু নিবেদিতা, ও ভারতবর্ষকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। তোমার নাম শুনেই বলল, "শুক্তি, তোমার বন্ধু কি আবার সিস্টার নিবে-দিতা হবেন? ও বাঙালী হতে চায়।"

"যদি চায়ও, ও হতে পারবে না। তাছাড়া ধরলাম ওর মনোভাব আন্তরিক, তাহলেই বা তুমি কি করবে? বিয়ে করে এখানে থাকবে? বেসিল মার্কাসকে বিয়ে করে বার্লিনে গোটা জীবন কাটাবে? নতুন ডাক্তার। তুমি হবে ফ্রাউ ডক্‌টর মার্কাস। এঁদো রাস্তায় থাকবে। সকালে উঠে স্বামীর সার্জারি গুছিয়ে, টেলি-ফোনের খবর টুকে, রান্না করবে। মোটা মোটা জার্মাণ বাচ্চা মানুষ করবে, যাতে তারা বড় হয়ে ভারতবর্ষের টুঁটি চেপে ধরে।"

আমি শিউরে উঠলাম, "না, না।"

মনে পড়ে গেল বাবার কাছে প্রতিশ্রুত্যা আমি, বিদেশী বিবাহ করব না। তবেই বাবা আসতে এখানে দিয়েছেন।

নিষ্ঠুর গলায় নিবেদিতা বলে চলল, "গোটা জীবন ওই জার্মান বলতে হবে—শুক্তি, আমরা কি করে বিদেশিনী হ'তে পারি, বলো?"

পরিষ্কার কাঠের মেজেতে সূর্যের আলো, উপরি উপরি তিন সারি জানালা। উঁচু ছাদ, চারদিকে কাঠের বারান্দা। প্রাচীরে নানা ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর, ধর্মচিত্র। তাকে দু' একটি প্রাচীন মূর্তি, বাসন সাজানো। জানালার ওপাশে সানুদেশ, মরকত মণির মত সবুজে উজ্জ্বল, সোনার মত হলুদে উজ্জ্বল। দূরে আল্পস পর্বতের নিষ্পাদপ চূড়া। সমগ্র পরি-বেশে সম্পদ প্রাচুর্য-শক্তি। তিরিশ দশকের জর্মান পল্লী।

কিন্তু, আমার মন ফিরে চায় বাংলার পানা-পুকুর, আমার ধর্মপরায়ণা মাতা, যাঁর চোখের জল নিত্য আমার উদ্দেশে প্রবাহিত। কবে আমি ফিরে যাব? কবে সমাজের মধ্যে আবার নিরাপদ আশ্রয় নেব? প্রার্থনায় ঠাকুরের মাথায় রোজ তিনি তুলসী পরাচ্ছেন, চরণে চন্দনপুষ্প নিবেদন করছেন। বাংলার নাড়ীর যোগ আমার শিরায় শিরায়। ছিন্ন করতে গেলে আমার অস্তিত্ব ছিন্ন হয়ে যাবে।

বেসিল আমাকে অপরাহ্ণে ডাকল, শুক্‌টি, একটু বেড়াতে এসো না। আজ বড় গরম চলো বেড়িয়ে আসি। অনেক কিছুই তো দেখলে না। দিনরাত টাগোরের কবিতা নিয়ে বসে থাকো।"

আমি মনে মনে হাসলাম। বেসিল তুমি বিদেশী। কিন্তু তোমার প্রতি প্রেমই যে আমাকে আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বিদেশী আমায় কোথায় পাবো?

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে—"
"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই
তুমি তাই গো।"
"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে
ঝলকে দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
—সেথা পথ নাহি জানি
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।"

রবি ঠাকুরের কবিতা। পৃথিবীর মত প্রাচীন। বিদেশে আমার মনে মনে তারা মধু বিলোয়, মৃগনাভির মোহে প্রেমের কন্টকবনে ছুটে বেড়াই। আমি তাকে ভালবেসেছি। ভাগ্‌নারের সুরে আমার দূরের মানুষ কাছে এসেছে। আমার রাজপুত্র।

রাস্তার মোড়ে জলাধার, কাছে জলদেবতার মূর্তি। সেখানে একটু থামল বেসিল। উষ্ণ সূর্যের ছোঁয়ায় তার গালের তুহিনে দুটি গোলাপ ফুটেছে। আরক্ত অধর পাইপের ধোঁয়ায় ম্লান। মনে হ'ল আজ প্রথম ওর চোখের নীল তারায় যেন আমারি মতন কালোর ছায়া। ওর সোনালী চুলে যেন কৃষ্ণাভ বাদামী ছোঁয়া। ওর কোন অংশ যেন আমার।

গরু-ছাগলের গলার ঘণ্টায় মুখরিত খামারের পাশ দিয়ে ময়দানে নামলুম। সেখানে তারের যন্ত্রের সুরে, বেহালার গানে পুরুষ ও নারীর মিলিত জার্মাণীর পাহাড়িয়া চাষী নাচ শু-প্লাট্‌লার-এর আধিক্য। হাতে হাতে জড়িয়ে মিলনের নাচ। কিন্তু আমাদের ভারতীয় নৃত্য কত উন্নত।

আমার মুখের দিকে চেয়ে জার্মান ও ইংরাজি মিশ্রিত ভাষায় বেসিল বলল, "শুক্‌টি, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে না, না? নিজেদের কাল্‌চার তুমি অনেক উপরে ভাবো না?"

আমি অপ্রতিভ হলাম। আমার মনের কথা সে বুঝল কি করে?

বেসিল বলল, "আমি যে ডাক্তার, শুক্‌টি। দেহের ব্যাধির সঙ্গে মনের খবরও রাখি। কিন্তু ভুলো না, এই জুতো থাবড়ে শু-প্লাট্‌লার নাচ তোমাদের সাঁওতালি নাচের মত। তোমাদের যেমন ভরত নৃত্যম, কথক, মণিপুরী, কথা-কলি নাচ আছে, উচ্চাঙ্গ গান আছে, এ দেশে তেমনি উচ্চ শিল্পের সন্ধান পাও না? ফ্রাউলিন নিনা বলে তুমি ভাগ্‌নারের অপেরা ভালবাসো।"

আমাদের পাশ দিয়ে গ্রীষ্মপোষকে সজ্জিত অসংখ্য পুরুষ ও নারী সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। খামারের চাষীদের ঘোড়ায় টানা শস্যের গাড়ী চলারও বিরাম নেই। চারিদিকে উৎসব, জনতা।

আমি ভাঙা জার্মান ও ইংরাজিতে বললাম, "তুমি এত আমার দেশের কথা জানলে কি করে, বেসিল?"

বেসিলের মুখে কিসের ছায়া ভেসে এল। সে উত্তর সোজাসুজি দিল না। শুধু বললে, "তুমি হিন্দু, তোমরা ধর্ম ছাড়া এক পা চলো না। চলো তোমাকে আমাদের একটা দেবস্থানে নিয়ে যাই। এখানে ভারী ভিড়। সেখানে ধর্মের নামে তোমাকে কিছু বলব।"

সারা পার্বত্য প্রকৃতি নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল। পেয়ার ফুল গাছে দুলতে দুলতে বলল, আমি জানি। দূরের ত্রিকালদর্শী আল্পস,

(শেষাংশ ১৯৯ পৃষ্ঠায়)

কৃষি গবেষণায় ভারতবর্ষ

ডক্টর তারকমোহন দাস

(১)

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় গত দশ বছরে আমাদের দেশের কৃষিগবেষণার মোট ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয়নি। কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিচ্ছিন্নভাবে কৃষি গবেষণায় কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করলেও তাঁদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের নাম আজও সকল দেশের পেছনে পড়ে আছে এবং গত দশ বছরের মধ্যে আমরা সে জায়গা ছেড়ে একধাপও ওপরে উঠতে পারিনি। পাট চা, লাক্ষা প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রে নিছক প্রাকৃতিক

ইক্ষু রোপন—বর্ধমান বীজ খামারের একটি দৃশ্য। ফোটো : এস পি গুহ

আনুকূল্যে যেখানে আমরা একচেটিয়া সুবিধা-ভোগী ছিলাম সেখানেও নানা কারণে সংকট দেখা দিয়েছে। মাটির সঙ্গে আমাদের দেশের ভাগ্য গভীরভাবে জড়িত। আমাদের দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ অধিবাসী মাঠের মানুষ, মাঠের ফসলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের হৃদয়ের সুখ দুঃখ, জীবনের মূল্যবোধ। উন্নয়নের কার্যসূচীতে তাই কৃষিকে সর্বপ্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে খাদ্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী হওয়া এবং শিল্প রপ্তানীর চাহিদা মেটাবার মত কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করা এই পরি-কল্পনাগুলির লক্ষ্য। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এবং বিশেষজ্ঞগণ কেমনভাবে সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন সে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা.

কৃষি গবেষণার বর্তমান ধারা সম্পর্কে কিছু বলবার আগে ভারতবর্ষে কৃষি গবেষণার পটভূমি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯০৩ সালের আগে আমাদের দেশে কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী তরফ থেকে বিশেষ কোন চেষ্টাই হয়নি। বর্গীয়ের মানসকন্যা সুজলা, সুফলা বাংলাদেশের কৃষির অবস্থা জমিদার ও সরকারের বিচিত্র যুগ্মদোহনের ফলে এই সময় প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল, গত শতকের শেষার্ধে পর পর কয়েকটি দুর্ভিক্ষের স্মৃতি তার সাক্ষ্য বহন করছে। ১৮৮০, ১৮৯৮ ও ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষের তদন্তের জন্য ইংরাজ সরকারের তরফ থেকে কয়েকটি কমিশন বসান হয়, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য এই সব কমিশন কৃষির অবস্থা উন্নয়নের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু কিভাবে কৃষির অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে সরকারের সেদিন না ছিল কোন স্পষ্ট ধারণা, না ছিল তাঁদের হাতে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কিন্তু ঠিক এই সময়ই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কৃষিবিজ্ঞানের নূতন যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। গ্রেগর মেন্ডেলের মৃত্যুর ষোল বছর পরে ১৯০০ সালে ডি-ভ্রিস মেন্ডেলের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির পুনরাবিষ্কার করেন, এবং তার ফলে বংশগতি তত্ত্ব ও প্রজননবিদ্যার নূতন দিগন্ত খুলে যায়। এই সময়ই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যাকস্ ও পেফারের আবিষ্কারগুলি থেকে কৃষিক্ষেত্রে অজৈব সারের প্রয়োগ সুরু হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে সেদিন বিজ্ঞানের এই নব্য হাতিয়ারগুলি কাজে লাগাবার মত কোন প্রস্তুতিই ছিল না। সমস্ত দেশের মধ্যে বাস্তব অর্থে একটিও কৃষি গবেষণাগার ছিল না।

১৯০৫ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রথম ইম্পিরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট স্থাপিত হয় বিহারের অন্তর্গত পুষা অঞ্চলে। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনের ইতিহাস একটু বিচিত্র। হেনরী ফিপস্ নামে জনৈক আমেরিকান ধনীর অর্থানুকূল্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার পাউন্ড দান করেছিলেন এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গঠনের জন্য। এই টাকাটা সেদিন না পাওয়া গেলে মনে হয় দেশবাসীকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হত এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্নের জন্য; এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সংলগ্ন এক বিরাট ভূখণ্ডও ছিল, সেখানে নানা-রকম ফসলের ওপর পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালান হত; একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গবাদিপশুর খামারও ছিল তার সঙ্গে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৫ সাল অবধি পুষায় ছিল, তারপর বিহারের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এর প্রভূত ক্ষতি হওয়ায় ১৯৩৬ সালে নয়াদিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এরই নাম এখন ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, বিরাট ঐতিহ্য ও বিশাল স্থান অধিকার করে আজ ভারতের একটি প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পুষায় যখন এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তখনই তাঁরা সুপারিশ করেন শুধু এককভাবে চেষ্টা করলে সমগ্র দেশের কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়, তার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি কলেজ ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান খোলা দরকার। এই সুপারিশ অনুযায়ী কোয়েম্বাটুর, নাগপুর, লায়লপুর, কাণপুর, পুণা ও বিহারের অন্তর্গত সাবরে কতকগুলি কৃষি-কলেজ খোলা হয়। প্রত্যেকটি কলেজের সঙ্গে ব্যাপক পরীক্ষার জন্য খামার ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট সীমাবদ্ধ সঙ্গতি নিয়ে সারা ভারতের কথা চিন্তা করতে থাকলেও ১৯১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এক বিচিত্র কৃষি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণের ফলে কৃষি উন্নয়নের যাবতীয় ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কেন্দ্রের হাত থেকে চলে যায় রাজ্য সরকারগুলির হাতে। অন্যান্য দেশের মত এই সময় কৃষির অবস্থার মোড় ঘোরবার একটা সুযোগ এসেছিল এদেশে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা ও অদূর-দর্শিতার ফলে তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। প্রদেশ সরকারগুলির ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সীমাবদ্ধ, যার ফলে আমাদের দেশে অ্যাগ্রিকালচার কিছুকাল আর এক পাও নড়ল না।

১৯২৮ সালে ভারতে কৃষির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়। কয়েকজন বিখ্যাত ইংরাজ কৃষিবিশেষজ্ঞ এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা অধ্যাপক নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই কমি-

শনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক গাঙ্গুলী তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা প্রফেসর অব্ অ্যাগ্রিকালচারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এই কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সারা ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯২৯ সালে স্থাপিত হল ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ, প্রভূত ক্ষমতা এবং অর্থ তুলে দেওয়া হল তার হাতে। এই প্রতিষ্ঠানটিই আজ স্বাধীন ভারতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ, সংক্ষেপে আই-সি-এ-আর নামে পরিচিত। সারা ভারতবর্ষের কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণার এরাই ধারক ও বাহক।

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ছাড়াও আমাদের দেশের প্রধান ফসলগুলির উন্নতির জন্য কয়েকটি পৃথক কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। এঁরা অংশতঃ স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের কটন কমিটি সব থেকে এর মধ্যে প্রাচীন। ১৯২১ সালে তুলা চাষের উন্নতির জন্য এই কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। এই কমিটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালিয়ে যান এবং প্রজননবিদ্যার সাহায্যে কয়েকটি উন্নত জাতের কার্পাস গাছেরও সৃষ্টি করেন, মূলতঃ তার ফলে কার্পাস শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল আমাদের দেশে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পর পর আরও কয়েকটি কমিটি স্থাপিত হয়েছে আমাদের দেশে: গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এইভাবে লাক্ষা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ, তামাক, নারিকেল ও সুপারির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সাতটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠিত হয়েছে। আই-সি-এ-আর এর মূল দেহ হতেই এই কমিটিগুলির উৎপত্তি এবং তারই ছায়ায় পরিবর্ধিত হয়ে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কেবল তৈলবীজ কমিটি ছাড়া প্রত্যেকেরই বিরাট খামার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত গবেষণাগার আছে এবং পর্যাপ্ত মূলধন এই সব কমিটিগুলির পেছনে নিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ব্যারাকপুরের কাছে নীলগঞ্জে জুট কমিটির গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে; সেন্ট্রাল জুট অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর নাম। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গঠনের পেছনে প্রাক্তন ডিরেক্টার ডক্টর বলাইচাঁদ কুণ্ডুর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

যে সব ফসলের উন্নয়নের ভার এই সব কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন ধান, গম জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, আলু, মসলা, ফল ফুল এবং কৃষি ব্যবহার্য পশুসম্পদ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উন্নয়নের দায়িত্ব আই-সি-এ-আর সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন।

এখন আই-সি-এ-আর কেমনভাবে সারা ভারতে কৃষি গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন তার একটা মোটামুটি আভাষ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছ'তলা বিরাট বাড়ী হাঁকিয়ে আই-সি-এ-আর বসে আছে নিউ-দিল্লীতে। সেখানে প্রবেশ করলে শুধু ফাইলের স্তূপ, ক্যালকুলেটিং মেশিন, টাইপরাইটার এবং সপ্রতিভ অফিসার ও সন্ত্রস্ত কেরাণীর মুখ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। একটু মাটি বা সবুজের চিহ্ন কোথাও নেই, মাটির সঙ্গে হাতের মিলনে যেখানে কল্যাণের সূচনা হচ্ছে তার স্থান কেন্দ্র থেকে দূরে। কেন্দ্র কেবল যোগান দেয় সেই হাতে শক্তি ও হাতিয়ার।

কেন্দ্রের সব থেকে নিকটের গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির নাম হল ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি নিউদিল্লী রেলষ্টেশনের পাঁচ মাইল পশ্চিমে প্রায় এক হাজার একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে বাটলার, ফ্লেচার ও লেদার সাহেবের মত কয়েকজন দক্ষ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে গিয়েছেন। কয়েকটি উন্নত জাতের ইক্ষু, গম ও জোয়ার এই গবেষণাগারে উৎপন্ন হয়েছে, প্রধানতঃ তারই ফলে এই ফসলগুলির উন্নতি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্বে বিহারের অন্তর্গত পুষায় ছিল, তাই এখনও এর প্রচলিত নাম পুষা ইনস্টিটিউট। এই পুষা ইনস্টিটিউট ছাড়াও সারা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আরও নয়টি গবেষণা সংস্থা আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আই-সি-এ-আর-এর অনুমোদিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হয় এবং তার ফলাফল আই-সি-এ-আরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিয়মিতভাবে। আই-সি-এ-আর তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছাই করে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে পাঠিয়ে দেন বিভিন্ন জেলায় ও থানায় থানায় ব্যবহারের জন্য। প্রতিটি রাজ্য সরকারের হাতে অনেকগুলি করে রিসার্চ ফার্ম আছে, তাঁরাও আই-সি-এ-আর-এর কাছে ছোট বড় পরিকল্পনা পাঠিয়ে অনুমতি আনিয়ে নেন। আই-সি-এ-আর এই সব পরিকল্পনার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বহন করে থাকেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিও এইভাবে স্কীম পাঠিয়ে আই-সি-এ-আর-এর আনুকূল্য পেয়ে থাকেন। দেশের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই ইচ্ছা করলে তাঁদের অন্যান্য কাজের সঙ্গেই এই কৃষি পরিকল্পনাগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার ইতিবৃত্ত কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার ইতিহাস অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যথেষ্ট সুপ্রাচীন হলেও সুসংহত নয়। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষকরূপে বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী ফুল ও ফলের উন্নতির জন্য এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন এই সোসাইটির প্রথম সম্পাদক। এই

জীবনের সন্ধ্যাকালে করপদ্মে এই উপহার
রেখে যাই। ছন্দে গাঁথা এর মাঝে রহিল আমার
মর্মের অব্যক্ত বাণী। ধৈর্যশীলা ধরিত্রীর মতো
তুমি ছিলে পাশে পাশে! এ জীবনে না
আসিলে তুমি
হয়তো অস্তিত্ব হোতো সাহারা শুষ্ক মরুভূমি;
নয় কোন জলমগ্ন শৈলাঘাতে ডুবে যেতো তরী।
জীবনে স্বেচ্ছায় ডেকে আনিয়াছি দুঃখের
শর্বরী;
অজানায় দিনু ঝাঁপ; একবারও চাহিনি পিছনে।
নিঃশব্দে এসেছো চলি সুদুর্গম বনের গহনে।

নিত্য নব কুরুক্ষেত্রে তুমি মোরে দিয়েছো বিজয়;
কাল-বৈশাখীর ঝড়ে আকাশ ধূলিতে ধূলিময়;
বজ্র হাঁকে কড়্ কড়্; ভাগ্যতরী বুঝি ডুবে যায়।
সপ্তরথী মহোল্লাসে ঐ জোর দামামা বাজায়!
নিশ্চিত ধ্বংসের তীরে দেখিলাম তোমারে অটল।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঊর্ধ্বে তুমি নীরব নিশ্চল
প্রোজ্জ্বল প্রভাতী তারা! আমি ভয় পেয়েছি
অন্তরে;
তুমি কিন্তু বলিয়াছ: 'বীর শুধু একবারই মরে।'
দুর্দিনের সেই রাত্রে পাইনু তোমার পরিচয়;
নারী পুরুষের শক্তি। সেই শক্তি দুর্বার, দুর্জয়।

সত্য বটে মাঝে মাঝে নেমেছিল কৃষ্ণ যবনিকা
তোমার আমার মাঝে। সত্য বটে ক্রূর অহমিকা
প্রেমের কোমল অঙ্গে হানিয়াছে বিষাক্ত ছোবল;
বিকারের ঘোরে কিছু বলেছিনু আবোল-
তাবোল?

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। জানি দুঃখ রাখো
নাই মনে
রজনীর দুঃস্বপন উড়ে গেছে রাতের পবনে।

এ-ও সত্য—তোমা হ'তে মিটিত না পিপাসা
প্রাণের।
আমরা কাঙাল সেই অন্তহীন মহাজীবনের
যার নাম ভূমা; আর ভূমাতেই আনন্দ আমার।
প্রাণের বিহঙ্গ চায় আকাশের অনন্ত বিস্তার।
অধ্রুব যা,— তারে দিয়ে ভূমার পিপাসা
কভু যায়?

তবু চিরঋণ পাশে তুমি, প্রিয়ে, বাঁধিলে আমায়।
দিগন্তে গিয়েছে মুছে সব আলো। কোথায়
আশ্রয়?
তুমি নারী সে আঁধারে কণ্ঠস্বরে এনেছো
অভয়।

*   *   *

আমি চলে যাই দূরে;—তার পূর্বে এই নমস্কার
সেই নারীত্বের কাছে আবির্ভাব আসন্ন যাহার।
সে নারীর প্রতিবিম্ব হেরিয়াছি তোমার মুকুরে।
ঘরের সম্রাজ্ঞী—তবু পরিব্যাপ্ত দূর হ'তে দূরে
চেতনার আলো তার। সমাজের নীরব সেবিকা!
যেখানে অন্যায় সেথা আগুনের জ্বালাময়ী শিখা
সুতীব্র মর্যাদাবোধ! যায় প্রাণ, থাক তবু মান!
সে নারীর তরে আমি রচিলাম এই জয়গান।

*   *   *

সেই নারী যাহা হতে পুরুষের সমস্ত মহিমা।
যে দেয় সঞ্চারি রক্তে পৌরুষের প্রদীপ্ত গরিমা।
সেই নারী যার কাব্য পুরুষের কবিত্বের মূলে।
যাহার প্রজ্ঞার স্পর্শ জ্ঞানচক্ষু দেয় তার খুলে।
যার প্রেম হতে আসে পুরুষের প্রেমের প্লাবন।
প্রথম যাহাতে তার দেহ-মন-আত্মার গড়ন।
সেই নারী—যার মাঝে আদ্যাশক্তি মূর্ত
ঘরে ঘরে।
জীবন সায়াহ্নে তারে নমিলাম তোমার ভিতরে।

[illegible] আট [illegible] কাজে, তারপর স্থানান্তরিত হয় বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে এবং শেষে ১৮৭২ সালে এই সোসাইটি উঠে আসে আলিপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশে তাদের বর্তমান জায়গায়। রবীন্দ্রনাথের জামাতা ডক্‌টর নগেন গাঙ্গুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম খয়রা প্রফেসর অব্‌ অ্যাগ্রিকালচার নিযুক্ত হন ১৯২১ সালে. তিনি প্রায় দশ বছর ধরে উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে দেশের বিভিন্ন কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে যান। দুর্ভাগ্যের বিষয় তারপর মতান্তর কারণে বীতস্পৃহ হয়ে তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান। ১৯৪৮ সালে এই পদে নিযুক্ত হন ডক্‌টর পবিত্রকুমার সেন, তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ঝাড়গ্রাম কৃষিকলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কৃষি বিভাগ খোলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও গত ত্রিশ বছরের মধ্যে চুঁচুড়া, বহরমপুর, কালিম্পঙ্‌, দার্জিলিঙ্‌, কল্যাণী, হরিণঘাটা, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি শিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছেন। বর্তমানে তাঁদের হাতে সর্বসমেত ২৪টি কৃষি প্রতিষ্ঠান আছে। আনন্দের বিষয় হরিণঘাটা কৃষিকলেজটি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হতে চলেছে যেখানে প্রধানতঃ কৃষিবিদ্যাই শেখান হবে।

পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ কৃষি গবেষণাই চলে আই-সি-এ-আর-এর নিয়ন্ত্রণাধীন পরিকল্পনায়। গত দশ বছরের মধ্যে আই-সি-এ-আর প্রায় সাড়ে সাতশ'টি বিভিন্ন ধরণের কৃষি পরিকল্পনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। এক একটি পরিকল্পনার মোট খরচ কয়েক হাজার টাকা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা অবধি। একমাত্র ধানের উন্নয়নের জন্য তাদের পরিকল্পনার সংখ্যা প্রায় ৬৮টি। কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্র নিয়ে এই পরি-কল্পনাগুলি রচনা করা হয়। এছাড়া তুলা, পাট, লাক্ষা প্রভৃতি ফসল কমিটিগুলিও কয়েক শত পরিকল্পনা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে।

(২)

আমাদের দেশে কৃষি গবেষণার পটভূমির এই হল সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই সমস্ত গবেষণাগারে গত দশ বছরের মধ্যে কি ধরণের কাজকর্ম হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের কৃষি কতদূর উপকৃত হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর এখনও বাকী আছে।

গত দশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশের মত। ১৯৪৯-৫০ সালের মোট ফসলের পরিমাণ ১০০ সূচক সংখ্যা ধরলে ১৯৬০-৬১ সালে তা দাঁড়ায় খাদ্যশস্যের বেলায় ১৩১ এবং অন্যান্য শস্যের বেলায় ১৪৩। এই প্রবন্ধে তার একটা হিসাব দেওয়া হল।

[illegible] সময়ে কৃষির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, যেমন সার ও মাটির সমস্যা; সেচ, বীজ বপন ও কৃষি পদ্ধতি; জাপানী, চাইনিজ্‌ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে ধান ফলনের পরীক্ষা; প্রজননবিদ্যার প্রয়োগে নূতন জাতের ফসল ও গবাদি পশু উৎপন্ন; ফুল ও ফলের উন্নয়ন; আগাছা ধ্বংস ও বীজশূন্য ফলের উৎপাদনে হরমনের প্রয়োগ; ফসল ও গবাদি পশুর শারীরতত্ত্ব ও নানা রকম রোগ সম্পর্কিত গবেষণা; মৎস্য চাষের উন্নয়ন; বনজ বৃক্ষ সংরক্ষণের সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা; কৃষিব্যবহার্য যন্ত্রপাতির উন্নতি সম্পর্কে পরীক্ষা। এই ধরণের শত শত সমস্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ ব্যাপৃত ছিলেন। এই সব গবেষণার ফলাফল আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি দেখতে পাই, এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের কৃষি বৈজ্ঞানিকেরা অনেকগুলি উন্নত জাতের ধান, গম, তৈলবীজ, আলু, মসলা ও ফুলফল উৎপন্ন করেছেন। এই নূতন ভ্যারাইটির ফসল-গুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফলনের পরিমাণ বেশী, না হয় রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা যথেষ্ট, না হয় প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা বেশী। সারের ব্যবহার ও কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা বেশ কিছু বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আগাছা ও ফলের গাছে হরমন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, গবাদি পশুর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং ফসলের ক্ষতি বন্ধ করবার জন্য কতকগুলি বাস্তব উপায় উদ্ভাবন করেছেন, তার সঙ্গে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, জমির ক্ষয়ক্ষতি দূর এবং পতিত জমি উদ্ধার সম্পর্কে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, কিছু ফাণ্ডামেণ্টাল বা তত্ত্বগত জ্ঞানও সংগৃহীত হয়েছে।

কৃষির বাস্তব উন্নয়ন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে গত দশ বছরে জমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সারের পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণের মত। ১৯৫০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার টন, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন। জমি অনেকটা ব্যাঙ্কের মত, ক্রমশঃ কিছু কিছু করে জমি থেকে ফসল তুলে নিলে এবং জমিতে কিছু ফিরিয়ে না দিলে জমি একদিন ব্যাঙ্কের মত ফেল করে ফসল দেওয়ার ব্যাপারে। জমিতে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ভারতের গ্রামীণ অর্থ-নীতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমাদের দেশে যে পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত অজৈব সার তৈরী হয় তা দেশের মোট জমির পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়, এর পরিপূরক হিসাবে জৈব সারের ব্যবহার আরও বাড়ান প্রয়োজন, অধ্যাপক নীলরতন ধর মহাশয়ের গবেষণাগুলি এই বিষয়ে অনুধাবন করবার মত। গত দশ বছরের মধ্যে ভারতের সেচ জমির মোট পরিমাণ ৫ কোটি ১৬ লক্ষ একর থেকে বেড়ে আজ প্রায় সাত কোটি একরে এসে দাঁড়িয়েছে। মোট ফসলের পরিমাণ ও তার নিরাপত্তা তার ফলে বেড়েছে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে সমগ্র ভারতে প্রায় চার হাজার বীজ খামার স্থাপিত হয়েছে, চাষীর পক্ষে তার ফলে উন্নত জাতের তাজা বীজ সংগ্রহের সমস্যা অনেকটা দূর হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। তারপর প্রায় ৪০ লক্ষ একর পতিত জমি সংস্কার ও ২৭ লক্ষ একর জমিকে ক্ষয় হতে রক্ষা করবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতেও কিছু ফসলের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধরা যায়।

এ পর্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হল তা পাঠ করে পাঠকের মনে একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাবের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটু সতর্কভাবে এই বিবরণের খুঁটিনাটিগুলি যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, আমাদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যে উন্নতি ঘটেছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গত দশ বছরে ফসলের পরিমাণ যত বেড়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে তার চাহিদা বেড়েছে তার থেকেও বেশী। তাই ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির থেকে তার অপ্রতুলতা ও মহার্ঘতা বেড়েছে আরো বেশী। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ফসল ফলানোর প্রতি-

([illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাওয়া বদলে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন থাকনা এখন পড়ে।
জপের মালা থাক ঝুলিতে বাবুই বাসা বাঁধুক,
শিখটিক কেটে, পৈতে খুলে' উড়িয়ে দাও ঝড়ে
পাথর-নুড়ি বটতলাতে একলা বসে কাঁদুক।

মরণ-কান্না কেঁদে মরুক মালসা ভোগের হাঁড়ি
কীর্তনীয়া খোল ছেড়ে নিক নাকিব কুঁকার কাজ,
গুরু-পুরুত বেজার হয়ে গুটোক না পাততাড়ি
হিতৈষিণী সভায় বসুক বেকার আড্ডাবাজ।

বৃহৎ তন্ত্রসারের পুঁথি কাটুক তেলা পোকায়
নিত্য-কর্ম পদ্ধতিতে যাক বারোটা বেজে,
ধর্মসভায় পাঞ্জা লড়ুক বৃদ্ধ এবং খোকায়,
মহৎ জনের বাণীর সুধার রৌদ্রে উঠুক গেঁজে।

শাস্ত্র গ্রন্থ আরাম করে ঘুমান কুলুঙ্গীতে
সমাজ ধর্ম আপৎ ধর্মে জলাঞ্জলি দাও,
কালো ঘোড়া জোর কদমে ছুটুক চতুর্ভিতে
চক্ষু বুজে যা পার তাই পকেট ভরে নাও।

কাপুরুষই ধর্মভীরু, ধর্মভীরু নিজে
দুটি চক্ষু অন্ধ তাহার, হাত দুটি তার ঠুঁটো,
কাজেই দু'হাত তফাৎ রাখো দৈব-দেব-দ্বিজে
ভগবানের মাপের কাঠা—তলাতে তার ফুটো।
ভাগ্য এখন খুশ-খেয়ালে চলছে আঁকা-বাঁকা
গ্রহ, উপগ্রহ এখন যে যার মতো চলে,
দেবতা করেন আড়াল থেকে বৃথাই
আওয়াজ ফাঁকা,
প্রণামী নেন পাণ্ডা ঠাকুর অপূর্ব কৌশলে।

বলছি তাতেই, সমঝে চল, বদলে গেছে হাওয়া
ধ্রুপদী গান, বসিয়ে আসর, মিথ্যা এখন গাওয়া।

—কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারতবর্ষ—

(কৃষি উৎপাদনসূচক সংখ্যা ১৯৪৯-৫০ = ১০০)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৬০-৬১ (প্রত্যাশিত)
সকল প্রকার পণ্য—	৯৬	১১৭	১৩২	১৩৫
খাদ্যশস্য—	৯১	১১৪	১৩০	১৩১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

অগস্ত্য সাহেবের কুঠী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বাড়ীটা একবার দেখেই ভাল লেগেছিল শমিতার। সে অরুণকে বলেছিল—চেঞ্জে না-ই গেলাম। এখানে থাকলেই আমি আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠব। অবশ্য তুমি কাছে থাকলে।

অরুণ বলেছিল—ওখানেই ত' মুস্কিল করেছে কিনা! আমাকে সারাদিনই যে ঘুরতে হয় শমিতা। তবে তুমি যদি চাও ত' লিখে দিই কলকাতায়। ওরা কেউ এসে থাকুক তোমার সঙ্গে।

শমিতা বলেছিল তার দরকার নেই।

বাড়ীটা পুরনো। একশো বছরের ওপরে হবে বয়েস। বিরাট জমিটা বড় বড় ঝাউ আর য়ুক্যালিপটাস দিয়ে ঘেরা। সব চেয়ে যেটা ভাল লেগেছে শমিতার—বাড়ীটা সেকালের বাংলো আন্দাজে খুব ছোট। দুটি ঘর, দুটি বাথরুম, চারিপাশে টানা ঢাকা বারান্দা। অরুণের চাকরির জন্যে শমিতাকে বড় বড় বাড়ীতে থাকতে হয়েছে বরাবর। আর মফঃস্বলের বড় বড় পুরনো বাংলো বাড়ীর মধ্যে কি যেন আছে, সেগুলোকে কিছুতেই বাড়ী বলে মনে হয় না। তার মধ্যে কেন যেন ঘরোয়া, আপন ভাবটা সৃষ্টি করা যায় না। এত উঁচু এত নিস্তব্ধ, এমন চুপচাপ বাড়ীগুলো যে, শমিতার মনে হয়েছে, এরা বন্ধুতা পাতাতে চায় না বাসিন্দাদের সঙ্গে। যে সব দিন চলে গিয়েছে, তার মধ্যেই এরা ডুবে আছে। সেই সব কোম্পানীর সাহেবদের মতোই এদের স্বভাবে শৈত্য, আদবকায়দা দুরন্ত চারিপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা।

অসুখে ভুগে ভুগে মনটা অনুভূতিপ্রবণ হয়েছে বলেই বোধ হয় শমিতার মনে হলো বাড়ীটার মধ্যে যেন ভালোবাসবার আকাঙ্ক্ষা ছড়ানো ছিল। যেমন সে এসে দাঁড়াল, অমনি যেন বাড়ীটা তাকে বন্ধুর মতো দুটি হাত বাড়িয়ে আপন করে নিল।

কার ছিল বাড়ীটা কে জানে। দরজায় নাম চোখে পড়ে না। যার ছিল এই বাড়ী, সে হয়তো রাস্তার ওপরে ঐ পুরনো গোরস্থানটায় ঘুমোচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনই শমিতা মেয়েটিকে দেখল।

এই কুঠিটার ওপারে আর একটা কুটির হাতা। বড় বড় গাছে ঘেরা—বাড়ীটা চোখে পড়ে না।

বিকেলে শমিতা একা একা ঘুরছিল বাগানে। চারিপাশে শুধু গাছ। কোন শব্দ নেই। একটা আশ্চর্য প্রশান্তি শুধু ঝরে ঝরে পড়ছে। এমনি সময়ে সে দেখল মেয়েটিকে।

বয়স আঠারো উনিশ হবে। ছিপছিপে চেহারা। শাদা একটা গাউন পরনে। মুখের ভাবটি ভারী সুকুমার। শমিতা আশ্চর্য হয়েছিল। আরো আশ্চর্য লেগেছিল তার, যখন মেয়েটি তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছিল। মেম সাহেবদের সঙ্গে সে জীবনেও কথা বলেনি। মেয়েটি কথা বলেছিল থেমে থেমে। কথাগুলো যেন ভুল না হয়ে যায়। সেইজন্যে যেন তার ভয়। সে বলেছিল—

—আপনি কি এসেছেন লায়নারের বাড়ীতে?

—হ্যাঁ।

শমিতার বুকটা যেন কেমন করেছিল। কেন যে তার আশ্চর্য লেগেছিল, সে তা বলতে পারবে না। মেয়েটি ঝাউগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল—

—আমিও আগে আসতাম। বেড়াতাম ওখানে। য়ুক্যালিপটাসের গন্ধ আমারও খুব ভাল লাগতো।

—এখন আসেন না?

—এখন? না। আর আসি না।

মেয়েটির চোখে একটা বিষণ্ণতা, একটা আগ্রহ ফুটে উঠেছিল।

সে আপন মনেই বলেছিল

—এইখানে একটা পথ ছিল। এখানে একটা শাদা গোলাপের ঝাড় ছিল।

শমিতা আশ্চর্য হয়ে চেয়েছিল। বলেছিল

—কোথায় গেল?

মেয়েটি বিষণ্ণ সুরে কোমল চোখে তার দিকে চেয়ে বলেছিল—এখন আর নেই। পথটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গোলাপ গাছটা মরে গিয়েছে। শমিতা বলেছিল—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি? আমি অগস্তি সাহেবের কুঠিতে থাকি।

হঠাৎ একটা কুকুর ডাকছিল। গম্ভীর, ভারী সে ডাক। শুনে শমিতা চমকে চেয়েছিল। তখনই কিন্তু মেয়েটি চলে গিয়েছে। আর তাকে দেখতে পায়নি শমিতা। তবে সে গান শুনতে পেয়েছিল। মেয়েটি গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে।

And all the roses are gone....

কুকুরটার ডাক সে আবার শুনেছিল। আশ্চর্য হয়ে, কি ভাবতে ভাবতে শমিতা ফিরে এসেছিল। সে কিন্তু কেন যেন বাধা অনুভব করেছিল। অরুণকে কোন কথা বলতে পারেনি।

কয়েক দিন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল এই বাংলো বাড়ীর ওপর দিয়ে —গাছের ছায়া নিয়ে চাঁদ যখন অদ্ভুত সব ছবি এ'কেছিল বড় বড় ঘাসের উপর—তখন সে আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। তার যেন মনে হয়েছিল আজকে মেয়েটি আবার আসবে।

মেয়েটি এসেছিল। মেয়েটি সেই গাছটার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গান করছিল। শমিতা গানের কথাগুলো শুনেছিল। গানটার সুর ছিল ঐ পরিবেশের মতোই কোমল, মায়া মাখানো, ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভেঙে হারিয়ে যাওয়া। মেয়েটি গাইছিল

'None treads the weary tread
And all the roses are gone.
And the love, once dead
None comes to wake at dawn!'

মেয়েটি তাকে দেখেনি। গানটা শুনতে শুনতে শমিতার মনটা একটা অজানা দুঃখে ভারী হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি তার পরে দীর্ঘ-শ্বাসের মতোই অস্ফুটে বলেছিল

—আর নয়, আর কোনদিন নয়।

শমিতা দেখেছিল মেয়েটির চোখে জল। মেয়েটি তখন গভীর ভালবাসার সঙ্গে গাছটার গায়ে হাত বুলিয়েছিল। গাছটার গায়ে গাল রেখে দাঁড়িয়েছিল। তারপরও সেই কুকুরটা ডেকেছিল।

মেয়েটি আজ হঠাৎ চলে যায়নি। দীর্ঘ-নিশ্বাসটা বাতাসে মিলিয়ে দিয়ে সে আস্তে আস্তে গাছের আলোছায়ায় হারিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে শমিতার ঘুম আসেনি। সেদিন রাতে বাতাস তার কানে টুকরো টুকরো গানের সুর ভাসিয়ে এনেছিল। সে কথা বোঝেনি। তবে সুরটা বুঝেছিল। বুঝেছিল মেয়েটি গাইছে

— And all the roses are gone
And all the roses are gone !

শমিতা সেদিনও অরুণকে কিছু বলেনি। তার মনে হয়েছিল খুব আশ্চর্য বিস্ময়কর একটা অভিজ্ঞতার জগতে সে ছাড়পত্র পেয়েছে। মনে হয়েছিল এই অভিজ্ঞতাটা তারই থাকুক।

অরুণ যে কয়দিন বাড়ীতে ছিল, সে কয়দিন শমিতা বাগানে যায় নি। সে যেন জেনেছিল, বুঝেছিল, অরুণ থাকলে সেই মেয়েটি আসবে না। সে আরো কিছু বুঝেছিল, আর তার সে বোঝাটা সত্যি নাকি, তা জানবার জন্যেও তার আগ্রহ হয়েছিল। এদিকে অরুণের উপর অর্ডার পৌঁছে গিয়েছিল। বাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে। গভর্ণমেণ্ট এখানে বোরস্টাল স্কুলের নতুন বাড়ী করবেন। এই বাড়ীটা এই শহরের অন্যান্য কুঠিগুলোর মতোই ভেঙে ফেলা হবে।

মেয়েটি সব কথাই জেনেছিল। কে তাকে জানাল? শমিতার মনেও একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল।

মেয়েটি সেদিন অরুণ নেই জেনেই বোধ হয়—শমিতার বাগানে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল

—এই বাগানে একদিন কত সময় কাটিয়েছি। কত সন্ধ্যা, কত রাত!

শমিতা বলেছিল

স্কেচ : সুধেন্দু গাঙ্গুলী

—এখন কেন আসেন না?

মেয়েটি হেসেছিল। সে হাসি বুঝি বোবা এক কান্নারই আর এক ভাষা। সে য়ুক্যালিপ-টাসের শুকনো পাতা হাতে নিয়ে নাকের কাছে ধরছিল। তার পর, শমিতার দিকে চেয়ে, অথচ নিজেকে আর এই বাংলোটাকে শুনিয়ে বলে উঠেছিল

—জন লারনার নেই, পামেলা একা এ বাগানে এসে কি করবে?

জন লারনার কোথায়?

মেয়েটি ঈষৎ হেসে গুন গুন করে বলেছিল Laid in rest laid in sleep. শাদা মার্বেলে শাদা গোলাপের বাওয়ার আমি তার উপরে রেখেছিলাম। কিন্তু সে গোলাপগুলোও ভেঙে গিয়েছে।

তার পরে কুকুরটা ডেকেছিল। পামেলা চলে যেতে যেতে ফিরে চেয়েছিল। বলেছিল

—আর আসব না। আর কোনদিন নয়।

মেয়েটি চলে যেতে যেতে সেদিনও গান গেয়েছিল। আর শমিতা সেদিন ভয় পেয়েছিল। ছুটে চলে এসেছিল বাড়ী। পরে অরুণকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল

—অগাস্টি সাহেবের কুঠিটা কোথায়?

অরুণ হেসে বলেছিল

—তুমি যদি লিখতে জানতে শমিতা তবে সুন্দর একটা গল্প লিখতে পারতে। থিওডোর অগাস্টাসের স্ত্রী পামেলা, আর জন লারনারের প্রেমের কথা আমাকে কলেজের প্রিন্সিপাল শুনিয়েছিলেন। জন লারনারের সঙ্গে অগাস্টাস পামেলাকে মিশতে দেয়নি। লোকে বলে জন সেই দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। প্রিন্সিপাল বলেন, সে সব গল্পকথা। কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

—অগাস্টি সাহেবের কুঠিটা কোথায়?

অরুণ শমিতাকে দেখিয়েছিল। অগাস্টি সাহেবের কুঠি বলে আজ আর কিছু নেই। ঐ কাউগাছের বেড়াটাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। একটা নামহীন কবরকে পাশে রেখে বহরমপুরে কৃষ্ণনগর হাইওয়ে সোজা বেরিয়ে গিয়েছে।

তবু শমিতা দুই বাড়ীর মাঝখানে ভাঙা পথের চিহ্ন দেখেছিল। সে জেনেছিল, শাদা গোলাপের ঝাড় তা হলে এখানেই ছিল কোথাও।

চলে আসবার আগে কোম্পানীর আমলের সে পুরনো কবরখানায় সে জন লারনারকে খুঁজতে গিয়েছিল।

পুরনো দিনের কবর হিসাবে সমাধিটা কিন্তু ভালই ছিল। ভেঙে যায়নি। মার্বেলের সে গোলাপের বাওয়ার অবশ্য ছিল না। কিন্তু মস্ত একটা ক্রুশের নিচে শুধু And all the.... হরফগুলো পড়া যাচ্ছিল।

শমিতা বলেছিল—

And all the roses are gone.

অরুণ বলেছিল—কি করে জানলে?

শমিতা বলেনি। তবে ফিরে আসবার সময়ে সে অরুণের হাতটা নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়েছিল। বলেছিল

—জন লারনার আর পামেলা অগাস্টাস দুজনে দুজনকে ভালবাসতো, তাই ঐ বাড়ীটায় এমন একটা আপন করে নেওয়া ভাব তাই নয়?

অসুস্থ স্ত্রীর হাজারটা এলোমেলো কথা শুনে অভ্যস্ত অরুণ সস্নেহে শমিতার হাতটায় একটু চাপ দিয়েছিল। শমিতা বলেছিল

—গানটায় আরো কথা আছে, সুন্দর, সুন্দর! আমি কিন্তু মনে করতে পারি না। আমার মনে নেই।

—সুর?

—কি সুর?

—বা, তোমার কথামতো গান যদি হয়, তার সুর থাকবে না একটা?

—সুর আছে, সুর আছে, সুর ছিল।

শমিতা গুন গুন করে বলেছিল।

খট-খট—খট, চুপ। আবার খট-খট-খট, চুপ। আবার, খট-খট-খট, চুপ।

বিভূতি টাইপ করিতেছে। যদি কেহ বিভূতির পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার টাইপ করা কাগজের দিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তাহাতে লেখা হইয়াছে, ক ক ক, ফাঁক পপপ, ফাঁক। ম ম ম, ফাঁক ইত্যাদি।

এর মানে কি?

মানে বলিতেছি। একটি প্রকাণ্ড অফিস। তাহার মধ্যে একটা বিরাট হল ঘর। তাহার সমস্ত মেঝেটাতেই ছোট ছোট খোপ বা কুঠরি বসান। কতকগুলি খোপ কাঠের তৈরি, চমৎকার প্যানেল করা দেওয়াল এবং চকচকে পালিশ। কতকগুলি খোপ তৈরি রং করা ক্যানভাস দিয়া। আবার কতকগুলি আছে শুধু ক্যানভাস আর কাঠের ফ্রেমে তৈরি। অফিসের কর্মী ও কর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুসারে এই সকল খোপ তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। সারি সারি খোপের পাশ দিয়া লম্বা লম্বা গলি। সেখান দিয়া যাতায়াত করে কর্মীরা, আর ফাইলের বোঝা লইয়া বেয়ারারা। প্রত্যেক খোপের উপরে ঘোরে বৈদ্যুতিক পাখা।

একটি রংকরা ক্যানভাসের খোপে বসে বিভূতি, রমেশ আর যদু। বিভূতি একটু দেরি করিয়া অফিসে আসে একটু দেরি করিয়াই অফিস হইতে বাহির হয়। রমেশ ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘরে ঢোকে আবার পাঁচটা বাজিতেই টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। কোন-দিন এর ব্যতিক্রম হয় না। যদুর আসা আর যাওয়া দুইই অনিশ্চিত। কখনো পনর মিনিট আগে বসিয়া থাকে আর পান চিবায়, আবার কোনদিন আধ ঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকিয়া বলে, উঃ. অফিস করা আর যেন পোষায় না! তারপর ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে থাকে। অফিসের ছুটি হইবার অন্তত দশ মিনিট আগে সে বাহির হইবে। কারো কথা শুনিবে না। ইহার কারণ সম্বন্ধে বিভূতি আর রমেশের মধ্যে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

এই খোপের পাশেই আর একটি এমনি রংকরা ক্যানভাসের খোপ। মাঝে ক্যানভাসের দেওয়াল বা পার্টিশন। এই খোপে বসে বিভা-বতী, রমা আর মাধবী। মাধবী বিবাহিতা সুতরাং অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। সময়মত আসে যায়, নিয়মমত কাজ করে। পাঁচটার পর এক মিনিটও সে থাকে না। রমা চঞ্চল, মুখর, নিয়মের ধার ধারে না। যখন ইচ্ছা আসে, যখন ইচ্ছা যায়। উপরের কেহ সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে ভ্রূ নাচাইয়া বক বক করিয়া নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়। তাহার যুক্তির মধ্যে যুক্তি না থাকিলেও, অফিসারেরা তাহার সম্মুখে যেন অনেকটা নির্বাক হইয়া যান।

বিভাবতী শান্ত, কর্তব্যনিষ্ঠ, অল্পভাষী। আশেপাশের সকলে তাহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বিভাবতী যেমন রমা আর মাধবীর হাস্য-রসিকতায় যোগ দেয়, তেমনি এক এক সময় উহাদিগকে শাসনও করে। এই ঘরের টেবিল, চেয়ার, শেলফ প্রভৃতি ইহারাই নিজের ইচ্ছামত গুছাইয়া ও সাজাইয়া লইয়াছে। বিভাবতীর চেয়ারের ঠিক পিছনেই ক্যানভাসের পার্টিশনের ওপাশে বিভূতির টাইপ রাইটারের টেবিল আর বিভূতির চেয়ার। বিভূতি যখন টাইপ করে তখন, যদি মাঝখানে ক্যানভাস না থাকিত, তাহা হইলে হয়তো বিভূতির ডান হাতের কনুই বিভাবতীর পিঠে ঠেকিয়া যাইত।

অফিসের কাজকর্ম নিয়মিত চলে। কোন গোলযোগের ঝড় বহে নাই এই অফিসে। অফিসের উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর কর্মীরাই মোটা-মুটি শৃঙ্খলাপ্রিয়। মেয়েদের আর ছেলেদের মধ্যে হয়তো কারো কারো সঙ্গে কখনো সখনো একটু আধটু হাস্যরসিকতা হয়, তবে কোন গুরুতর মনান্তরের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। এই অফিসের শুষ্ক আকাশে, পার্টিশন ঘেরা শুষ্ক বাতাসে, আরশোলা-টিকটিকির আনাগোনার মধ্যে কখন যে একটা ফুলশর বিভূতি আর বিভাবতীর মাঝখানকার পার্টিশন ভেদ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা অফিসের কেহই জানিতে পারে নাই। উহাদের ঘরের বন্ধুরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা করিলেও কেহই উহাদের মধ্যে অশোভন আচরণের কোন লক্ষণ দেখিতে পায় নাই।

সেদিন পাঁচটা বাজিয়া গেল। অফিসের কর্মীরা একে একে বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। যদু বলিল: চললুম ভাই। তোমার ত এখন বসে টাইপ করা। কি যে লাভ হচ্ছে এই পাঁচটার পর খেটে খেটে!

রমেশ বলিল, আমার ভাই অত উৎসাহ নেই। অফিসের পরেও বসে কাজ করব, সে আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া রোজকার দরকারী কাজ ফেলে না রাখলেই হ'ল। কি বল, যদু?

তা বৈ কি। তা বৈ কি।

যদু আর রমেশ খোপ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এমনি ধরণের মন্তব্য করিয়া রমা আর মাধবী পাশের খোপে ব্যাগ আর বেঁটে-ছাতা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমা বলিল, চললুম ভাই, বিভা। আমার আর অফিসে বসে থাকবার ধৈর্য নেই। বিভাবতী বলিল, আমিও একটু পরেই উঠছি। এই ন'নম্বর ফাইলটা একটু ঠিক ক'রে রেখে যাই। কাল সকালে দশটায়ই হয়ত তলব পড়বে।

রমা আর মাধবী বাহির হইয়া গেল।

বিভূতির টাইপ-রাইটারে শব্দ হইল, খট-খট-খট, চুপ। খট-খট-খট চুপ।

বিভাবতীর কানে শুনাইল, আমি এখনও অফিসে আছি।

বিভূতির টাইপ রাইটারের ডানদিকে একটু নীচের দিকে বিভাবতীর জুতার গোড়ালির চাপে পার্টিশনের ক্যানভাসটা একটু ফুলিয়া উঠিল। বিভূতি চোখে দেখিল ক্যানভাসের একটা যায়গা একটু ফুলিয়া উঠিয়াছে, মনে মনে কানে শুনিল যেন বিভাবতী বলিতেছে, আমিও এখনও আছি।

আরো কিছুক্ষণ পরে, টাইপ রাইটারে শব্দ হইল, খট চুপ। খট চুপ। খট চুপ। বিভাবতী বুঝিল, আমি এখন বেরুচ্ছি।

বিভূতি দেখিল, পার্টিশনের গায়ে পর পর দুইবার ক্যানভাস একটু ফুলিয়া উঠিল। মানে, বিভাবতী নীরবে বলিতেছে, আমিও বেরুচ্ছি।

(২)

সেদিন শনিবার। শেষ শীতের বিকাল। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস। অফিসের ছুটি হইয়াছে। এই মাত্র বিভাবতী আর বিভূতির ঘরের অন্য কর্মীরা বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহারা জানে বিভূতি আর বিভাবতী একটু দেরী করিয়াই অফিস হইতে বাহির হয়।

বিভাবতীর চেয়ারের পিছনে টাইপরাইটারে শব্দ হইল, খট—চুপ, খট—চুপ, খট—চুপ।

বিভূতি দেখিল, তাহার ডানদিকে পার্টিশনের ক্যানভাস পর পর দুইবার একটু ফুলিয়া উঠিল।

বিভূতি ও বিভাবতী অফিস হইতে বাহির হইল। বিভাবতী একটু আগে, বিভূতি একটু পরে। দুজনে দুইটি বিভিন্ন স্টপে দুইটি বিভিন্ন বাসে উঠিল। একটু আগে পরে তাহারা নামিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। একটু পরে দেখা গেল, বিভূতি আর বিভাবতী দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠে, রাস্তা হইতে অল্প একটু দূরে।

তখনও রাস্তায় গাড়ীর ভিড় জমে নাই। ক্রমে ক্রমে এক একখানি গাড়ী আসিয়া থামিতেছে। যাত্রীরা কেহ গেটের ভিতর দিয়া ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরের বাগানে ঢুকিতেছে, কেহ বাহিরের মাঠের মধ্যে গিয়া বসিতেছে বা পায়চারি করিতেছে। চীনা বাদামওয়ালা, লেমনেড-জিঞ্জারেডওয়ালা, আইসক্রীমওয়ালা, পান, বিড়িওয়ালা, ফুচকা, দইবড়াওয়ালা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দোকানিরা তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য উদগ্রীব হইয়াছে। গাড়ী হইতে কোন শিশুকে নামিতে দেখিলেই বেলুনওয়ালা তাহার কাছে গিয়া বেলুন দেখাইতেছে।

বিভূতি আর বিভাবতী খানিকক্ষণ বসিয়া চারিদিকের দৃশ্য চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বিভূতি বলিল, এ জায়গাটা বেশ, না?

বিভাবতী বলিল, হ্যাঁ। এখানটা আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।

বিভূতি বলিল, হ্যাঁ। আমারও খুব ভাল লাগে, যদি আপনি সঙ্গে থাকেন।

বিভাবতী সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, আমি না থাকলেও আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে।

বিভূতি বলিল, সত্যি বলছি আপনার সঙ্গে এখানে এসে আমার মন কেমন হাল্কা হয়ে যায়। অফিসের কথা, অন্য সব কথা ভুল হয়ে যায়। ঐ দেখুন, একখানা এরোপ্লেন কত নীচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—কি সুন্দর দেখতে, না?

কেন, এরোপ্লেন কি আগে দেখেননি?

কেন দেখব না। প্রায়ই তো দেখি। কিন্তু আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেখতে খুব ভাল লাগে।

আপনি এক এক সময়ে বড় ছেলে মানুষের মত কথা বলেন।

হ্যাঁ। তা হবে। বোধ হয় আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে।

বিভাবতী ডাকিল, এই ডালমুট—

ডালমুট-ওয়ালা আসিল। দুই প্যাকেট ডালমুট কিনিয়া বিভাবতী একটি প্যাকেট বিভূতিকে দিয়া বলিল, এই নিন, খান। অফিসের পর একবার ক্যাণ্টিনে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনি যা খট-চুপ আরম্ভ করলেন, তাতে আর সময় পেলুম না।

ডালমুট খাইতে খাইতে বিভূতি বলিল, এই ফুচকা—

ফুচকা-ওয়ালা আসিল। কতকগুলি ফুচকা কিনিয়া দুজনেই খাইতে আরম্ভ করিল। বিভূতি বলিল, ডালমুটটা পরে খাওয়া যাবেখন।

ফুচকা শেষ হইল, আবার ডালমুট আরম্ভ হইল।

বিভাবতী বলিল, আচ্ছা, আপনি আমার আগে আর কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছেন—এমনি একা একা?

না। আমার যে পাড়ায় বাস, আর আমাদের বাড়ীর যে সংস্কার, তাতে ধাড়ী ধাড়ী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার কোন সুযোগ হয় নি।

আপনি আমাকে ধাড়ী বলছেন?

না, না, মানে, একটু বয়স্ক আর কি। আচ্ছা, আপনি আমার আগে আর কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এই রকম একা একা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে এসেছেন?

এখানে আসিনি, তবে আরো দু-তিন জনের সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ হয়েছিল। এই অফিসেই আলাপ হয়েছিল। তারা অফিস ছেড়ে চলে গেছে। আমিও বেঁচেছি।

কেন?

তাঁদের আমার ভাল লাগত না।

আমাকে আপনার ভাল লাগে বুঝি?

যান!

বিভূতি ও বিভাবতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রইল। বিভাবতী বলিল, কতকগুলো ডালমুট চিবিয়ে গলাটা শুকিয়ে গেল।

বিভূতি হাঁকিল, এই আইসক্রীম—

আইসক্রীমওয়ালা আসিল। দুজনে দুইটি আইসক্রীমের প্লাস হাতে লইয়া ঢাকনি খুলিয়া ছোট কাঠের চামচে দিয়া আইসক্রীম খাইতে লাগিল। আইসক্রীম খাইতে খাইতে বিভূতি বলিল, আচ্ছা, আপনার এ অফিসের কাজ ভাল লাগছে?

ভাল লাগালাগি আর কি? করতে হয় তাই করছি। আমার মত এই রকম কত মেয়ে যে ঘর-সংসার থেকে বেরিয়ে এই রকম চাকরির জাঁতার মধ্যে ঢুকেছে, তার কি ঠিক আছে? আমাদের এই অফিসেই আছে ত্রিশ-চল্লিশ জন। কেউ কি আর সখ করে ঢুকেছে?

পশ্চিমের দেশগুলোতে অনেক দিন আগে থেকেই মেয়েরা সব রকম কাজ করছে।

আর গোল্লায় যাচ্ছে। ওদেশের পণ্ডিতেরাই তো বলেন।

তা যাই বলুন, বর্তমান যুগে মেয়েদের কেবল হেঁসেলে পুরে রাখা কি চলে?

তবে চললে বোধ হয় ভাল হত।

নিশ্চয়ই না। আপনি ভারি সেকেলে। যাক্‌গে। একটা সিনেমায় যাবেন?

বিভাবতী বলিল, সেকেলে মেয়েরা বুঝি এমনি সবার সঙ্গে একা একা সিনেমায় যায়? আচ্ছা, ও তর্ক থাক। আজ শনিবার। টিকিট পাবেন না।

যে কোন একটা পুরোনো টুরোনো—

[illegible]

নেই। একটু সময় কাটানো আর অন্যমনস্ক হওয়া বই ত নয়!

রাস্তার ধারে গাড়ীর ভিড় জমিয়াছে। মাঠের মধ্যে লোকসমাগমও অনেক বাড়িয়াছে। আইসক্রীম ইত্যাদি ওয়ালাদের দল আরও পরিপুষ্ট হইয়াছে। বিভূতি ও বিভাবতী ধীরে ধীরে ট্রাম-রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সমস্ত দিন দোলের হুল্লোড় গিয়াছে। বিভাবতী ইহাতে যোগ দেয় নাই। কোন মতে পাশ কাটাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। সন্ধ্যা নামে নামে। আকাশে বাতাসে তখনও যেন রং ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজ অফিস ছিল না। বিভূতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই তবে উহাদের মধ্যে ঠিক করা আছে, কোন ছুটির দিন হইলে তাহারা কখন কোথায় পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আজ তাহাদের সাক্ষাৎ হইল কার্জন পার্কের পশ্চিমাংশের যেখানটা এখনও একটু সবুজ রহিয়াছে। চারিদিকে ট্রাম-বাসের ঘড়ঘড়ানি, তবু এই দিনে এই সময়টায় বেশ একটু ভালই লাগিতেছে। তাহারা ঘাসের উপরেই বসিয়া পড়িয়াছে। একটু ঝির ঝিরে বাতাস তাহাদের সর্বাঙ্গে যেন হাত বুলাইতেছে। কবিরা যাহাকে বলেন মলয় হাওয়া, তাহারই এক ঝামটা যেন তাহাদের গায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। একটু পরেই পূর্বের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়বার্তা লইয়া যেন বিদ্যুতের আলোগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছে কেমন করিয়া চাঁদটাকে জব্দ করা যায়। এমনিদিনে এমনি ক্ষণেই বুঝি কবি গাহিয়াছিলেন, এমনদিনে তারে বলা যায়।

বিভূতি ও বিভাবতী এই পুলকিত সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসিয়া যেন একটু গম্ভীরভাবেই চিন্তা করিতেছিল, কেমন করিয়া আরম্ভ করা যায়। ফলে কাহারও মুখ দিয়াই কথা বাহির হইতেছে না। শুধু এক একবার পরস্পরের দিকে চাহিয়াই আবার অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপ কাটিবার পর বিভূতি প্রথম কথা বলিল। সে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলব বলে সকাল থেকেই ভাবছি। কিন্তু কেমন করে বলব, বুঝতে পারছিলুম না। অনেক চিন্তা করে ভাবলুম, একটু লিখে নিয়ে যাই। সেটা ওঁকে পড়তে দেব, তাহলেই হবে। লেখাটুকু নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।

বিভাবতী লজ্জায় লাল হইয়া গেল। ভাবিল, ঠিক আজই চিঠি? একদিন আগেও না, একদিন পরেও না! থাক্, ভালই হ'ল।

বিভাবতী ধীরে ধীরে বলিল, আজ আপনার সঙ্গে আমারও একটা বড় দরকারী কথা ছিল। কেমন করে বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই একটু কাগজে লিখে এনেছি।

বিভূতি বলিল, কই দেখি?

বিভাবতী বলিল, আপনার চিঠিটা আগে আমাকে দিন।

বিভূতি বলিল, আমারটাই আগে?

বিভাবতী বলিল, হ্যাঁ।

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

ভূত-ভবিষ্যৎ

—রহস্য গল্প—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বনমানুষের থাবার মত প্রকাণ্ড একখানা লোমশ হাত পিছন থেকে আমার কাঁধের উপর এসে পড়ল।

কালবৈশাখীর মেঘ মাথায় করে পথ চলতে শুরু করেছিলাম। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক সন্ধ্যার আগে বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছানো চাই-ই নইলে রাতের অন্ধকারে বিদেশ বিভুঁই-এ বিষম বিপদে পড়তে হবে। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিমদিকে আড়াই মাইল পথ—প্রায় সবটাই তৃণপাদপহীন বালুপ্রান্তর—তারপর মিলবে কঙ্কালীতলার খেয়াঘাট, তার ওপারেই বেতুল গ্রাম, যেখানে বন্ধুর বিয়ের বৌভাতে আমি উপস্থিত না থাকলে নাকি সমস্ত আয়োজন পণ্ড হবে।.........

পথের চিহ্ন বড় একটা কিছুই নেই, শুধু বালি আর বালি। প্রায় অর্ধেকটা পথ এসেছি। ঝড় ঠিক ওঠেনি, তবে জোর হাওয়া দিচ্ছে—বালুকণার ঝাঁক শন্-শন্ করে উড়ে এসে গায়ে মুখে আছড়ে পড়ছে, আর তারই মধ্য দিয়ে মুখর হাওয়ার তুফান ঠেলে এগুতে হচ্ছে। কষ্ট একটু হচ্ছে বই কি। তবে বয়স অল্প, শরীরে শক্তি আছে, এটুকু কষ্টকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার মত স্ফূর্তিও আছে মনে। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে যেন একটা নতুন ধরণের অ্যাডভেঞ্চার বলেও মনে হচ্ছে। বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পথ চলছি।

এমন সময় বাজ পড়ল—ঠিক সামনে, বিশ-ত্রিশ গজের মধ্যেই।

তীব্রজ্বালা নীল বহ্নির একটা আঁকা-বাঁকা রেখা সাপের মত আকাশ থেকে নেমে পৃথিবীকে মুহূর্তের জন্যে একবার লেহন করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল যেন কে একটা ভারী লোহার হাতুড়ির একটি মাত্র আঘাতে আকাশ-জোড়া পুরু কাচের ছাউনি চড়াৎ করে ফাটিয়ে দিল। তারপর সেই হাতুড়ি নেমে এসে পড়ল আমার মগজের মধ্যে। হাড়ের কাঠামো থেকে স্নায়ু-তন্তু পর্যন্ত নির্মম আঘাতে ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠল।

সমস্ত শরীর ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে! ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেছে। এখুনি বোধহয় আছাড় খেয়ে পড়ে যাব।

ঠিক এমনি সময়ে পিছন থেকে হাতখানা এসে কাঁধের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গম্‌গমে গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'ভয় পেয়ো না—শান্ত হও! এই তো আমি তোমার কাছেই আছি—ভয় কি?'

পর মুহূর্তেই বক্তা আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। চোখের সামনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও যেন কাঁপছে। বালু-প্রান্তর ঝড়ের সমুদ্রের মত ফুলে ফুলে ফেঁপে উঠছে, উপরের আকাশ দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টা-লাগা চাঁদোয়ার মত ঢেউ দুলিয়ে নেমে আসতে চাইছে—আর এই দুই-এর মাঝখানে নানা রঙের মাকড়শার জালের মত অসংখ্য আলোর রেখা বাতাসের গায়ে হিজিবিজি লেখার আঁচড় কাটতে কাটতে বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।

তারই ভিতর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম ঝাড়া ছ-ফুট লম্বা চেহারা, কালো কুচ্‌কুচে রঙ্, মাথায় একমাথা কাঁচা-পাকা চুলের জট পাকানো জঙ্গল, পরনে টক্‌টকে লাল রঙের কাপড়, কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় তিন ফের্তা করে জড়ানো মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে প্রকাণ্ড একটা কাঠের কমণ্ডলু, চোখে ধারাল ছুরির ফলার মত ঝক্‌ঝকে প্রখর দৃষ্টি, মুখে অমায়িক হাসি—

আবার সেই গম্‌গমে গলার নির্দেশ শুনতে পেলাম, 'বসো, এইখানে একটু বসে জিরিয়ে নিয়ে সুস্থ হও—বহু দূর থেকে আসছ, একটু বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার।'

একে তো এই বিকট মূর্তির অপ্রত্যাশিত

গিয়েছিলাম, তার উপর আবার এই ধরণের কথা!—আমি কতদূর থেকে আসছি তা ও জানল কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের ভিতরকার অকথিত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলামঃ 'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।—ওঃ! কতকাল ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

বলে কি লোকটা! পাগল নাকি? হ্যাঁ, নিশ্চয় পাগল, নইলে—

কিন্তু বসতে হল। সর্বশরীর টলছে, শারীরিক গ্লানির সঙ্গে মানসিক বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতা মিলে আমাকে যেন একান্ত অসহায় করে ফেলেছে। সত্যই একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার।.........

লোকটা আমার সামনে বসে কমণ্ডলু থেকে জল ঢেলে পরম যত্নে আমার মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিচ্ছে। মাথা হেঁট করে বসে আছি, ঠিক চোখের সামনে ওর গলার লম্বা রুদ্রাক্ষের মালাটা হাঁটু-ঢাকা লাল কাপড়ের উপর সাপের মত আঁকা-বাঁকা হয়ে লুটিয়ে পড়ে অছে। রুদ্রাক্ষের দানার ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা গোটা গোটা কি সব গাঁথা রয়েছে। কি ওগুলো? হাড়—হাড়ের গাঁঠ। সদ্য-শেখা অ্যানাটমির জ্ঞান থেকে যেটুকু বুঝি—মানুষের হাড় বলেই মনে হয়।

মনে মনে শিউরে উঠলাম। এ কি বিভীষিকার সামনে এসে পড়লাম হঠাৎ!

দেহটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'এখন আমি বেশ সুস্থবোধ করছি, এইবার আমি যাব—এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে—'

লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে মিট্‌মিট করে হাসছে। আমার কথা শুনে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে তুমি? কোথায় যেতে চাও?'

'কঙ্কালীতলার খেয়াঘাট পেরিয়ে বেতুল গ্রামে যাব আমি। ওখানে আমার এক বন্ধুর

বৌভাতের নিমন্ত্রণ কাল, অথচ তুমি চলেছ আজ—কোত্থেকে আসছ?'

'আজ্ঞে কলকাতা থেকে।'

'কলকাতা?'—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভুরু দুটো বাঁকিয়ে কোঁচকানো কপালের দিকে ঠেলে তুলে জিজ্ঞাসা করল লোকটা, 'কলকাতা? সে আবার কোথায়?—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। কলকাতা—কালিকাতা— মহাতীর্থ কালীঘাট, গিয়েছিলাম একবার মাকে দেখতে সেখানে, তারই কাছে একটা জঙ্গলে গ্রাম, যত রাজ্যের সাপ আর বাঘ আর ঠ্যাঙ্গারের আস্তানা। আজকাল শুনেছি কতকগুলো ম্লেচ্ছ বণিক নাকি সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে।—তা তোমার নিবাস কি ঐ কলকাতাতেই?'

লোকটার কথা শুনতে শুনতে আমার ততক্ষণে প্রায় চোখ কপালে উঠবার উপক্রম হয়েছে। পাগল তো বটেই, কিন্তু কোন পাগল যে প্রাচীন ইতিহাসে এমন পোক্ত হতে পারে তা তো কখনও জানতাম না!

উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে না, আমার দেশ বর্ধমানের ওদিকে, কলকাতায় থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়ি। আমার বেতুলের বন্ধুটিও সেইখানে পড়ে।'

'কি? কি পড়—কোথায় পড় বললে?'

নেহাৎই গেঁয়ো লোক, নিরক্ষর,—মেডিক্যাল কলেজের নাম হয়তো নাও শুনতে পারে। তাই বুঝিয়ে বললাম, 'আমরা ওখানে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ি—আরও অনেক ছেলে পড়ে।'

বিস্মিত কণ্ঠে লোকটা বলে উঠল, বল কি? কলকাতার মত ভূঁড়ো গাঁয়ের কোন বদ্যি, তার খ্যাতি কিনা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে! বর্ধমানের মত এত দূর দূর দেশ থেকে ছাত্র আসছে তার সাগরেদি করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিখতে!'

এর আর কি জবাব দেব? চুপ করেই রইলাম। সবে দু বছর ডাক্তারী পড়ছি, পাগলের পাগলামি সারানোর বিদ্যা এখনও আয়ত্ত করে উঠতে পারিনি তো!

হঠাৎ লোকটা আমার গায়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গায়ে ওটা কি? পিরহানের মত দেখতে অথচ পিরহান নয়—ও রকম বিদঘুটে পোষাক কেন পরেছ?'

শরীরের গ্লানি তখনও পুরো কাটেনি, মনের মধ্যে একটু ভয়-ভয়ও করছে, তবু কথাটা শুনে বেশ একটু রাগ হল। আমার এত সখের সিল্কের শার্ট—তাকে বলে কিনা 'পিরহান', 'বিদঘুটে পোষাক'!

ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করেন বলে কি একটা শার্টও কখনও চোখে দেখেননি? এটা পিরহান নয়, শার্ট।'

'শার্ট—!' অদ্ভুতভাবে ওড়িয়াদের মত স্বরান্ত উচ্চারণ করল কথাটার—'একেই বুঝি শার্ট বলে? না—চোখে দেখিনি এর আগে কখনও, তবে হ্যাঁ, বই-এ পড়েছি কথাটা—'লম্ব শাট পটাবৃতঃ!' আমাদের এদিকে তো কেউ পরে না ও জিনিষ!'

বই-এ পড়েছে!—তাহলে তো লোকটা—! নাঃ, গেঁয়ো নিরক্ষর [illegible] কিছু নয়—কঙ্কালসার চেহারা—যদি হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে বিপদে পড়তে হবে। যেমন করেই হোক এর হাত এড়িয়ে পালাতেই হবে আমাকে।

একটু অনুনয়ের সুরেই বললাম, 'কিন্তু দেখুন, আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে—আরও অন্ততঃ পক্ষে এক মাইল পথ হাঁটলে তবে খেয়াঘাটে পৌঁছুতে পারব—'

'কি বললে? আরও কতটা পথ হাঁটলে?'

বুঝলাম 'শার্টের' মত 'মাইল' শব্দটাও লোকটা শোনেনি কখনও জীবনে। কিন্তু এই সব অতি সাধারণ ইংরোজী শব্দ জানে না এমন লোক যে আজকাল বাংলাদেশে কোথাও কেউ আছে তা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

বললাম, 'কম করেও আধ ক্রোশ পথ।'

হা-হা করে হেসে উঠল লোকটা। বলল, 'কি বকছ তুমি পাগলের মত? ভাল করে সামনের দিকে চেয়ে দেখ তো। ঐ তো ভাগীরথী—আর ঐ তো তার ধারে বনের মধ্যে কঙ্কালী মাতার মন্দির।'

তাই তো? একি হল!—ঐ তো সামনে—এক পো পথও হবে না হয়তো—নদীর ধারা বয়ে যাচ্ছে। ঐ তো ভাগীরথী, যা পার হলেই আমি বেতুল গ্রামে পৌঁছুতে পারব। তবে কি চলতে চলতে এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম যে যতটা ভেবেছি তার প্রায় ডবল পথ চলে এসেছি এর মধ্যে, কি জানি, তাই হয়তো হবে। —নদীর ধারে একটু বাঁদিকে একটা ছোট জঙ্গল, তার মধ্যে ভাঙ্গাচোরা মন্দিরের মতও কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

লোকটা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে—মুখে একটা অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত সস্নেহ হাসির আভাস। পাগলের মরজি—কি ভেবেছে কে জানে, কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন তার কতদিনকার হারানো রতন—কতকাল পরে ফিরে পেয়েছে।

বিপদ তো সেইখানেই। হারানো রতন ফিরে পেয়েছে—এখন যদি আর ছেড়ে দিতে না চায়।

যেন কতকটা নিজের মনেই বলে উঠল, লোকটা 'কঙ্কালীতলা অবশ্য এই জায়গাটাকেই বলে কিন্তু—এখানে তো কোন খেয়াঘাট নেই। নদী তুমি পেরুবে কি করে?'

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, 'কি বলছেন আপনি? নিশ্চয় আছে খেয়াঘাট এখানে। নির্মল আমাকে বার বার পথের কথা বুঝিয়ে বলেছে—কঙ্কালীতলার খেয়াঘাটের ঠিক ওপারেই তাদের গ্রাম। হয়তো পথ ভুলে একটু এদিকে-ওদিকে এসে পড়েছি, খুঁজলেই সন্ধান পাব—একটা জলজ্যান্ত খেয়াঘাট তো আর হারিয়ে যেতে পারে না।........নিন, এইবার সরুন আপনি আমার সামনে থেকে. অনেক দেরি হয়ে গেছে—আমাকে আমার গন্তব্যস্থানে যেতে দিন। বিপদের সময় আমাকে সাহায্য করেছেন, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাব, এমন সময় লোকটা খপ করে বজ্রমুষ্টিতে আমার বাঁ হাতের কব্জি ধরে ফেলল। মনে হল যেন বরফে ডোবানো কনকনে ঠাণ্ডা পাঁচ জোড়া লোহার [illegible] ধরেছে—আর একটু জোরে চাপ দিলে মড়মড় করে হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

চাপা হুঙ্কারের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল: 'চুপ করে বস এইখানে, মূর্খ বালক চাঞ্চল্য পরিহার কর।—আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাও।'

তারপর উচ্চারিত হল আশ্বাস বাণী—অত্যন্ত মৃদুস্বরে, কিন্তু অদ্ভুত একটা দৃঢ়তার সঙ্গে: 'কোন ভয় নেই তোমার মাতা কঙ্কালীর নামে শপথ করছি—তোমার গন্তব্যস্থানে আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

হয়তো আশ্বস্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে লোকটার কথা শুনে বুকের ভিতরটা গুর গুর করে কেঁপে উঠল। এতক্ষণ যা ছিল ঈষৎ কৌতূহল ও তাচ্ছিল্য মিশ্রিত সামান্য একটু ভীতি মাত্র, এইবার তা নিদারুণ আতঙ্কের রূপ ধরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে।

মন্ত্রচালিতের মত মাথা তুলে লোকটার চোখের দিকে চাইলাম। উঃ, কি মর্মভেদী দৃষ্টি! হাড়-পাঁজরা ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যেন সমস্ত অন্তরাত্মা হিম করে তুলছে। তাছাড়া মনে হচ্ছে যেন লোকটার দুই চোখের মধ্যে দুটো প্রচণ্ড শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি দপ্‌দপ্‌ করে ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে—জ্বলছে আর নিভছে—

মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, সমস্ত শরীর কেমন যেন এলিয়ে অবশ হয়ে আসছে।

ততক্ষণে লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে.—আর ধরে রাখার প্রয়োজনও নেই। ঐ দৃষ্টির অদৃশ্য বাঁধন ছিঁড়ে আমার আর এক পাও নড়বার উপায় নেই। ক্ষুধার্ত অজগরের সামনে দাঁড়িয়ে হরিণ শিশুর বোধহয় এমনি অসহায় অবস্থাই হয়ে থাকে।

লোকটা ভাল করে নড়েচড়ে বালির উপরে যোগাসন হয়ে বসল। তারপর সেই গম্ভীর গলায় কথা বলতে শুরু করল:

'শোন বালক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে— বোঝাবার আছে। তুমি কোথা থেকে আসছ, কিজন্য এখানে এসেছ, কোথায় তোমার সত্যকার গন্তব্যস্থান—কিছুই তুমি জাননা। এ সব কথা বুঝতে হলে প্রথমে তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে।'

ঝড়ো হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গেছে, আকাশ থেকে কেমন একটা অনৈসর্গিক ছাই-রঙা আলো ঝরে পড়ছে—যাতে দিনের আলোর ঔজ্জ্বল্যও নেই, প্রদোষ-গোধূলির কমনীয়তাও নেই। চারিদিকে কেমন একটা অস্বাভাবিক থমথমে ভাব—বিশ্বপ্রকৃতি যেন কুম্ভকে বসেছে বলে মনে হচ্ছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত চুপ করে বসে আছি—লোকটার কণ্ঠস্বর দূরাগত সমুদ্র গর্জনের মত কানে এসে লাগছে।........

—আমার নাম করালীপ্রসাদ দেবশর্মা, লোকে বলে করালী কাপালিক। তান্ত্রিক সাধনা আমাদের কুলধর্ম। আমার পিতৃদেব স্বর্গত কঙ্কালীপ্রসাদ দেবশর্মা ভাগীরথী তীরে মাতা কঙ্কালীর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁরই সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন মন্দিরের খুব বোলবোলাও ছিল. বহু দূরে থেকে গ্রামবাসীরা সব আসত পূজো [illegible]

পূজার্চনা ছিল নেহাৎই গতানুগতিক ধরণের, তাতে আমার মন উঠত না—মাতা কঙ্কালীকে গৃহদেবী বা গ্রামদেবীর সাজে সাজিয়ে প্রণামী আদায় করে জীবন কাটিয়ে দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত ছিল। আমি বেছে নিয়েছিলাম বীরাচারের পথ। আমার হাতে সেবার ভার পড়ার পর থেকেই আমি মহাবলি প্রথা প্রবর্ত্তন করি। তাতেই এ অঞ্চলের লোক ভয় পেয়ে এখানে আসা, পূজা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাই আজ এ স্থান জনহীন, মাতার মন্দির জীর্ণ ভগ্নস্তূপে পরিণত হতে বসেছে।..

মহাবলি!—কথাটা যেন আগে কোথায় শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কি যেন কথাটার মানে? এখন ঠিক মনে পড়ছে না।.........

—'দশ বছর বয়সে উপনয়নের পরই আমি দীক্ষা গ্রহণ করি— পিতৃদেবের কাছে নয়, শ্মশানচারী মহাতান্ত্রিক বগলাশঙ্কর আগমাচার্যের কাছে। তন্ত্রশাস্ত্রের বহু মহা মূল্যবান গ্রন্থাদি আজকাল আর পাওয়া যায় না। আমার গুরুদেব এই সব লুপ্ত তন্ত্রের পুনরুদ্ধার কার্যকেই নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের নানা দুরধিগম্য পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে তিনি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পত্র সব সংগ্রহ করে বেড়াতেন। তাঁরই কাছে আমি প্রথম ত্রিকালসিদ্ধির কথা শুনি। এই ত্রিকাল সিদ্ধি বস্তুটি কি বুঝিয়ে বলছি শোন

'ত্রিকাল সিদ্ধি লাভ করতে পারলে সাধকের কাছে ভূত-ভবিষ্যৎ, বর্তমানের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। তখন তিনি ইচ্ছা করলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, অতীত পৃথিবীর যে কোন যুগে গিয়ে প্রাচীন সমাজ ও ইতিহাসের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে আসতে পারেন অথবা অনাগত ভবিষ্যতের রহস্যময় গহ্বরে গিয়ে উঁকি মেরে আসতে পারেন। মহাকালের অন্তহীন রাজপথে যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত হয়। কালস্রোতের প্রবাহকে তিনি ইচ্ছামত মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন।'.........

কি আশ্চর্য! এই লোককে আমি কিনা অশিক্ষিত নিরক্ষর ভেবে অবজ্ঞার চোখে দেখছিলাম। বদ্ধ উন্মাদ—কিন্তু মহাপণ্ডিত লোকটা। কথাও বলছে ঠিক পণ্ডিতী ঢঙে, কেতাবী ভাষায়। কিন্তু ইংরাজী ভাষার এক বর্ণও তো জানে না। তবে H. G. Wells-এর 'Time Machine' বইখানা কি করে পড়ল? সে বই না পড়ে কি এমন গাঁজাখুরী গল্প কেউ বানিয়ে বলতে পারে.........

—'গুরুদেব নিজে ত্রিকালসিদ্ধি লাভের চেষ্টা কখনও করেননি—তাঁর সাধনা ছিল অন্যবিধ। কিন্তু সাধন প্রক্রিয়া তিনি ভাল করেই জানতেন। এই দুর্লভ সিদ্ধিলাভের আশায় আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছি দেখে আমার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পর তিনি আমাকে সযত্নে প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দেন।

'তারপর থেকেই শুরু হয়েছে আমার এই কঠোর সাধনা। গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রশক্তির প্রভাবে বজ্রসন্ধির সুযোগ গ্রহণ করে কালে কালে গ্রন্থিবন্ধন করতে হয়। তার জন্য চাই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি, নিখুঁত নৈষ্ঠিক চিত্তশুদ্ধি, নির্মম ইন্দ্রিয়নিপীড়ন, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীর একাগ্র আরাধনা। তবেই আসে সেই সুপবিত্র গ্রন্থি-মা—ঠিক সেই মুহূর্তে একবার বজ্রপাত হওয়াও প্রয়োজন। বজ্রসন্ধির সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই অতীত কিংবা ভবিষ্যৎকে আংশিকভাবে বর্তমানের মধ্যে টেনে আনা যায়—মহামায়ার চরম পূজোপচার সেই পথ দিয়েই সংগ্রহ করে আনতে হয়।

'গত বৎসর এক শ্রাবণী অমাবস্যার রাত্রে মাতা কঙ্কালীর কৃপায় আমার মন্ত্র সাধনার প্রথম পর্যায় সুসম্পন্ন হয়। বজ্রসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে মৃত অতীতের অন্ধকার দেউড়ি ক্ষণকালের জন্য আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর তারই ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় এক বৌদ্ধ চণ্ডাল—গৌড়াধিপ সম্রাট ধর্মপালের পদাতিক বাহিনীর একজন সৈনিক। প্রেত নয়, ছায়ামূর্তি নয়, জীবন্ত মানুষ—মন্ত্রশক্তির অমোঘ আকর্ষণে টেনে নিয়ে আসা প্রায় হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর একজন রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ। মাতা কঙ্কালীকে তার রুধির পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছি—আমার জীবনব্যাপী সাধনার অর্ধপথ আমি অতিক্রম করেছি। কিন্তু আরও অর্ধপথ এখনও বাকি রয়েছে।

'তাই তুমি আজ আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছ। বজ্রসন্ধির গ্রন্থিবন্ধ সেতুপথ দিয়ে মন্ত্রবলে বশীভূত ভবিষ্যৎ তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এইবার তোমার পালা। তারপর—তারপর আমি ত্রিকালসিদ্ধ হয়ে যাব—তন্ত্র সাধনার ইতিহাসে যে শক্তি কেউ কখনও অধিগত করতে পারেনি তাই আমার করায়ত্ত হবে—কালাশ্রয়ী বিপুলা বসুন্ধরা আমার হস্তামলকে পরিণত হবে—

'বুঝলে বালক, তুমি কলকাতা থেকে বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে আসছো না! তুমি আসছ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অন্ধকার ভ্রূণ-জগৎ থেকে। তোমার গন্তব্যস্থান বেতুল গ্রাম নয়—মাতা কঙ্কালীর মন্দির-প্রাঙ্গণের যূপকাষ্ঠ। তুমি এখনও জন্মগ্রহণ করনি, কিন্তু তোমাকে এখন মরতে হবে। তুমি হবে মাতা কঙ্কালীর সামনে প্রদত্ত শেষ মহাবলি—আমার ত্রিকাল-সিদ্ধি শিখরে আরোহণের শেষ সোপান।'

নিদারুণ আতঙ্কের কশাঘাতে আমার স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহের ভাবটা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। চটকা ভেঙ্গে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্রস্বরে চীৎকার করে উঠলাম, 'কি পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছেন আপনি? আমি কেন ভবিষ্যৎ থেকে আসতে যাব? আমি আসছি বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা সহর থেকে, সেখানে আমি মেডিক্যাল কলেজে—মানে—ইয়ে— চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ি। আমার বাড়ী বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে, আমার বাবা বর্ধমানে ওকালতি করেন। ঐ ভাগীরথীর ওপারে বেতুল—সেইখানে আমার বন্ধু নির্মল বোসের বাড়ী।—এই সোজা কথাগুলো কেন আপনি বুঝতে পারছেন না? কেন কতকগুলো আজে-বাজে কথা বলে শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন?—আপনি কি সত্যিই পাগল? নইলে এই আধুনিক সভ্যতার যুগে নরবলি দেওয়া সম্ভব এ ধারণা আপনার কেমন করে হল?—আপনার কি থানা পুলিশের ভয় নেই? মহাবলিই বলুন আর যাই বলুন, মানুষ খুন করলে যে আদালতের বিচারে ফাঁসি যেতে হয় তাও কি আপনার

লোকটাও উঠে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'এটা কোন সাল বল দেখি?'

একটু বিস্মিতভাবে উত্তর দিলাম, 'কেন—১৯১৫—মানে ১৩২২ সাল।'

কালো মুখে এক গাল সাদা হাসি মুহূর্তের জন্য ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল—অনাবিল কৌতুকের হাসিঃ 'তাই তো বলছি বালক—তোমার কথা আমার মন্ত্রসাধনার অব্যর্থতাই প্রমাণ করছে। মাতা কঙ্কালীর কৃপায় আমি যে বাংলাদেশে বেঁচে আছি সেখানে এখন চলছে ১১২০ সাল। বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা নয়—তবে তোমার কথা মিথ্যা হতে পারে না, আরও দুশো বছর পরে ঐ পচা জঙ্গুলে গ্রামখানাই নিশ্চয় বাংলার রাজধানীতে পরিণত হবে—এখন আমাদের রাজধানী মুকসুদাবাদ, যার নূতন নাম হয়েছে মুর্শিদাবাদ—এই ভাগীরথীরই তীরে, এখান থেকে মাত্র ক্রোশ দশেক দূরে হবে। সেখানে মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবী মসনদে বসে প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত হলেও তিনি অত্যন্ত বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি—হিন্দু প্রজাদের ধর্মানুষ্ঠানে কখনও ব্যাঘাত ঘটান না।......কিন্তু বৎস, তুমি এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছ কেন? মহাসাধকের সিদ্ধিলাভের সহায় হবে তুমি—তোমার রুধিরে মাতা কঙ্কালীর ভোগ-খর্পর পূর্ণ হবে—এতো তোমার পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া যে জীবন ধরাতলে আবির্ভূত হতেই এখনও দুশো বছর দেরি আছে—তার জন্য এত মমতাই বা কেন, তার বিনাশের আশঙ্কায় এত ভয়ই বা কিসের?'

লোকটার প্রশান্ত কণ্ঠস্বর, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার ভঙ্গী, মুখের মৃদু হাসি, সব মিলে আমাকে যেন পাগল করে তুলল। আতঙ্কের উত্তেজনায় অধীর হয়ে গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম, 'না-না—, মিথ্যা—মিথ্যা সব মিথ্যা কথা! আপনি হয় উন্মাদ, নয় জেনে শুনে নির্জলা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি ভূতও নই ভবিষ্যৎও নই, আমি বর্তমান। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আমাকে ভয় দেখাবার জন্য।'

করালী কাপালিকের গম্‌গমে গলা হঠাৎ উত্তেজনায় প্রখর হয়ে উঠলঃ 'মিথ্যা! মিথ্যা!—আমি মিথ্যা কথা বলছি! জিহ্বা সংযত কর বালক! তুমি কি বলছ তা তুমি জান না। আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে তো আমি নিজেও মিথ্যা, আমার গুরুবাক্য মিথ্যা, আজন্ম সাধনা মিথ্যা, মাতা কঙ্কালীও মিথ্যা।'—হঠাৎ আবার নিজেকে সামলে নিয়ে আগের মতই শান্তকণ্ঠে বলতে লাগল, 'না বৎস, কিছুই মিথ্যা নয়—তোমার কথাও নয় আমার কথাও নয়। সংসারে মিথ্যা বলে তো কিছু নেই—সব কিছুই নিত্যসত্যস্বরূপিণী মহামায়ার চৈতন্য-সাগরে লীলা-লহরী মাত্র...

সহসা কোথায় কি যেন একটা ঘটে গেল। কে যেন একটা অদৃশ্য সুইচ টিপে অকস্মাৎ সেই অস্বাভাবিক ছাই-রঙা মরা আলোটাকে নিভিয়ে দিল—তার বদলে চারিদিকে নেমে এল জমাটবাঁধা সন্ধ্যার জীবন্ত অন্ধকারপুঞ্জ।

যশোদা মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী। শিক্ষিতা মেয়ে সে নয়, কিন্তু এমনই তার অশিক্ষিতপটুত্ব যে, আধুনিক শিক্ষিত মেয়েরা তার কাছে হার মানে।

বিদুষীদের সংগে এই ধরণের মেয়ের বিশেষ একটা তফাৎ আছে। বিদ্যাশিক্ষা না থাকলেও এরা বিদগ্ধা, আধুনিক সভ্যতার প্রগতির সংগে সমান তালে পা ফেলে চলতে এরা আপন সহজাত পটুত্বের দ্বারাই শিখে নেয়। এমন মেয়ে অনেক আছে সংসারে, আমরা দেখতে জানি না বলেই দেখতে পাই না।

এখনকার বিদুষী ও শিক্ষিতা মেয়েদের সকলেই তো দেখছেন। মুখে না বললেও মনে মনে বলবেন, তারা যেন একটু কেমন ধারা। সকলে অবশ্য নয়, কিন্তু অধিকাংশই। সবই তাদের আছে, কিন্তু কি যেন একটুর অভাব, যেটুকু থাকলে বড়ই ভালো হতো। মেয়েলিত্বের যে বিশেষ সৌরভটুকু স্বাভাবিক, কলেজে ক্লাসের পর ক্লাসে উঠতে উঠতে সেটুকু যেন তাদের উবে যায়। সুন্দরীদের *সৌন্দর্য যেমন গুণের চেয়ে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে, বিদুষীদের বিদ্যাও অনেকের পক্ষে তাই হয়।

মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার আমি নিন্দা করতে বসিনি। বিদ্যাবতী অথচ গুণবতী, এমন মেয়েও আছে বৈকি। বিদ্যার সংগে সংগে গুণও বাড়বে, এইতো স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ না পেয়েও যারা আপন পরিস্থিতির ভিতর থেকে সেই সুযোগ কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিজেদের ততোধিক করে ফুটিয়ে তোলে, তাদের সেটা আরো বেশী বাহাদুরী বৈকি। যশোদার সম্বন্ধে সেই কথাটাই প্রযোজ্য।

যশোদা কলেজে পড়েনি, বোধ করি স্কুলে পড়ে থাকলেও উঁচু ক্লাসে পড়েনি। কিন্তু সে কী না জানে! ভালো বাংলা জানে, একটু আধটু ইংরেজী জানে, সাহিত্য জানে, কাব্য জানে, রবীন্দ্রনাথ জানে, গান জানে, আঁকতে জানে, কারুকার্য জানে, পলিটিকস জানে, পাটোয়ারী [illegible]

কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হলো তার আচরণ, ব্যবহার। মানুষের সংগে এমন সুন্দর ব্যবহার, একবার যে তার সংগে আলাপ করে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। কী তার খোলা মন, কী তার বিনয়, কী তার মুখের সরল হাসি! বয়স হয়েছে, তবু ছেলেমানুষি ঘোচেনি। চেনা মানুষ দেখলেই স্কুলের মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে ছুটে আসে, বক্ বক্ করে তার সংগে বকতে শুরু করে দেয়। দ্বিধা সংকোচ বা অহংকার কিছুমাত্র নেই। এক কথায়, তার কাছে আগন্তুক যে যেমনই হোক, সকল মানুষকেই সে—বশ করতে বলা ঠিক নয়—খুশি করতে জানে। শত্রু তাই কেউ তার হতেই পারে না।

কিন্তু আমি একজন বাইরের লোক হয়ে তার সম্বন্ধে এত খবর জানলাম কেমন করে?

আমার এক পুরানো রোগীর সে দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী। ভদ্রলোক ছিলেন ধনবান, আর নিঃসন্তান। বিপত্নীক হবার পর থেকে নানাবিধ রোগে ভুগছিলেন। ডিস্‌পেপসিয়া, তার উপর ডায়েবিটিস, মাঝে মাঝে ব্লাডপ্রেসার। খাওয়ার তদারক হয় না, অসুখ করলে সেবাশুশ্রূষা ভালো হয় না, কোনো যত্ন হয় না। দেখেশুনে আমিই বলেছিলাম—আপনি আবার একটা বিয়ে করুন। বড়োসড়ো দেখে একটা বউ আনুন, তাহলে কিছুকাল বাঁচবেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আমার কথাতেই বিয়ে করে আনলেন ঐ যশোদাকে।

পেশেন্টের স্ত্রী হিসাবেই যশোদার আমি প্রথম পরিচয় পাই। কয়েকবার তার সংগে আমার সাক্ষাতও হয়েছে, সাধারণভাবে কথা-বার্তাও হয়েছে। তাতেই মেয়েটিকে আমি চিনতে পেরেছিলাম, বিশেষ বুদ্ধিমতী বলেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপরে সেদিন তার নিজের মুখ থেকেই সকল কথা শুনলাম। আমার কাছে তার নিজের কথা খুলে বলার বিশেষ কারণ ঘটেছিল। সব কথা একটু গুছিয়ে বলি।

যশোদার বাবা তাদের গ্রামে বিষ্টু ডাক্তার নামে খ্যাত। কিন্তু নামের খ্যাতি থাকলেও করেন। তিন রকম ওষুধ তাঁর তৈরি করা থাকে, কুইনিন মিকচার, ফিবার মিকচার, আর বিসমাথ মিকচার। এই তিন রকমের দ্বারাই তিনি ডাক্তারি করেন। আর নির্ভয়ে ছুরি চালাতে জানেন, তাতে পয়সা কিছু বেশী আসে। কিন্তু টানাটানি করে তাঁকে সংসার চালাতে হয়। পোষ্য অনেকগুলি। মেয়েই হলো চারটি—সুখদা, যশোদা, ক্ষীরোদা, মোক্ষদা। ছেলে একটি—অন্নদাচরণ, স্কুলে পড়ে আর প্রত্যেকবার ফেল হয়। এ ছাড়া স্ত্রী আছে, এক বিধবা ভগ্নী আছে।

প্রথম মেয়ে সুখদার তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন পল্লীগ্রামেই। কিন্তু তারাও গরীব, সেখানে মেয়েকে দিনরাত বড়ো খাটতে হয়। মেয়ের দুঃখ দেখে বিষ্টু ডাক্তারের মনে কষ্ট হয়েছিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, গরীবের ঘরে আর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কিন্তু পণ দেবার মতো ক্ষমতা নেই, তাই দ্বিতীয় মেয়েটির জন্যে অবস্থাপন্ন কোনো দোজবরে পাত্রের সন্ধান করছিলেন।

বিনা পণে তেমন মনের মতো দোজবরে পাত্রও পাওয়া কঠিন। যশোদার বয়স কুড়ি পার হয়ে গেল, তবু তার জন্যে পাত্র জুটলো না। হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবুর খবর পেয়ে তিনি নিজে এসে একদিনেই বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেললেন। মেয়ের বয়স হয়েছে, আর গৃহস্থালির কাজকর্ম জানে, শুনে মৃত্যুঞ্জয়বাবুও রাজী হয়ে গেলেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অবস্থা খুবই ভালো। কলকাতায় মস্ত বাড়ি, বাড়িতে অনেক লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা উপলক্ষে সরকার গোমস্তাও আছে। বাড়ির নীচের তলায় এক পাশে বৈঠকখানা, এক পাশে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর অফিস। সেই বাড়ীতে তিনি বিয়ে করে যশোদাকে এনে তুললেন। যশোদার মায়ের কাছে তিনি বলেই এলেন, ওকে তিনি আর বাপের বাড়ী পাঠাবেন না। মেয়েকে দেখবার ইচ্ছে হলে তাঁরাই যেন আসেন, যতদিন খুশি কলকাতায় থেকে যাবেন।

হাবাগোবা এক পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। কলকাতা শহরের হালচাল দেখে সে হকচকিয়ে গেল। শহরে থাকার মতো শহবত নেই, কার সংগে কেমনভাবে কথা বলতে হয় তাও জানে না। সে প্রথমে ভেবেই পেলে না যে, কেমন করে এর মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিজেই তার সুবিধা করে দিলেন। উপরের ঘরে তাঁর এক লোহার সিন্দুক ছিল। তার চাবিকাঠিটা যশোদার হাতে দিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি হলে এই সংসারের মালিক। সংসার মানেই টাকা, তা নিশ্চয় জানো। সেই টাকার সিন্দুক রইল তোমার হাতে। এর থেকে যা খুশি তুমি নিজে বুঝে খরচপত্র করবে, যাকে যা দেবার দেবে, আর তার হিসেব রাখবে। বাস, এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না।

এতেই যশোদার ঘুমন্ত বুদ্ধি একটু একটু করে খুলতে শুরু করল। যে শিক্ষা তার কখনই হয়নি, তা আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকল। প্রথমে সে ভেবেছিল, একটা অত্যন্ত গুরুভার তার ঘাড়ে পড়ল, এ ভার সে হয়তো সামলাতে পারবে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে দেখলে যে এ এক আশ্চর্য অস্ত্র, এই অস্ত্র দিয়ে সবাইকেই জয় করা যায়। কিছুদিনের মধ্যে সকলেই তার বাধ্য হয়ে উঠল, সকলেই তাকে কর্ত্রী বলে মেনে নিলে। যশোদার মনটি খুব নরম, এতে অনায়াসে সকলের সংগেই তার হৃদ্যতার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। এমনকি চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত তাকে খুশি রাখতে পারলে বর্তে যায়।

বছরখানেকের মধ্যেই যশোদার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। তার দেহ ছিল অপুষ্ট রোগা, ময়লা-ময়লা, গায়ে আঁশটে বুনো-বুনো গন্ধ। সেই দেহ সুপুষ্ট নিটোল হয়ে উঠল, সেই ময়লা রংএরই একটা মাজা-মাজা রকমের খোলতাই হলো, গায়ে সেই বুনো গন্ধের বদলে মৃদু রকমের একটা ফুল-ফুল সৌরভ। আর পোষাক-আষাকের তো কথাই নেই, তাও শহরের হালফ্যাশানি সুরুচিসম্পন্ন হয়ে উঠল। তার নিজের হাতে পয়সা, বস্ত্রালংকার যেমন খুশি তেমনই সে কিনতে পারে। ভালো মন্দ চিনে নিতে তার বিলম্ব হলো না। তা ছাড়া দেহের বিকাশের সংগে সংগে মনের বিকাশও তার হচ্ছিল। এ বিষয়েও মৃত্যুঞ্জয়বাবু বিশেষ সুবিধা করে দিলেন।

তিনি বললেন—পাঁচজনের সংগে মেলামেশা করো। কলকাতার মেয়েরা এখন কত কিছুই জানছে, কত কিছুই করছে, সে সব তুমিও শিখে নাও।

যশোদা বললে—কার সংগে মেলামেশা করব? আমার বাধো বাধো ঠেকে।

মৃত্যুঞ্জয় বললেন—আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

কলকাতায় তাঁর আত্মীয় বন্ধু পরিচিত অনেক ছিল। তারা আগে আসা-যাওয়া খুবই করতো, তিনি বিপত্নীক হবার পর থেকে কেউ আর আসেনি। তাদের তিনি নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আনাতে লাগলেন। এতেই যশোদার অনেকের সংগে ভাবসাব ও অন্তরংগতা জন্মে গেল, মেয়েদের সংগেও আর কাছাকাছি বয়সের পুরুষদের সংগেও। তাদের সকলের বাড়িতেও যশোদার যাতায়াত চলতে থাকল।

যশোদার এমনিতেই পড়াশোনা করার বিলক্ষণ শখ ছিল। কিন্তু বাপের বাড়ি থাকতে তার কোনো সুযোগ পায়নি। এখানে এসে দেখলে, সবাই বই পড়ে, বই কেনে। তাই দেখে সেও উৎসাহের সংগে বই পড়তে আর বই কিনতে শুরু করলে। প্রথমে শিশু সাহিত্যের বই, তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ তার থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক। যে কবিতা ভালো লাগে সেগুলো সে মুখস্থ করে ফেলে। এমনি করে ধাপে ধাপে সে উঠতে শুরু করলে। শিখতে শিখতে শেখার আগ্রহ তার বেড়ে গেল। সে একটু একটু করে ইংরেজী শিখতেও লেগে গেল। নিজে নিজেই শেখে, গোলমাল ঠেকলে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, অভিধান থেকে মানে খুঁজে নেয়। বুদ্ধি ছিল ধারালো, মোটামুটিভাবে শিখতে বিলম্ব হলো না।

বই যখনই যা নতুন বেরোয় তখনই সে তা কিনে পড়ে। শুধু তাই নয়, সাময়িক পত্রাদিতেও তার ঘর ভরে গেল। দৈনিক কাগজ, পাক্ষিক কাগজ, মাসিক কাগজ, ছবির ম্যাগাজিন ইংরেজী, বাংলা দুই রকমই। দুনিয়ার সব খবরই সে রাখে, সব কিছু জানতেই তার আগ্রহ।

আর নতুন নতুন গান শিখতেও তার বিষম আগ্রহ। গলাটা ছিল সুরেলা। রেডিওতে গান শেখানো হয়, সে গান সমস্তই সে শিখে নেয়। কেউ রবীন্দ্র-সংগীত গাইলে তখনই তাকে ধরে বসে, আমাকে এটি শিখিয়ে দাওনা ভাই। বেশীক্ষণ কষ্ট করতে হয় না, দুচারবার গাইলেই সে শিখে নেয়। একটা হার্মোনিয়ম কিনলে, তাও বাজাতে শিখলে।

কিছুকাল ধরে গানে যেন তাকে পেয়ে বসল। নতুন গান শিখলেই সেটা রপ্ত করবার জন্যে যখন তখন গুনগুন করে গাইতে থাকে। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সে স্নান করে, ততক্ষণই তার গান গাওয়া চলে। ছাদে গিয়ে রেলিংএর ধারে বসে দুপুরবেলা যখন চুল শুকোয়, তখন চোখ বুজে আপন মনে রবীন্দ্র-সংগীত গায়।

আমাদের সমাজে কালচার বলতে যে গুণ-গুলি থাকা বোঝায়, তার কোনোটাই বাদ গেল না। যশোদা সুআলাপী, সুরুচিসম্পন্না, সুগায়িকা, সদা হাস্যমুখী, লোককে আদর-আপ্যায়িত করতে মুক্ত হস্তে খরচ করে, সকলকেই সন্তুষ্ট করতে জানে। মনে একটুও দেমাক নেই, কথাবার্তায় চাল নেই, আর মুখ ভার করতে তাকে কখনই দেখা যায় না।

যশোদার যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু ব্যক্তিগত আচরণ নয়, কর্মকুশলতা আর পরিকল্পনা-শক্তিও তার কম নয়। বাড়ির কাজের ভার সে চাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়েই বসে থাকত না, অনেক পরিশ্রমের কাজ সে নিজের হাতে করতো। ওপরের ঘরগুলি প্রত্যহ সে নিজের হাতে গোছাতো। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ রান্না প্রত্যহ নিজের হাতে রাঁধতো। নিজে সামনে বসে তাঁকে খাওয়াতো। তাঁর খাওয়া, পরা, বেরোনো, বিশ্রাম নেওয়া, সব কিছুরই তদারকের ভার সে নিজের হাতে রেখেছিল।

এ ছাড়া, থেকে থেকে হঠাৎ আর খেয়াল হলো, একটা থিয়েটার করলে বেশ হয়। আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে সমবয়সী মেয়ে পুরুষদের নিয়ে সে এক থিয়েটারের দল গড়লে। ঠিক করা হলো যে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" তারা অভিনয় করবে। তিন মাস ধরে তার রিহার্সাল চলল, ওদেরই বাড়িতে। চা জলখাবারের প্রচুর বন্দোবস্ত করা হলো। শেষে অভিনয় হলো এক আত্মীয়ের বাড়ির মস্ত হলঘরে। নিজেদের চেনাশোনা লোকদের মধ্যেই টিকিট বিতরণ করা হলো, একটা থিয়েটার করলে বেশ হয়। আত্মীয় গাইলে, তখন চারদিক থেকে প্রচুর হাততালি পড়ল।

আবার ওর এক খেয়াল হলো, বস্তির লোকের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। ওদের পাড়ায় ছিল গরীব গৃহস্থদের বস্তি, তাদের ছেলেমেয়েরা মুর্খই থাকে, অর্থের অভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হয় না। লেখাপড়া না শেখার কি দুঃখ তা যশোদা ভালো রকমই জানে। সে স্থির করলে যে ওদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার জন্যে সে নিজেদের বাড়িতে একটা স্কুল খুলবে, রোজ সন্ধ্যার সময় সেখানে পড়ানো হবে। সে নিজেও পড়াবে, আর কেউ যদি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পড়াতে চায় তাকেও দলে নেবে। ওদের বাড়ির নীচেকার বৈঠকখানা ঘরটা সন্ধ্যার সময় খালিই পড়ে থাকে, সেইখানে ফরাশ পেতে ছেলেমেয়েদের স্কুল বসল। তাদের কলরবে বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। পাছে তারা আসতে না চায়, তাই প্রত্যহ তাদের এক মুঠো করে চকোলেট লজেঞ্জ ঘুষ দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু তবুও প্রায়ই তারা কামাই করে, প্রায়ই তাদের অসুখবিসুখ হয়। বিনা চিকিৎসায় তারা পড়ে থাকে। এই দেখে তার খেয়াল হলো, সে নিজেই এদের চিকিৎসা করবে, বই পড়ে হোমিওপ্যাথি শিখে নেবে। হোমিও চিকিৎসার কয়েকখানা বাংলা বই কিনলে, ওষুধের বাক্স কিনলে। রোগের লক্ষণ দেখে বইএর সংগে মিলিয়ে মিলিয়ে সে ওষুধ বিতরণ করতে লাগল। তাতে কেউ কেউ সেরেও যায়, যারা না সারে তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে বলে রাখা দরকার যে বিয়ের পরে কয়েকটা বছর কেটে গেলেও তার কোনো ছেলে-পুলে হলো না। কিন্তু তা না হলেও তার পোষ্যের কোনো অভাব নেই। ঐ সব বস্তির ছেলেরা রয়েছে। তা ছাড়া সে নানা জাতের এক ঝাঁক পায়রা পুষেছে, ছাদে গিয়ে নিজের হাতে তাদের খাওয়ায়। তারা ওর কাঁধের উপর বসে, ওর হাত থেকে খাবার খায়। শুধু পায়রা নয়, কয়েকটা সায়ামীজ বেড়ালও সে পুষেছে। অনেক দাম দিয়ে মালয় দ্বীপের একজোড়া কাঠবেড়ালি কিনেছিল পুষবে বলে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে দুটো মারা গেল।

তারপর হলো ছবি আঁকার শখ। বিলেতী ম্যাগাজিনে নানা রকম রংচং-এ ছবি থাকে, তাই দেখে দেখে সে তার নকল করতে শুরু করলে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে না ঘুমিয়ে যশোদা বসে বসে এই কাজই করতো। এর জন্যে নানা রকম রঙীন পেন্সিল কিনলে, রংএর বাক্স আর তুলি কিনলে। অনেক কষ্ট করে সে আঁকতো বটে, কিন্তু ছবিগুলো

কিছুতে মনের মতো হতো না। তাই সে কেবলই ভাবতো, কেমন করে ভালোরকম আঁকতে পারা যায়। কার কাছেই বা শেখা যায়।

খুঁজতে খুঁজতে চেনাশোনাদের মধ্যেই হঠাৎ এমন একজনকে সে পেয়ে গেল যে দস্তুর মত আর্টিস্ট, চমৎকার আঁকতে জানে। তার নাম কামাক্ষী। বয়স বেশী নয়, ওর চেয়ে দু চার বছরের বড়ো হবে। সে যেন ছবি আঁকবার ম্যাজিক জানে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলে সে টপাটপ রেখার পর রেখা টেনে কয়েক মিনিটের মধ্যে অক্লেশে এমন জীবন্ত ছবি এঁকে ফেলে যে দেখলে তাক লেগে যায়। তাকে যা কিছুই আঁকতে বলো তাই সে তৎক্ষণাৎ এঁকে দিতে পারে, আর যা আঁকে তাই হয় চমৎকার। হেলায় শ্রদ্ধায় এক একটা তুলির পোঁচ দেয় কি সুন্দর!

যশোদা তাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে বললে—আপনি আমায় একটু শিখিয়ে দেবেন আঁকতে?

কামাক্ষী বললে—স্বচ্ছন্দে, কিন্তু মন দিয়ে লেগে থাকতে হবে।

যশোদা বললে—খুব খুব, আপনি দেখবেন আমি কেমন বাধ্য ছাত্রী।

কামাক্ষী বললে—রোজ আঁকতে বসতে হবে, একদিনও ঢিল দিলে চলবে না।

যশোদা বললে—নিশ্চয়ই না। সে কথা আপনাকে বলতে হবে না।

সেইদিন থেকে সুরু হলো অঙ্কন শিক্ষা। কামাক্ষী ভদ্রলোকটিকে দেখা গেল বেশ অমায়িক আর খুবই কর্তব্যপরায়ণ। প্রত্যহ বিকেলে নিয়মিত সময়ে একবার করে আসতে লাগল, ধৈর্যের সঙ্গে যশোদাকে আঁকতে শেখাতে লাগল। প্রথমে কিছুকাল শেখালো কেবল লাইন ড্রইং। তার পর শেখালো তুলিতে রং-এর পোঁচ দিতে।

কিন্তু কামাক্ষী যে এত যত্ন করে শেখায়, তার বিনিময়ে কিছুই নেয় না, টাকাকড়ি দিতে গেলে রাগ করে। বলে, আমি শখ করে শেখাচ্ছি, পয়সা নেবো কেন? যশোদা অবশ্য প্রত্যহই তাকে কিছু খাইয়ে ছাড়ে, কিন্তু সে আর এমন কি কথা।

যশোদা দেখলে যে কামাক্ষী ছবি আঁকে, কিন্তু তার নিজের কোনো ষ্টুডিও নেই। ছোট্টো একটা বাড়িতে থাকে, সেখানে শোয়াবসার জায়গারই টানাটানি। সে বললে, আমাদের বারান্দার কোণে ঐ ছোটো ঘরটা এমনি পড়ে থাকে, ওটাকে আমি ষ্টুডিও করছি। ওখানেই আপনি আপনার কাজ করবেন, আর আমারও তাই দেখে শেখা হবে।

ষ্টুডিওর উপযোগী সমস্ত আসবাবপত্র এনে যশোদা ঘরটিকে সাজালে। কামাক্ষী অমন সুন্দর ষ্টুডিও পেয়ে বেঁচে গেল। সে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ওখানে কাটাতে লাগল।

অধিকক্ষণ যাবৎ একসঙ্গে থাকতে থাকতে ক্রমে ওদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠল। মাষ্টার-ছাত্রী সম্পর্ক থেকে ক্রমে ভাই-বোনের মতো একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন এদের এটা নির্দোষ সম্পর্ক, এতে কোনো বাধা দিলেন না, যশোদার আঁকার উৎসাহ দেখে বরং খুশিই হলেন। কামাক্ষীর সঙ্গে দেখতেও বাধা নেই। চেনা লোক, বাইরের অপরিচিত কেউ নয়।

সবই ভালো। মানুষটিও ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে যশোদার একটু অন্যরকম সন্দেহ হতো। কামাক্ষী কেমন এক রকম বিহ্বল চোখে ওর দিকে চাইত, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক সময় হয়তো ওর অত্যন্ত গা-ঘেঁষে বসলো, ওর হাত-খানা কিছুক্ষণ ধরে রইল, হাতের উপর আঙুল বুলোতে লাগল, চুড়িগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। যশোদা বুঝতে ঠিকই পারতো যে এটুকু দুর্বলতা, কিন্তু মুখে কিছু বলতো না। ওতে বাধাও দিত না, কিন্তু প্রশ্রয়ও দিত না। ভাবতো যে, ওর তরফের অবহেলা দেখলেই ওটা আপনি বন্ধ হবে।

কিন্তু একদিন সে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললে। যশোদা ঝুঁকে বসে একমনে ছবি আঁকছিল, কামাক্ষী পিছনদিক থেকে এমনভাবে তার পিঠের উপর হাতখানা রাখলে, যেন আদর করে জড়িয়ে ধরার মতো। যে একজন পরস্ত্রী, ভদ্র নারীর উপযুক্ত সম্ভ্রম যাকে দেখাতে হয়, তার পিঠে কেউ চেনা লোক হাত দিলেও কখনো অমন করে জড়ায় না। যশোদা তৎক্ষণাৎ ওর হাতখানা ধরে ছুঁড়ে সরিয়ে দিলে, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে—ছি ছি, আপনি এমন? সরে যান এখান থেকে।

কামাক্ষীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে—আমি কি অন্যায় কিছু করেছিলাম?

যশোদা বললে—করেন নি হয়তো, কিন্তু করতেন। ও সব কি?

কামাক্ষী বললে—আমি স্বীকার করছি যে, ওটুকু আমার দুর্বলতা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সত্যিই ভালোবাসি। জীবনে কখনো কাউকে এত ভালোবাসিনি। কিন্তু তাতে দোষ কি আছে? আমি শুধুই একটু ভালোবাসি, তোমার কাছে কখনো কিছু চাই না।

যশোদা বললে—এতে বিলক্ষণ দোষ আছে। নাইবা কিছু চাইলেন, এখনই তো হাত বাড়িয়েছিলেন। যাকগে, ঢের হয়েছে, আমার খুব ছবি আঁকা শেখা হয়েছে। আপনি আর এ বাড়িতে আসবেন না।

কামাক্ষীর মুখখানা চুপসে এতটুকু হয়ে গেল। সে ঢোক গিলে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—এবারকার মতো আমাকে মাপ করো, এবার থেকে আমি খুব সাবধানে থাকবো। কিন্তু অমন করে আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

যশোদা বললে—না, এসব ভালো কথা নয়। আপনি আমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। তাতে আমারও ভালো, আপনারও ভালো।

কামাক্ষী আর কিছু বলতে পারলে না, মাথা নীচু করে চলে গেল।

যশোদা ছবি আঁকা একেবারেই ছেড়ে দিল। সে অন্য পাঁচরকম দিকে মন দিলে। কাজের তার কোনো অভাব নেই।

এর পর আরো দু বছর কাটল। বেশ ছিল যশোদা মৃত্যুঞ্জয়ের সেবাযত্ন নিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে, বস্তির ছেলেদের স্কুল করা নিয়ে, পাখি-পক্ষী নিয়ে, সাহিত্যচর্চা নিয়ে, আনন্দে তার দিন কেটে যাচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে থাকলে কোনোই গণ্ডগোল হতো না।

[illegible]

স্ট্রোক হয়ে মারা গেলেন। ডাক্তার ডাকার পর্যন্ত অবকাশ হলো না, অজ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। তার পর থেকেই যশোদার সব কিছু বিগড়ে গেল।

অনেক দিন পরে হঠাৎ সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। গিয়ে দেখলাম, তার শরীর মন দুইই অসুস্থ। চেহারাটা রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখে সেই হাসি নেই, চোখে সেই জ্যোতি নেই।

যশোদার খিদে নেই, ঘুম নেই। তার মাথা ঘোরে, শরীর অস্থির অস্থির করে, বুক ধড়ফড় করে। সে কোনো কাজকর্ম করতে পারে না, বিছানায় প্রায় সর্বক্ষণই শুয়ে থাকতে হয়। সে বললে, আমার একটা কিছু উপায় করুন, এমন করে বেঁচে থাকা যায় না। নিজেকে নিয়ে এত বেশী ভাবতে হবে, এ আমি কখনই ভাবিনি। জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

আমি তাকে যথারীতি পরীক্ষা করে দেখলাম। কোথাও কিছু রোগের চিহ্ন পেলাম না। আমি বললাম, শরীরে কোনো দোষ নেই, এ তোমার মনের রোগ।

যশোদা বললে—ঠিক বলেছেন, মনেরই রোগ। কী যে কষ্ট পাই তা আপনি জানেন না। শুয়ে থাকি, চোখ বুজে থাকি, অথচ ঘুম নেই। কেবল ভয়, কেবল আতংক। ঘরে একজন ঝি থাকে, বাইরে চাকর শুয়ে থাকে, তবু মনে হয় খাটের তলায় কে লুকিয়ে আছে, জানলা দিয়ে কে উঁকি মারছে। অথচ ঘুমের ওষুধ খেতেও ভয় করে, পাছে যদি আর না জাগি। আর দিনেও ঘুম নেই, তখন যত আবোলতাবোল চিন্তা।

আমি বললাম—কাজ নিয়ে থাকো না বলেই হয়তো মনে ঐসব বাজে চিন্তা আসে। তোমার স্কুল করা, ছেলে পড়ানো, সেগুলো কি এখন নেই?

যশোদা বললে—না, সে আর ভালো লাগে না, ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বললাম—তোমার সব পায়রা টায়রাগুলো আছে তো?

সে বললে—না, সেগুলো একে ওকে বিলিয়ে দিয়েছি। ভালো লাগে না।

আমি বললাম—কিছুই যদি ভালো লাগছে না, বাইরে কোথাও ঘুরে এসো না!

সে বললে—তারও কি উপায় আছে! আমার বুড়ো বাপ এসেছিলেন দেখতে। তিনি বললেন, কিছুদিন তুই আমাদের ওখানে থাকবি চল। তাই আমি যেতে পারলাম না। কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, এ বাড়ির চৌকাট পার হয়ে বাইরে বেরোতে হলেই আমি ভয়ে মরে যাবো। আজকাল কোথাও বেরোই না, এই বাড়িতেই থাকি।

আমি বললাম—তোমার মনের ইতিহাসটা আমায় খুলে বলো, কিছুই গোপন কোরো না। তখন তার কাছে সব কিছু শুনলাম।

সমস্ত শুনে আমি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তার পরে জিজ্ঞাসা করলাম—একটা কথা জানতে চাই, তুমি কি ভগবান মানো?

সে বললে—ওমা, ভগবান মানবো না! খুব মানি। তাতেই আরো বেশী কষ্ট।

আমি বললাম—সাধুরা বলেন, ভগবানের

[illegible]

জয়দেবের মেলা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের কেন্দুবিল্ব, শ্রীগীতগোবিন্দের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর লহরী হিল্লোলিত কেন্দুবিল্ব। চলতি নাম কেন্দুলী। লোকে কিন্তু কেঁদুলীও বলেন। বলে "জয়দেব।" জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় 'জয়দেব' যাব, 'জয়দেবের মেলা।' জয়দেব সারা ভারতের তীর্থক্ষেত্র, বাংলার অন্যতম পুণ্যপীঠ। কবি জয়দেব বাংলার সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন, ছিলেন পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্ন। আজ হইতে আটশত বৎসর পূর্বে কবি জয়দেব কেন্দুলী গ্রামে আবির্ভূত হন। সেকালে রেলপথ ছিল না, ছাপাখানা ছিল না, বেতার-যন্ত্র ছিল না, তথাপি জয়দেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার কবিখ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আজ তো ইউরোপ আমেরিকার রসিক সমাজও জয়দেবের নাম জানেন। কবির শ্রীগীতগোবিন্দ বিদেশের ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে। ভারতীয় এক বৃহত্তম সম্প্রদায়ের চক্ষে কবি একজন ভগবদ্ভক্ত, শ্রীভগবানের আপনার জন। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য যোগ ঘটিয়াছে। অতি অল্প কবির কাব্যই এইরূপ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জয়দেবের মেলা কতদিন পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। বীরভূমে বনমালী দাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত "জয়দেব চরিত্র" গ্রন্থখানিতে জয়দেব জীবনীর জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি কাহিনী জানা যায়। আচার্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ এই গ্রন্থখানির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। বলিয়াছেন—"তিনশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যেভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণচিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর। জীবন চরিত না হইলেও উপদেশপূর্ণ, ধর্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।" শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গ্রন্থখানি তিনশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

বনমালী দাসের গ্রন্থ হইতে যাহা জানা যায় তাহা মোটামুটি এইরূপ—পদ্মাবতী দক্ষিণাঞ্চলের মেয়ে। তাঁহার বাবা মা তাঁহাকে জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীরূপে দান করিতে আসিলে জগন্নাথদেব স্বপ্নে আদেশ দেন, পদ্মাবতীকে কেন্দুবিল্বে লইয়া গিয়া জয়দেবের হাতে দিয়া আইস। অতঃপর তাঁহারা কেন্দুলী আসিয়া জয়দেবের সংগে পদ্মাবতীর বিবাহ দেন। জয়দেব অজয়ের কদম্বখণ্ডী ঘাটে জল হইতে শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। জয়দেব প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যাইতেন, পদ্মাবতী পূজার আয়োজন করিয়া রাখিতেন, ভোগ রাঁধিতেন। জয়দেব গঙ্গাস্নানের পর বাড়ী ফিরিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা পূজা সারিয়া ভোগ নিবেদনপূর্বক বিগ্রহের প্রসাদ পাইতেন। অতঃপর পদ্মাবতী ভোজন করিতেন। জয়দেব তখন শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা করিতেছিলেন। অনেক দূর লিখিয়া মান ভাঙ্গাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়াছিলেন এই কথাটা আর লিখিতে পারিতেছিলেন না। লিখিয়াছিলেন "স্মর গরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং' ইহার পর লিখিতে হইবে "দেহি পদপল্লবমুদারম।" জয়দেবের কলম আর চলে না, গ্রন্থখানিও সম্পূর্ণ হয় না। শ্রীভগবানের কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ বড় ভাল লাগিয়াছিল। জয়দেব লিখিতেন, পদ্মাবতী গাহিতেন, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষ্যে আসিয়া শুনিতেন, শুনিয়া খুব খুসী হইতেন। সুতরাং গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিশেষ তিনি চিন্তিত হইলেন। অবশেষে একটি উপায় ঠিক করিলেন। জয়দেব গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জয়দেবের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতীর তখন ভোগ রান্না প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পদ্মাবতী বলিলেন, আজ যে এত সকালেই ফিরিয়া আসিলেন? জয়দেবরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গ্রন্থ লেখা কয়েকদিন বন্ধ হইয়া আছে। শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। তাই আজ আর গঙ্গায় না গিয়া অজয়েই স্নান করিয়া আসিলাম। এই বলিয়া তিনি যথারীতি দেববিগ্রহের সেবা-পূজাদি নির্বাহ করিলেন। পদ্মাবতীর রন্ধন শেষ হইলে অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদনের পর আপনি আপনার প্রসাদান্নও গ্রহণ করিলেন। শেষে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া পদ্মাবতীকে বলিলেন, পুঁথিখানি আনিয়া দাওতো। পদ্মাবতী পুঁথি আনিয়া দিলে—শ্রীভগবান নিজ-হস্তে তাহাতে লিখিলেন—"দেহি পদপল্লবমুদারম।" অতঃপর প্রতিদিনের মত বিশ্রামের জন্য শয্যায় শয়ন করিলেন। পাদ সম্বাহন করিতে করিতে পদ্মাবতী যখন দেখিলেন—প্রভু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিতে গেলেন। পদ্মাবতী ভোজন করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গা-স্নানান্তে কবি বাসভবনে ফিরিয়া আসিলেন। পতি-পত্নী উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা নাই। পদ্মাবতী ছদ্মবেশী জয়দেব কর্তৃক দেবসেবা হইতে প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ লিখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা যখন একে একে নিবেদন করিলেন—কবি তখন বলিলেন, গ্রন্থখানি লইয়া এসো তো দেখি। পদ্মাবতী গ্রন্থ আনিয়া দিলে জয়দেব দেখিলেন—সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ আপনি আসিয়া নিজ-হস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম" লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

একচিতে গ্রন্থপাত খুলিল ঠাকুর।
অর্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পূর।
অর্ধকলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদ পল্লব মুদার।
পাদ পূর্ণ দেখি মনে হইল প্রতায়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আশয়॥

জয়দেব আনন্দে পদ্মাবতীর ভাগ্যের প্রশংসাপূর্বক তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন।

এতবলি পদ্মা সঙ্গে করয়ে ভোজন।
পুনঃ পুনঃ প্রসাদের করয়ে বন্দন॥

পদ্মাবতী নিষেধ করিলে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদান্নের মহিমা বর্ণনা করিলেন—

এত শুনি পদ্মাবতীর বিস্ময় ঘুচিল।
একত্রে আনন্দে দোঁহে ভোজন করিল॥
চমৎকার এই কথা শুনিতে বিস্ময়।
এক-ঠাঁই পতি-পত্নী ভোজন করয়॥

জয়দেবে সমাগত বাউলের দল আপনার সাধন-সঙ্গিনীর সংগে এক পাত্রে ভোজন করিয়া সেই আদর্শ রক্ষা করিতেছেন।

জয়দেবের ভগবদ্ভক্তিতে পরিতুষ্টা জাহ্নবী দেবী সেদিন বলিলেন, প্রতিদিন তোমাকে ক্লেশ স্বীকার পূর্বক এত দূরে আসিতে হইবে না। আজি হইতে অজয়ের জলেই তুমি স্নান করিও, আমি অজয় মধ্যেই তোমাকে দর্শন দিব। পৌষ-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাদেবী অজয়বক্ষে আবির্ভূত হইয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাদেবী অজয়ে আবির্ভূতা হইবেন, এই কথা দিকে দিকে রটিয়া গিয়াছিল।

পৌষ সংক্রান্তির এক দিবস থাকিতে।
মহোচ্ছবের ঘটা প্রভু কৈলা ভাল মতে॥
দেশ বিদেশে লোক মহা গোল হৈল।
সংকীর্তন কলরবে পৃথিবী পূরিল॥

*　　*　　*

*　　*　　*

সাধু সন্ত তেজবন্ত একত্র হৈল।
অজয় কিনারে সব আখড়া বান্ধিল॥

*　　*　　*

*　　*　　*

কেবা আসে কেবা রান্ধে কে পরিবেশয়।
কেবা ভোজন করে কেহো কারে না চিনয়॥
জগন্নাথ ক্ষেত্রে যেন প্রসাদ বিকায়।
জাতি পাঁতি না বিচারে পাইলেই খায়॥
সেই মত দেখি জয়দেবের ভঙ্গীতে।
চারি বর্ণ একাকার কদম্ব খণ্ডীতে।

*　　*　　*

*　　*　　*

পৌষ সংক্রান্তি ব্রাহ্ম মুহূর্ত সমাগত হইল। সহস্র সহস্র নরনারী জয়ধ্বনি দিয়া কেন্দুলীর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। সারি সারি অজয় কিনারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—

হেন কালে দুই বাহু শঙ্খ উত্তোলন।
কদম্ব খণ্ডীর ঘাটে দিলা দরশন॥

শঙ্খ বলয়িত দুটি হাত তুলিয়া গঙ্গাদেবী আপন আবির্ভাব জানাইয়া দিলেন।

বনমালী দাসের মতে সেই হইতেই কেন্দুলীর মহোৎসবের তথা জয়দেবের মেলার সূচনা। এই পৌষ সংক্রান্তিতে [illegible]ীর ঘাটে অজয়ের জলে জয়দেব রাধামাধব যুগল

বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিগ্রহ প্রাপ্তি উপলক্ষেও উৎসব হইয়াছিল, কিন্তু দেশ-বিদেশের লোক পৌষ সংক্রান্তির উষায় অজয়ে স্নানের জন্যই সমাগত হয়। বীরভূমে দুটি মেলাই খুব বড়, খুব বিখ্যাত, একটি জয়দেব অন্যটি বক্রেশ্বর। শিব-চতুর্দশীর সময় বক্রেশ্বরের মেলা। আর পৌষ সংক্রান্তির সময় জয়দেবের মেলা। দুইটি মেলাই প্রায় দশ-পনের দিন স্থায়ী হয়, তবে জয়দেবের মেলায় পৌষ সংক্রান্তির দিন হইতে মাঘের দুই-দিন খুব জাঁক-জমক থাকে তিনদিনের দিন মেলা ভাঙ্গিতে সুরু হয়। তাহার পর জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য মেলা আরো পাঁচ-ছয় দিন থাকে।

জয়দেবের মেলা সারা গ্রাম জুড়িয়াই মেলা। মোহান্ত বাড়ীর পূর্বদিকে শ্রীরাধা-বিনোদের মন্দির। এই মন্দিরের উত্তরে দুই-সারি কাটা পোষাকের দোকান। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমানরা এই দোকানের মালিক। ইহারা দোকানে বসিয়াই ভাত রাঁধে। মুরগী রাঁধে। রাস্তার উপরেই হাতমুখ ধোয় বাসন মাজে। রাস্তাটা অপরিষ্কার করিয়া রাখে। মেলার মালিক ইহাদিগকে অন্যত্র সরাইয়া দিলে কাহারো কোন ক্ষতি হয় না। মন্দিরের পশ্চিমে এবং মোহান্ত বাড়ীর সদর-দরজারে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে উলি কাপড় ও ছাপা ধুতি শাড়ীর দোকান লইয়া আসেন তিন চারি জন। পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে এই সব কাপড়ের দোকান লইয়া ব্রজবাসীরা আসিতেন। ছাপা ধুতি শাড়ীর নাম বৃন্দাবনী কাপড়। মোহান্ত বাড়ী আর শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির—মাঝে একটা রাস্তা। এই রাস্তার দুই পাশে দুই একখানি কাপড়ের দোকান, তাহার পরই তরি-তরকারীর হাট। অজয় তীরবর্তী গ্রাম হইতে লোকে ফুলকপি, বাঁধা-কপি পালংশাক, বেগুন, গোল আলু, লাল আলু, সরবতী আলু প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। এই হাটের পশ্চিমে বিবিধ রকমের মাছ বিক্রী হয়।

শ্রীরাধাবিনোদের মন্দিরের পূবে—উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পথ দক্ষিণে অজয় তীর এবং উত্তরে কেন্দুলী গ্রামের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথের উত্তরে গেলে দেখিবে দুই পাশে কয়েকটা বড় করমের মনিহারী দোকান। তাহার পর লোহার হাতা বেড়িখুন্তী জ্বালিয়াছে স্থানীয় কামারেরা। ইহার মধ্যে ইদানীং কালা কামার খেতাবধারী পশ্চিমের কামারেরা আসিয়া স্থান করিয়া লইয়াছে। তাহার পর কয়েকটি খাবারের,—মিষ্টান্ন ও তেলে ভাজার দোকান। মাঝে পানের দোকান, ইদানীং আবার মাংসের খাবারেরও দোকান বসে। এই পথের শেষের দিকে একপাশে বসে পিতল কাঁসার বাসনের দোকান। জয়দেবের নিকট টিকরবেতায় এবং দুবরাজপুরে বহু কামারের বাস। টিকরবেতায় পিতল কাঁসার বাসন তৈরী হয়। এ দোকান তাহাদের। অন্যদিকে বসে পাথরের থালা, বাটী, গেলাস, ডাবর, খোরা প্রভৃতির দোকান। এ সমস্ত গয়া অঞ্চলের আমদানী। পাথরের দোকানের পূর্বদিকে কলাপটি, এদিকের দোকানের কলা দেশী কলা। এই সব দোকানীরা গরীব, লোক-দের পছন্দমত কমদামী কলা রাখে। এই পথের দক্ষিণ প্রান্তে আসে চন্দননগর অঞ্চলের ব্যবসায়ীগণ খুব সুন্দর জাতের কলা লইয়া। এই কলাপটি জয়দেবের মেলার অভিজাত কলা-পটি। কলাপটির পূর্বদিকে নানা রকমের মাটির বাসন এবং ঢোল, খোল ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের দোকানীরা দোকান পাতে।

রাধাবিনোদ মন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তের পথটি পশ্চিমমুখে গিয়াছে অজয়ের উত্তর তীর ধরিয়া কদম্বখণ্ডীর ঘাটে। এই পথের খানিকটা দূর পর্যন্ত নানা রকম পুস্তক, মালাতিলক ও তসর মটকার দোকান বসে। ইহারা তেমন শক্ত ছাউনী তৈরী করে না। এক ফালি কাপড় উপরে টাঙ্গানো থাকে, চারি পাশে থাকে কাপড়ের ঘেরা। ইহার পর দুই পাশে বসিয়া যায় কুষ্ঠীর মেলা। যত সাংঘাতিক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষ বোধ হয় সপরিবারে এক টুকরা ছেঁড়া ন্যাকরা বিছাইয়া এই পথের দুইধারে বসিয়া থাকে। নরনারী-গণ এক এক মুঠো চাউল, কেহবা এক আধটা পয়সা ইহাদের ন্যাকরার উপর ফেলিয়া দিয়া যায়। কদম্বখণ্ডীর ঘাট হইতে আবার সুরু হয় মিষ্টির দোকান। কয়েকটা দোকানের পরই অন্নদানের আখড়া। ছেলেবেলা হইতে এই মেলায় যাতায়াত করিতেছি। আমি দেখিয়াছি—এখন যে পথে কুষ্ঠ রোগীরা ভিক্ষার আশায় বসিয়া থাকে, পূর্বেও তাহারা এখানেই বসিত। এই পথের দক্ষিণে অজয়ের উত্তর তীরে অনেকগুলি আখড়া ছিল। বীরভূমের অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ এবং দু-একজন জমিদার এই সব আখড়ায় অন্নদান করিতেন। কদম্বখণ্ডীর ঘাটের পশ্চিমেও অনেকগুলি আখড়ায় অন্নসত্র খোলা হইত। এখন সেগুলি উঠিয়া গিয়াছে।

জয়দেবের কাঙ্গাল ক্ষ্যাপার আখড়া খুব বড় এবং বিখ্যাত আখড়া। এখানে তিন দিন বহুলোক খাইতে পায়। কাঙ্গাল একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পরও বহু ভক্ত আজিও আখড়াটি সুশৃংখলে পরিচালনা করিতেছেন। কাঙ্গাল ক্ষ্যাপার আখড়ার পশ্চিমে বর্ধমান জেলার বনগ্রামের অধিকারীদের পুরাতন আখড়া। শ্রীজগদানন্দ অধিকারী মহাশয় এই দুর্দিনেও আখড়াটি বন্ধ করেন নাই, অধিকারীদের আখড়ার উত্তরে বাউল সমাবেশের বড়তলা। নানাস্থান হইতে পূর্বে জয়দেবের মেলায় প্রায় হাজার পনের বাউল আসিয়া এই বড়তলায় জমায়েৎ হইতেন। এখনো কোন কোন বৎসর দুই-আড়াই হাজার বাউল কেহ একক, কেহবা সাধন-সঙ্গিনী সহ আসিয়া সমবেত হন। ইঁহারা তিনদিন থাকেন। এই তিনদিন অহোরাত্র নাচে গানে ইঁহারা আসর জমাইয়া রাখেন। একদল বা ঘুমান, তখন আর একদল জাগিয়া উঠেন। তিনদিন ধরিয়া জয়দেবে ইঁহাদের নাচ গানের বিরাম ঘটে না। অতীতদিনে নানাস্থান হইতে মেলায় বহু সাধু সন্তের শুভাগমন হইত। নানা সম্প্রদায়ের সাধু। এখনো কচিৎ দুই একজন আসিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এমন একজন প্রৌঢ় বাউলকে দেখিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়া-ছিলেন। জয়দেবের পশ্চিমদিকে খানিকটা মাঠ, ধানের জমি। মেলার সময় ধান থাকে না। এই মাঠে যাত্রীরা আসিয়া গাড়ী রাখে। সিনেমা-ওয়ালারা তাম্বু ফেলে। নানারকম চাষের সরঞ্জাম—লোহার দুনি, কাঠের লাঙ্গল, ঘরের দুয়ার, জানালা ইত্যাদিও এই মাঠে বিক্রীত হয়। হালের আখড়াধারীদের মধ্যে মনোহর ক্ষ্যাপা একজন। ইহার ভোজৈশ্বর্য দেখিবার মত। কোটরের সন্ন্যাসী আর একজন। সম্প্রতি বেশ সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন—সন্ন্যাসীর সংসার। বীরভূম জেলার সাজিনা গ্রামের শ্রীগদাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কাত্যায়নী আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্বক কিছুদিন হইতে অন্নদানে ব্রতী হইয়াছেন।

জয়দেবের মোহান্ত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ববর্তী মোহান্ত দামোদর ব্রজবাসী আত-তায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহার চেলা শ্রীরামবিহারী ব্রজবাসী গদির মালিক হইয়াছেন। ইহার আমলেই জয়দেবের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সারা বৎসর অন্যত্র বাস করিয়া মেলার কয়দিন আসিয়া ইনি জয়দেবে কাটাইয়া যান। মোহান্তের বাড়ী, দেবমন্দির, অতিথিশালা সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সর্বদিন বিগ্রহের পূজা হয় কিনা সন্দেহ। মোহান্ত কিন্তু নির্বিকার। ইহার একটি মাত্র সদগুণে সরকারী কর্মচারিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ইনি সদা সজাগ। সেজন্য অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

মেলায় লোক আসে আমোদ করিতে, রং তামাসা দেখিতে, জিনিস কিনিতে, কেহ বা সখের খাতিরে, কেহবা পুণ্যার্জনে। মেলায় কেহ কাহাকেও উপদেশ দেয় না। কিন্তু সমস্ত মেলাটার আবহাওয়া অজ্ঞাতসারে অনেক মানুষের উপর একটা অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। গল্পটা বলিতেছি। আমাদের গ্রামের পাশেই বাতিকার গ্রাম। এই গ্রামে একজন প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন—নাম মুকুন্দলাল সিংহ, লোকে বলিত মাখনবাবু। পদাবলী সাহিত্যে ইঁহার অগাধ অধিকার ছিল। রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নের সম্পাদিত উজ্জ্বল নীলমণি ইনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। আবার বিষয়-বুদ্ধিতেও ছিলেন অসাধারণ। গণেশ কীর্তনীয়া ইঁহার প্রিয় কীর্তনীয়া ছিলেন। রসিক দাসকেও ইনি প্রচুর শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রলাল সস্ত্রীক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এইজন্য বাতিকারের কয়েকঘর জমিদার এবং গৃহস্থ কায়স্থ মিলিয়া মাখনবাবুর ধোপা, নাপিত বন্ধ করিতে সচেষ্ট হন। স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের গ্রামের এবং পাশের গ্রামের ব্রাহ্মণেরাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। নানা অছিলায় দুই দলেরই ঘন ঘন লুচি মোণ্ডা এবং মাছের ঝোল জুটিতে লাগিল। বৎসর কয়েক ধরিয়া হুজুগটা ভালই জমিয়াছিল। আমরা পিতৃ-মাতৃহীন দুইভাই আমাদের কুল-দেবতার সেবার একজন প্রতিবেশী অংশীদারের আদেশে মাখনবাবুর বিরুদ্ধ দলে ছিলাম। আমাদের অপর একজন অংশীদার ছিলেন মাখনবাবুর দলে। কখন কিরূপে ব্যাপারটা আপোষ হইয়াছিল মনে নাই। তবে শুনিয়া-ছিলাম মাখনবাবু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাতিকারের কোন সম্পত্তির অংশ দেন নাই। সিউড়ীর বাড়ী এবং বাহিরের জমিদারীর ন্যায্য অংশ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। বাতিকারের এক ভদ্রলোক পাঁচকড়ি ঘোষ তাঁহার আদায় তহসিলের কার্য

করিয়াছেন। মণীন্দ্রলাল বাত্তিকারে আসিলে গ্রামের মধ্যে পৃথক একটি বাড়ীতে থাকিবেন।

ছেলেবেলা হইতেই জয়দেব যাই। শৈশবের কথা বেশ মনে নাই। কৈশোরে গ্রামের কাহারো সংগে যাইতাম। যৌবনে একাকী গিয়াই কয়েক-দিন কাটাইয়া আসিতাম। এক বৎসর গিয়াছি, সবে মাত্র পৌঁছিয়াছি, বেলা প্রায় প্রহরখানেক। মেলায় ঘুরিতেছি, একখানা কাপড় গামছায় বাঁধা, বগলদাবায় রাখিয়াছি, হঠাৎ মণীন্দ্র-লালের সংগে দেখা। হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন,—কোথায় উঠেছ? বলিলাম এইমাত্র তো এলাম, কোথাও উঠি নাই। বলিলেন এস, কোন ভয় নাই। পাঁচু ঘোষ (তাঁহার কর্মচারী) আছে। দ্বিজপদ চক্রবর্তী আছে,—সেই রাঁধিতেছে, সুতরাং এখানে খাইলে তোমার জাতি যাইবে না। এই শীতের দিনে মারা যাবে যে, এস আমি একটা ঘর ভাড়া লইয়াছি। তাহার সংগে গিয়া বাসায় উঠিলাম। অজয়ে স্নান করিয়া আসিয়া খাওয়া দাওয়া সারিলাম। তিনি আমাকে পাতিবার একখানি কম্বল এবং গায়ে দিবার একখানি বিলাতী কম্বল (র‍্যাগ) দিলেন। সারাদিন তাঁহার সঙ্গে মেলায় ঘুরিলাম, আখড়ায় আখড়ায় অন্নদান দেখিলাম। রাত্রেও তিনি আমাকে সংগে লইয়া বাহির হইলেন, বাউলদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিলেন, কীর্তন শুনিলেন, বাউলের গান শুনিলেন, নাচ দেখিলেন। রাত্রে আর কোন কথা হইল না। দুইজনে মাটির কোঠাঘরে উপরে ঘুমাইলাম। পরদিন সকালে বলিলেন, এত সকালে স্নান করিও না। কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যাটা সারিয়া আমার সংগে চল। বাজারে লইয়া গিয়া নিজে কিছু খাইলেন, আমাকেও খাওয়াইলেন। উপদেশ দিলেন, খাওয়ার বিষয়ে অনিয়ম করিও না। পরে আমি মেলায় চলিয়া গেলাম, তিনি বাসায় ফিরিলেন। আমি মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিয়া গামছাখানা লইয়া কদম্বখণ্ডীর ঘাটে স্নান সারিয়া আসিলাম। উপরে শুক্‌না কাপড়খানা ছিল। পায়ে কিছু বালু সামান্য কাদা লাগিয়া আছে। উপরে গিয়া দেখি মণীন্দ্রলাল স্নানের পর একখানি বই লইয়া পড়িতেছেন। আমি শুকনা কাপড়খানি লইয়া ভিজা কাপড় ছাড়ি-তেছি। হঠাৎ মণীন্দ্রলাল আমার একটা পা টানিয়া লইয়া মাথায় ঘষিতে লাগিলেন। টল্ সামলাইতে এক হাতে দেওয়াল ধরিয়া আপত্তি করিতে গিয়া দেখি দুই চোখে অবিরল জলের ধারা নামিয়াছে। মুখে বলিতেছেন—দে, দে। এই বলিয়া আর একটা পা টানিয়া মাথায় ঘসিলেন। সারা মাথায় টাক। দুই পায়ের বালু লাগিয়া তাঁহার টাকে লাল দাগ বসিয়া গেল। বলিতে লাগিলেন—প্রচারের এমন ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। বিজ্ঞাপন দিয়া দিন জানাইতে হয় নাই। টিকিট বেচিয়া টাকার জোগাড় করিতে হয় নাই। সাধিয়া যাচিয়া লোক ডাকিতে হয় নাই। অজয়ের বিছানা, অজয়ের ওড়না। হাজার হাজার নরনারী অবিশ্রান্ত হরিনাম গাহিতেছে, নাচিতেছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। এই অন্নদান, কত লোক খাইতেছে কে আনে, কে রাঁধে? সকলেই স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে, আপন খুসীতে শ্রম স্বীকার করিতেছে। যন্ত্রের মত কাজ, অথচ প্রাণবন্ত-উচ্ছল। বলিহারি তোমাদের মহাপ্রভুকে, এ সমস্তই তাঁহারই প্রভাবের ফল।

গরুর গাড়ীতে বাত্তিকার ফিরিলেন, একখানা গাড়ীতে জিনিষপত্র ও কর্মচারিগণ। অন্যখানিতে তিনি আর আমি। জয়দেব হইতে বাত্তিকার আসিতে কুড়মিঠা হইয়া পথ। কুড়-মিঠায় আমাকে নামাইয়া দিয়া গেলেন। সমস্ত পথ কুড়মিঠায় থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কুড়মিঠায় নামিবার সময় পুনরায় বলিলেন এখানে থাকিও না, মারা পড়িবে। এ স্থান ভদ্রলোকের বাসের স্থান নয়। এ অতি ভয়ানক স্থান। অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করিও। নানা কারণে সেই হিতৈষী বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আজিও ভুগিতেছি এবং দণ্ডে দণ্ডে সেই মানব ধর্মে নিষ্ঠাবান সরল মানুষটির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

যশোদার মাতৃত্ব

(৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দিকে মন দিতে পারলে মনের সব কষ্ট চিন্তা দূর হয়ে যায়। মন আর ফাঁকা থাকতে পারে না, তার সব অভাব মিটে যায়। যার কোনো কিছুই সম্বল নেই, ভগবানই তার সব চেয়ে বড়ো সম্বল। এ কথা জানো?

সে বললে—তা জানি, কিন্তু ভগবানকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয়। তিনি আমাকে অনেক কৃপা করেছিলেন, অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কেবল নিজের মনের সুখ নিয়েই দিন কাটিয়েছি, তাঁর কৃপার দাম কিছুই দিইনি। এখানে তিনি আমায় কিসের জন্যে পাঠিয়েছিলেন? সেটা কখনো ভেবেই দেখিনি। এখন তাই তো এত ভয়, তিনি আমাকে এখানে আর রাখবেন না।

আমি হঠাৎ মরে যাবো, উনি যেমন করে গেলেন। থাকার মতো কিছু কাজ তো নেই।

আমি বললাম—তিনি তোমাকে যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, সে কাজ এখনও তুমি করতে পারো, রাস্তা খোলা রয়েছে তোমার জন্যে।

সে বললে—তাহলে তাই আমাকে বলে দিন। সে কোন্ কাজ?

আমি বললাম—মা হবার জন্যে তুমি জন্মেছ, সেই রাস্তাই আবার ধরো। আবার তুমি বিয়ে করো। তাহলে তোমার কাজ পাবে, মনের সব কিছু ফাঁক ভরাট হয়ে যাবে।

যশোদা বললে—দেখুন, ডাক্তারি বিদ্যা আপনার খুবই থাকতে পারে, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি কিছুমাত্র নেই। যা অসম্ভব কথা তাই আপনি বলছেন।

আমি বললাম—তোমার পক্ষে যা দরকার তাই আমি বলছি।

যশোদা বললে—আপনারা কেবল একটা দিকই দেখেন, অন্য সব দিকগুলো দেখতে পান না। তাই বিধবাদের বলে বসেন, মাছের ঝোল খাও, মুরগির শুরুয়া খাও। তাই কি তারা খেতে পারে? আপনাদের কি, বলে দিয়েই খালাস।

আমি বললাম—প্রাণরক্ষার জন্যে তাও খেতে হবে বৈকি, যেখানে তা নিতান্ত দরকার। তোমাদের শাস্ত্রেও বলেছে, আতুরের জন্যে কোনো নিয়ম নেই।

যশোদা বললে—আপনি বলছেন আবার বিয়ে করতে। কিন্তু বলুন তো, কে আমাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করবে? আর পয়সার লোভে কেউ বিয়ে করতে রাজী হলেও কেমন করে আমি তাকে স্বামী বলে সহ্য করবো?

আমি বললাম—যে লোকটি তোমাকে ছবি আঁকা শেখাতো, কামাক্ষী নাকি যার নাম বললে, তার কি বিয়ে হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই সে বিয়ে করেনি।

যশোদা বললে—না, তার বাপ মা বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে তাতে রাজী হয়নি। এমনি ছবি টবি আঁকে, আর দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় শুনেছি।

আমি বললাম—তোমাকে বিয়ে করতে নিশ্চয়ই সে রাজী হবে।

যশোদা বললে—কিন্তু যাকে আমি একদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, তাকে আজ আমি কোন্ মুখে বলতে যাবো যে তুমি আমায় বিয়ে করো?

আমি বললাম—তাই বলো, ঐখানেই তোমার বাধছে। কিন্তু সে কথা তোমায় বলতেই হবে না। তুমি শুধু তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলো, স্টুডিও প্রস্তুত আপনাকে আমার বিশেষ দরকার, আবার আমি ছবি আঁকতে শিখবো।

যশোদা বললে—কিন্তু ধরুন, আবার বিয়ে করেও যদি ছেলেপুলে আমার না হয়?

আমি বললাম—তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, তোমার মা হবার কাজ করা তাতেও চলবে। মৃত্যুঞ্জয় যখন ছিলেন তখন সেই কাজই করছিলে। তাই ছেলেপুলে তখন না হওয়াতেও ক্ষতি হয়নি।

যশোদা বললে—আপনার কথা একটু ভেবে দেখতে দিন।

আমি বললাম—ভাববার কিছু নেই। এই আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন।

রৌদ্রবিলাস — শংকরনাথ দত্ত

পুরাতনী

॥ গোপাল ভৌমিক ॥

দিনের বেলায়
আলো জেবলে কাজ করে
আলোকানুভূতি
কখন গিয়েছে মরে
সে কথা বোঝার
ক্ষমতাও আজ নেই,
থাকুক আঁধার
ভয় করে আলোকেই।

মনে পড়ে আজ
চোখের প্রদীপ জেবলে
গভীর আঁধার
পার হয়ে অবহেলে
দেখেছি ভোরের
নতুন রবির কর
আকাশ-মাটিতে
ঘটায় স্বয়ম্বর।

পুরাতনী কথা
শুনলেও পাই ভয় ঃ
আলোকের হাতে
আঁধারের দরজায়
যত ঘটে আজ
আঁধার ততই ভয়াবহ হয়ে ওঠে:
শহুরে জলুষ
গাঁয়ে গিয়ে মাথা কোটে।
দুচোখ আলোতে
ভরে নিয়ে তবু মন
ভয়াবহ সেই আঁধারকে চেয়ে
খোঁজে ঝোপ-ঝাড় বন,
মাটির মায়ায় ইট হয় পরবাসী ঃ
ঘুরে ফিরে সেই পুরাতনীতেই আসি।

শেষ অঙ্ক

● রাম বসু ●

সমুদ্র কেড়েছো কিছু অবশিষ্ট নিয়েছো পর্বত
আমার বুকের রক্ত দৈবের উজ্জবল আশীর্বাদ
ভেঙেছো প্রবালকুঞ্জ, ভগ্নস্তূপ সে গঠিত জগৎ
যার তীব্র স্থিতিকাল সময়ের দুর্লভ প্রমাদ।

বিচূর্ণ অক্ষির নীচে অতীতের কথা ও ভর্ৎসনা
রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে চিতা,
অস্তিত্বের ভিতে শোকাবহ
ভিজে-ভিজে অন্ধকার, তার চোখে এমন সান্ত্বনা
কখনও ছিল না যাতে ধন্য হয় আমার প্রত্যহ।

নক্ষত্রের মাটি খসে; শেষ অঙ্ক ঘনায় এখন
রক্তমাখা দৃশ্যপটে বিষাদ আমাকে দ্যাখো তুমি
আপন নিয়তি ভুলে অবিচল; স্থির বনভূমি
প্রসারিত স্তব্ধতার কেন্দ্রে নিয়ে অম্লান শরণ
একটি ধ্বনির মন্ত্র, স্বয়ম্ভিত স্মরণে সত্তার
সুষমা, পদ্মের জন্ম দেখে যাবো এই অপেক্ষায়।

পবিত্র ফুজিয়ামা

রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নীল সমুদ্রে সূর্যের দেশে জাগে
প্রথম আষাঢ়ে পবিত্র ফুজিয়ামা;
টোকিওর সেই রক্ত ঝরানো পথে
[illegible] হিরোশিমা।
সেই রাগ থেকে রক্ত কিরণ নিয়ে
হে কবি ফোটাও শ্রাবণে দীপক রূপ।
জবালামুখে তুমি ফুটন্ত লাভা দিয়ে
অত্যাচারের ওড়াও অন্ধকূপ।

তমসার স্রোতে বেদনা কাঁপছে ক্রোধে,
ঝড়ের ভাষায় প্রলয়কে দাও ডাক,
বজ্র প্রহারে কাঁপুক মনের মাটি,
বাজে জঞ্জাল ফুৎকারে উড়ে যাক।
এত যে অশ্রু অপমানে পড়ে ঝরে,
এত যে রুধির করেছে নদীকে লাল,
দুঃশাসনের ক্ষমা নেই পৃথিবীতে,
নিষ্ঠুর হয়ে জেগে আছে মহাকাল।
শব্দকে তুমি সাজাও পদ্মরাগে
বিশ্বপ্রেমের উজ্জীবনের সুরে:
গভীর রাতের উজ্জবল ফুজিয়ামা
রাঙানো উষাকে থাকতে দিও না দূরে।
নব সৃষ্টির শ্যামল শোভাতে তুমি
আলোকে সেদিন হয়ত' রবে না বেঁচে;
তবুও জনতা ভুলবে না প্রিয় কবি
অমৃতের বাণী রাগিণীতে রেখে গেছে।

পত্রলেখার উক্তি

● চিত্তরঞ্জন মাইতি ●

পাহাড়ের কোলে কোলে
কত যে সূর্যের সোনা ঝরে ঝরে যায়,
কত মেঘ জমে আর
নিষ্ফল স্বপ্নের মত কোথায় হারায়।

আদিম অরণ্য কাঁদে
ঝড়ে ভেঙে গেলে তার গহন হৃদয়,
কত বালু সোনা নিয়ে
সমুদ্রের গর্ভে হয় দ্বীপের সঞ্চয়।

তুমি দেখলে না,
আমার কুমারী মন
বাণবিদ্ধ করে গেল যে বসন্তসেনা।

কত যে কর্ণিকা গুচ্ছে বেঁধেছি কবরী
রেখেছ কি খোঁজ,
এ আঁখির মধুপর্ক দিয়েছে তোমায়
আনন্দের ভোজ ?
মিলনের মধু লগ্নে
প্রণয়ের পত্রলেখা মনে রাখে কেউ,
কূল ছোঁয়া হয়ে গেলে
চিরদিন ফিরে যায় সাগরের ঢেউ।

তুমি চন্দ্রাপীড়,
কোনদিন জানলে না নারীর হৃদয় কি নিবিড়!

আর একটু

◎ গোবিন্দ চক্রবর্তী ◎

আর একটু যদি জানতে—
হয়ত তাহলে মানতে ঃ

যখন গহন তাপার আঁধার
সিন্ধুর রোলে ব্যথা বিস্তার,
সেই হাহাকারই হানতে—
মিলিয়েছিলেন বিধি শেষবার
বিয়াত্রিচে ও দান্তে।

কে বা জানে সেই আদি অঙ্কেতে
নীল নয়নের গূঢ় সঙ্কেতে,
শকুন্তলাই চেয়েছেন কি না
নৃপতিরে কাছে টানতে!

যদি আরেকটু জানতে
মানতে হয়ত মানতে—

উর্বশীরে যে কেন ফাল্গুনী
ফেরালেন; আর অত জাল বুনি
ভদ্রাকে রথে চড়ালেন—
প্রাগজ্যোতিষের কন্যাকে কেন
তবু বন্ধনে জড়ালেন ঃ
ছিল, ছিল আর আরো মানে তার
চেনা মানেটার প্রান্তে।

আরেকটু যদি জানতে—
সেই 'আরো কিছু' থাকে যে রয়েছে,
মানতেই হত, মানতে ঃ

মরুর আড়ালে নদীর ঝলক
মেঘেরা যতই বিদ্রোহী হোক,
নীল রুচিটুকু আনতে
আকাশ নিশানা জেবলে রাখে তাই
ধ্রুব তারা—দিগভ্রান্তে।

ক্ষমা নয়

*** নির্মল দত্ত ***

উৎখাত মানুষেরা ভিড় করে—
বর্বরতার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট,
লাঞ্ছিত মানবতা কেঁদে ফেরে।—
নির্লজ্জ সভ্যতার নির্মম পরিচয়!

নারীর ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি;
তাজা খুনে রাজপথ হ'ল লাল,—
দুর্জনেরা তাথৈ নৃত্য করে।—
প্রতিকারহীন বিচারের সংশয়!

আজ বলীয়ান হও বীর-দর্পে,
অবোধ জড়তাকে কর দূর,
অত্যাচারীর ভাঙ উদ্ধত বাহু;—
ধর গান্ডীব-ধনু। ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়।

অভিসারে

দেবেশ দাশ

জীবন আর জাপানীদের মধ্যে মোট দু'শো গজের তফাৎ।

মাঝে মাঝে মনে হয় বোধ হয় সেটুকুও নয়। জাপানী জিরো বমারগুলো জুম জুম করে নেমে আসে। বাজ-পাখীর মত কঠিন তাক করে তীব্র হাঁক দিয়ে ছোঁ মেরে উড়ে যায়। ফটাশ্ ফটাশ্ ফট্ করে গুলীর তুবড়ী ছড়িয়ে দেয়।

আমরা দুশোজন সৈন্যের দুটো কোম্পানী ট্রেঞ্চের উপর লতাপাতা ডালের ক্যামোফ্লাজ করা ঢাকনার তলায় লম্বা হয়ে কড়িকাঠ গুণি।

না। ঠিক হল না। মুখ মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে আমাদের কোল্ড মটেন অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাংসপিণ্ডটাকে জিইয়ে রাখবার সাধনা করি।

দু-পাশ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে দুটো বিরাট 'বুম' অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়োর লাইন। জংলী গাছ আর লতাপাতায় ভরা এই বুম দুটো পার হয়ে পাশ থেকে আক্রমণ হবে না। জাপানী শত্রুও তা করবে না। আর এই দুই পাহাড়ের লাইনের মাঝখানের প্রায় সমতল জমিটুকু আমরা আগে থেকেই দখল করে রেখেছি। আমরা মানে আমাদের এই নতুন গড়া আনকোরা কোম্পানী দুটো।

এগোবার আশা নেই। সামনে জাপানী সৈন্যদল চিন্দুইন নদীর বন্যার মত দুর্বারভাবে এগিয়ে আসছে। পেছোবার পথ নেই। পিছনে আমাদের প্রায় ভেঙে ছনছান হয়ে যাওয়া ব্রিগেড কতগুলো ছোট নদীর উপর রবারের ডোঙা দিয়ে ভাসানে পুল তৈরী করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ সেই অছিলায় প্রথমে আপনা প্রাণ বাঁচাবার পথ ঠিক করছে। জিরো বম্বারগুলো পাহাড়ের চূড়োর উপর দিয়ে ডিঙিয়ে এসে বোমা দিয়ে পোলগুলো ভেঙে নস্যাৎ করে গেছে কদিন আগে। গোটা ডিভিসনটাই ইঁদুর কলের মধ্যে ধরা পড়ত; কিন্তু কি ভাগ্যিস ইংরেজ সৈন্যরাই পথ দেখিয়ে আগুয়ান হয়ে যাচ্ছিল।

শ্ শ্ কেউ যেন না বলে বসে যে ওরা সবার আগে পালাচ্ছিল। ওরা সাম্রাজ্য তৈরী করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল প্রায় দুশো বছর আগে। এখনো সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই পেছন পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গা বাঁচিয়ে হটে যাওয়াকে হার বলা যায় না। আগুয়ান শত্রুকে পিঠ দেখানোকে বলা যায় না পালানো।

মোট কথা আমাদের এই ব্রিগেডটাই পেছু হটা লড়াইয়ে সবার পেছনে অর্থাৎ আগে ছিল। আনকোরা রঙরুট সব লাস্ট কাম লাস্ট সার্ভড—থুড়ি লাস্ট সেভড—এতে অন্যায় কিছু নেই।

এই দুটো কোম্পানীই আবার তারো মধ্যে সবার শেষে অর্থাৎ জাপানী বন্যাস্রোতের সামনে সবার প্রথমে। আমাদের উপর কড়া হুকুম : যেমন করেই পার ট্রেঞ্চ খুঁড়ে এই ফাঁকটা আটকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের উপরই সমস্তটা ডিভিসনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আমাদের অপারেশন অর্ডারের মধ্যে রয়েছে একটা মহান মিশন।

রেঙ্গুনে যখন প্রথম এ. আর. পি দল তৈরী হল, সেখানকার অসামরিক লোকরা কি হাসিই না হাসত! বলত—এ. আর. পি নয়। ওটার মানে হচ্ছে এলো রে পালা। আর আমাদের বর্তমান এই ব্রিগেডের পালানোর তৎপরতা দেখলে বর্মার বাঙ্গালীরা বোধ হয় হাসতেও ভুলে যেত।

কিন্তু আমরাও হাসতে ভুলে গেছি।

এই নো-ম্যানস ল্যাণ্ড—যেখানে শুধু আমি আছি আর আমার শত্রু আছে, সেখানে হয় সে আমাকে মারবে অথবা নিজে বাঁচবার জন্য আমি তাকে মারব—সেখানে আমরা এই রাতে হাসতেও পারছি না।

আজ ভোরে আমাদের দুটো কোম্পানীর সবে ধন অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর ক্যাপ্টেন একটা জাপানী শেলে ঘায়েল হয়েছেন। শুধু যদি মরে যেতেন তাতেও ক্ষতি ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু ওর ব্যাটল ড্রেসের একটা হাতা শেলের ঘায়ে জামা আর হাত থেকে ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে আমাদের ক্যামোফ্লজের একটা উঁচু ডালের উপর আটকিয়ে গেছে। আমরা সামনে তাকাতে সাহস পাই না; ফিল্ড টেলিসকোপে জাপানী-দের নড়াচড়া দেখলেও শিরদাঁড়া সিরসির করে ওঠে। পেছনে তাকালেও ভয় হয় ক্যাপ্টেনের ওই হাতটা ঝুলতে দেখে। কোম্পানীর নেতা, একমাত্র ইংরেজ, অপরাজেয় ইংরেজ, তার হাতটা যে দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্য কোম্পানীর অফিসার আগেই ঘায়েল হয়েছিলেন।

তাই আমরা ভয়ে কোন দিকেই তাকাচ্ছি না। সারাদিন জাপানীরা ওই হাতটা তাক করে ফায়ার করেছে। ওটাকে ফালি ফালি করে আমাদের বুকগুলোও ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ওটারই নিশানা ধরে নিজেদের লাইনের পেছনে যে মেশিনগানগুলো ছিল সেগুলি দিয়ে আমাদের ট্রেঞ্চের লাইনটা টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আমার চারপাশে এই লাইনটুকু টিকে আছে এখনো। সেখানেই দু-পাশ থেকে যারা এখনো বেঁচে আছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে জড়ো হয়েছে। ফিস ফিস করে, কিন্তু পাগলের মত উত্তেজিত হয়ে বলছে—কি করব, কি করে বাঁচব বলে দিন লেফটেনান্ট সাব, আমিই এখন ওদের অফিসার কম্যাণ্ডিং।

আমি লেফটেনান্ট দত্ত, কলকাতায় হগ-মার্কেটের দোকানে সার্ডিন মাছের টিন জানলার পাশে শো-কেসে সাজানো দেখতাম। প্যাকড লাইক সার্ডিনস কথাটা বইয়ে পড়ে ছিলাম। মিলিটারী মেসে খেতে বসে যখন সার্ডিনের ইলিশের মত আঁশটে গন্ধে আকুল হয়ে উঠেছি তখন কিন্তু কথাটির মানে মনে

হয়নি। এখন এই রাতে এই ট্রেঞ্চে গাদাগাদি করে আমার জোয়ানরা যখন চারদিকে চেপে আমার কাছে এসে শুয়ে পড়েছে তখন কথাটার মানে মনে এল। আমি ছাড়া আর কোন অফিসার—ছোট, মেজো, বড় কেউ আর এই কোম্পানীতে বেঁচে নেই।

এমন সময় আবার শেল পড়তে সুরু হল। হঠাৎ ভিজে স্যাঁতসেতে মাটিতেই আমরা মাথা প্রায় কবরস্থ করে শুয়ে পড়লাম। শেল পড়তে সুরু হয়েছে। এই মাটি, এই মাটির ভেজা স্যাঁতসেতে গন্ধ নিয়ে কলকাতায় কত কাব্য করেছি। এই মাটিতে নতুন চেরাই করা কাঠের পরিচিত মিঠে গন্ধ, বসন্তের শরতের বর্ষার আদুরে শিরশিরে পরশ। কিন্তু তারই মধ্যে নতুন একটা অনুভূতি এসে গেল। হঠাৎ যেন সবচেয়ে তুচ্ছ, সবচেয়ে স্বল্পায়ু জীব জগতের তলায় নেমে এলাম। পোকামাকড় যারা হতচ্ছাড়াভাবে মাটিতে হামা দিয়ে বেড়ায় তাদের চেয়ে বড় আমি কিছু নই। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে এই কদিন ধরে শেল পড়া, মেশিনগানের গুলী চলা সব কিছু সত্ত্বেও ওরা নিশ্চিতভাবে চলা-ফেরা করেছে। আমাদের ভয়, চকিত চমক ওদের বিচলিত করেনি। মাছি, মশারা পরম নিশ্চিন্তভাবে উদাসীনভাবে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেরিয়েছে। আবার দু-পশলা গোলা বৃষ্টির মাঝে নিশিথিনীর নীরবতা ভেঙে দুয়েকটা পাপিয়া পাল্লা দিয়ে গেয়ে উঠেছে—পিউ কাঁহা।

এদিকে ততক্ষণে আমরা ফাইটিং নাইফ অর্থাৎ কুকরী দিয়ে আরো মাটি খুঁড়ছি। নীরবে কিন্তু ভূতে পাওয়া উত্তেজনায়। শ্রাং শ্রাং শা এক একটা গোলা যেন কান ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই যেমন করেই হোক আরো খানিকটা মাটি খুঁড়ে অন্ততঃ মাথা আর কান-দুটো তার মধ্যে সেঁধিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ কুকরীটা হাত থেকে ফস্কে কোথায় ছিটকে পড়ল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখা সম্ভব নয়। পাগলের মত দশটা আঙুল দিয়েই আবো মাটি খুঁড়তে লাগলাম। ট্রেঞ্চ হচ্ছে পুরো শরীরের কবর। কিন্তু তাতে কুলোবে না। মাথার জন্য আলাদা আরো গভীর কবর চাই।

হঠাৎ মনে হল এই কান ফাটানো গোলা-গুলীই হচ্ছে জীবনের চিহ্ন। এই পাখী, এই পোকামাকড় এরাই মৃত্যু। মৃত্যুর হাতছানি। একবার মনে হল ছুটে এই ক্যামোফ্লাজের ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাই। এই গাছপালা ডালের আড়ালই আমাদের আসল দুষমণ। উপরের সুন্দর পৃথিবী, আলো বাতাস বসন্ত শ্যামল মাটি আর সুনীল আকাশ থেকে আড়াল করে রাখা শত্রু।

আমুক সিং অন্য জোয়ানদের চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে। মুখে মুখে অঙ্ক কষে বলল যে, জাপানীরা আমাদের পাল্লা ঠিক মত পেয়ে ফেলেছে। তাই দু-পাশের ট্রেঞ্চের লাইন গুঁড়িয়ে দিয়ে পেছনের পালাবার পথ তছনছ করে ওদের শেলের পাল্লা হিসাব করে আমাদের উপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

মিনিটখানেক পরে বলল—ওই দেখুন লেফটেনান্ট গাছগুলো মড় মড় করে উঠছে শেলের বাতাসের ধাক্কায়। ওদের পাল্লা আরো ছোট করে গুটিয়ে আনছে। আর পাঁচ মিনিট।

ওর মুখটা জোর করে গর্তে সেঁধিয়ে দিলাম।

গ্রীবিল আমার পা জড়িয়ে ধরল—
ওই শেলগুলো বর্তানীয়ার স্টীল
ওয়ার্কসের তৈরী।
দাঁত চেপে শাসালাম—
কি করে জানলে কোন্ স্টীলে ওগুলো তৈরী, চুপ করে পড়ে থাক।

ও শুনল না। ভেজা স্বরে শুকনো গলায় বলল—আমি সায়ান্টিফিকভাবে যাচাই করে দেখেছি। না হলে অত হাড়-কাপানো আওয়াজ হয় না।

ততক্ষণে আরেকটা শেলের টুকরোগুলো আমাদের মাথার প্রায় উপর লোহার বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডালপালার ছাউনী উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর একজন প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়ে কোন রকমে নিজকে সামলে নিল। যেন জ্যান্ত কবরের ভিতর থেকে ওর আওয়াজ বেরিয়ে এল—আমার টাক মেরা গাঞ্জা। আমার টাকটা এত চকচকে যে, জাপানীরা দূর থেকেই ওটা দেখে নিশানা করতে পারবে। পাগলের মত দু হাত দিয়ে সে মাথার উপর মাটি চাপা দিতে লাগল।

আমুক সিং একবার মিনতি করে আমার জিজ্ঞেস করল— মরে যাবার আগে এখান থেকে একবার বেরোবার চেষ্টা করলে হয় না? অর্ডার দিন, অর্ডার দিন লেফটেনান্ট সাব। চুহা কা তরহ, মরনা নাহি চাহতা।

চুপ, চুপ করে রইলাম। পিছনে ক্যাপ্টেনের হাতের হাতাটা এখনো দক্ষিণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে কি না কে জানে। একটু পরে বললাম—মরার ভান করে পড়ে থাক, কোম্পানী।

ওর দাড়ি গোঁফের মধ্যে দিয়ে যে কথাগুলি ফিস ফিস করে বেরোল তাদের মানে আমি হলফ করে বলতে পারব না। তবে সম্ভবতঃ আমুক বলে ছিল, অন্ততঃ ভেবেছিল—শালার অফিসার, ভেতো আর ধুতো বাঙালী। পালাবার হুকুমও দিতে পারে না ভীতু কোথাকার।

যাই বলে থুকুক হজম করে গেলাম। আমার নেই বাকী কোন কম্যান্ডের জোর; কোম্পানীর নেই কোন ডিসিপ্লিন।

তারপর—তারপর একটা নিরন্ধ্র নীরবতা নামল। সমস্তটা জগৎ, আমাদের জগৎ, আমাদের জীবন জুড়ে। শত্রুপক্ষের শেল দাগা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই নীরবতা আমাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আনল। এ ত আমাদের চেনা গ্রামের মাঠঘাটের শান্তিময় নীরবতা নয়, মধ্যরাতের তারার হাসিতে ভরা অন্ধকার। আগে যত নীরবতা অনুভব করেছি তা ছিল শব্দহীনতা, নিঃশব্দতা। আর এখন মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে শব্দ শুনতে পারার অক্ষমতা। শব্দ যেন আমাদের চারপাশে অরণ্যের হিংস্র পশুর মত ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে; ঘিরে রয়েছে আমাদের ওই দুপাশের ব্রহ্ম পাহাড়ের চূড়া-গুলো, সামনের ওই জাপানীদের ট্রেঞ্চ মায় কামানঘাটি, পিছনের ওই ভাঙা পোলের তলার কলোচ্ছ্বসিত মৃত্যুস্রোতগুলোর সব কিছুতে ছড়িয়ে, জড়িয়ে।

অনেক দূরে হঠাৎ যেন একবার নিঃশব্দতার বুক চিরে একটা মর্টার বা অন্য কিছুর আর্তনাদ বেরিয়ে এল। আমরা চমকিয়ে উঠলাম। সচকিত হয়ে বুঝলাম যে, না, মর্টার নয়। জাপানীদের কোন ফিল্ড মাইন ওদেরি দলের কারো অন্ধকারে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেষ করে দিয়েছে। না। এ-ও ঠিক শব্দ হল না। এ ত শুধু নিঃশব্দতা কথা কয়ে উঠল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ঈশ্বর নামে যে অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টর এই পৃথিবীর বিশ্বসঙ্গীতি বাজায় তার হাতের মায়াকাঠিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বন্দনা। পাড়ার মেয়ে বললে কিছুই বলা হয় না। সমস্তটা অঞ্চলের স্বপ্ন। ধনে প্রতিষ্ঠায় শিক্ষায় সবচেয়ে মানী অভিজাতের তরুণী কন্যা। তার পরের কথাগুলি আর পুনরাবৃত্তি না-ই করলাম। সে ত পরিচিত বহু বাঙালী অন্তরের ব্যর্থ যৌবনের পরাজয়ের কাহিনী। তা শুনতে মধুর; শোনাতে আরো মধুর। আর সাহিত্যিকদের কারো কানে কাহিনীটা একবার পৌঁছালে ত একখানা উপন্যাসই হয়ে যাবে।

সেই বন্দনা।

সংসারে আর কোন দিকেই কোন সুবিধা করতে পারলাম না। সে বিমুখ ছিল না। কিন্তু কোন্ মুখে তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? বলব যে তার মেয়েকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চাই। কি দেখাব সম্পদ, দেবো কোন্ পরিচয়? বাপের হোটেলের দৌলতে দেহ রক্ষা চলে, দেহলী ভরে তোলা যায় না। মুখ চালানো চলে; কিন্তু মুখ থাকে না। আর এই যুদ্ধের বাজারে চাকরী একটা জোটানো চলে; কিন্তু বরমাল্যের জন্য যোগ্যতর প্রার্থীর অভাব নেই।

আধুনিকা বাঙালিনীরাও কেমন যেন বরনারীর চেয়ে বীর নারী অর্থাৎ বীর যে বরমাল্য দিতে উৎসুক হয়ে উঠেছে এই যুদ্ধের বাজারে। শুধু চাকুরে শান্তশিষ্ট বর আর বর-নারীদের প্রার্থনার বর হিসাবে ঠাঁই পাচ্ছে না। মরিয়া হয়ে এমার্জেন্সী কমিশনের জন্য দরখাস্ত করব বলে বন্দনাকে জানিয়েছিলাম।

হেসে বন্দনা উড়িয়ে দিয়েছিল,—আর বলেছিল, আহা দেখো যেন ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যেয়ো না। জাপানী ক্রাইসানথিমামগুলো আবার তাবড় তাবড় সাইজের হয়। তা নিশ্চয়ই জান, কবি।

কবিতা লেখার জন্য এমন দাম নিশ্চয়ই আর কোন বাঙালী যুবকের দুর্ভাগ্যে জোটে নি।

মনে পড়ল যে কিছুদিন থেকে যত্ন করে ধুতি কুঁচিয়ে পরার দিকে নজর গিয়েছিল। তাতে বাড়তি খরচ ছিল না; ছিল বরণীয় রুচির বিজ্ঞাপন। কোনদিনই কবি কবি চেহারা ছিল না। হ্যাংলা হাল্কা দেহ অবশ্য ছিল না। কবিদের মত ভাবের তুফানে উড়ে যাবারও ভয় ছিল না। মাথার চুলের প্রাচুর্য আর ঢেউ কবিত্বের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল। বন্দনা এবার একটা তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ করে বলেছিল,—বাইরেলের ম্যামজা

আর ডিলাইলার গল্প জান ত। ঝাঁকড়া চুলের মধ্যেই স্যামসনের যত জোর ছিল। তুমিও বোধ হয় চুল ঝাঁকড়িয়েই জাপদের...।

সইতে না পেরে সরে এসেছিলাম। আমি কবি, দুর্বল, অপদার্থ। তাই মুখ ফুটে এটুকুও বলতে পারিনি,—দেখে নিয়ো তুমি, একদিন সত্যি যুদ্ধ জিতে ফিরে আসব। সেদিন পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।

কিন্তু আমি পেছন ফিরে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ও যেন নতুন আর কেউ। গম্ভীরভাবে বলেছিল—আমি ত রইলাম ওই জানলার গরাদের ওপারে বন্দিনী। যদি তুমি বীর হও, যদি তুমি বড় হও.......

তারপর সে-ও মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। শিকের ওপারে বন্দিনী। এমনভাবে আর কোনদিন সে নিজের মনকে খুলে দেখায় নি। আমার অবশ্যই এমার্জেন্সী কমিশন যোগাড় করতে হবে।

* * *

বোঁ-ও, বোঁ-ও, বোঁ-ও করে বোমারু বিমানগুলো আমার চারদিকে নেমে আসছে। তাক করে, নির্ঘাৎ আমাকেই তাক করে নেমে আসছে। না, শুধু যে নেমে এল তা নয়, আমায় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। উপরে নীচে পাশে সর্বত্র। কিন্তু আওয়াজ খুব বেশী নয়। বোধহয় হঠাৎ হামলার জন্য ইঞ্জিনগুলোতে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়েছে। আর জম্ জম্ করে মেশিনগান থেকে বুলেটও ছুঁড়ছে না। বোধ হয় জীবন্ত বন্দী করে নিয়ে যাবে; আর বিদ্যুতের মত গতিতে আমাকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে এগিয়েও যাচ্ছে না। শুধু আমার চারদিকেই বোঁ-ও, বোঁ-ও করে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছে। যমদূতের ষাঁড়গুলো সম্ভবতঃ এরকম করেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কোথায় আগুনের হল্কা ভরা গুলী, কোথায়। এর চেয়ে আমায় না হয় একটা নাইন-পাউণ্ডার বোমা দিয়েই সাবড়ে দাও।

আমি আছি রাজী
অভিসারে সাজি
মরণ মহোৎসবে ......

আরো কিসব কবিতা লিখেছিলাম। সত্যি আমি আজ রাজী আছি। কই নাইন পাউন্ডার একখানা ঝেড়ে দাও।

* * *

অস্থির হয়ে তন্দ্রা ভেঙ্গে উঠে পড়লাম। কোথায় বন্দনা, কোথায় বোমারু বিমান। চারদিকে শুধু মশার দঙ্গল, কামান দাগছে। বোঁ-ও, বোঁও করে দলে দলে নেমে এসে কামড়াচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মশারী, মুখ ঢাকবার জাল, সিট্রোনেলা মলম সবই কম্যান্ড থেকে দিয়েছিল। সেসব লটবহর চাপিয়ে বড়দিনের রাতে স্যান্টাক্লজের মত মূর্তি নিয়ে বর্মা ফ্রন্টে রওনা হয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন শুধু সাবমেশিন গান আর জান নিয়েও পালাতে পথ পাচ্ছি না।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। একটা ভেরী লাইটের হাউই উড়িয়েছে জাপানী লাইনের পিছনে। সবুজ সবুজ, টকটকে সবুজ আলোর একটি ফোয়ারা যেন আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ফিল্ড টেলিসকোপে চোখ লাগিয়ে প্রাণপণে সামনের দিকটা নজর করে দেখলাম। আমাদের ট্রেঞ্চের ঠিক সামনে ওই দুশো গজ দূরে

একালের খেলা : রাণা সরকার

মেশিনগান বেশ জুৎসই করে বসান হয়ে গেছে। তাদের নলের চোঙ্গাগুলো যমদূতের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্ত চক্ষু থেকে আগুন একবার ছাড়লেই হল।

সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। অত যে শেল ছোড়া হচ্ছিল সেটা শুধু বাইরের আবরণ। শেলের ছাতার আড়ালে মেশিনগান বসান হচ্ছিল। আজ শেষ রাতেই......শেষ রাতেই।

তার আগে আমাদের একটু ধোঁকা দিয়ে ঠান্ডা করে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ওই নীরবতা। ততক্ষণে জাপানীরাও বোধ হয় একটু খেয়ে জিরিয়ে নিয়েছে। এইবার।

ওই ভেরী লাইটের সবুজ আলোয় শ্যামকান্তি বর্মা আর বনজঙ্গলকে ভাসিয়ে ওরা একবার যাচাই করে নিল এই ট্রেঞ্চ ছাড়া আমাদের আর কোন ঘাঁটি বা নতুন সরবরাহ করা রি-ইনফোর্সমেন্ট আছে কিনা। এইবার।

একবার আমার ব্যাটল ড্রেসের উপর কাঁধে বোনাই করা তারা, আমার অফিসার পদের চিহ্ন তারার উপর হাত বুলিয়ে নিলাম। মা যেমন করে তার শিশু সন্তানের কপালে হাত বুলিয়ে তাকে রক্ষা করতে চায়। তারপর অন্ধকারেই কোম্পানীর বাকী সব সৈন্যদের ফিস ফিস করে তৈরী হবার অর্ডার মুখে মুখে চালু করে দিলাম।

ওরা হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেল। পালাতে চেয়েছিল; তার হুকুম দিতে পারার মত হিম্মত হয় নি। বাচতে চেয়েছিল, মরবার ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু হুকুম দেবার সাহস হয় নি। আর এখন কিনা বলছি পেটে হামাগুড়ি দিয়ে বেয়ে বেয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে ওই মেশিনগানের নীড়গুলো দখল করতে হবে।

আমৃক সিং অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল—সাত্যি, অফসার সাব, সত্যি? ওরা কিন্তু কচুকাটা করে ফেলবে মেশিনগান চালিয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস করে বললাম—ঠিক সেইজন্যই হামলা করব। এখনি। এখনই ওই মেশিনগান নেস্ট দখল করব। ওগুলির মুখ ওদেরই ট্রেঞ্চের দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করব। কোম্পানীই-ই—য়্যাডভ্যান্স।

নিরন্ধ্র অন্ধকার আমাদের চারদিক থেকে পিষে শ্বাসরোধ করে দিতে চাচ্ছে। তবু হামা দিয়ে হামলা করতে এগিয়ে চলেছি। আমায় আমার নেতাহীন কোম্পানী অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছে। আমার সামনের জায়গাটা যেন একটা অন্ধকারের চলন্ত ঢ্যালা। আমার সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে এগিয়ে চলেছে। একবার ভয়ানক প্রস্রাব পেল; মাত্র একবার। তারপর চেপে গেলাম। হাজার আন্টেক ফুট উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলো ইস্পাত-নীল আকাশে মাথা তুলে চোখ তুলে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দুপাশে মহামার বোমার উৎখাত জংলা জমিগুলিতে যেন ছায়ায় ছায়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাদের নজরের সামনে কি......? ছিঃ।

পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আমৃক সিং, আসছে প্রীবাল, আসছে গোটা নিউ পাঞ্জাব লাইট ইনফ্যান্ট্রির 'সি' কোম্পানী। ওরা আমার ভেতো আর ধুতো বলেছিল, ভীতু ভেবেছিল। ওদের পালাতে হুকুম দেবারও সাহস আমার ছিল না।

আর পিছনে আরো কে যেন আসছে। না। পিছনে নয়, সামনে। না, সামনে নয় চারপাশে। বন্দনার বর্ণনার ওই বড় বড় ক্রাইসানথিমাম ফুলগুলো নয় ত? একবার ওর মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সময় হল না। জানলার গরাদের ওপারে বন্দনা বন্দী হয়ে আছে। ওকে মুক্ত করে আনতে হবে। আমার যৌবনের পরম রাত্রির চরম অভিসার।

এবার মেশিনগানগুলোর প্রায় সামনে এসে পড়েছি। আর পেটে পেটে হাঁটা নয়। একবার হাঁটুতে হাতেতে চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ আবার একটা ভেরী লাইটের হাউস আকাশে উড়ে গেল। সব সবুজে সবুজ। আশার রঙ, আশ্বাসের রঙ। মেশিনগানগুলির সামনে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হুইল ঘুরিয়ে ওগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম।

মুখোমুখি। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বন্দনা জানলার গরাদের ওপারে বন্দিনী। আমার হাতে তার কারাগার ভাঙ্গবার অস্ত্র। ট্রেঞ্চের জমাট সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আর নাকে লাগছে না। ক্রিসনথিমামে গন্ধ আছে না কি? তার সাইজ কত বড়?

থাক। হিসেবে দরকার নেই। কোম্পানী-ই ফা-য়া-র।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসে নিরঞ্জনের ভাবনা তত বাড়ে! কাজটা হয়ত সমীচীন হচ্ছে না! মা-বাবার সাধ মেটাবার জন্যে এ বিয়েতে তার সম্মতি দেওয়া উচিত হয়নি! আই. এ; বি. এ; নয়, একেবারে সদ্য এম-এ পাশকরা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে? তাও আবার ইংরিজীর এম-এ। গুরুমশাইকে দূর থেকে আসতে দেখলে পাঠশালের ছাত্রদের বুকের মধ্যেটা যেমন করতে থাকে ওর মনের অবস্থা অনেকটা সেই রকম, মুখে তা প্রকাশ করা যায় না।

নিরঞ্জনের বাবার যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! সব পিতাই পুত্রস্নেহে অন্ধ, তা বলে নিজের ছেলের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় কতদূর, তার চেয়েও ত কেউ বেশী জানে না? কেবল যে সে আই. এ পাশ করতে পারেনি তাই যায়, তার আগে দু'বার টেস্টে ফেল করে এবং আরো বারতিনেকের চেষ্টায় তবে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনের গন্ডীটা কোন রকমে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাও আবার থার্ড ডিভিশনে। আর সবচেয়ে লজ্জার কথা, প্রতিবারেই সে ফেল করেছিল, ওই ইংরিজীতে। তার জীবনসঙ্গিনী হবে কিনা ওই ইংরিজীতে বিদ্যাদিগ্‌গজ মেয়ে? যার সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা আর এক শয্যায় শয়ন করা! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার চেয়ে এখনো সময় আছে। মাকে ডেকে বলবে, বাবাকে এ বিয়ে ভেঙে দিতে। পাকা দেখার পরও ত কত বিয়ে ভেঙে যায়!

কিন্তু সে-আশা বৃথা, তাও সে জানে। অগত্যা ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় নিরঞ্জন। বাবাকে বোঝানো শক্ত। তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ধারণা বিবাহের ক্ষেত্রে পাশ ও ফেল-এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখানে আছে শুধু একমাত্র পার্থক্য ধনী ও দরিদ্রের। লোকে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, দু'তিনটে পাশ করে কেবল অর্থ উপার্জনের জন্যে কাজেই যার সে অর্থ আছে, তার কাছে ওই ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলো আর ঠোঙা তৈরীর কাগজে কোন তফাৎ নেই! নিরঞ্জনের বাবা যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড় লোক, যাকে বলে লক্ষপতি। লেখাপড়া যেমন শেখেননি বা শেখার জন্যে কোনদিন সাধনা করেননি তেমনি লক্ষ্মীর আরাধনা করার জন্যেও উদয় অস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়নি। কালোবাজারের কোন্ চোরাপথে যে তাঁর বাণিজ্য লক্ষ্মী লোহার সিন্দুকে এসে ঢুকেছিলেন সে আলোচনা থাক। মোটকথা তিনি টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না। যার টাকা আছে তার সব আছে। দুনিয়ায় এমন কিছু নেই, যা তার পক্ষে সহজলভ্য নয়। আর এটা তিনি হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলেন পুত্রবধূ নির্বাচন করতে গিয়ে। তবু বাবার এই মতটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না নিরঞ্জন কেন কে জানে। বাবার নিরক্ষরতার কথা ভেবে তার মনে অনুকম্পা জাগে। হায়, এম. এ—এই কথাটার সম্যক অর্থ যদি তিনি বুঝতেন! 'মাস্টার অফ আর্টস'—কি সহজ ব্যাপার! একেবারে যাকে বলে বিদ্যের জাহাজ! তার সঙ্গে তুলনা করলে ও কি? একটা মালটানা গাধাবোট ত নয়ই, এমন কি 'ল্যাংবোট'ও বলা চলে না! বাবার ওপর এবার রাগ হয় তার। আর মেয়ে খুঁজে পেলেন না তিনি পুত্রবধূ করার মত? কেন, বাংলাদেশে কি মড়ক লেগেছে আইবুড়ো মেয়েদের?

আসলে বাবার অন্তরের দুর্বলতা যে কোথায়, তাও নিরঞ্জনের অজানা নেই। আজ তিনি লক্ষপতি। বাড়ী গাড়ী ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যেমন সব হয়েছে, তেমনি যে ধনী সমাজে তিনি সব সময় ওঠাবসা করেন সেখানে কেবল পুরুষ নয়, মেয়েরাও সব শিক্ষিতা একটা দু'টো তিনটে পাশ [illegible] বাটেই বিলেত [illegible] এই সময় নিজের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে তখন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে তাঁর বুক থেকে। তিনটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই যখন তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না, তাদের প্রাইভেট টিউটর রেখে তখন পড়াবার মত সঙ্গতি ছিল না। তারপর যখন সে অবস্থা এলো তখন তিনটে ছেলেই গেল বিগড়ে—বড়লোকের ছেলেরা যেমন যায়। কোন রকমে নিরঞ্জনের ওইটুকু হয়েছিল অর্থাৎ সরস্বতীর রেজেস্ট্রী খাতায় নামটা উঠেছিল মাত্র! নিরঞ্জনের বাবা তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন টাকা-পয়সা খরচ করে নিজের ছেলেদের মগজে বিদ্যাসাগর করতে পারেননি বটে কিন্তু পয়সার জোরে বিদুষী মেয়েকে ঘরে এনে পুষিয়ে নেবেন। তিনি দেখিয়ে দেবেন। নিজের ঘরে আলো জ্বললো না বলে অন্ধকারে না থেকে বাজার থেকে লণ্ঠন কিনে এনে আলো জ্বালাবেন না কেন? পুত্রের বদলে পুত্রবধূকে দিয়ে তিনি যদি শূন্যস্থান পূর্ণ করে সাধ মেটাতে চান, কার সাধ্য তাঁকে বাধা দেয়। মায়ের মুখ থেকে নিরঞ্জন প্রথম যখন তার বাবার এই শিক্ষিত পুত্রবধূর সাধের কথা শুনেছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তোমার এই মূর্খ ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন শিক্ষিতা মেয়েরা?

মা ফোঁস করে উঠেছিলেন। বি, এ-এম, এ পাশ করা কত মেয়ের বাপের হেঁটে হেঁটে রোজ জুতোর গোড়ালী ক্ষয়ে গেল, জানিস?

এ্যাঁ-বলো কি? কথাটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

সত্যি বলছি রে। শনিবার দিন একটি চমৎকার মেয়ে দেখে একেবারে কথা দিয়ে এসেছি আমরা। মেয়েটি এম এ পাশ, তায় ওপর ভারী সুন্দর দেখতে এবং খুব বনেদীঘরের মেয়ে! কেঁপে উঠেছিল তখন নিরঞ্জনের গলাটা, না-না, তা কেমন করে সম্ভব হয় মা।

কেন হয় না। মেয়ে এম এ পাশ করেছে বলে কি তার [illegible] সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। [illegible]
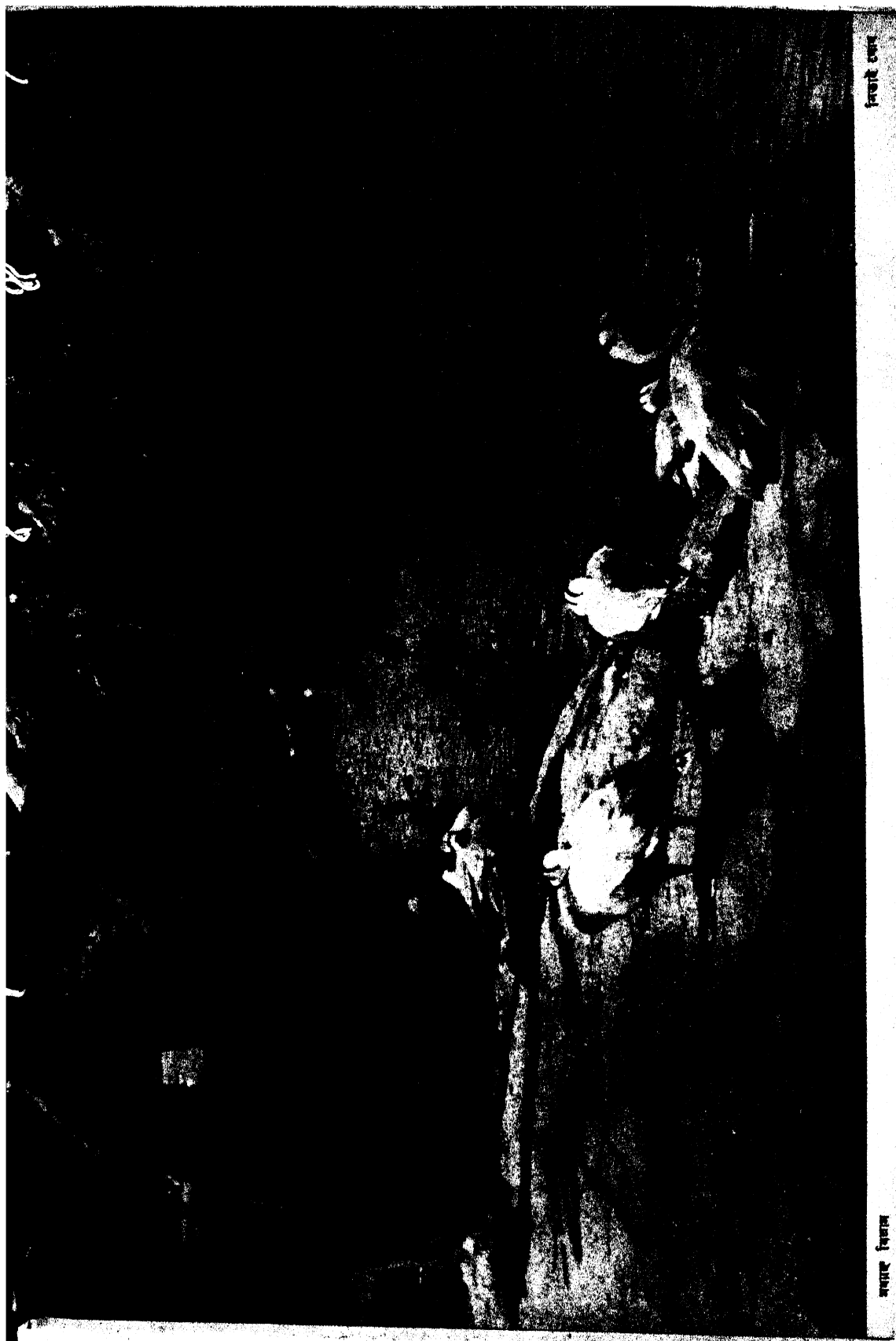
মধ্যাহ্ন বিশ্রাম — নিতাই ঘোষ

গয়না—মেয়েদের ওই ডিগ্রীগুলো তেমনি। বিয়ের বাজারে মেয়েদের মূল্য তারা শুধু বাড়িয়ে দেয়। নইলে আমি বা তাকে ঘরের বৌ করে আনতে যাবো কেন? মেয়ের কি দেশে অভাব?

কিন্তু মা, তোমার ছেলে যে মোটে একটা পাশ, তাও কেঁদে ককিয়ে!

আমি ত কোন কথা গোপন করিনি। মেয়ের জামাইনেই ওর মায়ের কাছে সেকথা পেড়েছিলুম। কিন্তু তিনি নিজে থেকেই বললেন, ইউনিভারসিটির ছাপটা যে শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র মাপকাঠি আমরা তা মনে করি না। আমার মেয়েও না।

ও তোমার মন রেখে বলেছে। আমাদের গাড়ী, বাড়ী, ধনদৌলত দেখে, চেপে গেছে। জানে, পেটে খেলে পিঠে সয়। মুখে এ কথা সেদিন নিরঞ্জন বললেও সঙ্গে সঙ্গে বিরূপ চিন্তাও মনের কোণে যে উঁকি মারেনি তা নয়। সত্যি ত ওর যেমন এম, এ ডিগ্রী নেই তেমনি গাড়ী, বাড়ী, ধনদৌলত, ব্যবসা ত আছে। তাছাড়া এম, এ পাশকরা বৌ আসছে না ত মাস্টারী করতে? তাকে লেখাপড়া শেখাতে? তাহ'লে কিসের এত সঙ্কোচ? নিজেকে এত ছোট মনে করছে সে কেন! না, না, এ হীনমন্যতা! একে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না! সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ ও অর্থের দম্ভে তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে ওঠে। মনে পড়ে যায়, নিজের খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইয়েদের মুখগুলো। তারা বি, এ, এম, এ পাশ করেছে বলে, ওদের দিকে কেমন একটা অবজ্ঞার চোখে তাকায়! প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা জাগে নিরঞ্জনের মনে। এই এম, এ পাশকরা মেয়ে বিয়ে করে সে কেবল প্রতিশোধ নেবে না তাদের ওপর দেখিয়ে দেবে কতখানি হিম্মত রাখে সে। তাদের কারো ভাগ্যে ত শিক্ষিতা স্ত্রী জোটেনি। এই প্রথম ওদের বংশে সবচেয়ে শিক্ষিতা বৌ এনে নিরঞ্জন তাদের সকলের মাথা হেঁট করে দেবে!

কিন্তু শিক্ষিতা বৌ যাতে বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝতে পারে যে ইউনিভারসিটির ডিগ্রী না থাকলেও, বিশেষ করে ইংরিজী শিক্ষার আসল নির্যাসটুকু উদরসাৎ করে বসে আছে নিরঞ্জন তার জন্যে সে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হতে থাকে। সে বাড়ীর আবহাওয়া একেবারে পালটে দিলে। প্রথমেই ঘরের দেওয়ালে যেখানে যত কালী, গণেশ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর ছবি ছিল, সবগুলো খুলে ফেলে তার জায়গায় ভাল ভাল ফ্রেমে বাঁধানো ইংলিশ পিক্চার—মেম সাহেবদের নানা ভঙ্গিমার ছবি, ধর্মতলা থেকে কিনে এনে টাঙালে। তারপর বিলীতি পাতাবাহারের নানা ধরণের গাছ কিনলে—'ফার্ণ', 'পাম', ঝাউ' "কেকটাস্', 'চাইনীস্ বেমবু' প্রভৃতি। ঘরে বারান্দায়, সিঁড়িতে, ড্রয়িংরুমে যাকে যেখানে রাখলে ভাল দেখায়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে রাখলে। সবশেষে মন দিলে ড্রয়িংরুমে লেটেস্ট ডিজাইন'-এর 'সোফা কাউচ' কিনে আনলে। তিনচারটে 'বুককেস্' ইংরিজী বইয়ে শুধু ভরে রাখলে। এছাড়া নানাধরণের ছোট বড় আলমারীতে ভর্তি করলে 'কিউরিয়ো' কাঠের পুতুল, মাটির ভাঁড়, পাথরের নুড়ি, সামুদ্রিক শাঁখ, ঝিনুক, আরো নানা রকমের ছেলেখেলার জিনিস! মডার্ণ হতে গেলে বাইরেটা যেভাবে সাজানো দরকার, তার কোনটাই বাকী রাখ'লে না। এরপর উড়ে ঠাকুর ছাড়িয়ে ডবল মাইনে দিয়ে রাখলে বাবুর্চি। ডাইনিংরুমে চেয়ার, টেবিলে বসে কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়া শুরু করলে—ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝালের পরিবর্তে চপ, কাটলেট, ফাউল রোস্ট, ফ্রায়েড রাইস্ প্রভৃতি ইংরিজী খানা।

নুতন নুতন চাকর নিযুক্ত হলো। তাদের কাউকে ডাকে 'বয়' বলে, কাউকে বা 'বেয়ারা'। তারা ওকে সম্বোধন করে 'সাহেব' বলে। কথায় কথায় 'জী' 'হুজুর' বলে সেলাম দেয় নিরঞ্জনকে।

সঙ্গে সঙ্গে ধুতি ছেড়ে স্যুট ধরলে নিরঞ্জন। সিগারেটের বদলে পাইপ। বাংলা খবরের কাগজের বদলে 'স্টেটস্ম্যান'। হিন্দী ও বাংলা সিনেমা দেখা বন্ধ করে 'মেট্রো', 'লাইটহাউসে'র ভক্ত হয়ে উঠলো। সকালে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে 'স্লিপিং স্যুটটা ছাড়ে না। ওটা পরেই 'ব্রেকফাস্ট' করে, ওটা পরেই ড্রয়িংরুমে বসে ইংরিজী কাগজ হাতে কেউ এলে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে। ওটা গায়ে জড়িয়েই দাড়ি কামায়। ওটা নিয়েই বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। ওর মা বাবা সেকেলে ধরণের হলেও, ছেলের মুখ চেয়ে সবই মেনে নেন। বরং ছেলের এই ইংরিজী আদবকায়দা দেখে আরো বেশী খুশি হন, সমাজে তাঁদের মুখ এতে যেমন উজ্জ্বলতর হবে তেমনি নুতন বৌমার কাছেও মানমর্যাদা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু নুতন বৌ, মীনাক্ষীর হাবভাব, আচার-আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে নিরঞ্জনের কাছে। প্রথম দিন ঘুম ভাঙিয়ে বেয়ারা যখন ট্রে-তে করে 'বেড্‌টি' দিয়ে গেল ঘরে, মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে মীনাক্ষী বললে, ম্যাগো, বাসীমুখে চা খাওয়া? দাঁত না মেজে, মুখ না ধুয়ে আমি জীবনে কিছু মুখে দিইনি!

বিস্ময়ের সঙ্গে নিরঞ্জন বলে উঠলো, তা বলে 'বেড্‌টি' খাবে না? জানো, সাহেবরা 'বেড-টি' না খেয়ে বিছানা থেকে ওঠে না?

আমি ত সাহেব নই। বলে এক কথায় চুপ করিয়ে দিলে মীনাক্ষী তাকে। থুথুতে, নালেতে মুখ ব্যাড় ব্যাড় করছে, কিঃ, ঘেন্না করে না?

বেশ ত, তোমার ইচ্ছে না হয়, থাক। বলে নিজেই 'বেড্‌টি' খেতে শুরু করে নিরঞ্জন। মীনাক্ষীর সঙ্গে তর্ক করতে যেন ভয় ভয় করে। কি জানি এম, এ পাশকরা মেয়ে, হঠাৎ যদি ওর বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়ে যায় তার কাছে। কি বলতে হয় ত কি বলে ফেলবে!

দু'তিন দিন বাংলা খবরের কাগজ পড়তে দেখে সে শুধু বললে, তুমি বাংলা কাগজ পড়ো? যেন বাংলা কাগজ পড়াটা কি এক মহা অপরাধ!

মীনাক্ষী স্পষ্টগলায় জবাব দিলে, হাঁ। কারণ বাংলাদেশের সব খবর-ই বাংলা কাগজে পুরো থাকে।

বাংলা উপন্যাস একগাদা বিয়েতে পেয়েছিল মীনাক্ষী। বাক্স বোঝাই করে সেগুলো সঙ্গে এনেছিল। সব সময় সেই সব উপন্যাস পড়তে দেখে একদিন নিরঞ্জন প্রশ্ন করলে, গাদা গাদা ইংরিজী বই ঘরে থাকতে এইসব বাজে বাংলা উপন্যাসগুলো পড়ো কেন?

বাংলা উপন্যাস বাজে! কে তোমায় বলেছে? তোমার ওই ইংরিজী বইগুলো আমি দেখেছি, 'রাবিশ' যত সব সস্তার ইংরেজী ও অমেরিকান 'নভেল'!' 'নভেল' না ছাইপাঁশ, কতগুলো নোংরামি কাঁচা খিস্তি যাকে বলে 'সেক্স' ছাড়া কিছু নেই। ওদের চেয়ে অনেক ভাল আজকাল উপন্যাস বেরুচ্ছে আমাদের দেশে। বরং ওইগুলোকে তুমি বিদায় করে দাও ঘর থেকে। যদি রাখতেই হয় বিলীতি বই, ত ভাল ভাল 'ক্লাসিক' বইয়ের অভাব আছে? তাছাড়া কত ভাল বাংলা বই রয়েছে! তাই এনে রাখো যে লোকে দেখলে বলবে সত্যিকারের এদের সাহিত্যর 'টেষ্ট' আছে! আর ওই ছবিগুলোকে তুমি খুলে ফেলো বাপু, মা বাবা ঘরে এলে আমি যেন লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারি না তাদের দিকে! ছিঃ। কত ভাল ভাল সব মাস্টার আর্টিস্টদের ছবি রয়েছে সেগুলো ফেলে ওইসব মেমদের যৌনসর্বস্ব ছবি কেউ ঘরে টাঙায়!

বেকুব বনে যায় নিরঞ্জন। সাহিত্য বা চিত্রকলার ভালমন্দ বোঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তার নেই সত্যি। তাই চেপে গিয়ে হঠাৎ বলে ফেলে, আমি ত ওসব পয়সা দিয়ে কিনিনি কারখানার লোকেরা সব প্রেজেন্ট করেছিল।

তাদের আর টেষ্ট এর চেয়ে ভাল হবে কি করে! বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে মীনাক্ষী স্বামীর দিক থেকে!

বেশত, যে সব ভাল বই বা ছবি ঘরে রাখা উচিত, তুমি নিজে কিনে এনে টাঙিয়ো।

হাঁ, সেই ভালো। নইলে লোকে ভাববে আমাদের কি 'লো টেষ্ট'! বলে আবার বাংলা উপন্যাসে মনোনিবেশ করলে নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়! মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে সে!

সেদিন ছিল ওদের নেমন্তন্ন খুব বড় লোকের বাড়ী। কিন্তু মীনাক্ষীর বেশভূষা দেখে হতাশ হলো নিরঞ্জন। দামী বিলিতী 'কসমেটিকস', 'মেকআপ', 'রুজ', 'লিপষ্টিক' কিছুই সে যেমন ব্যবহার করেনি, তেমনি সাহেববাড়ী থেকে অর্ডার দিয়ে যে সব অতি আধুনিক ডিজাইনের ব্লাউজ, অর্থাৎ যে ব্লাউজ পরে পিঠের তিনভাগ অনাবৃত থাকে আবার সামনে, বুকের নীচে থেকে নাভি পর্যন্ত নগ্ন দেখা যায় তাও গায়ে দেয় নি। তার বদলে পরেছে বুক ও পিঠ ঢাকা ভদ্রধরণের একটা গরদের ব্লাউজ, তার ওপর সাদা জরিপাড়ের বেনারসী, দুহাতে দুগাছা মুক্তোর চুড়ি, গলায় মুক্তোর নেকলেস, কানে হীরের দুল, অনামিকায় একটা হীরের আংটি। হালকা করে পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে, ছোট একটা সিঁদুরের টিপ দুটি বাঁকা ভ্রূর ঠিক মধ্যিখানে এঁকে, ভেল্‌ভেটের চটিটা পায়ে দিয়ে মীনাক্ষী যখন নিরঞ্জনের সামনে এসে দাঁড়ালো, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললে, তুমি এই রকম বেশভূষায় যাবে নাকি?

কেন, খারাপ দেখাচ্ছে?

না, খারাপ নয়। তবে আজকালকার দিনে এ সাজ অচল। বিশেষ যে ধনী ও শিক্ষিত সমাজে আমাদের যেতে হবে, সেখানে এইভাবে গেলে লোকে মুখ টিপে টিপে হাসবে। তোমায় গাঁইয়া ভাববে!

বেশ তাই যদি মনে করো, তাহলে তুমি একাই যাও। আমার জন্যে তোমার মাথা হেঁট হবে, আমি তা চাই না!

তার চেয়ে বরং একটু 'মডার্ণ'ভাবে সেজে-

গুজে এসো না। তোমার তো কোন কিছুরই অভাব নেই।

মীনাক্ষীর চোখ দুটো এবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বললে, মডার্ণ বলতে তুমি যা বলছো বুঝেছি। ওই পিঠ বারকরা এবং বুকের নীচ থেকে নাইকুণ্ডল পর্যন্ত খোলা জামা আর তার ওপর 'নাইলন'-এর সাড়ী, ঠোঁটে, মুখে রং, চোখে কাজল। যাতে তোমার স্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় কামার্ত পুরুষের দল এই ত? তা আমি কোনদিন পারবো না। যদি এইসব সখ ছিল প্রাণে, তাহলে কোন সিনেমা অভিনেত্রীকে বিয়ে করলেই পারতে?

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না নিরঞ্জন। চড়ে উঠলো, দেখো মীনাক্ষী, তাহলে সমাজে ও পথেঘাটে এই যে সব মেয়েদের দেখো, তারা কি কেউ শিক্ষিতা নয়? তুমি কি একলাই কেবল এম-এ পাশ করেছো?

না। আমি এমন নির্বোধ নই যে, সে কথা বলবো। তবে তুমি যাদের কথা বলছো, তারাই কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়। তারা ছাড়াও আরো অনেক অনেক মেয়ে আছে দেশে যারা শিক্ষিত, যাদের তুমি চোখে দেখো নি! বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে গেল মীনাক্ষী।

নিরঞ্জন একাই তখন মোটরে গিয়ে বসলো। গাড়ীর ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে কেবলি তার মনে হতে লাগল, এ কি রকমের শিক্ষিত মেয়ে!

খাবার টেবিলে সেদিন মীনাক্ষীকে অনুপস্থিত দেখে নিরঞ্জন প্রশ্ন করলো বাবুর্চিকে, মেম সাহেব কোথায়?

তিনি আজ খাবেন না।

কেন?

তাত জানি না হুজুর!

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল নিরঞ্জন মীনাক্ষীর ঘরে। তুমি খেতে যাওনি কেন?

আজ আমি তোমার সাহেবী খানা খাবো না। মার কাছে খাবো!

বেশ ত, সেটা কি টেবিলে বসে খাওয়া যায় না? এটুকু শোভনতা কি তোমার কাছে আশা করতে পারি না?

মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আচ্ছা চলো যাচ্ছি। মাকে বলছি, খাবার পাঠিয়ে দিতে!

মা নিজেই কাঁসার থালায় ভাত ও নানা-রকমের ব্যঞ্জন সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখতেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটা ছোট বাটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নিরঞ্জন বললে, ওটা কি?

ইলিশ মাছের তেল!

আর ওই যে আবর্জনার মত, ওটা?

মা জবাব দিলেন, গঙ্গার টাটকা ইলিশ, তার কাঁটাসোটা দিয়ে পুঁইশাকের ছেঁচড়া করেছি। বৌমা খেতে বড্ড ভালবাসে। কদিন ধরেই মনে করছি করবো। তা তুই একটু খাবি?

রাবিশ! যা কিছু ভাল, তা তোমার বৌমার রোচে না! বলে মুখটা নীচু করে সুপের প্লেটে চুমুক দিলে নিরঞ্জন।

বেশ। তোমার মত সাহেব ত আমি নই! ওই রাবিশ আমার ভাল। যান ত মা আপনি এখান থেকে। বলে মুখ টিপে হেসে নিরঞ্জনের চোখের দিকে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকালে! তারপর বললে, আর বাকীগুলো কি জিজ্ঞেস করলে না? এটা হলো ইলিশ মাছের রসা। আর এটা কৈ মাছের পাথুরী! বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসি নয় যেন তীক্ষ্ন বিদ্রূপ-বান! হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে সে নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা সত্যি কি তোমার ওই একঘেয়ে খানা খেতে ভাল লাগে? কি স্বাদ যে পাও, আমি ত বুঝি না। তার চেয়ে ঢের ভাল আমাদের বাঙ্গালীর খাদ্য। কত রকমারী মাছ, রকমারী তরিতরকারী, সাকসব্জী; কত বৈচিত্র্য! কত বিভিন্ন প্রকৃতির। স্বাদে গন্ধে গুণে এক একটা এক এক ধরণের!

থামো! এই বলে আর নিজের কুশিক্ষার পরিচয় দিয়ো না! তাহলে গ্রাণ্ড, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে খাবার জন্যে কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা লোকে ব্যয় করতো না!

ওটা সাহেবী নামের মোহ! মুখের স্বাদের জন্যে কেউ ওখানে যায় না। এ আমি জোর গলায় বলতে পারি?

তর্ক না বাড়িয়ে মনের রাগ মনে চেপে নেয় নিরঞ্জন। উচ্চশিক্ষিতা কোন মেয়ের মুখ থেকে যে এরকম কথা শুনবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি!

এরপর একদিন আরো আঘাত পেলে নিরঞ্জন মীনাক্ষীর ব্যবহারে। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিন কেমন মেঘলা মেঘলা ভাব। যেন বর্ষার আবহাওয়া। সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরে এলো নিরঞ্জন সিনেমা দেখতে যাবে বলে মীনাক্ষীকে নিয়ে।

মীনাক্ষীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখে মায়ের ঘরে বসে সে একটা থালায় মুড়ি ও তেলেভাজা-বেগুনি, পিঁয়াজী খাচ্ছে।

একি!

তার কণ্ঠস্বর থেকেই ছেলের মনের ভাব বুঝি মা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি বললেন, বর্ষার দিন, ছেলেমানুষের কত কি খেতে সাধ যায়। তাই দশরথের দোকান থেকে দু আনার মুড়ি আর দু আনার গরম গরম তেলেভাজা রামশঙ্করকে দিয়ে আনিয়ে দিয়েছি! বৌমা বলে, বর্ষার দিনে যদি তেলে-ভাজা না খেলুম, ত বর্ষার ইজ্জত থাকে না!

ছি, ছি, মা! ওর কথা শুনে চাকর-বাকরদের কাছে পর্যন্ত তুমি আমার মুখটা পোড়ালে! ওরা কি ভাবছে বলতো? ওদের শিক্ষিতা মেমসাহেব কিনা রাস্তার দোকান থেকে তেলেভাজা এনে খাচ্ছে! সত্যি এই না হলে শিক্ষা! এই না হলে কালচার? শিক্ষিতা মেয়ের যা নমুনা দিচ্ছে তোমার বৌ, যে অশিক্ষিতা মেয়েরাও হার মেনে যায় ওর কাছে। বলে রাগে গরগর করতে করতে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো।

এরপর চরম আঘাত হানলে মীনাক্ষী মহাষ্টমী পুজোর দিন। সকালে 'ব্রেকফাষ্ট' খেতে না আসাতে নিরঞ্জন মায়ের কাছে গিয়ে শুনলে, বৌমা গঙ্গাস্নান করতে গেছে। আজ মহাষ্টমী, ঠাকুরের কাছে অঞ্জলি না দিয়ে ত কিছু মুখে দেবে না।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার জ্বলে উঠলো। বললো, যত সব 'ভালগারিটিস।' ওই বারো-য়ারীর পুজোয় দশজনের সামনে গিয়ে অঞ্জলি দিলে বুঝি সমাজে তোমার মাথাটা খুব উঁচু হবে! না, আমি কিছুতেই এ সব 'এলাউ' করবো না! তোমার বৌয়ের আব্দারা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে!

পিছন থেকে ঘরে এসে ঢুকলো মীনাক্ষী। বললে, আজকের দিনে টেবিলে বসে 'ফাউল' খেলে বুঝি তোমার মাথা বেশী উঁচুতে উঠবে, না? জ্ঞান হওয়া থেকে কখনো এ দিনটাতে অঞ্জলি না দিয়ে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না! তাছাড়া আজ আমি নিরামিষ খাবো। লুচি খাবো মায়ের সঙ্গে। মা তা জানেন! এই বলে একটু থেমে মীনাক্ষী দৃঢ়স্বরে আবার বললে, পাড়ার বারোয়ারীতে অঞ্জলি দিতে যেতে যদি তোমার এত আপত্তি, বেশ, আমি তাহলে গাড়ী নিয়ে ত্রিকোণ পার্কে গিয়ে অঞ্জলি দিয়ে আসবো!

এবার ছুটে নিরঞ্জন ওর বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বললে, ওরা তোমাকে ঠকিয়েছে। ও এম-এ পাশ করেছে কে তোমাকে বললে? এর চেয়ে অশিক্ষিত মেয়েরা ঢের সভ্য! ইংরিজীতে পাশ করা মেয়ের এই রকম ব্যাভার?

বাবা গম্ভীর ও চিন্তিত মুখে শুধু জবাব দিলেন, হুঁ, আমিও সব লক্ষ্য করেছি!

উৎসাহ পেয়ে নিরঞ্জনের গলার ঝাঁজ আরো বেড়ে যায়। বলে, তুমি কি ওর ডিগ্রীগুলো নিজে চোখে দেখেছিলে বাবা?

নিরঞ্জনের পিছন পিছন মীনাক্ষী যে শ্বশুরের ঘর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা ওরা বাপবেটায় কেউই টের পায় নি। তাই নিরঞ্জনের মুখের ওই কথার পর যখন নাটকীয়ভাবে মীনাক্ষী একটা সুটকেশ হাতে করে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন ওদের দুজনের মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁরা কোন প্রশ্ন করার আগেই সে সুটকেশটা খুলে ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলোর সঙ্গে কতকগুলো সোনার মেডেল, স্কুল-কলেজে যা ইংরিজীতে পেয়েছিল বার করে শ্বশুরের হাতে দিতে দিতে বললে, বাবা এগুলো সঙ্গে দিয়েছিলেন দেখাবার জন্যে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম এতদিন। বলেই বিদ্যুৎগতিতে যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

যেন সামনে বজ্রপাত হলো! ওরা বাপ-ব্যাটায় শুধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্রেয় ও প্রেয়

প্রতি মানবের কাছে
আসে দুটি বহুমূল্য ধন,
শ্রেয় আর প্রেয় এই অরূপ-রতন।
অল্পবুদ্ধি রাখে প্রেয়
ক্ষণিকের সুখের লাগিয়া,
বুদ্ধিমান চায় শ্রেয়
পরমার্থ শ্রেষ্ঠকে জাগিয়া।
(কঠোপনিষদ)

কান্নার গন্ধ

অমরেন্দ্র ঘোষ

হয়ত সংবাদটা আপনারা অনেকে পড়েছেন। আমিও পড়েছি।

সেদিন ক্লান্ত এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা, ভাদ্দুরে জলো মেঘ সারাদিন ধরে গা ঝাড়ছে। জল আর জল! লণ্ঠন জেবলে উঠানে বসেছিলাম, একা, মাথার ওপর একটা টিনের চালা ছিল। তার চারদিক খোলা, লণ্ঠনটা ঝুলছিল একটা দড়ির সঙ্গে লোহার আংটায়। কখনো ঘুরছিল, কখনো বা দুলছিল ভিজা ঘূর্ণী বাতাসে।

নানা দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। দূরে নিকটে, পূবে পশ্চিমে। অদ্ভুত এক বিভ্রান্তিতে যেন মনটা ভরে গেল, কখনো দেখতে পেলাম পুঁই মাচার নিচে কে যেন কাঁদছে, কখনো ভিজা শিউলি ফুলের গন্ধে সেই যেন ফোঁপাচ্ছে। চোখ মেলে পরিচয় করতে ব্যাকুল হলাম। হায়রে লণ্ঠনটা করলে কিনা বেইমানি! অথচ তেল গলতে জুগিয়েছি আমি।

একেবারে অন্ধকার।

ঝির ঝির ঝির ঝির। কিছুক্ষণ বাদেই আবার তড়বড় করে ঝরে গেল এক পশলা। চিক-মক করে উঠলো উঠানের আকাবাঁকা বন্যার স্রোত। আবার শিউলি ফুলে কান্নার গন্ধ।

বন্যা থামল কিন্তু মন ভেসে চলল।

হয়ত সংবাদটা আপনারাও পড়েছেন আমিও পড়েছি, ঠিকঠিকানা জানিনে, তবু দুঃসাহসে বুক বেঁধেছি। যাবো কান্নার উৎস সন্ধানে, যে কান্নার গন্ধ করুণ। যে কান্নার বর্ণ নরম। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে প্রবাল ছড়িয়ে দেখেছেন কি? যে প্রবাল এক মুঠো শিউলির মত শাদা চিক্‌মিক্‌।

উপমা দিয়ে হয়তো বোঝাতে পারলাম না। হয়ত অক্ষমের হাতে পড়ে আরও জটিল হয়েছে অর্থ। তাই আপনাকেও অনুরোধ জানাচ্ছি চলুন না বেরিয়ে পড়ি। আপনি যিনিই হন না কেন, আপনার জীবনেও একটা ট্র্যাজেডি আছে। আছে কান্নার গন্ধ, কিছু বক্তব্য বালিশে জড়িয়ে।

[illegible] কি একা শুয়ে শুয়ে কাঁদেননি? অস্বীকারে, অগৌরবে? অনেক দিয়ে না পেয়ে?

তবে উৎস সন্ধানে আসুন। দেখবেন আমার আপনার এবং যাকে নিয়ে এ কথিকা লেখা, তার উৎস মুখ একই পাহাড়ে হিম ঝল্লার নিচে শুধু একটু ভূগোল পাল্টাচ্ছে, দেশ কাল পাত্র ভেদে।

আসুন আমরাও ভূগোল পাল্‌টাই। এই বাঙলা দেশের কলোনীর ভাদ্দুরে পরিবেশ থেকে পাড়ি জমাই মনের নায়ে। গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধান হলেও কথা ছিল না। দাক্ষিণাত্যের কোনো বন্ধুর পার্বত্য খাত হলে তো চিন্তাই করতাম না। যেতে হবে এই দ্বীপময় ভারতেরও ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে। সেখানে আল্‌পস পর্বতমালা ডানা-মেলে রয়েছে—থাক থাক বরফের ডানা। কল্পনা করুন ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার, পম্পাইর ধ্বংস। রোমের প্রাচীন সভ্যতা। এখনো ইটালী বহন করছে নানা কাব্য সঙ্গীত চিত্রের বিপুল ঐতিহ্য।

ঠিক ঠিকানাটা কি আপনার জানা নেই? সেই যে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল খবরটা।

ছায়া ছায়া অস্পষ্ট বটে। কিন্তু আমার যেন স্পষ্ট মনে পড়ে সমুদ্র কটিতটে ইটালীর কথা। বার বার নীলাম্বরী সরে গিয়ে দেখা যাচ্ছিল ফেনার ঝালর। সঙ্গীতে, শিল্পে একদিন প্রধান ছিল রোমক সভ্যতা। এ কাহিনী এক চিত্রশিল্পীর। সে মেয়ে কি পুরুষ জানিনে। ছোপ ছোপ সংবাদ। এলোমেলো তথ্য, অনেক রং চাপিয়ে ভাবছি তত্ত্বটাকে ফুটিয়ে তুলব।

একজন গাইড দরকার। ঐ তো একটি মেয়ে জলপাই গাছের আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে। পরনে হাল্‌কা পশমি স্কার্ট। মাথায় পালকের টুপি, ঠোঁট দু'খানা ভিজা চকোলেটের মত লাল।

গুড মর্নিং ম্যাডাম। আমরা নবাগত। বলতে পারেন একজন গাইড কোথায় পাব?

আপনারা কি এখানকার বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি দেখবেন? এটা হচ্ছে জগৎ বরেণ্য কবি দান্তে, চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম-ভূমি। মহান গ্যালিলিও এখানে জন্মেছেন। মেয়েটি গলা নামিয়ে বললে, আর জন্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি। আসুন কতকাল যে আপনাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

চমকে আমরা মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটি নিজেকে আরো ব্যঙ্গ করে হাসলে, হাসালে। চমৎকার রসিকা গাইড। সময়টা কাটবে স্ফূর্তিতে।

না শীত না গ্রীষ্ম। সমুদ্রের পাশ ধরে হেঁটে চলেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে পাতলা কুয়াশা মাখা দুরাশার মত পাহাড়। পাইন, ওক, ঝর্ণা। সমুদ্রের লোনা জলে নানা শ্রেণীর ছোট বড় মাস্তুল। ভাসমান ডক, নিকটে বন্দর, সম্মুখে পোতাশ্রয়, উঁচু উঁচু চিমনি।

আমাদের লক্ষ্য বন্দর নয়, ঐ যে অতি প্রাচীন এক স্থাপত্যের নিদর্শন। মোটা মোটা আকাশছোঁয়া পাথরের থাম। ঐটাই কি আর্ট গ্যালারি?

গাইড বললে ভিতরে চলুন।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ি ভাঙলাম। চেয়ে চেয়ে দেখলাম অদ্ভুত এক ভাস্কর্য। ফটকের সম্মুখে এক গ্রীক বীর। হাতে জ্বলন্ত মশাল। সেকালের আগুন যেন একালের ইতিহাস হয়ে রয়েছে ব্রোঞ্জে পাথরে।

মেয়েটি চকোলেট রাঙা ঠোঁট দু'খানা নাড়িয়ে বললে, আসুন, এই বীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

আমরা মার্বেল চত্বরে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ইনি হচ্ছেন আমার স্বামী।

বলেন কি?

আলেকজাণ্ডারের বিশ্ববিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ইনি ছিলেন পুরধা মশালচি। নিশ্চয় ইতিহাস পড়েছেন, তখন ছিল গ্রীকদের শৌর্য-বীর্যের যুগ। এঁরা মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হিন্দুকুশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলেন।

কাজটা কি খুব ভাল করেছিলেন?

নিশ্চয় নয়, অন্ততঃ আজকালকার দিনে তা

কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু গ্রীক এবং হিন্দু সংস্কৃতির সংগম হল। উনি মৃত্যু-কালে বলে গেলেন, বার বার জন্মান্তরে তোমার সংগে দেখা হবে। বিগত জীবনগুলোর আর ফিরিস্তি টানব না। হয়ত উনি যখন নাবিক ছিলেন, আমি তখন জেলের মেয়ে। উনি যখন চাষ করতেন, আমি তখন আপেল তুলি। কিন্তু এ জীবনে এখনো কুমারী। আজ কোথায় তুমি বিলাভেড?

গাইড একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

আমরা হাসলাম, বললাম শীগ্‌গিরই দেখা হবে। কিবা বয়স আপনার। অত মুষড়ে পড়বেন না এর মধ্যে।

ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান উপদেশের জন্য। গাইড হাসলে—যেন মুক্তার ঝাঁপি খুললে।

এবার ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের সংগে রয়েছেন নানা দেশের টুরিষ্ট, আরবের এক রাজপরিবার, ইংরেজ বণিক-দম্পতী, দুটি চীনা যুবতী। একটু এগিয়ে গেলেন তুরস্কের ক'টি ছাত্রী। মধ্য এশিয়ার নর্তকী একজন। আরো অনেককে চিনলাম। অনেককে চিনলাম না। যদিও গাইডের মুখে খৈ ফুটছে। রকমারি সজ্জা। কথা বলার বিশেষ বিশেষ ধরণ। শুধু একটা জায়গায় প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের মিল।—সকলের চোখেই অতলান্ত বিস্ময়।

প্রকাণ্ড হল। ভিতরে ঢুকলেই মনে হয় এই যে আঁধার, এ বুঝি বা আলোর আধিক্য। থামে দেওয়ালে কার্নিশে অশেষ কারুকার্য। এত ফিরিস্তি জানা নেই।

গাইড বুঝিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছু বুঝছি বলে মনে হচ্ছে না।

শুধু অবাক হয়ে দেখছি আর দেখছি। কোথাও বা মোটা কাঠের অপূর্ব ফ্রেমে আঙুর লতার নক্‌সা। ভিতরে একখানা মহার্ঘ বর্ণাঢ্য সান্ধ্য গোধূলির ছবি। কোথাও বা সোনার ফ্রেমে মুক্তার কাজ। ভিতরে অতুলনীয় মাতৃ-মূর্তি ম্যাডোনা। দেখতে পেলাম উদ্ভিন্ন-যৌবনা, কিশোরীর কাম কান্তি। ছবির পর ছবি। রয়েছে নম্রতার অবতার যিশুর দেব-দুর্লভ তৈলচিত্র।

এবার একটু বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছি। মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে গাইডের ঘোষণা। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেছে। তবু বর্ণসুষমা এতটুকুও ম্লান হয়নি কোন একখানা ছবির, কারণ এগুলো হচ্ছে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পীদের অমর অবদান। যুগ যুগ ধরে এমনি অম্লান রয়েছে এবং থাকবে।

গাইড মেয়েটি আবার একটু মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল, আবার একটু থেমে বলতে সুরু করল, আপনারা ইণ্ডিয়ান, আপনারা নিশ্চয় অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র দেখেছেন। সেই প্রাণবন্ত ছবিগুলো আঁকতে কি কি রং কিভাবে যে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, আজো যেমন বিজ্ঞানের কাছে জানা নেই, এগুলোর বেলাও সে কথা সমান প্রযোজ্য। এখানের প্রতিটি ছবিতে রয়েছে কালজয়ী স্পর্শ।

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এগিয়ে যেতে লাগলাম। দেখলাম রঙের জাদু, বর্ণের সমা-রোহ, ভাবের অপূর্ব দ্যোতনা। যুগ যুগান্ত চেয়ে থাকলেও বুঝি এ ছবিগুলোর আবেদন বিরস হবে না। এত মুগ্ধ হয়ে চলেছি যে, গাইড মেয়েটির কোনো বর্ণনাই আর কানে এলোনা। শুধু অতীতে তলিয়ে হাঁটছি। মহত্তে তলিয়ে ভাবছি। মানুষের ঐতিহ্যে তলিয়ে দেশ কালের সীমা ভুলে গেছি। বুঝিবা ভুলে গেছি হিংসা দ্বেষ, জাতিতে গোষ্ঠীতে ব্যবধান।

এই কি অমর লোকের স্বাদ?

গাইড মেয়েটি থামলে। এবার রীতিমত আবেগ মিশিয়ে বললে ঐ ত্রিকোণ হলটিতে শেষ ছবিখানা রয়েছে। এবং বিশেষ ছবি একটি। তার পর হে বন্ধু বিদায়। বেশ একটু করুণ হয়ে উঠল মেয়েটির গলা। আমার কেনই যেন মনে পড়ল এই মেয়েটির প্রথম সম্ভাষণের কাহিনী। মহান গ্যালিলিও এখানে জন্মেছেন। আর জন্মেছি এক অখ্যাত অবজ্ঞাত আমি।

মুহূর্তে মুগ্ধতা কেটে গেল। আবার কানে আসতে লাগল গাইডের ঘোষণা। প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই হল ঘরে একখানা ছবি আছে। যার মধুর স্মৃতি কোনো পর্যটক কখনো বিস্মৃত হতে পারেন না। দেশে ফিরে গিয়েও সারা জীবন ধরে রোমন্থন করেন এর মাধুর্য। আমি জানি আপনারাও করবেন। আমাকে ভুলে যাবেন, কিন্তু শেষ ছবিখানা কিছুতেই ভুলতে পারবেন না। এ এক আশ্চর্য শিল্প প্রতিভা। এ এক আশ্চর্য রং রেখার খেলা। এ এক স্মরণীয়—

হঠাৎ গাইডের কণ্ঠ স্তব্ধ হল, যেন দমকা হাওয়ায় নিভে গেল দীপ। কি যেন এক মহৎ বেদনায় তার চোখে দুফোঁটা জল নেমে এলো।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম ত্রিকোণ হলের সুমুখে।

এখানের অধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, প্রায় দেড়শ বছর বাদে ধরা পড়েছে এক অতিলোভীর দুষ্কর্ম। সে তার কলঙ্ক এক বরেণ্য গুণী-জনের নামে চালু করে দিয়ে গেছে গোপনে। এতকাল বাদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সে জালিয়াতি ধরা পড়েছে। গুণীর হাতের রেখা রং ও প্রযুক্তি বিন্যাসের সংগে কোনো মিল নেই এই জাল ছবির। আজ এখনি এ কলঙ্ক মহত্তের ভিড় থেকে সরিয়ে নেয়া হবে।

হোক কলঙ্ক, হোক অখ্যাতের আকৃতি, যে ছবি এতকাল ধরে প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছে তা দেখার জন্য ব্যাকুল হলাম।

শেষ ছবিখানা কোথায়?

কিন্তু কিছুই দেখা গেল না ছবিখানা কালো কাপড়ে মোড়া, যেন কফিনে ঢাকা হয়েছে শব।

গাইড, গাইড কোথায়?

রহস্যময়ী অদৃশ্য হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি আর বৃষ্টি! চারদিক কান্নার করুণ গন্ধে ঝাপ্‌সা। বহু পর্যটকের ভিড়ে সেই মেয়েটিই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই অখ্যাত অবজ্ঞাত অতিলোভী আমি।

ঐ কফিনের শব কি তারই কোনো এক বিগত জীবনের রং ও রেখার কলঙ্ক?

উভয়ত

(৬৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিভূতি বলিল, তা'হলে আগে পরে নয়। এক সঙ্গেই আমি আমার চিঠি দেই, আপনিও আমাকে আপনার চিঠি দিন।

বিভাবতী বলিল, আচ্ছা তাই হোক।

বিভূতি ও বিভাবতী এক এক টুক ভাঁজ করা কাগজ পরস্পরের হাতে দিল। এবং দু'জনেই সাগ্রহে তাহার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

বিভাবতী লিখিয়াছে, "আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব, ভেবে পাচ্ছি না। তাই সম্বোধন ছাড়াই লিখছি। কিছুদিন থেকে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একেবারে শেষ সীমায় এসে পেঁছেছি। বর্তমানে অন্য সব অভাব ছাড়াও একটা অভাব উৎকট হয়ে পড়েছে। আমার পরবার কাপড় নেই। কাপড়ের অভাবে আজ দোল খেলায় যোগ দিতে পারিনি। অসুখের অজুহাতে ঘর বন্ধ করে পড়ে ছিলাম। যে কাপড়খানা পরে এসেছি, সেখানার তিন জায়গায় সেলাই করা। ট্রামে বসে কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল, কখন একটা সাংঘাতিক বিপদ না ঘটে যায়। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আমাকে আজ তিরিশটে টাকা ধার দিন। আমি বাড়ী ফেরবার পথে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব। যদি আপনার বাড়ীতে যেতে আপত্তি থাকে, তাহলে, নিকটের একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব, আপনি বাসা থেকে এনে দেবেন। আশা করি, এটুকু উপকার করতে আপনি দ্বিধা করবেন না। তিরিশ টাকায় একজোড়া আট-পৌরে সাড়ী হয়ে যাবে। আজ সতেরই। সামনের মাসের গোড়াতেই আপনাকে এ টাকা শোধ করে দেব। একমাসে যদি না পারি, তাহলে দু'মাসে বা তিন মাসে নিশ্চয়ই দিয়ে দেব। ইতি বিভাবতী।"

বিভূতি লিখিয়াছে, "আপনাকে কি বলে সম্বোধন করলে আপনি খুসি হবেন, জানিনে। তাই আপাতত সম্বোধনটা বাদই দিলাম। কিছুদিন যাবৎ আমার আর্থিক অবস্থাটা ক্রমশ নীচের দিকে নামতে নামতে একবারে সাংঘাতিক অবস্থায় পেঁছেচে। মেসের ম্যানেজারের কাছে বিরানব্বই টাকা বাকি পড়েছে। কিছুদিন যাবৎ ম্যানেজার কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছে। আজ সকালে বলে দিয়েছে আজকের দিনের মধ্যে যদি পঞ্চাশ টাকা না দিতে পারি, তাহলে কাল সকাল থেকে খাওয়া বন্ধ করে দেবে আর চাকরদের দিয়ে মেস থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আজই আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দেন, তাহলে এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। আপনি 'না' বলতে পারবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই এখান থেকে গিয়ে আপনার বাড়ী থেকে টাকাটা নিয়ে যাব। যদি বাড়ীতে যেতে আপত্তি থাকে, তাহলে নিকটের রাস্তার পাশে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি বাড়ী থেকে টাকাটা এনে কোনমতে আমাকে পেঁছে দেবেন। আমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিয়ে টাকাটা শোধ করে দেব। আপনাকে তাগিদ দিতে হবে না। আজ আর কিছু লেখবার নেই। ইতি বিভূতি।"

উভয়েই চিঠি পড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে উভয়েই এক মিনিট দীর্ঘ এক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ট্রাম স্টপের দিকে অগ্রসর হইল।

ফাল্‌গুনী পূর্ণিমার চাঁদ তখন পূর্বাকাশে আপনার স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকিরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রতিভা ও পাগলামি

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্ব এর পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন নেই। কিন্তু ধারণাটা অনেক দিনের,—প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই বলেছেন প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যোগাযোগ আছে। সুতরাং প্রচলিত ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়েছে।

প্রতিভার ইংরেজী 'জিনিয়াস'। এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন থেকে। 'জিনিয়াসের' গোড়ার অর্থ হল অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। রোমান পুরাণে বলা হয়, প্রত্যেক লোকই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশেষ এক দেবতার তত্ত্বাবধানে বাস করে। জিনিয়াস আবার দু'রকম—শুভ এবং অশুভ। অশুভ জিনিয়াসের প্রাধান্য হলে জীবন দুঃখময় হয়।

কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যা শুধু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা করা যায় না; এবং কেন যে সে-ই পারে অন্য কেউ পারে না—এর যখন ব্যাখ্যা থাকে না, তখনই বুঝতে হবে এ হল প্রতিভার কাজ। প্রাচীনকালে সমাজ বিশ্বাস করতে পারত না কেউ নিজের ক্ষমতায় অসাধারণ কিছু করতে পারে। তাই প্রতিভাবানের কীর্তিকে জিনিয়াস বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কাজ বলে চিহ্নিত করা হত। ব্যক্তি জিনিয়াসের বাহন মাত্র।

প্রাচ্যের অনেক দেশে ধারণা ছিল যে উন্মাদ ব্যক্তির উপর দেবতার ভর হয়। তাই পাগলকে অবজ্ঞা না করে সমীহ করা হত। এখনও পৃথিবীর বন্য জাতিগুলির মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

এডগার অ্যালান পো

সমাজের মধ্যে প্রতিভাবান এবং উন্মাদরাই অসাধারণ। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাদের আচরণের ব্যাখ্যা করা চলে না। এই অসাধারণত্বকে তাই অধিষ্ঠাতৃ দেবতার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর প্রাচীনকাল থেকেই এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাদের অসাধারণত্ব যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই ধারণা বিভিন্ন যুগের মনীষী-দের মন্তব্যের ফলে প্রচারিত হয়েছে। প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) বলেছেন, পাগলামি দু'জাতের: সাধারণ পাগলামি এবং দৈবানুগ্রহ-পুষ্ট মানসিক উন্মাদনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর উন্মাদনা কবিদের মধ্যে দেখা যায়।

অ্যারিস্টটলের (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২) অভিমত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, পাগলামির স্পর্শ লাগেনি এমন কোনো মহৎ প্রতিভা দেখা যায়নি। রোম্যান দার্শনিক ও নাট্যকার সেনেকা (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪—৬৫ খৃষ্টাব্দ) অ্যারিস্টটলের উক্তি সমর্থন করেছেন। সেনেকার পূর্বে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সিসারো (খ্রীঃ পূঃ ১০৬—৪৩) এবং ল্যাটিন কবি হোরেস (খ্রীঃ পূঃ ৬৫—২৭) অ্যারিস্টটলের মতোই প্রতিভা ও পাগলামির সম্পর্ক স্বীকার করে মন্তব্য করেছেন। সেক্সপীয়ারও কাব্য-প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে যোগাযোগ দেখতে পেয়েছেন:

দি লুন্যাটিক, দি লাভার, অ্যান্ড দি পয়েট
আর অব ইম্যাজিনেশান অল্ কম্প্যাক্ট।

—মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিম, ৫ অঙ্ক,
১ম দৃশ্য।

ফরাসী দার্শনিক ও বিজ্ঞান-সাধক পাসকাল (১৬২৩—৬৩) বলতেন, পাগলামি ও প্রতিভা চিরদিনের প্রতিবেশী। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ম'তেন (১৫৩৩—৯২) পাগলাগারদে তাসোকে (১৫৪৪—৯৫) দেখে এসে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-ছিলেন যে, অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি নিজেদের পাগলামির জন্য অকালে অক্ষম হয়ে পড়েন।

ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রের নিকট ড্রাইডেনের (১৬৩১—১৭০০) এই লাইন দুটি সুপরিচিত:

গ্রেট উইটস্ আর স্যুয়োর টু
ম্যাডনেস অ্যালাইড,
অ্যান্ড থিন পার্টিসান্‌স্ ডু দেয়ার
বাউন্ডস্ ডিভাইড।

—অ্যাবসালোম অ্যান্ড অ্যাকিটোফেল,
১ম সর্গ।

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। এদের মধ্যে প্রভেদ খুবই সামান্য।

ফরাসী দার্শনিক ও লেখক দিদেরো (১৭১৩—৮৪) প্রতিভাবানদের পালগামি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হায়, যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা কত নির্বোধ!

প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যে সম্বন্ধ আছে তা শোপেনহাউঅ্যার (১৭৮৮—১৮৬০)-ও বিশ্বাস করতেন। প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যেই তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, বেদনা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল পাগল হওয়া। প্রতিভাবানের বেদনাই সবচেয়ে বেশী। রবীন্দ্রনাথ আদি কবিকে উল্লেখ করে যা বলেছেন প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি সম্বন্ধেই তা সত্য:

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ;

জোনাথান সুইফট

রুসো

সুতরাং প্রতিভাবানদের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ এত বেশী করে চোখে পড়ে।

অবশ্য অনেকে এই মতের বিরোধিতাও করেছেন। গোয়টে (১৭৪৯—১৮৩২) স্বীকার করতেন না যে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির সম্পর্ক আছে। তাঁর ধারণা ছিল প্রতিভাবানের মধ্যে পরিবার ও সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। ডঃ জনসন (১৭০৯—১৭৮৪) নিজে ছিটগ্রস্ত হলেও প্রতিভা ও পাগলামিকে পৃথক করেই দেখতেন। পূর্ণবিকশিত মানসিক শক্তি যিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন, জনসনের মতে তিনিই হলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি।

চার্লস্ ল্যাম (১৭৭৫—১৮৩৪) বিশেষ জোরের সঙ্গেই প্রতিভা ও পাগলামির সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই ধারণার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিভাবান লেখক সবচেয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের লোক; তাঁর মানসিক বৈকল্য ধারণার অতীত। অথচ ল্যাম নিজে মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে ভুগেছেন। তাঁর দিদি তো পালাজ্বরের মতো কিছুদিন পর পরই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ল্যাম্ হয়ত নিজেকে প্রতিভাবানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না; তাই পাগলামির সঙ্গে প্রতিভার কোনো সম্পর্ক দেখতে পাননি।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি মনীষীর অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের মতামত সমাজের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিভাবান ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত। সমাজ চিরাগত প্রথা ও ভাবনার দাস। নতুনকে গ্রহণ করতে সমাজ যে শুধু দ্বিধা করে তাই নয়, সক্রিয়ভাবে বিরোধিতাও করে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমাজে নতুনের অগ্রদূত হিসাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। প্রচলিত সামাজিক রীতি ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো কিছুকেই ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা স্বাভাবিক ও যুক্তি-সম্মত বলে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলে প্রচার করা হত। কখনো বা বলা হত এঁদের উপর শয়তান ভর করেছে। য়ুরোপে চার্চের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিভার লাঞ্ছনা ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সমাজের তথাকথিত নেতাদের হাতে যে কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তার কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। দীর্ঘকালের সামাজিক বিরোধের ফলে এই ধারণা প্রচার লাভ করেছে যে, প্রতিভা ও অসুস্থ মানসিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

[illegible]

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জীবনের ইতিহাস। তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অনেকেই মানসিক রোগে ভুগতেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে পাগলা গারদে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে লেখক, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত-শিল্পী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রতিভাবানদেরই দেখা যাবে। মানসিক ব্যাধিতে যাঁরা ভুগতেন তাঁদের মধ্যে সক্রেটিস, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ান, বীঠোভেন, সুম্যান, গ্যালিলিও, মোজার্ট, ক্লাইভ, নিউটন, কোঁতে, নীটশে প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকদের সম্বন্ধে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি।

কবি ও ঔপন্যাসিকের রচনা যেমন প্রচার লাভ করে অন্যান্য প্রতিভাবানদের কীর্তি তেমন প্রচারিত হয় না। লেখকদের মতো নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত করবার সুযোগও অন্য কারো নেই। তাছাড়া রচনার বহুল প্রচারের জন্য পাঠকদের মনে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। যাঁর লেখা পড়ে আনন্দ-বেদনায় মন অভিভূত হয়ে পড়ে সেই লোকটির পরিচয় কি? এই আগ্রহের ফলে লেখকদের জীবনের কাহিনী সাধারণের মধ্যে যত প্রচারিত হয় অন্য শিল্পীদের তেমন হয় না। হয়ত সেইজন্যই পাগলামির সঙ্গে প্রতিভার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই লেখকদের দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। লেখকদের মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেউ একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ বা বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে মানসিক রোগের যেরূপ আধিক্য দেখা যায় অন্য কোনো শতকে তেমন দেখা যায় না।

ইতালিয়ান কবি তোরকোয়াতো তাসোর (১৫৪৪—১৬৫৯) জীবনের দুঃখময় ইতিহাস বিচিত্র নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ। তাঁর 'জেরুজালেম উদ্ধার' কাব্য লাতিন সাহিত্যের একটি ক্লাসিকস্। তিনি ছিলেন ফেরারার ডিউকের সভাকবি। ডিউকের বোন লিওনারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাসোর বিপদ ঘনিয়ে এল। তিনি প্রাণভয়ে নেপোলস্ পালিয়ে এলেন; কিন্তু 'জেরুজালেম উদ্ধারের' পাণ্ডুলিপি ডিউকের সভায় রয়ে গেল। কাব্য এবং প্রণয়িনী হারিয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। ১৫৭৯ থেকে সাত বছর তাঁকে পাগলা গারদে আটক রাখা হয়েছিল। তাসোর জীবনী অবলম্বন করে গোয়টে একটি কাব্য-নাটক রচনা করেছিলেন। অন্যত্র গোয়টে যে অভিমতই প্রকাশ করুন না কেন, এই নাটকে তাসোর করুণ কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে যোগসূত্র দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হয়। বায়রণও 'দি ল্যামেণ্ট অব তাসো' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

পাসকাল (১৬২৩—৬২) বালক বয়সে একটি যোগ করবার যন্ত্র আবিষ্কার করে সমকালীন বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছিলেন। চিরজীবন তাঁর কর্মোদ্যম বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার মধ্যে বিভক্ত ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য প্রতিভার অনুরূপ কীর্তি তিনি রেখে যেতে

লেখকদের মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়

পারেন নি। তাঁর 'চিন্তাধারা' বইটি শিক্ষিত সমাজে চিরদিন সমাদৃত হবে। পাসকাল উন্মাদ আশ্রমে যাবার মতো উন্মাদ কখনো হন নি, কিন্তু মানসিক ব্যাধি তাঁর কর্মশক্তি অনেকটা পঙ্গু করেছিল। হ্যালুসিনেশানের জ্বালায় তিনি মানসিক শান্তি পেতেন না। তাঁর সর্বদাই মনে হত তিনি যেন এক অতলস্পর্শী গহ্বরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে সরে আসবার উপায় নেই, যে কোনো মুহূর্তে গহ্বরে পড়ে যেতে পারেন। আর ছিল, তাঁর অদ্ভুত জলাতঙ্ক। জল দেখলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এ-ছাড়া তীব্র মাথা ধরা এবং মৃগী রোগেও আক্রান্ত হতেন প্রায়ই।

'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর বিখ্যাত লেখক জোনাথান সুইফ্‌ট (১৬৬৭—১৭৪৫) জীবনে নাকি হেসেছেন মাত্র দু'বার। অথচ তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায় কত হাসির খোরাক ছড়িয়ে আছে। একটা অস্বস্তিকর মানসিক পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁর কাকা মৃত্যুর পূর্বে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সুইফ্‌টের উৎকেন্দ্রিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানসিক অস্থিরতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্টেলা ও ভানেসা নামক দুই মহিলার প্রতি তাঁর ব্যবহার। বিয়ে করবেন বলে দু'জনকেই কেবল আশা দিতেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই বিয়ে করেননি। সুইফট সারা জীবন মাথা-ঘোরা রোগে ভুগেছেন। কানে শুনতে পেতেন না; চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। মুখের এক পাশ অবশ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় এমন অগ্নিশর্মা হয়ে থাকতেন যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় হত। শেষ বয়সে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি এমন চরম অবস্থায় পেঁাছেছিল যে, তাঁকে সংযত রাখার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে হয়েছিল। মৃত্যুর পরে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কের গঠন ত্রুটিপূর্ণ।

ডঃ জনসন (১৬৯৬—১৭৭২) যদিও নিজে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির কোনো সম্বন্ধ দেখতে পাননি তথাপি তাঁর জীবন থেকেই এর সমর্থনে দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন বিষাদ রোগ বা মেলাঙ্কোলিয়া। জীবনের প্রথম ও

তাঁকে কাটাতে হয়েছে চরম দারিদ্র্যে এবং তার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। ব্যাধি-কল্পনা বা হাইপোকণ্ড্রিয়া রোগে তিনি সর্বদা অস্থির থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি যেন শুনতেন অদৃশ্য নরনারী তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। অন্য কেউ শুনতে পেত না। কিন্তু তিনি শুনতে পেতেন। পথে চলতে চলতে হঠাৎ কি খেয়াল হল, প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগুতে লাগলেন। হয়ত খেতে বসেছেন, অকস্মাৎ পাশের ভদ্রমহিলার পা ধরে টানতে আরম্ভ করলেন। এমনি সব বিচিত্র ব্যতিকের বিবরণ লিখে গেছেন বসওয়েল। জনসনের আতঙ্ক ছিল তিনি বদ্ধ পাগল হয়ে যাবেন।

রুশোর (১৭১২—১৭৭৮) পিতৃবংশে ছিল পাগলামির বীজ। যাঁর 'সামাজিক চুক্তি' একদা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করেছিল তাঁর মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই ব্যাহত হত। রুশোর কাজে ও কথায় পরস্পর-বিরোধিতার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অনেক সময় যুক্তিহীন দুর্বোধ্য উক্তি করতেন। পাস-কালের মতো তিনিও ছিলেন হ্যালুশিনেসানের রোগী। তাঁর সব সময় মনে হত সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; তিনি অত্যাচারীদের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন। বিষাদরোগ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

রোমান্টিক-পূর্ব যুগের ইংরেজ কবি কুপার (১৭৩১—১৮০০) কয়েকবার সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে ভালো থাকতেন, তখন কবিতা লিখতেন। সামান্য সরকারী চাকুরে হিসাবে তাঁর জীবন আরম্ভ হয়। একজন পৃষ্ঠপোষকের চেষ্টায় হাউস অব কমন্সে তিনি কেরাণীর চাকরি পেয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়োগের ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কুপারকে পরীক্ষা দিতে বলা হল। পাশ করলে চাকরি থাকবে; না হলে আবার বেকার হতে হবে। চাকরি যাবার আতঙ্কে কুপার বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বটে, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেল। এক বছর উন্মাদ চিকিৎসালয়ে থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। শ্রীমতী আনউইন নামে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। তাঁকে বিয়ে করবেন বলে সব স্থির। এমন সময় (১৭৭৩) আবার তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। এর পর থেকে প্রায়ই তিনি মানসিক রোগে ভুগতেন। শ্রীমতী আনউইন তাঁর সেবা করতেন, সুস্থ অবস্থায় উৎসাহ দিতেন কবিতা লিখতে। শ্রীমতী আনউইন কুপারের আগেই মারা গেলেন। কুপার তাঁর সেবা করেছেন। এর পর যখন কুপারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে তখন তাঁকে সস্নেহে সেবা করবার কেউ ছিল না।

'মার্ভেলাস বয়' চ্যাটারটন (১৭৫২-৭০) দারিদ্র্যের জ্বালায় এবং কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে না পারার বেদনায় আত্মহত্যা করেছেন এই কথা সকলে জানেন। কিন্তু তাঁর ল্যান্ডলেডির বিবৃতি থেকে জানা যায় আত্মহত্যার পূর্বে চ্যাটারটনের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭—১৮২৭) সারা জীবন অলৌকিক ছায়ামূর্তি দেখতে পেতেন, শুনতে পেতেন তাদের কথা। চার বছর বয়সেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ঈশ্বর জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছেন। দেবদূত, বাইবেলের প্রফেট প্রভৃতির ছায়া তিনি সর্বত্রই দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন হোমার, ভার্জিল, দান্তে ও মিলটন তাঁর দিবারাত্রির সঙ্গী। ব্লেক প্রচার করতেন যে, ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি ছবি আঁকেন ও কবিতা লেখেন। তিনি ঠিক উন্মাদ কখনো হননি, তথাপি স্বাভাবিক মান-সিকতার যে অভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জার্মান কবি হলডারলিন (১৭৭০—১৮৪৩) গ্রীক ঐতিহ্য সমাপ্তি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি চিঠির আকারে রচিত 'হাইপেরিয়ান' কাব্যগ্রন্থ। জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর তাঁকে উন্মাদ আশ্রমে কাটাতে হয়েছে।

কবি ও জীবনীকার রবার্ট সাদে (১৭৭৪-১৮৪৩) অনেক গাথা কবিতা এবং জীবনী ও প্রবন্ধ লিখেছেন। আজ তাঁর খ্যাতি অনেকটা ম্লান হলেও সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ১৮১৩ সাল থেকে তিনি ছিলেন ইংলন্ডের পয়েট লরিয়েট। বিরাট পরি-বারের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁকে প্রচুর লিখতে হত। কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে ভুগেছেন।

চার্লস ল্যাম (১৭৭৫—১৮৩৪) ও তাঁর দিদির করুণ কাহিনী সুপরিচিত। তাঁদের বংশে পাগলামির বীজ ছিল। ল্যামের বয়স যখন মাত্র কুড়ি তখন তিনি মানসিক বৈকল্যে আক্রান্ত হন। ছ' সপ্তাহ পরে পাগলা গারদ থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর দিদিও বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন। একদিন উন্মত্ত অবস্থায় মা'কে খুন করে ফেলল মেরি। ল্যাম দিদিকে দেখা-শোনার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। পাছে দিদির অযত্ন হয়, এজন্য তিনি বিয়ে করেননি।

ঊনবিংশ শতকের আমেরিকান সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯—৪৯)। পো ছিলেন একাধারে কবি, গল্পলেখক এবং সমালোচক। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে। ১৮৪৭ সালে স্ত্রী ভার্জিনিয়ার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। কেবল মদ খেতেন আর সেই নেশা দিয়ে বেদনা ভুলে থাকতে চাইতেন। একবার আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর থেকে প্রায়ই তিনি অল্প সময়ের জন্য মানসিক বৈকল্যে ভুগতেন, আবার সুস্থ হয়ে উঠতেন। মত্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

'সুপারম্যানের' তত্ত্ব প্রচারক নীটশে (১৮৪৪—১৯০০) দার্শনিক গ্রন্থ লিখলেও তাঁর রচনাবলী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এমন মৌলিক যাঁর দর্শনচিন্তা তিনিও শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারেননি। ১৮৮৯ সালে তিনি পাগল হয়ে যান। পাগলা গারদে তাঁকে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সুস্থ হতে পারেননি।

মোপাসাঁ (১৮৫০-৯৩) তাঁর পরিণতি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে আরম্ভ হয়। এমন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, মনে হয় যেন ফেটে পড়বে। চোখে সব অন্ধকার মনে হয়। তবু সে যুগের রীতি অনুযায়ী কপালের দুপাশে বড় বড় জোঁক লাগিয়ে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতেন। পাগল হবার আশঙ্কা তাঁর বরাবরই ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে পাগলের লক্ষণ জেনে নিয়ে নিজের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। ছোট ভাইয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ায় তাঁর আতঙ্ক আরো বাড়ল। পাগল হয়ে বেঁচে থাকবার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তিনি ক্ষুর দিয়ে গলা একটু কাটলেন, আত্মহত্যা করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। দেড় বছর বদ্ধ-পাগল অবস্থায় বাতুলাশ্রমে থেকে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মোপাসাঁর বইগুলি পাগল হয়ে যাবার আতঙ্কের ছায়ায় রচিত।

ভার্জিনিয়া উলফের (১৮৮২-১৯৪১) মতো এমন তীক্ষ্ম ধীসম্পন্না লেখিকা ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে পেয়েছেন সম্মান ও ভালোবাসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লন্ডনে বোমা পড়তে সুরু হবার পর থেকে ভার্জিনিয়া বড় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর দিনলিপি থেকে অসংলগ্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে। লন্ডনের উপরে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। স্বামীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে এসে বাস করতে লাগলেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে একদিন স্ত্রীর খোঁজে এসে স্বামী দেখলেন তাঁর নামে একটি চিঠি টেবিলের উপরে চাপা দেওয়া আছে, ভার্জিনিয়া কোথাও নেই। নিকটে নদী; নদীর তীরে পাওয়া গেল ভার্জিনিয়ার টুপি ও বেড়াবার লাঠি। পনেরো দিন পরে নদীর জল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। চিঠিতে স্বামীকে ভার্জিনিয়া লিখেছেন : 'আমার আশঙ্কা হয় আমি পাগল হয়ে যাব। অদৃশ্য লোক থেকে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে এসে আমাকে অস্থির করে, কিছুতেই কাজে মনঃসংযোগ করতে পারি না। এই মানসিক বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করেছি, কিন্তু আর পারছি না।...পাছে তোমার জীবন আমার জন্য দুঃখময় হয়ে ওঠে, এইজন্য আমি বিদায় নিচ্ছি।'

ওপরে আমরা লেখকদের জীবন থেকে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন যাদের মন ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। তাহলে প্রতিভার সঙ্গে পাগলামির যোগাযোগ সম্বন্ধে ধারণাটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? তীক্ষ্ম অনুভূতি, মানসিক সচেতনতা এবং মাত্রাতিরিক্ত উদ্দীপনা প্রতিভার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ। যে ঘটনা বা দৃশ্য অন্য লোকের মনে রেখাপাত করে না প্রতিভাবানের হৃদয়ে তা হয়ত প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কখনো ভুলে থাকা প্রতিভাবানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবির "নিত্য জাগরণ" মন ও অনুভূতির নিরন্তর সচেতনতা প্রতিভার লক্ষণ। স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ গঠনের উপরেই এইসব লক্ষণ নির্ভর করে। পাগলামিও স্নায়ু-রোগ।। উন্মাদ ব্যক্তির প্রবল উত্তেজনা, অস্থিরতা ও বিষাদ স্নায়ুবিকৃতির বাহ্যিক প্রকাশ। সুতরাং পাগলামি ও প্রতিভা দুই-ই স্নায়ুমণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। উত্তেজনার প্রকৃতি ও স্নায়ুর গঠন অনুসারে প্রতিভাবানের উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়া হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ। উন্মাদ ব্যক্তির মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা দেয় তার ফলে

(শেষাংশ ৯৬ পৃষ্ঠায়)

ছেলে

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

ওই মেয়েটি—আমাদের পেছনের বাড়ির বধূটি আমাকে নতুন করে শেখাল যে, সবার ডাকে সকলের অসাড় দেহে নিসাড় প্রাণে সাড় জাগে না।

নিজের যৌবনকালে আমিই তো দেখেছি। তখন সবে নতুন বিয়ে হয়েছে। চাকরি করি এক কারখানায়। থাকি তার কাছেই এক বাসায় বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের সঙ্গে। সকাল ছটায় আমার হাজিরা দিতে হয় কাজে। ভোর পাঁচটায় কলের ভোঁপু বেজে ওঠে। কী তার আওয়াজ! দশ দিক আঁতকে ওঠে সেই শব্দে। টানা পাঁচ মিনিট ধরে বাজে সেই দৈত্যপুরীর শিঙা। চারদিকে ঘুমন্ত কর্মীদের জাগাবার জন্যেই সেই ব্যবস্থা। কিন্তু আমার কুম্ভকর্ণী ঘুম কোনদিন ভাঙত না সেই গর্জনে। বিয়ের আগে সেই আওয়াজের উপরও বাড়িসুদ্ধ লোক চিৎকার পেড়ে তবে আমায় জাগাত। কিন্তু বিয়ের পরে? কলের শিঙার হুঙ্কার ওঠবার আগেই অনেক ভোরে নববধূ—লোকভরা বাড়িতে চেঁচিয়ে ডাকতে তো পারত না—কানের কাছে মুখটি এনে শুধু ডাকত, "ওগো!" ব্যস্, ওই এক ডাকেই ঘুম ভেঙে যেত, তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠতাম।

আমার বাড়িটির প্রশংসা করে সবাই। কিন্তু তার এক ফোঁটাও আমার পাওনা নয়। এ বাড়ির ছক নকশা পরিকল্পনা কিছুই আমার নয়। এ বাড়ি আমি করাইনি। আমি কিনেছি। যাঁর কাছ থেকে কিনেছি, আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক যেন আমারই মন থেকে আমার বাসনাটি টেনে এনে সেই অনুযায়ী তৈরী করিয়েছেন বাড়িটা। আর, তিনি নিজে থাকতেও পারলেন না এ-বাড়িতে, আমার কাছে বিক্রি ক'রে বাঁচলেন। অবশ্য বিক্রি করার আসল কারণটি তিনি আমায় বলেননি।

চাকরি থেকে অবসর পাবার আগে থেকেই মনে সাধ ছিল, এমন এক নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলে নীড় বাঁধতে হবে যেখান থেকে অল্প আয়াসেই শহরেরও নাগাল পাওয়া যায়—সেখানে বাকি জীবনটা একটু লেখা ও পড়া ক'রে কাটিয়ে দেব। অনবসর জীবনটা তো সেই পাঁচ বছর বয়সে ইস্কুল-ছোটা থেকে শুরু ক'রে অফিস-ছোটার শেষদিন পর্যন্ত শুধু ছোটাছুটি ক'রেই কাটাতে হয়েছে; লেখাপড়ার সাধটা অতৃপ্তই থেকে গেছে তার মধ্যে।

অবসর পাবার পরে এ বাড়িটার সন্ধান পাওয়া গেল সহজেই। ছোট্ট বাড়ি। মূলত দোতলা। তবে, তেতলায় সিঁড়িঘরের সঙ্গে ছোট একটা ঘর করা হয়েছে, তার পশ্চিম দিকটা সিঁড়ির লাগোয়া, পূর্বদিকে একটা বড় জানালা, দক্ষিণে দরজা আর একটা বড় জানালা আর সেই জানালারই বরাবর উত্তরের দেওয়ালে একটি ছোট জানালা। ঘরের দক্ষিণে একটু খোলা ছাত। এই ঘরটিও যেন করা হয়েছে ঠিক আমার মনের প্ল্যান বুঝে।

বাড়িটা কেনার আগে যথারীতি দলিলপত্র দেখেছি, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়িটি বিক্রি করছেন কেন?"

বললেন, তিনি নাকি শহরের একেবারে উপকণ্ঠে থাকতে চান, সেখানে বাড়িও কিনেছেন, তার দরুণ ধার হয়েছে কিছু, সেটা শোধ করার জন্যেই বেচে দিতে চান এ-বাড়ি।

বাড়ি কেনা হল। রেজেস্ট্রি হল। দখল নেওয়া হল। তেতলার ঘরটি আমার এত পছন্দ হল যে, একেবারে গৃহপ্রবেশের রাতটিও আমি ওই ঘরেই কাটিয়েছি। আমার বইপত্র নিয়ে একা ওই ঘরে আস্তানা নিয়েছি। 'ভবে এসেছি একা, যাব একা, সঙ্গে কেউ যাবে না।' বইপত্রও যাবে না সঙ্গে; কিন্তু বইপত্র থেকে যদি কিছু আহরণ করতে পারি, তা হয়তো জন্ম-জন্মান্তরে সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এমন একটা ক্ষীণ আশা আছে মনে। এমন আশা নয় যে, আগামী জন্মে আর 'অ আ ক খ' থেকে শুরু করতে হবে না। কিন্তু যাক্ সে-কথা।

আমার বাড়ির লাগ-উত্তরেই যে কুটির-বাড়িটি, দোতলা থেকে তার প্রায় সব এবং তেতলা থেকে একেবারে পুরো সবই দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরের ভিটিতে ওদের যে বাসগৃহ এবং পশ্চিমের ভিটিতে রান্নাঘর—দুটো ঘরেরই দরজা-জানালা খোলা থাকলে ভেতরে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এর জন্যে সংকোচ বোধ হলেও আমি নিরুপায়।

কেনার আগেই তো দেখা, পরীক্ষা করা প্রভৃতির সূত্রে কয়েকবারই আসতে হয়েছে এ বাড়িতে, উঠতেও হয়েছে ওপরে। তখনই লক্ষ্য করেছি পেছনের বাড়ির ওই বউটিকে। চোখ জুড়িয়ে গেছে যেন। রূপ বলতে যাঁদের মনে রূপোলি জেগে ওঠে তাঁদের রুচিকে আমার নমস্কার। রূপ বলতে আমি বুঝি সুন্দরকে। খুঁটিয়ে দেখলে বউটির মুখের গড়নে হয়তো কত-না খুঁতই বের করা যায়, কিন্তু ওর দিকে চাইলে তার কিছুই চোখে পড়ে না। সব ত্রুটিকে ঢেকে রেখেছে ওর নিটোল স্বাস্থ্যের মধুরতা। ভরাট গড়নের কর্মঠ শরীর, অথচ দেখলেই বোঝা যায়, ননীর মত কোমল। গায়ের রঙ ফরশা নয় ব'লে ময়লাও নয়। কী রকম বলব! দাঁড়ান। ঠিক! ঠিক বাঙলাদেশের পলিমাটির রং। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। আনন্দময়ী। শুধু মুখে নয়, মেয়েটা চোখেও হাসে। সর্বাঙ্গে হাসে। তার হাসিতে চলনে কোন চপলতা নেই—আছে স্নিগ্ধতা—যেমন আছে বাঙলাদেশের শ্যামলা রূপে। মেয়েটিকে দেখলেই আনন্দ হয়।

অথচ ওই মেয়েরই মধ্যে যে আমার জন্য এমন নিরানন্দ নিহিত ছিল, তা কে জানত! জানলে এ বাড়ি কিনতামই না আমি।

প্রথম রাত—গৃহপ্রবেশের রাত তো কাটল আমার সাধের এই নতুন বাড়ির তেতলার বিজন ঘরে। পরদিন উষাস্নান এবং প্রাতরাশের পরে প্রশান্ত প্রসন্ন চিত্তে কাগজ-কলম নিয়ে একটু লিখতে বসলাম। লেখাপড়া যাত্রা ক'রে রেখেছিলাম আগের দিনই। লেখা কিছুটা এগিয়েছে, অকস্মাৎ উত্তরদিক থেকে একটা বিকট গর্জন উঠে এসে আমার বুকের সঙ্গে কলমও কাঁপিয়ে

দিল। উত্তরের জানলাটা খোলাই ছিল, এক-লাফে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে। যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে গেলাম।

উত্তরের সেই বাড়িটির উঠোনের এক কোণে একটা পেয়ারাগাছের ডালের সঙ্গে মাথার লম্বা চুলের গোছার বাঁধনে ঝুলছে সেই বউটি। ঝুলছেই বলা চলে। তার দু' পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা রয়েছে অতি কষ্টে মাটি ছুঁয়ে কি না-ছুঁয়ে। মেয়েটির উপর-অঙ্গ থেকে শাড়ির আঁচল খসে নিচে পড়ে লুটোচ্ছে। সেই লুটিয়ে-পড়া আঁচল সে দু' হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করছে, কখনও হাত তুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজের চুলের গোছার বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না—মনুষ্য-অবয়বের একটা বিরাট দেহ স্ত্রী-জানোয়ার একটা লম্বা কাঁচা কঞ্চা দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি পেটাচ্ছে। বেশি ক'রে পেটাচ্ছে তার দুটো হাতের ওপর—যেন সে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে। পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটা মানুষেরই ভাষায় গর্জন করছে, "খাবি পেয়ারা? অ্যাঁ, খা পেয়ারা! পেয়ারা কেন, গোহাড় চিবোতে পারিস নি? দাঁতের যে তাতে আরও সুখ হত লা!......"

"দাঁড়া, তোর দাঁত আমি সাঁড়াশি দিয়ে ওপড়াচ্ছি।" বলে জানোয়ারটা ছুটে চলে গেল রান্নাঘরে—সাঁড়াশি আনতেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই অবকাশে মেয়েটি চুলের বাঁধন খুলে এক ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

ওই দৃশ্যের সঙ্গে আর একটি অঙ্গও দেখা গেল। পেয়ারাগাছের তলায় সেই জানোয়ারী কাণ্ডের অদূরে মাটির ওপর পা ছড়িয়ে ব'সে আছে বছর-চার বয়সের একটি নাদুসনুদুস ছেলে—নিশ্চল যেন পুতুল। তার দু' চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম যেন আটকে গেছে, সেই অবস্থায় তার ডানহাতে ধরা একটি আধ-খাওয়া পেয়ারা ঠেকে রয়েছে তার হাঁ-করা মুখে।

জানালায় ছুটে গিয়ে দৃশ্যটি দেখামাত্রই পেছিয়ে আসতে পারিনি। হতভম্ব হয়ে পড়ার দরুণ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তারই মধ্যে দেখে ফেলতে হল ওই দৃশ্য। সম্বিত হতেই পেছনে সরে এসে, টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম থর থর ক'রে।

পরিচয় জানা গেল প্রতিবেশী পরিবারটির। বাড়ির মালিক বিধুভূষণ বছর-তিরিশ বয়সের যুবক। মেয়েটি তার স্ত্রী। খোকাটি তার ছেলে। আর, মনুষ্যাকার স্ত্রী-জানোয়ারটি বিধুভূষণের জননী। বিধু চাকরি করে দূরের কোন এক কারখানায়। রোজ ভোরে উঠে, স্নান ক'রে, রুটি-চা খেয়ে, সে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধ'রে চলে যায় কাজে। দুপুরবেলা সেখানেই ক্যান্টিনে খায়। বাড়ি ফিরতে রাত ন'টা-দশটা বেজে যায়। অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ—বোকা-বোকা ধরণের।

প্রায় প্রতিদিন লেগেই আছে বউটির ওপর নির্যাতন। এক-একদিন একাধিক বারও চলে। উদ্যত হয়েই আছে শাশুড়ীর হাত। বউ-এর যাবতীয় আচার-আচরণই তার অপছন্দ। সব সময় সে মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই আছে, ওটা নাকি ভ্রষ্টা নারীর লক্ষণ। আশ্চর্য, ছেলে যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ততক্ষণ কিন্তু তার খান্ডারনী মাতা বকর বকর কি হুংকার-ঝংকারের ওপর আর ওঠে না। ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই তার হাত নিশপিশিয়ে ওঠে, আর ছেলে বাড়িতে পদার্পণ করলেই সেই নিশপিশানি বন্ধ হয়ে যায়! তবে কি বিধুর চিরনিজীব চোখেও কোন-একদিন এক কণা প্রতিবাদের আভাস দেখা দিয়েছিল এবং সেটা তার জননীর সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়নি?

কোনদিন সকালে বিধুভূষণ বেরিয়ে যাবার পরেই তার মা যমের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরল বউ-এর চুলের মুঠি। কী ব্যাপার? না, ভোর-বেলা বউ-এর ঘুম ভাঙেনি—তাকে ডেকে তুলতে হয়েছে। কোনদিন বাসন কম-মাজা হবার অপরাধে বউ-এর দুই গাল ফুলে উঠল চড়ে চড়ে। আবার তার পরদিন যেই বাসন একটু বেশি ঘষে চকচকে ক'রে মাজা হল অমনি আর রক্ষা নেই, শাশুড়ী চুলের মুঠি ধরে বউকে উবু করে ফেলে তার কপাল ঠুকে দিতে লাগল সেই বাসনের ওপর। বাসনের ধারের ঘায়ে কপাল কেটে রক্তারক্তি। সব ব্যাপারেই এমনি। খুঁত ধরা লেগেই আছে এবং সেই অজুহাতে প্রহার। প্রহার সশস্ত্র বা নিরস্ত্র হবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সেটা নির্ভর করে যথাসময়ে হাতের কাছে প্রহরণ পাওয়া-না-পাওয়ার ওপর। লঘু অপরাধেও কচাকাণ্ড চলে আবার গুরু অপরাধেও চলে কিল, চড়, মাথা-ঠুকে দেওয়া, ধাক্কা-মারা প্রভৃতি।

আমার গৃহিণী কয়েক দিনের মধ্যেই এ-সব দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বললাম, "আচ্ছা, বউটি কি তার স্বামীকে বলে না এ-সব কথা?"

তিনি বললেন, "স্বামী-না—স্বামী! একটা অবোলা বলদ। ওকে বলে কোন ফয়দা হলে নিশ্চয়ই বলত। আর বলবেই বা কখন?"

প্রতি রাত্রেই যে বধূটি তার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার অধিকার পায় তা নয়। এ বিষয়ে শাশুড়ীর কড়া বিধিনিষেধ আছে। যে-রাত্রে অধিকার পায়, গৃহিণীর বিশ্বাস, সে রাত্রেও শাশুড়ী ঘরের বাইরে আড়ি পেতে থাকে, এবং তা যে থাকে সে-কথা বউও জানে।

বউটার তো অমন সবল স্বাস্থ্য। সে কি রুখে দাঁড়াতে পারে না? গৃহিণীকে বললাম, "খান্ডারনী যখন বাড়ি থাকবে না, সেই সময় একদিন জানালা থেকে বউটাকে একটু উৎসাহ দিও তো......"

"রক্ষে কর।" আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "যে-ভদ্রলোক এ-বাড়ি ক'রিয়েছিলেন, তিনি কেন বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন তা বুঝি শোননি। আমি জানতে পেলাম কাল।"

সেই ভদ্রলোক নাকি বউটিকে উৎসাহ দিতেন শাশুড়ীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তাই-না জানতে পেরে, সেই প্রৌঢ় লোকটার আর তার মেয়ের মত এই বউটার নাম নিয়ে শাশুড়ী হাটে-মাঠে এমন কুৎসা রটাতে লাগল যে, কান পাতা দায়। খান্ডারনীকে তল্লাটের কেউ দু' চোখে দেখতে পারে না; কিন্তু এই রসটির এমনি মাদকতা যে, গ্রামের লোক বেশ একটু মজা পেয়ে ভেতরে ভেতরে মেতে উঠল। বাইরে সেই ব্যাপারে আর ভেতরে বউটির দুর্গতি দেখতে না পেরে, অতিষ্ঠ হয়ে ভদ্রলোক নিজের মান নিয়ে সড়ে পড়েছেন।

গৃহিণী অধীর স্বরে বললেন, "আমাদের কিছুই করতে হবে না, বাপু। তুমি বরং বরে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়ি বেচে ফেলার ব্যবস্থা কর।"

এ বাড়িতে কয়েকদিন কাটবার পর থেকে রোজই সন্ধ্যেবেলা দু'—একজন করে সহৃদয় অবসরজীবন প্রতিবেশী আমাদের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় বেড়াতে এসে তাঁরা কিছু ক্ষণ আমাকে নিজেদের সঙ্গদানে বাধিত করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে চতুর্দিকের খবর-টবর পাওয়া যায়। কাছের থেকে শুরু ক'রে অদূরের এবং সুদূরের পর্যন্ত—পল্লী থেকে দিল্লির এবং তারও ওপর গোটা পৃথিবীর সংবাদ।

ওই পরিবারটিকে যাঁরা বহুকাল ধরে জানেন তাঁদের কাছে জানা গেল, বিধুভূষণের বাপ নাকি চালাক-চতুর লোক ছিল, কিন্তু দেহ ছিল কাহিল। তবে, লোকটির নাকি তেজবীর্য ছিল এবং সে কাহিলও চিরদিনই ছিল না। স্ত্রীর দজ্জালপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে, উলটো খান্ডারনীর মার খেয়ে খেয়ে, তার ওপর মনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে লোকটা কাহিল হয়ে পড়েছিল। শেষটা আর সইতে না পেরে চলন্ত রেলগাড়ির চাকার তলায় গলা দিয়ে সব জ্বালা মিটিয়েছে।

সেই বাপের এবং এই মায়ের ছেলে বিধু-ভূষণেরও নাকি এমন হাবাগোবা হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ওই মহাজননীর তর্জন-গর্জন আর নিয়ত প্রহারের মধ্যে হতভম্ব হয়ে হাতেই বড় হয়েছে ব'লে তার মস্তিষ্কের জড়ত্ব আর ঘুচতে পায়নি। আজও মায়ের সামনে ছেলে যেন সব সময়ে জুজুর ভয়ে ভীত। মাস পড়লে পুরো মাইনেটা এনে মায়ের হাতে তুলে দেয়, আর প্রতি রাত্রে বাড়িতে খায় ঘুমোয়—এ ছাড়া সংসারের কোন খোঁজও রাখে না সে। ছুটির দিনে প্রায়ই কারখানায় বেরিয়ে যায় উপরি খাটতে। যেদিন বাড়ি থাকে, মায়ের অবিরাম হুকুমে ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতেই ছুটির আরাম তার মাথায় ওঠে।

আমার সেই সুবিবেচক প্রতিবেশীদের কাছে এক সন্ধ্যার আসরে উপদেশ চাইলাম, "আমি যে, দাদা, সইতেও পারছিনে, রইতেও পারছিনে; কি করা যায় বলুন দেখি?"

একজন বললেন, "এক কাজ করুন, মশাই। কালই একজন রাজমিস্ত্রী ডেকে একেবারে ইট গাঁথিয়ে বন্ধ করে দিন খাণ্ডার-গিন্নির বাড়ির দিকের সব কটি জানালা।

"খান্ডার-গিন্নি?" শুধোলাম, "এ নামেই ডাকে নাকি সবাই ওকে?'

বললেন, "ডাকবে! পেছনে পাড়ার সবাই ওই বলে ওকে। কিন্তু ও-নামে ডাকবে, এমন সাহস কার? তার মানে, যেচে ছোটলোকের মুখের গালমন্দ কে শুনতে চাইবে, বলুন?"

উত্তরদিকের জানালা বন্ধ করে দিলে যে দক্ষিণদিকের জানালা দিয়ে হাওয়া খেলবে না, এই কথাটা ভদ্রলোকেরা প্রবীণ হয়েও জানেন না। আমি জানি। কাজেই ইঁট গাঁথিয়ে জানালাটা বন্ধ না ক'রে তার পাল্লা-দুটোই বন্ধ ক'রে রাখতে লাগলাম। রাত্রে যখন উত্তরবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন নিজের শোবার আগে জানালাটা খুলে দিই—দখিনা হাওয়ার খেলায় আমার নিদ্রা সুখদায়ক হয়। কিন্তু বউটির দুঃখে মাঝে মাঝে রাত্রি বিনিদ্র হয়ে উঠে এবং দুঃস্বপনে দুঃখময় হয়ে ওঠে নিদ্রা।

দিনের বেলা আমার তেতলার ঘরের উত্তরের জানালা বন্ধ ক'রে রাখি। কিন্তু তার দুটো কবাটেই কাঠের জোড়ার মুখে ফাঁক রয়েছে— কাঠ শুকিয়ে চওড়া হয়ে গেছে সেই ফাঁক। তাতে চোখ রাখলে ওদিকের সবই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। আর এমনি আমার বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল যে, ওদিকে হুংকার-গর্জন উঠলেই আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাল্লার ফাঁকে চোখ না রেখে থাকতে পারি নে। এমন অবস্থায় কেউ কি আত্মদমন করতে পারেন? জানি নে। আমি, দেখলাম, পারি নে।

বউটির অসামান্য ভাল স্বাস্থ্যও তার নিজের ওপর একটা অভিশাপ। স্বাস্থ্য ভাল ব'লে ক্ষুধাটাও একটু বেশি। কিন্তু শাশুড়ী খেতে দেয় মাপা-ধরা। সুতরাং গাছের আর ক্ষেতের কলাটা-মুলোটা, পেয়ারা কি কচি শশাটা শাশুড়ীর অগোচরে সে মুখে তোলার চেষ্টা করে। শাশুড়ী কোনক্রমে টের পেলেই তার পরিণাম কি বিষময় হয়, সে তো আমি আমার এ-বাড়ির জীবনের প্রথম প্রভাতেই প্রত্যক্ষ করেছি।

খান্ডারনীর দেহটি যেমন দানবীয় আহারটাও তেমনি রাক্ষসিক। বাড়িতে খাবার জিনিষ যা কিছু আসে এবং জন্মায়, তার অন্তত অর্ধেক তার নিজের এবং বাকিটা আর তিনজনের। বাজারে দোকানে সে নিজেই যায় এবং প্রায়ই রাস্তাঘাটে দেখা যায় তার মুখ চলছে। তোলো হাঁড়ির মত সেই প্রকান্ড মুখের সতত-চর্বণভঙ্গি বিচিত্র। সাধারণত তার দুই চোখের তারা অবিরত ভাঁটার মত ঘুরছেই, কিন্তু কোন আহার্যের সৎকারে যখন তার মুখ নিবিষ্ট তখন চোখ দুটি প্রায় বোজা—তার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তারা দুটি স্থির। পেয়ারাতলায় ব'সে যখন সে আস্ত পেয়ারা মুখে নিয়ে চিবোতে থাকে তখন তার পরিতৃপ্ত দৃষ্টি দেখলে ভয় হয়, মনে হয় যেন সত্তুরের মাথা মুখে পুরে, চর্বণ ক'রে তার রস নিষ্কাশন করছে। রাস্তার মোড়ের নাপিতের কাছে গিয়ে প্রতিবারই কল লাগিয়ে মাথা মুড়িয়ে ফেলে; তাতে নাকি তার মাথা ঠান্ডা থাকে। দেহটা বিশাল গোলগাল কিন্তু নিরেট; তার পঞ্চাশোত্তর এ বয়সেও মনে হয় যেন লোহা-পেটাই শরীর। তার রংও লোহারং। জোর তো দেখতেই পাচ্ছি। শক্ত-সবল হৃষ্ট-পুষ্ট বউটাকে যেন নিজের খেয়ালমত দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, আছড়াচ্ছে, পেটাচ্ছে—যা খুশি তাই করছে।

সেদিন তখন বেলা প্রায় দুপুর। আমার ঘরের পূর্বদিকের জানালা দিয়ে দেখা গেল, খান্ডারনী বাজার থেকে ফিরছে। কেনা জিনিষ-পত্রে তার কোঁচড় ফুলে আছে—যেন প্রকান্ড ভুঁড়ি। একটা আখ সে দু'হাতে ধ'রে দাঁতের টানে তার খোসা ছাড়াচ্ছে আর টুকরো টুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে, চিবিয়ে, রস চুষে, ছিবড়েটা ফেলছে রাস্তার ওপর থুঃ ক'রে।

মধ্যাহ্ন-আহারের পরে আমি ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে, চোখের সামনে একখানা বই খুলে, একটু বিশ্রাম উপভোগ করছি—এমন সময়ে উঠল খান্ডারনীর গর্জন আর পেটানোর শব্দ। উঠে গিয়ে জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দেখি, বউটি ঘরের বারান্দার হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে আর তার নগ্ন পিঠের ওপর আধ-জানোয়ারনী। মেয়েটির পিঠে লম্বা লম্বা দাগ রক্তমুখী হয়ে ফুটে উঠেছে। মেয়েটি উঠে বসতে চায় কিন্তু অবিরত মারের চোটে উঠতে পারে না।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। আমি অনুভব করলাম যে, সেই মুহূর্তে একটা কিছু করা দরকার—মানুষ হয়ে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নে। কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হল না। বউএর ছেলেটি আজও ঠিকরে-আসা চোখ মেলে হাঁ ক'রে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সেই-ই সক্রিয় হল, ছুটে গিয়ে সে তার পিতামহীর পরনের কাপড় ধ'রে যথাশক্তি টানতে লাগল। কতটুকুই বা সেখানে তার যথাশক্তির মূল্য! তবু তাতেই কাজ হল। খান্ডারনী বাধা পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং প্রচন্ড আক্রোশে ছেলেটাকে তার কচি হাত ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কাছেই জমি তৈয়ারী করা হয়েছিল কোন ফসলের বীজ বোনবার জন্য, ভাগ্য যে, ছেলেটি ধপ্ ক'রে পড়ল গিয়ে তারই ওপর। সেদিকে চেয়ে আখের টুকরোটা শূন্যে উঁচিয়ে জানোয়ারনী ফুঁসতে লাগল, 'মর্—মর্—ডানা গজিয়েছে—মরতে এসেছিস—মর্!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ শব্দে তার ফোঁসানি চাপা পড়ে গেল। ওই জমিটার ধার দিয়েই বেড়ার ওপারে যে সরু গেঁয়ো পথ, সেই পথে যাচ্ছিল একটা লোক। ছেলেটি নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল এসে তারই চোখের সামনে। দেখেই লোকটা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, মেরে ফেললে মেরে ফেললে রে!'

চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল লোক।

খান্ডারনী সেই ইক্ষুদন্ড উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল, 'আয়—আয় শোরের বাচ্চারা এগিয়ে আয়—'

একটা হৈ-চৈ বেধে গেল। পথিক লোকটি বলল, 'পুলিশ ডাক।'

বিকট অঙ্গভঙ্গি করে, কোমরে কাপড়ের আঁচল গুঁজতে গুঁজতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল খান্ডারনী, 'ডাক—ডাক তোর পুলিশ বাবাকে। এসেছ্যালো তোর পুলিশ বাপ—ঠ্যাঙা দেখিয়ে খেদিয়ে দিয়েছি। আমার বউকে, আমার নাতিকে আমি শাসন করব, তাতে তোর পুলিশ বাপ কি করবে রে, পোড়ারমুখো ড্যাকরা?'

অশ্রাব্য ভাষা ছেড়ে গর্জাতে লাগল সে। কিছুমাত্র দমল না। উল্টে প্রতিবেশীরাই শেষ পর্যন্ত এর একটা কিছু বিহিত করার সংকল্প নিয়ে আস্ফালন করতে করতে যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

'হুত, মশাই, আমাদের গাঁয়ে......'তা হলে কি করা হত সে কথা না বলেই পথিকটি নিজের পথ দেখল।

কিন্তু বউটিই বা কেমন মেয়ে! গায়ে তো বেশ শক্তি আছে, অথচ প'ড়ে প'ড়ে মার খায়! একবার হাত-পা ছুঁড়লেও তো কতকটা ঠ্যাকাতে পারে। তা নয়, ও যেন মেনেই নিয়েছে যে, এই নিত্য নির্যাতনই তার পাওনা।

গৃহিণী বললেন, 'ও যে রুখে দাঁড়াবে, গায়ের জোরে পারবে কেন মেয়েটি ওই অসুরনীর সঙ্গে?'

'যতই অসুরনী হোক, ওর বয়স হয়েছে।' আমি বললাম, "যৌবনের ক্ষিপ্রতা আর শক্তি

দাঁড়াবে কিসের ওপর? পায়ের তলায় কি মাটি আছে অভাগীর?' গৃহিণী বললেন, 'বিধুচন্দ্র তো ওই চিজ। মায়ের চোখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস নেই। এদিকে মেয়েটার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই, মানুষ হয়েছে মামা বাড়িতে। মামা ওকে এই ভাগাড়ে ঠেলে দিয়ে ভাগনীদায় থেকে উদ্ধার পেয়েছে। মেয়েটার যে আর কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই গো। ওকে থাকতে তো হবে এ ডাকাতেরই থপ্পরে।'

তা হলেও এমন অসাড় হয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আসল কথা, মেয়েটির মধ্যে সাড় নেই। ওর প্রকৃতিতেও যেন যথেষ্ট মিল আছে বাংলাদেশের সঙ্গে। ওকে কেটে দুখানা করে ফেললেও বোধহয় হাতটি তুলে খাঁড়া রুখবে না। পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললেও একটিবার মার ঠ্যাকাতে চাইবে না—বাঁচবার চেষ্টায়। বাঁচবার যে প্রয়োজন আছে, সে বোধই হয়তো নেই ওর। কি ক'রে সাড় জাগানো যায় ওর মধ্যে? কে নেবে সেই ভার আমি কি পারি? আমার কি সাধ্য?

সেদিনকার ঘটনার বিবরণ জানা গেল গৃহিণীর কাছে। বাজার থেকে ফিরে খান্ডারগিন্নি নাকি তার ভুক্তাবশিষ্ট আখের টুকরোটি নাতিকে দিয়েছিল খেতে। দিয়ে, চলে গেছে স্নান করতে। নাতি সেই আখটা দিয়েছে তার মায়ের হাতে। মা বারান্দায় বসে দাঁত দিয়েই আখ ছাড়াচ্ছিল, দাঁতে কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরো দিচ্ছিল ছেলেকে আর নিজেও মাঝে-মধ্যে এক-আধ টুকরো খাচ্ছিল। পুকুরঘাট থেকে ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখেই......

ঘটনাটি সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করতে পারার আগেই গৃহিণী বললেন, 'তোমাকে বললাম খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে। আর দেরি কোরো না। এর পরে কোন্ দিন চোখের ওপর খুনখারাপি দেখতে হবে। বাড়িটা বিক্রী করার ব্যবস্থা কর তুমি।'

আমারও অতিষ্ঠ অবস্থা। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু'—বরাতে নেই তার করব কি? লোকে ভুতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে যায় শুনেছি, কিন্তু এ যে দেখছি মানুষের ভয়েই বাড়ি ছাড়তে হবে। মানুষ নয়—অমানুষের উৎপাতে। অথচ বাড়িটি এত পছন্দসই হয়েছে যে, এই কদিনেই তার মায়ায় পড়ে গেছি। যিনি সাধ করে বাড়িটা করেছিলেন; তিনিই যখন থাকতে পারলেন না, তার দীর্ঘশ্বাস ঘুরছে এ বাড়ির ওপর। কিন্তু বেচে দিয়ে তারপরে আর একটা পছন্দসই বাড়ি জোটানো কি সহজ কথা? নতুন বাড়ি করার ঝামেলাও এ বয়সে আর পোষাবে না।

কি করা যায়! ভাবতে ভাবতে দুদিন কেটে গেল। এ দুদিন খান্ডার বাড়িতে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। সাধারণভাবে চড়-চাপড়, ধাক্কাধুক্কির ওপর দিয়েই গেছে। এ রকম শান্তভাবে যখন মাঝে মাঝে দু-একদিন কাটে, তখন মনে ভরসা পাই। ভাবি, পেছনের বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাতে যাই? যে মার খাচ্ছে, সে যখন পড়ে পড়ে মার খেতেই ভালবাসে, তখন আমি কেন ভেবে মরি? কিন্তু মেয়েটির অসহায়তার কথা ভাবলেই মন টনটন করে ওঠে। চোখের সামনে একটি নারীর ওপর অমানুষিক নির্যাতন [illegible]

আমি মানুষ হয়ে কি করে তা সইতে পারি? আর ছাড়া মেয়েটির মায়ায় পড়ে গেছি। বউটিকে দেখলেই অন্তর বাৎসল্যে ভরে ওঠে। কি করে আমি ওকে দানবের কবল থেকে রক্ষা করব?

খান্ডারনী যতই আস্ফালন করুক, সেদিন-কার ঘটনায়, অত লোক জড় হতে দেখে, নিশ্চয়ই একটু দমে গেছে।

তৃতীয় দিন দুপুরের পরে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। মনে একটু প্রশান্তি এসেছে—খানিকটা লেখাও হয়ে গেল। কিন্তু, হঠাৎ উঠল সেই উত্তুরে গর্জন। কি যে অভ্যাস দাঁড়িয়েছে। এক-একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরেই মনে মনে সংকল্প করি যে, ওদিক থেকে কোন আওয়াজ এলে আর কিছুতেই উঠে জানালায় যাব না। কিন্তু ওই গর্জন কানে এলেই আর স্থির থাকতে পারিনে সংকল্প ভুলে, উঠে পড়িঃ এবারও তাই হল। উঠে গিয়ে জানালায় চোখ রেখে দেখি, ছি-ছি-ছি-ছি—!

খান্ডারনীর গর্জনভাব থেকেই অপরাধটা বোঝা গেল। বউটি ঘরের মধ্যে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, যথাসময়ে আপনা থেকেই জাগেনি। সেই অপরাধে দানবী শাশুড়ী চুলের মুঠো ধরে বউটাকে শোয়া অবস্থায়ই টেনে তক্তাপোশের ওপর থেকে ফেলল মেজেতে, মেজের ওপর দিয়ে টেনে নামাল বারান্দায় এবং তারপরেও টানছে উঠোনের দিকে। মেয়েটির পরনের শাড়ির অতি সামান্য অংশই তার গায়ে লেগে আছে; বাকিটা লুটোচ্ছে তক্তাপোশ থেকে মেজে পর্যন্ত। খান্ডারনী তাকে এমন জোরে টেনে নামাচ্ছে যে, উঠে বসতে পারার কোন সুযোগই সে পাচ্ছে না, তবু সেই অবস্থায়ই শাড়ির একটা কোণ প্রাণপণে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরে রেখেছে— যেন সেটা তার দেহ থেকে একেবারে আলগা হয়ে না যায়।

চোখ বুজে পিছিয়ে এলাম জানালা থেকে। তরতর করে নীচে নেমে এলাম। গৃহিণী দেখতে পেয়ে বাধা দিলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

সত্যিই তো, কোথায় যাচ্ছি? ওদের বাড়িতে নিশ্চয়ই নয়। যে দৃশ্য চোখে দেখতে না পেরে সরে এলাম, সে দৃশ্যের সম্মুখীন হয়ে বউটির লজ্জার ভার বাড়াতে নিশ্চয়ই যাব না। থমকে দাঁড়ালাম। ফের ওপরে উঠে জামাটি পরে নিলাম।

বড় রাস্তায় গিয়ে, বাস্ ধরে চলে গেলাম থানায়।

বিবরণ শুনে দারোগা বললেন, 'খান্ডার-মাগীর কথা সবাই জানে, মশাই। একবার নাকি পুলিশ পাঠানো হয়েছিল, মাগীর তাড়া খেয়ে বাপ্-বাপ্ বলে পালিয়ে এসেছে। মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা যায় না। উলটে তার হাতে মার খেয়ে কি কলঙ্কের ভাগী হব?

বললাম, 'তা হলে আপনারাও পারবেন না এই মেয়েটিকে রক্ষে করতে?'

বললেন, 'পুলিশকে আপনারা পেয়েছেন কি, মশাই? শাউড়ি বউকে ঠ্যাঙাচ্ছে—ছোট-লোকের ঘরে এ রকম ঘটনা আখছারই ঘটছে। তার মধ্যে নাক গলাতে যেতে হবে পুলিশকে?'

তাই তো! ছোটলোকের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো কি মানুষের শোভা পায়? বললাম, ও নিয়ে আমার নাকেও হয়তো চুলবুলুনি উঠত না, মশাই—যদি না ওই বাড়িটা কিনে বিপদে পড়তাম।

বললেন, 'ওদিকের সব দরজা-জানালা একেবারে পাকা গাঁথনি তুলে বন্ধ করে দিন।'

সেই একই সৎপরামর্শ। তাই করতে হবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ছি, বললেন, 'দেখুন এমনিতে ও সব ব্যাপারে আমাদের করবার কিছু নেই। তবে, এক কাজ করতে পারেন। বউটা যদি কোর্টে নালিশ করে—মানে ফৌজদারী আদালতে; তা হলে আদালত থেকে তদন্তের ভার পড়বে আমাদের ওপর। তখন ঠেসে এমন একখানা রিপোর্ট ঝেড়ে দেব যে...।

সেই রিপোর্টের ঠ্যালায় খান্ডারনীর যে দুরবস্থা হবে, সম্ভবত তারই কল্পনায় দারোগা সাহেব একেবারে ঘর ফাটিয়ে হাঃ-হাঃ শব্দে অট্টহাসি ছাড়লেন।

ঝিমোতে ঝিমোতে বাড়ি ফিরলাম। বউটাকে দিয়ে আদালতে তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে একটা নালিশ করানো যায় কি করে? সহজ মনে হচ্ছিল না কাজটা।

ভাল ঘুম হল না রাত্রে। যে ভগবানের ওপর আস্থা নেই কোনদিন, তাঁরই কাছে বার-বার প্রার্থনা করতে লাগলাম, 'তুমি যদি সত্যি থাক, তবে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে প্রমাণ দাও, প্রভু, যে, তুমি আছ......'

পরদিন সকালে মনে হল—বলং বলং নিজ বলং। নিজের উদ্ধারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে। বাস্তবিক, বউটির বিপদের চেয়ে যেন নিজের বিপদটাই মনে হল গুরুতর। কাজেই তার পরিত্রাণের ভার ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়ে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে প্রবৃত্ত হলাম। বাড়িটা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজে দেবার জন্য একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া লিখে ফেললাম।

দুবার উত্তরদিক থেকে ছোটখাট রকমের গর্জনধ্বনি কানে এল, কিন্তু নড়লাম না, উঠলাম না, জানালায় দাঁড়ালাম না, জোর করে নিজেকে বইপত্রের মধ্যে ধরে রাখলাম—যদিও মনকে তার মধ্যে ধরে রাখা গেল না।

দুপুরের পরে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সহরে যাব, গৃহিণী বললেন, 'দেখ, এ বাড়ি বিক্রি করে না হয় আর একটা বাড়ি কেনা গেল, কি ধর নতুন একটা বাড়ি করা গেল, কিন্তু সে বাড়িতে এর চেয়েও উৎকট কোন উৎপাত যে জুটবে না তার কিছু ঠিক আছে? তার চেয়ে বরং মিস্ত্রী ডাকাও, ওদিকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দাও—সেই ভাল।

'দক্ষিণের হাওয়া উত্তরে খেলা বন্ধ হবে। তাও না হয় বরদাস্ত করা গেল। কিন্তু ওই গর্জন কি তাতে আটকাবে?'

'না আটকাক। চোখের আড়াল হলেই ক্রমে সহ্য হয়ে যাবে। বাড়ির পেছনে আস্তাকুঁড়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা দেখবার কি দায় পড়েছে আমাদের?'

দায় কিছুই ছিল না—যদি ওই মেয়েটির মায়ায় না পড়তাম।'

বললেন, 'নিজের মেয়ে যে পরের ঘরে বিসর্জন দিয়েছি, তার কি হচ্ছে—সে খবরই কত রাখতে পারছি! কাজ নেই আর পরের মেয়ের মায়ায় জড়িয়ে।'

পরদিন সকালে। মিস্ত্রীর খোঁজে বেরোব ভাবছি, হঠাৎ আবার সেই গর্জন। আহা, এই করে করে মেরেই ফেলবে মেয়েটাকে। আমি সভ্য জগতের মানুষ হয়েও মেয়েটাকে বাঁচাতে পারব না!

চিৎকার শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছি। দাঁড়াতেই মনে হল, জানালা যতদিন আছে, ততদিন চোখ তো আর বন্ধ করে রাখতে পারিনে। জানালা যেদিন বন্ধ হবে, সেদিন চোখ খুললেও আর দেখতে পাব না।

জানালার পাল্লার ফাঁকে চোখ রেখে দেখি, বউটাকে কাত করে ফেলে দিয়েছে বারান্দার ওপর আর পেটাচ্ছে একটা কচা দিয়ে। এক-এক ঘা মারার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন উঠছে এক-একটা গালাগালির।

কি যে মেয়েটা! তুই একবার ঝেড়ে উঠে দাঁড়া না, মেয়ে! একবার হাত-পা ঝাড়া দিতেও কি পারিসনে! তা নয়, শুধু একটা হাত ওপরে মেলে ধরেছে—যেন ঢাল আড়াল দেওয়া হল মার ঠ্যাকাবার জন্য। লাভের মধ্যে, সেই উঁচু করে ধরা হাতটার ওপরই ঘা পড়ছে বেশি।

কাছেই ছেলেটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। আজ আর তার দু চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে না। শিশুর দুটি চোখে এক অদ্ভুত উত্তেজনা। হঠাৎ সে দু পা এগিয়ে গেল। তারপরেই যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে এল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। এমন একটা অধীরতা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে যে, দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে— খোকা সইতে পারছে না তার মায়ের ওপর এ নির্যাতন। অথচ সে নিরুপায়।

হঠাৎ কেঁদে উঠল ছেলেটি। না, কান্না নয়, চিৎকার। এক নিদারুণ উত্তেজনায় আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটি 'মা!—মা!—তুমিও মার, মা,—তুমিও মার না। ও মা! তুমি মারতে পারছ না? তুমি কেন মারছ না? তুমি ওঠ না, মা......'

অনর্গল চিৎকার করতে লাগল খোকা।

আর, অবাক কান্ড! সেই ডাক কানে যেতেই বউটি একবার চোখ তুলে তাকালে ছেলের দিকে। সেই দৃষ্টি আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি নিজে বুঝেছি। খান্ডারনীর প্রহারবৃষ্টির মধ্যেই উঠে বসল বউটি। তাই দেখে ছেলে দ্বিগুণ উত্তেজনায় লাফাতে লাগল, 'ওঠ—ওঠ, মা—মার—তুমিও মার—'

এক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি এবং চোখের নিমেষে খান্ডারনীর হাত থেকে এক টানে ছিনিয়ে নিল কচাটা। ছেলে দু হাতে তালি দিয়ে লাফাতে লাগল, সেই সঙ্গে চিৎকার করে কিছু বলছে; কিন্তু কি বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কচাটা ছিনিয়ে নিয়েই সেটা শূন্যে উঁচিয়ে প্রহার উদ্যত করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল মেয়েটি। তার দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল খান্ডারনী শাশুড়ী। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বউ-এর সেই দৃষ্টিতে তার দৃষ্টি যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। নিষ্ক্রিয় দানবী, মুখে শুধু বিড়বিড় করছে, কি! মারবি!—মারবি!'

দু পা পেছিয়ে গেল খান্ডারনী। আর সেই প্রহারোদ্যত ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে এল বউ। শাশুড়ীর মুখে আর শব্দ নেই। তার কদর্য দুটো ঠোঁট কাঁপছে। আরও এক-পা পেছিয়ে

(এক)

গড়িয়াহাট রোডের সব আলো যখন ভাল করে ভোর হবার আগেই দপ্‌ করে এক সঙ্গে নিভে যায় আর দমকা হাওয়ায় স্থির বটের পাতাগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন একা একা জানলায় দাঁড়িয়ে মণিমালা যেন শেষ বারের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

একটু দূরে—রাস্তার ওপারে সারি সারি ট্যাক্সি এখনও ঝিমিয়ে আছে। পেট্রল-পাম্পের নীল আলো প্রায় এক হয়ে এসেছে ভোরের ভিজে সবুজ রেখার সংগে। একতলা ছোট শিব মন্দিরে আজও সেই রোগা লোকটা রোজকার মতো বোধহয় ঘুমের ঘোরেই ঘণ্টা বাজিয়ে যায়। তখন মণিমালা জোর করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কেঁদে উঠতে চান।

কিন্তু কান্নার আর সময় নেই। এখুনি—শিব মন্দিরের ঘণ্টা থেমে গেলেই করবী জেগে উঠে যেন আর্তনাদ করে উঠবে, মা—আর মণিমালা ক্ষিপ্র হাতে মশারি তুলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলবেন, ছিঃ রুবি, ছিঃ! সকালে উঠেই কাঁদতে নেই। এত কান্না কেন? আমি কি বেঁচে নেই—

অল্প অল্প অন্ধকারে মণিমালা দেখবেন মোমের মতো কোমল একটা দেহ তাঁকে শক্ত করে ধরে বেদনায় পুঞ্জ পুঞ্জ বেগে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার চোখ থেকে জল পড়ছে টপ টপ টপ। আলুথালু চুল। কান্নার ক্লান্তিতে শুকনো ঠোঁট। প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। তবু কী সুন্দর!

মেয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকবেন মণিমালা। বুক ঠেলে ওঠা নিশ্বাস জোর করে চেপে রাখবেন। মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইলেও সান্ত্বনার অনেক মিথ্যা কথা মনের মধ্যে হাতড়ে ফিরবেন। করবীর ঘ' কালো চুলে দ্রুত হাত চালাবেন। আঁচল দিয়ে বার বার তার চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।

তারপর কাঁচ রোদ সামনের তেতলা বাড়ির গায়ে হলুদ-সোনালী কড়া প্রলেপ বুলিয়ে দেবে। গলা ফুলিয়ে কার্ণিসে এদিক-ওদিক করবে ছাই-নীল পায়রার দল, আর হঠাৎ তাজা হাওয়া ছুটে এসে মাথা কুটবে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে। একটি একটি করে গা-ঝাড়া দিয়ে জীবিকার অন্বেষণে অদৃশ্য হবে সদ্য ঘুমভাঙা ট্যাক্সি-গুলো। পেট্রল-পাম্পের নীল আলো নিভে যাবে। প্রথম ট্রামের ঘণ্টা বাজবে ঠন ঠন। হোস-পাইপের ছড় ছড় শব্দ আসবে আর ফুটপাতের ওপর জেগে উঠবে ছিন্ন বস্ত্র জড়ানো রোগা রোগা অনেক ছেলে-মেয়ে। তখন খুব সাবধানে—করবী যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে—তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতেই মণিমালা আর একটা নিশ্বাস ফেলবেন।

তাঁর নিজের জন্যে নয়, এ নিশ্বাস করবীর জন্যেই। একমাত্র মেয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। অন্যান্য বারের মতো ইচ্ছে করে আসেনি এবার। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া ঝর্ণার কল কল ধ্বনি ছড়িয়ে ছড়িয়ে—মণিমালার গলা বাড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বলেনি, মা, ও আমাকে নিতে আসবে সেই সন্ধ্যেবেলা—চল না আজ দুপুরে একটা ছবি দেখে আসি? কিম্বা একবার নিউ মার্কেটে যেতে হবে মা—আজ ওর জন্মদিন। কি দেয়া যায় বল তো? চল, তোমাকেই নিয়ে যাই—একটা ভাল কিছু পছন্দ করে দেবে।

শেষ রাতে বিছানার পাশে সাদা টেলিফোনটা হঠাৎ কাকিয়ে উঠেছিল আর চমকে বিছানার ওপর উঠে বসেছিলেন মণিমালা। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গেছে। অশুভ একটা ছায়া কাঁপছে ঘরের দেয়ালে। আতঙ্কের শিহর ঠেলে ঠেলে খাট থেকে নামিয়ে আনে মণিমালাকে। দপ্‌ দপ্‌ করে বুক কাঁপছে। টেলিফোনের মুহুর্মুহু আর্তনাদ থামিয়ে দেবার এতটুকু আগ্রহ নেই তাঁর।

তবু ইতস্ততঃ করে এক সময় তিনি বলেন, হ্যালো!

মা—তীব্র একটা চিৎকার ছোট যন্ত্রটার মধ্যে অস্বাভাবিক প্রতিধ্বনি তোলে।

মণিমালার উত্তেজনা-থরো থরো মুখ এবার অনেকটা ঝুঁকে পড়ে, কি হয়েছে রুবি?

ও মা, শিগগির এসো। ও কেমন করছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

কে কেমন করছে? প্রতাপ? ঠাণ্ডা একটা ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে মণিমালার বুকের মধ্যে, এর মধ্যে এমন কি হল রুবি—সন্ধ্যেবেলা তো তোরা দু'জন—

হ্যাঁ মা, তোমার ওখান থেকে ফিরে ভালই ছিল। ঘণ্টা দু-এক আগে বলে, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। রুবি, একটা ডাক্তার—এখন শুধু অদ্ভুত আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে—

আমি এখুনি যাচ্ছি—টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নেন মণিমালা। ডাকা ডাকি করে চাকরটার ঘুম ভাঙিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনেন। কিন্তু গড়িয়াহাট রোড থেকে পার্ক স্ট্রীটে জামাই-এর ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ও ফ্ল্যাটের আর প্রয়োজন নেই। করবী তারই সংগে থাকবে। কিন্তু এ যেন একটা নতুন মানুষ। নিপুণ শিল্পীর হাতে তৈরি পাথরের বিষণ্ণ প্রতিমা তাঁর সাতাশ বছরের করবী। মাত্র একটি মানুষের অভাবে সারা পৃথিবীর রঙ কী সাংঘাতিক ধূসর হয়ে ওঠে, আর যে বেঁচে থাকে শুধু স্মৃতির একরাশ হিম সম্বল করে। মণিমালা খুব ভাল করেই জানেন কী করুণ আর ভয়াবহ নিঃসঙ্গ তার জীবনের এক-একটি দিন।

নিরানন্দের প্রশস্ত একটা ছায়া কেবলই কাঁপে চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকারে। রসের ভাঙা পাত্রের ইতস্ততঃ ছড়ানো টুকরো-গুলো বিপুল ব্যাঙের মতো কর্কশ আওয়াজ তোলে থেকে থেকে। বিন্দু বিন্দু কান্না নিয়ে কখন এক সময় জেগে ওঠে তপ্ত নোনাজলের এক শান্ত সরোবর। সেখানে শ্বাস রোধ করে সারাদিন শুধু ডুবে থাকা! কেমন করে পারবে করবী! মেয়ের মতো ঠিক এমন করেই একদিন কেঁদেছিলেন মণিমালা, যখন মৃত্যুর হিংস্র স্পর্শ এক মুহূর্তে হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছিল তাঁর নিকটতম মানুষের। কিন্তু সেদিন মণিমালার বোঝবার ক্ষমতা ছিল না যে তাঁর জীবনের সঙ্গে রক্তের সঙ্গে প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিশে রইল—এক হয়ে গেল অনেক তিল তিল মৃত্যুর অনেক বিষ-নিশ্বাস। কোলাহলের জগৎ থেকে যেন একজনেরই নির্বাসন। আড়ম্বরের পরিধি শুধু একজনের কাছেই সীমিত—একাকীত্বের তিক্ত স্বাদ শুধু যে বেঁচে রইল তারই জন্যে। রোমকূপ দিয়ে অনুভব করেন মণিমালা, সে-জীবন মৃত্যুর চেয়ে কঠোর—আরও ভয়ঙ্কর।

তাই তাঁর আজকের গোপন কান্না প্রতাপের জন্যে নয়, তার আকস্মিক মহাপ্রস্থান মৃত্যুর জলাশয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল যাকে—মণিমালার বুক-নিঙড়ানো সমবেদনা শুধু তারই জন্যে। সতেরো বছর ধরে কী কঠিন জীবন এক-একটি পাষাণ সোপান বেয়ে বেয়ে আজ তিনি

[illegible] এসে পৌঁছেছেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়। করবীকেও ঠিক তেমন করেই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে—এ ভাবনা অসহ্য মণিমালার। না, তা হবে না। কিছুতেই না।

মা!

বাস আর ট্রামের দমকা আওয়াজ ছাড়িয়ে মিষ্টি একটা ডাক শুনতে পান মণিমালা। চমকে পিছনে ফিরে তাকান। করবী উঠে বসেছে খাটের ওপর। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কান্নার তোড়ে দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে না। চোখ দুটোও স্থির। আর কত কাঁদবে একটা মানুষ! মণিমালা তাড়াতাড়ি মেয়ের পাশে এসে বসে পড়েন।

কি রে রুবি? চা খাবি এখন? এক মিনিট—জল বসিয়ে দিয়েছি—

কৌতূহলের একটা অস্পষ্ট রেখা কাঁপে করবীর চোখের তারায়, খবরের কাগজ এসেছে?

কাগজ? এই প্রথমবার মেয়ের স্বাভাবিক স্বর শোনেন মণিমালা, আমি এখুনি দেখছি, আঙুলগুলো যেন খুশিতে ছটফট করে ওঠে। ঠক করে দরজার খিল খুলে বাইরে উঁকি মারেন তিনি। নিপুণ ভাঁজের তাজা কাগজ পড়ে আছে সামনে। মুহূর্তে ঝুঁকে পড়ে তিনি সেটা তুলে নিয়ে মেয়ের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই যে রুবি—

ঘরের ম্লান আলোয় কাগজের ছোট ছোট অক্ষর করবীর চোখে স্পষ্ট মনে হবে না বলে খাট থেকে নেমে সে জানালার কাছে চলে আসে। সরু দীর্ঘ আঙুলে কাগজের ভাঁজ ভাঙে। সেই ফাঁকে মশারি তুলে দেন মণিমালা। বিছানার চাদর টানটান করে তৎপর হাতে ফিকে হলুদ রঙের বেডকভার পেতে দেন। ঠিক ছ'দিন পর করবীর কান্না দিয়ে সকাল শুরু হল না। দেখুক সে ভাল করে খবরের কাগজ। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে জানুক। সারা পৃথিবীর সুগন্ধ আর আলোড়ন দিয়ে তার জীবন থেকে মৃত্যুর দৃঢ় রজ্জু শিথিল করে দিক। আবার হাসুক। আবার ঘুরে বেড়াক। নিজেকে মেয়ের প্রত্যেক দিনের ছায়ায় আবার নতুন করে দেখতে চান না মণিমালা।

মা, জানালার কাছ থেকে করবী ডাকে মণিমালাকে। খবরের কাগজের একটা পাতার একদিকে আঙুল ঠেকিয়ে মণিমালাকে বলে, এই দেখ—

কিছু না। দূর দেশের কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ নয়। কাগজের আপিসে করবীর নিজের পাঠানো কয়েকটি লাইন সে দেখায় মণিমালাকে। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুতে যাঁরা তাকে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং রাশি রাশি ফুল পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে সে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিঠি লেখার অক্ষমতা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

মুখে অস্বস্তির একটা ছায়া পড়ে মণিমালার। আর কোন খবর দেখবে না করবী। এখুনি হয়তো কাগজটা দূরে ছুঁড়ে দেবে। তারপর বুকে মাথা গুঁজবে তার। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। সারাদিন জীবন্ত মৃত্যু কণা কণা তুষার ছড়িয়ে যাবে চঞ্চল প্রাণের আনাচে-কানাচে। সেখান থেকে কৌশলে সরে যান মণিমালা। কেটলির সোঁ সোঁ শব্দ শুনে স্টোভ নিভিয়ে দেন। দামী ঠাণ্ডা দুটো সাদা কাপ আর টি-পট রাখেন টেবিলের ওপর। জোর করে মুখে হাসি টেনে করবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, রুবি মুখ ধুবি না? চায়ের জল ফুটে গেছে।

(দুই)

হোক আভরণহীন দেহ করবীর, তার আবরণে শোকের শুভ্র ছায়া কাঁপুক, আর প্রসাধনে অনেকক্ষণের ধৈর্যের কোন চিহ্ন না থাক—তার স্পর্শে রূপ ফিরে গেছে এ বাড়ির। এখন রজনীগন্ধার শূন্য ফুলদানটা সারা দিন হাঁ করে থাকে না—অনেক দিন পর আবার চেনা গন্ধ নাকে এসে লাগে মণিমালার। বসবার ঘরের আসবাবের রূপও পাল্টে গেছে আজকাল। সকালের দিকে করবী নিজে এসে লক্ষ্য করে বেমানান কিছু জড়ো হয়েছে কিনা সেখানে। আর এতদিন যে আলোর বাল্বগুলো শুধু কিছুক্ষণের জন্যে মণিমালার প্রয়োজন মতো, অন্ধকার ঠেকিয়ে রাখত আর ধুলোয় ধুলোয় নিষ্প্রভ হয়ে যেত কিছুদিনের মধ্যেই—তাদের করবী পরিয়েছে নানা রঙের শেড। করবীর ছোঁয়ায় এ বাড়ির প্রত্যেকটি আলো যেন হঠাৎ নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ভাষা খুঁজে পেয়েছে আবার।

এখন সন্ধ্যা শুধু ধোঁয়া আর অন্ধকার নিয়ে মণিমালার একাকীত্বের বোঝাটা আরও ভারী করে দেয় না। টক টক করে সাজানো ড্রয়িং রুমের দুটো জোরালো আলো অন্ধকার হবার আগেই করবী জ্বালিয়ে দেয়। গোল টেবিলটার ওপর ঝলসায় সাত-রঙা বিলিতি জারনাল একদিকে মেয়ে, অন্য দিকে মা। দুজনেরই চোখ রাস্তার দিকে। আর একটু পরেই গাড়ির হর্ণ বাজবে। কেউ না কেউ আসবেই। হয় প্রতাপের কোন বন্ধু সস্ত্রীক এসে জোর করে মেয়ে আর মাকে নিয়ে যেতে চাইবে বাইরে বেড়াতে কিম্বা কোন বড় রেস্তোরাঁয় পাতলা ধোঁয়া ওড়া কফির কাপ সামনে ঠেলে দিয়ে বলবে, প্লিজ!

শুধু প্রতাপের নয়, করবীরও বন্ধু এসে পড়তে পারে অন্য আর কেউ আসবার আগেই। অল্প অল্প হাসবে, শোকের শেষ রেখাটাও মুছে দেবার চেষ্টা করবে করবীর চোখ থেকে। কলেজ-জীবনের অনেক মজার মজার গল্প বলে মাঝের করুণ অধ্যায়টা ভুলিয়ে দিতে চাইবে। আর রাত নটা সাড়ে নটায় তার স্বামী পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকবে করবীর শোককে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। তারপর, মণিমালা ভাবেন, প্রতাপ যেমন করে মাঝে মাঝে একটু বেশি রাতে এসে করবীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত ঠিক তেমন করেই এক সময় দীপালির স্বামীও তাকে নিয়ে যাবে। যাবার সময় বার বার করবী আর মণিমালাকে আগামী শনি কিম্বা রবিবার তাদের ওখানে নেমন্তন্নের কথা মনে করিয়ে দেবে। তখন কৃত্রিম লজ্জায় সোফার একদিকে মণিমালা কাঁধ এলিয়ে দেবেন। আর যখন ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেন্সের মধুর সুবাস ছড়িয়ে করবী আবার এসে বসবে তার পাশে তখন নেমন্তন্নের কথা তুলে তিনি মৃদু আপত্তি জানাবেন।

রুবি, এবারে আর আমি না। তুই একা যা—

কোথায় মা?

দীপালিদের ওখানে। [illegible]। তোরা—[illegible] তোদের দলে মিশে সব সময় হৈ হৈ করা আমার কি শোভা পায় রে?

মার বুকে মাথা রেখে করবী হাসবে, আমাকে তুমি একটুও ভালবাস না মা। কেন, ও যখন [illegible] তখন আমাদের সঙ্গে কত হৈ হৈ করে [illegible]মি! আজ আমি একা বলে—

আচ্ছা হয়েছে, মণিমালা হেসে বলবেন, কথায় তোর সঙ্গে কে পারবে বল!

করবীও আদুরী মেয়ের মতো মণিমালাকে জড়িয়ে ধরে আব্দারের সুরে বলবে, তাহলে আমার সঙ্গে ওসব বাজে কথা বল কেন মা!

খুশির উষ্ণ আমেজে কোন কথাই আর অনেকক্ষণ বলতে পারবেন না মণিমালা। মেয়েকে বুকের কাছেই ধরে রাখবেন। জাপানী ফুলদানে টান টান রজনীগন্ধা পাখার হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপবে। রাস্তাটা হঠাৎ নিঝুম হয়ে যাবে। আজ আর কেউ আসবে কি-না কে জানে শোবার ঘর থেকে টেলিফোনটা খুশিতে ডাকবে করবীকে। আপন মনেই হাসবেন মণিমালা। কারণে-অকারণে আজকাল হাসি লেগেই থাকে তাঁর ঠোঁটে। বিন্দু বিন্দু কান্না নিয়ে ভরে ওঠা তপ্ত নোনা জলের জলাশয় হঠাৎ যেন জুড়িয়ে গেছে। কোন এক যাদুদণ্ড হাতে নিয়ে যেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে করবী ফুটিয়ে তোলে একটি একটি পদ্ম ফুল। শ্রবণ প্রখর হয়েছে মণিমালার। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সন্ধ্যের ঝোঁকে নিঃশব্দে প্রথম গাড়িটা এসে দাঁড়ালে তিনি না দেখেই গুঞ্জন করে ওঠেন রুবি, মিটার ভাটিয়া। জানলা দিয়ে অনেক দূরে সাদা শার্ট আর ট্রাউজারস পরা একটা মূর্তিকে টেনিস র‍্যাকেট দোলাতে দেখলেই তিনি বুঝে নেন ভৌমিক আসছে। আর যতই সাবধানে ওপরে উঠুক লাহিড়ী, সে দরজার ঘণ্টা বাজালেই এক ঝলক ফুলের গন্ধ নাকে লাগবেই মণিমালার দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের ভারী একটা তোড়া তাঁ[র] দিকে এগিয়ে দিয়ে লাহিড়ী বলে, গ[ুড] ইভনিং! মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করেন মণিমালা, এস লাহিড়ী! রুবি এখুনি আসবে। আর মনে মনে বলেন, ফুলের গন্ধ অনেকক্ষণ আগেই আমার নাকে লেগেছিল।

আর সাড়ে দশটা-এগারোটায় যদি টেলিফোন বাজে তাহলে সেটা যে ত্রিদিব ঘোষালের সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই মণিমালার। সে কি কথা বলবে তাও তিনি জানেন। আপিস থেকে বেরুতে অনেক দেরি হল আর তাছাড়া শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ল হঠাৎ তাই আজ বিকেলে—

আর তখন রাগের ভান করে চাপা স্বরে বলবে করবী, বিকেল বেলা ফোন করে সেটা জানাতে পারনি? আমি তাহলে একাই মিসেস ভাটিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারতাম—

কিন্তু মিসেস ভাটিয়াকে আমি জানিয়ে দিয়েছি রুবি—

হাসির একটা টুকরো ছিটকে আসবে মণিমালার কানে, ইউ সীম টু বি মোর ইন্টারেস্টেড ইন মিসেস ভাটিয়া—নটি বয়!

বাইরে তাকিয়ে থাকবেন মণিমালা। কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় কী গাঢ় রঙ বাসা বেঁধেছে! কী নিটোল মেঘ আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে প্রথম শরতের আকাশে! মৃত্যুর কোন চিহ্ন নেই কোথাও—কোন স্বাক্ষর নেই। শুধু নিজের [illegible]

আশ্চর্য উত্তাপের ফুলকি ছড়িয়ে ছড়িয়ে করবী খুলে ফেলেছে মৃত্যুর অসংখ্য হিম শীতল দৃঢ় রজ্জুর পাক। মণিমালার আলোক-রেখায় উজ্জ্বল সে জগৎ হারিয়ে গিয়েছিল তুষারের বিলম্বিত ঝড়ে বিস্মৃতির দিশাহারা অন্ধকারে—সে জগতে করবী আবার অনেকদিন পর যেন অলৌকিক কোন ক্ষমতার মহিমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁকে। প্রতাপ নেই কিন্তু তিনি তো আছেন।

(তিন)

একটু আগে ত্রিদিব ঘোষাল চলে গেল একবারও হর্ণ না বাজিয়ে সাবধানে নিজে ড্রাইভ করে। গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার ওপারে নার্সিং হোমের পাশ দিয়ে হাজরা রোডের দিকে যেতে যেতে আর একবার হাত নেড়ে যেন অভিনন্দন জানাল মণিমালা আর করবীকে। রোজকার মতো আজও সেই কখন এসেছিল বিলিতি দোকানের পেস্ট্রির বড় বাক্স হাতে নিয়ে বিকেল ফুরোতে না ফুরোতেই। হাসিয়ে হাসিয়ে অস্থির করে তুলেছিল ওদের দুজনকে। ত্রিদিব এলেই তার কথার তোড়ে ঘড়ির কাঁটাও যেন ক্ষিপ্র চঞ্চল হয়ে ওঠে। তরতর করে কখন দশটার ঘর ছাড়িয়ে যায় ওরা কেউই বুঝতে পারে না। হঠাৎ এক সময় ত্রিদিব নিজেই চমকে উঠে দাঁড়ায়, গুড গড! পাসড টেন। আই অ্যাম ভেরি সরি—এতক্ষণ আপনাদের—

মৃদুস্বরে করবী বলে, ডোণ্ট বি সিলি ত্রিদিব।

আজ কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই হাসিমুখে মণিমালা বলেছিলেন, আরও একটু দেরি করতে হবে তোমাকে—

বিনয়ে নম্র হয়ে উঠেছিল ত্রিদিবের দৃষ্টি বলুন?

আজ এক সঙ্গে খাব আমরা তিনজন।

ও, থ্যাঙ্ক ইউ!

পাশের ঘরে ডিনার টেবিলে আর একটা বেশি প্লেট চাকরটা সাজিয়ে রেখেছে কি না দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন মণিমালা, কালই তোমাকে বলতাম কিন্তু রুবি—মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি মিষ্টি হাসেন, ও বলে, যা কখনও বলে না—

কেন? ত্রিদিবও হাসে, আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে ওর যত আপত্তি—না মিসেস রয়?

স্বরে ঝাঁজ ছিটিয়ে করবী বলে, সার্টেইনলি আই অ্যাম নট অ্যাট অল উইলিং টু ডাইন উইথ-এ বিগ ব্লাফ—

মাথা উঁচু রজনীগন্ধার একটা প্রায় ঝরে পড়া শুকনো পাতা ছিঁড়ে ফেলে মণিমালা বলেন, না না, তা নয়। তুমি নাকি কখনও কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখ না। তাই আগে থেকে বললে তুমি কখনই—ইচ্ছে করেই কথা শেষ না করে ওদের একটা তর্কের সুযোগ দিয়ে যান মণিমালা। আর যেতে যেতে অদ্ভুত এক উল্লাসের স্বাদ অনুভব করেন বুকের মধ্যে। আর দুজনের চড়া গলার স্বর পাশের ঘরে এসে এখনও তিনি শুনতে পান। আর আপনমনেই অল্প অল্প হাসেন।

কিন্তু এখন অনেক রাত হয়েছে। আজ ত্রিদিব গেল বেশ রাত করেই। যদিও ঘুম নেই মণিমালার চোখে—ক্লান্তির ভার আছে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে। মশারি ঝুলিয়ে দিলেন তিনি। গড়িয়ে পড়লেন বিছানায় একা-একাই। আর একটু পরেই করবী চলে আসবে তাঁর পাশে। ত্রিদিবের বলা কথাগুলো বলে হাসবে। মেয়ের দিকে মশারির ভেতর থেকে তাকালেন মণিমালা। দুকান থেকে হীরের ছোট ছোট ফুল খুললেন। গলার সরু নেকলেস ঠেলে দিল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। কোল্ড ক্রীমে ডুবোনো আঙুল জোরে জোরে ঘষল মুখে আর গলায়। পট পট করে দুবার টিপল আলোর সুইচ। হলদে আলো নিভে হালকা নীল, আলোর ছায়া খেলল ঘরে। আধবোজা চোখে তবুও করবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন মণিমালা। কী সুন্দর!

তন্দ্রার চোখ দুটো একেবারেই বুজে এসেছিল মণিমালার। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার করবীর অস্বাভাবিক একটা ডাক, মা। চমকে উঠে বসলেন মণিমালা। নীলাভ আলোর কম্পমান রেখায় স্পষ্ট দেখলেন দুই হাতে জানলার শিক ধরে করবীর কোমল দেহ আবার চাপা কান্নার ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। মা!

রুবি! যেন সান্ত্বনার বদলে একটা কর্কশ শাসন বেরিয়ে এল মণিমালার জিব ঠেলে। মাশারির সযত্ন ভাঁজ দুই পায়ে ঠেলে ছুটে এসে তিনি মেয়েকে আঁকড়ে ধরলেন। ঠিক তেমনি টপ টপ জল পড়ছে করবীর চোখ থেকে। কি হল হঠাৎ এতদিন পর আবার কি কথা মনে পড়ল! আজ কত তারিখ? আজ কি প্রতাপের জন্মদিন? ওদের বিয়ের দিন? না, আজকের তারিখের তেমন কোন মূল্যই তো নেই করবীর কাছে। কিছুই মনে পড়ে না মণিমালার। তাহলে?

ছিঃ, রুবি, এবার সত্যিই মেয়েকে শাসন করেন মণিমালা, মাঝরাত্তে এমন করে কেঁদে শরীর খারাপ করবার কি মানে হয় তুই বল আমাকে? একটা উত্তরের আশায় জোর করে মেয়ের মুখ তুলে ধরেন তিনি। ঘুম ভাঙার বিরক্তিও অনুভব করেন মনে মনে।

মা, ইতস্ততঃ করে ফিস ফিস করে ওঠে করবী, ও কিছু বুঝতে চায় না— কোন কথা শুনতে চায় না—

মেয়ের কথা হঠাৎ দুর্বোধ্য মনে হয় মণিমালার, কে কিছু বুঝতে চায় না শুনতে চায় না রুবি?

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে করবী। নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে শান্ত হয়ে বলে, ত্রিদিব। আমি আজ তাকে কথা দিয়ে দিয়েছি মা—

ত্রিদিবকে তুই কি কথা দিয়েছিস রুবি? নীরস গলার স্বর ঠিক এই মুহূর্তে মধুর করে তোলবার সব কৌশল যেন ভুলে গেছেন মণিমালা। হালকা আলোয় তাঁর চেহারার সূক্ষ্ম পরিবর্তন বুঝতে পেরে করবী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে।

এ বিয়েতে তোমার মত নেই মা? এবার স্পষ্ট প্রশ্ন করে করবী, ত্রিদিবকে তুমি পছন্দ কর না?

অসহায় মণিমালা করবীকে ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে এসে যেন ভাঙা ভাঙা আর্তস্বরে বলে ওঠেন, করি করি করি। এ বিয়েতে আমার খুব মত আছে রুবি। তোর সুখেই আমার সুখ—সেকথা বুঝতে না পেরে কেন শুধু শুধু আমাকে এসব আজে বাজে প্রশ্ন করিস—তখন হাসি ফুটে ওঠে করবীর ক্রীমে ভেজা মুখে। আস্তে আস্তে খাটে উঠে [illegible] গেছে। সময় [illegible] করিয়ে মণিমালাকেও যে এখুনি শুয়ে পড়তে বলে। কিন্তু ঘুম আর নেই মণিমালার চোখে। নীল আলোটাও তিনি নিভিয়ে দেন। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুক করবী। যেন জানলার কাছ থেকে সরে যাবার কোন শক্তি আর নেই মণিমালার। পেট্রল পাম্পের আলো কাঁপছে। তেমনি ঝিমিয়ে আছে সারি সারি ট্যাক্সি। স্থির বটগাছ। পাতাগুলো [illegible] কোন কম্পন নেই তাদের বুকে। কেউ দেখছে না মণিমালাকে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চোখের জল ফেলেন। টপ টপ করে জল ঝরবে আর একটি একটি করে শুকিয়ে যাবে করবীর ফোটানো সব কটা পদ্মফুল। তপ্ত নোনা জলের নিঃসপত্ন সরোবর আবার ফুলে উঠবে—কেঁপে উঠবে মণিমালারই অশ্রুবিন্দুতে। সেখানে বার বার তিনি শুধু তাঁর নিজেরই ছায়া দেখে একা একাই কাঁদবেন।

আস্তে একটা হাত চোখের সামনে নিয়ে আসেন মণিমালা। না এ শিথিল হাত কোনদিনও ফুল ফোটাবার কোন যাদুদণ্ড আর হতে পারবে না। করবীর মতো কেমন করে [illegible] পায়ের মাটি স্পর্শ করবেন মণিমালা।

ছেলে

(৯২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গেল সে, তারপর ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

ছেলে মহা উল্লাসে তখনও লাফাচ্ছে আর হাততালি দিচ্ছে আর উৎসাহ দিচ্ছে মাকে।

চোখের আগুন নিভিয়ে, নিপাতিত শত্রুর ওপর থেকে তাচ্ছিল্যভরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মা। তার দু চোখে তখন বিম্বিত হল বাৎসল্যের অনন্ত সমুদ্র। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে হাতের প্রহরণ, তারপর দু হাতে ছেলেকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকে।

আমি ইতিমধ্যে কখন জানালা খুলে ফেলেছি, বলতে পারিনে। এবং গৃহিনী পেছন থেকে ধরে আমাকে না থামিয়ে দিলে, আমি যে আরও কতক্ষণ লাফাতাম, কে জানে।

তারপর আর কখনও বউ-এর গায়ে হাত তোলেনি খান্ডারগিন্নি। স্বভাবদোষে মাঝে মাঝে কুঁদুলে গলা ছাড়ে—কিন্তু গলায় আর সে জোর নেই। আর বউ-এর দিক থেকে কোন জবাব তো আসে না। সে মুখে তো সব সময়ে হাসি লেগেই আছে। তার সামনে একতরফা আর কতক্ষণ চালাবে খান্ডারনী! অনেক সময় চ্যাচামেচি করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর আবার এক সময়ে ফিরে আসে। কিন্তু হাত আর তোলে না।

শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা

পশুপক্ষী মানবেরে সমভাবে
ভালোবাসে যেই,
ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ
প্রার্থনাও করে থাকে সেই।
(কোলরিজ)

আশ্রয়প্রার্থী মদন ।

ছেলেখেলা

রায়চৌধু
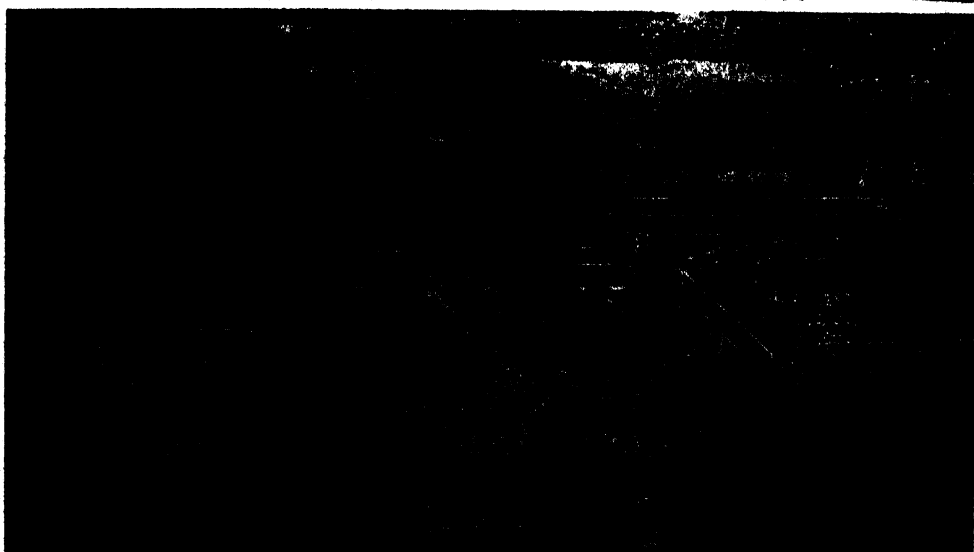
সমাধান

রমেশচন্দ্র সেন

মাটির ঘর, উপরে খড়ের চালা। বৃষ্টি হলে চালার অসংখ্য ফুটো দিয়ে প্রায় সব জায়গায়ই জল পড়ে। ঘরখানা কাদায় প্যাচ্ প্যাচ্ করে।

খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। জল-কাদার মধ্যেই সামান্য একটু শুকনো জায়গায় সরলা আঁচল পেতে শুয়েছিল। সে আজ কাজে যায় নি। তার কোলের মধ্যে ছিল ছোট ছেলে বাবুল। বৃষ্টি থামার পর কোন্ এক ফাঁকে বাবুল মায়ের কোল থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেছে। চালার দু'তিনটে ফুটো দিয়ে রোদের রেখা এসে পড়েছে তার মুখের উপর।

বেলা আন্দাজ দু'টো। বাইরে থেকে পিওন এসে ডাকল, তোমার টাকা আছে সরলা। মনি অর্ডার—

পিওনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। ব্যাপারটা কি প্রথমে সে বুঝতে পারে নি। উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, কি, কি চাই তোমার? পিওন কাকা না?

পিওন তাদের গ্রামের লোক। নাম নবীন। গ্রাম সম্পর্কে সরলার সে কাকা হয়।

নবীন বলল, হ্যাঁ—তোমার টাকা আছে।

—টাকা! আমার টাকা আসবে কোত্থেকে!

—তোমার ছেলে পাঠিয়েছে। আমাদের হাবুল—

টাকা পাঠিয়েছে! ভাল আছে সে? এর মধ্যেই টাকা পাঠাল কি করে? ক'টাকা?

প্রশ্নের স্রোতে বাধা দিয়ে একটু হেসে নবীন বলল, কেন, টাকা পাঠাবার খবর তোমায় দেয় নি?

—না।

বারো বছরের ছেলে হাবুলকে চাকরীর জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে অবধি সরলার ভাবনার আর সীমা ছিল না। কলকাতায় গিয়ে পৌঁছে সংবাদের পর হাবুল আর চিঠি দেয় নি। সে চিঠিতেও ঠিকানা ছিল না।

ছোট্ট ছেলে। এখনও বারো পূর্ণ হয় নি। বয়সের তুলনায় ও দেখতে ছোট খাট। স্কুলে যেত, পড়াশুনায় ভালই ছিল। কিন্তু স্কুল ছাড়তে হল অভাবের জন্য। স্বামীর মৃত্যুর পর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘরের বধূ হয়েও সরলা মুড়ির পাইকার সুন্দরদের বাড়ী মুড়ি ভাজে। কিছু আয় হয় বটে। কিন্তু এই দুর্মূল্যের বাজারে দিন আর তাতে চলে না। প্রায়ই অনশনে অর্ধাশনে থাকতে হয়। তাই ছেলেকে সে কলকাতায় পাঠিয়েছিল চাকরীর জন্য।

সরলা টাকাটা সই করে রাখল।

নবীন চলে গেলে সে মনিঅর্ডারের কুপনটা পড়তে লাগল। হাবুল দু' লাইনে নিজের খবর দিয়েছে—

মা, এক মাস আমার চাকরী হয়েছে। আজ মাইনে পেয়ে বারোটি টাকা পাঠালুম। আমি ভাল আছি।

রাজেন গুহ রোড্, ইতি
দমদম, গোরাবাজার। তোমার হাবুল

ছেলের চিঠি না পেয়ে সরলার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। মনে কলকাতা সম্পর্কেও ছিল বিভীষিকা। জায়গাটা যেন একটা বাজার। হৈ হল্লা সারাক্ষণ, গন্ডায় গন্ডায় লোক সেখানে গাড়ী চাপা পড়ে। গুন্ডারা ছোরা মারে। টাকাপয়সা জামাকাপড় কেড়ে নেয়। তার উপর আছে ছেলেধরা। ধরে নিয়ে গিয়ে কানা করে, খোঁড়া করে,—তাদের দিয়ে ভিক্ষে করায়।

এক একবার সরলা ভাবে, আহা ওইটুকু ছেলেকে পাঠালুম কেন? গ্লানিতে তখন তার মন ভরে যায়। হায় ক্ষুধা! তার জন্য নিজের বারো বছরের সন্তানকেও মানুষ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দেয়!

দীর্ঘ দিন—দু' মাস পর সেই ছেলের খবর এল, টাকা এল। ব্যাপারটি অভাবিতপূর্ব। ঠিক আনন্দ নয়, সরলার মনে সে এক অপূর্ব অনুভূতি। টাকাটা হাতের মুঠোয় চেপে সে চুপ করে বসে রইল। চেয়ে রইল বাইরে আকাশের দিকে। বর্ষাস্নাত নিবিড় নীল আকাশ। আশে-পাশে সবুজের স্নিগ্ধ লাবণ্য।

সরলা ভাবছে, হাবুলের কথা। গোরাবাজার জায়গাটাই বা কি রকম, কলকাতা থেকে কত দূরে? নবীন কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে হত। কত খবর রাখে সে। কত জায়গার চিঠি বিলোয়।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসেছিল নিজেও জানে না। ভাবছিল, আকাশ পাতাল অনেক কিছু। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, উপবাস। গঞ্জনার অন্ত ছিল না। প্রলোভনও আসত মাঝে মাঝে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে আজ পাঁচ বছর চলেছে ঐ একই অভিজ্ঞতা। সাত বছরের হাবুল আর দু' বছরের বাবুলকে নিয়ে অথৈ জলে সাঁতার কেটেছে সে। সুন্দরদের বাড়ী মুড়ি ভেজেছে। ঐ অঞ্চলটা মুড়ি বিড়ি বুরুশের। ব্যবসায়ীরা মুড়ি ভেজে, বিড়ি পাকিয়ে আর বুরুশ তৈরী করে কলকাতায় চালান করে।

স্বামী তার কলকাতায় এক দোকানে কাজ করত। সে বেঁচে থাকতে সরলা ভাবত ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবে। পাঁচ বছর বয়সে হাবুলকে ভর্তিও করে দিয়েছিল স্কুলে। দু' দু'টো বছর সে পড়ল। গৌর মাস্টার বলতেন, পড়াতে পারলে ছেলেটার হবে।

কিন্তু তার বাবা ভূপালের মৃত্যুর পর সব আশাই ছাড়তে হল।

হ্যাঁ, এই সময়ে মনে পড়ল বাবুলের কথা। সে গেল কোথায়? বাবুল, বাবুল—বলতে বলতে সরলা বেরিয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখল, চাঁদা কুকুরটার উপর সওয়ার হয়ে বাবুল বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। লোমশ মোটা কুকুরটাও যে খুশি হয়েছে এই সওয়ার পেয়ে। জিভ্ লক্ লক্ করছে।

ওমা! দস্যি ছেলের কান্ড দেখেছ? নেমে আয়, নেমে আয় হতভাগা। এত মানা করি,

তবু তুই কুকুরে চড়বি। একদিন দেবে এমন কামড়ে!—

বাবুল হেসে বলল, না মা, কামড়াবে না। ওকে আর আমাতে খুব ভাব।

দেয়া আর তুই। তোকে আজ খাতিরে খিচুড়ি খাওয়াব।

খিচুড়ি? খিচুড়ি কোথায় পাবে মা?— বাবুল সোল্লাসে প্রশ্ন করল। খিচুড়ির নাম শুনে চোখ দুটো তার আনন্দে বিস্ফারিত হল।

পাব রে পাব। তোর দাদা টাকা পাঠিয়েছে, জানিস? সে চাকরী পেয়েছে!—সরলা বলল।

খাওয়াবে ত ঠিক? খিচুড়িতে বড় বড় আলু দিও। আর চাঁদাকেও দিও কিন্তু।

হ্যাঁ দেব। তুই নাচ দেখি আগে।

বাবুল এবার চাঁদার উপর থেকে নেমে এসে মায়ের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, দাদার বুঝি খুব বড় চাকরী হয়েছে মা?

চাকরী হয়েছে, তবে বড় নয়। ঐ একরত্তি ছেলে, বড় চাকরী তারে দিবে কোত্থেকে?

সরলার মনে পড়ল, তার হাবুলও খিচুড়ি খেতে ভালবাসে। তার বাবাও বাসত। হাবুল আর বাবুল এইটে পেয়েছে বাপের কাছ থেকে।

কিন্তু হাবুলও কাছে নেই। থাক সে ইয়ত ভাল ভাল জিনিষ খাচ্ছে। চাকুরে ছেলে ও।

বিকেলে প্রবোধ মুদির দোকানে গিয়ে সরলা চাল, ডাল, নুন আর আলু কিনল। প্রায় পাঁচ সিকের জিনিষ। একসঙ্গে এত সওদা সম্প্রতি সে করেনি।

মুদি প্রশ্ন করল, কোন কুটুমসাক্ষাত খাবে নাকি গা?

সরলা বলল, না। আমার হাবুলের টাকা এসেছে আজ। সে চাকরী পেয়েছে কিনা।— বাবুল ধরল খিচুড়ি খাবে।

ভাল, ভাল। চাকরী হল কোথায়? মাইনে কত?

হয়েছে গোরাবাজারে। জায়গাটা কোথায় জানি না। মাইনে কত তা লেখেনি।

তোমারি ভাল হবে পিসি। ভাল মানুষ, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

মুদির দোকান কাছেই। তার বাড়ী থেকে তিন রশির বেশী নয়। এইটুকু পথের মধ্যে আরো দুজনার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হল সরলার। চাল, ডাল, তেল, নুন ও আলু— একসঙ্গে এতগুলো জিনিষ কেনার কৈফিয়ৎ। তার পক্ষে এতটা সওদা করা প্রতিবেশীদের কাছে বড়ই বিস্ময়কর।

সরলার মনের আনন্দ যেন আজ উপচে পড়ছে। তার হতাশায় অন্ধকার জীবনে ছেলের চাকরী এসেছে মেঘে ঢাকা আকাশের ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মত আশার আলো নিয়ে। এই আলোর সাহায্যে পথের সন্ধান পাবে সে। সেই পথে বাবুলকে নিয়ে যাবে। লেখাপড়া শেখাবে।

রাতে খিচুড়ি খাওয়ার সময় তার বার বার মনে হচ্ছিল প্রবাসী ছেলের কথা। খিচুড়ি খাওয়ার সময় তার প্রফুল্লতা দেখলে সরলার কী আনন্দই না হত!

পরদিন সকালে সে ছেলেকে একখানা চিঠি দিল।

বাবা হাবুল,

তোমার টাকা পেয়েছি। তোমার চাকরী হওয়ার খবরে খুব খুশি হয়েছি। কাল রাত্তিরেই তোমার টাকায় খিচুড়ি খেলুম আমরা। তখন বার বার মনে হচ্ছিল তোমার কথা।

তোমার কোথায় চাকরী হল, কি চাকরী, কি করতে হয় খুলে লেখ।

মনে করছি, বাবুলকে স্কুলে দেব। মাইনে লাগবে মাসে দেড় টাকা। তোমার মতামত জানাবে। আমরা ভাল আছি। তুমি আমার ভালবাসা ও চুমু নেবে।

ইতি—

আঃ

মা

পুনঃ—তুমি কি খাও লিখবে। আজ ও পাড়ার মণিরাম মিস্ত্রীকে খবর দিয়েছি। তাকে দিয়ে ঘরখানায় কিছু নতুন শণ দেওয়াতে হবে।

দিন পনের পরে হাবুলের চিঠি এল। সে লিখেছে—

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে একটু দেরী হল। তোমরা খিচুড়ি খেয়েছ জেনে খুব খুশি হলুম। মনে হচ্ছিল তোমার রান্নার কথা। রান্না না যেন অমৃত!

আমিও এখানে ভাল ভাল জিনিষ খাই। এর মধ্যে দুদিন খিচুড়িও খেয়েছি। বাবুলকে স্কুলে দিতে চেয়েছ, নিশ্চয়ই দেবে।

যাঁর কাজ করি তিনি খুব ভাল মানুষ। তিনি চোখে দেখেন না। তাই তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই আমার কাজ। তাঁর আর কেউ নেই। আমায় পেয়ে তিনি খুব ভালবেসে ফেলেছেন। আমিও তাঁকে ভালবাসি।

তোমার কথা তাঁকে বললুম। বুড়ো মানুষ তিনি। তোমায় আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তোমাদের ভাল হবে।

আর একটা কথা। আমি গান শিখছি মা। তুমি বলতে গলা আমার [illegible]। বাবুও সেইটে বুঝে আমায় গান শেখাচ্ছেন। [illegible] খুব ভাল গাইতে পারেন।

ছেলের হাতের [illegible] হল সরলার।

বড় লোক মনিব, বড়মানুষ। চোখ [illegible] তাঁর, তাই সঙ্গে বেড়াবার জন্য মাইনে দিয়ে লোক রেখেছেন। হয়ত তাঁর সংগে মাঝে মাঝে গাড়ীতে চড়ে হাবুল। কাজটাও এমন কিছু খারাপ নয়। খাটুনি কম, মাইনে মন্দ না। ভাল ভাল জিনিষ খায়। তার উপর গান শিখছে। বাবু হয়ত এবার স্কুলেও দেবে।

ছেলের চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে সরলা অতীতে চলে গেল। মনে পড়ল স্বামী বেঁচে থাকার সময়ের দিনগুলি। স্বাস্থ্যবান স্বামী, সুশ্রী সুন্দর, চরিত্রবান। তাঁর আয়ে দিন এক রকম গড়িয়ে যেত। অভাব বিশেষ ছিল না। হাবুল স্কুলে পড়ত। সরলার মনে ছিল তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা রঙীন কল্পনা।

হঠাৎ স্বামী মারা গেলেন। শুরু হল অভাব অভিযোগ। রূঢ় বাস্তবের আঘাত আসতে লাগল চারধার থেকে।

তার অজ্ঞাতেই বোধ করি ছেলের টাকা কটি তাকে এনে দিয়েছিল নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।

অতীত স্মৃতির পথ বেয়ে ধীরে ধীরে সরলা চলে এল বর্তমানে। অতীত ও বর্তমান এক হয়ে গেল। সে গুন্ গুন্ করে উঠল।

মণিরাম চালার উপর কাজ করছিল। সরলার গলাটা একটু চড়ে যাওয়ায় সে প্রশ্ন করল, কি হল মাসী?

লজ্জিত হল সরলা। উপরের দিকে চে[য়ে] বলল, ও কিছু না। আচ্ছা, তুমি বলতে পা[র] গোরাবাজার কোথায়, রাজেন্দ্র গড় [illegible]?

জানিনা। কেন বল দেখি—

আমার হাবুলের সেখানে চাকরী হয়ে[ছে] কিনা—

বড় ভাল ছেলে তোমার হাবুল। কি ক[রে] সে?

সরলা বলল, একজন বড়লোকের বাড়ী কা[জ] পেয়েছে। তিনি ভালবাসেন, সঙ্গে নি[য়ে] বেড়ান।

মণিরাম বলল, ওঃ।

চাঁদাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল বাবুল। এই সময় সে ফিরলে সরলা বলল, কি ছেলে বাবা। সারাদিন চাঁদা আর চাঁদা। জানিস্, এবা[র] তোকে স্কুলে দেব।

বাবুল বলল, আমি যাবই না স্কুলে।

যেতে হবে তোকে।

বেশ, তা হলে যাব চাঁদাকে নিয়ে।

তাকেও ভর্তি করিয়ে দিবি বুঝি?

বাবুল গম্ভীর স্বরে বলল, জান না মা চাঁদার ভারী বুদ্ধি। কুকুর হলে কি হয় বোঝে ও সব। খিচুড়ি খেয়ে বুঝতে পেরেছে আমাদে[র] অবস্থা ফিরেছে।

তা আর বুঝবে না। [illegible] বন্ধু একেবারে বুদ্ধির সাগর।

এর মধ্যে একখানা চিঠিতে হাবুল লিখল সুধীর চাকীবাবু আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকেন। খুব লেখা পড়া জানা লোক। স্কুলের মাষ্টার। আমি তাঁর কাছে রোজ রাত্তিরে পড়ছি। যারা দিনে কাজ করে তাদের জন্য নাইট্ স্কুল খুলেছেন তিনি। অনেক বুড়ো বুড়ো লোক আমাদের স্কুলে পড়ে। ছেলে [আবা]র লেখাপড়া করছে জেনে সরলা খুশী হল। সে জানতে চাইল, স্কুলে মাইনে [কত] কত?

হাবুল লিখল, মাইনে [illegible] না। বরং চাকীবাবু আমাদের সবাইকে বই দেন, খাতা পেন্সিল দেন।

দিন কাটে। দিনের পর দিন। মাস। মাসান্তে হাবুলের টাকা আসে। নবলগ বারোটি করে টাকা। সরলাও রোজগার করে। মা ও ছেলের টাকায় দিন একরূপ চলেছে। আগের সে কষ্ট আর নেই, পাওনাদারের কড়া তাগিদ নেই। চালার ফুটো জায়গাগুলিতে কিছু কিছু নতুন শণ পড়েছে। দরজায় হয়েছে হুড়কো। বাবুল পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে।

প্রথম কয়েকদিন চাঁদাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। একদিন পাঠশালায় এসে চাঁদার উপর সওয়ার হয়ে বসলে ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করলো। তারপর থেকে চাঁদাকে নিয়ে যায় নি। পাঠশালায় যাওয়ার সময় বলে যায়, তুই ভাল হয়ে থাকবি চাঁদু। আমি এসে তোকে আদর করব।

চাঁদাও তার ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানায়, জানায় ভালবাসা।

মাস কয়েক পরে, সরলা হাবুলকে লিখল, আজ ক'মাস তোকে দেখিনি। পুজো এসে পড়েছে বাবা। পুজোয় কখনো তোকে ছেড়ে থাকিনি। তুই এবার এলে বড় খুসী হব। বাবুলও তোর কথা প্রায়ই বলে। তোর পড়া-

সুন্দর ভাল হবে, জেনে রাখল। এতটির মাতার বলেছে।

হাবুল লিখল, বাবুল পড়াশুনোয় ভাল হয়েছে জেনে খুশী হয়েছি। পুজোয় আমি ছুটি পাব না। বাবু বলেছেন, শীতকালে বাড়ী যেও হাবুল। শীতকালেই যাব মা। তখন নতুন গুড় খাব, মুড়ি দিয়ে। তোমার ভাজা মুড়ি।

পুজো এল। সরলা ছেলেকে লিখল, তুই এবার পুজোয় একখানা নতুন কাপড় পরিস। আমাকে কম টাকা পাঠালেও চলবে।

ছেলের উত্তর এল। আমার কাপড়ের জন্য তোমার টাকা কমানোর দরকার নেই। পুজোর বাবু আমার কাপড় দেবে। কাপড় জামা দুই-ই। তোমরা নতুন কাপড় পরো।

ছেলের চিঠি পেয়ে না-দেখা এই বাবুর জন্য সরলার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

কয়েক বছর পর সরলা আর বাবুল এবার পুজোয় নতুন জামাকাপড় পরল।

দিন কাটছে। সরলার নিজের রোজগার আর তার ছেলের টাকায় দারিদ্র্যের ছাপ তাদের পরিবার থেকে কিছুটা মুছে গেছে। এর পেছনে সরলার কৃতিত্বও অনেকখানি। গোবর দিয়ে উঠান নিকানো। মাটির দেওয়াল লেপে মুছে রাখা। জানালা দরজায় ঝুল ও ময়লা ঝাড়া। মোটের উপর ছোট্ট বাড়িটিকে নিখুঁত পরিপাটি করে রাখার দিকে তার দৃষ্টি ছিল অনলস। তার সমশ্রেণীর আর পাঁচজন এটাকে মনে মনে ঈর্ষার চোখে দেখত। তবে সরল প্রকৃতির দু-একটি নারী মন্তব্য করত, মেয়েটি বেশ গোছাল।

কেউ বা বলে, ভাগ্যবন্তীও বটে। ছেলের চাকরী হয়েছে। সে মাস মাস টাকা পাঠায়। নিজেও রোজগার করে। ছোট ছেলেকে পড়াচ্ছে।

সরলা আশা করছিল, শীতকালের বড়দিনের ছুটিতে ছেলে বাড়ী আসবে। কিন্তু হাবুল নিরাশ করল তাকে। সে লিখল, বাবু এখন ছাড়ছেন না। বললেন, ব্যস্ত কি? তুই ত আর জলে পড়িস নি? যাবি কিছুদিন পরে।

এবার রাগ হল সরলার। ছেলের মনিবের উপর রাগ। হাবুলের চাকরী হওয়া অবধি এই লোকটার মঙ্গল চেয়েছে সে বরাবর। কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার পর মনে হল, এ আবার কেমন মানুষ! ক'টা টাকা দিয়ে ছেলেকে কিনে রাখতে চায়। মায়ের কষ্ট বোঝে না! বড়লোকের ধর্মই এই পরের দুঃখ-কষ্ট বোঝে না ওরা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সরলা উঠানের তুলসী-তলায় প্রণাম করতে যাবে এমন সময় সুন্দর এসে উপস্থিত।

এই সুন্দরদেরই মুড়ি ভাজে সে। সুন্দররা তাদের স্বজাতি, এক বংশ, বড়লোক তারা।

তাকে দেখে সরলা বলল, এস ঠাকুরপো। কলকাতা থেকে এলে কবে, তোমার দাদা পুরন্দর আছে কেমন?

সুন্দর বলল, আমি এসেছি আজ। দাদা ভাল আছে। বাবুল কোথায়?

বাবুল একটু আগে মাঠে কুকুর নিয়ে খেলা করছিল। সে, দুলু আর তোমাদের বাড়ীর লোকজন।

সুন্দর কি যেন বলতে চায় দেখে সরলা প্রশ্ন করল, তোমার আরও কেন কি বলা আছে ঠাকুরপো?

একটু ইতস্ততঃ করে সুন্দর বলল, আমি হাবুলের একটা খবর দিতে এসেছি।

কি খবর? সব ভাল ত?—ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল সরলা।

আমাদের হাবুল একটা অন্ধ ভিখিরীর সঙ্গে বেড়ায়। ভিখিরী গান গায়। সঙ্গে সঙ্গে সেও গান গায়। আর হাত পেতে পেতে লোকের কাছে ভিক্ষে করে।

ভিক্ষে করে! ভিক্ষে করে আমার হাবুল? আর লিখেছে কিনা বাবুর কাজ করে—

খানিক পরে সরলা চেয়ে দেখল, সুন্দর চলে গেছে। সে তখনও বিড়বিড় করছে। শেষটায় ভিক্ষুক হল হাবুল। ভিখিরী— তুলসী তলায় আর আলো দেওয়া হল না।

বাবুল এসে দেখে মা দাওয়ার অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছে। হঠাৎ ছেলেকে দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে সরলা কেঁদে ফেলল।

বাবুল ত অবাক। সে বুঝতে পারলনা এ কান্না কিসের, কেন? তার মায়ের দুঃখ কোথায়? সে মায়ের গালে হাত বুলায় আর বলে, কি হয়েছে? কাঁদিস না মা।

ছোট ছেলেকে কি যে বলবে তা বুঝতে পারে না সরলা। কি যেন বলতে গিয়েছিল। কিন্তু বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

সরলা বাবুলকে রাত্রে খাওয়াল। নিজে খেল না। বলল, শরীরটা ভাল নয়। সারারাত তার ঘুম হল না। আকাশ পাতাল কত কি ভাবল।

সব চেয়ে যে বৃত্তিকে সে ঘৃণা করে তার ছেলে আজ সেই বৃত্তি গ্রহণ করেছে। তার সেই অন্নে পরিপুষ্ট হচ্ছে তারা। ভগবান আর কি কোন কাজ জুটিয়ে দিতে পারেন নি।

ছেলেমানুষ সে। বোঝে না তার চাকুরির গ্লানি কোথায়?

কিন্তু তার নিজের সমস্ত সত্তা ত ভরে গিয়েছে সেই ভিক্ষান্নের জারিত রসে। সরলার সমস্ত মন গ্লানিতে ভরে গেল।

ভোরে উঠে অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগেই সুন্দরদের বাড়ীতে গেল। সে তখন পুকুর-ঘাটে প্রাতঃস্নান করছিল। তাকে বলল, একটা কথা ঠাকুরপো, হাবুল যে কি করে তা তুমি কাউকে বলনি ত? কাউকে বল না ভাই। এমনকি তোমার মাকেও না। আমার মাথার দিব্যি রইল ভাই।

না—বলব না কাউকে—সুন্দর তাকে আশ্বাস দিল।

সরলা বাড়ী ফিরে এল।

দুপুরেও খেতে পারল না সে। ভাতের থালার সামনে বসে খালি মনে হয়েছে এই চাল কিনেছে ভিক্ষের টাকায়। তার ছেলে, গৌরী-গ্রামের মিত্র বংশের ছেলে ভিখিরীর হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়। ভিক্ষের জন্য হাত পাতে। লোকে তার হাতে তাচ্ছিল্যভরে দুটো পয়সা ফেলে দেয়। কেউ বা দেয় না। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

কেউ বা টিপ্পনী করে, জাত ভিখিরীর বাচ্চা। সুধীর চাকীর স্কুলের আর পাঁচটা ছেলে তাকে ঘৃণা করে। নিশ্চয়ই করে। ভিখিরী বলে কাছে বসে না।

অথচ ছেলের চাকরী হয়েছে জেনে কি সুখেই মশ-গুল ছিল, স্বপ্ন দেখছিল কেন। স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে গেল। অভাবও তেমন যায়নি। অথচ এইটুকুর জন্য ছেলেকে ভিখারী সাজতে হয়েছে।

না, মা, হাবুলকে আজই লিখে দেবে এ চাকরীতে আমার দরকার নেই। ঘরে ফিরে এস।

তাতে কষ্ট হয়ত হবে। হয়ত কেন নিশ্চয়ই হবে। বাবুলকে স্কুল ছাড়তে হবে। আগের মতই চলবে অভাব-অভিযোগ। আবার ছেঁড়া কাপড় পরতে হবে। চালার ফুটো সংখ্যায় আরো বাড়বে। থাকতে হবে রোদ বৃষ্টির মধ্যে।

তা হোক, তবুও ছেলেকে সে ভিক্ষা করতে দেবে না।

বাবুল বিকেলে পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দেখল, মায়ের মুখ মন যেন ফ্যাকাসে, চোখ বসে গিয়েছে। চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো।

সাত বছরের ছেলে বাবুল। সেও বুঝতে পারল, মা'র কি যেন হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, মা, তুই এমন করে বসে আছিস যে? অসুখ করেছে তোর? জ্বর হয়েছে?

দু-তিনবার প্রশ্ন করার পর সরলা অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল, না, হয় নি কিছুই।

তবে তবে? মায়ের কাছে কোন জবাব না পেয়ে বাবুল চাঁদাকে নিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেল।

সরলা দুপুরেই ডাকঘর থেকে একখানা ইনল্যান্ড এনে রেখেছিল। কিন্তু তখন চিঠি আর লেখা হয়নি। সুন্দরদের বাড়ীতে কাজে যাওয়া হয়নি।

রাত্রে বাবুল ঘুমিয়ে পড়লে সে লিখতে বসল। ছোট্ট একখানা চিঠি লিখতে লাগল প্রায় এক ঘন্টা। লেখে আর কাটে। আবার কি যেন ভাবে। এক একবার উপরের দিকে চায়। নজর পড়ে চালার ছোট-বড় কয়েকটা ফুটোর দিকে। সেই রন্ধ্রপথে ঘরের মধ্যে জায়গায় জায়গায় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। এই নতুন ফুটোগুলির কথা সে জানত। ভেবেছিল, কাল-বৈশাখীর আগে আবার কিছু নতুন শণ দিয়ে ঘর ছেয়ে ফেলবে।

কাটাকুটির পর চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই—

বাবা হাবুল,

কাল সুন্দরের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি এক বাবুর হাত ধরে ভিক্ষে কর। আর আমি তোমার মা হয়ে সে ভিক্ষের চাল ফুটিয়ে খাই। ভাবতেও যে কি কষ্ট হচ্ছে—আমার—তা তোমাকে জানাতে পারব না।

ও কাজে আর দরকার নেই। চিঠি পেয়েই দেশে ফিরে এস। যেভাবে হোক দিন এক রকম কেটে যাবে। কিন্তু ভিক্ষের ভাত আমার মুখে আর রুচবে না।

এই কটি ছত্রের উপর তার দু'ফোটা চোখের জলও পড়ল। চিঠিখানা লিখে সে সযত্নে মুড়ল। আঠা দিয়ে ভাল করে আটকাল। ধীরে ধীরে নাম লিখল তার উপর। কাল নিজে গিয়ে ডাকে দেবে। এই চিঠি আর কারো হাতে দেবে না। যদি কেউ জানতে পারে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। জানে খালি সুন্দর। তার

(শেষাংশ ১২৮ পৃষ্ঠায়)

তেতলার এই নিরালা ঘরটিতে বসে পড়াশুনো করতে কখনো কোনো অসুবিধে বোধ করেনি মলিনা। কিন্তু কদিন ধরেই তার যেন ভারি উৎপাত মনে হচ্ছে।

জানলার পর্দাটা বারবার টেনে দিয়েও শান্তি নেই। একেই তো দক্ষিণটা লেক বরাবর খোলা, তারওপর সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় অস্থির হাওয়ার হুড়োহুড়ি। ফলে পর্দার অবিরাম দুলুনি কিছুতেই যেন আর থামতে চায় না। আর যতোবারই পর্দাটা একটু সরে সরে যায় ততোবারই মলিনার চোখ গিয়ে পড়ে পাশের বাড়িতে অন্য কয়েকজোড়া চোখের ওপর।

আচ্ছা ওরা অমন করে তাকিয়ে থাকে কেন মলিনার দিকে? নিজের মনের প্রশ্নেরই সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পায় না মলিনা। সে যে এমন কিছু একটা সুন্দরী নয় সে খেয়াল তার পুরোমাত্রায়ই আছে এবং নিজের দিকে কাউকে আকর্ষণ করার কোনো ঝোঁকও যে তার কোন কালে নেই সে কথাও কারো অজানা নয়।

তবু মলিনা এ কয়দিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে, এই নতুন দলটি এখানে আসার পর থেকে কিভাবে তারা সকাল বিকেল সন্ধ্যে সারাক্ষণ তাদের কলকণ্ঠে মুখর করে রাখে পাশের এই ফ্ল্যাট বাড়িটিকে। এদের কে কি করে না করে তার কোনো খবরই রাখে না মলিনা—রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না। মাত্র কয়েক মাস আগে সে কলেজে ঢুকেছে। নতুন নতুন নানা বিষয়ে মাথা গলাতেই সে ব্যতিব্যস্ত, অন্য সব কথা ভাববার তার ফুরসৎ কোথায়? তবু সময় সময় বার বার পড়ে পড়েও সে যখন কোনো দুর্বোধ্য বিষয়ের কূলকিনারা করে উঠতে পারে না তখন ঐ পাশের বাড়ি থেকে কোনো অবোধ্য গানের কলি সুরের দোলায় দোলায় ভেসে এলে সে যে মুহূর্তেই আনমনা হয়ে পড়ে সেকথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না মলিনা।

কিন্তু তাতে কি? আবার পরীক্ষা দিতে হবে না? স্কুলে চিরকাল মলিনা ভালো ছাত্রীর সম্মান কুড়িয়ে এসেছে। কলেজে এসে সে কি তার ব্যতিক্রম হতে দিতে পারে? কখনোই না। আবার বই-এ মন দিতে হয় মলিনাকে।

হঠাৎ দুরন্ত ঝড়ের বেগে দিদির পড়ার ঘরে ঢুকেই তার টেবিলে একরাশ চকোলেট ছড়িয়ে দিয়ে ছোট বোন মায়া একেবারে হাওয়া।

সবেমাত্র একটা চকোলেট ছাড়িয়ে মলিনা মুখে পুরেছে ঠিক তখুনি আবার মায়া এসে তার ঘরে হাজির। কি একটা কথা বলবে ভেবেছিলো, তাই বলতে এসেছে সে। এসেই বলতে শুরু করে, জানিস দিদি, ওবাড়ির ঐ মারাঠীর চেয়ে আমার বরং ঐ মাদ্রাজীকেই বেশি ভালো লাগে। আর ডেভিড তো কেবল হাসে; কথা বলায় ওর দারুণ লজ্জা। আশ্চর্য!

একটু আগেই একটা ম্যাপ আঁকছিলো মলিনা। হাতের কাছের বই-পত্রগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে রাখতে জিগোস করলো সে মায়াকে, কাদের কথা বলছিসরে তুই?

কাদের আবার, ঐ যে থ্রী মাস্কেটিয়ার্স!

এবার আর বুঝতে কোনো কষ্ট হলো না মলিনার। ওদের এতো খবর জানলি কি করে তুই? —একটু বিস্মিত হয়ে সে বরং জিগ্যেস করলো মায়াকে।

বারে, ওরা যে আমার ওদের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো একদিন। সেদিন কতো গল্প করেছে! তারপরেও আরো কদিন ডেকে ডেকে নিয়েছে আমাদের। আমাকে মীনাকে চকোলেট দিয়েছে, লজেন্স দিয়েছে। ভারি ভালো লোক ওরা।—মায়া উত্তর দেয়।

তাই নাকি? সাবধান, আর কক্ষনো যাবে না ওদের ওখানে বলে দিচ্ছি।

পুরো দুখবরেরও ততো নয় যে দিদি এবং যে দিদি এখনো তাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলতে চাচ্ছে না, তার এই অযৌক্তিক-কড়া শাসন মোটেই ভালো লাগলো না মায়ার। আর সে কি দিদিকে সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী? ত চট করে বলে বসলো, তা এতোই যখন আপ তাহ'লে খেলে কেন ওদের দেওয়া চকোলেট?

ছোট বোনের আস্পর্ধায় রাগে লাল হ ওঠে মলিনা। চেয়ার ঠেলে রেখে নিচে নেমে এ নালিশ ঠুকে দেয় মায়ের কাছে।

মা, মায়া আর মীনাকে তুমি একটু ধমব টক দাও এবার। বড়ো বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যা ওরা।

আলনায় জামা-কাপড় গুছোতে গুছো মা একটু চমকে উঠলেন। ক্ষুব্ধ মেয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, কেন রে, কি হয়েছে?

কী আবার হবে? তোমার আস্কারা পে পেয়ে দুমেয়ে এখন যা ইচ্ছে তাই করতে সাহস পাচ্ছে।—মলিনার এই উষ্মা প্রকাশ শেষ হবার আগেই মায়া আর মীনা সেখানে এসে হাজির।

জানো মা, পাশের দোতলায় ও'রা আমাদের ডেকেছিলেন, তাই আমরা গিয়েছিলাম। তার জন্যে দিদির সে কি রাগ! ফের যেন আমরা ওখানে না যাই বারণ করে দিয়েছে দিদি। কেন, গেলে কী দোষ হবে মা তাতে?—মায়ের মতটা জানতে চায় মায়া।

দিদি মানা করলে তা শুনতে হবে বৈকি।—বলেই বড়ো মেয়ের দিকে মা তাকান একবার। আর মলিনা বলে ওঠে:

আমি কি আর সাধে মানা করেছি? আমার মনে হয়, ওবাড়িতে নতুন যে ছেলেগুলো এসেছে ওরা মোটেই ভালো নয়। দেখছো না, এরই মধ্যে টফি-চকোলেট খাইয়ে কেমন ওদের হাত করে ফেলেছে।

ঠিক আছে, আর যাতে ওরা ওবাড়িতে না যায় তা দেখা যাবেখন।—এই বলে তখনকার মতো মা এ প্রসংগের ইতি টেনে দিলেও মলিনার ঐ সময়ের চেহারাটি অনেকক্ষণ ধরে মনে আঁকা
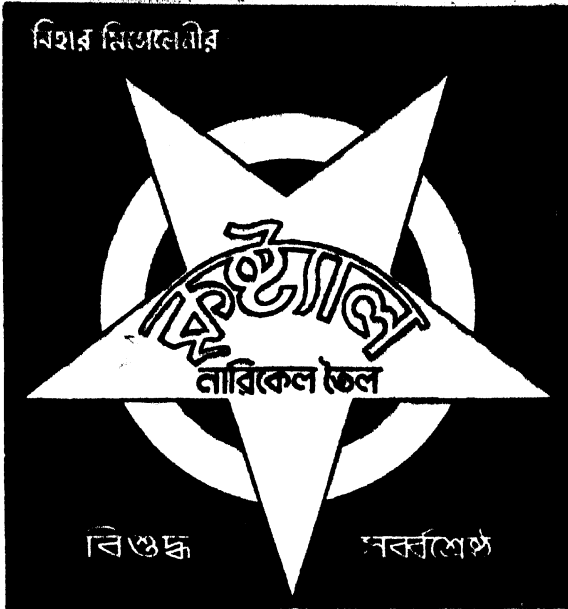
৺শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন
বিহার মিসেলেনীর
কুন্তলা
নারিকেল তৈল
বিশুদ্ধ
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বিহার মিসেলেনী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

SOLURESORCINOL
(AN IDEAL HAIR TONIC)
Prevents loss of hair, baldness, dandruff and acne and promotes growth of hair.
PASTEUR LABORATORIES
PRIVATE LTD.
2, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA-6
PHONE: 34-2674

হয়ে রইলো তাঁর। সত্যি এই বড়ো মেয়েকে নিয়ে যেমনি বাপ-মায়ের গর্ব, ওকে নিয়েই তেমনি আবার তাঁদের ভয়।

দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বাবার কাছেও নালিশ জানালো মলিনা।

উত্তরে কর্তা হেসে বল্লেন, তা ওবাড়ির ইয়ংম্যানরা কী করে জানবে যে তাদের প্রতি পাশের বাড়ির কোনো ইয়ংলেডী অপরিসীম বিরূপতা পোষণ করছে। যাইহোক সব গোলমাল মিটে যাবে। মায়া-মীনারও তো কর্তব্য বলে একটু কিছু থাকা উচিত। কাজেই টফি-চকোলেটের বদলে ওরা বরং ঐ ছেলে কয়টিকে চায়ে উপস্থিত হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসুক।

খুব ভালো হয় বাবা।—হাইকোর্টের রায়ে খুশি হয়ে হাততালি দিতে দিতে নেচে ওঠে মায়া আর মীনা। আর হাসতে হাসতে বলে, জানো বাবা, ওরা অদ্ভুত রকমের সুন্দর সুন্দর কথা বলে, গান গায় আর পিয়ানো বাজায়—শুনলে তোমারও খুব ভাল লেগে যাবে ওদেরকে।

বাবার একতরফা বিচারে মলিনা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও তাঁরই কথায় সে যেন আবার মনের জোর কিছুটা ফিরে পেলো। খাওয়া পর্বের শেষে বড়ো মেয়েকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন তিনি, ডোণ্ট মাইণ্ড মাই ডিয়ার ইয়ংলেডী, এভ্রিথিঙ উইল গো রাইট!

পরেরদিন মধুর বিকেল। মলিনাদের ছোট্ট লনটিতে ছোট্ট একটা পার্টি বেশ সুন্দর জমে উঠেছে। লেকের হাওয়া আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। গাছে গাছে রকমারি ফুল। ঘাসের কার্পেটে খানকয়েক চেয়ারে মিঃ ও মিসেস সিনহা বসেছেন অতিথিদের নিয়ে। মাঝখানে কয়েকটি টি-পাই।

মায়া আর মীনা দুবোন মিলে কাপে কাপে চা ঢেলে দিয়ে নিজেরাও বসে গেলো গল্পের আসরে। চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে গালগল্পের যেন একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ! অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পে গল্পে আসর একেবারে জমজমাট হয়ে উঠলো।

কিন্তু মলিনা কোথায়? তার অভাবটা একই সময়ে সবাই যেন বোধ করলো একসঙ্গে।

মলিনা বাড়ি নেই। কোনো এক অধ্যাপিকার বাড়িতে গিয়ে পড়ার অছিলায় কোন্ দুপুরে সে বেরিয়েছে তখনো ফেরার নাম নেই। অথচ বলে গিয়েছিলো ঠিক সময় মতোই সে আসবে, তার জন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু আসলে সে এলো সময় প্রায় কাবার করে দিয়ে—চা-চক্র যখন ভাঙে ভাঙে।

সত্যি সত্যিই মলিনা ভেবেছিলো চায়ের আসরের ঝামেলা থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, এতো রাতে আর তাদের বাড়িতে কেউ নিশ্চয়ই বসে নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার ধারণার গরমিল হয়ে গেলো অল্পের জন্যে।

বাবার ডাকে ভাঙা হাটেই এসে বসতে হলো মলিনাকে। আলাপ হলো তার নতুন প্রতিবেশীদের সঙ্গে। ওদের তিনজনের মধ্যে একজন মারাঠী, একজন মাদ্রাজী আর একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। প্রথম দুজন তখনো অবিরাম কথা বলে চলছিলো চায়ের টেবিলে। আর তৃতীয়টি যেমন লাজুক ভঙ্গীতে বসেছিলো মিঃ সিনহার মুখোমুখি হয়ে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই দু'চারটি করে কথা হলো মলিনার। মা আগেই উঠে গেছেন আসর থেকে। মায়া-মীনাও। এবার আসরের পাট উঠলো শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর।

সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়াশুনো করলো মলিনা। তারপর অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে শুয়েই সে শুনতে পেলো পিয়ানোয় একটি আশ্চর্য সুন্দর সুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দুচোখে নেমে এলো ঘুম—গভীর ঘুম। সুরের আবেশে কেমন যেন একটা নেশার ঘোরে সে নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে।

চায়ের টেবিলেই প্রথম আলাপ এবং দু-একটির বেশি কথাও তখন হয়নি তাদের মধ্যে। তার মধ্যেই মলিনার কেমন যেন ভালো লেগে গিয়েছে ডেভিডকে। শান্ত লাজুক দৃষ্টি নিয়ে একটা কর্ণার বেছে নিয়ে বসেছিলো সে। মাঝে মাঝে যখন চোখ তুলে সে তাকাচ্ছিলো কেমন একটা অদ্ভুত ভাব আচ্ছন্ন করছিলো তাকে। একবার মলিনার মনে হয়েছিলো, ডেভিড যদি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান না হতো তাহলে ভারি ভালো হতো। পরক্ষণেই আবার তার মনে হলো, এ-সব কি ভাবছে সে—ডেভিডের জাতিতে ওর কি এসে যায়?

তার পরেরদিনের কথা।

কলেজ থেকে ফিরে দোতলার ব্যালকনিতে বসে কী একটা বই পড়ছিলো মলিনা। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মলিনা ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলেই প্রশ্ন করলো, কে? উল্টোদিক থেকে উত্তর এলো, আমি আইভান ডেভিড কথা বলছি।

একটু আশ্চর্য লাগলো মলিনার। কেন, কি এমন দরকার থাকতে পারে তার যে ডেভিড ফোন করছে?

ধন্যবাদ মিস সিনহা, অনেক ধন্যবাদ। কাল আপনারা আমাদের অনেক অনেক প্লেজার দিয়েছেন।—ডেভিড বল্লে ওধার থেকে।

কিন্তু তার জন্যে ধন্যবাদ কি শুধু আমারই প্রাপ্য?—উত্তর দেয় মলিনা।

সেকথা বলছি না, তবে বিশেষভাবে আপনাকেই জানাতে ইচ্ছে হলো। আপনাকে কলেজ থেকে ফিরতে দেখেই একটু অপেক্ষা করে ফোন করলাম।

বেশ তো আপনার দেওয়া ধন্যবাদ আমরা সবাই মিলেই না হয় ভাগ করে নেবো।

সে আপনার ইচ্ছে। যাক, কি করছিলেন এখন বলুন।

তেমন কিছুই নয়, সামান্য খানিক বই নাড়াচাড়া।

তাহলে তো আপনাকে খুব ডিস্টার্ব করা হলো বোধহয়।—টেলিফোনে আইভানের গলার স্বরটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

সৌজন্য রক্ষার ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি মলিনা বল্লে, না-না আমাকে একটুও ডিস্টার্ব করা হয়নি মিঃ ডেভিড, বিলিভ মি, আমি মোটেই কোনো সিরিয়াস পড়া পড়ছিলাম না। একটা ডিটেকটিভ নভেল শুরু করেছিলাম মাত্র।

টেলিফোনের আলাপ সেদিন আর বেশি না এগুলোও আইভানের বক্তব্যের কিছুই যে তখনো পর্যন্ত বলা হয়নি তা বেশ বুঝতে পেরেছে মলিনা। মন্দ লাগে না কিন্তু এই ছেলেটিকে। খুব বেশি স্মার্ট না হলেও ভারি সুন্দর একটা ভঙ্গী আছে ওর যা সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথাবার্তায় খুব ভদ্র, সুকোমল।

এর মধ্যে পাশের বাড়িতে নবাগত ঐ তিনজন তরুণ সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর জোগাড় করে নিয়েছে মলিনা। ওদের দুজন কাজ করে রেলওয়েতে আর আইভান ভারতীয় বিমানবহরের একজন পাইলট। ওরা কে কখন কাজে যায় আর কাজ থেকে ফিরে আসে সে সব কিছুই আর অজানা থাকে না মলিনার কাছে।

শুধু তাই নয়, দিনে দিনে ঐ তেতলার জানালার আকর্ষণটাই কেমন যেন দ্রুত বেড়ে চলতে থাকে। এক এক সময় মলিনার মনে হয় ঐ নীল পর্দার আড়ালে তার জন্যে যেন অপেক্ষা করছে সুন্দরতর আর একটা জগৎ।

নিজেদের ফ্ল্যাটে কখনো কখনো পিয়ানো নিয়ে একা একাই বসে থাকে আইভান। হঠাৎ হয়তো বেজে ওঠে পিয়ানোর জলতরংগের মিষ্টি উচ্ছ্বাস। আবার কখনো পড়াশুনোর ফাঁকে জানলায় এসে দাঁড়ালেই মলিনা হয়তো দেখতে পায় বেতের একটা চেয়ার দরজার কাছে টেনে নিয়ে এসে চুপচাপ তাতে বসে আছে ছেলেটি। তাকিয়ে আছে তাদেরই জানলার দিকে।

একটু হেসে হয়তো মলিনা সরে এসেছে। কিন্তু আইভান ডেভিড তাতে খুশি হয়নি, বরং দুঃখই পেয়েছে।

পরক্ষণেই ফোন বেজে উঠেছে : হ্যালো! মলি, অনেক বসে বসে যাওবা তোমার দেখা পাওয়া গেলো, দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে। তাকে কি আরেকটু দীর্ঘ করা যেতো না?

কী যে সব বলছো!—মলিনা উড়িয়ে দিতে চায় ডেভিডের প্রশ্নকে।

আমার কথাগুলোকে খুবই বাজে মনে হচ্ছে, তাই না। তোমার হয়তো কোনো কষ্টই হয় না। নিচের দিকে এক পলক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েই তুমি হয়তো অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারো, কিন্তু সকাল থেকে চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থেকে থেকে একবিন্দু বর্ষণও যখন আমার ভাগ্যে মেলে না তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তা-কি একবারও তুমি ভেবে দেখেছো, ডার্লিং।

মলিনা এবার হেসে ফেল্লে।—সে আবার কি? সকাল থেকে চাতক পাখি হয়ে বসে থাকাটা তো কোনো কাজের কথা নয় ডেভিড। তা-ছাড়া আমার লেখাপড়া রয়েছে—আশাকরি তুমিও একেবারে কর্মহীন নও। কাজেই অমন করে অযথা ঘাড় ব্যথা করে কি লাভ বলো।

ডার্লিং, কথায় কথায় অমন যুক্তি এনোনা। তুমি তো জানো দিনের পর দিন আকাশে উড়ে বেড়িয়ে আমার কাল কাটে, নিচু দিকেই চেয়ে থাকতে হয় প্রায় সব সময়। কাজেই একটু রিলিফ পাবার জন্যে মাঝে মাঝে যদি ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকি তাতে তোমার আপত্তি হবে কেন ডার্লিং, বলো।—এমনি যুক্তিতে ডেভিড ঘায়েল করে মলিনাকে।

দিন যায় দিন আসে। টেলিফোনে এমনি সব টুকরো টুকরো আলাপ চলে প্রায়ই। আর জানলার মধ্যে দিয়ে চলে অসংখ্যবার দৃষ্টি-বিনিময়। তিন চার মাসে এর বেশি এগোনো যায়নি; তা সম্ভবও নয় এই পরিবেশে। কারণ মলিনা বেশ ভালোই জানে, বাবা-মা তার যতো লিবারেলই হোন না, সে একটু বেশি নড়চড়

হতে গেলেই তাঁরা দুজনেই অসন্তুষ্ট হবেন — ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। কাজেই আকাশ-বিহারী তরুণ তার স্বপ্নের ডানা মেলে দিয়ে আকাশেই বিচরণ করুক সেই ভালো, মলিনা আর এগোতে পারবে না—ডেভিডকেও তা জানিয়ে দিতে হবে।

সে কথাই মলিনা ভাবছিলো সেদিন এক বান্ধবীর সঙ্গে লেকে বেড়াতে বেড়াতে। ফিরে আসার পথে ডেভিডের সঙ্গে দেখা। দুজনেই থমকে দাঁড়ায়।

তুমি?—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েই খুব আস্তে প্রশ্ন করে মলিনা।

কেন লেকে যে পুরুষদের আসতে মানা এমন তো আমার কিছু জানা নেই।

না না, সে কথা বলছি না। লেকটা শুধু মেয়েদের বেড়ানোর জন্যে, তা মোটেই নয়।

তা যখন নয়, তখন চলো একটু একসঙ্গে বেড়ানো যাক। মলি, তোমার মনে হচ্ছে কিনা জানি না—আজই কিন্তু এই প্রথম আমরা এমনি নিশ্চিন্ত পরিবেশে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলছি।—ডেভিডের কথায় একটু অস্বস্তি বোধ করে মলিনা। বলে, দাঁড়াও—সঙ্গে বন্ধু আছে, আগে ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।

সেই আলাপ করিয়ে দেবার পরিণতি শেষ পর্যন্ত যে কী গিয়ে দাঁড়াতে পারে সেদিন কল্পনাও করতে পারেনি মলিনা।

সত্যি মেয়েরা এতো সংকীর্ণমনা! নমিতার সঙ্গে তার এতোদিনের ভাব, কিন্তু কখনো কি তার সম্বন্ধে এমন কিছু সন্দেহ করতে পেরেছে সে? আপন মনে ভাবতে ভাবতেই মলিনা লজ্জায় মুষড়ে পড়ে।

দিন যাবারই কথা। আর ক'দিন বাদেই বার্ষিক পরীক্ষা। পড়াশুনো তেমন ভালো হয়নি বলে মনটাও আগে থেকেই কেমন খারাপ হয়ে আছে। হঠাৎ সেদিন সকালবেলা একটি খাদা খামের চিঠি হাতে নিয়ে মিসেস সিনহা মলিনার ঘরে ঢুকলেন।

কার চিঠি মা?

তোমাকে হস্টেলে থাকতে হবে।

কেন মা, কী হয়েছে?—মায়ের গম্ভীর মুখের জবাব শুনে একটু যেন নার্ভাস হয়েই আবার প্রশ্ন করে মলিনা। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মা তাঁর নিজের হাতের চিঠিখানা তুলে দেন মেয়ের হাতে।

চিঠি পড়ে মলিনা তো অবাক!

কোনো এক হিতৈষী বন্ধু নিজের নাম অজ্ঞাত রেখে মিঃ সিনহার কাছে এই চিঠি লিখেছেন। ডেভিড এবং মলিনার হৃদ্যতা সম্বন্ধে বিশ্রী ধরণের ইংগিত করাই এ-চিঠির আসল উদ্দেশ্য এবং এ যে নমিতারই কাজ তাতে কোনো সন্দেহই নেই মলিনার। হাতের লেখাটা অন্যের হলেও চিঠিতে সেদিনের ঘটনার যে নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এবং যে ভাষায় তা লেখা হয়েছে তা নমিতার না হয়েই পারে না।

সে যাই হোক, চুপ করেই থাকতে হয় মলিনাকে। মা-বাবার মুখথেকে তার বিশেষ কিছু শোনা না গেলেও তাঁদের চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মোটেই অস্পষ্ট নয়। তার পড়াশুনো এবং ভবিষ্যৎ এ দুদিক রক্ষা করার জন্যেই তাঁরা তাকে হস্টেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করলেন। এবং যে ব্যবস্থা যে অনড় হবার নয় মলিনা তা বেশ ভালোই জানে। কাজেই বই-পত্তর গুছিয়ে ভালো মেয়ের মতো হস্টেলে তাকে যেতেই হবে। পড়াশুনো, হস্টেলের নিয়ম-কানুন আর সহপাঠিনী ও হস্টেল-বান্ধবীদের সঙ্গ, এই নিয়েই তাকে কাটাতে হবে তার পাঠ্য-জীবনের বাকি কয়টি বৎসর। এর মধ্যে ডেভিডকে মাঝে মাঝে মনে পড়লেও তার স্মৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসবে দিনের পর দিন। ক্রমশঃই অস্পষ্ট হয়ে আসবে আকাশ নীল পোষাক পরা স্নিগ্ধ সেই তরুণের উদাস গভীর চোখের ছবি। সহস্র বাধা-নিষেধ ও কলেজ আর হস্টেলের নিরুদ্ধ বেড়াজালে সে হয়ে পড়বে প্রায় বন্দিনী। আর দূরে নীলে মুক্ত বিহংগের মতো উড়ে উড়ে ডেভিড হয়তো হয়ে উঠবে স্বেচ্ছাচারী।—এমনি সব চিন্তা একটা জ্বালার সৃষ্টি করে মলিনার অন্তর-লোকে। কিন্তু তার কিছুই সে প্রকাশ হতে দেয় না বাইরে। চুপ করে থাকে।

যা হবার তাই হয়। কলেজ হস্টেলেই মলিনার দিন কাটতে থাকে একেক পদ এক করে। মুহূর্তগুলো নীরব মিছিল করে তার সম্মুখ দিয়েই চলে যাচ্ছে ক্রমাগত, কিন্তু একটি মুহূর্তও বিন্দুমাত্র দাগ কেটে রেখে যেতে পারছে না তার মনের অবচেতনে।

তারই মধ্যে হঠাৎ একখানা চিঠি আসে মলিনার নামে। হস্তাক্ষর তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই তাড়াতাড়ি খামের মুখ ছিঁড়ে আগে দেখতে হয় তাকে কে লিখেছে।

ও এ যে ডেভিডের চিঠি!—খামটা খুলে অল্পবিস্তর অবাকই হয় মলিনা।

ডেভিড লিখেছে মলিনাকে, ডার্লিং, তুমি হস্টেলে গিয়ে ভালো মেয়ে হয়ে উঠছো খুবই ভালো কথা। আমি তো এখন মুক্ত পাখি। আমার অবাধ স্বাধীনতা—অগাধ আনন্দ। আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়িয়ে শ্রান্ত পাখি যখন ঘরে ফিরে আসে, তখন তার একমাত্র প্রিয় সঙ্গী সুরা। চমকে উঠবে হয়তো, কিন্তু আমি যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ছেলে ডার্লিং। আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে সুরার প্রবাহ। আর তার অনুভব আমার শিরায় শিরায় সব সময়। সমস্ত পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ-বেদনাকে অনায়াসেই আমি মিশিয়ে দিতে পারি আমার ঐ সুরা-বন্ধুর আমেজটুকুতে।

মলিনা খুবই দুঃখ পায় চিঠিখানা পড়ে। আবার ভাবে, আশ্চর্য মানুষের মন—ডেভিড তাকে এতো ভালোবেসেছে! তা নইলে এমন অভিমানই বা হবে কেন ওর? কিন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যে কতোটুকুই বা মনঃজানাজানি হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে। আর অন্তর জগতে যাই ঘটুক না কেন, মলিনা তার দৈনন্দিন কর্মসূচীতে ব্যাঘাত ঘটতে দেয়নি কোথাও। অথচ তারই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কীভাবে যে ডেভিড তার সবটুকু মনকে জুড়ে বসেছে সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

বাড়ি ছেড়ে হস্টেলে আসবার আগের রাতের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবে না মলিনা। রাত বারোটা বাজতেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলো সে। কিন্তু হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো কার অনর্গল বকুনিতে? কে চেঁচাচ্ছে এতো রাতে? কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো সে কিছুক্ষণ ধরে। এই শোনো, এই শোনো বলতে বলতে একেবারে তার নাম ধরেই ডাক শুরু হয়ে গেলো যে। কী সর্বনাশ! নিজের নাম কানে আসতেই ভয়ে নীল হয়ে যায় আর কি মলিনা। এ কি পাগলামো ডেভিডের? ড্রিংক করে সে যা-তা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে কি সত্যিই মলিনার বিপদ চায়। বাবা-মা'র ঘর যদিও অনেকটা দূরে, তবু তাঁদের কানে যদি মধ্যরাতের এ হল্লার কিছুটা গিয়ে পৌঁছোয় তা হলে কি উপায়! ভয়ে ভয়ে উঠে গিয়ে নিজের ঘরের জানলাটাই বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলো মলিনা। কিন্তু তাতে কি হবে, ঘুম আর তার একবিন্দুও আসেনি সে রাতে।

পরদিন সকালেই মলিনা চলে এসেছে হস্টেলে। তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঘরের নীল পর্দাটা একবার একটু সরে গিয়েছিলো। তারই ফাঁক দিয়ে আভাসে একনজর সে দেখে নিয়েছে ডেভিডকে। ডেভিডের দুচোখে যেন অশেষ মিনতি; দুটি চোখেই শুধু এই একটি প্রার্থনা—আমাকে ক্ষমা করো।

কিন্তু কেন এই ক্ষমা-প্রার্থনা, দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সেজন্যে দায়ী কি শুধু একা ডেভিড, সে কি প্রশ্রয় দেয়নি ডেভিডকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং দিতে সে নিজে কি প্রচুর আনন্দ পায়নি?—হস্টেলে নিজের ঘরে বসে বসে আত্মসমালোচনায় মেতে ওঠে মলিনা। এসবই ডেভিডের চিঠির জের। চিঠিখানা তার এ্যাটাচি কেসে পুরে রেখে এমনি হাজারো রকম প্রশ্ন সে তোলে নিজের সামনে। কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জবাব সে পায় না তার মনের কাছ থেকে।

আর যাই হোক কিছুদিন ধরে তাকে ঘিরে বাড়িতে যে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠছিলো, হস্টেলে আসার পর তা থেকে যে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে সেটাই মলিনার কাছে বড়ো কথা। মনের সব দুঃখ সব অভিমান মনে চেপে রেখেই মলিনা তার পড়াশোনা চালিয়ে গেছে এবং পরীক্ষাটাও মোটামুটি সে ভালোই দিয়েছে।

মলিনার পরীক্ষার পরেই সপরিবারে শিলং বেড়াতে গিয়েছেন মিঃ সিনহা। ব্যারিস্টার সিনহার নিজেরই বাড়ি রয়েছে শিলং-এ, অনেক দিনের বাড়ি। নিজে বছরে একবার তিনি যানই সেখানে, কখনো সখনো সকলকে নিয়েও যান।

এর আগে আরো বারকয়েক মলিনা বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে শিলং-এ। ঠিক আগের দুবারের কথা তার বেশ মনে আছে। খুব ভালো লাগে তার শিলং-এর পরিবেশ। পাইন আর পপলারের দীর্ঘ সারির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কিংবা পাহাড়ী দেশের নিবিড় স্তব্ধতায় বসে ঝরণার গান শুনতে শুনতে নিজেকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কোনো কালেই ভোলবার নয়। এবারও দুচোখ ভরে সে দেখে নেয় শূন্যলোকে রাশি রাশি উদভ্রান্ত মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা—তারা কখনো চলেছে নুয়ে নুয়ে নিচের পথে, আবার কখনো কখনো তারা ঊর্ধ্বলোক বিহারী। দূরে, বহু দূরে আকাশ কখনো ধূসর, কখনো নীল।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দের বুকে গা-ঢাকা দেওয়া বিমানের গম্ভীর গর্জন কানে যায় মলিনার।

মলিনা চমকে চমকে ওঠে। চিলের মতো হুলকা ডানায় ভর করে বিমানগুলো ভেসে ভেসে চলে যায় কোথায় কোন সুদূরে। ডেভিড পাইলট, তাকেও নিশ্চয়ই এই রুটে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করতে হয়। কিন্তু কোন্ বিমানের সে পাইলট কি করে মলিনা তা জানবে? ডেভিডও নিশ্চয়ই জানেনা যে মলিনা এই শিলং পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জানলেই বা কি। আর কোনো আশাই নেই ডেভিডের সঙ্গে তার আর কোনো রকম যোগাযোগ ঘটবার। সব কিছু জেনেও মলিনা তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, এ তার এক অসহ্য যন্ত্রণা।

কলকাতায় ফিরে এসেই আবার সেই হস্টেল।

আজো পর্যন্ত কিন্তু ডেভিডের সেই চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি মলিনা। অথচ চিঠি পাবার পর থেকেই কিন্তু মনটা তার কেবলি উসখুস করে আসছে একটা কিছু জবাব দেবার জন্যে। কিন্তু সাহস পায়নি।

হঠাৎ একটা খেয়াল চাপলো মলিনার ডেভিডকে একটা চিঠি লেখবার। মায়া আর মীনাকে দেখেই বোধ হয় এ খেয়াল। দুহাতে সাহস কুড়িয়ে নিয়ে সে লিখে ফেল্লে চিঠিখানা। দু লাইনের চিঠি। অনেক দিন আগে পত্র পেয়েও এতোদিনে তার উত্তর দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ এবং 'কেমন আছ' প্রশ্নের আবরণে ডেভিডের কুশল সংবাদটুকু জানবার আগ্রহ জ্ঞাপন—এ ছাড়া এ চিঠিতে আর কিছুই নেই।

উত্তরও এলো তেমনি। দু লাইনের জবাব। ডেভিড লিখেছে, এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তুমি করবে ভাবিনি। তবু, যখন জানতে চেয়েছো লিখছি, ডিউটির সময়টুকু ছাড়া বাকি টাইমটা প্রায় নেশাতেই কাটে। তাতে অন্য ক্ষতি যাই হোক, সুর চর্চায় কোনো বাধা ঘটে না। বেশ আছি।

মায়া আর মীনার দূতিয়ালির মাধ্যমে এসব পত্রের আদান-প্রদান চলে। কিন্তু মলিনার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে চিঠি লেখাটাও যেন একটা নেশার মতো হয়ে উঠলো ডেভিডের।

দু'তিন দিন যেতেই মলিনার কাছে আর একখানা চিঠি এলো ডেভিডের কাছ থেকে। তাতে ডেভিড কঠিন প্রশ্ন তুলেছে। পরিষ্কার ভাষায় সে জিজ্ঞেস করেছে, কতোকাল এমনি অন্তরালে থাকবে ডার্লিং, এবার একটু সাহস দেখাও।

পত্রের উপসংহারে বেশ একটা অনুনয়ের সুরে। ডেভিড লিখছে, মলি এসো, আর দেরি নয়—আমাদের ভালোবাসার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক, এসো। আমাকে বিয়ে করতে তোমার সামনে বাধা আসবে জানি। কিন্তু আমাকে ভালোবাসাতেও তো তেমনি তোমার অনেক বাধা ছিলো। সে সব যখন কাটিয়ে আসতে পেরেছো আর একটু এগিয়ে আসতে ভয় কি? এসো।

মলিনার অন্তরলোকে একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে এই চিঠি। কী করবে সে এখন? কী উত্তর দেবে সে ডেভিডের জিজ্ঞাসার? না একদম চুপ করে যাবে?

অনেক ভেবেচিন্তে একটা উত্তর দেওয়াই উচিত বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলে মলিনা। কিন্তু সে উত্তর তৈরি করতে সে কি অপরিসীম প্রয়াস তার! রাত জেগে জেগে শেষ পর্যন্ত যে চিঠি সে লিখলো তাতে ভালোবাসার মন্দির থেকে পালিয়ে গিয়ে সমাজের প্রকাণ্ড দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নেবার প্রয়াসই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মলিনা লিখলে—ডেভিড, এমন অবস্থাতেও বিয়ের প্রস্তাব তোমার দিক থেকে আসবে এতোটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দেবার মতো সামর্থ্য আমার কোথায়—যে ভালোবাসার বন্ধনে আমরা জড়িয়ে পড়েছি বিবাহিত জীবনের স্বীকৃতির মধ্যেই যে তার সার্থকতা সে তো জানা কথা। কিন্তু আজকের দিনে আর্ত মানুষের জন্যে সমাজ-সংসারের মমত্ব কতোটুকু তাও কি আর কারো অজানা? এযুগে সমাজের মহত্ব জটিলকে জটিলতর করে দেওয়ায়, জটিলতা মোচনে নয় এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তুমি ক্রিশ্চিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তোমার সঙ্গে ভাষায়, ব্যবহারে, রীতিনীতিতে কোনো মিলই নেই আমার এবং আমার সমাজের। এই দুর্লঙ্ঘ্য অসামঞ্জস্যকে তুমি মানিয়ে চলবে কি করে বন্ধু? শুধু প্রেম দিয়ে কি এই বিরাট পার্থক্যের প্রাচীরকে অস্বীকার করে এগোনো যাবে? তাও কি সম্ভব ডেভিড?

কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে চায় না আইভান। বারেবারেই সে যুক্তি দেয়—আমার সমাজ তোমায় সহজেই গ্রহণ করবে, আমার দিক থেকে কোনো বাধাই নেই। তবে দুঃখ এই তোমাকে তোমার সমাজের সহানুভূতি হারাতে হবে। কিন্তু আমি যদি ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার অনেকগুণ তোমায় ফিরিয়ে দিই, তবু আসবে না?

আইভানের এই দুর্বার কামনার ঢেউ বার বার বালুবেলায় আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরে আসে।

মলিনা কিছুতেই পেরে উঠে না সম্মতি দিতে। সমাজ সংসার তাকে যতোটুকু অধিকার দেবে তার বাইরে এক পাও এগিয়ে যাবার সাহস তার নেই। এতে তার জীবন হয়তো জ্বলে জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে, কিন্তু তবু সে নিরুপায়। ব্যক্তিজীবনে নিজের ইচ্ছেকে প্রতিফলিত করার কল্পনা করতে গিয়েই চারদিক থেকে সে যেন প্রবল বাধা অনুভব করছে। তার পরেও কোথায় আর মলিনা ভরসা পাবে ডেভিডকে আশ্বাস দেবার!

আশ্বাস দেওয়া তো দূরের কথা, প্রবোধ বা সান্ত্বনা দিয়েও আজকাল আর কোনো চিঠি লেখে না মলিনা। তার সঙ্গে আইভান ডেভিডের পত্রবিনিময় ইদানীং বন্ধই আছে। নেশার মাত্রাটা আগের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে ডেভিড। মলিনা সঠিকভাবে তা না জানলেও সে আশংকাটা তার বার বার মনে এসেছে। কিন্তু তবু নতুন করে ডেভিডের কাছে চিঠি লেখার লোভকে কঠোরভাবে দমন করে রেখেছে মলিনা।

এমনিভাবেই কয়েকটি বছর পা ফেলে ফেলে পালিয়ে গেলো যবনিকার অন্তরালে। বসন্তের পর বসন্ত পেরিয়ে এসে মলিনা আবার এসে দাঁড়ালো এক উদাসী চৈত্র-সন্ধ্যার মুখোমুখি হয়ে।

বাড়ির পেছনে নতুন বেড়ে-ওঠা আমগাছটায় এবার প্রথম মুকুল ধরেছে। পাশের ফ্ল্যাট বাড়িটায় কতো ভাড়াটে এরই মধ্যে এলো আর গেলো। বিস্মৃতির আড়ালে তারা সবাই প্রায় হারিয়ে গেছে এক এক করে। হারায়নি শুধু একটি মুখ, মলিনার দৃষ্টিতে সে মুখ এখনো উজ্জ্বল। পুরো সাত বছর পরেও ডেভিডের সেই লাজুক দৃষ্টি, তার সেই মিষ্টি হাসিটি সে স্পষ্ট মনে করতে পারে। এমন কি তার বা কপালের ছোটবেলার সেই ক্ষতচিহ্নটি পর্যন্ত মলিনার দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করে ওঠে এক এক সময়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার মনকে ঘিরে ধরে আরেকটি ভয়ংকর প্রশ্ন—ডেভিডের হৃদয়ের ক্ষতটা কি শুকিয়ে গেছে এতো দিনে না এখনো সেই দগদগে ঘা-টা তার জীবনে ক্রমাগত বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে।

মলিনাদের বাড়ির আর সবাইর মন থেকে আইভান ডেভিডের স্মৃতি কিন্তু মুছেই গেছে একরকম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পরেও বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। মলিনা এখন একজন সরকারী কর্মচারী। পূর্ব রেলওয়ের প্রচার বিভাগে একটা ভালো কাজই সে জুটিয়ে নিয়েছে এবং কাজটা তার পছন্দ মতোই হয়েছে। তা হলেও দিনগুলো তার অসার, ছন্দোহীন বলেই মনে হয় সময় সময়।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো মলিনার নামে। পালাম এয়ারপোর্ট থেকে দীর্ঘ চিঠি। দীর্ঘকাল পরে ডেভিড লিখছে :

ডার্লিং, তোমায় কোনো দোষ দেবো না। কিন্তু কলকাতার জীবন সত্যি সত্যি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষটায় এই কিছু দিন হলো একেবারে রাজধানী দিল্লীতে বদলী হয়ে এসেছি। এই কটা বছর কোথায় কি ভাবে কাটিয়েছি জানতে চেয়ো না। তবে এতোগুলো বছর পার হয়ে এলাম কি ভাবে আমার কাছে সেটাই আশ্চর্য। নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে এমন কোনো লোককে কাছে পাইনি যাকে সব কথা খুলে বলে মনটাকে হালকা করে নিতে পারি। দিল্লী আসার পর নতুন এক এয়ার হস্টেসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। নাম তার জেন। প্রথম থেকেই জেনের চোখেমুখে একটা আর্তির ভাব লক্ষ্য করছিলাম। কি জানি কেন তার কাছে কথায় কথায় একদিন আমার জীবনের সব কথাই খুলে বলে ফেল্লাম। অসীম সহানুভূতি দিয়ে সে আমার বেদনাকে লাঘব করার প্রয়াস পেলে। শুধু তাই নয়, হঠাৎ একদিন সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলো। জেন বল্লে—ডেভিড, আমি কি তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী হতে পারি? তার পর থেকে সেও একটু একটু করে তার জীবনের বেদনার কথা আমায় জানিয়ে যেতে লাগলো। স্বামীর সত্যিকারের ভালোবাসা পায়নি সে কোনো দিন। এমন কি জেনের মর্যাদাকেও তার স্বামী ক্ষুণ্ণ করেছে। কলুষিত করেছে। গোপনে আর একটি মেয়েকেও সে বিয়ে করেছে। প্রথম যেদিন একথা সে জানতে পেলো গোটা জগৎটাকেই তার একটা জমাট অন্ধকারের গোলক বলে যেন মনে হলো। সেই অবস্থাতেই ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধরে পথে নেমে এলো সে। জেন শরণ নিলো আদালতের। সহজেই ডিভোর্স হয়ে গেলো। ওর সব কাহিনী শুনে মনে হলো, এই মেয়েটি যেন আমারই জীবনের আর একটি প্রতিরূপ। নিঃসঙ্গতার

(শেষাংশ ১২৮ পৃঃ)

পৃথিবীর বাইরে কি জীব আছে?

সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণের উদ্ভব আর বুদ্ধিমান জীবের বিবর্তন ঘটেছে কিনা এই প্রশ্নটি বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলের মনেই কৌতূহলের সঞ্চার করে। পুরাণে পৃথিবীর বাইরে দূর আকাশে অবস্থিত একাধিক 'লোকে'র কথা শোনা যায়। পুরাণের কথা নিয়ে বিজ্ঞানী অবশ্য মাথা ঘামান নি কোন দেশেই। এখন কিন্তু বিজ্ঞানীরা উত্তরপার্থিব জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রাণের উন্মেষ একেবারেই আকস্মিক ঘটনা, পৃথিবীর বাইরে তা ঘটে নি, যদিও সৌরজগতের দু-একটা গ্রহে যথা মঙ্গল এবং শুক্রে প্রাণের উদ্ভব হলেও হয়ে থাকতে পারে। যদি এ দুটো গ্রহে সত্যিই তা ঘটে থাকে, তাহলে সেখানকার জীব বিবর্তনের একেবারে নিচের ধাপে রয়ে গেছে। সৌরজগতের বাইরে কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া যাবে না কারণ সূর্য ছাড়া অন্য নক্ষত্রের গ্রহ নেই আর গ্রহ না থাকলে প্রাণের উন্মেষের ও বিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ মিলবে না এই ছিল তাঁদের মত। তার কারণও ছিল। তখন মনে করা হত সূর্যের গ্রহপরিবারের জন্মটাও একেবারে হঠাৎ ঘটে গেছে, অন্য তারার বেলায় তেমনটি হবার সম্ভাবনা যৎসামান্য—নেই বললেই হয়। সূর্যের সঙ্গে অন্য এক বৃহত্তর নক্ষত্রের প্রায় সংঘর্ষের ফলে সূর্যের দেহের কিছু অংশ ছিটকে পড়ে আর তাই থেকে গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। দুই নক্ষত্রে এমন নিবিড় কোলাকুলি মহাকাশে নিতান্তই দৈবাৎ ঘটে।

তারা আর গ্রহের জন্ম ও বিবর্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকের মনে হতে পারে তারা ও গ্রহের বিবর্তনের সঙ্গে জীব বিবর্তনের সম্পর্ক কি? সূর্যের কিরণ যদি চার-পাঁচশ' কোটি বছর ধরে পৃথিবীর উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে না পড়ত তা হ'লে জীবের বিবর্তন দূরে থাক প্রাণের উদ্ভবই সম্ভব হত না। সত্যি কথা বলতে প্রাণের বিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের একটি মাত্র উদাহরণই বিজ্ঞানীদের জানা—যে ব্যাপারটি পৃথিবীতে ঘটেছে। অনুরূপ অবস্থায় অন্যত্র তা ঘটবে আশা করা অসঙ্গত নয়, কারণ বিজ্ঞানের বিধি সর্বত্রই এক। অবশ্য পৃথিবীতে কি ভাবে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক বলা যায় না; ভরসা অনুমান এবং সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবীর আদিম যুগে, প্রাণের কোন লক্ষণ যখন ছিল না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিল না, ছিল মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস। জলের উপস্থিতি এবং বিদ্যুৎ স্ফুরণের ক্রিয়া এই থেকে প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর সৃষ্টি হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো থেকে হয়েছে প্রোটিন এবং প্রোটিন হল প্রাণের আধার। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ফক্সের পরীক্ষার উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি একটি পাত্রে উল্লিখিত গ্যাসগুলো এবং কিছু জল নিয়ে পাত্রের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটিয়ে অ্যামিনো এ্যাসিড পেয়েছেন। আঠারটি অ্যামিনো অ্যাসিডে তাপ প্রয়োগে প্রোটিনের মতো একটি বস্তু পেয়েছেন। জীবাণুরা এই বস্তু খেতে কোন আপত্তি করে না; এনজাইম এদের 'হজম' করতে পারে। গরম জলে এই প্রোটিনাভাস দ্রবীভূত করে ঠাণ্ডা করলে কোটি কোটি অতি সূক্ষ্ম গোলকের মতো বস্তু পাওয়া গেছে। এদের আকার বীজাণুর মতো এবং আচরণ অনেকাংশে জীবকোষের মতো। আশা করি এ থেকে কেউ মনে করবেন না পরীক্ষাগারে প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তা এখনও হয় নি। এগুলো বিভাজিত হয়ে নতুন গোলকের সৃষ্টি যতক্ষণ করতে না পারছে ততক্ষণ তা প্রাণধর্মী হচ্ছে না। এই ধরণের কোন গোলকে আদিম কালে প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল মনে করলে অসঙ্গত হবে না। আর প্রাণের একবার সঞ্চার হলে তার বিবর্তন ঘটবেই। এই বিবর্তনের ফলেই মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীবের উদ্ভব হয়েছে।

এখন তারা ও গ্রহের জন্ম ও বিবর্তনের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন মহাকাশে ব্যাপ্ত গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল মেঘ ঘনীভূত হয়ে তারার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক তারা একক নয়, দুই বা ততোধিক তারা তাদের ভারকেন্দ্রের চারি দিকে পরিভ্রমণ করে। আবার তারার

পাশের ছবিতে সূর্যের চেয়ে সামান্য কিছু ভারি তারার জন্ম, বিবর্তন ও মৃত্যু দেখান হয়েছে।

প্রথম : মহাকাশে ব্যাপ্ত ধূলিকণা ও গ্যাসের বিশাল মেঘ।

দ্বিতীয় : মেঘ ঘনীভূত হয়ে আদিম তারা ও আদিম তারার সৃষ্টি। ঘনীভবনের জন্য সময় লাগে প্রায় এক কোটি বছর।

তৃতীয় : তারাটি এখন মুখ্যক্রমে স্থিত, স্থিতিকাল প্রায় ৮০০ কোটি বছর।

চতুর্থ : মুখ্যক্রম অতিক্রম করে তারাটি লাল দৈত্যে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চম : তারাটির আকার আরও বহু গুণ বেড়ে গেছে। তার গ্রহলোকের জীবকুল তাপে ঝলসে শেষ হয়ে গেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থায় মোট স্থিতিকাল প্রায় দশ কোটি বছর।

ষষ্ঠ : তারার ঔজ্জ্বল্যে স্পন্দনের শুরু হয়েছে।

সপ্তম : তারার আয়তন ও দীপ্তি বহু গুণ বেড়ে গিয়ে নবতারার সৃষ্টি হয়েছে।

অষ্টম : সংকুচিত হয়ে তারাটি শ্বেত বামনে পরিণত হয়েছে। এর দীপ্তি একদিন শেষ হয়ে গিয়ে তারাটির মৃত্যু ঘটবে।

সৃষ্টির সময় অনেকের গ্রহপরিবারেরও সৃষ্টি হয়। অবশ্য সূর্য ছাড়া অন্য কোন নক্ষত্রের গ্রহ শুধু চোখে বা দূরবীণ দিয়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

অধিকাংশ তারারই গ্রহ আছে। কিন্তু গ্রহ থাকলেই কি প্রাণের উন্মেষের সম্ভাবনা থাকবে? অবশ্যই নয়, গুটি কতক নির্দিষ্ট অবস্থা প্রয়োজন। প্রথম হচ্ছে তাপের একটি মাত্রা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নাক্ষত্রিক শক্তির প্রয়োজনীয় দীর্ঘ কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন বিকিরণ। এই নির্দিষ্ট অবস্থাগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে জানতে হলে তারার জন্ম ও বিবর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। তারারা একই অবস্থায় চিরকাল আকাশে বিরাজ করে না। মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাসের মেঘ যখন ঘনীভূত হতে আরম্ভ করে তখন মহাকর্ষের সূত্র অনুসারে সঙ্কোচন ঘটে, সুতরাং আভ্যন্তরিক চাপ বাড়তে থাকে। সঙ্কোচন যত বেশি ঘটবে চাপও তেমনই বাড়বে। চাপ বাড়ার ফলে আদিম তারার উষ্ণতাও বাড়বে। উষ্ণতা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছলে তারার অভ্যন্তরে তাপ-কেন্দ্রকীয় প্রতিক্রিয়া—নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন—সুরু হয়ে যাবে। সব তারার প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন গ্যাস। তাপকেন্দ্রকীয় প্রক্রিয়ায় এই হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপই তারাকে দীপ্ত রাখে। তাপের আর একটি ক্রিয়া হল প্রসারিত করা সুতরাং মহাকর্ষজনিত সঙ্কোচনের বিপরীত দিকে তা ক্রিয়া করবে এবং তারাটিতে সাম্যাবস্থা আসবে।

মহাজাগতিক মেঘ থেকে আদিম তারা অবস্থায় আসতে সূর্যের চেয়ে কিছু বড় তারার লাগে প্রায় এক কোটি বছর। নাক্ষত্র বিবর্তনে এর পরের ধাপ মুখ্যক্রম বা 'মেইন সিকোএন্স'। সূর্যের সামান্য কিছু বড় তারার মুখ্যক্রমে স্থিতিকাল প্রায় ৮০০ কোটি বছর। এই স্থিতিকাল নির্ভর করে তারার উপাদানিক হাইড্রোজেনের পরিমাণ ও তার হিলিয়ামে রূপান্তরের হারের উপর। তারার ঔজ্জ্বল্য যত বেশি, তার উষ্ণতা ও হাইড্রোজেন-রূপান্তরের হারও তত বেশি, মুখ্যক্রমে তার স্থিতিকালও সেই অনুপাতে কম হতে বাধ্য।

অধিকাংশ হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়ে যাবার পর তারাটি মুখ্যক্রম অতিক্রম করে লাল দৈত্যে পরিণত হবে। তখন তার রঙ হবে লাল এবং আয়তন বেড়ে যাবে বহু গুণ। তারার গ্রহে জীবকুল থাকলে তা ঝলসে যাবে, তারপর গোটা গ্রহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সূর্যের চেয়ে সামান্য ভর বেশি এমন তারা লাল দৈত্য পর্যায়ে কাটাবে প্রায় দশ কোটি বছর। তারপর তারার দীপ্তিতে অনেক ঘন্টা-ব্যাপী স্পন্দন ঘটতে থাকবে কয়েক হাজার বছর ধরে। এর পর হঠাৎ একদিন আভ্যন্তরিক বিস্ফোরণ ঘটবে, আকার এবং দীপ্তি সহসা বহু গুণ বেড়ে যাবে। এই অবস্থা নবতারা বা 'নোভা'। পরে দীপ্তি কমে যাবে, আকার হয়ে যাবে বহু গুণ ছোট এবং একদিন তারাটি শ্বেত বামনে পরিণত হবে। এই হল তারার শেষ অবস্থা, এই দীপ্তিও একদিন নিঃশেষিত হয়ে একদা ভাস্বর নক্ষত্র দীপ্তিহীন বস্তুপিণ্ডে পর্যবসিত হবে। শেষের অবস্থাগুলোর কালক্রম সম্বন্ধে সঠিক হিসেব পাওয়া যায় নি।

উপরের আলোচনা থেকে এটুকু আন্দাজ করে বোঝা যাচ্ছে যে জীবনের উন্মেষ ও বিকাশ খুঁজতে হবে কেবলমাত্র মুখ্যক্রমের তারার গ্রহলোকেই। মুখ্যক্রমের তারাগুলোর মধ্যে ভর, উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্যের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উষ্ণতার—সুতরাং ঔজ্জ্বল্যেরও—অবরোহী ক্রম অনুসারে ইংরাজী বর্ণমালার 'ও', 'বি', 'এ' 'এফ', 'জি' 'কে' ও 'এম' এই সাতটি বর্ণাশ্রেণীতে তারাদের ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর আবার দুটো প্রধান অংশ তরুণ ও পরিণত। তারার বয়সের সঙ্গে এই তারুণ্য ও পরিণতির কোন সম্পর্ক আছে মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে; পরিণত তারার দীপ্তি তরুণ তারার তুলনায় কম। প্রত্যেক বর্ণাশ্রেণী আবার দশটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত—প্রত্যেক শ্রেণীবাচক অক্ষরের সঙ্গে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা যোগ করে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সূর্য জি-২, অর্থাৎ নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা।

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুসারে ও বি ও এ তারার গ্রহলোকে প্রাণের উন্মেষের সম্ভাবনা নেই কারণ মুখ্য ক্রমে এদের স্থিতিকাল ৩০০ কোটি বছরের কম। অপর প্রান্তে এম শ্রেণীর স্থিতিকাল যথেষ্ট দীর্ঘ বটে কিন্তু তার বিকীর্ণ শক্তির পরিমাণও অল্প, সুতরাং উষ্ণতার অনুকূল ক্ষেত্র এত স্বল্পপরিসর যে তার গ্রহে জীবের বিকাশ সুদূরপরাহত। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা মিলবে পরিণত এফ, সমগ্র জি ও তরুণ কে তারার গ্রহলোকে।

সূর্য যে বিশাল নক্ষত্র-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং যার একটি আকর্ষণীয় অংশ আমরা শুধু চোখে আকাশে দেখতে পাই সেই ছায়াপথে মোট তারার সংখ্যা বিশ হাজার কোটির মতো। এর শতকরা দশটি তরুণ কে, জি এবং পরিণত এফ। এই হিসেব অনুসারে ছায়াপথের দু হাজার কোটি নক্ষত্রের গ্রহলোকে জীববিকাশের সম্ভাবনা থাকা উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন গণনাটা আর একটু সংশোধন করা আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে বহু তারা একক নয়, যুগ্ম বা আরও জটিল। এদের যদি গ্রহ থাকে, না থাকবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, তাহলে তাদের কক্ষ হবে অত্যন্ত গোলমেলে, একক তারার গ্রহের মতো বৃত্তাভাস হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে জীবনের অনুকূলে উষ্ণতার পাল্লা সর্বদা না পাবার সম্ভাবনাই বেশি। এদের বাদ দিলে হিসেবটা এই দাঁড়ায়: ছায়াপথের শতকরা তিন থেকে পাঁচটি তারার গ্রহলোকে মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রবল। শতকরা তিনটি হিসেবে ধরলেও কেবলমাত্র ছায়াপথেই এমন তারার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০ কোটি। মহাকাশে ছায়াপথের মতো নক্ষত্র-পরিবার কোটি কোটি আছে। সুতরাং জীবনের অনন্তরূপ যে ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে সে কথা বললে অসঙ্গত হবে না।

অবশ্য এ পর্যন্ত যা বলা হল তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না যে পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশের অন্যত্র প্রাণের বিকাশ ও জীবের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। তার জন্য প্রয়োজন এমন কোন জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা যোগাযোগ স্থাপন। মহাকাশ বিচরণের সবে মাত্র ভূমিকার সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ এখনও পর্যন্ত মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল দূরের চাঁদে পদার্পণ করতে পারে নি। প্রথম চাঁদ, তারপর কাছাকাছি গ্রহ, তারপর দূরের গ্রহ; সৌরজগৎ পরিক্রমা শেষ হলে শুরু হবে আরও বহু দূরের নক্ষত্রলোকের সন্ধানে অভিযান। সেদিন আসতে এখনও অনেক দূর।

সুতরাং এই অবকাশে সুদূর সুযোগ্য গ্রহলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে [illegible] করলে ক্ষতি কি? মরিসন আর ককনি নামে দুজন বিজ্ঞানী গত বৎসর এই মত প্রকাশ করেন যে, ছায়াপথের আমাদের অজ্ঞাত কোন জগৎ থেকে সেখানকার বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছে কিছুদিন থেকে খবর পাঠাতে চেষ্টা করছেন। ককনি আর মরিসন কোন্ কোন্ তারার কাছ থেকে সংবাদ আসছে তার একটি সম্ভাব্য তালিকাও দিয়েছিলেন। এর মধ্যে এপসিলন এরিডানি, ট সেটি আর এপসিলন ইনডি এই তিনটি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে ট সেটির দূরত্ব ১০·৮ আলোক-বছর। এর চেয়ে খুব বেশি দূরে বেতার সংকেত পাঠান বর্তমানে কঠিন। ড্রেক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এপসিলন এরিডানি ও ট সেটির সঙ্গে বেতার সংকেত মারফৎ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। কোন সংকেত এখানে যেতে লাগবে ১০·৮ বছর এবং সেখানকার কোন সংকেত আসতে লাগবে সেই একই সময়। সুতরাং আজকের প্রচেষ্টার ফল কিছু হল কিনা জানতে বছর পঁচিশেক অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য ফল কিছু হবে কিনা তা একমাত্র দেবতারাই বোধ হয় বলতে পারেন।

সেখানে আর এখানে

অতসী চৌধুরী

সেথা স্নিগ্ধ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা—
নেমে আসে কদম আর শিরীষের শাখে;
হেথা সিক্ত মেঘপুঞ্জ যেন দিশেহারা,
জানালার ফ্রেমে আঁটা আকাশের ফাঁকে।
সেথা জানি ঝাউবন মর্মরতা মাঝে—
ফাগুনের আনাগোনা উচ্ছ্বাসে ভরা;
হেথা কেন দিনশেষে ক্ষণিকের সাঁঝে—
পর্দা ওড়ানো হাওয়া উদাসীন করা।
সেথা শুভ্র শরতের সুমধুর হাসি—
ফুটে ওঠে কাশফুল শিউলির বনে;
হেথা পণ্য সম্ভারেতে শরতের বাঁশি—
বেজে ওঠে ক্ষীণ সুরে মানুষের মনে।
সেথা শৈত্য সমারোহ হিমেল হাওয়ায়
শুরু হয় পত্রঝরা শুকনো ঘাস' পরে,
হেথা শৈত্য টের পাই জমাট—ধোঁয়ায়—
অথবা ঠান্ডা লাগা 'ফ্লু'—নামক জ্বরে।

অসামান্যা

সুশীল রায়

কে না দেখেছে এই ভদ্রমহিলাকে? যে কোনো গানের জলসা, যে কোনো ছবির এগজিবিশন, যে কোনো শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের মঞ্চাভিনয়—সর্বত্র আছেন ইনি। ইনি অর্থাৎ এই ভদ্রমহিলা।

মহিলাদের নাম জিজ্ঞাসা বুঝি করতে নেই বয়স তো জিজ্ঞাসা করতেই হয় না।

বয়স বলতে পারব না—বাইশ থেকে বেয়াল্লিশের মধ্যে যে কোনো একটা বয়স তাঁর হতে পারে।

কিন্তু নামটা বলতে পারব। মাত্র দিন কয়েক আগে জেনেছি নামটা।—অপর্ণা।

অপর্ণা দেবীর সর্বাঙ্গই সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে তাঁর হাসিটা।

চমৎকার হাসতে পারেন। অট্টহাস্য নয়, স্মিত পরিমিত ও সুন্দর সে হাসি।

তাঁকে নিয়ে আড়ালে আমরা হাসাহাসি করেছি অনেক।

হাসাহাসির কারণ এই যে, তিনি যখন যার সঙ্গে কথা বলেন, মনে হয় তারই বুঝি সব চেয়ে তিনি অন্তরঙ্গ। কিন্তু কার যে তিনি সত্যিকারের অন্তরঙ্গ তা কিছুতে ধরা যাচ্ছে না। এতে একটা কাজ হয়েছে—তিনি প্রত্যেকের প্রিয়জন হয়েছেন। এতে আরও একটা কাজ হয়েছে—কার যে তিনি আপনজন তা নিয়ে ক্রমাগত চলেছে জল্পনা-কল্পনা।

অপর্ণা দেবীকে না চেনে সহরে এমন বিদগ্ধজনের সংখ্যা সামান্য। যাঁরা কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন, নাট্যাভিনয় করেন—অপর্ণা দেবী তাঁদের খুবই পরিচিত।

কবিতার তিনি সমজদার, চিত্র প্রদর্শনীর তিনি উদ্বোধন করেন, নাট্যাভিনয়ে তিনি পাত্র-পাত্রীদের কাছে পরিচয় করে দেন।

অদ্ভুত গুণে গুণান্বিতা এই ভদ্রমহিলা।

আমি এ সহরে নতুন এসেছি। বহুদিন প্রবাসেই আমার জীবন কেটেছে। আমি এ সব কালচারের লাইনের লোকও না। আমি একজন কণ্ট্রাক্টার। বোম্বাইতে কাটিয়েছি দীর্ঘদিন, সম্প্রতি এসেছি কলকাতা। এখন এখানেই ব্যবসা করব মনস্থ করেছি।

কিন্তু আমার মাথায় একটু পোকা আছে, সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের যেমন থাকে। ঐ সব কালচারের আসরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, সুযোগ পেলে আসরে ঢুকি।

প্রথম থেকেই আমার বড় আশ্চর্য ঠেকেছে। কাগজে বিজ্ঞাপ্তি দেখে হয়তো গিয়েছি কোনো কবি সম্মেলনে, দেখেছি ঐ ভদ্রমহিলাকে; বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনে হয়তো গিয়েছি কোনো আর্ট এগজিবিশনে, দেখেছি ঐ ভদ্রমহিলাকে; শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় কোনো নাটক করছেন দেখে টিকিট কিনে ঢুকেছি কোনো নাট্য-গৃহে, মঞ্চের উপর মাইকের সামনে দেখেছি তাঁকে।

সর্বত্র তাঁকে দেখে বিরক্ত অবশ্য হইনি। কেন না, তাঁর চেহারা বিরক্ত হবার মত নয়। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি। যাঁর নাম জানিনে, ধাম জানিনে, পরিচয় জানিনে, জানতে ইচ্ছে হয়েছে, কে সেই বিখ্যাত মহিলা!

অনেক দিন একা-একা এই জিজ্ঞাসাটা নিয়ে কাটিয়েছি। ভেবেছি, নিশ্চয় কোনো স্বনামধন্যা এমন খুব বিদুষী হবেন এই মহিলা। তা না হলে সর্বত্র তাঁর এত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি কেন! আমিই বাংলার বাইরে আছি দীর্ঘদিন, তাই কাউকেই যেমন চিনিনে, এঁকেও তেমনি চিনিনে নিশ্চয়।

কিন্তু সেদিন আমার ভুল ভেঙে দিল বিশ্বনাথ। ছেলেটি বয়সে আমার চেয়ে অনেক কম, কিন্তু বুদ্ধিতে অনেক বড়। এবং অনেক খোঁজ-খবরও সে রাখে।

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে পাশ থেকে বিশ্বনাথ আমার গায়ে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'হচ্ছে কি। ছবি তো দেওয়ালে। সারা মেঝেময় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন চোখ!'

চমকে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে চেয়ে সার সার সাজানো ছবির উপর চোখ বুলোতে লাগলাম।

বিশ্বনাথের কানে কানেই যেন বললাম, 'এ সব হচ্ছে চিত্র, আর, উনি হলেন একটা চলচ্চিত্র। যাই বল, এ সব ছবির থেকে ওঁকে দেখতেই কিন্তু অনেক ভালো।

সারা ঘরে চলে-চলে বেড়াচ্ছেন ভদ্রমহিলা। সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। নতুন কেউ ঘরে এসে ঢোকা মাত্র ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলছেন, কি বলছেন তা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।

বিশ্বনাথকে বললাম, "যেমন গুণী, তেমনি রূপবতী"।

বিশ্বনাথ বলল, "হুঁ।"

বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম নাম কি। সে বলল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বনাথ ঠোঁট ওল্টালো।

আশ্চর্য হলাম। নামটা বলল, কিন্তু পরিচয়টা বলল না কেন!

এগজিবিশন-হল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে খোলা মাঠে এসে বসলাম দুজন। আমি ও আমার তরুণ বন্ধু বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললাম, 'উঃ, রিলিফ! ভেতরটা কি অসহ্য গরম, এখানে একটু খোলা হাওয়া পেয়ে যেন বাঁচা গেল।"

বিশ্বনাথ বলল, "সে কি দীপুদা? বিয়ের যে অত ধূপ ছিল আর, আপনার ভাবার মত গুণ ছিল, তাতে আরাম পেলেন না?"

বললাম, "তোমরা আজকালকের ছেলে। তোমাদের সঙ্গে কথায় পারব না। কিন্তু কে ঐ ভদ্রমহিলা?"

"উনি?" বিশ্বনাথ বলল, "উনি হচ্ছেন একজন নকলনবিশ। এইভাবে চলাফেরা করলে বিখ্যাত হওয়া যায়, তিনি দেখেছেন—"

বাধা দিয়ে বললাম, "কোথায়?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিশ্বনাথ বলল, "অতএব ঐভাবে চলতে-বলতে আরম্ভ করেছেন উনিও।"

বিশ্বনাথের কথা শুনতে লাগলাম।

এই ভদ্রমহিলা—অর্থাৎ অপর্ণা দেবী—নাকি অতি সাধারণ একটি মেয়ে। এঁকে বছর কয়েক আগেও দেখা গিয়েছে ট্রামে-বাসে চলাচল করতে। লেখাপড়াও বেশি জানে না। অর্থাৎ অতি সাধারণ পর্যায়েরই একটি মেয়ে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব ঘটল ভিন্ন ভূমিকায়। মাণিকতলা বয়েজ ইউনিয়ন একটি নাটক অভিনয় করছে, তার প্রযোজিকা হিসেবে বড় অক্ষরে নাম ছাপা হল অপর্ণা দেবী। ছোটদের একটা ছেলে খেলা ঐ নাট্যাভিনয়, কিন্তু তা হলে কি হবে, সারা সহরে পোস্টার পড়ে গেল।

সেইদিন থেকে সকলে ভাবতে লাগল, কে এই অপর্ণা দেবী। কে এই বিখ্যাত মহিলা।

রহস্য? এর পিছনের রহস্য? রহস্যটা কিছু না। অপর্ণা দেবীর স্বামী বিপিনবিহারী ভদ্র, হঠাৎ তাঁর বরাত গেল খুলে। মার্চেন্ট অফিসে তিনি কাজ করতেন, হঠাৎ একটা বিলেতী মার্কেন্টাইল ফার্মে তিনি পেয়ে গেলেন মস্ত চাকরী।

বিপিনবিহারী ভদ্র এই চাকরীর দৌলতে যে পরিমাণে বড় হয়ে উঠলেন, তার চতুর্গুণ বড় হয়ে উঠতে লাগলেন এই ভদ্রমহিলা।

বিশ্বনাথ হাসল, বলল, "ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছে দীপুদা যে, এখন বিপিনবিহারীর পরিচয়টাই দাঁড়িয়ে গিয়েছে অন্য রকম, তাঁকে চেনাতে হলে বলতে হয়—অপর্ণা দেবীর স্বামী। অর্থাৎ ভদ্রমহিলার পরিচয়েই এখন ভদ্রের পরিচয়।"

অপর্ণা দেবীর বৃত্তান্ত শুনে তাঁর উপর শ্রদ্ধা আমার বাড়ল। মহিলাটির মধ্যে উদ্যোগ আছে, উৎসাহ আছে, সাহস আছে—তা না হলে হঠাৎ সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে সোজাসুজি পাদ-প্রদীপের নীচে এসে দাঁড়ানো কি সহজ কথা? ক'টি মেয়ে পারে এ কাজ করতে?

বিশ্বনাথও আমার কথায় সায় দিল, বলল, "ঠিক। উনি যা পেয়েছেন, খুব বেশী মেয়ে তা পায় না। এর জন্যে মূলধন চাই, সকলের তা নেই।"

"মূলধন মানে? তুমি বলছ স্বামীর টাকা?"

"না। টাকাওয়ালা স্বামী আছে, এ রকম মেয়ের সংখ্যা কলকাতা সহরে কম না।"

"তবে?"

"তবে চাই একটা জিনিষ। বেহায়া হতে হবে। চোখের পর্দা ফেলতে হবে ছিঁড়ে।"

বিশ্বনাথের কথা মানতে পারলাম না। কোনো কারণে নিশ্চয় বিশ্বনাথ পছন্দ করে না ঐ মহিলাকে, সেইজন্যে তাঁর উদ্যোগকে তারিফ করতে সে ইচ্ছুক নয়।

বললাম, "খুব শাইন করবে, দেখো। ওঁর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ওঁর রূপের জন্যে বলছিনে।"

"তবে কিসের জন্যে?"

"ওঁর হাসি। হাসি দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়। উনি তা করবেন। আর, এ কাজে তাঁর স্বামীর কো-অপারেশন নিশ্চয় পেয়ে যাবেন। স্বামী নিশ্চয় ভালোবাসেন ওঁকে। উনিও নিশ্চয়—"

বিশ্বনাথ বলল, "থাক ও সব ঘরোয়া কথা। কে কাকে কত ভালোবাসে তার বিচার আমরা না করলাম।"

সুতরাং সে বিচার করার চেষ্টা আমরা পরিত্যাগ করে কেবল অপর্ণা দেবীর উপর নজর রেখে দিন কাটিয়ে চলেছি।

সর্বত্র তাঁকে আমরা দেখছি। হাসিতে আর খুশিতে তিনি উজ্জ্বল, রূপে ও গুণে মিলে একাধারে তিনি হয়ে উঠছেন লক্ষ্মী-সরস্বতী।

আশ্চর্যই লাগে। বিশ্বনাথ যার কথা বলেছে একটা নগণ্য ও সাধারণ ঘর, সেই ঘরের মেয়ে এমন অনন্যা ও অসামান্য হয়ে উঠছে কি করে।

সেদিন বেলঘরিয়ায় লোকশিল্পের একটা প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। এখানে পৌঁছেই চমক লাগল। এখানেও দেখি, প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করছেন অপর্ণা দেবী। কেবল সহরেই নয়, সহরের উপকণ্ঠেও তাঁর খ্যাতি এখন ছড়িয়েছে।

বিশ্বনাথ সঙ্গে ছিল। তাকে বললাম, "রুখতে পারলে না হে। এ এক অসাধারণ মেয়ে। শিগ্‌গিরই দেখবে—এই মেয়ে আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে যাবে।"

বিশ্বনাথ বলল, "অসম্ভব না, দীপুদা। যা দেখছি। সব পারবে ঐ মেয়ে। ওর অসাধ্য কিছু নেই।"

আমরা যেন অপর্ণাময় হয়ে গেলাম। আমাদের প্রায় সব কথার মধ্যে একবার-না-একবার অপর্ণা প্রসঙ্গ এসে যায়ই। নিজেদের উপরই এক এক সময় করুণা হয়, ভাবি ঐ মহিলাকে নিয়ে আমরা এত ভাবিত হয়েছি কেন।

এইভাবেই সময় কাটছে। কিন্তু কিছুদিন হল আমরা আবার নতুন করে আশ্চর্য হতে আরম্ভ করেছি। কিছুদিন থেকে অপর্ণা দেবীকে কোনো অনুষ্ঠানে আর দেখতে পাচ্ছি নে। অসুখ-বিসুখ কিছু করে থাকবে বলেই আমরা ধরে নিলাম।

কিন্তু বিশ্বনাথ খবর জোগাড় করে নিয়ে এল। বলল, "ট্র্যাজিডি। ভদ্রমহিলার স্বামী গত হয়েছেন।"

যেন এক পরমাত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলাম, এইভাবে চমকে উঠে বললাম, "ইশ। একটি মেয়ের কেরিয়ার এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল?"

"গেল। কিন্তু হয়তো গেল না। অনেক টাকা রেখে গেছেন ব্যাঙ্কে। তার উপর লাখ টাকার লাইফ ইনসিওর ছিল—সে টাকাও তো উনি পাচ্ছেন। শোকটা সামলে নিয়ে নতুন উদ্যমে নিশ্চয় নামবেন আবার আসরে।"

সেই আশাতেই বসে আছি আমরা। কিন্তু আসরে তাঁকে নামতে আর দেখছিনে। এতে ভালো লাগছে না। আমার মনে যেন অশান্তি ঢুকেছে। আমার মনের অবস্থাটা ঢাকতে পারিনি বুঝি, বিশ্বনাথ এই জন্যে আমাকে অনেক ব্যঙ্গ করেছে, বলেছে, "বুড়ো বয়সে এ হল কি দীপুদা! একে লোকে যে ভিমরতি বলবে!"

কথাটা শুনে মন্দ লাগল না। অমন এক মহিলার সঙ্গে আমার মত মানুষের নাম যোগ করে যদি একটু-আধটু তামাশা হয়ই, তাতে আমার ক্ষতির বদলে লাভ। আমিও ঐ মৌজে মশগুল হয়ে রইলাম। ইচ্ছে, অপর্ণা দেবীর সঙ্গে আমার এই কল্পিত প্রণয়ের কথাটা চারদিক রাষ্ট্র হয়ে যাক।

হন্তদন্ত বিশ্বনাথ এসে হাজির হল, বলল, "দীপুদা, খবর শুনেছেন?"

"কি?"

"আপনার বান্ধবী রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে চললেন?"

"কি ব্যাপার?"

ব্যাপার গুরুতর। অপর্ণা দেবী এক বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছেন। সঙ্গে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়েছেন, স্বামীর জীবন-বীমার মোটা টাকাও।

কথা বলতে পারলাম না। কি যেন বলতে গিয়ে তোত্‌লামি করে ফেললাম।

বিশ্বনাথ অট্টহাস্য করে উঠল। সে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না।

বিশ্বনাথ বলল, "প্যারিসে গিয়ে বিয়ে হবে—এই হচ্ছে শেষ খবর।"

সত্যিই শেষ খবর ঐটে। অপর্ণা দেবীর আর কোনো খবর জানিনে।

✱ অগ্নিসমা ✱

দুর্গাদাস সরকার

আমার চুলে দিয়ো না তুমি হাত,
মহাকালের আমরা দ্রৌপদী।
অগ্নিসমা আমি অকস্মাৎ
অনির্বাণ ব্যথায় নিরবধি।
মত্ত তুমি ফাগুনের ঝড়ে,
তোমার আছে প্রজাপতির পাখা।
একলা আমি রুদ্ধ থাকি ঘরে
অশান্তির দুঃস্বপ্নে ঢাকা।
ক্ষণকালের খেলার ছলনায়
খেলনা যেন আমরা পুরুষের;
হঠাৎ তারা আসে, হঠাৎ যায়
নারীর বুকে বেদনা দিয়ে ঢের।
আমার চুল ধরা কি যায় হাতে?
আমার চুল বিশাল আকাশের;
দুয়ার ভাঙ্গা বাহুর বজ্রাঘাতে
ঊর্মি তার মহাসমুদ্রের।
চিরকালের ছন্দে আমি জাগি,
মন্ত্র তার আছে বা কার মুখে?
যিনি আমার গোপন অনুরাগী
আমার চুল লুটায় তারি বুকে।

সাগর নয়,—হাওর।

এপার থেকে ওপার,—রি-রি করে কালো রেখা। ঢেউয়ের পর ঢেউ,—আকাশ ছুঁতে চলেছে যেন অসংখ্য দামাল হাতী। বর্ষায় ঝড়-বাদলে এমনি মাতাল হয়ে ওঠে হাওরটা।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

আনাইর হাওর। কোথাকার কে 'আনাই'। লোকের মুখে মুখে কত কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি 'আনাই' বলে কেউ ছিল কি না, কেউ জানে না। কিন্তু এই হাওরটা যে সত্যি আর তার রাক্ষুসী ক্ষুধা যে কত লোকের সর্বনাশ করেছে বা করছে, প্রত্যেক বর্ষায়ই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আনাই' নাই, কিন্তু হাওরের ঠিক মাঝখানটায় ভেসে থাকে মস্ত বড় একটা ঢিবির উপর একটা প্রকাণ্ড বটগাছ,—ত্রিকালের সাক্ষী। গাছের উপর ওড়ে কাপড়ের নিশান; একটি নয় অনেকগুলি। বর্ষাকালে নাকি নিশানা দিয়ে যায় মাঝি মাল্লারা। হাওর পাড়ি দিতে দিতে আনাইয়ের দোহাই পাড়ে তারা; কেউ কেউ চেরাগও জেলে দিয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন পর্যন্ত ভীষণ ভয়াল হয়ে ওঠে হাওরটা। তবু আশে-পাশে দূরের গাঁগুলির গা-ঘেঁষে জলের উপর ভাসে লতানো ধানের গাছগুলি। আশ্বিনের শেষাশেষি জল নামতে থাকে। কার্তিক-অগ্রহায়ণে দেখা যায় তার আর এক রূপ। ধানের শীষে ভরে ওঠে আনাইর হাওর।

শুধু ঠিক মাঝখানটায় সেই বটগাছের পাশে দেখা যায় ছোট একটি বিলে ফুটে রয়েছে সাদা আর লাল অজস্র পদ্মফুল। এই বিলটিকে ঘিরে চার-পাঁচ ক্রোশ-জোড়া আনাইর হাওর। বর্ষায় তার ভীষণ ভয়াল মূর্তি।

রূপসীবাড়ির ঘাটে থাকে পারাপারের নৌকা। রূপসীবাড়ি রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিক জোড়া এই হাওর। তারই দক্ষিণে সব বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রূপসীবাড়ির ঘাটে কত মাঝি নৌকা নিয়ে বাসা বাঁধে। এমনি একখানি পারানি নৌকা নিয়ে রতন মাঝির কারবার। বর্ষা এলেই ছোট্ট একখানা ছই নৌকা নিয়ে রতন মাঝি রূপসী-বাড়ির ঘাটে হাজির হয়।

রতন মাঝির পরিচয় কেউ জানে না। নৌকায় যেন তার ঘরবাড়ি। কত যে বয়স, তার হদিশ মেলে না। কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। কেউ কেউ ডাকে পাগলা রতন। মাঝে মাঝে নাকি পাগলামি তাকে পেয়ে বসে। বর্ষাটা এমনি করেই কেটে যায়। আশ্বিনের পর আর তাকে দেখা যায় না। রূপসীবাড়ির খাল দিয়ে উত্তরমুখে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায় তার নৌকা।

কত কথাই কত জনে বলে। রতন মাঝি কারো কথায় কান দেয় না। শুধু পারাপারের যাত্রী নিয়েই তার কারবার। বেশী যাত্রী দেখলেই তার মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে যায়। শুধু স্বামী আর স্ত্রী যেদিন তার নৌকায় সওয়ার হয়, সেদিন কি যেন এক খুশিতে রতন মাঝির মন ভরে ওঠে। অপরাপর মাঝিরা কানাকানি করে; কিন্তু সাহস করে কিছুই বলতে পারে না।

সেদিন ঠিক তার মনের মত যাত্রী পেয়েছে রতন মাঝি। মিয়া-সাহেব আর তার বিবি। যাবে তারা ক্ষুদ্রাকান্দি; দক্ষিণের ঐ কালিগঞ্জ বাজারের পূর্বদিকে ক্ষুদ্রাকান্দি। হাওর পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু আকাশের কোলে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। কোন মাঝিই সাহস করে নি।

সাহস করেছে রতন মাঝি—ডর নাই মিয়া-সাহেব। সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে যাব।

উত্তর দেয় মিয়াসাহেব,—হ্যাঁ জরুর। বকশিস মিলবে মাঝি। আমার লেড়কীর বড় বেরাম। তাকে দেখতে যাচ্ছি।

বোরখার ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিয়াসাহেবের বিবি। তারা ছইয়ের ভেতরে গিয়ে বসল।

আমার নাম মোহন মিয়া। যেই কথা সেই কাম মাঝি। জোরসে নৌকা চালাও।

মোহন মিয়া? —হঠাৎ চমকে ওঠে রতন মাঝি। কিছুই যেন মনে পড়ে না। কত মোহন মিয়া ত রয়েছে! আর কত রতনই না আছে। নিজের অতীত নিজেই ভুলে গেছে রতন। তবু মাঝে মাঝে বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

আনাইর হাওর পাড়ি দিতে হবে। পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে রতনের মুখে। মিয়াসাহেব আর তার বিবি অথৈ জলে নিজেদের লেড়কীকে খুঁজে বেড়াবে!

হঠাৎ এ কি হল? আনোয়ার ফকিরের কথা মনে পড়ে গেল। তার পৈশাচিক উল্লাস কোথায় মিশে গেল রতন তা বুঝতেও পারলে না। এমন ত হয় না। বার বার মনে পড়ছে আনোয়ার ফকিরের কাহিনী।

হাওর পাড়ি দিতে দিতে আনোয়ার ফকিরের ইতিকথার জাল বুনে চলে রতন মাঝি। হ্যাঁ, কত মাঝি মাল্লাকে সে এ ইতিকথা শুনিয়েছে!

আপন মনে হেসে ওঠে রতন। ডাকাত আনোয়ার শেষকালে হয়ে পড়ল কিনা 'আনাই ফকির'। তার ফকির হওয়ার কাহিনীটাও যে বিচিত্র। দুর্দান্ত মানুষ ছিল আনোয়ার। এমনি করেই বর্ষায় যাত্রীদের এপার ওপার করত আনোয়ার মাঝি। তারও ছিল এমনি একখানি ছইওয়ালা নৌকা।

ডাকাত ছিল আনোয়ার। তার নৌকায় যারা যাত্রী হত, কদাচিৎ তারা রেহাই পেত। সুযোগ বুঝে আনোয়ার হাওরের মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে দিত। তারপর সব লুটে পুটে নিত আনোয়ার। সত্যি মিথ্যা কে জানে?

কিন্তু এটা সত্যি যে একদিন আনোয়ারেরই ভরাডুবি হল এই হাওরের মাঝখানে। নৌকায় ছিল তার বিবি আর তার ছেলে নাসিম। শ্রাবণ মাস; টলমল করছে সর্বনাশা হাওর। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে বিবি আর ছেলেকে। দক্ষিণের ঐ ক্ষুদ্রাকান্দি গাঁয়ে আনোয়ারের শ্বশুরবাড়ি।

হঠাৎ ঝড় উঠল। মাঝ দরিয়ায় ঢেউয়ের উপর ঢেউ। নৌকার উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন হাজার হাজার অজগর। তারা

গিলতে চায়,—সওয়ারী শুদ্ধ নৌকা, তারা গিলতে চায়।

পাষাণের মত বুক আনোয়ার মাঝির। কোনদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে কাউকে ডাকেনি। তার দেহ ও মনে ভয় ডর বলে কোন কিছুই ছিল না। নাসিম চেঁচিয়ে ওঠে,—বাপজান! বাপজান! আনোয়ারের বিবি চীৎকার করে,— ওগো বাঁচাও, বাঁচাও।

ডুবে যায় নৌকা। আনোয়ারের বুকে জড়িয়ে আছে সাত বছরের ছেলে নাসিম। আর তার পিঠে জড়িয়ে ধরেছে তার বিবি। সাঁতার কাটে আনোয়ার। আকাশ জুড়ে যেন হাহাকার শুনতে পায়—বাপজান্! বাপজান্!

এরকম সাঁতার সে অনেকদিন কেটেছে। কিন্তু আজ আর পারে না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। এ হাওরে কত নৌকাডুবি হয়। আর সে নিজেই কতবার নৌকা ডুবিয়েছে। কত ছেলে, কত মেয়ে, কত বাদুন-জন্দর ডুবে মরেছে তার ছলনায়।

ছলনা? কিন্তু আজ মনে হল, তারাই যেন আনোয়ারের গলা টিপে ধরেছে। তারা? সেই তাদের প্রতিশোধ নিতে এসেছে? কত ভয়াল-মূর্তি ভেসে ওঠে আনোয়ারের চোখে।

নিজের ছেলে নাসিম। না, না, এ যে ছলনা! তাকে যারা জড়িয়ে ধরেছে, এরা তার কেউ নয়। প্রতিশোধ নিতে এসেছে তারা! যত সব শয়তান,—শয়তানীর দল।

জোর করে নাসিমকে বুক থেকে ছাড়িয়ে দেয় আনোয়ার। তার বিবি চীৎকার করে ওঠে। সে নিজেই ছেড়ে দেয় আনোয়ারের গলা।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে: আকাশ জুড়ে মুষলধারায় আর্ত কান্না—বাপজান্! বাপজান্! আনোয়ারের দেহ অসাড় হয়ে আসে। কোথায় কে ভেসে গেল। আনোয়ার কিংবা আনোয়ারের নৌকার কোন হদিশই পাওয়া যায় নি।

সবাই ভুলে গেছে আনোয়ারের কথা। কিন্তু তিন-চার বছর পর দেখা গেল মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি এক ফকির আস্তানা পেতেছে ওই বট-গাছের তলায়। সারাদিন কোদাল নিয়ে মাটি কাটত ফকির। বটগাছের তলার সেই মাটি স্তূপাকার হয়ে উঠল। ফকিরের দয়া পাবার জন্য যারা আসত, তারাও কোদাল ধরত। তার-পর মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এল টলটলে জল। গ্রীষ্মকালে কাঠফাটা গরমে জলশূন্য হাওর। ক্রোশের পর ক্রোশ—একফোটা জল পাবার উপায় ছিল না। ছাতি ফেটে যেত পিপাসায়। সেই হাওরের মাঝখানে মিঠা জলের পুকুর খুঁড়ে তুললে ফকির। সবাই জানল,—এ সেই আনোয়ার। ফকির হয়ে গেছে। সেই পুকুর আর নেই। পাড় ভেঙে গেছে; হয়ে গেছে একটা বিল। কত বছর,—কত যুগ কেটে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নাই।

বর্ষায় চেরাগ জেলে পথের নিশানা দিত আনাই ফকির! পতাকা টাঙিয়ে রাখত গাছের মাথায়। আজও সেই রীতি বজায় আছে।

মনে মনে হাসে রতন মাঝি। পাগল। —আনোয়ার একটা আস্ত পাগল ছিল। আনো-য়ারের ইতিকথা মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে হঠাৎ বুকটা তার আজ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অতীত ত ভুলে গেছে রতন। কিন্তু আজ এ কি হল? না, না, নৌকাটা ডুবিয়ে দিতে হবে।

ছইয়ের ভেতরে ছটফটানি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিয়াসাহেবের বিবি। এ্যা! ওদের মেয়ের ব্যারাম হয়েছে। দেখতে যাচ্ছে হঠাৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে; তারও এমন দিন ছিল।

ডালিম! হঠাৎ চমকে ওঠে রতন মাঝি। প্রায় জোর করেই ডালিমকে তার ঘরে এনেছিল রতন। ডালিমের বাবা রতনের ভয়েই রতনের সঙ্গে ডালিমের সাদি দিয়েছিল। বয়সের ছিল অনেক তফাৎ। বড্ড ভীতু ছিল ডালিম। রাত্রে পেঁচা ডাকলে ভয়ে তার বুকে মুখ লুকাত। ঝড়-বাদলে বড় ভয় পেত ডালিম। কয়েক বছর পর ডালিমের কোলে এল একটি মেয়ে।

দুর্দান্ত ছিল রতন। রাত দুপুরে বেরিয়ে যেত। কোথায় যেত কেউ জানত না। নিকারী-পাড়ার সবাইত এমনি বেরিয়ে যায়; তারা জেলে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। ভয়ে এতটুকু হয়ে যেত ডালিম।

মোহনমিয়া ছিল পাইকারী খদ্দের। ডালিমের বাবা তারই হাতে ডালিমকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রতনকে এড়াতে পারেনি। এখনো মোহন মিয়া নিকারীপাড়ায় আসে। বেশী বয়স নয়, দুজনে ভালই মানাত; এখনো আপশোস করে ডালিমের বাপ।

একদিন মাঝরাতে ডালিমের ঘুম ভেঙে যায়। রতন ফিরে এসেছে। তার কাপড়-চোপড়ে রক্ত দেখে ভয়ে চীৎকার করে ওঠে ডালিম। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রতনের বুকে।

ঝটকা মেরে ডালিমকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে রতন। তারপর অনেকদিন, অনেক বছর কেটে গেছে। জেল থেকে ফিরে এসে তাদের খোঁজ করেছিল; কিন্তু কি যেন হয়েছিল তার। রতনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল: শেষের দিকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল রতন। কারো কথা আর তার মনেই ছিল না।

চৌদ্দ বছর জেল খেটে ফিরে এসে রতন দেখে সবই পাল্টে গেছে। দেশ-গাঁ ছেড়ে দিল রতন। ডালিমকে ভুলেই গেছে; তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ত কদমকে; তার সেই ছোট্ট মেয়ে কদম।

তবু সেই আক্রোশ মেটাতো নিরীহ যাত্রী-দের উপর। ডুবিয়ে দিত নৌকা। রতন হল রতন মাঝি। পারাপার করে আনাইর হাওর।

ডালিমের সাক্ষোই তার জেল হল। প্রতি-শোধ নিতে গিয়েছিল রতন; কিন্তু ভুল করে-ছিল। মোহন মিয়ার বদলে ডালিমের বাপই প্রাণ দিয়েছিল।

মোহন মিয়াকে ভুলে গেছে রতন। সে যে আজ প্রায় কুড়ি বছরের কথা। কোথায় গেল মোহন মিয়া, আর কোথায়ই বা তার কদম আর ডালিম?

আনমনা হয়ে পড়ে রতন মাঝি। কিন্তু এ কি? কালো মেঘ যে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। হঠাৎ ঝড় উঠেছে; দুলে ওঠে নৌকা।

ছইয়ের ভেতর থেকে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে মিয়াসাহেবের বিবি। —আমার কদম! কদমকে একটি বার দেখতে দাও আল্লা!

মিয়াসাহেব ধমকে উঠেন,—চুপ কর! চুপ, চুপ! এখন নিজের জান বাঁচলেই হল। হেই মাঝি, টাল সামলে চল। তোমায় খুশি করে দেবো আমি।

বেরিয়ে আসে মিয়াসাহেব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন,—ঐ যে, ঐ যে, গাঁ দেখা যাচ্ছে! ঐ যে ক্ষুদ্রাকান্দি।

কদম! কদম! মা আমার!

রতনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

একটু আগেই ভেবেছিল রতন,—নৌকা-খানি উলটে দিতে হবে। মিয়াসাহেব আর তার বিবি। বেশ মজা দেখত রতন মাঝি। এই ত তার স্বভাব। আর কিছু নয়। ডাকাতি নয়, লুটপাট নয়, শুধু নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাস। অনেকদিন পর সে সুযোগ এসেছিল।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! এমনি জোড়ায় জোড়ায় ডুবিয়ে ডালিমের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে গেল। ঝড়ের ঝাপ্টা আর সামলানো যাচ্ছে না। বিবি ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মিয়াসাহেবকে জড়িয়ে ধরলে,—ওগো আমায় বাঁচাও! আমার কদম!

এক ঝটকায় বিবিকে নৌকার ওপর ফেলে দিয়ে মিয়াসাহেব জলে ঝাঁপ দিলে। সাঁতার কাটতে লাগল মিয়াসাহেব। আর বিবি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রতন মাঝির বুকে,—ওগো মাঝি! আমারে বাঁচাও। আমার কদম!

বিদ্যুৎ চমকায়। শিউরে ওঠে রতন মাঝি। বিবির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। মাথা-মগজে কি যেন এক জ্বালা! নৌকা আর সামলাতে পারে না। বিবিকে নিয়ে পারের দিকে সাঁতার কাটে রতন মাঝি।

হ্যাঁ, ক্ষুদ্রাকান্দিই বটে। বিবিকে পাড়ে তুলে দেয় রতন মাঝি। বিবি তার হাত ছাড়তে চায় না।

'তুমিও চল মাঝি।'—ঐ যে, ঐ যে আমার মেয়ে কদমের বাড়ি।

কদম! কদম! —ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে রতন মাঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে জলের দিকে [illegible]; ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

মিয়াসাহেবের বিবি ফিরে ফিরে [illegible]কায়। মনে হয় যেন, কত আপনার জনকে আজ আবার হারাল।

কিন্তু রতন মাঝি আজ হঠাৎ পালটে গেল। অনেক কষ্টে নৌকাখানাকে ধরে ফেলল রতন। ঝড় শান্ত হল।

হ্যাঁ, ডালিম বেঁচে আছে। তার কদমও বেঁচে আছে। কিন্তু তাদের কাছে সে বেঁচে নেই। দুষমন মোহন মিয়াই তাদের কাছে সত্যি।

হাওরের বুকে মিশে গেল রতন মাঝি। রতন মাঝি কিংবা তার নৌকাখানিকে আর কোনদিন কেউ দেখেনি।

বরং একা

সংসঙ্গ না জুটিলে
বরং থাকিও একা একা,
বন্ধুহীন এ-সংসারে
যদি পাও কুসঙ্গীর দেখা।

(ইংরেজী প্রবাদ)

সম্ভাষণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আরতি অবলীলায় সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

অনুরাধা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু তাঁর দাঁড়ানো চলবে না। অতিথি-অভ্যাগতরা সব বিদায় নেয়নি এখনো। তাঁদের কলহাসি কলগুঞ্জন কানে আসছে। এক্ষুণি তাঁর ডাক পড়বে, খোঁজ পড়বে। এই উৎসব-মুখর রাতটা শুধু তাঁর। শুধু তাঁরই জন্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই আজকের এই আয়োজন। অতিথিরা একে একে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বিদায় নেবেন। নতুন জীবনে পদার্পণের এটুকু অভ্যর্থনাই কাম্য ছিল একটু আগেও।

কিন্তু এই আয়োজনে আরতিও ঠিক তাঁদেরই একজনের মত এসেছে। তাঁদের একজনের মতই চলে গেল। তার বেশি কিছু নয়। কিছুই নয়।

খানিক আগেও যতবার আরতির দিকে চোখ পড়েছে, স্নেহে কৃতজ্ঞতায় বুকখানা ভরে ভরে উঠছিল তাঁর। শুধু তাঁর নয়, জীবনবাবুরও। ক'দিন ধরে ওকে নিয়ে অনেক প্ল্যান করেছেন তাঁরা, অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। আর ওকে হস্টেলে থাকতে দেওয়া হবে না, এখানেই জোর করে ধরে রাখা হবে তাকে। এই বাড়িতে, নিজেদের কাছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে অনুরাধা একটি কথাও বলতে পারলেন না, একটা অনুরোধও করতে পারলেন না। নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। আর হাসি মুখে আরতি সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

রাস্তায় নেমে আরতি একটা ট্যাক্সি নিল। বাড়ি যাবে? না কি হস্টেলে যাবে? এত রাতে হস্টেলে গেলে লোক কি ভাববে আবার। বাড়িই যাবে। কিন্তু বাড়ি গেলে তো সকলের সঙ্গেই দেখা হবে, সকলের চোখের ওপর দিয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে—সকলের সঙ্গে চোখাচোখি হবে। কেউ কিছু বলবে না। ভালো-মন্দ কিছুই না। কিন্তু তাও হাজার কথার বাড়া। এত দিন পরোয়া করেনি, সকলের চোখের ওপর বিদ্রোহ করে সে-ই বরং শেষ অনুষ্ঠানটুকু সম্পন্ন করিয়েছে। কিন্তু এখন আর তার থাকল কী? এমন খালি খালি লাগছে কেন বুকের ভিতরটা! বাড়ি ফিরলে কাকারা কাকীমারা ওর দিকে তাকালেই যেন টের পাবে সেটা, দেখতে পাবে।

ড্রাইভারকে হস্টেলের রাস্তার নির্দেশ দিল আরতি।

পিছনের গদিতে মাথা রেখে অন্য দিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল।......মা এবারে সুখী হবে। তাছাড়া, মায়ের ঋণও কিছুটা শোধ করা গেল। নিজের মায়ের ঋণ কখনো শোধ হয় না নাকি। কিন্তু এ তো নিজের মা নয়। সৎ-মা। কি বিচ্ছিরি কথাটা। না, এভাবে ভাববে না আরতি, এই মা না থাকলে কোথায় ভেসে যেত, কি গতি হত ওর, কে জানে। জীবনটা নিজের কাছেই বোঝা মনে হত, দুর্বহ লাগত। নিজের মা হোক আর না হোক, আরতি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু নিজের মা যে নয়, সেটা জীবনে এই প্রথম অনুভব করছে। দু'দিন বাদে সয়ে যাবে হয়ত, কিন্তু আপাতত এটুকুই যাতনার মত। নিজের মাকে মনেও পড়ে না আরতির। বড় কাকীমার তোরঙ্গে একটা ছবি দেখেছিল। তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। আজ্জে, এবারে এক দিন গিয়ে সেই ছবিটা চেয়ে নেবে। নিজের মায়ের ছবি।

তিন বছর বয়সে এই মাকে পেয়েছিল। তারপর দীর্ঘ সতের বছরের মধ্যে মায়ের অভাব বোধ করিনি কোনদিন। মা ওর থেকে পনের বছরের বড়, ওর কুড়ি এখন, মায়ের পঁয়ত্রিশ। দুঃখের আসল সময় তো এই মা প্রায় পার করে দিয়েছে বলতে গেলে ওরই জন্যে। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, তার জন্যে। কম কথা নাকি! আ-হা, এখনো সুখী হোক।

শুধু মায়ের অভাব নয়, বলতে গেলে বাবার অভাবও আরতি তেমন বড় করে অনুভব করেনি এ পর্যন্ত। বাবাকে হারিয়েছে সাত বছর বয়সে। এই মা-ই বাবার মতও আগলে রেখেছিল ওকে। অবশ্য তখন থেকেই জীবনমামা মায়ের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবন-মামা না থাকলে মা মেয়ে দুজনেরই কি যে হত...। জীবন দত্ত, মস্ত চাকুরে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর। কিন্তু পয়সার গুমোর নেই, টাকা দিয়ে সাহায্য করে সস্তা নাম কিনতে চায় নি, মায়ের পাশে থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সহায়তা করেছে। তার জোরটাই মায়ের মস্ত জোর ছিল। সেই জোরটা এখন বাড়ল আরো, পাকাপাকি হল। ভালই তো হল। ভদ্রলোকেরই বা মহত্ত্ব কম নাকি! একটানা এত গুলো বছর মুখ বুজে প্রতীক্ষা করার কথা কে কবে শুনেছে?

আরতি আগে কাকা ডাকত জীবন দত্তকে। বাবার বন্ধুকে তাই তো ডাকে সকলে। দশ-এগারো বছর বয়েস পর্যন্ত আরতিও তাই ডেকেছে। জীবন কাকা। তারপর মা হঠাৎ এক দিন কাকা বাতিল করে মামা বলিয়েছে। জীবন-মামা। বাড়িতে অনেকগুলো কাকা আরতির। কাকা-কাকা শুনতে শুনতে মায়ের কান ঝালাপালা নাকি। আরতি চট করে কাকাকে মামা করে উঠতে পারে নি, বার কতক বকুনী খেয়ে শেষে পেরেছে। কাকা ছেড়ে মামা বলানোর হেতুটা তখন বোঝেনি। পরে বুঝেছে। অনেক পরে মায়ের সেই দুর্বল চেষ্টার কথা ভেবে হাসিই পায় আরতির। এই করে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়, না গেল? মিছিমিছি এতগুলো বছরের অশান্তি আর যাতনা। যা হয়ে গেল, ভালো

হলে অনেক ভালো হত। ওর পরিণত জ্ঞান-বুদ্ধির অনেক আগে।

কাকারা তেমন বড় রোজগেরে নয় কেউ। আরতিকে এভাবে মানুষ করতে পারত না তারা, এভাবে লেখা-পড়া শেখাতে পারত না নিশ্চয়। নিজেদেরই এক একজনের অনেকগুলো করে ছেলেপুলে। বছরের পর বছর নির্বিবাদে ফেল করছে খুড়তুতো ভাই-বোনেরা। বাড়ি তো নয়, আস্ত বাজার একখানা। ওখানে লেখাপড়া হয়! আরতির কোনো কালেও হত না য়ুনিভার্সিটির মুখ দেখতে হত না। জীবন-মামার সঙ্গে ব্যবস্থা করে মা বারো বছর বয়েস থেকে হস্টেলে রেখেছে তাকে। সেই থেকে এই এম-এ পর্যন্ত হস্টেলেই চলেছে। মা-ই এ পর্যন্ত খরচা চালিয়েছে, নিজের উপার্জনের টাকায় ওকে পড়িয়ে এসেছে। বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকায় বিশেষ হাত পড়েনি। সে টাকা ওর নামেই আলাদা করা আছে। ওর বিয়ের জন্য— আবারও হাসি পাচ্ছে আরতির। যাক, এই একটা বছর খরচা-পত্রের জন্যে আটকাবে না কিছু। তার পরে? পরের কথা পরে। আরতি জানবে না।

জীবন মামা না থাকলে এ সংসারে থেকে মায়ের বি-এ পড়া হত না, বি-টি পড়াও হত না। চাকরি করা তো হতই না। মায়ের মুখেই সে দুর্দিনের গল্প শুনেছে আরতি। এ সংসারে জীবন মামার তখন খুব প্রতাপ। কাকাদের মধ্যে তিনজনকে জীবন মামাই তো ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকিয়েছে। তাছাড়া আপদে-বিপদে তার সাহায্য আশা করত সকলে। সাহায্য পেতও। কাজেই মনে থাকুক আর নাই থাকুক, তার ব্যবস্থার ওপর কথা বলবে কে? মায়ের লেখাপড়া, মায়ের চাকরি—সবই জীবন মামার জন্যে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একটা ইস্কুলের হেড মিসট্রেস হয় ক'জনে? কিন্তু মা হয়েছে। জীবন মামার কোন জায়গাতেই যেন জোর কম না।...অবশ্য ইস্কুলের চাকরি মা এখন আর করবে কি না কে জানে। করা সম্ভব কী? ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, ইস্কুলের ছোট ছোট মেয়েগুলোও হাঁ করে চেয়ে থাকবে তার সিঁদুর-পরা মায়ের দিকে। ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগছে আরতির। মাকে জিজ্ঞাসা করলে হত, বারণ করে এলে হত...।

কলেজে পড়তে কেমন একটা কানাঘুষা কাকীমাদের চাপাচাপি ইশারার আভাস পাচ্ছিল আরতি। বি-এ পরীক্ষার পর দু' মাস আড়াই মাস বাড়িতে ছিল যখন, তখন সেই ইশারা আর সেই অভাস আরো একটু স্পষ্ট আরো একটু উগ্র মনে হয়েছিল তার। কাকারা কথায় কথায় আর জীবনদা বলে না, জীবন দত্ত বলে। মায়ের মুখখানাও বেশির ভাগ সময় থম-থমে গম্ভীর।

তখনো কিছুই জানে না আরতি, মাকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, মা জীবন মামা আর আসে না কেন?

মা থমকে গিয়েছিল। চেয়েছিল খানিক। তারপর ভুরু কুঁচকে বলেছিল, আসেন না তাতে কি হয়েছে?

না, এই দু মাসের মধ্যে এক দিনও দেখলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

মায়ের উষ্মদুক্ত জবাবে একটু অবাকই হয়েছিল আরতি।—এ বাড়িতে কি মাথা বিকি করা আছে নাকি তাঁর যে আসতেই হবে। দেখার ইচ্ছে থাকলে নিজে গেলেই পারতিস!

আরতি বোকাই বটে। সেই দিন, সেই মুহূর্তেই বোঝা উচিত ছিল তার। তখনো খেয়াল হয়নি কিছু।

খেয়াল অনেক পরে হয়েছে। তখন জীবন দত্তর বাড়িতেও গিয়েছিল বইকি আরতি। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কাণ্ড করেছিল।

মাস তিনেক আগের কথা। দুই-এক দিনের ছুটিতে হস্টেল ভালো লাগছিল না বলে বাড়িতে এসেছিল। এসে হতভম্ব একেবারে। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় শুয়ে মা কাঁদছে। ওকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে আঁচলে চোখ মুছে কান্না সামলাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেছে।

কি হয়েছে মা?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মা মাথা নেড়েছে, কিছু না।

দু' হাতে করে মায়ের মুখখানা জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল আরতি। —কি হয়েছে বলো।

তার হাত ছাড়িয়ে বালিশে মুখ গুঁজে মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

ছোট কাকীমা আরতির থেকে বছর দুই বড় মাত্র। কলেজেও পড়েছে কিছু দিন। তার সঙ্গেই আরতির বেশি ভাব। মায়ের ঘর থেকে সোজা তার কাছে গেছে আরতি।

মা'র কি হয়েছে?

কি হয়েছে শুনেছে। ছোট কাকীমা লজ্জা পেয়েছে বলতে, কিন্তু তবু বলেছে শেষ পর্যন্ত।

আরতি অবাক, স্তব্ধ।

জীবন মামার বিয়ের প্রস্তাবে কাকারা নাকি অগ্নি মূর্তি এক-একজন, কাকীমারাও বিরূপ। মা হাঁ না কিছুই বলেনি। জীবন-মামা স্পষ্ট জবাব চেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। অফিসে এক কাকাকে ডেকে নিজেই সে কথা বলেছে জীবন মামা—স্পষ্ট জবাব একটা চাই। মাকে ছাড়েনি কাকারা, সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করেছে, আরতি নিজের মেয়ে হলে কি হত আরতির সত্যিকারের মা হলে এমন প্রস্তাব বরদাস্ত করত কি না।

মা এ কথারও জবাব দেয় নি।

আরতি হস্টেলে চলে এসেছিল। দু'দিন ভেবেছে। দিবা-রাত্র শুধু ভেবেছে। তারপর আবার বাড়িতে এসেছে। মাকে ধমকেছে, শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লজ্জা করে না? নিজের জোর নেই তোমার? তুমি কার পরোয়া করো?

নিজের জোর না থাক, মেয়ের জোরের বহর দেখে মা হকচকিয়ে গিয়েছিল মনে আছে। কাকাদের কাছেও সটান গিয়ে বোঝাপড়া করেছে আরতি, কাকীমাদের সঙ্গে বলতে গেলে ঝগড়াই করেছে। তাদের ওপর কারো কর্তৃত্ব খাটবে না সেটা আরতি বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে সকলকে।

সরাসরি জীবন মামার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত তারপর। এমন একটা সংকোচের ব্যাপারে এই মেয়ে যে এ রকম কোমর বেঁধে এগিয়ে আসতে পারে, কেউ ভাবেনি। জীবন দত্ত অবাক যেমন, খুশিও তেমনি। আরতির কথায় কোন দ্বিধা ছিল না, কোন জড়তা ছিল না। স্পষ্ট করে বলেছে, মায়ের জবাব তো আপনার জানাই ছিল, জবাব জানা না থাকলে আপনি প্রস্তাব করতেন না। বাধা শুধু বাড়ির লোক, সেই বাধার মধ্যে ফেলে রেখে মাকে আপনি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে জীবন মামা ওর মাথায় হাত রেখে আদর করে মাথাটা নেড়ে দিয়েছিল। আরতি খুশি হয়েছিল কিনা মনে নেই, কি জানি কেন তার চোখে তখন জল আসছিল। বলেছে, বাড়ির লোকেও আর বাধা দেবে না, আপনি ব্যবস্থা করুন।

দিন তিনেক আগে সেই ব্যবস্থাটাই হয়ে গেছে। তার মা এখন মিসেস জীবন দত্ত। ভাবতেও অদ্ভুত লাগছে আরতির।

তারই আনুষঙ্গিক আনন্দোৎসব এটা।

সন্ধ্যে থেকে অতিথি অভ্যাগতদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। হাসির হাট বসেছে। এ জগতে নিরানন্দের কিছুই নেই যেন। জীবন দত্ত খুশি, অনুরাধা খুশি। আর সব থেকে বেশি হাসিখুশি আরতি। ছোট মেয়ের মতই সে হৈ-চৈ করেছে সন্ধ্যে থেকে, দাপাদাপি করেছে, দেখাশুনা তদ্বির তদারক করেছে। অনুরাধা বার বার মেয়েকে লক্ষ্য করেছেন, আর স্নেহে মমতায় বুকখানা ভরে উঠেছে তাঁর। ...মেয়েটা দিন কে দিন কি সুন্দরই না হচ্ছে দেখতে। এম-এটা পাস করলেই ওর বিয়ে দেবেন, ছেলের মতই একটি ছেলে যোগাড় করতে হবে ওর জন্যে, রূপে-গুণে বিদ্যায় কিছুতে কমতি হলে চলবে না।

ঘড়িতে রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আরতি উঠে দাঁড়াল। চলি মা, অনেক রাত হল।

কাছে আর কেউ ছিল না, অনুরাধা অবাক মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। সে কি রে, তুই এখন যাবি কি।

আরতি হেসে সারা, রাত কত হল তোমার খেয়াল আছে, এখন না গেলে আর যাব কখন! বলতে বলতে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল আরতি, অনুরাধা বাধা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বলল, তুমি ও'দের দেখোগে, আমি পালাই এখন, মিঃ দত্তকে বলে দিও—

সেই মুহূর্তে অনুরাধা আড়ষ্ট পাংশু একেবারে। মিঃ দত্ত!

নতুন জীবনে কি তিনি পাবেন বা পেতে চলেছেন সেটা পরবর্তী ব্যাপার। যা হারালেন বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে এই মুহূর্তে সেইটুকুই তিনি আচমকা উপলব্ধি করলেন শুধু।

আরতি তরতরিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে চলে গেল।

অনুরাধা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সজ্জন ও মূর্খ

ফলবান গাছ ফলভারে অবনত,
সেইরূপ নত নিজগুণে সজ্জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ সে তো চির উদ্ধত,
মূর্খ কখনও হয় নাকো সজ্জন॥

(ভবভূতি)

রূপসী হিংসা — শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

পথ চল্‌তে — হীতেন চৌধুরী
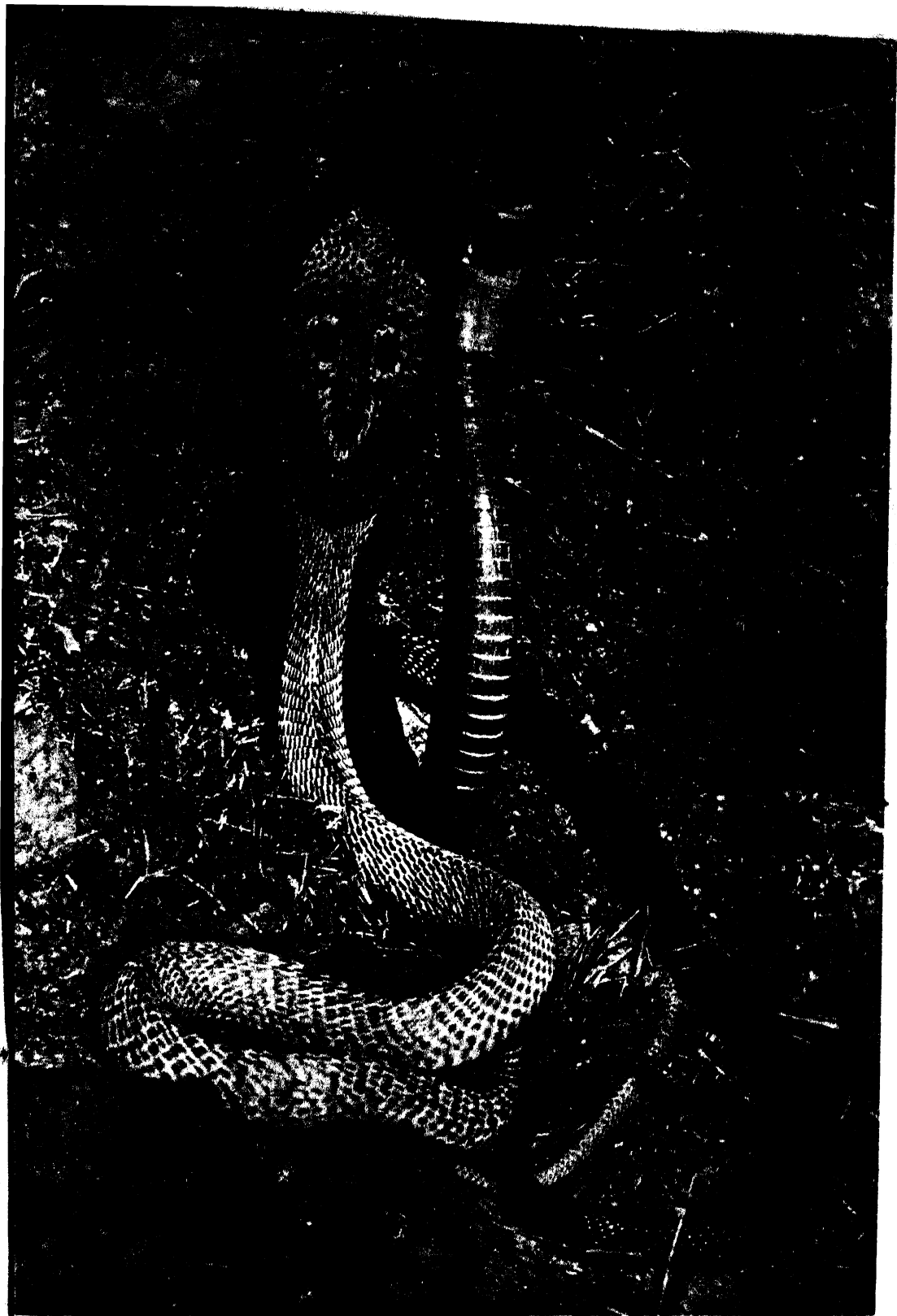
অনুরূপা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

টিম টিম লন্ঠন জ্বলে মাটি লেপা ঘরে
কাঁথায় নক্সা আঁকে কাজলা দিদি
বাঁশ বনের শিয়রে জাগে চাঁদ শুশ্রূষার মত,
ঝিঁ-ঝিঁর কোরাসে রাত্রি অগাধে ঘুমায়।
ন্যুইয়র্ক, মস্কো বা কলকাতা
স্পুৎনিক, ব্যালে বা ক্যাডিলাক
যেন অন্য পৃথিবীর রূপকথা, যেন উপন্যাস—
এই গ্রাম যেন অন্য গ্রহ।
ধারালো নখরে রঙ করা, আলতা-ঠোঁট,
চশমার ঘোমটায় চোখ ঢাকা

অনিন্দ্য সুন্দরী সব সহরের পরী—
হাওয়াই হস্টেস কিংবা ব্যালেরিণা
টি-ভির নায়িকা কিংবা অহংকারী প্যারির নগরী
কাজলা দিদির কাছে তারা সব অসম্ভব
অবাস্তব স্বপ্নের ছলনা,
পৌরাণিক গল্পের কোনো ছিন্নপাতা।
কাজলাদি তাদের কাছে
প্রাগৈতিহাসিক কোনো শিলায় অঙ্কিত
সিল্যুয়েট
অবলুপ্ত পুরাতনী।
কেউ কাকে দেখেনি চোখে, চেনে না,
অথচ তারা
একই পৃথিবীতে থাকে, একই রাতে
বিছানায় শোয়
একই বসন্তের বাতাস অঙ্গে মাখে,
অপরূপ, অনুরূপা—
কেউ কাকে দেখেনি চোখে, কেউ কাকে
চেনে না।

দামোদর

প্রভাতী দত্ত

এখন জাগিয়া আছি মনে হয় নূতন আকাশ
ভয় নেই মনে কোন, মনে হয় দুরন্ত প্রকাশ,
সে দামোদর আজ সে আলোর—
সে দামোদর শুধু সে ভালোর,
আজ নয়, আমি তারে দেখেছি যে আজ থেকে
বহুদিন পরে—
নতুন সভ্যতা নিয়ে গড়ে ওঠা নূতন নগর।
সেখানে মিছিল নেই আছে শুধু
জীবনের ভীড়ঃ
হয়ত বেঁধেছে কেউ আরো দূরে
মন ভাঙা নীড়।
সে নীড় কামনা করি, ঐশ্বর্যের ঔদার্য
আলোকে
আমি দেখি দুই তীরে, পৃথিবীর অনেক
ভালোকে।
হয়ত হারায়ে যাবো
জানি আমি সেদিনের মাঝে—
তবু জানি বেঁচে যাবো,
উজ্জীবিত অতীতের কাজে।

ওগো বধূ সুন্দরী

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

সাগর-পারের ওগো বধূ সুন্দরী,
সাগর তোমার মূর্ছিত পদতলে;
বুকের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী—
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে।

আকাশে কেবল মাতাল বৃদ্ধ চাঁদ
উলঙ্গ মেঘে মনের বেহালা বাজায়।

অনেকে সেদিন এসেছিল নানারূপেঃ
কেউ আলো কেউ ফুল বা রূপের ডালা
এনেছিল আর চেয়েছিল চুপে চুপে
তোমারই গলায় পরাতে তাদের মালা!
কিন্তু মজেনি অটল তোমার তনু,
কারণ ওরা যে অপটু সবাই গানে;
ওদের কথায় ফোটে না ইন্দ্রধনু—
সে-জাদু কেবল সাগরই তখন জানে।
তাইতো সেদিন সাগরে পাঠালে প্রেম,
সাগর নিজেকে তোমার তরেই সাজায়।

কিন্তু হঠাৎ কি যে হয় তারপরেঃ
ঢেউয়ের বাসরে দোল খায় ঘনঘটা,
এপারে-ওপারে আকাশ আছড়ে পড়ে—
মহাকাল তার দিগন্তে ঝাড়ে জটা!
চকিত-কাতর সাগর দাঁড়ায় ঘুরে,
সূর্যের মুখ অভিসম্পাতে কালো,
সংগীত মরে ঝড়ের অশ্ব-খুরে,
দেহ ঢেকে নেয় কবরে দিনের আলো।

বহুকাল পরে যখন বৃষ্টি নামে—
সাগর তখন লাঞ্ছিত দেহে লোটায়!

সাগর-পারের ওগো বধূ সুন্দরী;
সাগর তোমার মূর্ছিত পদতলে;
বুকের গভীরে ডুবেছে সোনার তরী—
বাসি অমৃত-ও একাকার নোনা জলে!

তবুও কি তুমি তাকেই কামনা করো—
বাসনা তোমার গোপনে কি ফুল ফোটায়!

অনাস্বাদিত

শচীন দত্ত

রাত্রিদিন প্রতীক্ষায় থাকি
উত্তপ্ত মনের দ্বন্দ্বে কখনো বা নিভে যাই জ্বলি।
ফিকে গাঢ় অন্ধকার ঃ অবাক বিস্ময়ে আঁকা পাখি
কখনো বা মেলে দেয় হঠাৎ খুশির ডানা,
ছড়ায় কাকলি।

আমি তার প্রতীক্ষায় থাকি
অন্ধ দিন বন্ধ দ্বারে নামুক একাকী—
ঘাস গন্ধ লুপ্ত হোক তপ্ত বুক চৈত্র রেখে যাক
সমুদ্র হাওয়ার হাতে দুর্ভিক্ষের শাঁখ

তবু আমি কান পেতে থাকি
আশ্বিনের পদধ্বনি মনে মনে গুনি
ভোলাবে যে এলো কিসে!
দুটি চোখে যার কথা বুনি।
ছায়াঘরে শান্ত সেই যন্ত্রণার পাখি!

স্বর্গ স্বপ্ন

॥ রাণা বসু ॥

কতদিন আর বুড়ো মনটাকে গর্তে
লুকিয়ে রাখবে?
এ ফাটা কপালে সোনা জুটবে না মহম্মারা
ফিকে ফাঁকা ঃ
চোখ খুলে দ্যাখো দুনিয়াকে আহা পরে
আফসোস হবে—
ইঁদুরের প্রাণ খুবলেই খায় গর্তের কোটরেতে।

জাহান্নমেতে যাবেই যখন কেন [illegible]
কপটো,
গণেশের মতো খুশিতে [illegible]
বাঁচলো কে মলো দুনিয়ায় [illegible]
[illegible]
কেউ বলবে না ঃ [illegible]
[illegible] শেঠ।
ব্যাঙ্কেতে যার আছে লাখ টাকা [illegible]
[illegible] সুখে,
সেই হতে পারে ত্যাগী মহাবীর [illegible]
[illegible] লুটে—
কানামাছি খেলে দেয়ালের গায়ে
আরশোলা টিকটিকি
তুমি টিকটিকি আরশোলা মানুষ,
দেয়ালা আস্তুর ঠিক-ই।
এতোদিন ধরে এ পোড়া হৃদয়
সোনার খোঁজ কি পেল?
সব কারচুপি মিথ্যেই হল শেষটা
ভালোবাসা খুঁজে পুড়লে জ্বালালে নিজে
শ্রেয় মনে ভাবি ঃ শালবীথিতলে রবীন্দ্র
গীতি শোনা।

যখন বসন্ত

॥ বটকৃষ্ণ দে ॥

যখন বসন্ত ছিলো ডালে, কৃষ্ণচূড়ার অঞ্জলি
ঢেলে তোমায় ডেকেছে, বনে বনে
কোকিল কাকলি
তোমার আসার পথ মুখর করেছে—সেদিন তো
আসোনি!—তোমারি ন্যামে শুকিয়ে ঝরেছে
ফুলবৃন্ত।
যখন আকাশে ছিলো শ্রাবণের মেঘমেদুরতা,
বৃষ্টির বর্ষণে এই ধূসর পৃথিবী শ্যামলতা
পেয়ে তোমাকে জানালো আহ্বান,
তখন তুমি দূরে
কোন শরতের স্বপ্নে সমাহিত মুগ্ধ মন সুরে!
এখন এসেছো তুমি কী দেবো তোমায়
আমি আজ!
আকাশে বর্ণালী নেই, বনে বসন্তের
কারু কাজ,—
তা-ও নেই। আমি শুধু অতীতের মৌন
সাক্ষী হয়ে
বেঁচে আছি, লগ্নভ্রষ্ট, ভবিষ্যৎ তোমার প্রণয়ে!
ভয় নেই!—প্রেম বলে, 'এই তো আমার জাদুকরি
রিক্ততরু কুসুমিত, শুনে তাকে পূর্ণতায় ভরি!'

নিশীথের হাসি

পুষ্পদল ভট্টাচার্য

স[illegible] সাতটার ট্রেনে বিষণপুর স্টেশনে নামল দিলীপ। বছর বারো আগে তার বাবা এখানের স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন। এখন তিনি পেন্সন নিয়ে কলিকাতাবাসী। দীর্ঘদিন পরে কৈশোরের লীলাভূমি বিষণপুরে নেমে দিলীপের মনে হল এতদিনে বাড়ী এলাম। স্টেশনে কেউ নিতে আসে নি। বন্ধু সমরেশকে চমকে দেবে বলে তাকে খবর দেয়নি সে।

সমরেশ এখানেই ডাক্তারী করছে। অনেকবার ডেকেছে সে দিলীপকে কিন্তু একটা না একটা বাধা পড়ায় আসা হয়নি। পথে চারদিকে চেয়ে দিলীপ দেখল বিষণপুরে আজও সেই গাছপালায় ঢাকা শান্ত পল্লী শহরটিই রয়েছে। দেখে সে একটা প্রশান্ত আনন্দ বোধ করল।

উত্তর প্রদেশের এই শহরটি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত। স্টেশন থেকে শহরে যাবার পথে খানিক দূর পর্যন্ত রেলওয়ে হাসপাতাল, রেলওয়ে কোয়ার্টার আর অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা পোড়ো জমি। এই জমিটার পর একটা বড় বড় গাছে ঢাকা মাঠ আর পুকুর। মাঠের এক প্রান্তে এখানের শিক্ষিত সমাজের ক্লাব, অন্য প্রান্তে শহরে যাবার রাজপথ। শহরে প্রবেশ করেই পথটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে চলে গিয়েছে। পূর্বদিকে ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ, থানা আর সরকারী হাসপাতাল ইত্যাদি। পশ্চিমদিকে পথটা গিয়েছে শহরের ধনী বাসিন্দাদের বাড়ীর আঙনে দিয়ে। বড় বড় হাতায় ঘেরা এক একটি বাংলো বাড়ী। এক বাড়ীতে কি হচ্ছে তা অন্য বাড়ীর লোকেরা সহজে জানতে পারে না। মুসলমানরা থাকে এই সব হাতার সুদূর প্রান্তে তাদের সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারে। এই পাড়ার স্থানীয় নাম রইস্ মোহল্লা।'

শহরের উত্তরদিকে বাজার অঞ্চল বা পুরান বিষণপুর। অধিকাংশ শহরবাসীই এদিকে বাস করে। বাজার অঞ্চলের অন্তর্গতেই সমরেশের বাংলো বাড়ী।

চাকরের কাছে দিলীপের আগমন সংবাদ পেয়ে সমরেশের স্ত্রী উষা এসে অভ্যর্থনা করল। গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দিলীপ জিজ্ঞাসা করল "সমরেশ কখন ফিরবে ডিসপেনসারী থেকে ?"

"ডাক্তার মানুষের কি বাড়ী ফেরার কোন বাঁধা-ধরা সময় আছে ঠাকুরপো ? তবে আজ বোধহয় উনি রাত নটা দশটায় ফিরবেন। কাছেই একটা গ্রামে গিয়েছেন রুগী দেখতে। জমীদার বাড়ীর রুগী। শহরে এসে চিকিৎসা করালে তাদের মান যায়।"

দিলীপ হেসে বলল, "আপনাদের তো তাতে ক্ষতি নেই। বরং শহরের বাইরে গেলেই ডাক্তারের মোটা পাওনা।"

তন্বী সুন্দরী উষা মুখ ভার করে বলল— "না ঠাকুরপো, যা দিন কাল পড়েছে তাতে অল্প 'ফি' নিয়ে শহরের ভেতর ডাক্তারী করাই ভাল। বেশী টাকার লোভে বাইরে গিয়ে, কিংবা রাত-বিরেতে রুগী দেখতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনা আমি ভালবাসি না।"

দিলীপ হো হো করে হেসে উঠল—"এখনও রাতে একলা বাড়ীতে থাকতে ভয় করে নাকি ?"

তার হাসিতে চটে গিয়ে উষা উঠে দাঁড়াল। বলল, "থাকগে ওসব কথা। চলুন আপনাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দেই।"

বিকালে চায়ের টেবিলে বসে দিলীপ বলল— "সমরেশ তো সেই রাত্রে ফিরবে। ততক্ষণ দু-একজন পুরান বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে একবার ক্লাবে ঘুরে আসি।"

উষা ভীত স্বরে বলল—"এখন এই সন্ধ্যার মুখে অত দূরে নাই গেলেন ঠাকুরপো। রাত্রে আবার হেঁটে ফিরতে হবে হয়তো। তার চেয়ে উনি ফিরলে কাল সকালে ও'র গাড়ীতে যাবেন সকলের সঙ্গে দেখা করতে।"

দিলীপ তার আপত্তি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা। শীতের সন্ধ্যায় তখনই রাতের কালিমার স্পর্শ লেগেছে। গাছের তলায় তলায় অন্ধকার ওৎ পেতে বসেছে। সুযোগ পেলেই শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

কাছাকাছি দুজন বন্ধুর খোঁজ করে তাদের দেখা পেল না দিলীপ। তার অধিকাংশ বন্ধুই থাকত রেলওয়ে কলোনীর দিকে আর না হয় রইস মোহল্লায়। রইস মোহল্লার একটি বন্ধুর বাড়ী গিয়ে শুনল সে বিশেষ কাজে দিল্লী গিয়েছে। বন্ধুটির বাড়ী থেকে বাইরে এসে দিলীপ হাত-ঘড়িতে দেখল সাতটা প্রায় বাজে। সে ভাবল এভাবে আর ঘোরাঘুরি না করে ক্লাবেই যাওয়া যাক। ছটায় ক্লাব খোলে। বন্ধুরা এতক্ষণে সেইখানেই সমবেত হয়ে থাকবে।

এ পাড়ার বাংলোগুলির পিছন দিকের পালায় ঢাকা ঘাসে আচ্ছাদিত একটা পায়ে চলা পথ দিয়ে গেলে ক্লাবের মাঠে তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়। দিলীপ সেই পথেই অগ্রসর হল। খানিকটা গিয়ে তার মনে হল কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তার টর্চের আলো ফেলল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। সে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল "কে, কে ওখানে ?" কিন্তু কোন সাড়া পেল না। কেবল অন্ধকারে একটা কুকুরের আর্তনাদ আর একটা অদ্ভুত হাসি শোনা গেল—"কিক্, কিক্ কিক।" হাসিটা মানুষের কি কোন জন্তুর ডাক তা বুঝতে পারল না দিলীপ। সে কাগজে পড়েছিল কিছুদিন যাবৎ এ অঞ্চলে হায়নার উপদ্রব হচ্ছে। হায়নার হাসির কথা বইয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজে কখনও সেই হাসি শোনে নি।

এখন পেছন দিকে ঐ রোমাঞ্চকারী হাসির শব্দ শুনে ভয় হল যদি হায়নার দল পিছু নেয় তাহলে নিরস্ত্র অবস্থায় ওদের হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করবে কি করে ?

দিলীপ দ্রুতপদে চলে মাঠের পথ ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে একটা আলোর নীচে দাঁড়াল। আগে একজন ট্রাফিক পুলিশ এখানে রাত দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতো। আজ তাকে দেখতে পেল না দিলীপ। পথেও মোটর তো দূরে থাক, একটা রিকসাও নেই। আলোর নীচে এসে দিলীপের ভয় দূর হয়েছিল। সে নিজের মনেই হেসে বলল—কোলকাতায় থেকে কোলকাতার বাবু

হয়ে গিয়েছি, তাই এই সামান্য শব্দে চমকে উঠেছি।

বিষণপুর ক্লাবে এখানের সম্ভ্রান্ত সমাজের সব মেয়ে-পুরুষই সন্ধ্যার সময়ে জমায়েত হয়ে তাস খেলায়, বিলিয়ার্ড খেলায়, গান-বাজনায় ও কখন কখন অভিনয়ে মেতে উঠতো। বিলাতিয়ানা যে'সাদের মজাজের জন্য কাঠের মেঝে যুক্ত নাচঘরেরও ব্যবস্থা ছিল। শীতের সময় এই উপলক্ষে এক একদিন এত ভীড় হত যে হলের ভেতর চলাফেরা করা যেত না। অনেকে শীত অগ্রাহ্য করে লনে এসে বসতো।

কিন্তু আজ বাড়ীটা কেমন যেন নিঃঝুম। গান-বাজনা দূরে থাক, মেয়েদের উচ্ছ্বসিত হাসি আর কলকথাও শোনা যাচ্ছে না। হলে আর সেক্রেটারীর ঘরে ছাড়া আর কোথাও আলোও জ্বলছে না।

হলে ঢুকে দিলীপ পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না। জন পাঁচ ছয় পুরুষ মেম্বার একটা টেবিল ঘিরে বসে খবরের কাগজ আর পত্রিকা পড়ছিলেন। তাঁদের মুখে চোখে কেমন যেন একটা ত্রস্ত ভাব। দিলীপ আসতে তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন কিন্তু কথা বললেন না। একটু ইতস্ততঃ করে দিলীপ সেক্রেটারীর ঘরে উঁকি দিয়ে আশ্বস্ত হল। সেক্রেটারীর আসনে তার পুরান বন্ধু কিষণ-চন্দ বিরাজিত। তিনি দিলীপকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানালেন। খানিকক্ষণ সংবাদ আদান-প্রদানের পর কিষণচন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় উঠেছ?"

সমরেশের বাড়ী শুনে তিনি চমকে উঠলেন—"বাজার মহল্লায়? তবে এত রাত্রে ক্লাবে এলে কেন?" তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ। "যাই হোক, আজ রাত্রে আর তোমাকে বাড়ী ফিরতে দেব না। রাতটা আমার বাড়ীতেই কাটাতে হবে।"

কিষণচন্দ এদিকের রেলওয়ে কলোনীতে থাকেন। তিনি জানালেন হলে উপবিষ্ট সব কয়জন মেম্বারই এই পাড়ারই লোক। ভিন্ন পাড়ার মেম্বাররা আজকাল সন্ধ্যার মুখেই টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন খেলা সেরে বাড়ী চলে যান।

দিলীপ বলল—"উষা দেবীকে তো বলে আসিনি। রাত্রে বাড়ী না ফিরলে তিনি ভাববেন।"

"তাঁকে ফোনে জানিয়ে দাও।"

"এখানে আসব শুনে উষা ভয় পেয়েছিল। এখন তুমিও ভয়ে আঁতকাচ্ছ। ব্যাপার কি বল তো?"

কিষণচন্দ বারবার জানালা দিয়ে ক্লাবের ফটকের দিকে চাইতে চাইতে বললেন—"ব্যাপার এই যে এখান থেকে শহরে যাবার পথটা নিরাপদ নয়।"

দিলীপ হেসে বলল—"থানা পুলিশের একেবারে নাকের ডগায় ঐ পথটা, তাছাড়া ঐ চৌরাস্তায় পুলিশ পাহারাও থাকে— অন্ততঃ বছর কয়েক আগে তাই থাকত। যদিও আজ আসবার সময়ে তার দেখা পাইনি।"

"কয়েক বছর আগে কেন, মাসখানেক আগেও ঐখানে পুলিশ থাকত। এখন চাকরী যাবার ভয়েও কোন কনষ্টেবল ওখানে পাহারা দেবে না। রাতে রোঁদে বেরবার সময়ও তিন চার জন পুলিশ এক সঙ্গে যায়। অন্ততঃ তাই বলে ওরা। সত্যিই রোঁদে যায় কিনা তা আর কে দেখছে বল। সন্ধ্যা হতেই তো শহরের সবাই যে যার বাড়ীর ভেতর ঢোকে। সকাল হবার আগে আর বেরয় না। তাই ঐ রাস্তায় তিন রাত্রে তিনটে খুন—।" কথা শেষ না করেই কিষণচন্দ উঠে দাঁড়ালেন। ক্লাবের ফটকের দিকে চেয়ে বললেন—"চল, ওঠ এবার বাড়ী যাওয়া যাক।"

"সে কি? এই তো সবে আটটা। এখনি ক্লাব বন্ধ হবে না কি?"

"হাঁ, আজকাল সকাল সকালই বন্ধ হয়।" কিষণচন্দ তাঁর ঘরের জানালা বন্ধ করে হলের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জানালা বন্ধ হবার আগেই দিলীপ লোকটিকে দেখে ফেলেছিল। লম্বা চওড়া কালো কাফ্রী ধরনের একজন পুরুষ হন্ হন করে হলের দিকে এগিয়ে আসছে। সে বারান্দার প্রান্তের জোরালো আলোর নীচে আসতেই দিলীপ শিউরে উঠল—"ওঃ কি ভয়ানক।' লোকটির মুখের একটা দিক পুড়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। সেদিকে চোখটাও ঢেলার মতন বেরিয়ে রয়েছে।

কিষণচন্দ দিলীপকে ঠেলে ঘরের বাইরে এনে দরজায় তালা দিতে দিতে একটা সাঙ্কেতিক শব্দ করলেন। অমনি হলে উপবিষ্ট মেম্বাররা বই আর কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে সেই কুশ্রী লোকটি হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দিলীপ দেখল সে কেবল কুরূপই নয়, তার মুখে আর ভালো চোখটাতেও কেমন একটা হিংস্রভাব।

কিষণচন্দকে চাবী হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল,—"মিষ্টার কপূর, আজ কি এখনই ক্লাব বন্ধ করবেন নাকি?"

"কি করব বলুন, মিষ্টার সহায়? রাত আটটা। এখনও অন্য মেম্বররা এলেন না। যাঁরা এসে-ছিলেন তাঁরা বাড়ী ফিরতে চান।"

দিলীপ পেছন ফিরে দেখল হলে উপস্থিত ব্যক্তিরা ভিন্ন একটি দরজা দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। মিষ্টার সহায় বললেন—"কিন্তু কুড়ি তারিখে যে বাজী রেখে ব্রিজ খেলার কথা ছিল। আজই তো কুড়ি তারিখ।"

"কথা তো ছিল। কিন্তু খেলোয়াড়রা উপস্থিত না হলে কি করব বলুন?" কথা বলতে বলতেই কিষণচন্দ বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পেছনে ক্লাবের চাপরাসী আর চৌকিদার হলের দরজা জানালা বন্ধ করছিল।

মিষ্টার সহায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিষণচন্দের দিকে চেয়ে বেশ একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত কর্কশ স্বরে বললেন—"আমার যদি আজ এখানে আসবার কথা না থাকতো তাহলে বোধহয় এত শীঘ্র ক্লাব বন্ধ করার দরকার হত না। তাই না মিষ্টার কপূর?"

হলের দরজার চাবীটা মিষ্টার সহায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে কিষণচন্দ বললেন—"বেশ তো আপনি এখানে বসে বইটই পড়ুন। এই চাবী রইল। যাবার সময়ে হলের দরজায় তালা দিয়ে চাবীটা আপনার সঙ্গেই নিয়ে যাবেন। সকালে আপনার বাড়ী লোক পাঠিয়ে সেটা আনিয়ে নেব। আজ আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটু ব্যস্ত রয়েছি। অনেকদিন বাদে এ শহরে এসেছে সে। আমার বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়।"

মিষ্টার সহায় চাবীর গোছা স্পর্শও করলেন না। রুক্ষস্বরে বললেন—"সত্যিই তো আর শয়তান নই আমি যে একলা বসে নরক গুলজার করব। আপনারা সবাই আমাকে এভাবে এড়িয়ে চলাই যদি স্থির করে থাকেন তো ক্লাবের মেম্বার করলেন কেন আমাকে? টাকার জন্য?"

এবার কিষণচন্দও চটে উঠলেন—"ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বারের যা দেয় তা থেকে এক পয়সাও বেশী নিইনি আমরা আপনার কাছ থেকে। রমেশ যদি আপনাকে মেম্বার করবার জন্য ওরকম জেদ না করতো তাহলে আমরা কখনই আপনাকে মেম্বার করতাম না। সেই জোচ্চোরটা—"

"সাট আপ।" গর্জে উঠলেন মিষ্টার সহায়। 'খবরদার আমার বন্ধু রমেশের নামে কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করবেন না।' কিষণচন্দ তবু দমলেন না। বললেন—"ডেভিলের প্রাপ্য ডেভিলকে দিতে হবে বই কি।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন।" মিষ্টার সহায় ঘুসি পাকিয়ে কিষণচন্দের দিকে এগিয়ে এলেন।

সেই মুহূর্তেই বারান্দায় অপেক্ষমাণ দু'জন মেম্বার ভেতরে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে কিষণচন্দ আর দিলীপকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন—"বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না কিষণচন্দ। অজায় শুক্লার আর গোবিন্দ শর্মার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন নাকি?'

নিমেষে পাংশুবর্ণ হয়ে দ্রুতপদে ফটকের দিকে যেতে যেতে কিষণচন্দ ডাকলেন—"এস দিলীপ।"

"আপনি যান কিষণচন্দজী, আমি সমরেশের বাড়ীতেই যাব।" ক্লাবের মেম্বার দুজন—বাজপেয়ী আর সেনগুপ্ত—সঙ্গেই আসছিলেন। সেনগুপ্ত বললেন—"পাগল হলেন নাকি? অন্যদিন হলে যদি বা আপনাকে ঐ পথে এত রাত্রে ছেড়ে দিতাম, আজ সাক্ষাৎ শয়তান পিছনে থাকতে কি আর আপনাকে ঐ পথে একলা হেঁটে যেতে দিতে পারি?" 'শয়তান' কথাটা বেশ চাপাসুরে উচ্চারণ করে পেছন ফিরে চেয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। দিলীপও পিছনে চেয়ে দেখল মিষ্টার সহায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদেরই দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দিলীপ সেদিক থেকে ফিরে বলল—"বেশ তো হেঁটে না হয় নাই যাব। চৌকিদারকে বলুন না একটা টাঙ্গা কিংবা রিক্সা ডেকে আনুক।"

কিষণচন্দ ফটকের সামনে দণ্ডায়মান তাঁর মোটরে উঠতে উঠতে বললেন—"দেখলেন না, চৌকিদার আর চাপরাসী হলের বড় দরজাটায় তালা দিয়েই এইমাত্র কি রকম দৌড়ে তাদের কোয়ার্টারে চলে গেল। এখন লাখ টাকা দিলেও ওরা বাইরে আসবে না। তাছাড়া আজকাল সন্ধ্যার পর কোন ভাড়াটে গাড়ীই আর সহরের পথে চলাচল করে না।"

দিলীপের মনে পড়ল, এখানে আসবার সময়ে একটিও গাড়ী দেখতে পায়নি পথে। তবু অবাধ্যের মতন বলল—"আমি বাড়ীই যাব। হেঁটেই তো এসেছি।"

বাজপেয়ী বললেন—"আপনি কিষণচন্দজীর গাড়ীতে উঠুন। আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসছি আমরা। এতজনে একসঙ্গে গেলে-এলে কোন বিপদ হবে না।"

"সেই ভাল।"—বলে কিষণচন্দ একরকম জোর করেই দিলীপকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। অন্য দু'জনও গাড়ীতে উঠলে তিনি গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বড় রাস্তায় উঠেই তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে এত বেশী বেগে গাড়ী চালালেন যে, গাড়ীর ঝাঁকানীতে আরোহীরা কথা বলার সুযোগ পেল না। যে-পথ মোটরের সাধারণ গতিতে কুড়ি মিনিটে যাওয়া যায়, সেই পথই দশ মিনিটে অতিক্রম করলেন তাঁরা। সমরেশের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিয়ে, দরজা খুলে কিষণচন্দ বললেন—"আচ্ছা, আজ আসুন গিয়ে। কাল দিনের বেলায় আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

দিলীপ গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মোটরটা আবার সবেগে রাজপথে উঠে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। মোটরের শব্দ শুনে সমরেশ প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছিল। দিলীপ ভেতরে গেলে সে দরজায় তালা দিল। দিলীপ বলল—"তোমরা কি সবাই পাগল হলে নাকি? এই তো সবে সাড়ে আটটা কি ন'টা। এরই মধ্যে সদরে তালা দিলে?"

"শীতের সময়ে এসব জায়গায় আটটা-ন'টাতেই রাত হয়, তা কলকাতায় থেকে ভুলে গিয়েছ বন্ধু।" সমরেশ উত্তর দিল। "তাছাড়া আমাদের পাগলামির হেতু শুনলে কালই তুমি ভয়ে এ শহর ছেড়ে পালাতে চাইবে। চল, এখন খাওয়াদাওয়া সেরে নেই, তারপর বলব তোমায় সব ঘটনা।"

সে রাত্রে সমরেশ দিলীপকে যে গল্পটি শোনাল, তা সংক্ষেপে এই—

বছর কয়েক আগে বোম্বাই প্রদেশবাসী দুই ভাই বিষণপুরে হীরাচন্দ মোতী-চন্দ এণ্ড সন্স নামের একটা অলংকারের দোকান খোলেন। বড় ভাই হীরাচন্দ আগে কোন একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। পেন্সান নেবার পর

তিনিই তাঁর সঞ্চিত টাকা দিয়ে দোকানটা খোলেন। ছোট ভাই মোতীচন্দ ছিলেন নামেমাত্র দোকানের অংশীদার।

হীরাচন্দের এক বন্ধুর ছেলে রমেশ একাউণ্টেন্স পরীক্ষার পাস করে এখানের ব্যাঙ্কে একটা চাকরীর চেষ্টায় হীরাচন্দের সঙ্গে দেখা করে। তিনি রমেশকে নিজের দোকানেই ক্যাশিয়ারের কাজ দেন। হীরাচন্দ যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন রমেশ বিশ্বাসভাজনের মতই কাজ করেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ছোট ভাই মোতীচন্দের সঙ্গে রমেশের বনিবনা হয়নি। মোতীচন্দ তাঁর নিজের হিসাবপরীক্ষক দিয়ে হিসাবের খাতা আর ক্যাশ পরীক্ষা করালে দেখা গেল, হিসাবে প্রায় হাজার টাকার গোলমাল রয়েছে। রমেশ বলে, মোতীচন্দই এ টাকা তার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া রসিদ সে অন্যান্য দরকারী রসিদের সঙ্গে ক্যাশবাক্সতেই রেখেছিল। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার সময়ে রসিদটা পাওয়া গেল না। কাজেই মোতীচন্দজী তহবিল তছরুপের অভিযোগে রমেশকে জেলে দিলেন।

যেদিন রমেশের জেল হয়, সেই রাত্রেই মোতীচন্দ অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন। সবাই সন্দেহ করে রমেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু ঐ ভয়ানক-দর্শন সহায়টাই তাঁকে খুন করেছে। কারণ, রমেশের মামলার রায় বেরোবার পর আদালতের বাইরে এসে সহায় মোতীচন্দকে শাসিয়ে বলে—"নিরপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়ায়, ভগবান কখন তাকে ক্ষমা করেন না, এ কথা মনে রাখবেন মোতীচন্দজী।"

কিন্তু পুলিশ সহায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পায়নি। মোতীচন্দজীর খুনের সময়ে সে ক্লাবে বসে বাজী রেখে তাস খেলছিল। এই খেলার সময়ে ডাক্তার শুক্লা আর গোবিন্দ শর্মা নামের দুজন মেম্বারের সঙ্গে সহায়ের প্রথমে ঝগড়া, তারপর হাতাহাতি হয়ে যায়। সহায় তাদের শাসিয়ে বলে—"এর শোধ নেব আমি।"

এই ঝগড়ার পর দুই সপ্তাহের মধ্যেই বাড়ী ফেরবার পথে ডাক্তার শুক্লা আর গোবিন্দ সহায় নিহত হন। এঁদের আততায়ীকেও ধরা যায়নি। শুক্লার মৃত্যুর সময়ে সহায় তার দোকানে ছিল। এর তিন-চারজন নিরপেক্ষ সাক্ষী আছে। গোবিন্দ শর্মার মৃত্যুর সময়ে সহায় ক্লাবে ছিল—এ কথা ক্লাবের কয়েকজন মেম্বার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবুও স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করছে যে, সহায় পিশাচ-সিদ্ধ পুরুষ। তার সঙ্গে যারই ঝগড়া হবে কিংবা যে কেউ কোন কারণে তার বিরাগভাজন হবে, সে-ই তার অধীনস্থ পিশাচের হাতে মরবে। এই কুসংস্কারের ফলে কেবল চাকরবাই নয়, ক্লাবের মেম্বাররা আর অন্যান্য সহরবাসীরাও সহায়কে এড়িয়ে চলছেন।"

গল্প শুনে দিলীপ হেসে উঠল—"আমি কালই গিয়ে সহায়ের সঙ্গে ভাব করব। সে যদি সত্যই পিশাচ-সিদ্ধ হয় তো তার কাছ থেকে পিশাচ-সিদ্ধির মন্ত্র শিখে নেব। আর তা যদি না হয়, তো একজন নিঃসঙ্গ বন্ধুবৎসল লোককে বন্ধু পাব তাই বা কম কি?"

সমরেশ বলল—"অত সাহস দেখিও না বন্ধু। ভাব করতে গিয়ে যদি তার বিরাগভাজন হয়ে পড়, তাহলে পিশাচের হাতে না হলেও, তার পোষা গুণ্ডার হাতে যে মরবে, তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ও সব হাঙ্গামার না গিয়ে যে কয়দিন এখানে আছ, আমাদের আনন্দ বর্ধন করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

সমরেশ নিষেধ করলেও দিলীপের অদম্য কৌতূহল তাকে পরদিন সহায়ের কাপড়ের দোকানে টেনে নিয়ে গেল। জটিল মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিল সে এক সময়ে। এখনও কলেজে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপনা করে। কাজেই কোন কৌতূহলপ্রদ চরিত্রের কথা শুনলেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসুক হয়ে পড়ে সে।

সহায়ের দোকান বাজার অঞ্চলের মাঝামাঝি একটা বেশ বড় দোতলা বাড়ীর নীচের তলায় অবস্থিত। দোকানটি এখানের অন্যান্য কাপড়ের দোকানের মতন যা-তা করে সাজান নয়। বিলাতী কাপড়ের দোকানের মতন সুশৃংখলে নানা আলমারী ও শো-কেসে সাজান। দেখলেই বোঝা যায় মালিক সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি।

সহায় দোকানঘরের মাঝামাঝি একটা টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে কিছু লিখছিল। দোকানে আর কোন লোক বা কর্মচারী ছিল না। দিলীপকে দেখেই সহায় চিনেছিল। তাই ভ্রূকুঁচকে বিরক্ত সুরে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?"

তার রুক্ষস্বর অগ্রাহ্য করেই হাসিমুখে নমস্কার করে এগিয়ে এল দিলীপ। "কিছু চাই না মিস্টার সহায়। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি আমি। বর্তমানে এ সহরে নবাগত হলেও এক সময়ে এইখানেই বাস করতাম আমরা। সেই সময়ে আমার স্কুল-জীবনে রমেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারপর রমেশের বাবা এখান থেকে বদলী হয়ে গেলে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুনলাম, আপনিও তার বন্ধু। তাই আপনার সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছা হল।"

দিলীপের হাল্‌কা বন্ধুত্বপূর্ণ কথায় সহায়ের কুঞ্চিত ভ্রূ সোজা হলেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সহজ হল না। সে বলল, "আপনার সাহস তো কম নয় দেখছি। সাক্ষাৎ শয়তান বলে যে লোক আজ এ সহরে পরিচিত, যার দোকানে বা বাড়ীতে একজন চাকরও কাজ করতে সাহস পায় না, আপনি এসেছেন তারই সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে?"

"না বন্ধু, তোমাকে যারা ভয় পায়, আমি তাদের দলে নই, আমি মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। 'আগে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী'—এই মত মানি না। আমি বলি, কয়লার খনিতেই হীরা পাওয়া যায়। আপনার অন্তরও যে হীরার মতই উজ্জ্বল, তা বুঝেছি আমার বন্ধু সমরেশের কাছে আপনার বন্ধুবাৎসল্যের কথা শুনে।"

তোষামোদে দেবতাও বশ হন, মানুষ তো ছার। কিছুক্ষণ এই ধরণের হাল্‌কা আলাপে দিলীপ সহায়ের সন্দেহ দূর করে তার বন্ধুত্ব লাভে সক্ষম হল। দিলীপ দেখল, মানুষটির আপাতরুক্ষ প্রকৃতির নীচে দয়ামায়া, ন্যায়বোধ, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি সদ্গুণ ফল্গুধারার মতই বয়ে চলেছে। ছেলেবেলা থেকে তার এই কালো কাফ্রীর মত চেহারার জন্য সহায়কে সমবয়সীদের ও অন্যান্য পরিচিতদের পরিহাস সহ্য করতে হত। সে সময়ে রমেশ আর তার বাড়ীর লোকেরাই সহায়কে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাই সহায় রমেশের প্রতি সদাকৃতজ্ঞ থাকে।

তার এই কুশ্রী চেহারার জন্যই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেও সহায় কোথাও কাজ যোগাড় করতে পারেনি। রমেশ এ-কথা শুনে তাকে বিষণপুরে এসে দোকান খুলতে বলে এবং নিজের বউয়ের গহনা বিক্রী করে মূলধনের একাংশ দেয়। সহায় বলল, "রমেশের এ-টাকাটা না পেলে আমি কখনই দোকান দিতে পারতাম না। কারণ, আমার বাবা মারা যাবার সময়ে যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন চাকরীর সন্ধানে বেকার বসে খাওয়ায় তা ফুরিয়ে এসেছিল। রমেশ কেবল টাকাই দেয়নি দোকানের জন্য সুবিধা দরে আসবাব কিনে দেওয়া, কর্মচারী ঠিক করে দেওয়া, সবই করেছিল সে। সন্ধ্যার পর নিজেও এসে আমাকে কাজে সাহায্য করত।" রমেশের গুণকীর্তন করতে করতে সহায় উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—"সে যে কত বড় মহান্ আত্মা, তা তুমি জান না ভাই। সেই ভাল মানুষকে যারা মন্দ বলে, তাদের কখনও কল্যাণ হবে না। মোতীচন্দ, শুক্লা আর গোবিন্দ শর্মার হত্যা ভগবানের নিজের হাতে দেওয়া শাস্তি। অন্য যারা রমেশের নিন্দা করবে, তারাও এইভাবেই অপঘাতে মরবে, দেখ তুমি।"

দিলীপ তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে সহায়কে শান্ত করল। তারপর 'বেলা বাড়ছে, আজ যাই, কাল আবার আসব' বলে সে উঠে পড়ল।

বাড়ীর পথে দিলীপের সন্দেহ হল—হয়তো সমরেশের কথাই ঠিক। সহায় তার পোষা গুণ্ডার সাহায্যেই এই খুনগুলি করাচ্ছে। [illegible] চিন্তে সে থানার পাশ দিয়ে আসছিল। থানার ফটকের সামনে দাঁড়ান একটা মোটর থেকে পরিচিত গলায় আহ্বান এল—"আরে দিলীপ নাকি? তুমি এখানে?" দিলীপ মুখ তুলে দেখল গাড়ীতে বসে তার বন্ধু বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ পুলিশ অফিসার সুপ্রকাশ রায়। দিলীপ জিজ্ঞাসা করল—"তুমিই বা এখানে কবে এলে? হত্যা-রহস্যের গন্ধে যে এসেছ, তাতো বুঝতেই পারছি।"

সুপ্রকাশ গাড়ীর দরজা খুলে বলল, "নে গাড়ীতে উঠে আয়। হোটেলে গিয়ে সব কথা হবে।"

সুপ্রকাশ স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে নেমেছিল। সেইখানে নিজের ঘরে বসে সে বলল—"আজ সকালের গাড়ীতে এসেছি এখানে। বিষণপুরে যে রহস্যময় হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তার কোন কিনারাই এ সহরের পুলিশ করতে পারছে না। তাই দিল্লীর পুলিশের কাছ থেকে এঁরা একজন ডিটেক্‌টিভ চেয়েছিলেন। দিল্লীর কর্তারা আমাকেই পাঠিয়েছেন। এখন থানায় গিয়েছিলাম। এখানের অফিসার মিস্টার গুপ্তা সন্দেহ করছেন কোন একজন সহায় নামের লোকই এই সব খুন করাচ্ছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ কিংবা তার নিযুক্ত লোকটিকে ধরা যাচ্ছে না। তিনি চান আমি সহায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লাগি। আমি বলেছি, কারো বিরুদ্ধে কোন 'প্রেজুডিস' নিয়ে আমি কাজ করতে রাজী নই। আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।" মিস্টার গুপ্তা এ কথায় বিরক্ত হলেও নিরুপায় বলেই মেনে নিয়েছেন আমার সর্ত"।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল, "কবে থেকে কাজ আরম্ভ করবে?"

"দেখি। আজ তো সবে যে কনস্টেবলরা মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেছে, তাদের আর পুলিশ সার্জেণ্টের বক্তব্য শুনলাম।" দিলীপ কোন প্রশ্ন না করে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল সুপ্রকাশের দিকে। সে এর আগেও কয়েকবার সুপ্রকাশের অপরাধী নির্ণয়ের কাজের সাক্ষী ছিল। তাই জানতো সুপ্রকাশ অনেক সময়ে সামনে উপবিষ্ট দিলীপকে উপলক্ষ্য করে নিজের মনেই আগাগোড়া ঘটনাক্রম সাজিয়ে নেবার জন্য কথা বলে। সে সময়ে কোন প্রশ্ন করলে তার একাগ্রতা নষ্ট হয় বলে সে বিরক্তি বোধ করে।

সুপ্রকাশ বলতে লাগল—"আজ থেকে প্রায় একমাস আগে স্থানীয় ব্যবসায়ী মোতীচন্দজী রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে দোকান থেকে একলা হেঁটে বাড়ী ফেরার পথে চৌরাস্তার কাছাকাছি রইস মোহল্লায় মোড়ের বটগাছ তলায় নিহত হন। সকাল সাড়ে ছয়টার আগে স্থানীয় পুলিশ বা অন্য কেউ মৃতদেহ দেখতে পায়নি। সকালবেলায় যে গয়লারা রইস মোহল্লায় দুধ দিতে যায়, তারাই প্রথম মৃতদেহ দেখে। এরা থানায় খবর দিলে পুলিশের লোকেরা এসে তদারক আরম্ভ করে। পুলিশ সার্জেণ্টের মতে কোন একটা ভারী লোহার জিনিষের সাহায্যে খুব কাছ থেকে লোকটির মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। সে আঘাতে মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আঘাত এতই আচমকা হয়েছিল যে, মোতীচন্দ সাবধান হবার সুযোগও পাননি। চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়।

যে কনস্টেবলের রইস মোহল্লার রাত্রে রোঁদ দেবার কথা, সে স্বীকার করেছে যে, সে রাত্রে খুব বেশী শীত পড়েছিল আর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কুয়াসা হওয়ায় সে আশেপাশে না তাকিয়ে বড় রাস্তায় একটা চক্কর দিয়ে থানায় ফিরে গিয়েছিল। কাজেই রাস্তার ধারে বটগাছের ছায়ায় পড়ে থাকা মৃতদেহ সে দেখেনি।

মোতীচন্দজীর মতই ডাক্তার শুক্লাকেও মাথাতেই আঘাত করা হয়েছিল। তিনিও আচমকা আঘাত সামলাবার সময় পাননি। তাঁর মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল তাঁর আর মোতীচন্দের বাড়ীর মাঝের গলিতে একটা বড় নিম গাছের নীচে। এইবার যে কনস্টেবল রোঁদে গিয়েছিল, সেই রাত বারোটার কাছাকাছি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আবছায়া আলোয় গাছের নীচে কে শুয়ে রয়েছে দেখে লোকটা কে দেখবার জন্য তার দিকে টর্চের আলো ফেলে, ঐ ভয়ানক দৃশ্য দেখে পুলিশের হুইসিল বাজিয়ে অন্য কনস্টেবলদের ডেকে আনে। পুলিশ সার্জেণ্টের মতে এই খুনটাও রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে হয়েছে। ঐ সময়ে এদিকের রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই ছিল না। শুক্লার আর মোতীচন্দের বাড়ীর সবাই রোজকার নিয়মমত নটা-দশটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। কাজেই আহতের আর্তনাদও কেউ শুনতে পায়নি। তবে মোতীচন্দের বাড়ীর একজন চাকর বলেছে, সে রাত দশটার পর মনিব বাড়ীর বাসনমাজার কাজ সেরে কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্তে নিজের ঘরের দিকে যখন যাচ্ছিল, সেই সময়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা উৎকট হাসির শব্দ শোনে। ঐ শব্দ শুনে সে এক ছুটে নিজের ঘরে এসে ঘরের দোর বন্ধ করে দেয়। রইস মোহল্লার অন্যান্য বাড়ীর চাকররাও নাকি রাত্রে মাঝে মাঝে ঐরকম রক্ত হিম-করা হাসির শব্দ শুনেছে। তারা বলে, কোন পিশাচসিদ্ধ লোক এ-সহরে 'দানো' এনেছে। সেই দানোটাই রাত্রে লোকের বাড়ীর আশেপাশে ঐরকম হেসে বেড়ায় আর রাত্রে একলা পথিক পেলে তাকে হত্যা করে।

এই খুনীর তৃতীয় লক্ষ্য—গোবিন্দ শর্মাকে পাওয়া যায় ক্লাবের বড় মাঠটায়, যেখানে কয়েকটা বড় নিম আর অশ্বত্থ গাছ ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে, তারি তলায়। এই রাত্রেও খুব কুয়াসা হয়েছিল, রাত তখন দশটা। গোবিন্দ শর্মা কোন কাজে স্টেশনে গিয়েছিলেন। সেখানে অত রাত্রে কোন গাড়ী না পেয়ে হেঁটেই বাড়ী ফিরছিলেন। এই মাঠের উপর দিয়ে তাঁর বাড়ী যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পায়েচলা পথ আছে। তিনি সেই পথে গাছগুলোর তলায় আসতেই আততায়ী তাঁকে আঘাত করে। সেই সময়ে বাজার মোহল্লার কয়েকজন লোকও স্টেশন থেকে ঐ পথে বাড়ী ফিরছিল। তারা গোবিন্দ শর্মার আর্তনাদ আর পৈশাচিক একটা হাসির শব্দ শুনে পথের মধ্যেই থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে আলো না থাকায় তারা ঐ গাছের নীচে যেতে সাহস পায় না। দৌড়ে স্টেশনে গিয়ে খবর দেয়। সেখান থেকে পুলিশের লোকেরা আলো নিয়ে এসে দেখে, গোবিন্দ শর্মা মাথা ফেটে মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তাঁর তখনও প্রাণ ছিল কিন্তু হাসপাতালে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা যান তিনি।

পুলিশের লোকেরা বিশ্বাস করে, সহায়ই গুণ্ডা দিয়ে এই সব খুন করাচ্ছে।—এই বলে সুপ্রকাশ পুলিশের সন্দেহের যে কারণগুলি উল্লেখ করল, তা দিলীপ আগেই শুনেছিল সমরেশের কাছে। এ পর্যন্ত বিবরণ দিয়ে সুপ্রকাশ দিলীপকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তো কাল এসেছ এখানে। এর মধ্যে ঐ সহায়ের সম্বন্ধে আর কিছু শুনেছ কি?"

দিলীপ আগের রাত্রের ও সেদিন সকালবেলার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলল—"সহায়ের কাছে যা শুনলাম, তা সত্যি হলে বলতে হবে, মোতীচন্দ আর তাঁর বন্ধুরাও খুব সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। হয়তো তাঁর এই অসৎ সঙ্গীদেরই কেউ কোন কারণে চটে গিয়ে এঁদের ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

"সহায় মোতীচন্দজীর সম্বন্ধে এত সব জানল কি করে?"

"তার বন্ধু রমেশের কাছে শুনেছে সে। সহায় বলছিল, রমেশ সন্দেহ করে যে, মোতীচন্দ তাঁর বন্ধু ডাক্তার শুক্লার আর গোবিন্দ শর্মার সাহায্যে তাঁর বড় ভাই হীরাচন্দকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল তিনি মোতীচন্দের জুয়াখেলা ও অন্যান্য বদ কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। হীরাচন্দ রমেশকে বলেছিলেন, মোতী দোকানের বহু টাকা বদখেয়ালে নষ্ট করেছে। এভাবে বেশীদিন চললে আমাকে পথে বসতে হবে। তুমি আমার অনুমতি ছাড়া মোতীকে এক পয়সাও দিও না।"

যেদিন হীরাচন্দ রমেশকে একথা বলেন তার কয়েক দিন পরেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। চিকিৎসা করেছিল শুক্লা, ডেথ সার্টিফিকেটও সেই লিখেছিল। গোবিন্দ শর্মার দোকান থেকে ওষুধ আনিয়ে ছিল শুক্লা। নিজের ডিসপেনসারী থেকে দেয়নি।

কেবল রমেশই নয়, হীরাচন্দের বিশ্বস্ত ভৃত্য বুন্ধুলালও সন্দেহ করে তার মনিবকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। একদিন মোতীচন্দের সঙ্গে ঝগড়ার সময়ে রমেশ তার সন্দেহের কথা বলে ফেলে তাই মোতীচন্দ তহবিল তছরূপের অভিযোগে তাকে জেলে দিয়েছেন। সহায় বলল আমি লোকের কাছে এও শুনেছি যে, মোতীচন্দ তাঁর ভাইপো চুন্নীলালকেও বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুন্ধুলাল সময় মতন অন্য একজন ডাক্তার এনেছিল তাই চুন্নীলাল বেঁচে গিয়েছে। সহায়ের কথারভাবে মনে হল খুনী কে তা সে কতকটা আঁচ করতে পেরেছে। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তোমার কাকে খুনী বলে সন্দেহ হয় তখন সে বলল—যতক্ষণ ন্যায়ের খড়্গ অন্যায়কারীর বলি চলেছে ততক্ষণ আমি বাধা দেব না। যে মুহূর্তে বুঝব আততায়ী কোন নিরপরাধকে খুন করেছে সেই মুহূর্তে আমি নিজের প্রাণের বিনিময়েও তাকে ধরিয়ে দেব। এই কথা বলার পর সহায় খুনের কথা নিয়ে আর কোন আলোচনা করতে রাজী হল না।

দিলীপের কথা শেষ হলে সুপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "তুমি এখন বাড়ী যাও দিলীপ। আমি বিকালে মোতীচন্দের বাড়ী তদন্ত করতে যাবার পথে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

সন্ধ্যায় দিলীপ আর সুপ্রকাশ মোতীচন্দের বাড়ী যাত্রা করল। সন্ধ্যা ছটা। শীতের অন্ধকার এরই মধ্যে সারা শহরে নিজের রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছে। রইস মোহল্লার বড় রাস্তায় বেশ দূরে দূরে এক একটা আলো জ্বলছে। তাতে ল্যাম্প পোস্টের তলায় খানিক দূর ছাড়া আর কোন স্থানই আলোকিত করতে পারছে না। এ পথে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। অনেকক্ষণ পর পর এক আধটা মোটর দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে তাতেই যা কিছু মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। বড় রাস্তার দুই পাশেই বড় বড় গাছের অন্ধকার। সেই দিকে চেয়ে সুপ্রকাশ বলল—যে কোন খুনীর পক্ষেই এ শহরে লুকিয়ে খুন করা সহজ।"

মোতীচন্দের বাড়ীর বারান্দায় উঠে কলিং বেল টিপতেই একজন বেশ লম্বা-চওড়া বলবান চাকর এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল "কাকে চাই?"

"আমরা পুলিশের লোক। এ বাড়ীর বর্তমান মালিক চুন্নীলালজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" সুপ্রকাশের কথা শুনে লোকটির মুখে চোখে কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে মিলিয়ে গেল। সে সসম্ভ্রমে সুপ্রকাশ আর দিলীপকে বসবার ঘরে বসিয়ে বাড়ীর ভেতর খবর দিতে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সে একজন একুশ বাইশ বছরের লম্বা সুদর্শন যুবককে হাত ধরে ধরে এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দরজার কাছে সরে গেল। যুবকটি তাদের করজোড়ে নমস্কার করে ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর পেছন ফিরে চাকরটার দিকে একবার চেয়েই গম্ভীর হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, "আমি আপনাদের কি সেবা করতে পারি?"

দিলীপের মনে হল যেন তোতাপাখীর মতন শেখান কথা আবৃত্তি করল যুবকটি।

সুপ্রকাশ বলল—মোতীচন্দজীর আর তাঁর বন্ধুদের খুনী আজও ধরা পড়ল না। তাই এখানের পুলিশ অফিসার আমাকে ঐ কাজে নিযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে আপনার আর আপনার বাড়ীর লোকদের সাহায্য চাই সর্বাগ্রে কারণ, মোতী-চন্দজীই আততায়ীর হাতের প্রথম বলি।"

দিলীপ কৌতূহলী দৃষ্টিতে চুন্নীলালকে লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল সুপ্রকাশের কথা শুনে চুন্নীলালের ঠোঁটের কোণে এক ঝলক রহস্যময় হাসি দেখা দিল। কিন্তু তখনই পেছনের লোকটির কাশীর শব্দ শুনে সে আবার সোজা হয়ে বসে একটু থেমে থেমে বলল—চাচাজীর খুনীকে ধরতে যা টাকা লাগে আমি দেব।" কথা বলার সময়ে তার মুখ গম্ভীর হলেও চোখে কেমন একটা কৌতুকের আভা দিলীপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেই কৌতুক নিভে গিয়ে দৃষ্টিটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—"আর কি করব বলুন।"

"আপনার আর আপনার বাড়ীর লোকদের একটা জবানবন্দী নেব। সে রাত্রে দশটা থেকে বারোটার মধ্যে কে কি করছিল তা জানা দরকার আমার।"

"শেষকালে কি আপনি এ বাড়ীর লোকদেরই খুনী বলে সন্দেহ করলেন নাকি? অথচ শহরে যদি ভালো করে খোঁজ করেন তো দেখবেন এখানে মোতীচন্দজীর মারাত্মক শত্রুর অভাব নেই। একজন তো বুক ফুলিয়েই বলে বেড়াচ্ছে পাপী মোতীচন্দ আর তার সঙ্গীরা মরে ভালই হয়েছে।" চাকরটি কর্কশ কণ্ঠস্বরে বলল।

সুপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"লোকটি কে চুন্নীলালজী?"

চুন্নীলাল এক গাল হেসে বলল, "ও হচ্ছে বুন্ধুলাল।" বুন্ধুলালের পরিচয় সুপ্রকাশ আগেই পেয়েছিল পুলিশ অফিসার গুপ্তের কাছে। এ বাড়ীর পুরান চাকর। হীরাচন্দ তাকে এত বিশ্বাস করতেন যে নিজের উইলে বুন্ধুলালকেই চুন্নীলালের গার্জেন করে গিয়েছেন। চুন্নীলালের পাঁচ ছয় বছর বয়সে তার মা মারা যান। সেই সময় থেকে সে বুন্ধুলালের স্নেহ যত্নেই মানুষ। এখনও সে চুন্নীলালকে সব সময় খোকার মতই আগলে বেড়ায়।

সুপ্রকাশ বলল—"আমি এখনও কাকেও সন্দেহ করিনি বুন্ধুলাল। কেবল চারদিকে সকলের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছি মাত্র। বলা তো যায় না তোমরা যে সংবাদটা তুচ্ছ মনে করছ সেই সংবাদটাই হয়তো খুনীকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করবে।"

মোতীচন্দজীর বউ এখানে নেই। তিনি খুন হবার আগেই তাঁর বউ বাপের বাড়ী গিয়েছেন। এখনও ফেরেননি। চুন্নীলালের এখনও বিয়ে হয়নি। এ সংবাদে দিলীপ আর সুপ্রকাশ দুজনেই বিস্মিত হল। কারণ এদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়।

চুন্নীলাল আর বুন্ধুলালের জবানবন্দীতে জানা গেল তারা দুজনেই সে রাত্রে রোজকার মতন রাত দশটার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। সকালের আগে আর তাদের ঘুম

ভাঙেননি। মোতীচন্দজীর রাত্রে বাড়ী ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কোথায় যেতেন তা একা জানে না। তবে চাকরেরা ফিসফাস করে বলছে উনি জুয়োর আড্ডায় আর অন্যান্য মন্দ জায়গায় যেতেন।

চৌকিদার তার জবানবন্দীতে বলল, মোতীচন্দজী এক একদিন অনেক রাত্রে মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরতেন। তাঁর বন্ধু শুক্লা কিংবা গোবিন্দ-শর্মা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে যেত। ওঁরা এখানে না থাকলে দুই এক রাত্র একেবারেই বাড়ী ফিরতেন না। কাজেই চৌকিদার একবার বাড়ীর চারদিক ভাল করে ঘুরে দেখে এসে ফটক-সংলগ্ন নিজের ঘরে শুয়ে থাকত। মোতীচন্দজী এসে ডাকাডাকি করলে উঠে ফটক খুলে দিত। মোতীচন্দজীর বাড়ী ফেরার এই অনিশ্চিত সময়ের জন্যই সে রাত্রে তিনি বাড়ী না ফেরায় চৌকিদার চিন্তিত হয়নি। পরদিন ভোর বেলায় বাড়ীর কাছের রাস্তায় লোকের গোলমাল শুনে সে আর বুদ্ধুলাল গিয়ে দেখে মোতীচন্দজী খুন হয়েছেন আর পুলিশ তাঁর মৃতদেহ পরীক্ষা করছে।

তারা বাড়ী এসে চুন্নীলালের ঘরের সামনে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর চাচাজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন। বুদ্ধুলাল তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করে।

চৌকিদার সে রাতে রাস্তায় কোন শব্দই শোনেনি। সুপ্রকাশের জেরার উত্তরে সে স্বীকার করল শীতের সন্ধ্যায় সে আর এ বাড়ীর ও আশে-পাশের কয়েক বাড়ীর চাকররা মিলে তামাক-টামাক খেয়ে থাকে। তা না খেলে এই দারুণ শীতে বড় কষ্ট হয়।

মোতীচন্দজীর বাড়ীর কাজ শেষ করে রাত প্রায় আটটা নাগাদ দিলীপ আর সুপ্রকাশ বাড়ীর বাইরে এল। পুলিশের গাড়ী এখানে পৌঁছেই ছেড়ে দিয়েছিল সুপ্রকাশ। পথে নেমে সে বলল, "কাল কোন্ পথ দিয়ে ক্লাবে যাচ্ছিলে তুমি? চল সেই পথেই হেঁটে ক্লাবে যাব। আজ ঐখানেই তদন্ত শেষ করব। কাল আবার শুক্লার আর গোবিন্দ শর্মার বাড়ী যাব খোঁজ করতে।"

দিলীপ সুপ্রকাশকে পথ দেখিয়ে আগের রাতের গলিতে এনে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা চুন্নী-লালকে তোমার কেমন মনে হল সুপ্রকাশ? তার আচরণ কেমন একটু অস্বাভাবিক নয় কি?"

"তুমি Abnormal Psychology পড়ে সব মানুষকেই অস্বাভাবিক দেখতে আরম্ভ করেছ দিলীপ। নইলে বয়সের তুলনায় একটু বেশী ছেলে-মানুষ, এ ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিকতাই আমি চুন্নীলালের আচরণে দেখিনি। বরং ঐ বুদ্ধুলালের আচরণই সন্দেহজনক। ওর ঘরটা একবার সার্চ করতে হবে।"

এই সময়ে পিছনে একটা চাপা পদশব্দ শোনা গেল। ওরা থামতেই শব্দটাও থেমে গেল। সুপ্রকাশ সেদিকে টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞাসা করল—"কে, কে ওখানে? সাড়া দাও নইলে গুলী করব।"

"না বাবুজী মারবেন না।" বলে একজন লোক গাছের আড়াল থেকে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। সুপ্রকাশ তার মুখে টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখে বলল—"তুমি মোতীচন্দের বাড়ীর চাকর নয়?"

"জী হাঁ। আপনাকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। ওখানে মনিবের সামনে কথাটা বলতে সাহস হয়নি আমার।"

"পুলিশের কাছে তুমিই তো বলেছিলে যে শুক্লা মারা যাবার রাত্রে তুমি বাড়ীর বাইরে হাসির শব্দ শুনেছিলে?"

"জী। কিন্তু যে কথা আমি পুলিশকে বলতে সাহস পাইনি তা হচ্ছে এই যে, আমার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করার আগেই দেখলাম খিড়কির দরজা দিয়ে প্রথমে আমার মনিব চুন্নী-লালজী তারপর লাঠি হাতে বুদ্ধুলাল বাড়ীর ভেতরে এল। মনে হল যেন মনিব বুদ্ধুলালকে টানতে টানতে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাচ্ছে আর বুদ্ধুলাল চাপা গলায় গর্জন করে কি যেন বলছে।"

"এ কথা পুলিশকে বলনি কেন?"

"জী, বুদ্ধুলালকে আমরা সবাই ভয় পাই। প্রথমদিন পুলিশের কাছে জবানবন্দীর সময়ে মনিব আর বুদ্ধুলাল সেই ঘরেই ছিলেন। আমি হাসির কথা বলতেই বুদ্ধুলাল আমার দিকে কটমট করে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে, আমি আর কিছু বলতে সাহস পাইনি। বুদ্ধুলাল আগে ডাকাতদলের সর্দার ছিল। চুন্নীলালজীর বাবা একবার তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকে সে ডাকাতি ছেড়ে তাঁর চাকরের কাজ নিয়েছে। কিন্তু বড় মনিব মারা যাবার পর ওর মতিগতি আবার খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

চাকরটা চাপা গলায় কথা বলতে বলতে ভয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছিল। আচমকা গাছের আড়াল থেকে সেই ভৌতিক হাসি শোনা গেল। সুপ্রকাশ হাসির দিক লক্ষ্য করে ছুটে গেল। দিলীপও তাকে অনুসরণ করল। খানিকদূর গিয়ে তারা দেখল আবছায়া মতন দু'জন লোক একটা বাংলোর দেওয়ালের আড়ালে চলে গেল। সেই জায়গায় গিয়ে টর্চের আলোয় ভালো করে দেখে সুপ্রকাশ বলল, "এ যে দেখছি মোতীচন্দের বাড়ীর পিছনদিকের চাকরদের বাড়ীর ভিতরে যাবার খিড়কীটা।"

দিলীপ বলল—কি করবে, আবার বাড়ীর ভেতর যাবে নাকি?

"না। চল থানায় গিয়ে কয়েকজন কনস্টেবল পাঠিয়ে সেই বাড়ীটাকে ভাল করে পাহারা দিক। আমার ভয় হচ্ছে চাকরটার জন্যে। খুনী যদি বুদ্ধু-লালই হয় তো চাকরটাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাকে না শেষ করে।"

"জী হাঁ। চাকরটাকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে বোকামিই করেছেন আপনি।" অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল।

"কে কে তুমি?"

বক্তা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সুপ্রকাশের টর্চের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে নমস্কার করে বলল—"জী, এ অধমের নাম সহায়।"

"এখানে এত রাত্রে কি করছিলেন?"

"জী, পিশাচ সাধনা করছিলাম।"

"দেখুন মিস্টার সহায়, পুলিশের সঙ্গে তামাসা করবেন না। এমনিতেই আপনার বিরুদ্ধে এত বেশী সন্দেহ পুলিশের যে প্রমাণ না পেলেও কেবল মাত্র আপনার সন্দেহজনক গতিবিধির জন্যই আপনাকে আমরা হাজতে আটকে রাখতে পারি।"

সহায় তেমনি বেপরোয়াভাবে হাসতে হাসতে বলল— "বেশ তো, তাই করেই দেখুন না, যদি এ শহরের ভবিষ্যৎ খুনগুলো রোধ করতে পারেন।"

দিলীপ শিউরে উঠে বলল—"তার মানে? ভবিষ্যতে আরও খুন হবে নাকি?"

সহায় রহস্যভরে হেসে জিজ্ঞাসা করল—"কি করবেন মিস্টার রায়? আমাকে গ্রেপ্তার করবেন, না বাড়ী যেতে দেবেন?"

সুপ্রকাশ বিরক্ত হয়ে বলল—"আজ রাত্রে আর কিছু বললাম না। কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব। দয়া করে বাড়ীতেই থাকবেন।"

"আমার বাড়ীর উপর তো পাহারাই রেখেছেন আপনারা। আমি কোথায় যাই, কি করি সবই তো পুলিশ অফিসার গুপ্তার নখাগ্রে। থানায় গিয়ে হয়তো শুনবেন এরই মধ্যে আপনার সঙ্গে আমার মোলাকাতের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে তাঁর কাছে। আচ্ছা চলি, নমস্তে।" বলে সহায় অন্ধকারে মিশে গেল।

দিলীপরা চাকরটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এসে দেখল চাকরটাও পালিয়েছে। দিলীপ বলল—"পালিয়েছে না খুন হয়েছে একবার ভাল করে দেখা দরকার।"

দুজনে টর্চের আলোয় রাস্তা পাশের জায়গাগুলো খোঁজ করে দেখল। কোথাও কোন জীবিত বা মৃত লোকের সঙ্গে দেখা হল না। অগত্যা থানায় গিয়ে সে রাত্রের মতন ঐ পাড়ার কড়া রকম পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে হোটেলে ফিরে গেল। দিলীপ ফিরল রমেশের বাড়ী।

পরদিন সকালেই সুপ্রকাশ দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে বেরুল তদারকে। ডাক্তার শুক্লার বাড়ীর আর গোবিন্দ শর্মার বাড়ীর সকলের জবানবন্দী নিয়ে সে গেল জেলখানায় রমেশের সঙ্গে দেখা করতে। রমেশের কাছে তারা মোতীচন্দের অসৎ কার্য-কলাপের সংবাদের সঙ্গেই সহায়ের অপূর্ব বন্ধু-বাৎসল্যের কথাও শুনল।

রমেশ বলল—সহায় দেখতে খারাপ বলে তার আত্মীয়রা, স্কুল-কলেজের সহপাঠীরা, এমন কি শিক্ষকরাও প্রায়ই বিদ্রূপ করতেন। তাই তার প্রতি আমার কেমন করুণা হত। আমি নিজেই যেচে তার সঙ্গে ভাব করেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে আমার বাবা মাও তাকে আমারই মতন স্নেহ করতেন। সহায়ের বাড়ীতে তার বাবা ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনিও পূজাপাঠেই সময় কাটাতেন। কাজেই স্নেহ-ভালবাসার কাঙ্গাল সহায় আমার খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।

এলাহাবাদে কলেজে পড়ার সময়ে আমরা একই ঘরে থাকতাম। একবার কি করে যেন হোস্টেলে আগুন ধরে গিয়েছিল। সহায়ের ঘুম ছিল হালকা। সেই প্রথমে আগুন লাগার কথা জানতে পারে। আমি চিরদিনই কুম্ভকর্ণ। বারবার চেষ্টা করেও জাগাতে না পেরে ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাকে কাঁধে তুলে সহায় দোতলা থেকে নীচের তলায় আসে। আমরা ছাড়া আর সবাই তখন বাড়ীর বাইরে। সহায় আমাকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে সেই জ্বলন্ত দরজার মধ্য দিয়ে ছুটে বাইরে আসে। ফলে তার হাত দুটো, মুখের একটা দিক আর মাথার চুল কিছু কিছু পুড়ে গিয়েছিল। আমাকে বাইরে এনেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। পরে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে যখন সে বাইরে এল তখন তার মুখখানা আরও কুশ্রী হয়ে গিয়েছে।

সহায় আমার জন্য না করতে পারে এমন কাজ নেই। কিন্তু সে কখনও এই খুন করেনি। সে জানত মোতীচন্দজীকে ভয় দেখিয়ে যদি বা আমাকে মুক্ত করা সম্ভব, তিনি মারা গেলে সে সম্ভাবনা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। মোতীচন্দজী ছাড়া সেদিনের টাকার লেনদেনের সাক্ষী আর কেউ ছিল না। দোকানে আমি ছাড়া আরো দু'জন সেলসম্যান থাকতো। দুপুরে একজন খেতে গিয়েছিল। অন্য-জনকে মোতীচন্দজী দোকানে এসেই কি একটা জিনিষ কিনতে বাজারে পাঠিয়ে দেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার কাছে ক্যাশ বাক্সে এখন কত টাকা আছে?"

আমি গুণে বললাম, "আজই সকালে দু'জন ক্রেতা এসে কিছু গহনা নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গিয়েছেন। তাতে এখন প্রায় হাজার টাকা জমেছে ক্যাশে। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসুন আপনি।"

মোতীচন্দজী হিসাবের খাতা পরীক্ষা করে দেখে টাকাটা তুলে নিলেন।

আমি বললাম—"একটা রসিদ লিখে দিয়ে যান। নইলে কোন গোলমাল হলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।"

মোতীচন্দজী বিরক্ত হয়ে একটা রসিদ লিখতে বসেন। এই সময়ে দোকানে একজন খরিদ্দার আসায় তিনি রসিদটা নিজের পকেটে রেখে তাকে অলংকারাদি দেখাতে লাগলেন। তারপর খরিদ্দার-

দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দোকানের বাইরে চলে গেলেন।

যে লোকটা খান খেতে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বলল—মোতীচন্দজী তো খদ্দেরের গাড়ীতেই বাড়ী চলে গেলেন। শুনে আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সেইদিনই দোকানের শেষে আমি মোতী-চন্দজীর বাড়ী গেলাম। তিনি রসিদ তো দিলেনই না, উপরন্তু আমায় চোর বলে গাল দিলেন। আমিও রাগ সামলাতে না পেরে বলে ফেললাম—"যে লোক নিজের ভাইকে বিষ খাইয়ে মেরেছে আর ভাইপোকে মারবার চেষ্টা করেছিল তার পক্ষে অন্যকে মিথ্যা দোষে চোর বলে গাল দেওয়া শোভা পায় না।"

আমার কথায় মোতীচন্দজী রাগে লাল হয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর ভাইপো চুন্নীলাল সেই ঘরে এসে পড়ায় তিনি ভয়ে পাংশু হয়ে আমতা আমতা করে আমায় বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, এই নাও রসিদ। এখন যাও আর আমায় জ্বালিও না।" বলে তিনি পকেট থেকে সকালে লেখা রসিদটা বের করে দিলেন।

এর কয়েকদিন পরেই তিনি নিজের তরফ থেকে একজন হিসাব পরীক্ষক আনিয়ে আমার খাতা পরীক্ষা করালেন। সে আমার নামে হাজার টাকা তহবিল তছরুপের দোষ দিল। দোকানের যে ক্যাশ বাক্সে দরকারী রসিদ থাকতো তাইতেই আমি মোতীচন্দের দেওয়া রসিদটাও রেখেছিলাম। কিন্তু দরকারের সময়ে সেই রসিদটা ছাড়া অন্য সব রসিদই পাওয়া গেল। আমার সন্দেহ হয় মোতী-চন্দজী নিজে কিংবা সেই হিসাব পরীক্ষককে দিয়ে রসিদটা সরিয়েছিলেন। আপনারা যদি সেই হিসাব পরীক্ষককে চেপে ধরেন তাহলে সত্যি কথা জানতে পারবেন।"

রমেশের কাছ থেকে দিলীপরা যখন জেলের বাইরে এল তখন বেলা দুপুর। সুপ্রকাশ গেল থানায়। দিলীপ খাওয়া-দাওয়া সেরে সহায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দিলীপের কাছ থেকে রমেশের সব কথা ও তার অনুরোধ শুনে সহায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চিন্তিতভাবে বলল—বেশ, কাল তোমাকে জানাব অপরাধীকে ধরতে তোমাদের কতটা কি সাহায্য করতে পারব। আজকের রাতটা আমাকে ভাববার সময় দাও।"

সেইদিন রাত্রেই সুপ্রকাশ দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে গেল। সেখানের মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝল তারা সবাই চায় এখনি সহায়কে গ্রেপ্তার করা হোক, নইলে এ শহরে কেউই নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছে না। রইস মোহল্লার দু' একজন মেম্বার বললেন, "এভাবে আর কিছুদিন চললে বাড়ীতে চাকর রাখা দায় হবে। তারা বলাবলি করছে এ পাড়ায় দানো এসেছে। সে সমস্ত রাত পাড়াময় লোকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যে কেউ সেই দানোর হাসি শুনবে তাকেই মরতে হবে। মোতীচন্দের যে চাকর সেই হাসি শুনেছিল কাল রাত্রি থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

এ খবর শুনে সুপ্রকাশ সেই রাত্রেই মোতী-চন্দের বাড়ী 'সার্চ' করালেন। কিন্তু চাকরটার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। বুদ্ধুলাল বলল—"সে কাল রাত্রি থেকে কোথায় গিয়েছে তা আমরা জানি না।"

পরদিন সকালে দিলীপ আর সমরেশ চা খেতে বসেছে এমন সময়ে সুপ্রকাশ এসে হাজির। সে বলল, "এখনি খবর পেলাম সেই চাকরটার মৃতদেহ রইস মোহল্লার শেষ দিকে মাঠের ধারে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। খানিক আগে কয়েকজন ঘেসেড়া ঘাস কাটতে গিয়ে মৃতদেহ দেখে এসে থানায় খবর দিয়েছে। থানার লোক গিয়ে চাকরটাকে চিনতে পেরে মিষ্টার গুপ্তাকে আর আমাকে খবর দিয়েছে। গুপ্তা গাড়ীতে বসে রয়েছেন। তুমি যাবে তো চল দিলীপ।"

দিলীপরা মাঠে পৌঁছে দেখল সেখানে তখন রীতিমত ভীড় জমে গিয়েছে। ভীড়ের মধ্যে একজন লোক খুব কান্নাকাটি করছিল। খোঁজ নিয়ে জানল সে মৃত চাকর সুখনের ভাই রামু। রামু এই পাড়ার শেষ বাড়ীটায় চাকরী করে। সে বলল—"কাল অনেক রাত্রে তার ঘরের জানালায় সুখন এসে কাতর সুরে ডেকে বলেছিল, "তোদের খিড়কিটা খুলে দে রামু। আমি আজ রাতটা তোদের বাড়ী থাকব। কিন্তু আমার বউ বলল—এ নিশ্চয় সেই পিশাচটার কাজ। তোমার ভাইয়ের বেশ ধরে এসে তোমাকে ডাকছে। বাইরে গেলেই মেরে ফেলবে।"

"বউয়ের কথা শুনব কি না শুনব ভাববার আগেই ঘরের বাইরের সেই লোকটা ছুটে পালাল। তারপরই সেই হাসি আর একটা আর্তনাদ শুনে আমরা ভয়ে সারারাত রাম নাম করেই কাটিয়েছি। তখন কি জানি যে, আমার ভাই ঐ দানোর হাত থেকে পালিয়ে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল!"

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন—"অন্য তিনটি খুনের মতই এটাও একইভাবে একই লোকের দ্বারা হয়েছে।"

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল—"কালই তো বলেছিলাম চাকরটাকে ছেড়ে দিয়ে ভাল করলেন না।"

সকলে মুখ তুলে দেখল সহায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখবামাত্র ভিড় সরে গিয়ে মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। গুপ্তা বললেন—"মিষ্টার সহায়, আর নয়। এবার আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন। আপনাকে আর ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।"

সুপ্রকাশ বলল, "থানায় যাবার আগে চলুন একবার মোতীচন্দের বাড়ী ঘুরে যাই। ওদের সকলকে চাকরটার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

মোতীচন্দের বাড়ীর সকলকে জেরা করা হয়ে গেলে সুপ্রকাশ হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলল—"আমার এই বন্ধু দিলীপ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। ও এক সময়ে একটা উন্মাদাগারে কাজও করেছিল কিছুদিন। তাই তার অভিজ্ঞতা থেকে সে বলছে এই খুনগুলো কোন পাগলের কাজ। তাকে খুনী ধরার ভার দিলে সে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে ধরে দেবে। এই শহরে আপনাদের জানাশোনা কোন পাগল আছে নাকি মিষ্টার গুপ্তা?"

গুপ্তা বিস্মিতভাবে একবার দিলীপের আর একবার সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন—"কই না তো, আমার এলাকায় কোন পাগল আছে বলে তো শুনিনি।"

সুপ্রকাশ সহায়, বুদ্ধুলাল আর চুন্নীলালের দিকে ফিরলেন। দেখলেন তারা সকলেই ত্রস্তভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চেয়ে আছে। সুপ্রকাশের প্রশ্নে তারাও নেতিবাচক উত্তর দিল।

সেই রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর দিলীপ বাড়ী থেকে বেরিয়ে মন্থর পদে রইস মোহল্লার পেছন দিকের গাছপালায় ঘেরা সেই গলিটা দিয়ে মোতী-চন্দের বাড়ীর দিকে গেল। খানিক গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেশলাই জেলে সিগারেট ধরাল। দেশলাইটা নিভিয়ে মাটিতে ফেলে সিগারেটে যেই সে একটা টান দিয়েছে অমনি মাথার উপর কিসের একটা আঘাত পড়ল খটাং। দিলীপ আর্তনাদ করে মাটির উপর গড়িয়ে পড়তেই সেই অদ্ভুত কিক কিক হাসি আর তার পরেই একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। এই সময়ে চারদিক থেকে কয়েকটা জোরাল টর্চের আলো এসে পড়ল যুদ্ধরত লোক কয়টির উপর। সেই আলোয় সব চেয়ে প্রথমে চেনা গেল সহায়কে। তাকে দেখেই পুলিস অফিসার গুপ্তা অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে গর্জন করে বললেন—"মিষ্টার সহায় এবার আপনি হাতেনাতে ধরা পড়েছেন।"

কিন্তু সুপ্রকাশ মিষ্টার সহায়ের দিকে না গিয়ে সেখানে উপস্থিত বুদ্ধুলাল আর চুন্নী-লালের হাতে হাতকড়া লাগাতে বললেন দুজন কনস্টেবলকে। গুপ্তা অবাক হয়ে বললেন—"আসল অপরাধীকে ছেড়ে ওদের কেন গ্রেপ্তার করলেন আপনি?"

সুপ্রকাশ বললেন—"এরাই আসল অপরাধী। কিন্তু ওকি? মিষ্টার সহায়ের মাথা ফাটল কি করে?" সুপ্রকাশ দিলীপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দিলীপ তখন সহায়ের মাথাটা কোলে নিয়ে বলছিল—"কেন বন্ধু ওভাবে নিজেকে বিপদের মুখে এগিয়ে দিলে তুমি?"

সহায় মূর্চ্ছিতভাবে একটু হেসে অস্ফুট স্বরে বলল—আর একবার বন্ধু বলে ডাক দিলীপ। তুমি আর রমেশভাই ছাড়া আর কেউ কখনো আমাকে বন্ধু বলে ডাকে নি ভাইয়া।"

দিলীপ চোখের জল মুছে বলল—"সুপ্রকাশ, তখনই বলেছিলাম সহায়কে আমাদের পরামর্শের কথা খুলে বল। তা শুনলে না। ও ভেবেছিল আমি বুঝি সত্যই অরক্ষিতভাবে রাত্রে পাগলকে ধরতে বেরোব। তাই আমার বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করেছিল। তারপর এখানে এসে আঘাত খেয়ে আমি আহত হয়ে পড়ে যাবার ভান করতেই ও পাগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ও তো জানত না যে, আমি অন্ধকারে এসেই মাথায় লোহার কালো শিরস্ত্রাণ পরে নিয়েছিলাম। ভেবেছিল পাগল বুঝি আমাকে মেরেই ফেলেছে। তাই ওকে ধরে ফেলবার জন্য তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদিকে সেই সময়ে পাগলের গার্জেনও এসে পড়ে অবস্থা বুঝে সহায়ের মাথায় ঘা বসিয়েছে। বুদ্ধুলাল ভেবেছিল আমি তো আহত হয়েইছি, সহায়কে আহত করতে পারলেই তার পাগল মনিবকে নিয়ে নিরাপদে সরে পড়তে পারবে।"

মিষ্টার গুপ্তা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কে পাগল? চুন্নীলাল? আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা সহায়কেই পাগল বলছিলে।"

গুপ্তার কথা শেষ হবার আগেই চুন্নীলাল হঠাৎ কিক, কিক কিক করে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন থানায় পুলিস অফিসার মিষ্টার গুপ্তার ঘরে বসে সুপ্রকাশ ঘটনাক্রম ব্যাখ্যা করছিলেন। "প্রথম দিন চুন্নীলালকে দেখেই দিলীপ সন্দেহ করেছিল তার মাথায় কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি। আমার মনে তখন বুদ্ধুলালের প্রতিই সন্দেহ জেগেছে। প্রথমতঃ ঐ ডাকাতে চেহারা তারপর চাকরদের উপর ওর অসীম প্রভাব। চাকররা যে তাকে ভয় পায় একটু পরেই সুখনের কাছে সে কথা শুনেও ছিলাম। ওদের বাড়ী সার্চ করার সময়ে বুদ্ধুলালের ঘরে লোহা বাঁধান বড় বড় দুটো পাকা বাঁশের লাঠি ছাড়া আর কোন অস্ত্রও দেখিনি ওদের বাড়ী। পরে অবশ্য জেনেছিলাম চুন্নীলালের কাছে একটা গুপ্তি ছিল যেটার ভেতরে তলোয়ারের বদলে লোহার ডান্ডা লুকান। সেটা নিয়েই চুন্নীলাল রাতে শিকারে যাবার আসবার পথের কোন বড় গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপর শিকার নাগালের মধ্যে এলেই তার মাথায় আঘাত করতো। খুব কাছ থেকে অত জোরে মাথার উপর আঘাত কেউই সামলাতে পারতো না। লাঠি দূর থেকে ব্যবহার করতে হয়। কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তি সময়-মত সাবধান হয়ে বসে পড়লে আঘাত কিছুটা এড়াতে পারে। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে এক হাত কিংবা আধ হাত তফাৎ থেকে সজোরে মাথায় আঘাত করতে হলে এই রকম ছোট অস্ত্রই দরকার। ঐ কাঠের খাপে অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখাও সহজ। দেখলে একটা বাহারে লাঠি ভাববে সবাই।"

গুপ্তা প্রশ্ন করলেন "কিন্তু নিজের কাকাকে আর তাঁর বন্ধুদের মারল কেন চুন্নীলাল?"

"কাকা তার বাপকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল

আর তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল—এই কথা দৈবক্রমে সে শুনে ফেলেছিল যেদিন রমেশ আর মোতীচন্দের মধ্যে টাকার রসিদ নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল সেদিন। এর আগেও চাকরদের কানাঘুষায় ঐ ধরণের কথা শুনেছিল সে। কিন্তু বিশ্বাস করে নি। সেদিন রমেশকেও ঐ কথা বলতে শুনে সে উত্তেজিত হয়ে মোতীচন্দের ঘরে ঢুকে পড়ে। ওকে দেখেই তাঁর ভীত বিবর্ণ মুখ আর তাড়াতাড়ি করে রমেশের সঙ্গে ঝগড়া মিটমাট করে নিতে দেখে চুন্নীলালের সন্দেহ আরও প্রবল হয়। সে বুদ্ধুলালকে ধরে পড়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য। ওর আগ্রহ দেখে বুদ্ধুলাল বলে ফেলে যে, মোতীচন্দজী তার বন্ধু ডাক্তার শুক্লা আর ঔষধ ব্যবসায়ী গোবিন্দ সহায়ের সাহায্যে হীরাচন্দজীকে মেরেছিল আর চুন্নীলালকে মারবার চেষ্টা করেছিল এ কথা সবাই জানে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাদের পুলিসে দেওয়া যায় না।"

চুন্নীলাল জিজ্ঞাসা করে "কোন প্রমাণ না পেলে মানুষ খুন করলেও খুনীর শাস্তি হয় না তাহলে?"

বুদ্ধুলাল বলে—"কোথায় আর হয় ভাইয়া। চোখের সামনেই তো দেখছ খুনীরা কেমন বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে।" তারপর দুঃখ করে বলে—"তোমার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনো মানুষ খুন করব না। তা না হলে নিজের হাতেই ওদের মাথা ফাটিয়ে শাস্তি দিতাম।"

একথা সবাই জানে শিশু আর পাগলের সামনে অসাবধানে কোন কথা বলতে নেই, কারণ তারা যা শুনবে তাই কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করবে। চুন্নীলালের বেলাতেও তাই হলো। মোতীচন্দজী ওকে ধুতুরা জাতীয় এমন কোন বিষ খাইয়েছিলেন যার দুটো প্রভাব ছিল—হয় মরবে আর না হয় চিরদিনের মতন পাগল হয়ে যাবে। বুদ্ধুলাল যদি সময় মতন অন্য ডাক্তার না ডাকত তাহলে চুন্নীলাল মরেই যেত। কিন্তু তা না হওয়ায় ওর ব্রেন কিছুটা খারাপ হয়ে যায়। চুন্নীলালের মামার বাড়ীর বংশে পাগল ছিল। তাই তাকেও পাগল বলে পরিচিত করে মোতীচন্দজী ওকে ডাক্তার শুক্লার পরিচিত একটা মেণ্টাল হোমে পাঠাতে চান। কিন্তু বুদ্ধুলাল দারুণ বিরোধিতা করায় তা সম্ভব হয় নি। বুদ্ধুলাল নিজের দেশজ ঔষধপত্র দিয়ে চুন্নীলালকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু ওর ব্রেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ হল না তা বুঝতে পারে নি। কেন না, ছেলেবেলা থেকেই চুন্নীলালের আচরণ কিছুটা পাগলাটে গোছেরই ছিল। সে যাই হোক, বুদ্ধুলালের কাছে শুনে দোষীর মাথা ফাটিয়ে তাকে শাস্তি দেবার কথা চুন্নীলালের মাথায় চেপে বসে। চুন্নীলাল রাত্রে খাবার খেয়ে শুতে যাবার পর বুদ্ধুলাল যখন নিশ্চিন্ত মনে চৌকিদারের ঘরে তামাক খেতে যেত সেই সময়ে চুন্নীলাল তার বাবার গুপ্তিটা নিয়ে বাড়ীর আশে-পাশে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত। আর সেই সময়েই সুযোগ পেয়ে প্রথমে তার কাকাকে পরে তার বন্ধুদের শেষ করে। পাগলের কাছে খুন করাটা একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়ায়। সে সুযোগ পেলেই রাত্রে বাড়ীর বাইরে গিয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত আর কুকুর-বেড়াল যা দেখতো, তাকেই ঢিল ছুঁড়ে মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

মোতীচন্দ খুন হবার পর আর সবার মতই বুদ্ধুলালও ভেবেছিল হয় সহায় আর না হয় অন্য কেউ তাকে মেরেছে। কিন্তু শুক্লা খুন হবার রাত্রে বুদ্ধুলাল কোন দরকারে চুন্নীলালের ঘরে গিয়ে তাকে বিছানায় না দেখে খুঁজতে বেরোয়। তারই ফলে খিড়কির দরজা খোলা রয়েছে দেখে সেদিকে গিয়ে দেখে চুন্নীলাল পাগলের মতন হাসতে হাসতে খিড়কির দিকে আসছে আর তার হাতে ঐ গুপ্তিটা। দেখেই বুদ্ধুলাল ভয়ে চমকে ওঠে। সে চুন্নীলালকে ধমকে তার হাসি থামিয়ে যখন টেনে বাড়ির মধ্যে আনছিল সেই সময়ে সুখন ওদের দেখে ভাবে তার মনিবই বুঝি বুদ্ধুলালকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

এরপর কয়েকদিন বুদ্ধুলাল চুন্নীলালকে সব সময়ে আগলে রাখত। কিন্তু সে হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল আর তারই সুযোগে চুন্নীলাল আবার বাইরে গিয়ে গোবিন্দ সহায়কে হত্যা করে।

চাকরটা যে রাত্রে খুন হয় সে রাত্রে প্রথমে বুদ্ধুলালই সন্দেহক্রমে চাকরটার পেছু নেয়। খানিক দূরে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে, চুন্নীলালও এসেছে। সে চুন্নীলালকে ধরবার চেষ্টা করতেই চুন্নীলাল হাসতে হাসতে খিড়কির পথে বাড়ীর ভেতর ছুটে পালায়। বুদ্ধুলালও তাকে অনুসরণ করে। আমরাও ওদের পিছনে গিয়ে দেখি খিড়কি ভেতর থেকে বন্ধ।

বুদ্ধুলাল পরদিন চাকরটাকে শহরে খুঁজে বেড়ায়। তাই শুনে সন্ধ্যার সময়ে যে বন্ধু সুখনকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল সে ভয়ে ওকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলে। বেচারা সুখন অনেক-খানি ঘুরে ঐ মাঠের পথ দিয়ে বেশ খানিকটা রাত্রে যখন ভাইয়ের বাড়ী পৌঁছেচে তখন কাছেই বুদ্ধুলাল ওৎ পেতে ছিল। বুদ্ধুলাল সেদিন চুন্নীলালকে ঘরে বন্ধ করে এসেছিল। ভেবেছিল নিজের হাতেই চাকরটাকে শাস্তি দিয়ে থানায় গিয়ে বলবে সেই এসব খুন করেছে। কিন্তু চুন্নীলাল জানালা দিয়ে বাইরে এসে তাকে অনুসরণ করেছিল। বুদ্ধুলালকে দেখে চাকরটা যেই মাঠের দিকে ছুটেছে অমনি সে তাকে তাড়া করে তার মাথায় গুপ্তির ঘা বসিয়ে দিল। বুদ্ধুলাল হাতের লাঠি তোলার আগেই কাজ শেষ করে হাসতে হাসতে পাগল বাড়ী ফিরে গেল।

গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "চুন্নীলালের যে মাথা খারাপ একথা তুমি সঠিকভাবে জানলে কি করে?"

"প্রথমতঃ জেলে রমেশের সঙ্গে কথা বলে। মোতীচন্দ, ডাক্তার শুক্লা আর গোবিন্দ শর্মা যেদিন রাত্রে তাঁদের দোকানে বসে হীরাচন্দ আর চুন্নী-লালকে বিষ খাওয়াবার পরামর্শ করছিলেন সেদিন রমেশ কোন একটা ওষুধ কিনতে একটু অসময়েই দোকানে গিয়েছিল। দোকানের দরজা আধ ভেজান আর ভেতরে আলো জ্বলছে দেখে সে ঘরের ভেতরে যায়। কিন্তু সেখানে কাউকে না দেখে সে যখন ফিরে আসবে কি না ভাবছে সেই সময়ে পাশের ঘরে মোতীচন্দের গলায় হীরাচন্দ সম্বন্ধে একটা মন্তব্য শুনে সে থেমে যায়। তারপর কিছু-ক্ষণ দরজার কাছে লুকিয়ে ওদের পরামর্শের কথা শুনে এসে পরদিন হীরাচন্দকে বলে। কিন্তু সাধু প্রকৃতির হীরাচন্দ রমেশের কথা বিশ্বাস করেন নি, বলেছিলেন "তুমি ভুল শুনেছ। ওরা বোধ হয় অন্য কারো কথা আলোচনা করছিল।"

রমেশের কাছ থেকে বাইরে এলে দিলীপ বলল—"আমি কালই বলেছিলাম চুন্নীলালের আচরণ কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে।" পরে সমরেশের কাছে শুনলাম চুন্নীলালের চিকিৎসার জন্য প্রথম দিন বুদ্ধুলাল তাকেই ডেকেছিল। চুন্নীলালকে যে বিষ খাওয়ান হয়েছিল এ কথা সমরেশ নিজে পুলিসে রিপোর্ট করে। কিন্তু মোতীচন্দ কোন রকমে তাদের অনুসন্ধান থামিয়ে দেন।

শেষ দিনে আমি আর দিলীপ পরামর্শ করে বুদ্ধুলাল আর চুন্নীলালকে জানিয়ে দিলাম যে, অপরাধী কে তা দিলীপ জানে। তারপর আপনাদের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার ফাঁদ পাতলাম। এই সময়ে সহায়কে আমাদের পরামর্শ থেকে বাদ দিয়ে মস্ত ভুল করেছিলাম। দিলীপ আগেই বলেছিল সহায় নির্দোষ। আমাদেরই মতন সেও অপরাধীকে ধরবার চেষ্টা করছে। তাই সে রাত্রে ওভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে প্রথমাবধিই তার প্রতি আপনারা যে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাই কাজ করছিল। সেই জন্যেই সহায়কে দলে নিইনি।

কিন্তু চুন্নীলালের বাড়ীতে সেদিন সকালে সে যখন শোনে যে, তার বন্ধু দিলীপ একাই অপরাধী ধরবার চেষ্টা করবে তখন সে ঠিক করে ফেলে যে, সেও দিলীপকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করবে। দিলীপের মাথার শিরস্ত্রাণের কথা সে জানত না। তাই দিলীপ আহত হবার ভান করে আর্তনাদ করতেই সে নিজের প্রাণের ভয় ভুলে আততায়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু প্রভুভক্ত বুদ্ধুলালের লাঠি যদি তার মাথায় না পড়তো তবে আহত হত না সহায়।

এই রাত্রে বুদ্ধুলাল মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই চুন্নীলালকে তো আটক করেই নি নিজেও তার সংগ নিয়েছিল। ভেবেছিল দিলীপকে শেষ করেই চুন্নীলালকে নিয়ে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে রাতারাতি।

সুপ্রকাশের কথা শেষ হলে দিলীপ বলল—"আমি খানিক আগে হাসপাতালে সহায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি নিরাপদে আছি দেখে সে আনন্দ প্রকাশ করে বলল—'দিলীপ ভাই, এবার আমার রমেশ ভাইকে জেল থেকে খালাস করে আন।'

আমি বললাম, 'সুপ্রকাশ রমেশের নির্দোষিতা প্রমাণ করার ভার নিয়েছে।' শুনে সে বলল—'আর আমার দুঃখ নেই ভাই। এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়েই মরতে পারব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুপ্রকাশ বললেন - "একেই বলে প্রকৃত বন্ধু। সহায় সত্যই খাঁটি হীরা।"

প্রদীপের ম্লান শিখা কেঁপে কেঁপে
চোখের পাতায়
ঘুম নামে। একটি স্পর্শ অনুভবে
বাতাস কি ভয়
অথবা মৃত্যুরই এই আবির্ভাব। হরিণ শিকারী
আমি দুর্বল ভেবে—
রাত্রির বিষণ্ন নদী পার হয় দুরন্ত উল্লাসে।
মাধুর্য-মন্থর এই স্বরচিত ঘর। দরজা খোলা
একান্ত সংসারে আমি একা।
আমি একা মনে মনে নিভৃত গোপন
যে কান্না প্রচ্ছন্ন বুকে প্রতিদিন দূরে
রেখে তাকে

নেপথ্য স্মৃতিতে মুখ
মিতভাষী বন্ধুর আলাপে।
না, আমি পারিনি দিতে কোনদিন
আনন্দ অথবা সুখ পরিচিত প্রতিবেশী যারা
শ্রাবণের সুরভিত ফুল আর ফুলের বেদনা।
স্তিমিত শোকের রাত্রি, ছায়াময় মৌন
অন্ধকারে

শিয়রে লুণ্ঠিত শব।
সামনে সে বসে আছে, অশ্রুনত আঁখি
বিচলিত আঙ্গুলের একটি অতল স্পর্শে
প্রাণ যদি ফেরে।

তাকে ঘিরে আদিগন্ত উজ্জ্বল শপথে
সারা রাত ক্লান্ত এক প্রদীপের ম্লান
শিখা কাঁপে।

কপাটের তৃতীয় শ্রেণীর হয়েও সন্তোষ মন্দ আয় করছিল না। তার উপর ডলির সঙ্গে বিয়ে হবার পর ওর ব্যবসাটা যেন আরও একটু ফেঁপে উঠলো। কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন, সেই রকম আর কি। তখন আলীপুরের এক জায়গায় ওর কাজ হচ্ছিল, সেদিন শনিবার মিস্ত্রীদের হপ্তার টাকাটা সকাল সকাল ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সন্তোষ একটা তিন নং বাসে উঠে পড়লো। তারপর বাস থেকে নেমে অর্ধ সম্পূর্ণ বাড়ীটার সামনে আসতেই ওর হেড মিস্ত্রী হাসি মুখে এক দীর্ঘ সেলাম ঠুকে এগিয়ে এলো। আজ সব মিস্ত্রীদেরই মনটা খুসী, কারণ হপ্তার টাকা পাবে। তারপর একটা প্যাকিং কেসের উপর রুমাল পেতে বসে হাত-চিঠি আর খাতাপত্র সাজিয়ে ও টাকাগুলো বার করতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখে মানি-ব্যাগটা নেই। সন্তোষের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে তন্ন তন্ন করে সবকটা পকেট ও দেখতে থাকে, আশ্চর্য কোথাও নেই! তাহলে কি পকেটমার? হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি? প্রায় ৫০০ টাকা ছিল, সবই গেছে! থানায় ডায়েরি লিখিয়ে সন্তোষ আবার ব্যাঙ্কে যায় টাকা আনতে, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আর কোন দিন যদি ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে ট্যাক্সি ভিন্ন ট্রামে বাসে উঠবে না।

কিছুদিন পরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আবার ওর ডাক পড়ে নতুন একটা কাজের জন্য। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্য একটা কাজের বাবদ মোটা টাকা জমা দিতে হবে ট্রেজারীতে। বেলা তখন দশটা, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, সন্তোষের পকেটে সেদিন অনেকগুলো টাকা রয়েছে তাই ও ট্রাম বাসের দিকে না গিয়ে ট্যাক্সি ধরতে স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হয়। কিন্তু স্ট্যান্ডে এসে দেখে একটাও ট্যাক্সি নেই। প্রায় মিনিট পনেরো পর একটা খালি ট্যাক্সি ধীরে ধীরে ঐদিকে আসছে দেখে। সন্তোষ সেটা ধরবার আশায় দৌড়ে যায়, কিন্তু ওকে আসতে দেখেই ট্যাক্সির ড্রাইভার হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে ডান দিকের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মিলিয়ে যাওয়া ট্যাক্সির দিকে ও হাঁ হয়ে বোকার মত চেয়ে থাকে। সন্তোষ আবার স্ট্যান্ডে ফিরে আসে। একটু পরে আরও একটা ট্যাক্সি আসে, সন্তোষ দরজা খুলতে গিয়ে দেখে হ্যান্ডেলটা ঘোরে না, ভেতর থেকে বন্ধ। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবেন? ও ভয়ে ভয়ে বলে এই কাছেই। ওর কথা শুনেই ড্রাইভার নেমে পড়ে গাড়ীর বনেট্‌টা খুলে দেয়, বলে দেখুন আমার ইঞ্জিনটা একটু খারাপ আছে, আপনি দয়া কোরে অন্য গাড়ী দেখুন। এরপর আর কিছু বলা যায় না। সন্তোষ দাঁড়িয়েই থাকে, যদি আর একটা ট্যাক্সি আসে এই আশায়। খানিক পরেই আর একটা এসে একটু দূরে দাঁড়ায়। সন্তোষ হাত নেড়ে তাকে দাঁড়াতে ইশারা কোরে ছুটে যায়, কিন্তু ওর আগেই আর একটি কোট প্যান্ট পরা লোক হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঐ ট্যাক্সিটায় উঠে বসে পড়ে, সন্তোষ প্রতিবাদ কোরে বলে "দেখুন আমি ওটাকে আগে ডেকেছি।" লোকটা বলে "না মশায়, আমি আগে ডেকেছি।" "কখনও নয়, আমি ঐ মোড় থেকে হাত নেড়ে ডাকছি, আর আপনি হঠাৎ এসে উঠে পড়লেই হল?" লোকটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের কথা কাটাকাটির মাঝখানেই মিটার নামিয়ে ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দেয়। সন্তোষ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর ঘড়িতে তখন ১২টা প্রায় বাজে, আর কিছুতেই দেরী করা চলে না, ওর জামা কাপড়ও তখন একটু একটু ভিজে গেছে, অথচ সেবারকার অভিজ্ঞতার পর বেশি টাকা নিয়ে ট্রাম বাসেও ওঠা যায় না। এমন সময় একটা রিক্সা দেখে শেষে তাতেই উঠে ও রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে রওনা হয়ে যায়।

রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে দেখে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তখন চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছেন। ওর আসবার কথা ছিল সাড়ে এগারটার সময়। পিওন বখশিসের আশায় ওকে ভদ্রতা করে বলে, আপনি এত দেরী করে এলেন? সাহেব তো আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। কাল সকাল সকাল এলে দেখা পাবেন। আজ লাঞ্চের পর সাহেব চিফ কমিশনারের সঙ্গে ইন্সপেকশনে থাকবেন। সন্তোষ লজ্জিত হয়ে ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে বলে কি করি বলো পকেটে বেশি টাকা নিয়ে ট্রামে বাসে উঠলে পকেটমারা যায়, তাই ট্যাক্সি ধরতে গেলুম কিন্তু কি করে জানবো বল যে, ট্যাক্সি করলে হয়তো ব্রহ্মাকেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অফিস টাইমে বৃষ্টি হলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। পিওন একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলে, বাবু আপনার নিজের গাড়ী নেই? রবিনবাবুর গাড়ী আছে, সত্যেনবাবুর গাড়ী আছে, বরেণবাবুও এবার একটা কিনেছেন। (ওঁরা হচ্ছেন সন্তোষের মতই অন্যান্য কন্ট্রাক্টর)। তাইতো নিজের একটা মোটর থাকলে ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সির দয়ার উপর আর নির্ভর করতে হয় না। সন্তোষ মনে মনে ঠিক করে এবার ও একটা মোটর কিনবেই। হাজার তিনেক হলেই তো আজকাল একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মোটর পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ত্রী ডলির এক ভাই বিনু, লরী ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করে, মোটর সম্বন্ধে তার বেশ জ্ঞান আছে। বাড়ী এসে তার সঙ্গে দেখা হতেই সন্তোষ তাকে একটা মোটরের খোঁজ করতে বলে। এবং তারপর নিজেও স্টেটস্‌ম্যান-এর বিজ্ঞাপনগুলো রোজ লক্ষ্য করে সন্তোষ কোনও মোটর বিক্রী আছে কি [illegible] একদিন স্টেটসম্যান-এ ডলির নজরে [illegible] একটা স্ট্যান্ডার্ড গাড়ী বিক্রী আছে। লেখা আছে গাড়ীটা সস্তায় দেওয়া হবে। মোটর কেনার কথা হবার পর থেকে ঐ ব্যাপারে ডলিরও খুব উৎসাহ।

সেদিন ছিল রবিবার, তাই সকালের দিকে ওরা দুজনেই ট্যাক্সি করে গাড়ীটা দেখতে গেল। অনেক খুঁজে খুঁজে মানিকতলার খালপারে একটা ভাঙাচোরা টিনের ঘরে শেষকালে ওরা গাড়ীটার নাগাল পেল। গাড়ীর মালিক অল্প বয়সী লোক, তিনি হয়তো ওদের দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, ওদের গাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই। কিন্তু গাড়ীটা দূর থেকে মন্দ দেখাচ্ছিল না। বেশ ছোট-খাট, ওদের পক্ষে ভালই। সন্তোষ মালিককে বল্লে, "একটু স্টার্ট করে দেখাতে পারেন?" অল্পবয়সী মালিক "নিশ্চয়" বলে নিজেই হ্যান্ডেল নিয়ে স্টার্ট দিতে শুরু করলেন। তাঁর হাতে মিনিট দশেক হ্যান্ডেল ঘুরপাক খেয়েও গাড়ী স্টার্ট হল না। মালিক একটু থমকে গিয়েছিলেন। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লেন, "অনেক দিন ব্যবহার হয়নি কিনা তাই ব্যাটারিটা একটু উইক হয়ে আছে, এখুনি স্টার্ট কোরে দিচ্ছি। এই খুকু তুই একটু [illegible]।" [illegible] তিনি [illegible]

খুলে ইঞ্জিনে এটা-ওটা ঠিক করে ড্রাইভারের সিটে বসলেন। পল্টু একটি কালোমত ছোকরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে হ্যান্ডেলটা নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। সে গলদঘর্ম হয়ে উঠলো; কিন্তু গাড়ী তবুও স্টার্ট হচ্ছে না। ব্যাপার দেখে সন্তোষ ঠিক করে ফেলেছিল ও গাড়ী -সে নেবে না, তাই একটু ইতস্ততঃ করে ওকে বলতেই হল যে, আর দরকার নেই কষ্ট করবার। ও গাড়ী ওর চলবে না। কিন্তু ঠিক সেই সময় গাড়ীটা স্টার্ট হয়ে গেল। মালিক উৎফুল্ল হয়ে বল্লে, "দেখলেন তো গাড়ীর ইঞ্জিন একদম নতুন, তবে কিছুদিন পড়েছিল তাই একটু দেরী হল।" গাড়ীটা স্টার্ট হতে দেখে ওরাও একটু খুসীই হল, কারণ ডলির ওটা পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ঐ অল্প বয়সী মালিকটিকে নিরাশ করতে ওদের কেমন যেন বাধছিল। তাই সন্তোষ জিজ্ঞেস কোরলে, "এর কত দাম?" ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেনে, "তিন হাজার"। "কিছু কম-সম হবে না?' "আজ্ঞে না, আমি এই দামেই আর একজন খদ্দের পেয়ে গেছি। তবে তিনি এক মাস পরে কিনতে চান, কিন্তু আমার এখুনি টাকার দরকার, তাই আপনি যদি এখনি নেন তাহলে ৫০্ টাকা কম করে দিতে পারি।" সন্তোষ ভাবলে, হয়তো বেশি দরাদরি করলে গাড়ীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই ও বল্লে, "আচ্ছা দেখুন ঐ ১০০্ টাকা বাদ দিয়ে ২৯০০শ টাকায় ওটা করে দিন"। লোকটি বল্লে, "আচ্ছা, তাই হবে, টাকা এনেছেন?' সন্তোষ ভাবেনি যে, এত সহজেই ও ১০০্ টাকা কমিয়ে ফেলতে পারবে, তবে টাকা তো ও আনেনি, তাছাড়া সেদিন রবিবার, ব্যাঙ্কও বন্ধ। সঙ্গে ওর গোটা ৩০শেক টাকা বড় জোর আছে। যদিও ওর বেশ লজ্জা করছিল। কিন্তু আর অন্য উপায় নেই দেখে ওকে বলতেই হল যে, আজ ও ২৫্ টাকা বায়না দিয়ে যাচ্ছে, তারপর কালকেই পুরো টাকা দিয়ে দেবে। অবশ্য মোটর ডিপার্টমেন্টে ভদ্রলোককে স্বয়ং গিয়ে গাড়ীটা ওর নামে বদল রেজিষ্ট্রীর ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে এবং কাল মোটর ডিপার্টমেন্টে যাবার পথে ওরা দেখেও নেবে গাড়ী কেমন চলে। ভদ্রলোক তাতেই রাজি হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। ওরা বেশ খুসী মনে বাড়ী এসে বিরুকে ফোনে জানিয়ে দিল যে, বেশ সস্তায় একটা ভালো গাড়ী পেয়ে গেছে, কালই রেজিষ্ট্রি হবে। তাই বিরু যেন বেলতলায় মোটর ডিপার্টমেন্টে অপেক্ষা করে। তাহলে পুরো টাকা দেবার আগে ইঞ্জিনটাও সে একবার দেখে নিতে পারবে।

পরের দিন সকালে ঠিক ১০টার সময় গাড়ীর মালিক সন্তোষের বাড়ীর দরজায় এসে কড়া নাড়লেন। সন্তোষ তৈরীই ছিল। সে বেরিয়ে এসে দেখতে পেল গাড়ীর ভিতর আরও তিন-চার জন লোক বসে আছে। অযথা এত লোক আনার কি দরকার ছিল তাও বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারলে গাড়ীতে উঠে বসার পর যখন গাড়ীর মালিক "এই পল্টু দেত এবার একটু ঠেলে" বলে ষ্টিয়ারিং ধরে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারটি ছোকরা পেছনের সিট থেকে নেমে গাড়ীটা ঠেলতে লাগলো। ব্যাপার দেখে সন্তোষ বল্লে "একি মশাই গাড়ী শেষ কালে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে নাকি?" মালিক জম্লি জবাব দিলেন "না না এই একটু শুধু নড়িয়ে দিলেই এখুনি স্টার্ট হয়ে যাবে।" কিন্তু নড়াতে নড়াতে প্রায় আধ মাইল গিয়েও গাড়ী স্টার্ট হল না। সন্তোষ যে গাড়ী কিনছে একথাটা এর মধ্যে ঝি, চাকরদের মুখ থেকেই বোধ হয় পাড়ায় রটে গেছিল, মোড়ের চায়ের দোকানের হরেনবাবু সন্তোষকে গাড়ীতে বসে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বল্লেন, "কি সন্তোষবাবু এমন স্পেশাল গাড়ী কিনলেন যে চারজন ড্রাইভার রাখতে হবে।" সন্তোষ আমতা আমত. করে বলে "না না কিনিনি এখনও শুধু দেখছি —একটু।" এবং এত ঠেলেও যখন চল্লনা তখন এ গাড়ী ও নেবে না বলে নেবে পড়তে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় গাড়ীটা স্টার্ট নিয়ে নিলে। গাড়ী গিয়ারেই ছিল তাই একটা হেঁচকা দিয়ে এগিয়ে চল্ল। চারটি ছোকরা পেছনে পেছনে ছুটছে। সন্তোষ বল্লে "থামান আপনার লোক-গুলো যে পেছনে রয়ে গেল।" "চেষ্টা করছি কিন্তু ব্রেকটায় সামান্য একটু দোষ আছে কিনা তাই থামছে না। এটা বলে দেয়াই ভালো, পারেন তো আপনি লাইনিংগুলো বদলে নেবেন। বেশ খানিক দূরে গিয়ে তবে গাড়ী থামলো। ছোকরা চারটে উঠে পড়লে মালিক ক্লাচ টিপে গিয়ার দিতে গেলেন ঘড়্-ঘড়্ ঘড়্-ঘড়্ শব্দ হতে লাগলো। গিয়ার আর নেয় না, সন্তোষ জিজ্ঞেস করে 'গিয়ার নিচ্ছেন' নাকি? মালিক বল্লেন হ্যাঁ, ঐ ফার্স্ট আর সেকেন্ড গিয়ারের দাঁতগুলো একটু ক্ষয়ে গেছে কিনা। গিয়ার বক্সটা আপনি বদলে নিতে পারেন যদি তো একেবারে ঠিক হয়ে যাবে, নাহলে এ গাড়ী খুব ভালো। খানিক পর গিয়ার নিয়ে গাড়ী চলতে থাকে কিন্তু ড্যাশ বোর্ড আর ফুট বোর্ডের কাছ থেকে এত ধোঁয়া বেরোতে সুরু হয় যে সন্তোষের চোখ জ্বালা কর্তে থাকে ও জিজ্ঞেস করে ধোঁয়া কিসের? মালিক বল্লেন ও কিছু নয় সাইলেন্সরটা এক জায়গায় একটু ভেঙ্গে গেছে। ওটাকে বদলে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ীটা ঠনঠনের মোড়ে পেঁছলেই হঠাৎ ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল সামনের গ্রিল আর বনেটের ফাঁক দিয়ে তখন ভীষণ গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হয়তো আগুন ধরে গেছে ভেবে সন্তোষ দরজা খুলে এক লাফে নেমে পড়ে। পেছনের সিট থেকে ছোকরা চারজন নেমে চাকার হাফ-ক্যাপগুলো খুলে নিয়ে জলের জন্যে রাস্তার টিউবওয়েলের দিকে ছুটে যায়। মালিকও তাড়াতাড়ি নেমে বনেটটা খুলে দিয়ে বল্লেন "না আগুন লাগেনি শুধু ইঞ্জিনটা একটু গরম হয়ে উঠেছে।" সন্তোষ বলে "হ্যাঁ ইঞ্জিনটা বদলে একটা নতুন ইঞ্জিন বসিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে বডিটাও যদি বদলে দেয়া যায় তাহলে আর কোনই গোলমাল থাকে না কি বলেন?" একটা খালি বেবী ট্যাক্সি ব্যাপার কি দেখবার জন্যে ঐখানে দাঁড়িয়ে গেছিল। সন্তোষ তাড়াতাড়ি তার দরজা খুলে উঠে পড়ে। তারপর চলন্ত ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে মালিককে লক্ষ্য কোরে বলে "টা...টা..." রাগের চোটে ওর মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

সন্তোষ মনে মনে ঠিক করে আগে বিরুকে না দেখিয়ে ও আর কখনও গাড়ী কিনতে যাবে না। মিছিমিছি বায়নার ২৫্ টাকা ওর মাঠে মারা গেল। তা যাক তবুতো সে গাড়ীটা কেনেনি, না হলে ঐ কয়েক হাজার টাকাই জলে যেত। কিন্তু বিরু কিম্বা অন্যান্য যাদের ও একটা গাড়ী খুঁজে দিতে বলেছিল তারা কেউই আজ অবধি একটাও গাড়ীর সন্ধান দিতে পারেনি। তাই শেষে ও হাজার তিনেকের মধ্যে একটা পুরোনো গাড়ী চাই বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলো।

বিজ্ঞাপন বেরোবার পর থেকেই ওর বাসায় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গাড়ীর খবর নিয়ে অনবরত লোক-জন আসতে লাগলো কিন্তু যে গাড়ী দামে সস্তা হয় সেগুলোয় অনেক দোষ থাকে; যেগুলো একটু ভালো, দালালরা, "আজকাল গাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা" বলে সে-গুলোর অসম্ভব দাম চেয়ে বসে। ডলির ইচ্ছে ছিল এবার সে বাপের বাড়ীতে যাবার সময় নিজের গাড়ীতেই যাবে। ওর বাপের বাড়ীর দিকের আত্মীয়দের প্রায় সকলেরই গাড়ী আছে, তাই শ্লেষের সঙ্গে "আমাদের এ জন্মে আর গাড়ী হয়েছে!" বলে সন্তোষকে মাঝে মাঝে ও খোঁটা দিতে সুরু করেছিল। সন্তোষ ঠিক করতে পারে না কি করবে। এমন সময় একদিন সকালে দুটি লোক এসে ওকে খবর দিলে একটা ১৯৫৪ সালের ভ্যানগার্ড বিক্রি আছে, দাম মাত্র ২৫০০্ টাকা। এই ক'দিনে গাড়ীর বিষয় আলোচনা কোরে কোরে গাড়ী সম্বন্ধে সন্তোষের অনেক জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ও তাই অবাক হয়ে যায়, এত সস্তা শুনে ও জিজ্ঞেস করে গাড়ীটায় কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল কিনা। লোক দুটির মধ্যে যার বুশ-শার্ট আর প্যান্ট পরা ছিল, সে বল্লে "না গাড়ীটা একজন আমাদের কাছে মর্গেজ রেখে-ছিল তারপর আর ছাড়াতে না পেরে আমাদের দিয়ে গেছে, তাই আমরা তাকে যে টাকা ধার দিয়েছিলুম শুধু সেই টাকাতেই বেচে দিতে চাই। গাড়ীটা একেবারে নতুন, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে যে কোন সময় গেলেই আপনাকে দেখাতে পারি।" সন্তোষ রাজী হয়ে যায়, আড়াইটার সময় ওদের অফিসে হাজির হতে। অফিসটা গোয়াবাগানে। প্যান্ট পরা লোকটি ওকে একটা কার্ড দিয়ে দেয়। কার্ডে লেখা আছে কোম্পা-নীর নাম রতনকুমার অ্যান্ড রঞ্জিতকুমার ব্র্যাকেটে (মানি লেনডার)। সন্তোষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, ভাবে বাঁধা রাখা গাড়ী নিশ্চয় ও সস্তায় পাবে, কিন্তু মানি লেনডার বলে এ রকম আর কাউকে কার্ড ছাপাতে সে দেখেনি। একটু খট্‌কা লাগে তবু ঠিক আড়াইটের সময় কার্ডের লেখা ঠিকানায় গিয়ে ও উপস্থিত হয়। প্রায় তিনটের সময় সন্তোষ যখন ওবাড়ী থেকে বেরোলো তখন ওর সোনার ঘড়ি হিরের আংটি আর মোটর কেনার জন্য যে ২৫০০্ টাকা ও নিয়ে গেছিল তার কোনটাই ওর সঙ্গে নেই। দালাল ছোকরাটি সন্তোষের জন্য লোহার ফটকের তালাটা খুলতে খুলতে বলে, "পাছে আপনি খেলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে যান তাই বলিনি, একটু পরেই মিশির আমাদের ফোন কোরেছিল। গাড়ীটা অনেকদিন পড়েছিল বলে ব্যাটারীটা খুব উইক হয়ে গেছে তাই স্টার্ট নেয়নি। ব্যাটারীটা ও চার্জে দিয়েছে। কালকে যদি আপনি আসেন তো গাড়ীটা নিশ্চয় দেখিয়ে দেবো।

ওর জন্য ডলি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা

(শেষাংশ ১২৫ পৃষ্ঠায়)

অন্য দিনের মত স্নান সেরে আধভিজে চুল নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালো অরুণিমা। প্রসাধনের তাগিদে নয়, ন'টা বেজে গেছে তারই শব্দে সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি এলো খোঁপা জড়িয়ে নিল। অন্য যে কোন দিনের মত সকালের দিকে রোদ গাঢ় হয়ে জানলার কাচে আর দেওয়ালে নক্সা কাটছে। ঘড়ির শব্দ, রাস্তার ব্যস্ততা, চলাফেরা, হাঁকডাক, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে এক আধ মুহূর্তে একটু অবসরের ঝিলমিলতা, একটু চোখ মেলে দেখা কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো। রোজকার মতই অরুণিমার সকাল হয়েছে।

ঘন ঘন চিরুণী চালিয়ে অরুণিমা ডাকল—বৌদি'—।

আজকে এক মিনিটও সময় নষ্ট করবার মত নেই, তবু নীলা হতাশ হয়ে খাটের উপর বসে পড়ল—।

"তুমি—আজকেও অফিসে যাচ্ছ!"

অপ্রস্তুত হয়ে অরুণিমা কৈফিয়ৎ খুঁজল। হঠাৎ সুবোধবাবুর ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়ার সংকল্প মনে পড়ে গেল। চাঁদা তুলে অফিসে ক'জন ওকে হয়ত দু'খানা রবীন্দ্রনাথের বই, এক বাক্স মিষ্টি, একটা ফুলের মালা উপহার দিত, ছোটখাট বক্তৃতা করত কেউ কেউ। অরুণিমাই সে সব ছেলেমানুষী প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

'ও'রা ছাড়লেন না বৌদি—! তবে বেশী দেরী করব না—দুপুরের ভেতরেই ঠিক ফিরে আসব—", অরুণিমা শাড়ীটা ঠিকঠাক করে নিল শান্ত হয়েছে ত!'

"আজকের দিনটা আর ভাত নাই খেলে—"; নীলা দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকালো—'উমা কত বছর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন জানো ত! এদিকে তোমার দাদা বাজারে যাওয়ার আগে পই পই করে বারণ করে গেছেন—তবু তুমি বেরোচ্ছ!"

"একটুও দেরী করব না বৌদি—।" আয়নার থেকে সরে এল না অরুণিমা। বরং আরও ভাল করে দেখল নিজেকে। অন্য যে কোন দিন আয়নার কাচে ফুটে ওঠা স্পষ্ট ছবিটার বেশী মূল্য সে দেয় না। হয়তো একবার তাকিয়ে দেখে ঘামে ভেজা মুখের কোথাও স্বল্প প্রসাধনের চিহ্ন ধরা পড়ছে কিনা। তারপর ভুলে যায় তার অস্তিত্ব।

কিন্তু আজকে আয়নাই তার সমালোচক। আয়নার নির্বিকার চোখ দিয়ে অরুণিমা নিজেকে দেখতে লাগল। দশ বছর অপেক্ষা করে থাকা ক্লান্ত করুণ মুখটা। যারা রোজ দেখে, হঠাৎ চোখে পড়ে না এই দশ বছর চলে যাওয়ার মর্মান্তিক ইতিহাস। কিন্তু আয়না ভুল বলে না, মিথ্যে বলে না। তাই যে ছবি সে তুলে ধরে, তার কোথাও রঙ চড়ানো চলে না, হয় না কোন কাল্পনিক অদল বদল। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় বোধ হয় নেই।

"নির্মল খবর পাঠিয়েছে রেজিস্ট্রী বাড়ীতেই হবে। ও তিন-চারজন বন্ধু নিয়ে আসবে সঙ্গে —আমাদেরও ফর্দে প্রায় একশ'জন ধরা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, কাকে বাদ দিই বল?" নীলা ব্যস্ত হয়ে রান্না ঘরের দিকে তাকালো—'এখন ভাড়াটে ঠাকুররা আসবে, তাদের জোগাড় দেওয়া এক ব্যাপার—।'

"কেন এত হাঙ্গামা করছ বৌদি"—অরুণিমা অনুযোগ জানালো—"কথা ছিল অফিসে গিয়ে দুটো সই করে আসব। ভোর রাত্তিরেই ত দমদম ছুটতে হবে।"

"মানুষের জীবনে এ দিন ত বার বার ফিরে আসে না ভাই, তাই আতিশয্য সইতেই হয়—।"

জীবনের যে কোন দিন নয়, বিশেষ একটি দিন—। কি মনে করে নীলার পাউডারের কৌটা থেকে নরম তুলোর প্যাডখানা মুখের উপর বুলিয়ে নিল অরুণিমা। চোখের নীচে গাঢ় কালির রেখা যদি ঢাকা পড়ে। কিন্তু না, সব ফুরিয়ে গেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নির্মল কি সে কথা বুঝতে পেরেই চমকে উঠেছিল ষ্টেশনে? তার মুখের হাসি, উজ্জ্বল ফর্সা রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তের জন্যে! নির্মলও কি বুঝতে পেরেছে দশ বছর অপেক্ষা করে থাকাটা আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে!

আয়না থেকে মুখ সরিয়ে অরুণিমা দেখলো নীলা কাচের ডিশে জলখাবার রেখে গেছে। 'খিদে নেই'—অরুণিমা আপন মনে বলল। দশ বছর একা একা তার দিন কেটেছে, আর নিঃসঙ্গ সেই সব সন্ধ্যায়, রাত্রিতে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে, উত্তর দিয়েছে। একলা ঘরে আপন মনে কথা বলা তার স্বভাব। তবু বৌদি দুঃখ করবে, না খেলে—। বৌদি ভাবছে, বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ ভাবছে, সুখের জোয়ারে আমি ভেসে গেছি—! তাই এত উত্তেজনা, তাই এত অস্থিরতা। অথচ ওরা কেউ ভাবছে না, বুঝছে না এই আয়নাটার কথা। আয়না দেখাচ্ছে আমার কপালের সামনে চুল উঠে ফাঁক হয়ে গেছে, চোখের নীচে অনেক দিনের ব্যর্থতার স্পষ্ট ছাপ। ওদের দেখবার চোখ নেই বলেই নির্ভেজাল আনন্দের বন্যায় ওরা তলিয়ে গেছে।

আনন্দের কারণ—নির্মল শেষ পর্যন্ত কথা রেখেছে। অরুণিমার মত আর সকলেও ভাবত নির্মল আর ফিরবে না। ফিরতে পারে না। একটা সামান্য মুখের কথার দাম কতখানি ধরা যায়?

"তুমি কয়েক বছর অপেক্ষা করতে পারবে অরুণিমা? বাবা মারা যাওয়ার পর দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণই আমার।"

কয়েক বছর কেন, তখন অরুণিমা চির অপেক্ষা করতে পারে! তাই কলেজের গণ্ডী শেষ হলে জেদ করে চাকরী নিয়েছে। প্রথম প্রথম নির্মল বোম্বাইতে চাকরীর সন্ধানে চলে যাওয়ার পর দিন যেন কাটতো না। সকাল প্রতীক্ষা করত বিকেলের—আর বিকেল সকালের। অধীর আশায় চিঠির পথ চেয়ে দিন কাটত। তারপর খবর এল কোম্পানী থেকে তিন বছরের জন্যে নির্মলকে বিদেশে পাঠানো হবে।

"তিন বছর—আরও তিন বছর অপেক্ষা কোর অরুণিমা—একথা বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। তোমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিলাম, কিন্তু আমার তরফ থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের পালা শুরু হবে না কোনদিন—।"

দাদা বললেন—"ভেবে দেখেছিস্ অরুণিমা —তোর বিশ্বাসের মর্যাদা ও দেবে। তা না হলে এখনও সময় পার হয়ে যায়নি—অন্য সম্বন্ধের খোঁজ করতে পারি।"

তিন বছরের জায়গায় চার বছর, পাঁচ বছর কেটে গেল। কোম্পানীর বিদেশের ব্রাঞ্চ অফিসে কাজ করছে নির্মল—এখন সে দেশে ফিরবে না। অরুণিমার দিদি পূর্ণিমা খবর আনল দেশে সে ফিরবেই না। হয়তো ওখানেই কোনো বিদেশিনীর খপ্পরে পড়েছে। বা সুন্দর মেয়ের—না পড়াটাই আশ্চর্য।

স্মরণময় মৃগাঙ্কুর

দাদা অরুণিমাকে ডেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—নির্মল কবে শেষ চিঠি লিখেছে, আর কি লিখেছে।

"শেষ চিঠি এসেছে এক বছর আগে—লিখেছে আরও কিছুদিন দেরী হবে হয়তো।" আরও লিখেছে—অরুণিমা কি আর অপেক্ষা করে থাকতে পারবে? 'পারব', মনে মনে উচ্চারণ করতে গিয়েও হোঁচট খেল অরুণিমা। তারপর সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলল ওকে—

'দুঃখ কি—চাকরী করছি। সামনের মাসে প্রমোশন হবে।'

"চাকরী করে তো সারা জীবন কাটে না"—ঝাঁঝিয়ে উঠেছে পূর্ণিমা।

দিনের পর দিন কেটে গেছে তারপর। একটা প্রচ্ছন্ন ভয় ক্রমশঃ তার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ঐ আয়নাই তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, সময় বয়ে গেল, লগ্ন ফুরিয়ে গেল। এরপর সে ফিরে আসবে না—আসতে পারে না। ভয় তাকে ঘিরে থেকেছে, সন্দেহ তার বুকের মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলেছে, সময় তাকে একটু একটু করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। শেষে অবশ্য মুক্তি পেয়েছিল অরুণিমা। নির্মল ফিরবে না জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আয়নার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গকে অগ্রাহ্য করে স্বস্তিতেই ছিল সে। কিন্তু চিঠি এল। অসম্ভব প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি ভরা চিঠি। নির্মল বোম্বাইতে মস্ত বড় চাকরী নিয়ে ফিরছে। অরুণিমা কি এখনও অপেক্ষা করে আছে?

চিঠিটা নিয়ে ক'দিন তোলপাড় চলল বাড়ীতে। কত উত্তেজনা, কত আনন্দ। প্রথমে সেও দিশাহারা হয়ে উঠেছিল—দশ বছরের অবিশ্রান্ত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-দোলার পালা ফুরিয়ে গেছে ভেবে এক মুঠো সুখ প্রজাপতির মত উড়ছিল বুকের মধ্যে। আয়নার কথা মনে পড়েনি। মনে পড়ল স্টেশনে যাওয়ার মুহূর্তে। ঠিক বেরোবার আগে পূর্ণিমার তদারকে সারা বিকেল ধরে প্রসাধন সারা হলে আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠল অরুণিমা। কই, আগে ত চোখে পড়েনি! আর তখন থেকেই পিছিয়ে যাওয়ার কথা মনে বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে উঠেছে। কিসের কথা—কিসের প্রতিশ্রুতি!

'পাগলের মত কথা বলিসনে—।' পূর্ণিমা প্রথমে আশ্চর্য হয়ে তারপর রাগে ফেটে পড়েছে। "তুই তার নখেরও যুগ্যি ন'স, তবু সে যেচে সেধে ঘরে তুলছে। কি দায় পড়েছিল তার—!"

"এখন তোর সে কথা মনে হওয়া উচিত নয়—"; ট্যাক্সি এসে গেছে শুনে দাদা তাড়া দিলেন। নিরুপায় হয়ে অরুণিমা চুপ করল। তারপর স্টেশন, ভীড়, ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ীর সামনে নির্মল। নির্মল!

হঠাৎ খেয়াল হল কতক্ষণ সে রাস্তায় ঘুরছে। একা একা। দুপুরের রোদে উপোসী ঠোঁট শুকিয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে। নির্মল কেন ভুল করছে এভাবে। উচিত অনুচিতের দোটানায় পড়ে মানুষ ভুল করে—। তারপর থাকে অনুশোচনার গোপন খোঁচা। নির্মল কি তাকে দেখে চমকে উঠেছিল? না, হয়তো তারই মনের ভুল। হয়তো তার মন বদলায়নি, তার চোখ আয়নার মত প্রতারক নয়।

শ্বেত করবীর স্মৃতি

মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা

পথে যেতে যেতে পাওয়া ছোট ছোট স্নেহ
ভালবাসা
কখন গুছিয়ে রাখি কোণার্কের আলোকে
আঁধারে
এই সত্য জানি তারা কোন এক স্তব্ধ দিন থেকে
স্মৃতির অমৃত দিয়ে ঢেকে রেখে আমার সত্তারে।

অবসন্ন অতীতের অনুজ্জ্বল পরিচয় থেকে
যে আনন্দ-কণাগুলি জমিয়েছি এতোদিন ধরে
তার ক্ষুদ্র স্মৃতি চিহ্ন এ মুহূর্তে গভীরে
গোপনে
দূরের ছবির মত বিছালো সে ধূসর প্রহরে।

গতকাল বৃষ্টি হল ফাল্গুনের উদাস আকাশে
ঢেকে গেল গ্রামগুলি অদূরের তৃণশূন্য ক্ষেত
সব স্বেদ মুছে দিয়ে এ পথের আগাছা ও ঘাস
নতুন সবুজ বর্ণে মেখে নিল প্রাণের সংকেত।

আমি জানি, গান দিয়ে ধুয়ে গেলে সব
অন্ধকার
একটি পবিত্র প্রেম এ জীবনে জ্বলবে আবার।

বাড়ীতে ফেরার আগে সে কথা নিজেকে বার বার বোঝালো অরুণিমা।

তারপর সকলের অনুযোগ অভিযোগের পালা সহ্য করে ওদের সকলের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালা, কপালে কুমকুম আর শ্বেত চন্দনের আঁকিজুকি, লাল চেলির জড়োয়া স্বচ্ছ আঁচল কপাল পর্যন্ত নামানো। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন দাদা। নীলা, পূর্ণিমা দুজনেই পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস জানালো। ভয় কি—ভয়ের কিছু নেই। চল্ এবার—নির্মল এসেছে ওঘরে—।

"ভয় পাবে কেন—কত ভাগ্য করে এসেছিল তোমাদের মেয়ে, তাই রূপে গুণে অমন জামাই জুটেছে"—কে একজন মন্তব্য প্রকাশ করল।

"একবার দেখ্‌না আয়নায়"—পূর্ণিমা হাত ধরে ওকে ওঠালো—'কি সুন্দর দেখাচ্ছে। চন্দন-পরানো খুব ভালো হয়েছে।'

"না, থাক্"—শুকনো গলায় বলল অরুণিমা। শাঁখ বাজলো একবার। না, আয়নায় আর নিজেকে দেখবে না। ওঘরে নির্মল বসে আছে, গলায় তার যুঁই ফুলের গোড়ে মালা।

"তাকাও—তাকাও—। শুভদৃষ্টি—এখন চোখ চাইতে হয়—।"

তাকালো অরুণিমা। স্বচ্ছ কাচের মত অনুভূতিহীন একজোড়া চোখে চোখ পড়া মাত্র অন্য আরেকটা আয়না দেখল সে। তার মনের অসহ্য ভয়, অফুরন্ত সংশয় সেখানে রেখায় রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখ ফেরানো গেল না—শুধু অসহায় ভাবে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে অরুণিমা এগিয়ে গেল।

মোটর কেনা

(১২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফেলেছিল। ভাত খাবার পর সন্তোষের মুখে সব কথা শুনে ডলি ওর কাকাকে ফোনে খবরটা দিয়ে দেয়। তিনি পুলিসের ডাক্তার। ব্যাপারটা শুনে সহজেই বুঝতে পারেন সন্তোষ এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিল। তাই ওদের বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ওর ১৫০০ শ টাকা দামের হীরের আংটি আর ৫০০ শ টাকা দামের ঘড়িটা উদ্ধারের জন্য সন্তোষকে সঙ্গে নিয়ে তখনি গোয়াবাগানে গিয়ে দেখেন বাড়ীটার বাইরে থেকে তালা দেওয়া, ভেতরেও লোকজন কেউ নেই। যাইহোক, তিনি এ ব্যাপারটার তদন্তের ব্যবস্থা কোরে থানার সাহায্যে বাড়ীটার সামনে পুলিশের গুপ্ত পাহারাও বসিয়ে দেন।

সেদিন রাত্রিতে প্রায় আটটার সময় ক্লান্ত হয়ে সন্তোষ যখন বাড়ীতে এলো তার একটু পরেই ওর একটা ফোন এলো। কোন একটি লোক দমদম থেকে জানতে চাইছেন ওর গাড়ী কেনা হয়েছে কিনা, কারণ তাঁর কাছে একটা ৫৩ মডেলের প্রিফেক্ট বিক্রি আছে। গাড়ীতে কোন দোষ নেই, দাম মাত্র তিন হাজার টাকা এবং যে কোন সময় ও গাড়ীটা দেখে আসতে পারে। শুনে সন্তোষ বল্লে অতদূরে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তবে যদি ভদ্রলোক কষ্ট কোরে দিয়ে গাড়ীটা ওর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারেন তা হলে ও কিনবে কিনা বলতে পারে। ভদ্রলোক নিজেই গাড়ীটা নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আসতে রাজি হয়ে গেল। ৫৩ মডেলের প্রিফেক্ট কোন দোষ নেই, মাত্র তিন হাজার সস্তাই তো! কিন্তু ডলি শুনে বল্লে "এ নিশ্চয় ঐ জোচ্চোরদেরই সন্তোষকে বিপদে ফেলার আর একটা ফন্দি।" কথাটা মাথায় ঢোকার পর সন্তোষেরও সেই সন্দেহই হতে থাকে। পরের দিন সন্ধ্যে সাতটায় ওদের চাকরটাও তখন কি একটা কাজে বাইরে গেছে, তাই প্রিফেক্ট গাড়ী নিয়ে ভদ্রলোকের আসার সময় ডলি ও সন্তোষ নিজেরাই লাঠি ছুরি ইত্যাদি সমস্ত ঠিক কোরে রাখে দুর্বৃত্তের হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কায়, কারণ ওরা ধরেই রাখে যে লোকটি সেই গোয়াবাগানের জোচ্চোরদেরই একজন। হয়তো এবার সদলে এসে ওদের আক্রমণ করবে। কিন্তু ভদ্রলোক যখন প্রিফেক্ট গাড়ীটা নিয়ে এলেন তখন ভাগ্যিস ওরা প্রথমেই লাঠি সোটা নিয়ে এগিয়ে যায়নি, তাহলে ভয়ানক ভুল করতো, কারণ ভদ্রলোকের গাড়ীটা সত্যিই খুব ভালোছিল, এবং কিছুদিন হল একটা নতুন অ্যামব্যাসাডর কিনে ফেলেছিলেন বলেই গাড়ীটা তিনি অত সস্তায় বিক্রি করছিলেন। প্রিফেক্টখানা কিনবার দিন সন্তোষ ভদ্রলোকের ঠিকানায় গিয়ে দেখে তিনি বিখ্যাত মার্শাল কোম্পানীর রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, দমদমের কারখানার কম্পাউন্ডের মধ্যে ও'র বিরাট বাগানওয়ালা কোয়ার্টার এবং তাঁর একটা নতুন অ্যামব্যাসাডরও আছে। এতোদিন পরে একটা ভাল গাড়ী ওরা কিনতে পারলো।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে অস্পষ্ট একটা পথের রেখা—শাল ও মহুয়া গাছ-গুলোর নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে সহজে নজরে আসে না।

এ পথ চেনে বনের হরিণের পাল। তাদের রোজকার পথ চলায় পায়ে পায়ে এ পথের আত্মপ্রকাশ। এ পথ গেছে কেওয়াই নদীর দিকে— নদীতে মিশে জলের নীচে প্রচ্ছন্ন থেকে ওপারে আবার ফুটে উঠেছে খাড়া পাড়ে, বেলে পাথরে।

হরিণের পাল এ পথ অনুসরণ করে নদী পার হয়ে ওপারে যায়। জলের মধ্যে উহ্য পথটার নিশানা পায় তারা পা ফেলে ফেলে। এক চুল এদিক-ওদিক হলেই চোরাবালি ও পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বড় বড় গহ্বর—নিস্তরঙ্গ মসৃণ জলগুলোর নীচে গা-ঢাকা দেওয়া মৃত্যু ফাঁদগুলো ওরা চেনে। সতর্ক পদক্ষেপে ওরা বুঝতে পারে জল কোথায় অগভীর, কোথায় চোরাবালি ও গহ্বর ওৎ পেতে নেই।

হরিণের পালকে অনুসরণ করে বেড়ায় এক দল শবর শ্রেণীর মানুষ—লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এই বনেই তাদের আশ্রয়। বনের হরিণের পদক্ষেপকে অনুসরণ করে তারাও বনের ঐ অস্পষ্ট পথের পেয়েছে সন্ধান। নদীর জলে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম নিরাপদ রেখাটি বেয়ে অনায়াসে নদী পার হয়ে যায় তারাও।

বনময় অবাধ ওদের আনাগোনা। বনের পশুদের পাশাপাশি থাকে ওরা অরণ্য আদিম আঁধারে। গাছের ডালপালা জড়ো করে ঘর তৈরী করে। হরিণ শিকার করে আগুনে ঝলসে তার মাংস খায়।

সভ্য মানুষদের মত অভাববোধ নেই ওদের। বনের পশুদের সঙ্গে পার্থক্য ওদের সামান্যই।

হরিণের পালের আনাগোনার ছন্দে গাঁথা ওদের দৈনন্দিন জীবন। খুবই সরল। সভ্যতার সংস্পর্শবর্জিত—কাজেই সুখী।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ওদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় ছন্দোপতন ঘটিয়ে এ বনে এলেন স্থানীয় জমিদার।

মধ্যপ্রদেশের এই বন-প্রধান অঞ্চলটির [illegible] লোকেরা বলে রাজাসাহেব। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হলেও রাজকীয় দাপট তাঁর এখনো আছে পুরোমাত্রায়।

জমিদারটি বয়সে নবীন—নাম তাঁর অমৃত সিং—সারঙ্গরের জমিদারের মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এই বনে শিকারে এসেছেন।

তাঁর অনুচরেরা আগে-ভাগে এসে কেওয়াই নদীর দক্ষিণ দিকে একটি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় একটি মাটির বাংলো তৈরী করে রেখেছিল। সুদৃশ্য সুন্দর বাংলোটি কৃষ্ণার খুব ভাল লেগে গেল।

অমৃত সিং এখানে এসেই ডেকে পাঠালেন শবরদের সর্দার ভিখনকে।

ভিখন প্রথমে আসতে চায় না—অমৃত সিং-এর পেয়াদা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে আসে।

অমৃত সিং-এর মুখের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভিখন—পেয়াদা তার কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললে, হাঁ করে দেখছিস কি—রাজাসাহেব ইনি—তামাম দুনিয়ার মালিক—গড় হয়ে নমস্কার কর।

ভিখন বুঝি বুঝতে পারে না কিছু—নমস্কার করা কাকে বলে তাও জানে না বুঝি—হতভম্বের মত দাঁড়িয়েই থাকে।

পেয়াদা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে, তবে রে, কুত্তা কাঁহাকা!

অমৃত সিং-এর বুঝি দয়া হয়—ঈষৎ হেসে তিনি বলেন, ছেড়ে দে-রে গিরিধারী সিং। লোকটা একেবারেই বুনো—কিছু বোঝে না।

ভিখন ও গিরিধারী সিংকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন অমৃত সিং। যখন রওনা হবেন কৃষ্ণা এসে মাথার দিব্যি দিয়ে বললে, সন্ধ্যার আগেই ফিরে এস গো।

অমৃত সিং রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

ভিখন বললে যে নদীর উত্তর দিকের জঙ্গলেই জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা বেশি। ছোট একটা ডোঙ্গা বাঁধা ছিল নদীর ধারে—গিরিধারী ব্যবস্থা করে রেখেছিল—তাতে করে নদী পার হলেন অমৃত সিং।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করে দুটো সম্বর শিকার করলেন অমৃত সিং।

গিরিধারী বললে, হুজুর সন্ধ্যা হয়ে এল—চলুন ফিরে যাই।

অমৃত সিং বললেন, কভি নেই। মাত্র দুটো সম্বর নিয়ে ঘরে ফিরতে পারব না। আওর ভি শিকার চাহিয়ে।

বলতে বলতে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটি হুইস্কির বোতল বের করে বেশ খানিকটা গলায় ঢাললেন। নির্জলা সোনালী তরল আগুন। মুহূর্তের মধ্যে উগ্র উত্তপ্ত একটা নেশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভিখনের মুখের ওপর লাল টকটকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, আসল জায়গায় নিয়ে চল। এখানে শিকার কই? মিছিমিছি ঘুরিয়ে মারছিস কেন আমাকে?

ভিখন স্থির দৃষ্টিতে অমৃত সিং মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, আসল জায়গাটি দুক্রোশ দূরে। পারবেন হাঁটতে অত দূর।

অমৃত সিং বললেন, আলবৎ পারব। চল্ এক্ষুণি—কোথায় নিয়ে যাবি চল্।

গিরিধারী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে, কিন্তু হুজুর—

অমৃত সিং গর্জে উঠলেন, চোপ রও।

ভিখন গভীর বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকে। রাত হয়ে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বনের গাছপালার জড়াজড়ির মাঝে মাঝে যে সব ফাঁক ছিল সব ভরে দিয়েছে। গাছগুলো সব একাকার হয়ে গেছে কালোর সমুদ্রে। গিরিধারীর হাতে ছিল বড় একটি টর্চলাইট—তার তীব্র আলোর রেখা অন্ধকারকে বিশ্লিষ্ট করে বিপুল আঁধারের রহস্যকে যেন আরও ঘনীভূত করে তোলে।

এত আঁধার বুঝি জীবনে কখনো দেখেননি অমৃত সিং। কিন্তু আরও বেশ খানিকটা মদ তিনি গলায় ঢেলেছেন—তার নেশায় আঁধার আর আঁধার থাকে না তাঁর চোখের সামনে—পথ চলেন তিনি বেপরোয়ার মত।

বনের মধ্যে হরিণের পালের পায়ে চলা পথটি যেখানে কেওয়াই নদীতে এসে মিশেছে সেখানে এসে দাঁড়াল ভিখন— বললে, এখানে বসে থাকুন হুজুর—আরও রাত হলে হরিণের পাল এ পথ দিয়ে আসবে।

অমৃত সিং রাইফেলটা শক্ত করে ধরে বললেন, হুজুর বসে থাকব—যত বৃষ্টি হোক না কেন। পাঁচশটা হরিণ না মেরে আমি নড়ব না এখান থেকে।

গিরিধারী বলে, কিন্তু হুজুর, রাণীমা ওদিকে একা আছেন—হয়ত খুব ভাবছেন।

অমৃত সিং খেঁকিয়ে উঠলেন, রাখ তোর রাণীমা—পাঁচশটা হরিণ আমি শিকার করবই। একটা গাঢ় কাল ইস্পাতের রেখার মত বনের আঁধারকে দু-টুকরো করে কেওয়াই নদী দুকূল ছাপিয়ে তরল উচ্ছ্বাসে সমস্ত বনকে শিহরিত করে তোলে।

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল—এখন সমস্ত আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। হঠাৎ জোরো বাতাস বইতে থাকে বনের স্তব্ধতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাসের মত। একটা হুঁ হাকায় যেন মাটির বুক ফুঁড়ে গাছের শাখা-প্রশাখা বেয়ে উঠতে থাকে আকাশের পানে।

তারপর বৃষ্টি নামে মুষলধারে। আকাশ ভেঙে পড়ে যেন জলের ধারায়।

গিরিধারী বললে, হুজুর, এই বৃষ্টিতে বসে থাকলে অসুখ করবে আপনার। চলুন ফিরে যাই।

অমৃত সিং বললেন, অসুখ! কত দেখেছি। কিন্তু এই বৃষ্টিতে বসে থাকা যায় না। তারপর ভিখনের উদ্দেশ্যে ধমক দিয়ে ওঠেন, এই বেয়াদব, বৃষ্টি পড়ছে কেন?

ভিখন নির্বিকার স্বরে জবাব দিল, তা তো জানি নে হুজুর। ও কি হুজুর, উঠে দাঁড়ালেন যে! শিকার করবেন না?

—না, আজ থাক। আজ ঘরে ফিরব। নে ওঠ, পথ দেখা।

ভিখন বললে, যে পথে এসেছি সে পথ দিয়ে ফিরতে গেলে তিন ক্রোশ হাঁটতে হবে। পারবেন হাঁটতে অতটা? তার চেয়ে বরং এখানে নদী পার হয়ে চলুন। আপনার বাংলো এখান থেকে কাছেই— আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

—কিন্তু পার হব কি করে! যা, ডোঙাটা নিয়ে আয় চট করে।

—ডোঙা রয়েছে দু-ক্রোশ দূরে। এ বৃষ্টিতে আসা যাবে না হুজুর। ঘাবড়াবেন না এই যে পথটা নদীর মধ্যে গিয়ে মিশেছে—এই পথ দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যেতে পারবেন। হরিণরা রোজ এ পথ দিয়ে নদী পার হয়—ওদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে পথটা।

অমৃত সিং বোতলে অবশিষ্ট হুইস্কিটুকু এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে পান করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল, হেঁটেই পার হব নদী।

ভিখন পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে যেতে যেতে বললে, এদিক দিয়ে আসুন হুজুর।

অমৃত সিং ভিখনের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, তুই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি নাকি?

ভিখন একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললে আপনি তো আর পথ চেনেন না—আমি চিনি—হরিণদের পিছু পিছু রোজ এ পথ দিয়ে চলাফেরা করি—

প্রায় চিৎকার করে অমৃত সিং বললেন, তোর আস্পর্ধা ত কম নয়। আমি এখানকার রাজা—এই বন-জঙ্গল নদী-নালা সব কিছুর মালিক—আর তুই কিনা পথ দেখাবি আমাকে!

লিনো-কাট　　　　অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

—আপনি তো পথ চেনেন না হুজুর।

—মুখের ওপর কথা বলতে আসিস না। এই বন্দুক দেখছিস তো—এক গুলীতে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। আমি পথ চিনি না তোকে কে বললে? এখানকার তামাম পথ-ঘাটের মালিক আমি—আর আমিই পথ চিনি না! আয় আমার সঙ্গে—আমিই তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বলে হন্ হন্ করে নদীর দিকে এগিয়ে যান অমৃত সিং।

চিৎকার করে ভিখন বলে, ওদিকে নয় হুজুর, ওদিকে নয়। ওখানে জলের মধ্যে চোরাবালি ও বড় বড় গর্ত আছে, আর জলও খুব বেশী।

অমৃত সিং তার কথায় কর্ণপাত না করে জলে পা দিলেন।

সামলে হুজুর, সামলে। —বলতে বলতে ভিখন ছুটে যায় অমৃত সিং-এর কাছে। অমৃত সিং খপ্ করে বজ্রমুষ্টিতে ভিখনের একটি হাত ধরে ফেলে বললেন, চল, তোকে পথ দেখিয়ে দিই—চিনিয়ে দিই নদী পার হবার সোজা রাস্তা।

ভিখন আর্তনাদ করে ওঠে, ছেড়ে দিন, আমাকে—ছেড়ে দিন।

অমৃত সিং তার চিৎকারে কর্ণপাত না করে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নদীর জলের মধ্যে।

প্রবল তোড়ে বয়ে যাচ্ছিল পাহাড়ী নদী। কালো মিকমিকে জলের উচ্ছ্বাস যেন হাজার হাজার ক্রুদ্ধ সাপের ফণার মত ফোঁস ফোঁস করছিল।

গিরিধারী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। অন্ধকারে অমৃত সিং বা ভিখন কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না সে। রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত। হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ নদীর স্রোতের উচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে ওঠে।

নদীর মধ্যে ইতস্ততঃ টর্চলাইটের আলো ফেলে কোথাও খুঁজে পায় না সে অমৃত সিং ও ভিখনকে।

হঠাৎ এক জায়গায় টর্চের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একটি হরিণের পাল। সার বেঁধে তারা নদী পার হচ্ছে—একটি সূক্ষ্ম পথের ওপর দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে—পথ ছেড়ে এক চুলও এদিক ওদিক হচ্ছে না কেউ।

সমাধান

(১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সম্পর্কে সরলা নিশ্চিন্ত। সুন্দর যখন কথা দিয়েছে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঘুণাক্ষরেও সে জানতে দেবে না।

চিঠিখানা সে তোরঙ্গের মধ্যে কাপড়ের ভাঁজে রেখে দিল।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। বারো বছরের ছেলের রোজগার সে খায়। সেই রোজগার যে কিসের বিনিময়ে অবোধ হাবুল তা বোঝে না। বোঝার বয়সও তার হয়নি। সে হয়ত মাকে, ভাইকে খাওয়াচ্ছে মনে করে খুশী মনেই আছে। গান শিখছে সে। বাবু তাকে যত্ন করে। সে বেশ ভুলেই আছে। কিন্তু সরলা ত ভুলে থাকতে পারে না।

যাক, চিঠি পেলেই সে চলে আসবে। হাবুল ও তার বাধা ছেড়ে। তবে একটা কথা। পড়া বন্ধ হবে তার। শুধু তার নয়, বাবুলকেও আর পাঠশালায় পাঠাতে পারবে না। গৌর মাস্টার বিনা পয়সায় পড়াতে রাজী হলেও কাগজ, কলম, বই-খাতা এ সবের পয়সা সে জোগাড় করবে কোথেকে? সবই ত হয়েছিল হাবুলের ওই কটি টাকায়।

শুধু কি তাই? খেতে পরতেও ঠিকমত পাবে না। আবার শুরু হবে সেই অনশন অর্ধাশন।

এই ধরণের নানা কথা, নানা ভাবনা তার মাথায় ভিড় করে এসে ভিড় করে। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

কিন্তু—কিন্তু ছেলেকে ভিখিরী সাজাতে দেবে না সে। যদি হাবুল না আসে। সে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে তাকে।

ধীরে ধীরে ওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পরের দিন ছেলেকে খাইয়ে নিজে সরলা দু মুঠো ভাত খেল। বাবুল স্কুলে চলে গেলে বাক্স থেকে চিঠিখানা বার করে সেও চলল ডাকঘরের দিকে। ডাকঘর থেকে সুন্দরদের বাড়ী মুড়ি ভাজতে যাবে। কাল যায়নি। একদিনের পয়সা মারা গেছে। এবার খাটবে কিছু বেশী। আরও অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে তাকে। যে করেই হক চালাতে হবে।

সে প্রবোধ মুদির দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় মুদি ডাকল, দিদিমণি—

সরলা দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রবোধ বলল, ছেলের টাকা আসেনি বুঝি?

না আসেনি।

তুমি ত সাত তারিখের মধ্যে পাওনা চুকিয়ে দাও। এবার বারো তারিখ হয়ে গেল, তাই বলছিলুম।

সরলা বলল, কেন যে টাকা পাঠাতে দেরী করছে তা' জানি না। টাকাটা এলেই দিয়ে দেব ভাই।

সংসারের সব খরচা সে মিটাতে পারে না। প্রতি মাসেই শেষের দিকে তার কিছু কিছু দেনা হয়ে পড়ে। মুদির দেনা, ধোপার দেনা। মাস-কাবারে হাবুলের টাকা দিয়ে তা শোধ করে। ব্যাপারটা সে যেন ভুলে ছিল। মুদির তাগাদায় সরলা রূঢ় বাস্তবে ফিরে এল। নিজের অজ্ঞাতে ঠোঁট দিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে ছোট একটা বৃত্ত তৈরী করল।

এই নদী ভালবাসি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

এই নদী ভালবাসি—
ঘুরে মরি এর তীরে তীরে—
দুর্নিবার আকর্ষণে কাছে টানে
প্রতিটি বিন্যাসে—
এর দোলা এর বাঁক এর হাসি
এর দীর্ঘশ্বাসে,
কী জলতরঙ্গ বাজে রঙে-ভঙে
মূর্চ্ছনায় মীড়ে
এই নদী ভালবাসি—
স্বপ্ন কত একে ঘিরে ঘিরে।
এর একটানা স্রোত সুদূরের তৃষ্ণা নিয়ে আসে
ঝাঁপ দিতে সাধ যায় এ অতলে অনন্ত উল্লাসে
সমস্ত রহস্য এর ভরে নিয়ে সত্তার গভীরে।
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা কী এ, একী হায়,
উন্মত্ত বাসনা!
বালুঝিকি কূলে কূলে বনে বনে
টিয়ার সবুজ
বিনিসুতো মালা গাঁথা, ভেসে আসা ফুল
দিয়ে দিয়ে।
অন্য কোথা আলো নেই—
কোন পথ নেই জানাশোনা—
আমার পৃথিবী এই—হোক না তা
কল্পনা অবুঝ
আমি তো রচেছি স্বর্গ এখানে চুণি পান্না নিয়ে।

প্রবোধ বলল, কিছু মনে করলে নাকি, সরলাদি?

সরলা ভাবল, হাবুলের টাকা আসার আগে মুদির গলা এতটা মোলায়েম ছিল না। ছেলের চাকরীর বিনিময়ে সরলা তার কাছ থেকে এই সৌজন্যটুকু পেয়েছে।

কিন্তু এর পর আর পাবে না।

সুন্দরদের বাড়ীর উদ্দেশে ধীরে ধীরে আরও কয়েক পা এগিয়ে কি যেন ভেবে সরলা আর কাজে গেল না। ডাকঘরের দিকেও নয়। সোজা বাড়ী ফিরে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। হাতের মুঠোয় ছেলেকে লেখা চিঠি। নিজের অজ্ঞাতে সেখানা মুচড়ে-দুমড়ে ভাবতে লাগল আকাশ-পাতাল অনেক কিছু। অন্ত নেই তার এই ভাবনার। ছোট্ট জগৎ তাদের। কিন্তু তাই বা কত সমস্যা বহুল। কত জটিলতা আছে। কি জটই না পাকিয়ে রেখেছেন বিধাতা বিশেষ করে তার মত গরীবের সমসার জট—

বাবুল বিকালে স্কুল থেকে এসে দেখল মা শুয়ে আছে। তার হাতের কাছে দুমড়ানো নীল একখানা কাগজ।

সে বলল, মা, জানিস আমি ফার্স্ট হয়ে উঠেছি। গৌর মাস্টার বললেন, খুব বিদ্বান হবে তুমি। আমার এবার নতুন বই কিনতে হবে কিন্তু।

সরলা নীরব। এ আনন্দ সংবাদও তার মনে কোন সাড়া দেয় না।

বাবুল বলল, আর মাইনে চেয়েছে মা। মাস্টার বললেন, তোর মাকে বলিস—মাইনে ফেলে রাখলে চলবে না। তোর দাদা ত চাকরী করে।

প্রথম পুরুষ

(১০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বেদনা যে কী নিদারুণ আমি তা মর্মে মর্মেই জানি। তাই জেন যখন আমার দুঃখে ব্যথিত হয়ে প্রস্তাব করলো আমার সঙ্গিনী হবার ঠিক সেই একই কারণে আমি আর তার সেই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হতে পারলাম না। কিন্তু তোমার কথা আমি ভুলে যাইনি। তাই সর্ত করেছি, এ বিয়ের অর্থ হবে নিছক সঙ্গ-বিবাহ। অর্থাৎ পারস্পরিক নিঃসঙ্গতা ঘোচানো ছাড়া আর কিছু নয়। জেন তাতেই রাজী। আমার মাধ্যমে সে আবার সগৌরবে সমাজের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে এতেই তার আনন্দ। আমার নিজেরও ব্যক্তিগত মত ছিলো, জীবনে কোনো কুমারী মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না—বিচ্ছেদ যার জীবনকে শূন্য করে দিয়েছে তেমনি কোনো মেয়ের শূন্যতা পূরণেই আমি শুধু সহায়ক হবো। চিঠিটা পড়ে তুমি হয়তো হাসবে। কিন্তু ডার্লিং, একথা তুমি নিশ্চয় করে জেনে রেখো, জেনকে আমি গ্রহণ করেছি একান্তই সেই ভাবে। আর তোমার ভালোবাসার স্মৃতিটুকে চির-কালের মতো সঞ্চিত করে রেখেছি আমার অন্তরের অন্তস্তলে। সেখানে তুমি অক্ষয়, অমর।

চিঠির নীচে সেই পুরোনো দিনের আস্বাদ। মনের আকাশে পুরোনো কথার অন্তহীন জটলা। জীবনের প্রথম লগ্নের ভালোবাসা। শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। কিন্তু তবু তার রেশ তো মিলিয়ে যায়নি। ক্রমে হয়তো কোনো দিন সেই রেশ পূর্বজন্মের মতোই বিস্মৃতির অতল তলায় তলিয়ে যাবে। কিন্তু তখন তো আর সেই স্মৃতির তরঙ্গ কোনো মনের দুকূলকে আর প্লাবিত করবে না।

ডেভিড তুমি সুখী হও।—এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে নীল চিঠিখানাকে হাতের মুঠোয় চেপে রেখে মনে মনে প্রার্থনা জানায় মলিনা। তারপর ছুটতে ছুটতে উঠে এসে দাঁড়ায় তেতলার সেই জানলার ধারে। পুরোনো অভ্যাস মতোই নিচের দিকে একবার তাকায়। পাশের বাড়ির দোতলার যে ফ্ল্যাটটির দিকে তাকাতে দুচোখ তার অভ্যস্ত একবার চেয়েই সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হয় মলিনাকে। কী আর করবে সে। কিছুই যে আর দেখবার নেই সেখানে।

মলিনাকে ঘিরে আজ তার চারদিকে শুধু আকাশ-শূন্যতা।

যন্ত্র চালিতের মত সরলা বলল, হ্যাঁ, দেব মাইনে। তার টাকা আসুক। বইও কিনে দেব।

সরলার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

তার মনে হচ্ছিল—মুদি, বাবুল, গৌর মাস্টার—সমস্ত সংসারটা যেন হাঁ করে চেয়ে আছে হাবুলের ঐ কটা টাকার দিকে। সময় গুণছে। ফুটোগুলো অপেক্ষা করছে তার ওই টাকার, টাকা এলে চালায় শণ উঠবে। সবাই যেন নির্মম,—নিষ্ঠুর।

নিজের অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে সে চিঠিখানা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বেড়া

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

চাপা অসন্তোষের ধূমে বহ্নির রূপ নিল। ছোট বৌয়ের হাত থেকে থালাটা নিয়ে বড়বৌ ছুঁড়ে উঠানে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠে চীৎকার, তুই কি ভেবেছিস না ছোট বৌ! আমি কি তোর পেট ভাতায় আছি? কথায় কথায় আমায় তুই চোখ রাঙাস!

ছোট বৌ তাড়াতাড়ি উঠানে নেমে থালাটা কুড়িয়ে নিল। টোল খেয়েছে দু জায়গায়। টোল-খাওয়া জায়গাগুলোর ওপর সন্তর্পণে হাত বোলাতে বোলাতে বড় জা'র দিকে চেয়ে বলল, এত দেমাক কিসের? তবু যদি বুঝতাম পেটে দু' কড়া বিদ্যে আছে। ভগবান তো সব দিক দিয়েই মেরেছেন। বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখলে সাত পুরুষ নরকস্থ হয়।

কি এত বড় কথা তুই আমায় বললি? ওই তো দুটো গুঁড়ো, ওরই জন্য তোর এত গুমর! ভগবান যদি থাকে, তবে আমি প্রাতঃবাক্য করছি, একটাও থাকবে না। নদের ঘরেতেই শেষ হবে। আমি যদি সতী হই, তবে আমার কথা—

বড় বৌয়ের কথা আর শেষ হল না। বাঘিনীর মত ছোট বৌ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

বড়বৌ ক্ষীণকায় কিন্তু ছোটবৌ রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট। সংসারে তার অভাব বেশী কিন্তু তবুও দিনের পর দিন কি করে সে মেদ সঞ্চয় করে চলেছে, সেটাই বিস্ময়ের কথা।

এক হাতে বড় জা'র চুল ধরে অন্য হাতে থালার কানা দিয়ে সবেগে আঘাত করে চলল।

এত বড় কথা! এতদিন বড় বলে রেহাই দিয়েছিলাম, কিন্তু কিসের বড়! যে নিজের মান রাখতে জানে না, সে আবার কিসের গুরুজন, ডাইনী কোথাকার!

কপালের দু-এক জায়গা কেটে রক্ত বেরোতেই ছোট বৌয়ের সম্বিত ফিরে এল।

ছোট বৌও একেবারে অক্ষত অবস্থায় নয়। সারা মুখে বড় বৌয়ের নখের আঁচড়, চুড়ির দাগ।

দুজনেই কুপিত বাঘিনীর মতন গর্জাতে শুরু করল। আর এক পালা হয়ত হয়ে যেত কিন্তু বাধা।

দুদিক থেকে দু-ভাই এসে উঠানে দাঁড়াল।

বড় ভাই সদরে গিয়েছিল এক মকদ্দমার ব্যাপারে। আজ কাছারী বন্ধ। কিন্তু উকীলের বাড়ী দরকার ছিল। মুহুরীর কাছে উকীলের দ্বার সর্বদা অবারিত।

ছোট ভাই ফিরল চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। পাশা খেলা শেষ করে।

দুই বৌ দুই স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনেই চোখে আঁচল চাপা দিল। কেবল বড় বৌ ফুঁপিয়ে কাঁদল, আর ছোট বৌ তারস্বরে।

বাস, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। ছোট ভাই হুংকার দিয়ে উঠল। যাত্রার দলের নামকরা এ্যাক্টর। জাঁদরেল পার্ট সবই সে করে, কাজেই গলার জোর খুব।

বড় ভাইয়ের গলার একটু দোষ আছে। নাকি সুর, তার ওপর স্বরটাও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা। হাওয়া ঢোকা ভেঁপুর মতন।

কিন্তু ঝগড়া-ঝাটিতে এ স্বর বেশ কাজে লাগে।

সহ্য আর আমিও করছি না। এতদিন শুধু শুনে এসেছি, আজ চোখের সামনে যা দেখলাম, এক ভিতে আর নয়। পৃথক রান্নাঘর তো হয়েইছে, এবার বসতবাটিও আলাদা করব।

আলাদা ব্যবস্থা না হলে আমি জল গ্রহণই করব না।

ছোট ভাই প্রায় লাফাতে শুরু করল।

ঈস আর একটু হলে চোখটা যেত। বড় ভাই এবার বড় বৌয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

অমন একচোখো মেয়েমানুষের চোখ যাওয়াই ভাল।

ছোট বৌ চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল।

কি এত বড় আস্পর্ধা, ভাসুরের কথার উপর কথা, বড় ভাইয়ের গলায় গিটকিরি শুরু হল। উদারা, মুদারা, তারা।

বাস, বেশী কথা কি, দর্মা কেনাই আছে। চ্যাঁচারির বেড়ার ওপর দর্মাগুলো লাগিয়ে দিলেই তো হয়। ছোট ভাই কাজের কথা বলল।

সত্যিই দর্মা কেনা ছিল। গরুর ঘরের পাশে আর একটা ছোট ঘর করার কথা। খড়-কুটো রাখবার। তারপর গোলমাল শুরু হতে বাড়তি ঘরের প্রশ্ন ওঠেনি।

গরু সব বড় ভাইয়ের, সুতরাং গোয়ালঘরও তার। দর্মাগুলো দু ভাইয়ের পয়সায় কেনা, কাজেই সে দর্মা বড় ভাই ব্যবহার করতে পারল না।

কদিন পরে কথা হচ্ছিল রোয়াকটা দর্মা দিয়ে আলাদা করে দিলেই বাড়ীটা দু ভাগ হয়ে যায়। পুবে বড়, পশ্চিমে ছোট। এক ছুটির দিন দেখে জন-মজুর লাগিয়ে কাজটা শেষ করে ফেলবে। কতক্ষণেরই বা মামলা।

কিন্তু না, আর অপেক্ষা করা চলবে না। আজ যা ব্যাপার হয়ে গেল এরপর এক বাড়িতে থাকা অসম্ভব। পৃথক অন্ন আগেই হয়েছিল। অবশ্য ছেলেপিলে দুটো গোলমাল করত। মার হেঁসেল থেকে জ্যাঠাইমার হেঁসেলে গিয়ে জুটত। মাঝে মাঝে ভাল-মন্দ তরকারিও চালান আসত বটঠাকুরের পাতের কাছে। আজ থেকে সব শেষ। ভাইয়ের চেয়ে বড় শত্রু আর পৃথিবীতে নেই।

বড় ভাই বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে শুরু করল। ছোট ভাই মাথায় করে দর্মাগুলো নিয়ে এসে উঠানে ফেলল।

কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। বাঁশের ফ্রেমে দর্মাগুলো বসিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া। উপস্থিত এই ব্যবস্থাই চলুক। তারপর মজুর ডেকে পাকা বন্দোবস্ত করলেই চলবে। এখন তো অন্তত কেউ কারুর মুখ দেখতে পাবে না।

কাজ শুরু হবার আগে ছোট বৌ একবার স্বামীকে তাগাদা দিয়েছিল, হ্যাঁগা দুটি মুখে দিয়ে এ কাজে লাগলে হত না?

ছোট ভাই কোন কথা বলেনি। শুধু আ[illegible] চোখে কটমট [illegible] চেয়েছে।

বড় বৌও বড় ভাইকে খাবার কথা মনে করে দিতে এসেছিল, বড় ভাই হাতের খাটা খুঁজিয়ে বলেছে, এ ব্যবস্থা না করে জলস্পর্শ করব না। থাকও না বড় বৌ। খাও এখুনি থেকে।

সুতরাং ব্যবস্থা হতে লাগল।

বাঁশের ফ্রেম লাগান হল। দর্মাগুলো পর পর সাজিয়ে দিল, ছোট ভাই দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। এদিক থেকে ওদিক। দর্মার ফুটো দিয়ে এক ভাই আর এক ভাইয়ের হাতে দড়ি গলিয়ে দিতে লাগল।

বড় ভাই দড়ি বাঁধতে বাঁধতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ছোট ভাইয়ের একটা হাত এদিকে এসে পড়েছে। এক হাতে দর্মাটা সে শক্ত করে ধরে আছে, যাতে নড়ে-চড়ে না যায়।

একটা আঙ্গুলের দিকে বড় ভাই এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। ঠিক আঙ্গুলের দিকে নয়, অনামিকার গোড়ায় একটা তিলের দিকে। লাল, বড় একটা তিল।

ছোট ভাইয়ের নাম সোমনাথ। ডাক নাম হাবু। এ তিলটা ওর সহজাত। বেশ মনে আছে বড় ভাইয়ের, হাবু যখন কোলে নেবার মতন হয়েছিল তখন থেকেই সে এই তিলটা লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য করার মতনই তিল। লাল টুকটুকে। ফর্সা রঙের আরও যেন মানিয়েছিল।

একদিন কথাটা দীননাথ মানে বড় ভাই তার বাপকে বলেই ফেলেছিল।

ভাইয়ের আঙ্গুলে একটা লাল মতন কি বাবা?

বাপ জমিদারের কাছারীতে খাতা লেখে। প্রায় সর্বদাই ব্যস্ত। অন্তত ব্যস্ততার ভাণ একটা থাকেই। ছেলের কথা শুনে বলল, এখন সময় নেই, বিকেলে এসে বলব।

বিকেলে বাড়ী ফিরতেই দীননাথ [illegible] করিয়ে দিল।

ছেলের আঙ্গুলটা নিরীক্ষণ করে [illegible] বলল, এটা তো তিল একটা দেখছি।

এটা কেন হাতে থাকে বাবা? বড় ছেলের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

কেন থাকে হাতে! দাঁড়া। বলে তাকের উপর থেকে বাপ পাঁজি পেড়েছিল। পাতা উল্টে উল্টে তিল-তত্ত্বের অধ্যায়ে এসে থেমেছিল।

বিড় বিড় করে পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় এসে বলেছিল।

এই যে, দক্ষিণ হস্তে তিল থাকিলে জাতক সুশ্রী, সৌভাগ্যবান ও বিনয়ী হয়। তিলটি লোহিত বর্ণ হইলে জাতকের রাজচক্রবর্তী হইবার সম্ভাবনা।

দীননাথকে কথাগুলোর মানেও ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

অর্থ শুনে দীননাথ চুপ। ছোটর রংটা ফর্সা, নাক, মুখ, চোখও নিন্দার নয়। কাজেই কালে সুপুরুষ হয়ে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। তার ওপর রাজচক্রবর্তী হলেই তো সর্বনাশ। দীননাথকে বড় ভাই হয়ে প্রজার মতন হুকুম তামিল করতে হবে।

পরের দিন ভোরে উঠে দীননাথ তন্ন-তন্ন করে নিজের দেহ খুঁজেছিল। লাল তিল দূরে থাক কোথাও একটু কাল তিলও নেই।

ভগবানের ওপর অসম্ভব রাগ হয়েছিল। এই একচোখোমির কোন মানে হয়! একই বাড়ীর ছেলে অথচ দীননাথের রং চাপা, নাক, মুখেরও তেমন বাহার নেই। মা মাঝে মাঝে বলত, আমার দীনুর রূপ না থাক বাপু। হীরের আংটি আবার বাঁকা!

সেই বয়সেই দীননাথ বুঝত এ শুধু স্তোকবাক্য। হীরের আংটি বাঁকা হলেও কেউ নেবে না।

দীননাথ অভিমানে ফুলে রইল। পাঠশালা যাবার সময় রোজকার মতন মা যেমন হাত ধরে ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেত, তেমনই নিয়ে যেতেই মুখ ফিরিয়ে রইল।

মনে মনে বলল, তোমায় ভক্তি করার কোন মানে হয় না। তোমার বিচার নেই। একই বাড়ীর দুই ছেলেকে তুমি দু রকম জিনিষ দাও।

তিলের কথাটা কিছুতেই তার মন থেকে গেল না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল দাওয়ায় সোমনাথ ঘুমোচ্ছে। চোখে কাজল, বাঁ গালে খয়েরের টিপ। রাজপুত্রের মতন চেহারা। অবশ্য তাতো হবেই। পরে যে রাজচক্রবর্তী হবে তার চেহারা ছেলেবেলায় রাজকুমারের মত হবেই হবে।

একদৃষ্টে দীননাথ চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর বই-শ্লেট ফেলে সোমনাথের পাশে গিয়ে বসল।

আচমকা সোমনাথের চীৎকারে মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

ছেলে লাল হয়ে গেছে। ফঁকিয়ে কাঁদছে।

কি হল রে— কি করেছিস হাবুর? ছেলে এমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?

দীননাথ নির্বিকার।

মা সোমনাথের পাশে বসে পড়ে নিরীক্ষণ করে দেখল তার সারা দেহ, পিঁপড়ে কামড়াল না লেগে গেল কোথাও!

দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল।

হাতের আঙ্গুলের গোড়াটা লাল। তিলের ওপর কে যেন চিমটি কেটেছে।

দীননাথের পিঠে দু-চার ঘা পড়তেই সব বেরিয়ে পড়ল। ভাইকে সে কিছু করতে চায়নি, কেবল তিলটা তুলে নিতে চেয়েছিল।

কেন তুলে নিতে চেয়েছিল সে কথা কিছুতেই দীননাথ বলল না। প্রচুর মার খাওয়ার পরও।

সোমনাথ একটু বড় হতেই কিন্তু দীননাথ বদলে গেল। তিল যে তুলে আর একজনের অঙ্গে বসানো যায় না, সে বোধটুকু তখন হয়েছে। তখন তার একমাত্র কাজ হল ভাইকে আগলে বেড়ান। ভাইকে মানে, ভাইয়ের তিলকে। কারণ হাবু রাজচক্রবর্তী হলে, সে নিজেও একটা কেউ-কেটা নিশ্চয় হতে পারবে।

মনে আছে দীননাথের, সোমনাথের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের ঝগড়াঝাটি হলে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। কোন রকমে মারামারিতে তিলটা না উঠে যায়। তা হলেই সর্বনাশ। সোমনাথ নিতান্ত সাধারণ হয়ে যাবে। তার চাকচিক্য, ভবিষ্যৎ সব শেষ।

আরও পরে, ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় লেগে ঠিক তিলের পাশটা কেটে গিয়েছিল।

দীননাথ বাড়ী ছিল না। ফিরে এসে খবর শুনে কেঁদে আকুল। ভাইয়ের তিল বুঝি আর নেই। তবু [illegible] সোমনাথের আঙ্গুলের ব্যাণ্ডেজ খুলে, অক্ষত তিলটা ছেলেকে দেখিয়ে তবে নিস্তার পেয়েছিল।

একটু বড় হতে নিজের তিলের ওপর দাদার এই মমতা দেখে সোমনাথ বিস্মিত হয়েছিল।

একদিন দাদাকে নিরালায় পেয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল।

হ্যা, দাদা, এ তিলটা থাকলে কি হয়?

ভাইয়ের অজ্ঞতায় দাদা বিস্মিত হয়েছিল। ভাইকে চুপি চুপি বলেছিল, কি না হয়, তাই বল? টাকা, পয়সা, পদ সব হয়।

তার মানে আমি খুব বড়লোক হব? ও পাড়ার মজুমদারদের মতন।

নাক দিয়ে দীননাথ অদ্ভুত এক শব্দ বের করেছিল। তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক।

কার সঙ্গে কার তুলনা! তুই হবি রাজ-চক্রবর্তী। সারা দেশে তোর মতন লোক ক'টা থাকবে? লাল তিল, যা তা কথা নয়।

দাদার কথায় সোমনাথেরও তিলের ওপর ভক্তি হয়েছিল। পাশাপাশি দুই ভাই শুত। দীননাথ ভাইয়ের হাতটা নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে রাখত সারা রাত। পাছে তুচ্ছ মশার কামড়ে রাজচক্রবর্তীত্ব লোপ পায়।

আরও পরে যখন ছোট ভাই চাকরী-বাকরী কিছু জোটাতে পারেনি, এ দরজা থেকে [illegible] দরজা ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখন [illegible] আঙ্গুলটা দাদার সামনে প্রসারিত করে [illegible], দাদা, লাল তিলে রাজচক্রবর্তী হয় না? দুবেলা দু-মুঠো ভাতের যোগাড়ই করতে পারছি না।

দীননাথ সান্ত্বনা দিয়েছে হবে, হবে, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। বড় কাজ হবে বলেই ছোট কাজ হচ্ছে না।

বহু কষ্টে একটা চাকরী যোগাড় হল। তাও দাদার সুপারিশে।

চাকরী হতেই দাদা বৌদি ক্ষেপে উঠল বিয়ে দেবার জন্য।

মাথা খারাপ তোমার? সোমনাথ আপত্তি করেছে, এই মাইনেয় বিয়ে!

দীননাথ চেঁচিয়ে উঠেছে, এই মাইনে মানে? আমার মাইনে নেই? কিছু বলা যায় না, বৌয়ের ভাগ্যেই হয়ত তোর বরাত খুলবে।

বৌ এল। বরাতে পাথর আরও যেন চেপে বসল দীননাথ কিন্তু আশা ছাড়েনি। পাঁজি পেড়ে ভাইকে তিলতত্ত্ব শুনিয়েছে।

বৌ স্বামীর ভাগ্য ফেরাতে পারল না। কিন্তু মন ফেরাল। রাত-দিন স্বামীর কানে ফুস-মন্তর দিয়ে দিয়ে দাদা বৌদিকে বিষতুল্য করে তুলল।

তখনও সোমনাথ পুরোমাত্রায় বদলায়নি।

যাত্রায় রাজা সেজে এসে দাদাকে বলেছে, দাদা, তোমার তিলতত্ত্ব কোন কাজে লাগল না। রাজচক্রবর্তী হওয়ার বদলে, যাত্রার দলে রাজা সেজেই জীবনটা কাটল।

দীননাথ তবু আশা ছাড়েনি। বলেছে, হবে, হবে, অত ব্যস্ত হস কেন। পাঁজির কথা কখনও মিথ্যে হয়!

তিলের ওপর আকর্ষণটা তিল তিল করে কখন যে গোটা মানুষটার ওপর বর্তেছে, তা দীননাথই ভাল করে জানে না।

(শেষাংশ ১৫১ পৃষ্ঠায়)

মুকুট

— মানবেন্দ্র পাল —

কল্যাণীর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেনি এমন যে কেউ একেবারে ছিল না, তা নয়; তবে তাদের নাম না করাই ভালো,—অন্ততঃ সরল নিষ্পাপ কিশোরী কল্যাণীর মুখ চেয়ে।

কল্যাণী যে গ্রাম্য সংসারে মানুষ—তার চারিদিকে আত্মীয়বন্ধু নিয়ে তার যে একান্ত নিজের ছোট্ট জগতটি ছিল, আজ চিরদিনের মত তাদের ছেড়ে চলে যাবার সময় চিরকালের সখ্যতা এবং কৃতজ্ঞতার শেষ সম্পদটুকু অম্লান রেখেই যেন চলে যায়—তার বিধবা মা সত্যবতীরও সেই ইচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার অখ্যাত গ্রাম। আচারে-বিচারে বাঁধা সংস্কারে জর্জর এখানকার প্রত্যেকটি পরিবার। তারই মধ্যে অতি যত্নে অতি সাবধানে সত্যবতী কল্যাণীকে এই চৌদ্দ বছর বুকের উত্তাপে লালন করে এসেছিলেন। কল্যাণীর শত্রু কেউ নেই—তবে কল্যাণী আপন অজ্ঞাতে কারও শত্রু কিনা তা অবশ্য সে জানে না। শান্ত ধীর, সরল বালিকা। রঙটি ময়লা কিন্তু মুখশ্রীটি বড়ো সুন্দর। স্নিগ্ধ টানা টানা দুটি চোখ। গভীর শান্ত বয়ঃসন্ধিমুখে নব-যৌবনের প্রথম তরঙ্গ সবেমাত্র দেহের তীর ছুঁয়েছে।

তবু মেয়ে কালো এই ছিল মায়ের ভাবনা। এছাড়াও আরও একটি ভাবনা ছিল, মেয়ের দেহটাই শুধু বেড়েছে, মনটা বাড়েনি মোটেই। এখনো আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিপড়ার সময়ে ছেলে-মানুষের মতো ভেজা চাই, ছোটো ছেলেদের মতো কাগজের নৌকা নালায় বৃষ্টির জলে ভাসানো চাই; আবার বিদ্যুৎ চমকালেই দুকানে আঙুল চেপে ছুটে এসে মায়ের বুকে লুকোবার সময় তার চৌদ্দ বছর বয়েসের কথা মনে করবার দরকারও হয় না। গ্রামে পুজোর সময় ঘোষালদের ঠাকুর দেখতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরার নাম নেই। ঠাকুর দেখছে তো দেখছেই। শুধু কি আর মাটির মূর্তি দেখছে? মা দুর্গার গায়ের রঙ দেখছে, অসুরের রঙ দেখছে, রক্তমাখা খড়্গ দেখছে, ডাকের সাজ দেখছে,—আর দেখছে বিরাট মুকুটখানা! যাত্রা হবে শুনলে কেউ আর তাকে বাড়িতে ধরে রাখতে পারবে না। খেয়ে না খেয়ে সারারাত যাত্রা শুনবে। শুনতে শুনতে হয়তো সেখানেই ঘুমিয়ে যাবে, তবু যাত্রা থেকে উঠে বাড়ি চলে আসবে না।

অথচ ওরই সমবয়সী পদ্ম—এইতো সবে পনেরোয় পা দিল, এরই মধ্যে যেন পাকা গিন্নি! পদ্মর সঙ্গে কল্যাণীর গভীর অন্তরঙ্গতা। সারাদিন দুই সখী পুকুর পাড়ে ছায়ায় বসে হাসি গল্প করবে—হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়বে। আবার কখনো পদ্ম গম্ভীর হয়ে কল্যাণীকে পরামর্শ দেয়, কল্যাণী বিশ্বস্ত শ্রোতার মতো তা শুনবে। কখনো সখীকে সোহাগ করে চিবুক ধরে বলে—হাঁরে তোর বর আসবে কবে?

কল্যাণী হেসে উত্তর দেয়—তুই চিতেয় চড়লে।

কিন্তু পদ্মর চিতায় চড়বার অনেক আগেই কল্যাণীর কপালে বর জুটল। গ্রামের পুরুষরা বর-পক্ষের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হল—আর মেয়েরা বরের রূপ দেখে ঈর্ষায় জর্জরিত হল। কিন্তু তবু কিছু করবার নেই। বিধাতাও এতটুকু বাদ সাধলেন না। ছেলের বাপ স্বয়ং এসে মেয়ে পছন্দ করে দশ ভরি ওজনের একখানি মুকুট মেয়ের মাথায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন।

গ্রামসুদ্ধ সবাই মুকুটটা দেখে গেল। সবাই বললে—বাঃ! [illegible] কল্যাণী [illegible] হতে চলল!

সত্যবতী তৃপ্তির হাসি [illegible]। কল্যাণী আপন আনন্দ গোপন করার জন্য লজ্জায় মাথা নীচু করল।

কেবল একজন নিন্দুক বললে—'সিঁদুর তো সবাই পরে, কপালগুণে [illegible] ধরে।' তা অমন মুকুট—ওকি আর সবাইকে মানায়? আহা কল্যাণী, দেখতে একটু যদি রূপসী হতিস!

কল্যাণী তেমনভাবেই মাথা নিচু করে রইল।

কল্যাণী শ্বশুরবাড়ি এল। জায়গাটা আধা-শহর আধা-পাড়াগাঁ। তবু শহুরে ভাবটাই বেশি। বাড়িখানা বিরাট। তার দেউড়ি থেকে পুজামণ্ডপ পর্যন্ত কোথাও একালের ছাপ নেই। প্রবীণ কালটা যেন ধুঁকতে ধুঁকতে অনেক কষ্টে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কল্যাণী বাড়ি দেখে অবাক হল। তাদের গাঁয়ে এত বড়ো বাড়ি কারও নেই।

শ্বশুরের বয়েস হয়েছে। কিন্তু চেহারাটি সুন্দর। ফর্সা ধবধবে রঙ যেন পাকা আমটি! আজকাল কল্যাণী পাশে বসে পাখা নিয়ে বাতাস না করলে যেন তাঁর খাওয়াই হয় না।

কল্যাণীর মন ভরে ওঠে। এত বড় বাড়ির বউ সে! এতো তার আদর! সত্যিই অমৃত চাটুজ্যের অবস্থা ভালোই। ছেলেগুলিও বেশ, কেবল বড়ো ছেলে কলকাতার একটি ধনী ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের সংস্পর্শে এসে বিগড়ে গিয়ে বাপের মতের অপেক্ষা না করেই জার্মাণী চলে গিয়েছে। এই একটা তাঁর মস্ত আঘাত। মেজো ছেলেটি খুবই ভালো। বিয়ে-থাওয়া করে এখানেই ঘর-সংসার করছে। ছোট ছেলে [illegible]

পাছে শহরবাসের পক্ষে যায়, তাই ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়া বন্ধ করে দিলেন এবং পাছে কোনো শহুরে শিক্ষিতা মেয়ের খপ্পরে পড়ে উচ্ছন্নে যায় তাই তিনি তাড়াতাড়ি কাছের একটি গ্রাম থেকে খুঁজে পেতে একটি মেয়ে জোগাড় করে আনলেন। মেয়েটি পরমাসুন্দরী নয়—তবু তার বাড়ির বৌ হবার মতো মোটামুটি গুণ তার আছে।

কল্যাণীর সৌভাগ্য দেখে তার গ্রামে যারা ঈর্ষা করেছে; তারা এ তথ্য জানত না। কিন্তু কল্যাণীর আরও একটি বিস্ময়ের বস্তু আছে এ বাড়িতে। সে হচ্ছে ঐ সুব্রত। তারই সুন্দর মুখখানি। তার গায়ের রঙ তো নয়, যেন [illegible]। কালো কুচকুচে ঢেউ খেলানো চুল। অবাক হয়ে লোভীর মতো কল্যাণী তাকিয়ে দেখেছে কতক্ষণ। কিন্তু, না, শুধু একবার ঐ থাক্ থাক্ চুলে হাত বোলাতে পারত!

শুধু ওর চুলই নয়—গোঁফের বাহার। সরু কচি গোঁফ নাকের ঠিক নীচ থেকে একটু নেমে এসে ঠোঁটের দুপাশে যেন দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাবাঃ! কী গোঁফ ছাঁটার বাহার! এমন কি তাদের গাঁয়ের কোনো নাপিতে ছাঁটতে পারে?

কত নির্জন দুপুরে হঠাৎই সেই ছেলেটা তার আশ্চর্য সুরে বলেছে—কী-দেখছ অমন করে?

উত্তর দিতে পারেনি কল্যাণী। কানের দু-পাশ লাল হয়ে গেছে শুধু।

তা বলে ও-ও বুঝি দেখে না? কত রাতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাদের বিছানায়। ঘুমের ভান করে কল্যাণী মিটি মিটি তাকিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ও-ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে সেই কখন থেকে!

পরে একসময়ে মায়ের কাছে গেলে পদ্মকে বলেছিল,—অমন করে কেউ চায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘুম কি আসে? তুই-ই বল! এমনি এক-আধ রাত্তির না—রোজ রোজ!

পদ্ম অবশ্য তার উত্তর দেয়নি। হয়তো বিশ্বাস করেনি।

হ্যাঁ, এ-বাড়ির সবই অবাক করা। একদিন হয়েছিল কি হঠাৎই রাত্তিরবেলায় পাশের মানুষ তার গায়ে হাত দিয়ে ফেলেছিল। অমনি কেন যে তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তা ঠিক বুঝতে পারেনি। না,—ভয়ও নয়, রাগও নয়, ঘেন্নাও নয়। তবে কেন যে এমন হল! মনে মনে স্থির করেছিল, পদ্মর কাছ থেকে জেনে নেবে। সে-রাত্তিরে সেই যে হাতটা চমকে সরিয়ে দিয়েছিল ও আর অমন করে তাকে ছোঁয়নি। বেশ ভালো ছেলে—লক্ষ্মী ছেলে! ভারি অবাক লাগে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আছে আর একটি। সেটিরই ওপর তার যত লোভ। সেটি যদিও তারই—তবু সেটি থাকে সযত্নে ঐ লোহার সিন্দুকে তালাবন্ধ।

শাশুড়ি সেদিন হাসতে হাসতে বললেন—এই নাও ছোটো বউমা, তোমার সিন্দুকের চাবি। তোমার জিনিসের দায়িত্ব তুমিই রেখো। এই বলে তিনি নিজে হাতে [illegible] আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে স্নেহাসিক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—বৌমার আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা না থাকলে কি মানায়?

শাশুড়িতো চাবি দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু সুব্রত বুড়োকর্তার মতো গম্ভীরভাবে বললে—চাবি দিলে, কিন্তু সাবধান, যখন তখন যেন সিন্দুক খুলো না। আর চাবি হারিয়ে ফেলো না।

কিশোর স্বামীর এ-কথায় কল্যাণীর রাগ হল না—হল ভয়। কেবলই মনে হতে লাগল, চাবিটা যেন ভার হয়ে তার পিঠে ঝুলছে।

এক-একদিন খুব ইচ্ছে করত, চুপি চুপি সিন্দুকটা খুলে, আর কিছু না, শুধু তার ঐ সোনার মুকুটটা একবার দেখে। মুকুট সে দেখেছে অনেকবার। দেখেছে ঘোষালদের প্রতিমার রাঙতা মোড়া মুকুট—দেখেছে যাত্রাদলে রাণীর মাথায় মুকুট। কিন্তু মুকুট যে অমন সত্যিকারের হয় এ তার জানা ছিল না।

তাই খুব ইচ্ছে করত, ঘরে যখন কেউ থাকবে না তখন চুপি চুপি ঐ মুকুটটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখে। কিন্তু পারত না, সাহসে কুলোত না। ঐযে সে বারণ করে দিয়েছে।

দিন কাটে। সবার আদরে সবার সোহাগে বাড়ির ছোটো বউ-এর মাটিতে আর পা পড়ে না। এবাড়িতে কারও সে বৌদি, কারও রাঙা বৌদি, কারও মামী, কারও কাকী। এই চৌদ্দ বছর বয়েসেই সে যে এত সম্মান পাবে তা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল! মনে মনে ভাবে, এবার যখন মায়ের কাছে যাবে তখন পদ্মকে এসব গল্প বলবে। কিন্তু পদ্মটা যেন কেমন হয়ে গেছে। আগের মতো আর তেমন সাড়া দেয় না।

এত সুখ—তবু কল্যাণীর কোথা যেন একটু দুঃখ। তার পিঠের ওপর আঁচলে বাঁধা ঐ ভারী চাবির গোছা নিত্যই উঠতে বসতে ঝম-ঝম্ করে বাজে—ও যেন তাকে কেবলই লজ্জা দেয়। না, সিন্দুক খোলবার অধিকার তাকে তারই মানুষ দেয়নি!

কিন্তু যদি একদিন খুলতে পেত—তা-হলে শুধু একবার ঐ মুকুটটা দেখত। ও মুকুটটা তো তারই। একবার শুধু ভালো করে দেখবে। বিয়ের পর আর পরা হয়নি,—কবে যে আবার পরতে পাবে কে জানে! সেই মুকুটটি একবার ঘরে খিল দিয়ে পরে দেখবে। কেমন লাগে তাকে দেখতে। এ-যে সত্যিকারের মুকুট কিনা! ছোটো বেলায় এই মুকুট নিয়ে তার কত কল্পনা ছিল।

কিন্তু মনের সাধ বনের ফুলের মতোই গোপনে ঝরে যায়!

বিয়ের সময় একদিন পরেছিল বটে মুকুটটা কিন্তু তখন লজ্জায় হৈ-চৈ-এর মধ্যে ভালো করে নিজেকে দেখতে পায়নি। ভালো করে কারুর মন্তব্য শুনতে পায়নি। বরঞ্চ সবাই মুকুটটিরই প্রশংসা করেছিল—তাকে কেমন মানিয়েছিল একথা কাউকে বলতে শোনেনি। বরঞ্চ—

হঠাৎই মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল—আহা কল্যাণী, একটু যদি রূপসী হতিস!

সে কি রূপসী নয়?

না। রূপসী কাকে বলে তা সে দেখেছে—এবাড়িতে এসে। তার বড় জা রূপসী। তার ননদরা রূপসী—তার শাশুড়ি রূপসী—এমন-কি বউ-ভাতের সময় কলকাতা থেকে বড়ো জায়ের যে বোনটি এসেছিল সেও রূপসী। তারই বয়সী মেয়েটি। ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু কী করে যে অত বড়ো বয়েস পর্যন্ত একটা ঢিলে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত—তা দেখে বরং কল্যাণী লজ্জায় মরে যেত। তবু খুব ভাব হয়েছিল তার সঙ্গে। যাবার সময় বার বার করে চিঠি দিতে বলেছিল, ও কলকাতা গিয়েই চিঠিও দিয়েছিল একটা—কিন্তু কল্যাণী লিখবে কী। যা হাতের লেখার ছিরি!

হ্যাঁ, এ বাড়ির সবাই রূপসী। শুধু ছোটো বউ রূপসী নয়।

একথা যেই মনে হল অমনি কল্যাণীর তরুণী বক্ষ তোলপাড় করে একটা নিঃশব্দ কান্না ফুঁপিয়ে উঠল। ইচ্ছে করল, এখুনি গায়ের গয়নাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়—আলনা থেকে দামী শাড়িগুলো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

আবার মনে হল, তবে যে এরা তাকে এত আদর করে সে কি মিছিমিছি? তাকে কি সবাই ভোলায়?

সেই নির্জন দ্বিপ্রহরে খাঁ খাঁ শূন্যতার মাঝখানে কল্যাণী আপন বেদনায় আপনি ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বারে বারে ঘুরে ঘুরে সেই একটা প্রশ্ন তার কানের কাছে ফুঁসতে লাগল—সে কি রূপসী নয়?

আহা পদ্মটা যদি এসময়ে কাছে থাকত!

কিন্তু—

এক এক দিনের কথা মনে পড়ে। সেও প্রা[illegible] এমনি দুপুরেরই কথা। বাইরে ঘনঘটা[illegible] অবিশ্রান্ত ধারা। ছাতের নালা দিয়ে তোড়ে জ[illegible] পড়ছে। মাঝে মাঝে আকাশ ফেড়ে বিদ্যু[illegible] চমকে উঠছে। অমনি কল্যাণী ভয়ে কানে আঙু[illegible] দিয়ে ঘর থেকে পালাচ্ছে। পিছন থেকে একটি ব্যস্ত-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে—ও ব[illegible] যাচ্ছ কোথায়?

চমকে উঠেই কল্যাণী বলে, [illegible] ভয় করছে।

—ভয় করছে তো, বাইরে কোথায় যাচ্ছ?

—দিদির কাছে।

অমনি একটি দুষ্টুমিভরা মুখ থেকে হাসির ঝংকার ওঠে। ছুটে এসে খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে বিছানার ওপর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়। অনুযোগের সুরে বলে—ভয় ভাঙাতে বুঝি কেবল বৌদিই পারেন, আর কেউ নয়?

এমন করে কেটে কেটে স্পষ্ট করে বলে যেন তার প্রত্যেকটা কথা বুকে গেঁথে যায়। কল্যাণী আবেগে আনন্দে কেঁপে ওঠে।

আবার অনেক দুপুরে হঠাৎ সেই দুষ্টু ছেলেটার কত রকমের খেয়াল! কোথাও কিছু নেই নিজেই বসে তাকে সাজাতে।

—দেখি, ঐ শাড়িটা পরো। উঁহু, সিঁদুরের টিপটা আমি পরিয়ে দিই। কাজল—কাজল কই? কাজল পরিয়ে দেব।

এমন ভাবে বলে যে 'না' করা যায় না।

এতেই সাজানো শেষ হয় না। এবার গয়না।

—সিন্দুকটা খোলো দিকি।

অমনি কল্যাণীর বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। ভুল শুনেছে না তো?

কোন ঝামেলা নেই

মডেল এন.টি. ৮২বি মূল্য ৪৭৫৲
(ট্যাক্স বাদে)

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

৩ ডালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা ১

অথরাইজড ডিলার

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

রেডিও এণ্ড এক্সেসরিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

অলকা রেডিওস এণ্ড নভেলটিস প্রাঃ লিঃ
৮, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

পি সি সাহা লিঃ
১৭০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

নান্ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

এম বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স
২১, চৌরঙ্গী, কলিকাতা—১৩
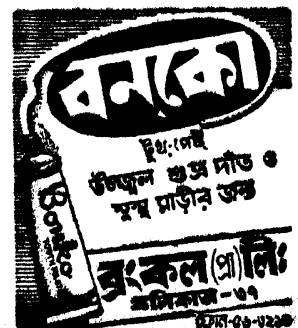
ভুল দেখে নি। আবার সেই মধুর আবেশ! কল্যাণী কম্পিত হাতে সিন্দুক খুলতে যায়। কিন্তু সে আমলের ভারী সিন্দুকের ডালা খোলা কল্যাণীর সাধ্যে কুলোয় না। দু'একবার টানাটানি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন সেও আসে হাসতে হাসতে। দুজনে মিলে টানাটানি করে ডালা খোলে। অমনি কুবেরের স্বর্ণভাণ্ডার এক মুহূর্তে কল্যাণীর চোখের সামনে নিঃশব্দ কঠিন হাসিতে ঝলমল করে ওঠে।

এক একটা গহনা বার করে সেই পাগল ছেলেটা তাকে দিনদুপুরে নিজের মনের মতো করে সাজাতে বসে। প্রায় সব গহনাই পরায়। শুধু—শুধু মুকুট বের হয় না। কল্যাণীর লুব্ধ-দৃষ্টি এবারও ব্যর্থ কামনার ভার বয়ে ফিরে আসে। কিশোরী-বধূ এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে ওঠে—ওটা পরব না?

মুখ ফুটে 'মুকুট' কথাটাও লজ্জায় উচ্চারণ করতে পারে না।

সে বলে—না, ওর দরকার নেই। এই বলে সিন্দুকের ডালা সশব্দে বন্ধ করে দেয়।

তারপরে বিহ্বলবিস্ফুব্ধ সালংকারা বধূকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বড়ো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—তাকাও আমার দিকে।

কিন্তু কল্যাণী তাকাতে পারে না। তার দুই চোখ যে তখন জলে টল্ টল্ করছে।

সে মুহূর্তের অত সুখ—কিন্তু তারই মাঝে ঘুরে ঘুরে কেবল ঐ একটি কথারই প্রতিধ্বনি—ওর দরকার নেই।

কেন নেই? ওর মুকুট কি তাকে মানায় না? সে রূপসী নয়, তাই কি ঐ সোনার মুকুটে তার অধিকার নেই?

ধরো তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী? কী হবে ঐ সোনার মুকুটে? এই যে আজ এমন করে পাওয়া—এই যে দুরন্ত ভালোবাসা এর চেয়ে বড়ো কি কিছু আছে? এ-সবই তো তার। ঐ ঘর তার—ঐ পালংক তার—ঐ মানুষটা তার—ঐ সিন্দুক তার—ঐ সোনার মুকুটটাও তারই। এর কোনোটাই কোনোদিন তার হাতছাড়া হবে না। তবে আর দুঃখ কিসের?

তবু অন্য অবসরে কল্যাণীর ব্যর্থ লুব্ধ-হৃদয় বারে বারে ঐ বদ্ধ লৌহ কারাগারের চারিদিকে অন্ধ ভ্রমরের মতো মাথা কুটে কুটে ফেরে।

ভাদ্র মাসের শেষ। চারিদিকে পুজোর আমেজ লেগেছে। মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য-কিরণ উৎসবের হাসির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে লাইনের ওপারে পক্বপ্রায় ধানের ক্ষেতগুলি বাতাসে থর থর করে কাঁপছে। কল্যাণীর বুকের মধ্যেও মাঝে মাঝে অমনি আশা-নিরাশার কাঁপন লাগছে—এবার পুজোয় মার কাছে যেতে পারবে তো?

একতারা বাজিয়ে সেদিন এক ভিখিরি আগমনীর গান গেয়ে গেল।—মা-মেনকার আর মন মানছে না। মেয়েকে নিয়ে আসবার জন্যে বারে বারে পাষাণহৃদয় গিরিরাজকে ব্যস্ত করে তুলছে—যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী—

কল্যাণীর হৃদয়ও ব্যাকুল হয়ে উঠল। মায়ের কাছে যেতেই হবে। কতদিন মাকে দেখেনি!

কিন্তু যাওয়া তার হল না। শ্বশুর স্বয়ং এসে বললেন—মা, এ-বছরটা তুমি এখানে থাকো। বাড়িতে পুজো। তুমি নইলে সবই যেন শূন্য হবে।

কল্যাণী আর বাড়ি যাবার কথা বলতে পারেনি। ব্যথিত হৃদয়ভার নিয়ে আপন বেদনায় আপনি মর্মাহত হয়ে রইল।

ক্রমে পুজোর দিন এগিয়ে এল। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেল। নতুন শাড়ি নতুন গহনা। চারিদিক গমগম। হ্যাজাকের আলোয় রাত যেন দিন!

এরই মধ্যে বাড়িতে একদিন একটু বেশি সোরগোল উঠল—অলকা এসেছে—অলকা এসেছে!

প্রথমে বুঝতে পারেনি কল্যাণী। তারপরেই মনে পড়ল—বড়ো জায়ের বোন! বিয়ের সময় এসেছিল। বেশ দেখতে। খুব ভাব হয়েছিল তার সঙ্গে। কলকাতায় থাকে—উঁচু ক্লাশে পড়ে।

অলকা এসে দাঁড়ালো কল্যাণীর কাছে।

—চিনতে পার?

না, সত্যিই চিনতে পারার উপায় নেই। এই তো সেদিন এসেছিলে। এরই মধ্যে কবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। সারা গায়ে স্বাস্থ্য আর যৌবন টলটল করছে। একে সুন্দর রঙ, তার ওপর দুটি ঘনপক্ষ্ম কাজলটানা চোখ। ও-মুখের দিকে যে একবার তাকায় সে আর সহজে মুখ ফেরাতে পারে না।

বাড়িসুদ্ধু সবাই তো এখন 'অলকা' 'অলকা' করে অস্থির। একে তরুণী তার ওপর সুন্দরী—তার ওপর কলকাতায় থাকে—কলকাতার স্কুলে উঁচু ক্লাশে পড়ে। এ-বাড়ির কোনো মেয়ে-বউ-এর কপালে এমন সৌভাগ্য ঘটেনি। অলকার গর্বে কল্যাণীর বড়-জাও যেন ইদানীং মেপে মেপে কথা বলতে শুরু করেছে।

পুজোর হাঙ্গামা মিটে গেল। কিন্তু ছুটি ফুরোয় নি। থেকে গেল কেউ কেউ। অলকা চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আটকালো সবাই। ঠিক হল একদিন বাড়িতে ছোট্ট একটা ঘরোয়া থিয়েটার করা হবে।

অলকার উৎসাহ খুব। মনের মতো একটা বইও পাওয়া গেল। পৌরাণিক বই। তা হোক, বেশ জমবে। তাতে আবার একটি রাজা আর একটি রাণীর পার্টও আছে।

রাজার পার্ট করবে কে?

অলকা তৎক্ষণাৎ বললে—সুব্রতদা!

সুব্রত রাজি হল।

—আর রাণী?

এবার সবাই চুপ। হঠাৎ সকলের মৌনদৃষ্টি দূর থেকে কল্যাণীকে শুধু একটিবার স্পর্শ করে গেল মাত্র। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বললে না। কল্যাণী লজ্জায় আপন কাজের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে রইল।

তখন স্পষ্টভাষী কে একজন বললে—অলকা রাণী সাজলে কিন্তু মানায় ভালো।

অমনি সমস্বরে সবাই তা মেনে নিলে। কেবল বৃদ্ধ অমৃতলাল ইতস্ততঃ করে বললেন, —কেন, আমাদের বৌমা হলেও তো—

তখনও কল্যাণী দূরে বসে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের আড়ালে পান সাজছিল, শ্বশুরের এই কথায় লজ্জায় উঠে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ লজ্জা সুখের নয়—এ লজ্জা অক্ষমের অপমান। সে যে কেবলমাত্র এ-বাড়ির ছোটো বউ—ঐ পরিচয়টুকুর গণ্ডী অতিক্রম করে কিছুতেই অন্য কোনো কাজে সে স্বামীর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়—এমনকি সামান্য অভিনয়ের ক্ষেত্রেও, এই কথাটাই আজ তাকে বারে বারে পীড়ন করতে লাগল।

মহড়া আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়িসুদ্ধ লোকের এখন আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। শুধু থিয়েটার আর থিয়েটার। শ্বশুরমশাইও মাঝে মাঝে নিজে তদারক করেন।

দুপুরে আগের মতোই অখণ্ড অবকাশে সজ্জিত হয়ে আসে, আবার চলে যায়। কিন্তু সুব্রতর আসার সময় নেই। সে তখন নীচের বৈঠকখানা ঘরে জোর মহড়া দিতে ব্যস্ত। ওপরের ঘরেও মাঝে মাঝে অলকার প্রাণখোলা হাসি—সুব্রতর উচ্ছ্বসিত বাহবা শরৎ-মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা চকিত করে কল্যাণীর কানে এসে পৌঁছয়। কল্যাণী মনের চঞ্চলতা দমন করবার জন্যে কখনো শোয়—কখনও উঠে বসে—কখনোবা উদাস দৃষ্টি মেলে দূর রেললাইনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তবু কিছুতেই নীচের ঘরে ঐ মহড়ার মধ্যে গিয়ে বসতে পারে না। তা যদি পারত, তাহলে তার নিজেরই পক্ষে অনেক জটিলগ্রন্থির সহজ মুক্তি ঘটত। কিন্তু তেমন মনের জোর তার ছিল না বোধ হয়।

সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে সুব্রতর দেখাই নেই একরকম। শুধু রাত্তিরে এক-একদিন বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে না পড়লে, গল্প করে। সে গল্পের বিষয়বস্তু ঐ থিয়েটারের রিহার্সাল।

—আঃ! অলকা যা পার্ট করচে! চমৎকার! যেমনি মুখের ভাব তেমনি উচ্চারণের ভঙ্গী! কই তুমি তো একবারও দেখতে গেলে না?

কিন্তু কল্যাণীর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

যদি একটি মাত্রও কথা কল্যাণী সে মুহূর্তে উচ্চারণ করতে পারত, তাহলে এ-কথার উত্তরে একটি কথাই বলত—কই তুমি তো একদিনও আগ্রহ করে আমায় ডেকে নিয়ে গেলে না? ইচ্ছে করলে আমার মতো সামান্য গ্রাম্য মেয়েকেও কি তুমি ওদের সামনে একটু সম্মান দিতে পারতে না?

কিন্তু বলি বলি করেও কল্যাণী কোনো কথাই বলতে পারল না। শুধু প্রাণপণ করে উচ্ছ্বসিত রোদন রুদ্ধ করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

—ঘুমোলে?

নিরুত্তর কল্যাণীর দিকে মুহূর্তমাত্র তাকিয়ে শ্রান্ত সুব্রত পাশ ফিরে শুলো।

অভিনয়ের আগের দিন রাত্রেও অমনি দুজনে নিঃশব্দে শুয়ে রইল পাশাপাশি। কল্যাণীর এই ক'দিনের আকস্মিক স্তব্ধতা দেখে সুব্রতর হয়তো মনে হয়েছিল, বাপের বাড়ি যেতে পারেনি বলেই কল্যাণীর মন খারাপ। তাই বোধহয় আর কথা বলে বিরক্ত করেনি। কিন্তু কল্যাণীর মনে হল, এত বড়ো অনাদর তার কপালেও ছিল! সে রাত্তিরটা শুধু চোখের জলেই জেগে রইল। নিদ্রিত সুব্রত বিন্দুমাত্র তা টের পেল না।

কিন্তু পরের দিন সকালেই হঠাৎ আশ্চর্য পরিবর্তন কল্যাণীর। হাসিখুশি, উচ্ছল, চঞ্চল। সেদিন যদিও সন্ধ্যার পর অভিনয় তবু সকাল থেকেই সবাই ব্যস্ত। কল্যাণী নিজে গিয়ে তাদের সেই ব্যস্ততার মধ্যে নিজের আসনটুকু

(শেষাংশ ১৪১ পৃষ্ঠায়)

নটী

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দাদারের অভিজাত পল্লীতে চারতলার পূব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট পেয়ে কোন স্ত্রী অসুখী হতে পারে একথা বিশ্বাস করা শক্ত—আমিও করিনি। তাই তিনদিনের দিন অফিস থেকে ফেরবার পরই মণিমালা যখন ঘোষণা করলে—"আর একদিনও এ বাড়ীতে থাকা চলবে না—কালই অন্যবাসা ঠিক করতেই হবে"—তখন চমকে উঠে টাইটা খুলতে গিয়ে বোধহয় ফাঁসটা টেনে দিয়েই থাকব—নইলে দম আটকে আসছে বলে মনে হল কেন।

মণিমালার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলুম। নাঃ ওর থমথমে মুখে কোথাও ঠাট্টার ছিটে-ফোটাও নেই। সকাল বেলা যাকে সুস্থ সবল সহজ হাসিখুশী দেখে গিয়েছিলুম, তার মাথা খারাপ হবার......নাঃ চোখে ত তার পাগলের দৃষ্টি নেই। তাছাড়া এইত কোটটা সহজভাবে হ্যাংগারে টাঙিয়ে দিলে,—ঘামে ভেজা গেঞ্জীটা বারাণ্ডার তারের উপর ক্লিপ্ দিয়ে আটকে দিলে—মোজা দুটো কাচবার জন্য একপাশে সরিয়ে জুতো জোড়া ঠিক জায়গায় রেখে থমথমে গলায় বললে—"কথাটা কানে ঢুকলো—কালই অন্য বাসায় সিফ্‌ট করতে হবে।"

শুকনো গলায় বললুম—"কেন কি হল?"

—"ছিঃ, লজ্জা করেনা প্রশ্ন করতে—এত অধঃপাতে নেমেছ?" বলে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

আমার সব কিছুই যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কাল রাত্রে—অর্থাৎ এখনো চব্বিশঘণ্টা পুরো হতে পাঁচঘণ্টা বাকী আছে। মণিমালা বলেছে "এট্যাচ্‌ড বাথ আর গ্যাসের উনুন আমার ছোটবেলার স্বপ্ন"—আর আজ! মণিমালা আবার তেমনি ছিটকে ঘরে এসে ঢুকলো—তার হাতে আমার স্লিপার। নাঃ, স্লিপার দুটো পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—কাল যদি এ বাড়ীতে রাত কাটাতে হয় তাহলে উপোষ করে মরব। ছিঃ—ছিঃ—কি ঘেন্না।"

"ব্যাপার কি মণি?"

—আহা ন্যাকা। ভিজে বেড়াল সাজা হচ্ছে—কিচ্ছুটি জানেন না। আমি বেশ্যার সঙ্গে একবাড়ীতে বাস করবো?—কপালে এও ছিল"

—বেশ্যা!

—আহা, আকাশ থেকে পড়লে যে। সিঁড়ির বাঁপাশে পশ্চিমদিকের ফ্ল্যাটটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—বেশ্যা না ত কি। কি চুপ করে রইলে কেন—বল সীতা সতী, সাবিত্রী—রোজ সকালে পাদক জল খাব—বল—বল—"

"লীলাবাঈ?"

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—চোখ চেয়ে এখন কত লীলাই দেখতে হবে—কিন্তু দোহাই তোমার আগে আমায় মরতে দাও—তারপর যা খুশী কোরো।"

—"ছিঃ মণি, তুমি এত নীচ হয়ে গেছ।—ভদ্রমহিলা শুনেছি নাচ গান করেন শেখানও। ব্যক্তি হিসেবে তুমি তাকে ছোট মনে করছ কেন। এখন ত কত ভদ্রঘরের মেয়েরা থিয়েটার বায়োস্কোপ করছেন—ছিঃ ছিঃ, তোমার এমন কথা বলা ভাল হয়নি।" অনেকটা ধর্মযাজকের মত সুরেই বললুম।

ফল বিপরীত হল। মণিমালা ঘৃণা আর ব্যঙ্গের সুরে বললে—"'ভদ্রমহিলা' 'আজ্ঞে' 'উনি' 'করেন', 'শেখান'—মরে যাই। বেশ্যা-বেশ্যা-বেশ্যা—হাজারবার বলব নাচ গান করে নাচউলী, বাঈজী-নটী—মানেই বেশ্যা।"

এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো বললে—যেন অভিধান দেখে বলছে। এ[illegible] কঠিন সুরে জবাব দিলুম—"তা তিনি যাই হোন্‌না কেন—আমাদের তাতে কি? আমাদের ফ্ল্যাট আলাদা—আমাদের......"

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই মণিমালা দুর করে বললে—কিন্তু সিঁড়ি এক—চোখে চোখে কথা হবে, গায়ে গায়ে ছোঁওয়া লাগবে, এসেন্স পাউডারের গন্ধ পাব মদমাতালে আসা যাওয়া করবে তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে বাঁয়ে ঘর ভুল হয়ে যেতে পুরুষের আর কতক্ষণ। জানি, জানি, তুমি আর আমাকে নতুন করে কি শেখাবে।"

নাঃ—সত্যিই শেখাবার আর কিছু নেই। তাই নিস্পৃহ কণ্ঠে বললুম—"কিন্তু তাতেই বা কি করব। বাড়ীত আর আমার নয় যে ইচ্ছে করলেই তুলে দিতে পারব, তিনিও ভাড়া দিয়ে থাকেন আমরাও ভাড়া দিয়ে থাকব।"

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ সাধুপুরুষ! তোমায় 'তাঁকে' তোলবার কথা একবারও বলিনি—নিজেদেরই উঠে যেতে বলছি। এমনি করে নিজের চোখের উপর নিজের সর্বনাশ দেখতে পারব না।"

এবার মরিয়া হয়ে জবাব দিলুম—তাহলে তোমাদের কোলকাতায় ফিরে যেতে হবে মণি—আমি কোন একটা মেসে গিয়ে উঠব। বোম্বাইএ বাসা পাওয়া যাবেনা।"

মণিমালার সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি আরো তীব্র হয়ে উঠল—"বড় আরাম-না? তাহলেই চার-পো হয়। আমি আসবার একমাস আগে এখানে এসে উঠেছ—খুব জমেছে বুঝি—আমি চলে গেলে সব কণ্টক দূর হয়—না?"

"যা খুশী কর—" বলে রাগ করেই উঠে পড়ে কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেলুম।

কাছেই একটা পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চের উপর নিজের ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দিলুম। মনের যে অবস্থায় মানুষ সন্ন্যাস নেবার বা আত্মহত্যার সংকল্প নেয়, আশ্চর্য! সেই অবস্থায় আমার লীলাবাঈকে মনে পড়ল। লীলাবাঈকে দেখিনি—একথা বলার মত নির্লজ্জ মিথ্যা আর নেই—সিঁড়িতে ওঠা নামার পথে অনেকবার তাঁর সামনাসামনি পড়েছি। একেবারে সিঁড়ির উপর

চোখ রেখে নতনেত্রা একপাশে সরে গিয়ে বরাবর সসম্ভ্রমে পথ করে দিয়েছেন। চোখোচোখি হবার সম্ভাবনা কম বলেই তাঁকে ভাল করে দেখেছি—সুন্দরী, শাঁখের রেখার মত সুপক্ষ্ম টানা টানা দুটো চোখের কোণে শ্রান্তির ঈষৎ কালো ছায়া—সারা দেহে নিটোল স্বাস্থ্যের দুর্নিবার আকর্ষণ। এই সিঁড়িতে তাঁর ভক্তদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—হলদে তার গোলাপি প্যাকান পাকড়ী—আর চুড়িদার পাঞ্জাবী—চলে যাওয়ার পরও আতর আর জর্দার গন্ধে সিঁড়িটা ম্যো ম্যো করেছে। তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্য থেকে তানপুরার আওয়াজ পেয়েছি, নূপুরের শব্দ গানের দু এক কলিও ভেসে এসেছে। মানুষের মর্জি দিয়ে যে মহৎ মন্তব্য একটু আগেই মণিমালার কাছে করেছি—তা আমার সাহিত্যিকের মত কিনা একথা এখন যাচাই করতে চাইনা।

কিন্তু তাই বলে মণিমালার অভিযোগ—না, আমি নিঃসংশয়ে জানি কোন অশুচি বাসনা আমাকে স্পর্শ করেনি। বস্তুতঃ আমাদের পাড়িটাই আলাদা—ছোটবেলা থেকে একটা আদর্শের অনুসরণ করে আপন দুর্ভাগ্য আর দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে করতে সবে একটু পায়ের তলার মাটির স্পর্শ পেয়েছি—আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসি—আমার একবছরের ছেলে রুণুকে নিয়ে আমি কত আশা আনন্দের স্বপ্ন দেখি—আমার এই জগতের বাতায়ন থেকে লীলাবাঈ-এর জগতের দিকে চেয়ে থাকার কৌতূহল থাকতে পারে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়—তা সে মণিমালা তার জিভে যত বিষই ঢালুক না কেন।

রাত হচ্ছে—ইচ্ছে না থাকলেও ক্লান্ত বিষণ্ণ মনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলুম। কাঁসার বেলটা টেপবার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানিনা লীলাবাঈ-এর বন্ধ দরজার পেতলের নবটার দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখলুম।

এরপর কয়েকদিন সাধারণতঃ যা হয় তাই। সুতরাং সে কথা থাক। অবিশ্রান্ত কান্না ঝগড়া তর্ক ভয় দেখানর শেষে মণিমালা শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েই মেনে নিয়েছে যে সতর্ক সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে স্বামীপুত্রকে রক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে বোধ হয় তার আর কোন কর্তব্য নেই—কারণ প্রত্যেক বিশ্বস্ত সূত্র থেকেই খবর পেয়েছে যে আমার কথাই ঠিক, বৃহৎ বোম্বাই শহরে—এমন কি তার সহরতলিতেও ইচ্ছে করলেই বাড়ী পাওয়া যাবেনা।

আমার অফিস যাবার সময় হাসিমুখে দরজা খুলে দাঁড়ান তার চিরকালের অভ্যাস। তার সে হাসিতে কিছু ইঙ্গিত কিছু দুষ্টামীর ছোঁয়া থাকত। এখনও দরজা খুলে দাঁড়ায়—শিক্ষিকার মত চোখের সতর্ক দৃষ্টি—প্রথমেই লীলাবাঈ-এর দরজার পেতলের নবটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে—কয়েকবার বাতাসের ঘ্রাণ নেয়—সন্দেহ হলে আমাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সিঁড়িটা পরীক্ষা করে, তারপরে আমার নামবার সময় যতদূর সম্ভব চোখের দৃষ্টিতে আমার পিঠটা বিঁধতে থাকে—সে আমি পেছনে না চেয়েও বুঝতে পারি। অফিস থেকে ফেরবার সময় প্রায়ই তাকে ঝুলবারান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি—আমাকে দেখতে পেলেই দরজা খুলে সিঁড়ির উপর গিয়ে দাঁড়ায় প্রিয় মিলনের আশায় যে নয় এ কথা বোঝবার মত বেকুফ আমি নই। অন্যান্য যত রকমের সাবধানতা নেওয়া সম্ভব সবই নিয়েছে সে, ও-বাড়ীর বাঈএর সঙ্গে এ বাড়ীর বাঈএর কথা বলা নিষেধ—মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে রুণুর টলটলে পা দরজার বাইরে ফেলবার উপায় নেই। তবুও অঘটন একদিন ধরা পড়ল। বাঈ-এর কোলে রুণুর গাল টিপে দিয়ে তার হাতে চকোলেট গুঁজে দিয়েছিলেন নাকি লীলাবাঈ। চকোলেট ছুঁড়ে ফেলে দিলে মণিমালা—শীতের সন্ধ্যায় অবেলায় ছেলেটাকে চান করিয়ে দিলে, আর তার প্রবল জেরার মুখে বাঈ যখন কবুল করলে—এমনি ঘটনা আরো দু একবার ঘটেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরী খতম।

শুনেছি 'অতি' কিছু নাকি বিধাতার অভিপ্রেত নয়। তাই মণিমালার অতি শুচিতার ফল এলো একদিন। বেলা তিনটের সময় অফিসে টেলিফোন পেলুম—আমার বাসায় বন্ধ ঘরে আগুন লেগেছে। তারপরই কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলুম। যখন পৌঁছলুম তখন এলোমেলো মেয়ে-পুরুষের ভীড় রাস্তায়, সামনের লন ভরে গেছে—সবাই চেঁচাচ্ছে। বাড়ীটার আরো অনেকটা ফ্ল্যাটের মালপত্র জমে উঠেছে সামনের লনটার উপর—সকলেই নিজেদের সামলাচ্ছে উপরে আমার ফ্ল্যাট থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মণিমালা! রুণু!—দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখেই মণিমালা পাগলের মত বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—"ওগো আমাদের কি হল গো—রুণু ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছে—দরজা কিছুতেই খুলতে পারলুম না।" বুকের পর কে যেন চাবুক মারলে। মণিমালাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উপরে দৌড়োলুম। শক্ত কাঠের ভারী দরজা ভিতর থেকে বন্ধ—কজনে মিলে লাথি ঘুঁসি মারতে অনেক শব্দ হল কিন্তু খুলল না। বাইরের বারান্ডায় যাবারও উপায় নেই। ভেতরে রুণুর ভয়ার্ত কান্না শুনতে পাচ্ছি। তাহলে ছেলেটা এখনো আছে—আবার নীচের দিকে দৌড়োলুম একটা কুড়ুল, সাবল যা হয় কিছু দরকার। কিন্তু কিছু নেই—ফায়ার ব্রিগেড ফায়ার ব্রিগেড বলে চিৎকার করে সেইখানে বসে পড়লুম।

হঠাৎ সকলের "সাবাস সাবাস" চিৎকারে উপরের দিকে চেয়ে দেখলুম—দুটো ফ্ল্যাটের মধ্যের দেওয়ালের কাঁচের শার্সি খুলে কার্নিশের উপর কখন নেমে দাঁড়িয়েছেন লীলাবাঈ। তাঁর হাতের একটা পাকান শাড়ী ছুঁড়ে আমার রেলিংএ লাগাবার চেষ্টা করছেন—দুবার টাল সামলে নিতেও দেখলুম। তবুও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শাড়ীর দুটো মুখ ধরে ফেললেন—তারপর সে শাড়ী ধরে ঝুলে পড়লেন সার্কাসের মেয়েদের মত। এই দুঃসাহসী মহিলার দিকে আমরা সবাই আতঙ্কে চেয়ে আছি—এক্ষুনি আমাদের সামনে অপঘাত মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু লীলাবাঈ রেলিং ধরে ফেললেন—তারপর প্যারালাল বারে ওঠার মত করে উঠে পড়লেন বারান্ডায়—শুধু বৃহৎ এক চাপড়া বালি সশব্দে নীচে খসে পড়ল। সবাই জয়োল্লাসে চিৎকার করে উঠল আমি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োলুম। সিঁড়ির মুখে উঠতেই আমার দিকে রুণুকে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়লেন লীলাবাঈ—তখনো তাঁর পেটিকোটের নীচে আগুন জ্বলছে।

আমার পিছন পিছন সবাই উঠে এসেছে। ওদিকে নীচে ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি। ড্রয়িং রুমে আমার সব কিছু পুড়ে গিয়েছে—যাক, তবু আমাদের সর্বস্ব রক্ষা পেয়েছে। চেয়ে দেখলুম রুনুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে মণিমালা কাঁদছে।

কারণও বোঝা গেল। স্টোভে খোকার দুধ বসিয়ে মণিমালা ভিতরে গিয়েছিল। দমকা বাতাসে ভিতরের দরজাটা বন্ধ হয়ে নীচের মেটো ছিটকিনিটা পড়ে যায়—সেই বাতাসে বোধহয় কোন কাপড়ও উড়ে পড়ে থাকবে জ্বলন্ত স্টোভের উপর।

নিজের আকস্মিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত না হলে লীলাবাঈকে নিশ্চয়ই মনে পড়ত। মনে যখন পড়ল তখন লজ্জায় বেদনায় মরে গেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁর বন্ধ দরজায় ঘা দিলুম। ঝি দরজা খুলে হাউ হাউ করে কেঁদে যা বললে তার অর্থ এই দাঁড়ায়—মাইজী পুড়ে গেছেন—যন্ত্রণায় ছটফট করছেন কিন্তু কাউকে ডাকতে দেবেন না। ওকে সরিয়ে দিয়েই ভেতরে ঢুকলুম।

সাজান ড্রয়িংরুমে কার্পেটের উপর পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন লীলাবাঈ। তাঁর গায়ের উপর একখানা সাদা চাদর টানা যেটুকু খোলা আছে তাতেই দেখলুম তাঁর হাত দুখানা আর মুখ ভীষণভাবে পুড়ে গিয়ে বড় বড় ফোস্কায় বিকৃত হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই দুটো হাত জোড় করে উর্দুতে বললেন—"বাবুজী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি দয়া করে চলে যান—আমি ভাল আছি, আমার কোন সাহায্যের দরকার হবে না।"

অসম্ভব! তাঁর ঘরের টেলিফোনে এ্যামবুলেন্সে খবর দিলুম। তাঁর বহু আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলুম।

কয়েকদিন ছুটি নিয়েছি। মণিমালাকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের সর্বনিকৃষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেছে। আগুনের জ্বালা জুড়োতে ভুল করে গায়ে জল ঢেলেছিলেন লীলাবাঈ। সমাজ পরিত্যক্তা এই নিঃসহ নারী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কাউকে ডাকতে পর্যন্ত চান নি। হাসপাতালে গেলে বারবার রুণুর খোঁজ করেছেন—আর হাত জোড় করে বারবার বলেছেন—বাবুজী আপনারা অনেক করেছেন—হাসপাতালে আমি খুব সেবা যত্ন পাচ্ছি—আপনারা আর কষ্ট করবেন না। কুণ্ঠায় জড়িয়ে যেত তাঁর কণ্ঠস্বর।

লীলাবাঈ-এর মৃত্যুর ঠিক দুদিন আগের সন্ধ্যা। তখন তাঁর পোড়া ঘা থেকে গন্ধ বেরোতে আরম্ভ করেছে। আমি একাই গিয়েছিলাম। লীলাবাঈ কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"আবার এলেন বাবুজী, আমার লজ্জার আর শেষ রইল না।" তারপর কিছুক্ষণ কেবিনের পর্দার দিকে চেয়ে কার যেন প্রতীক্ষা করলেন—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে শুনলাম। লজ্জিত হয়ে বললুম—"রুণুর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে তাই মণিমালা তাকে নিয়ে আর আসতে পারলনা। একা থাকলে কথা বলার অনেক অসুবিধে—আর বলবার

আচ্ছেই বা কি। লীলাবাঈ বললেন, চোখে আলো লাগছে—যদি অসুবিধে না হয় তাহলে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে—টেবিল ল্যাম্পটা উল্টোমুখে ঘুরিয়ে রাখতে। তাঁর ইচ্ছে মত ঘরের আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটার সেডটা ঘুরিয়ে দিতে মুখের উপর ছায়া পড়ল।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন লীলাবাঈ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"আমার সময় হয়েছে অনিলবাবু—কিন্তু যাবার আগে কয়েকটা কথা আমার কাউকে বলতে হবে—আপনি শুনবেন অনিলবাবু।" বিস্মিত হয়ে বললুম —"বাঃ চমৎকার বাংলা বলেন ত আপনি!" —"আমি যে বাঙ্গালীর মেয়ে অনিলবাবু।"

একটু থেমে বললেন 'সেই কথাই ত বলব। বড় ঘরের মেয়ে—আমার বাবার নাম করলে আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন তাই সে নাম আর করবনা—তাছাড়া এই মুখে তাঁর নাম উচ্চারণ করিই বা কি করে।" লক্ষ্য করলুম ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা কপালে ঠেকিয়ে পিতাকে প্রণাম করলেন। "ছোটবেলা থেকে নাচ গান আর খেলা-ধুলোয় আমার খুব ঝোঁক ছিল। পড়া-শুনোর সম্ভাবনা নেই দেখে বাবা সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন—বড় বড় ওস্তাদ রেখে নাচ গান বাজনা শিখিয়েছিলেন—অল্প বয়সেই খুব নাম হয়েছিল—সেই বয়সে কোলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় সংস্কৃতি সভায় নাচে গানে অনেক পুরস্কার পেয়েছিলুম।"

"মা বাবা দুজনেরই সাধু সন্ন্যাসীতে একটু বেশী ভক্তি ছিল। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই একজন বাঙ্গালী সাধু আসতেন। আমাদের পরিবারের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন বিশ্বাস করতেন। আমাদের ভাই-বোনদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবা তাঁর পরামর্শ নিতেন—আমাদেরও তাঁকে মান্য করে চলতে হত। যখনই আসতেন তখন অন্ততঃ চার-পাঁচ দিন থেকে যেতেন—পুজো পাঠে ভক্তদের আসা যাওয়ায় আমাদের বাড়ী সরগরম হয়ে থাকত।

একবার সন্ন্যাসী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা সকলেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেলুম। তারপর......" চুপ করলেন লীলাবাঈ।

বেশ অস্বোয়াস্তি অনুভব করছি—মনে হচ্ছে লীলাবাঈ এখুনি এমন কথা বলবেন যা শোনা আমার উচিত নয়—মানুষের দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিতে নেই—তাই বললুম 'শুনুন, ও সব কথা থাক, মানুষের প্রত্যেকের জীবনেই ভুল-ভ্রান্তি কিছু না কিছু থাকে—তাকে নাড়া দিয়ে লাভ নেই।"

লীলাবাঈ-এর মুখ দেখতে পেলুম না কিন্তু গলা শুনলুম—স্তব্ধ আত্মসমাহিত।—"সে কথা আমিও জানি অনিলবাবু—কিন্তু সে তাদের কথা যারা ভুল-ভ্রান্তি ভুলে নতুন করে চলতে চায়—অনেক মহৎ দায়-দায়িত্ব দিয়ে যারা সে ভুলকে মুড়ে রাখতে পারে—কিন্তু আমার ত সে পথ নেই—তাছাড়া আমি ত আর তাদের দলে নেই—"একটু থেমে বললেন—একদিন বর্ষার রাতে সেই সন্ন্যাসীই আমার কৌমার্যকে কলঙ্কিত করলেন—ফলে আমার সন্তান সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা গেল।" লীলাবাঈ কি কাঁদছেন? আমার সেই রকমই মনে হল।—"মা লজ্জায় ঘরে দরজা দিলেন—বাবা রাগে আর ঘৃণায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আমার নাচ গানের শিক্ষকদের উপর সন্দেহ ঘনীভূত হতে লাগল। সন্ন্যাসী আমাকে ডেকে আমার মা বাবার সামনে অনেক বকলেন—তাঁদের ভরসাও দিলেন।

তাঁর সঙ্গেই কোলকাতায় চলে এলুম। একটা ছোট বাসাও হল। ঝি রইল। আমি নিজেও খুব মুষড়ে পড়েছিলুম। সন্ন্যাসী আমাকে অনেক ধর্মকথা শোনাতেন—আমাকে মহাভারত থেকে বেছে বেছে উপাখ্যান পড়ে শোনাতেন আর বলতেন এতে কোন দোষ হয় নি—বেদ পুরাণে এরকম অজস্র নজির নাকি আছে। গোপনে গর্ভনাশের আয়োজন করছিলেন—জানতে পেরে কিছুতেই রাজী হলুম না। মা হবার প্রথম সরস অনুভূতিতে আমার দেহ ও মন ভরে উঠেছে—যদি তাঁর কথামত অপরাধই না হয়—তাহলে এ সর্বনাশা আয়োজন কেন। সন্ন্যাসী আপত্তি করলেন না। বাবার কাছে টাকা পাচ্ছেন—এদিকে তাঁর লালসা প্রায় প্রতিদিন আমার সর্বাঙ্গ লেহন করছে—আর পৃথিবীর লোকে বোধ হয় জানে তিনি পতিত উদ্ধার করছেন—সুতরাং যেমন চলছে চলুক। ক্ষতি কি?

"আমার ছেলে হয়েছিল অনিলবাবু। আমার জগৎ তখন সমস্ত পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে গেছে—আমি মা, আমার সমস্ত বাসাটা আমার সৌভাগ্যের বারাণসী। শুনেছি এমন দেশ নাকি আছে যেখানে আমার মত মায়ের পদমর্যাদা আছে—আমার খোকনকে সমাজ শ্রদ্ধা করবে। মনে মনে ভাবতুম খোকন একটু বড় হলে তাকে নিয়ে বাইরে চলে যাব—নাচ গান যা জানি তাতে হয়ত দুটো জীবন চালিয়ে নিতে পারব। সারা দিনটা আমার খোকনকে নিয়েই কাটত। সে হবার পর থেকেই সন্ন্যাসীকে আমি একটুও সহ্য করতে পারতুম না। প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হত। এক বছর এমনি কাটল—খোকন বড় হয়েছে—মা বলে ডাকে—রোজ রোজ তার নতুন নতুন কথা শুনি—টলমল করে চলতে শিখেছে। —অনেকটা আপনার রূপের মত—ছি ছি—ক্ষমা করবেন অনিলবাবু, রূপের সঙ্গে তুলনা করা আমার উচিত হয় নি।

'একদিন বাড়ীর ঝিটা বললে—কি আশ্চর্য মা, দাদাবাবুকে দেখতে ঠিক মহারাজের মত হয়েছে—অমনি চওড়া কপাল অমনি নাক।' সন্ন্যাসী সেখানে ছিলেন মনে হল চমকে উঠলেন —তাঁর চোখের উপর স্পষ্ট ভয়ের ছায়া দেখলুম। তারপর কয়েকদিন এলেন না—এলেন যখন তখনও ছাড়াছাড়া ভাব—তারপর......" অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন লীলাবাঈ। মনে হল যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আবার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি—অথচ সংকোচে লজ্জায় কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

"তারপর আমার খোকনকে আমিই একদিন শেষ করে দিলুম অনিলবাবু—" চমকে সোজা হয়ে বসলুম।—"সেদিন সন্ন্যাসী সেখানেই ছিলেন। খোকন দুধ খেতে চাইতনা, তাই কোলে শুইয়ে জোর করে যে দুধ খাইয়েছিলুম—তাতে বিষ মিশিয়েছিলেন সন্ন্যাসী। কিছুক্ষণের মধ্যে অস্বোয়াস্তিতে ছটফট করতে লাগল খোকন' তারপর কয়েকবার বমি পায়খানা হবার পর শেষ হয়ে গেল। সন্ন্যাসী নিজমূর্তি ধরলেন—বললেন 'জারজ সন্তানকে যদি নষ্ট করতেই হয় তাহলে আগে করলিনা কেন সর্বনাশী—এখন যে থানা-পুলিশ হবে অত বড় মানী লোকের মুখ পোড়ালী হতভাগী'। মা বাবার কথায় তারই পা জড়িয়ে বললুম—আমার মা বাবার সম্মান বাঁচান—যা বলবেন আমি তাই করব।' মরা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে একটুও কাঁদতে দেয়নি অনিলবাবু—বললে বংশের মুখ রাখতে গেলে তোকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। একবস্ত্রে সোজা লখনৌ যাবার পরামর্শ দিলেন; বললেন এদিকটা তিনি সামলাবেন। হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন আর একটা চিরকুটে একটা নাম আর ঠিকানা—বললেন তাঁরই কোন বন্ধুর —তাঁর কাছেই আশ্রয় পাব। লখনৌ-এ পৌঁছে জানলুম সে নাম ত দূরের কথা সে মহল্লা বলেও কিছু নেই। ফিরে আসতে পারতুম—কিন্তু কোথায় ফিরব আমার সমস্ত পিছনটা আমি নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি। আমার পাপের কি শেষ আছে। এবার ত আমি অগ্নিশুদ্ধ হয়েছি—বলুন অনিলবাবু, আমার খোকন কি আমায় ক্ষমা করবে।"

প্রায়ান্ধকার বিছানায় একটা চাদরে ঢাকা নারীদেহ ফুলে ফুলে উঠছে—যন্ত্রণা আর অনুশোচনায়। কান্নায় আমার গলাটা বুজে এসেছে। তবুও গলা পরিষ্কার করে বললুম—"দেখুন, আমি পণ্ডিত নই, শাস্ত্রজ্ঞানও নেই—কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসে নির্ভর করে বলছি মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার জন্য স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে—তাহলে সে স্বর্গ তার সমস্ত দুয়ার খুলে আপনার অভ্যর্থনা করবে—আপনার খোকন আপনার গলা জড়িয়ে ধরবার জন্য তার দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

লীলাবাঈ নিজেকে সামলে নিয়েছেন—মৃদুস্বরে বললেন—"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! আমার অনেক জ্বালার মধ্যে কত শান্তি পেয়েছি সে আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার আর একটা অনুরোধ, আপনারা আমাকে আর দেখতে আসবেন না—শুধু আমার শোবার ঘরের কোণে একটা টিপয়ের উপর একটা ছবি আছে সেইটা দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন—কিন্তু কিছুতেই নিজে আসবেন না অনিলবাবু।"

বুঝলুম, এ নিষেধ সৌজন্যের অতিরিক্ত অন্য কিছু। এ নিষেধ না মেনে তাঁর কাছে যাওয়ার আমার উপায় নেই অধিকারও নেই। হাত তুলে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

বাসায় ফিরে মণিমালাকে সংক্ষেপে সব কথা বললুম। তারপর তাকে নিয়ে চাবি খুলে লীলাবাঈ-এর ফ্ল্যাটে ঢুকলুম। ড্রয়িং রুমটা অতিক্রম করে শোবার ঘরে পৌঁছালুম। ভেবেছিলুম তাঁর খোকনের ছবি দেখব। দেখলুম তাঁর নিরাভরণ ঘরের কোণে একটি টিপয়ের উপর ভেলভেটের কুশনের উপর শুকনো ফুলের মালায় জড়ান শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে ম্যাডোনার ছবি। সামনের আরো একটি ছোট টুলের উপর অনেক পোড়া মোম জমে আছে। বাইরের ঘরের নর্তকী—প্রতিদিন কল্যাণী মাতৃমূর্তিতে ভিতরের ঘরে ঢুকেছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী। চোখের দৃষ্টি

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়

কঙ্কাত

মায়া বসু

পারবনা পারবনা পারবনা। কিছুতেই পারবনা আমি।"

উত্তেজিতভাবে চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছটফট করে উঠে দাঁড়ালো মন্দিরা।

"আমাকে কিছুই না জানিয়ে কোথাকার কে মিঃ রায়কে একেবারে কালই ইনভাইট করে আসা উচিত হয়নি তোমার। আমার সুবিধে-অসুবিধে বোঝা উচিত ছিল।"

কিন্তু তুমিই বা এত আপত্তি তুলবে কিকরে জানবো আমি? ও তো বেশিক্ষণ থাকতে আসছে না। বড় জোর ঘণ্টাখানেক। এমন তো অনেকেই এসেছে, আসবে। চা খাবে। গল্প করবে চলে যাবে। বাস ফুরিয়ে গেল। আমাদের বিয়েতে আসতে পারে নি। পুরোনো বন্ধুর বৌকে দেখতে আসবে। এতে দোষের কি আছে? এমন বন্ধু অনেকবারই তো এসেছে এখানে।

আমার কি নতুন বিয়ে হয়েছে নাকি যে কনেবৌ দেখতে আসবে ঘটা করে? প্রত্যেক দিন বন্ধুদের বাড়িতে এনে আড্ডা দেওয়া ভালবাসিনা আমি।

অভিযোগ সত্য নয়। বিস্মিত দৃষ্টিতে মনোজ স্ত্রীর ক্রুদ্ধ আরক্ত মুখের দিকে তাকালো।

কি ব্যাপার বল তো? ওর নাম শুনেই তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন? সত্যেন, অমল প্রশান্ত অবনীশ এদের বেলা তো আপত্তি করনি?

ব্যাপারটাকে তরল করে দেবার উদ্দেশ্যে একটু হেসে সকৌতুকে বলল, "কোথায় ওর এই সমস্ত দুঃখের কথা শুনে বিগলিত হয়ে ওকে দেখতে চাইবে, তা না উলটে তুমিও ওর পর চটে যাচ্ছো! বেচারার কপালটা দেখছি বড়ই মন্দ। বাকদত্তা প্রেয়সী প্রেমিকা বিয়ে করল না। আর বন্ধুর স্ত্রী তার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শুনে তার মুখ দর্শন করতে চাইছে না। চিনতে নাকি মন্দা ওকে বিয়ের আগে।

সরোষে মন্দিরা চীৎকার করে উঠল। তুমি থামো তো। যত সব বাজে ঠাট্টা ভাল লাগে না আমার।

"তবে থাক।" মস্ত বড় একটা হাই তুলে চেয়ারে গা ঢেলে দিল মনোজ। তোমার যখন এত আপত্তি, আমি না হয় কাল অফিসে গিয়ে টেলিফোন করে দেবো ওকে। যা হোক একটা কিছু কৈফিয়ৎ দিলেই হবে। তোমার শরীর ভাল না, কি অন্য কিছু—।

কিন্তু কত মিথ্যে অজুহাত আর কৈফিয়ৎ আছে সংসারে যাদিয়ে বাকী সমস্ত জীবনটা ওর মুখোমুখি আর চোখোচোখি না হওয়া যায়? একই সহরে থেকে? রাহুর গ্রাস থেকে কি চাঁদের মুক্তি আছে কোন দিন? বিমলেন্দুর হাত থেকে কি করে নিস্তার পাবে মন্দিরা? কোনো পথ খোলা নেই ওকে এড়িয়ে যাবার। সেই প্রত্যাখ্যান তার অপমানের নিদারুণ আঘাত সে কি কখনো ভুলতে পারবে? কোনো পুরুষ কি পারে?

না বিমলেন্দুও পারবে না। প্রতিশোধ নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ সে ছাড়বে না।

কি ভুলই না করেছিল সেদিন। অল্প বয়সের দুরন্ত যৌবনের উচ্ছৃংখলতায় অন্ধ হয়ে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছিল।

আজও যা মনে হলে দেওয়ালে মাথাকুটে মরে যেতে ইচ্ছে হয় সেই মারাত্মক ভুলের জন্যে!

কিন্তু—কিন্তু আজ এখন যেটাকে মারাত্মক ভুল বলে মনে হচ্ছে সত্যই কি সেদিন তার মধ্যে কোন ভুল ছিল? কোন সংশয়? কোন সন্দেহ কোন অবিশ্বাস?

বুকে হাত দিয়ে বলুক তো মন্দিরা:

কে ভেবেছিল এত তাড়াতাড়ি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

মনোজ যে বিমলেন্দুর প্রাণের বন্ধু, একসঙ্গে এনজিনীয়ারিং কলেজে পাঁচ বছর ধরে পড়েছে, তাই বা কি করে জানবে মন্দিরা?

সমস্ত জেনে শুনেও যে এখানে আসবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, শরীর খারাপের মিথ্যে কৈফিয়তে সে কি সন্তুষ্ট থাকবে, না সে কথা বিশ্বাস করবে?

টেলিফোনেই যদি বলে দেয় সব কথা যদি জানায় মনোজকে মানসীই মন্দিরা তখন কি হবে?

তার চেয়ে এই অনন্ত যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে ও আসুক। মন্দিরা দাঁড়াবে ওর সামনে নির্ভয়ে চোখ তুলে। যা বলবার বলুক। যা হবার সামনা-সামনি হোক। আড়ালে নয়।

আবার ঠেলে সরিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় এসে বসলো মন্দিরা। উত্তেজনার মুহূর্ত কেটে গেছে। এবার অবসাদের পালা।

আচ্ছা ওঁকে এখানে আসতে বারণ করতে হবে না। টেলিফোন করার দরকার নেই। কাল মিষ্টার রায় আমাদের সঙ্গেই চা খাবেন সন্ধ্যা-বেলায়।

লক্ষ্মী মেয়ে। মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে যায় এই যা দোষ। কিন্তু তুমি দিন দিন ভারী সেকেলে হয়ে উঠছো। আধুনিকা মেয়েরা স্বামীর বন্ধুর প্রেমের কাহিনী শুনে জ্বলে ওঠে না।

আদর করে মন্দিরার গাল টিপে মনোজ উঠে দাঁড়ালো। আমি সলিসিটর মিঃ ব্যানার্জির বাড়ি যাচ্ছি। ফিরতে রাত সাড়ে আটটা হবে। আলোটা কি জ্বেলে দিয়ে যাবো?

না থাক। একটু পরে জ্বালবোখন। তুমি

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঝাপসা হয়ে আসছে—গলার কাছে চাপা কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে। কুশমন্দুর ছবিখানা বুকের উপর তুলে নিলুম। ফিরে দেখলুম গলায় আঁচল দিয়ে খাটের উপর মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে মণিমালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মণিমালা ক্ষমা চাইছে।

কিন্তু বেশি রাত কর না ফিরতে।

সিঁড়িতে মনোজের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল। কাঠের পুতুলের মত অন্ধকারে মন্দিরা একা বসে রইল।

সামনেই ড্রেসিং টেবিলের মস্ত বড় মিররে অন্ধকারের মধ্যেই মন্দিরার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকা মূর্তিটার আবছা ছায়া পড়েছে। মস্ত বড় একটা জটিল জিজ্ঞাসার প্রশ্ন বাঁকা হয়ে যেন সকৌতুকে ওর দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ওটা যেন মন্দিরারই অতীতের ছায়া।

সহসা ছায়াটা নড়েচড়ে উঠতেই অজানা ভয়ে আরো যেন কাঠ হয়ে উঠল মন্দিরা। পর মুহূর্তে বিরক্ত হল। অসহ্য এ অর্থহীন ভয়। কোন মানে হয়না এ আতঙ্কের। জয় করতেই হবে এ ভয়কে।

মিররের বুকে স্থির হল ছায়ামূর্তি।

অফিস থেকে এসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে মনোজ বলেছিল, জানো মন্দা আজ হঠাৎ বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। মস্ত চাকরি করছে এখন। কাল তাকে আমাদের সঙ্গে চা খেতে বলেছি সন্ধ্যায়। ভারী চমৎকার ছেলে। আলাপ করলে তুমি খুব খুশি হবে।

টি-পটে গরম জল ঢালতে ঢালতে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকে উঠল মন্দিরা। ছলকে খানিকটা গরম জল পড়ল রেক্সিনের উপর। "বিমলেন্দু! কোন্ বিমলেন্দু?"

বিমলেন্দু রায়। আমার বন্ধু। এঞ্জিনীয়ারিং পড়তাম যাদবপুরে এক সঙ্গে। পাশ করে আমি চলে গেলাম গ্লাসগোতে। ও কিন্তু খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। একটা মেয়ের জন্যে ওর ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেল তখন। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হল না। যে মেয়েটাকে ও সর্বস্ব দিয়ে পাগলের মত ভালবেসেছিল, সেই ওকে প্রবঞ্চনা করল। লাভ অ্যাফেয়ারের শেষ পর্যন্ত পরিণতি হল মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে।

জুতো জোড়াকে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলল মনোজ। টাই খুলল। তারপর সার্ট।

দুচোখের সামনে ধোঁয়া। পৃথিবীটা যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রাণপণে টেবিলটাকে দুহাতে চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়াল মন্দিরা।

বিমলেন্দুর ভালবাসায় খাদ ছিল না। কত গল্পই না করেছে আমার কাছে তখন! মেয়েটাও নাকি তখন ওকে খুবই ভালবাসতো। অন্তত তখন ও আমাকে তাই বলেছিল। পরে অবশ্য ওর মত বদলে যায়।

কান দুটোর মধ্যে অজস্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। হৃৎপিণ্ডটা বুঝি এখনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এখান থেকে সরে যাবে, সে শক্তিও নেই। শরীরটা পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে। একটা অবয়বহীন ভয় আর আতঙ্কের হিমস্রোত শির শির করে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরে।

মেয়েটা কথা দিয়েছিল যতদিন না বিমলেন্দুর একটা ভাল চাকরি হয়, অপেক্ষা করবে ওর জন্যে। কখনও অন্য কারুকে কোন অবস্থাতেই বিয়ে করবে না। কিন্তু বাজে মেয়েরা কি ভালবাসার মূল্য বোঝে? না কথা রাখে?

তারপর বাথরুমে চলে গেল মনোজ। দু'এক মিনিট মাত্র। তবু মন্দিরার মনে হল যেন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে সে এই কাহিনীর শেষটুকু শোনবার জন্যে।

চায়ের টেবিলে এসে বসল মনোজ। খেতে খেতে আরম্ভ করল আবার।

"মেয়েটি কলকাতায় পড়তো। সেই সময়ই ওদের মধ্যে আলাপ আর গভীর ভালবাসা হয়। চার পাঁচ বছর পরেই বুঝি মেয়েটিকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়। তারপর আর কি! আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। হাতের কাছে ভাল পাত্র জুটল টপ্ করে তাকেই বিয়ে করে ফেললো। বিমলেন্দু বেচারা তখনো চাকরি পায়নি না কি। কে আর বসে থাকে ওর জন্যে হাতের কাছে এমন সুযোগ ছেড়ে! মেয়েটা চালাক বটে! আর বিমলেন্দুটা তেমনি বোকা। অমন মেয়ের স্মৃতি নিয়ে বিয়ে থা না করে বসে রইল।"

আর সহ্য হচ্ছে না। তবে সব কথাই বলেছে বিমলেন্দু মনোজকে? এত কথা বলেছে আর তার নামটা বলেনি! নিশ্চয় বলেছে। জেনে শুনে কী নিষ্ঠুর খেলাই না মনোজ তার সঙ্গে খেলছে!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবনা চিন্তার শেষ কূলে দাঁড়ালো মন্দিরা।

"আশ্চর্য ছেলে এই বিমলেন্দু। মেয়েটার সম্বন্ধে কত কথা বলেছে। কত বেড়ানো, সিনেমা কিন্তু আসল নামটা কোনদিনও বলেনি। নামটা যেন ওর অন্তরের জপমালা ছিল। মানসী বলেই বলতো আমার কাছে।"

স্যান্ডউইচটা কামড় দিয়ে নজর পড়ল মন্দিরার দিকে। "একি তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে।"

এতক্ষণে একটা উষ্ণতার উত্তাপ যেন মন্দিরার হিমশীতল শরীরটার রক্ত চলাচলের পথটাকে একটু সহজ করে দিলে। শুকনো কাঠ হয়ে যাওয়া গলাটাকে এক চুমুক চা'য়ে ভিজিয়ে নিয়ে এতক্ষণ বাদে যেন একটু সুস্থির হতে পারল ও।

"তোমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর সব জানিয়ে ওকে চিঠি দিয়েছিলাম। আমি যাকে ভালবেসেছি সেও আমাকে জেনেশুনে ভালবেসেই বিয়ে করছে। ও খুব খুশি হয়ে আমায় অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু আসতে পারেনি। নতুন চাকরিতে ছুটি পায়নি।"

ভাবলেশহীন মুখে কৌতূহলের মুখোস পরে সব কথাই শুনছিল মন্দিরা। চিঠিতে মন্দিরা নামধাম আলাপ পরিচয় পূর্বরাগের সব কথাই মনোজ লিখেছিল। আর সে চিঠি পড়ে মানসীকে চিনতে ওর এতটুকু ভুল হয়নি। যেটুকু দ্বিধা সংশয় ছিল, মানসী নিজের হাতেই তা নির্মূল করে দিয়েছিল। এতটুকু মায়াদয়া সে তো করেনি তখন। কাল সে আসছে মানসীর মুখোসটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে।

"ভারী খুশী হলাম মন্দিরা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে শুনে কিন্তু ঠাকুরঝি এর মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজছো কেন? যখন অত পড়ার সখ মন্দার। আমার কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও না? চারটে ছেলে আমার। মেয়ে নেই। আমার মেয়ে হয়ে ও কলেজে পড়ুক।"

কি সুখ। কি আনন্দ মামিমার চিঠি পড়ে! চলে এল কলকাতায় ভর্তি হল কলেজে। আরম্ভ হল মামাতো ভাইদের সঙ্গে থিয়েটার, সিনেমা আর এখানে ওখানে বেড়ানো। মফস্বল সহরের রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে দেখতে দেখতে মামাবাড়ীর অত্যাধুনিক আবহাওয়ায় রীতিমত আধুনিকায় পরিণত হল।

মামাতো ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবীরের বন্ধু বিমলেন্দু। ছেলেদের সঙ্গে মামিমা তাকে আলাদা করে ভাবেন না। মন্দিরাকেও করতে দেননি। আসা-যাওয়া খুব। আলাপ হল মন্দিরার সঙ্গে। তারপর কখন সে আলাপ প্রলাপে দাঁড়াল। গোপনে গোপনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল দুজনে।

মামাবাড়ির অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ জুটল পুরোমাত্রায়। লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা। কলেজ ফাঁকি দিয়ে এখানে ওখানে বেড়ানো। তাতেও যখন হল না, রেস্টুরেন্টের কেবিন। প্রথমে পর্দা ঢাকা। তারপর কাঠের হাফ দরজা হাওয়ায় যা উড়ে যায় না, ফাঁক হয় না। বয় ঢোকবার আগেই সাড়া পাওয়া যায় অতি সহজে।

এমনি একটা পরিবেশে বিমলেন্দুর কাঁধে মাথা রেখে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে মন্দিরা বলেছিল :

"To-morrow, Love, as today;
Two blent hearts never as tray,
Two souls no Power may sever,
Together, O my Love, for ever".

"তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন বিয়ে করব না বিমলেন্দু।"

ওকে সজোরে বুকের মধ্যে টেনে, কানের কাছে মুখ এনে বিমলেন্দু বলেছিল, "অমন প্রতিজ্ঞা করনা মন্দিরা ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে?"

কি উত্তর দিয়েছিল মন্দিরা? মনে আছে?

হ্যাঁ পরিষ্কার মনে আছে।

"অমন কথা বলনা বিমলেন্দু। তুমি ছাড়া অন্য একটা পুরুষ মানুষ আমাকে ছোঁবে, এ কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তার আগে বিষ খাব না—"

আর একথার উত্তরে বিমলেন্দু তাকে যা বলেছিল আর যা করেছিল তাতে অনেকক্ষণ সহজ স্বাভাবিক হতে পারেনি মন্দিরা। ভাগ্যিস ধারে কাছে বয়টা ছিল না।

কাপড়চোপড় সামলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চিরুনি নিয়ে চুল পরিষ্কার করে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লেগেছিল সেদিন।

সেকথা মনে হলে আজো মন্দিরার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আজো মনে হয়, আজো ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়—

কিন্তু সে ইচ্ছার মূল শিকড় সেই তো উপড়ে ফেলে দিয়েছিল নিজের হাতে।

বি-এ পরীক্ষা দিয়ে মন্দিরা ফিরে এলো বাপের বাড়িতে। আর ইচ্ছে না থাকলেও, মনের মত না হলেও হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে বিমলেন্দুকে যেতে হল ভিলাই।

মিলনের পর বিরহ। দুজনে দুই জায়গায়। দেখা সাক্ষাৎ নেই শুধু চিঠির উপর নির্ভর। মন্দিরা লেখে, চিরদিন শবরীর মত তোমার প্রতীক্ষা করব। আর বিমলেন্দুর জবাব আসে, বেশী দিন নয়। একটা কোয়ার্টার পেতে আর কয়েক বছর যাবে। মাইনেটাও তত দিনে আর একটু বাড়বে। ততদিন ধৈর্য ধর। ততদিনে

অভিভাবকদের সম্মতি মিলবে আশা করি। না মিললেও ক্ষতি নেই। তারা হাতে হাত মিলিয়ে না দিলে বিমলেন্দু নিজেই মন্দিরার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসবে রাত্রির অন্ধকারে।

বিয়ের কথাবার্তা চলছে বাড়িতে। বাবা কাকা জ্যাঠামশাই তৎপর হয়ে উঠেছেন। বাড়ির বড় মেয়ে। ঘটক আসছে। নিজেরাও খোঁজ খবর নিচ্ছেন। এখনও সেকেলে রীতি চালু এ বাড়িতে। আগে চৌদ্দ পেরুত না। তবে নেহাৎ কালটা পালটে গেছে। তাছাড়া লেখাপড়াটা জানা থাকলে সুপাত্র জোটানো সহজ হবে বলে ততটা আপত্তি ওঠেনি বাড়ি থেকে।

ছোট কাকার দূর সম্পর্কের শালার ছেলের সম্বন্ধ আনলেন ছোট কাকিমা। মনোজ চ্যাটার্জি। গ্লাসগো থেকে ফিরেই ঢুকেছে জেনরী অ্যান্ড স্যামসন কোম্পানীতে। প্রথমেই সাড়ে সাতশো। তারপর ধাপে ধাপে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অনুমান করে বাড়ির সবাই পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এক কথায় এ সম্বন্ধ নাকচ করে দিল মন্দিরা। প্রায় সমবয়সী ছোটকাকীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল ও বিয়ে করবে না। কোন মতেই না।

মাথায় হাত দিল সবাই। এমন সম্বন্ধ আর জুটবে? কি হোলো মেয়েটার? দুপাতা পড়াশুনো করে মাথা খারাপ হল নাকি ওর? উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে উঠলো সারা বাড়িটা।

জ্যাঠামশাই রাগা-রাগি করলেন খুব। বেশী লেখাপড়া করানোর কুফল সম্বন্ধে, অত বড় মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে ধাড়ী করে রাখার ফল যে হাতে হাতেই মিললো, এ বিষয়ে বক্তৃতাও দিলেন এক চোট বাড়ির সবাইকে।

কিন্তু হাল ছাড়লনা ছোটকাকী। বাড়ির সবাইকে শান্ত করল। দু-এক কথায় কি বিয়ে হয়? আজকালকার দিনের মেয়ে। যে সময়ের যে হাওয়া। যে রোগে যে ওষুধ। যে মন্ত্রে যে দেবতার পুজো। না দেখা না শোনা। বিয়ে করতে চাইবেই বা কেন?

মাকে, জ্যাঠাইমাকে বিয়ের কাজ গোছাতে বললে। শাড়ি, গয়নার অর্ডার দিতে বললে। আর মনোজকে লিখে দিলে দিন কতকের জন্যে পিসীকে দেখে যেতে।

তখনো জয়েন করেনি কাজে। মনোজ এলো। যেমন রূপ তেমনি গুণ। বাড়ির সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আর যাতে মন্দিরাও মুগ্ধ হয়, ছোটকাকী তার আয়োজন, সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ভাল করেই করলো।

দুদিনের জায়গায় দশ দিন হয়ে গেল। তারপর আরো কদিন। তারপর যখন মনোজ ফিরে যাবার সময় গদগদ কণ্ঠে মন্দিরার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়ল কেন জানি কিছুতেই আগেকার মত জোর করে নিজের অমতটাকে প্রকাশ করতে পারল না মন্দিরা।

কোথায় ভিলাই আর কোথায় মহানগরী কলকাতা! কোথায় মাঠের ভিতর দুখানা ঘরের কোয়ার্টার, তাও এখন পর্যন্ত জোটেনি, আর কোথায় মনোজের মস্ত বড় সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট। এতদিন তো কেবল চিঠিমাত্র ভরসা করেই কাটলো মন্দিরার। বাকি জীবনটাও কি কেবল [illegible] স্বপ্ন দেখেই কাটবে?

এতদিন অপেক্ষা করল। আরো দু-তিন বছর অপেক্ষার পরও যদি বিমলেন্দু কোয়ার্টার না পায়? মাইনেটাও যদি না বাড়ে? যদি—

আশ্চর্য এতগুলো যদি অনিশ্চয়তার ঘন মেঘ হয়ে আড়াল করে দাঁড়ালো বিমলেন্দুকে। মনোজের রূপ-গুণ, মস্ত বড় চাকরী আর ভালবাসার গুঞ্জনে কোথায় তলিয়ে গেল বিমলেন্দু!

ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। অনেক ভেবে-চিন্তে মন্দিরা একটা চিঠি লিখে জানাল ওকে। বিয়ের কথা। নিরুপায় হয়ে বাড়ির সকলের ইচ্ছার কাছে নিজের সমস্ত সুখ সে বলি দিল। স্বামীকে সে ভালবাসতে পারবে না কোনদিনও। বিমলেন্দুর প্রেম তার মনে অনির্বাণ প্রদীপ শিখার মতই জ্বলবে চিরদিন। তাকে যেন ক্ষমা করে বিমলেন্দু। মন্দিরার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাতে একমাত্র বিমলেন্দুরই অধিকার।

সেই শেষ চিঠি। বিমলেন্দু কোন উত্তর দেয়নি। মনোজ তার কাছে সব কথা খুলে লিখেছিল ঠিক সেই সময়ই। মন্দিরার সমস্ত ছলনাই তখন ধরা পড়ে গেছে তার কাছে!

কিসের একটা বিশ্রী শব্দে চমক ভাঙলো। এ কি? এখানে সেই করাত কলটা এলো কোথা থেকে? তার বাপের বাড়ির কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে স্কুলে যাবার পথে কাঠ চেরাই করা সেই কারখানাটা পড়তো। বই-খাতা বুকে নিয়ে কতদিন মন্দিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে মোটা মোটা কাঠ চেরাই। বিশ্রী আওয়াজ তুলে আসছে আর যাচ্ছে করাতটা। ঝুর ঝুর করে কাঠের গুঁড়োগুলো নীচে পড়ছে। সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠতো সেই শব্দে।

কিন্তু সেটা আজ এতদিন বাদে এখানে এলো কি করে?

বিমলেন্দু যে কাল আসছে মানসীর সঙ্গে দেখা করতে, সে খবর ও জানালো কি করে?

স্খলিত পায়ে অন্ধকারেই ওঠে এলো বারান্দায়। ঠিকে ঝি। দেরী করে এসেছে। তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্যে ঝামা ঘষে কড়ার কালি তুলছে। কর্কশ শব্দটা হচ্ছে তারি জন্যে।

অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। ধমক দিল ঝিকে। বাসন মাজার শব্দটা বন্ধ হল।

কিন্তু বন্ধ হল না কাঠ চেরাই করা করাতের নিঃশব্দ আর একটা আওয়াজ। সমস্ত রাত আর সমস্ত দিন একঘেয়ে সেই শব্দটা মন্দিরার কানের কাছে বাজতে লাগল বিচিত্র তিক্ত আর্তনাদে।

কাজে দক্ষতা দেখিয়েছে বিমলেন্দু। অল্প কয়েক বছরে প্রমোশনের পর প্রমোশন। উপস্থিত কলকাতা ব্রাঞ্চের সুপারভাইজার। অফিস থেকেই গাড়ী দিয়েছে। দামী সুট আর কড়া টাই। নিখুঁত ক্রীজ। আরো একটু মোটা হয়েছে আর ফর্সা। চুলে তেল নেই। এত সিগারেট খেতে শিখেছে কবে থেকে? আড়াল থেকে ভাল করেই ওকে দেখে নিল মন্দিরা। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে! যেন যুদ্ধের বেশে এসেছে বিমলেন্দু!

যুদ্ধের বেশে সেজেছে সেও। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে আর একবার নিজের যৌবনোজ্জ্বল দেহের দিকে আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখলো মন্দিরা পাতলা ফিনফিনে রক্তরাঙা শাড়ি। আবীর বরণ ব্লাউজ ভি-কাটের [illegible] প্রান্তে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে প্রবালের মালার লকেটটা, দু কানে চুণীর দুল। কপালে কুমকুমের টিপ। লাল ভেলভেটের চটি পায়ে যেন এক উত্তপ্ত প্রজ্বলন্ত বহ্নিশিখা।

আপন রূপে আপনি মুগ্ধ নার্সিসাসের কানের কাছে গুণ গুণ করে ভেসে এলো কার কথা?

'এমন করে সেজেছ কেন মন্দা? তোমার রূপের আগুনে কবেই তো নিঃশেষ হয়ে পুড়ে মরেছি! আর কেন? ছাইএ কি আগুন জ্বলে?

কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! যেন কৃষ্ণ-চূড়ার গুচ্ছ! বিয়ের পর তোমাকে লাল শাড়ি ছাড়া পরতেই দেব না।

আমার ভালবাসার রং কেমন জানো? বুকের রক্তের মত। সেই রঙে তোমায় রঙীন করে রাখব। মনে থাকবে তো?

মনে আছে বই কি। সবই মনে আছে। আর আছে বলেই যদি এতটকুও মুছে গিয়ে থাকে, মানসীকে দেখলেই সব মনে পড়বে।

এতটুকু সুযোগও কি পাবে না মন্দিরা? মনোজের দৃষ্টির আড়ালে বিমলেন্দুকে কি জানাতে পারবে না সেই তারাদের খবর যে তারারা অস্ত যায় না। রাতের সেই হারানো তারাগুলো সবই লুকিয়ে আছে দিনের আলোর গভীরে? কিছুতেই ঘরে আগুন জ্বালাতে দেবে না মন্দিরা। কি চায় বিমলেন্দু? মন্দিরার সর্বস্ব পণ!

দুই বন্ধুর সম্মিলিত উচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল মন্দিরা এ ঘরে। কে জানে হয়ত এখনি ওই হাসি গল্প শ্মশানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় পরিণত হবে!

কিন্তু শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? মুখের পান্ডুরতা রুজের, শুষ্ক অধরের ভয়ার্ত হতাশা লিপস্টিকের কড়া প্রলেপে ঢেকে বয়ের হাতে খাবারের ডিস সাজিয়ে ঘরে ঢুকলো মন্দিরা।

পা টলছে, মাথা টলছে, বুকের মধ্যে যেন সমস্ত শূন্য হয়ে গেছে। তবু চোখ তুলে হাত জোড় করে বিমলেন্দুকে নমস্কার করলো।

অভিনয়ে বিমলেন্দুও কম যায় না! 'নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জি। মনোজ বিয়ের আগে আপনার কথা, আপনাদের দুজনের পূর্বরাগের কথা সবই আমাকে লিখেছিল। ও যে এতটুকুও অত্যুক্তি করেনি সেটা আপনাকে দেখে বেশ বুঝতে পারছি।

মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। শুধু প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে একটু হাসি টেনে এনে খাবারের ডিসগুলো সামনে এগিয়ে দিল মন্দিরা।

"মিসেস চ্যাটার্জী, মনোজ আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। ওর কাছ থেকে আপনি তো সব কথাই শুনেছেন। ওর মতে মানসীর মত মেয়েও যেমন আছে, আপনার মত মেয়েরও তেমনি অভাব হবে না। আচ্ছা আপনার কি মত?"

করায়ত্ত শিকার নিয়ে খেলছে নিষ্ঠুর শিকারী। যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে বেড়াল। প্রাণপণে চায়ের কাপটা মুখে তুলে বিমলেন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়াল হতে হতে মন্দিরা উত্তর দিল। "উনি ঠিকই বলেছেন।"

মন্দিরাকে চমকে দিয়ে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল বিমলেন্দু। "আমার ভুল হয়েছিল। আপনাদের যে আলাদা মত থাকতে নেই, একথা মনে ছিল না।"

হাসিটা বিদ্রূপের না ব্যঙ্গের ঠিক বুঝতে না পেরে নড়ে চড়ে বসল মন্দিরা। পাতলা সাড়িটা গা থেকে খসে খসে পড়ছে। যাক। কপালের পর সাপের ফনার মত সেই চুলের গুচ্ছটা দুলছে তো? সুর্মাটানা চোখের বিদ্যুৎ কটাক্ষ? সেও তো ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে। তবে? তবে কেন বিমলেন্দুর চোখের দৃষ্টি এমন বরফের মত ঠান্ডা? তবে কেন ওর দুচোখের স্বচ্ছ দীঘিতে এতটুকুও ছায়া পড়ছে না মানসীর রক্তরাঙা সাড়ির? মানসীর হৃদয়ের গভীর উত্তাপ কি এতটুকুও স্পর্শ করছে না বিমলেন্দুর দেহমন?

"সত্যি আপনাদের দেখে ভারী ভাল লাগছে। ভেবেছিলাম মানসীর কাছ থেকে যে বঞ্চনা আর যে আঘাত পেয়েছি, তাতে হয়ত আর কখনও কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারব না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে হয়ত বার বার ঠকব না।"

দুচোখে গভীর আশ্বাস আর ভালবাসা ভরে পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মন্দিরা। "না বিমলেন্দু বাবু আমি বলছি আপনি আর ঠকবেন না। যা চান সব পাবেন। সে পাওয়াতে এতটুকুও ফাঁকি থাকবে না।"

যাক্। বলতে পেরেছে এতক্ষণে কথাটা। দম বন্ধ হয়ে আসা নিঃশ্বাসটা এবার সহজ ভাবে ছাড়তে পারল সে। বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠল মুখে। আর কোন ভয় নেই। মন্দিরার এই গভীর ইঙ্গিতটা না বোঝার মত বোকা নয় বিমলেন্দু।

মনোজ একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা এগিয়ে দিল বন্ধুর দিকে। "আচ্ছা বিমলেন্দু, অত হেঁয়ালী না করে বলেই ফেল না আসল কথাটা মন্দার কাছে।"

একটা অদ্ভুত ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল বিমলেন্দুর অধরের প্রান্ত। সিগারেটটা একটানে শেষ পয়েন্টে নামিয়ে নিয়ে এলো।

"সবেমাত্র চাকরিতে ঢুকেছি। অল্প মাইনে। উন্নতির আশা ভরসা ভবিষ্যতের অন্ধকারে। মানসী তখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে বোধ হয় খুব একটা অন্যায় করেনি। ওর কাছ থেকে এত বড় আঘাত পেয়েছিলাম বলেই দৃঢ় সংকল্পের জোরে এত তাড়াতাড়ি চাকরিতে এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে আমার।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মন্দিরার মুখ। ব্যর্থ হয়নি পতঙ্গের জন্যে বহ্নিশিখার এই আয়োজন। বুকের ওপর তুলে দিল স্খলিত অঞ্চল। চোখের উপর থেকে সরালো চুলের গুচ্ছ। একশো পাওয়ারের তীব্র আলোকে ঝক ঝক করে উঠলো তার রূপের তরঙ্গ।

অ্যাসট্রেতে ভস্ম হয়ে যাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে ফের আর একটা হাতে তুলে নিল বিমলেন্দু।

"কিন্তু সে বিয়ে করেনি মোটেই ওটা ও আমাকে আঘাত দেবার জন্যে মিথ্যে করে লিখেছিল। অবশ্য আমি কিছুদিন পরেই সে কথা জানতে পেরেছিলাম। যে আমাকে চায় না, যে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, মাথা নীচু করে কখনো তার কাছে যাব না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম। এতদিন পরে সে আমায় ডেকেছে। ক্ষমা চেয়েছে। এতদিন সে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আমার পথ-চেয়েই বসেছিল।"

নিবিড় শান্তিতে আর আনন্দে ভরে গেল মন্দিরার বুক। মধুর হাসিতে ভরে গেল তার প্রসাধন মার্জিত মুখ। বিমলেন্দু বুঝতে পেরেছে তার অন্তরের কথা। এতদিন সত্যি সত্যি ওর জন্যেই তো পথ চেয়ে বসেছিল মন্দিরা। পৃথিবীতে এত জল তবুও যেমন চাতক উৎকণ্ঠ হয়ে প্রতীক্ষা করে আকাশের মেঘের।

এতক্ষণ বাদে সেই একঘেয়ে করাতের শব্দটা থেমে গেছে। বড় মধুর লাগছে এই পৃথিবী। সমস্ত শরীর ঠিক সেই দিনের মত উদ্‌গ্রীব আর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে ব্যাকুল বাসনায়—

"তাকে তাই আর ফেরাতে পারলাম না। সে দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। আর বুঝতেই তো পারছো, দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সব মিটমাট হয়ে গেল মানসীর সঙ্গে।" লজ্জিতভাবে একটু হাসলো বিমলেন্দু মন্দিরার চোখে চোখ রেখে।

মনোজ সশব্দে হেসে সায় দিল বন্ধুর কথায়। "সে তো জানি। এতদিন পর একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছো। সত্যি ওর সঙ্গে তোমার মিটমাট হওয়াতে আমরা ভারী খুশি হয়েছি।"

সব মিটমাট হয়ে গেছে। খুশির বন্যায় যেন গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছা হল মন্দিরার। কী ভালো! কী সুন্দর বিমলেন্দু! আর কোন দুঃখই ওকে দেবে না সে!

"আচ্ছা আজ উঠি তাহলে। চলো না মনোজ কোথায় যাবে বলেছিলে, আমার গাড়িতে তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি।"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বুক পকেট থেকে একখানা ফোটো বার করে মন্দিরার সামনে টেবিলের উপর রাখলো বিমলেন্দু। "আপনার মত সুন্দরী কি না জানি না। দেখুন তো কেমন দেখতে মানসীকে?" মেঘশূন্য নীল নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ যেন একটা বাজ পড়ল মন্দিরার চোখের সামনে। ভয়ংকর একটা বিষধর সাপ যেন ফণা তুলে ধরলো তাকে ছোবল মারবে বলে। কার ছবি? কার ফোটো ওটা? শেষ পর্যন্ত এমন করেই প্রতিশোধ নিল বিমলেন্দু? মন্দিরার ফোটো-টাকে... এখনি যে মনোজ দেখে ফেলবে...... কি করবে! কি হবে! এ কি সর্বনাশ করল তার বিমলেন্দু! হাত বাড়িয়ে ফোটোটাকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করার মত এতটুকু শক্তিও তার অবশিষ্ট নেই! প্যারালিসিস্ হয়েছে মন্দিরার।

কি করবে না করবে কি হবে না হবে ভাবনা শেষ হবার আগেই মনোজ তুলে নিয়েছে ফোটোটা। উপরের কভারটা খুলে ফেলেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, "কি অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটি! লাকি ডগ্! দেখো দেখো মন্দা ওর মানসীকে—" চোখের সামনে তুলে ধরলো ফোটোটাকে।

বোবা চোখ চেয়ে দেখলো মন্দিরা। অপূর্ব সুন্দরী লাবণ্যময়ী একটি তরুণী। হাসি ভরা মুখে চেয়ে আছে তারি দিকে। দুদণ্ড চেয়ে থাকার মতই ফিগার। নীচে স্পষ্টাক্ষরে নাম লেখা। "বিমলেন্দুকে, মানসী মল্লিক।"

গাড়ি চলে যাবার শব্দটা কানে এলো। করাতের শব্দটার সঙ্গে যেন বড্ড মিল আছে না এই শব্দটার?

মুকুট

(১৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আপন অধিকারে গ্রহণ করল। কোমর বেঁধে সাধ্যমতো কাজে সহায়তা করল, অলকাকে 'রাণী' বলে মৃদু ঠাট্টা করল, পরিশ্রান্ত স্বামীকে নিজেহাতে দুকাপ চা করে খাওয়াল।

সুব্রতও অবাক হল তার এ পরিবর্তনে—শুধু সুব্রতই নয়, বাড়িসুদ্ধ সকলেই—এমনকি কল্যাণী নিজেও। তার যেন মনে হল, এই একটি রাত্রির চোখের জলে কখন অজ্ঞাতে তার বালিকা-মনের সঙ্গে যুবতীমনের গ্রন্থিটুকু খসে গিয়েছে। যেন আবিষ্কার করল, এই একটি মাত্র রাত্রির ব্যবধানে সে এক পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্তে খুব সহজভাবেই কল্যাণী সাজঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। এরকম সাজসজ্জার উপকরণ সে কখনো দেখেনি। সে এতকাল শুধু যাত্রাই দেখেছে। তবু সে বিস্ময় প্রকাশ পেল না চোখেমুখে। কল্যাণীকে আসতে দেখে রাজবেশধারী সুব্রত একটু সংকুচিত হল, আর রাজ-মহিষী অলকা একটু লজ্জিত হাসি হাসল।

বড়োদিদির মতো কল্যাণী এগিয়ে গিয়ে অলকার চিবুক ধরে একটু আদর করল। তারপর সুব্রতকে আলাদা ডেকে বললে—একটু আমার ঘরে আসবে?

সুব্রত নিরুপায় দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের 'পরে চেয়ে বললে—এখন!

—হ্যাঁ, বিশেষ দরকার। এই বলে স্বামীকে ওপরে নিজের ঘরে নিয়ে এসে নিজেহাতে সিন্দুকের ডালা খুলে অতি যত্নে সেই মুকুটটি বের করে বললে—অমন রাণীকে ও কী খেলাঘরের মুকুট পরিয়েছ! তার চেয়ে এইটে ঢের ভালো মানাবে। এই বলে বিস্মিত স্তব্ধ স্বামীর হাতে সেই স্বর্ণ মুকুটটি তুলে দিল।

বিমূঢ় সুব্রত দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললে—এটা বের করবে!—যদি হারিয়ে যায়?

পাতলা ঠোঁটের দুপাশে সূক্ষ্মহাসির রেখা ফুটিয়ে কল্যাণী বললে—যায় তো আমারই যাবে। সে তোমায় অত ভাবতে হবে না।

অন্ধকার শোবার ঘরে এসে দাঁড়ালো মন্দিরা। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল চুণীর দুল, প্রবালের মালা, রক্তরাঙা সাড়ি, আবীর বরণ ব্লাউজ। কুমকুমের টিপটাকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেললে নিষ্ঠুর হাতে।

ছাই হয়ে গেছে মন্দিরা, বিমলেন্দুর হাতের ঐ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটার মত! আর আগুন জ্বলবে না—কণামাত্র স্ফুলিঙ্গও অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে!

মাথার মধ্যে আবার আরম্ভ হয়েছে সেই কাঠ চেরাই করা করাতের শব্দটা।

দুহাতে কাণ চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল মন্দিরা।

দূর থেকে মন্দিরা শুধু কাঠ চেরাই দেখেছে। ভাল করে নজর করেনি করাতটাকে। সেটার কি দুধারেই ধার আছে? সেটা কি শুধু আসতেই কাটে?

যেতেও কি কাটে না?

মৎস্য কন্যা

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

মৎস্যকন্যা নিয়ে বহু রূপকথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কেউ স্বচক্ষে দেখেছে কিনা তার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

বৈজ্ঞানিকের বিবৃতিতে মৎস্যকন্যার স্থান আছে, তবে সে মৎস্যকন্যা রূপকথার মৎস্যকন্যার মতো নয়। এর গায়ে মাছের আঁশের মতো বড় বড় আঁশ থাকে না। মাছের ডানার মতো ডানাও থাকে না। এর মাথা মানুষের মতই, হাতও তাই, কোমর পর্যন্ত মানুষের মতো; কোমরের তলা থেকে দুটো পায়ের বদলে, একটি পুচ্ছাকার মাংসপিন্ড লেগে থাকে। এগুলির দেহের ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যায়, শরীরের অভ্যন্তরের বহু অংশ যথাযথ পুষ্টি লাভ করে নি। কোমরের হাড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবর্তমান থাকে, মূত্রাশয়, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় অংশ সৃষ্টি হয় না।

চিকিৎসা জগতে এই রকমের সৃষ্টির ব্যতিক্রম খুব কমই ঘটে। সমস্ত পৃথিবীর

মৎস্যকন্যার ছবি। পাশে ফুলও রয়েছে। উপরের দিকে ঠিক আছে। নীচে পায়ের বদলে পুচ্ছ রয়েছে।

হিসেবে মাত্র পঞ্চাশটি মৎস্যকন্যার বিবরণ পাওয়া যায়। মৎস্যকন্যা নাম কেন হল, এবিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে আন্দাজে নামকরণ করা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ব্যবচ্ছেদ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের পর স্থির হয়েছে স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের মতো অঙ্গের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়েছে। তাই নারীজনিত নাম বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক এবং সাহিত্যের মতেও শ্রুতিমধুর।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আমি আমার এক রোগিণীর প্রসব করাই। ভদ্রমহিলার বয়স কুড়ি; প্রথম সন্তান জন্মের চার মাস পরে সর্দিজ্বরে মারা যায়। বর্তমানটি দ্বিতীয় সন্তান। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভদ্রমহিলার কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁর যেন একটি সুস্থ সবল সন্তান হয়। প্রথমটির মতো রুগ্ন, নির্জীব যেন না হয়। আমি পরীক্ষায় দেখি বাচ্চা পেটের মধ্যে বিপরীতভাবে রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মাথা নীচের দিকে এবং পা উপর দিকে থাকে, এঁর ক্ষেত্রে মাথা উপর দিকে আছে। দৈহিক পরীক্ষায় মায়ের একমাত্র রক্তাল্পতা ছাড়া আর কোন দোষ পাইনি।

প্রসবের সময় দেখলাম পায়ের পরিবর্তে একটি পুচ্ছাকার মাংসখণ্ড বেরিয়ে এল, তারপর দেহ এবং মাথা নেমে এল, পরিশেষে ফুলের (Placenta) প্রসব হল। নবজাতকের উপর অংশ মানুষের মতো, কিন্তু নাভিস্থলের পর থেকে আর মানুষের মতো নয়। কোমরের তল থেকে দুটি পায়ের পরিবর্তে মধ্যস্থল থেকে একটি মাংসপুচ্ছ বর্তমান। প্রসবের পর মুহূর্তেই দু-একটি নিঃশ্বাস গ্রহণ করেই শিশুটির অকাল মৃত্যু ঘটে। তার মা জানেন শিশুটির মৃত্যু জন্মপরেই ঘটেছে এবং আকুল কান্না তিনি তিনদিন কেঁদেছেন। কতোবার বলেছেন, ডাক্তারবাবু আমাকে মরা বাচ্চাই একবার দেখান, কিন্তু পারিনি। বিকলাঙ্গ শিশু দেখলে মায়ের কান্না আরও বেড়ে যাবে; শোকের সান্ত্বনার কোন প্রলেপ হবে না।

আমি নবজাত শিশুর এক্সরে ছবি তুলে দেখি যে, সমস্ত হাড় ঠিকভাবে তৈরি হয়েছে কিনা? এক্সরে ছবিতে প্রতিফলিত হাড় দেখে বোঝা গেল, দেহের উপরিভাগ ঠিকই সৃষ্টি হয়েছে। মাথা, ঘাড়, হাত, বুক পিঠ মেরুদণ্ড সঠিক প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কোমরের কোন অস্থি নেই। কোমরের কাছে সরু হয়ে ল্যাজের মতো হয়ে গেছে এবং ল্যাজের মধ্যে হাড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়। যদি এই হাড়ের চিহ্ন পায়ের প্রতীক হয়, তাহলে প্রতীয়মান হয় যে একটি পা সৃষ্টি হয়েছে, অপরটি হয় নি, একে ইংরেজিতে বলে sympus monopus কেন হয়? এই রকম অদ্ভুত সৃষ্টি রহস্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় মায়ের মানসিক অবস্থা বহুলাংশে দায়ী। জরায়ুর মধ্যে শিশুর পুষ্টি হয় অতি বিচিত্রভাবে। প্রথম অবস্থায় কোষ সমষ্টি একটি পাতের (plate) সৃষ্টি করে। এই পাত ক্রমশঃ বেঁকে একটি খোলে (Cylinder) পর্যবসিত হয়। আমাদের দেহের সামনে ঠিক মধ্যভাগে একটি দাগ আপাদমস্তক আছে, এই দাগই দুপাশ থেকে সংযুক্ত হওয়ার চিহ্ন। এই খোলই আমাদের দেহের প্রধান অংশ, বুক এবং পেট সৃষ্টি করে। তারপর খোলের পাশ থেকে চারটে কোরক (bud) ফুটে বেরোয়, দুটি সম্মুখভাগে, দুটি পশ্চাৎভাগে এবং তারা দেহের সঙ্গে সমকোণে বৃদ্ধি পায়। সামনের দুটো হাত সৃষ্টি করে, পশ্চাতের দুটো পা। তারপর মাথা সৃষ্টি হয় খোলে উপরি অংশ ভাঁজ হয়ে।

মৎস্যকন্যার এক্স-রে—
[illegible] থেকে কোমর অবধি ঠিক পরিপুষ্টি লাভ করেছে। তার নীচে দু' পায়ের বদলে পুচ্ছের মত অংশ সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে পায়ের অস্থির মত হাড় রয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের অত্যধিক মানসিক দুর্বলতা থাকলে, নানা রোগের সৃষ্টি হয়। মানসিক অশান্তির সঙ্গে জরায়ুর সংকোচনের একটি সংযোগ আছে। অতীতকালে বিশ্বাস ছিল, জরায়ুর রোগ থেকে মানসিক রোগের সৃষ্টি। হিস্টিরিয়া রোগের নাম এসেছে এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তিস্থাপন করে। Hystero কথার অর্থ জরায়ু। জরায়ুর গোলমালের জন্য ফিট্ হয় বলে ফিটের রোগকে বলা হয় হিস্টিরিয়া, তখন ধারণা ছিল হিস্টিরিয়া কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়।

হিস্টিরিয়া বা অন্যান্য মানসিক অশান্তি থাকলে, জরায়ুর অল্পবিস্তর সংকোচন হয়, তার ফলে জরায়ুস্থিত ভ্রূণ যথাযথ বৃদ্ধি পেতে পারে না। হাত পায়ের বৃদ্ধি সমকোণ হবার

(শেষাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায়)
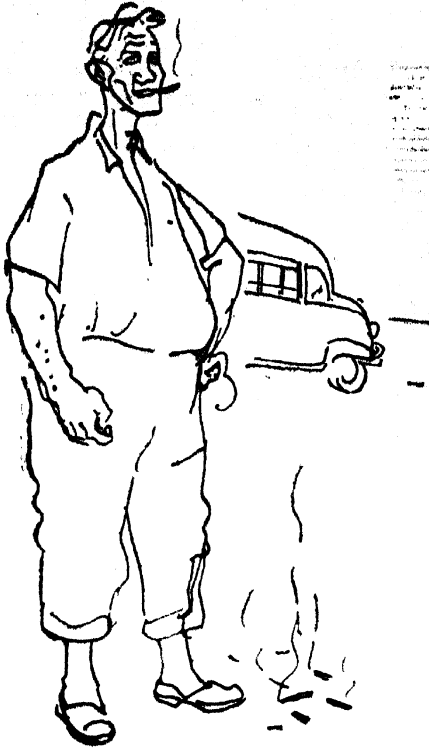
হঠাৎ মা-বাপ তুলে বিশ্রী গালাগালিটা শুনে ফটিকও একেবারে ক্ষেপে গেল।

সাবধান কালাদা, মুখ সামলে কথা বলো, হ্যাঁ। কাজ শিখাইছ ব'লে মাথাটা আমার কিনে নাও নাই!

কালাচাঁদ গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠলে, হ্যান্ডেল মারবি কিনা বল!

ফটিক ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। পায়ের কাছ থেকে হ্যান্ডেলটা তুলে কালাচাঁদ তার সামনে ছুঁড়ে দিলে। হাতের বিড়িটাও ছুঁড়ে ফেললে প্রায় সেই সঙ্গে। তার পর মুখ বিকৃতি ক'রে বললে, নবাবের বেটা এয়েচ আমার! না পোষায় আর কোথাও কাজ দেখে নে গা শালা—

ব্যাপার দেখে যাত্রীরা ভয়ে জড়সড়। চেনা-শোনা একজন ছিলেন ড্রাইভারের পেছনে বেঞ্চিতে। তিনি মোলায়েম স্বরে ব'ললেন, যেতে দিন কালাচাঁদবাবু, ছেলে ছোকরা মানুষ, না বুঝে ক'রে ফেলেছে।

কালাচাঁদ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, ছেলে-মানুষ মানে?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলেন।

রাগে অপমানে তখনও ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে ফটিক। তবু কালাচাঁদের হুকুম অমান্য করবার সাহস নেই। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে হ্যান্ডেলটা তুলে নিয়ে চলে গেল ইঞ্জিনের সামনে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, রইল শালার চাকরি। সিউড়ী পৌঁছে আজই রেজাইন না দিই তো আমি বাপের বেটা নই।

সে কথা কানে গেছে কালাচাঁদের। পানের ছোপ ধরা কালো কালো দাঁতে ভেংচি কেটে ব'ললে, গরুর গাড়ীর আবার হেডলাইট! কিলিনারের চাকরি তার আবার রেজাইন! রাখছে কে তোকে!

ইঞ্জিন গোঁ গোঁ ক'রে উঠল।

বক্রেশ্বরকে পেছনে ফেলে গাড়ী ছুটল সিউড়ীর দিকে। টিকিট কাটতে কাটতে আপন মনেই ফটিক ব'ললে, কিলিনার! এতগুলো লোকের মাঝে কিলিনার ব'লে অপমান! লাইসিনটো ক'রে নিই এবার। ভারী তোয়াক্কা রাখি তোর!

অপমানে কালি হ'য়ে গেছে ফটিকের মুখ। ক্লিনার হ'য়ে সে কাজে ঢুকেছিল তা ঠিক। কিন্তু এই চার বছরে সে পরিচয় কবে ধুয়ে মুছে গেছে। কন্ডাক্টারের পুরো সম্মান পেয়ে আসছে গত দু বছর ধরে। সবাই চেনে তাকে। নতুন যারা সব কাজে ঢুকেছে তারা দাদা বলে ডাকে। লাইসেন্স এখনো হয়নি বটে, কিন্তু একখানা গাড়ী কেউ ফেলে দিক তার হাতে। সারা রাস্তায় দাগ কেটে দিয়ে যাক। সে দাগের আধ ইঞ্চি বাইরে যদি টায়ারের ছাপ কোথাও পড়েতো নাক কান মলা খেয়ে চিরকালের মতো স্টিয়ারিং ছেড়ে দেবে ফটিক। তাও কিনা ক্লিনার বলে অপমান! হতে পারো তুমি গুরু। ওস্তাদ বলে মান্যি করব তোমাকে। কিন্তু জাতজন্ম তুলে কথা বলবার তুমি কে?

ফটিককে নিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচজন হল।

কেউ শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে নি কালাচাঁদের কাছে। সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর, দুমকা—সব লাইনেই ছড়িয়ে আছে কালাচাঁদের তালিম-পাওয়া কেউ না কেউ। হীরু, মাণিক, দীপচাঁদ, পূর্ণ—সকলেই একদিন ন্যাতা হাতে গাড়ী মোছার কাজ থেকে প্রথম হাতেখড়ি দিয়েছিল। এক এক করে সব কাজ তাদের শিখিয়েছে কালাচাঁদ। মন ঢেলে তালিম দিয়েছে প্রত্যেকটি সাগরেদকে। ওস্তাদ বলে আজও তারা প্রণাম ঠোকে কালাচাঁদের নামে। কিন্তু ওস্তাদের ব্যবহারে কেউ টিকতে পারে নি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কাজ শেখাবার পর কেন যে কালাচাঁদ এমন বিশ্রী ব্যবহার করে প্রত্যেকটি চেলাকে তাড়িয়েছে, তার কারণ কেউ খুঁজে পায়নি। ফটিক ভেবেছিল, কাজ শিখে আগের চারজন ওস্তাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে। সে অন্তত লেগে পড়ে থাকবে। কিন্তু তা বুঝি আর হল না।

কদিন আগের কথা।

স্ট্যান্ড থেকে ইরিগেশন কলোনী পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে এলো কালাচাঁদ নিজে। কলোনী পার হয়ে আর একটু এগিয়েই বক্রেশ্বরের রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁক ছাড়িয়েই কালাচাঁদ বললে, নে ফটিক, চালা গাড়ী।

ফটিক একগাল হাসি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসলে স্টিয়ারিং ধরে। যাত্রীদের মধ্যে একটা ভয়ের ভাব দেখা দিল। একজন বললেন, কী যে আপনার খেয়াল কালাবাবু! এখনো কাঁচা তার লাইসেন্স নেই, ওর হাতে এতগুলো লোকের জান-প্রাণ তুলে দিলেন?

কালাচাঁদ একটা বিড়ি ধরিয়ে হেসে বললে, ওর লাইসিন হয়ে আমিই আছি বসে। কোনো ভয় নাইগো বাবুমশায়, গাড়ী ঠিক বক্রেশ্বর পৌঁছাবে।

যাত্রীদের সমালোচনায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ফটিক সন্তর্পণে গাড়ী চালাচ্ছিল। কালাচাঁদ

তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, দূর ভীতুর ডিম কোথাকার, স্পিড তোল না কেনে, ভয় কী? এই ফাঁকা সরাণ পেয়েও এত ভয়, কলকেতার রাস্তায় গাড়ী দিলে তো হাঁ করে বসে থাকবি রে শালা!

অভয় পেয়ে অ্যাকসিলেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিলে ফটিক। গাড়ী ছুটল তীরবেগে। জানা না থাকলে বোঝবার উপায় নেই যে নতুন চালক গাড়ী চালাচ্ছে।

কালাচাঁদ বিড়িতে একটা সুখটান দিয়ে যে ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বললে, দ্যাখেন কেনে বাবুমশায়, ছোঁড়ার হাতখানা কেমন তৈরী হয়েছে!

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। কালাচাঁদের তাঁবেদার-পাওয়া যে কজন ড্রাইভার এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকেরই সুনাম আছে তা জানেন তিনি। তবু ভয়টাতো আর যুক্তি দিয়ে মন থেকে তাড়ানো যায় না!

বক্রেশ্বরের আঁকাবাঁকা পথে বাসটা ছুটেছে তীরের মতো। কালাচাঁদ মাঝে মাঝে তারিফ করছে।

সাবাস। এইবার একবারে ঠিক নিয়েছ তোর লাইসেন ডড় ডড় করে মঞ্জুর হয়ে যাবে রে!

ফটিকের চোখে মুখে উল্লাস উপচে পড়ছে। বললে, ডাউন টিপটা আজ আমি চালাব কালাদা।

কালাচাঁদ সস্নেহে হেসে বললে, খুব লোভ বেড়ে গিয়েছে বটে! আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন ভালোয় ভালোয় বক্রেশ্বরে পৌঁছে দে আগে।

মহানন্দে গাড়ী ছুটিয়ে চললো ফটিক। একটু একটু করে কাঁধের ভার তুলে নিয়ে আসছে তার ওস্তাদ। দু মাইল পাঁচ মাইল করে তার হাতে গাড়ী দিয়েছে মাঝে মাঝে। আজ প্রায় সারাটা রাস্তা। হয়তো আজ যাচাই করে নিচ্ছে সাগরেদের কেরামতি।

আরও শক্ত করে স্টিয়ারিং-এর চাকাটা চেপে ধরলে ফটিক। যেন কোনো গলতি না হয়।

সেদিন নির্বিঘ্নেই গাড়ীখানাকে সে পৌঁছে দিয়েছিল বক্রেশ্বর নদীর এপারে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যাত্রীরা চলে গেল নদী পেরিয়ে। কালাচাঁদ বললে, আর ভয় নেই। এবারে পারবি।

ফটিক কৃতার্থ হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞতায় ভরা চাউনির সঙ্গে বললে, সব তোমার দয়া কালাদা।

তার পরই আজকের ঘটনা।

যে মানুষটা বাপের স্নেহে এমন করে হাতে ধরে এতখানি এগিয়ে দিয়েছে, সে যে হঠাৎ সামান্য অপরাধে এত জঘন্য ব্যবহার করতে পারে তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল ফটিকের। তবু তো ব্যাপারটা সত্যি।

যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ফাঁকা মাঠের ভেতর গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে থাকে দু ঘণ্টা। বহুদূর বিস্তীর্ণ রুক্ষ ডাঙা জমির ভেতর একা একটা বটগাছ দাঁড়িয়ে। গাড়ীখানা সেখানেই থামে। একটু হেঁটে গেলেই বক্রেশ্বর নদী। পার হয়ে যাত্রীরা চলে যায় মন্দির দেখতে। কালাচাঁদ আর ফটিক সেই ফাঁকে। স্নান করে খেয়ে নেয়। দুপুরের পালা থাকলে আসার সময় সিউড়ীর হোটেল থেকে ভাত নিয়ে আসে। খেয়ে কোন দিন একটু ঘুমিয়ে নেয়। কোনোদিন গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয়। যাত্রীরা ফিরে এলে গাড়ী নিয়ে আবার রওনা দেয় সিউড়ীর দিকে।

আজ পৌঁছেছে বারোটায়, ছাড়বে দুটোয়।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বাসের ভেতর থেকে একটা লম্বা গদী নিয়ে বটগাছটার তলায় শুয়েছিল ফটিক। ফাঁকা মাঠের ফুর ফুরে হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কালাচাঁদের কর্কশ ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলে সে। তাকে কোনো কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই কালাচাঁদ বললে, নবাবী করে আবার গদীটা খুলে এনেছিস কেনে? প্যাসিঞ্জারেরা পাঁচ কথা বলছে।

ফটিক বললে, ওদের বাপের গদী নাকি?

তবে তোর বাপের গদী? আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছিস। গদী না হলে ঘুম হয় না বাবুর।

ফটিক উঠে গদীটা তুলে তুললো। এবার সরোষে বললে, খালোসা বাপ তুলছ কেনে কালাদা?

তুলবো না একশোবার তুলব। নবাব পুত্তুর প্যাসিঞ্জারের মুখনাড়াটা কেনে শুনবো আমি?

তাই বলে বাপ তুলবে?

হাজারবার তুলবো। বাপ তুললে আবার লেগেছে। বাপ তোর কোনো কালে গদী দেখেছে যেন?

ফটিক আর সহ্য করতে পারলে না। কাজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। চীৎকার করে উঠলো, খবরদার কালাদা, মুখ সামলে কথা বলো। কাজ শিখেছি বলে মাথাটা আমার কিনে নাও নাই।

তারপরও ঘাড় গুঁজে কালাচাঁদের হুকুম তামিল করতে হয়েছে তাকে। হ্যান্ডেল মেরে চালু করতে হয়েছে গাড়ীর ইঞ্জিন। প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছোটাতে হয়েছে সিউড়ী। সিউড়ী সিউড়ী...

প্রায় বারো বছর আগে।

বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে আঠারো উনিশ বছর বয়সের বিধবা মেয়ে ভাগীরথীকে নিয়ে উধাও হয়েছিল কালাচাঁদ চক্রবর্তী। তখন তার নিজের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। ভাগীরথীর তেমন আপনজন কেউ ছিল না। হাঙ্গামা পোয়াতে চায়নি কেউ। কালাচাঁদ এদিক ওদিক কিছুদিন ঘুরে শেষে সিউড়ীতে এসে আস্তানা করলে। একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে চাকরিটাও জুটে গেল। সেই অবধি সিউড়ীতে রয়েছে কালাচাঁদ।

ভাগীরথী একটা দিনের জন্যেও বুঝতে পারেনি যে সে বিয়ে করা বউ নয়। বিবাহিত স্ত্রীর সবটুকু মর্যাদা পেয়েছিল ভাগীরথী। কোনো আইনের বাঁধন নেই। এমন কি নৈতিক দায়িত্বটুকুও ইচ্ছে করলে হয়তো অস্বীকার করতে পারত কালাচাঁদ। কোনোদিন তা করেনি। তবু কী একটা ভয় যেন সর্বক্ষণ ঘিরে রাখত ভাগীরথীকে। কালাচাঁদের স্বভাবে প্রবল এক অস্থিরতা। যা কিছু তার কাছে পুরনো হয়ে যায় তাকেই সে দূরে সরিয়ে দেয়। ফি-বছর তার গাড়ীখানায় অন্ততঃ নতুন রঙের পোঁচ পড়া চাই। একটা বাড়ীতে এক বছর, বড়জোর নিরুপায় অবস্থায় দু'বছরের বেশী সে থাকেনি। আগের চেয়ে বেশী ভাড়ায় হয়তো খারাপ ঘরে উঠে গেছে। তবু পরিবর্তন চাই। পুরনো হলেই কালাচাঁদের কাছে তা মূল্যহীন।

ভাগীরথী ভয় পেত। মুখ ফুটে সাহস করে বলতে পারত না।

হীরু, মাণিক, দীপচাঁদ—একে একে সব ক'জন সাগরেদ পালিয়ে গেল কালাচাঁদের কাছ থেকে। অথচ তারা কেউই তাদের ওস্তাদের সঙ্গে কখনো দুর্ব্যবহার করেনি। তারা অতিষ্ঠ হয়ে গুরুকে ছেড়েছে। ভাগীরথী তা জানে।

ভাগীরথী একদিন সাহসে ভর করে বললে, ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে তুমি অমনধারা ব্যাভার করো কেনে বলো তো?

কী ব্যাভার? কালাচাঁদ নির্লিপ্ত স্বরে বললে।

এই যে সেয়ানা হলেই তাড়িয়ে দাও।

কাজ শেখা হয়ে গিয়েছে, আবার কী? আর ভালো লাগে না তাই তাড়িয়ে দিই। বললে কালাচাঁদ।

ভাগীরথী বললে, ভয় পাই আমি।

কেনে?

ভাগীরথী বললে, কবে আমিও বুঝি বাড়তি হয়ে যাবো তাই।

কালাচাঁদ হ্যা হ্যা করে হাসলে। —খাসা বলে কথা তোর।

ভাগীরথী আর কথা বাড়ালে না। তার ভয় তার বুকেই চাপ বেঁধে রয়ে গেল।

বছর দুয়েক আগে চতুর্থ সাগরেদ পূর্ণকে তাড়িয়ে ফটিককে এক চায়ের দোকান থেকে ধরে আনলে কালাচাঁদ। একেবারে আনাড়ি। তাকে অভয় দিয়ে কালাচাঁদ বললে, চায়ের দোকানে বয়-বেয়ারার কাজ করে কতটুকু আর কামাই করবি? থাক আমার কাছে, তোর হিল্লে করে দিব।

নতুন সাগরেদের খবর শুনে ভাগীরথী বললে, আর একটা নতুন ছোঁড়াকে কাজে লাগালে আবার? তারপর একদিন তো খেদিয়ে তাড়াবে।

কালাচাঁদ হেসে বললে, কী যে তুই ভাবিস তুই জানিস। আসল ব্যাপারটা কী জানিস? বড্ড এলেম এসে গেলেই ছোঁড়াগুলো লায়েক হয়ে যায়। তেমন হলে এটাকেও তাড়াবো।

না করলেও তুমি তাড়াবে।

মিছে কেনে তাড়াবো?

ওই তোমার স্বভাব।

কালাচাঁদ রাগলে না। হ্যা হ্যা করে হেসে বললে, ঠিক ধরেছিস। পুরনো হয়ে গেলে কেমন যেন আর ভালো লাগে না।

ভাগীরথী কালাচাঁদের জীবনে একটা ব্যতিক্রম। ফটিক চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। তার সৎকার থেকে শ্রাদ্ধ শান্তি পর্যন্ত কিছুই বাদ দেয়নি কালাচাঁদ।

অনেকেই অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছিল। যে লোক বছর বছর বাড়ী পাল্টায়, গাড়ীর রঙে নতুন পোঁচ দেয়, পুরনো সাগরেদ তাড়ায়, সে এবারে ঘরের মানুষ পালটাবার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু কালাচাঁদের ঘর ফাঁকা পড়ে রইল। উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলো কেউ কেউ।

কালাবাবু, ঘর যে ফাঁকা রয়েছে। আর একজনা ঘরের লক্ষ্মী আনেন কেনে।

কালাচাঁদ নির্লিপ্ত। মাসে মাসে বাড়ীর ভাড়া গুণে যায়। কাটায় বাস স্ট্যান্ডে। দু'বেলার খাওয়া হোটেলে। রাত্রিতে মদের আড্ডায় বসে

(শেষাংশ ১৫৯ পৃষ্ঠায়)

বয়ন শ্রীমতী বীথি সরকার

কল্পনার জাল

মোনা চৌধুরী

সোদপুর ষ্টেশনের উত্তরদিকের ফাঁকা মাঠে গোপাষ্টমীর মেলা জমে উঠেছে। মাঠের শেষ প্রান্তে সুদীর্ঘ গোশালা। গোপাষ্টমীর দিনে গোশালার গরুদের খাইয়ে পুণ্য অর্জন করতেই এসেছে হাজার হাজার লোক। আবার শুধু মেলা দেখতেও দূর দূর অঞ্চল থেকে কম লোক আসেনি।

মাঠের মাঝখানে নাচ-গানের আসর জমে উঠেছে। ঢোলক বাজিয়ে গান করছে একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে। একটা নাচ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা হৈ-হৈ করছে—আরেকটা হোক—আবার একটা—! সত্যিই অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে সে নাচছে। তার কালো দীঘল দেহটা পেঁচিয়ে পরেছে ঘন সবুজ শাড়ি। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন কোন সবুজ নদী গতির উল্লাসে মত্ত হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

বাজনা তীব্র হয়ে উঠেই থেমে গেল। পয়সার থালী নিয়ে এগিয়ে এলো মেয়েটি দর্শকদের কাছে। ভীড় কমতে সুরু করল।

—গোপাষ্টমীর মেলায় এসেছ। গো-ভগবতীর নামে নাচ দেখাবে। পয়সা কিসের হে বাপু? একজন টিপ্পনী কাটল।

—কি করবো বাবুজী! পেটটা তো আছে. হাসি-খুসী মেয়েটির চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

—চল কল্পবলী, আর পয়সা উঠবে না ওরে বাজনদার নারায়ণ বলল, দেখ নাচ যদি দেখে তিনশো লোক তাহলে পয়সা দেবে মাত্র তিনজন বুঝলি!

ওরা গেল গোশালার গেটের দিকে। ওখানে ভীড়টা একটু বেশী। সেখানে কিছুক্ষণ নাচ-গান করার পর ওরা পরিশ্রান্ত হয়ে বসল মেলার মাঝখানে একটি পুকুরের বাঁধানো ঘাটে।

বাজিয়ে ছেলেটি বলল, তুই কি চমৎকার নাচতে পারিস কল্পবলী—

—তুইও তো ভাল বাজাতে পারিস নারায়ণ।

—অথচ কপাল দেখ, আমি ঠেলা সাইকেল রিক্সা। আর তুই করিস—

—চুপ! মুখে তর্জনী চেপে ধরল কল্পবলী।

দুজনেই কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। হয়তো তাদের নির্মম ভাগ্যের কথাই ভাবতে লাগল। কল্পবলী বলল, চল না নারায়ণ আমরা একটা নাচ-গানের দল করে এখান থেকে চলে যাই—

—ধ্যাৎ পাগলা না কি! নেচে-গেয়ে পাঁচটা পেটের ভাত জোগাতে পারবো কখনো? একটু থামল নারায়ণ। যেন তীব্র কোন যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, হবে না হবে না রে, আমাকে শালা রিক্সা ঠেলেই মরতে হবে—উঠে দাঁড়াল নারায়ণ।

—এ কি! কোথায় চললি? বস না একটু।

—না রে এখুনি যেতে হবে। রামদেও সিং থানার জমাদার আমার বাঁধা সওয়ারি, তাকে রোজ এই সময় থানা থেকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয়। নারায়ণ চলে গেল।

পুকুরের অন্ধকার ঘাটে বসে ভাবতে লাগল কল্পবলী। আশ্চর্য মানুষ এই নারায়ণ। কিছুদিন আগে শ্যামনগর কালীপুজোর মেলায় তার নাচ দেখে বলেছিল, তোমার নাচের সঙ্গে আমাকে একটু বাজাতে দেবে গো! আমার বাজাতে খুব ভাল লাগে। তার কোন বাজিয়ে ছিল না। তাই সে রাজী হয়েছিল। ও শুধু একটু বাজাতে পেলেই খুসী আর কোনদিকে ওর লক্ষ্য নেই। কল্পবলীর নিজের ওপরেই রাগ হলো। দুঃখও হলো।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে জোড়া গীর্জার পাশে তেলেঙ্গাদের বস্তীতে এল কল্পবলী। তেলেঙ্গা দের সর্দার পারিয়া দেশী মদ তৈরী করছিল। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? চারদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, শোন. কাল তোকে ইছাপুর রেল গেটের গেটম্যান জগমোহনের কাছে যেতে হবে—

—কেন?

—তার কাছে চোরাই নেপালী গাঁজার চালান এসেছে। তুই কিনে নিয়ে আসবি।

—চুপ করে আছো কেন? যেতেই হবে তোমাকে, বিষাক্ত গলায় বলল, মেয়েদের নেত্রী কুলবেণী। সে খেজুরপাতার পাটি বুনছিল। উঠে এল।

—তোরা ওর সঙ্গে এ রকম [illegible] কেন রে? বলল, বুড়ো রাঙ্গাড়ু।

—কেন করবো না শুনি? ওর [illegible] দিতে হবে দুবেলা। আর ও [illegible] কেবল নেচে নেচে বেড়াবে—

রাঙ্গাড়ু একটু থেমে থেমে বলল, দেখ ও ভিন জাতের হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়ে—গাঁয়ের মেয়ে।

বুড়ো রাঙ্গাড়ু কেন কল্পবলীকে এত খাতির করে তা এই বি-টি রোডের তেলেঙ্গারা সবাই জানে। কল্পবলী জাতে কোলহাতি। ওদের জাতের বেশীর ভাগ মেয়েরই বিয়ে হয় না। ওদের দেবতা নটরাজ কোলা। তাকে ওরা কোলানট বলে। যে সব মেয়েদের পাঁচ বছর বয়সে কোলানটের কাছে উৎসর্গ করা হয়, তারা হয়ে যায় দেবদাসী। তারা নৃত্যের ছন্দে দেবতারই স্তব করে। তাই তেলেঙ্গানায় রাঙ্গাড়ুর মত প্রাচীন ও নিম্ন শ্রেণীর লোকরা আজও তাঁদের সমীহ করে।

কল্পবলী সেই দেবদাসী সম্প্রদায়ের মেয়ে।

তেলেঙ্গানার সেই কাল দুর্ভিক্ষের সময় সবাই যখন পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল, সেই সময় কল্পবলীকে দল ছাড়া হয়ে মাদ্রাজ ষ্টেশনে ঘুরতে দেখে রাঙ্গাড়ুরই অনুরোধে পারিয়া তাকে সঙ্গে এনেছিল।

ইছাপুর রেলগেটে যেতে হবে চোরাই গাঁজা আনতে হবে একেবারে একা! সেই দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম আসে না কল্পবলীর। যত বিপদের কাজ সব করাবে পারিয়া তাকে দিয়ে! তার মনে হয় যেন একটা হিংস্র ষড়যন্ত্র তার গলা টিপে ধরার জন্য গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। ভয়ে তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। বুকের ভেতরটা কাঁপে। নূপুর দুটো হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে কল্পবলী।

পরদিন ইছাপুর থেকে ফেরার পথে খড়দহ থানার কাছে দাঁড়াতে হলো কল্পবলীকে। সাঁ-সাঁ করে সাইকেল রিক্সা চালাতে চালাতে নারায়ণ চীৎকার করে বলল,—থাম রে কল্পবলী—জমাদার সাহেবকে নামিয়ে দিয়ে আসছি—তোর সঙ্গে কথা আছে—

উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কল্পবলী। নারায়ণ এল। বলল, নবাবগঞ্জের রাসের মেলায় যাবি কল্পবলী? নতুন একটা ঢোলক কিনেছি রে—

—যাবো কিন্তু—হঠাৎ থেমে গেল কল্পবলী। ব্যথার ছায়া ভেসে উঠল তার মুখে।

—তোর কি হয়েছে রে?

কল্পবলী একে একে সব কথা বলল। বলতে বলতে চোখ ফেটে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। তার কান্নাভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী হয়ে আসে নারায়ণের বুকটা। নিজের মনকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুট-স্বরে বলল, তুই নাচিয়ে—পুরোদস্তুর একটা 'আর্টিস' হয়ে তোকে এই ছোট কাজ করতে হচ্ছে। সব শালা এই কপাল!

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। মনটাকে শক্ত করে আবার বলল, কিন্তু আমি তোর জন্য কি করতে পারি কল্পবলী?

—তোর ঐ এক কথা! কল্পবলীর চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল।

দিন কাটে। কল্পবলীকে দিয়ে পারিয়ারা প্রত্যেক দিন চোরাই গাঁজা, আফিং চোলাই করায়। তার ইচ্ছে করে পারিয়াদের এই আশ্রয় থেকে, তাদের কুটিল ষড়যন্ত্র থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু একলা একটা মেয়ে মানুষ—কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াবে। নারায়ণের মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চিন চিন করে জ্বলে যায় তার মনের ভেতরটা।

আরো একদিন। কল্পবলী বি-টি রোড থেকে নেমে নির্জন মেঠো পথ ধরে যাচ্ছিল সুখচরের সাধু মহান্তদের আড্ডায়। রাতটাও ছিল এত অন্ধকার যে নিজের হাতও ভাল করে দেখা যায় না। হঠাৎ কল্পবলী তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। সঙ্গে আছে আফিং। তাকিয়ে দেখল একটা লোক তার দিকেই আসছে। ভয়ে উত্তেজনায় চীৎকার করে সে বলল,—কে তুমি—কি চাও? চোখের পলকে একটা বাগান বাড়ীর অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

ছুটতে ছুটতে কল্পবলী এল পারিয়ার কাছে। কোন রকমে বলল, পারলাম না সর্দার। একটা লোক আমার পিছু নিয়েছিল। বোধহয় পুলিশের— হো-হো করে হেসে উঠল সর্দার। বলল,—তুই মিথ্যা ভয় পাস কল্পবলী।

—কাজ করবে না তাই বলো। ওসব একটা ছল, কুল্লুবলী বলল।

রাত গভীর হলো। বি-টি রোডের ইলেকট্রিকের তারগুলোয় বাতাস সাঁ-সাঁ করে কান্নার মত বাজাতে লাগল। কল্পবলী তার নিজের ঘরে ঠায় জেগে বসে রইল। ভয়ে আতঙ্কে তার চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে হল সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কে-কে দুঃখ করবে? মা। কেউ না। নারায়ণ? নাঃ ঐ রিক্সাওয়ালাটা মানুষ নয়—মানুষ হলে ওর কষ্ট বুঝত। সে ঠিক করল, তিলে তিলে এই যন্ত্রণা সহ্য না করে পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে জেলে পচবে। সেও ভাল। বুকটা একটু হাল্কা লাগল। ধীরে ধীরে ঘুমে জড়িয়ে এলো তার চোখ দুটো।

কল্পবলীর ঘরের জানালার কাছে প্রেতের মত কতগুলো ছায়ামূর্তি ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। চারিদিকের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে চাপা ফিস-ফিস সুরে কথা শোনা গেল—সব ওর ঘরের ভেতরে ফেলে দিয়েছি!

পুলিশের কাছে ধরা দিতে হলো না কল্পবলীকে। সেইদিনই শেষ রাত্রের অন্ধকারে আবগারী পুলিশ ঘেরাও করল তেলেঙ্গাদের বস্তী। ডাকসাইটে দারোগা বিমল জোয়ারদারের পায়ের ওপরে কেঁদে পড়ল পারিয়া—বাবু, আমরা খেজুর পাতার পাটি বিক্রী করি—

—হ্যাঁ তার সঙ্গে আফিংটুকু, গাঁজাটুকুও পাচার করো, বাঘের মত গর্জন করে উঠল বিমল।

—বের কর শাগগীর মাল—

—আফিং, গাঁজা কখনো চোখে দেখিনি বাবু।

—থাম দেখাচ্ছি—এই মহাদেব—শিউচরণ, হরি—প্রত্যেকটা ঘর সার্চ করো, সেপাইদের সার্চের অর্ডার দিল বিমল।

একেকটা ঘর সেপাইরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে আর কল্পবলীর ঘরের দিকে তাকিয়ে বুড়ো রাঙ্গাডুর বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে।

বিমল নিজে সেপাইদের সঙ্গে প্রত্যেক ঘরে যেয়ে ওদের ঝোলাঝাপ্পা, হাঁড়ি-কুঁড়ি সব দেখল। কিন্তু কোন ঘরেই মাল পাওয়া গেল না। ব্যর্থ শিকারীর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দারোগা। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা ঘরের দরজা বন্ধ। ছুটে গেল সেখানে। হিংস্র গলায় চীৎকার করে বলল,—এই কে আছিস—শাগগীর দরজা খোল—!

কেউ কোন সাড়া দিল না। বিমল প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিল। খোলাই ছিল। হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হাঁ। কেউ নেই ঘরে। পারিয়াদের সকলের বিস্মিত ও বিমূঢ় মনেও একটা একটা প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল—কোথায় গেল কল্পবলী! আর কোথায় বা গেল রাত্রে ওর ঘরে রেখে দেওয়া মালগুলো?

ঠিক সেই সময় ভোরের অন্ধকার বিদীর্ণ করে নারায়ণের সাইকেল রিক্সা তীব্র বেগে ছুটেছে বারাকপুর ছাড়িয়ে বারাসত রোড ধরে। কল্পবলী হাসছে, কাঁদছে। কি একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে যেন ও জেগে উঠেছে। জেগে উঠে লোকটার কথা শুনছে। নারায়ণ যেমন জোরে সাইকেল চালিয়েছে তেমনি গড়গড়িয়ে বকে চলেছে। কল্পবলীর সব কথা কানে যাচ্ছে না, কিন্তু ভালো লাগছে।

একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে চলেছে লোকটা। থানার লোকেরা কেমন জব্দ হল সেই কথাই বলছে আর হাসছে হা-হা করে। তার সাইকেল রিক্সার সোয়ার জমাদারের মুখে শুনেছিল আজ কোন বস্তীতে হানা দেওয়া হবে। মাঝ রাতে ওকে নিয়েই শুধু সরে পড়েনি—এতদিন যারা আশ্রয় দিয়েছে কল্পবলীকে, তাদেরও এবারের মত বাঁচিয়েছে। মাল সব ডোবায় ফেলে এসেছে। নারায়ণ নিজের মনেই শাসাচ্ছে তাদের আবার যদি এই পাপ কাজ করে তো মরবে, এবারে কল্পবলীর জন্যেই বেঁচে গেল সব।

আরো কি শুনেছে কল্পবলী? শুনেছে গাঁজা, আফিং আর তাকে চোলাই করতে হবে না কোনদিন, নারায়ণও সাইকেল রিক্সা চালাবে না। তারা গান-বাজনার দল করবে।

কল্পবলী নাচবে। নারায়ণ বাজাবে।

কল্পবলীর বুকের রক্তে মৃদঙ্গের ধ্বনি বেজে উঠেছে।

মৎস্যকন্যা

(১৪২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরিবর্তে একই রেখায় হয় এবং সমান্তরাল ভাবে বৃদ্ধি পায়। জরায়ুর অত্যধিক সংকোচন ঘটলে পায়ের বৃদ্ধি কাছাকাছি এসে যায় এবং উভয় পায়ে জোড়া লেগে এক হয়ে ল্যাজের আকার ধারণ করে।

কুলিগার (Kuliga) গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে এই রকম অঘটন ভ্রূণ-জীবনের তৃতীয় সপ্তাহে ঘটে। তিনি বলেছেন, মায়ের মানসিক উত্তেজনার ফলে সন্তানের এই বিকৃতি ঘটে। তাঁর মতে মৎস্যকন্যা তিন প্রকারের।

(1) Sympus monopus — যার একটি পা সৃষ্টি হয়।

(2) Sympus apus — যার একটি পাও সৃষ্টি হয় না এবং

(3) Sympus dipus — যার দুটি পা হয়, কিন্তু সৃজন পথের দোষে জোড়া লেগে পুচ্ছের মত হয়ে যায়।

হোল (Hohl) এবং লেভি (Levy) প্রমাণিত করেছেন, প্রসবের সময় মৎস্যকন্যা সর্বদা অন্যভাবে হয়; কোনটির পুচ্ছ বেরোয়, কোনটির কাঁধ বেরোয়, কোনটির হাত। লেভি একটি রোগিণীর কথা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তাঁর রোগিণীর যমজ সন্তান হয়। প্রথমটির মাথা আগে প্রসব হয় এবং সেটি সুস্থ সন্তান। পরেরটি আড়াআড়ি ভাবে থাকে এবং ডাক্তার লেভি নিজে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে মাথা আগে প্রসব করান ও প্রসবের পরে দেখা যায় শিশুটি মৎস্যকন্যা।

সৌভাগ্যের বিষয় এইসব শিশু বাঁচে না। কোনটি জন্মের পর মুহূর্তে মারা যায়, কোনটি জন্মের আগেই পেটের মধ্যে মারা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি শিশুই পুরো মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। জন্মাবার সঙ্গে এদের মৃত্যু কেন ঘটে, তার গবেষণায় দেখা গেছে, এদের মূত্রাশয় নেই, বৃক্ক নেই, মলদ্বার নেই। বেঁচে থাকবার জন্য যে অঙ্গগুলির প্রয়োজন, তার একটিও বর্তমান না থাকায় এরা বাঁচতে পারে না। যতদিন মায়ের গর্ভে থাকে, জলের মধ্যে এরা বেঁচে থাকে, তাই বোধহয় সাহিত্যিকের কলমে এরা মৎস্যকন্যা আখ্যা পেয়েছে! এদের জগত আলাদা, এদের খাদ্য আলাদা। এদের জগত মাতার জরায়ু, এদের খাদ্য মাতার রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়। বাস্তব জগতের আলো, বাস্তব জগতের দৈনন্দিন খাদ্য এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তাই বোধ হয় এরা সাহিত্যের রূপকথায় স্থান পেয়েছে।

'রিট্রিট'

নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

"অ কেশোর! অ ভোলা! তোরা কোথাকার বজ্জাত ছেলে?" মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলল মিসেস হ্যারি। 'দূর হ', 'দূর হ' মুখপোড়ারা, গাছে একটাও পায়রা থাকতে দিবি নি। জানলা থেকে চীৎকার করতে লাগল। সারাদিনই এই রকম ছেলে তাড়াতে হয়; চেঁচাতে হয় গলার শির ফুলিয়ে। হাসতে হাসতে, ছেলের দল দূরে দূরে করে পালিয়ে গেল। রাগে গা সিঁটিয়ে উঠেছে, গরম নিশ্বাস পড়ছে উত্তেজনায়: এমন সময় বিউগলের শব্দ শোনা গেল।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটু স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে মাঠের ওপর। এমনি বেশ থাকে—নিজের বাড়ীতে, নিজের বিষয় সম্পত্তি আগলে। কারুর সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু স্কাউটের ছেলেরা যখন ড্রাম বাজাতে বাজাতে যায় তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। বিগ ড্রাম, কেট্‌ল ড্রাম—তার সঙ্গে চলরে চলরে সুরে কিংবা ও মাই ডার্লিং-এর সুরে সমবেত শিস—নয়তো 'লং লং ওয়ে টু টিপারারি'—যা ইচ্ছে গেয়ে যেতে পারে ছেলেরা; মধ্যে মধ্যে যদি বিউগল সাড়া দিয়ে ওঠে তবে আর রক্ষা নেই। মিসেস হ্যারি চ্যাটারটন যে অবস্থাতেই থাকুক বেরিয়ে আসবে আলু থালু হয়ে। কোমর থেকে স্কার্ট আলগা হয়ে যায়—একহাতে মুঠো করে ধরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বেরিয়ে আসে।

বয়সটা ষাট পেরিয়েছে। চোখের মণি ধূসর হয়ে এসেছে; মাথার চুলের আসল রং কি তা বোঝা যাবে না। বহু দিনের অযত্নে কাঠির মত হয়ে গেছে চুলগুলো। মাথা ভরা উকুন ধুলো আর মাটি। কাঁচা পাকা চুলের পার্থক্য নেই; ধুলোর রঙে লাল হয়ে গেছে।

রিটায়ার করার পর মিঃ হ্যারি চ্যাটারটন আপকার গার্ডেনের এই বাড়ী করেছিলেন। তাই [illegible] বসতে হয় নি। বাড়ীর অর্ধেকটা ভাড়া দেওয়া। বাকীটাতে মিসেস হ্যারি থাকে। একপাল মুরগী, গোটা তিনেক কুকুর আর একটি আয়া—এই নিয়ে তার সংসার। যতদিন মিঃ হ্যারি বেঁচে ছিলেন ততদিনই খাতির ছিল। এখন সে দিন নেই—। এখানকার লোকেরা হাসে, বলে, দাঁড়কাকের ময়ূর পুচ্ছ ধরার সখ। বাগ্দী বুড়ী মেম সায়েব হয়েছেন। ঘৃণায় কথাই বলে না অধিকাংশ লোক।

মার্চ করতে করতে ছেলের দল অনেকটা দূরে চলে গেছে; মিসেস হ্যারি ওদের পিছনে দৌড়তে লাগল। লাল ধুলো এবড়ো খেবড়ো নখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে—গোড়ালির চামড়া ফেটে পায়ের পাতা পর্যন্ত উঠে গেছে লম্বা লম্বা কালো দাগ। তার ফাঁকে স্পষ্ট ময়লা জমে আছে। হোঁচট খেতে খেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আপকার গার্ডেনের মোড়ের ওপর। রাস্তার ধারের প্রকাণ্ড গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে তখন পড়ন্ত রোদ্দুর নেমে এসেছে। সামনের বাংলোতে বি, বি, জে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার চ্যাটার্জি সাহেব ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছেন আর সিগারেট টানছেন। বারান্দার সিঁড়িতে সারি সারি ক্যাকটাসের টব সাজানো। চ্যাটার্জি সাহেব একটা সুখটান দিয়ে সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। টুকরোটা পড়ল নীচের ধাপের টবের পাশে। মিসেস হ্যারি এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরে পেল। আকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এল, মনে হল অনেকক্ষণ সিগারেট ধরানো হয় নি। বাগানের দরজা ঠেলে ফুলগাছের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলো; সবেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টুকরোটা নেবার জন্য। ধাক্কা খেয়ে ক্যাকটাসের টব গড়িয়ে পড়ল। চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—"কে? কি কচ্ছ ওখানে?" দমবন্ধ করে সিগারেটে টান মারল মিসেস হ্যারি। গাল ফুলিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। হলদে ছোপ [illegible] দাঁত বার করে হেসে বলল—"স্যার! এক্সকিউজ মি বাবু।" সিঁড়ির ওপর টবটা তুলে দিয়ে বসে পড়ল।—'রাগ কোর নি বাবু।'

একটা আরামের টান দিয়ে মুখ বিকৃত করে আবার বলল—"হাতে ছ্যাঁকা লাগছে বাবু। একটা বাড়্‌সাই ছাড়ো না?"

—'ফের জ্বালাতে এল বুড়ী।' একটা গোল্ড ফ্লেক ছুঁড়ে দিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—"পালাও-পালাও। উঃ দুর্গন্ধে ভরে গেছে জায়গাটা।" নাক কুঁচকোলেন বার দুয়েক।

গোল্ড ফ্লেকটা লুফে নিল মিসেস হ্যারি। বলল—"থ্যাংক ইউ স্যার।" ছোট সিগারেটটা টানতে টানতে এতক্ষণ বিউগলের সুরটা ভুলে গিয়েছিল। দুর্গন্ধের কথা শুনে মনটা আবার যেন কেমন হয়ে গেল। কাঁপা গলায় উদাস হয়ে বলল—"দুর্গন্দ আগে ছেলো নি বাবু—হরি সাইয়েবের আমলে বিলিতি খোশবাই মাখতুম যে গো।"

মলিন স্কার্টের কোমরটা একহাতে ধরে বেসামাল পা ফেলতে ফেলতে বাড়ীর দিকে ফিরল। আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সিগারেটের টুকরোটার শেষ প্রান্তে আগুন চলে এসেছে; হাতে বেশ ছ্যাঁকা লাগছে—তবু সেইটাই পরম সুখে টানতে লাগল।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। মরা-মরা চোখের কোণে একটু যেন জল জমে যায়। বুঝতে পারে, এখানে বড়ই অবজ্ঞাত ও। এখন আর মানুষ নেই ও—উপহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। আসানসোলের আপকার গার্ডেনের এই সব নতুন আসা অফিসারদের দল কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে, মিসেস হ্যারি চ্যাটারটন একজন সত্যিকারের বিলিতি সাহেবের বৌ। তাই যথাসম্ভব বাড়ী থেকে বেরোয় না। কিন্তু এই যে, যখন স্কাউটের ছেলেরা জুতোর শব্দে তাল মিলিয়ে ড্রাম পিটিয়ে যায় তখন আর থাকতে পারে না। তারপর যেই বিউগল বেজে ওঠে, [illegible]

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—সুরে মূর্ছনায় প্রতিধ্বনিত হয় সামনের ফাঁকা মাঠ—দূরের লাল কাঁকরের রাস্তাটাও যেন বেদনায় রক্তিম হয়ে ওঠে। চুপ চুপ হয়ে যায় পৃথিবী। দুনিয়ার বুক দুর দুর করে ওঠে; আর মিসেস হ্যারি চ্যাটার্টনের অস্থিময় বুকের খাঁচার মধ্যে জীবন্ত হৃদপিন্ডটা ধুক ধুক করে সেই শব্দে। কি যেন শুনল। কিসের যেন সুর—কিসের কথা মনে করিয়ে দেয়। এক অশরীরী ইচ্ছা মাথার মধ্যে জেগে ওঠে—এক অতীন্দ্রিয় কল্পলোকে মন ছুটে যায়। পাইড পাইপারের বাঁশী শুনে যেমন ইঁদুরেরা সম্মোহিত হয়ে বেরিয়ে ছুটে এসেছিল—সেও তেমনি চলে আসে। ছুটতে ছুটতে প্রায়ই অতটা এগিয়ে যায়— যেখানে চ্যাটার্জি সাহেবের ছোট্ট বাগানের বাঁশের বেড়া। গাছের বাহার দেখে কিংবা সাহেবের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। নিজেকে ফিরে পায়।

এরকম অনেকবার হয়েছে। এখানে এসে প্রায়ই মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে গল্প করে। মিসেস চ্যাটার্জি চটি ফট্ ফট্ করে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে বল্লেন—'তুমি কেমন করে বিলিতি সাহেবের মাথা ঘোরালে বল তো? বিয়েটা হল কি রকম করে?' ছাতলা পড়া দাঁত বার করে ক্যাকটাসের টবের পাশে বসে পড়ল মিসেস হ্যারি। মিসেস চাটার্জির ভাঙ্গা মুখ—জ্বলজ্বলে হাসি—কৌতুকে উপচে পড়া চোখের তারা। দেখতে দেখতে অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে যায়।

—সে কথা আর বোল নি বৌমা! ভালবাসা হয়েছিল।

মুখে আঁচল গুঁজে খিক খিক করে হাসেন মিসেস চ্যাটার্জি।

—সাহেব তোমাকে দেখে ভয় পেলো না—ভুলে গেল?

—হ্যাঁ। ভগমানের লীলে বৌমা! যারে দেখে মন মজে।

মন মজেছিল। টাউন থেকে একটু দূরে কয়লা খাদে কাজ চলত। কুলি কামিনরা কালো ভূতের মত চেহারা করে উদয় অস্ত খাটত। সন্ধ্যার সময় বস্তিতে এসে জল নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিত। ঝগড়াটি মুখরা—অজস্র কুৎসিত ভাষা বলায় ওস্তাদ ছিল সৈরভী।

সৈরভী বান্দীদের মেয়ে। কালো কুচকুচে গায়ের রং। ভাসা ভাসা চোখ; কালো ঠোঁটের ফাঁকে বরফের মত সাদা দাঁতের সারি। সারাদিন কয়লা গুঁড়ো মাখে আর সন্ধ্যায় মারামারি করে জল নিয়ে স্নান করে। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে সাবান মাখে। চপ্ চপে তেল দিয়ে চুল বাঁধে।

অফ ডে-তে এইখানে ঘুর ঘুর করে রেল কোম্পানীর গার্ড সাহেব হ্যারি চ্যাটারটন। ও নাকি খাটি বিলিতি। লোকে বলে 'বিলিতি না ছাই। এ্যাংলো—টাঁস।" ধবধবে রং, বাদামী চোখ, লাল চুল—লম্বা মানুষটা ভুলে গেল সৈরভীকে দেখে। যাকে দেখলে মনে হয় কয়লা খাদের প্রেতিনী—তাকে দেখে মজে গেল।

সন্ধ্যেবেলা সাবান দিয়ে গা ঘসতে ঘসতে সৈরভী চীৎকার করে—'আ মরণ! বলি, ও সাইয়েব, এখেনে মরতে এইছিস্ ক্যান র‍্যা। পেরানটা মজল নাকি?" সুর করে বলে।

হাতের সাবানটা যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ ঘসতে থাকে। সায়েবের যে মরণ দশা ধরেছে তা বুঝেছে সৈরভী। তাই নিজের কালো চামড়াটা সাদার দিকে টেনে নেবার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করছে।

হ্যারি সাহেবের প্রাণে ঘৃণাও নেই ভয় ডরও নেই। কালি ঝুলি মেখে হাঁফাতে হাঁফাতে সৈরভী তখন ফিরছে খনির কাজ সেরে। হ্যারি এসে তার নোংরা কালো হাত চেপে ধরল।

কুলিরা তেড়ে এসে বলল—'খবরদার সায়েব। আমাদের মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে তো খুন করে ফেলবো। কয়লা খাদে ফেলে দম বন্ধ করে মারবো।" শাসিয়ে রাখল তারা। এতগুলো কালো মানুষের রক্তচক্ষু দেখে হাত ছেড়ে দিল হ্যারি।

পরদিন থেকে সৈরভীকে কয়লা খাদে কাজ করতে দেখে নি কেউ। কখন চলে গেছে হেঁটে হেঁটে লাল রাস্তা মাড়িয়ে। নিশুতি রাতে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে পৌঁছে গেছে গার্ড সাহেবের কোয়ার্টারে।

সেই থেকে সৈরভী মিসেস চ্যাটারটন হয়েছে। ওদের বিয়ে হয় নি। একদিন স্কার্ট পরিয়ে—মাথায় সাদা টুপি দিয়ে হ্যারি ওকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে যীশুখৃষ্টের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এইখানে পবিত্র মন দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল—আর সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। সৈরভীর মনে প্রেম এসেছিল কিনা মনে নেই। ওর আগেকার স্বামী যখন কয়লা খাদের ভিতর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল—তখন বলেছিল—'বেধবা হয়ে সুখ নেই।'

সৈরভী নির্বিকারভাবে নিজেকে হ্যারির স্ত্রীর পদমর্যাদা দান করল। প্রতিবেশীরা বলল—'ওটা হ্যারির আয়া।'

সৈরভী জ্বলে যেত। এ ধরণের কথা কানে গেলে তেড়ে আসতো পাগলা কুকুরের মত; অকথ্য ভাষায় চীৎকার করে গালাগালি দিত।

হ্যারির ইংরিজি আর সৈরভীর গ্রাম্য ভাষা, কে যে কোনটা বুঝতো তা ঈশ্বরই জানেন। সৈরভী মেমসাহেব হবার সাধনা করতে লাগল। শাড়ী বর্জন করল। ফ্রক পরতে সুরু করল। উঁচু হিল জুতো পরে খুঁড়িয়ে হাঁটতো। তবু অবসর সময়ে লম্বা গাউন পরে জুতো খট-খটিয়ে হ্যারির হাত ধরে বেড়াতে যেত। দুবেলা মাষ্টার এসে পড়াতে লাগল। ইংরিজি শিখল অল্প; বাংলাও পড়তে পারত। কুৎসিত ভাষা ক্রমশঃ ভুলতে লাগল। ইংরিজি ভাষায় বাইবেলের বদলে 'মথী লিখিত সুসমাচার' পড়তে লাগল। প্রতি রবিবার মাথায় টুপি লাগিয়ে নিয়ম করে গির্জায় যেতে লাগল।

ডিউটি সেরে হ্যারি সায়েব যখন ফিরতো—বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড লেগে যেত। প্রথমেই এক দফা মারধোর করত হ্যারি—সৈরভীও প্রচণ্ড চীৎকার করত। তারপর দুজনেই ঠান্ডা হত। খাস বিলিতি হ্যারির কাছে শেষ পর্যন্ত সৈরভী টিকে গেল। যারা তাকে আয়া বলত—তারাও মিসেস হ্যারি বলতে সুরু করল।

হ্যারির মৃত্যুর সময়ে পাদ্রী এসে প্রার্থনা করেছিলেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। কফিনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কবর দিতে। কবর দিয়ে ফেরার সময় সৈরভী যখন দ্বিতীয় বার বিধবা হবার যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ী আসছিল সেই সময় হঠাৎ স্কাউটের ক্যাম্প থেকে বিউগল্-এর আওয়াজ শোনা গেল। দিনের শেষে ফ্ল্যাগ ডাউন করছে ওরা।

একটা বিউগলের সুর কেবল। গান নয়, ড্রাম নয়, সঙ্গে মার্চ করার শব্দ নয়; শুধু বিউগল্। আকাশ কাঁপল—হাওয়া কাঁদল; পাতাবাহারের মত থির থির করে শিউরে উঠল সন্ধ্যার বুকে। মিসেস হ্যারি বাড়ীর সামনের মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফুটবল হাতে নিয়ে কতকগুলো ছেলে বাড়ী যাচ্ছিল—তারা বলল ঠাট্টা করে— 'ঐ যে, শুনতে পাচ্ছ মিসেস হ্যারি? তোমার কর্তা গেছেন বলে বিউগল্ রিট্রিট বাজাচ্ছে।"

—"কি বললি?" অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করল মিসেস হ্যারি।

—'রিট্রিট্—রিট্রিট! গণ্যমান্য ব্যক্তি গেছেন, তাই বাজানো হচ্ছে।"

—'সত্যি!'

—সত্যি না তো কি মিথ্যে! শুনতে পাচ্ছ না— কালা নাকি?"

সত্যি শুনতে পাচ্ছে। কাকগুলো চলে আসছে। আকাশ ছেয়ে পাখীর দল কলরব করে বাসায় ফিরছে। তাদের ডানার ঝটপটির সঙ্গে বিউগলের সুর করুণ হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে দিগদিগন্তে। মিসেস হ্যারি গভীর সুখে চোখ বন্ধ করল। অশ্রু বেরিয়ে এল আনন্দে। তার স্বামী ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন।

একটি নতুন আশা ধানের শিষের মতো মুখ বাড়াল হৃদয়ের কোণে। হ্যারি সাহেব চলে যাবার সঙ্গে তার সবই গেল। বন্ধু নেই—স্বজন নেই। কে আছে? ছেলে নেই মেয়ে নেই। তার মৃত্যুর সময় কে এমন মনে করে পাদ্রী ডেকে আনবে শেষ প্রার্থনা জানাবার জন্যে? কেউ কি কবরের ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুল দিয়ে চোখের জল ফেলবে? কেউ কি 'রিট্রিট' বাজাবে এমন করে যাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর অব্যক্ত ক্রন্দনে ভারী হয়ে উঠবে?

কেউ ফুল দেবে না—কেউ প্রার্থনা করবে না। না করুক। এই যে সন্ধ্যায় কোন অচেনা ছেলের দল বিউগল বাজালো—সেই বাজনার সুরটা যেন কেঁদে ওঠে শেষ ঘুমটি চোখে নেমে আসার সময়।

আসানসোলের আপকার গার্ডেনে কত মানুষ এলো-গেলো। সকলেই চিনেছে মিসেস হ্যারিকে।

শরীরটা এখন গোলগাল নেই। ভাসা ভাসা চোখে অসহায় চাউনি এসেছে। একটু উদভ্রান্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া মানুষটা খারাপ নয়। কেবল তার মেমসাহেবী পোষাকটাতেই সকলে করুণার হাসি হাসে।

বাড়ীর পেয়ারা গাছে দল দল ছেলে আক্রমণ করে যখন তখনই শুধু তেড়ে আসে হিংস্র জানোয়ারের মত। কয়লা খাদের মজুরনীর আদিম প্রবৃত্তিটা মেমসাহেবী পোষাকের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

অন্য সময় মিসেস হ্যারি মথী লিখিত সুসমাচার পড়ে। রবিবার পৃথিবী দুর্যোগে হারিয়ে গেলেও—মাথায় টুপি লাগিয়ে পায়ে জুতো পরে গির্জায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে—'ভগমান যেশু, প্রেভু, তুমি ক্রেপা কর আমাকে।"

যারা ওকে উপহাস করে, যারা মানুষ বলে

(শেষাংশ ১৫১ পৃষ্ঠায়)
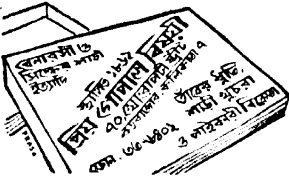
প্রিয়গোপালের শাড়ী সবারি প্রিয়

বনবাদাড় খালখন্দ পেরিয়ে পালকি চলে।

বৌয়ের মন চলে তারও আগে। সোঁদামাটি আর

শিউলি ফুলের গন্ধে মন আনচান।

বাপের বাড়ীর দেশ আর কতদূরে?

উত্তর যাত্রায়
দূরান্তের যাত্রা সহজ হোক

পূর্ব রেলওয়ে

(বাঁকুড়ার লোকশিল্পের নিদর্শনে।)

M.E.3

ইতিহাসে শরৎ ও বসন্ত

রমা নিয়োগী

সত্যিই কি এমন কোনও ঋতু আছে বিশেষ করে যখন ইতিহাস রচিত হয়? ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে এর একটু ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়। কাব্য সাহিত্যে দেখি বর্ষার শেষে শরতের হাল্কা মেঘ যখন দেশে দেশে ভেসে বেড়ায়, তখনই নাকি ভারতীয় রাজাদের বিজিগীষা জেগে উঠতো; চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী সাজিয়ে তাঁরা বার হয়ে পড়তেন দেশদেশান্তরে যুদ্ধ করে রাজ্য জয় করে ইতিহাস রচনা করতে। স্মৃতিপুরাণকাররাও বসন্ত এবং শরৎকে যুদ্ধাভিযানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কাল বলে মনে করতেন, কিন্তু কবিসাহিত্যিকদের চেয়ে তাঁরা ছিলেন অনেক বাস্তববাদী। মাত্র যুদ্ধের মাধ্যমে যখন ইতিহাস গড়া হতো তখন বছরের ঐ দু একটি ঋতু যুদ্ধের জন্য রাখলে ইতিহাসের অনেক পাতাই শূন্য থেকে যেত। কালিকলমে ইতিহাসের নজির সংগ্রহে প্রাচীন ভারতে কারও বিশেষ আগ্রহ ছিল না বটে কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে যুযুৎসার অভাব তখনও ছিল না; বরং হয়ত বেশীই ছিল যুযুৎসা মাত্র দুটি ঋতুতে ঝুলিয়ে উঠত না। অতএব বাস্তববাদী মৎস্য-পুরাণকার বলেছেন, সব ঋতুতেই বুদ্ধিমানে যুদ্ধ করা যায়। বর্ষায় যুদ্ধে পাঠান যায় পদাতিক ও হস্তী বাহিনীকে, হেমন্ত শীতে রথ ও অশ্ব বাহিনীকে, গ্রীষ্মকালে উষ্ট্র বাহিনী। অবশ্য মৎস্য পুরাণকারের মতেও যুদ্ধাভিযানের সর্বোত্তম সময় শরৎ আর বসন্ত, যখন সেনা-বাহিনীর চতুরঙ্গের চারটি অঙ্গই যুদ্ধ করতে পারে। রামায়ণেও দেখা যায় অকাল বোধনের পর রাবণ জয় করে ছিলেন রামচন্দ্র শরৎকালে। মনুর নির্দেশ হচ্ছে যুদ্ধযাত্রা করবে মার্গশীর্ষ মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণে, বিশেষতঃ যদি সে অভিযান হয় অবরোধ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কারণ তখন আমন শস্য উঠছে আর রবি শস্যের ভরসাও সুদূর নয়, খাদ্যাভাব হবে না অবরোধকারী সেনার। তবে যদি প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ করে লুটপাট করে কিঞ্চিৎ ক্ষয়ক্ষতি করাই উদ্দেশ্য হয় তবে ফাল্গুন চৈত্রেও অভিযান করা যায়।

ঋতুনির্দেশ বিষয়ে কিন্তু সর্বত্র সবাই একমত নয়, বাংলাদেশে সাধারণতঃ শরৎকাল ধরা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাস দুটি আর বসন্ত—ফাল্গুন চৈত্র; অথচ অভিধানকার অমর সিংহের মতে শরৎ হলো আশ্বিন কার্তিক, বসন্ত—চৈত্র বৈশাখ। আবার গত কয়েক বছর থেকে প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সরল বিশ্বাস বা পাঁজিপুঁথির কঠোর নির্দেশ কিছুতেই মানছে না আবহাওয়া; ফলে ঋতু জগতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তবে আবহাওয়ার এ উচ্ছৃঙ্খলতা নতুন বলেও মনে হয় না, স্মৃতি শাস্ত্রে বছরে তিনটি ঋতুর কথা আছে, গ্রীষ্ম বর্ষা, শীত, এমন কি মাত্র দুটি ঋতুর কথাও আছে গ্রীষ্ম ও বর্ষা। যাইহোক, সাধারণ ছটা ঋতুর কালনির্দেশে বাংলা মত আর অমরকোষী মতের পার্থক্যটুকুর সুযোগ নিয়ে আর খানিকটা খামখেয়ালী আবহাওয়ার কথা মনে রেখে আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি শরৎ প্রভাবিত কাল হলো গ্রেগরীয় পঞ্জিকার মধ্যে অগাস্ট থেকে মধ্য নভেম্বর আর বসন্ত মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মাঝামাঝি।

এরপরই কৌতূহল হয় ইতিহাসের ধারা কতটা শাস্ত্র মেনে চলেছে তা জানার। দুঃখের বিষয় প্রাচীন ভারতে তারিখ সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানার উপায় নেই। তখনকার দিনে দর্শনান্ধ ভারতীয়রা প্রবৃত্তি প্রয়োজন অনুযায়ী সন্ধি-বিগ্রহ যথেষ্ট করেছে কিন্তু পাকাপাকি হিসাব নজির রেখেছে সামান্যই। মধ্যযুগে যখন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়েছে আর বিদেশী বণিক দল আসছে ভারতে, বহু ঘটনার তারিখের পাকা হিসাব মেলে তখন থেকে। সমুদ্রাভি-যানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ হলো বসন্ত-কালে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভাস্কো ডা গামা যখন কালিকটে পৌঁছালেন। পরের শতাব্দীতে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন ১৫২৬ সালের ২১শে এপ্রিল। আরও যে দুইটি যুদ্ধের ফলে তিনি ভারতে দৃঢ়তর অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন তাও হয়েছিল বসন্তকালে; খানুয়ার যুদ্ধে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাজপুতেরা পরাজিত হলো, দু বৎসর পরে ৬ই মে আফগানরা। এই বসন্ত ঋতুতেই আবার বাবরের ছেলে হুমায়ুন শেরশাহের হাতে কনৌজের যুদ্ধে হেরে (মে, ১৫৪০ খৃঃ) সাময়িকভাবে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। পরবর্তী রাজ্যহীন রাজা আকবরের অভিষেক হলো ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬ সালে। দিল্লীর সিংহাসন তিনি পুনরুদ্ধার করলেন দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে ঐ বছরের শরতে ৯ই নভেম্বর। ১৭৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণে দুর্বল মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের পথ হয়েছিল।

শরতের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে শহর কলকাতার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল, ১৬৮৬ সালের সম্ভবতঃ ২৪শে আগাষ্ট জব চার্ণব যখন সুতানটিতে পদার্পণ করেছিলেন; অবশেষে কলকাতার পত্তন হলো ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগাষ্ট মাসে যখন এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করলো। ৭৫ বছর পরে কোম্পানী সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে শারদীয় উপহার লাভ করলো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অধিকার (১২ই আগাষ্ট, ১৭৬৫), বণিক গোষ্ঠীর প্রথম জমিদারী। এর পরে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাভিলাষী বিভিন্ন দলকে পরাজিত করতে বেশী সময় লাগেনি এদের। এ উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধ ঘটেছে বসন্ত ঋতুতেই। ১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের ফলে মহীশূরের স্বাধীন সুলতানী রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলো; ১৮১৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মারাঠা রাষ্ট্রপঞ্চকের নেতা পেশোয়া অশ্‌তির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরে ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৪৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী গুজরাটের যুদ্ধে শিখদের চরম পরাজয়ের ফলে ইংরাজ ৩০শে মার্চ শিখরাজ্য অধিকার করে। ইংরাজদের এই রাজ্য গ্রাস ও শাসন নীতির বিরুদ্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রতিবাদের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে; তারপর মীরাটে ১০ই মে বিদ্রোহাগ্নি পূর্ণ তেজে প্রজ্বলিত হয়।

বর্তমানযুগে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই চতুরঙ্গ বাহিনী ইতিহাস রচনা করে একথা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন না। যুদ্ধ চলে জলে আর আকাশে ও চলে কালিকলমে ও এমন কি বাকযোগে বা অসহযোগেও। শুধু যুদ্ধের মাধ্যমেই ইতিহাস গড়ে না, সন্ধি সম্মেলন বা যুদ্ধেতর অভিযান মহৎ সৃষ্টি বা আবিষ্কার ও ইতিহাস সৃষ্টি করে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটেছে শরতে কিম্বা বসন্তে। ভারত জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষিত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৩০শে চৈত্র) চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলার প্রবর্তনে, এ মেলা হয়েছিল "আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য"; এর উদ্দেশ্য ছিল "ভারতে আত্মনির্ভর স্থাপন।" ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর যেদিন বঙ্গভঙ্গ কার্য সমাধা হয় সারা বাংলা সেদিন অরন্ধনে শোক প্রকাশ করে, রাখী বন্ধন করে, "বিলাতী বর্জন—স্বদেশী গ্রহণের" ব্রত নিয়েছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বসন্ত ঋতুতে ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর আহ্বানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনাস্বরূপ সারা ভারতে হরতাল প্রতিপালিত হয়; আবার ১৯৩০ সালে ঐ তারিখেই ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্বোধন করেন। ১৯৪২ সালের অগাষ্ট মাসে "ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ হয়। পরবর্তী দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছে শরৎকালে, ১৯৪৬-এর ১৬ই অগাষ্ট মুশ্লিম লীগ কর্তৃক দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট খণ্ডিত ভারত আর পাকিস্থানের ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস্ লাভ।

বিশ্ব ইতিহাসের এলোমেলো দুচার পাতা-বিশেষতঃ শেষদিকের কয়েকটি, উল্টে গেলেও শরৎ বসন্তে ঘটা উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনার সন্ধান মেলে: সবই যে যুদ্ধাভিযান তা নয়, শান্তি-সম্মেলনও আছে, আর আছে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাও। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এক বসন্ত প্রভাতে মার্টিন লুথার ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের অনাচারের বিরুদ্ধে ৯৫ দফা প্রতিবাদপত্র উইটেনবার্গ চার্চের দরজায় টাঙ্গিয়ে দিয়ে খৃষ্টধর্ম জগতে বিপ্লব আনলেন, প্রতিবাদী ধর্মের প্রথম পাদক্ষেপ। এর ১৭ বৎসর পরে ৩রা নভেম্বর অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডে ধর্মব্যাপারে পোপ কর্তৃত্বের অবসান করে

নিজেকে ইংলণ্ডের চার্চের অধিকর্তা ঘোষণা করলেন। ইয়োরোপে ধর্মবিরোধকে কেন্দ্র করে শেষ যে যুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে তার অবসান হলো ১৬৪৮ সালের শরতে, ২৪শে অক্টোবর। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের বেপরোয়া রাজ্যগ্রাস নীতিতে চরম ব্যর্থতা স্বীকৃত হলো ইউট্রেক্টের সন্ধিতে—১১ই এপ্রিল ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রাধান্য ইয়োরোপ মেনে নিয়েছিল সাত বছর যুদ্ধের পর ১৭৬৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসের সন্ধিতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসেও শরৎ ও বসন্তের মহিমা অনস্বীকার্য। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হলো বসন্তকালে ১৯শে এপ্রিল, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লেক্সিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে, আর সংগ্রামের সমাপ্তিতে আমেরিকা স্বাধীন দেশের মর্যাদা পেলো শরৎকালে ১৭৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ভার্সাই সন্ধিতে। ওয়াশিংটন প্রথম প্রেসিডেণ্ট ঘোষিত হলেন ১৭৮৯ সালের ৩০শে এপ্রিল। ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষাও প্রায় সবই হয়েছে বসন্তে বা শরতে। ১৭৫ বছর পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা; তারপর লেজিসলেটিভ এসেম্বলির অধিবেশন ১লা অক্টোবর ১৭৯১ সালে। রাজা ষোড়শ লুইকে অপসারণ (১০ই অগাষ্ট) করে ন্যাশনাল কনভেনশানের অধিবেশন বসলো ২১শে অগাষ্ট ১৭৯২ সালে। এর পর একে একে ডাইরেকটারী (নভেম্বর, ১৭৯৫ খৃঃ) ও কনসুলেটের (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯) মাধ্যমে নেপোলিয়নের দ্রুত উত্থান লক্ষণীয়। শেষ পর্যায়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নেপোলিয়ন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘোষণা করে স্বয়ং "ফরাসীদের সম্রাট" পদে অধিষ্ঠিত হলেন। দশ বছর পরেই কিন্তু এ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তিনি ১৮১৪ সালের বসন্ত ঋতুতে এপ্রিল মাসে; পরের বসন্তে নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপ ত্যাগ করে ফ্রান্সে এলেন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আশায় (১৮১৫, মার্চ)। আরও ছ বছর পরের বসন্তকালে মে মাসে ব্যর্থমনোরথ নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। নেপোলিয়নের প্রথম রাজ্য ত্যাগের পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের শরতে ভিয়েনাতে শান্তিসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। ১০৪ বছর পর আবার শরৎকালেই (১১ই নভেম্বর) প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভও শরৎকালে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণে, ৬ বছর পরে (১৯৪৫) বসন্তকালে ইটালী ও জার্মাণী আত্মসমর্পণ করলো মিত্র পক্ষের কাছে; চূড়ান্ত পর্যায়ে শরৎকালে ৬ই অগাষ্ট হিরোসিমা ও ৯ই নাগাসাকি এটম বোমা বিধ্বস্ত হবার পর ১০ই জাপানও আত্মসমর্পণ করলো।

সাম্প্রতিক রাজনীতিক ইতিহাসের বড় ঘটনা গণজাগরণ ও বহু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে বসন্তে বা শরতে। বসন্তকালে যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জর্ডন (২২শে মে, ১৯৪৬), ইস্রায়েল ১৪ই মার্চ, ১৯৪৮), ইন্দোনেশিয়া গণরাষ্ট্র (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬), মরক্কো (২রা মার্চ, ও ৭ই এপ্রিল, ১৯৫৬) ঘানা (৬ই এপ্রিল, ১৯৫৭), শরৎকালে আত্মপ্রকাশ করেছে পিপলস রিপাব্লিক অফ চায়না (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯), মালয় ডোমিনয়ান রাজ্য (৩১শে অগাষ্ট, ১৯৫৭), নাইজার গণরাষ্ট্র ও সাইপ্রাস (অগাষ্ট, ১৯৬০)। নাইজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করবে অক্টোবরে, ১৯৬০ সালে।

রাজনীতি বা সামরিক অভিযানের বাইরেও শরৎ বসন্তের প্রভাব ছড়িয়ে আছে। এভারেষ্ট অভিযানে সফল হয়েছেন তেনজিং ও হিলারী বসন্ত শেষে (২৯শে মে, ১৯৫৩); দ্বিতীয় সাফল্যের দাবী চৌনিকদের এই বৎসর বসন্তে (২৫শে মে, ১৯৬০)। আবার হিমালয় অভিযানে চলেছেন হিলারী এই শরতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬০)। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে বসন্তের চেয়েও শরৎ সার্থক; আমেরিকার তিনটি রকেট ছাড়া হয়েছিল বসন্তে আর রাশিয়ার একটি। ওদিকে রাশিয়ার প্রথম দুটি স্পুটনিকই ছাড়া হয়েছে শরতে (অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৫৭) আর আমেরিকার দুটি। গত শরতে রাশিয়ার আরও দুটি যুগান্তকারী রকেটের একটি পেীছেছে চাঁদে অন্যটি পৃথিবী ও চাঁদ ঘুরে চাঁদের ওপিঠের ছবি তুলেছে (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ১৯৫৯)।

দেশ দেশান্তর আর গ্রহগ্রহান্তর থেকে এবার ফেরা যাক গৃহকোণে বাংলার সাহিত্য জগতে; এখানেও শরৎ আর বসন্তের জয় জয়কার। বহু পত্র পত্রিকার এবং বলাই বাহুল্য লেখকবর্গের ও তাছাড়া (বলা মোটেই বাহুল্য নয় যে) পাঠক গোষ্ঠীর ও (কারণ—অনেকেই এটা ভুলে যান) স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাহিত্যিক অভিযান চলে বিশেষ করে শরৎ সংখ্যা এবং বসন্ত সংখ্যাকে লক্ষ্য করে। এইসব সংখ্যায় বহুর মধ্যে দুচারিটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি সাহিত্য জগতেও ইতিহাস রচনা করবে বইকি প্রতি বসন্তে আর শরতে।

———

গান

অনিল ভট্টাচার্য

বনের কুসুম শুকায় যদি
আবার মুকুল ধরে
আর মনের কুসুম শুকিয়ে গেলে
শুকায় চিরতরে।
বনের পাখী ঘুমায় রাতে
সকাল বেলায় জাগে
সোনার আলোর নতুন অনুরাগে
আর মনের পাখী মরণ-ঘুমে
ঘুমায় অকাতরে।
বনের হরিণ পালায় যদি
আবার ফেরে ঘরে
ক্লান্ত দেহে সারা দিনের পরে
আর মনের হরিণ হারায় যদি
শুধুই অশ্রু ঝরে।
গাঙের জল শুকায় যদি
আবার ফিরে আসে
আকাশেতে চাঁদ যখন ভাসে
আর মনের নদী ধু ধু করে
আঁধার বালুচরে।

———

'রিট্রিট'

(১৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মনে করে মা—যাঁরবার তাদের অভিশাপ দিয়ে আসে যীশুর কাছে বলে—"তুমি তো সব দেখতে পাও ভগবান, যারা আমার এমনি করে তাদের মিত্যু হোক,—ঈশ্বর।" মনে যে ইচ্ছেটা ধানের শিষের মতো জেগে উঠেছে সেই কথা বলে. —"আমার মিত্যুর সময় যেন ছেলেরা রিট্রিট বাজায়।"

পেয়ারা গাছের ছেলের দল তাড়াতে গিয়ে হঠাৎ একদিন একটা ছেলেকে খপ্ করে ধরে ফেলল মিসেস হ্যারি।

বলল—"আয় কেশোর, আয় আমার সঙ্গে।" বাড়ীর বারান্দায় বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

—'হ্যারে শোন—আমার মিত্যুর সময় তোরা রিট্রিট বাজাতে পারবি? তোকে অসগোল্লা খাওয়াব। গাছের সব প্যায়রা দিয়ে দোবো। বল বাজাবি?'

মিসেস হ্যারির কথা বুঝলো না ছেলেটা। ওকে কেন ধরে এনেছে—সেই রাগে আত্মহারা সে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ধাক্কা দিল মিসেস হ্যারিকে। কলা দেখিয়ে বলল—'বয়ে গেছে আমার।'

শিরা বার করা ডিগডিগে শরীরে আঘাত লাগেনি। আঘাতটা বাজল বুকে। দপদপ করে উঠল হৃদপিণ্ডটা।

তারপর আয়া এসে কখন যে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গেছে। শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। কুঞ্চিত রেখায় ভরে যাওয়া মুখটা জলে ভিজে যাচ্ছে। একটা সিগারেটও টানলো না সারাদিনে—একটু জলও খেলে না। কুকুরগুলো বিছানার পাশে বসে রইল। ঘরের ভিতর খাঁচার মুরগী গুলো ঝট্‌ঝট্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেন এমন করে ভদ্রলোকের ছেলেরা? ওর যদি ছেলে থাকতো, এমন হত কি?

দুর্বল হয়ে গেল মিসেস হ্যারি। সারাদিন ধরে চোখ থেকে জল পড়েছে—মুখ ভিজেছে, মন ভিজেছে।

সন্ধ্যার সময় আবার শোনা গেল মার্চ করে ফিরছে স্কাউটের দল। গানের ফাঁকে বিউগল বেজে উঠল। ধড়মড় করে উঠে পড়ল মিসেস হ্যারি। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এই ভালো—এই ভালো। কাউকে আর সাধতে হবে না রিট্রিটের জন্যে। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। বিউগলের সুরে হাওয়া আকুল হয়ে উঠল—সন্ধ্যা করুণ হয়ে গেল। ছেলেদের পিছনে দৌড়তে লাগল মিসেস হ্যারি। কতদূরে চলে গেছে তারা। হোঁচট খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। উঠল না। মাঠের ওপর শুয়ে আধ বোজা চোখে পড়ে রইল। প্রার্থনা করল এই যেন শেষ হয়। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন মিঃ চ্যাটার্জি। হাত ধরে তুলতে গেলেন। হাতটা টান মেরে সরিয়ে নিল মিসেস হ্যারি। বলল—'ছাড়—শুনতে দাও।"

ঘাসের বুকে কান পেতে শুনতে লাগল বিউগলের সুর। সুরের আবেশে পৃথিবীর বুকটাও যেন দুলে উঠেছে। শান্ত হয়ে, পরম নিশ্চিন্তে মিসেস হ্যারি সেই স্পন্দন অনুভব করতে লাগল।

———

মাঘ মাসের সকাল। সকাল হয়েছে কিনা ঠিক খেয়াল ছিল না। জানলা দরজা বন্ধ করে, দুটো মোটা কম্বলের তলায়, আমি পায়ে পা জড়িয়ে, কুঁকড়ে শুয়ে ছিলুম। মাঘের শীত বাঘের গায়। বিশ বছরের মধ্যেও নাকি এমন শীত পড়ে নি, আগের দিন কাগজে পড়েছিলুম। শীতটা তাই আরও তীব্র মনে হচ্ছিল। জানলার কাঠ সংকুচিত হয়ে, ফাঁক দিয়ে, কনকনে হাওয়া ঢুকছিল, মাঝরাতে কোনক্রমে উঠে পাশ বালিশের ওয়ার খুলে ওখানে গুঁজে দিয়েছি।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। ঘুমটা তবু ভেঙে গেল। টেবিলে হাত ঘড়িটা টিক টিক করছে কিন্তু উঠে যে দেখব কটা বাজে তেমন উৎসাহ নেই। শুধু মনে মনে কামনা করলুম, আরও ঘন্টা দশেক রাত যেন বাকি থাকে, আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠব না। এই শীতে মানুষ বাইরে বেরোয় না। কাজকর্ম পড়ে থাক, পৃথিবী কিছুক্ষণের জন্য থেমে পড়ুক। কাজের চাইতে জীবন দামী।

এমন সময় যদিও কম্বলের তলায় মুড়ি দিয়ে ছিলুম, বেশ বুঝলুম দরজা ঠেলে খানিকটা কে ঢুকল, কিছু ফিকে আলো এবং এক পশলা কনকনে, চামড়া-কাটা তীব্র শীতের হাওয়া সঙ্গে নিয়ে। আমি প্রায় আঁতকে উঠব এমন সময় আমার শরীরের ওপর থেকে একটানে কে যেন কম্বল দুটো সরিয়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত এক কণ্ঠস্বর আমাকে 'ছত্রভঙ্গ' করে দিল, বিনু, ওঠ শিগগির, দেখবি আয় ব্যাপার।

শীতের ভয়ে আমি চোখ বুজেছিলুম, চোখ না খুললে যেন শীত কম লাগে। কণ্ঠস্বরে বুঝলুম শিল্পীবন্ধু তড়িৎ এসেছে। এত সকালে ও কখনো আসে না। কি ব্যাপার কে জানে। উঠব উঠব করছি, ও আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিল।

ঃ তোমাকে আজ এমন একটা জিনিস দেখাব, তোমার বাপের জন্মে তুমি দ্যাখোনি! শুয়োরের বাচ্চার কি সাহস। এটা কলকাতা শহর, না এঁদো গাঁ, গোলমাল করে নিজের কি যে কচর পচর লিখিস, ছেড়ে দে। চল্‌, দেখবি, শিগগির—

ও যখন "তুমি" এবং "তুই"এর জগাখিচুড়ি বানিয়েছে, তখন ব্যাপার সহজ নয়। তবু ওর কথায় আমি বিশেষ বিচলিত হই না। কারণ ও হল কলা-শিল্পী, বড়ই স্পর্শকাতর। একটুতে উত্তেজিত হওয়াই ওর চরিত্র। দীর্ঘ লোমশ হাত, চ্যাপ্টা নাক, তীব্র জ্বালাময় দুটো চোখ খানিকটা বন্য আদিম চেহারা। বুদ্ধির চাইতে হৃদয়ের হাতছানি ওকে উত্তেজিত করে বেশি। ওর কথায় অত বিচলিত হবার কিছু নেই। বললুম বোসো, সিগারেট খাও। এত তাড়া কিসের?

ঃ না, না বসাবসি নয়, বিনু। তুমি ভাবতে পারবে না ব্যাপারখানা কি। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা আমি জানি না। সারা জীবনে তুমি মন থেকে মুছতে পারবে না। তোমাকে না দেখিয়ে আমার শান্তি নেই। এই শীতে নইলে আমি ছুটে আসি? তুমি চলো শিগগির।

ঃ কোথায়? কত দূর?

ঃ আমাদের বাড়ির পাশে, কবরখানার ধারে ওই তেঁতুলতলার মাঠটায়।

আমি কোটের ওপর র‍্যাপার জড়িয়ে ওর সঙ্গে যখন পথে বেরুলুম তখনও রাস্তাঘাট লোকজন অল্প। নামে কলকাতা হলেও এটা আসলে শহরতলী। ভোর হবার অনেক আগে এদিকে ব্যারাকের কিছু লোক কাজে চলে যায়। এটা ভদ্রলোকের পাড়া। অফিস কাছারি দেরিতে, ঘুমও ভাঙে দেরিতে। তার ওপর আবার শীতের দিন।

আকাশ উজ্জ্বল নীল। এতটুকু কুয়াশা নেই। হাড়কাঁপানো বাতাস ছুঁচ গায়ে কেটে কেটে বসছে। নাকের ডগা কানের লতি অসাড় হয়ে আসছে। প্রায় হোঁচট খেতে খেতে আমি তড়িতের সঙ্গে চললুম। ও হনহন করে চলেছে, মুখে একটি কথা নেই।

ঃ অত জোরে হাঁটছো কেন, কি ব্যাপার?

ঃ দেখবেই এসো না!

আমরা বাসের রাস্তা পিছনে রেখে পাড়ার মধ্যে দু সার বাড়ির মাঝের পথ দিয়ে উত্তর মুখো এগুচ্ছি। উত্তুরে হাওয়ায় চোখে চোখে জল পড়ছে। দু পাশের বাড়ির দরজা জানলা নিশ্চিদ্র করে বন্ধ। মনে হল, মৃত্যুপুরীর মধ্যে দিয়ে যমালয়ের দিকে এগুচ্ছি।

ডানদিকে একটু বাঁক নিয়ে আমরা তেঁতুলতলার মাঠে এসে পড়লুম। সামনে ঝাঁঝি আর শ্যাওলায় ভর্তি পদ্মপুকুর। মাঠের শেষ সীমানায় উত্তর দিকে, কবরখানার পাঁচিল। পদ্মপুকুরের এক পাড়ে সেমিকোলনের মত নড়বড়ে, ছোটখাটো গুটি তিন-চার নতুন টালির চালের বাড়ি। এক পাশে ধোপাদের ভাটিখানা। ধোপা-বউ ভাটির পাশে গামলার জলে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ওপর নাচছে।

ঃ ওই দ্যাখো।

তড়িৎ পুকুরের পূব পাড়ে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল। দক্ষিণ-পূব কোণে গুটি তিন-চার লোকের জটলা। একটু দূরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা যেন কি দেখছে আর শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে কি বলাবলি করছে।

আমি প্রায় ছুটে ওপারে গেলুম, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম, একটি ছেঁড়া খোঁড়া মাদুরের ওপর একটি বৌ শুয়ে, একটা রোঁয়া-ওঠা কাঁথায় বুক পর্যন্ত ঢাকা, শীর্ণ দুটি পায়ে বিবর্ণ আলতার রং, কানের এবং নাকের ফুটোয় অলংকারের বদলে তুলসীর কাঠি গোঁজা, রুগ্ন গলায় বৈষ্ণবের কণ্ঠিমালা। মাথার কাছে একটি ইঁট, তার ওপর এক জোড়া খঞ্জনী উপুড় করা। বৈষ্ণবীর রুক্ষ চুল মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে খঞ্জনীকে স্পর্শ করছে। রোগ-ক্লান্ত, শিশির-ভেজা মুখখানি দেখে মনে হয় বৈষ্ণবী ঘুমুচ্ছে। চোখ দুটি বোজা, মুখে নির্বিকার প্রশান্তি। ঈষৎ ফাঁক করা, শুকনো কালচে ঠোঁটের কোণায় গুটিকয় মাছি কামড়ে বসেছে। বৈষ্ণবীর অনতিদীর্ঘ শরীরটি এই বিরাট মাঠের মধ্যে, তীব্র শীতের দাপটে, এরই মধ্যে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে একটা মমীর মত হয়ে গেছে। পাশে একটা কালি-পড়া হ্যারিকেন, একটি পুঁটলি ও শিকবেরকরা ছাতার গায়ে মুখ থুবড়ে আছে।

মাথার ওপর আকাশ সুনীল একটি চোখের মত, ঢেউ খেলানো। নীচে সবুজ ঘাসের ডগায় সহস্র শিশিরের বিন্দু, ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের মত স্থির, অবিচল। পূবে আকাশ ফিকে

হয়ে গেছে, কিন্তু যেন কি একটা আতঙ্কে সূর্য এখনো উঠতে ভয় পাচ্ছে। দু-একটি রশ্মির দূত পাঠিয়ে সভয়ে সে এখনও আড়ালে অপেক্ষা করছে।

আমি বৈষ্ণবীর শরীরের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারলুম না। কিছু দূরে জলে ভেজা, পুরোনো, ধূসর রঙের বাখারিতে ঘেরা, বাগান। তার নীচে ক'টি বাছুরের সাদা কঙ্কাল, শিশিরের জলে ভিজে উজ্জ্বল হয়ে দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে।

এ দিকটায় আগে বড় একটা কেউ আসত না। প্রায় ভাগাড়ের মত ছিল। গরু-বাছুর মরলে এখানে এনে টেনে ফেলে দিত। ওপাড়ে দু-একটা টালির চালের বাড়ি ওঠার পর এখন আর কেউ ফেলে না। তবে লোক এ দিকে বড় একটা আসেও না কেউ। কারণ একে ভাগাড়, তায় সাপের ভয় আছে।

ঃ ডেকে নিয়ে আয় ডাইনী তোর ব্যাটাকে। ডাইনীর বাচ্চাকে শূলে যদি না চড়িয়েছি তবে আমার দিব্বি, আমার বাপের দিব্বি, আমার চৌদ্দ পুরুষের—

ফিরে তাকালুম। ওদিকে যে এতক্ষণ চেঁচামিচি চলছিল শুনি নি। অনেকক্ষণ পর যেন সম্বিৎ ফিরে পেলুম।

দেখলুম লোকসংখ্যা বেড়েছে। বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্নো বয়সের এক বুড়িকে হারান-দা খুব গালি-গালাজ করছে। বুড়ি হাউ-মাউ করে কাঁদছে এবং অনর্গল কি বলে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটি কথা ঘুরে-ফিরে আসছে এবং সেটি মোটামুটি বোধগম্য হচ্ছে ঃ ও নিজের ইচ্ছায় এখেনে এসে মরেছে, তারানাথ ওকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় নি।

ঃ নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। ফের মিথ্যে কথা? কাল সন্ধ্যায় দেখে গেলুম এক-শো চার জ্বরে নড়তে পারে না। রাতে উঠে নিজের ইচ্ছেয় এসেছে?

ঃ ওর সোয়ামী ওকে কোলে করে এনে এখেনে শুইয়ে দিয়েছে গো, অগো, আমার তারানাথ কিছু করেনি গো। ওরে অ তারানাথ, তুই কোথায় গেলি বাপ, আগে আমায় তুই ফাঁসিতে লটকে দিয়ে যা রে—

বললুম, ব্যাপার কি হারান-দা? খুন নাকি?

হারান-দা খিঁচিয়ে ছিল। বললে, খুন নাকি মানে? খুন আবার কাকে বলে? মাগীর চৌদ্দ পুরুষকে আমি শূলে না চড়িয়েছি তো আমার—

বছর পঞ্চাশ বয়স, মাথায় কাঁচা-পাকা কদম-ছাট চুল। ছেলে নেই, বউ নেই, হারান-দা চির-কুমার। দিন যত যাচ্ছে পাড়ায় অনাসৃষ্টি বাড়ছে, আর হারান-দার গালি-গালাজও তত তীব্র হচ্ছে। সুরাহা হচ্ছে না কিছুই।

ঃ ওই লম্পট নচ্ছাড় তারানাথ, চামাড়ের পয়সায় এক টালির চালের খাঁচা বানিয়ে—

হারান-দার গালি-গালাজ বাদ দিয়ে যা বুঝলুম তা ভয়াবহ। তারানাথের বাড়িতে নিধু গোসাই বছরখানেক ভাড়া আছে। অল্প বয়সী বৌ ব্রজরাণী অসুখের জন্যে হাসপাতালে ছিল মাস ছয়েক। তারপর এখানে এসে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী একত্রই থাকে। ভিক্ষেই নিধু গোঁসাইয়ের সম্বল। ছ' মাসের ভাড়া বাকি। তাই নিয়ে নিত্যি তিরিশ দিন তারানাথের সঙ্গে বচসা। তারানাথ নাকি ব্রজরাণীর গায়ে হাতও তুলেছে এক দিন। আর ওই "ডাইনী" তারানাথের মা—সে তো ঠোনা মারে প্রত্যহ। হাসপাতাল থেকে আসা ইস্তক ব্রজরাণীর অসুখ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। তারানাথের এক কথা, যক্ষ্মার রোগী আমি ঘরে রাখব না। তারপর কাল দুপুর রাতে রোগীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। বলেছে, ওটা এক্ষুণি মরবে, আমার নতুন বাড়িতে মাগী মরলে আর ভাড়াটে আসবে না। বাড়ি "অশৌচ" হয়ে যাবে। ভূতে ভর করবে।

ব্যাটার আস্পর্ধা বোঝো। ওই কনকনে শীতে সুস্থ মানুষকে মাঠে নামিয়ে দিলে জমে বরফ হয়ে যায়, আর একটা রোগী সে কখনো বাঁচে? কোথায় গেছে তোর তারানাথ শিগগির বল। নইলে তোকেই বেঁধে থানায় নিয়ে যাবো।

তারানাথ হাওয়া। বাসের বড় রাস্তার ওপর তারানাথের তরীতরকারির দোকান। সেটারও ঝাঁপ বন্ধ।

বললুম, বৈষ্ণব ঠাকুর কই?

ঃ সে গেছে তার গুরু ভাইদের খবর দিতে সৎকারের ব্যবস্থা করতে। এখুনি এল বলে।

তড়িৎ বললে, তাই কি হয়? পুলিশে একটা খবর না দিয়ে—

হারান-দা বললে, সে বৈষ্ণব ব্যাটাও এক উদো। বলে, যে যাবার সে যখন চলেই গেছে তখন—যাওয়াচ্ছি আমি তোকে। থানায় খবর না দিয়ে লাশ নিতে দেব না। এই রইলুম আমি বসে।

তড়িৎ বললে, তুমি এখানে থাকো হারান-দা। আমরা দেখি টুলু-দাকে একটু খবর দিই। চল তো বিনু।

টুলু-দা পুলিশের লোক। আমাদের পাড়াটা দিনে দিনে পুলিশের হেড কোয়ার্টার হয়ে উঠেছে। ওরা পুলিশের লোক যেখানে থাকে দল বেঁধেই থাকে। ছাপোষা মানুষেরা একটু এড়িয়ে চলে। হাজার হোক রাজপুরুষ। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে সাড়ে বত্রিশ। আবার যারা একটু কাজ গুছিয়ে নিতে চায় তারা হেঁ হেঁ করে ডাকে, খোঁজ, তাস পেটে, বাড়িতে ডেকে এনে চা-পরোটা খাওয়ায়।

টুলুদাকে ডাকতে হল না। ঘুম থেকে উঠে গেঞ্জি গায়ে রকে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। পুলিশদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। শুধু গেঞ্জি গায়েই ওরা শীতকে হটাতে পারে। সব শুনে বললে, তাই নাকি?

তড়িৎ বললে, আপনি আপনার ওই কালো ওভার-কোটটা গায়ে চাপিয়ে চলুন। একটু কড়কে দেওয়া দরকার।

টুলু-দা বললে, পাগল নাকি? আমি ও কি করে করি। তোমরা থানায় ও-সিকে একটা ফোন করে দাও, তিনি ইনভেস্টিগেশনের জন্যে লোক পাঠিয়ে দেবেন। আমি বরং একটু এমনি দেখে আসি।

ব পড়ের খাটোটা গায়ে জড়িয়ে দাঁতন করতে করতে টুলু-দা এগোল।

কালোয়ারদের আয়রণ-ক্যাপসের গোডাউন থেকে তড়িৎ থানায় ও-সিকে একটা ফোন করল। ও-সি বললেন, ওর স্বামীকে থানায় এসে একটা ডায়েরী করে যেতে বলো।

আমরা চললুম নিধু বৈষ্ণবকে খুঁজে বের করতে। ডায়েরী করতে হবে। কিন্তু কোথায় নিধু বৈষ্ণব?

আমরা শুধু নিধু বৈষ্ণব নয়, পাড়ায় যাকেই গণ্যমান্য দেখছি তাকেই তেঁতুলতলার মাঠে গিয়ে এই অমানুষিক ঘটনাটা একটু দেখে আসতে বলছি। দেখে রাখুক সবাই।

করালী-দাকেও বললুম। করালী-দা আমাদের এখানকার কাউন্সিলার। সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে উঠতে যাচ্ছে, তড়িৎ বললে, করালী-দা, একবার তেঁতুলতলার মাঠে গিয়ে ব্যাপারখানা দেখে আসুন। শেষে আপনার এলাকায় এমন রাহাজানি?

করালী-দা প্যাডেল থেকে পা নামালেন। চিন্তিত মুখে বললেন, গিয়ে আমি কি করব, ভাই? বৈষ্ণব ঠাকুর এসেছিল। সৎকার সমিতিতে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি, তোমরা একটু দেখো।

ঃ গোসাই কোন্ দিকে গেল?

তেঁতুলতলার মাঠের দিকেই তো গেল, দেখলুম।

করালী-দা সাইকেলের বেল বাজিয়ে চলে গেলেন। তড়িৎ ইংরেজীতে একটা খিস্তি করে বললে, বুঝলি কিছু?

ঃ কিসের?

ঃ করালী-দা গেল না। ব্যাটা তারানাথের বাড়ি আছে, ভোট আছে। সামনেই ইলেকশন। কাউকে চটাতে চায় না বুঝলি?

বললুম, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। কোথায় ভোট আর কোথায় কি। এ সব দৃশ্য অনেকে দেখতে পারে না। কষ্ট হয়।

ঃ তোমার মস্তক হয়। তাড়াতাড়ি আয়। দেখি নিধু গোসাই আবার কোথায় গেল। ডায়েরীটা তো আগে ঠুকে দিই।

তেঁতুলতলার মাঠে ফিরে এসে দেখি সে এক দৃশ্য। ইতিমধ্যে পাড়ার ঘুম ভেঙেছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বহু লোক এসে জমেছে। বাড়ির কাজ-কর্ম ফেলে মেয়েরাও আসছে। দাঁড়াচ্ছে। ব্রজরাণীর চার পাশে ঘুরে গলায় আঁচল জড়িয়ে একটি মেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে কে জানে কেন প্রণাম করল। মেয়েটিকে আমি চিনি। সহরের রেস্তোরায় কাজ করে। বহু লোকের অভিজ্ঞতায় ওর চোখ দুটি নম্র, শান্ত, গভীর। এখন এই ঈষৎ রোদ্দুরে, ঈষৎ শিশিরে ভেজা মাঠে ওকে পূজারিণীর মত স্নিগ্ধ, সুন্দর, মহিমান্বিত মনে হচ্ছে।

ব্রজরাণীর চিবুকে এসে এক টুকরো রোদ পড়েছে। মুখটা ক্রমশঃ শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠছে। পাশে কতগুলো জবা ফুল কে যেন রেখে গেছে। অকাল মৃত্যু গাভীর গায়ে দগদগে লাল ঘায়ের মত ফুলগুলো জ্বলছে।

হারান-দা নিধু ঠাকুরকে বোঝাচ্ছে, পুলিশে খবর দিতেই হবে। তড়িৎ ও-সিকে ফোন করেছিল বললে। চলো ঠাকুর, থানায় একবার তোমায় যেতেই হবে। ও ব্যাটা চামাড়কে আমি একবার দেখছি।

ঠাকুরের দু চোখে জলের ধারা ঃ আমার ব্রজরাণী কি ফিরবে? তবে? তবে গোপাল, আমি গিয়ে কি করব? তারানাথের কি দোষ? ছ মাসের ভাড়া দিতে পারিনি, আমি অক্ষম, আমারই তো অপরাধ। ব্রজরাণী অভিমান করে চলে গেল। আর কি সে ফিরবে?

শুনে হারান-দা [illegible] [illegible] গেল।

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

কে ছিঁড়ল ফুলটা
কৃষ্ণ ধর

প্রতিহিংসার ছোরা দিয়ে বিঁধে গেল কা'রা
এক একটা বিশ্বস্ত দিন, রহস্যপুত্রের
শান্ত মুহূর্ত, আলোকিত সময়, নিশ্চিন্ত মনের
পালতোলা মৌসুমী আকাশের মেঘ।
কারা যেন ছুরিকাহত করে দিয়ে গেল, কা'রা ?

নিহত দিনগুলিকে দেখি।
বিকৃত শব, শুকনো বক
ঝরা পাপড়ির মতো বিশ্বাসের গ্রন্থিগুলো
কা'রা যেন ছত্রখান করল ছিঁড়ে,
এতগুলো কান্নাকে কোথায় ঘিরে রাখি,
রহস্যপুত্র!

অন্ধকার রাতটাকে আড়াল করে একদল মানুষ,
রমণীদের হাত ধরে উলঙ্গ শিশুগুলি,
সীমান্ত পার হচ্ছে, বুনো গোলাপের কাঁটায়
রক্ত ঝরছে পায়ের। হামাগুড়ি দিয়ে গুহার
পাথরটাকে আপ্রাণ শক্তিতে ঠেলে
ভাইয়ের মুখখানা দেখি।

এই দিনগুলিকে নিহত করো না, মিনতি
আমাদের করতলে তার উত্তপ্ত স্পর্শ পাচ্ছি
ভয়ের, আশঙ্কার, ত্রাসের।
আগুনটার জিভটুকু দ্যাখো, আকাশ ছুয়েছে।
ছেঁড়া গোলাপটা কাদা মাটিতে পড়ে আছে
এক আঁজলা রক্তের মতো,
কে ছিঁড়ল রমণীর ভালবাসার ফুল ?
ওকে বিরক্ত করো না॥

এই কি ধ্যানের আলোক-তীর্থ
সুনীলকুমার লাহিড়ী

আলোকতীর্থ আরো কতদূরে ?
তিমির-লোকের তোরণদ্বার—
এল কতদিনে হবো যে পার ?
আকাশে বাতাসে ঘনায় যে দেখি
প্রলয় ঝড়ের পূর্বাভাস—
হেরি ভাঙনের ভীষণ দেবতা
বহে আনে ঘোর সর্বনাশ।
শত পিশাচের অট্টহাসিতে
বাজে দুন্দুভি কাড়া-নাকাড়
নরমুণ্ডের মালা গেঁথে পরে
ডাকিনীরা হানি ভীম-প্রহার।
আকাশে বাতাসে ঘুরে ঘুরে ফেরে
অনাথিনীদের আর্তরব—
দগ্ধ-দিনের চিতা শয্যায়
শ্মশান প্রেতের গীতোৎসব।
এই কি ধ্যানের আলোকতীর্থ ?
মহাভারতের নিশাবসান!
ঘৃণ্য অধম নরপশুদেরে
হাত হ'তে আজ কে করে ত্রাণ ?
আর নয়—নয়, বহু কলঙ্ক
হয়েছে—কোথায় পিনাক-পাণি ;
মহাপ্রলয়ের লগন-বিলয়ে—
আবার শান্তি ফিরাও আনি।

দেহাতীত
• কনক মুখোপাধ্যায় •

মাটি বললে—
আমাকে ভুলনা কবি,
আমি অনাদি অনন্তকালের ধরিত্রী
বুক পেতে ধারণ করে আছি
তোমার সৃষ্টির ব্যথার মর্মকোষ।
জল বললে—
আমি তোমার অজানা পথের চলায় চলায়
মন্দাকিনী ধারা
মাটির গর্ভে অঙ্কুরের স্নেহ
প্রান্তরের শ্যামল রূপোচ্ছ্বাস
নেমে এস আমার যৌবনের বন্যায়
আমাকে ভুলনা।
আগুন বললে—
আমি তোমার লেখনীর দীপ্তি
অক্ষরের বুকে বুকে জ্বলন্ত চেতনা
আমার সঙ্গে এসো নির্ভীক—
যদি চাও—জ্বালিয়ে দিতে
গ্লানি ক্লেদ আর অসত্যের পসরা
আমাকে ভুলনা।
বাতাস বললে—
আমি তোমায় ছড়িয়ে দেই
ভরিয়ে দেই নিখিলের ছন্দে ঝংকারে
তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে কখনো বা স্তিমিত আবেগে
দোলা দিয়ে, সুখ দিয়ে, দিয়ে নৃত্যের তাল
আমাকে ভুলনা।
আকাশ বললে—
আমি তোমার নীলোৎপল স্বপ্ন
তোমার ধ্যানের মূর্তিরূপে
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নিয়ে যাই তোমার সাধনা
তারায় তারায় কালের স্বাক্ষরে—
লিখে রাখি তোমার ভাষার অতীত বাণী
আমাকে ভুলনা।
ভালবাসা বললে—
আমি তোমার বুকের দুরু দুরু ওঠা নামা
আমাকেই না ভুলতে পারার বেদনা
যদি সুখ চাও, স্বস্তি চাও—
আর—যদি পার—
ভুলে যেও আমাকে!

নামহীন নদী
নির্মলেন্দু গৌতম

ঝিকিমিকি রৌদ্রের রূপালী আঁচল—
নামহীন নদীটির মেঘরঙ জল!
কাশ দোলে পাড় হ'য়ে নামহীন নদী,
খুনোহাঁস আসে আর যায় নিরবধি!

ক্ষতি নেই, যদি এই জল ছুঁয়ে দাও,
এককলি কালো কালো গান যদি গাও!
শাড়ীটির জরি মোড়া পাড় যদি এই,
জল ছোঁয় একবারও, কোনো ক্ষতি নেই!

সকালের রৌদ্রের সোনালী ফসল,—
চমৎকার, ধমৎকার, মেঘরঙ জল!!

প্রখর গ্রীষ্মের পরে
শিবদাস চক্রবর্তী

প্রখর গ্রীষ্মের পরে প্রথম বর্ষণ,—
বহু বঞ্চনার শেষ বাঞ্ছিতের স্পর্শ-শিহরণ
ছেয়ে দিল সারা অঙ্গ সুপ্তির আবেশে ;
অবসন্নতার পরে প্রসন্ন প্রশান্তি।
এতদিন ধরে
আকাশে পিঙ্গল মেঘ দেখা দিয়ে হয়েছে উধাও
ব্যর্থ বাসনার মতো অনির্বাণ বেদনার দেশে
রেখে শুধু জ্বালা আর মৌন হাহাকার।
দহনে দহনে আর শোষণে শোষণে
এসেছে নিঃশেষ হয়ে
সঞ্চিত সৃষ্টির সুধা বসুধার বুকে
সর্বাঙ্গে জাগ্রত করে রিক্ততার নিশ্চিহ্ন ইঙ্গিত।
মনের নিঃশব্দ ব্যথা তার
ভেসেছে সবাক হতে অসংযত বৈশাখী বাতাসে।
বর্ষণের সাথে সাথে দহনের হলো অবসান,—
বিরহীদাদুরীর কণ্ঠে বাজে তারি স্পর্ধিত ঘোষণা।
বঞ্চিত বসুধা আজ ধন্য হোক পুণ্য ঋতুস্নানে
দান নিয়ে ফসলের মৌন প্রতিশ্রুতি।

আবেদন
শ্রী সিপ্রা বিশ্বাস

[illegible]
[illegible]
রক্তস্রোত [illegible]
প্রান্তরের [illegible]
নব সূর্যোদয়—এ শুধু কথার কথা ?
আজো দেখে অমানিশা, [illegible] রথ,
পশুরাও ভয়ে ভীত, [illegible] মানুষ
[illegible] আঘাত—
প্রেম, দয়া, ভালবাসা কথার ফানুস।
শক্তি যার, শক্তি তার, বলে বর্বরেতে
[illegible] আজ বুঝি ভুল!
সভ্যতার অহংকার শক্তির মোহেতে
[illegible] কপট নিদ্রায় শুয়ে
[illegible] দেখিছে লাঞ্ছনা,
[illegible]

নীল-কুঠি
সুকোমল বসু

নীল-কুঠি নীল নয়—আজ তার দেহটা বরং—
ইঁট-খসা জং ধরা মেটে-মেটে রং!
বিশাল মাঠের মাঝে দাঁড়ায় একাকী,
উৎসবের শেষে কারা
বুঝি তারে দিয়ে গেছে ফাঁকি!
নীল-কুঠি নীল নয়,
তবু বুকে প্রবাহিত নীল-ইতিহাস,
নীল অন্ধকারে ঝরে চাষীদের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস!
অনেক বুটের শব্দে—উৎসবের প্রমত্ত-উল্লাসে
বেদনার ক্ষীণ কণ্ঠ পরিণত হ'ল পরিহাসে!
সাগ্রহ-প্রশ্রয়-পুষ্ট পক্ষচ্ছায়ে সামন্ততন্ত্রের—
নীল-কর বণিকেরা আয়োজন করেছিল
শোষণ যন্ত্রের!
আজ সব চলে গেছে নীড়-ছাড়া পাখীর মতন
তবু নীল-কুঠি আছে—লাল দেহ,
নীল তার মন!

যমে মানুষে

ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

অপারেশন হয়ে গেল। রোগীর চৈতন্য ফিরে এসেছে। সবই আশানুরূপ কাজ হয়েছে। আধ ঘণ্টা সময় পেয়েছিলেন সার্জন। তাতেই যথেষ্ট। হার্ট থেকে সমস্ত রক্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। হার্টে রক্ত ঢুকবার নল দুটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই রক্ত নল দিয়ে বার করে নিয়ে একটা ছোট্ট কলের পাম্প দিয়ে আবার হার্ট থেকে সারা শরীরে রক্ত পাঠাবার বড় ধমনীতে (অ্যায়োর্টা) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই আধ ঘণ্টা হার্টের কাজ করেছিল ওই ছোট্ট ইলেকট্রিক পাম্পটা। আর রোগীর হার্ট রক্তশূন্য ছিল। সার্জন তাই ইচ্ছামত সেটাতে কাজ করতে পেরেছিলেন। হার্টের প্রকোষ্ঠগুলি খুলে ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দুটো ভেনট্রিকলের মধ্যে ছিল বরাট এক ছিদ্র আর হার্ট থেকে ফুসফুসে (লাংস) রক্ত যাওয়ার মুখটা ছিল অস্বাভাবিক সরু। ছুরি, কাঁচি, সূঁচ, সুতো দিয়ে এই অস্বাভাবিক হার্টকে মেরামত করে স্বাভাবিক করে দেওয়া শক্ত কিছুই নয়। তবে সার্জন চেয়েছিলেন যে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সময়ের জন্য তাঁকে হার্টটাকে এমন অবস্থায় পেতে হবে যাতে তার ভেতরকার সব খুলে ভাল করে দেখা যায় এবং ভিতরে ছুরি, কাঁচি, সূঁচ সুতো চালানর তিনি সুযোগ পান।

সমস্যাটা ছিল তাই। হার্ট ত অনবরত কাজ করছে। আর হার্টের গায়ে ফুটো করলেই ত সব রক্তারক্তি হয়ে একাকার হবে। রক্ত অবশ্য বন্ধ করা যায়। হার্টে রক্ত ঢুকবার পথ ফুটো বন্ধ করে দিলেই হার্ট রক্তশূন্য হবে। তখন আর তার গায়ে ফুটো করলে রক্ত বেরুবে না। ভিতরেও রক্ত না থাকায় সব বেশ ভাল পরিষ্কার দেখা যাবে। কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচলের কি হবে? হার্টকে ত অনবরত একদিকে সারা শরীর থেকে ফিরে আসা নীল রক্ত লাংসে পাঠাতে হচ্ছে শোধন ও অক্সিজেন পুষ্ট হতে; আর অন্যদিকে লাংস থেকে পরিস্রুত লাল রক্ত ধমনী পথে সারা শরীরে পাঠাতে হচ্ছে তার সব অংশকে জীবিত রাখবার জন্য। এই রক্ত চলাচল ব্যবস্থা ত এক মিনিটের জন্যও বন্ধ রাখা যাবে না। আধঘণ্টা বন্ধ রাখলে হার্টের মেরামত হয়ত
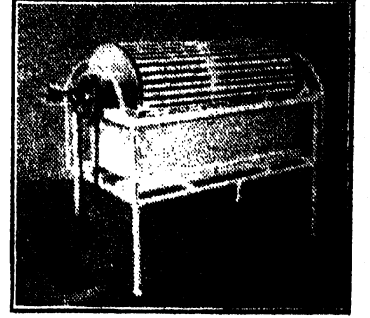
কলের কিডনী বা বৃক্ক

হবে কিন্তু রোগীকে ত আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সেটা হবে মৃতের উপর অস্ত্রোপচার।

হস্তচালিত কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র

কাজেই হার্টকে শুধু রক্ত শূন্য করলে চলবে না। তার রক্ত চলাচলের কাজটিও অন্য উপায়ে করিয়ে নিতে হবে। এই যান্ত্রিক যুগে এ আর একটা বেশী কথা কি। তাই সুরু হয়ে গেল এক্সপেরিমেন্ট। দরকার একটা পাম্প যার এক দিকটা থাকবে ভেনা ক্যাভার (শরীরের নীল রক্ত হার্টে প্রবেশ করবার শির) সঙ্গে সংযুক্ত। অপর দিকটা থাকবে হার্ট থেকে শরীরে রক্ত পাঠাবার প্রধান ধমনী অ্যায়োর্টার সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু বাকি রইল লাংসের কাজ। সরাসরি ভেনাক্যাভা থেকে অ্যায়োর্টাতে রক্ত পাম্প করলেই ত হবে না। নীল রক্তকে অক্সিজেন পুষ্ট করতে হবে আর তার থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বার করে নিতে হবে। তারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাঝ পথে একটা বোতল বসিয়ে তাতে রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন মেশাবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড বার করে নেবার বন্দোবস্ত করা হল। এই হার্ট-লাংস মেশিন দিয়ে জীবন্ত দেহে রক্ত চলাচল ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার পরীক্ষা করা হল প্রথমে কুকুরের উপর। পরীক্ষার আগে অবশ্য ছোট খাট আরও কয়েকটি সমস্যার সমাধান করে নিতে হল। যেমন রক্ত তরল রাখা। রক্তের একটা ধর্ম হচ্ছে
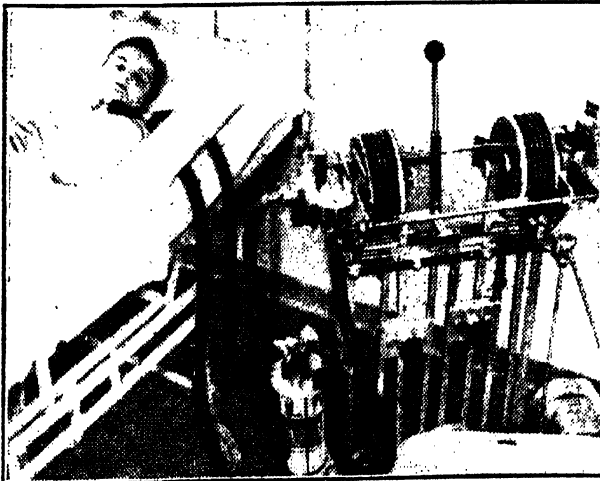
স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র

রক্ত শিরা বা ধমনীর বাইরে কিছুর সংস্পর্শে এলেই জমাট বেঁধে যায়। হেপারিন দিয়ে এই জমাট বাঁধা বন্ধ করা যায়। অন্য সমস্যাগুলি হচ্ছে রক্ত গরম রাখা, ফেনা হওয়া বন্ধ করা এবং জীবাণু সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করা, ইত্যাদি। এসব সমস্যার সহজেই সমাধান হল আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের অসীম উদ্ভাবন ক্ষমতায়।

কুকুরের উপর পরীক্ষা সফল হল। কুকুরের নিজের হার্ট ও লাংসকে পাশ কাটিয়ে শরীরের বাইরে রক্তকে শোধন করে নিয়ে কৃত্রিম শক্তি দ্বারা আবার সেই রক্ত শরীরের মধ্যে চালিয়ে দিয়েও কুকুরকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হল। আবার মেশিন বন্ধ করে দিয়ে স্বাভাবিক পথে রক্ত চলাচল প্রবর্তন করা গেল। কাজেই এই মেশিন ব্যবহার করে হার্টকে প্রয়োজনমত সময় তার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর হল। আর সেই সময়টুকুর মধ্যে সার্জন তাঁর মেরামতির কাজ সেরে নিতে পারবেন বলে আশ্বস্ত হলেন।

এরপর মানুষের উপরও এই মেসিনের ব্যবহার সফল হয়েছে। এর ফলে হার্টের অনেক অস্বাভাবিক গঠনমূলক রোগে অপারেশন করে সারান সম্ভব হয়েছে। তবে এর ব্যবহার কেবল হার্টের অপারেশনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অন্য যে সব মারাত্মক হৃদ্‌রোগ আছে তাতে এখনও এরকম কোন কলের হার্ট লাগিয়ে কাজ চালাবার সম্ভাবনা আপাততঃ নাই।

হার্ট ছাড়া শরীরের আরও দুই একটি যন্ত্রের কাজ কৃত্রিম উপায়ে চালান যায়। শ্বাস ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস চালানর পদ্ধতি (আর্টিফিসিয়েল রেসপিরেশন) অনেকে জানেন। জলে ডোবা বা ইলেকট্রিক শক্‌ লাগবার পর প্রাথমিক চিকিৎসায় এর প্রয়োজন হয়।

পলিও মাইয়েলাইটিস রোগে কখনও কখনও হঠাৎ শ্বাস প্রশ্বাস চালানর মাংসপেশীগুলি এমন অবসাদগ্রস্ত হয় যে শ্বাসক্রিয়া অচল হয়ে আসে। এই অবস্থায় দুই চারদিন কি তারও বেশী সময় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস ক্রিয়া চালানর ব্যবস্থা না করতে পারলে মৃত্যু অবধারিত। এর-জন্য আয়রণ লাংস যন্ত্র অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রে সারা শরীরটা একটা শক্ত আবরণীর মধ্যে ঢুকিয়ে তার মধ্যে বায়ুর চাপ কৃত্রিম উপায়ে পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে কমিয়ে শ্বাস ক্রিয়া চালান হয়। আরও অন্য ধরণের যন্ত্রও তৈরী হয়েছে যাতে শ্বাসনলের মধ্যে স্বয়ং চালিত যন্ত্র দ্বারা বায়ু পাম্প করা যায় ও বার করা যায়।

এই সব কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র অবশ্য বিশেষ বিশেষ জরুরি অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যে সব রোগে সাময়িকভাবে শ্বাস ক্রিয়া বিকল হয়ে মৃত্যু সংশয় হয় তাতেই এই যন্ত্রের প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্র চালিত শ্বাসক্রিয়ায় মানুষ বাঁচতে পারে না।

সম্প্রতি শরীরের আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। শরীরের সব অবাঞ্ছনীয় দূষিত পদার্থ প্রস্রাবের সংগে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই প্রস্রাব তৈরী হয় কিড্‌নিতে। কিডনিতে ছাঁকনির মত কতগুলি জিনিষ আছে যার মধ্য দিয়ে প্রচুর রক্ত চলাচল করে। রক্ত থেকে উৎপত্তি। কিড্‌নির কাজ বন্ধ হলে প্রস্রাব বন্ধ হয়। রক্তে অবাঞ্ছিত দূষিত পদার্থগুলি জমে যায় ও তার বিষক্রিয়ায় মারাত্মক ইউরিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ কোন রোগে কিডনীর কাজ বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত থেকে দূষিত জিনিষগুলি বার করে নেবার জন্যে আর্টিফিশিয়াল কিডনি বা কলের কিডনি তৈরী করা হয়েছে। এই যন্ত্র অনেকটা হার্ট লাংস মেসিনের মত। শরীরের কোনও নীল শিরা থেকে নল দিয়ে রক্ত বার করে একটা বোতল বা থলির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ বোতল বা থলির মধ্যে কুণ্ডলি পাকান কতগুলি টিউবে এমন একটা সলিউশন অনবরত চলতে থাকে যার মধ্যে রক্তের প্রয়োজনীয় সল্ট-গুলি রক্তের সমানুপাতে থাকে। ঐ টিউব এমন জিনিষে তৈরি যার মাধ্যমে ডায়ালিসিস্‌ চলতে পারে। বোতলে রক্ত থেকে দূষিত পদার্থগুলি ঐ টিউবের সলিউশনে ডায়ালিসিস হয়ে চলে যায়। পরে পরিশ্রুত রক্ত আবার পাম্পের সাহায্যে ধমনী পথে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

শরীরের অনেকখানি অংশ পুড়ে গেলে, বা দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক রকম আহত হলে, শরীরের অতিরিক্ত জল বা রক্ত ক্ষয় হলে অথবা কোনও আকস্মিক বিষ প্রয়োগে অনেক সময় প্রস্রাব সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় কিডনির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত কলের কিড্‌নির প্রয়োজন। কিড্‌নির স্বাভাবিক ক্রিয়া চালু থাকলেও এই কলের সাহায্যে অনেক সময় জীবন রক্ষা হয়।

অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খাওয়ার ফলে মুমূর্ষু রোগীকে এই যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচান গেছে। একটি রোগী এত বেশী বিষাক্ত ঘুমের ঔষধ খেয়ে ফেলেছিল যে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল তার পাকস্থলী থেকে প্রায় সবটা ঔষধই রক্তে মিশে গেছে এবং তার পরিমাণ এত যে স্বাভাবিকভাবে তার কিড্‌নি কাজ করেও সব বিষ শরীর থেকে বের করতে অন্ততঃ একমাস লাগবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব বিষ বার করতে না পারলে তাকে বাঁচাবার কোনও উপায় নেই। তখন খোঁজ পড়ল কলের কিডনির। কিন্তু সে হাসপাতালে বা আশে পাশে কোন হাসপাতালে সেই যন্ত্র ছিল না। ৮০ মাইল দূরে একটা হাস-পাতালে লোক ছুটল যন্ত্র আনতে। যন্ত্র এসে পৌঁছে গেল তাড়াতাড়ি, আর তার সাহায্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার রক্তের সব বিষ বার করে ফেলা হল।

এই বিজ্ঞানের যুগে কোন কিছুই আর অসম্ভব নয়। যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যেমন মানুষের নানা রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যন্ত্র উদ্ভাবন হচ্ছে চিকিৎসায়ও যান্ত্রিক সাহায্য ক্রমে ক্রমে বাড়ছে।

অনুরাগ

শ্রী সুলেখা ঘোষ

তোমার আঁখির তারা
সন্ধ্যা সজল মেঘমায়া,
তোমার আঁখির তারা
পল্লব ঘন বনছায়া;
আমার হৃদয়াকাশে এঁকে দেয় ব্যথার বিজুলী
তাই বুঝি খুলে যায় আবেগের রুদ্ধদ্বারগুলি।
মনের গোপন কেন্দ্রে
অবিরাম তব যাওয়া-আসা
কভু হাসি, কভু কান্না,
বোঝাবুঝি অনেক জিজ্ঞাসা—
নিভৃত মরমে তবু সরমের ভীরু আলাপন,
অধরে সুধার ঢেউএ দখিনার ক্ষণিক কাঁপন।
আমি যে শুনেছি রাতে
ঝিল্লীর মৃদু ঐকতান;
ভ্রমরের গুঞ্জন, তটিনীর কলকল গান;
ওরা যেন বলে যায় কেন তব সজল এ আঁখি
স্বপ্ন ছায়ে শুনি আমি এ পাড়াতে নীরবে একাকী।
ভ্রমর গুঞ্জন ফুলে ফুলে
কি বারতা আনে?
ঝিল্লীর যত কথা আঁধার রাতের কানে কানে।
তটিনী সাগর পানে ছুটে যায় নব অনুরাগে
কলময় কলগানে তাঁর দোলা কূলে এসে লাগে।
দৃষ্টির মাধুরী দিয়ে
তুমি যারে নিত্য যাও খুঁজে
ধরা দিতে সেও চায়
তোমার ঐ মনের সবুজে।
তোমার সজল আঁখি, ভীরু হৃদয়ের যত বাণী
অকথিত। তবু যেন আমি তার সবখানি জানি।

এখনও অধ্যায়

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসা জাল বুনে যায়
অনেক আশার ভিড় বুকে নিয়ে, যেখানে চঞ্চল
ময়ূর কণ্ঠের রঙ খেলা করে চোখের পাতায়—
উদার একটি কোন' আড়ালের বৈচিত্র্য উজ্জ্বল।

স্বপ্নেরই সিঁড়ি ভাঙা রাত্রি নিয়ে জীবনের পর্দা
যদিও অজস্র রূপে অপরূপ, মনে কিন্তু ভাসে
জানলার ফ্রেমে আঁটা দু'চোখে যে বৃষ্টিরই পর্দা
অজানা বিরহে কালো চারদিক চিন্তার আকাশে।

একটু বৃষ্টির ভেজা সবুজ ঘাসের চাপড়ায়
অথবা গাছের পাতা বর্ষার অজস্র যে শাসনে
জেগেছে রূপের আর নবীন রঙের যে খাতায়
হৃদয় ভরিয়ে দিয়ে অকথিত আশার আসনে।

ফুলের পাপড়ি যাবে ঝরে ঠিক সময় সীমায়।
সারাটা উদাস মন তখন যদিও কোন' এক
গভীর সম্পদে ভরা প্রাণে প্রেম সে চিরন্তনায়
ভালবাসা আশা-মূলে ঋতু-ভোর সজীব অনেক।

প্রীতির চোখের তীরে বুকের শতেক নোনা জল
দেহে ক্লান্তি আছে শেষে;
তবু তার কামনা আবেশ!
এ বিকাশে, বিচারের মেলে না
কেনই স্থিতি-তল;
জন্ম নেয় মুগ্ধ চোখে অনুভূতি প্রেমের নিমেষ।

মালাবার উপকূলে কেরল রাজ্যের লাল মাটি আর সবুজ নারিকেল বন দিয়ে ঘেরা সুন্দর মনোরম একটি গ্রাম কালাদি। কোচিন থেকে প্রায় ২৪।২৫ মাইল দূরে। একদা এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য।

এর্ণাকুলাম থেকে সকালের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে আমরা প্রায় বেলা দশটার সময় গিয়ে পৌঁছালুম আংগামালাই। ছোট্ট ষ্টেশান। চারিদিকে শুধু কাঠের গুদাম আর কারখানা। মালাবারী পুরুষ ও নারী একসঙ্গে কাজ করছে কাঠের আড়তে। লুঙ্গির মত পরিধেয় বস্ত্র আর ছোট জামা পরা শ্রমিক মেয়েরা পরিশ্রমে সুপটু। যার সঙ্গে পরিচয় হয় সকলেই বলে কেরলের মানুষেরা অসুখী নয়। যার একটি নারিকেল কুঞ্জ আছে সে তো মহাসুখী। অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু জাতি এরা। তাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা যায় হাসিমুখে গল্প করতে করতে এরা কাঠের ভারী ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে রেলের ওয়াগন ভর্তি করছে। দৈন্য থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য আছে এদের জীবনায়নে। তাই কেরলের রাঙা মাটি আর নারিকেল বনের শ্যামলিমায় ফুটে আছে সেখানকার মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি।

ষ্টেশান থেকে অনেকটা দূরে বাস ষ্ট্যান্ড। আমরা গিয়ে আসন নিতেই বাস ছেড়ে দিল। দক্ষিণের সর্বত্র দেখেছি বাস চলাচলের ব্যবস্থা বেশ উন্নত ও প্রশংসনীয়। সহর বাজার ঘুরে ঘুরে বাস চলেছে কালাদি গ্রামের পথে। আমরা এসে পড়েছি শঙ্করাচার্যের জন্মভূমিতে। নিভৃত গ্রাম মনোময় পরিবেশ। পথের দুপাশে কোথাও বা বাজার কোথাও বা মনুষ্য বসতি, আবার কোথাও বা শুধু আম কাঁঠাল আর কলাবাগান দূরবিস্তৃত হয়ে গিয়ে মিশেছে আকাশের সঙ্গে। যার দিগন্তে আকুলি বিকুলি করছে প্রমত্ত আরব সাগর।

কিন্তু একি? শঙ্করাচার্যের ভিটেতে যীশুখৃষ্টের ছবির এত প্রাচুর্য কেন? পথের দুপাশে সারি সারি দোকান। সেখানে বিক্রীর জন্য সুসজ্জিত রয়েছে যীশু ও মেরীর নানা ধরণের [illegible] ছবি। [illegible]? [illegible] জীবন থেকে তিনি বিলুপ্ত হয়েছেন ওই আলোয়াই নদীর তটে লাল মাটির অন্তরের গভীরে। মনে হোল কেরল রাজ্যে হিন্দুর চেয়ে খৃষ্টধর্মাবলম্বী মানুষই বোধ হয় বেশী।

প্রকান্ড একটি বাড়ীর সামনে বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর কোনও যাত্রী সেখানে নামল না। অতি সন্তর্পণে দ্বার খুলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। রাঙা মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। তার দুধারে শুধু ফুল আর ফলের বাগান। শুধু চাঁপা গাছ। স্তবকে স্তবকে ফুটে রয়েছে হলুদ আর শ্বেত দোলন চাঁপা। তার সুমিষ্ট সৌরভে বনভূমি আকুল হয়ে উঠেছে। আমরা চলেছি ত চলেছি। পথ আর শেষ হয় না। মালীদের ঘর, পূজারীদের কুটির, অতিথি ভবন শেষ হয়ে এক সময় আমরা এসে দাঁড়ালুম এক সুবিস্তৃত মুক্ত প্রাঙ্গণে। তার দুধারে মন্দির চূড়া প্রখর সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। তারই প্রান্ত ঘেঁষে ছল ছল করে বয়ে চলেছে আলোয়াই নদী। তার স্থানীয় নাম পেরিয়ার অথবা পূর্ণা। কোচিনে আরও অনেক নদী আছে। কিন্তু এই আলোয়াই নদীর জলই একমাত্র পানের যোগ্য। জননীর জল বহনের কষ্ট লাঘব করার জন্য শঙ্করাচার্য যোগবলে দূরে প্রবাহিত আলোয়াই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত করে প্রবাহিত করান নিজ বাসভূমির প্রান্তভাগ দিয়ে। সেই থেকে আলোয়াই শঙ্কর ভিটাপ্রান্তে প্রবাহিনী।

"পলকে পলকে, মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে

ঝলকে ঝলকে"—

নদীর তরঙ্গ হিল্লোলে দেখলুম সেই জীবন-মৃত্যুর খেলা। সেই উত্থান পতনের ইতিহাস। আলোয়াইর তটভূমিতে বসে, তার নীল জলে প্রাণের স্পর্শ রেখে আমরা প্রথমে গেলুম শঙ্করাচার্যের মন্দিরে। প্রকান্ড নাটমন্দিরের উপর ছোট মন্দির। অভ্যন্তরে শঙ্করাচার্যের সুবর্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এইস্থানেই একদা জন্মেছিলেন ভারতের এক সিদ্ধপুরুষ। আমরা সেই জন্মতীর্থের মাটিতে স্মরণ চিহ্ন নিবেদন করে এলুম এধারে সরস্বতী মন্দিরে। এই মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সপ্তমাতার মূর্তি [illegible] ভাস্কর্যে খোদিত আছে। তার নীচে পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে বেদমন্ত্রের শ্লোকগাথা। গর্ভগৃহে রৌপ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা বেদ ও বিদ্যাবতী সরস্বতী। রক্তবসনা সুবর্ণ প্রতিমা। তাঁর এক হস্তে একটি শুকপক্ষী, অপর হস্তে ধৃত রয়েছে মঙ্গলশঙ্খ। শঙ্করাচার্যের জ্ঞানানন্দদায়িনী ভাবকল্পা শুদ্ধ মূর্তি। কেউ কেউ বলে, মন্দিরের এই প্রতিমা শঙ্করাচার্যের জননীর শিলালেখ্য। মন্দিরের সামনে একটি প্রকান্ড নাটমন্দির আছে। প্রত্যহ এখানে ষোড়শ উপচারে হোম, পূজা, ভোগরাগ ও শাস্ত্রালোচনাদি হয়ে থাকে। কয়েকজন ছাত্র সেখানে বসে নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করছেন। আলোয়াইয়ের তটে চাঁপাতলাতেও কয়েকজন ছাত্র বসেছেন পুঁথিপত্র নিয়ে। কথা হচ্ছে শঙ্করের নামে এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন হয়েছে পান্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির সেই রকম। মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি তুলসীমঞ্চের নীচে রয়েছে শঙ্কর জননীর সমাধি বেদী। এখানেও নিত্য পূজা পাঠ ভোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে। ভোগের পর ভাতগুলি সমাধিবেদীর চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সে অন্নভোগ পাখীরা খেয়ে যায়।

মধ্যাহ্ন সূর্য আকাশে জ্বলজ্বল করছে। অগ্নিস্ফরা প্রচন্ড তাপ। কিন্তু কেরলের লাল মাটি আর শ্যামায়িত নারিকেল কুঞ্জে ছড়িয়ে আছে একটা মমতার্দ্র মনোময়তা। তার সঙ্গে মিশে আছে মালাবারী সাধারণ মানুষগুলির সরল আতিথেয়তা আর অবোধ্য ভাষার আকুতি। যে কথার সুর মোহাবিষ্ট করে রাখে অপরিচিত মনকে। সবচেয়ে সুন্দর এখানকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা পুষ্পিত চম্পক বনবীথি। তার কান্ড ও বল্কল দেখে মনে হয় কতদিনের প্রাচীন বৃক্ষ কে জানে? কিন্তু তার ফুলের অজস্রতা আলোয়াইর জলে বিহবল সৌরভ ছড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় তার তিথিহীন তারুণ্যের কথা।

সে আজ কতদিন আগে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বৈশাখের এক শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই কালাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জগদ্বরেণ্য পন্ডিত শঙ্করাচার্য। তাপস শ্রেষ্ঠ কুমারিল ভট্টের মন্ত্রশিষ্য। ভারতবর্ষ যখন বিদেশীয় ধর্মান্ধতার বিপাকে পতিত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সেই সময় তরুণ পরিব্রাজক শঙ্কর বীর সৈনিকের মত অবতীর্ণ হলেন সেই কুটিল রণক্ষেত্রে। হাতে তাঁর কোনও অস্ত্র ছিল না। শুধু কণ্ঠে ছিল অস্ত্রাধিক শাণিত বাণী। সেই বাণীমন্ত্রে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতির হৃত মনোবল। এইখানেই তিনি জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য।

এতবড় যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী শঙ্কর, একদা তাঁকেও অশ্রুবিসর্জন করতে হয়েছিল মাটির দুর্জয় ভালোবাসার টানে। এই সত্য শাশ্বত হয়ে রয়েছে শঙ্করজননীর সমাধি-বেদীর দুর্বাদলের সজলার্দ্র শ্যামাভায়।

গৃহত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসী শঙ্কর। পুত্রের বিরহে একাকিনী ঘরে কাল কাটাচ্ছেন শোকাতুরা জননী। অসহ্য সে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। অবশেষে একদিন মৃত্যু এসে মিত্রের মত তাঁকে মুক্তি দিল সেই বিরহ শোকানল থেকে। এই নিদারুণ

(শেষাংশ ১৬০ পৃষ্ঠায়)

॥ বেড়া ॥

(১৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ছোট ভাইয়ের লাল তিলটার দিকে দেখতে দেখতে দীননাথের দুটো চোখ জলে ভরে এল। ভাবতে লাগল, উন্নতি সোমনাথের নিশ্চয় হবে। তিলতত্ত্ব অভ্রান্ত। তবে যখন সোমনাথের অবস্থা ভাল হবে, তখন দীননাথ আর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মাঝখানে এই দর্মার বাধা। টাকা-পয়সা কোন কিছুর ভাগ দীননাথ চায় না। নিজে যা রোজগার করে যথেষ্ট। শুধু সবাই বলুক দীনুর ভাই আজ মস্ত লোক হয়েছে। দশখানা গাঁয়ের মাথা।

কিন্তু দাদাকে সোমনাথ আর স্বীকারই করবে না। পৃথক ভাইয়ের সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক! আলাদা অন্নই শুধু নয়, আলাদা বাস।

দর্মার মধ্যে দিয়ে দাঁড়ি গলিয়ে অপেক্ষা করে করে সোমনাথ বিরক্ত হয়ে উঠল।

কই ধর দাঁড়িটা। কতক্ষণ বসে থাকব।

কোন সাড়া নেই। কোন শব্দও নয়।

দর্মাটা ফাঁক করে সোমনাথ এদিকে উঁকি দিল। মতলবটা কি দাদার? ঘুমিয়ে পড়েছে, না সরেই পড়েছে একেবারে [illegible] ঘাড়ে সব কাজ চাপিয়ে।

উঁকি দিয়েই [illegible] দীননাথ [illegible]

[illegible]

দীননাথ সন্তর্পণে ভাইয়ের তিলের ওপর হাত বোলাল। [illegible] আরও [illegible] এবার [illegible] পাঁজির কথা ফলবে।

একটু একটু করে পুরোনো অনেক কথা মনে পড়ল সোমনাথের। তিলটা তার অনেক দিন বটে, কিন্তু সব সময় সেটাকে আগলে এসেছে দাদা। একটু আঁচড় লাগতে দেয়নি, পাছে ভাইয়ের সৌভাগ্যের ষোল-কলা পূর্ণ না হয়।

তোর ভালই হবে হাবু, দেখিস। ঠিক ভাল হবে। সেদিন আমার উকীলও তাই বলছিল। লাল তিল তো মস্ত সুলক্ষণ হে দীনু। তোমার ভাইয়ের উন্নতি রোখে কে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে দীননাথ তিল থেকে একবারও হাত ওঠাল না। সোমনাথের সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল।

খুব সাবধানে থাকিস হাবু। তুই যা একরোখা মানুষ। কোনদিকে তো খেয়াল নেই। এখনই এমনভাবে দর্মাগুলো আর্নিল মাথায় করে, আঙুলে চোট লাগলেই হয়েছিল। কটা দিন একটু সাবধানে থাকিস।

বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠল। সোমনাথের শরীরটা কাঁপতে লাগল থর-থর করে। মনে হ'ল, ও একলা পারবে না, চিরদিন এ তিলটা দাদাই বাঁচিয়ে এসেছে।

বুঝলি হাবু, কি একটা বলতে গিয়েই দীননাথ বাধা পেল।

দাদা, দাদা, আর্তনাদ করে সোমনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ল দীননাথের দিকে। হাতের দাঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দীননাথ ভাইকে বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরল।

দুই যোয়ান-মদ্দর চাপে দর্মাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

কালাবাবু

(১৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বটে। তার পরে আর এগোয় না। যারা চেনে তারা অবাক। মুখ টিপে টিপে হাসে কেউ কেউ।

ভাগীরথীর মৃত্যুর পর আজ প্রায় দু'বছর কাটতে চললো। কালাচাঁদের ঘরে আর কোনো নারীর আবির্ভাব ঘটেনি। মদের আড্ডা থেকে প্রতি রাতেই সে ফিরে এসেছে বাস ষ্ট্যাণ্ডে। আর কোথাও যায়নি। দু'বছরে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি একদিনও।...

বাস্ এসে গেছে কাড়িধ্যার বাজারে।

ফটিকের আজ সে আগ্রহ নেই। তবু যতক্ষণ চাকরিতে আছে, ততক্ষণ কাজ করতেই হবে। নিয়মমাফিক সে হাঁক দিলে, কড়ে, কড়ে—নামনেওয়ালা চলে আসেন কেনে গেটের মুখে—।

গাড়ী থামলো।

নেমে গেল কাড়িধ্যার যাত্রীরা। ভীড় করে দাঁড়ালে গুটিকতক ছেলেমেয়ে। কালাচাঁদ বললে, ইঞ্জিন জল খাবে। জল লিয়ে আয়—

বিনা বাক্যব্যয়ে বালতিটা বার করে নিয়ে কাছের ইঁদারার দিকে রওনা হ'ল ফটিক।

কালাচাঁদ ডাকলে, শোন্।

ফটিক দাঁড়ালে।

কি র‍্যা, কাজ ক'রবি না, রেজাইন দিবি?

দাঁতে দাঁত চেপে শ্লেষটুকু হজম ক'রলে ফটিক। বললে, ছাড়বো।

আজই? আমি তবে আর কাউকে দেখবো?

হাঁ।

বেশ যা, জল লিয়ে আয়।

ফটিক আপন মনে কী বলতে বলতে চলে গেল। কালাচাঁদ নেমে দাঁড়ালে রাস্তার ওপর। একটা বিড়ি ধরালে। পিট পিট করে তাকালে কৌতূহলী ছেলেমেয়েগুলির দিকে। তার ভেতর বছর বারো বয়সের একটা রোগা ছেলের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে। তার পর প্রশ্ন করলে, নামটা কী বটে তোর?

খালি গা ছেলেটা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল। তারপর ভয়ে ভয়ে বললে, নাম বটে পরাণ।

বাপ আছে?

আছে।

খেতে দেয়? দু'বেলা খেতে পাস?

চুপ ক'রে রইলো ছেলেটা।

কালাচাঁদ বিড়িতে একটা টান দিয়ে বললে, কাজ করবি?

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালে।

দূর আবাগের বেটা, হাওয়া গাড়ীর কাজ শিখবি নাকি বল্?

ছেলেটা কী বলবে দিশে পাচ্ছিল না। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল মাঝবয়সী আর একটি লোক। সে এগিয়ে এসে বললে এ ছোঁড়াটাকে লিবেন কালাবাবু?

তবে কি ইয়ার্কি করছি নাকি?

জিভ কেটে লোকটি ব'ললে, ছিঃ ছিঃ। তা নেন কেন ছোঁড়াটাকে। বড় গরীবের ছেলে ওটা বটে। অ্যাই পরাণ, তোর বাপকে ডাক না কেনে?

কালাচাঁদ বললে, ছেলেকে দেবে তো?

দেবে না? আপনার হাতে দিতে পারলে বত্তে যাবে ওর বাপ। বেটার আখের তো তৈরী হয়ে গেল বাবু। যা পরাণ, দৌড়ে যা কেনে।

পরাণ দৌড় দিলে। কালাচাঁদ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, জামা আছে তোর?

হিঁ। আছে বটে একটা। জবাব দিলে পরাণ।

পরে আসিস। এই গাড়ীতেই যাবি।

কাছেই বাড়ী। দু'মিনিটের মধ্যেই বাপকে নিয়ে পরাণ এসে হাজির। জামাটা পরে এসেছে। এরই ফাঁকে হাত বুলিয়ে মাথার খাড়া চুলগুলোকে কখন যেন একটু চেপে দিয়েছে।

পরাণের বাবা হাসবে কি কাঁদবে বুঝে পায় না। বার বার হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে বললে, ছোঁড়াটার কপাল বটে ভালো। লিয়ে যান কালাবাবু, সব দায়দায়িক আপনার।

ফটিক ইঞ্জিনে জল দিয়ে আড়চোখে ব্যাপারটা দেখছিল। পরাণ উঠে বসলে গাড়ীতে। ফটিক আপন মনে বললে, খুব তো লাফাইছিস শালা—পরে বুঝবি বটে।

গাড়ী আবার ছুটলো।

রাত্রিতে বাস ষ্ট্যাণ্ড থমথমে। পরাণকে হোটেল থেকে খাইয়ে গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে কালাচাঁদ। বেচারা এই প্রথম বাড়ী ছেড়ে এসেছে। একা অন্ধকার গাড়ীতে বসে কান্না পাচ্ছিল তার।

অনেক রাতে ফিরলে কালাচাঁদ। কাঁচি মদের গন্ধে ভুর ভুর ক'রে উঠলো বাতাস।

পরাণের কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কালাচাঁদ বললে, কী বাবা, মন খারাপ লাগছে? দূর বোকা, রোজই তো বাড়ীর সমুখ দিয়ে যাবি আসবি। তোর কিচ্ছু ভাবনা নেই। সব কাজ হাতে ধ'রে তোকে শিখিয়ে দেব। খুব মন দিয়ে শিখবি, কেমন?

পরাণ ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে বললে, হুঁ।

ও ছোঁড়াগুলোর মতো আবার বেইমানি করিসনি বাবা।

পরাণ কিছুই বুঝলে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কালাচাঁদের দিকে।

অবিচার

সত্য কহিলে লাঠি খাবে জেনো
ভুলে এ-জগৎ ভরা,
গলিতে গলিতে দুধ ফিরি করে,
বসে বসে বেচে সুরা।
(তুলসীদাস)

মৃত্যু

(১৫৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফিন্কির ফোয়ারা ছুটল। শেষে বললে, দেখছি তারানাথের বদলে আগে তোমাকেই ফাঁসিতে লটকানো উচিত। শোনো ঠাকুর, তোমাকে মিথ্যে কিছুই বলতে হবে না, যা সত্যি ঘটনা সেইটুকু বলে শুধু একটা ডায়েরী করে আসবে। তারপর আমি দেখছি তারানাথ আর তার ডাইনী মাকে। ভোঁড়ং, তোরা এখানে একটু দ্যাখ, লাশ কেউ না সরায়। আমরা থানা থেকে এলুম বলে।

হারানদা নিধু ঠাকুরকে এক রকম টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

লোকের ভিড় কমছে। অফিসের বেলা হচ্ছে, সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। এখন, বৌ-ঝিরা বেশি বেশি করে আসছে। রেস্তোরাঁয় যে মেয়েটি কাজ করে, সে বোধহয় আজ আর কাজে যাবে না। ঘুরে-ফিরে বারে বারে সে আসছে, ব্রজরাণীকে দেখছে, চোখের জল মুছছে।

ঘণ্টাখানেক পর হারান-দা ফিরল এ।। সে কি চোখ-মুখের অবস্থা হারানদার। মনে হল, এক্ষুণি ফেটে চৌচির হয়ে পড়বে। দেখেই বুঝলুম ব্যাপার খারাপ। বললুম, কি হল হারান-দা। গোঁসাই কোথায়?

: গোঁসাই সৎকার সমিতির অফিসে গেছে, গাড়ী নিয়ে আসছে।

: ডায়েরী করেছ?

: না। গোঁসাই বললে, সে আর ব্রজরাণী স্বেচ্ছায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। শুনে ওসি বললেন, তা হলে আর থানায় এসেছ কেন। যাও লাস পোড়াবার ব্যবস্থা করো গে।

হারান-দা অস্বাভাবিক রকমের প্রশান্ত স্বরে ঘটনাটা বলল:

: ব্যাটা গোঁসাইকেই ফাঁসি দেওয়া দরকার। এ দেশের কিস্‌ছু হবে না।

ক্রমশঃ রোদের তাত বাড়ছে। সকালের স্নিগ্ধ, সবুজ, শিশির ভেজা মাঠটা এখন কেমন নির্মম কঠিন হয়ে উঠছে। ব্রজরাণীর দেহটা রোদের তাতে জ্বলে-পুড়ে, কুঁচকে আরও কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটে, মুখে, চোখের কোণায় মাছির সংখ্যা বাড়ছে। রেস্তোরাঁর মেয়েটি মাঝে মাঝে হাত নেড়ে মাছিগুলিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা নিধু ঠাকুরের অপেক্ষায় আছি।

নিধু ঠাকুর গাড়ি নিয়ে ফিরল, আমি গিয়ে ধরলুম। বললুম, ঠাকুর, এটা কেমন হল। ডায়েরী তুমি করলে না কেন?

ঠাকুরের দুচোখে জল। বললে, মিছা কথা কখনও তো বলি নাই, গোপাল। তারানাথ আমাদের তাড়িয়ে দিতে এসেছিল ঠিকই। ব্রজরাণী বললে, তারানাথ-দা, তুমি কেন নিমিত্তের ভাগী হবে, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি। ব্রজরাণী আমার গলা জড়িয়ে কেঁদে বললে, ওগো, তারা-দা মানুষের চাইতে ওর বাড়িকে বেশি ভালো বাসে। এ ঘরে মরে তারাদাকে যদি দুঃখ দিই আমার আত্মা শান্তি পাবে না। তারাদা তার বাড়ি নিয়ে থাক, আমাদের ধরিত্রী জননীর কোল আছে। মাঠই আমাদের ভালো। তুমি একটু কোলে করে আমায় ওখানে নিয়ে চলো। আমি লণ্ঠনটা ধরছি। জলভরা চোখে ঠাকুর থামল: মিছা কথা তো কখনও বলি নাই, গোপাল। রাধা মাধব!

ফিরে তাকিয়ে দেখলুম সৎকার সমিতির লোকেরা লাশ গাড়িতে তুলছে।

নীল আশ্বিন ঝিকিমিকি নাচ
খুশির টগরে সাজানো বাগান।
হৃদয়-কপাটে খোলো আজ খিল।
জ্বর মোছা ভোরে পাখি গায় গান।
টুকরো শিশির যেন কৃস্টাল—
প্রজাপতি পাখা রেশম দিনের
পাতলা বোরখা ছিঁড়ে কিছু লাল
ছড়ালো গোলাপ; শ্যাওলা মিনের—
ওপরে হলুদ জলছবি-ছাপ
এঁকে দিল রোদ। নীল আশ্বিন।
ময়ূরে পেখমে, কবোষ্ণ তাপ,
প্রবালের দ্বীপ সমস্ত দিন।

সমস্ত দিন প্রতীক্ষা কার—
ঘড়ির কাঁটায় হাওয়ার টোকায়?
তারপর শেষে তরমুজে লাল
গোধূলি ডুবলে, জোনাকি পোকায়
ছেয়ে গেলে সব ছায়া-বটগাছ
কে এসে ডাকবে স্মৃতির শরীরে?
মেঘ মুছে দেবে আসমানী কাঁচ
চিকরে উড়বে আকাশের তীরে?

একটি জন্ম শিলালেখ্য

(১৫৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সংবাদ সুদূর তীর্থ পরিক্রমার পথে শংকরাচার্যের মর্মে গিয়ে শেলের মত বিদ্ধ হোল। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে দেখলেন এখনও জননীর মৃতদেহের সৎকার হয়নি। প্রতিবেশীরা তাঁকে অজ্ঞাত কোনও কারণে বর্জন করেছে। শোকার্ত পুত্র ছুটে গিয়ে একা বক্ষে তুলে নিলেন মাতৃশবদেহ। পবিত্র আলোয়াইর জলে তাঁকে স্নান করিয়ে দেহটি খণ্ড খণ্ড করে নিজ হস্তে তাঁকে সমাহিত করলেন এই নদীকূলের মৃত্তিকা গহ্বরে। তারপর এই আলোয়াইর নির্জন তীর প্রান্তে বসে অঝোর ধারায় করলেন অশ্রু বিসর্জন। অতঃপর চম্পক বনবীথির এই রক্ত মাটিকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে চলে গেলেন জন্মভূমিকে। সেই মাটিতে উত্তরকালে গড়ে উঠেছে এই স্মৃতিসৌধ। সে কতদিনের কথা, কিন্তু মনে হোল এই চাঁপা বনের কানে কানে নীল নির্জন আলোয়াই নদী আজও যেন চুপি চুপি বলছে সেই কাহিনী। একটি জন্মস্থান, ব্যাকুল স্নেহে, ব্যাকুল প্রেমে, সযত্নে ধারণ করে রয়েছে একটি জন্মক্ষণের সার্থক লগ্নকে, নিভৃত অশ্রুপাতের একটি শৈবাল সজল শিলালেখ্যকে।

স্কেচ : অমিতাভ সেন

রেনবো
ফাউন্টেন পেন কালি
রেনবো কালির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পিছনে আছে অবিরত গবেষণা, বৈজ্ঞানিক সম্মত প্রস্তুত প্রণালী এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।
রেনবো কালি—ঝর ঝরে লেখা হয়, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং যে কোন কলমে ব্যবহার করা যায়।
Rainbow
Ink
রেনবো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
প্রাঃ লিঃ
২১২এ, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১

লৌহ, হার্ডওয়ার, সিমেণ্ট ও এসবেসটস্
আমদানী ও রপ্তানি কারক
রেজিষ্টার্ড টাটা ইস্কো ডিলার্স
গ্রাম: হালপাটি
ফোন ৩৩-৪৮৭৭
৩৩-২৮৮২
৩৭-২৪৯৫
স্থাপিত-১৮৯১
রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
২০, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিঃ-৭
শাখা
২২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

ফোটো—স্বর্ণা ঘোষ

সাঁতারের পথে

ফোটো—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

মাছের ঘ্রাণ—

পরিচালক স্বপনবুড়ো

পূজোর চিঠি

আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল,—

তোমরা আজি মিলবে এসে
আমার আঙিনায়,
তাইত আকাশ রাঙা হল
সূর্য্যেরি আভায়!
তোমাদেরই নৃত্য-গানে
মোর পরানে বন্যা আনে
তোমাদেরই খুশির-খবর প্রভাত পাখী গায়!

আনন্দেরই ঝরণা ধারায় তোমরা করো স্নান,
সেই পুলকে কণ্ঠে তোদের উঠবে জেগে গান।
তোমাদেরই ভালোবাসায়—
জাগবো আমি নতুন আশায়,
তোমাদেরই মাঝখানে ঠাঁই পেতে পরান চায়॥

শুভার্থী—

স্বপনবুড়ো

"আশীর্ব্বাদ"

সুনির্মল বসু

তোরাই তরুণ এই ভারতের
উজল সবুজ ভবিষ্যৎ
অন্ধকারের বক্ষ চিরে
চালাস আলোর স্বর্ণরথ।
তোরাই জাগাস আশার বাণী,
জাগরণের প্রাণের সুর—
এই ধরণীর বুকের মাঝে
আপনি নামে স্বর্গপুর!
তোদের খুশি চির-উজল,
চির সফল তোদের সাধ,
তোদের কাঁচা প্রাণের প্রতি
রইল আমার আশীর্ব্বাদ।

কারবার

মনোজিৎ বসু

কার কথা বলি বলো, শোনো তুমি কথা কার?
যদি বলি,—"নরহরি লোক ভালো কথাকার,—
মনে তার এতটুকু নেইকো—অহংকার,
গিন্নীও তার মোটে চায়না—অলংকার,
দেখা হ'লে হাসিমুখে জানায়—নমস্কার,
নেই জানি তাহাদের কোনো কু-সংস্কার,
সুখে দুখে চিরকাল তাহারা যে অবিকার,
জোর ক'রে কোনো কিছু করে নাকো অধিকার,
বরং কাহারো হ'লে টাকাকড়ি—দরকার
থলি হাতে ছুটে আসে—নরহরি সরকার।"
শুনে তুমি বাঁকামুখে বলিবে—"চমৎকার,
কবে থেকে হ'লে বাপু এমন—গপ্পকার?'

উলটে শোনাবে তুমি আমারে যে বারবার
"নরহরি চুপিচুপি করে—চোরা-কারবার,
ধরা প'ড়ে জেলে গেছে কম ক'রে চার বার
লক্ষণ নেই তার সেই রোগ—সারবার,
ঘরে তার আছে এক জাঁদরেল পরিবার,
গহনার ভারে যার বল নেই নড়িবার!
মানে তারা তুকতাক্ বারবেলা শনিবার,
ছিংসুটে, ঝগড়াটে,—মুখ করে অনিবার,
কৌশল জানে ভালো অন্যকে ছলিবার,—
এইবার ভেবে দেখ কী বা আছে বলিবার?
মিছে যদি মনে হয়, ডায়মণ্ড-হারবার
চলে গিয়ে দেখে এস তাহাদের কারবার।"

শিল্পী—অনুরাধা দত্ত।

শিল্পী—রেবা রায় চৌধুরী।
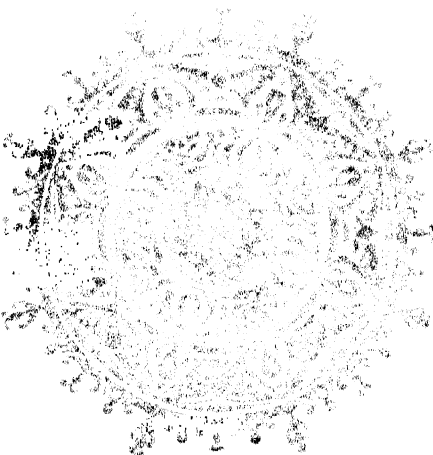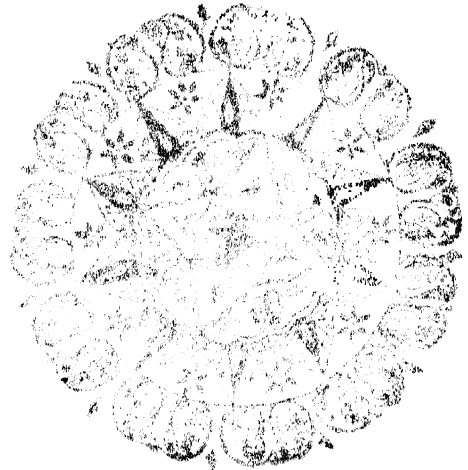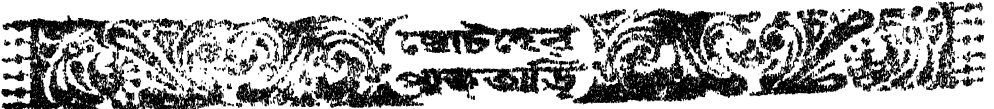
শূর্পণখার নাকটী কাটা, কেঁদে মরে মন্থরা।
তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচবে কি, সে মনমরা।।
রাবণ রাজা আগুন দিলো হনুমানের ল্যাজটাতে।
কংস বলে—আন ব্যাটারে, কান ম'লে দেই দুই হাতে।।
কুম্ভকর্ণের ঘুম দ্যাখো না, নাকের ভেতর বাজায় ঢাক।
চরাক—ঘোরায় ঘুম ছুটোবে, ডাকরে ঘটোৎকচে ডাক।।
ইন্দ্রজিতের বড়াই বড়ো, কীচক বেঁচে নেই কিনা।
তার হাতের এক চিমটি খেলে নাচতে হ'তো ধিনধিনা।।
লংকাকাণ্ড সাঙ্গ হ'লো কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে।
রক্ষপুরে রাক্ষসেরা হরেকৃষ্ণ নাম করে।।
কালনেমী নেই, শকুনি নেই, মামার বংশ চিঁচিংফাঁক।
বিভীষণের রাজ্যে চড়ে অষ্টপ্রহর শেয়াল—কাক।।

* * *

দন্তবক্র—মুনির লেখা স্বপনপুরাণ এই তো রে।
অষ্টাবক্র রেখে গ্যাছে স্বপনবুড়োর দপ্তরে।।

(রূপকথা)

গভীর বনে, যেখানে মানুষ যায় না, সেখানে এক হাত লম্বা বামন-বুড়োরা থাকে। তারা ছোট গাছগাছালির যত্ন করে, ফুলের গাছে জল দেয়, পোকা ফড়িংদের খবরদারি করে, প্রজাপতি পোষে। তারা সবাই ভাল লোক। তবে, কেউ কেউ একটু কুঁড়ে। কেউ একটু রগড় করতে ভালবাসে। লাল বুড়ো ছিল এই রকম। সে লাল কাপড় পরত; একটা লাল থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নীল বুড়ো নীল পোষাক পরত। সে ছিল খুব সাহসী। লাল বুড়ো তাকে ভালবাসত না।

বামন-বুড়োদের আর একটা কাজ ছিল,—ফুলের রঙ দিয়ে, রঙ্গীন নুড়ি পাথরের গুড়ো দিয়ে, গাছের গায়ে ছবি আঁকা। টুনটুনি পাখীর পালক নিয়ে তারা তুলি বানায়।

ফুলপরীরা ছোট্ট ছোট্ট পরী। তাদের আর বামন-বুড়োদের ভিতর বন্ধুতা। জ্যোৎস্না রাতে পরীরা পৃথিবীতে নেমে আসে, ঘাসের উপর নাচে। তখন ঘাসের ফড়িংগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে তাদের ভয় খাইয়ে দেয়। তাই বামন-বুড়োরা সন্ধ্যার আগে ফড়িংগুলোকে ধরে ধরে থলির ভিতর পুরে রাখে। সকাল হলে আবার ছেড়ে দেয়।
এক রাতে, বামন-বুড়োরা পরীদের ডাকল বনে এসে খাওয়া-দাওয়া করতে। ভারি ভোজের আয়োজন চলেছে। নীল বুড়ো সকাল থেকে কাজে লেগেছে। ছোট ছোট পাতার বাটিতে ফুলের মধু ফলের রস এনে জড়ো করছে। লাল বুড়ো ফাঁকি দিয়ে বসেছে কোথায় লুকিয়ে।

সারা রাত সবাই মিলে খুব নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর পরীদের যাবার সময় হল। জোনাকি পোকারা বাতি ধরল পথ দেখাতে। যেতে যেতে হঠাৎ পরীরা সবাই ভয় পেয়ে, "ওরে মা রে! ওরা কারা রে?" বলে চেঁচামেচি করে উঠল। তাদের সামনে সাদা সাদা ভূতের মত কি যেন সব দাঁড়িয়ে আছে,—গোল গোল চোখ বের করে তাকিয়ে দেখছে। কেউ বা বড় বড় দাঁত মেলে হাসছে। "কি হল? কি হল?" বলে বামন-বুড়োরা ছুটে এলো। নীল বুড়োর সাহস বেশী। সে সকলের আগে এগিয়ে গেল। দেখে, কতগুলো মস্ত মস্ত ব্যাঙের ছাতা! ছাতাগুলোর উপরে কালো আর লাল রঙ দিয়ে চোখ-মুখ আঁকা। সেগুলোকেই ভূতের মতো লাগছে দেখতে, জোনাকিদের মিটমিটে আলোতে। বামন-বুড়োরা রাগারাগি করছে, "কার এমন কাজ? অতিথিদের অপমান কে করেছে? এমন অভদ্র কে?"

নীল বুড়ো নীচু হয়ে দেখতে পেল, একটা ব্যাঙের ছাতার নীচে একটা লাল থলি পড়ে আছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না, কার এ কাজ। পরীরা তাড়াতাড়ি চলে গেল বাড়ী।

এর পরে একদিন পরীর দেশ থেকে চিঠি এল বামন-বুড়োরা সেখানে খেতে আর আমোদ করতে যাবে। সব বামন-বুড়োর নামে আলাদা আলাদা চিঠি এলো। নীল বুড়োর নামেও এলো। লাল বুড়োর নামে এল না। সে একলা একলা বসে এত কাঁদল যে তার চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেল।

(জর্জিয়ান রূপকথা)

এক রাজা......মৃত্যুকালে তার একটি মাত্র পুত্রকে ডেকে তাঁর হাতে দিলেন একটি সোনার কৌটো—বললেন—এর মধ্যে আছে একটি চুণীর গোলা। এ কৌটোটি সব সময় সঙ্গে রাখবে—যখন খুব বিপদে পড়বে, তখন এ কৌটো খুলবে—বেশী বিপদ ছাড়া কখনো এ কৌটো খুলবে না। তা যদি খোলো বিপদ হবে।

রাজা মারা যাবার পর রাজপুত্র হলেন রাজা। রাজা হয়ে মনে সুখ নেই—বাপ-রাজার শোকে তিনি কাতর। রাজকার্যে মন লাগে না। শেষে
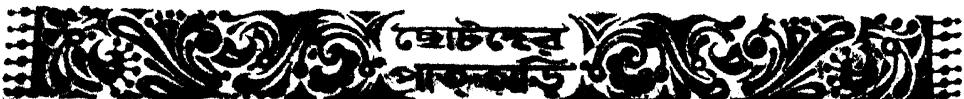
মন্ত্রী বললেন—মৃগয়া করতে চলুন মহারাজ—তাহলে মন কতক শান্ত হবে।

রাজপুত্র তখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে মৃগয়ায় বেরুলেন—মন্ত্রী চললেন সঙ্গে।

বনে তাঁরা অনেক পাখী মারলেন, বরা মারলেন, হরিণ মারলেন; তারপর বনে ছাউনি ফেলে সৈন্য-সামন্তরা রইলো ছাউনিতে—রাজা চললেন মন্ত্রীর সঙ্গে—দুজনে বনে ঘুরতে।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এলেন মস্ত এক পুরীর সামনে...... দেখেন পুরীর ফটকে লেখা—এ পুরীর মধ্যে প্রবেশ করলে দুঃখের সীমা থাকবে না......না প্রবেশ করলেও দুঃখ পাবে।

মজার কথা তো! রাজা বললেন, আমি পুরীতে প্রবেশ করবো।

মন্ত্রী বললেন, না মহারাজ, আগে আমি প্রবেশ করে দেখি, কি ব্যাপার ! তারপর আপনি যাবেন পুরীর মধ্যে।

রাজা বললেন—বেশ ! তাই হোক্।

মন্ত্রী চললেন পুরী-প্রবেশ করতে...বলে গেলেন—যদি আমি তিন দিনের মধ্যে না ফিরি বুঝবেন, আমি পুরীর মধ্যে বিপদে পড়েছি...... তখন আপনি আসবেন পুরীর মধ্যে আমাকে উদ্ধার করতে।

রাজা বললেন—বেশ।

তাই হলো। রাজপুত্র পুরীর বাইরে রইলেন।

তারপর, একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল—মন্ত্রীর ফেরার নাম নেই ! নিশ্চয় তিনি বিপদে পড়েছেন ! রাজা তখন ঢুকলেন পুরীর মধ্যে......মন্ত্রীকে উদ্ধার করতে।

পুরীর মধ্যে ঢুকে তিনি দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে বারোজন সান্ত্রী—তাদের সকলের হাতে খোলা তলোয়ার। তারা রাজাকে পুরীর মধ্যে নিয়ে গেলো।

একটা, দুটো করে এগারোটা ঘর পেরিয়ে তাঁরা ঢুকলেন বারোনম্বর ঘরে।

সে ঘরে রাজা দেখেন, সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছেন এক রূপসী কন্যা।

সান্ত্রীরা বললো—কন্যা আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করবেন আর আপনি যদি সে তিনটি প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারেন ভালো।—তা যদি না পারেন—একটি জবাব যদি ভুল হয়, কিম্বা কন্যা যদি কোনো প্রশ্ন না করে চুপচাপ বসে থাকেন তাহলে আপনার গর্দানা যাবে। আপনার আগে আপনার মন্ত্রী এসেছিলেন কিন্তু তিনদিনেও কন্যা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেন নি তাই তাঁর গর্দানা গিয়েছে।

রাজা দেখলেন, এ তো মহাবিপদ ! উপায় ? সঙ্গে ছিল সেই সোনার কৌটো—তিনি সেই সোনার কৌটো খুললেন। কৌটো খুলতেই তার ভিতর থেকে লাল চুণীর বড় একটি গোলা ছিটকে বেরুলো—বেরিয়ে সে গোলা চললো কন্যার পালঙ্কে।

পালঙ্কে উঠেই গোলার মুখে কথা ফুটলো। গোলা বললে—আমার প্রথম প্রশ্ন—এক রাজা—রাজার ভাই আর রাজার রাণী তিনজনে অরণ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন......সেখানে ডাকাত পড়ে রাজা আর রাজার ভাইএর মাথা কেটে নিয়ে গেল—রাণী শোকে কাঁদছেন, এমন সময় একটি নেংটী ইঁদুর তাঁদের দেহ দেয় কামড়ে—তাই দেখে রাণী নেংটীর গায়ে ইঁট ছুড়ে মারলেন ! নেংটী গেল মরে—তখন নেংটীর মা এসে একটা গাছের পাতা ছেঁকে সেই রস বাচ্ছার গায়ে মাখাতেই নেংটী উঠলো বেঁচে।

নেংটীর মা বললেন......আমি তো আমার নেংটী বাঁচালুম—তুমি কি করে বাঁচাবে রাজাকে আর রাজার ভাইকে? রাণী চোখে দেখলেন কোন্ গাছের পাতা এনে সেই পাতার রস ছেঁকে নিয়ে নেংটীর মা বাঁচিয়েছে নেংটীকে। নেংটীর মা নেংটীকে নিয়ে গেল চলে ......তখন রাণী করলেন কি, সেই পাতা নিয়ে এলেন—এসে দুজনের ধড়ে মাথা দিলেন জুড়ে—তারপর সেই পাতা ছেঁকে দিলেন গাছের পাতার রসের প্রলেপ। রাজা রাজার ভাই দুজনে বেঁচে উঠলেন। কিন্তু রাণী ভুল করে রাজার ধড়ে এঁটেছেন রাজার ভাইএর মাথা আর রাজার ভাই-এর ধড়ে রাজার মাথা। এখন আমার প্রশ্ন—কাকে রাজা বলে মানবো ?

রাজা বললেন, যার ধড়ে রাজার মাথা তাকেই রাজা বলে মানবো।

গোলা বললে—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে ! এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

গোলা আর একটি কাহিনী বললো। গোলা বললে—একজন ছুতোর মিস্ত্রী, একজন দর্জি আর একজন পুরুত—তিনজনে চলেছেন দূর দেশে......পথে বন,—বনে রাত্রি হলো। তখন তিনজনে আছেন জেগে—রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া সারলেন। তারপর কথা হোল—তিন প্রহর রাত—এক একজন এক প্রহর জেগে পাহারা দেবেন, আর দুজনে ঘুমোবেন। প্রথম প্রহরে দর্জি আর পুরুত ঘুমোলেন—ছুতোর মিস্ত্রী পাহারা দিতে লাগলেন।

পাহারা দিতে দিতে ঢুলুনি আসে—ছুতোর ভাবলো কিছু কাজ করি। সে তখন তার যন্ত্রপাতি নিয়ে গাছের ডাল কাটলো—কেটে তা থেকে বানালো চমৎকার একটি পুতুল......তারপর তার জাগার প্রহর শেষ হলো। সে ঘুমলো—দর্জি জাগলো এ প্রহরে পাহারা দিতে। পুতুল দেখে দর্জি সেটাকে বেশ ভালো পোষাক তৈরী করে পুতুল সাজালো।

তৃতীয় প্রহর এলো......তখন দর্জি ঘুমলো......এবারে পুরুতের পাহারা দেবার পালা।

পুরুত দেখলো সাজপোষাক পরা চমৎকার একটি কাঠের পুতুল। পুরুত ভাবলেন—এ পুতুলের প্রাণ দেবো।

পুরুত তখন মন্ত্র পড়ে পুতুলের প্রাণ সঞ্চার করলেন। পুতুল দিব্যি জ্যান্ত মানুষ হলো। এখন আমার প্রশ্ন—গাছের ডাল কেটে এ মনুষ্যের সৃষ্টি করলে কে ?

রাজা বললেন,—পুরুত ! পুরুত যদি প্রাণ না দিত তাহলে পুতুল মানুষ হতো না।

গোলা বললে......হ্যাঁ ঠিক বলেছো এখন আমার তৃতীয় প্রশ্ন...

গোলা বললে আর একটি কাহিনী। গোলা বললে এক জ্যোতিষী, এক বৈদ্য আর এক রাজার ডাকহরকরা—তিনজনে বেরিয়েছে দেশ ভ্রমণে। নানা দেশ ঘুরে এক দেশে তিনজনে এলো। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। তিনজনে বসলো এক নদীর ঘাটে।

জ্যোতিষী গুণে বললে—এ রাজ্যের রাজপুত্র খুব অসুস্থ—কোনো বৈদ্য সামাল দিতে পারছেন না—রাজপুত্রের প্রাণ যায় যায়।

বৈদ্য বললেন,—আমি দিতে পারি ওষুধ......যাতে রাজপুত্র সারবেন। বৈদ্য তখনি ওষুধ তৈরী করলেন। ডাকহরকরা বললে—আমি ছুটে গিয়ে এ ওষুধ দিয়ে আসবো।

তাই হলো বৈদ্যের ওষুধে রাজপুত্র সেরে উঠলেন। এখন আমার প্রশ্ন—কার জন্যে রাজপুত্র প্রাণ পেলেন ?

রাজা বল্লেন, বৈদ্যর গুণে।

গোলা বললে—ঠিক বলেছো।

যেমনি তিনটি প্রশ্নের জবাব শেষ হওয়া—গোলা পালঙ্ক থেকে নেমে কৌটোর মধ্যে ঢুকলো। কন্যা প্রাণ পেয়ে পালঙ্কে বসলেন।

কন্যা বললেন—আপনি আমায় বাঁচিয়ে তুলেছেন ? কি চান ?

রাজা বললেন—আমার মন্ত্রীকে বাঁচিয়ে দাও। কন্যা তখন মন্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিলেন। তারপর ?

তারপর রাজা কন্যাকে বিয়ে করে ফিরলেন রাজ্যে।

—

॥ এক ॥

চিতোরের মহারাণা উদয় সিংহ বন্দী ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের কারাগারে। সে সময়ে চিতোরে ছিলেন এক বীরাঙ্গনা নারী. নাম তার বীরা। বীরা ছিলেন রাণা উদয় সিংহের প্রেমাস্পদা। এই বীর নারী ছিলেন বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী—তিনি মেবারের সর্দারগণকে উত্তেজিত করিলেন এবং বলিলেন—এ কি চিতোরের রাণা রইবেন মুসলমানের কারাগারে বন্দী ? অসম্ভব ! বীরার বীরত্বপূর্ণ বাক্যে উৎসাহিত হইল সর্দারগণ—বীরা আপনার সৈন্যদলসহ সর্দারগণের সাহায্য লইয়া আক্রমণ করিলেন গভীর নিশীথে অতর্কিতভাবে সম্রাটের শিবির। 'হর হর বম্ বম্' রবে নিশীথ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া আক্রমণ করিলেন মোগল শিবির। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে হার মানিল বাদশা, হটিয়া গেল মোগল সেনানী. পড়িয়া রহিল তাহাদের শিবির-পরিত্যক্ত রণসম্ভার সব! বীরা উদ্ধার করিলেন সম্রাটকে। রাজপুত নারী ও সর্দারগণের দ্বারা বাদশাহ আকবর হইলেন পরাজিত, উদয় সিংহ মুক্ত হইলেন কারাগার হইতে !......সেই দিন হইতে আকবর এই অপমান ও পরাজয়ের কথা ভুলিতে পারেন নাই; তাঁর পণ হইল—যেমন করিয়া পারেন, চিতোর নগরী করিবেন ধ্বংস ! করিবেন লাঞ্ছিত, উড়াইবেন মোগল বিজয় কেতন্।

—তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে !

প্রতিশোধপরায়ণ বাদশাহ আকবর আসিয়া দিলেন হানা। ঘিরিয়া ফেলিলেন অগণিত সৈন্য দ্বারা মিবারের পর্বত-কানন-প্রান্তর। ঘিরিয়া ফেলিলেন চিতোরের দুর্গপ্রাকার। পল্লীতে পল্লীতে জাগিয়া উঠিল 'আল্লাহো আকবর ধ্বনি'। উড়িল অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা। মোগলেরা দিল চিতোরের তোরণে হানা !

॥ দুই ॥

চিতোরের যখন জীবন-মরণ সমস্যা। সেসময়ে রাণা উদয় সিংহ আপনার জীবন রক্ষার জন্য আরাবলীর কোন গুহার বুকে লুকাইয়া রহিয়াছেন! এই ভয়ে পাছে আবার বন্দী হন মোগল কারাগারে। উদয় সিংহ সিংহের তনয় হইয়া কাপুরুষের মত করিলেন পলায়ন। রাজা করে পলায়ন, রাজ্য দেখে কে ! কে রক্ষা করে চিতোরের রাণীদের ? কে করে নগরবাসীদের জীবন রক্ষা। বাপ্পারাওর পবিত্র বংশগৌরব কি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে ? চিতোর ত বীর শূন্য হয় নাই ! চিতোরের এই দুর্দিনে—চিতোরের গৌরব রক্ষার জন্য আসিলেন শহীদাস. চন্দাবৎ বংশের বীর সেনাদের সহ, আসিলেন দেশ-বিদেশের সামন্ত রাজারা—আসিল দেবলপতি, আসিল রাঠোর, আসিল অন্যান্য দেশের সব রাজারা.—তাঁহারা পণ করিলেন. "দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে কখনো চিতোরের স্বাধীনতা মোগলের হাতে তুলে দিব না।" মৃত্যু বরণ করিতে সকলে করিল পণ!—'হর্ হর্ বম্ বম্, জয় দেব একলিঙ্গ মহাদেব' রবে ধ্বনিত হইল নগর প্রান্তর!!

—গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম গর্জিয়া উঠিল মোগলের কামান। [illegible] পর্যন্ত। একদিকে দুই লক্ষ মুসলমান সে[না] অন্য দিকে মুষ্টিমেয় রাজপুত সেনানী। শহীদাস হইলেন রাজপুত সৈন্যের সেনাপতি। একদিকে মুসলমান সেনায় কামান বর্ষণ, অন্যদিকে রাজপুত সেনাদের শন্ শন্ শন্ ঘন ঘন তীর বর্ষণ। মোগলেরা প্রমাদ গণিল। তাহাদের কামান বর্ষণ চলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে 'সূর্যতোরণ' লক্ষ্য করিয়া, সেই তোরণ দ্বারে মুক্ত কৃপাণ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন ভীমকান্তি বীরবর শহীদাস, যুদ্ধ চলিতেছে দুইপক্ষে —এমন সময় একটি রক্তিম বরণের গোলা ছুটিয়া আসিয়া লাগিল শহীদাসের বক্ষে,—অস্তমিত রবির দিকে চাহিয়া মিবারের রক্ষার জন্য মহাপ্রাণ শহীদাস চলিয়া গেলেন অমরধামে। রাজপুতদের সকলের মুখে পড়িল করাল ছায়া ! সকলে সূর্যতোরণের বিরাট দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন নিজ নিজ শিবিরে !

ঘনতমসাচ্ছন্ন শিবির ! রজনী তিমির অবগুণ্ঠনে সব ঢাকিয়া ফেলিল।......

॥ তিন ॥

এ বিপদ সময়ে, আসন্ন সমরে কে হইবে সেনাপতি ? কে রক্ষা করিবে দেশ, মানসম্ভ্রম চিতোরের ?

এমন সময় বেজনোরের সামন্ত রাজ জয়মল্ল ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—শোন বন্ধুগণ—"স্বীকার করি উদয় সিংহ চলে গেছেন ভীরু কাপুরুষের মত, হয়েছি আমরা অপমানিত, কিন্তু আমাদের মিবার, আমাদের চিতোর, আমাদের পুণ্যবতী রাজপুত মহিলারা ত কোন অপরাধ করেন নাই। শুনেছেন ত আপনারা দুর্গের বাইরে মোগলের বিজয়োল্লাস, গুরু গুরু গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানের ধ্বনি। এই বিপদে আমাদের দেশ ও জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি চাই কৈলবারের অধিপতি ষোড়শ বর্ষীয় বীর যুবক পুত্তকে সেনাপতি পদে বরণ করতে? তাঁকে পরিয়ে দিই অভিষেক মাল্য!"

রাজপুতেরা সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"জয় পুত্ত বীরের জয়।" "পুত্ত আমরা তোমাকে করলাম এই জীবনমরণ সমরে আমাদের সেনাপতি! বৎস! তুমি হও আমাদের সহায়!" বলিলেন জয়মল্ল।

শুনেছি সম্রাট আকবরের দুই লক্ষ সেনা ! আর আমাদের মাত্র তিশ হাজার !! জানি না কি হবে এই যুদ্ধের পরিণাম !!

—এমন সময়ে রাজপুরোহিত আসিলে রণরঙ্গিণী দেবী চতুর্ভুজার চরণামৃত লইয়া, পান করাইলেন পুত্তকে। পরাইলেন কণ্ঠে চন্দনচর্চিত পুষ্প মাল্য, ললাটে পরালেন রাজতিলক। মন্দিরে দেবীর সম্মুখে হইল অভিষেক! বাজিল তুরি, ভেরী, দামামা, দগড়—রণবাদ্য। বাজিল রাজপুত নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে শঙ্খ রব। নূতন প্রাণ পাইল নগরবাসী।

ত্রিশ হাজার সৈন্যের মিলিত কণ্ঠে শুনিল সংগে জয় চিতোরের জয়, জয় সেনাপতি পুত্তের জয়। হর-হর-বম-বম! হর-হর-বম-বম।

॥ চার ॥

প্রবেশ করিলেন চিতোর দুর্গে পুত্তবীর।

তাঁহার জননী আসিয়া বলিলেন, শোন পুত্র, তোমাকে মানতে হবে আমার একটি আদেশ।

কি আদেশ মা জননী।

এই যুদ্ধে তোমার পত্নী, আমার পুত্রবধূ কৃষ্ণাকে করতে হবে তোমার সমরসঙ্গিনী।

পুত্ত বিনীতভাবে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—তাই হবে মা! তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য।

মাতা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,— জয় হউক তোমার। চলিয়া গেলেন মাতা—বলিলেন, আমি যাব এই যুদ্ধে আমাদের সব রাজপুত নারীদের সহ।

চিন্তিত মনে প্রবেশ করিলেন পত্ত শয়ন কক্ষে।

দেখিলেন তাঁহার বালিকা বধূ রণবেশে সজ্জিতা! কোথায় তাহার কনক বসন-ভূষণ, এ যে করালরূপিণী বীর নারী। দেবী জগদ্ধাত্রী। হাতে তার তীর-ধনু! কুঞ্চিত কুন্তল শোভা পাইতেছে স্কন্ধে।

প্রণাম করিল বালিকা কৃষ্ণা স্বামীকে। পত্ত প্রণয় বিগলিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দেবী তুমি, চিতোরের স্বাধীনতার প্রতীক তুমি, এস যুদ্ধে আমার সঙ্গে—চল বিজয় গৌরবে, দানবদলনী, বিদ্যুৎরূপিণী চন্ডীরূপে......

চিতোর জাগিয়াছে। নগরীতে কাহারো চোখে ঘুম নাই। নারীরা পতি-পুত্রকে যুদ্ধের জন্য প্রাণে জাগাইতেছেন প্রেরণা! চারণেরা দলে দলে পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা বীরগাথা গাহিয়া করিতেছে সকলকে উত্তেজিত। যাও যাও যাও বীরগণ চল সমরে। সকলে রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া বীরদর্পে আসিয়া দাঁড়াইল সূর্য তোরণ দ্বারে! বাজিল রণ-ভেরী! বাজিল দামামা! বাজিল শত শত শঙ্খ!

সূর্য কিরণোজ্জ্বল দীপ্ত প্রভাতে আরম্ভ হইল রণ! দুইদিকে দুই সমর সমুদ্র। তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত বিক্ষুব্ধ। ঘনঘোর গর্জন। অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি! সকলের আগে চলিলেন বীর সেনাপতি পত্ত।

পত্তের জননীর সঙ্গে চলিয়াছিলেন রাজপুত নারীরা। অব্যর্থ তীর সন্ধানে তাহারা বহু মুসলমান সেনার প্রাণনাশ করিতেছিল।

আকবর রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন ইঁহাদের বীরত্ব! স্তম্ভিত হইতেছিলেন এইরূপ অসীম সাহসিকতায়।

পত্তের জননী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন—ঐ দেখ পত্ত তোমার সম্মুখে ঐ যে তোমার পিতৃঘাতী সম্রাট আকবর। লক্ষ্য করিলেন পত্ত। দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন আকবর শাহকে আক্রমণ করিতে! রাজপুত সেনারা দলে দলে আসিল, তাঁহাকে সাহায্য করিতে। আবার ওদিকে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহিত আকবরকে রক্ষা করিবার জন্য লৌহ প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল মোগল সৈন্যরা। বলিল—সম্রাট শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন, নতুবা আমরা আপনার প্রাণ রক্ষা করতে পারব না।

বাদশাহ সেনাপতির কথা শুনিলেন।

অপর দিকে ঐ সময় বীরবর জয়মল্ল তাঁহার সৈন্য দল লইয়া দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া তীরের পর তীর নিক্ষেপ করিয়া মোগল সৈন্যদের প্রাণনাশ করিতেছিলেন। ঘন ঘন মোগল কামান দাগিতে-ছিল। দুর্গপ্রকার ভীষণ শব্দে ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে সময়ে রাজপুতদের না ছিল বন্দুক, না ছিল কামান। কতক্ষণ চলিতে পারে আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। তবু তবু জয়মল্লের আদেশে তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহারা মোগলদের আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। নিজে জয়মল্ল অশ্বপৃষ্ঠে কৃপাণ হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন দুর্গ রক্ষা করিতে এমন সময় এক অসতর্ক মুহূর্তে আকবর নিজে জয়মল্লকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। জয়মল্ল অশ্ব পৃষ্ঠে হইতে ধরাতলে পড়িলেন।

ধ্বনিয়া উঠিল বীরগর্বে মোগলের কামান গুড়ুম গুড়ুম রবে।

পত্ত দেখিলেন জয়মল্লের মৃত্যু। রাজপুত সেনাগণের প্রাণ-হানি। শুনিলেন আকবরের বিজয়োল্লাস! দেখিলেন রাজপুত বীরগণ "বীরা" ধারণ করিয়াছেন—শেষ বিদায়কালে রাজপুতেরা বীরা বা তাম্বুল গ্রহণ করেন।

কুরুক্ষেত্রে যেমন মহাবীর অভিমন্যুকে সপ্তরথী আসিয়া বেষ্টন করিয়াছিল, তেমনিভাবে শত শত মুসলমান সেনা পত্তকে ঘিরিয়া ধরিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শক্তি ছিল, অস্ত্র ধরিবার মত হস্ত ছিল দৃঢ় ততক্ষণ পর্যন্ত অসির আঘাতে মুসলমান সেনার প্রাণনাশ করিয়া অবশেষে একটি গোলার আঘাতে পড়িয়া গেলেন মৃত সৈন্যদের স্তূপের উপরে। তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী বাদশাহী সেনারা মহোল্লাসে আল্লাহো আকবর রবে করিল চারিদিক মুখরিত। পূর্ণ হইল আকবর শাহের বিজয় উন্মাদনা! চিতোর ধ্বংস হইল। শত শত রাজপুত নারী করিল জহরব্রত। এই ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল সংবৎ ১৬২৪, রবিবার, ১১ই চৈত্র, খৃঃ ১৫৬৮।

শেষ কথা।—আকবর স্বীয় রাজধানীতে বীরবর জয়মল্ল ও কিশোর বীর পত্তের বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপে কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এক অতি উচ্চ প্রস্তর বেদী প্রাসাদের সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মহা সমরে পত্তের জননী-সহধর্মিণী কৃষ্ণা আপন আপন প্রাণ বিসর্জন করেন।

রাজস্থানের ঘরে ঘরে পত্ত ও জয়মল্লের বীরত্বগাথা প্রচলিত। এখনও তাই কবিগণ তাহাদের বীরত্বগাথা গায়। রাজপুত নারীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেবতাদের ন্যায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহাদের করেন প্রণতি।

তখনকার কালে তপস্যা করে শক্তি সংগ্রহ করাই ছিল দৈত্য-দানবদের কাজ। তপস্যা করে শক্তি সংগ্রহ কর, শক্তি সংগ্রহ করে যাও স্বর্গে। স্বর্গে গিয়ে দাও দেবতাদের তাড়িয়ে। তা না হয় তো, ঋষি-মুনিদের উত্যক্ত করো, তাদের যাগযজ্ঞ নষ্ট করে দাও, তাদের উপর যত পারো অত্যাচার কর। দৈত্যদানবের মাথায় এই সবই আসতো, তপস্যার বলে শক্তি সংগ্রহ করে।

মধুকৈটভ রাক্ষসের ছেলে ধুন্ধু। মধুকৈটভ যুদ্ধ করেছিল বিষ্ণুদেবের সঙ্গে। যুদ্ধ করে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তার ছেলে ধুন্ধু করলে ভয়ানক তপস্যা। তপস্যা করে খোদ্ ব্রহ্মার কাছ হতে বর নিলে। বর নিয়ে দেব-দৈত্য-রাক্ষস ইত্যাদির অবধ্য হল। আর আস্তানা গাড়লো, উতঙ্ক মুনির আশ্রমের কাছে মরুপ্রদেশে—উজ্জালক নামে এক বালুকাপূর্ণ বিশাল স্থানের মধ্যিখানে। ধুন্ধু সেই বালুসমুদ্রের মাঝখানে শুধু ঘুমিয়েই কাটায়। ঘুমন্ত অবস্থায় সে নিশ্বাস ছাড়লে, খুব জোরে ভূমিকম্প হয়, অগ্নিশিখা ওঠে, ভয়ঙ্কর ধোঁয়া আর ধুলো ওড়ে। এমন ওড়ে যে, আকাশের সূর্যকেও ঢেকে দেয়। তারপর ঘুম থেকে উঠে, নানারকমের উপদ্রব করে মহর্ষি উতঙ্কের
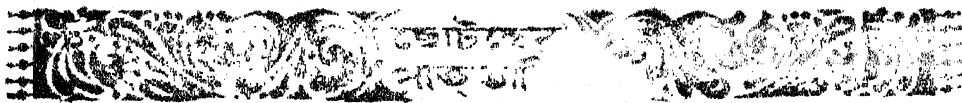
আশ্রমে গিয়ে। সে লুকিয়ে থাকে বালুসমুদ্রের মধ্যে—তাকে দেখতে পায় না কেউ-ই।

মহর্ষি উতঙ্ক একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে অযোধ্যার রাজা বৃহদশ্বের নিকটে গিয়ে বললেন এই ধুন্ধু রাক্ষসকে বিনাশ করবার জন্য। বৃহদশ্ব তাঁর পুত্র কুবলাশ্বের উপর এ কাজের ভার দিলেন। মহর্ষি উতঙ্ক ছিলেন মহা তপস্বী। তাঁর তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব বিষ্ণু, কুবলাশ্বের শরীরে প্রবেশ করলেন ধুন্ধুকে মারবার জন্যে। দেবতাদের মেজাজের ঠিক পাওয়া ভার। এক দেবতা খুসি হয়ে, না ভেবে চিন্তে একজনকে দিয়ে ফেললেন এক মহা বর। বর পেয়ে সে সুরু করলে নানা অপকীর্তি, অত্যাচার। তখন সামলায় কে তাকে?

অমনি আর এক দেবতা এই অত্যাচারীকে বধ করবার জন্যে আর একজনকে বর দিয়ে দিলেন।

এ ক্ষেত্রেও হল তাই। ব্রহ্মা দিলেন বর রাক্ষস ধুন্ধুকে। সে হয়ে উঠলো মহা অত্যাচারী। তখন তাকে মারবার জন্যে বিষ্ণু দিলেন আর এক বর মহর্ষি উতঙ্ককে। বললেন,—যুদ্ধের সময় কুবলাশ্বের দেহে তিনি শক্তি সঞ্চার করবেন।

কুবলাশ্বের ছিল একুশ হাজার পুত্র। তিনি এই একুশ হাজার পুত্র আর অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চললেন ধুন্ধুকে বধ করতে। এরা সবাই গিয়ে বালুকা-সমুদ্র খনন করতে লাগলো। কিন্তু ধুন্ধু রাক্ষসকে পাবে কোথায়? সে তখন বালির মধ্যে এক গোপন জায়গায় সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। এরা গিয়ে পৌঁছুতে, হট্টগোলে সে জেগে উঠলো, আর তার নিজের মুখ দিয়ে আগুন বৃষ্টি করে-করে, কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্রকে পুড়িয়ে মারলে। কুবলাশ্ব হতবাক্। সে নিরুপায় হয়ে বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করলে। বিষ্ণু তখন তার উপর সদয় হলেন, আর নিজের শক্তি দিলেন কুবলাশ্বকে। বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কুবলাশ্ব আবার মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলো, আর ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে ধুন্ধু রাক্ষসের মাথা কেটে ফেললে। এত ফন্দি করে এই মহাশত্রুর নিপাত হল। আর সেই থেকে কুবলাশ্বের নাম হল—"ধুন্ধুমার"।

এ সেই রামায়ণে পড়া চিত্রকূট পর্বত। যেখানে বনবাস যাবার পথে রামচন্দ্রের সঙ্গে ভরতের মিলন হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই চিত্রকূটে বেড়িয়ে আসবার লোভ ছিল। কিন্তু যাবার সুযোগ ঘটেনি। সেবার পুজোর ছুটিতে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকেও সঙ্গে নিলুম। বোম্বাই মেলে মাণিকপুর জংসনে এসে গাড়ী বদল করতে হল। টাইমটেবিল দেখে আগে থেকে সব ঠিক করে নিয়েছিলুম।

মাণিকপুরে এসে যখন নামলুম তখন বেলা বারোটা। চিত্রকূটে যাবার গাড়ী আসবে রাত্রে। আমরা ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমেই দিন যাপনের ব্যবস্থা করে ফেললুম। সঙ্গে পথের প্রয়োজনীয় সব কিছুই ছিল। কাজেই কোনও অসুবিধে হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে একটু বিশ্রাম করে নিলুম। বিকেলে একখানা টংগা নিয়ে একটু বেড়িয়ে এলুম।

ছবির মতো গ্রাম এই মাণিকপুর। একাধিক প্রাচীন মন্দির আছে এখানে। অল্প কিছু দূর ঘুরে দেখে ষ্টেশনে ফিরে এলুম। ট্রেণ লেট ছিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটায় এখান থেকে চিত্রকূটের গাড়ী ধরা হল। রাত্রি তিনটে নাগাদ 'কারউই' বলে একটি ষ্টেশনে এসে নামলুম। এখান থেকেই চিত্রকূট যেতে হয়। বাকী রাতটুকু আমরা কারউই ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমেই লম্বা সেণ্টার-টেবিলের উপর বিছানা বিছিয়ে ঘুমিয়ে নিলুম। কাল ভোরে উঠেই চিত্রকূট যাবো।

কারউই ষ্টেশন থেকে চিত্রকূট অল্প কয়েক মাইল মাত্র। ট্রেণ ও বাস সার্ভিস দুইই আছে। কিন্তু আমরা সকালে উঠে চা খেতে খেতে ঠিক করে ফেললুম ট্রেণে বা বাসে না গিয়ে একখানা টংগা নিয়ে যাবো। সারাটা পথ তাহলে বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া হবে। বিছানা-পত্র বেঁধেছেঁদে স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে টংগায় উঠলুম। যাত্রা হল সুরু।

তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। নবমী রাতের জ্যোৎস্নার ফিকে আলোয় পাহাড় প্রান্তর অরণ্য জলাশয় প্রভৃতি যেন স্বপ্নে দেখা ছবির মতো মনে হচ্ছে। ঝির ঝির করে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। বনফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আশেপাশের গাছের ডাল থেকে দু-একটা আধো-ঘুমে ভাঙা পাখী বাসায় বসেই কূজন শুরু করেছে। রাত্রি শেষের ম্লান জ্যোৎস্নাকে তারা বোধ হয় ঊষার আলো ভেবেছিল।

টংগা আমাদের কিছুদূরে এসেই থেমে গেল। নদী পার হতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, এটা কি নদী? টংগাওয়ালা বললে 'পৈসুনী' হুজুর! পরে জেনেছিলুম এই 'পৈসুনী'ই হল পুণ্যসলিলা পয়স্বিনী! আমরা খেয়া নৌকায় নদী পার হলুম। টংগাওয়ালা ঘোড়ার মুখ ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে নদীর জল যেখানে অগভীর সেই অংশ দিয়ে পারে এসে উঠলো। আমরা আবার তাতে চড়লুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চিত্রকূট পর্বতের সানুদেশস্থ সীতাপুর গ্রামে এলুম।

জনকনন্দিনী সীতার নাম ও স্মৃতিবিজড়িত এই সীতাপুর গ্রাম ভারতবাসীর কাছে পুণ্যস্থান। সীতাপুরে শুনলুম বছরে দুবার দুটি মেলা বসে। একটি 'দেওয়ালীর মেলা।' আর একটি হল 'রামনবমীর মেলা।' এই সীতাপুরের পূর্বপ্রান্তে চিত্রকূট পর্বত। আমরা যখন এসেছিলুম তখন এখানে একমাত্র বাঙালী পরিবার শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করতেন। চিত্রকূটে এঁরা একটি সেবাশ্রম করেছিলেন। দরিদ্র রোগী আর অসহায় অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করাই ছিল এই ব্রাহ্মণ পরিবারের পুণ্যব্রত।

এঁদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যখন আমাদের টংগা যাচ্ছিল ফণীবাবু দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে 'রোকো রোকো' বলে গাড়ী থামালেন। আমরা বাঙালী এবং চিত্রকূট দেখতে এসেছি শুনে বললেন, এখনি নেমে আসুন। টংগা ছেড়ে দিন। ধর্মশালায় গিয়ে উঠতে হবে না। আমার এ বাড়ী আপনাদেরই বাড়ী। ফণীবাবুর স্ত্রী নলিনী দেবী বেরিয়ে এসে আমার স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। আমিও টংগাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাঁদের অনুসরণ করলুম।

ফণীবাবু, ফণীবাবুর স্ত্রী, তাঁদের দুটি ছেলে শচীন্দ্র আর রবীন্দ্র এবং দুটি মেয়ে শেফালী ও মালবিকা—মনে হল আমাদের কত আপনার। যেন আত্মীয়ের বাড়ী এসে উঠেছি। তাঁদের আদর যত্ন আর সেবার গুণে আমরা সেখানে পরম আরামে প্রায় দশদিন তাঁদের উদার আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হয়ে বাস করে এসেছি। শ্রীমান শচীন ও রবীন আমাদের নিয়ে চিত্রকূটের যেখানে যা দ্রষ্টব্য ছিল একে একে

সমস্ত দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। ওদের না পেলে চিত্রকূটে আসা আমাদের ব্যর্থ হত।

চিত্রকূটের সংকীর্ণ পার্বত্য পথে ডুলী, ঘোড়া আর গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোনও যানবাহনে যাওয়া অসম্ভব। আমরা ঘোড়ায় চড়েই সব দেখে আসতুম। ও'রা অবশ্য আমার স্ত্রীর জন্য ডুলী ঠিক করেছিলেন কিন্তু সে এত ছোট আর অপরিসর যে তার মধ্যে মুখ গু'জে যাওয়া ভীষণ কষ্টকর। আমার স্ত্রী কুচবিহারের ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই হাতী ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল। তিনি তাই ডুলীর বদলে ঘোড়াই নিয়েছিলেন।

চিত্রকূট মধ্যপ্রদেশের বান্দা জেলায় অবস্থিত। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দী বলে। কিছু কিছু উর্দু ফার্সি বলিয়েও আছেন। চিত্রকূটের কামাদ পর্বতকে শ্রীরামচন্দ্র নাকি কামাদ শিবরূপে পূজো করেছিলেন। শিবরূপে পূজিত হওয়ায় কোনও মানুষের এ পাহাড়ে ওঠা নিষেধ। শিবের গায়ে পা ঠেকাবে কে? কামাদ শিবের শুধু মুখখানি দেখা যায়। হাত-পা কিছু নেই। তাই এই বিগ্রহের নাম হয়েছে 'মুখারবিন্দ!' স্থানীয় লোকেরা এই শিবকে বলে 'কামদা-নাথ!' এই পাহাড়টির চারিদিক বেষ্টন করে প্রায় ৩৬০টি ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় দেবমন্দির আছে। যদি রোজ একটি করে মন্দিরে পূজো দিতে যাও, তাহলে সবকটি মন্দির প্রদক্ষিণ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যাবে।

চিত্রকূট হিন্দুদের একটি অতি প্রাচীন তীর্থ। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন ভরা এ স্থানটি। প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যে চিত্রকূট মনোহর। প্রাচীন হিন্দু ও মোসলেম যুগের সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বহু স্থাপত্যশিল্পের ভগ্নাবশেষ এ স্থানটিকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। চিত্রকূটে এসে মনে হয় ঠিক যেন ছোটখাটো একটি বারাণসীধাম! তবে কাশীর মতো শহর ঠিক নয়। আবার, কাশীর কোল ঘেঁষেও এমন চিত্রকূট পর্বত নেই।

ফণীবাবুর পরামর্শে আমরা কোনও পান্ডার পাল্লায় পড়িনি। শচীন ও রবীন আমাদের গাইড হয়ে চিত্রকূটের আশেপাশে যেখানে যা আছে দেখিয়ে আনছিল। প্রথম দিনই আমরা মন্দাকিনী ঘাটে গঙ্গাস্নান করে 'মহাবীর স্থান' অর্থাৎ হনুমানের মন্দির, ভক্তকবি তুলসীদাসের আশ্রম—যাঁর হিন্দী রামায়ণ 'রামচরিত মানস' সারা ভারতে প্রচারিত, রাম-সীতার পর্ণকুটির দেখলুম। ঋষিদের যজ্ঞবেদী, মহাদেব দেউল দেখে লংকাপুরী দর্শনে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে অক্ষয়বট, শ্রীধর রাজধরের মন্দির দেখে, কামদাবাজার ঘুরে, রামচবুতারা আর রেওয়ারাজের সদাব্রত হয়ে 'মুখারবিন্দ' দর্শন করে গেলুম আবার—জানকী চরণপদ্ম, নৃসিংহগুহা, ব্রহ্মকুণ্ড, বিরজা-কুণ্ড, কপিলা গাই, চরণপাদুকা, লক্ষ্মণ পাহাড়, রামঝরোকা দেখতে। প্রথম দিনের উৎসাহ একটু বেশি কিনা। একদিনে সব দেখে নেব এমনি একটা ভাব। কিন্তু, চিত্রকূটে দেখা গেল দর্শনীয় স্থানের অন্ত নেই। 'চরণ পাদুকা' হল সেই জায়গা যেখান থেকে ভরত এসে শ্রীরাম-চন্দ্রের 'চরণ-পাদুকা' মাথায় করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পরের দিন আমরা একটু সকাল করে বেরিয়ে পড়লুম। মন্দাকিনীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে নৌকা নিয়ে ওপারে নওগাঁয় নেমে 'কোটীতীর্থ' দর্শনে গেলুম। কোটীতীর্থ চিত্রকূটের পূর্বদিকে মাইল চারেক দূরে। তিনশো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ে উঠতে হয়। স্থানটি ভারী মনোরম। পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে নিচে সমতলভূমির দৃশ্য আর মন্দাকিনী প্রবাহের ধারা মিলে চিত্রকূটকে দিগন্তের পটভূমিতে ঠিক একখানি চিত্রের মতই দেখায়! এই পাহাড়ের উপরেই মাইল খানেক দূরে 'দেবাঙ্গনা'। আবার একটি দেবস্থানও রয়েছে আর এক পাশে। এখানে নাকি দেবতারাও মাঝে মাঝে স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসেন। আর একটু দূরে 'সীতারসুই' অর্থাৎ এখানে মা জানকী রান্না করতেন। 'হনুমানধারা' বলে একটি জলপ্রপাত রয়েছে দেবস্থানের পাশে। এখান থেকে চারশো ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ী ফেরা হল।

তৃতীয় দিনে বেরিয়ে আমরা মন্দাকিনী আর অন্তঃসলিলা সরযূ নদীর সঙ্গম ঘাট 'রাঘব-প্রয়াগে' স্নান করে 'রামধাম', 'কেশব গড়', 'প্রমোদ বন', 'জানকীকুন্ড', 'স্ফটিকশিলা' ও 'শিরীষবন' দেখে অনসূয়া তীর্থে এলুম। জানকীকুন্ডে সীতাদেবী প্রতিদিন স্নান করতেন। এই কুন্ডের ধারে ধারে রাম-সীতার পদচিহ্ন পাথরে পাথরে মুদ্রিত রয়েছে। হয়ত সেদিন এ পাথর ছিল নদীর পলিমাটির মতই নরম। যুগ-যুগান্তের দীর্ঘ ব্যবধানে সে মাটি জমে আজ পাথর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেদিনের কাদামাটির উপর রাম-সীতার পায়ের যে ছাপ পড়েছিল তা আজও মিলিয়ে যায়নি। বরং চিরস্থায়ী হয়েই রয়েছে।

'স্ফটিকশিলা' হল মন্দাকিনী তীরে গভীর অরণ্য ঘেরা একটি নির্জন পাহাড়। এই পাহাড়ের কোলে নদীগর্ভে একটি প্রকান্ড শিলা-বেদী। এই বেদীর উপর রাম-সীতা নাকি প্রায়ই বিশ্রাম করতেন। এখান থেকে অনসূয়াতীর্থ প্রায় দশ মাইল দূরে। এইখানেই মন্দাকিনীর উৎপত্তিস্থলে মহামুনি অত্রির আশ্রম। ভরদ্বাজ ঋষির পরামর্শে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁদের বনগমন পথে এই অত্রি মুনির আশ্রমে এসেই বিশ্রাম করেছিলেন। অত্রি মুনির সাধ্বী পত্নী অনসূয়া দেবীই নাকি এদেশে প্রথম হিন্দু নারীর আয়তির চিহ্ন যে সিঁথির সিঁদুর তার প্রচলন করেছিলেন। সীতাদেবীর সীমন্তেও এই ঋষি-পত্নীই সেদিন সর্বাগ্রে সিঁদুর চর্চিত করে দিয়েছিলেন। অত্রি মুনির আশ্রম আর অনসূয়া তীর্থ রামায়ণে বর্ণিত ঋষিদের তপোবনের মতই শান্ত গম্ভীর ও পবিত্র। পিছনে সব মেঘছোঁয়া পাহাড় চূড়ো সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহাগহ্বর। শুনলুম আজও অনেক সাধু সন্ন্যাসী ওই নির্জন গিরিগুহায় তপস্যা করতে আসেন।

চতুর্থ দিনে যাওয়া হল গুপ্ত গোদাবরী দেখতে। এটি অনসূয়া তীর্থ থেকে আট মাইল দূরে। পথ এত ভাল নয়। পাথরপাল ও দেবগ্রাম পেরিয়ে মোরধ্বজ পর্বত পার হয়ে চৌবেপুর জনপদের ভিতর দিয়ে আরও দু-মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসে গুপ্ত গোদাবরীতে পৌঁছানো গেল। এখানে পাহাড়ের তলায় প্রকান্ড এক গুহার মধ্যে উঁকি মেরে "গুপ্ত গোদাবরী" দর্শন করতে হয়। কিন্তু সঙ্গে একটি বেশ জোর টর্চলাইট না থাকলে গুহার মধ্যে কেবল নিবিড় ঘন অন্ধকার দেখেই ফিরে আসতে হবে। এখান থেকে আরও দু-মাইল এগিয়ে কৈলাসতীর্থে এসে পড়লুম। এখানে বিশ্রাম ও আহারাদির বেশ সুব্যবস্থা আছে। আমরা রোজই আমাদের খাবার সঙ্গে নিয়েই বেরুতুম। সুবিধামতো ও মনের মতো পছন্দসই জায়গা পেলে সেখানে বসেই খাওয়া, গল্প ও বিশ্রাম সবই একসঙ্গে চলতো।

পঞ্চমদিনে আমরা গেলুম চিত্রকূটের উত্তরদিকে আড়াই মাইল দূরে "ভরত কূপ" দেখতে। সেখানেই স্নান করে ভরত মন্দির দর্শন করে এলুম পাঁচ মাইল আরও পূর্ব দিকে "রামশয্যা" দেখতে। এখানে নাকি বনগমনক্লান্ত রামচন্দ্র বিশ্রামার্থে কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন। এখান থেকেই আমরা আজ বাড়ী ফিরলুম। ফিরতে কোনও কষ্ট হল না। সীতাপুর এখান থেকে ছ-মাইল মাত্র। পাহাড়ী ঘোড়ার কাছে এ কিছুই নয়।

চিত্রকূটের আশে পাশে আরও অনেক দ্রষ্টব্য পুণ্য স্থান আছে। যেমন পুষ্কর তীর্থ চিত্রকূট থেকে চৌদ্দ মাইল মাত্র। তের মাইল দূরে মার্কন্ডেয় মুনির আশ্রম। উনিশ মাইল দূরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। চব্বিশ মাইল দূরে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। সূর্যকুন্ড, ব্যাসকুন্ড এবং আরও একাধিক ঋষি মুনির আশ্রম। সবকিছু ঘুরে দেখে আসা
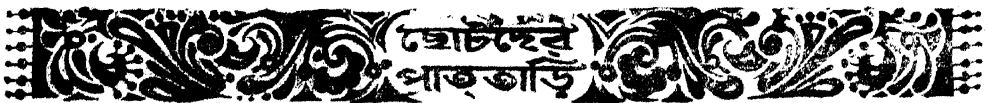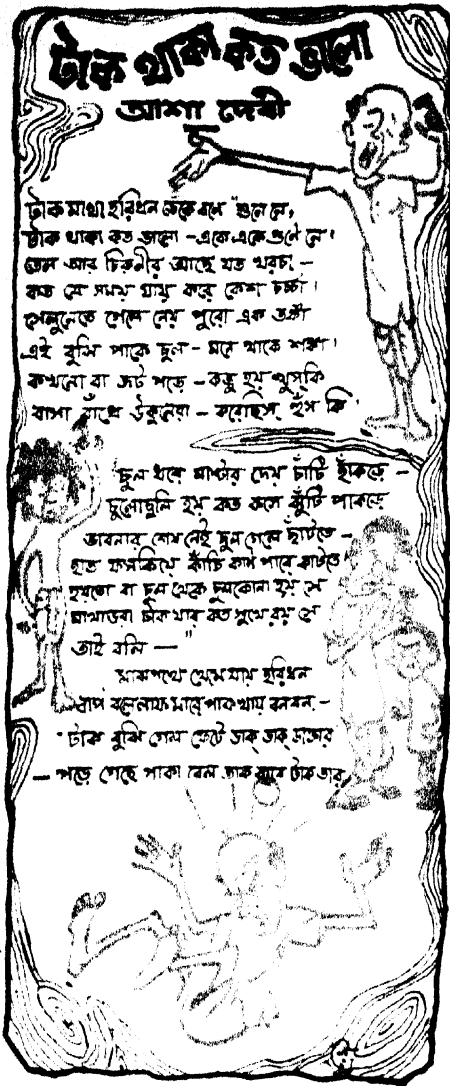
আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। চেষ্টাও করিনি। কারণ, আমরা ঠিক তীর্থযাত্রী হয়ে চিত্রকূটে যাইনি।

ছোট্ট সীতাপুর গ্রামটি আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। লোক-বসতি বড় বেশি নেই। অধিকাংশ সীতাপুরবাসীর উপজীবিকা পান্ডা-গিরি, আর ধর্মশালা আর যাত্রীনিবাস পরিচালনা। দেশ বিদেশের তীর্থযাত্রীর ভিড় এখানে বারোমাস লেগেই আছে। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। কুটীর শিল্পের মধ্যে রকমারি পাথরের জিনিস, কাঠের জিনিস, খেলনা পুতুল, সুপুরির কৌটো, বোতাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বানরের উৎপাত খুবই বেশি। সঙ্গে লাঠি না থাকলে বিপদ। যাই হোক, দশদিন খুব আনন্দে চিত্রকূট বেড়িয়ে সুস্থদেহ ও প্রসন্ন মনে আমরা বাড়ী ফিরে এলুম।

[মধ্যবিত্ত বসু পরিবারের উপবেশন কক্ষ। সকালবেলা। আজ মেজ ছেলে কমলের জন্মদিন উৎসব। কমলকে এই উৎসব উপলক্ষে যথোচিত সাজে সাজানো হইয়াছে। গরদের নতুন পাঞ্জাবী, পরনে কাঁচি ধুতি। গলায় ফুলের মালা। পায়ে লাল চটি। কপালে শ্বেত চন্দন। উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ সকলে শ্রীমানকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন! কমলও গুরুজনদের প্রণাম করিয়া এবং সমবয়স্কদের আলিঙ্গন দিয়া অভিনন্দিত করিল। জন্ম-দিনে শুভেচ্ছাসূচক একটি সঙ্গীত গীত হইবার পর গুরুজনরা চলিয়া গিয়াছেন। আসরে এখন রহিয়াছে শুধু ছেলের দল। এখন তাহাদের সভা বসিবে। কমল সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিল এবং অমল আসিয়া তাহাকে মাল্যভূষিত করিল। অন্যান্য সকলে করতালি দিয়া উঠিল।]

কমল ।। ভ্রাতৃগণ, আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষে যে সম্মান আমাকে আপনারা দেখিয়েছেন প্রকৃতই আমি তার অযোগ্য। কিন্তু তবু আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা শিরোধার্য করে আজ আমি আমার কর্তব্য পালন করব। আমাদের এই বসু পরিবারে ছেলেদের জন্মদিন উপলক্ষে যে নিয়ম বহুদিন থেকে চলে আসছে তা আপনাদের অজানা নয়। কিন্তু আজ ভাগ্যগুণে আমাদের মধ্যে একজন নতুন অতিথি আমরা পেয়েছি, আপনারা জানেন তিনি আমাদের নতুন বৌদির ছোট ভাই শ্রীমনীশ মিত্র। তাঁকেও আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

[করতালি]

মনীশ ।। তোরা একী করছিস মাইরী?

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার।

অমল ।। এই সভায় তুই তোকারী এবং মাইরী, আনপার্লিয়ামেন্টারী।

কমল ।। অবশ্য। কিন্তু উনি নবাগত। আমাদের নিয়মকানুন জানেন না বলেই এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

মনীশ ।। ও বাবা, নিয়মকানুন আবার কিরে! এ কোথায় এলাম রে বাবা!

কমল ।। না না আপনি শুনুন মনীশবাবু, আমাদের এই বসু পরিবারের নিয়ম, যার যেদিন জন্মদিন তিনি সেদিন এ পরিবারের কর্তৃত্ব লাভ করেন। হ্যাঁ, ঐ একটি দিনের সর্বময় কর্তা, একদিনের বাদশা তিনি এই পরিবারের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশে পরি-চালিত হবেন সমগ্র বসু পরিবার। অবশ্য গণতান্ত্রিক রীতিতে এবং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত সংবিধানের ভিত্তিতে।

মনীশ ।। ওরে বাবা, এ সব কি শক্ত শক্ত কথা।

কয়েকজন ।। অর্ডার, অর্ডার।

কয়েকজন ।। শান্তি! শান্তি!

কমল ।। পারিবারিক সংবিধান অনুযায়ী আজ আমি বসু পরিবারের

রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা গ্রহণ করলাম এবং সংবিধানের দশম বিধির 'ক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি আমার মন্ত্রিসভা গঠন করছি। সদস্যগণ নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করুন। শ্রীরঞ্জন বসু—অর্থমন্ত্রী। (হাততালি)। শ্রীঅমল বসু—খাদ্যমন্ত্রী (করতালি)। শ্রীবিমল বসু—স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শ্রীশ্যামল বসু—কৃষ্টি মন্ত্রী (করতালি)। শ্রীঅজিত বসু—পুলিশ মন্ত্রী। [বিপুল করতালি]

মনীশ ।। এই যাঃ আমি একটা চাকরী পেলাম না। মামার জোর নেই বলে বুঝি? (সকলে হাসিয়া উঠিল)।

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। মামার জোর কথাটা আনপার্লিয়ামেণ্টারী অর্থাৎ সভার নীতি বিগর্হিত। ওটা আপনি প্রত্যাহার করুন।

অনেকে ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ উইথড্র, উইথড্র। প্রত্যাহার করুন।

মনীশ ।। যে কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তা আমি ফেরাবো কি করে? কেউ পারে নাকি হে ব্রাদার্স!

খাদ্যমন্ত্রী ।। খুব পারে। সভাসমিতিতে হরদম কথা ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ।। আপনি শুধু বলুন যে আমি কথা ফিরিয়ে নিলাম।

পুলিশ মন্ত্রী ।। আপনি চুপ করে ভাবছেন কি? দেবো এইসান্ গাঁট্টা। সার্জেণ্ট!

সার্জেণ্ট ।। স্যার!

[সার্জেণ্ট চণ্ডীচরণ মিলিটারী কায়দায় পুলিশ মন্ত্রীকে স্যালুট করিয়া মনীশের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মনীশ ।। ওরে বাবা, মারবে নাকি। বেশ বাবা বেশ, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

[পুলিশ মন্ত্রীর ইংগিতে সার্জেণ্ট যথাস্থানে চলিয়া গেল]

মনীশ ।। তা দেখছি সার্জেণ্টের পোষ্টটিও বেশ। ও চাকরীটাও তো আমি পেতে পারতাম।

পুলিশ মন্ত্রী ।। আপনি থামবেন কিনা বলুন।

মনীশ ।। অবিচার হলে বলতে পারবো না? ঐ যে সার্জেণ্ট ওতো ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর আমি পড়ি নাইনে। ও চাকরী পেয়ে গেছে, আমি পাচ্ছি না, এ হলো নিছক স্বজন পোষণ। আজ আমার এখানে কোন ব্যাকিং নেই বলে আমার যোগ্যতারও কোন মূল্য নেই।

পুলিশ মন্ত্রী ।। দেবো এইসান্ গাঁট্টা—

কৃষ্টি মন্ত্রী ।। আচ্ছা আপনি এরকম গোলমাল করছেন কেন মনীশবাবু? এ বাড়ীতে আপনার কোনো মামা নেই সত্যি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনি আমাদের মেজদার শালা। এই সবে শালা হয়েছেন—হবে হবে আপনারও একটা ব্যবস্থা হবে।

মানস ।। অন্ এ পয়েণ্ট অব অর্ডার। কৃষ্টি মন্ত্রীর ঐ শালা কথাটা কি আনপার্লিয়ামেণ্টারী নয়?

অনেকে ।। হ্যাঁ হ্যাঁ উইথড্র, উইথড্র।

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। কৃষ্টি মন্ত্রীর শালা শব্দটি এখানে গালিগালাজরূপে ব্যবহার হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে একটি সুমধুর সম্বন্ধের অভিব্যক্তিরূপে। কাজেই প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠছে না। মনীশবাবু, আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি বেকার সমস্যার সমাধানও আমাদের লক্ষ্য! আপনি ধৈর্য ধরুন। অর্থমন্ত্রী রঞ্জন বসু, এবার আপনি আজকের বাজেট পেশ করুন।

রঞ্জন ।। আয়ের খাতে আজ আমরা গৃহকর্তার নিকট থেকে পেয়েছি আড়াই হাজার। (বিপুল করতালি) আড়াই হাজার নয়া পয়সা।

বিরোধীপক্ষ ।। শেম! শেম! ধিক্—ধিক্!

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। এর অতিরিক্ত টাকা পেতে হলে আপনাদেরই উপর বাড়তি কর চাপাতে হবে। রাজী আছেন আপনারা?

প্রায় সকলেই ।। না—না।

কমল ।। অর্থমন্ত্রী, এইবার আপনার ব্যয়ের দিকটা পেশ করুন।

অর্থমন্ত্রী ।। মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং সদস্যগণ, আয়ের খাতে আমাদের জমা আছে আড়াই হাজার নয়া পয়সা, অর্থাৎ পঁচিশ টাকা। ব্যয়ের খাতে আজকে প্রথমেই খাদ্যের কথা উঠছে। আজকে দুবেলা ভোজের মেনু হয়েছে এইরূপঃ—দুপুরে মাংস ভাত, রাতে লুচি মাংস। শুধু মাংসই আমদানী করতে হচ্ছে বাইরে থেকে। বাকীটা গৃহ ভান্ডারে মজুত আছে। মাংসের দরুণ নির্দিষ্ট হয়েছে এক হাজার নয়া পয়সা।

মনীশ ।। মানে দশ টাকা, মানে বড়ো জোর চার সের মাংস। নস্যি নস্যি।

অনেকে ।। সাধু—সাধু।

খাদ্যমন্ত্রী ।। আঃ কেন চেঁচাচ্ছেন আপনারা? ঘরে প্রচুর আলু আছে। আলু সহযোগে আড়াই সের মাংসই প্রয়োজন হলে আড়াই মণেই দাঁড় করানো যায়, ভুলে যাচ্ছেন কেন?

অর্থমন্ত্রী ।। তা হলে এই দশ টাকার ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হচ্ছে?

মানস ।। আমাদের দাবী আমরা পেটপুরে খেতে চাই।

অনেকে ।। নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমাদের দাবী মানতে হবে।

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। আজকের দিনে আপনারা কেউ উপবাসী থাকবেন না এ আশ্বাস দিচ্ছি। জানবেন এটা আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্র। এজন্যে যদি দরকার হয় আমাদের মন্ত্রী ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

অনেকে ।। ভিক্ষে!

অনেকে ।। শেম, শেম।

অনেকে ।। ধিক্—ধিক্।

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। আপনাদের এ আশ্বাস আমরা দিচ্ছি ভিক্ষেও যদি আমরা নিই আমাদের কল্যাণের জন্যেই তা নিতে হবে এবং সম্মানজনক সর্তেই তা নেবো। অর্থমন্ত্রী আপনি অগ্রসর হোন।

অর্থমন্ত্রী ।। আমরা দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী। প্রথমটি হোলো গিয়ে খাদ্য, তার সুসার ব্যবস্থা আমরা করেছি। দ্বিতীয়টি হলো গিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। কৃষ্টি।

কৃষ্টি মন্ত্রী ।। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা এবার একটি মাত্র ব্যবস্থাই করেছি, আজ সন্ধ্যায় সিনেমা দর্শন। (বিপুল করতালি)

অর্থমন্ত্রী ।। এবং তার জন্য এ বাজেটে ধরা হয়েছে এক হাজার নয়া পয়সা, অর্থাৎ দশ টাকা। (বিপুল করতালি)

কমল ।। দেখতে পাচ্ছি সর্বসম্মতিক্রমে আপনারা সিনেমা দেখার জন্য এই হাজার নয়া পয়সা ব্যয় মঞ্জুর করতে যাচ্ছেন। কিন্তু এতে আমার আপত্তি আছে। এ ব্যয় আমি অনুমোদন করছি না। সিনেমা তো আপনারা প্রায়ই দেখে থাকেন এটা কোনো নতুন আনন্দ নয়, অন্য কোনো নতুন আনন্দের জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করবো আপনারা এই ব্যয়টি নাকচ করুন।

প্রায় সকলেই ।। না না তা হবে না। আমরা সিনেমা দেখবো।

মানস ।। আমাদের দাবী—
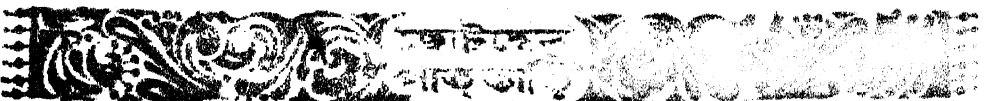
অনেকে ।। মানতে হবে। (তিনবার)

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। সভার অধিকাংশের মতের সঙ্গে যখন আমার মতের অনৈক্য হচ্ছে, তখন রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া আমার উপায়ান্তর নেই। সংবিধানের তিনশধারার 'গ' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমি আমার ভেটো প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের সিনেমা দেখায় গৃহীত প্রস্তাব না মঞ্জুর করছি।

মানস ।। না না এ আমরা মানবো না।

মনীশ ।। কি যে সব ছেলেমানুষী এখানে হচ্ছে।

অনেকে ।। ভারী তো একদিনের বাদশা।

অনেকে ।। না না এ অন্যায় আমরা মানবো না।

কমল ।। না মানলে, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবে। মিলিটারী আনতে হবে।

মানস ।। মিলিটারী! কোথায় মিলিটারী!

কমল ।। মিলিটারী, বাবা স্বয়ং। তাকেই তবে ডেকে আনতে হবে।

অনেকে ।। না, না, থাক।

কেউ কেউ ।। বাবা মশাই আসাই মানে মিলিটারী ডিক্‌টেটরসিপ।

কমল ।। আপনারা কি চান বলুন।

অনেকে ।। গণতন্ত্র।

অনেকে ।। ডাউন উইথ মিলিটারী ডিকটেটরসিপ।

অনেকে ।। গণতন্ত্র জিন্দাবাদ।

অনেকে ।। জংগী আইন বরবাদ।

কমল ।। অর্ডার, অর্ডার। অর্থমন্ত্রী, আপনার বাজেটে এখনো দেড় হাজার নয়া পয়সা খরচের অপেক্ষায় আছে। আমি বলেছি কোনো নতুন আনন্দের জন্য এই টাকা খরচ করা হবে। আসামবাসী বাঙালী ভাইদের আজ দুর্গতির অন্ত নেই। তাই আমি প্রস্তাব করছি আমাদের সেই দুর্গত ভাইদের ত্রাণকল্পে যে সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে, তাতেই আজ আমরা দান করবো আমাদের বাজেটের অবশিষ্ট টাকা। আপনারা আমার এই প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করে আমার জন্মদিনটিকে সার্থক করুন, আপনাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা—করযোড়ে প্রার্থনা।

অর্থমন্ত্রী ।। তথাস্তু।

সকলে ।। সাধু, সাধু। (বিপুল করতালি)

যবনিকা *

দ্রষ্টব্য : নাটিকাটি মেয়েদের দ্বারাও অভিনীত হতে পারে, শুধু নামগুলি পালটে নিতে হবে—যেমন কমল হবে কমলা, অমল হবে অমলা, বাদশা হবে বাদশাজাদি, শালা হবে শালী, স্যার হবে ম্যাডাম।

"—কে আছ কোথায়, অনাথশরণ, অন্ন দাওগো মোরে,
জঠরের জ্বালা কেমনে নিবারি ব্যর্থ পরাণ ধরে!
ছিনু কারাগারে, অনাহারে ওগো মরণের কোলে ঢুলি—"
করুণ আর্ত কণ্ঠে কাহার শোনা যায় কথাগুলি?
অম্বরপতি কহেন—"মহিষী, কেগো কাঁদে অনশনে?—"
"—রক্ষা করগো আমার জীবন—" ধ্বনিতেছে নির্জনে।

মানসিংহের পাঠ সমাপন হয়েছে তখন রাতে,
নৈশ ভোজনে চলেছেন রাজা হরষে রাণীর সাথে।
সুপ্ত সকলে, নীরব নগরী, রাজপথ জনহীন,
ভগ্ন কণ্ঠে বেদনার সুর ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ।
কাকজ্যোছনায় ঘুমায় রজনী, আকাশে অনেক তারা,
উত্তরে মৃদু মন্দ গতিতে বহে গাংগেয় ধারা।
রাজার প্রাসাদ মিনারে চাঁদের পড়েছে আলোক রেখা,
কাশীর দেউলে স্বর্গপুরীর শোভিছে চিত্রলেখা।

চঞ্চল হয়ে কহিলেন রাজা—"যে জন কাঁদিছে রাণী!
তাহারি জঠর জ্বালা নিবারিতে দাওগো খাদ্য আনি।
'বিরাজে যেথায় অন্নপূর্ণা সেথানে অন্ন তরে,
অভাগা আতুর সন্তান তার কেন হাহাকার করে!"
কহিলেন রাণী—"নাহিক সময় খাদ্যের সম্ভার
লয়ে যেতে এবে। হয়তো পথিক হারাবে জীবন তার;
মোদের সমুখে রয়েছে অন্ন, তাহা সবি করি দান,
পরিচয় দিয়ে পাঠাতে পাঠাতে শেষ হবে তার প্রাণ।"
অম্বরপতি কহেন পুলকে—"তব সম মহীয়সী
মহিষী যাহার, সেই চিরদিন সাথে লয়ে রবি শশী
পাবে ধরণীরে জীবন অর্ঘ্য সঁপিতে সগৌরবে,
তব করুণার ধারা-সম্পাতে মরুভূ শ্যামল হবে।"
সোনার থালাতে সাজায়ে অন্ন বসনে বাঁধিয়া শেষে,
বাতায়ন হোতে দিলেন মহিষী ভিখারী লভিল এসে।

ফুল্ল আনন ঝরিল অশ্রু শীর্ণ কপোল বাহি,
স্তুতি বন্দনা করে বার বার হরষে রিক্তরাহী।
অবশেষে কহে—"শোন গো জননী! পুণ্য কাহিনী তব,
প্রতি দিবসের মানুষের মনে দিবে গো চেতনা নব।"

ছোটদের পাততাড়ি
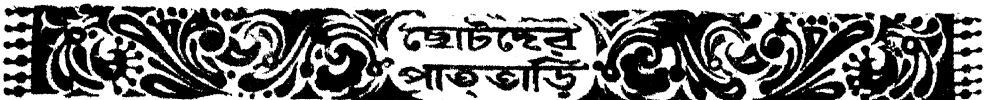
'স্বপনবুড়ো' দাদার চিঠি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি! না ঘামিয়ে উপায় নেই; কারণ প্রতি বছরের মতো এবারও দাদা আমায় তাগিদ পাঠিয়েছেন—পুজোর 'পাততাড়ি'তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা কিছু লিখে পাঠাতে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যটা এত বিরাট যে, সেখানে ঢুকলেই হাজারো ব্যাপার মনকে নাড়া দেয়। কোনটা বলি আর কোনটা না বলি, তাই নিয়েই লেগে যায় রীতিমতো গোলমাল।

এই গোলমালেই মগজে সব গুলিয়ে যাচ্ছিল; ঘেমে উঠছিল মাথাটা। ঠিক তেমন সময় চুলবুলে তুতুল দিদি হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এল। ঘরে ঢুকেই বললে—'মৌমাছি দাদা, দেখবে এসো কী কাণ্ড হয়েছে।'

—'কী আবার কাণ্ড বাধলো রে? কে বাধালো?'

তুতুল হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—'ঐতো ওরা আসছে তোমাকে মাছের সাঁতার দেখাতে।'

চোখ ফিরিয়ে দেখি—নিতু আর শঙ্কর দুজনে মিলে একটা বালতি ধরে নিয়ে আসছে। পিছনে আসছে, অন্তু, মিঠু, মনুয়া।

হৈ-হৈ করে বালতি সমেত আমার ছোট বন্ধুরা ঘরে ঢুকে পড়লো। তুতুল দিদি চেঁচিয়ে উঠলো—'বড়মামা বাজার থেকে থলিতে করে মাছগুলো নিয়ে আসতেই নিতুমামা একটা মাছ নিয়ে বালতির জলে ফেলে দিলে—আর অমনি মাছটা সাঁতার কাটতে লাগলো। কী কাণ্ড মাগো। আমার ভয় করছে।'

ঘরের মেঝেতে বালতিটা নামিয়ে শঙ্কর বললে—'ভয়ের কী আছে এতে? মাছ জলে সাঁতার কাটবেনাতো কী মাঠে চরে ঘাস খাবে, না গাছে চড়বে?'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম—বেশতো! মাছ সাঁতার কাটে কাটুক, তা আমার ঘরে হঠাৎ বালতি-ভরা জলে মাছটাকে নিয়ে হাজির হওয়ার কারণটা কি?'

শঙ্কর চট করে বললে—'তর্ক বেধে গেছে আমাদের তোমাকে মীমাংসা করে দিতে হবে। আমি নিতুকে বললুম মাছ মাত্রেই সাঁতরে বেড়ায় কে না জানে—কিন্তু কি করে সাঁতার কাটে তোরা বলতে পারিস? নিতুদাদা বললে—যেমন করে সাঁতার কাটতে হয় তেমনি করেই কাটে। জবাবটা কি ঠিক হয়েছে বলতো মৌমাছি তুমি?'

আমি হেসে বললাম—'ঐ রকম জবাবই সহজে দেবে যে কেউ, কিন্তু ব্যাপারটা অমন সোজা নয়।'

নিতু বললে—'সাঁতার কাটা আমাদের কাছে শক্ত, মাছেদের কাছে তো সহজই। মাছেরা তো মায়ের পেট থেকে পড়ে ডিম ফোটাবার পরই সাঁতরাতে শুরু করে।'

মনুয়া বললে—'নিতুদা তুমি চুপ করো, মাছ কি করে সাঁতার কাটে তুমি সেটা বলতে পারোনি, আমরাও সেটা জানি না কেউ? তর্ক না করে সেটাই জেনে নাওনা 'মৌমাছি' দাদার কাছ থেকে।'

শঙ্কর বললে—'ঠিক বলেছিস মনুয়া। আমিতো সেই জন্যেই মাছ—সুদ্ধ জলের বালতিটা মৌমাছি দাদার কাছে টেনে নিয়ে এলুম।'

আমি দেখলুম জলের বালতির ভেতর একটা কৈ-মাছ দিব্যি সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মিঠু আর তুতুল বালতির ওপর ঝুঁকে পড়ে—কৈ-মাছটার সাঁতার কাটার কায়দা-কসরৎ খুব মন দিয়ে দেখছে।

হঠাৎ মিঠু বললে—'মৌমাছিদা তুমিও দেখনা কি করে মাছটা সাঁতার কাটছে, ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা।'

আমি বললাম, 'নারে না, ব্যাপারটা অত সোজা নয়, চোখে দেখে মাছ সাঁতার কাটছে বলা যায় কি করে, কোন উপায়ে মাছ সাঁতার কাটে তা বলা যায় না। অন্ততঃ মাছের সাঁতার কাটার আসল কৌশল তিনটে শুধু চোখে ধরাই পড়ে না।

নিতু বললে—'মাছের সাঁতার কাটার আসল কৌশল তিনটের কথাই আগে বলো তাহলে।'

আমি শুরু করলাম—'তিনটি কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আর বড় কৌশল হলো—মাছের গোটা শরীরের সমস্ত মাংস-পেশী-গুলির কাঁপন থেকে একটা গতির সৃষ্টি হয়।

দুনম্বর কৌশল হলো মাছ পাখনা আর ল্যাজ নাড়িয়ে সেই বেগটাকে বাড়াতে কমাতে পারে। আর শেষেরটা হলো মাছের কানকোর ঝিল্লীর ভেতর দিয়ে জলের স্রোত যাওয়া-আসা করায় মাছের শরীরে জেট-বিমানের মতো একটা গতিবেগও সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ মাছই এই তিনটি কৌশলের কোনও একটি, দুটি সব কটিকেই এক সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সাঁতার কাটে।'

মনুয়া বললে—'আমিতো তাই বলেছিলুম যে মাছ পাখনা নাড়িয়ে সাঁতার কাটে।'

'অনেকেরই তাই ধারণা কিন্তু মাছের আসল সাঁতার কাটার শক্তিটা আছে মাছেদের শরীরের দেওয়াল হিসাবে যে মাংস-পেশী-গুলো কাজ করে তার ভেতরেই। পাখনাগুলো শুধু সাঁতারের ব্যাপারে মাছকে সামনের দিকে যেতে সাহায্য করে। মাছের সাঁতার শুধু জলের ভেতরে এগিয়ে যাওয়াই নয়, ভেসে থাকা, ওঠানামা করা—এমনি আরও অনেক কিছু।'

মনুয়া প্রশ্ন করলে—'আমাদেরও মাস্‌ল বা ঐ মাংসপেশী তো সকলেরই আছে—আমরা সবাই তো সাঁতার কাটতে পারি না?'

আমি ওদের বুঝিয়ে বলি—মাছের শরীরের মাংস-পেশী বা মাসল্‌গুলোর সঙ্গে আমাদের শরীরের মাংস-পেশীর তফাৎ অনেক। প্রতিটি মাছের শরীরে কানকো থেকে ল্যাজ পর্যন্ত W-র মতো মাংসপেশীর একেবারে জাল-বোনা আছে। মাছের দাগা বা টুকরো যা আমরা খাই—আসলে সেগুলো ঐ পেশীগুলোই। এই পেশীগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে কাঁপন জাগিয়ে জল পিছনে ঠেলে মাছ এগুতে পারে।

এই যে পেশীর কাঁপন, মাছের শরীরে পালা করে একবার এপাশে একবার ওপাশে চলে। কাজেই জলের চাপে উল্টো-পাল্টা ধাক্কা লেগে জল সরে আর মাছ এগিয়ে চলে। যেমন করে ঠিক আমরা বাঁ-পা আর ডান-পা দিয়ে পালা করে পায়ের নীচের মাটিটাকে ঠেলে দিয়ে হাঁটি, চলি, ঠিক ঠিক তেমনি আর কি।'

পট্ করে নিতু বললে—'ছোট ছোট চুনোপুঁটি গুলো যত তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটে, বড় মাছরাতো ততটা পারে না, কেন? ওদের তো মাংসপেশীগুলো আরও জোরালো?'

জবাব দিই—'এর কারণ মাছের শরীর যতো পাতলা আর সরু ছুঁচালো হয়, ততই বাড়ে তাদের মাংসপেশীগুলি কোঁচকাবার বা ফোলাবার ক্ষমতা। যার জন্যে পাঁকাল, বান, কুঁচে মাছ তীরবেগে সাঁতরে দৌড়ুতে পারে।

মাছ এ-পাশ ও-পাশে শরীরে দু'পাশে পেশীর কাঁপন বা চাপ দিয়ে জলে সাঁতরায়, কিন্তু কচ্ছপ, শুশুক, তিমি প্রভৃতি জলের
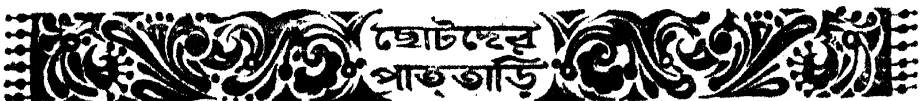
অনেকে ঢেউয়ের মতন ওঠা-নামা করে সাঁতারে গতি সৃষ্টি করে। কারণ, তাদের শরীরে ঝিল্লী দিয়ে জলের ভেতর থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ব্যবস্থা নেই—জলের ওপরে মাঝে মাঝে উঠে এসে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে হয়।'

হঠাৎ তুতুল চেঁচিয়ে উঠলো—'বালতির মধ্যে কৈ-মাছটাও তো মাঝে মাঝে ওপরে উঠছে আর নামছে? ওটাও বুঝি তাই করছে দাদু?'

'হ্যাঁ কৈ, মাগুর, ল্যাঠা, শাল, শোল মাছকেও মধ্যে মাঝে জলের উপরে উঠে ওদের ফুসফুসে অক্সিজেনের যোগানটা ঠিক করে নিতে হয়।'

মিঠু বললে—মাছেরা জলের নীচে কিন্তু যত সহজে সাঁতার কেটে বেড়ায়—মানুষরা তা পারে না—এর কারণ কি?'

'এর কারণ হলো মাছের শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা স্পেসিফিক গ্রাভিটি জলের স্পেসিফিক গ্রাভিটির সমান সমান হয়। মানুষের বেলায়তো তা হয় না। সেজন্য মাছ সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে, মানুষ পারে না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—একটা দশ সের ওজনের মাছের ওজন নোনাজলে আধসেরের মতো ভার দেয়। অর্থাৎ জলের নীচে তার শরীরের আসল ওজনের মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ তাকে বইতে হয়। ফলে সাঁতারের বেগ ও শক্তিটা জলের তলায় তাদের অনেক বেড়ে যায়।'

শংকরের খুব বুদ্ধি, সে আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে বসলো, 'এই জন্যেই বুঝি ছিপের সরু সুতোতেই দশ বারো সের ওজনের মাছকে জলে দিব্যি টেনে আনা যায় অথচ ডাঙায় ঐ একই সুতো দিয়ে ঐ একই মাছকে তুলতে গেলে পটাং করে ছিঁড়ে যায়?'

আমি ওর পিঠটা চাপড়িয়ে বললুম—'সাবাস।'

নিতু বলে উঠলো—'মাছেদের পাখনা আর ল্যাজটা কি কাজে লাগে?'

জবাব দিলুম: মাছেদের পাখ্না আর ল্যাজটা সাঁতারের সময় সামনের দিকে এগুতে এবং জলের ভেতরে মাছের শরীরের ব্যালান্স বজায় রাখতে সাহায্য করে; কিন্তু আসল কাজটা হলো তাদের সাঁতারের ব্যাপারে মোড় ঘোরা, কাৎ হওয়ায় মাছদের সাহায্য করা। কোনও মাছের পাখনাই জলে দৌড়বার সময় গতি থামাতে ব্রেকেরও কাজ করে।'

নিতু জিগ্যেস করলে—'আচ্ছা মৌমাছি, সবই তো বললে—কিন্তু সাঁতারের ব্যাপারে মাছের কান্‌কোর বা ঝিল্লী কি কাজ করে সেটা বুঝিয়ে দাও।'

—'আচ্ছা সেটাও মনে আছে দেখছি। মাছেদের সাঁতার কাটবার তিন নম্বর উপায় হলো—মাছেরা সাঁতার কাটবার সময় খাপুস-খুপুস করে মুখ খোলে আর বন্ধ করে—ঐ দেখ বালতির কৈ-মাছটা তাই করছে। ওটা কেন করছে জানিস?'

পট্ করে তুতুল আধো আধো কথায় বললে—'কিছু খেতে পায়নি বলে খাবি খাচ্ছে।'

হো-হো করে সকলে হেসে উঠলো। আমি বললাম নারে না, তা নয়। ঐভাবে জলটা মুখে ঢুকিয়ে টাকরার চাপ দিয়ে সেটাকে বেশ জোরে কান্‌কোর ঝিল্লীর ফাঁক দিয়ে ঠেলে বার করে দিচ্ছে—ফলে বাইরে চারপাশের জলটাকে মুখে ঐ জলের তোড় পেছনে ঠেলে দিচ্ছে আর মাছটার এগিয়ে চলা সহজ হচ্ছে। বিশেষ করে থেমে-থাকা মাছগুলোকে হঠাৎ যখন তাড়া খেয়ে খা করে ছুটতে হয়, তখন এই উপায়টা মাছেদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। তাছাড়া চ্যাপ্টা ধরণের মাছ যারা, তাদের জলের তলায় মাটিতেই স্থির হয়ে পড়ে থাকতে হয় সর্বদা, তারা আবার কানকোর ওপর দিকের ঝিল্লীর সাহায্যে জলের তোড়টা ওপর-মুখো চালিয়ে তারই ধাক্কায় মাটিতে চেপে বসে থাকাটা সহজ করে নেয়।'

মিঠু চট করে বলে বসলো—'বিজ্ঞানের বইতে কিন্তু পড়েছি মাছেরা ঐ কান্‌কোর ঝিল্লীর সাহায্যেই জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।'

'ঠিকই পড়েছ মাছের ঝিল্লী আসলে হলো শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ারই যন্ত্র। তবে ওটাও সাঁতারের কাজে সাহায্য করে মাছদের।'

কথা আর শেষ করতে হলোনা। হঠাৎ বালতি থেকে কৈ-মাছটা তিড়িং করে লাফিয়ে পড়লো চৌকাঠের ওপর। পড়েই কান্‌কোন ঠেল মেরে মেরে চৌকাট ডিঙিয়ে তর তর করে চললো নর্দমার দিকে। তুতুল তাই দেখে ভয়ে কান্না জুড়ে দিলে। ছেলেমেয়েগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলে। কিন্তু কৈ-মাছটাকে ধরবার সাহস আর কারুও হলো না।

আমি বললাম—'যা: এতক্ষণ তো মাছের সাঁতার দেখলি, এখন দেখগে যা কৈ-মাছ কি করে কান্‌কো বেয়ে হেঁটে বেড়ায়, গাছে চড়ে।'

ওরা বললে—'যত্তো বাজে কথা!'

আমি বললাম—'নারে না—একমাত্র কৈ-জাতীয় মাছেরাই কান্‌কোর ঠেলু মেরে ডাঙায়ও বেশ এগিয়ে চলতে পারে।'—

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কৈ-মাছটার পিছু নিলে আমার ছোট্ট বন্ধুরা। আমারও কথা ফুরুলো।

ছড়াও পড়া

য-ফলা	য	শয্যা ত্যাগ করে মর্মে কল্যাণী শান্তিতে। যাত্রা আসে মধ্য রাতে অত্যধিক শীতে॥
রেফ	র্	কর্কশ গলায় গর্ব তর্ক করে খালি। অসতর্কে মর্কটেতে পড়ে গেল কালি॥
ঋ-কার	ৃ	কৃশ মৃগ বৃথা ঘোরে তৃণহীন মাঠে। বৃষ হয়ে তৃষাতুর ঘোলা জল চাটে॥
র-ফলা	্র	মালপত্র বেঁধে নিয়ে শুক্রবার ভোরে। শুভ্রা গেল বদ্রীনাথ শুভযাত্রা করে॥
ক+ত	ক্ত	তক্তপোষে বসে থাকা শক্ত অতিশয়। অভুক্ত ছারপোকা যত রক্ত চুষে লয়॥
ঞ+জ	ঞ্জ	কুঞ্জে ফোটে পুঞ্জে পুঞ্জে নানাবিধ ফুল। গুঞ্জরণ করে শোন মধুকর কুল॥
ষ+ট	ষ্ট	পুষ্টি হীন গরীবেরা কত কষ্ট করে। তাই দেখে তুষ্ট হয় অপকৃষ্ট নরে॥
হ+ণ	হ্ন	অপরাহ্নে ঝটিকার চিহ্ন দেখা যায়। কালো ছায়া জাহ্নবীর দুকূলে ঘনায়॥
ন+ত	ন্ত	নিশান্তে অনন্ত আলো দিগন্তে ছড়ায়। ক্লান্ত চাঁদ বনান্তরে একান্তে লুকায়॥
শ+ব	শ্ব	বিশ্বনাথ ঘন ঘন ফেলে দীর্ঘশ্বাস। অশ্ব হবে নদী পার হয়না বিশ্বাস॥
ন+দ	ন্দ	অলিন্দে দাঁড়ায়ে ছন্দা দুটি কর জুড়ে। সানন্দে বন্দনা করে রবীন্দ্র ঠাকুরে॥

ইংরেজরা অনেক দিন আমাদের দেশে রাজত্ব করে গেছে। শাসক হিসাবে তারা যে অত্যাচারই করুক, মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে এক একজন রাজকর্মচারী এমন সব ঘটনার নিদর্শন রেখে গেছেন, যা স্মরণ করে যুগপৎ বিস্ময় ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। আসলে তাঁরা সম্মানীর সম্মান করতেন, গুণীর কদর জানতেন আর কারু ধর্মবোধকে কখনো ক্ষুণ্ণ করতেন না।

এমনি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আজ এখানে তোমাদের কাছে বলব। ঘটনাটি ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু আগে। সর্ব-ভারতীয় শিক্ষার এক ব্যাপার নিয়ে ভারতে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বিলেতের টনক নড়ে, এবং সেখান থেকে বড়লাটের উপর নির্দেশ আসে যে, মধ্যস্থ হিসাবে ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এর একটা ফয়সালা করে ফেলতে।

ভারত শাসনের জন্য ইংলণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাটরাই ছিলেন তখন এদেশের হর্তাকর্তাবিধাতা। ভারতে বিশেষ রকমের কোন গণ্ডগোল বাধলে বা প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে, এই বড়লাটদেরই জবাবদিহি করতে হ'ত ইংলণ্ডের রাজার কাছে এবং প্রয়োজনে সেখানকার নির্দেশ মতই চলতে হ'ত।

তখন ভারতে বড়লাট লর্ড কার্জন। বিলেতের নির্দেশ মত তিনি এলাহাবাদে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে নিয়ে এক বিচার-সভার আয়োজন করেন। কলকাতা থেকে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি মনোনয়ন করেন এবং স্থির হয়, তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে লর্ড কার্জন কলকাতা থেকে এলাহাবাদ রওনা হবেন। প্রথমদিকে বড়লাটের সঙ্গে একই গাড়ীতে যেতে স্যার গুরুদাস আপত্তি করলেও, শেষ পর্যন্ত লর্ড কার্জনের কথায় তাঁকে রাজী হতে হয়।

স্যার গুরুদাস ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। পুজোআর্চা ও খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব বেশী বাছ-বিচার ছিল তাঁর। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া তিনি কখনো কোথাও খেতেন না এবং স্নান-আহ্নিক সেরে তবে জলস্পর্শ করতেন।

এলাহাবাদে যাবার দিন আগে থেকে স্থির হয়ে থাকলেও, গাড়ী কখন ছাড়বে তা স্যার গুরুদাস জানতেন না। মাত্র আগের দিন তাঁর কাছে খবর এল যে, গাড়ী আগামীকাল সকালের দিকে ছাড়বে। সময়টা অবশ্য সেই সঙ্গে সঠিক বলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ সাত-সকালেই দুপুরের খাওয়া সেরে বেরুনো তো আর সম্ভব নয়। তাই স্যার গুরুদাস প্রাতঃকৃত্য সেরে সামান্য কিছু জলযোগ করেই যাত্রা করলেন।

বড়লাট বাহাদুরের তখন সম্পূর্ণ আলাদা ট্রেণ থাকত, ঝকঝকে, তকতকে সেই ট্রেণের মধ্যেই থাকত তাঁর ও তাঁর লোকজনের থাকা, খাওয়া ও কাজকর্ম করার ব্যবস্থা। সে ট্রেণ বড়লাটের গন্তব্যস্থান ছাড়া আর কোথাও থামত না। তার জন্যে, অন্য সব ট্রেণকে পাশে সরিয়ে রাস্তা করে দিতে হ'ত। লর্ড কার্জনের কামরার পাশেই স্যার গুরুদাসের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কামরার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে ট্রেণ ছেড়ে গেল। যে যাঁর কামরায় গিয়ে তাঁরা পৌঁছিয়ে বসলেন। ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ট্রেণ ছুটতে লাগল ভাইসরয় ও স্যার গুরুদাসকে নিয়ে। বড় বড় স্টেশন হুস্-হাস্ করে চক্ষের নিমেষে পেরিয়ে যেতে লাগল। কোথাও কোন স্টেশনেও থামবার প্রয়োজন নেই কয়লা-জল নেবার জন্যে।

সকাল পেরিয়ে দুপুরের রোদ সোজাসুজি মাথার উপর উঠল। খাওয়া-দাওয়ার সময় হ'ল বড়লাট লর্ড কার্জনের। বাড়ীর মত গাড়ীর মধ্যেই সব সুব্যবস্থা। স্নানাদি সেরে তিনি পরিপাটিভাবে খাদ্য খেলেন। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করবেন, এমন সময় লর্ড কার্জন কি একটা পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠালেন স্যার গুরুদাসকে।

এক কামরা থেকে অপর কামরায় যাবার জন্য মধ্যে দরজার ব্যবস্থা ছিল সারা গাড়ীতেই। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী গিয়ে পাশের কামরায় খবর দিতেই স্যার গুরুদাস উঠে এলেন।

দুজনের কথাবার্তা আরম্ভ হবে, এমন সময় হঠাৎ বড়লাটের কি মনে হ'ল তিনি স্যার গুরুদাসকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার মধ্যাহ্নভোজন হয়েছে তো?'

'না, আমি একেবারে এলাহাবাদে গিয়ে খাব।' উত্তরে বললেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সে কি কথা। আপনি সারাটা দিন উপবাসী থাকবেন!' বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন লর্ড কার্জন।

'আমার খাবার অনেক হাঙ্গামা। গাড়ীতে সে সব হবার উপায় নেই। তাছাড়া—'

সব শুনলেন লর্ড কার্জন। তারপর বললেন, 'এখন অন্য কথাবার্তা থাক। আগে আপনি পরের স্টেশনে নেবে খাওয়া-দাওয়া সারুন, তারপর আলাপ-আলোচনা হবে।' এই কথা বলেই তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে, পরের স্টেশনেই গাড়ী থামাবার নির্দেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের খাবার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যাতে হয় তা দেখতে বললেন।

স্যার গুরুদাস পথে এ সব হাঙ্গামা করায় যদিও আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে লর্ড কার্জন মোটেই কর্ণপাত করেননি।

বিহারের শেষ সীমান্তে একটি সামান্য ছোট্ট স্টেশনে এসে বড়লাটের ট্রেণ থেমে গেল। স্টেশনের স্টেশন মাস্টার থেকে ছোট-বড় সমস্ত রেল কর্মচারীরা থরহরি কম্পমান। সারা অঞ্চল জুড়ে হৈ-চৈ ছুটোছুটি পড়ে গেল। গাড়ী থেকে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও লোকজন সব নেবে পড়ল। স্টেশন মাস্টার বিহারী ভদ্রলোককে জানান হ'ল ব্যাপারটা এবং তড়িঘড়ি সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্যে জোর দিয়ে বলা হ'ল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই স্টেশনের কাছে একটি বাগান-বাড়িতে স্যার গুরুদাসের স্নান ও আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন স্থানীয় স্টেশনের লোকজনরা। নতুন উনুন তৈরি হ'ল, নতুন হাঁড়ি, কলসী আনাজ-কোনাজ, মসলাপাতি, ঘি, তেল, নুন এল এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় একজন উঁচু দরের পশ্চিমী ব্রাহ্মণ এসে, নতুন হাঁড়িতে সরু আতপ চালের ভাত চড়িয়ে দিলে। কুশাসনে বসে, খাঁটি গব্যঘৃত সহযোগে পদ্মপাতায় ভাত ও নিরামিষ তরকারি বাঁড়ুজ্যে মশাই আহার করলেন। আহারের পূর্বে ইঁদারার জলে তিনি ভালভাবে যে স্নান করে নিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

প্রায় ঘণ্টা দুই সময় লেগে গেল এই সব ব্যাপারে। লর্ড

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)
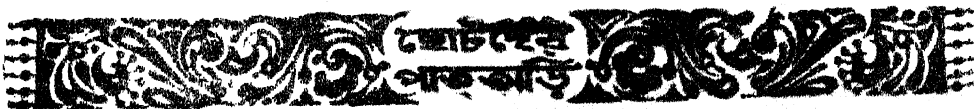
পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেটি।

আপন মনে গর্ত খুঁড়ে চলেছে মাটিতে। গর্ত তো নয়, যেন সুড়ঙ্গ। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছে।

ব্যাপার কি? এতটুকু ছেলে, হঠাৎ গর্ত খুঁড়ছে কেন, একাগ্র মনে? এ আবার কেমন ধারা খেলা?

খেলা নয়, পড়া।

ছেলেটিকে কে বলেছে, পৃথিবীটা গোল। ওর বিশ্বাস হয় নি কথাটা।

কেমন করেই বা হবে? ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে—যতদূর দেখ যায় পৃথিবীটা তো শটান চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওটা আবার কখনও গোল হতে পারে না কি?

—পারে বাবা, পারে। পৃথিবীটা সত্যই গোল।

বলেছিলেন গাঁয়ের পাদ্রী সাহেব। মস্ত পণ্ডিত লোক তিনি। কত জানেন-শোনেন। তাঁর কথা তো মিথ্যে হতে পারে না।

তবে কি পৃথিবীটা সত্যই গোল?

বেশ, পরীক্ষা করেই দেখা যাক না। পৃথিবীটা যদি গোলই হয়, তাহলে তো এক পিঠ থেকে সমানে গর্ত খুঁড়ে গেলে একদিন না একদিন আর এক পিঠে সে গর্ত ফুঁড়ে বেরুবেই।

দেখাই যাক না ফুঁড়ে বেরয় কি না।

ছেলেটি তাই আপন মনে গর্ত খুঁড়ছে মাটিতে।

আমার গল্প শুনে তোমরা তো হাসছ। কিন্তু ছেলেটি কে জানো?

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল। এখন তাঁর বয়স ৮০ বছরের উপরে। মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিত তিনি। নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছেন।

কি হলো?

হাসি যে থেমে গেলো তোমাদের!

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কার্জন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজে থেকে ষ্টেশনে নেবে তদারক করলেন। এই সময়টুকুর মধ্যে অসংখ্য লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল বড়লাটের এই ট্রেণ ও বড়লাটকে দেখতে তো বটেই, তবে তাঁর সঙ্গে যে বাঙ্গালী জজকে খাওয়াবার জন্য বড়লাট গাড়ী থামিয়েছিলেন, তাঁকে দেখবারই কৌতুহল ছিল তাদের মধ্যে বেশী।

এই ঘটনা নিয়ে সারা রেল লাইনে সেদিন হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল রেলের কর্মচারীদের মধ্যে এবং কয়েকখানি ট্রেণ পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে প্রায় ঘণ্টা দুই আটক পড়েছিল, বড়লাটের ট্রেণ এলাহাবাদে না পৌছান পর্যন্ত।

আমাদের ভারতের আশে-পাশে কত সুন্দর সুন্দর দেশ! একখানা এরোপ্লেনে চড়ে যদি ঘুরে আসতে পারা যায়, তাহলে এত জিনিষ চোখে পড়বে যে তা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। তবে এ রকমের দেখায় কেবল ভাসা ভাসা দেখাই হয় আসল যা সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়া যায় না। দেশের আসল জিনিষ হলো মানুষ আর তার জীবনযাত্রা। তাদের মধ্যে না থাকলে সে কথা জানা যাবে কী করে? বই পড়ে বা লোকমুখে শুনেও জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু কৌতুহলীর তাতে তৃপ্তি হয় না।

যাহোক, বছর কয়েক আগে এক ভবঘুরের সঙ্গে এক রেল ষ্টেশনে হঠাৎ আমার দেখা। দুজনেই গাড়ি চলে যাবার কয়েক মিনিট পরে ষ্টেশনে পৌছে বোকা বনে গেলাম। টাইমটেবিলে দেখলাম দুজনেরই পরের গাড়ি পাওয়া যাবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। তবে তাঁর গাড়ি আসবে আগে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল।

কথায় কথায় তাঁকে বলি, "মশাই, আপনি তো জীবন্ত ভূগোল। আমার ঘড়িকে ধন্যবাদ যে আপনাকে সে পথে মিলিয়ে দিলে। লোকে বই পড়ে সময় কাটায়। আমার সময়টা আপনার কথা শুনে কেটে যাবে। তাতে যেমন শিখবো, তেমনি লোকের কাছে আপনার কথা গল্প করবার চমৎকার বিষয় হবে।"

তিনি সহাস্যে বলেন, "আমার গল্প বলার বা লেখার শক্তি নেই, চলবার আর দেখবার শক্তি আছে। তার ফলে যা সঞ্চয় করেছি, তা থেকে কিছু দি। আপনার মতো সঙ্গী মিলেছে যে মোটরবাসে ষ্টেশনে এসেছি তার দৌলতে। ভাগ্যে তার কল বিকল হয়েছিল; দেখুন, বিদেশে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে স্বদেশের বুলি, আর প্রাণ ছটফট করে স্বদেশী খানার জন্যে। যদি বিদেশে থাকতেন, তাহলে আমার কথা মর্মে মর্মে বুঝতেন। লোকে বিদেশ ঘুরে এসে কত কথা বলে, বলে না কেবল ছেলে-মেয়েদের কথা। ওরা তাদের চোখেই পড়ে না। যেন ছেলে-মেয়ে শূন্য দেশ থেকে তারা ঘুরে এসেছে। আর সেটাও যে একটা মস্ত খবর!" বলে হো হো করে হাসেন। আবার বলেন, "জাপান থেকে ব্রহ্মদেশ পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা। পৃথিবীতে এখন উন্নতির, অন্যভাবে বলতে পারেন, নতুনের জোয়ার এসেছে। পুরনোর মাঝ দিয়ে বইছে নতুনের স্রোত। আর এটা দেখা যায় শহরেই বেশি। পুরনোর সবচেয়ে শক্ত ভিত পোতা আছে মানুষের মনে। যে জায়গাটার কথা বললাম, এখানকার লোকেরা আমাদের মতো ভাত খায়। তাই ধানের চাষ খুব।

"তা মশাই সব দেশের ছেলে-মেয়েদেরই আমার খুব ভালো লাগে। ঐ দেশগুলোর ছেলে-মেয়েদের চেহারায় মিল-গরমিল দুই-ই আপনার চোখে পড়বে। নাক চ্যাপটা, চোখ ছোট, মাথার চুল খাড়া, গায়ের রং হলদে। এই হলদেরও আবার একটু রকমফের আছে। কিন্তু সব দেশেই বিশেষ করে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশে ছেলেমেয়েরা সকলেই লেখাপড়া শেখে। আর, সকলেই শিষ্ট, গুরুজনদের সম্মান
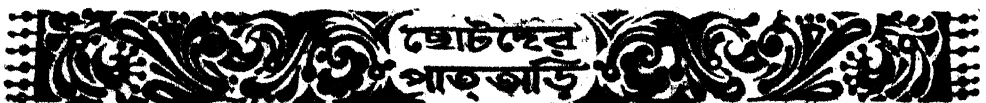
করে, নিজের দেশকে ভালোবাসে। আমাদের ভারতের মতো চীনও প্রাচীন সভ্যতার দেশ। আমরা অনেক দুঃখ সয়েছি। ওদের অবস্থাও সুখের ছিল না। আমরা দেশকে নতুন করে, ভাল করে গড়বার কাজে লেগেছি। ওরাও তাই করছে। পুরনো রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা একেবারে উল্টে দেওয়া হচ্ছে। চীন দেশে ছেলেমেয়ের বড় আদর। আগে মেয়েদের আদর-যত্ন করা হতো না, ছেলেদেরই আদর ছিল। এখন ওরা ছেলেমেয়েকে সমান চোখে দেখে, সমানভাবে শিক্ষা দেয়। ছেলেমেয়েরা যেমন লেখাপড়া শিখতে বাধ্য, তেমনি তাদের খেলাধুলো, শরীর চর্চা করতে হয়। শরীর সুস্থ, বলিষ্ঠ না হলে উন্নতির চেষ্টা বৃথা।

"চীন দেশে নানা রকমের খেলনা দেখেছি। ওরা কাগজ, তাল-পাতা, বাঁশ, প্লাস্টিক, চীনা মাটি ইত্যাদি দিয়ে কত রকমের খেলনা তৈরি করে। ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াতে বড় ভালোবাসে। চীনদেশে ঘুড়িও দেখেছি নানা রকমের। মাছ ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি, পাখি ঘুড়ি, আরও কত রকমের ঘুড়ি তা মনে নেই। আমাদের বাংলাদেশে বিশ্ব-কর্মা পুজোর দিন ছেলে-বুড়ো ঘুড়ি ওড়ায়। ওদের দেশের বছরের একটা দিনে হয় ঘুড়ি ওড়ানোর পর্ব। সেদিন ছেলে-বুড়ো ঘুড়ি ওড়ায়। রাতেও ঘুড়িতে আলো বেঁধে ওড়ানো হয়ে থাকে। এক একটা ঘুড়ি এত বড় করে তৈরী করা হয় যে, তুলতে গেলে দুজন লোকের দরকার। সে ঘুড়ি কতকটা আমাদের ঢাউস বা কোয়াড়ের মতো।

"ওদের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ সাদা-সিধে, কথাবার্তা নম্র, চাল-চলনে সকলেই চটপটে। সকলে শৃঙ্খলা মেনে চলে।

"জাপানকে এক সময়ে লোকে বলতো 'প্রাচ্যের ইংলণ্ড।' কেন বলতো সে কথা থাক। জাপানে যেমন কৃষির, তেমন শিল্প-বাণিজ্যেরও খুব উন্নতি হয়েছে। কৃষি-বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা শিখবার জন্যেও ওদেশে স্কুল-কলেজ আছে। ছেলেমেয়েরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে সেখানে পড়ে।

"জাপানী ছেলেমেয়েরা সকলেই লেখাপড়া শেখে, খেলা-ধুলো করে, শরীর চর্চা করে থাকে। সব দেশেরই একটি করে জাতীয় খেলা আছে। চীন-জাপানেও আছে। খেলাটা বোঝাতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু তা নেই। আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, টেবলটেনিস প্রভৃতি খেলার চলন হয়েছে। এগুলো ইউরোপীয় খেলা। চীন-জাপানের ছেলেমেয়েরা ঐ সব খেলাও খেলে থাকে। জাপানী কুস্তি যুযুৎসুর নাম পৃথিবীর কে না জানে? অনেকে যুযুৎসু শেখে। আমিও জাপানে থাকবার সময়ে কয়েকটা প্যাঁচ শিখেছি। একবার এক গুণ্ডাকে যুযুৎসুর প্যাঁচে ধুলোসাৎ করেছিলাম।

"পাঁচ বছর বয়সেই জাপানী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয়। তখন থেকে ছ' বছর প্রাথমিক শিক্ষা, পাঁচ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা আর দু বছর উচ্চ শিক্ষা লাভ করে, তবে কলেজী শিক্ষার যোগ্যতা লাভ করা যায়। এই তেরো বছরে ছেলেমেয়েদের নানা বিষয় শিখতে হয়। হাতের কাজ না শিখলে শিক্ষা সম্পূর্ণই হয় না। মনে করছেন, জাপানী ছেলেমেয়েরা স্কুলের পাঠ শেষ করেই বুঝি কলেজে ঢোকে। মোটেই তা নয়। অনেকে যায় কোন বৃত্তিমূলক বিদ্যা শিক্ষা করতে। তা না শিখলে চলবে কী করে? খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো?

"জাপানীরা বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। কাজেই কী করলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় শৈশবেই তা শিখতে হয়। জাপানে অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়ে আপনার চোখেই পড়বে না। জাপানীরা খুব ফুল ভালোবাসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই গুণটি দেখা যায়। চীনে ছেলেদের মতো ওরাও খেলনার খুব ভক্ত। নানা রকমের জিনিষ যেমন বাঁশ, কাগজ, চীনেমাটি, কাঠ, প্লাস্টিক, রবার ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরি করা হয়। সে সবের কিছু কিছু আমাদের দেশেও আসে। জাপানী ছেলেরাও ঘুড়ি ওড়াতে ভালো-বাসে। জাপানীরা নানা রকমের ঘুড়িও তৈরি করে। মাছ ঘুড়ি ওদের সবচেয়ে প্রিয়। কারণ, মাছ ওদের কাছে এক সুলক্ষণের জিনিষ। তাই অনেক বাড়ির সামনে বাঁশের খুঁটির মাথায় কাগজের মাছ ওড়ে। বছরের একটি দিনে জাপানী ছেলেরাও ঘুড়ি-ওড়ানো উৎসব করে। সেদিনটি হলো পাঁচই মে।

"আমাদের দেশের মেয়েরা পুতুল খেলে। পুতুলের বিয়ে দেয়। জাপানী মেয়েরাও পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিয়ে দেয়। পুতুলের বিয়েতে পুতুল-বর, পুতুল-কনেকে নিয়ে তারি আমোদ-আহ্লাদ হয়, তখন সত্যিকারের ভোজ দেয়। পুতুলেরা সাজে রাজা-রাণী, মন্ত্রী, কোতোয়াল, এমনি আরও কত কী! পুতুলের সামনে দেওয়া হয় ভাত, নানা রকমের খাবার, ফলমূল। এরও একটি বিশেষ দিন আছে। সেটি হলো তেসরা মার্চ।

"জাপানী ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয় সকাল সাতটায়। ভাত খাবার ছুটি হয় বেলা বারোটায়। যাদের বাড়ি স্কুলের কাছে, তারা ভাত খেতে বাড়ি আসে। দূরের ছেলেমেয়েরা সঙ্গে ভাত নিয়ে যায়। স্কুলের ছুটি হয় বেলা দুটোয়। শনি-রবিবারে স্কুল বন্ধ। ছুটির পর বাড়িতে এসেও ছেলেমেয়েরা কিছুক্ষণ পড়াশুনো করে। তারপর খেলা। ছেলেরা ইচ্ছে মতো খেলাধুলো করে, মেয়েরা শেখে নাচ-গান, পাখা তৈরি, চা তৈরি করতে। জাপানীরা চায়ের খুব ভক্ত, চীনেরাও তাই। চা তৈরি করার মধ্যেও একটি চমৎকার কৌশল আছে। সেটি শিখতে হয়। চীন-জাপানে আমাদের দেশের মতো করে চা তৈরি করা হয় না।

"জাপান থেকে আসি শ্যামদেশে, যার নাম থাইল্যান্ড হয়েছে। থাই মানে স্বাধীন। থাইল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তবে তা অনেককাল আগের কথা। সে কাহিনী থাক। ওদেশের জল-হাওয়া অনেকটা আমাদেরই দেশের মতো। আমাদের দেশের মতোই থাইল্যান্ডও কৃষিপ্রধান দেশ। শহরের সংখ্যা বেশি নয়, গাঁয়েই বেশি লোক থাকে। জাপানের মতো ওদেশে এখনও লেখা-পড়ার খুব চলন হয়নি। তবে শহরে আর গাঁয়ে দুরকমের শিক্ষা চলে। শহরের শিক্ষা আধুনিক। সেজন্যে আছে স্কুল-কলেজ, গাঁয়ের শিক্ষা পুরনো দিনের। গাঁয়ে শিক্ষা দেন বৌদ্ধভিক্ষুরা। ছেলেরা তাঁদের কাছেই কিছু লেখাপড়া, ধর্মাচার শেখে।

"গাঁয়ে কাগজের চলন কম। ছেলেরা শ্লেটে লেখে, আঁক কষে। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চির চলনও নেই। তাই গুরুর সামনে মেঝেয় আসন করে বসে পাঠ নেয়। শহরের স্কুলে অবশ্য বিলিতি কায়দা। সেখানে বিদেশী ভাষাও শিখানো হয়।

"আমাদের কাশ্মীরে ঝিলম নদীতে, চীন দেশের কয়েকটি বড় নদীতে অনেক লোক নৌকোয় বসবাস করে। থাইল্যাণ্ডেও বড় বড় নদীতে আপনি তা দেখতে পাবেন। নৌকোতেই হাট-বাজার বসে। সেজন্যে কিনা জানিনে, ছেলেদের হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটতে শিখানো হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় বড় বড় সোলা বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে বড়রা কাছেই থাকে। আর, ছেলে-মেয়েরা হাত-পা নেড়ে সাঁতার কাটতে শেখে। যেন জলের পোকা, জল দেখে একটুও ভয় পায় না। কিছু বড় হলেই সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাছে কোন নদীতে বা জলাশয়ে যায় স্নান করতে আর সাঁতার কাটতে। তারপর বাড়ি ফিরে খায়।

"ওদেশে হলদে রঙের ছেলেমেয়ে দেখে, প্রথম দিন তো আমি মনে করেছিলাম ওদের গায়ের রঙই বুঝি হলদে। কিন্তু শেষে জানতে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

বাপরে কি পাকা মেয়ে ওইটুকু খুকীটা
সামলিয়ে চলে সেতো সংসার ঝুঁকিটা।
ঘুম থেকে উঠে তার নেই কোনো কান্না,
আনাজের কুচি কেটে লুচি করে রান্না।
ডাল, ভাত, তরকারি, বেগুনের চাটনি,
পাতা ছিঁড়ে রাঁধে কত, বাপরে কি খাটনি!
হলো হলো জাফরাণ পোলাওয়ের হাঁড়িতে,
হলুদের কাদা-দাগ কুঁদে তার শাড়ীতে।
কিছু যদি বাদ যায় ভুরু যাবে কুঁচকে
দাদা বলে, 'কাজে বুড়ি বয়সেতে পুঁচকে।'
তাড়া দিলে বলে খুকু, 'যাচ্ছি কি পালিয়ে?
ঘ্যান ঘ্যান করে খেলে হাড়ে মাসে জ্বালিয়ে।
মেয়েটার বিয়ে হবে ন্যাকড়ার দেহটি
প্লাস্টিক বর তার চেনো ভাই কেহ কি?
বরযাত্রের বোনগুলি কোথা থেকে জুটলি?
মেয়েকে যে নিতে হবে ননদের পুঁটলি।'
কোন কিছু বাদ নেই সব আছে চিত্তে,
আগামীর ছবি সব, আজ শুধু মিথ্যে।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পাখির, মশা-মাছির উৎপাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ঐ রঙটি শিশুদের মাখানো হয়। ওদেশে এই দুটি বিশ্রী পতঙ্গের ভারি উৎপাত। আমি তো কয়দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

"গাঁয়ের আর শহরের ছেলেমেয়েদের চাল-চলনের মতো খেলা-ধুলোতেও বেশ পার্থক্য দেখেছি। শহরে ইউরোপীয় সভ্যতার দারুণ প্রভাব। গাঁয়ের ছেলেরা কাদা নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ওদের কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার। ছেলেরা গাছে চড়তে পরম পটু। বড় বড় নারকেল গাছে তর তর করে উঠে যায়। ওদেশে নারকেল গাছও অজস্র। গাঁয়ের ছেলেরা শেখে বাইরের কাজ, আর মেয়েরা শেখে ঘরের কাজকর্ম। কিন্তু ছেলেমেয়ে সকলেই রাঁধতে শেখে।

"চীন-জাপানের মতো ওদেশেও বড় বড় ধান ক্ষেত। প্রাকৃতির শোভাও চমৎকার। বৃষ্টি-ধোওয়া সেই শ্যামল শোভায় চোখ জুড়িয়ে যায়। তাই দেখে মাঝে মাঝে আমার সোনার বাংলার কথা মনে হতো। ওদেশে বৃষ্টি হয় খুব। আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে যায়, বাদলার পাগল বাতাস বনে বনে ছুটতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়, কড় কড় মেঘ ডাকে, তখন ছেলেমেয়েরা কী বলে জানেন? বলে, 'আকাশের দেবতা আর তার স্ত্রী ঝগড়া করছে।' আর অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরলে বলে, 'স্বর্গের পরী আর আকাশের মেয়েরা স্নান করছে। সেই জলে পৃথিবীও ভিজছে।' কিন্তু মশাই, ঐ শুনুন গাড়ির ঘন্টা। সব কথা বলবার সময় নেই। এই নিন্ আমার কার্ড। কলকাতার ঠিকানা। পনেরো দিন ওখানে থাকবো। যাবার আগে ফোন করবেন। সেদিন আরও অনেক দেশের কথা শোনাবো। আজ বিদায়।" বলে তিনি প্ল্যাটফরমে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই গাড়ি এলে তাতে চেপে চলে গেলেন দক্ষিণে।

তারপর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কারণ কার্ডখানি হারিয়ে ফেলেছি, ঠিকানাও মনে নেই। তাই ইচ্ছে থাকলেও অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের কথা আর শোনা হলো না। এখন কেতাব ভরসা।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ কাকে বলে তা বোধহয় তোমাদের বলে দিতে হবে না। এই জাহাজ জলের তলায় ডুবে চলা-ফেরা করে। জলের ওপরে কোনো কিছু দেখবার দরকার হোলে সেটা একটু একটু ক'রে ওপরদিকে উঠতে থাকে যতক্ষণ না তার ওপরকার একটা চোঙ্গার সামান্য একটু অংশ জলের বাইরে বেরিয়ে আসে। এই চোঙ্গাটার মাথায় একটা যন্ত্র থাকে যার সাহায্যে জলের ওপরকার সব কিছুই চোঙ্গার ভেতর দিয়ে নীচে জাহাজের খোলে একটা পাতে প্রতিফলিত হয়। এটাই হলো পেরিস্কোপ। ডুবো জাহাজের পেরিস্কোপের মতো না হোলেও তোমরা বাড়ীতেই এক ধরণের পেরিস্কোপ তৈরী ক'রে নিতে পারো।

এর জন্যে তোমাদের দরকার হবে—সাড়ে সাত ইঞ্চি চওড়া ও ১২ ইঞ্চি লম্বা মাঝারি রকমের পুরু এক পিস পিজবোর্ড, ১½ ইঞ্চি চওড়া ও ১¾ ইঞ্চি লম্বা দুটো ছোট ছোট আরশি বা আয়না, ছুরি, কাঁচি, গজ কাঠি, আঠা এবং ১০ ইঞ্চি চওড়া ও ১২ ইঞ্চি লম্বা এক পিস সাদা কাগজ।

বাড়ীতে একটা ভাঙ্গা আরশি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সেটা ছবি বাঁধাই-এর দোকানে নিয়ে গিয়ে মাপ মতো দুটো পিস কাটিয়ে আনতে পারো, তবে এর জন্যে কিছু মজুরী দিতে হবে। আর আঠাটা শিরিষ আঠা হোলেই ভালো হয়। দুভাগ জলে একভাগ শিরিষ আগুনে ফুটিয়ে গলিয়ে নিলেই শিরিষ আঠা তৈরী হয়।

এবার পিজ বোর্ডটার লম্বা দিকের একটা ধার থেকে ½ ইঞ্চি ছেড়ে পেন্সিল দিয়ে একটা লম্বা লাইন টানো। এই লাইনের বাইরের ½ ইঞ্চি অংশটুকুতে আঠা লাগিয়ে পিজবোর্ডটা লম্বা-লম্বিভাবে গোল করে মুড়ে আঠা লাগানো অংশটুকু চাপা দিয়ে জুড়ে দাও। এতে ৬½ ইঞ্চি বেড়ের ১২ ইঞ্চি লম্বা একটা চোঙ্গা তৈরী হবে, যেটার ভেতরের ব্যাস হবে ২ ইঞ্চি। চোঙ্গাটা তৈরী করবার আগে পিজবোর্ডটা অল্পক্ষণের জন্যে যদি জলে ডুবিয়ে রাখো, তবে সেটা নরম হোয়ে যাবার জন্যে গোল করে মোড়বার সুবিধা হবে। এখন সাদা কাগজটায় আঠা লাগিয়ে চোঙ্গাটার গায়ে জড়িয়ে দাও। এতে পিজবোর্ডটার জোড়ের মুখ কখনো খুলবে না। আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে চোঙ্গাটা বেশ শুকিয়ে গেলে ঐ সাদা কাগজটার ওপর রং তুলি দিয়ে চিত্তির-বিচিত্তির করে দিতে পারো।

চোঙ্গাটা যখন বেশ শুকিয়ে যাবে তখন সেটার যে কোনো একটা দিকের প্রান্ত থেকে ১½ ইঞ্চি নীচে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ১½ ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোল ফুটো করো। গোল-ফুটো করতে অসুবিধা হোলে চৌকা ফুটোও করতে পারো। এবারে চোঙ্গাটার অন্য প্রান্তে অন্য দিকের ফুটোটার একেবারে উল্টো দিকে ঐ রকমই ১½ ইঞ্চি নীচে ১½ ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটো করো। এই সঙ্গে যে ছবিটা দেওয়া হলো, ফুটো করবার আগে সেটা একবার দেখে নাও কোথায় কোথায় ফুটো দুটো করতে হবে।

এবারে মোটা যে কোন কাগজ থেকে আধ ইঞ্চি চওড়া ফিতে কেটে আরশি দুটোর পেছন দিকে, অর্থাৎ পারা লাগানো দিকের মাঝখান দিয়ে এমন ক'রে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও যাতে আরশি দুটোর চারদিকেই অন্ততঃ এক ইঞ্চি করে কগাজের ফিতে বেরিয়ে থাকে। তারপর ফিতে-লাগানো একটা আরশি নিয়ে চোঙ্গার এক প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে আরশির সোজা দিক, অর্থাৎ মুখ দেখবার দিকটা নীচু মুখ ক'রে সেটার একটা দিক ফুটোটার মাথার কাছে রেখে, অন্য দিকটা নীচের দিকে নাবিয়ে ফুটোর উল্টো দিকে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

বাপিকে খাওয়াবে রেঁধে নীপার কী কান্না—
দাও মা সুযোগ মোরে—করি আজ রান্না।
ঠুক্‌ঠাক্—ঠুং ঠাং—বেজে যায় তিনটা,
ভয় হয় না খেয়েই কাটে বুঝি দিনটা।
—এসো বাপি, এইবার বসো এসে আসনে,
তকতকে রান্না এ—ঝকঝকে বাসনে।
একে একে এসে গেল ঝাল-ঝোল কতো যে—
নাম-ধাম না-জানালে খাবে থতমত যে।
তুমি বাপি খেয়ে যাও, আমি দিই চিনিয়ে,
তারপর শুরু হয় ইনিয়ে ও বিনিয়ে—
রাশিয়ান আলুভাজা, খাসিয়ান ডালনা,
হাসিমুখে খাও সব, একটুও ঝাল না।
টার্কি কাবাব ওটা, মার্কিণী হ্যাচড়া—
কতো না শক্ত রাঁধা—কতো টানা-হ্যাচড়া।
কটমট চিবোও না—কাটলেট বোম্বাই,
ছোটখাটো হয় নাতো, আধহাত লম্বা-ই।
আর্মানী চপ ওটা, জার্মাণী শুক্ত,
কে বলে খারাপ খেতে? খেয়েই দেখুক ত!
চাইনিজ চচ্চরী, বালিনিজ ছেঁচকী,
মাঝে মাঝে জল খেলে উঠবে না হেঁচকি।
মাদ্রাজী ডাল খাও পাঞ্জাবী পোস্ত,
কাবুলী কোপ্তা খাও, খেতে বেশ চোস্ত!
বুঝবে কি কী মজার উজবেকী ছক্কা
একটু ছোঁয়ালে মুখে নেই আর রক্ষা!
ওটা ত ফরাসী ফ্রাই, চাটনিটা সুইডিশ,
অল্পে মেটে না সাধ, খেতে হবে দুই ডিশ।
এটা খাও আজমীরী, কাশ্মিরী ওইটে,
ওরে ঝুমো ভুলে যাই—খুলে ধর বইটে।
প্রথম পৃষ্ঠা থেকে একে একে ওলটা—
রান্নার বই? না—না, আন না ভূগোলটা।

মোহনলালকে এবার চাকরীর চেষ্টায় কলকাতায় যেতে হবে, এছাড়া তাদের বাঁচবার উপায় নেই। মোহনলালের বাবা মোহনলালকে চার বছরেরটি রেখে মারা যান। মা তাকে মানুষ করেছেন অতিকষ্টে। এখন মোহনের বয়স মাত্র ষোল বছর। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছে সে, কিন্তু তার আর পড়াশোনা করাও হবে না। এখন তো ওদের বসত বাড়ীটুকুই সম্বল। ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে কোন রকমে এতদিন চলল, আর দিন কাটে না। তাই মোহনের মা মোহনকে বললেন, 'মোহন, আর তো চালাতে পারলুম না বাবা, তুমি কলকতায় চলে যাও, আমার এক জ্ঞাতি ভাই অটলদা কাজ করেন, খবরের কাগজের আফিসে, তিনি কাল চিঠি দিয়েছেন,—'মোহনকে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দাও. একটা কাজ হয়ে যেতে পারে তার!'

মোহন জোর করে মুখে হাসি টেনে বললে, 'কলকাতায় তো আমাকে যেতেই হবে, সেজন্য তুমি অতো ভাবছ কেন মা? আমার শুধু ভাবনা, তুমি একাটি থাকবে, তোমার শরীরটাও ভেংগেছে, একাটি তো কখনও থাকনি। তা আর কি হবে—ক' ঘন্টারই বা পথ এখান থেকে কলকাতা। প্রত্যেক শনিবার আসব আবার সোমবার চলে যাব।'

মায়ের চোখে জল ভরে এল। মোহনও কখনও মাকে ছেড়ে একদিনের জন্য কোথাও থাকেনি, আর একেবারে চলে যাবে সেই কলকাতা।

মোহন মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরে বললে. 'তারপর কাজটা যদি হয়ে যায় মা, কলকাতায় একটা বাসা করে তোমায় নিয়ে যাবো।'

মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'সে পরের কথা পরে হবে বাবা, যতক্ষণ বেঁচে আছি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারি না, আমি শুধু চলে গেলে, ভিটেয় সন্ধ্যে বাতি পড়বে না। যাক, এখন ভালয় ভালয় চাকরীটা হলে বাঁচি! কাল দুপুরেই তাহলে তুই কলকাতা রওনা হয়ে যা, দিনটাও কাল ভাল আছে। খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়তে হবে, বৈশেখ মাসের যা কাটফাটা রোদ! হাটতে হবে কম পথটি নয়! দুপুরে বেরোলে ষ্টেশনে পেঁাছতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সন্ধ্যে সাতটায় গাড়ী।'

পরদিন মোহনও মার কথাটা মেনে নিয়ে, চারটে নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল দুগ্গা বলে।

মা পথপানে চেয়ে রইলেন, যতক্ষণ ছেলেকে দেখা যায়। মোহন বড় পুকুরটা পেরিয়ে, বাঁশবন ছাড়িয়ে যখন বড় অশ্বথ গাছের পাশে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে ঘরে ফিরলেন।

মোহন চলেছে তো চলেইছে—মাঠ বন জঙ্গল পেরিয়ে,—পথের যেন আর শেষ নেই! ধু-ধু করছে একটা নিরালা মাঠ পার হয়ে আসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালবোশেখীর মেঘও দেখা দিল আকাশে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ঝড়ো বাতাস বইতে লাগল। মোহন জোরে জোরে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে। মাঠটার শেষেই শ্মশান, শ্মশান পেরিয়ে খানিকটা গেলেই ষ্টেশনের কাছে গিয়ে পড়বে। কিন্তু ঝড়-জল মোহনের জন্যে অপেক্ষা করলো না। মেঘের গর্জনের সঙ্গে তুমুল ঝড় উঠল। অন্ধকারে আঁধির মধ্যে মোহন আর পথ খুঁজে পায় না। ধুলো-বালিতে বিপর্যস্ত হয়ে একটা বড় গাছের নীচে সে আশ্রয় নিলে। এবার আরম্ভ হ'ল মুষল ধারে বৃষ্টি। তখন ঘুটঘুটে করছে অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কড়-কড় শব্দে কান বিদীর্ণ করে কোথায় বাজ পড়ল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোতে মোহন বুঝতে পারলে যে, সে একটা শ্মশানের মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু এখান থেকে ষ্টেশনে যাবার রাস্তা সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলে না। চারিদিকে ভাংগা কলসী, পোড়া কাঠ, হাড়-গোড় ছড়াছড়ি হয়ে পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে মোহন যেন শিউরে উঠল! যতবারই সে এগোতে যায়, ধুলো-বালি উড়িয়ে কে যেন ধাক্কা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়! আবার সে কোনরকমে হাতড়াতে-হাতড়াতে এসে গাছের নীচেটায় দাঁড়ায়। এমনিভাবে কতক্ষণ যে কেটে ক'টা বেজেছে, তাও আন্দাজ করতে পারে না মোহন। মনে মনে ভাবে, নাঃ, আজ আর ট্রেণ ধরতে পারবে না সে। দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে, এমনি কত কি সাত-পাঁচ ভাবছে সে, এমন সময় হঠাৎ এরই মাঝে কে যেন গলা খাঁকারী দিয়ে উঠল! মোহন পেছন ফিরে দেখে, তার খুব কাছেই কালো ঝুলমত একটা বুড়ো লোক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! মোহন ভাবল এ লোকটারও বোধ হয় ওরই মত অবস্থা! যাই হোক, এই ঝড়-বাদলের মধ্যে, শ্মশানে একলা দাঁড়িয়ে ভয়ে যেন সে আধমরা হয়ে গিয়েছিলো, তবু একজন মানুষ দেখতে পেয়ে তার যেন ধড়ে প্রাণ এল। মোহন ভাবতেও পারেনি যে এখানে কোন লোকের দেখা সে পাবে। বিদ্যুতের আলোতে যদিও লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না, তবু আলো-আঁধারের মধ্যে যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাতে সে একজন বুড়ো মানুষই যে বটে, তাতে আর ভুল নেই।

আগাগোড়া একটা সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া ছিল লোকটার। মোহনকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়াতে দেখে, লোকটা আরো এগিয়ে এসে,

---

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

চোঙ্গাটার গায়ে তেরছাভাবে বসিয়ে, কাগজের ফিতের বাড়তি অংশ চারটিতে আঠা লাগিয়ে চোঙ্গার গায়ে এঁটে দাও। মনে রেখো—ফিতেগুলোর বাড়তি অংশের সব ক'টি আরশির পেছন দিকে থাকবে, কোনোটাই সোজা দিকে থাকবে না। এবারে অন্য আরশিটাও নীচু মুখ করে চোঙ্গাটার অন্য প্রান্তে ঠিক আগেরটার মতো করে তেরছাভাবে বসিয়ে দাও। ভুলো না যে, দুটো আরশিরই সোজা দিক মুখোমুখি থাকবে, আর আরশি দুটো থাকবে সমান্তরালে। তা না হোলে কোনো ফলই হবে না। কি রকম ক'রে আরশি বসাতে হবে তা ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

এই তো পেরিস্কোপ তৈরী হয়ে গেলো। এই পেরিস্কোপের মজা হলো এই যে, এটার একটা প্রান্তের ফুটো বাইরের দিকে রেখে চোঙ্গাটা উঁচু ক'রে ধ'রে ওপরের আরশি দিয়ে যে দৃশ্যই ধরো না কেন, নীচে তোমার দিকের ফুটোর আরশিতে তারই প্রতিফলন দেখতে পাবে। খেলার মাঠে বা অন্য কোথাও ভীড়ের মধ্যে না গিয়ে যদি ভীড়ের পেছন থেকে সেখানে কি হচ্ছে দেখতে চাও, তবে এই পেরিস্কোপেই তোমাকে সাহায্য করবে।

মোহনের সামনে দাঁড়িয়ে, বিশ্রী খনখনে গলায় বললে, "কি হে ছোকরা ঝড়-বাদলে মরবে নাকি? এস আমার সঙ্গে, আমার বাড়ী খুব কাছেই।—পিছু পিছু চলে এস!"

মোহন যেন স্বর্গে গেল। খুসী হয়ে বললে, "যাচ্ছি মশাই, ভাগ্যিস আপনার দেখা পেলুম! নইলে এভাবে এখানে সারা রাতই দাঁড়িয়ে ভিজতে হতো। আমি অন্ধকারে আপনাকে ঠিক ঠাওর করতে পাচ্ছিলুম না,—চলুন, চলুন, বৃষ্টি এবার অনেকটা ধরে এসেছে।" —বলেই মোহন সেই লোকটার পিছু পিছু চলল।

বুড়ো হলে কি হবে, লোকটা এত তাড়াতাড়ি হাটছিল যে, মোহন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। যাই হোক কিছুটা পথ পেরিয়ে লোকটা একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে থামল। ঘরে আলো নেই; অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু লোকটা এরই মাঝে নিমেষে কখন ঘরের মধ্যে চলে গেছে, মোহন টেরও পায়নি। সে এদিক-ওদিক চেয়ে ঘরের দরজাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। লোকটাকেও দেখা যাচ্ছে না, ব্যাপার কি রে বাবা! লোকটা কি হঠাৎ মিলিয়ে গেল নাকি? এই সব ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ লোকটা ঘরের ভেতর থেকে খেঁকিয়ে বলে উঠল, "কি হে, তুমি কি দোরে এসে বাইরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? আচ্ছা যা হোক!"—

মোহন বিনীতভাবে বললে, "আজ্ঞে, অন্ধকারে দরজাটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না!"

লোকটা এবার দরজাটা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "কই এস এইতো দরজা!"

মোহন ঘরে ঢুকল বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে আরো অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না! মোহন তাই বললে, "আজ্ঞে আলোটা জ্বালুন না, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না!"

লোকটা রেগে গিয়ে বলে, "হুঁ, যত সব! বলি আলো কোথায় পাব আমি শুনি? কেন তোমার সামনেই ঐ তক্তপোষটায় বসোনা এসে।"

মোহন কোনরকমে একটা তক্তপোষ হাতড়ে পেলে বটে, কিন্তু যেই তার উপর বসতে গেলো, তক্তপোষটা মড়মড় করে ভেঙ্গে হেলে পড়ল। কি আর করে মোহন, এটুকু আশ্রয় যে পেয়েছে এই যথেষ্ট। এখন কোনরকমে রাতটুকু কাটলে বাঁচে, একবার সকাল হলেই এখান থেকে পালাবে সে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। মোহন ভিজে সপসপে জামা-কাপড় পরেই তক্তপোষটায় ঠেস দিয়ে বসে রইল। বুড়ো লোকটার আর কোন সাড়া নেই। হয়তো শুয়ে পড়েছে।

একইভাবে অনেকক্ষণ বসে, তারপর মোহন মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটটা খুলে অন্ধকারেই খেতে লাগল। খুবই ক্ষিদে পেয়েছিল তার। খেতে খেতে হঠাৎ ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাওয়ার আওয়াজ তার কানে এল। চারিদিক চেয়ে কিছু না দেখতে পেয়ে মোহন বলে উঠল, "কই মশাই কোথায় গেলেন আপনি? এক-খানাই তো ঘর, কোথায় বসে তামাক খাচ্ছেন বলুন তো? তামাকের আগুনটাতো অন্ধকারে দেখা যাবে, কি ব্যাপার বলুন তো দাদু? এ যেন গোলক-ধাঁধা!"

এবার খুব কাছেই ঘরের মধ্যে থেকে লোকটি খুক খুক করে হেসে জবাব দিলে, "বলি ভাই তামাক খেলেই যে আগুন চাই, এমন কি কথা আছে। তা তুমি ভায়া এই ঝড়-বাদল মাথায় করে যাচ্ছিলে কোথা বল তো?"

—"আর বলেন কেন, সবই আমাদের অদৃষ্ট!" বলেই ভারাক্রান্ত-কণ্ঠে সংক্ষেপে তার অবস্থাটা বুড়োকে খুলে বললে।

লোকটি সব শুনে বললে, "হুঁ, বুঝেছি—মোটমাট, তোমার ভায়া কিছু টাকার দরকার এখনি। তা—আমার একটা কাজ যদি তুমি করে দাও, তবে তোমায় কিছু মোটা টাকা আমি পাইয়ে দিতে পারি। পারবে কাজটা করে দিতে?"

মোহন দ্বিরুক্তি না করে তখনি বললে, "নিশ্চয়ই পারব, আপনি আমায় এ বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন!" তবে মনে মনে মোহন ভাবলে—হুঁ, এই তো লোকটার অবস্থা। উনি আবার আমায় টাকা পাইয়ে দেবেন, তবেই হয়েছে।

লোকটা মোহনের কথায় খুসী হয়ে বললে, "বেশ, প্রথমেই নামটা জেনে রাখ ভাল করে। আমার নাম হচ্ছে, নরহরি দাস। নরহরি দাসের গয়ায় গিয়ে পিন্ডি দিয়ে আসতে হবে, খরচ তোমার কিছুই লাগবে না। আমার এক ঘড়া টাকা আছে, কতকাল আর আগলে বসে থাকব, ব্রাহ্মণ সন্তান আজ আমার অতিথি, এ ভালই হ'ল, ঘরের পশ্চিম কোণে টাকাটা আছে, কিন্তু কাজটি বাপু ঠিক ঠিক করা চাই—কি হে বুঝলে?"

জড়িতকণ্ঠে মোহন বললে, "আজ্ঞে"—

লোকটি এবার বেজায় খুসী হ'ল। তখনি সে বললে, "তা তো হ'ল, শুকনো মুড়ি চিড়ে খেয়ে রাত কাটাবে, আমি ভাল মর্তমান কলা এনে দিচ্ছি, আমার গাছের কলা!" বলেই সে একখানা সাদা ধবধবে হাত লম্বা বাড়িয়ে দিলে জানলা দিয়ে ঘরের বাইরে। এই না দেখে মোহন অ্যাঁ অ্যাঁ করে সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে পড়ল।......

ভোর হতে মোহন চোখ চেয়ে দেখে সে একটা পোড়ো ঝরঝরে ভাঙ্গা কুঁড়েতে পড়ে আছে। রাতের কথা তার সব মনে পড়ে গেল, সে ভাবল উঃ কি দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে, কিন্তু পরমুহূর্তে উঠে বসে দেখে, এক কোণে এক কাঁধি সোনার বরণ মর্তমান কলা! তবে, তবে এ তো স্বপ্ন নয়! এখন দেখি টাকার ঘড়াটা—ওমা, কি কান্ড! সত্যিই ঘরের পশ্চিম কোণে টাকাভর্তি ঘড়াটাও দেখতে পেলে।

তারপর? তারপর আর কি—ঘড়াটা না কাঁধে তুলে নিয়ে ঘর-পানে দে দৌড়!

তবে মনে মনে মোহন স্থির করলে, বাড়ী পেঁৗছেই, মাকে সব বলে, আজই গয়ায় রওনা হতে হবে নরহরি দাসের পিন্ডি দিতে। নইলে কখন এসে যে সে ঘাড় মটকে দেবে তা কে জানে।

[দুটি যুদ্ধের গল্প]

—এক—

অনেক অনেক দিন আগের কথা। মিশর তখন খুব সমৃদ্ধিশালী দেশ।

মিশরের পূর্ব দিকে লোহিত সাগর, পার হয়েই আরবের মরু-ভূমি, সেই মরুভূমির উত্তরে অসুর রাজ্য—আসিরিয়া। অসুরদের রাজা সেনাচেরিব-এর বিশেষ লোভ ছিল মিশরের উপর। তিনি জানতেন

মিশর দেশে [illegible] অভাব হয়েছে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন মিশর দেশ লুঠ করতে।
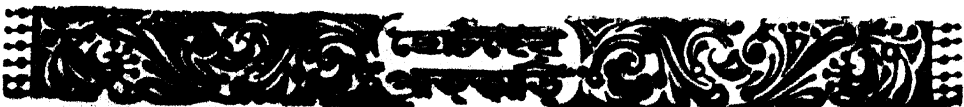
সিথস্ তখন মিশরের রাজা। অসুরেরা আসছে শুনে তিনি চমকে গেলেন। অসুরেরা বড় দুর্দান্ত পাহাড়ী জাত, তাদের সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়। মহারাজ বড় ভাবনায় পড়লেন।

অসুরেরা এগিয়ে আসছে। দেশের মধ্যে এসে পড়ার আগে তাদের বাধা দিতে হবে। রাজা সিথস্ সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যাবার আগে মন্দিরে গেলেন, দেবতা 'আমেন'-এর পুজো করলেন আশীর্বাদ চাইলেন—প্রভু দেবতা আমেন, আমি যেন শত্রুকে পরাজিত করতে পারি।

রাজা যুদ্ধযাত্রা করলেন। মিশর ছোট রাজ্য নয়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মার্চ করে, কদিন পরে রাজা এলেন অসুর সেনার সামনে। সন্ধ্যাবেলা দুদল সেনা পরস্পরের মুখোমুখি হলো।

অসুরদের বাহিনী বিশাল।

মিশরীয় বাহিনী তার অর্ধেকও হবে না।

নিশ্চিত জয়ী হবে জেনে অসুরেরা উল্লাস সুরু করলো আর নিশ্চয় পরাজয় হবে ভেবে মিশরীয়েরা দমে গেল।

রাত্রে তো আর যুদ্ধ হবে না, কাল সকালে যুদ্ধ সুরু হবে। দুদল সৈন্য রাত্রির মত তাঁবু ফেলে প্রত্যুষের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। মিশরীয় সেনাদের মধ্যে তখন হতাশা দেখা দিয়েছে। দুর্দান্ত অসুরদের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে কাল সন্ধ্যায় কেউ আর বেঁচে থাকবে না। তারা মরবে, তাদের সম্পদ লুঠ হবে, তাদের বাড়ীঘর ভস্মীভূত হবে। তাদের চোখে ঘুম এলো না। সারা রাত ধরে তারা শুধু দেবতা আমেন-এর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—হে দেবতা তুমি রক্ষা কর!

ওদিকে অসুরেরা মহানন্দে নিদ্রা গেল। কাল তাদের জয় অনিবার্য। তারপর মিশর লুঠ করে তারা প্রত্যেকে বড়লোক বনে যাবে। ঢালে ভাল করে চর্বি মাখিয়ে, ধনুকের ছিলায় চর্বি মাখিয়ে, তূণগুলি চর্বি দিয়ে পালিশ করে, পরদিন সকালের যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে তারা নিদ্রা গেল।

সে অঞ্চলে অনেক মেঠো ইঁদুর ছিল। বালুর দেশ। ইঁদুরগুলি খাদ্যাভাবে সদাই ক্ষুধার্ত থাকতো। কখনো কখনো কাছাকাছি ক্ষেত-খামারে চড়াও হতো। আজ হঠাৎ চর্বির গন্ধে তারা সজাগ হয়ে উঠলো। রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে এলো সুখাদ্যের সন্ধানে। চর্বির সঙ্গে ধনুকের ছিলা চিবিয়ে খেল, ঢালের হাতল চিবিয়ে খেল, তূণের চামড়া চিবিয়ে খেল, সারারাত ধরে সব কিছু খেয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা পালালো।

ঊষার আলো ফুটে ওঠার আগেই মিশরীয়েরা উঠে পড়লো, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, রাজা সিথস্ আদেশ দিলেন—অগ্রসর হও! আক্রমণ কর!

ওদিকে অসুরেরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে গিয়ে দেখে—এ কি? ঢাল ধরবার চামড়ার হাতল কোথায় গেল? ধনুকের ছিলা কই? তীরগুলি মাটিতে ছড়ানো রয়েছে, তূণের চামড়ার চিহ্নমাত্র নেই? এ কি হলো?

এদিকে মিশরীয়েরা এসে পড়লো, কিন্তু অসুরেরা লড়বে কি করে? তারা পালালো। তাদের ধনুক, ঢাল, তীর সব পড়ে রইল। বিনা যুদ্ধে মিশরীয়েরা জয়লাভ করলো।

পরে অসুরদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে তারা ব্যাপারটা বুঝলো, শুধু কয়েকটা ইঁদুরের জন্য বিশাল অসুর বাহিনী তাদের কাছে পরাজয় মেনেছে। ইঁদুরকে তারা ধন্যবাদ দিল। দেশে ফিরে এসে মন্দিরে রাজা সিথসের এক পাথরের মূর্তি তৈরী করলো, তার হাতে একটা পাথরের ইঁদুর, আর সেই মূর্তির নীচে লেখা রইল—ভগবানে বিশ্বাস রেখো!

—দুই—

অনেক অনেক কাল আগে চীনদেশে এক কুমোর ছিল। ভারী সুন্দর মাটির পুতুল সে গড়তে পারতো। নগরের এক পাশে একখানি কুঁড়ে ঘরে সে থাকতো, সে পথে কাজের মানুষের চলাচল বেশী ছিল না। তবু ছেলেমেয়ের দল তার ঘরের সামনে সদাই ভীড় করতো। এক একটি পুতুল রং করে সে যখন দরজার সামনে বসিয়ে রাখতো, তখন ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কোনো বয়স্কলোক দেখলে থ হয়ে যেত, বলতো—পুতুল তো নয়, যেন জ্যান্ত মানুষ!

পুতুলওয়ালা নানা রকম পুতুল তৈরী করতো। রাজা পুতুল, রাণী পুতুল, সিপাই পুতুল, নাচিয়ে পুতুল, বাজিয়ে পুতুল, চাষী পুতুল, তাঁতী পুতুল, জেলে পুতুল—নানা ধরণের রকমারি পুতুল। পুতুলওলা টাকাপয়সা বিশেষ গ্রাহ্য করতো না, কেউ পুতুল কিনুক আর নাই কিনুক, পুতুল তৈরী করেই সে খুসি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পুতুল দেখে খুসি হয় পুতুলওলার তাতেই আনন্দ। ছোটদের হাসিমুখের পানে তাকায় আর পুতুল গড়ে।

হঠাৎ নগরে একদিন সাড়া পড়ে গেল, তাতাররা আসছে নগর আক্রমণ করতে। চীনের উত্তরে তাতারদের বাস। অসভ্য দুর্দান্ত জাত, লুঠতরাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। দেখতেও যেমন কুৎসিত, মনও তেমনি হিংস্র, স্বভাবও তেমনি নিষ্ঠুর।

সম্রাট কাওৎসু তখন সেই নগরে বেড়াতে এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৈন্যসামন্ত ছিল না। তিনি যে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে কোন এক ব্যবস্থা করবেন সে সময়ও নেই, তাতাররা এসে পড়েছে।

এই নগরের সামান্য কজন সৈন্য অতো তাতারকে রুখবে কি করে? তবে কি নগর লুঠ হবে? সম্রাটকে তাতাররা বন্দী করে নিয়ে যাবে?

পুতুলওলা সব শুনলো, তারপর গিয়ে দেখা করলো সম্রাটের সঙ্গে, বললো—মহারাজ, আমি নগর রক্ষে করতে পারি, আপনি যদি অনুমতি দেন।

—তুমি একা?

—হাঁ মহারাজ, আমি একাই পারবো।

সম্রাট তখনই অনুমতি দিলেন।

কদিনের মধ্যে তাতার সেনা এসে নগর ঘিরে ফেললো। রাত্রে নগরের পাঁচিলের বাইরে চারিপাশের মাঠে তারা তাঁবু ফেললো। সকালে নগর আক্রমণ করবে বলে তারা ঠিক করলো।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে নগরের পানে তাকিয়ে তারা অবাক। নগরের পাঁচিলের উপর সারি সারি অসংখ্য সৈন্য। সূর্যের আলোয় তাদের মাথার টুপি ঝলমল করছে, বর্শার ফলাগুলো ঝকঝক করে। এতো সৈন্য এই নগরে ছিল! তাহলে তো নগর দখল করা [illegible] হবে না।

তাতাররা সারাদিন ভালো করে লক্ষ্য রাখলো। পাঁচিলের উপর সারি সারি সৈন্য তাদের আক্রমণ প্রতীক্ষা করছে। সারাদিন রোদে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়চড় নেই।

এতো সুশিক্ষিত সৈন্য থাকতে এ নগরের উপর আক্রমণ না চালানোই ভাল। তাতার সর্দার আদেশ দিলেন—ফিরে চল!

তাতাররা ফিরে চলে গেল।

নগর রক্ষা পেল।

পরদিন রাজা পুতুলওলাকে ডেকে বললেন—তোমার পুতুলই নগর রক্ষা করেছে! তোমার পুতুল সৈনিক দেখেই তাতাররা ফিরে গেছে!

সম্রাট পুতুলওলাকে অনেক বখশিস দিলেন।

টাকাপয়সা পেয়ে পুতুলওলা কিন্তু কাজ ভুললো না। নিজের সেই কুঁড়ে ঘরে বসে আবার সে আগের মতই পুতুল গড়তে লাগলো।
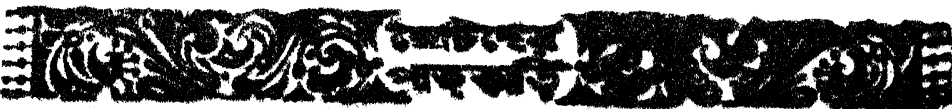
(সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে)

নারকেল গাছের মাথাটার দিকে তাকিয়ে এক মনে ভেবে চলেছে ছোট্ট মেয়ে ভারতী। সবে সন্ধ্যা, আকাশে চাঁদ উঠেছে। তা হলে কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভারতী ভাবছে কত সুতো কেটে চলেছে ঐ চাঁদের মা বুড়ি? না, তা মোটেই নয়। বারান্দার ছোট্ট চৌকিটাতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের দুটো তালুর মধ্যে মুখখানা রেখে এক দৃষ্টে গাছের মাথার দিকে চেয়ে আছে ভারতী, চাঁদ দেখবার মত মনের অবস্থা কি আর আছে?

এসে পড়েছে বার্ষিক পরীক্ষা। সারা বছর বই খোলার সময় পায় না ভারতী। প্রমোশনের পরেই সরস্বতী পুজো। সে হাঙ্গামা মিটতে না মিটতেই দোলের রং আর বারদোলের মেলার যাত্রা সার্কাস আর নাগরদোলার দুলুনীতে সব কিছুই যায় গুলিয়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে কাঁচা আমের সন্ধানে সারা দুপুর ঘুরে কি আর পড়াশুনা করা যায়? তারপর বর্ষার দিনে তাদের শান্তিনগরে যা কাদা! দিদিমণিদের ঝকমকে শাড়ীতেই যা চিত্তির এঁকে দেয় ছিটে পড়া কাদা, আর ছোট মেয়েরা ত অনেকে আছাড় খেয়েই পড়ে যায় ঐ পাঁকের মধ্যে। জল-কাদায় সর্দিতেই ভুগবে না সে পড়বে? এমনি করেই এসে পড়ে পুজোর ছুটি। দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো, কালী পুজো, ভাই-ফোঁটা আর জগদ্ধাত্রী পুজো পর পর এসে পড়ে, চারিদিকেই আনন্দ। এর মধ্যে কি পড়া হয়? বরং জানা জিনিষ ভুলে যেতে হয়। যখন স্কুল খোলে তখন মাথাটা একেবারেই সাফ, মগজে আর কিছু নাই। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বার্ষিক পরীক্ষা, হাঁ করে গিলে খেতে আসছে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে।

নিজের জীবনের উপর ধিক্কার জন্মায় ভারতীর। নাঃ, এ জীবন সে আর রাখবে না। কাকাকে জিজ্ঞাসা করে, "বল না কাকা, পরীক্ষার হাত থেকে কি করে বাঁচা যায়?" "কেন? ভাল করে পড়াশুনো কর" কাকা উত্তর দেন। উত্তরটা মনঃপুত হয় না ভারতীর, সারা জীবন পরীক্ষা দিতে সে পারবে না, পরীক্ষার পাট সে জীবনের মত চুকিয়ে ফেলবে, সে মরবে। সে দেখেছে মরে গেলে মানুষ যেন কোথায় চলে যায়, তাকে পড়তেও হয় না, কাজও করতে হয় না। মা বলেছেন, মানুষ মরে স্বর্গে যায়। সেও চলে যাবে স্বর্গে, কিন্তু যাবে কেমন করে? কাকার উপর তার গভীর শ্রদ্ধা। দু'হাত দিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বল না কাকা, কি করলে তাড়াতাড়ি মরা যায়?" ওর মনের ব্যথা কাকা সব বোঝেন, মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "ছিঃ, মরবে কেন? আমার কাছে পড়, ঠিক পাশ করে যাবে।" "না, না, তা আমি পারবো না, বছর বছর পরীক্ষা দিতে আমি পারবো না।" জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানায় ভারতী, "তোমাকে বলতেই হবে।" একটু দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায় কাকার মাথায়, কাকা হলে কি হবে, ছোটদের সাথে দুষ্টুমিতে তিনি কম নন। "তোমাদের উঠানে ঐ যে ছোট্ট নারকেল গাছটা আছে, তার কচি পাতার মাথাটা যদি দাঁত দিয়ে কাটতে পার, তবে নির্ঘাৎ মৃত্যু, কিন্তু কাটতে হবে রাতের অন্ধকারে।" "কোনও কষ্ট হবে না ত মরতে?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে ভারতী। "কিছু না দাঁতে কেটে ঘরে এসে শুয়ে পড়বে, আর ধীরে ধীরে চুষবে ঐ ডগাটা। ঘুমিয়ে পড়বে তুমি, সে ঘুম কোনও দিন ভাঙ্গবে না।" গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে ভারতীর। এমন কাকাকেও ছেড়ে যেতে হবে, বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন টন করে ওঠে। কিন্তু উপায় নাই।

তাই গাছের মাথাটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে ভারতী। ঐ ছোট্ট গাছটাতে ওঠা, তার কাছে কিছুই নয়। অনেক দিন পাড়ায় তার নাম রটেছে গেছো মেয়ে। কিন্তু সত্যি, যে লোকটা পরীক্ষার সৃষ্টি করেছিল, কি ভয়ানক পাজী সে লোকটা! সারা বছর সে স্কুলে যায়, কোনও দিন কামাই করে না, বর্ষাকালেও কাদা মেখে যায়। দিদি-মণিদের পড়া শোনে কিনা সেটা অবশ্য হলপ করে বলতে পারে না, মন তার পড়ে থাকে টিফিন পিরিয়ডে এক্কাদোক্কা খেলায় ঘরের দিকে না হয় চন্দনা নদীর ধারে পাকা কুল গাছের তলায়। তাতে কি হয়েছে? স্কুল ত সে কামাই দেয় না। সেই জন্যই ত সে প্রমোশন পেতে পারে। তা না দেও পরীক্ষা, পরীক্ষা ত নয়, যেন একটা আস্ত ভূত চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে ছেলেমেয়েদের হাড় মাংস। উঃ, যে লোকটা পরীক্ষা সৃষ্টি করেছিল, তাকে যদি পেত তবে তার মাথাটা চিবিয়ে খেত ভারতী। কিন্তু হায়, সেই বা আজ কোথায়? আর থাকলেও কি তার হেঁড়ে মাথাটা ঢুকত ভারতীর ঐ ছোট্ট মুখখানার মধ্যে?

"ধাড়ি মেয়ে পড়াশুনা নাই, বসে বসে ভাবছেন। এসো, খেয়ে-দেয়ে উদ্ধার কর" ঝঙ্কার দেন মা, "দিদি বোধ হয় ওর কাকার মত কবি হতে চলেছে," টিপ্পনী কাটে ছোট বোন ছোটী। ঝাঁ করে মাথাটা গরম হয়ে যায় ভারতীর। ইচ্ছা হয় দেয় বসিয়ে দুটো পাকা তাল ওর পিঠে। নাঃ, কিছুই সে আজ বলবে না কাউকে। আজকেই তার জীবনের শেষ রাত্রি। মা ওকে দেন মাছের বড় পেটি আর ঘন দুধের সর। মা কি তবে টের পেয়েছেন ওর মনের কথা, জানতে পেরেছেন, এই তার শেষ খাওয়া? মনে মনে হাসে ভারতী। ঝুপ করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি খাওয়াটা শেষ করে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় ভারতীর। মায়ের একখানা হাত এসে পড়েছে ওর গায়ের উপর। আস্তে আস্তে সরায় সে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয় তার। এমন মাকে ছেড়ে যেতে হবে। উঃ, পরীক্ষা ভূতটা গিলে খেলো তার জীবনের সব কিছু।

খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় ভারতী। ঝাঁ ঝাঁ করছে নিশুতি রাত, নারকেল গাছের গোড়ায় এসে দাড়ায় সে, উপরের দিকে তাকিয়েই বুকটা তার ভয়ে কেঁপে ওঠে। শেষ রাতে চাঁদের আলো পড়েছে গাছের মাথায়, শুকনো ডালগুলো ঝুলছে। আধো আলো আধো ছায়ায় মনে হচ্ছে কে যেন গাছের মাথায় বসে পা দোলাচ্ছে, তা হলে কি পরীক্ষা ভূতটা এখানে এসে বসেছে, তাকে আস্ত গিলে খাওয়ার জন্য? ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে ভারতী। মা ছুটে আসেন, বাবা ছুটে আসেন, বাড়ীর সবাই জেগে উঠেছে। দু হাত দিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নেন মা। মা'র বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে ওঠে ভারতী, "তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না মা, আমি পড়াশুনা করব।" "কি হয়েছে বল"—বার বার জিজ্ঞাসা করেন মা। মায়ের গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে ভারতী। কোনও উত্তর দেয় না। মা যে তাকে এত ভালবাসেন, মায়ের বুকে যে এমন নিরাপদ আশ্রয়, সেটা সে জীবনে এই প্রথম বুঝল। স্বর্গে যাওয়া আর হল না, পরদিন থেকে কাকার কাছে পড়াশুনা আরম্ভ করে দেয়, ছোট্ট মেয়ে সুন্দরী ভারতী।
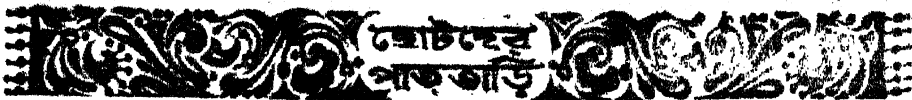
বছর বছর দুর্গা পুজো হয়—
সবাই বলেঃ দুর্গা মায়ের জয়!
কিন্তু মাগো, একটা কথা বলি—
সত্যি কথায় নেই তো কোন ভয়।

যখন ছিলাম আরো অনেক ছোট,
তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম—
'দশটি হাতেও দুর্গা জয়ী কই?'
আমার কথার দাওনি সেদিন দাম!

এখন তো মা বয়েস হলো ঢের—
আটটি বছর ধরেই শুধু দেখি,
অসুরটাকে নিধন করতে দেবী
পারোনিকো; আজব ব্যাপার একি!

ময়ূরে চড়া জামাই যে কার্তিক,
তার হাতে সেই ময়ূরে পড়া তীর
তাকেও দেখি ফ্যাল-ফ্যালিয়ে চেয়ে
চুপটি করে; কেমন সে মা বীর?

আর যারা সব, কেউ বা হাসে-নাচে,
কারুর হাতে পদ্ম-বীণা শাঁখ—
কেমন তবে শক্তি ওদের বলো,
ভাবতেও মা হই আমি অবাক!

দশভুজার দশটি হাতে যদি
থাকতো অসীম শক্তি ও বল, তবে
অসুরটাকে বধ করে কোন্ যুগে
মাততো সে মা' বিজয়-উৎসবে!

তাই তো ভাবি মিথ্যা কেন আর
শুধুই বলিঃ দুর্গা-মায়ের জয়!
বলবো, যেদিন দুর্গা-মায়ের হাতে
প্রাণ হারাবে অসুরটা নিশ্চয়।

আর্কিমিডিস যাদুকর ছিলেন না তিনি ছিলেন মহান বিজ্ঞানী। তাঁরই আবিষ্কৃত এক তথ্য প্রয়োগ করে কেমন অদ্ভুত এক যাদুর খেলা তোমরা দেখাতে পারো তাই বলছি শোন। একটা সাধারণ কাঁচের গ্লাস, একটা টাটকা হাঁস বা মুরগীর ডিম আর দুটো একই রকমের কাঁচের জাগ নাও। প্রথমে গ্লাসটার তিন ভাগের একভাগ অংশ ভর্তি করে পরিষ্কার নুন দিয়ে পরে বাকী অংশ পরিষ্কার জলে ভর্তি করো আর ভাল করে চামচ দিয়ে ঘেটে জলের সঙ্গে এই নুনে মিশিয়ে নাও, ভালভাবে মিশে গেলে বোঝা যাবে না যে জলে লবণ মেশানো আছে। দু'টো জাগের যে কোনও একটার মধ্যে এই নুন গোলা জলটুকু রেখে দিয়ে অন্য জাগটাতে নাও ঐ কাঁচের গ্লাসের দু' গ্লাস জল। নুন জলওয়ালা জাগটাকে পাশের ঘরে বা গ্রীণ রুমে রেখে দিয়ে দর্শকদের সামনে এসে উপস্থিত হও ডিম, গ্লাস আর দু' গ্লাস জল ভর্তি জাগটা নিয়ে। গ্লাস ডিম ও জাগের জল দর্শকদের দেখাও। জাগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে নাও। (এই সময়ে সহকারী জাগটি নিয়ে চলে যাবে ও সুযোগ বুঝে নুন জল ভর্তি জাগটা নিয়ে উপস্থিত হবে)। তুমি ডিমটা হাতে নিয়ে দর্শকদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডিমটা ছেড়ে দাও, ডিমটা জলে ডুবে যাবে। এইবার গ্লাসের মুখে হাত চাপা দিয়ে গ্লাস উপুড় করো আর জল পড়ে যেতে দাও। জল পড়ে যাবে আর ডিম থাকবে তোমার হাতে। এর পরে গ্লাসটাতে আবার জল ভরে নাও। (এ জল কিন্তু নুন জল। তোমার এবং দর্শকদের অলক্ষ্যে সহকারী জাগ বদল করেছে) ডিমটা ছেড়ে দিলে প্রথমে তা ডুবে যাবে কিন্তু পরক্ষণেই তা উঠবে ভেসে। দেখে দর্শকেরা হবেন অবাক। কেন এমন হয় জানো?

বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের মতে প্রত্যেকটি ডোবা জিনিষই , সমান আয়তনের জল (তরল পদার্থ যাতে ঐ জিনিষ ডুবে থাকে) সরিয়ে দিয়ে সেই পরিমাণ জলের যা ওজন সেটুকুন ওজন হারিয়ে ফেলে। একটি ডিম জলে ডোবার ফলে যেটুকুন জল সরে যায় তার ওজন ডিমটির ওজনের চেয়ে কম হওয়ায় ডিমটা জলে ডুবে থাকে। নুন গোলা জলের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা হয় অন্য রকম। নুন গোলা জলে যে পরিমাণ অংশ ডিম ডোবার ফলে সরে যায় তার ওজন ডিমের ওজনের চেয়ে কিছু বেশী হওয়াতে ডিম তার সবটুকুন ওজন হারিয়ে ফেলে জলে ডোবা অবস্থায় আর ফলে তা ওঠে ভেসে। 'আর্কিমিডিসের ভেল্কী'র একটি প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখলে তো?
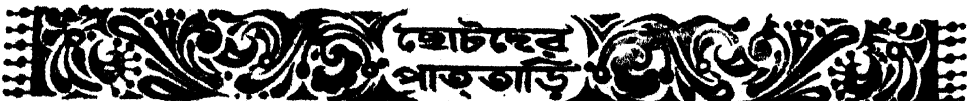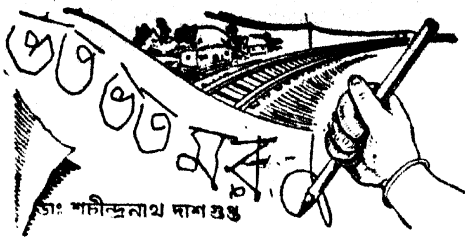
ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যদি যাও, দেখবে রেল লাইনের দুই ধারে ছোট ছোট পর্ণ কুটির। কোনটা ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা বা হেলে পড়েছে। আবার দেখবে ঘর ভেঙ্গেও পড়েছে দু-একটি। এই ঘরের একটিতে থাকে কমলা আর তার মা। দিন-দুঃখী। ভিক্ষে করে দিন আনে দিন খায়। মাথার উপর বলবার কেউ নেই। একেবারে নিঃস্ব ছন্নছাড়া। কিন্তু, কয়েক বছর আগে কমলার বাবা জীবিত ছিলেন। রেলের কাজ করতেন। লাইন দেখে বেড়াতেন। মাইনে যা পেতেন, তাতেই ছোট পরিবারের কোনমতে চলে যেতো। কমলা তখন সবে তিন বছরের। একদিন রেলের কাজ করে ফিরে আসছিলেন কমলার বাবা। রেলেতে কাটা পড়লেন। রেল কোম্পানী কিন্তু ইচ্ছা করলে কমলার মাকে বঞ্চিত করতে পারতেন। কিন্তু, তারা তা করলেন না। উল্টো শ-তিনেক টাকা কমলার মাকে দিয়ে দিলেন। দেবার সময় মাকে শাসিয়ে দিয়ে বললেন, এ নিয়ে গোলমাল যদি কর, ভাল হবে না। পরে টাকাটাও পাবে না। আবার বিপদেও পড়তে পার।

কমলার মা, সব কথা শুনল। শেষে বাধ্য হয়ে কোম্পানীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। সেই টাকা দিয়েই ঘর করেছে। বাকি টাকা নিজে খেয়েছে। কাজের চেষ্টা করেছে। যখন দেখল, টাকা প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আর উপায় নেই। কাজেই সে বাধ্য হয়ে ভিক্ষেয় বের হয়েছে। ভিক্ষেয় এমন কিছু হয় না, যার দ্বারা সংসার ভাল করে চলাতে পারে। শেষে আরম্ভ হল, আধ পেটা খাওয়া। এক দিন পর এক দিন খাওয়া।

কিন্তু নিজে না হয় কষ্ট করল। কিন্তু কমলা,—কমলা কি খাবে। চিন্তা, ভাবনা, রোগে, অনাহারে কমলার মা বিছানা নিলো। যা কিছু খাবার ঘরে ছিল তাই কমলা খেত। আর নিজে বিছানায় পড়ে ছটফট করত। পাঁচ বছরের কমলা—অত কথা সে বোঝে না। তাই মার নিকটে চুপ করে বসে থাকে। মা'র গা, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মা, ছল ছল চোখে চেয়ে থাকে কমলার দিকে। ঐ কচি মুখ দেখে তাঁর বুক ফেটে যায়। যদি হঠাৎ সে মরে যায়, তবে কার নিকট রেখে যাবে কমলাকে। কে ওকে দেখবে। কে দেবে ভাত। যখন ক্ষুধার জ্বালায় মা—মা বলে ডাকবে।

কমলা এসে বলল, মা ওঠ—খাবে না। ওঠ—মা ?

মা অতি কষ্টে চোখ মেলে বলল, না—মা, আমার ক্ষিদে নেই। তুই খেয়ে নে। ঘরের ঐ ধারে চাট্টি মুড়ি আছে।

না—মা, মুড়ি খাব না। ভাত খাব। কমলা আবদার ধরল।

ভাত কোথায় পাব—মা। আমার অসুখ। কে তোকে ভাত দেবে।

তোমার অসুখ—ঔষধ খাও না কেন—মা ?

টাকা—কোথায় পাব—মা।

আমাদের কেউ নেই—মা। যে টাকা দেয় ?

গরীবের কেউ নেই—মা, আছেন—একমাত্র ভগবান।

ভগবান—কে—মা ?

গরীবের মা—বাপ।

তিনি কোথায় থাকেন—মা ?

স্বর্গে।

কমলা উঠে চলে গেল।

দুপুরবেলা, কেউ কোথাও নেই। সারা পাড়াটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বাইরে বেশ কড়া রোদ। গরম পড়েছে মন্দ নয়। আগুনের হল্কা ঢুকছে ঘরের ভিতর। কমলা তাকিয়ে দেখল। মনে হয় মা ঘুমোচ্ছে। রেলের লাইনের ওপাশে একটা গরু ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। একটা ক্ষুধার্ত কুকুর কোথা হোতে একটা মাংসের হাড় এনে বেশ নিশ্চিন্ত মনে চিবুচ্ছে। কমলা একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। সবে সে ক খ শিখেছে। সে লিখল :—

"বব, ভগবন। টক—ন পঠব ত। ভত্ত ভত্ত মরণ। টক পঠও। মর, অসখ—ন পঠব ত মরণ হব। কমল।"

মোটা মোটা অক্ষরে এই কথাগুলো লিখল। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে বন্ধ করলো। তারপর উপরে মোটা করে লিখল। বব ভগবন। সরগ।' ঠিকানা লিখে কমলা ঘরের বাইরে চলে গেল। কিছু দূরে একটা চিঠির বাক্স ছিল। কমলা তাতে চিঠি ফেলতে গেল। কিন্তু, বাক্সটা একটু উঁচু। কমলা নাগাল পেল না। কমলা একবার, দুইবার চেষ্টা করল।

তুমি চিঠি ফেলবে খুকী। হঠাৎ কমলার পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল।

হ্যাঁ।

আচ্ছা—দাও। আমি ফেলে দিচ্ছি ?

এই নাও। কমলা চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দিল। ভদ্রলোক চিঠিটা উল্টে-পাল্টে দেখলেন। চিঠির উপরে কাঁচা হাতে বড় বড় করে লেখা,—"ভগবন—সরগ"। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে চিঠিটা খুললেন। পড়লেন, সব কিছু। তারপর তিনি জিজ্ঞাস করলেন।—চিঠি, তুমি লিখেছ—খুকু ?

আমি লিখেছি—ভগবান বাবাকে। মা, বলেন, আমাদের কেউ নেই। শুধু আছেন—ভগবান-বাবা। মার অসুখ। তাই তাঁকে টাকা পাঠাতে লিখছি।

ভদ্রলোকের কৌতূহল বেড়ে গেল, বলল—তুমি কোথায় থাক ?

ঐ দিকে।

চল আমি যাব তোমার মার কাছে।

তুমি কে ?

আমাকে ভগবান বাবা পাঠিয়েছেন তোমাদের জন্য—চল।

কমলার খুব আনন্দ হ'ল, বলল, সত্যি বলছ ?

সত্যিই বলছি। তিনি পাঠিয়েছেন।

সত্যিই ভগবান বাবা খুব ভাল মানুষ। মা বলেন—তিনি গরীবের মা—বাপ।

মা কি কখনও মিথ্যে বলেন—চল।

দুইজনে এসে কুঁড়ে ঘরের নিকট দাঁড়ালেন। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর এদিক, ওদিক ভেঙ্গে পড়েছে। ভদ্রলোক দেখলেন, ছেঁড়া মাদুরের উপর, ছিন্ন মলিনবস্ত্রে একটি জীর্ণশীর্ণ মহিলা পড়ে রয়েছেন। ভদ্রলোক নিকটে এলেন, নাড়ী দেখলেন। শেষে খুকীর দিকে তাকিয়ে বললেন :—তুমি চুপ করে বসে থাক খুকী। আমি ডাক্তার আর খাবার নিয়ে এখনি আসছি। ভদ্রলোক দ্রুত চলে গেলেন।

যখন ডাক্তার নিয়ে ভদ্রলোক ফিরে এলেন—কমলার মা চোখ মেলে চাইল। কমলা বলল, দেখ মা। ভগবানবাবা কাকে পাঠিয়েছেন। কমলার মার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।
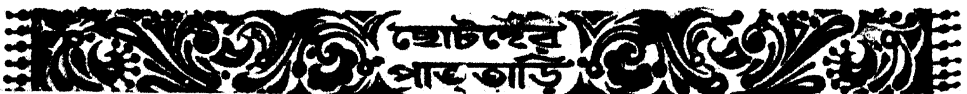
নাম ছিল তার ভেঙ্কটেশ
সে-নাম পিতৃদত্ত,
যা খুশী যে ডাকছে এখন
নেই এতে তার স্বত্ব।

পাড়ার সবাই রেখেছে তাই
ভেঙ্কুভূষণ নাম যে,
বাঙালী সে নয়কো মোটেই
অন্ধ্র দেশে ধাম যে!

এই ত সেদিন ছিল জানি
লোক সে কারিৎ-কর্মা
ঝোঁকের মাথায় মারলো পাড়ি
বম্বে থেকে বর্মা!

পৌঁছে গিয়েই নকরি পেলো
মাইনেও নয় মন্দ,
ভাবলো, জীবন কাটবে ভালোই
নেই যে তাতে সন্দ!

হঠাৎ কখন জাপানীরা
হয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ,
বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে জোর
বাধিয়ে দিল যুদ্ধ!

জাপ-বোমাতে কাঁপছে সহর
করবে কে আর রক্ষা?
ভেঙ্কটেশের ভাবনা ভীষণ
সে-ও বুঝি পায় অক্কা!

বৃটিশ-সেনার বীরত্বে আর
নেই কাহারো আস্থা,
দল বেঁধে তাই পদব্রজেই
ধরলো দেশের রাস্তা!

পেরোয় নদী ডিঙোয় পাহাড়
নিয়ে দেদার ঝক্কি,
ছুটেছে সবে, বোমার ভয়ে
উড়ছে পরাণ পক্ষী!

ইংরেজেরা ভাগছে সবে
সৈন্য সেপাই সঙ্গে
পিছু হটেই যাচ্ছে সটান
বর্মা থেকে বঙ্গে!

পথের কথা বলবো কি আর
প্রচণ্ড দুর্গম যে,
শুনলে পরেই আঁৎকে উঠে
আটকে যাবে দম যে!

স্বচক্ষে সব দেখে এসে
দীর্ঘ পথের যাত্রায়,
ভেঙ্কটেশের বুদ্ধি বিলোপ
ঘটলো পুরো মাত্রায়!

বায়ুর চাপেই উন্মাদ সে
বুদ্ধি যে তার ভ্রংশ,
এ-রোগ কারুর ছিলোই না যে
নিখুঁত তাদের বংশ!

অতীত? আহা! লোপ পেয়েছে
তার এ মনের রাজ্যে,
পাগল সে যে, প্রমাণ পাবে
তার প্রতিটি কার্যে!

ভেঙ্কটেশের ভাগ্য আজি
পথের ধূলায় লুটেছে,
এ-সব ব্যাপার দেখার পরও
চোখ কি কারুর ফুটেছে?
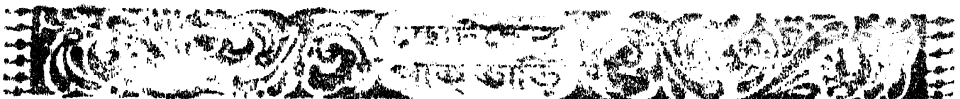
স্কুলে ইতিহাসের ক্লাসটাই সুমনের বেশ ভাল লাগে। ওর ক্লাসের বন্ধু-বান্ধবরা সবাই বলে ইতিহাসের পাতায় পাতায় নাম আর সাল মুখস্থ করা তাদের একেবারেই ভালো লাগে না। কিন্তু একথার সঙ্গে সুমনের মনের একেবারে মিল নেই। ইতিহাসের মাষ্টারমশাই নীলেনবাবু ক্লাসে ঢুকে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা তাঁর জায়গায় চলে গিয়ে পড়ানো সুরু করে দেন। সুমন একান্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর ক্লাস করে আর যাতে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সেজন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকে। নীলেনবাবু এটা লক্ষ্য করে থাকবেন—কারণ পরীক্ষার খাতায় তিনি ভাল করেই দেখেছেন সুমনের নির্ভুল উত্তর। মনে মনে তিনিও খুসী হন বৈ-কি!

মন দিয়ে সুমন পড়ে তাই নয়, ইতিহাসের সব চরিত্রগুলো নিয়ে মনে মনে ছবি আঁকে। নীলেনবাবুর কথা যখন কানে শোনে চোখের সামনে তারই ছায়া-ছবি যেন দেখতে পায়।

নীলেনবাবুকে চলে যেতে হবে। স্কুলের চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়েছে তাই নয়—আরো বড় ডাক এসেছে তাঁর। এই খবরে নীলেনবাবুর খুসী হবার কথা এবং আরো অনেকের—কিন্তু দুঃখ পেয়েছে সুমন। এরকম করে ইতিহাসকে চোখের সামনে তুলে ধরে আর কেউ পড়াতে পারবে না—একথা সুমন ভাবে—কিন্তু তার করবারই বা কি আছে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

সেদিন সহপাঠী শুভেন বল্লে, তোর মাষ্টারমশাই তো চল্লেন—কি হবে তোর?

মনটা খারাপই ছিল। অকারণ রেগে গিয়ে সুমন উত্তর দিলে, মাষ্টারমশাই একা তো আমার নয়, তোমাদেরও—তবে ওকথা বলছো কেন?

শুভেন হেসে বল্লে: রাগ করিস কেন? আমাদের স্কুলেই তো আমরা 'ফেয়ারওয়েল' দিচ্ছি—কাল একটা টাকা আনিস, সবাইকে বলে দিস।

সুমন বাড়ী গিয়ে মার কাছে টাকা চাইতে মা বল্লেন—এক টাকা করে চাঁদা তুলছো তাহলে তো অনেক টাকা হবে—তোমরা তাহলে কি করছো, শুধু খাওয়া দাওয়া না জিনিষপত্র দেবে? সুমন বল্লে: ওরা ব্যবস্থা করছে কি রকম কিছু জানি না, মাষ্টারমশাই চলে যাবেন শুনেই আমার ভাল লাগছে না তাই আমি এসবের মধ্যে থাকবো না, টাকা দিয়ে দেবো।

সত্যি সুমনের মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। সেদিনের উৎসবে যখন সুমনকে দেখা গেল না তখন ক্লাসের ছেলেরাই শুধু অবাক হলো তাই নয়, নীলেনবাবুও সেই পরিচিত মুখটি দেখতে না পেয়ে একটু বিস্ময়বোধ করলেন—।

উৎসব শেষে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নীলেনবাবু যখন পথে বেরোলেন—মনটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এতদিনের এই পরিবেশ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হলো—ছেলেরা অনেকেই তাঁকে ভালবাসতো বিশেষ সুমন—হঠাৎ বাধা পেলেন তিনি সামনে দিকে পড়তে গিয়ে সামলে নিলেন, তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করছে সুমন। হাত ধরে তুলে নিলেন তাকে বল্লেন: কেমন যেন খালি খালি মনে হচ্ছিল সুমন তোমায় দেখতে না পেয়ে, ভাবলাম আর হয়তো দেখা হলো না, ভালই হয়েছে এসেছ। আমি চলে গেলেও তোমার কথা আমার খুব মনে হবে কিন্তু, ভালো করে পড়াশুনা করো—তোমার উপর আমার অনেক আশা। সুমনের চোখ ভরে জল এসেছে, মাথা নীচু করে বল্লে: নিশ্চয়ই স্যার, আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

বাড়ী ফিরে সারা বিকেল সন্ধ্যাটা কিরকম বিশ্রী কাটলো, কেবলই যেন গলার কাছে কান্না পাকিয়ে উঠছে—নিজেরই লজ্জা হলো—ছিঃ ছিঃ লোকে যদি দেখে ভাববে সুমন পুরুষমানুষ হয়ে কাঁদছে! কিন্তু পড়ায় মন বসলো না, রাতে খেতে বসে কিছুই খেতে ইচ্ছা করলো না। মা বল্লেন: কি হলো আজ? বড্ড ঘুম পাচ্ছে মা।

সে রাত্রে ঘুমিয়েও সুমন স্বপ্ন দেখলো—ইতিহাসের ক্লাস, আর ব্ল্যাক-বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নীলেনবাবু যেন বলছেন: কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের জীবনের ধারা বদলে দিল... একটি শিলালিপিতে অশোক স্বয়ং তাঁহার ধর্মের বর্ণনা দিয়েছেন......পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিবে, জীবের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইবে, সত্য বলিতেই হইবে, এইগুলি হইল মহান কাজ।...অশোকের ধর্মমত ছিল সহজ সরল...বুদ্ধের মতামতও এইরূপ ছিল। পর্বত ও স্তম্ভগাত্রে অশোক ধর্মের নীতি সহজ কথায় উৎকীর্ণ করিয়াছেন...এইগুলিকে অশোকের শিলালিপি বলা হয়।"

সকালে ঘুম ভেঙে সুমনের মনটা ভারী হয়ে উঠলো। তারপর ইতিহাসের ক্লাসে নতুন মাষ্টারমশাইকে দেখে বারে বারে নীলেনবাবুকে মনে পড়তে লাগলো।

সুমন বড় হয়েছে। এই কয় বছরে পড়াশুনায় ক্লাসের সেরা ছেলে বলে তার নাম হয়েছে। নীলেনবাবুর কথা তার মাঝে মাঝে মনে হয়। মনে ভাবে তিনি হয়তো সুমনকে ভুলে গেছেন, আর এখন যদি দেখেন তো চিনতেই পারবেন না। সেদিনের ক্লাস সিক্স-এর সুমন আর আজকের ক্লাস ইলেভেনএর ছাত্র সুমন—তফাৎ আছে বৈকি অনেক।

সেদিন মাকে প্রণাম করে সুমন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে—আগের দুদিন বেশ ভালো লিখতে পেরেছে, আজকে ইতিহাস পরীক্ষা। মা কপালে একটি ছোট্ট দই-এর ফোঁটা দিয়ে দিলেন: ভাল করে লিখো।

রাস্তায় এসে ট্রামে উঠল সুমন। ইতিহাসের জন্য সে খুব ভয় করে না। সবই তার জলের মত মুখস্থই শুধু নয়, চোখের উপর ভাসছে। ছোটবেলায় ক্লাস সিক্স-এ যখন পড়তো তখনকার কথা মনে হলো আর মনে পড়লো নীলেনবাবুকে। একটু অভিমান হলো, স্যারকে আমি মনে রেখেছি কিন্তু তিনি আমায় একেবারে ভুলে গেছেন। স্কুলে তো সে বেশ নাম করেছে, শুধু তিনি বলেছিলেন বলেই তো সে আরো উৎসাহ পেয়েছে—কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন।

ট্রাম বন্ধ হয়ে গেল—খুব গোলমাল কানে এলো। সবাই ট্রাম থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে—কি হলো? কি হলো? এই শব্দ আসছে কানে।...সত্যি কি হলো? রাস্তার দিকে তাকাতে একটি পথচারী বল্লে: য়্যাকসিডেণ্ট।

য়্যাকসিডেণ্ট? তাহলে তো ট্রাম এখন অচল হয়ে থাকবে, সময় তো খুব বেশী নেই...মনে ভেবে সুমন নেমে সামনের দিকে এগিয়ে চল্লো। ট্রাম যদি না চলে তাকে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করে
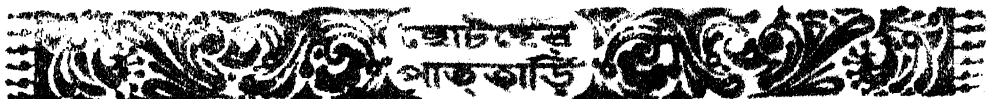
(শেষাংশ ১৯৯ পৃষ্ঠায়)

আট বছরের বুড়ি
সতীন্দ্রনাথ লাহা

আট বছরের বুড়ি—
আমায় পেলেই নালিশ করে
আনতো দুটি মুড়ি।।
আদায় লুচি ভাইতে দিয়ে,
বলতো কাছে পুতুল নিয়ে।
রাখতো পাশে খেলনা নানা
ভর্তি বেতের ঝুড়ি।।
বিদখুটে তার সখ।
কথার পিঠে কথা জুড়ে
করবে বকর-বক।।
সারা পাড়া বেড়ায় ঘেঁটে।
আজব খবর ভর্তি পেটে।।
পড়ার কথা জানতে গেলে
মারবে ছুঁড়ে চক।।

দিলেই হাতে পান—
খিল খিলিয়ে হাসবে মেয়ে
আহ্লাদে আটখান।।
হাত বাড়িয়ে চাইবে খিলি।
'সাত্যা ওকে পানকে দিলি'—
ন' পিসিমা বকবে যখন,
আড় চোখেতে চান।।

দেয় সে কাদার ঝাড়ি।
তাই না দেখে, বাড়ীর সবাই
হেসেই গড়াগড়ি।।
'কাদা ঘাঁটা হচ্ছে আবার'—
আওয়াজ এলো ভারাই বাবার।
ধমক দিয়ে বেরিয়ে গেলেম
দেখেই হাতে ঘড়ি।।

যখন কুটনো কোটে—
পাশের বাড়ীর আহ্লাদীরা
সবাই এসে জোটে।।
খেলবে তা'রা রান্না বাড়া।
আনবে মাটির কলসী হাঁড়া।
বেগুন বোঁটায় এ'চড় খোসায়
মিলায় শাক নোটে।।

দাঁড়কাক
বলরাম বিশ্বাস

বলো দেখি দাঁড়কাক
দাঁড়ে কেন রও না,
কা-কা ডাক ছাড়া আর
কথা কেন কও না?
দূর-ছাই, মার ঝ্যাটা।
যমপুরী যাও না!—
ঐ সব গালি ছাড়া
আদর তো পাও না?
সন্ধ্যা সকাল শুধু
ডেকে যাও বহুরে,
ভদ্রতা শেখোনি কি?
ক'লকাতা শহর এ।
চুরি করা খাদ্যটা
চোখ বুজে লুকোলে?
খুঁজে ফের পেলে নাকো
অনাহারে শুকোলে।
আপনার ডিম ভেবে
কোকিলের বাচ্চা
তা' দিয়ে ফুটিয়ে দাও,
বোকা তুমি আচ্ছা!
'বোকা কাক' বদনাম
র'য়ে গেল শেষটা,
শুধরাতে পারলে না,
ক'রলে না চেষ্টা।

বুড়ির অনেক কাজ।
পা মেলে কেউ পান চিবোলে
বলবে রে থই ভাজ।
ছাড়াবি চল কড়াই শুঁটি,
নয় খেলিগে পঞ্চ ঘুঁটি,
তাও না পেলে তেল চড়িয়ে
পাঁচটা বেগুন ভাজ।।

আট বছরের বুড়ি—
চড়বড়িয়ে বকতে পারে
সাত্যি কথার ঝুড়ি।।
গল্প করার আছে যে গুণ
হয় না খালি বাকোরই তুন
সবার মনে ঠাঁই পেয়েছে
অনেক বাহাদুরি।।

ছোটদের পাততাড়ি

মরশুমী ফুল চাষ জেনে রাখ আজ,
বুঝে-সুঝে কর যদি অতি সোজা কাজ

কসমস, হলিহক, এস্টার নাম,
পিটুনিয়া, স্যালভিয়া, ন্যাস্টার্স সাম্,
ক্যালেন্‌ডুলা, ফ্লক্স, কর্ণফ্লাওয়ার,
ডালিয়ার ছোট জাত, ভার্বিনা, আর-
লাকস্পার, এ্যালিসাম, এ্যাজিরেটাম,
ক্লার্কিয়া, মরশুমী ক্রিসেন্‌থিমম,
গাঁদ—নানা জাতি, পিংক, পর্টুলাকা।
সবই যেন তুলি ধরে ছবিতে আঁকা।
বীজ থেকে চারা করে বরষার শেষে,
বাগিচায় চাষ করে আমাদের দেশে।

'সুইট পী'এর লতা উঠে কাঠি বেয়ে,
মরশুমী সভা মাঝে মিঠে সব চেয়ে।
কার্নেশনের চাষে খুঁটিনাটি আছে
মিঠে বলে সমাদর সকলের কাছে।

রোদ আলো ইহাদের সকলেই চায়,
খোলা ছাদে টবে ভরে চাষ করা যায়।
ভাল বীজে ভাল ফুল হোক না তা দামী
ভাল বীজ রাখে শুধু কোম্পানী নামী।
গুঁড়ো খোল, শুঁটকীমাছ, আর গুঁড়ো হাড়ে
মরশুমী ফুলগুলি বড় হয়ে বাড়ে।
হাতে বেছে ফেলো পোকা ধরে যদি গাছে
বেশী হলে, পোকামারা বিষ বহু আছে।

বীজ তলা ঠিক করে বরষার পরে,
পাতাপচা সার, বালি, দিয়ে ভাল করে।
ফাঁক ফাঁক করে আগে বুনে বীজগুলো
বীজ ভর পুরু করে ঢেকে দিও ধুলো।
খট্‌খটে হলে তলা—বীজবোনা চলে,
ধসা ধরে মরে তারা বেশী বেশী জলে।

মাথা ঢাকা রোদ পিঠে ছাঁচের তলায়
সার মাটি ভরা টবে বীজ বোনা যায়।
বীজ তলা করো—মাটি খুসে বার-বার,
ঢেলে দিয়ে ভালভাবে পচে যাওয়া সার।
বীজ বুনো—সেই মাটি খুলে পুনরায়
ঝুর্‌ঝুরে ঝুরো মাটি ছোট চারা চায়।

মেপে বুঝে করে আগে, ফুলের কেয়ারী,
রঙে মিল রেখে চারা রোবে সারি সারি।
কম বেশী ফাঁকে ফাঁকে—বাড় অনুসারে,
উঁচু জাত, যারা—তারা যাবে পিছু সারে,
সোজা ভাবে রোবে চারা সাবধানে তুলে,
রোয়া হলে গোড়া চেপে, জল ঢেল মূলে।

জল দিও ফুলক্ষেতে মাটি হলে টান,
জলে সারে, আধমরা চারা পায় প্রাণ।
জল সেচ পরে যদি জমে যায় মাটি
খুসে দিতে হবে তাহা করে পরিপাটি।
সরু সরু মূল বাড়ে খোসা মাটি পেলে
মূলে হাওয়া টেনে গাছ মাথা তুলে ঠেলে।

নিজ ক্ষেতে নিজ হাতে করো যদি কাজ,
শেখাবার যত কথা বলা হল আজ।
ঠেকে ঠেকে একে একে শিখে যাবে ভাই,
পাততাড়ি ভরে এল—স্থান বেশী নাই।
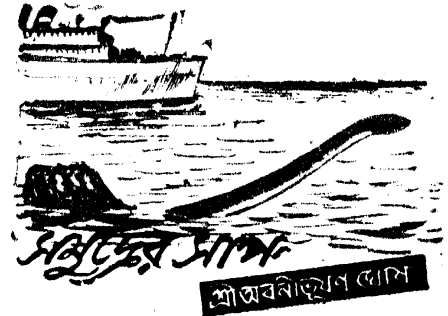
পুকুর-নদীর মত সমুদ্রেও বাস করে সাপ। তবে অনেকের ধারণা, সমুদ্রে বাস করে বুঝি মস্ত মস্ত সাপ। তা' ঠিক নয়। সমুদ্রের সব চেয়ে বড় সাপ সাত হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। অপর পক্ষে ডাঙায় কোন কোন সাপ ষোল-সতর হাত পর্যন্তও হয়।

সমুদ্রের সাপকে দেখলেই চিনতে পারা যায়। ডাঙার সাপের লেজ সাধারণতঃ মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু হ'য়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের প্রত্যেক সাপের লেজ নৌকার হালের মত চেপটা। সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে এ ব্যবস্থা। সমুদ্রের সাপের নাকের ছেঁদাও মাথার ওপরের দিকে—শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যাতে অসুবিধা না হয়। জলের তলায় সমুদ্রের সাপ ঘোরা-ফেরা করার সময় তার নাকের ছেঁদা চামড়ার একটি আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। মাছই হ'ল সমুদ্রের সাপের একমাত্র খাদ্য।

সমুদ্রের সাপ ঢেউয়ে ভেসে এসে কখনও কখনও তীরে বালিতে
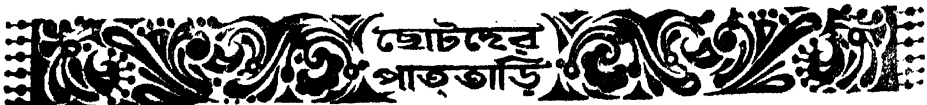
প'ড়ে থাকে। ডাঙায় এরা ভালভাবে চলা-ফেরা করতে পারে না। সমুদ্রের সাপ দেখতে বেশ সুন্দর। গা নানা রঙে চিত্রিত করা।

তোমরা জেনে রাখবে, সমুদ্রের সাপ মাত্রই বিষধর। তবে সমুদ্রের সাপের কামড়ে কদাচিৎ মানুষ মারা যায়। এ সাপের মুখ খুব ছোট। কাজেই মানুষকে ঠিকমত কামড়াতে পারে না। কামড়ানোর ব্যাপারে এ সাপের খুব উৎসাহও নেই।

সমুদ্রের সাপের কথা বললাম। এবারে জাহাজের নাবিকদের মুখে যে সর্পদানবের গল্প শোনা যায়, তার কথা বলি। সমুদ্রে যে সব নাবিকেরা জাহাজ চালিয়ে বেড়ায়, তারা প্রায়ই দাবি করে, বিরাট আকারের সমুদ্রের সাপ নিজেদের চোখে তারা দেখেছে। তোমাদের বলে রাখি, এ সব নাবিক মিথ্যা কথা বলে না। তবে তারা ভুল দেখে।

বিরাট আকারের সমুদ্রের সাপ সাঁতার কেটে যেতে দূর থেকে যারা দেখেছে বলে, তাদের একজনের বর্ণনার সঙ্গে আর একজনের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে মেলে না। তবে দুটি বিষয়ে প্রায়ই মিল থাকে। একটি হ'ল সাপের মত লম্বা আকার, অপরটি হ'ল বিরাট দৈর্ঘ্য।

সমুদ্রে এমন প্রাণী আছে যাদের এ দুটি বৈশিষ্ট্য আছে অথবা যাদের চালচলনে এ দুটি বৈশিষ্ট্যের ভ্রম হয়। তাদের কথা সংক্ষেপে বলি।

স্কুয়িড ব'লে সমুদ্রে এক ধরণের প্রাণী আছে যাদের ঠিক দেহটা প্রায় তের হাত। কিন্তু সে দেহ থেকে হাতের মত যে সব শুঁয়া বেরোয়, সেগুলি চৌত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হ'তে পারে। শুঁয়াগুলোর আগার অংশ মোটা হ'য়ে শেষ পর্যন্ত চেপটা হ'য়ে গেছে। যারা সর্পদানব দেখেছে ব'লে দাবী করে, তাদের অন্ততঃ কেউ কেউ স্কুয়িডের এই বিশাল শুঁয়া জলের ওপর নড়তে দেখেই সাপ ব'লে ভুল করেছে।

ওর (দাঁত) মাছ ব'লে সমুদ্রে এক ধরণের মাছ আছে। এও প্রায় তের হাত লম্বা হয়। ওর মাছের পিঠে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পাখনা আছে। মাথার দিকের পাখনাগুলো বেশ বড় এবং এদের আগার অংশ মোটা—অনেক পাখা পাশাপাশি থেকে বিস্তৃত ঝুঁটির মত দেখতে হয়। ওর মাছ গভীর জলে বাস করে। কখনও কখনও জলের ওপর ভেসে ওঠে এবং ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িতভাবে চলাফেরা করে। তখন এর পাখনা দূর থেকে বিরাট সাপের ফণা ব'লে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

শুশুক ব'লে সমুদ্রে যে প্রাণী আছে, তারা অনেক সময় সারি বেঁধে জলের ওপর ভেসে ভেসে চলে। দলের কেউ কেউ এক সঙ্গে ডোবে, আবার ভেসে ওঠে। এই সারিবদ্ধ শুশুকের দলকে দূর থেকে সর্পদানব ভাবা অসম্ভব নয়।

সমুদ্রে রোদ-পোহানো হাঙ্গর (Basking shark) ব'লে এক ধরণের হাঙ্গর আছে। এরা ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এই হাঙ্গর দল বেঁধে জলের ওপর ভেসে ভেসে বেড়ায় রোদ পোহানোর জন্যে। তখন এদের পিঠের পাখনা আর লেজের ডগা জলের ওপর ভেসে থাকে। দূর থেকে তা' দেখে কারও পক্ষে সর্পদানব ভাবা আশ্চর্যের নয়।

আমাদের দেশে গল্প প্রচলিত আছে যে, সমুদ্রে এমন সব সাপ বাস করে যাদের ফণা একটির বেশী। স্কুয়িডের অনেক শুঁয়া অথবা ওর মাছের অনেক পাখনা এক সঙ্গে দেখে বহু ফণাবিশিষ্ট সাপের গল্পের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।
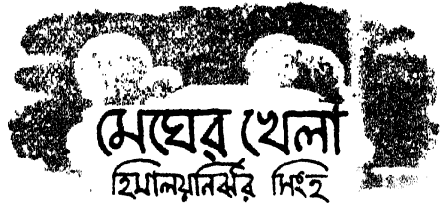
নীল আকাশে সাদা মেঘের
নৌকো চলে ভেসে—
মন যে আমার উধাও হ'লো
অজানা কোন্ দেশে......
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
সাত-সাগরের পারে,
নাম-না-জানা ফুলের আঁখি
ডাক্‌ছে বারে বারে॥

স্মৃতির বুকে উঠ্‌ছে ভেসে
কতো দিনের কথা,
কতো দিনের কান্না-হাসি
কতই ব্যাকুলতা;
উতল হাওয়ায় মনের পাতায়
জাগে যে কম্পন—
নীল আকাশের মেঘ দেখে তাই
আকুল হ'ল মন॥

আজকে তো নয় বহু আগেই
এই মেঘের-ই সাথে,
বৃষ্টি ঝরার ঝরঝরাণি
বাজ্‌ল নীরব রাতে;

জন্ম নিলেন কেষ্টঠাকুর
কারাগারের বুকে,
মনের মাঝে সে চিত্রটি
জাগ্‌ছে আজি সুখে॥

যুগে যুগে মেঘের খেলা
নিত্য নতুন রূপে—
আকাশ-চাওয়া এই মাটিকে
ডাক্‌ছে চুপে চুপে॥

সে ডাক শুনে মনের ময়ূর
উঠ্‌ছে নেচে ভাই,
যুগে যুগে মেঘের খেলা
তাইতো দেখে যাই॥
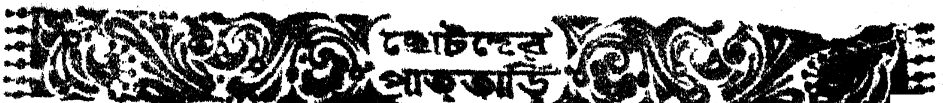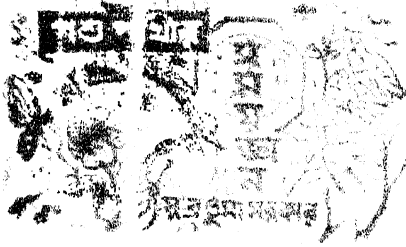
আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে ঘড়ির সময় নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। তোমরা ইস্কুলের ঘন্টা বেজে যাবে এই ভয়ে তাড়াহুড়া করে স্নান, খাওয়া সেরে বের হয়ে পড়।

জীবজন্তুরাও সময় মেনে চলে। দিনের শেষে পাখীরা তাদের বাসায় ফিরে আসে। ভোরের আলো দেখলে জেগে উঠে। আবার বেরিয়ে পড়ে আশ্রয় স্থল থেকে। বেশীর ভাগ জীবজন্তুও তাই করে থাকে। পশুপাখীদের এসব ব্যাপারে আমরা আর আশ্চর্য হই না কারণ আমরা এগুলি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু যদি বলি যে বেশীর ভাগ জীবজন্তুরা, পাখীরা, এমন কি ছোট ছোট মৌমাছিরা শরীরে ঘড়ি ব্যবহার ক'রে তাহলে বেশ আশ্চর্য লাগে না কি? ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। এ আমার মনগড়া কথা নয়। বহু বৈজ্ঞানিক, যাঁরা এবিষয়ে নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়েছেন, গবেষণা করেছেন, তাঁরাই এধরণের কথা বলেছেন। অবশ্য সত্যি সত্যিই ওরা হাতে হাতঘড়ি বা পকেটে পকেট ঘড়ি রাখে না কিন্তু এমন ওদের নিখুঁত সময়জ্ঞান যে মনে হবে ওরা বুঝি হাতে ঘড়ি বেঁধে চলছে। ওদের দেহের মধ্যে মনে হয় এরকম ঘড়ির ব্যবস্থা আছে।

মৌমাছিদের কথাই ধরা যাক। লক্ষ্য করে দেখা গেছে এরা চব্বিশ ঘণ্টা কতক্ষণ পর পর হয় তার নিখুঁত সময় রাখতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা মৌমাছি পালন করে দেখেছেন এরা যেখানেই থাকুক না, প্রতিদিন, প্রতি রাত্রে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর পর তাদের জন্য রেখে দেওয়া চিনির জলের পাত্রে এসে বসেছে। কোন ভুলচুক নেই। এক মিনিটও এদিক ওদিক হয়নি। সত্যিই ব্যাপারটা নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিচয় কি দিচ্ছে না?

এবার পিঁপড়েদের কথা বলা যাক। এরা সঙ্গে ক্যালেণ্ডার বা ডায়েরী নিয়ে ঘোরে না নিশ্চয়ই; কিন্তু এরা বছরের তারিখগুলি নির্ভুলভাবে হিসেব করতে পারে। দেখা গিয়েছে বছরের যে দিনটিতে একজায়গার বাসা থেকে পিঁপড়ে ডানা গজিয়ে উড়তে বেরিয়েছে ঠিক সেদিন সেই সময়েই অন্য এক জায়গার পিঁপড়ের দল উড়তে সুরু করেছে। অথচ এরা যে আগে থেকে পরস্পর পরামর্শ করে বেরিয়েছে তা মনে করার কোন হেতু নেই।

পাখীদের সময় জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আগেই বলেছি। শীতকালে দেখা যায় শীতের দেশের বহু পাখী গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে চলে যায়। আবার গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার এরা পাহাড়ের দিকের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা অঞ্চলে চলে যায়। নিয়মিতভাবে প্রতি বছর এটা ঘটে আসছে। পাখীদের দিন ও রাত্রির জ্ঞানও বেশ প্রখর। এরা জানে আলো থাকলে বুঝতে হবে দিন আর অন্ধকার হলেই রাত্রি। জাপানীরা তাই তাদের গাইয়ে পাখীদের বেশ ঠকাতে পারে। এরা শীত কালে সন্ধ্যার অন্ধকারের আগেই পাখীর খাঁচার কাছেই বেশ জোরালো আলো জেলে দেয়, আর পাখীরা রাত হয়নি মনে করে গান গেয়ে চলে। এইভাবে পাখীরা বোকা ব'নে যায়। মাদ্রাজের কাছে পক্ষীতীর্থে দেখা যায় দু'টি পাখী ঠিক সময় ভোগ গ্রহণ করার জন্য একই স্থানে, একই সময়ে প্রতিদিন আসছে। কোন ভুলচুক নেই।

সমুদ্রের কাঁকড়া নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে কাঁকড়ার গায়ের আবরণ বা খোলা দিনের বেলায় গাঢ় রং এর থাকে। সন্ধ্যার দিকে রং ফিকে হতে সুরু করে আবার সূর্য্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রং গাঢ় হতে থাকে। কাঁকড়ার এই রং পরিবর্তন রোদের জন্যই হচ্ছে মনে করা হত। কিন্তু একবার এক বৈজ্ঞানিক কি করলেন জান? তিনি কয়েকটি কাঁকড়াকে একটি অন্ধকার জায়গায় রেখে দিলেন। দেখা গেল রোদের আলো না পেলেও কাঁকড়াগুলির গায়ের রং গাঢ় নীল হলো, দিনের বেলায় আবার ফিকে হতে লাগল সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে ত রোদের কোন কারচুপি নেই তবে কি কাঁকড়া সময় ধরে তার গায়ের রং বদল করছে? ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না কি? কিন্তু অদ্ভুত হলেও পরীক্ষিত সত্য। বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

এরকম কত শত জীবজন্তু, পোকামাকড় আছে যারা প্রকৃতির তৈরী ঘড়ি মেনে চলছে নির্ভুলভাবে। এদের সময়জ্ঞান মানুষকেও আশ্চর্য করে দিয়েছে।

ইয়া মোটা ভুতো দেখো
বসে পা'টা ছড়িয়ে
মিশ মিশে কালো রঙ
লালা পড়ে গড়িয়ে
কুদে কুদে ট্যারা চোখ
ছয় ফুট লম্বা
প্রতিদিন গিলে ফ্যালে
কাঁদি কর রম্ভা
মেষ মোষ কত কী যে
চাই তার নিত্য
হাঁড়ি কয় ভাত পেলে
তবে খুসি চিত্ত।
প্রতিদিন মণ তিন
দুধ তার চাই যে
এর কমে খাওয়া হলে
ভুতো সেথা নাই যে,
ভোজ সেরে ভুতো শেষে
চেটে খায় হাতটা
হুলো এসে গজরায়
খালি দেখে পাতটা
ভুতোটার খাওয়া দেখে
বলে বটে মর্দ
তাই ভুতো করে নিজে
খাবারের ফর্দ।
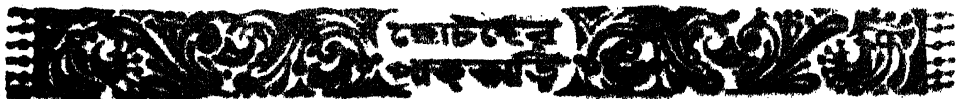
বন বন, ডালে ডালে, লতায় পাতায়
বিচিত্র বর্ণের কত ফুটেছে কুসুম;
সুমন্দ ঝঙ্কারে বায়ু মন্দ বয়ে যায়
এখনো জড়ানো চোখে রজনীর ঘুম।

মাথায় উষ্ণীষ পরা শিকারীর বেশ—
শিকারী সম্ভ্রান্ত বয়সে তরুণ
শিকারের খোঁজে করে অরণ্যে প্রবেশ
হাতে ধনু পিঠে শোভে তীর ভরা তূণ।

অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলে সাহসী যুবক
দিল্লীর সম্রাটের ক্রীতদাস প্রিয়।
সহসা দেখিল এক কুরঙ্গ শাবক
বসিয়া গাছের নীচে কচি কমনীয়।

যুবক সে মৃগ শিশু অঙ্কে তুলে লয়ে
অঙ্গে বুলায়ে হাত দিল আশ্বাস,
মুখপানে মূক প্রাণী চাহিল সভয়ে
দৃষ্টিতে সহস্র প্রশ্ন করিল প্রকাশ।

শিকারের সাধ তার গেছে বুঝি মিটে,
হরিণ শিশুটি পেয়ে তৃপ্ত তার মন,
লম্ফ দিয়ে আরোহণ করে অশ্বপিঠে
চলিল গৃহের পানে ত্যজিয়া কানন।

সহসা পশ্চাতে কার পদশব্দ শোনে,
ফিরে চেয়ে দেখে আসে জননী হরিণী—
হারানো শিশুর আশে নিঃশঙ্ক চরণে
দুঃখ ভরা, সুখ ছাড়া মণিহারা ফণী।

নয়নে মিনতি ভরি করে দৃষ্টিপাত
ফিরাইয়া দাও ওগো বাছারে আমার,
অথবা আমার অঙ্গে কর অস্ত্রাঘাত
নতুবা বন্দিনী কর, যা ইচ্ছা তোমার।

নির্বাক সে কণ্ঠ, সেই মৌন চাহনি
তাতেই মনের ভাষা হয়ে গেল পাঠ,
কোন্ জাদু মন্ত্র পড়ি এই মায়াবিনী
খুলে দিল শিকারীর হৃদয় কপাট।

অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামি মৃগ শাবকেরে
রাখিল মায়ের কাছে পরম যতনে
দু' চোখ ভরিয়া শুধু স্বর্গ শোভা হেরে
লইল মা যুকে টানি বুকের রতনে।

শিকারীর চোখে রাখে কালো দুটি চোখ
দৃষ্টিতে ঝরিয়া পড়ে মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা,
হে সহৃদয়! তব বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্
সতত তোমারে সুখী করুন বিধাতা।

গৃহে ফিরি যায় বীর আনন্দিত মনে,
কৃতজ্ঞ সে আঁখি দুটি কুরঙ্গ মাতার
আশীর্বাদ করে তারে শয়নে স্বপনে
হে দয়াল পাবে তব যোগ্য পুরস্কার।

সে দুটি কাজল চোখ সেই মৌন ভাষা
ভুলিতে পারে না বীর রজনী দিবসে।
মিটিল জীবনে তার যাহা ছিল আশা
সম্রাটের মৃত্যু হ'লে সিংহাসনে বসে।

এ যেন গো আশীর্বাদ মৃগ জননীর
ক্রীতদাস পায় আজ বিপুল বিভব
নির্ধন কিম্বা মূক ইতর প্রাণীর
সুখ-দুঃখ সবই আছে, আছে অনুভব।

সুখী যদি হয় তারা তব আচরণে
অথবা দেহে ও মনে পাইলে সন্তাপ,
অসহায় হইলেও নির্বাক নয়নে
দিতে পারে আশীর্বাদ কিম্বা অভিশাপ।
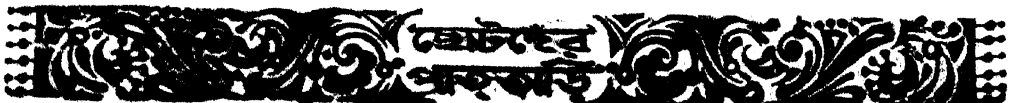
কুনো ব্যাঙ ঘর কুনো আমাদের সীতারাম,
ঢেঁকিশালে তড়পায় রাত-দিন অবিরাম।
উনানের ধারে তার গল্পটা জমে জোর,
সৈনিক সেজে ঘরে যুদ্ধটা করে ঘোর।
একটুকু হ'লে দেরি চা'টা পেতে সকালের,
কিম্বা খাবার পেতে কোনদিন বিকালের
কাপ-ডিস, থালা-বাটি ছুঁড়ে ফেলে ঝনঝন,
দেখে-শুনে লোকেদের মাথা ঘুরে বন! বন!
কাঁপে বাড়ী আশ-পাশ—হয় সবই তোলপাড়,
ভাবে লোকে এ কে এলো? ঘরে কোন্ জানোয়ার।
দেখে তার পাগলামি—লোকে সব বাতলায়,
কুনো ব্যাঙ ঘর-ছাড়া কর না তো হবে দায়!
যদি কেউ সত্যই আজি তার ভাল চাও—
ঘর-ছাড়া করে তাকে যেথা পায় ঠেলে দাও।

* * * *

কলকাতা পাঠাতেই আর কোন কথা নাই,
বহু ঠেকে দেখে শুনে হয়েছে সে আজ চাঁই।
কুনো ব্যাঙ ঘুরে-ফিরে বাইরেতে আজ তার,
স্বভাব বদলে গেছে ঘর কুনো ব্যবহার।
ঘুরে-ফিরে, মিলে-মিশে আজ সে তো দুনিয়ায়,
জ্ঞানে-গুণে গরিমায় নাম যশ কত পায়।
ঘর-কুনো সীতারাম—নয় আজ কুনো ব্যাঙ
চার ঠ্যাং গজিয়েছে খেয়ে খেয়ে কত ল্যাঙ।

কোথা তুই পেলি মাগো
এ গভীর ভালোবাসা,
কোথা তুই শিখলি এতো
আদরের মিষ্টি ভাষা?
কথা তোর নয় কথা মা,
যেন তা মধুর ধারা,
শুনি আর শুনিই কেবল
হয়ে রই আত্মহারা।
চোখে তোর মায়ার কাজল
বুকে তোর স্নেহের সুধা,
দিলে তোর মিষ্টি বুলি
মিটে না প্রাণের ক্ষুধা।
মনে তোর কী আছে মা
শুধু তাই ভাবনা কী সে?
পলকের অদর্শনে
বুঝি তাই হারাস দিশে?
এ কী এ মায়ার খেলা
মাটির এই পুতুল গ'ড়ে,
যা আছে অন্তরে তোর
দিয়েছিস উজাড় ক'রে।
বেঁধে রাখ্ সন্তানেরে
এ বিপুল ঋণের দায়ে,
চিরদিন লুটাই যেন
তোমার ঐ রাতুল পায়ে।

ইতিহাসের পরীক্ষা

(১৮৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরীক্ষার হলে পেঁাছতেই হবে যে। ইস্ রাস্তার উপর রক্ত। একটি ভদ্রলোককে ধরাধরি করে ওঠানো হচ্ছে। সুমন এগিয়ে গেল—একজন বলছেঃ এখনি হস্পিটালে নিয়ে যাওয়াই ভালো—একটা ট্যাক্সি ডাকতো হে। সুমন এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলো—সকলে মিলে যখন আহতকে ট্যাক্সিতে তোলা হলো—বিস্মিত হয়ে সুমন দেখলো আহত ব্যক্তি নীলেনবাবু।

স্যার আপনি? চীৎকার করে বলে উঠলো সুমন—তারপরেই বল্লেঃ ট্যাক্সি করে আমিই নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

হস্পিটালে প্রাথমিক চিকিৎসার ঘণ্ট-দুই পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো, আঘাত খুব গুরুতর নয়—তবে সাবধানে থাকতে হবে। কয়েকদিন নড়াচড়া বন্ধ। আবার তাঁকে নিয়ে সুমন এলো তাঁর বাড়ীতে। নীলেনবাবুর স্ত্রী আত্মীয়স্বজন সকলকে সুমন বল্লেঃ র‍্যাকসিডেণ্ট খুব গুরুতর নয় আপনারা চিন্তিত হবেন না। বিছানায় শুইয়ে যখন একটু সুস্থ হলেন নীলেনবাবু—কি ভাবে রাখতে হবে, ওষুধপত্র খাওয়াতে হবে এসব বুঝিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই গির্জার ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। ইতিহাসের প্রথম পত্র পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে। সুমন ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলো।

সব কথা শুনে মা বল্লেনঃ খুব ভালো কাজ করেছ সুমন। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি।

বাবা বল্লেন : হ্যাঁ ভালোই করেছ, গুরুর জীবনরক্ষা হয়েছে তবে কি জানো, আবার একটা বছর—মা বলে উঠলেন : তা হোক।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

আলপনা — — শ্রীমতী [illegible]
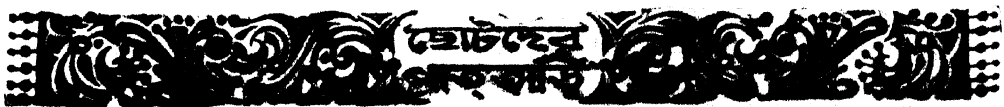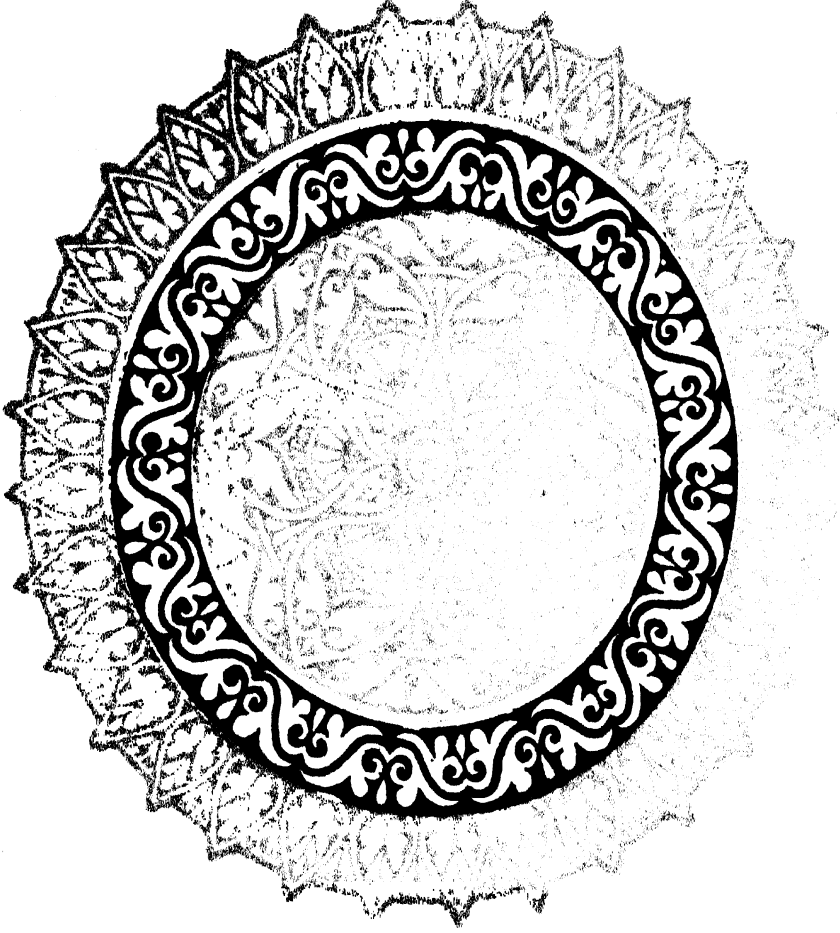
(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল যখন প্রকাশিত হলো, দশ-জনের মধ্যে প্রথমেই সুমনের নাম দেখা গেল। তারপরের দিন সংবাদ-পত্র হাতে করে নীলেনবাবু সুমনদের বাড়ী ঢুকলেন: কই সুমন, এসো এসো দেখতো চিনতে পারো কিনা এই সংবাদপত্রে কার ছবি বেরিয়েছে?

সকলের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে সুমন এসে নীলেনবাবুকে প্রণাম করে মাথা নত করে দাঁড়ালো— সুমন ভাবছিল আমার এই সৌভাগ্যের মূলে আমার শিক্ষক নীলেনবাবু।

সুমন আবার প্রণাম করলো তাঁকে।

নীলেনবাবু গভীর স্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।
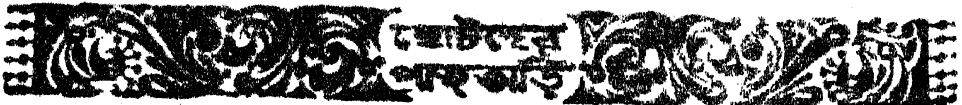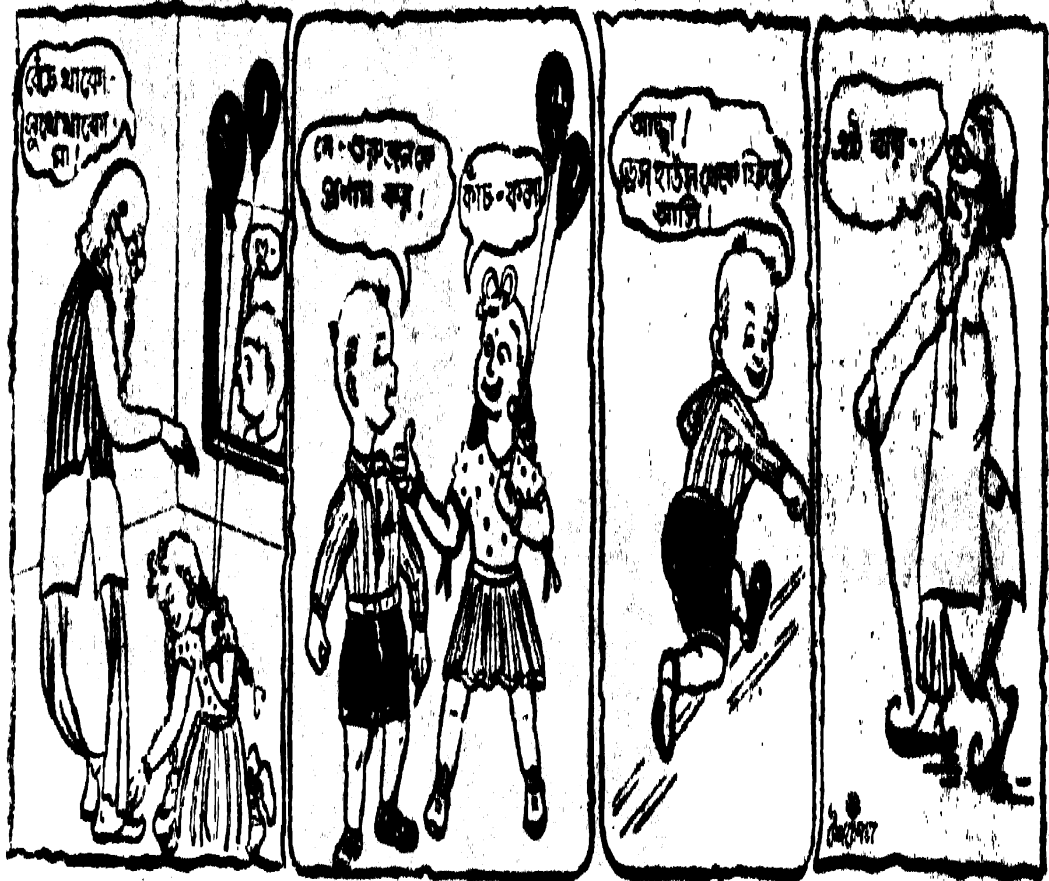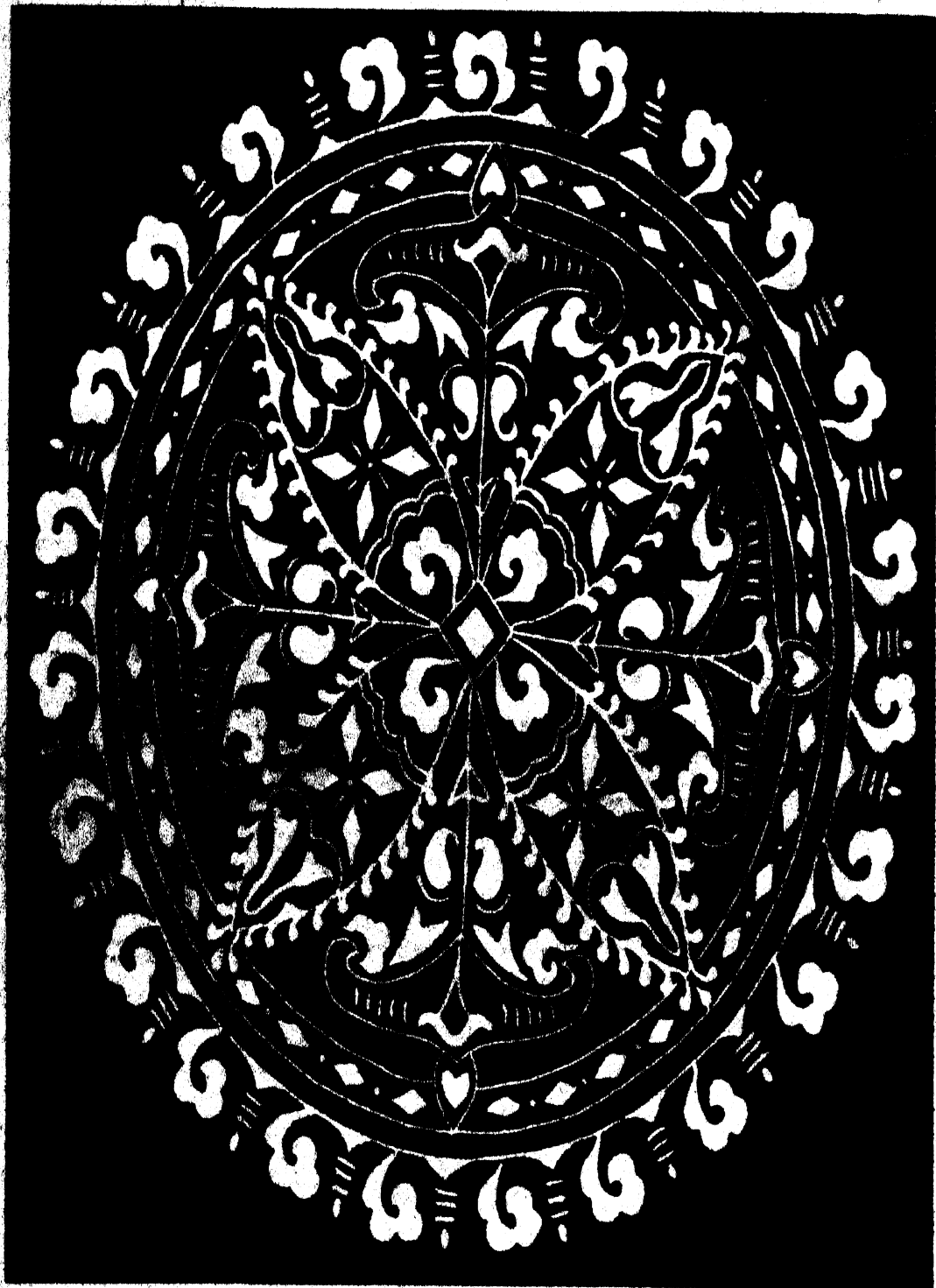
ছোটর প্রণাম নেবার ছলে
আপনবুড়োও সাজা চলে॥

আলপনা—   মিণ্টু লাহিড়ী

ইউনানী মতে

পেটেণ্ট ঔষধ ও সর্বপ্রকার জটিল রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র।

ইউনানী ড্রাগ হাউস

১৮, মির্জাপুর স্ট্রীট, (কলেজ স্কোঃ), কলিঃ
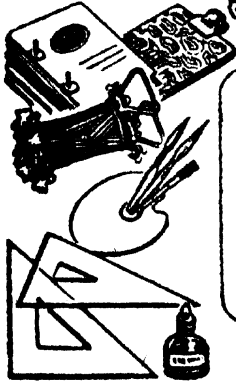
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

৬৩ই রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

সাম্প্রতিক গ্রন্থনিচয়

পৃথিবীর মত মানুষের মনের জগতও এক। বিদেশী পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি সরস গল্পের মাধ্যমে লেখক ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

একটি পৃথিবী একটি হৃদয়

মূল্য ৪·০০ —মিত্র ও ঘোষ

আমেরিকার সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস

লাইলাক একটি ফুল

মূল্য—৪·০০ —ভারতী লাইব্রেরী

বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমদিগন্তের নবতম পদ-সঞ্চার।

বিদেশ বিভুঁই

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ভাষায় লিখিত বহু ছবি বিশিষ্ট একটি অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী।

মূল্য ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিসার্স

এক জন্ম-অপরাধীর বিচিত্র কাহিনী.

পরম্পরা

(উপন্যাস)

মূল্য—৪·০০

মিত্রালয়

সন্ধ্যা হাস-পাতালের পটভূমিকায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে নূতন দিগন্ত।

রোদ জল ঝড়

এখানকার যেসব রোগী এতকাল ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠেছে নতুন প্রাণ নিয়ে এ বইয়ের পাতায় পাতায়।

মূল্য ৪·০০

পপুলার লাইব্রেরী

এই লেখকের আরও কয়েকখানি বই

মধুরেণ, বাজীমাৎ, সুতপার ভিটে, অনেক দূর, স্বপ্নলোক, ছেড়ে আসা গ্রাম।

আর. সি. দে. এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১৯৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, (বউবাজার), কলিকাতা ১২

Excelsior
for
*Performance
*Economy
*Reliability
THE WORLD'S LEADING LIGHTWEIGHTS
AVAILABLE AT
CYCLE HOUSE
GRAMS: EMBANDOW
174A, DHARAMTALA ST, CALCUTTA-13
Phone: 23-1205

পুজোর বাজারে চাই—
সুন্দর ও মজবুত
বাদুর
জুতো
বাদু এণ্ড কোং

দাড়ির প্রেম

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচ দেখে ফিরছিলাম; বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি ধর্মতলায় হঠাৎ চোখে পড়ল আমার বিপরীত দিকের পথ থেকে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। প্রথমে ভাবি ওঁর লক্ষ্যব্যক্তি আমি কি না? হাঁ, ঠিক আমিই তো। একে একে আমার পরিচিত সবাইকে স্মরণ করবার প্রয়াস পেলাম, কিন্তু কোন দাড়িমুখো পরিচিতের সন্ধান পেলাম না। যাই হোক সবুজ আলো দেখে, পুলিশের বাঁশী শুনে পথ পার হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। মনে হোল যেন দেখতে পেলাম কালো দাড়ির মাঝে সাদা দাঁতগুলো। কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুতের চমক। আমি চেয়ে রইলাম সেইদিকে।

কি প্রদীপদা আমায় চিনতে পারলে না? তার স্বর চিনি অথচ চিনতে দিচ্ছে না তার দাড়ি। লোকটি আমার হাত ধরলে। চিনতে পারছ না আমি বিকাশ।

বিকাশ? হাঁ এমন চেহারা করে রেখেছিস কেন? এমন সুন্দর চেহারা ছিল, এমন করে দাড়িতে ঢেকেছিস চিনব কি করে বল? আমার কৈশোরের অতি পরিচিত বিকাশ দাড়ুজ্জেকে ভুলতে বাধ্য হয়েছিলাম তার দাড়ির ধোঁকায়। বললাম সামান্য প্রজাপতি আকারের গোঁফ পর্যন্ত অর্ধাঙ্গিনীদের মাথার উত্তাপ বাড়িয়ে দেয় আর তোর পরিবারের তরফ থেকে কোন বাধা আসেনি দেখছি।

বিকাশ তার দাড়িতে হাত দিয়ে বলল, বাধা এসেছিল অনেক কিন্তু তাকে আমি উপেক্ষা করেছি। শুধু তাই নয় প্রদীপদা, এই দাড়ির দৌলতে বিংশ শতাব্দীর নারী-পুরুষ নির্বিশেষকে চেনবার সুযোগ হয়েছে আমার। এই কোলাহলমুখর রাজপথে সে আলোচনার অবকাশ দেবে না। নিরালা নিরিবিলিতে পরে একদিন শোনাব। এইটুকু বলে বিকাশ তার মেসের ঠিকানা আমায় দিয়ে ওর ওখানে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে চলে গেল সেদিন।

বিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ঔৎসুক্য নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যেবেলাই তার মেসে হাজির হলাম। ও দোতলায় থাকে। সিঁড়ি বেয়ে ওর ঘরের কাছাকাছি যেতে কানে ভেসে এল বিকাশের কণ্ঠনিঃসৃত গানের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি একটা আয়নার সামনে বসে বিকাশ তার দাড়িগুচ্ছে তেল মাখাচ্ছে। সেই তেলের সুবাসে ভরপুর হয়ে উঠেছে তার ঘরের বাতাস, তার গানের তালে তালে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে বিকাশঃ—

"ওহে সুন্দর মরি মরি"—

কালো দাড়িকে সুন্দর প্রিয়তমের রূপ দিয়েছে বিকাশ। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ওর দাড়ি বিন্যাস শেষ হল। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে বলল, আরে প্রদীপদা এসে গেছ? তারপর দাড়ির নিম্নাংশটা বুকে চেপে ধরে বলল—প্রদীপদা এই দাড়ি ছাড়া কোন স্বজনই আমার কাছে নেই। আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলে তার খাটখানার উপর।...... ......

চা খাবারের পর্ব শেষে সুরু করলে তার দাড়ির কাহিনী—

আমি তখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, হঠাৎ মনে হল দাড়ি রাখলে কেমন হয়। যেমন মনে করা তেমনি কাজ। শুভ শুক্রবার দেখে দাড়ি রাখা, অর্থাৎ, না-কামানো সুরু করলাম। প্রথমে রীতি ও আইন অনুযায়ী রাখলাম ফ্রেঞ্চ কাট। আমার সুন্দর মুখখানা সুন্দরতম দেখলাম আমার আয়নায়। ঝক্কি যে কিছু কিছু নিতে হল না তা নয়। প্রফেসর তার বেশীর ভাগ কথা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন।

এই ত গেল ক্লাসের ভিতরে, বাইরেও তেমনি। বক্তৃতা শেষে ঘর পরিবর্তনের সময় মেয়েরাও আমার আশেপাশে কাছ ঘেঁসে যাওয়া পছন্দ করত। বঙ্কিমবাবুর বাস্তব সত্য বাণী—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তাতো বটেই, তা ছাড়াও দাড়ি-শোভিত সুন্দরতর মুখের জয় আরও সর্বত্র। এই নূতন প্রমাণ হতে লাগল আমার কাছে। পথে কলেজে নিত্য-নৈমিত্ত্য। তারপর ঘটতে লাগল আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পথে-ঘাটে বয়স্ক লোকেরা ঠিকানা জানতো আমার বাড়ীর। কেউ কেউ আরও এগিয়ে তাদের মেয়ে ভাইঝির বিয়ের প্রস্তাব করতে পিছপাও হলেন না।

মা আপত্তি জানালেন বি-এ পাশ না করলে বিয়ে কি? সুখ না পেলেও সোয়াস্তি পেলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব উল্টে গেল প্রদীপদা, বি-এতে ব্যর্থ হলাম, ভাগ্যকে ধিক্কার দিলাম। বিমনা মনকে শাসন করলাম। আর অনেক ভেবে দাড়িকে দিলাম প্রশ্রয়। ভাবলাম এ মুখ আর দেখাব না, বাড়ুক দাড়ি ঢাকুক মুখ, মন আর বিবেকে দ্বন্দ্ব চলেছিল এই মতবাদে। মন বলেছিল তুই সুইসাইড কর, বিবেক বলেছিল হীন মনোবৃত্তি ছাড়। মন বলে দেশান্তরে চলে যাও, বিবেক বলে মা আছেন। শেষে মন ও বিবেক দুইই হারলো, জয়ী হলো আমার খেয়াল। মা, দাদা সাধারণ নিয়মে মর্মাহত হলেন, বিকু বুঝি সন্ন্যাসী হল। আমার তরফ থেকে যে ভয় কোনদিন ছিল না বরং স্বপক্ষে যুক্তি ছিল যথেষ্ট। তোমার হয়ত একঘেয়ে লাগছে আমার এ কাহিনী তবুও বলছি, ধৈর্য ধরে শোন, বুঝবে আমার দাড়ির দাম। স্বপক্ষের যুক্তি সেক্সপিয়ার, বার্ণার্ড শ, মাইকেলের দাড়ির মোহ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, ঋষি অরবিন্দ দাড়িও কামাননি নামও কমাননি। তাছাড়া ইতিহাস বিখ্যাত শিবাজীরও দাড়ি ছিল। ডারউইনজও ত দাড়ির প্রবল স্বপক্ষে, তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, বিশ্বে জীবজগতে পুরুষ সুন্দরতর হয়। পুরুষ সিংহের কেশরের

(শেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায়)

সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা

শ্রীতারা দাশের নূতন উপন্যাস

সেদিন পলাশপুরে

অমৃতবাজার বলেন, "he has brought into being a novel which thrills us. The author does not follow the stereotyped paths..."

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন (লেখকের নিকট লিখিত পত্রে) "বইখানি যে সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার বর্ণনা-শক্তি, ঘটনা-বিবৃতি ও আবেগ প্রকাশ প্রশংসনীয়।... সুলিখিত উপন্যাসের তালিকায় ইহা স্থান পাইবার অধিকারী।"

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন, "....It is a tale convincingly told.....offers an excellent reading. A good novel without pretensions."

পরিবেশক :

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কৃষি গবেষণায় ভারতবর্ষ

(৬২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যোগিতায় আমাদের দেশ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়েছে, গত দশ বছরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেই ব্যবধানের বিশেষ কোন তারতম্য হয়নি। শুধু তাই নয়, চা, পাট, লাক্ষা প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু সুবিধা ছিল তাও আমরা সংরক্ষিত করে রাখতে পারিনি নানা কারণে। মনে রাখতে হবে, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ তের বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে আমাদের দেশের কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন, তথাপি প্রতি একর জমিতে ধানের ফলন ১২—১৩ মণের বেশী করতে তাঁরা পারেননি। স্পেনে ঠিক এই পরিমাণ জমিতেই ধান ফলে ৫৬ মণ, আমাদের থেকে চার গুণেরও বেশী। স্পেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আরো ১২টি দেশের নাম পাওয়া যায়, যারা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে আমাদের থেকে বেশী দক্ষ। এমনকি পাকিস্তানও আমাদের হারিয়ে দিয়েছে ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতায়। আমরা প্রতি একর জমিতে গম ফলাই ৭ মণের কিছু বেশী; ডেনমার্ক, বেলজিয়ামে সেই পরিমাণ জমিতে গম ফলে ৩৫—৩৬ মণ, আর পাকিস্তান ফলায় প্রায় ১০ মণ। আমাদের দেশে আলু উৎপন্ন হয় প্রতি একর জমিতে প্রায় ৮২ মণ, সেখানে নেদারল্যান্ডে উৎপন্ন হয় ২৫৮ মণ। ভুট্টার ফসলের ব্যাপারে দেখা গেছে প্রতি একর জমিতে আমাদের দেশে সাড়ে ছ মণের বেশী ফসল পাওয়া যায় না, আমেরিকাতে সেখানে পাওয়া যায় সাড়ে পঁচিশ মণের মত। শুধুমাত্র কৃষিবিদ্যার আধুনিকতম জ্ঞান ও উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞ ও চাষীর মধ্যে প্রশ্নহীন সহযোগিতার ফলেই বিদেশী চাষীর পক্ষে ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে, কোন ইন্দ্রজাল বা প্রকৃতির পক্ষপাতিত্বের ফলে নিশ্চয় নয়। আমরা যে সবার নীচে, সবার পিছে পড়ে আছি, তার সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মত মনোভাব বোধ হয় এখনও সৃষ্টি হয়নি। আই-সি-এ-আর-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি নাকি উত্তর দেন, "এটা খুবই দুঃখের কথা, আমাদের দেশ এত পিছিয়ে রয়েছে", তারপর একটু থেমে অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিলেন "এটা একটা উৎসাহেরও কথা বটে, এর মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে আমরাও দু-তিন গুণ বেশী ফসল বাড়াতে পারবো। কিন্তু ওদের দেশে তা আর হবে না, ওরা প্রায় ম্যাক্সিমামে পৌঁছে গেছে।" কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও কি ম্যাক্সিমামে পৌঁছে যাইনি আমাদের যোগ্যতা দেখাবার প্রশ্নে? আমাদের দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গত দশ বছরে আমাদের ফসলের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল: সেখানে মাত্র ৩৫-৪০ শতাংশ নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কি করে বেশী ফসল ফলানো যায় সেই নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে। শুধু তফাৎ এই, অন্যান্য দেশে এই সব গবেষণালব্ধ ফল অতি দ্রুত সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে চাষীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, চাষীর হাতেই তার চরম মূল্যায়ন হয়েছে; আর আমাদের দেশে এই গবেষণালব্ধ ফলগুলি নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে সাইক্লোস্টাইল করা রিপোর্টের পাতার মধ্যে অথবা সাধারণের অগম্য কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর দুষ্পাচ্য পত্রিকার মধ্যে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিককে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তাঁদের কষ্টোপার্জিত বিদ্যার সঙ্গে পরিবেশের আনুকূল্যের সংমিশ্রণ ঘটলে শুকনো মাটির রূপের কি অভাবনীয় রূপান্তর ঘটতে পারতো! —ধনে, ধান্যে, প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁদের প্রতিভা কি বিপুল সার্থকতা লাভ করতো! আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, তার স্বাদ তারা আজও পেলেন না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা এবং তার নিষ্ফলা পরিণতির এই অস্বাভাবিক ইতিবৃত্ত আই-সি-এ-আর-এর কৃষি পরিকল্পনাগুলির মূলে কুঠারাঘাত করছে। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের গবেষণার ফল যাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করবেন সেই চাষীদেরও যথেষ্ট সচেতন করে তোলা হয়নি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। তার ফলে আমাদের দেশে চাষীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোন মানসিক সমতা নেই, কোন স্বাভাবিক সেতু বা স্বতঃস্ফূর্ত যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি পরস্পরের মধ্যে, চাষী কোনদিন এগিয়ে আসেনি ল্যাবরেটরীতে, বৈজ্ঞানিকও কোনদিন যায়নি চাষীর কুটীরে, দু'জনের ভাষা, দু'জনের সমস্যা অপরিচিতই রয়ে গেছে দু'জনের কাছে। প্রয়োগ বিজ্ঞানের বাস্তব সাফল্যের সম্মুখে এটাই সব থেকে বড় অন্তরায়।

✱ নদী-নারী ✱

অন্নদাশঙ্কর বসু

এ নদীকে নারী বলে করেছো
অনেক ব্যয়—কল্পনার যত ঋদ্ধি আছে,
এ নদীকে নারী বলে অলংকারে
গড়েছো কুহক।
নদী কি সত্যিই নারী?
সে প্রশ্নের জবাবে শুধুই
ছলনার ছলাকলা শেষে
জানালে—সত্যিই নদী নারী।
কুমারী শিশুর মত যুঁই ফুল, কিশোরী কি—
আরো ছোট তার চেয়ে—
পাহাড়ী নদীর ঢল, সবুজ অরণ্য ছোঁওয়া
লাবণ্যের জোয়ারে উচ্ছল।
তারপর তন্বী মেয়ে, ষোড়শী কি সপ্তদশী
সমতল চেতনায় মানুষের স্পর্শ ছোঁওয়া
বেগবতী ভোগবতী রূপ নেয়!
নাব্য নদী, জনপদ, এপার-ওপার ছোঁওয়া
দুই তীরে বিজ্ঞানের আশ্চর্য বিস্ময়!
সংসার-সমীক্ষা আসে, স্বামী-পুত্র আপনার
বৃত্ত-রচা।

বৃহৎ জীবন ডাকে,
হাতছানি নিঃস্বার্থের আর পার থেকে!
নদী যে বিশাল হয়, সমুদ্র-সম্ভবা,
অবশেষে মোহনায় জীবনের ব্রত উদযাপন!
নারীও বিকীর্ণ হয় সংসারের
কল্যাণ-সৌরভে লীলা কমলের ছলে
নিজেকে বিলিয়ে দেয়,
বিকীর্ণ করে বিশ্ব মোহনায়!

অতৃপ্তি

সাধন চৌধুরী

রাত্রির বুকে মস্তক রাখি
ধরিত্রী কয় ধীরে,
বাঁচিব না আমি সূর্যের প্রেম
যদি নাহি পাই ফিরে।

আমরা দু'জনে

অবিনাশ রায়

এই তৃষ্ণার বিকালেই আমি স্বরচিত রাজপুত্র।
আহা কি দৃশ্য সুদৃশ্য পট প্রাকৃতিক পটভূমি।
নীল আকাশের সেতু যেন, দিন-যাপনের
বাঁধা সূত্র

ছিঁড়েছে আমার হৃদয়ের গিঁট; প্রীতি-
ভাজনাসু, তুমি—
এসো না বেড়াবো: পৃথিবীর রূপ অপরূপ
উর্বশী।

অথবা আমরা স্বপ্নের খুব কাছাকাছি
হয়ে বসি।

এই যে তৃষ্ণা তৃষিত বিকাল, আমাদের সব দুঃখ
বেদনা-স্পন্দন, হিংসা ও গ্লানি, কলঙ্ক ক্ষতচিহ্ন
লোভের মতন মৃগয়া করে না যন্ত্রণাকেই মুখ্য
এখন ত আমি পার্থিব এই নরলোক থেকে ভিন্ন।
শিল্পীর মত ভুলেছি সকলই আত্মগত সন্তৃপ্তি
আহারে বিকাল, সোনালী বিকালে নীল
আকাশের দীপ্তি।

এই তৃষ্ণার বিকালেই আমি স্বরচিত রাজপুত্র।
আহা কি দৃশ্য সুদৃশ্য পট প্রাকৃতিক পটভূমি
নীল আকাশের সেতু যেন, দিন-যাপনের
বাঁধা সূত্র
অবিনশ্বর জন্ম-মৃত্যু: প্রীতিভাজনাসু, তুমি।

আলোর দিকে

॥ তুষার চট্টোপাধ্যায় ॥

আকাশে কালো মেঘ ঝড়ের রাত
তোমাকে কাছে পাই সান্ত্বনা
জোয়ারে এলোমেলো কী সংঘাত
আলোর পথ কেউ জানত না।

রাতের কালো পথ তবুও বাঁক ঘোরে
আকাশে শুকতারা পথ মাড়াই
তোমাকে কাছে পেলে হাওয়ার মর্মরে
আলোর দিকে খুশী হাত বাড়াই॥

অচিন প্রিয়

(৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আছে অজস্র। হাজার, দু' হাজার বছরের অতীতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় এই সব অজ্ঞাত গ্রামে। বেশ ভাল লাগে দেখতে ভগ্নদেউল আর বিধ্বস্ত অট্টালিকা।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন। গতি আছে, কিন্তু বিরতি অনেক বেশী। দু'পা যেতে না যেতেই শিশুর মত হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে স্টেশনের পর স্টেশন আসছে। সাদা বোর্ডে কালো অক্ষরে লেখা নাম। টিকিটঘরের বুকেও খোদিতলিপি। আলোকস্তম্ভের কাচে লাল রঙের নামাঙ্কন। মুখোমুখি ক্রশিং-লেভেলের অপর পারে অপেক্ষমাণ গরুর গাড়ী। সাইকেল আর সাইকেল-রিক্সা। টোকা মাথায় পথিক।

চলন্ত ট্রেনের বাইরে, পেছনে ফেলে আসা গ্রাম আর জনপদ দেখতে দেখতে আমি কেমন আত্মহারা হয়ে পড়ি। আমার মনে হয়, আমি যেন অনেক কিছু হারিয়ে ফেললাম। দেখলাম না, ঐ বৈচিত্র্যময় পল্লীগ্রামের সারি। দেখতে পেলাম না আমার বাঙলা দেশ। একটা একটা স্টেশন পেরিয়ে যায় গাড়ী, আর অনুশোচনা আসে। যেন কত দোষ করেছি। দেখতে না পাওয়ার কষ্টে আফসোস হয়।

—বাঙলা দেশের কোথায় কোথায় যাওয়া হয়েছে? সহযাত্রী বললেন। নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন,—তবে ট্রেনে তোমাকে হপ্তায় হপ্তায় চেপে যেতে হয়।

—হাঁ, তা যা বলেছেন। আমি বাহিরবিশ্ব থেকে চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিই সলজ্জায়। বললাম,—প্রতি শনি আর রবিবার আমি বেরিয়ে পড়ি। ছুটিছাটার দিনেও বাদ দিই না, ট্রেনে উঠে পড়ি। এ আমার এক বদঅভ্যাস বলতে পারেন।

সহযাত্রী আবার বললেন,—কোন্ কোন্ দেশ দেখলে এতদিনে?

আমি স্মৃতি হাতড়াই। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে যেন, জামরঙের শাড়ীর বাহার ও চাকচিক্য দেখতে দেখতে। স্বর্ণঅলঙ্কারের ঝলমল, আমার চোখ দুটিকে আচ্ছন্ন করে যেন। উর্বশীর টিকালো মুখে টানা টানা চোখ আর সূক্ষ্ম ভুরু, এখনও যেন বিরক্ত হয়ে আছে। সহযাত্রীর সঙ্গে তার সুসম্পর্কের সম্বন্ধটা স্পষ্ট শুনিয়ে দেওয়া, মন থেকে যেন অপছন্দ।

আমি বলতে থাকি যখন যেটা মনে পড়ে। একটা একটা নাম ব'লে যাই। আমার দেশের অজানা রহস্যের সন্ধান দিতে থাকি যেন। আমি বললাম,—গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম রূপধাপুরে।

—নাম শুনিনি কখনও। সহযাত্রী বললেন সহজ সুরে।

—বারুইপুরের কাছাকাছি। তার আগের সপ্তাহে যাই সেই মির্জাপুর-বাঁকীপুর।

—সে আবার কোথায়?

—তারকেশ্বরের লাইনে যেতে হয়। তার আগের সপ্তাহে ফুরফুরা। গত তিন মাসের মধ্যে আমি দেখেছি দোগাছিয়া, চম্পাহাটি, কলাছড়া, পেয়ারাডাঙ্গা, চিনিপাই, সখের বাজার, গোচারণ, [illegible] আঠারোবাঁকি।

কি এক স্টেশনে ট্রেন থামলো আবার। ছুটতে ছুটতে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। থেমে থাকে, দম নিয়ে নেয়। গর্জন তোলে আকাশে, ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি। ব্রেক কষতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি কখন, আমি নিজেই জানি না।

দূরে থেকে স্টেশন নজরে পড়েছে আমার। জনহীন শূন্য প্ল্যাটফর্ম। যাত্রী নেই একটিও। মনে হয়, এই স্টেশন থেকে কেউ কোনদিন ট্রেনে ওঠে না। কেউ নামে না ট্রেন থেকে। নতমস্তকে স্টেশনের নামটি খুঁজতে চেষ্টা করি।

সহযাত্রী বললেন,—কি, চললে না কি হে ভায়া?

আমি তখন স্টেশনের নাম দেখতে পেয়ে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছি। নামটি বেশ মিষ্টি। 'হাওয়াখানা'।

বললাম,—হ্যাঁ, আমি চললাম।

—জ্যান্ত ফিরতে হবে না ভায়া, জেনে রেখে দিও। হাওয়াখানায় মানুষ নেই আর। রাতে না কি বাঘ বেরোয়।

—দেখা যাক। বললাম আমি, গাড়ীর দুয়োরের দিকে এগিয়ে।

ভদ্রলোক স্বগতোক্তি করলেন,—আজকাল-কার ছেলেদের পৌরুষ! মরবে আর কি ঠেঙ্গাড়ের হাতে!

উর্বশী আরও বেশী বিরক্ত হয়। মুখ ফিরিয়ে নেয় আমার চোখে চোখ পড়তেই। আমিও স্টেশনে নেমে পড়ি। জামরঙের শাড়ীর ক্ষণে ক্ষণ রঙ-বদল, আমার মনের চোখে।

যথারীতি হুইশিলের সাবধানী শুনিয়ে বার কয়েক গর্জে ওঠে ইঞ্জিন। তারপর চলতে থাকে পা পা। পোড়া-কয়লার ধোঁয়া-গন্ধ ছড়িয়ে রেখে যায়।

ঝিঁঝির ডাক শুরু হয়েছে 'হাওয়াখানা' স্টেশনের আশে পাশে।

লাল কাঁকরের প্ল্যাটফর্ম, আমার পদশব্দে জেগে উঠলো যেন, কতকাল ঘুমের পর। স্টেশন-মাষ্টার নেই এখানে। টিকিট চেকারও নেই। কুলীদের ভীড় দেখতে পাই না কোথাও। চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। কিছুদূরে সিগন্যালের নীল আলো, একচক্ষু দানবের মত।

ওভার-ব্রীজ পেরিয়ে খানিক যেতে না যেতেই হঠাৎ দেখতে পাই একজনকে। বিপরীত প্ল্যাটফর্মে তিনি, এতক্ষণ চোখে পড়েনি। পশ্চিম আকাশের সূর্য দেখছেন একদৃষ্টে। বৈকালিক আকাশে রাঙা আবীর ছড়ানো। হয়তো কারও জন্য অপেক্ষায় আছেন। প্ল্যাট-ফর্মের একটি মাত্র বেঞ্চীতে ব'সে আছেন, পাষাণ মূর্তি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। অস্তগামী রৌদ্ররেখা মুখাবয়বে। চোখের তারা দুটি অসম্ভব জ্বলছে।

—আপনার তরেই ব'সে আছি। আসুন।

বয়োবৃদ্ধ লোকটি কথা বললেন হঠাৎ। আমি যেন চমকে উঠলাম কেমন, অপ্রত্যাশিত কথা শুনে! চোখের যত উজ্জ্বলতা, কণ্ঠ তেমন নয়। যেন একজন অনাহারী, কথা বললে মিহিসুরে। কথার শেষে বেঞ্চী ছেড়ে উঠে পড়লেন।

অস্বস্তি হয় আমার। এ রহস্যের কিনারা খুঁজে পাই না। কে এই ব্যক্তি! আমি খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। বৃদ্ধের বেশবাস অতি মলি[ন।] আজানুলম্বা মটকার পাঞ্জাবীতে একাধিক ছি[দ্র।] বোতামের বালাই নেই। ছিন্নভিন্ন ময়লা ধুতি[র] অবিন্যস্ত কোঁচা, প্ল্যাটফর্মে লুটোপুটি খা[চ্ছে।] পায়ে একজোড়া ফিতাহীন কেডস্। লোকটি[র] মুখাকৃতি চিন্তাক্লিষ্ট, চক্ষু কোটরগত। হা[ত] পায়ের শিরাগুলি বড় বেশী স্পষ্ট। মাথ[ায়] কতকাল চিরুণীর স্পর্শ নেই, কে জানে।

—আমি ঠিক চিনতে পারছি না। চি[ন্তা] জড়িত কথার সুর আমার। বললাম,—আপ[নি] আমাকে কি চেনেন?

তিনি হাসলেন মৃদুমন্দ। দক্ষিণা বাতা[সে] তাঁর মাথার রুক্ষকেশ, মটকার পাঞ্জাবী উড়[তে] থাকে। লোকটির হাসিতে বোঝা যায় না, সম্ম[তি] না অসম্মতি। আমার কথার জবাব পাই ন[া।] তিনি বললেন—এখানে আগমনের কারণ [কি] আপনার? কেউ কখনও আসে না এই পা[ণ্ডব]-বর্জিত দেশে।

—জায়গাটা দেখতে এসেছি। কারণ [আর] কিছুই নয়, উগ্র কৌতূহল। আমি বলল[াম] এগোতে এগোতে।

—তা বেশ, তা বেশ! লোকটি কথা ব[লেন] প্রচ্ছন্ন খুশীর সঙ্গে। বক্ত যেন আন[ন্দ] পেয়েছেন শুনে।

সন্ধ্যা নামতে খুব বেশী দেরী নেই। [তা] আমি আর বাক্যব্যয় করি না। স্টেশনের সিঁড়ি[র] দিকে পা চালাই। সিঁড়ির এক ধাপে একটি [অ]ভিখারী। এনামেলের তোবড়ানো চটাওঠা এক[টা] বাটি রেখেছে সম্মুখে। তার পাশেই ব'সে আ[ছে] একটা কালো কুকুর। দার্শনিকের মত ভাবা[লু] চোখ কুকুরের। আমার দিকে ফিরেও তাকায় ন[া।]

স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে রাস্তায় নে[মে] পড়লাম। একটি মাত্র দোকান ছাড়া কিছুই আ[র] নজরে পড়লো না। বিশাল এক বটবৃক্ষের ছায়[ায়] ছোট একখানি বিপণি। দশকর্মা ভাণ্ডার। চাল ডাল তেল লবণও বিক্রী হয়।

দুই তিনজন ক্রেতা দোকানের সামনে। রাস্তার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে দেখলা[ম] এক[টি] চালাঘরের সামনে সাইনবোর্ড [illegible]। লে[খা] আছে: 'দাতব্য চিকিৎসালয়'। [illegible]জন বিশীর্ণ মূর্তি রোগী চাতালে আর দাওয়ায়। মাতৃক্রো[ড়ে] অসুস্থ শিশু সন্তান। কাঁদছে না ধুঁকছে জা[নি] না, চিলের মত চিঁ চিঁ ডাকছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দাতাকর্ণ ডাক্তারকে দেখতে পাই রাস্তা থেকে। একখানা ভা[ঙা] চেয়ারে ব'সে আছেন। সামনে কেরোশিন কাঠে[র] টেবিলে ওষুধের বাক্স। কাচের শিশির সারি দোয়াত, কলম, খাতা।

—ভুল-পথে যাবেন না।

—হঠাৎ আবার সেই বৃদ্ধের কণ্ঠধ্বনি পেছন থেকে শুনে আবার একবার চম[কে] উঠলাম। ফিরে তাকাতেই তিনি সেই মৃদুম[ন্দ] হাসির সঙ্গে বললেন,—ওদিকে আর রাস্তা নেই। ওদিকে শুধু ফাটধরা আল আর শুকনো ক্ষেত খামার। রাস্তা গেছে ঐ দিকে। চলুন বাত[লে] দিই।

—অনেক ধন্যবাদ। বললাম আমি, কৃতজ্ঞতা[র] সুরে।

আমার পাশে পাশে চলতে থাকেন বৃদ্ধ ফিতাহীন কেডস জুতো, কেমন এক সছন্দ শব্দ তোলে উঁচু-নীচু মাটির রাস্তায়। চলতে চলতে বললেন,—চলুন, নদীর ধার দেখে আসবেন

বেশী কিছু দেখার নেই এই হাওয়াখানায়। নদীর তীরটুকু আছে শুধু।

—নদীর নাম কি? কত দূরে? সাগ্রহে শুধোই আমি। ইদিক সিদিক দেখতে দেখতে পথ চলতে থাকি।

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। দুর্বল হাসির সুর। বললেন,—নদীর নাম মরানদী। জল নেই এক বিন্দু। সেই ভাদ্রের শেষে বর্ষার জল নামলে নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। বেশী দূরে নয়, কাছেই।

ব্যগ্রচিত্ত আমার। কতক্ষণে দেখতে পাবো মরানদীর রেখা। শুকিয়ে যাওয়া নদীতট, দেখলে আমি বিলকুল ভুলে যাই। জলহীন জলাধার, এঁকে বেঁকে যেতে যেতে এক মহা-নদীতে মিশেছে। শুষ্ক বালিয়াড়িতে স্নাইপের ঝাঁক কিচমিচ করছে।

খানিক যেতে না যেতে বৃদ্ধ হঠাৎ থামলেন। এক মুহূর্ত ভাবলেন কি যেন। বললেন,—কিছু যদি মনে না করেন, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাবো আমার ভিটেয় এক বাটি গরম চা খেয়ে যান। দময়ন্তী হয়তো এতক্ষণে চায়ের জল চাপিয়েছে।

শেষের কথাটি নিজেকে শোনাতেই বললেন যেন। আমি কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। হাওয়াখানার দময়ন্তীর দর্শন হয়তো পাবো আমি।

—অনুরোধ নয়, বলুন আদেশ। কোথায় আপনার ভিটা?

—এই তো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ শীর্ণ অঙুলের নির্দেশে দেখালেন। বললেন,—বাপ পিতামোর ভিটে। অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছি আমরা, কংকাল রেখে দিয়েছি। নমুনা দেখাতে হবে না লোককে? আমার পূর্ব পুরুষ ধনী-মানী ছিলেন তার প্রমাণ আর কোথায় পাবো বলুন।

দেখলাম রাস্তার পাশেই এক বিশাল ভগ্নপুরী। দুয়োরে জানালায় কপাট নেই। গরাদ নেই। দেওয়ালের পলেস্তারা কবে যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এক বিধাতাই জানেন। কার্ণিশের এখানে সেখানে বট আর অশথের শিকড় জড়িয়েছে। রাস্তা থেকে দেখা যায়, বিরাট বিরাট ঘর। ধূলিমলিন বেলোয়ারী লণ্ঠন ঝুলছে সেই আদ্যিকালের। বাতি জ্বালে না কেউ।

প্রথম দেখায় আমি ধ'রে নিয়েছিলাম, হয়তো বা হানাবাড়ী হবে। খোলা খোলা জানালা দরজার হাঁ যেন গিলতে আসছে। পাঁচ মহলা প্রাসাদের একটা মহল দাঁড়িয়ে আছে অতি কষ্টে। ঝড়ের জোরালো দোলায় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে একদিন। মানুষের বসতি আছে, বিশ্বাস হয় না।

—দময়ন্তী। দময়ন্তী—ী—ী— ডাকতে ডাকতে বৃদ্ধ তার ভিটায় ঢুকে পড়লেন। যত দূর চোখ যায়, মানুষের চিহ্ন নেই। শুধু গাছ আর গাছ। বন জঙ্গল। ঝিঁঝিঁ ডাকছে দল বেঁধে। কি এক পাখী ডাকছে গাছে লুকিয়ে। বিরাট আওয়াজ। ভয় ভয় করে। কান পেতে থাকলে এখানে কালের পদধ্বনি শোনা যায় হয়তো।

চকিতের মধ্যে ফিরে আসেন ভদ্রলোক। মুখে কেমন আত্মতৃপ্তির হাসি যেন। দুই হাতে দু'টি পেয়ালা। হাতলবিহীন। ব্যালান্স রক্ষা করতে হয়। তাই একটা পেয়ালা আমার হাতে ধরিয়ে বললেন,—আসুন, খেয়ে নিন। দেখবেন, দুধ মিষ্টি কম। হয়তো মুখে রুচবে না।

আমি যেন বনভোজনে বেরিয়েছি। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অমৃতের আস্বাদ পাই।

—দময়ন্তীও আসছে, দেখা করবে আপনার সঙ্গে। বৃদ্ধ বললেন ফিসফিস সুরে। বললেন,—কিছুতেই আসতে চায় না, ভীষণ লজ্জা তার। অনেক বলতে তবে রাজী হয়েছে।

শ্বেতবসনা কে একজনের আবির্ভাব সেই প্রবেশ-দ্বারে। পাড়হীন থান পরনে। অত্যন্ত লজ্জাবতী। নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনন্যসাধারণ শুভ্র দেহবর্ণ।

—এই আমার দময়ন্তী। ভাগ্যহীনা মেয়ে আমার। বৃদ্ধ চায়ের নিঃশেষ পেয়ালা মেয়ের হাতে দিয়ে কথা বললেন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে। আমি বেশ দেখতে পেলাম, বৃদ্ধের গলকম্বল শিউরে শিউরে ওঠে। বললেন, দু' দু'বার বিয়ে দিয়েছি মেয়ের। নিজে একঘরে হয়ে আছি আজও। কিন্তু আমার এমনই পোড়া বরাত মেয়ের কপালে স্বোয়ামী সহ্য হল না। তাই আমার কাছেই রেখেছি মেয়েটাকে। যতদিন বেঁচে আছি রাখবো। তারপর—

তারপর আর কিছু বললেন না তিনি। জলজলে চোখ দু'টো ভিজে উঠলো। দময়ন্তীও আর দাঁড়ালো না। মুখে আঁচল চেপে অন্দরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদ যেন লুকিয়ে পড়ে ঘনমেঘে।

বেশ কিছুক্ষণের অসহ্য নীরবতা। আমি চায়ের পেয়ালা দুয়োরের একপাশে নামিয়ে রেখে বললাম,—চলুন, নদীর ধারে যাই।

আমার বাঙলাদেশের গ্রামের এক ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ঐ দময়ন্তী, বৃদ্ধের পরলোকপ্রাপ্তির পর কে তাকে দেখবে কে জানে! হয়তো কেউ দেখবে না।

রাস্তায় নামলেন তিনি। লম্বা লম্বা পদ-ক্ষেপে চললেন। মাটির বন্ধুর পথে ফিতাহীন কেডস জুতোর শব্দ।

সূর্য প্রায় অস্তাচলে। আঁধারের কালো আভাষ এখানে সেখানে। কাদির জটলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে। সান্ধ্য বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ভাসছে। সূর্যের আলো বড় একটা এ অঞ্চলে পৌঁছায় না।

আমার মনে না-দেখার দেখা পাওয়ার জিজ্ঞাসা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় এমনি অলাজমি আর গাছের আঁধারের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেখে এক জোড়া শিয়াল দৌড় দেয় ঊর্ধ্বশ্বাসে।

—মনে করুন, আপনি এই পথে একা একা চলেছেন। মনের দুঃখ ভুলে গিয়ে বললেন বৃদ্ধ। মৃদু মৃদু হাস্যরেখা মুখে। বললেন,—মনে করুন, একা যেতে যেতে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যার হাতে আছে কোন রকম মারণাস্ত্র।

—অর্থাৎ! ভয়ে ভয়ে বললাম আমি। এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি, বৃদ্ধ তার আজানু-লম্বা ঘটকার পাঞ্জাবীর পকেটে ডান হাতের মুঠো সিঁদিয়ে রেখেছেন। দেখে আরও ভীত হই আমি।

—অর্থাৎ, মনে করুন, তার হাতে থাকতে পারে ভোজালী, তরোয়াল, রিভলভার, যা হয় কিছু। চলতে চলতে বলে যান তিনি।

আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি বেশ ভীত হয়েছি। এতক্ষণে বুকে ধুক ধুক শব্দ হয়েছে। কর্ণকুহরে ঢুকিয়ে দেয়। পা আর চলতে চাইছে না। সম্মুখে শুধুই অন্ধকারের কালিমা। জোনাকি জ্বলছে বাঘের চোখের মত।

আমিও আমার পকেটে হাত পুরে দিই। ভয় না পাওয়ার ভাব দেখিয়ে বলি,—ধরুন আমার কাছেও যদি থাকে কোন এক অস্ত্র। ধরুন ছুরি ছোরা বা হয় কিছু।

হেসে ফেললেন বৃদ্ধ। শিশুর মত হেসে উঠলেন নির্জন বনাঞ্চলে। বললেন,—তবে তো ফাইট হবে পরস্পরে। হাতাহাতি হবে।

বৃদ্ধের চোখ, আমার পকেটে সিঁদানো হাত এতক্ষণে দেখতে পায়। মুখের হাসি মিলিয়ে যায় অকস্মাৎ। তিনি যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—ঐ বুঝি নদীর বালিয়াড়ি। আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলে কথা বললাম।

—হ্যাঁ, আমাদের হাওয়াখানার মরানদী। আমার দময়ন্তীর মতই যেন ভাগ্যহীন। জলের সঙ্গে মরানদীর মিলন নৈব নৈব চ।

এখানে সেখানে ঝোপ-ঝাড়। কাশের বন। মরানদীর শুষ্করেখা চোখে পড়ে। মৃত মরালের কঙ্কাল পড়ে আছে যেন।

—যা বলছিলাম, বলা হল' না। বৃদ্ধ আবার রহস্যময় কণ্ঠে কথা বললেন,—আপনি কি মনে করেন, রিভলভারের সঙ্গে ছোরাছুরির পাল্লা দিতে পারবে?

শিহরণের রোমাঞ্চ। আমার বুকের ভেতর ছাঁৎ করে ওঠে। লোকটি পকেট থেকে হাত বের করে না কেন এখনও। কি আছে পকেটে। ছোরা-ছুরি না রিভলভার কি জানি আমি ছাই।

আমি উত্তর খুঁজতে থাকি এলোপাথারী। সাংঘাতিক ভয়ে আমার সত্তা হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। যা মনে আসে ব'লে দিই। বললাম,—না তা কখনও পারে না। রিভলভারের সঙ্গে রিভলভার না চালালে ফাইট জমে কখনও!

আবার হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। হাসতে হাসতে বললেন,—ঠিক বলেছেন। ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনি কি ভীষণ ভয় পেয়েছেন। আপনার শ্বাসপতনের ধরণটা ভাল লাগছে না। ইয়ং ম্যান, এত ভয় কেন? এই দেখুন না আমার পকেটে কিচ্ছু নেই। কথা বলতে বলতে ফুটো পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে দেখালেন। বললেন, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। পকেট একেবারে আপনাদের কলকাতার গড়ের মাঠ। পুকুরের মাছ বিক্রী ক'রে খাই। সংসার চালাই। আমি রিভলভার পাব কোথায় ভাই?

স্বস্তির শ্বাস ফেললাম আমি। ভয় না পাওয়ার ভান করলাম। বললাম—এখন ফিরবো আমি। ফিরতি ট্রেন ধরতে হবে।

আমিও পকেট থেকে হাত বের ক'রে নিলাম। হাত-ঘড়িতে সময় দেখলাম।

—সে কি! আকাশ থেকে পড়লেন বৃদ্ধ। বললেন,—যাবেন কি মশাই, শুক্লপক্ষের রাতে নদীর ধারে বেড়াবেন না আপনি?

—না। বললাম ফেরার পথে ফিরে।

—এ দৃশ্য না দেখলে কি আর দেখলেন?

আবার আসা যাবে পরে, আপনাদের এই হাওয়াখানায়। আমি কথা বলতে বলতে জোর কদমে চলতে থাকি। যে পথ ধ'রে এসেছি সেই পথ ধরি আবার। আর কালবিলম্ব নয়। আর নয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে রক্ষা

(শেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায়)

নৈবেদ্য
প্রার্থিত কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করলে, ব্যষ্টিগতভাবেই হোক আর গোষ্ঠীগতভাবেই হোক, আমরা সকলেই চাই অর্ঘ্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।
পশ্চিমবঙ্গের নানা অভাব। সে অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে একটি একটি করে বাধা অতিক্রম করে,—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পরিবহন এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই তাঁরা এনেছেন বিশেষ সাফল্য।
পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁদের অর্ঘ্যের ডালি। দ্বিগুণ কর্মশক্তি লাভ করে যাতে আরো কঠিন কাজ করতে পারেন—সেই হলো তাঁদের প্রার্থনা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
WBF-I-59.

তিরিশ দশকের এক গল্প

(৫৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গম্ভীর হয়ে গেল। হ্রদের নীল জলে হাঁস পাখনা ঝাড়ল। আর ক্রোভার তৃণের প্রাচুর্যে উত্তপ্ত বাতাস বয়ে গেল।

ছোটখাটো, পাহাড়ী শস্যক্ষেত, মাঠ ছাড়িয়ে পাহাড়ের সানুদেশে একটু উঠে গেলাম এদের 'কাপেলে'। এবড়ো-খেবড়ো নীচু নীচু পাহাড়ের বুকে বেড়ার ঘেরা কাঠের ক্রুশে আবদ্ধ যীশু।

কাঠের মূর্তিটির কাছে পৌঁছা মাত্র ডান হাত কপালে, বক্ষে, বামে ও দক্ষিণে স্পর্শ করে ক্রশ চিহ্ন তৈরি করল বেসিল, মাথা নামাল।

হঠাৎ মনে হ'ল এ তো বিদেশী। এর সঙ্গে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? এর আকৃতি ভিন্ন, এর ধর্ম ভিন্ন। আমি আর এ কি করে এক হ'তে পারি?

আবার তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে আমাকে বললে সে, "শকুন্টি, তোমাদেরও প্রেমের দেবতা আছেন, কিষণা। যীশুকে তাঁরি সঙ্গে মিলিয়ে নাও না।"

আমার হাত সে ধরল, বর্বরের মত নয়, কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ কবোষ্ণে আমার ক্ষীণ বাঙালী বাহু পীড়িত হয়ে উঠল। বসন্তের বাতাস যেমন আঙুরের ত্বকে সুখ-স্পর্শ আনে, তেমনি তার অবাধ্য চুল উড়ে আমার কপোলে ছোঁয়া দিল। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।"

তৎক্ষণাৎ ধূসর নীল আকাশে সপ্ত রংয়ে রামধনুর উদয় হ'ল। আমার বিহ্বল মুখে তাকিয়ে সে বলল, "আমি জানি তুমিও আমাকে ভালবাস। জানো, একটা কথা তোমাকে আজ বলে দেব। আমারও একটা বাঙালী নাম আছে—বসন্ত।"

আমি চমকিত হলাম, "বলো, বলো বেসিল, কে তোমাকে বসন্ত নামে ডেকেছে?"

অন্ধকার মুখে সে বলল, "মেয়েলি ঈর্ষা নিরসনের জন্যে বলছি, প্রিয়া নয়। সে কে আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না। আর জিজ্ঞাসা কোর না আমার জীবনের কথা। আমি যা, তাই আমাকে তুলে নাও, শকুন্টি।"

আমার ভীত মুখের দিকে কোমল দৃষ্টি মেলে সে বলল, "জেনে রাখো, আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক। চোর ডাকাত বা খুনে নন। তিনি পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার। আমি তাঁর একই ছেলে। আমার সৎ বোন দুটি। তিনি আমাকে বার্লিন শহরে ডাক্তারিতে বসিয়ে মারা গেছেন।"

আমি কিছু বলবার আগেই সে ব্যস্তভাবে কথা উল্টে দিল—"আমি অবশ্য বার্লিনের অখ্যাতনামা রাস্তায় থাকি। একদিন আমি বড় লোক হ'বো, তোমারি জন্যে হ'বো। বার্লিনের বসন্ত আপেল ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে উষ্ণ বাতাস বয়। আমাকে একটি চুমো দাও।"

যেখানে যত ফুল ছিল, তারা ফুটে উঠল। আধোরেখার চাঁদ জাগল। বেসিল আমার কুমারী-জীবনের বসন্ত। শীষ দিয়ে ভাগনারের সুর সে আমাকে আবার শোনাল—লোহেনগ্রিন।

আমার রক্তপদ্মেও সুদূরের লোক, তারও জীবনে রহস্য আছে।

* * *

কয়েকটি দিন পরে অটোর বাড়ী ধোপা এসেছে কাপড় কাচতে। গৃহিণী ব্যস্ত রুটী তৈরির কাজে। সহরের কল থেকে অটো আটা পিষে এনেছে। নিনা বাড়ীর সব্জী বাগানে স্যালাডের উপযোগী আনাজ তুলছে। রান্না-ঘরেই খাবার টেবিল। এক গ্লাস বিয়ার হাতে অটো সেখানে খোসগল্পে মগ্ন।

দুপুরের খাবার সাজাচ্ছে নিনা, শূকরের মাংস, রুটী, মাখন, কফি। বাবাকে প্রশ্ন করল, "অতিথিদের মধ্যে মহিলা দু'জন আছেন আজ উপস্থিত। হের ডকটর কোথায়?"

নিবেদিতা খাবার আসরে ঢুকেছিল। তার দিকে চেয়ে একটু হেসে অটো বলল, "যুবক-কালে অমন নিত্য নূতন সঙ্গিনী নিয়ে ভ্রমণ করতে গেলে খাওয়া ভুলে যায় সবাই। ফ্রয়লাইন সেন, কিছু মনে করবেন না। হের ডকটর চিরকালের ফূর্তিবাজ।"

খাওয়ার পরে নিবেদিতা আমাকে কাল মুখে বলল, "শুনলে তো অটোর কথা?"

"বিয়ারের নেশায় বুড়ো কি না বলেছে।"

"মোটেই বিয়ারে ওদের নেশা হয় না। শক্তি, আমি হাতজোড় করছি, জার্মানি ছেড়ে চল। বাঙালীর মেয়ে তুমি, ভেসে যেও না। তুমি ওর জীবনের কিছুই জানো না। বসন্তের প্রেমে শীত কাটে না।"

"নাই বা জানলাম। ও নিষেধ করেছে জিজ্ঞাসা করতে।"

"ও তো করবেই, নইলে যে কেচ্ছা বেরিয়ে যাবে। শক্তি, তুমি এত বোকা? নিশ্চয় খোলা-খুলি প্রশ্ন করবার তোমার অধিকার আছে। তুমি কি ওর হাতে খেলার পুতুল? শক্তি, তোমার মা, তোমার বাবার কথাও কি ভুলে গেছ?"

সেদিন সন্ধ্যায় আবার পাহাড়ী 'কাপেলে'-তে গেলাম। এবার আমি তাকে ডেকে নিলাম।

সেদিনের সেই চাঁদ ঝরানো, ফুল-ফোটানো সন্ধ্যা। আমি বললাম, "বেসিল, তোমার জীবনের কথা আমি জানতে চাই। তোমার আমাকে বলতে হ'বে।"

নীল হয়ে গেল তার মুখ, "কেন? তোমাকে তো বলেছিলাম"—"জানি। কিন্তু এভাবে চলা যায় না। আমার যাবার দিন হয়ে এল। নিবেদিতা বড় বকাবকি করে।"

"কেন শকুন্টি? ওর নামের পশ্চিমী মহিলা তো দেশ ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তোমাদের দেশের জন্য—ও কেন বাধা দেয়?"

"ও আমার ভালো চায়।"

আমার দৃঢ়তা দেখে বেসিল চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আর একটু সময় যদি পেতাম, যদি তুমি আমাকে আর একটু ভালবাসতে। আমার কথা শুনে আমাকে ঘৃণা করবে না তো শকুন্টি।"

"দেখা যাক।"

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার সর্ব দেহ বন্দনা করতে করতে বেসিল বলল "তোমাদের বুদ্ধি না শুধু ভালবাসি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা ছবি যেন তুমি। কি সুন্দর। কিন্তু তোমার ভারতীয় সত্তা এক মুহূর্তে আমার কাছ থেকে সরে গেল। তুমি আমার গোপন কথা না শুনে নিরস্ত হবে না। শকুন্টি শোন, আমার জন্ম আইনসঙ্গত নয়। আমার মা বাবাকে বিয়ে করেননি।

এক বসন্তের জার্মানিতে একজন বাঙালী মহিলাকে আমার বাবা ভালবেসেছিলেন। তিনি বিবাহিতা ছিলেন। স্বামীকে ডিভোর্স করে বাবাকে বিয়ে করতে তিনি রাজী হলেন না। আমাকে 'বসন্ত' নামে একবার ডেকে তিনি জন্মের মত ছেড়ে চলে গেলেন। শকুন্টি, তোমরা বাঙালীরা কি নিষ্ঠুর।"

"নিষ্ঠুর?" আমার চিরদিনের রক্ষণশীল, অভিজাত দুহিতার সত্তায় তখন প্রচণ্ড কোলাহল জেগেছে। বিদেশী, তাই যথেষ্ট নয়, আবার কলঙ্কিত জন্ম! আর কেন? শক্তি সেন, তুমি পালাও।

"নিষ্ঠুর নও? ভাবপ্রবণতার মধ্যে তোমাদের সবলতা নেই। তোমরা ভালবাসো অথচ তার জন্য সমাজ ছাড়ো না।"

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, আমার সমগ্র জীবনে অশান্তি এনেছে যে বসন্ত, তাকে রূক্ষ কণ্ঠে বললাম, "সমাজ ছেড়ে কোথায় আসবো আমরা? পাপের মধ্যে? তোমাদের তো কোন কিছুই ভদ্রতাসঙ্গত নয়।"

নীলচোখে বসন্তের এবার অগ্নিদাহ দেখা দিল, সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল", আমাদের সম্পর্কে এত বড় কথা তুমি বললে? তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহারে অভদ্রতা কিছু পেয়েছ?"

তার ব্যবহারে যেন জার্মান জাতির সুপ্ত কোন বর্বরতা জেগে উঠল, আমার আধ্যাত্মিক ভারতীয় রক্ত বিদ্রোহ করে উঠল। আমিও সমধিক রূক্ষতায় উত্তর দিলাম, "পাইনি, কিন্তু পেতে কতক্ষণ। যাতে না পেতে হয় তাই তোমাকে ছাড়লাম। বিদায়!"

তাকে সেখানেই ফেলে রেখে বিদ্যুতের মত ছুটে চলে এলাম। পরের দিন সকালেই বাভেরিয়া ছাড়লাম।

"বল, আরও বলো।"

পাতায় পাতায় নূপুর বাজানো বর্ষা। ঘরের দেওয়ালে অন্ধকার। ফিরে এলাম আমরা বাংলা দেশে।

শক্তি সেন আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন, "আর নেই। নিবেদিতা কি লিখেছিল জানি না। এক-দুইমাসের মধ্যেই জোর করে বাবা ফিরিয়ে আনলেন আমাকে। জীবনে দেখা হয়নি।"

পাওলা চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠল। উঠে দাঁড়াল সে সবেগে। "কি হ'ল, পাওলা?" আমরা বিস্মিত প্রশ্ন করলাম।

"তোমরা কি নিষ্ঠুর। আমি জার্মানিতে ফিরে যাবো। আমার মায়ের দেশ।" "সে কি? জার্মানিতে তো মাত্র তিন-চারবার গেছ। তুমি বাংলার মেয়ে।" "না। আমি বাংলার নই। তোমরা ভালবাস শুধু কাঁদাতে।" দেখলাম পাওলার সমগ্র দেহে, মনে কোথাও বাঙালিত্ব

([illegible] পৃষ্ঠায়)

দুর্দৈবাচার্য

(৫২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

—কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতিষীই বা তার চেয়ে ভাল কি বলছেন? হবে হবে হবেই ত করে যাচ্ছেন ক্রমাগত। তারিখ দিতে পারেন না কেন? ওরা ত হোক বা না হোক, তারিখ একটা বেঁধে দিয়েছে মহাপ্রলয়ের। হল, মিটে গেল। না হল, তাও হল—সবাই জানলে ফাঁড়া কেটে গেল। এ কাঁহাতক খালি হচ্ছে হচ্ছে করে ঝুলে থাকা।

—কি জানেন, এগুলো হচ্ছে মোটামুটি হিসেব, যাকে বলে (general calculation)। মিথুন রাশির লোক ত একজন নয়। সবার নক্ষত্র লগ্ন রাশিচক্র এক নয়। নিখুঁত গণনা হবে পুরো রাশিচক্র নিয়ে। তাই এগুলো কারু খানিক লাগে, কারু বা লাগ-লাগ করেও ফসকে যায়—মানে রাশি যেটা ঘটাবে, নক্ষত্র হয়ত সেটাকে ভেস্তে দিলে।

—তা বটে।

—খাঁটি গণনা পেতে হলে পুরো ছকটি নিয়ে বসতে হয়। তাই চলুন না একদিন, যাবেন?

—কোথায়?

—জ্যোতিষীর কাছে। মানে, এই গণনা যিনি করছেন।

—আপনি চেনেন? ভাল লোক?

—চিনি, মানে শুনেছি। লোক ভাল না হলে কি আর অতবড় পত্রিকা তাঁর গণনা নিয়মিত বার করত?

—পত্রিকা ত সবই বার করে। জলদ্ধরের বিজ্ঞাপনও তারাই ছাপছে।

—আহা, সে হল বিজ্ঞাপন, টাকা পাচ্ছে ছেপে দিচ্ছে। তার সত্য-মিথ্যা নিয়ে কাগজের দায়িত্ব নেই। আর এটা ধরুন, একটা ফীচার। মানে এর সত্য-মিথ্যে সম্বন্ধে এডিটোরিয়াল দায়িত্ব নিতেই হচ্ছে খানিকটা। একেবারে বাজে মনে করলে কি ছাপত?

—তা বটে। কিন্তু তা হলে ফলছে না কেন?

—বললাম ত হয়ত আটকে যাচ্ছে কোথাও। অন্য কোন গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে। সেইটে বুঝে নেবার জন্যেই ত পুরো রাশিচক্র নিয়ে বিচার।

—কিন্তু, কোষ্ঠী ত নেই।

—কি বিপদ, আপনি ত আছেন। যতগুলো জানেন তাই বলে দেবেন। তারপরে হাতের পাতাও আছে, ওই থেকে হয়ে যাবে।

কৌতূহল হইল। ভদ্রলোকের আগ্রহকেও বাধা দিতে লজ্জা হইল। কহিলাম, বেশ ত, চলুন একদিন।

* * *

গ্রে স্ট্রীটে জ্যোতিষীর চেম্বার। প্রাচীনকাল হইতেই এ ব্যবস্থা। বড় বড় কবিরাজ এবং বড় বড় জ্যোতিষী, সকলেই গ্রে স্ট্রীটে থাকেন। গ্রে অর্থ প্রবীণ, পলিত কেশ। গ্রে স্ট্রীট অর্থে প্রবীণপাড়া।

ছোট একটি ঘর। সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি লম্বা বোর্ড খাড়া করা। তাহাতে চিত্র বিচিত্র করতল আঁকা তাহার তলায় জ্যোতিষীর নানাবিধ অলোকিক শক্তির বিবরণ ও বহুপ্রকার অব্যর্থ ফলপ্রদ কবচের মূল্য তালিকা।

জ্যোতিষী একাই ছিলেন। ছোট খাটে ফরাস। তাহার মাঝখানে বসিয়া একটি কোষ্ঠী দেখিতেছিলেন। আমরা নমস্কার করিয়া বসিলাম। জ্যোতিষীর বয়স খুব বেশী নয়। চল্লিশের মধ্যেই মনে হইল। সেটা অবশ্য অলৌকিক শক্তি বলেও হইতে পারে। খুব শীর্ণ আকৃতি, সম্ভবত অত্যধিক জপতপ ও উপবাসের ফল। চক্ষু কোটরগত ও ক্ষুদ্র—। নিশ্চয়ই ক্রমাগত হোমশিখার আঁচ লাগিয়া লাগিয়া হইয়াছে।

যথাসাধ্য ভক্তিমান হইয়া বসিলাম। কথা বার্তা বন্ধুই বলিলেন। কহিলেন, আপনার সাপ্তাহিক ফল এঁর ফলে ফলেও ঠিক ফলছে না। তাই নিয়ে এলাম, একবার দয়া করে সবটা দেখে দিতে হবে।

ফলছে না? জ্যোতিষী চিন্তামগ্ন হইলেন। তারপর ক্রমকাল জিজ্ঞাসা করিলেন। যথাসম্ভব বলিলাম, রাশি, নক্ষত্র, লগ্ন, গণও যথাশ্রুত বলিলাম। জ্যোতিষী পঞ্জিকা দেখিলেন হাত দেখিলেন, শ্লেটের উপর পাশার ছক আঁকিলেন, অনেক হিসাবপত্র করিলেন। তারপর বলিলেন, একটা গ্রহ বৈরী হয়ে আছে, যা ঘটাবে তাকে ঘটতে দিচ্ছে না। নইলে প্রত্যক্ষ ফল আপনার অনেক আগেই ঘটে যেত।

আমি কহিলাম, কিন্তু ফলবে কি করে। ধনাগম, না হয় কুড়িয়েই পেলাম কিছু। সন্তান, তাও হল। কিন্তু আমার ফলে ক্রমাগত দেখছি পদোন্নতি। তার মানে প্রোমোশন। কিন্তু আমার ঠিক উপরে যিনি আছেন, তিনি থাকতে থাকতে ত আর সেটা হতে পারে না।

জ্যোতিষী রহস্যময় হাসি হাসিলেন। কহিলেন, ভাগ্য প্রসন্ন হলে তাঁর একটা ভালমন্দ হতে কতক্ষণ।

—ভালমন্দ মানে বিপদ আপদ? ছি ছি

—বিপদ আপদই হবে কে বললে। ভালমন্দ মানে মন্দও হতে পারে, ভালও হতে পারে। ধরুন তিনি বেশী মাইনে পেয়ে আর কোথাও চলে গেলেন, বা অন্য অফিসে ট্রান্সফার হলেন বা ধরুন রেসে লটারিতে লাখ দুলাখ পেয়ে গেলেন আর চাকরি করলেন না।

—তা হয় ত আপত্তি নেই। যাক, দেখুন ত, আমার ব্যাপারটা কি হচ্ছে?

জ্যোতিষী আবার অঙ্ক কষিলেন, আমার দুই হাতের পাতা ধরিয়া ও টিপিয়া, দেখিলেন, আঙুলগুলো ভাঁজ ভাঁজ করিয়া দেখিলেন। শেষে কহিলেন, হবে, কিন্তু সময় নেবে ঐ গ্রহটি আরও দূরে সরে না যাচ্ছে যতদিন, ততদিন ধৈর্য ধরতেই হবে।

—কতদিন?

জ্যোতিষী পাঁজি খুলিলেন, তা ধরুন অন্ততঃ বছর দুই ত বটেই।

—সেরেছে।

—অবশ্য আগেও হয়। কিন্তু আপনারা ত এসব মানেন না।

—কি?

—পুরুষকার। যেটা নিজে থেকে, নৈসর্গিক কারণে ঘটবে তার নাম দৈব। নিজের চেষ্টায় তার ফলকে কিছু পরিমাণে ব্যাহত বা বর্ধিত করে নেওয়া যায়, তার নাম হচ্ছে পুরুষকার।

—সে কি করে হবে?

—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, পুরশ্চরণ, কবচধারণ ইত্যাদি।

—কি রকম? গ্রহ আমাকে বাধা দিচ্ছে। সে তার কক্ষপথে চলেছে। চলতে চলতে যখন এতটা দূরে যাবে যে তার প্রভাব আর আমার ওপরে পড়ছে না, তখন আমার মুক্তি এই ত?

—হ্যাঁ।

—তাই যদি হয়, আমি একটা মাদুলি ধারণ করলাম, বা আপনি একটা যজ্ঞ করলেন, তার ফলে কি সে গ্রহের গতিপথ বদলে যাবে বা গতির বেগ বেড়ে যাবে?

—অতি সংগত প্রশ্ন করেছেন। শিক্ষিত লোকের মত প্রশ্ন। উত্তর আমি দিচ্ছি শুনুন। একটা গ্রহ আপনার ভাল করছে। অন্য একটা তাকে ঠেকাচ্ছে। কবচ বা স্বস্ত্যয়নের ফলে দ্বিতীয় গ্রহের গতিবেগ বাড়বে না, ঠিক। কিন্তু প্রথম গ্রহের যে প্রভাব আপনার ভাগ্যের ওপর পড়ছে, কবচ বা স্বস্ত্যয়নের বলে তার সে প্রভাব বর্ধিত হতে পারে। তার বলে দ্বিতীয় গ্রহের বৈর-প্রভাবকে সে কাটিয়ে উঠবে আপনার যে শুভফল এতদিন ঘটাতে পারছিল না, এখন ঘটাতে পারবে।

—গ্রহের প্রভাব বাড়বে কি করে? আমি হাতে মাদুলি বাঁধলাম, তাতে গ্রহের কি হ'ল?

—আপনি চশমা পরেন কেন? সূর্য থেকে আলো আসছে। চশমা পরার ফলে সেই আলোকে আপনার চোখ আরও ভাল করে গ্রহণ করতে পারছে। যেটা খালি-চোখে পড়তে পারছিলেন না, এবার পারলেন। ঠিক ত?

হ্যাঁ।

—এও ঠিক তাই। গ্রহের অদৃশ্য রশ্মি আপনার দেহকে মনকে স্পর্শ করছে আপনার চিন্তাকে প্রবৃত্তিকে কর্মপ্রেরণাকে উৎসাহিত করছে। এরই ফলে মানুষের ভাগ্য গড়ে ওঠে। কবচে উপচারে যদি সেই রশ্মির প্রভাবকে আপনার ওপরে তার রি-অ্যাকশনকে বাড়িয়ে তোলা যায়, ভাগ্যের ওপর ফল কেন হবে না, বলুন?

মুগ্ধ হইলাম। কহিলাম, বেশ, করুন স্বস্ত্যয়ন। কি রকম খরচ পড়বে?

জ্যোতিষী কহিলেন, আমি যথাসম্ভব কমে করে দেব। আপনি ভাববেন না।

পুরশ্চরণ ও কবচের ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়া, ও কিছু টাকা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরে আবার গিয়া কবচ লইয়া আসিলাম। জ্যোতিষী সেদিন লাল কাপড় পরিয়াছিলেন, ললাটে রক্ত চন্দনের দীর্ঘ রেখা। কহিলেন, কাল সারারাত জেগে হোম করতে হয়েছে।

সাদা সাদা ছাইর একটি টিপ কপালে পরাইয়া দিয়া কহিলেন, যজ্ঞ-ভস্ম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। সব বিঘ্ন কেটে যাবে।

—কতদিনে ফল বুঝব?

—অচিরাৎ বুঝবেন, বিশ্বাস রাখুন। একটি মাদুলি বাহুতে বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, এ হচ্ছে সংকটা কবচ। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। প্রত্যহ শোবার আগে একে ভক্তিভরে প্রণাম করবেন। ভোর-বেলা একে ধুয়ে এক গণ্ডূষ জল খাবেন।

ঘাবড়াবেন না, হয়ত দু'দিন না যেতেই এর ফল ফলিতে পারবেন।

তাঁহার কথা মত সকল প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া বিদায় লইলাম। আমার 'ছিতাংশু' সারারাত্রি জাগিয়া আগুনে তাতে সহ্য করিয়াছেন ভদ্রলোক. টাকা লইয়া দরাদরি করা অসম্ভব।

কবচের প্রত্যক্ষ ফল কতদিনে প্রত্যক্ষ করিব, ভাবিতে ভাবিতে পথে বাহির হইলাম। প্রত্যক্ষ করিতে সময় লাগিল না।

অব্যর্থই বটে। হাতীবাগানের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল কবচটি সজীব হইয়া উঠিয়াছে।, বাহু বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। অনভ্যস্ত অনুভূতিতে চমকাইয়া উঠিলাম। আস্তিন গুটাইয়া তাহাকে স্বস্থানে ফিরাইবার জন্য টানা-টানি করিতেছি, এমন সময় এক পাপিষ্ঠ পিছন হইতে আমাকে ধাক্কা মারিল। ফলে কিছুটা ছিটকাইয়া কিছুটা পা হড়কাইয়া সরিয়া গেলাম এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বাঞ্ছিত ট্রামখানা আমাকে কিঞ্চিৎ গা ঘষিয়া দিল। হুমড়ি খাইয়া পড়িলাম। ডান পায়ের হাঁটুটি চমৎকার রকম আহত হইল।।

কিছু হৈ-চৈ, তারপর অ্যাম্বুলেন্স, তারপর আর জি কর। ডাক্তার বলিলেন, বাটি ফাটিয়াছে। ঠ্যাং জুড়িয়া প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ দিলেন। দিয়া গোটা পাখানাকে স্লিং-এ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ঝুলন্ত পা আমার মাথার বালিশ হইতেও কিঞ্চিৎ উচ্চস্থানে রহিল। পদোন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া মাসখানেক কাটিল, ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটিল।

মহাপ্রলয়ের দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। মহাভারতীয় মহাধর্মঘট মহাকলরবে স্থাপিত হইল এবং যথারীতি মহাফুটো হইয়া গেল। আসামে ভাল ভাল দেশপ্রেমাত্মক মহৎকর্ম অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—কতক বিবরণ শুইয়া শুইয়া কাগজে পড়িলাম, কতক বা লোকের মুখে শুনিলাম। এ সব খবর শুনিবার একটা সভ্যরীতি আছে। শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতে হয়, পড়িতে পড়িতে উত্তেজনার বশে এক একবার উঠিয়া বসিতে হয়, খুব মুখ চোখ গরম করিয়া হুঙ্কার টঙ্কার ছাড়িতে হয়, তার-পর আবার শুইয়া পড়িয়া বাকি খবরটুকু শেষ করিতে হয়, তারপর পৃষ্ঠা উলটাইয়া পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বা অলিম্পিক ও ক্রিকেট বোর্ডের খবর পড়িতে হয়। যথারীতি সমস্তই করিলাম, শুধু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসা বাদ। অটো-ম্যাটিক চেষ্টা করিয়াছিলাম দু' একবার। হাঁটু টাটাইয়া আবার চিৎ হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

মাসখানেক পরে আবার একদিন বাড়ি ফিরিলাম। ট্যাক্সি করিয়া অফিসে গেলাম। পদোন্নতির কাহিনীটি বন্ধুকে বলিলাম।

শুনিয়া তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গেল।

কথা প্রসঙ্গে কহিলাম, আচ্ছা, ভদ্রলোকের নাম কি?

কমলাকান্ত দ্বিবেদী।

—দ্বিবেদী মানে, অবাঙালী? আমারও ঐ রকম মনে হয়েছিল। ভদ্রলোকের কথাগুলো কি রকম বাঁকা বাঁকা, অস্পষ্ট উচ্চারণ, বোঝাই যায়, বাংলা চেষ্টা করে করে বলছেন, অথচ চেহারা দেখে পশ্চিমা বলে মনে হয় না। জানেন কিছু?

স্বপ্ন

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

চলেছি রাত্রির ট্রেনে। বাইরে দু'ধার অন্ধকার।
ভিতরে আলোক, যাত্রী কোলাহল। দেখি চেয়ে
সামনে জানলার ধারে একটি শ্যামল স্নিগ্ধ মেয়ে
বসে আছে এরি মাঝে। তার মুখ আর দেহ তার
যায় নাকো দেখা সব। শুধু কালো কবরীর ভার
এবং গ্রীবার কিছু দেখা যায়; আর পিঠ ছেয়ে
শাড়ির সলজ্জ রেখা বুকের কবোষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে
দেখা গেল এলোমেলো অজস্র ইচ্ছার একাকার।

ফেরালো না সেই মেয়ে পুরোপুরি একবারও
মুখ,
নীরবে শুধুই যেন পড়ে চলে আকাশের লেখা,
(মনে হয় সুখী নয়—
মনে তার কী যেন অসুখ)
তবু দেখি। দেখি আমি যতটুকু যায় তার দেখা।
তারপর স্বপ্ন দিয়ে ভরে নিই তার মুখ বুক :
সৃষ্টি করি জীবনের অন্তহীন অপাওয়া অদেখা।

জানিনে, খবর নেব।

পরদিন বলিলেন, পশ্চিমা নন। আসামী। ওঁদের সে অঞ্চলটা পাকিস্তানে পড়েছে। উনি অবশ্য তার আগে থেকেই কলকাতায় ছিলেন।

আসামের লোককে আসামী বলে। ইংরেজি অনুবাদ, ক্রিমিন্যাল। ক্রিমিন্যাল প্রাইভ্। পেশা রাহাজানি, চুরি, প্রবঞ্চনা।

পরদিন সকাল বেলা হাতীবাগানের বাজারে গিয়া নামিলাম। একটি দোকানে ঢুকিয়া কহিলাম, চাবুক দিন ত একগাছা, ভাল দেখে।

দোকানদার আমার বহুকালের পরিচিত। এককালে কিছু কিছু কুকর্মেরও সঙ্গী ছিলেন। কহিলেন, আপনি আর বুড়ো হবেন না?

হতে দিচ্ছে কই।

একটি চাবুক বাছিয়া লইলাম।

—দাম?

—সাড়ে চার টাকা।

—ডাকাতি। এর দাম পাঁচ সিকে।

—ছিল তাই। স্বাধীন হবার আগে।

—তারপর? চাবুকও স্বাধীন হ'ল?

—চাবুক কেন হবে। স্বাধীন হ'ল মানুষ। অবশ্য এটাও ভাবুন—আগে, চাবুক ছিল পাঁচ সিকে। কাউকে চাবকালে কোর্টে ফাইন হ'ত পাঁচ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। তার ওপর উকিল আছে কোর্টে যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া আছে. আর এখন ধরুন, চাবুক পাঁচ টাকা।

কিন্তু কাউকে চাবকালেই যে কোর্টে যেতে হবে তার কোন মানে নেই। চাবকান, তারপর মজাসে হেঁটে চলে যান, কেউ কিছু বলবে না। আপনি স্বাধীন নাগরিক। মোটের ওপর অনেক সস্তাই হয়েছে বলতে হবে।

—তা বটে। কোর্টে যেতে হয় না। সে ত আসামেই দেখা গেল।

পাঁচ টাকার একটি নোট দিলাম। কহিলাম রেখে দিন, ঘুরে আসছি এক্ষুনি।

চাবুক হাতে মুড়িয়া লইয়া, জ্যোতিষীর দরজায় গিয়া পৌঁছিলাম। উঠিয়া দেখি, ঘর খালি। ডাকিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কথা কানে আসিল।

অন্তরাল

আনন্দ বাগচী

নিঃশ্বাসে পারি না ছুঁতে, স্মৃতি উত্তাপে
বুক জ্বলে,
হাত বাড়ালে অন্ধকার দেওয়ালের মত,
তুমি নেই,
যে অন্তবিহীন পথ পার হলে কাছের দরজাটা
সে আজ দুর্গম বড়ো কাজি ফুল কুড়োতে
কুড়োতে।
খেয়া পারাপার বন্ধ, তুমি কোন্‌খানে
আছো, আমি
যুগ-যুগান্ত কেটে গেছে রুদ্ধশ্বাস রূপকথার
মতো,
বিবর্ণ শরৎ, হিম, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার বেদনা,
হিসাব মেলাতে মন রাজী নয় তবু দিনগত
পাপক্ষয়
নিঃশ্বাসে পারি না ছুঁতে, স্মৃতির উত্তাপে
বুক জ্বলে
হাত বাড়ালে অন্ধকার, চূর্ণ মুষ্টি আয়ু-
পরমায়,
পারে না নেভাতে দীপ, পারে না জ্বালাতে
আজ জানি।

ঘরের পিছন দিকে একটি দরজা। বন্ধ তাহার ওপিঠেই বোধহয় অন্দর বা শয়নঘর—কলিকাতার ভাড়াটিয়ার কপালে তাহার বেশী হারেম-ব্যবস্থা জোটে না।

শুনিলাম, একটি মৃদু নারীকণ্ঠ বলিতেছে : বাজার-টাজারের কি হবে? নাকি আজও হরি মটর?

জ্যোতিষীর কণ্ঠে জবাব শুনিলাম, অত্যন্ত শীর্ণ কণ্ঠস্বর : দেখি কি হয়। মোটে ত সাতটা এখনও।

—সাতটা। কিন্তু ন'টাতেই [illegible] কিছু? সেই মাসখানেক আগে [illegible] টাকা পেয়েছিলে একবার। তারপর থেকে শুকনোই চলছে।

—কি করব বল। যা ডামাডোল চলেছে এই ক'দিন ধরে। কখন কি বিপদে পড়ি তাই ভেবে কূল পাচ্ছি না।

নিজের বাজার আজ কি দিয়ে হবে সেটুকু বলবার মুরোদ নেই। তিনি যান অন্যের ভবিষ্যৎ গুণে বলতে। ভাত জুটবে কেন।

অত্যন্ত মৃদু। নিরুত্তাপ কণ্ঠ অত মৃদু, মিহি কণ্ঠে অত সহজে অতখানি তীব্র আঘাত করা—এ শুধু ধর্মপত্নীরাই পারেন।

নিঃশব্দ পদে বাহির হইয়া আসিলাম। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া কহিলাম, নাঃ, টাকাটাই ফিরিয়ে দিন।

—কি হ'ল? কাজ হ'য়ে গেল বুঝি?

—না, দরকার হ'ল না। গিয়ে দেখলাম আগে থেকেই মরে আছে।

টাকা লইয়া আবার ফিরিয়া গেলাম। জ্যোতিষী তখনও বাহিরে আসেন নাই। নিঃশব্দ পদে ঘরে উঠিলাম। নোটটিকে ফরাসের মাঝখানে বই-চাপা দিয়া রাখিয়া, আবার চোরের মত বাহির হইয়া আসিলাম।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

জনমত

(৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

না। বোঝা তো মুস্কিল—কার ভিতর কি আছে? আমাদেরই একটু সংযম অভ্যাস করা দরকার দেখছি। অত টপ ক'রে কারুর সম্বন্ধে ওপিনিয়ন পাস করা—'

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে শঙ্করবাবু চুপ করলেন, অর্থাৎ আত্মচিন্তায় ডুবে গেলেন। অনুশোচনাও বলা যেতে পারে।

তাঁর পাশ থেকে 'ক্যানসার' বলে উঠলেন, ঘৃণা লজ্জা, ভয়—তিন থাকতে নয়। মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিকে জয় করতে না পারলে তো, তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার জো নেই। পরমহংসে অবস্থা না তুরীয় অবস্থা কি বলে—তারই ফার্স্ট স্টেজ যে ওটা!'

প্রথম ভদ্রলোকটির কণ্ঠে এবার রীতিমতো অনুতাপের সুর।

'না, আমাদের বোধ হচ্ছে একটু অন্যায়ই হয়ে গেল। লোকটার মধ্যে কিছু আছে। আমরা একহাত নিতে গেছলুম—উনিই একহাত নিয়ে গেলেন আমাদের ওপর। ছি-ছি—না জানি কি মনে করলেন!'

শঙ্করবাবু বললেন, 'উহু-উঁহু—মনে করবার লোক নয় ওসব। আমাদের ছেলেমানুষী দেখে একটু হেসেছেন বড়জোর। মানুষের দুর্বলতা তো ও'দের জানতে বাকী নেই। আমি বাজী রেখে বলতে পারি—উনি ক্ষমাই করে গেছেন আমাদের!'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এবার বেশ একটু গর্বের সংগে বলে উঠলেন, 'হাম সমঝ লিয়া কি ইয়ে সাধু ভ্রস্ট নেহি হ্যায়—ইয়ে সচ্চা মহাত্মা হ্যায়! ঐ জন্যে তো হামি আগে ভাগে ওঁকে চায় অফার করলাম! কী কৃছু দয়া রাখবেন হামার উপর। বাস্‌রে বাস্—এৎনা গালি দিয়া হামলোক, পাথর হোনেসে ভি উসকা খুন গরম হো জানা চাহিয়ে। লেকিন উ পাথর ভি নেহি হ্যায়—উ দেওতা!' হাত তুলে তিনি উদ্দেশে একটা প্রণামও করলেন।

আবারও দেখতে দেখতে আমরা এ গাড়ির প্রায় তাবৎ আরোহী এক কাট্টা হয়ে উঠলাম। আবারও সেই সাধুর আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল সমগ্র কামরা। শুধু যা রংটা বদলেছে সে আলোচনার। হাওয়া এবার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

দেখতে দেখতে সেই ভণ্ড জোচ্চোর পরাশ্রয়ী পরান্নভোজী মতলববাজ ঠকপ্রতারক, গেরুয়ার অমর্যাদাকারী লোকটি—সাধু ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংসে পরিণত হলেন। লোকটা যে একটু 'ঊর্ধ্বে' উঠেছে, 'তাঁর' দিকে যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে—এবিষয়ে আর আমাদের কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমরা সকলেই আমাদের হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত। সত্যি, কোন মানুষের ওপরই অন্তত একটু না বাজিয়ে বা তার সম্বন্ধে কিছুটা না জেনে—এমন ভাবে মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়। আমাদের সকলকারই শিক্ষা হয়ে গেল খুব। ভবিষ্যতে সকলেই সাবধান হয়ে চলব। আর লাভটাই বা কি হ'ল-মাঝখান থেকে নিজেদের কথা নিজেদের কাছেই ফিরে এল।

আর শুধু লোকটি চুপ করে থেকে অনায়াসে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন। নীরব ধিক্কারে আমাদের প্রগলভতাকে লজ্জা দিয়ে গেলেন।

আকাশের দিকে থুতু ফেলতে গেলে যে এমনি করেই নিজের দিকে ফিরে আসে। এর মধ্যেই আর একটা বড় স্টেশনে গাড়ি এসে থামল সম্ভবত বাঁকিপুর বা পাটনা জংশন। আমাদের কামরাতেও একটা চাঞ্চল্য জাগল। দু'তিন জন এখানে নামবেন। একটু নিঃশ্বাস ফেলা যাবে হয়ত।

একটি লোক হাওড়াতেই কখন একটা বেঞ্চের ওপর মালপত্র সরিয়ে সামান্য একটু বসবার মত জায়গা করে নিয়ে ঠেলে-ঠুলে উঠে বসেছিলেন এবং তারপর অবিরাম অধ্যবসায়ের ফলে বহুক্ষণ ধরে মালগুলো ঠেলতে ঠেলতে তিল তিল করে সরিয়ে একটু কাৎ হতেও পেরেছিলেন। বাস্—তারপর আর তার ঐ দুর্লভ সুখস্বর্গ থেকে একবারও নামেন নি তিনি। সেই থেকেই ঘুমোচ্ছেন সমানে। এর মধ্যে একবারও চোখ মেলেন নি, চা খান নি, বাথরুমে যাবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এবার তারও ঘুম ভাঙল। ভদ্রলোকটি বাঙালী। 'কোথায় এল মশাই' বলে শুধো একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে যেমন শুনলেন—'পাটনা জংসন' অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। সম্ভবতঃ তাঁকেও এখানে নামতে হবে।

তারপরই সবাইকে ঠেলে-ঠুলে ধাক্কা দিয়ে—মুখে 'একটু দেখি সার কাইণ্ডলি থোড়া মেহেরবাণী করকে' বলতে বলতে একরকম নীচের লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর দিয়েই নেমে পড়লেন। তারপরই কাছাটা আঁটতে আঁটতে সামনের র‍্যাকটার দিকে হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'আমার স্যুটকেস?'

সে আর্তনাদে নিমেষের মধ্যে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু কেউই খুব চিন্তিত কি উদ্বিগ্ন হইনি। এইটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলো লোক আর তাদের মাল—শরৎবাবুর ভাষায় সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতই মিশে গিয়েছে। সুতরাং একটা স্যুটকেস যদি চাওয়া মাত্র খুঁজে পাওয়া না যায় ত এত উদ্বিগ্নের কি আছে?

'দেখুন না ঐ দিকটায়—

'কোথায় রেখেছিলেন মনে নেই?'

'কি রকম স্যুটকেস? চামড়ার না টিনের?'

'এই যে এটা কার? এই ঢাকা দেওয়া?'

'হাঁ হাঁ—ওকি ওযে আমার স্যুটকেস মশাই।'

ইত্যাদি সম্মিলিত শব্দের কোলাহলের মধ্যে থেকে ভদ্রলোকটির আর্তনাদ আবারও প্রবল হয়ে উঠল, 'না-না- আমি যে এই র‍্যাকটার ওপর রেখেছিলুম—ঠিক চোখের সামনে হবে বলে। রাত্তিরে দু-তিনবার চোখ খুলে খুলে দেখেওছি। মিশে যাবার তো কথা নয়। কী সর্বনাশ—একরাশ টাকা ছিল যে ওর মধ্যে।

সামান্য মাল রাখবার জন্য যে স্টীলরডের ছোট র‍্যাক থাকে—আগেকার টুপি রাখা র‍্যাকের মত, সেই র‍্যাকেই ছিল স্যুটকেসটা। ঠিক যেখানটা সেই মহারাজ বসেছিলেন, তাঁর মাথার কাছে—

একই সংগে বিদ্যুৎচমকের মত কথাটা আমাদের অনেকের মাথাতেই খেলে গেল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম আমরা।

সেই স্বামীজীই তো নামবার সময় স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। এতক্ষণ কারুরই খেয়াল হয়নি কিন্তু এবার মনে হচ্ছে—ওঠবার সময়, যখন সকলকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তো কাঁধ-ঝোলাটা ছাড়া তাঁর সংগে কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে না!

মূঢ়ের মত পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম আমরা—এবার কামরার ভেতরটা পুনরায় মুখর হয়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।
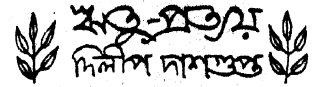
গ্রীষ্ম :

সর্ব সুলক্ষণা কন্যা শ্রান্ত হোলো ভেজা ঘামে
অনির্দিষ্ট বাতাসের সানাই-সম্ভারে
কবে তার বিবাহের লগ্ন আসে কে-বা জানে?
গৈরিক ধুলোতে তাই চন্দনের ঘ্রাণ যেন
পায় সে একাই বসে : প্রদাহের জ্বালা কতো?

বর্ষা :

অকস্মাৎ নেয়ে ওঠা ভাজ খোলা সবুজ শাড়ীটি
পাতার আড়ালে থেকে রংয়ে রংয়ে মঞ্চের ওপরে
নাচলো অঢেল নাচ। মেঘে জলে অর্কেস্ট্রার ধ্বনি
উইংসের পাশ থেকে; দর্শকের ঘন করতালি
দাদুরীর সোচ্চারণে। মনে হয় এর শেষ নেই।

শরৎ :

ফ্রক ছেড়ে শাড়ী-পরা আহা তুমি কুল কুল:
'ছিন্নধারা পলাতকা' মেঘ মেঘ হয়ে একবার
মাঠে ঘাটে খেলা করে শ্রান্ত হও ত্রয়োদশী রাতে
আর ভরা কুলে নদী ঢেউ শিশু শিশু খেলে
তোমার উরুর ডানদিককার তিল খুঁজে মরে.

হেমন্ত :

ভীরু প্রণয়ীর মতো অন্ধকারে আলগোছে চুম,
শিশিরের ভেজাভেজা রাত্রিশেষে কুমারী পৃথিবী
পেয়ে যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে কাকডাকা ভোরে
শিথিল করবী ঠিক করবার চূড়ান্ত মুহূর্তে
একরাশ ফুল গেল ঝরে পড়ে খিল খিল হেসে।

শীত :

সুড়সুড়ি খেয়ে এক বিগতা যৌবনা তন্বী
ছড়াতে গিয়েও কিছু হাসি আর অনুরাগ,
হঠাৎ কলিক পেনে কুয়াশার লেপ টেনে
চমকে দিয়েই যেন পরিপূর্ণ আনন্দকে
ঝিমিয়ে পড়লো আহা হিমালয় থেকে

বসন্ত :

কী প্রসন্ন প্রাণখোলা ছুটোছুটি প্রত্যয়ের পারে
কোথায় বা দেশ-কাল, কতদূরে সীমান্তের রেখা
সবই যেন মুছে গেছে। আছে এক বিছানো চাদর
তার ওপরে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দগুলো এসে
সেইটাকে এক করে ভালোবেসে করলো স্বীকার।

মরূদ্যান

(৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ধরে চেষ্টা করে মিস্টার জেঙ্কিকে ফিরে যেতে হয়নি? আর ওরা হল গিয়ে জাত-মেছো! তুমি আর কথা বলো না!

নলিনী বললে, আচ্ছা, চার ফেলে মাছটাকে ধরা যায় না? শুনেছি চার ফেললে মাছরা সব উঠে আসে?

অপরেশ বুঝিয়ে দিলে, আরে না না, নদীর জলে চার ফেলে কি হবে, স্রোতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না?

শিববাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, যুদ্ধে যেমন বিষ-গ্যাস ছাড়া নিন্দনীয়, তেমনি চার ফেলে মাছ ধরাকেও আমার নিন্দনীয় বলে মনে হয়।

মনোরমা উঠে দাঁড়াল। মাছ ধরা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগে না। দু'একদিন শিববাবুর সঙ্গে গিয়েছিল অপরেশ। তারপর দুটো দল হয়ে গেল। এক দলে শিববাবু একলা। আর এক দলে অপরেশ, নলিনী, আর মনোরমা। তারা কখনো হেঁটে, কখনো মোটর ভাড়া করে চারদিকের যত সব দ্রষ্টব্য জায়গা দেখে বেড়াতে লাগল। এসব ক্ষেত্রে মনোরমাই হল পথ-প্রদর্শক, বহুবার এসে এসে জায়গাটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। কখনো দোকানে বাজারে ঘিরে রাজ্যের দরকারী অ-দরকারী জিনিষ কেনা হয়। কেনে অবিশ্যি নলিনীই সব চাইতে বেশী। বাবা! কি খরচে মেয়ে গো! নিজের জন্য কেনে, মেয়ে-জামাইয়ের জন্য কেনে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের জন্য কেনে। দলে পড়ে মনোরমাও দু একটা না কিনে পারে না।

ওদিকে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ী ফিরে শিববাবু প্রসন্নমুখে বঁড়শী টঁড়শী পরিষ্কার করে তুলতে থাকেন। এমন সময় মনোরমা ঘরে এসে ক্লান্তভাবে জুতো মোজা ছাড়তে থাকে।

শিববাবু বলেন, কিগো, হাট-বাজার হল নাকি?

তেড়িয়া হয়ে ওঠে মনোরমা, উঃ! সারা গা রী রী করে আমার! এ ভাবে বড়লোকি দেখানো অসহ্য লাগে! তোমার কি! স্ত্রীর মান-সম্মানের কানাকড়িও দাম দাও না তুমি!

সে কি! ওরা কিছু বলেছে নাকি?

বলেনি, কিন্তু বলতে কতক্ষণ? আর এই পষ্টাপষ্টি বলে দিলাম, বড়মানুষি করে আমাকে কি আমার মেয়েকে কিছু দিতে এলে, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না! তাতে যা মনে করে করুক! ইস! খোলামকুচির মতো পয়সাগুলোকে খরচ করে দেখে দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় আমার!

ওঃ, এই? পরম নিশ্চিন্তে ছিপগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখেন শিববাবু। ছুটির মেয়াদও যত ফুরিয়ে আসছে, ততই কেমন একটা জেদ চেপে যাচ্ছে, ঐ বুড়ো বাহাদুরটাকে না ধরে এবার বাড়ী ফেরা হবে না।

সময় কি আর কারো জন্যে বসে থাকে? দেখতে দেখতে শেষের দিন এসে গেল, পরদিন ভোরে যাত্রা। হোটেল এর আগে থাকতেই খালি হতে আরম্ভ করেছে, ছুটি ফুরোতে আর বেশী দেরী নেই, বাতাসেও শীতের কামড় ধরেছে, বাকি আছে শুধু নেশাখোর মাছ-ধরিয়েরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ না।

অষ্টপ্রহর মাছ ধরার গল্প চলে, খাবার ঘরের টেবিলগুলো আগের চাইতে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এসেছে। এখন বারোয়ারী গল্প চলে। ছাড়াছাড়ির মুখে সবাইকে বড় অন্তরঙ্গ মনে হয়।

বুড়ো বাহাদুরই হলো গিয়ে সব গল্পের নায়ক। ম্যানেজার ঘোষবাবুর কাছে বুড়ো বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গোটা মহাভারত পাওয়া গেল। পনেরো বছর আগেও, নাকি যারাই ওকে দেখেছিল, তারাই বলেছিল এত বড় ট্রাউট মাছ হয় বলে তারা শোনেনি! ম্যানেজার বলতে থাকেন,

আরে মশাই, এ দেশে যে ট্রাউট হয় তাই লোকে বললেও বিশ্বাস করবে না। তবে এদের আর খাঁটি ট্রাউট মাছ বলা চলে কিনা জানি না। মাছদের মধ্যেও দোআঁশলা হয় কিনা কে জানে? অনেকে তো বলে এটা শোল মাছ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যাই হোক না কেন, পনেরো বছর ধরে এটাকে যে কেউ ধরতে পারেনি সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

নলিনী হেসে বলে, কি করে জানলেন এটা অন্য একটা মাছ নয়? ঘোষবাবু এই চান, সেই গল্পই বলতে চান।

পনেরো বছর আগে পুলিশের বড় সাহেব জেঙ্কিন্সের প্রতাপে এদিকে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। আর ঘাটের পাশে জেঙ্কিন্স ছিপ ফেলে মাছ ধরত। তখনি প্রথম বুড়ো বাহাদুরের কথা শোনা যায়। সাহেবের দামী বঁড়শি ওর কানকোতে বিঁধে যায়, তাই নিয়েই ও পালায়। এখনো নাকি গয়নার মতো কানকোতে বঁড়শী পরা, তাই দিয়েই ওকে চেনা যায়। কত জনাই তো দেখেছে। আমিও দেখেছি। তবে সেকেলে ওর গায়ের রঙের ভারি একটা বাহার ছিল। এখন চেহারার কোনো ছিরি নেই। সত্যি কথা বলতে কি কদাকার দেখতে একটা বুড়ো মাছ। তাও কেও ধরতে পারে না, নাকি ছিপের সুতো দাঁত দিয়ে কেটে দেয়!

নলিনী শুনে শুনে অবাক হয়। খেতে নিশ্চয় খুবই ভালো হবে? অমন পাকা মাছ!

শিববাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন কি! ওর শরীরটা হবে চামড়ার মতো শক্ত আর মজবুত, ওকে খাওয়ার কথা কেউ মনেও আনে না।

নলিনী বলে, তবে ধরতে চায় কেন? বেশ তো বেচারা খেলে বেড়ায়। এত শত্রুতা কেন? তা বেড়াতে পারে, ওর ওপর কারো কোনো রোগ নেই, এক ছোট জাতের মানুষ ছাড়া, যাদের ও সম্ভবতঃই গিলে খায়? একে ধরা হোল গিয়ে সখের ধরা।

অপরেশ বললে, হ্যাঁ, তাই। বিলেতে কেমন ওসব মাছের ছাল বাঁধিয়ে রাখে দেখেছ তো তুমি। ও একটা 'হবি' যাকে বলে।

ঘরের মধ্যে অনেকেই নাকি বুড়ো বাহাদুরকে দেখেছে। কখনো হঠাৎ মাঝ নদীতে ঘাই মেরে উঠেছে, কিম্বা লাফ দিয়ে জল থেকে একেবারে শূন্যে উঠে পড়েছে, ইলুসে গর্দিভ বুদ্ধি দেখে ফুর্তির চোটে!'

শিববাবু উঠে পড়ে বললেন, আজ সারা-দিন ছিপ ফেলে বসে থাকব। বুড়ো বাহাদুরকে না ধরে ফিরছি না।

মনোরমার বিরক্ত লাগে। বুড়ো বয়সে এ রকম ঢং অসহ্য মনে হয়। সবাই শেষবারের মতো বেড়ানো কুড়োনো, কেনাকাটা করতে বেরোয়। শিববাবু একটা ঝুলিতে বোতলে করে খাবার জল, ডিম সেদ্ধ, পাঁওরুটি, মাখন আর মাছ ধরার সরঞ্জাম, নতুন বঁড়শী আর লাল বিলিতী নকল ফড়িং নিয়ে ছিপ কাঁধে বেরিয়ে পড়েন।

বেলা চারটের পরে কৌতূহল রাখতে না পেরে, অপরেশরা একবার বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কা কস্য! ও মাছ আবার ধরা যায় নাকি? আর শিববাবু তো অন্য মাছ ধরলেও ছেড়ে দেন। অপরেশদের হাসাহাসির চোটে কাছাকাছি কোথাও বুড়ো বাহাদুর থাকলেও সে নিশ্চয় ভেগে পড়বে! শিববাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মনোরমা বলে, হ্যাঁ! আমার তো মনে হয় ও মাছটার কথা একটা মনগড়া গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়! কানকোতে বঁড়শী পরা ট্রাউট মাছের বংশধর না আরো কিছু! ঘোষবাবুর যেমন কথা! চল, এখন হোটেলে চল।

শিববাবুর মুখটা অন্য রকম দেখায়। ক'দিন ধরে সারাদিনের রোদে পুড়ে ফর্সা মুখটাতে এমনিতেই ঘোর তামাটে রং ধরেছে। তার ওপর এখন ঝড়ের অন্ধকার নেমেছে মনে হচ্ছে। তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। ঘরশুদ্ধ লোকের সামনে শপথ করেছেন, মাছ না নিয়ে যাবেন না। অগত্যা রাগ করতে করতে মনোরমাকে সত্যি ফিরে যেতে হয়।

ওদিকে সূর্যের আলো কমে এসেছে, সরল গাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, পাখীরা বাসায় ফিরেছে, দূরে দূরে অন্ধকার জমাট বাঁধতে সুরু করেছে, এমনি সময় টুপ করে ফাৎনা ডুবে গেল, ছিপে জোর টান লাগল। আর কথাবার্তা নেই, এক হেঁচকা টানে বুড়ো বাহাদুরকে শিববাবু ডাঙ্গায় তুলে ফেললেন। আর ডাঙ্গা বলে ডাঙ্গা, নদীটা থেকে পাঁচ হাত দূরে, এক সারি বড় পাথরের ওপারে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। এই নাকি বুড়ো বাহাদুর? এমন সেয়ানা মাছকে এক টানেই তোলা গেল? এতটুকু খেলাতে হলো না? বোধ হয় অন্যমনস্ক থাকবে, তাই ঝপ্ করে তুলে ফেলা গেছে, নইলে ও নাকি সুতো কেটে পালায়! সময় দিলে আর ধরতে হত না!

লাফানি ঝাঁপানি কি কম করছে? এক সারি পাথর মাঝখানে না পড়লে, তুলেও ওকে ডাঙ্গায় রাখা যেত না। একেই ট্রাউট বলে? এই কদাকার মাছটাকে? কালো কালো ছাই ছাই, মাঝে মাঝে ফিকে রঙ, কানকোর কাছটাতে বিশ্রী একটা লালচে ভাব। বাঁ কানে সত্যি সত্যি পুরোনো একটা বঁড়শী গাঁথা, সেও কালো হয়ে গেছে, মনে হয় যেন শরীরেরই অঙ্গ।

প্রথমে লাফানির চোটে ভালো করে দেখা যায়নি মাছটাকে। তারপর লাফানিও কমে এল, আর বাতাসের জন্য সে কি আকুলতা! সমস্ত শরীরটা হাপরের মতো উঠতে পড়তে লাগল, প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন কি কষ্টে ভরা।

এবার ভালো করে দেখলেন ওকে। খুব বড় নয়, দু'হাত আড়াই হাত হবে। গোল গোল চোখ শিববাবুর মুখ থেকে সরে না। কাছে যাওয়া যায় না, কামড়াতে চায়। ছিপের সুতোটা ঠোঁটের কোণে, দাঁতে ধরা যাচ্ছে না, দাঁতও হয়তো সব কটি নেই।

শিববাবুরও কষের দাঁত সব কটি নেই। মনোরমা বলে। ক্লাবের বাবুদের সঙ্গে পানদোক্তা খাওয়ার ফল, নইলে পঞ্চাশ বাহান্ন বছরে দাঁত পড়ার কথা নয়। ওর চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে আসছে না।

মাছটার চোখ কেন শিববাবুর মুখ থেকে সরে না? ওকি! নিজের গায়ে কামড় বসাতে চায় যে! ট্রাউটই বটে, ট্রাউট কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ট্রোগো' থেকে, তার মানেই হল কামড়ানো। বুড়ো বাহাদুর নিজের গায়ে কামড়াতে হয় না। আস্তে আস্তে পকেট থেকে পেন্সিলকাটা ছুরিটা বের করে অনেকটা দূরে থেকে সুতোটাকে কেটে দিলেন শিববাবু।

ওর সমস্ত শরীরটা যেন একবার খিঁচিয়ে উঠল; তারপর গা ঝাড়া দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে পাথরের সারি ডিঙিয়ে একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। এতখানি সুতো, লাল ফাড়িং, বঁড়শী সব নিয়ে ব্যাটা কালো জলে ডুব দিল। আর দেখা গেল না।

উঠে পড়লেন শিববাবু। আঃ, বাঁচা গেল। আরে! কি তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসছে। এখানে আবার সন্ধ্যে লাগলেই শেয়াল টেয়াল বেরোয়। ছোট ছোট চিতাবাঘও নাকি এই সব বনের মধ্যে থাকে। তারা একটু পরেই এখানে জল খেতে আসে। এক একবার থাবার দাগও দেখেছেন শিববাবু।

আর কি? জিনিষপত্র গুটিয়ে নিয়ে হোটেলে ফেরা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। বঁড়শী গেছে, ফাড়িং গেছে শুনলে মনোরমার ফুর্তি হবার জোগাড় হবে! সাড়ে সাত টাকা দাম এগুলোর। পুলিন কিনে দিয়েছিল। মনোরমা অবিশ্যি জানে না, ভাবে শিববাবুই কিনেছেন। স্বার্থপরের মতন সাড়ে সাত টাকা দিয়ে নিজের সখের জন্য কিনেছেন। ব্যাপার শুনে পুলিনরা খুব হাসবে।

হোটেলের বারান্দায় আজ সবাই জড়ো হয়েছে। খালি হাতে শিববাবুকে ফিরতে দেখে সকলের সেকি টিটকিরি! শিববাবুও হাসতে থাকেন। খিদেও পেয়েছে দারুণ, আর কাপড়-চোপড়গুলোও না ছাড়লেই নয়, কাজেই তাড়াতাড়ি ঘরে যাওয়া।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শিববাবু তাঁর বিবেচনাশূন্যতা নিয়ে খুব খানিকটা বকুনি খেলেন। সমস্ত গোছগাছ স্ত্রীর ওপর ফেলে রাখে যে পুরুষ মানুষ, তার বিষয় মনোরমার যে কিছু বলবার নেই, একথা মনোরমা কুড়ি মিনিট ধরে তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল।

তারপর মাছ ধরা নিয়ে এরকম ছেলেমানুষি একেবারে অসহ্য। শিববাবু যেন বুঝে রাখেন, এখানে এই শেষ আসা। এবার যেরকম লোক হাসালেন, এর পর আর মনোরমার এখানে মুখ দেখাবার জো নেই। বলতে বলতে চোখ ফেটে জল আসে মনোরমার। শিববাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বেশ, বেশ, মনোরমা, আর না হয় নাই এলাম। লক্ষ্মীটি, এবার শুয়ে পড় তো, তোমার শরীর খারাপ হলে মনুমা আমাকে বকবে।

আরো অনেক রাতে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে, ভাবেন শিববাবু, কি বুদ্ধি করেই না এসেই বঁড়শীর বাক্সটা ব্যাগে ভরে ফেলেছিলেন; নইলে নতুন বঁড়শী, ফাড়িং হারানোর কি কারণই বা দিতেন? আর মনোরমা তা হলে বাকী রাতটা বকাবকি করে কাটাত; কাল বুক ধড়ফড় সুরু হয়ে যেত, তারপর যাওয়া নিয়ে টানাটানি!

চোখে ঘুম আসে; মনটা বড় প্রসন্ন। বুড়ো ব্যাটা ডুবটা দেবার আগে সত্যি সত্যি জিব বের করে একটু ভেংচি মতন কেটে গেছিল! আরো ঘুমে ধরে শিববাবুকে। পরশু ভোরে পৌঁছে, বিকেলের দিকে ক্লাবে গিয়েই মাছ ধরার গল্প করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয় চা সিঙ্গাড়া না খেয়ে ছাড়বে না। ব্যাটাদের কথায় কথায় খাই খাই। যাক গে, বঁড়শী বাবদ যে সাড়ে সাত টাকা মনিব্যাগে ছিল, সে তো আর খরচ হয় নি, পুলিনই যখন বঁড়শী ফাড়িং কিনে দিল। সেই সাড়ে সাত টাকার এবার সদ্ব্যবহার হবে!

আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে শিববাবু পাশ ফিরে শোন। কানে আসে দুই মাইল দূরে, পাহাড়ে নদীর জলে, ছপ্ ছপ্ করে ল্যাজের বাড়ি দিয়ে, বুড়ো বাহাদুর সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

—

স্মৃতি তন্দ্রা

শ্রীরথীনকুমার দাশ

আমার শিয়রে তোমার সুরভি—
হিয়ার মাঝারে তোমারি তো ছবি
অঙ্কনিয়া।

আমার তনুতে নিবিড় আবেশ
মৃদু কিঙ্কিণি নৃত্যের রেশ
উল্লাসিয়া।

দেখেছি স্বপনে মুগ্ধা নয়ন
করেছো পুষ্প স্তবক চয়ন
কন্ঠনীল।

মধুর ছন্দে রিণ ঝিন ঝিনি

শুনেছি তনুতে মৃদু প্রবাহিণী
মুগ্ধবীণ।

উছলে তটিনী উল্লাসি প্রাণ
ছন্দে মধুর আনমনা গান
আপন হারা

স্নিগ্ধ তনুতে মৌন আভাষ
সজল মেঘেতে ভরিল আকাশ
বরষা ধারা।

অলক গুচ্ছে শিহরে কবিতা
তুমি অপরূপ অনিন্দিতা
সুর বীথিকা।

এসেছো বলোনি, পেতেছো হৃদয়
মধুর রমণী, তুমি তন্ময়
অভিসারিকা।

—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ

(৫৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নবজাত শিশু, নতুন সম্বন্ধ বলুন—এক কথায় নিত্য নতুন চাই ক্ষণে ক্ষণে জীবনকে নতুন করে আস্বাদ করায়। ভালোর চেয়ে আরও ভালোর যত না স্বাদ—আরও মন্দ তার চেয়ে স্বাদুতর। রসগোল্লা আর ঝাল ফুলুরিতে অনেক তফাৎ, রসনার দাবীতে কেহ নহে ঊন। এমনি ধারা অনেক কথা ভাবছিলাম পাকা দার্শনিকের মত—আর চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ভদ্রলোকের মুখভাব। আশ্চর্য—গীতার শ্লোকটি সেখানে সমুদ্রিত ও সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত রয়েছে যেন।

সেন্ট্রাল এভিনুার এ পারে এসে থামল গাড়ী। আবার ওঠা-নামার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। গাড়ী ছাড়তে দেখা গেল, দোরের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে একটি শ্যাম বর্ণের যুবক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। হাতে তার দুর্দশাগ্রস্ত একটি ছাতা—প্রায় সাদা কাপড়ের সর্বাঙ্গে সূচী ছিদ্র—কোন কোন শিক থেকে খুলে পড়েছে সে কাপড়, তাতে আবার সাদা কাপড়ের প্রকাণ্ড একটা তালি—। ছাতার ভাঙ্গা বাট দিয়ে জল ঝরছে অবিরল ধারায়।

দু পাশের লোক—হাঁ-হাঁ করছে—বেশ আক্কেল তো মশায়ের—আমাদের চান করিয়ে দিলেন! বাঃ রে নবাব—গ্রাহ্যই নেই!

সত্য কারও নিষেধ বাণী কানে তুলছে না, ছোকরা অতি তীব্র, কটু মন্তব্যেও বিচলিত হচ্ছে না। নিরুত্তেজিত ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমাদের বেঞ্চির দিকে। ভাবলাম আশ্চর্য হয়ে—অনুদ্বিগ্ন মনের এও কি তার একটি নমুনা!

আমাদের সামনে এসে থামল ছোকরা। দুটি অনুদ্বিগ্ন মনের দৃষ্টান্ত যেন মুখোমুখি হল।

তারপর এদিক-ওদিক চেয়েই, যে আমার ছাতা। বলে চাকামুখো প্রৌঢ়ের হাত থেকে এক রকম ছিনিয়েই নিলে সেটা। শত ছিদ্রময় তালি মারা ছাতাটি ওঁর গায়ের উপর ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল ছোকরা।

গাড়ী শুদ্ধ লোক তো হতবাক। শত দৃষ্টির তীর এসে পড়ল—চাকামুখোর সূচী-শিল্পময় প্রত্ন বিচার্য বস্তুটির উপরে।

আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলাম। ছাতাটির দিকে নয়—ছাতার যথার্থ মালিকের দিকে। নিজের জিনিষ ফিরে পেয়ে সে মুখে আনন্দের জ্যোতি রেখাটুকু কেমন ফুটলো দেখছিলাম। হায় দুর্ভাগ্য—গীতার শ্লোকাংশ তখন নিত্য দিনের ভিড়ে হারিয়ে গেছে! অনাদৃত ছাতাটি বেঞ্চি ঠেসানো পড়েই রইলো—ভদ্রলোক বৃষ্টির ছাঁটে ঝাপসা কাঁচের জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ততোধিক ঝাপসা লেপা-পোঁছা পথের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ী যাত্রা শেষ করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলো—ভদ্রলোক তখনও প্রকৃতি শোভা দর্শনে তন্ময়চিত্ত।
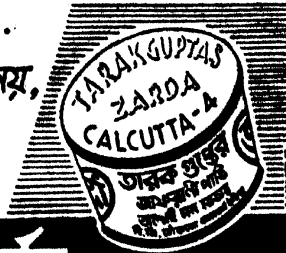
—

জে, এন, রায়
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৩৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
(বিবেকানন্দ রোডের জংসন)
কলিকাতা—৬

১১০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

অভিজ্ঞ কেমিষ্টের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত করা হয়।

বহু সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসালয়ে আমাদের ঔষধাদি সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

ব্যবসায়ীগণকে বড় অর্ডারের উপর উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে

রুক্মিনীর মহাখাসা দধি

রুক্মিনীর চমচম

রুক্মিনীর সন্দেশ

লক্ষ্মীনারায়ন মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান

১৫২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড
(পুরাতন ২৪/৪, রসা রোড) কলিকাতা-২৬
ফোন: ৪৬-২৯০০

বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

অজয় বসু
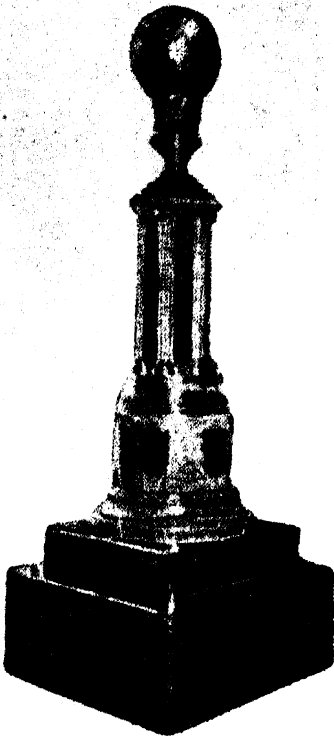
হেলমস্-হল ট্রফির নাম আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলে এর মর্যাদা অসাধারণ।

দেশ ও মহাদেশের অসামান্য দক্ষ ক্রীড়াবিদদের প্রতিভার স্বীকৃতির প্রতীক হলো এই ট্রফি। সারা দুনিয়ার বাছাই করা ক্রীড়াবিদদের মধ্যে মনোনীত মাত্র ছজনকে প্রতি বছর এই ট্রফি উপহার দেওয়া হয় এবং মনোনীত এই ছজন প্রতিনিধিত্ব করেন আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার। চাঁদির ট্রফির বাস্তব মূল্য হয়তো নগণ্যই হোক না কেন, হেলমস্-হল ট্রফি হাতে নিয়ে ক্রীড়াবিদেরা আদায় করে নেন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি ও অভিনন্দন।

রৌপ্য নির্মিত সুদৃশ্য ট্রফি উপহারের ব্যবস্থা এবং খেলোয়াড় বাছাই ও মনোনয়নের দায়িত্ব মার্কিণ মুলুকের প্রসিদ্ধ সংস্থা হেলমস্-হল বোর্ডের উপর। দেশ বিদেশের খেলোয়াড়দের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি দিতে ও অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে আর কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। তাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলের নিরিখে হেলমস্-হল বোর্ডের ভূমিকা অনন্য। বোর্ডের উদ্যোগে খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের প্রেরণা দেওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এবং সাম্প্রতিক কালে সেই পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণার স্পর্শ লেগেছে আমাদের ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মনের আকাশেও।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলে ভারতের কৌলীন্য নেই। তবুও আধুনিককালের তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাচীর জয় করে দু-দুজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হেলমস্-হল ট্রফি আদায়ে বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। দুটি চরিত্রই অবিস্মরণীয় এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। দুজনের প্রথম জন হলেন কে ডি সিং ওরফে 'বাবু', দ্বিতীয়জন মিলখা সিং ওরফে 'উড়ন্ত শিখ'!

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কির মহানাটকের নায়কত্ব করার পর ভারতীয় হকির দলপতি বাবুকে এবং এশীয়, কমনওয়েলথ ও আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরোভাগে থাকার পর গত বছরে মিলখা সিংকে হেলমস্-হল বোর্ড অভিনন্দন জানান। হকি খেলার তীর্থভূমি ভারতের মাটিতে গড়া বাবু এক বিশিষ্ট নক্ষত্র। মিলখা সিং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় অ্যাথলিট, সমকালীন এশীয় ক্রীড়াভূমিরও নায়ক। সহজাত প্রতিভার দ্যুতিতে ভাস্বর তাঁরা। নতুন করে তাঁদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগীদের মনের মণিকোঠায় তাঁরা দুজনেই মহামূল্য সম্পদ। কিন্তু তাঁদের স্বীকৃতিতে, সম্মানে ভারতবাসী মাত্রেরই গর্ববোধ করার অতি সংগত কারণ রয়েছে।

খেলাধুলার দুনিয়ায় আমেরিকার সাম্রাজ্য দৃঢ় বিস্তৃত। সেখানকার অলিতে-গলিতে বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আবির্ভাব। এতোগুলি খেলোয়াড়ের অভিজাত সমাবেশের মাঝেও সে দেশে বাবু ও মিলখা সিংয়ের প্রতিষ্ঠা, সেই বিশাল সাম্রাজ্যে দু-দুজন ভারতীয়ের নাম স্মরণীয়। শুধুমাত্র এই ঘটনাটুকুই খেলাধুলায় অনগ্রসর ভারতের গর্ব ও গৌরবের পরিচায়ক। হেলমস্-হল বোর্ডের অভিনব সংগ্রহশালায় নিজেদের জায়গা করে নিয়ে, মাতৃভূমিকে মর্যাদামণ্ডিত আসন দিয়ে ভারতের আপামর জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধে রেখেছেন ভারত-গৌরব বাবু ও মিলখা সিং।

হেলমস্-হল বোর্ডের প্রথম সংগ্রহ হলেন আধুনিক যুগের 'ফিডিপিডেস' গ্রীক অ্যাথলিট স্পিরিডন লোয়েস। সেই যে যিনি আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনের পুণ্য মুহূর্তে ম্যারাথন গ্রাম থেকে এথেন্সের মার্বেল স্টেডিয়াম পর্যন্ত সবার আগে ছুটে এসে উত্তরকালের হাতে এক বিচিত্র উপাখ্যান উপহার দিয়ে গিয়েছেন, তিনিই।

অনন্য ক্যানেন

ক্রিকেটের যুগধারক ইংলণ্ডের ডবলিউ জি গ্রেস হলেন হেলমস্-হল বোর্ডের দ্বিতীয় বর্ষের সংগ্রহ। তৃতীয় বর্ষে ইংলণ্ডের আর এফ ডোহার্টি ও অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টর ট্রামপার। ডোহার্টি উইম্বলেডন টেনিসে শীর্ষস্থান পেতেন বারে বারে আর ক্রিকেট খেলোয়াড় ট্রামপারের মর্যাদা খাস অস্ট্রেলিয়াতেও স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের চেয়েও বেশী।

সব নামই অবিস্মরণীয়। হেলমস্-হল বোর্ড স্বীকৃত ও অভিনন্দিত ক্রীড়াবিদদের তালিকায় বোধ হয় বিশ্ববিশ্রুত কোনো নামই অদৃশ্য নয়। একপলকের দৃষ্টি মেলেই নামগুলির সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই খেলাধুলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধ্যায়েরও হদিশ পাওয়া যায়। এমনি এক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়ে আছে আলভিন ক্রেনজলিনকে ঘিরে। ক্রেনজলিন ছিলেন মার্কিণ অ্যাথলিট। দ্বিতীয় অলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্র প্যারিসে এসে তিনি জয় করেন ৬০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার ও ২০০ মিটার হার্ডল রেস এবং ব্রড জাম্প ফাইনাল। এক আসরে চার চারটি স্বর্ণপদক ক্রেনজলিনের আগে আর কেউই পান নি। পরবর্তী ষাট বছরের মধ্যে পেয়েছেন মাত্র তিনজন, যথা ফিনল্যান্ডের পাভো নুর্মি, আমেরিকার জেসি

'বাবু'—কে ডি সিং

পারের অপেক্ষায় — অমল রায় চৌধুরী

শারদীয় যুগান্তর

ওয়েল্স, এবং নেদারল্যান্ডের শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন। ক্রেনজলিনকে অভিনন্দিত করা হয় ১৯০০ সালে। বারো বছর পর হেলমস্-হল আবার একজন বিশ্বপ্রিয় অ্যাথলিটকে অভিনন্দিত করেন। এ'র নাম হ্যান্স কোলেমেনেন, নিবাস ফিনল্যান্ড। কোলেমেনেন অলিম্পিক ক্রীড়ায় ক্রেনজলিনের কীর্তিকে স্পর্শ করতে পারেননি, কিন্তু কাছাকাছি এগিয়েছিলেন স্টকহোমে পাঁচ হাজার, দশ হাজার মিটার ও ক্রস কানট্রি দৌড়ে শীর্ষস্থান পেয়ে।

বৃটেনের টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী ল্যাম্বার্ট চেম্বার্সই হলেন হেলমস্-হল সম্মান তালিকায় প্রথম মহিলা। উইম্বলেডনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতেই শ্রীমতী চেম্বার্সকে পুরস্কৃত করা হয় ১৯১৪ সালে। তবে পরবর্তী কালে শ্রীমতী চেম্বার্সের পদাঙ্ক অনুসরণে হেলমস্-হল ট্রফি নিতে এগিয়ে এসেছেন অনেক মহিলাই। চেম্বার্স—উত্তরকালে মহিলাদের সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছেন উপর্যুপরি পাঁচবারের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মাদাম সুজেন লেগলেন ও উইম্বলেডন সম্রাজ্ঞী আমেরিকার হেলেন উইলসমুডি, মধ্যপথে নরওয়ের ফিগার স্কেটার, ছায়াচিত্র খ্যাতা সোনিয়া হেণি ও আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় এলায়েস মার্বেল এবং পিছন পানে দু দুবারের উইম্বলেডন বিজয়িনী ব্রেজিলের মারিয়া এসথার বুনো; দক্ষিণ আফ্রিকার টেনিস খেলোয়াড় সান্দ্রা রেণল্ডস ও নেদারল্যান্ডের অ্যাথলিট অনন্যা ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন।

ক্রীড়াবিদদের এই শোভাযাত্রার মূল চেহারাই বিচিত্র। দেশকাল, ধর্ম, বর্ণ, কোনো কিছুর মালিন্যই ছুঁয়ে যেতে পারে নি এই শোভাযাত্রার ছায়াকে। সেখানে রেড ইণ্ডিয়ান জিম থর্প উপেক্ষিত নন, সমাদরে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রতিষ্ঠা যেন খেলোয়াড়দের এই সমাবেশে আরও বৈচিত্র্যের রং ধরিয়ে রেখেছে।

অলিম্পিক বিজয়ীর সম্মানে বঞ্চিত ভাগ্যবিড়ম্বিত জিম থর্পও এক বিচিত্র মানুষ। ১৯১২ সালের আগে কেই বা তাঁর নাম শুনেছিল? শুনতে হলো স্টকহোম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে। সেই ক্রীড়া-ভূমিতে আবির্ভূত হয়ে জিম থর্প একাই জয় করলেন পেন্টাথলন ও ডেকাথলন প্রতিযোগিতা। স্বর্ণপদকও পেলেন। কিন্তু তারপর শ্বেতাঙ্গ প্রভাবিত ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার খামখেয়ালীতে তাঁর চ্যাম্পিয়ন আখ্যা

রেড ইণ্ডিয়ান থর্প

উড়ন্ত মিলখা

বিসর্জিত হলো, স্বর্ণপদকগুলি কেড়ে নেওয়াও হলো। থর্পের অপরাধ, তিনি নাকি নিজের অজ্ঞাতে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে অপেশাদারী নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন। টেকনিক্যাল অপরাধ, খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণও করা হলো না, রেড ইণ্ডিয়ান থর্প কোতল হয়ে গেলেন। কিন্তু হেলমস্-হল বোর্ড নিছক পুঁথিগত নীতির প্রশ্নকে বড় করে দেখেননি, তাঁরা বিচার করেছেন সর্বকালের অন্যতম বিশ্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট জিম থর্পের ক্রীড়াদক্ষতার। ন্যায় বিচারের মানদণ্ডে তাই থর্পের নাম হেলমস্-হলের সম্মান তালিকায় স্বমর্যাদায় উৎকীর্ণ।

সম্মান তালিকা আঁকড়ে রয়েছে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালের অবিস্মরণীয় তারকা ফিনল্যান্ডের অ্যাথলিট পাভো নুর্মিকে, আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় বিল টিলডেন, ভাইন্স ও ডোন্যাল্ড বাজকে, বৃটেনের ফ্রেড পেরিকে, নিগ্রো অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সকে। এবং আরও অনেককে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে হেলমস্-হল ট্রফি যাঁরা উপহার পেয়েছেন, তাঁদের দলে অ্যাথলিটদের ভীড় বেশী। দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার পর্টজিটার, ও কি ইয়াং হ্যাম ও জাপানের শিজোকি তানাকা, ফরমোসার চুয়াং কোয়াং ইয়াং, অস্ট্রেলিয়ার জন ল্যান্ডি, হার্ব ইলিয়ট, শ্রীমতী মারজোরি জ্যাকসন ও শার্লি স্ট্রিকল্যান্ড, বৃটেনের রোজার ব্যানিস্টার ও গর্ডন পিরি, চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জ্যাটোপেক, রাশিয়ার কুটস ও কুজনেৎসভ, হাঙ্গেরীর স্যান্ডর ইহারোস, আমেরিকার বব রিচার্ডস, মাল হুইটফিল্ড, প্যারি ওব্রায়েন, বব ম্যাথিয়াস, রাফার জনসন, ব্ল মর্গান

প্রেসিডেন্টের এক্তেয়ার না নিলেও, ভিন্নিতের প্রতীক অলিম্পিক, ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ন্যায়ের প্রসঙ্গে। তবে অনেকেও উপেক্ষিত হন, বিশেষতঃ লাতিনারো। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন ... ভাইভার শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া ম্যাককরমিক, দক্ষিণ আফ্রিকার জন হ্যারিসন, অস্ট্রেলিয়ার জন মার্শাল, জন ডেনিয়েলসন, জন কনরাডস ও শ্রীমতী ডনাভেন ল্যাপ, জাপানের হিরেও ফুরুহাশি, জামাদ কয়ুকোওয়া, তাকামি ইশিমতোর নাম।

সাম্প্রতিককালে এশীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে জাপানীরাই অপেক্ষাকৃত বেশীবার হেলমস্-হল বোর্ডের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পেরেছেন। গত ন বছরের মধ্যে এশীয় শ্রেষ্ঠ হিসেবে কমপক্ষে ছজন জাপানী পেয়েছেন এই ট্রফি উপহার। এশীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগমন যে অনস্বীকার্য হেলমস্-হল বোর্ডের মনোনয়নই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের নজীরকেও বোর্ডের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বলেই ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত ক্রীড়া পত্রিকাকে হেলমস্-হল ট্রফি উপহার দেওয়া হয়েছিল।

ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ থেকে সুরু, করে বিভিন্ন সময়ের বিখ্যাত ক্রীড়াবিদদের পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও হেলমস্-হল বোর্ডটি কিন্তু তেমন পুরানো প্রতিষ্ঠান নয়। ১৯৩৬ সালের ১৫ই অকটোবর মিঃ পল হেলমসের উদ্যোগে লস এঞ্জেলেসে হেলমস্ অ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই থেকেই পুরস্কার দেওয়ার রীতি হয় প্রবর্তিত। তবে সুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান পুরানো ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানানোর রীতি নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। হেলমসের সঙ্গে হলের নাম যুক্ত হয়ে থাকার কারণ এই যে, যে সুদৃশ্য ট্রফি বর্তমানে স্বীকৃত ক্রীড়াবিদদের হাতে দেওয়া হয়, সেই ট্রফিগুলির ব্যয়ভার বহন করে থাকেন মিঃ হেলমস্-হল।

হেলমস্ অ্যাথলেটিক ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এসে উপস্থিত হন একদিন। পল হেলমসের রুটির অনুরাগ ছিল না। মার্কিণ মুলুকে লস এঞ্জেলেসে আয়োজিত ১৯৩২ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া উপলক্ষে ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি অলিম্পিক গ্রামে এসে উপস্থিত হন একদিন। পল হেলমসের রুটির ব্যবসা ছিল। গ্রামস্থ প্রতিনিধিদের ভিনদেশী আহার্য গ্রহণে অসুবিধা হচ্ছে জেনে তিনি তাঁদের পছন্দমাফিক রুটি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করার ফলে লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক গ্রামে সমবেত ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে পল হেলমসের হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সেই সম্পর্কের সূত্রেই খেলাধুলোর সংগে

(শেষাংশ ২১৬ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণ পদকী ক্রেনজলিন

কেন এই ঔদাসীন্য
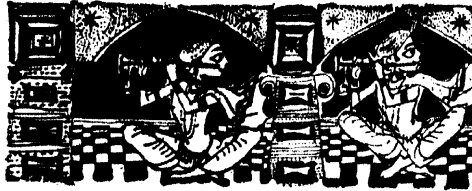
দুর্গা চৌধুরী

খেলার মাঠের নায়কনায়িকা হলেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা এ কথা সর্বজনসম্মত। অজস্র পরিসংখ্যান আউড়ে কথাটা আরও পরিষ্কার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। একটি নজীরের উল্লেখই যথেষ্ট হবে।

বছর দুয়েক আগে টোকিওতে এশীয় ক্রীড়ার যে তৃতীয় অনুষ্ঠান হলো তাতে জাপানের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৪৪ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী। তার মধ্যে ছাত্রছাত্রী ছিলেন ৫৭ জন। সদ্য পাশ করা ৬৫ জন প্রাক্তন ছাত্র এবং ৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই হিসেবের মধ্যে অবশ্য জাপানের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের কথা ধরা হয়নি, যদিও সে দলের অনেকেই ছিলেন ছাত্র প্রতিনিধি।

এই হিসেবের পাশাপাশি রয়েছে ভারতের নজীর। ভারতের পক্ষে ফুটবল খেলোয়াড় বাদে যে ৫৭ জন ক্রীড়াবিদ টোকিওর আসরে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের দলে ছাত্রের সংখ্যা ছিল চার এবং প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন তারও অর্ধেক। সংখ্যাতত্ত্বের এই তালিকা থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অ্যাথলেটিক, সাঁতার ও আনুষঙ্গিক খেলাধুলোয় ভারতীয় ছাত্রদের ভূমিকা যেন গৌণ এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামানের নিরিখে ভারতের ছাত্র-ক্রীড়ামানও অনুন্নত।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবনেই বয়সের সন্ধিক্ষণে দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং স্বভাবের প্রেরণায় দুর্জয় যা কিছু তা জয় করার সংকল্পে তাঁরা উজ্জীবিত হন। শক্তির নেশায়, মনের আবেগে তাঁরা ছোটেন গৌরীশৃঙ্গের শিখরে উঠতে, সাঁতরে সাগর পাড়ি দিতে, দৌড়ে, লাফিয়ে খেলে নিজেকে প্রকাশ করতে।

নিজেকে প্রকাশ করাই মানবীয় ধর্ম। প্রকাশ-ভঙ্গীর উৎকর্ষই মানুষের মহান রূপের পরিচায়ক, তা যে কোনো সূত্রেই যে পরিচয় গড়ে উঠুক না কেন। জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল আদর্শ। খেলাধুলোর মাধ্যমে ছাত্রজীবনে সামাজিক ও সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে বলেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের খেলাধুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। খেলাধুলোয় দেহে বল আসে, মনে আসে স্ফূর্তি ও উদারতা। তাই কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় ছাত্ররা উপহার পান খেলাধুলোয় প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কষ্টি পাথরে ঘসেমেজে এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শে ছাত্রদের খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করা যায় বলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলাধুলোর আদর [illegible]

অন্যান্য দেশে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ছাত্ররাই এগিয়ে রয়েছেন। আমাদের দেশে ছাত্রদের অনুপাতে সেনাবিভাগের ক্রীড়াবিদরা অগ্রগামী। গত কয়েক বছরের মধ্যে অ্যাথলেটিক, সাঁতার ও আরও হরেক রকম খেলায় ভারতীয় সেনানীদের সাফল্য লক্ষ্য করে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে যে, ছাত্রদেরও যদি সেনানীদের মতো সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তাঁরাও আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। বোধ হয় আমাদের দেশেও প্রতিভার অভাব ঘটেনি, অভাব রয়েছে প্রতিভা প্রতিভাত করার ব্যবস্থা। আমাদের মিলখা সিং, রমানাথন কৃষ্ণান, হকি দলই এ সম্পর্কে বড় ও আশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত। মিলখা সিং অথবা কৃষ্ণান যা হতে পেরেছেন, কোন ছাত্র যদি যথাসময়ে যথাযথ সুযোগ, সুবিধা ও শিক্ষা পান তাহলে তিনিও যে সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারবেন না এ কথা বিশ্বাস করার কারণ নেই। কারণ ছাত্রজীবনেই একাগ্রভাবে খেলাধুলোর চর্চায় ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগের সময় প্রশস্ত। সেই সময় দেহ কোনো বাদ সাধে না এবং অর্থোপার্জনের সংগ্রামের বাধাও ছাত্রদের মনের আকাশকে সংকুচিত করে তোলে না।

সুযোগ, সুবিধা, শিক্ষার অভাবের প্রশ্নটি অবশ্যই খুব বড়। কিন্তু এই এক অভাবেই আমাদের দেশের ছাত্ররা খেলাধুলোয় পিছিয়ে রয়েছেন এ কথাটা আদৌ খাঁটি নয়। অভাব রয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই। তবু অন্যত্র এগিয়ে যাওয়ার কিছু কিছু লক্ষণ পরিস্ফুট। কিন্তু ছাত্রদের ক্রীড়ামানের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কই? আমার মনে হয় যে ছাত্রদের ক্ষেত্রে সুযোগ, সুবিধা ও শিক্ষার অভাবের প্রশ্নটা আজ নিছকই পূর্ণথগত তর্কের বিষয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল গলদ থেকে গিয়েছে অন্য কোনখানে।

বিষয়টি বোঝাবার জন্যে শুধু মাত্র কলকাতা ও শহরতলীর দৃষ্টান্তই যথেষ্ট, শহর ও শহরতলীতে প্রায় এক লক্ষ ছাত্রছাত্রী আছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের জন্যে ক্রীড়ানুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার রীতি রীতিমত অব্যাহত। কিন্তু এই এক লক্ষের ক'জন নিয়মিত খেলাধুলোর চর্চা করেন?

খেলাধুলোর চর্চা না রাখার মূলে নিশ্চয়ই সুযোগ, সুবিধার অভাবের প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। সুযোগ, সুবিধা যা আছে তাতে শতকরা পাঁচজন ছাত্রছাত্রী অবশ্যই নিয়মিতভাবে খেলাধুলোর অনুশীলন করতে পারেন। কিন্তু তা করা হয় না। বাস্তবে খেলাধুলো সম্পর্কে ছাত্র মহল কিছুটা নিরুৎসাহ, আগ্রহহীন এবং উদাসীন। গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে নানাবিধ প্রশ্নের ভিত্তিতে বাংলা দেশে ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। [illegible]

কখনো কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেনি। তা ঘটেনি বলেই অসংকোচে মেনে নেওয়া যায় যে, বাস্তবে সে অভাব নেই। থাকলে দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে কোন না কোন দিন ক্ষীণ অভিযোগের সুরও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোতো।

কলেজের ছাত্র মহলে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন স্বর্গীয় অধ্যক্ষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় সারদারঞ্জন রায়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায় নৌবাইচের এবং শ্রদ্ধেয় ব্যায়ামাচার্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল গুহ ঠাকুরতা ব্যায়াম অনুশীলনের। ও'দের অপরিমিত উৎসাহ ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে একদা ছাত্রমহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সে আলোড়ন উত্তরকালেও অব্যাহত থাকার কথা।

ছাত্র ক্রীড়া মানোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে খেলাধুলোয় ছাত্রদের উদাসীনতার প্রশ্নটিই সব চেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। খেলার মাঠের, প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, সাজসরঞ্জামের এবং সংগঠনের অভাবের প্রশ্ন, সবই নিতান্ত গৌণ। মুখ্য কারণ ছাত্র মহলের উদাসীনতা।

এই উদাসীনতা কেন তার কারণ অনুধাবন করাও সহজসাধ্য নয়। প্রাথমিক পাঠ জীবন থেকে কলেজ জীবনের সুরু পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মনের ওপর সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাস্তব পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যায়। এই প্রভাবে তাঁরা খেলাধুলোয় উৎসাহিত বোধ করেন কিনা প্রশ্ন সেইটাই।

আপাতদৃষ্টিতে দেখি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনে খেলাধুলো সম্বন্ধে অদম্য উৎসাহ থাকে। কলকাতার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতে যে কোনো সর্বাত্মক ধর্মঘটের দিনেই তার উপযুক্ত প্রমাণ মেলে। রাজপথ ফাঁকা পেয়ে তারা অন্য দিনের অভাব পুষিয়ে নেয়। তাদের সেদিনের আচরণে ঘটে যায় ক্রীড়া প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু তার পর দিনে দিনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কেন? হয়তো উন্মুক্ত পরিবেশের অভাব, হয়তো বা আরও অসংখ্য কারণে।

সেই কারণ অনুধাবনের আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিশোর কিশোরীদের সুস্থ, স্বাভাবিক, সামাজিক এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মূলের সন্ধানে ফিরতেই হবে। কাজটি সামান্য নয়। সুতরাং এক মহান কর্তব্য সম্পাদনের তাগিদে আজ সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল দেশনায়কেরা এগিয়ে আসুন। সমাজ গঠনে, জাতি গঠনে এবং সুস্থ মনের গঠনে খেলাধুলারও যে মহান ভূমিকা এই চিন্তাতে অনুপ্রাণিত [illegible], এই আমার [illegible]।
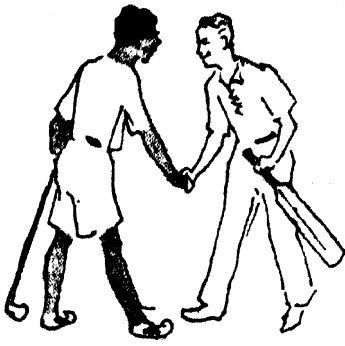
মৈত্রী প্রসারে খেলাধুলো

— শঙ্করবিজয় মিত্র —

প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ সুন্দর সমাজবদ্ধ মানব-গোষ্ঠীর স্বপ্ন মহা-মনীষীদের চিত্তকে আলোড়িত করেছে সুদূর অতীতকাল থেকে। তাই মহীয়ান ও গরীয়ান যুগ-সাধকরা 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'—এই বাণী প্রচার করে গেছেন। রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি বা রণনীতির ঊর্ধে উঠে এই শোভন সমাজের কল্পনা কিন্তু আজও সফল হতে পারেনি। যে ধর্ম মানুষকে সুন্দরের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করে সেই ধর্মের নামে মানুষে-মানুষে যে অন্ধ হানাহানি ও বিভিন্ন সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় তারই কাহিনী আজও লজ্জার উদ্রেক করে।

রাজনীতির খেলাতেও সেই একই কথা। এরই ঘূর্ণাবর্তে জাতিতে জাতিতে কিংবা মানুষে-মানুষে প্রীতির সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ততায় ভরে ওঠে এবং তারই বিষাক্ত পরিণতিতে যুদ্ধ দানা বেঁধে ওঠে। সম্প্রীতি স্থাপনের ঢক্কা-নিনাদই রাজনীতির একমাত্র অবদান বলা যেতে পারে, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে মানুষ আজ হয়ত এই সত্যই উপলব্ধি করছে যে, রাজনীতি দিয়ে প্রীতির জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

আধুনিক কালের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় জাতিতে জাতিতে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিবর্তে গড়ে তোলে অ-সম প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের মনোভাব। বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক যুগের এই অভিনব সভ্যতা মানুষের জীবনকে জটিল ও সংশয়পূর্ণ করে তুলেছে। একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় শান্তির সুরকে বিসর্জন দিতে বসেছে। এ-যুগের রণনীতি তাই অর্থনীতির হাত ধরে চলে। অস্ত্রের দাপটে শান্তির সৌধ চূর্মার হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর দু' দুটো মহাযুদ্ধ মানুষের প্রীতির সম্পর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। রণক্লান্ত শ্রান্ত মানুষ তাই শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রসংঘ। তবুও সেই কাম্য প্রীতির ভাব মানুষ গড়ে তুলতে পারছে কি? শক্তিশালী দেশগুলির বিপুল সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এমনভাবে নিয়োজিত হচ্ছে, যাতে করে প্রীতির পরিবর্তে শঙ্কা ও সংশয়ের আবহাওয়াই সৃষ্ট হয়ে চলেছে। শক্তিশালী দেশগুলির কথা ছেড়ে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকার মত বহু নগণ্য রাষ্ট্রও বিদ্বেষের বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে বর্ণবৈষম্যের অসামাজিক নীতি অনুসরণ করে।

সাম্য ও মৈত্রীর যে সাধনা যুগে যুগে চলে এসেছে, ফরাসী বিপ্লব ও আধুনিক যুগের রুশ বিপ্লব যাকে নবীন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুলেছে সেই সাধনা কি বিফল হবে? মানুষে মানুষে প্রীতি কি স্বপ্নের রাজ্যেই বিলীন হবে? বিভ্রান্ত মানুষ আজ এই প্রশ্নই তুলেছে। পথ কোথায়! আমরা এই প্রশ্নের জবাব পাই বহু মানবের মিলন ক্ষেত্রে। রাজনীতি, ধর্মনীতি বা অর্থনীতির মোহমুক্ত মন নিয়ে মানুষ যেখানে খোলাখুলিভাবে মিশতে পারে। সেই মিলন ক্ষেত্র আর কিছু নয়, সে মিলন ক্ষেত্র ক্রীড়াঙ্গন। জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য এই একটি মাত্র জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি; পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবে যেমন আনন্দের আবহাওয়ায় মিলিত হয়ে মানুষ কিছুক্ষণের জন্যেও ভেদ বা বৈষম্য ভুলে যায়, তেমনি ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিযোগিতার উৎসবে যে আনন্দময় পরিবেশ গড়ে ওঠে, সেখানে জাতির বা বর্ণের সীমারেখা সহজেই মুছে যায়। ক্রীড়ার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের, পণ্ডিত বা মূর্খের, শাসক বা শাসিতের মূল্য সমান। প্রতিযোগ্য বিষয়ে প্রতিভা যার, সম্মান তার। তা সে ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক। ক্রীড়াক্ষেত্রের কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগ্য বিষয়ে পরাজিত হয়ে বিজয়ীকে অসম্মান করে না, আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনন্দনে তাকে অভিনন্দিত করে বরণ করে নেয়, তাকে পরম কাম্য বন্ধু বলে। ক্রীড়াক্ষেত্রে জয়লাভটাই শেষের কথা নয়, ক্রীড়াতে যোগ দিয়ে আনন্দ পাওয়া, নিজেকে বা নিজের দেশকে সম্মানিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। মিলনের বাসরে যোগ দিতে পারাটাকেই যে কোন খেলোয়াড় সৌভাগ্য বলে মেনে নেয়। সেই মিলন বাসরে যে কেউ যোগ দেয়, তাকেই সে বন্ধু বলে, প্রিয়জন বলে গ্রহণ করতে পারে। সেখানে কে কোন্ দেশের মানুষ, তার ধর্মবিশ্বাস কি কিংবা তার গায়ের রং কৃষ্ণ বা কটা, সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। এই মিলন ক্ষেত্রে যে মানুষটিকে যেমনভাবে পেলাম, যেমনভাবে তাকে দেখলাম, যে আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরকে গ্রহণ করলাম, তাই দিয়েই প্রকৃত প্রীতি যেন গড়ে তুলতে পারি—ক্রীড়াক্ষেত্রের আকাশে-বাতাসে সেই সুর ধ্বনিত হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যেখানে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়গোষ্ঠী মিলিত হয়ে প্রতিযোগিতা করে, সেখানেও সেই মিলনের বাণী তাদের প্রীতির সূত্রে, সৌহার্দ্যের সূত্রে গ্রথিত করে। খেলার শেষে সামাজিক মেলামেশায় এই প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হয় এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এই মিলনের বাণী বয়ে নিয়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। এগুলো শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রীতির সম্পর্ক যে কত গভীরে পৌঁছায়, তার বহু দৃষ্টান্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কলায়-দলায় সাধারণ জীবনে যে বৈষম্য রচনা করে এবং কূট রাজনীতি যাকে বিষাক্ত করে তোলে ক্রীড়াঙ্গনের পবিত্র স্পর্শে তাই আবার সম্প্রীতিতে পরিণত হয়।

হিটলার শাসিত জার্মাণী যখন শক্তির উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তখন বার্লিন সহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ১৯৩৬ সালে। এই অনুষ্ঠানে মার্কিণ মুলুকের কৃষ্ণকায় প্রতিযোগী জেসি ওয়েন্স্ চার-চারটি বিষয়ে স্বর্ণপদক জয় করে সমগ্র বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগ্য বিষয়গুলিতে তখনকার দিনে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর একটি রেকর্ড পঁচিশ বছর ধরে ১৯৬০ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। এই প্রতিযোগিতার বিষয়টি সুদীর্ঘ লম্ফন। বার্লিন মঞ্চে সেদিন তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছিলেন জার্মাণীরই প্রতিযোগী লজ লঙ্। বহুক্ষণ ধরে পাল্লা চলে দুজনের। প্রতিযোগ্য সীমারেখা বেড়ে চলে। একে একে উভয়েই সামর্থ্য নিয়োগ করে তাকে লঙ্ঘন করে যায়। কে হারে আর কে জেতে বলাও শক্ত হয়ে ওঠে এক সময়ে। অলিম্পিকের ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময় ধরে এরূপ প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল। অবশেষে ওয়েন্স ২৬ ফুট ৫-৩/৮ ইঞ্চি অতিক্রম করে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলেন।

জার্মাণীতে তখন বর্ণবিদ্বেষের প্রভাব এত তীব্র যে, স্বয়ং হিটলার পর পর কালা আদমীদের সাফল্যে বিরক্ত হয়ে অলিম্পিক মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, দীর্ঘক্ষণ ধরে পরস্পরকে হারিয়ে দেবার প্রবল চেষ্টাতে মত্ত হয়েও লজ লঙ্ বা জেসি ওয়েন্স এই বিদ্বেষের বাষ্পমাত্র অনুভব করেন নি। প্রতিযোগিতার দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়কে মনে মনে প্রশংসা করেই চলেছিলেন —কি অসাধারণ শক্তি এই প্রতিযোগীর! পরস্পরের প্রশংসামুগ্ধ প্রতিযোগী অবশেষে এক প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন যে, ওয়েন্স নিজে ঘোষণা করেছেন—সেই যুগে স্মরণীয় বিশ্ব রেকর্ড প্রচেষ্টায় প্রতিদ্বন্দ্বী লঙের সঙ্গে সেদিন প্রীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, সে বন্ধুত্ব তাঁদের উভয়ের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। জেসি ওয়েন্স তাই বিশ্বাস করেন, জাতিগত, বর্ণগত বা যে কোন বৈষম্য ভুলিয়ে দিয়ে মানুষ আপন হয়ে উঠতে পারে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

শক্তি ও সম্পদশালী আমেরিকার কথাই যদি ধরা যায় তা হলে আমেরিকাকে বর্ণবিদ্বেষের তখন ঘাঁটি বলতেই চলে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালা আদমিদের উৎখাত করবার জন্য এখানে প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের অন্ত নেই। অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত নিগ্রোদের সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠা বিনাশের জন্য শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় সঙ্কল্পবদ্ধ। রাজনীতি আর ধর্মনীতি তাতে চিরকাল ইন্ধন যুগিয়েই চলেছে। প্রশমিতের কোন চেষ্টাই নেই। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে নিগ্রো ক্রীড়াবিদরা অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকায় জাতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের অভিযানকে প্রতিহত করতে চলেছে। প্রয়োজনের খাতিরেই আজ আমেরিকাকে বর্ণ-বিদ্বেষ পরিহার করতে হচ্ছে। অবশ্য আদর্শের দিক থেকে মার্কিণ মনীষীরা চিরদিনই বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিয়েছেন এবং সেই অভিযান সুরু হয়েছিল

জর্জ ওয়াশিংটনের আমল থেকেই। তবুও সাধারণের মন থেকেও আমেরিকা এই বিদ্বেষ মুছে ফেলতে পারেনি। ক্রীড়াঙ্গনে নিগ্রো প্রতিভার অভ্যুদয়ে এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমেরিকার গৌরব বৃদ্ধিতে নিগ্রো ক্রীড়াবিদদের অপরিসীম দান আমেরিকার জীবন থেকে বর্ণ-বিদ্বেষ উচ্ছেদে কম সহায়তা করেনি। বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই নিগ্রো ক্রীড়াবিদগণ আমেরিকার জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে থাকে। ১৯০৪ সালে সেণ্ট লুইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক থেকে নিগ্রো ক্রীড়াবিদ হ্যারী হিলম্যান ৪০০ মিটার দৌড় ও হার্ডল রেসে জয়ী হয়ে আমেরিকার জন্যে নিয়ে আসেন দুইটি স্বর্ণ পদক। তারপর মাঝখানে প্রায় আঠাশ বৎসর ব্যবধান থাকলেও ১৯৩২ সাল থেকে সুরু করে এ পর্যন্ত আমেরিকা বিশ্ব অলিম্পিকে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার অধিকাংশ বিষয়েই কৃতী এথলিট হলো নিগ্রো। ১৯৩২ সালে এডি টোলানও শত ও দুই শত মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয় করেন। ১৯৩৬ সালে জেসি ওয়েন্স শত মিটার, দুইশত মিটার দৌড় রিলে রেসে ও দীর্ঘ লম্ফনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে একাই চারটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। আমেরিকার ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে তিনি যে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাতে সমস্ত দেশ তাঁকে বীরের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর অসাধারণ সাফল্য জাতি বিদ্বেষকে জয় করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় মহাসমর অন্তে ১৯৪৮ সালে অলিম্পিকে আমেরিকা সাফল্যের এক অপূর্ব অধ্যায় রচনা করে। আমেরিকা পুরুষদের বিভাগে এগারটি এবং নারীদের বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে। শত মিটার দৌড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান, দুইশত মিটারে দ্বিতীয়, চারশত মিটারে তৃতীয় স্থান, আটশত মিটারে প্রথম স্থান এবং শত ও চারশত মিটার রিলেতে প্রথম, দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম এবং উচ্চ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার মধ্যে ডেকাথেলন সমেত পাঁচটি বিষয়ে বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ এবং অবশিষ্ট বিষয়ে ছিলেন সমস্ত নিগ্রো এ্যাথলিট।

আজকের আমেরিকাও রোম বিশ্ব অলিম্পিকে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তারও মূলে রয়েছে নিগ্রো ক্রীড়াবিদদের অসাধারণ কৃতিত্ব। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ জয়ে নিগ্রো সৈনিকরা যে শৌর্য, বীর্য ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে তার কথা স্মরণ করেই হয়ত যুদ্ধোত্তর আমেরিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিবন্ধক তুলে নিয়েছেন নিগ্রোদের ওপর থেকে। অবশ্য সামাজিক প্রতিবন্ধক প্রত্যাহারে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এ ছাড়াও শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে নিগ্রো নারী-পুরুষের অকল্পনীয় সাফল্য কম প্রভাব বিস্তার করেনি। এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের কথা বাদ দিলেও, মুষ্টিযুদ্ধে জ্যাক জনসন থেকে সুরু করে জো লুই এবং পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত নিগ্রো বীরদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এই সেদিনও নিগ্রো তরুণী এলথিয়া গিবসন উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-বিজয়িনী হয়ে আমেরিকায় প্রত্যাগমন করলে সমস্ত আমেরিকা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তাঁকে জাতীয় বীরাঙ্গনার সম্মানে সম্মানিত করেন।

এইভাবেই আমেরিকার জীবন থেকে বর্ণ-বৈষম্যের বিষাক্ত হাওয়া বিদূরিত হয়েছে। শুধু আমেরিকা নয়, বৃটেন ও কমনওয়েলথের দেশ-গুলিতেও ক্রিকেট, ফুটবল ও বিভিন্ন এ্যাথলেটিকস ক্রীড়ার মাধ্যমে শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য জয় করতে সমর্থ হয়েছে।

জার্মাণীর জাতীয় জীবনে ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রভাবে [illegible] যে এক জটিল সমস্যাকে অতি সহজে সমাধান করে ফেলেছে, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। মহত্তর জীবনের সুমধুর আহ্বানে মানুষ যে সর্বপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ এবং জটিল ও কুটিল রাজনীতিকেও উপেক্ষা করে এগিয়ে আসে, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর অলিম্পিক টিম প্রেরণের সুনিশ্চিত পন্থাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর মিলনকে কেন্দ্র করে কত অনুষ্ঠান, কত আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শক্তিবর্গের সম্মেলনেও যার সমাধান হয়নি, আজ বিশ্ব অলিম্পিকের ক্রীড়াক্ষেত্রে সেই মিলন সম্ভব হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর ক্রীড়াবিদরা একটিমাত্র দলে মিলিত হয়ে রোমের প্রান্তরে সমগ্র জার্মাণীর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। রোমের বিশ্ব অলিম্পিক ক্ষেত্রের এই মিলনের বাণী পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণীর রাজনৈতিক মিলনকেও হয়ত একদিন বাস্তবে রূপায়িত করবে।

বিশ্বের মধ্যে বোধ হয় আজ দক্ষিণ আফ্রিকাই একমাত্র দেশ, যে দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বর্ণ-বৈষম্যের বিদ্বেষকে জিইয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রসংঘ এই বিদ্বেষ বিনাশের চেষ্টায় এ পর্যন্ত সফলকাম হয়নি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বার্থ এই বর্ণবৈষম্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাই এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক আঘাত সম্ভব হচ্ছে না রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমেও। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে অতি স্বচ্ছ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি তাই দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি উত্তোলন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এই আলোড়নের ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এই সৎ সাহস ও সুউচ্চারিত সতর্কবাণী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য-নীতিকে প্রচণ্ড ধাক্কা হানবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সাম্য ও মৈত্রীর বাণী উচ্চারণে ও নীতির প্রসারণে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশ-গুলি কূট রাজনীতির আবর্তকে পরিহার করে যদি স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তা অনুসরণ করেন, তাহলে শুধু বর্ণবৈষম্য কেন, বিশ্ব-সমস্যার বহু বৈষম্য বিদূরিত হবে।

ওয়াল্টার লিনড্রাম, বব পটৌস্কি ও লুইস এঞ্জেলো ফারপোর বিদায় আন্তর্জাতিক শোকসংবাদ। এই সংবাদে মর্মাহত হয়েছেন সারা বিশ্বের ক্রীড়ানুরাগীকুল বিগত জুলাই-আগষ্ট মাসে। বিখ্যাত ত্রয়ীর প্রথমজন বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়, দ্বিতীয়জন অ্যাথলিট এবং শেষোক্ত ক্রীড়াবিদ মুষ্টিযোদ্ধা।

ওয়াল্টার লিনড্রামকে বিখ্যাত বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় বলে অভিহিত করলে তাঁর পরিচয়কে অতি সামান্য এক গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখা হয়। বরং বলা ভাল যে, লিনড্রাম ছিলেন বিলিয়ার্ড দুনিয়ার অবিসম্বাদী অধীশ্বর, জীবনকালে যিনি অপরাজেয় ও সর্বজয়ী।

ওয়াল্টার লিনড্রাম বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও যেন উপাখ্যান বর্ণিত এক উপভোগ্য চরিত্র। ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষরে তিনি বিলিয়ার্ড খেলার ইতিহাসে অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় বারে বারে শীর্ষস্থান পাওয়া এবং এক এক ব্রেকে হাজার হাজার পয়েণ্ট সংগ্রহ করাই তাঁর স্মরণীয় কীর্তি।

বিলিয়ার্ডে লিনড্রামের অস্পর্শিত বিশ্ব-রেকর্ড হলো ৪১৩৭ পয়েণ্ট। তাছাড়া তাঁর আরও বহু রেকর্ড এখনও অন্যের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ন্যূনতম সময়ে শত-সহস্র ব্রেক করেও তিনি অবাক করেছেন সকলকে। তিনি একশ' পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছেন মাত্র ছেচল্লিশ সেকেণ্ডে, ত্রিশ মিনিটে ১০১১ পয়েণ্টের ব্রেক। এসবই পরিসংখ্যান তালিকার শোভা বর্ধন-কারী নতুন নজীর।

১৯২৮ ও ১৯৪৬ সালের অন্তর্বর্তীকালে লিনড্রাম ছিলেন অপরাজিত। তাঁর অপরাজেয় শক্তির উৎসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একদা বিশ্ব বিলিয়ার্ড নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে খেলার আইন সংশোধন করে লিনড্রামকে তাঁর বিখ্যাত মার 'নার্সারি ক্যানন'-এর যথেচ্ছ প্রয়োগে বিরত রাখার প্রয়াস পেতে হয়েছিল। কিন্তু আইনের প্যাঁচ কষেও লিনড্রাম প্রতিভাকে সংকুচিত করে তোলা যায়নি, কেউই পারেন নি তাঁকে পরাজিত করতে।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ওয়াল্টার লিনড্রামের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে ইংলণ্ডের জন রবার্টসের (ছোট) দাবীর কথা উত্থাপন করে কেউ কেউ লিনড্রামকে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেছিলেন। কিন্তু রেকর্ড ও আরও রেকর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখে লিনড্রাম সমস্ত সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেন। গত ৩০শে জুলাই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়ায় একষট্টি বছর বয়সে লিনড্রাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভারতবাসী অষ্ট্রেলিয়ার এই খেলোয়াড়ের অনন্য ক্রীড়া-শৈলীর পরিচয় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাবার পথে তিনি ১৯৩৩ সালে বোম্বাইয়ে যাত্রা থামিয়ে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়ে-ছিলেন এবং ১২ই নভেম্বর এক খেলায় এক ব্রেকে ৯৮৫ পয়েণ্ট সংগ্রহের কৃতিত্ব দেখান। এর আগে অথবা লিনড্রামের পরে ভারতে অনুষ্ঠিত কোনো

(শেষাংশ ২১৬ পৃষ্ঠায়)

শরীরকে সুস্থ রাখুন

~ মনতোষ রায় ~

শরীরকে সুস্থ সবল রাখা খুব একটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। একটু চেষ্টা করে আলস্য পরিত্যাগ করলেই আমরা তা করতে পারি। শরীরকে সুস্থ সবল রাখার একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যায়ামচর্চা। এই ব্যায়ামচর্চা সকলের জন্যই, তবে শারীরিক, মানসিক ও বয়সের অবস্থাভেদে তারতম্য আছে। আপনারা জানেন কি, দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, আমাদের এই শারীরিক দুর্বলতা? শারীরিক দুর্বলতা আমাদের জীবনে ভয়ংকর এক অভিশাপ। আমরা শরীরকে অবহেলা করি বলেই আমাদের জীবনে নেমে আসে এই জাতীয় অভিশাপ। আপনার আশেপাশে একবার চোখ ফেরান, দেখতে পাবেন, এই অবহেলার দরুণ কম বেশী প্রতি সংসারেই একটা না একটা রোগ লেগেই আছে, আর এই রোগের পেছনে সাধ্যানুযায়ী খরচাও হচ্ছে প্রচুর। একটু কষ্ট করে শরীরটাকে ভাল রাখার ব্যবস্থা করলেই এই খরচা অনায়াসে সেভিংস ব্যাংকে যেতে পারে অথবা ঐ পয়সায় আপনি সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনতেও পারেন। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, অভাব অনটনকে অদৃষ্টের পরিহাস বলে মেনে নেওয়াটা একটা প্রহসন মাত্র। শরীরকে যত্ন আপনি অজ্ঞাতসারে যতটুকু করে থাকেন, জ্ঞাতসারে করলে তার দ্বিগুণ ফল আপনি পাবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হোল শরীরকে যত্ন করাই বেঁচে থাকার পরিচয়।

আমরা খাই প্রয়োজনাতিরিক্ত, আর বিনা পরিশ্রমে অপচয় হয় তারচেয়ে বেশী। বিদেশীরা খায় কম, কিন্তু পরিশ্রমের দ্বারা সেটুকু শরীরের যথাযথ পুষ্টিতে লাগায়। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, অতিরিক্ত খেয়ে পরিশ্রম না করলে আলস্য আসে, কাজ না করবার নানান অজুহাত আসে। তার ফলে আমরা সর্বদিক থেকেই ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ি। অতএব আমরা যে যতটুকু ভালমন্দ খাদ্য

'সাইড ক্রসিং'
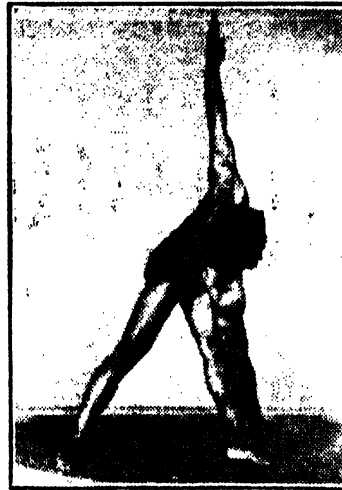
যাই খাই, সেই খাদ্যটুকু আবালবৃদ্ধবনিতার প্রত্যেকেরই পরিপূর্ণভাবে হজম করানো দরকার। এই হজমের ক্রিয়াটিকে শুদ্ধভাবে সাধিত করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে।

ব্যায়াম করার জন্য বিশেষ কোন স্থানের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, আবার এও জানি যে, সবার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা কোন আদর্শ ব্যায়াম সমিতিতে গিয়ে শরীর চর্চার নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করুন। আর যাঁদের সে সুযোগ নেই তাঁরা নিজেদের ঘরে বা ছাদে প্রয়োজনমত শরীর চর্চার অনুশীলন করতে পারেন। যাঁরা ঘরে বসে যোগাভ্যাস করবেন আমার এই প্রবন্ধে তাঁদের সম্পর্কেই কিছু বলব। এই যোগাভ্যাসের ফলে খাদ্য হজম সমস্যা সমাধান করে শরীরকে সুস্থ রাখার শক্তি আপনি লাভ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে যোগবস্তুটির অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে অল্প-বিস্তর বলার প্রয়োজন মনে করছি, যাতে এই বিষয়টির প্রতি সহজেই আপনাদের শ্রদ্ধা জাগে। এক কথায় বলা যেতে পারে যোগ দেহের সর্ববিধ রোগকে করে বিয়োগ। এর প্রধান কাজ হলো, শরীরের আভ্যন্তরীণ কলকব্জাগুলিকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখা। আমাদের দৈনন্দিন কর্মে ধর্মে এবং চিন্তার মাধ্যমে দেহের আভ্যন্তরীণ কলকব্জার চলৎশক্তি অব্যাহত রাখার একমাত্র পন্থা হচ্ছে যোগব্যায়াম ও পরিমিত পরিশ্রম করা। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন যে, বিনা পরিশ্রমী ব্যক্তি অসময়ে অকালে নিজেদের শরীরে একটা অস্বাভাবিকতা বোধ করতে শুরু করেন। এই বোধটা করতেন না, যদি তিনি পরিশ্রম এবং ব্যায়ামের সাথে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে আসতেন।

পূর্বেই বলেছি, যোগ শরীরের সর্ববিধ রোগকে করে বিয়োগ। কি করে এটা সম্ভব হয় জানেন কি? যোগাভ্যাসে শরীরের আভ্যন্তরীণ রক্তবহনাড়ী এবং বিভিন্ন গ্রন্থিরস নিঃসরণের ও গ্রহণের কাজগুলি সর্বদার জন্য সহজ ও সক্রিয় থাকে। তাই যোগাভ্যাসকারীদের শরীরে সহসা কোন ব্যাধি দেখা দেয় না। রোগের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরস্থ কলকব্জার আংশিক অক্ষমতা বা নিষ্ক্রিয়তা। কাজেই এখন নিশ্চয়ই মেনে নেবেন রক্ত ও গ্রন্থিরস যদি শরীরের বিভিন্ন কলকব্জাকে তাদের চাহিদামত যোগান দিতে পারে তাহলে ঐ সকল যন্ত্রের অকাল বার্ধক্য আসে না এবং শরীর অকালে রোগজর্জরিত হয় না। কাজে কাজেই অন্ততঃপক্ষে ২০।৩০ মিনিট যোগাভ্যাস করে, সুস্থদেহে বেশীদিন বেঁচে থাকার আশায় যদি শরীরটাকে রোগমুক্ত করে আপনি কার্যক্ষমতা লাভ করতে পারেন তবে এই অমূল্য বস্তুটিকে কেন অবহেলা করবেন, তার জবাব দিতে পারবেন কি? যদি না পারেন, তাহলে আমার এই প্রবন্ধ পাঠের অব্যবহিত পরই যোগাভ্যাসের সংকল্প গ্রহণ করুন। তাই আমি আপনাদের সবার অভ্যাসোপযোগী কয়েকটি যোগব্যায়ামের নির্দেশ দিচ্ছি এগুলি নিয়মিতরূপে পালন করবেন। যথা :—

Breathing, Side, Crossing, Hands up squat.

উড্ডীয়ান—
সর্বাঙ্গাসন—
মৎস্যাসন—
অর্ধকূর্মাসন—
ভুজঙ্গাসন—
যোগমুদ্রা—
শবাসন—দশ মিনিট

এই আসনগুলির পরিচিতির পরে এইসব

'ব্রিদিং'

'হ্যান্ডস আপ স্কোয়াট'

'উড্ডীয়ান'

ব্যায়ামের সাথে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে গ্রন্থিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাদের গুরুত্ব ও ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলে নিচ্ছি যাতে এই ব্যায়ামগুলির অভ্যাসযোগে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আপনাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রথমেই আসুন থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি প্রসঙ্গে। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে নীচের দিকে অবস্থিত—এরা সংখ্যায় দুটি। কিন্তু প্যারাথাইরয়েডের সংখ্যা চারটি—এরা থাইরয়েডের উপরে ও নীচে সংলগ্ন থাকে। আমাদের শরীরে নানা কারণে যে সকল বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে ধ্বংস করা থাইরয়েড গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের প্রধান কাজ। আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও থাইরয়েডের সুস্থতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই গ্রন্থির দুর্বলতায় কোষ্ঠবদ্ধতা, পরিপাকশক্তি হ্রাস, স্নায়ুদৌর্বল্য, মেদবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। প্যারাথাইরয়েড যদিও এতগুলি কাজ করে না, কিন্তু যে কাজটি করে সেটি শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন খাদ্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে যে ক্যালসিয়াম যায় সেই ক্যালসিয়াম কিছুতেই শরীরের কাজে লাগত না, যদি না প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি এ বিষয়ে সাহায্য করত।

থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাছাকাছি আর একটি গ্রন্থি আছে যার নাম হোল থাইমাস। শৈশব ও কৈশোরে জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিকে দাবিয়ে রেখে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে সহায়তা

অর্ধকূর্মাসন

করে এই থাইমাস। এর পরেও যদি আমরা ব্যায়ামের দ্বারা থাইমাসকে সক্রিয় রাখতে পারি তবে আমাদের দেহের শ্রী ও সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

এবার যে ছোট্ট গ্রন্থিটির কথা বলব তার নাম পিটুইটারি। এই গ্রন্থিটি মাথার নীচে করোটির মধ্যে একটি অস্থি গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত। এর সামনের অংশকে অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি এবং পিছনের অংশকে পোস্টিরিয়ার পিটুইটারি বলা হয়। গ্রন্থিটি দেখতে ছোট হলেও এর কাজ খুব কম নয়। এই গ্রন্থি যদি জন্ম থেকেই অকর্মণ্য হয়, তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের ও মনের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে হয় না। কোন কারণে গ্রন্থিটি যদি দুর্বল হয়ে যায় তবে অকালবার্ধক্যকে আপনি আর রোধ করতে পারবেন না।

সংস্কৃতে ক্লোম বলে একটা কথা শুনে থাকবেন, তারই ইংরেজী নাম হোল প্যানক্রিয়াস। এই প্যানক্রিয়াস আমাদের শরীরের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থিগুলির অন্যতম। এই গ্রন্থিটি পেটের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কটি কশেরুকার Lumber Vertebralo সামনে অবস্থিত। এই গ্রন্থির বহির্মুখী পাচকরস ডুওডিনামে যে খাদ্যবস্তু আসে তার পরিপাকে সহায়তা করে। কিন্তু এর অন্তরস ইনসুলীন খাদ্যের সারবস্তুকে দেহের শক্তিতে পরিণত করে। এর অভাবে রক্তে

'সর্বাঙ্গাসন'

শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই বুঝতে পারছেন এই গ্রন্থিটিকে সুস্থ রাখা আমাদের শরীরের পক্ষে কত দরকারী?

এবার মেয়েদের শরীরের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থি ওভারির কথা বলে গ্রন্থিতত্ত্বের আলোচনা শেষ করব। ওভারি সংখ্যায় দুটি। মেয়েদের তলপেটের ভিতর জরায়ুর দুইপাশে এই গ্রন্থিদ্বয় অবস্থিত। নারীত্বের বিকাশ সম্পূর্ণরূপেই এই গ্রন্থির উপর নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থির অক্ষমতার ফলে নানারূপ স্ত্রী ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই গ্রন্থি দুর্বল হলে স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সন্তান প্রসবের পর মেয়েদের নানান দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, আমাদের শরীরের সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে এই গ্রন্থিগুলির কতখানি সহযোগিতা প্রয়োজন। কাজেই যদি আপনি এদের সহযোগিতা পেতে চান, তবে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আপনিও এদের সহযোগিতা করুন।

'মৎস্যাসন'
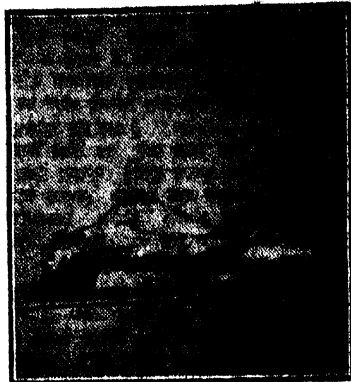
এবার আমি পূর্বোক্ত ব্যায়ামগুলির বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখুন 'Set' মানে বার বা দফে এবং এক এক সেটে নিজের সাধ্যানুযায়ী যতবার আপনি করতে পারেন তাকে বলা হয় Repetation বা পুনরাবৃত্তি। আর ৫ থেকে ৯ নম্বর পর্যন্ত আসনগুলির পাশে (৩০-৩০)৩ বলে যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে তার অর্থ হোল কোন আসন ৩০ সেঃ করার পর ৩০ সেঃ শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে এবং এভাবে ৩।৪ বার অভ্যাস করতে হবে।

Breathing পা জোড়া করে দাঁড়ান। দুহাত পিছনে ধরুন। এরপর পেট টেনে বুক উঁচু করতে করতে খুব ধীরে ধীরে নাক ফুলিয়ে দম নিন এবং ধীরে ধীরে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম ছাড়ুন ও পেট ও বুক শিথিল করুন। এইভাবে ১০ বার অভ্যাস করবেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখুন, প্রতি ব্যায়াম ও আসনেই নাক দিয়ে দম নেবেন এবং ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দম ছাড়বেন। আমরা সব সময়েই দম ছাড়া নেওয়া করছি। কিন্তু এই বিশেষভাবে দম ছাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্য হোল হৃদপিন্ড ও ফুসফুসকে ব্যায়ামে যে পরিশ্রম হবে সে সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া।

Side crossing ২।৩ হাত পা ফাঁক করে দাঁড়ান। হাত দুটি কাঁধের সমান্তরালে লম্বা করে দিন। প্রথমে দম নিন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে হাঁটু সোজা রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করুন এবং বাঁহাতের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সোজাসুজি তাকান। আবার দম নিতে নিতে সোজা হয়ে উঠে হাত কাঁধের সমান্তরালে পূর্ববৎ লম্বা রেখে দম ছাড়তে ছাড়তে অপরদিকে ঐ একইভাবে করুন। দুদিকে দুবার

'ভুজঙ্গাসন'

যোন। এভাবে (৬×২=১২ বার) ১ সেট করে একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় অভ্যাস করুন। একটু তাড়াতাড়ি করবেন। মোট ২ অথবা ৩ সেট করুন। এই ব্যায়ামে মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি হয়, কোমরের চর্বি কমে এবং কিডনী সক্রিয় হয়। Hands up squat — দুই হাত মত পা ফাঁক করে দাঁড়ান। হাত মুঠো করে দম নিতে নিতে হাত মাথার উপর তুলতে তুলতে বসুন। আবার দম ছাড়তে ছাড়তে হাত নামাতে নামাতে উঠে দাঁড়ান। এইভাবে ২ সেট করুন। তাড়াতাড়ি করবেন। এই ব্যায়ামে হাত পায়ের পেশীর শক্তি বৃদ্ধি হয় ও দেহের গঠনকে সুন্দর করে।

(৪) উড্ডীয়ান—হাঁটু মুড়ে বসে হাত হাঁটুতে রেখে দম নিয়ে দম ছেড়ে দিন। এখন ঐ বন্ধ অবস্থায় পেটটাকে একটু দ্রুত ভিতরে টানুন ও শিথিল করুন—এক সঙ্গে ১০বার এরূপ করুন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার করুন। মোট ৫ দফা করবেন। এই মুদ্রায় প্লীহা, যকৃৎ ও অন্ত্র খুব সক্রিয় হয়। ফলে পরিপাকক্রিয়ার উন্নতিসাধনে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে এই মুদ্রা যথেষ্ট সহায়তা করে।

(৫) সর্বাঙ্গাসন—চিৎ হয়ে শুয়ে কাঁধের উপর শরীরের ভর রেখে কোমরে হাত দিয়ে

যোগমুদ্রা

চিত্রানুযায়ী পা দুটো উপরে তুলুন। এই অবস্থায় ক্রমিঃ ধীরে ধীরে দম ছাড়া নেওয়া করে, হাঁটু ভেঙে কোমর মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ক্রমিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪বার করুন। এই আসনে থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি সক্রিয় ও সুস্থ থাকে। টনসিলের দোষ দূর হয় এবং স্নায়ুর সবলতা বৃদ্ধি করে।

(৬) মৎস্যাসন—পদ্মাসনে বসে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার তালু মাটিতে রেখে পিঠ মাটি থেকে কিছুটা তুলুন। হাঁটু যেন মাটিতে থাকে। হাত দিয়ে পায়ের আঙ্গুল ধরুন অথবা হাত হাঁটুতে রাখুন। এবার পেটটাকে টেনে বুক উঁচু করে ধীরে ধীরে দম নিন এবং আবার পেট শিথিল করে দিয়ে দম ছাড়ুন। এইভাবে ½ মিনিট দম ছাড়া নেওয়ার পর পদ্মাসনে চিৎ হয়ে শুয়ে ক্রমিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪বার অভ্যাস করবেন। এই আসনে থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থির কাজও খুব ভাল হয়, [illegible] থাইরয়েড গ্রন্থির দোষ দূর করে এবং ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে।

(৭) অর্ধকূর্মাসন—হাঁটু মুড়ে বসুন। মাথার উপর হাত তুলে দম নিন, এবার দম ছাড়তে ছাড়তে চিত্রানুযায়ী কপাল মাটিতে ঠেকান, হাত লম্বা করে ক্রমিঃ ধীরে ধীরে দম ছাড়া নেওয়া করুন।

তারপর শুয়ে পড়ে ক্রমিঃ শবাসনে বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪বার অভ্যাস করুন। এই আসনে যকৃৎ, প্লীহা ও পরিপাকের অন্যান্য যন্ত্রাদি সুস্থ থাকে এবং পেটের বায়ু দূর করে।

(৮) ভুজঙ্গাসন—পা জোড়া করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। চিত্রানুযায়ী দুই হাত কাঁধের সমান্তরালে মাটিতে রাখুন, কনুই কোমর সংলগ্ন থাকবে। এবার দম নিয়ে তলপেট পর্যন্ত মাটিতে রেখে উপরের অংশ (কোমর থেকে মাথা) তুলুন। হাতের উপর বেশী ভর দেবেন না, কোমর ও শিরদাঁড়ার উপর ভর দিন। ঐ অবস্থায় ক্রমিঃ দম ছাড়া নেওয়া করে শুয়ে পড়ুন এবং শবাসনে ক্রমিঃ বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪বার করুন। এই আসনে ওভারীর কাজ খুব ভাল হয়, মেরুদণ্ড নমনীয় হয় ও হৃৎপিণ্ড সবল হয়।

(৯) যোগমুদ্রা—পদ্মাসনে বসুন। চিত্রানুযায়ী হাতের আঙ্গুল পেটের কাছে রেখে বুড়ো আঙ্গুল কোমরের পাশে রাখুন। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে কপাল মাটিতে ঠেকান এবং ঐ অবস্থায় ক্রমিঃ দম ছাড়া নেওয়া করার পর শবাসনে ক্রমিঃ বিশ্রাম নিন। এইভাবে ৩।৪বার করুন। এই মুদ্রায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের বায়ু দূর হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। দম নেওয়ার সময় নাভিতে আঙ্গুলে [illegible] চাপ দিন এবং দম ছাড়ার সময় আঙ্গুলে শিথিল করুন।

(১০) শবাসন—সবশেষে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে শরীরটাকে সম্পূর্ণভাবে শিথিল করে দিয়ে ১০ মিঃ বিশ্রাম নিন। এই সময় ব্যায়ামগুলির উপকারিতার কথা একমনে চিন্তা করবেন।

ত্রয়ীর বিদায়

(২১৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিলিয়ার্ড খেলায় শতাধিক পয়েন্টের নজীর রাখা আর কারোর পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি।

লিনড্রাম বিদায় নিয়েছেন পরিণত বয়সে কিন্তু গাটৌস্কি নিতান্ত অকালে এবং এক শোচনীয় দুর্ঘটনার পরিণতিতে। তাই গাটৌস্কির জীবনাবসানের দৃষ্টান্ত রীতিমতো বেদনাদায়ক।

অ্যাথলিটদের ক্রমোন্নতির যুগে যেকালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বেড়েই চলেছে, সেই কালে বব্ গাটৌস্কির দক্ষতা অনস্বীকার্য। কারণ, এই যুগেই তিনি বিশ্বের রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন এবং সে রেকর্ড তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিল আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান তালিকায় স্বীকৃত।

১৯৫৭ সালের ২৭শে এপ্রিল প্যালো আলটোতে ১৫ ফুট ৮¼ ইঞ্চি লাফিয়ে বব্ গাটৌস্কি কর্ণেলিয়াস ওয়ারমারদামের পনেরো বছরের পুরানো রেকর্ড (১৫ ফুট ৭¾ ইঞ্চি) ভেঙে দেন এবং উত্তরকালে আরও কয়েকবার পোল ভল্টে পনেরো ফুটের বাধা যান ডিঙিয়ে।

গত ২রা আগষ্ট এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে বব্ গাটৌস্কির যখন প্রাণবিয়োগ হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ। পঁচিশ বছরের তারুণ্যের প্রশ্নকে ঘিরেই ক্রীড়ামোদীদের দুঃখ বেশী কারণ, বিশ্বাস করা যায় যে, আরও সুযোগ পেলে, বেঁচে থাকার অধিকার থাকলে হয়তো তাঁর বিপুল সম্ভাবনার পরিণত প্রকাশ দেখে ক্রীড়ানুরাগীরা আরও আনন্দ পেতে পারতেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম পর্বে লুইস এঞ্জেলো ফারপোর জীবনাবসান ওয়াল্টার লিন্ডরামের মতোই হয়েছে।

লুইস এঞ্জেলো ফারপো মুষ্টিযুদ্ধের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে। ফারপো অবশ্য বিশ্বের হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়নের অনন্য মর্যাদা অর্জন করতে পারেন নি কিন্তু দক্ষ ও ভয়ংকর লড়িয়ে বলে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য।

মুষ্টিযুদ্ধ মহলে ফারপো পরিচিত ছিলেন পম্পাসের ক্ষ্যাপা ষাঁড় বলে। তাঁর মুষ্টিযুদ্ধের রীতি ও মানসিক গঠন ছিল এই আখ্যার সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফারপোর ক্ষিপ্ত রণং দেহি মূর্তি দেখে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী আতঙ্কিত হননি। অমন যে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জ্যাক ডেমপসি তিনিও ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাননি।

বিশ্বের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জেস ওয়েলার্ডকে অষ্টম রাউণ্ডে নক আউট করে ফারপো হন বিশ্ববিখ্যাত এবং তারপর আরও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন সুবিখ্যাত জ্যাক ডেমপসির সঙ্গে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফারপো শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেও প্রথম রাউণ্ডেই এক ঘুষির ঘায়ে জ্যাক ডেমপসিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন রিংয়ের বাইরে দর্শকদের কোলে।

জ্যাক ডেমপসি নিজেও ফারপোর প্রচণ্ড [illegible] শক্তির কথা স্বীকার করে গিয়েছেন। [illegible] ২৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক পোলো [illegible] ফারপোকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে নক আউট ক[illegible] জ্যাক ডেমপসি মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন—

'এক ঘুষিতে রিংয়ের বাইরে ফেলে দেওয়ার আগেও ফারপোর ডান হাতের বজ্রমুষ্টি একবার আমার চিবুক ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেই এক লহমার স্পর্শেই আমি যেন চৈতন্য হারিয়ে বসেছিলাম। তারপর প্রথম রাউণ্ডে আমি আর জেতার উদ্দেশ্যে লড়তে পারিনি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছি স্রেফ জান বাঁচানোর তাগিদে। আর একটি তেমন ঘুষি মুখে পড়লে আমার হার তো অনিবার্য হোতোই, সেই সঙ্গে প্রাণ বাঁচানোও বোধহয় দায় হয়ে দাঁড়াতো!'

ডেমপসির এই স্বীকৃতিতেই ফারপোর সমস্ত পরিচয় পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে এই উক্তি ডেমপসি চরিত্রের মর্যাদাও বাড়িয়ে দিয়েছে।

লুইস এঞ্জেলো ফারপো ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। তাঁর জীবনাবসানও হয় আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারস শহরে।

বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

(২০৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তিনি জড়িয়ে পড়েন নিবিড় বন্ধনে। মিঃ পল হেলমসের জীবনাবসান ঘটেছে, কিন্তু তাঁর নাম ক্রীড়াক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ক্রীড়াবিদদের পুরস্কৃত করা ছাড়া মিঃ পল হেলমস ক্রীড়া সম্পর্কিত একটি পাঠাগারও স্থাপন করে গিয়েছেন। যেটি বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ ভবন। এমনি [illegible] বিশাল ও বিচিত্র স্পোর্টস লাইব্রেরী বিশ্বের [illegible] কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। দেশ-বিদেশের অসংখ্য অনুরাগী [illegible] গবেষণায় প্রতি বছরই দীর্ঘ সময় [illegible] করেন, এই পাঠভবনের আদর্শ পরিবেশে

পাত্রী চাই

(৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ব্যাপারটা খুলে বলতে হয়।

হাটখোলার এই পাত্রটির বয়স সম্ভবতঃ পঞ্চাশ—কিংবা তার কাছাকাছি। তিনি বিয়ের জন্যে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তাতে বয়সের উল্লেখ করেননি। শুধু লেখা ছিল—কলিকাতায় দুখানা বাড়ী, বড় ব্যবসায়, দেশে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি, এক পয়সাও দাবী নাই.. ইত্যাদি।

এখন পাত্রীপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলচেন যে, ব্যবসায়ের পেছনে খুব ব্যস্ত থাকায় বিয়ে করবার সময় হোয়ে ওঠেনি। বিয়ে করবেন না স্থির করেছিলেন; কিন্তু সংসারে আর কেউ নেই; এত অর্থ-সম্পত্তি ভবিষ্যতে ভোগ করবার জন্যেও বটে, আর শেষ বয়সে দেখা-শোনা করবার জন্যেও বটে, বিয়ে করবার খুবই আবশ্যক এবং তাই......ইত্যাদি।

শংকর বললে—"কিন্তু এত বয়সে বিয়ে করাটা........বয়স আপনার ষাটের ভেতরেই হবে বোধ হয়?"

"ষাট! বলেন কি! আমার ঠিকুজি এনেচি, এই দেখুন। এই গেল মাঘে আটচল্লিশ ছাড়িয়ে........"

"উনপঞ্চাশীতে প্রবেশ করেচেন, তাই ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু তাতে কি? বয়সে কি আসে যায়? আমার দেহের আর মনের শক্তি যা আছে, তা অনেক তিরিশ বছরের যুবারও নেই। এখনো আমি একদমে ৭২টা বৈঠক আর ২৫টা 'ডন' দিতে পারি। দেখবেন?" বলেই উনপঞ্চাশী বাবাজী মালকোঁচা বেঁধে 'ডন' ফেলতে সুরু করলেন। বার দুচ্চার ডন দেবার পরই বে-কায়দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। পাছে বাড়ীতে ব্রহ্ম হত্যা হয়, সেই ভয়ে আশুবাবু ব্যস্ত হোয়ে বোলে উঠলেন—"থাক থাক হোয়েচে; আপনি বসুন এসে।"

তিনি উঠে এসে বলতে লাগলেন—"মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলুম। বর্ষাকাল। মাঠের মধ্যে দু'একটা লম্বা খানা আছে দেখেচেন ত? সেগুলো তখন জলে ভরা। চওড়াতে ৮।১০ হাত হবে। সকলে অনেকটা ঘুরে তবে ও-পারে গেল। আমি মশাই, দিলুম এক লাফ আর দিব্বি ও-পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!"

শংকর বললো—"চমৎকার! লাফ দেবার অদ্ভুত শক্তি ত আপনার!"

"তবে আর বলচি কি! মেয়ে আপনাদের খুব সুখে থাকবে; রাজরাণী হবে, এই বোলে দিলুম।"

শংকর অতি নম্রভাবে নিবেদন করলো—"আজ্ঞে, তা বুঝতে পেরেচি, তবে—কথা হোচ্চে এই যে, গরীব-গেরস্ত ঘরের মেয়ে, রাজরাণীগিরি তার ধাতে সইবে কি?"

কথাটার কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে, হাটখোলার বাবাজী চুপ করেই রইলেন। বন্ধ জানালার একটু ফাঁক দিয়ে জাহ্নবী দেবী সব দেখছিলেন আর মৃদু-মৃদু হাসছিলেন; কিন্তু তাঁর হাসির অন্তরালে একটা ভারি-ব্যথা তাঁর সারা অন্তরদেশকে যন্ত্রণা দিচ্ছিলো।

আশুবাবু হাটখোলার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"বুকে আপনার লাগেনি ত?"

"কিছু না—কিছু না। ঐ যে বল্লুম, একদমে আমি—ওরকম ২৫।৩০টা 'ডন' দিতে পারি, তবে অভ্যেসটা ঠিক নেই বলে........ওর নাম কি........ঐ রকম......" কথাটা অসমাপ্তই থেকে গেল।

অতঃপর আরো দু'একটা আলাপ-আলোচনা হোল; চা-জলখাবারের ব্যবস্থাও শেষ হোল এবং পরিশেষে পাত্র-বাবাজীকে জানানো হোল যে শীঘ্রই এখানকার পাকা মতামত জানিয়ে, পাকা-দেখার দিন ধার্য করে তাঁকে চিঠি দেওয়া হবে।

বেশ হৃষ্ট মনেই হাটখোলার বাবাজী হাটখোলায় ফিরে গেলেন। সম্ভবতঃ পাকা দেখার চিঠিও পাঠানো হোয়ে থাকবে, কিন্তু ডাক বিভাগের কু-ব্যবস্থার জন্যে সে চিঠি আজ চৌদ্দ বছরের মধ্যেও বাবাজীর কাছে পৌঁছায়নি।

* * *

দিন চার-পাঁচ পরে একদিন সকালবেলা শংকর সেই দিনের একখানা কাগজ হাতে নিয়ে এ বাড়ীতে এসে ডাকলো—"কাকাবাবু!"

জাহ্নবী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন—"এস বাবা; তিনি ঐ কেষ্ট পালের দোকানে গেছেন, এখনি আসবেন, তুমি ঘরে এসে বোসো। চা খাবে কি? কোরে দোবো?"

"খেতে পারি খুড়ীমা, যদি আপনি কোরে দেন; রাধু কোরে দিলে খাব না, কেন না ও বড্ড চিনি কম দেয়; কিপটের এক-শেষ।"

রাধারাণী কি একটা করছিলো; শংকরের সামনে এসে হাসতে হাসতে বললে—"শংকরদা" আমি চিনি কম দিই?"

"দাও ত! খুড়ীমাই বলুন, দাও কিনা।"

জাহ্নবী বললেন—"হ্যাঁ মা, তুমি চিনি একটু কমই দাও, উনিও তাই বলেন।"

শংকর হাসতে-হাসতে বোলে উঠলো—"কেমন হোল ত? তোমার হার হোয়ে গেল, রাধু। আর চিনি কম দেবে?"

শংকরের মুখের দিকে চেয়ে রাধারাণী বললো—"কতকগুলো চিনি দিলে, চা ভাল হয় নাকি, তার চেয়ে শংকরদা, চায়ের বদলে আপনাকে এবার থেকে সরবৎ কোরে দোবো।"

জাহ্নবী বললেন—"তুমি ঘরের ভেতর গিয়ে বোসো বাবা, আমি চা কোরে রাধুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল দিদি এসেছিলেন। তুমি বিয়ে করতে চাও না বোলে দিদি কত দুঃখ করলেন। কেন বাবা, বিয়ে-থা না করলে কি আর চলে? একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে কর বাবা।"

"বিয়ে করতে হবে বৈকি খুড়ীমা; কিন্তু এখন নয়। মায়ের ইচ্ছে আমি ল'টা পাস করি। তাই হবে। ল'টা পাস কোরেই, তখন এক সোনার লক্ষ্মী এনে মা'র ঘরে প্রতিষ্ঠা কোরে দোবো......ঐ ত কাকাবাবু এসে পড়েচেন।"

আশুবাবু শংকরকে নিয়ে তাঁর ঘরের মধ্যে গেলেন।

শংকর তার হাতের কাগজখানার একটা স্থান দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এই পাত্রটির কথা পড়ুন কাকাবাবু; মনে হচ্চে, এটা মন্দ হবে না।" আশুবাবু সেটা বার দুত্তিন পড়ে দেখে বললেন—"হ্যাঁ, যদি লাগে ত এটা ভালোই হবে মনে হয়।"

"তা হোলে আজকেই দিন একখানা চিঠি ছেড়ে।"

চিঠি ছাড়া হোল।

যথাসময়ে তার জবাবও এসে গেল।

আবার সবিস্তারে চিঠি দেওয়া হোল এবং সবিস্তারে আবার তার জবাবও এল। তারপর উভয়পক্ষের দেখা-দেখি, পছন্দ, লেন-দেন ইত্যাদির কথা সবই নির্ঝঞ্ঝাটে এবং আশানুরূপভাবেই সম্পন্ন হোল এবং পাকা-দেখাও হোয়ে গেল। শুভকর্মের দিনও স্থির হোয়ে গেছে। ১৭ই আষাঢ়।

পাত্রপক্ষের খুবই ইচ্ছা ছিল, শুভ কাজ যাতে আরো সত্বর সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই, কিন্তু রাধারাণী পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বোলে, এ মাসে এ'রা রাজী হননি। যাই হোক, বিশেষ কোনও অনিবার্য দৈব ব্যাঘাত না ঘটলে ওই দিনেই রাধার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বিবাহ-কার্য সু-সম্পন্ন হবে। ঐ দিনটিতেই জাহ্নবী দেবী তাঁর এতদিনকার অহোরাত্রের চিন্তা সমুদ্র থেকে কূলে উঠবেন। এই রকমই হয়। শংকরের মা যে একদিন তাঁকে বোলেছিলেন—'বিয়ের ফুল যখন ফুটবে, তখন কোথা দিয়ে যে কি হবে, তা জানতেও পারবে না'—সে কথা এখন বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্চে। তাঁর আরও একটা কথা সত্য হোয়ে দেখা দিতে যাচ্চে। 'দেখে নিস্, তোর মেয়ের বরাতে ভালো বরই জুটবে,—সতী লক্ষ্মীর মুখের এ কথাটাও সত্য হোতে চলেচে। যেহেতু সুহাস আদর্শ পাত্র। যেমন সৎ তেমনি শান্ত ও ভদ্র আর তেমনি তার আদর্শ নীতিজ্ঞান ও স্বধর্মে আস্থা। সুহাসের মা নেই, বাপ আছেন, তিনি মহাশয় ব্যক্তি। সুহাস 'পুষ্পাল এন্ড কোং'র ভালো মেক্যানিক; মাহিনা প্রায় তিনশোর কাছাকাছি।

শংকরের মা একদিন জাহ্নবী দেবীকে বললেন—"কেমন? যা বলেছিলুম, ঠিক তাই ফললো ত?"

জাহ্নবী দেবী বললেন—"সতী লক্ষ্মীর মুখের কথা, ফলবেই ত দিদি।"

শংকর বললে—"খুড়ীমা, আমি বোলেছিলুম না যে, রাধুর বিয়ে ভালো জায়গাতেই হবে?"

আনন্দে জাহ্নবী দেবীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো।

* * *

সতরই আষাঢ়।

ক'দিন আগে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ নেমেছিলো, কিন্তু কাল থেকে আকাশ পরিষ্কার হোয়ে গেছে। তিন-চার দিনের ধারা-স্নানের পর প্রকৃতি শুদ্ধ সবুজ শাড়ী পোরে যেন হাসচে, আর তার সেই স্নিগ্ধ হাসি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়চে।

বিয়ের লগ্ন আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পর। ঐ একটা মাত্রই লগ্ন। সকাল থেকেই এ বাড়ীতে হৈ-চৈ সুরু হোয়েচে।

"আশুবাবু, আশুবাবু! কোথায় আপনি?"

"অ-রাধু, কোথা গেলি [illegible]"

"অ-দিদি! হাই-আমলা কোথায় রেখেছ?"

"আরে, শংকর গেল কোথা?"

"মোনা-ধ্বনি ভাসাতে হবে যে গো!"

সোর-গোলের আর শেষ নেই। শংকরের মা আজ সকাল থেকেই এ বাড়ীতে। জাহ্নবী দেবীর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনও শেষ হোয়ে সন্ধ্যা হোল। সকলের চলা-ফেরা, হাঁক-ডাক, কর্ম-ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ বাইরে থেকে কে বলে উঠলো—

"শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও, বর এসেচে।"

শংকর হাত-ঘড়িটা দেখলো—পৌনে আটটা। সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে তিনটে শাঁখ ক্রমাগতই বাজতে লাগলো।

সামনের বাড়ীর বৈঠকখানাতে বরের বসবার বন্দোবস্ত করা হোয়েছিল। বরপক্ষ থেকে বোলেছিলো—'এই দুর্মূল্যের বাজারে বরযাত্রী একটিকেও নিয়ে যাওয়া হবে না, শুধু বর, বরের বাবা, পুরোহিত মশাই আর একজন নরসুন্দর।' সুতরাং শুধু এই চারজনই ট্যাক্সি থেকে নামলেন।

শংকর খোরা-ঘুরির মধ্যে মাঝে মাঝেই হাত-ঘড়িটা দেখছে—আটটা, স'আটটা, সাড়ে আটটা...........

বাড়ীর মধ্যকার অল্প পরিসর উঠানটুকুতেই বিয়ের স্থান করা হয়েছিল। এ-পক্ষের পুরোহিত মশাই—আশুবাবুকে বললেন,— "লগ্ন হোয়েচে, বর-কনেকে এইবার পিঁড়িতে এনে দাঁড় করান।"

আশুবাবু বরকে হাত ধরে তুলে আনতে গেলেন।

ঠিক সেই সময় বাইরে একটা মহা হৈ-চৈ আর গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোল। ভেতর থেকে অনেকে ছুটে বাইরের দিকে গেল। সেখানে ভীষণ একটা গোলমাল। রাস্তার ওপর ভীড় জমে গেছে। একটি ২৩।২৪ বছরের যুবতী, খুব উচ্চ কণ্ঠে বরের উদ্দেশে নানারূপ কটু কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে। তার কোলে একটি বছর দুইয়ের শিশু। আর একটি বৃদ্ধ লোক, সম্ভবতঃ যুবতীর পিতা, তিনিও বরকে খুব গালি-গালাজ দিচ্ছেন। সে এক মহা কেলেঙ্কারী কাণ্ড! বর এদিকে একেবারেই উধাও। বরের বাবা, পুরুত ঠাকুর ও নাপিত ভায়াকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যুবতীটি ও বৃদ্ধ মহা উত্তেজিত হয়ে অশ্রাব্য ও অভদ্র উক্তি করে চলেচে। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে সেই সব কেচ্ছা শুনেচে। বৃদ্ধ ও যুবতীটি বরের সম্পর্কে যে কেলেঙ্কারীর রামায়ণ গান গাইলেন, তার সংক্ষিপ্ত ও সারমর্মটি এই:—

বরের আসল নাম যুধিষ্ঠির পোড়েল। আমতার ঐদিকে দেশ। দেশে বুড়ো বাপ ও প্রথম পক্ষের স্ত্রী আছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, ২০ বছর বয়েসে কোলকাতা চলে আসে ও একটা বিলিতী ফার্মে ভালো 'লেদ'-এর কাজ শেখে। সেখান থেকে বছর ৩।৪ পরে সুহাস চক্রবর্তী—এই নামে পরিচয় দিয়ে লোকটা 'পায়োন কোম্পানী'তে মেসিন-সপ-এর কাজে বহাল হয়। প'চ বছর ওখানে কাজ করছে। বছর চার আগে, এই বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়ে, তাঁর এই মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের বছর দুই পরে একটি মেয়ে হয়। তখন থেকে এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার আর নির্যাতন চালাতে থাকে। সহ্য করতে না পেরে বৌটি কোলের মেয়েটিকে নিয়ে, দরিদ্র বাপের কাছে চলে আসে। আজ যে লোকটা বাপ বলে বরের সঙ্গে এসেচে, ও ওর বাপ নয়; ও একটা মস্ত মাতাল ও জুয়াড়ী। তবে ওর স্বামীর চাকরীটা সত্য, আর যা মাইনে পায়, তা'ও সত্য; কিন্তু মদ আর জুয়ায় সব নষ্ট করে.........ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব ব্যাপার দেখে আর শুনে আশুবাবু আর জাহ্নবী দেবীর মনের অবস্থা যে কি হোল তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে এতক্ষণ আনন্দ-কোলাহল আর হৈ-চৈ চলছিলো, সেখানে সহসা গভীর দুঃখের কালো ছায়া নেমে এসে, সমস্ত আনন্দ উৎসবকে নিঃঝুম ও নিস্তব্ধতার নিষ্ঠুর আবরণ দিয়ে ঢেকে দিলে। আশুবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ একধারে চুপ কোরে বসে রইলেন, তারপর মাতালের মত টলতে টলতে বিছানার ওপর গিয়ে উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়লেন। আর জাহ্নবী দেবী মেয়ের কথা ভেবে প্রথমটায় চীৎকার করে কিছুক্ষণ কান্না-কাটি করবার পর, এখন দালানের এক কোণায় পিঠ হেলান দিয়ে নির্বাক অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর আর কোনও সাড়া নেই, চোখে এক ফোঁটা জলও নেই; তিনি জীবিত কি মৃত, তাও বোঝবার উপায় নেই।

আর রাধারাণী? সে সেই উঠানের পিঁড়িতে চেলীর কাপড় পরে, বধূবেশে, সেইভাবেই বসে আছে। মনে হয়, সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টা হোয়ে গেছে, একটু ছোঁয়া লাগলেই বুঝি তার প্রাণহীন দেহ সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে লুটিয়ে পড়বে!

সামনের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে পাড়ার সকলে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও শলা পরামর্শ করছিলেন। জয়ন্তবাবু বললেন,—"আমাদের রাধুটার এখন গতি কি হবে? এ ত ভয়ানক কাণ্ড হোল! এক কাজ কর শংকর, এখনি তুমি তুলসীবাবুকে গিয়ে ধরে বোস। তিনি মেয়েটার জাত রক্ষা করুন। ওঁর মেঝ ছেলে অমরের সঙ্গে......

হেমন্ত বললেন, "তা একবার গিয়ে বলে দেখতে পার, কিন্তু তুলসীবাবু যেরকম পয়সা-পিশাচ লোক, তাতে...তুমি বরং শৈলদাকে গিয়ে ধরে বসো। তোমার চেয়ে ভবানী বললে আরো ভাল হয়; তাই না হয় যাও ভবানী। শৈলর কাকাকে একটু ভালো করে... ..."

শংকর ও ভবানী তখনি চলে গেল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে দুজনেই বিফল হয়ে ফিরে এল।

কালিদাসবাবু বললেন,—"এই বরটার ব্যাপারে কিন্তু পুলিশে একটা রিপোর্ট দেওয়া দরকার। এ রকম জোচ্চোর, পাষণ্ড........"

সকলে মিলে নানা রকম আলোচনা ও পরামর্শ করতে লাগলেন। নীহারবাবু বললেন,—"কিন্তু বউটি আর তাঁর বাবা যা বল্লেন, ঘটনা আর সময় সম্বন্ধে যেন একটু-অ-ধটু অমিল মনে হচ্ছে।" বেহারীবাবু বললেন,—"আরে, একে মেয়েছেলে, তার ওপর বিষম উত্তেজিত হোয়েই এসেছে, আর বাপটিত একেবারে বৃদ্ধ। ভেঙে পড়েছেন, সব গুছিয়ে, হিসেব করে কি বলতে পারে? মোট কথা, এই লোকটা একটা ঘোর পাষণ্ড, অত্যাচারী। সমাজে এ রকম লোক ......শংকর কোথা গেল? ডাকো ত একবার। পুলিশে লোকটার সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দেওয়া খুবই দরকার; শংকর! শংকর!"

"শংকর! ও শংকর!"

কিন্তু কোথায় শংকর? পুলিশে রিপোর্ট দিতেই গেছে না কি? রিপোর্টটা পরে দিলেও চলতো; এখন এই অবস্থায় রাধুর কি ব্যবস্থা হবে, সেইটাই সব চেয়ে বড় কথা আর আগের কথা। কি উপায় করা যায়! সবাই চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন।

সহসা বাড়ীর মধ্যে ঘন-ঘন শাঁখের শব্দে সচকিত হোয়ে উঠে—, সকলে বাড়ীর মধ্যে ছুটে এলেন।

এসে দেখলেন, ও বাড়ীর নীলুর দিদি রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে; জাহ্নবী দেবীর মরা দেহে আবার নতুন করে প্রাণের সাড়া জেগেছে, তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেচে; শংকরের মা গাছকোমর বেঁধে আবার চারদিকে ছুটো-ছুটি সুরু করেছেন। এদিকে ছাঁদনাতলায় বরের পিঁড়িতে, চেলীর জোড় পরে, বরবেশে দাঁড়িয়ে—শংকর, আর তার পাশের পিঁড়িতে রাধা; রাধার এখনকার মুখ-খানি খুসী ও তৃপ্তিতে টল-টল করছে, ঠিক যেন আঁধার রাতের বৃষ্টি-ভেজা পদ্মের ওপর হঠাৎ আলোর ঝলমলানী!

রোম? —নীরো?

*** হরপদ চট্টোপাধ্যায় ***

অগ্নির লোল-জিহ্বা যখন গ্রাস করছিল
অসহায় রোমকদের শেষের আশ্রয়,
রোমের নিশীথ যখন ধ্বনিত হচ্ছিল
দগ্ধ জনতার বীভৎস চিৎকারে,
আর সে দৃশ্য উপভোগের পৈশাচিক আমেজে
বীণার লয় মিলিয়েছিল যখন নীরো—
সেদিন আমি হেসেছিলাম।
দগ্ধ দেহের পূতি গন্ধের পথ বেয়ে
নেমে এসেছিল রোমের ধ্বংস যেদিন,
সেদিনও হেসেছি।
এ হাসির সাথে ও হাসির যোগ ছিল।
আজও লেগেছে আগুন মহামানবের সাগরতীরে।
পঞ্চাশ হাজার বছরের তালিমে
সভ্য-হওয়া মানুষের হাতে হাতে
ছড়াচ্ছে সে আগুনের কণা।
অসহায় প্রবাসীর রক্তের ধারায়,
শংকিত নারীত্বের বিস্রস্ত ইন্ধনে,
অক্ষম বৃদ্ধের, অবোধ শিশুর বলির মূল্যে,
সে আগুন উঠছে লেলিহান হয়ে।
মানবতাবাদের লজ্জাহীন ভণ্ডামির আড়ালে
মানুষের রক্তস্রোত উষ্ণ করে তুলেছে
পূর্বভারতীর সিক্ত অঞ্চল।
রক্তের আগুনে নিশীথের বুকে জেগেছে সুর;
আজকের নীরোর মনে লেগেছে
সেই সুরের আমেজ।
তন্দ্রালস চোখে বীণার লয় মেলাচ্ছে
আজকেরও নীরো।
কান্নায় ভরা চোখ। তবু হাসছি কেন?
এ হাসির সাথেও কি যোগ থাকবে
ভবিষ্যতের কোনো একদিনের
ক্ষমাহীন ক্রুর হাসির?

একটি সন্ধ্যা
শ্রীকৃষ্ণধন দে

একটি সজল সন্ধ্যা ঘন-মেঘ-বর্ষণের পরে,
একটি মদির সন্ধ্যা রূপজীবা প্রতীক্ষাকাতরা,
একটি তরুণী সন্ধ্যা তৃণগন্ধ সলজ্জ অধরে,
একটি অধীরা সন্ধ্যা বিহগের কূজন-মুখরা।

একটি রূপসী সন্ধ্যা বাঁকা চাঁদ বেঁধেছে কুন্তলে
একটি বিবশা সন্ধ্যা রজনীগন্ধার বাহুপাশে,
একটি অলস সন্ধ্যা ঢাকে তনু শিথিল অঞ্চলে,
একটি নিরালা সন্ধ্যা শিহরিছে পূবালী বাতাসে।

একটি স্বপ্নালু সন্ধ্যা অতীতের স্মৃতি চায় ফিরে
একটি চটুলা সন্ধ্যা ঝিল্লীর নূপুর বাজে পায়ে,
একটি মোহিনী সন্ধ্যা মুগ্ধ করে কোন তপস্বীরে,
একটি মধুরা সন্ধ্যা দাঁড়ায়েছে কানন-প্রচ্ছায়ে।
একটি নবোঢ়া সন্ধ্যা ঢাকে মুখ ছায়াবগুণ্ঠনে,
একটি নিঃসীম সন্ধ্যা নেমে আসে কবির নয়নে।

কি যে পাই, কি হারাই
চিত্তরঞ্জন পাল

কি যে পাই, কি হারাই—বেঁচে থাকা
যেন বিড়ম্বনা;
মরশুমী ফুলের মত ক্ষণে ফুটে অগোচরে ঝরা।
শংকিত অন্তরে যার প্রান্তরে হাহাকার ভরা
খররৌদ্রে মেশে তার ক্ষণিকের ছায়ার সান্ত্বনা।
প্রেম যেন মরূদ্যান বঙ্কিমান সাহারার বুকে;
চুমুকে তৃষ্ণাই বাড়ে—কী পিপাসা পথিকের প্রাণে।
নিরন্ন পেটের ক্ষুধা মেটে না তো খাবারের ঘ্রাণে
বসন্তের ভালবাসা ভয় পায় শীতের অসুখে।
রঙীন স্বপ্নের পটে পলে পলে বিচিত্র বাহার—
ধন-মান, গান-সুর, বাড়ি-গাড়ী শিরোপা ও নারী
ব্যর্থতার অংকপাতে হিসাবের খাতা ক্রমে ভারী—
আকাঙ্ক্ষার কাঁচ মুখে অপ্রতুল কৃপণ আহার॥
বাসনার সব আংগুর নিঙড়ে নিয়ে প্রস্তুত নির্যাস
পান করি সাধ্য নেই। ধূ-ধূ মাঠে পীতবর্ণ ঘাস।

॥ উত্তরণ ॥
শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়

বলার অনেক কথা ছিল
ইচ্ছার সাঁকোয় তারা পা দিয়ে দাঁড়ায়।
শুধুই গর্জালো আর বিদ্যুৎ চমক দিয়ে
যে মেঘটা সরে গেল
তার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রশ্ন করি
এ কি হলো?
আকাশের নিঃস্তব্ধতা পাঠাল উত্তর।
তবুও অবাক নই।
অরণ্যের অন্ধকারে ছদ্মবেশ কি হবে লুকিয়ে?
নিরন্ধ্র ও পথ নয়।
লম্পটের কাল হাতে যে ইচ্ছা
রোজ রাতে সমুদ্রের জোয়ার এনেছে—
অগাধ নীলের মত শান্ত হয়ে যাক,
তার পর পায়ে পায়ে
ভাঙ্গা সাঁকো পার হয়ে যাবো।

হাজার বছর পরে
শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

হাজার বছর ধরে চলিতেছি পথ একা
আনমনে পৃথিবীর বুকে,
শ্রান্তিহীন ক্লান্তি মাঝে চিরন্তন এক পথে
দিশাহারা বছরের পর,
পুরানো অজানা পথ সাথী মোর নিশিদিন
জীবনের নিত্য সুখে-দুখে।
দুর্গম উত্তুংগ গিরি, সমুদ্র মেখলা ধরা,
মরুভূমি দিগন্ত উষর,
কত চাঁদ, কত তারা হারায়েছে পথ কোথা কত
দেশ হয়েছে বিলীন,
নূতন জগতে কত পুরাতন মাঝে অবিচল
স্মৃতি নূতন ভাস্বর,
নবোদিত অরুণের রাগরক্ত রেখা নিখিলের
বুকে চির নিদ্রাহীন,
উন্মত্ত সিন্ধুর ঢেউ আকুল আবেগে ভেসে
যায় কোথা যুগ-যুগান্তর।
ধূসর ধরণী মাঝে ভাঙ্গা-গড়া হেরি নিতি
দেশ জাতি বিদগ্ধ সমাজ
অগণন রাহী চলে রহস্যের যবনিকা তীরে
হেরি শুধু নিরন্তর,
পৃথিবীর রাজপথে হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব কেন,,
অতীতের প্রেত ভূমি আজ,
শতাব্দীর সঙ্গীতের মূর্ছনায় জেগে ওঠে
রোগ, শোক, মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
হাজার বছর পরে সেই আমি নিত্য অভিযান,
চিরশাশ্বত অমর,
চলেছে অনাদিকাল অনন্ত সঙ্গীতে চন্দ্র,
সূর্য, তারা বিশ্ব চরাচর।

প্রেমের চতুর্দশ পদাবলী
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ফুল-ফল বিস্ফারিত সিক্তপত্র মেঘল নয়ন
কোমল স্পন্দনে বন্ধ শতনদী সমুদ্র শয়ন,
রৌদ্রের সম্ভাব্য স্পর্শ নীলবন হরিৎ মেখলা
রক্ত-মাংস রক্তবাহী চমকিত আকাঙ্ক্ষা চঞ্চলা।

প্রেমের সংক্ষিপ্তকাল কলধ্বনি প্রত্যূষ সন্ধ্যায়
সবুজসতৃষ্ণতপ্ত দুটি চোখ রাত্রিদিন ধায়,
আবর্তের প্রতিপাকে ক্রমে ক্রমে সে অন্তঃ
সলিলা
ঈপ্সিতনিভৃত স্বাদেচমকিত মেঘরৌদ্রলীলা।

বিস্ফারিত বিচ্ছুরিত চৈতন্যের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস
বিষণ্ন মেঘল চোখে সেই চোখ ক্রমেই সুহাস,
আর কেন সুহাসিনী, পৃথিবীর বিহ্বলনিদ্রায়
কটক ও মুদ্রা ভঙ্গ সাঙ্গ দিবা ক্ষীণতনুকায়।

ফুল-ফল বিস্ফারিত সিক্তপত্র পূর্ণতার ধ্যান
কোমল স্পন্দনে তোল হে ঈশ্বরী সমুদ্রের
গান।

দিন-লিপি
প্রভাকর মাঝি

পুরাতন দিন-লিপি। পাতা উল্টাই।
যে জীবন পলাতক, তাকে খুঁজে পাই।
সেই ঝরো ঝরো দিন, মধুমতী নদী,
(আহা, ফের সে জীবন ফিরে পাই যদি!)
কত রৌদ্রের রঙ, এলোমেলো ঝড়,
এ মনের ক্যানভাসে কাটলো আঁচড়।
কত দুরাশার ডাকে ছুটে যেতে হয়,
দপ্ দপ্ জ্বলে তবু জোনাকি-হৃদয়।
সব আছে—কিছু নয় হারাবার ধন,
হারিয়েছে শুধু সেই মায়াবী জীবন।
সময়ের যাদুঘরে, কালের নিয়মে
ভেবেছি যাদের, মমি হয়ে যাবে ক্রমে।
দিন-লিপি খুলতেই আজ দেখি ,সবে
চুপি চুপি আসে কেউ, কেউ কলরবে।
বোবা অক্ষরগুলি কথা কয়ে উঠেঃ
এবং যে বেদুইন পথে পথে ছুটে,
একটু সময় সে-ও থমকে দাঁড়ায়।
স্মৃতির শেফালি ঝরে হাল্কা হাওয়ায়!

কত দিন কত রাত কত কাল
লাবণ্য পালিত

কত দিন...কত রাত...কত কাল...
ভাঙা মন নেই কোন আশ্বাস,
কত কথা কত সুর...কত তাল...
শুধু বুঝি ব্যথিতের নিঃশ্বাস।

অনিমেষ চেয়ে থাকা জল-চোখ
বুজে আসে ভ্রূকুটির আঘাতেই......
কান্নার পথে ফেরে বৃথা শোক
বিদ্রূপ করে যায় আমাকেই...।
তবু আছে বাসনার হাহাকার...,
কত আশা গড়ে ওঠা জীবনের!
সমুখের পথ ধূলি-ঝঞ্ঝার...
দূরে থেকে শ্বাস শুনি প্লাবনের।
মুক্তির গান খুঁজি, অসহায়
মনটাকে বেঁধে রাখে দৃঢ় জাল...,
সমুখের সর্পিল পথটায়
চলি কত রাত...কত কাল...!

ঝরা শিউলি
হিরন্ময়ী বসু

ঝরে পড়া শিউলির দল
ধূলির অঙ্গনে তার বিছায় আঁচল।
সুরভি তাহার তবু হয় না যে শেষ
দিনান্তের শেষক্ষণে রেখে যায় রেশ।

ঝরে পড়া শিউলির জল
অপরাহ্ন তপনের দাহে চঞ্চল,
ধূলি মেখে করেছে সে স্নান
তবুও শুভ্রতা তার রয়েছে অম্লান।

মহিলা ইন্-চার্জ

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সবাই ঘটা করে বাঁশী বাজিয়ে ও'র গোঁফজোড়া কামিয়ে দিলাম। তারপর থেকে ও দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের বিভাগের কাজ আরম্ভ করে দিল। সত্যিকারের আনন্দ ও পেত স্ত্রীলোকঘটিত কেসগুলোর নিষ্পত্তি করতে পেরে। নিষ্পত্তি করবার পদ্ধতিও ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। পুরুষ ও স্ত্রী দুটোকেই প্রথমে এক দফা বেশ করে চাবকে, তারপর আদপাক কথাবার্তা আরম্ভ করত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গরমিলের কেস হলে প্রাথমিক প্রহারের পর দুইজনকে একসঙ্গে ঘরে বন্ধ করে রাখত। দুইজনেই বলবে মিল হয়ে গিয়েছে, তবে দরজা খোলা হবে। মামলা নিষ্পত্তির এইসব পদ্ধতিকে আমরা বলতাম 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' পদ্ধতি। তবে সাধারণ হালকা অপরাধে, অপরাধিনীর কান ধরে ভুঁড়িতে ঢেউ খেলিয়ে হেসে বিদ্রূপ বাণ ছাড়তেই দেখা গিয়েছে কাজ হ'ত—বিশেষ করে 'মেলা-ডিউটি'তে রূপাজীবাদের মধ্যে।

'তা এখন নীলজানি টি এস্টেটের মহিলা-ইন-চার্জ চলেছেন কোথায়?'

'এরা বাড়ী ফেরবার সময় প্রত্যেক বছরই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মহিলা-ইন-চার্জ কি যে সে লোক—মহামান্য অতিথি। এদের আবার ভালয় ভালয় চা-বাগানে নিয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলে, সাহেব কিছু কিছু দেয় আমাকে।'

আবার সেই হাসি।

'কতরকমেরই যে কাজ আছে শ্রমিক-সেবার মধ্যে।'

'হ্যাঁ—সব সেবার মধ্যেই।'

এক মিনিটের জন্যও সে হাসি থামায়নি।

'মনে আছে নাটোয়ার লাল, সেই যে......'

'আপনি সর দুধ খুব খান বুঝি?'

'না। হঠাৎ ওকথা মনে পড়ল কেন?'

'আপনার গোঁফ-জোড়া দেখে। সর-ঘি না লাগলে তো অমন তেল কুচকুচে গোঁফ হয় না।'

'কোত্থেকে পাব দুধ? বিনা পয়সায় জুটলে তবে আমরা খেতে পারি। সে পেতে তুমি।'

সে যুগে অফিসের হোটেলে ঠাকুরের সঙ্গে 'কন্ট্রাক্ট' ছিল—ভাত, ডাল, আর দুটো তরকারির। একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিল নাটোয়ার লাল। কাঞ্চী গয়লানী তাকে এক পোয়া করে দুধ দিয়ে যেত। এই দুধ দেওয়া-নেওয়া নিয়ে প্রত্যহ একটা অভিনয় চলত। কাঞ্চী প্রত্যহ দামের জন্য তাগিদ করত; আর নাটোয়ার দুধের দাম হিসাবে গয়লানীর কলসীর মধ্যে এক পোয়া জল ঢেলে দিতে চাইত। এই নিয়ে প্রত্যহ এক দফা রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাঁটির পালা চলত। কোন রকমের গালা-গালি বাদ পড়ত না। নাটোয়ার কাঞ্চীর কান ধরে টানত আর হাতের উপরটা খামচে ধরত। কাঞ্চী হয় খাবল মেরে ধরত ওর ভুঁড়িটা, নয় সেটাকে দু হাত দিয়ে বেশ করে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিত, মন্থের পোনার হাঁড়ির মত করে। পরের দিনও আবার যথাসময়ে সে দুধ নিয়ে এসে ডাকত—কোথায় নাটোয়ার লাল!'

আমরা হিংসেয় ফেটে মরতাম।

'কাঞ্চী গয়লানী বেঁচে আছে এখনও?'

এই প্রথম নাটোয়ারের হাসি থেমেছে। একটু যেন আনমনা হয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ। সে এখন বুড়ি থুড়থুড়ী হয়ে পড়েছে। আর পারে না, বাড়ী বাড়ী দুধ দিতে যেতে। কখনো দেখা হলে আজও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। তার ওখানেই তো তোমার স্ত্রী আর...'

সে হঠাৎ লোটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল আমার কথা শেষ হবার আগেই। লোক ডিঙিয়ে, ঠেলাঠেলি করে, সে গিয়ে পৌঁছেছে বাথরুমের কাছে। বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বিরক্তির ছাপ পড়েছে তার চোখ-মুখে। ট্রেণের গতি কমেছে। একটা ছোট ষ্টেশন এসে গেল। নাটোয়ার গাড়ী থেকে নেমে পড়ল লোটা নিয়ে। গাড়ী শুদ্ধ সকলের নজর তার উপর। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তার দেখছে। ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা দিল। অন্য কামরায় ওঠবার চেষ্টা করছে নাটোয়ার লাল। ভিড়। পাদানেও লোক রয়েছে দাঁড়িয়ে। প্রতি কামরায় সে বোধহয় উঠতে চেষ্টা করল। হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে সাঁওতাল পুরুষরা। মেয়েদের মধ্যে অনেকে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। লোটা শুদ্ধ হাত তুলে কি যেন ইশারা করছে নাটোয়ার লাল। বোধহয় বলছে, ভাবিস না—আমি পরের গাড়ীতে আসছি।

আর কেউ বুঝতে পারেনি। আমি জানি যে সে ইচ্ছা করেই এ ট্রেণে গেল না। তার লোটা নিয়ে ওঠবার মুহূর্তেই, আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সে আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না। দেখা হবার প্রথম থেকে, আমি যতবার আমাদের ওখানকার কথা পাড়তে চেয়েছি, ততবার সে কথা পাল্টাতে চেষ্টা করেছে।

জীবনে মাত্র একদিন আমি তাকে চটিয়ে দিয়েছিলাম। সেইদিনকার কথাটাই ও এড়িয়ে যেতে চায়।

......তখন মহিলা-ইন-চার্জ নিজের পসার-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে ওভার কোট পরে ছড়ি নিয়ে নিজের রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অফিসের কাছের রাজ-মিস্ত্রী টোলার কয়েকজন স্ত্রীলোক মহিলা-ইন-চার্জ'এর ভুঁড়িতে চিমটি কেটে একদিন নালিশ জানাল যে পুলিশ কনষ্টেবলরা রাত্রিতে টহল দিতে বেরিয়ে অমুক মিস্ত্রীর বাড়ীতে আড্ডা গাড়ছে কয়েকদিন থেকে। দ্বারভাঙ্গা থেকে নতুন এসে ও মিস্ত্রী এখানে ঘর তুলেছে দিন কয়েক আগে। সামাজিক নিয়ম মানে না-পাড়ার আদব-কায়দা জানে না; বললেও গায়ে মাখে না। কোথা থেকে একটা মেয়ে মানুষকে নিয়ে এসেছে তিনচার দিন হল। বলে তো যে তাকে বিয়ে করবে। ওখানে পুলিশদের রাতের আড্ডা ওই জন্যই। তোর মত দারোগা পাড়ায় থাকতে, পাড়া-পড়শীর এই হাল হবে নাটোয়ার? মান-ইজ্জত তো আর থাকে না!

শুনেই খেপে উঠেছে মহিলা-ইন-চার্জ। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! তার নাকের উপর এই কাণ্ড! পাড়ার মধ্যে এত বড় বেয়াদবি সহ্য করবার পাত্র নাটোয়ার লাল নয়। এখনই যা। ধরে নিয়ে আয়! দুটোকেই একসঙ্গে! আজ ওদের হাড় আর মাস আলাদা করব। ভাবে কি ওরা!

ধরে আনতে বলায় ওরা সত্যিই কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনল। এমনিতে নাকি আসছিল না। কানুন ছাঁট ছিল দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রী। বলে নাটোয়ার লাল ডাকবার কে? ও কি দারোগা? দেখ এইবার! দারোগা না দারোগার বাপ! পুলিশ চৌকিদাররা ওর বাড়ীতে রাত কাটায় কিনা, তাই এত বুকের পাটা!......

তুমুল কোলাহলের মধ্যে রাজমিস্ত্রী টোলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শোভাযাত্রা অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে আসে। যেন রাজ্য জয় করে ফিরছে। মেয়ে আসামীটির মাথায় লম্বা ঘোমটা টানা।

অফিস বারান্দায় উঠতেই ছড়ি নিয়ে গালা-গালি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'এর জন্য।

কিন্তু এ কি? হঠাৎ অবগুণ্ঠনবতীর ঘোমটা ফাঁক হয়েছে। ওদের শ্রেণীর মান অনুযায়ী দেখতে সুশ্রী মেয়েমানুষটি।

থমকে দাঁড়িয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ।

প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটবার পর, এতক্ষণে মুখ খুলল স্ত্রীলোকটির।

......'মরদ! ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোসাঁই! গোঁফ কামিয়ে দারোগার বিবি হয়ে বসে আছেন চেয়ারে! এখানে পুলিশের উর্দি পরে ছড়ি হাতে করে নবাবীন ফলাস, তবে বিয়ে করা বউ-এর কাছে সাত বছরের মধ্যে যাস না কেন?......

বন্যার স্রোতের মত গালির স্রোত বইছে। কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিখুঁত অঙ্গ-ভঙ্গীরও বিরাম নাই। কেউ তাকে থামতে বলছে না। 'মহিলা-ইন-চার্জ' এর সম্বন্ধে সুনিপুণভাবে সাজানো, নূতন নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ গালিগুলো কৌতূহলী শ্রোতার দল গিলছে। কখন থেকে যেন এদের মনে হচ্ছে আরম্ভ হয়েছে যে, মেয়েমানুষটা যা বলছে সব সত্যি। সত্যি না হলে এত ঝাঁজ! জানে তো তারা। যতই চোখা হ'ক মিথ্যা গালিমন্দতে এ ধক থাকে না। চোখমুখে দেখ না! শুধু কি মেয়ে মানুষটার মুখ-চোখ—যার বিরুদ্ধে বলছে তার চেহারা দেখ না, কি হয়ে গিয়েছে! তাকাতে পারছে না কারও দিকে নাটোয়ার লাল। ও কি মিছে গালাগাল সইবার লোক! মিথ্যা হলে এতক্ষণে টেনে জিভ ছিঁড়ে ফেলে দিত মেয়েমানুষটার। নাটোয়ার লালের স্বভাব যে এ রকম, সে কথা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি! এত ভড়ং, এত শাসন সে সব কি শুধু আমার জন? নিজের জন্য অন্য নিয়ম? বিয়ে করা স্ত্রীর খোঁজ নেয় না সাত বছরের মধ্যে! আর এই মেয়েমানুষটা ওর বিয়ে করা স্ত্রী! বেচারীর কি দোষ!...... আর এই নাটোয়ার লালকেই আবার এঁরা মেয়েমানুষদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়েছেন।

মন যত নাটোয়ারের উপর বিরূপ হয়, ততই এই স্ত্রীলোকটির উপর সকলের সহানুভূতি বাড়ে। নিজেদের অজানতে কখন থেকে যেন মিস্ত্রীটোলার লোকেরা এই স্ত্রীলোকটির পক্ষ নিতে আরম্ভ করেছে। একজন এগিয়ে

গিয়ে তার কোমরের দড়ি খুলে দিল। অন্য সকলে লজ্জিত হল—এতক্ষণ তাদের কারও একথা মনে পড়েনি ভেবে।

ক্রমেই দেখা গেল দর্শকরা আমাদেরও ছেড়ে কথা বলছে না। কে জানে এই সব মহাত্মাদের মধ্যে কে কি মূর্তি!......পাবলিকের পয়সায় ফুটানি ছাটে সব!......

আমরা তখন পালাতে পারলে বাঁচি। মামলা নিষ্পত্তির ভার উপস্থিত দর্শকরা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে তৎক্ষণে। দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রীর অপরাধ অতি তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের চোখে। স্ত্রীর বিচ্যুতির সমস্ত দোষ নাটোয়ার লালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে এরা। মেয়েরাই খেপে উঠেছে বেশী। সামাজিক দায়িত্ববোধও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। একটা কিছু এর বিহিত করতেই হয়!

হ্যাঁ, এখনই! মুহূর্তের দেরী করবার ধৈর্য নাই কারও এখন। মহিলা-ইন-চার্জ এর নিজের নিয়ম অনুযায়ী তাকে এখন চাবকানো উচিত, কিন্তু এই গরম-গরমির বাজারেও তাকে মারধর করতে বাধে। যদিও এই নীচ স্বার্থপর লোকটা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তঞ্চকতা করে এসেছে এতদিন। এতগুলি মন নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ না করেও একই সময়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কেমনভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে। এখানকার কর্ম প্রণালী সকলেরই জানা।

মহিলা-ইন-চার্জ আর তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে অফিসের একটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল তারা। চাবি রেখে দিল তাদের নিজেদের কাছে। যখন দুইজনে মিলে বলবে যে তারা একসঙ্গে ঘর করবে ভবিষ্যতে তখন খোলা হবে দরজা। যদি বলে, তাহলে মিস্ত্রীটোলার লোকেরা ওদের নতুনভাবে থাকবার জন্য চালা তুলে দিতে রাজী আছে। এখন বাছাধন মহিলা-ইন-চার্জ থাকুন বিয়েকরা বউ-এর উপর এই তালাবন্ধ ঘরে!

একজন টিন বাজিয়ে ঘোষণা করে দিল যে মহিলা-ইন-চার্জের অফিস এখন থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। আর এই ঘরের আনাচে কানাচে কোন লোক ঘোরাঘুরি করলে, দরজায় আড়ি পাতলে বা জানলা দিয়ে উঁকি মারলে মিস্ত্রীটোলার দণ্ডবিধি অনুযায়ী কঠোরভাবে দণ্ডিত হবে। ......প্যারে ভাইয়ো! সাবধান!......

দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রী এই গোলমালে কখন সরে পড়েছে সেদিকে কারও খেয়াল নাই।

পরের দিন সকালে দেখা গেল জানলার কাঠের গরাদ ভেঙ্গে পালিয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ। সেই যে পালিয়েছিল, আর ওমুখো হয় নি।

তারপর আজ একুশ বছর পরে নাটোয়ারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা ট্রেণে।

ও ভয় করছিল যে আমি এই দিনকার কথা বুঝি তুলব। তাই পালাল।

ভুল ভেবেছিল। বেচারা যে নিজের গল্পের সবটা জানে না। কাঞ্চী গয়লানী ওর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল নিজের বাড়ীতে। তখনও ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা তুচ্ছ হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল। নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত আমরা বলেছি—"কাঞ্চী ভাল করে দেখতো মেয়ে-মানুষটার কান আছে কিনা; যা ঘোমটা দিয়ে থাকে!"

মাস কয়েক পর থেকে কাঞ্চী নাটোয়ারের স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে, কান্নাকাটি আরম্ভ করে আমাদের কাছে। কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ব্যাপারটা। দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রীই জেতে। আইনের চোখে সাব্যস্ত হয় যে, সদ্যোজাত শিশুটি, স্ত্রীলোকটির বিবাহিত স্বামীর।

এই ছেলেটির কথাই আমি তুলতে চেয়েছিলাম নাটোয়ারলালের কাছে।

জনকয়েক সাঁওতালনী কাঁদছে। পৃথিবী-সুদ্ধ মেয়েরা যার জন্য কাঁদে, সে নিজের স্ত্রীর মান পেল না কেন জানি না। সাঁওতাল পুরুষেরা আশ্বাস দিচ্ছে ক্রন্দনরতা মেয়েদের।

এই অবস্থাতেও আমার হিংসে হচ্ছে নাটোয়ারলালের উপর।

চরিত্র হীন

(৪১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এসে অবধি রাখাল মামার ডাক হাঁকই শুনেছি, ওঁর সঙ্গে 'সুশীলাদির কথা কওয়া শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম! গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তুমি যাবে বৈঠকখানায়?'

'হচ্ছে হচ্ছে, যাচ্ছিই তো।' বলে তাড়াতাড়ি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে আসেন রাখাল মামা।

ফিরতি পথে ট্রেণে বসে বললাম, 'মা এটা কি হলো?'

মার পিত্রালয় বিচ্ছেদে চিত্ত বিষণ্ণ, উদাস-ভাবে বলেন, 'কি আর হলো!'

'নীতুদাকে গিয়ে কি বলবে?"

'বলবো আবার কি', মা নিজের অভ্যাসে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, বলবো, 'কেন নড়বে রাখালদা দেশ থেকে? অত যত্ন, অত সেবা ত্রিভুবনে আর করবে কেউ ওর?'

'মা সুরটা যে উল্টো লাগছে?'

মা আরও উদাসভাবে বলেন, 'তা' কি করবো! সব সময় কি একসুরে বাজে।

'নীতুদা বললে তুমি ঘুস খেয়েছ।'

'ওঃ, বলবে তো আমি একেবারে ভয়ে মরে যাবো। কেন নীতু কি জজ? আমি চুরির আসামী? বলি ওই যে মেয়েমানুষটা অগাধ বুদ্ধি, অফুরন্ত গতর, আর অঢেল শক্তি নিয়ে চিরকালটা শুধু ভেসে ভেসে বেড়ালো, যার পরের সংসারের বেগার খেটে এল, এই মরণ-কালে একটা নিজের সংসার পেয়ে বর্তে গেছে সে। বেচারাকে সেইটুকুন থেকে উচ্ছেদ করে আবার ছন্নছাড়া করবো ভাবতে মায়া হয় না, কী পরিপাটির সংসার, কী গোছ, কী বাসন্দো, দেখলে চোখ জুড়োয়! কি করে মুখের ওপর বলবো, এ সংসারে তোমার অধিকার নেই, তুমি বিদেয় হও।'

'কিন্তু তোমাদের সমাজ?'

চুলোয় যাক! সমাজকে এখন কোন লোকটাই বা মানছে এখন?'

'আর পাপপুণ্য, ধর্ম-অধর্ম?'

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'দেখ নীতু, গিয়েছিলাম বটে হেড়েমেড়ে, কিন্তু ওদের দেখে মনে হলো পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা কি আমরা? যিনি মালিক, যিনি বিচারকর্তা, তিনিই সত্যাবিচার করবেন। আর ওই তোর রাখাল মামা! ওঁর যা স্বভাব, শুধু সেবা যত্নই নয়, সারাক্ষণ ওঁর খিটখিটেনি খাবার জন্যেও একটা লোকের দরকার। ছেলেরা পারবে? বৌরা পারবে? কেউ পারবে না। শুধু নাকি যে মানুষটা চিরটাকাল ওকেই প্রাণ ঢেলেছে—'

আবেগকে সংহত করে সহসা একটু চুপ করে যান মা।

আমি বলি, 'আমি কিন্তু বলেছি ওঁকে।'

'কী বলেছিস? কাকে কি বলেছিস?'

'ওই তোমার রাখাল দাদাকে। বললাম, এ বয়সে এভাবে এখানে একা থাকায় ছেলেরা খুব দুঃখিত, পাঁচজনে তাদেরই নিন্দে করে, বলে বুড়ো বাপকে ফেলে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তা—

'তা কি? কি উত্তর দিলেন? লজ্জা পেলেন? না ধমকে উঠলেন?

'লজ্জাও পেলেন না, ধমকেও উঠলেন না, ঠাণ্ডা গলায় বললেন 'সে কথা যে বুঝি না বাবা তা' নয়, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি এখানে আছি, তাই সুশীলা দুটো খেতে পাচ্ছে। ছেলেরা কি ওকে মাসোহারা দেবে? আমার চাকরী নেই, দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই কৌশল খেলে বসে আছি। চিরটাকাল যে মানুষটা আমার মুখ চেয়েই রইল, তাকে এখন 'আমার নেই' বলে ভাসিয়ে দেব? আর ওটারও চিরকাল নিজের একটা সংসার নেই বলে কী আক্ষেপ! তাই বলি, কিছুই তো হলো না, তবু মরণকালে দুটো হাঁড়ি-কুঁড়ি নেড়েও যদি 'জীবনটা সার্থক হলো ভেবে শান্তি পায় তো পাক। ছেলে বেটাদের তো বলে দিয়েছি, তোরা যত পারিস আমার নিন্দে করে বেড়াস। বলিস—বাবা বদ-মেজাজি, বাবা খামখেয়ালি, বাবা একজেদি, বাবা খিটখিটে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে থাকতে পারে না বাবা। নচেৎ আরও যা প্রাণ চায় বলিস পাঁচজনকে, আমার কোন কিছুতেই গায়ে ফোস্কা পড়বে না।'

মা কি ভাল করে সবটা শুনতে পেলেন? জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন দেখছি যে।

সবার ভাগ্যেই

প্রত্যেকের জীবনেই
আসে কিছু বৃষ্টিঝরা দিন,
মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার
সূর্যালুপ্ত আনন্দ মলিন।
(লং ফেলো)

হয়বর সিং

(৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আর ভাবতে লাগল।

সাত দিনের আর দু'দিন বাকি।

অবলা গাইটির দিকে চেয়ে তার মুখের গ্রাস খড় ক'আঁটি বিক্রি করতে হয়বরের মন সরে না। আবার না বেচলেও হাঁড়ি-ফাটক। এমনিতেই সে দুর্বল। একটা ঠেলা দিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাঁড়ি-ফাটকের যন্ত্রণার কথা ভাবতেও তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

লক্ষ্মণকে নিরিবিলি পেয়ে সে তার হাত দুটো ধরলে : হাঁ হে, অবলা জন্তুর মুখের গেরাস বেচতেই হবে শেষ পর্যন্ত?

ক্যানে?

লক্ষ্মণ মুচকি মুচকি হাসে।

—সেই রকমই তো কড়ার আছে।

—তা হোক। কিছু করতে হবে না। আমি নায়েব মশাইকে বলে দোব।

আর একবার ফিক করে হেসে লক্ষ্মণ চলে গেল।

লোকটা বাজে কথা বলে না, হয়বর জানে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হল। মনে খানিকটা স্ফূর্তিও এল। গুন্ গুন্ করে গতবারের বোলানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি এল।

শশিমুখী তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে।

পরনে একখানি চওড়া কালো পাড় ফর্সা শাড়ি। সোনার মৃণালের মতো দুটি বাহু অনাবৃত। বাম করতলে মাটির প্রদীপ। ডান করতল দিয়ে সেটি হাওয়া থেকে আড়াল করা।

হয়বর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল : এ কি শশিমুখী!

রং তার বরাবরই ফর্সা। কিন্তু অযত্নে যেন ছাই-ছাপা ছিল। সেই ছাই সরিয়ে যেন পালিশ করা হয়েছে। অর্থাভাবে চুলে তেল বড় একটা পড়ে না। আজ সেই চুলে পারিপাটি করে কবরী বাঁধা।

উৎসাহে হয়বর গান ধরে দিলে, গতবারের বোলানের গান

কালোশশী আসবে বলে
শশিমুখী চুল বেঁধেছে।

আচমকা গানে শশিমুখী একবার যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

তার মুখ কাগজের মতো শাদা।

একদিন হয়বর খেয়াল করলে, যাই রান্না হোক, তার স্বাদ যেন বদলেছে। তরকারিতে একটুখানি তেল পড়ছে। শশিমুখীকে হেঁটো-হাতে প্রতিবেশীর বাড়ি চাল ধার করতে যেতে হয় না। এমন কি গাইটাও যেন একটু চিকণ এবং পরিপুষ্ট হয়েছে। তার দুধও বেড়েছে।

হয়বর খায়-দায় কাঁসি বাজায়। সংসারের খবরে কোনো দিনই বড় বেশি থাকত না। এখনও তাই। শুধু বাড়িতে যে একটু লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে, আহারের জুৎ বেড়েছে, এইতেই খুশি। সে দুবেলা দুটো খায় আর শিবতলায় বুড়ো বটের ছায়ায় তাস খেলে।

সোমবার হাটবার।

শশিমুখী জিজ্ঞাসা করলে, হাটে যাবা তো?

পয়সা আছে?

—আছে।

শশিমুখী খুঁট খুলে একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিলে। ধামা নিয়ে হয়বর চলে যাচ্ছিল। শশিমুখী ডাকলে।

—আর শোনো।

—বল।

—হাট থেকে তোমার নিজের জন্যে একখানা ধুতি এন।

হয়বর নিজের ছিন্ন মলিন ধুতির দিকে চাইলে। বললে, সত্যি। এ আর পরা যায় না।

শশিমুখী হাসলে : পরা তো যায় না, কিন্তুক আমি না বললে খেয়ালও তো হয় না।

হেসে হয়বর বললে, খেয়াল একদিন হয়েছিল, জানলি? কিন্তুক টাকা-পয়সার যা অবস্থা।

—আমিও ধার করে আনলাম।

এত বড় মিথ্যে কথা বলেই শশিমুখী আর দাঁড়াল না। হন হন করে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

কেষ্টদাসী এখন প্রায়ই আসে। হয়বর লক্ষ্য করে শশিমুখী আর তাকে অপমান করে তাড়ায় না। বরং দুজনে হেসে হেসে গল্পই করে, কখনও চুপি চুপি কখনও জোরে জোরেই।

ইতিমধ্যে হয়বরের একটা চাকরীও জুটে গেল। বরাত যখন ফলে এমনি করেই ফলে।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে তারিণীর একখানা কাপড়ের দোকান আছে। দোকানটা বেনামীতে। সেইখানে চাকরী। মাস তিনেক শিক্ষানবিশ। এখন দুবেলা খাওয়া আর দু টাকা মাইনে। পরে আরও বাড়বে।

ঘর ছেড়ে বাইরে চাকরী করতে হয়বরের ইচ্ছা ছিল না। এরা কখনও গ্রাম ছেড়ে বাইরে থাকেনি, খেতে না পেলেও। কিন্তু শশিমুখী তাকে এত বড় সুযোগ ছাড়তে দিলে না। এক রকম জোর করেই পাঠালো।

কাঁদ কাঁদ হয়ে হয়বর বললে, জানিস তো আমি গাঁ ভুঁই ছেড়ে থাকতে পারি না।

শশিমুখী ধমক দিলে : বেটাছেলে রোজ-কার করতে বাইরে যায় না? গাঁ-ভুঁই কি পালাচ্ছে?

—কিন্তুক তোকে ছেড়ে কি করে থাকব?

শশিমুখী হেসে বললে, আমি ত পালাচ্ছি না।

হয়বরকে চাকরী নিয়ে যেতেই হল। শশি-মুখীর কাছে কোনো ওজর আপত্তি চলল না।

সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দোকানের কাজ। ওরই মধ্যে দুপুরে একটুখানি ছুটি পায়। দুটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে আবার দোকানে বসে। রাত্রে আটটার সময় দোকান বন্ধ হলে আবার রান্না। নিদ্রাটা দোকানের পাশের ঘরে।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। ইচ্ছা হয়, রাত্রেই বাড়ি পালায়। ভোরে কাক-কোকিল ডাকবার আগেই ফিরে আসে। পাঁচ মাইল পথ বই তো নয়?

কিন্তু ভূতের ভয়ে পারে না।

অবশেষে ভূতও একদিন হার মানলে। যে ঘরে সে শোয় তারই এক কোণে কার একখানা বর্শা ঠেসান দেওয়া আছে। কত দিন থেকে আছে কেউ জানে না। সেইটে কাঁধে নিয়ে এক রাত্রে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘুরপথে সদর রাস্তা দিয়ে নয়। মাঠের মধ্যে দিয়ে নাকের সোজা যে পথ সেই পথ দিয়ে।

হন হন করে চলে।

খানিক দূর এসে মনে হল, বর্শাটা আনা ঠিক হয়নি। ভারী কত! কিন্তু কি আর করা যায়! আর কতটুকুই বা পথ! ওই তাদের গ্রাম দেখা যায়।

শিবতলায় এসে যেন সে বাঁচল। আঃ! এই তার গাঁ। এর কাছে আর কোনো গাঁ লাগে?

একবার মনে হল, মনের আনন্দে দু'কড়িকে একটা হাঁক দেয়। কিন্তু সামলে নিলে। নায়েব জানতে পারলে ভালো হবে না।

মোড় ঘুরেই একটা বাঁশবন। সেখানে জোনাকীর মেলা বসেছে।

বাহা রে!

আপন মনেই হয়বর বললে। তখনই তার মনে হয়, সন্ধ্যাবারেও এই বাঁশবনের পাশ দিয়ে একা যেতে তার গা ছমছম করত। আর আজ অন্ধকারে পাঁচ মাইল পথ সে একা হেঁটে চলে এল! ভূত তো আছেই। তার উপর সাপ খোপ কি নেই?

কি তাজ্জব ব্যাপার!

বর্শা কাঁধে নিয়ে হয়বর আপন মনেই অবাক হয়ে ঘাড় দোলায়।

ওই তার বাড়ি।

ভাঙা পাঁচিলের কাছে এসে হয়বর একটু দাঁড়াল। কি করলে শশিমুখীকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় সেইটে ভাববার জন্যে।

হঠাৎ মনে হল কারা যেন বারান্দায় ফিস ফিস করে কথা বলছে!

অত্যন্ত সন্তর্পণে হয়বর পাঁচিল পেরিয়ে গোলার আড়ালে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। কথা বলছেই বটে। কি যেন খুব হাসির কথা। একজন নয় দুজন।

একজন শশিমুখী, আরেকজন কে?

হয়বর ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলে। শশিমুখী তার দিকে পিছন ফিরে বসে, আর তার কোলে মাথা রেখে কে আরেকজন শুয়ে। সেও তার দিকে পিছন ফিরে।

কে হতে পারে?

হঠাৎ তার মনে ছবির মতো ভেসে গেল : লক্ষ্মণ, কেষ্টদাসী, নায়েব, পাড়ার লোকের যত নিগূঢ় বিদ্রূপ এতদিন যা তার কাছে অর্থহীন বলে মনে হত, সব

তার মাথায় খুন চড়ে গেল।

সন্তর্পণে আরও কাছে এসে হাতের বর্শা যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে মারলে লোকটার পিঠে। টপ্ করে শব্দ করে বর্শাটার অনেকখানি গেল পিঠে বিঁধে।

লোকটা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

শশিমুখীও চীৎকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হয়বর তখন লাফ দিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তাকে দেখে শশিমুখী চুপ করে গেল। হয়বর তখন পাগলের মতো।

(শেষাংশ ২২৪ পৃষ্ঠায়)

যূথী পিসীমা

রানু ভৌমিক

ছেলেবেলা থেকেই যূথী পিসীমার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। ছাদের ওপরে ছোট একটি ঘরে একা থাকতেন তিনি। একহারা, লম্বা, ফর্সা চেহারা—পরনে সরু পাড় তাঁতের শাড়ী সাদা ব্লাউজ।

তাঁর সবই ছিল নিয়মে বাঁধা। সরু ছাড়া অন্য কোন পাড় তাঁকে আমি কখনও পরতে দেখিনি। ঠিক সাড়ে নটায় নীচে নামতেন, কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে এমনকি একবারও না তাকিয়ে স্কুলে চলে যেতেন। যখন ফিরতেন তখন পাঁচটা। একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তিনি।

খোরাকী বাবদ মাসে মাসে তিনি সংসারে টাকা দিতেন, আর একটা ঠিকে ঝির মাইনে। সেই ঝিটাই [illegible] ওপরে নিয়ে আসত।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়েই চলেছিল। খুব ইচ্ছে হ'ত ওঁর সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু সাহস পেতুম না। মা, কাকীমার কাছে ওঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম সবই ভাসা-ভাসা।

আরও কিছুদিন পরে হঠাৎ কি মনে হল ওঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। কিছুক্ষণ আগে ওঁর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

একটা চেয়ারে বসে আছেন উনি। কি করুণ বিষণ্ণ মুখ। একবার ভাবলুম ফিরে যাই। পরক্ষণেই নিজেকে কিছু ভাববার অবসর না দিয়ে চট্ করে ডাকলুম, পিসীমা।

—কে? চমকে তাকান উনি। কি চাই! শান্তকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিছু না। এই......আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলুম।

—কথা? একটু হেসে আবার প্রশ্ন করেন, কি কথা?

—আপনার জীবনের কথা। এবারে আমি স্পষ্টভাবে কাটা কাটা উচ্চারণে বলি, আপনাকে নিয়ে গল্প লিখব আমি।

—কেন? কেউ কিছু বলেনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন উনি।

—বলেছে। কিন্তু সবই উল্টোপাল্টা। তা থেকে এটুকু জেনেছি যে, ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল আপনাদের। স্বামী বিহারের কাজ করতেন—আর বিয়ের এক বছর পরেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

একটু থেমে [illegible], কিন্তু কেন হল ছাড়াছাড়ি। আর সেইটেই তো গল্প।

—হ্যাঁ, সেটাই প্রধান গল্প। উনি ধীরে ধীরে বলেন, সংক্ষেপে বলছি। লিখবার মত ইচ্ছে হলে তুমি বাড়িয়ে নিও।

বিয়ের আগেই গোপনে কবিতা লিখতুম। বিয়ের পর সেই গোপন-বার্তা স্বামীর জানা হয়ে যায়। কবিতাগুলি অদ্ভুত ভাল লাগে তাঁর।

নিজের মনেই লিখতাম। ছাপাবার কথা কখনও মনে হয়নি। কিন্তু, স্বামীর প্রশংসায় প্ররোচিত হয়ে তদানীন্তন একটা নামকরা কাগজে পাঠিয়ে দিলুম। সেই পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম আমরা।

প্রত্যাশায় তিন চার মাস কেটে গেল। একদিন হঠাৎ স্বামী খুবই উত্তেজিতভাবে পত্রিকাটি নিয়ে এলেন। নিশ্চয়ই কবিতাটা ছাপা হয়েছে। দুরু দুরু বুকে কাগজটা খুললাম। প্রথম পাতাতেই একটা ছবি।

ছবিটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম আমি। স্বামীও তাকিয়েছিলেন। দুজনে চোখাচোখি হতে চোখ ফিরিয়ে নি আর অসহায় বোধে দুটি আত্মা জ্বলতে থাকে।

ছবিটি আমার কবিতার ভাব-রূপ। আমার সকল বর্ণনাই তুলির টানে রেখায়িত করা হয়েছে। একটি মুদিত পদ্ম কোরক দিয়ে গোপন প্রেমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পদ্ম-কোরকের উল্লেখও ছিল আমার কবিতায়। ছবিটি সম্পাদকের নিজের আঁকা।

স্বামী অফিসে চলে যান। আমি ছবিটি নিয়ে চুপ করেই বসে থাকি। এক সময় হঠাৎ দারুণ রাগ হয় আমার। একটা কাগজ টেনে নিয়ে সম্পাদককে কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করে চিঠি লিখি।

কয়েকদিন পরেই উত্তর এলো। সম্পাদক লিখেছেন, 'সুচরিতাসু, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যত চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে সবই এই ধরণীর স্তরে স্তরে প্রবাহিত। আমরা যখন সৃষ্টি করি তখন সেই ধারার কিছুটা এসে বাসা বাঁধে আমাদের মন-মানসে। কাজেই, একই সময় [illegible] স্থানে বিভিন্ন শিল্পীর একই রকম অনুভব বিস্ময়ের বিষয় নয়।

চিঠিটা পাবার পর আপনার কবিতাটি আবার পড়লাম। কবিতাটি চিত্রের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। আমার চিত্রে যদি অত সুন্দর ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে আমি ধন্য।'

আমার সেই রূঢ় অপমানজনক চিঠির এরকম উত্তরে খুবই লজ্জিত হলাম এবং ক্ষমা চেয়ে মিষ্টি একটা উত্তর দিলাম। নিশ্চয়ই আমার চিঠি ওঁরও ভাল লেগেছিল। উনি আবার একটা চিঠি দিলেন। এইভাবেই চলে চিঠির আদান-প্রদান।

শেষটা যেন এক নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। এ এক প্রচণ্ড আসক্তি। স্বামীর প্রতিও ঠিক এই ধরণের আসক্তি ছিল না। স্বামীর ভালবাসা যেন মাটী—যার ওপরে নির্ভর করতে পারি—আত্মস্থ হই যার স্পর্শে—আর এই আসক্তি যেন অসীম আকাশ—যত দূরে তত মধুর।

দেখিনি কেউ কাউকে—তবুও কত পরিচিত হয়ে গেলাম। চেহারা নিয়ে অনেক রকম কল্পনা করতাম। ওঁকে সে কথা লিখতে উনি ওঁর ছবি পাঠিয়েছিলেন। আমার ছবিও পাঠিয়েছিলাম।

চিঠির মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল, তাই বুঝি এত গভীর ছিল এই আকর্ষণ। কোন দোষ দেখতে পাই না, শুধু গুণ—

এ জন্য স্বামীর প্রতি ভালবাসা কিন্তু বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ স্বামী তো তাই বলতেন। একদিন বললেন, কি ব্যাপার, তোমার হাবে-ভাবে, কথায় হাসিতে যে মধু ঝরে পড়ছে। এত মধুময়ী হলে কি করে?

—মন-মধু পান করে মত্ত হয়েছি। পরিহাস-ভরে উত্তর দিতাম।

সত্যিই যেন মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই মত্ততার আবেশেই একদিন মনে হল, যাব কলকাতায়। ওঁকে দেখব।

(শেষাংশ ২৩২ পৃষ্ঠায়)

সকালে একটু বেরিয়েছিলাম। দশটা নাগাদ বাসায় ফিরে শুনলাম, দুটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন এবং কাল সকালে আবার আসবেন বলে গেছেন।

শুনলাম, কিন্তু কোন রকম কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। গৃহিণী তাতে একটু অবাক হয়ে বললেন, একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলে না যে! ভদ্রলোক দুটি কোথা থেকে এসেছিলেন, কি নাম তাঁদের...

আমি বললাম, কিছু দরকার আছে কি তার? প্রথমত, তাঁরা আবার আসবেন কালই। দ্বিতীয়ত না-ই যদি আসেন আর, তাতেই বা ক্ষতি কি?

জবাব হল, হতেও ত পারে কিছু ক্ষতি। ধরো কোন বিশেষ দরকারে...

বাধা দিয়ে বললাম, বিশেষ দরকারে নিশ্চয়। কিন্তু দরকারটা কার? তাঁদের, না আমার? যদি আমাকে তাঁরা পাওনা টাকা দিতে এসে থাকেন, তাহলে আমি না থাকলেও তুমি ছিলে, তোমাকেই দিয়ে যেতেন। কিংবা দিয়ে যেতেন। যদি দুই মাছ দই ল্যাংড়া আম বা সিল্কের চাদর উপহার দিতে এসে থাকেন, তাহলে বাড়ীতে কারো না কারো হাতে দিয়ে নিজের নামটা বলে যেতেন।

অর্থাৎ তোমার কাছে আসতে হলেই লোককে পাওনা টাকা, নয়ত দই-মাছ-সন্দেশ হাতে নিয়ে আসতে হবে। তোমার ত দেখছি তাহলে জমিদারী সেরেস্তার নায়েব, নয়ত সওদাগরী অফিসের বড়বাবু হওয়া উচিত ছিল। উঠতে বসতে কলাটা মুলোটা পালা পেতে!

বললাম, কিছু হাতে নিয়ে না হয় না-ই এলেন কেউ আমার জন্যে। কিন্তু আমার মাথায় চাপাবার জন্যে মতলবের বোঝা নিয়ে আসবেন কেন এবং শুধু সেই রকম মহাপ্রাণ লোকরাই আসবেন কেন?

কি রকম লোকদের কথা বলছ?

এই ধরো: কাগজে প্রবন্ধ ছাপিয়ে দেওয়া, বেতারে প্রোগ্রাম পাইয়ে দেওয়া, বইয়ের বিক্রী করে দেওয়া, হাসপাতালে বেড ও কলেজে সিট জুটিয়ে দেওয়া, চাকরির জন্যে চিঠি দেওয়া... এই সবই শুধু 'রিজার্ভ' থাকবে আমার জন্যে? আর কিছুই প্রত্যাশিত নেই আমার কারো কাছে?

কেন তোমার কাছে ত লেখাও চাইতে আসেন অনেকে। অনেকে আসেন সভায় প্রধান অতিথি, নয়ত সভাপতি হওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করতে। লাঞ্চে ডিনারে যাবার জন্যে বলতেও আসেন কেউ কেউ। এগুলোর বুঝি কোনই দাম নেই?

দাম বলতে যদি কাঞ্চনমূল্য বোঝ, তাহলে কিছুই নেই। লেখার জন্যে যাঁরা তদ্বির তাগাদা করতে আসেন, তাঁরা প্রায় সকলেই চান বিনা পয়সায় গল্প প্রবন্ধ কবিতা যা-হক একটা কিছু বাগিয়ে নিয়ে কাগজের পেট ভরাতে। যাঁরা দক্ষিণা দেন, তাঁরা আসেন জমিদারের পেয়াদার মতো ফরমায়েসের গদা উঁচিয়ে, রচনা চেয়ে কৃতার্থ করলেন, এমনি একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার নিয়ে! সুতরাং বিশেষ খুসী হবার মতো লোক আসেন না বড়-একটা কেউই লেখা চাইতে। আর সভা-সমিতির কথা বলছ? কাগজে সভার বিবরণ এবং সেই সঙ্গে নিজেদের নাম-ধাম ছাপানোর সুবিধা হবে বলেই না কাগুজে লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়! নইলে হত কি? লাঞ্চ ডিনার সম্বন্ধেও তথৈবচ!

তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ?

কিছুই না। চাইছি নিজের কাজ নিয়ে থাকতে এবং নিজের খুসী মতো চলতে। খালি অন্যের স্বার্থ সুবিধা ও প্রয়োজনের বরাত পিঠে নিয়েই বেঁচে থাকব, এ কেমন কথা বলো ত!

দেখো, কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে একটা বাড়ী করো। আর একটা গাড়ী করো। সেখান থেকে গাড়ী হাঁকিয়ে রোজ অফিসে আসবে, আবার কাজ সেরেই ফিরে যাবে। তাহলে কেউ আর তোমার নাগাল পাবে না। বুঝতে পারছি, তোমার পতন হয়েছে! মানুষের সংসর্গই আর সহ্য হচ্ছে না তোমার।

আহা-হা কথাটা তুমি আগাগোড়াই ভুল বুঝছ যে। মানুষ চাই, সংসর্গও চাই। কিন্তু সে মানুষ সহজ হবে, সহৃদয় হবে, দরদী হবে, স্বার্থহীন হবে তবে ত! বিশুদ্ধ আড্ডা দিতে কে না চায়? কিন্তু কোথায় সুযোগ বলো ত তেমন আড্ডার? চার দিকে খালি কিল বিল করছে ছোট-বড় রকমারি স্বার্থ। যেন রাশি রাশি সাপ!

তোমার কোন স্বার্থ নেই? তুমি কি নিঃস্বার্থ, মহাত্মা নাকি?

মোটেই না। আমি মহাত্মা নই, মহাত্মা নামক কোন পদার্থে প্রত্যয়ও রাখি না। স্বার্থ-জ্ঞান আমারো টন টনে এবং সেই জন্যেই চাকরি করি, বই লিখি, বক্তৃতা দিই। আর সেই জন্যেই নিমন্ত্রণ খাই না, থিয়েটার-বায়স্কোপের পাশ নিই না, বিশিষ্ট লোকদের জন্ম-তিথি, ছেলে-মেয়ের বিবাহ বা মৃত্যু উপলক্ষে এক ফাঁকে হাজিরা দিয়ে Among those present-এর তালিকায় নিজের নামটা তুলতে দিই না!

আর এই জন্যেই তোমার বই ফিল্ম হয় না। নাটক স্টেজে নেয় না। প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায় না। কবি-সম্মেলনে তোমাকে কেউ কপালে চন্দন আর হাতে একশো টাকা দেয় না। কোন নামী পুরস্কার তোমার বরাতে জোটে না। ওপরওয়ালারা রাত্রি করে মার্জারের মিটিং-এ ডাকে না, সরকারী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটিতে স্থান দেয় না! খালি ত বসে বসে বৃহদারণ্যক উপনিষদ আর তালমুদ, ফার্দৌসী আর ভার্জিল পড়ো, গোটে আর রবীন্দ্রনাথ, রিলকে আর এলুয়ের নিয়ে বাগাড়ম্বর করো! ওদিকে গরম পিঠে যেখানে যা আছে, সব যে অন্যেরা লুঠে নিচ্ছে, সে খেয়াল আছে?

বুঝলাম, বাক্য এবার বাক্যবাণে পরিণত হচ্ছে। বললাম, সবই মানলাম। কিন্তু এজন্যে আমার ত্রুটিটা কোন্‌খানে?

কোন্‌খানে? দেখো, ছোটদের না পুছলেও চলে। কিন্তু বড়দের কাছে যেতে হয় তাদের মন রাখতে হয়, দরকার মতো এটা-সেটা করে দিয়ে তাদের অন্তরঙ্গ করে নিতে হয়। তা না হলে শুধু শুধু আদর করবে কেন তারা?

ক্ষমতা-অক্ষমতা বলে বুঝি কিছু নেই? আমার নাটক যদি অভিনয়ের উপযুক্ত না হয়, নভেল যদি ফিল্মে না খাপ খাওয়ানোর মতো হয়, প্রবন্ধ যদি যথেষ্ট বৈদগ্ধ্যপূর্ণ না হয়, তবু আমাকে স্থান দিতে হবে! প্রাইজের যোগ্য যদি না হই আমি, তবু...

তুমি কলা বোঝ! যে-সব নাটক প্লে হয়, যে সব নভেল ফিল্ম হয়, যে-সব প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়, যে-সব বই প্রাইজ পায় মাল হিসাবে তার ষোল-আনাই যে খাপের

(শেষাংশ ৯৩০ পৃষ্ঠায়)

সিন্দুক খুলে হরিহর স্যাকরা খদ্দেরের কানফুল দুটো তুলে রাখছিল। পাতলা বেগুনী কাগজে মোড়া ছিল জিনিষটা, কিছু অসাবধানবশতঃ দুটোর ভিতর থেকে একটি গড়িয়ে পড়ে সোজা সিন্দুকের তলায় ঢুকলো। হরিহরের খেয়াল নেই। পয়সার জোক হলেও আজকাল মানুষটা চোখেও কম দেখে, অনুভব শক্তিটাও কেমন যেন কমেছে।

নজর এড়াল না শুধু কুমুদের। হরিহর স্যাকরার 'সুবর্ণ কুটিরের' একমাত্র কারিগর, বিশ্বস্ত কর্মচারী কুমুদ তখন সোনার লকেটের উপর মীনের কাজ করছিল। আড় চোখে ব্যাপারটা তাকিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিল। কারণ নিশ্চিন্ত হরিহর সোনার কানফুল পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সিন্দুকের চাবী বন্ধ করে সিন্দুকের ডালা ঝেঁকে ঝেঁকে দেখছে ওটা ঠিক বন্ধ হল না খোলা রইলো।

দুপুর প্রায় শেষ হয় হয়, হরিহর সিন্দুকের চাবী ট্যাঁকে গুঁজে বললো—অ কুমুদ, তুমি উঠবে কখন? বেলা যে এদিকে যায় যায়।

—এই হাতের কাজটা শেষ করেই উঠবো খুড়োমশাই। তোলা উনুনে চাল ডালের এক খ্যাটানী চাপান আছে, নামাব আর খাব।

যা ভাল বোঝ কর। হরিহর, কাপড়ে কষি সামলে উঠে দাঁড়াল। অরে অ নলচে, দোকান ঘরটা ঝাট-পাট দিয়ে যা বাবা, দেখি কোথাও কিছু পড়ে ঝরে রইলো নাকি?

কুমুদ ব্যস্ত হয়ে উঠলো,—না খুড়োমশাই আমার হাতের কাজটা শেষ না হলে দোকান ঝাঁট দেওয়া মুস্কিল, নলচে থাক, হাতের কাজ শেষ হলে, আমিই ঝাঁট দিয়ে দোব। আপনি বাড়ী যান।

হরিহর আপত্তি করলো না। বুট জুতো পায়ে গলিয়ে থপ থপিয়ে দোকান ছাড়তেই কুমুদেরও কাজের ইতি। মীনে করা লকেটখানা বাক্সর মধ্যে তুলে রেখে সিন্দুকের তলায় উপুড় হয়ে পড়লো। এক হাত হবে না—একটু দূরে সোনার জিনিষটা অন্ধকারে ঝক ঝক করছে। হাত লম্বা করে ফুলটা নিয়ে এল কুমুদ, ট্যাঁকে গুঁজলো।

বেলা হয়েছে যথেষ্ট। খিদেয় পেটের মধ্যে চুঁই চুঁই করছে, মাথায় খানিকটা তেল থাবড়ে চান করতে যেয়ে দেখে চৌবাচ্ছায় এক ফোঁটা জল নেই। উপর তলার বাড়ীওলার গুষ্টিবর্গ শেষ জলবিন্দুটা অবধি নিঃশেষ করে নিয়েছে।

আপন মনে আচ্ছা করে গালাগাল দিয়ে বালতি গামছা হাতে কুমুদ গলির মধ্যে ঢুকলো। মোহন দত্ত লেনে ঢোকার মুখে সুবর্ণ কুটিরের অস্তিত্ব, পাশ দিয়ে গলি গিয়েছে। সরু সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তার গলি। আবর্জনা আর নোংরার স্তূপে পা বাড়ান দায়,—কিন্তু সে সব যাই হোক, এ গলির প্রত্যেকটি বাসিন্দার মধ্যে সকলের সংগে কুমুদের হৃদ্যতা অকৃত্রিম। কারো মেয়ের বিয়ের পাতা করা থেকে সুরু করে কার বউ-এর প্রসব বেদনা উঠলো তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, তার সব কিছু কুমুদ ছাড়া করার কেউ নেই।

পাঁচিদের বাড়ীতে জলের অভাব নেই। কুমুদ ঐ বাড়ীতেই ঢুকলো, উঠোনের উপরই শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্ছায়, কুমুদ গামছা বালতি রেখে হাঁক ছাড়লো—এই পাঁচি, একবার এদিকে শুনে যা তো—

আঠারো উনিশ বছরের পাঁচি ভিজে হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়াল—কি বলছো?

কুমুদ ট্যাঁক থেকে কানফুলটা বার করলো—এইটা তোর কাছে রাখ, বড়দি পাঠিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভাল দেখে এক জোড়া কানফুল তৈরী করে দিতে।

পাঁচি জিনিষটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো,—তা একটা কেন গো কুমুদ দা?

ঐ একটাতেই দুটো হয়ে যাবে। আর শোন, তোর কাছে সব শুদ্ধ কত টাকা জমলো রে?

পাঁচি শূন্যের দিকে চেয়ে হিসেব করলো, অষ্ট আশী টাকা বার আনা। জান কুমুদদা, আমি কিন্তু বাপু তোমার টাকা থেকে দশটি নিয়ে একখানা শাড়ী, একখানা জামা কিনেছি, মাসে মাসে এক টাকা করে দিয়ে শোধ করে দোব।

পাঁচির কথায় কুমুদ তেড়ে উঠলো—তোর এই স্বভাবের জন্য কোন দিন আমার হাতে খুন হয়ে যাবি পাঁচি। তোকে হাজার দিন বলেছি না যে না বলে আমার ক্যাশ ভাংবি না।

পাঁচি নিভয়ে বললো,—এতে আবার ক্যাশ ভাংগা ভাঙ্গার কি দেখলে। দরকার পড়লো নিয়েছি আবার দিয়ে দোব।

আচ্ছা ঠিক মত দিস, কথার যেন বেঠিক না হয়।

বাইরে থেকে হুড়মুড়িয়ে একটা ছেলে ঢুকে পড়লো—অ পাঁচি দি,—না, এই তো কুমুদদা, কুমুদদা, একবার আমাদের বাড়ীতে আসবে?

কেন রে? কি দরকার? হাঁপাচ্ছিস কেন?

ছেলেটা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো,—দিদা সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে কুমুদদা, কি রক্ত—

বলিস কি রে ঝন্টু, রক্ত? চল তো দেখি।

কুমুদ বালতি গামছা ফেলে ঝন্টুকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো। পাঁচিদের দুখানা বাড়ীর পাশে ঝন্টুদের বাড়ী। বাড়ীটি দোতলা, সিঁড়ি খাড়াই উঁচু, বুড়ো মানুষ ঝন্টুর দিদিমা কি-ভাবে যেন পড়ে গেছেন, খুব বেশী না হলেও খানিকটা রক্ত বেরিয়ে বুড়িকে কাতর করেছে।

দুপুর বেলা, বাড়ীতে পুরুষ বলতে কেউ নেই, কুমুদকে দেখে ঝন্টুর মা কিছু আশ্বস্ত হলেন। বললেন—দেখ না ভাই, একি জ্বালায় পড়লুম। দুপুরে যদি কোন দিন একটু দু চোখের পাতা এক করেছি অমনি একটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছেন।

কুমুদ ঝুঁকে পড়লো বুড়ির উপরে—অ মাসীমা কি করে পড়লেন, সিঁড়ি দিয়ে?

বুড়ি পিট পিট করে চাইছিল, কুমুদের কথায় একটু হাসির চেষ্টা করলো। বললো,—নীরো আমায় ঠেলা দিল রে বাবা, একটু আচার খাচ্ছিলাম, এমন সময়—

বুড়ির একটু ভীমরতি মত হয়েছে। আবোল তাবোল বকে। তার উপর খাবার লালসা

এবং স্বামী ছেলে কেউ না থাকায় মেয়ের কাছে চিরপোষা হয়ে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু মেয়ে নীরো মায়ের এমন কথায় প্রায় ক্ষেপে ওঠার যোগাড়। দেখচো কুমুদ, কথা শুনেছ, বুড়ো হয়ে মরতে চললেন। তবু ভীমরতি গেল না। হাঁ মা, আমি তোমায় ঠেসে ফেলে দিয়েছি?

মেয়ের অপমানাহত কণ্ঠস্বরে, বুড়ি কান দিল না, কুমুদকে দেখে বুড়ির সাহস বেড়েছে। চোখ বুজেই বললে,—দিয়েছিসই তো! তুই আমায় দেখতে পারিস না।

অন্নদাতা মেয়ের মুখ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে আরক্ত হয়ে উঠেছে। আরও কি একটা কথা বলতে যেতেই কুমুদ বাধা দিল,—ছেড়ে দিন দিদি, কার কথা ধরে কথা কাটাকাটি করছেন, ছেড়ে দিন।

বুড়ি বোধ হয় বেশী দিন বাঁচবে না, হাত-পা মুখ সব কেমন ফোলা ফোলা, রক্তহীন হাড়-সার চেহারা। কুমুদ বুড়ির কানের কাছে ঝুঁকে পড়লো—হাসপাতালে যাবেন মাসীমা। হাসপাতাল?

—যাব রে বাবা, যাব! সেখানে থাকতে দেবে যে কটা দিন না মরি?

—আরে মরবেন কেন? চলুন, আপনাকে হাসপাতালে দিয়ে আসি। দুদিনে সেরে উঠবেন।

ফের সুবর্ণ কুটিরে ফিরে এল কুমুদ। তেল-মাখা শরীরের উপরই জামা কাপড় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ঝণ্টুর মায়ের মুখ অপ্রসন্ন কালো। কুমুদের হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললো—যাতে যা হয় এতেই চালিয়ে নিও ভাই।

বুড়িকে ঐ অবস্থাতেই পাঁজাকোলে করে রিক্সায় তুললো কুমুদ। ধারে কাছে কাউকে দেখতে পেল না একটু সাহায্যের জন্যে। রিক্সায় উঠে বুড়ি মুখ ফেরাল। ঝণ্টুর মা তখনও সদরে দাঁড়িয়ে। বুড়ি একটু হেসে বললো—চললুম রে নীরো, তোর কাছে ভগবান যেন আর না পাঠায়।

বাকি কথাটা বুড়ির গলার ঘরঘরে আওয়াজে ঢেকে গেল।

এমন জীবন দেখা, এমন মানুষ দেখা—আর এই দেখাটাই যেন কুমুদের একটা আসল কাজের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। সারা পাড়ার মানুষ খুঁজে বেড়ায় ওকে, আপদে-বিপদে, সহায়-সম্পদে।

কুমুদ না করতে পারে না, যায়। যে ডাকে তার কাছেও যায়। যে না ডাকে তার কাছেও যায়।

আর এমন ডাকেরই একখানা চিঠি এসেছে কুমুদের কাছে। মেজ বোনের ছেলের টাইফয়েড। যেতেও হবে, ওষুধও চাই। ওষুধটাই মুখ্য। কাজ-কর্ম ফেলে রেখে চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরে অনেকক্ষণ ভাবলো কুমুদ। মেজ বোনের অসহায় মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐ একটা ছেলে নিয়ে বিধবা, তার যদি ভাল-মন্দ একটা কিছু হয়?

কথাটা ভাবতে আপন মনেই শিউরে উঠলো কুমুদ, কিন্তু আসল সমস্যা দেখা দিচ্ছে মনে,—টাকা কোথায়?

দোকানে দুটো সিন্দুক। বড়টার মালিক হরিহর স্বয়ং, দ্বিতীয়টি নামে সিন্দুক হলেও কাজে কিছু নয়,—ওটা কুমুদের। নিজের দরকারী টাকা পয়সার সঙ্গে নিজের দায়িত্বে আনা খদ্দেরের জিনিষগুলো নিজের জিম্মায় ওতেই রাখে।

সিন্দুক হাঁটকে আজ দেখলো কুমুদ। খদ্দেরের দুটো একটা জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই। সিন্দুক একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে, এতটুকু সোনার গুঁড়ো বলতে কিছু নেই। কুমুদ দেখে শুনে নিজেই অবাক হল,—খদ্দেরের গয়না গড়াতে যেয়ে সোনার বদলে এত যে ঠেসে ঠেসে পান ভর্তি করছে, সে সব সোনা তবে যাচ্ছে কোথায়? সুতরাং অগতির গতি পাঁচি ছাড়া উপায় নেই।

পাঁচিদের বাড়ী ঢুকতেই প্রচণ্ড ঝগড়ার আওয়াজ ভেসে এল। এক বাড়ীতে বহুজনের মিলিত বসবাসের ফলে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই আছে। নীচের একতলার একখানা ছোট ঘরে পাঁচিরা থাকে। ভাই বোন। বাপ মা বলতে কেউ নেই। দরজার গোড়ায় বসে পাঁচি জামা সেলাই করছিল। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় অন্ধকারটা বেশী জমাট বেঁধে উঠেছে। কুমুদ এসে দাঁড়াল—হ্যারে পাঁচি, তোর কাছে কত টাকা আছে রে?

হ্যারিকেনের আলোয় কুমুদের লম্বা ছায়াটা সোজাসুজি হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। পাঁচি উঠে দাঁড়াল,—টাকা বুঝি আমার কাছে ডিম পাড়বে? ঝণ্টুর দিদিমাকে রক্ত দেবার জন্যে তুমি সেদিন সব টাকা নিয়ে নিলে না?

নিয়েছি বুঝি?

আপন মনে খানিক ভাবলো কুমুদ,—মেজদির ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছে, তাই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আচ্ছা পাঁচি বলতো, আমি কি কল্পতরু? হাড়কিপ্টে হরিহর বুড়ো। মাসে ষাট টাকা মাইনে দেয়। তাতে সারা মাস নিজে খাব, বাড়ী পাঠাব, দান-ছত্তর করবো—অত আসে কোথা থেকে?

পাঁচি কথা বললো না, একখানা আসন পেতে দিল,—বসো, বসে কথা বলো।

বসবো কি রে, এখন তো মরার সময়ই নেই। কথাগুলো বলতে বলতে পাতা আসনখানায় কুমুদ বসলোও। নজর তুলে দেখলো পাঁচি সেজেছে, কালো ডুরে শাড়ীখানা ভারী চমৎকার মানিয়েছে। হাসলো কুমুদ,—তুই তো বড় সেজেছিস রে পাঁচি? বেশ লাগছে দেখতে আজ।

পাঁচির চোখে লজ্জার ছায়া,—জান কুমুদদা, সামনের বাড়ীর অতসীর বিয়ে!

কুমুদের চোখের সামনে মেজ বোনের ছেলেটার মুখখানা ভেসে বেড়াচ্ছে, বড় কাকুতি-মিনতি করে চিঠি দিয়েছে। পাঁচির কথায় কুমুদ বললো,—অতসীর বিয়ে তো হয়েছে। তোরও হবে বলবোখন হাঁদাকে।

হাঁদা পাঁচির দাদা, জামা সায়া ফেরী করে বেড়ায়। কুমুদের কথায় পাঁচি বিষণ্ণ হলো,—থাক, তোমার আর হাঁদাকে বলতে হবে না।

না হবে তো না হবে, যাঃ—কুমুদ আসন ছেড়ে তেড়ে উঠলো। পাঁচিদের বাড়ী থেকে বেরোতেই খুকীর বাপের সঙ্গে মুখোমুখি। ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর, সঙ্গে ডাক্তার। কুমুদ দাঁড়িয়ে পড়েছে—হ্যাঁ, দ্বারিকদা কি ব্যাপার? ডাক্তার কেন?

খুকীটার অসুখ করেছে ভাই, ভাল মেয়েটা কালও খেলাধুলো করেছে, রাত থেকে জ্বর, আজ সমানে ভুল বকছে।

ছোট থেকে মোহন দত্ত লেনের সঙ্গে নাড়ীর টান জড়িয়েছে কুমুদের। দ্বারিকের মেয়ে খুকীকে সেদিন জন্মাতে দেখলো কুমুদ, এতটুকু ফুটফুটে মেয়েটা জানলার উপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে—কুমুদ মামা, অ কুমুদ মামা।

দেখা হলেই তার ওভাবে ডাকা চাই। সেই সুন্দর মেয়েটার কি হল একবার দেখতে হবে,—খোঁজ নেওয়াটা দরকার।

দোতলার ঘরে খাটের উপর খুকী অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, মাথার গোড়ায় খুকীর মা বসে বসে চোখ মুচছেন, ডাক্তারকে নিয়ে খুকীর বাবা মেয়ে দেখাতে ব্যস্ত।

কুমুদের নজরটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে যেয়ে পাশে টেবিলের উপর পড়লো। লাল রং-এর একটা মানিব্যাগ, মাথুজী, চাবী, এটা-ওটা বহু টুকিটাকি জিনিষ পড়ে রয়েছে। ঘরের মানুষ রুগী নিয়ে ব্যস্ত, কুমুদের নজর পেট মোটা মানিব্যাগের উপর আটকে গেল।

ডাক্তার পিছন ফিরে গম্ভীর ভাবে রোগ পরীক্ষা করছেন, নানারকম প্রশ্ন করছেন, কুমুদের কান কোথাও নেই। কুমুদের শরীরটা যেখানেই থাক, সারা ইন্দ্রিয় জুড়ে তখন শুধুই মেজবোনের চিঠিখানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলেটার অসুখ, টাকা চাই, ওষুধ কিনতে হবে।

নিজেরও অজ্ঞাতসারে কখন যেন কুমুদ টেবিলের কাছে সরে এসেছে। কারো নজর নেই, কুমুদ খুকীর মাকে সান্ত্বনা দিল,—কাঁদবেন না দিদি, মাথার গোড়ায় বসে অমন করে চোখের জল ফেলতে নেই।

মেয়ের মা চোখের জল নিচু হয়ে আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন,—মেয়েটা জ্বরের তাড়সে কেমন করছে দেখ। কি করে যে ভাল হবে—?

খুকীর মায়ের রুদ্ধগলা দিয়ে আর বেশী কিছু বেরোল না। কুমুদ তাড়া দিল,—কিছু ভয় নেই, ঠিক ভাল হয়ে যাবে! মানুষের অসুখ-বিসুখ করে না?

আরও দুটো চারটে কথা বলে রাস্তায় বেরিয়ে এল কুমুদ। রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল। লাল রং-এর মানিব্যাগটা হাতে ঠেকছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে 'সুবর্ণ কুটিরে' এসে দেখলো কুমুদ হরিহর খাতা খুলে বসে আছে। কুমুদকে ঢুকতে দেখেই মুখ তুললো।—আচ্ছা কুমুদ, চৌধুরী গিন্নির কান-ফুল জোড়া, তার একটা সিন্দুকে রয়েছে, একটা নেই! গেল কোথায় বল তো?

—সে আবার কি, সিন্দুকে একটি রয়েছে, একটা নেই?

—তাই তো দেখছি, হরিহর মাথা নাড়লো—কুমুদ, তোমার কি মনে হয়, মনের ভুলে অন্য কোথাও রাখিনি তো।

—তা কি করে হয় খুড়ো মশাই। সোনা বলে কথা, এ কি ফেলে দেবার জিনিষ! দেখুন সিন্দুকের মধ্যেই কোথাও রেখেছেন।

হরিহর আরও খানিক সিন্দুক নেড়েচেড়ে দেখলো কিন্তু কানফুল পাওয়া গেল না। রাত হয়ে যাচ্ছিল এদিকে, হরিহর হিসেব মিলিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে বাড়ী চলে গেল।

কুমুদ দোকান বাড়ীতেই থাকে। সামনের ঘরখানা মস্তবড়। সেখানা দোকানের জন্য রেখে পাশেরখানা খদ্দেরের, তারও ওপাশে না ঘর না খুপরী গোছের ছোট ঘরখানায় কুমুদ রাঁধে খায় শোয়। আঠারো বছর বয়েসের সময় মাঝদিয়া

ছেলেকে এনে এখানেই এই কুটুরীতেই দশটা বছর কাটালো।

হরিহর চলে যেতে দোকানঘর বন্ধ করে লাল মনিব্যাগ খুলে ফেললো কুমুদ। একশো টাকার দুখানা, দশ টাকার সাতখানা নোট, আরও কিছু এদিক-ওদিক খুচরো। অনেকগুলো টাকা, মেজ বোনের ছেলের ওষুধের দাম যতই হোক,—এতেই কুলিয়ে যাবে।

কিন্তু খুকীদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে গেলেই কুমুদের পা দুখানা যেন আটকে যায়। দুপুরে পাঁচিদের বাড়ী যাবার মুখে খুকীদের বাড়ীর বন্ধ সদর দরজার গোড়ায় খানিক দাঁড়ায়, কান পেতে ভিতরের কথা শুনতে চেষ্টা করে। খুকীটা কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয়নি।

সেদিন খন্দেরের বাড়ী থেকে ফিরে আসতে বিকেল হয়ে গেল প্রায়। কোনমতে চান সেরে সকালের কড়কড়া ভাত তরকারী বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছে কুমুদ—আপনমনে খুকীদের কথাই ভাবছিল, দরজার উপর মানুষের ছায়া, নজর তুলে দেখলো, পাঁচি দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে একটা বাটি।

হাসলো কুমুদ,—তোর হাতের বাটিতে কি রে?

—মাংস! দাদা একটু এনেছিল তাই রেঁধেছি। পাঁচি হাতের বাটি কুমুদের পাতের কাছে নামিয়ে রাখলো। কুমুদের পাতে শুকনো ভাত, জলের মত ডাল, কালু রং-এর তরকারী।

—এ কি দিয়ে খাচ্ছ কুমুদদা। মানুষ এমন করে খেতে পারে?

মুখের ভাত গলা দিয়ে নামিয়ে দাঁত বার করে হাসলো কুমুদ,—আমরা কি মানুষ রে! ষাট টাকা মাইনে পাই, বাড়ী পাঠাই চল্লিশ, থাকে কুড়ি—এতে একটা মানুষের এর বেশী হবে কি করে বল?

পাঁচির চোখে বেদনার সঙ্গে বিস্ময় মিশলো। —কেন, তুমি যে আলাদা ব্যবসা কর, তার থেকে নিতে পার না? আমার কাছে তো হরদমই টাকা রাখছো।

হো হো করে হাসলো কুমুদ।—ও টাকা বিয়ে করার জন্যে জমাচ্ছি রে। তা জমছে আর কোথায়, সব তো খরচ। ভাল কথা। একটা কাজ কর তো দেখি,—কুমুদ টাঁক খুলে চাবী বার করলো। আমার সিন্দুকটা খোল, সামনেই একটা ব্যাগ আছে দেখবি, লাল রং-এর—বার করে নিয়ে আয়।

কুমুদের জিনিষপত্তরে হাত দেবার অবাধ অধিকার পাঁচির। সিন্দুক খুলে ব্যাগ নিয়ে এল,—এইটা?

—দেখি! বাঁ হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল কুমুদ। নিজের চোখের সামনে একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। আবার পাঁচিকে ফিরিয়ে দিল, —খুলে দেখ তো কত আছে?

পাঁচি ব্যাগের মধ্যে যা-কিছু ছিল বার করে গুণলো। বললো,—উনসত্তর টাকা তিন আনা।

—ঠিক আছে। তোর কাছে রাখ, দরকারে নেব।

—তা তো নেবে। কিন্তু এত টাকা থাকতে তুমি ঐভাবে খাবেই বা কেন?

—বেশ করবো খাব। কুমুদ তাড়া দিল—তুই এখন বিদেয় হ' তো! আমি জুত করে খাই।

কুমুদের এই রকমই কথায় ছিরি। ওর উপর রাগ করলে চলে না, কিন্তু পাঁচি আজ রাগ করলো—যাচ্ছি, যাচ্ছি। আমি সামনে এলেই তো তোমার শুধু তাড়াবার ফন্দি।

পাঁচি রাগ করে চলে যাবার মুখে আবার ডাকলো কুমুদ—এই পাঁচি শোন, দ্বারিকদার মেয়ে খুকী কেমন আছে জানিস নাকি কিছু?

মাথা দোলাল পাঁচি,—জানি। খুব অসুখ, কাল থেকে শুনেছি নাকে নল ঢুকিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়াচ্ছে। ঐ যে গো, অক্সিজেন না কি বলে তাই—

—বলিস কিরে! কুমুদের চোখ গোল হয়ে উঠলো।

—তুই গেছিলি নাকি দেখতে?

—গেছিলুম! শুনেছি তিনটে চারটে অসুখ একসঙ্গে। তুমি যাওনি দেখতে?

—যাওয়া হয়নি রে পাঁচি, সময় করে উঠতে পারিনি।

পাঁচি চলে গেল। কুমুদের কাজ আছে আজ বিস্তর। বিয়ের কাজ পড়েছে। দোকানে বিয়ের দরুণ এমন বেশী কাজকর্ম পড়লে, হরিহর বাইরে থেকে বাড়তি কারিগর আনায়, নয়তো কুমুদ একলাই অন্য সময় সবকিছু করে।

হরিহর আজ কদিন বাড়তি কারিগর নিয়ে কাজ করছে। একপাশে কুমুদ ঘাড় গুঁজে চুড়ির উপর ছিলা কাটছিল, বাইরে থেকে আওয়াজ ভেসে এল,—মিস্তিরী মশাই, আছেন নাকি?

হরিহর মাথা তুললো,—দেখতো কুমুদ, বেচনের বাপের গলা পাচ্ছি যেন।

উঠে এল কুমুদ। দোকানের বাইরের ধাপিটার উপর বেচনের বাপই বটে। কুমুদকে আসতে দেখে হাতখানা জড়িয়ে ধরলো,—কুমুদ ভাই, আমার মেয়েটার সেই রুলি দুগাছা বন্ধক ছাড়াতে এসেছি।

হরিহর সোনা-রুপোর গড়িত কাজ ছাড়া বাঁধা-বন্ধকীর কাজও করে। কুমুদ বললো,—এসেছেন তো ভিতরে যান। মিস্তিরী মশাই আছেন।

—থাকলে কি হয় ভাই, ও চশমখোর ব্যাটা তো একটা পয়সা সুদ ছাড়বে না। কিন্তু আমার যে আসল ছাড়া দেবার কোন ক্ষমতা নেই। অথচ ওটা গেলে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারবো না।

—এই তো আপনারা মুস্কিল করেন। আচ্ছা, আজ যান, আজ কিছু হবে না। পরশু নাগাত আসবেন, দেখি কি করতে পারি।

কিন্তু মুস্কিল যতই হোক এ মুস্কিল আসানের ভার কুমুদকে নিতেই হবে। কারণ মুস্কিল আসান না করতে পারলে কুমুদেরও স্বস্তি নেই। যে ঘাড়ে চাপে সেও ছাড়বে না। কাকুতি-মিনতি করবে, তাতে না হয় হাতে ধরবে, পায়ে পড়বে।

বড়লোক খন্দেরের বাড়ীর কাজ হচ্ছে। অনেক সোনার কাজ। ফারপোর হাঙ্গরমুখো বালা। বালার মুখের মধ্যে ঠেসে ঠেসে পান ঢোকাল কুমুদ। এরকম ধরণের কাজ হাতে পেলে কুমুদ ভারি খুশী। মনের আনন্দে গয়নার খিলেনে খিলেনে পান ঢুকিয়ে সোনাটুকু নিজের পকেটে তুলতে পারে। তিন ভরি সোনার বালা আধ ভরি পান ঠেসে হাঙ্গর-মুখো বালার মুখ বন্ধ করলো কুমুদ। ওজনে ঠিক, উপর বাইরে ঝকঝকে আজ্ঞা কুমুদের আধ ভরি লাভ। কুমুদ ভারি সুদক্ষ কারিগর, খদ্দের পছন্দ করে ওর হাতের কাজ।

হাতের কাজ শেষ করে আধ ভরি সোনা পকেটে ফেলে পাঁচিদের বাড়ী যাবার জন্যে উঠলো কুমুদ। আজ কদিন অসময়ে বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তাঘাট প্যাচ্ প্যাচে। পাঁচিদের বাড়ী ঢোকার মুখে দেখলো দরজার গোড়ায় হাঁদা বসে আছে। চোখেমুখে রাগের চিহ্ন। কুমুদকে দেখেই বললো,—এই যে কুমুদদা, মুখপোড়া মেয়েটার একটা গতি করতে পার? কানা হোক খোঁড়া হোক,—যেমন হোক ও আপদ গলা থেকে নামাতে পারলে বাঁচি।

—কেন রে। কি হলো।

—কি না হল! সখ হয়েছে। উনি উল কিনে সোয়েটার বুনবেন। তা আমি বলেছি টাকা নেই, পরে দেব, তা ওনার সবুর সইছে না, এখনই চাই। হাঁদা দাঁত খিঁচোলে—কি আমার নবাব খাঞ্জা খানের বেটি—

অসাবধানের কথাটা জিব কেটে সামলে নিল হাঁদা।

—আমি চললুম কুমুদদা, আহ্লাদী রইলেন, একটু দেখো। উনি বুঝি এখনও ভোজন করেন নি!

বোঁচকা-বুঁচকী কাঁধে ফেলে হাঁদা উঠলো। ঘরে ঢুকলো কুমুদ। তক্তপোষের উপর শুয়ে আছে পাঁচি, চোখে জল।

কুমুদ পাঁচিকে কিছু একটা বলতে যাবার মুহূর্তে কানে ভেসে এল একটা বুকচাপা কান্নার স্বর। অনেকের মিলিত গলা, কান্নার শব্দটা সারা গলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে।

তক্তপোষের উপর তেড়ে উঠলো পাঁচি। পাঁচিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমুদ।—কে কাঁদছে রে, কার কি হল!

এ প্রশ্ন পাড়ার প্রত্যেকটি লোকের মুখে, মিলিত কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ পেলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ কৌতূহলী হয়, ছুটে যায়, দেখে।

যা সন্দেহ করেছিল কুমুদ তাই, খুকীদের বাড়ী থেকে শব্দটা আসছে। গুমরে গুমরে যন্ত্রণা-কাতর পশুর মত বিরামহীন কান্না। বাড়ীর ভিতর থেকে দুজন ডাক্তার গম্ভীরমুখে বেরিয়ে আসছেন।

নিজের পা দুখানা রাস্তার উপর আটকে গেল। সমস্ত শরীর পঙ্গু অসাড়। গলির মধ্যে একজন দুজনের ভীড় জমছে। কুমুদ অনড় পা দুখানাকে টেনে টেনে খুকীদের বাড়ীর সামনে থেকে সরিয়ে এনে দোকানে ঢুকলো। কাজকর্ম তেমন নেই, দুপুরের রান্না করাই আছে, কুমুদ বিছানা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

ছোট সংকীর্ণ গলিটার মধ্যে যে কজন মানুষের বাড়ী আছে, সেই সমস্ত বসবাসকারী সব বাড়ীর মানুষগুলোই কুমুদের চেনা, একান্ত পরিচিত। বিপদে-আপদে সহায়-সম্পদে—সব অবস্থায়। সুবর্ণ কুটিরে সোনার বাটের উপর হাতুড়ী ঠুকতে ঠুকতে এ গলির মধ্যে কে ঢুকলো কে বেরোল তার সবটুকুই নজরে আসে কুমুদের। আজও দেখলো ফুলের বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত খুকী নিঃশব্দে চলে গেল। জেগে থাকলে বলতো—কুমুদ মামা, কি করছো গো? কি গয়না গড়ছো?

How marvellous its effect!
যে জিনিষেই ছড়াও না'কো "টিম পাউডার" দেখবে কেমন চমক দিয়ে ফুটবে বাহার
TIM
For business enquiry please write to
Nu York Chemical Industries,
66, Cornwallis Street, Calcutta-6.
Phone—55-4749
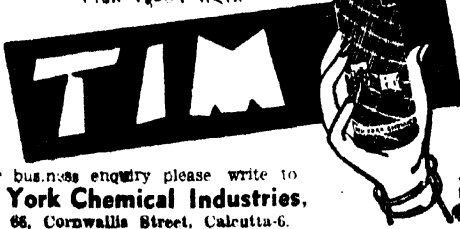
গাঙ্গুরামের ৪টী শ্রেষ্ঠ অবদান
দধি
রাবড়ী
সন্দেশ
চমচম
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
২২।১, গড়িয়াহাট রোড, কলিঃ-১৯, ফোন ঃ ৪৬-৫১৪৭
১৫৯দি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬।

সারারাত কুমুদের ঘুম এল না। খালি ভাবলো, অস্থির হয়ে শুধুই ভাবলো। পরের দিন, সকাল বেলায় খুকীদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। নিস্তব্ধ বাড়ী, দ্বারিকের নাম ধরে ডাকাডাকি সুরু করলো কুমুদ।

আরও খানিক পর নীচে নেমে এলেন ভদ্রলোক। কুমুদের হাতে তখন লাল মানিব্যাগ। কোন ভণিতা না করেই ব্যাগটা এগিয়ে ধরলো,—দ্বারিকদা, এটা আপনার।

দ্বারিকের শোকাচ্ছন্ন মূর্তি মুহূর্তে পাল্টে গেল। নিরুত্ত চোখে উত্তেজনা, ছোঁ মেরে কুমুদের হাতথেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন। —এ ব্যাগ তোমার কাছে এল কি করে.

—যেমন করে আসে। প্রথম দিন খুকীকে দেখতে এসেছিলাম দেখি ব্যাগটা টেবিলে পড়ে আছে। আপনারা কেউ লক্ষ্য করেন নি। সেই সময় আমার টাকার খুব দরকার ছিল।

সোজা সরল উক্তি। স্পষ্টবাদিতায় দ্বারিকবাবু স্তম্ভিত। বললেন,—তুমি চোর?

কুমুদ হাসলো,—যা বলেন।

ভদ্রলোক প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। শেষে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন,—জান, তোমায় আমি পুলিশে দিতে পারি?

জানি। কুমুদ ঘাড় নিচু করে মাথা চুলকালো। তবে আপনার পুলিশ আর কতটুকু শাস্তি দেবে, কাল থেকে আমি এমনিতেই যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছি, নয়তো কুমুদরঞ্জন যোষাল যেচে হাতে করে পুলিশের কাছে ধরা দেবার জন্য কি আর ব্যাগ এনেছে।

দ্বারিকবাবু কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। এক সময় জড়িত গলায় বললেন,—জান কুমুদ, এই টাকাটা থাকলে খুকীর আমি আরও ভাল করে চিকিৎসা করাতে পারতুম। দুঃসময়ে খুব চুকে তুমি আমার এত বড় ক্ষতি করলে?

পরেরদিন গলির মুখে লাল পাগড়ীর আভাষ। লাল পাগড়ী দেখেই কৌতূহলী মানুষের ভীড় লেগেছে। ভীড়টা জমে উঠেছে হরিহরের দোকান ঘরের সামনে, অর্থাৎ সুবর্ণ কুটিরের সামনে। দ্বারিক নয় আসামী ধরিয়েছে হরিহর। হরিহর দোকান ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছে,—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! চোরের সাথী চোর, আমারই খেয়ে পরে মানুষ হয়ে আমার ঘরে চুরি!

বেশী কিছু নয়, হরিহরের সিন্দুক থেকে বেচনের দরুণ বাঁধা খাতা রুলি দুগাছা পাওয়া যাচ্ছে না। কুমুদ স্বীকার করেছে—জিনিষটা ও নিজে নিয়েছে এবং খরচও করেছে।

বাপের জ্বালায় হরিহর পুলিশ ডেকেছে।

পুলিশকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পাঁচুদের বাড়ী ঢুকলো কুমুদ। চোরকে দেখার জন্য মানুষের ভীড় একটা দেখবার মত। কৌতূহলী মানুষ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে গুলতানি করছে, সমালোচনা করছে। কুমুদের কোন দিকে নজর নেই। মাথার উপর থেকে বোঝা নেমেছে—তাই আনন্দে মশগুল।

অন্ধকার ঘরে একপাশের উপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে পাঁচি। কেউ নেই। কোথায় বেরিয়েছে। দরজা খোলা। পাশে দাঁড়ান। ভিতরে ঢুকলো কুমুদ।

কেঁপে কেঁপে ওঠা পিঠের উপর হাত রাখলো কুমুদ। পাঁচু ওঠ, দেখ, বিয়ে করবো বলেছি যে, এমন সময় কাঁদিস কেন?

বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পাঁচি। কুমুদদা, তুমি কেন

বাকি কথাটা মুখ দিয়ে বেরোল না। বুকের গলার মধ্যে না বলা থেকে গেল। কিন্তু পাঁচির মুখ দিয়ে যে কথা বলা হলো না, সে কথার সবটুকুই জানা হয়ে গিয়েছে কুমুদের। আরক্ত মুখ, রুদ্ধ গলা, জল ভারাক্রান্ত দুটো চোখ—পাঁচির মনে এত বড় ভালবাসা কোথায় লুকোন ছিল, কুমুদ সে কথা কখনও জানতে পারেনি, এতটুকু সন্ধান পায়নি।

আস্তে করে মাথায় পিঠে হাত বুলাল কুমুদ,—এমন করে কেন ভালবেসে মরলি পাঁচি? আর তলেই যদি বাসলি, একবার বললি নে!

একি মুখে বলা যায়, এতো বোঝার জিনিষ! তুমি বোঝনি?

কি করে বুঝি বল,—রূপের মধ্যে এই যে পোড়া কাঠের মত চেহারা, গুণের মধ্যে চুরি—এমন মানুষকে কেউ ভালবাসে তা কি আমিই বুঝেছিলুম!

দরজার বাইরে থেকে লাল পাগড়ী হাঁক লাগিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল পাঁচি। চোখের জলে সবকিছু ঝাপসা, বিবর্ণ।

—তোমায় ওরা ধরে ছাড়বে কুমুদদা?

—ওরা তো জানি না, ওরা না ছাড়লে আমি নিজেই পালিয়ে আসবো. পিছনে ভালবাসবার মানুষ আছে জানা থাকলে মানুষে সাগরের তলায় যেতে পারে, হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে পারে, আর আমি জেলের দুটো গরাদ ভাঙতে পারবো না? খুব পারবো। তুই কিছু ভাবিস না, আমি আবার শিগগিরই আসছি।

নিজের ঝাপসা চোখে পাঁচির জলভরা দুটো চোখ মুছিয়ে দিল কুমুদ।

যূথী পিসীমা

(২২৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমাদের চিঠির আদান-প্রদানের খবর স্বামী কিছুটা জানতেন। এখনও ঠিক চিঠির মতই হ'ল। কলকাতা যাবার প্রধান কারণ গোপন করলুম। মায়ের অসুখ—মাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে—এই কথাই স্বামীকে বললাম। মা চিররুগ্না—উনি সহজেই বিশ্বাস করলেন। একটু আপত্তি করেছিলেন একা যেতে দিতে—ওঁকে বুঝিয়ে রাজী করলুম।

ট্রেনে ওঠামাত্রই কিন্তু স্বামীর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এতদিন কখনও স্বামীকে ছেড়ে থাকিনি। কলকাতায় এসে কিছুই ভাল লাগে না। কোন রকমে কয়েকদিন কাটিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম।

পৌঁছে, ষ্টেশনে স্বামীকে না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। নানা রকম অমঙ্গল আশংকা করতে করতে নিজেই একটি গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে গেলাম। দরজা জানালা সব বন্ধ। হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া নয়—স্বামী ছেড়েই দিয়েছেন বাড়ীটা। দরজার গায়ে বড় বড় তালা ঝুলছে।

অবাক হবার মত মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না। সেখান থেকে দেড় মাইল দূরে ওঁর এক বন্ধুর বাড়ী, ঐ গাড়ীতেই সেখানে গেলুম। বন্ধু বাড়ীতেই ছিলেন। আমাকে দেখে বেরিয়ে এসে কি রকম এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু না, ভয়ের কিছু নেই। স্বামী অসুস্থ হননি। তিনি শুধু ঐ বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন ঠিকানা বন্ধু জানেন না... ।

ব্যাপারটা এমনিতেই যথেষ্ট রহস্যময়; আমি আরও অবাক হলাম বন্ধুর ব্যবহারে। উনি একবারও আমাকে নামতে বললেন না।—অথচ ওদের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। আমার সব প্রশ্নের উত্তর তিনি এমন কঠিন বিরক্তির সঙ্গে দিলেন যে, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া একটি কথা বলতে পারলাম না।

কলকাতায় ফিরেই কিন্তু রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। আমার নামে একটি চিঠি—একটি প্যাকেট। খামের উপরে স্বামীর হাতের লেখা দেখে দ্রুত চিঠিটা খুললাম। সম্বোধনহীন দুটি লাইন, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কারণ জানতে হলে প্যাকেটটি খুলো।'

প্যাকেটে একটি মেয়ের ছবি উচ্ছল যৌবন ভারে মেয়েটি যেন পাগল হয়ে উঠেছে। এবং তারই স্বাক্ষর মেয়েটির চুলে, ঠোঁটে, চোখে, তার সারা শরীরের সৌন্দর্যের ছন্দে। ছবিটি ঐ সম্পাদকের লেখা.....

পিসীমা চুপ করলেন। কিছুক্ষণ থেমে এক নিঃশ্বাসে বললেন, ছবিটি আমারই প্রতিকৃতি। সেদিকে একবার চাইতেই চোখে পড়ে পিঠের নীচে কালো একটি জড়ুল—জড়ুলটির চারিপাশে অসম বৃত্তাকারে একটি লাল রেখা—

চরিত্রহীনা অপবাদ দিয়েই স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছিলেন এবং সেই অপবাদ মাথায় নিয়েই নীরবে চলে এসেছিলাম।......

তারপরে, অনেকদিন কেটে গেছে। বহুদিন ওঁকে নিয়ে গল্প লিখতে বসেছি। কিন্তু পারিনি। ওঁর কথা মনে হলেই মনে হয় সেই কথা—'সেই অপবাদ মাথায় নিয়ে নীরবে চলে এসেছিলাম'; তবে কি অপবাদ সত্য নয়!

আজ হঠাৎ যূথী পিসীমার চিঠি পেলাম। উনি লিখেছেন, কল্যাণীয়াসু, অনেক কাগজেই আজকাল তোমার লেখা দেখতে পাই। হয়ত কোনদিন আমাকে নিয়ে লেখা গল্পও বেরুবে। কিন্তু, গল্পের উপসংহারে কি লিখবে বল তো। তাই আমি আজ তোমাকে একটি কথা জানাচ্ছি। অনেক প্রমাণের বিরুদ্ধে একটিমাত্র বিশ্বাসের কথা।'

এরপর, চিঠির অনেকটা জায়গা ফাঁকা। যেন উনি অনেকক্ষণ ভেবেছেন। পরে একদম শেষে শুধু একটি লাইন, 'সেই সম্পাদকটির সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি।'

জার্মাণরা গোমড়ামুখো, ইংরেজরা রাম দাম্ভিক, ফরাসীরা চতুররসিক, ইটালিয়ানরা কথায় বক্কেশ্বর, ডেনরা ডানপিটে, রাশিয়ানরা রাশভারি ও ভদকাসেবী, অব আমেরিকানদের রকমটা কেমন? চুইংগাম-খেগো, মাথায় কদমছাট লাগান, কথার স্বরে গলার চেয়ে নাকের আওয়াজ বেশি, বন্ধুত্ব করতে সদা উপুড়হস্ত। যেখানে বাঙ্গালী সেখানেই দুর্গা-কালী, সেখানেই পাঁঠা বলি সেখানেই দলাদলি, সেখানেই গালাগালি। আর যেখানেই আমেরিকান সেখানেই টেলিভিশন, সেখানেই গাড়িজুড়ি, সেখানেই ঘোরাঘুরি, সেখানেই হটডগ। যেখানেই বাঙ্গালী সেখানেই আড্ডা। যেখানেই আমেরিকান সেখানেই ম্যানহাটান ও মার্টিনি।

ম্যানহাটান ও মার্টিনি হল এদেশের দুটি প্রিয় ককটেল। আমেরিকান ককটেল সভ্যতার দুটি নিয়াস। নিউ ইয়র্কের বাইরে থেকে কেউ এলেই রাতারাতি কেমিস্ট হয়ে যায়। এ ককটেলএ কতটা হুইস্কি, কতটা ভেরমুথ, কতটা জিন মেশান আছে তা যাচাই করতে। বহু ঘাটের জল নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীতে মিশেছে। আপনি এসে মেশোন—জল ধরে এনে মেশান হয়েছে। কৃত্রিম প্রয়াগ। হাডসনের সঙ্গে জর্ডনের জল, ভলগার জল, গঙ্গার জল। সত্যি একাকার হয়েছে? সাদা আমেরিকানদের সঙ্গে কালো আমেরিকানরা মিশে গেছে শুনি। কতটা গভীর কতটা আন্তরিক কতটা নিঃশ্বাসে ভরে। জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তরখানাটা এক-খানা দেশলাইয়ের বাক্সের মত—বিরাট বাড়ীটা এখানেই সাজসজ্জা করে পূর্ব-নদীর ধারে (ইস্ট-রিভার) দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু গ্রেগরী পেগ আর মার্লিন মনরো নিয়ে সারাটা আমেরিকা ভর্তি নয়। আমেরিকায় জেফারসন, আব্রাহাম ও ওয়াশিংটনের মত লোক ছিলেন। আর বেশিভাগ লোকই আমাদের হরি যদু মধুর মত। শুধু যা তারা সুট প্যান্ট পরে কম্যুউনিজমের নামে জুজুর ভয় পায়, কিন্তু ভাবনাচিন্তায় সব দেশের সাধারণ লোকের মত সেই এক সাচ্চা উপলব্ধি—দিনগত পাপক্ষয় কি করে সুখে পরিবার নিয়ে ঘর করব, ছেলে মানুষ করব, তারপর বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করে কাশী বৃন্দাবনের মত যিশু ভজনা করব। এখানকার মেয়েমহলেও আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী বরদাসুন্দরীরা আছেন, মধ্যবয়সী সুহাসিনীরা এবং হালের কালের ইভা-ইরারা। সবাই আছেন, শুধু যা অন্য নামে অন্য গা গতরে। শাড়ীর বদলে স্কার্ট ব্লাউজের আচ্ছাদনে। এইসব সাধারণের পক্ষে যারা অসাধারণ তাদের মুখচ্ছবি বিনারঙে কালো পেনসিলে সাদা কাগজে আঁকলে দেখাবে কেমন?

নিউ ইয়র্ক দ্বীপের নাম ম্যানহাটান। এই দ্বীপের মধ্যে আকাশছোঁওয়া বাড়ীর ঘন বসতি আর বৃত্তের বাইরে জলের সারি। পাপ দাঁড়ায় না, সমুদ্রে ধুয়ে চলে যায়। ডলারও দাঁড়ায় না—পকেটে এলেই পালাই পালাই করে। নিউ ইয়র্ক সাড়া আমেরিকার প্রতীক নয়। আমেরিকাও নিউ ইয়র্ক নয়। সব বৃত্তের যেমন এক কেন্দ্র, তেমনি সারা আমেরিকার এক নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক দিয়েই আমেরিকা পরিক্রমা শুরু।

*   *   *

নিউ ইয়র্কের দমদম হল আইডেল ওয়াইল্ড। সহরের বাইরে কয়েক মাইল দূরে। আসতে না আসতেই আবার আইডেল ওয়াইল্ড-মুখো হবার কারণ ঘটল। সঙ্গে আনা একখানি সুটকেশ উদ্ধার করে আনার জন্যই যাবার প্রয়োজন হয়। সুট প্যান্ট হারালে এখানে তার ব্যবস্থা হওয়া কঠিন নয়। কিন্তু কানজিভরম, মুর্শিদাবাদী, কটকী, কাশ্মিরী ইত্যাদি গেলে কি কোন উপায় থাকতে পারে? শুনেছি নয়। তাই বিশ্বাজিত পায়ে কোন পর্যন্ত প্যান আমেরিকান কাউন্টারে ঢুঁ মারা হল।

ছিপছিপে মহিলাটি কথা শোনার আগেই প্রায় সব বুঝে ফেললেন। জানালেন সুটকেশ ঠিক আছে। নিজে রদ্দুরে আইসক্রীম গলে যাওয়ার মত গলে মিষ্টি হেসে বললেন সেদিনের যাত্রীরা ভাগ্যবান, কারণ এত অল্প সময়ে এর আগে জেট কখনও অতলান্তিক পার হয়নি—মাত্র ৫ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে এই রকম একটা দুটো আলগোছা কথা বলার পর মহিলাটি জানালেন যে সুটকেশটি আনতে হবে এখান থেকে খানিক দূরে আর একটা বাড়ী থেকে। সেটা মাল রাখার বাড়ী—কার্গো সিটি।

ধন্যবাদ জানিয়ে কার্গো সিটির দিকে পা বাড়ান গেল। দূরে আইডেল ওয়াইল্ডের মস্ত ল্যানডিং গ্রাউন্ড। মানুষের তৈরী তাবড় তাবড় সব [illegible] পাখী। কোনটি উড়ছে, কোনটি নামছে, কোনটি বা মেডে ঘুমুচ্ছে। খুসী হয়ে আমরা রসগোল্লা পানতুয়া খাই, এরা হাজার হাজার মাইলের দূরবেশ হুসহাস করে গিলতে পারে। মাইল হজম করেই না দূর বলে কোন কিছুকে আর থাকতে দেয়নি।

কার্গো সিটিতে প্যান অ্যাম শেড চিনে ভিতরে এগলুম। বড় গোছের একটি হলঘর। ঢুকেই বাঁ দিকে চারজন কাস্টাম অফিসার টেবিল জাঁকিয়ে বসেছেন, মাল পরীক্ষা করে ছাড়পত্র লিখে দেবার জন্য। আর ডানদিকে প্যান অ্যাম কর্মচারীরা যাত্রীদের রসিদ দেখে সুটকেশ, অন্যান্য মাল ভিতরকার শেড থেকে নিয়ে আসচেন। যন্ত্রের মত কাজ চলেছে। লোকে আসছে, রসিদ দেখাচ্ছে, খানিক অপেক্ষা করার পর নিজের নিজের মাল হাতে পেয়ে কাস্টাম অফিসারদের কাছে পরীক্ষা করাবার জন্য নিয়ে আসচে। নিজের রসিদটা দিয়ে অপেক্ষা করছি কখন খোদ কোম্পানীর সুটকেশটি লক্ষ্মী ছেলের মত আবার সুড় সুড় করে হাতে ফিরে আসবে। অবশেষে তিনি সত্যিই এলেন—শাড়ী ভর্তি সুটকেশ। যাক বাঁচলুম—সব শান্তি। ঠিক এমনি সময় ফুটি ফাটার মত সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল হাসির রোল। হঠাৎ একবার মনে হল আমার উপর কটাক্ষ করে হাসি নয় তো।

ব্যাপার তখনও বোধগম্য হয়নি। হাসির বোমাটা ফেটেছে ওইদিকে কাস্টাম অফিসারদের দিক থেকে। এবার ঘাড় ফিরিয়ে লোকের মাথার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সর্বপ্রথম যে বড় অফিসারটি বসেছেন তার টেবিলের দিকে সবাই ভীড় করে কি একটা জিনিস দেখছে। বুঝতে দেরী হল না। একটা কাগজের মোড়কের মধ্যে থেকে চার পাঁচটা আমাদের দেশের তৈরী লম্বা লম্বা জরীর মালা বার হয়েছে। সেগুলোই এই পুলকের কারণ। ইতিমধ্যে বড় কাস্টাম অফিসারটি একটি জরীর মালা নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছেন এবং অন্য কাস্টাম অফিসারদের বিতরণ করতে ব্যস্ত। অবিলম্বে তাঁরা সবাই টেবিলের উপর চড়ে, গলায় মালা দুলিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে লাললা লা সুরু করে দিয়েছেন। এই দৃশ্য যারা এতক্ষণ দর্শকের ভূমিকায় দেখছিল তারাও নাচের তালে তালে তালি বাজিয়ে সুরু করে দিয়েছে। কোনদিকে কারু ভ্রূক্ষেপ নেই, টেবিলটা হয়ে উঠেছে একটা স্টেজ। গুদামের ভিতর থেকে যে সব নিগ্রো ছেলেরা মাল এনে দিচ্ছিল তারাও এসে ভীড় বাড়াল। বেশ জোরসে রকেনা রকেনা চলতে লাগল। খানিক এগিয়ে এসে টেবিলের নীচে মোড়কের কাগজটিতে চোখ পড়তে দেখলুম প্যাকেটটি এসেছে পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় সহর থেকে—দেওয়ানী অভিনন্দন শ্রীসুরজিৎ সিং-এর নামে।

দশ পনের মিনিট বাদে ঘরের হুল্লোড় থেমে গেল। নাচ বন্ধ হল, যে যার কাজের জায়গায় ফিরে গেল। আবার সুরু হল কাজ। নিজের বাক্স পরীক্ষার জন্য বড় কাস্টাম অফিসারটির কাছে আসতেই তিনি বাঁয়ে বললে এদিকে, ওদিকে, মাঝখানে

(শেষাংশ ২৩৯ পৃষ্ঠায়)

লক্ষ্মী আবাহন

শ্রীমতী সুষমা দেবী

অম্বর দাঁড়িয়েছিল, হাতে তার বিলাতি এয়ার মেলের একটা চিঠি। সে অনেক চিঠি লেখবার পর শ্রীলতা সামান্য ক'লাইন জবাব দিয়েছে, নিতান্তই সাদাসিধে, তবে ভালোর মধ্যে এই যে, শ্রীলতা ফিরছে। তারিখ সময় পর্যন্ত সে জানিয়ে দিয়েছে।

শ্রীলতা সত্যিই তা হলে ফিরছে? লণ্ডনে একটা বড়ো হাসপাতালে এতদিন সে কাজ করছিল। পরীক্ষাগুলো ঠকটক করে পাসও করে ফেলেছে। এবার আর ওদের মিলনের কোনও বাধা নেই, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অম্বরের সুদিন আসছে।

অম্বর সাংবাদিক, খবর সংগ্রহ ও লেখা নিয়েই ওর কারবার। সেবার এখানকার অফিস থেকেই ওকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিল। সেখানে যাবার কিছুদিন পরেই মিসেস কীর্লিং-এর পার্টিতে শ্রীলতার সঙ্গে ওর প্রথম দেখা। তার ধরণ-ধারণ দেখে অম্বর প্রথমে এগোতে পারেনি। যদিও বিদেশে সমবয়সী বাঙালী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ইচ্ছা তার খুবই হয়েছিল। শেষে মিসেস হেউড ওদের পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিন থেকেই কী যে অম্বরের হয়েছিল, যেন তাকে নেশায় পেয়েছিল, কাজ-কর্ম সব মাথায় উঠেছিল। তার পর কত অপরাহ্ন, কত সন্ধ্যা শ্রীলতার পাশে কাটিয়েছিল, এখন সে সব মনে হলে তার সারা শরীর নাড়া দিয়ে ওঠে।

শ্রীলতা হাসপাতালের কাজে সব সময়ে ব্যস্ত থাকত, তবু ওরই মধ্যে চোখে মুখে তার ব্যাকুলতা ফুটে উঠত। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাতে হাত দিয়ে দুজনে পার্কের নির্জন বেঞ্চে বসে কত, কত কথা তারা বলে যেত। অম্বর যেদিন দেশে ফেরে সেদিনের কথা আজও সে ভুলতে পারে না। শ্রীলতার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল, বেরিয়ে আসা কান্না চাপতে সে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়েছিল দেখে অম্বরের বুকটা মুচড়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, "তোমার আসাপথ চেয়েই থাকব, শ্রী। তুমি [illegible] করে [illegible] আর [illegible] পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারব না। তোমার কোনও কাজে আমি বাধা দোব না, শুধু আমায় তোমার সঙ্গ দিও। তোমার সংসারে, তোমার ছায়ায় আমি শান্তিতে থাকতে পেলেই কৃতার্থ হব। আগে থাকতে জানিয়ে রাখছি কিন্তু ভয় পেও না—আমার সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার কাঁধে চাপিয়ে দোব।" শুনে ওর দিকে চেয়ে শ্রীলতা মিটি মিটি হেসেছিল। তার সে মুখখানা এখনও যেন অম্বর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঐ ত দূরে নীল আকাশের গায়ে শ্রীলতার শ্যামবর্ণ মুখখানা ফুটে রয়েছে, বড়ো বড়ো টানা চোখের পাতাগুলো ঝপ ঝপ করে উঠছে নামছে।

শ্রীহীন ঘরখানার দিকে চেয়ে অম্বর মনে মনে হাসল। আর বেশী দিন নয়, এবার এ ঘরের চেহারা বদলাবে। মার্জিতরুচি শিক্ষিতা একটি নারীর হাতের স্পর্শের জাদু পেয়ে প্রাণহীন মলিন ঘরখানা সুন্দর, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অম্বরের এই একঘেয়ে জীবনের রিক্ততার অবসান হবে।

জানলার কাছ থেকে সরে একটা চেয়ারে বসে অম্বর সিগারেট ধরাল। অনেকক্ষণ ধরে সে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগল, আর সেই সঙ্গে নানা জল্পনা কল্পনা করে চলল। আজ দু'বছর ধরে যা টাকা সে জমিয়েছে তাতে ওরা বিয়ের পর অনায়াসে দার্জিলিঙে, এমন কি কাশ্মীরেও গিয়ে দু'তিন সপ্তাহ হানিমুন করতে পারবে। শ্রীর যদি ইচ্ছা হয়, তা হলে না হয় আরও কিছুদিন বাড়িয়ে নেবে।

টেবিলে নানারকম কাগজ স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। গ্লাসের জল কতদিন একইভাবে থেকে ঘোলা হয়ে গেছে। তক্তাপোষের উপর বিছানাটা নিতান্তই অচল, ছেঁড়া চাদর ও ওয়াড়ের ভিতর দিয়ে তোষক বালিশের প্রকৃত রূপ বেরিয়ে পড়ছে। না, শ্রীলতার আশায় বসে থাকলে চলবে না, এখন থেকেই একটু একটু করে সব গুছিয়ে ফেলতে হবে। শ্রীলতা ওকে বড়োলোক না ভাবলেও গরীব ভাবতে [illegible] এই [illegible] প্রথম থেকেই শ্রীলতার কাছে প্রকাশ হলে খুব সুখের হবে না।

আধভেজানো দরজা ফাঁক করে শ্যামল ঘরে ঢুকল। সে ওর বন্ধু, দু'জনে একই কাজ করে। "কী ব্যাপার অম্বু, চুপ চাপ যে? খবর পেলাম আমায় শীগ্‌গির জাপান যেতে হবে। তোকেও বোধ হয় বাইরে কোথাও যেতে হবে।"

"আমাকে?" অম্বরের চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল।

"হ্যাঁ, তোকেও।"

"না ভাই, তা সম্ভব হবে না। আমি যেতে পারব না, তাতে যদি কাজ ছাড়তে হয় তাও ছাড়ব।"

"পাগলামি ছাড় অম্বু। এমন সুযোগ পাবি কোথায়? পরের পয়সায় দেশ দেখা আর কাজ, দুইই হবে।"

"হলেও উপায় নেই। শ্রী ফিরছে, আমার যাওয়া এখন অসম্ভব।"

"কবে ফিরছে? কবে?" উৎসুক হয়ে শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

"দ্যাখ্ না চিঠিখানা।"

"সে কি রে আপত্তি নেই তোর? ফিয়াঁসের চিঠি—না, না।"

"শ্রী চিঠিতে কোনও কথা লেখে না। লেখা ওর বাঘ! স্টেথোস্কোপ আর ল্যান্‌সেট ফরসেপ্‌স নিয়ে দিনরাত ও এত ব্যস্ত থাকে যে, অন্য কিছু আর হয়ে ওঠে না।"

টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে শ্যামল এক নিমেষে পড়ে ফেলল। মাত্র ক'টা লাইন লেখা, পড়তে সময় লাগে না। চিঠিখানা খামে পুরে শ্যামল টেবিলে রেখে দিল। "দূর! এ কি চিঠি? যেন নেহাৎ দায়ে পড়ে লেখা, এ মেয়েকে বিয়ে করে তুই কী করবি অম্বু? ওর কাছ থেকে ডাক্তারির প্রেসকৃপশান আর হিতোপদেশ ছাড়া কিছুই পাবি না, নিতান্তই মরুভূমি!"

"না রে, তুই যা ভাবছিস তা নয়। আমি বিলেত থেকে ফেরবার পর প্রথমদিকে শ্রী যে

...ঠিগুলো লিখেছিল সেগুলো তোকে দেখাব একদিন। পড়লে বুঝতে পারবি ওর মনের ভেতরটা কী রকম।"

"হ্যাঁরে, চা খাবি? দিতে বলব?"

"না, এই মাত্র খেয়ে বেরিয়েছি। তা তুই যে আজ ঘরে বসে? বেড়াতে যাসনি? ভাগ্যিস যে তোর দেখা এমন অসময়ে পাব। একটা জরুরি খবর জানবার ছিল, এখন কি তোর সময় হবে?"

"না ভাই, আজ আর কিছু পারব না। তোকে কিন্তু আমায় সাহায্য করতে হবে। দেখছিস ঘরের অবস্থা? এটাকে না ফেরালে শ্রীকে আনব কোথায়? শুধু একখানা ঘর এতে চলবে না। মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাট একটা দেখতেই হবে। ভালো রাস্তার ওপর চাই, নইলে শ্রীর প্র্যাকটিসের অসুবিধে হবে। তার একটা ছোটখাটো চেম্বার চাই। খাবার ঘরও একটা চাই, এতদিন বিলেতে বাস করে ফিরছে, সেটা ত ভাবতে হবে? তার মতো মেয়ের উপযুক্ত বাবস্থা যদি না করি, মনে হয় ত আক্ষেপ করবে। তুই, শ্যামল, ভালো দেখেই একটা ফ্ল্যাট দ্যাখ্‌। ভাড়া একটু বেশী হলে আর উপায় কী? আমরা দুজনে রোজগার করে ম্যানেজ করে নোব।"

"বিয়ে কবে?"

"এখনও ঠিক হয় নি। শ্রী এসে কলকাতার মাটিতে না পা দিলে কী করে ঠিক হবে? তার আগে আমি কিছু ফার্নিচার কিনতে চাই, ডবল সাইজের খাট একটা, ড্রেসিং টেবল, ওরই সঙ্গে ম্যাচ করা একটা আলমারি। আলনাও একটা চাই, নইলে শ্রী কাপড় চোপড় রাখবে কী করে?"

"কেন, শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু পাবি না? ও সব আবার কেউ কেনে নাকি?"

না রে, সে গুড়ে বালি! ওরই কাছে শুনেছি সে রকম আপনার লোক কেউ নেই। অনেক কষ্টে ডাক্তারি পড়ে গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গেছে।

আচ্ছা আর তাহলে তোকে দিয়ে কিছু হবে না? দেখি, নইতো কি অপর কারও কাছ থেকে খবরটা জোগাড় করতে পারি কি না। আমায় আবার মাসিমাকে নিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বেচারি চোখ নিয়ে ক'দিন ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছে, রাঁধতে অবধি পারছে না। চাকরটা নেহাৎ আনাড়ি, কোনও কর্মের নয়। নিজেই হাত পুড়িয়ে আর ভাত পুড়িয়ে যা কাণ্ড করছি বলবার নয়! শ্যামল বেরিয়ে গেল। অম্বর একই ভাবে বসে সিগারেট টানতে টানতে স্বপ্নরাজ্যে ঘুরতে লাগল।

* * *

ক'দিন চেষ্টা করেও শ্যামল আর অম্বর পছন্দ মত ফ্ল্যাট একটা জোগাড় করতে পারল না। বড়ো রাস্তার উপর যা আছে তার ভাড়া শুনে দু-বন্ধুই পিছিয়ে এসেছে। শেষে ঠিক হল আপাততঃ ঐ ঘরখানাই মানানসই করে সাজিয়ে রাখবে, সামনের বারান্দায় পার্টিশন দিয়ে খাবার জায়গা করে নেবে। ইতিমধ্যেই চারজনের মতো ছোট একটা খাবার টেবল ও চারখানা চেয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, সন্ধ্যার আগেই সে সব এসে পড়বে।

অফিস থেকে সকাল সকাল ফিরে অম্বর বসে টাকার হিসাব করছে। জিনিষপত্রের দাম যা সে আন্দাজ করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পড়ে গেছে। এরপর হানিমুনের জন্য হয়ত কিছু টাকা ধার করতে হবে। তা হোক গে, দুজনে রোজগার করলে শোধ করতে সময় লাগবে না। বিয়ের জন্য এক হাজার টাকা আগেই সে সরিয়ে রেখেছে। শ্রীকে অন্ততঃ একটা কিছু সৌখিন গহনা, আর ভালো দু-একখানা শাড়ি না দিলে চলবে না। গহনা কিনবে কি না ভাবছে, ওদিকে আবার শ্রীর যদি না পছন্দ হয়, কিন্তু তাকে অবাক করে দিতেও অম্বরের ইচ্ছা করছে।

শ্রীর আসবার আর দেরী নেই, মাঝে মাত্র চার দিন বাকী। বিয়ের দিন আগে থেকে ঠিক না হলেও সে এখানে বেড়াতে আসবে নিশ্চয়ই। তার ভবিষ্যৎ ঘরকন্না আগে দেখে নিলে কোন্ জায়গায় কোন্ জিনিষের দরকার বুঝে নিজেই সে ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিতে পারবে।

"ধনকেষ্ট, এই ধনকেষ্ট?"

"কি বাবু?" বলে রোগা হাড় বেরকরা যে লোকটি এসে দাঁড়ালো তাকে দেখলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। পেটটি বড়ো, মনে হয় পিলে-লিভার ভর্তি। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত রুক্ষ, এখানে ওখানে খাপচানো, উঠে গিয়ে টাক বেরিয়েছে। সাদা শাঁখ বেরকরা চোখ দুটো তুলে অম্বরের দিকে চেয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবু? কি চাইছ?"

"চা দিলি না? রোজ বললে তবে দিবি? তা হলেই মা এলে তুই কাজ করেছিস! নাঃ, তোকে দিয়ে বাপু হবে না, আমায় অন্য লোক দেখতেই হবে।"

কেন হবে নি? দু-বেলাই ত আমি এনে দিচ্ছি? চায়ের নয় একটু দেরী হয়েছে, তাই বলেই আমায় রাখবেনি? যাব কোথা? ...

কি খাবে, শুধু চা, না মোড়ের দোকান থেকে সিঙাড়া নেসে দুবো?

যা আনবি নিয়ে আয়। তোর কাপড়-চোপড়ের যা ছিরি, দেখলে হাতে খেতে ইচ্ছে করে না।

বেশ ত নেসে দাও না ভালো কাপড়-জামা? জানোই ত নেই? মা এসবে, তার আগেই নেসে দাও। নিজের ঘর ত গুছোতে নেগেছ!

আ মর হতভাগা! কথা বলতে শুধু জানে না। যা, বিদেয় হ'!

ধনকেষ্ট চলে গেল। টাকার সুবিধে করতে গিয়েই ঐ অপদার্থটাকে অম্বর রেখেছে। আজই শ্যামলকে বলবে দেশী বিলাতি রান্না জানে না ছাড়া বেয়ারার কাজও করতে পারে এই ধরণের একজন পাকা লোককে খুঁজে বার করতে হবে। মাইনে ত বেশী চাইবেই, উপায় কি? আরে ছ্যাঃ! ঐ ধনকেষ্টকে দিয়ে কি কাজ চলে? ওর মূর্তি দেখে শ্রীলতা মূর্ছা যাবে।

চা খাওয়া শেষ হতেই ফার্ণিচার এসে পড়ল। সেগুলি ঠিক করে সাজিয়ে রাখতে অম্বরের অনেক সময় গেল। জানলা দরজায় পর্দা না দিলে ঘরখানা মোটেই মানাচ্ছে না। ঐ সঙ্গে ফুলদানিও দুটো চাই। শ্রী ফুল বড়ো ভালবাসে। বিলাতে কারও বাগানে গিয়ে সীজন ফ্লাওয়ার দেখলে সে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে মিনিটের পর মিনিট চেয়ে থাকত কখনও বা আলতো করে নরম মসৃণ ফুলের গায়ে হাত বুলোত। তার দিকে চাইলে সে হেসে বলত, "কি মসৃণ, কি সুন্দর! দ্যাখো অম্বর? এদের সৌন্দর্যের তুলনা আছে পৃথিবীতে? চেয়ে থাকলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।" বাগান আর কোথায় পাবে অম্বর? গোটা কতক মাটির টব কিনে এনে ভালো দেখে কিছু ফুলের চারা লাগাবে।... হঠাৎ শাড়ি গহনার কথা আবার তার মনে পড়ে গেল। শ্যামলের ওখানে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক, কি করা যাবে। বাক্স খুলে বিয়ের জন্য তুলে রাখা টাকা থেকে তিন'শ বার করে সে পকেটে ভরে শ্যামলের বাড়ির দিকে রওনা হল।

* * *

আজ সকালে বম্বে মেলে শ্রীলতা এসে পৌঁছাবে। ভোরে উঠে অম্বর ঘরখানা দশবার দশরকম করে গোছাল। জানলায় সে নেটের পর্দা দিয়েছে। দরজায় হ্যাণ্ডলুমের মোটা কাপড় বেশ মানিয়েছে। কাঁচের সস্তা ফুলদানি দুটোতে ফুল সাজিয়েছে, কাল রাত্রেই সেগুলো মার্কেট থেকে কিনে এনেছিল।

অম্বরের ইচ্ছা, শ্রীকে সে সোজা এখানেই এনে তুলবে। নেই বিয়ে হল, তাতে ক্ষতি কি? দু দিন বাদেই ত হবে? শুধু শুধু হোটেলে উঠে অনর্থক কতকগুলো খরচ। চাকরকে ডেকে সে মাছ মাংস কিনতে বাজারে পাঠালে।

অম্বর ঘর আর বারান্দা ঘুরে ফিরে শিস দিয়ে বেড়াতে লাগল। মন তার উত্তেজনায় ভরে গেছে। কত দিন, ক—ত দিন পরে সে শ্রীলতাকে দেখতে পাবে! লণ্ডনের স্মৃতিভরা দিনগুলো কেবলই তার মনের মধ্যে এসে তোলপাড় করতে লাগল। ট্রেণ আসবে দশটায়। ষ্টেশনে যাবার রাস্তায় অম্বর ফুলের মালা ও তোড়া কিনে নিয়ে যাবে, শ্রীলতাকে আদর অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করবে না সে।

তাড়াতাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে অম্বর সা[illegible] পরতে গেল। হৈ হৈ করে শ্যামল আর মাসি[illegible] এল। "হল তোর, অম্বু? আমরা [illegible] আগেই তৈরি হয়ে এসে গেছি।"

"একটু দাঁড়া ভাই, আমারও হ[illegible] গেল বলে।"

"আঃ, কি এত সাজছিস? আজই বর হয়েছিস নাকি? বর সাজাবার ভারটা কিন্তু আমাদের হাতেই ছেড়ে দিস, অম্বু, দেখবি কি মার্ভেলাস সাজাব তোকে!"

আয়, আয়, আমার হয়ে গেছে। এ কি, বৌদি যে? আমি ত আপনি আসবেন আশা করিনি?

আপনি না করলেও আমি লোভ সামলাতে পারলুম না ঠাকুরপো। আপনার বন্ধুর কাছে আপনার হবু গিন্নীর এত গল্প শুনেছি, তাই আরও দেখতে এলুম। কেন, গেলে কি তিনি কিছু মনে করবেন? তা হলে নয় ফিরে যাই। আমায় ত তিনি চেনেন না?

তা কেন? দেখলে শ্রীর আনন্দই হবে। আমি ত তাকে চিনি। চেনা না থাকলে চিনিয়ে দিতে কতক্ষণ?

বাক্স খুলে অম্বর নতুন কেনা চুড়ি দুটো বার করল। সাদা পাতলা টিস্যু কাগজের এধার ওধার থেকে ঝকঝকে সোনার জেল্লা দেখা যাচ্ছে। কাগজ খুলে সে দুটো প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে অম্বর বলল, "বৌদি, আপনার পছন্দ আছে। সে দিন যদি আপনার শরণ না নিতুম তাহলে এমন সুন্দর জিনিষটি

(শেষাংশ ২৪৩ পৃষ্ঠায়)

কাল-বিম্ব

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

ছিহিও করে, না দেখেও পারে না। প্যারিসের 'ফোলিস্ বার্জার' বা নগ্ন-নৃত্যের আকর্ষণ এমনি সার্বজনীন। বিমানে যাত্রীদের হাতে হাতে সচিত্র হ্যান্ডবিল বিলি হচ্ছে, তাতে লেখা আছে, প্যারিসে এসে যদি রূপসী রমণীদের নগ্ন-নাচই না দেখলেন, তবে আর কি দেখলেন? এয়ার পোর্টে পৌঁছেও দেখবেন তারই বিজ্ঞাপন—প্যারিস ভ্রমণ আপনার স্মরণীয় বা রমণীয় করতে হলে, ফোলিস বার্জারে আসাই হবে আপনার উপযুক্ত নির্বাচন। প্যারিস বিদেশী পর্যটকদের সুখের স্বর্গ। সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, আর্ট, সংস্কৃতি দর্শন, বিজ্ঞান, ফ্যাসান ইত্যাদির মহাতীর্থ। মহানগরীর পরিকল্পনা থেকে পথ-ঘাট, পার্ক, মিউজিয়াম, এভিনিউ প্রাসাদ সবই যেন স্বপ্নময়। প্রমোদ বিলাসীর জন্য ধীর প্রবাহিনী সিন নদীতে বজরা আছে, বড় বড় থিয়েটার আছে, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব আছে, তবু আবার নগ্ন-নাচের আসর কেন? সভ্যতার রুচিবিকার বলে সবাই যা বর্জন করেছে, প্যারিস সেই অঘটনকে ঘটা করে হাঁকছে 'দেখে যাও!' 'দেখে যাও'। যা কোথাও কখনো দেখনি তা এখানে দেখতে পাবে। স্বর্গের এ কেমন উপসর্গ? আদিমতার এ কি আধুনিক আবর্তন?

প্রমোদ বিলাসী বৈদেশিক ভ্রমণকারীর দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করে নেয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ফোলিস্ বার্জারে ভীড়ের অন্ত থাকে না। মুখে মুখে প্রশ্নের ঢেউ বয়ে যায়, 'দেখেছেন? দেখেছেন?' যাদের হয়তো তেমন উৎসাহ নেই, তাঁরাও ভাবেন, আবার প্যারিসে আসা হবে কিনা কে জানে, এসেছি যখন, একবার দেখেই যাই।

বন্ধুপত্নী ফরাসী মহিলা ত রেগে আগুন। তাঁর বাঙ্গালী স্বামী যে কাল আমাদের সঙ্গে নগ্ন-নৃত্য দেখে এসেছে, এ নিয়ে গত রাত্রেই তাদের এক দফা কলহ হ'য়ে গেছে। পরদিনও তার জের কাটেনি। অতিথি অভ্যর্থনার পালা শেষ করে ভাঙ্গা ইংরেজীতে শুনিয়ে দিলেন 'ইত্ ইজ নত্ গুদ্। থিয়েতাদ্ ইজ গুদ্'—ওটা ভালো নয়, থিয়েটার ভালো।

কেন ভালো নয়?

"বিবজে দো আর ন্যুদ,' নোকেদ। দো দু নত প্রেৎ—তারা ন্যাংটো, উলঙ্গ, পোষাক পরে না।"

ফরাসী মহিলা, বন্ধুপত্নীর জ্ঞান-গুণের সুনাম আছে। গান বাজনায় তাঁর বিশেষ ঝোঁক। নিজের গানের অনেক রেকর্ড আছে। শিল্পী দলের একজন হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরেও এসেছেন। গান-বাজনা, উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনা, নাম-জাদা শিল্পীদের সমাবেশ তাঁদের ঘরে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রচনা ফরাসী ভাষায় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

খোদ প্যারিসের নারীর মুখে নগ্ন নাচের নিন্দা শুনে ভালোই লাগল।

'তবে আছে কেন?'

'কয়েকটা নারী-পুরুষের বদখেয়াল, আর বিদেশী পর্যটকদের পকেট খালি করার ফন্দী আর কি!'

ভালোবাসা বেচাকেনার বিষয় হয়ে আছে ইউরোপে। দাম্পত্য বন্ধনে নিবিড়তার চেয়ে আসঙ্গ-লিপ্সা বড়। ফুলের বনে যার পাশে যায়, তাকেই ভালো লাগার প্রবৃত্তি ঘুর ঘুর করতে থাকে।

'রু দে বাক' থেকে ফোলিস বার্জার খানিকটা দূরেপাল্লার পথ। শো আরম্ভ রাত আটটায়। শেষ হ'তে এগারোটা। রঙ্গমঞ্চের পাশেই রেস্তোরাঁ থেকে খাওয়া শেষ করে নেয় অনেকেই। খাওয়া প্রায় শেষ হ'তে দেখা গেল, পাশের টেবিলে বিলের টাকা নিয়ে তুমুল তর্ক বেঁধে গিয়েছে। দু'জনের মদের দাম প্রায় দ্বিগুণ ধরা নিয়ে ঘোর চ্যালেঞ্জ। ম্যানেজার এসে থামিয়ে দিলেন, এখানকার চার্জ একটু বেশীই হয়ে থাকে। আমোদ-প্রমোদের অগ্রিম প্রায়শ্চিত্ত আর কি।

বিশাল, সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহে খুব কম করেও সাত-আটশো লোকের বসবার স্থান আছে। দোতলায় উঠে আবার হলে নেমে যেতে বা উপরে স্টলের গ্যালারিতে টিকেট অনুযায়ী আসন গ্রহণ করতে হয়। সিঁড়ির পাশেই ল্যাভেটরী। দু' ঘণ্টার বেশী ঠায় বসে থাকতে হবে, মনে হ'ল, একটু হালকা হ'য়ে যাই। ফিরবার পথে একটা লোক পথ আগলে ধরল।

পয়সা? সে কিরে বাবা। ল্যাট্রিনে যেতেও পয়সা? পাশের বিদেশীরাও বিস্মিত হ'য়ে পকেটে হাত পুরতে লাগলেন। দশ ফ্রাঁ দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

দোতলায় উঠে দেখি, বারান্দায় একটা লোক কালো কালো কি জিনিস নিয়ে বসে আছে, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনেক লোক। ব্যাপার কি? এখানে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট দূরবীণ। মঞ্চের দূরত্বে যাদের রূপের তৃষ্ণা দূর হবে না, তাদের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিসুখের জন্যই এই ব্যবস্থা। অভিনয় শেষ হ'লে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

'কত ভাড়া'?

মাত্র দেড় টাকা মঁসিয়ে'। থাক্ থাক্ চোখটা যখন খোলাই আছে, তখন আর দূরবীণ দিয়ে কি হবে? তবু প্রায় সবগুলোই চোখের সামনে ভাড়া হয়ে গেল।

আলো ঝলমল প্রেক্ষাগৃহে সুসজ্জিত নর-নারীর সে কি ভীড়! আসন একটিও খালি পড়ে নেই। সবাই তাকিয়ে আছে যবনিকার দিকে যেন দেখবে না, গিল্‌বে।

উঠ্‌লো যবনিকা। বিবসনা নারীর সঙ্গে পোষাকপরা পুরুষের চললো নৃত্য-নাট্য। 'চরণ-ভঙ্গে ললিত ছন্দে চমকে চকিত ছন্দ।' ছন্দের পতন ঘট্‌লো নারী যখন বিবশ হয়ে একেবারে সটান শুয়ে পড়লেন। আর পুরুষটি এসে এরোপ্লেন নামার ভঙ্গীতে দু' হাত ছড়িয়ে পূর্ণ দেহ দিয়ে হাত খানেকের ব্যবধান রেখে ভর করলেন তারই উপরে। একখানা হাত ও একখানা পা উঁচু হয়ে রইল, সেও যেন এরোপ্লেন থেমে আছে।

করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠল। এর পরে এলেন প্রায় বিশজন নরনারীর একটা দল। এখানেও পুরুষেরা পোষাক-পরিচ্ছদে চটকদার, কিন্তু নারীদের উচ্চ নিম্ন তিন স্থানে তিনটি চকমকি সাদা চুমকি বসানো বৃত্ত ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেজ ধাঁধিয়ে তাদের হাত পা জানু নিতম্বের ঘন ঘন প্রদর্শনী চললো নাচের তালে-তালে। তাঁরা চলে যেতেই এলেন ঈষৎ-বসনা, নগ্নপ্রায় এক নারী আর তার পুরুষ-সঙ্গী। তারা নৃত্য দেখালেন নানা কসরতে। কখনো দুজনের দু' পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে কখনও হাত উপরে তুলে পাখী ওড়ার ভঙ্গিমায়। এ পাশ ও পাশ, চার পাশে ঘুরতে থাকলেন নানা ছন্দে, অনঙ্গের ইঙ্গিতে। এরই মাঝে নারী যখন তার একখানি পা তুলে ধরলেন একেবারে মাথার সমান্তরাল রেখায় এবং উঁচিয়ে রাখলেন বেশ খানিকক্ষণ, তখন আবার হর্ষ-পুলকের করতালি। বিবসনা, স্বল্প-বসনা, নরনারীর বিভিন্ন ধরণের দ্বৈত, অদ্বৈত, সম্মিলিত। নৃত্যনাট্য চললো অনেকক্ষণ ধরে।

ক্লান্তি বোধ করার উপক্রম হ'তেই এল বিশ্রামের সময়। কিন্তু যবনিকা পড়লো না। অল্প কয়েকজন বাইরে চলে গেলেন, তাঁরা হয়তো জানতেন না যে, বিশ্রামের সময়েও তামাসা আছে। অভিনেত্রীদের কয়েকজন খোলাদেহে নেমে এলেন দর্শকদের মধ্যে। বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসলেন দর্শকদের পাশের আসনে। কয়েক মিনিটের রহস্যালাপের পরই দেখা গেল তারা তিনজন দর্শকের হাত ধরে নিয়ে উঠে গেলেন মঞ্চের উপরে। একজন একজন করে তারা আরম্ভ করলেন হাসিঠাট্টা। একজন দাঁড়িয়ে রইলেন আর একজন এক পাশে, পার্শ্ববর্তিনী নারী তাঁর

হাতে ঝাঁকুনী দিয়ে চাপা করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর আর লজ্জা দূর হয় না। হাসির হুল্লোড় বয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহে। দ্বিতীয় পুরুষ বেশ আসর জমিয়ে আলাপ চালাতে লাগলেন। হাসি টিট্‌কারী কথায় কথায়। তৃতীয় ব্যক্তি কোন প্রকারে সলজ্জিত ভাবে চালিয়ে দিলেন। তাঁকেই প্রথম আহ্বান করা হল দ্বৈত নাচে। কিন্তু বেচারা ভালো নাচ জানেন না, তালে বেতালে একটু চেষ্টা করেই দিলেন ছেড়ে। দাঁড়ালেন গিয়ে সলজ্জভাবে মঞ্চের এককোণে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নাচের বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তিনি সমান তালে নাচের পারদর্শিতা দেখিয়ে করতালি লাভ করলেন। প্রথম ব্যক্তির হাত ধরতেই তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিলেন ছুট! একবারে লাফিয়ে পড়লেন অডিটোরিয়মের মধ্যে। আবার উচ্চ হাসি, করতালি ও হৈ হৈ।

ফোলিস বার্জারে তামাসা শুধুই তামাসা নয়। এ তামাসার খেসারৎ অনেক। অভিনেত্রী যারা যাদের পাশে গিয়ে বসেছিলেন তাদেরও পাঁচ-দশ টাকা পকেট থেকে বার করে দিতে হয়েছে, আবার যারা মঞ্চে উঠে আনন্দ করে এসেছেন, তাদেরও পনর-বিশ টাকা অভিনেত্রীদের হাতে গুঁজে দিতে হয়েছে নগদ নগদ! তারপরেই পুরস্কারের পালা। স্থির হ'ল দ্বিতীয় ব্যক্তিই প্রকৃত রসিক। তাঁর পুরস্কার একটি চুম্বন। এক ছড়া মালা এনে তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হ'ল। মাথায় দেওয়া হ'ল এক মুকুট, আর একটা পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গের শোভাবর্ধন করল। ভদ্রলোক যে সত্যিই রসিক তা বুঝা গেল তখনই, যখন নারীর চুম্বন লাভে তৃপ্ত হ'য়ে তিনি তখনই তাকে সজোরে চুম্বন দিয়ে সম্বর্ধনা করলেন। একবার নয়, দু'বার হ'ল তার পুনরাবৃত্তি। এবারে অভিনেত্রীরাই তার পোষাক ফিরিয়ে নিয়ে হাততালি দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে বিদেয় দিলেন নিজ নিজ আসন নিতে।

তবু প্যারিসের ফোলিস বার্জার বা নগ্ন-নৃত্য সম্পর্কে রটনা যত, ঘটনা তত নয়। অনাবিল নগ্ন-নৃত্যের দৃশ্য আসলে মোট পাঁচ ছটা। বিশ্রামের পর যখন তামাসা আরম্ভ হয়, তখন চলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের নাচ গান। তার মধ্যে 'মিশরীয়' নাচ আছে, তুরস্কের নাচ আছে, আফ্রিকার নাচ আছে, আছে অন্যান্য দেশের বহু অনুকরণ। একটা দৃশ্য দেখে মনে হ'ল তা ভারতীয় নাচেরই অনুকৃতি।

নগ্ননৃত্যের চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল অন্য একটি দৃশ্যে। আলোছায়ায় ঘেরা সুদূর বিস্তৃত বনশ্রেণী আর তারই মধ্যে ঘুরেফিরে নাচছে বসনমুক্ত অপ্সরী কিন্নরীর দল। সংখ্যায় প্রায় বিশজন। যা দেখতে চান, তাই দেখতে পাবেন।

আরও আছে বাঙালদের কাঁটা-চামচ ধরে খাওয়ার কৌতুককর দৃশ্য। কাঁটা ধরতে ছুরি ঠিক থাকে না, উভয়ের সংযোগ যদি বা হ'ল মাংস কেটে নেবার সময় টুকরোটা ছিট্‌কে পড়ে গেল টেবিলের তলায়। চারিদিকে তাকিয়ে যখন টুকরোটা হাত দিয়ে তুলতে গেল, তখন এসে পড়ল বয়। খানিকটা ঝোল হাতের চাপে প্লেট থেকে গড়িয়ে পড়ল তোয়ালের ওপর—এমনি আরও কত কি! বাঙাল, বিদূষক, ভাঁড় এরাই হ'ল বিশ্বের হাসির খোরাক।

খাই-খাই করেও যাদের যৌবন যায়নি, যৌন-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যাদের নারীদেহ সম্পর্কে কৌতূহল ঘোচেনি, এসব তামাসা প্রধানতঃ সেই বয়স্কদেরই উপভোগ্য। ফরাসী মহিলা বলেছিলেন, প্যারিসের লোক ওসব কেউ প্রমোদের ধারও ধারে না। কথাটা কতটা সত্য জানি নে। তবে দর্শক শ্রেণীর অধিকাংশই যে বিদেশী বিশ্ব-ভ্রমণকারী, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, এশিয়া ও অন্যান্য দেশের লোক, তা অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। সংস্কৃতিবানের প্রথম স্বরূপ বিবেক ও রুচির সঙ্গে। কিন্তু এখানে অন্ততঃ কিছু-কালের জন্যও তা বর্জন করে থাকতে হবে। যাদের পোষাক নেই, লজ্জার বালাই নেই, মন নিয়ে সূক্ষ্ম চাতুর্যের কৌশল নেই, সেই স্থূলতাই এখানকার অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। রুচি, সৌন্দর্য, ভালো-মন্দ, মোহ, প্রেম নিয়ে মগুর ভোগে লাভ নেই। রুচিবান, সংস্কৃতিবান, ধী ও শাস্ত্র-মানেরা যাঁরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বা রাষ্ট্র-শাসনে অধিষ্ঠিত এমন বহু নরনারী এ ইন্ড-নিবাসের দর্শক হয়ে নাচ দেখে গিয়েছেন। তাতে তাঁদের কারোরই মানহানি হয়নি; জৈব আকর্ষণকে কেন্দ্র করেই জীবের সৃষ্টি, তার আবেদন যাবে কোথায়? এসব ব্যাপারে কোন ভাবনাকেই অধিক দূরে শেকড় চালাতে দিতে নেই মনের মধ্যে। কোন দেশ রেখে-ঢেকে কোন দেশ কিছু ফেলে, কিছু ছেড়ে এ ধরণের দেহ-বিন্যাস দর্শনীয় করছেন সবাই। প্যারিসই শুধু একেবারে খুলে-মেলে ধরেছেন তাদের উর্বশীদের লোকচক্ষে। অনাবৃত রূপ আসলে কালের আয়নায় অনন্তকালের প্রতিবিম্ব। যাদের চোখ আছে, তারা তো দেখবেই। আলোচনা চলবে, সমালোচনা হবে, ছি ছিও অনেকেই করবে, কিন্তু সময় হ'লে সুযোগ পেলে সকলেই আবার ভীড় করেও দাঁড়াবে, যেমন করছে প্যারিসে, যেমন হয়েছে কলিকাতায় কোন কোন বৈদেশিক নাচ-গানের পার্টির আগমনে। আসল কথা—"মনেরে আজ কহ যে ভালোমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।"

পূজায়-লীলায়
শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

জীবনের পূজা কবে হবে সমাপন
শুকায়ে ছড়ানো ফুল-নৈবেদ্যের থালে,
তুমি কেন নাহি এসে সবরে সাজালে;
ব্যর্থ হবে বাস্তবের বিচিত্র স্বপন।
সাধনায় মগ্ন ধ্যানে অচঞ্চল মন
উদ্ভাসিত প্রেমালোকে প্রাণের আড়ালে,
সে আলোকে প্রিয়তম আসিয়া দাঁড়ালে;
অনন্ত চলায় পথে সহজ গমন।

কালস্রোতে আসে যায় বৈচিত্র্যের গতি,
প্রাত্যহিক মোহ মায়া ভাসায় প্লাবনে।
নিতি-নব অভিনয় করায় নিয়তি,
এসো প্রিয় ত্বরা করি নয়নে নয়নে।

জীবনের যত পূজা বিফলে না যায়,
প্রেমের পূজায় আত্মা ভুলায় লীলায়।

সখের সারকাস

(২৩৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভাল করে হাত চালিয়ে দেখলেন। তাঁত সাড়ী দেখে বললেন— —these belong to the boss of your kitchen?

নির্জলা বাংলায় বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, গৃহিণীর।

Whats that?

Boss of the kitchen in Bengali.

অফিসারটি মিশুকে। জরীর মালাগুলো তখনও টেবিলে পড়ে রয়েছে। সেগুলোর দিকে দেখিয়ে বললেন —good thing, sign of friendship! আইসেনহাওয়ারকে দিল্লীর লোকরা যেমন দিয়েছিল, তাই নয়? ইণ্ডিয়া আমেরিকা ফ্রেণ্ডসিপ বলে আমার সঙ্গে করমর্দন করে গুড বাই সারলেন।

সহরে ফিরে আসার জন্যে বাস যেখানে দাঁড়ায় সেদিকে আসতে হল। এখানকার বাসের নাম লিমুজিন। একখানি লিমুজিন রাস্তার ধারে সটান শুয়ে আছে বুকের দরজা-খানি ফাঁক করে। বাইরে তখন অসংখ্য কুচি কুচি বরফের দানা সূর্যের আলোকে হীরের মত জ্বলজ্বল করছে—ঠাণ্ডা বাতাস ওভারকোট ভেদ করে ভিতরে ঢোকবার জন্যে লড়াই করছে। বাসের ভিতরে এসে হিটারের উষ্ণতা শরীরকে মৃদুমন্দ সেঁকে দিল। এখানকার বাসে কণ্ডাকটার থাকে না। ড্রাইভার কুরুক্ষেত্র-ফ্রেণ্ড—সব্যসাচী বিশেষ। একাধারে কণ্ডাকটার, চেকার ও ড্রাইভার। বাসে ঢুকতে হয় সামনের মুখ দিয়ে। উঠেই মেসিনে খুচরো পয়সা দিয়ে ভাড়া চুকতে হয়। খুচরো না থাকলে ড্রাইভারের কাছে ভাঙানি পাওয়া যায়। ড্রাইভার এক হাতে ষ্টীয়ারিং অন্য হাতে খুচরা পয়সা, এবং মুখে সিগারেট, প্রত্যেক ষ্টপেজে বাস এলে ড্রাইভার সুইচ টিপে দরজা খোলা বন্ধ করে। নামবার জন্যে বাসের পিছনে আর একটা দরজা থাকে। যতক্ষণ যাত্রী ওঠে বা নামে ততক্ষণ বাস সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমাদের বাস তখন ছাড়-ছাড়। ড্রাইভার বাস থেকে নেমে এসে যে ষ্টার্টার বসে ছিল অদূরে তার সঙ্গে কি কথা বললে কাঁচের জানালা দিয়ে শোনা গেল না। তবে দেখা গেল দুজনে দুজনের থুতনীতে যেমন আমাদের ঠাকুমা দিদিমা খুদেদের আদর করে থাকেন, সেইরকম বার কয়েক দোলিয়ে দুলিয়ে ড্রাইভার গাড়ীতে উঠে এল। আমার পাশে সদ্য লণ্ডন থেকে নামা একজন ইংরেজ এই ড্রাইভার-ষ্টার্টারের অনাবশ্যক আদরের আতিশয্যে ছি ছি গোছের মুখভঙ্গি করে পেঁচুর মত একভাবে গম্ভীর হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার হাতের সুটকেশখানা ভালভাবে বাগিয়ে ধরে বসলুম। ভাগ্যি এই সুটকেশ আনতে আসা, তাই না এই সখের সারকাস দেখতে পাওয়া। মানহাটানের দিকে বাস তীরবেগে ছুটে চলল।

> **অদৃষ্ট**
>
> দুরদৃষ্ট ভাগ্যহীন যেই দিকে চায়,
> কপালের দোষে তার সাগর শুকায়।
>
> (ইংরেজী প্রবাদ)

।। আমীর ও ফকির ।।

অজিতকৃষ্ণ বসু

"ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে অধর্মকথা
বলিস নে মাইরি!"
ফকিরচাঁদকে বললে আমীরচাঁদ।
পয়দা না হয়েছে ফকিরের বৌ মোক্ষদা,
আর এর আগে কখনো বাপ হয়নি ফকির,
আজ তাই দুই দোস্ত-র মচ্ছব হবে
পেলিটির হোটেলে।
"বলেছিলি ব্যাটা হলে খাওয়াবি, হয়েছে বেটি।"
বললে আমীর, "তাই আজকের
সব খরচটা আমার।
তোকে ওদিকে খোদা মেরেছে, এদিকেও আবার
পেলিটি পকেট মারবে?
তা হয় না। ওসব অলেহ্য কথা আমি
শুনবো না ফকির।
আজকের পুরো খরচা আমার।"

"বলেছিলুম বাপ হলেই খাওয়াব। বাপ হয়েছি,
খাওয়াব।
পুরো খরচা আমার।" ফকির জোরগলায় বললে।
"নাই বা হয়েছি ব্যাটার বাপ। বেটি আমার
ভারি পয়মন্ত;
ভোরবেলা ওর বাপ হলুম আর বিকেলে
এক পকেট সাফ করেই সাড়ে সাতাশ টাকা।"

দুই দোস্ত পকেটমার—আমীরচাঁদ আর
ফকিরচাঁদ,
দুই গুরুভাই, একই ওস্তাদের সাগরেদ দুজন
এখন দুজনেই এমনি ধুরন্ধর
যে বাঁ হাত পকেট মারলে ডান হাত টের পায় না।
এই ক'দিন আগে পেলিটি হোটেল আর
রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে যেতে ফকিরকে বলেছিল
আমীর
"সায়েবদের আমলে মাইরি পকেট মেরে সুখ ছিল,
আর এখন খালি পকেটে পকেট [illegible]।
দুত্তোর স্বরাজ!"
আর বলেছিল "প্রাণের একটা [illegible]
মিটলো না ফকির।
ঢুকে এই পেলেটিতে সায়েবি কায়দায় খানা
খাওয়া আর সরু ফিতের জামা পরা মেম
সায়েবের নাচ দেখা
বেহেস্তের হুরী যার কাছে ফেলনা নয়।"

"বাস্! পাকা কথা হয়ে গেল।" বলেছিল ফকির।
"এই ক'দিন বাদেই ছাওয়াল হবে আমার বৌ
মোক্ষদার;
সেদিন পকেট মেরে এ হাতে যা উঠবে
পুরো ফুঁকে দেবো পেলেটিতে এক সাথে
আমরা দুজন
খানা পিনা করে আর মেম সায়েবের নাচ দেখে।"

সেই দিন এসেছে আজ। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা।
ফকিরের পকেটে বিকেলে পকেট-মারা
সাড়ে সাতাশ টাকা,
আর হৃদয়ে দুরু দুরু ভয়।
সাড়ে সাতাশ ফুঁকে দিতে এক ফোঁটা চোট
লাগবে না চিত্তে
কিন্তু যদি খানার টেবিলে মুখোমুখি পড়ে যায়
কোনো দারোগা, কোনো সার্জেণ্ট?
সর্বনাশ!!!
রাস্তায় এদের ভয় করে না ফকিরচাঁদ,
কিন্তু শিউরে উঠল চারদিক ঘেরা ঘরে
মুখোমুখি মোলাকাতের কথা ভেবে।
অথচ এই ভয়ের কথা বলা যায় না আমীরচাঁদকে,
হো হো করে হেসে উঠবে আমীর,
বলবে "মোক্ষদার আঁচলের তলায় লুকিয়ে
ঘরের কোণায় বক বকম্ করগে ফকিরচাঁদ।"
"আজ নির্ঘাত নাকালের একশেষ হতে হবে।"
ভাবলে আমীরচাঁদ।
সায়েবি রেস্তোরাঁয়, সায়েবি হোটেলের
আদবকায়দা
একদম জানা নেই তার।
জানা নেই কেমন করে ঢুকতে হয়, বসতে হয়,
কি কায়দায় বয়দের ডেকে কেমন করে ফরমায়েশ
করতে হয়,
তাছাড়া কেমন করে পড়বে খানাপিনার ফর্দ?
সে যে ইংরিজিতে ছাপা।
"অথচ ফকরেটা তো দেখছি একদম ডরাচ্ছে না।
ও শালার নিশ্চয় সায়েবি আদব-কায়দা
সব দুরস্ত,
বেকুব বনবো শুধু আমি। আর তামাশা দেখবে
ফকির।"
ভাবলে আমীরচাঁদ। আর ভাবলে "কে জানে?
হয় তো বা আমায় বেকুব বানিয়ে মজা
দেখবে বলেই
ওর আজ আমায় পেলিটিতে নিয়ে যাবার গরজ।"
"চল এবারে এগোই।" মনের দায়ে মরিয়া হয়ে
বললে ফকির,
তার বুকের কাঁপুনি আমীর টের পেয়েছে
সন্দেহ করে।
"আলবৎ!" বললে মনের দায়ে মরিয়া
আমীরচাঁদ
ফকির তার মনের ভয় টের পেয়ে মনে মনে
হাসছে সন্দেহ করে।
দুজোড়া শঙ্কা-ভরা কম্পমান পা এগিয়ে
চললো
ধীরে ধীরে ধর্মতলার মোড় থেকে পেলিটির
দিকে।

পাছে আমীর আগে বলে ফেলে এই ভয়ে
ফকির বললে
"ভয় পেলি নাকি আমীর? আচ্ছা ভরপোক
তুই দেখছি।"
আরো জোরে পা চালাবার ভান করে
আমীর বললে
"ভরপোক না হাতী! আজকের খরচার
আধাআধি বখরা।
তারপর তোর দৌলতে মোক্ষদা যেদিন
ব্যাটার মা হবে
সে দিন না হয়......"

"ঠিক আছে!" বললে দুরু দুরু-হৃদয়
ফকিরচাঁদ।
পেলিটি হোটেল এগিয়ে আসছে যেন
[illegible]
আপন পকেটের উনিশ টাকা সাড়ে বারো আনা
নেড়েচেড়ে
আমীরচাঁদ মনে মনে বললে "শালার
পেলিটি হোটেল!
তার মনে মনে চটে উঠল মোক্ষদার ওপর।
দূরে দেখা যাচ্ছে পেলিটি হোটেলের আলো।

ফকিরচাঁদের কেউ পকেট মারলে খুশি হত
আমীর
কিন্তু কাকের মাংস কাকে খায় না,
পকেটমার মারে না পকেটমারের পকেট।
"পেলিটি হোটেলে ঢুকবার আগে পেলিটি
রেস্টুরেন্টে দুপেয়ালা চা খেয়ে নেব
কি বলিস আমীরচাঁদ?" বললে ফকিরচাঁদ।
"তা তো নিতেই হবে।" বললে আমীর,
"গলাটা যে শুকনো কাঠ হয়ে আছে একেবারে
ভিজিয়ে নিতে হবে। বেশ জম্পেশ করে বসে
খেতে হবে চা।"
একদম যে ডরায়নি তাই দেখিয়ে দিলে
বুক ফুলিয়ে

কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে
পেলিটির দরজা
রাস্তার ওপারে তাকালে ফকিরচাঁদ—

জনার্দনের বাঁদর মার্কা বিড়ির দোকান
হাতছানি দিয়ে ডাকছে।
"বিড়িতে খানকতক সুখটান দিয়ে আসা যাক।"
বললে ফকির। "পেলিটির ভেতরে বিড়িফিড়ি
চলবে না।
আর বিড়ির মজা মাইরি সিগ্রেট ফিগ্রেটে
মেলে না।"

"একেবারে প্রাণের কথাটি বলেছিস্ ফকির!"
বললে আমীরচাঁদ।
রাস্তা পেরিয়ে বিড়ি ফুঁকতে গেল
আমীর ফকির।
শেষ হলো বিড়ি, একটা দুটো,
হেসে আমীর ভাবলে ফকির হাসছে,
আর ফকির ভাবলে আমীর হাসছে,
যখন রাস্তা পেরিয়ে ফের পেলিটির দিকে
ফিরে এলো তারা।
এগোতে লাগল ধীরে ধীরে, ছুতো নাতায়
দেরি করে করে।

শেষ হলো অনেক ছুতোনাতা, আর মাত্র
চার গজ দূরে
পেলিটি হোটেল আর রেস্তোরাঁর সিংহদ্বার।
"ইয়া খোদা!" বললে আমীর, ফকির বললে,
"হা ঈশ্বর!"

ওদিক থেকে আসছিল অন্ধ জেকব
একটা ছোট তারের যন্ত্র পিড়িং পিড়িং
বাজাতে বাজাতে,
তাকে ধরে নিয়ে আসছিল চক্ষুষ্মান
এক ছোকরা।
জেকবের বুকে দুলছে কাঠের তৈরি
ক্রুশবিদ্ধ যীশু।
"হেল্প এ পুওর ব্লাইন্ড ম্যান"
বলছিল জেকব,
আর ছোকরা থেকে থেকে বলছিল
"অন্ধজনে দয়া করুন।"

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

রবি দত্ত

পহলগাঁ

প্রভাতকান্তি ঘোষ

সহযোগিতা

সংবাদ প্রভাকরের নেপথ্যে

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংবাদপ্রভাকর সম্বন্ধীয় এই বিবরণীগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, যতদূর মনে হয় প্রকাশিত হয়নি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই ঘটনা আমার গোচরীভূত হ'ল কি করে, সেই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে, এই আখ্যায়িকার নায়ক যোগেন্দ্রমোহন আর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ছিলেন জাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। যোগেন্দ্রমোহনের সহধর্মিণীকে যতীন্দ্রমোহনের ছোট মেয়ে মনোরমা দেবী (বাঙলার সাধারণ গ্রন্থাগারের আদিযুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্যারীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ এবং কলকাতা পৌরসভার কোষাধ্যক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী) প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যোগেন্দ্রজায়ার কাছে এই গল্প শুনেছিলেন মনোরমা দেবী। মনোরমা দেবীর কাছে এই গল্প শুনেছেন তাঁর একমাত্র মেয়ে মলয়াবতী দেবী (স্বর্গীয় ডাঃ স্যার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী)। মলয়াবতী দেবী আমার পিতামহী। দাদুমার কাছে এই গল্প আমি শুনেছি। এই সব কাহিনী এতকাল আমাদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সকলের অবগতির জন্যেই এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা হ'ল। —লেখক)

পটে আঁকা ছবি যেন। মলিনতাশূন্য শুভ্রতার প্রমূর্ত প্রতীক। সাদা মোমের উপর কোন মহাশিল্পী যেন এঁকে রেখেছেন একজোড় ভ্রমরাকালো ভ্রূ, দুটি পলাশনয়ন, গোলাপের মত দুটি নরম ওষ্ঠ। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য যেন একটি আধারকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যের যেন ইতি নেই, লালিত্যের যেন শেষ নেই, লাবণ্যের যেন সীমা নেই।

ছেলে নয়—যেন মূর্তিময় আনন্দ, যেন সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি, যেন নবজীবনের জয়গান। দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বেড়ে উঠতে থাকে শিশু—তৎকালীন বাঙলার বিরাট পুরুষ গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র অফুরন্ত রূপলাবণ্যের অধিকারী নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁকে কেন্দ্র করে পরিজনবর্গের আনন্দ যেন বাঁধ মানতে চায় না।

নন্দকুমার ঠাকুরের দুই ছেলে যোগেন্দ্রমোহন আর সুরেন্দ্রমোহন। জ্যেষ্ঠ যোগেন্দ্রমোহনই আমাদের আজকের এই আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র। সুপুরুষ নন্দকুমারের ছেলেরাও উত্তরাধিকার-সূত্রে বাবার সৌন্দর্যে পূর্ণ মাত্রায় ভাগ বসিয়েছেন। যোগেন্দ্র-সুরেন্দ্রের যে প্রতিকৃতি আজও তাঁদের খুল্লতাত পুত্র নৃপ-কবি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশ্ববিশ্রুত প্রাসাদের নাচঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে—সেই ছবি দুটির তলায় নাম না লেখা থাকলে আপনি নিশ্চয়ই ভাবতেন যে-কোন সুন্দরী ইউরোপীয় তরুণীর ছবি বুঝি।

গোপীমোহনের প্রথম পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন। তাঁকে আট বছরেরটি দেখে গেছেন গোপীমোহন। এই আট বছর যোগেন্দ্রমোহন গড়ে উঠেছেন সম্পূর্ণরূপে পিতামহের তত্ত্বাবধানে. তারপরে নন্দকুমার দৃষ্টি দিলেন ছেলের দিকে। বাল্যকাল থেকে তাঁকে শেখানো হতে লাগল সংস্কৃত, ফরাসী, উর্দু, ইংরিজী চারটি ভাষা। পুরোহিতের কাছে পূজার্চনা অধ্যয়ন করলেন গীতশাস্ত্র, পাঠ নিয়ে যান গীত সম্বন্ধে, ব্যায়ামবীরের কাছে শিখতে হয় ব্যায়াম-কৌশল। দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বিকশিত পেতে থাকেন কিশোর যোগেন্দ্রমোহন। সঙ্গীতও শিখছেন। ধর্মসঙ্গীত আর মার্গসঙ্গীত।

গোপীমোহনের নির্মিত ভদ্রাসন ৬৫নং পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট। তারই রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যোগেন্দ্রমোহন। কৈশোরের শেষ প্রান্তে তিনি উপনীত। সেদিন বসন্ত কি বর্ষা জানা নেই, সেদিনটি রৌদ্রপরশনদীপ্ত বা মৌন মেঘে সমাচ্ছন্ন তাও আমাদের জানার বাইরে। তখন আলো ঝলমলে সকাল বা অলস-ক্লান্ত অপরাহ্ন তাও আমাদের জ্ঞানের অতীতে, তবে যা ঘটেছিল—সেই ঘটনাটুকু জানা আছে।

প্রায় যোগেন্দ্রমোহন দেখতে পান বাড়ীর সামনে দিয়ে একটি ছেলে নিত্য যাতায়াত করে। বড় লোভ হয় তাকে ডেকে আলাপ করেন, ছেলেটির চেহারার মধ্য দিয়ে কি যেন আছে যা মুগ্ধ করেছে যোগেন্দ্রমোহনকে। প্রথম দেখার পর থেকেই ভাল লেগে গেল যোগেন্দ্রের। ছেলেটিকে বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবার কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন যোগেন্দ্র। রাস্তা দিয়ে তো কত শত ছেলে নিয়ত যাতায়াত করেছে কিন্তু কই আর কাউকে দেখে তো অনুরূপ অনুভূতি জাগে না যোগেন্দ্রের। কেন? এ কেনর উত্তর যোগেন্দ্রের নিজেরও অজানা। সেদিন আর থাকতে পারলেন না যোগেন্দ্র। বাহক মারফৎ আহ্বান জানালেন ছেলেটিকে। ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়াল, চোখে তার উজ্জ্বল স্বপ্ন, অবয়বে তার বুদ্ধির দীপ্তি আর অন্তরে যেন তার কৌতূহলের আলোড়ন।

—তোমার সঙ্গে আলাপ করব বলে তোমায় ডাকলুম—যোগেন্দ্রের প্রথম সম্ভাষণ।

—আমার সঙ্গে আলাপ করতে তোমার আপত্তি আছে?

ছেলেটি হেসে ফেলে।

—তোমার নামটি কি—বল।

—এইবার প্রথম মুখ খুলল ছেলেটি, ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

—কোথায় থাকো?

—এখানে জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে থাকি। নিবাস কাঁচরাপাড়ায়।

হাত বাড়িয়ে দিলেন যোগেন্দ্রমোহন—সেই হাতে হাত রাখলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বন্ধুত্বের শপথ নিলেন দুজনে।

নিয়মিত আসতে থাকেন ঈশ্বরচন্দ্র। বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাঁকে যথেষ্ট প্রীতির চোখে দেখেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় বাড়ীর কর্তাদের মধ্যে। একদিন তিনি না এলে উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না কারো। ঈশ্বরচন্দ্র মুখে মুখে ছড়া কাটেন তারই মধ্যে কবিতার লাইনও বলে যান কখনও কখনও। গান রচনা করেন গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।

আঠারো শো তিরিশের কথা বলছি। কথার ফাঁকে যোগেন্দ্রমোহন বললেন—ঈশ্বর গালগল্প না করে এস কাজ করা যাক। কাজের মত একটা কাজ। ভেবে দেখ আমাদের দেশে কি নেই—নেই কাগজ, নেই বাঙ্গালীর নিজস্ব নাট্যশালা। শেষেরটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। ছোট কাকামশাই (প্রসন্নকুমার ঠাকুর) নিজে এ অভাব

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনেকদিন দেখা এ দৃশ্য যেন নতুন হয়ে
দেখা দিল।
অন্ধ জেকবের ভিক্ষার উপার্জনেই বেঁচে আছে
অন্ধ জেকব,
আর তার বুড়ো বাবা, বুড়ী মা, পঙ্গু
অসহায় ভাই.
জেকবের করুণ আবেদনের করুণ তর্জমা করে
বলছিল ছোকরা।

আজ হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল আমীরচাঁদ,
পকেট থেকে নিয়ে পুরো উনিশ টাকা
সাড়ে বারো আনা
তুলে দিলে অন্ধ জেকবের হাতে।
ফকিরকে বললে "হঠাৎ যেন বেহেস্ত থেকে
জেল্লালো আম্বাজান

পোলাটিতে রেস্তো না ফুঁকে দিয়ে দে সব
অন্ধকে—
এদের শুকিয়ে রেখে তোরা পোলাটিতে
মজা লুটবি? ছিঃ!"

শুনে চোখ ছলছলিয়ে উঠল ফকিরচাঁদের।
সহৃদয়তায় তার ওপর টেক্কা দেবে আমীর?
পকেট থেকে পুরো সাড়ে সাতান্ন টাকা নিয়ে
তুলে দিলে অন্ধ জেকবের শীর্ণ হাতে।

তারপর পোলাটি হোটেল পিছনে ফেলে
এগিয়ে চলল
আমীর আর ফকির; মনে মনে বললে,
"বাঁচা গেল।"
বুজর্গোর মুখ পরমানন্দে উদ্ভাসিত।

পুরোহিতদের ভার নিয়েছেন, আমরা এস কাগজ করি। যে কাগজ জাতকে গঠন করবে। যার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর অন্তরের বাণী রূপ নেবে, যার মধ্যে দিয়ে গোটা দেশটা কথা বলবে। কাগজ নেই বলব না, কিন্তু কাগজের মত কাগজ কই—কেবলমাত্র সংবাদ পরিবেশনেই তো পত্রিকার দায়িত্ব শেষ নয়। তুমি সম্পাদনার ভার নাও, তোমার প্রতিভাকে কাজে লাগাও। ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দেন সম্পাদনার ভার আমি নিলুম কিন্তু অন্যান্য ভার, আশ্বাস দেন যোগেন্দ্র, সে ভাবনা তোমার নয়, সে ভাবনা আমার।

আহার নিদ্রা ঘুচে গেল দুই বন্ধুর। কাগজ আর কাগজ। কাগজ ছাড়া চিন্তা নেই জল্পনা-কল্পনা-মকসো-খসড়া-প্ল্যান আর বাজেট। সব ঠিক হয়ে গেল। তারপর নামকরণ। তাও একদিন স্থির হ'ল—কাগজের নাম হবে সংবাদ প্রভাকর। পুরোহিতের কাছে দিন নেওয়া হল ১৬ই মাঘ ভাল দিন। সেই দিন আত্মপ্রকাশ করবে সংবাদপ্রভাকর।

কাকাদের অনুমতি নিলেন যোগেন্দ্র। ছোট কাকা প্রসন্নকুমার তো নিজেও একজন ধুরন্ধর পত্রিকা-সেবী। রিফর্মার তাঁর সাংবাদিক নৈপুণ্যের স্বাক্ষরবাহী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ জানালেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে। গুরুর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন যোগেন্দ্র। গুরুর আশীর্বাদও এসে গেল। পত্রিকা প্রকাশের এক হপ্তা আগে (৯ই মাঘ) এ উপলক্ষে পরিবারের সকলের কল্যাণার্থে যজ্ঞ করলেন যোগেন্দ্রমোহন। ১৫ই মাঘ পরিপূর্ণ উপবাসে রইলেন যোগেন্দ্র, কে একজন বলেছিলেন—এতে এত বাড়াবাড়ি কেন। এ কি কোন ব্রত পালন? যোগেন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন ঠিক তাই—সেবাব্রত। দেশের সেবা, নিজে পবিত্র না থাকলে কি করে আমার মধ্যে সেবাধর্ম জাগ্রত হবে? প্রশ্নকর্তা তারপর আর কিছু টিপ্পনি কেটেছিলেন কি না জানা যায় নি—১০ই মাঘ দরিদ্রনারায়ণ সেবা করালেন যোগেন্দ্রমোহন—এক শো কাঙালীভোজন করানো হল, নিজে স্বহস্তে রন্ধন করে আহার্য-বস্তু পরিবেশনও করলেন যোগেন্দ্রমোহন (ঈশ্বরচন্দ্রের সহায়তায়)। আহারান্তে প্রত্যেককে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হল—নগদ একটি করে টাকা। প্রত্যেকের হাতে আচমনের জলও দিয়েছিলেন দুই বন্ধুতে। জাতিভেদের সংকীর্ণতা থেকে তখনকার দিনেই যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন অনেক উর্ধ্বে। ১১ই মাঘ হল বস্ত্রদান। সকাল থেকে বেলা প্রায় দুটো পর্যন্ত বস্ত্রদানপর্ব চলল। একই লোক যে ঘুরে ফিরে কতবার এসে গেল তার হিসেব আর কে রাখছে। ১২ই মাঘ ব্রাহ্মণ বন্দনা— ব্রাহ্মণ বিদায়ও হল উপযুক্ত দক্ষিণাসহ। ১৪ই মাঘ সকালে বসল সংগীতানুষ্ঠান, সন্ধ্যায় বিবিধ আনন্দোৎসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দল এই দিন নিমন্ত্রিত হলেন, সারা দিন তাঁরা রইলেন তাঁদের জন্যে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হল। ১৬ই মাঘ ১২৩৭ (১৮৩১ জানুয়ারী) সংবাদপ্রভাকর জন্মগ্রহণ করল। জন্মগ্রহণ করল সর্বকালের অবিস্মরণীয় পত্রিকা, জন্মগ্রহণ করল বাংলা সাহিত্যে প্রবীণ ও নবীনের মিলন-সেতু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। জন্মগ্রহণ করল নতুন ইতিহাস। ১৭ই মাঘ। এক শো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজনের লেখনী উপহার দিলেন যোগেন্দ্রমোহন, লেখনীগুলির শিরোদেশ স্বর্ণশোভিত করে দেওয়া হল।

যোগেন্দ্রমোহন বুঝেছিলেন যে, শুধুমাত্র মসী হলেই চলবে না, অসির প্রয়োজনও অপরিহার্য। শক্তির উপাসক বাঙালী, শক্তি চর্চাও তার অবশ্যকরণীয়। কয়েকজন মল্লবীরকে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আনালেন যোগেন্দ্রমোহন। নিজের বাড়ীতে তাঁদের রাখলেন। বাঙলার মল্লবীরদেরও তাঁদের সংগে মিলিত করলেন। যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন যোগেন্দ্রমোহন। বালক তরুণ, যুবকদের নিয়ে শক্তিসাধন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শক্তিসাধন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা যথোচিত সমারোহের সংগে পালিত হল। ভোরে আর অপরাহ্নে শক্তিচর্চা অনুষ্ঠিত হোত, সপ্তাহে একদিন থাকত বিরতি। বিভিন্ন মল্লবীর ব্যায়ামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। যোগেন্দ্রমোহনের বাড়ীতে তাঁরা থাকতেন, আহার্য আসত যোগেন্দ্রমোহনদেরই পাকশালা থেকে এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের বেতন পেতেন। শিক্ষার্থীর জন্যে ব্যবস্থা ছিল, উষ্ণ বা শীতল পানীয়ের বাদাম আখরোট কিসমিস পেস্তা মাখন প্রভৃতি সুখাদ্যের এবং শিক্ষালাভের জন্যে তাঁদের ব্যয় করতে হোত না একটি কপর্দকও। ১৮৩২ সালেই শক্তি সাধন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। সেই বছরেই হিন্দু থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন সংবিধানাচার্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বাঙালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা। এতেও সম্পূর্ণ তুষ্ট হননি যোগেন্দ্রমোহন। যোগেন্দ্রমোহন বললেন—প্রভাকর আর সাধনকেন্দ্র আর একটু প্রতিষ্ঠিত হোক, তারপর নাট্যশালার কাজেও আমি আত্মনিয়োগ করব। ছোট কাকামশাই যা করেছেন তার তুলনা নেই। বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন প্রথম পাতাতেই তাঁর নাম লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে। কিন্তু বাঙলার প্রথম নিজস্ব নাট্যশালায় দেশীয় নাট্যসম্পদ অনুপস্থিত কেন, সেইজন্যেই এটি বাঙালীর নিজস্ব প্রথম প্রচেষ্টা হলেও পরিপূর্ণতার স্পর্শ প্রাপ্ত নয়, আমি নাট্যশালা করব, আমি বাঙলার নূতন নাটক লেখার জন্য খুঁজে বের করব, নতুন নাট্যকারকে—সেই নাটক অভিনীত হবে আমার নাট্যালয়ে—তাতে বিদেশীর প্রভাবমাত্র থাকবে না।

যোগেন্দ্রমোহনের এ আশা পূর্ণ হয়নি, আর কোন আশাই তাঁর পূর্ণ হল না। পরের বছরই (১৮৩২) অত্যন্ত অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন যোগেন্দ্রমোহন। নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে ছিনিয়ে নিল মানুষের মধ্যে থেকে। তাঁর জীবন যবনিকার ঘটল অকালপতন। শক্তিসাধন কেন্দ্র অস্তিত্ব হারাল। সংবাদপ্রভাকরের প্রকাশও কিছুকালের জন্যে স্থগিত রইল। নাট্যশালার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল? একটা বিরাট সম্ভাবনা আবির্ভাবের সংগে সংগেই মিলিয়ে গেল। পত্রিকা হিসেবে সংবাদপ্রভাকরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজকের দিনের শিক্ষিত সমাজের কাছে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচায়ক। জাতীয় জীবনে এর অবদান অতুলনীয়। বাঙলার পত্র-পত্রিকাকুলের আদিপুরুষ সংবাদপ্রভাকর। দুঃখের কথা এই যে, এর দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা, জয়জয়কার ও বিজয়বৈজয়ন্তী দেখে যেতে পারেননি যোগেন্দ্রমোহন—এর প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, এর শুভজন্মের পরম পুণ্যপ্রভাতে যিনি করলেন প্রথম মঙ্গল-শঙ্খনাদ।

স্বপ্নময় পুরুষ যোগেন্দ্রমোহন। মাত্র বাইশটি বর্ষার ধারায় তিনি নিজেকে করেছেন অভিসিঞ্চিত বাইশটি গ্রীষ্মের উত্তাপ তিনি পেয়েছেন জীবনে। বাইশটি বসন্তকে তিনি করেছেন প্রত্যক্ষ। বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যোগেন্দ্রমোহন, তাঁর কর্মজীবনের মেয়াদ বোধহয় দুটি বছরও নয়, যোগেন্দ্রমোহন নশ্বরজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন আজ প্রায় এক শো আটাশ বছর আগে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কীর্তি, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে অমরত্বের আসনে করেছে অধিষ্ঠিত। এ আসন থেকে কোনদিন তাঁর অপসারণ ঘটবে না, এখানে কালের ধ্বংসধর্মী বাহুযুগল পারবে না তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে। বিধাতা পৃথিবীতে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন মাত্র বাইশটি বছরের পরমায়ু। কিন্তু ঐ অত্যল্প সময়সীমার মধ্যে সাময়িক পত্রের ইতিহাসে যে অবিনশ্বর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন যোগেন্দ্রমোহন সেই কীর্তিই তাঁকেই অমরত্বের আসন দিয়েছেন। যে আসনে তিনি কালজয়ী যেখানে তিনি আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, যেখানে তিনি দিব্যবিভায় সমুজ্জ্বল। তাঁর অমরকীর্তিকে নমস্কার, তাঁর অটুট ব্যক্তিত্বকে শত কোটি প্রণিপাত, তাঁর কল্পনাতীত বিরাটত্বকে শ্রদ্ধা আর সর্বোপরি তাঁর জ্যোতির্ময় স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করি প্রাণের প্রণাম।

অনুস্মৃতি

মানস রায়চৌধুরী

গানে আমার ভরে উঠলো ভোরবেলার হাওয়া
লাফিয়ে যায় শূন্য থেকে অন্য নীচু ডালে
একটি চপল কাঠবিড়োলী
সকাল বেলার আলো।
ঘুম ভাঙেনি মৌমাছিদের অসম্ভব [illegible]
এটা কি মাস? শীত পেরিয়ে একটু [illegible]
আবার রোদ পোহালে লাগে তপ্ত।
ফাল্গুনের প্রথম বেলা, অনাবৃত [illegible]
যায় মাঠের এধার থেকে ওধারে ওই
নির্জনতায় সাদা, বকুলতলা।

•

তুমি এখন অকম্পিত [illegible] বনে
ভিজে আঁচল জড়িয়ে গায় হাঁটছো কোন দিকে,
অবকাশের কুণ্ঠাহীন গুঞ্জরণ—
ছেলেবেলার স্মৃতির হাসি
পদ্মবন, শেওলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ভেসে উঠছে সরোবরের জলে।

•

সকাল বেলা হারিয়ে যায়
মধ্য দিনের ধূলি-বিলীন যেন কিশোর পান্থ
ফিরে তাকায় ব্যাকুলতায়
বিরাট আকাশ—অচিন মহাদেশের শেষ প্রান্ত।

"লক্ষ্মী আবাহন"

(২৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এখনও পেতুম না। সত্যি চমৎকার হয়েছে। শ্রীর নিশ্চয় পছন্দ হবে।" আবার কাগজে মুড়ে মুড়ে দুটিকে সে ভিতর পকেটে রাখল। বাক্স বন্ধ করে এবার সে উঠে দাঁড়াল।

শ্যামল হাসছে। "ও-দুটো এখন নিচ্ছিস কেন? পরে তোর বাড়ি এলে বরং দিস।"

না ভাই, ফেরবার সময়ে গাড়িতে আমি নিজে হাতে শ্রীকে পরিয়ে দোব। আমার দেরি সইবে না।

তারা তিনজনেই হেসে উঠল।

*   *   *

ফুলের মালা ও তোড়া নিয়ে ওরা যখন হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল তখন ট্রেণ এসে পেঁছিতে মাত্র এক মিনিট দেরী। দূরে ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। অম্বরের মনের উত্তেজনা তার মুখে চোখে প্রকাশ পাচ্ছে। তারা প্ল্যাটফর্ম ধরে সামনের দিকে আরও খানিক দূর এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিরাটকায় ইঞ্জিন শব্দ করতে করতে ষ্টেশনে ঢুকল, প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্তের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল। লোকের ভিড়ে জায়গাটা গিস্‌গিস্ করতে লাগল। ট্রেণ থামার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছুটোছুটি সুরু হল। "কুলি, কুলি, ইধার আও"—চারিদিক থেকে সকলে ডাকতে আরম্ভ করল। শ্রীলতার দেখা না পেয়ে অম্বর প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে লাগল। হঠাৎ একটা ফার্স্টক্লাস কামরার জানলায় তাকে দেখা গেল, মুখ বাড়িয়ে সে কুলিকে ডাকছিল।

ঐযে, ঐ ত শ্রীলতা! শ্যামল, এগিয়ে আয় বলে অম্বর ঊর্ধ্বশ্বাসে সে-দিকে ছুটল।

ততক্ষণে শ্রীলতা ট্রেণ থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। সামনে অম্বরকে দেখে আনন্দিত স্বরে সে বলল, "অম্বর, তুমি, তুমি এসেছ? তার পর কুলিকে দিয়ে সে জিনিষপত্র নামাতে লাগল।

সেই কামরা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে একটি লম্বা-চওড়া পুরুষ নামল। টক্‌টক্ করছে ফর্সা রঙ, সুন্দর মুখচোখ, পরনে দামী বিলাতী সুট। শ্রীলতার সামনে এসে সে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করল, "ডার্লিং, আমরা সোজা হোটেলেই যাব ত?"

"হ্যাঁ, ডিয়ার," বলে শ্রীলতা এগিয়ে গিয়ে অম্বরের সামনে দাঁড়াল। পুরুষটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে অম্বর চেয়েছিল। শ্রীলতাকে সামনে দেখে অম্বর বলল, "তোমায় নিতে এসেছি, শ্রী। শুধু শুধু হোটেলে উঠবে কেন? চলো আমার বাড়ি।" ফুলের মালাটা অম্বর তার গলায় পরিয়ে দিল। শ্যামল ও মালিনী এগিয়ে এল।

লজ্জিত স্বরে শ্রীলতা বলল, "এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি, অম্বর। ইনি আমার স্বামী, ডক্টর ভাটিয়া। লণ্ডনেই আমাদের বিয়ে হয়েছে। সে খবরটা তোমায় দোব দোব করেও দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, হোটেলেই আমরা ঘর বুক করেছি। জিনিষপত্র নিয়ে ওখানে ওঠাই সুবিধে। দু-দিন পরেই আমরা ম্যাড্রাস চলে যাচ্ছি। ওখানেই ইনি কাজ পেয়েছেন। এসো, তোমার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই।... এই আমার বন্ধু, অম্বর চৌধুরী। এর কথা তোমায় বলেছি।

ভিড়ের মধ্যে ভাটিয়া শুনতে পেল না। কুলিদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'চলে এসো, ডার্লিং।" কুলিদের পিছনে শ্রীলতা হন হন করে এগিয়ে গেল।

ফুলের তোড়াটা হাতে করে অম্বর পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে সেই দিকে চেয়ে রইল।

একটি কবির মৃত্যু হয়েছে খবর কি রাখো তার?
শোক সংবাদ কাগজে হয়নি ছাপা,
রূপসী নগরী হাসি কোলাহলে
মেতে আছে অনিবার,
তুচ্ছ খবর পড়ে গেছে তাই চাপা।

সে কবির ছিল বুকভরা গান, কণ্ঠে অমৃত ভাষা,
কত আশা মনে রঙীন স্বপ্ন ভরা,
মানুষের মনে জাগাবে চেতনা,
প্রেম-প্রীতি ভালবাসা,
গড়িবে নূতন একটি বসুন্ধরা।

সে কবির ঘরে নিয়ত অভাব, স্বপ্ন গিয়েছে টুটে,
স্ত্রী-পুত্র তার উপবাসে মরে বুঝি,
জীবন যুদ্ধে বিব্রত কবি, কবিতারা মাথা কুটে,
আলোর দিশারী পায় না কোথাও খুঁজি।

সে কবির আজ মৃত্যু হয়েছে নিয়তির পরিহাসে,
দিল না পৃথিবী বাঁচবার অধিকার,
ব্যর্থ আবেগ কাঁদে বুকে তাই অসহায় নিশ্বাসে,
বেঁচেও জীবন ক্ষয় হয়ে গেছে তার।

সকালের আগন্তুক

(২২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মাঠে জমা হবার যোগ্য, সে তুমিও জানো, আমিও জানি, অন্যেরাও জানেন। তবু সে-সব পাত্তা পায় কেন? পায় ব্যক্তি-সম্পর্কের জোরে।

ঐ জোরকেই বলে পাশ-দুয়ারী তদ্বির! ওর ওপর মুষলাঘাতই আমার ব্রত, ঐ পথে লাভের কড়ি কুড়ানো নয়! সেই জন্যেই আমি তথাকথিতদের কেয়ার করি না, তাদের কাছে যাই না, তাদের কর্তৃত্ব স্বীকার করি না!

আবার আজেবাজেদেরও তোমার সহ্য হয় না! তারা এলে ডাকলে দাবী-দাওয়া তুললে, তাতেও তুমি বিরক্ত হও! তোমায় ত দেখছি মহা মুস্কিল!

তা একটু মুস্কিল বৈকি! যে মানুষ লাও ও লোভ দুটোকেই বর্জন করে চলতে চায়, আর শুধু সংস্কৃতি ও মননশীলতার চর্চায় নিবিষ্ট থাকতে চায়, এ যুগে তাকে বরদাস্ত করার মতো পটভূমিই নেই যে!

এই পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছেছে, ইতি-মধ্যে নীচেয় এক জন মহিলার আবির্ভাব হল। আর একদিনও এসেছিলেন তিনি, একটি শিশু-কন্যার ভার কোন অনাথ প্রতিষ্ঠানে দেওয়া যায় কিনা, তার সন্ধান করতে।

গৃহিণী বললেন, এখন ফিরিয়ে দোব, বাড়ী নেই বলে?

সে কি কথা? নিরুপায় নিরাশ্রয় মানুষের সঙ্গে ছলনা করবে?

সে আমি জানি। সেই জন্যেই ত ঐ সব ফাঁকা আস্ফালনে কান দিই না কোন দিন। যাকগে, এবার বলি শোনো: যে দু-জন সকালে এসেছিলেন তাঁদের একজন অচিন্ত্যবাবু, অন্য-জন প্রেমেনবাবু!

অ্যাঁ? এতক্ষণ বলো নি কেন সে কথা!

দিন শেষে — এ, এম, কুমার
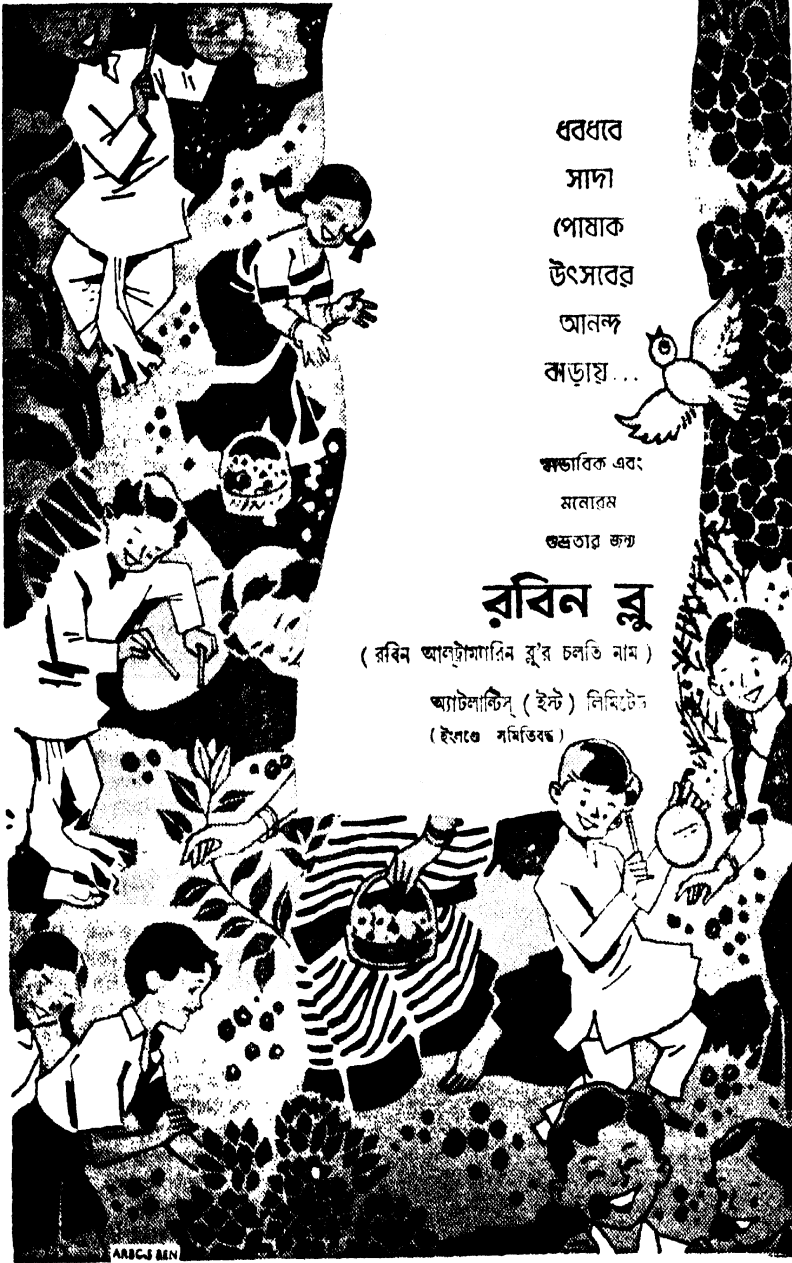
ধবধবে
সাদা
পোষাক
উৎসবের
আনন্দ
ঝরায়...
স্বাভাবিক এবং
মনোরম
শুভ্রতার জন্য
রবিন ব্লু
(রবিন আলট্রামারিন ব্লু'র চলতি নাম)
অ্যাটলান্টিস্ (ইস্ট) লিমিটেড
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

বার বার বলি—'আমার কথা ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো' আর বার বারই একটা-না-একটা প্রশ্ন তুলে বলা হয় এর জবাব দিয়ে কথা শেষ করুন, দাদা। কথা শেষ করবার সময় এসেছে, তা কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না; পলে পলে তা নিজেই আমি অনুভব করি। কিন্তু তবুও কথা বলি। আবার চোখ রাঙিয়েও কেউ কেউ কথা বলিয়ে নেয়। বলতে হয় বুড়ো বলে; বলতে হয় নির্লজ্জ বলে। বলে হাততালিও পাই, গাল-গালিও খাই। যখন বলি এমন নাট্য-প্রয়াস আর দেখিনি, তখন বলতে শুনি, 'এতদিন নাটক লিখেছে, ও বুঝবে না ও কে বুঝবে।' আর যখন কোন নাট্য-প্রয়াসকে দোষযুক্ত বলি, তখন শুনি-'সারা জীবন ধরে নাটকের নামে রাবিশ জড়ো করেছে মহাকাল যা ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেবে, ও আবার নাটকের অথবা অভিনয়ের প্রয়োজনার বোঝে কি?' তবু নির্লজ্জের মতো দুরকম কথাই বলি। বলি মানুষ বলে, কথক-জীব বলে।

•

আগে শুনতাম অতীত দিনে বাংলায় নাটক হয়নি। তারপর শুনলাম নীলদর্পণের (১৮৬০) পরে নবান্ন (১৯৪৩) ছাড়া নাটক হয়নি।

শ্রী এস সি এ প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'হসপিট্যাল' চিত্রে সুচিত্রা সেন

তখন সব প্রগ্রেসিভরা প্রাচীনদেরকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ওকেই বুলি করে তুল্লেন। তাও শুনলাম। প্রতিবাদও করলাম। তারপর একদল প্রগ্রেসিভ, কি কারণে জানি না, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যখন অভিনয় করলেন, তখন রোয়াব উঠল, হ্যাঁ, ওই একখানা নাটক বটে। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু', গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' যখন অভিনীত হলো, তখন নব আবিষ্কারের গৌরবও দাবী করা হোলো। দুঃখীর ইমান, পথিক, উলুখাগড়া, ছেঁড়াতার পর পর অভিনীত হয়, আর শোনা যায়, নবান্নর ট্রাডিশন খরস্রোত হয়েছে। অপর দল বাস্তুভিটা, তরঙ্গ, মশাল নিয়ে বল্লেন, নাটকহীন দেশে এই-ই এলো নাটকের প্লাবন। ক্রমে নতুন ইহুদী, বারোঘণ্টা, বুদবুদ, মৌচোর, ডাউন ট্রেণ এসে নাটকের অস্তিত্ব প্রমাণিত করল, প্রমাণিত করল তা সংক্রামিত, খেলা-ভাঙার-খেলা আরো কত নাটক। তারপর বরাত খুলে গেল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর নাটক ত বটেই, গল্প উপন্যাসের যেন-তেন-প্রকারেণ দেওয়া নাট্যরূপ দেখিয়েও বলা হতে লাগল, এই তো দিলাম নাটক। যে নাটকগুলির নাম করলাম, তার প্রায় সব-গুলিরই আমি সমর্থন করেছি লিখে এবং বক্তৃতাও দিয়ে। কিন্তু ওদের দুর্বলতা যখনই দেখাতে চেয়েছি, তখনই পাল্টা গাল খেয়েছি কালজয়ী নাটক রচয়িতাদের কাছে, আর ওদের অভূতপূর্ব প্রযোজকদের কাছে। তবুও আমি কখনো বলিনি নাটক হচ্ছে না। আমি জানি মানুষ যেমন দোষ ও দুর্বলতাবিহীন হয় না,—মানুষের সৃষ্টি, মানুষকে নিয়ে সৃষ্টি, নাটকও তেমন দোষ ও দুর্বলতাবিহীন হয় না। আমাদের অতীত নাটকে রচয়িতার ও বাঙালী জাতির অনেক দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশিত [illegible]

কিন্তু দোষ ও দুর্বলতা থাকবার জন্য যদি বলা হয় বাংলাদেশে নাটকই নেই, তাহলে ওই যুক্তির জোরে বলাও চলে যে, বাংলাদেশে বাঙালীও নেই। কিন্তু যাঁরা 'নেই, নেই' বলেন, তাঁরা আবার 'আছে আছে' রোয়াবও তোলেন। এক প্রগ্রেসিভ দলের অধিকারী একদিন এসে বল্লেন,—'দাদা, বাংলাদেশে এমন একখানা নাটক আছে, তার খবর ত কেউ রাখে না!' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কোন্ নাটকের কথা বলছ, ভায়া?' তিনি বল্লেন,—'কেন, অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়'!' আমি বল্লাম—'খবর রাখবেন না কেন? ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা ওখানা অভিনয় করেছিল; খুব ভালো চলেনি। ভাল নাটক। কিন্তু অমৃতলাল ওর চেয়েও ভালো নাটক অনেক লিখেছেন। বিদেশী নাটককে স্বদেশী করবার অসামান্য দক্ষতা তাঁর ছিল। তিনি মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন বলেই তা পেরেছিলেন। বাঙালীকে অবহেলা করে বিদেশীকে স্বদেশী করা যায় না।' প্রগ্রেসিভ ধৈর্য হারিয়ে বল্লেন—'সেদিন কোশিটিউশনে ওই নাটক অভিনয় করে সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি।' আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বিষয়টা পাল্টে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—''আমাদের 'শাস্তি' দেখেছেন ত? রবীন্দ্র-নাথের ওই গল্পটিতে যে অনবদ্য নাট্যবস্তু আছে,

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত 'ভগিনী নিবেদিতা' চিত্রের নামভূমিকায় অরুন্ধতী [illegible]

এ-কথাই যা আগে কে বুঝেছে?" আমি বল্লাম—"যাঁরা বুঝেছিলেন, তাঁদেরকে তোমরা বুঝতে চাও না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে ওখানা "অভিমানিনী' নামে অভিনীত হয়। কে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, তা আমার জানা নেই; কিন্তু অভিনয় করেছিলেন দানিবাবু, ক্ষেত্র মিত্র, কুসুমকুমারী, নরীসুন্দরী। আমি সে-অভিনয় দেখিনি, তোমাদেরটা দেখেছি যুব-উৎসবে এবং গণনাট্যোৎসবে। শান্তিনিকেতনের প্রভাত মুখোপাধ্যায় শেষের বার আমার পাশে বসে অভিনয় দেখেছিলেন। তিনি বল্লেন—'শেষের দৃশ্যটা বাদ দিতে বললেন।' প্রথমবার দেখে আমি বলেছিলাম, 'শেষের দৃশ্য সম্বন্ধে একটা কিছু করা দরকার। তুলসী বেঁচে থাকলে হয়ত করতেন।"

*

প্রগ্রেসিভ আমার সে-কথার জবাব না দিয়ে বল্লেন—"বাংলা থিয়েটার রবীন্দ্রনাথকে অবহেলা করে নিজেরই ক্ষতি করেছে।" আমি বল্লাম—"অবহেলা করল কোথায়? বেঙ্গল থিয়েটার রাজা ও রাণী মঞ্চস্থ করেছেন (১৮৮২), ন্যাশনাল করেছেন কেদার চৌধুরী রূপান্তরিত বৌঠাকুরাণীর হাট 'রাজা বসন্ত রায়' নাম দিয়ে (১৮৮৬), ষ্টার 'রাজা ও রাণী' করেছেন (১৮৮৯), ক্লাসিক 'চোখের বালি' করেছেন (১৯০৪), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৯১০), দানিবাবু কচ, তারাসুন্দরী দেবযানী; রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রূপান্তরিত 'দিদি'র নাট্যরূপ 'অকলঙ্ক শশী' ওই বছরেই। অমরেন্দ্র নাথ, তারক পালিত, হাঁদুবাবু (মন্মথনাথ পাল), কুঞ্জ চক্রবর্তী, কাশী চট্টোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। আর্ট থিয়েটার করে 'চিরকুমার সভা' (১৯২৫), 'গৃহ-প্রবেশ' (ঐ), 'বশীকরণ' (ঐ), 'শোধবোধ' (১৯২৬), নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হয় 'বিসর্জন' দিয়ে (১৯২৬), আর্ট থিয়েটার 'পরিত্রাণ' (১৯২৭), নাট্যমন্দির শেষরক্ষা (১৯২৭), রাধিকানন্দ সম্প্রদায় (এম্পায়ার) চিত্রাঙ্গদা (১৯২৮), নাট্যমন্দির 'তপতী' (১৯২৯), মনোমোহন 'মুক্তির উপায়' (১৯৩০), ক্যালকাটা থিয়েটার্স (নাট্যনিকেতন) নরেশ মিত্র রূপান্তরিত 'গোরা' (১৯৩৬), নবনাট্য মন্দির 'যোগাযোগ' (ঐ), ষ্টার 'নৌকা ডুবি'। বাঙালী দর্শকরা তখন যদি ভীড় করতেন, বাংলা থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের আরো নাটক অবশ্যই মঞ্চস্থ করতেন।" প্রগ্রেসিভ কথা ঘুরিয়ে নিলেন।

*

তিনি বল্লেন—"শাস্তির শেষ দৃশ্যের কথা কি বলছিলেন?" "বলছিলাম, শেষটা কি হবে ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। শুরুটা সব নাটকের বেশ হয় দেখি, ঘুলিয়ে যায় শেষ করবার মুখে। দুঃখীর ইমান বেশ নাটক। কিন্তু শেষটা হয়েছে wishful. প্রায়ই দেখতে পাই, 'দুঃখীর ইমান' মঞ্চস্থ করবার সৎসাহসের জন্য নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। আমার যতদূর জানা আছে, ওর প্রযোজনায় তাঁর কোন দান নেই। তিনি কেবল প্রতিবন্ধকতা করেন নি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য আর তুলসী লাহিড়ী সব ঝুঁকি নিয়ে ওর অভিনয় করিয়েছিলেন এবং প্রযোজনার ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস শিশিরকুমার যদি ওর প্রযোজনায় মন দিতেন, তাহলে ওর শেষটা হয়ত তিনি বদলে দিতেন। না দিলে তিনিও ভুল করতেন।

বহুরূপী তাঁদের 'ছেঁড়াতারের' শেষটা বহুদিন বাদে বদলেছিলেন; বদলে ভালোই করেছিলেন। গোড়াতেই ওর দিকে যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁরা অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। 'রক্তকরবী'ও কিছু কিছু তাঁরা পরিবর্তন করেছেন। তাতে ক্ষতি হয়েছে, এমন [illegible] কিছু একটা অবশ্যই পরিবর্তনের প্রসঙ্গ যাঁরাই তুলতেন, তাঁদেরকেই তাঁরা নির্বোধ বলতেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী 'এক মুঠো আকাশ' নিয়ে সাধারণ ব্যবসায়ী রঙ্গালয়ে এলেন। তখন শোনা গেল এমন নাটক আগে কখনো দেখা যায়নি। মহলা দিতে দিতে আর অভিনয় করতে করতে, যে-নাটক তিনি এনেছিলেন, তার খোল-নলচের অনেক বদল করলেন। তখনো বলা হতে লাগল এমন নাটক কখনো হয়নি। পরিবর্তন না করবার আগেও অপূর্ব, পরিবর্তন করবার পরও অপূর্ব! কারু কথা শুনে পরিবর্তন করতে হবে এমন কথা আমি বলি না। অভিজ্ঞতা অনুসারে পরিবর্তন করাই নাটকের পক্ষে হিতকর। কিন্তু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা নাটকের পক্ষে শুভংকর নয়। বহুক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি প্রগ্রেসিভরা ভুল স্বীকার করেও ভুল শোধরাতে নারাজ। ভুলকেই নির্ভুল প্রতিপন্ন করবার জিদ অনেককেই পেয়ে বসে। আর তার যুক্তি হয়ে দাঁড়ায় সে-কাল থেকে পৃথক দৃষ্টি-কোণ। কিন্তু লজিকে সে-কাল এ-কাল ভেদ আছে বলে আমার ত জানা নেই। প্রগ্রেসিভরা লেখেন ভালো, বিষয়বস্তুও নির্বাচন করেন ভালো, কিন্তু নাটককে তার Logical Conclusion-এ পৌঁছে দেবার বেলায় কী যেন তাঁদের কলম চেপে ধরে, অন্যদিকে ঠেলে দেয়।

*

আগে যেমন শুনতাম নাটক নেই, এখন তেমন শুনছি নাটক হচ্ছেও না। ও-কথা সেকেলেরা বলেন না, একেলেরাই বলেন। সেকেলে সকলেই ত আজ হতবাক; আমি ছাড়া। এ-কেলেরা নিশ্চিতই কোন ত্রুটি লক্ষ্য করছেন। তাঁরা বলছেন বিদেশী নাটকের অনুবাদ অথবা বিদেশীর অনুকরণে রচিত নাটক অভিনীত হতে হতেই এই ত্রুটি দূর হবে। হবে না সে-কথা বলি কি করে? বহু দেশে তা হতে দেখা গেছে। আমরাও ত একশ' বছর তাই-ই করছি। আজকাল বিদেশী নাটক আর তাদের প্রযোজককুল ও নাটক নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁদের নখদর্পণে সততই প্রতিফলিত। তবুও, অতীতে না হোক, আজকার দিনে, কেন নাটক হচ্ছে না? একশ' বছরেও না হয়ে থাকে ত কবে আর তা হবে?

*

আমি কিন্তু খুব হতাশ নই। আমি মানি নতুন লেখকদের দৃষ্টি সমাজের নানা স্তরে প্রসারিত হয়েছে, নতুন নতুন বিষয়বস্তু তাঁরা আহরণও করছেন। কিন্তু তাই পরিবেশন কি ভাবে করবেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা সুনিশ্চিত নন। তাঁদের প্রথম দুশ্চিন্তা হচ্ছে, পাছে রীতিটা যথেষ্ট আধুনিক না হয়; সেকেলে গন্ধ ছড়ায়। তাঁদের দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা হচ্ছে পাছে তাঁদের সৃষ্টি বুর্জোয়া সৃষ্টি বলে কথিত হয়। এখন, বাঙালীর রচিত নাটকে বাঙালী চরিত্রের পরিচয় থাকবে না, এ ত একেবারে অসম্ভব কথা। রোমান নাটক থেকে, ফরাসী নাটক থেকে নিয়ে ইংরেজরা নাটক লিখেছে, কিন্তু ইংরেজী নাটক হয়ে ইংরেজেরই মনের গন্ধ ছড়িয়েছে, যেমন আইরিশ ব্যালাডের প্রভাবে রচিত 'বাল্মীকীর প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সৌরভে সুরভিত করেছিলেন, মাইকেল যেমন করেছিলেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'কে, অমৃতলাল দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন তাঁদের কোন কোন নাটককে তা করেছিলেন। ওকে আত্মসাৎ করা না বলে 'নিজকরণ' বলাই ভালো। প্রয়োজন মনে করলে রূপ নোব বাইরের থেকে, বিষয়বস্তুও নোব, কিন্তু দেখব তা কতটা নিজস্ব করা সম্ভব। গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস'কে 'নীচের মহল' করে নিজস্ব করা যায় নি, কিন্তু সাজাহানকে তা করা গিয়েছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলতেন, 'সাজাহান' রসের দিক দিয়ে 'কিং লিয়ার' নাটকের চেয়ে নিরেস নাটক নয়, যদিচ সাজাহানের অনেক কিছু বাদ দিয়ে তিনি অভিনয় করতেন। শিশিরকুমার 'কিং লিয়ার' পড়েননি, অথবা বোঝেন নি, আশা করি এমন কথা কেউ বলবেন না। 'মালিনী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শেকসপীয়ারের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত, এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। আসল কথা মনের একটা সত্যকার [illegible] আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।" শেকসপীয়ারের নাটক চিরন্তন নাটকরূপে স্বীকৃতি পেলেও আরো নাটকও চিরন্তন হয়েছে ভিন্ন রীতি অবলম্বন করেও। কাজেই শেকসপীয়ারের রীতি ছাড়াও অন্য রীতি, যেমন ইবসেনের রীতি কি গোর্কির রীতি, কি চেকভের রীতি, কি [illegible] কোন রীতি যে এ-দেশের নাটকের রূপ [illegible]

[illegible] 'সপ্তপদী' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

অবলম্বন করা যাবে না — তার কোন মানে নেই। কিন্তু যে-রীতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন দেশ-কালের ধারায় আবিষ্কার চেষ্টা করতে হবে। এ-পাশ্চাত্যে যতটুকু ভাবে তাই করা যায়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তা করা হয়নি বলে কিছুতেই তাকে আমলাদার করা যাচ্ছে না। সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র এবং তাদের অনুগামী অনেকে তা করেছেন; আবার তা অগ্রাহ্যও করতে চেয়েছেন কেউ কেউ। নাটকেও ঊনবিংশ শতকের নাট্যকাররা তা করেছেন। বিশেষ করে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, তেমন রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ বিরোধও সৃষ্টি করছে। পরস্পরবিরোধী ভাব ও আদর্শ সর্বত্রই একটা সংঘাত সৃষ্টি করছে পৃথিবীর সকল দেশে। সেই সব সংঘাত প্রতিফলিত হচ্ছে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, শিল্পের ভিতর দিয়ে নানা দেশের মর্মকে আশ্রয় করে, মতবাদকে [illegible] সাহিত্যে তার পরিক্রম দেখা যাবে এমন আশা করা সঙ্গত নয়। ভারতবর্ষেও তা দেখা দিয়েছে। সেটা [illegible] কথা নয়, আসল কথা, ভাববার কথা কি নেব, কতটুকু নেব। এইটি জানা দরকার, আমার দেশের জন্য কি প্রয়োজন। দেশের সঙ্গে দেশের শিল্পের, বিশেষ করে নৃত্য-নাট্য-সংগীতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে। [illegible] প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া তা সার্থক হয় না। যে নাটক দেখতে দেখতে দর্শকেরা ঘুমিয়ে পড়েন, যে-গান শুনতে শুনতে শ্রোতারা দুই হাতে দুই কান চাপা দেন, যে-নাচ দেখতে দেখতে দর্শকদের চিত্ত নেচে ওঠে না, সে-নাটক, সে-সংগীত, সে-নৃত্য যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, ব্যর্থ প্রয়াস বলেই কথিত হয়। তাই এমন বিষয়বস্তু বেছে নিতে হয়, এমন ছন্দ, এমন সুর, এমন তাল-লয় বেছে নিতে হয়, যার সার্বজনীন আবেদন আছে। তাই বেছে নেবার সময় জাতির মর্মবীণের মূল সুরটির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। আর তা করতে হলে দেশের প্রতি, দেশের লোকের প্রতি, দেশের সংস্কৃতির প্রতি, শ্রদ্ধা নিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে মন দিতে হয়।

বিদেশের কাছ থেকে আমাদের যেমন নেবার আছে, তেমন দেবারও আছে প্রচুর। যদি ধরে নি আমাদের যা কিছু আছে সবই তুচ্ছ, তাহলে কেবল দিতেই আমরা অসমর্থ হব না, কোনো কিছু বলে নিতেও পারবো না; নকলনবিশী অবশ্য করতে পারব। কিন্তু নকল জিনিস [illegible] করে আমাদের সৃজনীশক্তির পরিচয় দিতে পারব না, বিশ্বকে বিস্মিত করতে পারব না, শ্রদ্ধাও পাব না কারো।

এক সময়ে কাব্য, নাট্য ও সংগীতকে ব্যবহার করা হোতো নাটককে রসঘন করবার জন্য, নাটকে রস ধরাবার জন্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল আন্তর্জাতিক যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের মানুষকে বার বার কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি এনে এমনই একটা কদর্য সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রকট করল যে মানুষের মন থেকে কাব্য উবে গেল। কাটা কাটা কড়া কড়া কথা চড়া সুরে বলা, অথবা সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করাই হোলো প্রগতির পরিচয়। কবিতা ও নাটক নতুন রূপ গ্রহণ করল। কবিতা ও নাটক আমাদের দেশে যেমন সার্বজনীন হয়েছিল ইউরোপে তা হয়নি, শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও। ইউরোপে তা প্রধানত শহরে ও শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ-কথা ইউরোপীয় নাটক-সংক্রান্ত লোকদের মুখে শুনেছি, কোন সমালোচকের লেখায় পড়িনি। এই কথাই আমি সত্য মনে করেছি। শেক্সপীয়ার, ইবসেন, শ' শিক্ষিতরাই সম্যকভাবে বুঝতে যেখানে গায়ের রক্ত জল করে গেছেন, সেখানে জনসাধারণ যে ওদের নাটকের মর্ম অভিনয় দেখেই বুঝে নেয়, এ-কথা মনে করবার কারণ নেই। তারা বুঝল কি বুঝল না, তা নিয়ে ও-দেশে কারো মাথাব্যথা ছিল না। ও-দেশের সভ্যতা শহুরে সভ্যতা। যা কিছু [illegible] শহরই করত, শহুরে শিক্ষিত লোকদেরই জন্য করত। কিন্তু আমাদের কাব্য, আমাদের সংগীত কেবলমাত্র শহুরে সৃষ্টিই ছিল না। শহর গড়ে ওঠবার পরেও তাই স্রষ্টারা পল্লীর দিকে তাকিয়েছেন, পল্লী থেকে নিয়েছেন অনেক কিছু। বর্তমান বাংলা নাটক শহরে উদ্ভূত হলেও বাঁচবার তাগিদে পল্লীর সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চেয়েছে। তা করে গিয়েছিলেন গিরিশ। তাই তিনি বাংলা নাট্যশালার জনক। তাঁর পরবর্তীরাও তা করেছেন [illegible] ও [illegible] প্রেমকে দেশভক্তি ও দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করে। তাঁরা এর প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক লিখে গেছেন যা পল্লীর প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে — যেমন বিসর্জন, প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ, [illegible], মুক্তধারা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি। [illegible] বলেন যে পল্লীর লোকের কাছে দুর্বোধ্য হবে, আমার তা মনে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে যাবার লোকের অভাব। আর বাংলার পল্লীও দেশ বিভাগের পর একরকম মরেই গেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের দুই পাশে যে পল্লীগুলির প্রাণ এখনো ধুক-ধুক করছে, তা সম্পূর্ণরূপেই শহরাশ্রিত। শহরই আজ সর্ব বিষয়ে নায়কত্ব করছে। গিরিশ শহরে-পল্লীতে যে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টি পল্লীতে নেওয়া যেত, তাও পরিত্যক্ত হয়েছে। শহরের নাট্যস্রষ্টারা বলছেন নাটকের ভাষায় লিরিক থাকবে না, আবেগ থাকবে না, দ্যোতনা থাকবে না, আদর্শ থাকবে না, থাকবে ক্ষোভ, থাকবে রোষ আর অভিযোগ, এবং সভায় সভায় যেমন প্রতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তেমনই প্রতিবাদে হবে নাটকের সমাপ্তি। শহরের দাবীই ত এই। সে ত এই নায়কত্বই দেবে।

*

শহর গড়ে উঠেছে, এবং আরো গড়ে উঠবে, কেবল আপিস-আদালত, শেয়ার-মার্কেট-ডককে কেন্দ্র করেই নয়, নানা ধরণের নতুন-নতুন ফ্যাক্টরীকেও কেন্দ্র করে। তাই থেকে আমদানি হবে ভারতীয় শহরে শহরে ইউরোপীয় জীবন, ইউরোপীয় সমস্যা, ইউরোপীয় সংস্কৃতি। আর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে, বর্মা থেকে গম এনে, চাল এনে, উন্নত [illegible] ব্যবস্থা যত কার্যকর হবে, [illegible] বিবেচিত হবে, পল্লী তত উপেক্ষিত হবে; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তারই [illegible] হিসেবে [illegible] এবং ইস্পাতের হিসেবকে [illegible] করে [illegible] চাইবে। আর [illegible] ভারতবর্ষ হয় ইউরো-আমেরিকা হবে, না হয় হবে [illegible], এই আশাই সরকারী ও বেসরকারী মহলে পোষিত হচ্ছে। ভারতবর্ষকে গড়তে হচ্ছে [illegible] এই চিত্র মনে রেখে। এ চিত্র কিন্তু সোশালিস্ট দেশসমূহের বা কমিউনিস্ট দেশসমূহের চিত্র নয়, রাশিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতির চিত্র নয়। ও-সব দেশের পল্লী মৃত নয়, মুমূর্ষুও নয়, উপেক্ষিতও নয়। ও-সব দেশের কো-অপারেটিভ, পল্লী-কমিউন, বিকেন্দ্রীভূত শিল্প ও ফ্যাক্টরী পল্লীতে নবজীবন সঞ্চার করছে। ও-দেশে কোন প্রতিষ্ঠানই অচলায়তন নয়, জনসাধারণের দ্বারা প্রাণবন্ত, জীবন্ত; অবশ্য কমিউনিজমের আদর্শের মধ্যে সীমায়িত। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয়নি এই কারণে যে, সেই কমিউনিজমের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের এবং মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ।

বাংলাদেশে সাহিত্য এবং নাটক সৃষ্ট হয়েছিল শহরেই, যখন সারা পল্লী অঞ্চল ছিল দাসভূমি। সে ধরণের দাসত্ব আমাদের দেশে কখনো ছিল না। জনগণের সে লাঞ্ছনা, সে অসহায়তা, সে সর্বরিক্ততা আবার গুমরে গুমরে ওঠা সেই মুক্তির ব্যাকুলতা আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। কিন্তু রুশের সাহিত্য ও নাট্যস্রষ্টারা তাই খুঁজে পেয়েছিলেন জাতির মর্মবীণের মূল সুরটি; এবং নানা মতবাদের ভিতর দিয়েও যুগে যুগে সেই সুরটি ধ্বনিত রেখেছিলেন মহাবিপ্লবের সময় পর্যন্ত, এবং তার পরেও তা ধ্বনিত রেখেছেন। আজকার বহু ভাষাভাষী সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সুর অবলম্বন করে নব সৃষ্টির আবেগকে গভীরতর করে, রামধনুর সপ্তবর্ণে রঙীন করে, অপেরার মাধ্যমে, ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত নবজীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু যে বোলশয় দলই পল্লীতে পল্লীতে তা বহন করে নিয়ে যান তা নয়, পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী দলগুলিও শহরে শহরে নিয়মিত ভাবে ঘুরে বেড়ান। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশেও এটি হোতো। কোলকাতার থিয়েটার মফঃস্বলে যেত, মফঃস্বলের কীর্তন, কবিগান, ঝুমুর প্রভৃতি কোলকাতায় আসর বসাতো; যাত্রাও এখনকার তুলনায় অনেক বেশী অভিনীত হোতো কোলকাতা ও মফঃস্বলের শহরে শহরে। আজ মফঃস্বলের শহরে শহরে নাটক অভিনয় করা কঠিন হয়েছে কতকগুলি কারণে। তা হচ্ছে এই :—(ক) আগেকার টাউনহলগুলি প্রায় সবই সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়েছে, (খ) রাজারা আর জমিদাররা, বায়না করে যাঁরা থিয়েটার আর যাত্রাভিনয় করাতেন, তাঁরা আর নেই, (গ) বারোয়ারী দলাদলির ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে, (ঘ) রেলের ভাড়া বেড়ে গেছে, কনসেশনের যে ব্যবস্থা আছে, এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধে, তাও টুরিং পার্টির পক্ষে সুবিধাজনক হচ্ছে না এই জন্য যে, কনসেশন দেওয়া হচ্ছে টার্মিনাস থেকে টার্মিনাস যাওয়া-আসায়। কোলকাতা থেকে দিল্লী গেলে আবার কোলকাতাতেই ফিরে আসতে হবে, পথে কানপুরে, এলাহাবাদে, কাশীতে অথবা পাটনায় নামতে হলে কনসেশনের সুবিধে পাওয়া যাবে না। ওর যে-কোন যায়গায় অভিনয় করতে হলে কোলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই যায়গায় যাওয়া-আসার জন্য কনসেশনের আবেদন করতে হবে। প্রমোদ কর থেকে রেহাই পেতে হলে দলকে 'রেজিস্টার্ড' করতে হবে। সব দেশের ভ্রাম্যমাণ দলগুলিকে এত ঝামেলা পোহাতে হয় না।

*

চীনে কেবল পিকিং অপেরাই নয়, আঞ্চলিক অপেরাগুলিও প্রাধান্য লাভ করেছে। ওদের কাগজে পড়েছি, নয়াচীন প্রতিষ্ঠা পাবার পর দুই হাজার অপেরার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। খানকতক 'চাইনীজ লিটারেচারে' প্রকাশিতও হয়েছে, সেকেলে বলে পরিত্যক্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে চণ্ডালিকা, নটীর পূজা প্রভৃতির উপাদান নিয়েছেন, উপনিষদ, পুরাণ থেকেও নিয়েছেন, তাঁর সমসাময়িক জীবন থেকেও নিয়েছেন, আবার ভবিষ্যতে মানব-জীবন যা হবে বলে তিনি বুঝেছেন, তারও রূপ দিয়েছেন। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম যুগে বলা হোতো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতে অমর হয়ে থাকবেন না। যাঁরা সেদিন তা বলেছিলেন, আজ তাঁরাই রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পালন করবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্র স্মৃতি-তর্পণ পাপ, রবীন্দ্র নাট্য-পরিবেশনাও অর্থহীন। নিরর্থক সেই পাপ আমরা যেন না অর্জন করি। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ধ্যানের বিষয় করে তুলবে আশা

(শেষাংশ ২৫৪ পৃষ্ঠায়)

ছবির কথা বলতে গেলেই আমার সমালোচকের নিরপেক্ষ লেখনীর মুখে সর্বাগ্রে বাংলা ছবির কথাই আসে। কিন্তু কেন? ব্যাপকতর ভাবধারা ও গভীরতর দৃষ্টিশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন আমি, অর্থাৎ আমার সমালোচক সত্তা, বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমার চিন্তাবৃত্তিকে সঞ্চালিত করতে পারলো না?—এমন প্রশ্ন করলে অনুচিত বা অস্বাভাবিক হবে না।

কিন্তু তবু, একান্তরূপে বাংলা-ছবিরই প্রসঙ্গ অবতারণার একটা যুক্তি আছে, যেটাকে ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত মনের কৌশল। কৈফিয়ৎ মাত্র ধরে নিলে অন্যায় করা হবে। অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও কারণের সূক্ষ্ম অগোচরী প্রভাবে আমার বাঙলা-মায়ের অন্ন-জল-বায়ু, প্রকৃতি মনে ও প্রকৃতিতে ছায়া-ছবির বিষয়ে যে কোন চিন্তা বা আলাপ-আলোচনার মধ্যেই বাংলা-ছবির প্রাধান্য বা অনুপ্রেরণা যে নিছক স্বভাবসহজ প্রতিক্রিয়া মাত্র, এবং এর সঙ্গে যে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনের কোন নিগূঢ় সম্পর্ক নেই এ কথা যে কোনো রসিক ও অনুশীলিত মন অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন। আমার যে সমালোচক মন ও চিন্তাবৃত্তিকে আমি আমার নিজস্ব আবেষ্টনী, দেশ, প্রদেশ, কাল ও পাত্রের স্থূল সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বজনীনতার উদার ও মুক্ত প্রাঙ্গণে পৌঁছে নিয়ে যাব, সেই মন ও সেই ধ্যানধারণা আমার একান্ত লালিত নিজস্ব বাঙালী মনের প্রতিফলন থেকে বিমুক্তও নয়, মুক্তও নয়। তা হতেও পারে না। সীমা ও অণুর সাহায্যেই আমাকে যেতে হবে অসীম ও পরমের চেতনা-গভীরে। আপনাকে যথার্থরূপে ভালবাসতে শিখলেই সে ভালবাসার আধার খুঁজবো ঘর থেকে বাহিরে, আপন থেকে পরে, প্রদেশ থেকে দেশে, দেশ থেকে মহাদেশে, মহাদেশ থেকে উদার বিশ্বে।

তাই যখন ছায়াছবির কথা ভাবি, আমার বাঙালী-চৈতন্যের বিমুগ্ধ আবেশ কিছুতেই এড়াতে পারি না,—এতে লজ্জার বা দুঃখের কিছু নেই। কেন না আমার এই বাঙালী মনই যেমন ভালবাসে বাংলা ছবিকে, তেমনি সমাদর করে ভালবাসতে পারে ও জানে হিন্দী, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী বা অন্য কোন ভাষার ছবিকেও। সেখানে রয়েছে আমার প্রাণের মর্মমূলে ছায়াচিত্ররূপ ললিতকলার বিশেষ রূপ, রস, শব্দ ও গন্ধবাহী সূক্ষ্ম সৃজনীশিল্পের গভীর রসোপলব্ধি। সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীত আমার মনের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে আমার স্পন্দনের কাছে, আমার চৈতন্যের রূপ থেকে অরূপের কাছে।

তাই ভালো ছবি দেখলেই মনের গভীরে গিয়ে রসাঘাত করে সেই ছবির-সঙ্গে-ছবির একান্ত আত্মীয়তা, সেই একাত্মতার দিগ্বাহুপ্রসারী বিস্তার। তাই ভালো বাংলা ছবি দেখলেও মনে পড়ে ভাল হিন্দী বা বিদেশী ছবির গুণের বা রসের প্রসাদধারার কথা। আবার ভালো বিদেশী ছবি দেখলেও স্মরণপথে ভেসে ওঠে—তুলনামূলকভাবে বা তুলনা-নিরপেক্ষভাবে বাংলা ছবির দোষ বা গুণ সব-কিছু জড়িয়ে তার বিশেষ চিহ্নের কথা। এ যেন উপলব্ধির গভীরে পারাবারের দুই বৃহৎ পারের মধ্যেকার সেতু। যোগসাধনও করে, আদান-প্রদান করে—উভয়ের সম্প্রসারণও করে।

তা ছাড়াও, বাংলা ছবি আমার প্রিয়া হতে বাধা কোথায়? বাইরের জগতের অপরূপ কোন রূপসীকে দেখলে কি আমার সৌন্দর্যপিয়াসী চোখ ও মনে আলোড়ন তুলবে না? আবার তাই থেকে এই নাকি চিন্তাই কি প্রতিষ্ঠিত হবে যে সেই নতুন রূপসী আমার প্রিয়ার উর্বশী মূর্তিকে আমার মনের মণিকোঠা থেকে ঠেলে ফেলে দেবে, বা তার শাশ্বত দ্যুতিকে ম্লান করে দেবে? তা হয় না। হয় এইটুকুই যে আমি হয়তো সেই হঠাৎ-দেখা সুন্দরীর বিচিত্র কোন রূপের একটি বিশেষ ভঙ্গীটুকু বা অঙ্গকে মনের ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে নিয়ে সেই বিশেষ রূপের লাবণ্যটুকু ঢেলে দিতে চাইব, বা দিয়ে আলিম্পন দিতে চাইব আমার প্রিয়ার নিজস্ব রূপ-সম্ভারকে। এ আমার প্রাণের প্রাণ, মনের ধ্যান, ও তার বিস্মৃতির ও কল্পনার উন্মুক্ত আকাশপথ।

কিন্তু তাই বলে বিদেশিনী সুন্দরী রূপসীর চুরি করা বা ধার-করা রূপের, তার উগ্র রূপসজ্জার প্রলেপ এনে নিভৃতে বসে তাই দিয়ে আমার প্রিয়াকে সাজাতে বসবো না, দেব না তাকে চটুল

(শেষাংশ ২৫২ পৃষ্ঠায়)

রাজেন তরফদার পরিচালিত ও জনতা পিকচার্স পরিবেশিত 'গঙ্গা'-র একটি মনোরম দৃশ্য

সিনেমার কাগজে 'জীবনী'র ছড়াছড়ি। রকমারী জীবন, রকমারী 'জীবনী'। পাঠকের তাগিদ, সম্পাদকের হুকুম। আর সেই তাগিদ মেটাতে আর হুকুম তামিল করতে কলম শাণিয়ে আর বুদ্ধি বাগিয়ে পাঠক-নির্দেশিত ঠিকানায় 'জীবন'-এর তথ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েন সিনেমার সাংবাদিক—তারকা-জীবনের ভাষ্যকার, জীবনীকার। কয়েক কাপ চা কফি আর ঠাণ্ডা সরবতের পরিবেশন এবং আলাপচারী তারকার মিষ্ট ভাষণ—সব কিছুর মধ্যে সাংবাদিক-জীবনীকারের চোখ, কান ও মন সদা-জাগ্রত, সতর্ক। কাজ গুছিয়েই সোজা দপ্তরখানা। পুরো 'জীবনী' বেরিয়ে আসে কিছুক্ষণের ভেতরেই—খানিকটা রিপোর্টাজ, খানিকটা উপন্যাস আর বাকিটা রূপকথার ধাঁচে এক অতি-কাহিনিক বিন্যাস। একটা গোটা জীবনী। শুভ জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে স্বপ্ন-ঠাসা কৈশোরের মধ্য দিয়ে সিনেমা-রাজ্যে প্রথম ছাড়পত্র পাওয়া এবং তারপর ধীরে ধীরে অথবা হঠাৎ আচমকা দুরন্তভাবে তারকায়িত হওয়ার লম্বা ইতিহাস। এবং উপসংহারে সিনেমা-রাজ্যের বাইরে প্রাত্যহিক জীবনে ভালো লাগা না লাগার লম্বা ফিরিস্তি—কোন্ বইটা ভারি মিষ্টি, কোন্টা খেতে ভারি মজা, কোন্ বইটা পড়তে ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক মুহ্যমান, সম্পাদক খুশী আর সাংবাদিক-জীবনীকার নতুন উদ্যমে নতুন জীবন-এর খোঁজে ভ্রাম্যমাণ।

আমি একজন সিনেমার কারবারী। আমার ডাইনে-বাঁয়ে, ওপরে-নীচে, আশে-পাশে সর্বত্র সিনেমা। সিনেমায় জড়িয়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে। একটি জীবন-এর সন্ধান আমিও পেয়েছি। সেই জীবনী লিখতে আজ আমি বসেছি।

তখনো তার অস্তিত্ব জানা যায়নি। জানা গেল তখন, যখন সিনেমা জন্মাল। অর্থাৎ সিনেমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্ম। ১৮৯৫ সাল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে বেড়েই চলেছে, এগিয়েই চলেছে—ঠিক যেমন বাড়ছে, ঠিক যেমনটি এগোচ্ছে সিনেমা। নানা উঠতি-পড়তির মধ্য দিয়ে নানা চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে এক বিস্তৃত অসমতল পথ বেয়ে আজ সে এক বিশিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—ঠিক যেমনটি ঘটেছে সিনেমার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সিনেমার সঙ্গে এর যেন নাড়ির সম্পর্ক, দুইয়েরই কেউই একে অপরকে ছেড়ে চলতে শেখেনি যেন! ১৮৯৫ সালে সেই যে এদের যুগল যাত্রা শুরু হোল, আর ছাড়াছাড়ি হয়নি আজ পর্যন্ত—হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই থেকে এগিয়েই চলেছে পথ-পরিক্রমায়। কখনো গতি মন্থর হয়েছে, কখনো দ্রুত ছুটেছে, কখনো বা হোঁচট খেয়েছে, খুঁড়িয়ে চলেছে—কিন্তু চলেছেই সেই থেকে। চলার বিরাম নেই এদের, কারণ, চলাই এদের ধর্ম—সিনেমার এবং তার যার জীবনী লিখতে বসেছি।

সে দর্শক। সিনেমার দর্শক। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে যার জন্ম। এবং সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে যার বয়স বাড়ছে, সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে যার বুদ্ধিবৃত্তি ও সম্পদ বেড়েই চলেছে প্রতি পদক্ষেপে এবং যার ক্ষয় নেই এক তিলও। জীবনে যার স্থবিরত্ব আসবে না কখনো। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডার যার বেড়েই চলবে, মন-রাজ্যের বিকাশ ঘটবে দিনের পর দিন। সেই চিরকালের দর্শক-এর—ইটারন্যাল স্পেকটেটর-এর—পথ-পরিক্রমার ইতিহাস সিনেমার মতোই চাঞ্চল্যকর, গতিশীল।

১৮৯৫ সাল। দর্শক দেখল ছবি নড়ে। দর্শক দেখল ছবির মানুষ ওঠে, বসে, হাঁটে, ছোটে। তারই সঙ্গে ছবির পর্দায় আকাশের মেঘকেও ছুটতে দেখল দর্শক। আকাশের মেঘ, জলের স্রোত, ঘোড়ার গাড়ি। রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, ফিটন গাড়ি। সবই ছুটছে। এবং সবটাই ছবি! দর্শক অবাক! দর্শক স্তম্ভিত!

এতোদিন দর্শক দেখে এসেছে ছবি অনড়।
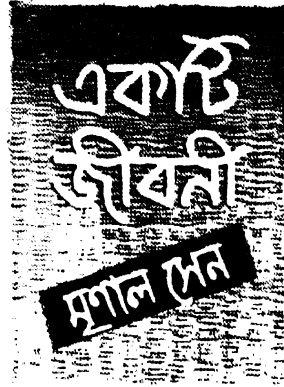
কাগজে আটকানো, দেয়ালে লটকানো, ক্যানভাসে বন্দী। কিন্তু আজ দর্শক দেখতে পেল সেই ছবির বন্দীদশা ঘুচেছে, ছবির পর্দার সীমানার মধ্যে তার অবাধ গতি। দর্শক মুগ্ধ! বিস্ময়ে অভিভূত দর্শক!

ছবির মুক্তি ঘটালেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু মুক্ত-ছবির মালিকানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলেন দুনিয়াদারির কারবারীরা—ব্যবসায়ীরা। সদ্যমুক্ত ছবির বিপুল সম্ভাবনাকে তাঁরা কাজে লাগালেন, শিল্পীদের ডেকে এনে বসালেন কাজে যাঁদের দায়িত্ব হোল ঘটনার কাঠামোর মধ্যে চলমান ছবিগুলোকে নজরবন্দী করে রাখা। ফলে পর্দায় ছবির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল, পারম্পর্য রক্ষা করে একটা পুরো ঘটনার বিন্যাস ঘটল এবং ধীরে ধীরে ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে একটা গোটা গল্প ফেঁদে বসলেন ছবির কারবারীরা। এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মন আরো জাঁকিয়ে বসল ছবির পর্দায়। প্রথম আবিষ্কারের সাময়িক চমক নয়, ছবির কাহিনী ও ছবির কীর্তি দর্শকের সত্ত্বাকে পুরোপুরিভাবে দখল করে বসল ধীরে ধীরে।

দর্শক একের পর এক গল্প দেখতে পেল ছবির পর্দায়। পুরো গল্প। এতো দিন সে গল্প শুনেছে গল্প-বলিয়ের কাছে, বই-এর পাতায় পড়েছে, রঙ্গমঞ্চে শুনেছে ও দেখেছে। কিন্তু ছবির দর্শক ছবির পর্দায় এই প্রথম গোটা একটা গল্প দেখার রস আস্বাদন করল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দর্শক দেখল। দেখল দুঃসাহসিক এক পুরুষ অথবা নারী। পুরুষের হাতে তরোয়াল, হয়তো বা কোমরে রিভলবার। নারীর চোখে ঠুলি, পরনে ট্রাউজার। যা খুশি তাই করে চলেছে এই পুরুষটি অথবা নারী-বেশী ছুঁড়িটি, যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে। কখনো বেলুনে চেপে চাঁদের দেশে চলে যাচ্ছে, কখনো এক লাফে তেতলার ছাদে উঠছে, কখনো বা ধাবমান রেল গাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ছে চলমান মোটর-গাড়ির ঘাড়ে, আবার কখনো সমুদ্রের তলদেশে এক নতুন দেশের সন্ধান পাচ্ছে। ছবির পর্দায় অসাধ্য সাধন করে চলেছে এই অমানবিক পুরুষ বা ঠুলি-পরা মহিলাটি। 'বাহাদুর-কা-খেল'! অথবা 'হান্টার-ওয়ালী'র রহস্য! আর সবটাই দর্শকের চোখের সামনে, এক অকাট্য বাস্তবতা নিয়ে ঘটছে যেন। দর্শক দেখছে, শিহরণ জাগছে প্রতিমুহূর্তেই, চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরছে মাঝে মাঝে, তারপর সব শেষে উল্লসিত করতালির মধ্যে প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠছে। এক অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাসে দর্শকের চোখ মুখ উদ্ভাসিত।

প্রেক্ষাগৃহের চৌকাঠ পেরোলো দর্শক। পান-বিড়ি-সিগারেট। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। রাস্তার ভিড়, মানুষের মিছিল। শহুরে শব্দের সোরগোল।

দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ল হট্টগোলের মাঝখানে। রূপকথার নেশা উবে গেল এক মুহূর্তে। একটা ধাক্কায় দর্শক ছবির কল্পলোক থেকে ছিটকে এসে পড়ল সান-বাঁধানো ফুটপাথে। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটালো দর্শকের, মনের চেহারা। গোটা মানুষটার রূপ বদলালো। দর্শকের রূপান্তর ঘটল নাগরিকত্বে—যে নাগরিক হাঁটে, চলে, ভাবে—সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে, সমাজ-চিন্তায় যে অংশীদার, রাষ্ট্রীয়-জীবনে যে উপস্থিত।

অর্থাৎ চারিদিকের বাস্তব পরিবেশের চাপে দর্শকের অস্তিত্ব লোপ পেল প্রেক্ষাগৃহের চৌকাঠ ডিঙোতেই, ছবির প্রভাব কেটে গেল দরজা পেরোতেই। অথচ এটাই কি ছবির কারবারীরা চেয়েছিলেন? শুধু এইটুকুর জন্যেই কি ব্যবসায়ীরা টাকা ঢেলেছিলেন? আর বিজ্ঞানের এতো বড়ো অবদান কি এইটুকুতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন ছবির কারবারীরা। নতুন নতুন শিল্পী আমদানী করলেন ছবির ব্যবসায়ীরা। আর ছবির বিজ্ঞানীরা ছবিকে কথা কওয়াতে উঠে-পড়ে লাগলেন।

ছবির প্রভাব ছড়িয়ে গেল আরও অনেকখানি। প্রেক্ষাগৃহ ছাড়িয়ে ছড়ালো রাস্তায়, ট্রামে-বাসে, বৈঠকখানায়, লাউঞ্জে, চায়ের টেবিলে। নতুন গল্প-বাঁধলেন ছবির গল্পকার, নতুন রূপে ও রীতি জন্ম নিল ছবির পর্দায়। 'বাহাদুর-কা-খেল' আর 'হান্টারওয়ালী'র পরিবর্তে দর্শক দেখল এমন কতকগুলো চরিত্রকে যারা হাঁটছে চলছে কথা বলছে বেশ কাছের মানুষের মতো, যারা কথায় কথায় চাঁদের দেশেও উধাও হয়ে যাচ্ছে না বা একলাফে তেতলার ছাদে গিয়েও যারা পড়ছে না।

কিন্তু একেবারেই লাফালাফি করছে না এমনও হোল না। নায়িকা এবারও লাফালো, কিন্তু বাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে পড়লো না। ছবির নায়িকা এবার লাফিয়ে পড়লো পাঁচিল ডিঙিয়ে। কলেজের পাঁচিল, ছোট্টো পাঁচিল। কলেজ পালিয়ে কলেজ-তরুণী লাফিয়ে পড়লো কলেজের সীমানার বাইরে। এবং পড়লো তো পড়লো একেবারে নায়কের ঘাড়ে।

নায়ক মজুর। মজুর বলেই কেবল মজুরীর কথাই ভাববে এমন নায়ক কিন্তু সে মোটেই নয়। সে যে নায়ক, ছবির নায়ক! মেয়ে-কলেজের পাঁচিলে ঠেসান দিয়ে নায়ক-মজুর, ভাবুক-মজুর গান গাইছিল তখন। প্রাণমাতানো গান। ঠিক এমনি সময়ে ঝুপ করে ঘাড়ে পড়লো প্রথমে একজোড়া হাই-হীল জুতো এবং তারপর নায়িকা। তারপর? তারপর এক দুরন্ত রোমান্স! এক রোমাঞ্চকর রোমান্স! সেই রোমান্সের দরিয়ায় হাবুডুবু খেল নায়ক-নায়িকা, আর সেই রোমান্স-লাঞ্ছিত জলের ঝাপটা খেল দর্শক। মন ভরে উঠল দর্শকের।

রাস্তার ভিড়ে এসে দাঁড়ালো দর্শক। রোমান্টিক আবেশে তখনো সে আচ্ছন্ন। কোথায় মনের কোন্ নিভৃত কোণে কি এক দুরূহ ইচ্ছা, এক না-মেটানো ক্ষুধা আজ যেন তাকে পেয়ে বসল। বাস্তবের পরিবেশে নিজেকে মিশিয়ে দিতে, চলমান পৃথিবীর বুকে গা ভাসিয়ে দিতে সে আজ নারাজ। নাই বা জানল সে গাইতে, কলেজের মেয়েকে কাঁধে চাপাতে নাই বা পারল সে। তবু—।

দর্শকের চোখে ঘুম নেই। আচ্ছন্নতায় মুহ্যমান দর্শক। ছবির প্রভাব জড়িয়ে রইল তার সমস্ত অস্তিত্বে। এবং শেষ পর্যন্ত দর্শক আবার ফিরে এল তার নিজেতে, তার নাগরিক সত্ত্বায়—এক প্রচণ্ড ধমক খেয়ে। অফিসের সাহেবের ধমক—হিসেবে গোলমাল হয়েছে। অথবা গিন্নীর মুখঝামটা—গোয়ালার দু' মাসের দাম বাকি পড়েছে। অথবা হেড-মাস্টারের শাসানি।

সব ঝুট্ হ্যায়! দর্শক বুঝল, সবটাই বানানো, সবটাই কাল্পনিক। কেবল বাস্তবের একটা খোলস

হয়েছে মত্ত। চোখ ফিরিয়ে রইল দর্শক। কানে তুলো এঁটে রইল।

অর্থাৎ ছবির সম্পদ বেড়েছে এবং তারই সঙ্গে দর্শকও সম্পদশালী হয়েছে। 'বাহাদুর-কা-খেল' ও স্টান্টারওয়ালি'কে নাকচ করে দিয়ে ছবির কারবারীরা যখন নতুন কিছু উপস্থাপিত করছেন ছবির পর্দায়, দর্শক তাই নিয়ে বেশ কিছুদিন মাতামাতি করেছে, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই দর্শকের চাহিদা বেড়ে গেল আরো অনেকখানি এবং সেই চাহিদার চাপ এসে পড়ল ছবির কারবারীদের ওপর। তার ওপর ভেতরে ভেতরে-ও নতুন সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন শিল্পীরা। আরো নতুন, আরো রক্ত-মাংস-জাত, আরো বাস্তব।

নতুন নতুন আরো অনেক জন্ম নিল ছবির পর্দায়। নতুন কাহিনী, নতুন আঙ্গিক, সমাজের নতুন নতুন সমস্যা, নতুনতর শিল্পের সার্থক প্রয়োগ।

প্রভাব বিস্তৃত হোলো আরো। সমাজের কর্তারা ছবিকে স্বীকার করে নিলেন।
সমাজ-শিক্ষার মূল্যবান বাহন হিসেবে পরিগণিত হোল ছবির শিল্প।

ছবির দর্শক নমস্কার জানাল সে যুগের শিল্পনায়কদের, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে তাঁদের নাম ছড়িয়ে দিল চারিদিকে। তারপর, আবার একদিন দর্শক উসখুস করে উঠল, একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় খানিকটা হাঁপিয়ে ওঠার মতো অবস্থা হোল দর্শকের। 'বড়ুয়া কলার' তখন রীতিমতো 'বাজারে' হয়ে পড়েছে, মেয়েদের গায়ে তখন উঠেছে ছিট পিকচারী ব্লাউজ আর শাড়ি।

বড়ুয়া কলার-এর চটক আর ছিট পিকচারী ব্লাউজ ও শাড়ির মোহ ছাপিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল দর্শকের উসখুসুনি। কেমন যেন পানসে হয়ে পড়ছে ছবির রাজ্য, কেমন যেন প্রাণহীন। নতুন কিছু চাই—নতুন, বাস্তব, জীবন্ত।

দেশে তখন দারুণ দুর্যোগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর একটা প্রচণ্ড ওলোটপালট এনে দিল জাতীয় জীবনে, তছনছ করে দিল পারিপার্শ্বিককে, উলঙ্গ বাস্তবের মুখোমুখি টেনে নিয়ে এল নাগরিক-মানুষকে। বঞ্চনা, জ্বালা আর ক্রোধ—সমস্ত মিলিয়ে সবাই যেন কেমন হয়ে উঠল। অতি বড়ো স্বপ্ন-বিলাসীরও স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গেল কঠিন বাস্তবের হুংকারে। সাদা চোখে সেদিন একে অপরকে দেখল এবং পারিপার্শ্বিককে বুঝল।

সেদিনের সেই বাস্তবের মহাশ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাস্তবের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে পারলেন না বুদ্ধির কারবারীরা—শিল্পী সাহিত্যিকেরা। এবং শেষ পর্যন্ত সেই ছোঁয়াচ এসে হানা দিল রোমান্টিক আবেশে আচ্ছন্ন সেদিনের সেই ছবির রাজ্যেও। নতুন ছবি তৈরি হোল সেদিন, তৈরি হোল নতুন ইতিহাস।

ছবির নায়ক বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ঘরের বুদ্ধি খাটিয়ে স্বল্প রোজগারে-যুবক। ছবির নায়ক পায়ে হেঁটে পথ চলেছিল সেদিন, ট্রামে চেপেছিল, ট্রাম থেকে দেখতে পেয়েছিল শহরের রাস্তায় জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল আর দেখেছিল চালের দোকানের সামনে অপেক্ষমান মানুষের ভিড়।

নায়িকা কারখানার মালিকের মেয়ে—সভ্য, স্নিগ্ধ, সপ্রতিভ।

কাল তেরশ পঞ্চাশ।

ছবির পরিবেশের সঙ্গে মিশ খেল দর্শকের নাগরিক সত্তা, ছবির চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গেল দর্শক। শশকের মতো কান খাড়া করে দর্শক শুনল ছবির প্রতিটি কথা, চোখ বড়ো বড়ো করে দেখল সব। দেখল, কারখানার মজুরেরা জমায়েৎ হয়েছে সভায়—তাদের দাবি তারা মেটাতে বদ্ধপরিকর। বক্তা বুদ্ধিজীবী নায়ক—বলিষ্ঠ, দৃপ্ত। দর্শক দেখল, নায়িকাকে নজরবন্দী করে রেখেছেন কারখানার মালিক—নায়িকার বাবা। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক টিক করেই চলেছে। নায়িকা উসখুস করছে, ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বার বার। সভা ভঙ্গ হতে চলেছে নায়িকার। উসখুসুনি বাড়ছে। আর দর্শক উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠছে। প্রচণ্ড ক্লাইম্যাকস! তারপর, এক সময়ে, দর্শকের মনে আনন্দের ঢেউ জাগিয়ে আর পরিবারের মুখ হাসিয়ে নায়িকা নেমে এল (অথবা উঠে এল) নায়কের কাছে। নায়কের পাশাপাশি দাঁড়াল। আওয়াজ উঠল জনতার মধ্য থেকে—'গোপা দেবীকি জয়!'

দর্শকের হৃদয় জয় করে নিল সেই ছবি। মস্ত এক তোলপাড় পড়ে গেল সমস্ত দেশে। ছবির ইতিহাসে এক দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম হিসেবে অভিনন্দন জানাল দেশের মানুষ—নাগরিক মানুষ।

দর্শককে কিন্তু তার পরেই একদিন ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল 'গোপাদেবী'র বাড়ির কাছাকাছি—হাতে অটোগ্রাফের একখানা বাঁধানো খাতা। স্টুডিওর আশেপাশেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা গেছে—হাতে সেই খাতা। অনেক পাতা ভরতি হয়ে গেছে তখন—গোপাদেবী'দের অটোগ্রাফ আর বাণীতে ঠাসা।

এমনি সময় দর্শকের কানে এল নতুন একটা খবর। মস্ত খবর। পৃথিবী ছেঁকে বাছাই করা ছবির সম্মেলন ঘটানো হচ্ছে শহরের প্রেক্ষাগৃহে—যে ছবির ঠিকানাও দর্শক কোনোদিন পায় নি সেই সব ছবি, যে শিল্পীর নামও কোনোদিন শোনে নি।

দর্শক ছুটল প্রেক্ষাগৃহে। নিত্য নতুন ছবি দেখল দর্শক—নানা ছবি, নানা জাতের, নানা ঢঙের। অবাক বিস্ময়ে দেখল দর্শক। গুপ্তধনের সন্ধান পেল।

ছবির পর্দায় দর্শক দেখল জীবনের দৈনন্দিনতা। দেখল, দৈনন্দিনতার মাধুর্য, দৈনন্দিনতার কাব্য, দৈনন্দিনতার নাটকীয়তা। দর্শক দেখল সেই সব শিল্পীর ছবি যাঁরা অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের ইশারা পান, সাধারণ মানুষের পারিপার্শ্বিকের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলাই যাঁদের উদ্দেশ্য এবং যাঁরা জীবনের প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস নিয়ে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন—
We make things spectacular not by their exceptional qualities, but by their natural qualities.

দর্শক স্তম্ভিত, অভিভূত। এবং দর্শকের মনে মন মিশিয়ে ছবির শিল্পীও স্তম্ভিত, অভিভূত। দর্শক চঞ্চল হয়ে উঠল। শিল্পী দিশেহারা।

ঠিক এমনি সময়ে ছবির পর্দায় হঠাৎ অবিশ্বাস্যভাবে আবির্ভাব এক নবতম বিস্ময়ের। অনন্যসাধারণ, অনির্বচনীয়। ছবির পর্দায় এক মহৎ কাব্যের রস আস্বাদন করল দর্শক, প্রত্যক্ষ করল এক বিরাট প্রতিভা। জীবনের মাধুর্য, জীবনের মহত্ত্ব, জীবনের কাব্য, সত্তার আশ্চর্য সুন্দর স্নিগ্ধতা—ছবির পর্দায় জীবন্ত হয়ে ধরা দিল দর্শকের চোখে। কাব্য অপুর চোখে, কাব্য বৃষ্টির জলে দুর্গার চুল ভিজিয়ে নেওয়াতে, কাব্য কাশবন পেরিয়ে রেলগাড়ির চলাতে, কাব্য শান্ত পুকুরে ছোটো ছোটো পোকার অকারণ চঞ্চলতায়।

দর্শক মুগ্ধ। দর্শক বিস্মিত। সমস্ত দেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর বিদেশ অভিনন্দন জানাল।

ছবির রাজ্যে বিপ্লব ঘটল। বিপ্লবে সাড়া দিল আরো অনেকে। আর দর্শক মুখিয়ে রইল সামনের দিকে। ভবিষ্যতের দিকে।

দর্শক আজও বেড়েই চলেছে, এগিয়ে চলেছে দর্শক সামনের দিকে। ছবির মতো। ছবিরই সঙ্গে সঙ্গে।

বাঙলা ছবির কথায়

(২৪৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সঙ সাজাবার মর্মদাহ। পরাবো না তাকে গাউন। দেবো না তাকে সযত্নে কামানো ভ্রূযুগলে কৃত্রিম ও সূক্ষ্ম ভ্রূকুটির দৈনন্দিন মালিন্য। মাখাব না তার প্রকৃতি রাগ-রক্ত সরস ওষ্ঠাধরে পুরু, কর্কশ ও পীড়াদায়ক 'ওষ্ঠ-কাঠির' শুষ্ক ক্লেদ। ও যাকে সাজে তাকেই সাজে।

অথচ ঠিক তাই আমরা কিন্তু আজ আত্মঘাতী মূর্খের মতো করছি, নিজের ঘরে। বাংলা ছবিকে ভালবাসবার গরব করে, তার আঙ্গিক ও আত্মিক দৈন্যকে সমৃদ্ধি দেবার ছল করে, আমরা না-বলে-আমদানী করা বিদেশী উপাদানের অঙ্গের নাম ও গোত্র বদল করে বেমালুম [illegible] চালিয়ে দিতে চাইছি বাংলা ছবির গাত্রাব[illegible] ও অন্তরঙ্গসজ্জার চতুর প্রয়োগের মধ্যে। সে[illegible]র্য-প্রয়োগের যা কিছু কুফল তা আজ ঘটছেই। এবং প্রিয়া-র প্রিয়কে সেই কুৎসিত অপপ্রয়োগের বিষাক্ত রূপ ক্লিষ্ট ও পীড়িত করছেই।

এই কথাটুকুই আজ আমার জাত-ভাই পরিচালক বা চিত্রনাট্যকারদের কাছে সভয়ে নিবেদন করি। দোহাই তাঁদের, ঘরের প্রিয়াকে সাজ শেখাতে তাঁরা বিদেশী ঢঙের বিলাসী হোটেলের নৈশ অভিযানে নিয়ে যাবেন না, ফক্সট্রট বা পলকা নাচ-এর কায়দায় তাকে বাহুলীন করবেন না। শুভ্র চন্দনের সুচিক্কণ ও মৃদু গন্ধবাহী তিলক রেখাকেই এঁকে দিন তার শামলা কপালে। দিশী-শাড়ীর সলাজ বিস্তৃতির ভাঁজে ভাঁজেই ভরিয়ে তুলুন তাঁরা প্রিয়ার লজ্জায়-আনম্র দেহের কম্প্র আকুলতা। ঘরের বৌকে পরের বৌ-এর রঙে রাঙাতে গেলে সে বৌ রইবে 'না ঘরকা, না ঘাটকা'।

বাংলা ছবি আমার কাছে সেই বঙ্গবধূ। সে আমার বউ-ও যেমন, আমার সন্তানের জননীও তেমন। পারবো না তাকে গাউনের উগ্র সজ্জার অনাবরণ দিতে, পারবো না আমার সন্তানসন্ততিকে নিয়ে তাদের মায়ের সেই বিভ্রান্ত রূপ ও আচরণ দেখাতে। তা' হোক না কেন সে রূপ আধুনিক বাস্তবধর্মের প্রতীক, আন্তর্জাতিকতার আঙ্গিক। আমার বাংলা ছবির খড়ের ঘরের মাটির দাওয়ায় ও মোটা মাদুরে সে শুধু বেমানান নয়, বীভৎস। সেখানে সে রাক্ষসী। তার হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।

নাট্যলোকের নানাকথা

(২৫৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গিরিশ থিয়েটার তাপস সেনের এবং আধুনিক সুরকারদের সহায়তায় আধুনিক অপেরা অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেও গিরিশের ট্রাডিশন কিছুটা বহন করতে পারেন।

(চ) তাঁরা এবং তাঁদের নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার পরামর্শদাতারা যদি নিশ্চিত করে বুঝে থাকেন যে, গিরিশের ট্রাডিশন বহন করা নাট্যোন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহলে গিরিশ থিয়েটার নামটি বর্জন সততার পরিচয় হোতো না কি? আমার মনে হয় শুরুতে ও'রা যে সংকল্প নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, কাজে কিছুটা অগ্রসর হয়ে, যে-কোন কারণে, তা পরিবর্তিত করেছেন, এবং কৈফিয়ৎ হিসেবে যা সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছেন, তা আসলে গিরিশ থিয়েটার সম্বন্ধে ও'দের অন্তরের বক্তব্য নয়। ও'রা সার্থক ব্যবসায়ী। ও'রা জানেন আঙুলের চাপ দিয়ে কোন্ দিকের পাল্লা কখন ভারি করতে হয়।

নাট্যলোকের নানাকথা

(২৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করা যায়। তার ফলে, আশা করা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের মন আকৃষ্ট হবে। সে সংস্কৃতি সর্ব বিষয়েই দীন নয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ বারের মতো বলে গেছেন—"আশা করব, মহা-প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের দিগন্ত থেকে।" মাও সে-তুং ওর অনেক পরে বলেছেন—"পূবের বাতাস পশ্চিমে বইবে।" মাও সে-তুঙের ওই উক্তিকে অনেকে রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেন। সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের উক্তি সম্বন্ধে কেউ তা বলেন না কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, আমাদের রাষ্ট্রনায়করা, শিক্ষা-নায়করা এবং সংস্কৃতির বাহকরা পশ্চিম ইউরোপ থেকেই কেবল রাষ্ট্রতন্ত্র, শিক্ষাতন্ত্র এবং সংস্কৃতির প্যাটার্ন সংগ্রহ করছেন,—যে পশ্চিম ইউরোপ আজকার দিনে, অতীতের মতোই, সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করছে অথচ কোন সমস্যা সমাধান করতে পারছে না; না ঘরের, না বাইরের। এই প্যাটার্ন আহরণ করবার প্রবৃত্তি, শহুরে সভ্যতার প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক শ্রদ্ধা, আমাদের দেশের শিক্ষাকে, স্কুল-কলেজকে, ইউনিভার্সিটিকে, কৃষি কো-অপারেটিভকে, গ্রাম-পঞ্চায়েৎকে, কমিউনিটি প্রজেক্টকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারছে না; নাটককেও না।

•

একজন রুশী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, আজকার দিনে তোমরা গোর্কির নাটক নিয়ে অত মাতামাতি করছ কেন? আমি বল্লাম—"মাতামাতি মোটেও করছি না। গোর্কির খান বিশেক নাটকের মাঝে একমাত্র 'লোয়ার ডেপথস' কোন-কোন দল রূপান্তরিত করে অভিনয় করেছেন। রুশ সাহিত্যের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে বিংশ শতকের প্রথম থেকেই। 'লোয়ার ডেপথস' অবলম্বনে আমাদের দেশে প্রথম নাটক রচিত হয় এই শতকের দ্বিতীয় দশকে। কিন্তু তখন তা অভিনীত হয় না। অভিনীত হয় যখন তোমাদের রাজনীতিক প্রভাব আমাদের উপর পড়ে। লোয়ার ডেপথস আমাদের সমাজেও আছে। তার রূপ তোমাদের জারতন্ত্র যে লোয়ার ডেপথস সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে পৃথক। গোর্কিকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি এই কারণে যে, তাঁর ওই নাটক আমাদের লোয়ার ডেপথস সম্বন্ধে আমাদেরকে সচেতন করেছে। যদিচ আমাদের রূপান্তরিত নাটকে গোর্কিকেও পুরোপুরি পাওয়া যায় না, আমাদের লোয়ার ডেপথস-এ কোনমতে যারা নাকের ডগা বাঁচিয়ে বেঁচে আছে, তাদেরও পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যা পাওয়া যায়, তাও আমাদের কাছে মূল্যবান।"

•

লেনিনগ্রাদের ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের একজন ডিরেক্টর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে আমাকে বল্লেন, তিনি সম্প্রতি 'মুদ্রারাক্ষস' অনুবাদ করেছেন। আমি বল্লাম, তার আসলে তোমরা শকুন্তলা অভিনয় করেছ, সোবিয়েত প্রতিষ্ঠার পরও তা করেছ, মৃচ্ছকটিক করেছ, মুদ্রারাক্ষসও করতে যাচ্ছ। আমরা তার জন্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু উপকৃত হই তোমরা যদি বুঝিয়ে দাও কি কারণে ওগুলি তোমরা অভিনয় করছ। তিনি বল্লেন,—ও-প্রশ্নের জবাব আমাদের নাট্যবিদরা দিতে পারবেন। মস্কোতে কাউকে জিজ্ঞাসা কোরো। জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পাইনি। কিন্তু ওই প্রশ্ন আমার মনে এখনো রয়েছে আরো এই কারণে যে, ওই সব নাটক, শকুন্তলা এবং আরো কিছু কিছু সেকেলে-সৃষ্টি কেমন করে অভিনয় করা যায়, সে সম্বন্ধে সঙ্গীতনাটক আকাদেমী কিছু হদিস দিতে পারে কিনা, তাই জানতে চেয়ে নানা দেশ থেকে চিঠি আসে। আমরা কোন হদিসই দিতে পারি না। পারি না, কারণ, ও-সব নাটক নিয়ে, ওদের অভিনয় নিয়ে, আমরা মাথা ঘামাই না, শুধু বাহাদুরী নেবার সময় গ্যয়টের শকুন্তলা আবৃত্তি করি। এটা লজ্জার কথা। কোন কোন প্রগেসিভকে প্রচার করতে শুনি সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিরাজ-দ্দৌলা আজকের দিনে অচল। আমি জানি অচল নয়। তবুও জানতে চাই,—কেন, অচল কেন? জবাব পাই, সম্রাটই নেই আজকার দুনিয়ায়। জিজ্ঞাসা করি—'পিটার দি গ্রেট', 'বোরিস গুডুনোভ', 'আইভ্যান দি টেরিবল' সোবিয়েত দেশে সচল রাখা হয় কেন? জবাব পাই—ওদের সৃষ্টির সঙ্গে বাংলা নাটকের তুলনা করবেন না! এরকম অনেক প্রশ্ন আমাকে করতে হয়, অনেক রকমের জবাব শুনতেও হয়। বিষয়টা আমি বুঝতে চাই। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাই না। আমি জানি নানা forces যখন সক্রিয় হয়, নানা বিরুদ্ধ ভাবের যখন সংঘাত হয়, তখনই সাহিত্য শিল্পের নবজন্ম হয়। অতীতে যে-সব force কাজ করেছে তার ফলে যে নাটক হয়েছে, আজকার forces সে-নাটকের জন্ম দেবে না। আবার আগামীকাল নতুন নতুন forces কাজ করে নাটকের নব নব রূপ দেবে। কিন্তু ওই অবিরল পরিবর্তনের মাঝেও একটি ঐক্য যদি থাকে, তাহলেই ভবিষ্যতে জাতীয় নাটক রূপ পরিগ্রহ করবে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন'। ওরই জন্য ট্রাডিশন বজায় করে রাখা দরকার। ট্রাডিশনকে শ্রদ্ধা দিতে যখন বলি, তখন সে শ্রদ্ধা নিজে আত্মসাৎ করতে চাই না। আমি তো আর ট্রাডিশন সৃষ্টি করিনি।

•

সম্প্রতি একটা কথা উঠেছে যে, নাটকে নাটকের চেয়ে টেকনোলজিকে বড় করে তোলা হচ্ছে। আর তার জন্য তাপস সেনই দায়ী। টেকনোলজির যুগে যদি তা হোতো, ডাইনামোর মত নাটক, আর-ইউ-আর-এর মতো নাটক যদি বাংলাদেশে খুব বেশি হোতো, তাহলেও বিস্মিত হবার কিছুই থাকত না। কিন্তু তা হয়নি। আলোর খেলাই টেকনোলজি নয়। আর তাপস সেন তার অপপ্রয়োগ সব যায়গায় করেন নি; বহুরূপীর কোন নাটকেই তা করেন নি। বরঞ্চ আমি লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছি যে, নাটক যত সূক্ষ্ম হয়েছে, তাঁর আলোকসম্পাত তত সার্থক হয়েছে; নাটকের অংশ হয়ে উঠেছে আলো। 'রক্তকরবী'তে, 'ডাকঘরে' এবং সব চেয়ে বেশি করে 'পুতুল খেলায়' তা দেখা যায়।

•

Mood Light সম্বন্ধে তাপস কখনো ভুল করেছেন বহুরূপীর কোন নাটকে, অথবা ওঁদের কোন নাটককে ডুবিয়ে দিয়েছেন বলে আমি ত মনে করতে পারছি না। কথাটা উঠেছে 'সেতু' অভিনয় শুরু হবার সময় থেকে। ওঠবার কারণ আছে। আলোর খেলা দিয়ে ও-ভাবে ট্রেণ চলে যাবার এফেক্ট সৃষ্টি আমাদের মঞ্চে বিগত চল্লিশ বছরের মাঝে কখনো হয়নি। আগেও না। সিনেমার পর্দায় চলন্ত-ট্রেণ দেখিয়েও ও-এফেক্ট আমাদের দেশে কখনো করা সম্ভব হয়েছে বলেও আমি শুনিনি। আমি মনে করি তা করাও যায় না। যায় না বলেই ওটা একান্ত করে নাটকেরই আওতায় আসে। আমার শুধু মনে হয়েছে দৃশ্যটি আনবার সঙ্গত প্রস্তুতি হয়নি বলে ওই কৌশলটি নাটককে যতটা বিকশিত করতে পারত, ততটা পারেনি। নাটক তাপস লেখেন নি, এবং আলোকে বড় করবার মতলবে নাটককে তিনি দুর্বল করেননি। যা করতে পারতেন, তা পারলেন না বলে মনে মনে হয়ত তিনি ক্ষুব্ধই হয়েছেন। যাঁরা বলছেন আর কিছু না দেখে ওই দৃশ্যটা দেখলেই পয়সা উঠে যায়, ওই দৃশ্যটি দেখবার পর তাঁরা কিছু উঠে যান না। তাঁরা যে যথেষ্ট আধুনিক তাই বোঝাবার জন্যই ওই কথা মুখে বলেন। ও তাঁদের মনের কথা নয়। ট্রেণের ওই দৃশ্য না থাকলেও তাঁরা 'সেতু' দেখতেন। অনুরূপা দেবীর 'মা' তাঁরা দেখেছেন, এমনই আগ্রহভরে ওই মঞ্চেই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। সেদিনও নীহার গুপ্তের 'মায়া মৃগ'ও কম আগ্রহ-ভরে তাঁরা দেখেন নি। সেই প্রফুল্ল (১৮৯০), জনা (১৮৯৪), অভিনয়ের সময় থেকেই দেখা গেছে যে, এদেশের দর্শকরা মায়ের বেদনা ও ক্ষোভ, তার কারণ যাই হোক, উপেক্ষা করতে পারেন না। সেতুতে মাতৃত্বের ব্যথাভরা আবেদন আছে। সেতুর আকর্ষণের অন্য কারণ হচ্ছে তার অভিনয়। তৃপ্তি মিত্র যে আবেগের ঝড় বইয়ে দেন, এদেশের দর্শকরা নাটকের কাছে চিরদিনই তাই প্রত্যাশা করেন। অনেক দুর্বল নাটক কেবল ওই কারণেই জনপ্রিয় হয়েছে। কেন জেনারেশনের পর জেনারেশনের দর্শক এত পরিবর্তনের পরেও একই চিত্তাবেগের বশীভূত থাকেন, তাই তু ভাববার কথা, বোঝবার কথা। ওটা কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিলে ত নাটকের উপাদান সম্বন্ধে সত্যোপলব্ধি হবে না। সেতু অথবা 'ক্ষুধা' কিছু নয় বলা সহজ। ওদের দুর্বলতা দেখিয়ে দেওয়াও শক্ত নয়। কিন্তু ক্রমশত রাত দর্শক আকর্ষণ করা আদৌ সহজ নয়। ওরা কেন তা করে, তাই ধরতে পারলে জাতীয় নাটকের অন্তত একটা মূল সূত্রের হদিস পাওয়া যাবে। জনপ্রিয় হওয়া নাটকের পক্ষে তুচ্ছ কথা নয়। আবার তুচ্ছ কারণেও নটক জনপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু সেতুর অভিনয়ও তুচ্ছ নয়, ট্রেণের দৃশ্য, সময়োচিত স্থাপিত না হলেও, তুচ্ছ নয়; দর্শকদের চিত্তাবেগও তুচ্ছ নয় অন্ততঃ এই কারণে যে, তাঁরা না এলে নাটক দেখবার লোক থাকে না, নাটক লেখারও কোন মানে হয় না, থিয়েটারও সচল থাকে না। তবে দুর্বলতা দূর করবার কথা ভাবতে হবে বৈকি!

•

টেকনোলজির প্রাধান্যের কথা দ্বিতীয়বার উঠেছে 'অঙ্গার' জমে ওঠবার পর। কিন্তু অঙ্গারের পিট-হেডটির পরিকল্পনা এবং তার আবহ সৃষ্টি অভিনয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে সিচুয়েশনটিকে এমনই সার্থক করেছে, যাকে আমাদের মঞ্চে অভূতপূর্ব অবশ্যই বলা যেতে পারে। ও দৃশ্য দেখে বলা চলে না যে, টেকনোলজিকে নাটকের চাইতে বড় করা হয়েছে। শ্রমিক নিয়ে ওর আগে কিছু কিছু নাটক এদেশে লেখা হয়েছে স্বাধীনতার পরে। কিন্তু সে সব নাটক আবশ্যকীয় আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে রচিত হয়েছে বলেই তাদের অভি-নয়কে শ্রমিকদের সভা বলেই মনে হয়েছে। অঙ্গার দেখে তা মনে হয়নি। অঙ্গার বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টি করেছে। টেকনোলজি এখানে নাটককে চাপা দেয়নি, নাটককেই ফলিয়ে ধরেছে, ফুটিয়ে তুলেছে। ওর শেষ দৃশ্যটি সম্বন্ধে ও-কথা আমি বলতে পারি না এই কারণে যে, আমার মনে হয়েছে, নাটক ওর আগের দৃশ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ওটি তাই নাটকের সঙ্গে সহজভাবে মিশে গিয়ে নাটককে ফলিয়ে তুলতে পারে নি, যদিচ ওর প্রতিফলনও আমাদের মঞ্চে অভূতপূর্ব এবং আমাদের দর্শকদের কাছে খুবই বিস্ময়কর। তাপস সেন ওই দৃশ্যটির রূপ দিতে কিছু ভুলও করেছেন। ওই স্বল্প-

সবুজ জল আর কাচের ছাদে প্রতিফলিত আলো মিলে যে এফেক্‌ট সৃষ্টি করে, তাতে করে মৃত্যুর মুখব্যাদানের ভীতি সঞ্চার করে না; বরং বিউটি'র প্রত্যাশা জাগায়। আমি যেদিন নাটক দেখেছিলাম, সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম ড্রপকার্টেন পড়ে গেলেও দর্শকরা আসন ত্যাগ করতে ইতস্তত করছেন। মনে হোলো, তাঁদের যেন কি প্রত্যাশা রয়েছে। ওই দৃশ্যটিকে নাটকের সঙ্গে কি করে সংযুক্ত করা যায়, এবং কিছুটা ভয়াবহ করা যায়, তা ভাববার অবসর আছে। অনেকেই বলছেন, ওই দৃশ্যটিই দর্শক আকর্ষণ করছে। আমার মনে হয়, ও-দৃশ্যটি না থাকলেও নাটকের নাটকত্বই দর্শক আকর্ষণ করত, যদিচ নাটকেও কিছুটা গোল আছে। খাদে যারা ঢুকল, তারা স্ট্রাইক অবহেলা করে ঢুকতে নারাজ ছিল। শেষটায় তারা টাকা পাবার লোভকে জয় করতে পারল না। তাহলে তখনকার মতো তারা 'ব্ল্যাক লেগস্‌' হোলো। আমি মানি ব্ল্যাক লেগ হবার কারণ দুঃসহ দারিদ্র্য। কিন্তু দারিদ্র্য সইতে না পেরে যারা ব্ল্যাক লেগ হয়, তাদেরকে কি সাধারণত গৌরব দেওয়া হয়ে থাকে, অথবা তারা কি ত্রাস খেলে মৃত্যুর অপেক্ষা করবার মত দৃঢ়তা দেখাতে পারে, অথবা শহীদ বলে নিজেদেরকে মনে করতে পারে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর আমার মন থেকে পাইনি, নাটক থেকেও না। তাই আমি সহজেই শেষ দৃশ্যটি উপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু ওর জন্য তাপস সেনের কৌশলকে আমি অপকৌশলও বলিনা। ওই দৃশ্যটি দেখে তাপস সেনের প্রতি আমার প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। অপেরার উপযুক্ত মাল-মশলা, অর্থাৎ লিব্রেটো, অর্কেস্ট্রা আর কোরিওগ্রাফির সহায়তা পেলে তিনি বহুভাষাভাষী এই দেশের একটা বড় অভাব পূর্ণ করতে পারেন অপেরা রূপায়িত করে।

•

প্রগ্রেসিভদের ব্যবসায়ী থিয়েটারে যোগদান এবং ব্যবসায়ী থিয়েটার পরিচালনা আমি নানা কারণে বাঞ্ছনীয় মনে করি। তার বড় কারণ শোনা-কথা এবং পড়া-কথা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা নব-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। ব্যবসায়ী থিয়েটারের দর্শকদেরকে জাতির ক্রস-সেকশন বলা যায়। তাঁরা যাতে খুশি হন তাকে, দোষ-গুণ নিয়েই, সেই জাতির পরিচয় বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁরা আর্টের কোন ইজম-এর আতস-কাচের ভিতর দিয়ে নাটক দেখেন না। তাঁরা নাট্যরসের স্বাদ পেতে চান। তাঁরা যেমন স্নেহপরায়ণ, তেমনই অকরুণ। নাটক সৃষ্টির যেমন সহায়ক তাঁরা, তেমনই হন্তারক। তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে, অতিক্রম করে, নাটক লেখা যায়, কিন্তু সে নাটককে জাতীয় সৃষ্টিরূপে মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই তাঁদেরকে প্রাচীন ভারতে 'প্রেক্ষা দেবতা' বলা হোতো। তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ নব নব অভিজ্ঞতা দেয়। আর তারই ফলে নাটক রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করে। এই অভিজ্ঞতার বিষয়ে সার্থক নাটক আর ব্যর্থ নাটক সমানই কাজ করে। ব্যবসায়ী থিয়েটারে আবার 'অর্থ দেবতাও' অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁরাও যেমন স্নেহশীল, তেমনই অকরুণ। তাঁরা রসের প্রত্যাশী নন, অর্থের প্রত্যাশী, ক্ষমতার প্রত্যাশী। তাই বহু দেশে নাট্যশালাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। তার ফলে আবার নাট্যশালা অনেক দেশে ব্যুরোক্রেশীর নাগপাশে বাঁধাও পড়ছে। নাট্যসৃষ্টি তাই কোথাও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাবার বাঁধা সড়ক পায় নি। বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে পথের নিশানা ঠিক করে শিল্পীদেরকে এগিয়ে যেতে হয়। কেউ দু'পা চলে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, কেউ মাইলস্টোন পুঁতে পুঁতে অগ্রগামী হয়। এমনই হয়েছে চিরদিন, এমনই হবে চিরদিন। প্রবন্ধ লিখে অথবা বক্তৃতা করে নাটকের খ্যাতি বা অখ্যাতি রটানো যায়, কিন্তু নাটক সৃষ্টি করা যায় না। নাটক সৃষ্টি হয় প্রেক্ষাগৃহে; নাট্যকারের টেবিলেও নয়, থিয়েটারের মঞ্চেও নয়।

•

মিনার্ভা থিয়েটার গ্রুপের 'মিনার্ভা' থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা যেমন হালের নাট্যলোকের একটি বড় ঘটনা, তেমন গিরিশ থিয়েটারের সূচনাও একটি বড় ঘটনা। গিরিশ থিয়েটারের পরিকল্পনার কথা আভাসে-ইঙ্গিতে যখন শুনেছিলাম, তখন আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু বাদ্য শুরুর মুখে ওর মালিকরা সংবাদপত্রে যে কৈফিয়ৎ কেটেছিলেন, তা পড়ে বিস্মিত হলাম। গিরিশ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের মনে যদি গিরিশের নাটক অভিনয় সম্বন্ধে এতই সংশয় ছিল, তাহলে গিরিশ-থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন কি ভেবে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁদের কৈফিয়ৎ থেকে তা ধরতে পারি নি। বিশ্বরূপাই ত তাঁদের অভিনয়ের সংখ্যা অনায়াসেই বাড়িয়ে দিতে পারতেন, 'ডাউন ট্রেন'কে বিশ্বরূপার নাট্যসম্ভারের আর একটি উজ্জ্বল মণিরূপে দর্শকদেরকে উপহার দিতেও পারতেন। তার জন্য ত গিরিশের নাম সংযুক্ত করে একটি প্যারালাল থিয়েটার গড়বার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে একটি থিয়েটারের মালিক কি আর একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন; একটা কেন, একশটা পারেন, একশটা নাম দিয়ে। কিন্তু গিরিশের নামাঙ্কিত কোন নাট্য প্রতিষ্ঠানের উপর কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা স্বতন্ত্র কথা, গুরুতর কথা। গুরুতর এই কারণে যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত গিরিশ থিয়েটার রেজিস্টার্ড হয়ে গেলে 'গিরিশ থিয়েটার' নামে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান আত্ম-পরিচয় দিতে পারবে না। আইনত বর্তমান গিরিশ থিয়েটারের মালিকরা ওই নাম ব্যবহার করবার এবং অপরকে এই নাম ব্যবহার করতে বাধা দেবার অধিকার রাখেন। তাঁরা যদি গিরিশের নাটক অভিনয় নাও করেন, অথবা অভিনয়যোগ্য নয় বলে প্রমাণিত করেন, এবং নিজেদের অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্য, নিজেদের আর্থিক লাভের জন্য, থিয়েটারটিকে যদি ব্যবহার করেন,—তাহলেও কারুর কোন আপত্তি করবার আইনসঙ্গত কোন অধিকার থাকবে না। সে অবস্থাতে বাংলা নাট্যশালার জনককে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে বলে বাঙালী জাতি সেই থিয়েটারের মালিকদের প্রশস্তি গাইতে পারেন কি? গিরিশের নাম জুড়ে দিয়ে কেউ যদি লোহা-লক্কড়ের দোকান খোলেন, তাহলে এ প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বাংলার নাট্যশালার জনক যিনি, তাঁর নামাঙ্কিত কোন নাট্যশালাকে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া স্বতন্ত্র কথা। আত্মবিস্মৃত এবং আত্মনিন্দা-পরায়ণ বাঙালী জাতি আপন শক্তিকে এবং আপন প্রতিভাকে অবহেলা করে, অবমাননা করে, আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় আসামের ঘটনা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করছে। বাঙালী জাতির সকল গৌরবকে একে একে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে সদ্য বাঙালী নব-গৌরব লাভের লোভে দিকে দিকে ভিক্ষাভাণ্ডধৃত যুক্ত-পাণি প্রসারিত করে কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলছে, আমাদের কিছু ছিল না, কিছু নেই, তোমাদের ভিক্ষায়ে পুষ্ট হয়ে আমরা নিজেদেরকে গৌরবমণ্ডিত করি। এই মনোবৃত্তির জন্যই গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবের (১৯১২) পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরকালের মধ্যেও বাঙালী জাতি গিরিশের নামাঙ্কিত একটি জাতীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান গড়তে পারল না! নিজেদের সেই লজ্জা, সেই কর্তব্যচ্যুতির [illegible] তাঁরা চাপা দিতে চাইছেন ধনিক-মালিকের ব্যবসা-বুদ্ধিকে [illegible] [illegible] [illegible] অভিনন্দন জানিয়ে।

•

মালিকদের পাটোয়ারী বুদ্ধির তারিফ [illegible] করি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত গিরিশ লাইব্রেরীও তারিফ করেছিলাম। একটি থিয়েটার [illegible] [illegible] আর একটি থিয়েটার তাঁরা প্রতিষ্ঠা করছেন [illegible] তাঁদের গুণকীর্তন করতে আমি লজ্জিতও হব না। তাঁদের নতুন থিয়েটারের যে নামই তাঁরা দিন, আমার বাধা দেবার শক্তিও নেই, অধিকারও নেই। আমার অভিযোগ তাঁদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে নয়, তাঁদেরও বিরুদ্ধে নয়। অভিযোগ দিশাহারা আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে, আর প্রতিষ্ঠাতা মালিকদের প্রচারিত কৈফিয়তের স্বতোবিরোধী কয়েকটি উক্তির বিরুদ্ধে। কারণ সেগুলিকে আমি নাট্যোন্নয়নের হন্তারক বলে মনে করি। সেগুলি সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলি :—

(ক) গিরিশের সুদীর্ঘ নাটক দেখতে এবং সংলাপ শুনতে আজকার বাঙালী [illegible] হবে না, এ-কথা সত্য যে নয় তা বিশ্ব-রূপার মালিকরা ওই বাড়িতে অধিষ্ঠিত হবার ঠিক আগেই নাট্যাচার্য শিশির-কুমার বুঝিয়ে দিয়েছেন। [illegible] [illegible] এখনো বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

(খ) সুদীর্ঘ নাটককে ছোট করা অন্যায় নয়, এবং তাতে করে গিরিশের সম্মান ক্ষুন্ন করা হয় না। সংক্ষিপ্ত করবার মতো উপযুক্ত লোক বাংলা দেশে একাধিক আছেন। (তাঁদের মাঝে আমি নিজেকে স্থাপন করবার সুযোগ করে নিতে চাইছি না কিন্তু।) বিশ্বরূপার কর্তৃ-পক্ষের স্মরণ থাকতে পারে তাঁদের কোন উৎসব উপলক্ষে আমি একটি আর্ট-কাউন্সিল গড়বার পরামর্শ দিয়েছিলাম। ওইরূপ একটি কাউন্সিল এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

(গ) গিরিশের ভাষা আজকার অভিনেতৃরা উচ্চারণ করতে পারবেন না, কবিতা আবৃত্তি করতে পারবেন না, অথবা চরিত্র বিকশিত করতে পারবেন না, একথা বলবার কোন কারণ নেই। আমি হালের বহু শক্তিমান অভিনেতা ও শক্তিমতী অভিনেত্রীর নাম করতে পারি যাঁরা তা নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু তাঁরা সকলে হয়ত গিরিশের নাটক অভিনয় করতে চাইবেন না। তাঁরা না চাইলেও আধুনিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাঝে কিছু কিছু অবশ্যই পাওয়া যেতে পারত। তাছাড়া ব্যবসায়ী মঞ্চে শক্তির পরিচয় বার বার দিয়েছেন এমন অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী মঞ্চের বাইরে রয়েছেন এবং মঞ্চে অবতীর্ণ হতে রাজী আছেন। তাঁদেরকে আহ্বান জানালেও নাট্যোন্নয়নে বিঘ্ন ঘটত না।

(ঘ) গিরিশ থিয়েটার নতুন দল গড়েছেন। গিরিশের নাটক অভিনয়ে উৎসাহী এবং পারদর্শী অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁরা অবশ্যই সংগ্রহ করতে পারতেন। ক্ষুধায় ও সেতুতে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা সকলেই ওদের রচনায় মুগ্ধ হয়ে অভিনয় করতে রাজী হয়েছেন, তা কি বলা যায়? অভিনয় ত অনেকে অর্থকরী বৃত্তি করে নিয়েছেন।

(ঙ) গিরিশ থিয়েটারে কেবল গিরিশেরই নাটক অভিনয় করতে হবে, এমন কথা আমি মনেও করি না। গিরিশ এখন আর ব্যক্তি নন, গিরিশ এখন প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠান বহন করে এমন যে কোন নাটক, নতুন বা পুরাতন, অভিনয় করলেই গিরিশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়।

(শেষাংশ ২৫২ পৃষ্ঠায়)

আসল রূপটি কী ছিল জানি না। চোখে যা দেখলাম, তাতে মনে হল, পুকুর-ডোবা-পানার জলাভূমিতে নতুন গ্রাম গড়ে উঠেছে। নতুন পথঘাট, নতুন ঘরবাড়ি, ঘাট-বাঁধানো পুকুর—স্কুলবাড়ি, মন্দির, মসজিদ, চণ্ডী-মণ্ডপ—যেন পটে আঁকা একটি ছবি। তবুও পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের উপরেই যে এই নবরূপের আবির্ভাব, তা চিনে নিতে ভুল হয় না। এই নব-কলেবর নিয়েছে যে অঞ্চলটি তার নাম বিশ্বেবেড়িয়া-গাজিপুর। হিন্দু-মুসলমান হাজার চারেক লোকের বাস এখানে। মোট লোক-সংখ্যার পঞ্চান্ন ভাগ হিন্দু, বাদ বাকি মুসলমান।

গত বছর অক্টোবরে বন্যায় গৃহহীন, আশ্রয়-হীন হয়েছিল যত লোক, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার আমতা থানার অন্তর্গত এই অঞ্চলটির উপরই প্রকৃতির তাণ্ডব দেখা দিয়েছিল বুঝি সব থেকে বেশী। গোটা অঞ্চলটাই প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বসেছিল। প্রবল বন্যা তার করাল ছায়া নিয়ে নেমে এসেছিল এই গণ্ডগ্রাম দুটির বুকের উপর। গবাদি পশু বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল, চারিদিকের অনন্ত জলরাশির মধ্যে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল ঘরের চালে, গাছের শাখায়। সে-দৃশ্য যাঁরা চোখে দেখেছেন, ভুগেছেন যাঁরা—আজও তাঁরা দুর্দিনের কথা স্মরণ করে শিউরে ওঠেন।

দীর্ঘ নমাসের অক্লান্ত ও অতন্দ্র সাধনায় সেখানে আজ অন্তহীন হতাশা আর হাহাকারের মধ্যে এক নতুন জীবন, নতুন উদ্দীপনা, নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। যাঁরা এসেছিলেন এই জনকল্যাণের ব্রত নিয়ে, ব্রত শেষে আজ তাঁরা বিদায় নিচ্ছেন। সেই অশ্রুসিক্ত বিদায়পর্বটুকুই চোখে ভাসছে।

এই বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। এসেছিলেন সরকার, এসেছিলেন বিভিন্ন জনকল্যাণ সমিতি। চলচ্চিত্র-সেবীরাও—যাঁদের লোকে শুধু সিনেমার লোক বলেই জেনেছে, তাঁরাও বুকভরা ব্যথা নিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বতন্ত্র একটি পথ বেছে নিলেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ও পৌরপতির বন্যার্ত সাহায্য তহবিলে মাত্র সাড়ে বারো হাজার টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, প্রত্যক্ষ সহযোগিতার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সরাসরি দুর্গতদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

সেই সেবা-যজ্ঞে বিশেষ করে সামনে এগিয়ে এলেন 'কাবুলিওয়ালা'র প্রযোজক অসিত চৌধুরী ও প্রযোজক-পরিচালক বিকাশ রায়। পেছনে রইলেন বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি (বি এম পি এ), আর তার সদস্যবৃন্দ—প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলা-কুশলীরা। হিন্দী ছায়াচিত্রের পরিবেশকদের সহ-যোগিতায় স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে সাহায্য করলেন প্রচার-বিদ বাগীশ্বর ঝা। এঁরা এসে দেখলেন কাজটি বড় সহজ নয়। আরও দেখলেন সহুরে মানুষ, বিশেষ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের আত্মোৎসর্গে সেখানে অনেক বিস্ময়, অনেক সংশয়। তাই প্রথমেই সেবা আর ভালবাসার বিনিময়ে গ্রামবাসীদের কাছে টানতে চাইলেন তাঁরা। প্রথমে কাছে এলো দুর্গত তরুণ দল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল বৃদ্ধ, যুবা, নারী-পুরুষ—অনেকেই। কর্ম-যজ্ঞে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন সবাই। কর্মস্রোতের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এক প্রীতির বন্ধন রচনা করলেন চলচ্চিত্রসেবীরা। নমাস ধরে একটানা কাজ চললো। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতি ব্যয় করলেন লক্ষ মুদ্রা। তার রূপটি কী দাঁড়িয়েছে, সে-পরিচয় গোড়াতেই দিয়েছি। এই স্বল্প পরিসরে সেই পরিচয়ের প্রায় সবটাই অসম্পূর্ণ, তবু পাঠক তা থেকেই বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির এই বিপুল কর্মোদ্যমের পরিচয় পাবেন। শুধু একটি কথা বলা হয়নি। বলা হয়নি—এই সেবা কাজে উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, জাতিধর্মের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তার পরিচয় পাওয়া গেল, পাশাপাশি নতুন করে গড়ে-ওঠা মন্দির আর মসজিদ দেখে, আর টুকরো টুকরো ঘটনায়। বিশেষ করে দুটি বিদায় অভিনন্দন অনুষ্ঠানে। গ্রামবাসীরা যে ভাষায় চলচ্চিত্রসেবীদের অভিনন্দন জানালেন, তাতে হয়ত সাহিত্যগন্ধ অথবা সাজানো ভাষা ছিল না, কিন্তু ছিল বুকের ছোঁয়া, আত্মীয় বিচ্ছেদের দরদ। বাংলার চলচ্চিত্রসেবীরা কখনো ভুলতে পারবেন না এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানের কথা। ভুলতে পারবেন না সেই সাংবাদিক অতিথিরাও, যাঁরা এই করুণ বিদায়-পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী।
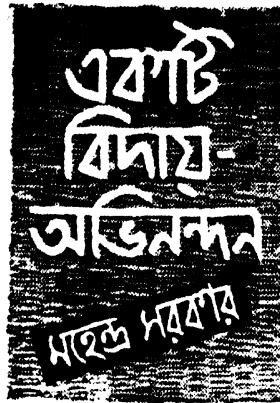
প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করি এখানে। বিদায়-শেষে গ্রাম থেকে নদীপথে আমতায় এসে আমরা যে-যার নির্দিষ্ট মোটরে উঠে বসেছি। এক-এক করে গাড়ীগুলো ছাড়ছে। অনেকেই শেষ অভিনন্দন জানিয়ে গ্রামের ফিরতি পথ ধরেছেন। দূরে দাঁড়িয়ে গালভরা দাড়ি এক বুড়ো মুসলমান সেই দৃশ্য দেখছিলেন, আর কাকে যেন ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিলেন। অসিত চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন আমাদের মোটরের সামনে। হঠাৎ লোকটিকে দেখতে পেয়েই অসিতবাবু উৎফুল্ল অন্তরঙ্গতায় বলে উঠলেন, আরে, আউলাদ সাহেব যে! বলুন কি, সমিতির কাজ কেমন চলছে? লোকটির দু'চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে তখন। যেন অনেক ব্যথা ভিড় করে কণ্ঠে কথা ফুটলো। বললে, বাবু, আর দেখা হবে না? দু'চোখ মেলে তার দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন অসিতবাবু। মনে হচ্ছে বুক ঠেলে কান্না আসছে তাঁর। কয়েকটি নিবিড় মুহূর্ত। অনেক পাওয়ার সঙ্গে অনেক হারানো ভরাট যেন। তারপর বললেন, দেখা হবে না কেন, হবে। আমি তো মাঝে মাঝেই আসবো এখানে।

আর একটি কথাও তিনি বলতে পারেন নি। ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েছে। তাকিয়ে দেখি গাড়ীর আর সকলে মুখ ফিরিয়ে আছে এক-একজন এক-একদিকে।

......এ-আনন্দের বেদনা ছোঁয়াচে বড়।

মৃণাল সেন পরিচালিত 'পুনশ্চ' চিত্রের একটি দৃশ্য। ফুটপাতের পুরনো বইয়ের দোকানে বই কিনতে এসে নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দূরে কিছু একটা দেখে কৌতূহলী হয়েছেন।

অথ লক্ষ্মীনারায়ণ কথা

মনোজ বসু

কলিকালে দেখা যাচ্ছে, ভক্ত বড় বেশি হয়ে পড়েছে। ডেকে ডেকে অস্থির করে তোলে। আর কী সব দিন গিয়েছে সেকালে! কত শৌখিন মতলব আসত মাথায়! ক্ষীরোদসাগরে পদ্মপাতা পেতে নিয়ে তার উপরে অনন্তশয়ন. লক্ষ্মী কোমল হাতে পদসেবা করছেন......

সেই নারায়ণ শিলীভূত হয়ে আপাতত চৌধুরিদের অন্ধকার ভাঙাচোরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাও কি রেহাই দেবে একদণ্ড?

প্রাচীন পরিবার চৌধুরিরা, অধুনা নেক অবস্থা পড়ে গিয়েছে ইদানীং।

পুবের কোঠা থেকে হঠাৎ কে ধমক দিয়ে ওঠে: নারায়ণ, নারায়ণ! আঁতুড়ের বউ ছোঁয়া-ছুঁয়ি, চানটান করবিনে? কী ম্লেচ্ছ রে বাবা!

গলাটা মেজগিন্নির মতন। জাহাবাজ মেয়েমানুষ। নারায়ণ সন্ত্রস্ত: ম্লেচ্ছ কাকে বলছে? সকালের দিকে পাঁচ-সাত জনে ঠাকুর প্রণাম করে গেছে—ভেবে দেখলেন, বউও ছিল একটি দুটি তার মধ্যে। আঁতুড়ঘরের কোনটা, তিনি তো বোঝেন কি করে? পাষাণদেহ নিয়ে স্নানেরই বা কি উপায় এখন?

মেজগিন্নি আবার বলেন, যা তুলসীর জল ছিটিয়ে আয়। তারপরে খেতে বসবি।

সর্বরক্ষে! লক্ষ্য নারায়ণঠাকুর নন, বাড়ির কোন অবোধ ছেলে বা মেয়ে। কিন্তু প্রায় তখনই পুঁটের মা রে-রে করে এসে পড়েন: বুকে-পিঠে তুলসী দিয়ে তোমার যে পুজো করলাম নারায়ণ ঠাকুর, পাঁচ-পাঁচটা পয়সা দক্ষিণে। ফেল করে বাড়ি এল, কানা ঠাকুর একটিবার চোখ তুলে দেখলে না?

পুঁটে পড়াশুনো করবে না, আজে বাজে লিখে আসবে। তবে কি কর্তব্য হল, পুঁটের হয়ে পরীক্ষায় বসে ঠাকুর নির্ভুল উত্তর লিখে দেবেন?

মেজকর্তা বলাই চৌধুরিমশায়ের তেজারতি ও রাখি-মালের কারবার। তিনি স্বয়ং এলেন মন্দিরে। মাঝে মাঝে আসেন এমন। সঙ্গে যথারীতি একজন খাতক।

হ্যান্ডনোটে পঞ্চাশ টাকা সই করে দিচ্ছে। সুদ লেখা রইল টাকায় এক আনা। লেখাজোখায় তার বেশি বে-আইনি। কিন্তু মুখে ঠিক রইল চার আনা। ঠাকুর নারায়ণ সাক্ষি রইলেন।

অনেক জরুরি ব্যাপারে নারায়ণকে এই রকম সাক্ষি হতে হয়।

যথা: নারায়ণ সাক্ষি। যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম—বলাইর ভাই কানাই চৌধুরির মেয়ে সুচিত্রার বিয়ে। বিয়ের আসরে এই সময়টা গিয়ে বসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সম্ভব নয় বলে নারায়ণ উৎকর্ণ হয়ে মন্ত্রের সমস্ত শুনে নিচ্ছেন।

পলক ফেলতেই দু তিন বছর কেটে যায়।

সুচিত্রার বর এসেছে। দু-জনে কোথায় গিয়েছিল, ফিরছে এখন মন্দিরের সামনে দিয়ে।

পানের দোক্তা দেবে না— বলি, বিয়ে করনি নারায়ণ সাক্ষি রেখে?

নারায়ণের মুখ শুকোয়। গালি-গালাজ সুরু হয়ে যায় এই বুঝি! বিয়ের মন্ত্রের মধ্যে পানের দোক্তা দেবার চুক্তি ছিল কিনা, সঠিক মনে পড়ছে না। বুড়ো হয়ে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়েছে।

আবার ওদিকে বলাই চৌধুরির টাকা শোধ দিয়ে গেছে হ্যান্ডনোটে লিখিত এক আনা হারে সুদ হিসেব করে। বেশি একটা পয়সাও দিল না। বলাই মন্দিরে হামলা দিয়ে পড়েন: এত বড় অধর্ম! তোমার সামনেই তো কথা নারায়ণ। বলি, হাত পা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলে নাকি? মুখে রক্ত উঠে মরে না কেন খাতকটা? এমন হলে লোকে মানবে কেন?

এক কাঁসর পান্তাভাত খেয়ে পুরুত ঠাকুর এসে পুজোয় বসলেন: এতে সচন্দন গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ—

কলেজে-পড়া বউ তাপসীর উপর পুজো দেখাশুনোর ভার। সে হেসে বলে, চন্দন কোথা ঠাকুর মশায়? গন্ধপুষ্পই বা কই?

পুরুত বলেন, এদ্দিন ধরে পুজো করছি, ভারি তো করলেন ঠাকুর আমার! চন্দনে আর কাজ নেই। বেলপাতা আছে—গন্ধটন্ধ যা দরকার, ওই থেকে ঠাকুর শুঁকে নিন।

নারায়ণ ভেবে পান না, পুরুতের সঙ্গে কি রকম ব্যবস্থা করলে পুজোয় আবার ফুল-চন্দন আসে।

একদিন রাত্রিবেলা ঘুমুচ্ছে বাড়ির লোকে। জন চারেক চোর ঢুকেছে। ফিসফিসিয়ে বলে, বাবুদের ঠাকুরবাড়ি। গড় করে যা।

সিঁদকাঠি নামিয়ে রেখে ভক্তিভাবে তারা প্রণাম করে: ঠাকুর, ভাল রকম পাওনাগণ্ডা হয় যেন। কানাইবাবুর মেয়ে অনেক গয়না পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। আর কিছু নয়—গয়নার বাক্সটা দিয়ে দিও, তাতেই হবে।

সিঁদ কেটেছে মাঝের কোঠায়। ঘণ্টাখানেক পরে চলে যাচ্ছে। গোদার সিঁদকাঠি নাচিয়ে বলে, এত করে বলে গেলাম, তা দিলে তো এই ছেঁড়া মশারি আর পিতলের ঘটি।

আর একজন বলে, ফুটো ঘটিতে তালি আঁটা। কলির দেবতা, ওদের আর পদার্থ নেই।

যখন সিঁদকাঠি নাচাচ্ছিল, ভয়-ভয় করছিল নারায়ণের। দুর্জন লোক—দিল বা এক ঘা বসিয়ে। অন্তর্যামী যদিচ, কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় সঠিক স্মরণ করতে পারেন না গয়নার বাক্সটা সুচিত্রা কোনখানে রেখে দিয়েছে। তবে না হয় অদৃশ্য হাতে বাক্সটা সিঁদের মুখে রেখে দিতেন।

[illegible] চলছে। এক বিপদ কাটে তো,

আর একটা। নারায়ণ উপায় খুঁজে পান না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। সব নারীই যেমন হয়। মন্দিরের কোটরে নারায়ণের সঙ্গে রাতদিন পড়ে থাকতে তিনি নারাজ। মাঝে মাঝে ত্রিভুবনে একটা করে চক্কর দিয়ে আসেন। এবারে ফিরে এসে চিন্তাকুল স্বামীর দিকে নজর পড়ল।

মুখপদ্ম এমন মলিন কেন প্রভু?

নারায়ণ দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে শোনালেন।

লক্ষ্মী ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন কিছুক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁরও, কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহ-ত বিনা বয়স ধরা যায় না। দেখাচ্ছে তাঁকে অতি অল্পবয়সী। বিহ্বল হয়ে বুড়ো নারায়ণ তাকিয়ে আছেন।

লক্ষ্মী বলেন, হয়েছে—

কি হল?

আর অন্ন হাপিত্যেশ হবে না। শোধ করে দিচ্ছি।

কুবেরকে স্মরণ করলেন। কুবের এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। লক্ষ্মী বলেন, আমি নামেই শুধু লক্ষ্মী। ভাণ্ডারে কুলুপ এঁটে তুমি বসে আছ, ইচ্ছে হলে আমার কিছু করবার জো নেই।

কুবের বলেন, সে কী কথা। হুকুম হলে তক্ষুনি চাবি খুলে দেব। আমার কোন্ দোষ বলুন।

চৌধুরিদের অগাধ বিত্ত ঢেলে দাও। অ... আদেশ।

যথা আজ্ঞা—বলে কুবের পুনশ্চ প্রণাম করে বিদায় হলেন।

তারপরে কী কাণ্ড। ছপ্পর ফুঁড়ে ঐশ্বর্য আসে চৌধুরিদের। বলাই চৌধুরী মশায়ের এবারে কি বুদ্ধি হল—যা-কিছু সঞ্চিত সমস্ত টাকার ধান কিনে গোলা বোঝাই করলেন। ধারবাকি করেও কিনলেন। আর বর্ষায় জল একটু পড়তে না পড়তেই দেশব্যাপী বন্যা। এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ। পুলকিত চৌধুরি মশায় র‍্যাকে সমস্ত ধান বেচে দিলেন তিনগুণ দামে।

আবার পুঁটের মা একদিন গাঙের ঘাটে নাইতে গেছেন। ভাটার টানে একটা পুঁটলি ভেসে এসে গায়ে লাগে। কোথাকার নোংরা আবর্জনা—সরে আর একদিকে গিয়ে ডুব দিচ্ছেন তো পুঁটলি ভেসে গেল সেখানেও। শক্ত জিনিস বলে ঠেকে. চৌকো সাইজ। ডাঙায় এনে পুঁটলি খুলে দেখেন, কারুকার্য-করা চন্দন কাঠের বাক্স। এবং পুলকিত দৃষ্টিতে দেখলেন, সোনার মোহরে ঠাসা সেই বাক্স।

এই চলল। চৌধুরীবাড়ির যে কেউ ছাই-মুঠো ধরছে তো সোনা মুঠো হয়ে যায়। ফেঁপে ফুলে উঠলেন তাঁরা দেখতে দেখতে। ও তল্লাটে এমন বড়লোক আর নেই।

পুরুত ঠাকুর এসে শোনান, নারায়ণের দয়ায় সমস্ত হচ্ছে।

পুঁটের মা বলেন, আর আপনি তো এখনো সেই মুগের অংকুর আর ছাঁচ-বাতাসার ভোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। ও হবে না। মোটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি। ব্যাংকে থাকবে। তার সুদ থেকে ভালো মেওয়া-মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করবেন ঠাকুর মশায়।

নারায়ণ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলেন, শুনেছ তো? ভোগের দুঃখ ঘুচে গেল এবারে।

লক্ষ্মী হাসলেন একটু। জবাব দিলেন না।

মেজকর্তা দরাজভাবে বললেন, মন্দির মেরামত হবে—ঠিকাদার কাজে লাগবে কাল-পরশু থেকে। সামনে নতুন নাটমন্দির—অষ্টপ্রহর ভক্তদলের কীর্তন চলবে সেখানে। মণ্ডপের পাশে পুরুতঠাকুর মশায়ের কোয়ার্টার। অত দূর থেকে হেঁটে এসে হাঁসফাঁস করেন, মন্তরে মন থাকে না আর তখন।

নারায়ণ লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বলেন, এই সেরেছে! দুপুর আর সন্ধ্যায় পুরুত এখন দু-বার করে আসে। বাসা পেয়ে সগোষ্ঠি এসে উঠলে ঘণ্টা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করবে রাত-দিন। তার উপরে নাটমণ্ডপে ভক্তদের কীর্তনানন্দ। চোর তাড়িয়ে ডাকাতের পত্তন—এ তুমি কী করলে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী এবারও হাসলেন।

শুভদিনে সপরিবারে পুরুত নতুন কোয়ার্টারে এসে উঠলেন। বাড়ির ভিতর থেকে এখন আর নৈবেদ্য আসে না। ব্যাংক থেকে সুদের টাকা তুলে মেওয়া-মিষ্টান্ন সহ ষোড়শোপচারে আয়োজনের ভার পুরুতের উপর। হচ্ছেও তাই। আলোচাল-কলা ছাড়াও সন্দেশ-রসগোল্লা খেজুর-কিসমিস ইত্যাদি। সন্দেশ-রসগোল্লা মাস খানেক আগে কিনে রেকাবিতে পরিপাটি করে সাজানো আছে। রেকাবিগুলো দুপুরে ও সন্ধ্যায় নিয়ে এসে বিগ্রহের সামনে রাখতে হয়। কী জানি, বাড়ির কোন গিন্নি পুজোর সময় এসে পড়লেন ... দিবং। খুঁত পেলে পুরুতের মুণ্ডপাত করাবেন। তবে আসেন না ইদানীং আর কেউ। উদ্যোগ হয় না, সময়ও পান না। পুরুতেরও ক্রমশ আলস্য এসে যায়—সাজানো নৈবেদ্য বাসায় পড়ে থাকে, মন্দির অবধি বয়ে আনা ঘটে ওঠে না। নারায়ণের ভোগে আগে যা-ই হোক মুগের অংকুর ও ছাঁচ-বাতাসার অভাব হত না, এখন তুলসীপাতা বেলপাতা আমপাতা ইত্যাদি পাতালতাই শুধু।

নতুন নাটমণ্ডপে গোড়ার দিক দু-পাঁচবার কীর্তন হয়েছিল। কিন্তু শ্রোতার অভাবে জমে না। কীর্তনীয়ারা খোল বাজিয়ে খুশি মতন গেয়ে বরাদ্দ দক্ষিণা নিয়ে চলে যেত। ইদানীং তা-ও বন্ধ। কড়িকাঠের ফোকরে চামচিকের বাসা।

সন্ধ্যার পর পুঁটের মার পায়ে দাসী বাতের তেল মালিশ করছে। তাপসী বউকে দেখতে পেয়ে পুঁটের মা বললেন, নারায়ণের পুজো হচ্ছে তো ঠিক মতো?

তাপসী বলে, টাকা খাচ্ছেন পুরুতমশায়—পুজো হবে না মানে?

কই, আরতির ঘণ্টা আজকাল শুনতে পাইনে।

আপনারা বিকিতে খেলেন যে সেই সময়টা। আরতির ঘণ্টা কানে যাবে কেমন করে?

কোন রকম উপদ্রব নেই, নির্বিঘ্ন শান্তি। নারায়ণ ভারি খুশি। লক্ষ্মীকে বললেন, বেশ হয়েছে! ক্ষীরোদসাগরে পদ্মপাতা পাততে বল আবার। আর দশসেরি পটল একটা। বিস্তর জায়গা পেয়েছি। পটল মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়িগে। তুমিও চল লক্ষ্মী, পদতলে হাত বুলোবে।

আমার জামার পকেট

॥ কুমারেশ ঘোষ ॥

আমার জামার পকেট
কোনকালে খালি থাকেনি এবং
এখনো তা থাকে না।

ছোট্টবেলায় আমার ছোট্ট পকেট
ভর্তি থাকতো মার্বেলগুলি,
লাট্টু-লেত্তি, ঘুড়ির সুতো
আর লজেঞ্জ বিস্কুটেঃ আমার দাদুর ঘুস।
ঘুস দিয়ে দাদু ভাব জমাতেন ছোট নাতির সঙ্গে
আর বলতেন হেসেঃ শালা ভারি ঘুসখোর।
এবং আমার জামার পকেট হতোই কেবল বোঝাই।

আমার জামার পকেট পরেও যায়নি খালি;
স্বরচিত কোন কবিতার পাতা এবং একটি পেন,
মন-দেয়া কোন লাজুক মেয়ের
নীলখামে ভরা চিঠি,
কখনো বা তারই ফটো,
কিংবা রেস্টুরেন্টের বিল, সিনেমা টিকিট দুটো,
আমার পকেটে থাকতো আমার সময় মতো সব।

সময় মতই থাকতো পকেটে—
ভুলে পাছে যাই, লম্বা বাজারী-ফর্দ।
পকেটে থাকতো পাওনাদারের মোটারকমের বিল।
মাসের প্রথমে মাইনে-পাওয়া
কড়কড়ে নোট গুনে ভরেচি পকেটে.
এবং ভরেচি উপরি পাওনা—
চলতি কথায়ঃ ঘুস।

আজও আমার জামার পকেট-ভরাঃ
সেই মার্বেলগুলি, লাট্টু-লেত্তি
এবং ঘুড়ির সুতো,
রাংতায় মোড়া টফি আর চকোলেটে—
কেড়ে টানবার আগে নাতির জন্য ঘুসঃ
শালা ভারি ঘুসখোর!

মিনতি

* নীলিমা মুখোপাধ্যায় *

কাতর দুর্বল আমি হে মোর পৃথিবী
তোমার হিংসার গ্রাসে পীড়িত জর্জর।
সর্পসম প্রতিদিন বিদ্বেষের হলাহল ঢালি
কেন জীর্ণ করিতেছ আমার বিবেক?
কেন কেড়ে নিলে সেই স্বপ্নময় সরল অন্তর
সুরভরা ছন্দভরা আনন্দের লীলানিকেতন?
আমার অতীত ছায়া ধিক্কারিছে আজি
নামহীন, দীপ্তিহীন, তৃপ্তিহীন
আজিকার মোরে।
মিনতি আমার রাখ—সম্বর এ সংহারের সাজ
আবির্ভূত হও ওগো অনুপম জীবনদেবতা—
দুর্দিনের কুয়াসা টুটি বাঁচাও আমারে।
আরবার দেখি তব ক্ষমাময় উদার স্বরূপ।

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। ডিমাপুর থেকে মোটরে চলেছি মণিপুরের উদ্দেশে। বেলা বারোটা নাগাদ মোটর এসে থামল নাগা পাহাড়ের রাজধানী কোহিমায়। সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল মুরগীর খাঁচা হাতে কয়েকজন নাগা। প্রত্যেকেই লম্বায় অন্তত ছ'ফুট। কেমন সুগঠিত, মাংসপেশী বহুল বলিষ্ঠ দেহ এদের। গলায় শাঁখের টুকরো দিয়ে তৈরী মালা, কারো কারো কণ্ঠাভরণের মাঝখানে আস্ত এক-একটি শঙ্খ ঝুলানো, বাহুতে হাতীর দাঁতে প্রস্তুত বাজুবন্ধের মত আকৃতি বিশিষ্ট একপ্রকারের গয়না, গায়ে হাতাহীন কালো জামা, এদের কাছা না দিয়ে পরা কালো রঙের কটিবাসে গাঁথা রয়েছে সারি সারি কড়ি। এদের দেহসৌষ্ঠব এবং দেহসজ্জা উভয়ই দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এরাই হচ্ছে আঙ্গামী নাগা।

নাগারা আঙ্গামী আও, সেমা, কাচা, রেঙ্গমা, লোটা, কনিয়াক, সাংটাম প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রধানতঃ নাগা পাহাড়েই এদের বাস। এ ছাড়া মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলসমূহও টাংখুল, মারম, কালিয়া, খইরাও, কাবুই কুইরেং, চিরু, মারিং ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের দ্বারা অধ্যুষিত। মণিপুরে অবস্থানকালে এদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার হয়েছিল। ইম্ফলের 'সেনা কাইথেল' বাজারে বেড়াতে গেলেই নজরে পড়ত মণিপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিক্রয়ার্থ বিভিন্ন সওদাসহ সমাগত নাগাদের ভিড়। তন্মধ্যে টাংখুলরাই সবচেয়ে দলে পুরু। এদের কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লাল-সাদা বা লাল-নীল রঙের দীর্ঘ বস্ত্রে ঢাকা। সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণগুলো পাখীর পালক, পশু-লোম, সরু বাঁশের টুকরো, চাঁচা-ছোলা অর্ধবৃত্তাকার মোষের শিং ইত্যাদি দ্বারা শোভিত। অনেকের মনে এই ধারণা বিদ্যমান যে, অধিকাংশ নাগাই উলঙ্গ অবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করে। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তার প্রমাণ পেয়েছিলাম আমি ইম্ফলের এই সেনা কাইথেল বাজারেই। এই হাটে যারা নিয়মিতভাবে আসত তাদের মধ্যে একমাত্র কাবুইদেরই লজ্জাসরমের বালাই কম। পুরুষদের পশ্চাদ্দেশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। খালি সামনের দিকে এক একটি ঝোলা নেংটি ঘুনসিতে আটকানো। মেয়েদের দেহের মধ্য ভাগটুকু মাত্র এক-একখানা নিতান্ত অপরিসর অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত।

আমি যখন নাগাদের সংস্পর্শে আসি তারপর সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতীত হয়েছে। এর মধ্যে নানাদিক দিয়ে এই আদিবাসীদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারও হয়েছে ধীরে ধীরে, নিজেদের রাজনৈতিক দাবি আদায় করবার জন্যে এরা গঠন করেছে Naga National Council নামক রাজনৈতিক সংস্থা। একটি মাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রেখে পরিচালিত হয়েছে এদের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, সেটি হল এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা।

আসামের ইতিহাস আলোচনা করলে নাগাদের সমাজে আর্যীকরণের কথা জানতে পারা যায়। অতীতে একদল নাগা, প্রথম আসাম-বিজয়ী আহোম রাজা সুকাফার অভিযাত্রী বাহিনীতে যোগদান করে। কালক্রমে এই যোদ্ধা নাগারা আহোমদের ধর্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি গ্রহণ করে অসমীয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে যায়। আহোমরাজা স্বর্গদেও সুপিমকা তাঁর রাজান্তঃপুরের এক কুমারীকে জনৈক 'খুনবাও' অর্থাৎ নাগা রাজকুমারের হস্তে সম্প্রদান করেন—এমনিভাবে নাগা এবং আহোম এই দুই রাজবংশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বর্গদেও গদাধর সিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ প্রমুখ আহোম রাজারা নাগা কন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

এমনিভাবে বিবাহসূত্রে এবং অন্য কোনো কোনো কারণে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে কতকটা সংস্পর্শ ঘটলেও বৃহত্তর নাগা সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজস্ব আচারব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি সযত্নে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই বীর্যবন্ত আদিম জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত নেমে এল বৃটিশ শাসনাধীনে আসার পর। খৃষ্টান মিশনারীদের প্ররোচনায় দলে দলে নাগারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ভয়াবহ পরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। নিজেদের ধর্মসমাজ সংস্কৃতি সব-কিছুর ওপর হয়ে উঠল তারা বীতস্পৃহ, পরানুকরণস্পৃহা হয়ে দাঁড়াল তাদের মজ্জাগত। মিশনারীরা তাদের ঘাড়ে একটা বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও আদর্শ চাপিয়ে দিয়ে তিল তিল করে তাদের জাতীয় সত্তার ধ্বংসসাধন করতে লাগল। এর পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে নৃতত্ত্ববিদ মিলস্ সাহেব তাঁর The Ao Nagas নামক পুস্তকে তাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

"মিশনারীরা যে সমস্ত ভুল করেছে তন্মধ্যে কোন্‌টি আদিবাসীদের পক্ষে ভবিষ্যতে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় এরা জোর করে আওদের স্কন্ধে বিজাতীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায় করেছে।"

অবশ্য একথা সত্য যে, নাগাদের সমাজে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত অনেক কুপ্রথা দূরীভূত হয়েছে মিশনারীদেরই চেষ্টায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নরমুণ্ড শিকারের কথা। আঙ্গামী, আও, লোটা, রেঙ্গমা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নাগাদের মধ্যেই এর রেওয়াজ ছিল। আও নাগাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল যে, মানুষের মাথা যত বেশী কেটে আনা যাবে ততই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হবে, শস্যের ফলন হবে প্রচুর। নরমুণ্ডছেদক বহু পুত্রকন্যা পরিবৃত হয়ে শুধু যে ইহলোকেই প্রচুর ভোগসুখ করবে তেমন নয়, পরলোকে গিয়েও তার সুখ-সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকবে না।

দলবদ্ধভাবে নরমুণ্ড শিকারে লোটা নাগাদের জুড়ি ছিল না। কোনো গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ হয়তো একত্রে ক্ষেতে কাজ করছে, হঠাৎ ভিন গাঁয়ের নরমুণ্ড শিকারীরা অতর্কিতে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলত। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে তারা তাদের মুণ্ডগুলি কেটে নিয়ে চলে যেত, এমনকি যে সকল শিশুর দন্তোদ্গম হয়নি তারা পর্যন্ত বাদ যেত না। ক্ষেত্রকর্মে রত মায়ের পিঠে বাঁধা নিরীহ শিশুর রক্তে ভিজে উঠত মাটির বুক।

সেদিনের নাগাদের সঙ্গে আজকের নাগাদের কত পার্থক্য! পৈশাচিক নরহত্যা ছিল যাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, আজ সারা ভারতের সঙ্গে সমানতালে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নাগারা যে তাদের যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত কুসংস্কার বর্জন করে আসামের সমস্ত আদিবাসীদের পুরোভাগে এসে আসন গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে এটা কম বিস্ময়কর নয়।

নাগারা নরমুণ্ডশিকারী, সর্বভুক, নগ্ন শালীনতাবোধ বর্জিত এ সকল কথাই শুধু আমাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। তাই এদের জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার সঙ্গেই শুধু আমরা পরিচিত। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে এদের প্রকৃতিগত সদ্‌গুণাবলীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় অনেক দিক দিয়েই এরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নাগাদের দেশে বেড়াতে গেলে উপভোগ করা যায় মুক্ত জীবনানন্দের আস্বাদ। আঙ্গামীদের আতিথেয়তা মনকে মুগ্ধ করে। অতিথির জন্যে এরা দরাজ হাতে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। নাগাদের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের সদাহাস্যময় ভাব আর কৌতুকপ্রিয়তা। নিতান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এদের প্রাণখুলে হাসতে দেখা যায়। এদের অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ অভিব্যক্ত হয় স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যগীতে। নৃত্য নাগাদের উৎসবের অপরি-

(শেষাংশ ২৬৫ পৃষ্ঠায়)

খোলা জানালাটা ছুঁয়ে কাঁপছে আবার কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো, কাঁপছে ওদের কচি ডালগুলোও! যেখানে আজকেও আবার দেখা দিয়েছে সেই কুঁড়ি ধরবার সম্ভাবনা।

নিচের কার্ণিশে এই মাত্র উড়ে এসে বসল একটা শালিক: বৃষ্টির জলে ভিজেছে সে-ও, তাই ভিজে পালকগুলো লেপ্টে আছে গায়ের সঙ্গে।

হাওয়ার বেগ কমেনি এখনও; দেবদারুর পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছে সে হাওয়ায়! অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে তার।

কে যেন আসছে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে শোনা যাচ্ছে ওর হাল্কা চটির আওয়াজ।

খোলা জানালার বুক থেকে একটু সরে আসেন রায়বাহাদুর শঙ্করপ্রসাদ। মুখটাকে ফেরান এইদিকে, দরজার দিকে মেলে ধরেন দু'চোখের দৃষ্টি—

ঃ কে!

ঃ বাবা!

দরজার পর্দা সরে যায়। দেখা দেয় একখানা হাসি আর খুশীমাখা মুখ।

ঃ আমি রুবি।

ও এগিয়ে আসতে থাকে।...স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর সিঁথির সিঁদুর আর সরল দৃষ্টি—

ঃ সেদিন যে তোমার শরীরটা ভাল দেখে যেতে পারিনি বাবা—তাইতো...

ঃ তাই এসেছ এবার ভাল দেখবার আশা নিয়ে! পরম স্নেহের স্পর্শ ওর সর্বাংগে বুলিয়ে দেন শঙ্কর।

ঃ ভাবতেও আনন্দ হয় একথা। কেউ এখনও আমার জন্যে ভাবে! সুস্থতা কামনা করে! চায় সাচ্ছন্দ্য।

রুবির দৃষ্টি এবার ঘুরে আসে ঘরের

ঃ কিন্তু ও জানালাটা খুলে রেখেছ কেন বাবা! একে এই বৃষ্টি, তারপরও ঠাণ্ডা হাওয়া—

ঃ কোথায় ঠাণ্ডা!

মেয়ের অনুযোগ যেন গায়ে মাখতে চাননা শঙ্কর। বলে যান।

ঃ তাছাড়া হাওয়াটাও বইছে অন্যদিকে। বৃষ্টির ছাট আসবার সম্ভাবনা নেই।'

ঃ তবু—

রুবি বলে চলেছে—

ঃ তবু আমার মনে হয়—বাড়িতে যারা আছে তারা তোমার স্বাস্থ্যের দিকে তেমন নজর রাখে না। এ অবহেলার সুযোগ তুমিই দিচ্ছ বাবা! নইলে, আজকালকার দিনে এত সব বাজে মানুষের খরচ চালাতে কার দায় পড়েছে, বলতে পারো?—"

ঃ থাক—থাক্।

শঙ্কর বাধা দেন। সমস্ত মুখের উপর একটা চাপা বেদনার ছায়া এসে পড়ে তবু ও—

ঃ ওরা আছে তোর মায়ের সময় থেকে। আজ যদি তার অভাবে তাড়িয়ে দিতেই হয় ওদের,—তাহলে—

হঠাৎ হেসে ওঠেন। ও প্রসঙ্গ চাপা পড়ে অন্য কথায়—

ঃ তার চেয়ে তুই ভেতরে যা; দু'পেয়ালা কফি পাঠিয়ে দে এখানে। আর—"

পূর্ণচ্ছেদ নয়, একটু থেমে শেষ করেন আগের কথাটাই—

ঃ হ্যাঁ, জেনে যা—আমি ভাল আছি। এত সুস্থ মনে করছি নিজেকে, যা আর কোন দিন করিনি। মনে হচ্ছে, আমি যেন আবার কয়েক বছর আগের দিনে ফিরে গেছি। সেই যেদিন তুই ছিলি এতটুকু,—আর তোকে নিয়ে তোর মায়ের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা ছিল না—সেই দিনে ফিরে গেছি আবার।'

দৃষ্টিটা জানালার দিকে ছুটে যায় যেন! কখন যেন ঘরের বার হয়ে যায় রুবিও।

সবুজ পাতা! এত নরম সবুজ ও পাতার রং যে, ওটাকে মুঠোয় পুরে চট্‌কে ফেলতে ইচ্ছে করছে শঙ্করের।

আর—এই যে হাওয়া যে হাওয়া হঠাৎ এসে চলে যাচ্ছে ছুটে—মাথায়-মুখে আর গায়ে ছোঁয়া লাগছে যার,—ওটাকে কি আজ দীর্ঘ-দিনের পুরেও নিজের বলে দাবী করা যায় না? দু'হাতে চেপে ধরা যায় না এই জামাগুলোর নিচে—কারও দুখানা হাত, কি কারও নরম মুখের মত।

কিন্তু এ আবার কি খেয়াল? চঞ্চল হয়ে ওঠেন অকারণেই। বারকয়েক ঘোরাফেরা করেন ঘরের এদিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত। মনে হয়—আবার কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে। কে আসছে যেন।

কিন্তু না, এ ঘরের সামনে দাঁড়াল না সে। চলে গেল এ ঘরের সামনে দিয়েই অন্য ঘরে, অন্য কারও কাছে, যার কাছে দরকার।

আর তিনি—

দরকারের দরজাটা তো নিজের হাতেই বন্ধ করে দিচ্ছেন আস্তে আস্তে। তবু যারা আসে—তাদের নেহাৎ ফেরাতে পারা যায় না বলেই আসতে পারে,—নইলে নয়।

—"আসতে পারি?"

সেতারের তারগুলো যেন এক-সঙ্গে ঝঙ্কার তুলেছে মনের মধ্যে। সরে যাচ্ছে আবার ঐ দরজার সামনে—দোদুল্যমান পর্দাটা। তার ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে কাজলটানা দুটো চোখ আর হাসিমাখা একখানা শ্যামল মুখ। চেনামুখ ওখানা। রোজই ঐ সময়ে আসে—আর ঐ একই প্রশ্ন করে প্রতিদিনই—

—ঃ আসতে পারি?

—ঃ বিলক্ষণ।

মুখ ফিরিয়ে নেন যেন অনেকটা অভিমানে.

: আমি তো কিছু বলবো না তোমায়। বলা আমার উচিতও নয়।...

পর্দা সরিয়ে তবু এগিয়ে আসে রমা; বসে পড়ে সামনেরই খালি চেয়ারটায়।

ওর মুখের দিকে তাকান শঙ্কর—মনে হয় যেন হাসি চাপছে ও। চাপুক। তবু বলে যান—

: তুমি তো জানো রমা,—নিঃসঙ্গ অবসরের মধ্যেও এই সময়টুকু—শুধু এই সময়টুকুকে যেন সমস্ত মন দিয়ে ঘিরে রেখেছি আমি। এও কি বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে তোমায়?'

চেয়ারের পেছনে রাখা কুশানের পরে যেন হাল্কা দেহটাকে মেলে রেখেছে রমা। নিটোল মুখের 'পর থেকে পাউডারের প্রলেপ ঝরে ঘন হয়ে রেখাঙ্কন করেছে গলার খাঁজে খাঁজে কানের পাতায় চিক চিক করছে শাদা পাথরের বিন্দু দুটো।

সবকিছুকে দেখছেন যেন খুঁটিয়ে। এক সময়ে সোনার কেসটা ঝকঝকিয়ে ওঠে শঙ্করের হাতে; লাইটারের আলোটাও জ্বলে ওঠে একবার, সেই সঙ্গে সিগারেটের মৃদু সুগন্ধে ভরে ওঠে সমস্ত ঘরখানা।

সামান্য সময়। সেই সময়টুকুর মধ্যেই সেটুকু আবার নেমে আসে দুই আঙ্গুলের ফাঁকে।

বলে যান—

—: আচ্ছা এমন দিনে ওরংয়ের শাড়ীটা পরেছ কেন?...

— : রংটা আপনার পছন্দ হয় না বুঝি?" উত্তরটা যেন ওর ঠোঁটে ঠেকেই ছিল, বার হয়ে এসেছে প্রশ্নের ছোঁয়া পেয়ে। বলছে—

—: সত্যি, সময়োপযোগী রং পছন্দের যদি একটা লিস্টও দিতেন এর আগে, তাহলে নিশ্চয় এতটা ভুল হতো না। এজন্যে দায়ী কিন্তু আমি নই,—আপনি।"

—: ঠাট্টা করছো?—"

:—ঠাট্টা করবো, আপনাকে! কি যে বলেন আপনি!

হাসিতে যেন ভেঙ্গে পড়তে চায় রমা। কিন্তু ওর মধ্যে থেকেও বার হয়ে আসে থেমে—থেমে।

—: ঠাট্টা কিসের? মনিব আপনি আর আমি আপনার কর্মচারী মাত্র। সম্পর্ক তো এইটুকু; তবু, দয়া করে যেটুকু আন্তরিকতার সুযোগ দিয়েছেন, বলাটুকু কেবল তারই দাবী নিয়ে।

নইলে—"

করুণ থেকে আরও করুণ হয়ে ওঠে ওর মুখের হাসি, গলার সুর—

— : নইলে কোনদিনই এভাবে কথা বলার সাহস আমার হতো না। পারতুম না—। এ স্পর্ধারও জন্ম আপনারই দেওয়া অজস্র মমতার মাঝখানে। উপকার পাওয়ার কৃতজ্ঞতায় ও যেন খানিকটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়—তাকিয়ে থাকে মার্জনা ভিক্ষার দৃষ্টি নিয়ে।

তাকান শঙ্করও। যেন অনুসন্ধান করেন ওর এই কৃতজ্ঞতার পেছনে লুকানো আছে কত দুঃখ, কত দারিদ্র্যের ইতিহাস, তারই।

'ফাঁক' দিয়ে গেছে এ বাড়ির পুরোনো চাকরটা, ব্যবস্থাটাও যার পুরোনো গৃহস্বামীর মত উচ্ছ্বলতাবিহীন।

তবু ওরই একটা পেয়ালা তুলে নিয়েছেন শঙ্কর নিজে, অন্যটা রমা।

পেয়ালায় পরিপূর্ণতাটুকু কমে আসছে খুব ধীরে; কিন্তু ধৈর্যের এই মাত্রাটুকুও ফাঁকি দিতে পারেনি শঙ্করের দৃষ্টিকে। বলেন—

— : ভাল লাগছে না বুঝি? চা-আনতে বলবো?"

: না।

: থাক তবে।

সামনের জানালাটা এখনও খোলা, হাওয়াটা এখনও এলোমেলো। টেবিল ঢাকার প্রান্ত আর টেবিলে রাখা ফুলগুলোর পাপড়ি কাঁপছে সে হাওয়ায়।

: বন্ধ করে দেব জানালাটা?"

: না।

খালি কাপ-ডিসটাকে টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখেন শঙ্কর। বলেন—

— : ও অনুরোধ রবিও করে গেছে আর একবার; শুনিনি,—এখনও শুনবোনা।

হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট যদি একটু আসেই তো আসুক না। ক্ষতি কি তাতে? বরং লাভ আছে। সে লাভ অতীতের ঐশ্বর্যকে মনে পড়িয়ে দেওয়া। যখনকার জীবনটা ছিল কচিপাতার মত সবুজ আর মনটা ছিল বর্ষার জলের মত বেগবতী। দু-দিকের ধুলো-বালি ভাসিয়ে নিয়ে যেত সে স্রোতে। কিন্তু আজ তা নেই। পানা আর পলিমাটিতে বুজে এসেছে নদীটা। যেটুকু স্রোত আজও বয়ে চলেছে ঝির ঝিরিয়ে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে যে কোনও মুহূর্তে।

— : বেশ লাগে আপনার কথাগুলো শুনতে, মনে হয় নোট করে নেই।

: উঁহু। আজকের দিনটা ঐ লেখা-জোখার বাইরে।'

: কিন্তু দরকারী চিঠিপত্রগুলো।

— : ও সবও আজ আর লেখার দরকার নেই। ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে কেবল গল্প শুনতে। গল্প বল। যে গল্প বলতে সময়ের হিসেব করতে হবে না; তুমি বলে যাবে, আর শুনবো আমি।

— : কিন্তু এমন কোন গল্প তো আমার জানা নেই।—

: বাজে কথা। ও কথায় আমার বিশ্বাস নেই। অন্ততঃ তোমার জীবনের এই কয়টা বছর—তা সে কুড়িই হোক আর পঁচিশই হোক, এই বছরগুলোর একটা দিন, একটা রাতও কি তোমার মনে রেখাপাত করেনি ব'লতে চাও?—না, ও-কথা বিশ্বাস করি না আমি, আদৌ নয়।—

রমার মুখ থেকে জবাব আসে না। চুপ ক'রে থাকেন শঙ্করও কিছুক্ষণ—কেবল, সময়ের নিস্তব্ধতাকে মাপ করে চলে—দেওয়াল ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটা।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গে যেন ·

—: রমা।

—: বলুন।

—: গাড়ী বার করতে বল ড্রাইভারকে, আমি বেরুবো।—

—: সে কি?

সচকিত হয়ে ওঠে রমা—

: কি বলছেন রায় বাহাদুর। এই বৌবিল পর্যন্ত না আপনার ওঠা-হাঁটা সব নিষেধ করে-ছিলেন ডাক্তার।

: কিন্তু, বৌবিলের সঙ্গে এ দিনের কোনও সম্পর্ক নেই। আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। বাধা দিও না। আজ যাব আমি খোলা আকাশের নীচে,—সবুজ ঘাস আর খোলা জলের ধার দিয়ে দিয়ে—। যাও, ড্রাইভারকে বল গাড়ী বার করতে। আমার হুকুম।

ছোট্ট 'মরিসটা' ছুটে চলেছে এসপ্লানেড থেকে—গঙ্গার ধার লক্ষ্য করে।

একটার পর একটা আলো পড়ছে পেছনে, স'রে যাচ্ছে পাথরের মূর্তি, আর রেলিং ঘেরা বাগান। দু'পাশের শার্সি খোলা। মাঝে মাঝে মুখের 'পরে এসে আছড়াচ্ছে জলো হাওয়া—আর পথের আলো। ওয়াসার মুঠো মুঠো ঘুরে 'ফ্লাডল্যাম্পের' জল সরাচ্ছে অনবরত।...

শঙ্কর ব'লে চলেছেন—

—: প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেদিন এসেছিলে চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে। ভেবেছিলাম, সেটুকু মঞ্জুর করলেও করতে পারি; আবার না করলেই বা ক্ষতি কি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—ক্ষতিটা সইতে আমাকে হবেই—তা সে যতটুকুই হোক।

—: কি ব'লছেন রায় বাহাদুর।

অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় যেন গলার স্বর কাঁপছে রমার—

: শরীরটা আজ আপনার নিশ্চয়ই ভাল নেই।'

: সে ভাবনা তোমার না করলেও চলবে রমা; কিন্তু চ'লবে না জবাব না দিলে। বল, কেউ কোনদিন তোমার কাছে কিছু চায়নি?—দিতেও আসেনি কিছু?

: ও কথা আজ থাক। আজ আমার এখনি ফিরতে হবে। এখনি,...... এই যে,......সাত টা বাজে...।' হাত ঘড়িটা একবার উল্টে দেখে ও—

: রজন এসে গেছে এতক্ষণ,—হয়তো অপেক্ষা করছে আমার—। কি ব'লবো তাকে, কি কৈফিয়ৎ দেব তার কাছে!'

কাজলের রেখায় মনের উৎকণ্ঠা যেন বাধা মানতে চায়না রমার—। ডাকে—

—: রায় বাহাদুর—

নিষ্পলক দৃষ্টি শংকরের। কানের পাশে এসে ঠেকছে ও'র শ্বাস-প্রশ্বাস; সমস্ত চামড়াটা ঝলসে দিতে চায় যেন তার উষ্ণতা।

কি ব'লতে চেষ্টা করে রমা, কিন্তু বাধা দেন শঙ্কর। শক্ত মুঠোয় টেনে নেন ওর ঠাণ্ডা হাত দুখানা! আর একটা হাতের সমস্ত শক্তি যেন জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে রমার সমস্ত দেহটাকে! দলে, পিষে—আজকের এই বাদল-হাওয়ায় মিশিয়ে দেবার আগ্রহে:

—: কে! কে সেই রজন। কি সম্পর্ক তার তোমার সঙ্গে? বল, স্পষ্ট করে বল,—

—: আর যদি না বলি।

: হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!......

জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন আজ এই উন্মত্ততার নীচে চাপা পড়ে গেছে শঙ্করের; বলে ওঠেন—

(শেষাংশ ২৬৬ পৃষ্ঠায়)

পূর্বাচলের পানে

(১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করে আমার কাছে চারটে পয়সা চাইলো। আমি তাকে পয়সা দিতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় দিবাকর আমায় বাধা দিয়ে বললে—চলুন। জেলের হুন্দোক পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে দিবাকর বললে,—কয়েদীদের কি ওদের পয়সা নিতে আছে। কেউ দেখলে আপনার জেল হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম পয়সা নিয়ে ওরা করে কি? দিবাকর বললে—নেশা করে, খাবার-দাবার আনিয়ে খায়।

বললুম বল কি! জেলের মধ্যে কে ওদের নেশা করবার জিনিষ এনে দেয়।

দিবাকর বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে—হুঁ, হুঁ—পয়সা থাকলে সবই সম্ভব হয়।

দিবাকর বেশ পরিষ্কার বাংলা বলতে পারতো। ধর্মদাসও পরিষ্কার বাংলা বলতো কিন্তু তার কথার মধ্যে একটু টান ও একটু সুর থাকতো যা বাংলা দেশের নয়। একদিন দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করলুম এমন পরিষ্কার বাংলা তুই শিখলি কোথা থেকে? দিবাকর বললে তার বাবাও খুব বাংলা বলতে পারতেন। তিনি তাকে বাংলা লেখা পড়া শিখিয়েছেন। সে আরো বললে সে অনেকগুলি বাংলা উপন্যাস পড়েছে, কিছু কিছু ইংরেজী লেখা-পড়াও সে করেছে তাছাড়া তার মাতৃভাষা-তো আছেই। দিবাকর জানালে এখানকার মিশন স্কুলে সে তিন-চার ক্লাস অবধি পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম আরো পড়িসনি কেন? সে বললে—সে যে স্কুলে পড়তো সেটা আসলে মেয়েদের স্কুল। সেখানে তিন-চার ক্লাসের বেশী ছেলেদের আর পড়তে দেয় না। তার বড়ো ভাই ছেলেদের স্কুলে কিছুদিন পড়েছিল। স্কুলে পড়তে পড়তেই ওইখানেই একটা চাকরী পেয়ে গেল বলে পড়াশুনো আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। দিবাকর আগেই বলেছিল মাসের মধ্যে অনেক দিন তাদের খাবার জোটে না, একবেলা না খাওয়া তো লেগেই আছে। সে সকাল থেকে আমাদের বাড়ীতে এসে কাজে লাগে সেই বেলা বারোটা অবধি। আবার তিনটে-চারটের সময় আসে সন্ধ্যে উৎরে গেলে বাড়ী যায়। লোকটা এতক্ষণ আমাদের বাড়ীতে থাকে এবং প্রায়ই অভুক্ত থাকে এই চিন্তা আমাকে বড়ই পীড়া দিতো। মাঝে মাঝে আমার ঘরটা তাকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে তাকে দুটো চারটে পয়সা দিতুম। কিন্তু তিন-চার দিন পয়সা দেবার পরে সে পয়সা নিতে অস্বীকার করে বললে পয়সা দেবেন না ও-তো আমারই কাজ।

দুপুরবেলা যেদিন তার খাওয়া জুটতো না সেদিন তাকে দেখলেই আমি টের পেয়ে দিবাকরকে বলতুম—আজ রাত্রিবেলা আমাদের এখানে এসে খাবি।

রাত্রিবেলা দিবাকর একটা কাঁসি নিয়ে এসে হাজির হতো, তাতে আমি যতদূর সম্ভব ঠেসে ভাত তরকারী ইত্যাদি দিতুম সে বাড়ী নিয়ে যেতো। কিন্তু এ রকম দু-তিন দিন নিয়ে যাবার পরই সে খাবার নিতে অস্বীকার করে বললে আজ খাবার জুটেছে। আমি তাকে জেরা [illegible] বলতো সে [illegible] থাকতো মাইরি বলছি [illegible]।

দিবাকরকে এইভাবে সাহায্য করা অর্থাৎ সাহায্য করতে চেষ্টা করা পূর্বে কিংবা ধর্মদাস কারো মনঃপূত ছিল না। একদিন ধর্মদাস আমাকে গোপনে ডেকে স্পষ্টই জানালে যে, দিবাকরকে বেশী প্রশ্রয় দেবেন না। ও লোক ভাল নয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন কি করে ও আমার? ধর্মদাস কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল ভেবে নিয়ে বললে—ও কি জাত জানেন? আমি বললুম কি জাত?

ওরা পান, আপনাদের দেশে হাড়ি, মুচি আছে ওরা সেই জাত।

ধর্মদাসকে জানিয়ে দিলুম আমি জাত মানি না। আমার কাছে পান, মহান্তি সবই এক।

কথাটা শুনে মনে হলো ধর্মদাস মনে মনে আঘাত পেলো।

ধর্মদাসের বিলক্ষণ হাতটান ছিলো। আপিসের খুঁটিনাটি জিনিষ কেনবার জন্য তাকে টাকা দেওয়া হতো এবং সে তা থেকে বেশ কিফায়েত করতো। দু-একবার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সে হাতে-হাতে ধরাও পড়েছে তবুও নির্দোষ ও নির্লোভ দিবাকরের নামে নালিশ করতে তার একটুও বাধল না, এ জন্য ইচ্ছে করেই আমি তাকে আঘাত দিয়েছি। দিবাকরকে বলতুম রাত্রে আমি একলা শুই তুই এসে আমার ঘরে শুবি। দিবাকর রোজ পারতো না তবে প্রায়ই সে রাত্রে এসে আমার কাছে থাকতো। এই সব দিনে রাত্রের খাওয়াটা তাকে আমাদের এখানেই খেতে হতো। সেজন্য তার আপত্তির অন্ত থাকতো না। রাত্রি নিশুতি হয়ে গেলে অনেক রাত অবধি আমরা কত রকমের গল্পগুজব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তুম।

একদিন সকালে বাজারে দেখলুম একটা দোকানে চমৎকার থেলো হুঁকো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হুঁকোগুলো যেন আমায় আকর্ষণ করতে লাগলো। হুঁকোর এমন রূপ ইতিপূর্বে আর কখনও চোখে পড়েনি। আমরা সেই সময়েই স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য বিড়ি সিগারেটে বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলুম। হুঁকোও আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না। এর আগে হুঁকোতে অতি শিশুকাল হতেই মাঝে মাঝে টান মেরে দেখেছি কিন্তু নিজস্ব হুঁকো পোষবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয়নি। আমি সেই দোকানে গিয়ে হুঁকোর দর জিজ্ঞাসা করলুম। দিবাকর সঙ্গে ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে হুঁকো কি হবে।

বললুম সিগারেটে বড় পয়সা খরচ হয়, এবার থেকে আমি তামাক খাবো। জিজ্ঞাসা করলুম তুই তামাক খাস?

দিবাকর হেসে বললে—পেলেই খাই।

সেই দোকান থেকে আমার জন্য একটা ও দিবাকরের জন্য একটা হুঁকো কিনলুম। মনে পড়ে পাছে মুখে জল ওঠে সেই জন্য দুটো ছোট ছোট পেট মোটা নলও কেনা হলো। বলা বাহুল্য তামাকের টিকে ও কল্কে কেনা হলো। দিবাকর বললে এ বাজারে ভাল তামাক পাওয়া যায় না। এবার যেদিন জেলখানায় তেল আনতে যাব সেদিন মতিগঞ্জের বাজার থেকে ভাল তামাক কিনে আনা যাবে।

বাজার থেকে বাড়ী ফেরবার পথে এক জায়গায় দেখলুম ছোট-খাটো একটি ভীড় জমেছে ও একজন লোক বেশ উচ্চস্বরে তাদের কি বোঝাচ্ছে। দিবাকর সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম।

বাড়ীর থেকে একটু দূরে এক ক্রীশ্চান-পাড়া ছিল। দেখলুম একদল [illegible]গোছের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। খানিকক্ষণ পরে দিবাকর ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম কি হয়েছে, লোকগুলো কি বলাবলি করছে। দিবাকর বললে ও ভোটের ব্যাপার। দিবাকর যা বললে তার মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এখানকার একজন ধনী গভর্ণমেন্টের খেতাবধারী রাজা তিনি। বরাবর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে আসছিলেন। কেউ কখনও মনে করতে পারেনি যে তাঁকে কেউ হারাতে পারবে। কাল রাত্রে হারুবাবু তাকে হারিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন। শুনলুম হারুবাবুও একজন মস্ত ধনী এবং খুব ভালো লোক। রাজা সাহেব হেরে যাওয়াতে লোকে খুবই খুসী হয়েছে। কথাবার্তা হতে-হতে জিজ্ঞাসা করলুম—হারুবাবুর বাড়ী কোথায়?

দিবাকর বললে সেই চাঁদবালি একেবারে সমুদ্রের কাছে। আমি যখন এখানে আসি তখন একবার যেন শুনেছিলুম সে বালেশ্বর সমুদ্রের ধারে অবস্থিত, কিন্তু সেকথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি, স্থির করলুম কালই সমুদ্র দেখতে যেতে হবে। দিবাকরের কাছ থেকে পথ-ঘাট সব ভালো করে জেনে নেওয়া গেল। সন্ধ্যেবেলা দাদাকে বললুম—কাল সকালে বাইসাইকেলটা নিয়ে সমুদ্র দেখতে যাব।

দাদা বললে—যা কিন্তু জলে নামিসনে।

পরদিন সকালে কোন রকমে বাজার সেরে বাইসাইকেল চড়ে বেরিয়ে পড়লুম সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। দিবাকরের নির্দেশ মতো প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে এসে পড়লুম একটা সরু খালের ধারে। খালের সরু সাঁকো পেরিয়ে লাল পথ সিধে চলে গিয়েছে দূরে একটা আলোকস্তম্ভের দিকে। আমার মনে হলো ঐখানে পৌঁছুতে পারলে সমুদ্র দেখতে পাব। জোরে পা চালিয়েছিলুম। কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম রাস্তার দুই পাশে ছোট বড় নানা আকৃতির বালিয়াড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো দেখেই আমি চিনতে পারলুম। কারণ বালিয়াড়ির বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে বঙ্কিমবাবুর বইয়ে পড়েছিলুম। আরো কিছুদূর চলার পরে একটা কিসের আওয়াজ শুনতে পেলুম। একটা অখণ্ড শাঁ শাঁ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। পথ ছেড়ে দিয়ে বালুভূমিতে নেমে পড়লুম। সামনেই দৈত্যের মতো ছোট বড় সব বালিয়াড়ি পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে জুতো বালিতে ভর্তি হয়ে গেল। বালিতে পা বসে যেতে লাগলো। কিন্তু সেই অকূলের আহ্বানে আকর্ষণে আমি সামনের দিকে এগিয়ে চললুম। মাঝে মাঝে সাইকেল ঠেলে দৌড় দিই। কিন্তু কার সাধ্য সেখানে দৌড়য়। বালিতে পা ডুবে যায়, আস্তে চলাই দুষ্কর। তারপরে একটা বড় বালিয়াড়ির পাশ কাটাতেই সামনে পড়ল সমুদ্র। অপার সমুদ্র।

প্রথম দৃষ্টিতে সমুদ্রকে দেখে আমার অন্তরে জেগেছিল বিস্ময়! যাকে বলে পরম
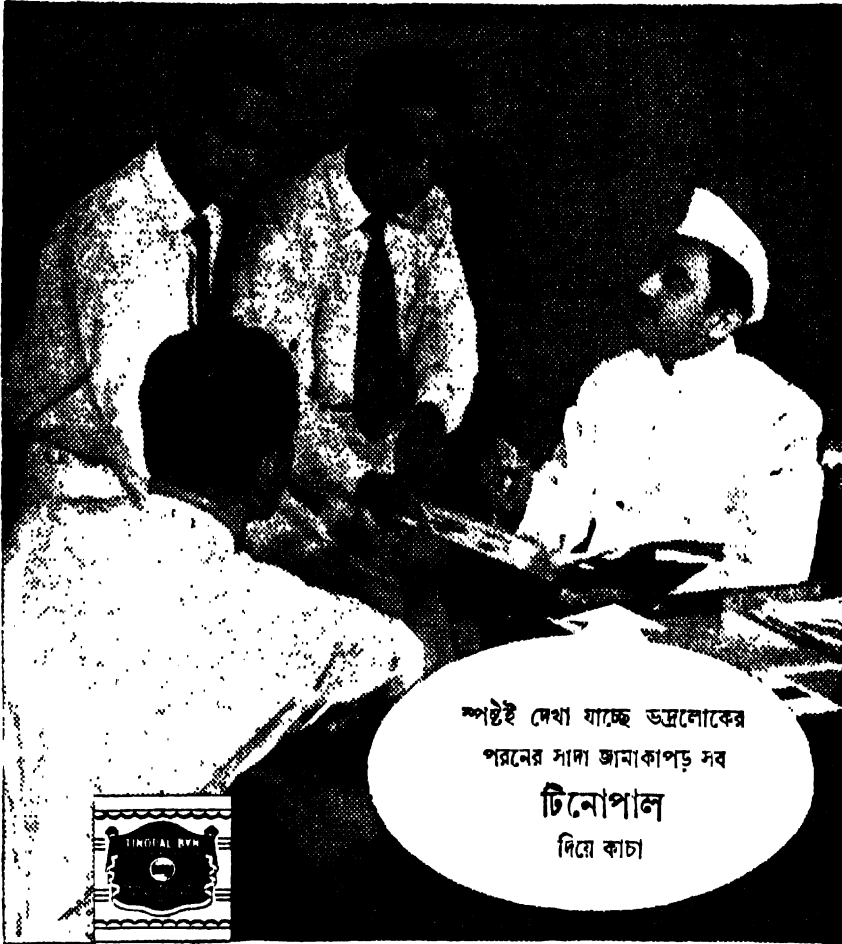
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের
পরনের সাদা জামাকাপড় সব
টিনোপাল
দিয়ে কাচা
TINOPAL BVH
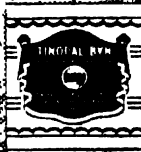
বিস্ময়। স্বতঃই মনে হলো 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ নেই। ছোট ছোট ঢেউ একটার পর একটা এসে অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে, তারপর সেগুলি সেই জল ফেনামিশ্রিত সহস্র জিহ্বায় কিছু দূর দৌড়ে এসে বালিতে মিশে যাচ্ছে। নীল জলধি, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় আর কিছু নেই। দেখতে দেখতে আমার মন কিরকম ভাবনা-শূন্য হয়ে গেল। সামনেই চোখ দেখছে অনন্ত, সীমাহীন নীল জলধি, কান শুনছে শুনোত্তর অশ্রান্ত ঝঙ্কার, মাথার উপরকার ঐ নীল রহস্য গিয়ে মিশেছে নীল পারাবারে দিগন্ত রেখায় নীলে নীলে একাকার হয়ে গেছে। এভারেষ্টের মাথায় চড়ে বোধ হয় তেনজিং-এর এই রকম হয়েছিল। বিরাট ও মহান কিছুর সম্মুখীন হলে সকলেরই বোধহয় এই রকম হয়।

এই রকম অবস্থায় কতক্ষণ কেটে গেছে তা বুঝতেই পারিনি। সম্বিত ফিরে আসতে দেখলুম আমি বালিতে বসে আছি—সাইকেলটা কখন পড়ে গিয়েছে।

বুঝতে পারলুম বেলা হয়েছে, আর দেরী নয়। সাইকেল নিয়ে আবার বালি ঠেলে হেঁটে এসে রাস্তায় পড়লুম। বাড়ীতে এসে দেখলুম দাদা কিংবা পুর্ণ কেউ খায়নি। আমার জন্যে সকলেই চিন্তামগ্ন। দাদার কাছে কিছু বকুনিও শুনতে হলো। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নতুন হুঁকো-কলকেতে এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়া গেল।

জেলখানায় দেখে দেখে আমারও সবজীর বাগান করবার ইচ্ছে হলো। দিবাকরকে বলতে সেও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সেই দিনই কটকের এক ব্যবসায়ীকে ভাল বীজের অর্ডার দিলুম। তারপরে বাগানের অনেকখানি জায়গা ঠিক করে আমরা দুজনে কোদাল দিয়ে পাট করতে শুরু করে দিলুম। খাওয়া, দুবেলা বাজার করা ও তামাক টানা ছাড়া আমার কোন কাজই ছিল না। তাই এই নতুন কাজে খুব উৎসাহ লেগে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বীজ এসে পৌঁছল, আমাদের বরাতক্রমে দিন দুয়েক ছোট খাটো একটু বৃষ্টিও হয়ে গেল। বীজ লাগান হলো লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, ঝিঙে, শশা, চিচিংগে ইত্যাদি। সব আলাদা আলাদা ক্ষেত করে দেওয়া হলো। নতুন জমি আর সামান্য কিছু সারও দেওয়া হয়েছিল। দেখতে দেখতে মাটি ফুঁড়ে গাছ বেড়িয়ে পড়ল। আমিও সকাল, দুপুর, বিকেল সব সময়েই গাছগুলির পাশে ঘুরে বেড়াতুম। প্রতি দিনই নতুন পাতা বেরুচ্ছে। তারই সঙ্গে আমার মনে উৎসাহ ও আশা গজিয়ে উঠছে। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে প্রত্যেক ক্ষেতে উঁচু মাচা করে এনে দেওয়া হলো। কুমড়ো, লাউ গাছ তরতর করে বাড়তে লাগল। কিন্তু অন্য গাছগুলি আমার মনের সংগে তাল রেখে বাড়ছিল না বলে মনটা খুঁত খুঁত করছিল।

ইতিমধ্যে আরেক রকম উত্তেজনা এসে জুটলো। একদিন সকালে ক্ষেত পরিদর্শন করছি এমন সময় গুটি কয়েক ছেলে বাগানে এসে আমাকে নমস্কার করলো।

কি ব্যাপার! তারা যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা ব্যায়াম করে এমন কুস্তির একটা আখড়া করতে চায়। তারা এই জন্য জমি পাচ্ছে না।

দেখলুম ছেলেরা খুবই উৎসাহিত। ওরা দাদার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজেরা আখড়া খুলে ফেললে। তারপরে একদিন জয় মহাবীর বলে মহোৎসাহে কুস্তি করতে লেগে গেলো। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা ভীম পান্ডা নামে ভীমকায় ব্যক্তিকে কুস্তি শেখাবার জন্য ধরে নিয়ে এলো। লোকটার দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তার নামেরই সামিল। দিবাকর বললে, সে নাকি মস্ত পালোয়ান। বড় বড় পালোয়ানকে সে ঘায়েল করেছে। লোকটার এই দেশেই বাড়ী, তবে অনেক দিন কোন এক রাজা তাকে পালোয়ান হিসেবে রেখেছিল। সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। ভীম পান্ডা নাকি অসম্ভব রকমের খায়, তার খাদ্যের একটা ফিরিস্তিও দিবাকর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে ফেললে। যাই হোক, সেই ছেলেদের উৎসাহ দেখে আমারও উৎসাহ লেগে গেল। নিজে ব্যায়াম না করলেও রোজ ভোরবেলা উঠে তাদের কুস্তি দেখতুম। একদিন কুস্তি হচ্ছে এমন সময় দেখলুম একজন কাবুলিওয়ালা এসে পথের ধারে দাঁড়াল। আখড়াটা পথের ধারেই ছিল, সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কুস্তি দেখতে লাগল। পরের দিনও সেই কাবুলিওয়ালা সেইখানে এসে দাঁড়াতেই আমি লোকটাকে ভিতরে ডাকলুম। ডাকা মাত্রই সে বাগানের দরজা খুলে আখড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি।

সে বললে রহমান।

বললুম, তুমি ব্যায়াম করো?

সে বললো হ্যাঁ। ব্যায়াম না করলে এই লাঠি চালাব কি করে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা চলে গেল। কাবুলিওয়ালা দেখে ছেলেদের মুখ একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমাদের ভীমের মুখও শুকিয়ে একেবারে আমসি। সে চলে যেতে সবাই বলতে লাগল ওরা সাংঘাতিক লোক। কাঁচা মাংস খায়। ওদের গায়ে ভয়ানক জোর। ওদের অত্যাচারে দেশশুদ্ধ স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলে থরহরি কম্পমান। খুব চড়া সুদে, টাকায় দু' চার আনা, এমনকি সুবিধা পেলে আট আনা পর্যন্ত সুদ আদায় করে। ওরা মামলার জন্য আদালতে যায় না, স্রেফ লাঠির জোরে সুদ ও আসল আদায় করে। লোকে বিপদে পড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা নেয়, কিন্তু শেষকালে প্রাণের দায়ে গরু, ছাগল, লাঙল এমন কি জমি বেচে টাকা শোধ করে।

আমি বললুম, ওদের যতখানি ভীষণ মনে করা যায়, ওরা ততখানি ভীষণ নয়। ওরা ভীতু লোকের ওপরই বেশী জুলুম করে। কলকাতার রাস্তাঘাটে পালে পালে কাবুলি দেখতে পাওয়া যায়। আগে ওরা খুবই অত্যাচার করত বটে, কিন্তু আজকাল বেশী চালাকি করতে গেলেই লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে ওদের ধরে খুব প্রহার দেয়।

একটি ছেলে বললে তাদের পাড়ায় এক-জনের সেদিন মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পুলিশেও ওদের কিছু বলে না। তাদের বললুম পাড়ার লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে তাকে ঠ্যাঙানি দিলেন না। ওদের দেখতে যে রকম, গায়ে কিন্তু সে রকম জোর নেই। আমরা অনেক কাবুলিওয়ালা ধরে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি এবং অনেককেই হারিয়ে দিয়েছি। কথাটা বোধ হয় তাদের বিশ্বাস হলো না, অনেকেই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগল।

কিন্তু কাবুলিওয়ালা প্রায় রোজই আসতে লাগলো। এই পাড়ায় বোধ হয় তার কোন যজমান ছিলো, তাকে ধরবার জন্যে তার এই আসা-যাওয়া। কারণ বিনা প্রয়োজনে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না।

একদিন রহমানকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কুস্তি লড়বে?

রহমান বললে—হ্যাঁ লড়বো, কিন্তু কার সংগে লড়বো?

আমি ভীম পান্ডাকে দেখিয়ে বললুম—কেন এর সংগে।

ভীম সে সময় সবে মেহনত সেরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। একেই তো তার ছিল বিরাট শরীর, তার ওপর সদ্য ডন বৈঠক মারা চেহারাটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। রহমান তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে—কিঃ! এর সংগে! বেশ লড়বো, কিন্তু কিছু বাজি রাখতে হবে।

তার কথা শুনে বললুম—বেশ কত টাকা বাজি বলো?

রহমান তার কুলোপানা হাতখানা প্রসারিত করে বললে—পাঁচ টাকা।

বললুম—কুছ পরোয়া নেই, পাঁচ টাকাই বাজি রইল।

টাকার গন্ধ পেয়ে রহমান মহা উৎসাহিত হয়ে লাঠি মাটিতে রেখে মাথায় কুল্লা পাগড়ি খুলে ভেলবেটের ওয়েস্ট কোট খুলতে লাগল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললুম—আরে না-না, এখুনি লড়তে হবে না। প্রথমে একজন শালিশ জোগার করতে হবে, তার কাছে জমা রাখতে হবে তোমার ও আমার টাকা। তারপরে আরো অনেক ব্যাপার আছে; এখুনি কি কুস্তি হয়! তুমি বরঞ্চ পরশু দিন এস, আমরা কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলবো।

আমার কথা শুনে রহমানের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে কুল্লা মাথায় তুলে নিয়ে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে, তবে কবে হবে?

বললুম, পরশু এসো, তখন সকলে মিলে কথাবার্তা বলা যাবে।

রহমান তো চলে গেল। এদিকে আমাদের বহুৎ দঙ্গল-মারা কালির ভীমের অবস্থা শোচনীয়।

জীবনে কোনদিন কাবুলিওয়ালার সঙ্গে দঙ্গল লড়তে হবে জানলে সে হয়তো ব্যায়াম করতই না। দেখলুম তার মুখ শুকিয়ে গেছে, গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে না। তবুও সাঁই সাঁই করে বললে—ওরে বাবা, ওর সংগে আমি লড়বো না। কোথায় কোন্ ফাঁকে বুকে পেটে গোঁজা মেরে দিয়ে আমার দফা ঠান্ডা করে দেবে।

আমি তাকে খুবই উৎসাহ দিতে লাগলুম। ওকে তুমি এক মিনিটে চিৎ করে ফেলতে পারবে। তারপরে দিবাকর বিশুদ্ধ উড়িয়া ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তাকে কি সব বোঝাচ্ছে যার ফলে সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। শেষকালে সে আসল কথাটা বললে। কিন্তু আমি টাকা দিতে পারবো না।

—কুছ পরোয়া নেই, টাকা না হয় আমিই দেব।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাজার করতে গিয়ে দেখলুম কুস্তির খবরটা বেশ রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। দু' একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কবে কুস্তি হচ্ছে। কুস্তি সম্বন্ধে দিবাকরকেও জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

আমাদের একটি ছেলে আসত তার বাবা ওখানকার নামজাদা উকিল। তিনি আমাদের এই দঙ্গলের মধ্যস্থতা করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে ছেলেটিকে বললুম। বিকেল নাগাদ সে এসে জানালে আজ সন্ধ্যে বেলা বাবা আপনাকে ডেকেছেন এ সম্বন্ধে কথা হবে।

সন্ধ্যের সময় উকিল বাবুর সঙ্গে দেখা করে সব বৃত্তান্ত বলে তাঁকে মধ্যস্থের কাজ করতে বললুম। সব শুনে তিনি বললেন, এদিককার তো সব হোল কিন্তু তোমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ।

সর্বনাশ! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আবার কি জিজ্ঞাসা করব! উকিলবাবু বললেন,—হ্যাঁ, আগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মতি নিয়ে এসো।

তখন ওখানে একজন বাঙালী ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং খুবই কড়া লোক বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। উকিলবাবুর কথা শুনে আমার সমস্ত উৎসাহ ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল। বললুম—দেখুন আপনি দয়া করে যদি তাঁর সম্মতি এনে দেন। কাবুলি-ওলাদের ভয়ে শহরের ছোট বড় সকলেই সন্ত্রস্ত। ও যদি হেরে যায় এবং নিশ্চয় হারবে, তাহলে সকলের মনে জোর আসবে যে তাদেরও হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

আমার কথা শুনে উকিলবাবু দস্তুর মতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—ঠিক বলেছ তুমি খুব ভালো কথা বলেছ। কাল আমায় বিশেষ একটা কাজের জন্য সাহেবের খাস কামরায় যেতে হবে। এই কথা বলেই তাঁর কাছ থেকে আমি সম্মতি আদায় করে নিয়ে আসব।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্মতি দিয়েছেন তবে তিনি বলে দিয়েছেন সহরের মধ্যে যেন এ সব হাঙ্গামা না করা হয়। শহরের বাইরে সেই বড়োবালুনের ধারে আপনারা এই কুস্তির দঙ্গল করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন শহরের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন ঢেঁড়া পিটানো কিম্বা কোন রকম শোভাযাত্রা করা চলবে না। এ সম্বন্ধে আমি তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি।

অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি মধ্যস্থতার কাজ করতে রাজী হলেন।

পরের দিন সকাল বেলা রহমান ঠিক এসে হাজির, সে সঙ্গে আরো দুজন কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে এসেছিল। তখুনি আমরা সবাই উকিল-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দুপক্ষ থেকে পাঁচটাকা পাঁচটাকা তাঁর কাছে জমা রাখা হলো, স্থির হলো তিনবার কুস্তি হবে তার মধ্যে দুবার যে জিতবে সেই বাজীর টাকা পাবে। ভীম পাণ্ডা ও রহমান দুজনেই কাগজে সই করলে। পনেরো দিন পরে এক রবিবার বেলা তিনটের সময় কুস্তি হবে। কুস্তির জায়গা অর্থাৎ আখড়া দুই তরফেরই পছন্দ হওয়া চাই, নদীর ধারে মাটি পাওয়া যাবে না অতএব আলগা বালির উপরেই দঙ্গল লড়া হবে। পরদিন বিকেল বেলা রহমান ও তার একজন সঙ্গীকে নিয়ে আমরা বড়োবালুনের ধারে গিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা জায়গা ঠিক করলুম। মার্টিন সাহেবের দরওয়ানের পালও আমাদের সঙ্গে এসেছিল। দঙ্গলের কথা শুনে তারাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। মাতাব সিং আমায় বললে—আপনাকে কিছু করতে হবে না আমরা কুলি দিয়ে আখড়া খুঁড়িয়ে রাখব।

নির্দিষ্ট দিনে আমি আর দিবাকর নদীর ধারে গিয়ে হাজির হলুম। দেখলুম সেখানে বেশ বড় রকমের একটি ভীড় জমেছে। বংশী-বাবু অর্থাৎ উকিলমশায়ও এসে হাজির হয়েছেন। আমাদের আখড়ার ছেলেরা ও রহমান তখন আসেনি কিন্তু দলে দলে আরো লোক আসতে লাগল। বেশী লোক দেখে বংশীবাবু বলতে লাগলেন এত ভীড় হওয়া ভালো হচ্ছে না। শেষকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আমাকে ধমক খেতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আখড়ার সবাই ভীম পাঁড়ে ও মাতাব সিং এর দল এসে উপস্থিত হলো। দেখলুম ভীমের প্রশস্ত কপালে দুই ভুরুর মাঝখান থেকে একেবারে মাথার চুল অবধি একটি বিরাট সিঁদুরের গদাচিহ্ন আঁকা। কিন্তু রহমান তখনও আসেনি দেখে আমার সন্দেহ হতে লাগল সে হয় তো এলো না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান আরও তিন চারটে কাবুলিওয়ালা এসে হাজির হলো, দেখলুম তাদের সঙ্গে একটি বালকও।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বংশীবাবু বললেন এবার তোমরা তৈরী হও। দুজনেই তৈরী ছিল। তারা ল্যাঙট পরে আখড়ায় নেমে পড়ল। রহমনের শরীর অত্যান্ত শীর্ণ কিন্তু বেশ দৃঢ় বলে মনে হলো। কিন্তু ভীমের সামনে তাকে একটা কাঠির মত দেখাতে লাগল। তবে কাঠির মত শরীর হলে কি হবে! সে আখড়ায় নেমে মারলে দু' তিন লাফ তারপরে দুই হাতে ভর দিয়ে পা দুটো উপরে তুলে খানিকক্ষণ সেই অবস্থায় চলে বেড়াল তারপরে ইয়া আলী ইয়া আলী বলে কয়েকটা বৈঠক মেরে মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো চোখের সামনে এনে ফেললে। তখন তাকে দেখে একটা দৈত্যের মত মনে হতে লাগলো। দেখলুম ভীম পাণ্ডার মুখখানি চুপসে গেছে। বংশীবাবু চেঁচিয়ে বললেন এবারে তোমরা কুস্তি শুরু করো।

কুস্তি শুরু হলো। দুজনে দুকোণ থেকে এসে পরস্পরের হাত ধরা মাত্র রহমান ইয়া আলী বলে এক ঝটকায় তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাণ্ডাজীর গন্দাম করে ভূমিতে পতন—পড়ে যেন শিরীর ফুলের আঘাতে। ভীম চিৎ হয়ে পড়েই রইল। রহমান বেশ ধীরে সুস্থে ঘোড়ায় চড়ার মত তার বুকের উপর এসে চড়ে বসল। ওদিকে ভীম পড়া মাত্রই উল্লাস ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাবুলি-ওলারা যারা এসেছিল তারা ঢোলক বাজাতে লাগলো।

—এবার টাকা দাও।

বংশীবাবু বললেন—এখনি টাকা কি আরো দুবার লড়াই হোক যা কথা হয়েছে তা পূরো করতে হবে।

রহমান ও তার দলের লোকেরা আপত্তি করতে লাগল। কিন্তু তাদের আপত্তি চললো না। ওদিকে ভীমরা আর লড়তে রাজী নয়। আমি দেখলুম তখনও সে কাঁপছে—বললুম তুমি কি? কুস্তি হলো না কিছু না আগেই পড়ে গেলে?

সবাই মিলে উৎসাহ দেওয়ায় ভীম আবার দাঁড়িয়ে গেল। এবার সে এক মুহূর্তে এক ঝটকান দিয়ে রহমানকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলো। তৃতীয় বার বোধ হয় মিনিট খানেকের মধ্যেই ভীম তাকে চিৎ করে ফেললে।

দুবার কুস্তি জেতার পর ভীম বাজী জিতে গেল। দর্শকবৃন্দ খুশী হয়ে উল্লাসে চিৎকার করতে করতে ভীমকে কাঁধে তুলে নাচতে আরম্ভ করলে। রহমানের দল নীরবে চলে গেল। এর পরে অন্ততঃ আমি যতদিন ছিলুম ওদিকটায় কাবুলিওয়ালাদের অত্যাচার হয়নি।

ইতিমধ্যে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলো। আগেই বলেছি আমাদের পূণ্ মহারাজ আহিফেন সেবন করতেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তেন। ক্রমে তার এই নিঃশ্বাস ছাড়া অভ্যাসটি ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ালো সে শুধু সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাত পা-ও ছেড়ে দিলে। ব্যাপার দেখে ডাক্তার ডাকা হলো। নেশাখোর লোক সরল হয়ে থাকে, পূর্ণ অকপটে ডাক্তারের কাছে স্বীকার করলে যে, সে দৈনিক প্রায় এক ভরি আফিং খায় নিত্য দুবেলা—গাঁজা টানে এবং সপ্তাহে দু'তিন দিন অর্থাৎ সুবিধা হলেই গুলি খেয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাক্তারকে আশ্বাস দিলে গুলিতে সে অভ্যাস্ত নয়। ডাক্তার তো তার নেশার ফিরিস্তি শুনে স্তম্ভিত।

ইদানিং তার রান্না এত সুস্বাদু হয়ে উঠেছিল তার কারণ জানতে পেরে আমরাও স্তম্ভিত। একদিন সে ডালেতে নুনের বদলে সোডা দিয়ে ফেলেছিল।

যাইহোক, সমস্ত পরীক্ষা করে আমাদের আড়ালে ডেকে বললেন—অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় একে অবিলম্বে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।

সকালবেলা ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, সেই-দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতায় চলে গেল।

পূর্ণ চলে যেতে আমাদের দুজনকার সংসার বানচাল হয়ে যাবার অবস্থা। রাঁধবার লোক যতদিন যোগাড় না হয় ততদিন কি হবে! আমি দাদাকে বললুম—কিছু ভয় নেই দাদা, যতদিন না লোক পাওয়া যাচ্ছে ততদিন আমিই রাঁধব, এখন তুমি খেতে পারলে হয়।

দাদা বললেন—তুই যা রাঁধবি তাতেই চলবে।

সেইদিন থেকে আমি রান্নাঘরের ভার নিলুম। খুব ছোটবেলায় আমি ও আমার ছোট ভাইবোনেরা মিলে চড়ুইভাতি করতুম। খিচুড়ি বেগুন ভাজা ও আলুভাজা তৈরি হতো এবং সে খাদ্য খুবই ভাল লাগতো। এই অভি-জ্ঞতার উপর ভরসা করেই রাঁধবার ভার নিলুম। কথা হলো দিবাকর মশলা বাটবে ও আমাকে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবে যে জন্য দাদা তাকে একটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। আরো কথা হলো যে সে রাত্রিবেলা আমাদের এখানেই খাবে এবং থাকবে।

মহোৎসাহে রান্নার কাজে লেগে গেলুম। ডাল, ভাত, বাগানের লাউ কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁচা পেঁপে ইত্যাদি তুলো তুলো করে কেটে

হতে ভাবলো। প্রথমটা তা অখাদ্য বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু দিবাকর বাৎলে দিলে ওতে একটু ঘি ঢেলে দিন। ঘি দেওয়ার পর সে জিনিষটা কোন রকমে খাওয়ার মতো হয়ে উঠলো। এর ওপর হতো মাছের ঝোল। রাত্রিতে ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, আর হতো মাছের ঝাল। মাছের ঝোল কিছুতেই ঘন হতো না বলে ভারী আপশোষ হতো। আমাদের রান্নাঘরটা ছিল খুব বড় আর উঁচু। উনুনের উপরে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলতো, আর বাইরের দাওয়ায় লন্ঠনটা কম করে রেখে দেওয়া হতো। দাদা বাড়ী থাকতেন না, অতো বড় বাড়ী নিস্তব্ধ নিঝুম চার পাশে প্রকাণ্ড বাগান ঝম ঝম করছে, উনুনের ওপর মাছের ঝোল চড়ানো, আমাদের দুজনের হাতে দুই হুঁকো ভড়াক ভড়াক হুঁকে। গুড়ুক গুড়ুক ফুঁকছি আর মাছের ঝোল ঘন হচ্ছে কিনা তাই দেখছি। ছিলিম পর ছিলিম পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু ঝোল আর হয় না শেষকালে ঝোল মরে যেত কড়া চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজ ছাড়তো তবুও ঝোল ঘন হতো না। অতি কষ্টে মনে কড়া নাবিয়ে ফেলতুম। সেই সব কথা মনের মধ্যে ঝক ঝক করে ফুটে উঠছে, আর ভাবছি এই সব স্মৃতি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল।

একদিন দিবাকর বললে তার বাবা তাকে একখানা বাংলা উপন্যাস দিয়েছিলেন সে আজও সেখানাকে সযত্নে রেখে দিয়েছে। উপন্যাসটার নাম সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না। বললুম সেখানা একদিন নিয়ে আসিস তো।

পরের দিন সে জীর্ণ কাগজে মোড়া একখানা বই এনে আমার হাতে দিলে। কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে উপন্যাসটার নাম দেখলুম মাধবী কঙ্কণ। তার নরেন্দ্র আর হেমলতা সেই থেকে আমার জীবনবন্ধু হয়ে আছে। কত সন্ধ্যা আমি ও আমার ছোট ভাই নরেনের জীবন কথা আলোচনা করেছি ব্যথায় আমাদের কৈশোর মন টন্ টন্ করে উঠত। কতদিন হেমলতার অশ্রুর সঙ্গে নিজের অশ্রু মিলিয়েছি। অভাগিনী জুলেখার দুঃখে কখন পীড়িত হয়েছি কখনও তার ওপর রাগ হয়েছে। যে জুলেখা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেবার রাজ্যের অন্যতম প্রদেশে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট পল্লীর মধ্যে অবস্থিত সেই এক লিঙ্গের মন্দির সেই মাধবী কঙ্কণ উড়িষ্যার এক নগণ্য সহরে নগণ্য পল্লীতে এক হাড়ীর ঘরে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে দেখে আমি সেদিন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যিনি মাধবী-কঙ্কণ লিখেছেন তিনি একথা জানতে পারলে কি মনে করবেন। বইখানার অবস্থা দেখলুম খুবই খারাপ। কোন কোন জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে কোন কোন জায়গায় ছাপার অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিবাকর বললে—তার বাবা যখন তাকে বইখানা দিয়েছিলেন তখনই তার ঐ অবস্থা।

দিবাকর বইখানা আমাকে আর ঘাটতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা কাগজে মুড়ে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

আমি আর দিবাকর রাত্রে একই ঘরে শুতুম। আমি থাকতুম তক্তাপোষে আর সে থাকতো মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে। ঘরের এক কোণে লন্ঠনটা কমিয়ে দেওয়া থাকতো। অনেক রাত্রি অবধি আমাদের মধ্যে গল্প চলতো। রাজনীতি, সমাজ, খেলা, রান্না বাগান করা নানা বিষয় নিয়ে। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম হ্যারে দিবাকর কখনও প্রেমে পড়েছিস?

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল তা পড়েছিলুম আজ্ঞে।

তার কথা শুনে তড়াক করে আমি বিছানায় উঠে বসে বললুম বলিস কিরে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একবার।

তক্তাপোষ থেকে নেমে বললুম,—দিবাকর তুই ব্যাটা জিনিয়াস্। ওঠ, তোর প্রেমের কাহিনী শোনা।

দিবাকর উঠে বসলো। আমি কোণ থেকে লন্ঠনটা তুলে এনে তার পলতে বাড়িয়ে আমাদের মাঝখানে রাখলুম। বললুম, আগে দু ছিলিম তামাক সাজ।

তামাক টানতে টানতে দিবাকরের প্রেমের কাহিনী শুনতে লাগলুম।

সে একটি মেয়ের নাম তার সুবর্ণ। তারা একসঙ্গে মিশন ইস্কুলে পড়তো। দিবাকর বলতে লাগলো ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খুব ভাব জমে উঠলো কিন্তু কেউ জানতে পারলে না। সেভেন ক্লাস অবধি পড়ে আমি সেই ইস্কুলেই চাকরী করতে লাগলুম সুবর্ণ উঁচু ক্লাশে পড়তে লাগল। সুবর্ণ উঁচু ক্লাশে উঠে গেল। তারা ছিল ক্রিশ্চান। আমি ঠিক করলুম ক্রিশ্চান হয়ে সুবর্ণকে বিয়ে করব। হঠাৎ কি করে আমাদের ভালবাসার কথা ফাঁস হয়ে গেল। সুবর্ণর বাবা ইস্কুলে গিয়ে বলে দিলে, আমার বাবাকেও জানিয়ে দিলে। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ সব শুনে আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। বাবা আর দাদা দুজনে মিলে আমাকে এমন মার দিলে যে আমি দুদিন উঠতে পারিনি। সুবর্ণর বাবা তাকে নিয়ে চলে গেল আন্দুলে। সেখানেও মিশন ইস্কুল আছে, সুবর্ণ সেখানে থেকে পাস করে সেই ইস্কুলেই চাকরী করতে লাগলো। তার বাবা তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিলেন, কিছুদিনের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গুড়ুকে দু-তিনটে টান মেরে দিবাকর আবার শুরু করলে। প্রায় বিশ বছর পরে সে এখানে আবার ফিরে এসেছে। এতদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হলো, সুবর্ণই আমাকে ডেকে কথা আরম্ভ করলে। সে বললে আর আন্দুলে থাকতে ভাল লাগল না। আমি এ দেশেরই মেয়ে আমার স্বামীও এ দেশের লোক, তাই চেষ্টা চরিত্র করে এখানকার মিশন ইস্কুলে চাকরী বদল করে চলে এসেছি। এখানে মিশনারীদের যে কাঠের কারখানা আছে সেখানে আমার স্বামী মিস্ত্রীর কাজ করে তার এখন চারটি ছেলে-মেয়ে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে পথে দেখা হয়। কখনও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বার্তা হয়, কখনও হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—'হ্যাঁরে সে সব দিনের কথাবার্তা হয় না?

দিবাকর বললে, একদিন জিজ্ঞাসা করে ছিলুম—সুবর্ণ আমাদের সেদিনের কথাগুলো মনে আছে?

আমি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলুম—সে তাতে কি বললে?

দিবাকর বেশ খানিকটা দম নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—সুবর্ণ উত্তর দিলে উড়ে ভাষায় সেদিন সকাল গলানি সখী! অর্থাৎ সখী গো সেদিনকার সকালের সে প্রহর অতীত হয়ে গেছে।

রান্নাঘরের ব্যবস্থার পরিবর্তন আজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। রন্ধন কার্যে আমার কোন ক্লান্তি আসেনি, তবে আমার তৈরী রান্না খেয়ে আমাদের সকলেরই ক্লান্তি এসেছিল। একই আস্বাদন ডাল, ঝোল, ঝাল, তরকারী আর কতদিন খাওয়া যায়! অন্য লোকতো দূরের কথা দিবাকর পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ীতে খেয়ে আসতে লাগলো। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে শেষকালে দাদাই একজন পাচক জোগাড় করে নিয়ে এলেন। তার হাতে রান্নাঘরের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি ছুটি নিলুম।

আরেকটি ঘটনার কথা বলেই এবারের এই পর্ব শেষ করব। তখন শীতকাল, দাদা কি একটা কাজে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছেন। সকালবেলাকার বাজার করা হয়ে গিয়েছে হাতে কোন কাজ নেই। দিবাকর বাগানে কাজ করছে। ঘরে বসে ভাবছি কি করা যায়, হঠাৎ কি খেয়াল হলো উঠে গরম ফ্লানেলের কোট চড়িয়ে টাই কলার বেঁধে মাথায় একটা ধুচনি গোছের বড় সোলার টুপি দিয়ে বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

সহরের বাইরে সেই যে লাল মাটির পথ চলে গিয়েছে মার্টিন সাহেবের বাড়ীর পাশ দিয়ে বাবলা বনের ভিতর দিয়ে রেল-সেতুর তলা দিয়ে এঁকে-বেঁকে বুড়াবালামকে ঘিরে মাঠের মধ্যে দিয়ে সেই পথে চললুম হু-হু করে নিরুদ্দেশ। হু-হু করে চলেছি বাতাসের বেগে অনভ্যাসের টুপি স্থানচ্যুত হবার চেষ্টা করছে। এক হাতে টুপি চাপা আর এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা রয়েছে মুখো বাতাসটা পেরিয়ে কিছু দূর যেতেই সাইকেলের বেগ কমাতে বাধ্য হলুম। দেখি রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড গাছ। রাস্তার আধখানা জুড়ে একটা ডাল বাড়িয়ে দিয়েছে তার তলা দিয়ে মানুষ কোন রকমে হেঁটে যেতে পারে কিন্তু সাইকেল চড়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। রাস্তাটাও সেখানে খুবই সরু, কাজেই যতটুকু ফাঁক আছে সেটুকু দিয়ে পার হতে একটু সাবধান হতে হবে। বাধা অতিক্রম করে আবার ছুটলুম নির্জন পথে, দু-পাশের মাঠ হু-হু করছে ধান কাটা শেষ করে চাষীরা ফসল ঘরে তুলেছে। এ জায়গায় একটা ছোট্ট গ্রামের মতো দেখলুম খালকয়েক খড়ের কুটির, তারই মধ্যে গরু, ছাগল, শিশুরে পাল ঘুরছে। সে সব ফেলে রেখে আমি ছুটেছি। পথের যেমন শেষ নেই আমার ইচ্ছারও বর্তমানে শেষ নেই। বোধহয় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর এসে পড়লুম এক জায়গায়। যেখান দিয়ে রেল চলে গেছে সেইখানে সাইকেল থেকে নেবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরলুম বাড়ী মুখো। ফিরতি মুখে গতি অনেক মন্থর, মাথার ধুচনী আর স্থানচ্যুত হতে চাইছে না কিন্তু অনভ্যাসের পোষাক পরে এই শীতেও দর-দর ধারে ঘামতে লাগলুম। চলতে চলতে এতক্ষণে দূরে দেখতে পেলুম সেই গাছটাকে। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখলুম রাস্তার সেই ফাঁক জায়গাটাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে গাছের দিকে কি দেখছে। আমি ঘণ্টা দিচ্ছি

উপরওয়ালা বিচার করবেন!

ভগবতীশঙ্কর দে

চাঁদ কহে চামেলি গো, চামেলি কহিছে চাঁদেরে......

পাশের ফ্ল্যাটে রেকর্ড বাজে। আর নিজের ঘরে সুপ্রিয়া শোয়া থেকে উঠে বসে। বসে বসে শোনে। তিন মিনিটের গান ফুরিয়ে যায়। কাটে প্রায়। কিন্তু সুপ্রিয়া বসেই আছে।

মন্টেভিলা গার্ডেনের নিকষ কালো রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। সবুজে সবুজে [illegible] গাছ লতিয়ে আছে বারান্দায়। পাহাড়ী লতা জলের পাইপ বেয়ে উঠে গেছে ছাদে। দোতলার একটা ফ্ল্যাটে দুটি সন্তান নিয়ে থাকে গায়িকা সুপ্রিয়া। রেডিও আর গ্রামোফোনে গান গায়, গানের টিউশানি করে, একটা মেয়ে স্কুলের শিক্ষিকা।

অত্যধিক পরিশ্রম করে সুপ্রিয়া। নিরালা অবসরকে ভয় পায়। সুখ পালিয়েছে। শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বিয়ে হয়েছিল ভাল ঘরে, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা পায়নি। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সুপ্রিয়াকে সে বিয়ে করেছিল। মদের অভ্যেস ওর বহু দিনের। বিয়ের পর মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুপ্রিয়ার উপর অত্যাচার করে পশুর মত। দিন দিন সে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলে। উপলক্ষ্য গানের মাস্টার মৌলিনাথ। সুপ্রিয়ার কুমারী জীবনের প্রেমিক। সুপ্রিয়াকে সে ভুলতে পারেনি। অসংখ্য গানে সে তাদের প্রেম কাহিনী বাঁচিয়ে রাখছে। কে না জানে এ খবর—

সকল অপবাদ, সকল অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করবার প্রতিজ্ঞা করে সুপ্রিয়া। অতীতকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে, বর্তমানকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু ভুলতে দেয় না মৌলিনাথ, ভুলতে দেয় না স্বামী। মৌলিনাথের সংগীত আর স্বামীর অত্যাচারে পাগল হয়ে ওঠে সুপ্রিয়া। মৌলিনাথের চাঁদ আর চামেলির গান ওর দুজনের কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছে। মাতিয়ে তুলেছে দেশ। মৌলিনাথের জীবনী বেরিয়েছে কাগজে। স্রষ্টা শিল্পী নিবারুণ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মাতাল স্বামী। মৌলিনাথের কথা তুলে সর্বক্ষণ সুপ্রিয়াকে আঘাত দিয়ে একটা হিংস্র উল্লাসে ফেটে পড়ে।

শেষপর্যন্ত বাবার কাছে লুটিয়ে পড়ে সুপ্রিয়া। আর যে সহ্য হয় না অত্যাচার। ধরিত্রীর মত সহনশীলা হতে হবে। উপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় পিতা।

কিন্তু ধরিত্রীর মত সহনশীলা হতে পারে না সুপ্রিয়া। রক্ত মাংসের মানুষ সে। যেদিন মৌলিনাথের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল, সেদিন বাড়িতে বিরাট এক ভোজের ব্যবস্থা করে স্বামী। মদের গ্লাসে বয় আনন্দের ঝড়। সে রাতেই দুটি সন্তানকে বুকে ধরে সুপ্রিয়া পালায়।

তারপর কেটে গেছে কত বছর। ঝরে গেছে সকল স্বপ্ন। সুপ্রিয়া আর ফিরে যায়নি স্বামী গৃহে, ফিরে যায়নি পিতৃগৃহে। শুধু কাজ আর কাজ। কাজের পাহাড়ে চাপা পড়েছে সুপ্রিয়া। থেমে গেছে আনন্দ রস কল্পনা।

আজ মনে পড়ে প্রথম যৌবনের মধুময় একটি সন্ধ্যারাতের কথা। গান শেখাতে এসেছে মৌলিনাথ। নবীন গায়কের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে গানের কলি, চাঁদ কহে চামেলি গো, চামেলি কহিছে চাঁদেরে...বিস্ময়ে ছুটে অনুযোগ করে, এ গান ত আমাকে দেননি! গুরু তাকায় শিষ্যার দিকে। বলে, তোমাকে অদেয় ত আমার কিছুই নাই সুপ্রিয়া। কিন্তু এখনও যে শেষ হয়নি সুর সংযোজনা আর রচনা। প্রথম যৌবন। মাস্টার মশাইর দৃষ্টিতে দৃষ্টি কাঁপে। কেমন একটা লজ্জা, কেমন একটা দেহের শিরশিরানি জোর করে চোখদুটি বুঁজিয়ে দেয়। চোখ বুজে মাস্টার মশাইর মুখখানা ভাবতে ভাল লাগে। ভাল লাগে মৌমাছি স্বপ্নের জাল বুনতে আর জাল ছিঁড়তে।

গায়ের রঙ কালো, শীর্ণকায় ছোটখাট মানুষটি, বয়সে অনেক ফারাক। তবু তাকে ভাল লাগে। প্রথম যৌবনের ভাল লাগা যুক্তি নাই, বিচার নাই। দেহ মনে নতুন দুনিয়ার ডাক। কল্পনা [illegible]।

মৌলিনাথ তানপুরায় টান দেয়। সুরের ঝঙ্কার তুলে বলে, গত সপ্তাহের গানটা একবার আমার সঙ্গে গাও সু.....।

মুহূর্ত পরে দ্বৈতকণ্ঠের সুর লহরীতে ভরে যায় ঘরের বাতাস। মীড় আর মূর্ছনায় সুরের ওঠা-নামায় যেন স্বপ্ন রাজ্যের হাতছানি।

এ গানের সুরে সুরেই নিজেকে হারিয়েছে সুপ্রিয়া। গান ত নয় যেন সাপুড়ের বাঁশি। ধনীর দুলালী ভুলেছে আভিজাত্য। বান্ধবীরা বলে এ ভালো নয়। কি আছে লোকটার। স্বাস্থ্য-হীন, নিঃস্ব গায়ক। শুধু এক দঙ্গল ছাত্র-ছাত্রীর ভরসা।

চম্পা মুখে কালি পড়ে। দুচোখে জল নামে। চোখ মুছে সরে আসে। তর্ক করে না। কার সাথে তর্ক করবে। ওরা শুধু চিনেছে টাকা। মানুষ চেনবার চোখ নাই কারুর। মাস্টার মশাই যে সুরের সাগর, রত্নের আকর।

সুপ্রিয়া উঠে যায় বাগানে। মরসুমী গাছ-গুলি শুকিয়ে গেছে। এককোণে গাঁদা গাছের বন। কোথা থেকে একটা দোয়েল শিস দিয়ে নেমে আসে। সুপ্রিয়ার কাছ থেকে একটু দূরে নেচে নেচে সে গায় কত গান। সুপ্রিয়া আড়-চোখে তাকিয়ে দেখে। বউ তার গন্ধরাজের ডালে বসে আছে ঘাড় বাঁকিয়ে। কিছুতেই সে নেমে আসে না। গান থামিয়ে দম নেয় দোয়েল। তাকিয়ে দেখে বউকে। তারপর আবার আরম্ভ হয় জীবনপণ গান আর নাচ। যেন পাগল হয়ে গেছে দোয়েল। কয়েকটা পালক খসে যায়। ডানা ঝুলে পড়ে, পরিশ্রমে ছোট্ট বুক বুঝি চৌচির হয়ে যাবে। আর সহ্য করতে পারে না দোয়েলনী। নেমে আসে নীচে। আনন্দে ফেটে পড়ে দোয়েল। গান থামিয়ে দুজনে উড়ে যায় জামের ডালে।

মুখ ফিরিয়ে নেয় সুপ্রিয়া। মানুষের জীবনে কেন এমন সর্পিল জিজ্ঞাসা। এর চেয়ে যে পাখির জীবনও সুন্দর। প্রশ্ন নাই, বাধা নাই। মিলন কত সহজ, সরল।

বান ডেকেছে। কানায় কানায় ভরা দুকূল। ঝুঁকি বাধা আর মানে না। মৌলিনাথ চমকায়। একি রূপান্তর! গানের সুর কেন কাঁপে কেন কথা যায় হারিয়ে? মৌলিনাথ ডুব দেয় ভাবনার

(শেষাংশ ২৮২ পৃষ্ঠায়)

মধুচন্দ্র

(১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিল 'বাঃ বেশ ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস আসিতেছে।' বলিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, "বসি, একটু সরো।"

আমি একটু সরিয়া জায়গা করিয়া দিলাম। তপতী বসিল। কিছুক্ষণ পরে আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল, 'আহা একটু সর না। বাবা! কি একালষেঁড়ে মানুষ!"

আমি একটু সরিতেই তপতী টুপ করিয়া আমার পাশে শুইয়া পড়িল, ডান পাশেই। খাটের দিকটা তপতীর জন্য খালি রাখিয়া দিতে হইল।

ক্রমে ক্রমে, খাটের ডাহিন দিকটায় তপতীর দখল কায়েম হইয়া গেল। আমি বাঁ দিকে সরিয়া আসিলাম।

রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর ছিল তপতীর ডিপার্টমেন্ট। সেখানে নাক গলানো আমার অধিকারের বাহিরে। মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়িত, ষ্টোভে তেল ভরা, বা কয়লা ভাঙিবার জন্য। এসব রান্নাঘরের বাহিরে বসিয়াই করা চলিত।

নিজের ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও তপতীর বাহিরেও অনেক কাজ ছিল, স্কুল, সভা সমাবেশ প্রভৃতি। এসব সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার ছিল না। বলিতে গেলেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে।

আমার কিন্তু, অফিস হইতে ফিরিতে আধ-ঘণ্টা দেরী হইলে, বা বেতন হইতে দু টাকা কম পড়িলে, অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইত। এ কৈফিয়ৎ চাওয়ার মধ্যে, কিন্তু স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নাই। আছে শুধু কর্তব্য বুদ্ধি জাগরিত করিবার চেষ্টা।

সাম্য হইলে আর কর্তব্য করিতে হইবে না, এমন কথা ত নাই।

(৩)

সিভিল ম্যারেজ হইয়াছে।

ফুলশয্যা, বৌভাত, ইত্যাদি কোন উৎসবই হয় নাই। তাই, ইচ্ছা ছিল ইংরেজী কেতায় মধুচন্দ্র যাপন করিবার। এতদিন সুবিধা করিতে পারি নাই। এবার পূজোর ছুটিতে মন্দার হিল বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা, পল্লীর শোভা ও সহরের সুখ-সুবিধা সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়। বন্ধুর একটি বাসা খালি পড়িয়া ছিল। সেখানেই উঠা স্থির করিলাম।

বাসাটী বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছেই। সকালের বাস হইতে নামিয়া, বাসায় ঢুকিয়াই বলিলাম, 'একটু চায়ের জোগাড় কর। আমি ততক্ষণ একটা লোকের সন্ধান করি। ঝাড়ু দেওয়া, জল তোলা, এইসব করিতে হইবে ত।"

আধ ঘণ্টা পরে একটা লোক সঙ্গে করিয়া বাসায় ফিরিয়া দেখি, তপতী চা, চিনি, দুধ, কাপ, সসার ইত্যাদি সাজাইয়া বসিয়া আছে।

আমি আসিতেই কাঁপা গলায় চীৎকার ছাড়িল, 'ষ্টোভ আন নি?'

আমি বলিলাম, 'ষ্টোভ আনা হয়নি না কি?"

'কৈ আনিলাম? আমি জানি তুমি আনিয়াছ।"

"আমি আনিব? ওটা তো তোমার ডিপার্টমেন্ট।"

'বাঃ! আমার ডিপার্টমেন্ট। তেল ভরিত কে?"

"তেল না ভরিয়াই না হয় লইয়া আসিতে। তেল ত এখানেও আধ ঘণ্টায় জোগাড় করা যায়।"

"আচ্ছা, কাঠ আনিয়ে দাও। আধ ঘণ্টায় তোমার চা তৈয়ার করিয়া দিতেছি।"

লোকটিকে কাঠ আনিতে পাঠাইলাম, সে ফিরিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিল।

তপতী অস্থির হইয়া চারিদিকে হাতড়াইতে লাগিল, যদি পাতা কাঠ ইত্যাদি কিছু পাওয়া যায়। পাওয়া গেলও কিছু। উনানে আগুন ধরানো হইল। কিন্তু কাঠের উনানে কেটলি ডুবিয়া যায়। খুন্তি দিয়া উনানের মুখ দুভাগ করিয়া, কোনওরূপে, কাৎ করিয়া কেটলি বসানো হইল। চাও ফুটিতে লাগিল।

চায়ের কাপ সম্মুখে ধরিয়া তপতী বলিল, "এখন হইতে ঠিক হইল, আমার রান্নাঘরের কোন কাজে তুমি থাকিবে না। ষ্টোভ আনা হয়নি, অন্যায় হইয়াছে। আমি এখুনি একটা স্পিরিট ষ্টোভ কিনিয়া তোমার ক্ষোভ মিটাইয়া দিতেছি।"

"স্পিরিট ষ্টোভ এখানে পাওয়া যাইবে না। এবং এদেশে ভদ্র মহিলারা বাজারে বাহির হন না।"

তপতী চুপ করিয়া গেল।

সেদিন বেলা আড়াইটায় আধ-সিদ্ধ খিচুড়ি খাইয়া দুইজনে বিশ্রাম করিতে গেলাম। দুজনের মনে একই চিন্তা,—রাত্রে আহারের কি ব্যবস্থা? এবং দুইজনের কাহারো মুখে কথা নাই।

ময়দা আনা হইয়াছে, কিন্তু চাকী-বেলুন আনা হয় নাই। সুতরাং রাত্রেও খিচুড়ির ব্যবস্থা হইতেছে, মনে হইল।

তপতী একাই সব ব্যবস্থা করিবে। আমার কিছু করিবার নাই। তাই, বাহিরের বারান্দায় বসিয়া, আমি খদ্যোৎখচিত অন্ধকারের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

সহসা একটা বুকফাটা চীৎকারে আতঙ্কিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলাম। মনে হইল চীৎকার আসিতেছে, রান্নাঘরের দিক হইতে। তপ[illegible] কোনও গুণ্ডার হাতে পড়িয়াছে! মাঠের [illegible] খানে বাড়ী! চোর ডাকাতের অভাব কি [illegible] কি তপতীর হাত ও গলা হইতে [illegible] ছিনাইয়া লইতেছে?

দৌড়াইয়া রান্নাঘরের দরজায় [illegible] হাজির হইলাম। দেখিলাম তপতী ঘরে [illegible]স্থলে একাই দাঁড়াইয়া আছে। উনা[illegible] ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে তাহার মুখ চক্ষু সিক্ত ও আরক্ত, গালে ও কপালে ভিজা চুল সাঁটিয়া রহিয়াছে, আঁচল খসিয়া পড়িয়াছে, এবং চক্ষে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি।

আমাকে দেখিয়াই সে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল, "ওটাকে তাড়িয়ে দাও না।"

"কে? কি? কাকে তাড়াতে হবে?"

পা ঠুকিয়া তপতী বলিল, "ভেতরে এসো না। ঐ যে দোরের ওপরে রয়েছে?"

আমি বলিলাম, "আমার ভেতরে যাবার ত হুকুম নেই।"

তপতী যেন ঘরের মধ্যে নাচিতে লাগিল এবং বলিল, "বাবা! বাবা! বাবা! সব সময় ইয়ার্কি! ভাল লাগে না। ওটাকে তাড়িয়ে দাও—।"

ভেতরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলাম "কাকে তাড়াতে হবে?

"ঐ যে দোরের ওপর রয়েছে।"

"কী"

"ঐ যে একটা মাকড়সা।"

আমি মারিতে উদ্যত হইলে তপতী বলিল "মেরো না, মেরো না। ওটাকে তাড়িয়ে দাও।"

মাকড়সা তাড়াইয়া, তপতীর হাত ধরিতেই সে আমার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, [illegible] দমে আগুন ধরিয়াছে।

মধুচন্দ্রের জন্য একটি রাতই যথেষ্ট মনে করিয়া, আমরা কলিকাতার দিকে রওনা হইলাম, পরের দিন সন্ধ্যায়। সেখানে পৌঁছিয়াই তেলভরা ষ্টোভ পাওয়া যাইবে।

ডিপার্টমেণ্টের চারিপাশের পার্টিশনগুলো এখনো খাড়া থাকিবে কি?

সন্ধ্যাবেলার মেঘ

॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ॥

পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত যে কথা
জলে ছায়া পড়ে—ঝিরঝির নীল জল।
পলাশের বনে ফাগুন হয়েছে পতিব্রতা,
জলেতে তোমার রূপ একি টলমল।।
গাছে গাছে রঙ—কৃষ্ণচূড়ার রোমাঞ্চ জীবনের,
কোকিলের গান সমানে বেজেছে,
দেবদারু বনে হাওয়া
মর্মর তোলে, মনিয়া-ঘুঘুও মৌমাছি-ভ্রমরের
কত যুগ হতে একই সুরে সেই চলেছে
তো গান গাওয়া।।
ঘাসে ঘাসে মরা আলোর আভাস, বিকেল
পুটোয় জলে,
বাঙলোর এই বারান্দা ছুঁয়ে জীবন নিরুদ্বেগ,
ট্রেন এসেছিল কতক্ষণ আগে, নেই আর গোলমাল
পুকুরে এখন টলমল করে সন্ধ্যাবেলার মেঘ।।

জীবনকে ভালবেসে

বটকৃষ্ণ দাস

গাছে জল দিই নিয়মিত প্রত্যূষে,
খুঁজে দেখি কটা কুঁড়ি এলো কোন ডালে,
পায়রা ওড়াই, বুলবুলি রাখি পুষে,
ফুলদানি ভরি কৃষ্ণ চূড়ার লালে,
যেহেতু এখনো জীবনকে ভালবাসি।
সংসার পাতি, শিশুকে আদর করি,
শ্রমের শিশির মুছে দিই দয়িতার,
রবি ঠাকুরে গানেই স্বপ্ন গড়ি,
মেঘের ভেলায় ভাবনাকে করি পার,
যেহেতু এখনো জীবনকে ভালবাসি।
শব্দকে নিয়ে খেলা করি মনে-মনে,
হিজিবিজি ছবি আঁকি সারারাত জেগে,
নিজেরই ছায়াকে ডেকে বলি নির্জনেঃ
বেশ আছি, ওহে, আনন্দে-উদ্বেগে,
যেহেতু এখনো জীবনকে ভালব[illegible]

গ্রহ-নক্ষত্র বিজয় কল্পনার পাল্লা কতদূর?

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

স্পুৎনিক, রকেট ও ল্যুনিকের খবর আজকাল আমাদের খানিকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে বলতে পারেন। মহাশূন্যে তাদের আসা-যাওয়ার মধ্যে আর তেমন নতুনত্ব নেই। এখন একবার চাঁদে যেতে পারলে বাজারটা আবার সরগরম হয়ে ওঠে। প্রথমে চাঁদ, তারপর মঙ্গল, তারপর শুকতারা। সেখানেই শেষ নয়, আরো গ্রহ-উপগ্রহ আছে, আছে আমাদের সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে আরো বহু সৌরমণ্ডল।

চাঁদে বা মঙ্গলে যাওয়ার কথা কল্পনা করা সোজা কিন্তু বাস্তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে "পঞ্চম মহাসাগর" সেই মহাকাশ পাথারের কূলে-উপকূলে আমরা সবাই বাস করি। এমন একজনও নেই যে, সেই মহাকাশের সৈকতে বাস করে না। মানুষ আজ সেই অকূল পাথারে কূলের সন্ধানে বার হয়েছে। সেই সাগর যাত্রার সাথে সন্দে।

মহাশূন্যের জাহাজের কাণ্ডারীর গন্তব্য পথ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেড় এই ত্রিক্ষেত্র দিয়ে গিয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রে যাতায়াতের সঙ্গে তার গোড়ায় গরমিল। এই হল প্রথম সমস্যা।

আরেকটি জটিল সমস্যা—

এক প্লুটো ছাড়া সৌরমণ্ডলের অন্য সমস্ত গ্রহ এক নির্দিষ্ট সমতল কক্ষপথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর কক্ষপথের সমতল ক্ষেত্র এবং মঙ্গলের কক্ষপথের সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে ১·৯ ডিগ্রী ব্যবধান। সেই ব্যবধানের কথা খেয়াল না রেখে কোন রকেট যদি মঙ্গলের দিকে চালানো যায় তাহলে সেটা লক্ষ্যের ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে। মাত্র ৮০ লক্ষ কিলোমিটার।

মহাকাশের যাত্রীকে মনে রাখতে হবে যে, আকাশ সাগরের বিভিন্ন বিন্দুতে মহাকর্ষের পরিমাণ বিভিন্ন এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে একই বিন্দুতে মহাকর্ষের তারতম্য ঘটে। মহাকর্ষের হিসাবে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে জাহাজটি লক্ষ্যস্থলের বহু লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে।

পার্থিব জগতে জাহাজ, রেলগাড়ী এমন কি উড়োজাহাজে করে যেখানেই যাওয়া যাক গন্তব্যস্থল সব সময় এক জায়গাতেই থাকে। কলকাতা থেকে দিল্লী যে যাবে সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে দিল্লী যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কিন্তু চাঁদে পৌঁছানো অত সোজা নয়। রকেট-জাহাজ ছাড়বার সময় চাঁদ যেখানে ছিল, পরে চাঁদ তো সেখানে থাকবে না। [illegible] এক [illegible] পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। সেই ভ্রাম্যমাণ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বহু হিসেবপত্র করে তবে জাহাজের দিক ঠিক করতে হবে। স্বয়ংক্রিয় পরিগণন যন্ত্র ছাড়া সে হিসেব করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত এমনও হতে পারে যে, লক্ষ্যের ঠিক উল্টো দিকে রওনা হলে তবে লক্ষ্যে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে (৩নং নক্সা দেখুন)।

এ ছাড়া আরো কত শত সমস্যা আছে মহাকাশযাত্রীর সামনে কিন্তু তবু একথা বলা অন্যায় হবে না যে, অতীতে কলম্বাসের মত যাঁরা পৃথিবীর অজ্ঞাত অঞ্চলের সন্ধানে বার হয়েছিলেন তাঁদের তুলনায় আজকের মহাকাশযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। তাঁরা কলম্বাস বা মেগেলনের মত, নাবধ্যক্ষ বেরিং এর মত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাত্রা করবেন না। বিজ্ঞান আজ তাঁদের প্রত্যেকটি বিষয়ে নির্ভুলভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা সেই দিকে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। মহাকাশ পথে আজ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে একটি আন্তর্গ্রহ ষ্টেশন যেটি চন্দ্রলোকে যাত্রার পথে প্রথম সোপান।

চাঁদে যাবার রাস্তা—

পৃথিবীর মত ২৭টি গোলক যদি এক সরলরেখা বরাবর পাশাপাশি সারি দিয়ে রাখা যায় তাহলেই পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটি পুল তৈরী হতে পারে। সেই পুলের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর দৈর্ঘ্যের ৯ গুণ। মহাজাগতিক মানদণ্ডের মাপে সে দূরত্ব নেহাতই নগণ্য। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া সম্ভবত এক মামুলী ব্যাপার হয়ে যাবে কলকাতা থেকে দিল্লী যাবার মত। [illegible]

তৃতীয় স্পুৎনিকের আসল মাপে তৈরী একটি মডেল

মঙ্গল বা শুক্রে যাওয়া অত সহজ হবে না। সে রাস্তা উত্তর মহাসাগরের জাহাজ-পথের মতই দুর্গম।

সৌরমণ্ডলে এ পর্যন্ত যে ৩০টি উপ-গ্রহের কথা আমরা জানি সেগুলির মধ্যে চাঁদের
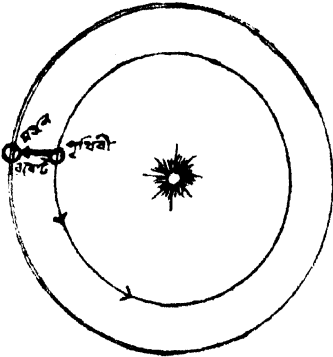
মঙ্গল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখন রকেটটি সোজাসুজি মঙ্গলে পাঠাতে হলে রকেটের অনেক বেশি বেগ চাই কারণ রকেটটিকে সেক্ষেত্রে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিরুদ্ধে যেতে হবে।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। চাঁদ আয়তনে এত বিরাট যে তাকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলি অনেক ছোট এমন কি মঙ্গলের "ফোবস" ও "ডিমস" নামে যে ২টি উপগ্রহ আছে সেগুলির ব্যাস মাত্র ১০।১২ মাইল এবং মঙ্গল থেকে সেগুলির দূরত্ব ১২।১৪ হাজার মাইল মাত্র। আমরা যদি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা হতাম কিম্বা মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবী যদি উপগ্রহ বদল করে নিত তাহলে মহাকাশ ষ্টেশন পেতে আমাদের খুবই সুবিধা হত যে, এত কষ্ট করে আন্তগ্রহ ষ্টেশন তৈরী করতে হোত না।

যাই হোক চাঁদে যেতে হলে কতটা জ্বালানী চাই সেটা হিসেব করাটা হল প্রথম কথা। জ্বালানীর পরিমাণ দূরত্বের ওপর নির্ভর করে
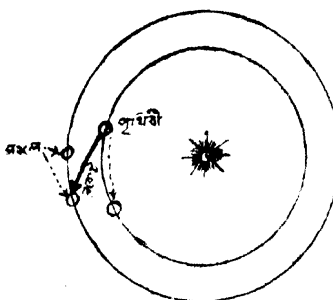
রকেটটি একেবারে সোজাসুজি না ছুড়ে যদি কিছুটা কোণাকুনি পাঠানো যায় তাহলে অত বেশি বেগের দরকার হবে না, জ্বালানীও কম লাগবে। তবে এক্ষেত্রে রকেটের মঙ্গলে পৌঁছতে কিছু বেশি সময় লাগবে।

না, নির্ভর করে মহাকর্ষের ওপর। পৃথিবী থেকে চাঁদ রকেটে ২।১ দিনের পথ। কিন্তু রকেটের ইঞ্জিন সেই সময়ের থেকে মাত্র মিনিট দশেক চলবে, ওঠবার পর মিনিট কয়েক এবং নামবার মুখে মিনিট কয়েক। বাকি সময় সে প্রধানত মহাকর্ষের টানে এবং নিজস্ব সঞ্চিত বেগে বেগে চলবে। তাই মিনিট দশেক ইঞ্জিন চালাবার মত জ্বালানী হলেই চাঁদে যাওয়া যাবে। চাঁদে আবহমণ্ডল নেই বলে চাঁদে নামবার সময় রকেটের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ইঞ্জিনের বেগ ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর প্রথম রকেট চাঁদে গিয়ে আঘাত করেছে। এর পরে সম্ভবত একটি স্বয়ংচালিত বেতার কেন্দ্র পাঠানো হবে যা থেকে চাঁদ সম্পর্কে নানা রকম সংকেত পৃথিবীতে "রীলে" করা হবে। তৃতীয় ধাপে একটি মানুষবিহীন চন্দ্র-প্রদক্ষিণকারী জাহাজ। তারপরে একজন পর্যবেক্ষক সহ ঐরকম একটি রকেট-জাহাজ চাঁদের চারদিকে ঘুরবে। মানুষবিহীন চন্দ্র-প্রদক্ষিণকারী রকেট থেকে চাঁদের অন্য পিঠের ছবি তোলা হয়েছে। একটি তিন ধাপের রকেটের প্রথম দু'ধাপে জ্বালানী সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে। যাত্রাপথে শেষ ধাপটিকে জ্বালানী জোগান দিয়ে প্রথম ধাপ দুটি আপনা থেকে খসে পড়ে পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে যাবে। তখন শেষ ধাপটি একাই ছুটে চলবে চাঁদে। চাঁদের আকাশে শেষ ধাপের জ্বালানী ট্যাঙ্কটি আলাদা হয়ে গিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরবে এবং শেষ ধাপটি যাত্রী নিয়ে চাঁদে গিয়ে নামবে উল্টো দিকে মুখ করে।

মঙ্গল ও শুক্রের রাস্তা—

চাঁদ আজ মানুষের নাগালের মধ্যে। চন্দ্র-বিজয়ের পর মানুষ কোন্ সুদূরে রাজ্য জয় করার দিকে পা বাড়াবে? নিশ্চয়ই মঙ্গল ও শুক্র হবে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল। কারণ এই দুটি গ্রহই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। কিন্তু মঙ্গল ও শুক্রের দিকে যাবার পথে আরো কতক-গুলি ক্ষুদ্রতর জগৎ আছে যেগুলি মহাকাশ-যাত্রীকে সাহায্য করতে পারে মহাজাগৎ সমুদ্রে প্লবমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। সেগুলিকে বলা হয় "অ্যাস্টেরয়েড" বা পুঞ্জগ্রহ। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার পুঞ্জগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির কক্ষপথ কোথাও অন্য গ্রহের কক্ষপথের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, কোথাও বা পাশ দিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি আছে ইরস নামে একটি পুঞ্জগ্রহ যার ব্যাস ২৫ কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে যার ন্যূনতম দূরত্ব ২০ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটারের মত। সেটি ১৯৩১ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭৫ সালে। পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাবার পথে ইরস আমাদের সরাইখানা হতে পারে এই রকম পুঞ্জগ্রহ আরো আছে।

সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশী। সুতরাং মঙ্গলের কক্ষপথের দৈর্ঘ্যও বেশী। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন (পৃথিবীর দিনের মাপে) লাগে অর্থাৎ মঙ্গলের ১টি দিনের মেয়াদ ৪৮ ঘণ্টার মত। প্রতি ১৫ বছর অন্তর মঙ্গল একবার করে পৃথিবীর কাছাকাছি আসে (৫ কোটি ৬০ লক্ষ কিলো-মিটার)। ১৯৫৬ সালে মঙ্গল আমাদের কাছে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭১ সালে। সেই সময় কোন রকেট যদি সেকেণ্ডে ১২ কিলো-মিটার বেগে ছোঁড়া হয় তাহলে ১৫০ দিন পরে সেটি মঙ্গলে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু মঙ্গলের যাত্রীও প্রথমে মঙ্গলে যাবে না। সে আগে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবস এবং ডিমস-এ। ফোবস থেকে মঙ্গলের গোলকটি যাত্রী পরীক্ষা করে দেখবে। সেটি
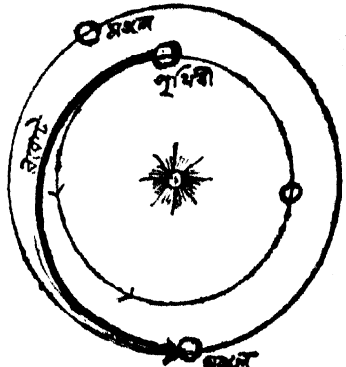
সবচেয়ে কম প্রাথমিক বেগে এবং কম জ্বালানী খরচ করে রকেটটি এইভাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির অনুকূলে পাঠানো যায়। কিন্তু এতে তার মঙ্গলে পৌঁছতে কয়েক বছর লেগে যাবে।

আয়তনে দেখাবে চাঁদের ৯ গুণ। মঙ্গল থেকে ফোবসের দূরত্ব মোটে ৯৩৪০ কিলোমিটার অর্থাৎ চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের ৪১ ভাগের এক ভাগ। সেখান থেকে যাত্রী মঙ্গলে যেতে পারে।

শুক্রের পথের সঙ্গে মঙ্গলের পথের তফাৎটা এইখানে যে শুক্রের পথ গিয়েছে পৃথিবীর পথের বাইরের দিক দিয়ে নয়, ভিতরের দিক দিয়ে কারণ শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের আরো কাছে। শুক্রগামী রকেটকে সূর্যের দিকে ছুঁড়তে হবে এমনভাবে সময় হিসেব করে যে, রকেটটি যখন শুক্রের কক্ষপথে পৌঁছবে, শুক্র ঠিক সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে
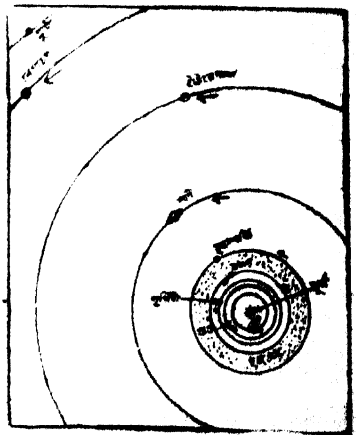
সৌরমণ্ডলে বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ।

যেন সেইখানে গিয়ে পৌঁছয়। রকেটের যাত্রা-পথের দৈর্ঘ্য হবে ৪০ কোটি কিলোমিটার। সেই পথ পার হতে লাগবে ১৪৬ দিনের মত।

(শেষাংশ ২৮২ পৃষ্ঠায়)

উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাল্ডেভটের এলিফ্যাণ্ট মার্কা কর্ক প্রোডাক্টসের জন্য আপনার চাহিদা জানান। পূর্ব-ভারতের একমাত্র এজেণ্ট : মেসার্স জে বি দস্তুর অ্যাণ্ড কোং, ২৮, গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : ২৩-৪৫১৩। বহু জিনিস মজুদ মাল থেকেও পাওয়া যাবে।

প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১

নতুন
জীবনের
নতুন
প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের
জননীকে পুষ্টিকর
টনিকের ওপর নির্ভর
করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায়
সাহায্য করে
এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি
ফিরিয়ে আনে।

ভাইনো-মল্ট

এ নহে কাহিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বার ফুট লম্বা আর দশ ফুট চওড়া একখানি ঘর। সংলগ্ন একফালি ঢাকা বারান্দা। এ ছাড়া সিঁড়ি ঘরও একখানি সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে। সিঁড়ির মতই চওড়া আর হাত পাঁচেক লম্বা। অনেক ঘোরাঘুরির, অনেক খোসামোদ আর সুপারিশের জোরে ভাড়া পেয়েছেন অলক গাঙ্গুলী। ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

সংসার ছোট। স্বামী-স্ত্রী, দুটি ছেলে একটি মেয়ে। মেয়েটি সর্ব কনিষ্ঠ। বড় ছেলে বাদে আর সকলে ঘরখানি দখল ক'রেছে। বারান্দায় রাখা হ'য়েছে, একটি ময়না একটি টিয়া আর একটি কোকিল। এ ছাড়া একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুরও সঙ্গে এসেছে। জীব জন্তু পোষা অলক গাঙ্গুলীর এক মারাত্মক নেশা। হয়তো সেই জন্যই স্ত্রী সুনন্দা বাধা দিয়ে অশান্তি ঘটাননি কোনদিন।

সিঁড়ি ঘরখানি দেওয়া হ'য়েছে বড় ছেলে সুজিতকে। সুজিত কলেজে পড়ে। বেশ নিরিবিলি ঘরখানি। পড়াশুনা করবার উপযুক্ত পরিবেশ। খুশী হবার কথা যদিও নয়—তবুও চুপ ক'রে থাকতে হয়। উপায় কি। তাছাড়া মাথার উপর ছাদ আছে... চারপাশে দেওয়াল র'য়েছে......নাইবা থাকল আলো বাতাসের জন্য একটিও জানালা কিংবা দেওয়ালে বালি অথবা চুন।

অগ্রিম টাকা দিয়ে রসিদখানি হাতে নিয়ে অলক বললেন, চৈত্র মাসের একটা দিন বাদ দিয়ে আমরা বোশেখ থেকেই আসব। ইতিমধ্যে বাড়ীটিকে একটু বাসোপযোগী করে রাখবেন। আমি কলি ফেরাবার কথা বলছি.........

বাড়ীর মালিক আকাশ থেকে পড়লেন, বাবা দেখছি সব কথা আপনাকে খুলে বলিনি! আমার অত সখের বিলাতি গরুটা মরে গেল তাই.........

কিন্তু সে থাকগে মোদ্দা ঐ ভাড়ায় তাহ'লে আর আলাদা বাড়ী পেতে হবে না মশাই। ক'রতে চান নিজে করিয়ে নেবেন। আমার দ্বারা...........

কথাটা শেষ হবার আগেই অলক তাঁর এই অমার্জনীয় ধৃষ্টতায় কুঁকড়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, আজ্ঞে বাবাবাবুর দোষ নেই। তিনি বোধ হয় ভাবতে পারেননি যে, বাড়ী পেয়ে আমি আবার চুনকামের বায়না ধরবো। আচ্ছা নমস্কার।

অলক গাঙ্গুলী সরে পড়লেন এবং নির্দিষ্ট দিনে বাড়ী দখল ক'রলেন। সেই থেকেই এই বাড়ীতে আছেন। ছটি বছর বেশ ত' কেটে গেল। ছ বছরের ছটি বর্ষা নির্বিঘ্নে পার হ'য়ে গেছে। কোন রকমের দুর্ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

এবাড়ীতে এসে একবার মাত্র কলি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন অলক গাঙ্গুলী কিন্তু তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই—উপরন্তু দেওয়াল আর ছাতের বালির পলেস্তারাও খসে গেছে। যেটুকু এখানে ওখানে লেগেছিল অলক নিজে হাতে তা ঠুকে ঠুকে খসিয়ে ফেলেছেন। নইলে কি হ'তো বলা যায় না।

সুনন্দা বাধা দিয়েছিলেন, যা আপনি খসে যেতো তার পিছনে আবার পরিশ্রম ক'রলে কেন?

অলক জবাব দিয়েছেন, সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে আমাকে কষ্ট করে খসাতে হ'চ্ছে নইলে ঐ সঙ্গে আরও কিছু খসবে।

বাড়ীতে অলক গাঙ্গুলী বেশীক্ষণ থাকেন না। থাকার উপায় নেই ব'লেই থাকেন না। অফিস ফেরত একটা পার্ট টাইমের চাকরী তাকে ক'রতে হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মাত্র ঘণ্টা দুই সময় তাঁর হাতে থাকে। তারও একটি ঘণ্টা ব্যয় ক'রতে হয় তাঁর আশ্রিত জীবজন্তুগুলির জন্য। বাকী সময়টুকু অফিস যাবার তোড়জোড় ক'রতে আর সংসার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি ক'রতেই কেটে যায়। সুনন্দা অবশ্য চুপ করেই থাকেন, কিন্তু অলক পারেন না। এটা তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নিয়মিত রুটিনের মধ্যে একটি।

রবিবারটা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আর নিরুদ্বিগ্ন দিবানিদ্রায় কেটে যায়। এর ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না। ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধেও অলক গাঙ্গুলী রীতিমত উদাসীন। মাঝে মাঝে সুনন্দাকে বলেন, ঘরে ব'সে থাকলে আমার যখন চলবে না তখন ওসব দায়িত্ব নেওয়াও আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু কথায় এবং কাজে অলকের সামঞ্জস্য থাকে না। প্রায়ই অন্যথা হয়। এই নিয়ে স্ত্রী এবং ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের সৃষ্টি হয় আর এই অসন্তোষের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে রাগ করে সুনন্দাকে বলেন, ছেলে মেয়েদের নিয়ে আবার মাথা গরম ক'রছো কিসের জন্য? তার চেয়ে তোমার পাখী আর কুকুরের কথা ভাবো। ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হ'বে। লেখা পড়া হয় হবে নইলে রিক্সা টেনে খাবে। তবু দয়া করে অকারণে চেঁচা-মেচি করো না।

অকারণে! বিস্মিত অলক গাঙ্গুলী চিৎকার ক'রে ওঠেন! বলেন, মাস মাস স্কুল-কলেজের মাইনে যোগাবার সময় আমি—

স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে সুনন্দা বলেন, থামো—তোমার কর্তব্য শুধু মাইনে গুণলেই শেষ হয় না। কথাটা তুমি না বুঝলে আমি আর কি ক'রতে পারি।

কি হ'লে হয় শুনি? নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তোমার ছেলে মেয়েদের পাহারা দিলে বুঝি! অলক গাঙ্গুলী রাগ করে জবাব দেন।

সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে বললেন, পাড়ার ছেলের কথা কেউ বলেনি। মিছি মিছি নিমিত্তের ভাগী হ'তে নিষেধ করেছিলাম। একটু আগেই তুমি সমুকে তোমার পাখীর ছোলা আর কুকুরের জন্য মাংসের ছাট আনতে পাঠালে বলেই কথাটা আমাকে বলতে হ'লো। সমু তাকে করছিল কিনা তাই —

এতবড় অভিযোগেও অলক লজ্জা পেলেন না বরং তিক্ত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, সব বাড়ীর ছেলে পিলেরাই অমন দু'একখানা সংসারের কাজ ক'রতে হয়।

সুনন্দা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, সব বাড়ীর কথা জানিনে কিন্তু তোমার ছেলেদের ক'রতে হয় একথা মানতেই হবে। দরকার হ'লে কাজ করবে না এমন কথা আমার বলছি নে, কিন্তু তার একটা সময় থাকা উচিৎ। তোমার যেটা সখ ওদের কাছে সেটা সখের নয়।

অলক গাঙ্গুলীর দু'চোখে একরাশ বিস্ময়। তাঁর সহধর্মিনী স্ত্রীর মুখে ঠিক এই ধরণের অনুযোগ আর ইতিপূর্বে শুনেছেন বলে তো মনে পড়ছে না। অলককে তাই থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়। রাগ করতে গিয়েও ইতস্ততঃ করেন। সখ...সখ বৈকি। কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভাঙে, শোবার ইচ্ছের মত। প্রয়োজন মেটাবার সংস্থান ক'রতে যাকে দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রতে হয় তার পক্ষে পাখী আর কুকুর পোষা একটা বিলাসিতা বৈকি—কিন্তু এগুলো যুক্তি—ভাবপ্রবণতা যুক্তির চেয়ে বড় হ'য়ে উঠলেই বিভ্রাট ঘটে।

অলক গাঙ্গুলী সহসা রাগ করে জবাব দেন, আমি আমার পয়সায় সখ মেটাই তাতে অনুযোগ দেবার কি আছে।

শান্ত কণ্ঠে সুনন্দা বলেন, কিছুই থাকতো না যদি প্রয়োজন মিটিয়ে এ কাজ ক'রতে।

অলক গাঙ্গুলী চীৎকার করে উত্তর দেন, তোমার এ কথার মানে!

সুনন্দা সংযতভাবে বলেন, এর জবাব আমার কাছে চেও না। নিজে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে চিন্তা ক'রলে তুমি নিজেই খুঁজে পাবে।

অলক গাঙ্গুলীর কণ্ঠে বিস্ময়, আমি নিজেই খুঁজে পাব!

সুনন্দা জবাব দিলেন, ঠিক তাই। যখন ছিল তখন বলতে যাইনি। এখন নেই বলেই বলতে বাধ্য হয়েছি। সবদিকে তোমার দৃষ্টি থাকলে একথা আমাকে বলতে হতো না। কিন্তু আর নয়। মিথ্যে কথা কাটাকাটি করে যদি কিছু তোমার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারতে না, তাতে আমিও আনন্দ পাব না।

সমু মাংসের ছাট আর পাখীর খাবার নিয়ে বহুক্ষণ ফিরে এসেছে, কিন্তু মা বাবার বাকযুদ্ধ দেখে ভয়ে এবং সংকোচে এতক্ষণ তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। মা চুপ করতেই সে আত্মপ্রকাশ করল।

সুনন্দা নিঃশব্দে সরে গেলেন। অলক গাঙ্গুলীও আত্মসম্বরণ করে ছেলের হাত থেকে জিনিষগুলো গ্রহণ করে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে আত্মনিয়োগ ক'রলেন। সমু আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় ঘরে প্রবেশ করে তার অসমাপ্ত অঙ্ক নিয়ে বসল। বাড়ীর ছোটখাটো কাজ ক'রতে গিয়ে প্রায় প্রত্যহই তার এই ধরণের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে সবকিছু মেনে নেওয়ার শিক্ষাই সমু তার মার কাছ থেকে পেয়ে এসেছে তাই চুপ করেই থাকে। তবে দাদার নিষেধ সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে বহুবার সে তার শরণাপন্ন হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। দাদার কলেজের পড়া—তাঁর সময় কোথায়। বাবাকে বললে তিনিও পিছু হটে যান। তাঁদের যুগের লেখাপড়ার সঙ্গে বর্তমানের নাকি এতই প্রভেদ যে, তা ছাড়া তাঁরইবা সময় কতটুকু। স্কুলের অবস্থাও তথৈবচ। বোর্ডে মুখস্ত লেখার মত মাস্টারমশাই অঙ্ক কষিয়ে দেন। বুঝিয়ে দিতে বললে বোর্ড থেকে টুকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বুঝে নেবার উপদেশ দিয়ে তিনিও কর্তব্য শেষ করেন। এই অসহায় অবস্থার হাত থেকে কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যাবে বালক সমু তার অপরিণত বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারে না। নিরুপায় হয়ে মার কাছে এসে ছল ছল চোখে দাঁড়ায়। এখানে সমুর লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, ভয় নেই। মা যে তার চেয়েও কত বেশী অসহায় এ কথা বোঝে না বলেই তাঁর কাছে বারেবারে ছুটে আসে। প্রথম প্রথম সুনন্দা প্রতিকারের চেষ্টাও করেছেন। ছেলেকেও মুখে আশ্বাস দিয়েছেন। বর্তমানে মুখের আশ্বাসবাণীটুকুও ফুরিয়ে গিয়েছে। শুধু নিজেকে চেপে থাকা আর গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই সুনন্দার। স্বামীর কাছে সমুর জন্য একজন গৃহ শিক্ষকের কথা বলায় তিনি এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন যে সুনন্দা চমকে থেমে গেলেন না। অলকের বাপ ঠাকুর্দা এমনকি নিজেও তিনি নিজেরাই চেষ্টায় লেখাপড়া করেছেন। আসলে আজকালকার ছেলেরা খাটতে ভুলে গেছে—পরিশ্রম করতে নারাজ। ফাঁকি দিয়ে সব কিছু আয়ত্ত ক'রতে চায়।

সুনন্দার ইচ্ছে হয়েছিল প্রতিবাদ করে বলেন, তোমাদের যুগে স্কুল, কলেজে পড়ান হ'তো। কিন্তু বর্তমানে যা হচ্ছে তাকে আর যা বলো পড়ানো বলে না। কিন্তু কথাটি মনে এলেও মুখে এলো না। মিথ্যা তর্ক করবার মত ধৈর্য আর সময় সুনন্দার ছিল না।

ছেলের পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, নিজের চেষ্টায় যারা বড় হতে পারে তারাই সত্যিকার মানুষ বাবা। বাড়ীতে সবাকে কি মাস্টার রেখে দিতে পারে সমু।

সেইদিন থেকে সমু প্রাণপণ চেষ্টা করছে এগিয়ে চলতে, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেই সে এদিক ওদিক তাকায় অপরের সাহায্যের প্রত্যাশায়। আবার তাকে দাদার কাছেই যেতে হয়। মনে মনে ঠিক করে ফেলে সে, যেমন করে হোক দাদার কাছ থেকেই অঙ্ক আদায় করে নেবে।

পা টিপে টিপে সমু দাদার সিঁড়ি ঘরের পাশে এসে দাঁড়ায়। ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে সে ইতস্ততঃ করতে থাকে। দাদা গান গাইছে, কিন্তু সম্ভবতঃ তার পাশের পড়া পড়ছে। সমু অন্ততঃ তাই ভেবেছে।

সুজিত অবশ্য পাশের পড়া পড়ছিল না। পড়ছিল নিজের লেখা একখানা চিঠি। পাশের বাড়ীর ছন্দাকে লিখেছে। লিখেছে সে নিজেই তবুও দেবার আগে নিজের কানে কেমন লাগে তাই পরখ করে দেখছিল।

সমুর দু'চোখে বিস্ময়। দাদা বার বার পাশের বাড়ীর ছন্দা দিদির নাম করছে কেন? সমুর শংকিত উৎসুক দৃষ্টি সাবধানে একবার ঘরখানি প্রদক্ষিণ করে এল। না কেউ নেই শুধুই তার দাদা তখনও পড়ার টেবিলের উপর ঝুঁকে একাগ্রভাবে কি পড়ছে। সমু পর্দার দরজার পাশে আত্মগোপন করল। সুজিত তখনও আবৃত্তি করে চলেছে...ভয় পেয়ো না ছন্দা তবে বাড়াবাড়িও করো না। আমি জানি পার্থক্য আজকের দিনে একটা বাধাই নয়। তবে আমি গরীবের ছেলে বলে তোমার মনে যদি দ্বিধা থাকে তাহলে আলাদা কথা। নইলে পেলেও আমি তোমার পক্ষে দাঁড়াব না। চলে যাব। তোমার জবাব পাবার অপেক্ষায় অনন্ত দুর্ভাবনা নিয়ে পথ চেয়ে থাকবো......

সমুর হাত থেকে তার খাতা আর বইটা পড়ে গেল। শব্দে আবৃত্তি বন্ধ হল সুজিতের। হয়তো অকারণেই চমকে উঠে সে ঘর থেকে বার হয়ে আসে। সমুকে নীচু হয়ে বই খাতা তুলতে দেখে চাপা রাগে বলে, তুই এখানে কতক্ষণ এসেছিস বাঁদর!

শংকিত কণ্ঠে এতটুকু হয়ে গিয়ে সমু জবাব দেয়, তুমি পাশের পড়া পড়ছিলে আমি জানতাম না দাদা। একটা অঙ্ক কিছুতেই মিলছে না তাই তোমার কাছে এসেছিলাম।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে হঠাৎ স্নেহকোমল কণ্ঠে ভাইকে কাছে ডেকে সুজিত বলল, অনেকক্ষণ এসেছিস বুঝি? সোজা ঘরে চলে এলিনে কেন? মিছিমিছি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলি কিসের জন্য।

সমু দাদার এতখানি সদয় ব্যবহারের তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, আমি তো এইমাত্র এসেছি দাদা—

সুজিত জবাব শুনে খুশী হলো। ভাই-এর একখানা হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে সস্নেহে বলল, আর কটা মাস একটু কষ্ট কর সমু। আমার পরীক্ষাটা হয়ে গেলে রোজ তোকে নিয়ে বসবো।

সমু শুধু একটুখানি হাসল। কোন জবাব দিল না।

সুজিত ওর হাত থেকে বই খাতা চেয়ে নিয়ে পুনরায় বলল, কি অঙ্ক রে সমু? প্রশ্নের? ওসব কি আর এখন মনে আছে। নতুন করে আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। তার চেয়ে তুই বরং বইখাতা রেখে যা আর কি কি অঙ্ক হচ্ছে না দেখিয়ে দে—আমি ধীরে সুস্থে করে রাখবো। কাল সকালে এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস।

এই সময় রোজ একবার ছন্দা দেখা দেয় যায়। সুজিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সমু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজিত বলে, তুই বরং নীচে গিয়ে অন্য পড়াগুলো দেখে নে। তাছাড়া বাবারও আসবার সময় হয়ে গিয়েছে।

সমু বলে, বাবা এখন আসবেন কেন দাদা...

তাকে বাধা দিয়ে সুজিত বলল, আসতেও ত পারেন।

সমু চলে গেল। ওর চলে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সুজিত দ্রুত ছাদে চলে এলো। ছন্দার দেখা নেই। শুধু একটা বেড়াল মানুষের সাড়া পেয়ে এ ছাদ থেকে ও ছাদে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুজিত বেশ কিছুক্ষণ ছাদের কার্ণিশের উপর হাত রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

সঙ্গীতের সুরে আপনার গৃহ আনন্দমুখর ক'রে তুলবে

ন্যাশনাল একো রেডিও

এই উৎসবের রঙে রঙীন দিনে বাড়ীর সবাইকে গানবাজনা ও আনন্দপ্রমোদে মাতিয়ে রাখুন; একটি সুন্দর অল-ওয়েভ ন্যাশনাল-একো রেডিও কিনুন। আপনার চেনা ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতার দোকানে গিয়ে এই মডেলগুলি আজই দেখুন!

মডেল ইউ-৭১৭ : ৫ বোতাম ভাল্‌ব—৮ ভাল্‌বের কাজ করে; ৩-ব্যাণ্ড—এসি ও ডিসি। বাদামী রঙের প্লাস্টিক ক্যাবিনেট। দাম ২৩০৲। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙেরও আছে— দাম—২৬০৲

মডেল বি-৭১৭ : ৪ বোতাম ভাল্‌ব—৬ ভাল্‌বের শক্তিসম্পন্ন; ৩-ব্যাণ্ড—ড্রাই ব্যাটারিতে চলে। বাদামী রঙের ক্যাবিনেট। দাম—২৫০৲। ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙেরও আছে— দাম—২৬০৲

মডেল এ-৭৪৪ : ৮-ব্যাণ্ড, এসি রেডিও। ৬ বোতাম ভাল্‌ব—৯ ভাল্‌বের কাজ করে। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন। মনোরম দু'রঙে-তৈরী ক্যাবিনেট।

দাম—৪১৫৲

মডেল বি-৭৫১ : মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটির মত—এটি ট্রানজিস্টারযুক্ত : ড্রাই ব্যাটারীতে চলে। ৩টি ট্রানজিস্টার সমন্বিত—৯ ভাল্‌বের শক্তিসম্পন্ন ৬ বোতাম ভাল্‌ব। দাম—৪২৫৲

মডেল ৭৩০ : ৬টি বোতাম ভাল্‌ব—৯টি ভাল্‌বের কাজ করে, ৮-ব্যাণ্ড; "ম্যাগ্নি-ব্যাণ্ড" টিউনিং। চকচকে কাঠের ক্যাবিনেট। মডেল এ-৭৩০ এসিতে চলে; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি। দাম—৪৯৫৲

মডেল এ-৭৩১ : ৭টি বোতাম ভাল্‌ব—১০টি ভাল্‌বের কাজ করে, ৮ ব্যাণ্ড, এসি। শব্দগ্রহণে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। আর, এক স্টেজে টিউনড্‌। উচ্চাঙ্গের তিনিয়ার কাঠের ক্যাবিনেট। দাম—৬২৫৲

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা

সকল দামই নেট। স্থানীয় কর আলাদা।

কেবলমাত্র আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতার কাছ থেকে কিনুন।

জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • পাটনা • দিল্লী • বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

গ্রহ-নক্ষত্র বিজয় কল্পনার পাল্লা কতদূর?
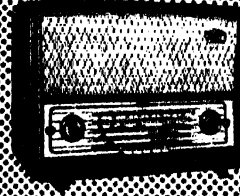
(২৭৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শুক্রের কোন উপগ্রহ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে শুক্রে যাওয়া আরো কঠিন হবে।

সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ বিজয়ের অভিযানের পূর্বসর্তগুলি হোল ঃ

(১) পৃথিবীর মহাকর্ষ জয় করে মহাকাশে উড়ে যাবার মত প্রাথমিক বেগ।

(২) সেই বেগ সৃষ্টি করার উপযুক্ত জ্বালানী।

(৩) পৃথিবী থেকে রওনা হবার সময় রকেটের গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিপরীত দিকে না হওয়া (রকেট ও পৃথিবীর গতি ভিন্নমুখী হলে পৃথিবীর মহাকর্ষ জয় করার জন্যে আরো অনেক বেশী বেগের দরকার হবে)।

(৪) পৃথিবীর মহাকর্ষের সীমানা পার হলে রকেটের কতটা বেগ চাই সেটা হিসেব করে সেই মত ব্যবস্থা করা কারণ কিছুটা নিজস্ব বেগ না থাকলে শুধু গন্তব্য গ্রহ বা উপগ্রহের আকর্ষণে রকেটের গতি হয়ে যাবে অত্যন্ত মন্থর।

(৫) গ্রহে নামবার সময় এবং গ্রহ থেকে আবার পৃথিবীর দিকে রওনা হবার সময় সেই গ্রহের মহাকর্ষ জয় করা।

মহাজগত বিজয়ের পথে প্রথম ধাপ হচ্ছে চাঁদ। মঙ্গল ও শুক্র হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপের লক্ষ্য। তৃতীয় ধাপে হচ্ছে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ। তারপর আসবে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, প্লুটো ইত্যাদি। সূর্য থেকে দূরতম গ্রহগুলি শুক্র বাদে অন্য প্রত্যেকটি গ্রহের উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির আছে এক ডজন উপগ্রহ, শনির আছে ৯টি, ইউরেনাসের ৫টি মঙ্গলের এবং নেপচুনের ২টি করে। চাঁদ বাদ দিলে এ পর্যন্ত আমরা সৌরমণ্ডলে ৩০টি উপগ্রহের খোঁজ পেয়েছি।

অন্য সৌরমণ্ডলের সন্ধানে—

সৌরমণ্ডলের উপগ্রহ বিজয়ের পর মানুষ হয়ত একদিন অন্যান্য নক্ষত্র জগতে যাবার কথা চিন্তা করবে। সূর্যের নিকটতম জ্যোতিষ্ক 'প্রক্সিমা', 'সেন্টরাস', নক্ষত্রপুঞ্জে 'আলফা সেণ্টারী' নক্ষত্রের নিকটে একটি রক্তিম তারকা। প্রক্সিমার আলোকরশ্মির পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৪·২৭ আলোক বৎসর লাগে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ৪-এর পিঠে ১৩টি শূন্য কিলোমিটার। মানুষ যেদিন সেই সব নক্ষত্রের রাজ্যে হানা দিতে পারবে সেদিন সে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে তার চোখের সামনে সে দেখতে পাবে কিভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্ভব হয় অর্থাৎ সূর্যের শৈশব কাল তার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়। মানুষ তখন এমন সব দুনিয়ার খোঁজ পাবে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্রাণীর।

অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব—

বিজ্ঞানের বিচারে আমাদের নীহারিকা পুঞ্জে (সূর্য যে পরিবারের সদস্য) অন্তত ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে এবং প্রতি হাজার নক্ষত্রের মধ্যে অন্তত একটির নিজস্ব গ্রহ আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের নীহারিকা পুঞ্জে অন্তত ১০ কোটি "সৌরমণ্ডল" আছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা পুলকোভো মানমন্দির থেকে দূরবীণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, "সিগনাস" নামে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তার ৬১ নম্বর নক্ষত্রটির একটি গ্রহ আছে। প্রক্সিমা নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গিয়েছে। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ব্রুনো প্রায় ৩৬০ বছর আগে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু সৌরমণ্ডল আছে তখন ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছিল। আজ ব্রুনোর সেই ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত।

মহাজগতে ১০ কোটি সৌরমণ্ডল আছে কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব আছে কতগুলিতে?

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ তাঁর "ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার" বইখানিতে বলেছেন ঃ—"জীবন হচ্ছে প্রোটিনঘটিত বস্তুর এক বিশিষ্ট রূপ।" কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি কতগুলি মূল পদার্থ নির্দিষ্ট উত্তাপ ও আর্দ্রতার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশে জড়কে জৈবরূপ দান করে। যে কোন গ্রহে বা উপগ্রহে প্রোটিনের এই রকম যোগাযোগ হলেই প্রাণের উদ্ভব হতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের মত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব অন্য জগতে আছে কি? এর উত্তরে এঙ্গেলস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলব যে, "চিন্তাশক্তি আহরণ করার দিকে বিবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়া বস্তুর সহজাত প্রকৃতি।" তবে সেই চিন্তাশীল প্রাণীর রূপ যে সব জায়গায় বা সব সময়ে একই রকম বা পৃথিবীর মানুষের মতই হতে হবে এমন কথা নেই।

চাঁদ কহে চামেলি গো

(২৭৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সাগরে। কেন এ দুর্বলতা, কেন স্বর্ণ প্রতিমার লোভ?

রাত্রির প্রহর কাটে নিঃশব্দে। পেঁচার ডাক আর শোনা যায় না, বাদুড়ের পাখা ঝাপটানো বন্ধ। আকাশের সাদা মেঘে সোনারোদ ঝলসায়। মৌলিনাথ ছটফটায়। চাঁদ আর চামেলির গান অসমাপ্ত। ছাত্ররা তাগিদ দেয়। ম্লান হাসি হাসে মৌলিনাথ।

দিন বয়ে যায়। মৌলিনাথ সুপ্রিয়ার বাড়ি যায় না। সংগোপনে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আঁকড়ে ধরে তানপুরা। শুধু গান আর গান, শুধু সুর আর সুর। সুরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে। সুপ্রিয়ার বাড়ি থেকে লোক এসে ফিরে যায়। মৌলিনাথ অনড়। সুপ্রিয়ার চিঠি অবহেলায় পড়ে থাকে, পড়েও দেখে না।

কিছুই ভাল লাগে না সুপ্রিয়ার। শুধু অস্থিরতা। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর নিদারুণ ক্ষোভে কান্না পায়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। কান্না শেষে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

হারমনিয়মে ধুলো জমেছে। তাকালে কান্না পায় কতদিন গান গায় না। কি করে গাইবে গান? যাতনায় যে ফুসফুস কাতরায়।

কৃষ্ণপক্ষ আকাশ। দিগন্তে দৃষ্টি মেলে তারার দল থরো থরো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়া। চামেলির কান্না কি শুনতে পায় আকাশের চাঁদ?

সেদিন রাত্তিরে মৌলিনাথ ডুবে আছে সঙ্গীত সাগরে। তানপুরার গুঞ্জন আর গায়কের সুমধুর কণ্ঠস্বর আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনেকক্ষণ এসেছে সুপ্রিয়া। দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় থামে গায়কের গান। নজর পড়ে দরজার দিকে। কে ওখানে দাঁড়িয়ে? চমকে ওঠে মৌলিনাথ। ঘরের আলো জ্বালে। দু'হাতে মুখ ঢাকে সুপ্রিয়া।

মৌলিনাথের বাড়ি সুপ্রিয়ার আগমন এই প্রথম। কিন্তু হতবাক্ মৌলিনাথ। কাঁপছে সুপ্রিয়া, বুঝি কাঁদছে। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল মৌলিনাথ। বলে, ভেতরে এসে বসো সুপ্রিয়া।

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে সুপ্রিয়া। চোখের জলে আলো পড়ে চিক্ চিক্ করে। অভিমানিনী রাগ করে বলে, আপনি কেন যান না মাষ্টার মশাই......

কি বলবে মৌলিনাথ, কি বলে বোঝাবে না যাবার কারণ। কিছুই কি বোঝে না সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। কান্না ভুলে সুপ্রিয়া হাসছে।

সুপ্রিয়ার এ হাসিতে মৌলিনাথের বুক কাঁপে, মাথা ঘোরে. ভেসে যায় সকল চিন্তা. সকল ভাবনা। শান্ত ছেলের মত জামাটি গায়ে দিয়ে, ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসে সুপ্রিয়ার পিছু পিছু।

আবার শুরু হয় গান শেখান আর শেখা। সুপ্রিয়া বলে, কোথায় আমার চাঁদ আর চামেলির গান?

মৌলিনাথ উত্তর দেয়, চাঁদ আর চামেলির গানই আমরা গাইব। তুমি যে আমার চামেলি গো......

রাঙামুখে সুপ্রিয়া দৃষ্টি নামায়। মৌলিনাথ নতুন সুর তোলে।

সোনালী স্বপ্নে দিন কাটে। নতুন নতুন গান তৈরী করে মৌলিনাথ। মৌলিনাথ গায়, সুপ্রিয়া শোনে, সুপ্রিয়া গায় মৌলিনাথ শোনে। হৃদয়ের দরদ আর কণ্ঠের সৌন্দর্য পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে। পুলক শিহরণে দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়। বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দঘন বিমুগ্ধ দুটি মন পরম আশ্বাসে জড়িয়ে ধরে পরস্পরে।

মৌলিনাথের মনে কখনও যদি শংকা জাগে, সুপ্রিয়া দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় তার মনের কালো মেঘ। বলে, ভয় পেলে চলবে কেন। যদি বাধা আসেই, সে বাধা দু'পায়ে মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাব। কি গো পারবে না?

তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।

কিন্তু সে পরীক্ষার সুযোগ আর আসে না। ওদের প্রণয় কাহিনী টের পেয়েছে সুপ্রিয়ার বাবা। একটা গানের মাষ্টারের এতো বড় স্পর্ধা। এক বোঝা অপমান মাথায় বয়ে মৌলিনাথ ফিরে আসে। আর পক্ষকাল না ঘুরতেই সুপ্রিয়ার বিয়ের সানাই বাজে। সুপ্রিয়ার প্রেম, বিদ্রোহ, কান্না ব্যর্থ হয়ে যায়।
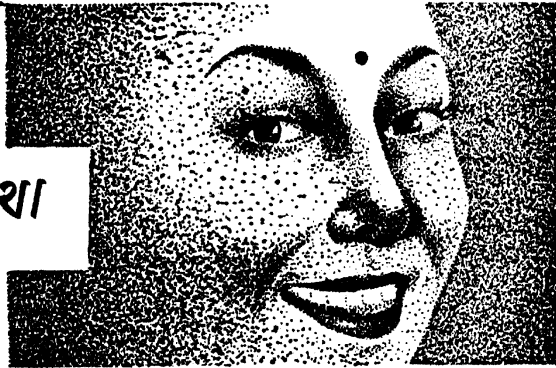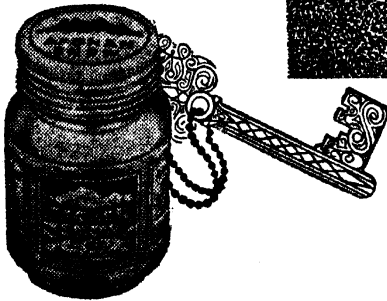
ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর নিজের কৃষ্টি ও সাধনার ফল সংগ্রহ করে দেশে-বিদেশে তাই প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। সর্বকৃষ্টির মাঝে ভারতীয় সংগীতটুকু ভুলে গিয়ে মুসলমানী যুগের সংগীত সম্পদ নিয়ে নিজেদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার যে প্রচেষ্টা আজ চলেছে তা কোনদিনই সমর্থনযোগ্য নয়। মুসলমানী যুগের পূর্বেও যে ভারতে সংগীত চর্চা ও সাধনা হতো এবং তা যে পৃথিবীর যে কোন জাতির কৃষ্টি অপেক্ষা পুরাতন ও স্বতন্ত্র সেকথা আজকের ভারত ভুলতে বসেছে।

ভারতে সংগীত সম্পদ জনপদ হিসাবেও যেমন পুষ্ট ছিল তেমনি পরিপূরিত ছিল তার সামগ্রিক সংগীত অধ্যায়ে। এই সংগীত অধ্যায় নিয়ে তারা যুগে যুগে গবেষণা করে, প্রতি মানবের আত্মিক উন্নতির পথ দিখেয়েছিলেন বলেই তার নাম দেওয়া হয়েছিল মার্গ-সংগীত। অর্থাৎ পথ প্রদর্শক সংগীত—যার ভিতর দিয়ে আত্মিক উন্নতি অবধার্য। আর জনপদ ও প্রাদেশিক সংগীতকে তারা দেশী নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়। কারণ মানুষের আত্মিক উন্নতিও যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-বন্ধুদের দেশীয় সম্পদ।

সংগীতের মাঝে আবদ্ধ থাকে এক প্রশান্ত শান্তি ও আনন্দ। শুভ্র আনন্দ ও শান্তি ব্যতীত ভারত কোনোদিনই সংগীত সম্বন্ধে ভাবতেই পারেনি। পারিবারিক জীবনের আমোদ আহ্লাদের মাঝে সংগীতকে নামিয়ে এনেছে মুসলমানী যুগ। নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর পর্যায়ে তারা সংগীতকে নামিয়ে নিয়ে গেছেন যার জন্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত সংগীত-সাধককে সমাজের কাছে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। সাধারণ আমোদ আহ্লাদের মাঝে সংগীতকে স্থান দিতে গিয়ে মুসলমানী আমলে বহু প্রক্ষিপ্ত সংগীতরচনা তৈরী হয়েছিল—যা ভারতীয় শুভ্রতায় মিশিয়ে দিয়েছিল পারস্য আরবের জাগতিক কামোদ্যক পরিকল্পনা। তাই খাঁটি দুধে গোচনা পড়ে তাকে বিষাক্ত করে তুলেছিল।

হয়ত কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন সংগীতের আবার জাত কিসের? তবে কেন এই সংস্কারগত ভেদাভেদ? এ বিষয়ে বক্তব্য এইটুকু সংগীতে বরণ করে নি তবে ইংরাজী, চৈনিক, জাপানী বা অন্যান্য দেশের সংগীত প্রভাব মিশ্রিত সুরকেই বা দোষ দি কেন? সবাইকে বরণ করে নিতে পারা যায়, তবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরের কাছে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া ভারত কোনদিনই সংগীত সম্পদে অপর দেশের মুখাপেক্ষী ছিল না। ভারতীয় সংগীত শুধু যে স্বয়ংসিদ্ধ এমন নয়, বরং বলা যেতে পারে ভারত সারা পৃথিবীর সংগীতশিক্ষক।

বৈদিক যুগের পরও ভারত, সংগীত সম্পদে এতদূর উন্নত ছিল যে, Imperial Gazette of India 6th Vol.এ Sir William Hunter লিখেছেন ঃ
"A regular system of notation had been worked out before the age of Panini (350 B.C.) and the seven notes were designated by their initiate letter. These notations passed from Brahmanas through the Persians to Arabia and Egypt and was thence introduced into European music by Guidod Arezzo at the beginning of 11th Century".—

৩৫০ খৃঃ পূঃ ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি ও ধারা এতই সুকল্পিত ছিল যা পারস্য দেশের মাধ্যমে সারা জগতে বিস্তারিত হবার ক্ষমতা রেখেছিল।

রোমের কবি Titus Lucrasius (58 B.C.) তাঁর একটি সংগীত পুস্তকে লিখেছেন—
"The wild's sing through bird's first chatterings : The human beings copy it; but before this, once in one fine evening—the evening breeze gets its way through the hollow bamboo pipe, which resounds in tune and gives impetus to the birds to whistle out in mirth and mankind copies it to develop the same, in songs—writes an Indian Musician."

৫৮ খৃঃ পূর্বের অবস্থায়ও রোম ও গ্রীসের সংগীত-সম্পদ কোথায় ছিল তাও জানা যাচ্ছে। তারা ভারতীয় সংগীত-সম্পদের আশায় পথ চেয়ে থাকতো।

হিব্রু ইতিহাসে জানা যায় যে হিব্রুরাও অত্যন্ত সংগীতপিপাসু। তাঁরা তাঁদের মন্দিরের বাজাতেন তার অধিকাংশই ভারত থেকে সংগৃহীত।

Bainchim— গ্রীক সংগীত বিশারদ, তার বাদ্যালোচনায় লিখেছেন—সানাই, বাঁশুরী, মুরলী, দোতারা, একতারা, সিতারা, প্রায়ই তাঁদের দেশে, প্রতি ঘরেই ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ পূর্ব-মুসলমানী যুগের ও মুসলমানী যুগের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি গ্রীসে আমদানী হয়ে ব্যবহৃত হতো।

গ্রীসে একদিন শ্রীমতী নামায়োয়ের মুরলী বাঁশী সারা গ্রীসের অধিবাসীকে পাগল করে তুলেছিল। Demetiam Polyocroton গ্রীসে তার নামে একটি মন্দির স্থাপনা করেন। এবং বিশ্ববিখ্যাত (Thebe) থিবের Ismonius বলেছেন যে, ভারত থেকেই মুরলী ও বাঁশুরী প্রভৃতির data (ডাটা) আনানো হয়েছিল ইজিপ্টে—এবং ইজিপ্ট থেকেই গ্রীসে তা আমদানী হয়।

মুঘল রাজত্বের পূর্বে ভারত বারবার বাইরের শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে গ্রীস ও আরবের কাছে। এঁরা যে শুধু এ-দেশের মণি-মাণিক্যই লুটে নিয়ে গিয়েছিল তা নয়—এরা দেশের সৌন্দর্যময়ী নারী, গায়িকা, বড় বড় পণ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানীদেরও ধরে নিয়ে যেতে ভুল করেনি। মামুদ গজনি ১৭বার ভারত আক্রমণ করে, যখন ভারতীয় সম্পদ লুটে নিয়ে যায় তখন সে ভারতীয় সুন্দরী, গায়িকা, সংগীতজ্ঞ, জ্যোতিষাচার্য, মনীষী, গুণী ও জ্ঞানী কারোকেই ছেড়ে যায়নি। ঐতিহাসিকরা লিখছেন—'তৎপরে মামুদ বোগদাদ ও তুর্কি-স্থানের রাজাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এই সমস্ত মণি-মাণিক্য প্রদর্শন করাইলেন। গ্রীস ও রোমকদিগের আমন্ত্রণ করিয়া ভারতীয় বিদুষীদের নৃত্য, কলা ও সংগীত পরিবেশন করাইলেন। বড় বড় ভারতীয় জ্যোতিষীদিগকে রাজ্য হিসাবে ভাগ করিয়া উপঢৌকন দিলেন—।" আরও লিখেছেন—"থানেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনকালে মামুদ দুই লক্ষ পুরুষ ও স্ত্রী বন্দী করিয়া লইয়া যান। ইহাদের মধ্যে বহু ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীও ধরা পড়েন। ইহাদের আগমনে গজনী নগর ভারতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।"

এইভাবে ভারতের কৃষ্টি ও সম্পদ ভারতের বাইরে প্রথম পারস্যে পরে আরবে ছড়িয়ে পড়ে—সেখান থেকে ইজিপ্টে যায় এবং পরে গ্রীসে ও রোমের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজেই ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্য নিয়ে কোন বাদানুবাদ চলে না। সেই আদি সংগীত মুসলমানী প্রভাবের ফলে এক নবতর রূপ নিল। আধুনিক সংগীত সমাজ তাকেই বললেন ক্লাসিক, এই ক্লাসিক কৃষ্টি নিয়ে দেশের রথী-মহারথীরা দেশে বিদেশে নিজেদের গুণপনা দেখাতে বিশেষ ব্যস্ত অথচ যা আসল ভারতীয় তা পড়লো পেছিয়ে—আবর্জনার মত পড়ে রইল পুরনো বইয়ের ধূলাপড়া পাতার ফাঁকে।

আদি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন বিহীন হলো, কারণ তা অর্থকরী পর্যায়ে পাংক্তি পেলো না। কতগুলি গ্রন্থের পাতার কারাগারে আজও যদি তা মাথা খুঁড়ে মরে তবে ভারতীয় কোন্ সংগীত-সম্পদ

সবাই বলে ভারতের সংগীতের ইতিহাস বড়ই জটিল। mythological period কে ছেড়ে দিয়ে বাস্তব পুরাকালীন পুস্তক পর্যালোচনা করলে ভারতীয় সংগীতের পূর্ণ রূপ আজও অনুধাবন করা যায়। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি কি আসল ভারতীয় সংগীতের সন্ধান দেবে না?

ভরতাচার্যের সংগীত নৃত্যাকার, দামোদরের সংগীত দামোদর, শার্ঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর, মৈথিলভীষ্ম মিশ্রের গীতসংকর, শ্রীনিবাসের রাগতত্ত্ব-বিরোধ, চিমবোস্মনভূপালের সংগীত রাঘব, হরিভট্টের গীত প্রকাশ ও সঙ্গীত কলানিধি, পুণ্ডরীক বিটবলের রাগমঞ্জরী ও রাগমালা ও সংগীত-নৃত্য রত্নাকর, বিমলের—রাগ-চন্দ্রোদয়, ক্ষেমকর্ণের রাগমালা, জীবরাজ দীক্ষিতের রাগমালা, গন্ধর্বরাজের রাগ রত্নাকর, মঙ্গল পুত্র সোমের রাগবিরোধ, সোমনাথের রাগ-বিরোধ বিবেক, কমললোচনের সংগীত চিন্তামণি, নারায়ণের সংগীতনারায়ণ, অহোবলের সংগীত-পারিজাত, বেদের সংগীত পুষ্পাঞ্জলি, কুম্ভকর্ণ মহিমেন্দ্রের সংগীত-মীমাংসা ও সংগীতরাজ, দেবেন্দ্রের সংগীত মুক্তাবলী, মম্মটের সংগীত-রত্নমালা, সোমরাজদেবের সংগীত রত্নাবলী, কৈবল্যাশ্রমধুতের সংগীত শাস্ত্র, তুলজীরাজের সংগীত সারামৃত, রামানন্দতীর্থের সংগীত সিদ্ধান্ত, ভীমনরেন্দ্রের সংগীতসুধা, সিংহ-ভূপালের সংগীত সুধাকর, সদাশিব দীক্ষিতের সংগীত সুন্দর, কমললোচনের সংগীতামৃত, সুধাকলশের সংগীতোপনিষদ ও সংগীতো-নিষৎসার ইত্যাদি থেকেও কি স্বাধীন ভারত আদি ভারতীয় সংগীতের রূপ খুঁজে পাবেন না?

এ ছাড়াও কয়েকটি নামহীন বিশিষ্ট গ্রন্থ রয়েছে যাতে ভারতীয় সংগীতের আদ্যোপান্ত ইতিহাস পাওয়া যায়—তা হচ্ছে—রাগধ্যানাদি কথনাধ্যায়, রাগপ্রসার, রাগ-রাগিণী স্বরূপবেলা-বর্ণন, রাগলক্ষণং, রাগবিবেক, রাগানাং স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার বর্ণনং, রাগার্ণব, রাগোৎপত্তি, সংগীতকল্পদ্রুম, সংগীত কৌমুদী, সংগীত-মকরন্দ, সংগীতরত্ন, সংগীতরাগ লক্ষণ, সংগীত-শিরোমণি, সংগীত সাগর, সংগীতসার, সংগীত সারসংগ্রহ, সংগীতার্ণব, ইত্যাদি।

এই সকল গ্রন্থে নাদ ও নাদোৎপত্তির প্রকার শ্রুতিবিবরণ, বাদ্যবিবরণ, গ্রামবিবরণ, মূর্চ্ছনা, কূটতান, রাগবিবরণ, ঋতুভেদে রাগিণীর বিনিয়োগ বিবরণ, রাগাদির ধ্যান, নর্তন প্রকরণ এবং সংগীত শাস্ত্রোক্ত বহু বিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়—যা থেকে ভারতীয় সংগীত সম্পদের আসল রূপ নিরূপিত হওয়া দুঃসাধ্য নয়।

হিন্দী ভাষায় কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রচিত "রাগসাগরোদ্ভব কল্পদ্রুম নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রাগ-মুসলমানী যুগের সংগীত আলোচনার একটি উৎকৃষ্ট উপাদান বলা যায়।

আমাদের সংগীত মহল এক দারুণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যেমন একদিন হিন্দু সমাজ ছিল। ফলে, তা খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তেমনি আজকের সংগীত সমাজের এই কুসংস্কার অদূর ভবিষ্যে নিষ্পেষিত হবে বলেই বিশ্বাস করি।

শিল্পে, চিন্তায়

। বংশীধারী দাস ।

আকাশ থেকে রং দু হাতে মুছে ফেলে
বিষাদে ম্লান ছায়া দুঃসময়
ছড়িয়ে যায় যদি, ভ্রূকুটি বিদ্রূপ
কুটিল মেঘে মেঘে কীর্ণ হয়,
অথবা নির্মম দু'হাতে ছেঁড়ে যদি
আলোর কুঁড়িগুলি অন্ধকার,
জ্বালাও চেতনায় আত্মক্ষয়ী আলো
জ্বালাও মোমবাতি যন্ত্রণার।

যদিও চারপাশে জীর্ণ পাতা আর
হলদে ফুল ঝরে অনাদৃত,
তিরিশ ভাদ্রের হাওয়ার আর্তিতে
অকৃতী যৌবন সমর্পিত,
তবুও, হে জীবন, জীর্ণ পাতা আর
ধুলোয় খোঁজো সুখী সমন্বয়,
শিল্পে, চিন্তায় আলোর প্রস্তুতি
আঁধারে করো, ভোলো হতাশা, ভয়।

জগতে সহজসাধ্য মূল্য উপার্জনে সক্ষম হলে আর চায় না গবেষণার দ্বারে করাঘাত করতে। কিন্তু পুরাতনী পাতা না উল্টে দেখলে, ভারত কোনদিনই তার নিজস্ব স্বাতন্ত্রিক গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। যা শাশ্বত যা চিরন্তনী তার প্রকাশ অনিবার্য।

পরিশেষে আরও একটু ইঙ্গিত দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে—সংগীত সমাজপতিদের ক্লাসিক পর্যা ধার্য করা। ধ্রুপদ ও খেয়াল ব্যতীত এ'রা কোন সংগীতকেই ক্লাসিক পর্যায়ে ফেলতে চান না। অথচ যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বসাহিত্য বা কলাক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাসিক লেখক, কলাবিদ, সাহিত্যিক বা কবিরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে ক্লাসিক পর্যায় উঠে যান। যেমন কবি কালিদাসও ক্লাসিক কবি আবার মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এমনকি সত্যেন দত্ত, কাজী নজরুল পর্যন্ত ক্লাসিক পর্যাভুক্ত হয়ে গেছেন তাঁদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। কিন্তু সংগীত ক্ষেত্রে তা হবার জো নেই। সেই পুরাতন সনাতনী প্রথায়—'ভদ্রলোকের এককথা'—হিসাবে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই এ'রা ঠুংরী, টপ্পা, টপখেয়াল, ভজন, গীতাংভজন, বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী বা রবীন্দ্র সংগীতকে ক্লাসিক অধ্যায় স্থান দেন না। অথচ ক্লাসিক মানে class by itself-ই বলা চলে—অর্থাৎ যে সংগীত নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেই স্বপ্রকাশ—এবং যুগাবর্তেও যা হারিয়ে যাচ্ছে না—বা তার নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলার ক্ষমতা রক্ষা কচ্ছে। ক্লাসিক অধ্যায়ে কেন যে এগুলি স্থান পায় না—বা সংগীত কর্তারা স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করেন—সে বিষয়েও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মনের রং

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

তবু হাতে হাত রেখে ধীরে
ছবি আঁকা সন্ধ্যায় যদি
চোখে নামে সিন্ধুর ছায়া,
তোমার হৃদয় হয় নদী;

আলোর পাখিরা অবশেষ
জাফরাণী বিকেলের প্রাণ—
বুঝেও বুঝি না আকাশের
বুকে ঢাকা কতো অভিমান।

বাদল করেছে মেঘ। দেখে,
পরবাসী, সবুজের মায়া;
কী কথা বলেছে মন, জানো?
প্রতিপলে ভাবনার ছায়া।

তবু হাতে হাত রাখি ধীরে,
বকুলের বুকে নির্বাস;
পৃথিবী আদিম বাহু পাশে
কাছে এলে কোকিলের আশ।।

সাধারণ

গোরাচাঁদ নন্দী

জীবনকে যদি ভালবেসে থাকো একান্ত
তোমার সহিষ্ণু ধৈর্যের দিগন্ত ছাপিয়ে,
তাহলে পরপারে প্রবেশিকার অগ্নিপরীক্ষায় দিন
সত্যের যে শিখা জ্বলবে,
তার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবে
মানবতার বুকফাটা চাপা কান্না চোখের জলে।
আর তার জয়গানের দামামা তৈরী হবে
তদানীন্তন মহাজনদের চকচকে চামড়ায়।

"— — ভাই ভাই" জয়ন্ত আচার্যের সৌজন্যে

এ নহে কাহিনী

(২৮০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রইল। তারপর এক সময় ঘরে ফিরে এল। সমুর অংকের বই-খাতা টেবিলের উপর পড়ে আছে আর মনস্তত্ত্বের বইখানির পৃষ্ঠার আড়াল থেকে ছন্দাকে লেখা চিঠিখানি উঁকি মারছে। সুজিত চিঠিখানা টেনে বার করল। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে লিখতে বসলো।

ছন্দা সেদিনে বলেছিল বটে। ওর বাবা মা, সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখছেন। ...নীচে থেকে ওদের কুকুরটা ডেকে উঠেছে। অকারণেই সুজিত চমকে উঠল। কিন্তু তাদের কোকিলটাও প্রায় সংগে সংগে ডাকতে সুরু করেছে। চমকের ঘোর কেটে গিয়ে দোলা লাগে তার মনে।

নতুন করে চিঠি লেখা শেষ না হতেই মার ডাক এল। খেতে বসতে হবে। দেরি করা চলবে না। এই একটি ব্যাপারে সুনন্দা একেবারে 'সাহেব'। সংসারে সকলেই একথা জানে। অন্যথা হবার যো নেই। বাবার কথা আলাদা। তাঁর খাবার বরাবরই ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। তাঁর জন্য এইটিই নিয়ম।

সুজিতকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয়। যাবার আগে আর একবার ও বাড়ীর ছাদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখল। কিন্তু বৃথা।

খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়িই শেষ করল সুজিত। সুনন্দা কম খাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেন। মাকে যাহোক একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে সে উঠে পড়ল। যাবার আগে সমুকে বলল, রাত্রেই তোর অংকগুলো করে রাখবো কাল সকালে বুঝে নিস। সমু আর একবার কৃতার্থ হয়ে গেল। সুনন্দার চোখে মুখে সন্দিগ্ধ বিস্ময়। ছেলেকে ভাল করেই জানেন সুনন্দা। সুজিত চলে যেতে তিনি সমুকে জিজ্ঞেস করেন, কি বলে গেল তোর দাদা? কিসের অংক করে দেবে সমু?

সমু আজকের সান্ধ্য অভিযানের কথা মাকে সবিস্তারে বলে গেল। সুনন্দা কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শুনে গুম হয়ে রইলেন। ভাল মন্দ কিছু বললেন না।

সমু বলে, দাদার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমাকে রোজ পড়াবে বলেছে।

সুনন্দা একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে চেষ্টা করে সহজ হয়ে বললেন, ভালই তো।

সমু উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকে, তখন তুমি দেখে নিও মা, কত ভাল নম্বর আমি তুলবো।

সুনন্দার চোখে জল দেখা দিল। মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো সুন্দর আর মিষ্টি হাসি। সমুকে স্নেহভরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলেন, তাহলে কত যে খুশী হবো বাবা সে তুই বুঝবিনে সমু।

প্রতিবাদ জানিয়ে সমু বলে, আমি জানি মা।

সুনন্দা বিস্ময়ের ভাণ করে বলেন, তাও জানিস তুই সমু? তারপরেই কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে মনে মনে বলতে থাকেন, আর জানবিনেই বা কেন। অবস্থাই তোদের বুঝতে শিখিয়েছে।

[illegible] মার মনের কথা পড়তে পারে না— মুখের কথার জবাব দেয়, সত্যিই আমি জানি মা।

সমুর উক্তিকে মেনে নিয়েই সুনন্দা তাকে থামিয়ে দেন। কি জানি কেন সমুর এই কথাগুলি আনন্দের চেয়ে ব্যথাই দেয় সুনন্দাকে।

সাধারণ ঘরের মেয়ে সুনন্দা। লেখা পড়া সামান্য করেছেন। একটা অসম্ভব রকমের আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই তিনি করেন নি—তাই বলে কোন দিন রঙিন স্বপ্ন তিনি দেখেন নি, কিম্বা একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন সংসারের ছবি মনে মনে কোনদিন আঁকেন নি একথা বললে ভুল বলা হবে।

আর আর দশজনা মেয়ের মত তিনিও কল্পনা করতেন। আপন অন্তরে তাকে লালন করেছেন, পালন করেছেন, প্রাণদান করেছেন, কিন্তু তাঁর মনের চেহারার সংগে বাস্তবের মিল খুঁজতে গিয়ে বারে বারেই তাঁকে হতাশ হতে হচ্ছে। হয়তো এইটেই সংসারের নিয়ম। রঙ পাল্টায়, চেহারা বদলায়, সুরের পরিবর্তন ঘটে। তাই সমু যা ভাবে সুজিতের সে কথা মনেও আসে না। একদিনের সত্য আর-একদিন মিথ্যে হয়ে যায়। যদিও এর কোনটাই অর্থহীন নয়—মূল্যহীন নয়। তবু মন মানে না। অনুযোগ আর অভিযোগের কালমেঘ ঘনিয়ে আসে।—সত্য কথা বলতে কি স্বামীর কাছ থেকে সুনন্দা কিছু কম পান নি। কিন্তু সে পাওয়ার মধ্যে তাঁর তরুণী মনের বহুমুখী ক্ষুধা আর আকাঙ্ক্ষাই ছিল সীমাবদ্ধ। অন্য চিন্তা তখন ছিল গৌণ। আজ সেদিনের তরুণী হয়েছেন মাতা। তাই দেহের উপর আর মনের উপর একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আগাগোড়া বদলে গিয়েছেন সুনন্দা। বদলানটাই স্বাভাবিক—প্রকৃতির ধর্ম। কিন্তু তাঁর নিজের বেলায় যেটা প্রাকৃতিক ধর্ম—সন্তান সন্ততির সম্বন্ধে এর অন্যথা কেমন করে আশা করা যায়। হয়তো সেই কারণেই সুনন্দা থেমে গেছেন। মন যা চায় তা না পেলেও প্রকাশ্যে অভিযোগ দেন না। শুধু মায়ের কর্তব্য পালন করে যান। বিশেষ করে সমু যে নিতান্তই বালক—একান্ত নির্ভরশীল। তাই ওকে ঘিরেই সুনন্দার ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু কতখানি তিনি করতে পারেন। তাঁর নিজের ইচ্ছাও যে অপরের শক্তি এবং অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল—।

সমু অনেকক্ষণ ধরে তার মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে চেয়ে ছিল। মার এই ভাবান্তরের কোন সহজ অর্থ সে খুঁজে পেল না। আস্তে আস্তে ডাকল, মা... ওমা......।

সুনন্দা বর্তমানে ফিরে আসেন। বলেন এখন তোর খাওয়া হলো না সমু?

সমু বলে, খাওয়া তো আমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে মা।

সুনন্দা বলেন, তাহলে চুপ করে বসে আছিস কেন?

সমু উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে বলে, তোমার কি হয়েছে মা?

সুনন্দার বুকের ভিতরটা দুলে ওঠে। বিস্মিত হন সমুর প্রশ্নে। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে হেসে জবাব দেন, কিছু হয়নিতো সমু।

সমু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করে, তুমি ঠিক বলছো [illegible]

সুনন্দা হেসে বলেন ওরে [illegible]।

সমু চলে যায়।

●

পরদিন সকালবেলা অংক বুঝে নিতে এসে প্রচুর উপদেশ শুনেই সমুকে বিদায় নিতে হয়েছে। মুখ কালো করে বই খাতা নিয়ে ফিরে আসবার মুখে মায়ের সংগে তার দেখা। সমু একবার ছলছল চোখে মুখ তুলে [illegible] ব্যাপারটা বুঝে নিতে সুনন্দার দেরী হলো না। কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার [illegible] বোধহয় সময় হয়নি সমু? নিজেই চেষ্টা করে দেখো। হলে হবে, না হলে হবে না। [illegible] দাপটের সংগেই তিনি রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

কুকুরের পরিচর্যারত অলক গাঙ্গুলী একবার মুখ তুলে দেখে পুনরায় নিজের কাজে মন দিলেন।

সমু মায়ের এই অকারণ উষ্মার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে অপরাধীর মত মুখ করে সরে পড়ল।

●

এমনি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির ভিতর দিয়েই এই সংসারটা চলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হোঁচোট খেয়ে থমকে দাঁড়ালেও চলাটা অব্যাহত ছিল। ইতিমধ্যে সুজিত বি-এ পাশ করে একটা চাকরীও যোগার করে নিয়েছে। অনেকদিন পরে অলক গাঙ্গুলী হাসিমুখে স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন, বুঝলে নন্দা এইবার একটু এপাশ-ওপাশ করবার সুযোগ পাব।...কিন্তু এই সুযোগ পাবার আগেই সুজিত বাপ-মায়ের অজ্ঞাতে পাশের বাড়ীর ছন্দা সাহাকে রেজিষ্টারী করে বিয়ে করে চলে গেল।

সুনন্দা মনে মনে বললেন, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু প্রকাশ্যে ভাল-মন্দ একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না। আর অলক গাঙ্গুলী দিন কয়েক স্ত্রীর উপর খুব একচোট হম্বি-তম্বি করে শেষ পর্যন্ত রাগ করে আর একটা কুকুর কিনে নিয়ে এলেন।

সংসার আবার যথানিয়মে চলতে থাকে। সুনন্দাকে নিয়মিত রান্না করতেও হয়। সেই রান্না খেয়ে অলককে অপিস যেতেও হয়। সমুকেও তার ভাগের কাজগুলি পূর্বের মতই করতে হয়। শুধু সুজিতের নাম ভুলেও কেউ মুখে আনেন না। একমাত্র সমুই মাঝে মাঝে চুপি চুপি দাদার পরিত্যক্ত ঘরে এসে বসে থাকে। পরীক্ষার পরে দাদা তাকে রোজ রোজ পড়াবে বলেছিল। ও বাড়ীর ছন্দাদিদির জন্যই সব গোলমাল হয়ে গেল। দাদার জন্য সমুর মন কাঁদে। মার মুখের পানে তাকাতে আজকাল ভয় করে। মা আর সে মা নেই। বদলে গেছেন। ভালমুখে একটা কথাও আর বলেন না। যেন সব দোষ সমুর।...তার পানে মা আর আগের মত ফিরে দেখছেন না—ছোট বোন টুনুই যেন তাঁর সব। তাকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত।

বাড়ীতে যে লোক আছে তাও বুঝবার উপায় নেই। সবাই যেন থেমে গেছে। শুধু ময়নাটার কথা আর কুকুর দুটোর চীৎকার [illegible] [illegible]। টুনু দিনরাত তার [illegible]

অলককে সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। রাত্রে বাড়ী ফেরেন আরও দেরি করে। সমু অত রাত্র পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না।

ওদের জীবনযাত্রার বর্তমান ধারাটাই সকলে একপ্রকার রপ্ত করে নিয়েছিল। অন্ততঃ বাইরে থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একটা চাপা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল তা হঠাৎ প্রকাশ পেল সমুর ক্লাশ প্রমোশন না পাওয়াকে কেন্দ্র করে। সমু নিজেও অবাক হয়ে গেল প্রগ্রেস রিপোর্ট হাতে পেয়ে। অঙ্কে সে অবিশ্বাস্য রকম বেশী নম্বর পেয়েছে। আর যে ইংরাজী আর বাংলায় সে এতদিন সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে এসেছে তাতে করেছে ফেল। কোথাও কোন গোলযোগ হয়েছে ভেবে সে প্রধান শিক্ষকের শরণাপন্ন হলো, কিন্তু সহানুভূতির পরিবর্তে প্রচণ্ড ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত মার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। তুমি মা বাবাকে একবার হেড স্যারের কাছে যেতে বলো।

মা ধৈর্যসহকারে শুনে জানালেন, তিনি বলবেন। কিন্তু বলার পরিণামে যে বালক সমুর ভাগ্যে এতখানি নিপীড়ন ঘটবে একথা সুনন্দা একবারও ভাবতে পারেননি। পারলে হয়তো চুপ করেই থাকতেন।

কথাটা শেষ হতেই আগুনে ঘি পড়ল। অলক গাঙ্গুলীর অন্তরের চাপা আগুন একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনে ঝলসে ক্ষত-বিক্ষত হলো সমু। সুনন্দা যেন পরের হয়ে গেছেন। একটি কথাও বললেন না, একবারও প্রতিবাদ করলেন না। শুধু মাতালের মত টলতে টলতে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যার আশ্রয় নিলেন।

অলক গাঙ্গুলী হাত-গুটিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন, দুধ-কলা দিয়ে আমি আর সাপ পুষতে পারবো না। একটা গেছে তুমিও যাও। এ বাড়ীতে জায়গা হবে না।

সমু যেন কাঁদতেও ভুলে গেছে। এতক্ষণ ধরে যে এতবড় একটা ঝড় তার উপর দিয়ে চলে গেল একথাটাও যেন সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ অলক গাঙ্গুলীর ক্ষিপ্ত চীৎকারে সমু চমকে উঠল। এখনও দাঁড়িয়ে আছিস আমার চোখের সুমুখে। দূর হয়ে যা। কোন দিন আর মুখ দেখাস না। যা বেরিয়ে যা—

সমুর বুকের ভিতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। ব্যথিত অসহায় দৃষ্টিতে একবার পিতার রুদ্রমূর্তির পানে তার পর ঘরের রুদ্ধ দরজার পানে চেয়ে দেখে টলতে টলতে রাস্তায় এসে সে দাঁড়াল। একবার ছন্দাদের বাড়ীর দিকেও চেয়ে দেখল। সেই মুহূর্তে হয়তো একবার তার দাদার কথা মনে পড়ল। সমু এগিয়ে চলল। কোথায় তা সে জানে না।

সমু দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই অলক গাঙ্গুলী আত্মস্থ হলেন, ধীরে ধীরে একটা অজ্ঞান ভয় তাকে বিচলিত করে তুলল। না জেনে-শুনে এতখানি রূঢ় ব্যবহার করা সংগত হয়নি। একবার মনে হলো ছুটে গিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু 'আমি' বোধ তাঁকে থামিয়ে রাখে। কোথায় আর যাবে—পেটের জ্বালায় আপনিই ফিরে আসবে। তাছাড়া মাঝে মাঝে একটু আধটু শাসনেরও প্রয়োজন আছে। যুক্তি কিন্তু মন মানে না সে ছেলের পিছু পিছু ধাওয়া করে। বারে বারেই সমুর বেদনা-ক্লিষ্ট নির্বাক মুখখানি চোখের সম্মুখে ফুটে উঠছে। নিঃশব্দে ছেলেটা মার খেয়েছে নিঃশব্দেই পিতার আদেশ পালন করতে চলে গেছে। অলক অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকেন। ক্ষণপূর্বে ধৈর্য হারিয়ে যে কাণ্ডটি করেছেন তার সমর্থন এই মুহূর্তে আর নিজের কাছেও পাচ্ছেন না। বরং একটা বোবা-কান্না বুকে ঠেলে কণ্ঠ পর্যন্ত উঠে আসতে চাইছে।

অলক আজ আর অপিসে গেলেন না। দশটা বাজতেই জামাটা মাথা-গলিয়ে বার হয়ে গেলেন। বারটা পর্যন্ত দরবার করে শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, সমুর অনুমানই ঠিক একের নম্বর অপরের নামে বসিয়ে এই বিভ্রাট করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দুঃখ জানিয়ে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন আর অলক গাঙ্গুলী সেই থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাগলের মত সম্ভব অসম্ভব সর্বত্র খুঁজে ফিরেছেন সমুকে, কিন্তু বৃথা। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুকে ডেকে এনে পাখী আর কুকুর দুটো তাকে দান করে অপরাধীর মত বাইরের রোয়াকে গিয়ে বসে রইলেন। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছেন। ……

সারাদিন পরে সুনন্দা দরজা খুলে বার হয়ে এলেন। যন্ত্রচালিতের মত সংসারে কাজ করে যেতে লাগলেন। সামান্য কিছু রান্নাও করলেন কিন্তু অলক তা মুখে তুলতে পারলেন না। ক্লান্ত অবসন্নভাবে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঘুমুতে পারলেন না। একটি চিন্তাই তাঁকে পাগল করে তুলেছে। ভগবান জানেন ছেলেটা এখন কোথায়……অলক নিজেকে ধিক্কার দেন।

রাত বেড়ে চলেছে। সুনন্দার চোখেও ঘুম নেই। বারে বারে উৎকর্ণ হয়ে কিছু যেন শুনবার চেষ্টা করছেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস সমু আসবে। যেখানেই যাক রাত্রে মার পাশে শুয়ে তার গায়ের উপর একখানা হাত না রেখে একটি দিনও সে ঘুমুতে পারে না।

এই মাত্র বারটা বাজল। সমু এখনও ফিরে এল না। এতক্ষণের অপেক্ষা এখন ভয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তবুও মুখ ফুটে একটি কথাও তিনি স্বামীকে বললেন না। বলবেনও না!

সারাদিন স্বামী কি করেছেন কোথায় ছিলেন সুনন্দা তা জানেন না। জানবার আগ্রহও তাঁর নেই। তাই বলে কর্তব্যে তাঁর অবহেলা নেই। নইলে বুকের মধ্যে এতবড় একটা হাহাকার লুকিয়ে রেখে তিনি স্বামীর জন্য রান্নার ব্যবস্থা করতে পারতেন না। কি হবে অভিযোগ আর অনুযোগ দিয়ে। যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছেন সে যে আর ফিরে আসবে না একথা সুনন্দার চেয়ে বেশী করে আর কে জানে। তবুও অন্তরে ব্যথা পান স্বামীর সব ব্যাপারে নির্বাক ঔদাসীন্য দেখে।

…বাইরে একটা শব্দ হলো না…সুনন্দা কান পেতে রইলেন। হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন দ্রুত হয়ে উঠেছে। উঠে বসেছেন সুনন্দা। তারপর লঘুপদে অগ্রসর হয়ে খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আর কোন সাড়া নেই। কি জানি হয়তো সুনন্দা ভুল শুনে থাকবেন। শূন্য দৃষ্টিতে তিনি আকাশের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন।…

সদর দরজায় আবার শব্দ হলো। সুনন্দা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে মুখ বাড়াতেই তাদের পুরানো অ্যালসেসিয়ানটার সাক্ষাৎ মিলল। ফিরে এসেছে কুকুরটা। আজই সন্ধ্যায় ওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুনন্দার বুক ভেঙে একটা নিঃশ্বাস পড়ল। দরজা খোলা পেয়েও কুকুরটা ভিতরে প্রবেশ করল না। ল্যাজ নেড়ে আর ঘর ঘর শব্দ করে কিছু যেন বলতে চাইছে।

অলক দূরত্ব বজায় রেখে স্ত্রীকে অনুসরণ করে অদূরে অপেক্ষা করছিলেন। কুকুরটার ভাব-ভঙ্গী দেখে তাঁর সন্দেহ হওয়ায় এগিয়ে গেলেন। মনিবকে কাছে পেয়ে দু-পা উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করল তারপর কাপড় কামড়ে ধরে কিছুদূর আকর্ষণ করে ছেড়ে দিয়ে নিজে এগিয়ে চলল। অলক নিঃশব্দে সঙ্গে চলেছেন। সুনন্দা উদাস-দৃষ্টিতে তাদের চলার পথের পানে চেয়ে রইলেন।

রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা বাড়ীর বাইরের রোয়াকের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে সমু। কুকুরটা এসে থামল সেখানে। ঘুমন্ত সমুর চোখের কোলে অশ্রুচিহ্ন তখনও স্পষ্ট। অপরাধীর দৃষ্টিতে খানিক পুত্রের মুখের পানে চেয়ে থেকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অলক ডাকলেন সমু—

একটি ডাকেই লাফ দিয়ে উঠে বসল সমু এবং সম্মুখে পিতাকে দেখে [illegible] গেল।

অলক আবেগরুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় ডাক দিয়ে সমুর হাত ধরে তাকে বুকের কাছে টেনে নিতেই সমু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এতবড় অভাবিত ব্যাপার সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

কুকুরটা একবার পিতা একবার পুত্রের মুখের পানে চেয়ে দেখে ডেকে উঠল, ভৌ, ভৌ—অলক সেই অবস্থায়ই কুকুরের মাথার উপর একখানি হাত রেখে বললেন, বাড়ী চল্—

পিতা ও পুত্রকে নিয়ে কুকুরটা ফিরে এসেছে। অলক সমুকে নিয়ে কুণ্ঠিতপদে ঘরে প্রবেশ করলেন। সুনন্দা তখনও সদর দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, কুকুরটা কিন্তু অন্যত্র যায়নি, সুনন্দার পাশেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। সেইদিকে নজর পড়তেই সদরে খিল তুলে দিয়ে বসে পড়ে কুকুরটাকে তিনি প্রচণ্ড আবেগে বুকে চেপে ধরলেন। সুনন্দার এতক্ষণের অবরুদ্ধ কান্না অকস্মাৎ পথ পেয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

শ্রেষ্ঠ

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই এ-সংসারে,
সত্যের তপস্যা জেনো শ্রেষ্ঠ চরাচরে,
লোভ আর আসক্তিতে যত দুঃখ পাও,
ত্যাগের চেয়েও সুখ পাবে না কোথাও।

।মহাভারত।

প্রেত-তত্ত্ব, আত্মা-তত্ত্ব ও আত্মশক্তি

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষ দেহ মন ও আত্মা দ্বারা গঠিত। দেহ দ্রব্যজাত অর্থাৎ পদার্থ দ্বারা গঠিত—ইহা নশ্বর। মনও দ্রব্যজাত তবে স্থূল দ্রব্যজাত নহে—ইহা সূক্ষ্ম। আত্মার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই,—

"জন্ম মৃত্যু নাহি আত্মার, 'আছে' কি 'হইবে না' কি 'নাই'—এ তো নয়,
আত্মা নিত্য শাশ্বত পুরাণ, দেহ নাশে
ইহা বিনষ্ট নাহি হয়।" [গীতা ২।২০]

দেহ মধ্যে যে আত্মা থাকে তাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি—ইহা পরম আত্মা বা ভগবানের অংশ। গীতা ১৫।৭-এ আছে "সনাতন আমার অংশ দেহে জীবাত্মা হয়ে......."। যেমন সমগ্র সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির কিছু অংশ বাষ্পকণা আকারে পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে, সেইরূপ অনন্ত আত্মার কণা বা অংশ ভিন্ন ভিন্ন দেহে জীবাত্মা হইয়া ছড়াইয়া আছে [একাংশেন—গীতা ১০।৪২]—জলকণা যেরূপ বহু ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রে ফিরে সেইরূপ জীবাত্মা জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া পরম আত্মায় ফিরিতেছে—আবার নূতন জীবাত্মা নূতন জলকণার ন্যায় অনন্ত হইতে বাহির হইতেছে। গীতা ১৫।৮-এ মৃত্যুতে মন সম্বন্ধে আছেঃ—

"দেহস্থিত জীবাত্মা যখন ছাড়ি চলি যান
এই দেহ হতে,
লয়ে যান মন-ইন্দ্রিয়, বায়ু যথা
লয় গন্ধ আধার হতে।"

অর্থাৎ পার্থিব দেহ ত্যাগ করিবার সময় বিদেহী আত্মা (বা জীবাত্মা) মন ও মনের অংশ চিৎ বুদ্ধি অহংকার লইয়া যান। আবার আত্মাই দেহ চালু রাখেন—আত্মা দেহত্যাগ করিলে দেহ নষ্ট হইয়া যায়।

মৃত্যুর পর বিদেহী-আত্মা (বা জীবাত্মা) পৃথিবীর জীবিত লোকের সহিত সংলাপ করিতে সক্ষম কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আমরা দেখি যে বহুদেশে বহু ধর্মে এইরূপ সংলাপের দৃষ্টান্ত আছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা সত্য দর্শন করিয়া (বা অপর পারের সত্য দেখিয়া) বেদ প্রণয়ন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মহর্ষি ব্যাস নদীতীরে একটি অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে মৃত ব্যক্তিরা জল হইতে উঠিয়া তাহাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েন এবং রাত্রিশেষে চলিয়া যান। ইহার ভাবার্থ এই যে আত্মা যে কেবল চিরস্থায়ী তাহা নহে, অনুকূল কারণে জীবিত ও মৃতের মধ্যে [সঠিকভাবে বলিতে হইলে, শরীরী ও অশরীরীর মধ্যে—কারণ যাহাদের আমরা "মৃত" বলি তাহারা সত্য সত্য মরে নাই] সংলাপ সম্ভব। ভারতের বাহিরেও বাইবেল (Bible) প্রভৃতি বহু গ্রন্থে অশরীরীর সঙ্গে সংলাপ, অশরীরী দর্শন, অশরীরীর দয়ায় ব্যাধিমুক্ত, জীবিতের দেহে অশরীরীর ভর প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে বুঝায় যে, সুবিধামত বা অনুকূল কার্যকলাপে এইরূপ সংলাপ সম্ভব হয়। ভারতীয় যোগী ও তান্ত্রিক, চীনদেশের টাও-পন্থীরা [Tao-ist] তিব্বতীয় লামা ও অন্যান্য দেশের ভৌতিক তত্ত্ববিদেরা অসাধারণ ও অসম্ভব সাধন করিতেন বা করিতে পারেন—কিন্তু **যেটা সীমার মধ্যে অসাধারণ বলিয়া মনে হয়, অনন্তমধ্যে বা অসীমে সেটা নিয়মাধীন ও সম্ভবপর।**

যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা আত্মাতত্ত্ববিৎ ছিলেন—পল ও পিটারের ভর হইলে অসাধারণ উক্তি করিতেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি সাধকেরা অন্তরের মধ্যে বাণী শুনিতে পাইতেন। অনেক কবি বা দার্শনিক এইরূপ বাণী শুনিতে পান। বাঙলার কবি জয়দেব উপযুক্ত ছন্দ (বা ভাব) খুঁজিতে-ছিলেন, স্নান সমাপনে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে তাঁহার পুঁথিতে উপযুক্ত ছন্দ লেখা রহিয়াছে—সেই ছন্দটি সর্বোৎকৃষ্ট। একজন ব্যারিষ্টারকে জানি, তিনি একটি অশরীরী আত্মার বাণীমত উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিতেছেন। নিখুঁতদর্শী জ্ঞানীরাই প্রেততত্ত্বে আত্মার অবিনশ্বরতা এবং দৃশ্য ও মর-জগতের মধ্যে যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখেন।

পাশ্চাত্য দেশের পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতিতে লোকে এতই উন্মত্ত যে তাহারা আত্মিক দৃশ্যকে বিদ্রূপ করে, তথাপি তথায় বিদেহীর সহিত সংলাপ চলিতেছে। স্যার আর্থার কনান ডয়েল, বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ প্রভৃতি মনীষিগণ এ সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। স্যার আর্থার কনান ডয়েল জীবদ্দশায় বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্ভবপর হইলে জানাইবেন এবং এ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা যেমন বৈজ্ঞানিক ক্রীড়া দেখিয়া সত্য অনুভব করেন, আমার মনে হয় তেমনি আত্মিক-সংলাপে ধর্ম সম্বন্ধে ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমরা সত্য অনুভব করিতে পারি। অবশ্য আত্মা-সংলাপের ভাল মন্দ দুই দিকই আছে—আমাদের দেশে তান্ত্রিকদের মারণ, সংঘাটন প্রভৃতি, তিব্বতে রোলাং, পুরবা, চড় প্রভৃতি, কিম্বা আফ্রিকা বা অন্য দেশের ভৌতিক সাধন প্রভৃতি বহু অনিষ্ট-কর দিক আছে। আবার প্রায় সকল ধর্মেই উপকারার্থে আত্মিক শক্তির প্রয়োগ, যোগীদের বিভূতি, খৃষ্টের পাপীদের উদ্ধার ও পঙ্গুদের আরোগ্য করা, শোকাতুর আত্মীয়দের সান্ত্বনা ও মৃত আত্মীয়ের সংযোগে শোকমুক্ত করা—এ সমস্ত সাধারণ উপকার নহে! **আত্মা-তত্ত্বের ভালর দিকও আছে। পূজা ও প্রার্থনায় ফল আছে।** আমাদের দেশে মন্ত্রকে সজীব করিতে হয়—ইহাতে যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়, আবার এইরূপ সঞ্জীবন করাতে মন্ত্রের শক্তিও বৃদ্ধি পায়—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। পূজায় দেবদেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়--ঠিকমত হইলে মন্ত্রশক্তিতে সজীবতা আনে। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন মন্দিরে দেব বা দেবী জাগ্রত—অর্থাৎ সেখানকার কার্যকলাপে জাগ্রতভাব বা সজীবতা আনিয়াছে। মন্ত্রশক্তির প্রভাব নূতন নহে। গীতায় আছে যে, যজ্ঞ দ্বারা মানুষ দেবতাদের সাহায্য করিবে, তাহাতে দেবতারা মানুষকে সাহায্য করিবেন—এইরূপে পরস্পর সাহায্যে উভয়েরই বৃদ্ধি ও উপকার হইবে। [গীতা ৩।১১]

মৃতের দেহে আত্মার প্রবেশের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। **স্বামী শঙ্করাচার্য তান্ত্রিক মন্দন মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করিলে মন্দন মিশ্রের বিদুষী স্ত্রী ভারতী বলেন যে, স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক, সুতরাং ভারতীকে পরাজয় না করিতে জয় সাব্যস্ত হইবে না। স্বামী শঙ্করাচার্য ইহাতে স্বীকৃত হইলে, সুচতুর ভারতী তাঁহাকে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। সন্ন্যাসীর ঐ বিষয়** কোন জ্ঞান না থাকায় **স্বামী শঙ্করাচার্য এক** মাসের সময় লহেন। স্বামী শঙ্করাচার্য পর্বত-গুহায় নিজ দেহ শিষ্যদের জিম্মায় রাখিয়া সদ্য-মৃত অমরুক নামক একজন রাজার দেহে প্রবেশ করেন ও উক্ত রাজার বহু সংখ্যক রাণী ও নর্তকীর সঙ্গে থাকিয়া ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। এদিকে উক্ত রাজার মন্ত্রীরা ও রাণীরা দেখেন যে, রাজা পূর্ববৎ নহেন—অসাধারণ মেধাবীযুক্ত। তাঁহারা ঠিকই অনুমান করেন যে, কোন যোগীর আত্মা মৃত রাজার দেহে ভর করিয়াছেন ও যোগীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই এই দেহ ত্যাগ করিয়া যোগী নিজদেহে ফিরিবেন। যেখানে যত সমাধিগ্রস্ত যোগীর সজীব দেহ থাকিবে তাহা ভস্মসাৎ করিবার হুকুম দেন, কিন্তু স্বামী শঙ্করাচার্য ঠিক সময়ে নিজদেহে ফিরিয়া আসেন। অশরীরী আত্মা জীবিত মানুষের দেহে ভর করিয়াছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। প্রেত-চক্রের দৃশ্য যাহারা দেখেন তাহাদের দেহ এইরূপ ভরের উপযুক্ত—মধ্যস্থ ব্যক্তি বা মিডিয়ামের দেহ প্রেতের ভরের উপযোগী।

চিন্তাধারার একাগ্রতা ও গাঢ়তায় অসাধারণ ও অলৌকিক ফল হয়। তিব্বতে একটি গল্প আছে যে, সেরূপ ভক্তি ও গাঢ়তা থাকিলে এমন কি কুকুরের দাঁত হইতেও জ্যোতি বাহির হয়। তিব্বতী এক ব্যবসায়ী ভারতে আসিতেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে ভারত হইতে বুদ্ধের কোন নিদর্শন আনিতে বলেন। তিনি দুইবার তাহা ভুলিয়া যাইলে তাহার মাতা খুব দুঃখিত হন। তৃতীয় বারেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিতে ফিরিতে স্মরণ হওয়ায় পথিপার্শ্বের একটি কুকুরের কঙ্কাল হইতে একটি দাঁত তুলিয়া আনিয়া তাহার মাতাকে দেন ও বলেন যে উহা বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্রের দাঁত। তাহার মাতা ও গ্রামের সারা লোক খুব ভক্তি ও একাগ্রতায় সেই দন্তের পূজা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, উহা হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে। রামায়ণ যুগে

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় শক্তি প্রকাশ করিলে বশিষ্ঠের তপ শক্তিতে [বা আত্মার শক্তিতে] সে সমস্ত ধ্বংস হয়। একালেও এই সেদিন মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত আত্মার শক্তি সঞ্চয়ে ইংরাজদের রাজশক্তি খর্ব হয়। তপ ও অভ্যাসের দ্বারা আমরা নিজেকে উন্নত করিতে পারি—নিজের পরিণাম ও পরকাল রচনা করিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ভগবান বলিতেছেন:—

"অভ্যাস-কৌশলে মন অনন্য হয়ে
স্মরিলে আমায়,
হে পার্থ, চিন্তাতে তবে দিব্য
পরম পুরুষকে পায়।" [গীতা ৮।৮]

"দেবপূজক দেবলোকে যায়,
পিতৃপূজক পিতৃলোকে যায়,
ভূতপূজক ভূতলোকে যায়,
আমার যাজক আমাকে পায়।"
[গীতা ৯।২৫]

ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষার লোক ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়—যার যতটুকু জ্ঞান তার ততটুকু ক্ষমতা:—

"যুক্ত আমারে শ্রদ্ধায় ও নিবিষ্টচিত্তে
ভজে যাহারা।
হইয়ে নিত্যযুক্ত, আমার মতে যুক্ততম তাহারা।
আর যাহারা সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে জিতেন্দ্রিয়,
অপরিবর্তনীয়, অনির্দিষ্ট ও সর্বব্যাপী আমার
অচিন্তনীয় অব্যক্ত মূল জানি,
নিশ্চলে ধ্যান করে,
তারা সর্বভূত হিতে রত থাকি পাইবেন
আমারে।
অব্যক্তের সাধকদের অধিক ক্লেশ ভোগই হয়,
কেন না, দেহধারীদের অব্যক্তচিন্তা
ক্লেশেই হয়।"

অর্থাৎ দেহধারীর পক্ষে দেহ-হীনের (অর্থাৎ অব্যক্ত) চিন্তা কষ্টসাধ্য, বিশেষতঃ স্তবে ও প্রার্থনায় যাঁহার স্তব ও প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মন ন্যস্ত করিয়া ধ্যান করিতে হয়। এইজন্য প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে মনে মূর্তির উদয় হয়। হয় তো সেইজন্য অনেক ধর্মে আছে যে, ভগবান নিজের মূর্তির অনুরূপ মানুষকে গড়িয়াছেন। বোধ হয় এইজন্য অধিকাংশ হিন্দু ব্যক্তরূপের উপাসনা করে—পরম ভগবানকে সমগ্রে চিন্তা করা সাধ্যাতীত, সেইজন্য ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেব বা দেবী আকারে পূজা করে। ভগবানের কার্যকরী শক্তিকে (Executive force in Nature) অনেকে চণ্ডীদেবী জ্ঞানে পূজো করেন এবং বিপদ-আপদে চণ্ডীদেবীর সপ্তশত শ্লোক সঠিক ও সজীবভাবে পাঠ করিয়া ফল পান।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্মনীতি, ভৌতিক অনুষ্ঠান ও মিশ্রিত রীতি চালু আছে। অন্তেষ্টিক্রিয়ার ও মৃত্যুর সময় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে মৃতের যেন পরকালে ভাল হয়। মৃত্যুতে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া আত্মা বাহির হইলে পুনর্জন্ম হয় না। তাই তিব্বতে মৃত্যুযাত্রীর কাছে এক প্রকার অনুষ্ঠান করে—একজন লামা "হিক্, হিক্" বলে ও একজন "ফট্" বলে ও অনুষ্ঠান করে যাহাতে তাহার আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ফট্ করিয়া ভেদ করিয়া বাহির হয়। জঙ্গলি দেশে বহু ভৌতিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও তাহাতে তাহাদের কাজও হয়। আফ্রিকার একজন মহাপুরুষ ভারতে আসিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এখন দেহরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অশরীরী আত্মা তাঁহার একমাত্র শিষ্যের মধ্যস্থতায় আসেন ও বহুলোকের উপকার করেন—রোগীদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেন, আর্তের সাহায্য করেন, শোকার্তদের মৃত-আত্মীয়দের সহিত সংলাপ করান, দীক্ষা পাইবার উপযুক্ত লোকদের দীক্ষা দেন ইত্যাদি। শীলমোহরে বন্ধ করা খামের ভিতর প্রশ্ন থাকিলে, খাম না খুলিয়া উহার ভিতর উত্তর দেন ও প্রয়োজন হইলে উহার ভিতর রোগমুক্তির জন্য মাদুলিও দেন। মৃতের সহিত সংলাপে, মৃত-ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে হস্তাক্ষর ছিল সেই হস্তাক্ষরে লেখা আসে। চক্ষুর সামনে অদৃশ্য হস্তে পেন্সিল সোজা হইয়া উঠিয়া লিখিতে দেখিয়াছি। মৃত ব্যক্তির ছবি আসিতেও দেখিয়াছি। পূজার ফুল নৃত্য করিতে দেখিয়াছি ও তাহা হইতে মাদুলি প্রভৃতি আসিতে দেখিয়াছি। আমার ২০ বৎসরের (১৯২৬-৪৬) দুরন্ত জাপানি রোগের এইভাবে ঔষধ পাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছি ও অন্যকে সেই ঔষধে আরোগ্য করিতেছি। এই সমস্ত আত্মাশক্তির ভালর দিক। আবার প্রেততত্ত্বে অনিষ্ট সাধন করা খারাপ দিক। আমাদের দেশে মারণ সংঘাটন, বানচালা প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠান আছে—অন্য দেশেও এইরূপ আছে। সারা পৃথিবীতে এইরূপ বহু প্রেততত্ত্ব ও ভৌতিক প্রথা পাওয়া যায়। মিশরের বালক রাজা টুটান খামেনের [Boy-King Tuten Khamen] গোরস্থানে নিম্নতম সতর্কবাণী ছিল:—

"উপর ও নিচের অশরীরীগণ, ভীতি প্রদর্শক অশরীরীবর্গ, অন্ধকারে বিচরণকারী ও নির্জন পথের ভ্রমণকারী অশরীরীগণ, পাশ্চাত্যের, পাতালের, নক্ষত্রলোকের আলো-ছায়ার মাঝে ভীতিপ্রদ ও গুহাস্থিত অশরীরীগণ, যাহারা ত্রাস ও কম্পন আনেন তাঁহারা, নিশাচরগণ ও যাহাদের নাম লইতে ভয় হয় তাহারা, গোরস্থানের বাসিন্দারা, সকলে আমার পক্ষে হউন। যে কেহ আমার গোরস্থান অপবিত্র বা হস্তক্ষেপ করিবে তাহাকে বিনষ্ট করুন, তাহার যেন সেই হস্ত শুকাইয়া যায়, সে যেন বিনষ্ট হয়।"

আশ্চর্যের বিষয় যাহারা উক্ত গোরস্থানে হস্তক্ষেপ করার সম্পর্কে ছিল বা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই হঠাৎ ও শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

যে সমস্ত কার্যে কষ্ট বেশী, কিন্তু ফল অল্প সে-সব করায় লাভ নাই। ২৫ বৎসর ধরিয়া কৃচ্ছ্রসাধনকারী একটি সাধুকে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করেন যে, অতদিনের কৃচ্ছ্রসাধনে কি লাভ হইয়াছে। উত্তরে সাধু গর্বভরে বলেন যে, তিনি হাঁটিয়া নদী পার হইতে পারেন। বুদ্ধদেব বলেন, "মাত্র এইটুকু। দেখিতেছি—এত সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছেন, কারণ, কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে যে কোন মাঝি নদী পার করিয়া দিবে।"

প্রেত সংলাপ বা বিদেহী-সংলাপের বহু দিক আছে—সীমাছাড়া হইলে কুফল ফলিবে। তাহা ছাড়া ভূতুরে কাণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণতঃ ওঝার দ্বারা যাহা হয় তাহা ত্যাজ্য। তান্ত্রিক বা অন্যান্য ক্রিয়ায় অনিষ্ট করা পাপ। এ সবকে ভৌতিকতা [Spiritism] বলে। ভগবানই পরম আত্মা—সুতরাং আত্মাতত্ত্ব [Spiritualism] বলিলে উচ্চাঙ্গের আত্মার সহিত আলাপ বা ভগবানের সহিত যোগাযোগ বুঝায়। আমরা যেন সুমহান আত্মাতত্ত্বের নামে ভুল বুঝিয়া প্রেততত্ত্বে বা ভৌতিকতায় উন্মত্ত না হই। হয় তো প্রথম প্রথম ঠিক বুঝিবার জন্য একটু একটু প্রেততত্ত্ব দেখিয়া আত্মাতত্ত্বের চেষ্টা করা খারাপ না হইতে পারে, কিন্তু প্রেততত্ত্ব ও আত্মাতত্ত্বের সীমানা না বুঝিয়া প্রেততত্ত্বে মাতিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। ভগবানই পরম আত্মা—ভগবানকে উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ "দিব্য-জীবন" [Life Divine] নামক পুস্তকে একস্থানে এ সম্বন্ধে যাহা আভাস দিয়াছেন তাহার সারার্থ—

"আমাদের অন্তরকে জাগ্রত করিবার একটি উপায় হইতেছে আত্মার সহিত সংলাপ, যাহাতে অন্তরের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, যাহাতে আমরা পরম (বা অনন্ত) আত্মার যে সত্তা আছে তাহার সন্ধান পাই। আমাদের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন ("মামৈবাংশ" গীতা ১৫।৭) তাহা যেন অনন্ত আত্মার সহিত যুক্ত হইতে পারে—ইহা অনুভব করিবার জন্য যেন আমরা নূতন পথের পথিক হই। এইরূপ হইবার জন্য অন্তরের এই দ্বার খুলিবার জন্য, (১) ধর্ম, (২) আত্মার সহিত সংলাপ, (৩) ধর্মচিন্তা ও (৪) আত্মস্ফূর্তি বা আত্মার শক্তি এই চারিটি উপায়ে আমরা অগ্রসর হইতে পারি—প্রথম প্রথম এই সব কয়েকটির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে কিন্তু শেষে প্রথম তিনটিকে বর্জন করিয়া কেবল আত্মাচেষ্টায় বা আত্মার শক্তিতে পরমাত্মা পাইতে হইবে।"

এখানে একটি কথা বলা যাইতে পারে। যোগের দ্বারা অসাধারণ ক্ষমতা হয়। পদার্থ (material) ও আত্মায় (Spiritualism) যে কত তফাৎ তাহা যোগে বুঝাইয়া দেয়। পদার্থের কার্যাবলী ও গুণ যোগে অকেজো করিয়া দেয় ও প্রমাণ করায় যে আত্মাই আসল। যোগসাধনের প্রথম পুরস্কার বিভূতি লাভ—অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা। কোন কোন যোগী এই ক্ষমতা পাইয়া তন্ময় হয়—তাহাদের আর উন্নতি হয় না। ভগবান পাইবার একান্ত বাসনায় উন্নতির পথে যায়, কিন্তু বিভূতি পাইয়া ভগবানকে বা উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না।

মোট কথা, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ (গীতা ১৫।৭)। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা মৃত্যুর পর নিজ নিজ উন্নতিমত মনোবৃত্তি পায় (গীতা ১৫।৮) —সেই অশরীরী জীবাত্মার সংযোগ ভাল কি মন্দ তাহা সেই জীবাত্মার মনোভাব বা উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যেমন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রভেদ সেইরূপ অশরীরী সংলাপ ও আত্মাতত্ত্বে বা পরমাত্মার ধ্যানে প্রভেদ। প্রথম প্রথম চেষ্টায় জীবাত্মা-সংলাপে অন্তরকে জাগ্রত করা যাইতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত বাণীমত আত্মার সহিত সংলাপে সুবিধা হইতে পারে কিন্তু আসলে আত্মার শক্তিতেই পরমাত্মা লভ্য।

উৎপাত

আমিনুর রহমান

অমরদার বৈঠকখানায় সেকালের জাপানী দেওয়াল ঘড়িটায় বিশ্রী শব্দে ঢং-ঢং করে রাত এগারটা বাজতেই গনাইমামা হাতের তাশ ফেলে দিয়ে তক্তপোষের ওপর থেকে তড়াক করে নেমে পড়ে বললেন, চুলোয় যাক তোমার 'থ্রী নো ট্রাম্প'—দশটার মধ্যে বাড়ী না ফিরলে গিন্নী দরজা খুলবে না বলে দিয়েছে।

অমরদা তখনও হাতের মেলা তাশের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, আঃ বস-না গনাইমামা, এগারটা যখন বেজেই গেল তখন না হয় তোমার বড়জোর বারটা বাজবে—যাই বল 'থ্রী হার্টসের' খেলা তোমার নেই, 'ডবল' দিলে পালাবার পথ পাবে না।

এদিকে গনাইমামা বাঁ-পার চটি কোন রকমে ডান পায়ে গলিয়ে আর এক পায়ে ভোম্বলের এক পাটি 'মোকাসিন' পরে রাস্তায় নেমে হন-হন করে হাঁটতে সুরু করে দিয়েছেন। দরগা রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে পার্কের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন। সামনে গ্যাস-পোস্টের আড়ালে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে।

'কি আপদ, এত রাত্রে কোন আবাগী পথে বেরিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।' আপন মনে বকতে বকতে গনাইমামা এগিয়ে গেলেন মেয়েটার দিকে। ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটিকে আপাদমস্তক চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, উঁহু ব্যাপার মোটেই সুবিধে ঠেকছে না—কাঁচা বয়েস, সুশ্রী চেহারা, গায়ে গয়নাও আছে—এভাবে নির্জন রাস্তায় একা ফেলে রেখেও যাওয়া যায় না। বলি ও খুকী, তোমার কি হয়েছে, এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কাঁদো কেন?

মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢেকে আরো বেশী করে কাঁদতে লাগলো। গনাইমামা নিজের টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, যা বাবা—মেয়ে যে কেঁদেই সারা, কার মেয়ে, কোথায় বাড়ী না বললে তোমার বাড়ী পৌঁছবার ব্যবস্থা কি করে করব?

মেয়েটি কান্নার বেগ কমিয়ে বলল, আমি বাড়ী যাব না—বাড়ী গেলে মা আমাকে খুব মারবেন।

গনাইমামা অবাক হয়ে বললেন, কি সর্বনাশ, মা মারবেন বলে বাড়ী ফিরবে না? কেন কি এমন অপরাধ করেছ যে, তোমার মা মারমুখো হয়ে আছেন?

একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটি বলল, আমাদের কলেজের একটা মেয়ের বাড়ীতে প্রায়ই যাই বলে মা রাগ করেন, বলেছিলেন আর কোনদিন গেলে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবেন।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে গনাইমামা মন্তব্য করলেন, সহপাঠিনীর বাড়ীতে গিয়েছ তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে যার জন্য তোমায় শাস্তি পেতে হবে? এ তোমার মার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি।

চুলের ফিতেটা আঙ্গুলের ডগায় জড়াতে-জড়াতে মেয়েটি মাথা নীচু করে বলল, আমার বান্ধবীর দাদার মোটরে চড়ে মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাই কি না তাই মা রাগ করেন। আজ গান্ধীঘাটে গিয়েছিলুম—পথে মোটরের ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এত রাত্রে বাড়ী ফিরলে মা আমাকে ভীষণ মারবেন।

গনাইমামা গম্ভীরভাবে বললেন, হুঁ, এতক্ষণে বুঝলুম রোগটা কোথায়। তা বাপু, তুমি ত আর ছেলেমানুষ নও। কলেজে পড়, এটা ত বোঝ যে মা যা বলেন, তা তোমার ভালোর জন্যই বলেন। মার কথা শুনলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়। যাক্‌গে এখন চল তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। গুন্ডার কবলে পড়ার চাইতে মার কাছে দু-চার ঘা খাওয়া ঢের নিরাপদ। চল, চল, এদিকে আবার রাত করে বাড়ী ফেরার জন্য আমার কপালেও অনেক দুর্ভোগ আছে।

মেয়েটি কিন্তু এক পাও নড়ল না। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, আমি বাড়ী যাব না, মা খুব মারবে, আমার মাকে ত আপনি চেনেন না। দশটা গুন্ডাকে যতটা না ভয় করি তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করি মাকে। আপনি যদি কথা দেন যে, মা মারতে এলে আপনি বাধা দেবেন তাহলে আপনার সঙ্গে যাব।

গনাইমামা একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মার সঙ্গে ত আর আমি হাতাহাতি করতে পারব না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে তিনি তোমায় না মারেন। আমার গিন্নীর সঙ্গে আঠারো বছর ঘর করে দজ্জাল মেয়েদের কি করে সামলাতে হয় সে অভিজ্ঞতা আমার খানিকটা হয়েছে। আমার গিন্নীকে ডাঁশা পেয়ারা দিলে রাগ পড়ে যায়—তোমার মার যদি ঐ রকম কোন উদ্ভট সখ থাকে তাহলে বাপু আমি এই রাতদুপুরে তা জোগাড় করতে পারব না। চল, আর দাঁড়িয়ে থেক না, যা-হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেনে-টেনে এক-পা দু'পা ক'রে মেয়েটি এগোতে লাগল। গনাইমামা আর থাকতে না পেরে খপ্ করে তার হাতটা ধরে নিয়ে এক রকম হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। পথ চলতে-চলতে জেনে নিলেন, মেয়েটির নাম বেলা এবং তার বাবার নাম সুনীল দত্ত, প্রেসে চাকুরী করেন। বিনা আপত্তিতে কিছু দূর হাঁটবার পর বেলা তার গতি মন্থর করে ফেলল এবং শেষ পর্যন্ত শক্ত খুঁটির মত দাঁড়িয়ে পড়ল। গনাইমামা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আবার কি হল?

বেলা তখন রীতিমত বলির পাঁঠার মত কাঁপতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গনাইমামা বেশ বুঝতে পারলেন যে, সে তার বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। যে রকম গোঁয়ার্তুমি সুরু করেছে তাতে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভবপর হবে না বরং বেশী জবরদস্তি করলে পাড়ার লোকেরা উল্টো বুঝে তাঁকেই আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে পুলিশের হেপাজত করে দেবে। বেলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে গনাইমামা বললেন, চল মা, ভয় কি? আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, তোমার মাকে আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলব যাতে তিনি তোমায় না মারেন।

বেলা আবার গুটি গুটি চলতে সুরু করল এবং একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ীর সদর দরজার সামনে গিয়েই আবার পেছু হটে এলো এবং পালাবার উদ্যোগ করল। তার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখে গনাইমামা দরজায় ঘা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, পোড়ারমুখীর রাত বেড়ানো হল? গলায়

দাড়ি জুটলো না তোর? গঙ্গায় জল কি শুকিয়ে গেছে? কোন মুখ নিয়ে তুই বাড়ী ফিরলি? আজ তোকে মেরে আধমরা করে না ফেলি ত কি বলেছি। দাঁড়া তুই, মুড়ো ঝাঁটাটা হাতে নিয়ে তবে দরজা খুলব।

এদিকে বেলার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বুকের মধ্যে তার হাদ পেটানো চলছে। সে গনাইমামাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, যাতে মায়ের প্রথম সম্ভাবণে তার রক্ষাকর্তাই না পালিয়ে যান। সশব্দে দরজা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা দরজার বাইরে এসে গনাইমামাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, ও-মা, এ-মুখপোড়া মিনষেকে আবার কোত্থেকে জুটিয়েছে! তিনকাল যেতে বসেছে, ও ছুঁড়ির বাবার বয়সী হবে, আর তুমি কি না রাতদিন আমার মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোটরে করে হাওয়া খাইয়ে আনো। দাঁড়াও তোমার হাওয়া খাওয়ার সখ জন্মের মত ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

বলতে না বলতে ঝাঁটা উঁচু করে ভদ্রমহিলা বিদ্যুৎ বেগে গনাইমামাকে আক্রমণ করলেন। ঝাঁটাটা পিঠের ওপর পড়বার আগেই তিন লাফে গনাইমামা রাস্তার ধারের ডাস্টবিনের আড়ালে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভীষণ ক্ষেপে রণচণ্ডি-মূর্তি নিয়ে ভদ্রমহিলা তাড়া করে গেলেন এবং দুজনে মিলে ডাস্ট-বিনের চারধারে ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরপাক খেতে লেগে গেলেন। বেলা চিৎকার করে উঠল, মা, মা, ওঁকে মেরো না, ওঁর কোন দোষ নেই।

বেলার মা মুখঝামটা দিয়ে বললেন, না দোষ নেই, একটা কাঁচ মেয়েকে বেড়াবার নাম করে নিয়ে গিয়ে রাত-দুপুরে বাড়ীতে পেঁাছে দিতে আসবে তাকে মারবে না, শিকেয় তুলে রাখবে। আগে বিটলে শয়তানের বাপের নাম ভুলিয়ে দিই তারপর তোমার ওষুধ হচ্ছে।

গনাইমামা বেতো শরীর নিয়ে এত দৌড়-ঝাঁপ কখনও করেন নি, একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছেন। একটা ডাস্টবিন মাত্র আড়াল করে উদ্যত মুড়ো-ঝাঁটা থেকে আত্মরক্ষা করতে যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এরই ফাঁকে হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, আপনি শান্ত হোন ভদ্রে, আপনি যা ঠাওরেছেন আমি তা নই। আপনার মেয়েকে বাড়ী পেঁাছে দিতে আসা আমার ঝকমারি হয়েছে।

কে কার কথা শোনে! মহিলাটি সমানে যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলেন এবং শপাং শপাং করে ডাস্টবিনে, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঝাঁটার বাড়ি মারতে লাগলেন, অবশ্য প্রত্যেকটি গনাইমামাকে লক্ষ্য করে মারা হয়েছিল। ইতিমধ্যে হৈ-চৈ শুনে আশপাশের বাড়ীর জানালায় ছেলে, বুড়ো মেয়ে-মরদের ভীড় জমে গিয়েছে, চাপা হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

বেলা তখন মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে মার হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, মা তুমি কি পাগল হলে? ও ভদ্রলোককে আমি আদৌ চিনি না। তোমার মারের ভয়ে আমি পার্কের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম বলে উনি দয়া করে আমাকে বাড়ী পেঁাছে দিতে এসে-ছিলেন। তুমি সব কথা না শুনে এমন চেঁচা-মেচি আরম্ভ করলে যে চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা এতক্ষণে নিরস্ত হলেন। বার-কয়েক নিজের মেয়ের দিকে আর গনাইমামার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, যা ওঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসা, সব কথা ভালো করে শুনে দেখি। পাড়ার লোকের ত মরণ হয় না, কোথাও একটু খুট্ করে শব্দ হলেই অমনি হুট্পাট্ করে সব তামাশা দেখতে আসে।

গনাইমামা তখনও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে খোঁচা লেগে খুলে যাওয়া কোঁচাটা সামলে নিতে নিতে বেলাকে বললেন, তোমার মা ডাঁশা পেয়ারাকেও হার মানিয়েছেন, একেবারে ঝুনো নারকোল। এই বুড়ো বয়সে তোমার মার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় হয়েছে।

ঘরের মধ্যে গিয়ে গনাইমামার মুখে সব কথ শোনার পর ভদ্রমহিলার যত রাগ গিয়ে পড়ল মেয়ের ওপর। বেলার হয়ে অনেক ওকা-লতি করলেন গনাইমামা এবং তাকেও ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন যে, এ বয়সে মায়ের অবাধ্য হলে কি ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে। অনেক-ক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর মেয়েটি কথা দিল যে সে আর কোন দিন মার অবাধ্য হবে না এবং মাও গনাইমামার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মেয়েকে ক্ষমা করলেন।

এদিকে রাত্রি যত বাড়ছে গনাইমামা ততই উস-খুস করছেন। বেলার মা মেয়ের প্রসঙ্গ ছেড়ে তার বাবার কথা পাড়লেন। প্রেসে সুনীলবাবুর নাইট ডিউটি। কেবল শনিবার দিন বাড়ীতে থাকেন। মেয়েটাকে আদর দিয়ে বেয়াড়া করে ফেলেছেন, এখন তাকে সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। শেষ পর্যন্ত গনাইমামা যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। তাঁকে বাড়ীর বাইরে পেঁাছে দিয়ে ভদ্রমহিলা নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য পুনরায় ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, শনিবার রাত্রে অবশ্যই আসবেন, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।

পরদিন যথারীতি গনাইমামা খেয়ে-দেয়ে অফিস চলে গেলে গনাই-গিন্নী ঘরদোর গোছাচ্ছেন এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে দেখেন বোস গিন্নী। ইনি থাকেন দরগা রোডে কিন্তু লোয়ার রেঞ্জ পর্যন্ত সকল গৃহেই তাঁর অবাধ গতি। গনাই-গিন্নী বিশেষ পাত্তা দেন না বলে এ বাড়ীতে তাঁর গতায়াত খুব কম। বোস গিন্নী তাঁর পান-দোক্তা রঞ্জিত দাঁতগুলি যথাসম্ভব বিকশিত করে আদিখ্যেতার সুরে বললেন, এই যে, দিদি কাজ-কর্ম সব সারা হল বুঝি? আর ভাই নানা ঝামেলায় মাঝে মাঝে এসে যে খবরাখবর নেব তার উপায় নেই। খবর সব ভাল ত?

গনাই গিন্নী কোন উত্তর দিলেন না, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বোস গিন্নী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাবছ বোধ হয় আজ কি মনে করে তোমার বাড়ীতে এলুম। আসতে কি চেয়েছিলুম, কর্তাই জোর করে পাঠালেন। বললেন, পাড়ায় থাকি, হাজার হোক একটা দায়িত্ব আছে ত—চোখে ঠুলি বেঁধে আর কানে ছিপি এঁটে ত আর বাস করিনে—সব দেখে-শুনে তাই আর চুপ করে থাকতে পারলুম না—কর্তা বললেন অতকরে তাই সাত-সকালে ছুটে এলুম।

গনাই-গিন্নী অবাক হয়ে শুনছেন আর ভাবছেন কি মতলব নিয়ে এসেছেন বোস গিন্নী। আসল কথাটা না বলে কেবল ভনিতাই করে যাচ্ছেন দেখে গনাই গিন্নী বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, আমার হাতের কাজ সব পড়ে রয়েছে, আপনি কি বলতে এসেছেন—চট্পট্ বলে ফেলুন ত।

বোস গিন্নী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন, হ্যাঁ ভাই, বলব বই-কি, বলবার জন্যই ত এতটা পথ এলুম।

আমি ত ভাই নিজের চোখ কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। কর্তা বলছিলেন—সমাজ কোন রসাতলে যেতে বসেছে, তা না হলে এও কি সম্ভব। বেচারা ভালমানুষ স্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে বদমায়েস স্বামী কি কাণ্ডটাই না করে বেড়াচ্ছে। কাল থেকে শুধু ভাবছি, কালে কালে হল কি—কি ঘেন্না, কি পাপ! কর্তা বলছিলেন—

গনাইগিন্নী এক ধমক দিয়ে বললেন, চুলোয় যাক কর্তা, কি হয়েছে তাই বলুন।

ধমক খেয়ে বোসগিন্নী বেশ ঘাবড়ে গেলেন, কয়েকটা ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, রাগ কোর না বোন, সবই ভাগ্য, তা না হলে এমন করে কারও কপাল পোড়ে। সংসারে নিরীহ স্ত্রী খেটে খেটে গতরে ঝাঁঝরা পড়িয়ে ফেলল আর ওদিকে বুড়ো মিন্সে তার মেয়ের বয়সী এক ছুঁড়িকে নিয়ে রাত-দুপুরে হাওয়া খাইয়ে ফিরে এসে রাস্তার মাঝখানে ঝাঁটাপেটা খায়। রাত-দুপুরে সে কি তুমুল কাণ্ড। সারা দরগা রোডের লোক দেখেছে রাস্তার ওপরে লোকটাকে কি নাজেহালটাই না করল।

গনাইগিন্নী কিছু না বুঝেই মন্তব্য করলেন, বেশ করেছে. অমন লোককে রাস্তায় ফেলে বেইজ্জত করলেই জব্দ হয়।

বোসগিন্নী আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, কই আর জব্দ হল বোন। সে মেয়ে আর মা দুটোই ডাইনী—যাদু জানে—তা না হলে অত কাণ্ডর পর মিন্সেকে আবার খাতির করে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর মা-বেটিতে মিলে তার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে গুজুর গুজুর করল, আবার শনিবার রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল।

গনাইগিন্নী পুনরায় তাড়া দিয়ে বললেন আরে মলো যা, কার কথা বলছেন তাই স্পষ্ট করে বলুন না।

বোসগিন্নী বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালের ওপর দুটো আঙুল রেখে বললেন, ও আমার পোড়া কপাল, এতক্ষণেও বুঝতে পারলে না কার কথা বলছি। এমন নিপট ভালমানুষের কপালে এত দুঃখও থাকে। এতক্ষণ ধরে তোমার বর্ণচোরা কর্তার কথাই হচ্ছিল। এখন ডুবে ডুবে জল খায় যে—

গনাইগিন্নী গর্জে উঠলেন, মিথ্যা কথা, আমার কর্তা তাশের আড্ডায় যায় বটে, কিন্তু ঐ সব নোংরা কাজ কখনই করতে পারে না। আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না।

বোসগিন্নী হতাশার সুরে বললেন, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। কর্তা বললেন যে, জানাশোনা ঘরে এই সব বেলেল্লাপনা হচ্ছে একবার জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এবার তবে উঠি। একবার ডাক্তারগিন্নীর বাড়ী হয়ে যাই।

গনাইগিন্নী কিন্তু অত সহজে বোসগিন্নীকে ছেড়ে দিলেন না। গত রাত্রে তাঁর স্বামীর নৈশ অভিযানের সমস্ত তথ্য তিনি বিশদভাবে জেনে নিলেন—মেয়ের নাম, বাড়ীর নম্বর, রাস্তায় ডাস্টবিনের অবস্থান কিছুই বাদ গেল না। বোসগিন্নী পাশের বাড়ীতেই থাকেন। আড়িপেতে

(শেষাংশ ৩০০ পৃষ্ঠায়)

তিক্ত ঔষধ

(২৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঐতিহাসিক নাটক, তাতে মেয়ের পার্ট কমই। বড় বড় দুটি পার্ট এই মেয়ে দুটিই নেবে। আরও গুটি দুয়েক আছে এবং সেট-কে-সেট কলকাতা থেকেই আনাবার কথা উঠেছিল, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হয় নি। নূতন পরীক্ষা, খরচ আছে বেশ। তবে এটা বাইরে-বাইরেই প্রচার করা হয়েছে। ভেতরের কথা, অর্থাৎ ওপরের যে কয়জন ক্লাবের পলিসি নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁদের মনের কথা, যারা এতদিন মেয়ের পার্ট নিয়ে এসেছে তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার করে ফেলতে চান না। এটা তো একটা পরীক্ষাই. কোন কারণে সফল না হলে আবার তো ওদেরই ভরসা। যাদের একেবারে না হলে চলবে না, তাদের বাকি দুটা পার্ট দিয়ে ঠান্ডা করে রাখা হয়েছে। একটা ড্রামাটিক ক্লাব চালানো আর একটা রাজ্য চালানোয় বিশেষ কোন প্রভেদ নেই তো।

ঐ পলিসিরই অন্যতম ব্যবস্থা হিসাবে ওদের সংগী পুরুষটিকেও একটি পার্ট দেওয়া হয়েছে। পুরুষের পার্ট নেওয়ার লোক যথেষ্ট আছে, তবে ওকে পার্ট দেওয়া সর্তের একটা অংগ। ওই মেয়ে দুটির অভিভাবক হয়ে আসবে। পুরুষ অভিভাবক বলতে যে ধারণাটা মনে উদয় হয়, সে রকম অবশ্য কিছু নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবা একজন। মেয়ে দুটি নাকি খুড়-তুতো-জ্যেঠতুতো বোন; যুবকটি ওদের জ্যেঠতুতো জ্ঞাতিভাই; আর একটু দূরে সম্পর্কের জোরের ছেলে।

পার্ট দেওয়া হয়েছে হীরো। অর্থাৎ নাটকের মূল নায়কের নয়, তবে সাধারণ অর্থে হীরোরই, খুব বীর-রসের একটা লাফালাফি দাপাদাপির ভূমিকা। যুবকের চেহারা আছে। নাম তপেশ।

বড় মেয়েটি, যে নায়িকার পার্ট নিচ্ছে, বছর বাইশ-তেইশের। নাম তমাল। ছোটটির নাম তনু বছর দুয়েকের কম হবে।

তমাল মেয়েটি বেশ সুশ্রী এবং স্মার্ট।

ঠিক হয়েছে ওরা হপ্তায় একবার করে আসবে। শনিবারের রাত্রি এবং রবিবারের দুপুরে রিহার্সেল দিয়ে চলে যাবে। থিয়েটারটা হবে মাস দেড়েক পরে।

মৃগেনদেরই পাড়ায় একটা ছোট্ট বাড়ি খালি পড়ে আছে, যাঁদের বাড়ি তাঁরা মাস দুয়েকেব জন্য বাইরে চেঞ্জে গেছেন। ওরা এলে ঐ বাড়িতে থাকবে ঠিক হয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ির চাকরটাই রেঁধে বেড়ে দেবে, রসদ জোগাবে ক্লাব। রীতিমতো তোয়াজ করতে হচ্ছে।

তবে সার্থকই। তনু আর তপেশ এমন বিশেষ কিছু নয়। তনু মেয়ে, তপেশের চেহারাটা আছে, এই যা ওদের স্বপক্ষে, তবে তমাল একাই যে নাটকটা দাঁড় করিয়ে দেবে এতে আর সন্দেহ নেই কারুর। যেমন ষ্টেজ মানানো চেহারা, তেমনি ষ্টেজ-ফ্রী, তেমনি ডেলিভারি বা পার্ট বলার কায়দা। বইটা ট্রাজেডী, কাউকে যে শুকনো চোখে বাড়ি ফিরতে হবে না, এটা ঠিক।

মেয়েটি এদিকেও ভালো। মেম্বারদের বাড়িতে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ক্লাবের সুবিধা হোত, ভাগাভাগি করে নিঃখরচায় চলে যেত, ওই রাজি হয়নি। তাইতে মনে হয়েছিল বোধ হয় দেমাকে। কিন্তু দেখা গেল মোটেই তা নয়। বেশ মিশুকে এবং আমুদে-আহ্লাদে। ওরা তিনজনে সন্ধ্যার গাড়িতে এসে পেঁছায়, নেয়ে-ধুয়ে একেবারে রিহার্সেলে চলে যায়, আর সময় পায় না। তবে রবিবার সকালে তোয়ের হয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাপ ক'রে আসে। অবশ্য সেধেও নয়, গায়ে পড়েও নয়। ক্লাবের মেম্বারদের সংগে পরিচয় হয়েছে, তাদের তরফ থেকেই নিমন্ত্রণটা। হয়—মা দেখতে চান...স্ত্রী আলাপ করতে চায়, সময় হবে কি সকালের দিকে?

যায় দুই বোনেই শুধু; কাছে হোল তো হেঁটেই, দূরে হোল তো রিকশা ক'রে। এক বাড়ির পরিচয়ে অন্য বাড়ি, তার পর আবার অপর এক বাড়ি। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, অভিনয় তো ব্যবসা নয়; এই করে নাকি দুই বোনের কলেজের খরচ চালাচ্ছে। আলাপ-পরিচয়ে মেয়েদের মধ্যে বেশ খাতির জমিয়ে নিল।

খাওয়ার নিমন্ত্রণও হতে লাগল বার তিনেক আসার পর থেকেই। সেটা অবশ্য তিনজনেরই। ক্রমে যেটা পাকা ব্যবস্থা হিসাবে আগে করা যায় নি, সেইটেই হয়ে গেল পাকা। নিমন্ত্রণটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। বাসায় রান্নার পাট গেল উঠে।

নীরার সংগেও পরিচয় হোল। ও-ত কলেজে পড়া মেয়ে, অভিনয়েও নাম ছিল, সেই একটা সূত্র, তার পর যখন প্রকাশ পেল তমালের, সেই কলেজেরই ছাত্রী, বছর চারেক আগে নীরা সেখান থেকে পাস করে বেরিয়েছে, তখন পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতাতেই গিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমটা এই ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও খুব সূক্ষ্ম একটা কি যেন রইল একটু ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে। মেয়েটির একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, একটা মোহই, তবু দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে বাধছেও একটু, একেবারে আপন ক'রে নিতে পারা যাচ্ছে না। যে মেয়ের স্বামী রোমান্স ভাবাপন্ন তার ঐ এক দুরদৃষ্ট। নীরা নিজে প্রাণখোলা মেয়ে, এই ধরণের মোহে মুগ্ধই হয়ে পড়ে, আকর্ষণে আকৃষ্টই হয়, তবে এ ভাবটা যদি বাড়ির অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে তো বিপদ বৈকি।

তবে এই ব্যবধানটুকু রইলও না বেশিদিন। একটু সজাগ রাখতে হোল দৃষ্টিকে, তারপরেই বুঝতে পারল গোলযোগের কিছু নেই। এদিকে এসে রবিবার সকালের নিমন্ত্রণটা নীরাদের বাড়িতেই একচেটে হয়ে গেছে। নীরাদের ছোট সংসার, তিনজনেই সকালে এসে উপস্থিত হয়, গল্পগুজব জমে ওঠে; তমাল আবার বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটাই যেন একাই পূর্ণ করে রাখে। কিন্তু মৃগেনের মনে যে কোন গলদ নেই, কোন কৌতূহলই নেই বিশেষ ধরণের এটাতে আর কোন সংশয়ই থাকে না নীরার মনে।

বেশ ভালোই লাগে নীরার। সে যে এমন ভাবে স্বামীকে জয় করে ফেলতে পেরেছে, এমন নিরবশেষভাবে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলেছে এতে একটা আত্মপ্রসাদই অনুভব করে। তমালের একটা আকর্ষণ থাকলেও নীরা আর সবার মতো গোড়া থেকেই আমল দেয়নি। এখন দেখছে শেষ পর্যন্ত দিয়ে ভালোই করেছে। কথাটা হচ্ছে, জীবনে মাঝে মাঝে এই ধরণের এক একটা পরীক্ষা হয়ে যাওয়া ভালো।

পরীক্ষায় শিষ্য স-সম্মানে পাস করেছে; গুরু বেশ সন্তুষ্টই। কিম্বা যদি ডাক্তার বলে ধরা যায় তো তাহলেও।। আরও বাড়িয়েই দিল তমালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-টুকু। শেষ রিহার্সেলের দিন ওরা এসে একেবারে নীরাদের বাড়িতেই উঠল। নীরারই বিশেষ আগ্রহে। এলও শনিবার সকালের গাড়িতে। দুটা দিন আগাগোড়া রিহার্সেল দেওয়া হবে বইটা। রবিবার আবার ষ্টেজ রিহার্সেল। দু'টা দিন নীরাদের সঙ্গেই রইল ওরা। খুব হৈ-হুল্লোর মধ্যে কাটিয়ে সোম-বার সকালের গাড়িতে ফিরে গেল কলকাতায়। সামনের শনিবার অভিনয়। দৃষ্টি সজাগই রেখে গেছে নীরা, কোন কিছু গলদ নেই একেবারে।

মঙ্গল গেল, বুধ-বৃহস্পতি গেল। শুক্রবার সকালের ডাকে কলকাতার একটা নামকরা গহনার দোকান থেকে একটা রেজিষ্টারি করা ছোট্ট পার্সেল এসে পেঁছাল, আন্দাজ তিন ইঞ্চি × তিন ইঞ্চি আকারের। মৃগেন একটা কলে বেরিয়ে গিয়েছিল, নীরাই সই দিয়ে নিয়ে নিল। স্বর্ণকারের দোকান থেকে স্বামীর নামে পার্সেল, সহজ সম্বন্ধের অধিকারেই স্ত্রীর একটা আগ্রহ থাকে, খুলে ফেলল নীরা।

তার পরেই তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

একটি বড় রূপার মেডেল।

রূপার মেডেলের নামে বাজারে ছাঁচে-ঢালা যে পাৎলা বাহারকাটা নিকেলের সস্তা মেডেল চলে সে ধরণের নয়। বেশ ওজনদার আসল রূপারই ফরমাসী মেডেল। গোল, একটা টাকার প্রায় দু' গুণ আকারের। কিনারাটা একটা সোনার প্লেট দিয়ে মোড়া। সোনার জল দেওয়া যে না হ'তে পারে এমন নয়, তবে জিনিসটার আভিজাত্য দেখে মনে হয় আসল সোনারই। ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে তো সমস্তটাই সোনার জলের করে দেওয়া যেত।

ভেতরে উৎকীর্ণ লেখাটুকু পড়ে মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল নীরার।

—"কুমারী তনু মিত্রকে—সার্থক অভিনয়ের জন্য—জনৈক গুণগ্রাহী"। গোল করে লেখা। মাঝখানে এই সহরের নাম আর অভিনয়ের তারিখ।

মেডেলটা মুঠোর মধ্যে চেপে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল নীরা। ওর গল্পের এক চক্ষু হরিণের কথা মনে পড়ে গেছে; কবে সেই ছেলেবেলায় পড়েছিল।

স্বামীর রোম্যান্সের নেশাটা তাহলে যায়নি একেবারে!

রোম্যান্স বৈ আর কি? 'সার্থক অভিনয়'এর সংগে তনুর বিশেষ সম্বন্ধ যে নেই এটা আর সবার মতো মৃগেন ভালো রকমই বোঝে। বাকি থাকে রূপ। আছে রূপ তনুরও তবে তমালের ধারে কাছে দিয়েও যায় না। বাকি থাকে একটা জিনিষ; একটু "আহা!"

এই "আহা"-র চেয়ে বড় রোম্যান্স আর নেই। হয়তো তমালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি

রাখার জন্যই মৃগেনের মনটা অরক্ষিত তনুর দিকে গিয়ে পড়েছে। তবু নীরা জানে অবহেলিত সৌন্দর্য পুরুষের চোখে আরও কত গুণ সুন্দর হয়ে ওঠে। বছর তিন হয়ে গেল পুরুষের সঙ্গে অহর্নিশ রয়েছে, জানবে না?

না, রাগ করেনি মোটেই। রাগ কিসের যা স্বাভাবিক, যা নিত্যই হচ্ছে তার জন্যে? কলেজ থেকে যে চল-চপল লঘু জীবনের চর্চা করে এসেছে, একে জব্দ ক'রে, ওকে হাসিয়ে—তাতে আর কিছু না হোক, জীবনটাকে খেলার ছলে, হাসির ছলে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর—ইংরাজীতে ওরা বেশ কথাগুলো দিয়েছে—স্পোর্টিং স্পিরিট......... সেন্স অব্ হিউমার।

একটা কথা। খুব যদি বড় করেই দেখা যায় তো এ একটা পুরুষালি রোগই। একেবারে নীরোগ মানুষ তো চায়ও না ডাক্তারে। হাসি খেলা ছলেই এই তিন বছরে কতকগুলো রোগ তো সারাল নীরা। ভেবেছিল এটাও একেবারে গেছে, দেখছে কিছু আছে অবশেষ। একটা কড়া দাগ আরও দরকার। দিতে হবে আর কি।

অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক হাতড়ে বের করতে হোল ওষুধটা। আজ একটা সুবিধা, স্টেজ তোয়ের আর অন্য অন্য ব্যাপার নিয়ে থাকবে সবাই। মৃগেনকেও ঐ হাঙ্গামা সামলাতে বাইরে বাইরে থাকতে হবে ব'লে গেছে, কোনও এক সময় এসে খেয়ে যাবে। এবার অনেক ছাতু গুলেছে সবাই, তুলতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

নীরা ওদের স্বর্ণকার রামধনকে ডেকে পাঠাল। বলল "দেখো না বিপদ, কালকে থিয়েটার। মেডেলটা দেওয়া হবে, তা একেবারে গোলমাল ক'রে অন্যকার মেডেল পাঠিয়ে ব'সে আছে। কে দিচ্ছে তার নাম নেই; যাকে দিচ্ছে তার নামের জায়গায় অন্য নাম—এক কান্ড! তাও এল কখন্, না শিয়রে সংক্রান্তি করে এই আজকে। ঠিক করে দিতে পারবে তাড়াতাড়ি?

রামধন জানাল—শক্ত আর কি; তবে পালিশটা একটু মার খেয়ে যাবে; কলকাতার পালিশ তো এখানে হতে পারে না।

তা থাক। ঠিক ঠিক পড়াটা তো আসল কথা, পালিশ তো পরে। সেখানে গিয়ে করিয়েও নিতে পারবে।

ভুল সংশোধন ক'রে এক টুকরা কাগজে লিখে দিল—

"ধীর রস অভিনয়ের জন্য—শ্রীতপেশ দত্তকে—জনৈকা মহিলা।"

—খালি পিটটায় এটা লিখে, ওদিকের লেখাটা চেঁচে দিয়ে যতটা হয়। পালিশ। একটু তাড়াতাড়ি দরকার। ঘন্টা-দুয়েক পরে নীরা নিজেই লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবে।

তোয়ের হয়ে এলে নীরা ওটা আবার ভালভাবে প্যাক ক'রে রেজেষ্ট্রি ক'রে ক্লাবের সেক্রেটারির নামে পাঠিয়ে দিল। প্রেরকের একটা কাল্পনিক নাম আর একটা কাল্পনিক ঠিকানা ভেবে বের করতে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হোল না। স্থানীয় পার্সেল, আজ শুক্রবার, কালই পৌঁছে যাবে। এক্সপ্রেস ডেলিভারির বাড়তি মাশুলও দিয়ে দিল।

খুবই ব্যস্ত আছে মৃগেন। প্রায় দুইটার সময় বাড়ী এল খেতে। অডিটোরিয়মের কতকগুলো জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না, আবার এক্ষুণি না বেরুলে নয়। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুমুঠো ভাত-তরকারী গুঁজে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে হাত মুছতে মুছতে মনে পড়ে গেল হঠাৎ—কিম্বা যেন হঠাৎ—প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ—একটা পার্সেল এসেছিল আমার নামে?"

"কিসের?"—নীরা প্রতিপ্রশ্ন করল। "না"—ব'লে আর সোজা মিথ্যা কথাটা বলল না স্বামীর কাছে। আবার গুরুজনও তো।

একটু থতমত খেয়ে যেতেই হ'ল মৃগেনকে, তবে এত তাড়াতাড়ির একটা সুবিধা যে বেশ উত্তর এড়িয়ে যাওয়া যায়। টেবিলে কাচের বাটি থেকে পানটা তুলে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে বলল—"এলে রেখে দিও।"

"দোব।"

—সত্য কথাটাই বলল স্বামীর কাছে। মুখ ঘুরিয়ে একটু হাসলও।

পরদিন এদিকের আয়োজনের হাঙ্গামা অনেকটা মিটে গেছে। মেডেলের চিন্তাটাই প্রধান হয়ে রইল মৃগেনের। একেবারে পোষ্ট অফিস থেকে ডেলিভারি নেওয়া নিরাপদ ভেবে একটা লোক পাঠিয়ে দিল। কে এসে খবর দিল পিওনটা বেরিয়ে পড়েছে। বসেই থাকত বাড়ীতে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট একজন ছেলে পাঠিয়ে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। এ্যামেচার ক্লাবের সমস্যা তো মিটেও মেটে না। এর পর নিরাপদ না হলেও, ফিরে এসে তুলতেই হোল কথাটা—"পার্সেলটা এসেছিল আজ?"

"আজ? কৈ, না তো।"—বেশ সহজ কণ্ঠেই সত্য কথাটা বলল নীরা। বেশ সহজ কণ্ঠে প্রশ্নও করল—"কিসের পার্সেল গা? তুমি যেন কাল থেকে বড় ভাবনায় রয়েছ।"

"দ্যাখো না! একজন মেডেল দেবে, তা আমার ঘাড়ে ভার দিয়েছেন। আজও এল না, এমন ভাবনায় পড়া গেছে!"

"লোকটা কে? মেডেলটা দিচ্ছে কাকে?"

"দিচ্ছে, ঐ যে তনু বলে মেয়েটি, তাকে। নাম প্রকাশ করতে চায় না নিজের।"

"ভীতু!"—বেশ একটু তিরস্কারের টোনেই বলল নীরা; "বাঃ, আমার যাকে পছন্দ তাকেই দোব। এতে ভয় করবার কি আছে কাউকে!"

—টেবিলে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মুখ নীচু করে বলেছিল নীরা। কানে কি রকম একটু লাগতে মৃগেন চেয়ে দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর, হাসলে ওর গালে যে টোলটুকু খায়, ওটা তাই না'কি?

"যাই, কাজ প'ড়ে আছে অনেক"—ব'লে তখুনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়েই চলে যেতে সন্দেহটা বেড়েই গেল মৃগেনের। তবে রইল না বেশিক্ষণ। সেই রাত্রেই প্রেসিডেন্ট স্টেজ থেকে অন্যান্য মেডেলের কথা জানাবার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন—একজন অজ্ঞাত-নামা মহিলা শ্রীমান তপেশ দত্তকে তাঁর বীররস অভিনয়ের জন্য একটি সোনার পাতের বেষ্টনী দেওয়া রূপার মেডেল উপহার দিয়েছেন।

শ্রমিক : রাধিকা রায়চৌধুরী

তবু যেটুকু সন্দেহ লেগেছিল এগিয়ে গিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে মিটিয়েও নিল মৃগেন।

বিনিদ্র রাত্রির পর সমস্ত দিনটা এক রকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে দুজনে। একটু একসঙ্গে হোল সন্ধ্যার পর। মৃগেন টেবিলে একটা ডাক্তারি মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছে অলসভাবে, নীরা একটা সেলাই নিয়ে বসেছে শোফায়। চাকরটা এই মাত্র চা দিয়ে গেল।

পাতা ওলটাতে ওলটাতেই পাশে খুব দ্রুত একটা দৃষ্টি হেনে নিয়ে বলল—"ভদ্রমহিলা যাকে পছন্দ তাকে বরমাল্য দিয়েছেন, এতে নাম গোপন করবার কি আছে? তোমার কথা ধ'রে আমারও বলতে ইচ্ছে করছে—ভীতু! কাউয়ার্ড!

সেলাই থেকে একটু চোখ তুলে চাইল নীরা। মুখে একটা সিগারেট চেপে আছে মৃগেন, তার সঙ্গে ওটা কি একটু হাসিও রয়েছে চেপে? তবে রাগ যে নেই এতে নিঃসন্দেহ নীরা। তিন-তিন বছর ঘর করে আর কিছু পারুক বা না পারুক কৌতুক-চৈতন্য বা সেন্স অব্ হিউমারটা এনে দিতে পেরেছে স্বামীর মধ্যে। সেই ভরসাতেই একটু চুপ করে থেকে ওদিকে একটা ক্ষিপ্র দৃষ্টি হেনে নিয়ে বলল—"তা আর নয়? ভীতু— সে একশ'বার!"

তারপর আর একটু হেসে, আর একটা দৃষ্টি হেনে—

"কিন্তু একটা কথা—ভীতু হলেও ভদ্রমহিলা বীররসের পক্ষপাতী অন্ততঃ।"

মুখের অস্পষ্ট একটু হাসি ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবেই স্পষ্টতার দিকে এগুচ্ছে; ওদিকে সিগারেটে চাপা হাসিটুকুও। একটু,—আরও একটু, তারপর ঘর ফাটিয়ে দুজনে সমতানে উঠল হেসে।

হাসির দমকে নীরাকে তো ঘর ছেড়ে বারান্দায় ছুটেই বেরিয়ে যেতে হোল।

বঙ্গ সাহিত্যে নারী

(২৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যশা কবি সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন যখন মেয়েরা এ বি পড়ে বিবি সেজেই শুধু ছাড়বে না—আবার আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়াও খাবে তাঁদেরই প্রবল জনমতের চাপে সমাজের নানা স্তরে নানাভাবে নারীজীবন ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজজীবন হয়েছিল অচল ও পঙ্গু। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকা মোক্ষদায়িনী দেবীর একটি কবিতার উল্লেখ করছি। কবিতাটি কবিত্বে যাই হোক তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই নারী কবির বিদ্রোহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পুরুষসমাজের প্রতি যে কষাঘাত করেছিল তাতে ভোটাধিকার দাবীকারিণীদের চেয়ে তাঁর সাহস কম ছিল বলে বোধ হয় না।

"হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর বাবু—
দশটা হতে চারটা অবধি দাস্যবৃত্তি করা
সারা দিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
'বড় কর্ম করি' ভেবে দেমাকে অজ্ঞান—
এদিকে সাহেব দেখে হৃদি কম্পমান
শিখিয়া ইংরাজি ভাষা বড় অহঙ্কার
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেকচার
কহিতে ইংরাজি বুলি খান হাবুডুবু—
শুনে যা ইংরাজী কয় বাঙ্গালীর বাবু।

যে কালে অধিকাংশ মেয়েদের লেখাপড়া রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে গোপনে করতে হোত সেই সময়ে ইনি প্রকাশ্যে কবি হেমচন্দ্রকে এমন উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক জর্জ রাসেল বলেছিলেন যে, প্রত্যেক কবির কাব্য রচনা ছাড়াও আরো কোন সামাজিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। তা না হলে তাঁর কাব্য সত্যনিষ্ঠ হয় না, জীবনবোধ জন্মায় না। জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় চাই। বাঙ্গালী পুরুষের জীবনেই স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই বিস্তৃতি দুর্লভ ছিল, মেয়েদের তো কথাই নেই। যে সব লেখিকারা কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের জীবনের ক্ষেত্র ছিল অপরিসর, তাই অধিকাংশ স্থলেই প্রণয় হতাশা শোক ও অশ্রুজলই নারী কবির কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। ব্যতিক্রম দুচারজন ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী কাগজ সম্পাদনা করেছেন, নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের তিনি পথপ্রদর্শিকা, গদ্য ও পদ্য রচনায়ও তাঁর প্রচুর দক্ষতা। সরলা দেবীর তেজপূর্ণ জীবন কর্মদীপ্ত, বৈচিত্র্যময়, তবে তিনি বড় কবি নন। সরোজিনী নাইডুর বৃহত্তর বৃত্ত-জীবন—কাব্যশক্তি গভীর, তবু তা বিদেশী ভাষার মরুপথে দিশাহারা। তবু সত্ত্বেও বাঙ্গালীর মেয়ে কিন্তু ভারতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তাঁর প্রতি আমাদের দাবী সামান্যই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই সমাজের অবস্থার বিভিন্ন স্তরে মেয়েরা বাস করছেন। কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে ইংরেজী শিক্ষার খোলা দরজা দিয়ে বিদেশী সাহিত্য ও জীবনের সংবাদ পেয়েছিলেন। জীবনের পথ তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম বাধাগ্রস্ত ছিল। ওদিকে সমসাময়িক হলেও মানকুমারী বসু প্রভৃতি অনেকেই যে সমাজে বাস করেছেন তা প্রথাবদ্ধ জীবনের সঙ্কীর্ণভূমি। তার উপর অকালবৈধব্য ও সন্তান শোক এই দুটি বহু নারী কবির জীবনের নিয়ামক ঘটনা। এবং সে শোককে কর্মের উৎসশক্তিরূপে ব্যবহার করবার বা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তিগত দুঃখকে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের জগতে পৌঁছে দেবার পথ নেই। তাই অধিকাংশ কবিতাই শোকগাথা, অশ্রুকণা অশ্রুজল। অনেক স্থলেই কবি নিজেকে হত-ভাগিনী দুর্ভাগিনী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিতা করে নিশ্চিন্ত। অন্তঃপুরচারিণীরা স্বভয়ে যা লেখেন তার মোটামুটি ভাব মানকুমারী বসুর এই কবিতাটিতে পাওয়া যায়—

'নীরবে ফুটাব সাধ, নীরবে শুকাব আশা
নীরবে কবিতা যত গাহিবে প্রাণের ভাষা
জীবনের যত সাধ নীরবে নীরবে হবে
মরণেরো গায়ে মোর নীরবতা লেখা রবে।'

এই গভীর আত্মলোপকারী অবস্থার মধ্যে দেশের জন্য শোক, পরাধীনতার দুঃখ মাঝে মাঝে কোনো কোনো অন্তঃপুরচারিণীর মন আকুল করেছে। মানবতা ও সাম্য বোধের আভাস দেখা গেছে। যেমন—

'কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।'

স্বজাতি ও স্বদেশের সমস্যা মাঝে মাঝে নারী কবিদের মনে দেখা দিলেও মূল এবং প্রধান ভাবধারা ব্যক্তিগত জীবনের শোক-দুঃখ। শোকের দাহ অবরুদ্ধ জীবনের মুখে ছোট ছোট আবর্ত তুলেছে কিন্তু গভীর—তত্ত্ববিস্তার অন্তর্মুখী কিংবা আবেগের প্রবলতায় জীর্ণ জীবনের প্রথা সংস্কার ছিন্ন করে নূতনের জন্ম দিতে পারে নি। কবিতা চলেছে ধীর মন্দ গমনে সভয়ে সশঙ্কচিত্তে অশ্রুজলের ফোঁটা ফেলে, হৃদয় সমুদ্রের বাঁধ ভেঙ্গে নয়। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলবার শক্তি নেই, না কাব্যে না জীবনে। তবু এর মধ্যে যে কয়েকজনের কলম ভাষা ও ভাবের বিশেষত্বের কারণে উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে কামিনী রায় ও প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম প্রথম দিকে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনায় শোকই প্রধান কিন্তু তাঁর ছোট ছোট পদ্য কণিকাগুলি বিশ্ব সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান পাবার যোগ্য। এবং অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে তাঁর যা পুরস্কার লাভ হয়েছিল তা বর্তমানে আকাদামি পুরস্কারের চেয়ে কম নয়। রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' নামে কাব্য-গ্রন্থে প্রিয়ম্বদা দেবীর কয়েকটি কবিতা ভ্রম ক্রমে সংযুক্ত হয়ে যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে তিনি প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের একটি অপূর্ব সমালোচনা প্রবাসীতে প্রকাশ করে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। এমন ভুল যে ঘটতে পারে প্রিয়ম্বদার রচনার উৎকর্ষের তাই প্রমাণ। কেহ যেন মনে না করেন যে অনুকরণ প্রবণতার জন্যই তা ঘটেছিল। দুঃখের দহনে ঐ লেখাগুলি শুদ্ধ কাব্যরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে আসন পাবার যোগ্য। তার মধ্যে একটি মাত্র কণিকার উল্লেখ করছি:—

প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
যদি তাহা কোনমতে সংসার যাত্রার পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়
পরিশ্রান্ত এ হৃদয়—বলহীন পরাণ আমার।

রবীন্দ্র যুগের শেষের দিকে ১৯৩০ নাগাদ উমা দেবীর 'বাতায়নে' স্থায়ী রচনার বিশেষত্ব আছে। নিজের জীবনের সুখদুঃখপরায়ণতা থেকে বহির্জগতের দিকে বাতায়ন খুলে সাধারণ মানুষের জীবনের বিচিত্র ছবি দেখার আনন্দ কবিতাগুলিকে বিশেষত্ব দিয়েছে। এই সময়ে রাধারাণী দেবীর 'লীলা কমল' নামে প্রণয়মূলক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। বর্তমানকালে কবিতা লিখিয়ে মেয়েদের সংখ্যা কম নয় কারু কারু কবিখ্যাতি হয়েছে, কিন্তু ক্ষেত্র যতটা বিস্তীর্ণ হয়েছে তুলনামূলকভাবে দেখলে মনে হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে সে পরিমাণে প্রতিভার দ্যোতনা দেখা যাচ্ছে না। বিশেষতঃ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এ অভাব বিশেষ লক্ষ্য হয়। বিশাল বিশ্বের পথে সর্বমানবের অভিমুখে বাঙ্গালী মেয়ের লেখনী কোন নূতন সত্য রসসিক্ত করে আজও তো পাঠাতে পারে নি। কবি দেবেন্দ্র সেন কামিনী রায়ের একটি কবিতা পড়ে লিখেছিলেন "স্ত্রীকণ্ঠে এমন সুন্দর সঙ্গীত খুব কম শুনিয়াছি।" এ প্রশংসা আজ আর যথেষ্ট নয়।

কবিতার ক্ষেত্রে যা বলা গেল মনে হয় উপন্যাসের ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও সমাজের প্রভাব নারীর লেখনীর উপর একই রকম ক্রিয়া করেছে। একশ বছরের উপরে হয়ে গেল স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে ও আধুনিকতা—আধুনিকতা অর্থে আমি বেশভূষা চাল-চলন বলছি না—যুক্তিবাদী চিন্তা ক্রমে ক্রমে সাহিত্যে জীবনে প্রবেশ করেছে কিন্তু তা ধীরে ধীরে ঘটেছে এবং এত ধীরে ঘটার ফলে একই সময়ে এদেশে চিন্তার বিভিন্ন স্তরে মেয়েরা, শুধু মেয়েরা নয়, সমস্ত সমাজ বাস করছেন। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীকে অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে মরণং ধ্রুব কিনা এবং একাদশীতে বিধবার পানাহার উচিত কিনা তা নিয়ে তর্ক করতে, চিন্তিত হতে দেখেছি। অতএব মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্রে সমাজ চেতনা নানা স্তরে বিভক্ত থাকবেই এবং তার ফলে উপন্যাস রচনায় তার প্রভাবও লক্ষ্য হবে।

ঔপন্যাসিক মহিলাদের মধ্যে বিচিত্র ঘটনা-বহুল কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে ও রচনার প্রাচুর্যে অনুরূপা দেবী অগ্রগণ্যা। সমাজের নানা সমস্যার ছোট ছোট বিড়ম্বনার আঘাতে প্রতিঘাতে সুখ দুঃখ গ্রথিত নানা চরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সম্রাজ্ঞীর আসন পেয়েছিলেন। তবু বলতে হবে নূতন যুগের ভাবধারাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত নারী চরিত্র স্ফুটনে ও যুগোপযোগী মনস্তত্ত্বে সরল প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষায় সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উপন্যাসে ছোট গল্পে শিশু সাহিত্যেও এঁদের দান প্রভূত। প্রবাসীর মত কাগজ গড়ে তোলবার কাজেও এঁদের কীর্তি কম নয়। মানব জীবনের রসবেদনাপূর্ণ নানা ছবি গত যুগে নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির কলমে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সমাজের ধারা যেমন পরিবর্তিত হয়েছে নূতন নূতন দৃষ্টি নিয়ে মনস্তত্ত্ব ও সমাজের বিভিন্ন পথে নবযুগের লেখিকাদের দৃষ্টি পড়েছে—বর্তমানে আমাদের মধ্যে বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতি আরো অনেক গল্প লেখিকা ও ঔপন্যাসিক নারীর জোরাল কলম কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে চলেছেন। শিশু সাহিত্যের সুরু থেকে সুখলতা রাও প্রমুখ কয়েকজন নারীর মধুর রচনা শিশুমনে আনন্দের ঝরণা বইয়ে দিয়েছে। আমাদের বাল্যকালে সীতা দেবী শান্তা দেবীর "হিন্দুস্থানী উপকথা", সুখলতা রাওর "আরো গল্প" প্রভৃতিতে যে আনন্দ পেয়েছি আজকে এমেরিকান কাউ বয়-এর নকল করা গল্পে ছেলে-মেয়েরা সে শুদ্ধ স্বাস্থ্যকর আনন্দের স্বাদ কি পাবে? বর্তমানে লীলা মজুমদার শিশু সাহিত্য লিখছেন। প্রবন্ধ রচনায় সে-যুগে স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী প্রচুর দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী আজ পর্যন্ত লিখে চলেছেন। রাণী চন্দ, প্রতিমা দেবী, চিত্রিতা দেবী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, মায়া বসু প্রভৃতি এঁরাও রচনায় সুনাম অর্জন করেছেন। তবু গত বিশ বৎসরের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা স্বাধীনতা যে পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে সংখ্যা গণনায় সাহিত্য জগতে তাঁদের স্থান সেই অনুপাতে যথেষ্ট বলতে পারি না। বিশেষতঃ প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নারী রচয়িতার জোরাল কলমের সংখ্যা আজও নিতান্ত কম। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও সময়োপযোগী স্থান আজও করে নিতে পারা যায় নি। অথচ পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে

আলোচনা করে সুলেখা দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে বঙ্কিম-সঞ্জীবচন্দ্রের সময় থেকে বহু মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইন্দিরা দেবী ও তাঁর ভগ্নী প্রতিভা চৌধুরী সঙ্গীত পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—আজ এই দুঃসাহস করা কঠিন। ভারতী ও বালকের মত মহিলা সম্পাদিত কাগজ আজকের দিনেও যে দুর্লভ এ সত্য কি আমাদের অগ্রগতির প্রতি কটাক্ষ করে না? বলতে পারেন সে যুগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের যে উচ্চ আবহাওয়া, যে বিস্তৃত ও সত্যনিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আজ তা কোথায় পাওয়া যাবে? অবশ্য শুধু নারী রচয়িতা বা সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে নয় সর্বত্রই সাহিত্যের মানও নেমে এসেছে। প্রবাসীর মত পত্রিকাই বা আজ বাংলাদেশে কোথায়, মডার্ণ রিভিউর মত পত্রিকাই বা কোথায়? যা বাঙালীর সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের শাঁস বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবে? একথা ঠিক যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টি ব্যাপক হয়েছে। বহুজনের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ ছড়িয়ে পড়েছে। লেখক-লেখিকার সংখ্যা বেড়েছে সন্দেহ নেই, তবে গুণাগুণের বিচার করলে গুণের চেয়ে অগুণ একটু বেশী। সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি সাহিত্যের মান কমিয়ে এনেছে তা স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে একই। সাহিত্য যখন থেকে জীবিকা হয়েছে তখন থেকেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আর একটা প্রধান সমস্যা এসে পড়েছে। পূর্বে যখন সাহিত্য চর্চা প্রধানতই শখ ছিল তখন লেখক লেখিকার জীবনে প্রলোভন মায়ের মূর্তি নিয়ে সত্য ভঙ্গ করতে পারত না। পাইকারী দরে যা হোক একটা কিছু খাড়া করে পুজোর বাজারের খরচ তোলবার জন্য সাহিত্যকে ব্যভিচার করবার কথা কেউ মনেই করতে পারতেন না। লেখার জন্য যে লেখা নয় কেবলমাত্র টাকার জন্যই যে লেখা তাদের আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন হবেই - ব্যবসা তা লোহারই হোক কি কবিতারই হোক একই। এই জন্য উপন্যাস যখন হয় পুজোর বাজার, নয় সিনেমার বাজার লক্ষ্য করে লেখা হয় তখন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট পথভ্রান্ত হয়ে যায়। আমি এ-কথা কখনো বলছি না যে, সাহিত্যিকরা লেখার জন্য অর্থমূল্য চাইবেন না বা পাবেন না ও তাঁদের কর্মের মূল্য অন্য চতুরতর লোকে ভাগবখরা করে নিয়ে যাবে। এতদিন তেমন ভুলের ফসল অনেক পাওয়া গেছে, তাতে লাভ হয় নি। বার্ণার্ড'শ' বলেছিলেন—happy is the man who can live by hishobby—শখে যার জীবিকা হয়ে যায় সেই সুখী—কিন্তু অন্ততঃ শখটা শখ থাকা চাই।

বর্তমানে সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে রুচির ও কুরুচির এবং নানা দিকের পার্থক্য এতবেশী হয়ে গেছে যে তাতেও পাঠকের সংখ্যা ভাগ হয়ে গিয়ে—লেখক-লেখিকাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে—কি লিখব শুদ্ধ সাহিত্য, রাজনীতি, রাজ পরিতোষণ নীতি না রোমাঞ্চকর সেনসেশনালিজম। কেউ যেন মনে না করেন আমরা রহস্য কাহিনীর বিরুদ্ধে বলছি—ডিটেকটিভ উপন্যাসও যে শুদ্ধ সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, কনান ডয়েল তা প্রমাণ করে দিয়েছেন কিন্তু সেটি পৌঁছন চাই—শাণিত বুদ্ধির ক্ষুরধারের ভিতর যে রসের উৎস আছে তিনি তার সন্ধান পেয়েছিলেন শুধু লোকের কৌতূহলোদ্দীপনাতে আঘাত করে, টাকার থলির ছিদ্র খোঁজবার জন্যই সে লেখা হয় নি। সাহিত্য পত্রিকাখানি উপার্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় ভাগ করে নিয়েছেন অতএব পাঠকেরও রুচি ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং তারও ফলে সাহিত্যিকের লেখনী কেবল নিজের মর্মগত সাহিত্য-উন্মাদনার উপর নির্ভর করতে পারছে না। লেখক একলা লিখতে পারেন না—পাঠকের চিত্তভূমি চাই, নইলে তাঁর বীজে ফসল ফলে না। একদা প্রবাসী সমগ্র বাংলা দেশের মনোহরণ করতে পারত—আজ হয়ত তা হতে পারবে না। যেখানে একটি কুৎসিত কথা নেই, একটা খুনের গল্প নেই, একবিন্দু অশ্লীলতা নেই যুক্তি-নির্ভরতাই যেখানে সম্পাদকীয়ের বল মতের গোঁড়ামী নয়, এমন কাগজ আজ যদি হয় তবে তার পাঠক-পরিধি সীমিত হয়ে যাবে। সেনসেশন্যালিজম-এর চর্চা শিশু-সাহিত্যে ভূতের গল্পে, খুনের গল্পে, তথাকথিত অ্যাডভেনচারের গল্পে আজ ২০।২৫ বছর ধরে ধীরে ধীরে বিষ ঢালতে শুরু করেছে। মনে আছে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে যখন ভূতের গল্প শিশু সাহিত্যে তার ভয়াবহ মূর্তি দেখাতে শুরু করেছে, ব্যক্তিগতভাবে বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর তার প্রভাব লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হচ্ছিলাম। এমন সময় একটি ঘরোয়া সভায় একটি প্রবীণ ভৌতিক লেখককে পেয়ে এ সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছিলাম, তিনি আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, ইয়োরোপের শিশু সাহিত্য এই রকম ভূত ও তার আনুষঙ্গিক খুন—কিংবা খুন ও তার আনুষঙ্গিক ভূত, অর্থাৎ আগে খুন হবে তার পর ভূত হবে—এই সবে ঠাসা, কৈ তাতে সে দেশের ছেলে-মেয়েদের তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না—। আমরা প্রাচীন প্রথায় শিক্ষা পেয়েছিলাম বলে প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠের মুখের উপর জিজ্ঞাসা করতে পারিনি যে যা কিছু বিলাতে তৈরী তাই ভাল কিনা এবং শিক্ষার ফলাফল বিচার হতে সময় লাগে কিনা। কিন্তু আজ তার উত্তর মিলেছে। ঐ শ্রেণীর সাহিত্যের বিষাক্ত পদার্থ ভবিষ্যৎ বংশের রক্ত দিচ্ছে বিষিয়ে। ফলে সে দেশে অপরাধপ্রবণতা যে ভয়ানক রকম বেড়ে উঠেছে তা কারু অজানা নেই।

সাহিত্য ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের কর্তব্য একই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ কর্তব্য আছে। ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে যেমন অন্নে ভেজাল হচ্ছে তেমন মানসিক পথ্যের বদলে অপথ্যে যদি সন্তানের, সমাজের রক্ত বিষিয়ে যায় সেখানে নারীর পালনী শক্তির পূর্ণ প্রকাশ করা প্রয়োজন। যদি সহজে সরস্বতীরূপে ফল না হয়, তবে চণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা যে-কোন দেবীর অনুকরণ করা যেতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুনাফার লোভ বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে চলেছে—তা তুলে ফেলা দরকার। কিন্তু তা হচ্ছে কৈ—নূতন নূতন বিপদ এসে জুটছে।

জীবনের নানাদিকে মেয়েরা আজকাল অগ্রসর হয়ে এসেছেন, অনেক দুঃসাহসিক কাজে পর্যন্ত পুরুষের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। তবু মনে হয়, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' পথ এখনও যথেষ্ট সহজ নয়। যে কোন পথেই মেয়েদের একটু জায়গা ছেড়ে দিতে এদেশের পুরুষের তৈরি সমাজে এখনও মনু শাসিত মন ইসারায় বারণ করে... সাহিত্যক্ষেত্রেও তার কম উদাহরণ দেখা যায় না। মেয়েদের হাতে খবরের কাগজের অস্ত্রও নেই প্রকাশনার ব্যবসাও নেই। পথ খুলবার জন্য দাঁড়াতে হয় যাঁদের দরজায় তাঁরা তাঁদের মতানুবর্তিনীদের কৃপা বর্ষণ করে থাকেন স্বেচ্ছামত কিন্তু কোথাও যদি স্বাধীন চিন্তার কোনও লক্ষণ দেখা যায় তবে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা অবহেলায় তার বিলোপ সাধন করতে কাউকেই কম তৎপর দেখি না। একেত সমস্ত জনসাধারণের মনে সবটা জুড়েই রাষ্ট্রনেতাদের কচকচানি চলেছে তার মধ্যে একটু ফাঁক করে যদি পুরুষ সাহিত্যিকরা খানিকটা স্থান করে নেন মেয়েদের সেখানে ঢোকা সহজ হয় না। নিকৃষ্টতম রাষ্ট্র নেতাদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা ভাষণ কাগজের বৃহত্তম শিরোভূষণের দাবী রাখে, কিন্তু চিন্তা-গ্রথিত একটি সত্যবাণী অনাদৃত অবহেলিত পড়ে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে এর বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বর্তমানে সরকারী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই জনসাধারণ বুঝতে পারবেন জাতীয় উৎসবের প্রাঙ্গণে সাহিত্যিকের স্থান কোথায় এবং এই বিশেষ উৎসবে রবীন্দ্র চিন্তানুশীলনকারীরাই বা কেন বিশেষভাবে অনাদৃত। যাদের মতামত মাইনে দিয়ে কেনা যায় না, তাদের আজ কোথাও স্থান নেই—তার উপরে মেয়েদেরও স্বাধীন মতামত বরদাস্ত করতে হবে এমন সহিষ্ণুতা কার কাছে আশা করব? তার চেয়ে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য দিয়ে খবরের কাগজের ঔদাসীন্য দিয়ে তেমনি অবস্থা ও সৃষ্টি করা যায়, যা পরদা দিয়ে বোরখা দিয়ে হোক—তাতে সুবিধা কম ছিল না।

সাধারণতঃ সাহিত্যিকের কোন সমস্যা নেই। যা অন্যের পরম সমস্যা সাহিত্যিকের জীবনে তাই প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে—চরমতম দুঃখ ধন্য করে ফুল ফোটে, ব্যথা গোলাপ হয়ে ওঠে। তার একমাত্র সমস্যা সমাজের নানা দিক থেকে মার যখন মূর্তি ধরে সত্যভ্রষ্ট করতে চায়—যার ফলে সাহিত্যের যুগই এখন বদলে গেল। সত্য সাহিত্যের এ যুগ নয়। কবিতা অন্তরের সত্যকে রূপ দেবে, কিন্তু সত্য আছে কোথায়? সাধনার মূল্য না দিয়ে পাইবার প্রচেষ্টা অর্থাৎ অল্প মূলধনে প্রচুর মুনাফার মনোবৃত্তি জীবনের সব ক্ষেত্রকে আক্রমণ করে দূষিত করে দিচ্ছে। সাহিত্যও তাই সহজ সরলভাবে আপন অন্তরের অনুভবকে প্রকাশ করতে পারে না, লেখকের মনে সন্দেহ আসতে থাকে যথেষ্ট আধুনিক হোল ত, যুগোপযোগী হোল ত, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ল নাত? কৃত্রিম উপায়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে কৌশলে মনকে ধাক্কা লাগিয়ে—একটা চটকদার হয়ে ওঠবার চেষ্টা সাহিত্য ক্ষেত্রকে বিকৃত করে দিচ্ছে। তার উপরে আছে দল বাঁধার প্রবৃত্তি। এই দল বাঁধা ও পরস্পরের পিঠ চাপড়ান নীতিতে সমস্ত পুরস্কার ও প্রশংসা এবং প্রচার একত্র হয়ে মিথ্যাকে সত্য, দিনকে রাত করবার চেষ্টা চলেছে। সাহিত্য যখন সত্য জীবন্ত ছিল, তখন তার পুরস্কার ছিল পাঠকের রসবোধে, কবিতা যখন মিথ্যা ও মৃত হয়ে গেছে, তখনই তার মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে খোসামুদি ও টাকাতে। কোন সাহিত্যই শুধু সাহিত্যিকের রচনা নয়—রচয়িতা ও শ্রোতা এই উভয়ের মিলনেই সাহিত্য—তা সে পুরুষের কলমেই হোক বা নারীর কলমেই হোক। আমি নিরাশার কথা দিয়ে শেষ করতে চাই না, কিন্তু যে দেশে, তা সে যেখানেই হোক, পাঠক ও লেখকের মাঝখানে রাজনীতি বা রাজ তোষণনীতি খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখবে, লোভ সত্য-দৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করবে, সেখানে খাঁচার পাখি রবে সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি রবে বনে—দোঁহার মিলন হবে না, সাহিত্যের সত্য সুর বাজবে না।

সংশয়

সুজিত কুমার নাগ

কুহেলি বিহীন অন্ধকারের পথে,
সংশয় ভরে বার বার আমি ভাবি
কেন এ বেদনা? নীরব করেছে বাণী-
সপ্ত-ঋষির প্রশ্ন চিহ্নখানি।
তবুও মানি না, বুঝিতে পারি না কেন?
এই যে আকাশ কোথা থেকে পেলো আলো?
একটা কেবল সরল রেখার ধারা
খুঁজে পাবো তারে চক্রবালের দিকেঃ
জীবনের যত পরম সত্য তারা।

নাগিন

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পাঁচজনেও যা, একজনেও তাই! তখন বললুম, এত টাকা চাঁদা তুললি, স্বামীর জন্যে কিছু খরচ করবিনে? ছুঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে কি জবাব দিল জান, বাবা? মুখ বেঁকিয়ে বললে, স্বামীর টাকা হলে খরচ করতুম বৈকি! মরা গরু ঘাস খায় না রাধুর মাসি!

হাসিমুখে বললুম, ওর নাম সুশীলা নাকি?

ওমা, তা হলে বলি শোনো, বাবা। ওর নাম সুশীলা, আর ওর স্বামীর নাম ছিল রেবতী বিশ্বেস। —রাধুর মাসি চোখ কপালে তুলে বলল, এখন বুঝি নিজের নাম বদলে রাখল নীলিমা চৌধুরী! ভেতরে ভেতরে মেয়েটা স্যায়না কম নয়। ছনু পালের মেজ ছেলেটা ওকে সব সলাপরামর্শ দিচ্ছে, অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘরে বসে কানাকানি করে। শোনো বাবা, সুশীলার এখন শাঁসালো অবস্থা। জমির মালিককে ডেকে সেদিন খাজনা মিটিয়ে দিল। এখন শুনছি ঘরদোর নতুন করে সারাবে, পুকুরপাড়ের ধার থেকে ঘর পর্যন্ত ইঁটের পাঁচিল তুলবে!

মেয়েটি তা হলে বেশ হাসিখুশী আছে বলো?

গলা নামিয়ে রাধুর মাসি বলল, স্বামী মরেছে তা বোঝাই যায় না। গায়ে জামা, পরনে কালাপেড়ে শাড়ি। ঘরদোর বেশ গুছিয়ে তুলেছে। ছেলেপুলে ত হয়নি, গায়ের গন্ধ গায়েই আছে কিনা—। তুমি দেখো বাবা, ও-মেয়ে সোজা পথে হাঁটবে না। পালেদের কানাই হল ওর মস্ত খুঁটি। সোয়ামির অসুখের সময় আসা-যাওয়া করত কিনা—

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন নীলিমাকে স্বচক্ষে দেখলুম। বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, আমি উঠতে যাব—এমন সময় পিছন থেকে আমার স্ত্রী হাসিমুখে বললেন, ওই দ্যাখো তোমার সুশীলা যাচ্ছে—!

দেখে বেশ খুসীই হলুম। ঘোমটা সামান্যই এখনও আছে, এবং সে ঘোমটাটুকু পুরুষের চোখে কিছু লোভনীয়। স্বাস্থ্যের সম্পদ এবং দেহের লাবণ্য—এ দুটো খুঁটিয়ে দেখলে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে ঈষৎ বৈরাগ্য আসে—

উচ্চরোলে হেসে উঠল দেবরায়ের সহকর্মীর দল। পাঞ্জাবী বন্ধু শরণ সিং বললেন, আ, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!

দেবরায় বলল, একটি ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে সে রাজহংসীর মতো চলেছে এবং সেই ব্যাগের ফিতেটি ওর হাতে জড়ানো। যে-কোনও পুরুষ ওর হাতে অমনি করে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে পারত!

পুনরায় হাসির হট্টগোল শোনা গেল।

না, তামাসা নয়—দেবরায় বলল, স্বাস্থ্যের বাঁধুনি বড় নয়, কিন্তু ওর মনের বাঁধুনির কাঠিন্য চোখে পড়ল। ভ্রুক্ষেপ করছে না পথের দুধারে, কুণ্ঠাবোধ করছে না আপন অতীত ইতিহাস স্মরণ করে,—প্রতিক্ষণে সে যেন আত্মনির্মাণের কাজে ব্যস্ত। নীলিমাকে এখন দেখলে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। বেশ তৈরি মেয়ে!

পরম্পরায় শোনা গেল, সে আজকাল এমন এক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করে যেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে হাতের কাজকর্ম এবং কুটীরশিল্পেরও শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজের হাতে সে রান্নাবান্না করে, বাসন মাজে, ঘরদোর ঝাড়ে, পুকুরঘাটে সাবান মেখে ঈর্ষা-কাতর ঝিয়েদের চোখের উপর হাসি-হাসি মুখে স্নান করে এবং যথাসময়ে নিত্য-নতুন শাড়ি পরে হিলতোলা জুতো পায়ে দিয়ে বেরোয়। পালেদের কানাই নাকি অনেক সময় তার খরচপত্র যোগায়। পাড়ায় পাড়ায় ওকে নিয়ে বেশ চাপা কানাকানি চলছিল।

রাধুর মাসি একদিন বলল, সুশীলা যে আজকাল গান শিখছে, বাবা। মেটে ঘরে থাকে কিনা তাই বাইরে আওয়াজ শোনা যায় না। হপ্তায় তিন দিন গান শিখতে যায়। মেয়ে খুব তুখোড়, বাবা।

গান সে কতটা শিখল তা অবশ্য আমার জানবার সুযোগ হয়নি, তবে কারিগরী বিদ্যা সে কিছু শিখেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাস ছয়েকের মধ্যেই। হঠাৎ একদিন শোনা গেল এ পাড়ার মহিলারা ঈষৎ সুলভ মূল্যে নীলিমার ঘর থেকে খাঁটি নারকেল তেল কিনতে আরম্ভ করেছেন। ভেজালের এই যুগে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিশুদ্ধ বস্তু পাওয়া সৌভাগ্যের কথা বৈ-কি। দেখতে দেখতে নীলিমা চৌধুরীর ঘরের সামনেকার উঠোনটি টিনের কৌটো ও কানেস্তারায় ভরে উঠল, এবং জানা গেল এ কারবারটির যদি কিছু উন্নতি ঘটে তবে ওই নারকেলতলার নীচেকার বস্তিতে একটি কারখানা বসে যাবে এবং তার উদ্বোধন করবেন স্বয়ং শিল্পমন্ত্রী!

পাড়ার মহিলা মহলে কানাকানি চলছিল কিছুকাল থেকে। মেয়েটার বয়স কাঁচা। শ্রীমান্ কানাই মাঝরাত্রি পর্যন্ত নীলিমার ঘরে বসে যে কেবল মাত্র নারকেল তেলের উৎপাদন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে এবং একমনে খাতাপত্রের হিসাব নিয়ে থাকে, একথা হলপ করে কেউ বলুক ত? রাতারাতি ঘরের চারদিকে ওরা পাকা পাঁচিল তুলল, এর কারণই বা কি? শুধুই কি নারকেল তেল? এতই কি তেল? —একাধিক বাড়ির বধূ-সমাজে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

আসল কথাটা হল, পাড়া-প্রতিবেশী মহলে ঈর্ষা, সন্দেহ এবং পরশ্রীকাতরতা মাথা চাড়া দিচ্ছিল। রাখালবাবু বলাবলি করছিলেন, আমার মামাতো ভাইয়ের ছোট শালা এখন হুগলী জেলায় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর,—গভর্ণমেন্ট তার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে যদি বেঁকে বসে, তবে ওই বস্তি-টস্তি একেবারে ধরাশায়ী করে দিতে পারে। যত সব দুর্নীতির কাণ্ড!

আরেকজন বললেন, কর্পোরেশনে সবাই মিলে দরখাস্ত দিলেই ত হয়, ল্যাঠা চুকে যায়! ওরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে।

ছনু পালের মুদির দোকানে বেনামী চিঠি আসতে লাগল,—তোমার ত্রিশ বছরের আইবুড়ো ছেলেকে সাবধান করো, নৈলে রক্ষে থাকবে না! পাড়ার লোক ঘাস খায় না, মনে রেখো।

এই ভাবে যখন সামাজিক এবং নৈতিক-শাসন উগ্র হয়ে উঠছে, সেই সময় একদিন আমাকে কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়তে হল। মাস-তিনেক পরে যখন সস্ত্রীক ফিরে এলুম আমার কর্মস্থল থেকে, রাধুর মাসি একদিন খবর দিল, সুশীলা আজ মাস দুই হল এখান থেকে পালিয়ে গেছে, বাবা। কেউ তার সন্ধান জানে না। কেউ বলছে গয়া-কাশী, কেউ বলছে বৃন্দাবন!

কিন্তু তার কাজ-কারবার?

তা বেশ চলছে।—রাধুর মাসি বলল, কানাই সব দেখা-শোনা করছে। ওর ঘরদোর সবই আগলে থাকে। কানাইকে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না! বলে, আমি কি জানি?

প্রশ্ন করলুম, মেয়েটা পালালো কি জন্যে, বলতে পার?

ওমা, বলে গেছে নাকি? আমরা ত সবাই দুদিন পরে জানলুম গো। কর্পূরের মতন যেন উবে গেল!

এক সপ্তাহ কাল যেতে-না-যেতে আমার স্ত্রী একদিন সহাস্যে বললেন, তোমাদের এক কথা! ওই ত নীলিমাকে দেখলুম!

দেখলে?

হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখলুম। তবে হ্যাঁ, একটু রোগা হয়ে গেছে। জৌলুসটা কিছু কমেছে!

হাসিমুখে তাকালুম। স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন!

রাধুর মাসি বিকেল বেলায় বাসন মাজতে এসে বলল, শুনেছ বাবা, সুশীলা দুটো গরু পুষেছে। মস্ত দুটো গরু বাবা, দুবেলায় প্রায় আধমণ দুধ হচ্ছে। রাখালবাবু, ঘটগোবিন্দ, তুলসী বোষ্টম—সবাই ওর কাছে দুধ নিচ্ছে। আমাকেও এক পো করে খেতে দিচ্ছে! সেদিন জিজ্ঞেসা করলুম, তিন-চার মাস ছিলে কোথায়, সুশীলা? মুখের ওপর কি জবাব দিলে জান, বাবা? স্বামীর জন্যে মন খারাপ কিনা তাই তীর্থ করতে গিয়েছিলুম! শোনো কথা!

দেখতে দেখতে নারকেলতলার বস্তিতে দুধের ব্যবসাটা বেশ জমে উঠল। শোনা গেল, ঠিকে-ঝিরা একে একে গৃহস্থ বাড়ি থেকে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে এবং নীলিমার ওখানে মোটা মাইনের চাকরি নিচ্ছে। ঘুটে বেচা-কেনা এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে, এবং অনেক গৃহস্বামী তাঁদের সীমানার পাঁচিল ভাড়া দিতে সুরু করেছেন। বিপত্নীক নিশিকান্তবাবু একদিন তামাক খেতে খেতে বললেন, সাবাস মেয়ে বটে, পাড়াটা একেবারে তাতিয়ে তুলেছে!

বস্তির ঠিক পুব দিকে পুকুর পাড়ের দক্ষিণে অনেকটা জমি খালি পড়েছিল—বনবাদাড়ে ভরা। সম্প্রতি কয়েকজন লোক এসে সেটা জরীপ করে গেছে। দেখতে দেখতে সেখানে বাঁশ, শালের খুঁটি, করোগেট সীট এবং ইঁট, চুণ সুরকি এসে পড়তে লাগল। খবর পেলুম ওখানে নীলিমার মস্ত চালাঘর তৈরি হবে। এপাশে কারখানা, ওপাশে আপিস এবং পুব দিকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত মস্ত এক গোয়াল তৈরি হবে। পাঞ্জাব থেকে নাকি একদল বড় বড় গরু আসছে। আশ-পাশে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

পাড়ার লোক বেঁকে বসল। এখানে কারখানার দূষণ এবং গোয়ালের দুর্গন্ধ কোনটাই বরদাস্ত করা হবে না। জমির মালিকের কাছে

পাড়ার প্রতিনিধি দল গেল। কিন্তু পরম্পরায় শুনলুম, জমির মালিক নাকি এখন নীলিমা চৌধুরী! এ জমি উচ্চ মূল্যে সেই নাকি কিনেছে! প্রতিনিধিরা নিরাশ হয়ে ফিরল।

নীলিমা আগে পায়ে হেঁটে যেত, তারপর যেত বাস অথবা রিকসা-তে, এখন প্রায়ই সে আনাগোনা করে ট্যাক্সিতে। মধ্যে-মাঝে সরকারি কর্মচারী এক আধজন তার কাছে আসে ফাইল হাতে নিয়ে, পুলিশের লোক আসে কখনো-সখনো, এক-আধজন ভাটিয়া এবং অবাঙ্গালী বণিককেও মধ্যে-মাঝে তার দরজায় দেখা যায়। ক্রমশঃ খবর পাওয়া গেল, দক্ষিণ টালিগঞ্জের দিকে কোথায় যেন মস্ত এক নারকেল বাগান ইজারা নিয়েছে নীলিমা। সেখানে নারকেল দাঁড়ি, হুঁকো, তামাক তৈরির কারখানা ইত্যাদি বসবে। এই পাড়ারই গোলক পণ্ডিত একদিন আমাকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন,—বুঝলেন মিঃ রায়, মেয়েমানুষে বারো হাত কাপড় পরলেও তার কাছা নেই, বুঝলেন ত? আপনি ত ঠান্ডা মানুষ! কারো সাতে পাঁচে নেই!

জবাব দিলুম, কিন্তু এর ওপর ওমেয়েটার কাছা থাকলে আরও কি সাংঘাতিক হত তাই ভাবছি!

শুনুন তবে,—পুলিশে চোখ রেখেছে। মেয়েটা বে-আইনী সুপুরি চোলাই করে একশ' তিরিশ টাকায়, বেচে আসে আড়াইশোয়। বসিরহাট থানায় সবাই খবর রাখে! মেয়ে-মানুষের দৌড় আমরা জানি, মশাই। লোকের মুখ আর চাপা থাকবে না!

গোলক পণ্ডিত ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে প্রশ্ন করলুম, আপনার ছেলেটি নাকি ওদের নারকেল তেল বেচে মোটা কমিশন পায়?

আরে, সেই জন্যেই ত' আমরা কেউ মাথা তুলতে পারিনি, মশাই। —গোলক বললেন, কাজটা গেলে ছেলেটা আবার বেকার হয়ে আড্ডাবাজি করবে তাই ভয় পাই। তবু যা হোক দু' পয়সা আনছে! আমি বলে রেখেছি, খবরদার, ছুঁড়িটার দরজা মাড়াবিনে কোনোদিন, তাহলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো! আসল কথাটা কি জানেন, কাজকর্ম টাকা পয়সা দিয়ে পাড়ার লোককে ঠান্ডা রাখছে! মেয়ে বড় চতুর, মিঃ রায়।

বছর তিনেকের মধ্যে এ পাড়ার চেহারাটা অনেকটা পালটিয়ে গেল। নারকেলতলায় বস্তি আর রইল না,—সেখানে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি উঠল, তার সামনে মস্ত ফুলবাগান। ডোবা-পুকুর দেখতে দেখতে সরোবর হয়ে উঠল। বাগানের পাশে মস্ত মোটর গ্যারেজ, সরোবরের কোল ঘেঁষে অফিস বাড়ি, এবং মেয়েদের বসবাসের জন্য ছোট ছোট ঘর। ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে চারদিকে, টেলিফোন বাজছে ঘরে ঘরে, নানাদিকে কর্মব্যস্ততা, কোটপ্যান্টপরা লোকজনদের আনাগোনা। অবশ্য আমাকেও সামান্য কিছু কাজ করে দিতে হয়েছিল। সমগ্র প্রতিষ্ঠানের নক্সাটা আমাকে দিয়েই আঁকিয়ে নিয়েছিল। অবশ্য টাকাকড়ি আমি নিইনি।

মুন্সী মথুরাপ্রসাদ এবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মনে হয় স্যার, নীলিমার যৌবন কি ওর উন্নতির মূলে কাজ করেছে?

আমি জানিনে—দেবরায় বলল, এটুকু জানি যৌবন যদি দুর্বুদ্ধিতে বিকারগ্রস্ত হয় তবে সে উঠতে দেয় না, নিচে নামিয়ে আনে। যৌবন মানেই একটা শক্তির আধার, নীলিমা সেই শক্তির প্রয়োগ জানত।

কিন্তু তার বড় রকমের শিক্ষা ছিল কি?

নীলিমার শিক্ষা বোধহয় সহজাত ছিল!

ত্রিবেদী সাহেব প্রশ্ন করলেন, আপনার কি ধারণা, কানাইয়ের সঙ্গে নীলিমার প্রণয় সম্পর্ক ঘটেছিল?

আমি জানিনে—দেবরায় পুনরায় বলল, তবে শ্রীমান কানাই বছর চারেক পরে যখন নীলিমার কদর্য নিন্দা রটাতে লাগল, তখন বুঝতে পারলুম কানাই ওর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল!

কিন্তু নীলিমা?

হুইস্কির পাত্রে চুমুক দিয়ে দেবরায় একটু হাসল। বলল, এও আমি জানিনে। অবৈধ প্রণয় ঘটে অতি সংগোপনে। ওটা চোখে পড়ে না। তবে মেয়ে মানুষ অনেক সময় আত্মদান করে চক্ষুলজ্জার দায়ে, কার্যোদ্ধারের দায়ে,—প্রণয়ের দায়ে নয়!

আপনি কি বলতে চান, নীলিমার নৈতিক চরিত্র নষ্ট ছিল?

ওটা বলা কঠিন। কেননা একালে চরিত্র-নীতির ব্যাখ্যা অনেক বদলেছে। সতীত্বের ধারণা সম্বন্ধে মেয়েরাই আজকাল নতুন করে ভাবতে বসেছে। নীলিমার ও ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানবার চেষ্টা করিনি। মহৎ ভালবাসার উদাহরণও নোংরা রটনায় ঘুলিয়ে ওঠে।

প্রশ্ন কর্তারা চুপ করে গেলেন।

সিগারেট ধরিয়ে দেবরায় বলল, আমাদের পাড়ার সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত, সংরক্ষণশীল এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার হলেন চাটুয্যেরা। তাঁদের বড় মেয়ে শ্রীমতী সুনন্দা সম্প্রতি অর্থনীতি-শাস্ত্রে এম-এ পাস করেছিল। চাটুয্যে পরিবারের সম্মতিক্রমে একদিন সুনন্দা এসে নীলিমা চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করল, এবং নীলিমা তার হাতে তার মস্ত আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম ছেড়ে দিল। সেইদিন প্রথম সমাজ-বিপ্লবের চেহারা দেখতে পেলুম। সমগ্র পল্লীতে সেদিন নবজীবনের সাড়া দেখা দিল। এপাড়ার প্রবীণ সমাজপতি নিশিকান্তবাবু এসে নাকি নীলিমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

মেয়েদের উন্নতির পথ এখন আর তেমন দুর্গম নয়; প্রতিযোগিতা এখনও প্রবল হয়ে ওঠেনি। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে দেখছিলুম, সভা-সমিতির উদ্বোধনে এবং প্রধান অতিথির পদে নীলিমার মাঝে মাঝে ডাক পড়ছিল। আমার স্ত্রী মধ্যে-মাঝে বেতারে নীলিমার ভাষণ শুনেছিলেন। বিষয়টি হল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা। এছাড়া সম্প্রতি শুনতে পাচ্ছিলুম, সরকারী শিল্প-পরিষদে শ্রীমতী নীলিমা অবৈতনিক পরামর্শদাতা হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। আমেরিকার কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের জন্য শিল্প পরিষদ্ থেকে যে প্রতিনিধিদল যাত্রা করবেন, নীলিমা নাকি তাঁদেরই একজন।

সর্দারজি এবার বললেন, স্যার, এতক্ষণ চুপ করেছিলুম, এবার কিন্তু গাত্রদাহ হচ্ছে। কানাইটার কি দুর্ভাগ্য!

দেবরায় এই খেদোক্তি শুনে হেসে উঠল।

সন্দেহ নেই, কানাই বড় দুর্ভাগা। নীলিমার নতুন জীবনের রথের চাকা মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল একা কানাইকেই নয়, আরও দু'একজনকে। কানাইয়ের মুখ থেকে নিন্দা রটনার ভিতর দিয়ে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, নীলিমা আরও দুচারজনকে তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করেছে! কানাই বুদ্ধিমান ছিল না। যুবতী নারীর প্রশ্রয় দেওয়াটাকে প্রণয় বলে ভুল করেছিল।

দক্ষিণ কলিকাতার একটি অভিজাত পল্লীতে নীলিমার জন্য যে বসতবাটীটি নির্মাণ করা হবে তার প্লানটি প্রস্তুত করার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। প্রায় দেড় বিঘা জায়গা। পশ্চিমে থাকবে প্রবেশ-পথ, আর পাশে বাবুর্চি ও পরিচারকদের বসবাসের ঘর এবং গ্যারেজ, দক্ষিণ ও পূর্বে থাকবে একটি লন ও ফুল-বাগান। মাঝখানে বাড়িটি হবে ছোট—কিন্তু ছবির মতো। সানন্দে এ কাজটি আমি নিয়েছিলুম। এক লক্ষ টাকার মধ্যে এ বাড়িটির নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হলে নীলিমা খুশী হবেন।

মাসখানেকের মধ্যে প্লানটি প্রস্তুত করে যখন খবর পাঠালুম তার জবাবে ইংরেজি ভাষায় আমার কাছে এল একখানা আমন্ত্রণ পত্র। আগামী শনিবার সন্ধ্যায় ছ'টার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চায়ের আসরে আমি উপস্থিত হতে পারলে নীলিমা দেবী বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করবেন।

আমার স্ত্রীর উল্লেখ ছিল না আমন্ত্রণপত্রে, সুতরাং নির্দিষ্ট দিনে আমি একাই গিয়ে হাজির হলুম।

দক্ষিণ টালিগঞ্জের এক প্রান্তে সেই বাড়ি খুঁজে বার করতে আমাকে একটু বেগ পেতে হল। সামনের দিকে প্রকাণ্ড নারকেল বাগান, ভিতরে ভিতরে ফল-পাকুড়ের গাছ। দক্ষিণে ক্ষীণকায়া আদিগঙ্গা হেজেমজে রয়েছে।

পুরোনো বাড়িখানার নিচের তলায় দুচারজন অ-বাঙ্গালী নানাবিধ কাজকর্মে ব্যস্ত। ওদেরই পাশ কাটিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি ধরে আমি উপরতলায় গেলাম। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক এখনো আসেনি, সুতরাং এরই মধ্যে বড় বড় দু একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই আমি অগ্রসর হচ্ছিলুম। এরূপ পরিবেশ আমি ঠিক আশা করিনি।

যে মেয়েটি ঘোমটা দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এল, সে একালের নীলিমা চৌধুরী নয়, সে হল সেকালের সেই সুশীলা দাসী, রেবতী বিশ্বাসের বিধবা। সামনে এসে ভুলুণ্ঠিতা হয়ে আমাকে প্রণাম করে উঠল। পরে বলল, আমাকে ঘোমটা তুলতে না বললে আমি ঘোমটা দিয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলব।

হেসে বললুম, তুমি মুখ ঢেকে কথা বলবে, এর জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি। তুমি দেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোমটা খুলে ফেলেছ:

নীলিমা ঘোমটা সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে বলল, আসুন—

আশেপাশে কেউ নেই, সমস্ত দোতলাটা শূন্য মনে হচ্ছে। বললুম, কই, তোমার চায়ের আসর কোথায়, নীলিমা?

কোথাও নেই। আসর বসাবেন একা আপনি। আমি চা করব, আপনি খাবেন। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে কেউ আসবে না,

বসুন। হরির মা? একবার শুনে যাও ত?

রান্নাঘরের ওদিক থেকে এক বর্ষীয়সী পরিচারিকা এসে দাঁড়াল। নীলিমা বলল, চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত' হরির মা!

ঘরে এসে বসলুম বটে, কিন্তু সে-ঘর অতি দরিদ্র। যেমন দরিদ্র নীলিমার পরিচ্ছদ,—পরনে তা'র আধময়লা কোরা একখানা সরু পাড় ধুতি। এ মেয়ের চারিদিকে কোথাও কোনও সম্পদের চিহ্ন আছে এটি কেউ বিশ্বাস করবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর এই মেয়েটিই আমার ওখানে হাত পাততে গিয়েছিল। মাঝখানের পাঁচটা বছর স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। নীলিমা প্রমাণ করল, সে আজও ভিখারিণী।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললুম, ইংরেজি চিঠিখানা কি তুমিই লিখেছিলে?

হ্যাঁ, আমারই লেখা—নীলিমা বলল, আপনাকে জানানো দরকার ছিল, নারকেলতলার বস্তির ঝি-মহলের মধ্যে আমি হারিয়ে যাইনি। কিছু লেখাপড়া আমি শিখেছি। আপনার কাছে আত্মসম্ভ্রমের পরিচয় দেওয়া আমার দরকার ছিল, মিঃ রায়।

কেন বলত? তোমার সম্বন্ধে আমার ত' কোনও কৌতূহল ছিল না?

আপনার ছিল না,—আমার ছিল। আপনার ভদ্র ব্যবহারের দিকে আমার মন প'ড়ে থাকত, কিন্তু আপনার স্ত্রী কিছু মনে করবেন, এই ভয়ে চোখ তুলে তাকাইনি কোনদিন!

হঠাৎ শরণ সিং ব'লে উঠলেন, আ, কেয়াবাৎ! অব ত' মহব্বৎ কি বাৎ সুরু হো যায়গা সাব!

সবাই হেসে উঠে দেবরায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল। দেবরায় তার গেলাসে চুমুক দিয়ে শুধু বলল, ননসেন্স!

—হ্যাঁ, নীলিমা বসেছিল আমার পায়ের কাছে। আমি তা'র সরল স্বীকারোক্তি শুনে হাসছিলুম। সে পুনরায় বলল, আপনি যে পায়ের ধুলো দিলেন এতেই আমি ধন্য। আপনাকে আজ ডাকতে ভরসা পেয়েছি এইজন্যে যে, এতদিন পরে আমি সব সংকোচ কাটিয়ে সহজ হয়েছি। আপনার কাছে কিছু গোপন করব না, এই সাহস সঞ্চয় করবার জন্যেই সাত বছর সময় নিয়েছি।

আমি একটু অবাক হয়েই তা'র কথা শুনছিলুম।

নম্র শান্তকণ্ঠে নীলিমা পুনরায় বলল, আপনি জানেন আমি সামান্য মেয়ে। আমি যে নরককুণ্ডে প'ড়েছিলুম, উঠবার কোনও আশা ছিল না—এ আপনি দেখেছেন। ঠিক এখনও বুঝিনি, কেমন করে উঠলুম!

বললুম, তোমার যোগ্যতা আর শক্তিই তোমাকে তুলেছে।

না, মিঃ রায় ওর কোনটাই নয়! মেহনত আমি করেছি বটে, কিন্তু পুরস্কার জুটেছে তার তুলনায় অনেক বেশি। পুরুষ সমাজের বোকামির ওপর সিনেমা ছবির 'ষ্টার' যেমন খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা আর পয়সা পায়,— আমি তার চেয়ে বেশি কিছু নই। শুধু আমার কর্মজীবন একটু অন্য পথে গেছে, এই যা।

এবার বললুম, তা হলে আমিও একটু সংকোচ কাটিয়ে কথা বলি? তুমি কিছু মনে করবে না ত?

একটুও না—নীলিমা জবাব দিল।

কানাই পালের সংগে তোমার কোনও সম্পর্ক ছিল?

ছিল! তার ধারণা ছিল, ওটা ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু আমি তার কথা শুনে হাসতুম। শেষ পর্যন্ত দুই জন্তু মিলেছিল বৈকি!

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে এবার প্রশ্ন করলুম, তাহলে আজ সে তোমার নামে নানা নোংরা কথা বলে বেড়াচ্ছে কেন?

নীলিমা হাসল। বলল, দেখুন, ওর দোষ নেই। কানাই প'ড়ে রইল সেই মুদির দোকান, গরুর গোয়াল আর নারকেলতেলের পাড়ায়। আমি কিন্তু স্থির থাকতে পারলুম না, আমাকে বেরিয়ে যেতে হল বাইরের সমাজে। ওর সংগে আর মিলল না। ওর রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

তোমার অসম্মান ঘটবে নীলিমা, নৈলে আমি আরও দু' চারটে প্রশ্ন করতুম। তবে আজ থাক্—

নীলিমা বলল, আপনি সিগারেট ধরান্, আমি জানি আপনি সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারেন না—

পকেট থেকে সিগারেট বা'র ক'রে যখন ধরাচ্ছি নীলিমা তখন বলল, প্রশ্ন করতে আপনার লজ্জা হতে পারে, কিন্তু আপনার সব প্রশ্নের আমি জবাব দিয়ে যাচ্ছি। —সাধু ভাষায় যাকে বলে পদস্খলন,—তা দু'চারবার আমার ঘটেছে! আতস বাজি বেশি পোড়াতে গেলে হাত মাঝে মাঝে পু'ড়ে যায় বৈ কি। সন্তান চাইনি বলেই একবারও সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দিইনি! মুখ থুবড়ে বার বার পড়েছি বটে, তবে আবার মাটিতে ভর দিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছি,—লোকচক্ষের আড়ালে গিয়ে নিজেকে মেরামত করেও নিয়েছি! চিরকাল পুরুষরাই গাড়ি চালায়, আর মেয়েরা য়্যাক্‌সিডেণ্টে মরে! এবার আমার গাড়ির তলায় যদি দু'চারজন কানাই চাপা যায়, গ্রাহ্য করে কে?

নীলিমার মুখ চোখের কাঠিন্য দেখে আমি একটুখানি থতিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে এক সময় বললুম, তুমি যে বিপুল কাজ চারিদিকে ফেঁদেছ, এ সমস্ত একা তুমি সামলাবে কেমন ক'রে?

আমি কেন সামলাব, মিঃ রায়?—নীলিমা বলল, যারা কাজ করবে তারাই ওর মালিক, তারাই সব দেখবে! আমার দরকার ছিল দেশের কাজ, আমার নিজের কাজ নয়। আপনি যে বাড়ীটির প্ল্যান্ করেছেন, সেটি বেশি বয়সী বিধবা মহিলাদের জন্য,—যাদের কোনও উপায় নেই, যাদের কোথাও আদর নেই! তারা ও বাড়িতে থাকবে, মাসোহারা পাবে।

নীলিমার সংগে আলাপ করতে করতে আমার ঈষৎ ভাবাবেগ ঘটেছিল বৈকি। এবার বললাম, তুমি যদি মনের মতন সংসার পেতে নীলিমা, তাহলে সেই সংসার তোমার হাতে সুন্দর হ'ত।

সবিনয়ে নীলিমা বলল, স্বামী মনের মতন না হলে সংসার সুন্দর হয় না!

আমি হাসছিলুম। এবার বললুম, ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম তোমার নেমন্তন্ন রাখতে। আজকাল তোমার খ্যাতি চারদিকে। তোমার সর্বাধুনিক সাজসজ্জা, টয়লেট্, তোমার চেহারায় যৌবন, এমন কি চলনের ভঙ্গীটি পর্যন্ত—লোকের মুখে-মুখে ফেরে। আজ তোমাকে এভাবে দেখব কখনও ভাবিনি।—অচ্ছা, এবার আমি উঠি। এই নাও তোমার প্ল্যান্—এর জন্যে আমাকে যেন টাকাকড়ি দেবার চেষ্টা করো না। তোমার সংগে আমার বন্ধুত্ব নির্মল হয়ে থাক্, তার এই চিহ্ন রেখে গেলুম।

আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই নীলিমা তেমনি করেই আমাকে প্রণাম করল। কিন্তু সে মুখ তুলতেই কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় দেখলুম, তা'র চোখে জল। আমি যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

হরির মা আলোটা নিয়ে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াল। নীলিমা আমার সঙ্গে সংগে নিচে পর্যন্ত নেমে এল। তারপর এক সময় পিছন থেকে বলল, আমাকে আপনি ক্ষমা ক'রে যান্—

ক্ষমা! কেন?

আমি আপনার কাছে অপরাধী! বছর কয়েক আগে অপনার ঘরে সাপ হয়ে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু রাধুর মাসির হাত থেকে ঝিয়ের কাজটা কোন মতেই কেড়ে নিতে পারলুম না!

আমি খুব হাসছিলুম। নীলিমা পুনরায় বলল, দেশশুদ্ধ সব লোক আজ আমাকে হিংসে করে, কিন্তু আমি যে নিজে একজনকে হিংসে করে জ্বলে-পুড়ে মরছি—সে ব্যক্তি কে জানেন ত?

মুখ ফিরিয়ে তাকালুম।—

সে আপনার স্ত্রী! তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

বিস্তৃত প্রান্তরের উপরে জ্যোৎস্না নেমেছে। শীতের রাত্রি অনেক হয়েছে। অদূরে 'চাঁচাই' জলপ্রপাতের অস্পষ্ট গুরু রব শোনা যাচ্ছিল। চারিদিকের প্রকৃতিকে মায়াচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।—

দেব রায়ের গল্প যখন শেষ হল, সবাই চুপ।

এক সন্ধ্যার প্রার্থনা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘৃণা থেকে মুক্তি দাও প্রভু, এই অকরুণ ঘৃণা
সহিতে পারি না।
দূরে যায় মোহ ঝরে অনর্গল, কেন সান্নিধ্যানে
তার রুগ্ন মুখ ভেসে ওঠে, কেন হরিদ্রানয়ন,
ভালে বয়সের—চিত্রকলা, ওষ্ঠে পরিপূর্ণ কান্ন
হাসে কুটিল শাঙ্খিনী।
কিঞ্চিৎ রহস্য দাও রমণীর চিক্কণ শরীরে
ক্লান্ত রমণীরে।
অপেক্ষায় আছি দীর্ঘকাল
যদি কোনোদিন স্বাদু মনে হয় চুম্বনের নিষিদ্ধ
লবণ
যদি স্নেহ রাজ্যে ফের অগ্নি জ্বলে ওঠে!
ছুঁয়ে দেখ কতকাল ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছি।
অথবা আমাকে এই মুহূর্তেই জীর্ণ করে দাও;
স্পন্দিত লজ্জাও
নিভে গেলে অন্ধকারে কল্পনার স্বপ্নলোক রচি—
যারা অভিমানে গেছে অন্তরালে, তারা
সুমিত চরণে, প্রেমে নিরন্তর বেষ্টন করুক,
আমি সব দুঃখ রেখে অবসন্ন বালকের মতন
ঘুমাবো।।

শিবনাথ শাস্ত্রী--শশীকুমার হেস

(২৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

The Guest House,
Race Course,
Baroda (camp),
20-2-1900.

শ্রীশ্রীচরণেষু,

কয়েক দিন যাবত আপনার চিঠির অপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম। আশা করি একটু সুবিধা পাইলেই আমাকে লিখিতে আজ্ঞা হইবে। ব্রাহ্মসমাজ কমিটি আমার সম্বন্ধে কি করিলেন, জানিবার জন্য একটু ব্যস্ত আছি। Miss Flamant -এর চিঠিতে প্রায়ই আপনার কথা জানিতে পাই। সেদিন না কি আপনি দুইবার তাঁকে বাড়ীতে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এবং তার পরদিন তাঁকে প্রায় বাঁধকপির মতো গোলাপ একটা উপহার দিয়াছিলেন। আজ আবার আপনার নাকি খুব ভাল চিঠি পাইয়াছেন—আমাকে লিখিয়াছেন। তাঁর ইংরাজীতে এমন বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, যাতে আপনাকে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠান; তাই তাঁর অনুরোধ—আমিই তাঁর হয়ে কয়েকটি ছত্র আপনাকে লিখি। তিনি ফরাসীতে লিখিয়াছেন, "আমি জানি না এবং জীবনে কোনও দিন জানিব না তাঁর এই স্নেহ ও মহত্ত্বের ঋণ পরিশোধ করিতে এবং উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে। বিধাতার কৃপায় যেদিন আমাদের গৃহ হইবে, পরিবার হইবে, তখন তাঁহার স্নেহ এবং উপদেশের সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হইব।"

আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন তাঁর কোন ধর্মে বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু সরল অন্তঃকরণটি বিধাতা বহুদিন দূরে ফেলিয়া রাখেন নাই। লণ্ডন আসিয়া অবধি তিনি বিনা প্রার্থনায় শুইতে যাইতেন না, বিনা প্রার্থনায় প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতেন না। সেই হইতে তাঁর চরিত্রে একটা মহা পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; সেই হইতে তাঁর সরলতা আশ্চর্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হৃদয়ের অতি ক্ষুদ্র চিন্তাটিও আমার কাছে গোপন করিতেন না। তখনও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া কোন আশা দিই নাই। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা, নানাবিধ অমূল্য গুণরাশি, সর্বোপরি স্বর্গীয় সরলতার প্রতি আমি বেশীদিন উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি নাই। বিবাহের আশ্বাস না দিলেও তিনি ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেন। এইরূপেই তাঁর আমার দেশের প্রতি আকর্ষণ ছিল। আমি আর কোনদিক না চাহিয়া তাঁকেই বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, সেইদিন হইতে তাঁর জীবনে আরও এক মহা পরিবর্তন ঘটিল। তিনি আমাদের ভিতর আসিবার পর আপনাদের দৃষ্টান্তে এবং উপদেশে আরও অনেকগুলি মহৎ ফল ফলিয়াছে। আপনি নাকি তাঁকে একখানা Prayer Book দিয়াছেন; প্রতি প্রাতঃকালে তিনি তাহা পাঠ করেন। আজ আমাকে লিখিয়াছেন—"তোমার বন্ধুগণ তোমাকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু জানিও আমার ভালবাসা এবং ভক্তির সহিত তার তুলনা হইতে পারে না। তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা,—আমার অনেকগুলি দুর্বলতা আছে, তন্মধ্যে রাগ একটি প্রধান। সেই জন্য কখনও তোমার প্রতি যদি কর্কশ ব্যবহার করি, তবে তাহা পাপে পরিণত হওয়ার পূর্বে আমাকে ক্ষমা করিও। ইহা আমার কতকগুলি শিরা উপশিরার দোষ, কিন্তু আমার হৃদয়ের নহে।" দেখুন তো সরলতা কতদূর। আমার স্বদেশীয় মহিলা-চরিত্র সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু ইউরোপে দেখিয়াছি যাঁরা স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন তাঁরাও নিজের ত্রুটিটি কখনো স্বীকার করিতে রাজী হন না; নারী চরিত্র এমনি অভিমানে পূর্ণ। কিন্তু ইঁনি দেখিতেছি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে গঠিত; নগণ্য দোষ এতটুকুও লুকাইবার চেষ্টা নাই। আমার বিশ্বাস ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এঁর এবং পরোক্ষভাবে আমার অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে।

লোকে আমাকে গালি দিতেছে, ব্রাহ্ম সমাজেরও অনেক পুরুষ এবং মহিলা আমার কাজের দোষ প্রচার এবং নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁরা আমাকেও জানেন না, Miss Flamant-কেও জানেন না, অথচ সমালোচনা! কিন্তু তাঁরা জানেন না যে আমি কারোও মুখ চাহিয়া একাজে প্রবৃত্ত হই নাই, কারও রাঙ্গা মুখ আমাকে একাজ হইতে নিবৃত্তও করিতে পারিবে না। যে দিন গরীব পথের ভিখারী ছিলাম সে দিনও বিধাতার দিকেই চাহিয়াছি; আজও তাঁর মুখ চাহিয়াই একাজে প্রবৃত্ত।

আমার আশা আছে এই ভিন্ন জাতি, ভিন্নদেশী মেয়েকে নিয়াই একটি প্রকৃত পরিবার গঠন করিয়া দেখাইব, কি করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়; ইহাই আমার একমাত্র বাসনা। আপনারা আমাকে এই আশীর্বাদ করুন।

Miss Flamant প্রফেসর বসুর বাড়ীতে পরম সুখে আছেন—তিনি বিদেশে আছেন বলিয়া একেবারেই তাঁর মনে হয় না। এঁদের দেখে তাঁর মনে ধারণা জন্মিয়াছে এই দেশের সকল লোকই দেবতা। আমাদের সম্বন্ধে তাঁর এত উচ্চ ভাব। আগামী সপ্তাহে নাকি আপনি তাঁকে চন্দননগর নিয়া যাইবেন, বলিয়াছেন; সে জন্য তাঁর আনন্দের সীমা নাই। আপনার কাজ কর্মের বাধা না জন্মিলে যখন যেখানে ইচ্ছা তাঁকে নিয়া যাইবেন।

আমার ভয় হইতেছে বাজে কথায় চিঠিখানা পূর্ণ করিয়া আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিতে বসিয়াছি। বাস্তবিক, এতকথা লিখিব বলিয়া আমি ভাবি নাই।

আমার কাজকর্ম বেশ চলিতেছে। মার্চ মাসের শেষ ভাগে সবই শেষ হইবে বলিয়া আশা করি।—আমি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছি। শ্রীচরণের মঙ্গল জানিতে বাসনা। নিবেদন ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী সেবক
শশীকুমার হেস

তুরুপ

(২৯২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই দেখেছেন এবং শুনেছেন। পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত আকারে বোসগিন্নী সে ঘটনা বিবৃত করলেন।

শনিবার আসবার আগেই একদিন দুপুরবেলা গনাইগিন্নী দরগা রোডে গিয়ে সরেজমিনে ঘটনাস্থল তদন্ত করে এলেন। বোসগিন্নী যেমন বলেছিলেন, বাড়ী, রাস্তা, ডাস্টবিনের বর্ণনা আনুপূর্বিক সবই মিলে গেল। তারপর শনিবার এলো। গনাই মামা অফিস যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আজ রাত্রে আমার নেমন্তন্ন আছে, ফিরতেও হয়ত একটু দেরি হতে পারে।

গনাইগিন্নী মুখে কিছুই বললেন না। মনে মনে সংকল্প করলেন আজ এর একটা হেস্ত-নেস্ত তিনি করবেনই। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অবকাশ তাঁর আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও হয়নি। বোসগিন্নী তাঁর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। গনাইমামা সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে অমরদার আড্ডায় চলে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তাস পিটে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি আসর ছেড়ে উঠে গেলেন। দরগা রোডে সুনীলবাবুর বাড়ীতে কড়া নাড়তেই চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে এসে দরজা খুলে দিল বেলা, গনাইমামার হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল এবং চীৎকার করে মা-বাবাকে ডাকতে লাগল।

বেলার বাবা সুনীলবাবু অত্যন্ত আমুদে এবং মজলিসী ব্যক্তি। গনাইমামার সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে জমিয়ে ফেললেন। সেদিন রাত্রের বিচিত্র অভিযানের কাহিনী গনাইমামা যখন বেশ রসিয়ে রসিয়ে সুনীলবাবুকে শোনাচ্ছিলেন তখন বেলা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছিল এবং তার মা খাওয়ার আয়োজন করার অজুহাতে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গনাই গিন্নী। সুনীলবাবু চমকে উঠে চিৎকার করে উঠলেন, আপনি কাকে বলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছেন? কি চান?

গনাইমামা চকিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে উঠলেন, ওঃ তুমি এসে পড়েছ—আমার পাগলী মায়ের কথা তুমিও শুনেছ দেখছি। এ দিকে আয় মা বেলা, ইনি তোর কাকিমা। তোর মাকে খবর দে। সুনীলবাবু আপনাদের বলতেই ভুলে গিয়েছি—আমার গৃহিণীকেও আজ সন্ধ্যায় এখানে আসবার জন্য আপনাদের হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম। আমি অফিস ফেরতা চলে এসেছি কিনা তাই ওঁর কথা বলতে স্রেফ ভুলে গিয়েছিলুম।

বেলার মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে গনাই গিন্নীর একটা হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন দিদি, বসুন। আমাদেরই অন্যায় হয়ে গেছে আপনাকে আসবার কথা আমরা বলিনি।

গনাইমামা তাঁর গিন্নীর ম্লান ফ্যাকাশে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

পালানো যায় না

(২৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মনে হ'ল সমস্ত রাত তো কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

ভিতরে ঢুকে সে পিঠের বোঁচকা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে' খুলে গেল কপাটটা আর ছপ ছপ ছপ ছপ শব্দও হল একটা বাইরে। বনোয়ারি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিলে আবার। আবার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাড়গিলার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার মনে। ওর আসল নাম দনদন্। ভালো নাম ছিল দনজারি। কিন্তু তার চেহারার জন্যে সবাই ওকে হাড়গিলা বলে' ডাকত। হাড়গিলার মতোই দেখতে। লম্বা লিকলিকে. কোমরের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরল-রেখায় নয়। দুবার বেঁকেছে। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা বাঁক. হঠাৎ মনে হয় কুঁজো (এই বাঁকটার উপরই ছুরি মেরেছিল বনোয়ারি), আর দ্বিতীয় বাঁকটা ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু এ বাঁকটা উল্টো রকম। লম্বা ঘাড়টা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে আর গলার দিকটা বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে।   মনে হয় কেউ যেন ওর ঘাড়ে লাথি মেরে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে গলাটা।   গলাটা অসম্ভব লম্বাও। ঝাঁকিটাও বেশ উঁচু। খাঁড়ার মতো নাকের সঙ্গে সেটা যেন পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, ঠিক ফরসা নয়. হলদে। কপাল উঁচু. চোখ দুটো কটা, মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভুরু নেই। চোখ মুখে কেমন যেন একটা বকের ভাব। এ রকম লোক যে কি করে ঝুমকোর মতো মেয়েকে পটাতে পেরেছিল, তা বনোয়ারি বুঝতে পারেনি। হাড়গিলা অবশ্য ঝুমকোর প্রেমে পড়েনি, সে ঝুমকোর সঙ্গে ভাব করেছিল তার গয়না আর গিনিগুলো হাতাবার জন্যে, কিন্তু ঝুমকো তো পড়েছিল। তা না পড়লে ভিতরের অত খবর কি হাড়গিলা জানতে পারত? সে কোন বাক্সে গিনিগুলো রাখত, আলমারির কোনখানটায় তার গয়না-গুলো আছে সব কি বলত হাড়গিলাকে? ভাল না বাসলে বলত না। হাড়গিলাই বনোয়ারিকে নিয়ে গিয়েছিল ঝুমকোর কাছে।   একা তো অতবড় জোয়ান মেয়েকে খুন করা যায় না, এক-জন সহকারী চাই। আর হাড়গিলা ছোরাছুরি বা গোলাগুলীর পক্ষপাতী ছিল না। সে বলত ও সব বড় গোলমেলে জিনিস. ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। তার চেয়ে টুঁটি টিপে শেষ করে' দেওয়াই নিরাপদ। বনোয়ারি জাপটে ধরে ছিল ঝুমকোকে, আর হাড়গিলে টুঁটি টিপেছিল. বনোয়ারির চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। বারান্দায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মট্ করে একটা শব্দ হল...ঠিক এমনি শব্দ ঝুমকোর গলা থেকেও বেরিয়েছিল!

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বনোয়ারি। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে টর্চ আছে। তার ঝোলার মধ্যে লণ্ঠনও আছে একটা। টর্চটা ভিতরের পকেটে ছিল। খুব বেশী ভেজেনি। জ্বালা গেল। জেবলেই নিশ্চিত হল বনোয়ারি। কপাটে খিল ছিটকিনি দুই আছে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল দুটোই। তারপর ঝোলাটার ভিতর থেকে লণ্ঠনটা বার করল। আলাদা একটা বোতলে কেরোসিন তেলও ছিল। গত পনেরো দিন থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কত অজানা জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে, আরও কত রাত কাটাতে হবে তার ঠিক নেই, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি, বিশেষ লণ্ঠন আর কেরোসিন তেল, টর্চ, দেশলাই আর মোমবাতি সে সংগ্রহ করে রেখেছে। কপাট বন্ধ করে সে লণ্ঠন. তেলের শিশি বার করলে, টর্চের আলো জেবলে জেবলে। দেশলাইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরি হল। নানাবিধ কাপড়-জামার জটিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল। সব বার করে ফেললে সে বোচকাটা থেকে। অনেক রকম কাপড় জামা ছিল। প্যাণ্ট, হাফ-প্যাণ্ট, ঝোলা-পাজামা, ধুতি, শার্ট, কোট, হাওয়াই সার্ট হরেক রকমের, রঙগীন চশমা দু'তিন জোড়া। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে গিয়েছিল। বনোয়ারি ক্রমাগত পোষাক বদলে বদলে বেড়াচ্ছিল। তার ধারণা হয়েছিল পুলিশ তো বটেই হাড়গিলার প্রেতাত্মাও পোষাক বদল করলে বোধ হয় তাকে চিনতে পারবে না। যদিও সে বারবার নিজের সঙ্গে তর্ক করছিল যে ভূতটুত সব কুসংস্কার, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না, কিন্তু তবু সে সাবধানতা অবলম্বন করতে ছাড়েনি। তাকে কে বনোয়ারির পিছনে বসে আর একজন কানে কানে বলছিল—সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি একটা শব্দ যখন শুনেছ, তা যাই হোক, সাবধান হও। বনোয়ারি ক্রমাগত পালাচ্ছিল আর পোষাক বদলাচ্ছিল। কখনও সাহেবী পোষাক কখনও পেশোয়ারী, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মিলিটারি। চোখে কখনও গগলস, কখনও শাদা চশমা, কখনও নীল।...ভিজে কাপড়-জামার মধ্যে দেশলাইটা পাওয়া গেল অবশেষে। একদম ভিজে গেছে।   টর্চের আলোতেই তাড়াতাড়ি লণ্ঠনে তেল ভরে' ফেলল সে। টর্চের আলোটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। টর্চটা নিবিয়ে রেখে দিল। একটু আলোর সম্বল রাখা ভাল। দেশলাইটা জ্বলবে কি? বড্ড ভিজে গেছে। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, একটা কাঠিও জ্বলল না। আবার সুরু করল সে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্, অন্ধকারে শব্দটা অদ্ভুত শোনাতে লাগল, কেউ যেন হাঁচছে। হাঁচছে? না, হাসছে? পাগলের মতো কাঠির পর কাঠি খসতে লাগল বনোয়ারির। একটাও জ্বলল না। সব কাঠি ফুরিয়ে গেল। টর্চটা জেবলে ছড়ানো কাঠিগুলোর দিকে সভয়ে চেয়ে রইল সে। টর্চের আলোটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। আর বেশীক্ষণ টিকবে না। আবার নিবিয়ে দিলে টর্চটা।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে বজ্র পড়ল একটা। মনে হল এই বাড়িতেই পড়ল। থর থর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। বনোয়ারির মনে হল—সমস্ত রাত অন্ধকারে কি করে' কাটাব এখানে? আলোটা যদি জ্বালতে পারতুম। আলো থাকলে কারও পরোয়া করতাম না। হঠাৎ ডান দিকে খিক খিক খিক খিক করে' শব্দ হল। তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল বনোয়ারি। ঠিক যেন ব্যঙ্গ করে কে হাসল। যে দিক থেকে হাসিটা এল টর্চটা জেবলে সেই দিকে দেখলে চেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখতে পেল একটা খোলা জানলা রয়েছে ওদিকের দেয়ালে। এগিয়ে গেল সে-দিকে। টর্চ ফেলে দেখল বাইরের বারান্দায় দু'-তিনটে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই খ্যাক খ্যাক শব্দ করছে সম্ভবত। ফিরে এল আবার। টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোঁফ-দাড়িগুলো খুলে ফেললে। জলে ভিজে পরচুলাগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল একটা। তারপর ব্যাগের ভিতর হাত পুরে একটা পাঁউরুটি বার করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। খুব খিদে পেয়েছিল। ভাগ্যে পাঁউরুটিটা সঙ্গে এনেছিল। খেতে খেতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গেই কথা সুরু করে দিল। নিজের কণ্ঠস্বরই যেন সঙ্গী হল তার সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে। "হাড়গিলে এ তুই কি করলি বল তো। তোর সঙ্গে কথা ছিল তুই আধা-আধি বখরা দিবি আমাকে। ছিল না? কিন্তু মাত্র কুড়িটি টাকা দিয়ে আমাকে তুই বিদেয় করে দিলি কোন আক্কেলে? আমি কি কুলী? আমি সাপটে না ধরলে তুই ওর গলা টিপতে পারতিস? আর আমাকেই কলা দেখালি। কেমন মজাটি টের পাইয়ে দিলুম। ছুরির একটি ঘায়ে তো কাৎ হয়ে পড়লি। আমার সঙ্গে চালাকি! গয়না গিনি সব পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিশ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাব আবার।"

বাইরে আবার ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে সেই খিক খিক হাসি।

"আঃ, শেয়ালগুলো জ্বালালে তো! হাড়-গিলে, তুই ভাবছিস আমি ভূতের ভয়ে কাঁপছি? মোটেও না। তুই শেষ হয়ে গেছিস। তোকে আর ভয় নেই। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারলে কারো পরোয়া করতাম না। অন্ধকার বলেই গল্পটা [illegible]—"

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মুখটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, সুনীলবাবু বোধ হয় জানেন না যে, আমরা নিঃসন্তান। তাই সেদিন রাত্রে কুড়িয়ে পাওয়া আমার পাগলী মাকে দেখিয়ে গিন্নীর তাক লাগিয়ে দেব ভেবে-ছিলুম—কিন্তু তা কি হবার উপায় আছে—বাতাসের আগে খবর পেঁছে গেছে গিন্নীর কানে।

মন্ত্রপূত ফণিনীর মত উদ্যত ফণা নামিয়ে নিয়ে গনাই গিন্নী ধপ করে একটা সোফার ওপর বসে পড়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

গনাইমামা তাই দেখে বললেন, রাস্তার আলোর নীচে ছোট ছোট সবুজ পোকাগুলোর জন্য পথহাঁটা দুষ্কর। সেদিন আমার চোখে একটা পড়েছিল—আজ গিন্নীর চোখে একটা পড়েছে। ভীষণ জ্বালা দেয় আর চোখে থেকে জল পড়ে বুঝলেন সুনীলবাবু।

বেলার মা হঠাৎ উঠে গিয়ে পশ্চিমদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলো। একটু পরে পাশের বাড়ীর জানালাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। গনাইগিন্নী মুখ তুলে একবার বেলার মার দিকে তাকালেন এবং পরক্ষণেই দুজনে অর্থপূর্ণ মৃদু হাসলেন।

টক্ করে একটা শব্দ হল।

মেজেতে কি যেন পড়ল একটা উপর থেকে।

টর্চটা মুঠোয় চেপে ধরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বনোয়ারি। তারপর জ্বালল টর্চটা। যা দেখল তাতে তার মুখটা 'হাঁ' হয়ে গেল একটু। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতন হল। মেঝের মাঝখানে একটা দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তুলে নিলে সেটাকে। শুকনো খট্‌খটে নতুন দেশলাই এক বাক্স। দু'দিকের কাগজ পর্যন্ত ঠিক আছে। কোত্থেকে এল এটা? কে দিলে? টর্চটা ছাতের উপর ফেলে দেখবার চেষ্টা করল একটু। কিছু দেখা গেল না। খিক খিক হাসিটা আবার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিবে গেল। তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনোয়ারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে নিলে দেশলাইটা। প্রথম কাঠিটাই জ্বলে উঠল।

... ...লণ্ঠনটা জেলে বেশ করে গুছিয়ে বসেছিল বনোয়ারি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আকাশের গুরু গুরু শব্দ আর ঝড়ের তান্ডব চলছিল। আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে সেই ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ শব্দ আর খিক খিক হাসি। এইটেই শুনছিল বনোয়ারি একাগ্র হয়ে। শেয়ালগুলো ও রকম করছে? তাই নিশ্চয়। এই বিশ্বাসেই অনড় হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু একটু পরেই এ বিশ্বাস আর টিঁকল না। খিক খিক শব্দটা কানের খুব কাছে শোনা গেল। নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন গালে লাগল। আর মনে হতে লাগল ঘরের ভিতরই যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চোপরাও, খবরদার—"

টপ করে ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার করে' চীৎকার করে' উঠল বনোয়ারি। শব্দটা থেমে গেল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে' বসে রইল সে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ হল না। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেল ঘরের কোণে ছায়ামূর্তির মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। ঠিক যেন হাড়গিলার ছায়া পড়েছে। বোঁ করে ছোরাটা সেই দিকে ছুঁড়ে দিলে সে। ছায়াটা সট্ করে যেন উপরের দিকে মিলিয়ে গেল, আর ছোরাটা গেঁথে গেল দেওয়ালে। বনোয়ারি উঠে গেল দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু পারলে না। ছোরাটা দেওয়ালে এমন গেঁথে বসে গিয়েছিল যে খোলা গেল না। টানাটানি ধস্তাধস্তির চরম করল বনোয়ারি, কিন্তু কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না ছোরাটা। মনে হল ভিতর থেকে ছোরাটাকে কে যেন শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছোরাটা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল বনোয়ারি। ছোরার বাঁটটা কাঁপতে লাগল, বনোয়ারির মনে হল যেন বলছে—না, না, পারবে না। ছেড়ে দাও। ঠিক এই সময়ে খিক খিক হাসিটা আবার কানের পাশে শুনতে পেল সে। লাফিয়ে সরে গেল একধারে। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে। আর একবার চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল। টানতে টানতে হঠাৎ হাত ফসকে গেল তার, দড়াম করে নিজেই পড়ে গেল মেঝের উপর। ছোরার বাঁটটা দুলে দুলে বলতে লাগল—না, না, না, না। আর সঙ্গে সঙ্গে খিক খিক হাসি। [illegible] উঠে কপাট খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল বনোয়ারি বাইরে। দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে তার কাপড়-চোপড় উড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরের মেঝের চারদিকে। লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু নিবল না। তার আগেই বনোয়ারি ঘরে এসে ঢুকল প্রকান্ড লম্বা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে।

"পিটিয়ে লম্বা করে দেব হারামজাদাকে—" উচ্চকণ্ঠে এই স্বগতোক্তি করে কপাটটা আবার ভাল করে বন্ধ করে দিলে সে। তারপর লম্বা ডালটা রাখল একধারে। কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে বোঁচকায় পুরে ফেলল। তারপর ঘরের মাঝখানে গুম্ হয়ে বসে রইল ভ্রূকুঞ্চিত করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্রমশ ঘুম পেতে লাগল তার। ঢুলতে লাগল। হঠাৎ থমকে উঠল একবার। মনে হল ঘরের আর একটা কোণে ফিস্-ফিস করে কথা কইছে যেন কারা। লম্বা ডালটা তুলে তেড়ে গেল সে দিকে। কেউ নেই। তারপর তার মনে হল সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে বোধহয়। তাই ও-সব আজগুবি জিনিষ দেখছে আর শুনছে। একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত? হুঁঃ, যত সব বাজে কথা। বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝের উপর। চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘুম এল না। তবু চোখ বুজে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত ছোট্ট শব্দ হ'ল। চু-চু-চু। বনোয়ারি চোখ খুলে দেখলে ছাতের উপর থেকে কালো মতন কি একটা ঝুলছে। ঝুল না কি? পুরোনো বাড়িতে ঝুল থাকা অসম্ভব নয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। মনে হতে লাগল ক্রমশ সেটা বড় হচ্ছে। নীচের দিকে লম্বা হচ্ছে। সাপ নয়-তো? বনোয়ারি উঠে সেই লম্বা ডালটা তুলে সেটার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডালটা খুব লম্বা, নাগাল অনায়াসেই পাওয়া যেত। কিন্তু ওটা ক্রমাগত সরে' সরে' যেতে লাগল। আর ক্রমশঃ লম্বা হয়ে নামতে লাগল মেঝের দিকে। বনোয়ারি শেষে পাগলের মতো ঘোরাতে লাগল ডালটা। তারপর অপ্রত্যাশিত এক কান্ড হল। হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে জাপটে ধরল তাকে। নরম দুটো হাত, ঠিক যেন মেয়েমানুষের হাত, পিঠের উপর স্তনের স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু। বনোয়ারির হাত থেকে ডালটা পড়ে গেল। আর ছাত থেকে সেই কালো বস্তুটা নামতে লাগল ক্রমশঃ। বনোয়ারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সে দিকে। দেখতে দেখতে সেটা তার চোখের সামনে নেমে এল। বনোয়ারি দেখলে সেটা ঝুল নয়, সাপও নয়, আঙুল একটা। বিরাট মোটা রোমশ আঙুল, প্রকান্ড নখ রয়েছে তাতে। আঙুলটা মেঝের কাছে আসতেই চড়াৎ করে শব্দ হ'ল একটা, মেঝেটা ফেটে গেল। সেই ফাটলের ভিতর থেকে বেরুল হাড়গিলার মুন্ডটা। "কে, বনোয়ারি এস, এস, ভয় পাচ্ছ কেন। ঝুমকো এবার ছেড়ে দাও ওকে। ও আসবে এইবার। ঝুমকো আমার গলাটাকে কামড়ে ছ্যাত্‌রা-খ্যাত্‌রা করে দিয়েছে একেবারে। দেখতে পাচ্ছ?"

বনোয়ারি দেখতে পেয়েছিল। হাড়গিলার [illegible] একটা গর্ত। গর্তের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যাচ্ছে।

"ঝুমকো ছেড়ে দাও ওকে। ও এইবার আসবে। বন্ধু এস—"

অদৃশ্য হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অদৃশ্য এবার দৃশ্যও হ'ল। বনোয়ারি ঘাড় ফিরিয়ে এবার দেখতে পেল ঝুমকো দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড়টা ওদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, মুখময় ফেনা, চুল-গুলো এলোমেলো। তারপর বনোয়ারি অনুভব করল হাড়গিলা তার হাত ধরে টানছে আর ঝুমকো ঠেলছে তাকে পিছন থেকে। বনোয়ারি গর্তে ঢুকে পড়ল।

ফেরারী আসামী বনোয়ারির মৃতদেহ সাতদিন পরে পুলিশ আবিষ্কার করল ওই ঘরের মধ্যে। মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে একটা ফাটলের মধ্যে আটকে ছিল।

সাবালক

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ফুল-ফোটা ওই সকালবেলায় জাগলো মন
অভিজ্ঞতার নতুন জীবন খুলল দোর
নিরস সে এক মরা-রোদ্রের পেলাম খোঁজ
হাওয়ার কাঁটার শৃংখল পায়ে-আসল ভোর।
গ্রহণ লেগেছে সূর্যে—
সময়, যে ছিল ঘুমন্ত, আজ
ঝটিকার বেগে ছুটছে।

জীবন-পথের সামনে পাহাড় ঃ সঙ্গী নেই
একা যেতে হবে যে বাধা ডিঙিয়ে অনেক দূরে
সামনে পেছনে অনিশ্চিতের হাতছানি
মাথার ওপর কালের পাখিরা যাচ্ছে উড়ে।
অতীত গিয়েছে হারিয়ে ঃ
ভবিষ্যতের কালো রাস্তায়
দিলাম পা একা বাড়িয়ে।

দিন ও রাত্রি

* অমরেন্দ্র দাস *

ঘুম ভাঙতে দেখি লাল পলাশের দোলন
ভোরের হাওয়ায় স্নিগ্ধ চোখে ফোটে,
আর যে দেখি আমার বঁধুর লাজ রাঙানো মন
ভোমরারা সব ফুলের কুঞ্জে জোটে।

দিনের বেলা মধুর স্বপ্নে কাটে
অফিস থেকে যখন ফিরি ঘরে,
আকাশ নামে অন্ধকারের মাঠে
রাত্রি আসে স্মৃতির সিঁড়ি পরে।

এমনি করে চক্র ঘোরে দিনের
বয়স বাড়ে পথের অশথ গাছের,
দিনটি কাটে তবু ভীরু মনের
রাতের ব্যথায় অশ্রু ঝরে চাঁদের।

রংয়ের বাহার—বেশভূষায়!

বেলা দে

বেশভূষা বা প্রসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য রূপকে সুন্দর করে তোলা; বসন, ভূষণ, কেশের কারুকার্য ইত্যাদি দিয়ে নিজেকে সাজাবার চেষ্টা করা। কারণ সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত। রুচিসম্মতভাবে পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার মধ্যে একটা নৈপুণ্য থাকা উচিত। কারণ মনে রাখা দরকার খুব সুন্দর ও দামী জিনিসও ভুলভাবে ব্যবহার করলে তার কোনো ফল হয় না, আবার খুব সাদাসিধে জিনিস দিয়েও মোটামুটি নিজেকে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজালে তার চেহারা দেখায় অন্যরকম।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী মানুষের দেহ ও মন যেমন বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেইরূপই সে তার বেশভূষাও অনেকটাই পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। গরম দেশের সাজপোষাক যেমন, শীতের দেশের ঠিক তেমন হতে পারে না।

প্রথমেই শাড়ী নির্বাচনের কথা—প্রধানতঃ দেহের গঠন ও গায়ের রংয়ের উপর শাড়ী নির্বাচন নির্ভর করে, কিন্তু আমরা সাধারণতঃ শাড়ী কেনবার সময় সামনে যে রংটা চোখে দেখতে ভালো লাগে সেইটাই কিনে ফেলি। অথচ যিনি এই শাড়ীখানি পরবেন তাঁর কথা একবারও মনে করি না।—কিন্তু শাড়ীর রং বেছে নেবার আগে এদিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার! যাঁদের গায়ের রং বেশ ফর্সা তাঁরা অবশ্য গাঢ় রংয়ের শাড়ী পরতে পারেন, তবে হালকা বা ফিকে রং যে পরবেন না তা নয় কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন এমন ফিকে রং যেন না হয় যা গায়ের রংয়ের উপর আভা ফেলে রংকে অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে করে তুলবে—যেমন বেশী ফিকে হলুদ, কমলা, গোলাপী ইত্যাদি রং। যাঁদের গায়ের রং ময়লা বা শ্যামবর্ণা—তাঁরা অবশ্যই ফিকে রংয়ের শাড়ী পরবেন কিন্তু গাঢ় রংয়ের শাড়ী জামা যে তাঁরা একেবারে বর্জন করবেন এমন কথা বলি না। কয়েকটি রং তাঁরা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন পাউডার ব্লু, শ্যাওলা সবুজ, মেরুণ ইত্যাদি। সাদা শাড়ীতে সকলকেই মানাবে এতে একটা স্নিগ্ধ ভাব আছে। তবে আমার ধারণা যাদের গায়ের রং বেশ ময়লা তাঁরা সাদা শাড়ী যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার করবেন।

এর পরই মনে রাখা দরকার স্থান ও সময়-বিশেষে কি ভাবে বেশভূষার পার্থক্য করা যেতে পারে। এখানে রং সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা ও জ্ঞান থাকা উচিত, কেন না রংই বিশেষভাবে পোষাকের রূপ দেয়। যেমন নীল, সবুজ, ফিকে হলদে, কমলালেবু, লাল, বেগুনে ও গাঢ় হলুদ খুব আনন্দের ও জাঁকজমকের পরিচয় দেয়। সাদা রংয়ের ভিতর দিয়ে পবিত্রতা ও সরলতার ভাব প্রকাশ পায়। লাল, বেগুনে, গাঢ় গোলাপী, ঘোর কমলা, নীল রং সাধারণতঃ গরম লাগে, ফিকে নীল, সাদা, ফিকে সবুজ, হাল্কা হলদে, পলার রং শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে।

ভোরের দিকে এবং দিনের প্রথম ভাগে ফিকে হলুদ, ফিকে সবুজ, ফিকে নীল শাড়ী ফর্সা মেয়েদের খুব ভালো মানায়। অপেক্ষাকৃত [illegible]

কোরা দেশী শাড়ীর যে নীলচে ছাই রং সেই রংয়ের ফিকে গোলাপী রংয়ের শাড়ী পরতে পারেন।

আবার সব জায়গায় সব রংয়ের বেশভূষাও মানায় না। শিক্ষার স্থানে যেমন স্কুল কলেজে সাধারণতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের সাদা পোষাকই পরা উচিত। কিম্বা রঙ্গীন হলেও খুব ফিকে হওয়া দরকার। প্রার্থনা বা পূজাগৃহে, যেমন গীর্জা বা মন্দিরে পারতপক্ষে সাদা পোষাক পরলেই খুব মানায়। সন্ধ্যায় ও রাত্রে গাঢ় রং পরা চলে। জরি, রেশম, কিংখাব জাতীয় জিনিস রাতের আলোয় বিশেষ ভালো দেখায় না।—সব রকম লাল, কালো, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, কমলা, সোনালী, রূপোলী, ঘন সবুজ, বাদামী, পেঁয়াজী এইসব রংয়ের বাহার খোলে রাতের আলোয়। কালো শাড়ীর সঙ্গে সাদা বা রূপোলী জামা বেশ মানায়। জাঁকজমক আর ধুমধাম এড়িয়ে যাবেন সব সময়।

শাড়ীর আর গলার আর হাতের সাধারণ সুন্দর রেখার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবেন, শাড়ীর পটভূমির রং বা বিভিন্ন রঙের মধ্যে যেটি প্রধান রং সেই রং বেছে নেবেন ব্লাউসের জন্য, রংয়ের পোঁচকেও ঠিকমত মিলিয়ে নেবেন, আর তা ছাড়া শাড়ী যে জিনিসের তৈরী, ব্লাউসও যেন সেই ধরণের জিনিসেরই তৈরী হয়। অর্থাৎ ধরুন কয়েক রকম রেশম আছে যার জাতই হলো শান্ত আর অনুগ্র। কোনো রেশম বা ফুরফুরে—প্রায় জীবন্ত, কোনটি চকচকে আর উজ্জ্বল, কোনটায় স্নিগ্ধভাব! ব্লাউস যে জাতের রেশম দিয়ে হবে শাড়ীও যেন সেই জাতের রেশমেরই হয়। তবু একই সঙ্গে দুটো চকচকে জিনিস বর্জন করুন—তার অকৃতকার্যতা অবশ্যম্ভাবী। মাইশোর সিল্ক, জর্জেট আর সিফনের সঙ্গে তসর, আসামের রেশম বা মুগা মেশাতে পারলে চিত্তাকর্ষক ফল পাওয়া যায়।

শাড়ীর সঙ্গে রং মিলিয়ে ব্লাউস, পেটিকোট পরা সুরুচির পরিচয়। যাঁদের সুবিধা আছে,

তাঁরা অবশ্যই এদিকে দৃষ্টি রাখবেন। শাড়ীর রং যা হবে সেই রংয়ের কোনো গাঢ় রংওলা ব্লাউস অথবা শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও পরা যেতে পারে। যেমন সবুজ শাড়ীর সঙ্গে কালো বা সাদা রংয়ের ব্লাউস, নীল শাড়ীর সঙ্গে গোলাপী, মেরুণ বা চকোলেটের সঙ্গে কালো বা হলদে ব্লাউস, কালো শাড়ীর সঙ্গে সাদা বা ফিকে সবুজ রংয়ের ব্লাউস। তাছাড়া শাড়ী যদি খুব জমকালো হয় তবে তার সঙ্গে যথাসম্ভব সাদাসিধে ব্লাউস পরবেন। তাছাড়া টিস্যু, জরী বা ব্রোকেট, অথবা বেনারসী শাড়ী হলে স্যাটিন, ভেলবেট, সিল্ক এইগুলোরই ব্লাউস পরা উচিত। কারণ দুটোই জমকালো বা ঝকঝকে মানায় না। মনে রাখবেন একটি ব্লাউসের রংয়ের গুণেই একখানি শাড়ী ওৎরাতে পারে। আবার একেবারে মাঠেও মারা যেতে পারে।

আরো একটি দিকে লক্ষ্য রাখবেন—খুব মোটা বা মোটার দিকে যাঁদের দেহের গড়ন তাঁরা সবটা এক রংয়ের বা ছোট বুটিদার শাড়ী পরলেই ভালো মানাবে। রোগা বা সুগোল ও ঋজু যাঁদের গড়ন তাঁরা চোখুপী, ডুরে বা জংলা শাড়ী পরলে বেশ মানাবে। সম্ভব হলে, যা

(শেষাংশ ৩২০ পৃষ্ঠায়)

ক্যাপ্টেন ঃ [illegible]

ঠন্‌ঠনে বনাম তালতলা

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কলেজ থেকে আসতে পথে চটির চলন, তার
হালকা ঠেকেছিল; রাগ এমন সর্বনাশা,
রাগের মাথায় বাঘ দিয়েছে ঘোগকে যেন বাসা!
নীচে নেমে খাটের তলায় ধরা পড়ল ভুল,
নীলমণিটা আঁখিরে মধু ফুটিয়ে যাবে হুল!
উপায় এখন নাই কিছু আর, নাকেতে খত দিয়ে
তালতলার ওই চটি জোড়া তালতলাতে গিয়ে
ফিরিয়ে দিতে হবে; হল ঠনঠনিয়ার হার—
শেষ রাত্রে হলধরের নিদ্রা নাহি আর।

সুদর্শন সে, সুপুত্র বটে অতি,
ঘটিতে দিবে না জনকের অপমান।
কাগজে মুড়িয়া চটি জোড়া নিয়ে নম্বর খুঁজে খুঁজে
তালতলা লেনে গেল পরদিন প্রাতে।
দুয়ারে নাড়িতে কড়া বার বার দ্বার খুলে দেয় এসে
নীলমণি-সুতা লোকায়তা যার নাম।
তেইশ বছর বয়স তাহার বাপ-মার এক মেয়ে
এম-এ. পাস ক'রে গবেষণা করে প্রতীচ্য দর্শনে,
মহাপন্ডিতা তবু সুবিনীতা অতি।
বিবাহযোগ্য মেলেনি পাত্র আজো আছে অনূঢ়া সে;
ধাড়ী কন্যার অদৃষ্ট ভেবে জননী শান্তিহারা।
"কী চাই?" প্রশ্নে সুমিষ্ট ভাষে জানালো সুদর্শন
পিতার ভুলের লাগি মার্জনা ন্যায়বাগীশের কাছে
এসেছে চাহিতে এবং ফেরাতে চটি।
"আসুন ভিতরে", বলি লোকায়তা দ্রুত গিয়ে মাকে বলে।
স্পন্দহীন বপুটি লইয়া যত দ্রুত সম্ভব
এসে তিনি কন, "এস এস বাছা, ও'রা দুটি ভাই-ভাই
অথচ দেখ তো দু' বাড়ির নাই চেনাশোনা-আনাগোনা
শহুরে আচার হেন অকরুণ, পোড়া এই সভ্যতা!"
আসন পাতিয়া আদরে বসান, "কী নাম তোমার বাবা,
লেখাপড়া সব সাঙ্গ হয়েছে বুঝি?"
মেয়েকে বলেন, "লোকী, যাও তো মা, বাবাকে খবর দাও।"
হৃষ্টচিত্তা সুদর্শনের চেহারা, বিনয় দেখে
আবার বলেন, 'বল বাবা, ব'ল লজ্জা করো না মোরে,
দূরে থাকি বটে, তবু বাছা আমি তোমারি মায়ের মতো।'
সবিনয়ে বলে হলধরসুত, "আমি শ্রীসুদর্শন
প্রেসিডেন্সীতে করি ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনা।"
শুনে সংবাদ পাত্রীর মাতা হ'ন যে হৃষ্টতরা।
ব্যস্তবাস্তে নীলমণি নামে, প্রণাম পাইয়া বলে,
"বেঁচে থাকো বাবা, তুমি যে এসেছ খুশি হইয়াছি ভা
ভালো হ'ল এই ছোট-ছুতো নিয়ে জানা-শোনা পরিচয়,
তুচ্ছ থেকেই ঘটে চিরদিন মহৎ সম্ভাবনা।"
খাবারের থালা আনে লোকায়তা, চা'র পেয়ালাও আসে—
জুতো বিনিময় ছুতোয় হ'ল কি হৃদয়ের বিনিময়?
ভাবিতে ভাবিতে পথে এক সাথে লোকায়ত, লোকায়তা
ধরে ফির'র এল কিছু আনমনা নবীন অধ্যাপক।

নীলমণি গিন্নী দেয় মুখ ঝামটা
"হা পোড়াকপালে তব এ ছেলের নামটা,
পড়ে নাই মনে কোনো এমন সুপাত্র
পাবে বল, রীতে তব জ্বলে যায় গাত্র।"

নীলমণি হেসে বলে, "দিও নাকো দৃষ্টি,
ওই আঙ্গুরের ফল মোটে নয় মিষ্টি।
যেটুকু বা আশা ছিল চটি-চটা কান্ডে
বিবাহের মা ভবানী এসে গেছে ভান্ডে!"
ঝঙ্কার দিয়ে বলে নীলমণি গিন্নী
সত্যপীরের মেনে মনে মনে সিন্নি,
"শুনব না কিছু আমি, যাও গলবস্ত্র,
দরকার হলে ধর ক্রন্দন-অস্ত্র।
সার্বভৌম পায়ে যত তেল লাগে দাও,
সিকায় তুলিয়া রাখ মতের ঝগড়াটাও।
যত বিদ্বানই হও, মনে রেখো হামেশা
কন্যার বাপেদের ভিক্ষাই তো পেশা।"

হলধর বলে, "অসম্ভব,
একে তো বাঙ্গাল, তাহাতে স্নব।
আঁকড়ে যে রয় লোকায়তে
তারে বিশ্বাস কোনো মতে
করিতে পারি না; মোর ঘরে
ছুঁচ ঢুকে ফাল রূপ ধরে—
চাই না তা আমি, তার চেয়ে
গয়ার তামাক যাও খেয়ে।"

চুকে-বুকেই গেল সবি, নিপ্‌ড্‌ ইন্‌ দি বাড!
কিন্তু ফুলটা ফুটেছিল কোমল কারো মনে?
শুষ্ক-হৃদয়-মরু কারো হঠাৎ আসা-ফ্লাড
ভাসিয়ে দিয়ে গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফোটায় সঙ্গোপনে!
প্লেটো, অ্যারিস্টটল, প্লটিনাস এপিকটেটাস—এঁরা
যুক্তি নীতি জুগিয়ে গেছেন, রন্ধ্রপথে কভু
তাঁদের মনে ঢুকে হঠাৎ কেউ বেঁধেছে ডেরা?
ঠিক জানে না, মনের কোণে প্রশ্ন রহে তবু।

পাতায় ওথেলোর একটু হলেই অনামনা,
লাগায় ঘোর-ঘোর সে কি শুধুই দেস্‌দিমনা?
পোপের অনুবাদে হেলেন হয়তো হাজির হন,
তাঁরেই ভেবে কাঁদে তরুণ অধ্যাপকের মন?
ঠনঠনিয়ায় হয় শুধু ঠনঠনিয়ার চটি?
বাঙ্গাল কারে কয় বল, কারেই বা কয় ঘটি?
শেক্সপীয়ার কি বেকন? কর, এখন বিচার তার,
হায় রে ললাট-লেখন, তত্ত্ব জেনে কি লাভ কার?

খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজ বাড়ি-প্রাঙ্গণে
মহতী বিচার-সভা বসিয়াছে, বঙ্গ পণ্ডিতেরা
নামকরা লোভী নয় তো সবাই, খ্যাতির লোভেও আসে।
সভা-সমাগমে, গৃহ দেবতার আরতি-ঘন্টারবে
সমবেত শিশু, জনতার সেই বিচিত্র কোলাহলে
ফাঁকে ফাঁকে শুনি মাইক-কণ্ঠে অকুণ্ঠ বক্তৃতা।
বিচার-তর্ক বিতণ্ডা আর অনুস্বারের যোগে
কঠিন কলহ হয়-হয় বুঝি, বাধে বা ধুন্ধুমার!

পণ্ডিতকুল শিরোমণি যাঁরা বাড়ির মোটরকারে
মহা সম্ভ্রমে আনীত হইয়া বসে সভা আলো করি।
হলধর আর নীলমণি রা সেই মহারথী দলে
সাপ ও নেউল মনে হয় যেন বসে আছে গলাগলি!

হাড়ী ছেলে

দেব দত্ত

পারে বল, রাতে তব জ্বলে যায় গাত্র।"

সাপ ও নেউল মনে হয় যেন বসে আছে গলাগলি।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঞ্চনজঙ্ঘা — পি, জি, দাস
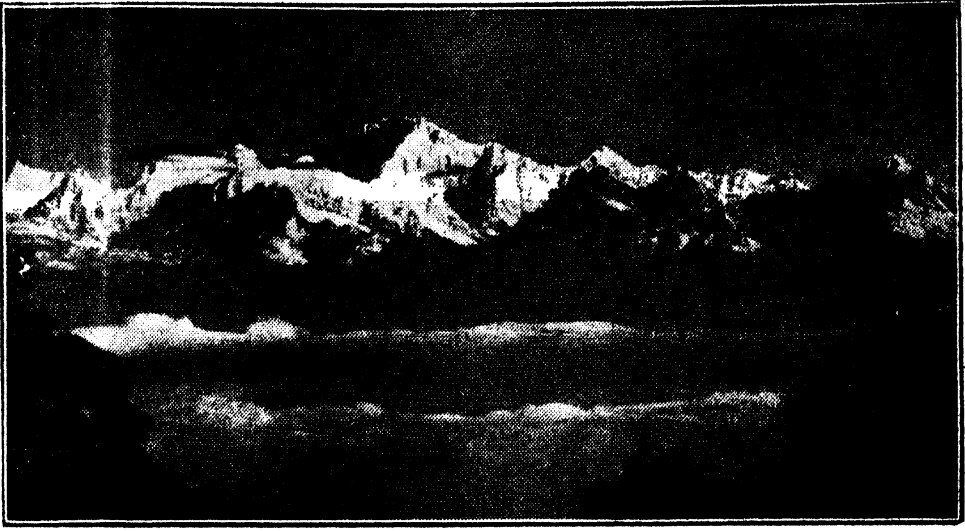
বিদায়-অন্তে অনেক রাত্রে একই মোটরকারে
বহু তৈজসবস্ত্র সংগে দুজনে গৃহাভিমুখে
আসিতেছিলেন, উভয়ের মুখে থম্‌থমে নীরবতা।
তালতলা লেন বাঁকের মুখেতে বিষম দুর্ঘটনা,
দৈবই হবে, দেবতার মনে না জানি কি প্যাঁচ ছিল;
পিপা ঠাসা এক লরি এসে 'কারে' সবেগে ধাক্কা মারে,
কাবাব-রুটির দোকানে ঠেকিয়া চ্যাপ্টা বনেটে সেটা
থামিতেই হ'ল ঘোর হৈ-হৈ শব্দ।
জনতা ঘিরিল, আসিল পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেডও শেষে।
ধাক্কা খেয়েও নীলমণি ছিল নিখুঁত ও নিরাপদ,
খাতিরও তাঁহার ও পাড়ায় ছিল খুবই।
তাঁর অনুরোধে সংজ্ঞাবিহীন হলধরে সবে ধরি
শ্রীনীলমণির বৈঠখানায় শোয়াল তক্তপোষে।
ট্যাক্সিতে গিয়ে নীলমণি নিয়ে এল বড় ডাক্তার,
আসিল সুদর্শন স-জননী ফোনেতে খবর পেয়ে:
ঠনঠনে এল, মাতে তালতলা অতিথির সৎকারে।
ডাক্তার চান হসপিটালেতে 'রিমুভাল' অচিরাৎ।
সেরিব্রাল হেমারেজ সে সহজ নয়।
নীলমণি-জায়া কঠিন কঠোর, শেষ তক তাঁরি জেদে
সেখানেই রেখে চিকিৎসা-সেবা চলে।
অবুঝ সতীরে বুঝ দেয়, নাই শিবেরো সাধ্যে তাহা।
সেবা পরিপাটি হলধর-জায়া দেখে-শুনে খুশি হয়ে
ফিরিয়া গেলেন ঠনঠনিয়ায় সংসার আছে তাঁরো,
নীলমণি-জায়া করেন মানত ঠনঠনে কালীমার।
অজ্ঞান হলধর,
অসহায়ভাবে প'ড়ে থাকে তাই তালতলা-আশ্রয়ে।

তার পরেতে ঘটল কি যে বলতে মোরে হবে?
জলের মত পরিষ্কার এ, ঘটেই থাকে ভবে।
বেহুঁস, তবু শ্রীহলধর করেন অনুভব,
কোথায় যেন আনছে তাঁরে, শাঁখ-ঘণ্টার রব
যায় না শোনা ঠনঠনিয়ার কোথায় কালীবাড়ি?
পড়ল মনে মাথায় চোট পেয়েছিলেন ভারি
ভূকৈলাস ফিরতি পথে; উঠে বসতে যান,
বাধার সাথে অতি কোমল হাতের ছোঁয়া পান।
কে যেন কয়, "জ্যোঠামশাই, থাকতে হবে শুয়ে."
বুকের কাছে মুখ একটা এসেও ছিল নুয়ে।
আরামে চুপ ক'রেই থাকেন, তর্ক গেছেন ভুলে,
লাগছে ভাল কাঁচা হাতের স্পর্শ পাকা চুলে।
এমন সময় রোগীর ঘরে ঢুকল সুদর্শন,
প্রশ্ন করে, "বাবা এখন আছেন বা কেমন?"
ছেলের গলার আওয়াজ শুনে ব্যাকুল হলধর
উঠতে যাবেন, পেতেই বাধা লাগান কষে চড়।
হঠাৎ চড়ে মাথা ঘুরে পড়ল লোকায়তা,
হতবম্ভ সুদর্শনও খুঁজে না পায় কথা।
এক চড়েতেই খুসী হলেন ঠনঠনিয়ার কালী।
মধুর হুলুধ্বনির মাঝে অনুতাপের কালি
মুছেও গেল হলধরের; শ্রীনীলমণি জায়া
ঠনঠনেতে মানত-মতো পুজেন মহামায়া।

* * * * *

হ'ল যত জুতোর দোকান ঠনঠনিয়ার ধারে কাছে,
দেখবে চটি তালতলারও বাক্স বন্দী হয়ে আছে।
বিশ্বাস না হয় যদি চ, এই পুজোতেই পরখ কর,
দু' পণ্ডিতের মিলন করে চটির মিলন কেমন দড়।।

তারে চিনিতে পারিনি

অঞ্জলি বসু (সরকার)

নামটা শুনেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অনন্যা রায়।—

মফঃস্বল স্কুল থেকে পাস করে সবে কলকাতায় কলেজে ভর্তি হয়েছি। সব সময়ই থাকি তটস্থ, ভয় সঙ্কোচে জড়সড়।

কিন্তু অনন্যা নামের আকর্ষণে সে লজ্জা-ভয়ের আবরণও দূরে সরিয়ে ফেলতে হোলো একদিন।

কলেজ জীবনের প্রথমদিন থেকে কারণে অকারণে চারদিকে গুঞ্জন শুনেছি—"অনন্যা" —"অনন্যা রায়"—"অনন্যাদি"—যে নামে কলেজ গৃহপ্রাঙ্গণ চতুর্দিক মুখরিত, মফঃস্বলের মেয়ে হয়ে কোন্ সাহসে জিজ্ঞেস করি—"এ নাম কার? এ মানুষটা কে?"

অথচ এমন নামের অধিকারিণী কে না জানলেই বা কেমন করে চলে? তিনি অধ্যাপিকা কি ছাত্রী কি কেরাণী কি লাইব্রেরীয়ান তাও যেন ধরা শক্ত।

এমনি অবস্থায় একদিন টিফিন পিরিয়ডে করিডোরে দাঁড়িয়ে চীনে বাদামের খোসা হাত দিয়ে ভাঙতে না পেরে দাঁতে চাপতে যাচ্ছি হঠাৎ পলিটিক্সের স্যার অমরেশবাবু প্রফেসরস কমনরুম থেকে চকিতে বেরিয়ে এসে আমার হাতে একখানা মোটাসোটা বই গছিয়ে দিলেন।

—"আপনি ফার্স্ট ইয়ারের তো? এই বইটা অনন্যা রায়কে দিয়ে দেবেন। বলবেন—আমি দিয়েছি।" বলেই পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড় মুছতে মুছতে আবার কমনরুমের দিকে ফিরে গেলেন।

আমার দুপাটি দাঁতের ভিতর তখনও চীনে বাদামটা আট্‌কানো।—

অনন্যা, অসামান্যা, অসাধারণ্যা—যাই তিনি হোন, আমি তখন একান্ত অসহায়া। কলেজের পাঁচশো মেয়ে, পঁয়ত্রিশজন অধ্যাপক-পিকা, পনেরোজন কেরাণীর ভিতর কে অনন্যা রায় এক নজরে চিনে বের করা আমার সাধ্যের অতীত।

জিজ্ঞেস করব? এই কলেজের ছাত্রী হয়ে অনন্যা রায় কে, জিজ্ঞেস করা আর ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে নেহরুজী কে জিজ্ঞেস করা একই কথা। তা আমি পারব না।—

ঘণ্টা পড়তে আর মিনিট পাঁচেক দেরী। এর পরেই পলিটিক্সের ক্লাস—স্যারের সঙ্গে দেখা হবে, আর জিজ্ঞেসও নিশ্চয় করবেন। একেতো মফঃস্বলের মেয়েদের স্যারেরাও একটু অনুকম্পার চোখে দেখে থাকেন, তার উপর আমার এই গ্রাম্যজনোচিত অজ্ঞতার পরিচয় পেলে হয়তো উইক্‌লি টেস্টেও তার প্রভাব বিস্তারিত হতে পারে। আমার তখন হাতের তালু ঘেমে উঠেছে বইটাও চট্‌চটে লাগছে। কাপড়ের কোঁচা থেকে চীনেবাদামের খোঁসা-গুলি ঝেড়ে ফেলে, মোটা বইটা বগলদাবা করে আমার বই, খাতা, ব্যাগ হাতে নিয়ে ক্লাসের দিকেই গুটিগুটি এগোতে লাগলাম।

ক্লাসের মেয়েদের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই বা কতক্ষণ? মোটা বইটার কৈফিয়ৎও কি দেব? স্যার দিয়েছেন, কিছুর মধ্যে কিছু নেই—হঠাৎ স্যারই বা আমাকে আমার অপাঠ্য একটা বই দিতে যাবেন কেন? অনন্যা রায়কে দেবার জন্য? তা অনন্যা রায়কে না দিয়ে আমি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? অনন্যা রায়কে চিনি না বলে? শোনবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব বাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে আমার উপরে ভাবতেই মাথা ঘুরতে লাগল।

মরিয়া হয়ে সামনের টুলে বসা বেয়ারা-টাকেই ধরে ফেল্লাম—"অনন্যা রায়কে দেখেছ এদিকে? আমি খুঁজে পাচ্ছি না—বড্ড দরকার—একটু দেখ না"—দুর্ভিক্ষের সময় যেমনি করে ফ্যান চায় মানুষে তেমনি শোনালো আমার গলাটা।

বেয়ারাটার দয়ার শরীর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুল ছেড়ে উঠে কমনরুমের দিকে এগোলো। পিছু ডাকতে হোলো তাকে—"এই শোনো—আমি কমনরুমে যাব না—ওঁকে দেখতে পেলে এখানে আসতে বোলো—আমি দাঁড়িয়ে আছি—বুঝলে?" সহস্র রহস্য রোমান্সে অভ্যস্ত কলেজের বেয়ারারা—বিনা বাক্য ব্যয়ে লোকটা আবার এগিয়ে গেল।

পেয়ে যায় ভাল—না হ'লে যে কি করব জানি না। তার চেয়েও বিপদে পড়ব যদি বেয়ারা ফিরে এসে বলে—"বড্ড ভীড় কমনরুমে, ডাকতে পারলাম না—ওখানেই আছেন—আপনি যান না ভিতরে"—বেয়ারারা এরকম প্রায়ই বলে কিনা—তাহলে বইটা নিয়েই ক্লাসে যাব। স্যারের বই স্যারকে ফিরিয়ে দেব—বলব, "ঘণ্টা পড়ে গেল, অনন্যা রায়কে পাইনি।"

এই কথাটাকেই অন্য কোনোভাবে বলা যায় কিনা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে-ছিলাম।—"কোথায়? কে ডাকছেরে? কোন ইয়ারের?" তীক্ষ্ণ চঞ্চল কণ্ঠস্বর কানের কাছে শুনে চমকে উঠলাম। বেয়ারা আঙুল তুলে দেখালো আমারই দিকে—"ঐ যে উনি।"

এ মেয়ের নাম অনন্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? অদ্ভুত মেয়ে! ভীড়ের ভিতর খুঁজে পাওয়া শক্ত সত্যি, কিন্তু একবার খুঁজে পেলে হারিয়ে ফেলা আরও শক্ত।

লম্বায় পাঁচফুটের বেশী নয়, রোগা একটু অতিরিক্তই—হলদেটে ধরণের ফর্সা রং, মুখের গড়ন অবাঙালী—নাক্‌টা টিকোলো চিবুক ছুঁচোলো আর চোখদুটো অস্বাভাবিক। একটু ছোটো, কিন্তু প্রায় কান পর্যন্ত টানা। আর কি দারুণ তীব্র উজ্জ্বল দৃষ্টি তাতে তার সামনে আপনি নিজেকে গুটিয়েও ফেলতে পারবেন না —মেলে ধরতে সঙ্কুচিত হবেন। অথচ লম্বা পাপড়িতে ঢাকা সেদুটি চোখের দিকে সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে না থেকেও আপনি পারবেন না।

নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে চেয়ে দেখলে এই কথাই আপনার মনে হবে—কি অনন্য দুটি চোখ! অনন্যা ছাড়া আর কোন নাম এ মেয়েকে মানায় না। সে রূপসী কি মামুলি—সে প্রশ্ন অবান্তর। তার সজ্জায় জৌলুষ আছে কি আট-পৌরে—সে কথা মনেই উঠবে না। শুধু মনে হবে এমন চোখ মানুষের হয়! যেন অতলসাগরে অস্থির ঢেউ, যেন মর্মর স্তূপে তীব্র সন্ধানী আলো। কেমন করেই ঐ ছোটো টানা চোখ-দুটিতে বাসা বাঁধল!

চোখ যার এমন তার মনটা না জানি কেমন! শুধু কি মেধা! শুধু কি বুদ্ধির দীপ্তি! শুধু কি বিদ্যার সতেজতা। অসাধারণ একটা আকর্ষণী শক্তি সে দুটো চোখের ভিতর দিয়ে আপনাকে টানতে থাকবে। অথচ, কাছে গেলে দেখবেন পুরু কাঁচের জানলা ভেদ করে সে আলো আসছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন

হয়তো তার উত্তাপও পাচ্ছেন, কিন্তু পারছেন না ভিতরে ঢুকতে। আপনার লোভ আরও বেড়ে যাবে। কাঁচের পাল্লায় মাথা ঠোকাঠুকি করে হয়তো কপাল কেটে রক্তও বেরোতে পারে, কিন্তু দরজা খুলবে না।

সেই বন্ধ দরজার মুখোমুখি এবার দাঁড়াতে হোলো আমাকে। সেই অনবদ্য চোখ দুটি আরও একটু টেনে উপর দিকে তুলে অনন্যা রায় জিজ্ঞেস করল—"তুমি ডাকছিলে? কি ব্যাপার? কোন ইয়ারে পড় তুমি?"

গলার স্বরে অস্বস্তি বোধ হয়। খানিকটা তাচ্ছিল্য, খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অসহিষ্ণুতার কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর সংমিশ্রণ—কিন্তু তার তলা দিয়ে এমন একটা সুর রিণ্‌রিণ্‌ করে বাজছে যে আপনার মনে হবে কথাগুলি আর একবার শুনি, একটু ধরে রাখি।

সেই সুরটা ভেঙ্গে যাবার ভয়েই আমি নিঃশব্দে মোটা বইটা অনন্যা রায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। হাল্কা করে ভ্রুকুঁচকে বইটা খুলে দেখল সে—তারপর তেমনি হাল্কা সুরে জিজ্ঞেস করল—কে দিয়েছে? "কেন জানি না প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে আমি বল্লাম—"পলিটিক্সের স্যার—অমরেশ ব্যানার্জী"—

খিলখিল করে হাসল অনন্যা রায়—"ওঃ! আমাদের That A B C D! সে আবার অমরেশ ব্যানার্জী হোলো কবে থেকে?" বলেই চট্‌ করে হাসি থামিয়ে, সামান্য ঘাড়টা বেঁকিয়ে ঠোঁট কামড়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপরেই প্রায় শিস্‌ দিয়ে বলে উঠল—"যত সব বাড়াবাড়ি"—বলেই দু আঙ্গুলে গলা টেপার মত করে মোটা বইটাকে টিপে ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল একরকম আচমকাই। বাড়া-বাড়িটা স্যারের কি আমার কিছু বুঝতে না পেরে আমি করিডোরেই কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই শুরু। অপরাপর পরিচয় পেলাম ধীরে ধীরে। পাটনা ইউনিভার্সিটির মেয়ে। ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট আর ইন্টারমিডিয়েটে জেনারেল অর্ডারে সেকেন্ড হয়ে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে এখানে পড়তে এসেছে।

তার জ্ঞানের পরিধি এবং জ্ঞানার্জনের স্পৃহা অধ্যাপকদের বিস্ময় জাগিয়েছে, সহপাঠিনীদের জাগিয়েছে শ্রদ্ধা। টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলোতে অধ্যাপকদের এক এক সময়ে যেন চ্যালেঞ্জ করে বসত অনন্যা রায়। কলেজের সে গৌরব। নোট দিয়ে, বই দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপকরা তাকে সাহায্য করবার জন্য সব সময়ে থাকতেন উৎসুক হয়ে।

আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে অনন্যা রায় তখন ফোর্থ ইয়ারে। এমনিতেই ফোর্থ ইয়ারের মেয়েদের আমরা একটু সমীহ করে চলতাম—তার উপর অনন্যা রায়ের আসন ছিল অনন্যসাধারণ। তার ক্লাসে ঢোকা বেরোনো, প্রফেসরদের সঙ্গে নির্ভীক আলাপ, অন্য ইয়ারের মেয়েদের সঙ্গে ছেলে ভুলোনো সুরে কথাবার্তা, সবের মধ্যেই আমরা দেখতে পেতাম বৈশিষ্ট্য। গন্ধ পেতাম বৈচিত্র্যের।

কিন্তু এতখানি বৈচিত্র্য যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল, সে কথা কখনও ভাবতে পারিনি, অনন্যা রায় যে তার বৈশিষ্ট্য এমনিভাবে ফুটিয়ে তুলবে তা কখনও কল্পনা করিনি।

বি-এ পরীক্ষায় অনন্যা রায় ফেল করল। সমস্ত কলেজে যেন শোকের ছায়া নেমে এল। কর্তৃপক্ষ আর ছাত্রীদের মনের তলায় চাপা রইল সে শোক।

কিন্তু দু'মাস বাদে যে শোক আমাদের মেনে নিতে হোলো সে এল বেয়ারার হাত দিয়ে কলেজ অফিসের নোটিশরূপে—

"অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ অমরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি, ফিল-এর আকস্মিক পরলোকগমনে কলেজের সমস্ত বিভাগ আগামীকাল বন্ধ থাকবে।"

কলেজ যথারীতি বন্ধ থাকল—শোকসভা অনুষ্ঠিত হোলো। সবই হোলো। তবু কোথায় যেন একটা অনুভূতি লুকিয়ে রইল যেটা একদিন নিজের পথে প্রকাশ হবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

তাই হোলো। লোক পরম্পরায় খবর এল—অমরেশবাবু আত্মহত্যা করেছেন। একছত্র লিখে রেখে গেছেন—"অনন্যা, তুমি কেন ফেল করলে আমি জানি—আমি কিন্তু ফেল করব না"—

জনশ্রুতিতেই শুনলাম আমরা—অমরেশবাবু অনন্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। অনন্যা বলেছিল—"যদি পাস করি, তা'হলে"—অমরেশবাবু বলেছিলেন—"তোমার পাস ফেলের সঙ্গে তাহ'লে আমার জীবন মরণ জড়িত হয়ে রইল!"

অনন্যা ফেল করল। অমরেশবাবু মরণকে বেছে নিলেন।

আর পড়েনি অনন্যা। ভাগলপুরে ফিরে গিয়েছিল।

তারপরে দিন গড়িয়ে গেছে। আমরাও কলেজ জীবন পেরিয়ে গেছি।

একদিন এক মিটিংয়ে মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে আমার পার্শ্ববর্তিনী বললেন—"এই বয়সে ভদ্রলোকের কি দুরবস্থা দেখুন! সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী—ডাইভোর্স করে চলে গেল?",

অপরিচিত ভদ্রলোকের জন্য এমন কিছু মমতা জাগল না আমার, তবু বলতে হোলো—"তাই নাকি? তা সে স্ত্রীটি কে?"

"এককালে খুব ডাকসাইটে মেয়ে ছিল—অনন্যা রায় ছিল নাম। বিয়ের পরে সেন হয়েছিল। শোনেনি নাম?

মাথাটা কোন্‌দিকে নাড়লাম খেয়াল নেই। চোখ দুটো মিটিংভাঙা ভিড়ে ভদ্রলোককে খুঁজতে লাগল। অন্যমনস্কতার মধ্যে অমরেশবাবুর মুখখানা একবার সামনে দিয়ে ভেসে গেল।

এমনি কত আসে কত যায়। কে বা তার হিসাব রাখে? শুধু কালের বুকে একটা স্বাক্ষর থেকে যায়।

জানি না এমনি কোনো স্বাক্ষরের পাঠোদ্ধার করবার তাগিদে আমার ভাগ্যে লেখা ছিল কিনা—নয়তো বর্ষাকালে দার্জিলিং যায় কি কেউ? তবু গেলাম। সপরিবারেই গেলাম। গিয়ে পৌঁছান পর্যন্তই। আর কিছু করার নেই। অত বৃষ্টিতে দার্জিলিংএ আর কি করা যায়?

একাদিক্রমে সাতদিন বৃষ্টির পর একদিন একটু রোদ মতন উঠল। তাতে উত্তাপ নেই—শুধু সামান্য আলো আছে। তাই যথেষ্ট। সাতদিন কান্নার পর মৃদু হাসিরই বা দাম কত?

কেউ নড়তে চায় না হোটেল থেকে—কলকাতার মানুষ তো! বলে—"বাপরে কি ঠান্ডা!"—"চারদিক প্যাচপ্যাচ্‌ করছে, মাগো!" রাস্তায় বেরিয়ে আবার বৃষ্টি নামুক আর কি?—"কত জোঁক কিলবিল্‌ করছে চারদিকে দেখছ না?"

"দুত্তোর" বলে নিজেই বেরিয়ে পড়ব ঠিক করলাম। একাই নেমেছিলাম রাস্তায়। পথে এক নেপালী সঙ্গিনী জুটে গেলেন। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলাম ঘুমের রাস্তা ধরে। কত অজানা মানুষের, অচেনা ঘটনার ইতিহাস তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে ঝরতে লাগলো।

ঘুমেই থাকেন উনি। বললেন—"একদিন ঘুমে বেড়িয়ে যাবেন—দার্জিলিং-এ এর চেয়ে দৃশ্য কি আর ভাল দেখবেন—তা নয়। তবু দু'একটা দর্শনীয় বস্তু আছে বৈকি। ওখানকার বৌদ্ধমঠ দেখলে নিশ্চয় আপনার ভাল লাগবে।"

"কি আছে সেখানে?"

"ভিতরে তথাগত আছেন। ভিক্ষু ভিক্ষুণী থাকেন কয়েকজন। শাস্ত্রপাঠ হয়।"

"ভিক্ষুরা সব নেপালী?"

"নেপালী আছেন—অন্য জাতীয়ও আছেন। বাঙালীও আছেন।"

"বাঙালী ভিক্ষু?"

"নয় কেন? নতুন একজন ভিক্ষুণী এসেছেন—দেখে ঠিক বোঝা যায় না—খুব চোখা চেহারা—শুনেছি তিনি বাঙালী।"

"ভিক্ষুণী বাঙালী? যাব একদিন মঠ দেখতে। আকাশ ভাল থাকলে কালকেই যাব।"

"খুব ভাল। এই গরীবের ঘরেও একটু দর্শন দিয়ে যাবেন—আমার স্বামী ওখানকার স্কুলের হেড মাস্টার।"

আরও খানিক দূর এগিয়ে তিনি তাঁর পথে চলে গেলেন। নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ভাল লাগল না—আমি ফিরে এলাম।

হোটেলে এসে গল্প করলাম। সবাই বিপক্ষে—"কাঞ্চনজঙ্ঘা, টাইগারহিল, অবজারভেটরী, এভারেস্টের চূড়ো, ঝর্ণা বরফ—সব পড়ে রইল, এখন বুড়োদের মত সাধুফকির দেখতে চল! ও তুমি একা যাও বাপু—ওসব দেখবার জন্য এত কষ্ট করে হিমালয়ের চূড়োয় এসে উঠি নি আমরা!"

সাধু দেখার ইচ্ছে যে আমারও খুব ছিল তা নয়—কিন্তু জেদ চড়ে গেল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে পরদিন সকালে, হয়তো মুষলধারেই নামবে খানিকবাদে—তার মধ্যেই বেরোলাম বর্ষাতি চাপিয়ে, ছাতা নিয়ে।

খানিকটা দূরে গেলাম একাই। কিন্তু ভগবান যাকে চিরজীবনের সঙ্গী করে বেঁধে দিয়েছেন, তিনি অত নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে ছেড়ে দিতে পারলেন না—এক সময়ে চমকে চেয়ে দেখি পাশে এসে হাজির হয়েছেন।

দুজনে চললাম সেই ঘুমের রাস্তা ধরেই। নিজেদের মনে আবোলতাবোল বকতে বকতে। বৃষ্টির ঝাপসা পর্দার ওপিঠ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছু—শুধু খানিকটা রঙের তফাৎ, আকারের তারতম্য আবছা মত চোখে [illegible] লাগছে!—

(শেষাংশ ৩৯০ পৃষ্ঠায়)

অবনীন্দ্রনাথ —পেন্সিল স্কেচ— চিত্রনিভা চৌধুরী

কোতলে আম

(১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

যদিই বা করতাম্, ক্ষতি কি?
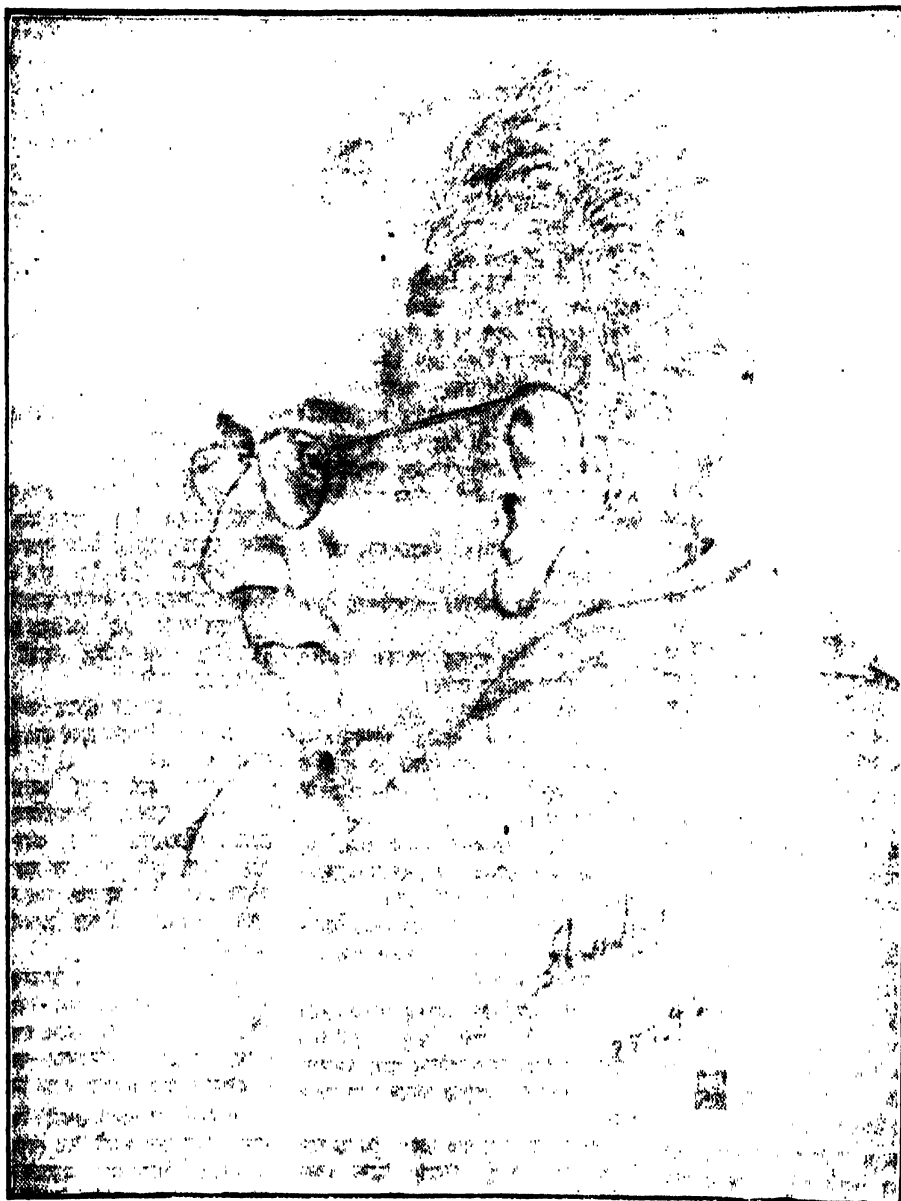
তার চেয়ে সহজ ইঁদারায় ল্যাফিয়ে পড়া।

তারো চেয়ে সহজ নিজের বুকে বসিয়ে দেওয়া।

বিস্মিত বাঁদী বলে ওঠে, সে সাহস আছে তোমার মালিকা?

সাহস কি তোর একচেটিয়া নাকি?

আনন্দিত বাঁদী নত হ'য়ে তার জরি কাজ-করা জুতো জোড়া চুম্বন করে।

কিন্তু ওদের সংকল্প কার্যে পরিণত করবার প্রয়োজন হ'ল না। সকাল বেলাতেই একদল ইরাণী নশকচি পাহারা বসালো দরজার সম্মুখে। এ ক'দিনের মধ্যেই সবাই বুঝতে পেরেছিল যে নূরবাঈ ইরাণের বাদশার মুহব্বতী পিয়ারী।

।। ২ ।।

এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এবারে একটু পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক।

১৭৩৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী কর্ণালের যুদ্ধে নাদির শা দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহকে পরাজিত করে। তারপরে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজ শিবিরে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে ফেলে অভীষ্টমত সন্ধিপত্র লিখিয়ে নেয়। বাদশার সঙ্গে উজীর, ভকিল, আমীর ওমরা সকলে বন্দী হ'য়েছিল, বাদশার হ'য়ে কথা বলতে পারে এমন কোন লোক বাইরে ছিল না। তারপরে বাদশার নিমন্ত্রণে নাদির শা সসৈন্যে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হ'য়ে লালকেল্লায় আতিথ্য গ্রহণ করে। এই ঘটনা থেকে কূট-নীতিক সৌজন্যটুকু বাদ দিলে দাঁড়ায় যে নাদির শা দিল্লীর বাদশাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এসে দিল্লী ও লালকেল্লা অধিকার করলো। নাদির শা লালকেল্লায় অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে হিন্দুস্থানের শাহান শাহ বলে ঘোষণা করলো, মসজিদে তার নামে খুৎবা পড়া হ'ল, মুদ্রায় তার নাম ছাপা হ'ল—আর তার ইরাণী, তুরাণী, কুর্দ, মঙ্গোল, আফগান সৈন্যদল শাজাহানা-বাদের নানা স্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসলো। পুরাতন বাদশাহী কর্মচারীরাই শাসন চালাতে লাগলো নূতন শাহান শার নামে।

মহম্মদ শা ও নাদির শার দিল্লী প্রবেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যা লিখেছেন তার ভাবার্থ অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি, পড়লেই তৎকালীন অবস্থাটি বেশ বুঝতে পারা যাবে।

বাবর ও আকবরের অধঃপতিত উত্তরপুরুষ তখৎ-ই-রবানে বাহিত হ'য়ে নীরবে, গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করলো; না বাজলো নৌবৎ না উড়লো নিশান; ইশাক খাঁ, বহরজ খাঁ, জাবিদ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন ওমরাহ ছিল তাঁর সঙ্গে। পরদিন প্রাতে বিজয়ী শাহ ধূসর রঙের অশ্বে প্রবেশ করলো দিল্লীতে। শালিমার-বাগ থেকে লালকেল্লার দরবাজা পর্যন্ত পথের দুইদিকে মোতায়েন তার সৈন্যশ্রেণী। বাদশা বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিল, তার পা রাখবার জন্যে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল সোনার জরতে কাজ করা মহামূল্য মসনদ। নাদির প্রাসাদ কক্ষ অধিকার করলো—আর হিন্দু-স্থানের বাদশা আসাদ বুরুজের দেউড়ীর নিকটে একটি কক্ষে আশ্রয় নিল। শাহ হ'ল বাদশার অতিথি, স্বহস্তে খানা পরিবেশন করলো বাদশা। শাহের সৈন্যদলের কতক লালকেল্লার চারদিক বেষ্টন ক'রে রইলো, কতক রইলো যমুনার চরে—আর কতক রইলো সহরের নানা স্থানে।

।। ৩ ।।

দিল্লী অধিকার ক'রে বাদশার আতিথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাদির শা এতটা পথ আসেনি। হিন্দুস্থানের বাদশার ঐশ্বর্যের অলৌকিক খ্যাতি তাকে টেনে এনেছে এই দীর্ঘ পথ। এবারে লালকেল্লায় বেশ কায়েম হ'য়ে ব'সে সেই ঐশ্বর্যের কতটা কি ভাবে করায়ত্ত করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেল ইরাণের শাহ। এখন হিন্দুস্থানের বাদশা, আমীর ওমরাহ থেকে সাধারণ প্রজা সকলের ধনদৌলতের উপরেই তার বিজয়ীর অধিকার। নাদির শা তার উজীর আর ওমরাহদের ধন-দৌলত খানা সুমারী করবার নির্দেশ দিল, বাদশা দেবে এত, আমীর ওমরাহগণ দেবে এত, আর দিল্লীর নাগরিকগণ দেবে এত—অর্থাৎ মোট এত টাকা চাই তার। শাহের পরওয়ানা নিয়ে দিকে দিকে কোটাল বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে রাতের বেলা তার মনোরঞ্জন করবার জন্যে দেওয়ানী খাসে জলসার ব্যবস্থা করে খোদ বাদশাহ। এ না ক'রে উপায় নেই, কতকটা প্রথা রক্ষা, কতকটা সৌজন্য। বাদশাহের নিজের মনোরঞ্জনের জন্য যে-সব নতকী আছে তাদের উপরেই ভার।

নাদির শার বড় ভালো লেগে যায় নূরবাঈ নামে একটি নর্তকীকে। নূরবাঈয়ের তেমন কোন নাম ডাক ছিল না, দলের আর পাঁচজনের মতো একজন মাত্র। কিন্তু এখন নাদির শার চোখে পড়ে যেতেই মুখে মুখে তার নাম পড়লো ছড়িয়ে, সবাই বলতে সুরু করলো নূরবাঈ নূরবাঈ। তার বয়স অল্পই, রূপ যৌবন শিক্ষা সহবৎ সমস্তই আছে—এ সব তো আরো অনেকের আছে, আসলে যে গুণে শাহকে মুগ্ধ করলো তা হচ্ছে তার বাক-চাতুর্য। কথার পিঠে লাগসই কথা বলতে তার জুড়ি নেই। যে বিজয়ী বীরের সম্মুখে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না, যার আধখানি কথায় লোকের মুণ্ড খ'সে পড়ে কথার লীলা থেকে সে হতভাগা বঞ্চিত। ক্ষুধা থাকে খাদ্য জুটতে চায় না। এখন একটি সুন্দরী তরুণীর সুর্মা-কালো চোখ আর তাম্বুল রাঙা ওষ্ঠাধর লালে কালোয় সুধা বিষে মিশিয়ে যদি সেই নির্ভয়ে বর্ষণ করে—তবে তৃপ্ত হয় সেই কথার ক্ষুধা। হাসির রূপোর তবকে মুড়ে রাঙা রাঙা ঠোঁটের প্রবালের মিনে করা কথাগুলো যখন শাহের দিকে নিক্ষেপ করে তখন দিগ্বিজয়ী বীর একদম মস্তানা হয়ে যায়—বলে পিয়ারী তুমি তো ইরাণের বুলবুল এখানে এলে কেন?

সে মুখে চোখে বিদ্যুৎ চূর্ণ ছড়িয়ে বলে—একদিন ইরাণের সিংহ আসবে এদেশে, আমি এ কেমন কথা পিয়ারী! সিংহের নকীব বুলবুল! ঝঙ্কৃত বলয়ের উপর হাজার ঝাড়ের রোশনাই কুড়িয়ে নিয়ে সেলাম করে বলে, শাহান শাহ হিন্দুস্থানে থাকলে দেখতে পাবেন সিংহ গর্জন মেসের নকীব এখানে চাতক।

বাহা, বাহা বলে ওঠে নাদির শা, শুধায় এমন কথা শিখলে কোথা থেকে মেরা জান।

প্রশ্নটা উল্টে দিয়ে সে বলে, ইরাণের বুলবুল গান শেখে কোথা থেকে খোদাবন্দ।

গান আছে ইরাণের বাতাসে।

কথা ভাসে হিন্দুস্থানের আকাশে।

তবে তো ইরাণের জিত, কথার চেয়ে গান বড়।

তবে হিন্দুস্থানের বুলবুলকে ইরাণে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা কেন খোদাবন্দ!

নাদির শা দেখলো কথা চালানোর চেয়ে অস্ত্র চালনা সহজ। তাই সে কথা কাটাকাটির পথ পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী উজীরকে বলল—নূর বিবি কো চার হাজার মোহর ইনাম দেনা।

নূরবাঈ আজানুনত হয়ে সেলাম করা উপলক্ষে রূপে যৌবনে দেহকান্তিতে মুঠো মুঠো হীরে জহরৎ ছড়িয়ে বলল, খোদাবন্দ—দুনিয়া কা মালিক।

এখন রাতের বেলা জলসা না হ'লে আর নাদির শার চলে না, আর জলসা মানেই নূর-বাঈ-এর নাচ আর মধুবর্ষী কথা।

দ্বিতীয় দিনে শাহ হুকুম দিল নূরবাঈকে তৌল করে মোহর দিতে হবে। আদেশটা অন্য সব নর্তকীদের কানে বিষ বর্ষণ করলো, তবে তারা দেখালো যে সান্ত্বনাও আছে—ছুকরির ওজন খুব বেশী নয়।

অবশেষে একদিন নাদির শা আদেশ করলো যে বিবি তোমাকে আমার হারেমভুক্ত হয়ে ইরাণে যেতে হবে।

আদেশ শুনে ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেলেও মুখ শুকালো না, হেসে উত্তর দিল, খোদাবন্দ আপনি খোদারও উপরে, মরবার আগেই আমার বেহস্তবাসের হুকুম দিলেন।

নূরবাঈ বাসায় ফিরে এসে বাঁদীকে হুকুম করলো—আমিনা তুই এখনি গিয়ে নাসের খাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমিনা অনেকদিন আছে, হাসি ঠাট্টা করবার অধিকার অর্জন করেছে, বলল, আবার তাকে কেন, ইরাণে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বুঝি।

নূরবাঈ বিরক্ত হয়ে বলল, সে তুই বুঝবিনে, বেয়াদপি করিসনে, শীগ্‌গীর যা।

শীগ্‌গীর না হয় গেলাম, কিন্তু পাহাড়গঞ্জ তো কাছে নয়, ফিরতে দেরী হবে।

দেরী হলে চলবে না, তাঞ্জামে করে যা।

আজ যে বড় তাড়া দেখছি মালিকা, কিন্তু সে এলে হয়।

নিশ্চয়ই আসবে, বলিস বড় বিপদ।

আমিনা বিদায় হয়ে গেলে গালে হাত দিয়ে সে বসে রইলো জানলার ধারে—ওখান দিয়ে দেখা যায় পাহাড়গঞ্জে যাতায়াতের পথ।

।। ৪ ।।

বাঁদী বিদায় হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে চমকে উঠে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলো নূরবাঈ—হঠাৎ নাসির খাঁকে ডাকতে পাঠালো কেন? একি নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরবার চেষ্টা?

পড়লো কাষ্ঠখণ্ড কেন, নাসির খাঁ তো ছিল লাল পানসী, কতকাল অপেক্ষা করেছে তার ঘাটে, নূরবাঈ চড়বে আশায়। এতকাল যাকে উপেক্ষা করেছে হঠাৎ আজ তাকে মনে পড়তে গেল? নাদির শার প্রসারিত বাহু থেকে যদি তাকে উদ্ধার করতে পারে। তখনি আবার পানসীর উপমা সূত্রে মনে পড়লো সংসারের অভ্যস্ত নদী প্রবাহে পানসীর অমিত কার্যকারিতা আসে সত্য কিন্তু এ যে নাদির শাহী খেয়ালের উন্মত্ত দরিয়া! শুধুই কি খেয়াল! দিগ্বিজয়ীর চোখে মুখে যে লোভের ছটা দেখেছে তার অর্থ বুঝতে ভুল হয়নি তার। দিগ্বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণে তার যে নৈতিক আপত্তি ছিল তা নয়, আদৌ নয়, কারণ স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটাকে নৈতিক মানে বিচার করতে কখনো শেখেনি সে., ও বস্তু যে নৈতিক মানে বিচারের যোগ্য সে ধারণাই তার ছিল না। না তা নয়, কেমন যেন জুগুপ্সা জমে গিয়েছে ঐ দিগ্বিজয়ী লোকটার উপরে। তার প্রতি নাদির শার স্নেহ অনুকম্পা অনুগ্রহ বদান্যতার অন্ত নেই, কিন্তু যতই দিন গিয়েছে লোকটার বীভৎস ভিতরটা বাইরের কুৎসিত রূপে চোখে পড়েছে নূরবাঈ-এর। সে ভেবেছে লোকটার বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু বীর নয় সে। কী বীভৎস হাসি—সমস্তটা মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। হাত দুখানা কী রোমশ আর দেহের তুলনায় স্থূল! নাঃ এ বীরের বাহু নয়। ওর হারেমে যাওয়া মানে ঐ বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দেওয়া! ভাববামাত্র গা ঘিন ঘিন করে ওঠে তার। কিন্তু ভেবে পায় না হিন্দুস্থান জয়ী ঐ বাহুর আলিঙ্গনপাশ থেকে উদ্ধার পাবে কি করে? তার পরে ভাবে—সে ভাবনা তো আমার নয়, নাসির খাঁর।

কি বাঈজী, আজ অসময়ে হঠাৎ গোলামকে মনে পড়লো কেন? ইরাণে যাওয়ার জন্যে তাঞ্জাম গড়তে হবে না, হাতীর ফরমাশ দিতে হবে?

আরে, খাঁ সাহেব যে, এসো এসো। তা ভাই তাঞ্জাম কি হাতীর দরকার হলে কি আর তোমাকে স্মরণ করতাম—শাহান শা নিজেই জোগাতেন।

তাই তো ভাবছি আমাকে আবার কেন!

পরিহাসের সুর পরিত্যাগ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে নূরবাঈ বলল, খাঁ সাহেব, ঐ ইরাণী দস্যুটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো।

আরে চুপ, চুপ! কে কোথা থেকে শুনবে, আমাদের দুজনেরই শির যাবে।

সে-ও ভালো।

তা বটে, তবে তোমার জন্যে আমার শির যাবে কেন?

তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

সেই রকমই তো ভাবতাম—কিন্তু তোমার মনের ভাব যে অন্য রকম।

আসল কথা তো আজ জানতে পারলে।

বিপদে পড়ে?

বিপদেই তো ভালবাসার পরীক্ষা।

বেশ, খোদার শপথ করে বলো।

তাই বলছি।

এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলল নূরবাঈ। নাসির খাঁর প্রতি তার মনোভাব যেমনি হোক তাকে ভালবাসা বলা যায় না। কাউকে সে কখনো যথার্থ ভালোবাসেনি, ভালবাসবার ধাতুতে সে গঠিত হয়নি। কিন্তু আজ বিপদে পড়ে ভালোবাসা কবুল করলো—এ কবুল নিতান্তই সংকটের, মনের নয়।

এবারে নাসির খাঁ বলল—এ যে ঘোরতর সংকটে ফেললে বাঈজী, নাদির-শার কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করি কি উপায়ে?

চলো না কেন বাইরে পালিয়ে যাই।

হিন্দুস্থানের বাইরে কোথায় যাবো?

চলো না কেন নেপালে চলে যাই।

তা যেতে হলেও তো অর্ধেক হিন্দুস্থান পেরিয়ে যেতে হবে—ইরাণী ফৌজের পাহারা এড়াবে কেমন করে?

নূরবাঈ এ প্রস্তাবের দুরূহতা জানতো, জানতো যে কোথাও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সে কান্নায় ভেঙে লুটিয়ে পড়লো। অবলা নারীর চোখের জল নাসির খাঁর বীর হৃদয় বিচলিত করে তুলল—সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—নূরবাঈ, একদিকে হিন্দুস্থান জয়ী শাহান শা নাদির শা—আর একদিকে পাহাড়গঞ্জ এলাকার কোটাল নাসির খাঁ পঞ্চাশ ঘোড়ার মনসবদার। খুব সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা! কি বলো?

কেন তোমার দিকে কি আল্লা নাই?

যার তলোয়ারের জোর বেশী মনে হয় আল্লা তার দিকে।

কেন তোমার দিকে কি ভালোবাসা নাই?

যার টাকার থলি বেশী লম্বা মনে হয় ভালোবাসা তার দিকে।

কেন তোমার দিকে আমি নাই?

পিয়ারী তুমি যে কার দিকে তা যদি সত্যি বুঝতাম!

তবে এই প্রমাণ নাও—বলে ভূলুণ্ঠিতা বিদ্যুল্লতা উঠে নাসির খাঁর গলা জড়িয়ে ধরে দুই গালে চুম্বন করলো।

এই কি সব? শুধালো নাসির খাঁ।

না—এ শুধু আগাম।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল—যথা লাভ।

আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেন?

পরিণাম চিন্তা করে।

উদ্বিগ্ন নূরবাঈ শুধালো, তুমি কি করতে চাও? লড়াই নাকি?

লড়াই তো হয় ফৌজে ফৌজে। আমার ফৌজ কোথায়?

তবে?

আমি করতে চাই বিদ্রোহ।

তারই বা ফৌজ কোথায়?

বিদ্রোহের একদিকে ফৌজ আর একদিকে—

নিঃশ্বাস রোধ করে নূরবাঈ জিজ্ঞাসা করে, আর এক দিকে?

রাজ্যের তামাম আদমি রহিম, খলিল, হরবক্স, মাধো সিং, তুমি, আমি সবাই।

এ যে কচুকাটা হবে।

কত কাটবে! বিবি, হিসাব করে প্রেম আর বিদ্রোহ হয় না। কোনটাই তুমি বুঝবে না, যাক, এখন আমি চললাম।

আবার কবে আসবে?

বেঁচে থাকলে ২।৪ দিনের মধ্যে দেখা হবে। মরবার আশঙ্কা আছে নাকি?

আছে বই কি! ঐ যে বললে কচুকাটা।

তবে না হয় থাক।

তবে তাঞ্জাম গড়বার ফরমাস দিই।

তাহ'লে এসো—কিন্তু একটু সাবধানে থেকো।

নাসির খাঁ চলে গেলে অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। এ আবার কি হতে চলল? না হয় যেতই সে ইরাণে। সে তো শুনেছে যে তিন পুরুষ আগে ইরাণ থেকেই তারা এসেছিল হিন্দুস্থানে। সেখানে ফিরে গেলে এমন কি ক্ষতি হত? আর শাহান শার হারেম? কারো না কারো হারেমে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ যখন অনিবার্য, যেতই বা নাদির শার হারেমে। কিন্তু তখনি মনে পড়ে যায় নাদির শার চেহারা, কথা বলতে বেরিয়ে পড়ে মাড়ি, চোখ দুটো ছোট, নাকটা বাজপাখী, ঠোঁট দুটো স্থূল, বাহু রোমশ আর কর্কশ। না, না, তা হতেই পারে না। তুলনায় নাসির খাঁর কী বীর বপু। বুকটা বাদশাহী সড়কের মতো চওড়া, গর্দানশাহী বুরুজের মতো বলিষ্ঠ, হাত দুখানা লালকেল্লার লাহোরী দরজার মতো সবল—আর সবশুদ্ধ মানুষটা নকড়খানার মতো উন্নত। তখনি নিজেকে প্রশ্ন করে সত্যি কি ভালোবাসে নাসির খাঁকে সে? না, না, না। মনে পড়লো তার মা বলতো বাঈজীদের ভালোবাসতে নেই—যে ব্যবসার যা রেওয়াজ। এ ব্যবসায় ভালোবাসার ভান চলে—কিন্তু আসলি চিজ অচল। আর অচল কি সচল কেমন করে জানবে নূরবাঈ। ওর মনে এখন পর্যন্ত ভালোবাসা জাগবার সুযোগটাই যে পায়নি। সারা জীবন ভালোবাসার ভান করেই কাটালে সে। কিন্তু নাদির শার সঙ্গে ভালোবাসার ভান করতেও সে প্রস্তুত নয়—ভানের পথে নাসির খাঁ পর্যন্ত চলতে পারে। সে ভাবে নাসির খাঁ বলে গেল একটা কিছু করবে। কিন্তু কি করবে? বিদ্রোহ, সেটা আবার কি? বিদ্রোহ বলতে কি বোঝায় ঠিক জানে না সে। সে কি হাঙ্গামা না তার চেয়েও কিছু বেশী যাকে বলে 'গদর'। তার জুড়িবদর জীবনের স্মৃতিতে অনেকগুলো 'গদরের' ছাপ আছে তার মনে। হয়তো বা সেই রকম একটা কিছু ঘটাবে নাসির খাঁ। কিন্তু তাতে কি সে মুক্তি পাবে দস্যুটার কবল থেকে! হয়তো ওরই মধ্যে কেউ ছুরি বসিয়ে দেবে শয়তানটার বুকে! ঠিক ঠিক, তাই ঠিক। তখনি মনে পড়ে নাসির খাঁর কোমরবন্ধের ছুরিটাকে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে রত্ন-খচিত ছুরিখানার দীপ্তি অভয় রশ্মি বিতরণ করে তার মনে। মনটা একটু হাল্কা হতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

।।৫।।

কাণ্ডটা কখন কোথায় কাদের দ্বারা কেন সুরু হয় আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা তার কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। হঠাৎ দেখা গেল যে শাজাহানাবাদের লোকেরা ক্ষেপে উঠে ইরাণী সৈন্যদের আক্রমণ আরম্ভ করেছে। কেউ বলে এর মূলে আছে একটা গুজব। সহরের মধ্যে রটে গেল যে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময়ে নাকি নাদির শা খুন হয়েছে। অনেকেই বলল, অসম্ভব নয়, বাদশার সঙ্গে শাহের সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল বটে। আবার অনেকে বলে স্থানীয় আমীর ওমরাদের কাছে থোক টাকা-কড়ি আদায়ের উদ্দেশ্যে ইরাণী সৈন্যরা যে জুলুম সুরু করেছিল তাতেই ক্ষেপে গিয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত। আবার অনেকের মতে হাঙ্গামার মূলে পাহাড়গঞ্জ এলাকার কোটাল

যত বড় বড় গমের আড়ত। গমের দর নিয়ে আড়ৎদারদের সঙ্গে ইরাণী সৈন্যের বচসা সুরু হয়ে যায়—সেই বচসা ক্রমে দাঙ্গায় হয় পরিণত। এখন, কারণ যাই হোক, দাঙ্গা ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো মহল্লা থেকে মহল্লায়—চাঁদনীচক থেকে জামা মসজিদের কাছে, ভকিলপুরা থেকে মোগলপুরায়—অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ব্যাপক আর ভীষণ আকার ধারণ করলো। শত শত ইরাণী সৈন্য জখম হতে লাগলো। তারা না জানে দেশী ভাষা, না জানে সহরের পথ-ঘাটের অন্ধি-সন্ধি; তাছাড়া প্রস্তুতও ছিল না কাণ্ডটার জন্যে। সব বড় সহরেই একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক থাকে, দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠতরাজের সুযোগ পেলে তারা ছাড়ে না। সহরের শাসন ব্যবস্থা আগেই ভেঙে পড়েছিল, কেউ তাদের থামাতে চেষ্টা করলো না, ইচ্ছা করলেও থামানো আর সম্ভব ছিল না। এ হচ্ছে বিকালবেলার ব্যাপার। ক্রমে শাহের কানে খবরটা উঠল—সে বিশ্বাস করলে না, ভাবলো ইরাণী সৈন্য লুঠতরাজের হুকুম আদায় করবার উদ্দেশ্যে একটা অজুহাত খাড়া করেছে। মাঝ রাতে দাঙ্গা কমে গিয়ে শেষ রাতে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হল। প্রকৃত ব্যাপার কি জানবার জন্যে নাদির শা কয়েকজন নশকাচি প্রেরণ করলো, লালকেল্লা থেকে বের হওয়া মাত্র তারা নিহত হল। তখন খোদ নাদির শা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে শতাধিক দেহরক্ষী নিয়ে লালকেল্লা থেকে বের হল। তখন ভোরবেলা। সোজা শাহ চাঁদনীচকের সোনেরী মসজিদের কাছে এসে উপস্থিত হল। তার কিছু আগে থেকেই নুরবাঈ ছাদের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সারা রাত্রি তার কেটেছে বিনিদ্র—সহরের কোলাহলে ঘুম সম্ভব ছিল না। এখন সে দেখতে পেলো অস্ত্রে সুসজ্জিত অশ্বারূঢ় সসৈন্য নাদির শাকে। নাদির শা সহরের অবস্থা দেখে বুঝলো যা শুনেছিল তা মিথ্যা নয়। তখন শাহ তলোয়ার খুলে কি যেন আদেশ প্রচার করলো—সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষী সৈন্যদল তলোয়ার খুলে শাহের অনুকরণে চীৎকার করে উঠল—"কোতলে আম।" সেই ভয়াবহ ধ্বনি প্রবেশ করলো নুরবাঈ-এর কানে—কোতলে আম। কিনা কোতলের আমহুকুম। জনতার মধ্যে যাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল তাদের মনে পড়লো অনেককাল আগে আর এক বিজয়ী বিদেশী কোতলে আম হুকুম দিয়েছিল—তৈমুরলঙ। ঐ সর্বনাশা হুকুম শুনবা মাত্র যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে সুরু করলো—কিন্তু বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কোতলে আম হুকুম শুনবামাত্র নাদিরশাহী সৈন্যদল ঘোড়া ছুটিয়ে, তলোয়ার খুলে, বর্শা বাগিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে পড়লো গিয়ে জনতার উপরে। আর সমস্ত তদারক করবার উদ্দেশ্যে নাদির শা সোনেরী মসজিদের ছাদের উপরে উঠে খোলা তলোয়ার হাতে রইলো দাঁড়িয়ে। আর অদূরে ছাদের উপরে চিলে কোঠার ধারে কার্ণিশ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো নুরবাঈ। আর নীচে চাঁদনীচক, মেওয়া বাজার, জহুরী বাজারে ছিন্নমর্দিত, পিণ্ডীকৃত নরদেহের স্তূপ ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠতে লাগলো। রক্তোন্মাদ ইরাণী সৈন্যের কোতলে আম গর্জনের তলে চাপা পড়ে গেল মনুষ্যের আর্তনাদ।

আর দশজন লোকের চেয়ে নুরবাঈ যে বেশি নিষ্ঠুর তা নয়, খুন জখম দর্শনে তার যে আর দশজনের চেয়ে বেশি আনন্দ তা নয়। তবু কেন সে এমনভাবে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো ঐ নারকীয় কাণ্ডানিচয় বলতে পারিনে। যখন আর সকলে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল, কিম্বা ঘটনার বীভৎসতায় মর্মাহত হয়ে আত্মগোপন করছিল, সেই সময়ে সেই দৃশ্যে কেন তার এমন তন্ময়তা? হয়তো এর মধ্যে মনের কোন গূঢ় গোপন লীলা আছে। দু' একটা খুন জখম, কিছু রক্তপাত যেমন করুণ তেমনি বীভৎস; কিন্তু সেই হত্যার আবর্তে যখন হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারায়, রক্তে যখন কোটালের বান ডাকে, তখন ঐ অতিকায়িক আত্মবিস্তারে তা বুঝি একটা মহিমা লাভ করে। খুনী নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, দুর্বৃত্ত গর্হণীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু জগতের সমস্ত পাপ যার মধ্যে ঘনীভূত, সেই শয়তানও কি সেই অর্থে, সেইভাবে নিন্দনীয়! সে যে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ যে লোকটা আসরে বসলে যাকে কত ক্ষুদ্র, কত বীভৎস, জুগুপ্সাযোগ্য মনে হয় —সে যখন কোতলে আম গর্জন করে সোনেরী মসজিদের উপরে দাঁড়ালো, তার অঙ্গুলি হেলনে, আদেশের কটাক্ষে নরকের সমস্তগুলো দ্বার দরবাজা খুলে গিয়ে সহস্র মূর্তিতে মহা হত্যা বেরিয়ে এলো, ছিন্ন নরদেহে আততায়ী অশ্বারোহী পদে পদে ব্যাহত হতে লাগলো, রক্তপিচ্ছিল পথে আততায়ী পদাতিক ক্ষণে ক্ষণে স্খলিত পদ হতে থাকলো, চাঁদনীচকের নহরের জলের ধারা রক্তে স্ফীত হয়ে দুই কূল ভাসিয়ে দিল, মুমূর্ষু ও পলায়নপরের আর্ত রবের সঙ্গে হত্যাকারীর প্রতিশোধাত্মক কণ্ঠস্বর মিলে গিয়ে আকাশটাকে কণ্টকিত করে তুলল, আর সর্বোপরি ঐ মসজিদের স্বর্ণচূড়ায় উজ্জ্বল পটকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে নরকাগ্নি শিখায় দেদীপ্যমান ঐ বীরমূর্তি অতিকায়িক মহিমায় আকাশের তুঙ্গ স্পর্শ করলো, তখন এক প্রকার উৎকট উল্লাস অনুভব না করে পারলো না নুরবাঈ। সূর্যোদয়ের বিভায় যেমন ধীরে ধীরে দিগ্‌মণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি উৎকট উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ চোখ। এই ভাবটি দেখেই ভীত হয়ে উঠেছিল বাঁদী, ভেবেছিল এমনিতে তো হুঁস হলনা মালিকার, একবার নাসির খাঁকে ডাকলে কেমন হয়। কিন্তু কোথায় নাসির খাঁ এই ডামাডোলের মধ্যে। সে জানতো বাড়ী থেকে বের হলেই নিহত হবে, বাড়ীর মধ্যে বসেও যে প্রাণ রক্ষা পেলো তা নাদির শা'র কৃপায়—নুরবাঈ-এর বাড়ী রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে পাহারা মোতায়েন হয়েছিল।

দুপুর গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্ন হয়ে এলো, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো নুরবাঈ।

বিকাল বেলায় বাদশার সনির্বন্ধ অনুনয়ে নাদির শা হত্যার হুকুম প্রত্যাহার করলো। ইরাণী সৈন্য শিবিরে ফিরলো—মৃত ও মুমূর্ষুর স্তূপ পড়ে রইলো যেখানে ছিল।

সেই উৎকট উল্লাসে বিভোর হয়ে বিনিদ্র রাত কেটে গেল নুরবাঈ-এর। সে স্থির করলো, আত্মসমর্পণ করতে যদি হয়ই তবে এমনি বীরের কাছে করতে হয়—সমস্ত প্রবৃত্তিতে মানুষের স্বভাবের সীমা যে ছাড়িয়ে গিয়েছে, মনে হল সে মানুষ নয়, আরব্যোপন্যাসের দৈত্য, মনে হল তার কাছে আত্মদান করতে যেন ঐ মহিমার অংশীদার হওয়া যায়। যে অনুপাতে তার মনকে আকর্ষণ করলো নাদির শা—সেই অনুপাতে বিদ্বেষমিশ্রিত ক্রোধ গিয়ে পড়লো নাসির খাঁর উপরে। কিসে আর কিসে, কোথায় রুস্তম আর পথের কুত্তা।

॥৬॥

পরদিন সন্ধ্যায় নুরবাঈকে সাজ-পোষাক পরতে দেখে বাঁদী বলল—কোথায় যাবে মালিকা?

কেন, দেওয়ানী আমে, শাহান শা তাঞ্জাম পাঠিয়েছে।

হতবুদ্ধি বাঁদী বলল—কাল যা ঘটে গিয়েছে তার পরেও! কেউ যাচ্ছে না। তবিয়ৎ খারাপ বলে শুয়ে থাকো, আমি গিয়ে বলছি।

নুরবাঈ গর্জে উঠল। চুপ কর হারামজাদি, ফের মুখ খুলবি তো কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। দে আমার ওড়না দে।

নীচে কে চিল্লায় রে?

উঁকি মেরে দেখে বাঁদী বলল—নাসির খাঁ।

নুরবাঈ বলে ওঠে—এত লোক মরলো, শয়তানটা মরেনি। তখনি জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নশকাচিদের উদ্দেশ্যে বলল—সিপাহী ঐ লোকটা কাল শাহান শাকে খুন করতে চেয়েছিল।

তার কথা শেষ না হতেই তলোয়ারের ঘায়ে নাসির খাঁর মুণ্ড খসে পড়লো।

তাঞ্জামে চেপে রওনা হয় নুরবাঈ লালকেল্লায়।

শাহান শা বলল—নুরবাঈ তো আমার উপরে গোসা করেছে।

নুরবাঈ বারে বারে কুর্ণিশ করে বলল—দুনিয়ার মালিক আমার কসুর আর বাড়াবেন না। (ইস লোকটা কি অকিঞ্চিৎকর, বীভৎস, প্রকট-মাড়ি, স্থূল ওষ্ঠ, রোমশ বাহু।)

তবে ইরাণে না যাওয়ার কারণ কি পিয়ারী।

খোদাবন্দ, আমার মা বৃদ্ধা তাতে অসুস্থ, না পারি রেখে যেতে, না পারি নিয়ে যেতে।

(কোথায় গেল কালকার সেই মহিমময় জ্যোতিষ্মান বীর রুস্তম।)

এ ঠিক কথা, এমন অবস্থায় তোমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

নুরবাঈ মাথা নত করে থাকে।

শাহান শা গলা থেকে এক ছড়া হার খুলে নিয়ে ইঙ্গিত করে। নুরবাঈ কুর্ণিশ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে নতজানু নতমস্তকে অবস্থান করে। শাহান শা হার পরিয়ে দেয় ওর গলায়।

নুরবাঈ কুর্ণিশ করবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হাঁ হাঁ কি হ'ল, কি হ'ল!

নাদির শার ইঙ্গিতে কয়েকজন ওর হতচৈতন্য দেহ বহন ক'রে বাইরে নিয়ে যায়।

আমীর ওমরার দল কানাকানি করতে থাকে, ইরাণে না যেতে পারবার দুঃখেই বাঈজী মূর্ছা গিয়েছে।

জাগো অন্ধ জাগো—

— ধনঞ্জয় বৈরাগী —

সওদাগরের নৌকো লেগেছে ঘাটে। দেখতে এসেছে ছেলে-বুড়োর দল। দেখতে এসেছে বাড়ীর বৌরা, মেয়েরা, সঙ্গে আছে শিশুর পাল।

মনে তাদের পুলক, চোখে তাদের বিস্ময়। অবাক হয়ে দেখে নৌকো থেকে নামছে থরে থরে পণ্য সম্ভার। বেশীর ভাগই মেয়েলী জিনিষ—মন ভোলানো মুক্তোর মালা, কেশ-বিলাসী মাথার তেল, প্রাণ মাতানো কস্তুরী আর কত রকম রামধনু রঙের সাজপোষাক। মেয়েগুলো মুঠো ভরে তুলে নেয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, এ ওর গায়ে পরিয়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসে।

তাদের রঙ্গ দেখে ছেলেরা। রঙ্গ দেখে সওদাগর।

টিপ্পনী কাটে বুড়োরা, আঃ মর, ছুঁড়িগুলোর কি কোন লজ্জাসরম নেই!

উত্তর দেয় সওদাগর, আহা ছেলেমানুষ কিনা, নতুন নতুন জিনিষ দেখে ফুর্তি করছে।

—তাই বলে হাটের মাঝে, এত লোকের সামনে? ওদের পুরুষগুলো কি মরেছে?

—তোমরাও তো একদিন ঐরকমই ছিলে গো?

মোড়ল মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি তোলে, কখ্খনো নয়। আমরা কখনও বেহায়া ছিলাম না।

সওদাগর আর তর্ক বাড়ায় না। রুপোর কৌটো থেকে পান বার করে বুড়োদের দিকে এগিয়ে দেয়।

মোড়ল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, এটা কি জিনিষ সওদাগর!

সওদাগর মুচকি হাসে, খেয়ে দেখ না।

—কিছু হবে না তো।

—সে রকম জিনিষ কি আমি আনি? এই দেখ, আমিও খাচ্ছি।

সওদাগর ওদের সামনে মুখে পান ভরে নিয়ে চিবুতে থাকে।

সংশয় কেটে যায়।

মোড়ল খেল পান, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও। একবার নয়, দুবার নয় বারে বারে তিনবার। বাঃ, বাঃ তোফা খেতে। কেমন সুন্দর রস, কি মিষ্টি গন্ধ, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুক করে আর মনে লাগে দোলা। যাদুকাঠির পরশে এ কত বছর বয়েস কমিয়ে দেয়। চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে এক রূপকথার রাজ্যে, যেখানে না পাওয়ার কান্না শোনা যায় না। সকলেই আনন্দ করে, হাসে খায় আর ঘুমোয়।

সওদাগর প্রত্যেকবার এখানে আসে মাল বেচাকেনা করতে। লেনদেন শেষ হয়ে গেলে চলে যায়। এবার কিন্তু মোড়ল তাকে ছাড়লো না। জোর করে নিয়ে গিয়ে তুলে দিলে এক সোমহলা বাড়ীতে।

সওদাগর হাসিখুশী মানুষ, মোটাসোটা নাদুসনুদুস। এড়াতে পারল না এদের একান্ত অনুরোধ। থেকে গেল এই ভিনদেশে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনুমতি চেয়ে নিল এখানে ব্যবসা খোলবার।

মোড়ল সানন্দে সম্মতি দিল, ব্যবসা করবে বৈকি সওদাগর, তা না হলে তোমার পোষাবে কেন? তবে একটা কথা, প্রত্যেকদিন আমাদের ঐ খাবার জিনিষটি চাই।

সওদাগর সারা গা নাচিয়ে হাসে, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আমার লোক গিয়ে বাড়ী বাড়ী পান পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—আহা, অত কষ্ট করবে কেন সওদাগর ভাই, আমরা নিজেরা এসেই নিয়ে যাবো'খন।

সওদাগর বাধা দিয়ে বলে, তা কেন, আমার লোকগুলো কি শুধু বসে বসে খাবে! তাদেরও তো কাজ দেওয়া দরকার।

মোড়ল কি যেন ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করে, এরপর যখন তোমার ভাঁড়ার ফোরাবে!

—তার জন্যে ভয় নেই, রাতের বেলা এখান থেকে রপ্তানি মাল নিয়ে নৌকো যাবে, ফিরে আসবে সকালবেলা পান বোঝাই করে।

কথা শুনে মোড়লের আর আনন্দ ধরে না।

সওদাগর চেপে বসল তার ব্যবসা-পত্তর নিয়ে।

সওদাগর শুধু যে ব্যবসা করবার জন্যে এখানে থাকতে রাজী হয়েছিল, তাই নয়, তার লোভ ছিল একটি সুন্দর মুখের উপর। এর আগে আগে যতবারই সে এখানে এসেছে, দেখেছে আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে রঙিণীকে। দুর্গা প্রতিমার মত টানাটানা চোখ, সে চোখে সমুদ্রের নীল তরঙ্গ। মাথায় দীর্ঘ ঘন চুল, সে চুলে অরণ্যের কালো অন্ধকার। মুখে তার মিষ্টি হাসি, সে হাসিতে কত রঙ্গভরা।

তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হ'ত না সব সময়। কোনরকমে তারই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছিল সওদাগর, এ-সব মামুলী মালা তোমার জন্যে নয়।

রুক্মিণী কথা বলেনি. চোখ দিয়ে হেসেছিল।

সওদাগর ভরসা পেয়ে বলে, এর পরের বার তোমার জন্যে আমি খুব ভাল জিনিষ নিয়ে আসব।

কথা মিথ্যে নয়, এবার সে সত্যিই রুক্মিণীর জন্যে নিয়ে এসেছে একছড়া মুক্তোর মালা। নৌকোয় শুয়ে শুয়ে কতরকম স্বপ্ন দেখেছে, কিভাবে সে মালা পরাবে রুক্মিণীর গলায়। কি কথা বলবে, উত্তর না দিলেও রুক্মিণীর চোখের ভাষা এবার সে নিশ্চয়ই পড়তে পারবে।

কিন্তু ঘাটে নেমে অবধি সওদাগর মেয়ে-গুলোর দিকে তন্ন তন্ন করে দেখেছে, সকলেই এসেছে, আসেনি শুধু রুক্মিণী, যাকে সে খুঁজছে। অন্য কারুর কাছে তার খবর নেওয়ার সাহস হয়নি সওদাগরের। কিন্তু মোড়লের আমন্ত্রণে সে এখানে থাকতে রাজী হয়েছে ঐ জন্যেই। জানে এখানে থাকলে রুক্মিণীর দেখা সে নিশ্চয় পাবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সওদাগর চুপচাপ বসেছিল বারান্দায়। ভাবছিল এই দেশটার কথা। সত্যিই সোনার দেশ, এখানকার চাষারা যাদু জানে। শস্যশ্যামল ক্ষেত, গোলাভরা ধান, অভাব বড় কম। চাহিদাও অল্প। এমন দেশে ব্যবসা করলে দেখতে হবে না, ভাল ভাল সোনা পাঠাতে পারবে দেশে, বৌ ছেলের কাছে। অন্ধকারে চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করে ওঠে।

মনে হল কে যেন আসছে, শোনা যাচ্ছে তার ভীরু পদধ্বনি।

—কে ওখানে?

—আমি। সাড়া দিল নারীকণ্ঠ।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রুক্মিণী। সওদাগর নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। সে চোখ ফেরাতে পারে না। আরও সুন্দরী হয়েছে রুক্মিণী, সারা অঙ্গ থেকে তার লাবণ্য ঝরে পড়ছে।

—তুমি যে আজ ঘাটে আসনি? সহজভাবে বলতে গিয়েও সওদাগরের গলা কেঁপে ওঠে।

রুক্মিণী হেসে উত্তর দেয়, তাইত এখন এলাম।

—তোমার জন্যে মুক্তোর মালা এনেছি যে।

—কৈ দেখি।

সওদাগর মালা এনে রুক্মিণীর হাতে দেয়। রুক্মিণী আনন্দে অধীর হয়ে পড়ে, বলে, কি সুন্দর, কত দাম এর?

সওদাগর হাসে, এর কোন দাম নেই।

—তাও কখন হয়, এমনি এমনি আমি নেব কেন?

—বাঃ, তোমার জন্য এনেছি, দাও তোমার গলায় পরিয়ে দিই।

রুক্মিণীর হাসি থেমে যায়। ব্যথাভরা গলায় বলে, তা হয় না সওদাগর।

—কেন হবে না রুক্মিণী।

—আমার বিয়ে হয়েছে, তাইত আমি ঘাটে যেতে পারিনি।

সওদাগর আকাশ থেকে পড়ে, ওঃ তাই। আমারই ভুল হয়েছে, ঘরে যাও, দেখ সে যেন না আবার রাগ করে।

রুক্মিণী হাসবার চেষ্টা করে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি।

—কিসের জন্যে?

রুক্মিণী মালাটা তুলে ধরে, বল কত দাম দিতে হবে?

সওদাগর, না, যে মালা উপহার দেব বলে নিয়ে এসেছিলাম, তা আমি বিক্রী করতে পারব না।

—তাহলে?

—যাবো তোমাদের বাড়ী, কর্তার সঙ্গে আলাপ করবো। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

রুক্মিণী ভয় পায়। দেখো, আবার বলে বোস না আমি এখানে এসেছিলাম।

—সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে।

—কর্তা তোমার কথা ঠিক শুনবে।

সওদাগর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কি করে বুঝলে?

রুক্মিণী মুচকি হাসি মারে, তোমার পান খেয়ে ও খুব খুসী হয়েছে। দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

শুধু যে রুক্মিণীর স্বামীকেই ঘুমে ধরেছে তাই নয়, দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল এ ঘুমের রোগ। বুড়ো, বুড়ি, ছোঁড়া, ছুঁড়ি, কেউ রেহাই পেল না। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল সারা দেশটা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গায়ের চামড়া তাদের মোটা হল, অনুভূতির শক্তি গেল ভোঁতা হয়ে।

সওদাগর এখন জাঁকিয়ে বসেছে, ফলাও হয়েছে তার ব্যবসা। পাড়ায় পাড়ায় সে দোকান দিয়েছে, জিনিষের জন্যে যাতে না দেশের লোককে কষ্ট পেতে হয়। আজকাল আর তাদের বাড়ীতে ঘি তৈরী করতে হয় না, দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সেইরকম দুধ, চিনি, চাল, সংসার চালাবার যাবতীয় সরঞ্জাম। যে যার জমি গরু ভাড়া দিয়েছে সওদাগরকে। দিব্যি আছে দেশের লোক, তাদের আর মেহনৎ করতে হয় না, ভাড়ার টাকা পায়, দোকানে গেলে জিনিষ পায়।

তার ওপর বিনাপয়সায় পান, যা সওদাগরের লোকেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিলি করে আসে।

এর চেয়ে সুখের দিন আর কি আছে?

মোড়ল আর আজকাল কাজের তদারক করে না, সময় কোথা তার? ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে তুড়ি মেরে, এক একদিন এসে বসে সওদাগরের গদিতে সেও শুধু খোস গল্প করার জন্যে।

সওদাগর অবশ্য মোড়লকে দেখলেই একগাল হেসে উঠে এসে অভ্যর্থনা করে, খাতির করে বসায়। বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি নিজে এই গরীবের কুঠিতে এসেছ। মোড়লের শুনতে ভাল লাগে, তবু মুখে বলে, কি যে বল সওদাগর, তুমি তো আমার ভাই-এর মত।

—এ তোমারই মহত্ত্বের পরিচয়।

—তা নয় সওদাগর ভাই, তুমি আসার পর থেকে এ-দেশের চেহারা বদলে গেছে। জীবন-যাত্রা কত সহজ হয়েছে। তোমার কাজ যত দেখি আমি অবাক হই।

সওদাগর মোড়লের কথা শুনে একেবারে গলে যায়, দু'খিলি পান এগিয়ে দিয়ে বলে, তোমাদের ভালবাসা পেয়েছি বলেই এত কাজ করতে পারছি। দেখছো তো রাতদিনই খাটছি।

—তা আর দেখছি না, সবাই আমরা তারিফ করি, তোমার কাজের তারিফ। উঠবার সময় মোড়ল কি যেন ভেবে জিজ্ঞেস করে, এখানে তোমার কাজের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? কোন সঙ্কোচ করো না সওদাগর ভাই, অসুবিধে হলেই জানিও।

সওদাগর কান খুজ্‌লি' করে।

তা দেখে মোড়ল জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবে?

সওদাগর মৃদু মৃদু হেসে বলে, কাজ করার মত লোক ঠিক পাচ্ছি না।

—কেন, ছেলে-ছোক্‌রারা কাজ করে না?

—করে মানে দেখ সে রকম 'দিল' লাগিয়ে করে না। তাতে আমার 'নুকসান' হয়। যদি 'হুঁসিয়ার' কাজের লোক পাই, জিনিষের দাম তো আরও কমিয়ে দিতে পারি।

মোড়ল চিন্তিত হয়ে পড়ে, তুমি কি বল সওদাগর ভাই!

সওদাগর দাঁত বের করে হাসে, যদি অনুমতি দাও, আমাদের 'মুলুক' থেকে কিছু কাজের লোক নিয়ে আসি।

—এই কথা বলার জন্যে তুমি 'কিন্তু কিন্তু' করছিলে? নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে, এ-দেশের লোক কুঁড়ে বলে কি কাজ বন্ধ থাকবে? যতজন খুশী তুমি নিয়ে এস।

সওদাগর প্রায় ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করে।

সওদাগর যেন ভেতরে ভেতরে তৈরী হয়েই ছিল। মোড়লের মুখের কথা বেরুতে না বেরুতেই আসতে সুরু করল সওদাগরের মুলুকের লোকেরা। নৌকার পর নৌকা বোঝাই লোক। এসেই তারা হুড়মুড় করে লেগে গেল কাজে। যে কারখানায় শুধু দিনের বেলা দরজা খুলত, সেখানে রাত্রেও চালু হল বিরাম-বিহীন কাজ। সুদক্ষ কর্মীদের প্রচন্ড মেহনতে তিন গুণ বেড়ে গেল উৎপাদন।

দেশবাসীর মুখে আর হাসি ধরে না। জিনিষপত্রের দাম আরও কমিয়ে দিয়েছে সওদাগর। তাদের আর খাটতেও হয় না, চিন্তাও করতে হয় না। তারা পান চিবোয় আর সুখে নিদ্রা দেয়। কিন্তু যাদের বাড়ী কারখানার কাছে তাদের একটু অসুবিধে হয় ঘুমের। সারা রাত ধরে শুনতে হয় ঠং, ঠং, খট খটাস শব্দ।

ঘুমুতে পারে না শুধু কর্মীরা, সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্যন্ত তাদের পরিশ্রম। এতটুকু জিরোবারও তাদের উপায় নেই, জানে সওদাগর-এর সতর্ক পাহারা তাদের উপর। রাতের অন্ধকারেই ঐ মানুষটা কাজ করার অমানুষিক শক্তি পায়। বাঘের মত তার চোখ দুটো জ্বলে। গর্জন করে সে সিংহের মতন কিন্তু বুদ্ধিতে সে ধূর্ত শেয়াল।

আর রাতের অন্ধকারে ঘাট থেকে ছাড়ে নৌকো। দেশের লোকেরা যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, সওদাগর তখন নৌকোয় মাল বোঝাই করে, রপ্তানীর মাল। ছইএর তলায় লুকোন থাকে ভাল ভাল সোনা। কেউ জানতেও পারে না, কেমন করে রাতের অন্ধকারে দেশের সম্পদ চলে যায় বিদেশে।

আর রাতের অন্ধকারে একজন আসে অভিসারে। সে রুক্মিণী। স্বামীকে সওদাগরের দেওয়া পান খাইয়ে, সযত্নে ঘুম পাড়িয়ে, সে আসে সওদাগরের কুঠিতে। নিজের আটপৌরে মামুলী পোষাক ছেড়ে রুক্মিণী এখানে এসে পরে মোহিনী বেশ, মসলিনের সূক্ষ্ম অঙ্গ-সজ্জা। এলো চুল খুলে দিয়ে সগর্বে দাঁড়ায় আয়নার সামনে, ঘুরে ফিরে সে নিজেকে দেখে। সওদাগর তাকে নতুন জীবন [illegible]। [illegible] যে

এত রূপ আছে তা সে নিজেই জানত না।

রঙ্গিণী তার রূপের শিখায় দগ্ধ করেছে সওদাগরের দুই পক্ষ। কামনার পক্ষ। পতঙ্গের মত সে এসে ঝাঁপ দেয় রঙ্গিণীর রূপের বহ্নিতে, নিস্তার পায় না, লুটিয়ে পড়ে তার পায়ের কাছে।

লাস্যময়ী রঙ্গিণী মস্করা করে, ওকি করছো?

—তোমাকে দেখে দেখে আমার আশ মেটে না রঙ্গিণী, তাইত প্রতিটি রাত্রে আমি অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি।

—তুমি বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বল সওদাগর।

সওদাগর রঙ্গিণীর হাতটা বুকের কাছে টেনে নেয়, শুধু তোমার জন্যেই তো আমি এই বন-বাদাড়ে পড়ে আছি।

—সত্যি বলছো?

—কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না!

রঙ্গিণীর বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়, বলে, তবে চল না সওদাগর আমাকে নিয়ে তোমার দেশে, এখানে থাকতে আর আমার ভালো লাগছে না।

সওদাগর হাসবার চেষ্টা করে, আমার দেশে, সেযে অনেক দূরে, তুমি সেখানে কি করে যাবে?

রঙ্গিণীর মনের উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে তার কথার মধ্যে, শুধু আমরা দুজন চলে যাব নৌকো চড়ে, রাতের অন্ধকারে এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে। কেউ জানতে পারবে না। সেখানে গিয়ে আমরা সংসার পাতবো।

সওদাগর প্রথমে কোন সাড়া দেয় না, পরে ইতস্ততঃ করে বলে তা হয় না রঙ্গিণী।

—কেন হয় না!

—সে তুমি বুঝতে পারবে না। এখনও সময় আসে নি। যদি কখনও আসে তোমায় নিয়ে যাব নিশ্চয়।

—রঙ্গিণীর ঠোঁটে খেলে যায় বিদ্রূপের হাসি, বুঝতে পেরেছি, আমায় নিয়ে ঘর বাঁধতে তুমি চাও না।

—না, না, তুমি আমায় ভুল বুঝেছ, তা আমি বলিনি রঙ্গিণী, সওদাগর লঘুছন্দে তার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, রঙ্গিণী তাকে কঠিন হাতে সরিয়ে দেয়, তেতো গলায় বলে, থাক ঢের হয়েছে।

সওদাগরের স্বরূপ চিনতে পেরেছে একজনই, সে রঙ্গিণী। কিন্তু কতটুকু শক্তি তার, কি করে সে তার মুখোস খুলে দেবে, কে তার কথা শুনবে, বিশ্বাস করবে? সবাই যে আজ ঘুমুচ্ছে। অসময়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গাতেও ভয় করে, যদি তারা ক্ষেপে যায়। রঙ্গিণীর নিজের পা-ও যে পিছলেছে, যদি তারা ক্ষমা না করে? নির্মম শাস্তি দেয়। তাই জেনে শুনেও মুখ খুলতে পারে না রঙ্গিণী, চুপটি করে বসে থাকে, আত্মগ্লানিতে ছট-ফট করে মরে, আর রাতের অন্ধকারে সওদাগরের কুঠিতে এসে অভিসারের অভিনয় করে।

হঠাৎ এক ঘটনা ঘটল এ দেশে। আশ্চর্য ঘটনা।

রঙ্গলালকে সাপে কামড়ালো। রঙ্গলাল মোড়লের ছেলে। প্রথম পক্ষের ছেলে। বছর তিরিশ বয়স। সন্ধ্যের মুখে মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ী ফিরছিল, সঙ্গে ছিল দু'চারজন বন্ধু। প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এক সাপ এসে তাকে কামড়ালো। বন্ধুরা প্রথম চোটে একটু হকচকিয়ে গেলেও, সাপটাকে তারা ছাড়েনি, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। মরা সাপটাকে দেখে তারা রঙ্গলালের জীবন সম্বন্ধে আরও শঙ্কিত হয়েছে। এ প্রচণ্ড বিষধর সাপ। কিন্তু আশ্চর্য রঙ্গলাল মরেনি।

প্রথমটা ভয় পেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু যখন তার জ্ঞান ফিরে এল সে সম্পূর্ণ সুস্থ। শরীরে কোনরকম গ্লানি নেই।

সাপে কামড়ানোর খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছিল সকলে, এসেছিল মোড়ল, এসেছিল সওদাগর। মেয়েরা পাল্লা দিয়ে কাঁদবার জন্যে তৈরীও হচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই উঠে বসল রঙ্গলাল, অবাক হয়ে দেখতে লাগল চারদিকের ভীড়।

মোড়ল কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করে এখন কেমন আছিস বাবা?

রঙ্গলালের বিস্ময় এখনও কাটেনি, আমার কি হয়েছিল?

মোড়ল মরা সাপটাকে দেখিয়ে দেয়।

রঙ্গলাল ভয় পেয়ে আবার চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমাকে সাপে কামড়েছে।

—কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না।

মোড়লের শীর্ণ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। এ মঙ্গলময়ের অপরিসীম করুণা। তা না হলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমার ছেলে বাঁচলো কি করে!

রঙ্গলাল আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরে আসে।

অবাক হয়ে সকলে তাকে দেখে। এ এক পরম বিস্ময়।

কিন্তু এই অবাক হওয়ার ঘোর কেটে গেল সকলের। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল রঙীন স্বপ্নের আমেজ, দু খিলি করে সওদাগরের পান মুখে পুরে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল, এমনকি মোড়লও।

শুধু অন্য দিনের মত ঘরে ঢুকতে পারলো না রঙ্গলাল। সবাই চলে যাবার পরও সে চুপচাপ বসে রইল। কিছুতেই সে বুঝতে পারলো না, বিষধর সাপের কামড়েও সে মরল না। কেন? কি করে সে এখনও বেঁচে আছে? কাপড় দিয়ে পা বাঁধতে হোল না, রোজা ডাকার দরকার হোল না, অথচ সে দিব্যি বেঁচে রইল, কি এর রহস্য?

রাতের অন্ধকারে রঙ্গলাল এসে দাঁড়ালো খোলা আকাশের নীচে। তার মনে আজ এক নতুন অনুভূতি। মনে হচ্ছে সে যেন নতুন জীবন পেয়েছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মনে হয় কতদিন বাদে সে আজ প্রাণভরে দেখছে আকাশ, দেখছে খোলা মাঠ, দেখছে প্রকৃতির বিস্ময় ভরা রূপ।

কিন্তু এ রূপ তো তার অপরিচিত নয়, আগেও সে দেখেছে। অনেকদিন আগে, যখন সে খেটে খেত, চাষবাস দেখতো, যখন জীবন এত সহজ ছিল না, যখন সওদাগর আসেনি এদেশে ব্যবসা করতে। তবে এতদিন সে কি করছিল। চার পাশের নিঃঝুম অন্ধকার বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে কি এদের মতই সে ঘুমিয়েছে! দিন নেই রাত নেই শুয়ে কাটিয়েছে, কিন্তু কেন? এমনতো সে আগে ছিল না।

—এতদিনে তোমার ঘুম ভেঙেছে রঙ্গলাল?

রঙ্গলাল চমকে ওঠে, কে কথা বলল? একি তার নিজের বিবেক!

সাপের দংশন তোমায় নির্বিষ করেছে রঙ্গলাল।

আবার সেই কণ্ঠস্বর। রঙ্গলাল এবার ভরসা করে এগিয়ে যায়, দেখে নীল নির্জন আকাশের নীচে একলা দাঁড়িয়ে রঙ্গিণী।

রঙ্গলালের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, এত রাতে একলা তুমি এখানে কি করছ রঙ্গিণী, কোথায় যাচ্ছ?

রঙ্গিণী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, এসেছিলাম তোমার কাছে।

—আমার কাছে, কেন?

—বলতে, জাগো অন্ধ জাগো।

—তুমি হেঁয়ালী করে কি বলছো রঙ্গিণী আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

রঙ্গিণী কঠিন স্বরে বলে, তাইত তোমাকে অন্ধ বলছি রঙ্গলাল, বুঝতে পারছো না দিনের পর দিন তোমাদের অল্প অল্প করে বি[illegible] খাওয়ানো হয়েছে, যাতে তোমাদের বুদ্ধি ন[illegible] হয়ে যায়। বি[illegible] ঘুমিয়ে পড়ে, হয়েছেও তা[illegible] দেখতে পাচ্ছো না বিষাক্ত শরীরে সবাই ঘুমু[illegible]

সাপের কামড়ে তোমার চেতনা ফিরে এ[illegible] একেই বলে বিষে বিষক্ষয়।

রঙ্গলালের শরীর কেঁপে ওঠে, এসব কথা তুমি কি করে জানলে?

রঙ্গিণী হাসে, আমি তো বিষ খাইনি, সওদাগর যে পানের সঙ্গে মৌতাত মেশায় তা আমি জানতাম। একটু থেমে বলে, তোমার সামনে এখন অনেক কাজ। একটা নেশাখোর জাতকে তোমায় জাগাতে হবে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলের কানের কাছে গিয়ে চীৎকার করে বলতে হবে, "জাগো অন্ধ জাগো।"

সেই দিন রাত্রি থেকেই সুরু হল কিসের যেন কানাকানি। রাতের অন্ধকারে কারা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে, বোঝা যায় না তারা কি বলছে, শুধু মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে একটা সতর্কবাণী, "জাগো অন্ধ জাগো।" সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে তার প্রতিধ্বনি ওঠে, আকাশে বাতাসে কিসের যেন সঙ্কেত। যে বুঝতে পারে এ সঙ্কেতের গোপন অর্থ, সে এক অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। যে বোঝে না তারও মনে শান্তি নেই, নির্বোধ পশুর মত কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে বোঝবার প্রয়াস পায়, এ অশান্ত আক্ষেপ কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছে।

সিঁদুরে মেঘ দেখে যে সকলের আগেই বুঝতে পেরেছিল দুর্দিন সমাগত, সে আর কেউ নয় স্বয়ং সওদাগর। নিজেই গেল সে মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মোড়ল তখন সবেমাত্র চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে, সওদাগরকে আসতে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কি ব্যাপার ভাই, খবর না দিয়ে নিজেই এসে পড়লে।

সওদাগর বিষণ্ণ হাসে, কি করবো বল, গরজ বড় বালাই।

—একটু খুলেই বল না।

—আকাশের অবস্থা খুব ভালো ঠেকছে না, মনে হচ্ছে ঝড় উঠ্‌লো বলে।'

মোড়ল সত্যি সত্যিই আকাশের দিকে তাকায়।

সওদাগর বিরক্তি গোপন করতে পারে না, মৃদু ধমক দিয়ে ওঠে, ও আকাশ নয়, বলছি তোমার দেশের কথা।

মোড়ল আরও ধাঁধায় পড়ে,—আমি তো কিছুই আজ বুঝতে পারছি না।

—যখন বুঝতে পারবে তখন আর তুমি মোড়ল থাকবে না।

—তার মানে।

—তোমাকে ওরা গদি থেকে সরাতে চাইছে।

—কারা ?

সওদাগর চট করে উত্তর দেয় না, বলে, শুনলে তুমি কষ্ট পাবে।

মোড়লের জিদ চেপে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে, না, না, বল, আমি শুনতে চাই।

সওদাগর বিষ ওগ্‌ড়ানো গলায় বলে, রঙ্গলাল।

—রঙ্গলাল! না, না, তা হতে পারে না। সে আমার ছেলে, আমার অনুগত।

—হয়ত ছিল, কিন্তু এখন নেই, ওর মাথায় কেউ দুষ্টু বুদ্ধি ঢুকিয়েছে। বুঝিয়েছে তুমি আবার বিয়ে করেছো, ওকে হয়ত কিছুই দিয়ে যাবে না, তাই লোকজনকে উল্টো-পাল্টা মিথ্যে কথা বলে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

মোড়ল মুখ গোঁজ করে কথাগুলো শোনে।

—কি ভাবছো মোড়ল ?

মোড়ল দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয়, তুমি ঘরে যাও সওদাগর ভাই, আমি এদিকের খবর করছি, এটুকু জেনে রেখ রঙ্গলাল যদি অন্যায় করে থাকে, আমার ছেলে বলে সে নিস্তার পাবে না।

খোঁজ খবর বিশেষ কিছু করতে হ'ল না মোড়লকে, দুচার জনের সঙ্গে আলাপ করতেই বুঝতে পারলো সওদাগর একেবারে মনগড়া কথা বলেনি। সত্যিই রঙ্গলাল বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোকজনকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করেছে। এক-নাগাড়ে নিজের কথা সে শুনিয়ে যায়। কেউ যদি প্রতিবাদ করতে আসে কিম্বা কোন কথা বলে, রঙ্গলাল তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করে বলে, জাগো অন্ধ জাগো। এমনি করে কিছু ছেলে-মেয়েকেও সে নাকি নিজের দলে ঢুকিয়েছে।

শুনেই গা পিত্তি জ্বলে গেল মোড়লের। বাড়ী ফিরে গুম্ হয়ে বসে রইল। খেলো না, শুলোনা, সে দেখবে কখন আজ রঙ্গলাল বাড়ী ঢোকে।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে রাতের অন্ধকারে বাড়ীতে এসে রঙ্গলাল বাবাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হল, তুমি এখনও জেগে আছ!

মোড়ল দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, তোমার জন্যে বসে আছি।

—বল।

—এ সব কি শুনছি, তুমি লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছ, কি চাও তুমি ?

রঙ্গলাল দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয়, তাদের ঘুম ভাঙাতে।

—আমার অনুমতি নেওয়ারও দরকার মনে করলে না ?

—তুমিও যে ঘুমুচ্ছিলে।

মোড়ল চোখ দুটো ছোট করে বলে, তোমার মতলব বুঝতে আর আমার বাকী নেই।

রঙ্গলাল হাসে, তুমি বুঝতে পারলেই ত আমার ছুটি! মোড়ল কিন্তু হাসে না, প্রয়োজন হলে তারই ব্যবস্থা আমি করবো।

মোড়লের হুমকিতে ভয় পেল না রঙ্গলাল। রাতের অন্ধকারে আবার সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ওর জন্যে রঙ্গিণী দাঁড়িয়ে থাকবে ঘাটের কাছে, সেখান থেকে ওরা দুজনে মিলে যাবে সেই সব বাড়ীতে যেখানে আলো জ্বালিয়ে বসে আছে তরুণ তরুণীরা, তাদের কথা শোনবার জন্যে। রঙ্গলালরা তাদের পরামর্শ দেবে, আন্দোলনের কথা বোঝাবে, তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে বলবে, "জাগো অন্ধ জাগো।"

মোড়লও কিন্তু আজ ঘুমোয়নি। সেই রাতের অন্ধকারে সেও বেরিয়েছে, সোজা গিয়ে উঠেছে সওদাগরের কুঠিতে। সওদাগর তাকে দেখে চমকালো না, যেন সে জানতোই মোড়ল তার কাছে আসবে। মনে হল তারই জন্যে সে অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করল, কি মোড়ল, আমার কথা বিশ্বাস হল ?

মোড়ল গজরাতে থাকে, এতদিন দুধ কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছি।

—তা না হলে নিজের ছেলে হয়েও রঙ্গলাল তোমার ক্ষতি করতে চায় ?

—ও একটা শয়তান।

সওদাগর মোড়লের কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে, এটা কিন্তু তুমি খাঁটি কথা বলেছ, ও শয়তানই, তোমার আদরের রঙ্গলাল নয়।

মোড়ল ঠিক কথাটা বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকায়, কি বলছ তুমি ?

সওদাগর ক্রুর হাসে, সত্যি কথা, তোমার রঙ্গলাল সাপের কামড়ে মরেছে, তার মৃতদেহ-টাকে আশ্রয় করেছে কোন শয়তানের প্রেতাত্মা।

—এও কি সত্যি হয় ?

—নইলে কোন ছেলে কি আর বাপের সর্বনাশ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে ?

মোড়ল উঠে পড়ে পায়চারী করে, ঘন ঘন মাথা নাড়িয়ে বলে, ওকে নিয়ে আমি কি যে করব বুঝতে পারছি না।

সওদাগর বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে, রঙ্গলালের মায়া ত্যাগ কর। তুমি মোড়ল হয়ে শয়তানের অনুচরকে বাঁচিয়ে রাখতে পার না, এতে অন্যায় হবে।

—তুমি কি বল সওদাগর ভাই!

সওদাগর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মোড়লকে নিরীক্ষণ করে, আমি যা বলব, তুমি তা করতে পারবে ?

উত্তর দিতে গিয়ে মোড়লের গলা কেঁপে ওঠে, কোন রকমে বলে, পারব।

—রাজদ্রোহের অপরাধে দেশবাসীর সামনে ঐ শয়তানের অনুচরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার হুকুম দাও।

—এ তুমি কি বলছ সওদাগর!

সওদাগর শকুনির মত হাসে, তা না হলে তোমায় গদী হারাতে হবে।

সওদাগরের কাছে হ্যাঁ না কোন উত্তর দিয়ে না এলেও মোড়ল মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেল্‌লে। দু একদিনের মধ্যেই ঢ্যাঁড়া পড়ে গেল সারা দেশে, মোড়লের ছেলে রঙ্গলালকে শয়তানে পেয়েছে। দেশ আর দেশবাসীর কল্যাণের জন্যে মোড়ল হুকুম দিয়েছে রঙ্গলালকে পুড়িয়ে মারবার। বাজারের মধ্যে মাচা বাঁধা হয়েছে, সেইখানেই আগুন লাগিয়ে রঙ্গলালকে পোড়ান হবে। সকলে যেন এসে নিজের চোখে দেখে শয়তানের অনুচর হওয়ার কি নির্মম শাস্তি। যেন বোঝে মোড়ল বৃদ্ধ হলেও এখনও সে কতখানি কর্তব্যনিষ্ঠ, যেন উপলব্ধি করে পুত্রস্নেহের চেয়েও মোড়লের দেশপ্রেম কত উঁচু, কত মহৎ।

নির্দিষ্ট দিনে হাজার হাজার লোক এসে জমা হল বাজারের মধ্যে। সকলের মনেই চাপা উত্তেজনা। রঙ্গলালকে যারা শয়তানের অনুচর বলে মেনে নিয়েছে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে আগুনের তীব্র শিখা রঙ্গলালের দেহটাকে গ্রাস করবে। কিভাবে আর্তনাদ করতে করতে শয়তান সেখান থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু যারা রঙ্গ-লালকে ভালবেসেছিল, বুঝতে চেষ্টা করে-ছিল তার মনের কথা, তারা অনুভব করছে এক অব্যক্ত বেদনা। তবু তারা এসেছে নিজের চোখে দেখতে চায় এ অত্যাচারের শেষ কোথায়। সেই সঙ্গে এসেছে মোড়ল। এসেছে সওদাগর, এসেছে আরও সম্ভ্রান্ত লোকেরা, এসেছে মেয়েরা, দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফ্যাকাশে মুখে। এসেছে রঙ্গিণী, কিন্তু নিভয়, নিঃশঙ্ক তার চাহনি।

রঙ্গলালকে দুজন লোক ধরে এনে মাচার ওপর বেঁধে দিল। সেও নির্ভয়। সেই উঁচু মাচার ওপর থেকে রঙ্গলাল শুধু চীৎকার করে বলল, "জাগো অন্ধ জাগো"। সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি তুলল রঙ্গিণী। আশ্চর্য হয়ে দেখল মোড়ল, দেখল সওদাগর, সেই বিপুল জনতার মধ্যে থেকেও কারা যেন রঙ্গলালের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে 'জাগো অন্ধ জাগো।'

চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কাঠের মঞ্চ জ্বলছে, জ্বলছে রঙ্গলাল, কিন্তু তারই মধ্যে থেকে তার ধীর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, 'জাগো অন্ধ জাগো।'

কোথা থেকে এল এক ঝলক পাগলা হাওয়া, আগুনের হল্‌কা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিল গাছের শাখায়, পল্লীর কুটিরে, মানুষের অন্তরে। আগুন, আগুন, চারদিকে সে এক ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। আগুনের কি বিপুল সমারোহ, কি ভয়বিহ্বল তার মূর্তি!

সওদাগরের লোকেরা প্রথম চোটে চেষ্টা করেছিল আগুন নেভাবার, বাল্‌তি বালতি জল ছুঁড়েছিল আগুনের ওপর। কিন্তু ক্রমশঃ তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল।

'রঙ্গিণীর দল তখনও একনাগাড়ে চীৎকার করে যাচ্ছে, 'জাগো অন্ধ জাগো।'

সত্যি অন্ধরা জাগল। আগুনের আলোয় তারা ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি। এতদিনের পুঞ্জী-

(শেষাংশ ৩২০ পৃষ্ঠায়)

ট্রামটা এসে স্টপেজে দাঁড়াতেই ফার্স্ট ক্লাস লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লো দীপ্তি ভাদুড়ী। রোদের তেজে ইতি-মধ্যেই পথের পিচ গলতে সুরু করেছে। পায়ের স্লিপার বার বার আটকে যাচ্ছিল; এতক্ষণে তা থেকে কিছুটা মুক্তি পেলো সে। কিন্তু অফিসের এ্যাটেণ্ডেন্সে আজ লেট-মার্কটা অবধারিত। সকাল থেকে আজ কি যেন কি হয়েছে, আদৌ ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না; কিন্তু হোস্টেলের দুপুরের নিঃসঙ্গ শূন্যতা আরও অসহ্য। যে ক'টি মেয়ে তাদের পার্ক লেডিস হোস্টেলে থাকে, তারা সবাই কোনো না কোনো অফিসে চাকরী করে। ন'টার পর কেউ আর ঘরে থাকে না, দরজায়-দরজায় তখন ইন্টার-লক প'ড়তে সুরু করে। সারা বাড়িটা আগলাবার জন্যে থাকে শুধু রাঁধুনী কালীর মা। এই পরিবেশে খাঁ-খাঁ দুপুরটা ঘরে ব'সে কাটানো কঠিন। ইচ্ছে না থাকলেও তাই বেরোতে হয়। অফিসের পরিবেশটা স্বতন্ত্র, সেখানে ফাইলের চাপে আর লোকের ভিড়ে দেখতে দেখতে কখন যে পাঁচটা বেজে যায় লক্ষ্যই থাকে না। কাজের চাপে মন-ভোলা সময়টা আপনি থেকেই কখন এক-দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে গড়িয়ে যায়। তাই তো দীপ্তি অনেক চেষ্টা ক'রে তবে অফিসে জয়েন করেছে। ইণ্ডিয়ান সিরামিক্সের কাজ, দু'জন দু'জন ক'রে পাঞ্জাবী আর সিন্ধীতে পার্টনার। প্রথম দিন এসে পুরুষদের মধ্যে একা একা কাজে ব'সতে কেমন বাধো-বাধো লাগছিল, ইতিমধ্যে নতুন এক লেডি টাইপিস্ট এসে জয়েন করায় মনের সেই জড়তা অনেকটা কাটলো দীপ্তির। সে যদি সারা অফিসের স্টাফের মধ্যেও একা মেয়ে হতো, তবু তাকে এ জড়তা কাটিয়ে দশটা-পাঁচটা ডিউটি করতে হ'তো। এতে তার ক্লান্তি নেই; যদি দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা এমনি করে খাটতে পারতো, তাতেও বোধ করি ক্লান্তি ছিল না দীপ্তির; কিন্তু কাজশূন্য মুহূর্তগুলো বড় দুঃসহ। সেই মুহূর্ত-গুলোকে বড় ভয় করে সে—যেমন ভয় করে হোস্টেলের দুপুরের নিঃসঙ্গ শূন্যতাকে। এ সব মুহূর্তে কেবলই মনে হয়—শ্বাস রুদ্ধ হয়ে সে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে, অথচ মৃত্যু এসে তাকে চৈতন্যলোক থেকে অবচেতনার তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে না। নিয়ে গেলে সে বাঁচতো, প্রতি মুহূর্তের স্মৃতিদংশন থেকে বেঁচে যেতো সে। তাই তো কাজের মধ্যে ডুবে থেকে মৃত্যুর মতই নিজেকে অবলুপ্ত করে রাখতে চায় দীপ্তি। কিন্তু তাই বা পারে কই? হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে যেমন বিকৃত ঝঙ্কারে সেতারটা আছড়ে পড়ে, মাঝে মাঝে তেমনি সেই মৃত্যুলোক ভেদ করে স্মৃতির তারটা মনের মধ্যে আচমকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। তখন কোথায় কাজের ফাইল প'ড়ে থাকে, তা তার নিজেরই খেয়াল থাকে না,—পেনের নিবে কালি শুকিয়ে যায়, আপন মনে ব'সে ব'সে ভাবে দীপ্তি, ভাবে আর অস্থির হয়ে ওঠে নিজের মধ্যে।

অফিসে টিফিন গড়িয়ে যাবার পর আজ বুঝি তেমনি ক'রে আবার সে নিজের অলক্ষ্যেই কখন চিন্তার জটিল জালে জড়িয়ে গেল। মনে পড়লো সেই দিনগুলির কথা, যখন সে বালিকা ছিল। পাশের চাটুজ্জে বাড়ির লোটন ছিল তার বন্ধু। স্কুলেও দু'জনে একই ক্লাসে পড়তো। লোটনের দাদা শিবেন ছিল প্রতিবেশী ছেলেদের লিডার। সবাই তাকে ভয় করতো, এমন কি লোটনও। কিন্তু সেই ভয়টা সে কিছুতেই দীপ্তির মনে ঢোকাতে পারেনি। সেবার কাল-বৈশাখী সুরু হ'তেই দু'দিন খুব শিলা বৃষ্টি হলো। দীপ্তি বললোঃ 'সামনের মল্লিকদের গাছে একটাও আর আম নেই। এত ঝড়ে বোঁটায় কি আর আম থাকে? শিবুদাকে বল্ না কিছু কুড়িয়ে আনতে, কাসুন্দি মেখে খেতে কি মজাটাই লাগবে!'

সঙ্গে সঙ্গে লোটনের চোখ দু'টো কপালে উঠে গেল। বললোঃ 'দাদাকে আমি বলবো আম কুড়িয়ে আনতে? ও আম এ গলা দিয়ে নামলে তো?'

বাগ্‌ডাঁসার মতো চোখ দুটো বড় বড় করে দীপ্তি ব'ললোঃ 'আচ্ছা ভীতু তো তুই! শিবুদা বাঘ না ভালুক যে, ভয়ে একটা কথা অবধি বলতে পারিসনে!'

লোটন নিজেও জানে না—কেন সে দাদাকে এত ভয় পায়? মনে হয়—এই বুঝি একটা চড় কষিয়ে দিল কিম্বা চুলের মুঠো ধরে কান দুটো মলে দিল! তেমনি ভয়ে-ভয়েই ফিস্‌ফিস্ করে সে ব'ললোঃ 'তুই নিজে গিয়েই বলনা! বাঘ না ভালুক—অমনি সে পরিচয়টাও পেয়ে আস্‌বি!'

জিভ ভেংচে দীপ্তি বললো ঃ 'আরে শিবুদা যদি আম কুড়িয়ে এনে দেয়, তবে?'

--'তবে কি?' চোখ দু'টো হঠাৎ বুঝি মুহূর্তের জন্যে একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো লোটনের!

ঠোঁটের কোণে হাসি গোপন ক'রে দীপ্তি বললোঃ 'তবে কাসুন্দি দিয়ে আম মেখে তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো; জিভ গড়িয়ে জল প'ড়ে তোর ফ্রক ভিজে গেলেও একটুকরো পাবিনে।'

—'চাইনে তোর আমমাথা।' বলে ছুটে পালাচ্ছিল লোটন।

দীপ্তি বললোঃ 'আমি খাবো আর শিবুদা খাবে, বুঝলি?'

যেতে যেতে দীপ্তির মুখের দিকে একবার ফিরে তাকালো লোটন, তারপর কোথায় এক-দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আম কিন্তু শিবেনকে দিয়ে ঠিকই আনালো দীপ্তি। ঘরের ফ্লাওয়ার ভাসে দু'টো টাট্‌কা গোলাপ ছিল; তা থেকে একটা তুলে নিয়ে শিবেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, ব'ললোঃ 'তুমি নিশ্চয়ই গোলাপ খুব ভালোবাসো, তোমার জন্যে তাই গোলাপ নিয়ে এলাম শিবুদা।'

খুসীতে শিবেনের চোখ দুটো চক্-চক্ ক'রে উঠলো, বললোঃ 'বাঃ, ভারী চমৎকার

গোলাপ তো, ভেরী সুইট।' ব'লে নিজের হাতে টেনে নিয়ে দীপ্তির মুখের দিকে চোখ দুটো তুলে ধরে ছোট্ট করে শিবেন ব'ললোঃ কিন্তু তুই গোলাপের চাইতেও লাভলি, মোর সুইট।'

অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলো না দীপ্তি, বুঝবার মতো বয়স হয়নি, তাই কথা শুনে শিবেনের মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল সে।

বুঝতে পেরে শিবেন ব'ললো : 'ইংরেজী ভাওয়েল আর কনসোনেন্ট বুঝি এখনও পড়তে সুরু করিসনি? বলছিলাম কি—গোলাপটা তো সুন্দরই, কিন্তু তার চাইতেও সুন্দরী আর মিষ্টি তুই। তা—তোকে কি দিই, বলতো?'

শেষ কথাটার জবাবটা সংগে সংগেই দিতে পারতো দীপ্তি, কিন্তু তার আগের কথাটা তার মনের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করে তুললো! তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে যখন দেখলো—সকালের সূর্য ক্রমেই মাথার উপর উঠে আসছে, তখন সে কোনো রকম দ্বিধা না করেই আমের কথাটা ব'লে ফেললো।

আর কাজটা যেন প্রায় ইলেকট্রিকে হয়ে গেল।

হেসে দীপ্তি বললোঃ 'লোটন তোমাকে ভীষণ ভয় করে, তাই না শিবুদা?'

মিষ্টি মিষ্টি হেসে শিবেন বললোঃ 'লোটন বুঝি তাই বলে?'

'—বলে না, তবে বুঝতে পারি।' বলে দীপ্তিও ঠোঁটের পাশে হাসি গোপন করে নিলো।

কাসুন্দি দিয়ে সত্যিই যখন আমমাখা হলো, তার ভাগ থেকে কিন্তু লোটন বাদ গেল না। দীপ্তি বললোঃ 'কিরে, দেখলি তো শিবুদা কি রকম আমার কথা শোনে!'

উত্তরে কিছু একটাও না বলে একটুকরো আম মুখে পুরে জিভ আর তালুতে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে নিঃশব্দে দীপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লোটন, তারপর দাদাকে হঠাৎ চোখে পড়তেই ভোঁ ক'রে এক দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

হাসিতে ফেটে প'ড়তে চাইল দীপ্তি।

আজ তার সে হাসি কোথায়? কেমন ক'রে আজ সে-হাসি তার নিভে গেল?

এক গাদা কাজ যে টেবলের উপর জমে আছে, এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য ছিল না দীপ্তির। কখন যে সেই দূর বিস্মৃত দিনগুলির মধ্যে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল ছিল না তার। হঠাৎ টেবলের সামনে সিনিয়ার এ্যাসিস্টেন্ট মিঃ বসাককে চোখে প'ড়তেই সম্বিত ফিরে পেয়ে হাতের কাছে একটা ফাইল টেনে নিয়ে বসলো সে।

মিঃ বসাক ব'ললেনঃ 'দেখে যেন আপনাকে আজ খুব সুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে না মিস ভাদুড়ী! শরীর খারাপ করেনি তো?'

উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্তি বললো : 'না স্যার সুস্থই তো আছি!'

মিঃ বসাক বললেনঃ 'লাইসেন্সের ফাইলটা বোধ করি আপনার কাছে! একবারটি যদি ফাইলটা নিয়ে আমার ঘরে আসেন, ভালো হয়।'

সংগে সংগে ফাইলটা বার ক'রে মিঃ বসাকের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলো দীপ্তি। রিনিউয়াল লেটার-ইসুর ইন্সট্রাকশন নিয়ে যখন সে আবার নিজের সিটে ফিরে এলো, ঘড়ির কাঁটায় তখন তিনটে চল্লিশ। চিঠি তৈরী করে টাইপরাইটারকে পাঠিয়ে দিতে দিতে আরও কুড়ি মিনিট কেটে গেল। ইচ্ছে করলো না আর নতুন করে কোনো ফাইলে হাত দিতে। হাত দিয়েও কাজ হবে না। চারটের পর এমপ্লয়িদের মন আর চেয়ার-টেবলে থাকে না, দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে গোলামী জীবনের অবসান ঘটাতে চায় তখন। অফিসাররাও পাঁচটার পর কেউ চেম্বারে থাকেন না, বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের কারুর সংগে দীপ্তির মেলে না। সে কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়; কিন্তু অফিসে যাদের সংগে কাজ, তারা যদি চারটের পর থেকেই কাজে ঢিলে দেয়, তবে দীপ্তিই বা একা ফাইল নিয়ে ব'সে থেকে কি করতে পারে? বাধ্য হয়ে তাকেও কাজে ঢিলে দিতে হয়। কোনো কোনো দিন হয়তো এর ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু তা অফিসের ওয়ার্কিং ডে'র গুণতির মধ্যে আসে না। এলে বেঁচে যেতো দীপ্তি, নিজেকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু থেকে সে বাঁচতো।

—ভাবতে গিয়ে আবার কখন নিজের মধ্যে হারিয়ে গেল সে।

সে আর লোটন তখন কৈশোর ছাড়িয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। শিবেন তখন সিক্সথ ইয়ারের মেডিকেল ছাত্র। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলো। লোটন তখন আর দাদাকে একটুও ভয় করে না, ছোটবেলায় ভয়ের কথা মনে হলেই ফিক ক'রে হেসে ফেলে, বলেঃ 'কেন যে মিছেমিছি অমনি ক'রে ভয় করতাম, কি জানি, নইলে দাদাকে দিয়ে অনেক কাজ গুছিয়ে নিতে পারতাম।'

দীপ্তি বললোঃ 'এবারে শিবুদাকে দিয়ে তুই একটা ভালো বর জুটিয়ে নে। ক'লকাতার মেডিকেল ছাত্র, কত ভালো ভালো ছেলে শিবুদার বন্ধু; এখানকার এই পলাশডাঙ্গায় তোকে আর তবে মুখ থুবরে প'ড়ে থাকতে হবে না; বাইরের আকাশ পেয়ে ডানা মেলতে পারবি।'

মুখ টিপে হেসে লোটন বললো : 'আমার কথাটা তো আর মুখ ফুটে দাদাকে ব'লতে পারবো না, তোর কথাটাই বলি। কিন্তু তাতেই বা সুবিধের কি হবে? দাদার নিজেরই যে তোকে ভীষণ পছন্দ। বলে—দীপ্তির মতো সুইট আর লাভলি মেয়ে হয় না। বললাম, 'তবে ওকে আমার বৌদি করে ঘরে আনোনা দাদা।' শুনে দাদা একটুকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,—'সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, এখুনি তা কি করে হয়?'

শুনে বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিল দীপ্তি। সেই ছোটবেলা থেকে শিবুদাকেও যে তার বড় পছন্দ! সেই প্রথম যেদিন শিবুদা তাকে সুইট আর লাভলি বলেছিল, অর্থ না বুঝেও কেমন একটা অজানা তৃপ্তিতে সারা বুকখানি তার ভরে উঠেছিল। আজ আবার লোটন সেই শব্দ দুটোরই পুনরাবৃত্তি করে তার মনের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিল। কি ব'লে যে লোটনের কথার সে জবাব দেবে বুঝে উঠলো না।

একটুকাল থেমে পুনরায় লোটন বললোঃ 'কিরে, শুনে তোর আর তর সইছে না, তাই নারে?'

লোটনের চোখের দিকে নিজের চোখ দুটোকে এবারে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তুলে ধরে দীপ্তি ব'ললোঃ 'যাঃ, ভারী অসভ্য তুই; বড্ড বাজে ব'কতে পারিস।'

দু' হাতে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে এবারে হাসতে হাসতে লোটন ব'ললো, 'সত্যি বল না ভাই, তা হ'লে কেমন হয়! বৌদি হলেও তোকে তো আর বৌদি ব'লে ডাকতে পারবো না, নাম ধরেই ডাকবো। কিন্তু দাদার তা আপত্তি হবে না। ভারী মজা হবে, তাই নারে?'

যেন এখনই সব পাকাপাকি হয়ে গেল। যেন এইমাত্র শিবেন টোপর মাথায় এসে হাত ধরে দীপ্তিকে নিয়ে তাদের ঘরে গিয়ে উঠলো! তবু আশা বড় বালাই। মনে মনে দীপ্তি বললোঃ 'তাই যেন হয়, এমন একটা মজার দিন যেন সত্যিই লোটন পায়; তবে নিজে টাকা খরচা করে লোটনের গলায় সে চেন পরিয়ে দেবে।'

এরপর তার যত সম্বন্ধ এসেছে জোর করে ফিরিয়ে দিয়েছে দীপ্তি। বাবা অনেককাল আগেই চোখ বুজেছেন, নইলে চটে যেতেন মা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চোখের জল ফেলেছেন, তবু দীপ্তি কোনো বর-কর্তার সামনে গিয়ে পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীর মতো আনত নেত্রে প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে বসেনি। তার পরিবর্তে ইউনিভার্সিটির সিলেবাস ঘেঁটে ঘেঁটে একসময় সে বি-এ পাশ করে গেজেটে নাম তুললো।

ততদিনে আরও অন্ততঃ বার দুয়েক শিবেন এসে পলাশডাঙ্গায় এক সপ্তাহ করে কাটিয়ে গেছে। শেষবার এসে লোটনকে সে আর দেখতে পায়নি, তার আগেই তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। জরুরী টেলিগ্রাম পেয়েও বোনের বিয়েতে শিবেন আসতে পারে নি। পরীক্ষার চাপ ছিল। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে দীপ্তির কানে কানে লোটন বলে গেল : 'আমি তো আর থাকতে পারলুম না, দাদাকে আমি চিঠি দিয়েছি; এবারে বাড়ি এলে তুই যেন তার সংগে সব পাকাপাকি করে নিস!

যা কোনোদিনই সম্ভব নয়, লোটন তারই ইংগিত করে গেল। শিবুদাকে মুখ ফুটে দীপ্তি নিজের কথা বলবে? একথা কি লোটনকেই সে কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পেরেছে? —শিবেন পলাশডাঙ্গায় এসে আবার কলকাতায় ফিরে গেল। যাবার আগে জানালায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ একবার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তার সংগে, বললো : 'শুনলাম্‌ তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছ, ভেরী হ্যাপি নিউজ; এবারে কি এম এ পড়বে, না আর কিছু?'

—আর কিছু অর্থে কি বল্‌তে চাইল শিবেন বোঝা গেল না; বুঝতে চাইলও না দীপ্তি, উত্তরে শুধু বললো : 'ভাবচি কি করবো?'

শিবেন বললো : 'খবর দিও, সুখী হবো। এখন তো আর লোটন নেই যে জানাবে, তুমি নিজেই লিখে জানিও।'

উত্তরে দীপ্তি কিছু একটা বলবার আগেই চোখের আড়াল হয়ে গেল শিবেন। শুধু লেখাপড়ার কথাটই জিজ্ঞেস করে গেল সে; আর কিছু নয়। অথচ অনেক কথাই তো বলে যেতে পারতো সে, বলতে পারতোঃ হাউ সুইট এ্যাণ্ড লাভ্‌লি ইউ আর! ঐ কথাটুকু শুনবার জন্যে যে উৎকর্ণ হয়ে ছিল সে! তার ইংগিতটুকু অবধি রেখে গেল না সে। বড় দুঃখ হলো, বড় অভিমান হলো দীপ্তির। ক্রমে সে ভুললো—

[illegible] এম বি বি-এস পাশ করে মেডিকেল কলেজে এটেন্ডিং ফিজিশিয়ান হিসেবে জয়েন করেছে। যদি সময়মতো জানতে পারতো, তবে তাকে গ্র্যাজুয়েট হবার কথা জিজ্ঞেস করার আগেই শিবুদাকে সে কনগ্র্যাচুলেট করতো। সেই সুযোগটুকু অবধি সে পেলো না। কিন্তু তার চাইতেও বড় ঘটনা যেটা, তা শুনবার আগে কান দুটো কেন বধির হলো না দীপ্তির? শুনলো—সামনের মাঘে লাইলী বাগচীর সঙ্গে তার বিয়ে। লাইলী শিবেনের সঙ্গেই পাশ করে বেরিয়েছে। ক্লাসে প্রফেসরের চোখ এড়িয়ে যে প্রেমের সুরু, এবারে চার চোখের মিলনে আর চার হাতের বন্ধনে সে প্রেমের পূর্ণতা। একটি নারীর সৌভাগ্যের কথা ভাবতে গেলে আনন্দের শেষ থাকে না, কিন্তু দীপ্তির অদৃষ্ট নিয়ে নিয়তির এই অদ্ভুত পরিহাস কেন? কাকে সে এ প্রশ্ন করবে? লোটনকে? কিন্তু তারই বা আজ এ প্রশ্নের জবাব দেবার সময় কোথায়? সে নিজেও যে আজ স্বামী-সোহাগে সন্তানসম্ভবা! তার জগৎ দীপ্তির জগৎ থেকে আজ একেবারেই সরে গেছে। লোটন আজ স্ত্রী, কাল সে জননী হবে। আর দীপ্তি?

আর ভাবতে পারলো না সে। সেই কখন থেকে মাথাটা যেন বড় ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িতে সাড়ে চারটের বেল পড়তেই খানিকটা সচকিত হয়ে বসলো দীপ্তি। চোখে পড়লো যে চিঠিটা ইতিপূর্বে সে টাইপে পাঠিয়েছিল, কখন এসে বেয়ারা যেন তার টাইপ্ট কপি টেবলের উপর চাপা দিয়ে রেখে গেছে! একটুও টের পায়নি দীপ্তি। টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা মিঃ বসাককে দিয়ে সই করিয়ে ডেচ্‌পাচে পাঠিয়ে দিতে পারতো সে। সাড়ে চারটের পর ডেচ্‌পাচ আর নতুন কোনো চিঠি এন্ট্রি করে না। তাড়াতাড়ি টাইপ হওয়া সত্ত্বেও চিঠিটার ডেচ্‌পাচে একদিন দেরী হয়ে গেল। হয়তো এই নিয়ে মিঃ বসাক কাল কথা শোনাতে পারেন। কিন্তু উপায় কি!

জীবনের কোনো দিকেই যেমন কোনো দিন উপায় ছিল না, আজও কোনো কাজেই তেমনি নেই। সেদিন বুক ফেটে বড় কান্না পেয়েছিল দীপ্তির—যেদিন শিবেন সম্পর্কে তার সব কথা জানা হয়ে গিয়েছিল। মাকে গিয়ে বলেছিল : 'আমি কলকাতায় হোস্টেলে থেকে এম এ পড়বো ঠিক করেছি; এখানে তোমার একা থাকতে অসুবিধে হবে না তো?' মা শুধু বলেছিলেন : 'তোর বিয়ে হলেও তো আমি একাই থাক্‌তাম, এখনও একাই থাকবো।'

কিন্তু বিয়ে হলে মাকে অনায়াসে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে পারতো দীপ্তি; কলকাতার হোস্টেলে তা সম্ভব নয়। অথচ এম এ না পড়ে এভাবে চুপচাপ বসে থেকেই বা করবে কি সে?

ভাবতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যেই আবার কখন ভাবনার জালে জড়িয়ে গেল দীপ্তি। এম্‌প্লয়িরা অনেকেই যে তখন একে একে টেবল্‌ গুছিয়ে উঠতে সুরু করেছে, সে দিকে চোখ গেল না তার।

—এম-এ পড়তেই সেদিন কলকাতার হোস্টেলে এসে উঠলো দীপ্তি, তারপর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এ্যাডমিশন নিয়ে এলো। মাকে অভয় দিয়ে চিঠি দিল পলাশডাঙ্গায়—কিছু যেন না ভাবে মা, সামনের ছুটিতেই তো সে আবার বাড়ি যাচ্ছে।

কিন্তু ছুটির দিন যখন এগিয়ে এলো, পলাশডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্যে মনটা তখন আর তৈরী নেই দীপ্তির। ক্লাসের এত ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিপুল চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকাতে যেতেই হঠাৎ কেমন চম্‌কে উঠেছিল দীপ্তি! অবিকল শিবেনের মতো চেহারা। সেই নাক, সেই চোখ, সেই ভ্রূ, শুধু চুলগুলো একটু বিসদৃশ। কিন্তু কে জানতো—সেই মুহূর্তে দীপ্তির চোখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হেসে ফেললো বিপুল। একেই কি দার্শনিকেরা বলেছেন—লভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট! এক মুহূর্তে মনে মনে অনেক কিছু ভেবে ফেললো দীপ্তি। ভাবতে ভাবতে ক্লাসের পর যখন হোস্টেলের পথে পা বাড়ালো সে, দেখলো—ফাঁকা রাস্তায় সামনে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে বিপুল, বললো : 'আপনার দুচোখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। আপনার সঙ্গে সেধে সেধেই কেন যেন আলাপ করতে ইচ্ছে হলো! আপনি কিছু মাইন্ড করলেন না তো?'

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে দীপ্তি বললো : 'না, না, মাইন্ড করবো কেন; আমরা একই সঙ্গে পড়ছি, এতে মাইন্ড করবার কি আছে। আপনাকে দেখে অবধি আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছিল—খুব পরিচিত চেহারা, এর আগে অনেকবার দেখেছি, অথচ কোথায়, মনে নেই।'

বিপুল বললো : 'হয়তো পথে, সিনেমা হলে কিম্বা কোনোদিন কোনো কফি হাউসে!'

তার মুখের দিকে পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে দীপ্তি বললো : 'শেষের দুটোর কোনো যায়গাতেই নয়, কারণ ও দুটো যায়গা সম্পর্কে আমি একেবারেই অভ্যস্ত নই।'

—'তা হলে পথ চলতেই হয়তো ঘাসফুলে দেখে থাকবেন!' কথাটা বলে বিপুলও এবারে চোখ দুটো কেমন পিট্‌পিট্‌ করে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গেই দীপ্তি বললো : 'না, না, তা কেন, টগর কিম্বা গন্ধরাজও তো হতে পারে!'

উপলব্ধির আতিশয্যে বিপুল কিন্তু থেমে রইল না, বললো, 'তা হলে সে-ফুলে এতদিন ভ্রমরার আলাপ চল্‌তো।'

হেসে এবারে দীপ্তি বললো : 'আপনি কিন্তু সত্যিই ভারী সুন্দর করে বলতে পারেন; আপনার মতো ছাত্রদের সত্যিই আর্টস নিয়ে পড়া সার্থক।'

—'আর আপনার মতো ছাত্রীর বুঝি শুধু কমার্শিয়াল জিওগ্রাফী?' বলে হো-হো করে হেসে উঠলো বিপুল, তারপর হাসির বেগ থামিয়ে বললো : 'যদি ঘরে ফেরার টানটা বড় না হয়, তবে চলুন না খানিকক্ষণ ময়দান দিয়ে ঘুরে আসি!'

একটু কাল কি ভেবে নিয়ে দীপ্তি বললো : 'হোস্টেলে দেরী করে ফেরায় অসুবিধা আছে। তার চাইতে চলুন না, হোস্টেলের ভিজিটার্স রুমে বসে চা খাবো আর গল্প করবো!'

কিন্তু এ প্রস্তাবে কেন যেন সাড়া দিতে পারলো না বিপুল, বললো : 'আজ থাক, অন্য কোনোদিন যাবো, গিয়ে অনেকক্ষণ বসে গল্প করবো। আজ বরং চলি।'

মুখ ফুটে দীপ্তি কেন যেন বল্‌তে পারলো না—'আসুন', শুধু নীরবে বিপুলের মুখের দিকে চোখ দুটো তুলে ধরলো। সেই চোখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এক সময় নিজের পথ ধরলো বিপুল।

কিন্তু এখানেই যদি বিপুলের পর্ব শেষ হতো, তবে হয়তো ভালো ছিল। কিন্তু তা হলো না। শিবেনের ছায়া আছে বিপুলের মধ্যে; তাই সে যখন এর পরেও নিজে থেকে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে নিল, তখন তাকে অবজ্ঞায় ফিরিয়ে দিতে পারলো না দীপ্তি। একদিন তারা সত্যিই ময়দানে বেড়াতে গেল, ময়দান থেকে আউটরাম ঘাট, তারপর ইডেন-গার্ডেন ক্রশ করে চৌরঙ্গীতে এসে চায়ের কেবিনে বসলো দু'জনে। এ যেন পূর্বজন্মের অঙ্গীকার ছিল, এজন্মে তাই সে অঙ্গীকার রক্ষা না করে, শান্তি নেই!

বিপুল বললো, 'এম-এ'র ক্লাস তো দেখতে দেখতে একদিন আমাদের ফুরিয়ে যাবে, তখন কে কোথায় থাকবো, কে জানে!'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে দীপ্তি এবারে কাপটাকে নামিয়ে রাখলো।

একটুকাল থেমে বিপুল পুনরায় বললো : 'আচ্ছা, এমন হয় না—চিরদিন আমরা খুব কাছাকাছি থেকে গেলাম! মাঝে মাঝে আজকের ক্লাসগুলোর কথা আলোচনা করে তখন আমরা গত দিনগুলোর স্বপ্ন দেখে আনন্দ পাবো!'

চায়ের কাপটাকে এবারে এক চুমুকে নিঃশেষ করে শান্ত কণ্ঠে দীপ্তি বললো : 'পৃথিবীতে হয় না বা হতে পারে না—এমন কিছুও কি আছে!'

—'সত্যিই নেই।' উৎসাহ বোধ করে বিপুল বললো : আর নেই, বলেই সংসারে আমার মতো ছোট প্রাণীরা আশা নিয়ে বাঁচে।'

—'তুমি-মানে—' হঠাৎ বুঝি জিভে একটা কামড় বসে গেল দীপ্তির, সঙ্গে সঙ্গেই শব্দটাকে সংশোধন করে সে বললো : 'আপনি ছোট? প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে আপনার তো তবে খুব ধারণা আছে দেখ্‌ছি!'

নিজের অলক্ষ্যেই হঠাৎ বিপুল বলে ফেললো : 'তোমার কাছাকাছি থাকতে পারলে ভাবছি ধারণাটা আপনি থেকেই পাল্টাবে।'

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ বয় এসে মসলার ডিসে বিল রেখে গেল। ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দিতে যাচ্ছিল দীপ্তি, তার হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পকেট থেকে একখানি পাঁচ টাকার নোট বার করে ডিসের উপর রাখলো বিপুল, বললো, 'এটা আমার দেয়, সুতরাং পাগ্‌লামি চলবে না।'

দীপ্তি বললো, 'আমার কাছে খুচরা থাকতে অমন বড় নোটটাকে এখুনি ভাঙ্গাবার এমন কি দরকার ছিল?'

—'জীবনে কখন্‌ যে কোন্‌টা দরকার, তা আমরা নিজেরাই জানি না।' সিট ছেড়ে উঠে পড়ে বিপুল বললো : 'যেমন দেরী হয়ে গেল, আজ যদি হোস্টেলে ঢুকতে না দেয়, তবে কি করবে?'

মুখ টিপে হেসে দীপ্তি বললো : 'কোথাও কোনো রোয়াকে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করেই না হয় রাতটা কাটিয়ে দেবো।'

এরপর কতদিন যে এমনি ভাবে গল্প করে কেটেছে, আজ ভাবতে গেলে তা বিস্ময় বলে বোধ হয়। সামারের ছুটিটা সেবার বিপুলের সঙ্গেই কেটে গেল। মাকে চিঠি দিয়ে জানালো—পড়ার চাপে এখন কলকাতা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, মা যেন এজন্যে দুঃখ না করে। কিন্তু

ভিতরে ভিতরে মার শরীর যে ক্রমেই ভেঙেগ পড়ছিল, একথা জান্‌তো না দীপ্তি। তা নিয়ে মাও কখনও বিব্রত করেন নি তাকে।

এমনি করেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা দিয়ে যেন আবার একটা ঝড় বয়ে গেল।

হোস্টেলে সেদিন কে একজন আগন্তুকের স্লিপ পেয়ে ভিজিটার্স রুমে এসে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে দু'চোখ ভরে গেল দীপ্তির। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে শিবেন। বললো : 'বাড়ি গিয়ে মাসীমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। কিন্তু তুমি কি আশ্চর্য মেয়ে, বলোতো?'

—'কি রকম?'

—'তুমি তো জানতে—আমি এখানে মেডিকেল কলেজের এ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান, ফোন করেও তো একবার খোঁজ নিতে পারতে!'

মৃদু কণ্ঠে দীপ্তি বললো : 'ভেবেছিলাম—বিয়ে করে বৌদিকে নিয়ে কোথাও হয়তো ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছ, তাই—'

—'বিয়ে করে বৌদিকে নিয়ে মানে কি? শিবেন বললো, 'গুড গড, তুমি হয়তো তবে লাইলীর কথা শুনেছিলে, সে তো গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস নিয়ে সেই কবেই কলকাতার বাইরে চলে গেছে! তাদের ফ্যামিলির খুব ইচ্ছে ছিল—যাতে আমি লাইলীকে এ্যাকসেপ্ট করি, কিন্তু লাইলী তা এ্যাপ্রুভ করেনি।'

খুসীর ঝঙ্কার নয়, দীপ্তির নিজের কাছেই মনে হলো—কথা শুনে তার কণ্ঠ থেকে একটা আহত স্বর বেরিয়ে এলো : 'ও—!'

একটু দম নিয়ে পুনরায় শিবেন বললো : 'জানো দীপ্তি, এবারে ঠিক করেছি—বিয়ে করে আমি সংসারী হবো। লোটনের খুব ইচ্ছে ছিল—তোমাকে যাতে সে বৌদি করে পায়। তা—তুমি যদি—'

সমুদ্রে ঢেউ জাগলে যেমন হয়, দীপ্তির বুকখানি এবারে বোধকরি তার চাইতেও বেশী উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। লক্ষ্যে পড়লো—ভুলে এতক্ষণ শিবেনকে সে বসতে পর্যন্ত বলেনি, বলবার মতো অবকাশটুকু পর্যন্ত পায়নি সে। তার কথায় যে সাড়া দেবে, তারই বা অবকাশ কোথায় আজ তার জীবনে? একদিন যে তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে নতুন ডাঙ্গায় এসে হাত বাড়ালো সে, সে হাতে নতুন দিনের স্পর্শ বুলিয়ে দিল বিপুল। বিপুলের মধ্যে শিবেনকেই বুঝি সে নতুন করে পেয়েছে! তাকে হেলায় ফিরিয়ে দিয়ে আর কি ফিরে যাওয়া যায় শিবেনের জীবনে?—ভাবতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল দীপ্তি।

শিবেন বললো : 'তোমাকে পেলে আমি যে সুখী হবো, একথা লোটন জানে; জানে বলেই—'

আর শুনতে পারছিল না দীপ্তি। নিজেকে নিয়ে আর যুদ্ধ করতেও পারছিল না। হঠাৎ সে বলে উঠলো : 'লোটনকে জানিয়ে দিও, আমি তাতে সুখী হবো না: তুমি আমাকে ক্ষমা করো শিবুদা।'

শুনে হঠাৎ বুঝি দু'পা সরে গিয়ে দরজার চৌকাঠের উপর উঠে দাঁড়ালো শিবেন। বললো : 'আমি কি এতই অযোগ্য দীপ্তি?'

—'ছিঃ, তুমি কেন অযোগ্য হবে! এম-বি ডাক্তার তুমি, বাংলাদেশ তোমার কত দাম হাত বাড়ালেই মনের মতো পাত্রী পাবে, সেই সঙ্গে মোটা যৌতুকও পাবে বৈ কি!' থেমে দীপ্তি বললো : 'আর আমি? সামান্য গ্রাজুয়েট, আমার কি দাম আছে সংসারে! তুমি আমার অপরাধ নিও না শিবুদা!'

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ পিছন থেকে যেন একটা ছায়ামূর্তি উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। ছায়াই তো, বিপুল তো শিবেনেরই ছায়া মাত্র। তার কাছেও তবে আজ এক্সপোজড হয়ে গেল দীপ্তি? একদিন যাকে নিজে থেকে ভিজিটার্স রুমে ডেকে এনে চা অফার করতে পারে নি, আজ সে নিজে থেকে কোন্ দিগন্তের কাল-বৈশাখী ডেকে নিয়ে এগিয়ে এলো?

দুজনেই হঠাৎ যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো বিপুলের সামনে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে দীপ্তি বললো : 'এস, তোমার সঙ্গে শিবুদার আলাপ করিয়ে দিই বিপুল। আমার বন্ধু লোটনের দাদা, সেদিক থেকে শিবুদা আমারও দাদা। আর বিপুল হচ্ছে আমার ক্লাস-মেট, ভীষণ ইনটেলিজেন্ট, ক্লাসের সব্বাই ওকে তাই খুব হিংসে করে।'

হাত তুলে শিবেনকে নমস্কার জানালো বিপুল।

শিবেন বললো : 'ভারী খুসী হলাম পরিচয় পেয়ে, কিন্তু দু'দণ্ড অপেক্ষা করে যে গল্প করবো, তার আর অবকাশ নেই; হাসপাতালে গিয়ে আমাকে আবার পেসেন্ট এ্যাটেন্ড করতে হবে। আমি চলি।' বলে এক মিনিটও আর অপেক্ষা না করে গট্‌গট্ করে সোজা পথে নেমে গেল শিবেন।

হয়তো সেই পথের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখতে যাচ্ছিল দীপ্তি, কিন্তু বিপুলের কথায় বাধা পেলো।

বিপুল বললো : 'উনি হয়তো আমাকে দেখেই এমনি করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, নইলে আরও দু'দণ্ড অপেক্ষা করে তোমার উপযুক্ত মূল্যটা তোমার উপর আরোপ করে তোমার শেষ মতামতটা নিয়েই তবে যেতে পারতেন।'

এতটা আশঙ্কা করে নি দীপ্তি, শুনে কোথায় যেন তার ব্যক্তিত্বে বড় আঘাত লাগলো। সহ্য করতে পারলো না কথাটা, এমন কি ভবিষ্যতের দিক তাকিয়েও না। চাপা কণ্ঠের উপর কেমন একটা জোর দিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠলো : 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ ইন্টারফেয়ার করে, তা আমি সহ্য করতে পারিনে। ছিঃ বিপুল।'

—'মানে?' খানিকটা বুঝি অবাক হলো বিপুল, সেই সঙ্গে কিছুটা আহতও হলো বৈ কি! বললো : 'তুমি তবে আমাদের এই প্রতিদিনের সম্পর্কটা উড়িয়ে দিয়ে তোমাকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাচ্ছো?'

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ভিজিটার্স রুমে এতক্ষণ আর কোনো মেয়ে এসে কারুর জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিল না।

তবু কণ্ঠস্বরকে যতখানি সম্ভব খাদে নামিয়ে এনে দীপ্তি বললো, 'কোন্ সম্পর্কের কথা তুমি বলতে চাচ্ছো বিপুল? তুমি আমি ক্লাস-মেট, এর বাইরে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই, আর কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। যদি আর কিছু ভেবে থাকো, তবে ভুল করেছ, আর কোনো সম্পর্ক নিয়ে কোনোদিনই আমরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো না।'

কথা শেষ করতে গিয়ে দু'চোখ ফেটে জল এলো দীপ্তির। ভাবলো বৌদির [illegible] এ সে কি বলল [illegible] বিপুলকে? কি বললো, তা সে নিজে। দীপ্তি নিজেই কি এতদিন বিপুলকে একান্ত করে চায়নি? যদি না চাইবে, তবে বিপুলকে নিয়ে নিজেই কি এতদিন যে স্বপ্ন দেখেছে? [illegible] ঘুরিয়ে নেয় সে, কিন্তু তাকিয়ে দেখলো বিপুল চলে গেছে। দীপ্তি জানে—আর তাকে খুঁজে পাবে না, এমন কি ক্লাসে গিয়ে অথচ তার দিকে চোখ তুলে তাকানো যাবে না। এমন করে প্রতিদিন সে ক্লাসেই বা যাবে কি করে? এ সে কি করলো?

নিজের ললাটে একবার করাঘাত করলো দীপ্তি। ভাবলো—আর একদণ্ডও নয়, আজই সে শেষ ট্রেন ধরে পলাশডাঙ্গায় চলে যাবে: থাক্ পড়ে পড়াশুনো, থাক্ পড়ে কলকাতা সহর।

পলাশডাঙ্গাতেই রওনা হয়ে পড়লো সে। এসে দেখ্‌লো—নির্জন শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে মা। অনেক কষ্টে একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো : 'তুই এলি, বাঁচলাম, এবারে আমার ছুটি।' বলে সেই যে চোখ বুজলো, আর সে চোখ খুললো না।

ভাবতে গিয়ে সেদিনের মতো আজ বুঝি আর একবার দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো দীপ্তির দু চোখ বেয়ে। সেই দুঃসময়ে সেদিন যখন তার কোনোদিকেই কোনো পথ খোলা ছিল না, তখন সংশয় জেগেছিল একবার নিজেকে নিয়ে। তারপর মনটাকে স্থির করে ফেল্‌লো। শিবেন নয়, বিপুল নয়, নিজের অধিকারে একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আর চাকরী চাই—যার মধ্যে দিন-রাত নিজেকে নিয়ে ডুবে থাকতে পারে সে। তার জন্যে আবার যে তাকে এমন করে অদৃষ্ট কলকাতায় টেনে আনবে, ভাবতে পারে নি সে। সেই পথ, সেই ফুটপাথ, কিন্তু অন্যদিন, অন্য পরিবেশ।

সামান্য চেষ্টাতেই চাকরীটা হয়ে গেল: একটা সিটও জুটে গেল পার্ক লেডিস হোস্টেলে। আজ তারই মধ্যে দিনরাত বিঘূর্ণিত হয়ে নিজের মধ্যে নিজে মাথা কুটে মরছে দীপ্তি। কখনও খোলা জানালার পাশে বসে আজও কি মনে পড়ে না শিবেন আর বিপুলকে? মনে পড়ে। আজ যদি শিবেন এসে আবার তার সামনে দাঁড়ায়, আবার যদি সেই ছোটবেলার মতো তেমনি সুরে বলে : 'তুই গোলাপের চাইতেও লাভ্‌লি, মোর সুইট।' তবে বুঝি তাকে আর ভুল বুঝে মিথ্যে আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া চলে না! কিন্তু—

হঠাৎ দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটার বেল বেজে গেল। একটা দুঃস্বপ্ন থেকে বুঝি এতক্ষণে জেগে উঠলো দীপ্তি। তাকিয়ে দেখলো—সামনের চেয়ার টেবিল সব ফাঁকা। যে মাদ্রাজি লেজার-কিপার প্রতিদিন সব চাইতে দেরী করে যায়, আজ সেও কখন দপ্তর গুটিয়ে চলে গেছে। আর বোধ করি টেবিল আগ্‌লে বসে থাকা শোভন নয়।

অবসন্ন দেহটাকে কোনোভাবে টেনে নিয়ে এবারে উঠে পড়লো দীপ্তি, তারপর ঝিঁঝি-ধরা পা দুটোকে সোজা সিঁড়ির দিকে বাড়িয়ে দিল।

—

তারে চিনিতে পারিনি

(৩০৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অজস্র পাহাড়ী ফুল অপরূপ বর্ণচ্ছটা নিয়ে দু পাশে ছড়িয়ে আছে। সরু বেণীর মত ঝর্ণা এধার ওধার থেকে নেমে এসে কাঁপতে কাঁপতে ঝোপঝাড়ের ভিতর মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচের থেকে কখনও আসছে চাবাগানের ভ্যান, কি মানুষবাহী গাড়ী, কি মালবাহী ট্রাক। কখনও পাশ দিয়ে বেগে ছুটে গিয়ে বাঁকের মুখে নেমে হারিয়ে যাচ্ছে তারা।

হঠাৎ সামনে বাঁকের কোলে হলুদ আভা একটা ফুটে উঠল। ফুলের রং নয়, নয় ভিজে মেঘে সূর্যের আলো, ট্রাক বা গাড়ীর রঙীন দেহও নয়। কিন্তু গভীর উজ্জ্বল হলুদ রং। কোথায় তার উৎস, কিসের উদ্দেশ্যেই বা তা সামনে এগিয়ে আসছে—কি করে বুঝব? মেঘের ছায়ায় আর বৃষ্টির ঝাপটায় অন্ধকার দেখছি তখন।

আমরাও এগোচ্ছি, সেই হলুদ রেখাও এগিয়ে আসছে। আরও কাছাকাছি এলাম থেমে যেতে হোলো তখন—একদল মানুষ, মাথায় ছাতা হলুদ পোষাকে ঢাকা শরীর। চোখের সামনে এল যখন দলটা, তখন দাঁড়ালাম এক পাশে সরে। ভিক্ষুর দল। মুণ্ডিত মস্তক। কারো হাতে দণ্ড আছে। কারো গলায় ঝোলানো ঝোলা। সাত আট জন হবেন।

অদূরের বৌদ্ধ বিহারের কথা মনে পড়ে গেল। সেখান থেকেই আসছেন বোধ হয় এ'রা। এই বৃষ্টিতে ভিজলে আর যাব না ঘুম পর্যন্ত, এখানে দাঁড়িয়েই দেখি। দেখি ভিক্ষুণীরাও কেউ আছেন নাকি দলে।

একজন দুজন করে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পার্বত্য চেহারা অধিকাংশের। এক-জনের দেখলাম অত্যধিক ফর্সা রং—ইউরোপীয় গড়ন মুখের—সেই দেশেরই মানুষ বোধহয়। ভিক্ষুণীরা আসছেন শেষে। মাথায় চূড়া করা, গলায় জপের মালা, পায়ে কাপড়ের জুতো।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি। আড়াই হাজার বছর যেন মনটা পিছিয়ে গেল। কোন রাজকন্যা শ্রেষ্ঠীকন্যা এ'রা! কার নামে কার চিন্তায় কার আকর্ষণে সব ছেড়ে সব পাওয়ার মন্ত্র জেনে নিয়েছেন এ'রা। সকলেরই দেহে বলিষ্ঠ তারুণ্য অন্তরে প্রোজ্জ্বল ত্যাগদীপ্তি. মাথা নুইয়ে আসে।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন যেন যুক্ত করেছি হাত দুখানা। নীচু করেছি মাথা। চমক ভাঙাল একটি মধুর নিঃশব্দ হাসির স্পর্শে; যে হাসি দিয়ে আমায় সিঞ্চন করলেন—দলের সর্বশেষ ভিক্ষুণীটি। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলে উঁচু চূড়া, সোনালী দেহটি ঘিরে হলুদ রং আলখাল্লা, হিমালয়ের আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ঘুরে অরণ্যের কোল বেয়ে কোন অজানার রাজ্যে চলেছেন। সর্ব অবয়বে আগুনের দীপ্তশিখা, চোখদুটিতে করুণার স্নিগ্ধ মন্দাকিনী। জোড়কর। হাতদুটো কপালে ঠেকালাম।

দলটা নজর পেরিয়ে আর একটা বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল যখন—সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল আমার। পাশে যিনি ছিলেন ধরে ফেল্লেন আমায়।

"কি হোলো?"

"ও কে?"

"ভিক্ষুণী তো!"

"না না!"

"কি না না?"

"ওকে ডেকে আনি।"

"কাকে?"

"অনন্যা রায়কে!"

"কে অনন্যা রায়?"

তাইতো! কে অনন্যা? অন্যতে ওর কি প্রয়োজন? ও যে আপনাতে আপনি পরিপূর্ণা। অলোকসামান্যা ও যে তথাগতপ্রাণা!

ভুল জেনে গেছেন অমরেশবাবু। মিটিংএর সেই মাঝবয়সী ভদ্রলোকটির জন্য আর কোনো কৌতূহল রইল না মনে।

চিরন্তনী

বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখে মেখে কতোদিনের আলো
আকাশ-জোড়া ম্যাপের পুবে মেঘের মহাদেশে
মুখ বাড়ালো কে সে?
আকাশ তবু মিথ্যে কেন তারার প্রদীপ জ্বালো।
কাজল নদীর বাঁকে দেখি গাছের পাতার ফাঁকে
জন্মাবধি দেখে আসার 'প্রাচী'-র প্রাচীনাকে:
কতোকালের বলীরেখায় মুখ গিয়েছে ফেটে
ক্লান্ত, ও যে ক্লান্ত মহাবৃত্ত পথে হেঁটে।
'তোমায় সখি'...ক্ষণোদ্ভাসে হঠাৎ উঠি বলে—
আজো ভালো বাসতে পারি একাকিনী হ'লে।
মুখের রেখা মুছে এসো আনো নতুন আলো,
নতুন হাসি হাসতে শেখো বাসবো তবে ভালো।
পুরনো সেই স্মৃতির মাঠে, পুরোনো সাঁঝ আসে—
গত দিনের হাওয়ায় ভেসে কাজল নদীর পাশে।
'কোথায় পাবো? আমার যে গো পুরনো সম্বল।'
ফিসফিসিয়ে আদিকালের চাঁদের বুড়ী কয়।
সেকালিনী আপন মনে শেখা হাসিই হাসে
স্মৃতি ব'লে যা বুঝি তা' পুরনো বিস্ময়।

জাগো অন্ধ জাগো—

(৩১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভূত নেশার ঘোর গেল নিমেষের মধ্যে কেটে. তারা দেখল মঞ্চের ওপর যে পুড়ছে সে রঙগ-লাল নয়। তার মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে মহা-পুরুষের মূর্তি। যিনি তাদেরই উদ্ধারের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল তাদের জড়তা। এতদিন রঙগলাল তাদের যা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, যা তারা বুঝতে পারেনি, আজ সব কিছুই তাদের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল।

রঙগলাল নেই কিন্তু রঙিগণী আছে। তাকে সঙ্গ নিয়ে উন্মত্ত জনতা ছুটলো সওদাগরের কুঠির দিকে। সেখানে তাকে পেল না। পেল না তার কারখানায়। ঘাটের কাছে এসে দেখতে পেলো দূরে ভেসে যাচ্ছে পালতোলা নৌকো। বুঝলো সওদাগর তার দল-বল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেগেছে দেখে সামনা-সামনি দাঁড়াবার সাহস হলো না তার।

রঙগলাল পুড়লো আগুনে। মোড়ল পুড়লো চিন্তায়। আত্মগ্লানি তাকে গলা টিপে শেষ করে দিল।

শুধু জেগে উঠলো এখানকার ঘুমিয়ে পড়া মানুষগুলো।

এমনি করেই একটা পুরোন জাত জাগে, নতুন জীবন পায়।

রংয়ের বাহার—বেশভূষায়

(৩০৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আগেই উল্লেখ করেছি শাড়ীর সঙ্গে জামার রং সর্বদাই মানিয়ে পরবার চেষ্টা করবেন। সকলের এইভাবে রং মিলিয়ে পরা সম্ভব না হলে, কালো, সোনালী, গাঢ় লাল বা মেরুণ সাদা, ঘোর সবুজ এই কয়টি রংয়ের ব্লাউস তৈরী করে রাখলে সব শাড়ীর সঙ্গে দরকার হলে পরতে পারবেন।

সবশেষে একটা কথা বলছি, হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তা হলো শুধু বাইরে বেরুতে হলেই যে সুরুচিসম্পন্ন পোষাক পরিচ্ছদ পরা উচিত এবং বাড়ীতে এসে যে কোনো ভাবে থাকলেই হলো, এ যেন কেউ মনে না করেন। বাড়ীতেও যতটা সম্ভব সংযত এবং সুরুচিপূর্ণ বেশভূষায় থাকা উচিত। বাড়ীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করতে পারলে বাইরের প্রশংসার কোনো মানেই হয় না। শুধু ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি নয়, সমাজের এবং সকলের সুখ শান্তিও বহুলাংশে এর উপর নির্ভর করে।

হেডলাইন ও গল্প-চিত্রণ : কালী-কিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র বল, সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর মৈত্র, অহিভূষণ মল্লিক, মৈত্রেয়ী দেবী, শ্যামদুলাল কুণ্ডু ও রঞ্জন দাস।

সম্পাদক—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকা প্রেস, ১২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত।